আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

সম্পাদক—

কবিরাজ শ্রীবিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ

" শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম,-এ এম,-বি।

সহঃ সম্পাদক—কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন।

প্রথম বর্ষ।

(১৩২৩ আশ্বিন হইতে ১৩২৪ ভাদ্র)।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩্ টাকা মাশুল ।৶০ আনা।

২৯ নং ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে

শ্রীহারপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন দ্বারা প্রকাশিত।

প্রথম বর্ষের সূচী।

(বর্ণমালানুসারে)

আয়ুর্ব্বেদ।

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

১ম বর্ষ। বঙ্গাব্দ ১৩২৩—আশ্বিন। ১ম সংখ্যা।

মাঙ্গলিক।

নমঃ শঙ্কর! চন্দ্র-শেখর!
ভবসিন্ধুর কর্ণধার!
ইহ সংসারে— বর্ণিতে পারে—
মহিমা তোমার সাধ্য কার?
মৃত্যুঞ্জয়! মঙ্গলময়!
ইচ্ছায় হয় সৃষ্টি ও লয়!
মুক্তি ভিখারী— ব্রহ্মা মুরারি—
ও চরণে ঢালে অর্ঘ্যভার!
নমঃ শঙ্কর! চন্দ্রশেখর!
ভব সিন্ধুর কর্ণধার!
শিরেতে গঙ্গা— কল-তরঙ্গা,
শিঙ্গ ডমরু শোভিত কর!
স্কন্ধে উরসে— ভৈরব রসে—
গর্জ্জে ভীষণ ভুজঙ্গবর!
পিশাচ সঙ্গে, ভ্রমণ রঙ্গে,
ভ্রূকুটি-ভঙ্গী ভয়ঙ্কর!
পিঙ্গল কেশ, সন্ন্যাসি-বেশ,
পরেশ! মহেশ! দিগম্বর!
নেত্র-অনলে- বিদ্যুৎ জ্বলে,
কোটি মন্মথ ভস্মছার,
চন্দ্র-মৌলি! শম্ভো! ত্রিশূলী!
বক্ষো-ভূষণ অস্থিহার,
নিঃস্বের গতি! বিশ্বের পতি!
কর্ণে ধুতুরা কর্ণিকার,
নন্দী-শরণ! বন্দি চরণ—
লওহে দীনের নমস্কার

সূচনা।

জীবন ক্ষুদ্র, মৃত্যু বিরাট; জীবন মুহূর্ত, মৃত্যু অনন্তকাল, জীবন দিবস, মৃত্যু রজনী: জীবন চঞ্চল, মৃত্যু স্থির; জীবন সুন্দর, মৃত্যু ভয়ানক, জীবন সঙ্কীর্ণ, মৃত্যু প্রশস্ত; জীবন প্রত্যক্ষ, মৃত্যু অদৃষ্ট, জীবন জীবের সেবা করে, মৃত্যু জীবকে গ্রাস করে।

এই যে জীবন মৃত্যুর আশ্লেষ-বিশ্লেষ—ইহারই নাম "আয়ুর্ব্বেদ"! সংসারে জন্মমৃত্যুর ঘনিষ্ঠ কুটুম্বিতা বুঝাইবার জন্য, অতীতের এক মঙ্গল মুহূর্ত্তে—ভারতে "আয়ুর্ব্বেদের" সৃষ্টি হইয়াছিল। নিয়ম ভঙ্গে, সংযম ভঙ্গে, আদি-দম্পতির উপেক্ষিত বংশধর যখন ব্যসন-জাত রোগ-তাড়নায় দাব-দগ্ধ কুরঙ্গের মত ছুটাছুটি করিতেছিল,—তখন এই "আয়ুর্ব্বেদ"ই স্নেহ-ময়ী জননীর ন্যায় হতভাগ্য মানব সন্তানকে কোলে তুলিয়া লইয়াছিল!

আমাদের যাহা কিছু আছে, সকলেরই সীমা—মৃত্যু; মৃত্যু অনন্ত জীবনকে খণ্ড করে, অবিভাজ্য মহাকালকে ভগ্নাংশে বিভক্ত করে। মৃত্যুর নামে মানুষ ভয় পায়, মৃত্যুকে পরাভব করিতে না পারিলে, মানুষের উপ-ভোগমধুর পার্থিব সুখ চরিতার্থ হয় না। মৃত্যুকে সাধ্যমত দূরে রাখিবার জন্য মানুষ দীর্ঘ জীবন কামনা করে। ভক্ত আরাধ্য-দেবতার কাছে অমর বর চায়—ইহার অধিক সে আর চাহিতে জানে না। তাই অমরত্ব লোভে বহু যুগব্যাপিনী তপস্যার কথায় আমাদের পুরাণের বহু অধ্যায়—হিরণ্ময়। ভারতের "আয়ুর্ব্বেদ" সেই তপস্যার চরম ফল।

মৃত্যু—বীচি-বিক্ষোভ চঞ্চল মহাসমুদ্র, তাহার বক্ষে জীবন-তরণী ভাসিতেছে, তরঙ্গে দুলিতেছে, বাতাসে হেলিতেছে, অবশেষে সেই সমুদ্রগর্ভের সলিল সমাধিতে মিশিতেছে। মানুষ ঊর্দ্ধমুখে ক্ষীণকণ্ঠে জীবনের 'বন্দনা' গাহিতেছে, সে শব্দ ডুবাইয়া গম্ভীর নির্ঘোষে সর্ব্বকাল পরিপূরিত করিয়া অনন্তের মুখে উত্তর আসিতেছে—"মরণের জয়!" এই সর্ব্বজয়ী সর্ব্বগ্রাসী মরণের বিরুদ্ধে—ভারতের "আয়ুর্ব্বেদ" দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান! নিখিল স্বার্থ ও পরমার্থের মধ্যে মিলাইয়া ঋষিহৃদয়ে যে আনন্দের হিল্লোল জাগিয়াছিল 'আয়ুর্ব্বেদ" তাহারই দেবোদ্দিষ্ট অপূর্ব্ব নৈবেদ্য। "আয়ু-র্ব্বেদ" শুধু চিকিৎসা শাস্ত্র নহে, জড় ও জীব-নের সামঞ্জস্য দেখাইয়া "আয়ুর্ব্বেদ" বিশ্ব-... "মহাবিজ্ঞান": স্থূল সূক্ষ্মের পুলক-... —আয়ুর্ব্বেদ পুণ্য সমুজ্জ্বল "ষড়দর্শন"। যুগা... রর কত সুখ, কত ভোগ, কত শোক ..., কত উৎসব ব্যসনের হর্ষব্যথা, অ...দের বুকে চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে!

কিন্তু হায়! আর্য্য ঋষির অতুলনীয় মহা-কীর্ত্তি এমন যে অমূল্য আয়ুর্ব্বেদ, আমরা তাহার মহত্ত্ব ভুলিয়া গিয়াছি। আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে। যে দেশে একদিন পূর্ণসুখ, পূর্ণ স্বাস্থ্য, পূর্ণ বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত ছিল,—সেই দেশে এখন নিত্য নূতন উৎকট রোগের আমদানি হইতেছে! আমাদের 'সদাব্রতের ভাণ্ডার' হইতে মা লক্ষ্মী কাঁদিয়া চলিয়া গিয়াছেন! "আয়ুর্ব্বেদের"

আদের করিয়াছিলাম বলিয়া,—আমাদের দেশের প্রকৃতি বিকৃতিময়ী, জল বায়ু অস্বাস্থ্যকর, ভূমি সার-শস্য-বিরলা, গাভী ক্ষীণপয়স্বিনী, তরুলতা দীন ফলবতী, নদ-নদী শূন্য সলিলা! আমাদের এখন বড় দুঃসময়; আমাদের সাধের এবাম্নবর্ত্তি-পরিবার অনেকাংশে শিল্প-স্বল্পাবশিষ্ট, আমাদের চতুর্দ্দিকে কেবল অভাব, অসত্য, অধর্ম্ম, অন্নকষ্ট! বিংশতি কোটি মানবের আবাসভূমি—ভারত ভূমির বক্ষে বসে, অন্ধকার ও বিষণ্ণতা—উভয়ে মিলিয়া, আজ মরণের ধ্যান করিতে বসিয়াছে।

"আয়ুর্ব্বেদের" অনুশাসন মানি নাই বলিয়া, "আয়ুর্ব্বেদকে" বিস্মৃত হইয়াছি বলিয়াই আজ আমাদের দেশে অকালমৃত্যু রুদ্র তাণ্ডবে নৃত্য করিতেছে। যে"আয়ুর্ব্বেদ" একদিন জগতের অভাব অন্যায়ের সহিত নিরন্তর দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়া লক্ষ লক্ষ জীবন রক্ষা করিয়াছিল, তাহার মর্য্যাদা রাখি নাই বলিয়া, আজ আমাদের এত অধঃপতন।

আমাদের সমাজের এখন সঙ্কটাপন্ন মুমূর্ষুর অবস্থা, ব্রাণ্ডী কুইনাইনের উত্তেজনায় আর তাহাতে বলাধান হইবে না। এখন তাহার উদ্বোধনের জন্য আয়ুর্ব্বেদের ধাতুমদাত্রা মৃগনাভি প্রয়োগ করিতে হইবে। আমাদের অক্ষয় গৌরবময় অতীত ইতিহাসে আয়ুর্ব্বেদের শাশ্বত সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত, সেই সিংহাসনে আবার আমাদিগকে শিব-স্থাপন করিতে হইবে। আয়ুর্ব্বেদের কথা—ভারতের "কৃষ্ণকথা", আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস ভারতের উন্নতির ও সভ্যতার ইতিহাস। সেই অনবদ্য মঙ্গলমধুর ইতিহাসকে ভবিষ্যতের উদীয়মান গৌরবে সঞ্জীবিত করিতে হইবে।

আমরা বেদের দেশে জন্মিয়াছি আমাদের দীক্ষা—পরার্থ-পরতার মহামন্ত্রে। ছান্দোগ্য উপনিষদ পড়িয়া আমরা বুঝিয়াছি আমাদের জীবন—যজ্ঞ। আমরা ভারতবাসী—জীবনযজ্ঞের যজমান। যজ্ঞার্থে স্বয়ম্ভু কর্ত্তৃক, এই জম্বুদ্বীপের বেদমণ্ডপে আমরা সৃষ্ট হইয়াছি। বেদভক্ত বলিয়া, বেদের উপাসক বলিয়া, আমরা বৈদ্য। পুণ্যপূত আয়ুর্ব্বেদ—আমাদের বরেণ্য 'বেদ', সর্ব্বজন-হিতৈষণা—আমাদের প্রাণের উপাসনা, মানবের স্বাস্থ্য—আমাদের যজ্ঞনির্ম্মাল্য।

বেদরক্ষা, জীবরক্ষা, দেশের ঋদ্ধি বৃদ্ধি—আমাদের সাধনার লক্ষ্য। আমাদের প্রথম কার্য্য—প্রকৃত "বৈদ্য" গঠন করা। এদেশে "কবিরাজ" অনেক আছেন, কিন্তু বৈদ্যের সংখ্যা বড়ই অল্প। বৈদ্য না হইলে বৈদিক যজ্ঞ কে করিবে? আমাদের দ্বিতীয় কার্য্য—আয়ুর্ব্বেদের জীর্ণ কঙ্কালে "নবজীবন" সঞ্চার আয়ুর্ব্বেদ এখন রত্নশালিনী রাজপুরীর ভগ্নাবশেষ; প্রত্নতাত্ত্বিকের মত সেই ভগ্নস্তূপ সাদরে অনুসন্ধান করিতে হইবে। অভ্রভেদী বিরাট প্রাসাদ—বহুদিনের অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়াছিল, তাহার চূড়া ভাঙ্গিয়াছে, কার্ণিশ খসিয়াসে, জমাট ধসিয়াছে,—কড়িবরগা জীর্ণ কীটদষ্ট হইয়াছে নিপুণ হস্তের স্নেহ পরিচালনে—সে গৃহের সংস্কার করিতে হইবে প্রয়োজন হইলে—য়ুরোপের জীবন্ত বিজ্ঞানের সিমেণ্ট দিয়াও বিশ্লিষ্ট সন্ধি পূর্ণ করিতে হইবে দেশে দেশে ঘুরিয়া মানব জ্ঞানের চূর্ণবালি সংগ্রহ করিতে হইবে। ধার করা জিনিষ বলিয়া লজ্জা করিলে চলিবে না। জ্ঞানবর্দ্ধনে উপাদান যে স্থানেরই হউক্-তাহা কখনও অপবিত্র হয় না।

আমাদের তৃতীয় কার্য্য—জীবরক্ষায় ঔষধ সংগ্রহ চিকিৎসা কার্য্যে—কুণ্ঠিত জ্ঞান মহাপাপ। আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থী ছাত্র যাহাতে ঔষধের বিশুদ্ধ উপাদান, গাছ গাছড়া, বিষ, উপবিষ, ধাতু উপধাতু, অনায়াসে চিনিয়া লইতে পারে, সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

এই তিন প্রধান উদ্দেশ্য লইয়া, আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিলাম। আয়ুর্ব্বেদের আটটী শাখার যোগ্যাকরনপূর্ব্বক অধ্যাপনার জন্য—"অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাই আমাদের যজ্ঞমণ্ডপ। নূতন উদ্যমে আমরা যজ্ঞ আরম্ভ করিলাম। যোগ্য ব্যক্তিগণ—কেহ হোতা, কেহ উদ্গাতা, কেহ বা তন্ত্রধারের কার্য্য ভার গ্রহন করিয়াছেন। ঋষি বংশধর ঋক্‌মন্ত্র সঙ্কলন করিতেছেন। এ যজ্ঞের ঋত্বিক্ স্বয়ং স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। সার আশুতোষ তাঁহার উদার করুণার কল্যাণ হস্ত, প্রতিভা দীপ্ত মহান্ হৃদয়, এবং একনিষ্ঠ স্বাধীন প্রাণ-মহাসাধনায় নিবেদন করিয়াছেন। সহৃদয় বন্ধুগণ, আমরা মহর্ষি-গ্রথিত এই মণি রত্ন-মালা লইয়া আপনাদের দ্বারে সমুপাগত, সযত্নে কণ্ঠে ধারণ করিলেই কৃতার্থ, উৎসাহিত ও ধন্য জ্ঞান করিব।

শুভার্থহীন অধম আমরা—আমাদের ঋদ্ধি "আয়ুর্ব্বেদ", আমাদের প্রাণপঙ্ক্তি "আয়ুর্ব্বেদ", আমাদের ছন্দ—বাতপিত্তকফের ত্রিষ্টুভ্ মঞ্জরী "আয়ুর্ব্বেদ", আমাদের তীর্থ সলিল "আয়ুর্ব্বেদ" আমাদের সর্ব্বস্ব—নিখিল বিশ্বের মঙ্গল নিকেতন—"আয়ুর্ব্বেদ" তাই "আয়ুর্ব্বেদ" নামেই আমরা নাম করণ করিলাম। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুণ—আমাদের যেন জ্ঞানকৃত কোনও ত্রুটী না হয়। সরস্বতী দৃষদ্বতীর পবিত্র-কূলে—সাম ঝঙ্কারের সঙ্গে একদিন যে মহাসত্য উদ্‌ঘোষিত হইয়াছিল, তাহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। সেই বেদ-ধ্বনি-মুখরিত সানু, সেই হোম-ধেনু সমূহের বিহার ক্ষেত্র—সেই মুনিকন্যা-সেবিত লতাবিতান, সেই নীবার কণাকীর্ণ উটজাঙ্গন, আবার যেন আমরা ফিরিয়া পাই। রৌদ্রকরোজ্জ্বল পুলকময় প্রভাতে, ময়ূখ সন্তপ্ত জ্যোতির্ম্ময় মধ্যাহ্নে, ধীরসমীরসেবিত স্নিগ্ধ-গম্ভীর প্রদোষে, মুক্ত প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া ধীরোদাত্ত ভাষায় আবার যেন আমরা বলিতে পারি—

পুনর্ম্মনঃ পুনরায়ুর্ম্ম আগন্,
পুনঃ প্রাণাঃ পুনরাত্মা ম আগন্,
পুনশ্চক্ষুঃ পুনঃ শ্রোত্রং ম আগন্

আমাদের সেই মন সেই আয়ু, সেই প্রাণ সেই আত্মা, সেই চক্ষু, সেই কর্ণ—যাহা আমাদের নষ্ট হইয়া গিয়াছে—সমস্তই আবার ফিরিয়া আসুক।

আয়ুর্ব্বেদ।

০:*:০

অসীমে লগ্ন, সমাধি মগ্ন,
বিরাট-নির্ব্বিকার,
চতুর্ম্মুখের মুখ পঙ্কজ।
হইতে ব্যক্তি যা'র,
সৌম্য-রুচির মহান্ মূর্ত্তি
জন্ম মরণ মাঝে,
অনল-কুণ্ডে, বিলাস আহুতি
যে দিল পরের কাজে,
বিশ্বের বায়ু, নিশ্বাস যার,
বিজ্ঞান যার প্রাণ,
উদার-হস্তে, যে করে ভক্তে
দীর্ঘ জীবন দান,
ইঙ্গিতে যা'র মদন ভস্ম
শঙ্কিত মহাকাল,
কল্পনা বলে ভূতলে সৃষ্টি
অযুত ইন্দ্রজাল,
সভা-সহায় 'কণাদ' যাহার
করেছে নাড়ীচ্ছেদ,
সিন্ধু মথন-উত্থিত ধন,
সে এই "আয়ুর্ব্বেদ"।
অশ্বি-যুগল, দ্যুলোকে বহিল
যাহার স্বর্ণরথ,
মর্ত্ত্যে রচিল, শ্রীপুনর্ব্বসু
অবতরণের পথ,
তুলিল শঙ্খে, ওঙ্কার ধ্বনি,
তাপস "ভরদ্বাজ"
বরিল "জতুকর্ণের" কর,
মহামঙ্গল লাজ;

"স্বাগত" বলি, তূর্য্য-নিনাদে
ডাকিল "অগ্নিবেশ",
সোম-উচ্ছ্বাসে উঠিল কাঁপিয়া,
আর্য্য উপনিবেশ;
"অত্রি" করিল অভিষেক যার
শত তীর্থের নীরে,
আপনি ইন্দ্র, রত্ন-কিরীট
পরাইল যা'র শিরে;
পুণ্য পুলোক-স্পর্শে ঘুচাতে
নিখিলের গ্লানি ক্লেদ,
দেবতার দেশে, দেখা দিল এসে,
সে এই "আয়ুর্ব্বেদ"!
"ধন্বন্তরি" কনক কুম্ভ
স্থাপিল সিংহদ্বারে,
"ভেল" সাজাইল কল্প তোরণ
পল্লব-ফুলহারে,
শ্বেতচন্দন তিলক ললাটে,
পরাইল "ক্ষার-পাণি"
"চরক" "হারীত" "সুশ্রুত" দিল,
পূজা-সম্ভার আনি,
"জেজ্জড়" আর "বৃন্দদাস" মিলি;
"বসুধারা' দিল ঢালি,
"বৃদ্ধ বাগ্ভট" করিল আরতি,
'পঞ্চপ্রদীপ' জ্বালি;
হৃদি-মন্দিরে তান্ত্রিক শিব
পেতে দিল 'বীরাসন',
শব-সাধনায়, পৃথিবীর অণু
পরমাণু আহরণ।

"অমর" হইয়া মর জগতের,
মিটিল মনের খেদ
মানবের দেশে সিন্ধু আনিল,
সে এই 'আয়ুর্ব্বেদ'।
'অষ্টাঙ্গের' লাবণ্য যা'র
কোটি সূর্য্যের দীপ্তি,
রোগীর সেবায় অতুলহর্ষ
অন্তর ভরা তৃপ্তি,
আত্মার ভূমানন্দে ছুটায়ে
পবিত্র হোম-গন্ধ
রাতুল চরণ বন্দে যাহার
শত ক্রীড়া-শীল ছন্দ,
দীক্ষা যাহার পর-হিত ব্রতে,
'সন্ন্যাস' -যা'র ধর্ম,
নির্ম্মল মনে প্রতিবিম্বিত
চির নিষ্কাম কর্ম্ম,
কীর্ত্তি যাহার ত্রিতাপ তপ্ত
বিঘ্ন ও ব্যাধি নাশ,
প্রার্থীরে দেয় ভিক্ষা নিয়ত
করুণা—"অমৃত প্রাশ"
শাসনের নীতি 'আরোগ্য যা'র
'নিরূহ' বস্তি' 'স্বেদ'
নিস্বের দেশে দেখা দিল এসে,
সে এই "আয়ুর্ব্বেদ"।
যুগান্তরের প্রবল প্রভাবে,
নিত্য নূতন বেশ,
ত্রিবিধ দুঃখ নিবারণ তরে,
মুখে কত উপদেশ,
মৃত্তিকা খুঁড়ি, বনে বনে ঢুঁড়ি,
অধ্যবসায় কত,
শ্মশান শয্যা "ফুলশয্যায়"
হয়ে প্রেম পরিণত;

কৃতঘ্ন নর, ব্যসনের লোভে,
হিত কথা গেল ভুলে,
দেখা দিল পাপ, সুন্দর হ'য়ে,
অবগুণ্ঠন খুলে;
সোণার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়িল,
তবু না হইল জ্ঞান,
"ষড় দর্শন" শিখাইল শেষে,
মরণের মহাধ্যান,
তন্দ্রাজড়িত অলস নয়নে,
রহিলনা ভেদাভেদ,
যত্ন অভাবে—শৃঙ্খলাহীন,
সে এই 'আয়ুর্ব্বেদ'।
কত বিপ্লব, কতই ঝঞ্ঝা,
প্রলয় ডাকিল আনি,
মূর্চ্ছিত তনু, কোলে তুলে নিল,
কুলীন "চক্রপাণি"
"শঙ্কর" "শিবদাস গোবিন্দ
প্রভৃতি বৈদ্যগণ
অঙ্গের ধূলা ঝাড়িয়া করিল
চেতনা-সম্পাদন;
"জল্প-কল্প তরুর মন্ত্র,
শুনাল "গঙ্গাধর"
"কৈলাস" "রমানাথের" যত্নে,
কণ্ঠে ফুটিল স্বর,
ক্ষৌম-বসন দিল পরাইয়া,
"গোপী ও "দ্বারকানাথ,
দাঁড়াইল ধরি 'দুর্গা "প্রসাদ"
"পঞ্চাননের" হাত;
কঙ্কালে দিল বিজয় রক্ত
শোণিত—মাংস—মেদ
নূতন যুগেতে শ্রীছাঁদ
পাইল আয়ুর্ব্বেদ!

শ্রীব্রজবল্লভ রায়।

আবাহন।

বহু যুগযুগান্তর পূর্ব্বে যখন ভূত-জননী বসুমতী অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন পশুপ্রতিম মানব সমূহে পূর্ণ ছিল, যখন জ্ঞানের বিমল জ্যোতিতে জাতিগণ চিত্ত উদ্ভাসিত হয় নাই, যখন জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিদ্যা, ধর্ম্ম মনুষ্যের উপাস্য বলিয়া বিবেচিত হইত না, তখন এই পুণ্যভূমি ভারতে, এই ঋষিগণ-সেবিত, ভারতীর চরণ-স্পর্শ পূত ভবনে, এই জ্ঞান ধর্ম্ম বিদ্যা পুণ্য পীযূষ-প্রবাহ সুশীতল দেশে করুণাবতার মহর্ষিগণ মানবদিগের রোগ-যন্ত্রণা দর্শনে ব্যথিত হইয়া হে সনাতন আয়ুর্ব্বেদ! একান্ত হৃদয়ে তোমার আবাহন করিয়াছিলেন। সেই প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যপ্রবণ-চিত্ত মহাত্মাগণের আবাহনে তুমি পুণ্যক্ষেত্র ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছিলে। হে চিরানন্দপ্রদ, তোমার পাদস্পর্শে শ্মশান স্বর্গে পরিণত হইল, মরুভূমি নন্দন উদ্যানে পরিবর্ত্তিত হইল, রোগীর উৎকট রোগযন্ত্রণা দূর হইল, রুগ্নের রোগক্লিষ্ট মুখে আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিল, অকাল-মরণোন্মুখ পুনর্জীবন লাভ করিল, বন্ধ্যা পুত্র লাভ করিল, ক্লীব পুরুষত্ব লাভ করিল, মেধাহীন মেধা লাভ করিল, অল্পায়ু দীর্ঘ জীবন লাভ করিল। হে কল্পতরু, তোমার প্রসাদে ভারত আনন্দময় হইয়া উঠিল।

সে আজ কত দিনের কথা। তাহার পর কত দিন, কত মাস, কত বৎসর, কত যুগ-যুগান্তর অতীত হইয়া গিয়াছে। ভূত ধাত্রীর বিশাল বক্ষো-নাট্যশালায় কত সুখ দুঃখ পূর্ণ মহা-নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে, কত ঝঞ্ঝাবাত, কত ভূমিকম্প, কত অগ্ন্যুৎপাত, বসুধা বক্ষ বিধ্বস্ত করিয়া চলিয়া গিয়াছে, কত রাষ্ট্র-বিপ্লব, সমাজ-বিপ্লব, ধর্ম্ম-বিপ্লব বিভিন্ন জাতির জীবনে যুগান্তর ঘটাইয়াছে। কত উন্নত জাতি অবনত হইয়াছে, কত অবনত জাতি উন্নত হইয়াছে, কত প্রাচীন বিদ্যা লোপ পাইয়াছে, কত নূতন বিদ্যা উদ্ভাবিত হইয়াছে।

জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, জীব মরণশীল। উত্থান, পতন ভাগ্যচক্রনেমীর পরিবর্ত্তন সম্ভূত। আর্য্যজাতি তাহা জানেন তাই তাঁহারা এই জাগতিক পরিবর্ত্তনে বিস্মিত নহেন। কিন্তু হে অমর্ত্ত্য! আজ তোমার এরূপ পরিবর্ত্তন দেখিতেছি কেন? হে অপৌরুষেয়, হে অব্যয় তুমিত এ জগতের নও তুমি যে স্বর্গের, তুমিত বিনশ্বর নও, তুমি যে অবিনশ্বর, তুমিত ক্ষয়শীল নও, তুমি যে অক্ষয়। তবে তোমার এ পরিবর্ত্তন কেন? কোথায় তোমার সে চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রদ পল্লব-ফল-সমৃদ্ধ শ্রেষ্ঠ মহাশাখা? তাহাত আর লোকলোচনের বিষয়ীভূত নহে? কেবল একমাত্র নাতি-শুষ্ক নাতি-ফল পল্লব যুক্ত শাখা দৃষ্টিগোচর হইতেছে। হে নিত্য, তোমার এ পরিবর্ত্তনের হেতু কি? হে জ্ঞানময়, জ্ঞানের ত বিনাশ নাই, জ্ঞানের ত ক্ষয় নাই, তবে আজ তোমার এরূপ ক্ষয় দেখিতেছি কেন?

'না—না—অবিনশ্বর তুমি, অক্ষয় তুমি, তোমার কি বিনাশ হইতে পারে, তোমার কি ক্ষয় হইতে পারে। তোমাকে আয়ত্ত করিবার জন্য যেরূপ কঠোর সাধনার আবশ্যক, পূর্ব্বতম মহর্ষিগণ যেরূপ মহতী সাধনার বলে তোমাকে আয়ত্ত করিয়াছিলেন, সেরূপ সাধনা আমাদের নাই। হে অব্যয়, তাই তুমি আমাদের নিকট [illegible], আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের অতীত, আমাদের ক্ষুদ্র [illegible]

অনায়ত্ত। স্থূল-দৃষ্টি আমরা সূক্ষ্ম-দৃষ্টি-হীন হইয়াছি বলিয়া তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না। কিন্তু হে শাশ্বত, তুমি ছিলে, তুমি আছ এবং তুমি থাকিবে। দেবতার আবাহন করিয়া, উপযুক্ত উপচার দ্বারা কায়-মনো-বাক্যে তাঁহার পূজা করিতে হয়, তবে দেবতা প্রকট হইয়া থাকেন। কিন্তু হে দেবতা, আমরা উপযুক্ত দ্রব্যসম্ভারে সম্যকরূপে তোমার পূজা করিতে পারি নাই, তাই তুমি আমাদের নিকট অপ্রকট হইয়া আছ।

হে আরোগ্যপ্রদ, তোমার এই প্রচ্ছন্ন অবস্থা বিশাল ভারত ভূমিকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছে। সে দীর্ঘ আয়ু, সে মেধা, সে প্রতিভা, সে শৌর্য্য, সে বীর্য্য ভারতে আর নাই। রোগশীর্ণ ভারতবাসী আজ চর্ম্মাচ্ছাদিত কঙ্কাল মাত্র, আর সেই কঙ্কালের মধ্যে একটা শত-রোগ—শোক পীড়িত প্রাণ, বহির্গত হইবার জন্য ব্যাকুল ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ঘরে ঘরে হাহাকার, পীড়িতের আর্ত্তস্বর, বিনষ্ট প্রিয়জনের হা হুতাশ, লুপ্ত-স্বাস্থ্যের করুণ বিলাপধ্বনি, আজ ভারতভূমিকে মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে। প্রতি গৃহস্থের গৃহকোণে রোগ ও অকাল মৃত্যু লুক্কায়িত রহিয়াছে। তাই হে আয়ুর্ব্বেদ, হে শর্ম্মদ, তোমার পুনরাবাহন করিতেছি—তুমি এস। আবার তোমার অষ্ট শাখা, অসংখ্য প্রশাখা—পত্র-পুষ্প-ফল সমৃদ্ধ হইয়া বিরাজ করুক। তোমার সুশীতল ছায়া, সুগন্ধি পুষ্প, অমৃতময় ফল, ভারতবাসীর সুখস্বাচ্ছন্দ্য সম্পাদন করুক। এস হে মহান্, হে শাশ্বত, হে সনাতন, এস। এ শ্মশান সদৃশ ভারতকে আবার রম্য উপবনে পরিণত কর, তোমার প্রভাবে রোগ ও অকাল মৃত্যু দূরে পলায়ন করুক, ভারতবাসীর রোগমরণ-পঙ্কিত বিষণ্ণ বদনে নির্ভীকতা ও হাসি ফুটিয়া উঠুক। তোমায় ছাড়িয়া, সুপথ ভুলিয়া ভারতবাসী ক্রমশঃ ডুবিতে বসিয়াছে। তুমি সুপথ দেখাইয়া নিমগ্ন প্রায় ভারতবাসীকে উদ্ধার কর। হে সর্ব্ব শাস্ত্রময়, তুমি আমাদিগকে স্বাস্থ্যনীতি, ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দাও। তোমার শিক্ষা দীক্ষার প্রভাবে ভারত আবার মধুময় হউক।

হে আরাধ্য, অল্প সাধনায় দেবতা প্রসন্ন হয়েন না। তোমাকে প্রসন্ন করিবার জন্য অনেক মনস্বী মহর্ষির বক্ষশোণিতের প্রয়োজন হইয়াছিল। আজ তোমার পুনরাবাহনের দিনে, আমরা অসংখ্য ভ্রাতা তোমার মূলদেশ শোণিত সিক্ত করিবার জন্য বক্ষ উন্মুক্ত করিয়াছি। এস এস হে বহু সাধন-সাধ্য, তোমার যত অভিরুচি দোহদরূপে আমাদের বক্ষশোণিত লইয়া তুমি আবার পূর্ণাঙ্গে আবির্ভূত হও। আর এই পুণ্য ভূমি ভারতবর্ষে এই দধীচি-শিবিকর্ণ পদরজ-পূতদেশে, এই পরহিতৈক ব্রত পুণ্যপূত ভবনে, কে কোথায় আছ আত্মত্যাগী মহাপুরুষ, নরসমাজের কল্যাণের জন্য, আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধারের জন্য বক্ষঃ-শোণিত প্রদানে অগ্রসর হও।

এস এস হে নিত্য, তুমি নিত্য হইলেও নিত্যা মহামায়ার ন্যায় তোমার আরাধনা করিতেছি, লোকের মঙ্গলের জন্য জগন্মাতার ন্যায়, হে জগতের পিতৃমাতৃ স্থানীয় আয়ুর্ব্বেদ, তুমি পূর্ণ-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হও। হে সর্ব্বসিদ্ধিদ, তোমার পূর্ণ-মূর্ত্তি না দেখিতে পাইয়া আজ আমরা ঘৃণিত, পদদলিত, মর্ম্মাহত। জগতে আজিও এমন কোন ভাষার সৃষ্টি হয় নাই, যে ভাষা আমাদের হৃদয়-নিহিত এই মর্ম্মচ্ছেদী দুঃখ-কাহিনী প্রকাশ করিয়া বলিতে

পারে। হে বরণ্যে, হে নিখিল-চিকিৎসাশাস্ত্র-রত্নাকর সদ্যঃ-অপগতবাল্য বিজ্ঞান-গর্ভ নবযৌবন-মদোদ্ধত বিবিধবৈদেশিক চিকিৎসাশাস্ত্র আজ আমাদিগকে নির্ব্বাক্ নির্নিমেষ ও নির্ব্বৌক্তিক করিয়া তুলিয়াছে। তাহারা যখন প্রত্যক্ষ-প্রমাণাভাস-প্রয়োগ দ্বারা আমাদিগকে ও জনসাধারণকে মুগ্ধ করে, তখন হে বৃদ্ধ-বিজ্ঞান-গর্ভ, ধীরোদাত্ত আয়ুর্ব্বেদ! আমরা নিঃসাহসে, নির্ব্বাক্ বদনে, নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাহাদের প্রতি চাহিয়া থাকি। আর একটা নিদারুণ দুঃখ, নিদারুণ শোক, নিদারুণ আত্মগ্লানি, আমাদের এই অস্থিপঞ্জর বেষ্টিত হৃদয়কে শতধা ছিন্ন করিয়া হাহাকার রবে দিগ্বিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতে চাহে। মনে হয় আমরা খ্রীষ্টান জাতির কথিত ঘোর নরকে পতিত হইয়াছি। আমাদের সম্মুখে শীতল জল, কিন্তু পান করিবার উপায় নাই। সম্মুখে সুকোমল শয্যা, কিন্তু শয়ন করিবার উপায় নাই। আমাদের আছে সকলি, কিন্তু কিছুই নাই। তাই হে চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রদ, হে পূর্ণ, তোমায় আবাহন করিতেছি। তুমি এস, এস হে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর, তোমার পূর্ণ মূর্ত্তিতে প্রকট হও। বল, একবার দৃপ্ত গম্ভীর স্বরে বল—

"যদ্ ইহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ।"

এস, এস হে আমাদের সর্ব্বস্ব, আমরা প্রাণহীন, আমাদের প্রাণ দাও। আমরা বাক্যহীন আমাদের বাক্য দাও, আমরা সাহসহীন আমাদের সাহস দাও। আমরা জ্ঞানহীন আমাদের জ্ঞান দাও।

———

পঞ্চকর্ম্ম।

স্বেদ।

প্রায়শো বপুষঃশুদ্ধিং কৃত্বা দেয়ং যদৌষধং।
অতঃপূর্ব্বং চিকিৎসায়াং শোধনং পরিকীর্ত্তিতম্॥

প্রায় রোগ মাত্রেই শরীর প্রথমে পরিশোধন করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে, যথোপযুক্ত ফল লাভ হয়, নচেৎ তাদৃশ ফল হয় না। ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া বীজ বপন করিলে যেরূপ সুন্দর শস্য হয়, অনাকৃষ্ট ভূমিতে তদনুরূপ হয় না। অতএব জটিল পুরাতন রোগে বিধিবিহিত শোধন বিধেয়।

শোধন কাহাকে বলে?

যদ্দ্বারা শরীরস্থ দোষাদি বহুপরিমাণে বিদূরিত হইয়া, শরীর প্রকৃতিস্থ অথবা চিকিৎসোপযোগী হয়, তাহাকে শোধন বলে।

শোধন পাঁচ প্রকার যথা—বমন, বিরেচন, দুই প্রকার বস্তি ও নস্য। বমনাদি পাঁচটিকে পঞ্চকর্ম্ম বলে। এই পঞ্চ কর্ম্মের পূর্ব্বকর্ম্ম বলিয়া প্রথমে স্বেদ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবৃত হইতেছে।

ভাবমিশ্র বলেন—

"যেষাং নস্যং প্রদাতব্যং বস্তিশ্চাপি হি দেহিনাম্।
শোধনীয়াশ্চ যে কেচিৎ পূর্ব্বং স্বেদ্যাশ্চ তে মতাঃ॥

পঞ্চকর্ম্মের মধ্যে যেটীই কর অগ্রে স্বেদ দিতে হইবে।

স্বেদ কাহাকে বলে?—"স্বিদ্যতে অনেনেতি স্বেদঃ।" যদ্দ্বারা ঘর্ম্ম হয় তাহা স্বেদ। স্বেদ কাহার কার্য্য? গুণ কি? স্বেদ অগ্নির কার্য্য। অগ্নি (তাপ) কারণ, স্বেদ—কার্য্য।

স্বেদের গুণ—

অগ্নির্বাতকফস্তম্ভ-শীত-বেপথু-নাশনঃ॥
আমোত্থিতস্য শমনো রক্তপিত্ত-প্রকোপনঃ

অগ্নি, বাতকফজনিত স্তব্ধতা দূর করে, শীত, কম্প নিবারণ করে।

অতএব যে সময় আমাদের শরীরের সর্ব্বাঙ্গে বা যে কোন প্রদেশে তাপের অল্পতা হেতু শিরাস্থ রস, রক্ত স্ত্যান অর্থাৎ গাঢ়, হইয়া, স্তম্ভ, গৌরব, বেদনা জন্মাইয়া, অকর্ম্মণ্য ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, তৎকালে স্বেদ প্রয়োজ্য, সুতরাং যেখানে অবরোধ, প্রায়ই সেই স্থানে স্বেদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অবরোধ কাহাকে বলে?—গতিজ্ঞান না হইলে অবরোধ জ্ঞান হয় না। এই জগৎ নিয়ত গতিশীল, "গচ্ছতীতি জগৎ।" আমাদের অধিষ্ঠাত্রী পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য সকলই ভ্রমিতেছে। ইহাতেই দিবা, রাত্রি, ঋতু, পরিবর্ত্তন হইতেছে। গতি না থাকিলে জগৎ ক্ষণমাত্র থাকিতে পারে না, গতিই জীবন। জগতে যে গুণ আছে জাগতিক পদার্থ পুঞ্জেও সেই গুণ আছে। আমরা জগতের একাংশ। সুতরাং "ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে বসন্তি কলেবরে।" বহির্জগতে চন্দ্র সূর্য্যের গতি দ্বারা যেরূপ পদার্থ নিচয়ের স্থিতি পরিণতি, সাধিত হইতেছে, সেইরূপ আমাদের দেহেও প্রাণ সঞ্চরণশীল, নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা যাবতীয় শারীরিক ক্রিয়া হইতেছে—স্ব স্ব বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি, আহার-পরিপাক, মলমূত্রাদি নিঃসরণ সকলই শারীরিক গতি-নিবন্ধন। গতিই জীবন, গতিহীনতাই মৃত্যু, শরীরের গতিই প্রাণ।

অতএব যিনি যে পরিমাণে শারীরিক পদার্থ সকলের সংস্থান, স্বভাব ও ক্রিয়া অবগত আছেন, তিনি সে পরিমাণে অবরোধ বুঝিতে পারেন। এই জন্য যদি চিকিৎসক সেই গতি ও অবরোধের প্রতি লক্ষ্য রাখেন তবে তাঁহাকে কর্ত্তব্য নিরূপণে অধীর হইতে হয় না।

যেরূপ রেলপথ কি জলপথ পরিষ্কার না থাকিলে, যান অবরুদ্ধ হইয়া আরোহী বিপন্ন হয়, সেইরূপ আমাদের শরীরের স্রোতঃপথের অবরোধ হইলেও বিপদের সম্ভাবনা। অতএব কেনই বা অবরোধ হইয়া থাকে—কিরূপেই বা পরিষ্কার হয়, তাহা জানা আবশ্যক।

সিরা সমূহের যথোপযুক্ত অবকাশ না থাকিলেই অবরোধ হয় না। অবকাশ আকাশের গুণ, যেরূপ মেঘ সঞ্চিত হইয়া আকাশ আবৃত করে, শরীরে ও তদনুরূপ রক্তাদি স্তম্ভিত হইয়া অবরোধ করে। তাপের সঙ্কোচে যেরূপ মেঘ সংযত হয়, শরীরেও তাপের অভাবে রসরক্তাদি সংযত হয়। মেঘ যেমন তাপ সংযোগে দ্রবীভূত হইয়া বর্ষণ করে শরীরেও তদনুরূপ তাপ সংযোগে ঘর্ম্মাদিরূপে তাহা বিনির্গত হয়। অতএব অবরোধের বহিস্থ কারণ—শীতবায়ুর স্পর্শ, শীতলজল, আভ্যন্তর কারণ—শ্লেষ্মজনক ও অজীর্ণকর আহার ইত্যাদি। এই জন্য শাস্ত্রকারেরা প্রধানতঃ আমরসকেই স্রোতঃ অবরোধের প্রধান কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আহারস্য রসঃ শেষো যো ন পক্কোঽগ্নিলাঘবাৎ।
স মূলং সর্ব্বরোগানামাম ইত্যভিধীয়তে॥

পাচকাগ্নির বেশ বল না থাকিলে ভুক্তবস্তু হইতে যে অপরিপক্ক রস জন্মিয়া থাকে তাহাকেই আমরস বলে। এই আমরস বহুরোগের কারণ। দোষ (বায়ু, পিত্ত, কফ) সাম ও নিরাম ভেদে দ্বিবিধ।

কি ব্রণ, কি জ্বর অতিসারাদি, আম, নিরাম বোধ ভিন্ন চিকিৎসা সুচারুরূপে হইতে পারে না।

কিন্তু যেরূপ অবরোধে স্বেদ, তদনুরূপ বাতাধিক্যে আক্ষেপাদি রোগেও স্নিগ্ধ মালিস

স্বেদ ভিন্ন উত্তম উপায় নাই। কিন্তু সকল অবরোধেই তাপ প্রয়োগ হয় না, কোন কোন অবরোধে উপনাহ (পুল্‌টিস্) প্রলেপ এবং নিঃসরণ করাইতে হয়। এবং কোন কোন স্থানে প্রকৃতির উপর নির্ভর করিতে হয়। যেমন কুজ্ঝটিকাবৃত দিনে জাহাজ পুরুষকারে চালাইতে পারে না, সূর্য্য প্রকাশের অপেক্ষা করে, তেমন এই সকল বিষয়ের কর্ত্তব্যতা চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও বিচার শক্তির উপর নির্ভর করে। তাঁহার জ্ঞানের পরিচালনার জন্য মাত্র কিঞ্চিৎ উদাহরণ প্রদত্ত হইল।

যখন শরীরে কিম্বা শরীরের একদেশে তাপের অল্পতা হয়, তখন তাহাতে তাপের সঞ্চার করাই স্বেদের উদ্দেশ্য। অগ্নিতাপ ভিন্নও এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হইতে পারে। চরক সাগ্নি ও অনগ্নি এই দুই ভাগে স্বেদের বিভাগ করিয়াছেন। তন্মধ্যে শঙ্করাদি সাগ্নিস্বেদ। অনগ্নিস্বেদের উল্লেখে বলিয়াছেন—

"ব্যায়াম উষ্ণসদনং গুরুপ্রাবরণং ক্ষুধা।
বহুপানং ভয়ক্রোধাবুপনাহাহবাতপাঃ।
স্বেদয়ন্তি দশৈতানি নরমগ্নিগুণাদৃতে।

সাক্ষাৎ অগ্নি সম্বন্ধ না থাকিলেও, ব্যায়াম উষ্ণগৃহ, গুরুবস্ত্রাবরণ, ক্ষুধা, বহুমদ্যপান, ভয়, ক্রোধ, উপানাহ (পুল্‌টিস্) যুদ্ধ এবং রৌদ্র দ্বারা স্বেদের কার্য্য হইয়া থাকে।

চরক ত্রয়োদশ প্রকার স্বেদভেদ বর্ণনা করিয়াছেন। তদ্বিষয়ে পরে কিঞ্চিৎ বলিব।

চরক বলেন—

বাতশ্লেষ্মণি বাতে বা কফে বা স্বেদ ইষ্যতে।
স্নিগ্ধরুক্ষস্তথা স্নিগ্ধো রুক্ষশ্চাপ্যুপকল্পিতঃ॥

সাধারণতঃ স্বেদের ব্যবহারে স্বেদ ত্রিবিধ—রুক্ষ, স্নিগ্ধ এবং স্নিগ্ধরুক্ষ। কফে রুক্ষ, বাতে স্নিগ্ধ বাতকফে স্নিগ্ধরুক্ষ স্বেদ প্রদান বিধেয়। কফে রুক্ষ স্বেদ, যথা—বালুকা, প্রস্তর, চূর্ণাদি। বাতে স্নিগ্ধ-স্বেদ—দুগ্ধ-সিদ্ধ মাষ, তিল, যব প্রভৃতি। বাতশ্লেষ্মে রুক্ষস্নিগ্ধ স্বেদ—ভুষি, গোময় ইত্যাদি।

স্বেদ দিবার পূর্ব্বে পুরাতন ঘৃত দ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া লইবে। কেবল কফে স্নিগ্ধ মালিষ আবশ্যক করে না।

সাধারণতঃ চিকিৎসকগণ সন্নিপাত জ্বরে, বাত শ্লেষ্ম-জ্বরে বালুকা প্রভৃতির রুক্ষ স্বেদ ব্যবহার করেন।

বালুকাস্বেদ—প্রথমতঃ কটাহে বালুকা উত্তপ্ত করিয়া একখণ্ড বস্ত্রের উপর এরণ্ড পত্র স্থাপন করিয়া তাহার উপর বালু দিয়া পুট্‌লী বান্ধিয়া, কাঁজি কি তণ্ডুলপিষ্ট জলে নিমগ্ন করিয়া, তদ্দারা স্বেদ দিবে। সিক্ত না করিলে বস্ত্রাদি দগ্ধ হইয়া যায় এবং রোগী স্বেদ সহ্য করিতে পারে না।

কিন্তু মস্তিষ্কের উত্তেজনায় রক্তাধিক্য হইয়া জ্ঞানাবরোধ কি বেদনা হইলে বিশেষ পরীক্ষা না করিয়া স্বেদ দিবে না। রক্তাধিক্যে স্বেদ দিলে রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে, ইহাতে জল বা বরফ দিবে।

রক্তাধিক্যের লক্ষণ—রক্তাধিক্যে নাড়ী চঞ্চলা, বেগবতী, স্থূলা, চক্ষু আরক্তিম, জিহ্বা পরিষ্কার রক্তবর্ণ, শ্লৈষ্মিক লক্ষণহীন যাতনা।

কফাধিক্যের লক্ষণ—কফাধিক্যে নাড়ী শীতল, ক্ষীণ, চক্ষু আবিল (ঘোলাটে) জিহ্বা শ্বেতলেপযুক্ত, মুখ শ্লেষ্মাবৃত, শ্লৈষ্মিক লক্ষণযুক্ত যাতনাহীন। অনেক স্থানে দেখিয়াছি ডাক্তারগণ এই পার্থক্য না দেখিয়া সকল

স্থানে রক্তাধিক্য নির্দ্দেশ করেন। স্থলবিশেষে এইরূপ ভেদ নিশ্চয় না করিয়াও জল প্রয়োগে মস্তকের সিরাসমূহের পরিধি সঙ্কুচিত হইয়া অবরোধ বারণ হয়। উপযুক্তরূপ প্রয়োগ করিতে না পারিলে অনিষ্টও হইয়া থাকে। কিন্তু রক্তাধিক্যে তাপ পড়িলে রোগ ও যাতনা উভয়েরই বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

যদি মস্তকের অভ্যন্তরে গাঢ়রূপে অবরোধ হয়, অথবা রক্তহীনতা হইয়া সন্ন্যাসের উপক্রম হয়, তবে কোন ক্রিয়াতেই ফল হয় না। অতএব মস্তক-সম্বন্ধীয় রোগে বিশেষ বিবেচনা না করিয়া কোন কাজ করিবে না। ইহাতে চিকিৎসকগণের বাদানুবাদে শেষে নিজেরাই অখ্যাতির ভাগী হন।

কতকাল স্বেদ দিবে? চরক বলিয়াছেন—

শীতশূলব্যুপরমে স্তম্ভগৌরবনিগ্রহে।
সঞ্জাতে মার্দ্দবে স্বেদে স্বেদনাদ্বিরতির্মতা॥

যে পর্য্যন্ত শৈত্য, গুরুতা ও স্তব্ধতা দূর হইয়া ঘর্ম্ম না হয়, বেদনা না যায় ও শরীর মৃদু না হয়, সেই পর্য্যন্ত স্বেদ দিবে।

কোন্ কোন্ স্থানে স্বেদ দিবে না।—

বৃষণৌ হৃদয়ং দৃষ্টী স্বেদয়েন্মৃদু বা ন বা।
মধ্যমং বঙ্ক্ষণৌ শেষমঙ্গাবয়বমিষ্টতঃ॥

হৃদয়, অণ্ডকোষ ও নেত্রে স্বেদ দিবে না, অথবা আবশ্যক হইলে মৃদু স্বেদ দিবে।

স্বেদ অতিরিক্ত প্রযুক্ত হইলে দাহ স্বেদ দুর্ব্বলতা অঙ্গাবসাদ এবং পিত্তপ্রকোপ হইয়া থাকে। চরক বলিয়াছেন—

পিত্ত-প্রকোপো মূর্চ্ছা চ শরীরসদনস্তথা।
দাহস্বেদাঙ্গদৌর্ব্বল্যমতিস্বিন্নস্য লক্ষণং॥

ইহার প্রতিবিধান শেষ শীতল চিকিৎসা করিবে। চরক বলিয়াছেন—

অতি স্বিন্নস্য কর্ত্তব্যো মধুরঃ স্নিগ্ধশীতলঃ।

কি কি রোগে স্বেদ দিবে না—

চরক বলেন—

কষায়মদ্যনিত্যানাং গর্ভিণ্যা রক্তপিত্তিনাং।
পিত্তিনাং সাতিসারাণাং রুক্ষিণাং মধুমেহিনাং॥
বিদগ্ধভ্রংশবধ্নানাং বিষমদ্যবিকারিণাং।
ক্লান্তানাং নষ্টসংজ্ঞানাং স্থূলানাং পিত্তমেহিনাং॥
তৃষ্যতাং ক্ষুধিতানাঞ্চ ক্রুদ্ধানাং শোচতামপি।
কামল্যুদরিণাঞ্চৈব ক্ষতানামাঢ্যরোগিণাং॥
দুর্ব্বলাতিবিশুষ্কানামুপক্ষীণৌজসাং তথা।
ভিষক্ তিমিরিকাণাঞ্চ ন স্বেদমবতারয়েৎ॥

অর্থ—কষায় ঔষধপায়ী, নিত্য মদ্যপায়ী, গর্ভিণী, রক্তপিত্ত রোগী, অতিসার রোগী, রুক্ষস্বভাবী, মধুমেহ রোগী, ব্রণরোগী, বিষ ও মদ্য বিকারগ্রস্ত, ক্লান্ত, অচেতন, স্থূল, পিত্তমেহ রোগগ্রস্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, ক্ষুধিত, ক্রুদ্ধ, শোকী, কামলা ও উদর রোগী, ক্ষতরোগী, উরুস্তম্ভ রোগী, দুর্ব্বল, অতিশয় শুষ্ক এবং যাহার ওজোধাতু ক্ষয় হয় এরূপ রোগিগণকে স্বেদ দিবে না।

কি কি রোগে স্বেদ বিধেয়?—

চরক বলেন—

প্রতিশ্যায়ে চ কাশে চ হিক্কাশ্বাসেম্বলাঘবে।
কর্ণমন্যাশিরঃশূলে স্বরভেদে গলগ্রহে॥
অর্দ্দিতৈকাঙ্গসর্ব্বাঙ্গপক্ষাঘাতে বিনামকে।
কোষ্ঠানাহবিবন্ধেষু শুক্রাঘাতে বিজৃম্ভকে॥
পার্শ্বপৃষ্ঠকটিকুক্ষিসংগ্রহে গৃধ্রসীষু চ।
মূত্রকৃচ্ছ্রে মহত্ত্বে চ মুষ্কয়োরঙ্গমর্দ্দকে॥
পাদোরুজানুজঙ্ঘার্ত্তিসংগ্রহে শ্বয়থাবপি।
খল্লীষ্বামে চ শীতে চ বেপথৌ বাতকণ্টকে॥
সঙ্কোচায়ামশূলেষু স্তম্ভগৌরবসুপ্তিষু।
সর্ব্বেষ্বেষু বিকারেষু স্বেদনং হিত মুচ্যতে॥

রোগের ভেদ অনুসারে স্বেদের ভিন্ন ভিন্নরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে বটে (যেমন বাতে,স্নিগ্ধ দ্রব্যকৃত স্বেদ ; কফে, রুক্ষ দ্রব্যকৃত স্বেদ) কিন্তু শরীরের স্থানভেদে ইহার ব্যভিচার দৃষ্ট হয়—শাস্ত্রকার বলেন—স্থানং জয়েদ্ধি পূর্ব্বং হি স্থানস্থস্যাবিরুদ্ধতঃ।" এইজন্য কফ, বাত-স্থানস্থিত হইলে স্নিগ্ধপূর্ব্বক রুক্ষস্বেদ দিবে। বায়ু, কফ-স্থানস্থিত হইলে রুক্ষপূর্ব্বক স্নিগ্ধ স্বেদ দিবে। আমাশয়, কফ স্থান, এই স্থানে বাত বিকার হইলেও অগ্রে রুক্ষস্বেদ পরে স্নিগ্ধস্বেদ দিবে। চরক বলেন—

আমাশয়ে গতে বাতে কফে পক্বাশয়াশ্রয়ে।
রুক্ষপূর্ব্বো হিতঃ স্বেদঃ স্নেহপূর্ব্বস্তথৈব চ॥

সচরাচর চিকিৎসকেরা আমাশয়ে রুক্ষ স্বেদ দেন না। যাহারা শাস্ত্রজ্ঞ তাঁহাদের মধ্যেও যাঁহারা ইহার ফল না দেখিয়াছেন তাঁহারা ইহার সম্যক্ উপকারিতা অনুভব করিতে পারেন না। আমি অনেক স্থানে দেখিয়াছি বায়ু আমাশয় গত হইয়া বেদনা স্ফীততা জন্মাইয়াছে, নানা স্বেদ ঔষধে বারণ হইতেছে না, এস্থানে বালুকা স্বেদ প্রদানে উপকার পাইয়াছি। অতএব আমাশয়িক শূল কি প্রত্যাখ্যানে রুক্ষ স্বেদ ব্যবহার করিতে পারা যায়। এই প্রকার বস্তি বাতস্থান, এখানে কফ প্রকোপে বেদনা হইলেও পূর্ব্বে স্নিগ্ধ দ্রব্যকৃত স্বেদ দিয়া পরে রুক্ষ স্বেদ দিতে হইবে। কিন্তু কেবল বেদনা, স্ফীতি দেখিয়াই স্বেদ ব্যবস্থা করিবেন না। বেদনাস্ফীতি আন্ত্রিক বিদ্রধি যকৃৎ-প্লীহাগত রক্তাধিক্য নিবন্ধনও হইতে পারে। অতএব প্রথমে রোগজ্ঞান আবশ্যক। এই সকল উপদেশ এইখানে আবশ্যক করে না তথাপি নবীন শিক্ষার্থিগণ অনবধানতা বশতঃ কর্ত্তব্য পরিহার অকর্ত্তব্য ব্যবহার না করেন, তজ্জন্য সাবধান করা হইল।

আধ্মানে স্নিগ্ধোক্ত তৈল মালিষ করিয়া বাষ্পস্বেদ কি ঘটস্বেদও প্রদত্ত হইয়া থাকে।

হৃদয়ে অর্থাৎ হৃন্মর্ম্মে স্বেদ নিষেধ ; কিন্তু হৃদয়োপলক্ষিত বক্ষোদেশে নিষেধ নহে, কাস, শ্বাস,বক্ষোবেদনায় পুরাতন ঘৃত মালিশ করিয়া, পান অর্কপত্র দ্বারা বক্ষঃ পার্শ্ব ও পৃষ্ঠে স্বেদ দেওয়া হইয়া থাকে।

সঙ্করঃ প্রস্তরো নাড়ী পরিষেকোঽবগাহনম্।
জেন্তাকোঽশ্মঘনঃ কর্ষূঃ কুটী ভূঃকুম্ভিরেবচ॥
কূপোহোলাক ইত্যেতে স্বেদয়ন্তি ত্রয়োদশঃ॥

চরকোক্ত উক্ত ত্রয়োদশ প্রকার স্বেদের বিশেষ বিবরণ সূত্র স্থানের ১৪শ অধ্যায়ে লিখিত আছে। সাধারণতঃ সঙ্করস্বেদ অধিক ব্যবহৃত হয়। স্থল বিশেষে পরিষেক অবগাহস্বেদ ও দেওয়া হয়। বাতব্যাধিতে বেশবার স্বেদ এবং শাল্বনস্বেদ প্রসিদ্ধ।

প্রাচীনকালের মূত্রবিজ্ঞান

সে অনেক দিনের কথা। মানবের ঋদ্ধি বৃদ্ধি কামনায় আর্য্য ঋষি তখন 'কুরুক্ষেত্রের' মুক্তপ্রাঙ্গণে যজ্ঞ মণ্ডপ বাঁধিয়াছিলেন। সরস্বতী দৃষদ্বতীর কূলে কূলে তখন "আপো-হিষ্টেতি" মন্ত্র ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিত। মুনি-সঙ্ঘের মধ্যবর্ত্তী আচার্য্য ভরদ্বাজ তখন জীব জগতের অভাব-অন্যায়ের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতেন। দেশে পূর্ণবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠার জন্য—প্রয়োগ-কুশল 'অত্রি' 'হারীত' অপরিচিত বিষ ভক্ষণে "নীলকণ্ঠের" গৌরব লাভ করিতেন। এখনকার এই প্রাণহীন মলিন ভারত তখন কত আনন্দময়—কত উদ্যমময়! শ্যামল বনশ্রীর মধ্যে, জীবনের বিচিত্র স্পন্দনে—এদেশে তখন অনাবিল শান্তি বিরাজ করিত।

সেই নামহীন, স্মৃতিহীন অতীতে,—জ্ঞান-গরিষ্ঠ আচার্য্য গোষ্ঠী-ব্রহ্মণ্য প্রতিভায় যে সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন—তাহাতে অনেক অমূল্য রত্ন উঠিয়াছিল। ভর্তৃকর্ণের "মূত্র-বিজ্ঞান" সেই অনন্ত রত্নের অন্যতম। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই মূত্র-বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব।

এখন লোকে কথায় কথায় মূত্র পরীক্ষা করে এবং তাহার জন্য য়ুরোপের জীবন্ত বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে লোকের অপরাধ নাই। হিন্দুর উদার বিজ্ঞান এই বিংশ শতাব্দীর স্বর্ণ যুগে নিতান্ত শীর্ণ ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। আয়ুর্ব্বেদের যজ্ঞ এখন হবিঃদুর্ল্লভ হইয়া উঠিয়াছে। বহুদিনের অনাদরে, অশ্রান্ত-সাধনার অতুল আরোগ্য-ভাণ্ডার—কলা-নিপুণা কল্যাণশ্রীর অভাবে, এখন একান্ত বিশৃঙ্খল! জীবন সমস্যার মীমাংসা সূত্র যাঁহাদের হাতে ছিল, তাঁহাদের অযোগ্য সন্তান এখন সূত্র ও সূত্রার্থ হীন! জীবন তন্ত্রে এখন মহা নির্ব্বাণের স্বপ্নচ্ছায়া! মন্ত্র—অসম্পূর্ণ, ছন্দ যতিহীন, হোমাগ্নি—তুহিন—শীতল, ঋত্বিকের বংশধর ঋক্ উচ্চারণ ভুলিয়া গিয়াছে!

এখন, রোগীর মূত্র-পরীক্ষার প্রয়োজন হইলে, কবিরাজগণ কেবল মূত্রে তৈল বিন্দু প্রক্ষেপ করেন। কিন্তু আচার্য্যযুগে আমাদের দেশে, মূত্র পরীক্ষার বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক যুগের কতকগুলি জীর্ণ ও কীটদষ্ট পুঁথি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই সকল অপূর্ব্ব, অপ্রকাশিত বৈদ্যকগ্রন্থে চিকিৎসা তন্ত্রের অনেক অমূল্য উপদেশ নিহিত আছে। আমরা একে একে তাহা পাঠকগণকে উপহার দিব। আজ কেবল প্রাচীনকালের মূত্র বিজ্ঞানের কথা বলিব।

বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক যুগে, ভারতের "আয়ুর্ব্বেদ", গ্রীস, মিশর, আরব ও পারস্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল †। বৌদ্ধধর্ম্ম—জন্ম, কর্ম্ম, জ্বালা, যন্ত্রণা নিভাইবার ধর্ম্ম; সুতরাং দৈহিক ব্যাধি নিবারণ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রণব বা ওঁকার। এই যুগে শবচ্ছেদ ও পশুবধ রাজাজ্ঞায় নিষিদ্ধ হইয়া যায়। তাহারই ফলে, বৌদ্ধযুগে বিশুদ্ধ লাক্ষণিক চিকিৎসার আবির্ভাব হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম মানুষকে দেবতা করিয়া তুলিয়াছিল, মানবের সেই দেবত্ব ও ভ্রাতৃতন্ত্রের শুভসংবাদ লইয়া যখন

† মল্লিখিত "আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাসে" এ সকল কথা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রমণগণ দেশে দেশে ছুটিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে ভারতের আয়ুর্ব্বেদ কামবোধির কূল হইতে গ্রীক্ দ্বীপ-পুঞ্জ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এই সময় মূত্র বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হয়। রাজা অশোক "প্রিয়দর্শী" নাম গ্রহণ করিয়া, পশু ও মানবের রক্ষা কল্পে দেশ দেশে রুগ্নাবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। খৃঃ পূঃ ২৪৯ হইতে, খৃষ্টাব্দ ৭৫০ পর্য্যন্ত, আয়ুর্ব্বেদের বৌদ্ধযুগ।

বৌদ্ধযুগের চিকিৎসকগণ আচার্য্য জতুকর্ণের মূত্র-বিজ্ঞানকে পল্লবিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্য—আমরা সমগ্র পুস্তকখানি পাই নাই, কেবল ২১ খানি মাত্র পুঁথির পাতা পাইয়াছি। পণ্ডিত শশিভূষণ কাব্যতীর্থ কবিরাজ বিহার অঞ্চল হইতে পুঁথিখানি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এক সময় বিহার বৌদ্ধগণের লীলাক্ষেত্র ছিল।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মতে মূত্রকে জ্বাল দিয়া পরীক্ষা করা হয় বৌদ্ধযুগের বৈদ্যগণ এ প্রণালী জানিতেন। কেবল মাত্র মূত্র পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন, রোগীর দেহের কোন ধাতু দূষিত হইয়াছে।

মূত্রৈঃ পয়স্তুল্যমিতং বিমিশ্রং
মূলস্য চূর্ণং খলু পুষ্করস্য।
প্রক্ষিপ্য পক্কং মৃদুনাগ্নিনা তৎ
মেদঃ প্রদুষ্টং যদি লোহিতং স্যাৎ॥

রোগীর মূত্র লইয়া তাহাতে তুল্যপরিমিত দুগ্ধ মিশ্রিত করিবে। পরে তাহাতে পুষ্কর মূলের চূর্ণ [পুষ্কর মূল—পশ্চিম প্রদেশে জাত বৃক্ষ বিশেষের মূল, ইহা জলে জন্মে, ইহার পাতা কহ্লারের পাতার মত, ফুল ঠিক পদ্মের ন্যায়। বঙ্গদেশের বৈদ্যগণ পুষ্কর মূলের অভাবে কুড় নামক গন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করেন] কিঞ্চিৎ পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া, যদি দেখ ঐ মূত্র লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়াছে, তাহা হইলে বুঝিবে রোগীর দেহের মেদোধাতু বিকৃত হইয়াছে।

মূত্রে নবমৃৎপাত্রস্থে নাগভস্মং বিনিক্ষিপেৎ।
তদুষ্ণস্পর্শ ক্ষেদ্বিদ্যাৎ শুক্রদোষং সুনিশ্চিতং॥

নূতন মৃৎপাত্রে মূত্র রাখিয়া, তাহাতে সীসকভস্ম নিক্ষেপ করিলে, যদি মূত্র উষ্ণ স্পর্শ বোধ হয় তাহা হইলে ঐ রোগীর শুক্রের দোষ জন্মিয়াছে বুঝিবে।

মূত্রসিক্তং হি বসনং মূলস্য পুষ্করস্য চ।
আর্দ্রয়িত্বা রসেনৈব শুষ্কং তৎ বর্ত্তিকাসমং॥
কৃতং তজ্জ্বলং নূনং তৈলাক্তসম মেবহি।
জ্বলতীতি বিজানীয়ান্মজ্জদোষং ধ্রুবং সুধীঃ॥

একখণ্ড বস্ত্র প্রথমে রোগীর মূত্রে সিক্ত করিবে, পরে ঐ বস্ত্রখণ্ড আবার পুষ্কর মূলের রসে ভিজাইবে। শুষ্ক হইলে ঐ বস্ত্রখণ্ড সলিতার মত পাকাইয়া উহা জ্বালিবে। যদি তৈলাক্ত বর্ত্তিকার মত বেশ উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতে থাকে, তাহা হইলে জানিবে রোগীর মজ্জা ক্ষয় হইতেছে।

দিনত্রয়ং স্থিয়া মূত্রেসিক্তং গোধূমমাদরাৎ।
শুষ্কীকৃতং ছায়ায়াঞ্চেন্নবা স্ফুটতি ভর্জ্জিতং।
ততো দুষ্টং বিজানীয়া দার্ত্তবং খলু যোষিতাং॥

কতকগুলি গোধূম লইয়া স্ত্রী-মূত্রে বেশ করিয়া ৩ দিন ভিজাইবে। পরে তাহা ছায়ায় শুষ্ক করিবে। এই গম ভাজিলে যদি ফুটিয়া না উঠে, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে ঐ রমণীর আর্ত্তব দূষিত হইয়াছে।

মূত্রে কন্দুকে নারীনাং নিক্ষিপ্যোজ্জ্বলহীরকং।
দিনত্রয়াবসানে তৎ দৃশ্যতে চেদনির্ম্মলং।
সন্তানোৎপাদিকা শক্তির্নষ্টা জ্ঞেয়া ততঃ স্ত্রিয়াঃ॥

স্ত্রীলোকের মূত্র উষ্ণযুক্ত করিয়া তাহাতে ১খণ্ড উজ্জ্বল হীরক ডুবাইয়া রাখিবে। ৩ দিন

পরে যদি ঐ হীরকখণ্ড অনির্ম্মল অবস্থায় রহিয়াছে দেখিতে পাও, তাহা হইলে জানিবে ঐ রমণীর আর গর্ভ হইবার আশা নাই।

স্ত্রীলোকের গর্ভ হইয়াছে কি না, তাহার মূত্র পরীক্ষা করিয়া সেকালের ভিষক্‌গণ বলিতে পারিতেন।

মূত্রে নার্য্যাঃ ক্ষিপেৎ শ্বেতশাল্মলীপুষ্প-চূর্ণকং।
তত্রৈব স্নেহবদ্ব্যং দৃশ্যতে চেৎ পরেঽহনি।
ততো গর্ভং বিজানীয়াৎ স্ত্রিয়া ইত্থং বিশেষতঃ॥

নারীমূত্রে শ্বেতশিমূলের ফুলের চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। পরদিন যদি দেখ ঐ মূত্রের উপরিভাগে তৈলের মত দ্রব্য ভাসিতেছে, তাহা হইলে জানিবে সে নারী গর্ভবতী হইয়াছে।

মূত্রেঽবলায়াঃ সিংহাস্থি চূর্ণং নিক্ষিপ্য পশ্যতি।
যদি বুদ্‌বুদ-বত্তস্মিন্ বিদ্যাৎ গর্ভবতীং হি তাং॥

স্ত্রীলোকের মূত্রে সিংহাস্থি চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া যদি দেখ—বুদ্‌বুদের মত ভুড়্‌ভুড়ি কাটিতেছে তাহা হইলে বুঝিবেন সে নারীর গর্ভ সঞ্চার হইয়াছে।

বৌদ্ধযুগের বৈদ্যগণ মূত্র পরীক্ষা করিয়া বলিতে পারিতেন—ঐ মূত্র স্ত্রীলোকের কি পুরুষের।

মূত্রৈস্তুল্যমিতৈস্তৈলে মিশ্রয়েৎ মূলজং রসং
করকস্য ততো বিদ্যাৎ পীতাভং যদি তদ্ভবেৎ।
পুরুষস্যেতি তন্মূত্রং নীলাভং চেদ্ ধ্রুবং স্ত্রিয়াঃ॥

মূত্রের সহিত তুল্য পরিমাণে তৈল মিশ্রিত করিয়া তাহাতে করক মূলের রস দিবে। যদি মূত্রের বর্ণ পীতাভ হয়, তাহা হইলে সে মূত্র পুরুষের, আর নীলবর্ণ হইলে সে মূত্র রমণীর বলিয়া জানিবে।

স্ত্রী-জাতির মধ্যে যেমন বন্ধ্যা নারী আছে পুরুষের মধ্যেও তেমনি বন্ধ্য-পুরুষ আছে। কিন্তু, সাধারণ লোকে এ কথা জানেন না। তাই পুত্র না হইলে এ দেশে পুরুষ আবার একটী বিবাহ করিয়া বসেন। দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভ না হইলে পুরুষকে তৃতীয় পক্ষও অবলম্বন করিতে দেখা যায়। শেষ জীবনে এই তৃতীয় পক্ষের শাসন বিশ্বামিত্রের ত্রি-বিদ্যা শাসনের চেয়েও ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়ায়। পুত্রলাভে বঞ্চিত হইয়া যাঁহারা দ্বিতীয় দার-গ্রহণে উদ্যত হ'ন, তাঁহাদের বুঝিয়া দেখা উচিত—কাহার দোষে সন্তান হইতেছে না? বৌদ্ধযুগের বৈদ্য বলেন,—পুরুষ বন্ধ্য, কি স্ত্রী বন্ধ্যা, নিম্নলিখিত উপায়ে তাহা পরীক্ষা করিবে।

স্থানদ্বয়েঽলাবুবীজং কৃত্বা চ প্রোথিতং পৃথক্
একত্র পুরুষোঽন্যস্মিন্ নারী মূত্রং পরিত্যজেৎ
যস্য নো জায়তেঽঙ্কুরো মূত্রাসিক্তে তু বীজকে।
তস্য দোষং বিজানীয়াৎ শুক্রজং সত্যমেব হি॥

পৃথক্ পৃথক্ দুইটি স্থানে লাউ বীজ রোপণ করিবে, উহার একটি স্থানে পুরুষ, এবং অপর স্থানটিতে রমণী প্রস্রাব করিবে। যাহার মূত্র সিক্ত বীজ হইতে অঙ্কুরোদগম হইবে না, তাহারই শুক্রজ দোষে সন্তান হইতেছে না জানিবে। এখানে, কথা উঠিতে পারে স্ত্রীলোকের তো শুক্র নাই, তাহার আবার শুক্রজ দোষ কি? কিন্তু সুশ্রুত প্রমুখ আচার্য্যগণ স্ত্রী জাতির শুক্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

মূত্র বালকের কি যুবার, পশুর কি মানুষের, পূর্ব্বাচার্য্যগণ তাহাও পরীক্ষা করিয়া বলিতে পারিতেন। জ্বর, অতিসার, গ্রহণী, প্রমেহ, অর্শ, অম্লপিত্ত প্রভৃতি যাবতীয় রোগ—কেবল মাত্র মূত্র পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা অনায়াসেই বলিয়া দিতেন। কিন্তু প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কায় অদ্য এইখানেই "ইতি" করিলাম।

শ্রীব্রজবল্লভ রায়।
ভূতপূর্ব্ব "বঙ্গদর্শী" সম্পাদক

* পুরুষ মূলের পরিবর্ত্তে কুড় ব্যবহার করিলে পরীক্ষা সিদ্ধ হইবে কিনা? সিংহাস্থি কি? করকের পরিচয়ের উপায় কি? যদি লেখক উল্লেখ করিতেন তাহা হইলে অনেকেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিতেন (আঃ সং)।

নিখিল ভারতবর্ষীয় বৈদ্য-সম্মেলন।

১৮৩৭ শকে, মান্দ্রাজ নগরে, নিখিল ভারতবর্ষীয় বৈদ্য-সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশনে সভাপতি,—বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য, কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায়, কবিরত্ন, এম্, এ ; এম্, বি ;

সভাপতির অভিভাষণ—

যিনি লীলাচ্ছলে ব্রহ্মাণ্ডরূপে ব্যক্ত হইয়া পুনরায় লীলা সংহার করিয়া অব্যক্ত-ভাব ধারণ করেন, যিনি স্রষ্টা এবং সৃষ্টি, যিনি হবিরূপে দাহ্য এবং অগ্নিরূপে দাহক, যিনি দ্রব্যরূপে দৃশ্য এবং চক্ষুরূপে দ্রষ্টা, যিনি শব্দ-রূপে শ্রাব্য এবং কর্ণরূপে শ্রোতা, যিনি খাদ্য-রূপে ভোজ্য এবং প্রাণিরূপে ভোক্তা, যিনি পথরূপে গম্য এবং চরণরূপে গন্তা. যিনি দ্রব্য-রূপে গ্রাহ্য এবং হস্তরূপে গ্রাহক, যিনি রজো-গুণে স্রষ্টা, সত্ত্বগুণে পালক এবং তমোগুণে অন্তক, যিনি নিত্য, সনাতন, শাশ্বত ও অব্যয় —সেই জগদেককারণ জগন্নাথের চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি।

যাঁহার কৃপায় সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব নররূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছি, যিনি স্বর্গ, যিনি ধর্ম্ম, যিনি পরমতপ, যিনি এই মর্ত্ত্যধামে একমাত্র নররূপী প্রত্যক্ষ দেবতা, সেই স্বর্গগত জনকের চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি।

যাঁহাদিগের কৃপায় জ্ঞানলাভ করিয়া মনুষ্য নামের উপযুক্ত হইয়াছি, যাঁহারা জ্ঞানা-ঞ্জনশলাকা দ্বারা আমার অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন নয়ন উন্মীলিত করিয়া দিয়াছেন, যাঁহাদিগের কৃপায় ভগবতী ভারতী দেবীর চরণরেণুতে মস্তক স্পর্শ করিতে সক্ষম হইয়াছি যাঁহাদিগের কৃপায় অখণ্ড-মণ্ডলাকার চরাচরব্যাপ্ত বিশ্ব-নাথের শ্রীচরণ ধ্যান করিতে সমর্থ হইয়াছি, সেই জ্ঞানদাতা ও দীক্ষাদাতা গুরুদিগের চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি।

সর্ব্বভূতে দয়া প্রকাশই যাঁহাদিগের জীব-নের একমাত্র ব্রত ছিল, ভগবানকে সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত জানিয়া যাঁহারা সর্ব্বভূতের সেবায় জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন, যাঁহাদিগের চেষ্টায় পুণ্যময় আয়ুর্ব্বেদ পৃথিবীতে প্রচারিত হইয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করি-তেছে, সেই পুণ্যশ্লোক দয়াবতার মহর্ষিগণের চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি।

যাঁহারা লোপোন্মুখ আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রকে উদ্ধার ও রক্ষা করিয়া ভারতের গৌরব অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন, যাঁহাদিগের সহায়তা না পাইলে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে অধ্যয়ন অধ্যাপনা দুষ্কর হইত মহর্ষিগণের পরবর্ত্তী সেই আয়ুর্ব্বেদ-বিশারদ সংগ্রহকার ও টীকাকারগণের চরণে প্রণাম করি।

এই মহতী সভায় বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত যে সকল জ্ঞানী ব্যক্তি উপস্থিত আছেন, যাঁহারা সর্ব্বস্বার্থ ত্যাগ করিয়া আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধার [illegible] হইয়াছেন, সেই মহানু-ভব [illegible] আন্তরিক অভিবাদন করি।

[illegible] সমবেত সভ্য মহোদয়গণ। [illegible]

[illegible]

করিয়াছেন আমি সেই পদের উপযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। এই মহতী সভা পরিচালনজন্য যে শক্তি—যে জ্ঞানের প্রয়োজন, আমাতে সে জ্ঞান—সে শক্তি কোথায়? কিন্তু আপনাদের নিয়োগ আমি অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

একে শক্তি ও জ্ঞানের অভাব, তাহাতে বহু আতুরের সেবায় নিযুক্ত থাকিতে হয় বলিয়া, আমার অবসর অত্যন্ত অল্প। ইহার উপর আপনাদের নিয়োগপত্র অতি অল্পকাল পূর্ব্বে প্রাপ্ত হওয়ায় এই কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইবারও অবকাশ পাই নাই। সুতরাং আমার যে যথেষ্ট ক্রটী ঘটিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আশা করি আপনারা নিজগুণে ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন।

এই মহতী সভার মহদুদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে প্রথমেই আমাদের পরম কারুণিক সম্রাটের কথা মনে পড়ে। রাজা প্রজার পক্ষে পিতৃতুল্য, এবং আমাদের সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ আমাদিগকে পুত্র-নির্ব্বিশেষেই পালন করিয়া আসিতেছেন। সাগরাম্বরা ধরণীর প্রায় অর্দ্ধাংশ যাঁহার শাসনদণ্ডাধীন, যাঁহার রাজ্যে সূর্য্য কখন অস্তমিত হয় না, যাঁহার রাজত্বে অসংখ্য বিভিন্ন জাতির বাস— সেই রাজাধিরাজচক্রবর্ত্তী গতপূর্ব্ব-বৎসর ভারতবর্ষে আসিয়া কি ভাবে বালক বালিকাদিগের সহিত সদালাপ করিয়াছিলেন, তাহা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। মহাত্মা পঞ্চম জর্জ্জ কেবল আমাদের বাহিরের সম্রাট্ নহেন, তিনি আমাদের হৃদয়ের সম্রাট্। আমাদের সেই সদাশয় সম্রাট্ আজ বলদৃপ্ত দুর্ব্বৃত্ত শত্রুর সহিত যুদ্ধে বিপন্ন। রাজা যখন বিপন্ন; তখন আমরাও যে বিপন্ন তাহা আর স্বতন্ত্র করিয়া বলিতে হইবে কি? যেখানে ধর্ম্ম সেইখানেই জয়। সুতরাং আমাদের ধার্ম্মিক রাজা যে জয় লাভ করিবেন ইহা সুনিশ্চিত। আমরা আমাদের সম্রাটের জয়লাভ এবং তাঁহার স্বাস্থ্যলাভের জন্য ভগবানের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি।

সভ্য সহোদয়গণ! আজ এই মহাসম্মেলনে —এই আনন্দের দিনে মনে পড়ে তাঁহাদের কথা—যাঁহাদিগকে গত সম্মিলনে দেখিয়াছি, কিন্তু বর্ত্তমান সম্মেলনে আর দেখিতে পাইতেছি না। তাঁহারা কোথায়, যাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সম্মিলনে এই মহাসম্মিলনের সার্থকতার জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছেন, অর্থ, সময় ও স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া সভার কার্য্যোদ্ধারের নিমিত্ত অহোরাত্র চেষ্টা করিয়াছেন—সেই সুপরিচিত মহাজনেরা কোথায়? হায়! কে উত্তর দিবে তাঁহারা কোথায়! জীবন-সমুদ্রের পরপারে কোন অজ্ঞাত দেশে তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেই মধুরস্বভাব উদার মহাত্মারা আজিও তাঁহাদের চিরসেবিত আয়ুর্ব্বেদের কথা ভুলিতে পারেন নাই—এখন ও যেন জীবন-সমুদ্রের পরপার হইতে তাঁহাদের দীর্ঘশ্বাস শুনা যাইতেছে।

দুঃখের বিষয় যে, বিশাল ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের পরলোকগত ভাবৎ ভিষক্গণের বিষয় আমি অবগত নহি। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ৺তারাপ্রসন্ন সেন মহোদয়ের অভাবই আমি বিশেষরূপে অনুভব করিতেছি। এই মহাসভায় অনেকেই বোধ হয় গত বৎসরের সম্মিলনীতে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। সে বৎসর তিনি কলিকাতার সম্মিলনীর জন্য যেরূপ [illegible] ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা [illegible]

অতীত। ৺তারাপ্রসন্ন সেন এবং অন্যান্য স্বর্গগত চিকিৎসকগণের নাম চিরস্মরণীয় হউক।

সভ্য মহোদয়গণ! আজ এই আনন্দজনক মহাসম্মেলনের দিনে বহু প্রাচীন যুগের এক পুরাতন কাহিনী মনে পড়ে। যে উদ্দেশ্যে এই মহাসভায় আমরা সমবেত হইয়াছি, প্রায় সেই উদ্দেশ্য সাধন জন্যই, বহু পুরাতন যুগে, আত্রেয়, কাশ্যপ, ভৃগু, অগস্ত্য গৌতম, ভরদ্বাজ, মৈত্রেয় প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষিগণ, জীবের প্রতি করুণা পরবশ হইয়া, অদ্রিরাজ হিমালয়ের পাদদেশে সমবেত হইতেন। স্বর্গের দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেই মহর্ষিগণের তুলনায় আমরা ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র। কিন্তু আমরা যে সেই ভারতগৌরব—শুধু ভারত-গৌরব বলি কেন—জগদ্‌গৌরব মহামহিমময় মহাপুরুষদিগের পদাঙ্কানুসরণ করিতে উদ্যত হইয়াছি, ইহাও আমাদের পক্ষে পরম গৌরবের বিষয়।

বীণা বাদকগণ যেমন বীণার তন্ত্রী এক সুরে বাঁধিয়া লইয়া শ্রুতিমধুর ঐক্যতান বাদন করেন, হে সমাগত বিভিন্ন প্রদেশীয় ভিষক্‌গণ, আসুন আমরাও সেইরূপ প্রাদেশিক—সাম্প্রদায়িক পার্থক্য ভুলিয়া গিয়া, সেই মৈত্রীপরায়ণ আয়ুর্ব্বেদবক্তা ঋষিগণের চরণরেণু মস্তকে গ্রহণ পূর্ব্বক আমাদের হৃদয়বীণা একসুরে বাঁধিয়া লইয়া, সেই মহান্ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, এই মহাসভায় আয়ুর্ব্বেদের অভ্যুদয়মূলক মহাগীতি গান করি, যাহা শুনিয়া হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতবাসীর হৃদয়তন্ত্রী সমস্বরে বাজিয়া উঠিবে। তখন এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথও নিরাপদ হইবে। তখন আমরা বুঝিতে পারিব যে আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি—স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়—স্বার্থত্যাগের জন্য, আত্মহিতের জন্য নয়—পরহিতের জন্য, আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য নয়—আত্মবিসর্জ্জনের জন্য। জগতের চতুষ্খণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন—দেখিতে পাইবেন যে, যখন যে কোন জাতি যে কোন বিষয়ে উন্নতিলাভ করিয়াছে, তাহার মূলে কতকগুলি মহাপুরুষের আত্মবিসর্জ্জনের প্রমাণ জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। সিদ্ধিলাভের জন্য কঠোর সাধনা আবশ্যক, শুধু বাক্যের ছটায় সিদ্ধিলাভ হয় না। বেদ উদ্ধারের জন্য স্বয়ং ভগবানকেও মীনরূপ ধারণ করিতে হইয়াছিল। যাবতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক, কিন্তু বিধিবশাৎ অধুনা বিরল-প্রচার ও বিকলাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের উদ্ধারের জন্য এই বারিধিবিধৌতচরণা হিমাদ্রিকিরিটিনী পুণ্যময়ী ভারতভূমিতে কে কোথায় আছ—মাদ্রাজী, মারাঠী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী উৎকলী—কে সাধক আছ—মহাসাধনায় জন্য অগ্রসর হও, আত্মবিসর্জ্জনের জন্য প্রস্তুত হও। ভারতবাসী তোমায় আত্রেয় ধন্বন্তরির পদপ্রান্তে বসাইয়া ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিবে।

যে পুরাকালের কথা আমি বলিতেছি—যে সময়ে ভারতে মানবকল্যাণকল্পে বেদ, বেদান্ত দর্শন, উপনিষদ, জ্যোতিষ প্রভৃতির প্রণয়ন ও প্রচার জন্য স্বচ্ছন্দবনজাত ফলমূলাশী মহর্ষিগণ কঠোর সাধনা করিতেছিলেন, সেই সময়ে এবং তাহার বহু পরবর্ত্তীকাল পর্য্যন্ত জগতের অন্যান্য দেশ ঘোরতর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। সেই সকল দেশের অধিবাসিগণ বন্য পশুর ন্যায় উলঙ্গ হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিত এবং নখ-দন্ত দণ্ড-মুষ্টি-লোষ্ট্র প্রহারে [illegible]

হতাহত করিত। সেই সকল অসভ্যজাতির সভ্যতালাভের সহিত ভারতবর্ষের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কিন্তু অধিকাংশ বিজ্ঞানশাস্ত্রের মূলসূত্র যে ভারতবর্ষেই প্রথমে উদ্ভাবিত হইয়াছিল এবং অপরাপর জাতির বিজ্ঞানশাস্ত্র যে তজ্জন্য ভারতবর্ষের নিকট ঋণী, অধুনা জগতের যাবতীয় বিদ্বদ্বর্গ তাহা একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। অন্যান্য বিজ্ঞানের কথা ছাড়িয়া দিয়া, আমাদের আলোচ্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিষয় আলোচনা করিলে জানা যায় যে, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলি প্রথমে ভারতবর্ষ হইতে আরবদেশে প্রচারিত হয়। আরবদেশে ভারতবর্ষীয় চিকিৎসক অধ্যাপক ছিলেন, এবং তথায় চরক ও সুশ্রুত গ্রন্থ অনূদিত ও অধীত হইয়াছিল, ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আরব হইতে মিশর, মিশর হইতে গ্রীস, গ্রীস হইতে রোম, রোম হইতে সমগ্র য়ুরোপ এবং পরে পৃথিবীর চতুর্খণ্ডেই আয়ুর্ব্বেদের মূলসূত্রগুলি প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। বলা বাহুল্য যে, সেই মূল সূত্রগুলি অন্যকোন দেশেই আর পূর্ব্বাকারে নাই। ভিন্ন ভিন্ন দেশে নীত এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতির চেষ্টায় রূপান্তরিত, পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও বিভিন্ন সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়া সেই মূলসূত্রগুলি বিভিন্ন চিকিৎসা-শাস্ত্ররূপে জগতে প্রচারিত রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে অনেক পাশ্চাত্য কোবিদ স্ব স্ব মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রমাণ স্বরূপ দুই একটি উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

এ, এফ্, হরনেল, সি, আই, ই, পিএচ্, ডি, এম্, এ, মহোদয় তাঁহার গ্রন্থে (Studies in the Medicine of Ancient India) লিখিয়াছেন :—

"Probably it will come as a surprise to many as it did to myself, to discover the amount of anatomical knowledge which is disclosed in the works of earliest medical writers of India. Its extent and accuracy are surprising, when we allow for their early age—probably the sixth century before Christ—and their peculiar methods of definition. In these circumstances the interesting question of the relation of the medicines of the Indians to that of Greeks naturally suggests itself. The possibility, at least, of a dependence of either on the other cannot well be denied, when we know as on historical fact the two Greek physicians, Ktesits, about 400 B. C. and Megasthenes about 300 B. C., visited or resided in Northern India."

ভাবার্থ:—ভারতবর্ষের প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ-কারগণের লিখিত গ্রন্থে শারীরত্ব সম্বন্ধে যে গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা শুনিয়া আমার ন্যায় অনেকেই আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠশতাব্দীর ন্যায় প্রাচীন সময়ে ঐ জ্ঞানের বিস্তৃতি এবং যাথার্থ্য—বিশেষতঃ শারীরতত্ত্ব লিখিবার সুন্দর প্রণালী—প্রকৃতই বিস্ময়কর। এ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে গ্রীক ও হিন্দুদিগের এ বিষয়ে কিরূপ সম্বন্ধ ছিল এই প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়। এক দেশের শারীরতত্ত্ব যে অপর দেশের শারীরতত্ত্বের ভিত্তি স্বরূপ হইয়াছিল তাহা নিতান্ত সম্ভবপর। বিশেষতঃ খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে টেসিয়াস্ এবং তৃতীয় শতাব্দীতে

মেগাস্থিনিস্ নামক দুইজন গ্রীসদেশীয় চিকিৎসক উত্তর ভারতবর্ষে গমন করিয়াছিলেন বা বাস করিয়াছিলেন—যখন এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়, তখন ইহা আর অস্বীকার করা যায় না।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ম্যাক্স্ নিউবার্গার তাঁহার গ্রন্থে (History of Medicine) লিখিয়াছেন:—

"That Greek medicine adopted Indian medicaments and methods is evident from the literature. The contact between the two civilisations first became intimate through the march of Alexander, and continued unbroken throughout the reign of Diaduchi and the Roman and Byzantine eras. Alexandria, Syria and Persia were the principal centres of intercourse. Indian physicians, means and methods of healing are frequently mentioned by Grecœ-Roman and Byzantine authors, as well as many diseases endemic in India, but previously unknown. During the rule of the Abbasides, the Indian physicians attained still greater repute in Persia, whereby Indian medicines became engrafted upon the Arabic, an effect which was hardly increased by the Arabic dominion over India. Indian influence, in the guise of Arabic medicine, was felt anew in the west. The apparently spontaneous appearance in Sicily in the fifteenth century of rhino-plastic surgery bespeaks a long period of previous Indo-Arabian influence. The plastic surgery of the nineteenth century was stimulated by the example of Indian methods. The first occasion being the news derived from India, that a man of the brickmaker's caste had, by means of a flap from the skin of the forehead, fashioned a substitute for the nose of a native."

ভাবার্থ:—"সাহিত্য পাঠ দ্বারা জানা যায় যে গ্রীকজাতি ভারতবর্ষীয়দিগের ঔষধ এবং চিকিৎসা-প্রণালী গ্রহণ করিয়াছিল। আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয় কালে উভয় জাতির মধ্যে সংস্পর্শ ঘটে এবং উহা ডিয়াডোচির রাজত্বকালে এবং রোম্যান ও বাইজেন্টাইন্দিগের যুগে চলিতে থাকে। এলেকজেন্দ্রিয়া, সিরিয়া এবং পারস্য দেশই প্রধানতঃ মিলনের কেন্দ্রস্থল ছিল। গ্রীকো-রোমান এবং বাইজেন্টাইন্ লেখকদিগের গ্রন্থে ভারতবর্ষীয় চিকিৎসক ও চিকিৎসা প্রণালীর এবং যাহা গ্রীসদেশে ছিল না অথচ ভারতবর্ষে ছিল—এরূপ অনেকগুলি রোগের বহুল পরিমাণে উল্লেখ দেখা যায়। আব্বাসাইডের রাজত্বকালে ভারতবর্ষীয় চিকিৎসকগণ পারস্যদেশে অধিকতর সম্মান লাভ করিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষীয় ঔষধ আরবদেশের চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। পরে উহা আরবদেশীয় ঔষধের ছদ্মবেশে পাশ্চাত্য দেশে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল। কৃত্রিম নাসিকা নির্ম্মাণের প্রণালী (Rhino plasty) ভারতবর্ষীয় ও আরবদেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্র হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীতে সিসিলিদেশে প্রচারিত হইয়াছিল। শস্ত্রচিকিৎসায় চর্ম্ম উৎকর্ত্তন বিজ্ঞান শরীরের এক অঙ্গের চর্ম্ম কাটিয়া অপর স্থানে সংযুক্ত করার পদ্ধতি (Plastic operation)

ভারতবর্ষীয় চিকিৎসা-প্রণালীর সহায়তায়ই উন্নতিলাভ করিয়াছিল। "বহুপূর্ব্বে একজন ভারতবাসী সিসিলিদেশীয় জনৈক লোকের কপালের চর্ম্ম লইয়া নাসিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিল **এই সংবাদ অবগত হইয়া পাশ্চাত্য জাতি উনবিংশ শতাব্দীতে এবম্বিধ শস্ত্রোপচারে প্রবৃত্ত হয়েন।**

এইখানে আমরা আয়ুর্ব্বেদের শ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্ট দেখিতে পাই। আয়ুর্ব্বেদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম, এবং জগতের যাবতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের জনক। অথবা জনক বলিলেও ঠিক হয় না, —প্রপিতামহ বা বৃদ্ধ প্রপিতামহ। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, শস্ত্র-চিকিৎসায়ও ভারতবর্ষই শিক্ষাগুরু। দুঃখের বিষয় অনেক পাশ্চাত্য চিকিৎসক এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে শিক্ষিত ভারতবাসী আয়ুর্ব্বেদকে অবজ্ঞার চক্ষেদেখিয়া থাকেন।

আয়ুর্ব্বেদ জ্ঞানের অভাব, পশ্চাত্য চিকিৎসক এবং এবং চিকিৎসাগ্রন্থ লেখকগণকে অনেক সময় ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত করিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতেছে যে, ডাক্তার অস্লার ও ম্যাক্রে কর্ত্তৃক সম্পাদিত চিকিৎসা-গ্রন্থে (A system of medicine) উইলিয়াম টি, কৌন্সিলম্যান্ এম, ডি, লিখিয়াছেন—

"The first description of the disease Small-pox, which leaves no doubt as to its nature, is given in the well known treatise by Rhazes in the tenth century."

ভাবার্থঃ—"মসূরী (বসন্ত) রোগের নিঃসংশয়কর বর্ণনা রেজেস্ নামক আরব-দেশীয় চিকিৎসকের গ্রন্থে দশম শতাব্দীতে প্রথমে লিখিত হইয়াছিল"।

কিন্তু উক্ত সময়ের বহুকাল পূর্ব্বে লিখিত চরক এবং সুশ্রুত গ্রন্থে মসূরিকার লক্ষণ ও চিকিৎসাদির বিষয় লিখিত আছে। দুঃখের বিষয় উক্ত লেখক তাহা অবগত নহেন বলিয়া পূর্ব্বোক্ত ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন এবং জগৎকে এরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী করিতেছেন। আয়ুর্ব্বেদের গৌরব বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত প্রমাণ সহ এইরূপ লেখকদিগের ভ্রম প্রদর্শন করা এই সভার কর্ত্তব্য বলিয়া আমি মনে করি। উপযুক্ত প্রমাণ পাইলে ঐ সকল গ্রন্থকার অবশ্যই স্ব স্ব গ্রন্থলিখিত ভ্রম সংশোধন করিয়া দিবেন।

সুখের বিষয় এই যে অনেক পাশ্চাত্য চিকিৎসক আয়ুর্ব্বেদের মহত্ব কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। কলিকাতা মেডিকেল কালেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক চার্লস্ সাহেব ছাত্রদিগকে বক্তৃতা দিবার সময় প্রায়ই বলিতেন—দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, আজ আমি তোমাদের নিকট তাহার পুনরুল্লেখ করিতেছি মাত্র। শিষ্যগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে চরকের বিমান স্থানের রোগভিষগ্জিতীয় অধ্যায়ের কিয়দংশ তিনিই কলিকাতা মেডিকেল কলেজের সোপান—শ্রেণীর সম্মুখস্থ প্রাচীরে প্রস্তর ফলকে খোদিত করিয়া রাখিয়াছেন।

আমেরিকা দেশের ফিলাডেলফিয়া নগরের ডাক্তার ক্লার্ক এম, ডি, মহোদয় চরকের ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করিয়া বলিয়াছেন—

"If the physicians of the present day would drop from the Pharmacopœa all the modern drugs and

chemicals, and treat patients acoording to the methods of Charaka, there will be less work for the undertakers and fewer chronic invalids in the world."

ভাবার্থ:—যদ্যপি চিকিৎসকগণ আধুনিক ঔষধাদি পরিত্যাগ করিয়া চরকের মতে চিকিৎসা করেন, তাহা হইলে মৃত্যুর সংখ্যা কম হইবে এবং পৃথিবীতে চিররোগী খুব অল্পই দেখা যাইবে।

ডাক্তার পল, বার্থোলেম বলিয়াছেন –

"I have been exceedingly struck with the meaning of many passages which indeed go beyond anything that I have met before in medical literature."

ভাবার্থ:—অনেক স্থানের ভাবগাম্ভীর্য্য দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। আমি এ পর্য্যন্ত যতগুলি চিকিৎসা-গ্রন্থ দেখিয়াছি, কোনটীতেই এরূপ গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাই নাই।

আয়ুর্ব্বেদের মহত্ত্ব ও গৌরবের তুলনায় উদ্ধৃত প্রশংসাবাদ নিতান্ত অল্প হইলেও, অনেক পাশ্চাত্য ভিষক্ যে আয়ুর্ব্বেদের মহত্ত্ব কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, ইহাই আমাদের আনন্দের বিষয়।

সভ্যগণ, আসুন এক্ষণে আয়ুর্ব্বেদ-মহার্ণবে নিমগ্ন হইয়া তন্নিহিত রত্নরাজির কথঞ্চিৎ মূল্য নিরূপণ করিতে চেষ্টা করি।

প্রথমেই আয়ুর্ব্বেদের যে বিভাগ দেখিতে পাই তাহা অতীব সুন্দর। শল্য, শালাক্য, কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্য, অগদ, রসায়ন ও বাজীকরণ – এই অষ্টাঙ্গে আয়ুর্ব্বেদ বিভক্ত। কেহ বলিতে পারেন কি—কোন কালে - কোন দেশে—কোন চিকিৎসা-শাস্ত্রে এরূপ উৎকৃষ্ট বিভাগ হইয়াছে, হইতে পারে, বা হইবে।

আয়ুর্ব্বেদের দ্বিতীয় অপূর্ব্বত্ব - বায়ু, পিত্ত, কফ। এই মহাসভায় সমবেত চিকিৎসকমণ্ডলী সকলেই বায়ু, পিত্ত ও কফের বিষয় অবগত আছেন। বিশেষতঃ আমার পূর্ব্ববর্ত্তী সভাপতিগণ বায়ু, পিত্ত ও কফ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা অনাবশ্যক। তবে পাশ্চত্য চিকিৎসকগণও যে বায়ু, পিত্ত, ও কফ পরোক্ষভাবে স্বীকার করিয়া থাকেন, সেই কথা বলি।

বায়ু, পিত্ত কফ তিনটী শক্তি এবং এই তিনটী শক্তির বলে শরীর রক্ষিত, পীড়িত এবং ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শরীরের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে যে গতিক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাহা বায়ুর সাহায্যেই হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রোক্ত"নার্ভ" সকলের ক্রিয়া ঠিক বায়ুর ক্রিয়ার অনুরূপ। পাশ্চাত্যমতে শরীরের যে কোন কার্য্য নার্ভের শক্তিবলে মাংসপেশীর দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। নার্ভসকল যে শক্তির বলে কার্য্য করে সেই শক্তিকে আমরা বায়ু বলিয়া থাকি। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ নার্ভের 'নার্ভ' নামকরণ করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই।

এঁদ্ কেনড্রিক সাহেব এন্সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় ফিজিওলজি প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :

"The nerve may be regarded as conductor of a mode of energy, which for want of a better name is termed nerve-force."

নার্ভ যে শক্তি দ্বারা কার্য্য করিতে সমর্থ

হয়, সেই শক্তি ভবিষ্যতে বায়ু বা তদ্রূপ কোন নামে অভিহিত হইবে, এইরূপ আশা করা যায়।

অপর দুইটি শক্তি পিত্ত ও কফ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বায়ুর ন্যায় এত স্পষ্ট মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন নাই। এই রূপ দুইটি শক্তির অস্তিত্বের আভাস মাত্র তাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন ডাঃ কষ্টর তাঁহার ফিজিওলজিতে লিখিয়াছেন—

"The animal body dies daily, in the sense that at every moment some part of its substance is suffering decay, and is undergoing combustion. Combustible, in the ordinary sense of the word an animal body is not, by reason of the large excess of water which enters into its composition, but an animal body thoroughly dried will in the presence of oxygen burn like fuel and like fuel give out energy and heat."

ভাবার্থ: জীবের শরীর নিয়ত মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। কারণ প্রতি মুহূর্ত্তে জীব-শরীরের অংশ বিশেষ ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে, শরীরস্থ অগ্নিসংযোগে জলিয়া যাইতেছে, প্রচুর জলীয় পদার্থ শরীরে আছে বলিয়া জীব-শরীর একবারে জলিয়া যায় না। যদি ঐ জলীয় অংশ শরীরে না থাকিত তাহা হইলে জীব শরীর ইন্ধনের ন্যায় শীঘ্রই জলিয়া যাইত।

আয়ুর্ব্বেদের সেই পুরাতন কথা। "শীর্য্যত ইতি-শরীরম্"—শরীর প্রতিমুহূর্ত্তে শীর্ণ হইতেছে। তেজোরূপ পিত্ত শরীরকে দগ্ধ করিয়া দিতে উদ্যত, আর সোম্য শ্লেষ্মা শরীরকে আলিঙ্গন করিয়া দহমান অগ্নির প্রকোপ হইতে শরীরকে রক্ষা করিতেছে। শাস্ত্রে পিত্ত ও কফের সহিত সূর্য্য ও চন্দ্রের যে উপমা দেওয়া হইতেছে, এখানে সেই ভাব পরিস্ফুট দেখা যায় সুতরাং প্রকারান্তরে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান বায়ু, পিত্ত ও কফ নামক তিনটি শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন, ইহা অযুক্তি যুক্ত বলিয়া মনে হয় না।

নাড়ীজ্ঞান আয়ুর্ব্বেদের অন্যতম গৌরবের বিষয়।

জগতের আর কোন দেশে—আর কোন জাতির মধ্যে এরূপ নাড়ীজ্ঞান ছিল না—কখন যে হইবে এরূপ আশাও বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত নাই। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বহুবিধ যন্ত্রাদির সাহায্যে যে রোগ নির্ণয় করিতে অসমর্থ, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক অধিকাংশস্থলে একমাত্র নাড়ী পরীক্ষা, করিয়া তাহা নির্ণয় করিতে পারেন।

আজকাল অনেক শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তি ভুক্তদ্রব্যের সহিত যে নাড়ীর গতির সম্বন্ধ আছে, তাহার উল্লেখ করিয়া উপহাস করিয়া থাকেন। কিন্তু বলিতে বাধ্য হইতেছি যে তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। আমি চিকিৎসকদিগকে বলিতেছি না, কিন্তু চিকিৎসক ব্যতীত এই মহাসভায় অন্য কোন সভ্য যদি এ সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েন, তাহা হইলে অনায়াসে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। নিত্য শাকান্নভোজী ব্যক্তিকে একদিন মাংসাদি আহার করাইয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন, যে নাড়ীর গতি আর পূর্ব্বরূপ নাই—অন্যরূপ হইয়াছে। [illegible] জ্ঞানসম্পন্ন চিকিৎসক অনায়াসে [illegible] দেখিয়া "পুষ্টিস্তৈলগুড়াহারে মাংসে [illegible] কৃতিঃ" এই তথ্য বুঝিতে পারেন।

কিন্তু আয়ুর্ব্বেদোপদিষ্ট নাড়ীজ্ঞান এরূপ আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার হইলেও উহা সহজ লভ্য নহে। মহর্ষি কণাদ "নাড়ীবিজ্ঞান" গ্রন্থের উপসংহারে বলিয়াছেন :—

"নাড়ীপরিচয়ন্ত্বাবং প্রায়শো নৈব দৃশ্যতে।
তেন ধার্ষ্ট্যান্ময়োক্তং যং তৎ সমাধেয়মুত্তমৈঃ॥
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে প্রসিদ্ধা যস্য যা গতিঃ।
সৈবোপমানমত্র স্যাৎ প্রসিদ্ধ-গুণযোগতঃ॥
ন শাস্ত্রপঠনাদ্বাপি শশ্বদধ্যাপনাদপি।
স্পর্শনাদিভিরভ্যাসাদেব নাড়ীবিবেকভাক্॥
নাড়ীগতিরিয়ং সম্যগভ্যাসেনৈব গম্যতে।
নাড়ীপরিচয়ো লোকে প্রায়ঃ পুণ্যেন জায়তে॥
নাড়ীগতিরিয়ং সম্যগ্ যোগাভ্যাসবদেকতঃ।
নান্যথা শক্যতে জ্ঞাতুং বৃহস্পতিসমৈরপি॥"

মহর্ষি কণাদের ন্যায় মহাপুরুষের এই সত্যোক্তির উপর আর কিছু বলা ধৃষ্টতা মাত্র।

(ক্রমশঃ)

—

ব্রণ-চিকিৎসা।

কবিরাজ মহাশয়েরা ব্রণ-চিকিৎসা জানেন না। অধুনা, ছেদ-ভেদ-বন্ধন-সাধ্য বিদ্রধি ব্রণ-শোথ প্রভৃতির চিকিৎসায় এবং শোধন-রোপণাদি কর্ম্মসাপেক্ষ ব্রণ-প্রতিকারে উদাসীন রহিয়া, বৈদ্যক-শাস্ত্রমতাবলম্বি-চিকিৎসকগণ এরূপ কলঙ্ক ভাজন হইয়াছেন। পরন্তু প্রচুর ক্ষতিগ্রস্তও হইতেছেন। অনেকের বিশ্বাস, কবিরাজ মহাশয়দিগের উপজীব্য চিকিৎসাগ্রন্থে অস্ত্রোপচারের এবং ক্ষতরোগের চিকিৎসা-পদ্ধতির উপদেশ নাই। এইরূপ অযথা বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ব্রণ-চিকিৎসার্থি-রোগিগণ কবিরাজের শরণ লয়েন না। তজ্জন্য কবিরাজগণের মধ্যে যাঁহারা ব্রণ-চিকিৎসায় সুনিপুণ, তাঁহারা ব্রণ চিকিৎসায় কুশলতা দেখাইবার অবসর পান না।

মধ্যবিত্ত এবং দারিদ্র্যগ্রস্ত লোকদিগের হিতার্থে বৈদ্যকমতের ব্রণ-চিকিৎসা প্রচলিত হওয়া একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। যদি জড়তা পরিহার করিয়া, বৈদ্যকমতাবলম্বি-চিকিৎসকগণ সচেষ্ট হয়েন, তাহা হইলে অত্যল্পকালেই দেশে দেশীয় ব্রণ-চিকিৎসা সুপ্রচলিত হইতে পারে।

অধুনা নর-নারী শরীরে যে সমস্ত রোগের আবির্ভাব হইতে দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে অনেক রোগ, সম্ভবতঃ অর্দ্ধেকেরও বেশী, ব্রণ, ব্রণপরিণামী এবং ব্রণ-সংসৃষ্ট ব্যাধি। আয়ুর্ব্বেদোক্ত ব্রণ-চিকিৎসার ক্রম পরম্পরা অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা করিলে, সেই সকল রোগের মধ্যে অনেক ব্যাধি, অত্যল্প ব্যয়ে এবং অল্প সময়ের মধ্যে আরোগ্য করা যায়। আয়ুর্ব্বেদোক্ত ব্রণ চিকিৎসার পদ্ধতি অতি সুন্দর, ব্রণ প্রতীকারের ঔষধ সমস্ত আশু সুফলপ্রদ এবং ঔষধের ব্যয়ও অকিঞ্চিৎকর।

আজিও দেশ হইতে আয়ুর্ব্বেদোক্ত ব্রণ-চিকিৎসা সম্যক্ লোপ পায় নাই। অন্য চিকিৎসায় হতাশ হইয়া, কেহ বা অন্য চিকিৎসা করাইতে অসমর্থ হইয়া, দেশীয় ব্রণ চিকিৎসার আশ্রয় লইয়া থাকেন, তাই আমরা কচিৎ দেশীয় ঔষধের সুফলোপধায়কতা প্রত্যক্ষ করিয়া চমৎকৃত হইবার সুযোগ পাইয়া থাকি। দেশীয় ব্রণ-চিকিৎসার ফল প্রত্যক্ষ করিবার আরও একটী সুযোগ আছে। দেশে টোট্কা বা বা মুষ্টিযোগ নামে পরিচিত ব্রণ-শোথের ঔষধ আজিও কাহার কাহার জানা আছে। সম্ভবতঃ অনেকের জানা আছে যে, অতি কঠিন ক্ষত-রোগও টোট্‌কা ঔষধে ভাল হইয়া থাকে। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, সে সকল

টোট্‌কা আয়ুর্ব্বেদোপদিষ্ট ঔষধ। কুত্রাপি পূর্ণাঙ্গে, কচিৎ কিঞ্চিৎ বিকৃত বা পরিবর্ত্তিত হইয়া, লোক পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে।

পুনঃ পুনঃ বলা বাহুল্য যে দেশে দেশীয় চিকিৎসার প্রসার বৃদ্ধি করিতে হইলে কবিরাজ মহাশয়দিগকেই পুরোবর্ত্তী হইতে হইবে। কবিরাজ মহাশয়দিগের মধ্যে যাঁহারা বিজ্ঞতম বলিয়া অধুনা প্রসিদ্ধ তাঁহারা অধিকরণ, যোগ, হেত্বর্থ, পদার্থ, প্রদেশ, উদ্দেশ, নির্দ্দেশ অনুসারে, প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ-ন্যায়ের সাহায্যে এবং শব্দ ও দর্শন শাস্ত্রের কূটতর্ক দ্বারা শাস্ত্রদুর্গের দ্বারোদ্‌ঘাটনার্থ ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছেন। কাজটা মন্দের কথা হইতেছে না। কিন্তু সেই সঙ্গে শস্ত্রোপচারে এবং ব্রণ-চিকিৎসায় মনোনিবেশ করিলে দেশের মঙ্গল হইতে পারে।

যাঁহারা চিকিৎসক নহেন, অথচ দেশের মঙ্গলার্থী, তাঁহাদের সহায়তারও বিশেষ প্রয়োজন। আর যাঁহারা ব্রণরোগগ্রস্ত, অন্ততঃ পরীক্ষার জন্য দেশীয় চিকিৎসার আশ্রয় লইলে তাঁহারা উপকৃত হইবেন এবং সাধারণে চিকিৎসার সাফল্য দর্শনে, আয়ুর্ব্বেদোক্ত ব্রণ-চিকিৎসায় ক্রমশঃ শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উঠিবেন।

আমরা আয়ুর্ব্বেদে প্রবন্ধ লিখিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, সর্ব্বাদৌ ব্রণ-বিষয়ক নানা কথা সংক্ষেপে লিখিতে প্রয়াস পাইব। অকিঞ্চনের অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধ দ্বারা উদ্দেশ্য সাধনের সম্যক্ আশা করা যায় না। আশা করি কৃতবিদ্য কর্ম্মকুশল চিকিৎসকগণ উদ্দেশ্য সাধনে যত্নপর হইবেন। অন্যান্য ভাল কাজের মত এ কাজেও বিঘ্নের আশঙ্কা আছে। কিন্তু সকলে যত্নপর হইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির বাধা হইবে না।

ব্রণ—ব্রণশোথ।

বাঙ্গালা ভাষায় যে ব্যাধিকে ঘা বলে, সংস্কৃত ভাষায় তাহার নাম ব্রণ রোগ। অরুস্ প্রভৃতি আরও কয়েকটী ব্রণ-বাচী শব্দ আছে, কিন্তু সে শব্দগুলি সুপ্রচলিত নহে।

চুরাদিগণীয় ব্রণ ধাতুর অর্থ গাত্রবিচূর্ণন। প্রকুপিত দোষ শরীরের একদেশে বা স্থানে স্থানে সংশ্রিত হইয়া তদ্ বা তত্তদ্ দেশের ত্বক্, মাংস, সিরা এবং স্নায়ু প্রভৃতি বিচূর্ণন অর্থাৎ বিধ্বংস করিয়া এই রোগ উৎপাদন করে, তজ্জন্য এই রোগের নাম ব্রণরোগ।

সুশ্রুতের মতে ব্রণশব্দ বৃ ধাতুমূলক। "বৃণোতি যস্মাদ্ রূঢ়েঽপি ব্রণবস্তু ন নশ্যতি। আদেহধারণাৎ তস্মাদ্ ব্রণ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ,—ঘা পুরিয়া শুকাইয়া গেলেও ব্রণবস্তু অর্থাৎ ঘায়ের দাগ দেহ ধারণকাল যাবৎ থাকিয়া যায় এইজন্য ইহার নাম ব্রণরোগ।

ব্রণরোগ দুইপ্রকার। একপ্রকারকে শারীর ব্রণ বলে; অপর প্রকারের নাম সদ্যোব্রণ। আহার বিহারের দোষে, অথবা শরীরে ব্রণারম্ভক দোষ-বীজের সংক্রমণ জন্য প্রকুপিত বায়ুপিত্ত কফ, শরীরের স্থান বিশেষে সংশ্রিত হইলে, অল্পাধিক শোথ পুরঃসর যে ব্রণরোগ উৎপন্ন হয় তাহার নাম শারীর ব্রণ। অস্ত্র-শস্ত্রাদি দ্বারা স্থান বিশেষ ছিন্ন-ভিন্ন মথিত-পিচ্ছিত হইলে যে ব্রণরোগ জন্মে তাহাকে সদ্যোব্রণ বলে।

শারীর ব্রণ, শোথপূর্ব্বক ব্যাধি। দেহের কোন বা কোন কোন স্থানে, প্রকুপিত দোষের সংঘাত জন্য শোথ উৎপন্ন হয়। সেই শোথ পাকিয়া স্বয়ং ভিন্ন হইলে অথবা [illegible] দিলে ব্রণরোগের আবির্ভাব হয়।

শরীর-ব্রণ জন্মিবার পূর্ব্বে যে শোথ উপস্থিত হয়, তাহারই নাম ব্রণশোথ। ব্রণ-শোথ—রাগোষ্মতোদস্ফীতি-লক্ষণ। অর্থাৎ শোথযুক্ত স্থানের ত্বগ্‌দেশের বর্ণ বিপর্য্যয় ঘটে; হয় লাল হয়, বা কাল হয় কিম্বা পীত অথবা শ্বেতবর্ণ ধারণ করে; স্থানটী অল্পাধিক পরিমাণে গরম হইয়া উঠে, নানাপ্রকার তোদ অর্থাৎ বেদনা উপস্থিত হয় এবং ফুলিয়া উঠে।

বাতজ, পিত্তজ, কফজ, শোণিতজ, সন্নি-পাতজ এবং আগন্তুজ ভেদে ব্রণ শোথ ছয় প্রকার। দ্বিদোষজ শোথও প্রকাশ পাইতে দেখা যায়।

যে শোথের বর্ণ লাল বা কালো, শোথযুক্ত স্থানে হাত বুলাইলে পরুষ অর্থাৎ খস্‌খসে বোধ হয়, শোথ টিপিলে বসিয়া যায় অর্থাৎ টোল খায় এবং টাটানি, শূলানি, দপ্‌দপানি প্রভৃতি যাতনা কখন বোধ হয় কখন বা হয় না, সেই শোথের নাম বাত-শোথ।

যে শোথ শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে, শোথ, যুক্ত স্থানটী পীত বা লোহিতচ্ছবি ধারণ করে, ব্যাধিত স্থানে জ্বালা অনুভূত হইতে থাকে, এবং শোথ টিপিলে কোমল বোধ হয় কিন্তু টোল খায় না, তাহাকে পিত্তশোথ বলে।

কুপিত কফ স্থানসংশ্রয় করিলে কফজ-শোথ উৎপন্ন হয়। কফজ শোথ ধীরে ধীরে বাড়িয়া দীর্ঘকালে পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই শোথের বর্ণ পাণ্ডু বা শুক্ল এবং চাক্‌চিক্য-যুক্ত। কফজশোথ কঠিন হয়, শোথে কণ্ডু প্রভৃতি যাতনা বিদ্যমান থাকে।

রক্তশোথ পিত্তশোথের লক্ষণযুক্ত পরন্তু অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ।

যে শোথে বাতজ, পিত্তজ এবং কফজ শোথের লক্ষণ দেখা দেয়, সেই শোথকে সান্নি-পাত বা ত্রিদোষজ শোথ বলে।

আহত স্থান ফুলিয়া উঠিলে তাহাকে আগন্তু শোথবলে। বোলতা, ভীমরুল এবং মৌমাছি প্রভৃতি সবিষ প্রাণীর দংশনে এবং নির্ব্বিষ প্রাণীর নখদন্তপাতেও আগন্তু-শোথ জন্মে। শরীরের কোন স্থানে সবিষ প্রাণী চলিয়া গেলে কি মূত্রত্যাগ করিলে এবং অন্যান্য বাহ্য কারণে, আগন্তু শোথের আবির্ভাব হইয়া থাকে। চিকিৎসা প্রকরণে আগন্তু শোথের বিশেষ বিবরণ বলা যাইবে।

শোথ-সমুত্থান অনেক প্রকার রোগ মনুষ্য-শরীরে আবির্ভূত হইয়া থাকে। গ্রন্থি, অলসী এবং বিদ্রধি প্রভৃতি শোথসমুত্থান ব্যাধি। ব্রণশোথও শোথসমুত্থান রোগ। কিন্তু ব্রণশোথ অপরাপর শোথ করণ ব্যাধি হইতে ভিন্ন লক্ষণ। ব্রণ-শোথ প্রায়শঃ ত্বঙ্মাংসাশ্রয়ী দোষসংঘাত। বিদ্রধি প্রভৃতি, ত্বঙ্মাংস এবং অন্যান্য আভ্যন্তরীণ ধাতুকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। ছয় প্রকার ব্রণ-শোথের লক্ষণ সংক্ষেপে বলা হইয়াছে; বিদ্রধি প্রভৃতির লক্ষণ যথাবসরে বলিব।

বল্মীক নামক দুর্জ্জয় রোগ বিশেষও এক প্রকার শোথ-সমুত্থান ব্যাধি। গ্রীবার পশ্চাদ্‌ভাগে, স্কন্ধদেশে, পৃষ্ঠে, উদরে এবং মস্তকে প্রায়শঃ এই রোগ জন্মে। কদাচিৎ হাতে ও পায়ে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। এই রোগের চলিত নাম Curbuncle (কার্ব্বাঙ্কল)। বল্মীক ত্রিদোষজ ব্যাধি।

ত্বগ্‌দেশে এবং ত্বঙ্মাংস-ব্যবচ্ছেদক কলা (Subcutaneous tissue) ভাগে দোষসংশ্রিত হইয়া, বৃত্তাকার বৃহত্তর ব্রণশোথের ন্যায় শোথ উৎপাদন করে। উৎপন্ন শোথ মাংসকোথ বিশিষ্ট (Gangrinous)। এবম্ভূত শোথ-সমুত্থান ব্যাধির নাম বল্মীক বা কার্ব্বাঙ্কল।

বল্মীকের উপরিতন দেশে একাধিক সমুচ্ছ্রায় উদ্গত হইতেও দেখা যায়। ডাক্তারেরা এই ব্যাধিকে জীবাণু-প্রভব (Bacterial origin) বলেন। বল্মীকের উপরিতন ত্বক্ অপসৃত হইলে একাধিক ছিদ্র (Opening) প্রকাশ পায়। সেই সকল ছিদ্র দিয়া আস্রাব নিঃসৃত হইতে থাকে। এই রোগে তোদ, শূল, জ্বালা এবং অন্যান্য যন্ত্রণা বিদ্যমান থাকে কখন কখন রোগের সঙ্গে জ্বরও প্রকাশ পায়।

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রকরণে, আমরা ব্রণ-শোথ এবং ব্রণরোগের সিদ্ধফল চিকিৎসা ক্রমে বলিব। দেশীয় ঔষধের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা উৎপাদন এবং বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য, মধ্য-বিত্ত এবং দারিদ্র্যগ্রস্ত লোকের উপকারের নিমিত্ত, ধনিজনেরও বহুদিনের ক্লেশভোগ নিবারণার্থ, অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, আমরা এইস্থানে কার্ব্বাঙ্কল্ রোগের একটী মহৌষধের প্রস্তুতি প্রণালী এবং প্রয়োগবিধি লিপিবদ্ধ করিলাম। উপেক্ষা না করিয়া, অবৈজ্ঞানিক না ভাবিয়া, যাঁহারা এই ঔষধ ব্যবহার করিবেন, তাঁহারা বহুব্যয়ের, ক্লোরোফরমে অভিভূত হইবার এবং বহুদিন শয্যাশায়ী থাকিয়া ভুগিবার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেন।

বল্মীকের (কার্ব্বাঙ্কলের) মহৌষধ।

অনন্তমূল, যষ্টিমধু এবং নালুকা যোগে এই ঔষধটী তৈয়ার করিতে হয়।

অনন্তমূল সকলেরই পরিচিত দ্রব্য। দ্রব্যটী দুর্লভও নহে। অনেক স্থলে জঙ্গল হইতে সংগৃহীত হইতে পারে, সহরে, বন্দরেও কিনিতে পাওয়া যায় যে অনন্তমূল বেশ টাট্কা আছে—গন্ধ-বর্ণ-রস বিকৃত হয় নাই, সেইরূপ অনন্তমূল কুটি কুটি করিয়া শুকাইয়া গুঁড়া করিতে হইবে। সুচূর্ণিত অনন্তমূল পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ গ্রহণকরতঃ স্বতন্ত্র রাখিয়া দিবে।

যষ্টিমধুও সুপরিচিত দ্রব্য। পশারির দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়। যে যষ্টিমধুর বর্ণ ও আস্বাদ ঠিক থাকে, পুরাতন হয় নাই, পোকায় ধরে নাই, সেইরূপ যষ্টিমধু গুঁড়া করিয়া পৃথক্ রাখিয়া দিবে।

নালুকাও পশারির দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়। পশারিরা ইহাকে নাল্কো বলে; সংস্কৃত নাম নলিকা। কবিরাজ মহাশয়েরা এই দ্রব্য তৈলের মূর্চ্ছাপাকে ব্যবহার করেন। নালুকা দেখিতে দারুচিনির ন্যায়, তবে দারুচিনির চেয়ে নালুকা স্থূল-বল্কল। আস্বাদও কতকটা দারুচিনির ন্যায়।

নালুকা গুঁড়া করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া পৃথক্ রাখিবে। তারপর অনন্তমূলের গুঁড়া ⁄০ এক ছটাক, যষ্টিমধু চূর্ণ ⁄০ এক ছটাক এবং নালুকাচূর্ণ ⁄৴০ আধপোয়া এক সঙ্গে উত্তমরূপে মিশাইয়া উপযুক্ত আবৃত পাত্রে রাখিয়া দিবে। আবশ্যক হইলে উক্ত পরিমাণের বেশী গুঁড়াও করিয়া লইতে হয়।

প্রয়োজনানুরূপ, ২ আঙ্গুল পুরু, ব্রণক্ষেত্র যুড়িয়া প্রলেপ লাগান যাইতে পারে, এরূপ পরিমাণের ঐ মিশ্রিত চূর্ণ গ্রহণ করিয়া শীতল জলে গুলিয়া প্রলেপ দিবার উপযোগী করিয়া কার্ব্বাঙ্কলটী আচ্ছাদন করিয়া প্রলেপ বসাইবে। তদুপরি এক খণ্ড কচি কলার পাত দিয়া, যেখানে যেরূপ ব্রণ-বন্ধন করিতে হয়, অর্থাৎ প্রলেপটী স্থান ভ্রষ্ট না হয়, সেইরূপভাবে, বাঁধিয়া রাখিবে। এইরূপে দিবসে একটী প্রলেপ লাগাইতে হইবে। প্রলেপটী শুকাইতে আরম্ভ করিলেই বদলাইয়া দিবে। চারি

পাঁচটী প্রলেপ লাগাইলেই জ্বালা যন্ত্রণা দূর হইবে। পরদিনেও এই প্রলেপ ঐ ভাবে যোজনা করিবে। প্রায়শঃ দ্বিতীয় দিনে কচিৎ তৃতীয় দিবসে, শোথ বসিয়া যায় এবং শোথের উপরিতম শীর্ণত্বক্ উঠিয়া গিয়া ব্রণছিদ্র প্রকাশ পায়। ব্রণছিদ্র প্রকটিত হইলেও তদুপরি প্রলেপ যোজনা করিবে। ক্রমশঃ শোথ লীন হইতে থাকিবে এবং ছিদ্র সকল দিয়া পূঁজ নিঃসৃত হইবে। এই সময় নিমের পাতা দিয়া সিদ্ধ করা জল দিয়া উত্তমরূপে ধুইয়া প্রলেপ যোজনা করিবে। ক্ষত বিশুদ্ধ হইলে নিমের পাতা দিয়া গব্যঘৃত পাক করিয়া লগাইলে অচিরে ঘা শুকাইয়া যাইবে।

যে কোন ব্রণশোথে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে সুফল লাভ করা যায়।

শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কবিরত্ন।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ
ও
অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়।

আয়ুর্ব্বেদের আটটী অঙ্গ।

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র—আয়ুর্ব্বেদ, আট ভাগে বিভক্ত হইয়া অনুশীলিত হইয়া আসিতেছে। আয়ুর্ব্বেদের আটটী অঙ্গের নাম—শল্য, শালাক্য, কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্য, অগদ-তন্ত্র, রসায়ন ও বাজীকরণ তন্ত্র।

প্রাচীনভারতে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের চর্চ্চা ও উন্নতি।

আয়ুর্ব্বেদের এই অষ্টাঙ্গ বিভাগ কেবল পুঁথিগত নহে। আয়ুর্ব্বেদে কৃতশ্রম মাত্রেই অবগত আছেন, প্রাচীন ভারতে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের প্রত্যেক অঙ্গ লইয়া বহু আলোচনা, বিবিধ তথ্য-সংগ্রহ ও নানা পুস্তক প্রণীত হইয়াছিল। শল্যতন্ত্রবিদ্‌গণ, যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষার ও অগ্নিকর্ম্ম দ্বারা যে সকল উৎকট ব্যাধির প্রতীকার করিতেন, তাহার কিঞ্চিৎ মাত্রের বিবরণ পাঠ করিয়া, আধুনিক সার্জ্জেনগণ ও বিস্মিত হইতেছেন। শালাক্য তন্ত্রবিদ্‌গণ, চক্ষুকর্ণাদি রোগ চিকিৎসায় কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, সুশ্রুত সংহিতা পাঠে তাহার কিঞ্চিৎ মাত্র আভাস পাওয়া যায়। কৌমার-ভৃত্য অর্থাৎ শিশুর পালন ও চিকিৎসা বিষয়ে এদেশে বহুগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। আমরা অদ্যাপি আয়ুগ্রন্থে পতর্ব্বক, জীবক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শিশু চিকিৎসকের নামোল্লেখ দেখিতে পাই। অগদতন্ত্র অর্থাৎ বিষচিকিৎসার যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছিল। এতদ্বিষয়ক গ্রন্থ অধুনা নিতান্ত দুর্লভ হইলেও আমরা সুশ্রুত সংহিতার কল্পস্থান পাঠ করিয়া জানিতে পারি যে সর্প, শৃগাল, মূষিক ও বিবিধ কীটাদির সংখ্যা, জাতি-বিভাগ, দষ্টলক্ষণ ও বিষবেগ বিষয়ক বিবিধ সূক্ষ্ম তত্ত্বের আলোচনা হইয়াছিল। সর্পদেহে বিষের প্রকৃতি পরীক্ষার জন্য, নির্ব্বিষ ও নির্ব্বিষ সর্পের বর্ণসঙ্কর উৎপাদন করা হইত। সর্পাদি বিষের সকল চিকিৎসা ও আবিষ্কার হইয়াছিল। রসায়ন ও বাজীকরণ চিকিৎসা

বিদ্যার প্রভাবে ভারতবাসিগণ অকাল জরার আক্রমণ হইতে মুক্ত থাকিয়া, অমিত বল ও সুদীর্ঘ আয়ুঃলাভ করিয়া ছিলেন।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের অনালোচনা ও চিকিৎসক সম্প্রদায়ের অবনতি।

গ্রন্থলোপ, সদ্‌গুরুর অভাব, অনুৎসাহ, পুনঃপুনঃ রাষ্ট্রবিপ্লব এবং অন্যান্য কারণে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের সম্যক্ আলোচনায় বিঘ্ন ঘটিলে, ক্রমশঃ যোগ্য চিকিৎসকের অভাব হইতে লাগিল। জীবের পরম হিতকারী, আচার্য্যগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ, অবশেষে শাস্ত্রানভিজ্ঞ জনগণের হস্তে ন্যস্ত হইল। পরিতাপের বিষয়—কুশাগ্রধী, জিতহস্ত, ধন্বন্তরিশিষ্যগণ যে ব্রণটপাটনাদি কর্ম্ম সযত্নে নির্ব্বাহ করিতেন, তাহা অনভিজ্ঞ ক্ষৌরকারগণের কুলাগত কর্ম্ম হইল। শাস্ত্রদর্শী সুশ্রুত-সতীর্থগণের বিশেষ যত্নানুষ্ঠিত মূঢ়গর্ভ-শল্যোদ্ধরণ অর্থাৎ গর্ভাশয়ে বিবিধ বিচিত্রভাবে স্থিত শিশুর বহিষ্করণ কার্য্য শাস্ত্রবহিষ্কৃত নীচ জাতীয় অবলাজনের অবলম্বনীয় হইল। আচার্য্য পর্ব্বতক, জীবকের সম্পাদিত শিশু চিকিৎসা মূর্খ "ছেলের রোজার" হস্তে সমর্পণ করা হইল। অগদতন্ত্রবিদ্ গণের অনুষ্ঠিত বিষ চিকিৎসার ভার অজ্ঞানান্ধ "মালবৈদ্যের" হাতে গেল। ক্রমে এমন অবস্থা হইয়াছে যে, ভারতে যে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের এতাদৃশী উন্নতি হইয়াছিল, তাহা অধুনা যুক্তি তর্কদ্বারাও সাধারণ লোককে বিশ্বাস করান কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের পুনরালোচনার আবশ্যকতা।

যে আয়ুর্ব্বেদ কতকাল হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, আমাদের দোষেই অজ্ঞলোকের হাতে পড়িয়া তাহা অধুনা বিকলাঙ্গ ও মলিন হইয়া পড়িয়াছে। আয়ুর্ব্বেদের এই দুর্দ্দশা কখনই আমরা উপেক্ষা করিতে পারিনা। পক্ষান্তরে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের আলোচনা না থাকায়, আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসগণ বিড়ম্বিত ও অবজ্ঞাত হইতেছেন। ইহাও কদাপি স্পৃহণীয় নহে। অতএব অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের পুনরালোচনা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদের আধুনিক অধ্যাপনা-প্রণালী।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের পুনরালোচনা নিতান্ত আবশ্যক হইলেও অধুনা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপনা হইতেছে না। এদেশীয় আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ কেবল মাত্র কায়চিকিৎসার অধ্যাপনা করিয়া থাকেন কিন্তু তাহাও সম্যক্ উপদিষ্ট হয় না। যে দ্রব্য-পরিচয় চিকিৎসক মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা দ্রব্য-প্রদর্শন পূর্ব্বক যথাযথ ভাবে শিক্ষা না দেওয়ায়, অজ্ঞ লোকের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। যে বস্তিকর্ম্ম কায়চিকিৎসার অর্দ্ধেক বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, আধুনিক কবিরাজগণ তদ্বিষয়ে উপদেশ লাভ না করায় তাঁহাদিগকে অন্যের মুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে। শিক্ষার অভাবেই ধন্বন্তরি-শিষ্যসন্ততি শস্ত্রচিকিৎসায় পরাঙ্মুখ হইয়াছে। সদ্‌গুরুর অভাবে নাড়ী-জ্ঞান ক্রমে সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে। [illegible]

কায়চিকিৎসকেরও যোগ্যতা উত্তরোত্তর হ্রাস পাইতেছে।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের সম্যক্ আলোচনার জন্য বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা।

আয়ুর্ব্বেদ কাব্যশাস্ত্র নহে—চিকিৎসা বিজ্ঞান। ইহার অধ্যাপনা প্রণালী প্রত্যক্ষ-দর্শনমূলক ও যোগ্যাকরণ পূর্ব্বক হওয়া উচিত। পূর্ব্বে এদেশে ঐ ভাবেই আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপনা হইত। কি আত্রেয় সম্প্রদায়, কি ধন্বন্তরীয় সম্প্রদায় উভয় সম্প্রদায়ের গ্রন্থেই স্পষ্টতঃ উল্লেখ আছে যে, আয়ুর্ব্বেদবিদ্যার্থী, শাস্ত্রোক্ত বিষয় যদি "হাতে হেতেড়ে" না করিয়া কেবলই পুঁথিগত বিদ্যায় তুষ্ট থাকে, তাহা হইলে সে চিকিৎসা করিবার যোগ্য নহে। কথাটা আরও স্পষ্ট করিয়া বলি—মনে করুন, ছাত্র দ্রব্য-গুণ পড়িতেছে। সে সেই দ্রব্যটীর শাস্ত্রোক্ত রস, গুণ, বীর্য্য বিপাক, প্রভাব প্রভৃতি যাবতীয় তত্ত্ব বেশ আয়ত্ত করিল, কিন্তু দ্রব্যটী চক্ষে দেখিল না—চিনিল না, বলুন দেখি এ জ্ঞান তাহার কি কাজে লাগিবে? এইরূপ শারীরস্থানের শাস্ত্রীয় উপদেশ যদি নরশরীরে দর্শন না করাইয়া, কেবল পুঁথিগত বিষয়ের মৌখিক শিক্ষা হয়, তাহা হইলে সে শিক্ষা কি ছাত্রের হৃদয়ে মুদ্রিত হইবে? না তাহার নিঃসংশয় জ্ঞান জন্মিবে? আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার এই কুপ্রণালীর জন্যই সুযোগ্য আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসকের সংখ্যা ক্রমশঃ অল্প হইতেছে, সুতরাং সাম্প্রদায়িক অবনতি ঘটিতেছে। নচেৎ দেশে বুদ্ধিমান্ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যার্থীর কিছু অভাব নাই। অধ্যাপনাগত এই সকল অনর্থপরম্পরা দূর করিবার জন্য, বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসে কলিকাতা শ্যামবাজারের অন্তর্গত ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীটের ২৯ সংখ্যক ভবনে "অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের বিভাগ।

দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে বহু আয়ুর্ব্বেদীয় সুচিকিৎসকের প্রয়োজন। আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যার্থীর সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ অধিকার থাকা আবশ্যক। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দেশে সংস্কৃত-ভাষার তাদৃশী চর্চ্চা নাই; সুতরাং অনেকে সামান্য সংস্কৃত জ্ঞানলাভ করিয়া বা সংস্কৃত না জানিয়াই, আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতে আসেন। দেশের অবস্থানুসারে অল্পশিক্ষিত ও সংস্কৃত অনভিজ্ঞ আয়ুর্ব্বেদবিদ্যার্থিগণকে প্রত্যাখ্যান করাও এখন চলেনা; সুতরাং অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগ ও বাঙ্গালা বিভাগ পৃথক্ করিতে হইয়াছে। অধ্যাপনার বিষয় উভয় বিভাগেই এক, কেবল ভাষার পার্থক্য। সংস্কৃত বিভাগে তাবৎ বিষয় সংস্কৃতে এবং বাঙ্গালা বিভাগে যাবতীয় বিষয় বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ছাত্রেরা সংস্কৃত বিভাগে অধ্যয়ন করিয়া আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য হয়েন ইহাই আমাদের অধিকতর স্পৃহনীয়, এজন্য ব্যাকরণ, কাব্য ও দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপনার জন্য একটী পৃথক্ বিভাগ খোলা হইয়াছে। ব্যাকরণ, কাব্য ও দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপকগণ এই বিভাগের অধ্যাপনা করিবেন। ছাত্রগণ এই বিভাগ হইতে ব্যাকরণ, কাব্য, দর্শন শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিয়া পশ্চাৎ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে প্রবেশ করিতে পারেন।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপনা যথাযথ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নির্ব্বাহ করিবার জন্য বিদ্যালয়ে যে দ্রব্যরাশি সংগৃহীত হইয়াছে তদ্বিষয়ক স্থূল বিবরণ—

(ক) ঔষধাগার—ঔষধ নির্ম্মাণের বিবিধ যন্ত্র পাত্রাদি।

(খ) **ভেষজ-পরিচয়াগারে**—৫০০ শতাধিক বণিক্ দ্রব্য, বিবিধ ধাতূপধাতু এবং ২০০ শতাধিক সজীব উদ্ভিদ্।

(গ) **যন্ত্রশস্ত্রাগারে** শস্ত্র-কর্ম্মোপযোগী বিবিধ যন্ত্রশস্ত্র।

(ঘ) **বিকৃত শারীর-দ্রব্য-সম্ভারে**—পীড়া বিশেষে বিকৃতি প্রাপ্ত নর-শরীরের আশয়াদি।

(ঙ) **গবেষণামন্দিরে**-চিকিৎসা-বিজ্ঞানোচিত বিবিধ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান ও পরীক্ষার জন্য নানা উপকরণ এবং যন্ত্রাদি।

(চ) **শারীরপরিচয়াগারে**—নরকঙ্কাল, মানব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুরঞ্জিত চিত্র ও মৃত্তিকা-রচিত, রঞ্জিত আশয়াদি সংগৃহীত হইয়াছে।

প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর অধ্যাপনা আরম্ভ হইয়াছে। অধ্যাপকগণের নাম—

কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ কবীন্দ্র।

" " যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন, এম, এ, এম, বি।

" " সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী. বি, এ, এল্, এম্, এস্।

" " বিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ।

" " সুরেন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ।

বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী।

প্রথম বার্ষিক শ্রেণী।

বনৌষধি বিজ্ঞান, দ্রব্যগুণ, রসশাস্ত্র, অঙ্গবিনিশ্চয়-বিদ্যা, শারীরবিজ্ঞান ও এই সকল অধীত অংশের যোগ্যাকরণ। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উন্নীতকরণের পরীক্ষা।

দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী।

পরিভাষা ও রসরত্নাদি-তত্ত্ব, ঔষধ প্রস্তুত শিক্ষা, অঙ্গবিনিশ্চয়-বিদ্যা (তদ্বিদ্যসম্ভাষা [পাঠ চাওয়া] ও ব্যবচ্ছেদ পূর্ব্বক মৃতকপরীক্ষাসহ) শারীর-বিজ্ঞান, রোগবিনিশ্চয়। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উন্নীতকরণের পরীক্ষা।

তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী।

দ্রব্যগুণ, ঔষধ প্রস্তুত শিক্ষা, রোগবিনিশ্চয়, কায়চিকিৎসা, শল্যতন্ত্র, প্রসূতিতন্ত্র, (ধাত্রীবিদ্যা), আরোগ্যশালাকর্ম্মাভ্যাস, কৌমারভৃত্য। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে উন্নীতকরণের পরীক্ষা।

চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী।

কায়-চিকিৎসা, শল্যতন্ত্র (যন্ত্রশস্ত্রকর্ম্মাভ্যাসসহ) শালাক্য-চিকিৎসা, উভয় তন্ত্রগত তদ্বিদ্যসম্ভাষা, ব্রণবন্ধন শিক্ষা, নাড়ীবিজ্ঞান, স্বস্থ-তত্ত্ব, অগদতন্ত্র, আরোগ্যশালাকর্ম্মাভ্যাস। সংস্কৃত বিভাগের ব্যুৎপত্তিলাভের সাধারণ প্রশংসাপত্র ও বাঙ্গালা বিভাগের চরম-পরীক্ষা।

পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণী।

নাড়ীবিজ্ঞানের বিশেষ আলোচনা, দ্বাদশ মাস আরোগ্যশালাকর্ম্মাভ্যাস, কায়-চিকিৎসা ও শল্যশালাক্য তন্ত্রের প্রত্যক্ষদর্শনমূলক বৃদ্ধ-বৈদ্যোপদেশ। চরম পরীক্ষান্তে উপাধিদান।

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পাঠ্য পুস্তকরূপে গৃহীত হইল—

১। চরক-সংহিতা ২। সুশ্রুত-সংহিতা ৩। অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহ ৪। অষ্টাঙ্গহৃদয় ৫। মাধব-নিদান ৬। হারীত সংহিতা ৭। সিদ্ধযোগ ৮। চক্রদত্ত ৯। ভাবপ্রকাশ ১০। শার্ঙ্গধর ১১। রসরত্ন-সমুচ্চয় ১২। রসেন্দ্র-সার-সংগ্রহ ১৩। বঙ্গসেন ১৪। ধন্বন্তরীয়-নিঘণ্টু ১৫। রাজনিঘণ্টু ১৬। বনৌষধি-দর্পণ ১৭। নাড়ীবিজ্ঞান ১৮। পরিভাষা-প্রদীপ ১৯। পথ্যাপথ্যবিনিশ্চয়।

মুদ্রিত, অমুদ্রিত বৈদ্যক গ্রন্থ-সংগ্রহ—গ্রন্থাগার।

মহর্ষি আত্রেয়ের শিষ্যগণের প্রত্যেকেই এক একখানি গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু এক চরকসংহিতা ভিন্ন আত্রেয় সম্প্রদায়ের আর কোন গ্রন্থই আমরা দেখিতে পাইতেছি না। ভগবান্ ধন্বন্তরির বারজন শিষ্য, বারখানি গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু এক সুশ্রুতসংহিতা ভিন্ন ধন্বন্তরিসম্প্রদায়ের আর কোন গ্রন্থই আমরা পাইতেছি না। তারপর এক সুশ্রুতসংহিতারই কত ভাষ্য, টিপ্পনী, টীকা রচিত হইয়াছিল। এগুলির কেবল নামমাত্র আমরা শ্রুত আছি। চরকসংহিতার দ্বাদশজন টীকাকারের নাম আমরা জানিতে পারিতেছি, কিন্তু অধুনা কেবল চক্রপাণির টীকা মাত্র পাওয়া যায়, তাহাও প্রায় খণ্ডিত। ইহা ভিন্ন গজ, অশ্ব, বৃক্ষ, প্রভৃতির পালন ও চিকিৎসা বিষয়ে কত গ্রন্থই রচিত হইয়াছিল। কত নিঘণ্টু, "দ্রব্যচিহ্নের" মত কত দ্রব্য পরিচায়ক গ্রন্থ, কত প্রাণিবিষয়ক পুস্তক, কত সূদশাস্ত্র, কত গন্ধশাস্ত্র, কত মদিরাসব প্রস্তুত বিষয়ক গ্রন্থ ও কত যে ধাতু-মণি-রত্নাদি পরীক্ষার পুস্তক রচিত হইয়াছিল এক্ষণে তাহার সংখ্যা করা অসম্ভব। এই গ্রন্থরাশি কি বাস্তবিকই বিলোপ প্রাপ্ত হইয়াছে? কি করিয়া এ প্রশ্নের উত্তর দিব। অদ্যাপি বৈদ্যক গ্রন্থ অনুসন্ধানের জন্য ভারতবর্ষব্যাপী, কোন আন্তরিক প্রযত্ন অনুষ্ঠিত হয় নাই। দেশের যে যে স্থানে প্রাচীন গ্রন্থরাশি অদ্যাপি সযত্নে রক্ষিত রহিয়াছে, সেই সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করা হয় নাই। সাহিত্য পরিষদের চেষ্টার পূর্ব্বে কে জানিত বাঙ্গলা ভাষায় এত বিচিত্র গ্রন্থরাশি আছে? সুতরাং আমরা ইচ্ছা করিয়াছি যে, সংস্কৃতজ্ঞ ভ্রমণকারী পণ্ডিত নিয়োগ করিয়া ভারতের ভিন্ন ভিন্ন দেশে সংস্কৃত বৈদ্যক গ্রন্থের অনুসন্ধান করা হইবে এবং প্রাপ্ত গ্রন্থ বা তৎপ্রতি-লিপি সংগ্রহ করিয়া অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারের পুষ্টিসাধন করিতে হইবে। একার্য্য নির্ব্বাহার্থ বহু অর্থের ও প্রচুর লোকবলের প্রয়োজন। আশা করি আয়ুর্ব্বেদহিতৈষিগণ গ্রন্থরক্ষার প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমাদিগকে সাহায্য ও পরামর্শ দানে বাধিত করিবেন।

বৈদ্যক বৃক্ষ-বাটিকা।

যোদ্ধার যেমন অস্ত্র-প্রয়োগ কৌশল জানা আবশ্যক, চিকিৎসকেরও তদ্রূপ দ্রব্য-যোজনা-কুশল হওয়া প্রয়োজন। দ্রব্য প্রয়োগ করিতে হইলে দ্রব্যের পরিচয় আবশ্যক। দ্রব্যের পরিচয় আবার, দ্রব্যের প্রত্যক্ষ-দর্শন-মূলক পরীক্ষা সাপেক্ষ। দ্রব্যের প্রত্যক্ষ দর্শন জন্য আবার দ্রব্যের একত্র সমাবেশ আবশ্যক, সুতরাং বৈদ্যকবৃক্ষ-বাটিকা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ হইতেছে।

ভারতের চিকিৎসা-শাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ, মহার্হ ভৈষজ্য-রত্নে পরিপূর্ণ। অন্য কোন দেশের চিকিৎসা-শাস্ত্র এরূপ ভৈষজ্য-সম্পদের স্পর্দ্ধা করিতে পারে না। কেবল দেশীয় ঔষধের গুণে, কত অনভিজ্ঞ লোকও কত দুরারোগ্য ব্যাধির প্রতীকার করিতেছে, ইহা আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি; কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা দিন দিন কত উপকারী দ্রব্য হারাইতেছি। [illegible] অপরিচিত [illegible]

প্রকাশ বা চক্রসংগ্রহোক্ত কত দ্রব্যই ক্রমশঃ আমাদের অপরিচিত হইয়া পড়িতেছে। আমরা বলাডুমুরকে ত্রায়মাণা বলিয়া এবং কোন অজ্ঞাতনামা কাষ্ঠ বিশেষকে প্রপৌণ্ডরিক বলিয়া প্রয়োগ করিতেছি। আজকাল কৃষি-কার্য্যের বিস্তার হেতু, বৃক্ষ গুল্মাদির বিলোপ সাধিত হইতেছে। দ্রব্যলোপের সহিত দ্রব্যের অপরিচয় অবশ্যম্ভাবী। অতএব দ্রব্যের লোপাপত্তি নিরাশার্থ বৈদ্যক-বৃক্ষবাটিকা প্রতিষ্ঠার নিতান্ত প্রয়োজন। কেবল দ্রব্যের লোপাপত্তি নিবারণ নহে, দ্রব্যের গুণোৎকর্ষের জন্য ও উদ্যান-প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা আছে। আমরা অধুনা যে সমস্ত বৃক্ষ লতা, গুল্মাদি ঔষধার্থ ব্যবহার করিতেছি দীর্ঘকাল আরণ্য উদ্ভিদের সহিত জীবনসংগ্রামে তাহারা হীন-বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে, এই সকল হীনবীর্য্য ঔষধি উদ্যানে সযত্ন-পালিত হইলে, তাহারা আবার তাহাদের পূর্ব্ববীর্য্য পুনঃ প্রাপ্ত হইবে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে উদ্ভিদ্ সংগ্রহ এবং সংগৃহীত উদ্ভিদ্গুলিকে তত্তৎ দেশের ভূমি, বায়ু ও প্রাকৃতিক অবস্থানুসারে রক্ষাপূর্ব্বক ভৈষজ্যোদ্যান প্রতিষ্ঠা, বহু ব্যয় ও আয়াস-সাধ্য। আশা করি আয়ুর্ব্বেদ-হিতৈষী সহৃদয়-গণ আয়ুর্ব্বেদের রক্ষা ও উন্নতিকল্পে আমাদের সহায় হইয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয়।

চিকিৎসাশাস্ত্রের সজীবতা রক্ষা ও উন্নতি কল্পে যেমন সুচিকিৎসকের প্রয়োজন, লোকো-পকার সুশিক্ষা ও চিকিৎসার প্রসারের জন্য তদ্রূপ দাতব্য চিকিৎসালয় ও আতুরালয় (In-door Hospital) আবশ্যক। এই কলিকাতা মহানগরীতে কার্য্যোপলক্ষ্যে কত দেশের লোক বাস করিতেছে। ইহাদের মধ্যে দরিদ্র লোকের সংখ্যাও অল্প নহে। যে কএকটী দাতব্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয় আছে, লোক সংখ্যার তুলনায় সে গুলি কোন মতেই প্রচুর নহে। বিশেষতঃ ঐ দাতব্য চিকিৎসালয়গুলি সহরের দক্ষিণ ভাগেই প্রতিষ্ঠিত; অতএব সহরের উত্তরাংশের লোকের উপকারার্থ ২৯ নং ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীটের বাটীতে, বিগত ২১ মাঘ হইতে একটী আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিদিন প্রাতঃ ৮॥—১০॥ পর্য্যন্ত দুই ঘণ্টাকাল, সমাগত রোগিগণের, যোগ্য চিকিৎসক কর্তৃক রোগ পরীক্ষা পূর্ব্বক ঔষধ বিতরিত হইতেছে এবং আতুরালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে।

আমরা অতীব আনন্দ ও উৎসাহের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে যোগ-দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী শাস্ত্র-বাচস্পতি।
,, ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।
,, মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় (নাটোর)
,, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী (কাশিমবাজার)
,, মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর।
,, মহারাজা রণজিৎ সিং (নসীপুর)।
,, রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় সি, এস, আই,
,, জষ্টিস্ নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
,, রাজা হৃষীকেশ লাহা।
,, রাজা বাসুদেব (কলেঙ্গড, মান্দ্রাজ)
,, গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (গোবরডাঙ্গা)
,, বাবু প্রফুল্লনাথ ঠাকুর।
,, পি, সি, লাল জমিদার (পূর্ণিয়া)।
,, রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া (গৌরীপুর)

শ্রীযুক্ত রায়বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেন (বহরমপুর)
,, হেমেন্দ্রনাথ সেন এম, এ, বি, এল
,, মহেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরি } জমিদার
,, জ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরি } (নিমন্তিতা)
,, রায়বাহাদুর চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়।
,, রায়বাহাদুর অমৃতলাল রাহা।
,, অনরেবল মহেন্দ্রনাথ রায় সি, আই, ই,
,, দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল
,, মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল
,, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম, এ,বি,এল
,, জ্যোতিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল
,, অনরেবল নিশিকান্ত সেন রায়বাহাদুর
,, সি, আর, দাস বার-এট্-ল
,, এন্, সি, সেন বার-এট্ ল
,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরি এম, এ, বি, এল
,, এস্ কে, অগস্তি এম, এ, আর, পি, এস
,, রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরি এম, এ, বি এল জমীদার (টাকী)

নবাব্ সিরাজ উল্-ঈশলাম।
আমীন্ উল্ ঈশলাম খাঁ বাহাদুর
অনঃ ফজলুল্ হক এম, এ, বি, এল,
নুর উদ্দীন আহাম্মদ এম, এ, বি, এল।
অধ্যাপক আবদুল হাকিম।

শ্রীযুক্ত ডাঃ অমিয়মাধব মল্লিক এম, বি,
,, ডাঃ সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি,
,, ডাঃ সার কৈলাসচন্দ্র বসু
ডাঃ ই. হেরল্ড ব্রাউন্ এম, ডি, এম, আর, সি, পি, লেঃ কর্ণাল, আই, এম, এস, (রিঃ)
ডাঃ আর, এল, দত্ত লেঃ কর্ণাল আই, এম, এস, (রিঃ)
ডব্লিউ, সি, গ্রেহাম্ বার-এট্-ল।
,, পণ্ডিত কালীচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ
,, ,, যাদবেশ্বর তর্করত্ন
,, কবিরাজ দুর্গাপ্রসাদ সেন।
,, কবিরাজ রাজেন্দ্র নারায়ণ সেন কবিরত্ন
,, ,, শ্যামাদাস বাচস্পতি
,, ,, নগেন্দ্রনাথ সেন
,, ,, কালীশচন্দ্র সেন
,, ,, অমৃতলাল গুপ্ত
,, ,, হরমোহন মজুমদার কাব্যতীর্থ
,, ,, অধ্যাপক লাহোর আঃ কালেজ
,, ,, সারদাকান্ত সেন (ভূতপূর্ব্ব নেপাল রাজবৈদ্য)
,, ,, হেমচন্দ্র সেন কবিরত্ন
,, ,, বিশ্বেশ্বরপ্রসন্ন সেন
,, ,, কালীভূষণ সেন
,, ,, যদুনাথ গুপ্ত কবিরত্ন
,, ,, আশুতোষ সেন কবিরত্ন
,, ,, অশ্বিনীকুমার সেন কবিরঞ্জন
,, ,, নিশিভূষণ রায় কবিরঞ্জন
,, ,, রাধাকিশোর সেন
,, ,, শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন
,, ,, গিরীন্দ্রনাথ কবিভূষণ
,, ,, তারাচরণ ব্যাকরণতীর্থ
,, ,, শরচ্চন্দ্র সেন ব্যাকরণতীর্থ
,, ,, সতীশরঞ্জন দাসগুপ্ত
,, ,, করুণাকুমার সেন ভিষক্‌রত্ন
,, ,, আদিত্য নারায়ণ সেন
,, ,, শরচ্চন্দ্র সেন
,, ,, তড়িৎকুমার বিদ্যাবিনোদ

শ্রীযুক্ত গিরীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ,
,, ভগবতকুমার শাস্ত্রী এম, এ,
,, রসিহর বিদ্যারত্ন এম, এ,
,, কেশবলাল গুপ্ত বি, এল,
অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ,
শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রমথনাথ নন্দী
,, ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ

শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
,, ডাঃ যতীন্দ্রনাথ মৈত্র
,, ডাঃ বটকৃষ্ণ রায়
,, ডাঃ হরিপদ চট্টোপাধ্যায়
,, ডাঃ নলিনীরঞ্জন গুপ্ত এম, ডি,
,, ডাঃ শিবচন্দ্র মল্লিক
,, নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল,
,, সত্যদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
,, ধর্ম্মদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
,, কৃষ্ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
,, সুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায়
,, হিরণ্ময় রায়

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল,
,, গিরিজানাথ রায় চৌধুরি
,, শৈলজানাথ রায় চৌধুরি
,, যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরি
,, দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরি
,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরি
(জমিদার সাতক্ষীরা)
,, লক্ষণচন্দ্র রায়
,, রায় সাহেব বিহারীলাল সরকার
,, রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ,
,, চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ
,, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বসুমতী)
,, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

(ক্রমশঃ)

উন্মত্ত কুক্কুরাদির বিষ লক্ষণ ও চিকিৎসা।

মাধবনিদান পাঠ করিয়া যাঁহারা মনে করেন আয়ুর্ব্বেদে ক্ষেপা কুকুর শৃগালে কামড়ানর লক্ষণ ও অরিষ্ট বর্ণিত হয় নাই তাঁহাদের অবগতির জন্য প্রথমেই আমরা সুশ্রুত-সংহিতার কল্পস্থানের ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে নিম্নলিখিত কএক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম—

“শৃগালশ্বতরক্ষ্বৃক্ষ-ব্যাঘ্রাদীনাং যদানিলঃ।
শ্লেষ্মপ্রদুষ্টো মুষ্ণাতি সংজ্ঞাং সংজ্ঞাবহাশ্রিতঃ।
তদা প্রস্রস্তলাঙ্গূলহনুস্কন্ধোঽতিলালবান্।
অত্যর্থবধিরোঽন্ধশ্চ সোঽন্যোন্যমভিধাবতি।
তেনোন্মত্তেন দষ্টস্য দংষ্ট্রিণা সবিষেণ তু।
সুপ্ততা জায়তে দংশে কৃষ্ণঞ্চাতিস্রবত্যসৃক্।
দিগ্ধবিদ্ধস্য লিঙ্গেন প্রায়শশ্চোপলক্ষিতঃ।
(১) যেন চাপি ভবেদ্ দষ্টস্তস্য চেষ্টাং রুতং নরঃ।
বহুশঃ প্রতিকুর্ব্বাণঃ ক্রিয়াহীনো বিনশ্যতি।
(২) দংষ্ট্রিণা যেন দষ্টশ্চ তদ্রূপং যদি পশ্যতি।
অপ্সু বা যদি বাদর্শে রিষ্টং তস্য বিনির্দ্দিশেৎ।
(৩) ত্রস্যত্যকস্মাদ্ যোঽভীক্ষ্ণং শ্রুত্বা দৃষ্ট্বাপি বা জলম্।
জলত্রাসন্তু বিদ্যাত্তং রিষ্টং তমপি কীর্ত্তিতম্।
অদষ্টো বা জলত্রাসী ন কথঞ্চন সিধ্যতি।”

শৃগাল, কুকুর, নেকড়েবাঘ, ভালুক, ও ব্যাঘ্রের শরীরস্থিত বায়ু, শ্লেষ্মার দ্বারা দুষ্ট হইয়া, শরীরের জ্ঞানবহা নাড়ী আশ্রয় করিলে উহারা উন্মত্ত হইয়া থাকে। ইহারা উন্মত্ত হইলে, লাঙ্গুল সোজা, মুখ লম্বা এবং ঘাড় বক্র দেখায়। মুখ হইতে অতিরিক্ত লালাস্রাব হয়। তখন ইহারা কর্ণে শুনিতে ও চক্ষুতে দেখিতে পায় না। উন্মত্ত হইলে শৃগালাদি আর পরস্পর সম্প্রীতিপূর্ব্বক বাস করে না। তখন তাহারা একে অন্যকে আক্রমণ করে এবং মনুষ্যাদিকে দংশন করিতে উদ্যত হয়। উন্মত্ত শৃগালাদির শরীরে বিষ সঞ্চার হয়। তখন ইহারা যাহাকে দংশন করে তাহার শরীরেও বিষ সঞ্চার হয়। [illegible]

স্পর্শজ্ঞান থাকে না এবং উহা হইতে কৃষ্ণবর্ণ রক্ত নির্গত হইয়া থাকে। উন্মত্ত শৃগাল বা কুক্কুরাদি যাহাকে দংশন করে সে যদি শৃগাল বা কুক্কুরাদির মত ডাকে, কিম্বা উহাদের স্বভাব অনুকরণ করে, তাহা, হইলে তাহার আর আরোগ্যের আশা নাই—সে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। যে জন্তু কর্ত্তৃক দষ্ট হয়, রোগী যদি জলে কিম্বা আর্শিতে সেই জন্তুর মূর্ত্তি দেখিতে পায়, তাহা হইলে সেই রোগীর জীবনের আশা নাই জানিবে। রোগী কেবল জল দেখিয়া বা জলের নাম মাত্র শুনিয়াই যদি বিনা কারণে ভয় পায়, তাহা হইলে তাহার এই জলত্রাস অরিষ্ট (মরণজ্ঞাপক লক্ষণ) বলিয়া বুঝিতে হইবে। অল্পমাত্র দংশন করিলেও যদি জল দেখিলে ভয় পায়, তাহা হইলে সেই বিষদোষও নিবৃত্তি পায় না।

আমরা সুশ্রুতের উক্তির স্থূল অর্থ করিলাম। এস্থলে বক্তব্য এই যে উপরি লিখিত দষ্টশব্দের অর্থ কেবল দন্তদ্বারা দংশন নহে নখাঘাতও বুঝিতে হইবে। * আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে ক্ষিপ্ত কুক্কুরের সামান্য নখাঘাতেও কাহার কাহার জল ত্রাস প্রকাশ পাইয়া, মৃত্যু হইয়াছে। আমাদের কোন চিকিৎসক বন্ধুর প্রত্যক্ষীকৃত একটী রোগীর বিবরণ তাঁহার নিজের কথায় বলিতেছি—"রোগী দেখিতে গেলাম, রোগের ইতিহাস এই—রোগীর বয়স ২৩।২৪ বৎসর, স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল, রীতিমত কাজ কর্ম্ম করিতে ছিলেন। আজ হঠাৎ কয়েকবার মূর্চ্ছা (ফিট্) হইয়াছে। আমি রোগীর নিকট থাকিতে থাকিতেই মুখের খিচুনি ও ফিট্ হইল। শীতল জল প্রচুর পরিমাণে মাথায় দিতে দিতে মোহ ভাঙ্গিল। রোগী জ্ঞান পাইয়াই বলিল "জল দিবেন না জল দিবেন না" আমি বলিলাম "কেন শীত করে কি? রোগী বলিল 'না" "না"। তারপর আমি বলিলাম এতবার ফিট্ হওয়ায় তোমার খুব ক্লান্তি হইয়াছে—জল খাবে কি? রোগী কিঞ্চিৎ উত্তেজিত ভাবে "না না" বলিল। ক্ষুধা পায় না? কিছু খাবে না? রোগী বলিল তা খেতে পারি। খাবার আসিল, রোগী খাইলও মন্দ নয়, কিন্তু জল খাইতে চায় না। জলের উপর মহাবিরক্ত। পানীয় জল আনিবা মাত্র মহাবিরক্তি সহকারে উত্তেজিত ভাবে বারম্বার বলিল -"জল চাহি না" "জল লইয়া যাও"। তখন আমার সন্দেহ হইল। আমি আরও নিশ্চয় বুঝিবার জন্য গোপনে চাকরকে বলিলাম এক বাল্তি জল আনিয়া এই ঘরে রাখ। জল আনিল—রোগী জল দেখিয়াই মহাত্রস্ত ভাবে "জল লইয়া যাও" "জল লইয়া যাও" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তখন আমি রোগীকে জিজ্ঞাসা করিলাম কোন দিন তোমাকে কুকুরে কামড়াইয়াছিল কি? রোগীর তখন বেশী জ্ঞান রহিয়াছে, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—আমার বাড়ীতে কয়েকটী কুকুর আছে। ২।২½ মাস পূর্ব্বে আমি একদিন বাইসাইকেলে চড়িয়া বাহিরে যাইতেছি এমন সময় আমার বাড়ীর কুকুরগুলির মধ্যে একটী কুকুর আমার পিছু পিছু

---

* কল্পস্থানের ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে প্রকৃতিস্থ কুক্কুরাদির নখদন্তকৃত ক্ষতের চিকিৎসায় সুশ্রুত যখন বলিয়াছেন—

"নখদন্তক্ষতং বালৈর্যৎ কৃতং তদ্বিমর্দ্দয়েৎ।
সিঞ্চেৎ তৈলেন কোষ্ণেন তে হি বাতপ্রকোপজাঃ।

তখন উন্মত্তের নখক্ষতে যে বিষসঞ্চার হইবে ইহা বলাই বাহুল্য।

আসিতে লাগিল এবং নিষেধ করিলেও বারম্বার লাফাইয়া লাফাইয়া আমার পা ধরিতেছিল—এরূপ তো কখন করে না। আমি বারম্বার তাড়া করায় শেষে ঘরে ফিরিয়া গেল, কিন্তু তার নখ আমার পায়ে মোজা ফুটিয়া একটুকু লাগিয়াছিল—অতি সামান্য আঁচড় গিয়াছিল, কিছুমাত্র রক্ত পড়ে নাই—অতি সামান্য আঁচড়। তাহা আমি গ্রাহ্যই করি নাই—কোন দিন এ কথা ভাবিও নাই। আজ আপনি জিজ্ঞাসা করায় মনে হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম সেই কুকুরটী কোথায়? রোগী বলিল তাহার অগ্নিমান্দ্য হইয়াছিল, কিছু না খাইয়া শুকাইয়া শুকাইয়া আঁচড়ানর একমাসের মধ্যে মরিয়া গিয়াছে। আবার সেই মুখমণ্ডলের আক্ষেপের সহিত ফিট্ হইল। আমি গৃহস্থকে বলিলাম রোগীর জল-ত্রাস (হাইড্রোফোবিয়া) হইয়াছে। রোগ কঠিন—আপনারা অন্য কোন চিকিৎসককে দেখাইতে পারেন। পরে শুনিলাম অনেক সাহেব ডাক্তার আসিয়াছিলেন, কিন্তু সেই রাত্রিতেই রোগীর মৃত্যু হইয়াছিল।"

এই বাস্তব ব্যাপার হইতে আমরা প্রধানতঃ দুইটী তত্ত্ব জানিতে পারিতেছি।

(১) উন্মত্ত কুকুরের বিষ অতি গুপ্তভাবে কিয়ৎকাল শরীরে অবস্থিতি করিয়া পশ্চাৎ সংজ্ঞানাশ জন্মাইয়া প্রাণবিনাশ করিতে পারে।

(২) অতি ঈষৎ দষ্ট হইলেও জলত্রাস জন্মিতে পারে এবং জলত্রাস প্রকাশ পাইলে মরণ নিশ্চিত।

প্রথমোক্ত তত্ত্বটী অতি প্রাচীনকাল হইতে এদেশের কেবল চিকিৎসা-শাস্ত্রে কেন কাব্যে পর্য্যন্ত স্পষ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। সুশ্রুতের টীকাকার ডল্বণ কোন আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ হইতে সারোদ্ধার করিয়া বলিতেছেন—

অত্রার্থে তন্ত্রান্তরম্—"ব্যাধিতেন শ্বাদিনা দষ্টস্য শ্লেষ্মা প্রকুপিতঃ সংজ্ঞাবাহিনীধমনী রন্ধ্রপ্রবিশ্য সংজ্ঞানাশ মাপাদয়তি সদ্যঃ কালান্তরাদ্ বা ইতি বিশেষঃ। ততোনরঃ স্পৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা জলাৎ ত্রস্যতি। তস্যাপি তদরিষ্টং জানীয়াৎ" (সুশ্রুত টীকা—কল্পস্থান ৬ অঃ ৯০২ পৃঃ জীবানন্দের সংস্করণ)।

ডল্বণোক্তির মর্ম্ম এই—রোগগ্রস্ত কুক্কুরাদি প্রাণিকর্তৃক দষ্ট ব্যক্তির শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া সংজ্ঞাবাহিনী ধমনীগণের ভিতর প্রবেশ করিয়া দষ্ট ব্যক্তির সংজ্ঞানাশ (মোহ বা মূর্চ্ছা) জন্মাইয়া থাকে। এই সংজ্ঞানাশ, দংশন মাত্রেই কিম্বা কিছুকাল পরেও জন্মিতে পারে। কুক্কুরাদির বিষের এই বিশেষত্ব। ইহা বৈদ্যক শাস্ত্রোক্ত কথা। কাব্যেও দেখি - সীতা রাবণের গৃহে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া রামচন্দ্র লঙ্কায় সীতা চরিত্রের অগ্নিপরীক্ষা করিয়া তবে গ্রহণ করিয়া ছিলেন; কিন্তু তথাপি অযোধ্যার প্রজারা, সীতাচরিত্রের প্রতি পরগৃহবাস-দূষণোপলক্ষ্যে কটাক্ষ করিলে, মহাকবি ভবভূতি দীর্ঘকাল পরে পুনর্নবীভূত এই সীতাচরিত্রগত দূষণকে উন্মত্ত কুকুরের বিষের সহিত তুলনা করিয়াছেন *।

দ্বিতীয় তত্ত্বের সম্বন্ধে বক্তব্য—যে রোগের যে লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগীর মরণ হইতে দেখা যায়, সেই লক্ষণকে

* হাহা ধিক্‌পরগৃহবাসদূষণংযদ্
বৈদেহ্যাঃ প্রশমিতমদ্ভুতৈরুপায়ৈঃ
এতত্তৎ পুনরপি দৈবদুর্বিপাকা-
দালর্কংবিষমিব সর্ব্বতঃ প্রসৃপ্তম্ (উঃ চঃ ১মঃ [illegible])

সেই রোগের অরিষ্ট লক্ষণ বলে। সুশ্রুত, উন্মত্ত কুক্কুরাদি কর্তৃক দষ্ট ব্যক্তির যে তিনটী অরিষ্ট লক্ষণ বলিয়াছেন আমরা উপরি উদ্ধৃত শ্লোকে তাহাতে একাদিক্রমে অঙ্কপাত করিয়াছি। এক্ষণে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সংক্ষেপে বলিতেছি। কুকুর শৃগালে কামড়াইলে প্রথম অরিষ্ট লক্ষণ—যে প্রাণি-কর্তৃক দষ্ট হইয়াছে, দষ্ট ব্যক্তি তাহার তুল্য আচরণ ও শব্দ করিবে অর্থাৎ কুকুরে কামড়াইলে কুকুরের মত ডাকিবে, কুকুরের মত চলিবে, কুকুরের মত কামড়াইতে যাইবে, ক্লান্ত হইলে কুকুরের মত জিহ্বা বাহির করিয়া ঘন ঘন শ্বাস লইবে ইত্যাদি। দ্বিতীয় অরিষ্ট লক্ষণ—রোগী জলে বা আয়নাতে দংশনকারী প্রাণীর মূর্ত্তি দেখিবে। তৃতীয় অরিষ্ট লক্ষণ—জল দেখিয়া কিম্বা জলের নাম শুনিয়াই ভয় পাইবে, ইহার নাম জলত্রাস। এই তিনটী অরিষ্ট লক্ষণ বলিয়া, মহামতি সুশ্রুত বলিতেছেন—

"অদষ্টোঽপি জলত্রাসী ন কথঞ্চন সিধ্যতি।"

এখানে ঈষদর্থে নঞ্ অর্থাৎ অদষ্ট পদের অর্থ অল্প দষ্ট—ঈষৎ দষ্ট। ঈষৎ দংশন করিলেও যদি দষ্ট ব্যক্তি জল দেখিয়া ভয় পায় তাহা হইলে তাহার বিষদোষ কদাপি আরাম হইবে না—মরণ নিশ্চিত জানিবে। এখন সুশ্রুতোক্তির সহিত উপরি লিখিত বাস্তব ঘটনা মিলাইয়া দেখুন।

চিকিৎসা।

"বিস্রাব্য দংশং তৈর্দষ্টং সর্পিষা পরিদাহিতম্।
প্রতিহ্যাদগদৈঃ সর্পিঃ পুরাণং বাপি পায়য়েৎ।
অর্কক্ষীরযুতঞ্চাস্য দদ্যাচ্ছীঘ্রবিরেচনম্"।

(সুশ্রুত কল্পস্থান ৬ অঃ)

উন্মত্ত কুক্কুরাদি কামড়াইবামাত্র যে স্থানে দংশন করিয়াছে সেই স্থানের উপরিভাগ হইতে দংশন স্থান পর্য্যন্ত টিপিতে টিপিতে যত পারা যায় রক্তস্রাব করাইয়া পরে অত্যুষ্ণ গব্যঘৃতে তুলা ভিজাইয়া দষ্ট স্থানের উপরি স্থাপন করিবে। ইহাতে ঐ স্থান দগ্ধ হইয়া বিষাবশেষ নষ্ট হইবে। অতঃপর সুশ্রুত সংহিতার কল্প স্থানের ৭ম অধ্যায়োক্ত "মহা সুগন্ধি অগদ" রোগীর সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ যে অঙ্গে দংশন করিয়াছে তদঙ্গে লেপন করিবে। রোগীকে অন্ততঃ দশ বৎসরের পুরাণ গব্যঘৃত ১ তোলা পান করাইবে। অপরাজিতার মূলের রসে আকন্দের আঠা ২।১ ফোঁটা মিশাইয়া নস্য করাইবে। সেবন জন্য, সুশ্রুত নিম্নলিখিত কয়েকটী যোগের উল্লেখ করিয়াছেন—

(১) শ্বেতাং পুনর্নবাঞ্চাস্য দদ্যাদ্ধুস্তূরকাযুতাম্।
(২) "পললং তিলতৈলঞ্চ রূপিকায়াঃ পয়োগুড়ঃ।
নিহন্তি বিষমালর্কং মেঘবৃন্দমিবানিলঃ।"
(৩) "মূলস্য শরপুঙ্খায়াঃ কর্ষং ধুস্তূরকার্দ্ধিকম্।
তণ্ডুলোদকমাদায় পেষয়ে তণ্ডুলৈঃ সহ।
উন্মত্তকস্য পত্রৈস্তু সংবেষ্ট্যাপূপকং পচেৎ।
খাদেদোষধকালে স্বদলর্ক-বিষদূষিতঃ।"

(সুশ্রুত কল্পস্থান ৬ অঃ)

(১) "কনকোড়ুম্বর ফলমিব
তণ্ডুলজলপিষ্টং পীতমপহরতি"।
(২) "কনকদলদ্রবযুক্ত গুড়দুগ্ধপলৈকং
শুনাং গরলম্"।

(চক্রসংগ্রহ—বিষ চিঃ)

সুশ্রুতে ও চক্রদত্তে মাত্রার উল্লেখ নাই; অতএব আমরা বৃদ্ধবৈদ্য সম্মত পূর্ব্বযোগের মাত্রার উল্লেখ করিতেছি।

(১) কাঁচা শ্বেতপুনর্নবামূল, ১ তোলা, ধুতুরার কাঁচা ফুল এক তোলা [illegible]

গব্য দুগ্ধ বা শীতল জলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিতে হইবে।

(২) তিলবাটা ২ তোলা, তিল তৈল ২ তোলা, আকন্দের আঠা ৬ রতি, আকের গুড় ২ তোলা মিশাইয়া সেব্য।

(৩) শরপুঙ্খার কাঁচা মূল ২ তোলা, ধুতুরার কাঁচা মূল এক তোলা, আতপ চাউল ১ তোলা, নূতন আতপ চাউলের চেলোনির সহিত পিষিয়া যতগুলি পত্র আবৃত করিবার জন্য প্রয়োজন ততগুলি ধুতুরার পত্রে পিঠা প্রস্তুত করিয়া সেব্য।

(১) যজ্ঞডুমুরের পুষ্ট ফল ২টী, কনক ধুতুরার পরিপুষ্ট বীজ ১৬টী একত্র পেষণ করিয়া সেবন করিবে।

(২) ধুতুরা পাতার রস ২ তোলা, উত্তম গব্যঘৃত ২ তোলা, আকের গুড় ২ তোলা, গব্যদুগ্ধ ২ তোলা—একত্র সেব্য।

আমরা আয়ুর্ব্বেদ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া চিকিৎসা প্রণালী দেখাইলাম, অতঃপর চিকিৎসা প্রণালীর কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা লিখিত হইতেছে।

সুশ্রুতোক্ত ঔষধ তিনটী এবং চক্রোক্ত ঔষধ ২ টীকে ভাগ করিলে দেখা যায় যে, সুশ্রুতোক্ত প্রথম ও তৃতীয় ঔষধে এবং চক্রোক্ত দুইটী ঔষধেই অধিক মাত্রায় ধুতুরা আছে। ধুতুরার একটী নাম "উন্মত্ত" এবং দ্রব্যগুণ বেত্তারা সকলেই একবাক্যে অধিক মাত্রায় সেবিত ধুতুরার মূল, পত্র ও বীজের মত্ততা, ভ্রম ও মূর্চ্ছাকারিতা গুণ স্বীকার করিয়াছেন। আর সুশ্রুতোক্ত দ্বিতীয় ঔষধে যে সমস্ত দ্রব্য রহিয়াছে সকলই বিরেচক, কেবল আকন্দের আঠা বামক ও বিরেচক উভয়ই। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে সুশ্রুতোক্ত প্রথম ও তৃতীয় যোগ এবং চক্রোক্ত ২টী যোগ সংজ্ঞা নাশ ও উন্মত্ততা জন্মাইতে পারে। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে উন্মত্ত কুক্কুরাদির বিষ, দষ্টব্যক্তির শরীরে থাকিয়া শীঘ্র বা কালান্তরে সংজ্ঞানাশ করিয়া থাকে। যাহা বিষের কার্য্য, ঔষধের দ্বারা তাহা উৎপাদন করিবার প্রয়োজন কি? একথা বুঝিতে গেলে সুশ্রুত-কথিত উন্মত্ত কুক্কুরাদি বিষ—চিকিৎসার মূল-সূত্র বুঝিতে হইবে। সুশ্রুত উপদেশ দিয়াছেন—

"কুপ্যেৎ স্বয়ং বিষং যস্য ন স জীবতি মানবঃ।
তস্মাৎ প্রকোপয়েদাশু স্বয়ং যাবন্ন কুপ্যতি॥
(সুশ্রুত কল্প ৬ অঃ)

ইহার অর্থ এই—কুকুরের বিষ দষ্ট-ব্যক্তির দেহে স্বয়ং প্রকুপিত হইবার পূর্ব্বেই ঔষধ দ্বারা সেই গুপ্ত বিষের প্রকোপ জন্মাইবে। কেন না, বিষ স্বয়ং কুপিত হইলে রোগী বাঁচে না। অতএব শাস্ত্রকার অতিরিক্ত মাত্রায় ধুতুরা সেবন করাইয়া, বিষ স্বয়ং কুপিত হইয়া যাহা করিত, ঔষধ দ্বারা তাহাই করাইতে বলিলেন। ঈষৎ দষ্ট হইলে, সাধারণতঃ জল-ত্রাসের লক্ষণ প্রকাশ না পাওয়া পর্য্যন্ত আমাদের উল্লিখিত রোগীর মত, লোকে কোন চিকিৎসাই করায় না—উপেক্ষা করে। পরে বিষ যখন স্বয়ং কুপিত হইয়া মূর্চ্ছা ও জলত্রাস জন্মাইয়া থাকে তখনই চিকিৎসা করান হয়, সুতরাং আধুনিক চিকিৎসকগণ জলত্রাসরে (হাইড্রোফোবিয়া) যে অসাধ্য বলিয়া জানেন তাহা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। কিন্তু তাঁহারা যদি সুশ্রুতের উপদেশানুসারে বিষ-প্রকোপের লক্ষণ মূর্চ্ছাদি প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বেই, বিষ-প্রকোপকারী উপরি লিখিত ঔষধ প্রয়োগ করেন তাহা হইলে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইবে না। (ক্রমশঃ)

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

১ম বর্ষ। { বঙ্গাব্দ ১৩২৩—কার্ত্তিক। } ২য় সংখ্যা।

শরচ্চর্য্যা।

বঙ্গদেশে স্বাস্থ্যের যেরূপ অবনতি ঘটিয়াছে, তাহাতে সকলেরই স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে এতদ্দেশের উপযোগী যাবতীয় নিয়ম ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। পাঠকদিগের নিকট আমাদের একান্ত অনুরোধ এই যে, তাঁহারা যেন স্বয়ং এই সকল নিয়ম পালন করেন এবং আত্মীয়-স্বজনগণকে পালন করিতে উপদেশ দেন। তাহা হইলে আশা করি, আবার দেশের লোক স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভ করিবে।

আমাদের দেশে প্রধানতঃ শীতোষ্ণ-বর্ষণ লক্ষণাক্রান্ত তিনটী ঋতু বর্ত্তমান দেখা যায়। এই তিনটী ঋতুর তিনটী অন্তর্বিভাগ করিয়া ছয়টী ঋতু কল্পনা করা হইয়াছে। তন্মধ্যেও শীতের অন্তর্ভুক্ত হেমন্ত, গ্রীষ্মের অন্তর্গত বসন্ত এবং বর্ষার শরৎ। আয়ুর্ব্বেদে বমন বিরেচনাদি শোধনকার্য্যের জন্য আর এক-প্রকার ঋতুবিভাগ কল্পিত হইয়াছে। উপযুক্ত স্থলে তাহার আলোচনা করা যাইবে।

ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে জগতে এবং আমাদের দেহে একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে। গ্রীষ্মের তীক্ষ্ণ রবিকরে পৃথিবী উত্তপ্ত ও বর্ষার জলধারায় সিক্ত এবং শীতে তুষারপাতে শীতল হইয়া থাকে। গ্রীষ্মের উত্তাপে গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া আমরা সূক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারা শরীর আবৃত রাখিতেও কষ্ট বোধ করি, কিন্তু শীতে, ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া স্থূল উষ্ণ বস্ত্র দ্বারা শরীর আবৃত করিয়াও সুখী হইতে পারি না। শীতে আমরা পায়সপিষ্টকাদি যথেষ্ট পরিমাণে আহার করিতে পারি, কিন্তু গ্রীষ্মে অতিরিক্ত শীতল জলপান বশতঃ দুর্ব্বল অগ্নি, গুরুপাক খাদ্য জীর্ণ করিতে সমর্থ হয় না। বিবিধ পুষ্পাভরণ ঋতুরাজ বসন্তের আগমনে, নিম্ব-কিসলয় আমাদের রুচিজনক হয়, কিন্তু অন্য ঋতুতে তাহা রসনার তাদৃশ তৃপ্তিকর হয় না।

ভিন্ন ভিন্ন ঋতুর এইরূপ পার্থক্যবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে আমাদের আহার-বিহারও পৃথক্ হওয়া উচিত। আয়ুর্ব্বেদে ঋতুভেদে আহার বিহার সম্বন্ধে যে উপদেশ আছে,

তাহা ঋতুচর্য্যা নামে কথিত। সম্প্রতি শরৎ কাল উপস্থিত। তজ্জন্য এই প্রবন্ধে আমরা শরৎকালে কিরূপ আহার বিহার করা উচিত, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

মাঘ হইতে আরম্ভ করিয়া দুই দুই মাসে শীতাদি ছয়টী ঋতু ধরা হইয়াছে—যথা, মাঘ ও ফাল্গুন শীত বা শিশির, চৈত্র ও বৈশাখ বসন্ত, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় গ্রীষ্ম, শ্রাবণ ও ভাদ্র বর্ষা, আশ্বিন ও কার্ত্তিক শরৎ এবং অগ্রহায়ণ ও পৌষ হেমন্ত ঋতু। সাধারণ ঋতু বিভাগের সহিত আয়ুর্ব্বেদের এই ঋতু-বিভাগের পার্থক্য পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন।

ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন প্রকার আহার-বিহার করিতে হয় বটে, কিন্তু ভাদ্র মাসের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত বর্ষা ঋতুর নিয়ম পালন করিয়া যদি আশ্বিন মাসের প্রথম তারিখ হইতে শরৎ ঋতুর নিয়ম পালন করা যায়, তাহা হইলে সহসা আহার-বিহারের নিয়ম পরিবর্ত্তন জন্য শরীর অসুস্থ হইতে পারে। সেই জন্য এক ঋতুর নিয়ম ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিয়া অন্য ঋতুর নিয়ম পালন করা উচিত, শাস্ত্রে এইরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এক ঋতুর শেষ সপ্তাহ এবং পরবর্ত্তী ঋতুর প্রথম সপ্তাহকে ঋতুসন্ধি বলে। এই ঋতু-সন্ধির সময় ক্রমশঃ এক ঋতুর নিয়ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ঋতুর নিয়ম অবলম্বন করিতে হয়।

ছয়টী ঋতুসন্ধির মধ্যে শরৎ ও হেমন্তের মধ্যবর্ত্তী ঋতুসন্ধির একটু অপবাদ আছে। যথা—

কার্ত্তিকস্য দিনান্যষ্টৌ অষ্টাবগ্রহায়ণস্য চ।
যমদংষ্ট্রা সমাখ্যাতা বহ্বাহারো ন জীবতি॥

অর্থাৎ—কার্ত্তিকের শেষ আটদিন এবং অগ্রহায়ণের প্রথম আট দিন—এই সময়টুকু যমদংষ্ট্রা (যমের দাড়া) বলিয়া সমাখ্যাত। এ সময়ে যে ব্যক্তি বহুভোজন করে,সে দীর্ঘ-জীবি হয় না। "বহ্বাহারো ন জীবতি" স্থলে "লঘ্বাহারস্তু জীবতি" পাঠও দেখা যায়। ইহার অর্থ—যে ব্যক্তি লঘু আহার করে, সেই দীর্ঘজীবি হয়।

শরচ্চর্য্যার বিষয় বলিবার পূর্ব্বে এইস্থলে আর একটী কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন। ঋতুচর্য্যা সম্বন্ধে উপদেশ দিবার পর শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—

উপশেতে যদৌচিত্যাদোকসাত্ম্যং তদুচ্যতে।
দেশানামাময়ানাঞ্চ বিপরীতগুণং গুণৈঃ॥
সাত্ম্যমিচ্ছন্তি সাত্ম্যজ্ঞাশ্চেষ্টিতং চাদ্যমেব চ।

অর্থাৎ—এমন দেখা যায় যে কোন নির্দ্দিষ্ট আহার বিহার, অপথ্য হইলেও নিরন্তর অভ্যাসবশতঃ ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে পীড়াকর না হইয়া বরং সুখজনক হইয়া থাকে। এইরূপ আহার বিহারকে ওকসাত্ম্য বলে। যে ব্যক্তি যেরূপ নির্দ্দিষ্ট আহার বিহার দ্বারা ভাল থাকে, তাহার পক্ষে ঋতুচর্য্যার নিয়ম পালন তাহার ওকসাত্ম্যের বিরুদ্ধ না হয় দেখিতে হইবে। উদাহরণ দিতেছি—শরৎকালে দধি সেবন নিষেধ,কিন্তু নিরন্তর দধি সেবন করিয়া দধি যাহার ওকসাত্ম্য হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে শরৎকালেও দধি সেবন বিশেষ অহিতকর হইবে না। বিহার সম্বন্ধে তেমনি—দিবানিদ্রা যাহার ওকসাত্ম্য শরৎকালে দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ হইলেও তাহার পক্ষে উহা পীড়াকর হইবে না। রোগ সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে—যদি কাহার শরীরে অত্যন্ত বায়ুর প্রকোপ থাকে, শরচ্চর্য্যায় কথিত শীতল ও তিক্ত দ্রব্য সেবন করিলে সেই বায়ু আরও কুপিত হইতে পারে। সেইজন্য ঋতুসাত্ম্য হইলেও শীতল ও তিক্ত

দ্রব্য তাহার পক্ষে সাত্ম্য (হিতকর) নহে। অন্ধের ন্যায় ঋতুচর্য্যার নিয়ম পালন না করিয়া এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া ঋতুচর্য্যার নিয়ম পালন করিতে হইবে।

ঋতুভেদে অম্লমধুরাদি রস সেবনের উপদেশ আছে। তথাপি শাস্ত্রকার লিখিয়াছেন.:—

নিত্যংসর্ব্বরসাভ্যাসঃ স্বস্বাধিক্যমৃতাবৃতৌ।

অর্থাৎ ;—নিত্য সর্ব্ব প্রকার রস (মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত, কষায়) সেবন করা উচিত। তবে যে ঋতুতে যে রস সেবন করিবার উপদেশ আছে, সেই ঋতুতে সেই রস বহুল পরিমাণে সেবন করা কর্ত্তব্য। অন্যরস অল্প পরিমাণে সেবন করা উচিত।

শরৎকালের লক্ষণ।

বভ্রু রুক্ষঃ শরত্যর্কঃ শ্বেতাভ্র-বিমলং নভঃ।
তথা সরাংস্যম্বুরুহৈর্ভান্তি হংসাসঘট্টিতৈঃ॥
পঙ্কশুষ্কদ্রুমাকীর্ণা নিম্নোন্নতসমেষু ভূঃ।
বাণসপ্তাহ্ব-বন্ধুক-কাশাসন-বিরাজিতা॥

অর্থ—শরৎকালে মেঘমুক্ত সূর্য্য কপিলপিঙ্গলবর্ণ ও উষ্ণতর হয়। আকাশ নির্ম্মল ও শ্বেতবর্ণ মেঘব্যাপ্ত হয়, সরোবরে পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া শোভা বিস্তার করে, হংস সকল সরোবর-জলে আনন্দে সন্তরণ করে, নিম্নভূমি কর্দ্দমযুক্ত, উচ্চভূমি শুষ্ক, ও সমভূমি বৃক্ষ দ্বারা আকীর্ণ হইয়া থাকে এবং ঝিণ্টী, ছাতিম, বাঁধুলি কেশে ও শালবৃক্ষ পুষ্পিত হয়।.

প্রথমে বলা হইয়াছে, যে, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাস শরৎকাল। তবে শরৎ ঋতুর লক্ষণ লিখিবার সার্থকতা কি? সার্থকতা অবশ্যই আছে। যে ঋতু যেরূপ লক্ষণান্বিত হয়,সেই সমস্ত লক্ষণ সেই ঋতুতে যথাযথরূপে প্রকাশ পাইলেই তাহাকে অব্যাপন্ন (অবিকৃত) ঋতু বলা যায়। আর সেই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ না পাইলে তাহাকে ব্যাপন্ন (বিকৃত) ঋতু বলা যায়। ব্যাপন্ন ও অব্যাপন্ন ঋতুর বিষয় পরে লিখিত হইবে। এক্ষণে শরচ্চর্য্যার বিষয় বলা যাইতেছে।

ঋতুভেদে দোষের সঞ্চয়, প্রকোপ ও প্রশম হয়। বর্ষাকালের কুপিত বায়ু, শরৎকালে প্রশমিত হইয়া থাকে, আর বর্ষাকালের সঞ্চিত পিত্ত, শরৎকালীন সূর্য্যসন্তাপ হেতু কুপিত হয়। এইজন্য শরৎকালে মধুর, লঘু, শীতল, কষায় এবং তিক্ত অন্ন পান যাহা পিত্তনাশক তাহাই সেবন করা উচিত। তিক্ত দ্রব্যের মধ্যে এই সময়ে পল্‌তা, উচ্ছে ও হিঞ্চে শাক পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত তিক্তই শরৎকালে যথেষ্ট সেবন করা কর্ত্তব্য। শিউলীপাতা,পলতার ন্যায় ভাজিয়া বা দালের সহিত খাওয়ার রীতি স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে। উহা শরৎকালে বিশেষ হিতকর সন্দেহ নাই। যে দেশে এই প্রথা প্রচলিত নাই, সে দেশের অধিবাসিগণ ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। শরৎকালে লঘু দ্রব্য লঘু মাত্রায় (পেট ভরিয়া নহে) সেবন করা উচিত। শালি তণ্ডুলের অন্ন (পুরাণ হৈমন্তিক ধান্যের তণ্ডুল) এবং যব ও গোধূমকৃত লঘুপাক খাদ্য প্রশস্ত। দালের মধ্যে মুগের দালই শ্রেষ্ঠ। ছোলা, মসুর মটর ও অড়হরের যূষও ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু ঐ সকল দাল, ঘৃত ও বহু মসলা সংযুক্ত করিয়া আহার করা উচিত নহে। কারণ তাহাতে গুরুপাক হইয়া থাকে। পটোল, বেগুণ, ডুমুর, মোচা, থোড়, চিচিঙ্গে (হোপা), দেশী কুমড়া প্রভৃতি তরকারী অল্প মাত্রায় সেবন করা উচিত।

আলু, বিলাতী কুমড়া প্রভৃতি তরকারী ব্যবহার না করা, বা খুব অল্প মাত্রায় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। মৎস্য, অন্য জলজ প্রাণীর মাংস (কচ্ছপ, কাঁকড়া, ঝিনুক প্রভৃতি), নানাপ্রকার হংস, বক প্রভৃতি জলচর-প্রাণীর মাংস এবং মহিষ শূকরাদি আনূপ (জলাশয়সমীপচর প্রাণীর মাংস) প্রশস্ত নহে। বটের,চাতক প্রভৃতি পক্ষীর মাংস, হরিণের মাংস, মেষ মাংস এবং শশকের মাংস, লঘুপাক করিয়া আহার করা উচিত। ইক্ষু, গুড়, চিনি, মিছরী দুগ্ধ প্রভৃতি সুপথ্য। কাঁচা ঘৃত সেবন করা প্রশস্ত নহে।

বেদানা, আপেল, মিষ্ট নাসপাতি, পেঁপে, মিষ্ট বাতাবী লেবু, আতা, খেজুর, কিসমিস, মনাক্কা, আঙ্গুর, আমলকী প্রভৃতি ফল শরৎকালে সুপথ্য।

বসা (চর্ব্বি) তৈল, পূর্ব্বোক্ত নিষিদ্ধ মাংস, দধি, ক্ষীর দ্রব্য এবং তীক্ষ্ণ মদ্য শরৎকালে সেবন করিবে না। শরতের রৌদ্র এবং হিম অত্যন্ত অনিষ্টকর বলিয়া পরিত্যাগ করিবে। এই ঋতুতে দিবানিদ্রা সেবন করিবে না। শরতে পূর্ব্ব-বায়ু বর্জ্জনীয়।

শরৎকালে বিরেচন বিশেষ হিতকর। এই সময়ে সুস্থ শরীরে, সপ্তাহে বা পক্ষে একদিন করিয়া জোলাপ লইলে, বহু রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় এবং শরীর সুস্থ থাকে।

শরৎ কালে জল, দিবাভাগে মেঘমুক্ত-তীক্ষ্ণ সূর্য্যকিরণ দ্বারা সন্তপ্ত ও রাত্রিকালে চন্দ্রকিরণে সোম-গুণান্বিত হয়, অপিচ অগস্ত্যের উদয় হেতু উহার বিষদোষ নষ্ট হয়। সেই জন্য শরৎ কালের জল নির্ম্মল, পবিত্র, এবং স্নান, পান ও অবগাহনে অমৃতের ন্যায় হিতকর। ইহা রুক্ষ বা অভিষ্যন্দি নহে।

শরৎকালে শারদীয় পুষ্পের মাল্য ধারণ, নির্ম্মল বস্ত্রপরিধান এবং সন্ধ্যাকালে চন্দ্র-কিরণ সেবন করা হিতকর। কিন্তু হিমের জন্য অধিক্ষণ বাহিরে থাকা উচিত নহে। এই ঋতুতে তিন দিন অন্তর স্ত্রীগমন করিবার উপদেশ আছে।

শরৎকালে পিত্তশ্লেষ্মজ জ্বর হয়। পিত্ত প্রধান থাকে এবং কফ তাহার অনুবল হয়। কফ ও পিত্ত দ্রব ধাতু বলিয়া উক্তজ্বরে যথেষ্ট লঙ্ঘন সহ্য হয়। সেই জন্য সাধারণতঃ শরৎ কালের জ্বরে লঙ্ঘন দেওয়া উচিত। তবে প্রধানতঃ পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর হইলেও, অন্য জ্বর যে একেবারে হয় না, তাহা নহে। অন্য জ্বর হইলে, অবস্থা বিবেচনায় লঙ্ঘন প্রযোজ্য।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ।

আয়ুর্ব্বেদ শব্দটী সকলের শ্রুতিগোচর হইয়া থাকিলেও, আয়ুর্ব্বেদে কি আছে,তাহা অনেকেই অবগত নহেন। সেই জন্য আমরা এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অভিধেয় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চেষ্টা পাইব।

আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, প্রথমেই দেখা উচিত যে, আয়ুর্ব্বেদ শব্দে কি বুঝায়।

চরক সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

আয়ুর্হিতাহিতং ব্যাধেনির্দানং শমনং তথা।
বিদ্যতে যত্র বিদ্বদ্ভিঃ স আয়ুর্ব্বেদ উচ্যতে॥

অর্থাৎ যাহাতে কিসে আয়ুর হিত হয় এবং কিসে অহিত হয়, লিখিত আছে, যাহাতে রোগ জন্মিবার কারণ ও তাহার প্রশমনের উপায় কথিত আছে,তাহাকেই বিদ্বদ্বর্গ আয়ুর্ব্বেদ বলিয়া থাকেন। সুশ্রুতে লিখিত আছে;

ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদ-প্রয়োজনং ব্যাধ্যুপসৃষ্টানাং ব্যাধিপরিমোক্ষঃ স্বস্থস্য রক্ষণঞ্চ। আয়ুরস্মিন্ বিদ্যতে হনেন বা আয়ুর্বিন্দতীত্যায়ুর্ব্বেদঃ।

অর্থাৎ ব্যাধিত ব্যক্তিকে ব্যাধিমুক্ত করা এবং সুস্থ ব্যক্তিকে রক্ষা করাই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। যাহাতে আয়ু আছে, যদ্বারা,আয়ুর বিষয় জানা যায়, যদ্বারা আয়ুর বিচার করা যায় অথবা যদ্বারা আয়ু লাভ করা যায়, তাহাকে আয়ুর্ব্বেদ বলে।

সুশ্রুত-সংহিতায় লিখিত আছে—

ভগবন্! "শারীরমানসাগন্তুস্বাভাবিকৈর্ব্যাধিভির্ব্বিবিধবেদনাভিঘাতোপদ্রুতান্ সনাথানপ্যনাথবদ্বিচেষ্টমানাম্ বিক্রোশতশ্চ মানবানভিসমীক্ষ্য মনসি নঃ পীড়া ভবতি। তেষাং সুখৈষিণাং রোগোপশমনার্থমাত্মনঃ প্রাণযাত্রার্থঞ্চ প্রজাহিতহেতোরায়ুর্ব্বেদং শ্রোতুমিচ্ছামি ইহোপদিশ্যমানম্। অত্রায়ত্তমৈহিকমামুষ্মিকঞ্চ শ্রেয়ঃ।"

ঔপধেনব প্রমুখ ঋষিগণ ধন্বন্তরিকে কহিলেন, হে ভগবন্! শারীরিক, মানসিক আগন্তু ও স্বাভাবিক ব্যাধি দ্বারা পীড়িত, বিবিধবেদনায় নিতান্ত কাতর, সনাথ হইলেও অনাথের ন্যায় বিপরীত ক্রিয়াকারী, করুণ-ক্রন্দন-পরায়ণ মানবদিগকে দেখিয়া আমাদের অত্যন্ত মনঃপীড়া হইয়াছে। তাহাদের সুখের জন্য, রোগ নিবারণের জন্য, স্বীয় জীবন-যাত্রা সুখে নির্ব্বাহের জন্য এবং প্রজাগণের হিতের জন্য, আমরা আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করি, সে সম্বন্ধে আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করুন। ইহলোক এবং পরলোকের শ্রেয়ঃ আয়ুর্ব্বেদেরই আয়ত্ত।

এইখানে আমরা অন্যান্য জাতির চিকিৎসা শাস্ত্রের তুলনায় আয়ুর্ব্বেদের শ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্ট দেখিতে পাই। রোগের নিদান ও প্রশমনোপায় এবং সুস্থের স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতির বিষয় সকল জাতির চিকিৎসা শাস্ত্রে লিখিত আছে। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদে ঐ সকলত আছেই, তদ্ব্যতীত ইহ ও পরলোকে শ্রেয়স্কর যাবতীয় নীতি অর্থাৎ ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি সমস্ত নীতিই আয়ুর্ব্বেদের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে আয়ুর্ব্বেদ সর্ব্বশাস্ত্রময়।

সহজেই মনে হইতে পারে যে, আয়ুর হিতাহিত (অর্থাৎ স্বাস্থ্যরক্ষা ও দীর্ঘ জীবন

লাভ সম্বন্ধে উপদেশ এবং রোগের কারণ নির্দ্দেশ ও প্রশমনোপায়) যখন আয়ুর্ব্বেদের আলোচ্য বিষয়, তখন অন্যান্য নীতি শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া আয়ুর্ব্বেদ কি অনধিকার চর্চ্চা করেন নাই। এবিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে, চিকিৎসা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটু স্বাধীন ভাবে আলোচনা করা আবশ্যক।

চিকিৎসাশাস্ত্রের উদ্দেশ্য কি? কিত ধাতু হইতে চিকিৎসা শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। কিত ধাতুর অর্থ রোগাপনয়ন। সুতরাং সংক্ষেপে বলিতে গেলে ব্যাধিতকে রোগমুক্ত করাই চিকিৎসা-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। তাহাই যদি হইল, তবে সুস্থব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার এবং দীর্ঘ জীবন লাভের উপদেশ কেন? সুতরাং স্বীকার করিতে হইতেছে যে, মানবগণ যাহাতে ব্যাধিমুক্ত হইয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারে, তাহাই চিকিৎসা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। সরল ভাষায় বলিতে গেলে, মানব জীবনের দুঃখ নিবৃত্তি এবং সুখ-সাধনই চিকিৎসা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

এক্ষণে দেখা যাউক যে, সুখের জন্য মানবের কোন্ কোন্ দ্রব্যের প্রয়োজন। কেবল অব্যাহত স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ জীবন পাইলেই মনুষ্য সুখী হইতে পারে না। মানবের সুখ-দুঃখের সহিত ধর্ম্ম, অর্থ, লোকাচার সকলেরই বিশেষ সম্বন্ধ। আর সেই জন্যই আয়ুর্ব্বেদে ঐ সকল ব্যাপার সম্বন্ধীয় নীতি কথিত হইয়াছে। বিভিন্ন নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয় বহু উপদেশ আয়ুর্ব্বেদকে অলঙ্কৃত করিয়াছে। বাহুল্য ভয়ে দিগ্‌দর্শন স্বরূপ আমরা দুই একটী মাত্র প্রমাণ উদ্ধৃত করিব।

ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে :—

সুখার্থাঃ সর্ব্বভূতানাং মতাঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ।
সুখং চ ন বিনা ধর্ম্মাৎ তস্মাদ্ধর্ম্মপরো ভবেৎ॥

অর্থাৎ সুখের জন্যই সকলের চেষ্টা। কিন্তু ধর্ম্ম ব্যতীত সুখলাভ হয় না। সুতরাং ধর্ম্মপর হইবে।

তারপর অর্থ নীতি। ইহলোক অপেক্ষা পরলোকের দিকেই আর্য্যজাতীর অধিকতর লক্ষ্য ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া ইহজীবনের অতি প্রয়োজনীয় যে অর্থ—তাহার উপযুক্ত সমাদর করিতে আয়ুর্ব্বেদকার বিস্মৃত হয়েন নাই। পরলোকত আছেই, কিন্তু তাই বলিয়া ইহলোকটা কি একেবারে ছাড়িয়া দিতে হইবে। সে বুদ্ধি ত প্রশংসনীয় নহে। কারণ—"যা লোকদ্বয়সাধনী চতুরতা সা চাতুরী চাতুরী।"

অর্থাৎ যাহা ইহলোক এবং পরলোক—উভয় লোকেই শ্রেয়োলাভ করাইতে পারে, সেই চতুরতাই চতুরতা।

সেইজন্য ইহ জীবনের প্রত্যক্ষ-দেবতা অর্থ সম্বন্ধে শাস্ত্রকার বলিয়াছেন :—

তিস্র এষণাঃ পর্য্যেষ্টব্যা ভবন্তি। তদ্‌ যথা প্রাণৈষণাধনৈষণা পরলোকৈষণেতি।

অর্থাৎ মানুষের চেষ্টা তিন প্রকার। প্রথমেই প্রাণরক্ষার চেষ্টা। কেননা প্রাণ না থাকিলে ধন লইয়া কি করিবে। তারপর প্রাণ বাঁচাইয়া ধনলাভের চেষ্টা করিবে; কেননা ধন ব্যতীত ইহ লোকে শ্রেয়োলাভ করিতে পারা যায় না, পরলোকেও কতকটা বটে। তারপর পরলোকোপকারক ধর্ম্মার্জ্জনের চেষ্টা।

কূপমণ্ডূক জলের বিস্তৃতি কেবল কূপেই সীমাবদ্ধ দেখে। দুঃখের সহিত বলিতে

হইতেছে, যে অনেক আধুনিক তথাকথিত উন্নত জাতির জীবন সমন্ধে জ্ঞান, কূপমণ্ডূকের ন্যায় ইহলোকেই সীমবদ্ধ। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ জানেন যে, জীবন অনন্ত—ইহলোকের কয়েক দিন, জীবনের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। পরলোক লইয়া আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অনেক বিচার আছে। কিন্তু প্রথমতঃ, তাহা আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে এবং দ্বিতীয়তঃ উহা দর্শন শাস্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য।

ইন্দ্রিয় লইয়া মানুষকে অনেক সময় বিপদে পড়িতে হয়। উচ্ছৃঙ্খল অশ্ব সদৃশ ইন্দ্রিয়গুলিকে লইয়া কিরূপে চলা যায়, তাহা বিশেষ বিবেচনার বিষয়। এই দুর্বৃত্ত অশ্বগুলিই অনেকসময় মানবের অধঃপতনের মূল স্বরূপ হইয়া থাকে। এসম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ বলেন

ন পীড়য়েদিন্দ্রিয়াণি ন চৈতান্যতি-লালয়েৎ।

অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলকে পীড়িত করিবে না কিম্বা অতিরিক্ত লালিতও করিবে না। ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের এই উপদেশ ইহ এবং পর—উভয় লোকের পক্ষেই শ্রেয়স্কর। ইহলোকের পক্ষে উহা শ্রেয়স্কর বলিয়া স্বীকার করিলেও, পরলোকের পক্ষে উহা শ্রেয়স্কর কি না, সে সম্বন্ধে অনেকের সংশয় হইতে পারে। সেই সংশয় নিরাশার্থ ঠিক অনুরূপ না হইলেও এক উদ্দেশ্যবাচক দুইটী শ্লোক সর্ব্বধর্ম্মশাস্ত্রসার গীতা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈবচার্জ্জুন॥
যুক্তাহার বিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাবোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥

অর্থাৎ—হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি অত্যধিক আহার করে বা একেবারে আহার করে না, যে ব্যক্তি অত্যন্ত নিদ্রা যায় অথবা একবারে নিদ্রা সেবন করে না, তাহার সমাধি হয় না। যিনি পরিমিতরূপ আহার বিহার করেন, কর্ম্ম সকলে পরিমিতরূপ চেষ্টা করেন যিনি পরিমিতরূপে নিদ্রা সেবন করেন, এবং জাগরিত থাকেন, তাঁহার যোগ দুঃখনিবারক হইয়া থাকে।

সদাচার বিধি সম্বন্ধে উপদেশ দিবার পর লিখিত হইয়াছে—

ইত্যাচারঃ সমাসেন যং প্রাপ্নোতি সমাচরন্।
আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং যশো লোকাংশ্চ শাশ্বতান্

এই সকল আচার পালন করিলে দীর্ঘ আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, যশ এবং নিত্যলোক লাভ করা যায়। উপদেশগুলি যেরূপ সুন্দর, তাহাতে ইহা কিছুমাত্র অত্যুক্তি নহে। দুই চারিটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

সংসারে থাকিতে হইলে নানা প্রকৃতির নানা লোকের সহিত সংসর্গ ঘটে। এই সকল বিভিন্ন প্রকৃতির লোকগুলিকে সন্তুষ্ট রাখিবার উপায় কি? সে সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ বলেন—

জনস্যাশয়মালক্ষ্য যো যথা পরিতুষ্যতি।
তং তথৈবানুবর্ত্তেত পরারাধন-পণ্ডিতঃ॥

লোকের প্রকৃতি দেখিয়া যে যাহাতে সন্তুষ্ট হয় তাহাকে সেইরূপ আচরণ দ্বারা সন্তুষ্ট করিবে।

নাধীরো নাত্যুচ্ছ্রিতসত্বঃ স্যাৎ। নাভৃতভৃত্যো নাবিশ্রব্ধস্বজনো নৈকঃ সুখী। ন দুঃখশীলাচারোপচারো ন সর্ব্ববিশ্রম্ভী ন সর্ব্বাভিশঙ্কী। ন সর্ব্বকাল-বিচারী। ন কার্য্যকালমতিপাতয়েৎ। নাপরীক্ষিতমভিনিবিশেৎ। নেন্দ্রিয়বশগঃ স্যাৎ।

অধীর কিম্বা উদ্ধত স্বভাব হইবে না। ভরণীয় ব্যক্তিগণের ভরণপোষণ করিবে। আত্মীয়গণকে অবিশ্বাস করিবে না। একাকী সুখভোগ করিবে না। দুঃখপ্রদ চরিত্র বা আহার ব্যবহার পরায়ণ হইবে না। সকলকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিবে না, বা সকলের প্রতি অত্যন্ত সন্দিহান হইবে না। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া বিচার করিয়া কার্য্যকাল নষ্ট করিবে না। অপরীক্ষিত বিষয়ে অভিনিবেশ করিবে না, ইন্দ্রিয়ের বশতাপন্ন হইবে না। 'সম্পদ্বিপদ্স্বেকমনা হেতাবীর্ষ্যেৎ ফলে নতু।'

সম্পদ-বিপদে সমচিত্ত হইবে। হেতুতে ঈর্ষা করিবে, কিন্তু ফলে ঈর্ষা করিবে না। অর্থাৎ অমুক বিদ্যা শিক্ষা করিয়া যথেষ্ট ধন ও যশঃ উপার্জ্জন করিয়াছে, সুতরাং আমিও বিদ্যা শিক্ষা করিব—এইরূপ ভাবিবে। কিন্তু উহার এত ধন ও যশঃ কেন হইল, এরূপ ঈর্ষা করিবে না।

আয়ুর্ব্বেদ এতই উদার যে, বিদ্যাকে নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা সঙ্গত মনে করেন নাই। তাই সদাচার বিধির শেষে বলা হইয়াছে।

যচ্চান্যদপি কিঞ্চিৎ স্যাদনুক্তমিহ পূজিতম্।
বৃত্তং তদপি চাত্রেয়ঃ সদৈবাভ্যনুমন্যতে॥

অর্থাৎ—অন্যত্র যে উত্তম সদাচার দেখিতে পাওয়া যায় এবং যাহা এখানে উল্লিখিত হয় নাই, তাহাও পালন করা আত্রেয় ঋষির অনুমোদিত।

বাহুল্য ভয়ে আয়ুর্ব্বেদান্তর্গত অন্যান্য শাস্ত্রের কথা না বলিয়া এক্ষণে আমরা চিকিৎসা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে বলিতে হইতেছে যে—"যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ" আয়ুর্ব্বেদের এই গর্ব্বোক্তি সম্পূর্ণ সত্য। আয়ুর্ব্বেদে নাই কি? আজ ঐ যে সুদূর য়ুরোপে বলদর্পিত মদোদ্ধত পাশ্চাত্যজাতিগণ ক্রূরভাবে পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া হতাহত করিতেছে, ঐ যে জলস্থল ব্যোমচারী নরহত্যার নিমিত্ত অসংখ্য রণসম্ভার সৃষ্টিসংহার করিতে উদ্যত হইয়াছে, ঐ যে বিবিধ নরঘাতন যন্ত্র ভীষণ গর্জ্জন করিয়া পলকে পলকে সহস্র সহস্র নরের বিনাশসাধন করিতেছে, সে বিষয়ও আয়ুর্ব্বেদে উল্লিখিত হইয়াছে। যে যুদ্ধ পৃথিবীর চতুস্খণ্ডস্থিত মনুষ্যকে শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে, যে যুদ্ধ কোটি কোটি মনুষ্যের অন্নাভাবের কারণ স্বরূপ, যে যুদ্ধ পৃথিবীকে নরকে পরিণত করিয়াছে, সে যুদ্ধের বিষয়ও আয়ুর্ব্বেদে উল্লিখিত হইয়াছে। যে যুদ্ধে আমাদের পরম কারুণিক সম্রাট,দুর্ব্বলের রক্ষার জন্য অনিচ্ছাস্বত্বেও যোগ দিতে বাধ্য হইয়াছেন, যে যুদ্ধে বহুজাতি অজস্র বক্ষঃশোণিতপাত করিয়া পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে, যে যুদ্ধে নগরের পর নগর, দেশের পর দেশ, শ্মশানে পরিণত হইতেছে, সে যুদ্ধ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী আয়ুর্ব্বেদে দৃষ্ট হয়।

চরকে লিখিত হইয়াছে :—

"তথা শস্ত্রপ্রভবস্যাপি জনপদোদ্ধ্বংসস্যাধর্ম্ম এব হেতুর্ভবতি। তে অতিপ্রবৃদ্ধ রোষ-লোভ-ক্রোধমানাঃ দুর্ব্বলানবমত্যাত্মস্বজনপরোপঘাতায় শস্ত্রেণ পরস্পরমভিক্রামন্তি, পরান্ বাভিক্রামন্তি পরৈর্ব্বাভিক্রাম্যন্তে রক্ষগণাদিভির্ব্বা বিবিধৈর্ভূতসঙ্ঘৈস্তমধর্ম্মমন্যাপ্যপচারান্তরমুপলভ্যাভিহন্যন্তে।"

শস্ত্রপ্রভাব জনপদধ্বংসের ও কারণ অধর্ম্ম। যাহাদের লোভ, ক্রোধ ও অভিমান অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহারা দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগকে অবমান করিয়া, আত্মীয়স্বজন ও পরের উপঘাতের জন্য পরস্পর শস্ত্র দ্বারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, অথবা অপর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। (ক্রমশঃ)

আয়ুর্ব্বেদে পরিপাক ক্রিয়া।

পরিপাক ক্রিয়া চিকিৎসা শাস্ত্রে একটী প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। মানব দেহের হ্রাস বৃদ্ধি—এমন কি উৎপত্তি-স্থিতি-লয় পর্য্যন্ত সমস্তই এই পরিপাক ক্রিয়ার অধীন। যদিও মানবদেহের উৎপত্তি, শুক্র-শোণিতের সংযোগেই সম্পন্ন হইয়া থাকে, তথাপি দেখা যায় যে, সেই শুক্র-শোণিতও পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্যেই উৎপন্ন হইয়া এই দেহের সৃষ্টি করে। সুতরাং এই পরিপাক ক্রিয়া কি এবং কি ভাবেই বা এই দেহে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা বিশেষভাবে জানা আবশ্যক। মানবদেহ প্রতিনিয়ত ক্ষয়-বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ক্ষয় হইতে শরীরকে রক্ষা করিবার জন্য ও শারীরিক পুষ্টি বিধানের জন্যই আহারের আবশ্যক। যে ক্রিয়া দ্বারা ভুক্তদ্রব্য অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া রস-রক্তাদিরূপে পরিণত হয়, তাহাই পরিপাক ক্রিয়া। এই পরিপাক ক্রিয়া সর্ব্বদেহব্যাপী, কারণ সর্ব্বদেহেই এই পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে। তথাপি প্রথমতঃ ও প্রধানরূপে আমাশয়েই এই কার্য্য সম্পন্ন হয় বলিয়া, আমাশয়ের ক্রিয়াকেই চিকিৎসা শাস্ত্রে পরিপাক ক্রিয়া বলা হইয়াছে। মানবদেহ যেমন ভূতময়, অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ এবং ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূতের পরমাণু দ্বারা নির্ম্মিত, আহার্য্য দ্রব্যও তদ্রূপ। সুতরাং আহার্য্য দ্রব্য, রস-রক্তাদিরূপে পরিণত হইয়া, সমান জাতীয় অংশ দ্বারা, রস-রক্তাদি ধাতু সমূহের পুষ্টি বিধান করিতে পারে। আহার্য্য দ্রব্যসকল পরমাণু ও প্রকৃতিভেদে অসংখ্য প্রকার এবং রসভেদে ঐ সমস্ত দ্রব্য বহুবিধ। কিন্তু ভক্ষণ ক্রিয়া ভেদে উহারা চতুর্ব্বিধ—চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য এবং পেয়। মানবগণ মুখ দ্বারা আহার্য্য দ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকে। শারীরিক পুষ্টি বিধানের জন্য বাতাতপাদি বাহ্য দ্রব্য, ত্বক্ দ্বারা দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া শারীরিক পুষ্টি বিধান করিলেও তাহা আহার সংজ্ঞায় অভিহিত হয় না। সুতরাং আহার্য্য দ্রব্য চারি শ্রেণীর অতিরিক্ত নহে। যে সকল দ্রব্য মুখ-কুহরে পতিত হইলে দন্ত সাহায্যে চর্ব্বিত হইয়া অধঃকৃত হয়, তাহারা চর্ব্ব্য, যে সকল দ্রব্য জিহ্বা, কপোল ও ওষ্ঠ সাহায্যে আকর্ষণ করিয়া অধঃকৃত করা হয় তাহাদিগকে চূষ্য এবং যে সকল দ্রব্য জিহ্বা দ্বারা লেহণ করিয়া তালু, কপোল প্রভৃতির সাহায্যে অধঃকৃত করা হয়, তাহাদিগকে লেহ্য ও যে সকল দ্রব্য মুখে পতিত হইবামাত্র অধঃকৃত করা হয়, তাহাদিগকে পেয় বলে। এই চারিটী উপায় ভিন্ন মানবগণ অন্য কোন উপায়ে আহার গ্রহণ করে না। সুতরাং এই চারি প্রকার উপায় বা ক্রিয়া ভেদেই আহার্য্য দ্রব্য চারি শ্রেণীতে বিভক্ত।

মুখগহ্বর—ইহা ভুক্ত দ্রব্য মুখে কিয়ৎকাল স্থাপন করিবার নিমিত্ত একটী বিবর বিশেষ। ইহা বদন মণ্ডলের বক্রতাবস্থি ও হন্বাস্থি দ্বারা একটী পুটকের ন্যায় নির্ম্মিত। ইহার অভ্যন্তরে একটী বড় জিহ্বা আছে, তাহার নাম গোজিহ্বা। গোশব্দের অর্থ রস, মধুরাদি রস জানিবার পক্ষে ইহাই এক মাত্র উপায় বলিয়া ইহার চরকোক্ত নাম গোজিহ্বা বা রসনেন্দ্রিয় বলা হয়। এই জিহ্বার মূলভাগে আরও একটী ক্ষুদ্র জিহ্বা আছে

এবং ইহার উর্দ্ধদেশে তালু প্রান্তে অঙ্কুরাকৃতি একটী মাংসখণ্ড দৃষ্ট হয়, এই উভয়কেই উপজিহ্বিকা বলে। এতদ্ভিন্ন মুখ গহ্বরের সম্মুখভাগে উর্দ্ধদেশে ও নিম্নদেশে দুই পংক্তি দন্ত আছে। চর্ব্বণোপযোগী দ্রব্য, মুখে প্রক্ষিপ্ত হইবামাত্র জিহ্বা সঙ্কুচিত, প্রসারিত ও সঞ্চালিত হইতে থাকে এবং দন্ত পংক্তিদ্বয় চর্ব্বণ করিতে থাকে। এই সময় জিহ্বা, কপোল এবং দন্তমূল হইতে চুয়াইয়া অজস্র রস নির্গত হইতে থাকে। এই রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া, ভুক্তদ্রব্য কোমলতা এবং পিচ্ছিলতা প্রাপ্ত হয়, এবং তখনই উহা অধঃকরণোপযোগী হয়। যতক্ষণ উক্ত অবস্থাপন্ন না হইবে ততক্ষণ জিহ্বা ভুক্তদ্রব্যকে মুখবিবরে ধরিয়া রাখে। এইরূপে আহার্য্য দ্রব্যসকল অধঃকরণোপযোগী হইয়া জিহ্বা সাহায্যে কণ্ঠোপরি নীত হয়। পূর্ব্বোক্ত জিহ্বা, কপোল ও দন্ত নিঃসৃত রস, কেবল ভুক্তদ্রব্যের কোমলতা সাধন করে—তাহা নহে, উহা পরিপাক ক্রিয়ারও বিশেষ সাহায্য করে। এই রস-নিঃসরণ ক্রিয়া স্বাভাবিক। কারণ কোন দ্রব্য মুখে প্রক্ষিপ্ত হইবামাত্রই এই রস প্রচুর পরিমাণে নির্গত হয়, ইচ্ছা করিয়া ইহার নিঃসরণ বন্ধ করা যায় না। উপবাস করিলে এই রসের পরিমাণ কমিয়া যায়। আবার অপ্রিয় দ্রব্য কিম্বা ক্রুদ্ধ অথবা ভীত হইয়া আহার করিলেও অল্প পরিমাণে ইহার স্রাব হয়। কিন্তু শীতল, পিচ্ছিল, মধুর, অম্ল ও লবণ রসদ্রব্য সেবনে ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ইহা কি পরিমাণ নির্গত হইতে পারে তাহা বলা যায় না। কিন্তু দেখা যায় যে, যে পরিমাণ দ্রব্যই মুখে ক্ষিপ্ত হউক না কেন এই রস সমস্তই সিক্ত করিবে। প্রথমাবস্থায় ইহা স্বচ্ছ জলের ন্যায় এবং ক্ষণকাল পরে ইহা কিঞ্চিৎ ঘন হইতে দেখা যায়। লোভনীয় কোন দ্রব্য অথবা অম্লদ্রব্য দর্শন করিলেও এই রস আপনা আপনি নির্গত হইয়া থাকে। ভুক্তদ্রব্য মুখে না থাকিলে এই রস অল্প পরিমাণে নির্গত হইয়া মুখকে রসাল রাখে মাত্র। এই রসের নাম লালা। ইহা মধুররস, শীতল, পিচ্ছিল, শ্বেতবর্ণ, স্বচ্ছ এবং অতিশয় পাতলা। ইহা শোণিতের শ্বেতাংশ হইতে উৎপন্ন মলভাগ দ্বারা পুষ্টিলাভ করে। কণ্ঠপ্রদেশ, জিহ্বামূল, কর্ণমূল প্রভৃতি ইহার প্রধান স্থান। ঐ সকল স্থানের বিবিধ গ্রন্থি হইতে লালা নির্গত হইয়া মুখ গহ্বরে পতিত হয়। ইহা সৌম্য ধাতু বা শ্লেষ্মা। ইহারা শ্লেষ্ম জাতীয় হইলেও ইহাদের স্বরূপ, গুণ ও কর্ম্ম একরূপ নহে। অধিষ্ঠান ভেদে ইহারা বিভিন্ন গুণ ও প্রকৃতি লাভ করিয়া থাকে। যেমন কণ্ঠগত গ্রন্থির স্রাব ঘন এবং কর্ণমূলগত গ্রন্থির স্রাব ঠিক সেরূপ নহে। উহা তনুতর এবং অল্প পিচ্ছিল। পরিপাক কার্য্যে ইহারা মিলিত হইয়াই কার্য্য করে। সুতরাং ইহাদের আর পৃথক্ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব্বোক্তরূপে চর্ব্বিত দ্রব্য এই লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া পিচ্ছিল এবং কোমলতা প্রাপ্ত হইলে, জিহ্বা আহার্য্য দ্রব্যকে কণ্ঠনাড়ীর উপরিভাগে জিহ্বামূলে স্থাপন করে। কণ্ঠদেশের উপরিভাগ একটী মহাবিপজ্জনক স্থান। ইহার উর্দ্ধ দেশে নাসারন্ধ্র এবং সম্মুখভাগে শ্বাসনাড়ী। ভুক্ত দ্রব্যকে এই দুইটী মার্গ অতিক্রম করিয়া কণ্ঠনাড়ীতে উপস্থিত হইতে হইবে। কিন্তু ভগবানের এমনই কৌশল যে এই স্থানে ভুক্তদ্রব্য আসিবামাত্র যখনই জিহ্বা, কপোল এবং তালু একত্রিত হইয়া উহা কণ্ঠদেশে প্রেরণ করে ঠিক সেই

মুহূর্ত্তে কণ্ঠগত মাংসপেশী উপজিহ্বিকার সহিত কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া শ্বাসনাড়ীর উপর পতিত হয় এবং সেই মুহূর্ত্তেই উর্দ্ধভাগেও কোমল তালুর সহিত উর্দ্ধস্থিত উপজিহ্বিকা নাসারন্ধ্রের উপরে পতিত হয়। এবং ভুক্ত-দ্রব্য নিরাপদে কণ্ঠনাড়ীতে গড়াইয়া উপস্থিত হয়। অতঃপর ক্রমে অন্নবহা-নাড়ী দ্বারা আমাশয়ে প্রবেশ করে। জিহ্বা-মূল, তালু ও কণ্ঠপেশীর সংকোচনকালে প্রাণ-বায়ুতে যে বেগ উপস্থিত হয় তাহাও ভুক্ত দ্রব্যের আমাশয়ে গমনে সাহায্য করে। ভুক্ত-দ্রব্য যতক্ষণ জিহ্বামূলে অবস্থিতি করে ততক্ষণ মানবের ইচ্ছাধীন থাকে। কিন্তু কণ্ঠনাড়ীতে উপস্থিত হইলে আর মানবের ইচ্ছাধীন থাকে না। ভুক্তদ্রব্যের প্রেরণ ক্রিয়া জিহ্বা তালু ও কণ্ঠপেশীর ক্রিয়াধীন হইলেও ইহা অন্য কৌশলে সম্পাদিত হয়। ভুক্তদ্রব্য প্রেরণকালে রসনেন্দ্রিয় এই সংবাদ মনের নিকট উপস্থিত করে। অনন্তর উহা গ্রহণ করা উচিত কি না বিবেচনা করিবার জন্য মন উহা বুদ্ধির নিকট সমর্পণ করে। তৎপরে বুদ্ধি বিচারপূর্ব্বক গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য তাহা চৈতন্যের নিকট বিজ্ঞাপিত করে, এবং চৈতন্যময়ের ইচ্ছা দ্বারা অর্থাৎ যখন প্রেরণ করিবার জন্য চৈতন্যময় পুরুষ আদেশ করেন, ঠিক সেই সময় জিহ্বা, কণ্ঠপেশী ও তালু প্রভৃতির ক্রিয়া হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যগুলি নিমেষ অপেক্ষাও দ্রুত সম্পন্ন হয়। অনন্তর ভুক্ত-দ্রব্য কণ্ঠনাড়ীতে উপস্থিত হইলে প্রাণবায়ুর বেগে এবং কণ্ঠনাড়ী ও আমাশয়ের কুঞ্চনে ক্রমে আমাশয়ে উপস্থিত হয়।

যাহাতে অপক্ব ভুক্তদ্রব্য পরিপাকের জন্য অবস্থিতি করে তাহার নাম আমাশয় পাকস্থলী। ইহার উর্দ্ধাধোভাগ নলকাকৃতি এবং মধ্যভাগ একটী থলের মত। আমা-শয়ের তিনটী আবরণ আছে, বাহ্য, মধ্য ও আভ্যন্তর। মধ্য আবরণ মাংসপেশী দ্বারা নির্ম্মিত এবং কলাব্যাপ্ত। এই আবরণেই শিরা, স্নায়ু ধমনী এবং অসংখ্য গ্রন্থি স্রোত দৃষ্ট হয়। আভ্যন্তরভাগে শ্লৈষ্মিক আবরণ। ইহা জরায়ু নির্ম্মিত। ইহাতে যে সমস্ত শ্লেষ্মবাহিস্রোত দৃষ্ট হয় তাহারা উরঃ কণ্ঠপ্রদেশ হইতে সমাগত। আমাশয়ের উর্দ্ধভাগে অর্থাৎ নলকাকার প্রদেশের মধ্য-আবরণে বহু শ্লেষ্ম-গ্রন্থি দৃষ্ট হয়। ভুক্তদ্রব্য আমাশয়ে আসিবা-মাত্র এই সকল গ্রন্থি হইতেও লালার ন্যায় শ্লেষ্মা ক্ষরিত হয় এবং ক্রমে ভুক্তদ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হয়। ইহার নাম ঔদক শ্লেষ্মা। ঔদক শ্লেষ্মা স্বচ্ছ জলের ন্যায় মধুর, রস, পিচ্ছিল এবং শীতগুণযুক্ত। ইহাতেও ক্ষার জাতীয় আগ্নেয়াংশ দৃষ্ট হয়। ইহারা অনেকটা লালা সদৃশ। পূর্ব্বোক্ত লালা ও আমাশয়ের শ্লৈষ্মিক রসের সহিত মিলিত হইয়া ভুক্তদ্রব্য আমাশয়ে পরিপাক প্রাপ্ত হয়। ইহাই আমাশয়ের প্রথম পরিপাক ক্রিয়া। এই প্রথম পরিপাককালে আমাশয়ের ভুক্তদ্রব্যগুলি পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, যে উহারা অত্যন্ত পিচ্ছিল এবং ফেনযুক্ত হইয়াছে এবং আরও দেখা যাইবে যে মধুররস, লবণরস, শীতল, পিচ্ছিল দ্রব্য বা অংশগুলি সম্পূর্ণরূপে গলিয়া গিয়াছে এবং ঐ সকল দ্রব্য বা দ্রব্যের অংশ-গুলি মধুররসে (শর্করায়) পরিণত হইয়াছে। এবং কটুতিক্ত প্রভৃতি রসপ্রধান দ্রব্যগুলিও সম্পূর্ণ না হইলেও কিঞ্চিৎ মধুরতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ পরিপাককালে ভুক্তদ্রব্য-গুলি আমাশয়ের গাত্র ঘেঁসিয়া [illegible]

করিতে থাকে। একবার গ্রহণীর মুখ পর্য্যন্ত যায়, আবার ফিরিয়া আমাশয়ের মধ্যস্থলে আসে এবং আমাশয় আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হয়। ঠিক এই সময়েই আমাশয়ের নিম্ন গাত্র হইতে একপ্রকার রস ক্ষরিত হইয়া ভুক্ত-দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হয়। ইহা অম্লরস, এবং ঔদক শ্লেষ্মা অপেক্ষা অধিকতর আগ্নেয়। এই রস অত্যধিক অম্লযুক্ত হইলেও কিঞ্চিৎ লবণাক্ত বা লবণানুরস। এই রসের সহিত মিশ্রিত হইয়াই ভুক্তদ্রব্য ফেনযুক্ত হয়। এবং দেখা যায় যে ভুক্তদ্রব্যগুলি ক্রমে অম্লরস হইয়াছে। এই রসের সহিত মিশ্রিত হইলে ভুক্তদ্রব্য অধিকাংশই গলিয়া যায়। কিন্তু অতিশয় রুক্ষ ও কঠিন দ্রব্যগুলির এখানেও কোন পরিবর্ত্তন হয় না। স্নেহজাতীয় পদার্থের উপর ইহার বিশেষ কিছু ক্রিয়া প্রকাশ পায় না, তবে স্থূলাংশগুলি ভাঙ্গিয়া যাইতে দেখা যায়। এই সময় ভুক্তদ্রব্যগুলি অম্লরস হইলেও পূর্ব্বোক্ত মধুররসকে ইহারা নষ্ট করে না অর্থাৎ মধুররসের উপর ইহাদের কোন ক্রিয়া হয় না। এই সময় আমাশয়ের নিম্নমুখ—আমাশয় এবং গ্রহণী উভয়ের মধ্যস্থল সম্পূর্ণরূপে কুঞ্চিত থাকে, তজ্জন্যই ভুক্তদ্রব্য সহসা গ্রহণীতে প্রবেশ করিতে পারে না। ভুক্তদ্রব্যগুলি সম্পূর্ণরূপে গলিয়া গেলে গ্রহণীমুখ প্রসারিত হয়, তখন ক্রমে উহা গ্রহণীতে প্রবেশ করে।

গ্রহণী আমাশয়েরই একটী অংশ। আমাশয় যেমন একটী থলের মত, ইহা ঠিক সেরূপ নহে। ইহা দেখিতে কতকটা নলের আকৃতি। ইহা কিঞ্চিৎ বক্র হইয়া নাভিপার্শ্বে ক্ষুদ্রান্ত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার আভ্যন্তরভাগ পিত্তধরা কলাব্যাপ্ত। ইহা ভুক্তদ্রব্যের সমস্ত অংশকে সম্যক্‌রূপে পরিপক্ক না করিয়া পরিত্যাগ করে না। এইজন্য আমাশয়ের এই অংশটীর নাম গ্রহণী। এই গ্রহণী ও আমাশয়ের বাঁকে যকৃতের পিত্তকোষ হইতে একটী ধমনী আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এই ধমনী দ্বারা যকৃতের পিত্তকোষ হইতে পিত্ত আসিয়া গ্রহণীতে পতিত হয়। ইহা দেখিতে ঈষৎ তাম্র ও পীত। ইহার জলীয়াংশ অপনীত করিলে যে পীত তাম্রাভ অণু দৃষ্ট হয় তাহাই গ্রহণীস্থিত কলা গাত্রে সংলগ্ন থাকে। এই অণুগুলি আগ্নেয়। ইহাদের গাত্র হইতে অতি সূক্ষ্ম অনুদ্ভূতরূপ উষ্মা নির্গত হয়। সমান বায়ু এই উত্তাপ লইয়া গ্রহণী, আমাশয় ও পক্কাশয়ে বিচরণ করে। বায়বীয় পরমাণু অরূপ বলিয়া দৃষ্টিগোচর হয় না। এই গ্রহণী গাত্রস্থিত পিত্তে অম্ল অথবা কটু রস প্রয়োগ করিলে পিত্ত উত্তেজিত হয় এবং তৎকালে যকৃৎকোষ হইতে প্রচুর পরিমাণ পিত্ত নির্গত হইতে থাকে। সুতরাং অম্লরসযুক্ত ভুক্তদ্রব্য গ্রহণীতে প্রবেশ করিলে অধিকতর পিত্তস্রাব হইতে দেখা যায়, এবং এই পিত্তের সহিত ভুক্তদ্রব্য মিশ্রিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন করে। ধন্বন্তরি গ্রহণীকেই পিত্তের বা পাচকাগ্নির প্রধান স্থান বলিয়াছেন। মহর্ষি আত্রেয় বলেন—পিত্ত পাচকাগ্নি নহে, কায়োষ্মাই পাচকাগ্নি। এই দুই মতই সত্য, কারণ পিত্তে দ্রবভাগ ও তেজোভাগ দুইই আছে। উত্তাপ পিত্তেরই ধর্ম্ম। পিত্তাণু ব্যতীত শরীরের অন্য কোন অংশে উত্তাপ নাই। এই পিত্তাণু হইতে নির্গত তাপই সর্ব্বদেহব্যাপী। মহর্ষি আত্রেয় এই তাপকেই উষ্মা বলিয়াছেন। এবং ধন্বন্তরি ইহাকেই পিত্ত বা পাচকাগ্নি বলিয়াছেন।

এই পিত্ত দেহে নানা স্বরূপে অবস্থিতি করিয়া অগ্নিকার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। প্রথমতঃ যকৃতে সঞ্চিত হইলেও তথায় ইহার কোন কার্য্য দেখা যায় না। বিশেষতঃ যকৃতের পিত্ত গ্রহণী-স্থিত পিত্তের ন্যায় প্রবল আগ্নেয় নহে। উহাতে দ্রবভাগ অধিক থাকায় অগ্নিগুণ দুর্ব্বল থাকে। ইহার দ্রবাংশ মল-মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া যায়, এবং আগ্নেয়াংশ গ্রহণী গাত্রে লিপ্ত দেখা যায়। সুতরাং গ্রহণীস্থিত পিত্ত অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। এই পিত্তাণুগুলি পীত-তাম্র হইলেও ইহা দ্বারা অবস্থা বিশেষে নানারূপ বর্ণ প্রস্তুত হইতে দেখা যায়। নীল, হরিত, লোহিত, কৃষ্ণ, পীত প্রভৃতি বর্ণ এই পিত্ত হইতেই উদ্ভূত হয়। মানবপিত্তের সূক্ষ্ম অণুদকল অবিকৃত অবস্থায় কটুরস প্রধান। এই কটুরস পিত্তের সহিত মিলিত হইয়াই ভুক্তদ্রব্য অম্লরসের পরিবর্ত্তে ক্রমে কটুরস হইয়া যায়। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও দ্রব্য-গুলির স্বাভাবিক রসের কার্য্য নষ্ট হয় না। এই সময় গ্রহণীতে আর এক প্রকার রস আসিতে দেখা যায়। (ক্রমশঃ)

কবিরাজ শ্রীহরমোহন মজুমদার।

মন্থর-জ্বর বা মোতীজ্বর।

মন্থর-জ্বর সর্ব্বপ্রথমে মাড়বার দেশে প্রাদুর্ভূত হয়। প্রাচীনকালে এই রোগ ভারত-বর্ষে দৃষ্ট হয় নাই; কারণ চরক-সুশ্রুতাদি প্রাচীন গ্রন্থে এবং ভাবপ্রকাশ ও মাধব নিদা-নাদি সংগ্রহ পুস্তকেও এই ব্যাধির উল্লেখ নাই। মাড়বারীদিগের ভবনেই মন্থর-জ্বরাক্রান্ত রোগী অধিক সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই পীড়ার প্রকোপ প্রায়শঃ গ্রীষ্মকালেই হইয়া থাকে। আধুনিকগ্রন্থ "রোগ-সমুচ্চয়-দর্পণ" এবং "যোগরত্ন"প্রভৃতিতে ইহার উল্লেখ আছে। কথিত ব্যাধি সম্বন্ধে প্রোক্ত বৈদ্যকগ্রন্থের অভিমত এবং আমি বহুবর্ষ যাবৎ উক্ত রোগের চিকিৎসা করিয়া যাহা বুঝিয়াছি তাহাই লিখি-তেছি। এই মন্থর-জ্বরের নাম—মোতীঝুরী, মোতী-বালা, মধুরিক জ্বর ইত্যাদি। ইহা সাধারণ জ্বর নহে, ইহার আক্রমণে অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই জ্বর রাজ-পুতানায় প্রাদুর্ভূত হইয়া ক্রমশঃ অন্যান্য দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। অনুমান হয় যে, মন্থর-জ্বর ৩০০ শত বর্ষের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আবির্ভূত হয় নাই। অন্যথা—ভাবপ্রকাশে ইহার সন্নিবেশ দৃষ্ট হইত; কারণ ভাবপ্রকাশে পর্টুগীজদের আনীত ফিরঙ্গরোগের উল্লেখ আছে। এইরূপ জানিতে পারা গিয়াছে যে, কিছুদিন পূর্ব্বে মাড়বার দেশে বহুকাল যাবৎ অনাবৃষ্টি হওয়ায় গ্রীষ্মের আতিশয্য হয়; বিশে-ষতঃ রাজপুতানা অঞ্চলে জলের অল্পতা ও গ্রীষ্মের প্রাবল্য স্বাভাবিক; তাহার উপর আবার যদি অনাবৃষ্টি হয় তবে মরু সন্নিহিত দেশে বাস করা যে কত কঠিন তাহা সহজেই অনুমেয়। এই অবস্থায় তদ্দেশবাসি-জনগণের শরীরের পিত্ত অতিমাত্র প্রকুপিত হইয়া, রক্ত-ধাতুকে দূষিত করিয়া, সর্ষপ-সন্নিভ বা তদ-পেক্ষাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা সমূহ উৎপাদন করে। এই ব্যাধির আর একটী কারণ এই যে, জলের অল্পতা নিবন্ধন মাড়বারীগণ নিজ দেশে স্বচ্ছন্দে অবগাহন স্নান ও শরীর মার্জ্জন করিতে পারে না, তজ্জন্য শরীরে ধূলা ও স্বেদ

কর্দ্দমের মত হইয়া রোমকূপ সমূহ বন্ধ করিয়া ফেলে, তজ্জন্য যথারীতি স্বেদোদ্গম না হওয়ায় শারীরিক উষ্মা বহির্গত হইতে না পারিয়াও পিত্ত ও রক্তধাতুকে দূষিত করিয়া প্রোক্ত পীড়ার উৎপাদক হয়।

উক্ত জ্বরের পূর্ব্বরূপ—

* কাসারুচিস্তৃষা প্রলাপো দাহবান্ জ্বরঃ
অঙ্গানাং গৌরবং গ্লানিরস্থিভেদো বিনিদ্রতা
পূর্ব্বলিঙ্গন্তু সর্ব্বেষামিদং বৈদ্যৈরুদীরিতং॥

কাস, অরুচি, পিপাসা, প্রলাপ, দাহযুক্ত জ্বর, শরীরে গুরুতা, গ্লানি, অস্থিভেদ ও নিদ্রানাশ ঘটিয়া থাকে।

জ্বরের লক্ষণ ;—

জ্বরো দাহো ভ্রমো মোহো * অতিসারো বমিস্তৃষা
অনিদ্রা চ মুখং রক্তং তালু জিহ্বা চ শুষ্যতি
গ্রীবামধ্যেচ দৃশ্যন্তে স্ফোটকাঃ সর্ষপোপমাঃ
এতচ্চিহ্নং ভবেদ্ যত্র স মধুরক উচ্যতে॥

জ্বর, দাহ, ভ্রম, মোহ, অতিসার, বমি, অনিদ্রা, রক্তবর্ণতা এবং তালু ও জিহ্বার শুষ্কতা হইয়া থাকে; ইহা ভিন্ন গ্রীবামধ্যে সর্ষপাকৃতি স্ফোটক সমূহ দেখা যায়। চর্ম্মের উপর যেরূপ পীড়কা উৎপন্ন হয়, মুখাভ্যন্তরে জিহ্বায় এবং কণ্ঠনালীতেও তদ্রূপ স্ফোটক উৎপন্ন হইয়া থাকে; তজ্জন্য রোগী অন্ন বা রুটী প্রভৃতি পদার্থ চর্ব্বণ করিতে বা গিলিতে পারে না, দুগ্ধ ও মুদ্গাদিযূষ অক্লেশে পান করিতে পারে। ইহাতে জ্বর প্রায়শঃ ৩ হইতে ৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত হইয়া থাকে; অধিকন্তু কাস, শরীর বেদনা এবং ওষ্ঠে ক্ষত উৎপন্ন হয়, অনেক সময় জ্বর বিচ্ছেদ হয় না, কখন কখন সকালে বা সন্ধ্যাকালে জ্বরের লঘুতা হয় মাত্র; রোগী অনেক সময় ক্রন্দন করিয়া থাকে। কোন কোন রোগী মধুরিকায় বহু দিবস যাবৎ অভিভূত থাকে; তখন এই মধুরিকা জীর্ণজ্বরে পরিণত হয়।

রক্তদুষ্টি হইতে যেরূপ মসূরিকার উৎপত্তি হয় মধুরিকাও তদ্রূপ শোণিত বিকার জন্য; সুতরাং ইহাকে মসূরিকার অন্তর্গত মনে করিলেও অসঙ্গত হয় না। ইহাতে কোন কোন রোগীর জ্বরের প্রথমাবস্থায় দাস্ত হয়, আবার কাহারও কাহারও জ্বরের শেষ সময়ে ভেদ হইয়া থাকে। রোগীর গলদেশ হইতে জঙ্ঘা পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানে মুক্তাসদৃশ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কাসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে কণ্ডু বিদ্যমান থাকে।

মন্থর-জ্বর-রোগীর চিকিৎসা মসূরিকার ন্যায়। ইহাতে অনেক বৈদ্য ঔষধ প্রয়োগ করেন না। এই মসূরিকা সংক্রামক ব্যাধি।

এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত; আতুরগৃহ প্রবলবায়ু-বিরহিত অথচ আলোকসম্পন্ন ও অসঙ্কীর্ণ হওয়াই সঙ্গত। অতিশয় শীতোপচার বা অত্যন্ত উষ্ণক্রিয়া রোগীর পক্ষে হিতসাধনী হয় না। রজস্বলা স্ত্রীলোক বা অশুচি অবস্থায় কেহ যেন রোগীর গৃহে প্রবেশ না করে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। ইহাতে পিত্তের প্রাবল্য থাকিলেও দোষের তারতম্য অনুসারে ইহাকে সান্নিপাতিক ব্যাধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে দোষ হয় অসঙ্গত হইবে না। মধুরিকার উগ্র স্ফোটক

---

* অর্ব্বাচীন গ্রন্থ যোগরত্নাদিতে এই পাঠ আছে কিন্তু "জ্বরো দাহোঽতীসারশ্চ ভ্রমোমোহস্তৃষা বমিঃ" পাঠে,কোন দোষ হয় না।

গুলি মুক্তার ন্যায় সমুজ্জ্বল, পীড়কাসকল শ্বেত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ হয়, এজন্য ইহাকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

অনেক রোগী কেবল লঙ্ঘনে থাকিয়া, একটু গরম জল পান করিয়াই আরোগ্য লাভ করে; ইহাতে ১৭ হইতে ৩৭ দিন মধ্যে দোষের পরিপাক হয়। দোষ-দুষ্টির তারতম্যানুসারে প্রোক্ত সময়ের ইতর বিশেষও হইয়া থাকে।

শ্রীসারদাচরণ সেন কবিরত্ন।

সূতিকাগার ও প্রসূতিচর্য্যা।

সংসারক্ষেত্রে যে স্থানটিতে মানব-জীবন-সূর্য্য উদিত হয়, পৃথিবীর মধ্যে যে গৃহ মানবের প্রথম পরিচিত, যে গৃহতল মানবকে প্রথম আশ্রয় দান করে, সেই আদি আশ্রয়ভূমি সূতিকা-গৃহের স্বাস্থ্যকরত্বের প্রতি আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন।

এতদ্দেশের সূতিকা-গৃহ যেরূপ স্থানে, যেরূপ উপাদানে যেরূপ সঙ্কীর্ণভাবে নির্ম্মিত হয়, তাহা যে অতীব নিন্দনীয় ও অস্বাস্থ্যকর সেই কথা আজ আমরা পাঠকপাঠিকাগণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। সহরের কথা ছাড়িয়া প্রথমতঃ পল্লীগ্রামের কথাই বলিতেছি। বাটীর প্রাঙ্গণের মধ্যে অতি অপ্রশস্তরূপে অধিকাংশ স্থলেই একখানি চালের দ্বারা অর্দ্ধ গৃহ নির্ম্মিত হয়। কোন স্থানে সুপারিপত্র, তালপত্র, স্থলবিশেষে উলুখড় দ্বারা তাহার উপরের আবরণ (ছাউনী) দেওয়া হয়। বর্ষাকালে বরুণদেবের কৃপা হইলে সদ্যোজাত শিশু-সন্তানটিকে বুকে লইয়া স্বীয় মস্তক রক্ষা করিবার জন্য প্রসূতিকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। গৃহের চতুর্দ্দিকে যে বেড়া দেওয়া হয় তাহাও অতি জঘন্য। বাটীর যে সমস্ত চাটাই, মাদুর, হোগলা অব্যবহার্য্য ও পরিত্যাজ্য তৎসমুদায় দ্বারাই গৃহের চতুর্দ্দিকে আবরণ দেওয়া হইয়া থাকে। উহা রৌদ্র, বৃষ্টি হিম নিবারণের পক্ষে যে কতদূর সাহায্য করে তাহা সহজেই অনুমেয়। গৃহভিত্তি প্রায় উচ্চ করা হয় না, যদিও কোন কোন স্থানে করা হয় তাহাও ৫ ইঞ্চি ঊর্দ্ধ নহে। ইহার ফল এই যে, বর্ষাকালে প্রাঙ্গণের জল শোষণ করিয়া ভিত্তি নিরন্তর আর্দ্র অবস্থায় থাকে। এইরূপ আর্দ্র-ভূমিতে ১খানি চাটাই বা মাদুরমাত্র শয্যাধার নির্দ্দিষ্ট হয়, শয্যাটী আবার বাটীর অব্যবহার্য্য, ছিন্ন, মলিন, পরিত্যক্ত বসনাদি দ্বারা রচিত হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ সূতিকা-গৃহের আয়তন এতদূর সংকীর্ণ হইয়া থাকে যে, তাহাতে পাদবিস্তার করিয়া শয়ন করা প্রসূতির পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়। এই প্রকার অস্বাস্থ্যকর সূতিকাগারে প্রসূতি, সদ্যোজাত শিশুটীকে ক্রোড়ে করিয়া ১০ দিন বা এক মাস পর্য্যন্ত অতি কষ্টে কখন অর্দ্ধশায়িতভাবে কখন বা উপবেশন করিয়া দিবা-যামিনী অতিবাহিত করেন। এইরূপ গৃহে বাস করিয়া প্রসূতি ও সন্তান যে সর্দ্দি, কাসি, জ্বর প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইবে ইহা আর বিচিত্র কি? সূতিকা-গৃহে সদ্যোজাত শিশুর দেহে যে রোগের বীজ অঙ্কুরিত হয়, ঐ বীজ কালক্রমে পরিপুষ্ট হইয়া মহৎ অনিষ্টসাধন করে। কচিৎ চিরজীবনের জন্য শিশুকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে। প্রসূতি ও সূতিকা-রোগগ্রস্ত হইয়া রুগ্ন

শয্যায় শায়িতা থাকেন, কোন কোন স্থলে বা ইহজীবনের লীলা শেষ করিয়া শিশুটীর জীবনও সংশয়াপন্ন করেন।

ফল প্রত্যাশায় বৃক্ষের বীজ বপন করিয়া যদি তাহাতে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্তরূপ বারি সিঞ্চন করা না হয়, যদি তাহাতে সূর্য্যের কিরণ স্পর্শ না করে, তাহা হইলে সে বীজ যেমন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়, কিম্বা অঙ্কুরিত হইলেও যেমন পুষ্টিলাভ করিতে পারে না, তদ্রূপ সূতিকা-গৃহে যখন সন্তান ভূমিষ্ট হয় তৎকালে তাহার স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না রাখিলে, সে সন্তান জীবনে কখনও স্বাস্থ্যবান্ ও দীর্ঘায়ু হইতে পারে না। যে সূতিকা-গৃহ আমাদিগের ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান স্বাস্থ্যের নিদানভূত, সেই সূতিকা-গৃহ সংস্কারের উপরই জাতীয় জীবনের উন্নতি যে সর্ব্বথা নির্ভর করিতেছে একথা বোধ হয় পাঠক হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন।

যে সময় আমরা পৃথিবীর সহিত প্রথম পরিচিত হই, সেই সময় আমাদিগের আশ্রয় শয্যা পরিত্যক্ত চাটাই, মাদুর হোগলা বা চাঁচ, আর যখন আমরা ভবলীলা শেষ করিয়া লোকান্তরে আশ্রয় লইতে যাই, তৎকালে মৃতদেহের জন্য খাট, পালঙ্গ, লেপ তোষকের ব্যবস্থা। ইহা অপেক্ষা পরিতাপ ও মূর্খতার বিষয় আর কি হইতে পারে। অবশ্য দরিদ্র-দিগের জন্য ঐরূপ ব্যবস্থা হয় না বটে কিন্তু যাহাদিগের জন্য হইয়া থাকে, তাহাদিগের সূতিকাগার বাটীর ভিতর যেখানি নিকৃষ্ট গৃহ তাহাই নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে সূতিকাগার নির্ম্মাণ ও প্রসূতির সুখজনক দ্রব্যাদি রক্ষার এইরূপ ব্যবস্থা আছে—

ঋষি সুশ্রুত বলিতেছেন—সূতিকাগার ৮ হাত দীর্ঘ ৪ হাত প্রস্থ, পূর্ব্ব বা দক্ষিণ দ্বারবিশিষ্ট এবং গৃহভিত্তি সুলিপ্ত হইবে। ইহাতে পর্য্যঙ্ক (খাট), রক্ষাকর ও মঙ্গলজনক দ্রব্য থাকিবে।

ঋষি চরক বলিতেছেন—নবম মাসের পূর্ব্বেই সূতিকা-গৃহ নির্ম্মাণ করিবে। যেস্থানে সূতিকাগার নির্ম্মাণ করিবে সেই স্থানটি যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়। তাহাতে যেন অস্থি, বালুকা, খোলার কুচি প্রভৃতি না থাকে, গৃহের ভূমি যেন প্রশস্ত রূপ, রস, গন্ধবিশিষ্ট হয়, অগ্নি রক্ষার্থে আম্র, বিল্ব, গাব, ইঙ্গুদী, বরুণ বা খদির কাষ্ঠের প্রচুর আয়োজন রাখিবে। পর্য্যঙ্ক, বসন, আলেপন, আচ্ছাদন, পিধান, মল মূত্রাদি পরিত্যাগের স্থান, উনন, ঘৃত, তৈল, মধু, সৈন্ধব, জল এবং প্রসূতির পক্ষে যে সমস্ত দ্রব্য সুখকর ও আবশ্যকীয় তৎসমুদয় রক্ষা করিবে। (চরকশারীর ৮ম)

সূতিকাগার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সুপ্রশস্ত, স্বাস্থ্যপ্রদ ও প্রসূতির আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সমন্বিত হইবে ইহাই আচার্য্যগণের মত। কিন্তু আমাদিগের বর্ত্তমান সময়ে সূতিকাগার নির্ম্মাণ ও নির্ব্বাচন যেন একটি বাজে কাজের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে।

জীবনের প্রথম আশ্রয় স্থান, স্বাস্থ্যরক্ষার প্রথম সূত্রপাত যে গৃহে, তৎপ্রতি আমাদিগের পূর্ণ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যাঁহাদিগের পাকা বাড়ী ঘর আছে তাঁহারা যেন বাটীর মধ্যে একখানি পরিষ্কৃত, পরিচ্ছন্ন, খট্‌খটে, উপযুক্ত দরজা জানালাবিশিষ্ট সুপ্রশস্ত গৃহ সূতিকাগাররূপে নির্ব্বাচন করেন। দ্বিতল বা ত্রিতল হইলে তাহাতে খাটের আবশ্যক করেনা কিন্তু নিম্নের ঘর হইলে তাহাতে খাটের ব্যবস্থা করা সঙ্গত ও অত্যাবশ্যক।

যাঁহাদিগের কাঁচা-বাড়ী ঘর, তাঁহাদিগের যথাসাধ্য যত্নপূর্ব্বক সূতিকা গৃহ নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য। গৃহভিত্তি ন্যূন পক্ষে দ্বিহস্ত পরিমিত উচ্চ এবং শুষ্ক হওয়া উচিত, সুবিধা হইলে উহাতে একখানি খাটের ব্যবস্থা রাখিবেন। পরিষ্কৃত-পরিচ্ছন্ন-সুকোমল শয্যা, ঋতু অনুযায়ী আবশ্যকীয় গাত্রাবরণ প্রদান করিবেন।

সূতিকা গৃহের চাল বেড়া, রৌদ্র, বৃষ্টি, হিম হইতে শিশু ও প্রসূতিকে সুরক্ষিত করিবার উপযুক্ত হওয়া আবশ্যক, অথচ আলো, বাতাস প্রবেশের পক্ষে বিঘ্ন না জন্মে তৎপ্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। **অগ্নিরক্ষা** সূতিকাগারের একটী প্রধান ও অত্যাবশ্যক কার্য্য। বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ নব্য শিক্ষিত বাবু ভায়াদিগের বাটীতে সূতিকাগারে অগ্নিরক্ষার ব্যবস্থা, স্বেদ, তাপ প্রভৃতি প্রাচীন-প্রথা প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে।

প্রসবান্তে প্রসূতিকে স্বেদ-তাপ দেওয়া যে তৎকালিক ও ভবিষ্যত স্বাস্থ্যরক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়, ইহা বলাই বাহুল্য। প্রসবান্তে রক্ত হীনতা প্রযুক্ত কফ ধাতু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এই সময় উষ্ণ ক্রিয়া দ্বারা কফের হ্রাস পায় এবং শরীর সুস্থ ও সবল হয়।

আমরা বিশেষরূপ অবগত আছি প্রসবান্তে যে সকল প্রসূতিকে উপযুক্ত স্বেদ তাপ দেওয়া হয়না, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই ভবিষ্যতে সর্দ্দি, কাসি, মস্তকে গুরুভার বোধ, হস্তপদে বেদনা প্রভৃতি নানাবিধ বাতশ্লৈষ্মিক পীড়ায় কষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন। এমন কি কোন কোন স্থলে বাতরোগাক্রান্তা হইতেও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

প্রসঙ্গ ক্রমে আমরা আর একটী কথার উল্লেখ প্রয়োজন মনে করি, কোন কোন স্থলে আমরা "হরিবোলার ব্যবস্থা দেখিতে পাই— এই প্রথায়, প্রসবান্তে, প্রসবের পরবর্ত্তী সমস্ত নিয়ম বর্জ্জন করিয়া প্রসূতিকে ও সদ্যোজাত বালককে ইচ্ছানুসারে স্নান আহারাদি প্রদান করা হয়। কিন্তু এ নিয়ম আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এ প্রথা পূর্ব্বে এদেশে কখনও ছিল না। ইহা বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবার সময় হইতেই হইয়াছে। স্থল বিশেষে কোন কোন স্থানে বিশেষ অনিষ্ট হয় না সত্য, কিন্তু কোন কোন স্থলে ইহার বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। এই প্রথা যে প্রসূতি ও সদ্যোজাত বালক উভয়েরই পক্ষে হিতকর নহে, ইহা আমরা অবশ্য বলিব।

অগ্নিরক্ষা—সূতিকাগৃহে একটী অনতি-গভীর গর্ত্ত করিবে, তন্মধ্যে শুষ্ক কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নি প্রজ্জলিত রাখিবে,* লতা পত্র সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা কখনও অগ্নি প্রজ্জলিত করিবে না, কারণ লতা-পত্রের সহিত কোন প্রকার বিষাক্ত দ্রব্য থাকিতে পারে ঐ বিষাক্ত দ্রব্যের ধূম নির্গত হইয়া প্রসূতি ও সন্তানের অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে। আম, তেঁতুল, গাব, সুন্দর, বেল প্রভৃতি অতি শুষ্ক কাষ্ঠের অগ্নি জ্বালিবে। কাষ্ঠবিশেষ শুষ্ক না হইলে অগ্নিকুণ্ড হইতে ধূম নির্গত হইয়া সদ্যোজাত সন্তানের ও প্রসূতির শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার বিঘ্ন সম্পাদন করিতে পারে।

দিবানিশি ঐ নির্ধূম অগ্নি সূতিকাগারে সাবধানের সহিত রক্ষা করিবে। এবং তদ্দ্বারা প্রসূতিকে সকাল ও সন্ধ্যায় স্বেদ প্রদান করিবে।

* অধিষ্ঠানে চাগ্নিং প্রজ্বালয়েৎ।
(সুশ্রুত—শারীর ১০ অঃ)

সূতিকাগারে কখনও কেরোসিন তৈলের আলো রাখিবে না, উহার ধূম অতীব অনিষ্টকারী। নিদ্রিতাবস্থায় রুদ্ধ গৃহ কেরোসিন তৈলের ধূম ব্যাপ্ত হইলে, মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে।

অতঃপর আমরা প্রসূতির পথ্যসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

প্রসবের পর প্রসূতিকে শীতল বস্তু—এমন কি শীতল জল পর্য্যন্ত পান করিতে দিবে না। ঈষদুষ্ণজল পান করিতে দিবে। প্রথমে দুই একদিন চিড়াভাজা উত্তম গব্যঘৃত ও গোলমরিচ চূর্ণ যোগে প্রসূতি সেবন করিবে। অনেক প্রসূতির প্রসবের পর দুষ্টরক্ত রীতিমত স্রাব না হওয়ায়, উদরে অত্যন্ত বেদনা হয়, কিন্তু প্রসবের পর প্রসূতিকে পিপুল, পিপুলমূল, চক্রি, চিতামূল, ও শুঁঠ সমভাগে চূর্ণ করিয়া এই চূর্ণ সিকিভরি পরিমাণ লইয়া একছটাক গরম জলে মিশাইয়া উহার সহিত সিকিভরি আকের গুড় দিয়া প্রথমতঃ প্রসবের পর ৩।৪ দিন সেবন করাইলে আর এরূপ বেদনা জন্মিতে পারিবে না। এবং দুষ্টরক্তও নিঃশেষিত রূপে নির্গত হইয়া যাইবে। ইহাকে "ঝাল খাওয়া" বলে। পল্লীগ্রামে এখনও ইহা প্রচলিত আছে। প্রসবের পর রক্তস্রাব জন্য কোন কোন প্রসূতির অত্যন্ত পিপাসা হইয়া থাকে, এ-অবস্থায় ঈষদুষ্ণ জল অল্প অল্প পান করা উচিত। কয়েক দিনের পর প্রসূতিকে পুরাণ সরু চালের ভাত, ভাজা তরকারী উত্তম গব্য ঘৃত ও গোলমরিচ চূর্ণসহ সেবন করিতে দিবে। ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তি প্রবল থাকিলে মোহনভোগ ও লুচি অপথ্য নহে। কিন্তু প্রসূতি সর্ব্বদা আহারের মাত্রার প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন—অপরিমিত ভোজন সর্ব্বথা অহিত কর। প্রতিদিন প্রসূতি ও শিশু রীতিমত তৈল মর্দ্দন পূর্ব্বক স্বেদ গ্রহণ করিবে। ভাবমিশ্র বলিয়াছেন—

"প্রসূতি হিতমাহারং বিহারঞ্চ সমাচরেৎ॥
ব্যায়ামং মৈথুনং ক্রোধং শীতসেবং বিবর্জ্জয়েৎ।
সর্ব্বতঃ পরিশুদ্ধা স্যাৎ স্নিগ্ধপথ্যাল্প-ভোজনা।
স্বেদাভ্যঙ্গপরা নিত্যং ভবেন্মাস-মতন্দ্রিতা।

প্রসূতি হিতকর আহার-বিহার পরিমিতরূপ সেবন করিবে। উচ্চনীচ স্থানে গমনাগমন, সিঁড়িতে উঠানামা শ্রমজনক কার্য্য, স্বামিসহবাস, ক্রোধ, ঠাণ্ডা হাওয়া লাগান, ঠাণ্ডা জিনিষ খাওয়া ত্যাগ করিবে। এই সকল নিষেধ না মানিলে সূতিকা রোগ জন্মে। একমাস পর্য্যন্ত নিত্য তৈল মর্দ্দন ও সেঁক লওয়া উচিত।

"প্রসূতা সার্দ্ধমাসান্তে দৃষ্টে বা পুনরার্ত্তবে
সূতিকানামহীনা স্যাদিতি ধন্বন্তরে র্মতম্।
ব্যুপদ্রবাং বিশুদ্ধাঞ্চ বিজ্ঞায় বরবর্ণিনীম্।
ঊর্দ্ধং চতুর্ভ্যো মাসেভ্যো নিয়মং পরিহারয়েৎ।

প্রসবের পর দেড়মাস কিম্বা যতদিন পুনর্ব্বার ঋতুদর্শন না হয় ততদিন প্রসূতি সূতিকানামে অভিহিত হয়। প্রসূতি পূর্ব্বোক্ত মৈথুন বর্জ্জনাদি নিয়ম চারিমাস পালন করিয়া সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ-দেহা হইলে, চারিমাসের পর তাহাকে নিয়ম বর্জ্জন করিতে উপদেশ দিবে।

আমরা প্রবন্ধ শেষ করিলাম। যদি আমাদের দেশের নারিগণ প্রসবের পর, আয়ুর্ব্বেদ বিহিত উপরি লিখিত নিয়মগুলি দৃঢ়তার সহিত পালন করেন, তাহা হইলে আধুনিক স্ত্রী-রোগ-চিকিৎসকগণের কার্য্য অনেক লঘু হইয়া আসিবে এবং ভারত আবার সুস্থ, বলিষ্ঠ, দীর্ঘায়ু, মেধাবী ও ধার্ম্মিক সন্তানসন্ততি লাভ করিয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিবে।

কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন।

নিখিল ভারতবর্ষীয় বৈদ্য-সম্মেলনে

সভাপতির অভিভাষণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এক্ষণে আমরা আয়ুর্ব্বেদের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব।

শস্ত্রচিকিৎসায় আয়ুর্ব্বেদ যে চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র যে এ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের নিকট বিশেষ ঋণী তাহা পাশ্চাত্য মনস্বিগণও স্পষ্টরূপে স্বীকার করিয়া থাকেন। অধুনা যে সকল তথ্য পাশ্চাত্য-চিকিৎসাবিজ্ঞান নবাবিষ্কার বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহার অধিকাংশই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে। আধুনিক শস্ত্র-চিকিৎসা বহু প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় শস্ত্র-চিকিৎসা অপেক্ষা কি পরিমাণে উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা বিশেষ বিবেচ্য। এক্ষণে জনসাধারণের মনে এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, পাশ্চাত্য শস্ত্র-প্রয়োগ বিজ্ঞান তদ্দেশীয়গণই এদেশে আনয়ন করিয়াছেন। অধুনা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ যখন আর শস্ত্রকর্ম্ম-কুশল নহেন, তখন এই ধারণা নিতান্ত দোষাবহ নহে। কিন্তু শল্যতন্ত্র প্রধান সুশ্রুত গ্রন্থের প্রথমেই লিখিত হইয়াছে :—

তত্র শল্যং নাম বিবিধ তৃণকাষ্ঠপাষাণ-পাংশুলোহলোষ্ট্রাস্থি-বাল-নখ-পূষা,স্রাবান্ত-গর্ভ-শল্যোদ্ধারণার্থং যন্ত্রশস্ত্রক্ষারাগ্নিপ্রণিধান-ব্রণ-বিনিশ্চয়ার্থঞ্চ। সু, সূত্র, ১ অঃ।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের মধ্যে শল্য তন্ত্রকেই প্রধান বলা হইয়াছে। যথা—

অষ্টাস্বপি চায়ুর্ব্বেদতন্ত্রেষেতদেবাধিকমভিমতমাশুক্রিয়াকরণাদ্যন্ত্রশস্ত্রক্ষারাগ্নিপ্রণিধানাৎ-সর্ব্বকর্ম্মসামান্যাচ্চ। সু, সূত্র, ১ অঃ।

শস্ত্র কর্ম্মের আশু ফলবত্তার ইহার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক।

শস্ত্র কর্ম্ম অষ্ট প্রকার বলিয়া কথিত আছে। যথা—

তচ্চ শস্ত্রকর্ম্মাষ্টবিধং। তদ্যথা। ছেদ্যংভেদ্যং-লেখ্যংবেধ্যমাহার্য্যং বিস্রাব্যং সীব্যমিতি।

সু, সূত্র, ৫ অঃ।

শস্ত্র বিংশতি প্রকার। যথা—

বিংশতি শস্ত্রাণি। তদ্যথা মণ্ডলাগ্রকর-পত্রবৃদ্ধি-পত্রনখশস্ত্র-মুদ্রিকোৎপলপত্রকার্দ্ধধার-সূচী-কুশ-পত্রাটীমুখ-শরারিমুখান্তর্মুখত্রিকুর্চ্চক কুঠারিকা-ব্রীহি-মুখারাবেতস-পত্রকবড়িশ-দন্ত-শঙ্কেষণ্য ইতি।

সু, সূত্র, ৮ অঃ।

এই সকল শস্ত্র সূক্ষ্মধারযুক্ত এবং ইহাদিগের দ্বারা পূর্ব্বকথিত আট প্রকার শস্ত্রকর্ম্ম সম্পাদিত হইয়া থাকে। যথা—

মণ্ডলাগ্রং ফলে তেষাং তর্জ্জন্যন্ত নখাকৃতি।
লেখনে ছেদনে যোজ্যং পোথকী শুণ্ডিকাদিষু ॥
বৃদ্ধিপত্রং ক্ষুরাকারং ছেদভেদনপাটনে।
মাংসপ্রবুদ্ধতে শোফে গম্ভীরে চ তদন্যথা ॥
ছেদেহস্থ্নাং করপত্রন্তু খরধারং দশাঙ্গুলম্।
বিস্তারে দ্ব্যঙ্গুলং সূক্ষ্মদন্তং সুৎসরুবর্দ্ধনম্ ॥

ইত্যাদয়ঃ অষ্টাঙ্গহৃদয়ে সূত্রস্থানে ষড়-বিংশতিতম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্যানি।

শস্ত্র সম্পৎ সম্বন্ধে লিখিত আছেঃ—

তানি সুগ্রহাণি সুলোহানি সুধারাণি সুরূপাণি সুসমাহিত মুখাগ্রাণ্যকরালানি চেতি শস্ত্র-সম্পৎ। তত্র বক্রং কুণ্ঠং খণ্ডং খরধার-

মতিস্থূল মত্যল্পমতিদীর্ঘমতিহ্রস্বমিত্যষ্টৌ শস্ত্র-দোষাঃ। অতো বিপরীত গুণমাদদীতান্যত্র-করপত্রাৎ। তদ্ধি খরধারমস্থিচ্ছেদনার্থং। তত্র। ধারাভেদনানাং মাসূরী। লেখনানামর্দ্ধ-মাসূরী। বিস্রাবণানাঞ্চ কৈশিকী। ছেদনা-নামর্দ্ধ-কৈশিকীতি। তেষাং পায়না স্ত্রিবিধাঃ ক্ষারোদক তৈলেষু। তত্র ক্ষারপায়িতং শরশল্যাস্থিচ্ছেদনে। উদকপায়িতং মাংস-চ্ছেদনভেদনপাটনেষু। তৈলপায়িতং শিরা-ব্যধনস্নায়ুচ্ছেদনেষু॥ তেষাং নিশানার্থং শ্লক্ষ শিলা মাষবর্ণা। ধারা সংস্থাপনার্থং শাল্মলী-ফলকমিতি॥

ভবতি চাত্র :—

যদা সুনিশিতং শস্ত্রং রোমচ্ছেদি সুসংস্থিতং।
সুগৃহীতং প্রমাণেন তদা কর্ম্মসু যোজয়েৎ॥

সু, সূত্র, ৮ অঃ।

যন্ত্র সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

যন্ত্রশতমেকোত্তর মত্রহস্তমেবপ্রধানতমং যন্ত্রা ণামবগচ্ছ। কিং কারণং। যস্মাদ্ধস্তাদৃতে যন্ত্রাণামপ্রবৃত্তিরেব তদধীনত্বাদ্ যন্ত্রকর্ম্মণাং। তত্রমনঃশরীরাবাধকরাণি শল্যানি তেষামাহ-রণোপায়ো যন্ত্রাণি। তানি ষট্প্রকারাণি। তদ্ যথা স্বস্তিকযন্ত্রাণি, সন্দংশযন্ত্রাণি, তালযন্ত্রাণি, নাড়ীযন্ত্রাণি, শলাকা যন্ত্রাণি, উপযন্ত্রাণি চেতি॥ তত্র চতুর্ব্বিংশতিঃ স্বস্তিক-যন্ত্রাণি। দ্বে সন্দংশ-যন্ত্রে। দ্বে এব তালযন্ত্রে। বিংশতির্নাড্যঃ। অষ্টাবিংশতিঃ শলাকাঃ। পঞ্চবিংশতিরুপযন্ত্রাণি। তানি প্রায়শো লৌহানি ভবন্তি। তৎপ্রতিরূপকাণি বা তদলাভে। তত্র নানাপ্রকারাণাং ব্যালানাং-মৃগপক্ষিণাং-মুখৈর্ম্মুখানি যন্ত্রাণাং প্রায়শঃ সদৃশানি। তস্মা-ত্তৎসারূপ্যাদাগমাদুপদেশাদন্যযন্ত্রদর্শনাদ্যুক্তিতশ্চ কারয়েৎ॥ সু, সূত্র, ৭ অঃ।

শস্ত্র সম্বন্ধে উপদেশ দিবার পর শাস্ত্রকার বলিয়াছেন যে আবশ্যক মত যন্ত্র যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত করিয়া লইবে। ইহাতে স্থলবিশেষে নূতন যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া লইবার উপদেশ স্পষ্ট জানা যায়।

শস্ত্রকর্ম্ম শিক্ষা সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে :—

অধিগত-সর্ব্বশাস্ত্রার্থমপি, শিষ্যম্ যোগ্যা-স্কারয়েৎ। ছেদ্যাদিষু স্নেহাদিষু কর্ম্মপথ-মুপদিশেৎ। সুবহুশ্রুতোঽপ্যকৃতযোগ্যঃ কর্ম্মস্ব-যোগ্যো ভবতি॥

ইহার পর ছেদ্যাদি ক্রিয়া কি করিয়া শিক্ষা করিতে হয় সে সম্বন্ধে বিস্তারিত উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

শস্ত্রচিকিৎসকের গুণ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে —

শৌর্য্য মাশু-ক্রিয়া শস্ত্রতৈক্ষ্ম্যমস্বেদ-বেপথু।
অসম্মোহশ্চ বৈদ্যস্য শস্ত্র-কর্ম্মণি শস্যতে॥

সু, সূত্র, ৫ অঃ।

শস্ত্র চিকিৎসকের দোষ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

হীনাতিরিক্তং তির্য্যক্ চ গাত্রচ্ছেদন মাত্মনঃ।
এতাশ্চতস্রোঽষ্টবিধে কর্ম্মণি ব্যাপদঃ স্মৃতাঃ।
অজ্ঞানলোভহিতবাক্যযোগ
ভয়প্রমোহৈরপরৈশ্চভাবৈঃ।
যদা প্রযুঞ্জীত ভিষক্ কুশস্ত্রং তদা
সশেষান্ কুরুতে বিকারান্।
তৎক্ষার-শস্ত্রাগ্নিভিরৌষধৈশ্চ
ভূয়োঽভিযুঞ্জানমযুক্তি-যুক্তং।
জিজীবিষুর্দূরত এব বৈদ্যং
বিবর্জ্জয়েদুগ্র-বিষাগ্নি-তুল্যং।

রোগীর প্রতি চিকিৎসকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

তস্মাপুত্রবদেবৈনং পালয়েদাতুরম্ ভিষক্।

সু, সূত্র, ২৫ অঃ।

শস্ত্র কর্ম্মের ত্রৈবিধ্য সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—

ত্রিবিধং কর্ম্ম। পূর্ব্বকর্ম্ম প্রধান-
কর্ম্ম পশ্চাৎকর্ম্মেতি।

পূর্ব্বকর্ম্ম অর্থে শস্ত্রচিকিৎসার পূর্ব্বে রোগীকে বিরেচনাদি দ্বারা শুদ্ধ করিয়া লওয়া, প্রধান কর্ম্ম শস্ত্রোপচার এবং পশ্চাৎ কর্ম্ম অর্থে কৃতশস্ত্রকর্ম্ম দুর্ব্বল রোগীকে সুস্থ ও সবল করা।

শস্ত্রকার্য্যের পূর্ব্বে আহরণীয় উপকরণ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

অতোঽন্যতমং কর্ম্ম চিকীর্ষতা বৈদ্যেন পূর্ব্বমেবোপকল্পয়িতব্যানি তদ্যথা যন্ত্রশস্ত্রক্ষারাগ্নি শলাকা-শৃঙ্গ-জলৌকালা-বুজাম্ববৌষ্ঠ-পিচুপ্রোত-সূত্রপত্রপট্টমধুঘৃতবসাপয়স্তৈলতর্পণযাকয়ালেপন-কল্কব্যজনশীতোষ্ণোদককটাহাদীনি পরিকর্ম্মিণশ্চ স্নিগ্ধাঃ স্থিরাঃ বলবন্তঃ।

শস্ত্রপ্রয়োগ কালে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ যে ক্ষেত্রে ক্লোরোফর্ম (chloroform) ব্যবহার করিয়া থাকেন, আয়ুর্ব্বেদে সেই সকল ক্ষেত্রে রোগীকে মদ্য পান করাইয়া অচেতন করা হইত।

প্রমাণ যথা :—

প্রাক্ শস্ত্রকর্ম্মণশ্চেষ্টং ভোজয়েদাতুরং ভিষক্।
মদ্যপং পায়য়েন্মদ্যং তীক্ষ্ণং যো বেদনাসহঃ॥
ন মূর্চ্ছত্যন্নসংযোগান্মত্তঃ শস্ত্রং ন বুধ্যতে।

সু, সূত্রঃ ১৭ অঃ।

ক্লোরোফর্ম এবং মদ্য, রসায়নশাস্ত্র মতে একজাতীয় পদার্থ। মদ্যের ন্যায় ক্লোরোফর্ম পান করিলে মত্ততা জন্মে। প্রভেদ এই যে ক্লোরোফর্ম আঘ্রাণ করাইয়া এবং মদ্য পান করাইয়া শস্ত্র প্রয়োগ করিতে হয়।

ব্রণ বলিতে অধুনা সাধারণে ফোড়া বুঝিয়া থাকেন কিন্তু শাস্ত্রে ব্রণ বলিতে ক্ষত বুঝায়। সুশ্রুতে দ্বিব্রণীয়চিকিৎসিতে লিখিত হইয়াছে:—

দ্বৌব্রণৌ ভবতঃ শারীর আগন্তুকশ্চেতি। তয়োঃ শারীরঃ পবনপিত্তকফশোণিত-সন্নিপাত-নিমিত্তঃ। আগন্তুরপি পুরুষপশুমৃগপক্ষি ব্যালসরীসৃপ প্রপতনপীড়ন-প্রহারাগ্নিক্ষারবিষ-তীক্ষ্ণৌষধশকলকপালশৃঙ্গচক্রেষু পরশুশক্তি-কুন্তাদ্যায়ুধাভিঘাতনিমিত্তঃ। তত্র তুল্যে ব্রণ-সামান্যে দ্বিকারণোত্থান-প্রয়োজন-সামর্থ্যাদ দ্বিব্রণীয় ইত্যুচ্যতে।

ইহার পর ভিন্ন ভিন্ন ব্রণের লক্ষণ, ষাট প্রকার চিকিৎসা এবং পথ্য প্রভৃতির বিষয় লিখিত হইয়াছে। ব্রণবন্ধনের চতুর্দ্দশ প্রকার প্রণালীর বিষয় কথিত হইয়াছে। যথা :—

কোশদামস্বস্তিকানুবেল্লিত-প্রতোলী-মণ্ডল-স্থগিক-যমক-খট্টা-চীন-বিবন্ধ-বিতান-গোফণা-পঞ্চাঙ্গীচেতি চতুর্দ্দশ-বন্ধ-বিশেষাঃ তেষাং নামভিরেবাকৃতয়ঃ প্রায়েণ ব্যাখ্যাতাঃ। তত্র কোশমঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিপর্ব্বসু বিদধ্যাৎ। দাম সম্বাধেঽঙ্গে। সন্ধিকূর্চ্চকভ্রূস্তনান্তরতলকর্ণেষু স্বস্তিকং। অনুবেল্লিতন্তু শাখাসু। গ্রীবা-মেঢ্রয়োঃ প্রতোলীং। বৃত্তেঽঙ্গে মণ্ডলং। অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিমেঢ্রাগ্রেষু স্থগিকাং। যমল ব্রণয়োর্যমকং। হনুশঙ্খগণ্ডেষু খট্টাং। অপাঙ্গয়োশ্চীনং। পৃষ্ঠোদরোরঃসু বিবন্ধং। মূর্দ্ধনি বিতানং। চিবুকনাসৌষ্ঠাংস-বস্তিষু গোফণাং। জত্রুণ ঊর্দ্ধং পঞ্চাঙ্গীমিতি। যো বা যস্মিন্ শরীর-প্রদেশে সুনিবিষ্টো ভবতি তং তস্মিন্ বিদধ্যাৎ। ব্রণমত ঊর্দ্ধ মধস্তির্য্যক্ চ॥

ব্রণ রোগীর পক্ষে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

ব্রণিনঃ প্রথমমেবাগারমন্বিচ্ছেত্তচ্চাগারং প্রশস্তবাস্ত্বাদিকং কার্য্যং। প্রশস্তবাস্তুনি গৃহে তচাবাতপবর্জ্জিতে। নিবাতে নচ রোগা [illegible] শারীরাগন্তু মানসাঃ [illegible]

দিবা নিদ্রা-বশগঃ স্যাৎ। * * * * * উত্থানসংবেশনপরিবর্ত্তনচংক্রমণোচ্চৈর্ভাষণাদিষু চাত্মচেষ্টাস্বপ্রমত্তং ব্রণং সংরক্ষেৎ। স্থানাসনং চংক্রমণং যানযানাতি-ভাষণং। ব্রণবান্ নিষেবেত শক্তিমানপি মানবঃ। * * * * গম্যানাঞ্চ স্ত্রীণাং সন্দর্শনসম্ভাষণসংস্পর্শনাদি দূরতঃ পরিহরেৎ। * * * * মদ্যাশ্চ মৈরেয়াঽরিষ্টাসবসীধুসুরাবিকারান্ পরিহরেৎ। বাতাতপরজো-ধূমাবশ্যায়াতি-সেবনাতিভোজনানিষ্টশ্রবণদর্শনের্ষ্যামর্ষভয়ক্রোধ শোকধ্যানরাত্রিজাগরণ-বিষমাশনোপবাস-ব্যায়ামস্থান-চংক্রমণশীত বাতবিরুদ্ধা শনাজীর্ণ মক্ষিকাদ্যা বাধাঃ পরিহরেৎ॥

এইরূপে ধূম, ধূলি, মক্ষিকা প্রভৃতি হইতে ব্রণরোগীকে রক্ষা করার ফলে ক্ষত দূষিত (Septic) হইতে পারে না।

শল্য সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

শল শ্বল আশুগমনে ধাতুস্তস্য শল্যমিতি রূপং। তদ্দ্বিবিধং শারীর মাগন্তুকঞ্চ॥ সর্ব্বশরীরাবাধকরং শল্যং তদিহোপদিশ্যত ইত্যতঃ শল্যশাস্ত্রং। তত্র শারীরং রোমনখাদিধাতবোঽন্নমলাদোষাশ্চ দুষ্টাঃ। আগন্তপি শারীরশল্যব্যতিরেকেণ যাবন্তোভাবা দুঃখমুৎপাদয়ন্তি। অধিকারো হি লোহবেণুবৃক্ষতৃণশৃঙ্গাস্থিময়েষু তত্রাপি বিশেষতো লোহময়েষেব বিশসনার্থোপপন্নত্বাল্লোহস্য লোহানামপি দুর্ব্বারত্বাদণুমুখত্বাদ্ দূরপ্রয়োজন-করত্বাচ্চ।

শস্ত্র ও শস্ত্রসাধ্য ব্যাধি সম্বন্ধে যাহা উল্লিখিত হইল তাহাতে বুঝা যায় যে অধুনা প্রচারিত প্রায় সর্ব্বপ্রকার শস্ত্রচিকিৎসার উল্লেখ আয়ুর্ব্বেদে আছে। তন্মধ্যে কয়েকটী রোগের চিকিৎসার বিষয় বলা যাইতেছে। চক্ষু চিকিৎসার প্রারম্ভে লিখিত হইয়াছে :—

ষট্‌সপ্ততির্বিহ ভিহিতা ব্যাধয়ো নামলক্ষণৈঃ।
চিকিৎসিত মিদংতেষাং সমাসাদ্ব্যাসতঃ শৃণু।
ছেদ্যাস্তেষু দশৈকঞ্চ নব লেখ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ভেদ্যাঃ পঞ্চবিকারাঃ স্যুর্ব্বেধ্যা পঞ্চদশৈবতু।
দ্বাদশাঃ শস্ত্রকৃত্যাশ্চ যাপ্যাঃ সপ্ত ভবন্তি হি।
রোগা বর্জ্জয়িতব্যাশ্চ দশ পঞ্চ জানতা।
অসাধ্যৌ বা ভবেত্তাস্তু যাপ্যৌবাগন্তু সংজ্ঞিতৌ।

শ্লেষ্মজ লিঙ্গনাশ রোগের (cataract) চিকিৎসায় কথিত হইয়াছে :—

শ্লৈষ্মিকে লিঙ্গনাশে তু কর্ম্ম বক্ষ্যামি সিদ্ধয়ে।
সচেদর্দ্ধেন্দুঘর্ম্মাম্বুবিন্দুমুক্তাকৃতিঃ স্থিরঃ।
বিষমো বা তনুর্ম্মধ্যে রাজিমান্বা বহুপ্রভঃ।
দৃষ্টিস্থো লক্ষ্যতে দোষঃ সরুজো বা সুলোহিতঃ।
স্নিগ্ধস্বিন্নস্য তস্যাথ কালে নাত্যুষ্ণশীতলে॥
যন্ত্রিতস্যোপবিষ্টস্য স্বান্নাসাং পশ্যতঃ সমং।
মতিমান্ শুক্লভাগৌ দ্বৌ কৃষ্ণামুক্ত্বাঽপাঙ্গতঃ॥
উন্মীল্য নয়নে সম্যক্ সিরাজাল-বিবর্জ্জিতে।
নাধো নোর্দ্ধঞ্চ পার্শ্বাভ্যাঃ ছিদ্রে দৈবকৃতে ততঃ॥
শলাকয়া প্রযত্নেন বিশ্বস্তং যবক্রয়া।
মধ্য প্রদেশিন্যঙ্গুষ্ঠ-স্থিরহস্ত-গৃহীতয়া॥
দক্ষিণেন ভিষক্ সব্যং বিধ্যেৎ সব্যেন চেতরৎ॥
বারিবিন্দ্বাগমঃ সম্যক্ ভবেচ্ছব্দ স্তথা ব্যধে।
সংসিচ্য বিদ্ধমাত্রন্তু যোষিৎ-স্তন্যেন কোবিদঃ॥
স্থিরে দোষে চলে বাপি স্বেদয়েদক্ষি বাহ্যতঃ।
সম্যক্ শলাকাং সংস্থাপ্যাভঙ্গৈরনিল নাশনৈঃ॥
শলাকাগ্রেণ তু ততো নির্লিখেদ্দৃষ্টি মণ্ডলম্।
বিধ্যতো যোঽস্য-পার্শ্বেহিক্সংরুদ্ধা নাসিকাপুটম্॥
উচ্ছিঙ্ঘনেন হর্ত্তব্যো দৃষ্টিমণ্ডলজঃ কফঃ।
নিরভ্র ইব ঘর্ম্মাংশুর্যদা দৃষ্টিঃপ্রকাশতে॥
তদাসৌ লিখিতং সম্যক্ জ্ঞেয়া যা চাপি নির্ব্যথা।
ততো দৃষ্টেষু রূপেষু শলাকামাহরেচ্ছনৈঃ॥
ঘৃতেনাভ্যজ্যনয়নং বস্ত্রপট্টেন বেষ্টয়েৎ।
ততো গৃহে নিরাবাধে শয়ীতোত্তান এব চ॥

উদ্গারকাসক্ষবথুষ্ঠীবনোজ্জৃম্ভনানি চ।
তৎ-কালান্নাচরেদূর্দ্ধং বিধিশ্চ স্নেহপীতবৎ॥
ত্র্যহাত্র্যহার্দ্ধে ধাবেত কৃষায়ৈরনিলাপহৈঃ।
বায়োর্ভয়াত্র্যহাদূর্দ্ধং স্বেদয়েদক্ষি পূর্ব্ববৎ॥
দশাহমেবং সংযম্য হিতং দৃষ্টি প্রসাদনং।
পশ্চাৎ কর্ম্ম চ সেবেত লঘ্বন্নঞ্চাপি মাত্রয়া॥

বদ্ধগুদোদর (Intestinal obstruction) এবং পরিস্রাব্যুদর রোগে শস্ত্র প্রয়োগ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

বদ্ধগুদে পরিস্রাবিণি চ স্নিগ্ধস্বিন্নস্যাভ্যক্তস্যাধো নাভের্ব্বামত শ্চতুরঙ্গুল মপহায় রোমরাজ্যা উদরং পাটয়িত্বা চতুরঙ্গুল-প্রকাণান্যন্ত্রাণি নিষ্কৃষ্য নিরীক্ষ্য বদ্ধগুদস্যান্ত্রপ্রতিরোধকরমশ্মানংবালংবাপোহ্য মলজাতং বা ততো মধুসর্পির্ভ্যামভ্যজ্যান্ত্রাণি যথাস্থানং স্থাপয়িত্বা বাহ্যং ব্রণমুদরস্য সীব্যেৎ। পরিস্রাবিণ্যপ্যেবমেব শল্যমুদ্ধৃত্যান্ত্রস্রাবান্ সংশোধ্য তচ্ছিদ্রমন্ত্রং সমাধায় কৃষ্ণপিপীলিকাভির্দংশয়েৎ দষ্টেচ তাসা কায়ানপহরেন্ন শিরাংসি ততঃ পূর্ব্ববৎ সীব্যেৎ সন্ধানঞ্চ যথোক্তং কারয়েৎ।

জলোদর রোগে উদরস্থ জল নিঃসারণ (Paracentesis abbominis) সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

উদকোদরিণস্তু বাতহরতৈলাভ্যক্তস্যোষ্ণোদকস্বিন্নস্য স্থিতস্যাপ্তৈঃ সুপরিগৃহীতস্যাকক্ষাৎ পরিবেষ্টিতস্যাধো নাভের্ব্বামতশ্চতুরঙ্গুলমপহায় রোমরাজ্যা ব্রীহিমুখেনাঙ্গুষ্ঠোদর-প্রমাণম বগাঢ়ং বিধ্যেৎ। তত্র ত্রপ্বাদীনামন্যতমস্য নাড়ী-দ্বিদ্বারাং পক্ষনাড়ীং বা সংযোজ্য দোষোদকমবসিঞ্চেত্ততো নাড়ীমপহৃত্য তৈললবণেনাভ্যজ্য ব্রণবন্ধেনোপচরেন্ন চৈকস্মিন্নেব দিবসে সর্ব্বং দোষোদকমপহরেৎ সহসাহ্যপহৃতে তৃষ্ণাজ্বরাঙ্গমর্দ্দাতিসারশ্বাসপাদদাহা উৎপদ্যেরন্না-পূর্য্যতে বা ভূশতরমুদরমসঞ্জাত-প্রাণস্য তস্মাতৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম-ষষ্ঠাষ্টদশম-দ্বাদশষোড়শরাত্রাণামন্যতম্ মন্তরীকৃত্য দোষোদকমল্পাল্প মবসিঞ্চেৎ। নিঃস্রুতে চ দোষে গাঢ়তরমাবিককৌশেয়চর্ম্মণামন্যতমেন পরিবেষ্টয়েদুদরং তথা নাধ্মাপয়তি বায়ু। ষণ্মাসাংশ্চ পয়সা ভোজয়েজ্জাঙ্গলরসেন বা। তত্র ত্রীন্ মাসানর্দ্ধোদকেন ফলাম্লেন জাঙ্গলরসেন বাবশিষ্টং মাসত্রয়মন্নং লঘুহিতং বা সেবেতৈবং সংবৎসরেণাগদী ভবতি। ভবতি চাত্র—আস্থাপনেচৈব বিরেচনেচ পানে তথাহার-বিধিক্রিয়াসু। সর্ব্বোদরিভ্যঃ কুশলৈঃ প্রযোজ্য ক্ষীরং শৃতং জাঙ্গলজো রসো বা॥

অশ্মরী রোগে শস্ত্র প্রয়োগ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

অথ রোগান্বিতমুপস্নিগ্ধমশক্তদোষমীষৎ কর্শিত মভ্যক্তস্বিন্ন শরীরং ভুক্তবন্তং কৃতবলিমঙ্গলস্বস্তিবাচনমগ্রোপহরণীয়োক্তেন বিধানেনোপকল্পিত-সম্ভার মাশ্বাস্য ততো বলবন্তমবিক্লবমাজানুসমে ফলকে প্রাগুপবেশ্য পুরুষস্য তস্যোৎসঙ্গে-নিষণ্ণ-পূর্ব্বকায় মুত্তানমুন্নতকটিকং সঙ্কুচিতজানু কূর্পরমিতরেণ সহাববদ্ধং সূত্রেণ শাটকৈর্ব্বা ততঃ স্বভ্যক্তনাভি-প্রদেশস্য বামপর্শ্বং বিমৃশ্য মুষ্টিনাহবপীড়য়েদধো নাভে র্যাবদশ্মর্য্যধঃ প্রপন্নেতি। ততঃ স্নেহাভ্যক্তে কৃপ্তনখে বামহস্ত প্রদেশিনী মধ্যমে পায়ৌপ্রণিধায়ানুসেবনীমাসাদ্য প্রযত্নবলাভ্যাং পায়ুমেঢ্রান্তরমানীয় নির্বলীক মনায়ত মবিষমঞ্চ বস্তিং সন্নিবেশ্য ভূশমুৎপীড়য়েদঙ্গুলিভ্যাং যথা গ্রন্থিরিবোন্নতং শল্যং ভবতি।

সচেদ্ গৃহীত শল্যেতু বিবৃতাক্ষো বিচেতনঃ।
হতবল্লবশীর্ষশ্চ নির্ব্বিকারো মৃতোপমঃ॥
ন তস্য নির্হরেচ্ছল্যং নির্হরেৎতু ম্রিয়তে সঃ।
বিনাত্বেতেষু রূপেষু নির্হর্ত্তং সমুপাচরেৎ॥

সব্যে পার্শ্বে সেবনীং যবমাত্রেণ মুক্ত্বাবচারয়েৎ শস্ত্রমশ্মরপ্রমাণং দক্ষিণতো বা ক্রিয়াসৌকর্য্যহেতোরিত্যেকে। যথা চ ন ভিদ্যতে চূর্ণ্যতে বা তথা প্রযতেত। চূর্ণমল্পমপ্যবস্থিতংহি পুনঃ পরিবৃদ্ধিমেতি তস্মাৎ সমস্তামগ্রবক্রেণাদদীত। স্ত্রীণান্তুবস্তিপার্শ্বগতো গর্ভাশয়ঃ সন্নিকৃষ্টঃ তস্মাদাসামুৎসঙ্গবচ্ছস্ত্রং পাতয়েদতোহন্যথা খল্বাসাং মূত্রস্রাবী ব্রণো ভবেৎ। পুরুষস্য বা মূত্রপ্রসেকক্ষণনান্মূত্রক্ষরণং।

অর্শরোগে ক্ষার, অগ্নি এবং শস্ত্র প্রয়োগ সম্বন্ধে বাগ্‌ভট বলিয়াছেন:—

শুচিংকৃতস্বস্ত্যয়নং মুক্তবিন্মূত্রমব্যথম্।
শয়নে ফলকে বান্যনরোৎসঙ্গে ব্যপাশ্রিতম্॥
পূর্ব্বেন কায়েনোত্তানং প্রত্যাদিত্য-গুদং সমম্।
সমুন্নত-কটীদেশমথযন্ত্রণবাসসা॥
সক্‌থ্নোঃ শিরোধরায়াশ্চ পরিক্ষিপ্ত মৃজুস্থিতম্।
আলম্বিতং পরিচরৈঃ সর্পিষাভ্যক্ত-পায়বে॥
ততোঽস্মৈ সর্পিষাভ্যক্তং নিদধ্যাদৃজুযন্ত্রকম্।
শনৈরন্বমুখং পায়ৌ ততো দৃষ্ট্বা প্রবাহণাৎ॥
যন্ত্রে প্রবিষ্টং দুর্নাম প্রোত-গুণ্ঠিতয়াহন্মুচ।
শলাকয়োৎপীড্য ভিষক্ যথোক্ত বিধিনাদহেৎ॥
ক্ষারেনৈবার্দ্রলিতরৎক্ষারেণ জ্বলনেন বা।
মহত্ত্বাবলিনশ্ছিত্ত্বা বীতযন্ত্রমথাতুরম্॥

ছিন্ন নাসিকার চিকিৎসা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে:—

বিশ্লেষিতায়াস্ত্বথ নাসিকায়া বক্ষ্যামি
সন্ধানবিধিং যথাবৎ।
নাসাপ্রমাণং পৃথিবীরুহাণাং পত্রং
গৃহীত্বা ত্ববলম্বিতস্য॥
তেন প্রমাণেন হি গণ্ডপার্শ্বাদুৎকৃত্যবদ্ধং
ত্বথনাসিকাগ্রং।
বিলিখ্য চাশু প্রতিসন্দধীত
তৎসাধু বন্ধৈর্ভিষগপ্রমত্তঃ॥

সুসংহিতং সম্যগথো যথাবন্
নাড়ীদ্বয়েনাভিসমীক্ষ্য বদ্ধা।
প্রোন্নম্যচৈনা মচূর্ণয়েচ্চ
পতঙ্গযষ্টিমধুকাঞ্জনৈশ্চ॥
সংছাদ্য সলক্ পিচুনাসিতেন তৈলেন
সিঞ্চেদসকৃত্তিলানাং।
ঘৃতঞ্চপায্যঃ স নরঃ সুজীর্ণে স্নিগ্ধো বিরেচ্য
স যথোপদেশং॥
রূঢ়ঞ্চসন্ধানমুপাগতং স্যাত্তদর্দ্ধশেষন্তু
পুনর্নিকৃন্তেৎ।
হীনাং পুনর্ব্বর্দ্ধয়িতুং যতেত
সমাঞ্চ কুর্য্যাদতিবৃদ্ধমাংসং॥

সু, সূত্রঃ, ১৬ অঃ।

এই চিকিৎসা পাশ্চাত্য দেশে রাইনোপ্ল্যাষ্টিক শস্ত্র চিকিৎসা নামে প্রসিদ্ধ এবং পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে এই চিকিৎসা-প্রণালী ভারতবর্ষ হইতেই অল্পকাল পূর্ব্বে পাশ্চাত্য দেশে প্রচারিত হইয়াছিল।

অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন যে রোগীর অস্থি, সন্ধি প্রভৃতি ভগ্ন হইলে রোগীকে শয়ন করাইয়া ভগ্নস্থল এরূপ ভাবে আবদ্ধ রাখা হয় যেন সেই অঙ্গ সঞ্চালিত না হয়। আয়ুর্ব্বেদে এইরূপ প্রণালী কপাট-শয়ন নামে কথিত। প্রমাণ যথা—

অথ জঙ্ঘোরু ভগ্নানাং কপাট-শয়নং হিতং।
কীলকা বন্ধনার্থঞ্চ পঞ্চ কার্য্যা বিজানতা।
যথা ন চলনং তস্য ভগ্নস্য ক্রিয়তে তথা।
সন্ধেরুভয়তো দ্বৌ দ্বৌ তলে চৈকশ্চ কীলকঃ॥
শ্রোণ্যাং বা পৃষ্ঠবংশে বা বক্ষস্যক্ষকয়োস্তথা।
ভগ্নসন্ধিবিমোক্ষেষু বিধিমেনং সমাচরেৎ॥

সু, চিঃ, ৩অঃ

(ক্রমশঃ)

শিশু-যকৃৎ-চিকিৎসা।

মহিলাগণের বিশেষ পাঠ্য।

ঠাকুরমা। এই যে—লীলা কখন এলি, ভাল আছিস্ ত?

লীলা। আমি ত ভাল আছি ঠাকুরমা, কিন্তু খোকার জন্যে মনে একটুও স্বস্তি পাইনে।

ঠা। কেন, খোকার আবার কি হল?

লী। তুমিত জান ঠাকুরমা, দু' দুটো ছেলেকে চেষ্টা ক'রেও রাখতে পারলেম্ না, যমের মুখে তুলে দিয়েছি। এখন এটার জন্যে প্রাণে আর একটুও স্বস্তি নেই। মধ্যে মধ্যে গা ছ্যাক ছ্যাক করে। ডাক্তার দেখে ব'লেছে, একটু নাকি লিভার বেরিয়েছে।

ঠা। তোদের ঐ কেমন এক ধারা। ছেলে পেট থেকে প'ড়তে না প'ড়তেই লীবার—লীবার। লীবারত ছেলের পেটে জন্মায় না, ডাক্তার-বদ্যির মাথায় জন্মায়।

লী। সে কি ঠাকুমা, দুটো ছেলেরই ত লিভার হয়েছিল। শেষে আমরাও হাত দিয়ে বুঝ্তে পারতাম্।

ঠা। তা' হবে না, ছেলে পেট থেকে প'ড়লেই আগুনের মত আরোক আর বড়ি গুলো দিন চার পাঁচ বার ঢক্‌ঢক্ করে গেলাবি, আর লীবার হবে না! আমরাও ছেলে পিলে মানুষ ক'রেছি, কথায় কথায় অমন ডাক্তার-বদ্যি ডাক্‌তাম্ না। তোদের কাণ্ডই এক আলাদা। আজ ছেলের একটু গা গরম হয়েছে ডাক্ ডাক্তার, আজ একটু কাসি হয়েছে ডাক্ বদ্যি, আজ একটু পেটের অসুখ হ'য়েছে ডাক্ ডাক্তার। পোড় ডাক্তার বদ্যিও তেমনি। এসেই বগলে এক নল আর বুকে এক চোঙ বসিয়ে, নয়ত নাড়ী টিপে এক গাদা ওষুধ লিখলেন, আর ব'ললেন তিন ঘণ্টা অন্তর, নয়ত প্রাতে, মধ্যাহ্নে বিকালে, রাত্রে।

লী। তা' ছেলে-পিলের অসুখ হ'লে ডাক্তার-বদ্যি ডাকব না?

ঠা। ঐ ত তোদের দোষ। ওত ডাক্তার বদ্যি ডাকা নয়, রোগ ডেকে আনা। দুদিন ধরা-কাটা ক'রে দেখ, রোগ আপনি সারে কিনা, তারপর দুদিন টোট্‌কা-টুট্‌কী দিয়ে দেখ। তারপর দরকার হ'লেই ডাক্তার বদ্যি ডাকবি। তা নয় হুট্ বলতেই ডাক্তার বদ্যি।

(প্রফুল্লের প্রবেশ)

প্র। এখন আর সে দিন নেই ঠাকুমা, এখন সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার না ডাকলেই রোগী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অক্কা।

ঠা। তোদের মত বোকারাম তাই ভাবে। যে রোগে রোগী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অক্কা পাবে সেত রোগ নয়—সে যে কাল। সেখানে ডাক্তার-বদ্যি ডাকা কেন—ডাক্তার বদ্যিকে গুলে খাওয়ালেও কিছু হবে না। লোকনাথ বদ্দি বলত, যে জ্বরে সকল উপসর্গ প্রথম থেকেই দেখা দেয়, সে জ্বর নয়, বড় গিন্নি! জ্বরকে আগে ক'রে কাল এসেছে বুঝতে হবে।

প্র। কিন্তু কালের সঙ্গে যুদ্ধ করেও ডাক্তারকে জয়ী হ'তে দেখিছি ঠাক্‌মা। আমার একটী বন্ধুর মেয়েব জ্বর হ'য়েছিল। মেয়েটীর হাত পা ঠাণ্ডা হল, ডাক্তার ওষুধ দিলে, অমনি হাত পা গরম হল। নাড়ী দ'মে গেল, ডাক্তাব ওষুধ দিলে, অমনি নাড়ী তাজা হল। খুব ঘাম হ'তে লাগল, ডাক্তার ওষুধ দিলে, অমনি ঘাম বন্ধ হল।

ঠা। এ আর একটা নূতন কথা কি! লোকনাথ বদ্যি বলত, বিকারের রোগীর চিকিৎসা করা সোজা নয় বড় গিন্নি, যমের সঙ্গে যুদ্ধ করা। উপসর্গ দেখে দণ্ডে দণ্ডে ওষুধ দিতে হয়। কিন্তু তা ব'লে কি ছেলে পিলের একটু অসুখ হ'লেই গাদা গাদা ওষুধ গেলাতে হবে? কচি বেলা থেকে যদি গাদা গাদা ওষুধ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হয়, তবে সে ছেলেকে কদিন বাঁচান যাবে।

প্র। কিন্তু তা ব'লে ডাক্তাব বদ্যি দেখাতে দোষ কি?

ঠা। দেখ, সে রকম বিজ্ঞ ডাক্তার ছিও কম, আর বেশীর ভাগ ডাক্তার বদ্যি ব্যবসাদার। একবার একটা ঘটনার কথা বলি শোন্। তোর ঠাকুরদাদার একবার ভারি অসুখ হয়। আমার শাশুড়ি ছিলেন পাকা গিন্নি। তিনি প্রথমে ডাক্তার-বদ্যি ডাকতে দেন্ নি। একটু অসুখ বেশী হ'তেই ঠাকুর, গাঁয়ের এক ছোকরা ডাক্তার ডেকে নিয়ে এলেন। সে সবে কলেজ থেকে বেরিয়েছে। সে এসে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওষুধ আর পথ্যির ব্যবস্থা করলে। কিন্তু আমার শাশুড়ী বললেন, ও ডাক্তারের হাতে থাকলে আমার ছেলে বাঁচবে না। তখন ঠাকুর আবার হুগলী থেকে একজন বিলেত ফেরত ডাক্তার নিয়ে এলেন, সেও ছোকরা। সেও ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওষুধ আর পথ্যির ব্যবস্থা ক'রে গেল। আমার শাশুড়ী তার হাতেও রোগী রাখতে রাজি হলেন না। ঠাকুরকে বল্লেন, ও সব ছেলে-ছোকরাব কাজ নয়, তুমি বিজ্ঞ ডাক্তাব নিয়ে এস। ঠাকুব আবার হুগলী থেকে একজন আধবুড় ডাক্তার নিয়ে এলেন। তিনি এসে আগেকার ডাক্তারদের চেয়ে কিছু কম ক'রে ওষুধ-পথ্যির ব্যবস্থা ক'রে গেলেন। কিন্তু আমার শাশুড়ী তার মতেও চিকিৎসা করাতে রাজী হলেন না, বল্লেন—ওর চুল পাক্‌লে কি হয়—বুদ্ধিটে নেহাৎ কাঁচা।

লী। বাবা, তোমাব শাশুড়ী ত কম পাত্র ছিলেন না ঠাক্‌মা।

ঠা। আগে শোন সব। ঠাকরুণের কথায় ঠাকুর রেগে গেলেন, বল্লেন—তুমি এ ডাক্তার নয়—ও ডাক্তার নয় ক'রে চিকিৎসা না করিয়ে কি ছেলে মেরে ফেলবে? এই নিয়ে দুজনে ঝগড়া। শেষে স্থির হল—হুগলী থেকে রামনারায়ণ বদ্যিকে আর কল্‌কাতা থেকে একজন বিজ্ঞ ডাক্তারকে আনা হবে। আর অন্য ডাক্তারেরা যে সব ওষুধ পথ্যির বন্দোবস্ত করে গেছে, সব তাদের দেখান হবে। তারা যদি বলে যে আমার শাশুড়ির অন্যায় হয়েছে, তা হলে ঠাকুর যে শাস্তি দেবেন তাঁকে তাই নিতে হবে।

লী। বাবা, মেয়ে মানুষের এত সাহস!

ঠা। কেন মেয়ে মানুষ কি মানুষ নয়! শাশুড়ির যে বুদ্ধি-বিবেচনা, আর যে সব গুণ দেখেছি, আজ কাল অনেক লেখাপড়া জানা বাবুভায়াদের তা দেখ্‌তে পাইনে।

লী। যাক সে কথা। তার পর কি হল বল।

ঠা। তার পর ডাক্তার-বদ্যি এল, আর সব কথা আগাগোড়া শুনে শতমুখে আমার শাশুড়ির সুখ্যাত করতে লাগল। ডাক্তারটী ঠাকুরকে বল্লেন, যে আপনি বড় ভাগ্যবান্ তাই এমন স্ত্রী পেয়েছেন। আপনার স্ত্রীর বুদ্ধিবলেই আপনার পুত্র এবার প্রাণ পেলে। আগে যে ডাক্তার বাবুরা এসেছিল, তাঁদের মতে চিকিৎসা হ'লে বোধ হয় ছেলেটী রক্ষা পেত না। রোগ, প্রকৃতি ভাল করে, ওষুধে তার সাহায্য করে মাত্র। কিন্তু আগে যাঁরা দেখেছিলেন, তাঁরা প্রকৃতির উপর কিছু বেশী জোর করতে চেয়েছিলেন। তার ফল বোধ হয় ভাল হত না।

লী। তার পর কবিরাজ কি বল্লেন?

ঠা। কবিরাজ বল্লেন, অতি সত্য কথা। রোগীর প্রবল জ্বর, অথচ অল্প অল্প মল বার-বার নির্গত হচ্চে। আগেকার ডাক্তার বাবুরা দাস্ত বন্ধ করবার ওষুধ দিয়ে ছিলেন, কিন্তু তাতে ফল খারাপ হতো। জ্বর প্রবল হয়ে রোগী মারা যেতে পারত। রোগীর হিত করতে গিয়ে, কত চিকিৎসক যে এইরূপ ভ্রম করে, রোগীর অহিত করে; তার সংখ্যা নেই। আপনার বুদ্ধিমতী স্ত্রীর গুণেই এক্ষেত্রে সেটা ঘটতে পারে নি।

লী। তার পর কি হ'ল।

ঠা। তার পর তাঁরা দুজনে বেশ বনি-বনাও হয়ে ওষুধ দিলেন। শেষে পথ্যি নিয়ে দুজনে মহা তর্ক বাধলো।

লী। সে কি রকম?

ঠা। ডাক্তার বল্লেন রোগী আজ এগার দিন প্রায় অনাহারে আছে, এখন থেকে বলকর পথ্য না দিলে ক্ষীণ হয়ে মারা প'ড়বে। কবিরাজ বল্লেন, সে আশঙ্কা একেবারেই নেই। রোগী অনাহারে আছে বটে—কিন্তু অনাহারে থাকলে মুখ যেন শুকিয়ে যায় এর তা হয়নি, বরং মুখ রসা রসা রয়েছে, নাড়ী পুষ্টি রয়েছে, নাড়ী ক্ষীণ হয়নি। আর এর পরিপাক যন্ত্রের যেরূপ অবস্থা, তাতে খাদ্য দিলে খাদ্য পরিপাক হবে ব'লে মনে হয় না।

লী। তার পর কি হল ঠাকুমা, তর্কের কি শেষ হল?

ঠা। তর্কের শেষ হল না। কবিরাজ মহাশয় বল্লেন, যে অনাহারে রাখলে চৌদ্দ দিনে এর জ্বর ছেড়ে যাবে। ডাক্তার বল্লেন, যে চৌদ্দ দিনে কখনই জ্বর ছাড়বে না, রোগী ৪১ দিন ভুগবে।

লী। তার পর?

ঠা। তার পর দুজনে তর্ক ক'রে যখন বনাবনি হ'লনা, তখন দুজনেই বল্লেন, যে যিনি এতদিন রোগী দেখেছেন—রোগীকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, তাঁর যা মত—তাই করা হোক। ব'লে—আমার শাশুড়ীর মতের ওপর নির্ভর করলেন।

লী। তিনি কি বল্লেন?

ঠা। তিনি ব'ল্লেন কবিরাজ মশায় যা বলেন আমারও তাই মত। কাজেই রোগীকে আর কিছু পথ্য দেওয়া হল না। আগে যে ছানার জল আর বেদানার রস দেওয়া হচ্ছিল, তাই দেওয়া হতে লাগল।

লীলা। তার পরে ?

ঠা। তার পর চৌদ্দদিনে জ্বর ছেড়ে গেল। ডাক্তার বাবুটী এমন ভাল লোক, যে তাঁর কথা খাটুল না ব'লে তাঁর একটুও দুঃখ হল না। তিনি খুব আহ্লাদ ক'রে কবিরাজ মশায়কে বল্লেন, এখন থেকে আমি আপনাকে গুরু ব'লে মনে ক'রব। কেননা, পথ্য প্রয়োগ সম্বন্ধে এই সৎ-শিক্ষা আপনার কাছে পেয়েছি। আমি যেরূপ পথ্য দিতে চেয়েছিলাম, তা দিলে হয়ত রোগী মারা পড়ত।

লী। বাঃ, ডাক্তার বাবুটী বড় চমৎকার লোক ত! কবিরাজ মশায় তার কি উত্তর করলেন ?

ঠা। কবিরাজ মশায় বল্লেন, না আপনার ন্যায় বিজ্ঞ চিকিৎসকের হাতে থাক্‌লে রোগী মারা যেত না, তবে অনেক দিন ভুগত বটে। আর এই রকম রোগী যে বেশী দিন ভোগে, সে কেবল পথ্যের দোষে। সে যাহক্, কিন্তু আজ আপনার গুণগ্রাহিতা, বিনয়, সৌজন্য দেখে যে আনন্দ পেলাম, তেমন আনন্দ জীবনে কখন পাইনি। অনেক চিকিৎসকের অজ্ঞানতার সঙ্গে সঙ্গে দাম্ভিকতা এত প্রবল যে, আমাদের উপদেশ সত্য হলেও তাঁরা গ্রহণ করতে চান না, সত্য কিনা—তা পরীক্ষা করতেও চান না।

লী। যাক্—এখন তুমি খোকার অসুখের কি করবে বল ?

ঠা। এই কথাটা শেষ ক'রে তবে ব'লব। এ সব কথা শুনলে তোদের উপকার হবে। ডাক্তার কবিরাজ দুজনেই সাত দিন বাড়ীতে ছিলেন, রোগীকে পথ্য দিয়ে তবে তাঁরা বাড়ী থেকে যান্। তাঁদের যাবার আগের দিন বাড়ীতে ৪।৫ জন অতিথ এল। ঠাকুরুণ রোজ নিজে রেঁধে সকলকে খাওয়াতেন। কিন্তু সে দিন তাঁর আমোদ দেখে কে! একা একশ হয়ে রেঁধে বেড়ে সকলকে খাওয়ালেন। সে দিন খাওয়া-দাওয়ার পরে ডাক্তার বাবু ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা কল্লেন—দেখুন, আপনার স্ত্রী কি স্কুলকলেজে পড়াশুনো করেছিলেন ? ঠাকুর কল্লেন—না, কেন বলুন দেখি ? ডাক্তার বাবু বল্লেন, দেখুন, আজ আমার একটা মস্ত ভুল ভেঙ্গে গেল। এত দিন আমার ধারণা ছিল, যে মেয়েদের শিক্ষা দিতে গেলে স্কুল কলেজে পড়ান আবশ্যক, কিন্তু এখন দেখছি সেটা মস্ত ভুল। আজ এক সপ্তাহ আমি আপদার স্ত্রীকে লক্ষ্য ক'রে আসছি। সকাল থেকে রাত দশটা পর্য্যন্ত তাঁর কাজের বিরাম নেই। কিন্তু সর্ব্বদা আনন্দময়ী, কখন মুখে বিরক্তির চিহ্ন দেখিনি। এত গুলি লোককে একলা রেঁধে খাওয়ান্—আবার রান্না যেমন চমৎকার, তেমনি মার মত যত্ন ক'রে খাওয়ান্—তা ঝি চাকর অবধি। আমি জন্মে এমন চমৎকার রান্না খাইনি—এত তৃপ্তির সহিত কোথাও আহার লয় নি। যেখানে যাই—বামুন ঠাকুর ঠক্ করে একথাল আধসিদ্ধ চাল আর কতকগুলো গাছ পালা সিদ্ধ দিয়ে যায়। এ দিকে আবার রোগীর সুশ্রূষা কি সুন্দর করেন। তার ওপর আপনার মা ঠাকরুণকে রামায়ণ প'ড়ে শোনান আছে। আপনার স্ত্রীকে দেখে মনে হয়, সংসারে থেকেই মেয়েদের শিক্ষা হওয়া উচিত, স্কুল-কলেজের শিক্ষা কোন কাজের নয়।

কবিরাজ মশায় বল্লেন, আপনি সুন্দর কথা বলেছেন। যে সংসারে পুরুষদের খেটে

খেতে হয়—আর তাই পনের আনা তিন পাই—তা হাকিমই হউন আর মুৎসুদ্দিই হউন, তাদের বাড়ীর মেয়েদেরও পরিশ্রম করা উচিত। সংসার কর্ম্মক্ষেত্র। কাজ না ক'রে অলস হ'য়ে বসে থাকলে শরীরে নানা রোগ আশ্রয় করে। আজকালকার বিলাসিতার যুগে অনেকেই মেয়েদের বিলাসিনী ক'রে তুলেছেন। তার বিষময় ফলও তাঁরা ভোগ করছেন।

ঠাকুর হেঁসে বল্লেন, কবিরাজ মহাশয় যে এক পাই বাদ রাখলেন তাদের উপায় কি?

কবিরাজ মশায় বল্লেন, যে এক পাই বা তারও কম লোক বাদ রেখেছি, তারা কমলার বরপুত্র। তাদের শত শত দাস-দাসী আছে, তাদের মেয়ে পুরুষ কারও পরিশ্রম করবার আবশ্যক হয় না। ক'র্‌লে যে পাপ হয় এমন কথা ব'লছি না, তবে প্রায়ই কেউ করে না। এই সব ধনবানদের মেয়েরা নানা বিদ্যা শিক্ষা করে। এদের জীবন যাত্রার উপায় দুই প্রকার। এক দেশের ও দশের হিত করা, অপর নানা প্রকার বিলাসিতার স্রোতে ভেসে যাওয়া।

ডাক্তার বাবু বল্লেন, সে এক পাইয়ের কথা এই জন্যে বাদ দেওয়া ভাল। কিন্তু আজ কাল পনর আনা তিন পাইয়ের মধ্যে অনেক ঘরের মেয়েরা সংসারের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে, বঙ্কিম-রবীন্দ্রের-নভেল কবিতা—কেউবা সেক্সপিয়র-মিলটন প'ড়ে—হারমোনিয়ম বাজিয়ে আর থিয়েটার দেখে দিন কাটায়। সেই জন্যে বলছিলেম যে আমাদের দেশের মেয়েদের শিক্ষা গৃহস্থলীর মধ্যে হওয়াই ভাল।

ঠাকুর বল্লেন, আপনি সহরের স্কুল-কলেজে পড়া বিলাসিনীদের দেখে-দেখে বিরক্ত হয়ে গেছেন, তাই মূর্ত্তিমতী কর্ত্তব্য-রূপিণী আমার স্ত্রীকে দেখে তাদের উপর আর স্কুলের উপর চ'টে গেছেন। কিন্তু দেখুন—প্রকৃত পক্ষে স্কুলে পড়াবার সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থলীর কর্ত্তব্য শিক্ষা দিলে দুদিকই বজায় থাকে। আর মেয়েদের আমরাই বিলাসিনী ক'রে তুল্‌ছি।

আজও অনেক কথা হল—সে সব আর ব'লে কাজ নেই। শেষে ডাক্তার বাবু বল্লেন, দেখুন কলকাতায় আমার পসার বেশ, আর বড় ডাক্তার বলে খ্যাতিও আছে। কিন্তু পথ্যজ্ঞান সম্বন্ধে আপনার স্ত্রীর কাছে পরাস্ত হয়েছি। নবীনারা যদি প্রাচীনাদের কাছে এসব শিখে রাখেন, তা হ'লে দেশে রোগ ও অকাল মৃত্যুর সংখ্যা অনেক হ্রাস পায়।

প্র। তোমার গল্পের ভেতর অনেক ভাল কথা আছে, বটে ঠাকুমা, কিন্তু তা ব'লে বেশীর ভাগ ডাক্তার-বদ্যিই যে সুচিকিৎসক নয়, একথা আমি স্বীকার করিনে।

লীলা। দেখ, তুমি বাজে তর্ক কয়ো না। ঠাক্‌মার মতেই খোকাকে রাখবো।

প্র। যে আজ্ঞে, তাই হোক। এত বড় বিলেত-ফেরত ডাক্তার বাড়ীতে থাকতে আর বাইরে যাওয়া কেন।

ঠা। অই বুদ্ধিতেই তোমারা গেলে গবচন্দ্র! তোরা কি ভাবিস—যে ছমাস বিলেত থেকে এলেই লোকে মানুষ হয় এদেশে কি মানুষ হ'বার উপায় নেই। এদেশে কি

ভগবান কারুও মানুষ হবার উপায় রাখেন নি? নিজের দেশকে তোরা এত ছোট চোখে দেখিস্!

প্র। তা সত্য কথা বলতে কি ঠাক্‌মা, এখন অনেক বিদ্যে শিখ্‌তে আমাদের বিলেত যাওয়া দরকার।

ঠা। যেতে হয় যা'বি, বিদ্যের কি পার আছে! কিন্তু সব বিদ্যে শিখতেই যে বিলেত যেতে হ'বে তা মনে করিস্‌নে। দেশে অনেক রত্ন আছে; সেত তোরা খুঁজে দেখবিনে। হাতের কাছে রত্ন ফেলে রত্নের জন্যে বিলেতে ছুটবি।

প্র। তা এ কথাটা যা ব'লেছ তা সত্যি ঠাক্‌মা।

ঠা। কেমন হার মান্‌লিত।

প্র। পাঁচশোবার। তোমার নাতনীর কাছেই হেরে আছি, তা তোমার কাছে।

ঠা। হুঁ, তোর ঠাকুরদাদা বলতেন যে, সে কালের ঋষিরে সমস্ত জগতকে জ্ঞান দিয়ে গেছেন। আর তোরা তাঁদের বংশধর হ'য়ে ঘরের নিন্দে ক'রে পরের দোরে দাঁড়াচ্ছিস্।

প্র। সেটা তোমার মত ঋষিপত্নীকে দেখলেই বোঝা যায়।

ঠা। তা'রা ঋষিই ছিল রে। তোদের মত টেড়িকাটা ফ'তো বাবু ছিল না। তা'দের প্রাণ দেশের আর দশের জন্যে কাঁদত।

প্র। আমাদের প্রাণ কি কাঁদে না ঠাক্‌মা?

ঠা। একেবারে যে কারও কাঁদে না, সে কথা বল্‌ছিনে, তবে অনেকেরই কাঁদে—পেটের দায়ে।

লী। তুমি আর বাজে কথা ক'য়ে সময় নষ্ট করো না। নিজের কাজ থাকেত করগে, নইলে আমি যতক্ষণ না যাই ততক্ষণ কড়ি গোন গে।

প্র। তা'র চেয়ে আমি এখানে মুখটী বুজে বস্‌ছি, তবু চাঁদ মুখ খানা দেখ্‌তে পাব। শুধু একটা কথা বলে নিই। দেখ ঠাক্‌মা, খোকাকে যদি ভাল করতে পার, যা চাইবে বক্‌শিস্ দেব।

ঠা। বেটা ছেলে হলে তোমার মাগটী চাইতাম, দেখতাম কি করতে। এখন আর কিছু চাইনে, চাই তোমার কান দুটী লাল ক'রে দিতে।

প্র। তা যদি খোকাকে ভাল করতে পার, একবার ছেড়ে পাঁচশোবার লাল ক'রে দিও। অসুবিধে হয়, কাণ দুটো কেটে রেখে যাব।

ঠা। সে আর কাটতে হবে না, দুকাণ কাটাই তোমরা। দুনিয়ার মধ্যে মাগটী-ভাতারটী আর ছেলে—এই নিয়েই মত্ত। বাপ-মা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবাসী—কারুর দিকে বড় ফিরে তাকান্‌না বাবুরা। অতিথ-ফকির এলে এক মুঠো ভিক্ষে পায় না। ক্রিয়াকর্ম্মের মধ্যে পরিবারের গহনা গড়ান আর পশ্চিম বেড়ান।

প্র। কিন্তু আজকাল যে রকম অতিথ ফকির—

লী। আবার?

প্র। বস্ চুপ।

লী। তার পর কি করবো বল ঠাক্‌মা

ঠা। শোন্ বলি। বাড়ীতে গরু আছেত?

লী। না, গরু নেই।

ঠা। ওমা সেকি! বড় মানষী কেবল গাড়ীঘোড়া আর দাসদাসী নিয়ে। বাড়ীতে গরু না থাকলে বাজারে দুধ খেয়ে কি ছেলে পিলে বাঁচে?

লী। তা আমি গরু কেনাব।

ঠা। হাঁ তাই করিস্। আর গরুটী যেন মড়ুঞ্চে না হয়। গরুটীকে বেশ ভাল ক'রে পাল্‌বি, যেন তার মনে দুখ-কষ্ট না হয়।

লীলা। সে কি ঠাকমা?

ঠা। ন্যাকি আর কি! মানুষের মনে দুঃখ-কষ্ট হলে শরীর খারাপ হয় তা জানিস্ত, গরুর মনে দুঃখ-কষ্ট হ'লে তা'দের শরীরও খারাপ হয়। আর তা হলে তাদের দুধও খারাপ হয়।

লী। বাবা, এতও জান ঠাকুমা!

ঠা। গিন্নিপনা করা সোজা নয় দিদি-মণি—একটী সংসারের রাণীগিরি করা। সব জানতে হয়, নইলে ছেলে-পিলে কি আপনি মানুষ হয়।

প্র। এবার আর চুপ ক'রে থাকা চল্‌লো না। ঠাক্‌মা গরু পালবার কথা যা বল্‌লেন, অনেক ডাক্তার বাবু তা'র চেয়ে অনেক বেশী কথা লিখে গিছেন। যথা, গরুকে খারাপ জিনিষ খেতে দিলে দুধ খারাপ হয়, গরুর থাকবার স্থান পরিষ্কার রাখা উচিত, নীরোগ ব্যক্তির ভাল ক'রে হাত ধুয়ে দুধ দোওয়া উচিত, দুধ দোওয়ার পাত্র পরিষ্কার রাখা উচিত, গোয়াল ঘরে যা'তে মশা-মাছি-পোকা-মাকড় যেতে না পারে—তা করা উচিত। তাঁরা আরও অনেক কথা ব'লে গেছেন। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা বোধ হয় এতটা সমজদার ছিলেন না।

ঠা। সাধে বলি তোরা হাতের কাছে রত্ন থাক্‌তে রত্নের জন্যে বিদেশে ছুটিস্। ঋষিরা যে গরুকে দেবতা ব'লে গেছেন, যে-সে দেবতা নয়—সাক্ষাৎ ভগবতী। গাভী ত্রিলোকের মা, তাঁর শরীরে সকল দেবতা বাস করেন, হিন্দুরা তাই গাভীর পূজা করে—গোশালা দেবমন্দিরের মত পবিত্র দেখে। দেব-মন্দিরের মত গোশালা পরিষ্কার রাখতে হয়, কোন রকম অনাচার হ'তে দিতে নেই। যদি একবার ঋষিরে গোপালন সম্বন্ধে কি ব'লে গেছেন দেখিস্, তা হ'লে বুঝতে পারবি যে, তোমার ডাক্তার বাবুদের ততদূর পৌঁছুতে এখনও অনেক দেরী।

লী। কেমন, মুখের মত জবাব পেয়েছ ত? আমি তারপর কি ক'রবো বল ঠাকুরমা।

ঠা। তারপর, সেই এক গাইয়ের দুধ দিবি। একেলার দুট ওবেলা দিস্‌নে, কি জানি যদি খারাপ হ'য়ে যায়। আর দুধ খাও-যার ঝিনুক, বাটী, দুধ গরম করবার কড়া খুব পরিষ্কার রাখ্‌বি।

লী। তা'ত রাখি।

ঠা। তা'রপর শুধু দুধ না দিয়ে দুধ সিদ্ধ ক'রে দিবি। এক পোয়া দুধ, এক পোয়া জল আর এক খানা থেঁতো করা "পিপুল" এক সঙ্গে জ্বালে চড়িয়ে এক পোয়া থাকতে নামাবি। তা'রপর ছেঁকে একটু একটু গরম থাক্‌তে খাওয়াবি। পিপুলের সঙ্গে এই রকম দুধ সিদ্ধ ক'রে দিলে দুধ সহজে হজম হয়, দুধের দোষ কেটে যায়, আর সামান্য সর্দ্দি কাসি থাকলে তাও ভাল হ'য়ে যায়। যদি ঝাল বা বিস্বাদ ব'লে ছেলে খেতে না চায়, তা হলে একটু মিছরী দিয়ে দিস্, তাহলে খাবে।

লী। ডাক্তার কিন্তু একেবারে দুধ বন্ধ ক'রে দিতে বলে।

ঠা। বলুক ডাক্তারে। লোকনাথ বদ্দি বলত, কচি ছেলেরা দুগ্ধজীবী, তাদের কখন দুধ বন্ধ করতে নেই—যেমন সয়—অল্প-বিস্তর দিতে হয়।

লী। আচ্ছা তাই করবো।

ঠা। হ্যাঁ ভাল কথা, তোদের ওখানে গাধা আছে?

প্র! গাধা কেন ঠাক্‌মা, চ'ড়ে রোগী দেখতে যা'বে নাকি?

ঠা। চড়বার গাধা সামনেই আছে, খুঁজতে যেতে হবে না। দুধওলা গাধা চাই?

লী। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠাক্‌মা, বাড়ীর কাছে ক' ঘর ধোপা আছে, আর তারা গাধার দুধ বেচে দেখেচি।

ঠা। তা হ'লে ভালই হয়েছে। যতটুকু পার গাধার দুধ খোকাকে দেবে, বাকী গাইয়ের দুধ দেবে।

লী। গাধার দুধ কতটুকু দেব?

ঠা। গাধার দুধত বেশী পাওয়া যায় না, যতটুক যোগাড় করতে পার। এই ধর, এক পোয়া পাঁচ ছটাক। আর দুধ খাওয়াবে ঠিক নিয়মমত—২৷৩ ঘণ্টা অন্তর আধ পোয়া আড়াই ছটাক ক'রে দেবে। যখন-তখন খাইও না। আর একবারে বেশী দুধ দিয়ো না।

লী। অনেকে মাইয়ের দুধ দিতে বারণ ক'রে তার কি করবো বলত ঠাক্‌মা।

ঠা। আগে দেখতে হ'বে যে, মাইয়ের দুধ খারাপ হয়েছে কি না, তা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে। একটা বাটীতে জল নিয়ে জলটা বেশ স্থির হ'লে তাতে একটু মাইয়ের দুধ গেলে ফেলবে। যদি দেখ দুধ জলের সঙ্গে বেশ মিশে গেল আর রং বেশ শাদা থাক্‌ল, তা হলে বুঝবে—দুধের দোষ নেই! আর যদি অন্য রকম হয়—দুধ জলের সঙ্গে বেশ না মেশে, ডুবে থাকে, কি ভেসে থাকে, কি প্রথমে ডুবে পরে ভেসে ওঠে, আর যদি শাদা ছাড়া অন্য রঙ দেখা যায়, তা হলে বুঝবে যে, মাইয়ের দুধ খারাপ হ'য়েছে। খারাপ হ'লে ছেলেকে মাই না দেওয়াই ভাল।

লী। কিন্তু ছেলে যদি মাই ছেড়ে না থাকে?

ঠা। না থাকে তাহলে অগত্যা মাই দিতে হ'বে। প্রথমে যত পার দুধ গেলে ফেলে দিয়ে তার পর মাই খেতে দেবে, তা হলে বেশী দুধ পেটে যাবে না। একটা কথা মনে রেখ। অনেক সময় পোয়াতীরা মাইয়ে কুইনেন ফুইনেন নানা রকম তেতো লাগিয়ে ছেলেকে মাই ছাড়াতে বাধ্য করে। তাতে ছেলে মাই ছাড়ে বটে, কিন্তু তাদের মনে বড় কষ্ট হয়। ছেলের মনে এমন কষ্ট দিয়ে মাই ছাড়ানর চেয়ে দুধ গেলে ফেলে মাই দেওয়া অনেক ভাল।

লী। ছেলের মনে কষ্ট হয় কিনা কি ক'রে বুঝব?

ঠা। ছেলে যেন মনমরা হ'য়ে থাকে, ভাল ক'রে হাঁসেনা, খেলা করেনা, কাঁদে, ভাল ক'রে খায় না, আদর করলে তেমন প্রফুল্ল হয় না—এই সব দেখ্‌লেই বুঝবে যে, ছেলের মনে খুব কষ্ট হ'য়েচে। হ্যাঁ, ভাল কথা, ছেলেকে মাই বেশীই দেওয়া হ'ক্ আর অল্পই দেওয়া হ'ক, তোমার কিন্তু খুব ধরা-কাটায় থাকতে হবে।

(ক্রমশঃ)

ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্য।

আমাদের হিতের জন্য ত্যাগী-আর্য্য-ঋষিগণ অতি গবেষণায় চতুরাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। কালের কঠোর নিয়মে ভারত অধুনা অধঃপতিত। সুতরাং সেই পূর্ব্ব বিধিনিষেধ পদদলিত হওয়ায়, আর্য্য-সন্তানগণ ক্রমশঃ হীনতেজ, ক্ষীণ-বীর্য্য অল্পায়ুষ্ক হইয়া পৃথিবীতে অন্যান্য জাতির নিকটে অসভ্য, ঘৃণাস্পদ বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। ইহার মূল অন্বেষণ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, চতুরাশ্রম-ধর্ম্ম-নষ্ট-জনিত পাপেই আজ আমরা এরূপ হীন-তেজ, ক্ষীণ-বীর্য্য, অল্পায়ুষ্ক ও অল্প-মেধাবী হইয়া আর্য্যকুল-কলঙ্ক নামে অভিহিত। সেই চতুরাশ্রম কি?—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু। মানুষের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের যত প্রকার পন্থা আছে, তন্মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যই প্রধান। শাস্ত্রে কথিত আছে—"ব্রহ্মচর্য্য ময়নানাম্"।

প্রথমে গোড়া না বাঁধিয়া কোন কার্য্য করিলে যেমন তাহা সুসম্পন্ন হয় না সেইরূপ ব্রহ্মচর্য্যাদি দ্বারা শরীর পুষ্ট না করিয়া গৃহস্থাধর্ম্মে প্রবেশ করিলে তাহার গৃহস্থাশ্রম তত সুখকর হয় না। পূর্ব্বে—আর্য-ঋষিগণের সময় নিয়ম ছিল—চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত গুরুগৃহে থাকিয়া সংযত চিত্তে জিতেন্দ্রিয় হইয়া অধ্যয়নাদি দ্বারা জ্ঞানার্জ্জন করিয়া, পঞ্চবিংশ-বর্ষে গার্হস্থ্য ধর্ম্মে প্রবেশ করিয়া সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে হইত। সেই কারণে তৎকালে এদেশে হৃষ্টপুষ্টহৃ কর্ম্মনিপুণ জ্ঞানপ্রবীণ দীর্ঘায়ু লোক সচরাচর দেখা যাইত।

মহর্ষি সুশ্রুত বলেন—

"পঞ্চবিংশে ততো বর্ষে পুমান্ নারী তু ষোড়শে
সমত্বাগতবীর্য্যৌ তৌ জানীয়াৎ কুশলো ভিষক্"।

পুরুষের পঁচিশ বৎসর বয়স না হইলে বীর্য্য পরিপুষ্ট হয় না, স্ত্রীলোকেরও ষোল-বৎসর বয়স না হইলে সর্ব্বাবয়ব পরিপুষ্ট হয় না; অতএব ইহার পূর্ব্বে সন্তানাদি হইলে তাহারা অপরিণত বীর্য্য হইতে উৎপন্ন বলিয়া, চিররুগ্ন ও অল্পায়ুষ্ক হইবে এবিষয়ে সন্দেহ না। কৃষক যেমন কৃষি কার্য্যেই অপরিপক্ক বীজ বপন করিয়া সুফল পায় না, সেইরূপ মানব-মানবীও ব্রহ্মচর্য্যাদি দ্বারা বীর্য্যাধান ও চিত্তসংযম না করিয়া অপত্যোৎপাদনে ব্রতী হইলে, সুফলের পরিবর্ত্তে কুফল ফলিবে ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? সঞ্চয়বিমুখ গৃহস্থ ব্যয়বাহুল্য দ্বারা যেরূপ ঋণী হইয়া পড়ে, সেইরূপ ব্রহ্মচর্য্যাদি-হীন মানব, অকালে গার্হস্থ্য ধর্ম্মে প্রবেশ করিয়া, অসংযত চিত্তে রিপুর তাড়নায়, অত্যধিক ক্ষয়জনিত-পাপে ব্যাধিরূপ ঋণ যাতনায় রাত্রি দিবা দুঃখ ভোগ করে।

যাবৎকাল পর্য্যন্ত শরীরের সর্ব্বাবয়ব সুগঠিত না হয়, মনঃ চরম উৎকর্ষ লাভ না করে, ধী ধৃতি-স্মৃতি-স্বরূপা বুদ্ধি সম্যক্ পরিপুষ্ট না হয়, তাবৎকাল ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা রেতঃ-সংযম করিবে অর্থাৎ কোনও প্রকারে বীর্য্য নষ্ট করিবে না। এজন্য অনেক স্থলে রেতঃ-সংযম অর্থেই ব্রহ্মচর্য্য শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অষ্টাঙ্গমৈথুন সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিয়া চিত্ত সুস্থির রাখিলেই ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা পায়। একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনই সর্ব্ববিধ মঙ্গলের সর্ব্বপ্রথম সোপান।

অষ্টাঙ্গমৈথুন ত্যাগ না করিলে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা পায় না। অষ্টাঙ্গ-মৈথুন যথা—

"স্মরণং কীর্ত্তনঃ কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণং।
সঙ্কল্পোহধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ।

এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥" অর্থাৎ অভিলষিত কামিনীর রূপ, গুণ, বাক্‌ বিন্যাস প্রভৃতি মনে মনে চিন্তা করা, তাহার রূপের কথা, গুণের কাহিনী বাক্‌চাতুরীর বিষয়াদি প্রিয়জনের নিমট বলা, একসঙ্গে ক্রীড়া করা, পরস্পর দেখা দেখি, সঙ্গোপনে কথা বলা, কি প্রকারে মিলন হইবে তাহার চেষ্টা করা প্রভৃতিকে অষ্টাঙ্গ-মৈথুন বলে। ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় ঐরূপ কার্য্য একান্ত নিষিদ্ধ। সেইজন্য মনু যথার্থই বলিয়াছেন—

"অবিদ্বাসমলং লোকে বিদ্বাংসমপি বা পুনঃ।
প্রমদা হ্যুৎপথং নেতুং কামক্রোধবশানুগন্॥"

কিশোর বয়সে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া, চতুর্বিংশতিবর্ষকাল পর্য্যন্ত অষ্টাঙ্গ-মৈথুন ত্যাগ করা মনুষ্যত্ব-প্রয়াসী মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বিশেষতঃ বিদ্যার্থিগণের পক্ষে অষ্টাঙ্গ-মৈথুন বর্জ্জন করা পরম হিতকর। শুক্র বা বীর্য্য পুরুষশরীরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাদান। স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি দর্শন, গুহ্যভাষণ, সঙ্কল্প ও অধ্যবসায় দ্বারা শুক্র চালিত হয় এবং ক্রিয়া-নিষ্পত্তি দ্বারা ক্ষরিত হয়। শুক্রের অস্থিরতা অশেষ অনর্থের মূল। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলে শুক্র সুস্থির হয়, সর্ব্বাবয়ব বিশেষতঃ মস্তিষ্ক পরিপুষ্ট হয়, সুতরাং ধৃতি-স্মৃতি-শক্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ব্রহ্মচর্য্য পুনরায় এদেশে প্রতিষ্ঠিত না হইলে, অন্য শত চেষ্টায়ও বোধ হয় জাতীয় গৌরব রক্ষিত হইবে না।

কবিরাজ

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিদ্যাবিনোদ।

দোহদের উপযোগিতা।

শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়ে গর্ভিণীর আন্তরিক অভিলাষের নামই দোহদ। তন্ত্রাদিতেও "গর্ভিণ্যভিলাষে দোহদম্‌" বলিয়া উল্লেখ আছে। গর্ভিণীর এই দোহদের উপরি গর্ভস্থ সন্তানের সুখ, স্বাস্থ্য, ধর্ম্মভাবাদি কি পরিমাণ নির্ভর করে, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

প্রথমতঃ গর্ভিণীর সহিত গর্ভের যে একটী অনায়াসানুমেয়, অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে, এ বিষয়ের প্রমাণ-প্রপঞ্চ পর্য্যালোচনার পূর্ব্বেই গর্ভের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ক্রমিক পুষ্টি ও সজীবতাই যে প্রমাণ স্বরূপ সর্ব্বসাধারণের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইবে সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। তথাপি আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ গর্ভিণী ও ভ্রূণের সম্বন্ধ বিষয়ে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তন্মধ্যে কিঞ্চিৎমাত্র লিখিত হইতেছে। সুশ্রুত বলেন—

"মাতুস্তু খলু রসবহায়াং নাড্যাং গর্ভনাভি-নাড়ী প্রতিবদ্ধা, সাস্য মাতুরাহাররসবীর্য্যমাবহতি তেনোপস্নেহেনাস্যাভিবৃদ্ধির্ভবতি।"

মাতার রসবাহিনী নাড়ীর সহিত গর্ভস্থ শিশুর নাভি-নাড়ী (অমরা) সংলগ্ন থাকে। সেই নাড়ী কর্ত্তৃক মাতার আহারজাত রসের সারভাগ ভ্রূণশরীরে নীত হয়, এবং তদ্দ্বারা উপস্নিগ্ধ হইয়া গর্ভ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। চরক বলেন—

"গর্ভঃ পরতন্ত্রবৃত্তি র্মাতরমাশ্রিত্য বর্ত্তয়ত্যু-পস্নেহোপস্বেদাভ্যাম্। স তস্য রসঃ সর্ব্বরসবর্ণ-করঃ সম্পদ্যতে॥"

গর্ভ সর্ব্ববিষয়ে মাতার অধীন থাকিয়া

উপস্নেহ এবং উপস্বেদের দ্বারা জীবিত থাকে। মাতার আহারজাত রসে গর্ভের সমস্ত বল ও বর্ণ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। উপস্নেহ ও উপস্বেদ সম্বন্ধে বহু বক্তব্য থাকিলেও আমরা অপ্রাসঙ্গিক বোধে এস্থলে উল্লেখ করিলামনা। তন্ত্রকর্ত্তা ভোজ বলেন—

যদ্ যদশ্নাতি মাতাস্থ ভোজনং হি চতুর্বিধং।
তস্মাদন্নাদ্রসীভূতং বীর্য্যং ত্রিধা প্রবর্ত্ততে॥
ভাগঃ শরীরং পুষ্ণাতি স্তন্যং ভাগেন বর্দ্ধতে।
গর্ভঃ পুষ্যতি ভাগেন বর্দ্ধতে চ যথাক্রমম্॥

গর্ভের মাতা যে চর্ব্ব্য চুষ্য প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ আহার্য্য ভোজন করেন, সেই আহার-জাতরস তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া এক ভাগ গর্ভিণীর শরীর রক্ষা করে, দ্বিতীয় ভাগ স্তন্যরূপে পরিণত হইতে থাকে এবং তৃতীয় ভাগ গর্ভের পরিপুষ্টি ও বৃদ্ধি সাধন করে।

দ্বিতীয়তঃ পূর্ব্বোক্ত দোহদরূপ অভিলাষ গর্ভিণীর কি গর্ভের তাহাই বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। এই বিষয়ে উভয়বিধ মতের সমর্থক উক্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সুশ্রুত বলেন,—

"কর্ম্মণা চোদিতং জন্তো র্ভবিতব্যং পুনর্ভবেৎ।
যথা তথা দৈবযোগাদ্দৌহৃদং জনম্ হৃদি"॥

জীব পূর্ব্বজন্মে যে প্রকার কর্ম্মের দ্বারা জীবন অতিবাহিত করে, গর্ভাবস্থাতেও দৈবযোগবশতঃ (পূর্ব্বজন্ম কৃত কর্ম্ম প্রযুক্ত) হৃদয়ে সেই প্রকারই দৌহৃদ (সাধ, অভিলাষ) জন্মিয়া থাকে। চরক বলেন—

"প্রার্থয়তে চ জন্মান্তরানুভূতং ইহ যৎ কিঞ্চিৎ"

গর্ভস্থিত জীব জন্মান্তরে অনুভূত সুখদুঃখং মূলক প্রার্থনা সকল ইহজন্মে করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে চরকে দেখা যায়—

"মাতৃহৃদয়ঞ্চাস্য হৃদয়ং, মাতৃহৃদয়াভিসম্বদ্ধং রসবাহিনীভিঃ সংবাহিনীভি স্তস্মাদুভয়োর্ভক্তিঃ সম্পদ্যতে॥"

গর্ভের হৃদয় মাতৃজ এবং মাতার হৃদয়ের সহিত রসবাহিনী নাড়ীসমূহ দ্বারা সম্বদ্ধ থাকে, সেই নাড়ীসমূহ দ্বারাই গর্ভের প্রার্থনা মাতৃহৃদয়ে এবং মাতার প্রার্থনা গর্ভের হৃদয়ে পরিচালিত হয় বলিয়া উভয়ের ইচ্ছা সমান হইয়া থাকে।

এস্থলে বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে এক দিকে যেমন চতুর্থমাসে—যখন গর্ভের চৈতন্য সঞ্চার হয়, তৎকালে বহির্জগত হইতে বিশেষ সম্বন্ধ বিহীন প্রশান্তচিত্ত-প্রায় ভ্রূণের জন্মান্তরানুভূত সুখ দুঃখের বৃত্তিগুলির স্ফূরণ অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। অন্য পক্ষেও সেইরূপ বাহ্যজগতের সহিত বিশেষ সম্পর্কশীল মাতৃহৃদয়ের অনবরত স্ফূরিত অনন্ত আকাঙ্খা হৃদয়ে হৃদয়ে সম্পর্কযুক্ত গর্ভে, অলক্ষ্য ভাবে অন্তঃ প্রবাহিত হওয়াও অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক উক্ত প্রকার উভয়বিধ মতের উল্লেখ থাকিলেও পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে চতুর্থ মাসের পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ গর্ভের চৈতন্য সঞ্চারের পূর্ব্বের আকাঙ্ক্ষা, গর্ভিণীর অভিলাষ নামে অভিহিত হইতে পারে, কিন্তু চতুর্থ মাস হইতে গর্ভিণীর যে সকল আকাঙ্ক্ষা হয়, সে সকল যে প্রধানতঃ গর্ভস্থ জীবের আন্তরিক প্রবৃত্তিমূলক সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

গর্ভিণীর চতুর্থ মাসের পূর্ব্ববর্ত্তী অভিলাষ, দোহদপর্য্যায়ক হইলেও উহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিশেষ বিষয়ীভূত নহে, কারণ— চৈতন্যের আশ্রয় স্থল হৃদয়ের তৎকালে উৎপত্তি না হওয়ায়, গর্ভিণীকে তখন দ্বিহৃদয়া

বা দৌহৃদিনী বলা যায় না। বস্তুতঃ দৌহৃদিনীর অভিলাষই দৌহৃদ পদবাচ্য অর্থাৎ দোহদের লক্ষীভূত। মানব যখনই চিত্তে কোন বিষয়ে কোনরূপ অভাবের উপলব্ধি করে, তখনই তাহার ঐ বিষয়ক একটী আকাঙ্ক্ষার উদয় হয় এবং পরে উহা কার্য্যে পরিণতি লাভ করে। জগতের যাবতীয় কার্য্যের মূলেই ঐরূপ এক একটী ইচ্ছা এবং তাহার মূলে আন্তরিক অভাবের সত্ত্বা বর্ত্তমান রহিয়াছে। আবার এই অভাবের পূর্ণতায় মানবের সুখ এবং তাহার অপূরণে দুঃখানুভূতি স্বাভাবিক। পূর্ব্বোক্ত নিয়মে গর্ভিণীর আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ দোহদ যখন গর্ভস্থ জীবের প্রবৃত্তিমূলক, তখন তাহার পূরণাপূরণের সহিত যে গর্ভের সুখ দুঃখানুভব হয় ইহা স্থির নিশ্চিত। ঐরূপ অনুভব করে বলিয়াই ঋষি ও পূর্ব্বাচার্য্যগণ "প্রিয়হিতাভ্যাং গর্ভিণীং বিশেষেনোপচরন্তি" বলিয়া গর্ভিণীর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে উপদেশ করিয়াছেন। "* গর্ভিণ্যাঃ বেদোক্তৌ নাধিকানিতা" বলিয়া তাহার পক্ষে ব্রত উপবাসাদি আপাতক্লেশকর বেদবিধি পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ করিয়াছেন। এই খানেই আমাদের প্রস্তাবিত দোহদের প্রভূত প্রয়োজনীয়তা এবং এই খানেই দোহদাভাবের রোমাঞ্চকারিণী পরিণাম কৃচ্ছ্রতা।

দোহদ সম্বন্ধে সুশ্রুত বলেন ;—

"ইন্দ্রিয়ার্থাংস্তু যান্ যান্ সা
ভোক্তুমিচ্ছতি গর্ভিণী।
গর্ভবাধভয়াত্তাংস্তান্ ভিষগাহৃত্য দাপয়েৎ॥"

নারীগণের গর্ভাবস্থায় যে সকল বিষয় ভোগ করিতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের বাসনা হয়, গর্ভের পীড়া নিবারণ করিবার জন্য সেই সকল সাধ পূর্ণ করা কর্ত্তব্য। সুশ্রুতে লিখিত আছে।

"লব্ধদৌহৃদা হি বীর্য্যবন্তং চিরায়ুষঞ্চ পুত্রং জনয়তি..." "সা প্রাপ্তদৌহৃদা পুত্রং জনয়েত গুণান্বিতং।"

অন্তঃসত্ত্বা নারীর অভিলাষ পূর্ণ হইলে বীর্য্যবান্ দীর্ঘায়ু ও গুণবান্ সন্তান জন্মিয়া থাকে। দোহদ না দেওয়ার দোষ বলিতে গিয়া সুশ্রুত বলিয়াছেন—

"অলব্ধদৌহৃদা গর্ভে লভেতাত্মনি বা ভয়ং।
যেষু যেষ্বিন্দ্রিয়ার্থেষু দৌহৃদে বৈ বিমাননা।
প্রজায়েত সুতস্যার্ত্তি স্তস্মিংস্তস্মিংস্তথেন্দ্রিয়ে।"
"দৌহৃদ-বিমাননা কুব্জং কুণিং খঞ্জং জড়ং
বামনং বিকৃতাক্ষমনক্ষং বা সুতং জনয়তি"

যথোপযুক্ত সময়ে গর্ভিণীর অভিলাষ পূর্ণ না করিলে গর্ভবিষয়ে এবং আত্মবিষয়ে তাহার ভয় (আন্তরিক বিপর্য্যয়) হয়। গর্ভবতী রমণীর যে যে ইন্দ্রিয়ের কামনা পূর্ণ না হয়, সন্তানের সেই সেই ইন্দ্রিয়ের পীড়া জন্মিয়া থাকে এবং তাহাতে সেই ভগ্নমনোরথা গর্ভিণী কুব্জ (কুজো) কুণি (নখরোগাক্রান্ত) খঞ্জ (খোঁড়া) জড় (বোকা, হাবা) বামন (খর্ব্ব) বিকৃতাক্ষ (টেরা) অথবা অনক্ষ (অন্ধ) সন্তান প্রসব করিয়া থাকে।

মহর্ষি চরকের "বিমাননে হ্যস্য দৃশ্যতে বিনাশো বিকৃতির্ব্বা" দৌহৃদের অবমাননা করিলে গর্ভের বিনাশ ও বিকৃতি দেখা যায় এই বচনের দ্বারা তিনি যেন স্বয়ং ঐরূপ ব্যাপদ্ যোগপ্রত্যক্ষ বা অক্ষি গোচর করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন—

"প্রার্থনাসন্ধারণাদ্ধি বায়ুঃ কুপিতোঽন্তঃ শরীর মনুচরন্ গর্ভস্যাপদ্যমানস্য বিনাশং বৈরূপ্যং বা কুর্য্যাৎ"

গর্ভিণীর প্রার্থনা ভঙ্গ করিলে তাহার বায়ু

কুপিত হইয়া গর্ভশরীরে বিচরণ পূর্ব্বক গর্ভের বিকৃতি এমন কি বিনাশ পর্য্যন্ত সাধন করিয়া থাকে। এতদ্দ্বারা মহর্ষি দোহদাভাব জনিত মহা অশুভের সূক্ষ্ম কারণও নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

বস্তুতঃ এস্থলে আমরা প্রথমতঃ স্থূলভাবে বিবেচনা করিলেও দেখিতে পাই যে, মানবের আন্তরিক বৃত্তিগুলি ইন্দ্রিয় সমূহের দ্বারাই প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। ঐরূপ প্রকাশের সময় ইন্দ্রিয়গণের সঙ্কোচ বিকাশ প্রভৃতি নিজ নিজ ক্রিয়া (ব্যায়াম) হওয়াও স্বাভাবিক। যখন আমরা আমাদের হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়গণের কোন একটীকে দিন কয়েক কোনরূপ কার্য্যের অবসর না দিয়া আবদ্ধ রাখিলে, তাহার অনিয়ত বৈকল্য এবং শক্তি হীনতা উপলব্ধি করি, তখন ভ্রূণের তথাকথিত বৃত্তির স্ফুরণের অভাবে যে তাহার অবয়ব-বৈকল্য হইবে কিম্বা তৎবিপরীতে পূর্ণতা লাভ করিবে সে বিষয়ে আশ্চর্য্য কি? দ্বিতীয়তঃ আরও একটু অগ্রসর হইয়া সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করিলে দেখা যায়, যে মানবের আকাঙ্ক্ষাগুলি যখন তাহার আন্তরিক অভাব মূলক এবং সেই আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতায় যখন আন্তরিক পূর্ণতা ও পরিতৃপ্তি ঘটে, তখন সেই পরিতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়গণেরও যে পরিতৃপ্তি এবং পরিপুষ্টি সাধিত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

গর্ভস্থ জীবের শুভাশুভ যেখানে দোহদের উপর এতটা নির্ভর করে সেখানে বীর্যবান্ দীর্ঘায়ু ও বহুগুণান্বিত সন্তান লাভে কোন ব্যক্তিরই পক্ষে দৌহৃদিনীর আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখা সঙ্গত নহে। অধিক কি দৌহৃদিনীর আকাঙ্ক্ষা ভঙ্গজনিত দুঃখোৎপাদনের ভয়ে চরক—"তীব্রায়াং খলু প্রার্থনায়াং কাম মহিত মপ্যৈ হিনোপসংহিতং দদ্যাৎ" বলিয়া তীক্ষ্ণবীর্য্য অহিতকর দ্রব্যাদিও গর্ভিণীকে হিতকারী দ্রব্যের সংযোগে দিতে অনুমোদন করিয়াছেন। কেবল দৌহৃদিনীরা প্রার্থনার (অর্থাৎ গর্ভবতী নারী চতুর্থ মাস হইতে যাহা প্রার্থনা করে তাহার) অপূরণ যে গর্ভস্থ সন্তানের পক্ষে অশুভকর তাহা নহে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গর্ভিণীর সহিত যখন গর্ভের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন ইহাতে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিতেছে যে, গর্ভাবস্থার যে কোন সময় গর্ভিণীর ইচ্ছা পূর্ণ না করিলে গর্ভস্থিত সন্তানের স্বাস্থ্য, বল, ইন্দ্রিয় ও আয়ুর বিঘ্ন ঘটিবে এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কেবল গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর হিতাহিত অনুষ্ঠানের সহিত গর্ভস্থিত শিশুর হিতাহিতের যে সম্বন্ধ আছে তাহা নহে, এমন কি গর্ভাধানের পূর্ব্বে, রজঃস্বলা নারীর কৃতকার্য্যের ফল পর্য্যন্ত তাহার পুত্রকে ভোগ করিতে হয়। আচার্য্য বলিয়াছেন—ঋতুবতী নারীর অশ্রুপাতে সন্তান বিকৃত চক্ষু, দিবানিদ্রায় নিদ্রালু, অঞ্জন প্রয়োগে অন্ধ, স্নানানুলেপনে দুঃখশীল এবং তৈলমর্দ্দনে কুষ্টরোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। অতএব গর্ভাবস্থায় যে কোন সময়েই বিশেষতঃ দৌহৃদিনী বস্থায় গর্ভিণীর অভিলাষ অপূর্ণ রাখিবে না। কে বলিতে পারে যে, কন্যা-গৃহ হইতে রাজর্ষি জনকের স্বদেশ গমনের পরে পিতৃবিয়োগ-বিধুরা গর্ভিণী সীতার একমাত্র চিত্তবিনোদের জন্যই বুদ্ধিমান্ লক্ষ্মণ চিত্রদর্শনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন না?

বহুকাল হইতে এই দোহদদানের প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে বটে কিন্তু দেখিতে পাই, অধুনা ধনী-দরিদ্র প্রায় সকলেই

ইহার বিধি-নিষেধের বন্ধন শিথিল করিয়া দিয়াছেন। অঙ্গুলী-সংখ্যেয় ধনিগণ বিলাসের অধীন হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক যানারোহণ, দিবা-নিদ্রা, রাত্রিজাগরণ প্রভৃতি গর্ভিণীর কয়েকটী বর্জ্জনীয় বিষয়ের অনুষ্ঠান করাইতেছেন, এজন্য তাঁহাদিগের সন্তানগণের মধ্যে সংপ্রতি ভগ্নস্বাস্থ্যের সংখ্যা অধিক দৃষ্ট হয়। অবশিষ্ট লোক দারিদ্র্যের কঠোর নিপীড়নে ইচ্ছা সত্ত্বেও বিধিগুলির অধিকাংশ পালন করিতে পারিতেছে না। এই নিমিত্ত তাঁহাদের সন্তানদিগের মধ্যে ক্ষীণ, বিকৃত ও অপূর্ণাঙ্গের পরিমাণ অধিক হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিক সমাজকে উন্নত করিতে হইলে ও সমাজের প্রধান অঙ্গীভূত সন্তানগণের দীর্ঘায়ু, বল ও গুণগ্রাম কামনা করিলে সকলেরই এই বিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত।

কবিরাজ

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ।

হরীতকী।

হরীতকী সকলের নিকটেই সুপরিচিত। তবে আজকাল কেবল সুপরিত এই মাত্র। পূর্ব্বে হরীতকী আর্য্যজাতির অস্থি মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছিল। আজিও যাগ, যজ্ঞ, ব্রতাদিতে হরীতকীর ব্যবহার তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই স্বচ্ছন্দ-বনজাত অনায়াসলভ্য ফলগুলির কি এত গুণ আছে, যাহাতে আর্য্য-জাতি সে গুলিকে এতাদৃশ সমাদর করিতেন? গুণ না থাকিলে ত কাহার আদর হয় না! এই প্রবন্ধে আমরা হরীতকীর গুণ নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাইব। তবে তাহার পূর্ব্বে হরীতকী আর্য্যজাতির নিকট কত সমাদর লাভ করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে দুই চারিটী প্রমাণ উদ্ধৃত করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

হরীতকীভুঙ্ক্ষ্ব রাজন্ মাতেব হিতকারিণী।
কদাচিৎ কুপ্যতে মাতা নোদরস্থা হরীতকী॥

অনুবাদ।—হে রাজন্ হরীতকী ভক্ষণ করুন, উহা মাতার ন্যায় হিতকারিণী। মাতাও কদাচিৎ কুপিতা হইয়া থাকেন, কিন্তু উদরস্থ হরীতকী কখন কুপিত হয় না। অপিচ,

পীযূষং পিবতস্ত্রিবিষ্টপপতের্যে বিন্দবো নির্গতা
স্তেভ্যোঽভূদভয়া দিবাকরকরশ্রেণীব দোষাপহা
কালিন্দীব বলপ্রমোদজননা গৌরীব শূলি-প্রিয়া
বহ্নিদ্যোতকরী ঘৃতাহুতিরিব ক্ষৌণীব নানারসা॥

অনুবাদ।—স্বর্গের পতি (ইন্দ্র) অমৃত পান করিবার সময় যে অমৃতবিন্দু পতিত হইয়াছিল, তাহা হইতে হরীতকী উৎপন্ন হয়। ইহা সূর্য্যালোকের ন্যায় দোষনাশক, যমুনার ন্যায় বল ও প্রমোদজনক, গৌরীর ন্যায় মহাদেবের প্রিয়, ঘৃতাহুতির ন্যায় অগ্নিবর্দ্ধক এবং পৃথিবীর ন্যায় নানারসাত্মক। অন্যচ্চ,—

হরস্য ভবনে জাতা হরিতা চ স্বভাবতঃ।
হরতে সর্ব্বরোগাংশ্চ তেন নাম্না হরীতকী॥

অনুবাদ।—হরের (মহাদেবের) ভবনে জাত, স্বভাবতঃ হরিদ্বর্ণ এবং সর্ব্বরোগ হরণ করে বলিয়া হরীতকী নাম হইয়াছে।

হরীতকীর গুণ সম্বন্ধে বাগ্‌ভটে লিখিত হইয়াছে।—

কষায়া মধুরা পাকে রুক্ষা বিলবণা লঘু।
দীপনী পাচনী মেধ্যা বয়সঃ-স্থাপনী পরা॥

উষ্ণবীর্য্যা সরায়ুষ্যা বুদ্ধীন্দ্রিয় বলপ্রদা।
কুষ্ঠবৈবর্ণ্যবৈস্বর্য্যপুরাণবিষমজ্বরান্॥
শিরোঽক্ষি-পাণ্ডুহৃদ্রোগকামলা-গ্রহণীগদান্।
সশোষশোথাতিসারমেদমোহবমিক্রিমীন্॥
শ্বাসকাসপ্রসেকার্শঃপ্লীহ.নাহগরোদরম্।
বিবন্ধং স্রোতসাং গুল্মমূরুস্তম্ভমরোচকম্॥
হরীতকী জয়েদ্ব্যাধীংস্তাংস্তাংশ্চ কফবাতজান্।

অনুবাদ।—হরীতকী কষায় রস, পাকে মধুর* রুক্ষ, লবণ রসবিহীন (অন্য পঞ্চরস বিশিষ্ট) লঘু, অগ্নিদীপক, পাচক, মেধাবর্দ্ধক, পরমায়ু বর্দ্ধক, পরম বয়ঃ-স্থাপক (যৌবনকে দীর্ঘস্থায়ী করে), উষ্ণবীর্য্য, সারক, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সমূহের বলপ্রদ এবং কুষ্ঠ, বিবর্ণতা, বিস্বরতা, পুরাতন জ্বর, বিষম জ্বর, শিরোরোগ, চক্ষুরোগ, পাণ্ডু, হৃদ্রোগ, কামলা, গ্রহণীরোগ, শোষ, শোথ, অতিসার, মেদ, মোহ, বমি, ক্রিমি, শ্বাস, কাস, মুখ দিয়া জল উঠা, অর্শ, প্লীহা, আনাহ, বিষদোষ, উদররোগ, স্রোত সকলের বিবদ্ধতা, গুল্ম উরুস্তম্ভ, অরুচি ও কফবাতজ রোগ নাশক।

অন্যচ্চ—

চর্ব্বিতা বর্দ্ধয়ত্যগ্নিং পেষিতা মলশোধিনী।
স্বিন্না সংগ্রাহিণী পথ্যা ভৃষ্টা প্রোক্তা
ত্রিদোষনুৎ।
উন্মিলিনী বুদ্ধি-বলেন্দ্রিয়াণাম্।
নির্ম্মূলিনী পিত্তকফানিলানাম্।
বিসর্জ্জিনী মূত্রশকৃন্মলানাম্।
হরীতকী স্যাৎ সহ ভোজনেন।
অন্নপানকৃতা ন্ দোষান্ বাতপিত্ত-
কফোদ্ভবান্।

হরিতকী হরত্যাশু ভুক্তান্তোপরিযোজিতা।
লবণেন কফংহন্তি পিত্তঃহন্তি সশর্করা
ঘৃতেন বাতজান্ রোগান্ সর্ব্বরোগান্
গুড়ান্বিতা।

অনুবাদ।—হরীতকী চর্ব্বণ করিয়া খাইলে অগ্নি বৃদ্ধি হয়, পেষণ করিয়া খাইলে কোষ্ঠশুদ্ধি হয়, সিদ্ধ করিয়া খাইলে মল সংগ্রহ (তরল মল গাঢ়) হয় এবং ভাজিয়া খাইলে ত্রিদোষ নষ্ট হয়। খাদ্যের সহিত হরিতকী সেবন করিলে বুদ্ধি, বল ও ইন্দ্রিয়শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, পিত্ত, কফ ও বায়ু নষ্ট হয় এবং মল মূত্রাদি (শরীরের অন্যান্য মল—Excretion) নির্গত হয়। আহারের পর হরিতকী সেবন করিলে অন্নপানকৃত দোষ নষ্ট হয় (অর্থাৎ ভুক্ত অন্ন দূষিত হইয়া কোন প্রকার পীড়া উৎপাদন করিতে পারে না) এবং বায়ু, পিত্ত ও কফের দোষ (বিকৃতি) নষ্ট হয়। হরিতকী লবণের সহিত সেবন করিলে কফরোগ, চিনির সহিত সেবন করিলে পিত্তজ রোগ, ঘৃতের সহিত সেবন করিলে বাতজ রোগ এবং গুড়ের সহিত সেবন করিলে সমস্ত রোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

হরিতকী এবংবিধ গুণযুক্ত হইলেও স্থল বিশেষে হরিতকী প্রয়োগ নিষিদ্ধ। যথা—

তৃষ্ণায়াং মুখশোষেচ হনুস্তম্ভে গলগ্রহে।
নবজ্বরে তথা ক্ষীণে গর্ভিণ্যাং ন প্রশস্যতে॥

অনুবাদঃ—তৃষ্ণা রোগে, মুখ শোষে, হনুস্তম্ভে (Lock jaw), গলগ্রহে (Wry-neck) ও নবজ্বরে এবং ক্ষীণ ব্যক্তি ও গর্ভিণীর পক্ষে হরীতকী প্রশস্ত নহে।

শাস্ত্রে সাত প্রকার হরীতকী এবং তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহারের উল্লেখ আছে। যথা—

* পাক বা বিপাক, রস, বীর্য্য, প্রভাব প্রভৃতির বিষয় এবং আয়ুর্ব্বেদোক্ত অন্যান্য পারিভাষিক সংজ্ঞার অর্থ বনৌষধি দর্পণের দ্বিতীয় খণ্ডে দেখুন।

বিজয়া রোহিণী চৈব পূতনা চ মৃতাভয়া।
জীবন্তী চেতকী চেতি পথ্যায়াঃ সপ্ত জাতয়ঃ॥
অলাবুবৃত্তা বিজয়া বৃত্তা সা রোহিণী স্মৃতা।
পূতনাস্থিমতী সূক্ষ্মা কথিতা মাংসলামৃতা॥
পঞ্চ-রেখাভয়া প্রোক্তা জীবন্তী স্বর্ণবর্ণিনী।
চেতকী চাসিতা ক্ষুদ্রা সপ্তানামিয়মাকৃতিঃ॥
বিজয়া সর্ব্বরোগেষু রোহিণী ব্রণরোহিণী।
প্রলেপে পূতনা যোজ্যা শোধনার্থেঽমৃতা হিতা॥
অক্ষিরোগেঽভয়া শস্তা জীবন্তী সর্ব্বরোগহৃৎ।
চূর্ণার্থে চেতকী শস্তা যথাযুক্তং প্রযোজয়েৎ॥

অনুবাদ।—বিজয়া, রোহিণী, পূতনা, অমৃতা, অভয়া, জীবন্তী ও চেতকী ভেদে হরীতকী সপ্ত জাতীয়। তন্মধ্যে **বিজয়া** অলাবুবৎ গোলাকার, **রোহিণী** গোলাকার, **পূতনা** সূক্ষ্ম এবং বৃহৎ অস্থি (আঁটি) যুক্ত, **অমৃতা** মাংসল (প্রচুর শস্যযুক্ত), **অভয়া** পঞ্চ রেখাযুক্ত, **জীবন্তী** স্বর্ণের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট এবং **চেতকী** ক্ষুদ্র ও কৃষ্ণবর্ণ। সমস্ত রোগে বিজয়া, ব্রণ রোপণার্থ (ঘা শুকান) রোহিণী, প্রলেপ কার্য্যে, পূতনা শোধনার্থে, অমৃতা চক্ষুরোগে, অভয়া, সর্ব্বরোগে জীবন্তী এবং চূর্ণ ঔষধে চেতকী ব্যবহার্য্য।

হরীতকীর সাত প্রকার ভেদের উল্লেখ থাকিলেও অধুনা কেহ সে বিষয়ে লক্ষ্য করেন না এবং তাহার ফলে এ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানও অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়িয়াছে। যখন এদেশে যজ্ঞে, ব্রতে, খাদ্যে, ঔষধে হরীতকী ব্যবহৃত হইত, তখন আমাদের দেশে হরীতকী বৃক্ষ যত্নপূর্ব্বক পালিত হইত। যে কোন উদ্ভিদ্ যত্ন সহকারে পালিত হইলে তাহার ফলের আকার ও গুণগত অনেক উন্নতি দৃষ্ট হয়—তিক্ত, ক্ষুদ্র, বীজবহুল নিতান্ত হীন-শস্য বন্য পটোল, দীর্ঘকাল সযত্ন-পালিত হইয়া সুস্বাদু উত্তম পটোলে পরিণত হইয়াছে। হরীতকী সম্বন্ধেও এই কথা। অধুনা এদেশে হরীতকী বৃক্ষ সযত্নে পালিত না হওয়ায়, দীর্ঘকালের অযত্নে, সুবৃহৎ, মাংসল হরীতকী এইরূপ ক্ষুদ্র, হীন-শস্য হরীতকীতে পরিণত হইয়াছে। এবং ইহার অনেক জাতি বিলুপ্ত হইয়াছে। অধুনা বাজারে যে হরীতকী বিক্রীত হয়, তন্মধ্যে বিভিন্ন আকারের হরীতকীও দেখা যায়। বোধ হয় শাস্ত্রোক্ত লক্ষণের সহিত মিলাইয়া শাস্ত্রোপদেশ অনুসারে সেইগুলিকে প্রয়োগ করিলে অধিকতর ফল পাওয়া যাইতেও পারে। অধুনা যাহা জঙ্গী হরীতকী নামে প্রসিদ্ধ তাহা শাস্ত্রোক্ত চেতকী বলিয়া বোধ হয়।

হরীতকীর উৎকর্ষ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—

নবা স্নিগ্ধা ঘনা বৃত্তা গুর্ব্বী ক্ষিপ্তা চ চাম্ভসি।
নিমজ্জেৎ সা প্রশস্তা চ কথিতাতিগুণপ্রদা॥
নবাদি-গুণযুক্তত্বং তত্রৈকত্র দ্বিকর্ষতা।
হরীতক্যাঃ ফলে যত্র দ্বয়ং তৎ শ্রেষ্ঠমুচ্যতে॥

অনুবাদ:—নূতন, স্নিগ্ধ, ঘন (শস্যবহুল) গোলাকার, গুরু এবং যাহা জলে ফেলিলে ডুবিয়া যায় এইরূপ হরীতকীই ফলপ্রদ।

উপরোক্ত নূতন প্রভৃতি গুণযুক্ত হইলে অথবা একটী হরীতকী চারিতোলা হইলে এই দুই প্রকার হরীতকী শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে।

এক্ষণে আমরা ভিন্ন ভিন্ন রোগে আয়ুর্ব্বেদোক্ত হরীতকী প্রয়োগের বিষয় উল্লেখ করিব।

হরীতকী চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে বিষম জ্বর নষ্ট হয় (চক্রদত্ত)। তিল তৈল, ঘৃত কিংবা মধুর সহিত হরিতকী সেবন করিলে কণ্ঠদাহ নামক সন্নিপাত জ্বর নষ্ট হয় (ভাবপ্রকাশ)। অতিসার রোগীর উদরে যন্ত্রণা থাকিলে এবং অল্প অল্প বিবদ্ধ মল নির্গত

হইলে হরিতকী ও পিপুল চূর্ণ বাটিয়া উষ্ণজল সহ সেবন করাইয়া বিরেচন করাইবে (চক্রদত্ত)। উষ্ণজলের সহিত হরিতকী সেবন করিলে অতিসারের আমদোষ নষ্ট হয় (চরক)। মধুর সহিত হরিতকী সেবন করিলে অগ্নি বর্দ্ধিত হয় ও আম পরিপাক পায়। ইহা শূলযুক্ত অতিসারে প্রশস্ত (বঙ্গসেন)। রক্তার্শ রোগীকে ভোজনের পূর্ব্বে গুড়ের সহিত হরিতকী সেবন করাইবে। গুড় ও হরিতকী সেবন করিলে পিত্ত ও শ্লেষ্মা নষ্ট হয় এবং কচ্ছ, কণ্ডূ, বেদনা ও অর্শ নষ্ট হয়। ঘৃত ভর্জ্জিত হরিতকী গুড় ও পিপুলের সহিত কিংবা তেউড়ী ও দন্তী মূলের সহিত সেবন করিলে বায়ুর অনুলোম হইয়া অর্শ নষ্ট হয় (চক্রদত্ত)। গোমূত্রে হরিতকী ভিজাইয়া পরদিন সেই হরিতকী সেবন করিলে অর্শ নষ্ট হয় (বাগ্‌ভট)। হরীতকী বাটিয়া গুড়, শুঠ চূর্ণ বা সৈন্ধব লবণ সহ সেবন করিলে অগ্নি বৃদ্ধি হয়। গুড়ের সহিত নিত্য হরিতকী সেবন করিলে আমাজীর্ণ অর্শরোগ এবং মলবদ্ধতা নষ্ট হয় (চক্রদত্ত)। হরিতকী গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া গোমূত্র সহ বাটিয়া খাইলে. কফজ পাণ্ডুরোগ নষ্ট হয় (চরক)। হরিতকী চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে উহা পাচক ও অগ্নিদীপক হয় বলিয়া কফজ রক্তপিত্ত, শূল ও অতিসার নষ্ট হয় (চক্রদত্ত)। হরিতকী চূর্ণ বাসকের রসে সাত দিন ভাবনা দিয়া পিপুল ও মধুসহ সেবন করিলে প্রবল রক্তপিত্ত নষ্ট হয় (হারীত)। হরিতকীর সহিত সম পরিমাণ শুঁঠ পেষণ করিয়া উষ্ণ জলসহ সেবন করিলে শ্বাস ও হিক্কা নষ্ট হয় (চক্রদত্ত)। উষ্ণ জলের সহিত হরিতকী চূর্ণ সেবন করিলে হিক্কা নষ্ট হয় (সুশ্রুত)। হরিতকীর সহিত সম পরিমাণ শুঁঠ বা পিপুল মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে স্বরভেদ নষ্ট হয় (চক্রদত্ত)। (ক্রমশঃ)

উন্মত্ত কুক্কুরাদির বিষলক্ষণ ও চিকিৎসা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তারপর উন্মত্ততা জনক ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া সুশ্রুত বলিতেছেন—

"করোত্যন্যান্ বিকারাংস্তু
তস্মিন্ জীর্য্যতি চৌষধে।
বিকারাঃ শিশিরে স্থাপ্যা
গৃহে বারিবিবর্জ্জিতে॥
ততঃ শান্তবিকারস্তু স্নাত্বা
চৈবাপরেঽহনি।
শালি ষষ্টিকয়োর্ভক্তং
ক্ষীরেণোষ্ণেন ভোজয়েৎ॥
(সুশ্রুত ঐ)

সেবিত ঔষধ পরিপাক পাইবার সময় হইতে রোগি-শরীরে অন্য কতকগুলি বিকার প্রকাশ পাইবে। এ বিকারগুলি কি সুশ্রুত বলেন নাই। আমরা চক্রদত্ত কথিত শেষোক্ত ধুতুরাঘটিত ঔষধ সেবন করাইয়া দেখিয়াছি দষ্টব্যক্তি ঠিক পাগলের মত আচরণ করে—সে লোককে মারিতে যায়, হাসে, কাঁদে, গান করে, চক্ষু রক্তবর্ণ ও চাহনি ব্যাকুলের মত হয়। এইরূপ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য? সুশ্রুত বলিতেছেন—ঔষধ খাওয়াইয়া রোগীকে ঠাণ্ডা ঘরে রাখিবে। সে ঘরে যেন জলের সম্পর্কও না

থাকে। পরদিন তাহাকে স্নান করাইয়া ভাল দাদখানি চাউলের ভাত এবং দুধ খাইতে দিবে। ঔষধ সেবনের দিন সুশ্রুত রোগীর স্নান আহারের কথা কিছু বলেন নাই; সুতরাং অস্নাত রাখা ও উপবাস দেওয়াই বোধ হয় তাঁহার অভিপ্রেত। উপবাস দিলে ঔষধের ক্রিয়াও তীব্রতরভাবে প্রকাশ পাইতে পারে—ইহা আরোগ্যের পক্ষেও অনুকূল বটে, কিন্তু আজকাল লোকের আর সেরূপ বল নাই; সুতরাং ঔষধ সেবন-দিনেই ঠাণ্ডা জলে স্নান, পান্তা ভাত, তেঁতুল গোলা জল, ডাব প্রভৃতি খাইতে দেওয়া হয়। ঔষধ সেবনের ২।৩ দিন পরে রোগীকে সুস্থ হইতে দেখা গিয়াছে এবং জীবনে তাহার আর কখনও বিষলক্ষণ প্রকাশ পায় নাই।

সুশ্রুত অতঃপর বলিতেছেন—

"দিনত্রয়ে পঞ্চমে বা বিধিরেষোঽর্দ্ধমাত্রয়।
কর্ত্তব্যো ভিষজাবশ্য মলর্ক-বিষনাশনঃ।"

তিন দিন কিম্বা পাঁচ দিনের দিন আবার অর্দ্ধ মাত্রায় ঐ ঔষধ অবশ্য প্রয়োগ করিবে। আজকাল সাধারণতঃ একবার দিলেই যথেষ্ট, কিন্তু যদি রোগী সম্যক্ উন্মত্ত না হয়, তাহা হইলে গুপ্ত বিষের সম্যক্ প্রকোপ জন্য দ্বিতীয় বার ঔষধ প্রয়োগের প্রয়োজন হইতে পারে।

এখন সুশ্রুতোক্ত দ্বিতীয় যোগটী যাহা বমনও বিরেচনকারী তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সুশ্রুত বলিয়াছেন—

"দদ্যাৎ সংশোধনং তীক্ষ্ণমেবং স্নাতস্য দেহিনঃ।
"অশুদ্ধস্য সুরূঢ়েঽপি ব্রণে কুপ্যতি তদ্বিষম্॥"

যাহার শরীর উত্তমরূপ শোধন করা হয় নাই, তাহার দংশনের ক্ষত সম্পূর্ণ আরাম হইলেও, বিষ কুপিত হইয়া থাকে, অতএব শোধন ঔষধ দিবে। বিরেচন, বমন দ্বারা শরীরের শোধন হয়, অতএব সুশ্রুতের দ্বিতীয় যোগটী প্রয়োগের আবশ্যকতা দৃষ্ট হইতেছে।

ব্রণ-চিকিৎসা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

"ষন্মূলোঽষ্ট-পরিগ্রাহী পঞ্চ লক্ষণ-লক্ষিতঃ।
ষষ্ঠ্যা বিধানৈ নির্দ্দিষ্টৈ শ্চতুর্ভিঃ সাধ্যতে ব্রণঃ॥"*

সুশ্রুত—চিঃ ১মঃ অঃ

যে যে উপায় অবলম্বন করিয়া ব্রণ-শোথ, ব্রণ এবং ব্রণ-বিকৃতি চিকিৎসা করিতে হয় তৎসমুদয়কে ব্রণোপক্রম বলে।

অপতর্পণ, আলেপ, পরিষেক, অভ্যঙ্গ, স্বেদ, বিম্লাপন, উপনাহ, পাচন, বিস্রাবণ, স্নেহ, বমন, বিরেচন, ছেদন, দারণ, লেখ্য, এষণ, আহরণ, ব্যধন, সীবন, সন্ধান, পীড়ন শোণিতাস্থাপন, নির্ব্বাপণ, উৎকারিকা, কষায় বর্ত্তি, কল্ক, সর্পি, তৈল, রসক্রিয়া, অবচূর্ণন, ব্রণধূপন, উৎসাদন, অবসাদন, মৃদুকর্ম্ম, দারুণ কর্ম্ম, ক্ষারকর্ম্ম, অগ্নিকর্ম্ম, কৃষ্ণকর্ম্ম, পাণ্ডুকর্ম্ম,

* বায়ু, পিত্ত, কফ, শোণিত, সন্নিপাত অর্থাৎ দুই বা তিন দোষের সমবায় এবং আগন্তু এই ছয়টী ব্রণের মূল অর্থাৎ কারণ, এই জন্য ব্রণরোগ ষন্মূল। ত্বক্, মাংস শিরা, স্নায়ু, সন্ধি, অস্থি, কোষ্ঠ এবং মর্ম্ম এই আটটী স্থান পরিগ্রহ অর্থাৎ আশ্রয় করিয়া ব্রণ-রোগ উৎপন্ন হয় এই জন্য ব্রণ রোগ অষ্ট পরিগ্রাহী। বাত, পিত্ত, কফ, দুই দোষের বা তিন দোষের সংঘাত এবং আগন্তু লক্ষণোপলক্ষণ-লক্ষিত বলিয়া ব্রণ রোগকে পঞ্চলক্ষণ লক্ষিত বলে।

প্রতিসারণ, রোমসঞ্জনন, লোমাপহরণ, বস্তি-কর্ম্ম, উত্তর বস্তিকর্ম্ম, বন্ধ, পত্রদান, ক্রিমিঘ্ন, বৃংহণ, বিষঘ্ন, শিরোবিরেচন, নস্য, কবলধারণ ধূম, মধু, সর্পি, যন্ত্র, আহার এবং রক্ষাবিধান ভেদে ব্রণোপক্রম ষাট প্রকার।

সাত প্রকার প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত চিকিৎসকেরা উক্ত ষষ্টি-সংখ্যক উপক্রম ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে অবলম্বন করিয়া থাকেন। তজ্জন্য বোধ সৌকর্য্যার্থে তৎসমুদয়কে বিম্লাপন, অবসেচন, উপনাহ, পাটন, শোধন, রোপণ এবং বৈকৃতাপহ এই সাতটী ক্রমে বিভাগ করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

উক্ত সাত প্রকার ক্রমের মধ্যে বিম্লাপন, অবসেচন, উপনাহ এবং পাটন, আম, পাচ্যমান এবং পক্বশোথ বিষয়ক। শোধন এবং রোপণ ব্রণ বিষয়ক। ব্রণ আরোগ্য হইলে, ব্রণ-পদে যদি কোন প্রকার বিকৃতি রহিয়া যায়, তাহা হইলে সেই বিকৃতি শান্তির জন্য, বৈকৃতাপহ ক্রম অবলম্বন করিতে হয়।

আদৌ ব্রণ-শোথ শান্তির উপক্রম অবলম্বন করা উচিত। শোথের অবস্থা বিশেষে বিশিষ্ট-ক্রমে অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা করিতে হয়। সেই কারণে ব্রণ শোথ এবং ব্রণ রোগের চিকিৎসা বলিবার পূর্ব্বে ব্রণ শোথের আবশ্যিক ভেদ বলা যাইতেছে।

পূর্ব্বে বাতাদি ভেদে ছয় প্রকার শোথের লক্ষণ বলা গিয়াছে। আম, পচ্যমান এবং পক্ব-ভেদে সেই সমস্ত শোথের অবস্থা ভিন্ন প্রকার।

মন্দোষ্ণতা, ত্বক্‌সবর্ণতা, শীতশোফতা, স্থৈর্য্য অর্থাৎ কঠিনতা, মন্দবেদনতা এবং অল্পশোফতা আম ব্রণশোথের লক্ষণ।

আম-শোথ উপেক্ষা করিলে, কিংবা দোষ-বাহুল্যহেতু, বিধিবিহিত চিকিৎসায় শোথ বিলীন না হইলে, শোথ পরিবর্দ্ধিত হইয়া জলপূর্ণ বা বাতপূর্ণ চর্ম্ম পুটকের আকার ধারণ করে। শোথযুক্ত স্থানের বর্ণবিপর্য্যয় ঘটে—লাল বা কাল কিংবা পীতরঙ্গে রঞ্জিত হয়। ব্যাধিত স্থলে নানা প্রকার যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়া রোগীকে আকুল করিয়া তুলে। সমস্ত শরীরেও অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভূত হইতে থাকে এবং জ্বর, দাহ, পিপাসা এবং অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই সময় প্রদুষ্ট বায়ু, পিত্ত, কফ যুগপৎ স্থান সংশ্রয় করিয়া পাক আরম্ভ করে। শোথের এইরূপ অবস্থার নাম পচ্য-মানাবস্থা।

শোথের তৃতীয়াবস্থার নাম পক্বাবস্থা। এই অবস্থায় শোথের উৎসেধ কমিয়া যায়। শোথযুক্ত স্থানটী পাণ্ডুশ্রী ধারণ করে এবং কণ্ডূতিগ্রস্ত হয় অর্থাৎ চুলকাইতে থাকে। শোথের পার্শ্বে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া মার্জ্জনা করিলে সোয়াস্তি বোধ হয় এবং পূয়নিঃসরণের ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে। শোথের একপ্রান্তে একটী অঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করতঃ, অপর প্রান্তে অঙ্গুষ্ঠান্তর দ্বারা ধীরে ধীরে পীড়ন করিলে, জলপূর্ণ চর্ম্ম-পুটকে জলসঞ্চারবৎ পূয়সঞ্চার অনুভূত হইতে থাকে শোথের পক্বাবস্থায় জ্বরাদি উপদ্রব প্রশমিত হয়।

অতঃপর বাতাদি দোষভেদে ব্রণ-লক্ষণ বলা যাইতেছে—

বাতজন্য ব্রণ—শ্যাব বা অরুণবর্ণ; অগভীর উষ্ম-বিহীন; পিচ্ছিল, অল্পস্রাবী;

অপতর্পণাদি ষষ্টিসংখ্যক বিধান অবলম্বন করিয়া ব্রণ চিকিৎসা করিতে হয়, এই নিমিত্ত ব্রণকে ষষ্টি-বিধান নির্দ্দিষ্ট রোগ বলে। পরন্ত উপযুক্ত চিকিৎসক, গুণবদ্ দ্রব্য, কর্ম্মকুশল পরিচারক এবং আত্মবান্ রোগী না হইলে চিকিৎসা কার্য্য চলে না এই জন্য ব্রণরোগ

অস্নিগ্ধ; চট্‌চটায়নশীল; স্ফুরণ, আয়াম, তোদ, ভেদ বেদনা বহুল এবং মাংসোপচয় পরিহীন।

পিত্তজব্রণ—ক্ষিপ্রজ অর্থাৎ অতি-শীঘ্র ব্রণের সঞ্চার হয়। পিত্তজ ব্রণ নীলাভ বা পীতাভ, দাহ পাকরাগ বিকারী এবং পীতবর্ণ পীড়কা জুষ্ট। পিত্তজব্রণ হইতে রক্তবর্ণ এবং উষ্ণ আস্রাব নিঃসৃত হইতে থাকে।

কফজব্রণ—ব্রণ নিরন্তর উগ্রকণ্ডু-বহুল, স্থূল, ঘন, কঠিন, সিরা ও স্নায়ুজালাবৃত, পাণ্ডুবর্ণ এবং মন্দবেদন। কফজব্রণ হইতে শীতল, গাঢ় এবং পিচ্ছিল আস্রাব নিঃসৃত হইতে থাকে।

রক্তজন্যব্রণ—প্রবালের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট, কৃষ্ণ-স্ফোট পীড়কাবৃত, তীক্ষ্ণক্ষার গন্ধি, সবেদন, ধূমায়নশীল এবং রক্তস্রাবী। রক্তজব্রণে পিত্তজব্রণের লক্ষণ ও বিদ্যমান থাকে।

বায়ু-পিত্তজ—ব্রণ তোদ-দাহ যুক্ত এবং ধূমনির্গমবৎ অনুভূতি যুক্ত। এই ব্রণ হইতে পীত অরুণ বর্ণের আস্রাব নিঃসৃত হয়।

বাতশ্লেষ্মজব্রণ—কণ্ডূতি অর্থাৎ চুলকান বাতশ্লৈষ্মিক ব্রণের একটী বিশিষ্ট লক্ষণ। তোদ-বেদনা বিশেষ এবং কঠিনতা এই ব্রণের অপর দুইটী লক্ষণ। বাতশ্লেষ্মজ ব্রণ হইতে শীতল এবং পিচ্ছিল আস্রাব নিঃসৃত হয়।

পিত্তশ্লেষ্মজব্রণ—এই ব্রণ পাণ্ডু-বর্ণের আস্রাব স্রাবী, উষ্ণস্বভাব, দাহ যুক্ত এবং পীতাভ। গুরুত্ব ইহার অন্যতম লক্ষণ।

বাতরক্তজব্রণ—রুক্ষ, অগভীর অতিশয় বেদনা বিশিষ্ট, স্পর্শানুভূতি রহিত, অল্পপাক এবং অরুণ বর্ণের আস্রাব স্রাবী।

পিত্ত রক্তজন্য ব্রণ—এইব্রণ ঘৃতমণ্ডের ন্যায় বর্ণ এবং মাছ ধোয়া জলের ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট, কোমল এবং প্রসারণশীল। এই ব্রণ হইতে কৃষ্ণবর্ণ এবং উষ্ণ আস্রাব নিঃসৃত হয়।

শ্লেষ্ম-রক্তজ-ব্রণ—রক্তবর্ণ, গুরু, পিচ্ছিল, কণ্ডূযুক্ত, স্থির এবং রক্তযুক্ত পাণ্ডু-বর্ণের আস্রাব স্রাবী।

বাতপিত্ত-শোণিতজ ব্রণ—এই জাতীয় ব্রণ হইতে পীতবর্ণ তরল রক্ত স্রুত হয়। স্ফুরণ অর্থাৎ পুনঃ পুনশ্চলন (দপ্‌দপ করা) তোদ, দাহ এবং ধূমনির্গমবৎ অনুভূতি বাত-পিত্ত শোণিতজ ব্রণের অপরাপর লক্ষণ।

বাত-শ্লেষ্ম শোণিতজ ব্রণ—কণ্ডূযুক্ত, স্ফুরণশীল, চুমচুময়মান অর্থাৎ চিম্‌-চিমি জাতীয় বেদনা বিশিষ্ট এবং পাণ্ডু ঘন রক্তস্রাবী।

শ্লেষ্ম-পিত্ত শোণিতজ ব্রণ—দাহ, পাক, রক্তিমা এবং কণ্ডূযুক্ত শ্লেষ্ম-পিত্ত-শোণিতজ ব্রণ ও পাণ্ডু-ঘন রক্তস্রাবী।

বাত-পিত্ত-কফজ—অর্থাৎ সন্নি-পাতজ ব্রণে পৃথক্ দোষজ ব্রণের লক্ষণ, বেদনা এবং স্রাব বিদ্যমান থাকে।

বাত-পিত্ত-কফ শোণিত—ব্রণে অসহ্য দাহ বিদ্যমান থাকে। ক্ষত স্থানে মথনবৎ বেদনা অনুভূত হয়, এবং পুনঃ পুনঃ স্ফুরিত হইয়া যন্ত্রণা প্রদান করে। পাক রাগ, কণ্ডু এবং সুপ্তি অর্থাৎ স্পর্শ জ্ঞানের অভাব প্রভৃতি এই ব্রণের অপরাপর লক্ষণ।

ছয় প্রকার ব্রণশোথের লক্ষণ, শোথের আম, পচ্যমান, পক্কাবস্থা এবং চতুর্দ্দশ প্রকার ব্রণের লক্ষণ বলা হইল। অতঃপর ব্রণশোথ এবং ব্রণের চিকিৎসা বলা যাইতেছে।

ব্রণ-শোথ চিকিৎসা।

ব্রণ-শোথের লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই চিকিৎসার বিধান করা উচিত, উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। ব্রণ-শোথ চিকিৎসার প্রথম উপক্রম বিম্লাপন। যে সমস্ত উপক্রম অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা করিলে এক দেশোত্থিত শোথ বিলীন হইয়া যায় অর্থাৎ স্থান সংশ্রিত দোষ বা দোষ-সংঘাত তরল হইয়া রক্তস্রোতে মিলিয়া, রোমকূপ পথে বা শ্বাস পথে বা সর্ব্বপ্রকার মলায়ন দিয়া বাহির হইয়া যায় তাহার নাম বিম্লাপন। বিম্লাপন শব্দের একটী পারিভাষিক অর্থও আছে। সেই অর্থে শোথ বিলয়নের নিমিত্ত শোথযুক্ত স্থান অঙ্গুষ্ঠ, পাণিতল বা বেণুদল (বাঁশের কঞ্চি) দিয়া মর্দ্দন করা বুঝায়। সেই পারিভাষিক বিম্লাপন অন্যতম বিম্লাপন। বস্তুতঃ "বিম্লাপ্যতে অনেনেতি ব্যুৎপত্ত্যা বহিঃ-পরিমার্জ্জন-রূপে শমনে, শোথ-বিলয়ন-কর-প্রলেপ-পরিষেকাভ্যঙ্গদাবপি বর্ত্ততে"। ফলতঃ অচিরোত্থিত অবিদগ্ধ আমশোথ লয় করিবার জন্য পারিভাষিক বিম্লাপন এবং আর যে যে উপায় অবলম্বন করা হয় তাহার নাম বিম্লাপন।

ব্রণ-শোথ চিকিৎসায় দ্বিতীয় ক্রম—অবসেচন। জলোকাদি দ্বারা রক্তবিস্রাবণের নাম অবসেচন। ব্রণ-শোথযুক্ত স্থানে দোষ-হর কাথ আদি সেচন করাও অবসেচনোপক্রম।

তৃতীয় ক্রম—উপনাহ। শোথ পাকাইবার জন্য যে যে উপক্রম অবলম্বন করা তৎসমুদয়ের সাধারণ নাম উপনাহ।

উক্ত তিনটী উপক্রম, আম-পচ্যমান এবং পক্কশোথ বিষয়ক। অপতর্পণ, আলেপ, পরিষেক, অভ্যঙ্গ, স্বেদ, বিম্লাপন (পারিভাষিক) উপনাহ, পাচন, বিস্রাবণ স্নেহ, বমন এবং বিরেচন এই কয়েকটী উপক্রম উক্ত ত্রিবিধ উপক্রমের অন্তর্ভূত। (ক্রমশঃ)

কবিরাজ,

শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-কবিরত্ন।

অগ্নি।

জীবজন্তুর জীবন ধারণোপযোগী অসংখ্য পদার্থের মধ্যে বায়ু, অগ্নি ও জল অতি প্রয়োজনীয়। আবার এই পদার্থত্রয়ের মধ্যে বায়ু সর্ব্বপ্রধান, কারণ অগ্নি ও জল ব্যতীত তবু দুই একদিন জীবন ধারণ করা যায়, বায়ু ব্যতীত এক মুহূর্ত্তও জীবিত থাকা যায় না, কিন্তু তা বলিয়া অগ্নি এবং জলের প্রয়োজনীয়তাও বড় অল্প নহে, ঘনীভূত শীতে দেহ আড়ষ্ট এবং প্রখর সূর্য্যোত্তাপে তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে, অগ্নি ও জলাভাবে কিরূপ ক্লেশ হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। কেবল তাহাই নহে, অগ্নি ও জলাভাবে আমাদিগের নিত্য ব্যবহার্য্য খাদ্য দ্রব্যের রন্ধনাদি পাকক্রিয়া সমাধা বা তদভাবে আমাদিগের জীবনধারণও অসম্ভব হয়। যেমন বাহ্যস্থানীয় সকল তণ্ডুল ও মাংস ব্যঞ্জনাদি অগ্নিপক্ক হইয়া খাদ্যোপযোগী হয়, তদ্রূপ উদরের অগ্নি ও জলদ্বারা সেই খাদ্য আবার পরিপক্ক হইয়া রসরক্তাদি সার পদার্থে পরিণত হয় এবং সেই সকল সার পদার্থই শরীরের ধারণ ও পোষণ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে

অতএব কেবল বায়ু বলিয়া নহে বায়ুর ন্যায় অগ্নি এবং জলও আমাদিগের জীবন। দেহের যে অগ্নি পানাহারের পাচক, তাহাই ঔষধ পথ্যের পরিপাচক। যেমন পানাহারে শরীরে রসরক্তাদি সার পদার্থ উৎপন্ন ও বলবীর্য্যাদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ঔষধ পথ্য দ্বারাও শরীরে রসরক্তাদি পদার্থ উৎপন্ন ও বলবীর্য্যাদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সেই জন্যই আয়ুর্ব্বেদে বলা হইয়াছে—

সারমেতচিকিৎসায়াঃ পরমগ্নেশ্চ পালনম্।
তস্মাদ্‌যত্নেন কর্ত্তব্যং বহ্নেস্তু প্রতিপালনম্॥

যত্নের সহিত কায়াগ্নির রক্ষণ ও পালনই চিকিৎসার সার ও চিকিৎসকের শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। কারণ অগ্নি দুর্ব্বল বা নিস্তেজ হইলে, ঔষধ পথ্যই পরিপক হয় না, দেহ শীতল হইয়া নাড়ী ছাড়িয়া যায়। তজ্জন্য আয়ুর্ব্বেদে চিকিৎসকগণকে পুনঃ পুনঃ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে—

অস্তু দোষশতং ক্রুদ্ধং সন্তু ব্যাধিশতানি চ।
কায়াগ্নিমেব মতিমান্ রক্ষন্ রক্ষতি জীবিতম্॥

শরীরে শত কুপিত দোষই থাকুক বা শত ব্যাধিই থাকুক, অগ্রে কায়াগ্নির রক্ষণ ও পালন কর্ত্তব্য, কারণ অগ্নিই দেহের প্রদীপ স্বরূপ, অগ্নি অভাবে সেই জীবন-প্রদীপ নিবিয়া যায়। কায়াগ্নির এক নাম পিত্ত, পিত্ত দেহের তাপ। যে তাপ ক্ষিত্যাদি অষ্টপ্রকৃতি-বিশিষ্ট জগদবয়বের দেহে তেজ বা সূর্য্যরূপে অধিষ্ঠিত, যে তাপ প্রজ্জ্বলিত চুল্লীর মধ্যে অগ্নিরূপে অধিষ্ঠিত, যে তাপ প্রদীপে দীপালোক নামে অভিহিত, যে তাপ তড়িতালোক ও গ্যাসালোক রূপে অধিষ্ঠিত, সেই তাপই দেহে পিত্তরূপে অধিষ্ঠিত—

অগ্নিরেব শরীরে পিত্তান্তর্গতঃ কুপিতাকুপিতঃ শুভাশুভানি করোতি। চরক।

অগ্নিই শরীরে পিত্তের অন্তর্গত থাকিয়া কুপিত হইয়া অশুভ ও অকুপিত থাকিয়া শুভ বা অমঙ্গল ও মঙ্গল বিধান করে। তবে অগ্নি ও পিত্ত উভয়ের প্রভেদ আছে,—অগ্নিতে যে আলোক বিদ্যমান, পিত্তে তাহার অভাব, কিন্তু অগ্নিতে যে তেজ, তাপ ও জ্যোতি বিদ্যমান পিত্তে তাহার সদ্ভাব। সুতরাং তেজোধর্ম্মী পিত্তই দেহের অগ্নি বা সূর্য্য। দেহ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড, জগৎ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড। "ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে বসন্তি কলেবরে" ব্রহ্মাণ্ডে যে সকল গুণ বিদ্যমান, দেহেও সেই সকল গুণ বিদ্যমান। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূতের যে গুণ তাহা জীবদেহেও বিদ্যমান, তবে সেই সকল গুণের তারতম্য অবশ্যই আছে, আর সেই জন্যই জগতে অসংখ্য বৈচিত্রময় দ্রব্যের সৃষ্টি।

জাগতিক সকল দ্রব্যই পঞ্চভূতাত্মক, কিন্তু সকল দ্রব্যে তাহাদিগের গুণের পরিমাণ সমান নহে। তদ্রূপ পিত্ত দেহের অগ্নি বা সূর্য্য হইলেও পিত্তে অগ্নি বা সূর্য্যের সমস্ত গুণ সমভাবে নাই। আর সেইজন্যই পিত্ত সূর্য্য এবং অগ্নির সমধর্ম্ম হইলেও অগ্নি এবং সূর্য্যেরই অধীন। যেমন জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যকান্তমণির সংস্পর্শে সূর্য্যোত্তাপ ঘনীভূত হইয়া অগ্নিতে পরিণত হয়, তদ্রূপ সূর্য্যোত্তাপ সংস্পর্শে জীবজন্তুর দেহের তাপ ঘনীভূত হইয়া ভুক্তান্ন পাক ও দর্শনাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে। সূর্য্যোদয়ে যেমন জগতের প্রকাশ, তদ্রূপ জীবজন্তুরও প্রকাশ (জাগরণ) এবং ক্ষুৎপিপাসারও প্রকাশ অথবা সূর্য্যোদয়ে জীবজন্তুরও উদয় এবং তৎসঙ্গে ক্ষুৎপিপাসারও উদয়। সূর্য্যের প্রখরোত্তাপে ঔদরাগ্নি উদ্দীপিত হইয়া ক্ষুৎপিপাসার উদ্রেক করে।

সূর্য্যে যে সকল গুণ বিদ্যমান, তাহাই ঘনীভূত হইয়া অগ্নিতে পরিণত হয়, তজ্জন্য সূর্য্যালোকের ন্যায় দীপালোক, গ্যাসালোক ও তড়িতালোকে রজনীর অন্ধকার বিনাশ করে। পিত্ত শব্দে যাহা তাপিত হয় বা তাপ প্রদান করে, তাহাকে বুঝায়। এই পিত্ত, সূর্য্য বা অগ্নিরই তাপ এবং বায়ুর গতিশক্তি বা স্পন্দন ও কম্পন হইতে সেই তাপের উদ্ভব। বিকৃতি দ্বারা, প্রকৃতি নির্ণীতা হয়। জ্বর দেহের স্বাভাবিক তাপের বিকৃতি। বিকৃতি শব্দে হ্রাস, বৃদ্ধি। দেহের স্বাভাবিক তাপ ৯৮° ডিগ্রী, জ্বরে সেই তাপের বৃদ্ধি এবং জ্বর বিচ্ছেদে শরীর শীতল হইলে সেই তাপের হ্রাস, এ উভয়ই দোষের—উভয়ই প্রকৃতির বিকৃতি। পরন্তু এই হ্রাস ও বৃদ্ধির যে মধ্যবর্ত্তী অবস্থা, তাহাই সাম্যাবস্থা এবং এই অবস্থাই জ্বরবিহীন অবস্থা। এই যে বিকৃতাবস্থা ইহা হইতেই প্রকৃতাবস্থা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। বলা বাহুল্য সে অবস্থায় ও হ্রাসবৃদ্ধি বিদ্যমান থাকে, তবে এত অল্পমাত্রায় থাকে যে তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। জ্বর, দেহের স্বাভাবিক তাপেরই বিবৃদ্ধি এবং বায়ুর স্পন্দন বা কম্পন হইতেই উহার উদ্ভব, আর তাহার ফলে শ্বাস প্রশ্বাস ও নাড়ী দ্রুতবেগে স্পন্দিত হয়। অতএব বায়ুর স্পন্দন বা কম্পন হইতেই তাপের উৎপত্তি এবং যেখানে বায়ু নাই, সেখানে গতিশক্তি বা কম্পন নাই, আর যেখানে গতিশক্তি বা কম্পন নাই, সেখানে তাপও নাই, সুতরাং তাপ সর্ব্বতোভাবে বায়ুর অধীন।

উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন, আকাশ হইতে বায়ুর, বায়ু হইতে তেজের, তেজ হইতে জলের এবং জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি। ঋষির কথা যে সত্য, বায়ু হইতে তাপের উৎপত্তিই তাহার প্রমাণ। যেমন বায়ুর কম্পন হইতে তাপের উদ্ভব, তদ্রূপ আকাশ হইতে বায়ুর উদ্ভব এবং জাগতিক সকল বস্তুই আকাশ পদার্থের পরিণাম। আকাশই বায়ুর চলন গুণে ও চাপে সন্তপ্ত হইয়া উঠে ও তাহা হইতে তেজস্তত্ত্বের উদ্ভব হয়। এই তেজস্তত্ত্বও বিশ্বপরি-চালনী মহাশক্তির একটি প্রধানতম অঙ্গ। বেদান্তে বহুস্থানে এই তত্ত্বকে ব্রহ্মস্বরূপে উপাসনা করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ তেজ বা অগ্নিতত্ত্ব সাধনার একটি প্রধানতম অবলম্বন। বৈদিক উপাসনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা গায়ত্রীর, সেই উপাসনাও তেজস্তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া, তদ্ব্যতীত বৈদিক যাগ যজ্ঞাদি সকল ক্রিয়াকাণ্ডেই অগ্নি ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। অগ্নিই এই সকল সাধনার প্রধানতম অবলম্বন। তন্ত্র বলেন, আমাদিগের দেহস্থ অগ্ন্যাধার যে মণিপুর পদ্ম, তাহার ধারণা ও সাধনা মনঃসংযম ও ঈশ্বর তত্ত্বে উপনীত হইবার প্রধানতম উপায়। এইরূপ কি সাধন বিষয়ক, কি বিজ্ঞান বিষয়ক সকল শাস্ত্রেই সর্ব্বত্র তেজ বা অগ্নিতত্ত্ব প্রধানতম স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

অগ্নির স্থান কেন এত উচ্চে অগ্নির ক্রিয়া ও গুণ আলোচনা করিলে, তাহা বুঝা যায়। বিশ্বপ্রকাশের প্রধানতম বিভাব, রূপের প্রকাশ। বিশ্বপ্রকাশ বলিতে গেলেই আমরা সাধারণতঃ রূপের প্রকাশ বুঝি। জাগতিক বস্তু সকলকে রূপ প্রদান করা তেজের কার্য্য। জগতের উপাদানভূত মূলপদার্থ সকলকে তেজ উপযুক্ত পরিমাণে পাচিত করিয়া বিভিন্ন বস্তুর রাসায়নিক সংশ্লেষ বা বিশ্লেষের কার্য্য

একটি নূতন পদার্থ সংগঠন ও প্রকাশমান করে। এইরূপে বস্তু সকল প্রতিনিয়ত রূপান্তরিত বা পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া জগৎকে বহুরূপে প্রকাশমান করিতেছে। বস্তু সকলকে রূপান্তরিত বা পরিণামিত করা তেজের কার্য্য, আবার পরিণামিত রূপ সকলকে প্রকাশিত করাও তেজের কার্য্য। বায়ুর চলন গুণে তেজ ও চলগুণ-বিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ ও প্রকাশ্য উভয়বিধ ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে। শাস্ত্রকারগণ বলেন ;—

"তৈজসাস্তু রূপং রূপেন্দ্রিয়ং বর্ণঃ সন্তাপে ভ্রাজিষ্ণুতা পক্তিরমর্ষস্তৈক্ষ্যং শৌর্য্যঞ্চ"।

সূর্য্য—তেজের আধার, রূপ, বর্ণ, তাপ, প্রকাশমানতা, পরিপাকশক্তি, অমর্ষ, তীক্ষ্ণতা ও শৌর্য্য ইহারা সূর্য্যতেজেরই বিকার বা অবস্থান্তর। রূপের ঘনীভূতাবস্থা আলোক বা অগ্নি। সূর্য্যোত্তাপে বস্ত্র দগ্ধ হয় না, কিন্তু সূর্য্যকান্ত মণির সংযোগে সূর্য্যালোকে ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া অগ্নি উৎপাদন ও বস্ত্রাদি দগ্ধ করে। (ক্রমশঃ)

কবিরাজ—শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত, কবিভূষণ।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের জন্য যে সকল মহাত্মা মাসিকদান, ও এককালীন দান করিয়া দেশের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন এবং আয়ুর্ব্বেদের মহোপকার সাধন করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাঁহাদের নাম ও প্রদত্ত টাকার উল্লেখ করিতেছি—

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন
অধ্যাপক, এম, সি, কালেজ শ্রীহট্ট ২৲
,, অধ্যাপক এ, হাকিম ... ৪৲
,, জ্যোতিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য উকীল, পূর্ণিয়া ২৫৲
,, ডাঃ এস্, সি, চক্রবর্ত্তী আই, এম, এস শ্রীহট্ট ... ...২৲
,, ডাঃ ডি, এন্, মুখোপাধ্যায়, কটক ১০৲
,, এচ্ সান্যাল অমরাবতী-বেরার ... ৩৲
,, ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হাবড়া ২৲
মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম, এ বি, এল, উকীল হাইকোর্ট, ভবানীপুর ২৫৲
শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৲
,, ডাঃ মদনমোহন দত্ত ১০৲
,, ডাঃ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি-এল, উকীল হাইকোর্ট ৪৪, মির্জাপুর ষ্ট্রীট, মাসিক ২৫৲ হিঃ—১৫০৲

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত এন, সি, সেন স্কোয়ার, বার-এট্‌-ল, ১ম দফায়—২০৲
,, যমুনাদাস গোয়েনকা ৩, বেঙ্গারাপটী ১৮
ডবলিউ সি, গ্রেহাম্ ... ১০০৲
শ্রীযুক্ত হিরণ্যমোহন দাশগুপ্ত উকীল, বগুড়া ৫৲
,, প্রবোধচন্দ্র রায় ... ৫০৲
,, তারণকৃষ্ণ লস্কর ৬, উইলিয়মস্ লেন কলিকাতা......১০৲
,, সুরেন্দ্রমাধব মল্লিক ৪ বলরাম বসুর ফার্ষ্ট লেন, ১ম দফা—২০৲
রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অমৃতলাল রায় ১০০০৲
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরি
শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরি জমিদার নিমতিতা [illegible]

(ক্রমশঃ)

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

১ম বর্ষ। বঙ্গাব্দ ১৩২৩—অগ্রহায়ণ। ৩য় সংখ্যা।

বাঙ্গালার স্বাস্থ্যোন্নতি সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম—এই পাঁচটীর পাঁচটীতেই আমরা সাধারণ ভারতবাসী—বিশেষতঃ বঙ্গবাসী, নানারূপে বিড়ম্বিত। আমরা শুষ্ক মাটিতে বাস করিতে পাই না; স্নান পানের জন্য পরিষ্কার জল পাই না; পল্লীগ্রাম গুলি জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে—প্রচুর সূর্য্যালোক আসে না। মাটি পচায়, গাছ পচায়, বায়ু অনেক স্থানে দূষিত হইয়াছে, আমরা বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে পাই না। রোগ-ক্লিষ্ট, শোক-দষ্ট, অন্নাভাবে শীর্ণ, অকালে জীর্ণ, কোটি কোটি নরনারীর আর্ত্তরবে আকাশ পর্য্যন্ত বিদূষিত হইয়াছে, শূন্য প্রাণে শূন্য পানে চাহিয়াও আমরা সান্ত্বনা পাই না। দুর্দ্দশায় আমাদের শান্তি স্বস্তি অন্তর্হিত হইতে বসিয়াছে। কি করিব, আমরা নির্ব্বাচিত সদস্যপূর্ণ মন্ত্রণা সভা লইয়া? কি করিব, কমিটি, বোর্ড, কৌন্সিল লইয়া? কি করিব, উচ্চ, নীচ, সুলভ, দুর্লভ, শিক্ষা লইয়া? কি করিব, সভাগৃহ মধ্যে রাজ-কর্ম্মচারীদিগকে অবাধে প্রশ্ন করিবার ক্ষমতা লইয়া? আর কি করিব, 'রাজা' 'রায় বাহাদুর' 'স্যর হইয়া? আমরা তৃষ্ণার জল পাই না, শীতে রৌদ্র পাই না, বাস্তুর মাটী পাই না, গ্রীষ্মে বিশুদ্ধ বাতাস পাই না; আমরা যে জ্বরে উজাড় হইতে বসিয়াছি, আমরা যে পুষ্টিকর প্রচুর আহার অভাবে দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছি। ভেজাল খাদ্য খাইয়া আমাদের যে নিত্য দেহের বল কমিতেছে, হৃদয়ের সাহস টুটিতেছে, প্রাণের স্ফূর্ত্তি ঘুচিতেছে।

রাস্তা, বাঁধ, জাঙ্গাল, সড়ক—সমগ্র ভারতে নিত্যই বাড়িতেছে। গোলোক ধাঁধার মত পথের জটিলতায় লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারি না। স্থল পথের কিঞ্চিৎ সুসার হইয়াছে বটে কিন্তু জল নিকাশীর পথ প্রচুর না থাকায় বন্যার জল বৃষ্টির জল বাহির হইতে পারে না। মাটিতে ক্রমাগত জল বসিতে থাকে; কাজেই ভূমি হইয়াছে ম্যালেরিয়ার বিহার ক্ষেত্র। শুষ্ক ভূমিতে বাস করিতে চিকিৎসক উপদেশ দেন, কিন্তু

ভূমিতে জল বসিলে, ভূমি শুষ্ক থাকে কিরূপে? সুতরাং বাস্তু ভূমি সকল বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে। আবার নদী গর্ভ ক্রমে ভরিয়া উঠিতেছে,—তবে বল দেখি, এ দেশের আর মঙ্গলের আশা কোথায়?

পূর্ব্বে ধনী মধ্যবিত্তের ধর্ম্ম-প্রাণতা ছিল, পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার ও নব পুষ্করিণীর প্রতিষ্ঠা প্রায়ই হইত; এখন আর সে ধর্ম্মপ্রাণতা নাই—কিন্তু প্রাণরক্ষা ত চাই; ভাল জলের সংস্থান না করিলে নদী বিহীন পল্লীগ্রাম টিকিতেই পারে না। এ বিষয়ে সকলের মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। তাহার পর দেশে জঙ্গল বাড়িতেছে। কতক আমাদের উদাসীনতায়, কতক আমাদের আলস্যে, আর কতক আমাদের লোভে। বাগাত জমিতে গাছ পালা চিরকালই আছে ও থাকিবে; কিন্তু বাস্তু উদ্বাস্তু—আমরা লোভ পরবশ হইয়া আমের কলমে লিচুর কলমে ভরিয়া ফেলিতেছি। যাহার জমি আছে সে বাগান করুক, কিন্তু বাস্তু উদ্বাস্তু জঙ্গল করিও না। মাঠাল জমিও বাগাতে পরিবর্ত্তন করিও না। জঙ্গলে ভূমি শুষ্ক হইতে পায় না, তাহাতে বাস্তুর বিলক্ষণ ক্ষতি হয় এবং ক্ষেত্রে বাগান করিলে শস্য-সম্ভার কমিয়া যায়। আগাছা একটু বড় হইলেই পূর্ব্বে লোক কাটিয়া ফেলিত; এখন পাথুরে কয়লা জ্বালানি হওয়ায়, আগাছার তত টান নাই, বড় বড় আগাছায় নগরের ও গ্রামের উপকণ্ঠ একবারে ভরিয়া উঠিতেছে। আলস্যে ও উদাসীনতায়, আমরা সেগুলি কাটাইবার বন্দোবস্ত করি না। কিন্তু না করিলে আর চলে না। আপনার অবস্থা, আপনার গ্রামের অবস্থা, আপনার জেলার অবস্থা—ধীরে সুস্থে বিবেচনা করিয়া দেখ; দেখিলে বেশ বুঝিতে পারিবে, আমাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ায়—আমাদের ইহকাল পরকাল নষ্ট হইতেছে। যাহাতে আপন গ্রামে, আপন ভিটায়, আমরা সুস্থ শরীরে বাস করিতে পারি, তাহার চেষ্টা সকলকেই করিতে হইবে। নদী গুলির বহতা বজায় রাখিতে হইবে, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিতে হইবে, বাটীর আশেপাশের জঙ্গল কাটাইয়া ফেলিতে হইবে।

শরীর বহিলে, ধর্ম্মসাধন হয়, লোক-যাত্রা সাধন হয়; শরীর সুস্থ না থাকিলে কোন কিছুই হয় না। কোন কিছু ভালও লাগে না। যাহাতে সুস্থ শরীরে নিজের ভিটায় বাস করিতে পার, তাহার জন্য প্রথমে নিজে চেষ্টা কর, জঙ্গল কাটাইবার পয়সা না জুটে, প্রত্যহ স্বহস্তে নিজে কাটিতে থাক; তাহার পর প্রতিবাসীর জঙ্গল কাটাইবার জন্য, জনের জনের বাড়ীতে গিয়া, হাতে পায়ে ধরিয়া তাঁহাদিগকে বন কাটাইতে লওয়াও। গ্রামের মাথাল মাথাল লোকদের বল, ফাঁড়ীর জমাদারকে বল, থানার দারোগাকে বল, নদী বহতা করাইবার জন্য জমিদার মহাশয়কে বল, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরকে বল, লাগিয়া পড়িয়া থাকিলে পাহাড় টলান যায়!

শিক্ষা বল, বিদ্যা বল, গুণপণা বল, ধন বল, যশ বল,—শরীর বহিলেই সব! যাহাতে আমরা সেই শরীর সুস্থ রাখিয়া দু'দিন বাঁচিতে পারি—তাহার জন্য অগ্রে আমাদের চেষ্টা করিতে হইবে। সেই চেষ্টাকে "আত্মতত্ত্ব নীতি" বলিতে হয় বল, প্রজানীতি বলিতে হয় বল,—এই জন্য রাজ পুরুষদের

নিকট যে ক্রন্দন আবেদন নিবেদন—তাহাকে 'রাজনীতি' বলিতে হয় বল—কিন্তু এই চেষ্টা এখন কিছু দিন করা চাই। সর্ব্বরূপ আন্দোলনে বিশ্রাম দিয়া এই কার্য্যে লাগিয়া যাও; উদাসীনতায়, আলস্যে, নির্ব্বুদ্ধিতায়, আসল খোয়াইয়া নকলের জন্য লালায়িত হইওনা।

সমস্ত বাজে কথা ও কাজের কথা ফেলিয়া রাখিয়া আমাদের বাঙ্গালীকে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের কথা অগ্রে ভাবিতে হইবে। যাহার যতটুকু সাধ্য স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য তাহাকে ততটুকু চেষ্টা করিতে হইবে। যে মহাপুরুষ —তিনি সন্ন্যাসী হউন, গৃহী হউন, হিন্দু হউন, মুসলমান হউন, ব্রাহ্ম হউন খৃষ্টান হউন, বাঙ্গালী সাধারণের মন এ বিষয়ে লাগাইয়া দিতে পারিবেন,—তিনিই দেশের প্রকৃত বন্ধু। আমরা অস্বাস্থ্য-তরঙ্গে নিমজ্জমান হইতেছি, হাবুডুবু খাইতেছি,—অগ্রে আমাদের উদ্ধার সাধন কর, তাহার পর আমাদিগকে অন্য উপদেশ দিও। এই এত কাল ধরিয়া বাঙ্গালার মাসিক পত্র পর্য্যালোচনা করিলাম, কই একথার গুরুত্বের উপলব্ধি ত কোথাও দেখিলাম না! সংবাদ পত্রেও এ সম্বন্ধে আলোচনা হয় না, কেবল "অমৃত বাজারে" কিছু থাকে, দু'এক খানা বাঙ্গালা সংবাদ পত্রে ও একটু আধটু স্বাস্থ্যের কথা থাকে—কিন্তু প্রাণের কথা প্রাণ দিয়া লেখা ত দেখিতে পাইনা! অমৃত বাজার বলেন—"কলিকাতার লোকে জল-কষ্ট বা অন্ন-কষ্ট কিছুই বুঝে না, সেই জন্য কিছুই লেখে না।" তবেই ত, কলিকাতা আমাদের মাথা—মাথায় না লাগিলে মাথা ব্যথা হইবে কেন? কলিকাতার বড় লোকদের সাহায্য যদি না পাওয়া যায়, আমরা এই মধ্য শ্রেণীর সম্প্রদায়—আমরা আপনারা চেষ্টা করিয়া কিছু করিতে পারি না কি? নাই বা হইলাম "রামমূর্ত্তির" মত জোয়ান, সুরেন্দ্র বাবুর মত বক্তা, ডাক্তার ঘোষের মত আইনজ্ঞ, ঠাকুর কুমারের মত ধনশালী, আমরা সামান্য লোক—এই সামান্য বল, বিদ্যা, বুদ্ধি, বিত্ত লইয়া, প্রতিজনে চেষ্টা করিয়া, আমাদের নষ্ট-স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিয়া, একটু আরামে দুইদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারি না কি?

বঙ্গদর্শনের আমল হইতেই আমি এই স্বাস্থ্যতত্ত্বের কথাটা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু অলস বাঙ্গালী কথাটা শুনিয়া ও শুনে না। তাই আমাদের হেম, নবীন অকালে মরিয়াছে, রামেন্দ্র, প্রফুল্ল—যৌবনেই বুড়া হইয়াছে, আমার কর্ম্ম ক্ষেত্রের সঙ্গী আর কেহই বাঁচিয়া নাই। আছে—এক পাঁচকড়ি, বাঙ্গালীর দুঃখ ব্যথা সে কতকটা বুঝিয়াছে, বাঙ্গালীর কথা সে গুছাইয়া বলিতে পারে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, যাদের জন্য সে কাঁদে, তারা তা'কে চিনিতে পারিল না।

বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কলিকাতার কবিরাজ মহাশয় ত "আয়ুর্ব্বেদ" বাহির করিলেন,—বুড়া হইয়াছি, মঙ্গলকামনা করিতে পারি—কামনা পূর্ণ হউক। আমি ত কয়েক বৎসর ধরিয়া একঘেয়ে কান্না কাঁদিয়া স্বাস্থ্যে ও সাহিত্যে সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করিতেছি, মানব-স্বাস্থ্য যাঁহাদের বেদ—আমার চেয়ে তাঁরা কথাটা ভাল করিয়া লোককে বুঝাইতে পারিবেন।

যাঁহারা "আয়ুর্ব্বেদ" পরিচালনা করিবেন, আমি তাঁহাদের সকলকে চিনি না। তবে যে দুইজন কর্ণধার হইয়া কাগজের হাঁটে

নাম লিখাইয়াছেন—তাঁহাদের চিনি। যামিনী-ভূষণ—প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানেই কৃত-বিদ্য। বিরজা চরণ—কুচবিহারের রাজ-বৈদ্য,—আমার পরম প্রীতি-ভাজন প্রবীণ সাহিত্য-সেবী অম্বিকাচরণ গুপ্তের কনিষ্ঠ। আয়ুর্ব্বেদের এই দুই কর্ণধার,—ইহাঁদের উত্তর-সাধক আমার প্রিয় ছাত্র – দুকাণ কাটা ব্রজবল্লভের উজ্জ্বল মন্তব্য, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, অমূল্য ইঙ্গিতে স্বাস্থ্য যেমন হিতকারী, সাহিত্যে তেমনই মনোহারী। তাই প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়া আমি—এই ত্রিমূর্ত্তিকে শার্টিফিকেট্ দিয়া ফেলিলাম।

বাস্তবিক, আয়ুর্ব্বেদ পড়িয়া আমার বড় আনন্দ হইয়াছে। প্রাচীন মতের অনুবর্ত্তন—চিরদিনই আমাদের পক্ষে মঙ্গল জনক। বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য বজায় রাখিতে হইলে; কাবাব কাটলেটের মমতা ছাড়িয়া, আবার তাহাকে ঋবিহস্ত প্রসারিত পল্‌তার ডাল্‌নার ভক্ত হইতে হইবে।

শ্রীঅক্ষয় চন্দ্র সরকার।

আমাদের কথা।

বহুদিন—বহুদিন পরে, মায়ের ছেলে আবার মায়ের ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে!

তিমির-কুটিলা রজনীতে, কাহাকে ও না বলিয়া, সে যখন অনির্দ্দিষ্ট পথে যাত্রা করিয়াছিল, তখন তাহার কৌতুক-তরল নেত্রে "নূতনের" মোহ! সে তখন ভাবে নাই—এই মোহই একদিন তাহার সোণার সংসার শ্মশানে পরিণত করিবে! ঝঞ্ঝালুণ্ঠিতা ধরণীর প্রলয়ানুষ্ঠানের মধ্যে—তাহার সেই গুপ্ত-পদক্ষেপ, তখন কেহ শুনিতেও পায় নাই।

অনেক দ্বারের লাঞ্ছনা সহিয়া,—আপনার সমস্ত সঞ্চয় শূন্য করিয়া, শ্রান্তদেহে, মলিন মুখে, আজ সেই হৃতসর্ব্বস্ব হতভাগ্য মাতৃ-মন্দিরের সিংহদ্বারে ফিরিয়া আসিয়াছে! কিন্তু কৈ, তাহার অভ্যর্থনার জন্য, পুরদ্বারে ত তূর্য্যধ্বনি হইল না? মঙ্গল শঙ্খ বাজাইয়া, জলের ঝারি দিয়া, লজ্জা-ললিত মুখের অবগুণ্ঠন সরাইয়া, কুলবধূগণ ত তাহাকে বরণ করিতে আসিল না? তাহাকে পথ দেখাইবার জন্য চন্দ্রশালার চূড়ে দীপালোক জ্বলিয়া উঠিল না? হায়! সমস্ত আপনার জন কি আজ তাহার এত পর হইয়া গিয়াছে!

অনুতপ্তের স্পর্শে—রুদ্ধ দ্বার সশব্দে খুলিয়া গেল। পলাতক পুত্র বড় ভয়ে ভয়ে সেই জনশূন্য বৃহৎ পুরীর প্রশস্ত প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিল। দেখিল—পুষ্পিত গুল্মলতায় শ্যামায়মান বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গন—অতীত গৌরবের শ্মশান ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে! সে বাটীর আর কেহই বাঁচিয়া নাই! যাহারা মরিয়াছে—তাহাদের চিতা চুল্লীর অর্দ্ধদগ্ধ চন্দন কাষ্ঠ হইতে তখন ও ধূম নির্গত হইতে ছিল। সেই নির্ব্বাপিত-প্রায় অগ্নির প্রেতালোক "কঞ্চুকীর" মত কুমারকে পথ দেখাইল। সে প্রতিকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিতে লাগিল, অক্ষয় ভাণ্ডার এখনও অনন্ত রত্নে পূর্ণ। তাহার সমস্ত ঐশ্বর্য্যই অবিকৃত, কেবল অনেক দিনের অনাদরে বিশৃঙ্খল। এখন ও সেই পরিত্যক্ত ভদ্রাসনে—কতকগুলি জীর্ণ কীট

দষ্ট পুঁথি—"যকের" মত তাহার অমূল্য সম্পত্তি রক্ষা করিতেছে। যে, মার কোল ছাড়িয়া যুবক চলিয়া গিয়াছিল, উদাসীন সন্তানের মঙ্গল কামনায় সেই মা প্রতিদিন প্রাতঃসন্ধ্যায় দেবতার দ্বারে যে মাথা খুড়িয়াছিল, এখনও কক্ষমধ্যে তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান! চির-প্রতীক্ষা-শীল, ক্ষুণ্ণ, পিতৃস্নেহ—অসংখ্য দর্শন বিজ্ঞানের পুঁথিতে পরিণত হইয়া অর্জ্জুনের অক্ষয় কবচের মত এখন ও কক্ষমধ্যে তাহার মঙ্গল ধ্যান করিতেছে!

যুবক আরও দেখিল—তাহার জন্য যে সকল অপূর্ব্ব খাদ্য প্রস্তুত হইয়াছিল, এখনও তাহা তেমনই ঢাকা রহিয়াছে—মাতৃস্নেহের মন্দার-মধু তাহাকে বিকৃত হইতে দেয় নাই। তাহার আরোগ্য কল্পে সযত্নে আহৃত "জড়ী বুটীর পুঁটুলী" এখনও কক্ষ গাত্রে—টাঙ্গান' রহিয়াছে!

যুবক আর এক কক্ষে প্রবেশ করিল। এই কক্ষে—তাহারই জন্য একদিন শান্তি স্বস্ত্যয়ন হইয়াছিল। এখনও সহকার-পল্লব-পেলব মঙ্গল-কলস গৃহ মধ্যে শোভা পাইতেছে! যুবক আর থাকিতে পারিল না, অনুতাপে তাহার বুক ফাটিতে ছিল, উচ্ছ্বাসাকুল বেদনাপ্লুত হৃদয় দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া, কম্পিত কণ্ঠে সে চীৎকার করিয়া একবার মা বলিয়া ডাকিল! মানব নয়নের কুহেলী আবরণ ভেদ করিয়া—তাহার সম্মুখে এক দেবীমূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল! যুবক দেখিল—এই ত সেই মা! দৈন্যের মধ্যে ও তেমনি মহিমান্বিতা! আমার জন্ম জন্মান্তরের অস্ফুট স্মৃতি—আমার ভবিষ্যতের চিরোজ্জ্বল আশা, কে বলে তুমি মরিয়া গিয়াছ? তোমার ত মৃত্যু নাই! আত্মহারা হইয়া আমি তোমায় ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তুমি আমার ইহকাল পরকালের মধ্যে—নাদের বন্ধনী। তুমি আমার কর্ম্ম, ভক্তি জ্ঞান—"ত্রয়ী" তুমি আমার সুখ দুঃখের অভিব্যঞ্জনা—ওঙ্কার; তুমি আমার জীবনে মরণে সর্ব্বময়ী! তুমি আমার আমিত্বের অধ্যাস, কর্ম্মের জিজ্ঞাসা, সমাধির নিদ্রা! আমার অনাচারে তুমি জীর্ণ জড়ের মত হইয়াছিলে, সেই মোহ প্রাপ্ত মাতৃদেহ আমি চিতা শয্যায় তুলিয়া দিয়া ছিলাম! সে চিতায় জ্ঞান বিজ্ঞান পুড়াইয়া আগুণ ধরাইয়া ছিলাম,—অবোধ আমি, আলো দেখিয়া, তাপে মাতিয়া, পিশাচের মত কঙ্কালের করতালি দিয়া, চিতা প্রদক্ষিণ করিয়াছিলাম! এখন বুঝিতেছি—সে অগ্নি মাতৃঘাতী, তাহাতে আমার দেশ পুড়িয়াছে, বিজ্ঞান পুড়িয়াছে, সর্ব্বস্ব পুড়িয়াছে! তাই নয়ন জলে—আজ চিতা নির্ব্বাণ করিতে আসিয়াছি। এসো মা এসো—আয়ুর্ব্বেদের জীবনীয় স্নেহে—তোমার অঙ্গের দাহস্ফোট শীতল করিয়া দিই। তোমার কমকলেবরের সমস্ত কালিমা মুছিয়া দিয়া—তাহাতে হরিচন্দন লিপ্ত করি!

"ভেবেছিনু আমি বুঝি দীন মাতৃহারা?
আজ দেখি—মা ত' কভু নহে গৃহ ছাড়া!
সর্ব্বময়ী মা আমার সর্ব্বঘটে আছে।
দিন রাত আছি আমি মায়েরই যে কাছে!
নিদাঘে মা "ষষ্ঠী" রূপা—বট বৃক্ষ মূলে,
দেশের অনাথ শিশু কোলে লন তুলে,
বরষাতে "দশহরা" মকর-বাহিনী।
তৃষিতে তুষিতে—বুকে স্নেহ মন্দাকিনী!
শরতে সারদা মাতা—দুর্গা দশভুজা,
লক্ষ্মী ভেবে পূর্ণিমায় করি তাঁরি পূজা!
আমার আঁধারে "কালী" তারা মা আমার,
করে—"বরাভয়" "মুণ্ড" [illegible]!

হেমন্তে মা "জগদ্ধাত্রী"—রাজরাজেশ্বরী,
শস্য পূর্ণা বসুন্ধরা রূপে আলো করি।
শিশিরে মা "বীণাপাণি" শত-দল পরে,
বসন্তেতে "অন্নপূর্ণা" দর্ব্বী পাত্র করে!
মা আমার বিরাজিত ষড়্‌ঋতু মাঝে!
চারিদিকে দেখি আমি মা'র মহিমা যে!"

বলিতে হইবে কি, উপকথার পলাতক যুবক আর কেহই নহে—আমরাই। আমাদের পরিত্যক্ত ভদ্রাসন—নিখিল বিজ্ঞানের সূতিকা-গৃহ "আয়ুর্ব্বেদ।" আমরা পত্র সূচনায় বলিয়াছি—দেশ রক্ষা করিতে হইলে প্রথমেই "আয়ুর্ব্বেদকে" বাঁচাইতে হইবে।

আমরা যে মানুষের বংশধর, আমরা যে জাতির বনিয়াদ,—মোহ মদিরায় মুগ্ধ হইয়া তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, ভুলিয়া কীট পতঙ্গের দলে মিশিয়াছিলাম! একদিন আমাদেরই পূর্ব্ব পুরুষের প্রতিভা যে জগজ্জ্যোতি রূপে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তকে জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলিয়াছিল,—তাহা আমরা ভাবিবার অবকাশ পাই নাই। এখন সে মোহ নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে। সহস্র বর্ষব্যাপী কৃষ্ণ বিরহের জড়তা ঘুচিয়াছে। প্রিয় দর্শনের আশায় আবার আমরা মিলনের প্রভাসক্ষেত্রে একত্র হইয়াছি। "আয়ুর্ব্বেদের" কথাই আমাদের কৃষ্ণকথা। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের ঐশ্বর্য্য একদিন অরুণ কিরণে শত ময়ুখ মালায় প্রাচী-গগনোপান্ত সমুদ্ভাসিত করিয়াছিল।

তাঁহাদের মহত্বের মহাশ্মশানে আজ আমরা দণ্ডায়মান! ভুলিয়া যাও ভাই! নিশার দুঃস্বপ্নের কথা; ভুলিয়া যাও সে প্রবল ভৈরব ফেরুনাদ, ভুলিয়া যাও সে নর কপালের খট মট্ বিকট ধ্বনি; ভুলিয়া যাও—নিশাচরের করাল কণ্ঠের হলহলা রব; যে চিতা-ভস্মকে তুমি আজ সামান্য জ্ঞান করিয়া ভাসাইয়া দিতেছ, তাহা ভস্ম নহে—ভারতের বিভূতি। সেই বিভূতি-ভূষণকে অঙ্গরাগ করিতে পারিলে, তুমি শব-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবে।

তোমরা হয় ত বলিবে,—"আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি করিতে হইলে, আবার চরক, সুশ্রুত, হারীত, অগ্নিবেশকে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে।" এ কথায় আমাদের আপত্তি করিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস—বিশ্ব-সত্যের চিরন্তন দিব্য মানব চরক, সুশ্রুত—তাঁদের ত মৃত্যু হয় নাই। কালধর্ম্মে তাঁহারা তিরোহিত হইয়াছেন, তাঁহারা আবার আসিবেন। এসো আমরা তাঁহাদের আগমনী ঋক্ উচ্চারণ করি! নিশ্চয়ই তাঁহারা উত্তর দিবেন।

আমরা মন্ত্র জানিনা, সূত্রার্থ ভুলিয়াছি, বহ্নি বিসর্জ্জন দিয়া, মৃতুগন্ধি অন্ধকারে জড়ের মত বসিয়া রহিয়াছি। কিন্তু অতীতের মোহ ত ভুলিতে পারি নাই। যে দিন ভাবী আশার কল্পনা দুই চ'খ ভরা অশ্রুর আড়ালে তাহার সোহাগের সপ্তবর্ণ লুকাইয়াছে, সেই দিন হইতেই ত অহরহ কেবল অতীত স্মৃতির রোমন্থন করিতেছি! অধম অযোগ্য আমরা—কিন্তু "মানুষ আমরা নহিত মেষ"। তোমরা আশীর্ব্বাদ কর—জন্মেজয়ের সর্পসত্রের ন্যায় আমরা "ব্যাধিসত্র" করিব। বশিষ্টের "পুত্রেষ্টির" ন্যায় আমরা এদেশে বেদেষ্টির অনুষ্ঠান করিব। আমাদের দেশ হইতে 'মড়ক মহামারী' চলিয়া যাইবে, প্রাচীন ঋষির আত্মা আবার এদেশে নবজন্মে নবদেহে পুনরাবির্ভূত হইবে।

তোমরা আমাদের সহায় হও। আমরা ক্ষুদ্র, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য ক্ষুদ্র নহে। আজ কাল, তোমাদের কাছে [illegible]

আদর বাড়িয়াছে, খাল, বিল, পুষ্করিণী হইতে প্রস্তর ফলক, ধাতুমূর্ত্তি কুড়াইয়া আনিয়া সযত্নে তাহা রক্ষা করিতেছে, নষ্ট লিপির পাঠোদ্ধারের ভার লইতেছে, কিন্তু যাহা হারাইয়াছে—একবার সমস্ত বিক্ষিপ্ত চিত্ত কুড়াইয়া আনিয়া, একাগ্রভাবে তাহাকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা—একবার করিবে না কি? "আয়ুর্ব্বেদ" তোমাদের পুরাতন সম্পত্তি,—তোমাদের স্পর্দ্ধার সামগ্রী, গৌরবের জিনিষ,—সেই আয়ুর্ব্বেদকে রক্ষা কর,—মানুষ আবার দেবতা হইবে।

বেদের যজ্ঞে—আমরা সকলকেই আহ্বান করিতেছি, সকলেরই সাহায্য ভিক্ষা করিতেছি। বেদের দেশে জন্মিয়া, শক্তি থাকিতে যিনি এযজ্ঞে যোগদান না করিবেন—তিনি মানবের বন্ধু নহেন! তাঁহার দেশ-হিতৈষণা শুধু বিড়ম্বনা! এদেশের প্রতি নগরে, প্রতি গ্রামে—কত অসংখ্য নর নারী—ব্যাধি শয্যায় শয়ন করিয়া, আরোগ্যের আশায় শীর্ণবাহু ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া, ঈশ্বর-চরণে হৃদয়ের আকুল নিবেদন জানাইতেছে; কত সুখের সংসারে কত ভয়ার্ত্তা জননী—রুগ্ন শিশুর মরণাহত সুকুমার দেহ কোলে করিয়া বসিয়া নয়ন জলে ধরণী সিক্ত করিতেছে! জীবনের ফুল্ল বসন্তে কত প্রেমিক যুবকের শেষ নিশ্বাস পৃথিবীর বুকে মিশিতেছে; কত মিলন-সুখ-ফুল্ল নব দম্পতীর—সাধের কুঞ্জে মৃত্যুর ঘোর বিভীষিকা দেখা দিতেছে; বৃদ্ধা জননীর স্নেহের ক্রোড়ে—একমাত্র বংশধর মহা নিদ্রায় নিদ্রিত হইতেছে, জরাজীর্ণ বৃদ্ধের শেষ অবলম্বন কালের ফুৎকারে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে,—কই কেহই ত তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছেন না। এদেশে মৃত্যুর কৃষ্ণ যবনিকা দিন দিন বিসর্পিত হইতেছে, মহাকাল নিত্য নিত্য নূতন ব্যাধির আমদানি করিতেছেন, অথচ এদেশের প্রতি গৃহের পার্শ্বে,—প্রত্যেক কুটীরের অঙ্গনে, কত সহজ, কত অনায়াসলভ্য মহৌষধ বিদ্যমান রহিয়াছে! সুচিকিৎসার অভাবে কত সুখ-সাধ্য রোগ – প্রাণঘাতি-ভীষণ-মূর্ত্তিতে আত্ম প্রকাশ করিতেছে।

আমরা যে সকল কথা লিখিলাম ইহা ত সাধারণের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট সত্য ঘটনা। দেশের এরূপ অবস্থা দেখিয়া, যাঁহার প্রাণ কাঁদেনা—মানবাভিধানে বোধ হয় তাঁহার নাম স্থান পাইবে না! আমাদের বিশ্বাস—এই ব্যাধি-ব্যাপন্ন দীন দেশে কেহই আয়ুর্ব্বেদ প্রতিষ্ঠার বিরোধী হইবেন না। তাই সাহস করিয়া আজ আমরা সকলেরই সাহায্য চাহিতেছি। যাঁহার যে শক্তি আছে তাহা লইয়াই আমাদের সাহায্য করুণ। আমরা সাধারণের পরিচারক, যথাসাধ্য সম্ভার সংগ্রহ করিয়া, কৃতাঞ্জলি কৃত করপুটে ভক্তির পাদ্য অর্ঘ্য লইয়া, দেশের লোকের পরিচর্য্যায় আত্ম-নিয়োগ করিলাম। যতদিন জগতে রোগ থাকিবে, অকাল মৃত্যু থাকিবে,—ততদিন আমরা যজ্ঞমণ্ডপ হইতে কোথায় যাইব না। যখন দেখিব—একখানি শোক-মলিন মুখ ও মানব বিজ্ঞানের অপূর্ণতার পরিচয় দিতেছে না—তখন বুঝিব আমাদের পূর্ণাহুতির কাল নিকটে আসিয়াছে।

রত্নমালিনী রাজপুরীর ভগ্নাবশেষের সহিত—আমরা আয়ুর্ব্বেদের তুলনা দিয়াছি। এই বৃহৎ অট্টালিকার অনেকস্থান ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে—কত ভূমিকম্প বাত্যা, বৃষ্টি, ইহার উপর হিল্লোল তুলিয়াছে, কাল-তটিনী কালিন্দী ইহার পাদমূলে তরঙ্গাঘাত করিয়াছে, যুগ-

যুগান্ত ধরিয়া অধিকারীর অনাদরে ইহা জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এখনও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর ইহার বিরাট বিপুল আয়তন দণ্ডায়মান। এই ঋষি-মনীষা-রচিত কল্যাণ-মন্দিরের পুনঃ সংস্কার করিতে হইবে, স্থানে স্থানে —নূতন হর্ম্ম্য গড়িয়া তুলিতে হইবে। বহুকাল ধরিয়া যাহা ভাঙ্গিয়াছে—একদিনে তাহার সংস্কার বিশ্বশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার ও কার্য্য নহে। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি বহু সময় সাপেক্ষ। ইহা একজনের বা এক দলেরও সাধ্যায়ত্ত নহে। আমরা একজন্ম ধরিয়া যেটুকু পারি—করিব, ব্যক্তি মরে—সম্প্রদায় মরেনা,—সুতরাং আমরা ভরসা করিতে পারি, আমাদের অবর্ত্তমানে নূতন সম্প্রদায় আসিয়া অপূর্ণ অংশের পূরণ করিয়া দিবেন। তাহার পর এক পুরুষ, তাহার পর আর এক পুরুষ, এই রূপ জন্ম জন্মান্তরের অশ্রান্ত সাধনায় যে মন্দির নির্ম্মিত হইবে,—তাহার চূড়া বিমান ভেদ করিয়া দেবতার চরণ স্পর্শ করিবে।

আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে সময় চাই, মানুষ চাই, কুবেরের ভাণ্ডার চাই। উন্নতির প্রথম সোপান—আয়ুর্ব্বেদীয় কলেজ ও রুগ্নাবাস প্রতিষ্ঠা করা। সেই মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য—আজ আমরা সকলের কাছেই ভিক্ষার্থী। এক পয়সা হইতে এক লক্ষ মুদ্রা পর্য্যন্ত—আমাদের বেদ-ভাণ্ডারে—আমাদের ভিক্ষার ঝুলিতে, সমান আদরের জিনিষ। বেদরক্ষার জন্য, আপনাদের যাহা সাধ্য, ভিক্ষা দিন। এ ভিক্ষায় ভগবান্‌কে ভিক্ষা দেওয়া হইবে। ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ তো হাত পাতিয়া ভিক্ষা করেন না। অনাথ আতুরের হাত পাতাই তাঁহার হাত পাতা। জীবকে রোগ হইতে মুক্ত করিবার জন্য যিনি ভিক্ষা দেন, তিনি দেবতাকে ভিক্ষা দেন। ঋদ্ধি, বুদ্ধি, জ্ঞান, গৌরবে—এদেশকে যাঁহারা জগতে শীর্ষস্থানীয় দেখিতে চাহেন, তাঁহারা আমাদের সহায় হউন। সপ্তর্ষির মত উচ্চে বসিয়াও যাঁহারা মরণাহত পল্লীবাসীর মর্ম্মব্যথা বুঝিতে পারেন, আমরা তাঁহাদিগকেই কর্ম্মক্ষেত্রে আহ্বান করিতেছি। এই অসীম বিরাট সত্বার মধ্যে, আমাদের 'হাসি কান্না' জড়িত ক্ষুদ্র জীবন কোথায় লুপ্ত হইয়া যাইবে; আমাদের আশা কামনা ভোগলিপ্সা—সূর্য্যাস্তের বর্ণরেখার মত একদিন নীরবে মিলাইয়া যাইবে, আমাদের তুচ্ছ প্রাণবিন্দু পুষ্পদলচ্যুত শিশির কণার মত কবে ভাগীরথীর সাগরাভিমুখ জলতরঙ্গে নিঃশব্দে মিশিয়া যাইবে। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন বেদরক্ষায় আমরা যেন সত্যযুগের 'বিসর্জ্জন' দেখাইতে পারি।

শ্রীব্রজবল্লভ রায়।

অগ্নি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বর্ণও পার্থিব বস্তু নহে,—সূর্য্যের তেজ, আকাশে নীল পীতাদি যে সকল বর্ণ দৃষ্ট হয়, তাহা আকাশে সূর্য্য-কিরণ-সম্পাতের ফল। ইহাই আদিবর্ণ। এই সকল বর্ণের সমাবেশে নানাবর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। রূপ শব্দে পদার্থের আকার বুঝায়। যে ইন্দ্রিয়ের

প্রভাবে পদার্থের সেই আকার দৃষ্ট হয়, তাহাই রূপেন্দ্রিয় বা চক্ষু। চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন হয়, সুতরাং দর্শনেন্দ্রিয়ও সূর্য্যের তেজ। যেমন নাসিকাদ্বারা বায়ু গ্রহণ করিয়া আমরা বাহিরের বায়ুর সহিত সংযুক্ত আছি, তদ্রূপ চক্ষের দ্বারা বাহিরের তেজ গ্রহণ করিয়া সেই তেজের সহিত আমরা সংযুক্ত রহিয়াছি। ভ্রাজিষ্ণুতা শব্দে প্রকাশমানতা, প্রকাশমানতা তেজের ধর্ম্ম, তেজ ব্যতীত কোন পদার্থ প্রকাশমান হইতে পারে না। পক্তি শব্দে পরিপাক শক্তি, খাদ্যের পরিপাক ক্রিয়াও তেজের প্রভাবেই সম্পন্ন হয়। অমর্ষ শব্দে ক্রোধ, ক্রোধ তেজেরই প্রভাব। তীক্ষ্ণতা শৌর্য্য বা শূরত্ব তেজের অন্যতম ধর্ম্ম। এক্ষণে দেখা গেল, রূপ, রূপেন্দ্রিয়, বর্ণ, তাপ, ভ্রাজিষ্ণুতা, পক্তি, অমর্ষ, তীক্ষ্ণতা ও শূরত্ব ইহারা একমাত্র তেজেরই অবস্থান্তর বা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা এবং তেজ সূর্য্যেরই শক্তি। আমরা ক্ষুদ্র জীব, বাহিরের মহাশক্তির অধীনে সর্ব্বদা কালযাপন করিতেছি। যেমন বাহিরের বায়ু ব্যতীত, আমরা এক মুহূর্ত্ত ও প্রাণ ধারণ করিতে পারি না, তদ্রূপ বাহিরের তেজ ব্যতীত ও আমরা এক মুহূর্ত্ত ও জীবিত থাকিতে পারিনা।

পিত্ত।

শরীরস্থ তেজের নাম পিত্ত। পিত্ত পাঁচ প্রকার—পাচক, রঞ্জক, সাধক, আলোচক ও ভ্রাজক। পাচক পিত্ত অগ্ন্যাশয়ে, রঞ্জক পিত্ত যকৃত ও প্লীহাতে, সাধক পিত্ত হৃদয়ে, আলোচক পিত্ত নেত্রদ্বয়ে ও ভ্রাজক পিত্ত সর্ব্ব-শরীরে এবং চর্ম্মে অবস্থিতি করে।

পাচক পিত্ত।

পাঁচ প্রকার পিত্তের মধ্যে পাচক পিত্তই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অন্য চতুর্ব্বিধ পিত্ত পাচক পিত্তেরই অপ্রধান অংশ বা শাখা প্রশাখা। পাচক পিত্তের ক্ষয় বৃদ্ধি হইলে অন্যান্য পিত্তের ও ক্ষয় বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। পাচক পিত্ত ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক, অপরাপর অগ্নির বল বৃদ্ধি এবং রস, মূত্র ও মলকে পৃথক্ করে। এই অগ্নি অবিকৃত থাকিলে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সৌন্দর্য্য, মেধা, বুদ্ধি, শূরত্ব, দেহের কোমলতা, পরি-পাক, তাপ ও দর্শনেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয়। পাচক পিত্ত পীতবর্ণ এবং উহাতে উষ্মা বা তাপাংশ অধিক। যেমন দীপের আলোক গৃহের একাংশে অবস্থান করিয়া অন্যান্য অংশকে আলোকিত করে, তেমন পাচক পিত্ত স্বীয় আশয়ে অবস্থিত থাকিয়া সমগ্র দেহকে আলোকিত করে।

রঞ্জক পিত্ত।

রঞ্জক পিত্তের স্থান যকৃৎ। ইহা ভুক্ত দ্রব্যের রসকে রঞ্জিত করিয়া রক্তে পরিণত করে। ("রঞ্জকং নাম যৎ পিত্তং তদ্রসং শোণিতং নয়েৎ")। রঞ্জক পিত্তে রঞ্জনগুণ অধিক, ইহার মুখ্য বা প্রধান ক্রিয়া ভুক্ত দ্রব্যের রস-রঞ্জন এবং গৌণ বা অপ্রধান ক্রিয়া ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক। রঞ্জক পিত্ত নীলবর্ণ, ইহা রসকে রঞ্জিত ও সুপক্ব করিয়া, দেহ ধার-ণোপযোগী শোণিতে পরিণত করে। আধু-নিক বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, সূর্য্যের নীলালোক দ্বারা পৃথিবীর পদার্থ সমূহের সংযোগ ও বিয়োগ ক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং পীতালোক দ্বারা প্রধানতঃ দৃষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত হয়। আয়ুর্ব্বেদ ও তাহাই বলেন। দেহে সূর্য্য-তেজের ক্রিয়ায়,

নীলবর্ণ রঞ্জক পিত্তের সংযোগে ভুক্ত দ্রব্যের সারভাগ রসের বর্ণ-বিপর্য্যয় ঘটে অথবা ঐরস রঞ্জিত হইয়া লোহিতবর্ণ ধারণ করে, ইহাই রসের সহিত নীলবর্ণ পিত্ত সংযোগের রাসায়নিক ফল। যকৃৎ পিত্তাধার, যকৃতের উপর পিত্তের থলীতে এই পিত্ত নিহিত। রঞ্জক পিত্ত অপক্ক বা নিস্তেজ পিত্ত, উহাতে উষ্মা বা তাপ অত্যল্প, যেমন নীলাকাশ সূর্য্যেরই একাংশ ও তদ্দারা পৃথিবীর রাসায়নিক সংযোগ বিয়োগ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, নীলবর্ণ রঞ্জকপিত্ত ও তদ্রূপ প্রধান পাচক পিত্তের একাংশ এবং তদ্দারা ভুক্তান্নের পরিপাক ও ভুক্তান্নজাত রসের রঞ্জনাদি রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। প্রধান পাচক পিত্ত পক্ব, পীতবর্ণ এবং সমধিক আগ্নেয়। তন্ত্রান্তরে বলা হইয়াছে।

"তস্মাত্তেজোময়ং পিত্তং পিত্তোষ্মা যঃ স পক্তিমান্।"

স কায়াগ্নিঃ স কায়োষ্মা স পক্তা স চ জীবনম্।

স সঞ্চরতি কুক্ষিস্থঃ সর্ব্বতো ধমনীমুখৈঃ॥

তেজোময় পিত্তের উষ্মা বা তেজই পক্তিমান্। উহাই কায়াগ্নি, কায়োষ্মা, অন্নাদির পাচক এবং উহাই জীবের জীবন। উহা কুক্ষিতে অবস্থিতি করিয়া ধমনীমুখ দ্বারা সর্ব্বশরীরে সঞ্চরণ করে।

সাধক পিত্ত।

"যত্ত সাধকসংজ্ঞং তৎ
কুর্য্যাদ্বুদ্ধিং ধৃতিং স্মৃতিং।"

যে পিত্তদ্বারা বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতি জন্মে, তাহাই সাধক পিত্ত। সাধক পিত্তের কার্য্য মনোবৃত্তি সকলের উৎকর্ষতা সাধন ও বুদ্ধি, মেধা এবং স্মৃতি প্রভৃতিকে যথোপযুক্ত কার্য্যকরী করিয়া তোলা ও সেই সকলকে যথাযথরূপে নিয়মিত করা।

আলোচক পিত্ত।

"যদালোচক-সংজ্ঞং তদ্রূপগ্রহণকারণম্।"

যে পিত্তদ্বারা রূপ দর্শন হয়, তাহার নাম আলোচক পিত্ত। আলোচক পিত্তের অবস্থিতি স্থান দর্শনেন্দ্রিয়। দর্শনেন্দ্রিয়ে আলোচক পিত্ত আছে বলিয়াই আমাদিগের, দর্শনক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়। চক্ষের পীতবর্ণ রেখা সমূহের জ্যোতিতে পদার্থ নয়ন গোচর হয়। আর এই জ্যোতি দ্বারাই আমরা বাহিরের তেজের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছি। যেমন নাসিকা দ্বারা আমরা বহির্ব্বায়ুর আকর্ষণ করিয়া বাঁচিয়া থাকি, তদ্রূপ চক্ষের দ্বারাই আমরা বাহিরের তেজ আহরণ করিয়া তেজের প্রকাশন ও পরিপাককরণ প্রভৃতি ক্রিয়া সমাধা করিয়া থাকি। আমরা কিছুক্ষণ চক্ষু মুদিয়া থাকিলে আমাদিগের নিদ্রা আইসে, কারণ চক্ষু মুদিয়া থাকিলে আমাদের সহিত বাহিরের তেজের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, সুতরাং বাহিরের তেজের প্রকাশন গুণ আমাদিগের মধ্যে আহৃত হইতে না পারায়, তমোগুণের আবরণ শক্তি প্রবল হইয়া, আমাদের প্রকাশশক্তিকে বিলুপ্ত করিয়া, নিদ্রাভিভূত করিয়া দেয়। শ্রুতি বলেন, চক্ষের অন্তর্গত তেজস্তত্ত্বে সেই পরমাত্মা পরম পুরুষ বিরাজমান। গীতায় বলা হইয়াছে—

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্॥

আমি বৈশ্বানররূপে প্রাণীদিগের দেহাশ্রিত হইয়া প্রাণও অপানের যোগে চতুর্ব্বিধ ভোজ্য পরিপাক করি।

সুশ্রুতে বলা হইয়াছে—

জাঠরো ভগবানগ্নিরীশ্বরোঽন্নস্য পাচকঃ।
সৌক্ষ্যাদ্রসানাদদানো বিবেক্তুং নৈব শক্যতে।

অন্নাদির পাককর্ত্তা জঠরাগ্নি প্রভৃতি সকলই সেই ভগবান পরমেশ্বর।

বস্তুতঃ যে শক্তি আমাদের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া আমাদিগের যাবতীয় শারীরিক ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেছে। যে শক্তি আমাদিগের ভুক্তান্ন জীর্ণ করিয়া, রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি ও মজ্জা শুক্র প্রভৃতি পদার্থ প্রস্তুত করিয়া শরীর সংগঠন, পোষণ ও প্রকাশন প্রভৃতি যাবতীয় শারীরিক ক্রিয়া, বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতি প্রভৃতি যাবতীয় মানসক্রিয়া, দর্শন, প্রকাশন ও উত্তেজন প্রভৃতি যাবতীয় স্নায়বীয় ক্রিয়া ও যাবতীয় ইন্দ্রিয়ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেছে, তাহা মানববুদ্ধির অগম্য, সুতরাং তাহা একমাত্র পরম দয়াল পরমেশ্বরের শক্তি ব্যতিরিক্ত আর কি হইতে পারে?

ভ্রাজক পিত্ত।

ভ্রাজকং কান্তিকারি স্যাল্লেপাভ্যঙ্গাদিপাচনম্।

যদ্দ্বারা অঙ্গে প্রলিপ্ত দ্রব্যাদি শোষিত ও পরিপক্ক হইয়া অঙ্গের শোভা সম্পাদন বা রোগবিমোচন করে, তাহাই ভ্রাজকপিত্ত।

মৃদু ও তীব্র দহন ক্রিয়া।

সূর্য্যোত্তাপে পৃথিবীর রস শোষিত হয়। অগ্নির তাপে জল সহযোগে ডালভাত তরিতরকারি প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্যের পাকক্রিয়া সমাধা হয়। ইহাকে মৃদু দহন ক্রিয়া বলা যায়। তীব্র দহন ক্রিয়ায় কাঠ কয়লা প্রভৃতি ভস্মীভূত হয়।

ডাল ভাত তরকারি প্রভৃতি আহার্য্য বস্তু অগ্নিতাপে তদ্রূপ দগ্ধ হয় না, রূপান্তরিত এবং লঘু ও কোমল হইয়া খাদ্যোপযোগী হয়, অপিচ উদরে গিয়া উদরাগ্নি সংযোগে পুনর্ব্বার রূপান্তরিত হইয়া রস, রক্ত ও মাংসাদিতে পরিণত হয়। ইহাকেই ভুক্তান্নের পরিপাক বা মৃদু দহন-ক্রিয়া বলা যায়। সূর্য্য, অগ্নি, ও পাচক পিত্তের ক্রিয়া অভিন্ন। সূর্য্য, তেজ বা অগ্নিবস্তুই শরীরস্থ পিত্তে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কুপিত হইলে অশুভ এবং অকুপিত থাকিলে শুভফল প্রদান করে, সেই শুভ ও অশুভ বা মঙ্গল ও অমঙ্গল এই—

পক্তিমপক্তিং দর্শনমদর্শনং মাত্রামাত্রত্বমুষ্মণঃ
প্রকৃতিবিকৃতিবর্ণৌ শৌর্য্যং ভয়ং ক্রোধং হর্ষং
মোহং প্রসাদমিত্যেবমাদীনি চাপরাণি দ্বন্দ্বানীতি।

পরিপাক ও অপাক, দর্শন ও অদর্শন, শারীরিক তাপের মাত্রার সমতা ও বিষমতা, প্রকৃতি ও বিকৃতি, বর্ণ ও অবর্ণ, শৌর্য্য ও অশৌর্য্য, ভয় ও অভয়, ক্রোধ, ও অক্রোধ, হর্ষ ও অহর্ষ, মোহ ও অমোহ, প্রসাদ ও অপ্রসাদ ইত্যাদি এবং এইরূপ আরও অনেক লক্ষণ আছে।

পরিপাক, দর্শন, শারীরিক তাপের মাত্রা, প্রকৃতি, বর্ণ, শৌর্য্য, অভয়, হর্ষ ও অপ্রসন্নতা এই সকল অক্ষুণ্ণ থাকা অকুপিত পিত্তের তথা স্বাস্থ্যের লক্ষণ এবং পরিপাকের পরিবর্ত্তে অপাক, দর্শনের পরিবর্ত্তে অদর্শন, শারীরিক তাপের বিষমতা, প্রকৃতির বিকৃতি, বর্ণের বিপর্য্যয়, শূরত্বের অভাব, ভয়, ক্রোধ, হর্ষের অভাব, মোহ ও অপ্রসন্নতা এই সকল পিত্ত বিকৃতির তথা অস্বাস্থ্যের লক্ষণ। পরিপাক হইতেই দর্শনাদি [illegible] উৎপত্তি হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে অগ্নিই দেহস্থ পিত্তে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সুফল ও কুফলের উৎপাদন করে, পরিপাক প্রভৃতি [illegible] সুফল এবং অপরিপাক প্রভৃতি [illegible] বস্তুতঃ ভুক্তান্ন সম্যক্ পরিপাক হইলে, দর্শনাদি

শারীরিক সমস্ত ক্রিয়া এবং স্বাস্থ্য অব্যাহত থাকে, আর ভুক্তান্নের অপাক হইতেই বিবিধ বিকারের সৃষ্টি হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদে বলা হইয়াছে—

রোগস্তু দোষ-বৈষম্যং দোষসাম্যমরোগতা।

দোষের বৈষম্য রোগ এবং দোষের সমতা অরোগ।

দোষ শব্দে বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা। ইহাদিগের বৈষম্যাবস্থায় দেহ অসুস্থ হয়। বাত, পিত্ত এবং শ্লেষ্মা সাম্যাবস্থায় থাকিলে দেহে প্রসাদভূত রক্তাদি সার পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং উহাদিগের বৈষম্যাবস্থায় রস-রক্তাদি সার পদার্থ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই সার পদার্থের বৃদ্ধির অবস্থা স্বাস্থ্যের অবস্থা এবং ক্ষয়ের অবস্থা অস্বাস্থ্যের অবস্থা। যে বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা সাম্যাবস্থায় দেহধারক ও দেহ-পোষক, সেই বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মাই বৈষম্যাবস্থায় দেহ পীড়ক ও প্রাণনাশক। দোষের এক নাম মল, দোষের বৈষম্যাবস্থায় মলাংশ এবং সাম্যাবস্থায় সারাংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ঘর্ম্ম, নাকের সিক্‌নী, মুখের থুথু, কাস ও বমনের পিত্ত প্রভৃতি মল পদার্থ বাচ্য এবং রসরক্তাদি প্রভৃতি সারপদার্থবাচ্য। সুশ্রুতে বলা হইয়াছে, বাত, পিত্ত এবং শ্লেষ্মাই দেহোৎপত্তির হেতু এবং তাহারা অবিকৃত থাকিলেই দেহ সুস্থ থাকে, আর বিকৃত হইলেই দেহ অসুস্থ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। চরকে বলা হইয়াছে—বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মার গতি দ্বিবিধ। প্রাকৃতী গতি ও বৈকৃতী গতি।

পিত্তাদেবোষ্মণঃ পক্তি র্নরাণামুপজায়তে।
তচ্চ পিত্তং প্রকুপিতং বিকারান্ কুরুতে বহূন্।
প্রাকৃতস্তু বলং শ্লেষ্মা বিকৃতো মল উচ্যতে।

যে পিত্তের উষ্মা হইতে পরিপাক শক্তি উৎপন্ন হয়, সেই পিত্ত প্রকুপিত হইলে আবার বহুবিধ বিকারের সৃষ্টি হয়। তদ্রূপ যে শ্লেষ্মা শরীরের বলকর, সেই শ্লেষ্মাই মলজনক। দেহের বাত, পিত্ত এবং শ্লেষ্মা কিরূপভাবে অবস্থান করিতেছে ও দেহ সুস্থ আছে কিনা, তাহা পাচকাগ্নির বলাবল ও ক্রিয়া দ্বারা জানা যায়। পাচকাগ্নি চতুর্ব্বিধ—

মন্দস্তীক্ষ্ণোঽথ বিষমঃ সমশ্চেতি চতুর্ব্বিধঃ।

মন্দাগ্নি, তীক্ষ্ণাগ্নি, বিষমাগ্নি ও সমাগ্নি। এই চতুর্ব্বিধ অগ্নি—বাত, পিত্ত এবং শ্লেষ্মার বৈষম্য ও সাম্য অবস্থা হইতে উৎপন্ন।

কফ-পিত্তানিলাধিক্যাত্তৎসাম্যাজ্জাঠরোঽনলঃ।

কফাধিক্যে মন্দাগ্নি, পিত্তাধিক্যে তীক্ষ্ণাগ্নি, বাতাধিক্যে বিষমাগ্নি এবং বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মার সাম্যাবস্থায় সমাগ্নি। এই চতুর্ব্বিধ অগ্নির মধ্যে সমাগ্নি শ্রেষ্ঠ, অগ্নির সাম্যাবস্থায় কোন বিকারের সৃষ্টি হয় না। অন্য ত্রিবিধ অগ্নি হইতেই বিকারের সৃষ্টি হয়।

বিষমো বাতজান্ রোগাংস্তীক্ষ্ণঃ পিত্তনিমিত্তজান্।
করোত্যগ্নিস্তথা মন্দো বিকারান্ কফসম্ভবান্॥
সমা সমাগ্নেরশিতা মাত্রা সম্যগ্বিপচ্যতে।
স্বল্পাপি নৈব মন্দাগ্নে র্বিষমাগ্নেস্তু দেহিনঃ॥
কদাচিৎ পচ্যতে সম্যক্ কদাচিচ্চ ন পচ্যতে।
মাত্রাতিমাত্রাপ্যশিতা সুখং যস্য বিপচ্যতে॥
তীক্ষ্ণাগ্নিরিতি তং বিদ্যাৎ সমাগ্নিঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।
আমং বিদগ্ধং বিষ্টব্ধং কফপিত্তানিলৈস্ত্রিভিঃ॥

বিষমাগ্নি হইতে বাতজরোগের, তীক্ষ্ণাগ্নি হইতে পিত্তজ রোগের এবং মন্দাগ্নি হইতে কফজ রোগের উৎপত্তি হয়। এই চতুর্ব্বিধ অগ্নির মধ্যে সমাগ্নি শ্রেষ্ঠ, কারণ সমাগ্নি সাম্যাবস্থায় অবস্থিতি করে এবং [illegible] সমভাবে পানাহার সম্যক্ [illegible]

মন্দাগ্নি অল্পমাত্রায়ও ভোজ্যবস্তু পাক করিতে সমর্থ নহে। বিষমাগ্নি কদাচিৎ সম্যক্ পরিপাকে সমর্থ হয়, আবার কখনও বা সম্যক্ পরিপাকে সমর্থ হয় না। অতি মাত্রায় আহার পানীয় পরিপাক করা তীক্ষ্ণাগ্নির কার্য্য। কফ, পিত্ত ও বাতের প্রকোপ হইতে যথাক্রমে আমাজীর্ণ, বিদগ্ধাজীর্ণ ও বিষ্টব্ধাজীর্ণ উৎপন্ন হয়।

ত্রিবিধ অগ্নি হইতে ত্রিবিধ বিকারের সৃষ্টি হয় বলিয়া ত্রিবিধ অগ্নিই অপাকের মধ্যে পরিগণিত এবং এই অপাক হইতেই দর্শনাভাব বা অদর্শন, শারীরিক তাপের মাত্রার বিষমতা, প্রকৃতির বিপর্য্যয়, বর্ণবিপর্য্যয়, পুরুষত্বের অভাব, ভয়, ক্রোধ, বিষাদ, মোহ বা অজ্ঞানতা ও অপ্রসন্নতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়, কিন্তু ত্রিবিধ অগ্নির মধ্যে মন্দাগ্নি সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট, তীক্ষ্ণাগ্নিতো দূরের কথা, এক্ষণে বিষমাগ্নির লোকও বঙ্গদেশে বিরল, পরন্তু মন্দাগ্নির লোকই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বলা বাহুল্য ইহা বাঙ্গালীর শোচনীয় দুর্দ্দশার চরম পরিণাম। তবে বেশী দিনের কথা নহে, বিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও এরূপ অবস্থা ছিল না, তখনকার লোকে মন্দাগ্নি বা বদ্‌হজম কাহাকে বলে, জানিত না, পাথর খাইয়া হজম করিত। দুই একজনের নহে, প্রায় অধিকাংশ লোকেরই তখন অগ্নি প্রবল ছিল। জলাহারের উপকরণ ছিল দই, চিড়ে ও গুড়, তাহাই তখনকার লোকে কত তৃপ্তির সহিত আহার করিত। এখন আর সে কালও নাই সে মানুষও নাই বা সে বলবীর্য্য বা দেহের লাবণ্যকান্তি কিছুই নাই। প্রায় প্রত্যেকেই অবসাদগ্রস্ত, কঙ্কালসার, বিষন্ন বদন, যেন আনন্দ চিরদিনের মত তাহাদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলে কেহ বলেন, আজ বদ্‌হজম হইয়াছে, কেহ বা বলেন, চোঁয়া ঢেকুর উঠিতেছে, কেহ বা বলেন, আজ পেটে বড় উইও জন্মিয়াছে, ইত্যাকার আক্ষেপোক্তি আজ কাল সচরাচর প্রায় প্রত্যেক বাঙ্গালীর মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ উদরাময় বা বদ্‌হজম আজ কাল যেন বঙ্গদেশে সংক্রামক রোগে পরিণত হইয়াছে। বাঙ্গালীর মধ্যে এরূপ লোক বিরল, যাঁহার পেটের অসুখ বা বদ্‌হজম নাই। যিনি বার্লির পরিবর্ত্তে মাছের ঝোল ভাত আহার করেন, তিনিই এক্ষণে মহা ভাগ্যবান্। বড় বেশী দিনের কথা নহে, দশ পনর বৎসর পূর্ব্বেও এদেশে তীক্ষ্ণাগ্নির লোক ছিল, এরূপ এক ব্যক্তিকে আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাঁহার নাম আধমোণী কৈলাস, নিবাস যশোহর জেলার অন্তর্গত মল্লিকপুর নামক গ্রামে। এই ব্রাহ্মণ প্রায় সর্ব্বদাই কলিকাতায় বাস করিতেন। তাঁহার ব্যবসায় ছিল শ্রাদ্ধ ও বিবাহাদি ক্রিয়া উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ ভোজন ও ভোজন দক্ষিণা আদায়। তাঁহার নামের পূর্ব্বে যে বিশেষণ তাঁহাকে বিশেষিত করিয়াছে, তাহা তখনকার কলিকাতাবাসী অনেকেই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, বস্তুতঃ তাঁহার অমিত-ভোজন দর্শনে সকলেই যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইতেন, বিস্মিত হইবারই কথা, এককালে অর্দ্ধমণ ভোজন বিস্ময়কর ব্যাপার নহে কি? তিনি চিকিৎসক শিরোমণি স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের বাটীতে ক্রিয়া কর্ম্ম উপলক্ষ্যে প্রায়ই আহার করিতেন, কারণ সেন মহাশয় তাঁহাকে আহার করাইয়া যেন পরিতৃপ্ত করিতেন, তিনিও সেখানে আহার করিয়া [illegible]

সন্তোষলাভ করিতেন। একদিন ৺কৈলাস শর্ম্মা আবদার করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, দেখ তুমি প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে ভোজন দক্ষিণা যাহা দিতেছ, আমি যে কয়েক জনের ভোজ্য ভোজন করিব, আমাকে সেই কয়েকজনের ভোজন দক্ষিণা দিতে হইবে, সে দিন তিনি এই কথা বলিয়া লুচি, সন্দেশ ইত্যাদি অর্দ্ধ মোণ আহার করিয়াছিলেন এবং ৺ সেন মহাশয়ও তাঁহার আবদার মত দশ টাকা ভোজন দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন। কৈলাস শর্ম্মা অনুগ্রহ করিয়া একদিন আমার বাটীতে আগমন করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহার পেটের অসুখ করিয়াছিল। আসিয়া বলিলেন, আমাকে অগ্নিকুমার দেও, আমি তাঁহার আদেশমত অগ্নিকুমার দিলাম, কিন্তু "একটি" দেখিয়া তিনি ক্রোধব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, তুমি তো দেখিতেছি "মস্ত কবিরাজ" তোমার এমন বুদ্ধি! যাহার আধ মোণ খোরাক, তাহাকে দিয়াছ একটি অগ্নিকুমার! দশ বিশটা দিতে হয়!! একালের নব্য যুবক সম্প্রদায় বিশ্বাস করিবেন কি না বা এসকল উপন্যাসের গল্প মনে করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন কি না, জানি না, কিন্তু ইহার এক বর্ণও মিথ্যা নহে। হায় সেই একদিন, আর এই একদিন! তখন অতি বৃদ্ধ যাঁহারা, তাঁহাদিগের মধ্যেও অতি অল্প লোকেই চস্মা ব্যবহার করিতেন, আর এখন চস্মাধারীর সংখ্যা করা যায় না, তাও আবার সবই নব্য যুবক ও বালক! হরি হরি এই তো দেশের অবস্থা! এই তো আমাদিগের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের অবস্থা! এই তো তাঁহাদিগের দূরদর্শন! তাঁহারা চস্মা ব্যতীত সম্মুখের মানুষটি দেখিতে পান না! অণুবীক্ষণ ব্যতীত অণুটি দেখিতে পান না, আর তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ চস্মা-ব্যতীত বৃদ্ধাবস্থা পরম সুখে অতিক্রম করিয়া-ছেন এবং প্রাচীন ভারতের ঋষিরা দিব্যচক্ষে সেই "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ানের" স্বরূপ দর্শন করিতেন! এই তো আমাদিগের তেজ! এই তেজের আবার গর্ব্বই কত! ইহারা মনে করে যেন ইহাঁদিগের পূর্ব্বপুরুষ-গণ নির্ব্বোধ এবং ঋষিরা অতিশয় অজ্ঞান ছিলেন! সমধর্ম্মী সমধর্ম্মীর আকর্ষক, "গুণী গুণং বেত্তি ন বেত্তি নির্গুণঃ।" বস্তুতঃ আমরা আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ বা সংযমী না হইলে, কি করিয়া তাঁহাদিগের তেজ ও বীর্য্যের বা জ্ঞান-গৌর-বের মহিমা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করিব? কোথায় সেই তেজ, কোথায় সেই বীর্য্য, আর কোথায়ই বা সেই রজস্তমোগুণ নির্ম্মুক্ত নির্ম্মল দিব্য জ্ঞান! আবার ভারতে— বাঙ্গালায় সেই ব্রহ্মচর্য্য, সংযম ও দিব্যজ্ঞান কবে ফিরিয়া আসিবে? কবে আমাদিগের জীবন ও সংসার মধুময় হইবে? সেই তেজ ব্রহ্মতেজ, সেই তেজ অগ্নির তেজ, যে তেজের প্রভাবে কপিলমুনি ষষ্টি সহস্র সগর সন্তানকে ভস্মীভূত করিয়াছিলেন! সেই তেজ, অগ্নির তেজ, যে তেজের বলে অর্দ্ধ মোণ খাদ্য পরিপক্ব হয়। সেই অগ্নি সত্ত্ব ও রজোবহুল। সত্ত্ব গুণের ধর্ম্ম প্রকাশ, সেই গুণ অগ্নি ও সূর্য্যে বিদ্যমান, যে গুণে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার বিনষ্ট হয়, সেই গুণে আহার পরিপক্ব ও [illegible] তমোগুণ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। দেহের অগ্নি দেহের পাচক পিত্ত, সেই পাচক পিত্তে [illegible] তেজ ও প্রকাশ ধর্ম্ম বিরাজমান, কিন্তু [illegible] চর্য্য ও সংযমের অভাবে পিত্ত বি[illegible] ও তাহার ফলে অগ্নি নিস্তেজ ও দেহ [illegible]

হইয়া পড়ে, সুতরাং তখন সে তেজের গুণ উপলব্ধি করা যায় না, অপিচ—অপাক বা অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হয় ও ক্রমশঃ তাহা হইতে অদর্শনাদি পিত্ত-বিকৃতির লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। ত্রিবিধ অগ্নি হইতে অপক্তি, এবং অপক্তি হইতে অদর্শন, উষ্মার অমাত্রত্ব বা বিষমতা, প্রকৃতি ও বর্ণের বিপর্য্যয়, অশৌর্য্য, ভয়, ক্রোধ, হর্ষাভাব বা বিষাদ এবং মোহ ও অপ্রসন্নতা প্রভৃতি প্রকাশ পায়। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, কাঠ কয়লার যে শক্তিতে রেল ষ্টীমারের এঞ্জিন বা কল পরিচালিত হয়, সে শক্তি—সূর্য্য-শক্তি। পাশ্চাত্য মনীষীদিগের এ কথা সত্য,—সূর্য্য-তেজের আধার, সেই তেজ যাহাতে অধিক নিহিত, তাহাকেই তৈজস বস্তু বলা হয়, তৈজস দ্রব্যে অগ্নির সংস্পর্শ ঘটিলেই তাহা জ্বলিয়া উঠে। গন্ধক, সোরা প্রভৃতি এই শ্রেণীর দ্রব্য। কাঠ কয়লায়ও সূর্য্যশক্তি নিহিত আছে বলিয়াই তাহা অগ্নিসংস্পর্শে জ্বলে। কয়লার সংযোগে এঞ্জিনের যে শক্তি, খাদ্যের সংযোগে দেহরূপী এঞ্জিনের সেই শক্তি, কিন্তু যদি দেহের পরিপাক শক্তি অত্যন্ত নিস্তেজ হয়, তাহা হইলে খাদ্য পরিপাকে সমর্থ হয় না। এঞ্জিনের অগ্নি নিস্তেজ হইলে কি কয়লা দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়? অতএব অগ্নিই যে তেজের আধার এবং সেই তেজ হইতেই যে পরিপাক শক্তি, বল, বর্ণ ও শৌর্য্য বীর্য্য উৎপন্ন হয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমাদের বাঙ্গালী বর্ত্তমানে অগ্নিহীন, সুতরাং নিস্তেজ ও দুর্ব্বল, কঙ্কালসার, কোটরগত চক্ষু, স্ফূর্ত্তিবিহীন মুখমণ্ডল, পাণ্ডুবর্ণ দেহ, যেন দেশের বালক ও যুবকগণ অশীতিপর বৃদ্ধের ন্যায় অকস্মাৎ জরাক্রান্ত হইয়াছে। ত্রিবিধ অজীর্ণ ও মন্দাগ্নিই এই দুরবস্থার মূল কারণ। অদর্শন শব্দে দর্শনাভাব, চক্ষের দ্বারা দর্শন ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়, অক্ষিগত রোগ উৎপন্ন হইলে দর্শনের ব্যাঘাত ঘটে। উষ্মা শব্দে পিত্তের তাপ। পিত্ত স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে দ্বিধা বিভক্ত। স্থূল পিত্ত দৃশ্যমান ও সূক্ষ্ম পিত্ত অদৃশ্য। অদৃশ্য পিত্তই উষ্মা বা তাপ নামে অভিহিত। বিকৃতি দ্বারা প্রকৃতি নির্ণীতা হয়। তেজের কি প্রকৃতি, কি শক্তি কি গুণ ও কি ক্রিয়া, চক্ষের ব্যাধি উপস্থিত হইলে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তদ্রূপ অগ্নির প্রকৃতি, তাহার বিকৃতি দ্বারা জানা যায়। মন্দাগ্নি বা অজীর্ণ উপস্থিত হইলে অগ্নি কি বস্তু, উপলব্ধি করা যায়। জ্বরে সন্তাপিত অবয়ব হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলে, তাপ কি বস্তু হৃদয়ঙ্গম করা যায়। আবার ঐ তাপ যখন প্রবৃদ্ধ হইয়া ১০৬।১০৭ ডিগ্রীতে পরিণত হয়, তখন দেহে কি পরিমাণ উষ্মা বা তাপ অবস্থিতি করিয়া কিরূপে খাদ্য পরিপাকাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাহা বুঝা যায়। কিন্তু এই যে তাপ, এই তাপ অস্বাভাবিক, স্বাভাবিক তাপে শরীর সুস্থ থাকে এবং দুর্ব্বলতার পরিবর্ত্তে শরীর সবল ও সতেজ করে, তজ্জন্য এই তাপ দূষিত পিত্তের ক্রিয়া বলিয়া গণ্য। পিত্ত প্রকৃতিস্থ থাকিলে—

দর্শনং পক্তিরুষ্মা চ ক্ষুত্তৃষ্ণা দেহমার্দ্দবম্।
প্রভা প্রকাশো মেধাচ পিত্তকর্ম্মাবিকারজম্॥

দৃষ্টিশক্তি, পরিপাকশক্তি, উষ্মা বা তাপ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দেহের মৃদুতা, কান্তি, প্রকাশ বা সত্বগুণের ধর্ম্ম প্রসন্নতা ও মেধা এই সকল অব্যাহত থাকে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বাত, পিত্ত শ্লেষ্মার গতি দ্বিবিধ—প্রাকৃতী ও বৈকৃতী। প্রাকৃতী গতির ফলে দেহে প্রসাদযুক্ত বাত,

শ্লেষ্মার প্রসাদগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও তাহার ফলে রস রক্তাদি সারবস্তর পরিমাণ বাড়ে বলিয়া শরীর সুস্থ থাকে, আর বৈকৃতীগতির ফলে দেহের মলভূত বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মার পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় বলিয়া বাতের অস্বা-ভাবিক শোষণ গুণে, পিত্তের অস্বাভাবিক দহনগুণে ও শ্লেষ্মার অস্বাভাবিক আর্দ্রতায় শরীরের রসরক্তাদি সার পদার্থসমূহ ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া দেহের ক্ষয়সাধন করে। যে বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা দেহোৎপত্তি এবং দেহধারণ ও দেহ পোষণের হেতু। যে বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা স্বভাবে অবস্থিতি করিলে দেহ সুস্থ ও সবল থাকে, সেই বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মাই অস্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলে স্বাস্থ্য ও দেহ নাশ করে। কিন্তু এই অস্বাভাবিক অবস্থা অপর কিছুই নহে, পদার্থের আশয় বা স্থানচ্যুতি। যাহার যে আশয়, সেই আশয়ে সে যথাযথভাবে অবস্থিতি করিলে, তাহার পরিমাণের তারতম্য ঘটে না. সুতরাং সে অবস্থায় স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে। লোকালয়ে যেমন প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতেই রন্ধনালয় বা পাকশালা বিদ্যমান, দেহেও তদ্রূপ পক্বাশয় ও অগ্ন্যাশয় বিদ্যমান। অপিচ ক্ষুধার উদ্রেক হইলে যেমন পাকশালার দিকে দৃষ্টি নিপতিত হয়, তদ্রূপ উদরের দিকেও দৃষ্টি নিপতিত হয়, বরং প্রথমেই উদরের দিকে দৃষ্টি পড়ে। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শরীরের সকল অবয়বে তাপ থাকিলেও কেবলমাত্র পক্বাশয়েই ক্ষুধার উদ্রেক হয়। সুতরাং পক্বাশয়ই অগ্ন্যাশয় বা অগ্নির স্থান। আবার যেমন সজল তণ্ডুল পূর্ণ হাঁড়ী চুল্লীর উপর স্থাপন করিলে, তন্নিম্নস্থ অগ্নিসন্তাপে তণ্ডুল পরিপক্ব হইয়া অন্নে পরিণত হয়, তদ্রূপ আমা-শয় বা ষ্টমাকের নিম্নস্থ সমান বায়ুর ধমন ক্রিয়ায় উদরাগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া আমাশয়স্থ খাদ্য পাক করে। আয়ুর্ব্বেদে বলা হইয়াছে—

সন্ধুক্ষিতঃ সমানেন পচত্যামাশয়স্থিতম্।
ঔদর্য্যোঽগ্নির্যথা বাহ্যস্থালীস্থং তোয়তণ্ডুলম্॥

এই সমান বায়ুর সমতায় ঔদরাগ্নি সাম্য-ভাব এবং বৈষম্যাবস্থায় বৈষম্যভাব অবলম্বন করে, আর এই সাম্যাবস্থার নামই সমাগ্নি এবং বৈষম্যাবস্থার নামই অগ্নি বৈষম্য। অগ্নি বৈষম্য ত্রিবিধ—মন্দাগ্নি, তীক্ষ্ণাগ্নি ও বিষমাগ্নি। মন্দাগ্নি—কফ-দুষ্ট, তীক্ষ্ণাগ্নি—পিত্ত-দুষ্ট এবং বিষমাগ্নি—বাত-দুষ্ট। সমান বায়ু কুপিত হইলে অগ্নির সমতা বা সাম্যভাব বিনষ্ট হয় এবং তখন কফের সহিত সংযুক্ত হইলে কফের গুরুতাবশতঃ অগ্নি অধোগামী হয় এবং বাত পিত্ত দুষ্ট হইলে বাত ও পিত্তের লঘুতাবশতঃ অগ্নি ঊর্দ্ধগামী হয়। যে গুণে বমন হয়, তাহাই অগ্নি ও বায়ুর গুণ এবং যে গুণে বিরেচন হয়, তাহাই পৃথিবী এবং জলের গুণ। দেহের বাত, পিত্ত এবং শ্লেষ্মা যথা-ক্রমে বায়ুর, অগ্নির এবং জল ও ক্ষিতির পরিণাম বা রূপান্তর। পিত্ত অগ্নির এবং কফ জল ও পৃথিবীর। বমন ও বিরেচন উভয়ই বিকার। বিকৃতির দ্বারা প্রকৃতি নির্ণীতা হয়। যে গুণে বমন ও বিরেচন হয়, সেই গুণে পিত্ত, শ্লেষ্মা এবং রসরক্তাদি পদার্থ দেহের ঊর্দ্ধ ও অধোগামী হয়। সুশ্রুতে বলা হইয়াছে—"বমনদ্রব্যাণি অগ্নিবায়ুগুণ-ভূয়িষ্ঠানি, অগ্নী বায়ু হি লঘু লঘুত্বাচ্চোর্দ্ধ-মুত্তিষ্ঠন্তি তস্মাদ্বমনমপ্যূর্দ্ধ—গুণভূয়িষ্ঠমুক্তং।" বমন দ্রব্য অগ্নি ও বায়ু গুণ বহুল, অগ্নি এবং বায়ু উভয়ই লঘু, লঘুত্ব হেতু তাহারা ঊর্দ্ধ-গামী হয়। তদ্রূপ—"বিরেচনদ্রব্যাণি [illegible]

বায়ুগুণভূয়িষ্ঠানি পৃথিব্যাপো গুর্ব্বো গুরুত্বা-দধো গচ্ছন্তি, তস্মাদ্বিরেচন মধোগুণভূয়িষ্ঠ মুক্তং। বিরেচন দ্রব্য পৃথিবী ও অম্বুগুণভূয়িষ্ঠ তজ্জন্য বিরেচন অধোগামী। পিত্ত স্বভাবতঃ লঘু এবং শ্লেষ্মা স্বভাবতঃ গুরু। যে গুণে আকাশ হইতে বৃষ্টি নিপতিত হয়, তাহাই জলীয়গুণ, এই গুণ দেহের শ্লেষ্মায় বিদ্যমান, আর যে গুণে নদ নদী ও সমুদ্রের জল বাষ্প হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয়, তাহাই সূর্য্যের দহন গুণ, এই গুণ দেহের পিত্তে বিদ্যমান। অথবা জ্বলন গুণবিশিষ্ট প্রজ্বলিত দীপালোকের ঊর্দ্ধগতি পিত্তে এবং তন্নিম্নস্থ তৈলের নিম্নগতি শ্লেষ্মায় বিদ্যমান, কিন্তু এই ঊর্দ্ধগতি ও নিম্নগতির কারণ সমান বায়ুর বৈষম্য, সমান বায়ু কুপিত হইলে, অগ্নি স্বকীয় আশয়-ভ্রষ্ট হইয়া উৎক্ষিপ্ত হয়, সুতরাং ভুক্তান্ন যথারীতি পরিপক্ব হয় না। চরকে ইহার একটি উত্তম দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে :—

যথা প্রজ্বলিতো বহ্নিঃ স্থাল্যামিন্ধনবানপি।
ন পচত্যোদনং সম্যগনিলপ্রেরিতো বহিঃ॥
পক্তিস্থানাত্তথা দোষৈ রুষ্মা ক্ষিপ্তো বহির্নৃণাম্
ন পচত্যন্নবহুতং কৃচ্ছ্রাৎ পচতি বা লঘু॥

যেমন স্থালীস্থ বহ্নি ইন্ধনযুক্ত হইলেও বায়ুদ্বারা বহিঃ প্রেরিত হওয়ায় সম্যক্ অন্নপাক করিতে পারে না, সেইরূপ দোষ সকলের দ্বারা মানুষের উষ্মা পক্বাশয় হইতে বহির্নিক্ষিপ্ত হওয়ায় আহার পাক করিতে সমর্থ হয় না অথবা কষ্টের সহিত লঘু অন্ন পাক করে। উষ্মা কিরূপে স্থানচ্যুত হয়, জ্বরই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। জ্বরে যে থার্ম্মমিটারের পারদ ঊর্দ্ধগামী হয়, তাহা ঊর্দ্ধগতিশীল অগ্নি ও বায়ু-গুণেরই ক্রিয়া এবং জ্বরবিচ্ছেদে শরীর শীতল হইলে আবার যে ঐ যন্ত্রের পারদ নিম্ন-গামী হয়, তাহাই শ্লেষ্মার সোম বা শৈত্য-গুণের ক্রিয়া। চরকে জ্বরোৎপত্তির প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে –

বিক্ষিপ্যামাশয়োষ্মাণং যস্মাদগত্বা রসং নৃণাং।
জ্বরং কুর্ব্বন্তি দোষাস্তু হীয়তেঽগ্নিবলং ততঃ॥

যেহেতু দোষ সকল আমরসকে প্রাপ্ত হইয়া আমাশয়স্থ উষ্মাকে স্থানচ্যুত করিয়া জ্বরোৎপাদন করে, সেইজন্য পাচকাগ্নি বলহীন হয়। যেমন অতি তপ্ত তৈল ও ঘৃতে জল নিপতিত হইলে সেই তৈল ও ঘৃতের উষ্মা বা তাপ উৎক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়, তদ্রূপ আমাশয়স্থ আমরস তন্নিম্নস্থ অগ্ন্যাশয়ে নিপতিত হইলে, সেই রসের চাপে অগ্ন্যাশয়ের উষ্মা উৎক্ষিপ্ত হইয়া সর্ব্বতঃ বিস্তৃত হয়, ইহাই জ্বর নামে অভিহিত। তজ্জন্য অগ্ন্যাশয়ের পাচকাগ্নি বলহীন হয়। কেবল জ্বর বলিয়া নহে, পাচকাগ্নির দুর্ব্বলতা হইতে অসংখ্যরোগের সৃষ্টি হয়। চরকে বলা হইয়াছে—

"যে রোগানীকে আশয়ভেদেন আমাশয়সমুত্থঞ্চ পক্বাশয়সমুত্থঞ্চ।"

আশয় ভেদে রোগ দ্বিবিধ, আমাশয়জাত ও পক্বাশয়জাত। আমাদিগের পানাহার মুখবিবর হইতে নিপতিত হইয়া আমাশয় ও পক্বাশয় এই দুই স্থানেই পরিপক্ব হয়, অতএব পানাহারের দোষে যে সকল বিকার জন্মে সেই সকল বিকার আমাশয় ও পক্বাশয় হইতেই জন্মে এবং অগ্নি-বৈষম্যই তাহার কারণ, তবে সকল রোগে অগ্নি সমভাবে দুর্ব্বল বা নিস্তেজ হয় না এবং সকল রোগের লক্ষণও একবিধ নহে। মন্দাগ্নি, তীক্ষ্ণাগ্নি ও বিষমাগ্নি এই ত্রিবিধ অগ্নি-বিকার হইতে যে সকল ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহার অধিকাংশ ব্যাধিতেই জ্বর [illegible]

প্রয়োগ করিলে অগ্নির দুর্ব্বলতা প্রতীয়মান হয়। জ্বর-বিচ্ছেদে শরীর শীতল হইলে যেমন থার্ম্মমিটারের পারদ ৯৪।৯৫ ডিগ্রীতে নামিয়া যায়, তদ্রূপ অনেক রোগেই পারদ নিম্নে নামিয়া যায়, ইহাই অগ্নিহীনতা তথা [illegible] বা শ্লেষ্মার সোমগুণ বৃদ্ধির লক্ষণ। [illegible] ক্ষুধা-হ্রাস, আহারে অনিচ্ছা বা [illegible] আহারের পরিমাণ হ্রাস পাওয়া অথ[illegible] বিক তাপ, ভয়, ক্রোধ, বিষাদ প্রভৃতি লক্ষণ [illegible] দুর্ব্বলতারই লক্ষণ। তাপই হউক, ভয়ই হউক, ক্রোধই হউক বা বিষাদই হউক অথবা মোহ বা অপ্রসন্নতাই হউক, সকল শরীরেই আছে, কিন্তু তাহার অস্বাভাবিক বৃদ্ধিই দোষের এবং তাহাই বিকার শব্দ বাচ্য।

ক্রোধ, ভয়, বিষাদ, অজ্ঞানতা ও অপ্রসন্নতা এ সকল স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক কিম্বা অগ্নিহীনতা হইতে উৎপন্ন কি না, তাহা জানাও কঠিন নহে। অগ্নিহীনতা হইতে জাত ক্রোধ, বিষাদ ও অপ্রসন্নতা প্রভৃতি লক্ষণ ক্ষণিক, তাহাদিগের স্থায়িত্ব বড় অল্প। যেমন ক্রোধের উদয়, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রশান্তি। অগ্নিহীন বা অল্পাগ্নি এঞ্জিন কি অধিকক্ষণ বা অধিক বেগে দৌড়াইতে পারে? ইন্ধন বিহীন বা অল্প কয়লা বিশিষ্ট এঞ্জিন কি অধিক তেজে ছুটিতে পারে? সেইজন্যই আয়ুর্ব্বেদে বলা হইয়াছে—

অস্ত দোষশতং ক্রুদ্ধং সন্তি ব্যাধিশতানি চ।
কায়াগ্নিমেব মতিমান্ রক্ষন্ রক্ষতি জীবিতং॥
সারমেতচ্চিকিৎসায়াঃ পরমগ্নেশ্চ পালনম্।
তস্মাদ্ যত্নেন কর্ত্তব্যং বহ্নেস্তু প্রতিপালনম্॥
তদ্ধি তেজোময়ং পিত্তং পিত্তোষ্মা যঃ স পক্তিমান্
স কায়াগ্নিঃ স কায়োষ্মা স পক্তা স চ জীবনম্।
স সঞ্চরতি কুক্ষিস্থঃ সর্ব্বতো ধমনীমুখৈঃ॥

কবিরাজ,
শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ।

আয়ুর্ব্বেদে পরিপাক ক্রিয়া।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ইহা শ্বেত, পিচ্ছিল, স্বচ্ছ, ক্ষার ও অগ্নিগুণযুক্ত। এই রসের গুণ ও কার্য্য কতকটা লালার ন্যায়। কিন্তু আমাশয়িক অম্লরসের সহিত ইহার ক্রিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাশয়িক রস স্থূলতঃ মধুর রসকে (শর্করাকে অম্লরূপে পরিণত করে এই রস আবার সেই অম্ল রসকে মধুর রসে আনয়ন করে। এবং দেখা যায় যে, ঘটনা ক্রমে গ্রহণী হইতে অতিরিক্ত পিত্ত চালিত হইয়া আমাশয়-গাত্র লিপ্ত করিলে পরিপাকের বিঘ্ন ঘটে। এইরূপ অবস্থায় যে কোন দ্রব্য আহার করিলে, পরিপাক প্রাপ্ত না হইয়া বরং তদ্বিপরীত অজীর্ণ (বিদগ্ধাজীর্ণ) রোগের সৃষ্টি করে। কিন্তু এই রস সেরূপ নহে, এই রসের সহিত যত অধিক পরিমাণে পিত্ত সংযুক্ত হইবে ততই এই রসের কার্য্য প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে থাকে। ঠিক এইরূপ অবস্থায় পুনঃ পুনঃ আহার করিয়াও মানব তৃপ্তি বোধ করে না, বরং আরও খাইবার ইচ্ছা হয়, ইহাকেই ভস্মব্যাধি [illegible] গ্রহণীপ্রাপ্ত এই রসের নাম [illegible] ক্লোমযন্ত্র নাভির উপরিভাগে [illegible] অবস্থিত। ইহা যকৃতের [illegible]

করিয়া প্লীহার সমসূত্রে নাভির উপরিভাগে অবস্থিতি করিতেছে। ইহার গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষ্ণবর্ণের দাগ দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ দাগগুলি দেখিতে অনেকটা "তিলের মত" সুতরাং ইহার অপর নাম "তিল"। যকৃৎ এবং ফুস্‌ফুসের সহিত ইহার বিশেষ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহা জলবাহি-ধমনীর মূল। এখান হইতে একটী ধমনী উত্থিত হইয়া জলবাহি কৈশিকী সিরাজালের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই ক্লোমযন্ত্র হইতে একটী ধমনী গ্রহণীর বাঁকের কিঞ্চিৎ নিম্নে উপস্থিত হইয়াছে। এবং তদ্দ্বারা ক্লোমরস গ্রহণীতে পতিত হইয়া পিত্তের সহিত একত্র হইয়াই কটুরস প্রধান ভুক্তদ্রব্যকে পরিপাক করে। এবং এই রসের সহিত মিলিত হইলে পুনরায় দ্রব্যগুলি মধুর রসে পরিণত হয়, ইহাই আমাশয়িক শেষ পরিপাক। এই শেষ পরিপাক কালে গ্রহণীগাত্র হইতে আরও বিবিধ প্রকার মধুর রস শ্লৈষ্মিকধাতু লালার ন্যায় নির্গত হইয়া ভুক্ত দ্রব্যের সহিত মিলিত হয়।

গ্রহণীর বিস্তৃত বিবরণ—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, গ্রহণী আমাশয়েরই একটী অংশ এবং বর্ণনার সুবিধার জন্য, "গ্রহণী ক্ষুদ্রান্ত্রের সহিত মিলিত" এ কথাও বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ গ্রহণী ও ক্ষুদ্রান্ত্রে বিশেষ কোন প্রভেদ লক্ষিত হয় না। একটী ধমনীই আমাশয় হইতে নির্গত হইয়া পক্বাশয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এই সমগ্র ধমনীর নাম ক্ষুদ্রান্ত্র। ইহার প্রথম অংশের নাম প্রধানতঃ গ্রহণী, ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় দ্বাদশ আঙ্গুল। অপর অংশের নাম প্রধানতঃ ক্ষুদ্রান্ত্র কিন্তু সাধারণতঃ এই বিস্তৃত সমগ্র ধমনীর নামই ক্ষুদ্রান্ত্র বা গ্রহণী বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে। আমাশয়ের ন্যায় ইহারও তিনটী আবরণ, বাহ্য, মধ্য ও আভ্যন্তর। বাহ্য আবরণ—ইহা ত্বকের ন্যায় অবস্থিত। এই আবরণটী আমাশয়ের ত্বক গাত্র হইতেই উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয়—পেশীর আবরণ। ইহাতে কতকগুলি পেশীতন্তু দীর্ঘাকারে সমস্ত ক্ষুদ্রান্ত্রে বিস্তৃত হইতেছে, এবং কতকগুলি তন্তু বৃত্তাকারভাবে এই ধমনীর সমস্ত পরিধি বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এই পেশীর আবরণে মাংসধরা কলা দৃষ্ট হয়। এই কলাগাত্রে শোণিতবাহি-সিরা, স্নায়ু সকল অবস্থিতি করে। আভ্যন্তর আবরণ পিত্তধরা কলা। ইহার ত্বক্‌গাত্র পিত্তময় হইলেও শ্লেষ্মা লিপ্ত থাকে, এবং কৈশিকী সিরাগুলি এই স্থানে আসিয়া অবশেষে ছিদ্ররূপে পরিণত হইতেছে। এবং এই সকল স্থান পেলব (কোমল) পেশীতন্তু দ্বারা নির্ম্মিত হওয়ায় আভ্যন্তর প্রদেশটী অতিশয় কোমল প্রাপ্ত হয়। এই ক্ষুদ্রান্ত্র পিত্তময় ও সমান বায়ুর বিচরণ স্থান বলিয়া, এই স্থানে হইতে পরিপাক প্রাপ্ত দ্রব্য সারভাগ অক্লেশে শোষিত হইতে পারে এবং ইহাতে শ্লেষ্মা থাকায় এই অন্ত্রে অন্নের গমন এবং পরিপাক ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। পেশীসূত্র বৃত্তাকারে ও দীর্ঘভাবে অবস্থিতি করায় ভুক্তদ্রব্যের অন্তর্গতি শিথিল হইতেছে। সুতরাং এই ক্ষুদ্রান্ত্রে ভুক্তান্ন সম্পূর্ণরূপে পরিপক্ক হইতেছে। এবং দেখা যায় যে এই অন্ত্রের প্রথম অংশ অপেক্ষাকৃত স্থূল, স্থির, বক্র ও অধিক পিত্তযুক্ত, তৎপর ক্রমে অল্প হইতে অল্পতর হইতেছে। সুতরাং আমরা বর্ণনার সুবিধার জন্য এই প্রথমাংশকে গ্রহণী ও অপরাংশকে [illegible]

এবং সমস্ত ধমনীকে ক্ষুদ্রান্ত্র বলিয়া অভিহিত করিতে পারি।

পূর্ব্বোক্তরূপে গ্রহণীতে পরিপাককালে ভুক্তদ্রব্য হইতে যে সারভাগ উৎপন্ন হয় তাহার নাম রস। রস শ্বেতবর্ণ, অতিশয় তনু, শীতল, মধুর রস, স্নিগ্ধ ও গতিশীল। এই রস পরিপাককালে পুনঃ পুনঃ নানা আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া রাসায়নিক সংযোগে অর্থাৎ বিকৃতি-বিষম-সমবায় বশতঃ মদিরা প্রভৃতির ন্যায়, ভুক্তদ্রব্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ দ্রব্য হইয়া পড়ে। এই সময় গ্রহণীস্থিত ভুক্ত দ্রব্য পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে গ্রহণীতে পরিপাককালে প্রথম অবস্থায় যে পচ্যমান অন্ন কটুরসে পরিণত হইয়াছিল তাহা পুনরায় ক্লোম-রস এবং গ্রহণীস্থিত শ্লৈষ্মিক ধাতুদ্বারা আক্রান্ত হইয়া মধুরতা লাভ করিতেছে। তৈল প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্য আমাশয় কিম্বা গ্রহণীতে পরিপাক প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু উহারা কৈশিকী সিরাজালে প্রবেশ করিয়া ক্রমে শোণিতবাহি সিরা দ্বারা সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত হয়। তৈল, জল, সুরা, ভাঙ্গ, অহিফেন প্রভৃতি দ্রব্য, কতকগুলি আমাশয় হইতে এবং কতকগুলি গ্রহণী হইতে অপক্ক অবস্থায় শোণিত-সিরায় প্রবেশ করে। পক্কান্নের সারভাগ, গ্রহণীস্থিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র দ্বারা কৈশিকী সিরায় প্রবেশ করিয়া ক্রমে ঊর্দ্ধ-গামী রসবাহিনী ধমনীতে উপনীত হয়। রসবাহিনী ধমনী নাভিদেশ হইতে পশ্চাৎ-ভাগে পৃষ্ঠদেশ অবলম্বন করিয়া হৃদয় প্রদেশে উপস্থিত হইয়া নীল সিরার সহিত মিলিত হইয়াছে। ভুক্তদ্রব্যের সারভাগ ও এই ধমনী দ্বারা হৃদয় প্রদেশে শোণিত সিরায় পতিত হইয়া হৃৎপিণ্ডে উপস্থিত হইতেছে। গ্রহণী হইতে সূক্ষ্মতম স্রোতঃ দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে রসের সহিত এবং অবশিষ্টাংশ শোণিত সিরায় প্রবেশ করিতেছে। এইরূপে সমস্ত ক্ষুদ্রান্ত্র হইতে ভুক্তদ্রব্যের সারভাগ এবং জল শোষিত হয়। এবং এই স্থান হইতে পিত্তের কিয়দংশ শোষিত হইয়া নীল সিরায় পতিত হইতেছে। এইরূপে ভুক্তদ্রব্যের সারভাগ, জল ও পিত্ত শোষিত হইলেও ভুক্তান্ন কঠিনতা প্রাপ্ত বা বিশুষ্ক হয় না, বরং পূর্ব্ববৎ তরলই থাকিয়া যায়। কারণ সমস্ত জলীয় ভাগের শোষণ হয় না, যাহা আবশ্যক তাহাই শোষিত হইয়া থাকে। অতিরিক্ত জলীয় ভাগ এবং আমাশয় পরিস্রুত রস, এতদুভয়ের দ্বারা উহার তরলতা পূর্ব্ববৎই থাকিয়া যায়। এই ভুক্তান্ন গ্রহণীর মূলভাগ হইতে যত অধিক অগ্রসর হইতে থাকে ততই মধুরতা লাভ করে। কারণ এই যে, গ্রহণী স্থিত কলা যত অধিক পিত্তযুক্ত, উপগ্রহণী সেরূপ নহে। উপগ্রহণীতেও লালার ন্যায় ধাতুস্রাব হইতে দেখা যায়।

ক্ষুদ্রান্ত্রের নিম্ন প্রান্তে একটী কবাট দৃষ্ট হয়। যতক্ষণ ভুক্তদ্রব্য ক্ষুদ্রান্ত্রে অপক্ক অবস্থায় অবস্থিতি করে ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ কবাট বদ্ধ থাকে এবং পরিপাক প্রাপ্ত হইলেই ঐ দ্বার খুলিয়া যায় এবং সহজে পক্কান্ন পক্কাশয়ে উপস্থিত হইতে পারে। কবাটের নিকট এই সময় অন্ন পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে ভুক্ত দ্রব্যের সারভাগ সমস্তই শোষিত হইয়াছে এবং পক্কান্ন তরল অবস্থায় হরিদ্রা বর্ণ ধারণ করিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় মল পক্কাশয়ে প্রবেশ করে এবং তখন হইতেই মলে দুর্গন্ধ জন্মে। দুর্গন্ধের কারণ কি? এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। কেহ

বলেন পক্বাশয় হইতে এক প্রকার রসের স্রাব হয় এবং তাহার সহিত মিশ্রিত হইয়া মলে দুর্গন্ধ জন্মে। বস্তুতঃ কোন একটী বিশিষ্ট রসের দ্বারাই যে দুর্গন্ধ জন্মে, ইহ নিশ্চয়রূপে বলা যায় না। কিন্তু দ্রব্য, পরিপাক ক্রিয়া, আশয় এবং ইহাদের সংযোগ এই সমস্তই একত্রে দুর্গন্ধের কারণ। ঐ কবাট, ক্ষুদ্রান্ত্র ও পক্বাশয়ের মধ্যে থাকিয়া ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রকে পৃথক করিতেছে। এই কবাট এমন কৌশলে অবস্থিত যে, পক্বাশয় গত দ্রব্য পুনরায় ফিরিয়া পশ্চাৎ ভাগে ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করিতে পারে না। কবাটের অংশদ্বয় অর্দ্ধ চন্দ্রাকার ও পেশী নির্ম্মিত। পেশীতন্তু কতকগুলি বৃত্তাকারে ও কতকগুলি সরলভাবে অবস্থিত থাকায় উহা আরও কঠিন হইয়াছে, উহা পিত্তধরা কলা দ্বারা আচ্ছাদিত। উণ্ডুক যখন মলপূর্ণ থাকে তখন কবাটের অংশদ্বয় এরূপভাবে সংলগ্ন থাকে যে, উণ্ডুক হইতে মল আর ফিরিয়া উপগ্রহণীতে উপস্থিত হইতে পারে না।

পক্বাশয়ের অপর নাম বৃহদন্ত্র। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির বৃহদন্ত্র প্রায় ৬৪ হইতে ৯৬ অঙ্গুলী দীর্ঘ। বর্ণনার সুবিধার জন্য ইহাকে চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম উণ্ডুক, দ্বিতীয় পক্বাশয়, তৃতীয় উত্তর গুদ, চতুর্থ অধরগুদ। উণ্ডুকের অপর নাম পুরীষাশ্রক। ইহা একটী থলীর মত, ইহা আন্ত্রিক কবাটের দ্বারা ক্ষুদ্রান্ত্রের সহিত যোগ রক্ষা করে। পক্বাশয়—বৃহদন্ত্রের প্রায় সমস্ত অংশের নামই পক্বাশয়। উহা উণ্ডুক হইতে আরম্ভ করিয়া ঊর্দ্ধগামী হইয়া পরে সরলভাবে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া নিম্নগত উত্তর গুদের সহিত মিলিত হইয়াছে। প্রধানতঃ [illegible] এই অংশটীর নামই পক্বাশয়। উত্তর গুদ—ইহা অধরগুদেরই একটী অংশ, নলকাকার। অধরগুদ—ইহা নিম্নদেশে বিস্তৃত হইয়া আবার সঙ্কীর্ণ হইয়া মলদ্বারে পরিণত হইয়াছে। ক্ষুদ্রান্ত্রের ন্যায় বৃহদন্ত্রের তিনটী আবরণ দেখা যায়। বাহ্য আবরণ, পেশীর আবরণ ও আভ্যন্তর আবরণ, বা মলধরা কলা। পেশীর আবরণের কতকগুলি পেশীসূত্র বহির্দেশে লম্বমানভাবে এবং কতকগুলি পেশীসূত্র অভ্যন্তরদিকে বৃত্তাকারভাবে অবস্থিতি করিতেছে। এই পেশীর আবরণ অতিশয় স্থূল; ইহা উপর্য্যুপরি তিনস্তর পেশীসূত্র দ্বারা নির্ম্মিত। এ স্থানের পেশীসূত্রগুলি কুঞ্চিত হইয়া থাকায়, অধিক মল প্রবেশ করিলেও ইহা বিস্তৃত হইতে পারে। উত্তর গুদ ও অধর গুদের পেশীর আবরণও ঐরূপ স্থূল এবং দ্বিবিধ অর্থাৎ দীর্ঘ ও গোলাকার এবং রুক্ষ ও কুঞ্চিত পেশীসূত্র দ্বারা নির্ম্মিত। গুদমার্গ বলয়াকার তিন খানি মাংসপেশী দ্বারা নির্ম্মিত। বৃহদন্ত্রের তৃতীয় আবরণ মলধরা কলা। ক্ষুদ্রান্ত্রের ন্যায় ইহাতে আগ্নেয়, সারভূত পিত্তাণুগুলি সংলগ্ন থাকে না। এই আবরণ ও তন্তু ত্বক নির্ম্মিত এবং শ্লেষ্মা, সিরাও স্নায়ু দ্বারা ব্যাপ্ত। ইহাতেও কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে। এবং তাহারাও কৈশিকী সিরার সহিত যোগ রাখিয়া থাকে। এবং এই সকল কৈশিকী সিরাজাল বহুকণই স্থূল অরুণ সিরার সহিত সংযোজিত। এই শোণিতবাহি কৈশিকী সিরা হইতেই অপান বায়ু পক্বাশয়ে প্রবেশ করে এবং পেটে এক প্রকার বেদনা উপস্থিত করিয়া মল বাহির করিয়া দেয়। এতদ্ভিন্ন মলভাগ হইতেও বায়ুর উৎপত্তি হয় [illegible] মল নিষ্কাশন ব্যাপারে বৃহদন্ত্রের [illegible]

[illegible]

ক্রিয়াও সাহায্য করে। বৃহদন্ত্রের পরিপাক শক্তিও কিছু না আছে তাহা নহে, তবে আমাশয় কিম্বা ক্ষুদ্রান্ত্রের সহিত তাহার তুলনা হয় না। কারণ পিচ্‌কারী দ্বারা কোন ঔষধ দ্রব্য, পক্কাশয়ে প্রবেশ করাইলেও তাহা পুরীষরূপে পরিণত না হইয়াই নির্গত হইয়া যায়। তবে উহার একটা শক্তি বা বীর্য্য শোণিতের সহিত মিশ্রিত হইতে দেখা যায়। ইহা দ্বারা জানা যায় যে পক্কাশয়ের পরিপাক ক্রিয়াও আছে, কিন্তু তাহা ত্বকের ন্যায়। পক্কাশয়ের পরিপাক প্রাপ্ত দ্রব্যের বীর্য্য শোণিত মধ্যেই শোষিত হয়। কিন্তু দ্রবমল সিরাজাল দ্বারা শোষিত হইয়া বস্তিদেশে নীত হয়।

পূর্ব্বোক্তরূপে অপান বায়ুর বেগে ও বৃহদন্ত্রের কুঞ্চনে মল সঞ্চালিত হইয়া উত্তর গুদে উপস্থিত হইলে একেবারে মলদ্বারে আসিয়া পড়ে না, কিন্তু উত্তর গুদে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করে। উত্তর গুদের উপরিভাগ বস্তি—গাত্রের সহিত সংলগ্ন। ইহার উপরিভাগ হইতে মল আসিয়া উত্তর গুদে পতিত হইলে দেখা যায়, মল কঠিনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কারণ উত্তর গুদে অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র মধ্যে অসংখ্য দ্রব মলবাহি সূক্ষ্ম স্রোতঃ বিদ্যমান থাকে। আবার ঐ সকল সিরাজালই বস্তিগাত্রে ব্যাপ্ত হইতে দেখা যায়।

অতঃপর অপান বায়ুর বেগে মল অধর গুদে উপস্থিত হইয়া নির্গত হইয়া যায়। কুন্থন ক্রিয়া দ্বারা অপান বায়ু উত্তেজিত হইতে পারে। অর্থাৎ নিঃশ্বাস টানিয়া উহা বাহির হইতে না দিয়া নিম্নদিকে চাপ দিলে অপান বায়ুর উপর যে ভার পতিত হয় তদ্দ্বারা ঐ বায়ু প্রকুপিত হইয়া অন্ত্রে বেদনা উৎপাদন করতঃ মল নিঃসারণ করিয়া থাকে। এবং এই সময় অন্ত্রেরও কুঞ্চন ক্রিয়া হইতে দেখা যায়। সাধারণতঃ গুদ-মুখ কুঞ্চিত থাকে কিন্তু মল নির্গমন কালে উহা প্রশস্ত হইয়া মল পরিত্যাগ করে। (ক্রমশঃ)

কবিরাজ—
শ্রীহরমোহন মজুমদার।

দীর্ঘজীবীর দিনচর্য্যা।

(১) শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল্, সি, এস, আই।

মনুষ্য প্রকৃতি যাঁহারা কিঞ্চিন্মাত্রও পর্য্যালোচনা করিয়াছেন তাহারা জানেন যে উপদেশ অপেক্ষা উদাহরণ মানুষের মনের উপরি অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। কেননা উপদেশ বাঙ্ময়, উদাহরণ শরীরী, উপদেশ কঠোর, উদাহরণ কোমল, উপদেশ আজ্ঞাকারী প্রভু, উদাহরণ হিতকামী সুহৃৎ। পিতার আদেশ পালন করিবে ইহা উপদেশ—রামায়ণ ইহার অপূর্ব্ব হৃদয়ানন্দকর উদাহরণ। ধর্ম্মের জয় অধর্ম্মের পতন উপদেশ মাত্র—মহাভারত ইহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিশদ উদাহরণ। নীতি সম্বন্ধে যেমন স্বাস্থ্যের পক্ষেও তদ্রূপ—আয়ুর্ব্বেদের স্বস্থবৃত্ত উপদেশ, দীর্ঘজীবী—তাহার উদাহরণ। আয়ুর্ব্বেদ হইতে কেবল আয়ুর্ব্বেদিক উপদেশ সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রচার করা অপেক্ষা এতদ্দেশীয় দীর্ঘজীবিগণের অনুষ্ঠিত আহার, ব্যায়াম ও আচারবিধি পাঠক পাঠিকাগণের নিকট উপস্থিত করিলে, অধিক ফললাভের সম্ভাবনা আছে এই চিন্তা করিয়া, আমরা দী-

জীবিগণের দিনচর্য্যা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। অধুনা বাঙ্গালীর সাধারণ পরমায়ুর পরিমাণ সম্বন্ধে যাঁহারা অনুসন্ধান করিয়াছেন তাঁহারা বলেন ৩০ হইতে ৪০ বৎসর আধুনিক বাঙ্গালীর গড় পরমায়ু বলা যাইতে পারে। এতাদৃশ শোচনীয় অবস্থায় যাঁহারা ৭০ অতিক্রম করিয়াছেন তাঁহাদিগকেই আমরা দীর্ঘজীবী বলিব। শিশু পড়িয়া গেলে কি বিষম খাইলে, মাতা "ষাট্ ষাট্" বলেন। ষাট বৎসর বাঁচাই যেন এখন খুব বেশী।

উত্তর পাড়ার সুবিখ্যাত রাজা শ্রীযুক্ত **প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়** এম্, এ, বি, এল্, সি, এস্, আই মহোদয় ১২৪৭ শালের ৩রা আশ্বিন জন্ম গ্রহণ করেন, সুতরাং এক্ষণে তাঁহার বয়স কিঞ্চিৎ অধিক ৭৬ বৎসর। আমি রাজা বাহাদুরের অনুষ্ঠিত দিনচর্য্যা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহাকে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়াছিলাম রাজা বাহাদুর তদুত্তরে আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক যাহা লিখিয়াছিলেন আমি তাহাই সুবিন্যস্ত করিয়া প্রকাশ করিতেছি। আশাকরি ইহাতে দীর্ঘ জীবনাভিলাষিগণের উপকার হইবে।

পিতা মাতার পবিত্র শরীর ও শাস্ত্রানুসারে বিশুদ্ধ আচার ব্যবহার, আমার দীর্ঘজীবনের প্রধান কারণ মনে করি।

দন্তধাবন—৪০ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে কখনও গুল-গুঁড়া কখনও খড়ি মাটীর গুঁড়া দিয়া দন্তধাবন করিতাম। তাহার পর এখন পর্য্যন্ত—মাটী গুঁড়া, সৈন্ধব লবণ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, তেজ, পাতা, লোধ ও সুপারি গুঁড়া সমান ভাগে মিশাইয়া এই গুঁড়া দিয়া দন্তধাবন করি। এখন পর্য্যন্ত দাঁত ভালই আছে।

তৈলমর্দ্দন—স্থির নিয়ম কিছু নাই—তবে প্রতিদিন তৈল মাখি। বর্ষা ও হেমন্তকালে কুব্জ-প্রসারণী এবং অপর ঋতুতে কটু তৈলে প্রস্তুত সৈন্ধবাদ্য তৈল মাখি। আমি কখনও সাবান ব্যবহার করি না।

স্নান—৬০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রতিদিন অবগাহন স্নান করিয়াছিলাম। এক্ষণে তোলাজলে স্নান করিয়া থাকি। শীতকালে—জলে স্নান করি।

আহার—৪০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বেলা ১০ কি ১০॥ টার সময় গৃহস্থ লোকের ন্যায় সাদাসিধে অন্নাহার করিতাম। বেলা ২।৩ টার সময় কচুরি সন্দেশ জল খাবার খাইতাম। রাত্রি ৮টার মধ্যে পুরী খাইতাম। মাসের মধ্যে ৪।৫ দিন ছাগ মাংস ভোজন করি। প্রতি মাসেই এই নিয়ম। মৎস্য ভোজন প্রায় ত্যাগ করিয়াছি। মাসের মধ্যে কখনও এক দিন খাই। গতবৎসর হইতে রাত্রিতে কেবল ২।৩ খানি রুটী কি খৈ খাইতেছি। ফলের মধ্যে রম্ভা, পেঁপে, আম্র, লিচু, শাকালু, কচিশশা, বাদাম, কিসমিস, ও পেস্তা সর্ব্বদা খাইয়া থাকি। এসকল আহারের সঙ্গেই খাইয়া থাকি। ২০ বৎসর বয়স হইতে ৬০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বোধ হয় একদিনের জন্যও উপবাস করিতে হয় নাই। আমার সকল রসের দ্রব্যই ভাল লাগে, তবে মিষ্ট দ্রব্য অধিক খাইতে পারি না। খাইলে অম্ল হয়। প্রাতে ১০॥ টার পূর্ব্বে আমি কিছুই খাই না।

পানীয়—বরাবর গঙ্গার জল পরিষ্কার করিয়া পান করিতাম কিন্তু [illegible]

ট্যাঙ্ক” হওয়ার পর আর গঙ্গা জল পান করি নাই, পুকুরের জল পান করিতেছি। আমি ১০।১২ বৎসর বয়সের পর কখনও বরফ ব্যবহার করি নাই। কখনও চা পান করি নাই।

নিদ্রা—পরীক্ষা দিবার ২।৩ মাস পূর্ব্বে কেবল ৫ ঘণ্টা নিদ্রা যাইতাম। মনে করিতাম যাহারা মনের সাধে নিদ্রা যাইতে পারে তাহারা কি সুখী। অপর সময় ৭।৮ ঘণ্টা নিদ্রা যাইতাম। ৩০ বৎসর হইতে রাত্রি ৩ টার সময় শয্যাত্যাগ করার নিয়ম করিয়াছি। ৫০ বৎসরের পর দিবানিদ্রা অভ্যাস হইয়াছে। কিন্তু আধ ঘণ্টা কি এক ঘণ্টার অধিক নহে।

শয়নগৃহ ও শয্যা—সমস্ত বৎসর আমার শয়ন গৃহের ১টী কি ২টী জানালা খোলা থাকে। গ্রীষ্মকালে সমস্ত জানালা খোলা থাকে। শীতকালে লেপ দিয়া মুখ কখনই ঢাকিতে পারি না। কখনও গদিকেদারায় বসি নাই। ৬।৭ বৎসর বয়সের পর কখনও গদিশয্যায় শয়ন করি নাই। ৫০ বৎসরের পূর্ব্বে কখনও মশারি ব্যবহার করি নাই।

পরিচ্ছদ—শীত, গ্রীষ্ম দুই কালেই আমি শীত ও গ্রীষ্ম সাধারণ লোক অপেক্ষা বেশী অনুভব করি। তজ্জন্য শীতকালে গায়ের উপরে ফ্লানেল জামা অথবা উর্লের গেঞ্জী ২।৩ মাস পরিয়া থাকি। আমি সাদাসিধা পরিচ্ছদের পক্ষপাতী। ৫০ বৎসরের পূর্ব্বে কখনও ছাতি ব্যবহার করি নাই।

ব্যায়াম—৫৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রতিদিন দুই বেলা অশ্বারোহণ করিতাম। সংপ্রতি প্রাতে ও অপরাহ্নে আধ ঘণ্টা করিয়া গাড়ীতে বেড়াই।

বিষয় কর্ম্ম ও অধ্যয়ন—স্নান আহারের সময় বাদে সকল সময় বিষয়-কর্ম্ম কিম্বা পুস্তক পাঠ করি। শরীর সুস্থ রাখিবার নিয়ম ১৬।১৭ বৎসর হইতে এখন পর্য্যন্ত সর্ব্বদা পাঠ করি ও ঐ সকল নিয়ম প্রতিপালন করিতে চেষ্টা করি। মানসিক অথবা শারীরিক কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকি। সকল বিষয়েরই পুস্তক পড়িয়া থাকি, তবে গত ২।৩ বৎসর মধ্যে শরীর ও চিকিৎসাবিষয়ক পুস্তকই অধিক পড়িতেছি। ১৩।১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পড়াশুনায় তাচ্ছিল্য করিতাম। তাহার পর স্কুল ও কালেজের পড়ার উপর ২।৩ ঘণ্টা মাত্র পড়িতাম। কিন্তু পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে ২।৩ মাস ১২ হইতে ১৮ ঘণ্টা পড়িতাম। শেষ রাত্রিতে ৩টার সময় উঠিয়া প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত লেখা পড়ার কার্য্য করিতাম। প্রায় ৫।৬ মাস হইতে সেজের আলোকে চক্ষুর দৃষ্টির হানি হইবার আশঙ্কায় বিছানায় শুইয়া থাকি। ৪টার পর উঠি—শেষ রাত্রিতে আমার ইংরাজি চিঠি পত্র ও অপর কাজ করি। অধিক কাজ না থাকিলে পুস্তক পাঠ করি।

ঔষধ—২০ বৎসর হইতে ৬০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ও পরে আবশ্যক হইলে হোমিওপ্যাথি ঔষধ সেবন করিতাম। গত ১০।১২ বৎসর হোমিওপ্যাথি ঔষধ ভিন্ন কবিরাজী ঔষধও খাইতেছি। প্রতি বৎসর ৩০।৪০ দিন ছাগলাদ্য ঘৃত ১ তোলা কি ১½ তোলা সেবন করি। পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রাতে ১০ টার পূর্ব্বে কিছু খাই না, কিন্তু যখন ছাগলাদ্য ঘৃত সেবন করি তখন প্রাতে ঘৃতের সহিত অর্দ্ধপোয়া গব্য দুগ্ধ পান করিয়া থাকি। বাল্যকাল হইতে কোষ্ঠকাঠিন্য আছে। এখন

বয়সে তজ্জন্য হলওয়ের পিল ৩।৩ বৎসর খাইয়াছিলাম। তারপর ৫।৭ বৎসর কোন রেচক ঔষধ খাই নাই। এক্ষণে প্রায় ৪০ বৎসর হইল "ঋতুহরীতকী" খাইতেছি। চক্ষু-রোগাধিকারের যে ভৃঙ্গরাজ তৈল আছে, ১০।১২ বৎসর হইতে প্রতি সপ্তাহে ৩।৪ দিন ঐ তৈলের নস্য লইয়া থাকি। অধিক লেখা পড়ার পর চক্ষুর কষ্ট হইলে নির্ম্মলী ফল মধুতে ঘসিয়া চক্ষুতে দিয়া থাকি। এমনিও প্রায়ই চক্ষুতে দিয়া থাকি।

বিশেষ অভ্যাস—চুরুট ছাড়িবার জন্য সাজা তামাক ২।১ দিন খাইয়া দেখিয়াছি, কিন্তু "তলব" নাই বলিয়া তাহা অভ্যস্ত হয় নাই। যতক্ষণ কাজে থাকি ততক্ষণ ঘরের ভিতর থাকি। বাকি সময় বারাণ্ডায় বা ফাঁকা জায়গায় থাকিতে ও বসিয়া পড়িতে ভালবাসি। প্রতিদিন প্রাতে ৪।৫টার সময় উপস্থতে জল দিয়া থাকি।

শ্রম-বিনোদন—ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের লইয়া অবসর যাপন করি ও তাহাদিগকে সমবয়স্কের ন্যায় দেখি।

নীতি—মন ভাল না রাখিলে শরীর ভাল থাকে না। পিতার উপদেশ ও তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসারে সাংসারিক ঘটনায় অধিক আনন্দ বা দুঃখ করি না। কোন কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য সম্পূর্ণ চেষ্টা করি কিন্তু তাহা বিফল হইলে মনকে কষ্ট দিই না। সাংসারিক ঘটনা সকল আমাদের মঙ্গলের জন্য ঘটিয়া থাকে, এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া মনকে সর্ব্বদা সুখে রাখি। কাহার ও সুখে হিংসা করি না এবং দুঃখে আনন্দ করিনা।

ধর্ম্মাচরণ—জীবনের সমস্ত কার্য্যেই ধর্ম্মানুশীলন করিয়া থাকি—প্রকাশ্য আহ্নিক কার্য্যে অতি সামান্য সময় ক্ষেপণ করি।

আমার বাতপৈত্তিকের ধাত। তবে প্রায় একবৎসর দেড় বৎসর হইতে দেখিতেছি পূর্ব্বাপেক্ষা মধ্যে মধ্যে শ্লেষ্মার বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

পীড়ার হেতু—যে কোন শারীরিক কষ্ট পাইয়াছি আমার বিশ্বাস তাহার কারণ ২২ বৎসর বয়স হইতে এপর্য্যন্ত চুরুট খাওয়া এবং ঔষধের প্রতি অধিক নির্ভর করিয়া মধ্যে মধ্যে অতি ভোজন।

আমরা অল্পায়ু হইতেছি কেন ?

আমরা অল্পায়ু হইতেছি কেন? বিচার করিয়া দেখিবার পূর্ব্বে, আয়ু সম্বন্ধে সাধারণ লোকের যে একটী বিষম ভ্রম আছে তাহা অপনোদন করা উচিত। আয়ুঃশব্দের অর্থ জীবিতকাল অর্থাৎ যতদিন আমরা বাঁচিয়া থাকি সেই কালকে আয়ু বলে। আমাদের জীবিতকালের কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই। মনে করিলে—স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালনকরিয়া চলিলে, আমরা আমাদের জীবিতকাল সুদীর্ঘ করিতে পারি—আমরা দীর্ঘজীবী হইতে পারি। আবার অত্যাচার করিলে, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মের অবমাননা করিলে, আমরা জীবিতকালকে অতি হ্রস্ব করিতে পারি—আমরা নিতান্ত অল্পায়ু হইতে পারি। লোকের কিন্তু ধারণা, মানুষ একটী নির্দ্দিষ্ট আয়ু লইয়া জন্মগ্রহণ করে।" তাহাদের বিশ্বাস অমুক এতদিন বাঁচিবে

অর্থাৎ অমুকের আয়ু তাহার জন্মের সহিত ঠিক হইয়া গিয়াছে—তা সে হাজার নিয়ম পালন করুক বা সহস্র অনিয়ম করুক তাহার জীবিতকাল তাহাতে বৃদ্ধিও হইবে না হ্রাসও পাইবে না—সে যত আয়ু লইয়া আসিয়াছে ততদিন তাহাকে কে মারে! জীবিতকাল সম্বন্ধে যাহাদের এইরূপ স্থির ধারণা আছে তাহারা যে স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন উপেক্ষা করিবে ইহা আর বিচিত্র কি? ইহাদের নিকট যদি কেহ বলেন "অমুক ঘোর অজিতেন্দ্রিয়—নানা অত্যাচার করিয়া মারা গেল"—উহারা অমনি বলিবে "উহার আয়ু ছিল না তাই মারা গেল।" এই নিয়ত-আয়ুবাদিগণের ভ্রম নিরাশ জন্য আমরা কিছু বলিব না। আয়ুর্ব্বেদবক্তা ঋষি আয়ু সম্বন্ধে শিষ্যের সন্দেহ নিরাশ জন্য যাহা বলিয়াছেন আমরা নিম্নে বঙ্গভাষায় তাহারই অনুবাদ প্রকাশ করিলাম—

"আয়ুর পরিমাণ যদি বিধাতাকর্ত্তৃক নিরূপিতই থাকিত তাহা হইলে দীর্ঘায়ুলাভ করিবার জন্য মন্ত্র, ওষধি, মণি, মঙ্গল, বলি, উপহার, হোম, নিয়ম, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস, স্বস্ত্যয়ন, প্রণিপাতাদি কেন? উদ্‌ভ্রান্ত, চণ্ড, চপল, গো, গজ, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, অশ্ব, মহিষাদি এবং দুষ্ট বাত্যাদি পরীহার করিয়া চলিবারই বা প্রয়োজন কি? পর্ব্বত হইতে পতন, গিরি সঙ্কট, দুর্গমস্থান, জলস্রোতঃ, প্রমত্ত, উন্মত্ত, মোহ-লোভাকুলমতি শত্রুগণ, প্রবল অগ্নি ও বিষধর সর্পাদি হইতে আত্মরক্ষারই বা আবশ্যকত্ব কি? আয়ুর পরিমাণ যদি নির্দ্দিষ্টই থাকিত তাহা হইলে দুঃসাহস, রাজকোপ প্রভৃতি আয়ুনাশ করিতে পারিত না। আমরা প্রায়ই প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, সহস্র পুরুষের মধ্যে যাহারা সর্ব্বদা যুদ্ধ করে এবং যাহারা না করে, তাহাদের আয়ু সমান নহে। আমরা দেখিতেছি যে জন্মমাত্র প্রতীকার ও অপ্রতিকার হেতু মানুষের আয়ুর অতুল্যতা রহিয়াছে (যেমন, যদি কোন শিশুর নাড়ীচ্ছেদে ব্যতিক্রম ঘটে তবে তাহার প্রতিকারে শিশুর জীবনরক্ষা ও অপ্রতিকারে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে)। যে বিষপান করে ও যে বিষপান করে না এই দুই জনের আয়ুর অতুল্যতা দেখা যায়। জলপানের কলসী অপেক্ষা চিত্রঘট অর্থাৎ চিত্রিত তোলা কলসী, অধিক কাল স্থায়ী হয়। যখন আমরা বুঝিতেছি বলিতেছি ও দেখিতেছি যে দেশ, কাল ও সাত্ম্যের বিপরীত আহার বিহারে আয়ুর হানি এবং শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধিপূর্ব্বক আহার বিহারে আয়ুবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে, তখন সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, হিতাচার-মূল আয়ু। গুরুর এই কথা শুনিয়া শিষ্য বলিলেন—ভগবন্ যদি আয়ুর পরিমাণ বিধিনির্দ্দিষ্ট না হইল তবে কালমৃত্যু অকালমৃত্যু কিরূপে সম্ভব হয়? এতদুত্তরে গুরু বলিতেছেন—একটী শকটের বিষয় চিন্তা কর—যদি শকটটী উত্তম সারবান্ কাষ্ঠে সুনিপুণ কারিকর কর্ত্তৃক সুগঠিত হয়, বলিষ্ঠ, শান্ত অশ্বে শকট বহন করে, সুনিপুণ সারথী শকট পরিচালন করে, সমতল রাজমার্গে বাহিত হয়, যথাকালে শকটচক্রে স্নেহাদি প্রদত্ত হয় এবং পরিমিত কার্য্য নির্ব্বাহ করে, তথাপি চক্রমণ্ডলের স্বপ্রমাণ-ক্ষয়হেতু এক দিন উহা বিনষ্ট হইবে। এইরূপ মানুষের দেহরথ যথাশাস্ত্র আহার বিহার অনুসারে পরিচালিত হইলেও একদিন উহা অচল হইবে। ইহাকেই কাল-মৃত্যু বলে। আর উক্ত শকটীর উপাদান যদি অসার হয়, গঠন যদি সুসংবিষ্ট না

হয়, যদি দুষ্ট অশ্ব কর্তৃক উচ্চনীচ মার্গে, অনিপুণ সারথী দ্বারা অতি ভারযুক্ত হইয়া পরিচালিত হয়, যদি অভিঘাত হেতু চক্রাঙ্গের হানি হয়, তাহা হইলে শকটটী যেমন অকালে বিপন্ন হইয়া থাকে, মানুষের শরীরও সেইরূপ বলের অতিরিক্ত চেষ্টা, অগ্নির অতিরিক্ত ভোজন, অতিমৈথুন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, বিষবহ্নির উপতাপ, অভিঘাত ও উপবাসাদিহেতু মধ্যকালেই অন্তিমদশায় উপনীত হয়। ইহারই নাম অকালমৃত্যু"। (চরক-বিমান ২য় অধ্যায়)

উপরি উদ্ধৃত ঋষিবাক্যের সারমর্ম্ম এই—মানুষের কোন নির্দ্দিষ্ট আয়ু নাই—হিতাচার পালন কর, আয়ু রক্ষিত হইবে, অহিতাচার কর, আয়ু ক্ষয় হইবে। অতঃপরও যদি নিয়ত-আয়ুবাদিগণের ভ্রম নিরাশ না হয়, তাঁহারা যদি হিতাচারের—স্বাস্থ্যরক্ষাকর নিয়মের উপকারিতায় দৃঢ় প্রত্যয় না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের এবং সমাজের দুরদৃষ্ট বুঝিতে হইবে। ইহাও বুঝিব যে, আর ঋষিবাক্যেও লোকের শ্রদ্ধা নাই।

সুবুদ্ধি পাঠক এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে, আয়ু বাড়ানর ও কমানর উপায় আমাদের হাতেই রহিয়াছে। কাহার ইচ্ছা নয় যে, আমি সুস্থ শরীরে থাকি ? কে ইচ্ছা করেন না যে, আমার আয়ু শতবর্ষ পরিমিত হউক ? অব্যাহত স্বাস্থ্য ও সুদীর্ঘ আয়ু যখন সকলেরই ঈপ্সিত এবং আয়ুর হ্রাস বৃদ্ধির উপায় যখন আমাদেরই সম্পূর্ণ আয়ত্ত তখন আমাদের অল্পায়ু হওয়ার কারণ কি ?

প্রথম কারণ—শিক্ষাভাব—আচার-ভ্রংশ। অধুনা আমাদের দেশে পল্লীতে পল্লীতে পাঠশালায় স্বাস্থ্যরক্ষার পুস্তক বালকদিগকে পড়ান হইতেছে—তবে শিক্ষাভাব কেমন করিয়া বলা যায় ? স্বাস্থ্যরক্ষার পুঁথি আবৃত্তি করাকে আমরা শিক্ষা বলিব না। যোগ্যাকরণ (Experiment) যেমন বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রাণ, আচার অনুষ্ঠান তেমনি স্বস্থবৃত্তের প্রাণ। আচারভ্রষ্ট হইয়া আমরা যদি স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম আবৃত্তি করি, তাহা হইলে এই প্রাণহীন শিক্ষাকে শিক্ষাভাব বলায় দোষ কি ? চারিদিকে কলেরা হইতেছে গুরুমহাশয় "সরলশরীরপালনের" নজির দিয়া উপদেশ দিলেন দেখ, তোমরা কেহ এখন কাঁচা ফল থাইও না। ছাত্র দেখিল গুরুমহাশয় স্বয়ং বাড়ী গিয়া পেয়ারা ও শশা খাইতেছেন। ছেলে পাঠশালায় পড়িয়া আসিল "প্রাতঃকালে দন্তধাবনের পূর্ব্বে কিছু ভক্ষণ করা উচিত নহে।" বাড়ীতে কিন্তু সে রোজ দেখে, বাবা বিছানা হইতে উঠিয়া কাছা দিতেও ত্বরা সহে না, আগে চা খান। আপনারা বলুন দেখি এস্থলে বালক গুরুমহাশয় ও পিতার আচরণের অনুকরণ করিবে কি পুঁথির মতে চলিবে ? পূর্ব্বে এদেশের পাঠশালায় "শরীরপালন" পড়ান না হইলেও আচরণ করিয়া গৃহে গৃহে শরীরপালন শিক্ষা দেওয়া হইত। এই শিক্ষাই যথার্থ শিক্ষা। তোমরা আগে নিজে সদ্‌বৃত্ত, সদাচার অনুষ্ঠান কর, পরে শিক্ষা দাও, যে শিক্ষা ফলবতী হইবে। নচেৎ মদ্যপায়ীর পানত্যাগের উপদেশ কেহ শুনিবে না। একটা গল্প মনে পড়িয়া গেল—একজনের ছেলে বড়ই মিষ্ট-প্রিয় ছিল। পিতা বিরক্ত হইয়া চিন্তা করিত, কিসে ছেলের এ অভ্যাস ছাড়ান যায়। একদিন পিতা পুত্রকে এক সাধুর নিকট লইয়া গেল—সাধু বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ, যাহাকে কৃপা করিয়া যাহা বলেন ঠিক ফলে। লোকটী সাধুকে বলিল, কৃপা করিয়া

আমার ছেলেটির অতিরিক্ত মিষ্ট খাওয়ার অভ্যাসটী ছাড়াইয়া দেন। সাধু বলিলেন, সাত দিন পরে বালককে লইয়া আসিও। সাত দিন পরে লোকটী ছেলে লইয়া আবার সাধুর নিকট উপস্থিত হইল। সাধু কেবল ছেলেটীর গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন "বেটা, মিঠা মৎ খানা" সেই হইতে বালক মিষ্ট খাওয়া পরিত্যাগ করিল। বালকের পিতা আবার সাধুর কাছে গিয়া বলিল "দেখুন আমার একটী সন্দেহ আছে, দয়া করিয়া ভঞ্জন করুন" সাধু বলিলেন, কি সন্দেহ বল। সে বলিল আচ্ছা আমাকে সাতদিন পরে আসিতে বলিলেন কেন? আপনি ত সেই দিনই "বেটা মিঠা মৎ খানা" এই কথা বলিতে পারিতেন। সাধু বলিলেন "দেখ আমি নিজে তখন মিষ্ট খাইতাম, তাই তখন ঐ কথা বলি নাই, সাত দিন আমি মিষ্টভোজন পরিত্যাগ করিয়া তবে ঐ কথা বলিতে পারিয়াছি এবং তোমার ছেলেও আমার কথা শুনিয়াছে"। আমাদের দেশের উপদেষ্টারা কবে এই কথার গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবেন? আজ কাল বিদেশ হইতে বিবিধ অশন বসনের আমদানী হইতেছে, লোকে শিক্ষার অভাবে, সে গুলি হিতকর কি অহিতকর বিবেচনা করিতে না পারিয়া, মূঢ়ের ন্যায় অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া যাহা পাইতেছে তাহাই গলাধঃকরণ করিতেছে। যাহা সম্মুখে দেখিতেছে তাহাতেই অঙ্গ ভূষিত করিতেছে। কত উদাহরণ দিব? ধরুন বিলাতী জমাট দুধ ও বিবিধ ফুড, শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত কে না ব্যবহার করিতেছে? যে দেশ গোধন ও ধান্য-ধনে ভরা ছিল সেই দেশের শিশুগণ আজ দেশান্তর হইতে আনীত পর্য্যুষিত দুগ্ধে পালিত হইতেছে। অহো দশাবিপর্য্যয়! এ সকল খাদ্য না বিষ? বিদেশীয় ব্যবসায়িগণ স্বার্থের জন্য ঐ সকল দ্রব্যের গুণোদ্ঘোষণ করিতেছে মাত্র। যে দেশের বিলাসপ্রিয়া রমণীগণ সৌন্দর্য্য হানির আশঙ্কায় সন্তানকে স্তন্যদানে পরাঙ্মুখী হয়, সে দেশেই উহাদের প্রচার হউক, ভারতে এ সকল চালাইও না। পরিচ্ছদের কথা কিঞ্চিৎ বলি—বিদেশ হইতে রাশি রাশি পুরাণ জামা, কোট এদেশে আসিতেছে। এই সকল জামা কোথা হইতে আসিতেছে? এগুলি কাহাদের পরিধৃত? এ সকল তত্ত্ব না জানিয়া এদেশের লোকে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ না করিয়া আগ্রহের সহিত মূল্য দিয়া ঐ সকল পুরাণ, অন্যের ব্যবহৃত জামা ক্রয় করিয়া পরিতেছে। আর কত দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধি এতদ্দেশে বিস্তার করিতেছে। যে দেশের প্রথা, পিতার গামছা পুত্র ব্যবহার করিবে না, সে দেশের এই দুরবস্থা! এই সকল আয়ুঃক্ষয়কর অনর্থ-পরম্পরা হইতে দেশবাসিগণকে রক্ষা করিবার কি কেহ নাই?

দ্বিতীয় কারণ—প্রজ্ঞাপরাধ। প্রজ্ঞাপরাধ কি? প্রজ্ঞা অর্থাৎ জ্ঞান যাহা করিতে বলে তাহা না করিলে জ্ঞানের নিকট যে অপরাধ করা হয় তাহাই প্রজ্ঞাপরাধ। প্রজ্ঞাপরাধের তিনটী অবস্থা; প্রথম—"জ্ঞাতানাং স্বয়মর্থানা মহিতানাং নিষেবণম্।" অর্থাৎ নিজেই বেশ বুঝিতেছি যে, এইরূপ আহার বিহার শরীরের পক্ষে কদাপি হিতকর নহে। তথাপি জানিয়া শুনিয়া প্রজ্ঞার কথা ইচ্ছাপূর্ব্বক না মানিয়া সেই অহিত আহার বিহার করিতেছি। দ্বিতীয় অবস্থা—

"বুদ্ধ্যা বিষম-বিজ্ঞানং বিষমঞ্চ প্রবর্ত্তনম্।
প্রজ্ঞাপরাধং জানীয়াম্মনসো গোচরং হি তৎ॥

প্রজ্ঞা, যথাযথ বস্তুতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া বলিতেছে "ইহা করিও না, ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অহিত" কিন্তু আমি প্রজ্ঞার কথা না শুনিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক উল্টা বুঝিয়া, অহিতকে হিতকর ও হিতকরকে অহিত ভাবিয়া আচরণ করিতেছি। ইহার পর এমন এক অবস্থা আসিয়া পড়ে যখন প্রজ্ঞার বাণী শুনিবার আর শক্তি থাকে না। এই অবস্থায় "ধীধৃতিস্মৃতিবিভ্রষ্ট" হইয়া অর্থাৎ হিতাহিত বিবেকশূন্য হইয়া লোক যে অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে ইহাই প্রজ্ঞাপরাধের তৃতীয় অবস্থা। প্রতি অবস্থার উদাহরণ দিতেছি। আমি বেশ জানি প্রাতরুত্থান স্বাস্থ্যের হিতকর, তথাপি জানিয়া শুনিয়াও আমি বেলা ৮টা পর্য্যন্ত বিছানায় পড়িয়া থাকি। আমি জানি, বায়ুপ্রবাহহীন বহুজনাকীর্ণ স্থানে রাত্রিজাগরণ অধিক অহিতকর, জানিয়াও আমি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থিয়েটার দেখিতে ছাড়ি না। আমি জানি চা পান করিলে আমার শরীর বড়ই অসুস্থ হয় তথাপি লোকের দেখা দেখি স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া চা খাইতেছি। প্রজ্ঞাপরাধের এই এক অবস্থা। আমি জানি পাশ্চাত্য জাতির অভ্যস্ত খাদ্য আমার জাতিসাত্ম্য নহে বলিয়া কিম্বা দেশান্তর হইতে আগত টীনবদ্ধ বিবিধ বস্তু পর্য্যুষিত, বলিয়া আমার শরীর ও মনের পক্ষে হিতকর হইতে পারে না, তথাপি আমি বিপরীত ভাবে চিন্তা করিয়া কোথাও বা কষ্টসৃষ্টা এক আধটা অনুকূল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া, যে ভক্ষ্য বস্তুতঃ অহিতকর তাহাকেই হিতকর ভাবিয়া স্বচ্ছন্দে সেবন করিতেছি। আমি দেখিতেছি বুঝিতেছি যে আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গ্রীষ্মকালে সাহেবদের মত আঁটাসাঁটা পোষাক আমাদের স্বাস্থ্যের প্রতিকূল, তথাপি আমি দশ জনের দেখাদেখি বিষম-জ্ঞানে অহিতকে হিতকর ভাবিয়া তদনুসারে আচরণ করিয়া আয়ুঃক্ষয় করিতেছি। প্রজ্ঞাপরাধের চরম অবস্থায় লোক মূঢ়ের ন্যায়, পর প্রেরিতের ন্যায়, সর্ব্বথা হিতাহিত বিবেকশূন্য হইয়া, অশুভানুষ্ঠান করে, কাব্যে ও সমাজে ইহার ভূরিভূরি উদাহরণ আছে।

তৃতীয় কারণ—উপকরণাভাব—দারিদ্র্য। নির্ম্মল পানীয়, বিশুদ্ধ পুষ্টিজনক খাদ্য, ঋতু উপযোগী বস্ত্রাদি, সুখকর বাসভবন, পরিমিত শ্রম, সেবাতৎপর ভৃত্য, রোগে চিকিৎসক, পথ্য, ঔষধ এইগুলি আয়ুরক্ষার সংক্ষিপ্ত উপকরণ। এই উপকরণগুলি অর্থব্যয়ে সংগ্রহ করিতে হইলেও আমরা অর্থাভাব শব্দ ব্যবহার না করিয়া উপকরণাভাব শব্দই প্রয়োগ করিলাম, কারণ সংসারে অনেকস্থলে অর্থের সদ্ভাব থাকিলেও উপকরণের অভাব দেখিতে পাই। যে ধনদ্বারা মানুষ আয়ুরক্ষার উপকরণ সংগ্রহ না করিয়া আত্মবঞ্চনা করে, স্বাস্থ্যচিন্তকগণ সেই ধনরাশিকে পাংশুরাশির মধ্যে গণনা করেন। পক্ষান্তরে যাঁহারা ধনাভাবে স্বাস্থ্যরক্ষার উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারেন না, তাঁহাদিগের জীবন বিড়ম্বনা মাত্র। আচার্য্য বলিয়াছেন, অগ্রে কিসে সুস্থ শরীরে দীর্ঘকাল বাঁচিতে পার সেই চিন্তা করিবে। তারপর কিসে ধনার্জ্জন করিতে পার সেই চিন্তা করিবে। উপকরণ বিহীন লোকের দীর্ঘ আয়ুর মত কষ্টকর আর কিছুই নাই। সেকাল অপেক্ষা একালে আয়ুরক্ষার উপকরণের সংখ্যা এবং মূল্য অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং অধুনা ঐসকল উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য লোককে অধিক শ্রম করিতে হইতেছে। দেশে কৃষি

ও বাণিজ্যের তাদৃশ প্রসার না থাকায় বহু-সংখ্যক লোকেই চাকুরীজীবী হইয়াছে। একে তাহাদিগকে অত্যধিক শ্রম করিতে হইতেছে, তাহাতে আবার পরের হুকুমে কাজ করিতে হইতেছে। এই হুকুমই তাহাদের আয়ুঃক্ষয়ের যথেষ্ট কারণ। আমাদের দেশের সরকারী আফিস আদালত, কারখানা, সওদাগরী কার্য্যালয় সকলেরই কার্য্যকাল মধ্যাহ্ন সময়ে। এ দেশে এক প্রহরের মধ্যে আহার করা স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর নহে, আবার দুই প্রহর অতীত হইলে আহার করাও উচিত নহে। কিন্তু দেশের লোকের কার্য্যকালের এমনই ব্যবস্থা যে, যথাকালে কার্য্য ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে হইলে, লোককে বাধ্য হইয়া এক প্রহরের বহু পূর্ব্বে, যাঁহারা দূরবর্ত্তী স্থান হইতে আসিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে সূর্য্যোদয়ের অল্প-পরেই আহার করিতে হয়। তারপর গ্রীষ্ম প্রধানদেশে আহারের পর গুরুতর চিন্তা ও শ্রম স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর না হইলেও, দেশের জজ-দিগকে আহারান্তেই বিচার করিতে হইতেছে। দেশের কেরাণীদিগকে আহারান্তেই লেখনী চালনা করিতে হইতেছে এবং দেশের হিসাব-রক্ষকগণ আহারান্তেই জমা খরচ লইয়া মাথা কুটিতেছেন। আহারান্তেই শিক্ষক পড়াইতে ছেন, ছাত্রও পড়িতেছে,—আর অগ্নিমান্দ্য বহুমূত্র, শিরোরোগ দল বাঁধিয়া আসিতেছে। আহারের পর মানসিক শ্রম করিবার প্রথা আমাদের দেশে পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না। এদেশের চতুষ্পাঠীর অধ্যাপনা প্রাতেই হইত, এদেশের রাজদরবার প্রাতঃকালেই বসিত। সুতরাং দেখা গেল আয়ুরক্ষার জন্য উপকরণ সংগ্রহ করিতে গিয়া লোকে আয়ু হারাইতে বসিয়াছে। অহো কি বিধি বিড়ম্বনা! কেবল কি আহারের পরই মানসিক শ্রম? আমি ত দেখিতেছি আজকাল দেশের অধিকাংশ লোকেই বাধ্য হইয়া অধ্যশন ও বিষমাশন করিতেছে। অধ্যশন ও বিষমাশন কি? যাহা ভোজন করা হইয়াছে তাহা সম্যক্ পরি-পাক পাইয়া ক্ষুধার উদ্রেকের পূর্ব্বেই পুনর্ব্বার ভোজন করাকে অধ্যশন বলে এবং অধিক মাত্রায় ভোজন, অল্পপরিমাণে ভোজন কিম্বা অকালে ভোজনকে বিষমাশন বলে। আজ-কাল জীবিকার জন্য অনেকেই বেলা ৪।৬ দণ্ডের মধ্যেই মধ্যাহ্নের ভোজন শেষ করিতে বাধ্য হয়। এই সময় কি ক্ষুধা হয়? বহু-লোককে বলিতে শুনিয়াছি, ঘড়িই আমাদিগকে আহার করিতে বলে, ক্ষুধার তাড়নায় খাওয়া কেমন তাহা অনেক দিন ভুলিয়া গিয়াছি। ইহা অধ্যশন নয় ত কি? আহারের সময়েরও স্থিরতা নাই। একই লোক পাঠ্যাবস্থায় বিদ্যা-লয়ের সময়ানুসারে, চাকুরে হইয়া চাকরীর অবস্থানুসারে এবং কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া নূতন অভ্যাস অনুসারে আহারের সময় স্থির করিতে বাধ্য হয়—বহু ভোজন এবং অল্প ভোজন ত অকাল ভোজনের সহচর, সুতরাং বিষমাশনের আর বাকী রহিল কি? এই দেশব্যাপী অধ্যশন ও বিষমাশনের ফলে অগ্নি-মান্দ্য, অজীর্ণ, গ্রহণী, শূল, যকৃৎদোষ, অনিদ্রা, বহুমূত্র, ক্ষয়, শিরোরোগ দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া আবালবৃদ্ধকে আক্রমণ করিতেছে। কথিত আছে "মৃত্যুর্ধাবতি ধাবতঃ" আহার করিয়াই দ্রুত হাঁটিলে মৃত্যুও তাঁহার প্রতি দ্রুত ধাবিত হয়। সমাজের অধিকাংশলোকের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলুন দেখি অধুনা আহারান্তে কাহাকে না দ্রুত হাঁটিতে হয়? এত হাঁটাহাঁটি সমস্তই উপকরণ সংগ্রহ জন্য

সুতরাং উপকরণাভাব প্রস্তাবে আমরা এ সকল কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

চতুর্থ কারণ - বিশুদ্ধ খাদ্য ও পানীয়ের অভাব। বণিক্‌গণের মধ্যে ধর্ম্মভীরুতা হ্রাস পাওয়ায় বাণিজ্যে অধর্ম্ম প্রবেশ করিয়াছে। বণিক্‌গণ ধনতৃষ্ণার ঘোর আবর্ত্তে পড়িয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে এবং অর্থকেই সর্ব্বস্ব ভাবিয়া অধিক লাভের প্রত্যাশায় বাণিজ্যক্ষেত্রে ঘোরতর প্রতারণার সৃষ্টি করিয়াছে। ফলে বিশুদ্ধ খাদ্যদ্রব্য দুর্লভ হইয়াছে। এখন মাখমে কলাবাটা; ঘৃতে সর্পের চর্ব্বি; সর্ষপ-তৈলে বিবিধ অপেয় স্নেহ; দুগ্ধে খড়ি মাটি, বাতাসা পচাপুকুরের জল; তামাকে চুণ, চটছেঁড়া পচা কাঁটাল; চিনি ও ময়দায় পাথরের গুঁড়া; আরও কত বীভৎস ব্যাপার ঘটিতেছে আমরা সে সকলের সংবাদ জানি না। দেশে আছে সব কিন্তু ফলের পক্ষে ভুয়া। খাদ্যে ভেজাল নিবারণের আইন আছে, কিন্তু লোকে আইনের কাটানও শিখিয়াছে। তোমার আমার যে দুঃখ সেই দুঃখ। কেবল কি খাদ্য? ঔষধ বিক্রেতারা বিদেশী দ্রব্যকে দেশী নামে, অজারিত কে সুজারিত বলিয়া, রহিমকে রাম বলিয়া চালাইয়া, দেশের লোকের স্বাস্থ্যহরণ করিতেছে। সুগন্ধি দ্রব্যের বণিক্ অটোকে অগুরু বলিয়া, ড্যাফোডিল্‌কে গন্ধরাজ বলিয়া চালাইতেছে। উগ্রবীর্য্য বিদেশীয় এসেন্স দেশীয় তৈলে মিশাইয়া বিবিধ বিচিত্র নামে বিক্রয় করিতেছে, আর অকালে খালিত্য পালিত্যের সৃষ্টি হইতেছে। যেদিকে দেখি সেই দিকেই মেকির চলন ভেজালের প্রচার।

বিশুদ্ধ পানীয় জলের কথা আর কি বলিব, আমরা সকলেই অনুভব করিতেছি যে বিশুদ্ধ জলের অভাবে পল্লীবাসার স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছে—ম্যালেরিয়া, কলেরা, অজীর্ণাদি বিবিধ দুশ্চিকিৎস্য পীড়ায় বর্ষে বর্ষে কত লোকের আয়ুক্ষয় হইতেছে।

অতঃপর আমরা সর্ব্বকারণ-সংগ্রাহক অধর্ম্ম ও অসংযমের বিষয় উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। শরীর সুস্থ রাখিতে হইলে, দীর্ঘ আয়ু লাভ করিতে হইলে, কেবল শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না—মনের বিষয়ও চিন্তা করিতে হইবে। মন সুস্থ না থাকিলে সুস্থ বলা যায় না। মন প্রফুল্ল না থাকিলে, সর্ব্বদা চিন্তাকুল চিত্তে কালযাপন করিলে, মানুষ সুস্থ থাকিতে পারেনা, দীর্ঘায়ু লাভ ত দূরের কথা। সমাজে অধর্ম্ম এবং অসংযমের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় লোকের চিত্তের সুখ দুর্লভ হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং চিত্তের অপ্রসন্নতা, চিন্তাকুলতার জন্য যে সকল রোগ জন্মিয়া থাকে, দেশের লোকের সেই সকল রোগের আধিক্য দেখা যাইতেছে। দেশের লোকের স্বাস্থ্যের কথা, আয়ুর কথা চিন্তা করিলে আকুল হইতে হয়। আশা করি ভগবান্ আবার সেই সুখের দিন ফিরাইয়া আনিবেন যখন দেশের লোকের—

"নগরী নগরস্যেব রথস্যেব যথা রথী।
স্বশরীরস্য মেধাবী কৃত্যেষবহিতোভবেৎ"॥

এই ঋষি বাক্যানুসারে কার্য্য করিবার ইচ্ছা ও শক্তি জন্মিবে।

শিশু-যকৃৎ-চিকিৎসা।

মহিলাগণের বিশেষ পাঠ্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

লী। কি রকম ধরা কাটা?

ঠা। দু বেলা ঝোল ভাত খাবে। ভাজা পোড়া, লঙ্কার ঝাল, দই, অম্বল, মাংস একেবারে খাবে না। দাল, গরম মসলা ঘিয়ের জিনিষ না খাওয়াই ভাল। যাতে গরহজম না হয় এমনভাবে খাবে।

লী। আমাকেও তা হলে রোগী করে তুল্‌লে দেখ্‌চি ঠাকুমা।

ঠা। তা দায়ে পড়েছ রোগী হতে হবে বৈ কি। রোগী হতে অসাধ থাকলে সেটা গোড়ায় ভাব্‌তে হয়।

লী। বেশ রোগীই না হয় হলাম তার পর কি করতে হবে বল।

ঠা। মনে যখন দুঃখ কষ্ট হবে, কি রাগ হবে তখন ছেলেকে মাই দিবিনে। মন বেশ ভাল হলে তবে মাই দিবি।

লী। কেন তাতে কি হয়?

ঠা। মনে দুঃখ কষ্ট রাগ হলে শরীর খারাপ হয়, মাইয়ের দুধও খারাপ হয়। আর সেই দুধ খেলে ছেলে পিলের অসুখ হয়।

লী। বাবা, এতও তুমি জান ঠাকুমা। তারপর কি বল।

ঠা। বলি শোন। শোক, দুঃখ, ভয়, ক্রোধ, উৎকণ্ঠা প্রভৃতি কারণে মন অভিতপ্ত হলে সে সময়ে মাইয়ের দুধ একটু বিকৃত হয়। সেই জন্যে সে সময়ে মাই দিতে নেই। মন সুস্থ হলে তবে দিতে হয়।

লী। যদি মনের অসুখের সময় ছেলে মাই খাবার জন্যে কাঁদে।

ঠা। দেখ, যতক্ষণ মন খারাপ থাকে কখন ছেলেকে মাই দিস্‌নে। মনের দুঃখ ভুলে বেশ করে হাত পা ধুয়ে ভিজে গামছা দিয়ে গা মুছে মন ঠাণ্ডা হলে ছেলেকে কোলে করে তার মুখ দেখ্‌বি আর ভগবানের নাম কর্‌বি। যখন ছেলের স্নেহে আপনি মাই ঝরে দুধ পড়বে তখন মাই দিবি, বুঝ্‌লি।

লী। হ্যাঁ বুঝেছি। এখন দুধ ছাড়া আর কিছু পথ্য দেব কি না তা বল।

ঠা। ভাল কথা, খোকা কদ্দিনের হলরে, দাঁত উঠেছে?

লী। যেটের কোলে এই আট মাসে পড়েছে ঠাকুমা। ওপরে চারটা নীচে চারটা দাঁত উঠেছে।

ঠা। তা হলে খুব পুরাণ চালের ভাত সিদ্ধ করে চট্‌কে কাপড়ে ছেঁকেই হক কি খুব ফেনের মত করে চট্‌কেই হক দুধের সঙ্গে মিশিয়ে দিস্।

লী। ডাক্তারেরা বার্লি কি মেলিন্‌স্ ফুড্ কি হরলিকস্ মলটেড্ মিল্ক দিতে বলে ঠাকুমা।

ঠা। তা বার্লি দিতে হয় দিস্। সেত বিলাতী যব বই আর কিছু না। তবে তার এক রকম আস্ত পাওয়া যায় তার কি একটা ইংরিজী নাম আছে বাপু—

প্র। পার্ল বার্লি ঠাকুমা।

ঠা। হ্যাঁ হ্যাঁ সেই পারুল বার্লি সিদ্ধ করে দিস্। আর পারুল বার্লি না পেলে রামলক্ষণের গুঁড়ো বার্লি দিস্।

প্র। রাম লক্ষণ নয় ঠাক্‌মা রবিন্‌সন্।

ঠা। তা হবে ভাই, বুড়ো বয়সে মর্‌বার্ সময় এখন ঠাকুর দেবতার নামই মনে আসে।

লী। আর ঐ দুরকম ফুডের কথা যে বল্লাম তার কি বলো ঠাক্‌মা।

ঠা। ফুডের মুডের ধার্‌ত দিদি আমরা ধারিনে। তাতে কি আছে না আছে তাও জানিনে। তবে আমার শ্বশুর বল্‌তেন্ ওগুলো এদেশের ছেলের পক্ষে ভাল নয় তিনিও না বুঝে বল্‌বার লোক ছিলেন না। তাইতে মনে হয় ওগুলো ভাল নয়। আমার মনে হয় দেশী ভাতের মণ্ড, শটীর পালো, পানফলের পালো প্রভৃতি থাক্‌তে, ও বিলাতী ফুড, ছাই ভস্ম গুলো ব্যবহার কর্‌বার্ দরকার কি। ভগবান কি আর এদেশের রোগীর পথ্যি এদেশে হবার উপায় করেন নি।

লী। আচ্ছা ঠাক্‌মা সাগুটা কি রকম?

ঠা। সাগুটা খুব হাল্‌কা জিনিস বলেই বোধ হয়, ওটা রোগীকে দেওয়া যাইতে পারে। সাগুতে একটু দাস্ত হয় আর বার্লিতে একটু দাস্ত কমায় এই তফাত্।

লী। আচ্ছা ঠাক্‌মা, দাঁত না উঠলে কি ভাত বার্লি কিছু দিতে নেই—তার মানে কি?

ঠা। দাঁত উঠ্‌লে ছেলে পিলে ভাত বার্লি সাগু এই সব হজম কর্‌তে পারে। সেই জন্যে আমাদের দেশে ছয় মাসে অর্থাৎ দাঁত ওঠ্‌বার সময় অন্নপ্রাশন দেবার নিয়ম আছে। সাধারণতঃ এই সময় থেকেই দুধের সঙ্গে ঐ সব জিনিষ কিছু দেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। কিন্তু আবার এমন অনেক ছেলে দেখা যায় যারা এক বৎসর পর্য্যন্ত দুধ ছাড়া কিছুই খায় না।

লী। দাঁত ওঠ্‌বার আগে সাগু বার্লি দিলে কিছু দোষ হয় ঠাক্‌মা? কিন্তু অনেক সময় ডাক্তারদের দিতে দেখেছি।

ঠা। দোষ যে হয় না এমন নয়। কেননা দাঁত ওঠ্‌বার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ সব জিনিষ দেওয়া উচিত। তবে ছেলে পিলের অসুখ হলে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে সাগু বার্লি অবস্থা বুঝে দেওয়া যেতে পারে।

লী। আর কিছু দেব না?

না আর বড় কিছু নয় তবে একটু বেদানার রস কি আঙ্গুরের রস, কি মিষ্টি লেবুর রস দিতে পার।

লী। আচ্ছা পথ্যির কথা ত হল এখন ওষুধের কি হবে বল।

ঠা। দাস্ত কবার হয় আর কি রকম হয় বল দেখি।

লী। দাস্ত প্রায়ই রোজ একবার মেটে রঙ্গের গুট্‌লে বাহ্যে হয়, দৈবাৎ দু'বার হয়—তখন মেটে মেটে কাদা কাদা মল হয়। কোন কোন দিন বাহ্যে হয় না।

ঠা। আচ্ছা, এক কাজ কর। হপ্তায় কৈলে বাছুরের চোনা দুদিন করে দিবি, দুধ খাবার ঝিনুকের এক ঝিনুক করে দিলেই হবে।

লী। কৈলে বাছুর কি?

ঠা। অবাক কল্লি তোরা, কৈলে বাছুর কি তা জানিস্ না। মাই খেগো কচি বাছুরকে কৈলে বাছুর বলে, সেই মেদী কৈলে বাছুরের চোনা, বুঝ্‌লি।

লী। হ্যাঁ। আর কি করব?

ঠা। আর হপ্তায় দুদিন করে আলুই দিবি।

নী। আলুই কি ?

ঠা। আলুই তয়ের করার কথাটা বলি শোন। বড় এলাচের খোসা ১টা, ছোট এলাচের খোসা ২টা, ধোয়া ঝাড়া পরিষ্কার জোয়ান দু আনা ওজন আর টাট্কা কালমেঘের পাতা পোকা ধরা না হয়, আধ ভরি ওজন, নিয়ে ঠাণ্ডা জলে বেশ পরিষ্কার শিল নোড়ায় খুব চন্দনের মতন করে বেটে, ছোট মটরের মত বড়ি তোয়ের করবি। এই বড়িকেই আলুই বলে। নীবার হলে কোন ছেলের বাহ্যে শক্ত হয় রোজ হয়ত হয় না। আবার কোন কোন ছেলের বার বার পাৎলা বাহ্যে হয়। যাদের পাৎলা বাহ্যে হয় তাদিকেও আলুই দেওয়া যায়—কেবল কালমেঘের পাতা কিছু কম করে দিয়ে আলুই তোয়ের করতে হয়। বেশ করে মনে রাখিস্, আলুই ছেলের অমৃত।

নী। আচ্ছা তাই করে দেব, আর কিছু দিতে হবে না ?

ঠা। না এখন আর কিছু নয়। এই দিয়ে কিছু দিন দেখ, যদি ভগবানের দয়ায় ক্রমে ভাল হতে থাকে তবে আর কিছুর দরকার হবে না।

নী। ভাল মন্দ কি করে বুঝব ?

ঠা। ভাল হলে ফ্যাকাশে ভাব থাকবে না, চোখের কোলে ক্রমশঃ বেশী রক্ত হতে থাকবে, ছেলে বেশ চন্মনে থাক্‌বে, হাঁসি খেলা করবে, আর কাঁদবে। যদি বেশী হয় তাহলে আরও ফ্যাকাশে হবে চোখের কোণ আরও শাদা হতে থাক্‌বে, ছেলে নির্জ্জীব পানা হবে, খেঁত্খেঁতে হবে আর বেশী কাঁদবে।

নী। হাঁ, ভাল কথা ঠাক্‌মা, একটু গা ছ্যাক্ ছ্যাক্ করে বলেছিলাম তার কি হবে ?

ঠা। স্পষ্ট জ্বর হয় বুঝ্‌তে পারিস্ ?

নী। না, তা হয় না, মধ্যে মধ্যে যে গাটা গরম গরম বোধ হয় !

ঠা। তা হলে এখন দুচার দিন থাক। যদি জ্বর হয় তখন তার ব্যবস্থা করা যাবে।

নী তা আমিত কাল চলে যাব, কবে আসব তার ঠিক নাই। জ্বর হলে কি করব তাই শুনে রাখি।

ঠা। দেখ, নীবারের জ্বর দুপুবের সময় বা বিকালের দিকেই হয়। গা একটু একটু গরম হয়, সে সময় একটু নির্জ্জীব আর খেঁত্-খেঁতে হয়, যদি এরকম দেখিস, তা হলে সকালে হপ্তায় দুদিন করে চোনা আর আলুই যেমন দিতে বলিছি তাই দিবি আর রোজ বিকালে একটু করে ঘুষ্‌ড়ো রস দিবি।

নী। ঘুষ্‌ড়ো আবার কি ?

ঠা। ঘুষ্‌ড়ো অনেক রকম হয়, তবে একে যে ঘুষ্‌ড়ো দিতে হবে তা বলি শোন। ক্ষেত্‌পাপড়া, শিউলী পাতা, গুলঞ্চ আর কাল-মেঘ টাট্‌কা যোগাড় কর্‌তে হবে। পাড়াগাঁয়ে যোগাড় করে নিতে হয় আর কলকাতায় চাঁদনী, নূতন বাজার, শোভাবাজার, বৌ-বাজার, মেছোবাজার আর মাধব বাবুর বাজারে যে বেদেরা বসে তাদের বলে রাখলে দরকারমত এনে দেয়। এগুলি যোগাড় হলে, সব সমান ভাগে নিয়ে বেশ করে ধুয়ে কুটে নিবি। একখানা কচি কলাপাতায় জড়িয়ে কলার ছোটা দিয়ে বাঁধ্‌বি, আর তার ওপর দুই আঙ্গুল পুরু করে মাটীর লেপ দিবি। তার পর ঘুঁটের আগুণে পোড়াবি। ওপরের মাটী লাল হলে, দিনে ঘরে আর রাত্রে হিমিয়ে রাখবি। রোজ বিকেলে তারি আধ [illegible] আন্দাজ রস ১০।১৫ ফোঁটা মধুর সঙ্গে মিশিয়ে

খাইয়ে দিবি। একদিন ঘুষ্‌ড়ো তয়ের করিলে পরদিন তা থেকে রস নেওয়া চলে না। রোজ কর্‌তে হয়।

লী। এরকম তয়ের করাও শক্ত।

ঠা। শক্ত আর কি একটু কষ্ট করলেই হয়।

তবে নেহাত অসুবিধে হলে কলাপাতা জড়িয়ে বেঁধে, আগুনে তাওয়া চড়িয়ে, তার ওপর রেখে এপিট ওপিট করে ভেজে নিবি। যখন কলাপাতা ঝলসা পোড়া হবে তখন নামিয়ে নিবি। এরকমে করলে খুব সহজে হয়।

লী। আর টাট্‌কা গাছ গাছড়া সব যদি না পাওয়া যায়।

ঠা। পাওয়া যাবে না কেন, একটু চেষ্টা করলেই পাওয়া যায়। আজ কাল তৈয়ারী শিশি ভরা ডাক্তারী ওষুধ পাওয়া যায়, ঢেলে খেলেই হল, তাই লোকে একটু কষ্ট করতে নারাজ। নইলে গাছ গাছড়ার অভাব কি? তবে ক্ষেত্‌পাপড়াটা সব সময়ে না মিলতে পারে। তা হলে করবি কি জানিস্—পাচনের দোকান থেকে শুক্‌নো অথচ বেশ টাট্‌কা—যেন পচা না হয়, ক্ষেত্‌পাপড়া আনিয়ে, জলে ভিজিয়ে তাই কুটে দিবি। ভাল শুক্‌নো ক্ষেত্‌ পাপড়া না পেলে ক্ষেত্‌পাপড়া বাদ দিয়ে ঘুষ্‌ড়ো করবি।

লী। আচ্ছা—নাওয়া কি বন্ধ থাকবে?

ঠা। যদি জ্বর হয় তা হলে বন্ধ থাকবে।

আর তা না হলে শরীরের ভাবগতিক দেখে যেমন সয় ২।৩ দিন অন্তর কাঁচা পাকা জলে নাইয়ে দিবি। নাওয়াবার সময় যেন ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে না লাগে। আর নাবার পরেই একটা মোটা জামা গায়ে দিয়ে দিবি।

লী। সব কথাই আমি জেনে নিয়েছি। এখন আশীর্ব্বাদ কর ঠাক্‌মা খোকা আমার যেন নীরোগ হয়।

ঠা। আচ্ছা আমি আশীর্ব্বাদ করছি তোর খোকা ভাল হবে। কিন্তু একজন-ভাল ব্রাহ্মণ ডেকে একটু শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিস্।

লী। আচ্ছা তা করবো। হাঁ একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তুমি বলেছ যে কচি বেলা থেকে আগুনের মত আরোক গুলো চক্ চক্ গিলিয়ে ছেলে পিলের লিভার হয় সত্যিই কি তাই?

ঠা। না সব ছেলের যে সেই জন্যে নীবার হয় তা নয়, তবে কতক সে জন্যেও হয় বলে আমার মনে হয়।

লী। তবে আর কি জন্যে লিভার হয় ঠাক্ মা?

ঠা। প্রায়ই বাপ্‌মার অম্বলের দোষ থাক্‌লেই ছেলে পিলের লিভার হয়। আজ কালকার দুধ, জিনিষ পত্র সব ভেজাল, তার ওপর নানা রকম অত্যাচার করে, আগে কার মত লোকে আর সংযমী নয়, এই সবের জন্যে বেশীর ভাগ লোকেরই গরহজম অম্বলের বেয়ারাম। কাজেই তাদের ছেলেপিলের লিভার হয়। আর গাদা গাদা ডাক্তারী ওষুধ পড়ে, নীবার বেগড়াবার বেশ সুবিধে ঘটে।

আর একটা কথা, আগে কচি ছেলেদের চোনা ও আলুই খাওয়ান হত। তাতে নীবার ভাল থাকৃত আর নীবারের কোন অসুখ হত না। এখনত সে প্রথা আর নেই। আর এজন্যেও ছেলে পিলের নীবারের রোগ বেশি হচ্ছে।

লী। তা এমন ভাল প্রথা উঠে গেল কেন?

ঠা। দেশের লোকের মতিভ্রম। ডাক্তারীর মোহে পড়ে লোকে এমন হিতকর প্রথা উঠিয়ে দিয়েচে। তার কুফলও ঘরে ঘরে দেখা যাচ্চে।

লী। আবার কি সে প্রথা চালান যায় না?

ঠা। আজ কাল চেষ্টা করলে কতকটা হতে পারে বলে মনে হয়। বাঙ্গালী জাতির মোহ যেন কতকটা কেটে আস্ছে। এখন অনেকে বুঝেছে যে দেশে অনেক ভাল জিনিষ আছে। এখন যদি লোকে আবার কচি ছেলেদের চোনা আলুই খাওয়ায় তাহলে নীবারের রোগ অনেক কমে যাবে।

লী। চোনা আলুই কি রোজ দিতে হয়।

ঠা। না—দরকার বুঝে হপ্তায় ত্বদিন, তিনদিন কি চার দিন দিলেই চলে।

লী। দরকার কি করে বোঝা যায়?

ঠা। কচি ছেলে পিলে রোজ ৩।৪ বার হল্‌দে হল্‌দে বাহ্যে করে। তা না হয়ে যদি কম, কি মেটে মেটে, কি গুট্‌লে বাহ্যে করে তবে বুঝতে হবে যে নীবারের দোষ হয়েছে। যার যত বেশী দোষ হয় তাকে তত বেশী দিন খাওয়াতে হয়।

প্র। ঠাক্‌মা আমি তোমার নাত্‌নীর হুকুমে মুখটী বুজে চুপ্‌টী করে বসে আছি, বাহবা দিতে পারি নি। কিন্তু তোমার ব্যবস্থা বড় পাকা বলে বোধ হচ্চে। আর ছেলে পিলের লিভার হবার যে কারণ বলেছ আমারও তাই মনে হয়। এখন বাড়ী ফেরবার সময় হল, পায়ের ধুলো দাও আর খোকাকে ভাল করে আশীর্ব্বাদ কর।

ঠা। এস দাদা এস। খোকা তোমার ভাল হয়ে যাবে ভাই, আমি আশীর্ব্বাদ করছি। মধ্যে মধ্যে লীলা সঙ্গে করে দেখা দিয়ে যাস্। আর ত বেশী দিন নয়। তোদের হাসি মুখ দেখে যেতে পারলেই হয়।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এক্ষণে আমরা চিকিৎসা বিষয়ে আয়ুর্ব্বেদের কৃতিত্ব নির্ণয় করিতে চেষ্টা পাইব। অন্যান্য চিকিৎসা-শাস্ত্র হইতে বিবিধ বিষয় উদ্ধৃত না করিলে আমাদের বক্তব্য বিষয় বিশেষ পরিস্ফুট হইবে না। তজ্জন্য আমরা ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে আবশ্যক মত বচনাদি উদ্ধৃত করিব। কিন্তু কোন চিকিৎসা-শাস্ত্রের নিন্দাবাদ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে চিকিৎসার কোন সার্থকতা আছে কি না সে সম্বন্ধে একটু বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। কেননা এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য আজ কাল অনেক মনস্বী ব্যক্তি গভীর গবেষণায় প্রবৃত্ত। অপিচ, অনেক সুবিজ্ঞ পাশ্চাত্য চিকিৎসক চিকিৎসা-শাস্ত্রের সার্থকতা সম্বন্ধে যেরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিতান্ত নিরুৎসাহকর। প্রমাণ স্বরূপ নিম্নে কয়েকটী মত উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

Said Sir John Forbes, M. D., F. R. S. "Some patients get well with the aid of medicine, more without it, and still more in spite of it."

2, Said the Dublin Medical Journal, "Assuredly the uncertain and most unsatisfactory art that we call medical science is no science at. all, but a jumble of inconsistent opinions, of conclusions hastily and often incorrectly drawn, of facts misunderstood or perverted, of comparisons without analogy, of hypothesis without reason, and of theories not only useless but dangerous.

3. Said Dr. Bostwich, author of the "History of Medicine." " Every dose of medicine given is a blind experiment on the vitality of the patient."

4. Said James Johnson, M. D., F. R. S., editor of The Medico-chirurgical Review—"I declare as my concientious conviction founded on long experience and reflection, that if there was not a single Physician, Surgeon, Man-midwife, Chemist, Apothecary, Druggist, nor drug on the face of the earth, there would be less sickness and less mortality than now prevail."

5. Prof. J. W. Carson, of the New York College of Physicians and Surgeons, says,—"We do not know whether our patients recover because we give them medicine or because nature cures them. parhaps breadpills would cure as many as medicine."

6. The eminent Dr. Alonzo clark, a professor in the same Medical College, states that, in their zeal to do good physicians have done much harm, they have hurried many to the grave who would have recoverd if left to nature" and that "all of our curative agents are poisons and as a consequence, diminishes the patients vitality."

7. Prof. Martin Paine, of the New York University Medical College, asserts that "durg medicines do but cure one disease by producing another" a sentiment with which the late Prof. Liebig, the well known German chemist agreed.

১। স্যরজন ফরবেস এম, ডি, এফ, আর, এস্ বলিয়াছেন—"কতক গুলি রোগী ঔষধের সাহায্যে আরোগ্যলাভ করে। তদ্পেক্ষা অধিক রোগী ঔষধ ব্যতীত ভাল হয়। তদপেক্ষা অধিক রোগী ঔষধকে তাচ্ছিল্য করিয়া ভাল হয়"।

২। ডব্‌লিন্ মেডিক্যাল্ জর্নাল্ বলিয়াছেন—"ইহা নিশ্চয় যে আমরা যে অনিশ্চিত এবং অসন্তোষকর বিদ্যাকে চিকিৎসা বিজ্ঞান বলি, তাহা একেবারেই বিজ্ঞান নয়। ইহা কেবল অনিশ্চিত মতের সমষ্টি, হঠকৃত এবং প্রায়শঃ ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত, ভ্রমাত্মক এবং বিপরীত তথ্য, অসদৃশ তুলনা এবং অহেতুকী ধারণা কেবল অনাবশ্যক নহে পরন্তু বিপজ্জনক মত মাত্র।

৩। চিকিৎসার ইতিহাস নামক গ্রন্থ প্রণেতা ডাক্তার বস্ উইচ বলেন :—রোগীকে এক এক মাত্রা ঔষধ দেওয়া কেবল রোগীর জীবনী শক্তির উপরি অন্ধ পরীক্ষা মাত্র।

৪। মেডিকো চিরুরজিক্যাল পত্রের সম্পাদক ডাক্তার জেমস্ জন্‌সন্ এম, ডি, এফ, আর, এস, বলেন : দীর্ঘ কালের বহুদর্শিতা এবং চিন্তা দ্বারা আমার বিহিত ধারণা জন্মিয়াছে যে, যদি চিকিৎসক, শস্ত্র চিকিৎসক, ধাত্রী-বিদ্যা-বিশারদ, রসায়ন-বিদ্, ঔষধপ্রস্তুতকারক এবং ঔষধ বিক্রেতা না থাকিত তাহা হইলে পৃথিবীতে রোগ এবং মৃত্যুর সংখ্যা কম হইত।

৫। নিউইয়র্কের কলেজ অফ্ ফিজিসিয়ানস্ এবং সার্জ্জেনের অধ্যাপক জে, ডবলু, কার্‌সন্ বলেন :—আমরা জানিনা যে আমরা রোগীদিগকে ঔষধ দিই বলিয়া তাহারা ভাল হয় অথবা প্রকৃতি তাহাদিগকে আরোগ্য করে। আমার ঔষধে যেমন রোগ ভাল হয়, রুটীর বড়ি করিয়া দিলেও সেইরূপ ভাল হয়।

৬। উক্ত বিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক প্রসিদ্ধ ডাক্তার এলোন্‌জো ক্লার্ক বলেন :—"চিকিৎসকগণ রোগীদের হিত করিবার উদ্দেশে অনেক অহিত করিয়া থাকে। যাহারা প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে বাঁচিত, এরূপ অনেককে তাহারা শীঘ্র মৃত্যু মুখে পাতিত করে। তিনি আরও বলিয়াছেন—আমাদের রোগ ভাল করিবার ঔষধগুলি বিষ এবং সেই জন্য উহারা রোগীর জীবনী শক্তি হ্রাস করে।

৭। নিউইয়র্ক ইউনিভারসিটী মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক মার্টিন পেইন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে—"ঔষধগুলি এক রোগ নষ্ট করিয়া অন্য রোগ উৎপন্ন করে। জার্ম্মাণীর প্রসিদ্ধ রসায়নবিদ অধ্যাপক লেবিগ্ এই মতের সমর্থন করিয়াছেন।

এক্ষণে দেখা যাউক এ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ কি বলেন।

চিকিৎসা-শাস্ত্রের সার্থকতা আছে কি না—এই প্রশ্নের মীমাংসার চেষ্টা অধুনা অনেক সুধী ব্যক্তির মস্তিষ্ক পীড়ার কারণ হইলেও, উহা বহু প্রাচীন যুগের আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণের সূক্ষ্ম দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। আমরা নিজের ভাষায় না বলিয়া এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে যাহা আছে তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি।

চতুষ্পাদং ষোড়শকলং ভেষজমিতি ভিষজো ভাষন্তে। যদুক্তং পূর্ব্বাধ্যায়ে ষোড়শগুণমিতি তদ্ভেষজম্ যুক্তিযুক্ত মলমারোগ্যায়েতি ভগবান্ পুনর্ব্বসুরাত্রেয়ঃ।

ভগবান্ পুনর্ব্বসু আত্রেয় বলিয়াছেন :—ভিষক্‌গণ বলেন যে ষোড়শকলাবিশিষ্ট চতুষ্পাদই ভেষজ*। পূর্ব্বাধ্যায়ে ঐ চারিপাদের যে ষোলটী গুণ বলা হইয়াছে তাহাই ভেষজ‡। ঐগুলি যুক্তিযুক্তরূপে প্রযুক্ত হইলে আরোগ্য লাভ হইয়া থাকে।

নেতি মৈত্রেয়ঃ। কিং কারণং? দৃশ্যন্তে হ্যাতুরাঃ কেচিদুপকরণবন্তশ্চ পরিচারকসম্পন্নাশ্চ আত্মবন্তশ্চ কুশলৈশ্চ ভিষগ্‌ভিরনুষ্ঠিতাঃ সমুত্তিষ্ঠমানা স্তথাযুক্তা শ্চাপরে ম্রিয়মানা স্তস্মাদ্ভেষজ মকিঞ্চিৎকরং ভবতি।

---

* চতুষ্পাদ যথা, ভিষগ্ দ্রব্যাণ্যুপস্থাতা রোগী পাদচতুষ্টয়ম্। (অনুবাদ) ভিষক্, দ্রব্য (ঔষধ), শুশ্রূষাকারী এবং রোগী এই চারিটী পাদ।

‡ শাস্ত্রে নির্ম্মল জ্ঞান, বহুদর্শিতা, চিকিৎসাকার্য্যে দক্ষতা এবং পবিত্রতা এই চারিটী চিকিৎসকের গুণ। প্রচুরতা, রোগনাশকতা, নানাপ্রকারে প্রযুক্ত হইবার উপযোগিতা এবং পূর্ণতা ও দোষরাহিত্য এই চারিটী ঔষধের গুণ। শুশ্রূষা করিতে জানা, দক্ষতা, রোগীর প্রতি অনুরাগ থাকা এবং পবিত্রতা এই চারিটী শুশ্রূষাকারীর গুণ। স্মৃতিমান্ হওয়া বৈদ্যের আজ্ঞামত চলা, অভীরুত্ব এবং রোগের বিষয় ঠিক বলা [illegible] চারিটী রোগীর গুণ।

মৈত্রেয় বলিলেন—ইহা ঠিক নহে। কেন না দেখা যাইতেছে যে কোন কোন রোগী উপযুক্ত উপকরণ (ঔষধ পথ্যাদি) যুক্ত, উপযুক্ত পরিচারকযুক্ত, আত্মবন্ত (অর্থাৎ অত্যাচারী নহে) এবং সুচিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসিত হইয়া আরোগ্য লাভ করিতেছে। আবার কোন রোগী ঐরূপ হওয়া সত্ত্বেও মরিয়া যাইতেছে। সুতরাং ভেষজ কোন কাজেরই নহে।

তদ্ যথা। শ্বভ্রে সরসি চ প্রসিক্তমল্পমুদকম্। নদ্যাং স্যন্দমানায়াং পাংশুধানে পাংশুমুষ্টিঃ প্রকীর্ণ ইতি। তথাপরে দৃশ্যন্তে অনুপকরণা শ্চাপরিচারকা শ্চানাত্ম-বন্ত শ্চাকুশলৈশ্চ ভিষগ্‌ভি রনুষ্ঠিতাঃ সমুত্তিষ্ঠমানাঃ। তথাযুক্তা ম্রিয়মাণা শ্চাপরে। যতশ্চ প্রতিকুর্ব্বন্ সিধ্যতি, প্রতিকুর্ব্বন্ ম্রিয়তে অপ্রতিকুর্ব্বন্ সিধ্যতি, অপ্রতিকুর্ব্বন্ ম্রিয়তে ততশ্চিন্ত্যতে ভেষজমভেষজেনাবিশিষ্ট মিতি।

চিকিৎসা কেমন অকিঞ্চিৎকর? না যেমন প্রকাণ্ড গহ্বরে বা জলপূর্ণ সরোবরে অল্প জল নিক্ষেপ করা, প্রবহমান নদীতে কিংবা পাংশুরাশিতে এক মুষ্টি পাংশু (ধূলি) নিক্ষেপ করা। আবার দেখা যায় যে উপকরণ (ঔষধ, পথ্য) নাই, পরিচারক নাই, রোগী অনাত্মবন্ত (অত্যাচারী) চিকিৎসক ভাল নহে, অথচ এরূপ স্থলেও রোগী আরোগ্য লাভ করিতেছে। আবার ষোড়শকল ভেষজসম্পন্ন হইলেও রোগী মরিয়া যাইতেছে। অতএব যখন দেখা যাইতেছে যে চিকিৎসা করিলে ভালও হয় এবং মরিয়াও যায়, আবার চিকিৎসা না করিলে ভালও হয় এবং মরিয়াও যায়, তখন ভেষজ হইতে অভেষজ পৃথক নহে বলিয়া মনে হয়। অর্থাৎ চিকিৎসা করাও যা—আর না করাও তা।

মৈত্রেয় মিথ্যা চিন্ত্যত ইত্যাত্রেয়ঃ। কিং কারণং? যে হ্যাতুরাঃ ষোড়শগুণ-সমুদিতেনানেন ভেষজেনোপপদ্যমানা ম্রিয়ন্তে ইত্যুক্তম্ তদনুপপন্নম্। ন হি ভেষজ সাধ্যানাং ব্যাধীনাং ভেষজমকারণং ভবতি। যে পুন রাতুরাঃ কেবলাদ্ভেষজাদৃতে সমুত্তিষ্ঠন্তে ন তেষাং সম্পূর্ণভেষজোপপাদনায় সমুত্থানবিশেষোঽস্তি। যথাহি পতিতং পুরুষং সমর্থমুত্থানায়োত্থাপয়ন্ পুরুষো বলমস্যোপাদধ্যাৎ স ক্ষিপ্রতর মপরিক্লিষ্ট এবোত্তিষ্ঠেৎ তদ্বৎ সম্পূর্ণ-ভেষজোপলম্ভাদাতুরাঃ। যে চাতুরাঃ কেবলাদ্ভেষজাদপি ম্রিয়ন্তে, ন চ সর্ব্বএব তে ভেষজোপপন্নাঃ সমুত্তিষ্ঠেরন্। ন হি সর্ব্বে ব্যাধয়ো ভবন্ত্যুপায়সাধ্যাঃ॥

আত্রেয় বলিলেন, মৈত্রেয় তুমি যাহা মনে করিতেছ তাহা মিথ্যা। কেননা তুমি যে বলিলে যে ষোড়শগুণসমন্বিত ভেষজ সংযুক্ত হইয়া রোগীর মৃত্যু হয়, তাহা অযুক্তিযুক্ত। কারণ ভেষজসাধ্য ব্যাধিতে ভেষজ প্রয়োগ অকারণ হয় না। আবার যে সকল রোগী ভেষজ ব্যতীত আরোগ্যলাভ করিতে পারে, তাহারা ভেষজযুক্ত হইলে আরও শীঘ্র এবং বিনা ক্লেশে আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। যেমন গর্ত্তে পতিত পুরুষ স্বয়ং উঠিতে সক্ষম হইলেও, যদি কেহ তাহাকে উঠাইয়া দেয় তাহা হইলে সে আরও শীঘ্র এবং বিনাক্লেশে উঠিতে পারে, সেইরূপ রোগীও সম্পূর্ণ ভেষজযুক্ত হইলে শীঘ্র ভাল হয়। যে সকল রোগী ভেষজের অভাবে মরিয়া যাইতেছে তাহারা সকলেই যে ভেষজযুক্ত হইলে বাঁচিত, তাহা নহে। কারণ সকল রোগ চিকিৎসা দ্বারা প্রশমিত হয় না।

ন চোপায়সাধ্যানাং ব্যাধীনা[illegible]মনুপায়েন

সিদ্ধিরস্তি, ন চাসাধ্যানাং ব্যাধীনাং ভেষজ সমুদায়োঽয়মস্তি, নহ্যলং জ্ঞানবান্ ভিষক্ মুমূর্ষুমাতুরমুত্থাপয়িতুং। পরীক্ষাকারিণো হি কুশলা ভবন্তি। যথা হি যোগজ্ঞোঽভ্যাসনিত্য ইষ্বাসো ধনুরাদায়েষুমপাস্যন্ নাতিবিপ্রকৃষ্টে মহতি কায়ে নাপরাধো ভবতি সম্পাদয়তি চেষ্টকার্য্যম্; তথা ভিষক্ স্বগুণ-সম্পন্ন উপকরণবান্ বীক্ষ্যকর্ম্মারভমাণঃ সাধ্যরোগমনপবাধঃ সম্পাদয়ত্যেবাতুরমারোগ্যেণ। তস্মান্ন ভেষজমভেষজেনাবিশিষ্টং ভবতি।

চিকিৎসাসাধ্য ব্যাধি চিকিৎসা ব্যতীত প্রশমিত হয় না। আবার অসাধ্য ব্যাধি চিকিৎসা দ্বারা ও ভাল হয় না। চিকিৎসক যতই জ্ঞানবান্ হউন্ মুমূর্ষু ব্যক্তিকে কখনই আরোগ্য করিতে পারেন না। যে চিকিৎসক রোগ সাধ্য কি অসাধ্য পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসা করেন, তিনিই সাফল্য লাভ করিয়া থাকেন। যেরূপ অভ্যাসশীল কুশলী ধনুর্দ্ধর ধনুতে শর যোজনা করিয়া অনতিদূরস্থ বৃহৎ পদার্থ অনায়াসে বিদ্ধ করিতে পারেন, সেইরূপ গুণবান্ ও উপকরণবান্ ভিষক্ পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসা করিলে সাধ্যরোগগ্রস্ত রোগীকে অনায়াসে আরোগ্য করিতে পারেন। সেইজন্য ভেষজ অভেষজ হইতে বিশিষ্ট নহে, ইহা বলা যাইতে পারেনা। অর্থাৎ অবশ্যই চিকিৎসার সার্থকতা আছে।

ইদঞ্চেদঞ্চ নঃ প্রত্যক্ষং যদনাতুরেণ ভেষজেনাতুরং চিকিৎস্যামঃ। ক্ষামমক্ষামেণ কৃশঞ্চ দুর্ব্বলমাপ্যায়য়ামঃ স্থূলং মেদস্বিনমপতর্পয়ামঃ। শীতেনোষ্ণাভিভূত মুপচরামঃ। শীতাভিভূতমুষ্ণেণ। ন্যূনান্ ধাতূন্ পূরয়ামঃ। ব্যতিরিক্তান্ হ্রাসয়ামঃ। ব্যাধীন্ মূলাবিপর্য্যয়েণোপচরন্তঃ সম্যক্ প্রকৃতৌ স্থাপয়ামঃ। তেষাং নস্তথা কুর্ব্বতাময়ং ভেষজসমুদায়ঃ কান্ততমো ভবতি।

ইহাও আমরা সকলে প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, ঔষধ প্রয়োগে রোগী আরোগ্য হইতেছে। ক্ষীণ, কৃশ ও দুর্ব্বল, পুষ্টিকর ঔষধ দ্বারা ও সবল হইতেছে। স্থূল ও মেদস্বী ব্যক্তি অপতর্পণ ঔষধ প্রয়োগে কৃশ ও অল্পমেদ বিশিষ্ট হইতেছে। শীতল ঔষধ প্রয়োগে উষ্ণাভিভূত ব্যক্তির এবং উষ্ণ ঔষধ প্রয়োগে শীতাভিভূত ব্যক্তির পীড়ার শান্তি হইতেছে। ঔষধ দ্বারা ক্ষীণ ধাতুর পুষ্টি হইতেছে এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত ধাতুর হ্রাস হইতেছে। কারণের বিপরীত ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা ব্যাধির শান্তি হইতেছে। এতদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে ব্যাধিতের পক্ষে ঔষধ নিতান্ত হিতকর।

জগতের যাবতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রেরই একটা মূলসূত্র আছে এবং সেই মূলসূত্রের উপরেই চিকিৎসার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। য়্যালোপ্যাথি চিকিৎসা শাস্ত্র পাঠ করিলে জানা যায় যে উহার মূল সূত্র :—

Contraria contraris curantur. অর্থাৎ বিপরীত পদার্থ দ্বারা বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত ব্যাধির উপশম হয়। পাশ্চাত্য দেশের অন্যতম চিকিৎসা শাস্ত্র হোমিওপ্যাথিক মতে Similia similibus curantur. অর্থাৎ সমগুণ বিশিষ্ট দ্রব্য দ্বারা সমধর্ম্মীরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। উভয়ের মূল সূত্র একেবারে বিপরীত। এমন হয় কেন? উভয়ের মধ্যে একটী নিশ্চয় ভ্রমাত্মক। কেননা হাঁ এবং না কখনই এক হইতে পারে না।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কোনটাই ভ্রমাত্মক নহে। তবে ঐ দুইটী বিভিন্ন মতকে এক দেশ-দর্শন-দুষ্ট বলা যাইতে পারে। অন্যত্র এই বিভিন্নমতবাদের সামঞ্জস্য দেখা যায়। সে কোথায়? জগতের প্রাচীনতম এবং যাবতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক আয়ুর্ব্বেদে।

আয়ুর্ব্বেদ বলেন—

হেতুব্যাধিবিপর্য্যস্তবিপর্য্যস্তার্থকারিণাম্।
ঔষধান্নবিহারাণা মুপযোগঃ সুখাবহম্।
বিদ্যাদুপশয়ং ব্যাধেঃ স হিসাত্ম্যমিতি স্মৃতম্॥

হেতুর বিপরীত, ব্যাধির বিপরীত, হেতু ও ব্যাধি উভয়ের বিপরীত অথবা হেতুব্যাধি উভয়ের বিপরীত না হইলেও অর্থাৎ উহাদের সমধর্ম্মী হইলেও, যে সকল ঔষধ, অন্ন এবং বিহার দ্বারা ব্যাধির উপশম হয় তাহাকে সাত্ম্য বলা যায়। ইহাই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার মূল সূত্র। একটু বিশদভাবে সূত্রটী বুঝান যাইতেছে।

য়্যালোপ্যাথি চিকিৎসা শাস্ত্রে বিপরীত দ্রব্য দ্বারা বিপরীত ব্যাধির শান্তি হয়, কিসের বিপরীত? হেতুর না ব্যাধির, না উভয়ের? ইহার কোন সদুত্তর ঐ তিনটী কথার মধ্যে পাওয়া যায় না। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদে উহা বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে। পাঠকদিগের বোধ সৌকর্য্যার্থ কতকগুলি উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে।

হেতুর বিপরীত, যথা, কফজনিত শীত যুক্ত জ্বরে উষ্ণবীর্য্য শুণ্ঠী প্রভৃতি। অন্ন যথা,—শ্রম ও বায়ু জনিত জ্বরে, শ্রম ও বায়ু নাশক মাংসের যূষ। বিহার যথা, দিবানিদ্রাজনিত কফে রুক্ষতাজনক রাত্রিজাগরণ। ব্যাধির বিপরীত ঔষধ যথা, অতিসারে সঙ্কোচক (Astringent) আকনাদি, বিষে বিষনাশক শিরীষ, কুষ্ঠে কুষ্ঠনাশক খদির প্রভৃতি। অন্ন যথা, অতিসারে মলস্তম্ভক মসূরের যূষ। বিহার যথা, উদাবর্ত্তে প্রবাহণ। হেতু ও ব্যাধি উভয়ের বিপরীত ঔষধ যথা, বাতজ শোথে বায়ু ও শোথ নাশক দশমূল। অন্ন যথা—বাতকফ জনিত গ্রহণী রোগে বাত, কফ ও গ্রহণী নাশক তক্র।

বিহার যথা—স্নিগ্ধ দিবা স্বপ্নজাত তন্দ্রায় রুক্ষ তন্দ্রা বিপরীত জাগরণ। এপর্য্যন্ত যাহা বলা হইল তাহা Coutraria Contraris Curantur. এইবার Similia similibus Curantur. দেখুন।

হেতু বিপরীতার্থকারী (অর্থাৎ হেতুর সমধর্ম্মী হইলেও রোগ নাশক) ঔষধ যথা—পিত্ত প্রধান পচ্যমান ব্রণশোথে (ফোড়া) পিত্তকর উষ্ণ উপনাহ (পুলটীস)। অন্ন যথা, পিত্ত প্রধান পচ্যমান ব্রণশোথে পিত্তবর্দ্ধক বিদাহী অন্ন। বিহার যথা বায়ু জনিত উন্মাদ রোগে বায়ু বর্দ্ধক ত্রাসন। ব্যাধি বিপরীতার্থকারী ঔষধ যথা, বমন রোগে বমন কারক মদন ফল। অন্ন যথা, অতিসারে বিরেচন জন্য বিরেচক দ্রব্য-সিদ্ধ দুগ্ধ। বিহার যথা, বমন রোগে প্রবাহন (বেগ দান)। হেতু ব্যাধি বিপরীতার্থকারী ঔষধ যথা, অগ্নিদগ্ধ স্থানে উষ্ণ অগুরু প্রভৃতির প্রলেপ। অন্ন যথা, মদ্যপান জনিত মদাত্যয় রোগে (Alcoholism) মত্ততা জনক মদ্য। বিহার যথা, ব্যায়াম জনিত সংমূঢ়বাত নামক রোগে জল-সন্তরণরূপ ব্যায়াম।

অবশ্য ঔষধের মাত্রা সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের সহিত হোমিওপ্যাথির মতের বিরোধ আছে। কিন্তু আমরা চিকিৎসার সূত্রের কথা বলিয়াছি।

এতদ্দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে জগতের দুইটী প্রধান চিকিৎসা শাস্ত্রের বিরোধী মূল সূত্রের সামঞ্জস্য প্রাচীনতম আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে রক্ষিত হইয়াছে।

হরীতকী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

হরীতকী গুড়ের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বদোষজ বাতরক্ত নষ্ট হয় (সুশ্রুত)। তিনটী বা পাঁচটী হরীতকী সেবন করিয়া গুলঞ্চের কাথ পান করিলে উগ্র বাতরক্ত রোগ নষ্ট হয়। হরীতকী চূর্ণ এরণ্ড তৈল সহ সেবন করিলে আমবাত, গৃধ্রসী (Scitica) ও বৃদ্ধি রোগ নষ্ট হয় (চক্রদত্ত)। ঘৃত কিংবা গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন পিত্ত শূলের পক্ষে হিতকর (ভাব প্রকাশ)। গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন গুল্মে হিতকর (সুশ্রুত)। হরীতকীর আঁটীর সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ অশ্মরী (পাথরী) রোগে হিতকর (বাভট্)। রসায়ন-বিধি অনুসারে উদর রোগীকে ক্রমশঃ সহস্র হরীতকী সেবন করাইবে (চরক)। গুড়ের সহিত হরীতকী ক্রমবৃদ্ধি নিয়মে এক মাস কাল সেবন করিলে শোথ, প্রতিশ্যায়, মুখরোগ, শ্বাস, কাস, অরুচি, জীর্ণজ্বর, অর্শঃ, গ্রহণী এবং অন্যান্য কফবাতজ রোগ নষ্ট হয় (চক্রদত্ত)। হরীতকী গোমূত্রে সিদ্ধ ও এরণ্ড তৈলে ভর্জ্জিত করিয়া সৈন্ধব লবণ সহ সেবন করিয়া উষ্ণ জল পান করিলে দীর্ঘকালজ বৃদ্ধি রোগ নষ্ট হয়। হরীতকী গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া কাথ প্রস্তুত করিবে, ঐ কাথের সহিত এরণ্ড তৈল ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কফবাতজনিত বৃদ্ধি রোগ নষ্ট হয়। হরীতকী চূর্ণ এরণ্ড তৈলে ভাজিয়া পিপুল ও সৈন্ধব লবণ সহ সেবন করিলে বৃদ্ধি রোগ নষ্ট হয় (চক্রদত্ত)। গো এবং ছাগাদির মূত্রের সহিত হরীতকী-চূর্ণ সেবন করিলে শ্লেষ্মজ শ্লীপদ রোগ নষ্ট হয় (সুশ্রুত)। হরীতকীচূর্ণ সম পরিমাণ নিম্বপত্রচূর্ণ সহ সেবন করিলে এক বা দেড় মাসে কুষ্ঠ ভাল হয়। হরীতকী সম পরিমাণ কিস্মিসের সহিত পেষণ করিয়া পুরাতন গুড় ও মধু সহ সেবন করিলে অম্লপিত্ত রোগ নষ্ট হয় (চক্রদত্ত)। হরীতকী লৌহ পাত্রে হরিদ্রার রসে ঘর্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা চিপ্প (আঙ্গুলহাড়া) পুনঃ পুনঃ লিপ্ত করিবে (বঙ্গসেন)। হরীতকীর কাথ মধু সহ সেবন করিলে কণ্ঠরোগে উপকার হয় (বাভট)। হরীতকী ঘৃতে ভাজিয়া চক্ষুর বহির্ভাগে লেপ দিলে নানাপ্রকার নেত্র-রোগ নষ্ট হয় (চক্রদত্ত)। হরীতকী গব্য ঘৃতে উত্তপ্ত করিয়া সেবন করিবে, এবং পরে দুগ্ধ পান করিবে। ইহাতে বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

হরীতকী উৎকৃষ্ট রসায়ন। রসায়ন কাহাকে বলে? ঔষধ দ্বিবিধ। কতকগুলি সুস্থব্যক্তির ওজোবর্দ্ধক এবং কতকগুলি ব্যাধিতের রোগ নাশক। সুস্থের ওজস্কর ঔষধ আবার দ্বিবিধ, যথা, রসায়ন ও বাজীকরণ। তন্মধ্যে রসায়ন ঔষধ সেবন দ্বারা দীর্ঘ আয়ু, স্মৃতি, মেধা, আরোগ্য, দীর্ঘস্থায়ী যৌবন, প্রভা, বর্ণ, সুস্বরতা, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের বল, বাক্‌সিদ্ধি, বিনয় এবং শান্তি লাভ করা যায়। প্রশস্ত রসাদি ধাতু সমূহ লাভ করা যায় বলিয়া উহার নাম রসায়ন।

সিন্ধূত্থ শর্করা শুণ্ঠী কণা মধু গুড়ৈঃ ক্রমাৎ।
বর্ষাদিষভয়া সেব্যা রসায়নগুণৈষিণা॥

অনুবাদ :—সৈন্ধবলবণ, চিনি, শুঁঠ,

পিপুল, মধু ও গুড় এই ছয়টী দ্রব্যের সহিত বর্ষাদি ছয় ঋতুতে হরীতকী সেবন করিলে রসায়নের ফল লাভ করা যায়। এস্থলে বলা উচিত যে আয়ুর্ব্বেদে শ্রাবণ ও ভাদ্র বর্ষা, আশ্বিন ও কার্ত্তিক শরৎ, অগ্রহায়ণ ও পৌষ হেমন্ত, মাঘ ও ফাল্গুন শীত, চৈত্র বৈশাখ বসন্ত এবং জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় গ্রীষ্ম এইরূপ সাধারণ ঋতু বিভাগ করা হইয়াছে।

রসায়ন ঔষধ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তবে দিগ্‌দর্শন জন্য দুই চারিটী বিষয় বলা যাইতেছে।

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে :—

পূর্ব্বে বয়সি মধ্যে বা শুদ্ধদেহং সমাচরেৎ।
অবিশুদ্ধশরীরস্য যুক্তো রসায়নো বিধি-
ন ভাতি বাসসি ক্লিষ্টে রঙ্গযোগ ইবার্পিতঃ।

অনুবাদঃ—যৌবনের প্রারম্ভে কিংবা প্রৌঢ় বয়সে রসায়ন ঔষধ সেবন করিতে হয়। এতদ্দ্বারা কথিত হইল যে বৃদ্ধ ব্যক্তি রসায়নের অধীকারী নহে। এবং (বমন বিরেচনাদি দ্বারা) শরীর শোধন করিয়া রসায়ন সেবন করিতে হয়। কেননা - মলিন বস্ত্রে যেরূপ ভাল রং ধরেনা, সেইরূপ অবিশুদ্ধ শরীরে রসায়ন ঔষধ কার্য্যকারী হয়না।

অপিচ,

যথাস্থূলমনির্ব্বাহ্য দোষান্‌ শারীর মানসান্‌।
রসায়ন গুণৈ র্জন্তু র্যুজ্যতে ন কদাচন॥
যোগা হ্যায়ুঃপ্রকর্ষার্থা জরারোগনিবর্হনা।
মনঃ শরীরশুদ্ধানাং সিধ্যন্তি প্রযতাত্মনাম্‌॥

অনুবাদ :—শারীরিক ও মানসিক দোষ রহিত না হইলে সে ব্যক্তি কখন রসায়ন ঔষধ সেবনের ফলপ্রাপ্ত হয় না। যে সকল ব্যক্তি শারীরিক ও মানসিক দোষ রহিত এবং সংযতাত্মা তাঁহারাই আয়ুঃবর্দ্ধক ও জরাপ্রতিষেধক রসায়ন ঔষধের ফল লাভ করিয়া থাকেন।

রসায়নার্থ পূর্ব্বকথিতরূপে হরীতকী প্রয়োগকে ঋতু হরীতকী বলে। ঋতু হরীতকীর মাত্রা সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ উপদেশ দৃষ্ট হয়।

বর্ষাকালে হরীতকী ছয় মাষা ও সৈন্ধব লবণ দুই মাষা, গিলিয়া খাইবে। শরৎ কালে হরীতকী পাঁচমাষা ও চিনি ৪ মাষা খাইয়া শীতল জল পান করিবে। হেমন্তে হরীতকী তিন মাষা ও শুণ্ঠী দুইমাষা খাইয়া তপ্তজল পান করিবে। শীতকালে হরীতকী তিনমাষা ও পিপুল দুই মাষা সেবন করিয়া তপ্তজল পান করিবে। একমাষা ১০টী কুঁচের সমান।

এইরূপ সাধারণ মাত্রার উল্লেখ থাকিলেও অবস্থাভেদে মাত্রার হ্রাস বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

এক্ষণে আমরা প্রত্যক্ষসিদ্ধ ব্যবহারের বিষয় উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

ক্ষতরোগে—হরীতকীসিদ্ধ জল দ্বারা ক্ষত ধৌত করিলে উপকার হয়। সূক্ষ্ম হরীতকী চূর্ণ গব্য ঘৃত সহ মলমের ন্যায় করিয়া প্রয়োগ করিলে ক্ষত প্রশমিত হয়। হরীতকী অন্তর্ধূমে* ভস্ম করিয়া ক্ষত স্থলে প্রয়োগ করিলে ক্ষত ভাল হয়।

নেত্র-রোগে—হরীতকীসিদ্ধ জল দ্বারা চক্ষু ধৌত করিলে নেত্র রোগ জন্মিতে পারে

* রুদ্ধ পাত্রের মধ্যে ভস্ম করিলে তাহাকে অন্তর্ধূমে ভস্ম করা বলে। উদাহরণ—হাঁড়ির মধ্যে হরীতকী রাখিয়া হাঁড়ির মুখে সরা দিয়া সংযোগ স্থল মৃত্তিকা দ্বারা রুদ্ধ এবং যতক্ষণ অভ্যন্তরস্থ হরীতকী অঙ্গারবৎ কৃষ্ণবর্ণ এবং ভঙ্গুর না হয় ততক্ষণ হাঁড়ির নিম্নে অগ্নিতাপ প্রদান কর।

না এবং জন্মিয়া থাকিলে ভাল হয়। হরীতকী চূর্ণ অসমান ঘৃত ও মধু সহ সেবন করিলে নেত্ররোগ জন্মিতে পারে না এবং দৃষ্টি শক্তি অব্যাহত থাকে।

মুখরাগে--হরীতকী চূর্ণ দিয়া নিত্য দন্ত ধাবন করিলে দন্ত ও দন্তবেষ্ট সুস্থ থাকে। দন্ত বেষ্টের স্ফীতিতে স্ফীতস্থলের উপর হরীতকী খণ্ড রাখিয়া দিলে স্ফীতি ও যন্ত্রণা নষ্ট হয়। হরীতকী সিদ্ধ উষ্ণ জলের পুনঃ পুনঃ কবল করিলে দন্ত ও দন্তবেষ্টের শূল নষ্ট হয়। হরীতকী সিদ্ধ জল দ্বারা মুখ ধুইলে এবং মধু সহ হরীতকী চূর্ণ প্রয়োগ করিলে মুখ, জিহ্বা ও দন্তবেষ্টের ক্ষত নষ্ট হয়।

কোষ্ঠ শুদ্ধির জন্য হরীতকী প্রয়োগ—শাস্ত্রে হরীতকী অনুলোমক বলিয়া কথিত। যে দ্রব্য অপক্ব দোষের পরিপাক এবং বায়ু বন্ধ ভেদ করিয়া মলকে অধঃপাতিত করে তাহাকে অনুলোমক বলে।

মৃদু বা মধ্যকোষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে হরীতকী কার্য্যকারী। ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তিকে প্রয়োগ করিলে প্রায়শঃ সুফল পাওয়া যায় না। তবে ব্যক্তিগত প্রকৃতির বিশেষত্ব হেতু হয়ত কোন ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তিরও বিরেচন হইতে পারে এবং হয়ত কোন মধ্যকোষ্ঠ ব্যক্তির নাও হইতে পারে। অন্যান্য হরীতকী অপেক্ষা জলী হরীতকী অধিকতর ভেদক।

রাত্রিতে শয়ন কালে কোষ্ঠ ভেদে আধ তোলা হইতে দুই তোলা বা ততোধিক মাত্রায় বাটিয়া কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ ও উষ্ণ জল সহ সেবন করিলে প্রাতে বেশ কোষ্ঠ শুদ্ধি হয়, অথচ কোনরূপ কষ্টকর উপসর্গ ঘটে না। কোষ্ঠভেদে—প্রাতে খালিপেটে হরীতকী চূর্ণ বা বাটা এক সিকি হইতে এক তোলা মাত্রায় সেবন করিলে ৩।৪ বার অল্প অল্প করিয়া তরল মল ভেদ হয়। আমি স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে এসম্বন্ধে হরীতকী Kntuow's Powder প্রভৃতি লবণঘটিত বিরেচকের ন্যায় ফলপ্রদ। সুতরাং ঐ সকলের পরিবর্ত্তে হরীতকী চূর্ণ ব্যবহার করা যাইতে পারে। খুব প্রত্যূষে পূর্ব্ব কথিত রাত্রের ন্যায় মাত্রায় হরীতকী সেবনে ৩।৪ বার মল ভেদ হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট নির্ব্বাচন কালে মনে রাখিতে হইবে যে হরীতকী যত বড় ও ভারী হয় ততই ভাল। অধিকন্তু যে হরীতকী ভাঙ্গিলে শস্য স্বর্ণের ন্যায় সুন্দর বর্ণ বিশিষ্ট এবং সারবান্ দেখা যায় তাহাই উৎকৃষ্ট।

অধিককাল হরীতকী সেবন করিলে পুরুষত্বের হানি হয় বলিয়া অনেকের ধারণা আছে কিন্তু শাস্ত্রে বা প্রত্যক্ষ ব্যবহারে হরীতকীর ঐরূপ কোন দোষের পরিচয় পাই নাই। সম্ভবতঃ সংযমী ব্যক্তিরাই হরীতকী ভক্ষণ করেন বলিয়াই এইরূপে অমূলক প্রবাদের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় পরিদর্শকের মন্তব্য।

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী শাস্ত্র-বাচস্পতি মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত ই. হেরল্ড ব্রাউন এম্ ডি, এম, আর, সি, পি, (লণ্ডন) লেপ্টেনাণ্ট কর্ণাল, আই. এম্, এস্ (রিঃ) অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া বিদ্যালয়ের "পরিদর্শকগণের মন্তব্য পুস্তকে" যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন নিম্নে তাহার মূল ও অনুবাদ মুদ্রিত হইল—

I have visited with great pleasure the Ayurvedic College which owes its foundation to the energy and enthusiasm of Kabiraj Jamini Bhusan Roy. The object of the institution is the cultivation of the Science of Medicine as taught in Ancient India, with all the advantages and accessories derivable from Modern Science. The Professors will each be in charge of a special subject and will teach his own selected branch both theoretically and practically. Thus we shall have different instructors in Chemistry, Physics, Botany, Physiology, Anatomy, Medicine, Surgery and Midwifery. There will also be an out-door dispensary where professional aid will be available free of charge in Medical and Surgical cases. Arrangements have been commenced for a Museum for Materia Medica so as to facilitate the identification of Medicinal plants. It is also intended to collect manuscripts of rare Ayurvedic works with a view to their publication in correct and reliable editions. I have mentioned a few only of the many striking features of the institution which make it worthy of liberal support from the public as also from the Government. A study of the indigenous system of medicnie, which has successfully maintained its ground against formidable rivals, will convince any impartial critic that its basis was scientific and not empirical ; we cannot consequently afford to ignore a system which embodies the results of the observation and experience of the acutest intellects of India for ages. The right course to follow is, not to treat it as a dead system incapable of further development, but to foster its growth as a progressive science. To achieve this end, ample funds are needed, and one can only express the hope that the requisite funds for a building, a hospital, a library, a museum and a laboratory will not be slow to come.

Sd. ASUTOSH MUKERJEE.

22nd July, 1916.

I had the pleasure of being conducted round the Ayurvedic college this morning, by my friend kaviraj Jamini Bhusan Roy, M. A., M. B.,

I was greatly interested at all I saw, there being indications on all sides of a serious and earnest ende-

avour to impart to the students the principles both of Ayurvedic and western medicine. This I consider a step in the right direction for, though many speak slightingly of the empirical nature of the former, there is not the least doubt that we have much to learn from it. There are a great many indigenous drugs which are of extreme utility, but are little known to the students of western medicine, as they are not taught in the various medical schools; these are being largely employed here, and, among the many interesting and useful collections I saw, was one of growing plants, most of which were familiar to me as useful medicinally . and each one was labelled with the vernacular as well as the botanical name.

The anatomical room was well supplied with models and drawings, the Materia Medica room with a large and very varied collection of drugs organic and inorganic and there was also a fair collection of surgical instruments.

The staff is exceptionally strong and as all the members are imbued with a love of their work and a strong determination to overcome all obstacles, the success of the institution is assured.

I am in absolute sympathy with this college, for it meets a distinct want. The Materia Medica of the drugs indigenous to Bengal has been surprisingly neglected. Of late the workers in the past, the last of whom was Dymock of revered memory, did a great deal in that direction.

The modern kabiraj with his wealth of empirical knowledge improved by being taught anatomy and physiology, medicine and surgery, will be amply equipped to practise the science and art of the profession ; and I wish the infant institution every success, while heartily congratulating Kabiraj Jamini Bhusan and his keen and intelligent associates on the success they have already attained,

Sd. E. HAROLD BROWN, M, D
M.R.C.P. (London)
Lt. Col. I.M.S. (Retired).

The 7th Sept, 1916.

আমি আয়ুর্ব্বেদ কালেজ পরিদর্শন করিয়া অতীব আনন্দিত হইলাম। কবিরাজ যামিনী-ভূষণ রায়ের কর্ম্মদক্ষতায় এবং উৎসাহে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞান-শাস্ত্রের আবিষ্কৃত বিবিধতত্ত্ব ও দ্রব্য-সম্ভারের সাহায্যে ভারতের প্রাচীন চিকিৎসা বিদ্যার অনুশীলন ও উৎকর্ষ সাধন করাই এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। এক একজন অধ্যাপকের প্রতি বিষয় বিশেষের অধ্যাপনার ভার অর্পিত হইবে। এবং তিনি সেই বিষয়ের শাস্ত্রাংশ যোগ্যাকরণ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করাই-বেন। রসশাস্ত্র, পদার্থবিজ্ঞান, বনৌষধি-বিজ্ঞান, শারীরক্রিয়াতত্ত্ব, অঙ্গ-বিনিশ্চয়-বিদ্যা, কায়চিকিৎসা, শল্য-শালক্য-চিকিৎসা ও প্রসূতিতন্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যায় এই আটটী

শাখার জন্য আটজন অধ্যাপক নিযুক্ত থাকিবেন। একটী দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চিকিৎসালয়ে সমাগত রোগিগণের ঔষধসাধ্য এবং শস্ত্রসাধ্য উভয় রোগের চিকিৎসা বিনামূল্যে নির্ব্বাহ করা হয়। চিকিৎসার্থ ব্যবহৃত বৃক্ষ গুল্ম লতাদির পরিচয়ের সুবিধার জন্য ভেষজ পরিচয়াগারের প্রতিষ্ঠা কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। দুর্লভ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ পূর্ব্বক ঐ সকল গ্রন্থের প্রামাণ্য বিশুদ্ধ সংস্করণ মুদ্রিত করাও উদ্যোক্তাদিগের অভিপ্রেত। এই বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠেয় বিবিধ চিত্তাকর্ষক বিষয়ের মধ্যে আমি কত্রকটীর মাত্র উল্লেখ করিলাম। অনুষ্ঠেয় বিষয়গুলি বিশেষ হিতকর সুতরাং এই বিদ্যালয় জনসাধারণের এবং রাজ-সরকারের নিকট হইতে বিশেষ আনুকূল্য লাভের যোগ্য। ভয়াবহ প্রতিদ্বন্দ্বী সত্বেও এতদ্দেশীয় চিকিৎসা প্রণালী স্বীয় যশঃপ্রভায় সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যে কোন নিরপেক্ষ সমালোচক যদি দেশীয় চিকিৎসা বিদ্যা আলোচনা করেন তাহা হইলে তাঁহার নিশ্চয় প্রতীতি জন্মিবে যে, এই শাস্ত্র বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরি প্রতিষ্ঠিত, ইহা কেবল অভিজ্ঞতালব্ধ-জ্ঞান-মূলক নহে। ভারতীয় সুতীক্ষ্ণ-ধীসম্পন্ন মনীষিগণের যুগযুগান্তরের অর্জ্জিত ভূয়োদর্শন এবং অভিজ্ঞতা যে চিকিৎসাশাস্ত্রে সঞ্চিত রহিয়াছে তাহাকে আমরা কদাপি অবজ্ঞা করিতে পারি না। এক্ষণে যে পন্থা অনুসরণ করিতে হইবে বলিতেছি—ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ, উত্তরোত্তর উন্নতির অযোগ্য—মৃত বলিয়া ভাবিও না কিন্তু উত্তরোত্তর উপচীয়মান বিজ্ঞান শাস্ত্রের মত যাহাতে ইহারও পরিপুষ্টি সাধিত হয় যত্নের সহিত তদ্রূপ অনুষ্ঠান কর। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু আশা করা যায়, কালেজের গৃহ, আতুর-নিবাস, গ্রন্থাগার, প্রদর্শনী ও কর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠার জন্য যে অত্যাবশ্যক অর্থের প্রয়োজন তাহা সংগৃহীত হইয়া যাইবে। (ইংরাজির অনুবাদ)।

স্বাঃ শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।
২২শে জুলাই ১৯১৬।

অদ্য প্রাতঃকালে আমার বন্ধু কবিরাজ যামিনী ভূষণ রায় এম্, এ, এম, বি, আমাকে আয়ুর্ব্বেদ কালেজ দেখাইলেন।

যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার চিত্ত সর্ব্বথা আকৃষ্ট হইল। আয়ুর্ব্বেদ এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যা উভয়ের মূলতত্ব ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য যে সকল দ্রব্যসম্ভার ও অনুষ্ঠানের আবশ্যক তৎসমুদয় সংগ্রহের জন্য আন্তরিক গুরুতর প্রযত্নের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল। এই পদ্ধতিই সম্যক্ উদ্দেশ্য সাধিকা হইবে বলিয়া বিবেচনা করি। অনেকে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকে কেবল ভূয়োদর্শন জ্ঞান-মূলক বলিয়া কটাক্ষ করিতে পারেন কিন্তু; এই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র হইতে আমাদের শিক্ষা করিবার যে অনেক বিষয় আছে, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। চিকিৎসা কার্য্যে বিশেষ উপযোগী—কত দেশীয় গাছ গাছড়া আছে; কিন্তু বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় না বলিয়া, পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিদ্যাশিক্ষার্থি-গণের এই সকল উদ্ভিদ সম্বন্ধে জ্ঞান অতি সামান্য। আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের শিক্ষার জন্য অনেক গাছ গাছড়া সংগৃহীত হইয়াছে। এই কৌতুহলোদ্দীপক অত্যাবশ্যক

সংগ্রহের মধ্যে আমি কতকগুলি জীবিত বৃক্ষ, গুল্ম, লতা দেখিলাম। ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয় বলিয়া এই সকল উদ্ভিদের অধিকাংশই আমার পরিচিত। প্রত্যেক গাছের বৈজ্ঞানিক নাম এবং বাঙ্গালা নাম লিখিত রহিয়াছে দেখিলাম।

যে গৃহে অঙ্গবিনিশ্চয় বিদ্যা শিক্ষার দ্রব্য-সম্ভার সংগৃহীত হইয়াছে, সেখানে বিবিধ চিত্র এবং আদর্শ (মডেল্) সুরক্ষিত রহিয়াছে দেখিলাম। ভেষজ পরিচয়াগারে ঔষধার্থ ব্যবহৃত বিবিধ জঙ্গম ও স্থাবর দ্রব্য এবং যন্ত্রশস্ত্রাগারে বিবিধ যন্ত্রশস্ত্র সংগৃহীত হইয়াছে।

অনুষ্ঠাতৃগণের বিশেষ যোগ্যতা আছে। অনুষ্ঠিত কার্য্যের প্রতি ইহাঁদের সকলেরই আন্তরিক অনুরাগ আছে এবং ইহাঁদের সকলেই সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন অতিক্রম করিবার জন্য বদ্ধপরিকর; সুতরাং এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য সিদ্ধি যে সুনিশ্চিত স্বেপক্ষে সন্দেহ নাই।

বহুপূর্ব্বে কতিপয় কর্ম্মিপুরুষ ভারতের দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু স্মরণীয় কীর্ত্তি ডাইমকের পর আর কেহই এদিকে শ্রমস্বীকার করেন নাই। এক্ষণে বঙ্গদেশ সুলভ গাছগাছাড়ার গুণাদি-তত্ত্বের আলোচনা এতাদৃশ অবজ্ঞাত হইয়াছে যে তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই বিদ্যালয়ে সেই বহুদিনের অবজ্ঞাত দ্রব্যগুণ বিদ্যার পুনরালোচনার সুব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়া এই বিদ্যালয়ের কার্য্যে আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে।

ভূয়োদর্শন-জাত-অভিজ্ঞতায় পরিপক্ক আধুনিক আয়ুর্ব্বেদ-চিকিৎসক, অঙ্গবিনিশ্চয়-বিদ্যা, শারীর-ক্রিয়াবিজ্ঞান, কায়-শল্য-শালাক্য চিকিৎসায় সুশিক্ষিত হইলে তাঁহারা ভিষক্‌বিদ্যায় সুনিপুণ এবং যুগোপযোগী সুচিকিৎসক বলিয়া আদৃত হইবেন। আমার আন্তরিক কামনা, এই অচিরপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যা-লয়ের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হউক। কবিরাজ যামিনীভূষণ রায় এবং তাঁহার কার্য্যানুরক্ত সুবুদ্ধি সহযোগিগণ এই শুভানুষ্ঠান কার্য্যতঃ নির্ব্বাহের পক্ষে যত দূর অগ্রসর হইয়াছেন তাহার জন্য আমি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। (অনুবাদ)

স্বাঃ ই, হেরল্ড ব্রাউন, এম, ডি, এম, আর, সি পি, (লণ্ডন) লেপ্টে ; কর্ণাল, আই, এম, এস্ (রিঃ)।

৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৬।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

১ম বর্ষ। বঙ্গাব্দ ১৩২৩—পৌষ। ৪র্থ সংখ্যা।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ।

এক্ষণে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কি সংক্ষেপে তাহারই পরিচয় প্রদান করিব। আয়ুর্ব্বেদ আটটী অংশে বিভক্ত বলিয়া উহা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ নামে বিখ্যাত। আটটী অঙ্গ যথা, কায়তন্ত্র, শল্যতন্ত্র, শালাক্যতন্ত্র, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্যতন্ত্র, অগদতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র ও বাজীকরণ তন্ত্র। প্রত্যেকের বিষয় সংক্ষেপে কথিত হইতেছে।

১। কায়তন্ত্র—জ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া ঔষধ-সাধ্য যাবতীয় রোগের চিকিৎসা এই তন্ত্রমধ্যে নিবিষ্ট অছে। কায়তন্ত্র আজিও আয়ুর্ব্বেদের প্রাবল্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হইবে না। অবশ্য যাঁহারা কবিরাজীকে "হাতুড়ে" চিকিৎসা বলিয়া মনে করেন অথবা বিংশশতাব্দীর এই নিত্য নূতন উন্নতির যুগে সেই বহু প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদের আশ্রয় গ্রহণ করা স্বীয় বিদ্যাবত্তার লাঘব বলিয়া বিবেচনা করেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কেননা—আয়ুর্ব্বেদের কায়-চিকিৎসা কিরূপ ফলপ্রদ তাহা জানিবার অবকাশ তাঁহাদের কখন ঘটিবে না। কিন্তু এইরূপ কতকগুলি লোক ব্যতীত ভারতের আপামর সাধারণ এবং অধুনা অনেক বৈদেশিক ব্যক্তি জীর্ণ জটিল রোগে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাই অধিকতর ফলপ্রদ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। কায়তন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশের উৎকর্ষ সম্বন্ধে "আয়ুর্ব্বেদে" ধারাবাহিকরূপে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে বলিয়া বর্ত্তমানে আমরা কেবল কায়তন্ত্রে কি কি বিষয় আছে তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

রোগ সম্বন্ধে—রোগোৎপত্তির কারণ, রোগনির্ণয়, বিভিন্ন রোগের নিদান উপসর্গ ও অরিষ্ট, অজ্ঞাত রোগ জ্ঞানের উপায়, রোগের সাধ্যাসাধ্য নির্ণয়, লঘু ও গুরু ব্যাধি নির্ণয়, সন্তর্পণ ও অপতর্পণজাত রোগ, জনপদোদ্ধ্বংস, রোগের প্রাকৃতাদি ভেদ প্রভৃতি।

রোগী সম্বন্ধে—রোগীর গুণ, রোগি-শুশ্রূষা রোগি-পরীক্ষা, রোগীর প্রকৃতি, সত্ত্ব, সাত্ম্য, প্রভৃতি।

পথ্য সম্বন্ধে—বিবিধ রোগে নানা প্রকার

পথ্যের কল্পনা, হিতাহিত বিচার, মাত্রা, সংযোগবিরুদ্ধত্ব ইত্যাদি।

ঔষধ সম্বন্ধে—ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ দ্রব্যের গুণ, উৎকর্ষ পরীক্ষা, নানা প্রকার ঔষধ কল্পনা ও তাহাদের প্রয়োগক্ষেত্র, ঔষধের মাত্রা, ঔষধপ্রয়োগের কাল প্রভৃতি।

চিকিৎসা—চিকিৎসার মূলসূত্র ও যোজনা-বিধি, ভেষজ, ক্ষার ও অগ্নি-প্রয়োগ, স্নেহ, স্বেদ, বমন, বিরেচন, নিরূহ, অনুবাসন, ধূম, নস্য, কবল, আশ্চ্যোতন প্রভৃতির প্রয়োগ।

সুস্থব্যক্তি সম্বন্ধে—স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম, রোগ প্রতিষেধের উপায়, দিনচর্য্যা, ঋতুচর্য্যা, সদাচারবিধি প্রভৃতি।

২। শল্যতন্ত্র—(Surgery) যন্ত্র শস্ত্র. জলৌকা, ব্রণবন্ধন, শস্ত্রসাধ্য রোগ, শল্য-নির্হরণ প্রভৃতি বহুবিধ তথ্যের আকর। ধাত্রী বিদ্যা (Midwifery) শল্যতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত, শল্যতন্ত্র সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ শ্রীযুক্ত যামিনী বাবুর অভিভাষণে দ্রষ্টব্য।

শালাক্যতন্ত্র—গ্রীবার উর্দ্ধদেশস্থ রোগ-সমূহের অর্থাৎ শ্রবণ, নয়ন, বদন ও শিরোগত রোগের লক্ষণাদি এবং উহাদিগের চিকিৎসার উপদেশ শালাক্যতন্ত্রের বিষয়ীভূত।

ভূতবিদ্যা–ইহা মন্ত্রায়ুর্ব্বেদ। কতকটা Spiritualismও বটে।

কৌমার ভৃত্য—কুমারদিগের লালনপালন এবং তাহাদিগের রোগ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে উপদেশ কৌমারভৃত্য তন্ত্রের বিষয়ীভূত।

অগদতন্ত্র—নানাপ্রকার স্থাবর ও জঙ্গম বিষের পরিচয়, ভিন্ন ভিন্ন বিষ-পীড়িতের লক্ষণ এবং তাহার চিকিৎসা অগদতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত।

রসায়ন—দীর্ঘজীবন, দীর্ঘ যৌবন, বল, বুদ্ধি, মেধা, স্মৃতি প্রভৃতি লাভ করিবার জন্য সুস্থব্যক্তিকে যে ঔষধ সেবনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাই রসায়ন তন্ত্রের অভিধেয়।

বাজীকরণ তন্ত্র—ভোগসুখকর, অপত্য-বর্দ্ধনকর ঔষধসমূহ বাজীকরণ তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের গৌরবের বিষয় সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচিত হইল। পরে আমরা আয়ুর্ব্বেদোক্ত প্রত্যেক বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব।

বর্ত্তমানে আয়ুর্ব্বেদের যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে সে সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু গত নিখিল ভারতবর্ষীয় বৈদ্যকসম্মেলনের সভাপতি মহাশয় এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া এবং তাঁহার সেই অভিভাষণ "আয়ুর্ব্বেদে" ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া আমরা বাহুল্য বিবেচনায় তাহা হইতে নিরস্ত হইলাম।

আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধারের জন্য চিন্তা ও চেষ্টা করা যে আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কিন্তু কি উপায়ে উহার পুনরুদ্ধার ঘটিতে পারে এ সম্বন্ধে আজ-কাল অনেকেই চিন্তা করিতেছেন—ইহা অতীব আনন্দ ও উৎসাহের কথা। আমরাও এ সম্বন্ধে আংশিকভাবে আলোচনা করিব।

এ বিষয়ে বিচার করিতে হইলে প্রথমেই দেখা উচিত যে তাদৃশ চেষ্টার উপযুক্ত কাল আসিয়াছে কি না? শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে "বরমেকাহুতিঃ কালে নাকালে লক্ষ কোটয়ঃ" অর্থাৎ কালে একটী আহুতি দিলে যে ফল হয়, অকালে লক্ষ কোটি আহুতিতে সে ফল হয় না। কালে বীজ বপন করিলে শস্য জন্মে, অকালে বপন করিলে তাহা নষ্ট হইয়া যায়।

নানা দেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায়, কালে ক্ষুদ্র চেষ্টা বলবতী হইয়া মহাফল প্রসব করিয়াছে। আবার অকালে মহতী চেষ্টাও স্বল্পমাত্র ফল উৎপাদন করিতে পারে নাই। সেই জন্য প্রথমেই দেখা উচিত যে আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধারকল্পে চেষ্টার কাল আসিয়াছে কি না?

পূর্ব্বাপর আলোচনা করিয়া দেখিলে একটা অনুকূল সমাধানের আভাস পাওয়া যায়। কারণ বহুকালের অবনতির পর অধুনা ভারতে একটা উন্নতির যুগ আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ভারতে এক্ষণে নানা প্রকার কল কারখানা স্থাপনের জন্য একটা বিরাট চেষ্টা চলিতেছে। টাটা আয়রণ ওয়ার্কস্ তাহারই একটী মধুময় ফল। সংস্কৃত বিদ্যার যথেষ্ট প্রচলন জন্য আমাদের সদাশয় গবর্ণমেণ্ট এবং অনেক দেশ হিতৈষী ব্যক্তি মুক্ত হস্ত হইয়াছেন এবং তাহার ফলে সংস্কৃত চর্চ্চা দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছে। কিছুকাল পূর্ব্বে দেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা যাহা ছিল এক্ষণে তদপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। শস্ত্র অজ্ঞ নরসুন্দরের হস্ত হইতে শিক্ষিত ডাক্তারের হস্তে স্থান পাইয়াছে। অধিক কি, ভীরু ও দুর্ব্বল বলিয়া আখ্যাত বাঙ্গালী যুবক আজ যুরোপের মহাসমরে যোগদান করিয়া বাঙ্গালীর দুর্নাম ঘুচাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই উন্নতির যুগে আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা করা সম্পূর্ণ সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

এক্ষণে দেখা উচিত যে আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধারের উপায় কি? বর্ত্তমানে আয়ুর্ব্বেদের যতটুকু পাওয়া যায় তাহা সম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয় না। অপিচ, যাহা পাওয়া যায় তাহাও সকলে বুঝেন বলিয়া মনে হয় না।

"যাহা পাওয়া যায় তাহা সকলে বুঝেন বলিয়া মনে হয় না" এই কথায় অনেকে ক্রুদ্ধ হইবেন। কিন্তু কথাটী যে অতি সত্য তাহার প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে। চরকের শারীর স্থানে গর্ভস্থিত ভ্রূণ "উপস্নেহ" ও "উপস্বেদ" দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এইরূপ লিখিত আছে। এই উপস্নেহ ও উপস্বেদের স্পষ্টার্থ কি?

শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে :—

ব্যপগতপিপাসাবুভুক্ষস্তু গর্ভঃ পরতন্ত্র বৃত্তি র্মাতরমাশ্রিত্য বর্ত্তয়ত্যুপস্নেহোপস্বেদাভ্যাম্। গর্ভস্তু সদসদ্ভূতাঙ্গাবয়ব স্তুদনন্তরং হ্যস্য লোমকূপায়নৈরুপস্নেহঃ কশ্চিন্নাভিনাড্যয়নৈঃ। নাভ্যাং হ্যস্য নাড়ী প্রসক্তা নাড্যাঞ্চামরামরা চাস্য মাতুঃ প্রসক্তা হৃদয়ে মাতৃহৃদয়ং হ্যস্য তামমরা মভিসংপ্লবতে সিরাভিঃ স্যন্দমানাভিঃ। স তস্য রসো বলবর্ণকরঃ সম্পদ্যতে।

অনুবাদ :—ভ্রূণ ক্ষুৎপিপাসা রহিত ও পরতন্ত্র হইয়া মাতাকে আশ্রয় করিয়া উপস্নেহ ও উপস্বেদ দ্বারা জীবিত থাকে। সদসদ্ভূতাঙ্গাবয়ব (কোন অঙ্গ প্রকাশ পাইয়াছে এবং কোন অঙ্গ প্রকাশ পায় নাই এরূপ) গর্ভ—লোমকূপের দ্বারা উপস্নিগ্ধ হয়, কখন বা নাভিনাড়ী দ্বারা পুষ্ট হয়। ভ্রূণের নাভির সহিত যে নাড়ী সংলগ্ন থাকে তাহাকে অমরা বলে, অমরার এক প্রান্ত মাতার হৃদয়ের সহিত সংলগ্ন থাকে। মাতার হৃদয় সংলগ্ন সিরা রসদ্বারা অমরা নাড়ীকে আপ্লুত করে। সেই রস দ্বারা ভ্রূণের বল বর্ণ জন্মে।

এই প্রকার ব্যাখ্যা হইতে মাতার নাভিনাড়ী ও লোম-কূপ দ্বারা গর্ভ পুষ্ট হয়, তাহা বুঝা যায়। কিন্তু স্পষ্টার্থ বুঝিতে হইলে আমাদিগকে টীকাস্বরূপ য়ুরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের লইতে হয়

ঋতু শোণিত স্থিত ডিম্ব (ovum) শুক্র-স্থিত স্পারমাটোজোয়া (Spermatogoa) কর্ত্তৃক বিদ্ধ বা আহত হইয়া গর্ভরূপে পরিণত হইলে তখন উহা রস শোষণ করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। ইহাকে উপস্নেহ (Subcutaneus absorption) বলা যায়। কিন্তু গর্ভ চিরদিন এইরূপ ভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। জরায়ুর মধ্যে অমরা (Placenta) উৎপন্ন হইলে সেই অমরার ভিতর দিয়া মাতার রস ভ্রূণ শরীর পোষণ করিয়া থাকে। এই রস কিরূপে মাতার শরীর হইতে গর্ভের শরীরে প্রবেশ করে? আমাদের ফুস্ ফুসে যেরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা রক্ত বায়ুস্থিত অম্লজান (Oxygen) গ্রহণ করে এবং স্বীয় দূষিত অংশ বায়ুতে মিশাইয়া দেয় সেইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা একটা খুব পাতলা পর্দার ভিতর দিয়া এইরূপ বিনিময় ঘটে। ইংরাজীতে ইহাকে অস্‌মসিস্ (Osmosis) বলে।

উপরি লিখিত বিষয়ের জন্য আমরা শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার শ্রীযুক্ত অমিয় মাধব মল্লিক এম্ বি, মহাশয়ের নিকট ঋণী। তিনি উপস্বেদের অর্থ Absorption through the Skin এবং উপস্নেহের অর্থ Absorption by osmosis লিখিয়াছেন। কিন্তু মূলে "লোমকূপায়নৈরূপস্নেহঃ" পাঠ থাকায় আমরা উপস্নেহ শব্দের অনুবাদ Absorption Through the Skin করিতে বাধ্য হইয়াছে। উপস্বেদ অর্থে "Absorption by osmosis" কিনা তাহা বিচার্য্য।

এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে য়ুরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের সহায়তা গ্রহণ করিলে আমরা সংক্ষিপ্ত শাস্ত্রাংশ অতি সহজে বুঝিতে পারি। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব সাহায্য গ্রহণ করা আমাদের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু আয়ুর্ব্বেদে এমন অনেক বিষয় আছে যাহার সহিত য়ুরোপীয় চিকিৎসার সম্পূর্ণ বিরোধ দেখা যায়। এরূপ স্থলে আমরা পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের মত গ্রহণ না করিয়া আয়ুর্ব্বেদের মতকেই অভ্রান্ত মনে করিব। এবং সেই মত যে অভ্রান্ত তাহা প্রমাণ করিবার জন্য জীবনের পর জীবন উৎসর্গ করিব। গুপ্ত সত্য একদিন অবশ্যই প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধার কল্পে আর একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার—আয়ুর্ব্বেদীয় অপ্রকাশিত গ্রন্থ সমূহের প্রচার। বিশাল ভারতবর্ষে কত দেশে কত অসংখ্য গ্রন্থ গুপ্তভাবে রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই সমস্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া প্রচার করিতে পারিলে অনেক অজ্ঞাত বিষয় সহজেই আমরা জানিতে পারিব, আয়ুর্ব্বেদের অনেক রহস্য সহজেই বুঝিতে পারিব।

গ্রন্থানুসন্ধান, গূঢ়শাস্ত্রার্থের সদ্‌ব্যাখ্যা, উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে অধ্যাপনা, বৈদকবৃক্ষ বাটিকা প্রতিষ্ঠা আয়ুর্ব্বেদের পূর্ব্বগৌরব প্রতিষ্ঠার প্রকৃষ্ট উপায় বটে কিন্তু যেরূপ ভাবেই উন্নতির চেষ্টা করা যাউক নিম্নলিখিত তিনটি বিষয় সফলতার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।

১। রাজানুগ্রহ।

২। চিকিৎসকগণের একতা।

৩। জন সাধারণের অর্থ সাহায্য।

রাজানুগ্রহ :—আমাদের সদাশয় সম্রাট্ এবং তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণ নানা প্রকারে ভারতের উন্নতি সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন

ছেন। তাঁহাদের কৃপায় কত লুপ্ত শিল্প পুনর্জ্জীবিত হইয়াছে; কত লুপ্ত-বিদ্যা সুপ্রচারিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদের ভাগ্যে আজিও তাদৃশ রাজানুগ্রহ লাভ ঘটে নাই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আমরা সমস্ত ভারতবাসী একযোগে যদি রাজার নিকট প্রার্থনা করি, তাহা হইলে কখনই সদাশয় সম্রাট আমাদের মনঃক্ষুণ্ণ করিবেন না। এস ভাই, আমরা সকলে রাজার নিকট প্রার্থনা করিয়া বলি :—

হে রাজরাজেশ্বর, হে রাজন্য-মৌলিমণি-মণ্ডিত পাদ পীঠ, আজ আমরা কাতর হৃদয়ে আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি আয়ুর্ব্বেদের প্রতি কৃপা-কটাক্ষপাত করুন। ভারতের সকল শাস্ত্রই রাজানুগ্রহ লাভ করিয়াছে, কিন্তু কোন অপরাধে আয়ুর্ব্বেদ সে অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত রহিয়াছে প্রভু! আপনার কৃপা-কটাক্ষ পাত হইলে আয়ুর্ব্বেদ আবার সম্পূর্ণাঙ্গ হইয়া রোগার্ত্তজনগণের রোগাপনয়ন করিয়া ভারতবাসীকে সুস্থ সবল করিতে সক্ষম হইবে। এই সদুদ্দেশ্যে সহায়তার জন্য ভারতবাসী আপনার মুখ চাহিয়া আছে। যে রাজচক্রবর্ত্তী কৃপা-কটাক্ষপাত করুন।

২। চিকিৎসক গণের একতা :—একতার অভাব বঙ্গদেশের অনুন্নতির একটী প্রধান কারণ। চিকিৎসক সম্প্রদায়ের মধ্যেও একতার বিশেষ অভাব। কবিরাজে কবিরাজে এবং ডাক্তার কবিরাজে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব পরিস্ফুট দেখা যায়। কিছু কাল পূর্ব্বে ডাক্তারগণ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন। কিন্তু সুখের বিষয় আজ কাল অনেকের সে ভ্রম ঘুচিয়াছে। অনেকে আজ কাল আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাকে, আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধকে আদর করিতেছেন। ইম্পেরিকেল অর্থাৎ অবৈজ্ঞানিক বলিয়া আয়ুর্ব্বেদের যে কলঙ্ক ছিল তাহা এক্ষণে প্রায় লোপ পাইয়াছে। আমরা আমাদের পরম প্রীতিভাজন ডাক্তার ভ্রাতাদিগকে আমাদের এই জাতীয় গৌরব আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি কল্পে সহযোগী হইবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছি।

আর হে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ এখন আমরা ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই। ব্যবসার ক্ষেত্রে তুমি আমার প্রতীদ্বন্দ্বী, আমি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী। সে ভাব তুমিও ত্যাগ করিতে পারিবে না, আমিও পারিব না। কিন্তু এস আমরা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় রূপ গণ্ডী নির্ম্মাণ করি। আমরা যখন সেই গণ্ডীর মধ্যে অবস্থান করিব, তখন আমরা আর "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই নাই" তখন আমরা "বয়ং পঞ্চ শতানি চ।" সেই গণ্ডী ভেদ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা রূপ রাবণ, আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধারের ঐকান্তিকী একনিষ্ট ইচ্ছারূপিণী পতিব্রতা সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না। গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া আবার তুমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে, আমি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইব। এস ভাই আর বিলম্ব করিও না, অনেক সময় অপব্যয় করিয়াছি; আর নয়, ঐ দেখ, আয়ুর্ব্বেদের দুর্দ্দশা দর্শনে ব্যথিত আত্রেয় ধন্বন্তরির স্বর্গগত আত্মা আমাদেরই মুখ পানে চাহিয়া আছে।

৩। আর হে ভারতীয় জনসাধারণ, আজ আমরা তোমাদের দ্বারে ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছি। আয়ুর্ব্বেদ তোমাদের, আয়ুর্ব্বেদ তোমাদের জীবন স্বরূপ, তোমরা আয়ুর্ব্বেদের, তোমরা আয়ুর্ব্বেদের জীবন

স্বরূপ। দাও ভাই ভিক্ষা দাও, ক্ষীণ প্রাণ কঙ্কাল সার আয়ুর্ব্বেদকে পুনরুজ্জীবিত এবং পুষ্ট করিবার জন্য ভিক্ষা দাও ভাই। ভিক্ষুক তোমার ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল হইতে একমুষ্টি দাও, কৃষিজীবী তোমার ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্য হইতে একসের শস্য দাও, গৃহস্থ তোমার বাজার খরচের পয়সা হইতে একটী পয়সা দিয়া যাও, ধনী তোমার ধন ভাণ্ডার হইতে অর্থ সাহায্য কর, বিলাসী তোমার বিলাসিতার জন্য ব্যয়ের শতাংশ দাও, রাজা মহারাজা, নবাব, জমিদার তোমরা কৃপা-কটাক্ষপাত কর। আর মা বঙ্গকুললক্ষ্মীগণ, তোমাদের বস্ত্রাভরণের সহস্রাংশ দান কর। মনে করিও না, এ দান বৃথায় যাইবে। আয়ুর্ব্বেদ শত সহস্রগুণ দিয়া তোমাদের এ ঋণ পরিশোধ করিবে। 'আয়ুর্ব্বেদ এমন একটী ফল, মূল বা পত্রের কথা তোমায় বলিয়া দিবে যদ্দ্বারা তুমি কঠিন ব্যাধি হইতে মুক্ত হইবে, তোমার রুগ্নপত্নী সুস্থ হইবে, তোমার মৃতপ্রায় পুত্র পুনর্জ্জীবন লাভ করিবে। আর হে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বদর্শী মঙ্গলালয় জগদীশ, তুমি একবার আয়ুর্ব্বেদের প্রতি কৃপা-কটাক্ষপাত কর।' আয়ুর্ব্বেদ ধন্য হউক।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিশুর সর্দ্দি ও কাস চিকিৎসা।

(লীলা ও ছোট বৌ)।

ছোট বৌ। ঠাকুরঝি কখন এলে?

লী। এই আস্‌ছি ভাই।

ছো। বাড়ীর সব খবর ভালত?

লী। খবর ভাল হলে আর এই অসময়ে ছুটে আসি।

ছো। কেন কি হয়েছে?

লী। এই ছেলে দুটোর অসুখ ভাই। ঠাক্‌মা কোথায় জানিস্?

ছো। ঠাকুমা ঠাকুর ঘরে পুজো আহ্নিক কর্‌ছেন্ এখনই আস্‌বেন।

লী। (নিরীক্ষণ করিয়া ওমা একি?

ছো। (বিস্ময়ে) কি ঠাকুরঝি?

লী। তুই কি আজ কোন মজলিসে নাচতে যাবি নাকি?

ছো। নাচতে যাব কি গো!

লী। পরনে ফিন্‌ফিনে পাতলা কাপড়, পায়ে ঘুমুর দেওয়া মল, গায়ে পাতলা ফিন্‌ফিনে বডিস—বুকের অর্দ্ধেকটা খোলা, তার ওপর পাতলা বাহার দেওয়া ওড়না, মুখে পাউডার মেখেছিস্, ব্লুম অফ্ রোজ (Bloum of rose) দিয়ে গাল রাঙা করেছিস্—এত নাচের পোষাক।

ছো। তবু ভাল।

লী। তবু ভাল কি?

ছো। এতে আর কি দোষ হল?

লী। এতে আর কি দোষ হল। গেরস্তর বউ, এই পোষাকে কোথায় যাবি শুনি?

ছো। চন্দ্র ঠাকুরের শ্বশুর বাড়ী নেমন্তন্ন।

লী। বলি কিসের নেমন্তন্ন, নাচবার না খাবার?

ছো। নাচবার আবার কি ঠাকুরঝি খাবার।

লী তবে এ নাচওয়ালীর পোষাক পরে কেন যাচ্ছিস্ ?

ছো। ভাল পোষাক পরে্ত কি ইচ্ছা হয় না ?

লী। ভাল পোষাক পর্‌তে কে তোকে বারণ কর্‌ছে। কিন্তু তুই গেরস্তর বউ, চল্‌তে ফির্‌তে তোর মল রুণু ঝুণু করে বলবে— "ওগো আমায় দেখ গো।" লোকের মন হরণ কর্‌বার জন্যে অসতী স্ত্রীলোকেরা পাউডার, ব্লুম অফ্ রোজ মেখে রূপ বাড়ায় আর লোককে মুগ্ধ কর্‌বার জন্য অঙ্গের সৌন্দর্য্য দেখবে বলে পাতলা কাপড় গায়ে দেয়। তুই কার মন হরণ করতে চলেছিস্, কাকে মুগ্ধ কর্‌তে যাচ্ছিস্ ?

ছো। তা আজ কালই সবাই—

লী। রেখে দে তোর সবাই। যদি কোন নির্ব্বোধ স্ত্রীলোক নাচওয়ালীর মত পোষাক পরে বেরোয় তবে কি সবাই তাই কর্‌বে।

ছো। তা মেমেরাওত কত রকম সেজে গুজে বেরোয়।

লী। তুই কি মেমেদের দেশে জন্মেছিস্ না মেমেদের সমাজে মিশেছিস্ যে মেমেদের মত চল্‌বি। মেমেরা অখাদ্য খায়, তুই খেতে পারিস্ মেমেদের অনেকবার বিয়ে হয়, তোর হতে পারে ?

(ঠাকুমার প্রবেশ)

ঠা। এই যে লীলা এয়েছিস্। কিসের ঝগড়া হচ্চে তোদের ?

লী। এই তোমার ছোট নাতবৌ নেমন্তন্ন খেতে বড়দার শ্বশুর বাড়ী যাচ্চে, তা পোষাকটা দেখ একবার।

ঠা। তাইত এই পোষাক পরে লোকের কাছে বেরুবি কি করে ছোট ?

ছো। তা আজ না হয় যা—

লী। চোপ্‌রাও কালামুখী। জানিস্ আমি তোর ননদ, কখন যদি এমন পোষাকে বাড়ীর বার হতে দেখি -- কি কোন গুরুজনের সুমুখে বেরুতে দেখি, এক কিল মেরে তোর দাঁত দুপাটি ভেঙে দেব। যদি একান্ত এ রকম সাজ্‌বার ইচ্ছা হয়, যার মনোরঞ্জন করা তোর দরকার—সেই স্বামীর কাছে এই রকম সেজে বসে থাকিস্। যা এখন এ কাপড় ছেড়ে ভাল মোটা কাপড় পরে আয়, ও বুক খোলা বডি রেখে বুক চাপা বডি পরে আয়, মোটা সাদাসিদে ওড়না গায়ে দিয়ে আর মল খুলে রেখে আয়।

(ছোট বধূর প্রস্থান)

লী। এ রকম কেন হল ঠাকুমা ?

ঠা। যুগধর্ম্ম—কালধর্ম্ম, তা বৈ আর কি বল্‌ব। প্রাচীনকালের কথা ছেড়ে দাও। বাল্যকালে আমরা দেখেছি—একখানা মোটা কাপড় আর চাদরের মধ্যে একটা দেবতার মত হৃদয় ছিল, সে হৃদয় সংযম, আত্মত্যাগ, সর্ব্বভূতে দয়া নিষ্ঠা, দেব দ্বিজে ভক্তি প্রভৃতি অশেষ সদ্‌গুণে পূর্ণ ছিল। একখানা মোটা লালপেড়ে সাড়ী আর দুগাছা শাঁখার মধ্যে একটা অশেষ সদ্‌গুণপূর্ণ মাতৃত্বপূর্ণ হৃদয় ছিল। আর এখন দেখি কি—জুতা, ষ্টকীন, মিহিধুতি, সার্ট, কোট, চেন ঘড়ির মধ্যে একটা ক্ষুদ্র স্বার্থপর হৃদয়, জামা সেমিজ বডিস, মিহিসাড়ী ও অলঙ্কারের মধ্যে একটা স্বার্থপর অনন্ত লালসাপূর্ণ নিষ্ঠুর হৃদয়। হায় হায় কি অধঃপতন !

লী। শুধু তাই নয় আগেকার লোক নাকি অসভ্য ছিল, আর এখনকার লোক নাকি সভ্য।

ঠা। তাই যদি হয় তবে ভগবানের নিকট

প্রার্থনা করি এই অসুখ অশান্তিপূর্ণ সভ্যতার পরিবর্ত্তে দেশে আবার সেই সুখশান্তিপূর্ণ অসভ্যতা ফিরে আসুক। নারায়ণ, নারায়ণ পার কর প্রভু!

লী। সে জন্যে ভাবতে হবে না ঠাক্‌মা, প্রভু এপারে বড় কাউকে রাখেন না সকলকেই দয়া করে ওপারে নিয়ে যান। এখন তুমি পার হবার আগে আমায় পার করে দাও।

ঠা। কেন আবার কি হল তোর?

লী। এই ছোট খোকার কাসি আর বড় খোকার সর্দ্দি।

ঠা। ছোট খোকার কি রকম কাসি?

লী। ওঃ! সে ভয়ানক কাসি। যখন হয় সহজে থামে না অনেকক্ষণ ধরে হয়। আর কাস্‌তে কাস্‌তে ছেলেটা নির্জ্জীব হয়ে পড়ে।

ঠা। কত দিন হয়েছে?

লী। সূত্রপাত আট দশ দিন আগে থেকে। প্রথমে সর্দ্দি হয়েছিল একটু একটু কাসিও ছিল। আজ তিন দিন এই রকম বেড়েছে।

ঠা। এর মধ্যে কিছু ওষুদ দিস্‌নি?

লী। বেশী কিছু নয় কেবল দুধের সঙ্গে পিপুল সিদ্ধ করে দিতাম। হাঁ ভাল কথা কাল আমার বড় নন্দাই এসেছিলেন। তিনি একজন ভাল ডাক্তার। তিনি বেশ করে দেখে শুনে বল্লেন যে একে হুপিং কাসি বলে। এ রোগের ওষুদ বড় কিছু নেই। কিছুদিন বাদে আপনিই সেরে যাবে।

ঠা। রোগ মাত্রেরই ওষুদ ভগবান সৃষ্টি করেছেন। ওষুদের অভাব নেই, অভাব জ্ঞানের। জ্বর হয় না ত?

লী। বেশ স্পষ্ট জ্বর হয় না তবে মাঝে মাঝে গা গরম বলে বোধ হয়।

ঠা। হুঁ ঘুংড়ি কাসি হয়েছে। বাহ্যে কেমন হয়?

লী। বাহ্যে খুব কঠিন। প্রায় একবার করেই হয়। একদিন কেবল হয় নি।

ঠা। খেতে দিচ্ছিস্‌ কি?

লী। ভাত দিইনে, দুধ, রুটী, বার্লি, মিছরী, বেদানার রস এই সব দিই।

ঠা। কফ ওঠে কিছু?

লী। বেশ ওঠে না। কাস্‌তে কাস্‌তে একটু আধটু ওঠে। তা প্রায়ই গিলে ফেলে, কখন হক করে ফেলে দেয়—যেন জিওলের আটা।

ঠা। বলি শোন। এর কফ একটু বসে গিয়েছে, কাজেই কফ যাতে সরল হয়ে উঠে যায় এমন ধারা ওষুদ আর পথ্যি দিতে হবে। দুধ আগেই বা কত খেত আর এখনই বা কতটুকু দিস্‌?

লী। আগে একসের পাঁচ পোয়া খেত এখন আধসের আড়াই পোয়া দিই।

ঠা। হাঁ তাই দিস্‌, আর পিপুল দিয়ে সিদ্ধ করে মিছরী দিয়ে দিস। যদি পাওয়া যায় তাহলে গাইয়ের দুধ না দিয়ে ছাগল দুধ দিস্‌। সব না পেলেও যতটা পাওয়া যায় দিবি আর বাকী গাইয়ের দুধ দিবি। ছাগল দুধ শুক্‌নো কাসি আর পেটের অসুখের পক্ষে বড় ভাল।

লী। আচ্ছা তাই দেব। কিন্তু মিছরী কি সবই দুধের সঙ্গে দেব?

ঠা। তা দিবি বৈ কি। মিছরীতে কফ বড় সরল করে। তবে আকের চিনির মিছরী যোগাড় কর্‌তে হবে। সেটা পাওয়া আজ কাল দুর্ঘট হয়েছে।

লী। তবে বাজারে যে মিছরী পাওয়া যায় ও কি থেকে তৈরেস?

ঠা। ও বিটের চিনির মিছরী। কাসির সময় দিশী চিনির মিছরী গলায় রাখ্‌লে স্বস্তি হয়, বিটের চিনির মিছরী রাখ্‌লে তেমন হয় না।

লী। তা সে আবার কোথায় পাব ?

ঠা। কোথায় কোথায় পাওয়া যায় তা আমি জানিনে, তবে আমরা প্রায় ভাট পাড়া থেকে আন্‌তাম। সেখানে পাড়ার ভেতরকার ময়রারা গুড় থেকে চিনি মিছরী তৈয়ের করে।

লী। তা আমি কালই চাকর পাঠিয়ে দিয়ে আনাব। আচ্ছা ভাল কথা তালের মিছরী দিলে হয় না ?

ঠা। তালের মিছরী বলে যে গুলো বিক্রী হয় ও গুলো ত এদেশে হয় না, চীন দেশ থেকে আসে। অনেক লোক, এমন কি ডাক্তার কবিরাজ ওগুলো ব্যবহার করেন, কিন্তু লোকনাথ বদ্দি বলতেন যে ওগুলো কিসে থেকে হয় যখন জানিনা তখন ও ব্যবহার কর্‌বোনা। তিনি দিশি চিনির মিছরীই ব্যবহার কর্‌তেন।

লী। তা এদেশে এত তাল গাছ তবু মিছরী হয় না কেন ?

ঠা। দেশের লোকের কি সে চেষ্টা আছে। তা না হলে দেশে যে তাল গাছ আছে তা থেকে গুড় মিছরী তৈয়ের কর্‌বার ব্যবসা করলে লোকে বড় লোক হতে পারে, দেশেরও একটা অভাব দূর হয়।

লী। তালের গুড় কিন্তু তৈয়ের হয় ঠাকুমা।

ঠা। সে জায়গায় জায়গায় হয় বটে—খুব সামান্য।

লী। বাপ্‌ সে কথা, আর কি দেব বল।

ঠা। বাহ্যে যখন ভাল হয় না তখন খৈ দুধ দেওয়াই ভাল। খৈ যেন টাট্‌কা হয় আর লাল কাঁচুলি ("খৈ চড়া") না থাকে।

লী। তা লাল লাল কাঁচুলিত সব খৈতে থাকে।

ঠা। না সব খৈয়ে থাকে না। ভাল ধানের খৈ বেশ সাদা ধপ্‌ ধপে হয়। যদিও বা থাকে সে এত কম যে ধর্ত্তব্য নয়।

লী। রুটী দেবো না ?

ঠা। দেখ কাসির পক্ষে লঘু পথ্যই ভাল রুটী একটু গুরুপাক, সেই জন্যে না দেওয়াই ভাল। তবে যদি ছেলে না রাখতে পারিস্‌ তা খুব পাতলা সুজির রুটী ২।১ খানা দিবি।

লী। সুজির রুটী কি করে করবো ?

ঠা। চারটী ভাল সুজি নিয়ে গরম জলে চটকে শক্ত ডেলার মত করবি। তার পর ফুটন্ত জলে সেই সুজির ডেলাটা দশ মিনিট সিদ্ধ করবি। তারপর তুলে নিয়ে দরকার মত অল্প দুটি সুজি মিশিয়ে খুব পাত্‌লা পাত্‌লা রুটী করবি।

লী। আচ্ছা ঠাকুমা পাঁউরুটী দেওয়া যায় না ?

ঠা। পাঁউরুটী টা আমাদের দেশে চলে গেছে, আর ওটা যখন ময়দা থেকে তয়ের হয় তখন দিতে বাধা নেই। তবে অনেক সময় খারাপ ময়দায় তয়ের হয়, ধুলো বালি মেশে সেইজন্য খুব ভাল না পাওয়া গেলে দিতে নেই।

লী। আর যদি ভাল পাওয়া যায়।

ঠা। তা হলে আগুণে সেকে দিতে হয়। পাঁউরুটী টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে একটা খুন্তীর আগায় বিঁধে আগুণের ওপর ধরতে হয় সে দিকটা কটা রঙের হয়ে গেলে আর এক পিট অমনি করে সেঁকতে হয়। যদি একটু

আধটু পুড়ে ওঠে সেটুকু ছুরি দিয়ে চেঁচে ফেল্‌তে হয়।

লী। তারপর বার্লি দিতে পারি?

ঠা। হাঁ দরকার হলে বার্লি দিতে পার।

লী। জল খাবার কি দেব?

ঠা। কিসমিস, খেজুর, মনক্কা, দাড়িম, কুমড়োর মেঠাই, দু'চারটে এলাচ দানা একটু মিছরী।

লী। একটু দাল তরকারি কি মাছের ঝোল খেতে চায়, তার কিছু দিতে পারি কি?

ঠা। এটা হলো বাতিক কাস, এতে বেতোশাক, কাকমাচী (গুড় কামাই) শাক, কচি মূলো, মাষ কলায়ের যূষ, মাছের ঝোল এ সব দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু কচি ছেলে—এত না দিয়ে একটু খলশে, শিঙ্গি কি মাগুর মাছের ঝোল দিস্।

লী। আচ্ছা তুমি ভিন্ন ভিন্ন কাস্ কি করে বোঝা যায়? আর কিসে কি রকম পথ্যি দিতে হয় একটু শিখিয়ে দাও।

ঠা। আচ্ছা মোটামুটি বল্‌ছি শোন। বাতিক কাসে মুখ, গলা, বুক শুকিয়ে উঠে, বুক, পাঁজর ও মাথার যন্ত্রণা হয়, খুব শুক্‌নো কাসি হয়, কফ খুব কম ওঠে। বাতিক কাসের পথ্যির কথা আগে বলিছি তা ছাড়া মাংসের যূষ, টক ফল, দই, আক এ সব অবস্থা বুঝে দেওয়া যায়। পিত্তকাসে চোখ আর কফ হলদে হয়, প্রায় একটু জ্বর হয়, তৃষ্ণা হয়, বমি হয় আর গায়ের জ্বালা হয়। এতে মুগের যূষ, বার্লি, বার্লির রুটী তেতো শাক, কিস্‌মিস, খেজুর, চিনি, খৈ এই সব পথ্য দিতে হয়। কফকাসে বুক খুব ভার হয়, গলায় যেন কি লেপা রয়েছে বোধ হয়, অরুচি হয়, বমি হয়, ঘন শাদা শ্লেষ্মা খুব বেরোয়। এতে বার্লি, যবের রুটী, মধু, খৈ, কুলথি কলায়ের যূষ, কচি মূলা, রুক্ষ, ঝাল, আর গরম জিনিষ পথ্য দিতে হয়। পিত্ত ও কফ কাসে মাছটা দেওয়া ভাল নয়।

লী। এখন ওষুদ কি দেব বল?

ঠা। আগে মালিষের কথা বলি। বুকে পাঁজরে পুরান গাওয়া ঘি গরম করে বেশ করে মালিষ কর্‌বি।

লী। পুরান ঘি কোথায় পাব?

ঠা। পুরান ঘি পাওয়া আজ কাল শক্ত, অনেক জায়গায় পুরান ঘি বলে যা বিক্রয় হয় সেটা ভেল। শুঁটের গুঁড়ো কি সাজি মাটির সঙ্গে নূতন ঘি মেড়ে পুরান বলে বিক্রি করে। আবার বড় বাজারে ঘি বিক্রির পর টিনগুলি তাতিয়ে ও তাথেকে একটু আধটু যা বেরোয় এক জায়গায় করে কোন কিছু মিশিয়ে কড়ো গন্ধ আর বদ রং করে পুরান ঘি বলে বেচে।

লী। ভাল পুরান কি করে চেনা যায় ঠাকুমা?

ঠা। ভাল পুরান ঘির রং কটা হয়, খুব কড়ো গন্ধ হয় আর চাল ভাজার মত দানা বাঁধে। তা সেরকম ঘি বাজারেও পাবিনে আমাদের বাড়ীতে আছে একটু নিয়ে যাস্। সেই ঘি বেশ করে মালিষ করে, আকন্দ পাতা গরম করে বুকে সেক দিবি। আর সেক দেওয়া হয়ে গেলে গরম কাপড় দিয়ে বুকটা বেঁধে রাখবি।

লী। সেক কবার দেব?

ঠা। সকালে সন্ধ্যায় দু'বার দিলেই হবে।

লী। এখন খাবার ওষুধের কথা বল।

ঠা। আমি অনেক গুলো ওষুধের কথা বল্‌ছি এর মধ্যে দু'টো ওষুধ দিবি। আর

কাসির ওষুদ একেবারে না খাইয়ে ২।১ ঘণ্টা অন্তর চেটে চেটে খেতে দিবি। (১) কণ্টকারী-ফুলের ভেতর যে কেশর থাকে তাই এক আনা মধুতে মেড়ে খাওয়ালে কাসি ভাল হয়। (২) পিপুলের গুঁড়ো ½ রতি আর ময়ূর পুচ্ছ ভস্ম দুই রতি মধুর সঙ্গে মেড়ে খাওয়ালে ভাল হয়, ময়ূর পুচ্ছ কিন্তু অন্তর্ধূমে ভস্ম করে নিতে হবে।

লী। অন্তর্ধূমে ভস্ম আবার কি ?

ঠা। শোন্ বলি। ময়ূর পাখার চাঁদ গুলো কেটে নিয়ে একটা ছোট হাঁড়ির ভেতর রাখ্‌বি। তার পর সেই হাঁড়ির মুখে এক-খানা ছোট সরা কি কটরা ঢাকা দিয়ে যোড়ের মুখ মাটী দিয়ে লেপে দিবি। লেপ শুকিয়ে গেলে সেই হাঁড়ি উনুনে চড়িয়ে তলায় জ্বাল দিলেই ভস্ম হয়ে যাবে।

লী। কতক্ষণ জ্বাল দিতে হবে ?

ঠা। কড়া জ্বাল হলে ১৫।২০ মিনিটেই ভস্ম হয়ে যাবে।

লী। তার পর আর কি ওষুদ বল ?

ঠা। (৩) কিসমিস দু'আনা, হরীতকী দু' আনা পিপুল তিন রতি বেশ চন্দনের মত করে বেটে ১টী ফোটা ঘি আর ২টী ফোটা মধু মিশিয়ে খাওয়ালে কাসি ভাল হয়। (৪) কুড়, আতইচ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল আর দুরালভা এই কয়েক মসলার মিহি গুঁড়ো সমান ভাগে মিশিয়ে ৩।৪ রতি মাত্রায় মধুর সঙ্গে খাওয়ালে কাসি ভাল হয়। (৫) ফট্‌-কিরির খৈ ১ রতি করে দু'বার খেলে সারে।

লী। হাঁ ঠাকুমা, শুনিছি বাসক কাসির খুব ভাল ওষুদ, তার কিছু দিলে হয় না ?

ঠা। বাসক দিলে এ রকম কাস সারে না বরং বেড়ে যায়। পিত্ত ও কফ কাসেই বাসক ভাল কাজ করে।

লী। আর কি ওষুদ বল্‌বে বল ?

ঠা। যা বলিছি ওতেই সেরে যাবে, তবে আরও একটা শিখে রাখ। একটা বেশ বড় অথচ পোকা লাগা নয় এমনতর বয়ড়া ঘি মাখিয়ে গোবরের ঠুলির ভেতর পুরবি, তার পরে সেটা ঘুঁটের আগুণে পোড়াবি, পোড়াতে পোড়াতে গোবর শুকিয়ে যখন জ্বলে উঠ্‌বে তখন আগুণ থেকে বের করে ভেঙ্গে সেই বয়ড়া নিবি। সেই বয়ড়ার বীচি ফেলে দিয়ে ৩।৪ রতি গুড়ো মধুর সঙ্গে খাওয়াবি।

লী। আচ্ছা, ছোট খোকারত হল, এখন বড় খোকার কি কর্‌বো বল ?

ঠা। বড় খোকার অসুখের কথা সব বল।

লী। বড় খোকার আজ চার দিন হল অসুখ হয়েছে। দু'দিন কম ছিল কিন্তু পরশু থেকে সর্দ্দিতে একেবারে হাস্ ফাঁস্ করছে। মুখ খানা ভার ভার টুসো টুসো হয়েছে, মাথার যন্ত্রণা, খিদে বড় নেই, দাস্ত এক দিন হয় এক দিন হয় না, গাটাও ছ্যাঁক্ ছ্যাঁকে হয়েছে, আর নাক মুখ দিয়ে খুব সর্দ্দি পড়ছে।

ঠা। কাসি আছে ?

লী। সে নেই বল্লেই হয়, এক আধ বার।

ঠা। নেই, এরপর হবে। গা বমি বমি করে ?

লী। হাঁ, গা বমি বমি খুব করে।

ঠা। এই হল কফ কাসের প্রথম অবস্থা, এ অবস্থার প্রথমেই বমি করাতে হবে। মুক্ত-বর্ষীর (মুক্তাঝুরি, বেড়াল কাঁদুনী) পাতার রস চা চামচের এক চামচে আর ছটাক জলের সঙ্গে খাইয়ে দিস্। তা হইয়ে বমি হবে। মুক্ত বর্ষী মধুর কাথ করে সেই কাথের সঙ্গে পিপুল,

ইন্দ্রযব, সৈন্ধব লবণ ও বচ এই গুলির গুঁড়ো সমান ভাবে মিশিয়ে এক সিকি মাত্রায় ঐ ক্কাথে মিশিয়ে খাইয়ে দিবি। তা হলেও বমি হয়ে অনেক শ্লেষ্মা উঠে যাবে।

লী। যষ্টিমধুর ক্কাথ কি করে কর্‌বো আর কত টুকু দেব?

ঠা। এক ছটাক যষ্টিমধু ৵২ সের জলে সিদ্ধ করে আধ সের থাক্‌তে নামিয়ে ছেঁকে নিবি। তারই দুই ছটাক আন্দাজ দিলেই হবে। কিন্তু রোগা দুর্ব্বল ছেলেকে বমি না করানই ভাল। আধ ছটাক ব্রাহ্মীশাক ও এক সিকি আদা থেঁতো করে কলার পাতে বেঁধে ঝল্‌সা পোড়া করে তার রস চা চামচের এক চাম্‌চে দেওয়া ভাল।

ঠা। সকালে বমি করাবি। তারপর কিছু খেতে দিস্‌নে। বেশ খিদে হলে বিকেলে খেতে দিবি।

লী। আচ্ছা ঠাক্‌মা, কফ কাসের সব অবস্থায় কি বমি করান চলে?

ঠা। না, যেখানে খুব সর্দ্দি উঠছে অথচ গা বমি বমি আছে সেইখানে বমি করান চলে। গা বমি বমি না থাকলে যদি বমি করান যায়, তা হলে রোগীর অনিষ্ট হয়।

লী। তারপর পথ্যি কি দেব বল?

ঠা। এক পোয়া ছাগলদুধ আর এক পোয়া জল সিদ্ধ করে, জল মরে গেলে সেই দুধে মিছরী আর ৩।৪ রত্তি মরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে দিবি। কফ কাসে দুধ না দেওয়াই ভাল, কিন্তু ছেলে মানুষ আর অনেকখানি করে দুধ খাওয়া অভ্যাস, তা এই একবার করে দিবি এতে আহার ওষুধ দুই হবে।

লী। আর কি দেব?

ঠা। জলবার্লি, বার্লির রুটী, খৈ, এই সব দিবি।

লী। জল খাবার কি দেব?

ঠা। বেশী খিদেত নেই, জল খাবার আবার কি দিবি। খিদে হলে বেদানা, কিস্‌মিস্‌, কুমড়োর মেঠাই দিস্‌।

লী। বড় খোকা বড্ড মুড়ি ভালবাসে ঠাক্‌মা, দু'টি মুড়ি দিতে পারি?

ঠা। তা গরম গরম টাট্‌কা মুড়ি দু'টি দিস্‌।

লী। এখন ওষুদ কি দেব বল?

ঠা। অন্য ওষুদের কথা বলবার আগে একটা কথা বলে রাখি, তোর দুই খোকাকেই গরম জল দিন ৩।৪ বার যত টুকু করে খাওয়াতে পারিস্‌ দিবি। জল একটু গরম হলেই গরম জল হয় না। অন্ততঃ ১০।১৫ মিনিট টগ্‌বগ্‌ করে ফোটা চাই। তার পর নামিয়ে সহ্য মত গরম খাওয়াবি। ঠাণ্ডাজল একেবারেই দিবিনে। আর সমস্ত খাবারই গরম গরম দিবি, ঠাণ্ডা হয়ে গেলে দিস্‌নে।

লী। গরম জল কি এত উপকারী?

ঠা। নবজ্বর, অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতা, কাসি, সর্দ্দি এসব রোগে গরম জল একটা মস্ত ওষুদ।

লী। আর কি ওষুদ দেব বল?

ঠা। আদার রস চা চামচের এক চামচ ২০।২৫ ফোটা মধু মিশিয়ে সকালে বিকালে দু'বার করে দিস্‌ তা হইলে সেরে যাবে। ইচ্ছে হলে একবার আদার রস আর একবার শুঁঠ, পিপুল মরিচের গুঁড়ো সমান ভাগে মিশিয়ে তার দুই রতি গরম জলের সঙ্গে দিতে পারিস্‌। আর কিছু দেবার দরকার হবে না। তবে জামা কাপড় দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে রাখবি যেন বাতাস না লাগে। আর বুকটায় একটা গরম কাপড় বেঁধে রাখিস্‌।

লী। আচ্ছা ঠাকুমা, মাথার যন্ত্রণাটা যাতে শীঘ্র যায় এমন কোন উপায় নেই?

ঠা। এক কাজ করিস্, খাঁটি সর্ষের তেল গরম করে পায়ের তলায় খানিক ক্ষণ মালিষ করে দিস্ তা হলে মাথার যন্ত্রণা কমে যাবে।

লী। আচ্ছা ঠাকুমা, দু' রকমত শিখলাম, পিত্ত'কাসের ওষুদও শিখিয়ে দাও না?

ঠা। বলি শোন। পিত্ত কাসে কফ পাতলা থাকলে এক সিকি তেউড়ীর গুঁড়ো চিনির সঙ্গে আর কফ ঘন থাকলে এক সিকি তেউড়ীর গুঁড়ো সমান চিরতার গুঁড়োর সঙ্গে মিশিয়ে খাইয়ে দাস্ত করাতে হয়। এবার যে মাত্রা বল্‌লাম এটা বড় লোকের মাত্রা। বয়স বুঝে মাত্রা কম করতে হয়।

লী। কি রকম বয়সে কত মাত্রায় দিতে হয়?

ঠা। ১২।১৩ বৎসর বয়েস হলে দু' আনা, ৫।৬ বছর বয়েস হলে এক আনা, ২।৩ বছর হলে আধ আনা এই মোটা মুটি বল্‌লাম।

লী। তার পর ওষুদ?

ঠা। গোটা কতক ওষুদ বল্‌ছি শোন। (১) কিস্‌মিস, আমলকী, খেজুর, পিপুল, মরিচ সমান ভাগে মিশিয়ে দু' তিন আনা মাত্রায়, গাওয়া ঘি এক আনা ও মধু দু' আনার সঙ্গে খেলে পিত্তকাস ভাল হয়। (২) কিস্‌মিস, খেজুর, পিপুল, খৈ, চিনি সমান ভাগে মিশিয়ে তিন চার আনা মাত্রায়, গাওয়া ঘি ও মধুর সঙ্গে খেলে পিত্তকাস ভাল হয়। (৩) পদ্ম-বীজের গুঁড়ো দু'তিন আনা মধুর সঙ্গে খেলে পিত্তকাস ভাল হয়। (৪) বাসক পাতার রস ২ তোলা মধুর সঙ্গে খেলে পিত্তকাস, কফ কাস ও রক্তপিত্ত ভাল হয়। আর আগে যে বগড়া গোবরের ঠুলিতে পোড়ানোর কথা বলেছি, তাতেও পিত্তকাস ভাল হয় পথ্যির কথাত আগেই বলিছি।

লী। হাঁ, তা আগেও বলেছ। এখন আমার কাজ শেষ হল। ছোট বৌকে বকিছি—ছোট বৌ কি করছে একবার দেখিগে।

ঠা। বেশ করেছিস্ বকেছিস্, আমি তোর বিবেচনা দেখে বড় খুসী হয়েছি। এরকম একজন গিন্নি সংসারে থাকা দরকার। বউমা আমার খেটে খেটে গতর জল করে কিন্তু অত শত বোধ নেই।

লী। তবু আমি একবার দেখে যাই ঠাকুমা, ছেলে মানুষ অত বোঝে না মনে কষ্ট হতে পরে।

ঠা। চল আমিও একবার গোকুলকে দেখে আসি তার বুঝি কি অসুখ করেছে।

(উভয়ের প্রস্থান)

আয়ুর্ব্বেদ অধ্যাপকের পত্র।

আমি "অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়" দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। বহু বন্ধুবান্ধব ও ছাত্রের নিকট বিদ্যালয়ের কথা বলিয়াছি। অন্তরের প্রিয়বস্তু ভাবিয়া বিদ্যালয় সম্বন্ধে কিছু চিন্তা ও করিয়াছি। আপনারা যে এত অনুষ্ঠান করিয়াছেন চক্ষে দেখিবার পূর্ব্বে তাহা বুঝি নাই, বা সোজা কথা বলিলে বিশ্বাস করি নাই বলাই ঠিক। অবিশ্বাস করায় বোধ হয় তেমন দোষও হয় নাই। কারণ ইতঃপূর্ব্বে অনেক আলোচনা, অনেক সংবাদ প্রচার হইয়াছিল বটে কিন্তু ফলে ঐগুলি দম্পতিকলহে পরিণত হইয়াছিল। এবার যে এমন নিঃশব্দে কার্য্য হইতেছে কেমন করিয়া বুঝিব বলুন। আমার মত আর যাঁহারা শব্দমাত্রে এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সংবাদ জানেন, বিদ্যালয় সম্বন্ধে তাঁহাদের মনের ভাবও হয়ত আমারই মত। এইজন্য দেশের অবস্থা চিন্তা করিয়া, আমি বিদ্যালয় সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ লিখিয়া পাঠাইতেছি। যদি সঙ্গত মনে করেন জনসাধারণের বিদিতার্থ পত্রখানি মুদ্রিত করিবেন।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য —অনেকে মনে করিতে পারেন, এদেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসকগণের গৃহে গৃহে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যাপনার ব্যবস্থা রহিয়াছে তবে আবার এই বিদ্যালয় কেন? প্রথমেই বলিয়া রাখি বিদ্যালয়ের কর্ম্মিপুরুষগণ গুরুগৃহে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যাপনার বিরোধী নহেন কিন্তু আমরা বেশ বুঝিয়াছি এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন, যে অধুনা দেশে যত আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসকের প্রয়োজন গুরুগৃহে অধ্যাপনা প্রণালী প্রবর্ত্তিত থাকায় তত চিকিৎসক পাওয়া যাইতেছে না। দেশের লোকের স্বাস্থ্যের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা মন্দ হওয়ায় রোগীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছে। দেশে বিবিধ চিকিৎসা প্রবর্ত্তিত থাকিলেও এখনও আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসাই বহুসংখ্যক প্রজাকে রক্ষা করিতেছে। আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা দেশের লোকের অভিমত হইলেও পাঁচসাত খানি পল্লীর মধ্যে হয়ত একজনও আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসক নাই। সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও দেশের লোক আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসার ব্যবস্থা করাইতে পারিতেছেন না। পক্ষান্তরে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসকগণের মধ্যে যাঁহাদের চিকিৎসা নৈপুণ্যের প্রতিষ্ঠা আছে, যাঁহাদের আয়ুর্ব্বেদ অধ্যাপনার যোগ্যতা আছে, তাঁহাদিগকে চিকিৎসা বৃত্তি লইয়া এতাদৃশ বিব্রত থাকিতে হয় যে, অধ্যাপনার আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহাদের অধ্যাপনার অবসর ঘটে না, অথবা কাড়িয়া জোর করিয়া তাঁহারা যতটুকু সময় অধ্যাপনার্থ ক্ষেপণ করিতে পারেন, তাহাতে অত্যল্পসংখ্যক ছাত্রেরও সাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের বিহিত অধ্যাপনা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন, নানাশাস্ত্রে কৃতশ্রম, বিশিষ্ট বুদ্ধিমান্ বিদ্যার্থী এই সকল আয়ুর্ব্বেদাধ্যাপকের নিকট ইঙ্গিতমাত্র উপদেশ লাভ করিয়া, স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধি ও চেষ্টা বলে বৈদ্যকশাস্ত্রের কেবল শাস্ত্র-দৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে পারেন বটে কিন্তু উপকরণাভাব হেতু প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট জ্ঞানলাভে প্রায়ই বঞ্চিত থাকিতে হয়। যাহা হউক সংস্কৃত চর্চ্চার অধুনা বিরল প্রচার হওয়ায়, এবম্বিধ বিদ্যার্থীর সংখ্যাও ক্রমশঃ অতি

অন্ন হইয়া পড়িতেছে। যে সকল অব্যুৎপন্ন ছাত্র, বড় গুরুর শিষ্য হইবার লোভে, এই সকল কর্ম্মাতিব্যস্ত আয়ুর্ব্বেদ অধ্যাপকগণের আশ্রয় লইতেছে, তাহাদিগকে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যাপনা করাইতে, অধম-বুদ্ধি শিষ্যের বোধোপযোগী করিয়া শাস্ত্র ব্যাখ্যার জন্য, যেরূপ দীর্ঘকাল ধীরতার সহিত পরিশ্রম ও উপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক, গুরুর তাদৃশ সময়, সুবিধা ও স্পৃহা না থাকায়, তাহারা কেবল আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়নের অভিনয় করিয়া, গুরু গৃহ হইতে স্বীয় গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছে। এবং স্বীয় অনুপযুক্ততার জন্য জনসমাজে আয়ুর্ব্বেদের অগৌরব প্রচার করিতেছে মাত্র। অপরদিকে দেশের নিয়ম যে, কবিরাজ অন্নদান করিয়া ছাত্র পড়াইবেন। বিদ্যা থাকিলেই ধন থাকিবে এমন কোন নিয়ম নাই। যে সকল আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসক আয়ুর্ব্বেদে কৃতশ্রম অতএব অধ্যাপনার যোগ্য, কিন্তু বিধিবশাৎ যাঁহাদের আর্থিক অবস্থা মন্দ, তাঁহাদের সময়, অবকাশ ও স্পৃহা থাকিলেও তাঁহারা ইচ্ছামত ছাত্র রাখিয়া দেশে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসকের অভাব দূর করিতে পারিতেছেন না। যে সকল কর্ম্মব্যস্ত চিকিৎসকের সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ অধ্যাপনার অবকাশ নাই, তাঁহারা সুবিধামত কিঞ্চিৎমাত্র সময় ক্ষেপণ করিয়া এবং যাঁহাদের অবকাশ আছে তাঁহারা প্রচুর সময়ক্ষেপ করিয়া যদি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন, তাহা হইলে দেশে আর আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের অভাব থাকে না। কিন্তু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ভিন্ন এবম্বিধ সম্মেলন নির্ব্বাহ হইতে পারে না। কলিকাতায় একটীমাত্র অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দ্বারা ভারতের আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসকের অভাব নিরাকৃত হইতে পারে না। দেশে এইরূপ শত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইলে এবং প্রতি বিদ্যালয় হইতে বার্ষিক শতজন ছাত্র সুচিকিৎসক হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে দেখিলে তবে আমাদের তৃপ্তি হইবে।

বিদ্যার্থি-গ্রহণের নিয়ম—সংপ্রতি দেশে যাহা নাই তাহার জন্য হা হুতাশ না করিয়া, দেশে যাহা আছে তাহা লইয়াই কাজ করিয়া যাও এবং ভবিষ্যতে তোমার অভিপ্রেত উচ্চ আদর্শের জিনিষ যাহাতে প্রস্তুত করিতে পার তাহার জন্য আন্তরিক চেষ্টাকর। ইহাই প্রকৃত হিতৈষী কর্ম্মিপুরুষের পন্থা। যখন কলিকাতার মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তখন যদি প্রতিষ্ঠাতৃগণ ইংরাজি ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছাত্র না পাইলে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যা দান করিবেন না এই সিদ্ধান্ত করিতেন, তাহা হইলে কি এ-দেশে পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যার এতশীঘ্র এতাদৃশ প্রচার হইত? দেশের অবস্থানুসারে তখন তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই এখন তাঁহারা এত অভিমত, যোগ্য, ব্যুৎপন্ন ছাত্র পাইতেছেন যে স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের ছাত্র গ্রহণ বিষয়েও আপনারা ঐরূপ কালোপযোগী উদার পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন দেখিয়া আমি আপনাদের দূরদর্শিতার প্রশংসা করিতেছি। আয়ুর্ব্বেদ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত সুতরাং আয়ুর্ব্বেদ-পাঠীর সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি থাকা আবশ্যক বটে, কিন্তু যদি আপনারা নিয়ম করিতেন যে কেবল সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছাত্র ভিন্ন অপরের বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার নাই, তাহা হইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিত। অতএব যত দিন দেশে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন বহুসংখ্যক ছাত্র না

পাওয়া যাইতেছে, ততদিন বাঙ্গালা ভাষা শুদ্ধ করিয়া পড়িতে লিখিতে পারে এরূপ ছাত্র গ্রহণ করা হইবে এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত করা অতি উত্তম হইয়াছে। আশা করি অদূর ভবিষ্যতে সহস্র সহস্র সংস্কৃতজ্ঞ বিদ্যার্থী বিদ্যালয়ে আয়ুর্ব্বেদ পাঠ করিতেছে দেখিতে পাইব। সংপ্রতি বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে—বাঙ্গালা শ্রেণী ও সংস্কৃত শ্রেণী। সংস্কৃত পড়িতে বুঝিতে ও লিখিতে পারে এমন ছাত্রকে সংস্কৃত বিভাগে প্রবেশাধিকার দেওয়া হইতেছে। সংস্কৃত বিভাগ ও বাঙ্গালা বিভাগের ভাষা মাত্র ভিন্ন, শিক্ষাগত বিশেষ কোন পার্থক্য দেখিলাম না। বরং সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ বলিয়া, বাঙ্গালা বিভাগের ছাত্রগণের সুশিক্ষার জন্য সুদক্ষ ও পরিপক্ক শিক্ষক অধ্যাপনায় মনোনীত করা হইয়াছে। যে সকল ছাত্র দেশান্তর হইতে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কেবল প্রত্যক্ষ-দর্শনমূলক জ্ঞানার্জ্জন ও শল্য শালাক্য তন্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইবার জন্য অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিষয় বিশেষ (যেমন দ্রব্যগুণ কি চিকিৎসা) অধ্যয়নের অভিলাষ থাকিলে তাহারও সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। সংস্কৃত বিভাগের ছাত্রদিগকে বেতন দিতে হয় না। বাঙ্গালা বিভাগের ছাত্রকে মাসিক ৩ টাকা বেতন দিতে হয়। বিষয় বিশেষ অধ্যয়ন করিবার জন্য বেতনের যে বিশেষ নিয়ম আছে তাহা অধ্যক্ষের নিকট আবেদন করিয়া জানিতে হয়। বাঙ্গালা বিভাগের পাঠ ৪ বৎসরে এবং সংস্কৃত বিভাগের পাঠ ৫ বৎসরে সমাপ্ত হয়। চরমপরীক্ষান্তে উপাধি দেওয়া হইয়া থাকে।

অধ্যাপনার প্রণালী—আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা বিজ্ঞান। বিজ্ঞান শাস্ত্রের অধ্যাপনা পূর্ব্বে এদেশে যেমন যোগ্যাকরণ পূর্ব্বক নির্ব্বাহ হইত, এই বিদ্যালয়ে সেইভাবে অথচ উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে নির্ব্বাহ হইতেছে। দ্রব্যগুণের অধ্যাপক অগ্রে দ্রব্যটী ছাত্রদিগকে দেখাইয়া চিনাইয়া দিয়া, বাজারে ঐ দ্রব্যের যত প্রকার নকল প্রচলিত সেগুলিও দেখাইয়া দিয়া, দেশ বিদেশে ঐ জিনিষটীর ভ্রমে যে সকল নকল দ্রব্য ব্যবহৃত হইতেছে তাহার বিবরণ শুনাইয়া, দ্রব্যগুণ শিক্ষা দিতেছেন। মানব শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপাদান, সংস্থিতি ও সম্বন্ধ কঙ্কালে, প্রতিমূর্ত্তিতে ও চিত্রে দেখাইয়া, বুঝাইয়া, অঙ্গবিনিশ্চয় বিদ্যার অধ্যাপক অঙ্গবিনিশ্চয় বিদ্যা শিক্ষা দিতেছেন। বিচিত্র বনস্পতি, ক্ষুপ, লতা, পুষ্প, সম্মুখে উপস্থিত রাখিয়া, দৃষ্টি-দীপক যন্ত্রের সাহায্যে সুযোগ্য অধ্যাপক বনৌষধি-বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন। দোষধাতু-মলাদিতত্ত্বের অধ্যাপক বিবিধ সুরঞ্জিত চিত্র-সাহায্যে রক্ত-সম্বহনাদি ক্রিয়া ব্যাখ্যা করিয়া প্রত্যক্ষবৎ বুঝাইতেছেন। রসোপরস ধাতূপধাতু প্রভৃতি বিবিধ স্থাবর খনিজ বস্তু সংগ্রহ করিয়া, রসশাস্ত্রের অধ্যাপক রসশাস্ত্র শিক্ষা দিতেছেন। দ্রব্যগুণ শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয়ে যে দ্রব্যসম্ভার সংগৃহীত ও সুসজ্জিত রহিয়াছে তাহা দেখিয়া, পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যায় সুশিক্ষিত কোন চিকিৎসক (ইনিও আমার মত একজন দর্শক) বলিলেন আমরা যদি পাঠ্যাবস্থায় এরূপ সুবিন্যস্ত ভেষজ পরিচয়াগার পাইতাম তাহা হইলে কত উপকার হইত। আমার সহ-পাঠী কোন প্রতিভাশালী প্রবীণ [illegible] শারীর পরিচয়াগারে সংগৃহীত [illegible]

আশয়াদির মৃন্ময় মূর্ত্তি ও বিবিধ সুরঞ্জিত চিত্র দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন—"দ্রব্যসম্ভার দেখিয়া আমার আবার শারীরের ছাত্র হইবার ইচ্ছা হয়।" অগ্রহায়ণের শেষ ভাগ হইতে ছাগ-শশকাদির মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখাইয়া অঙ্গ বিনিশ্চয় বিদ্যার অধ্যাপনা হইবে শুনিয়াছি। এস্থলে কেবল প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর অধ্যাপনার প্রণালী যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহাই লিখিত হইল।

শ্রী * * *

বিবাহ-রজোদর্শন-গর্ভাধান।

আমরা এই প্রবন্ধে বিবাহ, রজোদর্শন-গর্ভাধান সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের উপদেশ ব্যাখ্যা করিব। সহজ ভাষায় সরলভাবে এই প্রবন্ধ লিখিত হইবে। লিখিত বিষয়ের প্রমাণার্থ বৈদ্যক শাস্ত্র হইতে সংস্কৃত বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ দুর্ব্বোধ করিব না।

বিবাহ—যে স্ত্রী বা পুরুষের এমন কোন রোগ আছে যে রোগ সঞ্চারী অর্থাৎ সন্তান সন্ততিতে সংক্রমিত হইতে পারে, তাঁহার বিবাহ করা উচিত নহে। স্ত্রী বা পুরুষ দীর্ঘ-রোগী হইলে কিম্বা স্ত্রীলোকের প্রদরাদি যোনিরোগ থাকিলে বিবাহ নিষেধ। যে স্ত্রী বা পুরুষ এমন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যে বংশে সঞ্চারী রোগ আছে, তাঁহাদের কালাপেক্ষা করিয়া, স্বস্ব স্বাস্থ্যের অবস্থা বিশেষ চিন্তা করিয়া বিবাহ করা বিধেয়। বিবাহ ইন্দ্রিয় চরিতার্থ জন্য নহে। আশ্রম ধর্ম্মের উত্তর সাধক, সমাজের হিতকারী, বলিষ্ঠ, কুলপাবন সন্ততি দ্বারা বংশরক্ষা করাই বিবাহের উদ্দেশ্য। দীর্ঘ রোগপীড়িত স্ত্রীপুরুষ বিবাহ করিয়া সন্তানোৎপাদন করিলে সমাজে ক্ষীণ, দুর্ব্বলেন্দ্রিয়, অল্পায়ু লোকের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া সমাজের অকল্যাণ সাধিত হইবে ভাবিয়া আয়ুর্ব্বেদ উহাদের বিবাহ নিষিদ্ধ করিয়াছেন। সুরূপা, সুশীলা, সদ্বংশজাতা ও যে হীনাঙ্গী, বিকলাঙ্গী বা অধিকাঙ্গী নহে এরূপ পত্নী প্রশস্ত। যাঁহারা বিবাহ করিবার যোগ্য অর্থাৎ যাঁহাদের সুস্থ, বলিষ্ঠ সন্তানোৎপাদনের যোগ্যতা আছে তাঁহারা কত বয়সে বিবাহ করিবেন? সুশ্রুতের মতে পুরুষ ২৫ বৎসরে এবং নারী ১২ বৎসরে বিবাহ করিবেন। বৃদ্ধ বাগ্‌ভটের মতে পুরুষ ২১ বৎসরে এবং নারী ১২ বৎসরে বিবাহ করিবেন।

রজোদর্শন—এদেশে ১২ বৎসরের পর বালিকাদের প্রথম রজোদর্শন হইয়া থাকে। ৫০ বৎসরে স্ত্রীলোকদিগের রজোদর্শন নিবৃত্তি পায়। ইহাই সাধারণ নিয়ম। অবস্থা বিশেষে আর্ত্তব-রজের আবির্ভাব তিরোভাব কালের ন্যূনাধিক্য ঘটিয়া থাকে। অসংযম, বিলাসিতা, কুগ্রন্থ পাঠ, অসৎসংসর্গ, রজোদর্শনের পূর্ব্বে পুরুষসহবাস ইত্যাদি কারণে উপরি লিখিত কালের পূর্ব্বেও রজোদর্শন হইতে পারে। এবং স্বাস্থ্যভঙ্গ শোকাদি কারণে ৫০ বৎসরের পূর্ব্বেও রজোনিবৃত্তি ঘটিতে পারে।

আর্ত্তব শোণিতের স্বভাব ও ভেদ—মাসে মাসে ঋতুকালে নারীদিগের গর্ভাশয়ে যে রক্ত সঞ্চিত হয় তাহার নাম আর্ত্তব শোণিত। এই আর্ত্তবশোণিত এবং শরীরের ধাতু-শোণিত

উভয়ই আহার জাত সৌম্যগুণান্বিত রস হইতে জন্মিয়া থাকে। একই রস হইতে উৎপন্ন হইলেও আর্ত্তব শোণিত আগ্নেয় অর্থাৎ অগ্নিগুণ বহুল এবং ধাতু-শোণিত সৌম ও আগ্নেয়। এই আবর্ত্ত শোণিত দ্বিবিধ—কৃত্রিম ও অকৃত্রিম। যে আর্ত্তব শোণিত দেখিতে শশকের রক্ত বা লাক্ষা ("লা") সিদ্ধ করা জলের মত, যাহা কাপড়ে লাগিলে সহজেই ধুইয়া উঠান যায় তাহাই অকৃত্রিম আর্ত্তব শোণিত। আর যাহা ঈষৎ কৃষ্ণ, বিশিষ্ট গন্ধযুক্ত এবং ঋতু কালে ৩।৪ দিন যোনিদ্বার দিয়া নির্গত হইয়া যায় তাহাই কৃত্রিম আর্ত্তব শোণিত। গর্ভোৎপাদন ও সুসন্তান লাভের পক্ষে ইহা প্রশস্ত নহে বলিয়া ইহার নাম কৃত্রিম আর্ত্তব শোণিত। অকৃত্রিম আর্ত্তব শোণিত প্রশস্ত-গর্ভকৃৎ। ইহার স্রাব হয় না—শুক্র বীজের সহিত মিলিত হইয়া গর্ভোৎপাদন করে। কৃত্রিম ও অকৃত্রিম আর্ত্তব শোণিত এক সময়ে সঞ্চিত হয় না। কৃত্রিম আর্ত্তব শোণিত স্রাব হইয়া গেলে গর্ভাশয়ে অকৃত্রিম আর্ত্তব শোণিত সঞ্চিত হয়। কৃত্রিম আর্ত্তব শোণিত সকল ক্ষেত্রে ৩ দিনেই নিঃশেষরূপে স্রাব হয় না। ইহার স্রাব স্বাস্থ্য, ধাতু, মাতৃপ্রকৃতি অনুসারে ৭।৮ দিন পর্য্যন্ত থাকিতে পারে বটে, কিন্তু ইহা গর্ভাশয়ের পূর্ণ সুস্থতার পরিচায়ক নহে। কৃত্রিম আর্ত্তব নিঃশেষরূপে স্রাব না হইলে অকৃত্রিম আর্ত্তবের সঞ্চয় হয় না ইহাও নিশ্চিত।

ঋতু—দৃষ্টার্ত্তব ও অদৃষ্টার্ত্তব—ঋতু শব্দের অর্থ কাল, যেমন বর্ষা ঋতু শরৎ ঋতু। স্ত্রী-ঋতু শব্দের অর্থ স্ত্রী-লোকের গর্ভধারণ যোগ্য কাল। রজোদর্শন দিন হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশরাত্রি পর্য্যন্ত বহু-সম্মত-ঋতু অর্থাৎ গর্ভধারণ অনুকূল কাল। কাহার মতে ঋতু ষোড়শ রাত্রি, মতান্তরে এক-মাস। দৃষ্টার্ত্তব এবং অদৃষ্টার্ত্তব ভেদে ঋতু দুই প্রকার। যেখানে কৃত্রিম আর্ত্তব শোণিত যথারীতি স্রাব হইয়া থাকে তাহা দৃষ্টার্ত্তব ঋতু এবং যেখানে কৃত্রিম আর্ত্তব শোণিতের স্রাব দেখা যায় না তাহা অদৃষ্টার্ত্তব ঋতু বলিয়া কথিত। কৃত্রিম আর্ত্তব শোণিত স্রাব না হইলেও ঋতু হইয়াছে অর্থাৎ গর্ভধারণ যোগ্য কাল উপস্থিত হইয়াছে ইহা কি প্রকারে জানা যাইবে? অদৃষ্টার্ত্তব ঋতু হইলে নারীশরীরে যে সকল চিহ্ন প্রকাশ পায় আয়ুর্ব্বেদে সে গুলির উল্লেখ আছে, ঐ সকল লক্ষণ দ্বারাই অদৃষ্টার্ত্তব ঋতুর জ্ঞান হইবে। এই অদৃষ্টার্ত্তব ঋতুতে কৃত্রিম আর্ত্তব শোণিত অল্প থাকে বলিয়া স্রাব হয় না—ইহাতে কোন ক্ষতি নাই; কারণ অদৃষ্টার্ত্তব ঋতুতে, অকৃত্রিম আর্ত্তব শোণিত, যাহা প্রশস্ত গর্ভোৎপাদনে নিতান্ত প্রয়োজন, তাহা যথোচিত পরিমাণেই বিদ্যমান থাকে। যে সময় অকৃত্রিম আর্ত্তব শোণিত সঞ্চিত হয় (প্রায় ঋতুর চতুর্থ দিনের পূর্ব্বে হয় না) তাহাই যথার্থ ঋতু অর্থাৎ গর্ভাধান যোগ্য কাল।

গর্ভাধান—পূর্ব্বে বলিয়াছি ঋতু অর্থাৎ বহুসম্মত গর্ভধারণ যোগ্য কাল দ্বাদশরাত্রি। কিন্তু এই দ্বাদশ রাত্রিই গর্ভাধানের অর্থাৎ সন্তানোৎপাদনার্থ স্ত্রীতে স্বামির উপগত হইবার প্রশস্ত কাল নহে; কারণ ঋতুর যে তিন দিন কৃত্রিম আর্ত্তব স্রাব হইতে থাকে সেই তিন দিন পরিবর্জ্জনের বিধি আছে। পরিবর্জ্জনের হেতু এই—প্রথম, দ্বিতীয় তৃতীয়দিনে কৃত্রিম আর্ত্তব স্রাব হইতে থাকে বলিয়া এই সময় বীজ প্রবিষ্ট হইয়া গর্ভোৎপাদন করিতে

পারে না। যদি গর্ভোৎপত্তি হয় তাহা হইলে প্রথম দিনে গর্ভোৎপত্তি হইলে মৃত সন্তান প্রসব হয়, দ্বিতীয় দিনে সূতিকাগারেই মরিয়া যায় এবং তৃতীয় দিনে অনস্পূর্ণাঙ্গ ও অল্পায়ু হয়। চতুর্থ হইতে দ্বাদশ রাত্রির মধ্যে (কাহার মতে একাদশী রাত্রি ও গর্ভাধানের পক্ষে নিন্দিত). সুতরাং অষ্টরাত্রি অবশিষ্ট রহিল। এই অষ্ট রাত্রির মধ্যে যদি পুত্রকামনা থাকে তাহা হইলে চতুর্থী, ষষ্ঠী, অষ্টমী, দশমী, দ্বাদশী রাত্রিতে অর্থাৎ রজোদর্শন দিন হইতে ৪।৬।৮ ১০।১২ দিনের দিন রাত্রিতে পত্নীতে উপগত হইবে। যদি কন্যাকামনা থাকে তাহা হইলে পঞ্চমী, সপ্তমী ও নবমী রাত্রিতে অর্থাৎ ৫।৭।৯ দিনের দিন রাত্রিতে গর্ভাধান করিবে। পর পর রাত্রিতে গর্ভাধান করিলে সন্তানের আয়ু আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য ও বল বর্দ্ধিত হয় এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাত্রিতে গর্ভাধানে সন্তানের আয়ু প্রভৃতি হ্রাস পায়। কৃত্রিম আর্ত্তব শোণিত তিন দিনে নিঃশেষরূপে স্রাব হয় মোটামুটী ইহা ধরিয়া লইয়াই গর্ভাধানের উপরি লিখিত রূপ কালনির্ণয় করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ক্ষেত্রবিশেষে অধিক দিন পর্য্যন্তও উহার স্রাব হইতে দেখা যায়। কৃত্রিম আর্ত্তব শোণিতের স্রাব বন্ধ না হইলে আবার অকৃত্রিম আর্ত্তব গর্ভাশয়ে সঞ্চিত হয় না। এই অকৃত্রিম আর্ত্তব সঞ্চয় না হইলে আবার প্রশস্ত গর্ভোৎপাদন সম্ভব নয়; সুতরাং দ্বাদশ রাত্রি অপেক্ষা গর্ভাধানের কাল বাড়িয়া যাইতেছে। এই জন্যই আচার্য্য উত্তর উত্তরকালে গর্ভাধানের প্রশস্ততা ও কেহ কেহ ১৬ দিন বা এক মাস পর্য্যন্ত ঋতু স্বীকার করিয়াছেন।

গর্ভাধানের বয়স—বিবাহ হইলেই স্ত্রীসহবাস বা স্ত্রীর রজোদর্শন হইলেই গর্ভোৎপাদন করা আয়ুর্ব্বেদের অভিমত নহে। আজকাল বিবাহের বয়স লইয়া অনেক বিচার বিতর্ক হইতেছে বটে কিন্তু গর্ভাধানের বয়সের কথা কয়জন ভাবিয়া থাকেন। এই সকল অপরিণামদর্শী সমাজ-হিত-চিন্তকের মতে বোধ হয় বিবাহ ও গর্ভাধানের কাল পৃথক্ রাখিবার প্রয়োজন নাই। অধুনা সমাজে এই পার্থক্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকায়, একদিকে অত্যন্ত বালার গর্ভাধান হওয়ায় সমাজে দুর্ব্বলেন্দ্রিয় অল্পায়ু সন্ততির সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে; অপর দিকে অধিক বয়স্কা স্বতন্ত্রমতি যুবতীর সহিত উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় গৃহস্থলীর চিরোপভুক্ত সুখশান্তি এবং সংসারের চিরাভ্যস্ত "ধরণ ধারাণ" অন্তর্হিত হইতেছে। এই সকল অনর্থ পরম্পরা চিন্তা করিয়া এদেশে পূর্ব্বে বিবাহ ও গর্ভাধানের কাল পৃথক্ নির্দিষ্ট হইয়াছিল। আয়ুর্ব্বেদ পুরুষের বিবাহের বয়স ২৫ বা ২১ বৎসর এবং নারীর ১২ বৎসর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নারীর ১২ বৎসরের ঊর্দ্ধে রজোদর্শন হইয়া থাকে ইহাও কথিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ বলিয়াছেন গর্ভাধানের সময় পুরুষের বয়স ২৫ বা ২৯ বৎসর এবং স্ত্রীর বয়স ১৬ বৎসর হওয়া উচিত। দম্পতির বয়স ইহার কম হইলে সন্ততি গর্ভেই মরিয়া যায়। যদি গর্ভে না মরে তাহা হইলে অল্পায়ু হইবে। যদি অল্পায়ু না হয় তাহা হইলে দুর্ব্বলেন্দ্রিয় হইয়া (অর্থাৎ অল্প বয়সে চক্ষুর দোষ, কর্ণের দোষাদি জন্মিয়া) কোন রূপে বাঁচিয়া থাকিবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, আয়ুর্ব্বেদের মতে বিবাহের তিন বৎসর পরে গর্ভাধানের কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদে রজোদর্শনের কাল স্পষ্ট লিখিত নাই—কেবল দ্বাদশ বর্ষের ঊর্দ্ধে বলা

হইয়াছে মাত্র, সুতরাং যদি রজোদর্শন ১৩ বৎসরে গণনা করা যায়, তাহা হইলে রজোদর্শনের ২ বৎসর পরে গর্ভাধানের কাল নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। ইহা নিতান্ত সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। শিশুর দন্তোদ্‌গম হইলেই যেমন তাহার কঠিন খাদ্য চর্ব্বণ করিয়া খাইবার শক্তি জন্মে না এবং চর্ব্ব্য খাদ্য যেমন তাহাকে খাইতে দেওয়াও হয় না, তদ্রূপ নারীগণের রজোদর্শন হইলেই তাহাদিগকে গর্ভাধানের যোগ্যা বিবেচনা করা কোন মতেই সঙ্গত নহে—কাল অপেক্ষা করিতে হয়। বিবাহের পরবর্ত্তী তিনটী বৎসর নারীগণ ভর্তৃগৃহে বা পিতৃগৃহে থাকিয়া গৃহস্থলীর উপযোগী বিবিধ জ্ঞান লাভ করিবে এবং যেসকল গুণ থাকিলে রমণীগণ গৃহলক্ষ্মী হইতে পারেন কন্যার অভিভাবকগণ যত্ন পূর্ব্বক তদ্রূপ শিক্ষা দিবেন। পৃথক্ বাস করিলেও নিতান্ত অন্তরঙ্গ আত্মীয়-জনের সহিত আমরা যেরূপ দেখাশুনা যাওয়া আসা করিয়া থাকি, বধূ তিনটী বৎসর স্বামী ও শ্বশুর কুলের গুরুজনের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিবেন। স্বামী এবং অন্যান্য গুরুজনের প্রকৃতি এবং অভ্যাস বুঝিয়া তদনুকূলে স্বীয় চরিত্র, আচার ব্যবহার গঠন করিবেন। যাঁহারা দ্বাদশবর্ষে কন্যার বিবাহ দিতে পারেন এবং যাঁহাদের পুত্রেরা ২২ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ করিতে পারেন তাঁহাদের পক্ষে তিন বৎসর কাল কন্যা বা বধূ সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম অবলম্বন করিতে হইবে; কিন্তু আজকাল কন্যার বিবাহে পূর্ব্বাপেক্ষা বহু প্রচুর অর্থের প্রয়োজন উপস্থিত হওয়ায়, ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ বর্ষের পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ দেওয়া অনেকের পক্ষেই দুর্ঘট হইয়া পড়িয়াছে। যদি ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ বর্ষে বিবাহ হয়, আর পূর্ব্বের সেই প্রথা—"বিবাহের পর বছর না ফিরিলে শ্বশুর বাড়ী যাইতে নাই" দৃঢ়ভাবে বলবৎ রাখিয়া, "ধূলাপায়ে দিনের" কুত্রাপি প্রশ্রয় না দেওয়া হয়, তাহা হইলেই অতি সহজে আয়ুর্ব্বেদোক্ত প্রশস্ত গর্ভাধানের কাল সর্ব্বথা অনুবর্ত্তিত হইতে পারে। আজকাল "ধূলাপায়ে দিন করার" প্রবল প্রচারের দিনে এসকল কথা লোকের কত রুচিকর হইবে জানিনা, কিন্তু যদি বীর্য্যবান্ দীর্ঘায়ু সন্ততি আমাদের প্রার্থয়িতব্য হয়, যদি এদেশের সেই চির-মধুর গৃহস্থলীর সুখশান্তি আবার ফিরিয়া পাইতে চাও, যদি সমাজকে সুপটু শিল্পী, রসজ্ঞ কবি, যথার্থ ধার্ম্মিক ও দেশহিতব্রত মহাপ্রাণ মানুষে অলঙ্কৃত দেখিতে চাও, তাহা হইলে বিবাহ ও গর্ভাধানের বয়সের পার্থক্য অবশ্য রক্ষা করিতে হইবে। দম্পতির প্রতি বক্তব্য এই—তোমরা সন্ততির মঙ্গলের অনুরোধে, সমাজের হিতের অনুরোধে, সকলের বড় ধর্ম্মের অনুরোধে, মনুষ্যত্বের অনুরোধে সামান্য ২।১ বৎসর সংযম অবলম্বন করিয়া, জাতীয় সমুন্নতির মূল এই মহাব্রত পালন করিবে। যদি না করিতে পার, যদি অসংযমে আত্মবিসর্জ্জন দাও, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে অন্নের জন্য বহু বিনষ্ট করিতে উদ্যত বিচারমূঢ় বলিব।

ঋতুকৃত্য—বলিষ্ঠ, দীর্ঘায়ু, সুসন্তান লাভ করিবার জন্য ঋতুকালে স্ত্রীকে যে সমস্ত নিয়ম পালন করিতে হয় তাহারই নাম ঋতুকৃত্য। আমরা ঋতুকৃত্যকে বিহারাচারগত ও আহারগত এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া লিখিব। প্রথমে বিহারাচারগত ঋতুকৃত্য লিখিত হইতেছে। ঋতুর প্রথম তিন দিন স্ত্রী ব্রহ্মচারিণীর মত থাকিবেন। এই সময়ে স্ত্রীর দিবানিদ্রায় পুত্র নিদ্রালু, অঞ্জনে অন্ধ, রোদনে

বিকৃত-দৃষ্টি, স্নান ও অনুলেপনে দুঃখশীল, তৈলমর্দ্দনে কুষ্ঠী, নখ কর্ত্তনে কুনখী, দৌড়িলে চঞ্চল, অধিক হাসিলে প্রলাপী, অধিক কথা কহিলে বা উচ্চ শব্দ করিলে বধির হয় সুতরাং রজঃস্বলা নারী এই সমস্ত বর্জ্জন এবং কুশাসনে শয়ন করিবেন। রজঃস্বলার আহার—বিশুদ্ধ গব্যঘৃত মিশ্রিত সূক্ষ্ম পুরাণ তণ্ডুলের অন্ন বিশুদ্ধ গব্য দুগ্ধ যোগে প্রতিদিন একবার মাত্র ভোজন করিবেন। এ অবস্থায় স্বামিদর্শন পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ।

গর্ভাধান কৃত্য—গর্ভোৎপাদন কালে স্ত্রী পুরুষের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপরি সন্তানের শারীরিক ও মানসিক ভাব সম্পূর্ণ নির্ভর করে; অতএব সন্ততির মঙ্গল কামনায় দম্পতিকে কেবল রিপুপরতন্ত্র হইয়া গর্ভাধান করিতে আয়ুর্ব্বেদ নিষেধ করিয়াছেন, এবং সুসন্ততি লাভ করিবার জন্য যে সকল নিয়ম পালন করিবার উপদেশ দিয়াছেন সেই গুলিকেই আমরা গর্ভাধান কৃত্য নামে অভিহিত করিয়াছি। পূর্ব্বে বলিয়াছি পুরাণ রজঃস্রাব বন্ধ না হইলে গর্ভাধানের প্রশস্ত কাল উপস্থিত হয় নাই জানিবে। সাধারণতঃ তৃতীয় দিনেই রজঃস্রাব বন্ধ হয় ধরিয়া লইলে চতুর্থ দিবস হইতেই গর্ভাধানের কাল বলা যাইতে পারে। চতুর্থ দিনে স্ত্রী স্নান করিয়া উত্তম বস্ত্র ও অলঙ্কার ধারণ পূর্ব্বক মঙ্গলানুষ্ঠান ও স্বস্তিবাচন করিয়া স্বামীকে দর্শন করিবেন, কারণ ঋতুস্নাতা নারী প্রথমে যেরূপ মনুষ্য দর্শন করেন তদ্রূপ পুত্র প্রসব করেন। গর্ভাধান কালে স্ত্রী অতিভুক্তা ক্ষুধিতা, পিপাসিতা, ভীতা, বিমনা, শোকার্ত্তা ক্রুদ্ধা, অন্য পুরুষকামা কিম্বা অতি মৈথুনাভিলাষিণী হইলে গর্ভোৎপত্তি হয় না—হইলেও সুসন্তান জন্মে না। মনোজ্ঞ হিতকর বস্তু ভোজন করিয়া, গর্ভাধান কালে দম্পতি শুক্ল বস্ত্র পরিধান করিবেন, সুগন্ধি পুষ্পমাল্য ধারণ করিবেন এবং প্রফুল্ল ও উদার ভাবে সুগন্ধি সুখকর শয্যায় শয়ন করিবেন। শুক্র, আর্ত্তব ও গর্ভাশয় সম্যক্ বিশুদ্ধ থাকিলে গর্ভাধান নিশ্চয় সফল হইয়া থাকে এবং বলিষ্ঠ দীর্ঘায়ু সুসন্ততি লাভ হয়।

যদি বিশিষ্ট অপত্যলাভের অভিলাষ থাকে তাহা হইলে দম্পতি একমাস ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবেন। মৈথুনাদির চিন্তা ও করিবেন না। রজোদর্শন হইতে চতুর্থ দিবসে "পুত্রীয় বিধান" (যজ্ঞ বিশেষ) যোগ্য উপাধ্যায় দ্বারা নির্ব্বাহ করাইবেন। রজোদর্শন দিবস হইতে যত বিলম্ব করিয়া পারেন গর্ভাধারণের রাত্রি নির্দ্ধারণ করিবেন। ঐ দিন অপরাহ্নে পুরুষ, দুগ্ধ ও গব্যঘৃত সহ শালি তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিবেন। স্ত্রী, যাহা ভোজন করিবেন তন্মধ্যে তিলতৈল এবং মাষ কলায় প্রধানভাবে থাকিবে। ইহাই সুশ্রুতের মত। চরকের মত এই—স্ত্রী যদি উন্নত কায়, গৌরবর্ণ, সিংহতুল্য তেজস্বী, শুচি ও সত্ত্ববান্ পুত্র ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে চতুর্থ দিবসে শুদ্ধস্নানের পর পুরাণ যবের মিহি ছাতু মধু ও গব্যঘৃত মিশাইয়া শ্বেতবৎসা শ্বেতবর্ণ গাভির দুগ্ধে তরল করিয়া কাংস্য বা রজত পাত্রে সময়ে সময়ে সপ্তাহ পর্য্যন্ত পান করিবেন। প্রাতে প্রতিদিন একবার মাত্র শালিতণ্ডুলের অন্ন কিম্বা যবের অন্ন, দধি, মধু, ঘৃত যোগে কিম্বা গব্যদুগ্ধ যোগে ভোজন করিবেন। পরিষ্কৃত গৃহে পরিষ্কৃত শয্যায় শয়ন করিবেন। উত্তম আসন, উত্তম যান, উত্তম বসন, উত্তম ভূষণ ও উত্তম বেশ ধারণ করিবেন প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে বৃহৎ শ্বেতবর্ণ বৃষ ও পীতচন্দন-চর্চ্চিত শ্রেষ্ঠ

জাতীয় অশ্ব দর্শন করিবেন। স্ত্রীকে মনোনুকূল মধুর বাক্যে সন্তুষ্ট রাখিবে। যে স্ত্রী ও পুরুষের আকৃতি সৌম্য, বচন সৌম্য, আচার সৌম্য এবং কর্ম্ম সৌম্য তাহাদিগকে এবং যে রূপ দর্শনে চক্ষু তৃপ্ত হয় যে শব্দ শ্রবণে কর্ণ সুখী হয় এমন দৃশ্য দর্শন ও শব্দ শ্রবণ করাইবে। সেবানুকূল অনুরক্ত সহচরীগণ সেবা করিবে। কিন্তু স্বামীর সহিত মিলিত হইবে না। রজোদর্শনের চতুর্থ রাত্রি হইতে সপ্ত রাত্রি পর্য্যন্ত উপরি লিখিত নিয়ম পালন করিয়া পুত্রাকাঙ্ক্ষিণী স্ত্রী যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক স্বামীর সহিত অগ্নিকে পশ্চিম দিকেও ব্রাহ্মণকে দক্ষিণ দিকে রাখিয়া উপবেশন পূর্ব্বক পুত্রকামনা করিবেন। ব্রাহ্মণ পুত্রকাম্য যজ্ঞ করিবেন, যজ্ঞান্তে হোমের অবশিষ্ট ঘৃত প্রথমে স্বামী পরে স্ত্রী পান করিবেন। অনন্তর অষ্ট রাত্রি পূর্ব্বকথিত পরিচ্ছদাদি ধারণ পূর্ব্বক স্ত্রীসহবাস করিলে অভিলষিত পুত্র লাভ হয়।

সন্ততির বর্ণ যেরূপ ইচ্ছা করিবেন দম্পতির পরিধেয় এবং বৃষের বর্ণ ও তদ্রূপ হওয়া উচিত। অতঃপর সংক্ষেপতঃ উপদেশ এই যে,—স্ত্রী যেরূপ সন্ততি ইচ্ছা করিবেন, ব্রাহ্মণের নিকট হইতে সেইরূপ আশীর্ব্বাদ শ্রবণ করিবেন, সেই সেই জনপদের আহার ও পরিচ্ছদ চিন্তা করিবেন।

আয়ুর্ব্বেদ কি Empirical?

প্রবন্ধের নামে ইংরাজি শব্দের ব্যবহার দেখিয়া পাঠক মহাশয় রাগ করিবেন না। যাঁহাদিগের জন্য বিশেষতঃ এই প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে তাঁহারা ঐ ইংরাজি শব্দটাই ব্যবহার করেন এবং ঐ শব্দের বঙ্গানুবাদ অপেক্ষা মূল ইংরাজি শব্দটাই তাঁহাদিগের বুঝিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলিয়া আমরাও বাধ্য হইয়া ইংরাজি শব্দই ব্যবহার করিলাম। আয়ুর্ব্বেদ কি Empirical বলিলে এই বুঝা যায় যে,—আয়ুর্ব্বেদে রোগ কি? কেন হয়? কিরূপে হয়? কিরূপেই চিনিতে পারা যায়? ইত্যাদি রোগ সম্বন্ধীয় তত্ত্ব নাই। দ্রব্যের গুণ কি? শরীরের উপরি দ্রব্যের ক্রিয়া কি? দ্রব্য কিরূপেই রোগ প্রশমিত করে? ইত্যাদি চিকিৎসা বিষয়ক তত্ত্ব ও আয়ুর্ব্বেদে নাই। অর্থাৎ যাহারা আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসা করে তাহারা রোগও চিনে না ঔষধের গুণও জানে না। কেবল মূঢ়ের মত এইটুকু জানে যে এই ঔষধে এই রোগ ভাল হয়। দীর্ঘকাল এইরূপ না জানিয়া শুনিয়া বুক ঠুকিয়া ঔষধ দিতে দিতে যদৃচ্ছাক্রমে কতকগুলি রোগ আরাম করিয়া রোগ ও ঔষধ সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে তাহাই আয়ুর্ব্বেদ। আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে কোন কোন লোকের বা কোন কোন সম্প্রদায়ের এই রূপ ধারণা শুনিয়া পাঠক বিস্মিত হইবেন না। এমনই যুগধর্ম্ম যে, অধুনা অজ্ঞ বা অর্দ্ধ শিক্ষিত লোকের ত কথাই নাই সুশিক্ষিত বলিয়া যাঁহাদিগের খ্যাতি আছে তাঁহাদের অনেকের ও অভ্যাস এই যে, যে কোন বিষয়ে রায় প্রকাশ করিতে তাঁহাদের কিছু মাত্র কুণ্ঠতা নাই। যে বিষয়ে তাঁহারা কিছু মাত্র অধিকার নাই যে বিষয়ে তাঁহাদের কিছু মাত্র জ্ঞান নাই সে বিষয়েও পরের মুখে ঝাল খাইয়া তাঁহারা নিজ মত প্রকাশ করিতে কিছু মাত্র

দ্বিধা বোধ করেন না। এখন আর অধিকারী অনধিকারী বিচার নাই—সকলেই মনে করেন আমার সকল বিষয়েই অধিকার আছে। সাধারণ লোকও তেমনি—কে বলিতেছে, যিনি বলিতেছেন তাঁহার এ বিষয়ের জ্ঞান কিরূপ, তাঁহার কথা বিশ্বাস যোগ্য কিনা, বিবেচনা না করিয়া,শ্রুত কথার তাৎপর্য্য সত্যাসত্য নির্ণয় না করিয়া "গন্ধর্ব্বসেন মরগয়া" শুনিয়াই কাঁদিয়া আকুল! গন্ধর্ব্বসেন যে ধোবার গাধা—মানুষ নহে, ইহাও ক্রন্দনকারীদের জানা নাই। শ্রোতাদিগের ত এই অবস্থা। যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ Empirical বলিয়া প্রচার করেন তাঁহাদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় মহাশয় আপনি কি আয়ুর্ব্বেদ পড়িয়াছেন? তাহা হইলে নিশ্চয় শুনিতে পাইবেন যে তিনি স্বয়ং মূলগ্রন্থ পড়েন নাই কিন্তু কোন ইংরাজি পুস্তকে ইংরাজের লেখা আয়ুর্ব্বেদ বিষয়ক কোন প্রবন্ধ পড়িয়া বা কোন একখানি আয়ুর্ব্বেদীয় সংগ্রহ পুস্তকের বঙ্গানুবাদ আবৃত্তি করিয়া কিম্বা কোন কবিরাজের সহিত আলাপ করিয়াই নিজে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে আয়ুর্ব্বেদ Empirical. উপরি লিখিত প্রবন্ধ লেখক ইংরাজ, আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহের বঙ্গানুবাদ কিম্বা কবিরাজ বিশেষের সহিত আলাপ, যদি তাঁহার নিকট আয়ুর্ব্বেদের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করিতে না পারিয়া থাকে, তাহা হইলে সেটা কি আয়ুর্ব্বেদের দোষ? পেচক যে দিনে দেখিতে পায় না তার জন্য কি সূর্য্য দায়ী? বসন্তকালে বৃক্ষ বিশেষের পত্র না থাকিলে সেটা কি বসন্তকালের দোষ? একথাটা তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত। যে সমাজে শিক্ষিতাভিমানিগণেরও এই অবস্থা সে সমাজের যে নিতান্ত দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে ইহা বলাই বাহুল্য। যে চিকিৎসাশাস্ত্র—আয়ুর্ব্বেদ এতদিন তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে একটা অপবাদ রটাইবার পূর্ব্বে—একবার সেই শাস্ত্রটা নিজে নাড়িয়া চাড়িয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত ছিল না কি? দেখিলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সহিত নিজেদের বুদ্ধিমান্ বলিয়া আত্ম প্রকাশের দাবিটাও বজায় থাকিত। আয়ুর্ব্বেদ পরীক্ষা করিয়া দেখাও যে সোজা ব্যাপার নয়; আয়ুর্ব্বেদ যে ভাষায় কথা বলেন অনেকের সেই ভাবাই জানা নাই; সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও শিক্ষাদোষে তাঁহারা পরীক্ষা করিতে পারিছেন না। না পারিয়া নির্ব্বাক্ থাকাই উচিত ছিল। না বুঝিয়া অপবাদ রটনা করিলে আয়ুর্ব্বেদের কোনই ক্ষতি নাই। মণি যদি কর্দ্দমে পতিত থাকে তাহাতে মণির লজ্জা কি? সুগন্ধি পুষ্প যদি বনে ফুটিয়া বনেই মলিন হয় তাহাতে পুষ্পের ক্ষতি কি? তবে যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ লইয়া ব্যবহার করেন তাঁহাদিগের মনোবেদনা জন্মিতে পারে। যাঁহাদের আয়ুর্ব্বেদের স্বরূপ বুঝিবার আকাঙ্ক্ষা আছে অথচ শক্তি নাই, তাঁহাদিগের জন্যই আমরা এই শ্রমস্বীকার করিয়াছি। যাঁহারা চিরদিনই "পর-প্রত্যয়নেয় বুদ্ধি" বা যাঁহারা পরের জিনিষকে মন্দ ভাবে দেখিতেই চিরাভ্যস্ত তাঁহাদিগকে দূর হইতে নমস্কার করিয়া নিবেদন করিয়াছি আমাদের এই শ্রমস্বীকার তাঁহাদের জন্য নহে। সর্ব্বাগ্রে একটা কথা বলিয়া রাখি। পৃথিবীর যাবতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের উদ্দেশ্য এক হইলেও উহাদের প্রস্থান ভিন্ন ভিন্ন। ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সেই সেই চিকিৎসাশাস্ত্র বুঝিতে হইবে। আমি যে চিকিৎসা শাস্ত্রে জানি, জগতের যাবতীয়

চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রস্থান যে ঠিক তাহার মতই হইবে এরূপ আশা করা বাতুলতা, কিম্বা চিকিৎসাশাস্ত্র বিশেষকে তুলাদণ্ড করিয়া অন্যান্য চিকিৎসা শাস্ত্রের লঘুত্ব প্রমাণ করিতে যাওয়াও বিষম নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয়। আমিই অখণ্ড সত্য আয়ত্ত করিয়াছি আর কাহারও নিকট সত্য প্রকাশ পাইতে পারে না এইরূপ সিদ্ধান্ত, মানসিক স্বাস্থ্যের পরিচায়ক নহে। আয়ুর্ব্বেদ বুঝিতে হইলে, আয়ুর্ব্বেদের প্রস্থান, আয়ুর্ব্বেদের প্রাণালী অনুসরণ করিয়া বুঝিতে হইবে। নিজের নিজের মাপকাটী দিয়া মাপিলে সত্য নির্ণয় হইবে না।

রোগতত্ত্ব বিষয়ে আয়ুর্ব্বেদ কি বলিয়াছেন অগ্রে তাহাই বলিব। রোগতত্ত্ব বুঝিতে হইলে এই কএকটী বিষয় জানিতে হয়—(১) রোগ কি? (২) রোগ কত প্রকার? (৩) রোগের কারণ কি ও কত প্রকার? (৪) কিরূপে রোগজন্মে অর্থাৎ রোগের সম্প্রাপ্তি কি? (৫) রোগ চিনিবার উপায় অর্থাৎ রোগের পরীক্ষা ও লক্ষণ (৬) রোগের উপসর্গ (৭) রোগের অসাধ্য লক্ষণ। এক্ষণে আমরা রোগতত্ত্বকে উপরি লিখিত ৭ ভাগে বিভক্ত করিয়া আয়ুর্ব্বেদের মত ব্যাখ্যা করিব।

রোগ কি? চরক বলিয়াছেন 'বিকারো ধাতুবৈষম্যম্ সাম্যম্ প্রকৃতি রুচ্যতে"—ধাতুর সমতা স্বাস্থ্য, ধাতুর বিষমতা রোগ। ধাতু কি? যাহারা শরীর-রক্ষণোচিত কর্ম্ম করিয়া শরীর ধারণ করে তাহারা ধাতু। উহারা কে? বায়ু, পিত্ত ও কফ। এই বায়ু পিত্ত, কফের কার্য্য অনুসারে দুইটী নাম আছে—ধাতু ও দোষ। বায়ু, পিত্ত, কফ প্রকৃতিস্থ থাকিয়া অর্থাৎ নিজ পরিমাণে নিজ স্থানে এবং নিজ প্রকৃতিতে থাকিয়া শরীরের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকিলে অর্থাৎ সমভাবে থাকিলে ইহাদিগকে ধাতু বলে। এই ধাতু সাম্যই স্বাস্থ্য। আর ইহারা স্ব স্ব পরিমাণে বৃদ্ধি বা ক্ষয় প্রাপ্তি হইলে, নিজের স্থান হইতে বিচ্যুত হইলে এবং নিজ নিজ প্রকৃতি ত্যাগ করিয়া বিকৃতি প্রাপ্ত হইলে ইহারা দোষ নামে অভিহিত হয়, ইহাই ধাতু বৈষম্য বা রোগ। স্বাস্থ্য প্রকৃতি হইলে রোগ বিকৃতি, রোগ স্বাস্থ্যের বিকৃত অবস্থা সুতরাং রোগ বুঝিতে গেলে স্বাস্থ্য কি বুঝিতে হয়। এই ধাতু বৈষম্য-রূপ রোগের লক্ষণটী অতি সূক্ষ্ম। এই হিসারে বিচার করিতে গেলে সুস্থ লোক প্রায় পাওয়া যায় না। ধাতু-বৈষম্য এই নাম ভিন্ন, রোগ বলিয়া এই অবস্থার শাস্ত্রে আর কোন নাম নাই। এই আদ্য ধাতুবৈষম্য অতি অল্প বলিয়া ইহার কোন চিকিৎসাও নাই। এই অবস্থাকে ব্যবহারিক রোগ বলিয়া গণনা করা হয় নাই, উপেক্ষা করা হইয়াছে। কেবল চরকে নহে সুশ্রুতে ও রোগের এই সূক্ষ্ম অবস্থার লক্ষণ দেখিতে পাই। সুশ্রুত বলিয়াছেন "তদ্দুঃখসংযোগা ব্যাধয় ইত্যুচ্যন্তে" (সূত্রস্থান ১ম অধ্যায়) ইহার স্থূল অর্থ এই—পুরুষে (প্রাণীর) দুঃখ-সংযোগই রোগ। আরোগ্য সুখ—রোগ দুঃখ। আমরা উপরে যে ধাতু বৈষম্যের কথা বলিয়াছি, যখনই সেই ধাতু-বৈষম্য জন্মে তখন অবশ্যই দুঃখোৎপাদন হইয়া থাকে, এই দুঃখোৎপত্তিই রোগ। আদ্য ধাতু বৈষম্যের যেমন রোগ বলিয়া বিশেষ কোন নাম নাই—এই দুঃখ-সংজ্ঞক রোগেরও শাস্ত্রে তদ্রূপ কোন নাম নাই। রোগের সূক্ষ্ম অবস্থার কথা বলা হইল এক্ষণ শাস্ত্রে ব্যবহারতঃ যাহাকে রোগ বলা হইয়াছে—যেমন জ্বর, অতিসার প্রভৃতি তাহার লক্ষণ বলিতেছি। এই ব্যবহারিক

জ্বর অতিসার প্রভৃতি রোগের অনেক প্রকার ভেদ আছে এবং এই সকল রোগ-ভেদের লক্ষণ রোগবিনিশ্চয় গ্রন্থে (নিদানে) বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। আমরা এস্থলে কেবল ব্যাধিজাতির দুই একটি লক্ষণ বলিতেছি। জ্বরজাতীয় রোগের লক্ষণ,—শরীরের এবং মনের সন্তাপ - যে কোন জ্বরই হউক না কেন উহা সন্তাপ-লক্ষণ হইবেই; এইরূপ মলমার্গ দ্বারা দ্রব বস্ত নিঃসরণ, অতিসার জাতীয় রোগের লক্ষণ, সমস্ত অতিসারেই এই লক্ষণ বিদ্যমান থাকিবে। প্রকুপিত বাতাদি যাবতীয় রোগের জনক।

(২) রোগ কত প্রকার?—দুঃখসংযোগই ব্যাধি একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক ভেদে দুঃখ তিন প্রকার। আধ্যাত্মিক দুঃখ কি? এখানে আত্মা শব্দে শরীর এবং দুঃখ শব্দে দুঃখের (রোগের) কারণ কুপিত বায়ু, পিত্ত, কফ অর্থাৎ দোষকৃত শারীর দুঃখ—জ্বরাদি এবং মানস দুঃখ কামাদি বিকারই আধ্যাত্মিক দুঃখ। আধিভৌতিক দুঃখ কি? এখানে ভূত শব্দে বাহ্য বায়ু, অগ্নি, জল, ক্ষিতি প্রভৃতি, ইহাদের দ্বারা যে দুঃখ জন্মে তাহাই আধিভৌতিক এবং দেবাসুর কর্ত্তৃক যে দুঃখ জন্মে তাহা আধিদৈবিক দুঃখ। এই ত্রিবিধ দুঃখ সাত প্রকার ব্যাধিরূপে প্রাণিদিগকে ক্লেশ দিয়া থাকে। সাত প্রকার ব্যাধি এই—(১) আদিবল-প্রবৃত্ত (২) জন্মবল-প্রবৃত্ত (৩) দোষবল-প্রবৃত্ত (৪) সঙ্ঘাতবল-প্রবৃত্ত (৫) কালবল-প্রবৃত্ত (৬) দৈববল-প্রবৃত্ত (৭) স্বভাববল-প্রবৃত্ত। আদিবল-প্রবৃত্ত রোগ কাহাকে বলে?—পিতার দূষিত শুক্র এবং মাতার দুষ্ট আর্ত্তবশোণিত জন্য সন্তানের যে কুষ্ঠ, অর্শ, মধুমেহ ও ক্ষয়াদি রোগ জন্মে সেইগুলি আদিবল-প্রবৃত্ত রোগ। আদিবল-প্রবৃত্ত রোগ দুই প্রকার—মাতৃজ ও পিতৃজ। যে রোগ কেবল দূষিত আর্ত্তবশোণিত জন্য তাহা মাতৃজ এবং যাহা কেবল দুষ্ট শুক্র হইতে জন্মে তাহা পিতৃজ বলিয়া জানিবে। (২) জন্মবল-প্রবৃত্ত রোগ কি? গর্ভাবস্থায় চতুর্থ মাস হইতে গর্ভবতী নারীর কোন বিশেষ বস্ত ভক্ষণে, কোন বিহারে বা কোন দ্রব্যাদি দর্শনে যে আকাঙ্ক্ষা জন্মে তাহার নাম দৌহৃদ অর্থাৎ সাধ। গর্ভিণীর এই সাধ পূরণ করা উচিত। না করিলে দৌহৃদের অবমাননা হেতু গর্ভস্থিত শিশু বোবা, খোণা বা বামন হইতে পারে। এইগুলি জন্মবল-প্রবৃত্ত রোগ। তারপর গর্ভাবস্থায় প্রসূতির যেরূপ আহার. আচার পালন করিবার বিধি শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, প্রসূতি যদি সেইগুলি পালন না করে তাহা হইলে গর্ভস্থিত শিশুর যে অপরাপর রোগ জন্মিয়া থাকে সেগুলিও জন্মবলপ্রবৃত্ত ব্যাধির অন্তর্গত জানিবে। (৩) দোষবল-প্রবৃত্ত ব্যাধি কি?—জন্ম প্রকৃতিভূত দোষজাত জ্বরাদি এবং রোগ হইতে জাত রোগকে (যেমন জ্বরসন্তাপ হইতে রক্তপিত্ত, রক্তপিত্ত হইতে কাস ইত্যাদি) দোষবল-প্রবৃত্ত ব্যাধি বলে। ইহা দুই প্রকার—আমাশয়-সমুত্থ ও পক্কাশয়-সমুত্থ। কুপিত কফপিত্ত হইতে যে সকল রোগ নাভির উপরিভাগে জন্মিয়া থাকে তাহাদের নাম আমাশয়-সমুত্থ এবং কুপিত বায়ু জন্য যে সকল রোগ নাভির অধোভাগে জন্মিয়া থাকে তাহাদিগকে পক্কাশয়-সমুত্থ রোগ বলে। দোষবল-প্রবৃত্ত ব্যাধি আবার শারীর ও মানস ভেদে দ্বিবিধ। কুপিত বায়ু পিত্ত কফ যে সকল রোগের কারণ এবং যেগুলি শরীর আশ্রয় করিয়া

ন্মে সেইগুলি শারীর রোগ এবং যেগুলি রজঃ ও তমঃ হইতে জন্মে এবং যে সকল রোগ প্রথমে মন আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায় সেগুলি মানস রোগ। আদিবল, জন্মবল ও দোষবল-প্রবৃত্ত এই তিন প্রকার ব্যাধি আধ্যাত্মিকব্যাধি নামে জ্ঞাত। (৪)সঙ্ঘাতবলপ্রবৃত্ত রোগ কি?—দুর্ব্বল ব্যক্তি বলশালী লোকের সহিত লড়িলে বা পাল্লা দিয়া কোন কাজ করিলে, পর্ব্বত, বৃক্ষাদি হইতে পতিত হইলে যে সকল আগন্তু রোগ জন্মিয়া থাকে সেই সকল ব্যাধিকে সঙ্ঘাত-বলপ্রবৃত্ত রোগ বলে। ইহা দুই প্রকার—শস্ত্রকৃত ও ব্যাল অর্থাৎ হিংস্রজন্তু কৃত। সঙ্ঘাত-বলপ্রবৃত্ত রোগের অপর নাম আধিভৌতিক দুঃখ। (৫) কালবলপ্রবৃত্ত রোগ কি?—শীত, উষ্ণ, বায়ু, বর্ষাদি হইতে যে সকল রোগ জন্মে তাহাদিগকে কালবলপ্রবৃত্ত রোগ বলে। এই কালবলপ্রবৃত্ত রোগ দুই প্রকার—ব্যাপন্ন ঋতুকৃত ও অব্যাপন্ন ঋতুকৃত। যে ঋতুতে বায়ু, জল, ভূমি প্রভৃতির যেরূপভাব হওয়া উচিত তাহা না হইলে সেই ঋতুকে ব্যাপন্ন ঋতু বলে—যেমন বর্ষাকালে যদি উপযুক্ত বর্ষণ না হয় গ্রীষ্মকালে যদি শীত হয়, তাহা হইলে ব্যাপন্ন ঋতু বলিতে হইবে। এই ব্যাপন্ন ঋতু যে বিবিধ রোগ জন্মায় সেইগুলিকে ব্যাপন্ন ঋতু-কৃত কালবলপ্রবৃত্ত রোগ, আর যদি ঋতু ব্যাপন্ন না হয় তাহা হইলে কেবল কালধর্ম্মেও ঋতু বিশেষে এক একটী দোষ (বায়ু বা পিত্ত কিম্বা কফ) কুপিত হইয়া থাকে। মানুষ বেশ নিয়ম পালন করিয়া থাকিলেও কাল-ধর্ম্মেই বায়ু, পিত্ত বা কফের সঞ্চয় ও প্রকোপ হইয়া রোগ জন্মাইতে পারে, ইহাই অব্যাপন্ন ঋতুকৃত কালবলপ্রবৃত্ত রোগ। এখানে প্রসঙ্গ-ক্রমে আর একটী কথা বলিতে হইতেছে। শীত, গ্রীষ্ম বা বর্ষায় কেবল কালধর্ম্মে কিরূপে রোগ জন্মে এবং তাহার প্রতীকার কি? আয়ুর্ব্বেদে অতি বিশদভাবে এই তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। আমরা অতি সংক্ষেপে কেবল বিষয়টী মোটামুটি বুঝাইবার জন্য কিছু লিখি-তেছি। জিজ্ঞাসু পাঠক মূলগ্রন্থ পাঠ করিলে পুরস্কৃত ভিন্ন বঞ্চিত হইবেন না। এক ঋতুতে কিরূপে দোষের সঞ্চয় হয় এবং পরবর্ত্তী ঋতুতে কিরূপেই বা উহার প্রকোপ হইয়া ব্যাধি জন্মায় তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি—বর্ষাকালে দ্রব্যগুলি তরুণ এবং অল্প বীর্য্যসম্পন্ন হয়, জল ঘোলা এবং বিবিধ মলিন বস্তু সংযুক্ত হইয়া পড়ে। এই সময় আকাশ সর্ব্বদা মেঘাচ্ছন্ন ও ভূমি আর্দ্র এবং কর্দ্দমপূর্ণ হইয়া থাকে। ঐরূপ দ্রব্য আহার করিয়া, ঐরূপ ভূমিতে বাস করিয়া মানব শরীরও ক্লিন্ন ভাবাপন্ন হয়। বর্ষাকালীন শৈত্যে বায়ু কুপিত হইয়া অগ্নি মন্দ করে। একেই জল ও খাদ্য ঋতুধর্ম্মে দুষ্ট হয়, তাহার উপর আবার অগ্নির বল কম হওয়ায় আহা-রের বিদাহপাক জন্মে। এই বিদাহপাক হেতু পিত্ত সঞ্চিত হইয়া থাকে। বর্ষার পর শরৎকাল আসিলে আকাশ পরিষ্কার হয়—পথ শুষ্ক হয় এবং সূর্য্য মেঘ-নির্ম্মুক্ত হইয়া তীক্ষ্ণ কিরণ দান করেন। এই তীক্ষ্ণ সূর্য্য-কিরণে প্রাণিদেহে বর্ষা-সঞ্চিত পিত্ত দ্রবীভূত হইয়া কুপিত হয় এবং শরৎকালে পিত্ত জন্য রোগ জন্মায়। শরতের পর হেমন্ত আসিলে বর্ষার অল্পবীর্য্য তরুণ দ্রব্য পরিণত বীর্য্য ও বলবান্ হয় বর্ষার ঘোলা জল পরিষ্কার হয়—এইরূপ খাদ্য এবং পানীয় জল সেবন করিয়া শরীরে স্নিগ্ধ, শীতল এবং উপলেপ গুণের আধিক্য জন্মে। এদিকে শীতকালে সূর্য্য কিরণের তীক্ষ্ণতা কমিয়া আসে এবং শীতল

বায়ুর সম্পর্কে শরীর স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। সুতরাং শ্লেষ্মার সঞ্চার হয়। হেমন্তের পর বসন্ত আসিলে আবার গরম পড়িতে আরম্ভ হয় এবং সূর্য্যকিরণ প্রখর হইতে থাকে। এই সময়ে হেমন্তের সঞ্চিত কফ বিগলিত হইয়া কুপিত হয় এবং কফ জন্য রোগ জন্মাইয়া থাকে। বসন্তের পর গ্রীষ্ম আসিলে মানুষের খাদ্য ও পানীয় জল নিঃসার, রুক্ষ এবং অতিশয় লঘু-গুণান্বিত হইয়া থাকে। এইরূপ খাদ্য ও পানীয় সেবন করিয়া শরীরের রুক্ষতা, লঘুতা ও বৈশদ্য জন্মে। সুতরাং বায়ু সঞ্চিত হইয়া থাকে এবং এই সঞ্চিত বায়ু বর্ষার শৈত্যে প্রকুপিত হইয়া রোগোৎপাদন করে। যদি গ্রীষ্মের সঞ্চিত বায়ু বর্ষায়, বর্ষার সঞ্চিত পিত্ত শরতে, হেমন্তের সঞ্চিত শ্লেষ্মা বসন্তে নির্হরণ অর্থাৎ বাহির করিয়া দিবার ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে উহারা আর কালবল-প্রবৃত্ত রোগ জন্মাইতে পারে না। আয়ুর্ব্বেদে যে "ঋতুচর্য্যা" কথিত হইয়াছে এই ঋতু-কৃত দোষের নির্হরণই তাহার উদ্দেশ্য। যদি নির্হরণ না করা যায় অর্থাৎ মানুষকৃত চেষ্টা যদি নাই হয় তাহা হইলেও প্রকৃতি কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকেন না। কালধর্ম্মে বর্ষা ঋতুতে সঞ্চিত পিত্ত যেমন শরৎকালে কুপিত হয় তেমনিই আবার ঐ কুপিত পিত্ত হেমন্ত ঋতুতে স্বয়ংই প্রশমিত হয়। কালধর্ম্মে হেমন্তে যে শ্লেষ্মার সঞ্চয় এবং বসন্তে যাহার প্রকোপ হয়, সেই কুপিত শ্লেষ্মা গ্রীষ্মকালে স্বয়ং প্রশমিত হয়। নিদাঘে কালধর্ম্মে যে বায়ু সঞ্চিত এবং বর্ষার প্রকুপিত হয় সেই বায়ু আবার শরৎ ঋতুতে স্বয়ং প্রশমিত হয়। বৎসরের ঋতুবিশেষে যেমন দোষের সঞ্চয়, প্রকোপ ও প্রশম ঘটিতেছে দিবারাত্রির মধ্যে ও ঠিক সেইরূপ ঘটিয়া থাকে। দিবসের পূর্ব্বাহ্ণে বসন্ত-লক্ষণ অর্থাৎ কফ প্রকোপ, মধ্যাহ্নে গ্রীষ্ম-লক্ষণ অর্থাৎ শ্লেষ্মক্ষয়, অপরাহ্নে প্রাবৃট্-লক্ষণ অর্থাৎ বায়ু প্রকোপ জানিবে। এইরূপ রাত্রির প্রথম ভাগে অর্থাৎ সন্ধ্যায় বর্ষা-লক্ষণ অর্থাৎ পিত্তসঞ্চয়, অর্দ্ধরাত্রে শরৎ-লক্ষণ অর্থাৎ পিত্তকোপ এবং প্রত্যূষে হেমন্ত-লক্ষণ অর্থাৎ কফ সঞ্চয় জানিবে। সম্বৎসরে এবং অহোরাত্রে কিরূপে দোষের সঞ্চয়,প্রকোপ এবং প্রশম হয় তাহা সংক্ষেপে কথিত হইল। এক্ষণে আমরা প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসরণ করিব। (৬) দৈববল-প্রবৃত্ত রোগ কি?—যে সকল রোগ, অথর্ব্ববেদ বিহিত মারণাদি-কারক মন্ত্র, বিদ্যুৎ, বজ্র, পিশাচ ও ঔপসর্গিক রোগিসংসর্গ হেতু জন্মে সেই গুলি দৈববল-প্রবৃত্ত ব্যাধি। (৭) স্বভাববল-প্রবৃত্ত রোগ কি? ক্ষুৎ, পিপাসা, জরা, মৃত্যু, নিদ্রা প্রভৃতিকে স্বভাববল-প্রবৃত্ত রোগ বলে। কালকৃত ও অকালকৃত ভেদে ইহারা দ্বিবিধ। উচিত-কালে জরা, মৃত্যু ঘটিলে কালকৃত এবং তৎ-পূর্ব্বে ঘটিলে অকালকৃত বলে। এক্ষণে সাত প্রকার রোগের ব্যাখ্যা করা হইল। অতঃপর আমরা রোগের কারণ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদে কি আছে তাহাই অনুসন্ধান করিব।

রোগের কারণ কি ও কত প্রকার? চরক বলিয়াছেন—

"কালবুদ্ধীন্দ্রিয়ার্থানাং যোগো মিথ্যা নচাতি চ।
দ্বয়াশ্রয়ানাং ব্যাধীনাং ত্রিবিধো হেতুসংগ্রহঃ॥"

(সূত্রস্থান ১ম অধ্যায়)

ইন্দ্রিয়ার্থ শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়ের বিষয় অর্থাৎ যে ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা গৃহীত হয় তাহাই সেই ইন্দ্রিয়ের বিষয়। চক্ষুর বিষয় রূপ, কর্ণের বিষয় শব্দ, জিহ্বার বিষয় রস, নাসিকার বিষয় গন্ধ এবং ত্বকের বিষয় স্পর্শ। কাল, বুদ্ধি

এবং ইন্দ্রিয়ার্থের মিথ্যাযোগ, অযোগ এবং অতিযোগ যাবতীয় শারীর ও মানস ব্যাধির কারণ। ইহাই উপরি উদ্ধৃত হেতু-সূত্রের স্থূলার্থ। এক্ষণে আমরা কাল, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ার্থের মিথ্যাযোগ, অযোগ ও অতিযোগ কি তাহাই ব্যাখ্যা করিব।

কালের মিথ্যাযোগ অযোগ ও অতিযোগ—গ্রীষ্মকালে অতিগ্রীষ্ম, বর্ষাকালে অতিবৃষ্টি ও শীতকালে অতিমাত্র শীত হইলে কালের অতিযোগ হয়। গ্রীষ্মকালে ভাল গ্রীষ্ম পড়িলনা, বর্ষাকালে ভালবৃষ্টি হইলনা বা শীতকালে বেশ শীত পড়িলনা, ইহাই কালের অযোগ। আর গ্রীষ্মকালে গ্রীষ্মের পরিবর্ত্তে যদি শীত হয়। বর্ষাকালে বর্ষার পরিবর্ত্তে যদি গ্রীষ্ম হয় তাহা হইলে কালের মিথ্যাযোগ হইয়া থাকে।

মিথ্যাযোগ, অযোগ ও অতিযোগ স্বরূপ রোগের ত্রিবিধ কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া সর্ব্বাগ্রে কালের উল্লেখ করা হইল কেন? দুষ্পরিহর বলিয়া অগ্রে কালের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রজ্ঞাপরাধ ও ইন্দ্রিয়ার্থের মিথ্যাযোগ, অযোগ, অতিযোগ আমি যত্ন লইলে পরিহার করিতে পারি কিন্তু কালের মিথ্যাযোগ, অযোগ অতিযোগ আমি বর্জ্জন করিতে পারি না। সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া বর্ষাকালে যদি বৃষ্টি না হইয়া গ্রীষ্ম হয় তাহা হইলে এই আকালিক গ্রীষ্ম পরিহার করিবার কোন উপায় নাই। কালের পরই বুদ্ধির উল্লেখ করিবার হেতু এই যে, বুদ্ধির দোষ না হইলে আর লোকে ইন্দ্রিয়ার্থের মিথ্যাযোগাদির আচরণ করে না। এই বুদ্ধির দোষকে প্রজ্ঞাপরাধ বলে। প্রজ্ঞাপরাধ শব্দে এখানে শারীরিক, বাচিক এবং মানসিক ক্রিয়ার অপরাধ বুঝিতে হইবে। আমরা এক্ষণে কায়িক বাচিক ও মানসিক চেষ্টার অতিযোগ, অযোগ ও মিথ্যাযোগ কি তাহাই বলিব।

কায়িক চেষ্টার অতিযোগ, অযোগ, মিথ্যাযোগ কি?—কোন দৈহিক পরিশ্রমের কাজ, ধরুণ পথপর্য্যটন, ইহা কায়িক চেষ্টা। যদি অতিরিক্ত পথপর্য্যটন করা যায় তাহা হইলেই কায়িক চেষ্টার অতিযোগ হইল। ইহা পীড়ার কারণ। যদি একবারে পথপর্য্যটন না করি তাহা হইলে কায়িক চেষ্টার অযোগ হইল। ইহাও পীড়ার কারণ। মলমূত্রের বেগ উপস্থিত হইলে ধারণ করা, উপস্থিত না হইলে জোর করিয়া কোঁৎ পাড়িয়া ত্যাগের চেষ্টা করা, বিষমভাবে স্খলন, বিষম গমন, বিষম পতন, বিষমভাবে অঙ্গসন্নিবেশ ও শয়ন, অঙ্গপ্রদূষণ অর্থাৎ এমন কোন কর্ম্ম করা যাহাতে গাত্র ক্ষত বা বিকৃত হয়—যেমন খুব জোরে চুলকান, অবিধি পূর্ব্বক উল্কি পরা কি নাক কাণ বেঁধা, সংক্লেশন অর্থাৎ শরীরের ক্লেশ জন্মে এমন আহার বিহার যথা—অতিরিক্ত মদ্যপান, অধিকক্ষণ রৌদ্রে কি জলে থাকা ইত্যাদি, প্রহার এবং মর্দ্দন কায়িক মিথ্যাযোগ জানিবে।

বাচিক অতিযোগ, অযোগ, মিথ্যাযোগ কি? সঙ্কল্প অর্থাৎ চিন্তা মনের কার্য্য। এই চিন্তা অতিমাত্রায় করিলে মানস অতিযোগ, চিন্তা খুব কম করিয়া আনিলে মানস অযোগ এবং ভয়, শোক, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মান, ঈর্ষা ও মিথ্যাদর্শন অর্থাৎ যেটী যেরূপ নহে তাহাকে সেইরূপ চিন্তা করা, মানস মিথ্যাযোগ। মানস অযোগ অর্থাৎ নিশ্চিন্ততাও রোগের কারণ। অর্শো নিদানে বলা হইয়াছে "প্রথাক্ত-সেবা শীতৌ চ দেশকালাবচিন্তনম্"। অতঃপর আমরা ইন্দ্রিয়ার্থের অতিযোগ, অযোগ, মিথ্যাযোগ ব্যাখ্যা করিব।

(ক্রমশঃ)

দীর্ঘজীবীর দিনচর্য্যা।

(২) শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ সেন।

শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ সেন মহাশয়ের জন্ম ১২৪৪ সালের শ্রাবণ মাসে সুতরাং এক্ষণে ইঁহার বয়স কিঞ্চিৎ অধিক ৭৯ বৎসর। ইনি কলিকতা হাইকোর্টের একজন প্রসিদ্ধ উকীল। ইঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত শারদাপ্রসাদ সেন মহাশয়, সেন মহাশয়ের দিনচর্য্যা সম্বন্ধে যাহা আমাদিগকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন এস্থলে প্রকাশিত হইল। ইংরাজিতে একটা প্রবাদ আছে যে চিকিৎসক সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্পজীবী, তাহার নীচেই আইন ব্যবসায়ী। সেন মহাশয় আইন ব্যবসায়ী হইয়াও সুদীর্ঘজীবী; সুতরাং তাঁহার অবলম্বিত আহার বিহারাদি পাঠকগণের হিতকর হইতে পারে ভাবিয়া আমরা প্রকাশিত করিলাম। ইনি ১৮৬১ সালে আইন পাশ করিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল হন।

ভ্রমণ, পরিচ্ছদ—বিশেষ অভ্যাস।

বেড়ান অভ্যাসটা খুব কম ছিল, যখন বেড়াইতেন খুব আস্তে আস্তে চলিতেন। বাড়ীর পূজার দালানে অনেক বার পায়চারি করিতেন। পরিচ্ছদ মোটমুটি ব্যবহার করিতেন, তাহাতে বিশেষ কোন পারিপাট্য ছিল না।

ইঁহার বরাবর খুব প্রত্যূষে উঠা অভ্যাস, প্রত্যূষে উঠিয়া কিছুক্ষণ ছাদে পায়চারি করিতেন, পরে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া বাহিরে আসিয়া আদালতের কার্য্যে মনোনিবেশ করিতেন, বেলা ৮টা বাজিলে আদা ছোলা ভিজান একটু লবণের সহিত খাইতেন, ৯½টা বাজিলে একটি ছোট বাটির এক বাটী ভাল সরিষার তৈল গায়ে ও মাথায় মাখিতেন, খালিপায়ে হাঁটিয়া প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করা অভ্যাস ছিল, কি শীত, কি গরম, কি বর্ষা, সকল সময়েই নিয়মিত সময়ে গঙ্গাস্নান করিতেন, স্নান করিয়া বাড়ী আসিয়া পূজা আহ্নিক করিতে বসিতেন, ৫৬। ৫৭ বৎসর বয়সের পর পূজা আহ্নিকে ও জপে অধিক ক্ষণ সময় দিতেন।

ভোজন কার্য্য কখনও তাড়া তাড়ি সম্পন্ন করিতেন না, ধীরে ধীরে অধিকক্ষণ ধরিয়া আহার করিতেন, তাঁহার বরাবর নিয়ম ছিল এবং এখনও আছে যে আহার করিতে করিতে জল আদৌ খাইতেন না এবং এখনও খান না, আহারের পর কিছুক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া পরে এক গেলাস জল খান।

অধিক ভোজন কখনও করিতেন না। তিনি সর্ব্বদা বলিতেন যে যখন খাইবে পেটের এক কোণ খালি রাখিয়া খাইবে, মাটীর হাঁড়িতে সিদ্ধ করা খুব সরু দাদখানি চাউলের অন্ন আর ঘন অরহরের দাল এবং তাহাতে খুব ভাল ঘৃত ঢালিয়া তাই ভাতে মাখিয়া প্রায় সর্ব্বদাই খাইতেন, হিঞ্চে শাক ইঁহার প্রিয় খাদ্য, সেই জন্য হিঞ্চে শাক সিদ্ধ কিম্বা তাহার ডাল্‌না সর্ব্বদা খাইতেন, পটল, উচ্ছে, করলা, ঝিঙ্গে এ সকল তরকারী খুব ভাল বাসেন। পল্‌তার বড়া এবং পলতার ডাল্‌না প্রায় আগ্রহের সহিত খাইয়া থাকেন।

যৌবন অবস্থায় কাছারীতে ২টার পর জল খাবার খাইতেন, তজ্জন্য বাড়ী হইতে লুচি, তরকারী, ভাজা ও হালুয়া প্রস্তুত করিয়া প্রেরিত হইত। ১৫ বৎসর তাঁহার এ অভ্যাস ছিল, পরে কেবল ভাল হালুয়া খাই-

তেন, কিছুকাল পরে একটী সন্দেশ এবং একটী মাত্র রসগোল্লা খাইতেন, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আহার ও ক্রমে কমাইয়া ছিলেন। ইদানীং কাছারীতে কিছুই খাইতেন না, ৫টার পর বাড়ী আসিয়া মুখ হাত পা ধুইয়া ১টি ডাবের জল, ১টি সন্দেশ, দুইখানি লুচি ও একটু তরকারী খাইতেন, রাত্রে ৫।৬খানি রুটী খাইতেন, রাত্রের খাওয়া প্রায় ৯টার সময় সম্পন্ন করিতেন; কিন্তু ওকালতী হইতে অবসর লইয়া রাত্রে প্রায় ১০।১১টার সময় খাইতেন। মৎস্য কিম্বা মাংস যদিও যৌবনকালে খাইতেন, তবে খাইবার বিশেষ লোভ ছিলনা, পাঁঠার মাংস খাইতেন কিন্তু মাস দুই খাইয়া পরিত্যাগ করিয়া ছিলেন। ৪৮ বৎসর বয়সে মৎস্য মাংস একেবারে পরিত্যাগ করেন কিন্তু পেটের অসুখের জন্য চিকিৎসকের পরামর্শে কখন কখন কেবল মৌরলা মাছের ঝোল খাইতেন।

যখন কলেজে পড়েন তখন হইতেই নস্য লওয়া অভ্যাস করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সকল সময়ে লইতেন না, এখনও সেই অভ্যাস আছে। আহারের পর ১টী মাত্র পান খাইতেন, ১০ বৎসর হইল পান আদৌ খান না। রাত্রে আহার করিয়া তখনই শয়ন করিতেন না, প্রায় এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা গল্প করিতেন। জীবনে কখনও তামাক চুরুট কিম্বা অন্য কোন নেশার বশ ছিলেন না, চা কখনও পান করেন নাই।

একটী অষ্টধাতু নির্ম্মিত আংটী এখনও অঙ্গুলীতে পরান আছে। উক্ত আংটী একব্যক্তি বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার সামনে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল।

বাল্যকাল হইতে ইঁহার শরীর বেশ বলিষ্ঠ ছিল এবং তিনি কখনও পথশ্রমে ক্লান্ত হইতেন না। প্রয়োজন হইলে ২।১ ক্রোশ অনায়াসে হাঁটিতে পারিতেন।

পীড়া—ঔষধ।

একবার ম্যালেরিয়া জ্বরে কিছুদিন ভুগিয়া ছিলেন। অতিরিক্ত মানসিক শ্রম করায় একবার শিরোঘূর্ণন হইয়াছিল। তখন অনেক চিকিৎসকই মানসিক শ্রম ত্যাগ করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু একজন বিচক্ষণ কবিরাজের ঔষধে এবং উপদেশে আরাম হইয়া ছিলেন। দৃষ্টিশক্তি সমভাবেই আছে। চশমার সাহায্যে দেখিতে হয় না, যদিও একণে ৭১ বৎসর বয়স তথাপি এখনও রাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লেখা বেশ পড়িতে পারেন, ৪৫।৪৬ বৎসর বয়সের সময় চোখে অল্প অল্প ঝাপ্‌সা দেখিতেন এবং জল পড়িত। সেই সময় অনেকে চশমা লইতে বলিয়াছিলেন কিন্তু তিনি চশমা গ্রহণ করেন নাই, দুই চারি মাস একটু কষ্টের সহিত লিখিতেন ও পড়িতেন বটে কিন্তু তাহার পর সে ভাব কাটিয়া গিয়াছিল এবং চক্ষু পূর্ব্বের ন্যায় সতেজ হইয়াছিল। কখনও রাত্রে গ্যাসের আলো কিম্বা প্রবল কেরোসিনের আলোয় লেখা পড়া করেন নাই। প্রত্যহ রাত্রে তাঁহার বসিবার ঘরে নারিকেল তৈলের সেজের আলো এবং শয়ন কক্ষে রেড়ীর তৈলের প্রদীপ জ্বলিত, সামান্য জ্বর কিম্বা সর্দ্দি কাসি হইলে প্রথমে আদা ও বিল্বপত্রের রস খাইতেন এবং উপবাস দিতেন, যদি তাহাতে না কমিত তখন কবিরাজ কিম্বা ডাক্তারের ঔষধ খাইতেন, আদা ও বিল্বপত্রের উপর বড়ই শ্রদ্ধা ছিল, বাড়ীতে ছোট ছেলেদের অসুখ হইলে আদা ও বিল্বপত্রের রস খাওয়াইতে বলিতেন.

রাত্রে কখন কখন দুগ্ধের সহিত মনেক্কা কিম্বা কিস্‌মিস মিশ্রিত করিয়া খাইতেন।

ধর্ম্মভাব হাইকোর্টের উকীল মাননীয় শালিগ্রাম সিং মহাশয়ের কলিকাতার ভবনে প্রায় সন্ধ্যার পর রামায়ণ পাঠ হইত, ইনি প্রত্যহ শুনিতে যাইতেন, এবং পূজার ছুটী হইলে উক্ত সিং মহাশয়ের কৈলোয়ারের উদ্যানভবনে যাইতেন, তথায় অনেকগুলি বিহারী ভদ্রলোক একত্র হইয়া সমস্বরে রামায়ণ পাঠ করিতেন। পাঠ শুনিয়া ইহাঁর ভাবের উদয় হইয়া চক্ষু দিয়া অনবরত অশ্রু পতিত হইত। এরূপ ভক্ত শ্রোতা পাইয়া তাঁহারাও আনন্দের সহিত রামায়ণ পাঠ করিতেন। কৈলোয়ারে অবস্থিতিকালে অনেকক্ষণ শোণ নদীর সৈকতে বসিয়া তুলসী দাসের রামায়ণ গান করিতেন।

৭৫ বৎসর বয়সে ওকালতী হইতে একেবারে অবসর গ্রহণ করেন, তখন সকল সময়ে বাসায় বসিয়া নিরন্তর জপ করিতেন, বেড়ান একবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আহার খুব কমাইয়াছিলেন।

এক্ষণে ৭৯ বৎসরে পড়িয়াছেন, শরীরে কোন ব্যাধি নাই তবে চলিবার শক্তি একেবারে খুব কম, দৃষ্টি শক্তি সমান আছে, চশমার আবশ্যক হয় না।

আম্র। ✽

[কবিবর ৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত]

সকল ফলের শ্রেষ্ঠ হয় আম্র ফল।
ভক্ষণেতে সধ্য-ভাব, ফলে মোক্ষ ফল॥
সহকার সহ কার তুলনা বা দিব?
অনন্ত মহিমা তা'র ইঙ্গিতে কহিব।

শুন সবে রসালের জন্ম বিবরণ।
নিমেষে ত্রিতাপ জ্বালা হবে নিবারণ॥
লঙ্কাপুরে দশানন আপন বাগানে।
রেখে ছিল পুঁতে গাছ অতি সাবধানে॥

✽ ঈশ্বরগুপ্ত বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর শেষ কবি। একজন রসিক লেখক "মাছের ঝোলের" সঙ্গে গুপ্ত কবির কাব্যের তুলনা দিয়াছিলেন, "নবজীবনের" পাঠক বর্গের তাহা অবিদিত নাই। মাতৃভাষার প্রতি ভক্তি—তাহার সহজ ধর্ম্ম ছিল। যাঁহারা বঙ্গভাষার পুষ্টি সাধন করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই গুপ্ত কবির শিষ্য। এমন কি সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র এবং নাটককার দীনবন্ধুও গুপ্তকবির ছাত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় গুপ্তকবিকে বাঙ্গালী ভুলিতে বসিয়াছে। উদীয়মান লেখক অমরেন্দ্রনাথ রায় ও হেমেন্দ্র কুমার—মধ্যে মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের প্রসঙ্গ লইয়া একটু নাড়া চাড়া করেন, গুপ্তকবির ঋণ আর কেহই বোধ হয়, স্বীকার করেন না। বৈদ্য জাতির মধ্যে ও আর ঈশ্বর গুপ্তের আলোচনা দেখিতে পাইনা।

গুপ্তকবির বাটী ছিল—কাঁচড়াপাড়া গ্রামে। বাটিটী এখন ও বর্ত্তমান আছে; কিন্তু এখন সেই নবরসের আধার কবিকুঞ্জে—একঘর কুম্ভকার আসিয়া "চাক্" ঘুরাইতেছে। বৈদ্য বংশের কোনও ধন কুবের, জাতীয় কবির স্মৃতি রক্ষার জন্য—বাটিটি কিনিতে পারেন নাই।

ঈশ্বর গুপ্তের কতকগুলি কবিতা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। কাঁচড়া পাড়ার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ৺ যাদবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই কবিতা গুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কবিতাগুলি জীর্ণ কীটদষ্ট কাগজে—ধ্বংসোন্মুখ অবস্থায় পতিত। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র দে এম্ এ—আমাদিগকে কবিতাগুলি দান করিয়াছেন। "একজ" গুপ্তকবির প্রতিবাসী সতীশ বাবুকে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

যে কবিতাগুলি—খাদ্য তত্ত্বের উপযোগী হইবে, আমরা সে গুলি ক্রমশঃ "আয়ুর্ব্বেদে" প্রকাশিত করিব।

সীতা-অন্বেষণে গেলে বীর হনুমান।
জানকী জানান তা'রে আমের সন্ধান॥
শুনি রাম-দাস বড় পাইল আরাম।
জয়রাম ব'লে কপি ভাঙ্গিল আরাম॥
শাঁস খেয়ে আঁটী বীর দিল ছড়াইয়া।
সে আঁটীতে হ'ল গাছ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া॥
হনুর প্রসাদে তৃপ্ত মনুর সন্তান।
রামায়ণে এ কথার রয়েছে প্রমাণ॥
যে বানর আমগাছ মর্ত্ত্যে আনিয়াছে।
তা'র বংশধর যদি ওঠে তা'র গাছে।
লাঠী মারি, ঢিল ছুঁড়ি, গাল পাড়ি কত!
অকৃতজ্ঞ কেবা আছে আমাদের মত?
হনুর সে উপকার কেহ নাহি মানে।
গুণীর আদর কিন্তু ইংরাজেরা জানে॥
ধন্য দাদা! ডারুইন! তুমি বুদ্ধিমান!
"আদি" ব'লে বানরের বাড়ায়েছ মান।
তোমাদের বর্ণ সাদা, মনটীও সাদা।
সেইগুণে আমরা ত ঝুরে মরি দাদা।
প্রথমে যে যে জিনিষ করে আবিষ্কার।
তোমরা তখনি তা'রে দাও পুরস্কার॥
মাঘের প্রথমে ধরে বৃক্ষেতে মুকুল।
গন্ধ পেয়ে অন্ধ হ'য়ে, নারী ছাড়ে কুল॥
শর ব'লে ফুল-শর তুলে রাখে তূণে।
কে না হয় বিমোহিত রসালের গুণে?
ফাল্গুনেতে বাঁধে 'গুটী', চৈত্রে ধরে ধাঁচা।
বৈশাখে ঝাকড়া ভাব—বয়সটা কাঁচা!
জ্যৈষ্ঠ মাসে পেকে হয় অতি সুমধুর।
সেরসে বিরস লাগে অধর বধূর!
মনোহর কলেবর মানস টলায়।
দেখা মাত্র জল সরে অমনি নোলায়!
কুঁড়ে বেঁধে ব'সে থাকি গাছের তলায়।
কেবল আহার করি গলায় গলায়!
যত পাই, তত খাই, আশা নাহি মেটে।
ইচ্ছা হয় সব শুদ্ধ পুরে ফেলি পেটে!
হায় বিধি! এ ফলেতে কেন দিলে আঁটী!
আপনি আপন সৃষ্টি করিয়াছ মাটী!
মধু চেয়ে মিষ্ট ব'লে "মধুফল" নাম।
লিখেছেন কত গুণ বৈদ্য গুণ-ধাম।
যা'র ঘরে বিরাজিত গাছ পাকা আম।
তা'র করতলে—ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম॥
বল বর্ণ রক্ত মাংস শুক্র বৃদ্ধি করে।
কিছু শ্লেষ্মাকর, কিন্তু বায়ু পিত্ত হরে॥
ক'চি আম ঝোল খেলে দেহ ঠাণ্ডা হয়।
সিদ্ধ আম, স্নিগ্ধ গুণে মেদ করে ক্ষয়।
কেশী চূর্ণ উপকারী বমি অতিসারে।
বোঁটার আঠার তেলে চুলকণা সারে॥
পাতার রসেতে নাশে রক্ত—আমাশয়।
ছাল বেটে লেপ 'দলে ব্যথা ভাল হয়।
সুখসেব্য "আম্র খণ্ড" ভেষজ প্রধান।
খেলে, বৃদ্ধ যুবা সম হয় বলবান॥
নিত্য গৃহে অন্নাভাব--দীন দুঃখী যা'রা।
আম খেয়ে একমাস পেট পালে তা'রা॥
গুড় সহ 'আম্‌সীর' মধুর অম্বল।
অরুচিতে পোয়াতীর প্রধান সম্বল!
মস্‌লা মাখিয়া আম তেলে রাখ ফেলে।
"আমতেল" নাম তা'র প্রাণ ঠাণ্ডা খেলে!
কাঁচা আম ফালা দিয়ে আতপে শুখাবে।
অকালে আমের স্বাদ—"আমচুরে" পাবে॥
খোসা ছাড়াইয়া আম ঢেঁকিতে কুটিয়া।
সরিষা হরিদ্রা আর লুণ মাখাইয়া,
নূতন হাঁড়ীতে ক'রে যত্নে রাখ তুলে।
মাঝে মাঝে রৌদ্রে দিও সরা খানি তুলে।
"কাসুন্দীর" সঙ্গে রেঁধে ইলিসের টক্‌,
সেই কালে খেতে—যা'র প্রাণে আছে সখ্‌,
কারও বাড়ী দেখে যদি আমের আচার,
লজ্জা খেয়ে পরনারী করেনা আচার।
ঘন দুগ্ধে আম্ররস—অমৃত সমান!
দৈবে পেলে, সুধা ফেলে, দেবরাজ খান!
কানিতে ছাঁকিয়া রস রৌদ্রেতে শুখাও।
অসময়ে রসময় 'আমসত্ত্ব' খাও॥
শিলা বৃষ্টি ঝড়, পাখী, কুয়াসা, তস্কর,
আমের এ পঞ্চ শত্রু—খ্যাত চরাচর!
এড়ালে এদের হাত, তবে ফল পাই।
আত্মীয় গণেরে ল'য়ে পেট ঠেসে খাই॥
একাকী গোপনে আম খেওনাক' কেউ।
হত্যা হ'য়ে ঘরে যাবে ডেকে কেউ কেউ॥
নিজে খাবে, বিলাইবে, পুরকে খাওয়াবে।
তা' হ'লেই, স-শরীরে স্বর্গে চ'লে যাবে।
যাঁহার কিঙ্কর হ'তে পেয়েছ এ আম,
আম খেয়ে নাম তাঁর জপ অবিরাম!

—

বৈদ্যসম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ।

অনুবাদ :—জঙ্ঘা বা উরুদেশ ভগ্ন হইলে কপাট-শয়ন হিতকর। বন্ধন জন্য পাঁচটী কীলক (খোঁটা) এরূপ ভাবে রাখিবে যেন ভগ্ন স্থান চালিত না হয়। সন্ধিস্থলের দুই দিকে দুইটী করিয়া, পদতলে একটী, শ্রোণী-দেশে,পৃষ্ঠবংশে বা বক্ষে একটী এবং স্কন্ধসন্ধির উপরিভাগে একটী কীলক দিয়া ভগ্ন রোগীকে বন্ধন করাই বিধি।

কিরূপে ভগ্নস্থান বন্ধন করিতে হয়, কোন ঋতুতে কত দিন অন্তর বন্ধন পরিবর্ত্তন করিতে হয়, অষ্টাঙ্গ হৃদয়ের উত্তরস্থানে সপ্তবিংশতি অধ্যায়ে তাহা বিস্তারিত রূপে লিখিত আছে।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদের মহিমা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। পূর্ব্বে অস্থি ছেদনার্থ যে করপত্র (করাত) নামক শস্ত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে অঙ্গ-ছেদনের (Amputation) জন্য করপত্র প্রাচীন কালে ব্যবহৃত হইত, কিন্তু ভগ্নরোগে অস্থি-চ্ছেদনের নাম মাত্র উল্লেখ নাই কেন? এতদ্দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, প্রাচীন কালে অস্থিচ্ছেদনের বিষয় অবগত হইলেও চিকিৎসা শাস্ত্রের কলঙ্ক স্বরূপ অস্থিচ্ছেদন কার্য্যে চিকিৎ-সকদিগকে নিরুৎসাহিত করিবার জন্য বোধ হয় ভগ্নরোগে অস্থিচ্ছেদনের স্পষ্ট উপদেশ দেন নাই। যদিও সময়ে সময়ে অঙ্গচ্ছেদন না করিলে রোগীর বিপত্তি ঘটিতে পারে বলিয়া অঙ্গচ্ছেদন আবশ্যক হইয়া থাকে, তথাপি অঙ্গচ্ছেদনকে কখনই সুচিকিৎসা বলা যাইতে পারে না। যদি প্রয়োজনীয় অঙ্গচ্ছেদন করিয়াই রোগীকে আরোগ্য করিতে হয় তবে চিকিৎসা শাস্ত্রের ফলবত্তা কোথায়? আর রোগীকে শমনভবনে প্রেরণ করিয়া রোগমুক্ত করিলে তাহাকেই বা কুচিকিৎসা বলিবনা কেন? কিত ধাতু হইতে চিকিৎসা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। কিত শব্দের অর্থ রোগাপনয়ন, সুতরাং রোগ নাশ করা-কেই চিকিৎসা বলে। কিন্তু এখানেত রোগ নাশ করা হইল না। রোগীর অঙ্গনাশ করা হইল। সুতরাং ইহাকে চিকিৎসা কি করিয়া বলিব? নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে অঙ্গচ্ছেদন ব্যতীত যে রোগ আরোগ্য হইতে পারিত, এরূপ অনেক স্থলে আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ অঙ্গচ্ছেদন করিয়া থাকেন।

চিকিৎসা শাস্ত্রের বিশেষতঃ শস্ত্র চিকিৎ-সার ভিত্তি স্বরূপ শব-ব্যবচ্ছেদ (Dissection) সম্বন্ধে শাস্ত্রকার বলিয়াছেন :—

ত্বক্‌পর্য্যন্তস্য দেহস্য যোঽয়মঙ্গবিনিশ্চয়ঃ।
শল্যজ্ঞানাদৃতে নৈব বর্ণ্যতেঽঙ্গেষু কেষুচিৎ॥
তস্মান্নিঃসংশয়ং জ্ঞানং হর্ত্রা শল্যস্য বাঞ্ছতা।
শোধয়িত্বা মৃতং সম্যগ্ দ্রষ্টব্যোঽঙ্গবিনিশ্চয়ঃ॥
প্রত্যক্ষতো হি যদ্দৃষ্টং শাস্ত্রদৃষ্টঞ্চ যদ্ভবেৎ।
সমাসতস্তদুভয়ং ভূয়ো জ্ঞানবিবর্দ্ধনং॥

তস্মাৎ সমস্ত-গাত্র মবিষোপহত মদীর্ঘ-ব্যাধিপীড়িত মবর্ষশতিকং নিঃসৃষ্টান্ত্রপুরীষং পুরুষমপহন্ত্যামাপগায়াং নিবদ্ধং পঞ্জরস্থং মুঞ্জবল্কলকুশশণাদীনা মন্যতমেনা বেষ্টিতাঙ্গ মপ্রকাশে দেশে কোথয়েৎ, সম্যক্ প্রকুথিত-ঞ্চোদ্ধৃত্য অতো দেহং সপ্তরাত্রাদুশীরবালবেণু বল্কলকূর্চানামন্যতমেন শনৈঃ শনৈরবঘর্ষয়ং-স্ত্বগাদীন্ সর্ব্বানেব বাহ্যাভ্যন্তরাঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশে-ষান্ যথোক্তান্ লক্ষয়েচ্চক্ষুষেতি।

অনুবাদ :—শরীরের ত্বক্ প্রভৃতি যে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বর্ণনা করা হইল এই শল্যতন্ত্র ভিন্ন অন্য কোন তন্ত্রে তাহা বর্ণিত হয় নাই। শরীরে প্রবিষ্ট শল্য আহরণ করিতে হইলে শরীরের কোথা কি আছে তাহার নিঃসংশয় জ্ঞান থাকা উচিত। এই নিঃসংশয়জ্ঞান লাভ করিতে হইলে মৃতদেহ শোধন করিয়া অঙ্গ-বিনিশ্চয় করা উচিত। কারণ প্রত্যক্ষ দর্শন ও শাস্ত্ররূপ চক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া শিক্ষা করিলে তবে সম্পূর্ণরূপ জ্ঞানবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

সেইজন্য সম্পূর্ণাঙ্গ, বিষের দ্বারা মৃত নহে, অত্যন্ত দীর্ঘকাল ব্যাধি পীড়িত নহে এবং এক শত বৎসর অপেক্ষা কম বয়স্ক পুরুষের মৃতদেহ সংগ্রহ পূর্ব্বক অন্ত্র ও পুরীষ নিঃসারিত করিয়া ফেলিবে। অনন্তর মুঞ্জ (তৃণ বিশেষ) বল্কল, কুশ বা শণ যে কোন একটী দ্রব্য দ্বারা উত্তম-রূপে বেষ্টন করিয়া একটী পঞ্জরের (খাঁচা) মধ্যে রাখিয়া স্রোতোহীন নদীতে নির্জ্জনে রাখিয়া পচাইবে। উত্তমরূপ পচিলে সাত দিন পরে উদ্ধৃত করিয়া বেণার মূল, কেশ, বা বাঁশের ত্বক, ইহাদের যে কোন একটীর কূচী প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা ধীরে ধীরে ঘর্ষণ পূর্ব্বক বাহ্য এবং অভ্যন্তর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল চক্ষু দ্বারা দেখিবে।

অধুনা পাশ্চাত্য দেশে লর্ড লিষ্টার উন-বিংশ শতাব্দীর প্রথমে এণ্টিসেপটিক (antiseptic) নামক যে বিষ-প্রতিষেধক চিকিৎসার প্রচার করিয়াছেন তাহাও আয়ুর্ব্বেদকার-গণের অবিদিত ছিল না। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ ধূলা ও মক্ষিকা রোগজীবানুবাহক বলিয়া ব্রণ রোগীকে ঐ সকল পরিহার করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন, ঠিক এই কারণেই প্রাচীন সুশ্রুত গ্রন্থের পঞ্চমাধ্যায়ে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে :—

ব্রণমভিমৃশ্য প্রক্ষাল্য কষায়েণ প্লোতেনোদ-কমাদায় তিল-কল্ক-মধু-সর্পিঃ প্রাগাঢ়ামৌষধ-যুক্তাং বর্ত্তিং প্রণিদধ্যাৎ..........ততো গুগ্-গুল্বগুরুসর্জ্জরসবচাগৌরসর্ষপচূর্ণৈর্লবণনিম্বপত্র-ব্যামিশ্রৈরাজ্যযুক্তৈর্ধূপৈর্ধূপয়েদিতি।

অনুবাদ :—ব্রণ পীড়নও কষায় জল দ্বারা ধৌত করিয়া পরিষ্কার শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা মুছিয়া ফেলিবে। পরে তিলবাটা, মধু ও ঘৃত গাঢ়-রূপে মিশ্রিত বর্ত্তিতে (Lint) মাখাইয়া ব্রণ মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে।........অনন্তর গুগ্গুল্ ধূনা, অগুরু, বচ, শ্বেতসর্ষপ চূর্ণ করিয়া লবণ, নিম্বপত্রও ঘৃত সহ ধূপ প্রস্তুত করিবে এবং সেই ধূপের ধূম ব্রণে লাগাইবে।

মধু ও ঘৃত উৎকৃষ্ট বিষ প্রতিষেধক (antiseptic) এবং উক্ত ধূম প্রয়োগ দ্বারাও ব্রণ বিষাক্ত (Septic) হইবার ভয় নিরাকৃত হয়।

কল্পতরু সদৃশ আমাদের দেশের চিকিৎসা-শাস্ত্রে কেবল শস্ত্র প্রয়োগ নহে, পরন্তু ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগ বিষয়েও সুন্দর উপদেশ আছে। প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগের বিধি এরূপ উৎকৃষ্ট এবং অব্যর্থ, যে তাহার নিকট পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগ বিধি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়।

মহামতি সুশ্রুত বলিয়াছেন :—

শস্ত্রানুশস্ত্রেভ্যঃ ক্ষারঃ প্রধানতম ছেদ্য-ভেদ্যলেখ্যকরণা ত্রিদোষঘ্নাদ্বিশেষ-ক্রিয়া-কর-ণাচ্চ। স দ্বিবিধঃ প্রতিসারণীয় পানীয়শ্চ। তত্র প্রতিসারণীয়-কুষ্ঠকিটিম-দদ্রুকিলাস-মণ্ডল ভগন্দরার্ব্বুদ-দুষ্টব্রণ-নাড়ী-চর্ম্মকীল-তিলকালক-ন্যচ্ছ-ব্যঙ্গ-মশক-বাহ্য-বিদ্রধি-ক্রিমি-বিষার্শঃসূপ-দিশ্যতে; সপ্তসু চ মুখরোগেষু পজিহ্বাধি-

জিহ্বোপকুশ-দন্ত-বৈদর্ভেষু তিসৃষু চ রোহিণী ষেতেষু চৈবানুশস্ত্রপ্রণিধানমুক্তং। পানীয়স্তু গরগুল্মোদরাগ্নি-সঙ্গা-জীর্ণারোচকানাহ-শর্করা-শ্মর্য্যাভ্যন্তরবিদ্রধি-ক্রিমি-বিষার্শঃসুপযুজ্যতে।

অনুবাদ :—শস্ত্র এবং অনুশস্ত্র (অগ্নি জলৌকা) অপেক্ষা ক্ষার শ্রেষ্ঠ। কারণ ছেদ্য ভেদ্য ও লেখ্য কারক, ত্রিদোষনাশক এবং বিশেষ ক্রিয়াকারক। ক্ষার দুই প্রকার, যথা প্রতিসারণীয় এবং পানীয়। তন্মধ্যে প্রতিসারণীয় ক্ষার কুষ্ঠ, কিটিম, কিলাস, দদ্রু, মণ্ডল, ভগন্দর, অর্ব্বুদ, দুষ্টব্রণ, নাড়ীক্ষত, চর্ম্মকীল, তিলকালক, ন্যচ্ছ, ব্যঙ্গ, মশক, বাহ্যবিদ্রধি, ক্রিমি, বিষ, অর্শঃ, সাত প্রকার মুখরোগ এবং তিন প্রকার রোহিণী রোগে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, আর পানীয় ক্ষার দুষীবিষ, গুল্ম, উদর, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অরুচি, আনাহ, শর্করা, অশ্মরী, অন্তর্বিদ্রধি কৃমি, বিষদোষ ও অর্শঃ রোগে প্রয়োগ করা যায়।

ক্ষারাদগ্নির্গরীয়ান্ ক্রিয়াসু ব্যাখ্যাতস্তদ্দগ্ধানাং রোগাণামপুনর্ভাবাদ্ভেষজ-শস্ত্রক্ষারৈরসাধ্যানাং তৎসাধ্যত্বাচ্চ, অথেমানি দহনোপকরণানি। তদ্‌যথা। পিপ্পল্যজাশকৃদ্গোদন্তশর-শলাকা--জাম্ববৌষ্ঠেতর-লোহাক্ষৌদ্র--গুড়স্নেহাশ্চ। তত্র পিপ্পল্যজাশকৃদ্গোদন্তশরশলাকাস্ত্বগ্‌গতানাং। জাম্ববৌষ্ঠেতর-লোহানি মাংসগতানাম্। ক্ষৌদ্রগুড়স্নেহাঃ শিরাস্নায়ুসন্ধ্যস্থিগতানাম্।

অনুবাদ :—ক্ষার অপেক্ষা অগ্নি শ্রেষ্ঠ, ইহা অগ্নি প্রয়োগের ফল দেখিয়া বুঝা যায়। অপিচ, অগ্নিদগ্ধ ব্যাধির পুনরায় উৎপত্তি হয় না এবং ঔষধ, শস্ত্র ও ক্ষারের অসাধ্য ব্যাধিও অগ্নি প্রয়োগে প্রশমিত হইয়া থাকে। পিপুল, ছাগবিষ্ঠা, গোদন্ত, শর, শলাকা জাম্ববৌষ্ঠ, লৌহ, তাম্র, রৌপ্যাদি, মধু, গুড় এবং ঘৃতাদি স্নেহ দ্রব্য দহন কার্য্যের উপকরণ। তন্মধ্যে পিপুল, ছাগবিষ্ঠা, গোদন্ত শর ও শলাকা ত্বক্‌গত রোগে, জাম্ববৌষ্ঠ, লৌহ, তাম্র ও রজতাদি মাংসগত রোগে আর মধু ও ঘৃতাদি স্নেহদ্রব্য সিরাগত, স্নায়ুগত, সন্ধিগত ও অস্থিগত রোগে দহন কার্য্যে ব্যবহার্য্য।

বিষয় বাহুল্য এবং সময় সংক্ষেপ ভয়ে এ সম্বন্ধে অধিক বলিতে পারিলাম না। কিন্তু এতদ্দ্বারাই প্রমাণ হইতেছে যে আয়ুর্ব্বেদে ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগের সুন্দর ব্যবস্থা আছে।

অনন্তর আমরা ধাত্রী বিদ্যা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া শল্য তন্ত্র সম্বন্ধে বক্তব্য শেষ করিব। সুশ্রুতে কথিত হইয়াছে যে চতুর্থ মাসে ভ্রূণের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া আরম্ভ হয়। পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগের মতেও অষ্টাদশ সপ্তাহ কাল হইতে বিংশতি সপ্তাহের মধ্যে ভ্রূণের হৃদযন্ত্র রক্ত সঞ্চালন (Feetal circulation) করিয়া থাকে। পাশ্চাত্য দিগের এই আধুনিক আবিষ্কার বহু পূর্ব্বে হইতেই প্রাচীনগণ অবগত ছিলেন।

মূঢ়গর্ভ (Difficult labour) চিকিৎসা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

নাতঃকষ্টতমমস্তি যথা মূঢ়গর্ভশল্যোদ্ধরণং মত্র হি যোনিযকৃৎ-প্লীহান্ত্রবিবরগর্ভাশয়ানাং মধ্যে কর্ম্ম কর্ত্তব্যং স্পর্শেন। উৎকর্ষণাপকর্ষণস্থানাপবর্ত্তনোদ্বর্ত্তন ভেদনচ্ছেদনপীড়নর্জুকরণ দারণানি চৈকহস্তেন গর্ভং গর্ভিণীং বা হিংসতা, তস্মাদধিপতিমাপৃচ্ছ্য পরং যত্নমাস্থায়োপক্রমেৎ।

অনুবাদ :—মূঢ়গর্ভের শল্যোদ্ধারের ন্যায় কষ্টতর আর কিছুই নাই। ইহাতে যোনি,

যকৃৎ, প্লীহা, অন্ত্রবিবর ও গর্ভাশয়ের মধ্যে স্পর্শ দ্বারা কার্য্য করিতে হয় এবং উৎকর্ষণ (উপরের দিকে তোলা), অপকর্ষণ (নীচু দিকে নামান), স্থানাপবর্ত্তন ভ্রূণকে পরিবর্ত্তিত করিয়া অধোমুখে আনয়ন) উদ্বর্ত্তন (আধোমুখ ভ্রূণকে উত্তান করা), ছেদন ভেদন, পীড়ন, ঋজু করণ ও দারণাদি এক হস্ত দ্বারাই করিতে হয়। ইহাতে গর্ভ বা গর্ভিনীর হিংসা হইতে পারে বলিয়া গর্ভিণীর স্বামীকে ও রাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক কার্য্য করিবে।

গর্ভের অবরোধ এবং তাহার চিকিৎসা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

মৃতেচোত্তানায়া আভুগ্নসকৃথ্যা বস্ত্রাধারকোন্নমিতকট্যা ধম্বনগ-মৃত্তিকা-শাল্মলীমৃৎস্ন-ঘৃতাভ্যাং ম্রক্ষয়িত্বা হস্তং যোনৌ প্রাবিশ্য গর্ভমুপহরেৎ। তত্র সকৃথিভ্যামাগতমনুলোমমেবাকৃষেৎ। এক-সকৃথ্যা প্রপন্ন-স্যেতের সকৃথি প্রসার্য্যাপহরেৎ। স্ফিগ্‌দেশেনাগতস্য স্ফিগ্‌দেশং প্রপীড্যোর্দ্ধ মুৎক্ষিপ্য সকৃথিণী প্রসার্য্যাপহরেৎ। তির্য্যগাগতস্য পরিঘস্যেব তিরশ্চীনস্য পশ্চার্দ্ধমূর্দ্ধ মুৎক্ষিপ্য পূর্ব্বার্দ্ধমপত্যপথং প্রত্যার্জ্জব মানীয়াপহরেৎ। পার্শ্বাপবৃত্ত শিরসমংসং প্রপীড্যোর্দ্ধমুৎক্ষিপ্য শিরোঽপত্যপথমানীয়াপহরেৎ। বাহুদ্বয় প্রতিপন্নস্যোর্দ্ধমুৎপীড্যাংসৌ শিরোঽনুলোমমানীয়-পহরেৎ।

অনুবাদ :—গর্ভস্থ সন্তান মৃত হইলে গর্ভিণীকে উত্তানভাবে শায়িত করিয়া উরুদ্বয় অল্প বক্র ভাবে সংস্থাপন পূর্ব্বক কটির নিম্নদেশে বস্ত্রাধার রাখিয়া কটি উন্নত করিবে। অনন্তর ধন্বুবৃক্ষ, গিরিমৃত্তিকা, শাল্মলীনির্য্যাস ও ঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহা হস্তে মাখাইবে এবং সেই হস্ত যোনি পথে প্রবিষ্ট করিয়া সন্তান বাহির করিবে। গর্ভস্থ সন্তানের উভয় সকৃথি বাহির হইয়া অনুলোম ভাবে (নীচের দিকে) টানিয়া বাহির করিবে। এক সকৃথি বাহির হইলে অপর সকৃথি প্রসারিত করিয়া টানিয়া বাহির করিবে। নিতম্বদেশ প্রসব পথে উপস্থিত হইলে নিতম্ব দেশ ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া সকৃথি দ্বয় প্রসারিত করিয়া বাহির করিবে। ভ্রূণ পরিঘের (হুড়কা) ন্যায় তির্য্যক্ ভাবে থাকিলে পায়ের দিক ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিরা মস্তক নিম্ন দিকে আনিয়া বাহির করিবে। ভ্রূণের মস্তক পার্শ্ব দেশে অপবর্ত্তিত হইয়া অবস্থিতি করিলে এবং স্কন্ধ অপত্য পথে আসিলে স্কন্ধ ঊর্দ্ধে ঠেলিয়া মস্তক অপত্য পথে আসিলে স্কন্ধ দেশ ঊর্দ্ধদিকে তুলিয়া মস্তক অপত্য পথে আনিয়া বাহির করিবে।

গর্ভস্থ মৃত সন্তান ছেদন এবং বহিষ্করণ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

তত্র স্রিয়মাণস্য মণ্ডলাগ্রেণাঙ্গুলীশস্ত্রেণ বা শিরো বিদার্য্য শিরঃ কপালান্যাহৃত্য শঙ্কুনা গৃহীত্বোরসি কক্ষায়াং বাপহরেৎ। অভিন্নে শিরসি চাক্ষিকূটে গণ্ডে বা অংসসক্তস্যাংসদেশে বাহুং ছিত্বা দৃতি মিবাততং বাতপূর্ণোদরং বা বিদার্য্য নিরস্যান্ত্রাণি শিথিলীভূতমাহরেৎ। জঘনসক্তস্য বা জঘনকপালানীতি।

যদ্যদঙ্গং হি গর্ভস্য তস্য সজ্জতি তত্তিবক্।
সম্যগ্বিনিহরেচ্ছিত্বা রক্ষেন্নারীঞ্চ যত্নতঃ॥
গর্ভস্য গতয়শ্চিত্রা জায়ন্তেঽনিলকোপতঃ।
তত্রানল্পমতির্ব্বৈদ্যো বর্ত্তেত বিধিপূর্ব্বকম্॥
নোপেক্ষেত মৃতংগর্ভং মুহূর্ত্তমপি পণ্ডিতঃ।
স হ্যাশু জননীংহন্তি নিরুচ্ছ্বাসং পশুং যথা॥
মণ্ডলাগ্রেণ কর্ত্তব্যং ছেদ্যমন্তর্ব্বিজানতা।
বৃদ্ধিপত্রং হি তীক্ষ্ণাগ্রং নারীং হিংস্যাৎ কদাচন।

অনুবাদঃ গর্ভিণীকে আশ্বাসিত করিয়া মণ্ডলাগ্র বা অঙ্গুলীশস্ত্র দ্বারা প্রথমে গর্ভের মস্তক বিদীর্ণ করিয়া শঙ্কু (আকর্ষণী) দ্বারা আকর্ষণ করিয়া খণ্ডীকৃত খর্পর সকল নির্গত করিবে এবং বক্ষ ও কক্ষদেশ ধরিয়া টানিয়া নির্গত করিবে। মস্তক বিদীর্ণ করিতে না পারিলে অক্ষিকূট বা গণ্ড দ্বারা আকর্ষণ করিয়া বাহির করিবে।. মৃত সন্তানের স্কন্ধ দেশ দ্বারা. অপত্য পথ সংরুদ্ধ হইলে বাহু ছিন্ন করিয়া বাহির করিবে। ভ্রূণের উদর দৃতির (ভিস্তি, মশক) ন্যায় বায়ুপূর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠিলে উদর বিদীর্ণ করিয়া অন্ত্র সকল নিঃসারিত করিয়া ফেলিবে। ইহাতে দেহ শিথিল হইয়া পড়িলে টানিয়া বাহির করিবে। জঘন দেশ দ্বারা অপত্য পথ রুদ্ধ হইলে জঘন দেশের অস্থি কাটিয়া বাহির করিবে।

গর্ভের যে অঙ্গ অপত্য পথ রুদ্ধ করিয়া থাকে প্রথমে সেই অঙ্গ ছেদন করিয়া গর্ভিণীকে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিবে। বায়ুর প্রকোপ বশতঃ ভ্রূণের নানা প্রকার গতি হইয়া থাকে। কিন্তু চিকিৎসক এরূপ অবস্থায় বিধি পূর্ব্বক চিকিৎসা করিবেন। বিজ্ঞ ব্যক্তি মৃত গর্ভকে মুহূর্ত্তমাত্রও উপেক্ষা করিবেন না। কারণ উহা জননীকে রুদ্ধশ্বাস পশুর ন্যায় সত্বর বিনষ্ট করিয়া থাকে। মণ্ডলাগ্র শস্ত্র দ্বারাই মৃতগর্ভ ছেদন করা উচিত। বৃদ্ধিপত্র শস্ত্র অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বলিয়া প্রসূতিরও কখন কখন অনিষ্ট ঘটিতে পারে।

হে মহাভাগগণ! আমরা যে সকল শাস্ত্র বচন উদ্ধৃত করিলাম তাহা শ্রবণ করিয়া কেহ কি বলিতে পারেন যে প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ধাত্রীবিদ্যা ও শস্ত্র চিকিৎসা ছিল না বা সামান্য ভাবে ছিল? এরূপ স্পষ্ট প্রমাণ থাকিতেও যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকে শস্ত্র চিকিৎসা-কৌশল বিহীন বলেন আমি তাঁহাদিগকেই এই কথা বলিতেছি যে হয় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে জ্ঞানহীনতা, নচেৎ আভিজাত্যাভিমানিতা তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিতে বাধ্য করিয়া থাকে।

অধুনা পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণও যে আয়ুর্ব্বেদীয় শস্ত্র চিকিৎসা পরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, ইহা নিতান্ত আনন্দের বিষয়। মেডিকেল কালেজের অধ্যাপক ডাক্তার চার্লস্ মহোদয়ের কৃত কার্য্যের বিষয় পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা নামক প্রসিদ্ধ সুবৃহৎ অভিধানে এসম্বন্ধে কি লিখিত হইয়াছে শ্রবণ করুন:—

In both branches of the Aryan stock surgical practice (as well as medical) reached a high degree of perfection at a very early period. It is a matter of controversy whether the Greeks got their medicine (or any of it from the Hindus (through the medium of Egyptian priest hood), or whether the Hindus owed that high degree of medical and surgical knowledge and skill which is reflected in Charaka and Susruta (commentators of uncertain date on Yajurvade) to their contact with western civilisation afier the campaigns of Alexander. The evidence in favour of the former view is ably stated by wise in the introduction to his hietory of medicine among the Asiatics. The correspondence between the Susruta and Hipprocratic collection is closet in the sections relating to

the ethics of medical practice ; the description also of lithotomy in the former agrees almost exactly with Alexandrian practice as given by Celsns. But there are certainly some dexterous operations described in Susruta (such as the rhinoplastic) which were of native invention, the elaborate and lofty ethical code appears to be of pure Brahmanical origin ; and the very copious materia medica (which included arsenic, mercury, zinc and many other substances of permanent value) does contain a single article of foreign source. There is evidence also (in Arian, strabo and other writers). That the east enjoyed a proverbial reputation for medical and surgical wisdom at the time of Alexander's invasion. We may give the first place, then, to the Eastern branch of Aryan race in a sketch of the rise of surgery.

অনুবাদ :—আর্য্যজাতির প্রাচ্য প্রাতীচ্য উভয় শাখাই বহুকাল পূর্ব্বে শস্ত্র চিকিৎসায় বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। গ্রীকেরা ইজিপ্ট দেশের পুরোহিত গণের সাহায্যে হিন্দুদিগের নিকট হইতে তাহাদের চিকিৎসা-বিদ্যা অথবা তাহার কিয়দংশ শিক্ষা করিয়াছিল কিম্বা হিন্দুরা তাহাদের বহুপ্রাচীন যজুর্ব্বেদমূলক চরক ও সুশ্রুত লিখিত উন্নত কায়চিকিৎসা ও শস্ত্র চিকিৎসা আলেক্‌জাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পর পাশ্চাত্য জাতির সংসর্গে আসিয়া শিখিয়াছেন তাহা নিতান্ত সন্দেহের বিষয়। প্রথমোক্ত ব্যাপারের সত্যতা ডাক্তার ওয়াইজ তাঁহার "এশিয়াবাসির চিকিৎসা শাস্ত্রের ইতিহাস" নামক পুস্তকের ভূমিকায় যুক্তিযুক্তরূপে প্রমাণ করিয়াছেন। সুশ্রুত লিখিত চিকিৎসা-সূত্রের সহিত হিপোক্রাট কর্ত্তৃক সংগৃহীত চিকিৎসা শাস্ত্রগুলির বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। অশ্মরী রোগে শস্ত্রপ্রয়োগ সম্বন্ধে সুশ্রুতে যেরূপ উপদেশ আছে, আলেকজান্দ্রা নগরের চিকিৎসক সেলসস্ কর্ত্তৃক লিখিত চিকিৎসা তাহার অনুরূপ কিন্তু সুশ্রুতের লিখিত কতকগুলি সুন্দর শস্ত্রচিকিৎসা (যেমন ছিন্ননাসিকার চিকিৎসা) নিশ্চয়ই তদ্দেশীয় আবিষ্কার। চিকিৎসা নীতি সম্বন্ধে যে সুন্দর এবং উন্নত উপদেশ আছে তাহা বৈদিককালে লিখিত। বহু বিস্তৃত ভেষজ-সংগ্রহ, যাহাতে আর্সেনিক, পারদ, দস্তা এবং তদ্রূপ অনেক দ্রব্যের উল্লেখ আছে, তাহাতে একটীও বিদেশীয় বস্তু দেখা যায় না। এরিয়ান্ ষ্ট্রাবো এবং অন্যান্য লেখক গণের লিখিত প্রমাণ দ্বারা জানিতে পারা যায় যে আলেকজাণ্ডারের ভারত্ আক্রমণ কালে তত্রত্য কায়-চিকিৎসা ও শস্ত্রচিকিৎসা সম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রবাদবাক্য রূপে পরিণত হইয়াছিল। সুতরাং আর্য্যজাতির প্রতীচ্য শাখাকেই শস্ত্রচিকিৎসার উন্নতি সাধন বিষয়ে প্রথম স্থান দিতে পারি।

এক্ষণে কায়তন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব। আয়ুর্ব্বেদের অষ্টাঙ্গের মধ্যে কায়তন্ত্রানুযায়ী চিকিৎসাই এক্ষণে সমধিক প্রচলিত। কায়তন্ত্র প্রসঙ্গে চরকে লিখিত হইয়াছে :—

"যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ।"

অনুবাদ : - যাহা ইহাতে আছে তাহা অন্যত্র দেখিতে পাইবে, যাহা ইহাতে নাই তাহা কোথায়ও নাই। মহর্ষির এই মহাবাক্যের সার্থকতা এক্ষণেও আমরা স্পষ্টপ্রত্যক্ষ করিতেছি।

কায়তন্ত্র আলোচনা করিতে হইলে চরকই আমাদের প্রধান অবলম্বন। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে চরকসংহিতা কায়তন্ত্রের মূলগ্রন্থ নহে। মহর্ষি আত্রেয় কায়তন্ত্র শিক্ষা করিয়া তাঁহার শিষ্য অগ্নিবেশকে সে সম্বন্ধে উপদেশ দেন। সেই উপদেশ লাভ করিয়া অগ্নিবেশ ঋষি কায়তন্ত্র-প্রধান যে গ্রন্থ সঙ্কলন করেন তাহা অগ্নিবেশসংহিতা নামে খ্যাত হয়। কালে অগ্নিবেশ সংহিতার অঙ্গহানি ঘটিলে চরক ঋষি সেই সংহিতার প্রতি সংস্কার করেন এবং তখন হইতে অধুনা পর্য্যন্ত উক্ত গ্রন্থ চরকসংহিতা নামে প্রসিদ্ধ আছে। পরবর্ত্তী কালে চরকসংহিতার অঙ্গহানি ঘটিলে মহামতি দৃঢ়বল তাহার পুনঃ সংস্কার করেন। এইরূপে পুনঃ পুনঃ অঙ্গহানি ঘটায় এবং পুনঃ পুনঃ সংস্কৃত হওয়ায় কায়তন্ত্রের কতদূর অপকর্ষ ঘটিয়াছে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কিন্তু যতই অপকর্ষ ঘটুক না কেন আমরা চরকসংহিতা হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে জগতে কায়তন্ত্র-প্রধান যত চিকিৎসাশাস্ত্র আছে, এখনও চরকসংহিতা তাহাদের শীর্ষস্থানীয়।

চরকসংহিতার জনপদধ্বংসনীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে যে সময়ে সময়ে কোন দেশে মহামারী প্রাদুর্ভূত হইলে তত্রত্য অসংখ্য লোক একই প্রকার রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পৃথিবীর বহুদেশে মধ্যে মধ্যে এইরূপ মহামারী প্রাদুর্ভূত হইয়া অনেক নগর এবং জনপদকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছে, ইহা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। বিদেশীয় অনেক চিকিৎসক স্ব স্ব গ্রন্থে এইরূপ মহামারীর বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন এবং তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। সুতরাং সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য কিছুই নাই। কিন্তু সম্প্রতি ঐ যে ইউরোপ দেশে বিভিন্ন বল দৃপ্ত জাতি ভীষণ সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া অসংখ্য বজ্রনাদী যন্ত্র দ্বারা মুহুর্মুহু অসংখ্য অগ্নিময় লোহ গোলক নিক্ষেপ পূর্ব্বক লক্ষ লক্ষ সৈনিকের ও অন্যান্য ব্যক্তির প্রাণনাশ করিতেছে, ঐ যে নিহত সৈনিকদিগের বিধবা পত্নী, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী ও শিশু পুত্রের হাহাকার রবে গগণমণ্ডল পরিপূরিত হইতেছে এই মহা সমরের বিষয়ও সূক্ষ্মদর্শী আয়ুর্ব্বেদকার দিগের দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই, বহু প্রাচীন যুগে এইরূপ মহাসমর সম্বন্ধে শাস্ত্রকার কি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন, আপনারা তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন :—

তথাশস্ত্র প্রভবস্যাপি জনপদবিধ্বংসস্য অধর্ম্মহেতু র্ভবতি যেঽতিপ্রবৃদ্ধলোভক্রোধমানা তে দুর্ব্বলানবমত্য আত্ম-স্বজন-পরোপঘাতায় শস্ত্রেণ পরস্পরং অভিক্রামন্তি পরান্ বা অভিক্রামন্তি পরৈর্ব্বা অভিক্রাম্যন্ত ইতি।

এই উক্তির দ্বারা আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি যে আয়ুর্ব্বেদকারগণ কেবল শরীর সম্বন্ধে নহে, পরন্তু মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধেও যথেষ্ট গবেষণা করিয়াছিলেন।

প্রথমতঃ কায়তন্ত্রের পথ্য প্রয়োগ জ্ঞানের উৎকর্ষ দেখাইতে প্রয়াস পাইব। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে :—

বিনাপি ভৈষজ্যৈর্ব্যাধিঃ পথ্যাদেব নিবর্ত্ততে।
নতু পথ্যবিহীনানাং ভেষজানাং শতৈরপি॥

অনুবাদ :—ঔষধ ব্যতীত কেবল সুপথ্য সেবন দ্বারা রোগ নিবারিত হইতে পারে কিন্তু

সুপথ্য সেবী না হইলে শত ঔষধেও রোগ নিবারিত হয় না।

পথ্য প্রয়োগ সম্বন্ধে এরূপ সুন্দর জ্ঞান বোধ হয় আজিও জগতের অন্য কোন চিকিৎসাশাস্ত্রে নাই। জ্বর রোগে পথ্য সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—জ্বরাদৌ লঙ্ঘনং পথ্যং। অর্থাৎ জ্বরের প্রথমে উপবাসই পথ্য। চিকিৎসক মাত্রেই অবগত আছেন যে প্রবল জ্বরে শরীরের যাবতীয় যন্ত্র, বিশেষতঃ পরিপাক যন্ত্র নিষ্ক্রিয় ভাবে থাকে। যে ক্ষেত্রে পথ্য পরিপাক করিবার সামর্থ্য থাকে না, শরীরে প্রভূত আমরস সঞ্চিত থাকে, সেরূপ ক্ষেত্রে লঙ্ঘনের ন্যায় মহোপকারী পথ্য আর কি হইতে পারে? বিজ্ঞান-গর্ব্বিত পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র-কোবিদগণ আজিও এই মহাবাক্যের সার্থকতা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। রোগীর পরিপাক করিবার শক্তি না থাকিলে, খাদ্য দিলে অপকার ব্যতীত উপকার হয় না। ইহা অতীব আনন্দের বিষয় যে জ্বরে পথ্য প্রয়োগ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদকারগণ যে উপদেশ দিয়াছেন, অনেক বিজ্ঞ পাশ্চাত্য চিকিৎসক ক্রমে তাহার সারবত্তা বুঝিতে পারিতেছেন।

কিন্তু সাধারণতঃ জ্বরে লঙ্ঘন হিতকর হইলেও জ্বরবিশেষে পাচকাগ্নি একেবারে দুর্ব্বল হয় না; অপিচ দুর্ব্বল ব্যক্তি, বৃদ্ধ, বালক এবং গর্ভিণী স্ত্রীর লঙ্ঘন দ্বারা অনিষ্ট হইতে পারে। এ বিষয় লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্রকার বলিয়াছেন :—

তত্তু মারুতক্ষুতৃষ্ণা-মুখ-শোষ-ভ্রমান্বিতে।
কার্য্যং ন বালে বৃদ্ধে বা ন গর্ভিণ্যাং ন দুর্ব্বলে॥

অনুবাদ :—বায়ু প্রধান জ্বরে, জ্বররোগীর ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মুখ শোষ বা ভ্রম থাকিলে, জ্বররোগী বালক, বৃদ্ধ, গর্ভিণী বা দুর্ব্বল হইলে একেবারে উপবাস দেওয়া উচিত নয়।

নবজ্বরে লঙ্ঘন অমৃততুল্য হিতকর ভাবিয়া চিকিৎসক পাছে অতিরিক্ত লঙ্ঘন দিয়া রোগীকে মৃত্যু মুখে পাতিত করেন সেই আশঙ্কা করিয়া শাস্ত্রকার বলিয়াছেন :—

প্রাণাবিরোধিনা চৈনং লঙ্ঘনেনোপপাদয়েৎ।
বলাধিষ্ঠান মারোগ্যং যদর্থোঽয়ং ক্রিয়াক্রমঃ॥

অনুবাদ :—বলের বিরোধী বলিয়া রোগীকে অতিরিক্ত লঙ্ঘন দিবে না; কারণ যে আরোগ্যের জন্য চিকিৎসা তাহা বলের উপরেই নির্ভর করে।

পথ্য এরূপ ভাবে দিতে হইবে যেন অস্বাদু না হয় এবং অরুচি না জন্মায়। এসম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

সাতত্যাৎ স্বাদ্বভাবাদ্বা পথ্যং দ্বেষ্যত্বমাগতম্।
কল্পনাবিধিভিস্তৈস্তৈঃ প্রিয়ত্বং গময়েৎ পুনঃ।

অনুবাদ :—সর্ব্বদা একরূপ পথ্য সেবন বা অস্বাদু বলিয়া পথ্যের প্রতি রোগীর বিদ্বেষ হইলে নানা রূপ কল্পনা করিয়া পথ্যকে রোগীর প্রিয় করিবে।

এপর্য্যন্ত বলিয়া শাস্ত্রকার নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। বিবিধ কল্পিত পথ্য যদি রোগীর রুচিকর না হয়। তজ্জন্য শাস্ত্রকার বলিয়াছেন :—

জ্বরিতোঽহিতমশ্নীয়াৎ যদ্যপ্যস্যারুচির্ভবেৎ।
অন্নকালেহ্যভুঞ্জানো ক্ষীয়তে ম্রিয়তেঽপিবা॥

অনুবাদ :—জ্বরিত ব্যক্তির অরুচি হইলে তাহাকে অহিতকর দ্রব্যও ভোজন করিতে দিবে। কারণ অন্নকালে (আহারের সময়) আহার না করিলে রোগী ক্ষীণ হয়, অথবা তাহাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

আয়ুর্ব্বেদে আয়ুস্তত্ত্ব।

মধ্যযুগে লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদ অধুনা বহু কৃতবিদ্য লোকের যত্ন ও চেষ্টায় ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, ইহা বাস্তবিকই আমাদের আশা ও সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাহি। দেহীমাত্রেরই সুস্থ দেহ ও স্বচ্ছন্দমনে জীবনের দীর্ঘতা চিরবাঞ্ছনীয়। অশীতি-পর বৃদ্ধেরও জীবিতাকাঙ্খা বলবতীই রহিয়া যায়। সংসারের ত্রিতাপ যাঁহাদের হৃদয় ক্ষত বিক্ষত না করিয়াছে, তাঁহাদের সুস্থমন ও সুস্থদেহ যে চির স্পৃহণীয় তাহা স্বাভাবিক। এক্ষণে কি কি উপায়ে ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গের আধারভূত এই পাঞ্চভৌতিক দেহ ও মন অব্যাহত ভাবে সংরক্ষিত হয় তাহার উপায় জীব মাত্রেরই অনুসন্ধেয়, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণ মানব ও জগতের হিতকামনায় ইহ পরত্র মঙ্গলজননী উপদেশাবলীঅনেক কাল পূর্ব্বেই প্রচার ও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

দেশ বৈদেশিকাশিক্ষায় ও অনুচিকীর্ষায় বিভ্রান্ত, তাই আমাদের নিজঘরে অনন্ত রত্ন থাকিতেও আমরা পরের দ্বারে মুষ্টিভিক্ষার জন্য লালায়িত, তবে সুখের বিষয় এখন নিজের ঘরে কি আছে জানিবার জন্য অনেক শিক্ষিত লোকের অন্তর্দৃষ্টি দেশীয় শাস্ত্রাদির উপর নিপতিত হইতেছে। সুতরাং এ আন্দোলন ও গবেষণার যুগে সাধারণ্যে ঋষিদিগের অমূল্য উপদেশ প্রচারিত হইয়া অশেষ কল্যাণ বিধান করিবে বলিয়া আশা করা যায়। আমাদের প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয় "আয়ুর্ব্বেদে আয়ুস্তত্ত্ব" তজ্জন্য প্রথমে আয়ুর্ব্বেদ কি তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিব। মহামতি চরক বলিয়াছেন—

"হিতাহিতং সুখং দুঃখমায়ুস্তস্য হিতাহিতং।
মানঞ্চ তচ্চযত্রোক্ত মায়ুর্ব্বেদঃ স উচ্যতে।

হিতায়ুঃ, অহিতায়ুঃ, সুখায়ুঃ দুঃখায়ুঃ আয়ুর হিত ও অহিত এবং পরমায়ুর পরিমাণ যাহা পাঠে অবগত হওয়া যায়। তাহাই আয়ুর্ব্বেদ নামে অভিহিত।

মহর্ষিসুশ্রুত আয়ুর্ব্বেদ শব্দের দুটী অর্থ করেন, "আয়ুরস্মিন্ বিদ্যতে হনেন বা আয়ুর্ব্বিন্দতীত্যায়ুর্ব্বেদঃ" যদ্দ্বারা আয়ুর বিষয় জানা যায় কিম্বা যদ্দ্বারা আয়ুলাভ করা যায়, তাহাই আয়ুর্ব্বেদ, সুতরাং আয়ু চেষ্টা দ্বারা ও লভ্য বুঝিতে হইবে। ইহাদ্বারা আয়ুর্ব্বেদ কি এবং আয়ুর্ব্বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় কি বুঝিলাম, কিন্তু আয়ুঃ শব্দে শাস্ত্রকারগণ কি ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন, তাহাই আমাদের আলোচ্য। প্রসিদ্ধ শব্দ-তত্ত্ববিদ্ অমরসিংহ বলিয়াছেন "আয়ুর্জীবিত কালো না জীবাতু র্জীবনৌষধং" এতি পরিমাণংগচ্ছতি ইত্যায়ুরিতি উনাদি উস্ প্রত্যয় দ্বারা আয়ুশব্দ সাধিত হইয়াছে। তবেই বুঝিতেছি জীবিত কালের নামই আয়ুঃ। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে এই জীবিতকাল কি আমাদের নির্দ্দিষ্ট? কি অনির্দ্দিষ্ট? সাধারণতঃ কথায় বলিয়া থাকে "ইহার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে ইহার মৃত্যুনিশ্চয়, তবে কি আমাদের নিয়মিত বয়সে ও নিয়মিত সময়েই জীবলীলা সমাপন হইয়া থাকে? যদি তাহাই ঠিক হয় তবে কেহ ষোড়শবর্ষে, কেহ [illegible], কেহ কেহ [illegible], কেহ শতবর্ষে ইহলীলা [illegible]

করিতেছ কেন? যদি আয়ুর নির্দ্দিষ্টকাল থাকিত, তবে সকলেরই আয়ুর একটা বাঁধা বাঁধি নিয়ম থাকিত, তাহা যখন দেখিতেছি না তখন আমাদের স্বীকার করিতে হইবে, আয়ুর কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই এবিষয় মহর্ষি শাতাতপীয় কর্ম্মবিপাকে কি বলিতেছেন শুনুন—

"পথ্যাশিনাং শীলবতাং সদ্‌বৃত্তভাজাং বিজিতেন্দ্রিয়াণাং এবম্বিধানামিদ মায়ুবত্র চিন্ত্যাঃ সদাবৃদ্ধমুনিপ্রবাদঃ"

নিয়তসুপথ্যভোজী এবং চরিত্রবান্ এবং শাস্ত্রনির্দ্দিষ্টসদাচার পরায়ণ জিতেন্দ্রিয়, ব্যক্তিগণ এই প্রকার (শতবর্ষ পরিমিত) পরমায়ুর অধিকারী। এইবৃদ্ধ মুনিপ্রবচন সর্ব্বথা চিন্তনীয়।

এবিষয় বৃদ্ধ যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন "বর্ত্ত্যাধার স্নেহযোগাদ্ যথা প্রদীপস্য সংস্থিতিঃ। বিক্রিয়াচৈব দৃষ্টৈবমকালে প্রাণসংক্ষয়ঃ॥ যথাহনিকল বর্ত্ত্যাদিসত্বে প্রবলবাতাদিনা দীপনাশস্তথা সত্যপ্যায়ুষ্য-শুভকর্ম্মবশান্নৌদুর্গ-বর্ত্মগমন-কুপথ্যাশনাদিভিঃ প্রাণনাশ ইতি।

যেরূপ বর্ত্তি দীপ ও তৈলাদি অব্যাহত থাকা সত্বেও আকস্মিক বায়ু আসিয়া দীপনাশ করিয়া থাকে, তদ্রূপ পরমায়ুঃ বর্ত্তমান থাকা সত্বেও অশুভকর্ম্মহেতু নৌকাগমন, দুর্গমপথ গমনে আকস্মিক বিঘ্ন আসিয়া পরমায়ুঃক্ষয় করিয়া থাকে, কুপথ্য ভোজনাদি দ্বারাও আয়ুর পরিমাণ অযথাকর হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আয়ুর কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই, এক্ষণে আবার আমরা বলিতেছি—"পরমায়ু থাকা সত্বেও প্রাণ নাশ হইয়া থাকে, সুতরাং পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতেছে না। আয়ুর পরিমাণ স্থির নাই আবার পরমায়ু থাকিতে বিনাশ হইতে পারে ইহা কিরূপ হয়?

ইহার স্থূল মীমাংসা এই আয়ুর পরিমাণ ঠিক নাই বটে তবে বর্ত্তমান যুগে শতবর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত কাল মোটামুটি ধরা হইয়া থাকে। এ বিষয় বৈদিক কালে ঋষিদিগের প্রার্থনা বাক্য দ্বারাও দেখিতে পাই—"পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেমশরদঃ শতং" ইত্যাদি। মহর্ষি সুশ্রুত বলিয়াছেন—

"অব্যাহতগতি র্যস্য স্থানস্থঃ প্রকৃতিস্থিতো।
বায়ুঃ স্যাৎ সোঽধিকং জীবেদ্বীতরোগঃ সমাঃ শতম্"

যাহার বায়ু অব্যাহতগতি অর্থাৎ কোন কারণে বাধা প্রাপ্ত হয় নাই, স্বস্থানে ও স্বভাবে অবস্থিত, সে নিরোগী হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে। এ সমস্ত প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, আয়ুর একটী মোটামুটি হিসাব শতবর্ষ পর্য্যন্ত, যিনি সুনিয়ম ও সদাচার সম্পন্ন হইয়া থাকিবেন তিনি ঐ পরিমাণ পরমায়ুর অধিকারী হইবেন। পক্ষান্তরে যোগবলে যে পরমায়ুর পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহার প্রমাণ আমরা অনেক পাইয়াছি ও অনেক দূরদর্শী প্রাচীন মহাত্মার মুখাৎ শ্রুত হইয়াছি।

কেবল ইহাই নহে আয়ুর্ব্বেদ স্পষ্টাক্ষরে গুরুশিষ্যসংলাপ স্থলে কি বলিতেছেন শুনুন—

কিন্নু খলু ভগবন্ নিয়তকাল-প্রমাণ মায়ুঃ সর্ব্বং নবেতি? ভগবান্ উবাচ।
ইহাগ্নিবেশ! ভূতানামায়ুর্যুক্তিমপেক্ষতে।
দৈবে পুরুষকারেচ স্থিতং হ্যস্য বলাবলম্।
দৈবমাত্মকৃতং বিদ্যাৎ কর্ম্ম যৎ পূর্ব্বদৈহিকম্।
স্মৃতঃ পুরুষকারস্তু ক্রিয়তে যদিহাপরম্।
বলাবলবিশেষো হস্তি তয়োরপিচ কর্ম্মণোঃ।
দৃষ্টংহি ত্রিবিধং কর্ম্ম হীনং মধ্যমমুত্তমম্।
তয়োরুদারয়োর্যুক্তি র্দীর্ঘস্য সুখস্যচ।
নিয়তস্যায়ুষো হেতুর্বিপরীতস্য চেতরা।

মধ্যমা মধ্যমস্তেষ্টা কারণং শৃণু চাপরং।
দৈবং পুরুষকারেণ দুর্ব্বলংহ্যুপহন্যতে।
দৈবেন চেতরৎ কর্ম্ম বিশিষ্টেনোপহন্যতে।
দৃষ্ট্বা যদেকে মন্যন্তে নিয়তং মানমায়ুষঃ।
কর্ম্ম কিঞ্চিৎ কচিৎ কালে বিপাকে নিয়তং মহৎ।
কিঞ্চিত্ত্বকাল নিয়তং প্রত্যয়ৈঃ প্রতিবোধ্যতে॥

ভগবন্! আয়ুর পরিমাণে নিয়ত কাল সাপেক্ষ কি না? ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন হে অগ্নিবেশ! জীবদিগের আয়ুঃ যুক্তি (দৈব ও পুরুষকারের যোগ) অপেক্ষা করে, প্রথমতঃ আয়ুর বলাবল, দৈব ও পুরুষকার উভয়ের প্রতি নির্ভর করে, পূর্ব্ব জন্মের স্বকীয় শুভ বা অশুভ কৃত কর্ম্মের নামই দৈবকর্ম্ম। আর পুরুষের বর্ত্তমান জীবনের কর্ম্ম সমূহের নাম পুরুষকার কর্ম্ম। তবেই প্রকারান্তরে বলা হইয়েছে দৈবকর্ম্ম এবং স্বকৃত ও মানবের ইচ্ছাধীন। দৈব ও পুরুষকার এই উভয়বিধ কর্ম্মেরই একটা প্রবল ও দুর্ব্বল শক্তি মিলিত রহিয়াছে। হীন, মধ্যম ও উত্তমভেদে কর্ম্ম আবার তিন ভাগে বিভক্ত, তন্মধ্যে দৈব ও পুরুষকার উভয়েরই প্রবলশক্তি থাকিলে আয়ু দীর্ঘ ও সুখকর ও নিয়ত (পূর্ণ) হয়। এস্থলে নিয়ত আয়ুঃশব্দে শতবর্ষবুঝিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

কবিরাজ—শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন সেনগুপ্ত
শাস্ত্রী কবিরত্ন।

হেমন্ত চর্য্যা।

আমরা মুখে বলি, "আহার করি শরীর রক্ষার জন্য", কিন্তু অনেক স্থলেই দেখিতে পাই, আমরা আহার করি জিহ্বার তৃপ্তির জন্য। যদি সর্ব্বত্র, ইহা শরীরের হিতকর বা ইহা শরীরের অহিত কর এইরূপ বিবেচনা করিয়া আহার করিতাম, তাহা হইলে অনেক উৎকট রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিতাম। সুস্থ শরীরে আহারের হিতাহিত বিবেচনা করাত দূরের কথা আমরা লোভের এতই বশীভূত যে পীড়িত হইয়াও পীড়ার বৃদ্ধিকর বস্তু জানিয়া শুনিয়া সেবন করিয়া থাকি। মনুষ্যমাত্রেরই এই দুর্ব্বলতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ ঋতুভেদে হিত সেবন ও অহিত বর্জ্জনের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। যাহা জিহ্বার তৃপ্তিকর তাহা সকল সময়েই শরীরের পক্ষে হিতকর হয় না, গ্রীষ্মকালে দধি সেবন আপাত আরামপ্রদ বটে; কিন্তু উহা স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর নহে, অম্লের সহিত মধুর রস যোজনা করিলে—টকের সহিত মিষ্ট মিশাইলে রসনার তৃপ্তি কর হয় বটে কিন্তু সংযোগ বিরুদ্ধ হয় বলিয়া উহা বিবিধ ব্যাধি জন্মাইয়া থাকে। এস্থলে অনেকে বলিতে পারেন আমরা লোকজকে বিবিধ সুস্বাদু আহার-সুখ হইতে বঞ্চিত করিবার ব্যবস্থা করিতেছি। বস্তুতঃ যাহা শরীরের পক্ষে হিতকর নহে, আপাত সুখের জন্য তাহা ভোজন করিয়া পরিণামে পীড়াগ্রস্ত হওয়া কদাপি মনুষ্য মাত্রেরই বাঞ্ছনীয় নহে, সুতরাং যাহাকে আমরা আহার জন্য বলিয়া মনে করি, অনেক স্থলেই তাহা বিবিধ রোগের কারণ স্বরূপ হইয়া থাকে। তাই ঋতুচর্য্যা

লিখিতে বসিয়া এই সকল কথা আলোচনার প্রয়োজন এই যে, ঋতুচর্য্যা কেবল কাল বিশেষের উপযোগী আহার বিহার বিষয়ক হিতকর শাস্ত্রীয় শাসন বাক্য মাত্র। পাঠক যদি ঋতুচর্য্যায় উপদিষ্ট আহার বিহারের সহিত নিজ নিজ জিহ্বা ও মনের বিরোধ, অনুভব করেন, তাহা হইলে সেই বিরোধ, বিকার গ্রস্তের শীতল পানীয় প্রার্থনার ন্যায় অহিতকর ভাবিয়া, শাস্ত্রশাসন পালন পূর্ব্বক নিজের এবং সমাজের হিত সাধন করিবেন।

শরচ্চর্য্যা প্রসঙ্গে ঋতু বিভাগের বিষয় বলা হইয়াছে, এই প্রবন্ধে সম্প্রতি উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণের বিষয় বলা যাইতেছে।

অয়ন বিভাগ কেবল আয়ুর্ব্বেদের বিষয়ীভূত নহে পরন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রে ও উহার বহুল উল্লেখ আছে। শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে সূর্য্যদেব উত্তর পথে গমন করেন বলিয়া এই তিনটী ঋতু উত্তরায়ণ এবং এই জন্যই পৌষ সংক্রান্তি উত্তরায়ণ নামে খ্যাত। আর বর্ষা, শরৎ ও হেমন্তকালে সূর্য্যদেব দক্ষিণ পথে গমন করেন বলিয়াই এই তিনটী ঋতুকে দক্ষিণায়ণ বলে।

উত্তরায়ণে সূর্য্যকিরণ প্রখর হয় এবং বায়ু তীব্র ও রুক্ষ হয় বলিয়া পৃথিবীর স্নেহ ও রস শোষিত হইয়া থাকে, এই জন্য শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে পৃথিবীতে ক্রমশঃ রুক্ষভাবের আধিক্য হয়, শীত বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে যথাক্রমে তিক্ত, কষায় ও কটুরসের বৃদ্ধি হয় এবং মনুষ্যের শরীর ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে থাকে, উত্তরায়ণে সূর্য্য পৃথিবীর রস গ্রহণ করেন বলিয়া উহা আদানকাল নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। আদান কাল আগ্নেয় অর্থাৎ এই সময়ে উষ্ণতার আধিক্য হয়।

দক্ষিণায়ণে কালস্বভাব অনুসারে মেঘ, বায়ু ও বর্ষার জন্য সূর্য্যের তেজ মন্দীভূত হয় এবং চন্দ্রমা বলবান্ হইয়া স্বীয় শীত রশ্মি দ্বারা জগতকে স্নিগ্ধ করেন, এই জন্য দক্ষিণায়ণ সৌমকাল অর্থাৎ এই সময়ে জগতে সোমগুণের (শৈত্যাদির) আধিক্য হয়, বর্ষার জলে জগতের সন্তাপ দূর হয়, অরুক্ষ রস সকলের অর্থাৎ অম্ল, লবণ ও মধুর রসের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয় এবং মানবগণ ক্রমশঃ বলবান্ হয়, এই কালে সূর্য্য-তেজ-শোষিত পৃথিবীতে চন্দ্র স্বীয় সোম গুণ বিসর্জ্জন করেন বলিয়া ইহা বিসর্গকাল নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

আদান কালের শেষে অর্থাৎ গ্রীষ্ম ঋতুতে এবং বিসর্গ কালের প্রথমে অর্থাৎ বর্ষাঋতুতে মনুষ্য সর্ব্বাপেক্ষা হীনবল হয়। আদান কালের মধ্যে অর্থাৎ বসন্ত ঋতুতে এবং বিসর্গ কালের মধ্যে অর্থাৎ শরৎ ঋতুতে মনুষ্য মধ্যবল হয়। আর আদান কালের প্রথমে অর্থাৎ শীত ঋতুতে এবং বিসর্গ কালের শেষে অর্থাৎ হেমন্ত ঋতুতে মনুষ্য সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ হয়।

অগ্রহায়ণ ও পৌষ এই দুই মাস হেমন্তকাল, সম্প্রতি হেমন্তকাল চলিতেছে বলিয়া হেমন্ত চর্য্যার বিষয় লিখিত হইতেছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে শীত উষ্ণ ও বর্ষণ লক্ষণাক্রান্ত তিনটী ঋতুই প্রধান এবং অপর তিনটী ঋতু উহাদের অন্তর্ব্বিভাগ। এই হিসাবে হেমন্ত ঋতু শীতের অন্তর্ব্বিভাগ, এই সময়ে শীতল বায়ুর সংস্পর্শে শরীরস্থ উষ্মা নির্গত হইতে পায় না বলিয়া জঠরাগ্নি প্রবল হয় এবং গুরুপাক দ্রব্য অধিক মাত্রায় জীর্ণ করিতে পারা যায়, সেই প্রবল অগ্নি উপযুক্ত আহার রূপ ইন্ধন না পাইলে দেহস্থিত রসের ক্ষয় করিয়া থাকে এবং উপযুক্ত আহারের অভাবে বায়ু রুক্ষ ও [illegible]

কুপিত হয়, এইজন্য হেমন্তকালে স্নিগ্ধ (ঘৃতাদিযুক্ত) অম্ল, লবণ ও মধুর রসযুক্ত দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে আহার করা উচিত।

ঔদক মাংস (জলজ মাংস মৎস্যাদি) আনূপমাংস (জলাশয় সমীপে বিচরণকারী প্রাণীর মাংস শূকর মহিষাদি), বিলেশয় মাংস (যে সকল প্রাণী গর্ত্তমধ্যে বাস করে তাহাদের মাংস'—গোধা সজারু প্রভৃতি) প্রসহ মাংস গবাদি, প্লবমাংস, (যাহারা জলে ভাসিয়া বেড়ায় হংসাদি) শলাকায় বিদ্ধ করতঃ সিদ্ধ করিয়া (শূল্যমাংস, শিক কাবাব) আহার করিবে, গোধূম ও মাষ কলায় দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য, পিষ্টক, গুড়, চিনি, মিছরী, দুগ্ধ, ক্ষীর, ছানা, নূতন অন্ন, চর্ব্বি, তৈল প্রভৃতি সেবন করিলে দেহের ক্ষয় নিবারিত হইয়া পুষ্টি সাধিত হয়।

হেমন্তকালে সর্ব্বাঙ্গে বিশেষরূপে বায়ু নাশক তৈল মর্দ্দন, মস্তকে তৈল মর্দ্দন ও ঈষদুষ্ণ জলে স্নান হিতকর, রেশমী ও পশমী কাপড়ের দ্বারা শরীর আবৃত রাখা এবং গরম কাপড়ের আসন ও শয্যা ব্যবহার করা উচিৎ। উষ্ণগৃহে বা গর্ভগৃহে (মৃত্তিকাভ্যন্তরে নির্ম্মিত গৃহে) অবস্থান ও শয়ন হিতকর, এই সময়ে সর্ব্বদা জুতা ও ইকীন প্রভৃতি পাদত্রাণ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। শৌচকর্ম্মে ঈষদুষ্ণ ও জল ব্যবহার করা উচিত এবং সূর্য্যরশ্মির অল্পতা প্রযুক্ত শীতল বায়ুর সংস্পর্শে জড়ীভূত মানব মণ্ডলীর যথোপযুক্ত অগ্নিস্বেদ ও রৌদ্র সেবন করা কর্ত্তব্য ও প্রতিদিন কুস্তী করা কিম্বা বিবিধ ব্যায়াম করা আবশ্যক।

ছয় ঋতুর মধ্যে হেমন্ত ঋতুই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাণিগণের সমধিক বলপ্রদ, কারণ বর্ষাকালে উৎপন্ন শস্যাদি ও যাবতীয় ওষধি দ্রব্য, কাল পরিণাম বশতঃ এই সময়েই অধিক বীর্য্যবান হয় ও পরিপুষ্টি লাভ করে। পৃথিবী পঙ্কহীন হওয়ায় পানীয় জল স্নিগ্ধ ও নির্ম্মল হয়, তৎসমস্ত ভক্ষন ও পান করিয়া এবং জঠরাগ্নির প্রবলতায় সুজীর্ণ করিতে পারায় জীবগণ হৃষ্ট পুষ্ট হয়, কাক, গণ্ডার, মহিষ, মেষ ও হস্তী প্রভৃতি এই সময়ে বিশেষ বলশালী হইয়া থাকে সুতরাং বলসঞ্চয় করিবার পক্ষে ইহাই উৎকৃষ্ট কাল।

এই কালে রাত্রি দীর্ঘ হয় বলিয়া প্রাতে শৌচাদি নিত্যকার্য্য শেষ করিয়াই কিছু আহার করা উচিত। লঘু আহার অল্পাহার, বায়ু বর্দ্ধক অন্ন পান এবং পূর্ব্বদিকের প্রবাহিত বায়ু অনিষ্ট কর।' এই ঋতুতে নিত্য স্ত্রীসেবি ব্যক্তির পক্ষে প্রচুর মাংস, ডিম্ব, দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতি বাজী-কারক দ্রব্য আহার করা কর্ত্তব্য। এই কালে স্নিগ্ধতা, শৈত্য গুরুত্বাদির আধিক্য নিবন্ধন শ্লেষ্মার সঞ্চয় হইতে থাকে।

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত।

চরকোক্ত ষড়ুপায় বিধি।

লঙ্ঘণ, বৃংহণ আর রুক্ষণ, স্নেহন,
স্বেদন, স্তম্ভন কার্য্যে নিপুণ যে জন,
প্রয়োগ করিতে জানে বুঝিয়া সময়,
প্রকৃত ভিষক সেই জানিবে নিশ্চয়।
সর্ব্ব রোগে লঙ্ঘনাদি চিকিৎসা সম্যক্।
ফলে, মাত্রা বিচারিয়া করিলে প্রয়োগ।
সাধ্য-ভাবাপন্ন সব রোগারোগ্য হয়।
তেঁই ষড়ুপায় বিধি কহি সমুদয়॥
যাহা দেহ লঘুকর তাহাই লঙ্ঘন।
পুষ্টিকর হয় যাহা সেসব বৃংহণ॥
কর্কশতা, বিষদতা, রুক্ষতা জনক।
সমস্ত দ্রব্যই হয় রুক্ষণ-সংজ্ঞক॥
স্নিগ্ধ, অভিষ্যন্দি, মৃদু, ক্লেদ যাতে হয়।
স্নেহন তাদের নাম সুধীগণ কয়।
স্তব্ধতা রুক্ষতা শৈত্য নষ্ট যাতে হয়।
স্বেদ কর হয়, তাহা স্বেদন নিশ্চয়॥
গতিমান্, সচঞ্চল, দ্রব পদার্থের।
গতি রোধ করে, নাম স্তম্ভন তাদের॥
লঘু, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, বিশদ, কঠিন,*
সূক্ষ্ম, খর, সরদ্রব্য লঙ্ঘন প্রবীণ।
গুরু, মৃদু, স্নিগ্ধ, স্থূল, স্থির, মন্দ, ঘন,
শীতল, পিচ্ছিল, শ্লক্ষ্ণ দ্রব্যাদি বৃংহণ।
রুক্ষ, লঘু, খর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ আর স্থির,
অপিচ্ছিল, কঠিনাদি রুক্ষণ সুধীর॥
দ্রব, স্নিগ্ধ, সর, স্থূল, পিচ্ছিল, শীতল,
গুরু, মন্দ, মৃদুদ্রব্য স্নেহন সকল।
উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, সর, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, সূক্ষ্ম, দ্রব,
স্থির, গুরু দ্রব্য হয় স্বেদন এসব॥
শীতল, মন্দ ও মৃদু, শ্লক্ষ্ণ, রুক্ষ, স্থির,
সূক্ষ্ম, লঘু, দ্রবদ্রব্য স্তম্ভন সুধীর।

* দ্রব্যখণ্ডে এই সকল শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে।

লঙ্ঘন বিধি।

বমি, বিরেচন দুই আর আস্থাপন,
শিরো বিরেচন, এই চারি সংশোধন।
তৃষ্ণা, বায়ু, রৌদ্র আর ব্যায়াম, পাচন,
উপবাস, এই সবে কহিবে লঙ্ঘন॥
শ্লেষ্মা, পিত্ত, রক্ত, মল, যাদের সঞ্চিত,
দীর্ঘ দেহ, বলবান, বায়ু সংদূষিত;
তাহাদের বমনাদি চারি সংশোধন।
প্রয়োগ করিয়া বৈদ্য করায় লঙ্ঘন॥
মধ্যবল-শালী রোগ, কফ পিত্তোত্থিত,
অতিসার, হৃদরোগ, বিসূচীকান্বিত;
বমি, জ্বর, অলসক, হৃল্লাস, উদ্গার,
মল বদ্ধ, গাত্রশূল, অরুচি যাহার;
তাহাদের প্রথমতঃ প্রাজ্ঞ বৈদ্যগণ,
প্রায়ই পাচন দ্বারা করে প্রশমন॥
বমনাদি অল্প বল, কফ পিত্তোদ্ভূত।
তৃষ্ণারোধ, উপবাসে হয় দূরীভূত॥
মধ্য-বল-শালী রোগ হয় যে সকল।
হরে রৌদ্র, বায়ু সেবা, ব্যায়ামে কেবল॥
বলবান ব্যক্তিদের অল্প বলান্বিত।
রোগ হ'লে এ উপায়ে আশু বিদূরিত॥
মেহরোগাক্রান্ত, যার, ত্বক্ দুষ্ট হয়।
অতিযোগে গুহ্যমার্গে স্নেহ বাহিরয়॥
বাত ও বৃংহণ যুক্ত হ'য়েছে যাহারা।
লঙ্ঘনের উপযুক্ত শীতকালে তারা॥

লঙ্ঘনের ক্রিয়া।

যে দ্রব্যে বা কর্ম্মে দেহ লঘুবোধ হয়।
তাহাই লঙ্ঘন, কিন্তু বৃংহণ তা নয়॥
লঙ্ঘনেতে দোষ ক্ষয়, অগ্নি উদ্দীপিত।
দেহ লঘু, ক্ষুধাবোধ, জ্বর বিরহিত।
দোষ অগ্নি স্থান চ্যুত, অসাম্য যাহার।
লঙ্ঘনে দোষের পাক, জ্বর নাশে তার॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাসবিহারী রায়।

আমরা অতীব আনন্দ ও উৎসাহের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে যোগ দান করিয়াছেন।

মহারাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর মানিক্য বাহাদুর (ত্রিপুরা)।

শ্রীযুক্ত সার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,
,, ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, এম্, এ,
শ্রীযুক্ত অন্নদা কুমার রায় চৌধুরী জমীদার কীর্ত্তি পাশা, বরিশাল।
,, জ্ঞানদা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, জমীদার গোবরডাঙ্গা।
,, নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম, এ, ডি, এল, ঢাকা।
,, রায় চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, রিঃ ডেপুটী মাজিঃ।
,, রায়সাহেব আশুতোষ মুখার্জ্জি বি, এল,
,, কে, সেন, স্কোয়ার সিভিল সার্জ্জন, (পাবনা)।
,, সারদা চরণ ঘোষ গভর্ণমেণ্ট প্লীডার, ময়মনসিংহ।
,, রাম রতন চট্টোপাধ্যায়, উকীল, ভবানী পুর।
,, উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ বি, এ, এম, আর, এস।
,, ডাঃ হরিধন দত্ত,
,, ,, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, ঢাকা।
,, ,, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, এল, এম্, এস্।
,, ,, জ্যোতির্ম্ময় বানার্জ্জি এম, বি,
,, ,, ইউ বসু—(কলিকাতা)
,, ,, যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ এল, এম, এস,
ডাঃ শ্রীযুক্ত জে, এন, সেন—বিলাস পুর।
,, ,, অমূল্য চন্দ্র উকিল এম, বি।
,, ,, টি, সি, ভট্টাচার্য্য।
,, ,, এস, সান্যাল এম, বি।
,, ,, অমরেন্দ্রনাথ বানার্জ্জি, এল, এম, এস, কলিকাতা।
,, ,, বারিদ বরণ মুখোপাধ্যায়, এল, এম, এস।
,, ,, বি, এন, ঘোষ, আল্‌বার্ট ভিঃ হাসপাতাল।
,, ,, সুরেন্দ্র কুমার মজুমদার, এল, এম, এস।
,, ,, সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এল, এম, এস, বেনারস।
,, ,, নলিনী রঞ্জন সেন গুপ্ত এম, ডি,
শ্রীযুক্ত বি, ডি, মুখার্জ্জি,
,, কেশবচন্দ্র গুপ্ত,
,, বরদাকান্ত সেন গুপ্ত,
,, নগেন্দ্র কুমার সেন গুপ্ত,
,, প্রিয় শঙ্কর মজুমদার, উকিল।
,, কান্তীশভূষণ সেন, আই, এস, ও,
,, দ্বিজেন্দ্র কুমার মজুমদার, এম, এ, বি, এল।
,, হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত,
,, কামিনী কুমার সেন, উকিল।
,, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র,
,, ভূতনাথ পাল, (কলিকাতা)
,, যতীন্দ্রমোহন সেন, উকিল হাইকোর্ট।
,, চন্দ্রশেখর সরকার, উকিল, ভাগলপুর।
,, বিভূতিভূষণ দত্ত, এম, এস, সি।
,, দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু,
,, যতীন্দ্রনাথ বসু,

শ্রীযুক্ত এ, সি, রায়, সম্পাদক, "রিজেনারেশন।"
,, রাজকুমার রায়, ফরিদপুর।
,, বসন্তকুমার আইচ, যশোহর।
,, প্যারীমোহন চট্টোপাধ্যায়, মুন্সেফ।
,, রাখাল দাশ মুখোপাধ্যায়, বি, এল, উকিল কাঁথি।
,, দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
,, শীতলচন্দ্র ঘোষ।
,, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ।
,, কিরণকুমার রায় চৌধুরী।
,, বি, কে, সেন, হুগলী।
,, ক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্ন।
,, সনৎকুমার ঘোষাল।
,, নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, উকিল আলিপুর।
,, বীরেশ্বর সেন গুপ্ত, উকিল ফরিদপুর।
,, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, এম এ, বি, এল, উকিল হাইকোর্ট।
,, নলিনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল, উকিল বগুড়া।
,, নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ইঞ্জিনীয়ার।
,, মনোমোহন পাঁড়ে।
,, দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ।
,, প্রিয়দারঞ্জন রায় এম, এ,
,, অমৃতলাল গুপ্ত, বি, এল, সবডিঃ অফিঃ বাঁকীপুর।
,, অধ্যাপক এন, এন, সেন গুপ্ত।
,, বিজয়চন্দ্র সিংহ কলিকাতা।
,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ডিওলজিষ্ট।
,, নেপালচন্দ্র রায় এম, এ,
,, ক্ষিতীশচন্দ্র রায়, রংপুর।
,, যাদবচন্দ্র কাব্যতীর্থ, সাঙ্খ্যরত্ন, যশোহর।
,, দীনেশচন্দ্র চাটার্জ্জি, মুন্সেফ।
,, কবিরাজ মধুসূদন সেন গুপ্ত, ভিষগ্‌রত্ন।
,, ,, পূর্ণচন্দ্র দাস গুপ্ত, ঢাকা।
,, ,, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বিদ্যাবিনোদ।
,, ,, দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় কবিরঞ্জন, মোরাদপুর।
,, ,, কৃষ্ণকুমার সেন গুপ্ত।

(ক্রমশঃ)

গ্রন্থ প্রাপ্তিস্বীকার।

আমারা কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করিতেছি যে নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি দান করিয়াছেন—

কবিরাজ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র শর্ম্মা কবিভূষণ—চরকসংহিতা (সানুবাদ) এক খানি।

শ্রীযুক্ত কবিরাজ রাসবিহারী রায় কবিকঙ্কন—(১) আয়ুর্ব্বেদ তত্ত্ববিজ্ঞান পূর্ব্ব ও মধ্যখণ্ড (২) চণ্ডীচরিতামৃত (দেবীমাহাত্ম্য)।

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত রামতারণ চট্টোপাধ্যায় উকীল ভবানীপুর—১০০৲।

মাননীয় ডাঃ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন মহাশয় তাঁহার স্বর্গগত ভ্রাতা যোগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের (ইনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন) স্মৃতিরক্ষা কল্পে ৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষায় যে ছাত্র সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবে ঐ টাকার সুদ হইতে তাহাকে পদক দান করা হইবে।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

১ম বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৩—মাঘ। | ৫ম সংখ্যা।

বৈদ্যসম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ।

এস্থলে অহিতকর দ্রব্য দেওয়াব উদ্দেশ্য রুচির জন্য। একটু কুপথ্য-সংযোগেও যদি রোগী সুপথ্য আহার করিতে পারে—এই উদ্দেশ্য। নচেৎ কেবল কুপথ্য দেওয়া উদ্দেশ্য নহে। অনেকে "জ্বরিতো হিতমশ্নীয়াৎ" পাঠ করিয়া "জ্বরিত ব্যক্তি হিতকর দ্রব্য ভোজন করিবে"—এইরূপ অর্থ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। জ্বরিত ব্যক্তি হিতকর দ্রব্য ভোজন করিবে, ইহাত সাধারণ নিয়ম। তবে অরুচি হইলে হিতকর দ্রব্য ভোজন করিবে বলার সার্থকতা কোথায়? সুতরাং অহিতকর দ্রব্য বলাই শাস্ত্রকারের উদ্দেশ্য। অপিচ শাস্ত্রে না পাইলে আর একটী বচন আমরা অবগত আছি যে:—

"কুপথ্যমপি দাতব্যং যদি পথ্যং ন রোচতে।"

অর্থাৎ পথ্য রুচিকর না হইলে কুপথ্যও দিবে।

পথ্যপ্রয়োগ সম্বন্ধে এরূপ সুন্দর উপদেশ আর কোন দেশের চিকিৎসা-শাস্ত্রে আছে কি?

সন্নিপাত জ্বরে উপবাসসম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে;—

"ত্রিরাত্রং পঞ্চরাত্রং বা দশরাত্রমথাপি বা।
লঙ্ঘনং সন্নিপাতেষু কুর্য্যাদারোগ্যদর্শনাৎ॥"

অনুবাদ;—সন্নিপাত জ্বরে তিন দিন, পাঁচ দিন, দশ দিন অথবা যতদিন রোগ প্রশমিত না হয়, ততদিন উপবাস দিবে।

সন্নিপাত জ্বরে এইরূপ লঙ্ঘন যে হিতকর তাহা পাশ্চাত্যদেশীয় চিকিৎসকগণ এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছেন,—একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমি আমার কোন সন্নিপাতজ্বর-রোগীকে একুশ দিন পর্য্যন্ত বাজিন (ছানার জল, Whey) পথ্য দিয়া ছিলাম। আর একটী পঞ্চমবর্ষীয় বালককে আট দিন কাল কেবল গরম জল পথ্য দিয়া ছিলাম। উভয় রোগীই কথিত সময়ে আর কিছুই খাইতে ইচ্ছা করে নাই এবং ঐ সময়ান্তে অন্যান্য পথ্য আহার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। তখন অন্ন পথ্য দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য উভয়েই রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। এরূপ অধিক লঙ্ঘন সহ্য হওয়া সম্বন্ধে শাস্ত্রকার বলেন;—

"দোষাণমেব সা শক্তির্লঙ্ঘনে যা সহিষ্ণুতা।
নহি দোষক্ষয়ে কশ্চিৎ সহতে লঙ্ঘনাদিকম্॥"

অনুবাদ:—দোষের (বায়ু, পিত্ত, কফের) শক্তি বশতঃ এরূপ লঙ্ঘন সহ্য হয়, দোষের ক্ষয় হইলে কেহই লঙ্ঘন সহ্য করিতে পারে না।

আয়ুর্ব্বেদের এই বচন যে সম্পূর্ণ সার্থক, তাহা আমরা বহুস্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং সমবেত সভ্য মহোদয়গণের মধ্যে বিজ্ঞ চিকিৎসকগণও দেখিয়া থাকিবেন।

আয়ুর্ব্বেদে প্রতিরোগে এরূপ বহুবিধ সারবান্ উপদেশ আছে। আমরা সময়াভাববশতঃ এবং বাহুল্যভয়ে সে সকলের উল্লেখ করিতে পারিলাম না।

অনেকের বিশ্বাস যে আয়ুর্ব্বেদে মাংসপথ্যের প্রয়োগ নাই বা অত্যন্ত কম। কিন্তু এই বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। আপনারা অবগত আছেন যে ভিন্ন ভিন্ন রোগে নানা প্রকার প্রাণীর মাংস পথ্যরূপে প্রয়োগ করিবার বিধি আছে। ক্ষীয়মাণ যক্ষ্ম রোগীর বলপুষ্টিবর্দ্ধনের জন্য প্রধানতঃ ছাগমাংস ব্যবহার করিবার বিধি আছে। পাশ্চাত্য চিকিৎসা-কোবিদগণ বিজ্ঞানবিহিত অনুসন্ধানের ফলে জানিতে পারিয়াছেন যে যক্ষ্মা রোগের জীবাণু অন্যান্য পশু পক্ষীর শরীরে প্রবেশ করিয়া যক্ষ্মা রোগ উৎপাদন করিতে পারে; কিন্তু ছাগ ও মেষের শরীরে রোগ উৎপাদন করিতে পারে না। আয়ুর্ব্বেদে ছাগমাংস, ছাগশোণিত এবং ছাগদুগ্ধ যক্ষ্মারোগীকে সেবন করাইবার উপদেশ দেওয়ায় স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে ঐ মহান্ বৈজ্ঞানিক সত্য তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহাদের অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া পারা যায় না।

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে;—

ছাগমাংসং পয়শ্ছাগং ছাগং সর্পিঃ সশর্করম্।
ছাগোপসেবা শয়নং ছাগমধ্যে তু যক্ষ্মনুৎ॥

অনুবাদ:—ছাগমাংস, ছাগদুগ্ধ ও চিনিমিশ্রিত ছাগঘৃতসেবন, ছাগসেবা এবং ছাগমধ্যে শয়ন করা যক্ষ্ম-রোগনাশক।

পথ্যাপথ্যজ্ঞানসম্বন্ধে পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র এক্ষণে আয়ুর্ব্বেদের বহু পশ্চাতে রহিয়াছে। বিশেষতঃ আমাদের দেশবাসীর ধাতু-প্রকৃতিবিষয়ক জ্ঞানের অভাববশতঃ পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগের উপদিষ্ট পথ্যাপথ্য যে বিপরীত ফলপ্রদ হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি!

মাননীয় সভাসদ্ মহোদয়গণ! এ পর্য্যন্ত আমি যে সকল কথা বলিয়াছি তাহা আয়ুর্ব্বেদের পরম গৌরবের পরিচায়ক। এক্ষণে আয়ুর্ব্বেদের বর্ত্তমান অবস্থার পর্য্যালোচনা করিব। এ পর্য্যন্ত আয়ুর্ব্বেদসম্বন্ধে যে সকল মধুময় কথা বলিয়াছি, তাহা শ্রুতিপথে প্রবেশ করিয়া আপনাদের হর্ষ উৎপাদন করিয়াছে; কিন্তু এক্ষণে যাহা বলিব, তাহা বিষময় বলিয়া আপনাদের দুঃখ উৎপাদন করিবে,—এইরূপ আশঙ্কা করিতেছি। কিন্তু যদি আমরা কেবল গুণের দিকেই দৃষ্টি রাখি এবং দোষকে উপেক্ষা করি, তাহা হইলে আমাদের সে সকল দোষ কখনই সংশোধিত হইবে না। অপিচ এরূপ করিলে আপনারা কৃপা করিয়া আমাকে যে দায়িত্বপূর্ণ মহৎ পদে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত সম্মান করা হইবে না, বরং অবমাননা করা হইবে। সুতরাং এক্ষণে আমি যাহা বলিব, তাহা অপ্রিয় হইলে আমাকে ক্ষমা করিবেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আয়ুর্ব্বেদ জগতের যাবতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের মূলভূত। অন্যান্য চিকিৎসা শাস্ত্রকে এই মহান্ আয়ুর্ব্বেদ-বৃক্ষের

শাখাজাত ক্ষুদ্র বৃক্ষস্বরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে।' ভারতের অতীত গৌরবের বিষয় আলোচনা করিলে আমাদের মনে যেরূপ সুমহান্ আনন্দের উদয় হয়, আয়ুর্ব্বেদের বর্ত্তমান দুরবস্থার বিষয় আলোচনা করিলে সেইরূপ ক্ষোভে দুঃখে ও লজ্জায় হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়ে। আয়ুর্ব্বেদ হইতে মূলসূত্র সংগ্রহ করিয়া পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বহু কাল ধরিয়া কত কষ্ট স্বীকার করিয়া অজস্র অর্থব্যয় করিয়া সুদৃঢ় অধ্যবসায়ের ফলে কতই না উন্নতি সাধিত করিয়াছেন! আর আমরা স্বার্থ-পরতা, অবহেলা ও অশ্রদ্ধায় অন্ধ হইয়া আমাদের সেই জাতীয় গৌরব আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রকে কঙ্কালমাত্রে পর্য্যবসিত করিয়া তুলিয়াছি। ভাষায় এমন কথা নাই, কথার এমন শক্তি নাই, শক্তির এমন বিকাশ নাই যে—এই মর্ম্মভেদী দুঃখকাহিনী প্রকাশ করিয়া বলা যাইতে পারে!

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য যেরূপ স্বার্থত্যাগ, বিপুল চেষ্টা এবং অপেক্ষণীয় ক্লেশ স্বীকার করিবার শক্তি আবশ্যক, সে শক্তি এক্ষণে আমাদের নাই। শারীর তত্ত্বে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে শবব্যবচ্ছেদ যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা আয়ুর্ব্বেদে স্পষ্ট কথিত হইয়াছে। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ এক্ষণে শবব্যবচ্ছেদ করেন না বলিয়া শারীরতত্ত্বে তাঁহাদের ব্যুৎপত্তির অভাব ঘটিয়াছে। আমাদের শারীর বিজ্ঞান যাহা পাওয়া যায়, তাহা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ এবং শল্যতন্ত্রে যাহা গ্রন্থবদ্ধ আছে, তাহা অকিঞ্চিৎকর। সকল ক্রিয়ার শ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ বস্তিপ্রয়োগে এক্ষণে আমরা অক্ষম। অধিক কি, এই সকল অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় না জানিয়াও চিকিৎসা-কার্য্যে উদ্যত হইয়া আমরা বিজ্ঞান-জ্যোৎস্না-সমুদ্ভাসিত নানা চিকিৎসোপায়সমলঙ্কৃত যুগে বিশেষজ্ঞ পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগের এবং অন্যান্য বিবেচক ব্যক্তির নিকট উপহাসাস্পদ হইয়া পড়িয়াছি। ইহা কি আমাদের পক্ষে বিশেষ লজ্জাকর নহে? আমরা আয়ুর্ব্বেদানুসারী চিকিৎসক বলিয়া বৈদেশিক চিকিৎসকদিগের শারীর শল্যতত্ত্বাদি সরল ও সুলভ রীতিযুক্ত হইলেও তাহা আমাদের জ্ঞাতব্য বলিয়া মনে করি না; অথচ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রোক্ত বহু বিষয়ে আমাদের জ্ঞানের অভাব ঘটিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে রোগীর জীবনমরণের ভার লইয়া অবৈজ্ঞানিক পথ আশ্রয় করিয়া আমরা কি পূজনীয় মহর্ষিদিগের তপস্যার ফলভূত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের অবমাননা করিতেছি না এবং পরমার্থতঃ অপরাধী হইতেছি না? শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে;—

শাস্ত্রং গুরুমুখোদ্গীর্ণমাদায়োপাস্য চাসকৃৎ।
যঃ কর্ম্ম কুরুতে বৈদ্যঃ স বৈদ্যোঽন্যে তু তস্করাঃ॥

অনুবাদঃ—গুরুর মুখ হইতে সমগ্র শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণ করিয়া এবং তাহা বারংবার অনুশীলন করিয়া যে বৈদ্য চিকিৎসা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সেই প্রকৃত বৈদ্য; অন্যকে তস্কর বলিয়া জানিবে।

শরীরাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রসমূহের বিষয় অবগত না হইয়া, শস্ত্রচিকিৎসা ও বস্তিকর্ম্মাদিশিক্ষা না করিয়াও আমরা যে এখনও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক বলিয়া গণ্য হই, সে কেবল আয়ুর্ব্বেদের ভেষজবিজ্ঞানের মহত্ত্ববশতঃ। আয়ুর্ব্বেদোক্ত ভেষজবিজ্ঞান জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, পরিবর্ত্তনশীল নহে; এবং দেশ, কাল, পাত্রভেদে উপযোগী। অন্য দেশের ভেষজবিজ্ঞান আয়ুর্ব্বেদোক্ত ভেষজবিজ্ঞানকে কখনও

পরাভূত করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। এই ভেষজবিজ্ঞান সংস্কারের পূর্ব্বে, শবব্যবচ্ছেদাদি দ্বারা শারীরতত্ত্ববিজ্ঞানের জন্য আমাদের যথেষ্ট অধ্যবসায়ের সহিত মহান্ আয়াস স্বীকার করা আবশ্যক। পঞ্চকর্ম্মের একমাত্র বিরেচনই আমরা প্রয়োগ করিয়া থাকি, কিন্তু তাহাও অসম্পূর্ণ ভাবে; আয়ুর্ব্বেদোক্ত ছয় শত বিরেচনের মধ্যে এক্ষণে পাঁচ ছয়টীর অধিক ব্যবহৃত হয় না। অবশিষ্টগুলি কেবল গ্রন্থের শোভাবর্দ্ধন করিয়া থাকে মাত্র—কদাপি প্রযুক্ত হয় না। বিরেচন যে এক্ষণে যথাবিধি প্রয়োগ করা হয় না—তাহা নিম্নলিখিত বচনের দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। যথা :—

স্নিগ্ধায়, স্বিন্নাবান্তায় দাতব্যস্তু বিরেচনম্।
অন্যথা যোজিতং হ্যেতদ্ গ্রহণীগদকৃন্মতম্॥

অনুবাদঃ—রোগীকে স্নেহ প্রয়োগ করিয়া, পরে স্বেদ প্রয়োগ করিয়া, পরে বমি করাইয়া, তৎপরে বিরেচন প্রয়োগ করিবে। অন্যথা করিলে গ্রহণীগত রোগ জন্মিয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদের ভেষজবিজ্ঞান এতই উন্নতি লাভ করিয়াছিল যে সদ্যোমারাত্মক কৃষ্ণসর্পবিষও ঔষধের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। সর্পবিষ উপযুক্তরূপে প্রযুক্ত হইলে মৃতপ্রায় ব্যক্তিকেও ও যে পুনরুজ্জীবিত করে, আমরা তাহা বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে বিষপ্রয়োগকুশল চিকিৎসক ক্রমেই বিরল হইতেছে।

শালাক্য, অগদ, কৌমারভৃত্য, রসায়ন ও বাজীকরণ তন্ত্রও অধুনা যথাবিধি অভ্যাস করা হয় না। ঐ সকল তন্ত্রের অপ্রচলনহেতু আয়ুর্ব্বেদবিদ্যা সাধারণের পক্ষে অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়িতেছে, ইহা নিতান্তই আক্ষেপের বিষয়। এই সকল তন্ত্রের সুপ্রচলনের জন্য আমাদের যথেষ্ট যত্ন করা কর্ত্তব্য।

পরিতাপকর হইলেও একটি অনুপেক্ষণীয় বৃত্তান্ত আমার স্মৃতিগোচর হইতেছে। আমার পরিচিত জনৈক রাজবৈদ্য শিবিকারূঢ় এবং অনুচরবেষ্টিত হইয়া কোন রোগীর চিকিৎসার্থ দূরদেশে যাইতে ছিলেন। পথে কোন গ্রামে কতকগুলি নিতান্ত উৎকণ্ঠিতচিত্ত গ্রামবাসীকে দেখিতে পাইলেন। এদিকে ঐ লোকগুলি কবিরাজ মহাশয়ের দেখা পাইয়া গ্রামস্থ কোন আসন্নপ্রসবা স্ত্রীলোক প্রসব বেদনায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে—এই কথা তাঁহাকে নিবেদন করিল এবং অত্যন্ত কাতরভাবে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। জনিষ্যমান বালকের এক হস্ত যোনিবিবরপথে নির্গত হইয়াছিল, সুতরাং চিকিৎসকের সাহায্যব্যতীত প্রসবের কোন উপায় ছিল না। এ দিকে দশ ক্রোশের মধ্যে কোন চিকিৎসক পাওয়া যায় না। এই বিষয় জানাইয়া তাহারা বলিল,—আপনি কৃপাপূর্ব্বক গর্ভিণীকে প্রসব করাইয়া দুইটী প্রাণীর প্রাণ রক্ষা করুন। কবিরাজ মহাশয় সেই করুণ আহ্বান শুনিয়া ও এইরূপ ব্যাপারে নিজের শক্তিহীনতা স্মরণ করিয়া আন্তরিক কষ্ট অনুভব করিলেন এবং লজ্জা ত্যাগ করিয়া নিজের অসামর্থ্যের বিষয় গ্রামবাসীদিগকে বিজ্ঞাপিত করিলেন। কিন্তু গ্রামবাসীগণ মনে করিল যে আমরা রাজবৈদ্যের উপযুক্ত অর্থদান করিতে অক্ষম বলিয়া কবিরাজ মহাশয় আমাদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে অসম্মত হইতেছেন। সুতরাং তাহারা কবিরাজ মহাশয়ের কথায় বিশ্বাস না করিয়া গর্ভিণীকে দেখিবার জন্য তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতে লাগিল। অগত্যা কবিরাজ মহাশয় ভীতচিত্তে গ্রামবাসীদিগের সহিত যাইয়া সেই অভাগিনী গর্ভিণীকে দর্শন

করিলেন। কিন্তু দেখিয়া কি হইবে? কবিরাজ মহাশয় গর্ভিণীর নাড়ী পরীক্ষা করিলেন, পরে নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে গ্রামবাসীদিগকে বলিলেন যে—আপনারা ইহাকে আমাদের রাজপুরের ডাক্তারখানায় লইয়া যান; সেখানকার ডাক্তারবাবু ইহাকে প্রসব করাইবেন। কি পরিতাপের বিষয়! সম্মুখে দুইটি প্রাণী মরণোন্মুখ, নিকটে চিকিৎসক; কিন্তু চিকিৎসক শক্তিহীন। যে বৃত্তান্ত আজ আপনাদের সমক্ষে বিবৃত করিলাম, তাহা বিবেচনা করিয়া আপনারা বিচার করুন যে—এরূপ অবস্থায় পতিত শরণবিহীনা দরিদ্রা রমণীকে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক স্বয়ং সাহায্য করিতে অক্ষম হইয়া যদি পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন, তবে আয়ুর্ব্বেদের গৌরব কোথায় রহিল? আর এরূপ চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষারই বা সার্থকতা কি?

ঔষধ প্রস্তুতের জন্য আবশ্যক নানাপ্রকার ধাতু ও উদ্ভিজ্জের নাম এক্ষণে গ্রন্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। সে গুলির অধিকাংশই আমরা চিনি না এবং ব্যবহার করি না। সুতরাং যে সকল রোগ ঐ সকল অজ্ঞাত ধাতু বা ওষধির দ্বারা সহজে নিরাকৃত হইতে পারিত, সে গুলির নিরাকরণ করা সংপ্রতি আমাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য, ক্ষেত্রবিশেষে অসাধ্যও হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাংঐ সকল দ্রব্যের স্বরূপজ্ঞান এবং প্রাপ্তির উপায়ের জন্য আমাদের যথোপযুক্ত চেষ্টা করা উচিত।

আরও দেখুন, অধুনা যে সকল মুদ্রিত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ পাওয়া যায়, সে গুলি শব্দতঃ ও অর্থতঃ অত্যন্ত ভ্রমবহুল বলিয়া পাঠার্থীদিগের ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়া থাকে। সুতরাং সে গুলিকে ভ্রমরহিত করিয়া মুদ্রিত করা নিতান্ত আবশ্যক। অনতিপ্রাচীন টীকাকারগণের টীকায় প্রমাদ বা অজ্ঞানতাবশতঃ অথবা চিকিৎসা-শাস্ত্রের অনুপযোগী হইলেও ব্যাকরণ ও তর্কশাস্ত্রাদিতে স্বকীয় ব্যুৎপত্তি দেখাইবার আগ্রহবশতঃ অনেক ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। ইহাতে পাঠার্থীদিগের বুঝিবার সুবিধা না হইয়া অসুবিধাই হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ সকল টীকাকারদিগের পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়াছে বলিতে হইবে।

চিকিৎসা-কার্য্যের উপযোগী আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলিকে আমাদের প্রীতির চক্ষে দেখা কর্ত্তব্য। যদি আমরা প্রাচীনদিগের প্রতি ভক্ত্যাতিশয্যবশতঃ আধুনিক প্রয়োজনীয় আবিষ্কারের প্রতি দৃষ্টিপাত না করি, তাহা হইলে আমরা অবনত ব্যতীত উন্নত হইতে পারিব না। আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি যে পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রকে বিশেষ উন্নত করিয়াছে, তাহা বিবেচক ব্যক্তিমাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। আমি ঐ সকল আবিষ্কারের মধ্যে কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় আবিষ্কারের বিষয় এবং তাহাদের উপযোগিতার বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। (১) এক্স রে যন্ত্র (X' Ray apparatus) ইহা এক প্রকার আলোক। এই আলোকের সাহায্যে শরীরের অন্তর্নিহিত শল্য (বন্দুকের গুলি প্রভৃতি) দেখা যায় এবং অভ্যন্তরীণ ভগ্ন স্থান বা সন্ধিচ্যুতি সহজেই লক্ষ্য করা যাইতে পারে।

(২) অক্সিজেনের শ্বাসগ্রহণ oxygen inhalation), বায়ুস্থিত অক্সিজিন আমরা নিয়ত গ্রহণ করিতেছি, তদভাবে এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারি না। নিউমোনিয়া, অতিরিক্ত রক্তস্রাব, অত্যন্ত রক্তহীনতাপ্রভৃতি

রোগে যখন শরীরে অক্‌সিজেনের অভাব ঘটিয়া মৃত্যু হইবার আশঙ্কা হয়, তখন অক্‌সিজেনের শ্বাস গ্রহণ দ্বারা জীবন রক্ষা হইয়া থাকে।

(৩) উপশিরা বা চর্ম্মভেদ করিয়া লবণ জল প্রয়োগ (Saline injection intravenous and subcutaneous)—কলেরা-রোগে শরীরস্থ জলীয়াংশ এবং লবণ অতিরিক্ত পরিমাণে নির্গত হইয়া যায় বলিয়া সত্বর মৃত্যু ঘটে। উপশিরা (Vein) কিম্বা চর্ম্মভেদ করিয়া লবণজল প্রয়োগ করিলে অনেক সময় ঐ করাল রোগের কবল হইতে রোগীর প্রাণ-রক্ষা করা যাইতে পারে। সহসা অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলে ঐরূপে লবণজল প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

(৪) 'এমিটিন'নামক ঔষধ :—এমিবা (Amoeba) নামক এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র জীবাণু আছে এবং তাহারা মানব শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া এক প্রকার প্রবাহিকা রোগ উৎপন্ন করে। উহাকে জীবাণুজাত প্রবাহিকা (Amoebic dysentery) বলা যায়। সূক্ষ্মমুখ পিচকারী দ্বারা চর্ম্ম ভেদ করিয়া এমিটিন (Emetine) প্রয়োগ করিলে আশ্চর্য্য উপকার হয়।

৫। ডিপথিরিয়া বিষনাশক ঔষধ (Diphtheria Antitoxin) :—ডিপথিরিয়া নামক এক প্রকার গলরোগ আছে, সম্ভবতঃ উহা আয়ুর্ব্বেদোক্ত রোহিণী-রোগ। এই রোগ পূর্ব্বে অত্যন্ত মারাত্মক ছিল। আয়ুর্ব্বেদেও এইরূপ উল্লেখ আছে। কিন্তু এই ঔষধ আবিষ্কৃত হইবার পর ঐ রোগে শতকরা পাঁচজনের অধিক রোগীর মৃত্যু হয় না।

৬। কলি ভ্যাকসিন (Colli Vaecine) সূতিকা র এবং সেপটী সেমিয়া (Sceptic œmia) নামক শোণিতবিষাক্তকারক রোগে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। ইহা জীবাণু তত্ত্বসম্বন্ধে গবেষণার একটী মধুময় ফল।

রোগনির্ণয়ের জন্য যে সকল যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে গুলিও যথাসম্ভব আমাদের ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ঐ সকল যন্ত্রের মধ্যে ষ্টিথেস কোপ (Stethescops) নামক বক্ষঃপরীক্ষার যন্ত্র, রক্তসঞ্চালনের চাপ নির্ণায়ক যন্ত্র এবং অনুবীক্ষণযন্ত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে সকল ব্যাধি জীবাণুজাত সেই ব্যাধি নির্ণয়ের জন্য অনুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই। কিন্তু এই প্রস্তাবটি আমাকে সভয়ে করিতে হইতেছে। কেন না যাঁহারা প্রাচীন মতরক্ষার পক্ষপাতী তাঁহারা হয়ত ইহাতে আপত্তি করিতে পারেন।

বৈদেশিকদিগের উদ্ভাবিত আরও নানা প্রকার প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি আছে; কিন্তু অবসরাভাবে এবং আপনাদিগের ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কায় তাহা বলিতে ইচ্ছা করি না। এক্ষণে আপনাদিগের নিকট আমার সাগ্রহ নিবেদন এই—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের বিকল অঙ্গসমূহের পরিপোষণের জন্য আমাদের বিগতমৎসর হইয়া ও কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া বিজ্ঞানসম্মত সমুদায় সত্যগ্রহণপদবী নির্ভয়ে অনুসরণ করিয়া উদার মত অবলম্বনপূর্ব্বক সর্ব্বথা প্রযত্নপর হওয়া উচিত। পূর্ব্বকালে আমাদের দেশবাসিগণ এইরূপ ক্ষেত্রে লব্ধমহোৎকর্ষ বৈদেশিকদিগের নিকট শিষ্যজনোচিত সারল্যসহকারে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক মাৎসর্য্য ত্যাগ করিয়া অজ্ঞাত বিষয় শিক্ষা করিতেন। তাহাতে লজ্জাই কি, আর ভয়ই বা কি! মহাজন বলিয়াছেন :—'সর্ব্বতো জয়মন্বিচ্ছেৎ শিষ্যাদিচ্ছেৎ পরাজয়ম্।' অর্থাৎ সর্ব্বত্র জয়

ইচ্ছা করিবে, কিন্তু শিষ্যের নিকট পরাজয় ইচ্ছা করিবে।

এক্ষণে একটি গুরুতর বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আমি আমার প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সম্প্রতি ডাক্তার কৃষ্ণ স্বামী আয়ার মহোদয় মান্দ্রাজ মেডিকেল কৌন্সিলের নিকট যেরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা অত্যন্ত পরিতাপজনক। মান্দ্রাজপ্রদেশবাসী জনৈক দয়ালু এবং সদাশয় মহাত্মা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত দাতব্য আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়ের ডাক্তার আয়ার মহোদয় একজন গভারণর (Governor) ছিলেন। এই অপরাধে 'মান্দ্রাজ মেডিকেল কৌন্সিল' তাঁহার নাম রেজিষ্টারী ভুক্ত ডাক্তার দিগের নাম হইতে কাটিয়া দিয়াছেন। কলিকাতায় রায় ভগবানদাস বগলা বাহাদুরের স্থাপিত এইরূপ একটি ঔষধালয় আছে, এবং তাহাতে এলোপ্যাথি ও আয়ুর্ব্বেদীয় দুইটি বিভাগ আছে। ডাক্তার গুওার্সের ন্যায় ব্যক্তি, এই ঔষধালয়ের অন্যতম গভরর্ণর ছিলেন এবং আয়ুর্ব্বেদীয় ও এলোপ্যাথি উভয় বিভাগেরই পরিদর্শক-শস্ত্রচিকিৎসকের কার্য্য (Surgeon-superintendent) তিনিই করিতেন। এক্ষণে ডাক্তার ক্যাডি তাঁহার স্থলে নিযুক্ত হইয়াছেন। ডাক্তার ক্যাডি আয়ুর্ব্বেদীয় বিভাগের তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন করেন বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে কি কোন ব্যক্তি কোন কথা বলিতে পারে?

উন্নতিশীল পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদের এইরূপ নির্ব্বাসনদণ্ড ব্যবস্থা করিয়া কখনই লাভবান্ হইতে পারেন না। প্রকৃত বিজ্ঞানামোদী ব্যক্তি উদারচিত্ত এবং অধিক জানিবার জন্য আগ্রহশীল হইয়া থাকেন। তাঁহার চিত্ত নূতন জ্ঞান-জ্যোতি লাভ করিবার জন্য সর্ব্বদা উৎসুক। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ কি বলিতে পারেন যে—তাঁহারা জীব-জগৎ ও উদ্ভিজ্জজগৎ অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদের ভেষজ-বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছেন? ইহার উত্তরে তাঁহারা নিশ্চয়ই 'না' বলিতে বাধ্য। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ যে প্রত্যেক রোগ বিশেষতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশের রোগ প্রশমন করিতে পারেন না এই অভিজ্ঞতা তাঁহাদের নিত্যই লাভ হয়। অপর দিকে বায়ুরোগ, (Nervous disease), পক্ষাঘাত, উন্মাদ, চর্ম্মরোগ, পুরাতন জ্বর, অতিসার, প্রবাহিকা, কুষ্ঠ, মূত্ররোগ প্রভৃতিতে তাঁহারা একেবারেই অকৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। কিন্তু এই সকল রোগের আবশ্যক শস্ত্রপ্রয়োগব্যাপারে তাঁহারা যে সিদ্ধহস্ত তাহা, মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে হয়। যদি প্রতীচ্য চিকিৎসা-শাস্ত্র এই সকল রোগ প্রতিকারে সমর্থ হইয়া মনুষ্য জাতিকে দুঃখভোগ হইতে অব্যাহতি দিতে পারে, কাহারও সে সম্বন্ধে আপত্তি হইতে পারে না। চিকিৎসার ন্যায় মহৎ বিষয় যাঁহাদের জীবিকা সে সকল ব্যক্তিরত কথাই নাই। আমি আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে—কলিকাতা-মহানগরীতে এমন অনেক সুপ্রসিদ্ধ এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক আছেন—যাঁহারা বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ, যথা—পারদজাত সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ মকরধ্বজ, গুলঞ্চ, কালমেঘ, কুড়চি, অশ্বগন্ধা প্রভৃতির সার (Extract) ব্যবহার করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে আমার ভক্তিভাজন শিক্ষক মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল, অনারেবল সার্জ্জেন জেনারেল স্যার পার্ডে লিউকীস্ মহোদয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'বেঙ্গল কেমিকেল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্' নামক কারখানায় যেরূপ

প্রচুর পরিমাণে ঐ সকল দেশীয় ঔষধের সার প্রস্তুত করা হয়, তাহাতেই বুঝা যায় যে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ এ সকল ঔষধ কত অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন।

সংপ্রতি 'কিং এডওয়ার্ড মেডিক্যাল স্কুলে'র সংলগ্ন হুকুমচাঁদ লেবরেটারী এবং পাঠাগার উন্মোচন ব্যাপারে স্যার পার্ডে লিউকীস্ মহোদয় তাঁহার বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"I wish to impress upon you most stongly that you should not run away with the idea that every thing that is good in the way of medicine is contained within the ringfence of Allopathy or Western Medical science. The longer I remain in India and the more I see of the country and the people, the more convinced I am, that many of the empirical methods of treatment adopted by the Vaids and Hakims are of the greatest value, and there is no doubt whatever that their ancestors knew, ages ago, many things which are now-a-days being brought forward as new discoveries; for instance during the last few years, that there has been a cosiderable amount of talk about what is known as 'dechlarination' that is to say, that depriving of the system of salt. This arose from certain experiments carried out by Wival and Javal, as a result of which it is recognised that in all cases of dropsy the greatest benefit can be obtained by restricting your patients to an entirely salt free dietary. This was known thousands of years ago in the East and Vaid or Hakin could have told you, long before Wival and Javal made their experiments, that 'salt is contraindicated in all dropsical affections.

অনুবাদ:—"আমি আপনাদিগকে বিশেষ ভাবে ধারণা করিয়া দিতে চাই যে—ঔষধ সম্বন্ধে যাহা কিছু ভাল, তাহা এ্যালোপ্যাথি বা পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রের গোস্পদের মধ্যে আছে,—আপনারা এরূপ মনে করিবেন না যতই অধিক দিন আমি ভারতবর্ষে থাকিতেছি এবং বিভিন্ন প্রদেশ ও তত্রত্য অধিবাসিগণকে দেখিতেছি আমি ততই বুঝিতেছি যে বৈদ্য ও হাকিমদিগের অভিজ্ঞতামূলক চিকিৎসা বিশেষ মূল্যবান্। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বহু পূর্ব্বে যাহা জানিতেন, অধুনা সেরূপ অনেক বিষয় নূতন আবিষ্কার বলিয়া ঘোষিত হইতেছে; সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রমাণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে—বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ রোগীকে লবণ বন্ধ করিয়া চিকিৎসা করা সম্বন্ধে অনেক বাগ্বিতণ্ডা চলিতেছিল। ওয়াইভেল এবং জেভেল নামক চিকিৎসকদ্বয় পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন যে—লবণবিহীন পথ্য দ্বারা শোথরোগে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে এবং তাহাই পূর্ব্বোক্ত বাগ্বিতণ্ডার কারণস্বরূপ হইয়াছিল। ভদ্র মহোদয়গণ, ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই তথ্য প্রতীচ্য দেশবাসিগণ অবগত ছিল এবং ওয়াইভেল ও জাভেলের পরীক্ষার বহুপূর্ব্বে যেকোন বৈদ্য বা হাকিম্ বলিতে পারিত যে—সর্ব্বপ্রকার শোথরোগে লবণ অহিতকর।"

শিশুর উদরাময় চিকিৎসা।

(ঠাকুরমা ও নাতনী)

—:*:—

লীলা। ঠাকুরমা, আমি এসেছি।

ঠাকুরমা। কে লীলা নাকি?

লী। হাঁ ঠাকুমা, চোখে দেখ্তে পাওনা নাকি?

ঠা। চোখের আর দোষ কি দিদিমণি? আজ প্রায় একশত বৎসর হতে চল্‌লো প্রভু-ভক্ত ভৃত্যের মত খেটেছে। এখন ওর অবসরের সময় হয়েছে।

লী। সংসারের সব দেখে কি তোমার তৃপ্তি হয়েছে, ঠাকুমা?

ঠা। হয়েছে বৈকি ভাই। বাল্যকাল হ'তে আকাশের নীলিমা, বনস্থলীর শ্যামিকা পূর্ণচন্দ্রকরালোকিত রজনীর সৌন্দর্য্য দেখে আসছি; তার পর কিশোর বয়সে যখন বিবাহ হ'ল তখন দেখলাম, জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্য স্বামীর চন্দ্রবদনে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, তারপর পুত্র কন্যার আর তোমাদের চাঁদ মুখ দেখলাম। এখন বাহ্যদৃষ্টি আর ভাল লাগে না।

লী। ঠাকুর দাদার জন্যে কি এখনও তোমার মন কেমন করে ঠাকুমা?

ঠা। কেন করবে দিদিমণি? নশ্বর দেহ ত্যাগ করেছেন বলে তিনি কি আমায় ছেড়ে যেতে পেরেছেন। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে সর্ব্বদা তাঁকে অন্তরে দেখতে পাচ্ছি। তাই বলছিলাম যে বাহ্যদৃষ্টি আর ভাল লাগে না।

লীলা। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে স্বামীকে না পেলে কি তৃপ্তি হয় দিদিমা?

ঠা। হয় বৈকি ভাই। যখন অন্তদৃষ্টি লাভ করা যায় তখন হয়। জীবনে এমন এক দিন গেছে, যখন স্বামীর একটী চুম্বন পাবার জন্যে ব্যাকুল ভাবে কত রাত জেগে প্রতীক্ষা করে বসে থাকৃতাম, কিন্তু এখন আর চুম্বন আলিঙ্গনের আকাঙ্ক্ষা নাই, বাহ্য প্রেম চলে গেছে। মরা সোণার খাদ কেটে গিয়েছে। এখন অন্তরে সর্ব্বদা স্বামীকে দেখতে পাই, কিন্তু প্রেমের আকুলতা ব্যাকুলতা নাই—এবে বিরহ শূন্য, ধীর, শান্ত, স্থির প্রেম। এখন আর দৃষ্টি সানুরাগে স্বামীর মুখ পদ্মে বিন্যস্ত হয় না—কেবল তাঁর সর্ব্বতীর্থময় চরণ দুখানির উপর পড়ে থাকে, আর চরণ দুখানি থেকে যে একটা সূক্ষ্ম জ্যোতি নির্গত হয়ে বিশ্বপিতার চরণ ধূলিতে সংযুক্ত হয়েছে, চক্ষু সেই দিকে লোলুপ ভাবে চেয়ে থাকে।

নী। (পদধূলি লইয়া) ঠাকুরমা, আশীর্ব্বাদ কর—যেন তোমার মত পতিভক্তি পাই।

(প্রফুল্লের প্রবেশ)

প্র। বেশ, পরকালের দিকেই খরদৃষ্টি দেখছি যে ইহকালের কাজটা বুঝি ভুলে গেলে?

লী। ভয় নেই তোমার। এইবার ইহকালের কথা পাড়চি। দেখ ঠাকুমা সেবারেতে তোমার দয়ায় ছেলে দুটো রক্ষে পেলে। এবার আবার দুটোর পেটের অসুখ নিয়ে ভুগছি। কিছুতেই ভাল হয় না।

ঠা। কি রকম হয় বল্ দেখি?

লী। ছোট খোকার রোজই ৬।৭ বার করে পাতলা দাস্ত হয়, রাতেও ২।১ বার হয়। আর বড়খোকার রোজ ৩।৪ বার করে দাস্ত,

কখন পাতলা, কখন ভসকা ভসকা, আবার কখন বাঁধা মলও দেখা যায়।

ঠা। বাহ্যের চেহারা কেমন?

লী। ছোট খোকার হলদে রঙ্গের বাহ্যে হয়, আর বড় খোকার কখন হলদে, কখন মেটে, মেটে কখন শাদাটে, কখন বা শাক-ছেঁচানির মত বাহ্যে হয়।

ঠা। ওদের বয়েস কত হয়েছে রে?

লী। ছোট খোকা এই মোটে এক বছরের হল, আর বড় খোকার এই পৌষে আড়াই বছর পূরবে।

ঠা। কি খেতে দিস্?

লী। ডাক্তারে যখন যা বলে, জল বার্লি, বেঞ্জারস্ ফুড্, হরলিকের মল্‌টেড্ মিল্ক—এই সব।

ঠা। দুধ দিস্ না?

লী। না, ডাক্তারে দুধ একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে। ছোট খোকাকে কখন কখন একটু আধটু দেয়।

ঠা। ছোট খোকা কি মাই খায়?

লী। খেত; ডাক্তারে মাই দিতে বারণ করেছে।

ঠা। কেন?

লী। (নিরুত্তর)।

ঠা। পোয়াতি হয়েছিস বুঝি?

লী। হাঁ।

ঠা। তা হলে মাই দিসনে।

লী। কিন্তু খোকা বড় কাঁদে, এক আধবার না দিলে চলে না।

ঠা। তা দিস্, দুধ খুব করে গেলে ফেলে তার পর মাই দিবি। তাও যত কম হয় ততই ভাল।

লী। কেউ কেউ বলে—মাইতে তেতো মাখিয়ে রাখলে আর মাই খাবে না।

ঠা। না তা করিস্ নে। যাদের মাই খাবার বড় ঝোঁক, তাদের ঐ রকম জোর জবরদস্তি করে মাই ছাড়ালে ছেলে একেবারে মনমরা হয়ে থাকে। আর তাতে করে খুব অসুখও হ'তে পারে। তা না করে যে রকম বল্লাম অম্‌নি করে মাই দিস্।

লী। তার পর কি পথ্যি দেব বল?

ঠা। ছোট খোকার দাঁত উঠেছে কয়টা?

লী। উপরে চার্‌টে নিচে চার্‌টে।

ঠা। ভাত হবার পর থেকে ভাত খেতে দিস্?

লী। না ভাতত দিইনে।

ঠা। অন্যায় করেছিস্। শাস্ত্রে যে ভাত দেয়ার বিধি আছে, তার মানে যে সেই সময় থেকে শিশুকে ভাত খেতে দেওয়া উচিত।

লী। ডাক্তার বলে বার্লি দিলেই হবে।

ঠা। তা বটে, চাল, যব, গম একই জাতের; তবে আমাদের দেশে বহুকাল থেকে যা চলে আসছে, সেটা সয়ও ভাল আর খরচ ও কম হয়, পয়সাগুলোও দেশে থাকে।

লী। তুমি যা বলবে আমি তাই দেব।

ঠা। তা ভাতই দিস্। তবে বার্লি দিলেও ক্ষতি নাই, ওটা দেশে চলে গেছে। তবে বার্লি দিতে হলে ভাল বার্লি দিতে হয়। বাজারে অনেক বার্লিতে চালের গুঁড়ো মিশায়।

লী। আচ্ছা ঠাকুমা, তুমিত বলছ—ভাত দিতে; তবে চালের গুঁড়ো মিশালে ক্ষতি কি?

ঠা। কচি ছেলেদের একটু ভাল পুরাণ চালের ভাত দিতে হয়। ওরা যে চাল দেয় সেটা একেবারে জঘন্য। ভাল চাল দিলে ক্ষতি ছিল না।

লী। কিন্তু দেখ ঠাকুমা, তুমিত বলছ

ভাল চাল দিতে, কিন্তু আমাদের বাড়ীর পাশে আমাদের এক জন পাইক থাকে তারা জাতে পোদ। তার একটী এক বছরের ছেলেকে খুব মোটা রাঙা চালের ভাত দেয়, ছেলেটাও কোঁত কোঁত করে গেলে।

ঠা। তাতো হবেই দিদি! মানুষের যার যেমন অবস্থা, ভগবান্ তাকে তেমনি সয়বার শক্তি দিয়েছেন। শুধু খাওয়া কেন শীতের সময় তোমার খোকাটীকে গরম জামা কাপড়ে সাজিয়েও তোমাদের ভয় হয়—পাছে ঠাণ্ডা লাগে, কিন্তু পোদের সেই ছেলেটী এখনি পাতলা সুতোর কাপড় গায়ে দিয়ে অনায়াসে শীত কাটিয়ে দেয়। ভগবানের এ দয়া না থাকলে কি সৃষ্টি থাকত?

লী। ঠিক কথা ঠাক্‌মা। এখন ভাত কি করে দেব বল?

ঠা। বল্‌ছি, আগে বার্লির কথা বলি। বার্লি দিতে হলে খুব ভাল বার্লি দিতে হবে। এক রকম আস্ত বার্লি পাওয়া যায়, তাকে 'পার্ল বার্লি' বলে। সেই বার্লি সিদ্ধ করে দিলে খুব ভাল হয়।

লী। আচ্ছা ঠাকমা, বিলিতী বার্লির মত কোন জিনিষ কি আমাদের দেশে নেই?

ঠা। আছে বৈকি ভাই! আমাদের সোণার দেশে নেই কি? দেশে জিনিষ আছে, কিন্তু মানুষ নেই। ঐ শটী বলে যে একরকম গাছ আছে; কতকটা হলুদ গাছের মত আর হলুদের মত জিনিষ তার গোড়ায় হয়, সেই গুলি শুকিয়ে গুড়ো ক'রে বার্লির মত পাক করে খেতে দিলে ছেলেদের পেটের অসুখে খুব উপকার হয়। তা ছাড়া প্যান-ফলের পালো আছে একরকম কাঁচকলায় গুঁড়ো আছে, আরও কতকি আছে, কে তার সন্ধান করে! যদি কোন জ্ঞানী বড়লোক এই সব জিনিষ থেকে ছেলেদের জন্যে বার্লির মত একটা খাবার তৈয়ের করে, তা হলে অনেক লোক প্রতিপালন হয়, দেশের অনেক পয়সা বেঁচে যায়, আর যে করে তারও অনেক পয়সা হয়।

লী। হাঁ, ভাল কথা ঠাকমা। এরারুট কেমন জিনিষ?

ঠা। এরারুটও ছেলেদের পেটের অসুখে খুব উপকারী। বাহ্যে খুব কমিয়ে দেয়।

লী। তা যাক, সবত শুনে রাখলাম এখন ভাত কি করে দেব বল।

ঠা। বলি শোন ৩।৪—বছরের পুরাণ সরু চাল যোগাড় ক'রে বড় খোকাকে পোরের ভাত করে দিবি।

লী। পোরের ভাত আবার কি ঠাকমা?

ঠা। পোরের ভাত কি তাও জানিস্‌নে তোরা এমনই মেম্ বনে গেছিস্—শোন বলি। যাতে দরকার মত ভাতধরে এমন একটা ছোট ভাঁড় নিবি, আর চালগুলি বেশ করে বেছে ধুয়ে সেই ভাঁড়ে রাখবি, তাতে এমন জল দিবি যেন ফেন না থাকে, অথচ ভাত যেন বেশ সিদ্ধ হয়। তারপর কতকগুলি ঘুঁটে থাকে থাকে সাজিয়ে তাতে আগুণ ধরিয়ে দিবি, আর ভাঁড়টী তার উপর রাখবি। আর কিছুই করতে হবে না। শেষে বেশ সিদ্ধ হয়ে গেলে ভাতগুলি নামিয়ে নিবি।

লী। যদি নিত্য একরকম যোগাড় না হয় ঠাক্‌মা?

ঠা। যোগাড় হবে না কেন, চেষ্টা থাক্‌লেই যোগাড় হয়। নিতান্ত না হলে মাটীর হাঁড়িতে কাঠের জালে ভাত সিদ্ধ করে দিস্।

লী। মাছ তরকারী কি দেব?

ঠা। কচি কাঁচকলা আর ছোট কৈ, মাগুর, শিঙ্গি মাছের ঝোল; এছাড়া আর কিছু দিবিনে। তরকারী লঙ্কা কি ঘি দেওয়া হবে না। তাছাড়া যত কম তেলে রাঁধা যায়, ততই ভাল।

লী। তা শুধু এই তরকারী দিয়ে কি খাবে?

ঠা। অসুখ বিসুখ হলে আর উপায় কি! ঐ তরকারী দিয়েই ভুলিয়ে রাখতে হয়।

লী। এতে যদি অরুচি হয়?

ঠা। ছেলেপিলের প্রায়ই অরুচি হয় না। তবে নিতান্ত অরুচি হ'লে এটা সেটা দিতে হবে বৈকি। কিন্তু অন্য জিনিষের কথা বলছি ব'লে যেন গোড়া থেকেই দিস্‌নে। নেহাৎ দরকার বুঝ্‌লে তবে দিবি। অরুচি হ'লে একটু আধটু কুপথ্য দিয়েও রুচি করতে হয়।

লী। না তা দেব কেন। যদি নেহাৎ রাখতে না পারি, কি অরুচি হয়, দেখি তাহ-লেই দেব।

ঠা। হাঁ তাই করিস্‌। মসুর কি অড়হর দালের যূষ একটু আধটু দেওয়া চলে। কিন্তু কেবল যূষ একটা দাল যেন না থাকে। আর দালে মসলা যত কম দেওয়া যায় ততই ভাল। কেবল একটু নুন, হলুদ আর ধনে বাটা। তাই দিয়ে সিদ্ধ করে কাপড়ে ছেঁকে দিবি। তেল ঘির নামও নয়।

লী। আর তরকারী কি দেব?

ঠা। তরকারী আর কিছু না দেওয়াই ভাল, দিলে কুপথ্যি দেওয়াই হ'ল। তবে নেহাত দরকার হ'লে কোন দিন দুটো পল্‌তা বেগুণ সিদ্ধ করে দিলি। কোন দিন বা বেগুণ, কাচকলা আর কচি পটোলের তরকারী করে, কি ঐ সব তরকারী দিয়ে একটু গাঁদালের ঝোল ক'রে দিবি।

লী। গাঁদালের ঝোল কি ঠাক্‌মা?

ঠা। তোদের জ্বালায় জ্বালাতন বাপ্‌। গাঁদালের ঝোল কি তাও জানিসনে! গাঁদাল এক রকম লতানে গাছ। কোন কোন দেশে গন্ধভাদুলেও বলে। তারি পাতার সঙ্গে সিদ্ধ ক'রে ঝোল করলেই গাঁদালের ঝোল হ'ল।

লী। তরকারী আর কিছু নয় ত?

ঠা। না, তরকারী আর কিছু নয়। আর ঐ সব তরকারী যদি না খেয়ে চুষে ফেলে দেয়, তা হলে খুব ভাল হয়। হাঁ একটা কথা। ছাখ, -ভাতের সঙ্গে পাতি কি কাগ্‌জি লেবুর রস দিতে পারিস্‌। তাতে অরুচিও যায়, আর পেট ঠাণ্ডাও হয়।

লী। আচ্ছা, তরকারী ত হ'ল; এখন জলখাবার কি দেব বল?

ঠা। দাড়িম, বেদানা, পানফল, কেশুর সিঙ্গাপুরে কেশুর, কচি বেলপোড়া, পাকা গাব, বিলীতি গাব—যে গুলোকে 'ম্যাঙ্গোষ্টিন' বলে,—এই সব জিনিষ জলখাবার দিবি। তবে কেশুর টেশুরগুলো চিবিয়ে রস খেয়ে ছিব্‌ড়ে ফেলে দেওয়াই ভাল।

লী। অনেকে বেলের মোরব্বা দিতে বলে ঠাক্‌মা।

ঠা। আরে ওগুলো কিছুই নয়। বেলের মোরব্বা তৈয়ের কতে হ'লে বেল খণ্ড খণ্ড করে কেটে সিদ্ধ করে, তাতে আসল জিনি-ষটে বেরিয়ে যায়, থাকে কেবল ছিব্‌ড়েগুলো আর তার মধ্যে চিনির রস ভরে রাখে, ওর চেয়ে বেলপোড়া অনেক ভাল; আহার ওষুধ দুই হয়। তবে বেলপোড়ার সঙ্গে একটু চিনি মিশিয়ে দিলে ছেলেরা বেশ আনন্দে

খায়। আর একটা মনে রাখিস্ যে বেল যত কচি হয় ততই উপকারী।

লী। আচ্ছা, জলখাবার ত হ'ল। এইবার দুধের কথা বল।

ঠা। বাড়ীতে গরু করেছিস্ ত?

লী। হাঁ, সে আর বলতে। শুধু তাই নয় ঠাকুমা, গরু করে শ্বশুর বাড়ী আমার কত সুখ্যাত হয়েছে।

ঠা। কিরকম বল দেখি।

লী। আমার শ্বশুরেরা বড় গৃহস্থ, তাত জান ঠাকুমা। কোন তরকারীর খোলা, পাতের ভাত, এসব আগে ফেলা যেত। এখন সে সব গরুতে খায়, একটু কিছু ফেলা যায় না। বাগান থেকে রোজ দুজন মালি আসে, আমি তাদের ঘাস আনতে বলে দিয়েছি। তারা রোজ দুবোঝা করে ঘাস নিয়ে আসে। আর কিছু খড়, খোল ও দানা কিনতে হয়।

ঠা। কতগুলি গরু হয়েছে?

লী। গরু মোট ছ'টা। তিন তিনটের দুধ এক একবারে পাওয়া যায়। কাজেই বারমাস রোজ প্রায় ২০।২৫ সের করে দুধ হয়।

ঠা। তা হ'লে সংসারে একটা কাজ করেছিস্ বল।

লী। শোন না ঠাকমা, আগে দুধের জন্যে মাসে প্রায় দুশো টাকার কাছাকাছি খরচ হ'ত। এখন একশ টাকার বেশী হয় না।

ঠা। শুনে বড় আহ্লাদ হল লীলা। এই রকম গিন্নিপনাই ত চাই।

লী। আগে সব শোন। অনেক দুধ হচ্ছে দেখে যে দুধ খরচ হয়, তা বাদে যা থাকে, তাই নিয়ে আমি নানা রকম খাবার তৈয়ের করি। ছানা, ক্ষীর, সন্দেশ, ক্ষীরের পান্তুয়া, রাবড়ি, মাখন, ঘি,—এই সব। শ্বশুর, শাশুড়ী, ভাসুর, দেওর—এঁরা সেই সব খেয়ে বলেন—আর আমরা বাজারের খাবার খাবনা, বৌমার হাতের খাবার খাব। তা অত বড় সংসার ঠাকুমা, যাঁকে একদিন কিছু না দিতে পারি, তিনি সেই দিন রাগ করেন। শ্বশুর বলেন, বৌমাকে বল—আরও ছ'টা গরু পুষতে। কিন্তু বড় খাটতে হয় ঠাকুমা।

ঠা। এইত চাই দিদিমণি। সংসার কর্ম্ম-ক্ষেত্র। এ সংসারে যিনি না খেটে জীবন কাটিয়ে দিতে চান, তিনিত জেতেন না,—হারেন, সংসারে আত্মীয়-স্বজনদের—ছেলে, নাতি, জামাই, গুরুজনদের—স্বামী, শ্বশুর,ভাসুরদের যদি সুখী করতে না পারলাম, তবে এ মেয়ে-মানুষজন্ম বৃথায় গেল। তবে একটা কথা বলি দিদিমণি,—সংসারের ঝি চাকরদেরও একটু যত্ন করিস্। আমি যখন এবাড়ীতে আসি, তখন এদের এত বোল বলা ছিল না। রাম-প্রসাদ ব'লে একটা চাকর ছিল। তখন আমার দিদিমা বেঁচে। কোন ভাল খাবার এলে যখন তাঁরে দেওয়া হত, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করতেন—"রামপ্রসাদকে দেওয়া হয়েছে?" রামপ্রসাদকে না দিলে তিনি খেতেন না।

লী। ঠাকুমা, সে কথা বলতে হবে না। আমি কার নাতনী, সে কথা জান। সপ্তায় একদিন আমি খাবার দুভাগ করি। এক ভাগ বাবুদের জন্যে, আর একভাগ চাকরদের জন্যে। আর চাকর চাকরাণী কবে সেই দিন আসবে বলে হাঁ করে থাকে।

ঠা। শুনে বড় সুখী হলাম্ লীলা। আশীর্ব্বাদ করি—তুই সকলকে এমনি সুখী ক'রে নিজে চিরসুখী হয়ে পাকা মাথায় সিঁদুর পরিস্।

প্র। ঠাকুমা, এতক্ষণ মুখটী বুজে বসে আছি, কিন্তু এবার আর পাল্লেম না। তোমার নাত্নী সকলকে সুখী করেছেন বটে, কিন্তু আমাকে যে নিতান্ত অসুখী ক'রে তুলেছেন। সে দিকে কি তোমার একটু কৃপাদৃষ্টি পড়বে না ঠাকুমা?

ঠা। কেন ভাই, লীলা তোমায় কি অসুখী করেছে?

প্র। অসুখী নয় ঠাকুমা। সকালে ঘুম ভেঙ্গে লীলাকে খুঁজি, কোথায় লীলা! দুদিকে কেবল দুটো বালিষ। লীলা তখন গোয়ালঘর তদারক করছে। একটু বেলা হ'লে ভাবি— লীলা আস্‌চে, কোথায় লীলা! সে সংসারের একাজ সে কাজ নিয়ে ব্যস্ত। খাওয়ার সময় শুধু একবার তাকে দেখ্‌তে পাই। তার পর আর নয়। গভীর রাত্রে যখন সংসারের সকলে ঘুমিয়ে পড়ে, তখন লীলা খাবার নিয়ে আমার কাছে আসে। যাকে সর্ব্বদা দেখ্‌তে চাই, তাকে এত কম দেখ্‌তে পাওয়া কি একটা বিষম কষ্ট নয় ঠাকুমা?

ঠা। এতে কি তোর কষ্ট হয় প্রফুল্ল! সাক্ষাৎ কর্ত্তব্যরূপিণী এমন স্ত্রী পেয়েছিস্ এত ভাগ্যের কথা, এতে দুঃখ কেন ভাই? আজকাল যে রকম দিন কাল পড়েছে, তাতে লোকে তাই চায়। সংসারের কারও মুখের দিকে না তাকিয়ে, পাড়া প্রতিবাসীর খোঁজ খবর না নিয়ে স্ত্রী শুধু সর্ব্বদা আমার কাছে থাকে,—এই এখন লোকে চায়। কিন্তু সেটাও আমাদের শাস্ত্রে ধর্ম্ম নয়, অধর্ম্ম বলেই কথিত হয়েছে। স্ত্রী আমার সংসারের সকলকে সুখী কর্‌ছে, স্ত্রী আমার সংসার মাথায় করে রেখেছে, স্ত্রী আমার পরমপ্রিয় পতি-পুত্রের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বজায় রেখে সংসারের সকলের সুখের জন্যে খাট্‌ছে; এতে কি তোমার দুঃখ হয় ভাই?

প্র। ঠাকুমা, আজ তোমার পা ছুঁয়ে প্রাণের একটা সত্য কথা বলছি। যখন প্রথম এম, এ, পাস ক'রে জগতটাকে দেখেছিলাম, তখন তাই মনে হয়েছিল। ভেবেছিলাম যে— আমি আর স্ত্রী পুত্র এই নিয়েই সংসার, কিন্তু তোমার আর তোমার চেলা নাত্নীর ব্যবহার দেখে সে মত বদ্‌লে গিয়েছে। সকালে উঠে যখন লীলাকে কাছে পাইনে, তখন চুপি চুপি গোয়ালে গিয়ে দেখি—লীলা আমার গরুর শুশ্রূষা করছে। যখন দুপুর বেলা লীলাকে পাইনে তখন লুকিয়ে গিয়ে দেখি লীলা আমার পিতামাতার শুশ্রূষা করছে। যখন বিকালে লীলাকে পাইনে, তখন চুরি করে লুকিয়ে গিয়ে দেখি—লীলা আমার দাস দাসী অতিথি অভ্যাগতদের অভিযোগ শুন্‌ছে। দেখে আমার কি মনে হয় ঠাকুমা,—তা আমি প্রকাশ ক'রে বল্‌তে পারিনে। আর মনে হয় লীলা নিজে লীলা হয়নি, লীলাকে লীলা করেছেন তাঁর ঠাকুমা। তখন তোমার ঐ চরণদুখানির উদ্দেশে আমার মস্তক স্বতই অবনত হয়ে পড়ে ঠাকুমা। প্রার্থনা করি—যেন জন্ম জন্মান্তরে লীলার মত কর্ত্তব্যরূপিণী স্ত্রী পাই।

লী। নাও, আর বক্তৃতা কর্‌তে হবে না। তোমার শ্রীচরণের দাসী লীলা, তাকে অত বড় করা কেন? ওচরণে যে কত অপরাধ করি, তার কি সীমা আছে?

প্র। অপরাধ—অপরাধ অসংখ্য। প্রথম অপরাধ যে—আমায় সুখী করেছ। দ্বিতীয় অপরাধ যে আমার বাপমাকে সুখী করেছ। তৃতীয় অপরাধ যে আমার ভাইদের সুখী করেছ। চতুর্থ অপরাধে যে সংসারের দাস

দাসী অতিথি অভ্যাগতদের সুখী করেছ। এ অপরাধের শাস্তি কি লীলা?

লী। থাক এখন। অপরাধের শাস্তি যথাসময়ে দিও। এখন আমার কাজের কথা বলতে দাও।

ঠা। কিঁ মিট্‌লো তোদের?

লী। হাঁ ঠাক্‌মা মিটেছে, এখন দুধ দেবার কি বল?

ঠা। বড় খোকার কতটুকু ক'রে দুধ খাওয়া অভ্যাস?

লী। যখন ভাল ছিল, তখন পাঁচ পোয়া দেড় সের দুধ খেত।

ঠা। তা হলে এখন দেড়পো কি আধ-সের দুধ দিবি। যত দুধ তত জল, আর ৮।১০ টা মুথো থেঁতো করে একসঙ্গে সিদ্ধ করবি। যখন জল মরে যাবে কেবল দুধ থাকবে, তখন নামিয়ে নিবি।

লী। দুধ কি শুধু চুমুক দিয়ে খেতে দেব?

ঠা। পেটের অসুখে শুধু দুধ প্রায় সহ্য হয় না, তবে সহ্য হ'লে দেওয়া যেতে পারে।

লী। সহ্য হচ্চে কিনা কি করে বুঝব?

ঠা। ছেলের মলের দিকে নজর রাখলেই তা বোঝা যায়। যদি মলে শাদা শাদা ছানার মত জমাট দুধ দেখা যায়, তা হলে বুঝ্‌তে হবে যে দুধ হজম হচ্চে না।

লী। তা হলে কি করব?

ঠা। তা হলে শুধু দুধ না দিয়ে একটু ভাতের সঙ্গে, একটু বার্লির সঙ্গে দিবি। আর মলের দিকে নজর রাখ্‌বি।

লী। তাতেও যদি মলের সঙ্গে ছানা ছানা দুধ দেখা যায়?

ঠা। তা হ'লে ঐ রকম সিদ্ধ করা দুধ আর দুধের সিকি আন্দাজ চূনের জল এক সঙ্গে মিশিয়ে মধ্যে মধ্যে একটু আধটু করে খেতে দিবি।

লী। তাতেও যদি হজম না হয়?

ঠা। তা হলে দুধ কমাতে হবে। আর গরুর দুধ বন্ধ ক'রে ছাগলের দুধ দিতে হবে।

লী। ছাগল দুধ কি করে দেব?

ঠা। যেমন ক'রে গরুর দুধ দিতে বল্‌লাম, তেমনি করে দিবি। ছাগলদুধ পেটের অসুখের পক্ষে বড় উপকারী। যদি পাওয়া যায় তাহ'লে গরুর দুধ না দিয়ে এখন থেকেই দিস্‌।

লী। তাতেও যদি মলের সঙ্গে সেই রকম জমাট দুধ দেখা যায়?

ঠা। তা হ'বে মুতোর সঙ্গে সিদ্ধ করা ছাগল দুধই হজম করতে পারবে। তবে যদিই হজম না হয়, তা হলে দুধ কমিয়ে যতটুকু হজম হয়, ততটুকু দিতে হবে।

প্র। আমি একটা কথা বলে নিই ঠাক্‌মা। ডাক্তারেরা একটা জিনিষ বার করেছে, তার নাম হচ্ছে পেপটোনাইজিং পাউডার। এক-রকম গুঁড়ো। তা'র সঙ্গে দুধ তৈয়ার করে দিলে খুব সহজে হজম হয়। দরকার বুঝলে সেটা দিতে কি আপত্তি আছে?

ঠা। না তাতে আপত্তি কি। জিনিষটে যদি সত্যই উপকারী হয়, কেন ব্যবহার করব না? তবে কথা হচ্ছে এই যে—দেখতে হবে—জিনিষটে প্রকৃত উপকারী কিনা। আবার এক দিকে উপকার ক'রে অন্য বিষয়ে অপকার করে কি না সেটাও দেখা দরকার।

প্র। না ঠাক্‌মা, জিনিষটা খুব উপকারী তবে পরিণামে কোন অপকার করে কি না তা জানি না।

ঠা। তবেই ত কেমন করে দিতে বলি। ওগুলা না হলে কি চলে না?

প্র। আর একটা কথা বলছিলাম ঠাক্‌মা—ডাক্তারেরা কতকগুলি ছেলেদের খাবার তৈয়ার করেছেন, সেগুলি পেটের খাবার যেমন হজম হয় সেই রকম উপায়ে আগেই কতকটা হজম করা হয়। সেগুলি ছেলেরা খুব সহজে হজম করতে পারে। আর তার মধ্যে বেনজারস ফুড্ (Benger's food) বলে যে একটা খাবার আছে, সেটা ছেলেদের পেটের অসুখে খুব উপকারী।

ঠা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটার কথা জানি বটে। ঐ যে কলকাতার কুমারটুলীতে একজন খুব বড় আর খুব ভাল কবিরাজ ছিলেন, তাঁর নামটা কি ?

প্র। মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেন।

ঠা। হ্যাঁ, ঐ নামই বটে। তিনিই একবার আমাদের বাড়ী এসে ঐ খাবার আর ছাগলদুধ পথ্যি দিয়েছিলেন। তাতে খুব উপকারও হয়েছিল। তবে উহাতে ক্ষেত্রবিশেষে উপকার হলেও দেশের পক্ষে খাদ্য বলে ব্যবস্থা দেওয়া যাইতে পারে না।

লী। সেই ছোট বৌয়ের খোকার পেটের অসুখের সময় ঠাক্‌মা, আমারও মনে আছে। অমন কবিরাজ কিন্তু আর দেখিনি ঠাক্‌মা। তিনি মানুষ নন, দেবতা ছিলেন।

ঠা। দেখ, বিলাতি ফুড বা দুধ এদেশের ছেলেদের খাদ্য হয় এটা আমার ভাল বোধ হয় না—এদেশে কত উপকারী খাবার আছে। খুব দরকার হলে ওষুদ বলে দিতে হয়, খাবার করে নিওনা। দেশের জিনিষে চললে আর বিদেশের জিনিষ ব্যবহার করা কেন ?

প্র। হ্যাঁ, সেত বটেই। আর কবিরাজমহাশয়ও তাই করতেন।

লী। ভাল কথা ঠাক্‌মা। আজকাল বিস্কুটের খুব চলন হয়েছে। এরারুটের বিস্কুটের এক আধখানা দেওয়া যায় ?

ঠা। পারত পক্ষে নয়। তবে যেখানে নেহাৎ অন্য জিনিষ পাওয়া যায় না, সেখানে ছেলে ভোলাবার জন্যে খুব ভাল বিস্কুট এক আধ খানা দেওয়া যায়। তবে আবার বিলিতী টীনের বিস্কুটের চেয়ে শাদা বাতাসার মত হাল্কা যে একরকম দেশী বিস্কুট পাওয়া যায়, সেগুলো টাট্‌কা হ'লে শীঘ্র হজম হয়।

লী। দুধের কথাত হল। এখন আর কি করবো বল ?

ঠা। দুধের কথা হয়েছে, এখনও ঘোল আর ছানার জলের কথা বাকী আছে। যখন দুধ কোন মতেই হজম হয় না, কি খুব সামান্য একটু হজম হয়, তখন টাটকা দইয়ের সঙ্গে ঘোল দিলে আহার ওষুদ দুই হয়। ঘোল নানা রকম আছে। তার মধ্যে যত খানি দই তার সিকি জল মিশিয়ে মইলে যে ঘোল হয় সেইটেই দেওয়া ভাল। যে দইয়ে ঘোল হবে, সেই দই যেন খুব টক না হয়, কি একেবারে টক নয়, এমন না হয়। আর ঘোল থেকে বেশ ক'রে মাখন তুলে ছেঁকে তবে দিতে হয়।

লী। ঘোল কি সইবে ঠাক্‌মা, সর্দ্দি হবে না ?

ঠা। অনেকের সইতে পারে, আবার অনেকের সয় না। না সইলে কি একটু আধটু সর্দ্দি কাসি থাকলেও যদি ঘোল দেবার দরকার হয়, তা হ'লে একটা মাটীর হাঁড়িতে গোটা কতক জীরে ভেজে তার ওপর ঘোল ঢেলে দিবি, আর একটু ফুটে উঠলে নামিয়ে ছেঁকে কুসুম কুসুম গরম থাকতে খাওয়াবি।

কর্কট-রহস্য।

—:*:—

'মর্কটেতে কি জানিবে কর্কটের রস।
ভাগ্য যার ভাল, সেই খেয়ে গায় যশ॥
কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর মহাকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নিজ কাব্য-মধ্যে স্থান দিয়া যে কাঁকড়াকে 'অমরত্ব' দান করিয়াছেন, আজ আমি সেই কাঁকড়ার গুণ কীর্ত্তন করিব। মাঘের দুরন্ত হিমে, অলাবু-সুহৃদ্ কর্কটের প্রসঙ্গ যাঁহার ভাল লাগিবে না, কাঙ্গালের কর্কট রাশি ভাবিয়া তিনি আমায় ক্ষমা করিলে কৃতার্থ হইব।

কাঁকড়া সকলেই দেখিয়াছেন, সুতরাং কাঁকড়া যে কি পদার্থ, বোধ হয় তাহা আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। কিন্তু কাঁকড়া সম্বন্ধে অনেক কথা পাঠকের জানিবার আছে। কাঁকড়া অনেক রোগে উপকারী, এবং রোগ-উৎপাদনের শক্তিও কাঁকড়ার আছে। সেই সকল কথার আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

কাঁকড়া পঁচিশ প্রকার। ইহার মধ্যে কতকগুলি স্থলচর, কতকগুলি জলচর, আবার কতক গুলি বা উভচর। প্রাণিজগতে এপর্য্যন্ত একদল জলকর্কট আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহারা জলে বাস করে বটে, কিন্তু হিমসমুদ্রে থাকিতে ভাল বাসেনা। উষ্ণ কটিবন্ধনের দিকেই প্রচুর কাঁকড়া দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদ্র ব্যতীত খাল বিল নদীতেও কাঁকড়ারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করে; কখন কখন নদীতীরের সিকতাময় শুষ্ক চরে ইহারা বাসস্থান নির্ম্মাণ করে। স্থল-কর্কট শুষ্কভূমিতে থাকে, ইহাদিগকে জলে ছাড়িয়া দিলে তৎক্ষণাৎ শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরিয়া যায়। এইজাতীয় কর্কট সমস্ত দিন গর্ত্তের ভিতর লুকাইয়া থাকে, সন্ধ্যা হইলেই বিষয়কর্ম্মে অর্থাৎ আহার-অন্বেষণে বহির্গত হয়।

কাঁকড়ার শ্বাসযন্ত্র শরীরের মধ্যস্থলে স্থাপিত, দেখিতে ঠিক ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটুলির মত। এই শ্বাসযন্ত্রটিকে সর্ব্বদাই ইহারা সিক্ত করিয়া রাখে, শ্বাসযন্ত্র শুকাইলে কাঁকড়া বেশীক্ষণ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। কাঁকড়ার ভ্রমণশক্তি অতি অদ্ভুত, খাদ্য-সংগ্রহের জন্য ইহারা প্রত্যহ ৩০।৪০ মাইল পর্য্যন্ত অনায়াসে বেড়াইতে পারে। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে ইহারা শ্বাসযন্ত্রটী ভাল করিয়া ভিজাইয়া লয়, ইহাতে রৌদ্রের প্রখর তাপে পথ চলিবার সময়, ইহাদের কোনই কষ্ট হয় না।

এক শ্রেণীর কাঁকড়া আছে, তাহাদের একটী মাত্র দাড়া, দাড়াটী শরীরের চতুর্গুণ বৃহৎ। এই শ্রেণীর কাঁকড়া যখন পথে ভ্রমণ করে, তখন দাড়াটী সোজা করিয়া রাখে। ইহারা যখন গর্ত্তের মধ্যে থাকে, তখন ঐ দাড়াটী গর্ত্তের দ্বারদেশে আগড়ের মত করিয়া রাখে। এইরূপ অবরুদ্ধ গহ্বরে, আর কোনও জীব সহসা প্রবেশ করিতে পারে না।

আর এক শ্রেণীর কাঁকড়া আছে, তাহারা কেবল নারিকেলের শস্য খাইয়া জীবনধারণ করে। নারিকেলের লোভে ইহারা বড় বড় গাছে উঠে। দাড়া দিয়া নারিকেলের সুকঠিন বহিরাবরণ ভেদ করিয়া ফলমধ্যস্থিত শস্য বেশ তৃপ্তির সহিত ভোজন করে। ইহাদের দাড়া ঠিক সাঁড়াশির মত। এই দাড়া দিয়া ইহারা প্রথমে নারিকেলের ছোব্ড়া ছাড়ায়,

তাহার পর যেস্থানে নারিকেলের তিনটি চোখ আছে, সেইস্থানে সজোরে আঘাত করে। এইরূপে ঐ স্থানে ছিদ্র করিয়া শাঁসটুকু নিঃশেষে ভক্ষণ করে। প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ আদর করিয়া ইহাদের নাম রাখিলেন "ভোজন-বিলাসী।" ইহারা শুধু "ভোজনবিলাসী" নয়, শয্যা-বিলাসীও বটে! কেননা ইহারা যে গর্ত্তে বাস করে, নারিকেলের ছোব্‌ড়া দিয়া তাহারই মধ্যে বিশ্রামের জন্য সুখ-শয্যা রচনা করিয়া থাকে। নারিকেলভোজী কাঁকড়া খাইতে বড় সুস্বাদু। এই জাতীয় কাঁকড়ার গাত্র হইতে প্রায় এক কোয়ার্ট তৈল বাহির হইয়া থাকে। একজন জাহাজের অধ্যক্ষ এই কাঁকড়া স্বদেশে আনিবার জন্য একটী ডবল টিনের পেটিকায় আবদ্ধ করিয়া দিলেন, অধিকন্তু উক্ত পেটিকাটী লৌহনির্ম্মিত তার দিয়া জড়াইয়া বাঁধিয়া দিলেন। কিন্তু রাত্রির মধ্যেই কাঁকড়াগুলি টিনের বাক্সের গাত্রে ছিদ্র করিয়া কারামুক্ত হইয়াছিল। পাঠক মহাশয়! ইহাতেই, বুঝুন—ইহাদের দাড়া কতদূর শক্তিশালী!

কাঁকড়া অত্যন্ত কলহপ্রিয়। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বদাই যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিয়া থাকে। যুদ্ধে যিনি জয়ী হন, তিনি পরাজিত শত্রুর দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করিয়া ফেলেন। ইহারই নাম—"শত্রুর শেষ রাখিতে নাই।" ইহারা চাণক্যের কৌটিল্য-নীতির পরম ভক্ত।

আর এক শ্রেণীর কাঁকড়া আছে,—ইহাদের সম্মুখভাগ কঠিন আবরণে আবৃত, কিন্তু পশ্চাৎদিকে একেবারেই অনাবৃত। ইহাদের একটী লাঙ্গূল আছে। ইহারা অকর্ম্মণ্য জীব—না পারে জলে নামিতে, না পারে মাটীতে দৌড়াইতে; কিন্তু ইহারা অত্যন্ত বুদ্ধিমান্। সমুদ্রতীরে অনেক শম্বুকের খোলা পড়িয়া থাকে, সেই খোলার সাহায্যে পশ্চাদ্‌দিক আবৃত করিয়া ইহারা আত্মরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা নিবারণও করিয়া থাকে। মৃত শম্বুক না পাইলে, অনেক সময় ইহারা জীবিত শম্বুককে আক্রমণ করিয়া মারিয়া ফেলে। ইহাতে 'অন্ন বস্ত্র' উভয়ই সংগৃহীত হয়। জীব-জগতে এই জাতীয় কাঁকড়ার নাম "তপস্বী কাঁকড়া"; "তপস্বীই" বটে, কিন্তু "ভণ্ড-তপস্বী"! কারণ শম্বুককুলসংহার—ইহাদের জীবনের মহাব্রত!

উড়িষ্যা অঞ্চলের সমুদ্রকূলে পাঁচ ছয় রকম কাঁকড়া দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে একজাতীয় কাঁকড়ার বর্ণ উজ্জ্বল লোহিত, যেন—টক্‌টকে জবা-ফুল! মানব-হস্তের কঠিন স্পর্শে ইহারা মরিয়া যায়, তখন আর দেহের বর্ণ রাঙ্গা থাকে না, কালীর মত কালো হইয়া যায়। তদ্দেশীয় ধীবরগণ—সর্দ্দী কাশি হইলে, এই কাঁকড়া ছেঁচিয়া রস খায়। তাহাদের বিশ্বাস—কাশির এমন চমৎকার ঔষধ জগতে নাই। 'চাঁদীপুরে' কাঁকড়ার রস খাইয়া এক ধীবরপুত্রকে আমি কঠিন কাস-রোগ হইতে মুক্তি লাভ করাইয়াছি। দুর্গন্ধি 'কড্‌লিভার, খাইতে যাঁহাদের আপত্তি নাই, তাঁহারা একবার লাল কাঁকড়ার রস খাইয়া দেখুন, আমার বিশ্বাস—যথেষ্ট উপকার পাইবেন। বালেশ্বর হইতে ৩ ক্রোশ দূরে 'চাঁদীপুরে'র' সমুদ্রতীরে আমি এই শ্রেণী কাঁকড়া অসংখ্য দেখিয়াছি। সামান্য প্রয়াসেই ইহারা মানুষের হাতে ধরা পড়ে।

মালোবার উপকূলে এক রকম কাঁকড়া আছে, ইহাদের আকার তেঁতুলে বিছার মত! ইহারা মানুষ কি কোনও জীবজন্তু দেখিতে

পাইলে ছুটিয়া গিয়া কামড়ায়। এই জাতীয় স্ত্রী কাঁকড়াগুলি সম্ভোগান্তে স্বামী হত্যা করিয়া থাকে। তাহার পর নিজের সঙ্গিনীগণকে ডাকিয়া পরম তৃপ্তিপূর্ব্বক মৃত স্বামীর দেহ ভক্ষণ করে। ইহারা কেবল বংশ-রক্ষার জন্যই স্বামীর জীবিত থাকা প্রয়োজন মনে করে। বলা বাহুল্য—এইজাতীয় কাঁকড়ার পুরুষগণ —স্ত্রী জাতির অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল হইয়া থাকে। কিন্তু প্রণয়িণীর মন ভুলাইবার জন্য বিধাতা ইহাদিগকে স্ত্রী জাতির চেয়ে রূপবান্ করিয়াছেন। ইহাদের ভাগ্যে প্রাণের পরিবর্ত্তে—প্রেমলাভ হইয়া থাকে।

জীবপ্রবাহরক্ষার জন্য স্ত্রীপুরুষের মিলন —ঈশ্বরের অভিপ্রেত। কিন্তু কর্কট-জাতির যৌন সম্মিলন, জননপ্রক্রিয়াতেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। কর্কট পিতা বা কর্কটী মাতা কেহই অপত্যলালনের ভার গ্রহণ করে না। জননপ্রক্রিয়ায় পিতার এবং প্রসবপ্রক্রিয়ায় মাতার করণীয়ের অবসান হয়। কর্কট শিশু দৈবাধীন ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, দৈবাধীন রক্ষা পায়। কর্কটদম্পতির প্রেমের স্থায়িত্ব, ইহাদের জাতীয় প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। অনেক কাঁকড়াই কিছুতেই প্রণয়িণীর মন পায় না। প্রণয় নিবেদন করিতে গেলে ইহাদের মধ্যে প্রায়ই হাতাহাতি হয়। অনেকে আবার প্রেয়সীর অনুরাগ বিরাগ বুঝিতে না পারিয়া, সাধ্য সাধনা করিতে গিয়া প্রাণ হারায়। প্রেম-চুম্বনের ছলে প্রেয়সী, প্রেমিকের মাংস ভক্ষণ করে।

যে জাতীয় কাঁকড়া বাজারে বিক্রীত হয়, তাহার নাম "বায়লেট"। কাঁকড়ার মধ্যে ইহারাই কুলীন। ইহাদের এক এক জনের ভাগ্যে বহু স্ত্রীলাভ ঘটিয়া থাকে। ইহাদের পুরুষেরা বলবান্, তাহারা স্ত্রীকে ভালও বাসে, স্ত্রীও স্বামীর আনুগত্য স্বীকার করে। ইহাদের মধ্যে ভালবাসায় 'জেলাসি' বুঝিতে পারা যায়;—একে অন্যের স্ত্রীর সহিত প্রেম সম্ভাষণ করিতে সাহস করে না।

বায়লেটের বংশ অভাবনীয় রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। গর্ভবতী কর্কটী প্রসব করিবার জন্য সমুদ্রাভিমুখে বা নদী-তীরে গমন করে, প্রসবান্তে আর ফিরিয়া আসে না। অধিকাংশ কাঁকড়াই প্রসবের পর মরিয়া যায়। কর্কট শিশু "মাতৃহন্তারক" বলিয়া অনেক হিন্দু কাঁকড়া খায় না।

এক একটী কর্কটী অসংখ্য ডিম্ব প্রসব করে। ডিম্বগুলি দেখিতে কিম্ভুত কিমাকার, মাথাটী শিরস্ত্রাণের ন্যায়, সেই মাথায়—একখানি কুঠার;—তাহারই নিম্নে একজোড়া উজ্জ্বল চক্ষু। এই অল্পাবস্থাতেই ইহারা জলে সাঁতার দিতে থাকে। অল্পদিন পরেই এই সকল ডিম্ব অতি ক্ষুদ্র কাঁকড়ার আকার ধারণ করে। তখন আর জলে থাকেনা, সমুদ্রের তীরে উঠিয়া বেড়াইয়া বেড়ায়। একটু বড় হইলে, পিতৃ-মাতৃ-উদ্দেশে যাত্রা করে। এই সময়ই ইহাদের বিপদ,—পক্ষীরদল ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া কর্কটশিশুগুলিকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। যাহারা পক্ষিকুলের লুব্ধ দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে, তাহারাই ফিরিয়া গিয়া বাপমাকে দেখিতে পায়।

এস্থলে অনেকেই প্রশ্ন করিতে পারেন, যে কর্কটশিশুরা ত জন্মিয়া পিতামাতাকে দেখিতে পায় না, মা বলিয়া সোহাগ যত্নেও লালিত হয় না, তবে তাহারা কেমন করিয়া জন্মদাতা ও গর্ভধারিণীকে চিনিতে পারে, তাহাদের বাস-স্থানেরই বা কি করিয়া সন্ধান

পায়? প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহার উত্তরে বলেন —স্বাভাবিক সংস্কারই কর্কটশিশুর পথ প্রদর্শক, স্বাভাবিক সংস্কার বলেই তাহারা পিতা মাতাকে চিনিতে পারে।

কাঁক্‌ড়ারা দলবদ্ধ হইয়া যখন সমুদ্রযাত্রায় বহির্গত হয়, তখন একরকম শব্দ করিতে থাকে। সেশব্দ দুই মাইল দূর হইতেও শুনিতে পাওয়া যায়। দূর হইতে এই কর্কট-অভিযান দেখিলে মনে হয়, যেন এক বিরাট বীরবাহিনী রণযাত্রায় বহির্গত হইয়াছে। অভিযান প্রায় রাত্রিকালেই হইয়া থাকে। বলবান্ কর্কটগণ—পথ প্রদর্শকের কার্য্য করে! ইহাদের পশ্চাতেই—মন্থরগামিনী গর্ভবতীর দল। বৃদ্ধ শিশু ও দুর্ব্বল কর্কটগণ সকলের শেষে স্থান পায়। পথ চলিবার সময়—কর্কটবাহিনী কোন বাধাই গ্রাহ্য করে না। সম্মুখে কোন মানুষ বা পশু দেখিলে দংষ্ট্রা বিস্তার করিয়া ভয় দেখায়, কখন কখন সকলে মিলিয়া শত্রুকে আক্রমণও করিয়া থাকে। কর্কটবাহিনী ঠিক লম্বাভাবে অগ্রসর হয়, বামে বা দক্ষিণে হেলে না। সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া ইহারা প্রথমেই একবার অবগাহন স্নান করিয়া লয়। তাহার পর গর্ভিণীগণ অণ্ড প্রসব করে, পুংজাতীয় কর্কটগণ - স্থানান্তরে গিয়া খোলস ছাড়ে। এই সময় ইহারা অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, প্রায় পক্ষ কাল পরে, নূতন খোলস জন্মিলে তবে আবার গৃহাভিমুখে যাত্রা করে। এই সময়েই ইহারা মনুষ্যকর্ত্তৃক ধৃত হয়।

এই বার কাঁকড়ায় রোগনাশিনী শক্তির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া, এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

যাঁহাদের হৃদ্‌পিণ্ড দুর্ব্বল কাঁকড়া তাঁহাদের পক্ষে বড়ই উপকারী। যক্ষ্মা রোগে—কর্কট একটী সুপথ্য কিন্তু উদরাময়, শোথ, মেহ, উপদংশ, অজীর্ণ (ডিস্‌পেপসিয়া) উদরী, গুল্ম, যকৃৎ, প্লীহা, অর্শ, কুষ্ঠ, চক্ষুরোগ, প্রদর, বহুমূত্র, মূর্চ্ছা এবং বাত্‌রোগে কাঁকড়া-ভক্ষণ একেবারেই নিষিদ্ধ।

শিশু (১০ বৎসর বয়সপর্য্যন্ত) এবং গর্ভিণীর পক্ষে কাঁকড়া অত্যন্ত অহিতকারী।

মস্তিষ্ক-রোগে বধিরতায় এবং শুক্র-তারল্যে কাঁকড়া ঔষধির কার্য্য করিয়া থাকে।

যেসকল পুরুষের সন্তান হয় না এবং যেসকল রমণী পুনঃ পুনঃ কন্যা প্রসব করেন, কর্কট-ভোজনে তাঁহাদের উপকার হইতে পারে।

কর্কটের অস্থির সূক্ষ্ম চূর্ণ মাখন সহ চাটিয়া খাইলে, রক্তপিত্তজনিত রক্ত-বমন তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়।

কাঁকড়ার দাড়া দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধে ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া চরণতলে প্রলেপ দিলে, ছেলেদের শয্যামূত্র-রোগ ও দাঁত-কড়মড়ানি ভাল হয়। নিজ দেহেই ইহা আমি পরীক্ষার সুযোগ পাইয়া ছিলাম।

যে দিন কাঁকড়া ভক্ষণ করিবেন, সে দিন মূলা, দুগ্ধ, ডিম্ব এবং কোনও প্রকার দাল খাইবেন না। শাস্ত্র-মতে এগুলি কাঁকড়ার পক্ষে সংযোগবিরুদ্ধ।

অলাবুযুক্ত কর্কট যে কেবল মুখপ্রিয় তাহা নহে, উপকারীও বটে, কাঁকড়া পেট গরম করে—অলাবু কাঁকড়ার এই গুরুতর দোষ নষ্ট করিয়া থাকে।

কাঁকড়া ভোজনের পর--তরল দধি পান করিবেন।

দুগ্ধদোহনের সময় যে গাভী অস্থিরতা প্রকাশ করে, তাহার গলদেশে কাঁকড়ার কাণকুয়া বাঁধিয়া দিলে গাভী শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিবে।

শ্রীসতীশচন্দ্র দে এম্, এ।

অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য কি?

—:০:—

পৌষের হিমানীমণ্ডিত প্রভাত। গাঢ় ধূসর কুহেলিকার অন্তরালে তপনের আর্ত্তমূর্ত্তি—তেজোহীন, মলিন। মুক্ত জনতার মুখর কণ্ঠ তখনও পক্ষিকুলের ভোরের ভৈরবী থামাইতে পারে নাই। পল্লী-পথ দু'একটী পথিকের চরণ-চিহ্ন বক্ষে লইয়া, উদয়পুরীর কনকপ্রভার প্রতীক্ষা করিতেছিল। আকাশ তখনও কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন। দেহ-মনের বিপুল অবসাদ লইয়া, রুদ্ধ কক্ষে, দুই বন্ধুতে বসিয়াছিলাম। ওষ্ঠাধরচুম্বিত ফুরসীর নল অম্বুরীগন্ধী প্রচুর ধূম উদ্গীরণ করিয়া, ঘরের মধ্যেও কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করিতেছিল। আমরা স্মৃতিসর্ব্বস্ব অতীতের রোমন্থন করিতেছিলাম।

সপ্তাহ পূর্ব্বে, বন্ধু এক সংখ্যা "আয়ুর্ব্বেদ" পড়িবার জন্য লইয়াছিলেন। আমাদের মধ্যে সেই আয়ুর্ব্বেদেরই প্রসঙ্গ চলিতেছিল।

বন্ধু বলিলেন—"বড় বড় কবিরাজের বাড়ীতে ত ছাত্রগণকে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। সে শিক্ষার ফলে, অনেক ছাত্রই দেশমান্য কবিরাজ হইয়াছেন। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, তবে আর তোমারা বেশী কাজ কি করিবে? অনেক কবিরাজই ত ডাক্তারী পাশ করিয়া, তবে বৈদ্যশাস্ত্র পাঠ করিতেছেন; সুতরাং বহু অর্থ ব্যয় করিয়া, ডাক্তারী ও কবিরাজী একত্র মিলাইয়া, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয়-স্থাপনের উদ্দেশ্য কি?

বন্ধুর প্রশ্নের যাহা উত্তর দিয়াছিলাম, সেই কথাই আজ সকলকে শুনাইব। আমার বিশ্বাস—আমার এই তত্ত্বজিজ্ঞাসু বন্ধুটীর মত—অনেকেই অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয়ের মহান্ উদ্দেশ্য এখনও বুঝিতে পারেন নাই।

কবিরাজ মহাশয়দের বাটীতে ছাত্র পড়ান হইয়া থাকে। সে সকল ছাত্রের মধ্যে দুই একজন খুব নামজাদা চিকিৎসকও হন। কিন্তু সত্যের খাতিরে বলিতে হয়—আয়ুর্ব্বেদ যতটুকু কবিরাজি ব্যবহারে লাগে, কবিরাজগণ ছাত্রদের কেবল সেইটুকুই শিক্ষা দেন। ইহাতে বিপুলায়তন সমগ্র আয়ুর্ব্বেদের ধারণাই হয় না। যাহারা আয়ুর্ব্বেদকে কেবল কবিরাজী শাস্ত্র বলিয়া জানেন, তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদের মহিমা অবগত নহেন। আয়ুর্ব্বেদ জগতের একমাত্র আয়ুর্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ—অতলস্পর্শ অনন্ত মহাসাগর; 'এলোপ্যাথি' 'হোমিওপ্যাথি', টিস্যুরেমিডি, "ইউনানি" প্রভৃতি নিখিল চিকিৎসা-বিজ্ঞান—সে মহাসমুদ্রের এক একটী তরঙ্গ মাত্র। সাহস করিয়া বলিতে পারি—সমগ্র পৃথিবীর চিকিৎসার মৌলিক তত্ত্বগুলি আয়ুর্ব্বেদের সূত্রের উপর স্থাপিত। আপনারা আয়ুর্ব্বেদের চিকিৎসা, শারীর, বিমান, কল্প, সূত্র, সূত্রান্ত সকল মিলাইয়া দেখুন, এমন সূক্ষ্ম, এমন বিরাট, এমন সরল, এমন সম্পূর্ণ, এমন সুন্দর, এমন উদার বিজ্ঞান জগতে আর দ্বিতীয় নাই!

তাই অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, পৃথ্বীবাসীকে আমরা আয়ুর্ব্বেদের—"বিশ্বরূপ" দেখাইতে চাই। আমাদের "অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয়"—আয়ুর্ব্বেদের বিশ্ব-বিদ্যালয় হইবে। কিন্তু আমাদের কাজ বড় কঠিন; তাহার গুরুত্ব একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অল্প কথায়

প্রকাশ করা অসম্ভব। আমাদের কার্য্যনির্দ্দেশ পঞ্চভাগে বিভক্ত হইবে। কেননা—বৈদিক, ব্রাহ্মণ, আচার্য্য, বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক যুগভেদে—আমাদের আয়ুর্ব্বেদেরও পাঁচটি অবস্থা। আমাদের কার্য্যের তালিকা অতি সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি।

১ম। পাঠ্যপুস্তকপ্রণয়ন।

২। শল্যতন্ত্র ও শবচ্ছেদ।

৩। ভৈষজ্যের রাসায়নিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ।

৪। রুগ্ণাবাস ও ভৈষজ্য উদ্যান স্থাপন।

৫। লুপ্ত গ্রন্থের পুনঃপ্রচার।

আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতে হইলে, শারীর বিদ্যা [Anatomy] শারীর তত্ত্ব [Physiology] নিদান ও রোগ তত্ত্ব [Pathology and Etiology] দ্রব্যগুণ [Materia-Medica] চিকিৎসা (Therapeutics) কল্প [Toxicology] স্ত্রীরোগ ও কৌমার ভৃত্য [Gynecology, Child manage] শল্যতন্ত্র [Surgery] ধাত্রী-বিদ্যা ও গর্ভিণী ব্যাকরণ [Midwifery] আময়িক শারীর [Morbid Anatomy] এবং প্রত্যঙ্গ ও প্রতিরোগ চিকিৎসা প্রভৃতির আলোচনা করিতে হইবে। এজন্য পুস্তক প্রণয়নের আবশ্যকতা আছে। আয়ুর্ব্বেদের বিভিন্ন সংহিতা হইতে উদ্ধৃত করিয়া প্রত্যক্ষ দর্শনের সহিত মিলাইয়া, আয়ুর্ব্বেদের যে যে অংশ লোপ পাইয়াছে, সেই সেই অংশ নূতন সংযোগ করিয়া সন্দিগ্ধ স্থানের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়া গ্রন্থ রচনা করিতে হইবে। কিন্তু কাজটী বড় সহজ নহে, জীর্ণ সংস্কার হইলেও ইহার জন্য বিরাট পুরুষকারের প্রয়োজন। "সুশ্রুত" ও "বাগ্‌ভটের" শারীর স্থানের সহিত, পাশ্চাত্য এনাটমি বা ফিজিওলজির—বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। সুশ্রুতের মর্ম্ম শারীর পড়িলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়—আয়ুর্ব্বেদের শারীর ও পাশ্চাত্য এনাটমি উভয়ই এক। ইহার জন্য বড় বেশী পরিশ্রম করিতে হইবেনা। পরিশ্রম করিতে হইবে—সুশ্রুতের অমুক্ত অংশ পূর্ণ করিবার জন্য। যাঁহারা মন দিয়া সুশ্রুত সংহিতা পড়িয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন - যুগধর্ম্মে কালধর্ম্মে – সংস্কারকগণের হাতে পড়িয়া সুশ্রুতের বহু অধ্যায় সংক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে, অনেক স্থল পরিত্যক্তও হইয়াছে। এই সকল অংশ প্রত্যক্ষ-দর্শন-লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে পরিপুষ্ট করিতে হইবে, শাস্ত্রদৃষ্ট বিষয়ের সহিত প্রত্যক্ষ দৃষ্টের যদি কোন অনৈক্য থাকে, নিপুণ হস্তে তাহারও মীমাংসা করিয়া দিতে হইবে। এ কার্য্য একের সাধ্যায়ত্ত নহে। একজন বা একদল লোক - এক মহা প্রদেশের বিশাল দিগন্তব্যাপী মহাক্ষেত্র কর্ষণ করিতে পারে না। তাহাতে সকল ভূমি সমতল হয় না, সর্ব্বত্র সার পড়ে না, অনেক বল্মীক-বন্ধুর স্থান হয় ত তেমনি উষর থাকিয়া যায়। আমরা এক জন্ম ধরিয়া আয়ুর্ব্বেদ ক্ষেত্র কর্ষণ করিব। আমাদের উত্তরাধিকারিগণ—সেই কর্ষিত ক্ষেত্রের বহু দোষ বহু ব্যাপন্নতা দূর করিয়া দিবেন। তাহার পরে আর এক সম্প্রদায় বীজ বপন করিবেন। সমগ্র আয়ুর্ব্বেদের আত্ম-মহিমায়—সেই বীজ ক্রমশঃ অঙ্কুরিত, বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইয়া দিব্যফলপুষ্প-শোভিত কল্পপাদপে পরিণত হইবে।

আমরা মৈত্রী স্বাধীনতার অবতার উদার ইংরাজের প্রজা। উদারতা, অনুসন্ধান ও অগ্রগামিত্ব—আমাদের মূল মন্ত্র হউক। যুগে

যুগে মনুষ্যজ্ঞানের ক্রমবিকাশ হইতেছে। একযুগ, একজাতি, একদেশ সাকল্য বেদের [সম্পূর্ণ জ্ঞানের] অধিকারী হইতে পারে না। এ রহস্য, শ্রীকৃষ্ণের ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে, ভগবদ্গীতার স্বর্ণমুকুরে একদিন প্রতিফলিত হইয়াছিল, পণ্ডিতবর শবর স্বামী—দূর প্রসারিণী দিব্যদৃষ্টিতে বেদের ভিতর "পিক" প্রভৃতি যাবনিক শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাইয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদের স্বাধীন শেষ গ্রন্থকার ভাবমিশ্র—অনেক বিদেশী ঔষধের গুণ বর্ণনা করিয়া বিজ্ঞজনোচিত উদারতা দেখাইয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশীয় বৈদ্যগণ সেরূপ অসঙ্কীর্ণতা দেখাইতে পারেন নাই বলিয়াই—আয়ুর্ব্বেদের চরম অধঃপতন ঘটিয়াছিল। অতএব, প্রাচ্য বিজ্ঞানের পূর্ণ প্রকট মূর্ত্তি দেখিতে হইলে, পাশ্চাত্য আলোকের জীবন্ত রশ্মির সাহায্য লইতে হইবে। সুশ্রুতের শারীর স্থানের অনেক স্থলে পাঠের বিশৃঙ্খলতা বুঝিতে পারা যায়। ডল্লণ ও চক্রদত্ত প্রমুখ টীকাকারগণ—সে সকল স্থানে সংযতবাক্। পাশ্চাত্য ফিজিওলজির বিনা সহায়তায় সে সকল স্থানের মর্ম্মগ্রহণ করা একেবারেই অসম্ভব। অথচ, এই শারীর তত্ত্বই—চিকিৎসাবিজ্ঞানের একমাত্র মূল ভিত্তি।

আয়ুর্ব্বেদের শারীর তত্ত্ব -বাত পিত্ত কফ—এই ত্রিধাতুর উপর প্রতিষ্ঠিত। বায়ু পিত্ত ও কফের প্রকৃতি বুঝিলে—দেহের পরিপাক, রস পাক, ইন্দ্রিয়ার্থ, ইন্দ্রিয়জ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই অভিজ্ঞতা জন্মে। কিন্তু এই ত্রিধাতুর বিচিত্র রহস্য সহজবোধ্য নহে। "বায়ু" বলিলে যিনি বাতাস বুঝিবেন, "পিত্ত" অর্থে যিনি যকৃৎনিঃসৃত রস মনে করিবেন, এবং "কফ" বলিলে যিনি শ্লেষ্মাস্রাব বুঝিবেন, তিনি মহাভ্রমে পতিত হইবেন। এই বায়ু, পিত্ত কফকে লক্ষ্য করিয়া ঋষিগণ এমন অনেক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন;—যাহার অর্থ আমরা সহসা বুঝিতে পারি না। আমাদের টীকাকারগণও অনেক স্থলে তাহার রহস্য ভেদ করিতে পারেন নাই। কিন্তু সে সকল অমূল্য ইঙ্গিত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে পরিস্ফুট হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ-সংহিতার অনেক তথ্য পুরাকালে কেবল উপদেশগম্য ছিল, সেই জন্য তাহা গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। এখন আমাদের দেশে মর্ম্মজ্ঞ উপদেষ্টার একান্ত অভাব। তন্ত্রান্তর হইতে তদভাব পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। বীজরূপী ঋষিসূত্রের গূঢ় মর্ম্মকে সুব্যাখ্যাত করিয়া মহান্ মহীরুহে পরিণত করিতে হইবে। কথাটা আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলি। "বায়ু" "পিত্ত" "কফ"—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। ইহার স্বরূপ যে কত সূক্ষ্ম—তাহা দেখিতে গেলে—ঋষিযুগের সৃষ্টি-কুশলী প্রতিভা চাই। এই এই বায়ু, পিত্ত, কফের ক্রিয়া যে কত নিগূঢ় শারীরতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত—অনেকে বৈদ্যই তাহা বুঝিতে পারেন না। অনেকে "বায়ু-পিত্ত-কফ" বলিলে কতকগুলি বিশিষ্টলক্ষণ-সমষ্টি মনে করেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। যে ভাষায় আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র রচিত হইয়াছিল,—সে ভাষা দেবতার ভাষা; সে ভাষায় একশব্দ বহু অর্থে গৃহীত হইয়া থাকে। "পিত্ত" অর্থে পিত্তরস, কফ অর্থে কফস্রাব বুঝাইলেও কফ আর কফস্রাব, পিত্ত বা পিত্তরস সম্পূর্ণ পৃথক্। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ব্যতীত—ইহার মর্ম্মভেদ করা কঠিন। আয়ুর্ব্বেদের দ্রব্যগুণতত্ত্বে এমন অনেক শব্দ আছে, যাহার স্থূল অর্থ বোধগম্য হইলেও, সূক্ষ্ম অর্থ বুঝা যায় না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে সেই সকল শব্দের প্রভেদ

অতি সহজে ধরা যায়। "বাতহর" "বাতঘ্ন" "বাতমুৎ"—ইহাদের স্থূল অর্থ এক, কিন্তু সূক্ষ্ম অর্থ ভয়ঙ্কররূপে পৃথক্। এ সকল কথা পৃথক্ প্রবন্ধে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

যোগ্যাকরণপূর্ব্বক অধ্যাপনার প্রতিষ্ঠা করিয়া আয়ুর্ব্বেদকে জীবন্ত করিতে হইবে। আমরা জানি—মানবের ক্ষুণ্ণ জ্ঞান, মহাপাপ। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদ-বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য, নূতন করিয়া পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিতে হইবে।

২। শল্যতন্ত্র ও শবচ্ছেদ। মহর্ষি সুশ্রুত একজন অদ্বিতীয় সার্জ্জন ছিলেন। সুশ্রুতের প্রত্যেক অধ্যায়ে, প্রত্যেক পৃষ্ঠায়—সংশয়-প্রশ্নের অতীত অপার্থিব সত্য জাগ্রত। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে এমন কোন বিষয় নাই, যাহার বীজভাব সুশ্রুতে দেখিতে পাওয়া যায় না। সুশ্রুত শব-ব্যবচ্ছেদে—সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি মূত্রাশয় হইতে অশ্মরী কাটিয়া বাহির করিতেন। যকৃৎ-প্লীহায় বিদ্রধি হইলে তাহা ভেদ করিয়া দিতেন। যন্ত্র-সাহায্যে মূঢ়গর্ভ আহরণ করিতেন। উদরে আঘাত লাগিয়া ছিন্ন অন্ত্র বহির্গত হইয়া পড়িলে তাহা যথাস্থাপিত করিয়া সেলাই করিয়া দিতেন। নেত্ররোগে—তাঁহার মত অস্ত্র-প্রয়োগ-কুশল চিকিৎসক—দ্বিতীয় কেহ জন্ম গ্রহণ করেন নাই। আবর্ত্তন-বিবর্ত্তন-ক্রমে গর্ভিণীর সুখ প্রসবের ব্যবস্থায়, ভ্রূণ-পরীক্ষায়, ধাত্রীবিদ্যায়, তিনি যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা পড়িলে বিস্ময়ে অবাক্ হইতে হয়। প্লেফেয়ারের মিডিওফারির সঙ্গে আপনারা তাহা মিলাইয়া দেখিবেন।

সুশ্রুত 'বেসীলি থিওরী' জানিতেন। রাজ যক্ষ্মা, কতকগুলি জ্বর, পাপজ ব্যাধি—ইহারা সংক্রামক। কুষ্ঠের ক্রিমি আছে। পাণ্ডুরোগে গর্ভাবস্থায়—রক্তের লাল কণিকা কমিয়া যায়। যক্ষা রোগে হৃদ্‌পিণ্ডে কোটর (ক্যাবিটি) উৎপন্ন হয়। বিসর্পরোগে—রক্ত বিষাক্ত হইয়া পড়ে। বিষাক্ত সর্প দংশন করিলে হৃদয়ে রক্ত শল্য জন্মায়—তাহার ফলে শ্বাসকৃচ্ছ্রতায় মানুষের মৃত্যু ঘটে। বিসূচীকা রোগে, হৃদয়ে রক্তের চাপ বাঁধিতে থাকে। রক্তাতিসার ও উরঃক্ষতে আভ্যন্তরিক ক্ষতের চিকিৎসা করা উচিত। রক্তার্ব্বুদ থাকিলে রোগীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ইত্যাদি বহুবিষয় সুশ্রুত অমানুষিক দক্ষতার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। সুশ্রুতের বৈজ্ঞানিক গবেষণা—বিরাট বিশাল বিশ্বে এখনও অপরাজেয়।

আমাদের কার্য্য এই সুশ্রুতকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সাহায্যে বাঁচাইয়া তোলা! সুশ্রুত যে সকল শস্ত্রের ও যন্ত্রের নাম করিয়াছিলেন, কয়জন কবিরাজ তাহা চেনেন? আমরা তাহার যথার্থ আকৃতি ও গঠনপ্রণালী জানি না। আমাদের অনূদিত গ্রন্থে—যন্ত্রের নামার্থ, ব্যবহার ও প্রয়োগ ভাবিয়া আমরা কেবল কাল্পনিক চিত্র সন্নিবেশিত করিয়াছি। সুতরাং সুশ্রুতের এই অংশ ভাল করিয়া পূর্ণ করিতে হইবে। আয়ুর্ব্বেদের প্রাধান্য বজায় রাখিয়া—বৈদেশিক বিজ্ঞানের সহিত মালীর মত কলম বাঁধিতে হইবে।

আয়ুর্ব্বেদের উদ্ভিদ্-বিদ্যা অতি সুন্দর। কিন্তু ইহাকেও সরল ও শৃঙ্খলার সহিত সাজাইয়া লইতে হইবে। ভেষজ দ্রব্যের, পথ্যাপথ্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ দেখাইতে হইবে। আয়ুর্ব্বেদের মত সম্পূর্ণ চিকিৎসা কোথাও নাই। আয়ুর্ব্বেদের চিকিৎসা-তত্ত্ব - যুগযুগান্তরের সাধনার সফল সিদ্ধি। এখনও বৈজ্ঞানিকের মুখে শুনিতে পাই—"চরকের চিকিৎসা প্রচলিত

থাকিলে, পৃথিবীতে অকালমৃত্যু থাকিত না।” চরকের পরিচয় ক্ষুদ্র নিবন্ধে সম্ভবে না। চরক ৬০০ ছয় শত প্রকার জোলাপ জানিতেন। এমন প্রজ্ঞা-মহিম-দীপ্ত পেলব-সংহিতা—জগতের কোন ভাষাতেই অদ্যাপি সঙ্কলিত হয় নাই। এই চরক-সংহিতাতে এমন অনেক জিনিষ আছে—তাহা এমন সূক্ষ্ম ইঙ্গিত উপদেশ পূর্ণ—যে সেসকল ইঙ্গিত ও উপদেশ বুঝিতে হইলে পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের সাহায্য চাই।

অতএব প্রয়োজন মত আমাদিগকে কিছু কিছু ঋণ করিতে হইবে। এই ঋণের নামে কেহ কেহ হয়ত শিহরিয়া উঠিবেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রতি এ অধমের নিবেদন—হবিঃ যেখানকারই হউক—যজ্ঞ আয়ুর্ব্বেদ মন্ত্রে। ধরুণ—সুশ্রুতের শারীর-তত্ত্ব, বহুতথ্যে পূর্ণ, তাহাতে আমরা জীবদেহের সকল রহস্যই বুঝিতে পারি। শারীর-বিদ্যা—দেহের “ভূগোল” বিদ্যা। সুশ্রুতে তাহার সাধারণ মানচিত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। কোথায় কোন নদী কল্লোল মুখরা, কোথায় কোন্ পর্ব্বত গগনস্পর্শী, কোথায় কোন্ বন, কোথায় কোন্ নগর অবস্থিত—মানচিত্রে তাহার ইঙ্গিত থাকে মাত্র; কোন পর্ব্বত কত উচ্চ,—তাহার শৃঙ্গের সংখ্যা কত, কোন্ নদী কত গভীর, কোন্ বন কতদূর বিস্তৃত, কোন্ নগরে কোন্ জাতীয় লোকের বাস—তাহাদের আচার ব্যবহার কিরূপ, এসকল বিষয় সম্পূর্ণ জানিতে হইলে, যে অই নদী স্বয়ং দেখিয়াছে, পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছে, বনে উত্তরণ করিয়া নিসর্গ সুন্দরীর শ্যামল শোভায় মুগ্ধ হইয়াছে, তাহার কাছে গিয়া সমস্তই জানিতে হইবে আয়ুর্ব্বেদের শল্য তন্ত্র—অব্যবহার্য্য হইয়া অনেক দিন পড়িয়া আছে, যাঁহারা একণে শল্যতন্ত্র লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন—তাঁহাদের নিকটে গিয়াই আমাদিগকে সেই শল্য তন্ত্র শিখিতে হইবে। তবে আমাদের মূল সূত্র হইবে, অভ্রান্ত ঋষি বাক্য, আর তাহার ভাষ্য, বার্ত্তিক বা টীকা হইবে—পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্য। এরূপ ভাবে কার্য্য করিতে না পারিলে, আমরা আয়ুর্ব্বেদের সম্পূর্ণ মূর্ত্তি দেখিতে পাইব না।

রোগ নিরূপণে আমাদের অনুকূল সহায়—একমাত্র মাধব-নিদান। কিন্তু মাধবকর নিজ মুখেই স্বীকার করিয়াছেন—তাঁহার গ্রন্থ বহু তন্ত্রের সংক্ষিপ্ত সারসংগ্রহ। যাহারা অল্প বুদ্ধি শ্রমকাতর, তাহাদের জন্যই মাধবকর তাঁহার “রুগ্বিনিশ্চয়” রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতে হইবে—মাধবকরের প্রয়াস—আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রে দৈন্যের মধ্যে সুখের ক্ষীণ আভাষ মাত্র। সুতরাং মাধব-নিদান ছাড়া প্রকৃত বৈদ্যকে আরও বহুতন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। যে দোষদূষ্য লইয়া বৈদ্যগণ প্রকৃতির অন্তরঙ্গ আত্মীয় হইয়া উঠিয়াছেন, সে দোষদূষ্য যে কি জিনিষ—মাধব-নিদানে তাহার উল্লেখ নাই। ধাতু বিশেষে, প্রত্যঙ্গ বিশেষে—শারীর যন্ত্র বিশেষে বায়ুপিত্ত কফ যে কি, মাধব তাহার বিশদ ব্যাখ্যা দিতে পারেন নাই। এক বিকৃত পিত্ত হইতে অতিসার ও প্রমেহ দুইই হইতে পারে, কিন্তু অতিসার বা প্রমেহ বিশেষে—সে পিত্তের স্বরূপ কেমন, অবস্থিতিই বা কোথায়, মাধব তাহা বুঝাইয়া দেন নাই। অথচ এ সকল তত্ত্ব—মিশ্রকেশের নিদানে আছে, সুশ্রুত ও বাগ্‌ভটের নিদানেও আছে। এই সকল নিদান একত্র সংগ্রহ করিতে পারিলে আমাদের এই মাতৃভূমি চিরন্তনী কল্যাণী মূর্ত্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবেন। কিন্তু

কাহিনীও মানব-কাহিনীর সংমিশ্রণে আমরাও "মৃত্যুঞ্জয়" হইব।

আয়ুর্ব্বেদের একই ঔষধে—জ্বর, অতিসার, অর্শ, গুল্ম, প্রমেহ প্রভৃতি বিবিধ রোগের প্রতিকার হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ জ্বর, অতিসার, অর্শাদি যে কোন্ জাতীয়, কি বিকৃত শারীরতন্ত্রে যে তাহাদের উৎপত্তি—জিজ্ঞাসা করিলে, আমরা সহসা তাহার উত্তর দিতে পারি না। ইহার কারণ—আমাদের আময়িক শারীর বা দ্রব্যগুণ-তত্ত্ব—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও বিশৃঙ্খল। অথচ আমাদের সংহিতায়—কত ধাতু, কত বিষ, উপবিষ, কত রত্ন, কত বনৌষধি, কত জীবজন্তু,—ঔষধের উপাদানরূপে পরিকল্পিত হইয়াছে। এই সকল জিনিষ—আমরা যদি পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের প্রণালীতে সাজাইয়া লই তাহা হইলে আমাদের আয়ুর্ব্বেদের সম্মুখে—কোনও প্যাথলজি, কোন মর্বিড্ এনাটমি—অথবা কোনও মেটিরিয়া-মেডিকা—সগৌরবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। হা ভাগ্য! কেবল পরিশ্রমের ভয়ে, আর অর্থের অভাবে, আমাদের সকল শক্তিই আজ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। অনুতপ্ত যক্ষের বক্ষঃবেদনা—বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে আমাদিগকে আজ মেঘদূতের মন্দাক্রান্তার মত, কেবল অশ্রু সজল করিয়া তুলিয়াছে!

প্রত্যেক চিকিৎসকের পদার্থ-বিদ্যায়, এবং রসায়ন-শাস্ত্রে অধিকার থাকা চাই। মহর্ষি সুশ্রুত শিষ্যবর্গকে উপদেশ দিয়াছেন—"শুধু আয়ুর্ব্বেদ পড়িয়াই নিশ্চিন্ত থাকিও না। এক গ্রন্থে সকল তত্ত্ব থাকিতে পারে না, এক জন অধ্যাপকও সকল তত্ত্বের মীমাংসা করিতে অক্ষম। সুতরাং তোমাদিগকে বহুবিধ শাস্ত্র বিভিন্ন আচার্য্যের নিকটে অধ্যয়ন করিতে হইবে। বাস্তবিক জড়াত্মকই হউক আর আধ্যাত্মিকই হউক, সকল দর্শনের সহিত আয়ুর্ব্বেদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বৈদ্য হইতে গেলে, সকল শাস্ত্রের অনুশীলন করিতে হইবে। যেমন, ইন্দ্রিয়ার্থ বোধ কিরূপে হয়, কি জন্য মানুষ চক্ষে দেখিতে বা কর্ণে শুনিতে পায়, এ তত্ত্ব বুঝিতে গেলে—প্রাকৃতিক দর্শনের সাহায্য চাই। দৃষ্টিগত ও কর্ণগত এমন অনেক রোগ আছে, যাহাদের চিকিৎসা করিতে হইলে রূপ ও শব্দ রহস্যের জ্ঞান অনিবার্য্যরূপে আবশ্যক। ভারতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মহামুনি কণাদ—একথা বারংবার বলিয়া গিয়াছেন। দ্ব্যণুক, ত্র্যণুক, অদৃষ্ট ও শব্দতত্ত্ব বুঝিবার লোক বর্ত্তমান যুগে কেহ আছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। বৈশেষিক দর্শনে রসায়ন শাস্ত্রের অনেক তত্ত্ব আছে,—আমাদের মধ্যে কয়জন তাহা পড়িয়াছেন? আমাদের শাস্ত্রে কথায় কথায়—জারণ, মারণ, শোধন, অথচ ঐ সকল ক্রিয়ার রাসায়নিক-তত্ত্ব আমরা জানিতে চাহি না।

পূর্ব্বে—অনেক বৈদ্য, অনেক বণিক্ ব্যবসায়ী, এমন কি অনেক গৃহস্থ পর্য্যন্ত গাছ-গাছড়া চিনিতেন। এখন অনেক সময় ভেষজ উপাদানের জন্য, বাজারের বেদে পসারীর সততার উপর বৈদ্যগণকে নির্ভর করিতে হয়। ইহার যে কি বিষময় ফল—বৈদ্য ভিন্ন সাধারণে তাহা বুঝিবেন না। প্রত্যেক বৈদ্যকে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা শিখিতে হইবে, প্রকৃতির সহিত পরিচিত হইতে হইবে; বৈদ্যকে স্মরণ রাখিতে হইবে—বহু শতাব্দী পূর্ব্বে তাহারই বংশে একদা মনীষা ও প্রতিভার সমন্বয় হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্ব পুরুষের প্রতিভা ছিল নিসর্গের

মুকুর—জগৎ তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইত।

আমরা চরক, সুশ্রুত পড়ি,—রসৌষধি প্রস্তুত করি; কিন্তু যে দর্শনশাস্ত্র অনভিজ্ঞ, শস্ত্র-প্রয়োগের কৌশল জানে না, রসায়ন-তত্ত্বের মর্ম্ম বুঝে না,—তাহার চরক-সুশ্রুত ও রসগ্রন্থ পাঠ বিড়ম্বনা নহে কি? শুধু ব্যাকরণ ও কাব্যের কৌশলে, ষষ্ঠী, সপ্তমী, সমাস, কারকের যুক্তি অবতারণায়, অন্বয় বা ব্যাখ্যা করিতে পারিলেই "আয়ুর্ব্বেদ" শাস্ত্র পড়া হয় কি? কবিরাজের বাটীর ভৃত্য পরিচারকগণও ত অনেক সময় ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ করিয়া থাকে,—তাহাদিগকে কেহ "বৈদ্য"—সম্ভাষণ করেন কি!

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে আমরা প্রাকৃতিক দর্শন ও উদ্ভিদ্‌বিদ্যা আলোচনার পথ চির উন্মুক্ত রাখিব। আমাদের দেশে—আর একটী অভাব বৌদ্ধযুগের পর হইতেই দেখিয়া আসিতেছি। বৈদ্য চিকিৎসার রুগ্‌ণাবাস বা হাঁসপাতাল্ নাই! বিপর্য্যস্ত প্রকৃতির করুণ আর্ত্তস্বর—যে দেশের মানুষ পঞ্চ-তন্মাত্র-স্পৃষ্টা প্রকৃতিকে দ্রৌপদীর মত বিবসনা করিয়াছিল, যে দেশের জীবন্ত সোম বিন্দু—সাগরাম্বরা বসুন্ধরার বক্ষে সঞ্জীবনী মহাশক্তি আনিয়া দিয়াছিল,—সে দেশের বৈদ্যগণ—ব্যাধি-ত্রাণ রুগ্‌ণাবাসের মহিমা ভুলিয়া গিয়াছেন। ইহা কি লজ্জার কথা নহে? আমরা দেখিতে পাই, যে রোগ ডাক্তারে ভাল করিতে পারেন নাই, একজন বৈদ্য সামান্য বনৌষধির প্রয়োগে—সে রোগ আরাম করিয়াছেন,—আমাদের রুগ্‌ণাবাস নাই বলিয়া এ শুভসংবাদ গগন পবনে ঝঙ্কৃত হইতে পারে না। রুগ্‌ণাবাসেই—বৈদ্যের প্রকৃত কর্ম্মাভ্যাস। হাসপাতাল আছে বলিয়াই—ডাক্তারী চিকিৎসার এত কারুণ্য প্রসার! কারুণ্যে—যে আয়ুর্ব্বেদের জন্ম,—রুগ্‌ণাবাস প্রতিষ্ঠিত না হইলে, সে আয়ুর্ব্বেদ কখনই উন্নীত হইতে পারিবে না। আমরা কবিরাজী রুগ্নাবাস স্থাপন করিতে চাই।

আমাদের আর একটী কাজ - লুপ্তগ্রন্থের পুনঃ প্রচার। এখনও আমাদের এমন অনেক পুঁথি আছে—যাহা অদ্যাবধি মুদ্রাযন্ত্রে কবলিত হইবার সৌভাগ্যলাভ করে নাই। ক্রমশঃ সেইগুলি ছাপাইতে হইবে—নতুবা কীটদষ্ট জীর্ণ পাণ্ডুলিপি ধ্বংসের হস্ত হইতে আর বড় বেশী দিন রক্ষা পাইবে না। এই বিভাগের কার্য্যে যেসকল মহাত্মা আত্ম নিয়োগ করিবেন, তাঁহাদিগকে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে। ভারতের সর্ব্বত্র, সর্ব্বকালেই আয়ুর্ব্বেদ বিপুল প্রসার লাভ করিয়াছিল। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদীয় সংহিতা সংগ্রহের জন্য দেশে দেশে শ্রমণধর্ম্মী সন্ন্যাসীর মত ভ্রমণ করিতে হইবে। যেখানে যাহা পাওয়া যাইবে—তাহা সম্পূর্ণ হউক, অসম্পূর্ণ হউক, অতি অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশই হউক—সাদরে তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—প্রাচীন বৈদ্য-পরিবার এজন্য আমাদিগের প্রতি অযাচিত অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন। যাহার ঘরে প্রাচীন পুঁথি আছে, দেশের উপকারের জন্য তিনি তাহা দিয়া আমাদিগকে সাহায্য করিবেন। ইহা ভিন্ন বেদে, পুরাণে, তন্ত্রে, দর্শনে, চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়—তাহা আমরা সংগ্রহ করিব। অতীত সম্বল সংগ্রহ না করিলে, ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না।

এইরূপ ভাবে কার্য্য করিয়া আমরা যে নির্ব্বেদ-নিকেতন নির্ম্মাণ করিব, তাহার চূড়া

একদিন হিমাদ্রির মত আকাশ স্পর্শ করিবে। আয়ুর্ব্বেদকে জীবন্ত করিবার জন্যই—"অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের" প্রতিষ্ঠা। ইহা ব্যক্তি-বিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের সখের সামগ্রী নহে।

আমি অকপটচিত্তে মুক্তকণ্ঠে—আমার দেশবাসিগণের সম্মুখে—আমাদের অভাব অপূর্ণতার কথা নিবেদন করিলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—দেশ-হিতৈষীমাত্রেই আমাদের সহায় ও সহচর হইবেন। মেঘ-দুর্দ্দিন আষাঢ়ে জগবন্ধুর রথ যেমন অনেক বন্ধু মিলিয়া টানিয়া তাহা গন্তব্য স্থানে পৌছাইয়া দেন, তেমনি আমাদেরও আশা—দেশের লোক, আমাদের মনোরথের গতিতে কৃপাহস্তের অবলম্বন দিবেন। তাঁহাদেরই অনুগ্রহে—শারীর-নিদান শল্যতন্ত্র, গর্ভিণীব্যাকরণ সকল তত্ত্বে সুপুষ্টা-বয়ব বিরাট-দর্শন আয়ুর্ব্বেদ দেশের দৈন্যাতুর-তাকে আবার কোলে তুলিয়া লইবে।

এদেশে একবার একজন জাগিয়াছিলেন, —তিনি কপিলবাস্তর রাজকুমার বুদ্ধদেব, তাহাতেই জগৎ জাগিয়াছিল। আর একবার একজন জাগিয়াছিলেন—তিনি ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, তিনি ব্রাহ্মণ্যকে পুনর্জ্জীবন দান করিয়াছিলেন। তাহার পর আর একজন জাগিয়াছিলেন—তিনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, তাঁহার প্রেম প্লাবনে—দেশ ডুবিয়া গিয়াছিল, মানুষ দেবতা হইয়াছিল, সমাজ ভ্রাতৃতন্ত্রের আস্বাদ পাইয়াছিল। সেই একজনের প্রভাব —এখনও লোকে ভুলিতে পারে নাই, আর আমরা এত জন, এত ভাই—আমরা জাগিলে —আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি হইবে না? জীবের জীবনরক্ষার জন্য আমরা কি মর্ত্ত্যে ভগবানের সিংহাসন নামাইয়া আনিতে পারিব না? এসো ভাই—দলাদলি ভুলিয়া, সকলে এসো, —তোমাদের বিজ্ঞান ভূমি অনেক দিন হইতে নিষ্ক্রিয় পড়িয়া আছে, তোমরাই তাহা ফেলিয়া রাখিয়াছিলে; শুনিয়াছি—ভূমিকে কিছুদিন ফেলিয়া রাখিলে, তাহার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায়। তোমাদের বিজ্ঞান ভূমিরও উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে, এখন সকলে মিলিয়া, তাহাতে হাত লাগাও—হেমন্তের দিগন্তচুম্বি প্রান্তরে নিশ্চয়ই সোণা ফলিবে। এক সুরে যন্ত্র না বাঁধিলে তারের ঝঙ্কারে তার কাঁপিবে কেন?

শ্রীব্রজবল্লভ রায়।

আয়ুর্ব্বেদ কি Empirical ?

—:*:—

(পৌষ সংখ্যার ১৬৪ পৃষ্ঠার পর।)

রূপের অতিযোগ অযোগ, মিথ্যাযোগ কি ?—অত্যন্ত উজ্জ্বল বস্তুর নিরন্তর দর্শন যেমন প্রাতঃসূর্য্য, কোন উজ্জ্বল ধাতুতে কিম্বা দর্পণাদিতে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য কিরণ, বিদ্যুৎ, কিম্বা অতিতীব্র বিদ্যুদালোক দর্শন করিলে রূপের অতিযোগ, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কোন বস্তু একবারে না দেখা, রূপের অযোগ এবং অতি সূক্ষ্ম বস্তু, অতি নিকট বা অতিদূরস্থিত বস্তু, উগ্র, ভয়ঙ্কর, অদ্ভুত, ঘৃণাজনক অপ্রিয় ও বিকৃতরূপ নিরন্তর দর্শন করিলে রূপের মিথ্যাযোগ হইয়া থাকে।

শব্দের অতিযোগ, অযোগ মিথ্যাযোগ কি ?—বজ্রধ্বনি, কামান বন্দুকের কঠোর শব্দ, কল কারখানার কর্ণ পীড়াকর ঝন্‌ঝনি, সিংহ ব্যাঘ্রাদির বিকট শব্দ নিরন্তর শ্রবণ করিলে শব্দের অতিযোগ, কর্ণচ্ছিদ্র বন্ধ করিয়া একবারেকোন শব্দ শ্রবণ না করা, শব্দের অযোগ এবং কঠোর বাক্য, প্রিয়জনের মৃত্যু সংবাদ, যাহাতে চিত্তক্ষোভ ও ভীতি জন্মে এরূপ শব্দ শ্রবণ করাকে শব্দের মিথ্যাযোগ বলিয়া জানিবে।

গন্ধের অতিযোগ, অযোগ, মিথ্যাযোগ কি ?—অতি তীক্ষ্ণ, অতি উগ্র ও দুর্গন্ধি বস্তুর নিরন্তর ঘ্রাণ লইলে গন্ধের অতিযোগ, নাসিকা পথ রোধ করিয়া একবারে কোন দ্রব্যের গন্ধ না লওয়া, গন্ধের অযোগ এবং পচা, ঘৃণিত, ক্লিন্ন, অপবিত্র, বিষাক্ত ও শব প্রভৃতির গন্ধ ঘ্রাণ করিলে গন্ধের মিথ্যাযোগ ঘটিয়া থাকে।

রসের অতিযোগ, অযোগ, মিথ্যাযোগ কি ?—রস একাকী থাকিতে পারেনা, রস শব্দে রসাশ্রয়ী দ্রব্য বুঝাইবে। মধুর, অম্ল, লবণ, তিক্ত, ঝাল, কষায় এই ছয়টী রসাশ্রিত বস্তুর অতিভোজনকে রসের অতিযোগ, একবারে কোন রসাশ্রিত বস্তু ভোজন না করাকে রসের অযোগ এবং শাস্ত্রোক্ত বিধি পূর্ব্বক আহার না করাকে রসের মিথ্যাযোগ বলে।

আহারের শাস্ত্রোক্ত বিধি কি ? আয়ুর্ব্বেদ বলিয়াছেন আহারের হিতাহিতভাব আটটী বিষয়ের উপরি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সেই আটটী বিষয় যথা—প্রকৃতি, করণ, সংযোগ, রাশি, দেশ, কাল, ভোজনের নিয়ম এবং ভোজনের কর্ত্তা। খাদ্য দ্রব্যের স্বাভাবিক গুরু, লঘু প্রভৃতি গুণকে প্রকৃতি বলে যেমন মাষ গুরু, মুগ লঘু। এই প্রকৃতির উপরি আহারের হিতাহিত নির্ভর করে। স্বাভাবিক দ্রব্যের সংস্কারের নাম করণ। সংস্কার শব্দের অর্থ গুণান্তরের সংযোগ। জল, অগ্নি, শোধন, মন্থন, দেশ, বাসন, কালপ্রকর্ষ, ভাবনা ও পাত্রযোগে কিরূপে দ্রব্যের গুণান্তরাধান ঘটিয়া থাকে বলিতেছি। জল, অগ্নি ও শোধন যোগে গুরুগুণ তণ্ডুল হইতে লঘুগুণ অন্ন প্রস্তুত হইয়া থাকে। এস্থলে অগ্নি, জল ও শোধন যোগে তণ্ডুলে গুণান্তরাধান হইল। মন্থনযোগেও গুণান্তর জন্মিয়া থাকে যথা—শোথকারি দধিকে যদি মন্থন করা যায় তাহা হইলে সেই মথিত দধি স্নেহ যুক্ত হইলেও শোথ নাশক হইয়া থাকে। স্থানের গুণে দ্রব্যের গুণান্তর হইয়া থাকে যথা—ঔষধ বিশেষকে ধান্য রাশির ভিতর রাখিলে গুণান্তর সংযোগ হয়। বাসন অর্থাৎ

অধিবাসনের দ্বারা গুণান্তর হয়—যেমন তিলকে ফুলের সহিত অধিবাসিত করিয়া পীড়ন করিলে ফুলেল তৈল প্রস্তুত হয়। কাল প্রকর্ষে দ্রব্যের গুণান্তর হয় যেমন অরিষ্ট আসবাদিকে নির্দ্দিষ্ট কাল গাঁজাইতে হয় তবে গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে। পাত্র বিশেষে গুণান্তর হইয়া থাকে, যেমন—ত্রিকত্রয়াদি লৌহ, লৌহ পাত্রে লৌহ দণ্ডে মর্দ্দন করিবার উপদেশ আছে। ভাবনা দ্বারাও গুণান্তর হয় যেমন—আমলকীকে যদি কোন দ্রব্যের রসে রৌদ্রে শুষ্ক করা যায় তাহা হইলে আমলকীর গুণান্তর হইয়া থাকে। করণের কথা বলা হইল এক্ষণে সংযোগ সম্বন্ধে, বলিব। সংযোগ হেতু আহারের হিতাহিত সাধিত হইয়া থাকে। মধু ও ঘৃত কোনটাই মারক নহে কিন্তু মিলিত হইলে মারক হইয়া থাকে। দুগ্ধ ও মৎস্য পথ্য, কিন্তু সংযোগে কুষ্ঠাদিরোগের জনক হইয়া থাকে। ভাবনা ও সংযোগ এক নহে পার্থক্য আছে। রাশি অর্থাৎ প্রমাণের উপরি আহারের হিতাহিত নির্ভর করে। রাশি দুই প্রকার সর্ব্বগ্রহ রাশি ও পরিগ্রহ রাশি। ভাত, দাল, ব্যঞ্জন, দুগ্ধ মিলিত হইয়া যে প্রমাণ হয় তাহাকে সর্ব্বগ্রহ রাশি এবং ভাত এত, দাল এত, ব্যঞ্জন এত, দুগ্ধ এত, এই প্রত্যেকের প্রমাণকে পরিগ্রহ রাশি বলে। এই দ্বিবিধ রাশির উপরি আহারের গুণাগুণ নির্ভর করিয়া থাকে। দেশ অর্থাৎ দ্রব্যের উৎপত্তি ও প্রচার এবং ভোক্তার স্থান অনুসারে দ্রব্যে গুণান্তরাধান হইয়া থাকে, যথা—হিমালয়ে উৎপন্ন দ্রব্য গুরু এবং মরুদেশে জাত দ্রব্য লঘু হয়। যে সকল প্রাণী মরুদেশে বিচরণ করে এবং বহু ক্রিয়াকারী তাহাদের মাংস লঘু, ইহার বিপরীতকারী প্রাণীর মাংস গুরু। ভোক্তা যদি মরুদেশে বাসী হয়েন তাহা হইলে শীতল ও স্নিগ্ধ দ্রব্য এবং যদি অনুপদেশবাসী হয়েন তাহা হইলে উষ্ণ ও রুক্ষ দ্রব্য হিতকর হইবে। রসের অতিযোগ, অযোগ মিথ্যাযোগ ব্যাখ্যাত হইল।

স্পর্শের অতিযোগ, অযোগ মিথ্যাযোগ কি? - তৈলাদি তরল বস্তু প্রচুর পরিমাণে মাখাকে "অভ্যঙ্গ" এবং কোন দ্রব্যকে গুঁড়া করিয়া কিম্বা পেষণ করিয়া গাত্রে মর্দ্দন করাকে "উৎসাদন" বলে। অতি শীতল কিম্বা অতি উষ্ণ জলে স্নান, অতি শীত বা অতি উষ্ণ বাতাস ('লূর' মত) গায়ে লাগান, অতি উষ্ণ বা অতি শীতল দ্রব্যের অভ্যঙ্গ বা উৎসাদন করিলে স্পর্শের অতিযোগ ও সর্ব্বথা অনুপসেবন, স্পর্শের অযোগ বলিয়া জানিবে। স্নান, অভ্যঙ্গ ও উৎসাদন যদি শাস্ত্রবিহিত বিধি অতিক্রমপূর্ব্বক করা হয়—যেমন স্নানের পর উৎসাদন কিম্বা অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া হঠাৎ শীতল জলে অবগাহন, অপ্রীতিকর স্পর্শ যেমন শীতকালে শীতল শয্যা বা গ্রীষ্মকালে উষ্ণ শয্যা, কণ্টক কঙ্করাদির উপরি শয়ন বা উপবেশন, স্পর্শের মিথ্যাযোগ বলিয়া অভিহিত হয়।

আমরা যে হেতু সূত্রের ব্যাখ্যা করিলাম তাহার শেষে বলা হইয়াছে—"ত্রিবিধো হেতুসংগ্রহঃ" অর্থাৎ অযোগ, অতিযোগ, মিথ্যাযোগরূপ রোগের এই তিনটী সংক্ষিপ্ত হেতু। বস্তুতঃ হেতু তিনপ্রকার নহে অনেক। সকল রোগই প্রকুপিত বায়ু, পিত্ত বা শ্লেষ্মার কার্য্য সুতরাং যে যে আহার বিহার দ্বারা বায়ু, পিত্ত ও কফ প্রকুপিত হয় তৎসমুদায়ই রোগের হেতু। কি কি আহার বিহারে বায়ু পিত্ত কফের বৈষম্য জন্মে আয়ুর্ব্বেদে সে কথা অতি বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে। জিজ্ঞাসু মূলগ্রন্থ পাঠ করিবেন।

রোগের কারণ কি বলা হইল। এক্ষণে প্রতিজ্ঞানুসারে কারণ কত প্রকার বলিতে হইবে, রোগের প্রভেদ হেতুর বহু সংখ্যক হইলেও এস্থলে প্রসিদ্ধ দশপ্রকার হেতুভেদ লিখিত হইতেছে - (১) সন্নিকৃষ্ট (২) বিপ্রকৃষ্ট (৩) ব্যভিচারী (৪) প্রেরক (৫) উৎপাদক (৬) অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ। (৭) প্রজ্ঞাপরাধ (৮) পরিণাম (৯, বাহ্য (১০) আভ্যন্তর। (১) সন্নিকৃষ্ট হেতু - সন্নিকৃষ্ট শব্দের অর্থ নিকটবর্ত্তী। আজ রাত্রিতে গুরুভোজন করিলাম কল্য প্রাতে আমার অজীর্ণ হইল, এস্থলে গুরুভোজন অজীর্ণের সন্নিকৃষ্ট হেতু। (২) বিপ্রকৃষ্ট হেতু— গ্রীষ্মকালে সমুদ্র তীরবর্ত্তী কোন স্থানে গিয়া সমুদ্রের প্রীতিপ্রদ শীতল বায়ু নিরন্তর সেবন করিয়াছিলাম, গ্রীষ্মাবসানে আমার সেই শৈত্য সেবন জন্য ঘোরতর শ্লেষ্ম-বিকার উপস্থিত হইল এই শৈত্য সেবন শ্লেষ্মরোগের বিপ্রকৃষ্ট কারণ। (৪) ব্যভিচরী হেতু—যে দুর্ব্বল কারণ রোগ উৎপাদন করিতে পারে না তাহাকে ব্যভিচারী হেতু বলে। দধি সেবন তরুণ কফ রোগ জন্মাইতে পারে। আমি দধি সেবন করিলাম কিন্তু কফরোগ হইল না। এস্থলে দধি সেবন ব্যভিচারী হেতু হইল। স্বাস্থ্য যত উত্তম থাকে রোগের নিদানকে ততই ব্যভিচারী করিতে পারা যায়। স্বাস্থ্য যত মন্দ হয় ততই নিদান আর ব্যভিচারী হয় না—সামান্য হেতুতেই রোগ জন্মে। (৪) প্রেরক হেতু শরীরে রোগের কারণ সঞ্চিত আছে কিন্তু যে একটী কারণকে উপলক্ষ্য করিয়া সেই সঞ্চিত কারণ রোগ জন্মাইয়া থাকে সেই উপলক্ষীভূত কারণকেই প্রেরক হেতু বলে। যেমন হেমন্ত কালে আমার শ্লেষ্ম সঞ্চয় হইয়াছে, সেই সঞ্চিত শ্লেষ্মা বসন্ত কালের সূর্য্য সন্তাপে কুপিত হইয়া আমার কফরোগ উৎপাদন করিল—এখানে সূর্য্যসন্তাপ কফরোগের প্রেরক হেতু। (৫) উৎপাদক হেতু —আর হেমন্তকালজ যে মধুর রস শ্লেষ্ম-সঞ্চয়ের কারণ তাহাকেই উৎপাদক হেতু বলে। (৬-৮) —অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ, প্রজ্ঞাপরাধ ও পরিনাম এই তিনটী হেতু পূর্ব্বেই অতিযোগ, অযোগ মিথ্যাযোগ রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (৯-১০) বাহ্য হেতু ও আভ্যন্তর হেতু—আহার, আচার ও কাল প্রভৃতি রোগের বাহ্য হেতু আর বায়ু পিত্ত, কফ এবং রক্ত মাংসাদি সপ্তধাতু রোগের আভ্যন্তর হেতু। দোষভেদে ব্যাধিভেদে এবং দোষব্যাধি উভয়ভেদে যে তিনপ্রকার হেতু স্বীকৃত হইয়াছে তাহা আমরা পরে বলিব।

রোগের হেতু কত প্রকার বলা হইল, অতঃপর আমরা, রোগ কিরূপে জন্মে অর্থাৎ রোগের সম্প্রাপ্তি কি? তাহাই ব্যাখ্যা করিব। অহিত আহার বিহার—যেমন বিকৃত মাংসভোজন কিম্বা রাত্রিজাগরণ রোগের কারণ। এই অহিত আহার বিহার সেবন করিলে কিরূপে রোগোৎপত্তি ঘটিয়া থাকে তাহা বুঝিতে হইলে নিদান-সেবন ও ব্যাধি-দর্শনের মধ্যে যে কএকটী সূক্ষ্ম অবস্থা ভেদ আছে সেগুলি যথাক্রমে অনুসরণ করিতে হইবে। নিদান সেবনের অর্থাৎ যাহা রোগের হেতু তাহা আচরণ করার পর, প্রথম অবস্থা—সঞ্চয়, দ্বিতীয় অবস্থা—প্রকোপ, তৃতীয় অবস্থা— প্রসার, চতুর্থ অবস্থা—স্থানসংশ্রয়, পঞ্চমঅবস্থা— ব্যাধিদর্শন। নিদান সেবন করিলে যে রোগ জন্মিবেই এরূপ কোন নিশ্চয় নাই। নিদান সেবনে কিম্বা কালধর্ম্মে দোষের সঞ্চয় হইয়া থাকে মাত্র। সেই সঞ্চিত দোষ যদি রোগোৎপাদনের অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যথাক্রমে

প্রকোপাদি উপরি লিখিত ৪টী অবস্থার পরিণত হইতে পারে, তবেই রোগ জন্মিয়া থাকে। নচেৎ উহা ব্যভিচারী নিদান মধ্যে পরিগণিত হইয়া যায়। সঞ্চয়, উত্তরোত্তর প্রকোপাদি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কিরূপে ব্যাধি আনয়ন করে তাহাই আমাদের বক্তব্য। সঞ্চিত দোষ অনুকূল অবস্থা লাভ করিয়া প্রকুপিত হয় অর্থাৎ যোগ্য বল লাভ করে। প্রকুপিত দোষ (বায়ু, পিত্ত, কফ) পরে প্রসর লাভ করে অর্থাৎ সুস্থ শরীরে বায়ু, পিত্ত, কফ যে যে স্থানে অবস্থিত করে, সেই সেই স্থান হইতে ছড়াইয়া পড়ে। যেমন সুরা প্রভৃতি সঞ্চিত হইলে (fermented) যেমন উথলিয়া উঠে, সেইরূপ দোষও শরীরে প্রসরলাভ করিয়া থাকে। বায়ু এই গতিশক্তি দানের কর্ত্তা। বায়ু অচেতন হইলেও রজোগুণ-ভূয়িষ্ঠ বলিয়া কফ, পিত্ত, শোণিতের প্রবর্ত্তক হইয়া থাকে। দোষ ছড়াইয়া পড়িয়া শরীরের যে স্থানে রোগ জন্মাইবে সেই সেই অঙ্গে, যেমন—হস্ত, পদ, উদর, মুখ, চক্ষু কি কর্ণ কিম্বা হৃদয়, যকৃৎ, আমাশয়, বুক্ক বা বস্তি আশ্রয় করিয়া থাকে, ইহারই নাম স্থান-সংশ্রয়। দোষ স্থান সংশ্রয় করিলে মোটামুটী এই জানা যায় যে, অমুক অঙ্গের বা অমুক আশয়ের রোগ জন্মিবে কিন্তু সেই অঙ্গে বা আমাশয়ে অনেক প্রকার রোগ জন্মিতে পারে, তন্মধ্যে ঠিক কোন রোগটী জন্মিবে তখনও নিশ্চয় করা যায় না। পরে আরও একটু অনুকূল অবস্থা-প্রাপ্ত হইলে, স্থান-সংশ্রিত দোষ কি রোগ উৎপন্ন করিবে জানা যায় অর্থাৎ রোগের পূর্ব্ব-রূপ প্রকাশ পায়। যেমন মেঘদর্শনে বৃষ্টি, পুষ্প দর্শনে ফল অনুমিত হইয়া থাকে তদ্রূপ পূর্ব্ব-রূপ দর্শনে ভাবী ব্যাধির জ্ঞান হইয়া থাকে। কোন্ রোগের কি পূর্ব্বরূপ তাহা রোগবিনিশ্চয় গ্রন্থে, বলা হইয়াছে। রোগের পূর্ব্বরূপ আর স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইলে তাহাকে রূপ অর্থাৎ রোগের লক্ষণ বলা হয়। যখন রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় তখনই ব্যাধি-দর্শন অর্থাৎ এই জ্বর, এই অতিসার হইল বলিয়া থাকি। অন্যান্য চিকিৎসা-শাস্ত্রে এই ব্যাধি-দর্শনের পর চিকিৎসার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ বলেন ইহা চিকিৎসার পঞ্চম কাল। প্রথম যখন দোষের "সঞ্চয়" হইয়াছিল সেই চিকিৎসার প্রথম কাল। তখন সঞ্চিত দোষ বাহির করিয়া দিলে আর দোষের প্রকোপ হইতে পারিত না। দোষের সঞ্চিতাবস্থায় প্রতীকার না করিলে দ্বিতীয় অবস্থা—"প্রকোপ" প্রাপ্ত হয়, ইহা চিকিৎসার দ্বিতীয় কাল। প্রকোপ-কালে প্রতীকার করিলে আর তৃতীয় অবস্থা—"প্রসার" লাভ করিতে পাবে না। দোষ "প্রসারের" অবস্থায় উপনীত হইলে চিকিৎসার তৃতীয় কাল। প্রসার প্রাপ্ত দোষ পরে স্থান সংশ্রয় করে, এই অবস্থা চিকিৎসার চতুর্থকাল। স্থান সংশ্রয়ের পর ব্যাধিদর্শন ইহা চিকিৎসার পঞ্চমকাল। যে চিকিৎসকগণ ব্যাধিদর্শন অর্থাৎ রোগোৎপত্তির পর চিকিৎসা আরম্ভ করেন। আয়ুর্ব্বেদ বলেন তাঁহারা চিকিৎসা করিবার চারিটী অবসর হারাইয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া থাকেন। আয়ুর্ব্বেদের এই অপূর্ব্ব এবং অনন্য-সাধারণ চিকিৎসার ব্যবস্থা কেবল উপদেশ মাত্র নহে—প্রতিরোগে এইরূপ চিকিৎসা প্রদর্শিত হইয়াছে। সঞ্চয়েই চিকিৎসা করিলে দোষ আর উত্তরগতি লাভ করিতে পারে না; অতএব বর্ষাকালে সঞ্চিত পিত্ত শরৎকালে প্রকুপিত হইয়া যাহাতে পিত্তজন্য ব্যাধি উৎপাদন করিতে না পারে তজ্জন্য আয়ুর্ব্বেদ শরৎকালে পিত্তনির্হরণের ব্যবস্থা দিয়া-

ছেন। আবার শরৎকালে সঞ্চিত কফ যাহাতে বসন্তকালে কুপিত হইয়া কফরোগ জন্মাইতে না পারে তজ্জন্য আয়ুর্ব্বেদ বসন্তে কফনির্হরণের উপদেশ দিয়াছেন। মানুষকে ঋতুকৃত দোষের সঞ্চয় ও প্রকোপ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই প্রধানতঃ আয়ুর্ব্বেদে "ঋতুচর্য্যা" উপদিষ্ট হইয়াছে। সঞ্চয়েই যদি দোষ নষ্ট হইয়া গেল তবে তাহার প্রকোপ প্রসরাদি আর কোথা হইতে হইবে ? তারপরে রোগের পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পাইলেও যদি প্রতিকার করা যায় তাহা হইলে আর রূপ অর্থাৎ ব্যাধি জন্মিতে পারে না; অতএব আয়ুর্ব্বেদ রোগের পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পাইলেও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যেমন জ্বরের পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পাইলে অতি লঘু ভোজন কিম্বা উপবাস করিবার উপদেশ আছে। পূর্ব্বরূপে এই লঘু ভোজন বা উপবাস রূপ চিকিৎসা অবলম্বন করিলে আর জ্বর হইতে পারিবে না। নিদান সেবন হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যাধিদর্শন পর্য্যন্ত আমরা ব্যাখ্যা করিলাম বটে কিন্তু একটী কথা বলিতে বাকী আছে। আমরা বলিয়াছি দোষের সঞ্চয় হইতে প্রসর পর্য্যন্ত দোষ কি ব্যাধি জন্মাইবে জানা যায় না, পরে স্থান সংশ্রয় করিয়া পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পাইলে তবে কি রোগ জন্মিবে জানা যায়। এ বিষয়ে কএকটী সূক্ষ্ম কথা আছে এক্ষণে আমরা তাহাই বলিব। দোষ স্থান-সংশ্রয় করিয়া পূর্ব্বরূপ প্রকাশের পূর্ব্বে কি রোগ উৎপাদন করিবে যদি জানিতে না পারা যায় তাহা হইলে রোগের নিদান কিরূপে স্থির হয় ? অর্থাৎ এইরূপ অহিত আহার বিহার করিলে অমুক রোগ জন্মিবে, ইহা কিরূপে বলা যায় ? কারণ প্রথম, অহিত আহার বিহার দ্বারা দোষ সঞ্চিত ও কুপিত হইবে পরে প্রসার লাভ করিবে, তারপর স্থানসংশ্রয় করিবে সুতরাং যাহা চতুর্থ অবস্থায় জ্ঞেয় তাহা প্রথমাবস্থাতেই কিরূপে জানিব ? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে যদি এই কথা বলিতে পারা যাইত যে, অমুক আহার বিহার করিলে শরীরের অমুক অঙ্গ বা অমুক আশয় আশ্রয় করিয়া দোষ অমুক রোগ উৎপন্ন করিবেই অর্থাৎ রোগের নিদানের সহিত রোগের জন্মের একটা নিয়ত সম্বন্ধ আছে, তাহা হইলে চতুর্থ অবস্থার কথা প্রথম অবস্থায় বলা আর কঠিন কি ? কিন্তু বস্তুতঃ নিদানের সহিত রোগের জন্মের ঐরূপ কোন নিয়ত সম্বন্ধ নাই। নাই বলিয়াই আয়ুর্ব্বেদ নিদান অর্থাৎ রোগের হেতুকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা (১) দোষ হেতু (২) ব্যাধি হেতু (৩) দোষ ব্যাধি উভয় হেতু। (১) দোষ-হেতু—মধুর রস কফের, তিক্তরস বায়ুর এবং কটু রস পিত্তের সঞ্চয় ও প্রকোপের হেতু। আয়ুর্ব্বেদে ২০ প্রকার শ্লেষ্মরোগ, ৪০ প্রকার পিত্তরোগ এবং ৮০ প্রকার বায়ুরোগ স্বীকৃত হইয়াছে। মধুরস দোষ-হেতু অর্থাৎ কফের সঞ্চয় ও প্রকোপ করে মাত্র কিন্তু ঐ প্রকুপিত কফ উপরি কথিত ২০ প্রকার কফরোগের মধ্যে কি রোগের উৎপাদন করিবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং ইহা কেবল দোষের হেতু হইল। (২) ব্যাধি-হেতু—মৃত্তিকা ভক্ষণ পাণ্ডুরোগের হেতু। এই হেতুকে আমরা ব্যাধি-হেতু বলিব। মৃত্তিকা ভক্ষণ পাণ্ডুরোগ উৎপাদন করিবার পূর্ব্বে যদিও বায়ু বা পিত্ত বা কফের প্রকোপ জন্মাইয়া তবে পাণ্ডুরোগ উৎপাদন করে তথাপি মৃত্তিকা ভক্ষণ জন্য কুপিত সেই বাতাদি কেবল পাণ্ডুরোগেই জন্মাইয়া থাকে অন্য কোন রোগ জন্মাইতে পারে না. সুতরাং এই হেতুকে আমরা

ব্যাধি-হেতু বলিব। ব্যাধি-হেতু হইলেই যখন দোষ-হেতু হইবেই, কারণ দোষ বিনা ব্যাধি জন্মিতেই পারে না, তখন পৃথক-দোষ ব্যাধি উভয় হেতু স্বীকারের প্রয়োজন কি? কেবল চিকিৎসার সুবিধার জন্য এই হেতু ভেদ স্বীকার করা হইয়াছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, যে বস্তু দোষ-হর তাহা সর্ব্বত্র ব্যাধিহর নহে—এখানে আপত্তি হইতে পারে যে দোষ কারণ, ব্যাধি কার্য্য কারণভূত দোষের নিবৃত্তি হইলে কার্য্যভূত ব্যাধির নিবৃত্তি হইবে না কেন? দ্রব্য শক্তির উপরি প্রশ্ন চলেনা। আমরা দেখিতে পাই যে, কোন দ্রব্য দোষ হরণ করে কিন্তু ব্যাধি হরণ করিতে পারে না। এক্ষণে বুঝিতে পারা গেল যে কতকগুলি হেতু কেবল দোষ কুপিত করে কতকগুলি হেতু, বিশেষ ব্যাধি উৎপাদন করে। রোগবিনিশ্চয় গ্রন্থে প্রতি রোগের যে হেতু লিখিত হইয়াছে সেগুলির মধ্যে কতকগুলি দোষ-হেতু কতকগুলি ব্যাধি-হেতু কতকগুলি বা দোষ ব্যাধি উভয় হেতু। প্রসঙ্গক্রমে হেতু সম্বন্ধে আর একটী কথা বলিয়া আমারা এই বিষয়ের উপসংহার করিব। অনেক রোগ এক হেতু হইতে জন্মে আবার এক হেতু হইতে একটী রোগও জন্মে। বহু হেতু হইতে বহু রোগ জন্মে আবার বহু হেতু হইতে একটী রোগও জন্মে।

(৫) এক্ষণে আমরা রোগের লক্ষণও রোগপরীক্ষা সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের উক্তি ব্যাখ্যা করিব। রোগের লক্ষণ এবং রোগের রূপের একই অর্থ অর্থাৎ যাহা রূপ তাহা লক্ষণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। "রোগে লক্ষণ" বলিলে রোগ এবং লক্ষণ পৃথক্ বুঝায় কিন্তু লক্ষণ সমষ্টিই ত রোগ, লক্ষণ সমষ্টি ভিন্ন রোগের আর পৃথক্ অস্তিত্ব কোথায়? ঘর্ম্মরোধ সন্তাপ এবং সর্ব্বাঙ্গ-গ্রহণ ভিন্ন আর জ্বর কি? এই গুলির সমষ্টিই ত জ্বর, কাহার কাহার এইরূপ সন্দেহ হইতে পারে কিন্তু এরূপ সন্দেহ সঙ্গত নহে। ঘর্ম্ম-রোধ প্রভৃতিই জ্বর নহে। দোষ এবং দূষ্য (রস, রক্ত, মাংসাদি) সংমূর্চ্ছিত হইয়া যে অবস্থা বিশেষ জন্মায় তাহাই জ্বরাদিরূপ ব্যাধি, ঘর্ম্মাবরোধ প্রভৃতি তাহার কার্য্য। অথবা ঘর্ম্মরোধ প্রভৃতি প্রত্যেকে রূপ অর্থাৎ লক্ষণ ইহাদের সমষ্টির নাম ব্যাধি। সমুদায়ি সমুদয় হইতে পৃথক। পলাশ বৃক্ষের সমষ্টিই পলাশ বন বটে কিন্তু তাহা বলিয়া পলাশবৃক্ষ ও বন এক নহে। লক্ষণের দ্বারা ব্যাধির পরিচয় হয় বটে কিন্তু অনেক ব্যাধির একই লক্ষণ দেখা যায়, আবার একই ব্যাধির বহু লক্ষণ দৃষ্ট হইয়াথাকে সুতরাং নিঃসংশয় জ্ঞান লাভের জন্য আয়ুর্ব্বেদে রোগের ইতর-ব্যবচ্ছেদক (অন্য হইতে পৃথক করিবার) লক্ষণ এবং প্রায়শঃ দৃষ্ট লক্ষণ উপদিষ্ট হইয়াছে।

প্রত্যেক চিকিৎসকের জানা উচিত যে রোগ-পরীক্ষা ও রোগি-পরীক্ষা দুইটী পৃথক বিষয়। অনেক সময় দেখা যায় চিকিৎসকেরা রোগ পরীক্ষা লইয়াই তন্ময়, রোগি-পরীক্ষা—যাহার চিকিৎসা হইতেছে তাহার পরীক্ষা যে চিকিৎসা কার্য্যে নিতান্ত প্রয়োজন ইহা অনেক ক্ষেত্রেই বিস্মৃত হইতে দেখা যায়। রোগীকে ভুলিয়া রোগের চিকিৎসা করিলে যে কি বিষম অনর্থোৎপত্তি ঘটিয়া থাকে তাহা আজ কাল প্রত্যক্ষ করিবার অবসর বোধ হয় অনেকেরই ঘটিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ রোগ-পরীক্ষার সহিত রোগি-পরীক্ষার উপদেশ দিতেও বিস্মৃত হয়েন নাই, বরং রোগ-পরীক্ষা অপেক্ষা রোগি-পরীক্ষা অধিকতর বিস্তৃত ভাবে এবং

সূক্ষ্মরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব আমরা অগ্রে রোগি-পরীক্ষা পরে রোগ-পরীক্ষা আলোচনা করিব।

আয়ুর্ব্বেদ বলিতেছেন রোগি-পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখিবে রোগীর জন্ম ও বসতি স্থান কোথা; কোথা অবস্থিতিকালে রোগটী উৎপন্ন হইয়াছে, রোগী যেদেশের লোক সেই দেশের লোকের আহার কিরূপ, বল কিরূপ, এবং অভ্যাস কি? এই সকল তত্ত্ব জানিবার বিশেষ আবশ্যকতা আছে। শীতবহুল ইংলণ্ড-বাসী ইংরাজ ও গ্রীষ্মবহুল ভারতবাসী বাঙ্গালীর আহার, বল, অভ্যাস একরূপ নহে। একজন আবাল্য মাংসভোজী আর একজন প্রধানতঃ অন্নফলমূলভোজী কচিৎ মৎস্য মাংস ভোজন করে। ইহাদের বলও সমান নহে। সবলের পক্ষে ঔষধের যে মাত্রা হিতকর, দুর্ব্বলের পক্ষে সে মাত্রা মহা অনর্থের হেতু। অভ্যাসও ভিন্ন, একজন ভ্রমেও তিক্তরস সেবন করে না, মধুর ও অম্ল রস নাম মাত্র ভোজন করে। অপরে প্রচুর মধুরাম্লভোজী এবং ইচ্ছা করিয়া তিক্তবস্তু সেবন করে। চিকিৎসকের এই সকল পার্থক্য চিন্তা করা উচিত। এত হইল রোগীর দেশগত পার্থক্য, অতঃপর রোগীর আত্মগত বিষয় চিন্তা করা যাইতেছে। চিকিৎসক রোগীর প্রকৃতি, সার, সংহনন, সত্ব, সাত্ম্য, আহার-শক্তি, ব্যায়াম-শক্তি ও বয়স পরীক্ষা করিবেন।

প্রকৃতি—প্রকৃতি কি? যাহাকে আমরা "ধাত" বলি তাহাই প্রকৃতি—যেমন অমুকের বায়ুর ধাত, অমুকের পিত্তের ধাত ইত্যাদি। এই "ধাত" বা প্রকৃতি কিরূপে জন্মে? গর্ভাধানকালে পিতার শুক্র এবং মাতার অকৃত্রিম আর্ত্তব শোণিত, যে ঋতুতে গর্ভাধান হয় সেই ঋতু, গর্ভাশয়ের অবস্থা, মাতার তৎকালীন আহার বিহার এবং মহাভূত বিকার অনুসারে গর্ভস্থিত শিশুর শরীর নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ঐ শুক্রশোণিত, ঐ গর্ভাশয়, মাতার ঐ আহার বিহার যে যে দোষ (বায়ু, পিত্ত, কফ) দ্বারা অনুবিদ্ধ হয় গর্ভস্থিত শিশুর সেই সেই প্রকৃতি হইয়া থাকে। অর্থাৎ ঐ সমস্ত ভাব বায়ু দূষিত হইলে বায়ুপ্রকৃতি, পিত্তদুষ্ট হইলে পিত্তপ্রকৃতি; কফ দূষিত হইলে কফপ্রকৃতি হইয়া থাকে। এই প্রকৃতি জন্মের সহিত জন্মিয়া থাকে। এই বাতাদি প্রকৃতি জানিবার জন্য আয়ুর্ব্বেদ বাতাদি প্রকৃতি মনুষ্যের যে লক্ষণ বলিয়াছেন পাঠকের অবগতির জন্য আমরা সংক্ষেপে তাহা লিখিতেছি। কারণের গুণ কার্য্যে প্রকাশ পায়। শ্লেষ্মপ্রকৃতির কারণ শ্লেষ্মা সুতরাং শ্লেষ্ম-প্রকৃতির শরীর শ্লেষ্ম গুণযুক্ত হইয়া থাকে। শ্লেষ্ম শ্লক্ষ্ণ ও স্নিগ্ধ বলিয়া শ্লেষ্মপ্রকৃতি মনুষ্যের শরীর স্নিগ্ধ, দৃষ্টি সুখকর ও সুকুমার হইয়া থাকে। শ্লেষ্মা মধুরগুণ অতএব শ্লেষ্মপ্রকৃতি লোকের শুক্রধাতু প্রচুর, মৈথুনশক্তি অধিক এবং সন্তান বহু জন্মিয়া থাকে। শ্লেষ্মা সারও সান্দ্র বলিয়া শ্লেষ্মপ্রকৃতি মনুষ্যের শরীর দৃঢ়, অঙ্গ সমুদায় পূর্ণ ও পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। শ্লেষ্মা মন্দ, স্তিমিত, গুরু ও শীত গুণযুক্ত অতএব শ্লেষ্মপ্রকৃতি মানুষেরা অল্প উদযোগী ও অল্প আহার বিহার করিয়া থাকে। ইহারা সহজে ক্রুদ্ধ বা দুঃখিত হয় না। ইহাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দেহের উত্তাপ ও ঘর্ম্ম অল্প হইয়া থাকে। পিত্ত—উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, দ্রব, বিস্র, অম্ল ও কটু গুণ-যুক্ত অতএব পিত্তপ্রকৃতি মনুষ্যগণের উষ্ণ সহ্য করিবার ক্ষমতা থাকে না। গাত্র কোমল হয়, শরীরে তিল, মেছেতা ও চুলকানি প্রচুর জন্মিয়া থাকে। ইহাদের ক্ষুধা ও পিপাসা অধিক দেখা যায়। অপেক্ষাকৃত শীঘ্র ইহাদের

চর্ম্ম লোল হয়, চুল পাকিয়া যায় এবং টাক পড়ে, দাড়ি গোঁপ ঘন হয় না, চুল কটা হয়, ইহারা পরাক্রমশালী হয়, ইহাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রবল, ক্লেশ সহ্য করিবার ক্ষমতা থাকে, প্রায়ই পেটুক হয়, শরীরের সন্ধি ও মাংসের তেমন বাঁধুনি থাকে না, ঘর্ম্ম, মূত্র ও মল প্রচুর নির্গত হয়, শরীরে দুর্গন্ধ হয়, শুক্র অল্প এবং সন্তানও অল্প জন্মিয়া থাকে। পিত্ত-প্রকৃতির আয়ু ও বল মধ্যম। বায়ু রুক্ষ, লঘু, চল, বহু, শীত, পরুষ ও বিশদ গুণযুক্ত অতএব বাতপ্রকৃতি পুরুষের শরীর রুক্ষ, অপুষ্ট ও খর্ব্ব হইয়া থাকে। ইহার কণ্ঠস্বর রুক্ষ, ক্ষীণ ও ভাঙ্গা ভাঙ্গা হইয়া থাকে, গাঢ় নিদ্রা হয় না, কখন স্থির থাকিতে পারে না, প্রায়ই হাত পা নাড়ে, অধিক কথা বলে, শরীর শিরাব্যাপ্ত, সহজেই চিত্তের বিকার জন্মিয়া থাকে, ভয়, ক্রোধ অধিক হয়, শীঘ্র ধারণা করিতে পারে কিন্তু মনে রাখিতে পারে না, শীতবোধ অপেক্ষাকৃত অধিক ও গা ফাটিয়া থাকে। ইহারা অল্পায়ু, অল্পবল, অল্পসন্তান ও নিধন হইয়া থাকে। দ্বন্দ্বজপ্রকৃতি হইলে দুইটীর লক্ষণ দেখা যায়। বাতপ্রকৃতির বায়ুজন্য রোগ, পিত্তপ্রকৃতির পিত্তজন্য এবং কফপ্রকৃতির কফজন্য রোগ শীঘ্রই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যাহার যে প্রকৃতি অহিত আহার বিহারে সেই প্রকৃতিভূত দোষ যত শীঘ্র প্রকুপিত হয় অন্য দোষ তত শীঘ্র প্রকুপিত হয় না—যেমন কোন বাতপ্রকৃতির লোক অহিত আহার বিহার করিলে বায়ু যত শীঘ্র কুপিত হইবে কফপিত্ত তত শীঘ্র কুপিত হয় না। এইরূপ কফপিত্ত প্রকৃতির পক্ষেও জানিতে হইবে।

সার—প্রকৃতির পর আমরা সারের কথা বলিব। সার কি? বৃক্ষের সার বলিলে যেমন স্থিরাংশকে বুঝায় মনুষ্যের সার বলিলেও সেই-রূপ মাংসাদি ধাতুর বিশেষ বল বুঝাইয়া থাকে। এই সার সাত প্রকার যথা—ত্বক্‌সার রক্তসার, মাংসসার, মেদসার, অস্থিসার, মজ্জসার, ও শুক্রসার। হৃষ্টপুষ্ট হইলেই বলবান্ এবং কৃশ হইলেই দুর্ব্বল কিম্বা বৃহৎ শরীর হইলেই বলবান্ অল্পকায় হইলেই হীনবল এরূপ কল্পনা করিয়া চিকিৎসক যাহাতে ভ্রমে পতিত না হয়েন তজ্জন্য শরীর ও মনের বিশেষ বলরূপী এই সারতত্ত্ব তাঁহার আলোচনা করা উচিত। পিপীলিকা ক্ষুদ্রকায় হইলেও যেমন অনেক বড় জিনিষ বহিয়া লইয়া যাইতে পারে, মানুষের মধ্যেও সেইরূপ অনেক মানুষ দেখা যায় যাহারা স্বল্পকায় হইলেও বেশ বলশালী। সারই এই বিশেষ বলশালিত্বের কারণ। সারের দ্বারা যেরূপ শরীরের বল অনুমিত হয় তদ্রূপ মনের বলও জানা যায়। মানুষ যে মহোৎসাহ, ধীর, ত্যক্তবিষাদ, গম্ভীরবুদ্ধি, কল্যাণাভিনিবেশী ও ক্লেশসহ হয় সেও সারের গুণেই হইয়া থাকে। পূর্ব্বে আমরা ত্বক্ হইতে শুক্র পর্য্যন্ত যে সপ্ত প্রকার সারের উল্লেখ করিয়াছি আয়ুর্ব্বেদে উহাদের বিশেষ লক্ষণ লিখিত আছে—বাহুল্য-ভয়ে সেইগুলি লিখিত হইল না।

(ক্রমশঃ)

খাদ্যের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ।

যাঁহারা পাশ্চাত্য ভাষায় সুশিক্ষিত, পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের বিমল প্রভায় যাঁহাদের প্রাচীন কুসংস্কার দূরীভূত হইয়াছে, যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বান্তঃকরণে ইংরাজী রীতি, নীতি ও মতিগতির অনুকারণে অভ্যস্ত, তাঁহারাই বর্ত্তমান কালে "শিক্ষিত জন-সমাজ" শব্দের অভিধেয়। প্রোক্ত ভারত-সন্ততিগণের অধিকাংশ লোকেরই ধারণা এই যে ধর্ম্মের সহিত আহারাদির বিধি-নিষেধ বাহ্যাড়ম্বর মাত্র। ঈশ্বরে ভক্তি, জীবে দয়া, ও সত্যভাষণাদি সদ্‌গুণ থাকিলেই ধর্ম্মানুষ্ঠান হয়। স্নান, শৌচাচার, ললাটতটে চন্দন বা তিলকধারণ এবং দীর্ঘশিখা বন্ধন ব্যাপার নিরর্থক। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের উপাসনায় এই সকল ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজন নাই। যে সকল আহারীয় দ্রব্য রসনার তৃপ্তিসাধন করে, যাহা শ্রবণের আনন্দ বর্দ্ধন করে ইত্যাদি বিষয়ভোগ ধর্ম্মের হানি করে না। এই মতে অনেক ব্যক্তি চলিয়া থাকেন। বর্ত্তমানকালে রেলে, ষ্টীমারে চলিবার সময় শিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত জনমণ্ডল আর জাতি-বিচার করেন না, যে কোন ব্যক্তির স্পৃষ্ট অন্নপানাদি অম্লান বদনে গ্রহণ করিয়া পথ-শ্রান্তি দূর করেন। একটু প্রণিধানপূর্ব্বক চিন্তা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে স্নানাদি সদাচার এবং আহারীয় দ্রব্যের গ্রহণ ও পরিবর্জ্জন সর্ব্বথা ঈশ্বরোপাসনার অনুকূল। স্নান, চন্দনলেপন, শুক্লবসন পরিধান এবং সাত্ত্বিক ভোজন প্রভৃতি সকল বিষয়ই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য, তথাবিধ আচরণে মনের পবিত্রতা সাধিত হয়, চিত্ত পবিত্র হইলে আরাধ্য বস্তু লাভ করিতে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় না, আর মনঃ যদি চঞ্চল, কুৎসিত বিষয়ে বিলীন, থাকে তবে আরাধ্য বস্তু কখনই লাভ হয় না। সাধনার অনুরূপ সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, এজন্য সর্ব্বাগ্রে ইন্দ্রিয়ের রাজা মনের বিশুদ্ধি সম্পাদন জন্য পূতচরিত আর্য্যগণ আহারাদির সহিত ধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ স্থাপন করিয়াছেন এবং যে বিষয় ধর্ম্মানুষ্ঠানের অনুকূল তাহার গ্রহণ এবং প্রতিকূল বিষয়ের পরিবর্জ্জন করিতে বলিয়াছেন—তাহারই নাম শাস্ত্র—"শাস্তি ত্রায়তে যেন তচ্ছাস্ত্রং" সেইজন্য শাস্ত্রের বিধি নিষেধ অবনত মস্তকে মান্য করা কর্ত্তব্য। ঋষিগণ জগতের কল্যাণ কামনায় যে সকল সুনিয়মের অবতারণা করিয়াছেন, তাহার পরিবর্জ্জন করায় ভারতবাসিগণ দিন দিন ক্ষীণ দুর্ব্বল হইয়া অকালে কাল-কবলে পতিত হইতেছেন। মনু বলেন—

আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ।
আচারাদ্ধনমক্ষয্য মাচারো হন্ত্যলক্ষণম্॥

অর্থাৎ আচারানুষ্ঠান করিলে দীর্ঘ আয়ু, অভিলষিত সন্ততি ও ধন ধান্য প্রভৃতির লাভ হইয়া থাকে, আচার অনন্তলক্ষণ॥— কোন্ কারণে আর্য্যগণ খাদ্যাদির গ্রহণ ও বর্জ্জন করিয়াছেন এক্ষণে সংক্ষেপে তাহার কারণ নিশ্চয় করা যাইতেছে; কারণ প্রদর্শনের হেতু এই যে আধুনিক নব্য সভ্যগণ কারণ না শুনিয়া কেবল অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কোন কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইতে চাহেন না। স্নান* না করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা করায় দোষ কি?

* সাংখ্যমতে মনঃ মস্তকের অভ্যন্তরস্থ ঘৃতের ন্যায় পদার্থ দ্বারা তর্পিত হইতেছে। সহস্রারে আজ্ঞাচক্রে মনের বসতি স্থান, স্নান করিলে মস্তক শীতল হয়, সুতরাং মনঃ স্থির থাকে এজন্য সহজেই ধ্যেয় বস্তুর ধারণ করা যায়।

এই কথার সদুত্তর না পাইলে শিক্ষিত সমাজ সন্তুষ্ট হইবেন না; তজ্জন্যই জগতের আদি কারণের কথা বিবৃত হইতেছে ;—

এই নিখিল জগতের কারণ "প্রকৃতি"। সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি, সেই প্রকৃতি-প্রসূত-জগতের বৈচিত্র্যও প্রকৃতির গুণ-ভেদে সম্পন্ন হইয়া থাকে, অন্যথা সকল মানুষের বর্ণ,গঠন ও চরিত্র প্রভৃতিও একরূপই হইত। একটী ছাগী একই দিনে কখনই শুক্ল কৃষ্ণ ও কর্ব্বূর বর্ণের শাবক প্রসব করিত না।

এই জগৎ ত্রিগুণাত্মক সুতরাং আমরা যে সকল বস্তু আহার করি, যে যে বিষয়ের উপভোগ করি তাহার কোনটীতে সত্ত্বগুণের উদ্রেক হয়, কোনটীতে রজোগুণের আবির্ভাব এবং কোনটীতে তমোগুণের বিকাশ হইয়া থাকে।

শরীর অন্ন রস হইতে উৎপন্ন; সুতরাং যেরূপ গুণ-বিশিষ্ট অন্ন ভুক্ত হয়, শরীরেও সেই সেই ভুক্তদ্রব্যের গুণাবলী সংক্রমিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—"সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং, রজসো লোভ এব চ। প্রমাদ-মোহৌ জায়েতে তমসোঽজ্ঞান মেব চ"। সত্ত্ব-গুণের বাহুল্যে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, রজঃ ও. তমোগুণাধিক্যে লোভ, প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞানতা উপস্থিত হইয়া থাকে। মদ্য* মাংস ও পলাণ্ডু প্রভৃতির নিয়ত সেবনে শরীর উষ্ণ এবং চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে ; এই সকল কারণে তপশ্চক্ষু ঋষিগণ আহারীয় দ্রব্যের সহিত ধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অবলোকন করিয়াছেন ; তজ্জন্যই খাদ্যাদির বিধি নিষেধের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

এই বিধি নিষেধের ফলে আর্য্যসন্তানগণ দুগ্ধ, ঘৃত, কন্দ, মূল, ফল প্রভৃতি সাত্ত্বিক দ্রব্য ভোজন করিয়া রজঃ ও তমোগুণের অল্পতা সাধন করিতে সমর্থ হইতেন ; এবং সুদীর্ঘকাল সুস্থ শরীরে থাকিয়া তীব্র তপস্যা করিতে পারিতেন, তাহার ফলে অমৃতত্ব লাভ করি-তেন। চরক বলেন—"হিতাশীস্যান্মিতাশী-স্যাৎ কালভোজী জিতেন্দ্রিয়ঃ" হিত দ্রব্যের আহার করিবে, পরিমিত মাত্রায় ভোজন করিবে, যথাকালে ভোজন করিবে, এবং জিতেন্দ্রিয় হইবে, অর্থাৎ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া অতি মাত্রায় ভোজন করিবে না।

হিন্দু সন্তানদিগকে খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে আর নূতন কথা বলিবাব আবশ্যকতা নাই ; তাঁহা-দের আচার-পূত পূর্ব্ব পুরুষগণ যে সকল আহারাচার গ্রহণ ও বর্জ্জন করিয়াছেন, সেই চিরাচরিত পদ্ধতির অনুসরণে ধর্ম্মোপার্জ্জনের পথ সুগম হইবে।

আহারীয় দ্রব্যের গুণাগুণ বিচার করিতে গেলে প্রবন্ধ কলেবর নিরতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে ; এবং পাঠক মহাশয়দিগেরও ধৈর্য্যচ্যুতি হইতে পারে এজন্য এ বিষয়ের সংক্ষেপে উপ-সংহার করিতে হইল।

ঋতু-বিশেষে এবং তিথি-ভেদে নানাবিধ পদার্থ উপকারী বা অপকারী হইয়া থাকে। সেজন্য মুণিগণ অষ্টমীতে নারিকেল, ত্রয়ো-

* সঙ্গত মাত্রায় মদ্য পীত হইলে তাহা সুখপ্রদ, স্মৃতি ও বলবর্দ্ধক হইয়া থাকে। মদ্যের এই সকল গুণ থাকিলেও বিষয়ী লোকে সুরার মাত্রা ও কাল প্রয়োগ ঠিক রাখিতে পারে না ; মদিরার উন্মাদিনী শক্তির বশীভূত হইয়া পড়ে এই জন্য 'মদ্য মদেয় মেপেয় মগ্রাহ্যম্' বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে।

দশীতে বেগুন ভক্ষণ নিষেধ করিয়াছেন। মানুষমাত্রেই অনুসন্ধান করিলে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন যে পূর্ণিমা * তিথিতে বিল্বপত্র হইতে সহজেই রস নিঃসৃত হইয়া থাকে; অন্য তিথিতে তত সহজে হয় না; ইহার কারণ এই যে পূর্ণিমায় চন্দ্রমার বলের বৃদ্ধি হয়, চন্দ্রে জলের অংশ অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান আছে বলিয়া শশধর-কিরণে পৃথিবী রসবতী এবং শীতল হইয়া থাকে। পৌর্ণমাসীতে সাগর সলিল সম্যক্ পরিবর্দ্ধিত লইয়া নদনদীর জলেরও বৃদ্ধিসাধন করে, ধরিত্রী জলক্লিন্ন হয় বলিয়া জগতের সকল পদার্থ রসযুক্ত হয়; সুতরাং পৃথিবীস্থ লতাপাতা হইতে ঐকালে স্বল্পায়াসে রস গ্রহণ করা যায়। পক্ষান্তে পৃথিবী রসবতী হয় সেজন্য কফপ্রকৃতি-মানব এবং শ্বাস কাস ও বৃদ্ধি রোগাক্রান্ত জনের পীড়া সকল বৃদ্ধি পায়, কফ ক্ষয় ও রোগের শান্তির জন্য শাস্ত্রকার বলেন;—"কাকজন্ম সহস্রাণি গৃধ্রজন্ম শতানি চ শ্বাপদং লক্ষজন্মানি পক্ষান্তে নিশিভোজনে" সুতরাং প্রত্যেক তিথিতে নিষিদ্ধ বস্তুই আমাদের শরীরের অনুপযোগী; ইহা এই দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝিতে হইবে।

আমরা স্থূলদর্শী অল্পবুদ্ধি মানব, সকল বিধি নিষেধের সুযুক্তি সর্ব্বদা প্রদর্শনে অসমর্থ; কিন্তু ঋষিগণ যোগবলে সকল বিষয়ই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

কেবল আহারের নিয়ম পালনেই অভিলষিত লাভ হইবে না; শাস্ত্রের অন্যান্য বিধানেরও যথাসম্ভব পালন করিতে হইবে।

বসন ভূষণের বিশেষত্বেও মনের গতির বিভিন্নতা হয়। আমার একজন সৈনিক বন্ধু এক দিন বলিয়াছিলেন;—

"আমি যখন সৈনিকের পরিচ্ছদ পরিধান করি তখন আমার বল দ্বিগুণ বাড়িয়া যায়; রণোৎসাহে রক্ত উষ্ণ হইয়া উঠে, মনে হয় এই দণ্ডেই অরাতিকে ছিন্ন ভিন্ন ও উন্মথিত করিয়া ফেলি"। আরও একটী প্রাচীন আখ্যায়িকা শুনুন্—

এক সময়ে কোন মুনি ইন্দ্রত্ব লাভ করিবার মানসে উগ্র তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, মুনি-পুঙ্গবের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া পুরন্দর এক দিন ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন, তপস্বীকে যথোচিত প্রণাম করিয়া অনেক বিষয়ে আলাপ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন; সেই পুণ্যাশ্রম হইতে বিদায় হইবার সময় মুনিকে অনুনয়ের সহিত বলিলেন;—মুনে কৃপা করিয়া আমার এই খড়্গ খানি আশ্রমে রাখিয়া দিন্। কয়েক দিন পরে আমি স্বর্গে যাইবার সময় লইয়া যাইব, আমি এখন মুনিগণের পুণ্যাশ্রমাভিমুখে যাইতে ইচ্ছা করি, তথায় বিনীতবেশে যাওয়াই উচিত, অনুমতি করুন্। তাপস বাসবের বিনয়বচনে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া ইন্দ্রের খড়্গ খানি কুটীরের কোণে রাখিয়া দিলেন; ইন্দ্রও মনে করিলেন যে এইবার তপস্যায় বিঘ্ন হইবার আর বড় বিলম্ব নাই। অদ্য হইতে মুনির হৃদয়ে শক্রের ন্যাসস্বরূপ অসিখানির চিন্তাই সর্ব্বদা জাগরূক হইল, ইন্দ্র কবে আসিবেন, এই অসিখানি যদি কেহ চুরি করে এই মনে করিয়া স্নান ও পুষ্প চয়ন কালেও অসিখানিকে সঙ্গে রাখাই শ্রেয়ঃ বোধ করিলেন। ক্রমশঃ বন শ্রেণীর অন্তরালে কখন শুষ্ক তৃণ ছেদন করিয়া অস্ত্রের ধারা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন কখন

* অমাবস্যাতেও পৃথিবী অধিকতর শীতল হয়।

বা হিংস্র জন্তুর বধ করিতে আরম্ভ করিলেন; কিয়দ্দিবস এই ভাবে অতীত হইলে মুনি ঠাকুর এক দস্যুরূপে পরিণত হইলেন, তাঁহার তপোবন-সুলভ শান্ত-স্বভাব দূরে গেল! সুতরাং এই দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণীকৃত হইল যে ক্ষমা-সার ঋষিরাও দয়া দক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণাবলী অলক্ষিত ভাবে বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হন; অতএব মানবের পরমাভীষ্ট লাভেচ্ছু পুরুষগণ স্বেচ্ছারিতা পরিত্যাগ করিয়া সদাচার সম্পন্ন হউন। নানা জাতির স্পৃষ্ট উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া শারীরিক মানসিক ও নৈতিক অবনতি লাভ করিবেন না।

ধর্ম্মের সহিত আহার আচারাদির নিকট সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে, "যঃ শাস্ত্র বিধি মুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্। যে ব্যক্তি শাস্ত্রের বিধান অমান্য করিয়া করিয়া স্বেচ্ছাচারী হয় সে সিদ্ধি, সুখ এবং উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারে না। অলমতি-বিস্তরেণ।

শ্রীসারদাচরণ সেন, কবিরত্ন।

(দারভাঙ্গা)

বাধক রোগ চিকিৎসা।

লীলা ও সরমা।

—:*:—

লী। এই ঘরেই ঠাক্‌মা থাকেন, এখনই আস্‌বেন।

স। আমার ভাই কিন্তু বড্ড লজ্জা করে, আমি ঠাক্‌মার সুমুকে সব কথা বলতে পারবো না।

লী। ন্যাকি আর কি! রোগের কথা বল্‌বি তার আবার লজ্জা কিসের।

স। তা হক ভাই, আমি পারবো না। তোমায়ত সব বলিছি তুমিই বলো।

লী। আচ্ছা, তা আমিই বলবো। কিন্তু তুই আমার কাছে বসে থাকিস, যেখানটা আমার ভুল হবে কি আমার মনে না হবে আমার গা টিপে চুপি চুপি বলিস।

স। আচ্ছা তা বল্‌বো।

(ঠাক্‌মা ও ছোট বৌয়ের প্রবেশ)।

ছো। (লীলাকে প্রণাম করিয়া) ঠাকুরঝি কখন এয়েছ, বাড়ীর সব ভালত?

লী। এই আসছি ভাই, বাড়ীর সব ভাল। কিন্তু তুই যে একেবারে প্রণাম করে ফেললি, তোকেত কখন কারুও কাছে মাথা নোয়াতে দেখিনি।

ছো। ঠাকুরঝি, সে দোষ কি আমার? ছেলে বেলা থেকে যেমন শিক্ষা পেয়েছিলাম, সেই রকম ব্যবহার করতে শিখেছিলাম।

ঠা। ছোট ঠিক কথা বলেছে। ক'নে বউগুলিকে তাদের স্বভাবের জন্যে শ্বশুর বাড়ীতে অনেক সময় গঞ্জনা সইতে হয়। কিন্তু বাস্তবিক তাদের দোষ কি। তারা যে রকম শিক্ষা পায় সেই রকম হয়। তা লোকে বুঝি

নিজেদের সমান যাদের আচার ব্যবহার তাদের ঘর থেকে মেয়ে নিয়ে আসে তা হলে ভাল হয়।

লী। আমি বলি কি ঠাক্‌মা যে বিবিয়ানা শিক্ষা দেশ থেকে উঠে যাওয়া দরকার।

ছো। সে যে হয় তাত বোধ হয় না ঠাকুর-ঝি। আমি ছেলে মানুষ হলেও অনেক বাড়ীতে গিয়েছিত, সব জায়গায় সাহেবিয়ানা আর বিবি য়ানা। হিন্দুয়ানী বড় দেখতে পাইনে। বাপ মাকে দুবেলা প্রণাম করা ঠাকুরদের প্রণাম করে বাড়ী থেকে বেরোনা কেবল এই বাড়ী-তেই দেখছি।

লী। ছোটবউ ঠিক কথা বলেছে ঠাক্‌মা। এ স্রোত আর কি ফিরবে।

ঠা। ফিরবে বই কি দিদি, সনাতন আর্য্য-ধর্ম্মের কি বিনাশ আছে। যখন দেশের লোকে নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে, যখন আর্য্যধর্ম্মের মহত্ব বুঝতে পারবে, তখন আবার তারা হিঁদু হয়ে দাঁড়াবে। আমাদের স্রোত ত ফিরবেই, শুনতে পাই আজ কাল কয়েক জন খ্রীষ্টানও নাকি হিঁদুর মত চাল চালন আরম্ভ করেছে।

লী। যাক্, এখন আমাদের ছোটবৌ যে ফিরেছে সেই ভাল।

ঠা। হাঁ ছোট খুব ফিরেছে। এখন ঠাকুর, দেবতা, ব্রাহ্মণে ভক্তি হয়েছে, গুরু-জনের সেবা করতে শিখেছে, আমার সেবাত খুবই করে। এখন আর ছোট সে বাবু নেই।

ছো। এর মূল কিন্তু ঠাকুরঝি তুমি। সে পোষাকে বড় ঠাকুরের শ্বশুর বাড়ী নেম-তন্ন খেতে যাবার সময় বকুনি খাই, এখন মনে হয় কি করে গেরস্তর বউ ঝি সে রকম পোষাক পরে বেরোয়। সে দিন না বকে যদি আমায় প্রশ্রয় দিতে তা হলে আমার চাল কখনই শোধরাত না।

লী। তাইত হয়। যে বাড়ীর গিন্নিরা বা কর্ত্তারা বউ ঝিদের বেয়াড়া চাল দেখে শাসন করে না, সে বাড়ীর বউ ঝির চাল কখনই শোধরায় না।

ঠা। তা লীলা বোস দাঁড়িয়ে রইলি কেন। ছোট এখন এখানে থাকবি নাকি ?

ছো। না, আমার ঠাকুরের পূজোর যোগাড় করে দিতে হবে আমি যাই।

(ছোট-বৌয়ের প্রস্থান)

লী। (সরমাকে দেখাইয়া) ঠাক্‌মা, একে চিন্তে পার।

ঠা। (নিরীক্ষণ করিয়া) তোর ছোট ননদ সরমা যে। ভাল আছিস ত সরমা।

স। (পদধূলি লইয়া) হাঁ ঠাক্‌মা।

ঠা। জন্ম এইস্ত্রি হও দিদি, পাকা মাথায় সিঁদুর পর।

লী। সরমা কিন্তু ভাল নেই ঠাক্‌মা। ওর একটা অসুখ হয়েছে।

ঠা। কি অসুখ ?

লী। বাধক। তা অনেক ডাক্তারী ওষুদ খেয়েছে কিছুতে কিছু হয় না। শেষে আমার মুখে শুনে তোমার কাছে এয়েছে।

ঠা। আ! বাধক আর হিষ্টিরিয়া এযেন আজ কাল মেয়েদের হওয়া চাই। আমাদের আমলেত এসব বিদ্‌ঘুটে রোগের এত আম-দানী ছিল না।

লী। আচ্ছা ঠাক্‌মা এসব রোগ আজ কাল এত হচ্ছে কেন ?

ঠা। তার কারণ অনেক, কোনটা ছেড়ে কোনটা বলব। এই ধর ছেলেবেলা থেকে আজ কালকার মেয়েরা এমন নাটক

নভেল পড়ে, যাতে তাদের উত্তেজনা হয় অনেক সময় গরম জিনিষ খায় যাতে সেই উত্তেজনাকে বাড়িয়ে তোলে। থিয়েটার দেখা তার কম সাহায্য করে না। আগে ঘরে সব ঠাকুর দেবতার ছবি থাকত, এখন ঘরে যে সব ছবি টাঙ্গান থাকে সে গুলিও বড় কম সহায়তা করে না। এই সব কারণে ছোট ছোট মেয়েদের মন আর শরীর এঁচোড়ে পাকতে থাকে। তার পর প্রথম পুষ্প দর্শনের সময় থেকে স্ত্রীধর্ম্মের সময় যে রকম সুনিয়মে থাকা উচিত সে রকমে কেউ থাকে না।

লী। কি রকম ধরা কাটায় থাক্‌তে হয় ঠাক্‌মা।

ঠা। সম্পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে থাক্‌তে হয়। দিনে ঘুমুতে নেই, গায়ে সুগন্ধ বা অন্য কিছু মাখতে নেই, স্নান করতে নেই, নখ কাটতে নেই, তাড়াতাড়ি হাঁটতে কি দৌড়াতে নেই, চেঁচিয়ে কথা কইতে নেই, বেশীক্ষণ কথা কইতে নেই, উচ্চ শব্দ শুনিতে নেই, চুল আঁচড়াতে নেই, গায়ে বাতাস লাগাতে নেই, পরিশ্রম করতে নেই, মনের কোন রকম উদ্বেগ হওয়া ভাল নয়, হাঁসতে কাঁদতে নেই। আজ কাল এসব নিয়ম কি কেউ মানে। ঐ অবস্থায় গাড়ী করে বেটা-ছেলের সঙ্গে বেড়ায়, থিয়েটার দেখে আমোদ আহ্লাদ করে। তা এতে আর রোগ হবে না।

লী। আচ্ছা আর কিছু নিয়ম আছে ঠাক্‌মা?

ঠা। তিন দিন হবিষ্যি করতে হয়, হাতে, সরায় কি কলাপাতে খেতে হয়, আর মাটীতে কি কুশ পেতে শুতে হয়।

লী। তা শীত কালে কুশ পেতে শুধু গায়ে কি মানুষে শুতে পারে।

ঠা। পাগল আর কি! শাস্ত্র কারেরা দিগ্‌দর্শন মাত্র করিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য বুঝে অবস্থা মত ব্যবস্থা করতে হয়। এই সময়ে স্ত্রীলোকের শরীরেব একটা পরিবর্ত্তন ঘটে, ডিম্বাধার (ovary) আর জরায়ুতে (uterus) একটা কার্য্য প্রবাহ চলে। এসময়ে শরীর বা মনের কোন রকম উদ্বেগ হলে সেই কার্য্যে বাধা বা বিপর্য্যয় ঘটে থাকে। সেই জন্যে এই সময় কোন রকম সুখ দুঃখ ভোগ না করে প্রশান্ত ভাবে থাকতে হয়। শীতকালে মাটীতে কি কুশে না শুয়ে একটা কি কম্বলের উপর একটা কম্বল গায়ে দিয়ে শুলেই চলে।

লী। আচ্ছা আর কি কারণ আছে বল?

ঠা। আর একটা কারণ অসংযম। আজ কাল মেয়ে পুরুষ দুই অসংযত হয়ে পড়েছে। অমাবস্যা পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র কিছুরই বিচার করে না। তার পর সর্ব্বদা স্ত্রী পুরুষে এক জায়গায় থাকাটাও ভাল নয়।

লী। আরও কিছু কারণ আছে নাকি।

ঠা। খুঁজলে অনেক মেলে তবে মোটামুটি এই। তবে আর একটা কারণের কথা বলা হাইতে পারে। পূর্ব্বে বাপ মা যারে হাতে দিত সে কাণা খোঁড়া নিগুর্ণ যেমনই হক স্ত্রীলোকে তাকে দেবতার মত ভক্তি করত। এখন নভেল পড়ে সকলে মুখে না বললেও স্বামীকে বেশ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতে পারে না। এর সঙ্গে এই সব অসুখের কিছু সম্বন্ধ আছে বোধ হয়।

লী। আচ্ছা এখন ছোট ঠাকুরঝির কি হবে বল?

ঠা। কি হয়েছে বল।

লী। কেন বললাম ত বাধক

ঠা। বাধক বল্লে কি কিছু বোঝা যায়, না বাধক একটা রোগের নাম।

লী। সে কি ঠাক্‌মা বাধক রোগের নাম নয়।

ঠা। লোক্‌নাথ বদ্দি বলতেন যে এদানীর কবিরাজে বাধক রোগের নাম দিয়েছে বটে, কিন্তু স্ত্রীরোগ হয়ে সন্তান জন্মাতে বাধা ঘটলে তাকে বাধক বলে। সরমা তোমার কি হয় বলত।

স। (লীলার প্রতি চুপে চুপে) আমি বলতে পারব না বৌ তুমি বল।

লী। আমি বলছি শোন ঠাক্‌মা। ওর ঠিক মাসে মাসে হয় না একটু দেরী করে হয়, দৈবাৎ ঠিক একমাস পরে হয়। দৈবাৎ পরিষ্কার লাল রঙ্গের হয় নৈলে প্রায়ই কালচে দুর্গন্ধ, দু একটা ডেলার মত ও দেখা যায়, আর সঙ্গজের চেয়ে প্রায়ই কম হয়। সকল বার যন্ত্রণা হয়, কিন্তু কোন কোন বার বড় যন্ত্রণা হয়। যতক্ষণ রক্তটা না ভাঙ্গে ততক্ষণ যন্ত্রণা থাকে ভেঙ্গে গেলে যন্ত্রণা কমে যায়।

ঠা। এদিকে খিদে, ঘুম, বাহ্যে প্রস্রাব কেমন হয়?

লী। তা প্রায় স্বাভাবিক তবে বাহ্যে বেশ পরিষ্কার হয় না, ২।১ মাস অন্তর এক দিন ২।৪ বার পাতলা দাস্ত।

ঠা। বয়স কত হয়েছে?

লী। এই আঠার বছরে পড়েছে।

ঠা। এর মধ্যে পোয়াতি টোয়াতি হয় নি?

লী। না, যখন চৌদ্দবছর বয়স তখন থেকে এই রোগে ভুগ্‌ছে।

স। (লীলার প্রতি চুপে চুপে) এদানী ২।১ বার জলের মত ভেঙ্গেছে।

লী। কিছুদিন হল ২।১ বার জলের মত শাদা শাদা ভেঙ্গেছে ঠাক্‌মা।

ঠা। হাঁ এই থেকে ক্রমে শ্বেত প্রদরে দাঁড়ায়।

লী। তা যাতে না দাঁড়ায় তাই কর। বলি ভাল হবেত ঠাক্‌মা?

ঠা। ভাল হতে পারে। কিন্তু চিকিৎসা করান বড় কঠিন।

লী। তা যত কঠিনই হক আর যত খরচ পত্র হক তা করতেই হবে, তুমি ভাল করে দাও।

ঠা। খরচ পত্র বড় বেশী কিছু হবে না। সুনিয়মে থাকাই কঠিন।

লী। তা সে যেমন কঠিনই হক, কি করতে হবে তুমি বল।

ঠা। প্রথম কথা এই যে যতদিন অসুখ ভাল না হয় ততদিন স্বামী-স্ত্রীতে পৃথক্ ভাবে থাকতে হবে।

লী। সে কত দিন।

ঠা। তা প্রায় এক বৎসর।

লী। সে কি এত দিন।

ঠা। হাঁ এত দিন বরং বেশী। দেখ একটা যান্ত্রিক রোগ হলে ভাল হওয়াইত শক্ত, তার পর যদি ভাল হয় তবে বেশী দিনে। এই সব রোগে অনেকে এই নিয়ম পালন করতে পারে না বলে প্রায়ই রোগ ভাল হয় না সঙ্গের সাথী হয়।

লী। তা এত দিন স্বামী-স্ত্রীতে আলাদা থাকতে হবে।

ঠা। তা হবে বৈকি। দেখ শরীর অসুস্থ হলে যেমন তার বিশ্রাম দরকার, নইলে কি রোগ সারে।

লী। তা এর চেয়ে কম দিন থাকলে হবে না, ওষুদ না হয় থাবে।

ঠা। তাতে কাজ হবে না। কতকটা ভাল হয়ে আবাব রোগ প্রবল হবে।

লী। (চুপে চুপে সরমার প্রতি) কেমন লা পারবি ?

স। (চুপে চুপে) তা-সে তা-না হয়-তা আমি কি করে বল্‌বো, সে তোমার ঠাকুর জামায়ের হাত।

লী। তাই চেষ্টা করতে হবে ঠাক্‌মা এখন এর পথ্যি আর ওষুদ কি বল।

ঠা। পথ্যির বিশেষ ধরা কাটা করতে হবে না, তবে মাছ, কুলথি কলায়, মাষ কলায়, তিল, দই, মাংস, কাঁজি এই সব জিনিষ বেশী করে থাবে।

লী। আর যেমন নাওয়া থাওয়া করে, সব সেই রকম করবে।

ঠা। হাঁ তাই করবে, তবে দুটো কথা মনে রাখতে হবে যাতে মনে কোন রকম উত্তেজনা না হয় এরকম ভাবে থাকতে হবে। জঘন্য নভেল না পড়ে, রামায়ণ, মহাভারত পড়বে। থিয়েটার কি ঐ রকমের নাঁচ তামাসা দেখা বন্ধ করতে হবে। স্বামীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ না হওয়াই ভাল।

লী। তা হলে একেবারে সন্ন্যাসিনী হ'তে হবে বল।

ঠা। সেই রকমই বটে। রোগ হয় নিজের পাপে, তার প্রায়শ্চিত্ত চাইত। বাস্তবিকই এসব রোগ হলে যদি ঠাকুর দেবতা সেবা করে আর পূজা করে দিন কাটায় তা হলে রোগ ভাল হয়ে যায়।

লী। আর একটা কথা কি ?

ঠা। আর এটা কথা এই যে তলপেটে যেন কোন রকম আঘাত কি চাড় না লাগে। ভারি জিনিষ তোলা, বেশী সিঁড়ি ভাঙ্গা এসব করা হবে না।

লী। আচ্ছা এসব ব্যবস্থাত হল এখন ওষুদের কথা কি বল ?

ঠা। ওলট কম্বলের ছাল কাঁচা যোগাড় করতে হবে। সেই কাঁচা ছাল ॥০ তোলা আর মরিচ দু আনা এক সঙ্গে বেটে সকালে একবার করে থাবে।

লী। রোজ যদি কাঁচা ছাল না পাওয়া যায় শুক্‌নো নিলে হবে না ?

ঠা। কাঁচা ছাল টাই বেশী উপকারী। শুক্‌নো ছাল কি আরকে কাঁচা ছালের মত কাজ করে না তবে মধ্যে মধ্যে যদি না পাওয়া যায় তা হলে শুক্‌নো ছালই এক সিকি বেটে থাবে। ছাল শুক্‌নো হলেও যেন বেশীদিনের না হয়।

লী। না একেবারে একটানা থাবার দরকার সাত দিন খেয়ে দু চার দিন বন্ধ দেওয়া ভাল। তবে স্ত্রী-ধর্ম্ম হবার আগে তিন দিন ওষুধ পড়া চাই। স্ত্রী-ধর্ম্মের তিন দিন ওষুদ খাওয়া চাই।

লী। এর কি আর কোন ভাল ওষুদ নেই ঠাক্‌মা ?

ঠা। এইটেই খুব ভাল ওষুদ। তবে আরও দুই একটা বলি শিখে রাথ। জবাফুল কাঁজির সঙ্গে বেটে খেলে উপকার হয়। লতা কট্‌কীর পাত ঘিয়ে ভেজে খেলে উপকার হয়। আর একটা পাচন বলি শোন। আকনাদি, শুঁঠ, পিপুল মরিচ ও কুড়চি (জীবক) ছাল প্রত্যেকটী সাড়ে ছয় আনা ওজনে নিয়ে থেতো করে আদসের জলে নুতন হাঁড়িতে কাঠের মন্দ মন্দ জালে সিদ্ধ করবি। যখন

আধপোয়া আন্দাজ জল থাকবে তখন নামিয়ে ছেঁকে ঠাণ্ডা হলে খাওয়াবি।

লী। পাচন কি রোজ তৈয়ের করে খেতে হবে?

ঠা। হাঁ, রোজ তৈয়ের করতে হবে বৈকি। তবে এক লাগাড়ে ওষুধ খেয়ে কাজ নেই, সাত দিন খেয়ে দুদিন বন্ধ দেওয়া ভাল। আব স্ত্রী-ধর্ম্মের সময় কোন ওষুদই খেতে নেই।

লী। জবাফুল আর লতাকটুকীর পাতা কতটা করে খেতে হয়।

ঠা। জবাফুল আধ তোলা থেকে এক তোলা আর লতাকটুকীর পাতা এক তোলা থেকে দু তোলা পর্য্যন্ত।

লী। তা মাত্রা কম বেশী কি হিসাবে করতে হয়?

ঠা। সকলের শরীর, রোগও সমান নয়, কাজেই একরকম মাত্রা সকলের পক্ষে ঠিক হয় না, তবে প্রথম থেকে কম মাত্রায় আরম্ভ করাই ভাল। তার পর সে মাত্রা যদি বেশ সহ্য হয় তা হলে ২।৩ দিন পরে এক আনা বাড়িয়ে দিলে আবার ২।৩ দিন পরে এক আনা বাড়িয়ে দিলে। এমন করে ক্রমে বাড়াতে হয়।

লী। তা মাত্রা বেশী হলে কি করে বোঝা যাবে?

ঠা। তা হলে খিদে কম হবে, সমস্ত দিন ওষুদের ঢেকুর উঠবে, আর হয় বমি ভাব, নয় শরীরের গ্লানি একটা না একটা উপসর্গ দেখা দেবে। এই রকম হলেই মাত্রা বেশী হয়েছে বুঝতে হবে আর মাত্রা কমিয়ে দিতে হবে।

(মনোরমার প্রবেশ)

লী। একি মনু যে! তোরা পশ্চিম থেকে কবে এলি!

ঠা। কে মনু এয়েছিস আয় দিদি বেশ। সকলে ভাল আছে ত?

ম। (ঠাক্‌মা ও লীলাকে প্রণাম করিয়া) পশ্চিম থেকে আজ চার দিন এয়েছি দিদি। আর সকলে ভাল আছে, কিন্তু আমি ভাল নই।

ঠা। কেন কি হয়েছে তোর? তাইত বড্ড রোগা আর ফেকাশে হয়ে গেছিস যে।

ম। রোগে ভুগে শরীর একেবারে খারাপ হয়ে গেছে ঠাক্‌মা। আর তার ব্যবস্থার জন্যেই তোমার কাছে এসেছি। এখন আগে তোমাদের আর লীলা দিদির খবর বল।

ঠা। ভগবানের আশীর্ব্বাদে এবাড়ীর সকলে ভাল আছে। লীলার বাড়ীর ও খবর ভাল। তবে সংসারে পাঁচটা থাক্‌লে একটা না একটা রোগে ভোগে।

ম। তোমার সঙ্গে ইনি কে বড়দি?

লী। চিনিসনে? এ আমার ছোট ননদ সরমা। আয় তোদের আলাপ করে দি। এ আমার পিশতুতো বোন্ মনোরমা, বুঝলে ঠাকুরঝি।

স। (মনোরমার প্রতি) আপনি আমার বড় আমি দিদি বলে ডাকবো।

ম। তা ডেকো কিন্তু আপনিটে বাদ দিয়ো আর তুমি যখন দিদির ঠাকুর ঝি তখন আমি ঠাকুর ঝি বলে ডাকবো। আর দুজনে এসে ঠাক্‌মার সঙ্গে কি সলা পরামর্শ হচ্ছে বল দেখি।

লী। ঠাকুর জামাই হুড়কো হয়েছে তাই বশ করবার মন্তর শিখতে এয়েছে।

স। না দিদি না। তুমি বৌয়ের কথা শুনো না।

ম। তবে ব্যাপার কি?

লী। সত্যি কথা বলবো, দিদিরও যে দশা বোনেরও সেই দশা।

ম। কেন ঠাকুরঝি কি হয়েছে ?

লী। ওর বাধক হয়েছে, সেই ব্যবস্থা ঠাক্‌মার কাছে এতক্ষণ নেওয়া হচ্ছিল। তুমিও যখন চুপি চুপি ঠাক্‌মার কাছে এয়েছ তখন তোমারও এ রকম একটা কিছু বলে মনে হচ্ছে।

ম। হাঁ দিদি আমি প্রদরের ব্যেয়ারামে বড্ড ভুগছি। ডাক্তারী হোমিওপ্যাথি ওষুদ অনেক খেয়েছি কিন্তু কিছুতে কিছু হয় নি।

লী। তা বেশ হয়েছে, ঠাক্‌মার কাছে ব্যবস্থা নাও, এই সুযোগে আমারও ঐ রোগের চিকিৎসাটা শেখা হয়ে থাক।

ম। তুমি বুঝি ঠাক্‌মার বিপ্তে সেরে নেবার চেষ্টায় আছ।

ঠা। ওঃ লীলা আমার একজন সদ্দার পোড়ো। তার তোর অসুখের কথা আগাগোড়া বল।

ম। এ রোগের সূত্রপাত আমার অনেক দিন থেকে হয়েছে তখন আমার ১৪।১৫ বৎসর বয়স। কিন্তু তখন রোগ তত প্রবল হয় নি বলেও বটে আর লজ্জারও বটে কাউকে কিছু বলিনি।

ঠা। এই গুলো মেয়েদের একটা মস্ত ভুল অসুখের কথা কখনও গোপন করতে নেই, আর যত সামান্য রোগই হক, কখন অবহেলা করতে নেই। ঘরে আগুণ লাগবা মাত্র সঙ্গে সঙ্গে না নিবিয়ে দিলে যেমন শেষে আর নেবাবার উপায় থাকে না, রোগও তেমনি গোড়ায় চিকিৎসা না করলে শেষে ভাল হবার উপায় থাকে না।

ম। তা বউ মানুষ এসব রোগের কথা কি করে গুরুজনদের কাছে বলা যায়।

ঠা। হু, রোগের সৃষ্টি করতে তোমরা বেশ পার কিন্তু রোগের কথা বলতেই যত লজ্জা। আরে গুরু জনদের নাই বল্‌লি, লঘুজন স্বামীকেত বলতে পারিস।

লী। কিন্তু তুমি ঠাক্‌মা নিজে আমাদের দিকে নজর রেখেছিলে।

ঠা। সংসারে পাকা গিন্নি থাকলে তাইত করা উচিত। ছেলেবয়সে লজ্জাও করে বটে আর কোন রকম দোষ ঘটলে তারা বুঝতেও পারে না যে ভবিষ্যতে এক পরিণাম এত ভয়ানক হবে।

মা। ঠিক বলেছ ঠাক্‌মা, এমন হবে তা যদি তখন বুঝতে পারতাম তা হলে আমি নিশ্চয়ই সে সময়ে বলতাম।

ঠা। এই জন্যে গিন্নি বান্নির বৌঝির উপর এবং স্বামীর স্ত্রীর ওপর নজর রাখা দরকার। আর এগুলোর সূত্রপাত প্রায় বার বছর থেকে যোল বছরের মধ্যেই হয়। তা যাক এখন তোর রোগের কথা বল।

ম। আগেই বলিছি যে প্রথম থেকেই একটু বেশী রক্ত ভাঙ্গত তার পর যোল বছরের সময় বড় খুকী হয়। বড় খুকী হবার পর এক বৎসর এক রকম ভালই ছিলাম। তার পর আবার আরম্ভ হল। আবার এক বছর পরে ছোট খুকী পেটে আসে। সেবার অন্তঃসত্বা অবস্থায়ও একটু আধটু রক্ত ভাঙ্গতে লাগ্‌ল। কাজেই ডাক্তার দেখান হল। ডাক্তার দেখিয়ে সে যাত্রায় এক রকম ভাল হলাম। কিন্তু খালাস হবার ছমাস পরেই আবার রোগ দেখা দিল।

ঠা। রোগ কি একভাবে ছিল না ক্রমশঃ বাড়তে লাগল ?

ম। ক্রমশঃ বাড়তে লাগল বৈকি। এই সময় ডাক্তারী চিকিৎসা হয়েছিল তাতে একটু ভাল ছিলাম, কিন্তু দিন কতক ওষুদ বন্ধ করবার পরে যে কে সেই। আবার ওষুদ খাই একটু ভাল থাকি। এমনি করে দুবৎসর ভালয় মন্দয় কাটল তার পর বড় খোকা পেটে হল। বড় খোকা যখন পেটে তখনও একটু একটু রক্ত ভাঙ্গত। আবার ডাক্তারী ওষুদ খেয়ে বন্দ করতে হল। বড় খোকা হবার পর ছমাস যেতেই আবার অসুখ দেখা দিলে তখন প্রথমে ডাক্তারী, তার পর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা হল, তার পর একজন হিন্দুস্থানী কবিরাজকেও দেখান হল। ওষুদ খেলে একটু আধটু ভাল থাকতাম, কিন্তু রোগ একেবারে গেল না। তার পর ছোট খোকা হল। ছোট খোকা হবার চার মাস পরে থেকে আজ এক বৎসর অসুখে ভুগ্‌ছি।

ঠা। এখনকার অবস্থা কিরকম বল দেখি?

লী। এখন এক মাসের চেয়েও শীগ্‌গীর হয়, কখন বা মাসে দুবার হয়। রক্ত খুব বেশী ভাঙে। এতে শরীর খুব দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। মাথা ঘোরা, বুক ধড় ফড় করা, গা বেদনা, এই সব উপসর্গ জুটেছে। ভাল খিদে হয় না ঘুমও ভাল হয় না।

ঠা। ভয় নেই ভাল হয়ে যাবি। এখন থেকে সুপথ্যে থাকলে আর ওষুদ খেলে শীঘ্র ভাল হয়ে যাবি। তবে আর অত্যাচার না হয়।

স। আমিত আর কচি খুকি নই, বুড়ো মাগী কি আর অত্যাচার করবো?

ঠা। আমি যে অত্যাচারের কথা বল্‌ছি তা কচি খুকিরা করে না তোমার মত বুড়ো মাগীরাই করে থাকে। মোট কথা যাতে আর ছেলে পিলে না হয় সেটা করতে হবে।

ম। সে পরামর্শ আগেই হয়ে আছে ঠাকুমা। এখন ২।১ বৎসর আমি এখানে থাকবো আর তোমার নাতজামাই পশ্চিমে থাকবে।

স। তা মাঝে মাঝে আসবেন ত?

ম। সেও আলাদা ঘরে শোবার বন্দোবস্ত।

ঠা। ভাল বন্দোবস্ত করেছ। তা এ মতলব হল কার?

ম। তাঁর কে একজন ডাক্তার বন্ধু আছেন সেখানে তার পরামর্শে।

ঠা। তা ডাক্তার ভাল পরামর্শই দিয়েছে। এব ওপর আর ছেলে পিলে হলে আর তোকে বাঁচান যেত না। আজ আমাদের দেশে এইটে বড় বাড়াবাড়ি। অল্প বয়সে অনেক গুলি ছেলে পিলে হয়ে শরীর খোলা হয়ে গেছে, কিন্তু স্বামী, স্ত্রী, বাপ মা, শ্বশুর শাশুড়ী কারুর চৈতন্য নেই। শেষে শেষে পোয়াতি হয় কতকগুলি কচি কাঁচা রেখে মারা যায়, নয়ত একেবারে রুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য হয়ে কিছুদিন বেঁচে থাকে।

লী। থাক্ সে কথা, তুমি এখন মনুর ব্যবস্থা কর ঠাকুমা।

ঠা। শোন বলি মনু তোর শরীর এখন যে রকম হয়েছে তাতে কিছু দিন তোর পরিশ্রম না করে একেবারে শুয়ে থাকা দরকার।

ম। তা কি করে হবে ঠাকুমা, ছেলে মেয়ে গুলোকে এক একবার দেখ্‌তে হবে ত।

(ক্রমশঃ)

চরকোক্ত ষড়ুপায় বিধি।

অগ্নিদীপ্তি, আহারেতে অভিলাষ হয়,
দেহের লঘুতা জন্মে, রুচির উদয়॥
আহার্য্য অভাবে অগ্নি দোষ নাশ করে,
গুরুত্ব ও জ্বর নাশে, বাসনা আহারে;
সামদোষ, আমাশয়ে অগ্নিমান্দ্য করি,
স্রোতরোধে, জ্বরে তেঁই লঙ্ঘন আচরি।
ত্রিরাত্র, কি এক রাত্র, কিম্বা রাত্রদিবা,
দোষ, বলাবল ক্রমে লঙ্ঘন করিবা॥

সম্যক্ কৃত লঙ্ঘনের ফল।

দেহ লঘু, মল মূত্র-বায়ু নিঃসরণ,
উদ্গার, হৃদয় কণ্ঠ-মুখ বিশোধন;
তন্দ্রা, ক্লান্তি দূর আর রুচি, ঘর্ম্ম হয়,
সম্যক্‌তে ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রসন্ন হৃদয়॥

অলঙ্ঘনের দোষ।

কফ, বমি, বিবমিষা, সদা নিষ্ঠীবণে।
অশুদ্ধ হৃদয় কণ্ঠ তন্দ্রা অলঙ্ঘনে॥

অতিরিক্ত লঙ্ঘনে দোষ।

অতিরিক্ত উপবাসে সন্ধিভগ্নপ্রায়,
শরীর বেদনা, কাস, মুখশোষ তায়।
ক্ষুধা-রুচি হীন, তৃষ্ণা, দেখা শুনা হ্রাস,
ভ্রান্তি, উর্দ্ধবাত, মোহ, কায় অগ্নি নাশ;
গ্লানি বোধ, বলহ্রাস, উপদ্রব হয়।
আরোগ্যের জন্য বল প্রধান আশ্রয়।
বাত বৃদ্ধি, মুখশোধ, ক্ষুধা-তৃষ্ণাতুর,
গর্ভিণী, বালক, বৃদ্ধ, ভ্রান্ত ভয়াতুর,
দুর্ব্বল, পথিক, শ্রান্ত, কাম ক্রোধান্বিত,
ক্ষয়, শোষ, চিরজ্বরে, লঙ্ঘন অহিত।
সামবাতে আমপাক নিমিত্ত লঙ্ঘন।
কফ জ্বর বিধি ক্রমে তদন্তে বারণ॥
কফ পিত্ত দ্রব হেতু সহিবে লঙ্ঘন।
আমপাক হ'লে বায়ু না সহে কথন॥

বৃংহণ বিধি।

পশু, পক্ষী, মৎস্য যদি নহে রোগান্বিত,
বিষাক্ত, বাণাদি দ্বারা অথবা পীড়িত;
প্রকৃতির অনুকূল আহার, বিহার।
বয়স্থা হইলে, মাংস বৃংহণ তাহার॥
ক্ষীণ, ক্ষত, বৃদ্ধ, কৃশা, দুর্ব্বল যেজন,
নিত্য করে যেই ব্যক্তি পথ পর্য্যটন;
প্রতিদিন মদ্যপান নারী সেবা হয়।
গ্রীষ্মকালে বৃংহণীয় তাহারা নিশ্চয়॥
যেই ব্যক্তি শোষ, অর্শ, গ্রহণী পীড়িত,
তারপক্ষে মাংস ভোজী পশুমাংসহিত;
স্নান, নিদ্রা, চিনি, দুগ্ধ, ঘৃত, উৎসাদন।
সুমধুর স্নেহবস্তি সবার বৃংহণ॥

রুক্ষণ-বিধি।

কটু, তিক্ত, কষায়াদি দ্রব্য নিসেবন,
স্ত্রীসঙ্গ; সর্ষপ-তিল-খইল ভক্ষণ;
তক্র, মধুপানে হয় রুক্ষতা সাধিত।
কহিব রুক্ষণ কার্য্য যে যে রোগে হিত॥
যেই সব রোগে পুয়ঃ, রক্তাদি ক্ষরণ,
বায়ু. পিত্ত আদি দোষ বৃদ্ধি বিলক্ষণ;
উরুস্তম্ভ, মর্ম্মগত রোগ সমুদয়॥
রুক্ষণ কার্য্যেতে হিত হইবে নিশ্চয়॥

স্তম্ভন-বিধি।

দ্রব, তনু, সর, স্বাদু, তিক্ত ও শীতল,
কষায় দ্রব্যাদি হয় স্তম্ভন সকল।
পিত্ত ক্ষার অগ্নিদ্বারা দগ্ধ যেই জন,
বমি, অতিসার. আর বিষাক্ত যে জন;
স্বেদ অতিযোগ হেতু পীড়িত যাহারা,
রক্তপিত্ত রোগাদিতে স্তম্ভনীয় তারা।
স্তম্ভনীয় যে যে রোগ হইল কথিত।
স্তম্ভন ক্রিয়ায় তাহা হ'বে প্রশমিত॥

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

১ম বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৩—ফাল্গুন। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

শিশুর তড়কা চিকিৎসা।

ঠাকুরমা ও বড় বৌ।

বড় বৌ। ঠাকরুণত এখানে নেই, ঠাকমা, এদিকে অন্তবতী এসে পড়েছে। তা এ সময় কি খাবার দাবার যোগাড় করতে হবে—ব'লে দাও। একটু ত্রুটি হলে তোমার নাতি আমায় বনবাসে দেবে।

ঠা। সে সত্য ত্রেতা দ্বাপর চোলে গেছে বড়, তোর ভয় নেই। এটা কলি, বনবাসে দেবার যুগ নয়—'দেহি পদপল্লবমুদারমে'র যুগ।

ব। না ঠাকুমা, অন্য বাড়ীতে যা হয় হোক্, কিন্তু এ বাড়ীতে কলি বোধ হয় এখনও ঢুকতে পারেনি। যে বাড়ীতে নিত্য দেবসেবা অতিথি সেবা হয়, ভিক্ষুক ভিক্ষে না পেয়ে ফেরে না, ছেলেপিলে বউঝি, গুরুজন আর দেবতা বামুনদের ভক্তি শ্রদ্ধা, বাপমাকে দুবেলা প্রণাম ক'রে সদাচারে থাকে, যে বাড়ীতে, অখাদ্য কুখাদ্য প্রবেশ করতে পারে না, একজন আর একজনের হিংসে করেনা, সেখানে বোধ হয় কলির প্রবেশের অধিকার নেই।

ঠা। কথাটা বড় মিথ্যে বলিসনি বউ।

ব। শুধু মিথ্যে বলিনি তা নয় ঠাকমা, সম্পূর্ণ সত্যি বলিছি। কলির প্রাদুর্ভাব হ'লে লোকে অল্পায়ু হয়, অধার্ম্মিক হয়, রোগ ও অকালমৃত্যু ঘটে, পুরুষে স্ত্রীর অনুরক্ত হ'য়ে গুরুজনদের তাচ্ছিল্য করে, স্ত্রীলোকে কলহ-প্রিয় হয়,—স্বামী ও গুরুজনদের ভয় ভক্তি করে না—এই সব হয়ত ঠাকমা।

ঠা। হাঁ, তাই হয় বৈ কি।

ব। কিন্তু দেখ ঠাকমা, এ বাড়ীতে নেহাৎ অল্পদিন আসিনি। যা দেখেছি আর শুনেছি তাতে স্পষ্ট বুঝেছি যে—এ বাড়ীতে সকলে দীর্ঘায়ু, রোগ ও অকালমৃত্যু নেই, অধর্ম্ম প্রবেশ করে না, ছেলেপিলে বৌঝি পরস্পর হিংসা, দ্বেষ বা ঝগড়া করে না, গুরুজনদের ভক্তি শ্রদ্ধা করে, তবে কেন বলব না যে এ বাড়ীতে কলি প্রবেশ করতে পারে নি?

ঠা। তোমরা আমার এক একটী

াণার চাঁদ। এত চাঁদ যেখানে, সেখানে
: অন্ধকার আসতে পারে ?

ব। সে কথা ব'লে ভোলালে শুনছিনে
কমা। আমরা এখন চাঁদ হয়েছি বটে,
ন্তু সে কোন্ সূর্য্যের আলো পেয়ে—
চামার। আমরা অমানুষ ছিলাম—এখন
ানুষ হয়েছি, সে কার শিক্ষায় ?—তোমার।
হংস্র পশু যেমন তপোবনে গেলে হিংসা ভুলে
গয়ে শান্ত শিষ্ট নিরীহ হয়, আমরা তেমনি
তামার তপস্যার স্থলে এই বাড়ীতে এসে
ান্ত শিষ্ট হয়েছি।

ঠা। আমার করবার কি সাধ্যি, কর-
ার কর্ত্তা সেই ভগবান।

ব। তাত বটেই, কিন্তু একটা উপলক্ষত
াই। তা তুমিই হলে সেই উপলক্ষ। আমা-
দের বাড়ীত আগাগোড়া সমান টানে চলছে,
কিন্তু ঠাকুরঝিদের বাড়ীর কি পরিবর্ত্তনই না
ঘটেছে!

ঠা। হাঁ, ওদের বাড়ীর সকলেই সাহেবী
খানা ছেড়ে এখন পূরো হিঁদু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

ব। আচ্ছা ঠাকমা, এমন হয় কেন?
লোকে যখন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে
যে—প্রকৃত হিঁদুয়ানী-চালে চললে রোগ,
শোক, অকাল মৃত্যু থেকে অব্যাহতি পাওয়া
যায়, আর সুখ শান্তি আসে, তখন সাহেবী-
য়ানা চালে চলে কেন?

ঠা। কালের ধর্ম্ম বৈ আর কি বলবো?
কালের ধর্ম্মে লোকের বিপরীত বুদ্ধি আসে।
বিপদ হবার সময় হলেই এই রকম ঘটে।
সোণার হরিণ কখন হয় না, কিন্তু তবু সোণার
হরিণ দেখে রামচন্দ্র লোভ করেছিলেন।
বিপদ আসন্ন হলে বুদ্ধিমান ব্যক্তির বুদ্ধিও
লোপ পায়। আমাদের দেশের এখন তাই
ঘটেছে। তবে সাহেবীয়ানাকে মন্দ ব'লে
ভাবা তোমার একটা মস্ত ভুল। সাহেবদের
পক্ষে সাহেবীয়ানাই ভাল। বিলেতের মত
শীতের দেশে পাতলা কাপড় গায়ে দিয়ে,
আর আলোচাল কাঁচকলা ডাব খেয়ে তারা
বেশী দিন বাঁচতে পারে না। তাদের গরম
কাপড়, চা, মদ, মাংসই দরকার। তবে আমা-
দের দেশের লোক বিলিতী চালে চললে ভাল
থাকে না। আর বরং পূরো সাহেবী ভাল,
কিন্তু অনেকেই দু নৌকায় পা দেয়, আধা
সাহেব, আধা হিঁদু।

ব। আচ্ছা ঠাকমা, সাহেবরা ত এদেশে
সাহেবী চালে চলে, তবে তাদের শরীর
খারাপ হয় না কেন?

ব। খারাপ হয় না কে বলবে? ওরা
এই গরম দেশে এসে জ্যান্তে মরা হয়ে
থাকে। কিন্তু কি করবে—পেটের দায়। তবে
অনেক সাহেবই তাজা হবার জন্যে মধ্যে মধ্যে
বিলেত যায়, আর অসুখ হলেত যায়ই।

(ছোট বৌয়ের প্রবেশ)

ছো। কি বড়দি, তুমি এখনও এইখানে
বসে আছ?

ব। ঐ দেখ ভাই, ঠাকমার কাছে এলে
আর কাজ কর্ম্ম কিছুই মনে থাকে না। হাঁ
ঠাকমা, অম্বুবতী'র (অম্বুবাচী) কি যোগাড়
করবো বল?

ঠা। যা হয় করগে না, আমার খাবার
দিন ফুরিয়ে গেছে।

ব। আমি বলি—যে বেশ করে ময়ান
দিয়ে লুচি ভেজে রাখি, কিছু তরকারী আর
সন্দেশ তৈয়ের করে রাখি।

ঠা। অম্বুবতীতে কি পাক করা জিনিষ
খেতে আছে?

ব। অম্বুবতীর সময় পাক করবো কেন, আগে তৈয়ের করে রাখবো। অনেকেই ত তাই করে—দেখেছি।

ঠা। তারা শাস্তরকে ফাঁকি দেয়। অম্বুবতীর সময় পাক করা জিনিষই খেতে নাই। কিছু ফল মূল কাঁচা দুধ—এই সব হলেই চলবে।

ব। চিনি, মিছরি কি গুড়—কিছু মিষ্টি চাইনে?

ঠা। ও সব যে পাক করা জিনিষ। তবে ভাল মধু পাওয়া যায়ত দেখিস্।

(লীলার প্রবেশ)

ঠা। এই যে লীলা এয়েছিস্। আয়—বোস্।

লী। বস্‌বো কি ঠাকুমা, আমি বড় বিপদে পড়িছি।

ঠা। কেন আবার তোর কি হল?

লী। আমার সেই ছোট মেয়েটার খুব জ্বর, কালত যায় যায় হয়েছিল। হাত মুঠো বেঁধে, হাত পা শক্ত করে, চক্ষু কপালে তুলে কেমন কোর্‌তে লাগল।

ঠা। ও, তড়কা হয়েছিল। তা ভয় নেই, একটু বেশী জ্বর হলেই কচি ছেলে পিলের ও রকম হয়ে থাকে। ও রকম ভাব ভাল হয়ে যাবার পর বেশ চাঙ্গা হয়েছিল ত?

লী। হাঁ, ২।৩ ঘণ্টা বাদে জ্বর কমে গেলে বেশ খেলা করতে লাগল,—হাঁসতে লাগল।

ঠা। তা হলে ভাবনা নেই, ভাল হয়ে যাবে।

লী। আমার কিন্তু বালকের ব্যাপার দেখে বড় ভয় হয়েছে ঠাকুমা। যাতে ও রকম আর না হয়, তার উপায় করে দাও। আর হলেই বা কি

ঠা। জ্বর বেশী হ'লেই ওরকম হয়। কাজেই জ্বর কমাতে না পার্‌লে তড়কা হবার ভয় ঘুচবে না। জ্বর কমাবার কথা পরে বলছি, আগে তড়কা যাতে না হয় আর হলেই বা কি করা উচিত সে কথা বলি, তা বোস্ না তুই।

লী। তা বস্‌ছি। আমার আর বসা দাঁড়ান মনে নেই ঠাকুমা, তুমি বল এখন।

ঠা। একটু বেশী জ্বর হলেই দেখ্‌বি, ছেলে মুঠো বাঁধছে কিনা আর চোখ কপালের দিকে তুলেছে কি না। যদি সে রকম করছে দেখতে পাস্ তা হ'লে তখনি একটু অডি কলমে জল মিশিয়ে দুধের মত তাতে নেকড়া ভিজিয়ে কপালে পটী দিবি, পটী যেন শুকিয়ে না যায়—একটু একটু অডিকলম দিয়ে ভিজে রাখবি, আর মাথায় পাথার বাতাস করবি।

লী। তা অডিকলম ত অনেক রকম আছে—যে কোন অডিকলম দিলে চলবে?

ঠা। এক রকম সরু লম্বা শিশি ক'রে যে অডিকলম বিক্রী হয়, তাকে পাইভারের অডিকলম বলে। সেই গুলো খুব ভালো। তা যদি না পাও—তা হলে অন্য ভাল অডিকলমও দেওয়া যেতে পারে।

লী। আচ্ছা, অডিকলম যদি না পাওয়া যায়?

ঠা। তা হলে সোরা আর নিশাদল জলে দিলে জল বেশ ঠাণ্ডা হয়। সেই জলের পটী দিলে চলে।

লী। নিশাদল কোথায় পাওয়া যায়?

ঠা। ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়, বেণের দোকানে পাওয়া যায়, আর শেকরাদের কাজে নিশাদল লাগে ব'লে তাদের কাছেও থাকে।

লী। আর কিছু দেওয়া চলে না?

ঠা। শাদা কি লাল চন্দন ঘষে কপালে

লেপে দিলেও চলে। শুকিয়ে গেলে তুলে ফেলে আবার টাট্‌কা চন্দন লেপে দিতে হয়। যাই দাও মাথায় কিন্তু পাখার বাতাস দেওয়া চাই।

লী। আর যদি হয় তা হলে কি করতে হবে?

ঠা। হবার মুখে এ রকম করলে আর তড়কা হতে পায় না। হলেও এ রকম করলে ভাল হয়ে যায়।

লী। আচ্ছা ঠাকুমা, তড়কা কি একবার হয়েই ভাল হয়ে যায়?

ঠা। তার মানে নেই। যদি আর বেশী জ্বর না হয়, তা হলে একবার হয়েই ভাল হয়ে যেতে পারে। যদি আবার বেশী জ্বর হয়—আবার হতে পারে। একবারকার জ্বরেই বার বার হতে পারে, আর এইটেই খারাপ বেশী।

লী। তা যে সব উপায় বললে, তাতে যদি ভাল না হয়, তা হলে কি করবো?

ঠা। প্রায়ই এই সব উপায়ে ভাল হয়ে যায়। তবে যদি কিছুতেই ভাল না হয়ে অনেকক্ষণ থাকে, তা হলে বরণের আঙটি পুড়িয়ে কপালে ছেঁকা দিতে হয়।

লী। বরণের আঙটি ভিন্ন আর কিছু-তেই হয় না?

ঠা। হবে না কেন ছেঁকা দেওয়া যখন উদ্দেশ্য তখন একটা চাবির গোল মুখটা বা অন্য কিছু ঐ রকম ছোট জিনিষ গরম করে ছেঁকা দেওয়া যেতে পারে। কচি ছেলের কপালে ছেঁকা দিতে হবে, তাই পাছে কেউ কোন বড় জিনিষ দিয়ে ছেঁকা দেয়, এজন্য বরণের আঙটী দিয়ে দেবার নিয়ম হয়েছে।

লী। এতেও যদি ভাল না হয়?

ঠা। এতে ভাল না হ'লে জীবনের আশা কম। তবে আজ কাল আর একটা উপায় হয়েছে, আর সেটা ডাক্তারী কবিরাজী উভয় মত সম্মত চিকিৎসাও বটে। তবে আগে যখন তখন বরফ পাওয়া যে'ত না বলে দেওয়া হত না। ডাক্তারের একরকম রবারের থলের ভেতর বরফ রেখে মাথায় দেয়। তা থলে না পাওয়া গেলে কচু পাতা কি কলা পাতায় বরফ বেধেও মাথায় দেওয়া চলে। এতে জল শোষে না অথচ মাথায় ঠাণ্ডা লাগে।

লী। তা একে কচি ছেলে—তাতে এত ঠাণ্ডা লাগলে অসুখ বেড়ে যেতে পারে ত?

ঠা। যেখানে শ্লেষ্মার দোষ প্রবল সেই খানে ঠাণ্ডা লাগার ভয় বেশী। কিন্তু শ্লেষ্মা শরীরে বেশী থাকলে জ্বরের উত্তাপ খুব বেশী হয় না। পৈত্তিক কি বাত পৈত্তিক জ্বরেই গায়ের উত্তাপ খুব বেশী হয়। এতে ঠাণ্ডা লাগলে ক্ষতি হয় না। আর এক কথা—ঠাণ্ডা না লাগালে যখন প্রাণরক্ষা হয় না, তখন সে সময় তাই করেই প্রাণ রক্ষা করা উচিত।

লী। আচ্ছা ঠাকুমা, কবিরাজীতে জ্বরে ঠাণ্ডা করিবার নিয়ম আছে বললে, কিন্তু কোন কবিরাজকে তা করতে দেখিনি।

ঠা। লোকনাথ বদ্দি বলতেন—দেখ বড় গিন্নি, নূতন পিত্ত জ্বরে ঠাণ্ডা করবার কথা স্পষ্ট লেখা আছে* কিন্তু টীকাকার অন্য জায়গায় একটা বচন তুলে দেখিয়েছেন যে—নবজ্বরে ঠাণ্ডা করতে নেই, আর সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন যে তবে এটা নূতন পিত্তজ্বরে নয়—পুরাতন পিত্তজ্বরে। এমনি করে আমাদের দেশ থেকে এ সব বিষয় গোলমাল হ'য়ে পড়েছে।

* চক্রদত্ত—জ্বরচিকিৎসা, ৮০।

লী।. ডাক্তারেরা কি জ্বরে ঠাণ্ডা করে?

ঠা। হাঁ খুব করে, যেখানে জ্বরের উত্তাপ ভয়ঙ্কর হ'য়ে রোগী মারা যাবার উপক্রম হয়, সেখানে ঠাণ্ডা করা ছাড়া আর উপায় নেই। দু এক রকম ডাক্তারী ওষুধ আছে, যা খাওয়ালে জ্বর কমে যায়, কিন্তু একটু পরে যে কে সেই। তাই এখন জ্বরের তাত খুব বেশী হ'লে ডাক্তারেরা রোগীর সর্ব্বাঙ্গে আর মাথায় মোটা কাপড় জড়ায়, কেবল মুখটি বাদ রাখে। আর বরফ জল কি খুব ঠাণ্ডা পাতকো'র জল দিয়ে সেই কাপড়খানি ভিজিয়ে রাখে। এই রকম ভাবে ১৫।২০ মিনিট রেখে জ্বরের তাত কমে গেলে রোগীর সর্ব্বাঙ্গ বেশ করে মুছিয়ে বিছানায় শুইয়ে রাখে।

ঠা। জ্বর কেন হ'ল—বলতে পারিস?

লী। তাত বলতে পারিনে ঠাকুমা, তবে জ্বর হবার দু দিন পূর্ব্বে আমি নিজে তাকে খাওয়াইনি। আমার ঝিই তাকে খেতে দিত।

ঠা তা হলে খাওয়ার দোষেই হয়েছে। কচি ছেলে পিলের প্রায় খাওয়ার দোষেই জ্বর হয়। এ দুদিন বাহ্যে কেমন হচ্চে?

লী। রোজ ২।৩ বার পরিষ্কার বাহ্যে হয়, কিন্তু এ দিন একবার করে সামান্য একটু বাহ্যে করেছে।

ঠা। পেটটা দেখেছিস্?

লী। হাঁ, দেখেছি। পেটটা একটু ফাঁপা আর পেটের ভেতর গড় গড় করে শব্দ হচ্চে।

ঠা। তা হলে ঠিক হয়েচে। খাওয়ার দোষেই বটে। খেতে কেমন চায়?

লী। এখন খেতে বড় চায় না।

ঠা। তা হ'লে খেতে খুব কম দিস্। পিপুলের সঙ্গে দুধ সিদ্ধ ক'রে সেই দুধে জল মিশিয়ে সাগু সিদ্ধ ক'রে গরম গরম খাওয়াবি। যেন ২ ভাগ দুধ আর এক ভাগ জল থাকে। বার্লি কাপড়ে ছেঁকে দিস্। আর মিছরী না দিয়ে নুণ নেবুর রস দিয়ে দিলেই ভাল হয়। পেটটা ভাল হলেই জ্বর সেরে যাবে।

লী। কতটুকু দুধ দেব?

ঠা। যখন খিদে নেই বলচিস্ তখন এক পো পাঁচ ছটাকের বেশী দিস্‌নে।

লী। আর কিছু খেতে দেব না?

ঠা। কচি মেয়ে আর কি দিবি, একটু বেদানার রস দিস। আর মধ্যে ২।৩ ঝিনুক গরম জল দিস্।

লী। ওষুদ কি দেব?

ঠা। খাঁড়ি নুন বলে এক রকম নুন বেনের দোকানে কিন্‌তে পাওয়া যায়। সেই নুন গুঁড়িয়ে এক আনাভর সকালে আর এক আনা ভর বিকালে দিস্।

লী। আর কিছু দেব না?

ঠা। যদি আর দেবার দরকার হয়, তবে শিউলী পাতা কি বেলপাতার রস একবার চা চামচের এক চামচে—এই ৬৭ফোটা আন্দাজ দিস্।

লী। আর কিছু করতে হবে না?

ঠা। না, আর কিছু করতে হবে না। তবে তোমায় খুব ধরা কাটায় থাক্‌তে হচ্চে, পুরান চালের ভাত আর মাছের ঝোল ছাড়া আর কিছু খেয়ো না।

লী। আমি খুব ধরা কাটায় থাকবো, আমায় কিছু বল্‌তে হবে না। দরকার হ'লে আবার আস্‌ব। এখন আসি ঠাকুমা, মনটা ছেলেটার ওপর পড়ে রয়েছে।

ঠা। তা থাকবে বৈকি ভাই, ছেলের অসুখ হলে মার প্রাণ যে কি করে—তা মাই জানে। ভয় নেই, ভাল হয়ে যাবে।

(লীলার প্রস্থান)

বাধক রোগ চিকিৎসা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২২৪ পৃষ্ঠার পর।)

ঠা। ছেলে মেয়েদের ভার যতদূর পারিস্ ঝি-চাকরের হাতে দিস্ তার পর তোমার শাশুড়ী ননদেরাও কতক দেখতে পারবেন, নেহাৎ যেটুকু নইলে নয়, ততটুকু করবি।

ম। আচ্ছা, তাই করবো।

ঠা। হা তাই করিস্। ছোট খোকা কি মাই খায়?

ম। মাইয়েতে দুধ বড় নেই, এক আধবার টানে।

ঠা। তোর গায়ে যে রকম রক্ত নেই, তাতে ছেলেকে মাই না দেওয়াই ভাল। মাইয়ের দুধও গায়ের রক্ত কিনা, তবে নেহাৎ না রাখতে পারিস্ ত এক একবার দিস্।

ম। আচ্ছা—স্নান কি রকম করবো ঠাকুমা?

ঠা। এ রোগে অবগাহন-স্নানই ভাল, আর রোজ স্নান করাও চলে। কিন্তু একে তোর শরীর কাহিল, তাতে পশ্চিমের জল ছেড়ে এদেশের জলে নাইতে হবে; কাজেই শরীরের অবস্থা বুঝে কলের জল ধরে খানিক্ক্ষণ রোদ্রে রেখে তার পর স্নান করবি। স্নান ঘরের মধ্যে, আর অল্পক্ষণ ধরে করিস্। কি জানি ঠাণ্ডা লেগে আবার জর ফর হয়ে পড়বে! স্নান করতে ইচ্ছে না হ'লে, শরীর ম্যাজ্ ম্যাজে কি ভার ভার হলে স্নান না করাই ভাল।

ম। আচ্ছা, যে রকম বল্লে, সেই রকম করবো। এখন ওষুদ পথ্যির ব্যবস্থা কি হবে বল?

ঠা। আগে পথ্যির কথা বলি। বেশ খিদে হলে দু বেলাই পুরাণ চালের ভাত খাবি, আর দুবেলা ভাত সহ্য না হলে এক বেলা ভাত আর রাত্রে খৈ দুধ কি দুধ বার্লি খাবি।

ম। আমার কিন্তু পশ্চিমে থেকে রাত্রে রুটী খাওয়া অভ্যাস হয়ে গেছে ঠাকুমা!

ঠা। তা এদেশে তেমন ময়দা কি আটাও পাওয়া যায় না, আর রুটী তুমি হজম করতেও পারবে বলে বোধ হয় না। খিদে কেমন হয় বল দেখি?

ম। সকালে তবু একটু হয়,—রাত্রে সে না হওয়ার মধ্যে।

ঠা। তা হ'লে যদি ইচ্ছে হয়, আর সহ্য হয়, তা হলে ভাত খাবি, নয়ত খৈ দুধ কি দুধ বার্লি খাবি। আর নেহাৎ যদি খোট্টানি হয়ে থাকিস, তা হ'লে যবের রুটী, বার্লির রুটী কি সুজির রুটী খাবি।

ম। তরকারী টরকারী কি খাব?

ঠা। হা দেখ—যদি খৈ দুধ খাস্, তা হলে যে রকম বল্‌ছি এই রকম করে খেলে আহার ওষুদ দুই হবে। এক ছটাক কিস্‌মিস্ দুসের জলে সিদ্ধ ক'রে দেড়পো আধসের থাক্‌তে নামাবি। নামিয়ে ছেঁকে তাইতে খৈয়ের গুড়ো তোলা চারেক, একটু চিনি আর একটু মধু মিশিয়ে খাবি।

ম। ওর সঙ্গে দুধ খাওয়া যায় না?

ঠা। যাবে না কেন? তা হ'লে দুধ দেড়পো কি আধ সের—আর বাকী জল দিয়ে দুসের

ক'রে তার সঙ্গে কিস্‌মিস্‌ সিদ্ধ করে নিবি। তবে দুধ দিলে সেটা গরম গরম খেতে হবে, আর তার সঙ্গে মধু দেওয়া চলবে না।

লী। কেন ঠাকুমা, গরম জিনিষের সঙ্গে কি মধু খেতে নেই?

ঠা। গরম জিনিষের সঙ্গে -কি গরম করে— মধু ত খেতেই নেই; তা ছাড়া শরীরে গরম সেক তাপ দেওয়ার পরেও মধু খেতে নেই। গরম জিনিষের সংসর্গে এলে মধু বিষ হয়।

ম। তার পর তরকারীর কথা বল।

ঠা। তরকারীর মধ্যে নটেশাক, কাঁচড়া শাক, মোচা, কচি কাঁচকলা, মান, থোড়, পটোল, পাকা দেশী কুমড়ো, ডুমুর, লাউ, কাঁচা পেঁপে—এই সব খেতে পার। আলুটা না খাওয়াই ভাল, কিন্তু আলুটা এত চল্‌তি হয়েছে যে—আলু বাদ দিয়ে তরকারী রান্নাই হয় না, সেই জন্যে একটু আধটু আলু খেতে বলতেই হয়।

ম। দালের মধ্যে কি খাওয়া যায়?

ঠা। দালের মধ্যে মুগ, মসুর, অড়হর ও ছোলার দালের যুষ। মনে রেখ—দাল নয় দালের যুষ। দাল এখন হজম হবে না। তবে যুষ আলাদা করে করতে হবে না, গেরোস্তোর যে দাল রান্না হবে, তাই থেকে দাল গুলো নিংড়ে ফেলে দিলেই হবে। কিন্তু দালে, শুধু দালে নয় তুমি যে তরকারী খাবে তাতে, লঙ্কা কি সরষে বাটা দেওয়া না হয়। গুড়ের বদলে চিনি আর সরষের তেলের বদলে ঘি দিয়ে রাঁধা উচিত। অন্য নুণ ব্যবহার না করে সন্ধব নুণ ব্যবহার করা দরকার।

ম। মাছ মাংস কিছু খাওয়া যায় না?

ঠা। মাছ এরোগে বড় ভাল নয়, কেবল 'চিংড়ি' আর 'বান মাছ' খাওয়ার নিয়ম আছে। তবে বাংলা দেশের লোকের মাছ একটা প্রধান আহার—তা না হয়, খল্‌সে, কৈ, কি মাগুর মাছের ঝোল খাস্‌, কিন্তু একটা কথা ব'লে রাখি -মাছ দুধ এক বেলায় খাসনে। যে বেলায় মাছ খাবি –সে বেলায় দুধ খাবিনে, যে বেলায় দুধ খাবি—সে বেলায় মাছ খাবিনে। আর খুব কম খাবি, বরং মাছের ঝোলটা খাস্‌।

ম। মাংস খাওয়া যায়।

ঠা। শশক, ঘুঘু, হরিণ, পায়রা, ভেড়া —এই সকলের মাংস খাওয়ার নিয়ম আছে। কিন্তু তুমিত এখন মাংস হজম করতে পারবে না। তবে শরীর যে রকম তাতে মাংসের যুষ ক'রে খেতে পার্‌লে ভাল হয়।

ম। ঘি খেতে পার্‌ব?

ঠা। একটু একটু ঘি খেতে পার। তবে এখন কাঁচা ঘি না খেয়ে তরকারীতে দিয়ে কি দু একখানা ফুলকো লুচি খেতে পার। তার পর কচি তালশাঁস, ডাব নারিকেলের শাঁস, দাড়িম, খেজুর, কেশুর, পানফল, কিস্‌মিস্‌, মিছরী, আক—এই সব জিনিষ জল খাবার খেতে পার। তবে একটা কথা বলে রাখি— তোমার শরীর দুর্ব্বল ব'লে যেমন কিছু পুষ্টিকর জিনিষ খাওয়া দরকার, তেমনি খাবার যাতে হজম হয়—সে দিকে লক্ষ্য রাখাও দরকার। হজম হলে খৈ খেয়েও বল হয়, আর হজম না হ'লে কালিয়া পোলাও খেয়েও বল হয় না। বরং জ্বর, পেটের অসুখ, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ জন্মাবার সম্ভাবনা।

লী। আচ্ছা ঠাকুমা, এ রোগে পথ্যির কথাত বললে, কুপথ্যি কি তা বলনা—শিখে রাখি।

ঠা। বলছি শোন। পরিশ্রম, পথচলা, রৌদ্র লাগান, শরীর নাড়াচাড়া করা, গাড়ী-

চড়া, বাহ্যে প্রস্রাবের বেগ এলে বাহ্যে প্রস্রাব না করা—এই সব ভাল নয়। তার পর গুড়, কুলথি, বেগুন, তিল, মাষকলায়, সরষে, দৈ, পান, শিম, রশুন, টক জিনিষ, ঝাল জিনিষ, নুণ, ভাজাপোড়া, ক্ষার জিনিষ পাতকো'র জল—এসব খেতে নেই।

ম। আচ্ছা ঠাক্‌মা, এখন ওষুদের কথা বল।

ঠা। তোমাকে বড় ওষুদ না দিলে হবে না। তবে লীলা শিখবে বলেছে—তাই কতক গুলো ছোট ছোট মুষ্টিযোগ বলছি। রোগের প্রথম অবস্থায় কি সামান্য রোগে এই ওষুদ দিলে কাজ হয়।

(১) কুশের মূল আধতোলা চেলেনী জলের সঙ্গে বেটে তিন দিন খেলে রোগ ভাল হয়।

(২) শ্বেত বেড়েলার মূল আধতোলা দুধে বেটে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে একটু মধু দিয়ে খেলে রক্তপ্রদর ভাল হয়।

(৩) মোচার ভেতর যে কলা থাকে—সেই কলা শুকিয়ে গুঁড়িয়ে এক সিকি থেকে আধ তোলা মাত্রায় দুধের সঙ্গে খেলে ভাল হয়।

(৪) ডুমুরের রস আধ তোলা থেকে এক তোলা মাত্রায় মধু মিশিয়ে খেয়ে চিনি আর দুধের সঙ্গে ভাত খেলে রক্তপ্রদর ভাল হয়।

ম। এখন আমাকে কি বড় ওষুদ দেবে বল?

ঠা। বড় ওষুদ অশোক ছাল। অশোক ছালের মত রক্ত প্রদরের একটা ভাল ওষুদ নেই বললেই হয়।

ম। অশোক ছাল কি করে খেতে হবে?

ঠা। প্রথমে একটা পাচন ব্যবহার কর। অশোকছাল, বাসকছাল, রক্ত কমলের মূল আর দারুহরিদ্রা প্রত্যেক আধ তোলা হিসাবে দু তোলা নিয়ে থেঁতো করে আধসের জল দিয়ে সিদ্ধ করবি। তার পর আধ পোয়া থাকতে নামিয়ে ছেঁকে নিয়ে ঠাণ্ডা হ'লে খাবি। এটা ৩৷৪ দিন ব্যবহার করলে যত প্রবল রক্তস্রাবই হ'ক, কমে যায়। কিন্তু এসব রোগে দোষ হয় এই যে—রক্ত একেবারে বন্ধ হয়ে গেলে রোগীর বড় যন্ত্রণা হয়। আবার যতক্ষণ রক্ত না ভাঙ্গে, ততক্ষণ শরীর সুস্থ হয় না।

লী। রক্ত প্রদর—রোগ মাত্রেই কি এরকম হয়?

ঠা। না, তা হয় না। নূতন রোগেও হয় না, মাঝামাঝি রোগেও অনেক সময় হয় না, তবে পুরাণ রোগে অনেক সময় এ রকম হতে দেখা যায়।

ম। তা এরকম হলে কি করবো?

ঠা। ৩৷৪ দিন ঐ রকম পাচন খাবার পর যদি দেখিস্ যে রক্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছে আর যন্ত্রণা বোধ হচ্চে, তা হ'লে পাচন বন্ধ করে দিবি। আর আগে যে মুষ্টিযোগ বলেছি তার কোন মুষ্টিযোগ কি কেবল অশোকছাল দুধের সঙ্গে সিদ্ধ করে খাবি।

ম। অশোকছাল দুধের সঙ্গে কি ক'রে সিদ্ধ করবো?

ঠা। দু তোলা অশোক ছাল থেঁতো, ষোল তোলা দুধ আর ৬৪ তোলা জল ক'রে একসঙ্গে সিদ্ধ করবি। জল মরে গেলে, যখন কেবল দুধ ১৬ তোলা থাকবে, তখন নামিয়ে ছেঁকে নিয়ে খাবি। ফল কথা—এটা যেন মনে থাকে যে—এই ওষুদগুলো রক্তস্রাব বন্ধ হবার ওষুদ। কোনটা বেশী রক্ত রোধক, কোনটা

কম। কিন্তু আমাদের এমন ওষুদ এমন মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে যে—রক্তস্রাব যেন একেবারে বন্ধ না হয়, অথচ বেশী স্রাব না হয়। এই মনে কর—অশোকছাল দু তোলা দিলে যদি রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কা হয়, তা হলে অশোক ছাল ২ তোলা না নিয়ে এক তোলা নি'বি।

লী। তাতে জল দুধ কি আগেকার মতন নিতে হবে ?

ঠা। না, বলি শোন।—দুধের সঙ্গে ওষুদ পাক ক'রে খাওয়াকে কবিরাজীতে 'ক্ষীর পাক' বলে। এর নিয়ম হচ্চে এই—ওষুদ যতটা হবে, দুধ তার আটগুণ, আর জল দুধের চার-গুণ দিয়ে পাক ক'রে দুধ শেষ থাকৃতে নামিয়ে নিতে হয়। তা এক তোলা অশোক ছাল নিলে দুধ ৮ তোলা আর জল ৩২ তোলা একত্র পাক ক'রে ৮ তোলা থাকতে নামিয়ে নিতে হবে।

ম। তার পর ?

ঠা। তার পর আর কিছু নেই, এতেই অসুখ সেরে যাবে। রক্তস্রাব বেশী হলেই ঐ পাচনটা ব্যবহার করবি। আর খুব ক'মে গেলে অশোক ছাল দুধের সঙ্গে সিদ্ধ করে কিম্বা একটা মুষ্টি যোগ ব্যবহার করবি। পাচনটী অর্দ্ধেক মাত্রায় ব্যবহার করলেও চলে।

ম। পাচন অর্দ্ধেক মাত্রায় ব্যবহার করতে হ'লে কি ক'রে তৈয়ার করবো ?

ঠা। তৈয়ার পুরো মাত্রায় করতে হবে। তার পর অর্দ্ধেক খেতে হবে, আর অর্দ্ধেক ফেলে দিতে হবে।

লী। আচ্ছা ঠাকুমা, দারুহরিদ্রাত জানি—এক রকম হলদে কাঠ,—বেনের দোকানে পাওয়া যায়। কিন্তু রক্ত কমলের মূলটা কি ?

ঠা। রাঙ্গা পদ্ম ফুলের গোড়ায় কাদার ভেতর যে গেঁড় থাকে, তাকেই রক্তকমলের মূল বলে।

লী। ঠাকুমা, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো। আচ্ছা—মুষ্টি মানেত কিল—আর যোগ মানে লাগান। তা মুষ্টিযোগ দিলে ওষুদ খাইয়ে রোগীকে খুব কিলুতে হয় নাকি ?

ম। যদি তা হয় ঠাকুমা, তা হলে তোমার মুষ্টিযোগ আমার পক্ষে মারাত্মক হবে। এ শরীরে বেশী কিল সইবে না।

ঠা। কিল খাবার এত ভয়! কাঁটাল খেতে গেলেই মুখে আঠা লাগে—সেটা আগে ভাবতে হয়। যাক্ তোর ভয় নেই। মুষ্টি মানে মুটো, এক মুটো ওষুদ নেবার নিয়ম ছিল ব'লে মুষ্টিযোগ নাম হয়েছে।

লী। তা তুমিত একমুটো নিতে বল্লে না?

ঠা। এখনকার ক্ষীণপ্রাণ লোক কি আর অত বেশী মাত্রা সহ্য করতে পারে।

ম। আচ্ছা ঠাকুমা, সবত হ'ল। এখন এই মাথা ঘোরা, আর বুক ধড়ফড়ানিটে যাতে কমে, তার একটা উপায় কর।

ঠা। একটু শরীরে বল হ'লে ওগুলো আপনি যাবে। তবে এখন মাথায় তিলের তেল দিস্—কি একটু বড়বিন্দু তেল কিনে এনে মালিষ করিস। আর ১ তোলা শালপানি—ক্ষীরপাকের নিয়মে দুধের সঙ্গে পাক ক'রে খাস্, তা হ'লে বুক ধড়ফড়ানি কমে যাবে। তবে শরীরে একটু রক্ত না হ'লে একেবারে যাবে না।

লী। আচ্ছা ঠাকুমা, তুমি ত বল যে সব রোগেই বায়ু, পিত্ত, কফের দরুণ অবস্থা আলাদা হয়? তা এ রোগে কি সে রকম হয় না ?

ঠা। হয় বৈকি। তবে শোন বলি।—বাতিক প্রদরে রুক্ষ, ফেনা ফেনা, অরুণবর্ণ, অল্প অল্প রক্ত যন্ত্রণার সহিত নির্গত হয়। পৈত্তিক প্রদরে পীত নীল কি কৃষ্ণবর্ণ গরম রক্ত খুব বেগে নির্গত হয়, আর পিত্তের উপসর্গ হাতপা গা জ্বালা থাকে। কফপ্রদরে আটার মত পিঙ্গল পাণ্ডুবর্ণ বা মাংস ধোয়া জলের ন্যায় স্রাব হয়।

লী। তা ওষুধ ত আলাদা আলাদা বল নি?

ঠা। সব রোগে ওষুদ সম্বন্ধে সেটা আবশ্যক হয় না। এই মনে কর—খয়ের কুষ্ঠ রোগ নষ্ট করে। তা বায়ু, পিত্ত, কফ যে দোষই বেশী থাক্ না কেন, সকল অবস্থাতেই খয়ের প্রয়োগ করা চলে। এই রোগের যে সব ওষুধ বলেছি, সেগুলোও তেমনি সব অবস্থায় প্রয়োগ করা চলে।

লী। তা তুমি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার দু একটা মুষ্টিযোগ বল,—শিখে রাখি।

ঠা। আচ্ছা তবে বলি শোন। (১) সচললবণ, কালজীরে, যষ্টিমধু, নীল সুঁদি—প্রত্যেক জিনিষ এক আনা বেশ করে বেটে কি গুঁড়ো ক'রে আধ ছটাক আন্দাজ দই বা এক সিকি ভরি মধুর সঙ্গে খেলে বাতিক প্রদর ভাল হয়। (২) বাসক কি গুলঞ্চের রস ২ তোলা, আধ তোলা চিনি আর এক সিকি মধু মিশিয়ে খেলে পৈত্তিক প্রদর ভাল হয়। (৩) রোহিতক রয়না বা রেড়া গাছের মূলের কাঁচা ছাল ১ তোলা, কি আমলকীর বীচির শাঁস এক সিকি বেটে, চিনি আর মধু মিশিয়ে খেলে কফজ প্রদর ভাল হয়। (৪) কাপাসের মূল আধ তোলা চেলুনী জলের সঙ্গে বেটে খেলে ভাল হয়।

লী। যাক্, এ বিদ্যেটা এক রকম শেখা হল।

ম। (চুপে চুপে লীলার প্রতি) বাধকের বেদনার সময় বেদনা কমবার কোন উপায় আছে কিনা—জিজ্ঞাসা কর না বৌদি?

লী। একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে ভুল হয়েছে ঠাকমা, ঠাকুর ঝির যখন বাধকের বেদনা ধরে, তখন কি করে সেটা কমান যায়?

ঠা। রক্তটা যতক্ষণ না ভাঙ্গে, ততক্ষণ যাতনা হয়; ভেঙ্গে গেলে যাতনা কম হয়। তলপেটে সেক দিলে রক্তটা বেরিয়ে যায়। তা এক কাজ করিস,—একটা বোতলে গরম জল পুরে মুখে বেশ করে ছিপি বন্ধ ক'রে তাই দিয়ে তলপেটে নাইয়ের একটু নীচে সেক দিস্।

লী। তা এত গরম সইবে কেন?

ঠা। না সয়, বোতলের উপর দু এক পুরু কি যতটা আবশ্যক কাপড় জড়িয়ে নিস্।

লী। আর কোন উপায়ে তাত দেওয়া যায় না?

ঠা। গমের ভুষির পুলটীস্ দিলেও চলে। ভুষি বেশ করে বেটে গরম ক'রে একটা নেকড়ার আধখানায় মাখিয়ে আর আধখানা দিয়ে ঢেকে দিবি। আর সেই পুলটীশ তলপেটে বসিয়ে দিবি। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে সেটা বদলে আবার নূতন করে দিবি।

ম। আমার আর কিছু বলবার নেই ঠাক্মা।

ঠা। না আর কিছু বলবার নেই। এই রকম করগে যা, তাইতে অসুখ ভাল হয়ে যাবে। এখন তোরা আমায় ছুটি দে। আমার পুজো আহ্নিক করবার সময় হয়েছে।

লী। তবে তুমি এস ঠাকুমা।

(সকলের প্রণাম ও ঠাকুমার প্রস্থান)।

ম। ঠাকুমা আমাদের দেখ্‌চি ডাক্তার কবিরাজের উপর।

লী। যে উপকার ঠাকুমার দ্বারা পেয়েছি তা আর কি বলবো। ঠাকুমা না থাকলে বোধ হয়—ছেলেপিলেগুলকে বাঁচাতে পারতাম না। কত লোকের কত কঠিন বেয়ারাম যে ঠাকমা সামান্য ওষুদে ভাল করেছেন, তার আর সংখ্যা নেই; এখন যেকয়দিন বাঁচেন—আমাদেরই লাভ।

ম। তুমিও ত ক্রমশঃ ঠাকুমা হয়ে উঠছ বৌদি।

লী। অনেক শিখেছি বটে, কিন্তু অমন পাকা হ'তে পারি না।

ম। দিদি কি এখন এখানে থাকবে?

লী। না আমায় এখনি যেতে হবে।

ম। আমিও যাব। কিন্তু বাড়ীর কারো সঙ্গে দেখা হয় নি। একবার সকলের সঙ্গে দেখা করে আসি।

লী। চল, আমরা যাই।

(সকলের প্রস্থান)।

শিশুর উদরাময় চিকিৎসা।

(মাঘ সংখ্যার ২০০ পৃষ্ঠার পর)

লী। আর ছানার জল?

ঠা। এই আমাশা রক্তামাশা, অতিসার যখন বাড়াবাড়ি হয়, তখন ছানার জল খুব ভাল পথ্যি। দুধ কি ঘোল না সইলে কি বেশী না সইলেও একটু একটু ছানার জল দেওয়া ভাল।

লী। সে কি করে করব?

ঠা। দুধ গরম করে তাইতে পাতি কি কাগজি লেবুর রস দিবি। তা হইলেই—ছানা কেটে যাবে। তারপর সেইটে ছেঁকে যে নীল জল বেরুবে, সেইটে খাওয়াবি। কিন্তু ছাঁকবার সময় যেন ছানাটা টিপিস না। তা হ'লে ছানার কতক অংশ (পাতলা শাদা শাদা রঙ্গের) ছানার জলের সঙ্গে মিশিয়ে যাবে। যখন ঐ সব রোগ খুব প্রবল—তা কি বড় লোকের কি ছোটছেলের, তখন এই ছানার জল, খুব পাতলা ভাতের মাড় কি বার্লিতে লেবুর রস আর মিছরী দিয়ে কাপড়ে ছেঁকে পথ্যি দিলে আর বড় ওষুদ দেবার দরকার হয় না। একটু বেদানার রস আর চীনে কেসুরও দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু কেসুর চিবিয়ে ছিবড়ে ফেলে দিতে হয়। তবে আগেই বলেছি যে—ছোট ছেলেদের একেবারে দুধ বন্ধ করতে নেই।

লী। আচ্ছা ঠাকুমা, বড় খোকাকে গোরের ভাত কি একবেলা না দুবেলা দেব?

ঠা। যেমন খিদে আর যেমন সয় দেখে একবেলা কি দুবেলা দেওয়া যেতে পারে, তবে খুব পেট ভরে খেতে দিস্‌নে, একটু খালি রেখে দিস্।

লী। আর ছোট খোকাকে কি দেব?

ঠা। দুধ দেওয়ার কথাত বলিছি। তা ছাড়া বড় খোকার যে গোরের ভাত হবে তাই খুব চট্‌কে চট্‌কে একটু কাঁচকলা চটকানর

সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াবি। যদি তা না খায়, তাহ'লে মাড় করে দুধের সঙ্গে খাওয়াবি। আর আগে যে বার্লি বা শটীর পালোর কথা বলিছি, তাও দিতে পারিস্। মিহি পুরাণ চাল গুড়িয়ে খুব মিহি করে ছেঁকে বার্লির মত সিদ্ধ করে দিলেও চলে।

নী। আর কি দেব?

ঠা। আবার কি দিবি? ভোলাবার জন্যে একটু বেদানার রস কি একটু মিষ্টি কমলা লেবুর রস দিতে পারিস। বেশী দিলে পেট কামড়ানি বাড়বে।

নী। দেখ ঠাকুমা, কেউ কেউ বলে যে আমাকেও পেটের অসুখের রোগীর মত পথ্যি করিতে হবে।

ঠা। ছেলে মাই খেলে তাই করিতে হয় বৈকি? খুব কচি ছেলের অসুখ হলে দেখেছি, কবিরাজে মাকে ওষুদ খাওয়ায় আর সেই ওষুদ মাইয়ের দুধে মিশে ছেলের উপকার করে। তা তুইত আর মাই দিস্না। আর তোর পেটেও একটা রয়েছে। তবে খোকা যখন এক আধ-বার টানে তখন একটু ধরা বাঁধায় থাকিস।

নী। আর কি নিয়মে থাকতে হবে বল?

ঠা। আর নিয়ম কিছু নয়। তবে দুধ যেন নষ্ট না হয়, দুধের বাটী, ঝিনুক যেন পরিষ্কার থাকে, সে দিকে খুব নজর রাখিস্। বাটী ঝিনুকের দোষে, আর খারাপ দুধ খেয়ে, অনেক সময় ছেলেপিলের অসুখ হয়; আর ছেলেদের খাওয়ান সম্বন্ধে খুব সুনিয়ম দরকার। অনেক পোয়াতী নিয়ম-মত না খাইয়ে, যখন সময় পায়, তখন খানিক দুধ জোরজবরদস্তী করে গিলিয়ে দেয়। বড় খোকাকে চার ঘণ্টা অন্তর আর ছোট খোকাকে তিন ঘণ্টা অন্তর খেতে দিবি। এটা হল সাধারণ নিয়ম। ভাত খাওয়ার চার ঘণ্টা পরে খেতে দিবি, কিন্তু যদি এক-বার অল্প একটু বার্লি দিস্, তবে তার তিন ঘণ্টা পরে কিছু দিস্। আর খাওয়াতে হলে প্রধান দেখা উচিত ছেলের খিদে। ছোট ছোট ছেলেরা খিদে থাকলেই খায়, আর খিদে না থাকলেই খেতে চায় না। খেতে না চাইলে জোর ক'রে খাওয়ান উচিত নয়। তা অনেক ছেলে আবার খিদে পেলেও খেতে চায় না, বুকে হাঁটু দিয়ে দুধ খাওয়াতে হয়। তাদের ঐ রকম নিয়মে খাওয়ান উচিত। আবার বড় ছেলে খিদে না থাকলেও খাবার দেখলে "খাব খাব" করে। তাদেরও ঐ রকম নিয়মে খাওয়াতে হয়। আর মলের দিকে লক্ষ্য রেখে, খাবার হজম হচ্ছে কিনা দেখে, খাবার কমাতে বা বাড়াতে হয়।

নী। পথ্যিত হল। এখন ওষুদ কি বল?

ঠা। তিন চার দিন সুনিয়মে পথ্যি দিয়ে যদি অসুখ কমে যায়, তা হলে ওষুদ দেবার দরকার হবে না। নইলে এক কাজ করিস, বটগাছের যে ঝুরি নামে জানিস্ত?

নী। হাঁ, জানি।

ঠা। সেই ঝুরির আগা থেকে এক আনা (ছয় রতি) আন্দাজ নিয়ে চেলুনি জলের সঙ্গে বেটে ছোট খোকাকে আর দু আনা আন্দাজ বড় খোকাকে খাইয়ে দিবি। কচি বাবলা পাতা ও ওকড়ার কচি মূলও এই নিয়মে বেটে দিলে উপকার হয়।

নী। চেলুনী জল কি?

ঠা। গোটাকতক আতপ চাল খানিক ক্ষণ জলে ভিজিয়ে রেখে, পাথরের উপর চাল-

গুলো জলের সঙ্গে ঘষ্‌তে হয়। জলটা একটু শাদা শাদা হলেই চেলুনী জল হল।

লী। এতে যদি ভাল না হয়?

ঠা। এতেই ভাল হবে। যদি না হয়, তাহলে বেণের দোকান থেকে মুতো, পিপুল আতইচ আর কাকড়াশৃঙ্গী—এই চারটে জিনিষ কিনিয়ে আনবি। জিনিষগুলি পুরাণ, পোকা লাগা বা পচা না হয়। তারপর ঐ গুলি বেশ পরিষ্কার করে ঝেড়ে বেছে নিয়ে হামানদিস্তেয় গুঁড়ো করবি। তারপর কাপড়ে খুব মিহি করে ছেঁকে নিবি। তারপর চারটে জিনিষের মিহি গুঁড়ো সমান ভাগে একসঙ্গে মিসাবি। সেই গুড়োর ২রতি ছোট খোকাকে আর চার রতি বড় খোকাকে মধুতে মিশিয়ে খাওয়াবি।

লী। এত বড় হাঙ্গমা ঠাকমা?

ঠা। মনে করলেই তাই, নইলে কিছুই নয়। চারটে মসলা গুড়ো করা আর কি হাঙ্গামা?

লী। যদি হামানদিস্তে না থাকে?

ঠা। শীল পরিষ্কার করে ধুয়ে তাইতে গুঁড়িয়ে নিবি।

লী। আর একটা সহজ কিছু বল না?

ঠা। সহজ এর চেয়ে আর কি হবে? তবু একটা বলছি শোন।—এক তোলা বেল শুঁঠ আর এক তোলা আমগাছের ছাল থেঁতো করে আধসের জলে সিদ্ধ করে আদ পোয়া থাকতে নামাবি। মাটীর হাঁড়িতে মন্দ মন্দ কাঠের জ্বালে সিদ্ধ করতে হবে। তার পর ছেঁকে নিয়ে ঠাণ্ডা হলে, তার এক তোলা কি দেড় তোলা বড় খোকাকে আর আধ তোলা কি পৌনে একতোলা ছোট খোকাকে খাওয়াবি। খাওয়াবার আগে ওর সঙ্গে ৮।১০ ফোটা মধু আর এক টিপ খৈয়ের গুঁড়ো মিশিয়ে নিস।

লী। রোজ সিদ্ধ করতে হবে?

ঠা। হাঁ, রোজ সিদ্ধ করতে হবে। আর বাকীটা ফেলে দিবি।

লী। ওষুধ কি একবার করে দেব?

ঠা। হাঁ, সকালে একবার করে দিবি। তবে রোগের বেশী বাড় থাকলে বিকেলেও সকালের মত নিয়মে দেওয়া যায়। আর পাচন হলে, সকালের পাচনটা না ফেলে দিয়ে তাই থেকে বিকেলে দেওয়া চলে।

লী। আচ্ছা, ঠাক্‌মা, এখন এই রকম করেই দেখি। তার পর না হয় আবার শ্রীচরণে হাজির হব।

ঠা। তার আর দরকার হবে না। ওতেই ভাল হয়ে যাবে।

লী। (পদধূলি লইয়া) সেই আশীর্ব্বাদ কর ঠাক্‌মা।

ঠা। আশীর্ব্বাদত নিত্যই করি ভাই। রাজমাতা হও, রাজরাণী হও।

প্র। ঠাক্‌মা, তোমার শেষের আশীর্ব্বাদটা যে আমার পক্ষে বড় বিপজ্জনক। উনি যদি কোন রাজার রাণী হয়ে বসেন, তাহলে আমার উপায় কি হবে?

ঠা। কেন তুমিও রাজা হতে পার।

প্র। সেটা এজন্মে সম্ভব বলে মনে হয় না।

ঠা। পুরুষের ভাগ্যের কথা কে বলতে পারে?

লী। তুমি ঐ কর বসে, আমি চল্লাম।

(প্রস্থান)

প্র। বলি শোননা ওগো, আমায় ফেলে রেখেই চল্লে যে দেখছি? (প্রস্থান)

ঠা। এই দুটী প্রাণী কে জানে কোন অজ্ঞাত লোকে ছিল, তার পর সংসারে এল। এদের জন্মাতে দেখেছি, হামা দিতে দেখেছি, ছুটো ছুটী করে খেলা করতে দেখেছি। তার পর বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হয়ে পরস্পর অপরিচিত দুটী প্রাণী এত আপনার হয় গেছে যে—এক দণ্ড পরস্পরকে না দেখলে পৃথিবী শূন্য বোধ করে। অল্প দিন পূর্ব্বে যারা শিশু ছিল, তারা এখন শিশুর জনকজননী হয়েছে। একদিন আমিও সংসারে এ খেলা খেলেছিলাম, এ অভিনয় করেছিলাম। ক্রমে ক্রমে আমার খেলা ফুরিয়ে এসেছে। কোন অজ্ঞাত লোক-থেকে যে আমার পাঠিয়ে ছিল, সে আবার ফিরে যাবার জন্য আহ্বান করছে। নারায়ণ! নারায়ণ! মুক্তকর জগদীশ!

(প্রস্থান)

বৈদ্যসম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ।

(মাঘ সংখ্যার ১৯২ পৃষ্ঠার পর।)

মান্দ্রাজের "মেডিকেল কৌন্সিল," সভ্যগণের নাম তালিকা হইতে ডাঃ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণস্বামী আয়ারের নাম বাদ দিয়া আয়ুর্ব্বেদের ঘোরতর অবমাননা করিয়াছেন। এই অবমানায় "মেডিকেল কৌন্সিলেরই" অজ্ঞতা, সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিতা ও নীচতা প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র। যে আয়ুর্ব্বেদ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিরুদ্ধে সতেজে দণ্ডায়মান থাকিয়া যুগযুগান্তর হইতে স্বীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আসিতেছে, সেই আয়ুর্ব্বেদের বিমল যশোভাতি ইহাতে কিছুমাত্র ম্লান হইবে না। সপারিষদ শ্রীযুক্ত মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের সভায় ডাঃ কৃষ্ণস্বামী ঘটিত বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবে। আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি যে ভারত-গভর্ণমেণ্ট কদাপি মান্দ্রাদ মেডিকেল কৌন্সিলের অভিমত সমর্থন করিবেন না এবং আয়ুর্ব্বেদের হিতার্থে যে ডাঃ কৃষ্ণস্বামী এতাদৃশ স্পষ্টবাদিতা সত্যপ্রিয়তা এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা দেখাইয়াছেন, তিনি আমাদের সদাশয় গবর্ণরের নিকট নিশ্চয়ই সুবিচার প্রাপ্ত হইয়া জয় লাভ করিবেন। আমি আমার হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে বলিতেছি যে—'মান্দ্রাজ মেডিকেল কৌন্সিলে'র এইরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রমাত্মক, এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতির অন্তরায়স্বরূপ। 'বম্বে মেডিকেল কৌন্সিল' ডাক্তার পোপাত প্রভুরাম বৈদ্য, তাঁহার মৃত পিতার স্মৃতিরক্ষার্থ প্রতিষ্ঠিত আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা করার জন্য তাঁহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, আমি সমস্বরে তাহারও প্রতিবাদ করিতেছি।

আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির প্রতিবাদ যদ্যপি আমাদের উদারচেতা রাজরাজেশ্বর সম্রাটের উক্তির দ্বারা সমর্থিত হয়, তাহা হইলে উহা বিশেষ বলবান হইবে—সন্দেহ নাই, এই আশায় আমাদের মহামান্য সম্রাট ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ভারতাগমনকালে 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে'র প্রদত্ত অভিবাদনের প্রত্যুত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন—তাহার প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

You are to conserve the ancient

learning and simultaneously to push forward Western science.

অনুবাদ:—"প্রাচীন বিদ্যাকে রক্ষা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রসার সাধন করা আপনাদের কর্ত্তব্য"। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-মতানুসারী ব্যক্তিগণ, ডাক্তার কৃষ্ণস্বামী এবং ডাক্তার পোপাত প্রভুরাম বৈদ্য মহোদয় দ্বয়কে অযোগ্য নির্দ্দেশ করিয়া কি সম্রাটের এই মহৎ বাক্যের অন্যথা করেন নাই? ভারত-সাম্রাজ্য সুষ্ঠুরূপে পরিচালন করিতে হইলে পরস্পরের সহানুভূতি এবং একতা যে তাহার মূলসূত্র,—আমাদের সুবিবেচক সম্রাট তাহা স্পষ্টরূপেই বলিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসা-বিজ্ঞান যদি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করিয়া এক যোগে কার্য্য করে, তাহা হইলে সমধিক উন্নতি লাভ করা সম্ভব। এক জন দুই এবং অপরে তিন জানিলে যদি উভয়ে মিলিত হয়, তবে উভয়েই পাঁচ জানিতে পারে। কিন্তু প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করিলে একের সেই দুই এবং অপরের সেই তিনই রহিয়া যাইবে। এরূপ ক্ষেত্রে যদি আমরা পৃথক্ না থাকিয়া একত্র মিলিত হই, যদি পরস্পরের সহায়তায় উচ্চ উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হই, যদি প্রতিবাসীদিগকে সহানুভূতির চক্ষে দেখিতে পারি, যদি এ্যালো-প্যাথি, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্ব্বেদবিদ্ এবং ইউনানীচিকিৎসক,—সকলে মিলিত হইয়া এক মহান্ উদ্দেশ্যসাধনে যত্নবান পাইতে পারি, তাহা হইলে মানবজাতির রোগ যন্ত্রণা এবং অকাল মৃত্যু বহুল পরিমাণে হ্রাস হইতে পারে —সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এতদপেক্ষা উচ্চতর এবং মহত্তর উদ্দেশ্য জগতে আর কিছুই নাই, এবং পরস্পরের সহানুভূতি সেই উদ্দেশ্য সাধনের একমাত্র উপায়। আমাদের সদাশয় সম্রাট সেই সহানুভূতিরই সূচনা করিয়া গিয়াছেন এবং আমাদের উদারচেতা রাজ-প্রতিনিধির হৃদয়ও সহানুভূতিপূর্ণ। সমবেত সভ্যমহোদয়গণ, আসুন, আমরা সকলে মিলিত হইয়া আমাদের রাজপ্রতিনিধির নিকট এই উভয় প্রকার চিকিৎসা-বিদ্যাকে পৃথক্ করিবার নীচ এবং স্বার্থপর চেষ্টার বিরুদ্ধে আবেদন করি।

যে সকল চিকিৎসক দেশীয় ঔষধ ব্যবহার করেন, গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া তাঁহাদিগকে মিউনীসিপালিটীর চিকিৎসালয়ে এবং অন্যান্য সাধারণ চিকিৎসালয়ে চিকিৎসা-কার্য্য করি-বার অধিকার দিয়া যে উদারতা প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য 'বম্বে গবর্ণমেণ্ট' আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

অবশেষে, 'বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটী' আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রকে প্রাচীন বিদ্যা-শিক্ষা-বিভা-গের অন্তর্গত করিয়াছেন বলিয়া আমরা আহ্লাদের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আশা করি—তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র শিক্ষা এবং আয়ুর্ব্বেদের আটটী লুপ্ত প্রায় অঙ্গের উন্নতি-মূলক গবেষণার নিমিত্ত সম্পূর্ণরূপে উৎসাহ প্রদান করিবেন। ডাক্তার পি সি রায় হিন্দু রসশাস্ত্রসম্বন্ধীয় আলোচনার জন্য, ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী হিন্দু শস্ত্র-চিকিৎসাসম্বন্ধীয় শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধের জন্য, এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার প্রণীত হিন্দুদিগের শস্ত্রসম্বন্ধীয় পুস্তকের জন্য আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ। চিকিৎসা-বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীর পক্ষে আয়ুর্ব্বেদ একটী সুমহান্ গবেষণা-মন্দির। প্রাচীন ঋষি-দিগের যে সকল অদ্ভুত আবিষ্কার বহু শতাব্দী-ব্যাপী অবহেলায় ফলে বিস্মৃতিগর্ভে বিলীন

হইয়া গিয়াছে, সে গুলির যখন পুনরুদ্ধার হইবে, তখন তদ্দ্বারা রোগপীড়িত মানব-জাতির পরম মঙ্গল সাধিত হইবে—সন্দেহ নাই। অপিচ সেই সকলের সাহায্যে পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রেরও যথেষ্ট উন্নতি ঘটিবে এবং আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণও আপনাদের অজ্ঞতার বিষয় উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

সভ্য মহোদয়গণ, উপবেশন করিবার পূর্ব্বে আপনারা আমার বক্তব্য বিষয় শ্রবণ করিবার জন্য যে কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, তজ্জন্য বহু ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। সর্ব্ব-শক্তিমান্ বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি যে—মহদুদ্দেশ্যসাধনে আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি, তাহা সুসিদ্ধ হউক।

"সিদ্ধিঃ সাধ্যে সতামস্তু"।

(সম্পূর্ণ)

আয়ুস্তত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বিপরীত হইলে অদীর্ঘ, অসুখকর ও অনিয়ত হয়। যদি দৈব ও পুরুষকার মধ্যম হয় নিয়তি ও সুখ মধ্যম হইয়া থাকে। দৈব ও পুরুষকার হীনবল হইলে আয়ুও হীন হইয়া থাকে। প্রবল পুরুষকার দুর্ব্বল দৈব কর্ম্মকে পরাভূত করিয়া থাকে, পক্ষান্তরে প্রবলদৈবও দুর্ব্বল পুরুষকারকে বাধা দেয়। সাধারণতঃ আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই, একজন প্রতিভাসম্পন্ন, উন্নতমনাঃ, উদযোগী ব্যক্তি বহুচেষ্টায়ও একটি কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন না, অপর ব্যক্তি তাদৃশী শক্তি লাভ না করিয়াও অনায়াসে কার্য্য উদ্ধার করিতেছে, এ স্থলে বলিতে হইবে প্রথমোক্ত ব্যক্তি পুরুষকার সম্পন্ন হইয়াও প্রতিকূল দৈববশাৎ বা দুর্ব্বল দৈববশতঃ কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রবল দৈববলে অনায়াসে সে কার্য্য উদ্ধার করিতেছে। জগতের যাবতীয় কার্য্যই দৈব পুরুষকার ও কাল সাপেক্ষ, এই তিনটীর একত্র সমাবেশ না হইলে কোন কার্য্যই হয় না। যেমন কৃষক ক্ষেত্র কর্ষণ, বীজ বপন ইত্যাদি পুরুষকার সাপেক্ষ কর্ম্ম করিয়াছে, তখন দৈব বর্ষণ না করিলে বা বৃষ্টি না হইলে কেবল বীজবপনে তাহার অঙ্কুরোদ্গম হইবে না, আবার বর্ষণ হইলেও নির্দ্দিষ্ট সময় না হইলে শস্য অঙ্কুরিত হইবে না, হইলেও সীমা-বদ্ধ কাল না পাইলে উহা ফলপ্রসূ হইবে না। তদ্রূপ পরমায়ুব্যাপার ও জাগতিক সমস্ত কার্য্যই, দৈব, পুরুষকার এবং কালের অধীন। এরূপ দেখিয়া মনে হইতে পারে যে পরমায়ুর পরিমাণ বিধাতা কর্ত্তৃক ব্যক্তিভেদ ও অবস্থা-ভেদ নির্দ্দিষ্ট আছে।

বস্তুতঃ আয়ুর কাল বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট নহে, কোন মহাফল কর্ম্মই দীর্ঘায়ুরূপে পরিণত হয়। এস্থলে মহাফলকর্ম্ম শব্দে এইরূপ বুঝিতে হইবে,—কোন ব্যক্তি নানা প্রকার কুপথ্যাদি সেবন করিয়াও দীর্ঘ জীবন লাভ করিতেছে দেখা যায়, কিন্তু সে অলক্ষিতভাবে এরূপ কোন মহাফলজনক কার্য্য করিতেছে যাহা তাহার দীর্ঘজীবিতার কারণ স্বরূপ হইতেছে

হয়তো সে তাহা নিজেও লক্ষ্য করে নাই, কিম্বা অপরেও তাহা লক্ষ্য করে নাই। আবার কোন ব্যক্তি হয়তো সহস্র সুপথ্যসেবী হইয়াও অকালে সংসার হইতে বিদায় লইতেছে,—এরূপস্থলে বুঝিতে হইবে কোন অলক্ষিত মহাপ্রভাব কর্ম্মই এরূপ অকাল মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। আবার কোন মহাফল কর্ম্মই অনিয়তায়ুর হেতু হইতেছে, যখন উভয় প্রকারই দৃষ্টান্ত দেখা যাইতেছে তখন আয়ুর নিয়তত্ব স্বীকার করা যুক্তি-সঙ্গত নহে।

আমাদের পরমায়ু যে অনিয়ত তাহাই মহর্ষিদৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইতেছেন।

"যদি হি নিয়তকালপ্রমাণমায়ুঃসর্ব্বং স্যাদায়ুষ্কামানাং ন মন্ত্রৌষধিমণিমঙ্গলবল্যুপ-হারহোমনিয়ম-প্রায়শ্চিত্তোপবাস-স্বস্ত্যয়নপ্রণি-পাতগমনাদ্যাঃ ক্রিয়া ইষ্টয়শ্চ প্রযোজ্যেরণ্ নোদ্ভ্রান্তচণ্ডচপলগোগজোষ্ট্রখর তুরগমহিষাদয়ঃ * * * নসাহসং ন দেশকালচর্য্যা ন নরেন্দ্র-প্রকোপ ইত্যেবমাদয়ো ভাবা নাভাবকরাঃ স্যুবায়ুষঃ সর্ব্বস্য নিয়তকালপ্রমাণত্বাৎ "নচাভ্যস্তাকালমরণভয়নিবারকানা মকাল ভয়মাগচ্ছেৎ প্রাণিনাং ব্যর্থাশ্চারম্ভকথা-প্রয়োগবুদ্ধয়ঃ স্যুর্ম্মহর্ষীণাং রসায়নাধিকারে; নাপীন্দ্রো নিয়তায়ুষং শত্রুং বজ্রেনাভিহন্যাৎ, নাশ্বিনা বার্ত্তং ভেষজেনোপপাদয়েতাং নর্ষয়ো যথেষ্টমায়ুস্তপসা প্রাপ্নুয়ুর্নচ বিদিতবেদিতব্যা মহর্ষয়ঃ সসুরেশাঃ সম্যক্ পশ্যেয়ুরুপদিশেয়ু রাচরেয়ুর্ব্বা।

যদি আয়ুর পরিমাণ বিধাতা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইত, তবে দীর্ঘায়ু লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া কেন মন্ত্র, ঔষধি, মণি, হোম, প্রায়-শ্চিত্ত, স্বস্ত্যয়ন, বিনীতাচরণ প্রভৃতি স্বীকার করা হয়? যদি আয়ু নিয়তই হইত, তবে উদ্-ভ্রান্ত, প্রচণ্ড, চঞ্চল, গো, মহিষ, উষ্ট্র প্রভৃতি দুর্দ্দমনীয় জন্তুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা ও প্রবল বায়ু ও ঘূর্ণীবায়ু হইতে নিজকে সাবধান করিবার আবশ্যক হইত না, অপিচ নগপ্রপাত, গিরিসংকট, দুর্গমস্থান, প্রবল জলস্রোতঃ, প্রমত্ত, নৃশংস, ঈর্ষ্যা ও লোভপরতন্ত্র শত্রুগণ হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা বা তাহা-দিগকে পরাভূত করিবার বাসনা কিম্বা প্রবলাগ্নি বিবিধ বিষধর সর্প ও সরীসৃপ প্রভৃতি হইতে দূরে পলায়নের চেষ্টার আবশ্যক থাকিত না। যদি আয়ুর পরিমাণ নির্দ্দিষ্টই থাকিত, তবে দুঃসাহস, দেশ ও কালের বিরুদ্ধাচরণ রাজরোষ ইত্যাদি ও আয়ুনাশ করিতে সমর্থ হইত না। যদি অকাল মরণের নিয়ম না থাকিত, তবে অকালমরণ ভীতি প্রাণিদিগের হৃদয়ে সমুদিত হইত না। রসায়ন-প্রয়োগে দীর্ঘ জীবন লাভ ও জরাব্যাধি বিদূরিত হয় ইত্যাদি ঋষিবাক্য বৃথা বাক্যাড়ম্বর বলিয়া বোধ হইত, আর যদি শত্রুর আয়ু নিয়তই হইত, তবে শত্রু তাহাকে অস্ত্র প্রয়োগে হত্যা করার চেষ্টা করিত না, এবং চিকিৎসকগণ বিবিধ প্রকার ঔষধ প্রয়োগে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেন না, কিংবা ঋষিগণ কঠোর তপশ্চর্য্যা দ্বারা প্রচুর আয়ুর অধিকারী হইতেন না। সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষিগণ সুস্থদেহে দীর্ঘজীবন লাভের উপদেশ দান ও তদনুরূপ বিবিধ আচরণ করিতেন না।

"তস্মাদ্ধিতোপচারমূলং জীবিতং। অতো-বিপর্য্যয়ান্মৃত্যুঃ, অপিচ দেশকালাত্মগুণ-বিপরীতানাং কর্ম্মণাং আহারবিকারাণাঞ্চ ক্রিয়োপযোগঃ সম্যক্ সর্ব্বাতিযোগসন্ধারণ মসন্ধারণমুদীর্ণানাঞ্চ গতিমতাং সাহসানাং

বর্জ্জনং আরোগ্যানুবৃত্তৌ উপালভামহে হেতুমুপদিশামঃ সম্যক্ পশ্যামশ্চেতি।

অতএব স্থির হইতেছে দীর্ঘজীবন লাভের মূল উপায় হিতজনক আহার আচার সেবা। এতদ্বিপরীত মৃত্যুর কারণ, পরন্তু দেশকাল ও স্বভাবের বিপরীতাচরণ বা আহার বিহারাদির বিপরীতাচরণও অকাল মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ আমরা সর্ব্বদা বুঝিতেছি বলিতেছি ও দেখিতেছি যে সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার পরিহার, মলমূত্রাদির বেগধারণ না করা এবং গতিশীল জন্তু ও দুঃসাহসিক কর্ম্ম সমূহের পরিহার আরোগ্যের কারণ। যদি পরমায়ুর পরিমাণ এরূপ অনিশ্চিতই রহিল, তবে কাল ও অকাল মৃত্যু কিরূপে সম্ভব হয়? তাহাও সরল দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে।

"যথা যানসমাযুক্তোঽক্ষঃ প্রকৃত্যৈবাক্ষগুণৈরুপেতঃ সর্ব্বগুণোপপন্নোবাহ্যমানো যথাকালং স্বপ্রমাণক্ষয়াদেবাবসানং গচ্ছেৎ তথায়ুঃ শরীরোপগতং বলবতঃ প্রকৃত্যা যথাবদুপচর্য্যমাণং স্বপ্রমাণক্ষয়াদেবাবশানং গচ্ছতি, স মৃত্যুঃ কালে তথা স এবাক্ষো অতিভারাধিষ্ঠিতত্বাৎ বিষমপথাদপথাদক্ষচক্রভঙ্গাদ্বাহ্যবাহক-দোষাদনির্ম্মোক্ষাৎ পর্য্যসনাদনুপাঙ্গাচ্চান্তরা ব্যসনমাপদ্যতে, তথায়ুরপি অযথাবলমারম্ভাদযথাগ্ন্যভ্যবহরণাদ্বিষমশরীরন্যাসাৎ অতিমৈথুনাদসৎসংশ্রয়াৎ উদীর্ণবেগবিনিগ্রহাৎ বিধার্য্যবেগাবিধারণাৎ ভূতবিষাগ্ন্যুপতাপাৎ অভিঘাতাৎ আহারবিবর্জ্জনাৎ চাণ্ডরাব্যসনমাপদ্যতে স মৃত্যুরকালে, তথাজ্বরাদীনপ্যাতঙ্কামিথ্যোপচরিতানকালমৃত্যূন্‌পশ্যাম ইতি।

যেমনশকটের চক্রমণ্ডল প্রকৃত চক্রগুণ সম্পন্ন ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইলেও ব্যাহ্যমান হইতেই যথাকালে নিজ প্রমাণের ক্ষয় বশতঃ অবসান বা বিনাশ প্রাপ্ত হয় সেইরূপ শরীরের আয়ু ও বলবানের প্রকৃতি গুণে যথাবৎ উপচর্য্যমাণ হইয়াও নিজপ্রমাণের স্বাভাবিক ক্ষয় বশতঃ যথাকালে বিনাশ প্রাপ্ত হয় ইহাকেই আমরা কালমৃত্যু বলিয়া থাকি, আবার সেই চক্রমণ্ডল বা গাড়ীর চাকা অতিভার বশতঃ বিষমপথ বা উচ্চনীচপথ অথবা অপথ বশতঃ চক্রভঙ্গবশতঃ বাহ্যবাহকদোষ বশতঃ বা পরিচালক ও আরোহীর পরিচালন আরোহণ দোষে, অথবা চক্রগুলির অনির্ম্মোক্ষণ বা খুলিয়া পরিস্কার না করার জন্য বিপর্য্যস্ত হয় বা অসময়ে ক্ষয় অর্থাৎ বিপন্ন হয়, তদ্রূপ দেহীরও অযথারূপেও দেহের পরিচালন এবং অনিয়মে আহার বিহারাদি দ্বারা অসময়ে দেহের পতন ঘটিয়া থাকে তাহাকেই আমরা দেহের অকালমৃত্যু বলিয়া থাকি।

পূর্ব্বে আমরা আয়ুর্ব্বেদের লক্ষণে বলিয়াছি হিতায়ুঃ, অহিতায়ুঃ, সুখায়ুঃ, দুঃখায়ুঃ, আয়ুর হিত অহিত, পরমায়ুর পরিমাণ, যাহা পাঠে অবগত হওয়া যায়, তাহার নাম আয়ুর্ব্বেদ, এপর্য্যন্ত আমরা, পরমায়ু কি ও তাহা নিয়মিত কি অনিয়মিত তাহার বিচার করিলাম, এক্ষণে হিতায়ুঃ, অহিতায়ুঃ, সুখায়ুঃ, দুঃখায়ু কি, তাহার শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট লক্ষণ কি, তাহাই আমাদের বক্তব্য। জীবমাত্রেই স্বকীয় প্রাক্তন সুকৃতি বা দুষ্কৃতিবশে ইহজীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও দুঃখ দারিদ্র্যের অধিকারী হইয়া থাকে, কর্ম্মফল ভোগ দেহী মাত্রেরই অনিবার্য্য সুতরাং যাহার যেরূপ কর্ম্ম তাহাকে তদনুরূপ ফলভোগ করিতেই হইবে। শুভ কর্ম্মের ফলে হিতায়ু ও সুখায়ুর ভোক্তা ও অশুভ কর্ম্মফলে অহিতায়ু ও দুঃখায়ুর ভোক্তা জীবকে হইতে হইবে।

নিম্ন লক্ষণবিশিষ্ট জীবিতকালকে সুখায়ুঃ বলে।

"তত্র শরীরমানসাভ্যাং রোগাভ্যামনভিদ্রুতস্য বিশেষেণ যৌবনবতঃ সমর্থানুগতবলবীর্য্য পৌরুষপরাক্রমস্য জ্ঞান বিজ্ঞানেন্দ্রিয়ার্থবলসমুদায়স্য পরমর্দ্ধিরুচিরবিবিধোপভোগস্য সমৃদ্ধসর্ব্বারম্ভস্য যথেষ্টবিচারিণঃ সুখমায়ুরুচ্যতে অসুখমতো বিপর্য্যয়েণ।"

যে ব্যক্তিশারীর ও মানসরোগে অভিভূত নহে, যে ব্যক্তি বিশেষরূপে স্থির যৌবনের অধিকারী হইয়া থাকে, যে ব্যক্তি বলবীর্য্য পৌরুষ পরাক্রম সম্পন্ন, যাহার জ্ঞান (শাস্ত্র জ্ঞান) বিজ্ঞান (তদর্থনিশ্চয়শাস্ত্রানুযায়িনী নিশ্চয়াত্মিকাবুদ্ধিঃ) ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থ ও বল সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকে, যে ব্যক্তি পরম শ্রীসম্পন্ন রুচিকর বিবিধ উপভোগসমর্থ এবং যাহার সমস্ত চেষ্টাই সুসম্পন্না এবং যে ব্যক্তি স্বাধীন তাহার আয়ুকে সুখায়ু বলে। ইহার বিপরীত হইলে অসুখায়ু বলিয়া থাকে।

নিম্নোক্ত লক্ষণটি হিতায়ু বলিয়া কথিত।

হিতৈষিণঃ পুনর্ভূতানাং পরস্বাদুপরতস্য সত্যবাদিনঃ শমপরস্য পরীক্ষ্যকারিণোঽপ্রমত্তস্য ত্রিবর্গং পরস্পরেণানুপহতমুপসেবমানস্য পূজার্হসম্পূজকস্য জ্ঞানবিজ্ঞানোপশমশীলস্য বৃদ্ধোপসেবিনঃ সুনিয়তরাগের্ষ্যামদমানবেগস্য সততং বিবিধপ্রদানপরস্য তপোজ্ঞানপ্রশমনিত্যস্যাধ্যাত্মবিদস্তৎপরস্য লোকমিমঞ্চামুঞ্চাপেক্ষমানস্য স্মৃতিমতোহিতমায়ুরুচ্যতে অহিতমতোবিপর্য্যয়েণ।

যিনি প্রাণিগণের হিতাকাঙ্ক্ষী পরধনে বীতস্পৃহ, সত্যবাদী, শান্তিপ্রিয় সমীক্ষ্যকারী (পূর্ব্বাপরদৃষ্টি রাখিয়া কাজকরা) অপ্রমত্ত (সুখদুঃখে সমভাব) ধর্ম্মার্থকামের পরস্পর অবিরোধে ভোগকারী, পূজ্যজনের পূজক, জ্ঞান বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন, বৃদ্ধের সম্মানকারী রাগ বিদ্বেষ, ঈর্ষ্যা মদ ও মানের বেগধারণকারী, সতত বিবিধ দানপরায়ণ, তপোজ্ঞান শান্তিপরায়ণ অধ্যাত্মবিদ ও তৎপর (অধ্যাত্মপর) ইহা ও পরলোকের হিতলাভেচ্ছু এবং স্মৃতিমান্ ঈদৃশজীবিতকালের নাম হিতায়ুঃ ইহার বিপরীত অহিতায়ুঃ।

ক্রমশঃ।

কবিরাজ শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন সেন।

রোগ।

জীবশরীর —রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র, লসীকা, বসা, ওজঃ, ত্বক্, শকৃৎ, মূত্র, স্বেদ, বায়ু, পিত্ত, কফ, হৃদয়, যকৃৎ, ফুস্ ফুস্, ক্লোম, বৃক্ক, স্নায়ু, ধমনী, সিরা, রসায়নী প্রভৃতি স্থূলও সূক্ষ্ম ভেদে নানাবিধ শরীরোপকারক দ্রব্যদ্বারা গঠিত হইয়াছে। এই সকল দ্রব্যের গুণ যথা—গৌরব, লাঘব, শৈত্য, ঔষ্ণ্য, রূক্ষতা, কার্কশ্য, বৈশদ্য, পৈচ্ছিল্য, সান্দ্র, দ্রব, কাঠিন্য, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি; এবং এই সকল দ্রব্যের কর্ম্ম যথা—উৎক্ষেপন, অবক্ষেপন, আকুঞ্চন, প্রসারণ, নিমেষ, উন্মেষাদি দ্বারা শরীর ধৃত, বর্দ্ধিত ও যাপিত হয়। যদি কোন কারণে এই সকল দ্রব্য, দ্রব্যের গুণ বা কর্ম্ম অযথা বৃদ্ধ, ক্ষীণ বা বিকৃত হয়, তাহা হইলে শরীর পীড়িত হইয়াছে বলা যায়। মহর্ষি চরকও ব্যাধির এই প্রকার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যেষামেব হি ভাবানাং সম্পৎ সঞ্জনয়েন্নরম্।
তেষামেব বিপদ্ব্যাধীন্ বিবিধান্ সমুদীরয়েৎ॥

অর্থাৎ যে সকল ভাবের সম্পৎ হইতে মনুষ্যদেহ গঠিত হইয়াছে, তাহাদেরই বিপদ হইতে বিবিধ রোগের উদ্ভব হয়।

নিজ ও আগন্তুভেদে রোগ দুই প্রকার। দোষপ্রকোপজন্য যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম নিজরোগ। ভূত, বিষ, বায়ু, অগ্নি, সম্প্রহারাদিসমুত্থ রোগকে আগন্তু রোগ কহে। শরীর-দোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত, ও কফের প্রকোপজন্য যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম শারীর রোগ এবং মানস দোষের অর্থাৎ রজঃ এবং তমঃর প্রকোপ জন্য যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম মানসরোগ। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে রোগের আশ্রয় শরীর এবং মন। কিন্তু একের পীড়ায় অপর অবশ্যই পীড়িত হয়। আধার ভূত শরীর পীড়িত হইলে আধেয় মন পীড়িত হয়, আবার আধেয় মন পীড়িত হইলে আধারভূত শরীর পীড়িত হয়। যেমন উত্তপ্ত কটাহে কোন দ্রব্য রাখিলে সেই দ্রব্য কিংবা উত্তপ্ত দ্রব্য কোন কটাহে রাখিলে সেই কটাহ উত্তপ্ত হয়, সেইরূপ শরীর ও মনের বিষয় বুঝিতে হইবে, আত্মায় কোন প্রকার রোগ আশ্রয় করে না, কারণ আত্মা নির্ব্বিকার। তবে ইন্দ্রিয় ও মনসংযুক্ত আত্মাই পীড়া অনুভব করেন।

আগন্তু রোগের পূর্ব্বে যদিও দোষ প্রকোপ হয় না, তথাপি রোগ উৎপন্ন হওয়া মাত্রই দ্রব্যে রসোৎপত্তির ন্যায় দোষ-সংক্রমণ অনিবার্য্য।

রোগসকল নিম্নলিখিত ভাবে বিভক্ত হইতে পারে (১) পিতার শুক্র কিংবা মাতার আর্ত্তব দুষ্টিজন্য ভ্রূণশরীরে কুষ্ঠার্শমেহাদি যে রোগ সংক্রমিত হয়, তাহার নাম সহজ রোগ। (২) গর্ভকালে জননীর অপচার-হেতু কিংবা দোহদের (গর্ভকালে যে জিনিষে গর্ভিণীর লোভ হয়, তাহার নাম দোহদ) অভাব-হেতু ভ্রূণের কুষ্ঠ, পৈঙ্গল্য কিলাসাদি যে রোগ হয়, তাহার নাম গর্ভজ রোগ। (৩) অত্যধিক অপতর্পণ বা সন্তর্পণরূপ মিথ্যাহারবিহারাদি-জন্য উৎপন্ন রোগকে স্বাপচারজ রোগ কহে। (৪) ক্ষত, ভঙ্গ, প্রহারাদি এবং ক্রোধ শোক ভয় প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন যে শরীর ও মানস রোগ, তাহার নাম পীড়াকৃত বা আগন্তু ব্যাধি। (৫) শীতোষ্ণবর্ষ লক্ষণ কালত্রয়ের বিকৃতি-জন্য কিংবা যে কালে যে বিধি পালনীয়, তাহার অননুষ্ঠানজন্য যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম কালজ রোগ। (৬) দেবগুরুর অপমাননা; অথর্ব্ববেদবিহিত শ্যেণযাগাদি অথবা ভূতাভিষঙ্গপ্রভৃতি কারণজন্য যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম প্রভাবজ রোগ। (৭) কালেই হউক কিংবা অকালেই হউক, ক্ষুধা, পিপাসা এবং জরাদি যে সকল রোগ স্বভাব হইতে উৎপন্ন হয়, তাহার নাম স্বাভাবিক রোগ। সর্ব্বপ্রকার রোগই এই সাত প্রকারের কোন না কোন একটীর অন্তর্ভুক্ত। রুক্ সামান্য হেতু অর্থাৎ পীড়া দেওয়া সকল প্রকার রোগের সাধর্ম্ম্য বলিয়া সকলকেই রোগ নামে অভিহিত করা হয়। নিদান, পূর্ব্বরূপ, রূপ, সম্প্রাপ্তি এবং চিকিৎসার ভেদে রোগের অসংখ্য ভেদ কল্পিত হয়। সর্ব্বপ্রকার রোগে দোষ প্রকোপ থাকিতে হইবে। প্রথমতঃ নিদান-সেবনজন্য দোষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; পরে সেই বৃদ্ধ দোষ প্রকুপিত হইয়া উঠে; প্রকোপের পর প্রসর হয় অর্থাৎ স্বস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে আরম্ভ করে, পরে একটী স্থান সংশ্রয় করিলে রোগের প্রকাশ হয়।

দোষের বৃদ্ধি-হেতু যেমন পীড়া জন্মে, সেইরূপ দোষের ক্ষয়-হেতুও পীড়া জন্মে। যেমন শ্লেষ্মার ক্ষয়বশতঃ বায়ু প্রকৃতিস্থ পিত্তকে স্থানান্তরিত করিয়া যেখানে যেখানে বিচরণ করে, গাত্রের সেই সেই স্থানে ভেদনবৎ পীড়া, দাহ শ্রম ও দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয়, সেইরূপ পিত্তের ক্ষয় উপস্থিত হইলে বায়ু শ্লেষ্মাকে স্থানান্তরিত করিয়া শরীরের বেদনা, শৈত্য, স্তম্ভ ও গুরুতা উৎপাদন করে। এইরূপে দেহের ক্ষয়-হেতু নানা প্রকার রোগ উপস্থিত হইতে পারে। রোগ সকলের মধ্যে কতকগুলি রোগ সামান্যজ অর্থাৎ সর্ব্বদোষপ্রকোপজন্য উৎপন্ন হইতে পারে। যেমন জ্বর একটি সামান্যজ রোগ; ইহা বায়ু, পিত্ত কিংবা কফ যে কোন দোষের প্রকোপহইতে উৎপন্ন হয়। সেইরূপ রক্তপিত্ত, অতীসার, গ্রহণী প্রভৃতি রোগও সামান্যজ। আর কতকগুলি রোগ আছে, তাহারা নিয়ত একদোষের প্রকোপজন্য উৎপন্ন হয়। যথা গৃধ্রসী, খঞ্জত্ব, কুব্জত্ব প্রভৃতি অশীতি প্রকার বাতবিকার। দাহ, দবথু, ধূমক, অম্লক প্রভৃতি চত্বারিংশৎ পিত্তবিকার। তৃপ্তি, স্তৈমিত্য, আলস্যপ্রভৃতি বিংশতি প্রকার শ্লেষ্মবিকার। গৃধ্রসী প্রভৃতি বাতবিকার নিয়ত বায়ুপ্রকোপ ভিন্ন উৎপন্ন হইতে পারে না, পৈত্তিক কিংবা শ্লৈষ্মিক গৃধ্রসী রোগ কখনই উৎপন্ন হয় না। সেই প্রকার দাহপ্রভৃতি পৈত্তিক রোগ কখন পিত্তভিন্ন বায়ু কিংবা শ্লেষ্মজন্য উৎপন্ন হয় না, এবং তৃপ্তিপ্রভৃতি শ্লৈষ্মিক রোগ, বায়ু বা পিত্তজন্য কখনও উৎপন্ন হয় না। এই সকল রোগকে নানাত্মজ ব্যাধি বলা হয়।

রোগসকল কোথাও একদোষপ্রকোপজন্য, কোথাও বা যুগপৎ দ্বিদোষ প্রকোপজন্য এবং কোথাও বা যুগপৎ ত্রিদোষ প্রকোপজন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। দ্বিদোষ বা ত্রিদোষ প্রকোপজন্য যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহা দুই প্রকারের দেখা যায়। এক প্রকারের নাম প্রকৃতি সম সমবায় এবং অপর প্রকারের নাম বিকৃতিবিষম সমবায়। বাতিক পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক রোগে যে যে লক্ষণ প্রকাশ পায়, যদি বাতপৈত্তিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক, বাতশ্লৈষ্মিক কিংবা সান্নিপাতিক রোগে সেই সেই লক্ষণেরই প্রকাশ থাকে, তবে তাহা প্রকৃতিসম-সমবায়, আর যদি সেই সেই লক্ষণভিন্ন অন্য লক্ষণও প্রকাশ পায়, যেমন—ঘর্ম্মাগম বায়ুর ধর্ম্ম নহে, শ্লেষ্মার ধর্ম্মও নহে, অথচ বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরে ঘর্ম্মাগম একটী লক্ষণ, ইহা বিকৃতিবিষম-সমবায়। সাধারণতঃ দোষ ও দূষ্যের সংযোগে রোগ উৎপন্ন হয়। যেখানে সংযোগে উভয়ের বিক্রিয়া উৎপন্ন না হয়, সেই খানে প্রকৃতিসম-সমবায় দেখায়। কিন্তু যেখানে সংযোগে উভয়ের বিক্রিয়া উৎপন্ন হয়, সেই খানে বিকৃতিবিষম-সমবায়। দ্বন্দ্বজ এবং সান্নিপাতিক রোগস্থলে সর্ব্বত্র যে এক প্রকার লক্ষণ দেখা যাইবে, এমন হইতে পারে না। কারণ তারতম্যভেদে দোষের ৬৩ প্রকার ভেদ আছে। সেই ভেদজন্য রোগলক্ষণেরও ভেদ হয়। বাতশ্লৈষ্মিক রোগে যদি বায়ু ও শ্লেষ্মা তুল্যবলশালী হয়, তবে যে প্রকার লক্ষণ দেখা যাইবে, যেখানে বায়ু বা শ্লেষ্মা অধিক বলশালী কিংবা শ্লেষ্মা হীনবল হইবে, সেরূপ স্থলে আর সে প্রকার লক্ষণ দেখা যাইবে না। দোষের এই প্রকার যে ভেদ হইয়া থাকে, তাহার বিবরণ সুশ্রুতের দোষভেদীয়াধ্যায়ে বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। এখানে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

জ্বর।

আমি তখন দশমবর্ষীয় বালক, পিতা-মাতার স্নেহের উষায় আমার প্রভাত-জীবন তখন সুধাময়। পৃথিবীর সঙ্কীর্ণ উপভোগ হৃদয়ে তখনও অভাব অভিযোগ আনিতে পারে নাই। স্বনামধন্য পিতৃদেব তখন চুঁচুড়ার একজন বড় কবিরাজ। নানা দিগ্-দেশাগত রোগিগণ জীর্ণ পাণ্ডুর দেহে তাঁহার আরোগ্যাশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিত। তাঁহার পাণ্ডিত্য-খ্যাতির "মণিকর্ণিকায়", কত মণি-ময় মুকুট-মণ্ডিত মস্তক লুণ্ঠিত হইত।

মুনিসহস্রের মধ্যবর্ত্তী আত্রেয় ঋষির মত, বহু শিষ্যের প্রীতি-পরিবেষ্টনের মধ্যে বসিয়া পিতা আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র পড়াইতেছিলেন, শুব্ধ মধ্যাহ্নে তাহার কণ্ঠস্বর সজল গম্ভীর মেঘ-স্তনিতের ন্যায় শুনাইতেছিল। ডাক্তার কৈলাশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম বি, মহাশয়ের তখন খুব প্রসার প্রতিপত্তি; উভয়ের নামের সাদৃশ্য ছিল বলিয়া পিতৃদেবের সহিত কৈলাশ বাবুর বিশেষ ঘনিষ্ট আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল। সুযোগ ও সুবিধা পাইলে, কৈলাশ বাবু প্রায়ই আমাদের বাটীতে বেড়াইতে আসিতেন, সে দিনও আসিয়াছিলেন। পিতা পড়াইতেছিলেন—

"জ্বরস্ত্রিপাদস্ত্রিশিরাঃ ষড়্ভুজো নবলোচনঃ।
ভস্মপ্রহরণো রৌদ্রঃ কালান্তকযমোপমঃ॥

কিছু না বুঝিতে পারিলেও, শৈশব-চপল-কৌতূহলের বশে—আমি সেখানে বসিয়া-ছিলাম। পিতার মুখে জ্বরের এই অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শুনিয়া সহসা কৈলাশ বাবু বলিয়া উঠিলেন——

"কবিরাজ মহাশয়! আজ আপনার কাছে একটা নূতন কথা শিখিলাম। জ্বরের মাথা আছে, হাত পা আছে, চক্ষুঃ কর্ণ আছে—ইহা ত এতদিন জানিতাম না। জ্বর কি জীব জন্তুর ন্যায় ইন্দ্রিয়বান্? এই গুলাই আপ-নাদের শাস্ত্রের পাগলামী।"

বাল্যকালের স্মৃতিশক্তি যদি এই শেষ যৌবনে আমাকে প্রতারণা না করিয়া থাকে তাহা হইলে সাহস করিয়া বলিতে পারি—অস্তগমনোন্মুখ রবি-সদৃশ প্রশান্ত-মূর্ত্তি পিতা সে সময় কৈলাস বাবুর কথার কোনও উত্তর দেন নাই।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন ব্যস্ত ভাবে কৈলাস বাবু আমাদের বাটীতে আসি-লেন—পিতাকে বলিলেন "সেদিন আপনার মুখে জ্বরের হাত পা আছে শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম, উপহাসও করিয়াছিলাম; কিন্তু আজ আমার ভ্রম ঘুচিয়াছে। অনেক দুঃখেই ঋষিগণ জ্বরের মূর্ত্তি করিয়াছিলেন!" পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপার কি কৈলাস বাবু? হঠাৎ এত ঋষি ভক্তি জন্মিল কিসে?" কৈলাস বাবু বলিতে লাগিলেন—

" * * * পুত্রের আজ ২৬।২৭ দিন জ্বর; কিছুতেই জ্বর বন্ধ হইতেছে না। অনেক চেষ্টার পর আজ ৩ দিন জ্বরের বিরাম হইয়াছে বটে, কিন্তু বিরাম-কাল অল্পক্ষণস্থায়ী। গৃহস্থের ব্যগ্রতাতিশয়-অনুরোধে, গত কল্য ডাক্তার সাহেবকে * আহ্বান করিয়া ছিলাম, প্রত্যহ বেলা ১১ টার সময় জ্বর আসিতেছিল, সে জ্বর সমস্ত দিন ভোগ হইয়া পরদিন প্রাতঃকালে ৬ টার সময় ছাড়িতে-ছিল। তাই আমরা উভয়ে পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছিলাম—আজ ঐ ৬ টার সময় হইতেই রোগীকে কুইনাইন প্রয়োগ করিব। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—অন্যদিন জ্বর বেলা

১১ টার সময় আসিত, আজ একেবারে রাত্রি ৩ টার সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতেই আমার বিশ্বাস হইয়াছে—জ্বর নিশ্চয়ই জীব জন্তুর মত ইন্দ্রিয়বান্, তাহার কাণ আছে; রোগীর শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া আমরা দুইজন ডাক্তারে যে পরামর্শ করিয়াছিলাম, জ্বর সে কথা শুনিতে পাইয়াছে, এবং আজ সকাল সকাল আসিয়া, আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে!"

কৈলাস বাবুর রহস্য-চটুল ব্যঙ্গ শুনিয়া আমাদের বৈঠকখানা গৃহে, উৎস উচ্ছ্বাসের ন্যায় হাস্যকাকলি উত্থিত হইল। পিতাও হাসিলেন, কিন্তু সে হাসি নিদাঘ সন্ধ্যার চক্রবাল দীপ্তির মত চকিতে চমকাইয়া অধর প্রান্তেই মিশিয়া গেল। পিতা গম্ভীরভাবে বলিলেন "কৈলাস বাবু! আমাদের শাস্ত্র বুঝিতে হইলে মনে হিন্দুত্বের অভিমান থাকা চাই। মূলে যাহা 'অতীন্দ্রিয়'—তাহাকে নানা ইঙ্গিতে, নানা সঙ্কেতে, উপমায় রূপকে সাজাইয়া, ঋষিগণ—ইন্দ্রিয়ানুভূতির অধিকারে উপস্থিত করিয়া দিতেন আজ তুমি জ্বরের 'হাত পা'র কথা শুনিয়া উপহাস করিতেছ, কিন্তু এমন একদিন আসিবে, যে দিন উপহাস উপাসনায় পরিণত হইবে।"

কিশোর অনুভূতির মধ্য দিয়া, পিতার সেই উদার উপদেশ, ভবিষ্যৎ জীবনে পূর্ণাবয়ব ধারণ করিয়া নিত্য সহচরের মত, আমার সুখে দুঃখে, আনন্দে অবসাদে,—আজিও সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে। অতীত জীবনের কুহেলিকাচ্ছন্ন অনেক কথাই ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু এই ঘটনাটি জাতিস্মরের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যের ন্যায়এখনও আমার প্রাণে জাগিয়া রহিয়াছে। সে আজ কত দিনের কথা—সদ্যোদৃষ্ট স্বপ্নের মত এখনও তাহা আমার স্মৃতিপটে সমুজ্জ্বল!

বাস্তবিক আমাদের তন্ত্র, পুরাণ, কাব্য, সমস্তই রূপক রহস্যে পূর্ণ। আপনারা তান্ত্রিকের হরগৌরী মূর্ত্তি নিশ্চয়ই দেখিয়াছেন। শিবরূপী মহাকাল [মৃত্যু] বৃষভের উপর আরূঢ়, তাঁহার অঙ্কে বিশ্বজননী গৌরী। পুরাণে চতুষ্পাদ ধর্ম্মের নাম "বৃষ"। হরগৌরী চিত্রের উপাখ্যান ভাগ—মরণের কোলে জীবন অধিষ্ঠিত। এ তত্ত্ব বৃষরূপী, অটল বিশ্বজনীন মহা সত্যে প্রতিষ্ঠিত। মরণের রাজ্যেই জীবণের নেপথ্য-বিধান, অর্থাৎ মরণের ভিতর দিয়াই জীবনের পথ; মাতৃঅংশ যখন আংশিক মরিয়া গিয়াছে, মাতার জীবনী-শক্তিতে শক্তিতে যখন শেষ ভাঁটা পড়িতেছে,—যখন তাহা মহাকালের কোলে অধিষ্ঠিত,—তখনই গর্ভের উৎপত্তি। এই গভীর দার্শনিক তত্ত্বকে, সরল সহজ ছবির মত আঁকিয়া, তান্ত্রিক দেয়ালে দেয়ালে, হৃদয়ে হৃদয়ে, টাঙ্গাইয়া দিয়াছেন। আপনারা এই রূপক রহস্য বুঝিবার চেষ্টা করেন কি? আর্য্য ঋষির রূপক অসার গল্প নহে; তাহাতে প্রাকৃতিক সত্য, নৈতিক তত্ত্ব ও ঐতিহাসিক ঘটনার আভাষ থাকে। সূর্য্য উঠিলে কেতুরূপ অন্ধকার-সর্পের নাশ হয়, পুণ্য পাপকে বিধ্বস্ত করে, শ্রীকৃষ্ণ কোন একটী ভীষণ সর্পকে নিহত করিয়াছিলেন—এই ত্রিতত্ত্বের সংযোগে 'কালীয়দমন' রূপকের সৃষ্টি। এ চিত্র অনেক দিন হইতেই ত আমাদের কক্ষপ্রাচীরে লম্বিত রহিয়াছে, কিন্তু আমরা চিত্রকরের উদ্দেশ্য বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি কি? আমরা ল্যাম্বারাস্ মরের চসমা চখে দিয়া হিন্দুর দিব্য দৃষ্টি হারাইয়া ফেলিয়াছি, তাই

আমরা ভুলিয়া গিয়াছি—আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষের নেত্রসমক্ষে বিজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান, একদিন অভিন্ন হইয়া ধরা দিয়াছিল। *

আমাদের আয়ুর্ব্বেদেও এক সময়ে অনেক রূপক প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। সেই সকল রূপকে যে শারীর তথ্য নিহিত আছে—আমরা পাঠকগণকে একে একে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। জ্বর সমস্ত রোগের রাজা, এইজন্য সর্ব্বপ্রথমে জ্বরের কথাই আলোচনা করিতেছি। তবে গোড়াতেই বলিয়া রাখিতেছি—বেদরহস্য প্রচার করিতে যেটুকু সাহিত্যশক্তির প্রয়োজন, আমি তাহাতে একেবারেই নিঃসম্বল।

জ্বর—এখন সর্ব্বজনবিদিত মহারোগ। বৈয়াকরণিক জ্বরের সংক্ষিপ্ত ধাতু নিরূপণ করিতে পারেন নাই। জ্বর সকল রোগের প্রধান, তান্ত্রিক পূজার সম্ভার সাজাইয়া পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া জ্বরের পূজা করিয়াছেন। পুরাণকার জ্বরচরিত-অবলম্বনে লাবণ্যভূষণা দিব্য-ভাষায় জ্বরের উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন। বাঙ্গালী কবির রসময়ী লেখনী-মুখে জ্বরের যে বন্দনা-গুঞ্জন বাহির হইয়াছে—তাহা আরও অপূর্ব্ব! ঋষিগণ যে জ্বরকে রুদ্ররসের অবতার' বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, সেই জ্বর বাঙ্গালী কবির হাতে পড়িয়া মধুযৌবনা প্রেমিকা সাজিয়াছে! কবি জ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

'নিত্য নিয়মিত ভাবে তুমি তো আসিবে যাবে
আফিসের যেমন কেরাণী।
কি করিবে কুইনাইন্, আর্শেনিক,পল্‌তা,নিম,
'ডিঃগুপ্ত' 'ভাইব্রোণা' ব্রাণ্ডী পাণি ?
ইংরাজের মত তুমি, পাংচুয়েল, প্রেমময়ি!
ফরাসীর মত Positive.
ক্ষুধা ও তৃষ্ণার মত তুমি যে লো! স্বাভাবিক,
সময়ের মত সাময়িক!
তুমি যবে দাও দরশন—
পিরীতি-পরশরসে— ধৈরয বন্ধন খসে—
হাড়ে হাড়ে পেয়ে আলিঙ্গন'
কি কম্পন রন্ধ্রে রন্ধ্রে, দেখা দেয় প্রেমানন্দে
আপাদ মস্তক লোমে লোমে!
অস্থিচর্ম্ম সার দেহ রসের আবেশে গো!
বিছানায় টলে পড়ে ক্রমে!
কটি কটু কটায়িত, তনুরুচি সিহরিত,
ঠিক্ যেন, কুসুম কদম্ব!
ঘন ঘন শীৎকার— সুমধুর চীৎকার,
ক্ষণে দাহ, ক্ষণে গাত্র স্তম্ভ!'

জ্বরের মূক বিগ্রহকে নিশ্বাস ও ভাষা দিয়া, কবি যেন জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন!

জ্বরের কথা বলিবার পূর্ব্বে—আমি সংক্ষেপে—এই মহারোগের ইতিকাহিনীর আলোচনা করিব।

পৃথিবীর প্রথম গ্রন্থ 'ঋগ্বেদ'। ঋগ্বেদে 'হৃদ্রোগ' 'হরিমাণ রোগ' 'শ্বেতি রোগ' 'রাজ যক্ষ্মা' প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু 'জ্বরের' নাম ঋগ্বেদে লিপিবদ্ধ হয় নাই। এইজন্য দু'এক জন ঐতিহাসিক বলেন—বৈদিক যুগে এদেশে জ্বর রোগ দেখা দেয় নাই, বৈদিক যুগের পর ব্রাহ্মণ যুগ। তখন "আর্য্য-দস্যুর" বিরোধ বিগ্রহ শান্তভাব ধারণ করিয়াছে, ঐশ্বর্য্যের কোলে বসিয়া আর্য্যগণ

---

* রস্কিন তাঁহার 'কুইন অফ্ দি এয়ার' নামক গ্রন্থে রূপক সম্বন্ধে সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন।

বিলাসী হইয়াছেন। দেশে অজীর্ণ প্রভৃতি ব্যসন-জাত ব্যাধি জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। "শল্য বৈদ্যের" চেয়ে 'ভিষগ্ অথর্ব্বণের' আদর বাড়িয়াছে। এ হেন আলস্য-মধুর ব্রাহ্মণ যুগে আমরা জ্বরের নাম খুঁজিয়া পাই না।

ব্রাহ্মণ যুগের শেষ ভাগ অথর্ব্ববেদের যুগ: তৈত্তিরীয় ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণের পরে যে অথর্ব্ব বেদ রচিত হইয়াছিল, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ ইহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। সুতরাং 'অথর্ব্ব বেদকেও আমরা ব্রাহ্মণ যুগের ভিতরে ধরিব। ব্রাহ্মণ যুগে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ, এবং তৈত্তিরীয় সংহিতায় —'দকোদর' 'প্লীহোদর' 'পাণ্ডু' 'মেহ' 'যক্ষ্মা, 'অকাল বার্দ্ধক্য' প্রভৃতি রোগের কথা আমরা প্রথম জানিতে পারি। এ সকল রোগ বিলাসিতার সহচর। কিন্তু যে জ্বর রোগের রাজা বলিয়া চিকিৎসকগণ অভিনন্দন করিয়াছেন— ব্রাহ্মণ যুগে সে জ্বরের নামও পাওয়া যায় না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি অথর্ব্ববেদ অনেকগুলি 'ব্রাহ্মণের' পরে রচিত হইয়াছিল, ইহার সকল অংশও আবার এক সময়ে রচিত নহে। এই অথর্ব্ববেদে একটী নূতন রোগের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নাম"তক্ষ্মণ"। এ রোগের লক্ষণ ঠিক জ্বররোগের মত.—তক্ষ্মণ যে কতকটা ম্যালেরিয়ার লক্ষণাক্রান্ত ব্যাধি, পরে তাহা দেখাইব।

ব্রাহ্মণ যুগের পর 'আচার্য্য যুগ'—আর্য্য ভূমি তখন আর্য্য সভ্যতায় গৌরবান্বিত। ক্ষত্রিয় রাজা হইয়াছেন, দেশের শান্তি রক্ষা করিতেছেন, বৈশ্যগণ কৃষি বাণিজ্যে দেশের ধন ধান্য বৃদ্ধি করিতেছেন, কল্লোল-মুখরা দৃষদ্বতী ও সরস্বতীর পূর্ব্বতীরে পর্ণকুটির রচিত হইয়াছে। স্থালী চুল্লী লইয়া ঋষিগণ সংসারী সাজিয়াছেন, মুনি-পত্নীগণ স্বামী-সেবায় ও সন্তান পালনে নারী জীবনের আদর্শ গঠন করিতেছেন। ঋষিবালকের মুক্তকণ্ঠের বেদ গাথায়, ঋষি কুমারীর হোমধেনু-দোহনকালীন কলহাস্যে কুশক্ষেত্র তখন মুখর হইয়া উঠিয়াছে ভারতে তখন ঋষিযুগ, ধর্ম্মের তখন উপনিষদ্ যুগ, আয়ুর্ব্বেদের আচার্য্য-যুগ।

আয়ুর্ব্বেদের তখন উদ্যমময় যৌবনকাল। আশ্রমে আশ্রমে আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়,—মৌলিক অনুসন্ধান ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আয়ুর্ব্বেদের তখন সকল বিভাগ সম্পূর্ণ। এই আচার্য্য যুগের প্রধান প্রতিনিধি এখন 'চরক' ও 'সুশ্রুত" সংহিতা। চরকের চেয়ে সুশ্রুত আরও প্রাচীন গ্রন্থ। কেননা চরক সংহিতায় ইঙ্গিতে সুশ্রুতের উল্লেখ আছে—'ধান্বন্তর সম্প্রদায়ের' উপর কটাক্ষপাত আছে, কিন্তু সুশ্রুত সংহিতায় চরকের নাম গন্ধও নাই।

এমন যে প্রাচীনতম গ্রন্থ সুশ্রুত-সংহিতা' —তাহার নিদান স্থানে ও চিকিৎসা স্থানে জ্বরের কোন উল্লেখ নাই। জ্বরের নিদান, লক্ষণ, চিকিৎসা প্রভৃতি যাহা কিছু সমস্তই, সুশ্রুতের উত্তর তন্ত্রে সন্নিবিষ্ট। টীকাকার ডল্লন মিশ্রেরমতে—উত্তর তন্ত্র বৌদ্ধ নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক বিরচিত। জ্বর ও জ্বর চিকিৎসা উত্তর তন্ত্রের প্রসঙ্গীভূত বলিয়া অনেকের বিশ্বাস—সুশ্রুতের আমলে এদেশে জ্বর ছিল না। আমরা কিন্তু এ মতের পোষকতা করি না। আমাদের ধারণা—সুশ্রুত"শল্য বৈদ্যের সংহিতা" তাই সুশ্রুতের প্রথমাংশে কেবল শল্য শালাক্যের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর তন্ত্রে সুশ্রুত কায় চিকিৎসার একটী স্বতন্ত্র বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন, হয়ত সেই জন্যই 'জ্বরতত্ত্ব' উত্তর তন্ত্রে স্থান পাইয়াছে।

শল্য বৈদ্য ছিলেন বলিয়া, মহর্ষি যে কায় চিকিৎসা সম্বন্ধে কোনও কথা বলেন নাই, আমাদের ইহা বিশ্বাস হয় না। অমন পারগ সার্জ্জন যে নিজের গ্রন্থ অসম্পূর্ণ রাখিবেন, এ কথা কি সাহস করিয়া বলা যায়? আমাদের অনুমান—সংহিতার অন্যান্য অংশের ন্যায় নাগার্জ্জুন এ অংশেরও প্রতি সংস্কার করিয়াছিলেন। অতএব জ্বর ও জ্বর চিকিৎসা উত্তর তন্ত্রের প্রসঙ্গীভূত বলিয়া, সুশ্রুতের সময়ে এ দেশে জ্বর ছিল না এ কথা বলা চলে না।

চরক সংহিতার নিদান স্থানের প্রথমেই কিন্তু জ্বর নিদান অধ্যায় এবং চিকিৎসা স্থানের 'রসায়ন" ও 'বাজীকরণ' শীর্ষক অধ্যায় দুইটির পরই জ্বরের চিকিৎসা লিখিত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস বৈদিক যুগে যে রোগ "রাজ যক্ষ্মা" নামে পরিচিত ছিল, ব্রাহ্মণ যুগে তাহাই "তক্ম্নণ" নামে পরিচিত হয়। আচার্য্য যুগে সেই "তক্ম্নণ" রোগেরই "জ্বর" নামে নামকরণ হইয়াছিল, এ সকল কথা আমরা জ্বরেরনিদান তত্ত্বে বিস্তারিত ভাবে বলিব। "তক্ম্নণ" যে কিরূপে জ্বর আখ্যায় পরিবর্ত্তিত হইল, তাহার ও একটু আভাষ দিব।

জ্বরের পৌরাণিক ইতিহাস।

এক সময়ে প্রজাপতি দক্ষ রুদ্রকে অপমানিত করিয়াছিলেন। সেই অপমানে রুদ্রের ললাটস্থিত শশিনেত্র হইতে রক্তনাগিনীর ন্যায় বহ্নি জ্বালা বিকীর্ণ হইয়াছিল। রুদ্র রোষাগ্নি জাত বাণ প্রলয়-সহচর মহাকালের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অসুর গণকে সংহার এবং দেবগণকে সন্তপ্ত করিতে লাগিল ধ্বংসলীলার এই উন্মাদানুষ্ঠানে — সপ্তভুবন কাঁপিয়া উঠিল। দেবগণ প্রমাদ গণিয়া প্রমথ নাথকে স্তবে তুষ্ট করিলেন। শিব শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিলে—নেত্রসম্ভূত ক্রোধাগ্নি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—

"অহং কিং করবাণি তে"

"হে দেব! আমি এখন কি করিব?"

শিব উত্তর দিলেন —

"* * * * জ্বরো লোকে ভবিষ্যসি!
জন্মাদৌ নিধনে চ ত্বমপি চাবান্তরেষু চ।"

"তুমি জীবগণের জন্মকালে, মৃত্যুকালে, এবং জন্ম মৃত্যুর মধ্যকালে, "জ্বর"রূপে অবস্থান কর।" [ক্রমশঃ]

শ্রীব্রজবল্লভ রায়।

আয়ুর্ব্বেদ কি Empirical?

(মাঘসংখ্যার ২২০ পৃষ্ঠার পর)

—:*:—

সংহনন—সংহনন শব্দের অর্থ শরীরের বাঁধুনী, শরীরের বাঁধুনী দেখিয়াও চিকিৎসক অনেক বিষয় অনুমান করিতে পারেন। যাহার শরীরের অস্থিগুলি সম, সুবিভক্ত, সন্ধিসকল সুবদ্ধ এবং শরীরের পেশীগুলি সুসন্নিবিষ্ট, তাহার শরীরের বেশ বাঁধুনি আছে বুঝিতে পারা যায়। যাহাদের শরীরের সংহনন আছে তাহারা প্রায়শঃ দীর্ঘায়ু হইয়া থাকে।

সত্ত্ব—মনের বলকে সত্ত্ব বলা হয়। শরীর

বৃহৎ ও স্থূল হইলেই মনের বল অধিক হয় না। মানুষটী দেখিতে হয়ত খর্ব্বাকৃতি শরীরও কোনমতেই স্থূল বলা যায় না অথচ মনের বল যথেষ্ট আছে, ঘোরতর মানসিক কি শারীরিক ক্লেশ অক্লেশে সহ্য করিতে পারি। কোন কোন কঠিন পীড়ায় বা কোন অঙ্গচ্ছেদ হইলেও এইসকল লোক কিছু মাত্র কাতর হয়েন না যে বৃহৎ ব্রণে শাস্ত্রোপচার কালে রোগীকে অজ্ঞান করা চিকিৎসকেরা আবশ্যক মনে করেন এই সকল লোক কিঞ্চিৎ মাত্র বিচলিত না হইয়া সেই শাস্ত্রোপচার ক্লেশ সহ্য করিতে পারেন—"ক্লোরোফরম" করার কোনই প্রয়োজন হয় না। এই শ্রেণীর লোককে "প্রবর সত্ব" বলিয়া জানিবে। যাহারা অন্যের দেখা দেখি অমুক অনেক করিতেছে আমি পারিব না কেন এইরূপ সাহসে কি অন্যের সাহায্যে উপরি লিখিত "প্রবরসত্ব" লোকের অনুরূপ মনের বল দেখাইতে পারে তাহারা মধ্যম সত্বের লোক। আর যাহারা নিজে ত পারেই না অন্যের দেখাদেখি কিম্বা অন্যের সাহায্যেও মনের বল প্রদর্শন করিতে পারেনা, শরীর বৃহৎ ও স্থূল কিন্তু কিছুমাত্র বেদনা সহ্য করিবার শক্তি নাই, অল্পেই ভীত, অল্পেই শোকে ম্রিয়মান, সামান্য বিষয়েই অভিমানে কাতর, এমন কি উৎকট শব্দে, অপ্রিয় বাক্য শ্রবণে কিম্বা ভয়াবহ দৃশ্য ও শোণিত স্রাব দর্শনে অতিমাত্র ত্রস্ত, বিষণ্ণ ও বিকল চিত্ত হইয়া পড়ে তাহাদিগকে "হীন সত্ব" বলিয়া জানিবে। "হীনসত্ব" লোকের সামান্য শারীর কিম্বা মানস পীড়া হইলে সেই পীড়া সত্বর আরাম হয় না—আর প্রবরসত্ব লোকে কঠিন-পীড়াতে ও কাতর হয় না। সত্বগুণে প্রবল যন্ত্রণাকেও সামান্য বোধে অবিচলিত থাকে—সুতরাং পীড়া সত্বর প্রশমিত হইয়া থাকে। শরীরের উপরি মনের এতই প্রভাব।

সাত্ম্য—যে আহার বিহার সতত সেবা করিলেও স্বাস্থ্যের পক্ষে অহিতকর হয় না তাহার নাম সাত্ম্য। সাত্ম্য বস্তু শীঘ্র বলদান করে এবং বহুমাত্রায় সেবন করিলেও বিশেষ অহিত কর হয় না। এই সাত্ম্য প্রধানতঃ চারিপ্রকার জাতি-সাত্ম্য, দেশ-সাত্ম্য, ঋতু-সাত্ম্য ও ওকসাত্ম্য। যে জাতির যে বস্তু সতত ও প্রচুর ভোজনেও বিশেষ কোনও অহিত হয় না সেই বস্তু সেই জাতির জাতি-সাত্ম্য যেমন ইংরাজের পক্ষে মাংস এদেশবাসীর পক্ষে দুগ্ধ, ঘৃত, বাঙ্গালীর পক্ষে মৎস্য। চরকের চিকিৎসা স্থানের ৩০ অধ্যায়ের শেষে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ও দেশবাসীর সাত্ম্য লিখিত হইয়াছে। বিভিন্ন দেশের জলবায়ুর প্রভাবে যে বিশেষ দ্রব্য হিতকর হইয়া থাকে তাহার নাম দেশসাত্ম্য। হিমালয়ের উপত্যকা প্রদেশে মধু ও মাংস হিতকর কিন্তু রাজপুতনার তুল্য মরু-প্রধান দেশে মধু ও মাংস হিতকর নহে। মান্দ্রাজ ও সিংহল বাসীর পক্ষে অতিরিক্ত লঙ্কা সেবন প্রয়োজন বটে কিন্তু উড়িষার পক্ষে অহিত কর। ঋতু বিশেষের হিতকর বস্তুকে ঋতুসাত্ম্য বলে। শীতল পানীয় বরফ প্রভৃতি নিদাঘে হিতকর হইলেও হেমন্তের পথ্য নহে। যাহা অপথ্য হইলেও কেবল অভ্যাসের গুণে পীড়াজনক হয় না তাহাকে ওকসাত্ম্য বলে। যেমন দিবানিদ্রা অহিত কর বলিয়াই উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু যে ব্যক্তির দীর্ঘকাল হইতে দিবায় নিদ্রা যাওয়া অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে তাহার পক্ষে দিবানিদ্রা রোগকারী হইতে দেখা যায় না এস্থলে। দিবা-নিদ্রা ওকসাত্ম্য বলিতে হইবে। ইহা ওক-

সাত্ম্য বিহার। ওকসাত্ম্য আহারের কথা বলিতেছি। মনে করুন দীর্ঘকাল হইতে অভ্যাস করিয়া একজন মনুষ্য প্রতিদিন সিকিভরি অহিফেন সেবন করিয়া বেশ সুস্থ আছেন। অন্যের পক্ষে এতাদৃশ অহিফেন সেবন প্রাণ হানির অথবা সংজ্ঞাহীনতা মলরোধ, উদরাধ্মান প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার কারণ হইয়া থাকে। বাস্তবিক অভ্যাসের শক্তি অতি আশ্চর্য্য। অভ্যাসের প্রভাব এতই বিস্ময়কর যে ইহার বিষয় চিন্তা করিলে নিয়ম, অনিয়ম, হিতকর, অহিতকর প্রভৃতির পার্থক্যে সন্দেহ উপস্থিত হয়। ২ ঘণ্টা কোন পূতিগন্ধি স্থানে থাকিলে কি কিয়ৎ কালের জন্যও মলমূত্র স্পর্শ করিলে তোমার আমার শিরঃপীড়া, বিবমিষা ও অরুচি জন্মিয়া যায়। আবার ইহাও দেখিতেছি যে মেথরেরা সতত পূতি বস্তু ও মল মূত্রের সম্পর্কে থাকিয়াও কিঞ্চিৎ মাত্র ও অসুস্থতা অনুভব করে না। যে আর্দ্র, রুদ্ধ, অন্ধকার গৃহে একরাত্রি বাস করিলে তুমি আমি পীড়িত হইয়া পড়ি, কতলোক সেইরূপ গৃহে সুখে সুস্থ ভাবে বাস করিতেছে। অভ্যাসের এই বিস্ময়কর প্রভাব দর্শন করিয়া আয়ুর্ব্বেদকার ওকসাত্ম্যকে সাত্ম্য মধ্যে গণনা করিয়াছেন। চিকিৎসক রোগীর সাত্ম্য বিবেচনা না করিয়া যদি কেবল যথাশ্রুত ভাবে চিকিৎসা করেন তাহা হইলে তিনি অপরাধী হইয়া থাকেন। চিকিৎসক রোগীর আহার-শক্তি দ্বারা পরিপাকের বল এবং ব্যায়াম-শক্তি দ্বারা কর্ম্মবল পরীক্ষা করিবেন।

বয়স—অতঃপর আমরা বয়সের কথা বলিব। বয়স প্রধানতঃ তিন প্রকার—বাল্য, মধ্য ও বৃদ্ধ। ১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বালক। বালক তিন প্রকার ক্ষীরপ, ক্ষীরান্নাদ ও অন্নাদ। একবৎসর বয়স পর্য্যন্ত কেবল দুগ্ধ পান করিয়া থাকে বলিয়া একবৎসর বয়স পর্য্যন্ত বালককে "ক্ষীরপ" বলে। তার পর একবৎসর অর্থাৎ ২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বালকে দুগ্ধ ও কিছু কিছু অন্ন ভোজন করে বলিয়া "অন্নাদ" বলে। ষোলবৎসর হইতে ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত মধ্যবয়স। এই মধ্যবয়সকাল চারি ভাগে বিভক্ত—বৃদ্ধি, যৌবন, সম্পূর্ণতা ও হানি। ২০ বৎসর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি, ২০ হইতে ৩০ পর্য্যন্ত যৌবন, ৩০ হইতে ৪০ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণতা অর্থাৎ এই সময় পর্য্যন্ত ধাতু, ইন্দ্রিয় শক্তি, বল ও বীর্য্য পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৪০ হইতে ৭০ পর্য্যন্ত হানি—অর্থাৎ এই সময় বলবীর্য্য ঈষৎ হ্রাস পাইতে আরম্ভ হয়। ৭০ বৎসরের পর ইন্দ্রিয় শক্তি, বল, বীর্য্য উৎসাহ দিন দিন হ্রাস পাইতে থাকে। গাত্রের চর্ম্ম লোল হয় চুল পাকে, শ্বাস কাসাদি ব্যাধি কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া উৎসাহযোগ্য কর্ম্মে অসমর্থ হইয়া থাকে। এই অবস্থায় উপনীত হইলে বৃদ্ধ বলে। আজ কালকার লোকের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বয়োবিভাগ করিতে গেলে বলিতে, হয় সুশ্রুত ৭০ বৎসরের পরে যে অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন অধুনা তাহা ৫০ বৎসর ঋ স্থলবিশেষে বলিতে গেলে বলিতে হয় তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ও দেখা গিয়া থাকে। রোগীর বয়স চিকিৎসকের একটী অবশ্য চিন্তনীয় বিষয়। রোগীর বয়সের উপরি ঔষধ নির্ব্বাচন, মাত্রা, পথ্য প্রভৃতি অনেক চিকিৎসোপযোগী তত্ত্ব নির্ভর করে। রোগীর শরীরের প্রমাণ ও চিকিৎসকের অবশ্য লক্ষ্যীতব্য বিষয়। যাহাদের দীর্ঘ আয়ু লাভের সম্ভাবনা আছে, তাহাদের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিমাণ চরকের বিমান স্থানের ৮ম অধ্যায়ে এবং

সুশ্রুতের সূত্র স্থানের ৩৫ অধ্যায়ে উপদিষ্ট হইয়াছে। আজকাল যুদ্ধ ও পুলিশ বিভাগে লোক নির্ব্বাচন কালে দেহের উচ্চতা, ছাতির মাপ লওয়া হইয়া থাকে। কুতূহলী পাঠক চরক সুশ্রুতোক্ত প্রত্যঙ্গাদির পরিমাণের সহিত আধুনিক চিকিৎসকগণের সম্মত পরিমাণ মিলাইয়া দেখিতে পারেন। চরকের মতে মানুষের দেহের উচ্চতা নিজের আঙ্গুলের ৮৪ আঙ্গুল, সুশ্রুতের মতে ১২০ আঙ্গুল। এই ১২০ আঙ্গুল নিজের কি অন্যের তাহার উল্লেখ নাই।

রোগীর পরীক্ষা সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ যাহা বলিয়াছেন আমরা স্থূলতঃ তাহা ব্যাখ্যা করিলাম। অতঃপর রোগ পরীক্ষার কথা লিখিত হইতেছে। সুশ্রুত বলিয়াছেন রোগ বিজ্ঞানের উপায় ছয়টী—দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, স্বাদগ্রহণ, ঘ্রাণগ্রহণ ও প্রশ্ন। চিকিৎসক দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা যে পরীক্ষা করেন তাহাই দর্শনগত-পরীক্ষা। চিকিৎসক রোগীর মল, মূত্র, জিহ্বা, চক্ষু ও গাত্রের বর্ণ, রোগীর প্রত্যঙ্গগত অন্যান্য দর্শনযোগ্য বিকৃতি-দর্শন দ্বারা পরীক্ষা করিবেন। চিকিৎসক হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া যে পরীক্ষা করেন তাহাই স্পর্শনগত-পরীক্ষা। চিকিৎসক রোগীর ব্রণাদির পক্ক বা অপক্ক অবস্থা, প্লীহা, যকৃৎ, অগ্রমাংস প্রভৃতির বিবৃদ্ধি বা হ্রাস, শরীরের উত্তাপ বা শীতলতা ও বেদনা, শোথাদি স্পর্শদ্বারা পরীক্ষা করিবেন। শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা যে পরীক্ষা করা হয় তাহা শ্রবণ-গত পরীক্ষা। চিকিৎসক কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করিয়া উরঃক্ষতে উরোবিচারী বায়ুর গতি-শব্দ, কাস ও স্বরভেদ রোগের কণ্ঠস্বর, অন্ত্র ও কণ্ঠের কূজন, প্রভৃতি পরীক্ষা করিবেন। রসনেন্দ্রিয় দ্বারা চিকিৎসক যে পরীক্ষা করেন তাহাই রাসন-পরীক্ষা। চিকিৎসক যে কেবল নিজের জিহ্বা দ্বারাই এই পরীক্ষা নির্ব্বাহ করিবেন আচার্য্যগণের এরূপ অভিপ্রায় ছিলনা, এতদর্থে প্রাণি বিশেষের জিহ্বা দ্বারাও যে পরীক্ষা সিদ্ধ হইতে পারে তাহার উদাহরণ আমরা শাস্ত্রের বিভিন্ন স্থানে বিবৃত আছে দেখিতে পাই। রক্তপিত্ত রোগে স্রুত রক্ত কেবল জীবরক্ত কি পিত্তমিশ্রিত জীবরক্ত, কি কেবল অসৃক্‌-রঞ্জিত পিত্তমাত্র ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য আচার্য্যগণ উপরি লিখিত স্রুতবস্তু অন্নের সহিত মিশ্রিত করিয়া কুক্কুরকে ভক্ষণার্থ প্রদান করিবার উপদেশ দিয়াছেন। উহা যদি কেবল জীবরক্ত হয়, তাহা হইলে কুক্কুর সাদরে তাবৎ অন্ন ভোজন করিবে। যদি পিত্ত মিশ্রিত জীবরক্ত হয় তাহা হইলে কিঞ্চিৎ ভোজন করিয়াই পিত্তের তিক্ততা হেতু নিবৃত্ত হইবে এবং যদি নিরবচ্ছিন্ন পিত্ত হয় তাহা হইলে পিত্তের তিক্ততার ঘ্রাণ মাত্রেই নিবৃত্ত হইবে। এইরূপ প্রমেহ রোগীর মূত্র যদি পিপীলিকায় পান করে তাহা হইলে উহাতে শর্করা আছে বুঝিতে হইবে। এস্থলে কুক্কুর ও পিপীলিকার জিহ্বাই পরীক্ষার সাধন হইল। কেবল রাসন পরীক্ষার কথা কেন চক্ষু-কর্ণ-গত পরীক্ষা স্থলেও চিকিৎসক স্বীয় চক্ষু কর্ণের সাহায্য বা শক্তি বর্দ্ধনার্থ অন্য কোন যন্ত্রাদিও ব্যবহার করিতে পারেন। ইহা আচার্য্যগণের অনভিপ্রেত নহে। চিকিৎসক গন্ধগ্রহণ পূর্ব্বক যে পরীক্ষা করেন তাহাকে ঘ্রাণগত পরীক্ষা বলে। চিকিৎসক রোগীর গাত্র, মল, মূত্র, পূয, স্বেদ, নিঃশ্বাস, ব্রণ প্রভৃতির গন্ধ ঘ্রাণগত পরীক্ষা দ্বারা অবগত হইয়া থাকেন। প্রশ্ন করিয়া চিকিৎসক

রোগীর বসতি স্থান, জাতি, রোগোৎপত্তি স্থান, সাত্ম্য, দেশ, বল, ক্ষুধা; বায়ু, মূত্র, মলের বিসর্গ নিরোধ স্ত্রীলোকের রজঃ প্রবৃত্তি বা রোধ অবগত হইবেন।

রোগের পরীক্ষার কথা বলাহইল এক্ষণে আমরা রোগের উপদ্রব ও অসাধ্য লক্ষণের বিষয় কিঞ্চিৎ বলিতেছি। রোগারম্ভক দোষের প্রকোপ জন্য যে রোগ জন্মে তাহার নাম উপদ্রব—যেমন হিক্কা, তৃষ্ণা, অরুচি, শোথ প্রভৃতি জ্বরের উপদ্রব। চিকিৎসকগণ সতত রোগিশরীরে এইগুলি প্রত্যক্ষ করিতেছেন। উপদ্রবের পর এক্ষণে আমরা রোগের অসাধ্য লক্ষণের বিষয় সংক্ষেপে বলিব। যে রোগে যে লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগ আরামের আর কোন সম্ভাবনাই থাকে না সেই লক্ষণকে সেই রোগের অসাধ্য লক্ষণ বলে। ইহার অন্য নাম অরিষ্ট। আয়ুর্ব্বেদে প্রতিরোগের অসাধ্য লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই সকল অসাধ্য লক্ষণের অব্যভিচারিত্ব দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইতে হয় এবং দৃঢ় প্রতীতি জন্মে যে ইহা সুদীর্ঘকালের সুপরিপক্ক অভিজ্ঞতার ফল। যাঁহারা রোগের বিচিত্র গতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান ও বিচার করিয়াছেন তাঁহারাই এসকল কথা বলিতে পারেন, অন্যের বলা কোন ক্রমেই সম্ভব নহে।

আমরা আয়ুর্ব্বেদের রোগতত্ত্ব অতি স্থূল ভাবে ব্যাখ্যা করিলাম। যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদকে Empirical বলেন তাঁহারা যদি শ্রমস্বীকার পূর্ব্বক এই কথাগুলি নিরপেক্ষভাবে পাঠ করেন তাহা হইলে আশাকরি তাঁহাদের মত পরিবর্ত্তন হইবে। কোনও চিকিৎসা শাস্ত্রে রোগ ও রোগী সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত কিছু আছে কি? এখানে যাহা স্থূলভাবে আছে অন্যত্র হয়ত তাহাই বিশদীকৃত হইয়াছে মাত্র। পক্ষান্তরে এখানে এমন অনেক তত্ত্ব আছে যাহা পাঠ করিলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের চিকিৎসকের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হইবে। এমন অনেক বিষয় আছে যাহা বর্ত্তমান চিকিৎসক-সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ অচিন্তিত। যে বায়ু পিত্তকফ আয়ুর্ব্বেদে রূপ বিরাট মন্দিরের ভিত্তি স্বরূপ এস্থলে আমরা সেই বায়ু পিত্ত কফের বিষয় কিছুই বলিলাম না কেন? কেহ যদি আমাদিগকে এই প্রশ্ন করেন তাহা হইলে আমরা তদুত্তরে এই মাত্র বলিতে পারি যে পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাধকগণ যেরূপ অক্লান্ত শ্রম সহকারে রোগতত্ত্ব অনুসন্ধান করিতেছেন আর কিছুকাল এইরূপ গবেষণা-বৃত্তি জাগ্রত থাকিলে তাঁহারা স্বয়ংই বায়ুপিত্ত কফের তত্ত্ব জগতে প্রচার করিবেন। আমাদিগকে আর বুঝাইবার ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে না। যতদিন না সেই শুভদিন আসিতেছে ততদিন কেবল আমাদের এই সবিনয় অনুরোধ যে বায়ু পিত্তকফ-তত্ত্বকে অগ্রাহ্য করিবেন না, ধীরভাবে যথার্থ বৈজ্ঞানিকের স্বভাব-সুলভ তত্ত্বান্বেষণ-স্পৃহা হৃদয়ে লইয়া বুঝিবার চেষ্টা করুন। প্রকৃতি একদিন অবশ্যই তাঁহার রহস্য মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিবেন।

(ক্রমশঃ)

শিশু চিকিৎসা।

(বালিকা ও মহিলাগণের জন্য ছড়ায় লিখিত)

শ্লেষ্মা প্রধান বাল্যকালে,
পিত্ত বাড়ে যৌবন হ'লে;
বার্দ্ধক্যে বায়ু প্রবল হয়,
সকলশাস্ত্রে ইহা কয়।
(অতএব)—শ্লেষ্মা প্রধান রেখে মনে,
যত্নে রাখ শিশুগণে।
ঠাণ্ডা যা'তে নাহি লাগে,
দৃষ্টি রেখ তা'তে আগে।
গা' সদা তা'র ঢেকে রাখ;
প্রসূতিগণ নিয়মে থাক।
প্রসূতিগণের স্বেচ্ছাচারে,
কোমল মতির শ্লেষ্মা বাড়ে;
সেই শ্লেষ্মা হ'লে প্রবল
শিশু-শরীরে রোগ সকল।
শ্লেষ্মা কভু ভাল নয়,
হঠাৎ এতে মৃত্যু হয়।

বালক হয় তিনপ্রকার,
'দুগ্ধভোজী' যা'র দুগ্ধ আহার।
অন্ন যা'রা ভোজন করে,
'অন্নভোজী নাম তা'রা ধরে।
দুগ্ধ অন্ন ভোজী হ'লে,
'দুগ্ধান্ন ভোজী' নাম তা'রে বলে।
দুগ্ধ পায়ীর হ'লে পীড়া,
প্রসূতিকে দাও বড়ী গুঁড়া।
দুগ্ধান্ন ভোজীর পীড়া যখন,
ঔষধ দাও উভয়কে তখন।
পীড়া যদিঅন্ন ভোজীর
শিশুকে ঔষধ খাওয়াও ধীর।

দুগ্ধ পায়ীর পীড়া দেখে
উপবাসী রাখ প্রসূতিকে।
শিশুর উপবাস উচিত নয়,
স্তন্যদুগ্ধ ব্যবস্থা হয়।

বড় ঔষধ দিওনা শিশুকে কখন,
মহাজনের এটি বচন।
পাচন টোট্‌কায় রোগ সারাও,
যদি সুস্থ রাখ্‌তে চাও।

আমলকী আর হতকীর গুঁড়
ঘি মধুতে মিশাল কর।
জন্মেই যে শিশু টানে না মাই,
তার জিবে এ লাগাও সদাই।

স্তন দুগ্ধের অভাব যখন,
ছাগ দুগ্ধ কর ব্যবস্থা তখন।

গব্য দুগ্ধে শালপানি নিয়ে,
সিদ্ধ কর চিনি দিয়ে,
ছাগদুগ্ধ যদি না পাও,
এযোগ তখন খাওয়া'য়ে দাও।

ছাগ দুগ্ধের ন্যায় গুণ ইহার,
ব্যবস্থা ইহা মুনি জনার।

এক খণ্ড মাটি আগুনে পোড়াও,
দুধে ভিজিয়ে 'নাই'তে দাও,
'নাই' এর শোথের যত কষ্ট,
বালকগণের হয় নষ্ট।

হলুদ, লোধ, যষ্টিমধু,
আর প্রিয়ঙ্গু নাওগে শুধু,
তৈল দিয়ে পাক ক'রে
ঘসে দাও গে 'নাই' উপরে।
(কিম্বা)—ঐ জিনিস কটি'র গুঁড় নিয়ে,
বেশ করে দাও 'নাই'তে দিয়ে,
'নাই' পাক দেওয়া ভাল হয়,
বিজ্ঞ বৈদ্য এ যোগ কয়।

বচ, হরিদ্রা, শুঁঠ, পিপুল,
মরিচ, হত্তূকী—নাও গে তুল।
স্তন্য দুগ্ধে এদের কল্ক দিয়ে,
সেবনে শ্লেষ্মা যায় উঠিয়ে।
শিশুর শরীর হয় দৃঢ়,
জেনে রেখ এ যোগ গূঢ়।

'এঁড়ে' লেগেছে যদি যায় জানা,
ছাতিম ফুল, মরিচ, গোরোচনা
পিষে নিয়ে সেবন করাও,
যদি উপকার পেতে চাও।
সিদ্ধ অন্ন বেটে নিয়ে
কলার পাতে দাও রাখিয়ে;
কুশের দ্বারা উহা বেঁধে
আগুনে রেখে নাও দগ্ধে;
সেবন করাও এই যোগ
সেরে যা'বে এঁড়ে লাগা রোগ।

তুলসীর রস মধু দিয়ে
সর্দ্দি-কাসিতে দাও খাওয়াইয়ে,
বেশী সর্দ্দি মনে কর,
মিসিয়ে নিও কর্পূরের গুঁড়।

ময়ুরপুচ্ছ ভস্ম মধু সহ
সর্দ্দি ব'স্‌লে খেতে দেহ।

আদার রস আর পুরাণ ঘিয়ে
কিম্বা পুরাণ ঘি শুধু নিয়ে
বুকে গলায় মালিশ কর
সর্দ্দি যদি বসে বড়।
দু' আনা পিপুল আর তুলসী মঞ্জরী,
যষ্টীমধু, মিছরি, কণ্টকারি,
বড় এলাচ আর হরিতকী
ওজন কর একটি সিকি রাখি,
সিদ্ধ কর দেড় পোয়া জলে,
নামিয়ে নাও এক ঝিনুক র'লে,
খাওয়াইয়ে দাও দু'তিন বারে
সর্দ্দি কাশি শিগ্‌গির সারে।
জিনিসগুলি পূর্ব্ব রাতে
ভিজিয়ে রেখ পাথর পাতে।

মরিচ, পিপুল, শুঁঠের গুঁড়
বচ, হত্তূকী মিশাল কর;
আর হরিদ্রা সমান নাও,
দুধের সঙ্গে খেতে দাও,
শ্লেষ্মা এতে হয় সরল
শরীর এতে হয় সবল।
বয়স একমাস হ'য়েছে যা'র
মাত্র এক কুঁচ ব্যবস্থা তা'র।

বয়স বাড়ার পরিমাণে,
ব্যবস্থা ক'র মাত্রা জ্ঞানে।

সরষের তেল বুকে মালিস কর,
শ্লেষ্মা বস্‌লে ফল বড় *।

নাগর মুতা, হত্তুকী, নতি,
যষ্টিমধু, নির্ম্মছাল—সাড়ে আটত্রিশ রতি,
আধ্‌সের তুলে রেখে আধ্‌পোয়া
এক ঝিনুক খাওয়াও চুমুক দিয়া,
বাকীটুকু দাও গে' ফেলে,
শিশুর জ্বর যা'বে চ লে।
"মুস্তাদি" নাম এর হয়,
কাথ যেন একটু নরম রয়।

নতি, নিমছাল, হরীতকী,
বয়ড়া, হলুদ, আমলকী,
বত্রিশ কুঁচ এক একটি নিয়ে
আধ্‌সের জলে দাও চাপাইয়ে।
এক ঝিনুক মাত্র—আধ পোয়া র'লে
খাইয়ে দাও জ্বর যা'বে চ'লে।
"পটোলাদি" নাম হয় ইহার,
বিস্ফোট রোগেও হয় প্রতীকার।

হলুদ, দারু-হরিদ্রা, যষ্টীমধু
চাকুলে, ইন্দ্র-যব নাও সে শুধু,
আটত্রিশ কুঁচে কর ওজন
আধসের জল রাখ আধ্‌পো যখন,
সবটুকু ফেলে একটু খানি।
খাওয়ায়ে দাও জ্বর অতিসার জানি॥
অতি কচি শিশু হ'লে
শিশুর মা'কে খেতে শাস্ত্রে বলে।
"হরিদ্রাদি" ইহার নাম করণ,
ক'রে গেছেন মুনি জন।

শুঁঠ, আতইচ, কুড়চির ফল,
আটত্রিশ রতি নাও সকল।
মুতা, বালা তা'তে দিয়ে
আধ্‌সের জলে আধপোয়া নিয়ে,
শিশুর অতিসারে খেতে দাও,
দেখ্‌বে কেমন ফল পাও।
"নাগরাদি" নাম হয় এর
এর গুণ জেন ঢের।

বরাহক্রান্তা, ধাইফুল,
লোধ আল নাও অনন্তালে,
এক একটি ওজন আধ আধ ভরি,
আধ্‌সের জলে সিদ্ধ করি।
আধ্‌পোয়া থাক্‌তে নামিয়ে নাও
মধু সহ খানিক খাওয়াও,
শিশুর অতীসার যা'বে সেরে,
"সমঙ্গাদি" নাম বলে এরে।

বেলশুঁঠ, বালা, লোধ, ধাইফুল,
আর নাওগে গজপিঁপুল,
আটত্রিশ রতি কর ওজন
আধ্‌সের জল, রাখ আধপোয়া যখন।
খেতে দাও এই কাথ অতীসারে
কিম্বা—ঐ সকলে গুঁড় ক'রে

---

* কেহ কেহ সর্ষের তৈল উহার সমপরিমাণ ভূর্জ্জপত্রের তৈল ও ৫।৬ ফোঁটা তার্পিণ তৈল একত্র মিশাইয়া মালিশ করিতে বলেন। ইহাতে আরও শীঘ্র উপকার দর্শে, কারণ কয়েকটি ঔষধের মিলিত শক্তির পরস্পর সাহায্য দ্বারা রোগ প্রতীকারের পক্ষে সত্ত্বঃ সুফল প্রসব করিয়া থাকে। ভূর্জ্জপত্রের তৈল "ক্যাজু পটী অয়েল" নামে বেনের দোকানে চাহিলে পাওয়া যায়।

মধুর সহ করাও লেহন ;
"বিল্বাদি" এর নাম করণ।

আমের আঁটির মজ্জা আধ্ ভরি
আধ্ ভরি বেলশুঁঠ ওজন করি।
আধ্ সের জলের আধ্ পোয়া রাখ,
ভাল ক'রে তা'র পর ছাঁক।
'খই' আর চিনি মিশাও তা'তে,
বমন অতিসারে দাওগে খেতে।
"বিল্বত্য" নাম ইহার,
এ যোগ জেন মুনি জনার।

সরল কাষ্ঠ, দেবদারু, কণ্টকারি
বৃহতী, গজপিপুল নাও মিশাল করি।
হলুদ, শুল্‌কা নাও চাকুলে,
বেশ্ ক'রে নাও পিষে শিলে,
খেতে দাও ঘি মধু দিয়ে,
জ্বর অতীসার যায় সারিয়ে।
বাত, কামলা, পাণ্ডুরোগ,
গ্রহণী সারে—এমনি যোগ।

আতইচ এর গুঁড় মধু সহ
জ্বর কাশি বমিতে খেতে দেহ।
কিম্বা—ইহার সঙ্গে মুতার গুঁড়
আর কাঁকড়া শৃঙ্গী মিশাল কর।
"শৃঙ্গাদি" নাম ইহার হয়
বাল রোগ যায় সমুদয়।

তিল, যষ্টীমধু পিষে নিয়ে
[illegible], মধু আর চিনি দিয়ে,
রক্তামাশয় হ'লে ছেলের
লেহন করাও—ফল ঢের।

খই, যষ্টীমধু, চিনি মধু
চেলুনি জলে মিশাও শুধু,
আমাশয়ে খেতে ব্যবস্থা কর,
শিশুরোগে উপকার বড়।

কাঁকড়াশৃঙ্গী, মুতা, পিঁপুল,
আর আতইচ সমান তুল।
গুঁড় করে মধু সহ,
অতীসার বমিতে খেতে দেহ।
শ্বাস কাসের যত কষ্ট,
এ যোগেতে হয় নষ্ট।
"বালচাতুর্ভদ্রিকা" নাম ইহার
গুণ জানা আছে বিজ্ঞজনার।

বেলশুঁঠ, বালা, লোধ, ধনে
ধাইফুল, ইন্দ্রযব—সম ওজনে,
গুঁড় ক'রে মধুর সহ
জ্বরাতিসারে খেতে দেহ।
"ধাতক্যাদি" এরে কয়
বমি উপদ্রবও ভাল হয়।

মৌরি, পিঁপুল, রসাঞ্জন
কাঁকড়াশৃঙ্গী, মরিচ, খই চূরণ
সমান ভাগে মধুর সহ
জ্বর কাশি বমিতে খেতে দেহ।

কণ্টকারি ফলের রস বৃহতী নিয়ে
মধু আর মিশাও ঘিয়ে।
স্তন-দুগ্ধ পানে হয় বমন
সেবন করাও হ'বে নিবারণ।

আম আঁটির শাঁস, সৈন্ধব, খই
খাওয়া'লে বমি থাকে কই।

মধু একটু মিশিয়ে নিও
যখন তখন এর ব্যবস্থা দিও।

পিঁপুল মরিচ, চিনি, মধু
ছোলঙ্গ লেবুর রসে মাড় শুধু।
হিক্কা বমিতে দাও এ যোগ—
আর থাকবে না কোন রোগ।

ঝাপী টুপরী, আকলাদি মূল,
জাম, আমের ছাল সমতুল,
হৃদয়, নাই, তালুতে বেটে
বমি অতীসারে দাও—যা'বে কেটে।

কদবেল কাকমাচী, কুল, আমরুল,
সমান ভাগে কর তুল।
বেটে মাথায় লেপন কর,
বমি, অতীসারে—ফল বড়।

মাসকলাইয়ের যূষ, পিঁপুল চূর
মায়ে খেলে ছেলের আম দূর।

আম, আমড়া জামের ছাল
অতীসারে দেয় ফল।
মধু একটু মিশিয়ে নিও,
জিনিষ ক'টির গুঁড় দিও।

জীরে, সাদা ধুনার গুঁড়
আমাতিসারে ফল বড়।

বেল-মূলের কাথ, খই, চিনি
বমি, অতীসার যায় গো জানি।

ছাগ দুগ্ধ আর জাম ছালের রস,
শিশুর অতীসার হয় বশ।

মলদ্বার যদি পাকে ছেলের,
খাওয়াও গুঁড়া রসাঞ্জনের।

পিপুল, মরিচ, ছোট এলাচ চূরণ
চিনি, মধু আর সৈন্ধব লবণ,
ক'রে নিয়ে এই অবলেহ
শিশুর মূত্ররোগে খেতে দেহ।

শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত।

আমলকী।

আমলকী সুপরিচিত ফল। যখন আমলকী আমাদের গৃহে গৃহে খাদ্য ও ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইত, তখন আমরা আমলকী বৃক্ষকে যত্নে পালন করিতাম। প্রতিপালিত হওয়ায় আমলকী বৃক্ষ পুষ্ট বীর্য্যবান্ বৃহত্তর ফল প্রদান করিত। এখন আদর না থাকায় বনদেবী তাহাকে ক্রোড়ে লইয়াছেন। আর আমরা গ্রামোপান্তে অযত্নসম্ভূত আমলকী বৃক্ষের হীন-বীর্য্য ক্ষীণ ফল কুড়াইয়া লইয়া তাহার নিকট হইতে শাস্ত্রোক্ত গুণাবলীর দাবি করিয়া আয়ুর্ব্বেদকে উপহাস করিতেছি। বাঙ্গালা দেশের আমলকীকে ম্যালেরিয়া ধরিলেও এখনও দেশান্তরে সুপুষ্ট বীর্য্যবান্ আমলকী প্রকৃতিদেবীর কল্যাণে আমাদের পক্ষে দুষ্প্রাপ্য নহে। আমরা, দেশের চিরোপকারী আমলকী বৃক্ষের প্রতি সদয় দৃষ্টি প্রার্থনা করিয়া এবং

পাঠক পাঠিকাগণের নিকট আমলকীর উপকারিতা প্রচার কামনায় হরীতকীর পর (অগ্রহায়ণ সংখ্যার ১৩০পৃঃ) আজ আমলকীর প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইলাম।

আমলকী খাদ্যরূপেও যথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনেকেই আমলকীর মোরব্বা, আমলকীর চাটনী ও আচারের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। ঔষধের জন্য কাঁচা ও শুষ্ক দুই প্রকার আমলকীই ব্যবহৃত হয়। কাঁচা আমলকী শরৎ ও হেমন্ত ঋতুতে প্রচুর পাওয়া যায়। শুষ্ক আমলকী বেণের দোকানে পাওয়া যায়। চরকের "রসায়ন" পাদ আমলকীর যশোগানে পূর্ণ। "চ্যবনপ্রাশের" নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। এই চ্যবনপ্রাশের প্রধান উপাদান আমলকী। চরকে কথিত হইয়াছে—একদা ঋষিগণ লোকহিতার্থে গ্রাম্যবাস স্বীকার করিয়াছিলেন। গ্রাম্যবাসে তাঁহাদের বুদ্ধি মলিন, শরীর অলস ও কান্তি ম্লান হওয়ায় তাঁহারা "আমলক রসায়ন" সেবন করিয়া তপশ্চর্য্যার শক্তি ও অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। আমলকী, আর কি তুমি সেই পুরাকালের মত ব্রহ্মামৃত পূত হইয়া এই অকাল জরামৃত্যুগ্রস্ত ভারতে দেখা দিবে না?

আমলকী—কষায়, কটু, তিক্ত, মধুর ও অম্লরসবিশিষ্ট, রুক্ষ এবং শীতবীর্য্য, ইহা অম্লরসযুক্ত বলিয়া প্রকুপিত বায়ুর প্রশমক, মধুর রসযুক্ত ও শীতবীর্য্য বলিয়া পিত্তের এবং কষায় রস বিশিষ্ট ও রুক্ষবীর্য্য বলিয়া কুপিত কফের শান্তিকারক, সুতরাং ইহা মানবজীবনকে উক্ত ত্রিবিধ মহান্ অন্তরায় হইতে রক্ষা করিয়া সমভাবে পরিচালিত করে, ঔষধার্থ ইহার ফল ও বীজ এবং স্থলবিশেষে পত্রও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঔষধ প্রয়োগে ইহার মাত্রা স্বরস (জলভিন্ন রস) ২ তোলা, চূর্ণের পরিমাণ পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে চারি আনা হইতে অর্দ্ধ তোলা পর্য্যন্ত। আয়ুর্ব্বেদোক্ত ত্রিফলার অন্তর্গত থাকিয়া এই মহৌষধ গৌণভাবে বহুরোগে উপকারী হইলেও কয়েকটী রোগে মুখ্যতঃ ইহার উপকারিতা নিম্নে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

জ্বরে—আমলকী গুলঞ্চ ও ধ'নের সহিত সমানভাগে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে বাতিক জ্বর নষ্ট হয়, পিপাসাযুক্ত পিত্তজ্বরে পাচনের মত ২ তোলা অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করতঃ অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেবনে আশু উপকার হয়। দাহযুক্ত প্রবল জ্বরে, মস্তকে রক্ত সঞ্চরণ (congestion) হইয়া চক্ষু রক্তবর্ণ ও মস্তকে দাহ উপস্থিত হইলে আজকাল বরফ জল কিম্বা ঠাণ্ডা জলের অবধি পটী ও "আইস্ ব্যাগই" তাহার একমাত্র শান্তিকারক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু ঐরূপ অতিরিক্ত শৈত্য ক্রিয়া অনেক স্থলে নিউমোনিয়া প্রভৃতি উৎকট শ্লেষ্মজ ব্যাধির কারণ হইয়া থাকে, ঐরূপ ক্ষেত্রে আমলকী ঘৃতে ভাজিয়া কাঁজি কিম্বা তদভাবে আমলকীর রস দিয়া পেষণ করিয়া তালুতে রগে ও কপালে প্রলেপ দিলে বরফের ন্যায় শীতক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে, অথচ অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে না, হরিতকী, পিপুল ও চিতার মূলের সহিত আমলকী সিদ্ধ করিয়া পান করিলে কফ-জ্বর নিবারিত হয়, গুলঞ্চ ও মুথার সহিত আমলকী সিদ্ধ করিয়া পান করিলে চতুর্থক (দুই দিন ছাড়া) জ্বর নিবারিত হয়, বিসর্প জ্বরে আমলকীর রস গব্য ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে জ্বরের শান্তি হয়, এক ভাগ আমলকী ও চারি

ভাগ মুগের ডাইল আটগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া দুই ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইলে, সেই মুগের যূষ বাতিক জ্বরে, পৈত্তিক জ্বর ও বাত-পৈত্তিকজ্বরের অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ ও পথ্য হইবে।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুজনিত মলবদ্ধতায় ও পেট ফাঁপায় কিঞ্চিৎ তেউড়ী চূর্ণের সহিত আমলকীর রস সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

অর্শরোগে—আমলকী উত্তমরূপে পেষণ করিয়া মৃত্তিকা নির্ম্মিত কোন পাত্রের অভ্যন্তরে লেপন করিবে, তৎপর সেই পাত্রে ঘোল রাখিয়া পান করিলে উপকার হয়, অতিসারে আমলকী আঙ্গুর ও মধুর সহিত উত্তমরূপে পেষণ পূর্ব্বক সরবত্ প্রস্তুত করিয়া পানীয়রূপে ব্যবহার করার উপকারিতা দর্শনে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণও মুগ্ধ হইয়াছেন।

পিত্তশূলে—আমলকীর রস চিনির সহিত পান করিবে।

কাশে—আমলকীচূর্ণ দুগ্ধ সহ পাক করিয়া ঘৃতের সহিত সেবন হিতকর, (২) দুই তোলা আমলকী চূর্ণ, দেড় পোয়া জল ও আধ পোয়া দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করতঃ আধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া উহাতে সহ্য মত আধ তোলা কিম্বা ¼ তোলা গব্য ঘৃত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে উপকার হয়।

হিক্কায়—আমলকী এবং কয়েদ বেলের রস পিপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত সেবনে উপকার দর্শে।

বাতিক বমনে—আমলকীর রসে শ্বেতচন্দন ঘসিয়া গাঢ় হইলে কুল প্রমাণ তাহার বটী প্রস্তুত করিয়া মধুর সহিত সেবন অমোঘ প্রতিকারক।

রক্তপিত্তে—নাসিকা হইতে রক্ত পতন নিবারণের জন্য শুষ্ক আমলকী ঘৃতে ভাজিয়া কাঁজিতে পেষণ পূর্ব্বক মস্তকে প্রলেপ দিবে।

বাতরক্তে—আমলকীর রসের সহিত পুরাতন ঘৃত পান করিবে। (২) খদির কাষ্ঠ (খয়ের কাঠ, বেনে দোকানে পাওয়া যায়) ১ তোলা ও শুষ্ক আমলকী ১ তোলা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পান করিবে।

প্রমেহে—হবিষ্যান্ন ভোজন পূর্ব্বক আমলকী অধিক মাত্রায় ভোজন করিবে, (২) প্রস্রাবের যন্ত্রণায় অধিক পরিমাণ আমলকীর রস সেবনে আশু উপকারক (৩) ইক্ষুরসের সহিত আমলকীর রস সমভাগে সামান্য মধুর সহিত পান করিবে। ইহাতে অতিশয় যন্ত্রণা দায়ক সরক্ত মূত্র নির্গমন ও মূত্ররোধ নিবারিত হয়। প্রস্রাব অল্প অল্প হইলে কিম্বা বন্ধ হইলে আমলকী বাটা তলপেটে প্রলেপ দিলে প্রস্রাব হয়। (৪) মধুর সহিত আমলকীর রস সেবন প্রমেহে উপকারী।

মূত্ররোধে—আমলকী জলে পেষণ পূর্ব্বক নাভির নিম্নদেশে প্রলেপ দিবে। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণও ইহার উপকারিতা স্বীকার করেন।

শোথে—আমলকীর রস তেউড়ী চূর্ণের সহিত পান করিবে।

শীতপিত্ত রোগে—(চর্ম্মের উপর বোল্তা দংশনে যেরূপ চাকা চাকা ফোলা হয়, সেরূপ হইলে) আমলকী চূর্ণ পুরাতন ইক্ষুগুড়ের সহিত সেবন করিবে। পুরাতন গুড়ের অভাব হইলে নূতন ইক্ষুগুড় ১০।১২ ঘণ্টা রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। ইহা বীর্য্যবর্দ্ধক এবং চক্ষুরোগের উপকারক, রক্তপিত্ত দাহশূল ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগেও উপকার করিয়া থাকে।

শ্বেত প্রদরে—আমলকীর চূর্ণ কিম্বা রস মধুর সহিত সেবন করিবে। (২) আমলকীর বীজ উত্তমরূপে পেষণ পূর্ব্বক চিনি ও মধুর সহিত সেবন করিবে।

যোনিদাহে—আমলকীর রস চিনি সহ পান করিবে।

শিরঃক্ষতে—আমলকী চিনি ও ঘৃতের সহিত পেষণ করিয়া মস্তকে লেপন করিবে. আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ আমলকী, কুঙ্কুম ও নীলোৎপল (নীল সুঁদি) গোলাপ জলের সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিয়া শিরঃপীড়ায় দিতে বলেন।

চোখ উঠায়—সুপক্ক আমলকীর রস বিন্দু বিন্দু চক্ষুতে দিলে যন্ত্রণা ও লৌহিত্য নিবৃত্তি হয়।

চুল উঠায়—আমলকীর রসের সহিত তিলতৈল পাক করিয়া, শীতল হইলে কেশে মাখিবে। ইহাতে কেশ কৃষ্ণবর্ণ ও চিক্কণ হয়।

বমনে—আমলকীর রসে শ্বেতচন্দন ঘর্ষণ করিয়া গাঢ় করিবে, আমলকীর মত এক একটী বটিকা করিয়া, মধু সহ লেহন করিলে বায়ু জন্য বমন আরাম হয়।

শিশুর চর্ম্মরোগে—শিশুর "বিখাজ" "কাউর" হইলে শুষ্ক আমলকী গুঁড়া করিয়া গোমূত্রে ৭ বার "ভাবনা" দিবে, পরে উহা বড়ির মত করিয়া শুকাইয়া রাখিবে—এই ঔষধ গোমূত্রে ঘসিয়া লাগাইবে—ইহাতে কোন জ্বালা যন্ত্রণা নাই—অথচ ফলপ্রদ।

শিরঃপীড়ায়—শুষ্ক আমলকী, গোলাপের কুঁড়ি, জাফ্‌রাণ গোলাপ জলে বাটিয়া কপালে প্রলেপ দিলে বায়ু জন্য মাথা-ধরা আরাম হয়। আমলকী বৃক্ষের শাখা ঘোলাজলে ডুবাইয়া রাখিলে জল নির্ম্মল হয়।

কবিরাজ—
শ্রীসুরেন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ।

স্নেহন ও স্বেদন বিধি।

ঘৃত।

ঘৃত—বায়ুপিত্ত হর ; রস শুক্র আর,
ওজ পদার্থের হয় হিতৈষী আবার ;
অগ্নিদাহ গাত্র জ্বালা শান্তি প্রদায়ক।
কোমলত্বকর, স্বর-বর্ণ প্রসাদক॥
বাতপিত্ত রোগ, সেই প্রকৃতি যাহার,
দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি করা অভিপ্রায় যার ;
ক্ষত-ক্ষীণ রোগী, বৃদ্ধ, বালক, দুর্ব্বল,
সুস্বর-দীর্ঘায়ু যেই চাহে বর্ণ, বল ;
পুষ্টি, সৌকুমার্য্য, ওজ যাচে যে সন্তান,
স্মৃতি, মেধা, বুদ্ধীন্দ্রিয়, অগ্নি বলবান্ ;
যারা দাহ, শস্ত্র, বিষ, অনলে পীড়িত।
তাহাদের পক্ষে হয় ঘৃত পান হিত॥

তৈল।

তৈল বায়ু হর ; শ্লেষ্ম-বল-বিবর্দ্ধক,
ত্বকে হিত, উষ্ণশক্তি, যোনি বিশোধক ;
বিশেষত শরীরের স্থৈর্য্যতা কারক॥
যাহাদের কফ আর মেদাধিক্য হয়,
গলা ও উদর স্থূল, চঞ্চলাতিশয় ;
বাত ব্যাধিগ্রস্ত, বায়ু প্রকৃতি যাহার,
শরীরের বল তনু লঘু দৃঢ় আর,
স্থির গাত্র করিবারে আকাঙ্খা যাহার ;
চর্ম্মে সাদ স্নিগ্ধ, তনু, মসৃণত্ব যার ;
ক্রিমি, ক্রূর কোষ্ঠ, নালীক্ষতে যে পীড়িত।
তৈলাভ্যস্ত শীতকালে তৈল-পান হিত॥

বসা।

বাতাতপসহ, রুক্ষ দেহ-ধাতু যার,
কৃশ হয় তার নহি পথশ্রমে আর;
রেতঃ, রক্ত, কফ, মেদ শুষ্ক যার হয়,
অস্থি, সন্ধি, শিরা, স্নায়ু, মর্ম্মে শূল রয়;
যাদের ইন্দ্রিয়-স্রোতমহাবাতাবৃত,
অগ্নিবল অভ্যস্তের বসাপান হিত॥

মজ্জা।

দীপ্তাগ্নি বিশিষ্ট, ক্লেশ সহিষ্ণু আবার,
বহুভোজী, স্নেহাভ্যস্ত, বাতব্যাধি যার;
ক্রূর কোষ্ঠ যাহাদের; স্নেহ যোগ্য যদি।
তাহাদের পক্ষে হয় মজ্জা পান বিধি॥

স্বেদন বিধি।

তাপ, উষ্ণ, উপনাহ, দ্রব চতুষ্টয়!
স্বেদের প্রকার ভেদ, বায়ুনাশী হয়॥
বিশেষত তাপ উষ্ণ স্বেদে কফ নাশ।
উপনাহে বায়ু, দ্রবে পিত্তের বিনাশ॥
বলবান, উৎকট ব্যাধি প্রপীড়িত;
শীতকালে মহাস্বেদ হইবে বিহিত॥
দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে স্বল্প স্বেদ দিবে।
মধ্যমাবস্থায় মধ্য স্বেদ আচরিবে॥
কফ কোপে রুক্ষ স্বেদ, বাত শ্লেষ্ম যোগে
রুক্ষ স্নিগ্ধ দুইরূপ স্বেদই প্রয়োগে॥
কফ-মেদ কৃত বাত অবরুদ্ধ হ'লে,
উষ্ণগৃহ, রৌদ্রসেবা, যুদ্ধোদ্যম বলে;
পথ পর্য্যটন, গুরু আবরণ গায়,
চিন্তা ও ব্যায়াম ভার বহিবেক তায়;
নস্য, বস্তি, শোধনাদি হ'লে প্রয়োজন,
অগ্রে স্বেদ বিধি তাহা রাখিবে স্মরণ।
ভগন্দর, অশ্মরী ও অর্শরোগ ত্রয়ে,
শস্ত্রকর্ম্ম পরে স্বেদ প্রয়োগ অভয়ে॥
মূঢ় গর্ভ শল্যোদ্ধারে, কালে বা অকালে,
প্রসবান্তে স্বেদ বিধি সকলেই পালে।
ভুক্ত পরিপাক অন্তে, বায়ুশূন্য স্থান।
সর্ব্ববিধ স্বেদ বিধি জানিবে সন্ধান॥
স্নেহ সিক্ত জলে স্বেদ প্রদান করিলে,
ধাতুগত দোষ তার দ্রবীভূত হ'লে,
কোষ্ঠ অভ্যন্তরে তাহা করিয়া প্রবেশ,
বিবেচিত হ'য়ে থাকে জানিবে বিশেষ॥
শরীরেতে স্নেহ রাখি, আর্দ্রবস্ত্র দিয়া,
আবরিয়া চক্ষুদ্বয়, স্বেদ প্রদানিয়া,
রোগীর হৃদয়ে পরে শীতল স্পর্শন।
করাইবে, ইহা যেন নহে বিস্মরণ॥
অজীর্ণ, দুর্ব্বল, মেহ, ক্ষতক্ষীণ রোগে;
গর্ভিণী, তৃষ্ণার্ত্ত জনে স্বেদ না প্রয়োগে।
অতিসার, রক্তপিত্ত, পাণ্ডু ও উদর,
মেদ রোগে স্বেদ নাহি হয় হিতকর।
ইহাদের স্বেদে রোগ অসাধ্য হইবে।
নতুবা শরীর ক্রমে বিনাশ পাইবে॥
যদিও একান্ত স্বেদ্য হয় বিবেচিত।
মৃদু স্বেদ দান তারে করিবে নিশ্চিত॥
হৃদয়, নয়ন, মুষ্কে, স্বেদ দিতে হ'লে।
মৃদু স্বেদ বিধি তার জানিবে সকলে॥
অতিরিক্ত স্বেদ দিলে সন্ধি পীড়া হয়।
দাহ, তৃষ্ণা, ক্লান্তি, ভ্রান্তি, রক্তপিত্তাময়,
পীড়কাদি উপদ্রব হ'লে উপস্থিত।
করিবেক শীতল ক্রিয়া তাহাতে নিশ্চিত॥

তাপস্বেদ।

অলক্তক দ্বারা দেহ করিয়া বেষ্টন,
অগ্নিসিক্ত বালু, বস্ত্র, হস্তে বা কখন।
উষ্ণ করি সেই স্বেদ করিবে প্রদান।
তাপ-স্বেদ নামে তাহা হয় অভিধান॥

উষ্ণস্বেদ।

বাতনাশী দ্রব-কাথ-রসাদি পুরিয়া,
উষ্ণঘটে একপার্শ্বে ছিদ্রেক রাখিয়া,

ধাতু কিম্বা কাষ্ঠনল হাতেতে পুরিবে।
ষড়ঙ্গুলী মুখ, দীর্ঘ দ্বিহস্ত করিবে॥
ক্রমশ গোপুচ্ছাকৃতি সূক্ষ্ম অগ্রভাগ,
স্বেদ সৌকার্য্যার্থে নল হবে তিন ভাগ।
বাত রোগাক্রান্ত জনে তৈলাদি মর্দ্দিয়া,
আসনে বসাবে গুরু বস্ত্রে আবরিয়া।
হস্তিশুণ্ডিকাখ্য নল করিয়া ধারণ।
স্বেদ প্রদানিবে পরে হ'য়ে একমন॥
দেহ পরিমাণ ভূমি করিয়া মার্জ্জন।
তৎপরে খদির কাষ্ঠ করিয়া দাহন॥
দুগ্ধ কাঁজি দ্বারা তাহা করি অভ্যুক্ষণ,
করিবে বাতঘ্ন পত্রে ভূমি আচ্ছাদন।
করাইয়া তদুপরি রোগীকে শয়ন।
মাষাদি দ্বারায় স্বেদ করিবে তখন॥

উপনাহ স্বেদ।

কাঁজি দ্বারা বাত হর ঔষধ পিষিয়া,
লুন, স্নেহ, দুগ্ধ, মাংসরস মিশাইয়া;
বাত-রোগী অঙ্গে উষ্ণ করিয়া লেপন,
উপনাহ স্বেদ তায় করিবে তখন।
অথবা আনুপ-গ্রাম্য মাংসরস আর,
জীবনীয়গণ, দধি, সৌবীর আবার,
দুগ্ধ, বীরতরু আদিগণ সম্মিলনে,
পূর্ব্বোক্ত বিধানে স্বেদ দেয় কোনজনে॥
গোধুম, সর্ষপ, তিল, কুলথকলায়,
দেবদারু, সেফালিকা, তিসি, মাষকলায়,
শলুফা, স্থূলজীরক, ভেরেণ্ডার মূল,
জীরা, রাস্না, মৌরী, মূলা, শজিনা, পিপুল
বাবুইতুলসী, কাঁজি, গাঁন্ধাল, সৈন্ধব,
অশ্বগন্ধা, দশমূল, বেড়েলা এসব,
গুড়ুচী, বানরীবীজ, যত পাওয়া যায়।
কুট্টিত করিয়া সিদ্ধ করিয়া তাহায়;
অতঃপর বস্ত্রখণ্ডে বান্ধিয়া লইবে।
ঈষদুষ্ণ অবস্থায় স্বেদ প্রদানিবে॥
এ মহাশাল্বন স্বেদ নামে অভিহিত।
সর্ব্ববিধ বাত এতে হয় অন্তর্হিত॥
কাঁজিতে পেষণ করি উষ্ণ অবস্থায়,
কিম্বা সিদ্ধ, বস্ত্রে বান্ধি স্বেদ দিবে তায়॥

দ্রব স্বেদ।

বাতহর দ্রব্য-কাথে, কটাহ বা দ্রোণী
পূর্ণকরি বসাইবে তাতে রোগী আনি।
আকণ্ঠ মগন করি রাখিবে তাহায়।
দ্রব স্বেদ কহে তাহে কহিনু তোমায়॥
দ্রোণটী স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, কিবা,
কাষ্ঠ দ্বারা চতুষ্কোণ প্রস্তুত করিয়া।
ছাব্বিশ অঙ্গুলী দীর্ঘ, প্রস্থ, উর্দ্ধে হবে।
অথচ মসৃণ তাহা অবশ্যই রবে॥

পক্ষান্তরে।

নাভি উর্দ্ধে ষড়ঙ্গুলী নিমগ্ন করিয়া,
বসাইবে, উষ্ণ কাথ ধারায় ঢালিয়া,
স্কন্ধদেশে যতক্ষণ দ্রোণী পূর্ণ নয়,
ততক্ষণ ধারাপাত করিবে নিশ্চয়।
অবগাহনের বিধি মুহূর্ত্ত চতুষ্টয়,
অথবা আরোগ্য চিহ্ন যবে দৃষ্ট হয়।
তৈল, দুগ্ধ কিম্বা ঘৃতে স্বেদ প্রদানিবে।
দুই একদিন পরে স্নেহ আচরিবে॥
লোমকূপ, শিরামুখ, ধমনী দ্বারায়,
স্নেহ পশি দেহ মধ্যে বল, তৃপ্তি পায়!
জল সিক্তে বীজাঙ্কুর বর্দ্ধিত যেমন।
স্নেহ সিক্তে ধাতু বৃদ্ধি হইবে তেমন॥
দ্রব স্বেদ তুল্য হেন বাত বিনাশক।
উপায় কিছুই নাই জানিবে ভিষক॥
শীত, শূল, স্তব্ধ, দেহ গুরুত্ব হরিলে,
স্বেদ সম্বরিবে মৃদু অগ্নি উদ্ধেজিলে॥

অরিষ্ট প্রকরণ।

অরিষ্ট কাহাকে বলে, যে সকল লক্ষণ দেখিয়া মনুষ্যের ভাবী মরণ নিশ্চয় করা যায়, তাঁহাদিগকে অরিষ্ট লক্ষণ বলে। কি সুস্থ শরীরে, কি রুগ্নাবস্থায় সকল সময়েই মৃত্যুর পূর্ব্বে এই সকল লক্ষণ দেখা দিয়া থাকে। এমন কি, মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বেও এই সকল লক্ষণের আবির্ভাব হইয়া থাকে। রুগ্নাবস্থায় এই সকল অরিষ্টদ্বারা রোগের অসাধ্যত্ব বোধ হইয়া থাকে। এই সকল অরিষ্ট লক্ষণ শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, মানসিক বৃত্তিনিচয়ে, চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ে, হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ে, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধে, স্বপ্নযোগে, শরীরের মর্ম্মস্থানে নিমিত্তসকলের প্রাদুর্ভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে। শরীরের কোন স্থানে কিরূপ ব্রণ, ব্যঙ্গ, তিলকালক বা পীড়কাদির আবির্ভাব হইলে সুস্থশরীরীর মৃত্যু অনিবার্য্য, কিরূপ স্বপ্ন দেখিলে স্বপ্নদর্শনকারীর আয়ুষ্কাল নিঃশেষিত হয়, অথবা গুল্ম বা উৎকট রক্তপিত্ত রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে গুল্মরোগী কিরূপ স্বপ্ন দেখে; চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কিরূপ বিকৃতিতে আয়ুর্ব্বিঘাতক চিহ্ন উপস্থিত হয়, জ্বরাদি রোগে মস্তকের সীমন্তে, দন্তে বা নাসিকাদি প্রদেশে কি কি লক্ষণ উপস্থিত হইলে জ্বরাদিরোগ অসাধ্য হইয়া ভাবী মরণের সূচনা করিয়া থাকে, আসন্ন মৃত্যুকালে বা মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে শব্দস্পর্শাদিতে বা নাড়ীর কিরূপ অবস্থা সংঘটিত হইয়া থাকে, এই সকল বিবরণ বিস্তৃত ভাবে আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থসকলে বর্ণিত আছে। মহামতি চরক ইন্দ্রিয়স্থানে এই অরিষ্ট প্রকরণ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। সর্ব্বত্র ইন্দ্রিয়ের (তুষজ্বালাবৎ) যুগপৎ উত্থিত বৃত্তিকে জীবন বা আয়ু বলে। সুতরাং ইন্দ্রিয়স্থানই যথার্থ আয়ুর্বিজ্ঞান বা আয়ুর্ব্বেদ। এই ইন্দ্রিয়স্থানে বা অরিষ্টসকলে জ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে বৈদ্য কখনই বৈদ্যপদবাচ্য হইতে পারেন না। পৃথিবীর অপর কোন চিকিৎসাশাস্ত্রে এই অরিষ্টজ্ঞান অথচ রোগসকলের এইরূপ সাধ্যাসাধ্য যাপ্যত্ব নির্ণীত হয় নাই। সুতরাং এইটীই আয়ুর্ব্বেদের বিশিষ্টতা, শাস্ত্রকারকগণ এই সকল মরণজ্ঞাপক চিহ্নগুলির অব্যর্থতার উপর এতটা আস্থাবান্ যে, তাঁহারা বলেন যে, স্থলবিশেষে ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান বৃথা হইতে পারে, অথবা স্থলবিশেষে পুষ্প দেখিয়া ফলের অনুমানও বৃথা হইতে পারে, কিন্তু অরিষ্ট লক্ষণ দেখা দিয়াছে, অথচ মৃত্যু ঘটে নাই, এরূপ স্থল কুত্রাপিও দেখা যায় না। অরিষ্টচিহ্ন দেখা দিলে মৃত্যু অনিবার্য্য, বিশিষ্ট-সুপ্রযুক্ত চিকিৎসাও সে মৃত্যু নিবারণে সক্ষম নয়। গুণবান্ ভিষক্ অথবা উপস্থাতা কেহই তখন কার্য্যক্ষম হয় না। একমাত্র দৈব বা তপস্যা ব্যতীত আর কাহারও সে মৃত্যু নিবারণে ক্ষমতা নাই।

অরিষ্ট জ্ঞানের প্রয়োজন। এই অরিষ্টের বিষয় জানা থাকিলে যোগী আপনার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী জানিয়া যোগকার্য্যে বিশেষ মনোযোগী হইতে পারেন। ভোগী বা বিষয়ী তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে আপনার বিষয় কার্য্যের সুব্যবস্থা করিতে পারেন। চিকিৎসক রোগ অসাধ্য জানিয়া চিকিৎসাকার্য্য হইতে বিরত থাকিয়া রোগের শান্তিস্বস্ত্যয়নের পরামর্শ দিতে পারেন; গৃহস্থকে চিকিৎসার জন্ম ধনে

প্রাণে মজিতে হয় না। এবং রোগীও তীব্র ঔষধাদি সেবনের যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া শান্তমনে ধ্যানধারণায় অথবা তীর্থক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিতে পারেন। হিন্দুর পক্ষে মরণ দিনের স্থায় পুণ্যজনক, মহাফলপ্রসূ দিন আর নাই। সেই মহাপ্রস্থান দিনে হিন্দু দান ধ্যান করিতে পারিলে আপনাকে সফল-জন্মা ও কৃতকৃত্য বোধ করিয়া থাকেন। এবং যে বৈদ্য তাহা পারেন, তিনি তাঁহাকে আচার্য্যবৎ পরমোপকারী বন্ধু জ্ঞান করিয়া থাকেন। হিন্দুর জপতপ সকলই সদ্‌গতির জন্য, সজ্ঞান মৃত্যুর জন্য; এই সজ্ঞান মৃত্যুর জন্যই ঋষিগণ তপোবলে অরিষ্ট বিজ্ঞানের আবিষ্কার করিয়াছেন। পৃথিবীর কোন জাতির মধ্যে এ জ্ঞান নাই। কোন জাতির জন্মজন্মান্তরে বিশ্বাস নাই।

যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে জীব অন্তকালে কলেবর ত্যাগ করে, সেই ভাবানুসারেই পরকালে তাহার গতি হয়; হিন্দুশাস্ত্রের প্রেরণা এইরূপ। সুতরাং এই অরিষ্টবিজ্ঞান হিন্দুর পক্ষে পরম প্রয়োজনীয় পদার্থ। এই অরিষ্ট জ্ঞানের আলোচনায় এই শকুনবিজ্ঞান বা স্বপ্নবিজ্ঞানের আলোচনায় আপামর সাধারণেরও ঔষধ ও চিকিৎসার প্রতি একান্ত নির্ভরতা কমিয়া গিয়া জীবনীশক্তি বা আয়ুর স্বতন্ত্রতা ও জন্ম-জন্মান্তরে বা দৈবের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইতে থাকে। কোথাও কিছু নাই, কোন কার্য্যকারণ সম্বন্ধে একটী লোক যেমন আহারবিহারাদি স্বাস্থ্য বৃত্তির-অনুশীলন করে, নিত্যই সেইরূপ স্বাস্থ্যচর্য্যা করিতেছে, শরীরের কোন গ্লানি নাই, অথচ তাহার নাসাদণ্ড হঠাৎ বক্র হইয়া পড়িল অথবা তাহার মস্তকে হঠাৎ একটী গৃধ্র আসিয়া বসিল এবং এই ঘটনার ২।৪ দিন পরে কোন উৎকট ব্যাধি উপস্থিত হইয়া তাহাকে মৃত্যুমুখে নীত করিল, ইহা দেখিয়া সাধারণ লোকে কে না বিচার করিতে পারে যে, আয়ু বলিয়া একটী স্বতন্ত্র পদার্থ আছে, যাহা ঐহিক আহারবিহার, চিকিৎসাদি কোন কর্ম্মের অধীন নয়। যাহার অন্তঃস্থলে দৈবই বলবৎ কারণ। যাহার অন্নপানীয়ে ঘুণ, কেশ, কীট, নখ, লোম প্রভৃতি নিয়তই পরিলক্ষিত হয়, সে ব্যক্তি অসাধ্য রাজযক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া কে না স্থির করিতে পারে যে, ঐ সকল ঘুণাদি জীবাণু দৈব কর্ত্তৃকই রাজযক্ষ্মা রোগীর অন্নপানীয় দূষিত করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছে।

রাজযক্ষ্মা উৎপত্তির পূর্ব্বে জীবাণু কর্ত্তৃক অন্নপান দূষিত হইয়া থাকে, ছাগদ্বারা আঘ্রাত হইলে যক্ষ্মাবীজাণু কর্ত্তৃক আক্রান্ত স্থানের শুদ্ধি হয়, যে জ্বরে মস্তকে সীমন্ত (সিঁথি) বা বক্ররেখা দেখা যায়, সে জ্বর অসাধ্য, স্বপ্নে সূর্য্য দর্শন হইলে যে অতি গুরুতর রোগও আরোগ্য হয়, ছায়া বা কান্তি দেখিয়া যে রোগীর শুভাশুভ বলা যাইতে পারে, ইত্যাকার জ্ঞানসকল আলোচনা করিলে মন বিস্ময়-রসে পরিপ্লুত হয় এবং এই সকল জ্ঞানের আবিষ্কারক ঋষিগণের চরণতলে আত্মবলি দিলেও মনুষ্যসমাজ তাঁহাদের ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারে না, এ বিষয় প্রতীতি হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদের আলোচনায় বিশেষতঃ অরিষ্টজ্ঞানের আলোচনায় স্পষ্টই অনুভূত হয় যে, আদিজ্ঞান বা বেদ কি অনন্ত কি মহা-মহিম-শক্তিশালী এবং ঐ বেদদ্রষ্টা ঋষিগণের কি বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি! মনু বলিয়াছেন, ভূতং

মূলাশী সংযতাত্মা ঋষিগণ তপোবলে সচরাচর ত্রৈলোক্য দেখিতে পান, তাঁহারা তপোবলেই ঔষধশাস্ত্রে বিষচিকিৎসা প্রভৃতি জ্ঞানসকল আবিষ্কার করিয়াছেন। হেতু শাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া ঋষিবাক্যের প্রতি সন্দিহান হইতে নাই। বাস্তবিকও আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্রসকল যে অলৌকিক জ্ঞানপ্রসূত, উহা যে পরীক্ষালব্ধ হইতে পারে না, ইহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায়। ভাবিয়া দেখ, আমরা এই যে প্রতিদিন অন্নব্যঞ্জনাদি উপভোগ করিতেছি, আমাদের এই ভোজনবিধি কি সামান্য জ্ঞানমূলক? আজও পাশ্চাত্যজগৎ শিশু-খাদ্য কিরূপ হওয়া উচিত, তাহার গবেষণা করিতেছে, কিন্তু আমাদের অন্নপ্রাশন সংস্কার সেই বৈদিক যুগের। তণ্ডুল, তিল, যবের আবিষ্কার অথবা হরিদ্রা যে পচন নিবারক, এই সকল আবিষ্কারকি অদ্ভুত বিজ্ঞানমূলক নয়? পৃথিবীতে কোটী কোটী বৃক্ষ লতা ও ওষধি আছে, তন্মধ্যে ধান্যের ন্যায় এমন একটী শস্যের আবিষ্কার যাহা প্রতিদিন খাইলে অরুচি ও স্বাস্থ্য নষ্ট হইবে না, অথচ দেহে বলাধান ও জীবন রক্ষা হইবে, ইহা কি যুগযুগান্তরের পরীক্ষাবলে নিষ্পন্ন হইতে পারে? আমাদের আহারের বিধি, শয়নবিধি, গর্ভাধানাদি সংস্কারবিধি, আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা প্রভৃতি সমুদয়ই বেদমূলক ও অতীন্দ্রিয়, একথা আমরা অপর প্রসঙ্গে নিরূপণ করিব। পরন্তু এই নাড়ীজ্ঞান বা অরিষ্টজ্ঞান যে তপস্যাপ্রসূত, ইহা আমরা এই প্রসঙ্গে ক্রমশঃ দেখাইতে চেষ্টা করিব। নাড়ীজ্ঞান সম্বন্ধে মহর্ষি কণাদ নিজেই বলিয়াছেন যে, অল্প পুণ্যে লোকে নাড়ী পরিচয় লাভ করিতে পারে না। যোগাভ্যাসের ন্যায় একাগ্রচিত্তে ইহার জন্য তপস্যা করিতে হয়।

পরন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অরিষ্ট-জ্ঞান বা নাড়ীজ্ঞানের চর্চ্চা বৈদ্যসমাজ হইতে ক্রমশঃ লোপ পাইতে চলিল। আয়ুর্ব্বেদে আছে যে, শাস্ত্রদ্বারা হিতায়ু, অহিতায়ু, সুখায়ু, ও দুঃখায়ু এবং আয়ুর মান প্রভৃতি জানা যায়, তাহাকে আয়ুর্ব্বেদ বলে। রক্তসার, শুক্রসার, মেদঃসার প্রভৃতি সার অথবা ব্রাহ্মসত্ব, পিশাচসত্ব, গন্ধর্ব্বসত্ব ও সাত্ম্যাদি নানা বিবেচনায় আয়ুর পরিমাণ বা জীবনী-শক্তির উৎকর্ষাপকর্ষের কথা আয়ুর্ব্বেদে লিখিত হইয়াছে, তথাপি এই অরিষ্টজ্ঞান আয়ুর মান জানিবার বিশেষ উপায়। অগ্রে আয়ু বা জীবনীশক্তির পরীক্ষা না করিয়া ঔষধাদি প্রয়োগের ব্যবস্থা করিলে ঔষধ-ব্যাপত্তি ঘটে বলিয়া আয়ুর মান জানাই বিশেষ প্রয়োজনীয়। অরিষ্টলক্ষণদ্বারা, নাড়ী দেখিয়া রোগের সাধ্যাসাধ্যত্ব নির্ণয় করিয়া তবে চিকিৎসাকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। ঔষধ বল, চিকিৎসা বল, রোগীর জীবনী-শক্তি না থাকিলে কিছুতেই কিছু হয় না। বরঞ্চ জীবনীশক্তির হ্রাসাবস্থায় ঔষধাদির প্রয়োগ বিপরীত ফলজনক হইয়া থাকে। কিন্তু আজকাল কয়জন কবিরাজ আয়ু পরীক্ষা করিয়া তবে ঔষধাদি প্রয়োগ করেন, আমাদের দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার আজও এই সংস্কার আছে যে, অরিষ্টজ্ঞান বা নাড়ী-জ্ঞানশূন্য কবিরাজ কবিরাজই নহেন। কিন্তু আজকাল কয়জন কবিরাজ অরিষ্ট দেখিয়া বা নাড়ী দেখিয়া চিকিৎসা করেন। অথবা নাড়ী দেখিয়া রোগ নির্ব্বাচন করিতে পারেন? বড় বেশী দিনের কথা নয় ৫০।৬০ বৎসর

পূর্ব্বে এদেশে এমন সব শাস্ত্রজ্ঞ কবিরাজ মহাশয়গণ বিগুমান ছিলেন, যাঁহারা নাড়ী দেখিয়া রোগ নির্ণয় করিতেন, যাঁহারা অরিষ্ট দেখিয়া মৃত্যুর একমাস পূর্ব্বে রোগীকে তীর্থধামে মৃত্যুর জন্ম প্রস্তুত হইতে পাঠাইয়া দিতেন। বাটীর প্রাচীনা গৃহিণীগণেরও নাড়ীজ্ঞান বা রিষ্টারিষ্ট বোধ ছিল। কিন্তু হায়! এক্ষণে সে বৈগুও নাই, সে রোগীও নাই। রোগী কত্রকদণ্ডের মধ্যে মরিয়া যাইবে—রোগী শয্যাকণ্টক অবস্থায় যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতেছে, অথবা রোগীর নাভিশ্বাস উপস্থিত হইয়াছে, এমন সময়েও যাতনার উপর যাতনা—অরিষ্টজ্ঞান অভাবে ডাক্তার বা কবিরাজ মহাশয় হয়তো রোগীর গুহ্যদ্বার দিয়া পিচকারী দিতে বসিয়াছেন, অথবা রোগীর মৃত্যুশ্বাস বুঝিতে না পারিয়া তাহার বুকের ঘড় ঘড়ানির জন্ম মালিস দিতে বলিতেছেন। ডাক্তারি চিকিৎসায় এ জ্ঞান না থাকিতে পারে, ডাক্তারি ও আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসায় আকাশপাতাল প্রভেদ।* কিন্তু ডাক্তারি চিকিৎসাকে পরম সত্যবোধে নাড়ীজ্ঞান বা অরিষ্টজ্ঞানকে মিথ্যাবোধ করিয়া আধুনিক বৈগুমহাশয়েরা থার্ম্মোমিটর ও ষ্টেথিস্কোপাদি ব্যবহারে আপনাদিগকে মহাগৌরবান্বিত বোধ করিতেছেন, এইটী বিষম দুঃখের কথা; ডাক্তারেরা তো পূর্ব্বজন্ম, পরজন্ম, আত্মা এসব কিছুই মানেন না। তাঁহারা আয়ু কি আজও তাহা নির্ণয় করিতে পারেন নাই বলিয়া অগ্যাপি তাঁহাদের চিকিৎসাশাস্ত্রকে তাঁহারা ভৈষজ্য-বিজ্ঞান বলিয়া থাকেন। তাঁহারা আজও রোগের সাধ্যাসাধ্যত্ব বা যাপ্যত্ব স্বীকার করেন না। রোগ আরোগ্যের পক্ষে কাল যে একটী বলবত্তর কারণ, একথাও তাঁহারা ততটা মানেন না। সকল রোগকেই সাধ্য মনে করিয়া ভৈষজ্যবিজ্ঞান বলে তাঁহারা পুরুষ-কার প্রদর্শন করিতে যান। "জাত্যায়ুঃ ভোগবিপাকাঃ" পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে যে জন্মভোগ ও জীবনীশক্তি বিধৃত থাকে—প্রজ্ঞাপরাধ যে সকল রোগের কারণ, অথবা আধ্যাত্মিক নিয়ম বলে যে রোগ সকল সারিতে পারে, একথা তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের চিকিৎসা হেতুশাস্ত্রমূলক। সুতরাং নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। অন্ধকারে হস্তোপচারে গমনশীল হাতুড়িয়ার ন্যায় তাহারা এযাবৎ পরীক্ষারাজ্যে পরিভ্রমণ করিতেছেন। সুতরাং ডাক্তারি চিকিৎসার ভিতর অরিষ্টের কথা নাই, নাড়ীবিজ্ঞান নাই, দৈবব্যপাশ্রয় চিকিৎসা নাই বলিয়া উহা-দিগকে অনাবশ্যকীয় বোধে আমরা যদি উহাদের অনুশীলন না করি, তাহা হইলে আমরা কি প্রকারে বেদবিশ্বাসী বলিয়া পরিচয় দিব, এই যে কলিকাতা সহরে আজ-কাল অনেক মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ বিরাজ করিতেছেন, কৈ, বল দেখি নাড়ী দেখিয়া সময় বুঝিয়া তাঁহাদের মধ্যে কয়জন রোগীর গঙ্গাযাত্রার কাল নিরূপণ করিতে পারেন? কয়জন কবিরাজই বা লক্ষণদৃষ্টে রোগ অসাধ্য বুঝিয়া রোগীর আত্মীয়স্বজনকে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন হোমাদি দৈবব্যপাশ্রয় চিকিৎসা করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন? আয়ুর্ব্বেদের নিদান স্থান, আয়ুর্ব্বেদের বিমানস্থান, আয়ু-র্ব্বেদের শারীরস্থান, আয়ুর্ব্বেদের বায়ু, পিত্ত, কফ এবং উহাদের প্রকোপ প্রভৃতি অনুশীলন করিলে বুঝা যায় যে, আমাদের এই জন্ম কিছু নূতন আরম্ভ হয় নাই এবং আমাদের রোগ ও তাহার চিকিৎসা প্রভৃতির উপায় এই কালে

আরম্ভ হয় নাই, কত জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি দুষ্কৃতি অনুসারে এই শরীর ধারণ ও এই শরীরের ব্যাধি বিমোচনউপায়সকল সৃষ্টির অনাদিত্ব প্রযুক্ত নিত্য। বায়ু পিত্ত, কফরূপী দেবত্রয় এই দেহে অবস্থান করিয়া জীবের সুখ, দুঃখ বিধান করিতেছেন, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মবিপাকে মহাপাতক, অতিপাতকাদি পাপের জন্য ইহজন্মে রাজযক্ষ্মা, কুষ্ঠ, অর্শঃ, ভগন্দরাদি রোগ হয় এবং কর্ম্মজ রোগ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা উপশমিত হইয়া থাকে। কিন্তু কৈ কোথায় দেখিয়াছ কি যে, কবিরাজ মহাশয় রোগের জন্মকথন প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিতেছেন? ভিষক্, দ্রব্য, উপস্থাতা প্রভৃতি পাদচতুষ্টয় সাধকতম হইলেও তথাপি দৈব চিকিৎসা ব্যতীত অরিষ্টোপশম হইতে পারে না বলিয়া আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ অথর্ব্ববেদে অধিক ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। কেননা, অথর্ব্ববেদেই দৈবব্যপাশ্রয় চিকিৎসা বর্ণিত আছে। চিকিৎসাদ্বারা সাধ্যরোগ সুসাধ্য হয়; যাপ্যরোগ যাপ্য থাকে, কিন্তু অসাধ্যের প্রতিবিধান আয়ুর্ব্বেদে নাই বলিয়াই অথর্ব্ববেদের এত সম্মান। কিন্তু হায়, যে জন্ম জন্মান্তর, আয়ুর্ব্বেদের প্রতি বিষয়ে ওতপ্রোত সেই জন্মজন্মান্তরে দেবব্রাহ্মণে বেদবেদান্তে আধুনিক কবিরাজ মহাশয়গণের বিশ্বাস নাই, তা সাধারণ লোকের কোথা হইতে থাকিবে? ভগবান্ পাতঞ্জলি আয়ুর্ব্বেদে ও জ্যোতিষশাস্ত্রে বেদের প্রত্যক্ষতার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু হায়, যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদের প্রচারক, তাঁহারা বেদবিশ্বাসী নন। তাঁহারা "কামোপভোগপরমা" এই সত্যেরই বিশ্বাসী। সেই জন্যই পুরাকালে বেদবিশ্বদেব ব্রাহ্মণভক্ত ব্রতধারী পুরুষ ব্যতীত আয়ুর্ব্বেদের অপর কেহ অধিকারী ছিল না। কিন্তু এক্ষণে কেহ কেহ অর্থলোভে আয়ুর্ব্বেদচর্চ্চা করাতে আয়ুর্ব্বেদের এই দুর্গতি ঘটিতেছে। আয়ুর্ব্বেদবাদিগণের মধ্যে যদি থার্ম্মোমিটার বা ষ্টেথিস্কোপ প্রচলিত হইল—তবে কে আর নাড়ীবিজ্ঞানের বা অরিষ্টজ্ঞানের চর্চ্চা করিবে? ক্রমেই উহা মিথ্যার মধ্যে পরিগণিত হইবে।

শ্রীতেজশ্চন্দ্র বিদ্যানন্দ।

মসূরিকা (বসন্ত) রোগ।

দুঃখের অনুবন্ধ ব্যতীত সুখ থাকিতে পারে না। ইহা বুঝাইবার জন্যই বোধ হয় বিধাতা বসন্ত রোগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। নচেৎ যখন দুরন্ত শীতের অবসানে মলয় মারুত শরীরকে স্পর্শসুখ অনুভব করায়, যখন কোকিলের কাকলি এবং ভ্রমরের গুঞ্জন মানবের শ্রুতিসুখ সম্পাদন করে, যখন চ্যুত মুকুল পরিমল শত শত পুষ্পরাশির সৌরভের সহিত মিশিয়া মানবের ঘ্রাণেন্দ্রিয় চরিতার্থ করে, এমন সুখময় সময়ে এমন অসুখের সৃষ্টি কেন? নর কবির কাব্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া রচিত হয়। কিন্তু অমর কবির কাব্যে আমরা তাহার বিপরীত দেখিতে পাই। সে কাব্য বলে

যেখানে দুঃখ, সেখানে সুখ, যেখানে সুখ সেখানে দুঃখ। সুখ দুঃখ অভেদাত্মা হরি-হরের ন্যায় পরস্পর জড়িত।

বসন্ত রোগের শাস্ত্রীয় নাম মসূরিকা। মসূরীর (মসুর কলায়ের) ন্যায় ব্রণ উৎপন্ন হয় বলিয়া এই রোগের নাম মসূরিকা রাখা হইয়াছে। ইহা যে কি জন্য সাধারণে বসন্ত রোগ নামে খ্যাত হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এ বিষয়ের তথ্যনির্ণয়ে চেষ্টা করিতে পারেন। কিন্তু আমাদের স্বভাবতঃ মনে হয় যে, বসন্ত কালে এই রোগের প্রাবল্য ঘটে বলিয়া ইহার "বসন্ত" রূপেই নামকরণ হইয়াছে।

বসন্তরোগ জগতে অনেক কাল হইতে আছে এবং অনেক সময় অনেক দেশ শ্মশানে পরিণত করিয়াছে। মানবের প্রাণপণ চেষ্টা উপেক্ষা করিয়া এই রোগ যে আরও কতদিন জগতে বিদ্যমান থাকিবে, যিনি বসন্ত রোগের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই তাহা বলিতে পারেন, আমরা বসন্তের অন্তরঙ্গ বন্ধু নহি। সুতরাং তাহার দীর্ঘ জীবন কামনা করি না। কিন্তু আমাদের কাম্য না হইলেই যে সে স্বল্পজীবী হইবে, এরূপ আশা করিবার কোন কারণ নাই।

বসন্তরোগ অনেক দিন হইতে পৃথিবীতে আছে এবং আশা করি থাকিবে। আর এ রোগের অস্তিত্বের পরিচয় সম্ভবতঃ আয়ুর্ব্বেদেই প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু অনেক পাশ্চাত্য চিকিৎসক এ সম্বন্ধে নিতান্ত ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। নিম্নে তাহার একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

ডাক্তার ওসলার এবং ম্যাকরে প্রণীত চিকিৎসাগ্রন্থে ডাক্তার উইলিয়ম, টি, কাউন্সিল ন্যাক, এম,ডি, লিখিয়াছেন যে, মসূরিক রোগের প্রকৃত পরিচয়জ্ঞাপক বিবরণ দশম শতাব্দীতে রেজেস নামক জনৈক মুসলমান চিকিৎসক লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার বহুপূর্ব্বে চরক ও সুশ্রুত গ্রন্থে মসূরিকার লক্ষণ ও চিকিৎসা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়।

এক্ষণে পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রের মতে বসন্তরোগীকে যেরূপ স্বতন্ত্র রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়, পূর্ব্বে এরূপ ছিল কি না? বসন্ত রোগী সম্বন্ধে যেরূপ দেশাচার এখনও দেখা যায়, তাহাতে ইহার অনুকূল প্রমাণ পাওয়া যায়। এখনও যাঁহারা প্রাচীন মতের পক্ষপাতী তাঁহারা বসন্ত রোগীর গৃহে কাহাকেও যাইতে দেন না, রোগীর কাপড় রজকালয়ে প্রেরণ করেন না, এবং রোগীর গৃহ পরম পবিত্র রাখিয়া থাকেন।

কেবল দেশাচার বলিয়া নহে, শাস্ত্রেও বসন্ত রোগীকে নির্জ্জনে ও পবিত্র স্থানে রাখিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত স্পষ্টই বলা হইয়াছে :—

"ন চ তস্যান্তিকং ব্রজেৎ ॥"

অর্থাৎ বসন্ত রোগীর নিকটে কেহ যাইবে না। ইহাতে বসন্ত রোগীকে স্বতন্ত্র ভাবে রাখিবার নিয়ম সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়।

বসন্তরোগ যে সংক্রামক, তাহা রোগীকে এইরূপ স্বতন্ত্র রাখিবার ব্যবস্থাদ্বারাই প্রতীত হয়। সংক্রামক না হইলে এরূপ সাবধানতার আবশ্যক কি? আবার সংক্রমণ নিবারণের বিধিও অতীব সুন্দর। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বলেন যে, মসূরী রোগ পাকিবার পরে বিশেষতঃ শুষ্ক হইবার সময়ে উহা হইতে অসংখ্য কণা নির্গত হয় এবং সেই সকল

কণাদ্বারা রোগ সংক্রমিত হয়। এই তথ্য লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্রকার উপদেশ দিয়াছেন :—

"পক্কে ··· ধূপো মুহুর্যুক্তিতঃ।
শশ্বদ্‌গোময়ভস্মগুগ্‌গুলুমথো শুষ্কে
শিলাপিষ্টয়োরালেপঃ পিচুমর্দ্দপত্রনিশয়োঃ
শেষে ব্রণোক্তাঃ ক্রিয়াঃ)।"

অর্থাৎ বসন্তের গুটি পাকিয়া উঠিলে যুক্তিপূর্ব্বক ধূম প্রয়োগ করিবে; এবং সর্ব্বদা গোময় ভস্ম (ঘুঁটের ছাই) গায়ে মাখাইবে। শুষ্ক হইলে নিমপাতা ও হরিদ্রা শিলায় বাটিয়া প্রলেপ দিবে এবং ব্রণোক্ত ক্রিয়া করিবে।

মসূরিকা পাকিয়া উঠিলেই যাহাতে মক্ষিকাদি ক্ষতে উপবিষ্ট হইয়া রোগ সংক্রমণ করিতে না পারে, সেই জন্য ধূম প্রয়োগের ব্যবস্থা। গ্রন্থান্তরে ইহা ব্যতীত স্পষ্টই বলা হইয়াছে :—

"সপত্রনিম্বশাখাভির্মক্ষিকামপসারয়েৎ।"

অর্থাৎ সপত্র নিম্বশাখাদ্বারা মক্ষিকা তাড়াইয়া দিবে। অপিচ, গোময়ভস্ম লেপন করিবার যে বিধি আছে, তদ্দ্বারা যে কেবল মক্ষিকা নিবারণ হয়, এমত নহে, রোগবীজ বায়ুমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইতে পারে না অপিচ, গোময়ভস্ম বিষনাশক। বিষ ফোঁড়া হইলে গোময়ভস্ম ব্যবহারে বিষ নষ্ট হয়। সুতরাং গোময়ভস্ম সংযোগে বসন্তের বিষও নষ্ট বা হীনবীর্য্য হয়; মিশিতে পায় না। শুষ্ক হইলে নিমপাতা ও হরিদ্রা শিলায় বাটিয়া প্রলেপ দিতে বলা হইয়াছে। ইহাতে রোগবীজ কোন উপায়েই সংক্রমিত হইতে পারে না।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, বসন্ত রোগ সংক্রামক বলিয়া জানা ছিল এবং সংক্রমণ নিবারণের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে, কিন্তু রোগ সংক্রামক বলিয়া ত কোথাও উল্লেখ নাই। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, আয়ুর্ব্বেদকারগণ সংক্ষিপ্ত ভাবে যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহা সূক্ষ্মবুদ্ধি পুরুষের জন্য। অনেক স্থলে তাঁহারা দিগ্‌দর্শনমাত্র করিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রে পুনরুক্তি বা অত্যুক্তি বড় কোথাও দেখা যায় না। রোগের সংক্রমণ সম্বন্ধে আমরা একটী মাত্র আভাস পাই :—

'প্রসঙ্গাৎ গাত্রসংস্পর্শাৎ নিঃশ্বাসাৎ
সহভোজনাৎ।'
"একশয্যাসনাচ্চৈব বস্ত্রমাল্যানুলেপনাৎ॥
জ্বরঃ কুষ্ঠশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এব চ।
ঔপসর্গিকরোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরম্॥"

অর্থাৎ—একত্র থাকা, গাত্রসংস্পর্শ, নিঃশ্বাস, একত্র ভোজন, এক শয্যা ও আসনে শয়ন ও উপবেশন এবং এক বস্ত্র, মাল্য ও অনুলেপন ব্যবহার বশতঃ জ্বর, কুষ্ঠ, শোষ, চক্ষুউঠা এবং ঔপসর্গিক রোগসকল একব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তিতে সংক্রমিত হয়, এই বচনটীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক, বসন্ত রোগীকে নির্জ্জনে রাখিবার, তাহার কাছে কাহারও না যাইবার প্রভৃতি যে সকল উপদেশ, শাস্ত্রে আছে তদ্দ্বারা অনায়াসেই বুঝিতে পারেন যে, রোগটী সংক্রামক।

শাস্ত্রে বসন্ত রোগের বিষয় যেরূপ লিখিত হইয়াছে, বিশেষতঃ বসন্তের টীকার বিষয় উল্লিখিত না থাকায় সহজেই মনে হয়, সে সময়ে বসন্তরোগের প্রাবল্য কম ছিল। যে কারণেই হউক পরবর্ত্তী কালে উহা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে বসন্তের টীকা লইবার প্রথার সৃষ্টি ও প্রচলন, কতকাল পূর্ব্বে কোন মনস্বী ব্যক্তি কর্ত্তৃক যে উদ্ভাবিত

প্রচলিত হয়, সে সম্বন্ধে কোন প্রমাণ আমরা পাই নাই। তবে প্রাচীনদিগের মুখে যেরূপ শুনা যায়, তাহাতে এই প্রথা বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে, বোধ হয়। বর্ত্তমান টীকা দিবার প্রণালী উহার বহুকাল পরে আবিষ্কৃত এবং প্রচলিত হইয়াছে। ইহার পোষক স্বরূপ আর একটী অবস্থার বিষয়ের কথা এখানে উল্লেখ করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। উহাকে "গুলসান" বলে। কোন দগ্ধ পদার্থদ্বারা মণিবন্ধের সম্মুখ ভাগে বা পদের জঙ্ঘাদেশে ক্ষত উৎপাদন করা এবং সেই ক্ষতকে রক্ষা করার নাম "গুলবসান"। এই প্রথা এখনও সুদূর পল্লিগ্রামের স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে এবং তদ্দ্বারা অনেক কঠিন রোগের উপশম হইতে দেখা যায়। সম্ভবতঃ এই প্রথা আয়ুর্ব্বেদে প্লীহা যকৃৎ রোগে যে শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবার উপদেশ আছে, তাহারই রূপান্তরমাত্র।

বসন্তের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা সঙ্গত, এক্ষণে আমরা সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিব। উপায়গুলি দুই জাতীয়, কতকগুলি বসন্ত রোগীর পক্ষে প্রযুজ্য এবং কতকগুলি সুস্থ-ব্যক্তির পক্ষে প্রযুজ্য। রোগীর পক্ষে প্রযুজ্য উপায়গুলির বিষয় পূর্ব্বেই অনেকটা বলা হইয়াছে, যথা—রোগীকে নির্জ্জনে রাখা, রোগীর নিকট কাহারও না যাওয়া, রোগীর বস্ত্রাদি রজকালয়ে না দেওয়া, রোগীর গৃহে যাহাতে মাছি প্রবেশ না করিতে পারে, তজ্জন্য ধুম দেওয়া, কিন্তু রোগীর নিকটে শুশ্রূষাকারী না যাইলে চলিতে পারে না। শুশ্রূষাকারীকে যখন যাইতে হইল, তখন তাহাকেও রোগীর ন্যায় দেখিতে হইবে, অর্থাৎ তাহার নিকটে কেহ যাইবে না এবং তাহার বস্ত্রাদি রজকালয়ে দেওয়া হইবে না। রজকালয়ে বস্ত্র না দিয়া বস্ত্র গরম জলে সিদ্ধ করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য, রোগীর ঘরে যে কোন ব্যক্তি প্রবেশ করিবে, তাহার বস্ত্র সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম পালন করা আবশ্যক।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পক্কাবস্থায় গোময় ভস্ম এবং সংশুষ্ক অবস্থায় নিমপাতা ও হরিদ্রা লেপন করিলে রোগ সংক্রামিত হইতে পারে না। অপিচ ঐ সকল পদার্থ বীজনাশক বলিয়া রোগবীজের রোগোৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হয় বা কমিয়া যায়। কিন্তু তথাচ সাবধানের বিনাশ নাই। রোগীর শরীর-সংলগ্ন গোময়ভস্ম ও নিমপাতা হরিদ্রার প্রলেপ সংগ্রহ করিয়া পুড়াইয়া ফেলা বা দূরে পুতিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। রোগী সম্বন্ধে এই সকল উপায় অবলম্বন করিলে রোগ আর সংক্রামিত হইতে পারে না।

এক্ষণে সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে যে সকল উপায় অবলম্বনীয় তাহা কথিত হইতেছে। সংসারে নরের যম সকলেই—রোগও বাদ যান না। জীবনীশক্তি কমিয়া গেলে রোগ সহজেই মানব শরীরে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। সেই জন্য জীবনী শক্তি যাহাতে বর্দ্ধিত হয় অর্থাৎ শরীর যাহাতে সুস্থ এবং সবল থাকে, তাহা করা কর্ত্তব্য। এজন্য সুনিয়মে স্নানাহার করা, পবিত্র ও উৎকৃষ্ট দ্রব্য আহার করা, পচা, দূষিত ও বাসি খাদ্য আহার না করা, অতিরিক্ত আহার না করা, দিবানিদ্রা ও রাত্রি জাগরণ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যাহাতে বেশ কোষ্ঠ শুদ্ধি হয় তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত।

(ক্রমশঃ)

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

১ম বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৩—চৈত্র। | ৭মসংখ্যা।

সংক্রামক রোগ নিবারণে সদাচার।

আজকাল পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব। কলেরা, ডেঙ্গু, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, বিউবনিক প্লেগ, ম্যালেরিয়া জ্বর প্রভৃতি সংক্রামক রোগসকল ভীষণ মূর্ত্তিতে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বিচরণ করিতেছে। পাশ্চাত্য সভ্য জগতে এই সকল সংক্রামক রোগ নিবারণ জন্য কুষ্ঠাশ্রম, যক্ষ্মাশ্রম, আতুরাশ্রম, কোয়ারাণ্‌টাইন্‌ ও সিগ্রিগেসন্‌ প্রভৃতি নানাবিধ আশ্রম ও আইন জারি হইতেছে। এই সংক্রামক রোগের তথ্য নির্ণয় করিতে গিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন যে, পৃথিবীতে যত প্রকার রোগ আছে, তাহার অধিকাংশই সংক্রামক। এক দেহ হইতে অন্যদেহে যায় বলিয়া সংক্রামক রোগ কখন নূতন হইতে পারে না। ঐ সকল রোগবীজাণু অনাদি কাল হইতে দেহ হইতে দেহান্তরে সঞ্চারিত হইতেছে। কেবল যে রুগ্ন ব্যক্তির দেহে ঐ সকল বীজাণু দেখিতে পাওয়া যায়, এমন নহে। সুস্থ শরীরেও ঐ সকল বীজাণু প্রচ্ছন্নভাবে বাস করে। একারণ কি সুস্থ, কি রুগ্ন সকল ব্যক্তির সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকাই সংক্রামক রোগ হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায়।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে সংক্রামক রোগ সকলের সংক্রমণ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত ছিল। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার হওয়াতে এক্ষণে ইহা পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত ও সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়াছে যে, বীজাণু দ্বারা রোগ এক দেহ হইতে অন্য দেহে সংক্রামিত হয় এবং অধিকাংশ রোগই সংক্রামক। এই সকল বীজাণু বায়ু যোগে, নিশ্বাস প্রশ্বাস সহকারে, বিষ্ঠা, মূত্র, কফ, বমন, নখ, লোম, নিষ্ঠীবন, অন্ন, জল, দুগ্ধ, পরিধেয় বস্ত্র বা ধূলিকণা অথবা মশা মাছি প্রভৃতি জীবগণ দ্বারা আর এক দেহে প্রবেশ করে। জল, স্থল, বায়ু, আকাশ প্রভৃতি সমুদয়ই এই বীজাণু দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এই সকল বীজাণু যে কেবল রোগ উৎপাদন করে, তাহা নহে, পরন্তু সমুদয়

সৃষ্টিকার্য্যই এই সকল বীজাণুদ্বারা সুশৃঙ্খলে ও সুকৌশলে সম্পাদিত হইতেছে। আমাদের অন্ত্রমধ্যে এই সকল বীজাণু অবস্থান করিয়া পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্য করিতেছে, রক্ত মধ্যে অবস্থান করিয়া রক্তকণিকা সকল শোষণ করিতেছে। মূত্রনালীতে অথবা কোষ্ঠ-স্থানে থাকিয়া বিষ্ঠা মূত্র ত্যাগ কার্য্যের সহায়তা করিতেছে। আমাদের শরীরের বহিঃপদার্থ সকলেও সর্ব্বত্র ইহাদের ক্রিয়া লক্ষিত হইতেছে। দধি-বীজাণু দুগ্ধকে দধিতে পরিণত করিতেছে, মদ্যবীজাণু শর্করাকে মদ্যে পরিণত করিতেছে। যখন কোন রুগ্ন ব্যক্তি বিষ্ঠা, মূত্র, নিষ্ঠীবন, শ্লেষ্মা, কর্ণমল বা গাত্রমল ত্যাগ করে, অথবা যদি কোন ব্যক্তি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ বা বমন করে, নখ লোমাদি ছেদন করে, তখন তাহার সেই বিষ্ঠামূত্র, নিষ্ঠীবন প্রভৃতি পদার্থের সহিত এই সকল বীজাণু দেহ হইতে নিষ্কাশিত হইয়া আশ্রয়ের জন্য দেহান্তর অন্বেষণ করে। সূর্য্যালোক বা পরিষ্কার বায়ুতে ইহারা অধিকক্ষণ থাকিলে মরিয়া যায়। আগাছা যেমন অন্য বৃক্ষের আশ্রয় ব্যতীত বাঁচিতে পারে না, রোগোৎপাদনকারী বীজাণুগণও তদ্রূপ দেহের আশ্রয় ব্যতীত বাঁচিতে পারে না। মনুষ্য বা জীবদেহে প্রবেশ করিয়া ইহারা রক্তবীজের ন্যায় বংশ-বৃদ্ধি করিতে থাকে। মনুষ্যদেহের বিভিন্ন ধাতু হইতে রস শোষণ করিয়া এই সকল বীজাণু জীবন ধারণ করে। বীজাণুগণের দেহনিঃসৃত রস অতি বিষাক্ত। ইংরাজীতে ঐ রসকে টক্‌সিন্ বলে এবং আমাদের অথর্ব্ববেদের ভাষায় উহাকে তক্ষন্ বলে। এই বিষ হইতেই রোগের কষ্টদায়ক উপসর্গ-সমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। নানা প্রকার রোগের নানা প্রকার বীজাণু আছে। যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, কুষ্ঠ, কলেরা প্রভৃতি রোগের বীজাণু সকল ভিন্ন ভিন্ন। দেহের মধ্যে আবার এমন অসংখ্য অসংখ্য বীজাণু বাস করিতেছে, যাহারা রোগ বীজাণু সকল নাশ করিতেছে। এই সকল বীজাণু রোগ প্রতি-ষেধক।

এই বীজাণুতত্ত্ব আবিষ্কারের পর হইতে ডাক্তারি চিকিৎসার গতি অন্য দিকে ফিরিয়াছে। প্রাচীনকালের ডাক্তারি পুস্তকসকল আলোচনা কর দেখিবে—চিকিৎসা বা ঔষধের কথায় সেই সকল গ্রন্থ পরিপূর্ণ রহিয়াছে। আর আজকালকার ডাক্তারি গ্রন্থসকল দেখ, দেখিবে যে ঔষধ ও চিকিৎসাকে অকিঞ্চিৎকর বোধে ডাক্তারগণ যাহাতে ঔষধ সেবন ও চিকিৎসা না করাইতে হয়, সেই পথে দিন দিন অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহারা এক্ষণে বুঝিয়াছেন যে, রোগ হইলে ঔষধ বা চিকিৎসা দ্বারা তাহার আরাম করিবার জন্য চেষ্টা করা অপেক্ষা যাহাতে দেহে রোগ প্রবেশ করিতে না পারে, সেইরূপ আচরণ অবলম্বন করাই পরম শ্রেয়ঃ। রোগী বা সুস্থের ব্যবহৃত বস্ত্রাদি পরিধান করা অথবা কাহারও নখ, লোম, কফ, নিষ্ঠীবন না মাড়ান, কাহারও উচ্ছিষ্ঠ ভোজন না করা বা কাহারও আহার্য্য পাত্রসকল বিশেষরূপে শোধন না করিয়া তাহাতে ভোজন করা অথবা গৃহে আবর্জ্জনা না রাখা, কাহারও নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস গায়ে না লাগান, উত্তমরূপ পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন থাকা ইত্যাদি নানা প্রকারের সদাচারের প্রবর্ত্তন ও প্রচলন করাই এক্ষণকার ডাক্তারি পুস্তক সকলের চেষ্টা, এমন কি বিদ্যালয়ে ছাত্রগণের মধ্যে পরস্পর সংক্রমণ হয়, এজন্য

আমেরিকাতে মুক্তবায়ু বিদ্যালয়েরও প্রবর্ত্তন হইতেছে।

ভারতবর্ষের কথা। আমাদের এই আর্য্যক্ষেত্রে পুরাকালে টাইফয়েড্ জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর, ডেঙ্গু, বিউবনিক্, প্লেগ, কলেরা, রাজযক্ষ্মা প্রভৃতি মহামারী সংক্রামক রোগ সকলের প্রাদুর্ভাব এত ছিল না, এমন কি আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আধুনিক অনেক রোগের নামগন্ধও যে জানিতেন না, তাহা প্রাচীন গ্রন্থাদিপাঠে জানা যায়। আমাদের শাস্ত্রে বিশ্বাস না থাকাতে, আমরা সদাচার পরিত্যাগ করায়, রোগাভিসর ভিষক্‌গণের হস্তে এক্ষণে অধিকাংশ ভারতবাসীর চিকিৎসার ভার ন্যস্ত থাকায়, ভারত এক্ষণে দিন দিন রোগে শোকে দুঃখ দারিদ্র্যে মুহ্যমান হইতেছে। এমন কি রোগের জ্বালায় ভারতবাসীর জাতীয় অস্তিত্ব পর্য্যন্তও লোপ পাইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। এক বঙ্গদেশে বৎসর বৎসর ম্যালেরিয়া জ্বরেই দশ বার লক্ষ লোক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। ভারতবর্ষ এক্ষণে পৃথিবীর নানা জাতির কর্ম্মক্ষেত্র হওয়াতে নানা জাতির সমাগমে ও সঙ্ঘর্ষে ভিন্ন ভিন্ন রোগের আবাসস্থল হইয়াছে। ভারতবাসীর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম এক্ষণে ছিন্নমূল হইয়াছে, যে ভারতবাসী আর্য্য পূর্ব্বে স্নান, পান, ভোজন, শয়ন, স্ত্রীগমন, জীবিকার্জ্জন প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়েই সদাচার মানিয়া চলিত, স্পর্শাক্রমের ভয় করিত, আপনার আশ্রম বা বর্ণগণ্ডীর বাহিরে বাজারের কোন দ্রব্য বা কোন লোকের সংস্পর্শ রাখিত না, এক্ষণে সমাজবিপর্য্যস্ত হওয়াতে সেই আর্য্যকে প্রতিদিন পেটের দায়ে যে কত প্রকারে কত লোকের সংস্রব করিতে হইতেছে তাহা বলা যায় না। এক্ষণে আমাদের পান ভোজন শয়ন সকলই বাজারের উপর নির্ভর করিতেছে, এমন কি আমাদের মলমূত্র ত্যাগ তাহাও দশ জনের সঙ্গে একত্র হইয়া না করিলে চলে না, সুতরাং এই গুরুতর সংক্রামক কালে সংক্রামক রোগ নিবারণ জন্য একমাত্র সদাচারই অবলম্বনীয়।

আমাদের বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র সমুদয় শাস্ত্রই সদাচারের কথায় পরিপূর্ণ, চরকাদি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থসকলেও ঔষধ চিকিৎসার আলোচনা অপেক্ষা রোগ প্রতিষেধক সদাচারেরই অধিক আলোচনা এইরূপই হওয়া উচিত। কেন না, সুস্থের স্বাস্থ্যরক্ষা সদাচারের উপরেই নির্ভর করে। যাহাতে আয়ুলাভ করা যায়, তাহাকেই যদি আয়ুর্ব্বেদ বলে, তাহা হইলে সদাচার প্রতিপালনই আয়ুর্ব্বেদের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য। "আচারাল্লভতে হ্যায়ুঃ" সদাচার হইতে আয়ু লাভ করা যায়, এটী সকল শাস্ত্রেরই কথা। আজ কাল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও সংক্রামক রোগ নিবারণ জন্য রাজ্যমধ্যে হাইজীন্ বা সদাচার প্রবর্ত্তনের উদ্দেশে রাজাকে আইন জারী করিতে বলিতেছেন, কিন্তু আমাদের এই বিশ কোটী লোকসমন্বিত আর্য্যক্ষেত্রে বহুপূর্ব্ব হইতে শাস্ত্রের অনুশাসনেই প্রতিদিন প্রতিকার্য্যে সদাচারের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে। আমাদের সমাজকে সদাচারপ্রধান দেখিয়া পূর্ব্বে যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আমাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদেরই বংশধরেরা আজ হিন্দুর সদাচারের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন। মিল্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য ইতিহাসলেখকগণ আমরা সদাচারের অধীন দেখিয়া একদিন লিখিয়াছিলেন, যে অহো! ব্রাহ্মণের কি সৌভাগ্য! ভারতবাসী

কি পরাধীন! খাওয়া শোওয়া সম্বন্ধেও ভারতবাসীকে পরাধীন হইয়া চলিতে হয়। কোন্ দিন কি খাইতে আছে বা নাই, অথবা শৌচক্রিয়ায় কতবার হস্তমৃত্তিকা ব্যবহার করিতে হইবে, এসকল তুচ্ছ বিষয়েও হিন্দুকে ব্রাহ্মণের মুখাপেক্ষী থাকিতে হয়। পরন্তু এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, সদাচারের অভাব হেতুই আমাদের এত রোগ শোক।

ঋষিগণের বীজাণুভাবনা ছিল। আবার এই যে বীজাণু কর্তৃক রোগের সৃষ্টি প্রমাণ করিয়া লোকে ইহাকে নূতন আবিষ্কার বলিয়া মনে করিতেছে, কিন্তু স্মরণাতীত কাল হইতে ঋষিগণ এ তত্ত্ব জানিতেন বলিয়াই আমাদের দেশে শৌচাচারের এত বন্ধন। প্রাতঃকালে উঠিয়াই গৃহিণীগণকে গৃহমার্জ্জন করিতে হইবে, গৃহের আবর্জ্জনা সকল দূর করিতে হইবে, গৃহসকল গোময়দ্বারা উপলেপন করিতে হইবে, বাসন সকল ধৌত করিতে হইবে, কোন বাসনকে বা ভস্ম দিয়া মাজিতে হইবে, তামার বাসনকে যে অম্ল দিয়া মাজিতে হইবে, শৌচাচারের সময় পায়ুদেশ ও হস্তপদ মৃত্তিকা ও জলদ্বারা শোধন করিতে হইবে, স্নানীয় জল যে মাড়াইতে নাই, কফ, মল মূত্রাক্ত দ্রব্য যে স্পর্শ করিতে নাই, পরের পরিহিত বস্ত্রাদি যে পরিধান করিতে নাই, অস্থিসকল যে মাড়াইতে নাই, রৌদ্রে দিলে যে বিছানা মাদুর শুদ্ধ হয়, ইত্যকার আর্য্যসমাজের সমুদয় আচরণের মূলেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিহিত আছে। আর্য্যগণের দেহ শুদ্ধি, দ্রব্য শুদ্ধি, আহার শুদ্ধি, পানীয় শুদ্ধি, ভূমিশুদ্ধি, বস্ত্র শুদ্ধি, সূতিকাশৌচ, স্রাবাশৌচ, জননাশৌচ, মরণাশৌচ প্রভৃতি সমুদায় শুদ্ধি ও অশৌচের মূলে নানা প্রকারের বৈজ্ঞানিক তথ্যসকল নিহিত। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র সমুদয় শাস্ত্র আলোচনা করিলেই দেখা যায় যে, তাঁহারা জীবাণুতত্ত্ব বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। আমরা যে দেবকার্য্য করিবার পূর্ব্বে "অপসর্পন্তু তে ভূতাঃ" বলিয়া ভূতাপসরণ করি, হোমের পূর্ব্বে স্রুক্‌স্রুবাদি অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবার সময় "নিষ্টপ্তা অরাতয়ঃ" অর্থাৎ অরাতিগণকে দগ্ধ করিলাম বলি, শ্রাদ্ধের সময় যে "নিহন্মি সর্ব্বং যদমেধ্যবদ্‌ভবেৎ" অর্থাৎ সমুদয় অপবিত্রতাজনক অসুর দানবাদি নষ্ট করিবার জন্য পিণ্ডপাতিবার স্থান মার্জ্জনা করিতেছি বলি, অথবা কুশণ্ডিকার সময় যে "ইদং ভূমের্ভজামহং" অর্থাৎ হে ভূমি অত্রস্থ শত্রুসকল নাশ কর, আমি তোমার শরণাগত ইত্যাদি বলি, অথবা প্রতিদিন যে সূর্য্যদেবকে "বিশ্বদৃষ্টং অদৃষ্টহা" অর্থাৎ অদৃষ্ট আয়ুরাদিনাশক বলিয়া স্তব করি, অথবা ভোজন করিবার পূর্ব্বে পঞ্চার্দ্র হইয়া ভোজন করি, কেশ ও নখলোমের ভিতর পাপ প্রচ্ছন্ন থাকে বলি যে দ্রব্য স্বাভাবিক মিষ্ট, কিন্তু কালসহকারে অম্লতা প্রাপ্ত হয়, সেই শুক্ত দ্রব্য খাই না, অথবা যাতযাম বা বাসী জিনিষ খাই না ইত্যাকার আমাদের সমুদয় সদাচারের মূলে বীজাণুতত্ত্ব নিহিত আছে। অথচ আধুনিক জড়বাদী পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ন্যায় তাঁহারা জীবাণুকেই রোগসৃষ্টির একমাত্র সর্ব্বেসর্ব্বা কারণ বলেন নাই। তাঁহারা জীবাণুতত্ত্ব অবগত থাকিলেও প্রজ্ঞাপরাধ বা অধর্ম্মকেই রোগোৎপত্তির মূল কারণ বলিয়াছেন।

আধুনিক পণ্ডিতগণ বলেন যে, কলেরার বা প্লেগের বীজাণু দেহে থাকিলেই যে কলেরা বা প্লেগ হইবে, তাহা নহে। পরন্তু বীজাণু

দেহে না থাকিলে যে কলেরা বা প্লেগ হয় না, এইটী সুনিশ্চিত। সুতরাং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বচনানুসারে আমরা দেখিতে পাই যে, বীজাণুর প্রেরণাও অদৃষ্ট বা দৈবাধীন। আমরাও বীজাণুকে সর্ব্বোপরি প্রাধান্য না দিয়া আমরা রোগসৃষ্টির পক্ষে অধর্ম্মকেই প্রধান কারণ বলি। এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের নিয়ন্তা রুদ্রদেবের কোপকেই রোগোৎপত্তির মূল কারণ বলি। যিনি আমাদিগকে রোদন করান বা দুঃখ দেন, তাঁহাকে আমরা রুদ্র বলি। আমাদের শাস্ত্রে রুদ্রকেই সংহারকর্ত্তা বলে। যখন জনপদ অধর্ম্মবহুল হয়, তখন রুদ্রদেবই সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বায়ু, মেঘ, জল, মৃত্তিকা প্রভৃতির বিকৃতি উৎপাদন করিয়া জনপদ ধ্বংস করিয়া থাকেন। এই রুদ্রের দুই মূর্ত্তি, শিবময় ও অশিবময়। যজুর্ব্বেদের রুদ্রাধ্যায়প্রকরণে জানা যায় যে, মহারুদ্রের অনুচরেরাই সূক্ষ্ম রুদ্রগণ। তাঁহারাই মহারুদ্রের আদেশে লোকসকলকে ধ্বংস করিয়া থাকেন। এই সকল চর্ম্মচক্ষুর অগোচর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রুদ্রগণের যেরূপ বর্ণনা আছে, যদিও আধুনিকগণের জীবাণুর সহিত তাহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য নাই, তথাপি বোধ হয় যেন কতকটা সাদৃশ্য আছে। কোথায় অনুবীক্ষণের দৃষ্টি, আর কোথায় বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি।

যাহা হউক, আমরা শাস্ত্রীয় মতে প্রত্যেক বিষয়ের শৌচাশৌচ এবং শুদ্ধিঅশুদ্ধির ক্রমশঃ বিচার করিয়া এই প্রসঙ্গের শেষ করিব এবং সদাচার যে কেবল সুস্থের স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়, এমন নহে, পরন্তু রোগীর রোগোপশমের পক্ষেও যে ইহা প্রধান সহায় তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

শ্রীতেজশ্চন্দ্র বিদ্যানন্দ।

মসূরিকা।

যে কোন জমিতে বীজ বপন করিলেই ফসল হয় না। জমী রীতিমত কর্ষণ করিয়া বীজ বপন করিলে তবে ফসল হয়। আবার বালিতে বা পাথরের উপর বীজ বপন করিলে তাহা কখনই অঙ্কুরিত হয় না, কালে নষ্ট হইয়া যায়। রোগ সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম। রোগের বীজ সকল শরীরে সমান ভাবে রোগ উৎপন্ন করিতে পারে না। কর্ষিত জমির ন্যায় শরীর যদি দূষিত হইয়া থাকে এবং রোগ প্রতিষেধক শক্তি যদি কমিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে রোগবীজ সহজেই রোগ উৎপন্ন করিতে পারে, কিন্তু শরীর সুস্থ; সবল ও নির্ম্মল হইলে এবং রোগ প্রতিষেধক শক্তি প্রবল থাকিলে রোগ উৎপন্ন করিতে পারে না বা সামান্য ভাবে পারে। প্রকৃতির পালনী শক্তি যদি এইরূপে প্রাণিদিগকে রক্ষা না করিত, তাহা হইলে এতদিন রোগাক্রান্ত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইত।

পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, বসন্ত রোগের সংক্রামকতা আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণের সুবিদিত ছিল। তথাপি বসন্ত রোগের নিদান (কারণ) সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে কটু, অম্ল, লবণ ও ক্ষার পদার্থ অতিরিক্ত ভোজন, বিরুদ্ধ ভোজন যেমন মৎস্য ও দুগ্ধ একত্রে ভোজন, পূর্ব্বাহার অজীর্ণ সত্বে ভোজন, দুষ্ট পত্র শাকাদি

দূষিত খাদ্য ভোজন, অতিরিক্ত শাক* সিম প্রভৃতি ভোজন, দুষ্ট জল পান, দুষ্ট বায়ু সেবন প্রভৃতি কারণে বসন্ত রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই নিদান কি? জমির পক্ষে যাহা কর্ষণ, শরীরে রোগোৎপত্তির পক্ষে এই নিদান তাহাই। ঐ সকল দ্রব্য অতিরিক্ত সেবনে শরীরস্থ রক্ত, পিত্ত এবং কফ দূষিত হয়। সেই দূষিত শরীরে রোগবীজ প্রবিষ্ট হইয়া সহজেই রোগ উৎপন্ন করিতে পারে। আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহাকে বাতিক নিদান বলে। বোধ হয় ডাক্তারেরা ইহাকে exciting cause বলিয়া থাকেন।

এই স্থলে নিদানোক্ত আর একটী বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। নিদানে লিখিত হইয়াছে যে "প্রদুষ্ট পবন" বসন্ত রোগের নিদান। দুষ্ট শব্দ প্রয়োগ না করিয়া প্রদুষ্ট শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকের বোধার্থ বলিতে হইতেছে যে, সংস্কৃত ভাষায় বৃথা কোন শব্দের প্রয়োগ করা হয় না। "প্র" উপসর্গের অনেকগুলি অর্থ আছে, সম্ভবত এখানে "অত্যন্ত" অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, কিসের দ্বারা অত্যন্ত দুষ্ট পবন বসন্ত রোগ উৎপন্ন করিয়া থাকে? অতিরিক্ত জলীয় বাষ্প দ্বারা হইলে সর্দ্দি কাস হয়, বসন্ত রোগ হয় না। অত্যন্ত ধূম দ্বারা দূষিত হইলে, শ্বাস কাস হইতে পারে। তবে কিসের দ্বারা দূষিত? বসন্ত রোগের বীজের দ্বারা—এইরূপ মীমাংসাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের মতেও বসন্ত রোগের বীজ বায়ু দ্বারা বাহিত হয়। এই তথ্য যে বহু পূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ অবগত ছিলেন, এতদ্দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

কেহ বলিতে পারেন যে, এক প্রকার হইল বটে, কিন্তু বহু কষ্টে আর বড় অস্পষ্ট। তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখিবেন যে, আর্য্য ঋষিগণ প্রণীত যাবতীয় শাস্ত্রের কি দুরবস্থা। শাস্ত্রের বিমল জ্ঞান এক্ষণে আমাদের অজ্ঞানতায় সমাচ্ছন্ন। জানি না কতদিনে আবার আমরা সে জ্ঞান ফিরিয়া পাইব। শাস্ত্রের সকল তথ্যই এক্ষণে আমাদের নিকট অস্পষ্ট, জানি না কবে আবার তাহা স্পষ্টরূপে আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হইবে।

কোন রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাকে পূর্ব্বরূপ বলে। বসন্ত হইবার পূর্ব্বে প্রবল জ্বর, অত্যন্ত গাত্রবেদনা ও কখন কখন মাথায় যন্ত্রণা হয় এবং শরীর বিশেষতঃ মুখ রক্তাভ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ এই গুলিই দেখা যায়। আয়ুর্ব্বেদে লিখিত হইয়াছে যে, জ্বর, কণ্ডূ, গাত্রভঙ্গ, কার্য্যে অপ্রবৃত্তি, ভ্রম (যেন চাকার উপর চড়িয়া আছি বোধ হওয়া), ত্বকের শোথ, শরীরের বিবর্ণতা এবং নেত্ররোগ হয়। এ স্থলে জানা উচিত যে, পূর্ব্বরূপের সমস্ত লক্ষণই সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। কতকগুলি প্রকাশ

* আয়ুর্ব্বেদের শাক অর্থে "তরকারী" বুঝায়। শাক পাঁচ প্রকার, ১। পত্রশাক—নটে, পালম, প্রভৃতি। ২। পুষ্পশাক—সজিনা ফুল, কুমড়া ফুল, প্রভৃতি। ৩। ফল শাক—লাউ, কুমড়া, বেগুণ প্রভৃতি। ৪। নালশাক—কচু ডাঁটা, লাউ ডাঁটা, পুইডাঁটা প্রভৃতি। ৫। কন্দশাক—ওল, কচু, আলু প্রভৃতি। আয়ুর্ব্বেদ মতে শাক সুখাদ্য নহে।

শাকেষু সর্ব্বেষু নিবসন্তি রোগাঃ। তে হেতবো দেহ বিনাশকাঃ অর্থাৎ শাকে দেহনাশের হেতুভূত রোগ সকল বাস করে। পরে এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাইবে।

পাইয়া থাকে। অপিচ, পূর্ব্বরূপের লক্ষণগুলি যত অধিক আর যত প্রবলভাবে প্রকাশ পায়, রোগ ততই কঠিন হয়। আর যত অল্প ও সামান্যভাবে প্রকাশ পায়, রোগ তত মৃদু হয়। কিন্তু পূর্ব্বরূপ সামান্য ভাবে প্রকাশ পাইবার পর যদি অপর কোন উত্তেজক কারণের সংযোগ ঘটে, তাহা হইলে রোগ প্রবল হইতে পারে।

চিকিৎসাকার্য্যের সৌকর্য্যার্থ বসন্ত রোগের চারিটী অবস্থা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

(১) জ্বরাবস্থা—এই সময় প্রবল জ্বর হয়, কিন্তু গুটি নির্গত হয় না।

(২) নির্গমনাবস্থা—গুটি বাহির হইতে আরম্ভ হইয়া সমস্ত বাহির হওয়া পর্য্যন্ত।

(৩) পক্কাবস্থা—পাকিতে আরম্ভ হইয়া পাকা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত।

(৪) শুষ্কাবস্থা—শুকাইতে আরম্ভ হইয়া শেষ হওয়া পর্য্যন্ত।

ক্রমশঃ প্রত্যেক অবস্থার বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে।

(১) যে সময়ে দেশে বসন্তের প্রকোপ হয়, সেই সময়ে কাহারও জ্বর, গাত্রবেদনা, মস্তকের যন্ত্রণা হইলে এবং মুখ রক্তাভ হইলে বসন্ত হওয়াই সম্ভব। এরূপ ক্ষেত্রে রোগীকে নিবাত স্থানে রাখিবে, জল স্পর্শ করিতে দিবে না এবং উপবাস করাইবে। ক্ষুধা, পিপাসা ও মুখ শোষ থাকিলে এবং বৃদ্ধ ও বালকদিগকে জলসাগু বা জল বার্লি পথ্য দিবে। খদির কাষ্ঠ ১ তোলা ও পীতশাল (অভাবে অনন্তমূল) ১ তোলা /৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া /২ দুই সের থাকিতে নামাইবে এবং শীতল হইলে ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে। খদিরকাষ্ঠ, হরিদ্রা ও বহুবার (অভাবে হরিদ্রা) ঐরূপ নিয়মে সিদ্ধ করিয়া শৌচকার্য্যে প্রয়োগ করিবে। বসন্ত রোগের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পান ও শৌচকার্য্যে এইরূপ জল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বে যে বমন বিরেচনের কথা বলিয়াছি এই অবস্থায় তাহা প্রয়োগ করিবে। রোগী দুর্ব্বল হইলে সহ্যমত অল্প মাত্রায় বমন বিরেচন করাইবে। বমন বিরেচন আদৌ সহ্য না হইলে করোলাপাতার রস দুই তোলা ও হরিদ্রাচূর্ণ এক সিকি একত্র মিশ্রিত করিয়া নিত্য একবার করিয়া সেবন করাইবে। প্রথমে এই সকল নিয়ম পালন করিলে বসন্ত রোগ প্রবল হইতে পারে না। পূয ও বেদনা অল্প হয় এবং উপসর্গ উপস্থিত হয় না।

(২) এই অবস্থায় পথ্য প্রয়োগ রোগীর অবস্থার উপর নির্ভর করে। জ্বরের প্রাবল্য যতদিন থাকে, ততদিন অন্নাহার নিষিদ্ধ। জলসাগু, খৈ, জলবার্লি, কিসমিস, খেজুর, মিষ্ট দাড়িম ও মুগের যূষ পথ্য। জ্বর কমিয়া গেলে বা ছাড়িয়া গেলে অবস্থা ও পরিপাকশক্তি বুঝিয়া পুরাতন চাউলের অন্ন, ছোলা, মুগ বা মসূর দালের যূষ, পলতা, করলা, কাঁকরোল, কাঁচকলা প্রভৃতি পথ্য দেওয়া যাইতে পারে।

এই অবস্থায় প্রথমেই নিম্নলিখিত ঔষধের দুই একটী ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। (১) কুমুরিয়া লতা দুই তোলা ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া আট তোলা থাকিতে নামাইবে। অপর, হিং অল্প ঘৃত সংযোগে লৌহপাত্রে অল্প ভাজিয়া লইবে। পূর্ব্বোক্ত কাথে এই হিংচূর্ণ এক আনা বা দুই আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। (২) জয়ন্তীবীজ এক সিকি বাসি জলে বাটিয়া কিঞ্চিৎ ঘৃত, অল্প

প্রয়োগ করিবে। (৩) সুপারীর মূল এক সিকি পঁচিশটি মরিচের সহিত বাটিয়া বাসি জলের সহিত খাওয়াইবে। (৪) এক সিকি ময়না মূল ২৫টী মরিচের সহিত বাসি জলের সহিত খাওয়াইবে। (৫) এক সিকি নাটা করঞ্জের মূল ২৫টী মরিচের সহিত বাটিয়া বাসি জলের সহিত খাওয়াইবে।

তিন চারি দিন এইরূপ ঔষধ প্রয়োগের পর দোষ ও অবস্থাভেদে চিকিৎসা করিবে। দোষভেদে কিরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা লিখিত হইতেছে।

বাতজ বসন্ত রোগে—স্ফোট অরুণ বা শ্যাম বর্ণ, তীব্রবেদনাযুক্ত ও কঠিন হয় এবং বিলম্বে পাকে। পিত্তজ বসন্ত রোগে—স্ফোট রক্ত, পীত বা কৃষ্ণবর্ণ হয়, উহাতে দাহ ও তীব্র বেদনা থাকে, শীঘ্র পাকে, সন্ধি, অস্থি ও পর্ব্বসমূহে ভঙ্গবৎ বেদনা হয়, তালু, ওষ্ঠ ও জিহ্বা শুকাইয়া যায়, এবং তৃষ্ণা, অরুচি, কাস, কম্প, অস্থিরতা ও অত্যন্ত শ্রান্তি বোধ হয়।

রক্তজ বসন্ত রোগে—মলভেদ, গাত্রভাঙ্গা দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি ও তীব্র জ্বর হয়, চক্ষু লাল হয়, মুখে ক্ষত হয় এবং স্ফোটসকল পিত্তজ বসন্তের ন্যায় লক্ষণযুক্ত হয়।

কফজ বসন্ত রোগে—স্ফোট সকল শ্বেত বর্ণ, স্নিগ্ধ, স্থূল, কণ্ডূযুক্ত ও অল্প বেদনাযুক্ত হয়, বহু পরিমাণে উৎপন্ন হয়, বিলম্বে পাকে, এবং কফ প্রসেক, শরীর আর্দ্র বস্ত্রাবৃতবৎ বোধ হওয়া, মস্তক বেদনা, শরীরের গুরুতা, বমনাভাব, অরুচি তন্দ্রা ও আলস্য উপসর্গ ঘটে।

সন্নিপাতজ (ত্রিদোষজ) বসন্ত রোগে—স্ফোট সকল প্রবালের ন্যায়, পাকা জামের ন্যায়, মসিনার ন্যায় হইতে পারে। সাধারণতঃ চিড়ের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট, বিস্তীর্ণ, নীলবর্ণ, মধ্যস্থলে নীচু ও অত্যন্ত যন্ত্রণাবিশিষ্ট হয়, বিলম্বে পাকে, দুর্গন্ধ স্রাব হয় এবং বহু পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা অসাধ্য। চর্ম্মদল নামক বসন্ত রোগ অরুচি, প্রলাপ, স্তম্ভ এবং কণ্ঠরোধ উপসর্গ ঘটে।

রসরক্তাদি ভিন্ন ভিন্ন ধাতুকে আশ্রয় করিয়া বসন্ত রোগের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পায়, তন্মধ্যে ত্বক্ আশ্রয় করিয়া যে বসন্ত রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাতে জলবুদ্বুদের ন্যায় স্ফোট উৎপন্ন হয় এবং উহা বিদীর্ণ হইলে জলবৎ পদার্থ নিঃসৃত হয়। ইহা অল্প দোষযুক্ত হইয়া থাকে। সাধারণে ইহা জল বসন্ত বা পানিবসন্ত নামে খ্যাত।

বসন্ত রোগের যে চারিটী অবস্থার কথা বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথম অবস্থা ৩।৪ দিন থাকে, তাহার পর প্রথমে কপালে পরে হাতের কব্জির ভিতর দিকে বসন্ত বাহির হয়। ইহার ২।৪ ঘণ্টার মধ্যে মুখে, হাতে পায়ে এবং শরীরের অন্যান্য স্থানে প্রচুর গুটি বাহির হয়। গুটি বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে জ্বর ছাড়িয়া যায় এবং রোগী সুস্থতা বোধ করে। দ্বিতীয় অবস্থা ৩।৪ দিন, ইহার পর তৃতীয় অবস্থা। গুটিগুলি প্রথমে উজ্জ্বল রক্তবর্ণ থাকে। জন্মিবার ২।১ দিন মধ্যে একটু চাপা গোলাকার ফোস্কার ন্যায় হয়। ইহার দুই একদিন পরেই পাকিয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে জ্বর হয়, গুটির ভিতর পূঁয জমে বলিয়া শ্বেতাভ হরিদ্রাবর্ণ দেখায়। তৃতীয় অবস্থা ৩।৪ দিন থাকে। ইহার পর বসন্ত হইবার একাদশ বা দ্বাদশ দিনে গুটি শুকাইতে আরম্ভ হয় এবং জ্বর চলিয়া যায়। ইহাই চতুর্থ অবস্থা। এই অবস্থা ৩।৪ দিন থাকে। সাধারণতঃ বসন্ত রোগ এইরূপ ভাবেই প্রকাশ

পাইয়া থাকে। কিন্তু কখন কখন ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। নিম্নে একটী প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে।

একজন ধনবানের গৃহে চিকিৎসার্থ আহূত হই। রোগী দেখিবার পর সেই বাটীর জনৈক কর্ম্মচারীর ২৪।২৫ বৎসরবয়স্ক পুত্র আসিয়া বলে, দেখুন দেখি, গায়ে এগুলি কি বাহির হইয়াছে? দেখিয়া বসন্ত বলিয়া বোধ হইল এবং তাহাই বলিলাম। সে সময়ে আমি বসন্ত রোগের চিকিৎসা করিতাম না। সেই জন্য বলিলাম যে, এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা কম, আর কাহাকেও দেখাও। তাহারা একজন বসন্ত চিকিৎসককে দেখাইল। সে ব্যক্তি বসন্ত বলিয়া স্থির করিল এবং ঔষধ দিল। ঔষধ লইয়া রোগী দেশে চলিয়া গেল। সেখানে কোনও কিছু হইল না। ৮।১০ দিন দেশে থাকায় অনেকে রহস্য করিয়া বলিল, তোমার চুলকাণী হইয়াছে, অথচ বসন্তের দোহাই দিয়া বাড়ীতে বসিয়া আছ। ইহার ২।১ দিন পরেই রোগী কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল, আসিবার ২।৩ দিন পরে ভয়ঙ্কর বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইল। এই রোগেই তাহার মৃত্যু হয়।

বসন্ত রোগের দ্বিতীয়াবস্থার প্রথমে যে সকল ঔষধ প্রযোজ্য তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়াবস্থার শেষের দিকে নিম্নলিখিত ঔষধসমূহের মধ্যে যে কোন একটী ঔষধ অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে।

(১) রুদ্রাক্ষচূর্ণ এক আনা ও মরিচ চূর্ণ এক আনা বাসি জল সহ সেবন করিলে বসন্ত ভাল হয়।

(২) হরিদ্রাপত্র ও তেতুলপত্র পেষণ করিয়া শীতল জল সহ সেবন করিলে বসন্ত রোগ নষ্ট হয়।

(৩) নিম্বাদি—নিমছাল, ক্ষেৎপাপড়া, আকনাদি, পলতা, কট্‌কী, বাসকছাল, দুরালভা, আমলকী, বেণারমূল, শ্বেতচন্দন ও রক্তচন্দন ইহাদের ক্বাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ত্রিদোষ বসন্ত রোগ নষ্ট হয় এবং যে সকল বসন্ত উঠিয়াই বসিয়া যায়, তাহারা পুনঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

(৩) তৃতীয় অর্থাৎ পক্কাবস্থা—বসন্ত পাকিতে আরম্ভ হইলে শোষক পথ্য ও ঔষধ না দিয়া পুষ্টিকারক ঔষধ ও পথ্য দিবে। এই সময় কিস্‌মিস, দাড়িম, মাষকলায়ের যূষ, ঘৃত, চিনি প্রভৃতি পথ্য দিতে হয়। শোষক ঔষধ দিলে পাকোন্মুখ দোষ শুষ্ক ও অন্তঃপ্রবিষ্ট হইলে রোগ কঠিন হইয়া পড়ে। সেই জন্য পুষ্টিকর, রসবর্দ্ধক, পবিত্র ও লঘুপাক পথ্য দেওয়া উচিত। জ্বর না থাকিলে অন্নপথ্য দেওয়া যাইতে পারে। দুগ্ধ এই সময়ে সুপথ্য।

নিম্নলিখিত ঔষধগুলির যে কোন একটী অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে।

(১) গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, কিসমিস ও ইক্ষুমূল সমান ভাগে মোট দুই তোলা লইয়া ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইবে। অনন্তর ছাঁকিয়া উহার সহিত দাড়িমের রস ও ইক্ষু গুড় দুই তোলা মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। ইহাতে বসন্ত শীঘ্র পাকে এবং বায়ুবৃদ্ধি হইতে পারে না।

(২) কুলের আঁটির শাঁস চূর্ণ এক সিকি দুই তোলা ইক্ষু গুড় সহ সেবন করিলে বসন্ত শীঘ্র পাকে।

(৩) গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, রাস্না, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, রক্তচন্দন, গাম্ভারীফল, বেড়েলার মূল ও বৈচি ইহাদের

ক্বাথ করিয়া বাতজ বসন্ত রোগের পাক কালে প্রয়োগ করিবে।

(৪) কিসমিস, গাম্ভারীফল, খেজুর, পলতা, নিমছাল, বাসকছাল, আমলকী ও দুরালভা ইহাদের ক্বাথে থৈ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পিত্তজ বসন্তেও ইহা প্রযোজ্য।

বসন্ত পাকিতে আরম্ভ করিলেই গোময় ভস্ম গায়ে মাখাইবে। স্ফোটে অত্যন্ত ক্লেদ হইলে পঞ্চবল্কল চূর্ণ করিয়া প্রয়োগ করিবে। এই সময়ে নানা প্রকার উপসর্গ ঘটিয়া থাকে। সেই সকল উপসর্গের চিকিৎসার বিষয় কথিত হইতেছে।

রোগীর পেটফোলা ও পেটে যন্ত্রণা থাকিলে এবং বায়ু কর্তৃক কম্পমান হইলে জাঙ্গল প্রাণীর মাংসের যূষ সৈন্ধব লবণ সংযোগে প্রয়োগ করিবে। অরুচি হইলে দাল বা মাংসের যূষ অম্ল দাড়িমের রস মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

মুখ ও কণ্ঠের মধ্যে বসন্ত হইলে জাতীপাতা, মঞ্জিষ্ঠা, দারুহরিদ্রা, সুপারী, শাঁইগাছের ছাল, আমলকী ও যষ্টিমধুর ক্বাথ করিয়া গণ্ডূষ (আকণ্ঠ মুখে ধারণ) করিতে দিবে। পিপুল ও হরীতকী চূর্ণ মধু সহ সেবন করিলেও কণ্ঠ বিশুদ্ধ হয়। খদিরাষ্টক-পাচনে শোধিত গুগ্‌গুলু এক সিকি প্রক্ষেপ দিয়া সেচন করিলেও উপকার হয়।

চক্ষুতে বসন্ত হইলে গুলঞ্চ ও যষ্টিমধু সমভাগে বাটিয়া একটী পরিষ্কার কাপড়ে বাঁধিবে এবং উহা নিংড়াইয়া চক্ষু মধ্যে রস দিবে। যষ্টিমধু, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, মূর্ব্বা, দারুহরিদ্রার ছাল, নীলোৎপল, বেনার মূল, লোধ ও মঞ্জিষ্ঠা বাটিয়া উপরোক্ত প্রকারে তাহার রস চক্ষু মধ্যে দিলে এবং চক্ষুর পাতার উপর বাটিয়া প্রলেপ দিলে যন্ত্রণা নষ্ট হয়।

শিরীষ, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, শেলু ও বট ইহাদের ছাল সমভাগে বাটিয়া ঘৃত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে জ্বালা নিবারিত হয়। তেলাকুচার পাতার রস কাঁচা হলুদ একত্র ছেঁচিয়া তাহার রস লাগাইবে; এই ঔষধটী বিশেষ পরীক্ষিত। ডাক্তারী লোশন বোতল বোতল ব্যবহার করিয়া যেখানে ফল হয় না, সেখানে এই সামান্য ঔষধ দ্বারা বিশেষ ফল হয়। জ্বালা নিবারিত হয়। তণ্ডুলোদক দ্বারা পুনঃ পুনঃ ভিজাইলে পদের জ্বালা নিবারণ হয়।

বসন্ত পাকিবার সময় হইতে শুষ্ক না হওয়া পর্য্যন্ত ধূম প্রয়োগ কর্ত্তব্য। বচ, ঘৃত, বাঁশের নীল, বাকস্‌মূল, কাপাস বীজ, ব্রাহ্মী শাক, তুলসী, আপাং ও লাক্ষা সমভাগে লইয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া রোগীর শরীরে ধূম লাগাইবে। সরল কাষ্ঠ, অগুরু ও গুগ্‌গুলু দগ্ধ করিয়া সেই ধূম রোগীর গাত্রে লাগাইলে ক্ষত বিশুদ্ধ হয়, যন্ত্রণা কমিয়া যায় এবং ক্ষতে ক্রিমি হইতে পারে না।

নিম্নলিখিত কয়েকটী পাচন বসন্ত রোগের দ্বিতীয় অবস্থা হইতে শেষ পর্য্যন্ত সেবন করা যাইতে পারে। কোন কোনটী দ্বিতীয় অবস্থায় প্রয়োগ করা চলে। খদিরাষ্টক—খদির কাষ্ঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নিমপাতা, পলতা, গুলঞ্চ ও বাসক ছাল; ইহাদের ক্বাথ বসন্তরোগ নাশক।

অমৃতাদি—গুলঞ্চ, বাসকছাল, পল্‌তা, মুতা, ছাতিমছাল, খদিরকাষ্ঠ, অনন্তমূল, নিমপাতা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা; ইহাদের ক্বাথ।

পটোলাদি—পল্‌তা, গুলঞ্চ, মুতা, বাসক-

ছাল, দুরালভা, চিরতা, নিমছাল, কট্‌কী ও ক্ষেতপাপড়া; ইহাদের কাথ পান করিলে অপক্ক বসন্ত প্রশমিত হয় এবং পক্ক বসন্ত শুষ্ক হইয়া যায়।

রক্তাশ্রয়ী বসন্ত রোগে নাসিকা, চক্ষু, মল দ্বার, ফুসফুস প্রভৃতি স্থান হইতে রক্তপাত হইয়া থাকে। দাড়িম ফুলের রস, দূর্ব্বাঘাসের রস, আমের কোশীর রস এবং জল বা দুগ্ধ সহ মিশ্রিত চিনি ইহাদের যে কোন একটী দ্রব্যের নাস লইলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবারিত হয়। কর্ণ বা চক্ষু দিয়া রক্তস্রাব হইলেও ঐ সকল দ্রব্যের কোন একটি প্রয়োগ উচিত। মুখ দিয়া রক্তনির্গত হইলে বাসক পাতার রস মধু ও চিনির সহিত, যজ্ঞডুম্বুরের রস মধুর সহিত, রক্তকাঞ্চন ফুল মধুর সহিত, শিমুলফুল চূর্ণ মধুর সহিত; ইহাদের যে কোন একটি যোগ প্রয়োগ করিবে। মলদ্বার দিয়া রক্তস্রাব হইলে খোসাহীন কৃষ্ণতিল বাটা আধ তোলা ও চিনি আধ তোলা ছাগদুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে। কাঁটানটের মূল বাটিয়া চেলুনী জলের সহিত সেবন করিলেও রক্তস্রাব নিবারিত হয়। মূত্র দ্বার দিয়া রক্ত নির্গত হইলে কুশ, কাশ, শর, উলু ও ইক্ষু; ইহাদের মূলের কাথ প্রয়োগ করিবে।

যে স্থান দিয়াই রক্ত নির্গত হউক নিম্নলিখিত পথ্য হিতকর। কিসমিস, খেজুর, মউয়াফুল, ও ফল্‌সাফল মোট সিদ্ধ করিয়া আধ সের থাকিতে নামাইবে। অনন্তর ছাকিয়া লইয়া সেই কাথে খৈচূর্ণ ৪তোলা এবং কিঞ্চিৎ ঘৃত, মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া আহার করিতে দিবে। অন্ত দ্রব্য না পাইলে কেবল কিসমিস সিদ্ধ করিয়া ঐরূপ দেওয়া যাইতে পারে। প্রবল জ্বরে বা পেটের দোষ থাকিলে ঘৃত দেওয়া উচিত নহে।

প্রবল বসন্ত রোগে অনেক সময়ে বিকার উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় সুচিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করান কর্ত্তব্য। এই অবস্থায় জ্বর-বিকারের চিকিৎসা করিতে হয়। রোগীর শ্বাস, কাস, পার্শ্ববেদনা, তন্দ্রাধিক্য থাকিলে দশমূল, চতুর্দ্দশাঙ্গ বা অষ্টাদশাঙ্গ পাচন এবং কস্তুরীভূষণ, কস্তুরীভৈরব, পঞ্চানন রস প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। বুকে শ্লেষ্মা বসিয়া শ্বাসকষ্ট বা বাক্‌রোধ হইলে বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বে ক্রমাগত গমের ভূষির পুলটিস দিবে। চরম অবস্থায় প্রতাপলঙ্কেশ্বর, সূচিকাভরণ প্রভৃতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। নাড়ী ক্ষীণ এবং দেহ শীতল হইলে প্রথমে মকরধ্বজ ১ রতি, মৃগনাভি ১ রতি এবং কর্পূর ১ রতি মধু সহ মাড়িয়া ১ঘণ্টা বা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর ৩।৪ বার খাওয়াইবে। তাহাতে কাজ না হইলে পূর্ব্বোক্ত সর্পবিষঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

(৪) ক্ষত শুষ্ক হইতে আরম্ভ করিলে রোগীর অবস্থা বুঝিয়া শোষক পথ্য দিবে। জ্বর না থাকিলে এবং ক্ষুধা হইলে পুরাতন চাউলের অন্ন, মসূর, অড়হর ও বুটের দালের যুষ, নিমপাতা, সজিনা ডাঁটা, পটোল, পল্‌তা, উচ্ছে, কাঁচকলা, কাঁকরোল প্রভৃতি পথ্য। দুগ্ধ, মিষ্টদ্রব্য, কলায়ের দাল প্রভৃতি নিষিদ্ধ। প্রায়ই বসন্ত রোগের শেষে সর্দ্দি কাসি হয়। সর্দ্দি কিম্বা কাসি থাকিলে দুই বেলা অন্ন না দিয়া এক বেলা রুটী দিবে। রোগী অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িলে এবং অত্যন্ত বায়ু প্রকোপ থাকিলে পায়রা ও ডাক পাখীর মাংস বা জাঙ্গল মাংসের যুষ সৈন্ধব লবণ সংযোগে পথ্য দিবে।

এই সময়েও রোগীর গৃহে ধূপ দেওয়া চলিবে এবং নিমপাতা ও কাঁচা হলুদ শিলায় বাটিয়া রোগীর শরীরে প্রলেপ দিবে। যত দিন খোলস উঠিয়া না যায় ততদিন প্রলেপ দেওয়া উচিত। হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বেনার মূল, শিরীষ ছাল, মুতা, লোধছাল, শ্বেতচন্দন ও নাগকেশর জলসহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলেও উপকার হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বসন্তরোগের শেষে অনেক সময়ে কাস হয়। কাসের জন্য নিম্নলিখিত মুষ্টিযোগের যে কোন একটী প্রয়োগ করিবে।

(১) একটি বহেড়া ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া গোবরের ঠুলিতে পুরিয়া ঘুঁটের আগুণে পোড়াইবে। অনন্তর উহা উদ্ধৃত ও বীজ-রহিত করিয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ মধুসহ লেহন করিলে কাস ভাল হয়।

(২) হরীতকী, শুঁঠ ও মুতা সমভাগে চূর্ণ করিয়া সমস্ত চূর্ণের সমান ইক্ষুগুড়ের সহিত মাড়িয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা মুখে রাখিয়া চুষিয়া খাইলে কাস ও শ্বাস নষ্ট হয়।

(৩) পিপুল, শুঁঠ, খেজুর, খৈ, কিসমিস ও চিনি সমপরিমাণে একত্রে বাটিয়া এক সিকি মাত্রায় কিঞ্চিৎ মধুসহ সেবন করিলে কাস নষ্ট হয়।

(৪) পিপুল, রক্তকাষ্ঠ, লাক্ষা ও বৃহতী ফল সমভাগে চূর্ণ করিয়া দুই আনা মাত্রায় কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধুসহ সেবন করিলে কাস নষ্ট হয়।

বসন্তরোগের শেষে মুখে, মণিবন্ধে, কনুইয়ে এবং স্কন্ধের নিম্নে শোথ হইলে প্রথমে তাহাতে জোঁক লাগাইয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। পরে নিম্নলিখিত যোগের কোন একটী প্রয়োগ করিবে।

(১) তিল তৈলে বিছা ভাজিয়া প্রলেপ দিলে ঐ শোথ ভাল হয়।

(২) শেওড়া গাছের ছাল কাঁজির সহিত বাটিয়া ঘৃতসংযোগে প্রলেপ দিলে শোথ নষ্ট হয়।

(৩) বট, অশ্বত্থ, যজ্ঞডুম্বুর, পাকুড় ও বেতসের ছাল বাটিয়া ঘৃতসংযোগে প্রলেপ দিলে শোথ নষ্ট হয়।

(৪) পুনর্নবা, সজিনা ছাল, দেবদারু ছাল, গাম্ভারী ছাল, বেল ছাল, শোণাছাল, পারুল ছাল, গণিয়ারী ছাল, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর ও শুঁঠ বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলে শোথ ভাল হয়।

বসন্ত রোগ ভাল হইবার পর রোগীর বল জননার্থ লঘুপাক ও পুষ্টিকর সুপথ্য দিবে। বেশ সবল না হওয়া পর্য্যন্ত সাবধানে রাখিবে। বসন্তের দাগ ও গর্ত্ত মিলাইবার জন্য শঙ্খভস্ম ডাবের জলে মাখিয়া ঘর্ষণ করিবে। কালীয় কাষ্ঠ, প্রিয়ঙ্গু, আমের আঁটির শাঁস, নাগকেশর ও মঞ্জিষ্ঠা গোময় রসে বাটিয়া ঘৃতসংযুক্ত করিয়া প্রলেপ দিলে ব্রণস্থান ত্বকের সমান বর্ণবিশিষ্ট হয়।*

কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মিলে বা ভালরূপ কোষ্ঠ শুদ্ধি না হইলে হরীতকী এক তোলা ও সৈন্ধব এক সিকি সেবন করিলে অথবা তেউড়ীমূল চূর্ণ তিন চার আনা ও চিনি দুই আনা মিশাইয়া গরম জল সহ পান করিলে কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া থাকে। প্রবল গা বমি বমি থাকিলে ব্রাহ্মী শাকের রস এক ছটাক অথবা হেলেঞ্চার রস এক ছটাক কিঞ্চিৎ মধুসহ সেবন করিয়া বমন করিবে।

* অতঃপর যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা প্রবন্ধের প্রথমে সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত ছিল মুদ্রাকর প্রমাদবশাৎ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে।

লবণ মিশ্রিত গরম জল বা এক সিকি সর্ষপ চূর্ণ গরম জল সহ সেবন করিলেও বমন হয়। বমন বা বিরেচনের পরে সেইদিন কোনরূপ গুরুপাক খাদ্য আহার না করিয়া জলসাগু বা জলবার্লি খাইয়া থাকা ভাল। পরদিন শরীরের অবস্থা বুঝিয়া লঘুপাক আহার করা কর্ত্তব্য। শরীর ভারি বা ম্যাজম্যাজে হইলে অসুস্থভাব দূর হইয়া ক্ষুধার উদ্রেক না হওয়া পর্য্যন্ত লঙ্ঘন দেওয়া কর্ত্তব্য। জ্বরভাব হইলে উপবাস করা উচিত। উভয় অবস্থাতেই স্নান বন্ধ রাখা উচিত। এই সকল নিয়ম পালন করিলে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইবার ভয় খুব কম।

চতুর্দ্দিকে বসন্ত রোগের বা যে কোন সংক্রামক রোগের প্রাবল্য ঘটিলে এবং মহামারীর সময় সেই স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাওয়া সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ।

বসন্তের প্রাবল্যের সময় জ্বর হইলে প্রথম হইতে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। নিবাত স্থানে অবস্থান ও উপবাস নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বমির ভাব থাকিলে পূর্ব্বোক্ত উপায়ে বমন করা এবং কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে বিরেচক ঔষধ সেবন করা উচিত। ইহাতে রোগীর জ্বর হইলেও কখনই মারাত্মক হইতে পারে না।

শাস্ত্রোক্ত বসন্ত রোগের প্রতিষেধক কয়েকটী ঔষধ নিম্নে লিখিত হইয়াছে।

(১) নিমের বীজের শাঁস দুই আনা, বহেড়ার বীজের শাস দুই আনা ও হরিদ্রা দুই আনা পেষণ করিয়া শীতল জলসহ সেবন করিলে বসন্ত রোগ হয় না। (২) মোচার রস শ্বেতচন্দন বাটার সহিত, (৩) বাসকের রস যষ্টিমধু চূর্ণের সহিত, (৪) জাতি ফুলের পাতার রস যষ্টিমধু চূর্ণের সহিত সেবন করিলে বসন্ত রোগে আক্রান্ত করিতে পারে না।

বসন্ত রোগ যে সময়ে হয়, সেই সময়ে নিমপাতা এবং সজিনার ডাঁটা নিত্য আহার করা কর্ত্তব্য। বসন্ত রোগ পিত্তশ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ হয়। আর নিমপাতা ও সজিনার ডাঁটা পিত্তশ্লেষ্মানাশক। সুতরাং বসন্ত রোগের উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক। ইহা পরীক্ষিত।

আয়ুর্ব্বেদে মাংস ব্যবহার বিধি।

কবিরাজমহাশয় রোগীকে মাংস যূষ ব্যবস্থা করিলেন। রোগী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, সে কি কবিরাজমহাশয়, ডাক্তারেই ত মাংসের যূষ পথ্য দেয়! আপনারা ডাক্তারের নকল করিতেছেন দেখিতেছি! কি বিড়ম্বনা! আয়ুর্ব্বেদে যত মাংসের ব্যবহার আছে এত আর কোথায়ও নাই, অথচ লোকের এইরূপ ভ্রমাত্মক ধারণা! এই ভ্রম সংশোধন করিবার আশায় আমরা আজ পাঠকগণকে আয়ুর্ব্বেদোক্ত মাংস ব্যবহার বিধি উপহার দিতেছি।

জলচর, আনূপ (জল সমীপে বিচরণকারী), গ্রাম্য, মাংসাশী, একশফ (জোড়াক্ষুর) ও জাঙ্গলভেদে মাংস ছয়প্রকার। এই সকল মাংস উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ জলচর অপেক্ষা আনূপ, আনূপ অপেক্ষা গ্রাম্য, গ্রাম্য অপেক্ষা মাংসাশী, মাংসাশী অপেক্ষা একশফ এবং একশফ অপেক্ষা জাঙ্গল মাংস শ্রেষ্ঠ।

ইহারা আবার জাঙ্গল ও আনূপ ভেদে দুইপ্রকার। তন্মধ্যে জাঙ্গল মাংস আট প্রকার, যথা, জঙ্ঘাল, বিষ্কির, প্রতুদ, গুহাশয়, প্রসহ, বর্ণমৃগ, বিলেশয় ও গ্রাম্য। ক্রমশঃ প্রত্যেকের বিষয় কথিত হইতেছে।

জঙ্ঘাল—এণ (কৃষ্ণহরিণ), হরিণ (গৌর হরিণ), ঋষ্য (শ্বেতবর্ণপদযুক্ত হরিণ), কুরঙ্গ (ঈষৎ তাম্রবর্ণ বৃহৎ হরিণ), করাল (কস্তুরী মৃগ, ইহাদিগের নাভিতে কস্তুরী বা মৃগনাভি হয়), কৃতমাল একপ্রকার হরিণ (ইহারা দলে দলে বিচরণ করে) প্রভৃতিকে জঙ্ঘাল বলে। ইহারা বৃহৎ জঙ্ঘাবিশিষ্ট বলিয়া ঐ নামে আখ্যাত হইয়াছে। ইহাদের মাংসের সাধারণ গুণ যথা,—কষায়রসবিশিষ্ট মধুর রস, লঘুপাক, বাতপিত্তনাশক, তীক্ষ্ণবীর্য্য, তৃপ্তিকারক এবং মূত্রাশয়শোধক। অনাবশ্যক বিবেচনায় প্রত্যেকের পৃথক্ গুণ লিখিত হইল না। মূত্রাশয়শোধক বলিয়া ইহাদের মাংস অশ্মরী (পাথরী), শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত প্রভৃতি রোগে হিতকর।

বিষ্কির—তিত্তির, বটের, চকোর, ময়ূর, কুক্কুট প্রভৃতি পক্ষী চরণ ও চঞ্চু দ্বারা ছড়াইয়া আহার করে বলিয়া উহাদিগকে বিষ্কির বলে। ইহাদের মাংসের সাধারণ গুণ, যথা,—কষায়রসসংযুক্ত মধুর রস, লঘুপাক, শীতবীর্য্য এবং ত্রিদোষনাশক। কুক্কুটের মাংস স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক, শুক্রবর্দ্ধক, ঘর্ম্মজনক, স্বরপরিষ্কারক, বলবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, গুরুপাক এবং বায়ুরোগ, ক্ষয়, বমি ও বিষমজ্বরনাশক।

প্রতুদ—পারাবত, বন্য পারাবত, কোকিল, গ্রাম্য চটক, কাদাখোঁচা, খঞ্জন, ডাকপাখী প্রভৃতি আছড়াইয়া আহার করে বলিয়া উহাদের নাম প্রতুদ। ইহাদের মাংসের সাধারণ গুণ, যথা,—কষায় রসযুক্ত, মধুর রস, রুক্ষ, বায়ুবর্দ্ধক, পিত্তশ্লেষ্মনাশক, মূত্ররোধক এবং মলের অল্পতাকারক। ইহাদের মধ্যে পারাবতের মাংস রক্তপিত্তনাশক, কষায় রস, মধুর বিপাক এবং গুরু। রাজনিঘণ্টুর মতে পারাবতের মাংস বলবীর্য্যবর্দ্ধক, কফ, পিত্ত ও রক্ত দোষনাশক। রাজবল্লভের মতে উহা বাতপিত্তনাশক। পারাবতমাংস সম্বন্ধে বিভিন্ন মত উদ্ধৃত করিবার কারণ এই যে, শাস্ত্রের একাংশ দেখিয়া কোন বিষয়ের বিচার করা চলে না। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, পারাবতের মাংস সমস্ত মাংসের তুল্যগুণবিশিষ্ট। অন্য কোন বাদ্য না থাকিলে যেমন এক সর্ব্ববাদ্যময় ঘণ্টা দ্বারা পূজা নির্ব্বাহ হয়, সেইরূপ অন্য কোন মাংসের অভাব ঘটিলে পারাবতের মাংস দ্বারা তাহার কাজ চলে। কিছুকাল পূর্ব্বে কবিরাজেরা দুর্ব্বল রোগীর জন্য পায়রার পিলের যূষ (শাবকের) যূষ ব্যবস্থা করিতেন। এক্ষণে মুরগীর পিলে পায়রার পিলের স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মুরগীর মাংস এখনও সমাজে সুপ্রচলিত হয় নাই। সুতরাং কুক্কুট-মাংসরসে বঞ্চিত রোগীকে পায়রার পিলের যূষ দেওয়া যাইতে পারে। প্রতুদ মাংসের স্বরবর্দ্ধক শক্তি নাই। সুতরাং সুস্বরকামী ব্যক্তির কোকিল পোড়াইয়া খাওয়া বৃথা চেষ্টা মাত্র। প্রতুদ মাংসের মধ্যে চটকের মাংস এবং ডিম্ব অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক সুতরাং অল্প ও ক্ষীণশুক্র ব্যক্তিগণের পক্ষে পরম হিতকারী।

গুহাশয়—সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, নেকড়ে বাঘ, শৃগাল প্রভৃতি যে সকল জন্তু গুহায় বাস করে তাহাদিগকে গুহাশয় বলে।

ইহাদিগের মাংসের সাধারণ গুণ, যথা—মধুর রস, গুরু, স্নিগ্ধ, বলকর, বায়ুনাশক, উষ্ণবীর্য্য এবং চক্ষু ও গুহ্যরোগে বিশেষ হিতকর।

প্রসহ—কাক, বাজ, পেঁচা, চিল, শিকরে, শকুন প্রভৃতি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করে বলিয়া ইহাদিগকে প্রসহ বলে। ইহাদের মাংস গুহাশয় প্রাণীর মাংসের ন্যায় গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ ক্ষয়রোগীর পক্ষে পরম হিতকর।

পর্ণমৃগ—মলয় সর্প, গেছো ইন্দুর, কাঠবিড়ালী, বানর প্রভৃতি বৃক্ষে বাস করে বলিয়া ইহাদিগকে পর্ণমৃগ বলে। ইহাদের মাংসের সাধারণ গুণ, যথা,—মধুর রস, গুরু, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর, ক্ষয়রোগীর হিতকর, কাস-শ্বাস-অর্শঃ-নাশক এবং মলমূত্রনিঃসারক।

বিলেশয়—শজারু, গোসাপ, বনবিড়াল-শশক (খরগোস), সর্প, ইন্দুর, বেজী (নেউল) প্রভৃতি বিলে অর্থাৎ গর্ত্তে বাস করে বলিয়া উহাদিগকে বিলেশয় বলে। ইহাদের মাংসের সাধারণ গুণ, যথা,—মলমূত্রের ঘনত্বসম্পাদক, উষ্ণবীর্য্য, মধুর বিপাক, বায়ুনাশক, শ্লেষ্মপিত্তবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ এবং কাস, শ্বাস, ও কৃশতানাশক। ফণাযুক্ত সর্পের মাংস চক্ষুর পরম হিতকর। আশা করি, চক্ষুরোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

গ্রাম্য—অশ্ব, অশ্বতর (খচ্চর), গো, উষ্ট্র, ছাগ, মেষ এবং মেদ, পুচ্ছক (দুম্বা) প্রভৃতি গ্রামে বাস করে বলিয়া উহাদিগকে গ্রাম্য বলে। ইহাদিগের মাংসের সাধারণ গুণ যথা,—বায়ুনাশক পুষ্টিকারক, কফপিত্তবর্দ্ধক, মধুর রস, মধুর বিপাক, অগ্নিদীপক এবং বলবর্দ্ধক। তন্মধ্যে ছাগমাংস নাতিশীতল, গুরু, স্নিগ্ধ, অম্ল, পিত্ত ও কফবর্দ্ধক, অনভিষ্যন্দি এবং পীনসনাশক। বাগ্‌ভটের টীকাকার অরুণদত্ত বলিয়াছেন—ছাগমাংস মানুষের শরীরধাতুর সমান বলায় এই ভঙ্গীতে মনুষ্যমাংসের গুণ ব্যাখ্যা করা হইল। এই বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ আর্য্য জাতি নরখাদক ছিলেন বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন।

মেষমাংস—পুষ্টিকর, পিত্তশ্লেষ্মবর্দ্ধক, এবং গুরু। একক্ষুরবিশিষ্ট প্রাণীর মাংস মেষমাংসের সমানগুণবিশিষ্ট ও ঈষৎ-লবণরসাত্মক।

এই সমস্ত জাঙ্গল মাংস অল্প অভিষ্যন্দি। *
যে সকল পশুপক্ষী লোকালয় এবং জলাশয় হইতে দূরে বিচরণ করে তাহাদের মাংস অল্প অভিষ্যন্দি। আর যে সকল পশুপক্ষী লোকালয় বা জলাশয়ের নিকটে বাস করে তাহাদিগের মাংস অত্যন্ত অভিষ্যন্দি হইয়া থাকে।

আট প্রকার জাঙ্গল মাংসের বিষয় বলা হইল। এক্ষণে আনূপ মাংসের বিষয় কথিত হইতেছে।

আনূপমাংস পাঁচ প্রকার। যথা, কূলচর, প্লব, কোশস্থ, পাদি এবং মৎস্য। ক্রমশঃ ইহাদিগের বিষয় লিখিত হইতেছে।

কূলচর—হস্তী, মহিষ, শূকর, গণ্ডার, গুন্দ (ভোঁদড়) প্রভৃতি পশু জলাশয়তীরে বিচরণ করে বলিয়া উহাদিগকে কূলচর বলে। ইহাদের মাংসের সাধারণ গুণ, যথা, বাতপিত্তনাশক, শুক্রবর্দ্ধক, মধুর রস, মধুর বিপাক, শীতবীর্য্য, বলকারক, মূত্রকারক এবং কফ-

* যে সকল দ্রব্য গুরু ও পিচ্ছিল বলিয়া স্বেদবাহী শিরাসকলকে রুদ্ধ করিয়া শরীরের গুরুত্ব জন্মায় তাহাদিগকে অভিষ্যন্দি বলে। যেমন দধি।

বর্দ্ধক। বরাহমাংস—ঘর্ম্মকারক, পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, ধাতুবর্দ্ধক, গুরু, স্নিগ্ধ, বায়ুনাশক এবং বলকারক। প্লব—হংস, সারস, কলহংস, বক, পানকৌড়ী প্রভৃতি পক্ষী জলে ভাসিয়া থাকে বলিয়া উহাদিগকে প্লব বলে। এই সকল পক্ষী প্রায় দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। ইহাদিগের মাংসের সাধারণ গুণ যথা, রক্তপিত্তনাশক, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, মলমূত্রনিঃসারক, মধুর রস ও মধুর বিপাক *। তন্মধ্যে হংসের মাংস গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, মধুর রস, স্বরপরিষ্কারক, বর্ণের ঔজ্জ্বল্যসম্পাদক, বল ও পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক এবং বায়ুনাশক।

কোশস্থ—শঙ্খ, ঝিনুক, শম্বুক ও গুগ্‌লি কড়ি প্রভৃতি যে প্রাণীর শরীর কোশের (কঠিন আবরণ) মধ্যে থাকে তাহাদিগকে কোশস্থ বলে। ইহাদের মাংসের সাধারণ গুণ যথা, মধুর রস, মধুর বিপাক, বায়ুনাশক, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, পিত্তের হিতকারক, মলনিঃসারক এবং শ্লেষ্মবর্দ্ধক।

পাদী—কচ্ছপ, কুম্ভীর, কাঁকড়া, কৃষ্ণবর্ণ কাঁকড়া, শুশুক প্রভৃতির পদ আছে বলিয়া উহাদিগকে পাদী বলে। ইহাদিগের মাংস কোশস্থ প্রাণীর মাংসের ন্যায় গুণবিশিষ্ট।

মৎস্য—মৎস্য নানা প্রকার এবং তাহাদিগের মাংসের গুণও নানা প্রকার। সাধারণতঃ নাদেয় মৎস্যে মাংসের গুণ, যথা, মধুর রস, গুরুপাক, বায়ুনাশক, রক্তপিত্তজনক, উষ্ণবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ এবং মলের অল্পতাকারক। পুষ্করিণী ও দীর্ঘিজাত মৎস্য মধুর রস ও স্নিগ্ধ; মহাহ্রদজাত মৎস্যসকল অত্যন্ত বলকারক এবং অল্পজলজাত মৎস্য তত বলকর নহে।

তিমি, তিমিঙ্গিল, গাগরা, চাঁদা প্রভৃতি সমুদ্রজাত মৎস্যের মাংস গুরুপাক, স্নিগ্ধ, মধুর রস; অল্পপিত্তবর্দ্ধক, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক, শুক্রবর্দ্ধক, মলনিঃসারক এবং কফবর্দ্ধক। ইহারা মাংস ভক্ষণ করে বলিয়া অত্যন্ত বলকারক। সমুদ্রজাত মৎস্য অপেক্ষা চুটী (ডোব) ও কূপজাত মৎস্য অধিকতর বায়ুনাশক বলিয়া উৎকৃষ্ট। বাপী (ক্ষুদ্র পুষ্করিণী) জাত মৎস্য সকল স্নিগ্ধ এবং মধুর রস বলিয়া পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার মৎস্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। নদীজাত মৎস্য মুখ ও পুচ্ছদ্বারা বিচরণ করে বলিয়া উহাদের মধ্যদেশ গুরুপাক। সরোবর ও তড়াগ (বৃহৎ পুষ্করিণী) জাত মৎস্যের মস্তক (মুড়া) লঘুপাক। বক্ষঃস্থল দ্বারা বিচরণ করে বলিয়া সরোবরজাত মৎস্যের পূর্ব্বভাগ লঘু এবং অধোভাগ গুরু। পর্ব্বতের ঝরণার মৎস্য অত্যন্তঅল্পপরিশ্রমী বলিয়া উহাদিগের মস্তকের কিয়দংশ ব্যতীত সমস্তই গুরুপাক।

আনুপ জাতীর মাংস অত্যন্ত অভিষ্যন্দি।

চতুষ্পদ পশুর স্ত্রীজাতির মাংস এবং পক্ষীদিগের পুরুষজাতির মাংস উৎকৃষ্ট। বৃহৎকায় প্রাণীর মধ্যে যাহাদের শরীর ক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্রকায় প্রাণীর মধ্যে যাহাদের শরীর বৃহৎ তাহাদের মাংস উৎকৃষ্ট।

রক্ত হইতে মজ্জা পর্য্যন্ত ধাতু উত্তরোত্তর গুরু, অর্থাৎ রক্ত অপেক্ষা মাংস, মাংস অপেক্ষা মেদ, মেদ অপেক্ষা অস্থি,† এবং অস্থি অপেক্ষা মজ্জা গুরুপাক। সক্‌থি (উরুদেশ), স্কন্ধ, ক্রোড়

* জঠরানলসংযোগে ভুক্ত দ্রব্যের যে রসান্তর ঘটে তাহাকে বিপাক বলা যায়।

† অস্থি অর্থে সমস্ত হাড় চিবাইয়া খাইতে বলা হয়। তরুণাস্থির (Cartilaje) কথাই বলা হইয়াছে বোধ হয়।

মস্তক, পদ, হস্ত (সম্মুখের পদ), কটী, পৃষ্ঠ, বৃক্ক (Kidney), যকৃৎ (মেটে) এবং অন্ত্র উত্তরোত্তর গুরুপাক। (সক্‌থি অপেক্ষা স্কন্ধ, স্কন্ধ অপেক্ষা ক্রোড় ইত্যাদি। স্কন্ধ অপেক্ষা মস্তক; পৃষ্ঠ অপেক্ষা কটীদেশ এবং পশ্চাতের সক্‌থি (বায়) অপেক্ষা সম্মুখের সক্‌থি গুরুতর।

সকল প্রাণীরই দেহের মধ্যভাগ গুরুপাক। পুরুষ জাতির দেহের সম্মুখ ভাগ এবং স্ত্রী জাতির দেহের পশ্চাৎ ভাগ গুরু। বিশেষতঃ পক্ষীদিগের উরু ও গ্রীবা গুরু, এবং পক্ষ উৎক্ষেপণ হেতু উহাদের শরীরের মধ্যভাগ মধ্যম অর্থাৎ লঘুও নয় গুরুও নয়। ফলভক্ষক পক্ষীদিগের মাংস অত্যন্ত রুক্ষ, মৎস্য ভক্ষক পক্ষীদিগের মাংস অত্যন্ত পিত্তকর, এবং ধান্য ভক্ষক পক্ষীদিগের মাংস অত্যন্ত বায়ুনাশক।

জলচর, উভচর, গ্রামবাসী, মাংসাশী, একশফ, প্রসহ, বিলেশয়, প্রতুদ ও বিষ্কির ইহাদিগের মাংস উত্তরোত্তর লঘু এবং অল্প অভিষ্যন্দী। স্ব স্ব জাতির মধ্যে যে প্রাণী বৃহৎ শরীর বিশিষ্ট তাহার মাংস গুরুপাক, এবং অল্পসারবিশিষ্ট বলিয়া জানিবে। সমুদায় প্রাণীরই যকৃতের নিকটবর্ত্তী স্থানের মাংস প্রধানতম। তদভাবে মধ্যবয়স্ক, অক্লিষ্ট (যে পশু কোন ক্লেশ সহ্য করে নাই, কলিকাতায় যে সকল ছাগ চালান আইসে তাহারা খাদ্যাভাবে এবং পথশ্রমে ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে) উপাদেয় এবং সদ্যোহত পশুর মাংস গ্রহণ করিবে।

নিষিদ্ধ মাংস—শুষ্ক বা পচা মাংস, পীড়িত বা বিষ ও সর্প দ্বারা হত পশুরমাংস, বিষাদিলিপ্ত, শস্ত্রাদিবিদ্ধ, বৃদ্ধ দুর্ব্বল, অল্পবয়স্ক এবং জঘন্যখাদ্য আহারকারী পশুর মাংস ভক্ষণ করিবে না। শুষ্কমাংস অরুচি জনক, প্রতিশ্যায় কারক ও গুরুপাক। বিষাক্ত ও ব্যাধি হত মাংস মৃত্যুজনক। অত্যন্ত কচিমাংস বমি উৎপাদক। বৃদ্ধ পশুরমাংস কাস ও শ্বাস উৎপাদক। ক্লিন্ন (পচা) মাংস উৎক্লেশ (গা বমি বমি) জনক। কৃশপশুরমাংস বায়ু প্রকোপক।

এইরূপে প্রাণীর বয়স শরীরের অবয়ব, স্বভাব, ধাতু, ক্রিয়া, লক্ষণ, সংস্কার ও মাত্রার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মাংস সংগ্রহ ও আহার করিতে হয়। প্রত্যেকের বিষয় স্পষ্ট করিয়া বলা যাইতেছে।

বয়স যেমন মধ্য বয়স্ক প্রাণীর মাংস গ্রহণ করিবে। শরীরের অবয়ব—যেমন পক্ষীর উরুদেশ এবং গ্রীবা গুরু। স্বভাব - যেমন স্বভাবতঃ লাবমাংস লঘু। ধাতু—যেমন মাংস অপেক্ষা মেদ গুরুপাক। ক্রিয়া যেমন—বক্ষঃস্থল দ্বারা বিচরণ করে বলিয়া সরোবরজাত মৎস্যের পূর্ব্বার্দ্ধ লঘু, অল্প পরিশ্রমী বলিয়া পর্ব্বতের ঝরণার মৎস্য গুরু, যাহারা জলাশয়তীরে থাকে তাহাদের মাংস অভিষ্যন্দী এবং গুরু, যাহারা জঘন্য খাদ্য আহার করে তাহাদের মাংস অগ্রাহ্য, শষ্প শৈবাল ভোজন করে বলিয়া রোহিত মৎস্য কষায় রস, বায়ু নাশক এবং অল্প পিত্তবর্দ্ধক প্রভৃতি। লিঙ্গ— যেমন চতুষ্পদ প্রাণীর স্ত্রী জাতির মাংস উৎকৃষ্ট। প্রমাণ যেমন মহাশরীর প্রাণীদিগের মধ্যে অল্প

* এই জন্য সাহেবেরাও ছোলা খেকো (Grain fed) মাংস পছন্দ করেন।

* দেবতার না হউক দেবতার প্রসাদ পাইয়া পাছে ভক্তদিগের বমন রোগ জন্মায় সেই ভয়ে শৃঙ্গ বাহির না হইলে ছাগশিশু দেবতার নিকট বলি দেওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে।

শরীর বিশিষ্ট প্রাণীরমাংস লঘু। সংস্কার—যেমন ঘৃত, দধি, ধান্যাম্ল, কলাম্ল ইত্যাদির সহিত পাক করিলে মাংস লঘুপাক হয়। পাকের ব্যাপার পরে হইবে, পাঠক ধৈর্য্যধারণ করুন। মাত্রা—যেমন গুরুদ্রব্য আধ পেটা এবং লঘুদ্রব্য পেট ভরিয়া খাইবে।

মাংসের সাধারণ গুণ আলোচনা করা হইয়াছে। এক্ষণে মাংসের সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

মাংস তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা মৃদু মাংস, (যেমন শশকাদির মাংস,) কঠিন মাংস (যেমন হরিণাদির মাংস) এবং ঘন মাংস (যেমন অশ্বাদির মাংস) ভিন্ন ভিন্ন মাংসের পাক প্রণালীও ভিন্ন।

মাংসার্ক (মাংসের আরক)। মৃদুমাংসের অর্ক প্রস্তুত করিতে হইলে মাংসগুলিকে বড় বড় করিয়া কাটিয়া তাহাতে মাংসের চল্লিশ ভাগের একভাগ (চল্লিশ তোলা বা আধ সের মাংসে এক তোলা) সৈন্ধব লবণ মাখাইয়া এরূপ সাবধানে ধৌত করিয়া লইবে যেন মাংসগুলি অধিক সঞ্চালিত না হয়। অনন্তর জায়ফল, তেজপাত, লবঙ্গ, দারচিনি, এলাচ, নাগকেশররেণু, মরিচ ও মৃগনাভি এই সকল দ্রব্য মিলিত ভাবে মাংসের ষাট ভাগের একভাগ, ইক্ষুরস অভাবে দুগ্ধ মাংসের আট ভাগের এক ভাগ, মাংসের সহিত মিশ্রিত করিয়া মাংসের চারিগুণ জলসহ বকযন্ত্রে স্থাপিত করিবে এবং জাতী প্রভৃতি সুরভি পুষ্প দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া মৃদু অগ্নি সন্তাপে চুয়াইয়া লইবে।

কঠিন মাংসের অর্ক প্রস্তুত করিতে হইলে, মাংস ছোট ছোট করিয়া কাটিবে। অনন্তর মিলিত সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা ও সৈন্ধবলবণ মাংসের চল্লিশ ভাগের একভাগ পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া তিনবার কাঁজিদ্বারা এবং সাতবার ঈষদুষ্ণ জল দ্বারা ধীরে ধীরে ধৌত করিবে, পরে পূর্ব্ব নিয়মে জায়ফল প্রভৃতি দিয়া এবং জাতী পুষ্পাদি দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া চুয়াইয়া লইবে।

ঘন মাংসের অর্ক প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে মাংস খুব ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া লইবে, পরে পূর্ব্বোক্ত পরিমাণে সৈন্ধবলবণ দিয়া এবং তৎপরে শঙ্খ দ্রাবক মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধ দ্বারা সাতবার ধৌত করিবে। অনন্তর জায়ফল প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সংযোগে চুয়াইয়া লইবে।

মাংসরস—মাংসরস তিন প্রকার- যথা ঘন, অচ্ছ এবং অচ্ছতর। তন্মধ্যে ঘন মাংস রস প্রস্তুত করিতে হইলে চারিসের জলে দেড়সের মাংস দিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। অচ্ছ মাংস রস প্রস্তুত করিতে হইলে চারিসের জলে তিনপোয়া মাংস দিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া লইবে। অচ্ছতর মাংসরস প্রস্তুত করিতে হইলে চারিসের জলে অর্দ্ধ-পোয়া মাংস দিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া লইবে। এস্থলে জানা আবশ্যক যে মাংস রস প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে মাংস বাটিয়া বটকাকার করিবে। পরে তাহা অল্প ঘৃতে ভাজিয়া সিদ্ধ করিবে।

মাংস যূষ—মাংস একপোয়া দুইসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া গ্রহণ করিবে।

মাংস রসের গুণ যথা, সর্ব্বধাতুর পুষ্টিকর প্রাণ (Vitality) জনক, শুক্রবর্দ্ধক, ওজোবর্দ্ধক, বলবর্দ্ধক, শ্বাস কাস ও ক্ষয় নাশক,

বায়ুপিত্ত ও শ্রমনাশক, তৃপ্তি জনক, স্মৃতি, ওজঃ ও স্বরহীন ব্যক্তিদিগের পক্ষে হিতকর, জ্বর ক্ষীণ এবং উরঃক্ষত রোগীর হিতকর, যাহাদের সন্ধি ভগ্ন বা বিশ্লিষ্ট হইয়াছে তাহাদের পক্ষে উপকারী, কৃশ এবং অল্পশুক্র ব্যক্তির পক্ষে পুষ্টি ও শুক্রজনক। দাড়িম রসের সহিত প্রস্তুত মাংস রস বীর্য্যবর্দ্ধক এবং ত্রিদোষ নাশক। উদ্ধৃতসার মাংসের গুণ—যে মাংস হইতে সার বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে তাহা দুষ্পাচ্য বিষ্টম্ভী, রুক্ষ বিরস, বায়ুবর্দ্ধক এবং বল বা পুষ্টিকর নহে।

আয়ুর্ব্বেদে রোগীর পথ্যরূপে মাংস সংস্কার সম্বন্ধে এবং সুস্থ ব্যক্তির জন্য মাংস সংস্কার সম্বন্ধে সামান্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। অনেক স্থলে সূদ শাস্ত্রের উপর বরাত দেওয়া হইয়াছে। সূদশাস্ত্র রন্ধন কৌশল শিখিবার শাস্ত্র। দুঃখের বিষয় সূদশাস্ত্র এ পর্য্যন্ত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। সূদ শাস্ত্রের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে কত প্রকার সুখাদ্য হইতে যে আমরা বঞ্চিত হইয়াছি তাহা মনে করিলে রসনা লালাস্রাব করিয়া কাঁদিতে থাকে। এক্ষণে যাহা সামান্য কিছু পাওয়া যায় পাঠক তাহা উপভোগ করুন।

ললিত মাংস—ঘৃত, দধি, কাঁজি, ফলাম্ল (দাড়িমের রস প্রভৃতি) এবং মরিচ প্রভৃতির সহিত সিদ্ধমাংস ললিতমাংসনামে পরিচিত। ইহা হিতকর, বলকর, রুচিকর, পুষ্টিকর এবং গুরুপাক।

প্রলেহ মাংস—ললিতমাংসে বেশী করিয়া ঘৃত দিয়া এবং হিঙ্গু, মরিচ, জীরা, এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ প্রভৃতির দ্বারা সুরভি করিয়া পাক করিলে তাহা প্রলেহমাংসনামে খ্যাত হয়। ইহা পিত্ত ও কফবর্দ্ধক এবং বল মাংস ও অগ্নিবর্দ্ধক।

পরিশুষ্ক মাংস—মাংস ধুইয়া প্রচুর ঘৃতে ভাজিবে এবং তাহাতে মুহুর্মুহু উষ্ণ জল একটু একটু দিতে থাকিবে। জীরা, মরিচ, প্রভৃতি মসলা সংযোগে ঘন করিয়া এইরূপে মাংস পাক করিলে তাহাকে পরিশুষ্ক মাংস বলে। এই মাংস, স্নিগ্ধ, হর্ষজনক (রসনার এবং দেহের), ধাতু পুষ্টিকর, রুচিকর, বল, মেধা, অগ্নি, মাংস, ওজ; ও শুক্রবর্দ্ধক এবং গুরুপাক।

প্রদিগ্ধ মাংস—পরিশুষ্কমাংস প্রচুর দধি সংযোগে পাক করিলে তাহাকে প্রদিগ্ধমাংস বলে।

উল্লুপ্ত মাংস—খণ্ড খণ্ড মাংস পেষণ করিয়া ঘৃতাদির সহিত পাক করিলে তাহাকে উল্লুপ্ত মাংস বলা যায়। ইহা পরিশুষ্কমাংসের ন্যায় গুণবিশিষ্ট, ইহা অঙ্গারাগ্নিতে পাক করিতে হয় এবং সেই জন্য লঘু হইয়া থাকে।

ভর্জ্জিত মাংস—মাংস বাটিয়া মসলা মিশাইয়া ঘৃতে ভাজিয়া লইলে তাহাকে ভর্জ্জিত মাংস বলে।

প্রতপ্ত মাংস—দধি, দাড়িমের রস, ঘৃত, জীরা, লবণ ও মরিচ প্রভৃতির সহিত মাংস বাটিয়া অঙ্গারাগ্নিতে পাক করিয়া লইলে তাহাকে প্রতপ্ত মাংস বলে।

কন্দু পাচিত—মাংস, এলাচ, লবঙ্গ, হিং প্রভৃতি দ্রব্য বাটা দ্বারা লিপ্ত করিয়া কন্দুতে (over) পাক করিবে। পরে রাই সরিষা বাটা দ্বারা লিপ্ত করিবে। ইহাকে কন্দু পাচিত বলে। আজ কাল মাংস দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য বিশেষ সরিষা বাটা (Mustard) মাখাইয়া খাইবার নিয়ম দেখা যায়। কিন্তু আয়ু-

র্ব্বেদের পাকা বন্দোবস্ত, একেবারে মাখাইয়া দেওয়া। ইহাতে সরিষা বাটা মাখাইবার বিলম্ব হইতে পরিত্রান পাওয়া যায়।

শূল্য মাংস—হিঙ্গ মিশ্রিত জল এবং এলাচি, সুগন্ধ দ্রব্য বাটা মাখাইয়া মাংস শূলে বিদ্ধ করিবে এবং নির্ধূম অঙ্গারাগ্নিতে পাক করিবে। পাক কালে একটু একটু জল বা দাড়িমাদি ফলের রস দিতে হয়। ইহাকে শূল্য মাংস বলে।

এই সকল মাংস গুরুপাক। তৈলপক্ক মাংস উষ্ণবীর্য্য, পিত্তজনক এবং লঘু। ঘৃত পক্ক মাংস উষ্ণবীর্য্য নহে, মনোজ্ঞ এবং পিত্ত নাশক।

বেশবার—সুসিদ্ধ মাংসকে অস্থিবিহীন করিয়া শিলায় পিশিয়া লইবে। পরে পিপুল শুঁঠ, মরিচ, গুড় ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। ইহাকে বেশবার বলে। বেশবার গুরু, স্নিগ্ধ, বলকর, ও বাতজ রোগ নাশক। শশাঙ্ক কিরণ—মাংসের বড়া ভাজিয়া পুনরায় চূর্ণ করিবে এবং কর্পূর ও চিনি মিশ্রিত করিয়া বটকা (লাড়ু) প্রস্তুত করিবে। ইহাকে শশাঙ্ক কিরণ বলে। ইহা অত্যন্ত রুচি জনক।

এক্ষণে সুস্থ ও অসুস্থ অবস্থায় মাংসাহার সম্বন্ধে কিরূপ উপদেশ আছে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। প্রথমে সুস্থাবস্থার কথা ধরা যাউক।

হিতকর ও অহিতকর দ্রব্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রসঙ্গে আয়ুর্ব্বেদে লিখিত হইয়াছে যে শালি তণ্ডুলের অন্ন, যব ও গোধূমকৃতখাদ্য, ঘৃত, জাঙ্গল মাংস প্রভৃতি নিত্য আহার করিবে। দুঃখের বিষয় যে ইচ্ছা সত্ত্বে ও এই ঘোরতর জীবন সংগ্রামের দিনে ঋষিদিগের অমূল্য উপদেশ আমরা পেট ভরিয়া পালন করিতে পারি না।

সুস্থাধিকারে বায়ু প্রধান ব্যক্তিকে গণ্ডার শূকর, মহিষ প্রভৃতি আনুপ মাংস এবং গো, অশ্ব, অশ্বতর, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, ছাগ প্রভৃতি গ্রাম্য মাংস আহার করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। পিত্ত প্রকৃতি এবং শ্লেষ্ম প্রকৃতি ব্যক্তিকে ধন্বদেশ জাত প্রাণীর মাংস আহার করিতে বলা হইয়াছে।

ঋতু চর্য্যা প্রসঙ্গে সুস্থব্যক্তিকে গ্রীষ্মকালে জঙ্গলদেশজ মৃগ পক্ষীর মাংস যূষ, বর্ষাকালে ধন্বদেশজ মাংসের যূষ, শরৎকালে মরুভূমি জাত মৃগপক্ষীর স্বচ্ছ মাংস যূষ, হেমন্ত ও শীত কালে আনুপ, বিলেশয়, প্রসহ গ্রাম্য এবং জলজ মাংস গরম গরম খাইবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। বসন্তকালে জাঙ্গল মাংসই ব্যবস্থা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সকল প্রকৃতির ব্যক্তির পক্ষে এবং সকল ঋতুতেই মাংসাহারের ব্যবস্থা আছে।

পূর্ব্বকালে মাংসের যে বহুল প্রচলন ছিল, তাহা পুরাণ কাব্য আলোচনা করিলেও বুঝা যায়। রামচন্দ্র সীতার বিরহে কাতর হইয়া চতুর্দ্দিকে খুঁজিতে ছিলেন, কিন্তু স্বর্ণ গোধাটী দেখিবামাত্র বিরহ বেদনা চাপিয়া রাখিয়া গোধাটীকে সংগ্রহ করিলেন। প্রেমের দায় অপেক্ষা পেটের দায় অনেক বড়। বনবাসিনী দ্রৌপদী জয়দ্রথের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তাহাকে বিবিধ মাংসের লোভ দেখাইয়াছিলেন। অগস্ত্য মুনি মেষরূপী বাতাপিকে সমগ্র উদরস্থ করিয়াও কিছুমাত্র অজীর্ণ বোধ করেন নাই। সীতা শোকে কাতর জনক বৎসতরীর লোভ

সংবরণ করিলেও বশিষ্ঠপ্রাপ্ত উপহারের সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন।

মাংসের ব্যাপার লইয়া অনেক সময় বিষম দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। পুরাণাদিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন ব্রাহ্মণ হয়ত কোন রাজার নিকট গিয়া তৎক্ষণাৎ মাংস খাইবার আবদার করিলেন, না দিতে পারিলেই বিপদ। কল্মাষপাদ গুরুকে মাংস খাওয়াইয়া নরকস্থ হইলেন ; এরূপ বহু ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে মাংসপ্রীতি ইহলোকেই শেষ হইত না। মনুষ্যের আত্মা পরলোকেও মাংস কামনা করিত। পরলোকস্থ পিতৃপুরুষের মাংসাকাঙ্ক্ষা-নিবৃত্তির জন্য মাংসাষ্টকা শ্রাদ্ধ প্রচলিত ছিল। হায় দুর্ভাগ্য! এখন ইহ লোকেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না, পরলোকত দূরের কথা।

এতদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ব্বে মাংস খাওয়া হইত। রামচন্দ্রের স্বর্ণ গোধা আহরণের বিষয় পূর্ব্বে বলিয়াছি। এক্ষণে দ্রৌপদী জয়দ্রথকে কোন কোন মাংসের লোভ দেখাইয়াছিলেন পাঠক তাহার পরিচয় গ্রহণ করুন।

"দ্রৌপদী কহিলেন, হে সৌবীর! তোমার রাজ্য, রাষ্ট্র, কোষ ও বলের কুশল ত ?......। হে নৃপনন্দন! এক্ষণে পাদ্য ও আসন এবং প্রাতরাশস্বরূপ পঞ্চশত মৃগ প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। আর রাজা যুধিষ্ঠির স্বয়ং তোমাকে ঐণেয়, পৃষত, ন্যঙ্কু, হরিণ, শরভ, শশ, ঋক্ষ, রুরু, ষম্বর, গবয় প্রভৃতি বহু সংখ্যক মৃগ এবং বরাহ, মহিষ ও অন্যান্য মৃগ প্রদান করিবেন।"

দুঃখের বিষয় যে মাংসাহার সম্বন্ধে আমাদের উদারতা এক্ষণে বিষম হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া কেবল ছাগশিশুতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। তবে সুখের বিষয় যে পূর্ব্বসঙ্কীর্ণতা ঘুচিয়া আবার উদারতা বৃদ্ধি পাইতেছে। হোটেলে কুক্কুট মাংসের এবং চায়ের দোকানে কুক্কুটাণ্ডের অবাধ প্রচলন ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

মাংসাহার সম্বন্ধে এত সঙ্কীর্ণতা ঘটিয়াছিল কেন এবং মাংসের প্রচলন এত কম হইয়াছিল কেন সে সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব। এক্ষণে আয়ুর্ব্বেদে ভিন্ন ভিন্ন রোগে মাংসব্যবহার সম্বন্ধে কিরূপ উপদেশ আছে দেখা যাউক।

জ্বরে মাংস। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, জ্বর হইবার দশ দিন পরে রোগীর শরীরে যদি কফাধিক্য থাকে এবং সম্যক উপবাসের লক্ষণ প্রকাশ না পায় তাহা হইলে ঘৃত প্রয়োগ না করিয়া মাংসরস পথ্য দিবে। ঐণ (হরিণ) লাব প্রভৃতির মাংস রসজ্বরে সুপথ্য। কুক্কুট, ময়ূর, তিতির ও কৌঁচবক গুরু ও উষ্ণ বলিয়া কোন কোন চিকিৎসক জ্বরে ঐ সকল মাংসের যুষ প্রয়োগ করার প্রশংসা করেন না।

অপিচ, উপবাস হেতু জ্বররোগীর শরীরে অতিরিক্ত বায়ুপ্রকোপ ঘটিলে মাত্রা ও বিকল্পজ্ঞ চিকিৎসক কুক্কুটাদির মাংস রসও পথ্য দিবেন।

মাত্রা শব্দে পরিমাণ। কতটুকু পরিমাণে দিতে হইবে তাহার বিচার করা আবশ্যক। আর বিকল্প শব্দে বিশিষ্ট কল্পনা বা সংস্কার। কিরূপ উপায়ে এবং কি উপকরণসহ পাক করিয়া দিলে তাহা সহজে জীর্ণ হইবে এবং রোগীর পক্ষে হিতকর হইবে তাহাও বিচার করিতে হইবে। (ক্রমশঃ)

বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য।

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য যে একেবারে নষ্ট হইতে বসিয়াছে, ইহা সুনিশ্চিত। অনেকের হৃদয়ে বল নাই, মনে স্ফূর্ত্তি নাই, কার্য্যে উৎসাহ নাই, শরীরে সামর্থ্য নাই। কর্ম্মজগতে সর্ব্বপ্রকার উন্নতির প্রয়াস-বিরহিত জীবনে অনেকেই যেন একটা অজানা স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া বিধিনিরূপিত আয়ুষ্কালের কয়টা দিন কোনরূপে কাটাইতে পারিলেই কর্ত্তব্য পালিত হইল বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। আগেকার বাঙ্গালী কিন্তু এরূপ ছিল না। খুব বেশী দিনের কথায় কাজ নাই, আমাদের এক পুরুষ পূর্ব্বেও বাঙ্গালীর অবস্থা অন্য রূপ ছিল। তখনকার বাঙ্গালী এখনকার মত সভ্যতার চরম সোপানে অধিরোহণ করে নাই সত্য ; শীত, গ্রীষ্ম, শরৎ বসন্ত—সকল ঋতুতেই আবরণ-সম্ভারে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদনপূর্ব্বক ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেন না সত্য ; এক পোয়া পথ যাতায়াতের জন্যও তখনকার বাঙ্গালীরা ট্রাম অশ্বযান মোটর প্রভৃতির বন্দোবস্ত ছিল না সত্য ; কিন্তু তখন তাঁহাদিগের ধমনীর ভিতর, তাঁহাদিগের শিরায় শিরায়, তাঁহাদিগের অস্থিতে অস্থিতে নিয়ত কালের জন্য কি যেন একটা অপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চারিত হইত। বিধিপ্রদত্ত সেই অচিন্ত্যনীয় শক্তির সাহায্যে সে কালের বাঙ্গালী নীরোগ দেহে কালের পরমায়ু শতবর্ষ পূর্ণ না হউক, অন্ততঃ আশী নব্বই পঁচানব্বই বৎসর পর্য্যন্ত জীবন ধারণে সক্ষম হইতেন। এখন বাঙ্গালীহৃদয়ে সে শক্তি তিরোহিত হইয়াছে; সেই জন্য এখনকার বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যেরও এত দুর্গতি ঘটিয়াছে।

দুর্গতি বলিব না তো কি! আগেকার অপেক্ষা এখনকার বাঙ্গালীর মৃত্যুর হিসাব মিলাইলে একালে যে মৃত্যুর সংখ্যা বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা সরকারি হিসাব দেখিলেই অবগত হইতে পারা যায়। কলিকাতা সহরে শিশুদিগের মৃত্যুর পরিমাণ প্রতিবৎসরই কিছু কিছু বর্দ্ধিত হইতেছে। শৈশব মরণের এতাদৃশ বাহুল্যের জন্য তাহাদের স্বাস্থ্যহীন পিতামাতাকেই কি কারণ নির্দ্দেশ করিলে অন্যায় হইবে? আমার তো মনে হয়, ইহা সত্যসত্যই তাহাদিগের নষ্ট স্বাস্থ্য পিতামাতার প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন আর কিছুই নহে।

প্রকৃত পক্ষে আমরা শক্তিহীন হইয়াছি কি না, আমাদের সামর্থ্য কমিয়াছে কিনা, অকালবার্দ্ধক্য আমাদিগের শরীরে প্রবেশ করিয়াছে কি না,—ইহার জন্য অন্য কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না,—শরীর ধারণের সর্ব্বপ্রধান বিষয় আমাদের আহারের কথা আলোচনা করিলেই ইহার মীমাংসা হইয়া যাইবে। দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতি যে সকল আহার্য্যে আমাদিগের দেহ পুষ্ট হইবে, সে সকল দ্রব্য দেশ হইতে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদে দুগ্ধের নাম যতগুলি লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে পয়ঃ, স্তন্য এবং বালজীবন—এ কয়টি নাম যে কেন প্রদান করা হইয়াছে, তাহা বিশেষজ্ঞের নিকট ব্যক্ত না করিলেও চলিবে। ইহার গুণব্যাখ্যায় অনেকরূপ গুণের মধ্যে ইহাকেও জীবনীশক্তিপ্রদ প্রাণিগণের আত্মা, আয়ুষ্য এবং দেহস্থ পদার্থসকলের সংশ্লেষকারক বলিয়া অভি-

হিত করা হইয়াছে। ভূমিষ্ঠ কালের পর হইতে এই পয়ঃ বা দুগ্ধ জীবনীশক্তির পোষণ কার্য্য সমাধা করিবে বলিয়া সে কালে দেশে গোপালকের ব্যবস্থা যথেষ্টরূপে প্রচলিত ছিল। সকল গৃহস্থই সেকালে নিজে গো সেবা করিতেন। ফলে গৃহপালিত গাভী-জাত দুগ্ধ বাঙ্গালী গণের নিকট সহজ প্রাপ্য-ছিল বলিয়াই বাঙ্গালী শক্তি সামর্থ্য বলবীর্য্য কান্তি পুষ্টি—তাবৎ প্রার্থনীয় বিষয়লাভেই সমর্থ হইতেন। প্রকৃত পক্ষে সেকালে বাঙ্গালী মাত্রই শরীররক্ষার জন্য দুগ্ধ পানে যেরূপ সন্তোষ লাভ করিত, সহস্র সহস্র স্বুবর্ণ মুদ্রার বিনিময়ও তাহার সমকক্ষ হইত না। মহাকবি ভারতচন্দ্র এইজন্যই পাটনীর মুখ দিয়া দেবীর নিকট বর প্রার্থনা করিয়া-ছিলেন,—

"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।"

যে দেশে নীচকুলসম্ভূত সঙ্গতিহীন পাটনিও 'দুধে ভাতে' থাকিলেই তাহার অপত্যগণের যথেষ্ট কল্যাণ কামনা করা হইল বলিয়া মনে করিত, সে দেশে এক সময় দুগ্ধ-পানের ব্যবস্থা যে অত্যধিক প্রচলিত ছিল এবং সেই দুগ্ধ পানের ফলে পয়ঃ বা অমৃত পানের মত সুস্থ এবং সবলদেহে দীর্ঘজীবন লাভ ঘটিত তাহা তো বলিতে হইবে না। এক্ষণ দেশ হইতে সে ব্যবস্থা লুপ্ত হইয়াছে। বিলাতী জমাট দুগ্ধে এখন শিশুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। শিশুদিগের জননী—আমাদের দেশের অঙ্গনাগণ অঙ্গরক্ষার জন্য শিশুদিগকে স্তন্যদুগ্ধ প্রদানেও কার্পণ্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। এ অবস্থায় দেশে শিশুর মৃত্যুর যে যথেষ্ট কারণ নিহিত রহিয়াছে, শৈশবে মৃত্যু না ঘটিলেও স্বভাবতঃ রোগ-প্রবণ দেহ লইয়া জীবন কাটাইবার যে যথেষ্ট কারণ ঘটিয়াছে, বিধিনির্দ্দিষ্ট আয়ুষ্কালের বিপর্য্যয় ঘটিয়া অল্পায়ু হইবার যে প্রভূত কারণ দাঁড়াইয়াছে, ইহা নিভাজ সত্য কথা, একথার প্রতিকূলে বলিবার কোন কথাই নাই।

তাহার পর কতকটা সভ্যতার অঙ্গে গা ঢালিয়া দিয়া এবং কতকটা অক্ষমতানিবন্ধন বাঙ্গালীর আহার করিবার শক্তি সে কালের অপেক্ষা অনেক কমিয়া গিয়াছে। ভোজ নিমন্ত্রণে সে কালের মত আহার করিবার সামর্থ্য একালে বাঙ্গালীর তো লুপ্ত হইয়াছেই, যদি কাহারও সামর্থ্য থাকে তিনিও দেশ কাল বিবেচনায় লজ্জার খাতিরে সে সামর্থ্যের প্রয়োগে অনভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সেকালে কিন্তু এমনটা ছিল না। সেকালে আহারপটু ব্যক্তির আদর সম্ভ্রম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইত। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আহার করিতে পারিতেন, তাঁহাকে পরিতোষপূর্ব্বক খাওয়াইবার জন্য আয়োজনকারী ব্যস্ততায় সন্তুষ্টি লাভ করিত। এই আহার বিষয়ে পটু ব্যক্তিদিগের মধ্যে শান্তিপুর অঞ্চলের "মুন্‌কে রঘুনাথে"র নাম অদ্যাপি স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। কিম্বদন্তী আছে, এই "মুন্‌কে রঘুনাথে"র স্নানান্তে জলযোগের ব্যবস্থাই নাকি দশ পনের সের সন্দেশ বিধি-বদ্ধ ছিল।

এই আহারপটুতার ফলে শারীরিক সামর্থ্যে ঐ শান্তিপুরেরই "আশানন্দ ঢেঁকি" যেরূপ অমিত শক্তি লইয়া এক সময়ে দস্যু উপদ্রব হইতে স্বদেশ রক্ষা করিয়াছেন, তাহা-রই জন্য তাঁহার নামের জোরে "ঢেঁকি" উপাধি চলিত হইয়া আসিতেছে। প্রবাদ, সে সময়ে তাঁহার এক ধনী প্রতিবেশীর গৃহে

দস্যু আপতিত হইলে এই আশানন্দ একটি ঢেঁকির সাহায্যে তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। তাঁহার ঢেঁকি আখ্যা তাঁহাকে সেই সময় হইতে প্রদান করা হয়।

এ সকল তো এখন গল্পকথায় পরিণত হইয়াছে। এই গল্প কথার পরিণতি ছাড়িয়া দিলেও আমাদের বাল্যজীবনে আমাদের পল্লী ভূমির ব্যসনবিরহিত ক্রিয়াপরায়ণ গৃহস্থের আঙ্গিনায় বসিয়া যখন আমরা ভোজ-নিমন্ত্রণে তৃপ্তিলাভ করিয়াছি, তখনও আমাদের মধ্যে দু'চারিজন ভোক্তার আহারপটুতায় মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারি নাই। সহরের সভ্যতার মত পল্লীপ্রান্তে পোলাও কালিয়ার ব্যবস্থা কোনকালেই ছিল না। সাদা ভাত, বিশ পঁচিশ রকম ব্যঞ্জন, প্রচুর মৎস্য, দুগ্ধের রূপান্তরে পায়স দধি ক্ষীর সন্দেশ রসগোল্লাই পল্লীগ্রামের ভোজপ্রদানে বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। ফলাহারের ব্যবস্থা পূর্ব্বে চিঁড়া দধি-ক্ষীর-সন্দেশে নির্ব্বাহিত হইত। অধুনা লুচি তরকারি মিষ্টান্নে পরিণত হইয়াছে। যাউক সে কথা, ভোজের নিমন্ত্রণে আমাদের বাল্য জীবনে দু'চারিজন খুবই উদরপূর্ত্তি করিয়া আহার করিয়াছেন। আচমন করিয়া উঠিলেই হয়, এমন সময় তাঁহার নিকট সন্দেশ রসগোল্লা আনিয়া আরও কিছু খাই-বার জন্য অনুরোধ করা হইল, তিনি আর কিছু আহার করিলে কর্ম্মকর্ত্তার সমস্ত আয়োজন সার্থক হইবে এরূপভাব দেখান হইল, কর্ম্মকর্ত্তার সেই প্রস্তাবে সমবেত ব্যক্তিগণেরও সহানুভূতি প্রকাশ পাইল। কাজেই অনুরুদ্ধ ব্যক্তি অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না; এক গণ্ডা, দুই গণ্ডা করিতে করিতে পূর্ণ আহারের পর দশ বার গণ্ডা মোণ্ডা এবং রসগোল্লা উদরস্থ করিয়া ফেলিলেন। এখন-কার দিনেও পল্লীপ্রান্তে অন্বেষণ করিলে এরূপ আহার পরায়ণ ব্যক্তি দু'দশ খানি গ্রাম ছাড়াইয়া দু'এক জন না মিলিতে পারে এমন নয়।

যাহা হউক, সেকালে বাঙ্গালীর আহার এইরূপ ছিল। জীবনধারণের জন্য, শক্তি সঞ্চয়ের জন্য, কর্ম্মঠ হইবার জন্য, আহারের ব্যবস্থা যে সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য, ইহা সেকালের বাঙ্গালী বিলক্ষণই বুঝিত। একালে পুষ্টিকর আহার্য্য পাইবারও যো নাই, পাইলেও লোক-লজ্জায় উদরস্থ করিবার উপায় নাই। এক কথায় আহারের প্রথা দেশ হইতে একরূপ উঠিয়াই গিয়াছে। এখন প্রাতে উঠিয়া খালি পেটে খানিকটা 'চা' না খাইলে চলে না। আমি এমন অনেককে দেখিয়াছি, তিনি হয়তো দিনের মধ্যে ৬।৭ বারও চা পান করিয়া আত্মতৃপ্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ফলে এই অত্যধিক চা পান হইতে বাঙ্গালীর যকৃতের ক্রিয়া ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া বাঙ্গালীশরীরে অজীর্ণ অগ্নিমান্দ্য অক্ষুধা প্রভৃতি নানারূপ রোগ উপস্থিত হইতেছে। কথাটা উড়াইয়া দিবার নহে; সত্য সত্য এখন-কার বাঙ্গালীর বোধ হয় বার আনা আন্দাজ লোক শুধু এই কারণেই অজীর্ণপ্রবণ দেহে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

শুধু "চা" পান নহে, বাঙ্গালী সন্তানের দেহক্ষয়ের আরও কতকগুলি কারণ আছে। সিগারেটের ধূমপান এবং তাম্বুল বা পান চর্ব্বনের মাত্রা একালে বাঙ্গালী সন্তান যেরূপ বাড়াইয়া তুলিয়াছে, তাহারই ফলে দেশে থাইসিস বা যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা ক্রমশঃ পুষ্ট হইয়া উঠিতেছে। সরকারি হিসাবে শিশু

মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধির মত বর্ত্তমান সময়ে যক্ষ্মা-রোগে মৃত্যুর সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এই অতিরিক্ত সিগারেটের ধূমপান তাহার মধ্যে যে একটী প্রধান কারণ ইহা অবিসংবাদিত।

ইহা ভিন্ন আর একটি বিশেষ কারণে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে। সে কারণটীর কথা অনেকে গোপন করিতেছেন, কিন্তু গোপনেই সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে। বর্ত্তমান সময় আমরা ধর্ম্মকর্ম্মের বাহিরে গিয়াছি। আমাদের দেখাদেখি আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা ধর্ম্মবিগর্হিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে। সংসর্গ দোষেই হউক বা আবহাওয়ার বশেই হউক তাহাদিগের ইন্দ্রিয় সকলের পরিপুষ্টি হইতে না হইতেই তাহারা অবৈধ উপায়ে ইন্দ্রিয় চালনায় অভ্যস্ত হইয়াছে। বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহানির ইহাই সর্ব্বপ্রধান কারণ। এ কথাটী কেহ ভাবিতেও চেষ্টা করেন না, ইহাই দুঃখ।

রক্তের সারভাগই শুক্ররূপে পরিণত হয়। ইহা সকল দেশের সকল শাস্ত্রবিদেরাই বলিয়া গিয়াছেন। বাল্যকালে শুক্র ১২।১৩ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত জলবৎ তরল থাকে তাহার পর গাঢ়ভাব ধারণ করিতে আরম্ভ হয়। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ঐ শুক্র অন্ততঃ ২৫ বৎসর বয়ঃক্রমের কমে কথনই পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু ১২।১৩ বৎসর বয়সের সময় হইতে আমাদের দেশের বালকগণ অস্বাভাবিক উপায়ে অপরিণত শুক্রক্ষয়ে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। ক্রমে ঐ অভ্যাস অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাহারই ফলে ঘুণ ধরা বংশদণ্ডের ন্যায় বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ ভরসা স্থল বালকবৃন্দের দেহ অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িতেছে। দুঃখের বিষয় আমরা এদিকে আদৌ দৃক্‌পাত করিতেছি না। শরীরক্ষয়ের বিদ্যা তাহারা কতদূর শিক্ষা করিতেছে, তাহা আমরা একবারও ভাবিবার অবসর পাইতেছি না। কি করিয়া তাহারা কলেজের উচ্চডিগ্রি পাইয়া অর্থাগমের সুবিধা করিবে—ইহাই এখন আমাদিগের একমাত্র লক্ষ্যস্থল দাঁড়াইয়াছে।

অস্বাভাবিক উপায়ে অপরিণত শুক্রের ক্ষয় যেরূপ দোষাবহ, স্বাভাবিক উপায়েও তদপেক্ষা কম দোষাবহ নহে। এক কথায় শুক্রের পূর্ণ পরিণতি না হইলে, তাহা আদৌ ক্ষয় করা কর্ত্তব্য নহে। এইজন্য আগে বিদ্যাধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া অধিক বয়সে বিবাহ দিবার ব্যবস্থা ছিল। এখন অর্থলোভে সে ব্যবস্থা দেশের প্রায় সকল অভিভাবকই উল্টাইয়া দিয়াছেন। এখনকার বিবাহ, সাধারণতঃ পুরুষদিগের ১৮।২০ বৎসরের মধ্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই ১৮।২০ বৎসরের পুরুষদিগের পত্নীগুলি আবার বয়সে তাহাদিগের দু'এক বৎসরের কমমাত্র। কাজেই ১৮।২০ বৎসরের পুরুষ পঞ্চদশী বা ষোড়শী রমণীর মিলন সুখে আপাততঃ মধুর তৃপ্তিলাভ পূর্ব্বক ভবিষ্যতে যে নিতান্ত দুর্ব্বলেন্দ্রিয় ও অকালজরাগ্রস্ত হইয়া পড়িবে ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? কবি কি সাধ করিয়া বলিয়াছেন,—

"যৌবনে অধিক ব্যয় বয়সে কাঙ্গাল।"

অধুনা বাঙ্গালায় অম্ল, অজীর্ণ, থাইসিস্ এবং ধাতুদৌর্ব্বল্যগ্রস্ত রোগীর সংখ্যা যে এত বাড়িয়া গিয়াছে,—ঐ সকল রোগ নিবারণের জন্য প্রায় অধিকাংশ সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপন স্তম্ভগুলি নিত্য নূতন ঔষধে যে রোগ আরোগ্যের কীর্ত্তিকাহিনী প্রকাশ করিতেছে, তাহার কারণ ভাবিয়াছেন কি?

সেকালে লোকে ব্রহ্মচর্য্য পালনই শরীর ধারণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করিত, উপযুক্ত সময়ে বিবাহ হইলেও তিথিনক্ষত্র বাছিয়া স্বামী স্ত্রীর মিলনের ব্যবস্থা করিত। রজঃস্বলা স্ত্রী সেকালে অশুচি জ্ঞানে গৃহস্থলীর কোন কার্য্যেই স্থান পাইত না। সেকালে এ অবস্থায় স্বামীকে এক গ্লাস জল আনিয়া দিবারও স্ত্রীর পক্ষে ক্ষমতা ছিল না। একদিকে এইরূপ ভাবে শুক্ররক্ষার যেমন ব্যবস্থা করা হইত,অপরদিকে সেইরূপ সাত্বিক ও পুষ্টিকর আহার্য্যে শরীর রক্ষায় সকলেই মনোযোগ প্রদান করিতেন। কাজেই একালের অপেক্ষা সেকালের পুরুষগণ বলবীর্য্য শক্তি সামর্থ্যে চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ -সকল প্রকার সম্পদ্ লাভেই অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদ বলিয়া গিয়াছেন,—

"ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমম্।"

যদি মানব দেহে আরোগ্যই না থাকিল, তবে তাহার ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ - এ সকল সম্পদ্ লাভ কেমন করিয়া ঘটিবে? দেশের প্রত্যেক পিতা, প্রত্যেক অভিভাবক এ সকল কথা চিন্তা করুন। চিন্তা করিয়া আগে বালক রক্ষায় যত্নবান্ হউন। তবে আবার এই অধঃপতিত বাঙ্গালী জীবনে উন্নতি হইবে। নতুবা কীটদষ্ট কুসুমের মত বাঙ্গালী জাতি যে ক্রমশঃ অধঃপতনের অধস্তন দেশে পতিত হইবে, তাহা সুনিশ্চিত।

শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত।

জ্বর।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি।]

পুরাণে জ্বরোৎপত্তির আর একটী উপাখ্যান প্রচলিত আছে। তাহার উল্লেখ না করিলে বর্ত্তমান প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে

বাণ নামক অসুরের নাম পাঠকগণ অবশ্যই শুনিয়া থাকিবেন। বাণ শিব-বরে বলীয়ান্ ছিল, দেবগণ পর্য্যন্ত তাহাকে ভয় করিতেন। এই বাণের 'ঊষা' নাম্নী এক রূপসী কন্যা ছিল। সদ্যঃপ্রফুল্ল মধুগর্ভ কুসুম কলিকার ন্যায়, ঊষা পিতৃ গৃহে বর্দ্ধিত হইতেছিল; একদিন তাহাতে প্রেমের অরুণ-কিরণ প্রবেশ করিল। স্বপ্নে এক মহাপুরুষের ছায়া-মূর্ত্তি দেখিয়া, বালিকা মনে মনে তাহাকেই পতিত্বে বরণ করিল। ঊষা আত্মহারা হইল, পিতৃগৃহে অতুল ঐশ্বর্য্যের কোলে বসিয়াও তাহার মনে হইতে লাগিল "অতৃপ্ত-বাসনায় নবযৌবন প্রকৃতিরই তীব্র বিদ্রূপ"। কিন্তু তাহার এই ভাব বিশ্বকাবের অপূর্ব্ব ভাব্য রমণীর চক্ষে শীঘ্রই ধরা পড়িল। ঊষার সঙ্গিনী ঊষার বিরহ বেদনা বুঝিতে পারিল। বুঝিতে পারিল—শূন্য নয়নে জ্যোৎস্না-ফুল্ল আকাশের পানে ঊষার আকুল চাহনি দেখিয়া বুঝিতে পারিল—অতর্কিত আহ্বানে তরুণীর কোমল অঙ্গের অকস্মাৎ শিহরণ দেখিয়া, বুঝিতে পারিল—অনূঢ়া ঊষার আহারে অনিচ্ছা, ভ্রমণে অনুদ্যম, হাসিতে বিরসতা,

ও লাবণ্যে কালিমার ছায়া দেখিয়া, তখন অনেক কৌশলে, সঙ্গিনী উষার মনোচোরের সন্ধান করিল। শেষে, উষার যুগযুগান্তরের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা একটী ত্রিযামা যামিনীর মধ্যেই সাফল্য লাভ করিল! যুবতীর অনন্যাসক্ত ক্ষুব্ধ হৃদয়, লতার মত শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া, প্রেম পুলকিত দৃঢ় আলিঙ্গনে বাঞ্ছিত ধনকে বাঁধিয়া ফেলিল। যদুনাথ শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের সহিত উষার গান্ধর্ব্ব বিবাহ হইয়া গেল।

কিন্তু যুবক যুবতীর এই গুপ্ত মিলন বড় বেশীদিন চাপা রহিল না। উষার শয্যাগৃহে অনিরুদ্ধকে দেখিতে পাইয়া, দৈত্য-প্রহরীগণ বাণ রাজাকে সংবাদ দিল। বাণের বিশালায়ত লোচনে প্রলয়াগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। পৌত্রের জীবন রক্ষার জন্য, শ্রীকৃষ্ণ সসৈন্যে বাণরাজ্য শোণিতপুরে উপস্থিত হইলেন। দানব যাদবে, মহাযুদ্ধ বাধিল। ভক্তের আহ্বানে—স্বয়ং শঙ্কর রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন। দানব কুল, যাদব-তেজ সহিতে পারিল না, দেববিজয়ী বাণ মূর্চ্ছিত হইল। ভক্তের পরাজয়ে শঙ্কর ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তখন, শিবের দেহ হইতে এক অপূর্ব্ব তেজঃ বহির্গত হইল। সেই তেজঃ জ্বররূপে যাদব চমূকে একেবারেই অভিভূত করিয়া ফেলিল। জ্বর শ্রীকৃষ্ণের দেহেও প্রবেশ করিল। জ্বরাবেশে ভগবানের বারম্বার পদস্খলন হইতে লাগিল, শ্বাসকৃচ্ছ্র, জৃম্ভা বিকাশ, রোমাঞ্চ, তন্দ্রা, প্রভৃতি উপসর্গে দ্বারকানাথ বড় কাতর হইয়া পড়িলেন। তখন রুদ্র-জ্বরকে সংহার করিবার জন্য, শ্রীকৃষ্ণ ও দ্বিতীয় জ্বরের সৃষ্টি করিলেন। রুদ্রজ্বর ও বিষ্ণুজ্বরে প্রবল সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। রুদ্রজ্বর পরাভব স্বীকার করিয়া বিষ্ণুর স্তব জুড়িয়া দিল। বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া বলিলেন "বৎস জ্বর! তোমার স্তবে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর।" জ্বর কহিল—"দয়াময়! আমি আপনার শরণাগত হইলাম, আমার ভিক্ষা—জগতে আমি ভিন্ন যেন আর অন্য জ্বর না থাকে।" শ্রীকৃষ্ণ জ্বরের কামনা পূর্ণ করিলেন। বৈষ্ণব-জ্বর বিষ্ণু শরীরেই বিলীন হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ রুদ্র জ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"হে জ্বর! তুমি যেরূপে স্থাবর জঙ্গমাত্মক পদার্থ মধ্যে বিচরণ করিবে, আমি বলিয়া দিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া এক ভাগে চতুষ্পদ পশু মধ্যে, দ্বিতীয় ভাগে স্থাবর মধ্যে এবং অপর অংশে মনুষ্য মধ্যে বিচরণ কর। তন্মধ্যে তোমার তৃতীয় ভাগের চতুর্থাংশ পক্ষি-মধ্যে নির্দ্দিষ্ট রহিল; অপরাংশ দ্বারা মনুষ্য মধ্যে ঐকাহিক দ্ব্যাহিক ত্র্যাহিক ও চাতুর্থক নামে বিচরণ করিবে। অবশিষ্ট জাতি মধ্যে যেরূপে অবস্থান করিবে, তাহাও বলিয়া দিতেছি। তুমি বৃক্ষ মধ্যে কীট, পত্র মধ্যে পাণ্ডুতা ও সঙ্কোচ, ফল মধ্যে আতুর্য্য, পদ্মিনী মধ্যে হিম, মৃত্তিকা মধ্যে উষর, জল মধ্যে নীলিকা, ময়ূর দিগের মধ্যে শিখোদ্ভেদ, পর্ব্বত মধ্যে গৈরিক, এবং রোগ মধ্যে অপস্মারক ও ঘোরক নামে বিচরণ করিবে। তুমি ভূতলে, এই মত বিবিধরূপী হইবে, তোমার দৃষ্টি ও স্পর্শ মাত্র প্রাণিগণের বিনাশ ঘটিবে। দেবতা ও মনুষ্য ভিন্ন অন্য কেহ তোমার প্রভাব সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না।"

হরিবংশ—একাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

[কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনূদিত]

ইহাই জ্বরোৎপত্তির পৌরাণিক ইতিহাস।

এই উপাখ্যানের মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক তথ্য নিহিত আছে, ক্রমশঃ আমরা তাহার ব্যাখ্যা করিব।

পুরাণে জ্বরোৎপত্তির উপাখ্যানে মতান্তর থাকিলেও, জ্বর যে রুদ্র সম্ভূত, সকল পুরাণ-কারই ইহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু শিব যে জ্বরকে সৃষ্টি করিয়াছেন, একথা, বিংশ শতাব্দীর সভ্যতাময় স্বর্ণযুগে সহসা কেহ বিশ্বাস করিবেন না। এখন, প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধানে বাবুরা কিছু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, ফলে অনেক দেবতাই 'দেবত্ব' হারাইয়া স্বাধিকার বিচ্যুত হইতেছেন। বাবুরা প্রমাণ করিতেছেন—'শিব' একজন মানুষ, তাঁহার বাড়ীছিল তিব্বত দেশে। তিনি 'চামরীষণ্ডে' আরোহণ করিয়া পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, শীতপ্রধান দেশের অধিবাসী বলিয়া গঞ্জিকার ধূম পান করিতেন। শিব বর্ব্বরের দেবতা বর্ব্বরের সঙ্গে বাস করিতেন বলিয়া, 'দিগম্বর' সাজিতেন, কখনও বা কটিদেশে বাঘছাল আঁটিয়া লজ্জা নিবারণ করিতেন। শিব যখন, মাংসাশী, উলঙ্গ, ভিখারী, শ্মশানবাসী, তখন নিশ্চয়ই অনার্য্য। হিন্দুরা জোর করিয়া শিবকে দেবতা করিয়া ঘরে তুলিয়াছেন।

অনুচিকীর্ষুর দল এই ভাবে শিবের স্বরূপ নির্ণয় করিতেছেন। এ যেন পাদরীর মুখের কুৎসার প্রতিধ্বনি! এই সকল উৎকট মতের বিরুদ্ধে আমাদের বলিবার কিছু নাই। তবে জ্বরের কথা লিখিতে গেলে শিবকে ছাড়া চলেনা। জ্বরের প্রকৃতি বুঝিতে হইলে শিবকে চিনিতে হইবে, শিব-সর্ব্বস্ব তন্ত্রের গূঢ় রহস্য জানিতে হইবে। সেই জন্যই শিবের কথার উল্লেখ করিলাম।

হিন্দুর দেব দেবীর ধ্যান, মূর্ত্তিকল্পনা, রূপের আরোপ, বর্ণের দ্যোতনা—সমস্তই ভাবের সাবয়ব বিকাশ মাত্র। হিন্দু জানিতেন তাঁহার চিন্ময়ী দেবতা, মৃন্ময়ী হইলেও মৃত্তিকা-নির্ম্মিত প্রতিমা দেবতা নহেন, তাই পূজান্তে হিন্দু মাটির ঠাকুরকে বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন।

শিব -সৃষ্টির পুংশক্তি। এ শক্তি আদি ও অন্তে স্থায়ী, ইহার বিশেষণ—সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, মহাকাল; শিব, সংহার মূর্ত্তি, নিখিল শক্তি তাহাতেই সংহৃত হইয়া থাকে। সৃষ্টির সংহরণ -শিবেরই অভিব্যঞ্জনা, তাই শিবেরনাম মৃত্যুঞ্জয়। মৃত্যুর অজেয়তায় তাঁহার কণ্ঠ নীলবর্ণ; বিনাশ-শক্তি বিষধর তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। যে শ্মশানে জীবের পরিসমাপ্তি, শিব সেই স্থানে বাস করেন। ব্রহ্মাণ্ডের পরিণতি—ভস্ম শিবের অঙ্গরাগ। মনুষ্য-জীবন শিবত্ব স্ফুরণের মহা-মুহূর্ত্ত, শারীর বিত্তার মেরুদণ্ড—বিল্ববৃক্ষ। আমাদের দেহতত্ত্বের অনেক রহস্যই গল্পাকারে রচিত, সেই সকল গল্প, অর্থবাদ ও রূপক রোচকের ভিতর দিয়া, তন্ত্রে বেদে, পুরাণে—ত্রিষ্টুভ, অনুষ্টুভ, জগতী মহতীর মধুচ্ছন্দে কাল সাগরে প্রবাহিত।

পৌরাণিক তত্ত্বের অর্থ—

শারীর ক্ষেত্রে—শিব পিতৃ অংশ [Katabolism] বা দৈহিক বৈশ্লেষিক শক্তি। জ্বর চিকিৎসার রস প্রয়োগের সময় বিস্তারিত ভাবে ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। তন্ত্রে শ্লেষ্মার নাম 'শিব'—শ্লেষ্মা বা শারীরনিস্রাব [ঘর্ম্ম, মল, মূত্রাদি]—এই বৈশ্লেষিক শক্তির ফল। মহর্ষি অগ্নিবেশ জ্বরকে দেহ ও মনের সন্তাপ বলিয়াছেন। দেহ ও মনের যে সমবায় তাহারই

নাম পুরুষ, সুতরাং জ্বর পুরুষের [ভিতরকার মানুষের] এক প্রকার সন্তাপ। দক্ষ—দেবীর পিতা, মাতৃ অংশের [Anabolism রসপাক] প্রসবিতা। অতএব দক্ষ, বা শরীরের রসপাক প্রবর্ত্তক কারণ, যদি তাঁহার কন্যার [রসপাকের] সহায়তা না করেন; যদি তিনি শিব বা শরীরের বৈশ্লেষিক অর্থাৎ প্রাসেকিক ক্রিয়ার ন্যায্য প্রাপ্য উপহারাদি না দিয়া তাহার অপমান করেন, তাহা হইলে শিব [দৈহিক স্রাব ক্রিয়া—মলমূত্র ঘর্ম্মাদি] কুপিত হইয়া যে উত্তাপ উৎপাদন করেন, তাহারই নাম জ্বর। আপনারা জ্বরের নিদানের সহিত এ সকল তত্ত্ব মিলাইয়া লউন; দেখিবেন জ্বরের নিদান ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে। শরীরের স্রাব সংরোধ বা রসপাকের ব্যাপন্ন অবস্থাই জ্বরের মূল ভিত্তি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি - অথর্ব্ব বেদে এক রকম রোগের উল্লেখ আছে, তাহার নাম "তক্মণ"। এই 'তক্মণ' রোগই বৌদ্ধযুগে 'জ্বর' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই স্থলে আমরা বৌদ্ধযুগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস কীর্ত্তন করিব।

দিনকরের যেমন উদয়াস্ত আছে, তেমনি যুগধর্ম্মের ও উদয়াস্ত আছে। কালক্রমে, তীক্ষ্ণশায়কের মত উজ্জ্বল ব্রাহ্মণ্য প্রতিভাও নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। যজ্ঞের ছল করিয়া ভারতে তখন রক্তের স্রোতঃ প্রবাহিত, যজ্ঞভূমি যুদ্ধ-ভূমির আকৃতি ধারণ করিয়াছিল। রক্ত-দিগ্ধ বৈদিক ধর্ম্ম, ক্রমে সংকীর্ণ সংহিতায় পরিণত হইয়াছিল। সোম-পানের পরিবর্ত্তে ভারতের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সীধু-পান আরম্ভ করিয়াছিল। উপনিষদের সূক্ষ্ম হেতুবাদ বুঝিবার লোক বিরল হইয়া আসিতেছিল। ঋষিরা সেই সকল তত্ত্বে রক্ত মাংসের সংযোগ করিয়া পুরাণ রচনায় মন দিয়াছিলেন। এই রূপ সময়েই, ভারতের এক মঙ্গল মুহূর্ত্তে—কপিলবাস্তুর রত্নপ্রাসাদে ভগবান্ বুদ্ধদেব জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ প্রসারিত ধর্ম্ম সঙ্কীর্ণ ব্রাহ্মণ্যের বিরুদ্ধে রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল। নূতন ধর্ম্ম, জগতে ও জীবনে নূতন প্রাণ ঢালিয়া দেয়। বৌদ্ধধর্ম্মও ভারতকে নূতন ভাবে গঠন করিয়াছিল। বৌদ্ধযুগে একদিকে আয়ুর্ব্বেদের অধঃপতন ঘটিয়াছিল। রাজাজ্ঞায় পশুবলি, শবচ্ছেদ প্রভৃতি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, শারীর তন্ত্রের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল; অন্য দিকে আবার চিকিৎসা বিজ্ঞান কর্ম্মাভ্যাসের মহিমায় জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল! "প্রিয়দর্শী" রাজা অশোক, মানুষ ও পশু উভয় সম্প্রদায়ের জন্যই 'রুগ্ণাবাস' ও 'চিকিৎসালয়' স্থাপন করিয়াছিলেন। বেদে দেবতা—মানুষ; বৌদ্ধ ধর্ম্মে মানুষ—দেবতা; এই 'দেবত্ব' ও ভ্রাতৃতন্ত্রের মিলন সংবাদ লইয়া, শ্রাবকেরা দেশে দেশে ছুটিয়া ছিলেন। অনাম কামবোধির কূল হইতে গ্রীক দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত নির্ব্বাণ মন্ত্রের ঐক্যতানে মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম জ্বালা যন্ত্রণা নিভাইবার ধর্ম্ম। কারুণ্যে—আয়ুর্ব্বেদের জন্ম, প্রসার ও পরিপুষ্টি বলিয়া বৌদ্ধগণ আয়ুর্ব্বেদকে আদরে বরণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ নৃপতি ভিক্ষু শ্রাবকের সহিত বৈদ্যকেও গ্রহণ করিয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদের অনেক সংহিতায় বৌদ্ধ প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ নাগার্জ্জুনের হস্তে 'সুশ্রুত' প্রতি সংস্কৃত হইয়াছিল। আমাদের বিশ্বাস এই বৌদ্ধ যুগেই "জ্বর" নামে, বৈদিক "তক্মণের" নাম-করণ হয়।

এ অনুমানের কারণ—বেদে 'জ্বরের'

নাম নাই, আচার্য্যযুগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ সুশ্রুতের সূত্র বা নিদান স্থানে জ্বরের উল্লেখ নাই। সুশ্রুতের উত্তর তন্ত্র (যাহা নাগার্জ্জুনের রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধ) সেই উত্তর তন্ত্রেই জ্বর প্রসঙ্গ লিখিত হইয়াছে। সুশ্রুতাবির্ভাবের বহুকাল পরে এই উত্তর তন্ত্র মূল সংহিতার সহিত সংযোজিত হইয়াছে।*

প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ রাজা অশোক ব্রাহ্মণ বিরোধী ছিলেন। তাঁহার শাসন সময়ে তিনি যে ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতা নষ্ট করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাহার প্রচুর প্রমাণ সাহিত্য জগতে প্রচার করিয়াছেন। বৌদ্ধযুগে ব্রাহ্মণ রচিত 'আয়ুর্ব্বেদেরও' অনেক পরিবর্ত্তন করিয়াছিল। কেবল দৈহিক ব্যাধি বিনাশ বৌদ্ধধর্ম্মের 'প্রণব' বলিয়া বৌদ্ধগণ 'আয়ুর্ব্বেদকে' নষ্ট করিতে পারেন নাই। বরং তাহারা 'আয়ুর্ব্বেদকে" ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া আপনাদের প্রয়োজন সিদ্ধির অনুকূল করিয়া লইয়াছিলেন।

তাহার পর বৌদ্ধযুগের অবসান, তান্ত্রিক যুগের আবির্ভাব। সংঘ সত্যভ্রষ্ট হইয়া টলিতেছিল, নির্ব্বাণের দার্শনিকতা ভুলিয়া, অপাত্রে ন্যস্ত ব্রহ্মচর্য্য উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িতেছিল। মঠ চৈত্যে ব্যভিচার আসিয়া অনার্য্য উৎসবে যোগদান করিতেছিল। শঙ্কর, রামানুজ ও উদয়নের প্রতিভা উদয় তোরণে উকি মারিতেছিল। সুযোগ বুঝিয়া ব্রাহ্মণ্য আবার স্ব-প্রতিষ্ঠার অবসর খুঁজিতেছিল।

ভারতে আবার ধর্ম্ম-বিপ্লব আরম্ভ হইল। বৌদ্ধ ধর্ম্ম বলিয়াছিল—"রমণী ত্যাগ কর," তন্ত্র ঘোষণা করিলেন—রমণীত্ব জননীত্বে পরিণত কর। তাহা হইলেই তোমার প্রাকৃতিক পিপাসার শান্তি হইবে।"

এই সময় সামবেদী শুঙ্গ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ সগৌরবে মাথা তুলিলেন। পাটলিপুত্র নগরে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইল। ব্রাহ্মণ বৌদ্ধের উপর প্রতিশোধ লইলেন। বজ্র-দীর্ণ গিরিশৃঙ্গের ন্যায় অশোকের বিশাল রাজ্য চূর্ণ বেণু হইয়া মহাশূন্যে মিশিয়া গেল। এ ঘটনা খৃঃ পূঃ ২৪৯ হইতে খৃঃ ১৫০ পর্য্যন্ত এসিয়ার ইতিহাসে অক্ষরে অক্ষরে অঙ্কিত আছে, অনুসন্ধিৎসু পাঠক পড়িয়া দেখিবেন। স্বল্পাবসরে মাসিকের ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা বলিবার নহে।

ব্রাহ্মণ পুষ্যমিত্র রাজা হইলেন; অশোক ব্রাহ্মণ-বিরোধী ও বেদ-বিদ্বেষ্টা ছিলেন, অশোকের দলের উপরই পুষ্যমিত্রের প্রদীপ্ত রোষানল বজ্রের ন্যায় পতিত হইল। 'স্থবিরবাদী' "মহাসাঙ্ঘিক" প্রত্যেক বৌদ্ধই পুষ্যমিত্রের নির্য্যাতন সহিতে লাগিল। আয়ুর্ব্বেদের উপর দিয়াও এই বিপ্লবের ঝড় বহিয়া গেল। কুব্জিনিশ্চয় তন্ত্রে, আবার বৈদিক যুগের 'তক্ষ্মণ' রোগ বিপর্য্যস্ত প্রকৃতির আর্ত্তস্বর শুনাইয়া দিল। বাগ্‌ভটের শিষ্য মিশ্রকেশ 'তক্ষ্মণে'র লক্ষণ আবার লিপিবদ্ধ করিলেন,—

* রায় মহাশয়ের অবগতির জন্য নিবেদন করিতেছি যে, সুশ্রুতের সূত্রস্থানের ৩য় অধ্যায়ের সূচীতে জ্বরের উল্লেখ আছে। ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে জনপদ ধ্বংসকারী জ্বরের, ১০ম অধ্যায়ে স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা জ্বরের উত্তাপ পরীক্ষা, ১১ অধ্যায়ে পানীয় ক্ষারের জ্বরে অহিতকারিতা, ২১ অধ্যায়ে সর্ব্বাঙ্গগত রোগের উদাহরণে জ্বর এবং ৩৩ অধ্যায়ের ১৩—১৬ শ্লোকে জ্বরের অসাধ্য লক্ষণ আছে। আরও আছে। সুশ্রুতের উত্তরতন্ত্র যে নাগার্জ্জুনের রচিত বা পরে সংযোজিত নহে একথা বনৌষধিদর্পণের ভূমিকায় "বৈদ্যক গ্রন্থের বিবরণে" বলা হইয়াছে। আঃ সং।

কম্পঃ কণ্ঠৌষ্ঠবিট্‌শোষাক্ষবো মূর্দ্ধোদরাঙ্গরুক্‌।
বৈষম্যাস্বপ্নসন্তাপজৃম্ভাশ্চ তক্মণাকৃতিঃ॥

কম্প, কণ্ঠ ও ওষ্ঠ শোষ, মলশোষ [মলবদ্ধতা] হাঁচী বন্ধ, উদরের ঊর্দ্ধদিকে এবং মস্তকে যন্ত্রণা, বিষমবেগ, অনিদ্রা এবং শরীরের সন্তাপ ওজৃম্ভা—তক্মণ রোগের এই গুলি লক্ষণ। আবার তক্মণের পূর্ব্বরূপ দেখুন ;—

"জৃম্ভাঙ্গমর্দ্দাবরতি দৃগ্‌দাহো গৌরবারুচী।
তক্মণানাং প্রাগ্রূপং হি দ্বিত্রিজে দ্বিত্রিলক্ষণম্‌।

তক্মণই যে জ্বর, ইহাতে আর সন্দেহ থাকে কি ? তান্ত্রিক যুগের প্রথমপাদে পুষ্যমিত্রের শাসনকালে যে সকল আয়ুর্ব্বেদ তন্ত্র রচিত হইয়াছিল, মিশ্রকেশের 'আময়াবলোক' তাহাদের অন্যতম। আমাদের বিশ্বাস বৈদিক যুগে যে রোগ তক্মণ নামে পরিচিত ছিল, বৌদ্ধ যুগের বৈদ্যগণ তাহাকেই "জ্বর" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। আবার বৌদ্ধ বিদ্বেষের ফলে তান্ত্রিক যুগে সেই জ্বর "তক্মণ" নামে পুনরভিহিত হইয়াছিল। তাহার পর, বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপচার যখন তান্ত্রিকতায় মিশিয়া গেল, লোকে যখন অসাম্প্রদায়িক ভাবে সত্যের আদর করিতে শিখিল, তখন তক্মণ ও জ্বর হরিহরের মত এক হইয়া গেল। জ্বর নামেই তাহা আয়ুর্ব্বেদ সংহিতায় স্থান লাভ করিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীব্রজবল্লভ রায়।

আয়ুর্ব্বেদের জয়।

তখন কাটোয়ায় থাকিতাম।

কাটোয়া বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে একটী অতি প্রাচীন স্থান। ইহার পৌরাণিক নাম —'কণ্টকদ্বীপ', ঐতিহাসিক এরিয়ান সাহেব 'কণ্টকদ্বীপের' অপভ্রংশে Katadupa নামে ইহার নামকরণ করেন। সেই 'কাটাদুপা' ক্রমে কাটোয়ায় দাঁড়াইয়াছে। সেন-রাজের সময়ে, মুসলমানের আমলে,কাঁটোয়া বাণিজ্য বন্দররূপে পরিণত হইয়াছিল। বিশেষতঃ "নদীয়া বিজয়ের" পর ইহার ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্যের সীমা ছিল না। গঙ্গা ও অজয়ের সঙ্গমে অবস্থিত বলিয়া মুসলমানগণ এই কাঁটোয়ায় কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন।

কাটোয়ার পূর্ব্ব সমৃদ্ধি এখন আর কিছুই নাই। কালের ইঙ্গিতে সমস্তই সলিল-সমাধি লাভ করিয়াছে। তবে জেলায় মহকুমা থাকায় সহর এখনও একেবারে শ্রীহীন হইয়া পড়ে নাই। চাউলের গঞ্জ, এবং ন্যায়পরায়ণ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কাছারী, এখনও সহরকে জীবন্ত রাখিয়াছে।

আমি থাকিতাম নগরের বাহিরে। বিস্তৃত মাঠের মধ্যে একটী সুন্দর বাংলায় আমি বাস করিতাম। সংসারে আমার স্ত্রী ও আমি, আর দ্বিতীয় কেহ ছিল না। এই দুইটী প্রাণীর পরিচর্য্যার জন্য দুইজন ভৃত্য, দুইজন দাসী এবং এক অলকাতিলক শোভী উৎকল ব্রাহ্মণ, পাচকরূপে আমাদের ঘর আলো করিয়াছিলেন।

আহারের পর আমি কর্ম্মক্ষেত্রে যাত্রা করিতাম। আমার স্ত্রী তখন একা। সময় কাটাইবার জন্য আমাদের অবস্থান স্থানের সৌষ্ঠববর্দ্ধনে তিনি কিছু অতিরিক্ত মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন। চাকর চাকরাণীদের তিনি বসিয়া থাকিতে দিতেন না, নিজেও নজেল

পাঠে অবসর সুখ ভোগ করিতেন না। বাড়ী ঘর সাজানো বাংলোটিকে তিনি বেশ সাহেবী ধরণে সাজাইয়া ছিলেন। শিক্ষিতা মহিলার কলা-নিপুণ হস্তে, আমার বাংলো এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছিল। বন্ধু বান্ধব যিনিই বেড়াইতে আসিতেন, তিনিই আমাদের বাংলো দেখিয়া, আমার স্ত্রীর রুচির প্রশংসা করিতেন। মেদী পাতার বেড়ার মাঝখানে একটী ক্ষুদ্র গেট, গেটের পরেই রক্ত কঙ্করাবৃত সঙ্কীর্ণ পথ বাংলোর সোপান পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ। সেই পথের দুই পার্শ্বে সারি সারি ক্রোটন গাছ, ক্রোটন সারির পশ্চাতে সমতল ভূমি-খণ্ডের উপর নানাবিধ ফুলের গাছ। গাছ-গুলিতে বারমাসই ফুলফুটিত। আর এই বাগান ঘেরা বাংলো খানির সরল সজ্জা কৌশল, দর্শকগণকে দুইখানি বলয়-মণ্ডিত কল্যাণ ভরা কোমল হস্তের সন্ধান বলিয়া দিত।

একদিন অপরাহ্নে কর্ম্ম ক্লান্ত দেহে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম—শিশুর চপলহাস্যে ক্রীড়া কোলাহলে নির্জ্জন বাংলো যেন আনন্দ-মুখর হইয়া উঠিয়াছে। অল্পক্ষণ পরেই বুঝি-লাম—আমার এক শ্যালিকাপতি সপুত্র স-কলত্র আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন। বাসায় একটা ধূম লাগিয়া গিয়াছে, দাস দাসীরা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

কথা প্রসঙ্গে জানিতে পারিলাম, আমার শ্যালিকাটী কিছুদিন আমার বাংলোর অতিথি রূপে কাটোয়ায় বাস করিবেন। তিনি ম্যালেরিয়া জ্বরে অনেক দিন ভুগিতেছেন, ডাক্তার স্থান পরিবর্ত্তনের পরামর্শ দিয়াছেন। বিদেশে পরিচিত বা আত্মীয় লোক না থাকায়, আমার শ্যালিকাপতি তাঁহার পত্নীকে কিছুদিন আমাদের আশ্রয়েই রাখিবার সঙ্কল্প করিয়া-ছেন।

আমার শ্যালিকা-পতিটী—চৌকীদারের সর্দ্দার, অর্থাৎ ডেপুটী বাবু—দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতা প্রাপ্ত হাকিম। সুতরাং তাঁহার প্রস্তাব আমি সাগ্রহেই অনুমোদন করিলাম। ২।৩ দিন পরেই ডেপুটী বাবু কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেলেন। শ্যালিকা আমাদের কাছেই রহিলেন।

এস্থলে আমার শ্যালিকার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব। আমার শ্যালিকা আমার স্ত্রীর দুই বৎসরের অগ্রজ। প্রথমা কন্যা বলিয়া তিনি পিতামাতার স্নেহের পাত্রী ছিলেন; সুতরাং জনকালয়ে গৃহস্থলীর কাজ শিখিবার তাঁহার অবসরই হয় নাই। তাহার পর, বিবাহের পরই তিনি ডেপুটীগৃহিণী। ইহ জীবনে এই ডেপুটীগৃহিণীর যে কয়টা বিশেষ কর্ম্ম ছিল, তাহার মধ্যে—

১। বেলা ৯টার সময় শয্যাত্যাগ।

২। শয্যাত্যাগ করিয়া চা পান

৩। বেলা ১১ টার মধ্যে আহার।

৪। আহারান্তে ছয় ঘণ্টা ব্যাপী সুদীর্ঘ নিদ্রা।

৫। সর্ব্বদাই সিলুকা-জ্যাকেট, বডিস্ প্রভৃতি আঁটিয়া বসিয়া থাকা।

৬। দাস দাসীর প্রতি কারণে অকারণে তিরস্কার। এইগুলিই প্রধান।

তাঁহার দেহ ভাল ছিল না। হিষ্টিরিয়া ও ডিস্‌পেপ্‌সিয়া তাঁহার চিরসঙ্গিনী ছিল। ইহার উপর প্রায় বর্ষাকাল ধরিয়া তিনি ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছেন। শ্রম-বিমুখ শরীর যে ব্যাধির মন্দির, এই ডেপুটি গৃহিণীই

তাহার একমাত্র উদাহরণ। ডেপুটী বাবু পত্নীকে চালচলনে বিবি বানাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বুঝিতে পারেন নাই,—ইংরাজ মহিলা-রাও আবশ্যক মত ব্যায়াম করিয়া থাকেন। অশ্বারোহণে টেনিস্ ক্রীড়ায় তাঁহাদের যে অঙ্গ সঞ্চালন কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহাতেই তাঁহাদের কুসুম-কোমল কলেবর স্বাস্থ্যের অরুণিমায় ঝলমল করিতে থাকে। বাঙ্গালী বাবুরা ইহা বুঝিতে পারেন না ; তাঁহারা পত্নীকে বিবি সাজাইয়া কেবল গৃহ শোভার উপাদানে পরিণত করেন। তাই এখনকার বঙ্গনারী—

"নামটী অবলা কিন্তু ছলনায় ছাঁদুনী।
অগ্নি তাপে গলে তনু ভাত রাঁধে রাঁধুনী॥
গৃহকার্য্যে শক্তি নাই লোকে বলে গৃহিণী।
ধাত্রী পালে শিশু ছেলে, তবু হয় "জননী"॥
সৃষ্টি ছাড়া দৃষ্টি পোড়া হিষ্টিরিয়া সঙ্গিনী।
দাস দাসীদের প্রতি মুহুঃ চোখ রাঙ্গানী॥

ইত্যাদি কবি কাহিনীর লক্ষ্যস্থল হইয়া পড়িতেছেন। বিলাসিতায় আমাদের "সদর অন্দর" কলুষিত হইতে বসিয়াছে।

ডেপুটী বাবু যে কেবল পত্নীকেই বিবি বানাইয়া সন্তুষ্ট ছিলেন, তাহা নহে। পুত্র কন্যাকে নীতি শিক্ষা দিবার সময় ও তিনি হিন্দু আদর্শ ভুলিয়া যাইতেন। আত্মত্যাগের মহিমা বুঝাইবার জন্য তিনি জনহাওয়ার্ডের দৃষ্টান্ত দিতেন। সন্তানকে হিতাহিত জ্ঞান বুঝাইবার জন্য থিওডোর পার্কারের উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেন, নেপোলিয়নের উদাহরণ দিয়া তাহাদের বীরত্ব বুঝাইতেন। অথচ তাঁহারই দেশে বীরত্ব ধীরত্ব উদারতা ও সহিষ্ণুতার আদর্শ স্বরূপ কত ভীষ্ম, কর্ণ, রাম ও কৃষ্ণ—প্রভৃতির চরিত কাহিনীর কখনও অপ্রতুল ছিল না। কিন্তু ব্যর্থ শাসন বাল্য পঙ্কিলতা হইতে তাঁহার পুত্রেরা কখনও পরিত্রাণ পাইত না। তাহারা নিরাকার সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মকে যতটা না বিশ্বাস করিত, তাহার চেয়েও বিশ্বাস করিত, পিতামহী মুখশ্রুত বিকট-নেত্রা জটাই বুড়ীকে নেল্‌সনের দৃষ্টান্ত খাড়া করিয়া, সন্ধ্যাকালে তিনি যে পুত্রকে নির্ভীকতার মাহাত্ম্য শিখাইতেন, পরদিন প্রভাতে একটী নিরীহ গঙ্গা ফড়িং দেখিয়া তাহার সেই পুত্রই ভয়ে মূর্চ্ছিত হইত।

যাহা হইক, ডেপুটী গৃহিণী আমাদের কাছে দুই মাস থাকিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি দেখা গেলনা। এমন ছায়ালোক উদ্ভাসিত মধুরানিল-বীজিত সুন্দর স্থানে বাস করিয়াও তাঁহার রোগের উপশম হইল না। তখন সকলেই বলিলেন—একবার কলিকাতায় গিয়া ভাল ডাক্তার দেখান উচিত। ৫।৬ দিনের মধ্যেই সেই ব্যবস্থা করা হইল। ডেপুটী বাবু ছুটী লইলেন। কলিকাতায় একটা বাসা স্থির করা গেল। একজন ভাল ডাক্তার ডাকা হইল—তাঁহার ফিঃ ষোড়শ মুদ্রা! তিনি মোটরে চড়িয়া আসিলেন, রোগিণীকে অনেকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিলেন, শেষে অতুল গাম্ভীর্য্যের সহিত মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—"রোগিণীর থাইসিস্ হইয়াছে, তবে প্রথম অবস্থা, ভাল হইতে পারে।"

রোগের নাম শুনিয়াই আমরা ভীত হইলাম। যাহা হউক, ডাক্তারের ব্যবস্থা মত ঔষধ সেবন চলিতে লাগিল। একমাস কাটিল কোনও উপকার হইল না অধিকন্তু কাসির সঙ্গে রক্ত উঠিতে লাগিল। আর একজন ডাক্তার ডাকা হইল। তিনি আসিয়া রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। রীতিমত

চিকিৎসা আরম্ভ হইল। সেবন, মর্দ্দন, সন্তাপন, ইনহেলন, আচ্ছাদন, প্রক্ষালন, একে একে সমস্তই আচরিত হইল। এ যেন তান্ত্রিকের স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটনাদি ষট্‌কর্ম্ম সাধন! গৃহস্থের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ। অবশেষে ডাক্তার বাবু বলিলেন—"ভাল জায়গায় "চেঞ্জ" দিন, 'চেঞ্জ' অর্থে ডাক্তারী মতে "গঙ্গাযাত্রা" আমরা তাহা বুঝিলাম। বন্ধু বান্ধবেরা বলিলেন—"এ সকল রোগে—পুরীর জল হাওয়াই ভাল।" অগত্যা ডেপুটী বাবু পুরুষোত্তমের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আমাকে সঙ্গে লইতে ছাড়িলেন না। আমার ভয় হইল-পাছে যক্ষ্মা রোগীর সংস্পর্শে থাকিয়া আমাদের ও যক্ষ্মা হয়। স্ত্রীকে সাবধান করিয়া দিলাম। তিনি কিন্তু আমার কথা গ্রাহ্য ও করিলেন না। বিদেশের নির্ব্বান্ধব পুরে, তিনি যখন সেই মরণাহতা নারীর শয্যালুণ্ঠিত মস্তক, মায়ের মত নিজের কোলে তুলিয়া লইলেন, তখন আমার মনে হইল, এক স্বর্গের দেবী তাঁহার স্নেহময় করস্পর্শে সঞ্জীবনী সুধা সেচনে বুঝি রোগিণীকে রোগমুক্ত করিয়া, নবজীবন দান করিতে মৃত্যুমলিন রোগ শয্যার পার্শ্বে আবির্ভূতা হইয়াছেন। এই সেবাপরায়ণা সুন্দরীকে, আমি যে রোগিণীর সুশ্রূষা করিতে বারণ করিয়া ছিলাম, সেজন্য অনুতপ্ত হইলাম।

পুরীতে আসিয়া প্রথমে রোগিণীর অবস্থা একটু ভাল বোধ হইয়াছিল। কিন্তু সে ভাব বেশী দিন থাকিল না। আবার জ্বর বাড়িল, কাসির সঙ্গে রক্ত উঠিতে লাগিল, উদরাময় দেখা দিল। সেই সময় একজন সাহেব ডাক্তার পুরীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে আমার আলাপ ছিল। তিনি যেস্থানে সিভিল সার্জ্জন ছিলেন, সেই স্থানে আমিও কিছুদিন সরকারী কার্য্য করিয়াছিলাম। সেই সূত্রেই তাঁহার কাছে পরিচিত হইয়াছিলাম। সাহেবকে আমাদের বিপদের কথা জানাইলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ রোগিণীকে দেখিতে আসিলেন। দেখিয়া বলিলেন "এখন রোগ চিকিৎসার অতীত হইয়া গিয়াছে, ঔষধ সেবনে কোনও ফল হইবে না। ইনি কখনও পরিশ্রম করিতেন না, সেই জন্য অম্লরোগ ও অজীর্ণ রোগে ইহার স্বাস্থ্য একেবারেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সেই অজীর্ণ হইতেই 'টিউবারকুলিসিস্' জন্মিয়াছে। এখন আর কোনও উপায় নাই। আমি আর কি করিব?"

বাস্তবিক তিনি আর কি করিবেন? তবে তিনি যে অসামান্য উদারতা দেখাইলেন, এজীবনে তাহা ভুলিব না। আমরা টাকা দিতে গেলাম, তিনি লইলেন না।

রোগিণী আর পুরীতে থাকিতে চাহিল না। বলিলেন—"আমায় সেই কাটোয়ার লইয়া চল। শান্তিময় স্থানে শান্তিতে মরিতে দাও।" অনেক কষ্টে আবার তাঁহাকে কাটোয়ায় ফিরাইয়া আনিলাম। একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। কলিকাতায় থাকিবার সময় রোগিণীকে কিছুদিন হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খাওয়ান হইয়াছিল। কাটোয়ায় আসিলে প্রতিবেশী বন্ধুগণ বলিলেন—"এইবার কবিরাজী চিকিৎসা হউক। কথাটা যুক্তিযুক্ত মনে হইল। কিন্তু ডেপুটীবাবু একেবারেই অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তিনি স্পষ্টই বলিলেন চিকিৎসায় অনেক টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে। কবিরাজ দেখাইতে গেলে, আবার কলিকাতায় লইয়া যাইতে হইবে। এখন তাহা

একেবারেই অসম্ভব। এ অবস্থায় রোগিণীকে নাড়া চাড়া করা বিপদ্ জনক। কলিকাতা হইতে কবিরাজ আনিতে গেলেও—পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অর্থব্যয় করিতে হইবে। অতএব ও সঙ্কল্প ত্যাগ করুণ।" আমার তাহাতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু আমার স্ত্রী কোন কথা শুনিলেন না। তিনি কাটোয়া হইতেই একজন বৈদ্যকে আহ্বান করিলেন। বৈদ্যটীর বয়স হইয়াছিল; শ্রীখণ্ড গ্রামে তাঁহার বাড়ী। গো-যানে চড়িয়া, এক পা' ধূলা মাখিয়া, ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বৈদ্যরাজ উপস্থিত হইলেন! রোগিণীকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিলেন, প্রায় আধঘণ্টা নাড়ী টিপিয়া বসিয়া রহিলেন! তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে মনে হইল—ভগবানের আদালতে ইহাই বুঝি সাক্ষীর জেরা!" বৈদ্য গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন "রোগ কঠিনবটে! দেখি, কি করিতে পারি!" হায় বৃদ্ধ! এখনও আশা দিতেছ? দেখিতেছি, তোমার "বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধির" উদয় হইতেছে!

বোধ হয় কবিরাজ মহাশয় আমাদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই ঈষৎ হাসিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—আমার ঔষধ সেবন করাইতে সম্ভবতঃ আপনারা আপত্তি করিবেন না। কেননা,—কোনও ডাক্তারই আর এ রোগিণীর চিকিৎসায় অগ্রসর হইবেন না। সুতরাং দায়ে পড়িয়া—আমার বা আমার সধর্ম্মী কাহারও ঔষধ খাওয়াইতে হইবে। কিন্তু, আমিও রোগীণীকে কোনও পাকা ঔষধ দিব না। একটা পাচন লিখিয়া দিয়া যাইতেছি, ১৫ দিন তাহা খাওয়ান, তার পর আর একবার দেখিয়া সময়োচিত ব্যবস্থা করিব।

পাচনের ফর্দ্দ লিখিয়া দিয়া, দুইটী টাকা দর্শনী লইয়া, গো-যানে চড়িয়া কবিরাজ চলিয়া গেলেন। আমার স্ত্রী জোর করিয়া পাচন আনাইলেন। আমরা কেবল কৌতূহলী হইয়া তাহার ফলের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

চারিদিন পরে বুঝাগেল—ঔষধ ধরিয়াছে। রোগিণীর কাসি বেশ কমিয়া গিয়াছে, ক্ষুধাও বাড়িয়াছে। ১২দিন পরে দেখিলাম—রোগিণী বালিসে ঠেস্ দিয়া বসিতে পারিয়াছেন। ১৫ দিনের দিন কবিরাজ আবার আসিলেন, রোগিণীকে দেখিয়া বলিলেন—"আর ভয় নাই, বিপদ্ কাটিয়া গিয়াছে, আর আমার আসিবার আবশ্যক হইবে না। ঐ পাচন—এখনও ১মাস খাওয়াইবেন।"

তাহাই হইল। রোগিণী দিন দিন সুস্থ হইতে লাগিলেন। এক মাসের মধ্যে জ্বর বন্ধ হইয়া গেল। আমরা বিস্ময়ে অবাক্ হইলাম। সভ্যতার অহঙ্কারে স্ফীত ডেপুটী বাবুর প্রাণে—আবার ঋষিত্বের অভিমান আসিল। এ কি ইন্দ্রজাল? যে রোগ বড় বড় ডাক্তারে আরাম করিতে পারিল না, সে রোগ একজন পাড়াগেঁয়ে কবিরাজ ভাল করিল? সাহিত্যিক বন্ধু—ব্রজবল্লভের অনুপ্রাসিক ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—'কত কোট্‌কেনা, কত কফ্‌কিওর, কেপ্‌লারের কর্ডলিভার, কিছুতেই যে কাসি কমে নাই'—সেই কাসি কিনা সামান্য জড়িবুটীর কাথে, ভৌতিক ব্যাপারের মত অকস্মাৎ অন্তর্ধান করিল? ইহাই কি মন্ত্র শক্তি?

বহুদিন পূর্ব্বে আচার্য্য অক্ষয় চন্দ্রের এক প্রবন্ধে পড়িয়াছিলাম—'ভারত বাসী ভারত

কাহাকে বলে তাহা জানেনা ; বোঝেনা, ভাবেনা। ভারতবর্ষ—ভগবানের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। দেখিবার বস্তু বটে! কিন্তু আমরা ভারত সন্তান, এহেন ভারত আমরা দেখিনাই দেখিব না। * * * * দেখিবার সামগ্রী বটে—কিন্তু আমরা দেখিলাম না।' তখন সাহিত্য ধুরন্ধরের এই মর্ম্মবাণী সহসা মনে পড়িয়া গেল। বাস্তবিক ভারতের ত কিছুই আমরা জানিলাম না। ভারতের 'আয়ুর্ব্বেদ' অযত্ন মলিন ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে, আমরা ত তাহার আদর বুঝিলাম না! ল্যাণ্ডো-চড়া, মোটরা-রোজ, জীবন্ত বিজ্ঞানের প্রতিনিধি, যে রোগ অসাধ্য বলিয়া ছিলেন, গোয়াল বিহারী বৈদ্য সে রোগ যে অনায়াসে জয় করিলেন,—সে ত কেবল আয়ুর্ব্বেদেরই অপূর্ব্ব মহিমায় হতভাগ্য আমরা ভারতের কিছুই দেখিলাম না, কিছুই বুঝিলাম ন, তাই সার্ব্ববর্ণিক বিদ্যা চর্চ্চাতেও আজিও আমাদের দুঃখ ঘুচিল না।

যে পাচন খাইয়া আমার শ্যালিকা মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন,—নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

১। কণ্টিকারী, ২। দুরালভা, ৩। কুড় ৪। বাসক ছাল, ৫। কাঁকড়া শৃঙ্গি, ৬। পল্তা, ৭। মুথা, ৮। কটুকী ৯। চিরতা, ১০। লবঙ্গ, ১১। গুলঞ্চ, ১২। চই, ১২। পিঁপুল মূল, ১৪। পিপুল, ১৫। শুঁঠ ১৬। গজ পিপুল, ১৭। জায়ফল ১৮। বামন হাঁটী. ১৯। গন্ধ ভাদুলে, ২০। দারু হরিদ্রা।

এই কুড়িখানি মস্লা, প্রত্যেকটী ৮কুঁচ ওজনে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ইহাই দুই বেলা খাওয়ান হইয়াছিল। পুরাতন জ্বরও কাস রোগে—সাধারণে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

পাচনের ফর্দ্দখানি—ডেপুটী বাবু এখনও ইষ্টকবচের মত সযত্নে রক্ষা করিতেছেন। *

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ রায়
(বিএ, বি এল)

গোমাতা।

ভারতবর্ষে আবহমানকাল হইতে গো-সেবা মাতৃ সেবার ন্যায় পুণ্য কার্য্য মধ্যে পরিগণিত হইয়া আসিতেছিল ; কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা বিদেশীয় শিক্ষা দীক্ষায় অনুপ্রাণিত হওয়ায় আচার-ভ্রষ্ট অনার্য্যের ন্যায় গো সেবা পরাঙ্মুখ হইয়া, শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বল হারাইয়া দুঃখকে সুখ বলিয়া আলিঙ্গন করিতেছি। গো মাতা বলিয়া আর্য্যদের গো সেবা নিত্য নৈমিত্তিক কাজের মধ্যে ছিল। এমন কি গো-সেবা না করিয়া কোন ও কার্য্য আরম্ভ হইত না। বস্তুতঃ মানুষের

---

* যাঁহাদের বাটীতে দুশ্চিকিৎস্য রোগ—কবিরাজী ঔষধে আরোগ্য হইয়াছে, যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের গুণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সেই সংবাদ লিখিবার জন্য আমরা অনুরোধ করিতেছি। "আয়ুর্ব্বেদের জয়" শীর্ষক অধ্যায়ে আমরা ক্রমশঃ তাহা প্রকাশ করিব।

আঃ কঃ

জীবন গরুর নিকট সর্ব্বতো ভাবে ঋণী। জন্মাবচ্ছিন্নে সকল কাজেই গাভীর উপকারিতা বর্ত্তমান।

ভূমিষ্ঠ হইয়া আমরা মাতৃস্তন্য কয়েক মাস মাত্র পান করিয়া জীবিত থাকি; কিন্তু মাতৃ-রূপিণী গাভীর পীযুষ পান করিয়া চিরকাল জীবিত থাকিতে পারি। ভূমিষ্ঠ কাল হইতে আজীবন আমরা গো দুগ্ধ পান করিয়া জীবিত থাকিতে পারি বলিয়াই, গাভীকে আর্য্যশাস্ত্র কারেরা সপ্ত মাতার মধ্যে স্থান দিয়াছেন। সপ্ত মাতা যথা—"আদৌ মাতা গুরোঃ পত্নী ব্রাহ্মণী রাজপত্নিকা। গাভী ধাত্রী তথা পৃথ্বী সপ্তৈতা মাতরঃ স্মৃতাঃ॥" জীবন ধারণ ও পোষণের পক্ষে মানবের যত কিছু প্রয়োজন তাহার অধিকাংশই গোমাতা হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়—গোমাতা আমাদের সকল কার্য্যেরই সহায়তাকারিণী। এইজন্যই বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং সর্পি র্দধিচ রোচণী।
ষড়ঙ্গ মেতন্মঙ্গল্যং পবিত্রং সর্ব্বদা গবাম্"॥
ইতি শুদ্ধিতত্বম্। গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, ঘৃত, দধি ও গোরোচনা এই ছয়টী মঙ্গল্য ও পবিত্রকর দ্রব্য।

খাদ্য শস্যের জন্য কৃষি কার্য্যে গরুর প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। যখনই ঋষিগণ মানবের আহারার্থে পঞ্চ শস্য আবিষ্কার করিয়া সমাজে চাষের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তখনই গোমেধ যজ্ঞ নিষিদ্ধ বলিয়া প্রচারিত হইল। সেই সময়ে ভারতে গোরক্ষার বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছিল, বোধ হয় সেজন্যই বিধিবদ্ধ শাস্ত্র দ্বারা উন্মার্গগামী মানবদিগের কল্যাণ কামনায় গোবধ জনিত প্রায়শ্চিত্তা-দির বাধ্যতা মূলক শাস্ত্র প্রণয়ন হয়। যে কেহ জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত অপ্রতিপালন জন্য বা গোবধে লিপ্ত থাকিলে, প্রায়শ্চিত্তী হইতে হইবে।

কৃষিকার্য্য আমাদের দেশে বলীবর্দ্দ ব্যতীত হয় না। চাষ করিতে গরুর প্রয়োজন, ক্ষেতে সার দিতে গোময় প্রধান উপাদান, গোমূত্র ক্ষেত্রের কীটনাশক সুতরাং এদেশে চাষ কার্য্য গরুর সাহায্য ব্যতীত হয় না। পঞ্চগব্য জরায়ুর কীট নাশক বলিয়া গর্ভাধানের সময় যোষিৎ বর্গের সেবিত। তত্বদর্শী ঋষিগণ অতি গবেষণায় স্থির করিয়াছিলেন দূষিত বায়ু নাশ করিতে গোময়ের তুল্য সহজ লভ্য দ্রব্য ভারতে আর নাই। সেই জন্যই অদ্যাপি ও হিন্দুর গৃহ প্রাঙ্গনে প্রাভাতিক গোময় ছড়া প্রচলিত। আমাদের যাগ যজ্ঞ, ব্রত, নিয়ম সকলই গো-সেবায় পরিপুষ্ট। পূর্ব্বকালে পুণ্যতপা ঋষিগণ বিশুদ্ধ ঘৃতদ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন বলিয়াই সুকালে সুবৃষ্টি দ্বারা বসুন্ধরা শস্যপূর্ণা হইতেন।

সর্ব্ব-লোকাদর্শ পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বাল্য জীবন গো সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, গো সেবা না হইলে চিত্ত সংশুদ্ধি হয় না, এবং চিত্তশুদ্ধি না হইলে দেশের উন্নতিকার্য্যে আত্মনিয়োগ হয় না। বিশ্রুত-কীর্ত্তি-বিরাট রাজ গোধন প্রতিপালন করিয়া ভারতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। কর্ম্মবীর বিশ্বামিত্র গোধনের মহীয়সী ক্ষমতা দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া গোধন আকাঙ্ক্ষায়ই ক্ষত্র জীবনের উন্নতি সাধন করিয়া মহর্ষি হইয়া ছিলেন। দিলীপ প্রভৃতি রাজন্য বর্গ গো সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিয়া

ধন্য হইয়া ছিলেন। ভারতে গো সেবায় পুণ্য আছে ব'লিয়া আব্রাহ্মণ সকলেই এই পবিত্র কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিত। পুরাকালে পর-মুখাপেক্ষী হওয়া পাপ মনে করা হইত। সেই জন্যই শাস্ত্রে কথিত আছে "গাবঃ পবিত্রা মঙ্গল্যা দেবানামপি দেবতাঃ। যস্তাঃ শুশ্রূষতে ভক্ত্যা স পাপেভ্যঃ প্রমুচ্যতে॥" হিন্দুর গো সেবায় পুণ্য আছে পাপ নাই। এপ্রকার পবিত্র কার্য্যেও সময়ের দোষে এদেশে শিথিলতা পরিলক্ষিত হয়। বড়ই দুঃখের কথা। ভারতের আর সে দিন নাই, এখন গোরক্ষায় উচ্চশিক্ষিত ভদ্র মহোদয়গণের দৃষ্টি নাই। তাঁহারা গো-সেবা বা প্রতিপালনের ভার গোপজাতির উপর বিন্যস্ত করিয়া প্রণষ্ট স্বাস্থ্যের জন্য দেশের জল বায়ুর দোষ দিতেছেন। অনেকেই মুখরোচক, সুখাদ্য, পুষ্টিকারক ও শরীরের উপযোগী বলিয়া দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, নবনীতে বিশেষ প্রীতি রাখেন বটে কিন্তু তাঁহারা একবার ও ভাবিয়া দেখেন না যে, ঐ সকল দ্রব্য অধুনা কি প্রণালীতে সংগৃহীত হইতেছে। যতদিন না আর্য্য সন্তানগণ তাহাদের পুরাতন প্রথা অবলম্বন করিবেন ততদিন কিছুতেই বিশুদ্ধ দুগ্ধ, দধি, ঘৃতাদি মিলিবেনা। আমাদের গো-সেবা নিত্য কার্য্যের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে; তাহা না হইলে দিন দিন আর্য্য সন্তানগণ উৎকৃষ্ট দুগ্ধ ঘৃতাদির অভাবেই ক্ষীয়মান হইবে। যে দীনতা ও মলিনতার ছায়ায় আজ ভারত সন্তানগণের মুখপঙ্কজ মলিন, তাহা স্বীয় আচার ভ্রংশ জনিত পাপেই হইয়াছে।

কবিরাজ—

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিদ্যাবিনোদ।

চরকোক্ত।

ত্রয়োদশ প্রকার স্বেদের বিধান।

সঙ্কর, প্রস্তর, নাড়ী, স্বেদাবগাহন।
পরিষেক স্বেদ আর তথা অশ্মঘন॥
কর্ষু, কুটী, ভূমি, কুম্ভী কূপ ও হোলাক।
ত্রয়োদশ বিধ স্বেদ সহিত জেন্তাক॥

১

স্বেদ্য দ্রব্য বস্ত্রেপুরি পুঁটুলী করিয়া।
উষ্ণকরি, পিণ্ডাকারে অথবা পেষিয়া॥
যে সকল স্বেদ কার্য্য হয় সম্পাদন।
তাহাকে সঙ্কর স্বেদ কহে সুধীগণ॥

২

শূক, শালী, পুলাকাদি ধান্য সিদ্ধ করি।
উৎকারিকা, বেশবার, পায়স, খিচরি॥
প্রভৃতি প্রস্তুত করি, গরম থাকিতে।
দেহের প্রমাণ পাত্রে হইবে লেপিতে॥
তদুপরি পট্টবস্ত্র, কম্বল পাতিয়া।
এরণ্ড, আকন্দ পত্র কিম্বা বিছাইয়া॥
তৈলাভ্যক্ত করি রোগী তাতে শোয়াইবে।
এরূপে প্রস্তর স্বেদ সমাধা হইবে॥

৩

স্বেদ্যদ্রব্য-ফল, মূল, পত্র, শুঙ্গা কিবা।
উষ্ণবীর্য্য পশ্বাদির মাংস শির নিবা॥
যথাযুক্ত অম্ল-নুন-ঘৃতাদি সংযোগে।
কিম্বা মূত্র ক্ষীর আদি বিহিত যে রোগে।

হাঁড়ীর মধ্যেতে রাখি মুখ বান্ধি তার।
অনলদিবে বাষ্প যেন না সরে তাহার॥
মুখবদ্ধ শরাটীর ছিদ্র করি নিবে।
নল বসাইয়া তাতে বাষ্প স্বেদ দিবে॥
করঞ্জ, আকন্দ, শর, বংশ পত্রে কিবা।
হস্তি শুণ্ড সমস্থূল নলটী করিবা॥
এক ব্যাম-চতুর্ভাগ মূলের পরিধি।
অগ্রভাগ অষ্টমাংশ দীর্ঘ তার বিধি॥
নল ছিদ্র বায়ুনাশি-পত্রেরুদ্ধ হবে।
দুই তিন স্থান তার বক্র হয়ে রবে॥
বাতহর দ্রব্য সিদ্ধ তৈল ঘৃত দিয়া।
রোগীর সর্ব্বাঙ্গ নিবে পূর্ব্বেই মাখিয়া॥
নল, বক্র হলে বেগপ্রচণ্ড না হবে।
স্বেদ সুখকর তায় প্রদাহ না রবে॥
এইরূপ স্বেদ যাতে হয় সম্পাদন।
নাড়ী স্বেদ বলি তাকে কহে সুধীগণ॥

৪

বায়ুনাশি-দ্রব্য-কাথ, ক্ষীর তৈল, ঘৃত।
মাংস রস কিম্বা উষ্ণ জল পরিবৃত॥
টবেতে অবগাহন স্বেদার্থ করিবে।
অবগাহন স্বেদ নাম তাহার জানিবে॥

৫

বায়ুনাশি-উদ্ভিদের ফল মূল দিয়া।
কাথকরি, সুখ উষ্ণ, কলসী পূরিয়া॥
ঘটী বা নলবিশিষ্ট কোন পাত্রে পূরি।
রোগীর শরীরে ধীরে সেচিবে সে বারি॥
সেচনের পূর্ব্বে তার দোষ বিচারিয়া।
উপযুক্ত সিদ্ধ তৈল ঘৃত মাখাইয়া॥
বস্ত্র দ্বারা করিবেক দেহ আচ্ছাদন।
পরিষেক স্বেদ একে কহে সুধীগণ।

৬

স্বেদ্য রোগী-শয্যাসম প্রস্তরের খণ।
শিলা তাপি কাষ্ঠানলে বায়ু বিনাশন॥
উত্তপ্ত হইলে তাহা করি নিষ্কাষিত।
উষ্ণ জলে শিলাখানি ধুইয়া ত্বরিত॥
তদুপরি কৌষেয় বা মেষ রোম জাত।
কিম্বা কম্বলাদি শয্যা করিবে প্রস্তুত॥
ঘৃতাদি অভ্যক্ত করি শোয়াবে তথায়।
ঘনবস্ত্র আবরণ করি তার গায়॥
এরূপ স্বেদের নাম হয় অশ্মঘন।
অতঃপর কর্ষূ স্বেদ করিব বর্ণন॥

৭

অভ্যন্তর সুবিস্তীর্ণ সঙ্কীর্ণ বদন।
এরূপ গর্ত্তকে কর্ষূ কহে বুধগণ॥
স্থানের যোগ্যতা বুঝি করে বৈদ্যগণ।
রোগীর শয্যার নিম্নে গর্ত্তের খনন॥
গর্ত্ত পূরি ধূম শূন্য জলন্ত অঙ্গারে।
তদুপরি খট্টা দিতে শোয়াইবে তারে॥
এরূপে যে সব স্বেদ করিবে গ্রহণ।
কর্ষূ স্বেদ নাম তার কহে বৈদ্যগণ॥

৮

অনতি উচ্চ বিস্তার, গোলাকার হবে।
কুটীরের ঘন ভিত্তি, জানালা না রবে॥
কুড়াদি সুগন্ধিদ্রব্য প্রলিপ্ত করিয়া।
তাহাতে বিস্তীর্ণ শয্যা লইবে পাড়িয়া॥
প্রাবার অজিন, কুথ, কৌষেয়, কম্বল।
শয্যার উপকরণ হবে এ সকল॥
অঙ্গারাগ্নি পূর্ণ হাঁড়ী চতুর্দ্দিগে রবে।
তৈল কিম্বা ঘৃত মাখি রোগী শয্যা লবে॥
শুইয়া সুখেতে স্বেদ করিবে গ্রহণ।
ইহাকেই কুটী স্বেদ কহে বুধগণ॥

৯

অশ্মঘন ভূমি স্বেদ একই প্রকার।
প্রস্তরের স্থানে ভূমি শুধু ভিন্নতার॥

১০

বাতঘ্ন দ্রব্যের কাথে কুম্ভ পূর্ণ করি।
অর্দ্ধ, ত্রিভাগ কিম্বা ভূমি মধ্যে ভরি॥

কলসী উপরে, অতি স্থূল সূক্ষ্ম নয়।
এরূপ আসন, শয্যা স্থাপিবে নিশ্চয়॥
পরে লৌহ শিলা খণ্ড উত্তপ্ত করিয়া।
লইবে সে কুম্ভী মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া॥
বায়ুনাশি স্নেহ ভাক্ত; বস্ত্র পরাইয়া।
কুম্ভ বাষ্প স্বেদ দিবে আসনে বসিয়া॥
যেরূপে এ সুখে স্বেদ হয় সম্পাদন।
কুম্ভীস্বেদ নাম তার কহে সুধীগণ॥

১১

রোগীর শয্যার সম কূপের বিস্তার।
দ্বিগুণ প্রামাণ হবে গভীর তাহার॥
বায়ু শূন্য স্থান, তার মধ্য সুমার্জ্জিত।
গজাশ্ব গর্দ্দভ উষ্ট্র গোঘুঁটে পূর্ণিত॥
অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করি নির্ধূম হইলে।
অঙ্গার তুলিয়া তথা শয্যা বিস্তারিবে॥
বায়ুনাশি স্নেহ মাখি, বস্ত্র আচ্ছাদিয়া।
সুখে স্বেদ দিবে রোগী শয্যায় শুইয়া॥
যাহাতে এরূপ স্বেদ হয় সম্পাদন।
তাহাকেই কূপ-স্বেদ কহে বুধগণ॥

১২

বৃহৎ পিত্তল পাত্রে রোগী শয্যা সম।
গবাদি ঘুঁটায় দগ্ধ করিয়া উত্তম॥
উত্তপ্ত হইলে উহা, অগ্নি উঠাইয়া।
তদুপরি শয্যা নিবে রচনা করিয়া॥
স্নেহ ভাক্ত করি রোগী করিবে শয়ন।
অবশ্য থাকিবে তার গাত্র আবরণ॥
অক্লেশে এস্বেদ রোগী গ্রহণ করিবে।
ইহাকে হোলাক-স্বেদ সকলে কহিবে॥

১৩

জেন্তাক-স্বেদেতে স্থান পরীক্ষা উচিত।
রোগী গৃহ পূর্ব্বোত্তরে হবে তা নিশ্চিত॥
ফল ফুল সুশোভিত, তুষাঙ্গার হীন।
কৃষ্ণ বা সুবর্ণ বর্ণ মাটি তদধীন॥
নদী দীঘি পুষ্করিণী জলাশয় কূলে।
ঘাটের সমীপে স্থান হবে সমতলে॥
সাত কিম্বা আট হাত দূরেতে তাহার।
পূর্ব্ব বা উত্তর দ্বারী হবে কূটাগার॥
উচ্চতা বিস্তার তার ষোল হাত রবে।
মৃত্তিকায় লিপ্ত গৃহ গোলাকার হবে॥
উহাতে অনেকগুলি জানালা রাখিবে।
অভ্যন্তরে চারিদিকে পিণ্ডিকা গড়িবে॥

এক হস্ত পরিসর উচ্চতা তাহার।
কপাটের ধারে সুধু বাদ রবে তার॥
মধ্যস্থলে চারিহস্ত প্রশস্ত অপর।
সাতহাত; সূক্ষ্মছিদ্র রবে বহুতর॥
কন্দুর সদৃশ এক উনন করিবে।
তদূর্দ্ধ ঢাকিতে এক ঢাকনা গড়িবে॥
উননে খদির কাষ্ঠ, অশ্বকর্ণ কিবা।
পবিত্র কাষ্ঠাদি পূরি অগ্নিজ্বালি দিবা॥
যখন দেখিবে তাহা ধূমহীন আর,
অগ্ন্যত্তপ্ত স্বেদ যোগ্য উত্তাপ তাহার।
তখন বায়ু বিনাশি-স্নেহ মাখি গায়।
বস্ত্র আবরিয়া রোগী পাঠাবে তথায়॥
প্রবেশের কালে তারে উপদেশ দিবে।
"কল্যান আরোগ্য জন্য এগৃহে পশিবে॥
গৃহের বেদীর পরে করি আরোহণ।
যে পার্শ্বে লভিবে সুখ করিবে শয়ন॥
ঘর্ম্ম হয়, মূর্চ্ছাহয় জীবন্ত কখন।
বেদীছাড়ি দ্বারে নাহি কর আগমন॥
তথায় আসিলে ঘর্ম্ম মূর্চ্ছাদি হইয়া।
সদ্যঃপ্রাণ হারাইবে রাখিও জানিয়া॥
যখন বুঝিবে কফ বিগত তোমার।
ঘর্ম্মস্রাবরুদ্ধ-স্রোত বিমুক্ত আবার;
দেহলঘু; বিরুদ্ধতা, জড়তা, সুপ্তিভাব।
বেদনা ও ভারবোধ হবে তিরোভাব।
তখন করিবা তুমি বেশ্মনুসরণ।
দ্বারদেশে করিবেক শুভ আগমন॥
বেদীছাড়ি দ্বারদেশে যখন আসিবে।
সহসা শীতল জল নেত্রে নাহি দিবে॥
মুহূর্ত্ত বিশ্রাম পরে সন্তাপ জনিত।
শ্রম অপগত বোধ হলে সুনিশ্চিত॥
সুখোষ্ণ জলেতে স্নান; আহার করিবে।
ইহাকে জেন্তাক স্বেদ সকলে কহিবে॥

কবিরাজ

শ্রীরাসবিহারি রায় কবিকঙ্কণ।

রোগবিনিশ্চয়।

জ্বর

জ্বরোৎপত্তির কারণ।

নিম্নলিখিত কারণে মনুষ্যের জ্বর রোগ উৎপন্ন হয়—

মিথ্যা আহার, মিথ্যা বিহার, মিথ্যাপ্রযুক্ত রসায়ণ, মিথ্যাযুক্ত বা অতিযুক্ত স্নেহাদি কর্ম্ম অর্থাৎ স্নেহ-স্বেদ-বমন—বিরেচনের ও বস্তির অতিযোগ বা মিথ্যাযোগ, বিবিধ অভিঘাত, রোগ বিপর্য্যয়, ব্রণাদির পাক, অতিশ্রম, ক্ষয়, অজীর্ণদোষ, বিষভোজন, সাত্ম্যবিপর্য্যয়, ঋতু-বিপর্য্যয়, বিষবৃক্ষের পুষ্পগন্ধাঘ্রাণ, শোক, নক্ষত্র ও ক্রূর গ্রহপীড়া, অভিচার, অভিশাপ, কামাদি অভিসঙ্গ, ভূতাদিসঙ্গ; (স্ত্রীপক্ষে)—প্রসবের অনিয়ম, প্রসবান্তে অহিত সেবা, স্তন্যাবতরণ, স্তনদুগ্ধের দোষ (শিশু পক্ষে)।

মিথ্যা আহার।

আহার আবার মিথ্যা সত্য কি? আহারের উদ্দেশ্য শরীররক্ষা, কেবল চর্ব্বণ ও গলাধঃকরণ করিলেই আহারের উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হয় না। ভুক্ত বস্তু যদি পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া শরীর ধারণ ও পোষণের অনুকূল হয় তবেই তাহাকে যথার্থ আহার বলিব। যে আহার দ্বারা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না তাহাকে মিথ্যা আহার বলে। আটটী বিষয় বিবেচনা না করিয়া আহার করিলে আহার মিথ্যা হইয়া থাকে। সেই আটটী বিষয় যথা—(১) প্রকৃতি (২) করণ (৩) সংযোগ (৪) রাশি (৫) দেশ (৬) কাল (৭) উপযোগ-সংস্থা (৮) উপযোক্তা।

(১) প্রকৃতি শব্দের অর্থ স্বভাব। খাদ্যের স্বাভাবিক গুণকে প্রকৃতি বলে। মাষকলায়ের গুরুত্ব মুগকলায়ের লঘুত্ব, মাষ ও মুগের প্রকৃতি। এইরূপ সকল খাদ্য দ্রব্যেরই এক বা বহু স্বাভাবিক গুণ আছে। শরীরের অবস্থানুসারে এই সকল গুণ বিবেচনা করিয়া আহার করিতে হয়—না করিলে আহারের মিথ্যাযোগ অর্থাৎ সে আহার শরীরের পক্ষে হিতকর হয় না। সুতরাং রোগের কারণ হইয়া থাকে।

৬—আয়ুর্ব্বেদ, চৈত্র।

(২) করণ—স্বাভাবিক দ্রব্যের সংস্কারের নাম করণ। সংস্কার দ্বারা দ্রব্যের গুণান্তর হইয়া থাকে। এই সংস্কার আটপ্রকারে সাধিত হইয়া থাকে যথা—জল, অগ্নি, শোধন, মন্থন, দেশ, বাসন, ভাবনা ও পাত্র *।

(৩) সংযোগ—দুই বা বহু বস্তুর মিশ্রীভাবকে সংযোগ বলে। সংযোগের পূর্ব্বে সেই সেই বস্তুতে যে গুণ ছিল না সংযোগের পর তাহাতে এমন অনেক অপূর্ব্বগুণেরও আবির্ভাব হয়। মধু ও ঘৃতের মধ্যে কোনটীই মারক নহে কিন্তু মধু ঘৃত তুল্য পরিমাণে মিশ্রিত হইলে মারক হয়। মধু, মাংস, দুগ্ধ তিনটীর কোনটীই কুষ্ঠকারি নহে কিন্তু দুগ্ধ, মধু মৎস্যের মিলন কুষ্ঠকারি।

(৪) রাশি—দ্রব্যের মাত্রাকে রাশি বলে। রাশি দুইপ্রকার সর্ব্বগ্রহ রাশি ও পরিগ্রহ রাশি। ভাত, দাল, ব্যঞ্জন, দুগ্ধ মিলিত হইয়া যে পরিমাণ হয় তাহাতে সর্ব্বগ্রহ রাশি এবং এত ভাত, এত দাল, এত ব্যঞ্জন. এত দুগ্ধ প্রভৃতি প্রত্যেকের প্রমাণকে পরিগ্রহ রাশি বলে। এই দ্বিবিধ রাশি অর্থাৎ আহার পরিমাণের উপরি আহারের মিথ্যাত্ব অমিথ্যাত্ব নির্ভর করে।

(৫) দেশ—দেশ শব্দে খাদ্য দ্রব্যের উৎপত্তি ও প্রচার স্থান এবং ভোজন কর্ত্তার অবস্থিতি স্থান বুঝিতে হইবে। খাদ্যদ্রব্যের উৎপত্তি স্থানভেদে গুণান্তরের উদাহরণ—শীতপ্রদেশে জাত দ্রব্য গুরু এবং মরুদেশ জাত দ্রব্য লঘু হইয়া থাকে। দ্রব্যের প্রচার স্থান বিশেষেও

* জলদ্বারা সংস্কারে দ্রব্যের গুণান্তর হয় যথা—শুষ্ক কলায় ও ভিজান কলায়, চিনি ও চিনির সরবৎ। অগ্নিদ্বারা সংস্কারে গুণান্তর যথা—কাঁচা ও ভাজা কলায়। অগ্নির স্বরূপ ভেদেও গুণান্তর হয় যেমন কয়লার, কাঠের, ঘুঁটের ও তেলের জ্বালে পাক করা হইলে একই বস্তুর গুণান্তর হয়। শোধন দ্বারা গুণান্তরের উদাহরণ আমরা সকলেই জানি। তণ্ডুলাদি শোধন অর্থাৎ ধৌত করিয়া ব্যবহার না করিলে বিবিধ উৎকট রোগ জন্মিয়া থাকে। মন্থন মওয়া একটী সংস্কার। ইহার দ্বারাও দ্রব্যের গুণান্তর হইয়া থাকে। দধি শোথকারি কিন্তু মথিত দধির ননী না তুলিলেও উহা শোথনাশক হইয়া থাকে। দেশ অর্থাৎ স্থানভেদে দ্রব্যের গুণান্তর হইয়া থাকে এজন্য দেশকেও সংস্কারের অন্তর্গত করা হইয়াছে। উষ্ণজল, বায়ু-প্রবাহ-বর্জ্জিত স্থানে রাখিয়া শীতল করিলে যে গুণ হয়, প্রবাত স্থানে রাখিয়া শীতল করিলে তাদৃশ গুণ হয় না। গাছপাকা ফলের যে গুণ, ফল পাড়িয়া পাত্রাবদ্ধ করিয়া পাকাইলে, এই জাঁকান পাকা ফলের গুণ তাদৃশ হইবে না। অনেক ঔষধ ভস্মরাশি বা ধান্যরাশিতে রাখিবার উপদেশ আছে। বাসন—সংস্কার দ্বারা দ্রব্যের গুণান্তর হইয়া থাকে বাসন শব্দের অর্থ গন্ধাধিবাসন অর্থাৎ কোন সুগন্ধি বস্তুর সংসর্গে কোন দ্রব্যকে সুগন্ধি করা। আমরা যে তরকারীতে মসলা কি গরম মশলা দিয়া থাকি তাহাও একপ্রকার বাসন সংস্কার মাত্র। জল, গোলাপ ফুলের সহিত বাসন-সংস্কারে গোলাপ জলে পরিণত হইয়া থাকে। তিল, পুষ্প সহ অধিবাসিত হইলে সেই তিলজ তৈল ফুলেল তৈল হয়। বলা বাহুল্য জল ও গোলাপ জলের তিল তৈল ও ফুলেল তৈলের গুণ কদাপি এক নহে। ভাবনা সংস্কারের অর্থ এই যে, কোন বস্তুকে কোন রস বা কাথ দ্বারা আপ্লুত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করা। আমলকী কোন বস্তুর রসে আপ্লুত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলে অবশ্যই আমলকীর গুণান্তর হইবে। কালপ্রকর্ষ আর এক সংস্কার—কালপ্রকর্ষে অর্থাৎ পুরাণ হইলে অনেক দ্রব্যেরই গুণান্তর হইয়া থাকে। আমরা সকলেই জানি নূতন ও পুরাণ চাল, ঘৃত, গুড় প্রভৃতির গুণে অনেক তফাৎ। পাত্র বিশেষে ও দ্রব্যের গুণান্তর হয়। শাস্ত্রে রৌপ্য, স্বর্ণ, তাম্র কাংস্যাদি পাত্রে ভোজনের গুণ পৃথক্ পৃথক্ লিখিত হইয়াছে। কুষ্মাণ্ডখণ্ড তাম্র পাত্রে এবং ত্রিকত্রয়াদি-লৌহ লৌহপাত্রে পাক ও মর্দ্দন করিবার উপদেশ আছে।

গুণান্তর হয় যথা যে প্রাণী জলাসন্ন ভূমিতে বিচরণ করে কিম্বা গুরু দ্রব্য ভোজন করে তাহার মাংস গুরু এবং যে প্রাণী মরুদেশে বাস করে এবং লঘু বস্তু ভোজন করে তাহার মাংস লঘু হইয়া থাকে। আমরা সকলেই জানি কোন কোন ফল শস্য স্থান বিশেষে যেমন উপাদেয় হয় অন্যত্র তেমন হয় না। দেশ সংস্কার প্রভাবে দেশ সাত্ম্যও বিচার করিতে হইবে। রাজপুতনার মরুপ্রায় দেশে শীত পানীয় ও স্নেহ বহুল বস্তু ভোজন হিতকর কিন্তু হিমগিরি বক্ষঃস্থিত প্রদেশে ঐ সকল দ্রব্য কদাপি হিতকর হইতে পারেনা;—কিন্তু রুক্ষ ও উষ্ণ বস্তু হিতকর হইবে।

(৬) কাল—কালানুসারে বিবেচনা করিয়া ভোজন না করিলে আহার হিতকর হয় না। যাহা বালকের পক্ষে হিতকর, যুবকের পক্ষে তাহা হিতকর না হইতে পারে; যুবকের পক্ষে যাহা হিতকর বৃদ্ধের পক্ষে তাহাই যে হিতকর হইবে বলা যায় না। তারপর সুস্থ বালকের পক্ষে যাহা হিতকর, কিংবা শ্লেষ্মপ্রকৃতির বালকের পক্ষে যাহা হিতকর, রুগ্ন বা পিত্তপ্রকৃতির পক্ষে তাহা হিতকর হইবেনা। গ্রীষ্মে যাহা হিতকর, শীতে তাহা হিতকর নহে। অসময়ে ভোজন বিবিধ পীড়ার কারণ, অতএব কালবিবেচনা পূর্ব্বক আহার গ্রহণ করা নিতান্ত আবশ্যক, অন্যথা আহারের মিথ্যাযোগ ঘটিয়া থাকে।

(৭) উপযোগসংস্থা—ভোজনের বিধিকে উপযোগসংস্থা বলে। যেমন—ভুক্ত খাদ্য জীর্ণ হইলে পুনর্ব্বার ভোজন করিবে, পবিত্র স্থানে হস্ত, পদ, মুখ প্রক্ষালন করিয়া ভোজন করিবে, নিবিষ্ট চিত্তে ভোজন করিবে ইত্যাদি।

(৮) উপযোক্তা—ভোজন কর্ত্তা স্বীয় প্রকৃতি ও অভ্যাসের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া আহার করিবে। ইহার বিপরীত আচরণ করিলে মিথ্যা আহার জন্য পীড়া জন্মিতে পারে। আমি নিরামিষ ভোজন করিতে অভ্যস্ত, কি আমি একবার আহার করিতে অভ্যস্ত, আমি যদি মাংস ভোজন বা দুইবার আহার করি তাহা হইলে আমার পীড়া জন্মিতে পারে। দিবা-নিদ্রা নিষিদ্ধ কিন্তু যাহার দিবানিদ্রা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে তাহার পক্ষে দিবানিদ্রা হঠাৎ পরিত্যাগ বিধেয় নহে। যে আহার বিহার অহিতকর হইলেও অভ্যাস গুণে ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে হিতকর হইয়া পড়িয়াছে সেই আহার বিহারকে ওকসাত্ম্য বলে।

মিথ্যা বিহার।

স্নান, নিদ্রা, জাগরণ, ভ্রমণ, ক্রীড়া, মৈথুন প্রভৃতিকে বিহার বলে। এই স্নান, নিদ্রাদি কিরূপ ভাবে আচরণ করিলে স্বাস্থ্যের বা রোগারোগ্যের পক্ষে হিতকর হয় শাস্ত্রকার তাহা বলিয়া দিয়াছেন, কিম্বা ব্যক্তিবিশেষের এসকল বিষয়ে বিশেষ বিশেষ অভ্যাস আছে। শাস্ত্র বিধি অনুসারে কিম্বা শাস্ত্র বিরুদ্ধ হইলেও যাহা ব্যক্তিবিশেষের অভ্যাস গুণে সহ্য পাইয়াছে তদনুসারে, স্নানাদির অনুষ্ঠান না করিলেই মিথ্যা বিহার বলিয়া কথিত হয়। স্নান হিতকর বটে কিন্তু দীর্ঘকাল জলে থাকিয়া স্নান কিম্বা ঋতুর প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া স্নান (যেমন শীত-কালে অতিশীতল জলে স্নান কিম্বা গ্রীষ্মে অত্যুষ্ণ জলে স্নান) রোগের কারণ। বিহিত নিদ্রা

স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে হিতকর কিন্তু অতিনিদ্রা—বা অনিদ্রা মিথ্যা বিহার,ইহা বিবিধ রোগের কারণ। জাগরণ—ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগের উপদেশ আছে—ইহার বিপরীত আচরণ করিলে মিথ্যাবিহার হয়। পরিমিত ব্যায়াম শরীর রক্ষার জন্য নিতান্ত প্রয়োজন, কিন্তু অতিব্যায়াম মিথ্যাবিহার। দুঃসাহস পূর্ব্বক কোন আয়াস জনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াকেও মিথ্যাবিহার বলে। যে ২০ সের বস্তু তুলিতে পারে না সে যদি আড়াই মোণ ভার উঠাইতে চেষ্টা করে কিম্বা যদি কেহ ধাবমান অশ্ব মহিষাদির বেগরোধ করিতে প্রয়াস পায়, তাহা হইলে তাহার মিথ্যা বিহারের অনুষ্ঠান করা হয়—এইরূপ মিথ্যা বিহারকে "অযথা বলারম্ভ" বলে।

মিথ্যাপ্রযুক্ত রসায়ন।

যে ঔষধ শরীরের মালিন্য দূর করিয়া, আরোগ্য, বীর্য্য, কান্তি মেধা ও সুদীর্ঘ আয়ু দান করে। যাহা অকাল জরা হইতে দূরে রাখে সেই ঔষধকে রসায়ন বলে। রসায়ন, যাহাকে তাহাকে যখন তখন প্রয়োগ করা যায় না—শাস্ত্রে রসায়ন প্রয়োগের কতকগুলি বিধি উপদিষ্ট হইয়াছে। চরক সংহিতার চিকিৎসা স্থানের প্রথম অধ্যায়ে রসায়ন বিধি উপদিষ্ট হইয়াছে। এই নিয়ম প্রতিপালন না করিয়া রসায়ন যোগ সেবন করিলে মিথ্যা প্রযুক্ত রসায়ন জন্য জ্বর হয়। *

মিথ্যাযুক্ত বা অতিযুক্ত স্নেহাদিকর্ম্ম।

স্নেহাদি কর্ম্ম শব্দে স্নেহপান, স্বেদ, বমন, বিরেচন ও বস্তি এই পঞ্চকর্ম্ম বুঝিতে হইবে। মিথ্যাযুক্ত শব্দের অর্থ অযোগযুক্ত, কেননা স্নেহপানাদির মিথ্যাযোগ সম্ভব নহে। স্নেহপান প্রভৃতি উপরি লিখিত পঞ্চকর্ম্মের সম্যক্‌যোগ, অতিযোগ এবং অযোগ, শাস্ত্রকারেরা এই ত্রিবিধ যোগের উল্লেখ করিয়াছেন। পঞ্চকর্ম্ম ঠিক্ প্রযুক্ত হইয়া কার্য্যকারী হইলে সম্যক্‌যোগ, বমনাদির অত্যন্ত প্রবৃত্তি হইলে অতিযোগ এবং যদি প্রতিলোমভাবে ও অল্পমাত্রায় প্রবৃত্তি হয় অর্থাৎ যদি বমন করাইতে গিয়া বিরেচন কিংবা অল্পবমন কিম্বা বিরেচন করাইতে গিয়া বমন বা অল্পবিরেচন হয় তাহা হইলে অযোগ বলে। পঞ্চকর্ম্মের মধ্যে স্নেহপান ও বস্তির কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা আবশ্যক। বিশেষ ফল লাভের জন্য ব্যক্তিবিশেষকে ঘৃত, তৈল, বসা ও মজ্জা বিধিপূর্ব্বক পান করান হইয়া থাকে ইহারই নাম স্নেহপান। কোন্ কালে, কোন্ লোককে, কত মাত্রায় কতদিন ঐ ঘৃতাদি পান করাইতে হইবে ইহার বিশেষ বিবরণ আয়ুর্গ্রন্থের স্নেহাধিকারে বিবৃত হইয়াছে। বস্তি শব্দের অর্থ পিচকারী দ্বারা গুদমার্গ দিয়া কাথ বা স্নেহযুক্ত কাথ প্রবেশ করান। কেবল কাথ দ্বারা প্রদত্ত বস্তির নাম "নিরুহ বস্তি" এবং স্নেহান্বিত কাথাদি দ্বারা প্রদত্ত বস্তিকে "অনুবাসন বস্তি" বলে।

শস্ত্র, লোষ্ট্র, কশা (চাবুক), কাষ্ঠ, মুষ্টি, নখ, দন্ত ও পতনাদি হইতে প্রাপ্ত আঘাতকে অভিঘাত বলে।

---

* কোন সংগ্রহ পুস্তকে লেখাছিল আমলকীচূর্ণ আমলকীর রসে ৭টী ভাবনা দিয়া সেবন করিলে রসায়নের কার্য্য করে। এই দেখিয়া একজন ভদ্রলোক উহা প্রস্তুত করিয়া সেবন করে এবং সেবনের প্রথম দিনেই ঘোরতর জ্বররোগে পীড়িত হয়। আমি চিকিৎসার্থ আহূত হইয়া রোগের বিবরণ শুনিয়া উপবাস ব্যবস্থা করিলে—জ্বর নিবৃত্তি পাইয়াছিল। এইরূপ বহু উদাহরণ আছে।

সাত্ম্যবিপর্য্যয়—ঋতুবিপর্য্যয়।

সাত্ম্য শব্দের অর্থ যাহা অভ্যস্ত সুতরাং অপথ্য হইলেও বা অধিক মাত্রায় সেবন করিলেও অহিতকারী হয় না। সাত্ম্য ছয় প্রকার জাতি সাত্ম্য, প্রকৃতি-সাত্ম্য, ঋতুসাত্ম্য, ওকসাত্ম্য দেশ সাত্ম্য, আময়-সাত্ম্য। যে জাতির লোকের যে বস্তু সাত্ম্য তাহাকে জাতিসাত্ম্য বলে। যেমন ইংরাজের মাংস, বাঙ্গালীর অন্ন ও দুগ্ধ। চরকের চিকিৎসাস্থানের ৩০ অধ্যায়ের শেষে ভারতীয় কোন কোন জাতির কিকি সাত্ম্য ছিল তাহার উল্লেখ আছে। প্রকৃতি-সাত্ম্য—লোকে চল্‌তিকথায় যাহাকে "ধাত্‌" বলে (যেমন বায়ুর ধাত পিত্তের ধাত্‌ কফের ধাত্‌) তাহাই প্রকৃতি। এই প্রকৃতি অনুসারে যাহার যাহা সাত্ম্য তাহাকে প্রকৃতি সাত্ম্য বলে যেমন বায়ু প্রকৃতির স্বাদু, অম্ল ও লবণরস সাত্ম্য, কফ প্রকৃতির কটু, তিক্ত, কষায় রস সাত্ম্য। এই সাত্ম্যের বিপর্য্যয় হইলে অর্থাৎ কফপ্রকৃতির লোক যদি হঠাৎ অধিক পরিমাণে স্বাদু ও অম্লরস কিম্বা বাত প্রকৃতি কটু, তিক্তরস ভোজন করে তাহা হইলে সাত্ম্যবিপর্য্যয়-হেতু উহাদের জ্বর বা অতিসার হইতে পারে। ঋতুসাত্ম্য—যে ঋতুতে যে দ্রব্য ভোজন বা যেরূপ আচার বিহার হিতকর ঋতুচর্য্যাধ্যায়ে তৎসমুদায়ের উল্লেখ আছে। যদি এই ঋতু-সাত্ম্যের বিপর্য্যয় ঘঠে তাহা হইলে জ্বর বা অতিসার হইতে পারে। যেমন গ্রীষ্মঋতুতে স্বাদু, শীতল স্নিগ্ধ বস্তু হিতকর ইহার পরিবর্ত্তে যদি কেহ কটু তিক্ত রুক্ষ বস্তু ভোজন করে তাহা হইলে ঋতুসাত্ম্য-বিপর্য্যয়হেতু তাহার জ্বরাদি রোগ হইতে পারে। এইরূপ অন্যান্য ঋতুতেও ব্যাখ্যা করিবে। দেশসাত্ম্য—দেশ তিন প্রকার জাঙ্গল, আনূপ ও সাধারণ। এই তিন প্রকার দেশের জল, বায়ু ভূমি বিভিন্ন গুণাক্রান্ত হওয়ায়, দেশ ভিন্ন ভিন্ন গুণযুক্ত হইয়া থাকে। দেশ যে গুণাক্রান্ত হইবে তাহার বিপরীত গুণ সেই দেশের পক্ষে সাত্ম্য হইবে। স্নেহ ও গৌরব আনূপদেশের গুণ সুতরাং ইহার বিপরীত রৌক্ষ্য ও লাঘব আনূপদেশ সাত্ম্য বুঝিতে হইবে। রোগোপশমকারী আহার বিহারকে আময় সাত্ম্য বলে। স্তন্যাবতরণ শব্দের অর্থে প্রসবের পর স্তনে প্রথম "দুধনামা" ইহার জন্য যে জ্বর হয় লোকে সেই জ্বরকে "ঠুনকোজ্বর" বলে। জ্বর নিদানের অপর দুরূহ শব্দের অর্থ যথাস্থানে কথিত হইবে।

উপরি লিখিত কারণে কুপিত বায়ু. পিত্ত, কফ পৃথক্ ভাবে, সংসৃষ্ট ভাবে অর্থাৎ দুইটী দুইটী মিলিয়া (বাতপিত্ত, বাতশ্লেষ্মা, পিত্তশ্লেষ্মা) কিম্বা সন্নিপতিত হইয়া অর্থাৎ তিনটী একত্র মিলিয়া রসানুগত হইয়া থাকে। অনন্তর রসানুগত দোষ আমাশয় হইতে জাঠরাগ্নিকে (তেজোরূপ পাচক পিত্ত) বহির্নিক্ষিপ্ত করিয়া এই জাঠরাগ্নির উষ্মার সহিত দোষের নিজের উষ্মা মিলিত হইয়া, দেহের উষ্মার বলবৃদ্ধি করিয়া, প্রকুপিত দোষ সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে এবং ঘর্ম্মবাহি স্রোতঃ সকল রুদ্ধ করে। ইহার ফলে দেহে অধিক সন্তাপ জন্মিয়া থাকে সর্ব্বাঙ্গ অত্যন্ত উষ্ণ হয় তখন জ্বর হইয়াছে বলি। তরুণ জ্বরে অগ্নি নিজস্থান হইতে প্রচ্যুত এবং স্রোতঃসকল রুদ্ধ হয় বলিয়া নব জ্বরে প্রায় ঘর্ম্ম হয় না।

জ্বরের বিভাগ।

সমস্ত জ্বরেই সন্তাপ থাকে সুতরাং সন্তাপ লক্ষণ লইয়া বিচার করিলে জ্বর এক প্রকার

বলিতে হয়। নিজ ও আগন্তু ভেদে জ্বর দুই প্রকার। কারণ ভেদে নিজ জ্বর সাত প্রকার যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, বাতশ্লেষ্মজ, বাতপিত্তজ পিত্তশ্লেষ্মজ ও ত্রিদোষজ। আগন্তুজ্বর এক প্রকার সকল আগন্তু জ্বরই ব্যথাপূর্ব্বক হইয়া থাকে অর্থাৎ কোন না কোন রূপ আঘাত প্রাপ্ত হইলে হয়। এই আগন্তুজ্বর আবার কারণ ভেদে চারি প্রকার যথা—অভিঘাতজ, অভিষঙ্গজ, অভিচারজ ও অভিশাপজ। দোষের বলবত্ব এবং দুর্ব্বলত্ব কালের বলবত্ব এবং দুর্ব্বলত্বহেতু জ্বর আবার পাঁচ প্রকার যথা সন্তত, সতত অন্যেদ্যুঃষ্ক, তৃতীয়ক ও চতুর্থক। আশ্রয়ীভূত ধাতু ভেদে জ্বর সাত প্রকার যথা রসগতজ্বর, রক্তগতজ্বর, মাংসগত জ্বর, মেদোগত-জ্বর, অস্থিগতজ্বর, মজ্জগতজ্বর ও শুক্রগতজ্বর। অন্তর্ব্বেগ ও বহির্বেগভেদে জ্বর দুই প্রকার। ইহা ভিন্ন প্রাকৃত, বৈকৃত, সাধ্য, অসাধ্য, সাম, নিরাম, শারীর, মানস সৌম্য, আগ্নেয়ভেদে জ্বরের ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। এই সকল জ্বরের বিবরণ যথা স্থানে কথিত হইবে।

জ্বরের প্রধান লক্ষণ—দেহ ও মনের সন্তাপ। দেহের সন্তাপ বলিলে কেবল শরীরের উত্তাপ বুঝায় না উহার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়গণের বিকলতাও বুঝায়। ইন্দ্রিয়ের বিকলতা অর্থে যে ইন্দ্রিয়ের যে কার্য্য তদ্বিষয়ে তাহার অন্যথাচার বুঝায়। মনের সন্তাপার্থে চিত্তের বিকলতা—'কিছু ভাল লাগেনা' ভাব এবং গ্লানি বুঝায়।

সর্ব্বজ্বরের সামান্য পূর্ব্বরূপ।

জ্বর স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে, রোগীর গাত্র সম্পূর্ণরূপ উষ্ণ হইবার পূর্ব্বে সর্ব্ব-জ্বরেই যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় সেইগুলিকে জ্বরের সাধারণ পূর্ব্বরূপ বলে। নিম্ন লিখিত সমস্ত পূর্ব্বরূপ লক্ষণ প্রায় কাহারও প্রকাশ পায় না দুই চারিটী দেখা যায় মাত্র। যদি কাহারও নিম্নোক্ত সমস্ত পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পায় তাহা হইলে তাহার সেই জ্বর অসাধ্য বলিয়া জানিবে। সর্ব্বজ্বরের সাধারণ পূর্ব্বরূপ যথা—পরিশ্রম না করিলেও শ্রান্তি বোধ করা, "কিছুই ভাল লাগেনা" মনের এইরূপভাব, বিবর্ণতা, মুখের বিকৃত স্বাদ, চোখ ছল্‌ছল্‌করা, চোখে জল আসা, কখন ছায়া কখন বা রৌদ্র ভাল লাগে, কখন বাতাস ভাল লাগে, কখন বা নির্বাত স্থানে থাকতে ইচ্ছা হয়, হাই উঠা, গা ভাঙ্গা, দেহভার, রোমাঞ্চ, আহারে অনিচ্ছা, অন্ধকার দেখা, বিষন্নতা ও শীতবোধ অধিক নিদ্রা বা জাগরণ, কম্প, ভ্রম, দাঁত শিড় শিড় করা কোন শব্দ এমন কি গান পর্য্যন্ত ভাল লাগে না, অন্নের অবিপাক, দুর্ব্বলতা, অধিক পিপাসা, পিণ্ডিকোদ্বেষ্টন (পায়ের ডিমে কামড়ান) আলস্য (শক্তি থাকিতে কার্য্যে অনুৎসাহ) দীর্ঘসূত্রতা, কাজে স্ফূর্ত্তি না থাকা।

জ্বরের বিশেষ পূর্ব্বরূপ।

উপরি লিখিত লক্ষণের কতকগুলি বা কোনটী প্রকাশ পাইলে আমারা বুঝিতে পারি যে জ্বর হইবে, কিন্তু কি জ্বর হইবে জানিতে পারি না এইজন্য ঐ লক্ষণগুলিকে জ্বরের সামান্য পূর্ব্বরূপ বলে। কিন্তু এমন কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে যেগুলি প্রকাশ পাইলে কি জ্বর অর্থাৎ বাত্তিক পৈত্তিক কি শ্লৈষ্মিক জ্বর হইবে তাহা বলা যায়। এই বিশেষ লক্ষণগুলিকে জ্বরের বিশেষ পূর্ব্বরূপ বলে। সামান্য পূর্ব্বরূপের কোনটী বা কতকগুলির সহিত

যদি অধিক হাই উঠিতে থাকে তাহা হইলে বাতজ্বর, যদি অধিক চক্ষুজ্বালা করে তাহা হইলে পিত্তজ্বর, যদি আহারের প্রতি অনিচ্ছা প্রকাশ পায় তাহা হইলে কফজজ্বর হইবে জানা যায়। যদি হাই উঠাও চক্ষুজ্বালা থাকে তাহা হইলে বাতপিত্তজ, যদি আহারে বিশেষ অনিচ্ছা ও চক্ষুজ্বালা থাকে তাহা হইলে পিত্তশ্লেষ্মজ এবং যদি হাই উঠা ও আহারে অনিচ্ছা থাকে তাহা হইলে বাতশ্লেষ্মজ জ্বর হইবে। আর যদি তিনটীই থাকে তাহা হইলে ত্রিদোষজ্বর হইবে।

বাতজ্বরের নিদান ও লক্ষণ।

অতিরিক্ত শ্রম, মলমূত্রের বেগ ধারণ, অতিমৈথুন, মানসিক উদ্বেগ, শোক, রক্ত-স্রাব, জাগরণ, বিষমশরীরন্যাস অর্থাৎ উচ্চনীচস্থানে শয়ন কিম্বা পা উচ্চ ও মাথা নীচ ভাবে, রাখিয়া শয়ন, বাতজ্বরের কারণ।

কম্প, জরের বেগ কখন অল্প কখনও বেশী, গলা ও ঠোঁট শুষ্ক হওয়া, অনিদ্রা, হাঁচি না হওয়া, রুক্ষ চেহারা, মাথা বুক ও গায়ে বেদনা, মুখের বিকৃতাস্বাদ, মলের কাঠিন্য, পেটে বেদনা পায়ে ঝিন্‌ঝিনি লাগা, পিণ্ডিকোদ্বেষ্টন, সন্ধির যোড় যেন খুলিয়া গিয়াছে বোধ করা, উরু-দেশের অবসন্নতা, চুয়াল চাপিয়া ধরা, কাণে শব্দ, কপাল বেদনা, মুখের কষায় আস্বাদ, পিপাসা কাঠউকি, শুষ্ক কাশি, ঢেকুর না উঠা, অবিপাক, ভ্রম, প্রলাপ, রোমহর্ষ, দন্তহর্ষ, পেটফাঁপা হাইউঠা ও উষ্ণাভিপ্রায়তা অর্থাৎ গরম ভাল লাগা, বাতজ্বরের লক্ষণ। বাতজ্বর আসিবার ও বাড়িবার সময়—ভুক্তবস্তু জীর্ণ হইবার পর, দিনের শেষ ও বর্ষাকাল।

পিত্তজ্বরের নিদান ও লক্ষণ।

-কটু, লবণ, অম্ল, ক্ষার অতিভোজন, অজীর্ণে ভোজন, তীব্র রৌদ্র তাপ, অগ্নি সন্তাপ, অতিমাত্রায়, অল্পমাত্রায় কিম্বা অসময়ে ভোজন ও অতিশ্রম পিত্তজ্বরের বিশেষ কারণ। জরের বেগ প্রবল, তরল দাস্ত, অল্প নিদ্রা, বমন, কোন অঙ্গে ফোড়া হইবার সময় যেমন বেদনা হয় রোগীর কণ্ঠে, ওষ্ঠে, নাকে ও মুখে সেইরূপ বেদনা, ঘর্ম্ম নির্গম, অসম্বদ্ধ বাক্য, মুখ তিক্ত, মূর্চ্ছা, গাত্রদাহ, মদ (অল্পভাবে মূর্চ্ছা) তৃষ্ণা, ভ্রম (গা ঘোরা), মল, মূত্র ও চক্ষুর বর্ণ পীত হইয়া থাকে। অপিচ রোগী শীতল আহার আচরণ ভালবাসে, থুথুর সহিত রক্ত বাহির হয়, গায়ে লালবর্ণ বোল্‌তা কামড়ানর দাগের মত চিহ্ন প্রকাশ পায়, নিঃশ্বাসের বিকৃতি গন্ধ ও ভুক্ত বস্তুর অম্লপাক—পিত্তজ্বরের লক্ষণ।

কফজ্বরের নিদান ও লক্ষণ।

অধিক পরিমাণে ঘৃত, তৈলাদিযুক্ত বস্তু কিংবা গুরু, মধুর পিচ্ছিল, শীত (ঠাণ্ডা) অম্ল ও লবণ রস সেবন ও পরিশ্রম না করা কফজ্বরের বিশেষ কারণ।

রোগী মনে করে গায়ে যেন ভিজা কাপড় জড়ান আছে, জরের মৃদুবেগ, কাজ করিবার শক্তি আছে কিন্তু উৎসাহ নাই, মুখের মিষ্ট আস্বাদ, প্রস্রাব জলের মত শাদা, মল শাদা রঙের, গায়ের জড়তা, কিছু না খাইলেও রোগী মনে করে যেন কত খাইয়াছি, সর্ব্বাঙ্গ বিশেষতঃ মাথ

ও কোমর ভার, শীত বোধ, বমি বমিভাব, রোমাঞ্চ (গা কাঁটা দেওয়া), ঘুম খুব বেশী, নাক হইতে জলের মত শ্লেষ্মা স্রাব, কাসি, মুখে জল উঠা, আহারে অনিচ্ছা, চক্ষুর রঙ্ শাদা, এই গুলি কফজ্বরের লক্ষণ।

দ্বন্দ্ব জ্বর।

দ্বন্দ্ব শব্দের অর্থ দুই—দুইটী দোষ কর্তৃক (যেমন বাতপিত্ত, পিত্তশ্লেষ্ম, বাতশ্লেষ্ম) আরব্ধ জ্বরকে দ্বন্দ্বজ্বর বলে। এখন সন্দেহ হইতে পারে যে, বাত, পিত্ত ও কফ জ্বরের লক্ষণ বলিয়া আবার দ্বন্দ্বজ বাতপিত্তাদি জ্বরের লক্ষণ পৃথক্ বলিবার প্রয়োজন কি ? কারণ বাতজ্বরের ও পিত্তজ্বরের লক্ষণ একত্র করিলেই ত বাতপিত্তজ্বরের লক্ষণ হইবে। সর্ব্বত্র এইরূপ হয় না। কেবল জ্বর বলিয়া নহে সমস্ত দ্বন্দ্বজ রোগেরই লক্ষণ দুই প্রকারের দেখা যায়—প্রকৃতি-সম-সমবায়ারব্ধ ও বিকৃতি-বিষম-সমবায়ারব্ধ। জ্বর রোগকে উদাহরণ স্বরূপ লইয়া বুঝাইতেছি—বাতজ্বরের যে যে লক্ষণ ও পিত্তজ্বরের যে যে লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, যে বাতপিত্তজ্বরে কেবল সেইগুলিই প্রকাশ পায়—অতিরিক্ত কোন লক্ষণই দেখা যায় না, সেই বাতপিত্ত জ্বরকে প্রকৃতিসমসমবায়ারব্ধ বলে, কেননা এখানে কারণের (বাতপিত্তের) অনুরূপ অর্থাৎ সমান কার্য্য (লক্ষণ) হইল। শাস্ত্রকারগণ প্রায়ই এই প্রকৃতিসমসমবায়ারব্ধ দ্বন্দ্বজ রোগের লক্ষণ বলেন না। কেননা—প্রত্যেকের লক্ষণ জানা থাকিলে এইরূপ দ্বন্দ্বজ রোগের লক্ষণ না বলিলেও বুঝা যায়। কচিৎ অতিদেশে উল্লেখ করিয়া থাকেন। যেমন চরক বলিয়াছেন—

নিদানে ত্রিবিধা প্রোক্তা যা যা পৃথগ্‌জ্বরাকৃতিঃ।
সংসর্গসন্নিপাতানাং তথা চোক্তং স্বলক্ষণম্।

নিদানে বাতজ পিত্তজ কফজ জ্বরের যে যে লক্ষণ বলিয়াছি সেই সমস্ত লক্ষণের সমাবেশেই দ্বন্দ্বজ ও সন্নিপাত জ্বরের লক্ষণ বুঝিবে। সমস্ত দ্বন্দ্বজ রোগের এমন কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায় যাহাদের কতকগুলি, ঐ দ্বন্দ্বজ রোগটী যে দুইটী দোষ দ্বারা আরব্ধ উহাদের লক্ষণ এবং কোনটী বা কতকগুলি উহাদের কাহারও লক্ষণ নহে। এই প্রকার দ্বন্দ্বজ রোগকে বিকৃতিবিষম-সমবায়ারব্ধ বলে। উদাহরণ দিতেছি। আমরা পরে যে বাতপিত্ত জ্বরের লক্ষণ বলিব তাহাতে অন্যান্য লক্ষণের সহিত অরুচি ও রোমহর্ষ এই দুইটী লক্ষণ আছে। কিন্তু এই অরুচি বা রোমাঞ্চ বাতজ্বর বা পিত্তজ্বর কাহারই লক্ষণ নহে। বাতশ্লেষ্ম জ্বরের লক্ষণের মধ্যে 'সন্তাপ' আছে কিন্তু এই সন্তাপ বাতজ্বর বা শ্লেষ্মজ্বর কোনটীরই লক্ষণ নহে। বিকৃতিবিষমসমবায়ারব্ধ শব্দের অর্থ কারণের অননুরূপ কার্য্য। এস্থলে বাতপিত্ত জ্বরে, কারণের (বাতপিত্তের) অননুরূপ অর্থাৎ অসমান কার্য্য (অরুচি, রোমাঞ্চ) হইল। পরে যে সকল দ্বন্দ্বজ ও সন্নিপাত জ্বরের উল্লেখ করা হইবে সে সমস্তই বিকৃতি-বিষমসমবায়ারব্ধ জানিবে।

বাতপিত্ত জ্বরের লক্ষণ—পিপাসা, অজ্ঞান হওয়া, গা ঘোরা, গা জ্বালা, নিদ্রানাশ, মাথায় বেদনা, গলা মুখ শুকাইয়া যায়, রোমাঞ্চ, আহারে অনিচ্ছা, চক্ষুতে অন্ধকার দর্শন, হাতের পায়ের হাড়ে সূচ ফোঁটার মত বেদনা, অধিক কথা বলা, ও হাইউঠা।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

১ম বর্ষ। } বঙ্গাব্দ ১৩২৪—বৈশাখ। { ৮ম সংখ্যা।

পারিগর্ভিক (এঁড়ে লাগা) চিকিৎসা।

(ঠাকুরমা ও লীলা।)

লী। ঠাক্‌মা, আজ তোমায় এমন দেখচি কেন ?

ঠা। মনটা বড় ভাল নয় লীলা ! গোবিন্দ অনেক দিন গেছে, আজও ফিরে এল না, তার জন্য ভাবনা হচ্ছে।

লী। ঠাক্‌মা ! বাবা কি কচিছেলে, তাই তোমার এত ভাবনা হচ্চে ?

ঠা। ছেলের কচি বুড়ো নেই ভাই, বরং ছেলে যত বড় হয় তার প্রতি তত মায়া বেশী হয়। যতদিন যায় স্নেহের বন্ধন ততই কঠিন হয়ে পড়ে।

লী। কিন্তু ছোট ছেলেমেয়ের জন্যেইত আমাদের ভয় ভাবনা বেশী।

ঠা। সেটা খুব স্বাভাবিক। ছেলে যত ছোট, তত নিঃসহায়, সেই জন্যে তাকে দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে সাবধানে রাখতে হয়। ছেলে বড় হলে সে নিজের ভার নিজে নিতে পারে, সেই জন্যে তার মা অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারে। কিন্তু তা বলে মাতৃস্নেহ কমে না, বরং বাড়ে।

লী। তা হলে আমার ছেলে পিলের ওপর আমার যেমন মায়া, বাবার ওপর তোমারও তেমনি মায়া ?

ঠা। তারচেয়ে অনেক বেশী। তোমার স্নেহের ইতিহাস খুব ছোট, কিন্তু আমার যে সাতকাণ্ড রামায়ণ, শৈশব থেকে তাকে বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ করেছি। তাকে সুখে রাখবার জন্যে স্নান, আহার, নিদ্রা ভুলে যেতাম। তার কত মলমূত্র পেটে গিয়াছে। অসুখ বিসুখে কত দীর্ঘ রাত্রি উৎকণ্ঠিত চিত্তে জেগে কাটিয়ে দিয়েছি। দিনে সাতবার তাকে হারিয়েছি, কত আকুল হয়ে ভেবেছি। রাত্রে বুকের কাছে থেকে সরে গেলে চমকে উঠেছি। এমনি করে ক্রমে তাকে মানুষ করে তুলেছি।

লী। আমরাও তাই করেছি ঠাকুমা ?

ঠা। হাঁ; কিন্তু তোমাদের আপাততঃ এইখানেই শেষ, আমার এইখানে সবে প্রথম কাণ্ড শেষ। আরও ছয় কাণ্ড বাকী। তার পরে সেই ছেলে বিদ্যাশিক্ষা করতে গেছে, তখন কত ভেবেছি, দেবতার কাছে মানত করেছি, কিসে সে ভাল লেখা পড়া শিখবে। কোন ত্রুটি হলে নিজে মাথায় পেতে নিয়ে তাকে স্বামীর ক্রোধ থেকে রক্ষা করেছি। তার পর তার বিয়ে দিয়েছি। তার ছেলে পিলে মানুষ করেছি। সে যখন সংসারের ভার নিয়েছে, তখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছি যেন সকলকে সে সুখে রাখিতে পারে কেউ যেন তার নিন্দা না করে। কত আর বল্‌ব, এই এখনও দেখছিস্‌ত তার জন্যে ভাবছি।

লী। আহা! মাতৃস্নেহ এমনই বটে। এমন মার প্রতি যে পুত্র কন্যা অসৎ ব্যবহার করে নরকেও তাদের স্থান নেই।

(ছোট বৌয়ের প্রবেশ)

ছোট। ঠাকুমা, এঁরা সব ফিরে আসছেন।

ঠা। আঃ বাঁচালি ছোট! আশীর্ব্বাদ করি জন্ম এইস্ত্রি হও।

লী। কখন বাড়ী এসে পৌছুবেন?

ছোট। এক ঘণ্টার মধ্যে। আমি সকলকে খবর দিগে যাই।

লী। যা, আমাদের বাড়ীতে আর অন্য অন্য বাড়ীতে খবর দে, যেন সবাই আসে।

ছোট। তোমার সবাইত বৈঠকখানায় এসে বসে আছেন।

(ছোট বৌয়ের প্রস্থান)

লী। এইত ঠাকুমা! তোমার ভাবনা গেল এখন আমার দরকার মিটিয়ে দাও। আমি মা, বাবা আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবো।

ঠা। তোর আবার কি দরকার?

লী। আমি যে পাঠ নিতে এসেছি।

ঠা। কিসের পাঠ নিতে চাস, তা বল।

লী। এই এঁড়েলাগার। আমাদের বাড়ীর আশে পাশে তিন চার ঘর গেরোস্তের ছেলে হয় আর প্রায়ই এঁড়ে লাগে। তারা এসে আমায় ধরে বসেছে। তোমার আশীর্ব্বাদে অনেক ডাক্তার কবিরাজের চাইতে আমার রোগী বেশী। এখন এঁড়ে লাগে কেন, আর তার ওষুদ পথ্যি কি তা বল।

ঠা। এঁড়ে লাগে পোয়াতী মায়ের মাইয়ের দুধ খেয়ে।

লী। মাইয়ের দুধ খেয়ে কি এমন হয়? আমি দেখেছি—হাত, পা সরু, পেট মোটা, রোগা কাঁকলাসের মত হয়ে যায়। যা খায় তা হজম হয় না, ভস্‌কা ভস্‌কা বাহ্যে হয়।

ঠা। হাঁ মাইয়ের দুধ খেয়েই এ রকম হয়। মাইয়ের দুধ সকল সময়ে সমান থাকে না। গাই প্রসব করলে প্রথম দিন কতক তার দুধ লোকে খায় না, দুধ জ্বাল দিতে গেলে ছানা হয়ে যায়। নূতন বাছুরের পক্ষে সে দুধটা উপকারী কেননা তাতে কতকটা জোলাপের মত কাজ করে। মানুষের পক্ষে সেটা অপকারী। মাইয়ের দুধের সম্বন্ধেও এই নিয়ম। ছেলে হবার পর দিন কতক দুধ যে রকম থাকে, ছেলে একটু বড় হলে সে রকম থাকে না।

লী। তা পোয়াতি হলে কি হয়?

ঠা। পোয়াতি হবার দিন কতক পরেই ভবিষ্য শিশুর জন্য দুধ প্রস্তুত রাখবার ব্যবস্থা আরম্ভ হয়। পোয়াতীর শরীরে যে দুধ তৈয়ার

হবার কারখানা আছে, সেখানে ভবিষ্য শিশুর উপযোগী দুধ প্রস্তুতের আয়োজন চলে, কাজেই সে দুধ আর পূর্ব্বের শিশুর উপযোগী থাকে না। সেই জন্য পোয়াতী মায়ের মাই-য়ের দুধ খেলেই ছেলের অসুখ হয়।

লী। তা এর কি কোন প্রতীকারের উপায় নেই ?

ঠা। উপায় বাপ-মার হাতে। দেখ প্রকৃতিতে যত জীব জন্তু আছে, তাদের মধ্যে যে গুলি শাবক প্রতিপালন করে, তাদের পূর্ব্ব-শাবক যতদিন না নিজের ভার নিজে নিতে পারে তত দিন অন্য শাবক উৎপন্ন করে না। তেমনি মনুষ্য শিশু আত্মনির্ভর হতে না পারলে অন্য সন্তান উৎপন্ন করা উচিত নয়।

লী। কিন্তু মনুষ্য শিশুর আত্ম নির্ভর হতে ত অনেক সময় লাগবে ঠাকুমা !

ঠা। আমি সে আত্মনির্ভরের কথা বল্‌ছিনে, কেবল শিশুর আহার সম্বন্ধে বল্‌ছি, শিশু যতদিন আহার সম্বন্ধে মায়ের উপর নির্ভর করে অর্থাৎ যতদিন মাতৃস্তন্য পান করে, ততদিন আর সন্তান হওয়া উচিত নয়।

লী। তা হলে এঁড়ে লাগা রোগ বন্ধ হয়ে যাবে ?

ঠা। বন্ধত হয়ে যাবেই, অনেক শিশু ও প্রসূতি অকালমৃত্যু থেকে অব্যাহতি পাবে। এঁড়ে লাগার পরিণাম ফলে কতকগুলি শিশুর মৃত্যু হয়, তারা বেঁচে যাবে। আর অল্প বয়সে অনেকগুলি সন্তান প্রসব ক'রে প্রসূতি জীর্ণ শীর্ণ চিররুগ্না হয়ে পড়ে, কিছু কাল পরে কতক-গুলি কচি কাঁচা রেখে অকালে মারা যায়। মা মরা ছেলের কতক বাঁচে কতক বাঁচে না। যে সংসারে উপযুক্ত স্ত্রীলোক না থাকে সে সংসারের অতি শোচনীয় অবস্থা হয়ে পড়ে। এর জন্যে কত সংসারে যে হাহাকার উঠে তা বলা যায় না। স্বামী স্ত্রী একটু বুঝে চললে, একটু সংযমী হলে আর এ রকম ঘটে না।

লী। আচ্ছা ঠাকুমা ! ঘন ঘন ছেলে হলে পোয়াতীর এমন হয় কেন ?

ঠা। তা হবেনা ? প্রথমেই ধর গর্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই পোয়াতীর শরীরের রক্তে গর্ভ পুষ্ট হয়। কাজেই পোয়াতির রক্তের ক্ষয় আরম্ভ হয়। তার পর শরীরের কত পরিবর্ত্তন ঘটে, জরায়ু বড় হয়, খিদে হজম কম হয়। কাজেই আরও দুর্ব্বল হয়। তার পর প্রস-বের সময় যথেষ্ট রক্তপাত হয়, আর ছেলেও স্তন্য পান করিতে আরম্ভ করে। এই সকল কারণে পোয়াতির শরীরের যে ক্ষয় হয়, তা পূরণ হইতে দীর্ঘ কাল লাগে। সেটা পূরণ হতে না হতে আবার গর্ভ হইলে ক্ষয়ের ওপর পুনরায় ক্ষয় হয়। বার বার এই রকম হলে সে পোয়াতি আর কতদিন বেঁচে থাকে।

লী। তা অনেক ছেলের মা হয়েও দুএক জনকে বেশ সুস্থ থাকতে দেখেছি ঠাকুমা !

ঠা। সে খুব কম, দৈবাৎ এমন দু এক জন মহাপ্রাণ স্ত্রীলোক দেখা যায়। আবার যাদের ওপরে দেখতে বেশ, অনেক সময় তাদের ভেতরে কিছু থাকে না। এক রোগের ধাকাতেই শেষ হয়ে যেতে পারে। তবে একটা কথা, পোয়াতি হলে আর প্রসবের পর ভাল রকম যদি আহার পায় তা হলে প্রসূ-তির শরীর ততটা খারাপ হয় না। কিন্তু দেশের যে রকম অবস্থা, তাতে অধিকাংশ প্রসূ-তির ভাগ্যে তা জোটা কঠিন ব্যাপার। একে ত লোকের অর্থ নাই ; তারপর জিনিষ দুর্ম্মূল্য তার ওপর বাজারে ভেল জিনিষই পনর আনা। আগে প্রসবের পর প্রসূতিকে অনেক ঘি

খাওয়ান হত। এখন তত ঘি অনেকের ভাগ্যে জোটে না, যা জোটে তাও ভেল। ময়দায় নাকি সাদা পাথর গুঁড়িয়ে মিশিয়ে দিচ্ছে শুন্‌ছি। তা সেই পাথরের লুচি করে খেলে কি আর প্রসূতির বল হবে, বরং রোগ হওয়ারই সম্ভাবনা।

নী। যা বলেছ ঠাক্‌মা! আজ কাল খুব বড় লোক না হলে আর ভাল খাবার পেটভরে খেতে পায় না। তা এঁড়ে যাতে না লাগে তার উপায়ত শুন্‌লাম, এখন এঁড়ে লাগলে তার প্রতিকার কি বল।

ঠা। প্রথম উপায় মাই বন্ধ করা।

নী। কিন্তু ছেলে যদি মাই খাবার জন্যে হেদোয়?

ঠা। সে কথা আগে একদিন বলেছি। যদি না হাসে ভাল করে খেলা না করে, মনমরা হয়ে থাকে, তাহলে বুঝ্‌তে হবে যে ছেলের মনে বড় কষ্ট হয়েছে। এরূপ অবস্থায় মাই খেতে না দিলে কঠিন রোগ হতে পারে। সেই জন্যে মাইয়ের দুধ বেশ করে গেলে ফেলে, যত কম সম্ভব মাই দিতে হয়।

নী। পোয়াতীর খাবার কি কোন রকম ধরাকাট কর্‌তে হয়?

ঠা। তা হয় বৈকি। ছেলে পিলের অসুখ হলে সেই রোগের যে রকম পথ্যি, পোয়াতীর সেই রকম পথ্যি করা উচিত। তবে এঁড়েলাগায় এ নিয়মটা বড় বেশী খাটে না। কেননা আগেই বলেছি যে, মাইয়ের দুধ গর্ব্ভস্থ শিশুর উপযোগী করে তৈয়ের হতে থাকে। সুপথ্য থাক্‌লে সেটাত বন্ধ হবার নয়। তবে কিছু না কিছু উপকার হয়ই।

নী। তা, কি রকম পথ্যি করতে হয় ঠাক্‌মা!

ঠা। এঁড়ে লেগে ছেলেদের সাধারণতঃ অজীর্ণ রোগই হয়ে থাকে। সেই অজীর্ণ রোগের মত পথ্যি করতে হয়। এই দুবেলা সরু চালের ভাত আর মাছের ঝোল। বড় মাছ, ইলিসমাছ, এসব ভাল নয়। ছোট কৈ, মাগুর, শিঙ্গি, খলসে, মৌরলা এই সব মাছই ভাল। তরকারী খুব কম, কচি বেগুণ, পটোল, কচি কাঁচকলা সহজে হজম হয়। গোল আলু ভাল নয়, তবে ও না হলে আজ কাল চলেনা বলে দুএক খানা দেওয়া যেতে পারে। দাল ভাল নয়, তবে পোয়াতী মানুষ, তার দিকে আর তার পেটের ছেলেটার দিকে ত নজর রাখতে হবে, সেই জন্যে ইচ্ছা হলে একটু মুগ কি মসূর দালের যূষ দিতে হয়।

নী। পেটের ছেলের দিকে নজর রেখে খেতে দিতে হয় কেন ঠাক্‌মা?

ঠা। তা বুঝি জানিস্‌নে! এই জন্যে আমাদের দেশে সাধ দেবার নিয়ম আছে। আচ্ছা এসম্বন্ধে আর একদিন বুঝিয়ে বল্‌বো। তার আগে আয়ুর্ব্বেদ পত্রিকায় সুরেন কবিরাজ 'দোহদ' বলে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন সেটা একবার পড়ে দেখিস্‌।

নী। হাঁ, সেই মাসের আয়ুর্ব্বেদে বেরিয়েছিল; আচ্ছা সেটা আমি আর একবার ভাল করে পড়ে দেখ্‌ব। এখন তুমি পথ্যির কথা আর কি বল্‌বে বল।

ঠা। হাঁ বলছি। শাক খেতে ইচ্ছে হলে পল্‌তা কি বেতো শাক দেওয়া যেতে পারে। অম্বলের মধ্যে পাতি কি কাগজীলেবু আর পুরাতন তেঁতুল।

নী। আচ্ছা ঠাক্‌মা! পুরান তেঁতুল কি রকম হলে ভাল হয়? একবার একজন

পুরাণ তেঁতুল আন্‌লে, সে যে কত বছরের পুরাণ তা বল্‌তে পারি না। শক্ত কাঠের মত কোন আস্বাদন নেই। সেই কি ভাল ?

ঠা। না, সে অতি পুরাতন ব'লে বোধ হয়। অতি শব্দটা কোন কাজেই ভাল নয়। যে তেঁতুল বেশ কাল হয়ে গেছে, দেখ্‌লে তেঁতুল ব'লে বোধ হয় অম্লত্ব অতি অল্প থাকে, সেই তেঁতুলই ভাল। তার চেয়ে পুরাণ তেতুল খাওয়াও যা আর কাঠ ভিজিয়ে খাওয়াও তাই।

দী। আমিও তাই ভেবেছিলাম ঠাক্‌মা ! এখন তুমি পথ্যির কথা বল।

ঠা। ভাজা, পোড়া, শাক, অম্বল, পিঠে নাটা এসব না খাওয়াই ভাল।

দী। জল খাবার কি খাওয়া যায় ?

ঠা। জলখাবারের মধ্যে দাড়িম, বেদানা, চীনেকেশুর, পাকা গাব, বিলাতী গাব (ম্যাঙ্গোষ্টীন) মিছরী, এই সব ভাল। দুই চার টুক্‌রো আক্, কি দু একটা ভাল সন্দেশও পোয়াতীর ইচ্ছা হলে দিতে পারা যায়।

দী। আর কিছু দেওয়া চলে না ?

ঠা। না, আর কিছু নয়। অসুখ হলে কি আর সব জিনিষ খেতে আছে ? তাহলে অসুস্থ আর সুস্থ লোকের পথ্যির তফাৎ কি বৈল।

দী। যাক্ ছেলে পিলের বাপ মা হওয়া কি কষ্টের ঠাক্‌মা !

ঠা। কষ্ট বৈকি দিদি ! কষ্ট পেতেই সংসারে আসা, সংসারে কষ্ট বই কেউ সুখে নেই। কিন্তু এই কষ্টের মধ্যে এই অসুখের মধ্যে আমাদের মহাপরীক্ষা হয়ে থাকে। এ পরীক্ষায় যে জয়ী হতে পারে সেই মানুষই উন্নতি লাভ করে। আর যে পরাজিত হয়, সে অমানুষ, তার অবনতি হয়ে থাকে। সে অবনতি পুরুষে পুরুষে সংক্রমিত হয়। পুত্র-কন্যার শরীর ও মনের উৎকর্ষ সাধন পিতা মাতার উপর নির্ভর করে। এই মহাকর্ত্তব্য পালন করিতে পিতামাতার সংযমী ও ত্যাগী হওয়া আবশ্যক। তা হলে সৎ পুত্রকন্যা উৎপন্ন হয়ে সংসারের সুখ শান্তি বৃদ্ধি করতে পারে। আর এর বিপরীত হলে, রুগ্ন ভুগ্ন, অঙ্গহীন, বিকৃত, চরিত্রহীন পুত্র-কন্যা উৎপন্ন হয়ে সংসারে অসুখ ও অশান্তির সৃষ্টি করে।

দী। যা বলেছ ঠাক্‌মা ! সংযম আর ত্যাগশীলতার অভাবেই আমাদের দেশে এমন খারাপ ছেলে পিলে জন্মাচ্ছে। এখন তুমি এঁড়ে লাগার কথা বল।

ঠা। আগেই বলেছি যে, পোয়াতী মায়ের মাইয়ের দুধ খেয়ে এইরোগ হয়। তা ছাড়া মা যদি রোগ ভোগ করে, তার মাইয়ের দুধ খেলেও এ রকম রোগ হয়। আবার একেবারে মার মাইয়ের দুধ না খেতে পেলেও এরকম হতে পারে।

দী। সবগুলোকেই কি এঁড়ে লাগা বলে ?

ঠা। পোয়াতী-মায়ের মাইয়ের দুধ খেয়ে যেটা হয় সেটাকে শাস্ত্রে পারিগার্ভিক বলে। তারই বাঙ্গালা হয়েছে এঁড়েলাগা। তবে অন্য যে দুটো কারণে হতে পারে বললাম, তাতেও এই রকম লক্ষণ প্রকাশ পায়, চিকিৎসাও এক রকমের।

দী। লক্ষণ কি, কেবল শুকিয়ে যায় আর পেটের দোষ হয় ?

ঠা। কেবল তাই নয়, কাস, বমি, অরুচিও হয়। কারও কারও দাস্ত ভাল হয় না। সময়ে জ্বরও হতে পারে। ফল কথা অজীর্ণই

এর মূল, আর তা থেকে এসব উপসর্গ ঘটে থাকে।

লী। তা হলে সব জায়গায়ত এক রকম ওযুধ পথ্যি চলে না।

ঠা। তা চল্‌বে কি করে? তবে সাধারণতঃ হজম হয় না, আর ভস্‌কা ভস্‌কা বাহ্যে করে এই অবস্থার চিকিৎসা জানা দরকার।

লী। কি পথ্য দিতে হয়?

ঠা। পূর্ব্বে ছেলেদের পেটের অসুখ হলে যে রকম পথ্যি দেবার কথা বলেছি, সেই রকম। মুতো দিয়ে সিদ্ধ ছাগল দুধ, দুধবার্লি, দুধ এরারুট। ভাত খেতে শিখে থাকলে কচি কাঁচকলা আর ছোট মাছের ঝোল ও পোরের ভাত।

লী। দুধ কতটুকু করে দেওয়া যায়?

ঠা। অবস্থা বুঝে, যে যেমন সহ্য করতে পারে।

লী। সহ্য হচ্ছে কিনা কি করে বুঝবো?

ঠা। মল দেখিলেই বোঝা যায়। মলের সঙ্গে যদি ছ্যাক্‌ড়া ছ্যাক্‌ড়া, সাদা সাদা ছানার মত থাকে, তা হলে বুঝতে হবে যে দুধ হজম হচ্ছে না। তা হলে দুধ কমিয়ে দিতে হবে, আর দুধের সঙ্গে সিকি আন্দাজ চুণের জল মিশিয়ে দিলে ভাল হয়।

লী। আর কি লক্ষণ দেখে দুধ বাড়াতে হয়?

ঠা। যখন বেশ আঁট আঁট তামাটে বাহ্যে হবে, বাহ্যে কম হবে, তখন একটু একটু করে দুধ বাড়িয়ে দিতে হয়।

লী। কবার করে খেতে দেব?

ঠা। বয়স বুঝে আর কি রকম হজম হয় দেখে, তিন ঘণ্টা কি চার ঘণ্টা অন্তর দিতে হয়।

লী। জলখাবার কি দেওয়া যেতে পারে?

ঠা। দাড়িম, বেদানা, মিছরী, কেশুর, পানফল, কচি বেলপোড়া এই সব।

লী। আচ্ছা, এখন এ অবস্থায় কি ওষুদ দেওয়া যায় বল।

ঠা। যোয়ান, শুঁঠ, আতইচ, আর পিপুল মূল, সমান ভাগে নিয়ে গুঁড়ো করে বয়স বুঝে ৩।৪ রতি মাত্রায় গরম জলের সঙ্গে দিনে, দুবার করে দিলে ভাল হয়। সৈন্ধবনুন, পিপুল, মরিচ, রক্ত চিতার মূল আর মুতো বেশ করে গুঁড়ো করে সমান ভাগে মিশিয়ে ৩।৪ রতি মাত্রায় দিনে দুবার গরম জলের সঙ্গে খাওয়ালে ভাল হয়। সোহাগার খৈ, লবঙ্গ, যোয়ান, সৈন্ধবনুণ আর আতইচ সমান ভাগে গুঁড়ো করে ৩।৪ রতি মাত্রায় গরম জলের সঙ্গে খাওয়ালে ভাল হয়।

লী। সোহাগার খৈ কাকে বলে ঠাকুমা?

ঠা। বেনের দোকানে সোহাগা কিনতে পাওয়া যায়। সেক্‌রারা সোহাগা দিয়ে সোণা গালায়। সেই সোহাগা গুঁড়ো করে কড়ায় কি চাটুতে করে আগুনের ওপর চড়াতে হয়। খানিক ক্ষণ থাকলেই সোহাগার গুঁড়ো গুলো খৈয়ের মতন হয়ে যায়। একেই সোহাগার খৈ বলে।

লী। আচ্ছা, এখন যাদের দাস্ত ভাল হয় না, তাহাদের ব্যবস্থা কি রকম বল।

ঠা। প্রায় একই রকম, তবে যাতে দাস্ত পরিষ্কার হয়। এমন ধারা লঘুপাক পথ্য দিতে হবে। যাদের দাস্ত বেশী হয় তাদের পক্ষে ছাগল দুধ, ঘোল ভাল, কিন্তু যাদের পরিষ্কার হয় না তাদের পক্ষে গাইয়ের দুধই ভাল। আর দুধ পিপুলের সঙ্গে সিদ্ধ করে দিতে হয়। আর দুধ হজম না হলে সোডার জল কি গুড়ো-সোডা এক আনা, [illegible] পোরা

জলে গুলে দুধের সিকি আন্দাজ মিশিয়ে নেওয়া ভাল। অর্দ্ধেক বার্লি সিদ্ধ জলের সঙ্গে দুধ মিশিয়ে সবাইকেই দেওয়া যেতে পারে।

লী। জল খাবার কি দেওয়া যায়?

ঠা। আঙ্গুর, কিস্‌মিস, মনাক্কা, খেজুর মিছরী, পানফল এই সব দেওয়া যেতে পারে।

লী। আচ্ছা, এখন এদের ওষুধ কি তা বল।

ঠা। আগে যে সব ওষুধ বলেছি তার মধ্যে যে গুলো বাহ্যে কষা করে, যেমন মুতা আতইচ, সেখানে এই গুলো বাদ দিয়ে দেওয়া যেতে পারে। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সন্ধব নুণ হরীতকী ও রক্ত চিতার মূল গুঁড়িয়ে সমান ভাগে মিশিয়ে ৩।৪ রতি মাত্রায় দিনে দুবার গরম জলের সঙ্গে দিলে ভাল হয়। সন্ধব নুণ হরীতকী, পিপুল ও রক্ত চিতার মূল * গুঁড়ো করে সমান ভাগে মিশিয়ে ৩।৪ রতি মাত্রায় গরম জলের সঙ্গে দিনে দুবার খাওয়ালে ভাল হয়। হরীতকী, পিপুল ও সচল লবণ, বেশ গুঁড়ো করে সমান ভাগে মিশিয়ে ৩।৪ রতি মাত্রায় দিনে দুবার গরম জলের- সঙ্গে দিলে ভাল হয়।

লী। আচ্ছা এসবত হলো ঠাকুমা! এখন বমি, কাস, জ্বর এসব হলে কি করতে হবে?

ঠা। আগে শিশুর কাসের যে চিকিৎসা বলেছি, তারই দু একটা ওষুদ দিবি। আর যে ওষুদের কথা বললাম সেই ওষুদ দুবার কি একবার দিবি, আর কাসের ওষুদ একবার দিবি। কাসি হলে যে রকম পথ্যি দিতে বলেছি সেই রকম পথ্যি দিবি যেন গুরুপাক না হয়।

লী। জ্বর হলে কি রকম করতে হবে?

ঠা। জ্বর হলে ভাতটা না দেওয়াই ভাল। অবস্থা বুঝে খৈ দুধ, দুধ সাগু, দুধ বার্লি, খেজুর, কিসমিস, বেদানা, মিছরী এই সব পথ্য দিতে হয়।

লী। ওষুদ কি দেব?

ঠা। আগে যে এঁড়ে লাগার ওষুদ বলেছি তাই দুবার কি একবার দিবি। আর একবার সিউলী পাতার রস মধু, কি তুলসী পাতার রস মধু মিশিয়ে দিবি। ঘুষড়োর রস দিতে পারলে ভালই হয়।

লী। কিসের ঘুষড়ো?

ঠা। ক্ষেৎপাপড়া, শিউলীপাতা আর গুলঞ্চ, কাঁচা নিয়ে ধুয়ে কুটে কচি কলাপাতা জড়িয়ে এপিট ওপিট করে চাটুতে ভাজতে হয়, কলা পাতা ঝলসা পোড়া হলে নামিয়ে দিনে ঘরের ভেতর আর রাত্রে বাইরে রাখতে হয়। এক দিন করলে ২।৩ দিন চলবে না— রোজ করতে হবে।

লী। আচ্ছা রস কতটুকু করে দিতে হয়?

ঠা। বয়স বুঝে ২।৩ বছরের ছেলেকে আধ ঝিনুক রস ১০।১২ ফোটা মধু মিশিয়ে দিলেই হবে। বয়স কম বেশী হলে মাত্রাও কম বেশী করতে হয়।

লী। আচ্ছা বমি হলে কি ওষুদ দেব ঠাকুমা?

ঠা। আমের আঁটির শাঁস, খৈ, আর সন্ধব নুণ সমান ভাগে গুড়ো করে কি বেটে ৪।৫ রতি মাত্রায় একটু মধুর সঙ্গে দিলে ভাল হয়। খৈয়ের চূর্ণ জল ও মধুর সঙ্গে দিলে বমি ভাল হয়। অশ্বথ গাছের শুক ছাল

---

* রাংচিতা (যাহার বেড়া দেয় তাহা নহে) যে চিতার ফুল রক্তবর্ণ।

পুড়িয়ে জলে ফেলতে হয়। সেই জল ছেঁকে খেলে বমি ভাল হয়।

লী। আর এঁড়েলাগার ওষুদ কিছু দেব না?

ঠা। তা দিতে হবে বৈকি। দিনে দুবার কি একবার করে দিতে হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে ওষুদ দিলে বমি বাড়ে কিনা, যদি বাড়ে মনে হয় তাহলে দু এক দিন সে ওষুদ বন্ধ রেখে, আগে কেবল বমির ওষুদ দিবি। বমি ভাল হলে একটু একটু করে সইয়ে সইয়ে সেই ওষুদ দিবি।

লী। আর পথ্যি কি রকম চলবে?

ঠা। পথ্যি ঐ রকমই চলবে। পুরান চালের ভাত, খৈয়ের মণ্ড, বার্লি, দুধ, লেবু, দাড়িম, আঙ্গুর, কিসমিস, চিনি মিছরী এই সব। দুধ যদি সহ্য না হয়, বার্লি সিদ্ধ জলের সঙ্গে মিশিয়ে দিবি। তাতেও সহ্য না হলে দুই এক দিন বন্ধ রাখা দরকার। বরং টাটকা ঘোল ছেঁকে, কি গরম দুধে লেবুর রস দিয়ে ছানা কেটে গেলে সেই ছানার জল ছেঁকে দেওয়া ভাল।

লী। দরজায় গাড়ীর শব্দ হলো। এঁরা সব এলেন বুঝি?

ঠা। দেখ দেখি।

লী। হাঁ এসেছেন, তোমার কাছে আসছেন। (অগ্রে কর্ত্তা ও গৃহিণী পশ্চাতে দুই পুত্র, তিন পুত্রবধূ, দুই কন্যা ও তিন জামাতার প্রবেশ।) সকলের বৃদ্ধাকে প্রণাম এবং অপর সকলের কর্ত্তা ও গৃহিণীকে প্রণাম।

কর্ত্তা। সকলকে দেখছি, কিন্তু নন্দলালকে দেখছিনে কেন?

(নন্দলাল ও প্রভাসের দ্বারদেশে আগমন)

নন্দ। এই দেখ প্রভাস। এই আমাদের 'হোম'। বাঙ্গালীর সংসারের স্ত্রী পুরুষ পিতা, মাতা, কন্যা, জামাতা, পুত্রবধূ বিপদে আর উৎসবে একত্র হয়। নিত্য এরূপ একত্র হলে তার মাধুর্য্য থাকে না, নিতান্ত পুরতন হয়ে পড়ে। গুরুজনের সম্মুখে যুবক যুবতীর আলিঙ্গন চুম্বন বা রহস্যালাপ, আর বহু পুরুষের সম্মুখে বিকট দশন বিস্তার ক'রে আহার করা, যদি তোমরা সভ্যতা বলে মনে কর তা হলে ভগবানের কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যেন তেমন সভ্যতা কখন ভারতে আসে না আসে না। আর আমাদের এই সম্মিলনের মাধুর্য্য দেখ দেখি, স্ত্রীলোকের বিনয় ও লজ্জা দেখ দেখি। আমার মার অনেকগুলি নাতি পুতি হয়েছে, তথাপি ঠাকুমার সম্মুখে বাবার কাছে একটু ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সে ঘোমটা বলছে, দেবী! আমি তোমার হাতে মানুষ করা সেই পুত্রবধূ। তাই আমার অস্তিত্ব—কিন্তু যে মাতৃত্বের মহিমায় আজ এতগুলি প্রাণী তোমার চরণে প্রণত হতে এসেছে, সেই মহিমা তোমাদেরই নিদেশক্রমে আমায় অল্প পরিসর হতে বাধ্য করেছে। তারপর ঐ দেখ আমার স্ত্রী, মধ্যম ভ্রাতৃবধূ, তিন ভগ্নী আধ ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের ঘোমটা বল্‌ছে—মাতৃত্বের মহিমা আমাদের পরিসর কমিয়ে এনেছে কিন্তু আমরা তোমাদের সেই লজ্জাশীলা চরণের দাসী। আর ঐ দেখ আমার ছোট ভ্রাতৃবধূ কত সঙ্কোচে জড়সড় হয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। মাতৃত্বের মহিমা ওকে এখনও ত্যাগ স্বীকার করতে শেখায়নি, তাই ওর স্থান সংসারের সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নে। নিম্নে বলে মনে করো না ও কষ্টে

আছে। বাড়ীর সকলের চেয়ে বেশ ভূষার পারিপাট্য খুব বেশী, অলঙ্কার খুব বেশী, আহারের ব্যবস্থা প্রায়ই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। কিন্তু সংসারের পাঁচজন যখন একত্র হয়, তখন ত্যাগের কাছে ভোগ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আমাদের দেশের পারিবারিক সম্মিলন যেন চিরদিন এইরূপ থাকে।

আয়ুর্ব্বেদে মাংস।

(চৈত্র সংখ্যার ৩০১ পৃষ্ঠার পর)

পূর্ব্বে যে মাংসার্ক, মাংসরস ও মাংস যূষের কথা বলা হইয়াছে সেগুলি অতি লঘুপাক। রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া বিবিধ দ্রব্যের সংযোগে যূষাদি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। রোগীর সর্দ্দিকাশ থাকিলে আদা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা সংস্কৃত করা যাইতে পারে। অগ্নিবল অত্যন্ত ক্ষীণ হইলে হিং ও আদা বা শুঁঠের সহিত সংস্কৃত করিয়া দিলে সহজে জীর্ণ হয়। অরুচি থাকিলে দাড়িমের রস এবং সুগন্ধি দ্রব্য সংযুক্ত করিয়া দিতে হয়। এইরূপ নানাপ্রকার কল্পনা করা যাইতে পারে।

অতিসার রোগে—শশক, এন, লাব, হরিণ কপিঞ্জল, গৌরবর্ণ তিতির পক্ষী, এই সকল প্রাণীর রস এবং সর্ব্বপ্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য, সিঙ্গী ও মৌরলা অতিসার রোগে পথ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতিসারের সকল অবস্থায়ই যে মাংস যূষ পথ্য দিতে হইবে তাহা নহে, কেননা অতিসারে প্রথমে লঙ্ঘণই পথ্য। অতিসারের প্রধান অবস্থা (Acute stage) দূর হইলে এ সকল মাংসের যূষ লঘুপাক করিয়া পথ্য দেওয়া যাইতে পারে মাংস মলরোধক এবং বায়ুনাশক বলিয়া অতিসার রোগে আহার ও ঔষধ দুইয়েরই কাজ করে।

গ্রহণীরোগে—মাংসাশী-জন্তু, লাব পক্ষী, এণ, তিতির পক্ষী প্রভৃতির মাংস, ক্ষুদ্র মৎস্য মৌরলা ও খলিসা মৎস্য গ্রহণী রোগে পথ্য। মাংসাশী জন্তুর মাংস অত্যন্ত পুষ্টিকর বলিয়া ক্ষয় সংযুক্ত গ্রহণী রোগে বিশেষ ফলপ্রদ অতিসার রোগের ন্যায় লঘুপাক করিয়া প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

অর্শরোগে—মেষ, উষ্ট্র, কচ্ছপ সজারু, ফিঙ্গা পাখী, ছাগ, নেকড়ে বাঘ, স্বর্ণগাতক, অশ্ব, শৃগাল, ও অন্যান্য প্রকার জন্তুর মাংস হিতকর অর্শরোগীর ভাগ্য সুপ্রসন্ন, কেননা বিবিধ মাংস আস্বাদন করিবার সৌভাগ্য ঘটে। মাংস মলরোধক বলিয়া অর্শরোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিতে মাংস পথ্য দেওয়া সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। অথবা লবণ, আদা, হিং, জীরা, মরিচ প্রভৃতি সারক দ্রব্য সংযোগে সংস্কৃত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। উদরাময়যুক্ত অর্শরোগীর পক্ষেই মাংস সুপথ্য। রক্তার্শ রোগে রক্তপিত্ত রোগের নিয়ম অনুসারে মাংস প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। অর্শরোগে আনূপ মাংস ও মৎস্য অপথ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ভারতের অন্যান্য অংশে ধর্ম্মবিপ্লব ঘটিলেও বঙ্গে তান্ত্রিক দিগের প্রভাব ছিল। ছাগ, মেষ শশক, শজারু, কচ্ছপ এবং নানাপ্রকার

পক্ষীর মাংস লোকে আহার করিত। মহিষ বলি দেওয়া হইত বটে, কিন্তু কত দিন হইতে যে মহিষ মাংস আহার করিবার প্রথা লোপ পাইয়াছে তাহা বলাযায় না। এখনও স্থানে স্থানে বঙ্গের মুসলমানগণকে মহিষ মাংস আহার করিতে দেখা যায়। এই সকল মুসলমান পূর্ব্বে হিন্দু ছিল, মুসলমান জাতি, বঙ্গদেশ জয় করিবার পর মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ মহিষ মাংস আহারের প্রথা উহারা মুসলমানদিগের নিকট শিক্ষা করে নাই। প্রাচীন প্রথা বজায় রাখিয়াছে মাত্র।

চৈতন্য দেবের ধর্ম্মপ্রচারের অল্পকাল পরে বঙ্গে তান্ত্রিক যুগের অবসান হয়। গৌরাঙ্গের মহতী প্রতিভা বলে পরাজিত হইয়া বহু পণ্ডিত চৈতন্যদেবের মতের অনুসরণ করে। ফলে অসংখ্য বঙ্গবাসী বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করে এবং মাংসের প্রচলন অনেক কমিয়া যায়। এইরূপে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব কাল হইতে চৈতন্যদেবের সময় পর্য্যন্ত ধর্ম্মবিপ্লবের ফলে প্রাচীনকালের মাংসের বহুপ্রচলন অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে।

কিন্তু বাঙ্গালী মৎস্যকে একবারে ভুলিতে পারে নাই। বাঙ্গালীর মৎস্য প্রিয়তার নিকট ধর্ম্ম পরাভূত। বঙ্গের সকল ধর্ম্মাবলম্বী অধিকাংশ লোকই মৎস্য ভক্ষণ করিয়া থাকে। যাঁহারা প্রকাশ্যভাবে মৎস্য ভক্ষণ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন, তাঁহাদিগকেও গৃহপালিত বিড়ালের জন্য মৎস্য ক্রয় করিতে হয়। কিন্তু বাঙ্গলা ব্যতীত ভারতের অন্যান্য দেশে মৎস্যের এ সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য ঘটে নাই।

মাংস সম্বন্ধে আরও দুই একটী বলিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব। মাংসাহারের প্রচলন কমিয়া যাওয়ায় দেশের ভাল কি মন্দ হইয়াছে? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে এই মাত্র দেখা যায় যে, যখন মাংসাহার যথেষ্ট প্রচলিত ছিল, তখনই ভারত শৌর্য্যে, বীর্য্যে, জ্ঞানে, ঐশ্বর্য্যে জগতের শ্রেষ্ঠ ছিল। বর্ত্তমান উভয় বিষয়েই বিপরীত। আশা করি কোন যোগ্যতর ব্যক্তি ইহার মীমাংসা করিবেন।

মাংসাহার হিতকর কি অহিতকর? এই প্রশ্ন লইয়া আমিষাহারী এবং নিরামিষাহারী উভয় সম্প্রদায়ের বহুদিন তর্ক বিতর্ক চলিয়া আসিতেছে। উভয় পক্ষেরই অনেক অনুকূল যুক্তি আছে। কিন্তু বিশেষ মীমাংসা কিছুই হয় নাই। ভবিষ্যতে আমরা মাংসাহার সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশের মনস্বীদিগের মতামত পাঠকগণকে অবগত করিতে প্রয়াস পাইব।

তক্রমাংস—পাকপাত্র ঘৃত দিয়া হিং ও হরিদ্রা ভাজিয়া লইবে। পরে খণ্ড খণ্ড মাংস উপযুক্ত জল দ্বারা পাক করিবে এবং পাক শেষে জীরকাদি সংযুক্ত মাংস, তক্রে নিক্ষেপ করিবে।

শুদ্ধমাংস—পাক পাত্রে ঘৃত দিয়া হিং ও হরিদ্রা ভাজিয়া লইবে। পরে অস্থিহীন মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাজিয়া লইবে এবং উপযুক্ত লবণ ও জলসহ পাক করিবে। পাক শেষ হইলে বাটিয়া পানের রস, তণ্ডুল, লবঙ্গ ও মরিচ সংযুক্ত করিবে।

সহদ্রক—ছাগাদির উরু প্রভৃতির মাংসল স্থানের খণ্ড খণ্ড মাংস, শুদ্ধ মাংসের ন্যায় পাক করিবে।

আস—বৃহৎ মাংসখণ্ড পাক পাত্রে রাখিয়া উপযুক্ত জল, হিং, হরিদ্রা, আদা, শুঁঠ, লবঙ্গ, মরিচ, তণ্ডুল, গোধূম ও গোড়া লেবুর রস সহ পাক করিবে।

তলিত—শুদ্ধ মাংস ঘৃতে ভাজিয়া লইলে তাহাকে তলিত বলে।

শূল্য—যকৃৎ প্রভৃতি স্থানের মাংস ঘৃত ও লবণ মিশ্রিত করিয়া শূল বিদ্ধ করিয়া ধূম-হীন অঙ্গারাগ্নিতে, পাক করিয়া লইবে।

মাংস শৃঙ্গাটক—ছোট টুকরা টুকরা মাংস সিদ্ধ করিয়া লবঙ্গ, হিং, মরিচ, এলাচ, জীরা, ধনে ও লেবুর রস মিশ্রিত ঘৃতে ভাজিবে পরে বাটিয়া ময়দার ঠুলির ভিতর পুরিয়া ভাজিয়া লইবে।

অগ্নিমান্দ্য-অজীর্ণ রোগে এন, ময়ূর, শশক লাব, সারস এবং সর্ব্বপ্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য এই রোগে পথ্য। ক্ষুদ্র মৎস্য এক্ষণে পথ্য স্বরূপে ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু শাকান্নভোজী বাঙ্গালী অজীর্ণ রোগ গ্রস্ত হইলে মাংসের যূষ জীর্ণ করিতে পারে বলিয়া বোধ হয় না। পূর্ব্বে লোকে যে মাংসে অভ্যস্ত ছিল ইহা তাহার অন্যতম প্রমাণ। মাংস বায়ুনাশক। সুতরাং যে সকল অজীর্ণ রোগীর উদরে বায়ু সঞ্চয় হয়, সেই সকল রোগীকে হিং আদা, মরিচ প্রভৃতি পাচক এবং বায়ুনাশক দ্রব্য সাংযোগে সংস্কৃত লঘুপাক মাংসরস পথ্য দিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে।

পাণ্ডুরোগে—জাঙ্গল মাংসের যূষ এবং শিঙ্গিমাছ এই রোগে সুপথ্য। পিঁয়াজ রশুন চলিতে পারে, কিন্তু হিং দিয়া সংস্কৃত করা চলেনা।

রক্তপিত্ত রোগ—শশক, কপোত (পায়রা ভেদ), হরিণ, এন, লাব, পায়রা, বটের, বক, মেষ, কপিঞ্জল প্রভৃতির মাংস এবং চিংড়ি ও বাইম মাছ এই রোগে সুপথ্য। কিন্তু দধি রশুন, সর্ষপ, অম্ল দ্রব্য বা অধিক লবণ সহ সংস্কৃত করা উচিত নহে। রোগীর অগ্নিবল থাকিলে কেবল মাংসের যূষ না খাইয়া মাংসও স্বচ্ছন্দে আহার করিতে পারেন।

রাজযক্ষ্মা, ক্ষত ক্ষীণ রোগে—জাঙ্গল মাংস, ছাগমাংস, মাংসাশী জন্তুর মাংস প্রভৃতি রোগীর অগ্নিবল বিবেচনায় সংস্কৃত করিয়া যথেষ্ট প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কিন্তু হিং, রশুন বা অম্লদ্রব্য সহ সংস্কৃত করা উচিত নহে। ক্ষীয়মান যক্ষ্মারোগীর ক্ষয় নিবারণ করিতে মাংসের বিশেষতঃ মাংসাশী জন্তুর মাংসের ন্যায় খাদ্য আর দ্বিতীয় নাই। অগ্নি প্রবল থাকিলে বেশবার ও শশাঙ্ক কিরণ দেওয়া যাইতে পারে। প্রচণ্ড রৌদ্রে মাংস শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে। পরে সেই চূর্ণিত মাংস পাক করিয়া লেহ্য বা ভোজ্যরূপে প্রয়োগ করিবে।

কাসরোগে—গ্রাম্য, আনূপ ও ধন্বদেশ জাত পশু পক্ষীর মাংস কাসরোগে সুপথ্য। রশুন, ছোটএলাচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ প্রভৃতি দ্বারা সংস্কৃত করা যাইতে পারে কিন্তু সর্ষপ নিষিদ্ধ, মাংস বা মাংস যূষ গরম গরম লঘুপাক করিয়া, খাওয়া উচিত। মৎস্য নিষিদ্ধ।

শ্বাসরোগে—শশক, ময়ূর, তিত্তির, লাব, কুক্কুট এবং, বন্যদেশজাত পশু পক্ষীর মাংস সুপথ্য। এলাচ, শুঁঠ পিপুল, মরিচ প্রভৃতি চলিতে পারে, কিন্তু সর্ষপ নিষিদ্ধ। আনূপ মাংস ও মৎস্য অপথ্য।

হিক্কারোগে—এন, তিত্তির, লাব, এবং জাঙ্গল পশুপক্ষীর মাংস সুপথ্য। রশুন, মরিচ, আদা প্রভৃতি দ্বারা সংস্কৃত করা যাইতে পারে, কিন্তু অম্লদ্রব্য ও সর্ষপ অব্যবহার্য্য। আনূপ মাংস-অপথ্য।

স্বরভেদরোগে হংস, বন্যকুক্কুট, ও ময়ূর

মাংস আদা, রশুন, মরিচ প্রভৃতির দ্বারা সংস্কৃত করিয়া গরম গরম আহার করা উচিত।

অরুচিরোগে—শূকর, ছাগ, শশক ও কৃষ্ণ হরিণের মাংস, চেঙ্গ, মৌরুলা, ইলিশ, পুটী, খলিশা; কই ও রোহিত মৎস্য এবং মৎস্যের ডিম্ব সুপথ্য। দধি, ঘৃত, রসোন, দাড়িমের রস, মরিচ, হিং, আদা প্রভৃতি সংযোগে সংস্কৃত করা যাইতে পারে।

বমনরোগে—শশক, ময়ূর, তিত্তির, লাব এবং জাঙ্গল পশুপক্ষীর মাংস সুপথ্য। দধি, জীরা, মরিচ, আদা প্রভৃতির দ্বারা সংস্কৃত করা যাইতে পারে, কিন্তু, ছোটএলাচ ও সর্ষপ নিষিদ্ধ। মাংসের যূষ ছাঁকিয়া দাড়িমের রসাদি মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করা উচিত।

তৃষ্ণারোগে—ধন্বদেশজাত জন্তুর মাংস রস ও লেবুর রস মিশ্রিত করিয়া পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। এলাচ, ধনে, কর্পূর, জায়ফল, চিনি প্রভৃতি দ্রব্যের দ্বারা মাংসরস সংস্কৃত করা কর্ত্তব্য। লবণ, মরিচ, হিং প্রভৃতি নিষিদ্ধ। মূর্চ্ছারোগে বন্যদেশজাত মৃগপক্ষীর মাংসের যূষ সুপথ্য। চিনি, দাড়িমের রস, কর্পূর, এলাচ, তেজপাতা ধনে প্রভৃতি দ্বারা মাংসরস সংস্কৃত করা যাইতে পারে। মরিচ প্রভৃতি কটুদ্রব্য এবং তক্র নিষিদ্ধ।

মদাত্যয় রোগে—এন, তিত্তিব, লাব, ছাগ, কুক্কুট, ময়ূব ও শশকের মাংস সুপথ্য। দাড়িমের রস, কর্পূর, চিনি, ধনে, তেজপাত, হরিদ্রা প্রভৃতি দ্বারা মাংস সংস্কৃত করা উচিত। হিং প্রভৃতি তীক্ষ্ণ দ্রব্য এবং মরিচ প্রভৃতি কটু দ্রব্য ও তক্র বর্জ্জনীয়।

দাহরোগে—ধন্বদেশজ প্রাণীর মাংসরস এই রোগে সুপথ্য। মদাত্যয় রোগের লিখিত নিয়মে সংস্কৃত করা উচিত।

উন্মাদরোগে—কচ্ছপের মাংস এবং ধন্বদেশজাত জন্তুর মাংস ব্যবহার্য্য। ঘৃত, চিনি, তেজপাত, ছোট এলাচ, হরিদ্রা ধনে প্রভৃতি মসলা দ্বারা সংস্কৃত করা উচিত।

অপস্মাররোগে—কচ্ছপের মাংস এবং ধন্বদেশজ মৃগপক্ষীর মাংস উন্মাদ রোগের নিয়মে সংস্কৃত করিয়া প্রয়োগ করা উচিত। মৎস্য অপথ্য।

বাতব্যাধিতে (Nervous disease) পথ্য—গো, অশ্বতর, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, ছাগ, শূকর, মহিষ, হস্তী, হংস, কাদম্ব (শ্যামপক্ষ কলহংস), বক, ভেক, বেজী, শজারু, চড়াই, কুক্কুট, ময়ূর, তিত্তির কুম্ভীর, কচ্ছপ, শুশুক, প্রভৃতির মাংস এবং শিলিঙ্গ, পাবদা, গাগরা, কই, ইলিশ, তিমিঙ্গিল, রোহিত, মদ্গুর, শিঙ্গী; বাইম ও ক্ষুদ্র মৎস্য সকল এই রোগে প্রযোজ্য। দধি, ঘৃত, তৈল, অম্লদ্রব্য, লবণ, রশুন দাড়িম প্রভৃতি দ্বারা মাংস সংস্কৃত করা যাইতে পারে।

বাতব্যাধি অসংখ্য প্রকার। বাতব্যাধির এক রোগে যাহা পথ্য অপর রোগে তাহা অপথ্য। সুতরাং মাংস প্রয়োগ ও সংস্কার অবস্থার উপর নির্ভর করে।

বাতরক্ত রোগে—লাব, তিত্তির, ময়ূর, কুক্কুট, শুক, ভাষ, কপোত এবং চড়াই পাখীর মাংস বাতরক্ত রোগে পথ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ধনে, হরিদ্রা, তেজপাতা, ঘৃত চিনি প্রভৃতির দ্বারা মাংস সংস্কৃত করা যাইতে পারে। কিন্তু হিং, মরিচ, দধি, সর্ষপ প্রভৃতি নিষিদ্ধ।

আমবাত রোগে—জাঙ্গল দেশজাত পশুপক্ষীর মাংস রস এই রোগে প্রযোজ্য। রশুন, আদা হিং মরিচ, শুঁঠ, পিপুল, ছোট এলাচ,

তেজপাতা, লবঙ্গ, ধনে, হরিদ্রা জীরা প্রভৃতি মসলা ব্যবহার করা যাইতে পারে। মৎস্য ও দধি বর্জ্জনীয়।

শূলরোগে—এই রোগে জাঙ্গল মাংসের যূষ প্রশস্ত। সংস্কারের জন্য আমবাতের ন্যায় মসলা ব্যবহার করা উচিত। উদাবর্ত্ত (মলমূত্রাদির বেগধারণ জনিত বিবিধ রোগে) ও আনাহ (মল মূত্রের বিবদ্ধতা) রোগে—গ্রাম্য, ঔদক ও আনূপ মাংসের যূষ পথ্য। শুঁঠ, হিং, লবণ, মরিচ, তেজপাতা, মসলা ব্যবহার্য্য। উদাবর্ত্ত ও আনাহ রোগ নানা প্রকার, অবস্থা ভেদে মাংস প্রয়োগ ও সংস্কার করা আবশ্যক।

গুল্ম রোগে—ধন্বদেশ জাত প্রাণীর মাংস হিতকর। রশুন, তক্র, হিং, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আদা, জীরা, তেজপাত, ধনে, হরিদ্রা, প্রভৃতি মসলা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

হৃদ্রোগে—মৎস্য অপথ্য জাঙ্গল পশু পক্ষীর মাংস রস সুপথ্য। শুঁঠ, রশুন, ধনে, মরিচ, আদা, এলাচ, তেজপাতা, তক্র, দাড়িম, সৈন্ধব লবণ, প্রভৃতির দ্বারা সংস্কৃত করা উচিত।

মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে—ধন্বদেশ জাত পশু পক্ষীর মাংস গব্য, দধি, তক্র, ছোট এলাচ, কর্পূর, হরিদ্রা, ধনে, প্রভৃতি মসলার সহিত পাক করিয়া পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। মাংস অপেক্ষা মাংসের যূষই হিতকর। হিং, সর্ষপ, আদা, তৈল, লবণ এবং মরিচাদি তীক্ষ্ণ দ্রব্য বর্জ্জনীয়, মৎস্য অপথ্য।

মূত্রাঘাত (প্রস্রাব বন্ধ হওয়া) রোগে—ধন্বদেশ জাত মাংস পথ্য। মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের ন্যায় মসলা ব্যবহার্য্য।

অশ্মরী (পাথরী) রোগে—ধন্বদেশ জাত এবং অণ্ডজ প্রাণীর মাংস হিতকর। হিং, মরিচ, শুঁঠ, আদা ধনে, হলুদ, তেজপাতা প্রভৃতি মসলা ব্যবহার্য্য।

প্রমেহ রোগে—চড়াই, কপোত, শশক, তিতির, লাব, ময়ূর, এণ, বটের শুক প্রভৃতি জাঙ্গল মাংস প্রমেহ রোগে প্রশস্ত। মাংস অপেক্ষা মাংসের যূষই প্রশস্ত। মাংসের মেদ (fat) বাদ দিয়া অম্ল ও ঘৃত না দিয়া সংস্কৃত করিয়া লইবে। রশুন, আদা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ধনে, হরিদ্রা, তেজপাত, জীরা, প্রভৃতি মসলা ব্যবহার করা যাইতে পারে। দধি, তৈল, চিনি ও অম্ল দ্রব্য বর্জ্জনীয়। আনূপ মাংস, গ্রাম্য মাংস এবং মৎস্য অপথ্য।

মেদো রোগে (obesity)—এই রোগে পুষ্টিকর দ্রব্য মাত্রই অপথ্য। সুতরাং মাংস ও মৎস্য পরিত্যাজ্য। তথাপি মেদোরোগীগণ একেবারে বঞ্চিত হয়েন নাই, চিংড়ি মৎস্য সর্ষপ তৈল, মরিচ, আদা, শুঁঠ, হিং. এলাচ, প্রভৃতি মসলার সহিত পাক করিয়া আহার করিতে পারেন, ঘৃত ও চিনি পরিত্যাজ্য।

কার্শ্য রোগে—বিবিধ মাংস ঘৃতাদি সংযোগে উত্তমরূপে পাক করিয়া আহার করা হিতকর। তবে মাংস জীর্ণ হওয়া আবশ্যক। শুঁঠ, মরিচ প্রভৃতি মসলা ব্যবহার করা ভাল নয়।

উদর রোগে—জাঙ্গল মাংস পথ্য। রশুন, আদা, এলাচ, শুঁঠ, মরিচ, তেজপাত প্রভৃতি মসলা ব্যবহার্য্য মাংসের যূষ করিয়া খাওয়াই ভাল, কেননা এই রোগে অগ্নি দুর্ব্বল থাকে। ঔদক ও আনূপ মাংস অপথ্য। লবণ বর্জ্জনীয়।

শোথরোগে—ময়ূর, তিতির, কুক্কুট, লাব ও কচ্ছপের মাংস পথ্য। হরিদ্রা, শুঁঠ,

মরিচ, এলাচ, ধনে প্রভৃতি মসলা ব্যবহার্য্য। চিনি, দধি, লবণ ও অম্ল দ্রব্য বর্জ্জনীয়। গ্রাম্যমাংস ঔদক মাংস, আনূপ মাংস ও শুষ্ক মাংস অপথ্য।

ব্রধ্ন (বাঘী) ও কোষ বৃদ্ধি রোগে—বন্য দেশ জাত মৃগপক্ষীর মাংস প্রশস্ত। রশুন, হিং, আদা, মরিচ, প্রভৃতি মসলা ব্যবহার্য্য। আনূপ মাংস ও দধি অপথ্য।

গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অর্ব্বুদ (আব), শ্লীপদ (গোদ) প্রভৃতি রোগে মাংস পথ্য বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই। কিন্তু অপথ্য প্রসঙ্গে আনূপ মাংসের উল্লেখ আছে মাত্র। এত দ্বারা বুঝাযায় যে আবশ্যক মত জাঙ্গল মাংস চলিতে পারে।

বিদ্রধি (বড় ফোড়া) রোগে—পক্কাবস্থায় বন্য দেশজ মাংসের যূষের ব্যবস্থা আছে।

ব্রণশোথ (ফোড়া), ব্রণ (ঘা), সদ্যোব্রণ (আঘাতাদি জনিত ক্ষত) ও নাড়ীব্রণ (নালী ঘা) রোগে—জাঙ্গল মাংসের যূষ পথ্য। জাঙ্গল ভিন্ন অন্যান্য মাংস অপথ্য। ঘৃত, সর্ষপ তৈল, হরিদ্রা, ধনে, দাড়িমের রস প্রভৃতি দ্বারা মাংস সংস্কৃত করা যাইতে পারে। চিনি দধি, অম্ল দ্রব্য নিষিদ্ধ।

ভগন্দর রোগে—জাঙ্গল মাংসের যূষ সুপথ্য।

উপদংশ রোগে—বন্য দেশজ প্রাণীর মাংস সুপথ্য। অম্ল দ্রব্য, তক্র ও গুড় সংযোগ করিবে না।

কুষ্ঠরোগে—জাঙ্গল মৃগপক্ষীর মাংস হিতকর। ঘৃত, রশুন, হরিদ্রা ধনে, এলাচ প্রভৃতি মসলা ব্যবহার করা যাইতে পারে। দধি, অম্লদ্রব্য ও গুড় নিষিদ্ধ

শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠ (চল্‌তি কথায় আমবাত)—রোগে জাঙ্গল মাংসের যূষ পথ্য। সর্ষপ তৈল, মরিচ, আদা, হরিদ্রা, ধনে প্রভৃতি মসলা ব্যবহার্য্য। দধি, অম্ল দ্রব্য, চিনি ও গুড় বর্জ্জনীয়। আনূপ মাংস ও মৎস্য নিষিদ্ধ।

অম্লপিত্ত রোগে—জাঙ্গল মাংসের রস পথ্য। ধনে, হরিদ্রা, তেজপাতা প্রভৃতি মসলা ব্যবহার্য্য। দধি, মরিচ, হিং প্রভৃতি নিষিদ্ধ।

বিসর্প রোগে—জাঙ্গল মাংসের রস পথ্য। ঘৃত, হরিদ্রা, ধনে দাড়িমের রস, কর্পূর প্রভৃতির দ্বারা সংস্কৃত করা যাইতে পারে। রশুন, লবণ, মরিচ প্রভৃতি কটু দ্রব্য ও অম্ল দ্রব্য নিষিদ্ধ, অন্যান্য মাংস অপথ্য।

বিস্ফোট(বিষফোঁড়া) রোগে—ধন্বদেশজ মাংস পথ্য।

মসূরী (বসন্ত) রোগে—পায়রা, চড়াই, ডাক, বক, চকোর এবং শুক পক্ষীর মাংস অবস্থা বিবেচনায় প্রযোজ্য। লবণ, কটু দ্রব্য ও অম্ল দ্রব্য দ্বারা সংস্কৃত করিবে না।

মুখরোগে—জাঙ্গল মাংস রস এবং পুঁটি মাছ পথ্য। ঘৃত, হরিদ্রা, ধনে, জীরা, মরিচ, এলাচ প্রভৃতি মসলা ব্যবহার্য্য। দধি, অম্ল দ্রব্য ও গুড় নিষিদ্ধ। আনূপ মাংস এবং মৎস্য অপথ্য।

কর্ণরোগে—লাব, ময়ূর, হরিণ, তিত্তির ও বন্য কুক্কুটের মাংস পথ্য।

নাসারোগে—গ্রাম্য ও জাঙ্গল মাংস রশুন দধি, ঘৃত, লবণ, মরিচ, শুঁঠ, আদা হরিদ্রা, ধনে প্রভৃতি মসলা সহ পাক করিয়া প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

নেত্ররোগে—লাব, ময়ূর, বন্য কুক্কুট,

কচ্ছপ, ফিঙ্গা ও গৌরবর্ণ তিত্তিরের মাংস পথ্য।' ঘৃত, ধনে, হরিদ্রা, সৈন্ধবলবণ, এলাচ রশুন, কর্পূর প্রভৃতি মসলা ব্যবহার্য্য। নহে। অন্যান্য মাংস ও মৎস্য অপথ্য।

শিরোরোগে—ধন্বদেশজ মাংস, এলাচ, কর্পূর, হরিদ্রা, ধনে, দাড়িমের রস প্রভৃতি মসলা দ্বারা সংস্কৃত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

বিষরোগে—ময়ূর, তিত্তির, লাব, এণ, ইন্দুর ও সজারুর মাংস পথ্য। রশুন, সৈন্ধব লবণ, হরিদ্রা, ধনে, চিনি, তক্র প্রভৃতি দ্বারা সংস্কৃত করা যাইতে পারে।

এ পর্য্যন্ত যাহা লিখিত হইল তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে মাংস এদেশে সুস্থ ও অসুস্থ অবস্থায় বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। বাতরক্ত ও কুষ্ঠ রোগে এক্ষণে মাংসের ব্যবহার একেবারে নিষিদ্ধ। কদাপি কোন কবিরাজ ঐ দুই রোগে মাংস ব্যবহার করেন না। কিন্তু শাস্ত্রে স্পষ্টরূপে মাংস পথ্য বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

কেবল মাংস বলিয়া নহে বসা, মজ্জা এবং রক্ত ও ব্যবহৃত হইত। বসা (চর্ব্বি) আহারের উপদেশ, হেমন্ত ও শীত চর্য্যায় দেখা যায়। মজ্জা (Bone marrow) স্নেহ পানার্থ প্রযুক্ত হইত। প্রদর রোগের চিকিৎসায় লিখিত হইয়াছে যে এণ নামক হরিণের রক্ত চিনি ও মধু সহযোগে পান করিলে প্রবল রক্তপ্রদর ভাল হয়।

বহু প্রাণীর মাংস পূর্ব্বে বহুলরূপে ব্যবহৃত হইত তাহা নিশ্চয়, কিন্তু বর্ত্তমান সময় মাংসের প্রচলন কমিয়া গিয়াছে। কেবল বঙ্গদেশ বলিয়া নহে ভারতের সর্ব্বত্রই মাংসের প্রচলন অত্যন্ত কম হইয়া পড়িয়াছে।

পূর্ব্বেই প্রমাণ করা হইয়াছে যে মহাভারতের সময়েও বিবিধ জন্তুর মাংস যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ই ভারতে মাংস প্রচলনের এরূপ অল্পতা ঘটাইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের বহু রাজা বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া জীব হিংসা রহিত করিয়া দেন। এই জন্য বৌদ্ধাচার্য্য দিগকে এবং বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত রাজগণকে বহু আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের পর জৈন ধর্ম্মও জীব হত্যার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অবশ্য সকল হিন্দুই বৌদ্ধ বা জৈন ধর্ম্মে দীক্ষিত হয় নাই, কিন্তু বৌদ্ধ রাজার আদেশ পালন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। অপিচ, বৌদ্ধদিগের সংসর্গ গুণেও অনেক হিন্দু মাংস আহার পরিত্যাগ করিয়াছিল। যে সকল মহাপ্রাণ বৌদ্ধাচার্য্য পশুগণের প্রাণরক্ষার জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করিতে কণামাত্র কুণ্ঠিত হয়েন নাই, সাধারণে যে তাহাদের অনুকরণ করিবে তাহা আর বিচিত্র কি।

ইহার পর শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ প্রভৃতি অনেক সন্ন্যাসী ও যোগী জন্মগ্রহণ করেন। ভারতের বহুসংখ্যক হিন্দু সন্তান ঐ সকল শিষ্য বা অনুশিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। উহাদিগের শিক্ষা দীক্ষার প্রভাবেও মাংসের প্রচলন অনেক হ্রাস পাইয়াছিল।

মাননীয়।

শ্রীযুক্ত আয়ুর্ব্বেদ পত্র সম্পাদক মহাশয়গণ

সমীপেষু—

মহাশয়গণ! আপনাদের বিখ্যাত মাসিক পত্র আয়ুর্ব্বেদের এক পার্শ্বে নিম্নলিখিত প্রবন্ধটীর জন্য একটু স্থান দিলে যারপর নাই সুখী এবং একান্ত বাধিত হইব।

ভাষার চাতুর্য্য, ভাবের মাধুর্য্য এবং শব্দ বিন্যাসের পারিপাট্য প্রভৃতি ভাষার যে সমস্ত গুণ থাকিলে প্রবন্ধ প্রভৃতি সম্পাদকগণ সাদরে গ্রহণ করেন এবং পাঠক মহাশয়গণও আগ্রহের সহিত পাঠ করেন, আমাদের লেখায় তাহার কোনও একটী গুণও নাই; তবুও যে কেন আমরা, সুযোগ্য সম্পাদক কর্ত্তৃক সম্পাদিত সমস্ত দেশে প্রসারিত আপনাদের এই বিখ্যাত পত্রে আমাদের প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে সমুৎসুক হইলাম; তাহার কয়েকটী বিশিষ্ট হেতু আছে।

বক্ষ্যমান বিষয়টীর নিজ গুরুত্ব বিবেচনায়ই উহা সমস্ত মানবজাতির জীবন মরণ ও সুখ দুঃখের সহিত, বিশেষতঃ কি যোগী কি তান্ত্রিক কি আয়ুর্ব্বেদী কি ভিন্ন মতের চিকিৎসক কি গুরুতা, পৌরোহিত্য ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সমস্ত হিন্দু সন্তানগণের ধর্ম্ম কর্ম্মের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ।

এই পত্র দেশব্যাপী বলিয়া সকল স্থানের সকল বিভাগের পণ্ডিত মণ্ডলীরই ইহা আলোচনার সুযোগ হইবে। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, আমরা বিষয়টা উল্লিখিত মহাত্মাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিব মাত্র। এবং আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি টুকুও যথাসাধ্য তাহাদের সেবায় নিযুক্ত করিব। দ্বিতীয় হেতু এই যে বিষয়টা সকল সম্প্রদায়ের আর্য্য জাতির সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিলেও তর্কটী আয়ুর্ব্বেদ মূলক; সুতরাং আয়ুর্ব্বেদ পত্রেই প্রচারিত হওয়া সঙ্গত। আয়ুর্ব্বেদ মূলক হইলেও উহা অনেকটা প্রাচ্য চিকিৎসা ভাবাপন্ন। আর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হইলে এই বিষয়ের জন্য আমাদিগকে অনেক বেগ পাইতে হইত; কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে এখন কবিরাজ মহাশয়দের মধ্যে ডাক্তারী বিদ্যায় পারদর্শী চিকিৎসক একেবারে বিরল নহে। তন্মধ্যে এই আয়ুর্ব্বেদ পত্রের অন্যতর সম্পাদক শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম, এ, এম্‌বি, মহাশয় এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন এম, এ, এল, এম, এস, বিদ্যানিধি কবিভূষণ এই ব্যক্তিদ্বয় আমাদের বিশেষ পরিচিত। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ মহাশয় উভয় চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী এবং ইহারা সকলেই কলিকাতাবাসী সুতরাং মীমাংসার জন্য এক্ষণ আর আমাদিগকে অপর কোন ডাক্তারের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে না। আজকাল আমাদের মাহেন্দ্রক্ষণ! অল্পদিন মধ্যেই যে আমাদের লিখিত বিষয়ের একটা সুমীমাংসা হইবে, তৎসম্বন্ধে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই; কাজেই আমরা প্রস্তাবিত বিষয়ের অবতারণায় আর বিলম্ব করিব না।

কতিপয় বৎসরাবধি অনেক আয়ুর্ব্বেদ পারদর্শী খ্যাতনামা কবিরাজ মহাশয়দিগেরও এই বদ্ধমূল ধারণা এবং দৃঢ় বিশ্বাস চলিয়া আসিতেছে যে, ডাক্তারী পুস্তকে লিখিত হার্ট ডিজিজ (Heart disease) এবং আয়ুর্ব্বে-

দের হৃদ্‌রোগ এই উভয় একই রোগ। এবং হার্ট (আয়ুর্ব্বেদের ভাষায় রক্তাশয় বা রক্ত কোষ্ঠ) ও আয়ুর্ব্বেদোক্ত হৃদয় একই বস্তু (অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ)।

এই বিশ্বাস ও ধারণার স্রোতঃ পূর্ব্বে অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর প্রবাহের মত লোক-লোচনের অন্তরালেই প্রবাহিত হইতেছিল; কিন্তু দেখিতে দেখিতে এই স্রোতঃ এখন স্বীয়-খাত পরিপূর্ণ করতঃ ঢলের ন্যায় দেশের পর দেশ প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছে। পূর্ব্বে ইহা উক্ত মতাবলম্বী কবিরাজ মহাশয়দিগের ব্যবস্থা পত্রের এবং চিকিৎসিত রোগীর অনুসন্ধান ব্যতীত জানার আর কোন উপায় ছিলনা। এখন কিন্তু অনুসন্ধান ব্যতীতই উহা দৃষ্টি গোচর হইতেছে, এবং উক্ত মতাবলম্বী কবিরাজ মহাশয় দিগের সহিত আলোচনায় ও উক্তমতের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

আমরা কিন্তু এপর্য্যন্ত ছোটখাট যে দুই চারিখানা, আয়ুর্ব্বেদ সম্মত শারীর গ্রন্থ ও রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা গ্রন্থ এবং যোগ ও তন্ত্র শাস্ত্র আলোচনার সুযোগ পাইয়াছি, তাহার কোন ও একখানা গ্রন্থে ও উপরোক্ত মত সমর্থনোপযোগী কোন একটী প্রমাণ ও পাই নাই, পক্ষান্তরে ভূরি ভূরি বিরুদ্ধ প্রমাণই আমাদের দৃষ্টি গোচর হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস আয়ুর্ব্বেদোক্ত হৃদ্ রোগ, ও ডাক্তারী গ্রন্থোক্ত হার্ট ডিজিজ এক নয়, দুইটী, ভিন্ন রোগ, সমর্থন জন্য আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ হইতে কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দিলাম। তজ্জন্য কেহ যেন মনে না করেন যে, আমাদের মত ভ্রান্ত বলিয়া বিবেচিত হইলে ও আমরা সেই ভ্রান্ত মতেরই পোষণ করিব। এই শুভ সুযোগে উপরোক্ত বিষয়ের একটা চূড়ান্ত মীমাংসা অবশ্যই হইবে, এই মনে করিয়া প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম। শাস্ত্রীয় যুক্তি ও প্রমাণ বলে যে সিদ্ধান্ত হইবে, তাহা অগ্রাহ্য করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নয়। যাহা হউক আয়ুর্ব্বেদোক্ত হৃদ্‌রোগ, এবং ডাক্তারী গ্রন্থোক্ত হার্টডিজিজ (Heart Disease) অর্থাৎ (প্রতি পক্ষের ভাষায় কথিত হৃদরোগ) এক কিনা, এই বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত অতি সত্বর হওয়া আবশ্যক। এই সিদ্ধান্তে উপ-নীত হইতে হইলে আমাদিগকে নিম্নলিখিত বিষয় গুলির আলোচনা করিতে হইবে—

(ক) হৃদয় অর্থাৎ হৃন্মর্ম্ম, ও হার্ট অর্থাৎ রক্তাশয় বা রক্ত-কোষ, এই উভয়ই এক না ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় দুইটী পদার্থ?

(খ) এক জাতীয় পদার্থ হইলে ও উভয়ে একই পদার্থ (অঙ্গ) কিনা?

(গ) বিভিন্ন জাতীয় হইলে, কোনটী কোন জাতীয়, এবং কোনটীর স্থান কোথায়, এবং আকৃতি গত, ক্রিয়া গত (Functional) ও গুণ গত উহাদের কোন সাম্য আছে কিনা, অথবা সর্ব্বাংশে বৈষম্য?

(ঘ) হার্ট ডিজিজ্ (Heart disease) ও আয়ুর্ব্বেদোক্ত হৃদ রোগ, এই উভয়ের সংপ্রাপ্তি, রূপ (রোগলক্ষণ) নিদান (রোগের কারণ) ও চিকিৎসা প্রণালীর ঐক্য আছে কিনা। যদি ডাক্তারী পুস্তকে লিখিত ঐ সব বিষয়ের সহিত, কবিরাজী পুস্তকে লিখিত ঐ সব বিষয়ের মধ্যে এক কি ততোধিক বিষয়ের কিছু ঐক্য দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে কোন্ কোন্ বিষয়ে কি পরিমাণে ঐক্য এবং ঐ ঐক্যবলে হার্ট ডিজিজকে হৃদরোগ বলা যায় কিনা? এবং আয়ুর্ব্বেদোক্ত হৃদরোগের ঔষধ

দ্বারা তাহার (হার্ট ডিজিজের) চিকিৎসা চলিতে পারে কি না ?

উপরে যে যে বিষয় আলোচনা করার কথা উল্লেখ করা হইল, তদ্বিষয়ে সম্যক আলোচনা করিতে হইলে গ্রন্থই (শাস্ত্র) প্রধান অবলম্বন; সুতরাং তাহা হইতেই প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া দেওয়া গেল, এবং সর্ব্বসাধারণের বোধ সৌকর্য্যার্থে শ্লোকগুলির বাঙ্গলায় অর্থ করিয়া দেওয়া হইল।

(খ) (গ) হৃদয় ও রক্তকোষ (Heart) এই উভয়ের আকৃতি, এবং কার্য্যগত সাম্য ও বৈষম্য সম্বন্ধেই প্রথম আলোচনা করা যাউক।

ভাবমিশ্র সঙ্কলিত ভাবপ্রকাশ, কবিরাজ শ্রীযুক্ত কালীশচন্দ্র সেন কবিরত্ন মহাশয় দ্বারা অনুদিত ও সংশোধিত, বেণীমাধব দে এণ্ড কোং দ্বারা প্রকাশিত পূর্ব্বখণ্ড ৪২ পৃষ্ঠা।

১। "হৃদয়ং পুণ্ডরীকেন সদৃশং স্যাদধো মুখং।
জাগ্রত স্তদ্ বিকসতি স্বপতস্ত নিমীলতি।
আশয়স্তত্তু জীবস্য চেতনাস্থান মুত্তমম্।

অর্থ—হৃদয় আকারে পদ্মপুষ্প সদৃশ অধোমুখ; ইহা জাগ্রদবস্থায় বিকশিত এবং নিদ্রাবস্থায় মুদিত থাকে, এবং উহা জীবের উত্তম চেতনা স্থান।

এখানে দেখা গেল, হৃদয় পদ্ম সদৃশ অধোমুখ, আর হার্ট অর্থাৎ রক্তাধার উর্দ্ধে ন্যুব্জ, এবং অধোদিকে কুব্জ; একটা থলিয়ার আকার ও উর্দ্ধমুখ। হৃদয় নিদ্রিতাবস্থায় মুদিত থাকে, হার্ট জীবের চিরনিদ্রাবস্থার পূর্ব্বে মুদিত হয় না। উহার মুখ উর্দ্ধদিকে, তৎসংলগ্ন দুইটী শিরার একটী দ্বারা নিদ্রিত কি জাগ্রত সকল অবস্থায়ই বিশুদ্ধ রক্ত, আর একটী সিরা দ্বারা অশুদ্ধ রক্ত, সর্ব্বদাই প্রবাহিত হইতেছে। হৃদয় চেতনাস্থান, জীবের চৈতন্য সম্পাদন ইহার কার্য্য, আর হার্ট বা রক্তাশয় —রক্তস্থান (আয়ুর্ব্বেদ মতে যকৃৎ ও প্লীহা রক্তস্থান) সর্ব্বশরীরে রক্ত সঞ্চালন ইহার একমাত্র কার্য্য। পাঠক দেখিলেন হৃদয়ের সহিত হার্টের (Heart) ক্রিয়াগত, আকৃতিগত কোন সাদৃশ্যই নাই।

ঐ ভাবপ্রকাশ উক্ত খণ্ড ৪১ পৃষ্ঠা—

২। "শোণিতাজ্জায়তে প্লীহা বামতো হৃদয়াদধঃ
রক্তবাহিসিরাণাং স মূলংখ্যাতো মহর্ষিভিঃ॥

*   *   *   *

অধো দক্ষিণতশ্চাপি হৃদয়াদ্ যকৃতঃ স্থিতিঃ॥১১

অর্থাৎ হৃদয়ের বামাধোদিকে প্লীহা—ইহাকে মহর্ষিগণ রক্তবাহি সিরা সকলের মূল বলিয়াছেন আর হৃদয়ের দক্ষিণাধোদিকে যকৃৎ অবস্থিত। এই শ্লোকাংশ হইতে আমরা এই দেখিতে পাইলাম যে প্লীহা ও যকৃৎ এই দুইটী যথাক্রমে হৃদয়ের বাম ও দক্ষিণ অধোদিকে। সুতরাং হৃদয় এই দুই যন্ত্রেরই কিয়দ্দূর উপরে এবং ঠিক মধ্যভাগে। আর হার্ট যে বক্ষের বামোর্দ্ধপার্শ্বে তাহা সর্ব্বসম্মত।

হার্টের (রক্তাশয়) উর্দ্ধভাগের অতি সামান্যাংশ মাত্র বক্ষের ঠিক মধ্য রেখার উপর থাকিলেও উহা যকৃৎ প্লীহার এত উর্দ্ধে যে তদবলম্বনে যকৃৎ প্লীহার স্থান নির্দ্দেশ কোনরূপেই পণ্ডিতাগ্রগণ্য আয়ুর্ব্বেদ-লেখকের পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে না। হার্টকে হৃদয় ধরিলে আর প্লীহার বেলায় (বামতো হৃদয়াদধঃ) বলিতে হইত না। শুধু হৃদয়াদধো বলিলেই চলিত। আর যকৃতের নির্দ্দেশত এই শ্লোক দ্বারা কোনও মতেই হইতে পারে না। সুতরাং এই শ্লোকস্থ হৃদয় শব্দ দ্বারা হার্টকে বুঝাইবার আশা দুরাশা মাত্র।

আমাদের সুবিধার মধ্যে আমরা এই শ্লোক দ্বারা ইহাই মাত্র নিশ্চয় করিতে পারিলাম যে হৃদয়টা কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে হইলেও প্লীহাযকৃতের সমদূরবর্ত্তী। অর্থাৎ বক্ষের ঠিক মধ্যে কোন স্থলে অবশ্যই হইবে।

হৃদয়-সম্বন্ধে মীমাংসার প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ের অবতারণা করিতে হইলে, শারীর স্থান এবং চিকিৎসা স্থান এবং অন্যান্য স্থান হইতেও আমাদিগকে উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে। হয়ত অন্যান্য গ্রন্থের আশ্রয়ও লইতে হইতে পারে, কাজেই প্রবন্ধ কিছু দীর্ঘ হইয়া উঠা অসম্ভব নয়। আশা করি পাঠক মহাশয়গণ তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন।

প্রতিপক্ষ বলেন, হার্টে (রক্তাশয়ে) যাওয়ার পর রস, রক্তবর্ণ ও রক্ত নাম প্রাপ্ত হয়। এই উক্তির সম্বন্ধে ও আমাদিগকে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইতে হইবে। এবং তাঁহাদের অপরাপর আপত্তিগুলি ও খণ্ডন করিতে হইবে। এবং আমাদের স্বমত স্থাপন জন্যও চেষ্টা করিতে হইবে। এখন হইতে আমরা ঐ দুই বিষয় মনে রাখিয়াই চলিতে চেষ্টা করিব। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি বাধ্য হইয়াই করিতে হইবে। তবে চেষ্টা করিয়া যতদুর সংক্ষেপ করা যায় তৎসম্বন্ধে চেষ্টার ক্রটী করিব না। পুর্ব্বেই বলিয়াছি শাস্ত্রগ্রন্থ হইতেই প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দিব। বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত আমরা চিকিৎসা শাস্ত্র ব্যতীত অন্য শাস্ত্রের প্রমাণ উপস্থিত করিব না।

নিম্নে তাহারই চেষ্টা করা গেল।

বায়ু পিত্ত কফ এই তিন লইয়াই আয়ুর্ব্বেদ মতে স্বাস্থ্য ও রোগ; সুতরাং ঐ গুলি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা না করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়ান্তর নাই। উক্ত দোষত্রয় মধ্যে আবার বায়ুই সর্ব্বপ্রধান; কাজেই বায়ুর বিষয়ই প্রথম উল্লেখ করা গেল।

ভাবপ্রকাশ উক্ত খণ্ড ৪৮ পৃঃ—

বায়ুর স্থান ও নাম—

১ ২ ৩ ৪
৩। উদান স্তদনু প্রাণঃ সমানোঽপান এবচ।
৫
ব্যানশ্চৈতানি নামানি বায়োঃ স্থান প্রভেদতঃ

স্থানভেদে ১ উদান, ২ প্রাণ, ৩ সমান, ৪ অপান, ৫ ব্যান, বায়ুর এই পাঁচ নাম।

উহাদের স্থান—

১ ২ ৩ ৪
৪। কণ্ঠে হৃদি তথাগ্নস্তাৎ কোষ্ঠবহ্নের্ম্মলাশয়ে।
৫
সকলেঽপি শরীরেঽসৌ ক্রমেণ পবনোবসেৎ॥

অর্থাৎ ১ উদান, ২ প্রাণ, ৩ সমান, ৪ অপান, ৫ ব্যান, উহাদের স্থান যথাক্রমে—১ কণ্ঠ, ২ হৃদয়, ৩ অন্নাশয়, ৪ মলাশয় এবং ৫ সর্ব্বশরীর।

৫। যো বায়ুঃ প্রাণ নামাঽসৌ মুখং গচ্ছতি দেহধৃক্
সোঽন্নং প্রবেশয়ত্যন্তঃ প্রাণাংশ্চাপ্যবলম্বতে।
প্রায়শঃ কুরুতে দুষ্টো হিক্কাশ্বাসাদিকান্‌গদান্॥

অর্থ—প্রাণ নামক বায়ু মুখে গমন করতঃ অন্নাদি ভিতরে (আমাশয়ে) প্রবেশ করায়। ঐ বায়ু হইতে হিক্কা শ্বাসাদি রোগ জন্মায়। ইহা দ্বারাও বুঝা যায় যে, রক্তাশয় (Heart) হৃদয় হইলে, এবং তাহা প্রাণ বায়ুর স্থান হইলে, রক্তাশয়স্থ বায়ু ভুক্তদ্রব্য আমাশয়ে (Stomach) না লইয়া (Heart) রক্তাশয়েই লইয়া যাইত। আর Heart হিক্কারও উৎপত্তি স্থান হইত; এবং রক্ত বমন হিক্কা রোগে একটা সাধারণ লক্ষণ থাকিত। কার্য্যতঃ তদ্রূপ ঘটে কিনা তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

অতঃপর পিত্ত সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

পিত্ত সকলের নাম :—

৬। পাচকং রঞ্জক ঞ্চাপি সাধকালোচকে তথা।
ভ্রাজক ঞ্চেতি পিত্তস্য নামানি স্থান-ভেদতঃ।

পাচকাদি পিত্তের স্থান :—

৭। অন্যাশয়ে যকৃৎপ্লীহ্নোঃ হৃদয়ে লোচনদ্বয়ে।
ত্বচি সর্ব্বশরীরেষু পিত্তং নিবসতি ক্রমাৎ।

অর্থাৎ ১ পাচক পিত্ত অগ্ন্যাশয়ে ২ রঞ্জক যকৃৎ প্লীহায়, ৩ সাধক হৃদয়ে, ৪ আলোচক লোচনদ্বয়ে ৫ এবং ভ্রাজক পিত্ত সর্ব্ব শরীরের ত্বকে যথাক্রমে অবস্থান করে।

ভাবপ্রকাশ ঐ খণ্ড ৫৫ পৃষ্ঠা—

৮। রঞ্জকং নাম যৎ পিত্তং তদ্রসং শোণিতং নয়েৎ
যত্তু সাধক সংজ্ঞং তৎকুর্য্যাদ্ বুদ্ধিং ধৃতিং স্মৃতিম্।

ভাবার্থ—রঞ্জক নামক যে পিত্ত ঐ পিত্তই রসকে রক্তরূপে পরিণত করে; আর সাধক নামক পিত্ত বুদ্ধি, ধৃতি ও স্মৃতি উৎপাদন করে। উপরোক্ত শ্লোক দ্বারা কি ইহাই প্রমাণিত হইতেছে না যে, রঞ্জক পিত্ত দ্বারাই রস রঞ্জিত (রক্তবর্ণ প্রাপ্ত) হইয়া রক্ত নামে খ্যাত হয়। না—এখনও বলিতে চান রক্তকোষে যাইয়া রস রক্তবর্ণ হইয়া রক্ত নাম প্রাপ্ত হয়। উক্ত মতাবলম্বী কবিরাজমহোদয়গণ নাকি শবচ্ছেদ করিয়া দেখিয়াছেন, রক্তাধারে অর্থাৎ হার্টের চারিটা গর্ত্তের দুইটায় নাকি রস থাকে!

এই দর্শনের উপর নির্ভর করিয়া এবং শারীর স্থানের "রসস্ত হৃদয়স্থানং—শ্লোক ধরিয়া তাহারা বলেন; "যেহেতু Heart অর্থাৎ রক্তাশয়ের একদিকের দুই কোঠে রস থাকে, তখন এটা ত প্রত্যক্ষ প্রমাণেই স্থিরীকৃত হইতেছে যে, হার্ট আর হৃদয় একই?"

এরূপ দেখিয়া থাকিলে কেমন করিয়া কোন্ মুখে বলিব Heart আর হৃন্মর্ম্ম এক নয়, ডাক্তারবাবুদের কাছেও নাকি তাহারা হার্টের এক দেশে রস থাকার কথা শুনিয়াছেন। একেত প্রত্যক্ষ তদুপার আবার আপ্তবাক্য, এর চেয়ে অধিক প্রমাণের আর প্রয়োজন কি?

কিন্তু আমরা কোনও ভাল ডাক্তারকে ঐরূপ বলিতে শুনি নাই। আর নিজে, নরদেহ ব্যবচ্ছেদ করা দূরে থাকুক, অপর কাহাকেও নরশব ব্যবচ্ছেদ করিতে দেখি নাই। আমরা পাঁঠা কাটিয়া কিন্তু পাঁঠার রক্তকোষে রস দেখি নাই। উক্ত কবিরাজ মহোদয়েরা স্বয়ং দেখিয়াছেন এবং কোন কোন ডাক্তার বলিয়াছেন, তা বলিয়া ঐ কথাই ঠিক বা উহা মানিয়া লইতেই হইবে এমন কথা স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি হয় না। যাহা হউক, এতৎ সম্বন্ধে সুবিজ্ঞ ডাক্তার মহোদয়গণই মত প্রকাশের মুখ্য অধিকারী। তাহারা (Heart) হার্টে রস দেখিয়া থাকিলে অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইলে বাধিত হইব।

আমরা কিন্তু শাস্ত্রের দাস, শাস্ত্রানুশাসনেই চলিব। তা যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত শ্লোক পাঠে আমরা ইহাও পাইলাম যে, হৃদয় স্মৃতি ও ধৃতির স্থান। উক্ত শ্লোকের, "তদ্রসং শোণিতং নয়েৎ" ইত্যাদি উল্লেখ দ্বারাও যদি পিত্ত সংযোগে রসের রক্তত্ব প্রাপ্তি স্বীকার না করেন, তবে আর কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে দেখিতে পাইব—

ভাবপ্রকাশ ৬০ পৃষ্ঠা—

৯। "যদা রসো যকৃৎ যাতি তত্র রঞ্জক-পিত্ততঃ।
রাগং পাকঞ্চ সংপ্রাপ্য স ভবেদ্রক্তসংজ্ঞকঃ॥"

অর্থ—রস যকৃৎ প্রাপ্ত হইয়া, তথায় রঞ্জক পিত্তদ্বারা (রঞ্জক পিত্ত হইতে) বর্ণ ও পাক প্রাপ্ত হইয়া রক্ত সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

অতঃপর শ্লেষ্মা সম্বন্ধে লিখিত হইল :—

ভাবপ্রকাশ ঐ খণ্ড ৫৭ পৃষ্ঠা—

১০। "কফস্যৈতানি নামানি ক্লেদনশ্চাবলম্বনঃ। (১, ২)
রসনঃ স্নেহনশ্চাপি শ্লেষণঃ স্থানভেদতঃ।" (৩, ৪, ৫)

স্থানান্যাহ—

১১। "আমাশয়েঽথ হৃদয়ে কণ্ঠে শিরসি সন্ধিষু (১, ২, ৩, ৪, ৫)

নাম যথা—

ক্লেদন, অবলম্বন, রসন, স্নেহন, ও শ্লেষণ। (১, ২, ৩, ৪, ৫)

ইহারা যথাক্রমে,—

আমাশয়ে, হৃদয়ে, কণ্ঠে, শিরে এবং সন্ধি সমূহে বাস করে। (১, ২, ৩, ৪, ৫)

এস্থলে আমরা রস সম্বন্ধে কয়েকটী বিষয়ের আলোচনা না করিলে; মহাপণ্ডিত হইলেও আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী ব্যতীত অন্যান্য শাস্ত্রে কৃতবিদ্য বা কৃতশ্রম ব্যক্তিদিগকে আমাদের কথাগুলি ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিব না। সুতরাং বাধ্য হইয়াই রস সম্বন্ধে এক্ষণে কোন কোন বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা না করিয়া পারিলাম না। রস কথাটা পাঠ করিয়া স্বভাবতঃই নানা ব্যক্তি নানা রকম বুঝিতে পারেন, তাহাদের জন্য বিশেষতঃ আমাদের প্রস্তাবিত বিষয় হৃদয়ের প্রমাণ ও আমরা উপযুক্তরূপে করিয়া উঠিতে পারিব না। অতএব রস কি তাহার বর্ণ ও আকার কি, এবং কার্য্য কি এবং রসের স্থানই বা কোথায় যথা সম্ভব সঙ্ক্ষেপে এক্ষণে তাহার আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ রস পদার্থটা কি? ও তাহার গুণই বা কি তাহা বলিতেছি।

১২। সম্যক্ পকস্য ভুক্তস্য সারো নিগদিতোরসঃ
সতু দ্রবঃ সিতঃ শীতঃ স্বাদুঃ স্নিগ্ধশ্চলো ভবেৎ॥

অর্থ—ভুক্ত দ্রব্য জাঠরাগ্নি দ্বারা সম্যক্ প্রকারে পরিপাক পাইয়া, তাহা হইতে যে সার উৎপন্ন হয়, তাহাকেই রস বলা যায়। এই রস—দ্রব (তরল), শ্বেতবর্ণ, শীতল, মধুর স্নিগ্ধ ও গতিশীল।

রসস্য স্থানমাহ।—

১৩। সর্ব্ব-দেহ-চরস্যাপি রসস্য হৃদয়ং স্থলম্।
সমানমরুতা পূর্ব্বং যদয়ং হৃদয়ে ধৃতঃ॥

রস সর্ব্ব শরীর সঞ্চারী হইলেও হৃদয়কেই ইহার স্থান বলা যায়। কেন না—পূর্ব্বে হৃদয়ে যায়, এবং ইহার স্বকীয়াংশ সর্ব্বদাই হৃদয়েই থাকে। প্রমাণ—যথা—রসস্ত সমান বায়ুনা প্রেরিতো ধমনীমার্গেন শরীরা-রম্ভকস্য রসস্য স্থানং হৃদয়ং গত্বা তেন সহ মিশ্রিতো ভবতি। এখানেও রসস্য হৃদয়ং স্থানং বলা হইয়াছে; কিন্তু 'রক্তস্য' ত বলা হয় নাই। 'রক্তস্য বেতি' এমন ও ত বলা হয় নাই। তবু ও কি বুঝিতে হইবে যে রস এবং রক্তাধার একই।

টীকা যথা—"মর্ম্মৈক দেশে—হৃদয়ৈক দেশে" উদ্ধৃতাংশের সম্পূর্ণ শ্লোকের অর্থ এই—

"ত্রিদোষজ হৃদ্ রোগে যে দুরাত্মা তিল, ক্ষীরাদি (দুগ্ধাদি) সেবন করে তাহার আহার-জাত রস ক্লিন্নতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বিশুদ্ধ হইতে পারে না। ক্লিন্ন (অশুদ্ধ) রস হৃদয়ে যাইয়া

সম্যক্ ক্লিন্নতা প্রাপ্ত (পর্যুষিত) হয়। ঐ পর্যুষিত রস হইতে ক্রিমি জন্মে, ক্রিমির কণ্ডূয়ন জন্য হৃদয়ে গ্রন্থি জন্মে। অর্থাৎ ফুলিয়া উঠে। এস্থলে আমাদের অনুকূলে অনেক কথা ছিল; কিন্তু আপাততঃ পাঠক মহাশয়দের বিরক্তি আশঙ্কায় ঐ সব বলিতে বিরত রহিলাম। আমাদের উক্তির প্রতিবাদ দেখিলে বারান্তরে ঐ সব বিবৃত করা যাইবে।

সুশ্রুতের ক্রিমিরোগপ্রতিষেধাধ্যায় সূত্রস্থান ৪৩অঃ উক্ত হইয়াছে—

"শূলাগ্নিমান্দ্যপাণ্ডুত্বং বিষ্টম্ভবলসংক্ষয়াঃ
প্রসেকারুচিহৃদ্‌রোগবিড়্‌ভেদাস্তু পুরীষজে"

ইহার অনুবাদ অনাবশ্যক।

ডাক্তারী গ্রন্থে হার্টডিজিজের নানা প্রকার ভেদ আছে। কিন্তু ক্রিমি জন্য হৃদ্ রোগ আছে কিনা তাহা বিতণ্ডাবাদিগণ বলিতে পারেন।

নিরপেক্ষ সুধী পাঠক গণের অবগতির জন্য এখানে সুশ্রুতোক্ত হৃদ্ রোগের চিকিৎসা পদ্ধতির একটুকু উল্লেখ করিতেছি।

"বাতোপসৃষ্টে হৃদয়ে বাময়েৎ স্নিগ্ধ মাতুরম্
দ্বিপঞ্চ মূলকাথেন সস্নেহলবণেন তু"
"শ্রীপর্ণীমধুকক্ষৌদ্রসিতোৎপলজলৈর্বমেৎ
পিত্তোপসৃষ্টে হৃদয়ে সেবেত মধুরৈঃ শৃতম্"
"বচানিম্বকষায়াভ্যাম্ বান্তং হৃদি কফাত্মকে"
"হৃদয়স্থা পতন্ত্যেব মধস্তাৎ ক্রিময়ো নৃণাম্"

উপরোক্ত স্থলে কাশিরাজ ধন্বন্তরি স্বীয় শিষ্যকে উপদেশ করিতেছেন—

পূর্ব্বে রসের স্বকীয়াংশ বলিয়া যে বলা হইল, তৎসম্বন্ধে একটুকু না বলিলে কথাটা সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হইবে না। তাই কথাটা একটু প্রকাশ করিয়া বলা আবশ্যক।

১৪। রসস্তু হৃদয়ং যাতি সমান মারুতেরিতঃ
সতু ব্যানেন বিক্ষিপ্তঃ সর্ব্বান্ ধাতুন্ বিবর্দ্ধয়েৎ।
রসস্তু তত্র তত্র ত্রিধা বিভজ্যতে॥

অর্থ :—রস সমান বায়ু কর্তৃক চালিত হইয়া রসবাহিনী ধমনী পথ দ্বারা শরীরাভ্যন্তর স্থায়ী রসস্থানে হৃদয়ে নীত হইয়া তত্রস্থ স্থায়ী রসের সহিত মিশ্রিত হয়। তৎপরে ব্যান বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া রসাদি শুক্রান্ত সমস্ত ধাতুর পোষণ করে। চরকে উক্ত হইয়াছে :—

১৫। "স্থূলঃ সূক্ষ্মস্তন্মলশ্চ তত্রতত্র ত্রিধা রসঃ
স্বয়ং স্থূলোহংশঃ পরং সূক্ষ্মস্তন্মলং যাতিতন্মলঃ।

অর্থ—রস তিন প্রকারে বিভক্ত হয়। যথা—স্থূল, সূক্ষ্ম ও তন্মল ভাগ (ধাতুর মলাংশ), স্থূল ভাগ (স্বকীয়াংশ) পূর্ব্বোক্ত রূপে হৃদয়ে নীত হইয়া ধাতু অর্থাৎ রক্ত হইতে শুক্র ধাতু পর্য্যন্ত প্রত্যেক ধাতুর পোষণ করে এবং তন্মল ভাগ ধাতু সমূহের মলত্ব প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ রস পরিপাক পাইয়া তাহার স্থূলভাগ রসই থাকে, সূক্ষ্মভাগ প্রথমতঃ পরধাতু রক্তের পোষণ করে ও তন্মল ভাগ কফরূপে পরিণত হয়। অর্থাৎ রস ধাতুর মল কফ, রক্ত ধাতুর মল পিত্ত, মাংস ধাতুর মল কর্ণ ও নাসিকাদির মল, এবং মেদের মল, ঘর্ম্ম ইত্যাদি।

কেন রস সম্বন্ধে এত কথা লেখা হইল, আয়ুর্ব্বেদের পাঠক মহাশয়গণ নিজেরাই তাহা বুঝিবেন। অন্যান্য লোকের বুঝিবার জন্য নিম্নে তাহার কারণ উল্লেখ করিতেছি।

প্রতি পক্ষের প্রথম আপত্তি এই যে তাঁহারা Heart অর্থাৎ রক্তাশয়ের দুইটা প্রকোষ্ঠে রস দেখিয়াছেন, আমরা রস সম্বন্ধে যে কতিপয় শ্লোক (১২—১৫) উদ্ধৃত

করিয়াছি, পাঠক মহাশয় তদ্দারা দেখিতে পাইবেন যে রস (আহারীয় বস্তুর সারাংশ) প্রথমে তাহা হৃদয়ে যায়, তৎপরে অপরাপর ধাতু (রক্তাদি ধাতুর) সহিত মিশ্রিত হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত রঞ্জক পিত্তসহযোগে রক্তরূপে পরিণত হয়। স্থূলাংশ যাহা রস নামেই পরিচিত, তাহা স্বকীয় স্থান হৃদয়েই থাকে—আর তাহার বর্ণ শ্বেত। হার্টের এক প্রদেশে যাহারা রস দেখাইয়াছেন সেই রসের বর্ণটা শ্বেত, পীত কি লোহিত তাহা তাহারা অবশ্যই বলিতে পারেন। আমাদের শাস্ত্রোক্ত হৃদয়ের কোন স্থানেও রক্ত নাই, সুতরাং হার্টের চারিটা প্রকোষ্ঠের দুইটায় যদি কেহ রস দেখিয়াও থাকেন, তবু তদনুবলে তাহাকে হৃদয় বলা ত শাস্ত্র কর্ত্তাদের অভিপ্রেত বলিয়া কোন প্রমাণ নাই!

বাস্তবিক অর্দ্ধাংশে রসের স্থান, অর্দ্ধাংশে রক্তের স্থান, এমন একটা কিম্ভূত কিমাকার যন্ত্রের নামও আমরা কাহারও মুখে কোন কালে শুনি নাই।

হৃদয়ে সাধক নামক পিত্ত আছে, হৃদয়ে অবলম্বন নামক শ্লেষ্মাও রহিয়াছে এবং প্রাণ নামক বায়ুও রহিয়াছে। হৃদয়ে থাকিয়া প্রাণবায়ু যে কার্য্য করিতেছে তাহা আমরা পঞ্চম শ্লোকে দেখাইয়াছি। হার্টে বায়ু ঐ ঐরূপ কার্য্য কিছু নাই। সাধক নামক পিত্তের গুণ ৮ম শ্লোকে আছে অর্থাৎ হৃদয়ের বুদ্ধি, ধৃতি, স্মৃতিরূপ কার্য্যের কারণ ঐ সাধক পিত্ত। বিতণ্ডাবাদিগণের ইহাও দেখা কর্ত্তব্য যে হার্ট (রক্ত-কোষ্ঠে) বুদ্ধি, ধৃতি, স্মৃতি শক্তি আছে কি না! অর্থাৎ হার্ট হৃদয়ের মত বুদ্ধি স্থান কিনা, হৃদয়স্থ শ্লেষ্মার নাম অবলম্বন। এখন অবলম্বন শ্লেষ্মার কার্য্য কি তাহাও দ্রষ্টব্য।

১৬। রসযুক্তাত্মবীর্য্যেণ হৃদয়স্থাবলম্বনঃ
ত্রিকসন্ধারণঞ্চাপি বিদধাত্যবলম্বনঃ।

অর্থ—হৃদয়স্থ অবলম্বন শ্লেষ্মা রস (হৃদয়স্থ) সহযোগে আত্মশক্তি দ্বারা হৃদয় অবলম্বন এবং ত্রিকের সন্ধারণ করে। ত্রিক অর্থে এখানে শিরোবাহুদ্বয় সন্ধি।

উপরোক্ত স্থলে পাঠক মহাশয়গণ দেখিতে পাইলেন যে (গ) হৃদয়ের ক্রিয়া ও গুণ কি, এখন হার্টে আমরা উহার কোন একটী গুণ বা ক্রিয়া দেখিতে পাই না। সুতরাং হৃদয়ের সহিত হার্ট (রক্তাশয়ের) ক্রিয়াগত বা গুণগত কোন সাম্যই নাই। তবে আমরা কি করিয়া বুঝিব যে, হৃদয় আর হার্ট একই পদার্থ (অঙ্গ)?

এখন আমরা হার্ট (রক্তাশয় বা রক্তকোষ্ঠ) এবং হৃদয় এতদুভয়ের জাতি ও স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করিব, এবং উভয়ের মধ্যে এই দুই বিষয়ের কি পার্থক্য বা ঐক্য আছে তাহার অনুসন্ধান করিব।

অনেকেই অবগত আছেন হার্ট (রক্তাশয়টা) বক্ষঃ প্রাচীরের অনেকটা ভিতরের দিকে, এবং কণ্ঠ হইতে ক্রমে নিম্নদিকের পঞ্জরাস্থির মধ্যে। বাম দিকের পঞ্জরস্থি অর্থাৎ দ্বিতীয় পাঁজরার নিম্ন হইতে প্রায় ৬ষ্ঠ পঞ্জরাস্থি পর্য্যন্ত লম্বা; এবং এটাযে মাংস নির্ম্মিত তাহা ও বোধ হয় অধিকাংশ লোকই জানেন, তৎসম্বন্ধে বোধ হয় আর বেশী কথা লেখার প্রয়োজন নাই।

তবে হৃদয়টা কোন্ জাতীয় কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত অঙ্গ তাহাই আমাদের এখানে আলোচ্য।

ভাব প্রকাশ আশয়োপক্রমে বলিতেছেন। ৭০ পৃষ্ঠা ঐ খণ্ড।

১৭। নাভে র্বিতস্তিমাত্রঞ্চ কণ্ঠদেশাৎ ষড়ঙ্গুলম্। উরস স্তদ্ বিজানীয়াৎ শেষেতু হৃদয়ং মতম্। উরো রক্তাশয় স্তস্মাদধঃ শ্লেষ্মাশয়ঃ স্মৃতঃ আমাশয়স্তু তদধ স্তদধো দহনাশয়ঃ ইতি॥

উপরোক্ত শ্লোকের অর্থ কিছু জটিল। আমরা পৃথক্ পৃথক এডিসনের ২।৩ খানা বহি দেখিয়া ও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলাম না।

আমরা উহার অন্বয় ও অর্থ যেরূপ হওয়া সঙ্গত মনে করিয়াছি তাহা পরে দেওয়া হইল। আমরা যে দুইখানা বহির অনুবাদ পাঠ করিয়াছি তাহার এক খানার অনুবাদ এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"নাভি হইতে ১২ অঙ্গুলি উর্দ্ধে ও কণ্ঠ দেশ হইতে ৬ অঙ্গুলি নিম্নে এই দুইয়ের মধ্যে যে স্থান টুকু অবশিষ্ট থাকে তাহাকে উরঃ স্থল বলে, এই উরঃস্থলই রক্তাশয়। উরস্থল ও কণ্ঠ দেশের মধ্যগত স্থানকে হৃদয় বলে। রক্তাশয়ের নিম্নে (সুতরাং উরঃস্থলের নিম্নে) শ্লেষ্মাশয়, শ্লেষ্মাশয়ের নিম্নে আমাশয়, এবং আমাশয়ের নিম্নে অগ্ন্যাশয়।

কিন্তু শ্লোকের অন্বয় গ্রন্থে নাই, সুতরাং আমরা এই অর্থের সঙ্গতি বুঝিতে পারি নাই। আপনাদের পাঠকের মধ্যে আয়ুর্ব্বেদের ও অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থের বহু পণ্ডিত আছেন, আপনারাও প্রধান পণ্ডিত। ঐ অর্থ সম্বন্ধে আমরা কোন কথা বলিতে অক্ষম।

আমাদের কৃত অন্বয়, অনুবাদ ও অর্থ নিম্নে দেওয়া গেল।

অন্বয়—"নার্ভের্বিতস্তি মাত্রং (পরিত্যজ্য) কণ্ঠদেশাচ্চ ষড়ঙ্গুলং (পরিত্যজ্য) উরসঃ শেষে তু যৎ (স্থলং) তৎ হৃদয়ং বিজানীয়াদিতি মতং"

তন্নিম্নে "উরোরক্তাশয়" বলিয়া যে শ্লোক, ঐ শ্লোকের "উরোরক্তাশয়ঃ" এই টুকুর সহিত আমরা ঐক্য হইতে পারি নাই, ঐ স্থলে 'উরঃ ই রক্তাশয়" অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মতে উরসি (উরঃদেশে=বক্ষঃস্থলে) রক্তাশয়ঃ, তন্নিম্নে, শ্লেষ্মাশয়, তন্নিম্নে আমাশয়, এবং আমাশয়ের নিম্নে অগ্ন্যাশয় বা গ্রহণী।

বিষয়টা এই—প্রত্যেক ব্যক্তির উচ্চতা বা দৈর্ঘ্য যেমন তাহার আপন হাতের ৩।০ সার্দ্ধ তিন হাত পরিমিত, তেমনই প্রত্যেক ব্যক্তির নাভি হইতে কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত স্থানের পরিমাণ ও ২২ দ্বাবিংশ অঙ্গুলি।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের অর্থ আমরা যেরূপ বুঝিয়াছি তাহা নিম্নে লেখা গেল। আমাদের কৃত অর্থ সমীচীন কিনা বিজ্ঞ পাঠক মহাশয়গণ বলিতে পারেন।

অর্থ—নাভি হইতে (সোজাভাবে) উর্দ্ধে বিতস্তি (১২ আঙ্গুল) এবং কণ্ঠদেশ হইতে (সোজাভাবে) ৬ অঙ্গুলী মোট আঠার ১৮ অঙ্গুলির শেষ (অবশিষ্ট) অর্থাৎ বাদ যাইয়া উরঃদেশের (বক্ষের) যতটুকু বাকি থাকে তাহাই হৃদয় (হৃদয়ের পরিমাণ) আমরা এইমাত্র বলিলাম নাভি হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত স্থানের পরিমাণ ২২শ অঙ্গুলি, তাহা হইতে উপরোক্ত ১৮ অঙ্গুলি বাদ দিলে ২২ আঙ্গুলের বাকী থাকে ৪ অঙ্গুলি এখন যদি আয়ুর্ব্বেদোক্ত হৃদয়টার পরিমাণ ও চারি অঙ্গুলি হয় তবে বোধ হয় আমাদের কৃত অর্থে কাহারও আপত্তি হইবে না।

উপরোক্ত শ্লোকে "উরোরক্তাশয়স্তস্মাদধঃ শ্লেষ্মাশয়ঃ স্মৃতঃ। আমাশয়স্তু-তদধঃ" বলায়

পক্ষ বলেন যে—শ্লেষ্মাশয়ের নিম্নে আমাশয় বলায় উহাদের উভয়ের মধ্যে হৃদয় নামক একটা অবয়ব থাকা সাব্যস্ত হইতেছে না, বরং না থাকাই সাব্যস্ত হইতেছে।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে –

গ্রন্থকার গ্রন্থের সুশৃঙ্খলা রক্ষানুরোধেই হৃদয়ের নাম উল্লেখ করেন নাই। আশয়োপক্রমে এখানে আশয়ের কথাই বলিয়াছেন। হৃদয়কে আশয় মধ্যে পরিগণিত করিয়া এখানে তাহার অনুল্লেখে অবশ্যই কিছু দোষও ঘটিত এবং উক্তরূপ সন্দেহের ও কিছু কারণ হইত।

শারীর স্থানে প্রত্যেক অঙ্গের জাতি বিভাগ ক্রমে এক জাতীয় অঙ্গের পর আর এক জাতীয় অঙ্গের বিষয় লিখিত হইয়াছে। হৃদয় মর্ম্ম জাতীয়, তাহা একটুকু পরেই বিবৃত হইবে।

হৃদয়ের জাতি ও স্থান নির্ণয় করার পূর্ব্বে মর্ম্ম কাহাকে বলে তাহাই অগ্রে নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য।

মর্ম্মের সংজ্ঞা :—

"সন্নিপাতঃ শিরাস্নায়ুসন্ধিমাংসাস্থিসম্ভবঃ"
'মর্ম্মাণি তেষু তিষ্ঠন্তি প্রাণাঃ খলু বিশেষতঃ"

অর্থাৎ শিরাস্নায়ু মাংস প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পদার্থের একাধিক বস্তুর একত্র সম্মিলন স্থানকেই মর্ম্ম বলে। যথা দুই বা তিনটী শিরার মিলন স্থানকে সিরা মর্ম্ম; দুই তিন মাংসপেশীর মিলন স্থান মাংস মর্ম্ম ইত্যাদি।

বিভিন্ন জাতীয় মর্ম্ম সমষ্টির সংখ্যা একশত সাত (১০৭) নির্দ্দেশ করতঃ পুনঃ সন্ত মারক প্রভৃতি শাখা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। হৃদয় এই সন্ত মারক ১৯টী মর্ম্মের প্রধান। আবার ১০৭টী মর্ম্মের মধ্যে যে তিনটীকে প্রধান বলিয়াছেন তন্মধ্যে ও হৃদয় প্রধান। সুতরাং মানব দেহে হৃদয় প্রধান মর্ম্ম তাহার আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

হৃদয়ের (হৃন্মর্ম্মের) স্থান ও জাতি। ভাবপ্রকাশ ঐ খণ্ড। ৯৬ পৃষ্ঠা।

"স্তনয়োর্ম্মধ্য মামাশয়দ্বার মেকং সিরামর্ম্ম চতুরঙ্গুলং সদ্যোমারকং হৃদয়ং"

অর্থ—স্তনদ্বয়ের মধ্যে (বক্ষের ঠিক মধ্যস্থলে) আমাশয়দ্বার পর্য্যন্ত চারি অঙ্গুলি প্রমাণ যে একটি সিরামর্ম্ম আছে তাহাই হৃদয় হৃৎ বা হৃন্মর্ম্ম।

এই শ্লোকে হৃদয়ের স্থান, জাতি ও পরিমাণ নির্ণীত হইল। আর পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে হৃদয়ের অনুল্লেখ জন্য, আপত্তি ও নিরস্ত হইল। এবং স্পষ্টই বুঝা গেল যে ক্রমভঙ্গ দোষে দোষী না হইতে হয় এই মনে করিয়াই ঐ স্থলে হৃদয়ের নামোল্লেখ ও করা হয় নাই। এই শ্লোকের দ্বারা ইহাও দেখাগেল যে রক্তাশয়ের (Heart) সহিত, হৃদয়ের জাতি গত বা স্থান গতও কোন সম্বন্ধ নাই, গুণগত ক্রিয়াগত অনৈক্য বিষয়ে পূর্ব্বেই বিশদরূপে দেখান হইয়াছে। এখন আমাদের ১৯ সংখ্যক শ্লোক হইতে আমরা দেখিতে পাইলাম, যে হৃদয় সিরামর্ম্ম এবং ইহার পরিমাণ চারি অঙ্গুলী এবং নাভের্বিতস্তি মাত্রঞ্চ শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে দেখিয়াছি উরঃ বক্ষস্থলের ১৮ অঙ্গুলীর পর চারি অঙ্গুলী বাকী ছিল, হৃদয়ের পরিমাণও চারি অঙ্গুলী স্থির হইল। সুতরাং আমরা যে যে বিষয়ের আলোচনা দ্বারা হার্ট ও হৃদয়ের তর্ক মীমাংসা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াছিলাম, তাহার আলোচনায় আমরা কিছুতেই "হার্ট' ও হৃদয় একই বস্তু এরূপ সিদ্ধান্তে আস্থা স্থাপনের কোন কারণ পাইলাম না।

বাতব্যাধি নিদানে কোষ্ঠ নিরূপণে লিখিত হইয়াছে :—

"স্থানান্যামাগ্নিপক্কানাং মূত্রস্য রুধিরস্যচ।
হৃদুণ্ডুকঃ ফুপ্‌ফুসশ্চ কোষ্ঠ ইত্যভিধীয়তে॥"

অর্থ :—আমস্থান (আমাশয়) অগ্ন্যাশয় (গ্রহণী) পক্কাশয়, মূত্রাশয়, রুধিরাশয় (Heart) হৃদয় (অর্থাৎ হৃন্মর্ম্ম, উণ্ডুক ; যকৃতের অধোদেশস্থ যন্ত্র) ফুপ্‌ফুস" ইহাদিগকে কোষ্ঠ বলে।

এই শ্লোকে রুধির কোষ্ঠ রক্তাশয় লিখিয়া পরে হৃদয় লিখিয়াছেন, ইহাতেও কি বুঝিতে বাকি থাকিল যে, রক্তাশয় ও হৃদয় এই দুইটা স্বতন্ত্র পদার্থ। কেহ কেহ বা এই স্থলে এরূপ তর্ক ও উপস্থিত করেন যে এস্থলে রুধিরাশয় শব্দটা যকৃৎ প্লীহারই বোধক। আমরাও যকৃৎ প্লীহাকে রক্ত স্থান বলিতে আপত্তি করি না। কিন্তু স্থান, ও আশয় বা কোষ বা কোষ্ঠ এক বস্তু নয়। যেমন রস সর্ব্বস্থানে থাকিলে ও হৃদয়ই রসের মুখ্য স্থান বা আশয়, তেমন রক্ত স্থান অনেক থাকিলে ও সকল স্থানই রক্ত কোষ্ঠ বা রক্তাধার বলিয়া কোন গ্রন্থে ও উল্লিখিত নাই। এই রক্তাধার বা রক্তাশয়কে কোষ্ঠ বা আশয় শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। প্লীহা যকৃৎকে রক্ত স্থান মাত্র বলিয়াছেন। এই স্থানে যে গুলি কোষ্ঠ শ্রেণীতে পরিগণিত তাহাদের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন।

অপিচ রক্তাশয়ের স্থান বক্ষেই (১৭শ শ্লোকে) বলা হইয়াছে। আর প্লীহা যকৃৎ উভয়ই বক্ষঃ প্রাচীরের নিম্নে অবস্থিত সুতরাং এই আপত্তি আমার সঙ্গত বলিয়া মনে করিনা এখন সহৃদয় পাঠক মহাশয়গণের উপর বিচার ভার রহিল।

আর ও একটু বিবেচনা করিয়া দেখুন, উক্ত বাতব্যাধি প্রকরণে, অন্যান্য আশয় (কোষ্ঠ) গত ব্যাধির উল্লেখ করা হইয়াছে কিন্তু যকৃৎ প্লীহার নাম ও উল্লেখ করা হয় নাই। এই স্থলের রুধির স্থান শব্দ যকৃৎ বা প্লীহার বোধক হইলে বাতব্যাধি রোগ মধ্যে ঐ দুই রোগের ও নিদানাদি লেখা হইত। এবং "রুক্ষ-শীতাল্প-লঘ্বন্ন" বলিয়া বাতব্যাধির যে নিদান লিখিত হইয়াছে, তাহারই কোন না কোনটা যকৃৎ প্লীহার নিদান হইত, কিন্তু কোন ও নিদানেই ত তাহা দেখা যায় না। যকৃৎ প্লীহার নিদান ও চিকিৎসা স্বতন্ত্র সুতরাং এখানে রুধির স্থান শব্দে যকৃৎ বা প্লীহাকে কিছুতেই বুঝাইতে পারেনা এখানে রক্ত কোষ্ঠ শব্দ যে রক্তাশয়ের হার্টেরই বোধক এবিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ করা যায় না।

"বাতিক হৃদ্‌রোগে হৃদ্‌রোগীকে স্নিগ্ধ করতঃ দ্বিপঞ্চমূলী ক্বাথ ও লবণ দ্বারা বমন করাইবে। এইরূপে পিত্তজে গাম্ভার যষ্টিমধুক্বাথ দ্বারা, এবং কফজে বচ ও নিম্বাদির ক্বাথ দ্বারা বমন করাইয়া হৃদয় শোধন করাইবে। আর ক্রিমিজ হৃদ্‌রোগে ক্রিমিগুলিকে উৎক্লেশিত করতঃ ক্রিমি নাশক যোগ ব্যবহারে ক্রিমি নিঃসারিত করিবে।"

উপরোক্ত চিকিৎসা প্রণালী পাঠে অনায়াসেই বুঝা যায় যে "হৃদ্‌রোগে বমন দ্বারা হৃদি শোধন করা সর্ব্বাদৌ আবশ্যক"।

হৃদ্‌রোগটা যদি রক্তাশয় গত পীড়া (Heart Disease) হইত তাহা হইলে অদ্যাপি ও যে ধন্বন্তরির নামে আর্য্যগণ ঔষধের জীবন্যাস করেন, রোগী যাহার নাম স্মরণ করিয়া ঔষধ সেবন করেন, এবং যাহার স্মরণে ও রোগ দূর হয় বলিয়া বিশ্বাস করেন,

সেই ধন্বন্তরি কি ভ্রান্তি বশে রক্তাশয় গত রোগে বমন দ্বারা রক্তাশয় পরিষ্কার করার ব্যবস্থা দিতেন। বাস্তবিক হৃদয়টাকে রক্তাশয় বলার এবং রক্তাশয়িক পীড়ায় হৃদ্‌রোগোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করার কারণ আমরা কিছুই খুজিয়া পাই না।

হৃদ্‌রোগ যে হৃন্মর্ম্মেরই রোগ, তাহার নামেই প্রকাশিত আছে। তবু যে রক্তাশয়টাকে হৃদয় বলিতে যাইয়া আয়ুর্ব্বেদের হৃদয়ে কুঠারাঘাত করিতে অনেক শিক্ষিত লোক ও অত্যন্ত উৎসাহী কেন বুঝিতেছিনা। রক্তাশয়টাকে হৃদয় নাম দিলে আয়ুর্ব্বেদটার যেন একটা গৌরব বৃদ্ধি পায়, আয়ুর্ব্বেদের দেহটা যেন সুসংস্কৃত হয়।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের যে স্থানেই এই হৃদয় শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সে স্থানেই সাক্ষাত বা গৌণ ভাবে এই হৃন্মর্ম্মের সহিতই সংশ্লিষ্ট দেখা যায়। দিগ্ দর্শন স্বরূপ আমরা দুই একটী রোগের বিষয় উল্লেখ করিয়া আমাদের উক্তির সমর্থন করিব। বাহুল্য বলিয়া আর বেশী স্থলের উল্লেখ করিলাম না।

মাধব নিদান উন্মাদ রোগের নিরুক্তি ১৩১ পৃষ্ঠাঃ—

"মদয়ন্ত্যুদ্‌গতা দোষা যস্মাদুন্মার্গ মাগতা।
মানসোয়মত ব্যাধি রুন্মাদ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥

"উদ্‌গতাঃ—ঊর্দ্ধং হৃদয়ং গতা (ব্যাখ্যা মধুকোষ)।

অর্থঃ—যে রোগে প্রবৃদ্ধ, বিমার্গগত দোষ (বায়ু, পিত্ত, কফ) মনোবহাধমনীতে (সুশ্রুত মতে সংখ্যা ২৪) প্রবেশ করতঃ মনের মোহ (ভ্রান্তি) জন্মায় সেই মানস ব্যাধির নাম "উন্মাদ"। উন্মাদের সামান্য সম্প্রাপ্তি। ১৩২ পৃষ্ঠা।

"তৈরল্পসত্ত্বস্য মলাঃ প্রদুষ্টা বুদ্ধে র্নিবাসং হৃদয়ং প্রদূষ্য স্রোতাংস্যধিষ্ঠায় মনোবহানি প্রমোহয়ন্ত্যাশু নরস্য চেতঃ"।

টীকাঃ—বুদ্ধের্নিবাসং হৃদয়ং ইত্যনেন হৃদয়স্যাশ্রয়স্য দুষ্ট্যা তদাশ্রিতস্য জ্ঞানস্যাপি দুষ্টি ভবতি।

অর্থঃ—পূর্ব্বোক্ত কারণে অল্প সত্ত্ব গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তির দোষ সমূহ মনোবহা ধমনী সমূহে (সংখ্যা ২৪) প্রবেশ করতঃ মনুষ্যের চিত্ত বিকৃতি উৎপাদন করে। ইত্যাদি। হৃদয় অধিকার করিয়া উন্মাদ রোগ জন্মে; হৃদয় মন ও বুদ্ধির স্থান। জ্ঞানবহা নাড়ী (ধমনী) ইহাকেই অবলম্বন করিয়া শরীরের সর্ব্বত্র জ্ঞানের প্রভাব (কার্য্য) বিস্তার করে। এতগুলি বিষয় উপেক্ষা করিয়া ও হৃদয়কে রক্তাশয় (হার্ট) বলা শোভা পায় কি না সুধী পাঠকবৃন্দ বিচার করিয়া দেখিবেন।

কোনও কোনও বিতণ্ডাবাদী বলেন হৃন্মর্ম নামে কোনও একটা অবয়ব বিশেষ থাকিলে ও থাকিতে পারে কিন্তু আয়ুর্ব্বেদে যে হৃদ্‌রোগের নিদান ও চিকিৎসা লিখিত হইয়াছে তাহা ঐ মর্ম্মের পীড়া এবং চিকিৎসা নহে, তাহাদের কথিত হৃদয়ের অর্থাৎ হার্টেরই চিকিৎসা। তাহাদের এই উক্তি কত দূর সঙ্গত এস্থানে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

নিদানে হৃদ্‌রোগের সম্প্রাপ্তিঃ—

"দূষয়িত্বা রসং দোষা বিগুণা হৃদয়ং গতাঃ
হৃদি বাধাং প্রকুর্ব্বন্তি হৃদ্‌রোগং তং প্রচক্ষতে'

অর্থঃ—বিগুণ দোষ (বায়ু, পিত্ত, কফ) হৃদয়ে গমন করতঃ রসকে দূষিত করিয়া হৃদ্-

পীড়া জন্মায়। কিন্তু রক্তকে ত দূষিত করে না! হৃদয়টা রস ও রক্ত উভয়ের স্থান হইলে রক্তের সহিত দোষের কি কুটুম্বিতা যে তাহাকে দূষিত করে না। তাহার যত আক্রোশ কি কেবল রস বেচারীরই উপর।

ক্রিমি জন্য হৃদ্‌রোগে লিখিত হইয়াছে:—

"......গ্রন্থি স্তস্তোপ জায়তে

মর্ম্মৈক-দেশে সংক্লেদং রসশ্চাপ্যুপ গচ্ছতি
সংক্লেদাৎ ক্রিময়শ্চাস্য পতন্ত্যাপহতাত্মনঃ"

উপরোক্ত ক্রিমি জন্য হৃদ্‌রোগে স্পষ্টাক্ষরে "মর্ম্মৈক-দেশে" পদ দেখিয়া যাহারা বলিতে পারেন হৃন্মর্ম্ম নামে কোন মর্ম্ম থাকিলেও আয়ুর্ব্বেদোক্ত হৃদ্‌রোগ ঐ মর্ম্মের পীড়া নয়, হার্টেরই পীড়া তাহাদিগকে কোন কথা বলার অধিকার ত আমাদের নাই। এই মাত্র বলিতে পারি যে আয়ুর্ব্বেদোক্ত হৃদ্‌রোগ যে এই মর্ম্মেরই রোগ তৎবিষয়ে অনুমাত্র ও সন্দেহ থাকিতে পারে না। কারণ টীকাকার পরিষ্কারই বলেন যে মর্ম্মশব্দ এস্থলে হৃন্মর্ম্মেরই বোধক। তবে টীকাকারের ভাষ্য যদি তাহারা না মানেন, তাহাদিগকে মানাইবার ক্ষমতা আমাদের নাই।

নিবেদন এই সব ভাবে প্রবন্ধে সমস্তটী দিতে পারিলাম না। যে পর্য্যন্ত দেওয়া হইল, তাহা প্রকাশিত হইলে অবশিষ্টাংশ পাবে পাঠাইব ইতি।

শ্রীরাজকুমার দাশ গুপ্ত।

খাদ্য নির্ব্বাচন ও সংস্কার।

কলিতে অন্নই জীবের প্রাণ। অন্ন ব্যতীত কোন জীব স্বল্পকালও জীবিত থাকিতে পারে না। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া আমরা অন্নের জন্য মুখ ব্যাদান করি, আর অন্তর্জলির শেষ মুখব্যাদনে সে অন্নাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়।

কলির জীব অন্নগত প্রাণ, অন্নের অভাব ঘটিলেই আমরা পৃথিবী অন্ধকারময় দেখি। এটা প্রাকৃতিক সত্য। কিন্তু অন্নের সদ্ভাবেও অনেক সময় আমাদের অন্ধকার দেখিতে হয়। ইহা একেবারেই প্রাকৃতিক নহে, সম্পূর্ণরূপে আমাদের চেষ্টায়ত্ত সেই কথা বলিব বলিয়াই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

খাদ্যের সদ্ভাবেও আমরা পৃথিবী অন্ধকার ময় দেখি কেন? খাদ্য নির্ব্বাচন এবং খাদ্য সংস্কারে জ্ঞানের অভাব বা অমনোযোগিতাই ইহার কারণ। পূর্ব্বে সুখাদ্য স্বল্পমূল্য এবং অনায়াস লভ্য ছিল। কিন্তু এক্ষণে সুখাদ্য নিতান্ত দুর্ল্লভ এবং বহুব্যয় সাপেক্ষ। বাজারে খাদ্য বলিয়া যাহা বিক্রীত হয়, তাহা অনেক সময় অখাদ্য অথচ দুর্ম্মূল্য। এই ঘোরতর জীবন সংগ্রামের দিনে অনেকেরই আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক। মাতৃদায়, পিতৃদায়, কন্যাদায়, পুত্র কন্যার শিক্ষার ব্যয় এ সকল ত আছেই,তাহার উপর কতকগুলি অনাবশ্যক দায় আমরা সৃষ্টি করিয়া লইয়াছি। চা, চুরুট, উত্তম সাজসজ্জা প্রভৃতি এই দায়ের মধ্যে পরিগণিত। কলিকাতা সহরে ভাড়া গাড়ীর সহিস কোচম্যানও দিনের মধ্যে পাঁচ ছয় বা ততোধিক পয়সার পান বিড়ি চা কিনিয়া খায়, কিন্তু দুই পয়সার দুধ ঘি তাহাদের পেটে

পড়ে না। অনেক দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরও এই অবস্থা। বাজে খরচ চালাইবার জন্য বাজার খরচ কমাইতে হয়। কাজেই খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিবার সময় দ্রব্যের উৎকর্ষ অপেক্ষা পরিমাণের উৎকর্ষের দিকে অধিক লক্ষ্য রাখিতে হয়। ফলে হয় এই যে, তাঁহারা খাদ্য মনে করিয়া অখাদ্য আহার করনে এবং রোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন। বঙ্গ দেশে যে অকালমৃত্যু হয় তাহার বিবিধ কারণ আছে। তন্মধ্যে খাদ্য নির্ব্বাচনে অমনোযোগ একটী প্রধান কারণ। আমাদের বিশ্বাস জনসাধারণ খাদ্য নির্ব্বাচন সম্বন্ধে যদি একটু সতর্কতা অবলম্বন করেন তাহা হইলে বঙ্গে রোগ ও অকাল মৃত্যুর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম হয়, এবং ভবিষ্যতে ডাক্তার কবিরাজ এবং ঔষধ পথ্যের ব্যয়ের জন্য ঋণভার গ্রস্ত হইতে হয় না।

এক্ষণে খাদ্য নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কিরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। কিন্তু খাদ্য বহুবিধ এবং ভেজাল দেওয়া এমন চাতুর্য্যের সহিত চলিতেছে যে সে সবগুলি নির্দ্দেশ করা সম্ভবপর নহে, ইহা পাঠক স্মরণ রাখিবেন।

ঘৃত—ঘৃতের ন্যায় পবিত্র উৎকৃষ্ট এবং পুষ্টিকর দ্রব্য আর নাই। নৈবেদ্যে ঘৃতের ছিটা না দিলে দেবতারা তাহা গ্রহণ করেন না চাণক্যনীতিতে আছে যে, ঘৃতহীন ভোজন কিছুই নয়। চার্ব্বাক ঋণ করিয়াও ঘৃত খাইতে উপদেশ দিয়াছেন। এখনও বাঙ্গালার অধিকাংশ লোক বেশী না হউক অন্ততঃ তরকারীর সহিত এক আধ ফোটা ঘৃত উদরস্থ করিয়া থাকেন।

ঘৃত পূর্ব্বে সুলভ এবং অকৃত্রিম ছিল। এক্ষণে দুর্ম্মূল্য ও কৃত্রিম। বিশুদ্ধ ঘৃত পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। প্রায়শঃ বাদাম তৈল প্রভৃতি ভেজাল দেওয়া হয়। কিন্তু তত্রাচ বাজারে নানাপ্রকার দরে ঘৃত পাওয়া যায়। যাহা যত স্বল্প মূল্য তাহা ততই নিকৃষ্ট এবং ভেজালে পূর্ণ। এরূপ ক্ষেত্রে যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহাই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। সস্তার ঘৃত দুই পয়সার কিনিয়া কতকটা বাদাম তৈল খাইয়া রোগগ্রস্ত হওয়া অপেক্ষা এক পয়সার উত্তম ঘৃত খাইয়া সুস্থ এবং নীরোগ থাকাই ভাল।

তৈল—তৈল দুই প্রকার পাওয়া যায়। এক প্রকার কলের, আর এক প্রকার ঘানির। ঘানির তৈলে সামান্য ভেজাল থাকিতে পারে কিন্তু কলের তৈলে মারাত্মক ভাবে ভেজাল দেওয়া হয়। পাঠক দুইটী কাচ পাত্রে কলের তৈল এবং ঘানির তৈল রাখিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, উহা মনুষ্যের আহারের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। এরূপ ক্ষেত্রে তিন পয়সার কলের তৈল ব্যবহার করা অপেক্ষা দুই পয়সার ঘানির তৈল ব্যবহার করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

মৎস্য—যাঁহারা কখন কলিকাতার বাজারে গিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে বাজারে নানাপ্রকার মৎস্য বিক্রয় হয়। কতক জীবিত, কতক মৃত, কতক টাট্‌কা, কতক রসা, কতক পচা। চিংড়ি মাছ পচিয়া লাল হইয়া গিয়াছে অথচ তাহাই অনেক ভদ্র লোককে কিনিয়া লইয়া যাইতে দেখিয়াছি। তাঁহারা সস্তা ভাবিয়া কিনিয়া লইয়া যান বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদের টাট্‌কা মাছ অপেক্ষাও অনেক বেশী পড়ে। কেননা পচা মাছ খাইয়া যে রোগ হয় তাহার খরচও মাছের দামের

সঙ্গে ধরা উচিত। এরূপ ক্ষেত্রে শেষে অনেক বেশী দাম দেওয়া এবং রোগ ভোগ করা অপেক্ষা প্রথমে কিছু বেশী মূল্য দিয়া মৎস্য ক্রয় করা লাভ জনক। অপিচ, দুই খানি সস্তার পচা মাছের লোভ সংবরণ করিয়া একখানি টাট্‌কা মাছ খাইলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং রোগাক্রান্ত হইবার ভয় কম্ হয়।

তরকারী—টাটকা এবং বাসি শাকসবজী যাঁহারা পৃথক ভাবে আহার করিবার সুযোগ পাইয়াছেন তাঁহারাই জানেন যে উভয়ের আস্বাদনের প্রভেদ ও যেমন, শরীরের পক্ষে উপযোগিতার প্রভেদ ও সেইরূপ। শাক এবং লাউ বেগুণ প্রভৃতি তরকারী যত টাটকা পাওয়া যায়, দেখিয়া ক্রয় করা উচিত। একেত কলিকাতায় কিছুই টাট্‌কা পাওয়া যায় না, তাহার উপর সস্তার লোভে যদি বহুদিনের বাসী তরকারী কিনিয়া খাওয়া যায়, তবে তাহা যে স্বাস্থ্যের পক্ষে অন্তরায় হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি। পশ্চিম দেশ হইতে এক প্রকার ফুলকপি এই সময়ে কলিকাতায় আমদানী হয় তাহা এমন শুষ্ক ও বিবর্ণ যে কপি বলিয়া চিনিয়া লওয়া দুষ্কর। এরূপ দ্রব্য আহার করা যে রোগোৎপত্তির কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। শাক সবজী এবং তরি তরকারী কচি, টাট্‌কা কোমল এবং পোকা লাগা নহে, এরূপ দেখিয়া ক্রয় করা উচিত। কেবল কন্দশাক—যেমন আলু এবং কুমড়া প্রভৃতি কচি ভাল নহে পাকাই ভাল।

দুগ্ধ—শাস্ত্রে দুগ্ধ বিবিধ রোগ নাশক, আয়ুর্ব্বর্দ্ধক, জীবনীশক্তিবর্দ্ধক প্রভৃতি বিবিধ গুণ সম্পন্ন বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু কলিকাতা মহানগরের প্রভাব বশতঃ দুগ্ধের বা দুগ্ধবৎ পদার্থের গুণ ঠিক ইহার বিপরীত দাঁড়াইয়াছে, অর্থাৎ দুগ্ধ বিবিধ রোগ উৎপাদক পরমায়ু হ্রাস কারক, জীবনীশক্তি নাশক ইত্যাদি। কেবল সহর বলিয়া নহে, পল্লিগ্রামেও দুগ্ধের অভাব এবং গো জাতির অপকর্ষ বশতঃ দুগ্ধেরও অপকর্ষ ঘটিয়াছে। অস্থিসার জীর্ণশীর্ণ রুগ্না গাভীর শরীর হইতে উত্তম পুষ্টিকর দুগ্ধ পাওয়া সম্ভব পর নহে। কলিকাতায় আবার অধিকাংশ গাভীর বৎস মরিয়া যায়, বা কষাই দিগের নিকট বিক্রীত হয়। এ সম্বন্ধে প্রতিকারের উপায় রাজপুরুষদিগের হস্তে। পরে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। এক্ষণে বর্ত্তমান অবস্থায় উত্তম দুগ্ধ সংগ্রহের জন্য আমাদের কর্ত্তব্য কি? প্রথম কর্ত্তব্য যাহাদিগের পক্ষে সম্ভব গো পালন করা। দ্বিতীয় কর্ত্তব্য চেষ্টা পূর্ব্বক সুবৎসা এবং সুপালিতা গাভীর দুগ্ধ সংগ্রহ করা। অন্ততঃ শিশুদিগের জন্য এই উপায় অবলম্বন করা সর্ব্বোতোভাবে কর্ত্তব্য। তৃতীয় কর্ত্তব্য সুলভে টাকায় ছয় সের বা আট সের দরে জল বহুল দুগ্ধ ক্রয় না করিয়া উচিত মূল্যে খাটি দুগ্ধ ক্রয় করা।

দোকানে প্রস্তুত খাদ্য—দোকানদারেরা লাভ করিবার জন্য ব্যবসা করিয়া থাকে। সুতরাং খাদ্য প্রস্তুতের উপকরণ ঘৃত ময়দা, চিনি প্রভৃতি তাহারা যে সুলভ মূল্যে ক্রয় করিয়া আনে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। একেত সুলভ মূল্যের ঐ সকল দ্রব্যে যথেষ্ট ভেজাল থাকে, তাহার উপর দোকানে প্রস্তুতের সময় ও প্রস্তুত হইবার পর আরও কিছু অনিষ্টকর দ্রব্য তাহার সহিত সংযুক্ত হয়—যথা, পথের ধূলা, দোকানীর হাতের ময়লা, কদাচিৎ দেহের ঘর্ম্ম, কদাচিৎ মুখামৃত, আর

মাছি, আরসোলা প্রভৃতি জীববাহিত রোগ-বীজ। এহেন উপাদেয় খাদ্য আমরা ক্রয় করিয়া আহার করিয়া থাকি, সুতরাং রোগ না হইবে কেন?

অনেকে বলিতে পারেন যে কলিকাতায় এবং অন্যান্য সহরে সহস্র সহস্র খাবারের দোকান আছে, এবং লক্ষ লক্ষ লোক সেই সকল দোকান হইতে খাবার কিনিয়া খাইতেছে। যদি দোকানের খাবার কিনিয়া খাইলে রোগ হইতে তবে দেশে আর নীরোগ লোক থাকিত না। প্রকৃত কথাও তাই। যে সকল লোক বাজারের খাবার কিনিয়া খায় তাহাদের মধ্যে নীরোগ নাই বলিলেই চলে। অজীর্ণ, অম্লপিত্ত, শূল, উদরাময় ইহার একটা না একটা আছেই আছে। ১০০।১৫০ শত বৎসর পূর্ব্বে দেশে এত খাবারের দোকান ছিলনা, লোকে প্রচুর মৎস্য ও ভাল দুগ্ধ ঘৃত খাইতে পাইত। সেই সময়ের লোকের স্বাস্থ্য জীবনীশক্তি ও পরমায়ু যেরূপ ছিল এখনকার লোকের তাহা অপেক্ষা অনেক ন্যূনতা ঘটিয়াছে। অকাল মৃত্যু ও রোগ গৃহে গৃহে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে, আমাদের ক্ষমতা থাকিতেও আমরা প্রতিকার করি না।

মাংসের হোটেল আজকাল প্রতি গলিতে বহু সংখ্যায় বিদ্যমান, আর অনেক লোক বিশেষতঃ যুবক সম্প্রদায় সেই সকল হোটেলের প্রস্তুত মাংস উপাদেয় বোধে আহার করিয়া থাকেন। দোকানের খাবার অপেক্ষা এই সকল হোটেলের প্রস্তুত মাংস এবং মাংসজাত খাদ্য আরও জঘন্য। পূর্ব্বদিনের পচা বাসী মাংস যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে, সেগুলিকে হোটেল ওয়ালারা নূতন প্রস্তুত মাংসাদির সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া দেয়। যথেষ্ট ঝাল মসলার সংযোগ থাকে বলিয়া আস্বাদন দ্বারা ধারা যায় না। বাসী লুচি, কচুরি অপেক্ষা বাসী মাংস অধিকতর অনিষ্টকর। অবশ্য যেদিন হোটেলের মাংস খাওয়া যায় তাহার পরদিনই রোগ জন্মে না; আজ বীজ বপন করিলে কাল কি তাহাতে ফল ফলে? কিন্তু ঐ সকল খাদ্য আহারের পরিণামে ভবিষ্যতে শরীর রোগগ্রস্ত হওয়া অনিবার্য্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ক্ষমতা থাকিতেও আমরা তাহার প্রতিকার করিব না। যদি আমরা দোকানের খাবার খাওয়া পরিত্যাগ করি, বালক বালিকাদিগকে খাইতে না দিই তাহা হইলে অনায়াসেই ইহার প্রতিকার হইতে পারে। কথাটা শুনিতে শক্ত, কিন্তু কাজে অত্যন্ত সহজ। ছেলেরা যাহা দেখে তাহাই শিখে, আমরা যদি দোকানের খাবার না খাই এবং দোকানের খাবারের অনিষ্টকারিতা তাহাদের বুঝাইয়া দিই, তাহা হইলে ১০০।১৫০ বৎসরের মধ্যে যেমন অসংখ্য খাবারের দোকানের সৃষ্টি হইয়াছে, ১০০।১৫০ বৎসর পরে আবার তাহারা বিলুপ্ত হইবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু বলিতেন যেদিন স্কুলের ছেলেরা দোকানের খাবার ছাড়িয়া মুড়ি নারিকেল খাইতে শিখিবে সেইদিন বুঝিবে যে বাঙ্গালার উন্নতির দিন আসিয়াছে। অতি মূল্যবান উপদেশ, কিন্তু দেশের লোকে তাহা বুঝিল কৈ, উপদেশ গ্রহণ করিল কৈ? কিন্তু তাহা বলিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না, দেশবাসীকে বুঝাইতে হইবে। তুমি পিতা, পুত্র কন্যার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের চেষ্টা করা তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তবে

তুমি জানিয়া শুনিয়া কি বলিয়া ভবিষ্যতে রোগোৎপাদক এই সকল খাদ্য তাহাদের হাতে তুলিয়া দিতেছ? তুমি যে খাদ্য বলিয়া খাদ্যরূপী বিষ তুলিয়া দিতেছ তাহা তোমার জ্ঞান নাই? ইহাতে কি তোমার কর্ত্তব্য পালনের ত্রুটি হইতেছে না?

যাঁহাদের অবস্থায় কুলায় তাহাদের পক্ষে খাদ্যাদি ঘরে প্রস্তত করিয়া লওয়াই শ্রেয়ঃ। যাঁহাদের পক্ষে সেরূপ সুবিধা ঘটিবে না তাঁহাদের পক্ষে দোকানের খাবার না খাইয়া মুড়ি, নারিকেল, গুড়, ফল ইত্যাদি অবস্থানুসারে ক্রয় করিয়া খাওয়া ভাল। ইহাতে স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে এবং রোগ ভোগ হইতে অনেকটা অব্যাহতি পাওয়া যাইবে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে খাদ্য সম্বন্ধে প্রতিকারের উপায় রাজপুরুষদিগের হস্তে। এক্ষণে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

রাজা প্রজার রক্ষক, প্রজার পিতামাতা-স্বরূপ, রাজার অনুগ্রহ ব্যতীত প্রজার যে কোন অভাব যে কোন দুঃখ দূর হয় না। সুতরাং রাজার সাহায্য ব্যতীত আমাদের এই জীবন মরণ সমস্যা অন্ন সঙ্কটের প্রতিকারের উপায় কোথায়? পিতা মাতার সকল পুত্র সমান হয় না, কেহ কেহ দুরন্ত হয়, জোর করিয়া কাড়িয়া খায়। আবার কেহ কেহ শিষ্ট শান্ত হয়, না খাইতে পাইলেও জোর করিয়া কাড়িয়া খাইতে জানে না। কিন্তু তাই বলিয়া পিতা মাতা কি তাহাকে খাইতে না দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? আমরাও রাজার শিষ্ট শান্ত পুত্র বা প্রজা। তাঁহার দুরন্ত পুত্র ইংরাজ বা আইরিসদিগের ন্যায় জোর করিয়া কিছু চাহিতে জানি না। কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের দয়াল রাজা আমাদিগের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিবেন না, আমাদের দুঃখ দূর করিবেন না।

হে রাজ রাজেশ্বর! হে অখণ্ড মহিম-মণ্ডিত প্রজাবৎসল সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ! এই সুন্দর সাগরপারস্থিত ভারতভূমি হইতে আপনার ত্রিশকোটী প্রজা আপনার কৃপা ভিক্ষা করিতেছে। দুষ্ট ব্যবসায়ীরা অর্থলোভে কৃত্রিম খাদ্য প্রস্তত করিয়া আপনার এই বিশাল রাজ্যের প্রজাদিগের জীবন বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। ঐ সকল দুষ্ট ব্যবসায়ীদিগকে দণ্ডিত করিয়া আপনার পুত্র তুল্য প্রজাদিগকে রোগ ও অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা করুন।

স্থানীয় রাজপুরুষদিগের নিকট আমাদের প্রার্থনা যে তাহারা যেন এ সম্বন্ধে উদাসীন না থাকেন। যাহারা কৃত্রিম খাদ্য প্রস্তত করিয়া লোকের রোগ ও অকাল মৃত্যুর কারণ স্বরূপ হইয়া থাকে, তাহারা প্রত্যক্ষভাবে না হউক পরোক্ষভাবে নরহন্তা। সেইরূপ কঠিন দণ্ডই তাহাদিগের প্রতি প্রয়োগ করা উচিত। আমরা এ সম্বন্ধে আমাদের সদাশয় রাজ-প্রতিনিধি এবং প্রজাবৎসল গবর্ণর লর্ড কারমাইকেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

এ সম্বন্ধে আমাদের আরও একটু বক্তব্য আছে। লোকের স্বাস্থ্য যাহাতে ভাল হয়, দূষিত খাদ্য যাহাতে বিক্রীত হইতে না পারে তজ্জন্য রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত আছে। সময়ে সময়ে সংবাদ পত্রে দেখিতে পাই দূষিত ঘৃত বিক্রয়ের জন্য বিক্রেতার অর্থদণ্ড হইয়াছে। এইরূপ নিয়মই যদি থাকে আর দেশের লোকের অর্থে এইরূপ কর্ম্মচারীই যদি নিযুক্ত থাকে তবে এই ভেজাল খাদ্য পূর্ণ কলিকাতায় দুই চারিটি দোষীর দণ্ড হয় কেন? এ রহস্যের

বিষয় কেহ আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন কি ? কোন কোন দোকানে বিজ্ঞাপন দেখিতে পাই 'এখানে জল মিশ্রিত দুগ্ধ বিক্রয় হয়' 'এখানে ভেজাল ঘৃতে প্রস্তুত খাদ্য বিক্রয় হয়' 'এখানে বাজার চলন মিশ্রিত ঘৃত ও তৈল বিক্রয় হয়'। প্রকাশ্যভাবে এইরূপে ভেজাল খাদ্য ও খাদ্যের উপকরণ বিক্রয় করা শাসকদিগের কলঙ্কের পরিচায়ক নহে কি ?

এক্ষণে আমরা দ্রব্য সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করিব। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে সংস্কার দ্বারা লঘু দ্রব্যের গুরুত্ব এবং গুরু দ্রব্যের লঘুত্ব সম্পাদিত হইয়া থাকে। ধান্য হইতে খৈ এবং চিড়া প্রস্তুত হয়। খৈ কত লঘুপাক আর চিড়া কত গুরুপাক। আবার লঘুপাক খৈ ঘৃতাদি সংযুক্ত খৈচুররূপে পরিণত হইলে তাহা গুরুপাক হয়, আর চিঁড়ার মণ্ড প্রস্তুত করিলে তাহা লঘুপাক হইয়া থাকে। ফলতঃ সংস্কার দ্বারা খাদ্য দ্রব্যকে আমরা ইচ্ছামত লঘুপাক বা গুরুপাক করিয়া লইতে পারি।

চিকিৎসা কার্য্যে অভিজ্ঞতার ফলে আমরা জানিয়াছি যে, অধুনা বঙ্গদেশে বিশেষতঃ সহরে অজীর্ণ রোগের প্রাদুর্ভাব অত্যধিক। কোন কোন রোগীকে কুকারে রন্ধন করিয়া না খাওয়াইলে খাদ্য, জীর্ণ করিতে পারেন না। কালে কুকারে রাঁধিয়া খাওয়া রোগ যদি দেশব্যাপ্ত হইয়া পড়ে তাহা হইলে বড়ই বিড়ম্বনার বিষয়। সেই অনিষ্ট নিবারণের উদ্দেশ্যে আমরা খাদ্য সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

দ্রব্যের সংস্কার নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রকারে করা যাইতে পারে।

১। রন্ধন দ্বারা।

২। দ্রব্যান্তর সংযোগের দ্বারা

৩। ক্রিয়া বিশেষ দ্বারা

প্রত্যেকের বিষয় পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করা যাইতেছে।

১। রন্ধন—অগ্নি ও জল সংযোগে পাক করিলে সকল দ্রব্যই লঘুপাক হইয়া থাকে। কিন্তু রন্ধন কৌশলে ইহার বিশেষ তারতম্য ঘটে। বেগুন পোড়াইয়া খাইলে লঘুপাক। হয় কিন্তু ভাজিয়া খাইলে অপেক্ষাকৃত গুরুপাক হয়। দাল গুরুপাক কিন্তু দালের যূষ লঘুপাক সচরাচর লোকে যেরূপ দাল রন্ধন করিয়া খায় তাহা যূষ অপেক্ষা গুরুপাক। রন্ধনের তারতম্যে এক অন্নই নানাপ্রকার গুণযুক্ত হয়। পোরের ভাত মৃদু আগুণে পাক করা হয় বলিয়া বেশ সুসিদ্ধ হয়, সুতরাং খুব লঘুপাক। হইয়া থাকে। কাঠের জ্বালে ভাত রাঁধিলে পোরের ভাতের ন্যায় সুসিদ্ধ না হইলেও বেশ সিদ্ধ হয়। কিন্তু কয়লার প্রচণ্ড জ্বালে ভাত বেশ সুসিদ্ধ হয় না।

প্রসঙ্গ ক্রমে এই স্থানে বলা যাইতে পারে যে পোরের ভাতের ফেন ফেলিয়া দিবার নিয়ম নাই, অথচ উহা লঘুপাক ও রোগীর পথ্য কিন্তু সাধারণতঃ ভাতের ফেন ফেলিয়া দেওয়া

হয়। ইহা খাদ্যের অপচয় মাত্র। আয়ুর্ব্বেদে কথিত হইয়াছে যে অন্ন, চাউলের পাঁচগুণ জল দ্বারা পাক করিতে হয়। এইরূপ নিয়মে পাক করিলে ভাত বেশ সুসিদ্ধ হয় অথচ ফেন থাকে না। কিন্তু তখন কয়লার প্রচলন ছিল না। কাঠের মৃদু জ্বালে সিদ্ধ হইলে যত জল লাগে, কয়লার প্রচণ্ডজ্বালে সিদ্ধ করিলে তাহা অপেক্ষা অধিক জল লাগে। কেননা প্রচণ্ড তাপে জল অধিক মাত্রায় জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়। কয়লার জ্বালে রাঁধিতে হইলে সাতগুণ জল দিলেই চলিতে পারে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি ফেন ফেলিয়া দেওয়া খাদ্যের অপচয় মাত্র। ফেন জল এবং চাউলের ক্বাথ মাত্র। ফেন ফেলিয়া না দিয়া সমান জলে ভাত রাঁধিয়া খাইলে যাহার আধসের চাউল লাগিত তাহার দেড় পোড়া চাউলে চলিতে পারে। এই হিসাবে এক জন লোকের মাসে পনর পোয়া বৎসরে এক মনের উপর চাউল বাঁচিয়া যায়। ভারতের ন্যায় দরিদ্র দেশে ইহা কম লাভের কথা নহে।

আমাদের দেশে দাল, ভাজা, ঘণ্ট, দালনা, চচ্চড়ি, অম্ল, ঝোল এই কয় প্রকার তরকারী ব্যবহৃত হয়, দালের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ভাজা দ্রব্য গুরুপাক, সুতরাং মন্দাগ্নি সম্পন্ন ব্যক্তির না খাওয়াই ভাল। অন্য তরকারী বেশ সিদ্ধ হইলেই লঘু পাক হইয়া থাকে। দ্রব্যান্তর সংযোগে উহাদের কিরূপ গুণান্তর ঘটে তাহা পরে বলা যাইতেছে।

রন্ধনের উৎকর্ষাপকর্ষ সম্বন্ধে তাপেরই প্রাধান্য বেশী। তীব্র জ্বালে সিদ্ধ করা অপেক্ষা মৃদু জ্বালে সিদ্ধ করা তরকারী সুসিদ্ধ এবং লঘু পাক হয়। অগ্নি যাহাতে রন্ধন পাত্রের চতুর্দ্দিকে সমান ভাবে লাগে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। নচেৎ কতক সিদ্ধ এবং কতক অর্দ্ধ সিদ্ধ হইতে পারে।

রন্ধন কৌশল দ্বারা একই মাংস হইতে কালিয়া সুরুয়া এবং 'জগ' সুপ্, প্রস্তুত হইয়া থাকে। কালিয়া কত গুরুপাক এবং সুরুয়া ও 'জগ্' সুপ কত লঘু পাক।

২। দ্রব্যান্তর সংযোগের দ্বারা—জল সাগু লেবুর রস ও লবণ সংযোগে আহার অতি সহজে জীর্ণ। দুধ সাগু উহা অপেক্ষা গুরুপাক। আবার দালের সহিত সাগু খিচুড়ি প্রস্তুত করিলে আরও গুরুপাক হইয়া থাকে।

তরকারী সহ ছোলা ভিজান, বড়ি নারিকেলকোরা বা নারিকেল কুচি দিলে উহা অপেক্ষাকৃত গুরুপাক হইয়া থাকে। তরকারীতে বা মাংসে যত অধিক তৈল ঘৃত সংযোগ করা যায় তাহা ততই গুরু পাক হইয়া থাকে। পায়েশের সহিত পেস্তা বাদাম প্রভৃতির সংযোগ করিলে তাহা অপেক্ষা কৃত গুরুপাক হয়। আবার এরূপে

হলুদ, লঙ্কা, তেজপাতা, সর্ষপ অপর দিকে আদা বাটা, হিং, জীরা, মরিচ, প্রভৃতি মসলার সংযোগে খাদ্য পাক করিলে তাহা অপেক্ষাকৃত লঘু পাক হয়। আমাদের দেশে রন্ধনের জন্য যে সকল মসলা, ব্যবহার করা হয় তাহার সব গুলিই উপকারী। তবে শরীরের অবস্থা বুঝিয়া তাহার কিছু তারতম্য করা উচিত। পিত্ত প্রধান ধাতুতে হরিদ্রা, ধনে, মৌরী যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু লঙ্কা, সর্ষপ, জীরা, মরিচ, হিং, আদা প্রভৃতি কম ব্যবহার করা উচিত। কফ প্রধান ধাতুতে শেষোক্ত দ্রব্য গুলি যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ঐ সকল মসলা খাদ্যের স্বাদুতা সম্পাদন করে এবং অগ্নিকে উত্তেজিত করিয়া পরিপাক ক্রিয়ার সহায়তা করে। কিন্তু মসলা উত্তমরূপে বাটিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। বাটিয়া জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া দিলে আরও ভাল হয়। উত্তমরূপে বাটিয়া না দিলে মসলার অধিকাংশ দানা দানা থাকে এবং যাহাদের অন্ত্র দুর্ব্বল, তাহাদের অন্ত্রের উত্তেজনা ঘটাইতে পারে।

দ্রব্যান্তর সংযোগে ব্যঞ্জনকে কিরূপ লঘুপাক এবং রোগ নাশক করা যাইতে পরে নিম্নে তাহার একটী প্রমাণ উদ্ধৃত হইল।

একটী অজীর্ণ রোগীর ভালরূপ কোষ্ঠ শুদ্ধি হইত না বেশ ক্ষুধা হইত না, ভুক্ত দ্রব্য সুচারুরূপে জীর্ণ হইত না এবং মধ্যে মধ্যে পেটের অসুখ হইত। একবার প্রবাহিকা (আমাশয়) রোগে আক্রান্ত হইয়া সেই রোগী আমার চিকিৎসাধীনে থাকেন। চিকিৎসা দ্বারা প্রবাহিকা রোগের উপশম হইল, কিন্তু অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, মলের আম দোষ (পিচ্ছিল মল) রহিয়া গেল এবং কোষ্ঠশুদ্ধি ও ভাল হইত না। কোমরে বাতের ন্যায় সামান্য বেদনা ও হইল। রোগী হেঁট হইয়া অল্পক্ষণ থাকিলেই যথেষ্ট বেদনা অনুভব করেন। এদিকে রোগী ঔষধও খাইতে চাহেন না। আমি তাঁহার জন্য নিম্নলিখিত পথ্য ব্যবস্থা করিলাম।

পূর্ব্বাহ্নে পুরাতন দাদখানি চাউলের অন্ন এবং কৈ, মাগুর বা ছোট পোনা মাছের ঝোল। মাছের ঝোলে বেগুণ ও দুই এক খানা আলু এবং আদা বাটা ১ তোলা, রশুন ৫।৬ কোয়া ও হিং ২ রতি। হিং অল্প গব্য ঘৃতে লৌহপাত্রে ঈষৎ ভাজিয়া চূর্ণ করিয়া রাখিতে বলিয়াছিলাম। রাত্রিতেও এইরূপ মাছের ঝোল ও ভাত খাইবার ব্যবস্থা দিই। কিন্তু রাত্রে ভাত খাওয়া অভ্যাস না থাকায় শেষে পাঁউরুটী টোষ্ট করিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মে প্রস্তুত মাছের ঝোলের সহিতে খাইতে দিই। টোষ্ট করিবার নিয়ম এইরূপ:—পাঁউরুটী খণ্ড খণ্ড করিয়া বড় বড় বরফীর মত আকারে কাটিতে হয়। পরে ছুরি বা খুন্তির আগায় বিঁধিয়া আগুনের উপর ধরিতে হয়। সে দিক সিদ্ধ হইয়া ঈষৎ রক্তবর্ণ হইলে অপর দিক আবার ঐরূপে সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়।

এইরূপ নিয়মে পনর দিন পথ্য করিয়া রোগীর বিশেষ উপকার হইয়াছিল। দুই বেলা পরিষ্কার দাস্ত হইতে লাগিল, মলের আমদোষ দুর হইল, ক্ষুধা হইতে লাগিল, অজীর্ণ ও কোমরের বেদনা ভাল হইয়া গেল। যাঁহারা অজীর্ণ এবং তদানুষঙ্গিক আমবাত (চলতি কথায় বাত) প্রভৃতি রোগে কষ্ট পাইতেছেন তাঁহারা হিং, আদা, মরিচ, পিপুল, রসোন প্রভৃতি আম পাচক এবং অগ্নিদীপক মশলার সহিত খাদ্য পাক করিয়া সেবন করিলে

যথেষ্ট উপকৃত হইবেন। চরক সংহিতা নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে অন্নপানের সহিত ঔষধ সিদ্ধ করিয়া প্রয়োগের বিধি বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এস্থলে বলা আবশ্যক যে পূর্ব্বোক্ত অজীর্ণ-রোগীকে আরও একটী ব্যবস্থা দিয়াছিলাম। সেটী দুইবেলা যথেষ্ট ভ্রমণ করা।

৩। ক্রিয়া বিশেষ দ্বারা—দধি গুরুপাক কিন্তু মন্থন করিয়া মাখন উদ্ধৃত করিয়া লইলে যে ঘোল হয় তাহা লঘুপাক। চিঁড়া গুরুপাক কিন্তু উত্তমরূপে ধুইয়া ভিজাইয়া খাইলে অপেক্ষাকৃত লঘুপাক হয়। শুষ্ক ছোলা লঘুপাক। মটর শুটির বীজের খোসা ফেলিয়া দিলে অপেক্ষা কৃত লঘুপাক হয়। সাধারণ দুগ্ধ অপেক্ষা মাখন তোলা বা সর তোলা দুগ্ধ লঘুপাক। তরকারী ও ফলের ছাল বা খোসা ফেলিয়া খাইলে লঘুপাক হয়। আঁসযুক্ত আমের রস করিয়া খাইলে সহজে জীর্ণ হয়। যে সকল তরকারী বা ফলে ছিব্‌ড়া থাকে তাহার ছিব্‌ড়া ফেলিয়া খাইলে লঘুপাক হয়। কিন্তু সুস্থ-শরীর লোকের এই স্থলে জানা উচিত যে ফল ও শাক সব্‌জীতে যে ছিব্‌ড়া (Fibre) থাকে, তাহারা অন্ত্রের ক্রিমিগতি (Peristaltic movement) বর্দ্ধক বলিয়া কোষ্ঠ শুদ্ধির সহায়তা করে।

একই দ্রব্য অবস্থা ভেদে লঘু পাক বা গুরু পাক হইয়া থাকে। যেমন মটর শুঁটি কচি অবস্থায় লঘুপাক থাকে পাকিলে গুরু পাক হয়। কচি মূলা লঘু পাক কিন্তু পাকা মূলা গুরু পাক। গুড় অপেক্ষা চিনি বা মিছরী লঘু পাক। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যাহারা সুকুমার দেহ, সুখী, অল্প পরিশ্রমী, অল্পাগ্নি এবং সর্ব্বদা সুস্থ থাকে না তাহাদের পক্ষেই খাদ্য সম্বন্ধে পদে পদে বিশেষ চিন্তা করা প্রয়োজন। কিন্তু যাহারা বলবান, প্রবল অগ্নি সম্পন্ন, পরিশ্রমী এবং ভোজনপটু তাহাদের পক্ষে খাদ্য সম্বন্ধে তত বিচার করিবার আবশ্যক নাই। অধুনা বঙ্গদেশ প্রথম শ্রেণীর লোকে পরিপূর্ণ বলিয়া আমরা খাদ্য নির্ব্বাচন ও খাদ্য সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম। এক্ষণে শাস্ত্রে স্বভাবতঃ যে সকল খাদ্য হিতকর এবং যে সকল খাদ্য অহিতকর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

মাষকলাই, শিম, পিষ্টক, অঙ্কুরিত শস্য, শুষ্ক শাক, পাতলা ইক্ষু গুড়, ক্ষার দ্রব্য, কাঁচা মূলা, নষ্ট দুগ্ধের ক্ষীর বা ছানা, চিঁড়া প্রভৃতি নিরন্তর এবং প্রচুর পরিমাণে খাইবে না। যাহাদের অগ্নিবল অত্যন্ত অল্প, তাহাদের পক্ষে ঐ সকল দ্রব্য আহার করা অনুচিত। উত্তম চাউলের অন্ন, গোধুম ও যব কৃত খাদ্য জাঙ্গল প্রাণীর মাংস, মুগ, চিনি, কিস্‌মিস্ মধু, দাড়িম, সৈন্ধব লবণ, পটোল প্রভৃতি দ্রব্য শরীরের হিতকর বলিয়া নিত্য সেবন করিবে।

ধুমপানের সময়।

ধুমপানে আট কাল আছয়ে নির্দ্দেশ।
বাতশ্লেষ্ম সেই কালে হয় সমুৎক্লেশ।
স্নানাহার, বমনান্তে, হাঁচির অন্তর,
দন্ত ধাবনান্তে, নস্য-অঞ্জনের পর;
এইকালে উর্দ্ধ জত্রু-বাত কফাত্মক,
রোগ নহে আত্মধানে কহিলা চরক॥
অল্প বিশ্রামের পর তিন তিন বার।
ত্রিগুণ নবম সংখ্যা বারে ব্যবহার॥

প্রয়োগিক ধূমপান যে কালে কথিত।
দুইবার মাত্র পান জ্ঞানীর বিহিত॥
বারেক স্নৈহিক ধূম এককালে হয়।
বিরেচক ধূম পান দিনে বার ত্রয়॥
বিশুদ্ধ হৃদয়, কণ্ঠ, ইন্দ্রিয় নিচয়।
কুপ্তদোষ প্রশমিত, শিরলঘু হয়॥
যথামাত্রা, ধূমপানে এসব লক্ষণ।
অতিমাত্রা, অকালে বা মস্তক ঘূর্ণন॥
অন্ধতা ও বধিরতা, মূকত্ব উদয়।
রক্ত পিত্ত দুষ্টি আদি উপদ্রব হয়॥
বাত পিত্তে উপদ্রব হ'লে সংঘটন।
ঘৃতপান, স্নেহে নস্য অঞ্জন-তর্পণ॥
রক্তপিত্তে সুশীতল দ্রব্য সংঘটিত।
অঞ্জন, তর্পণ, নস্য হবে ব্যবস্থিত॥
শ্লেষ্ম পিত্ত প্রকোপেতে রুক্ষতাকারক।
অঞ্জন, তর্পণ নস্য হিতসম্পাদক॥

ধূমপান বিধি।

ধূমপান ছয়রূপ-শমন বৃংহণ,
রেচন, কাসঘ্ন, ব্রণধূপন বামন।
শ্রান্ত, ভয়যুক্ত কিম্বা যে জন দুঃখিত,
বস্তি বিরেচন ক্রিয়া হ'লে প্রয়োজিত;
রাত্রি জাগরিত, তৃষ্ণা, দাহযুক্ত আর,
তালুশোষ অভিযুক্ত উদররোগ যার;
তিমির, আধ্মান বমি, শিরোরোগান্বিত,
উরঃক্ষত, পাণ্ডুরোগ, প্রমেহ পীড়িত;
গর্ভিণী, রুক্ষ ও ক্ষীণ; দুগ্ধ, মধু আর
আসবান্ন, দধি, মৎস্য, করিলে আহার;
বাল, বৃদ্ধ, কৃশব্যক্তি, অকালে অধিক,
ধূমপানে উপদ্রব হবে বহু ঠিক॥
ঘৃতপান, নস্য আর অঞ্জন, তর্পণ,
ঘৃত, ইক্ষুরস, দ্রাক্ষা, দুগ্ধ নিষেবন;
চিনি পানা, মধুরাম্ল রসসহ যোগে॥
শ্রেষ্ঠ বৈদ্যগণ এতে বমন প্রয়োগে॥
দ্বাদশ বৎসর নিম্নে অশীতে উপর,
শিশু, বৃদ্ধ ধূমপানে না হবে তৎপর।
সম্যক প্রকারে ধূম হ'লে প্রয়োজিত,
কাস, শ্বাস, প্রতিশ্যায় হ'বে বিদূরিত;
মন্যাগ্রহ, হনুগ্রহ, শিরোরোগ আর।
বাতশ্লেষ্ম কৃত ব্যাধি হইবে সংহার॥
বাড়িবে-ইন্দ্রিয় বাক্য, মনঃ প্রসন্নতা।
কেশ-দন্ত- শ্মশ্রুদৃঢ়; মুখ সৌগন্ধতা॥

ধূম্রপ্রয়োগের নলাকৃতি।

ধূম নল তিন খণ্ড, তিন পর্ব্ব তায়,
স্থূলতা কনিষ্ঠাঙ্গুলি (ছিদ্র) রাজমাষাস্যায়।
চব্বিশ, বত্রিশাঙ্গুলি, চব্বিশ, ষোড়শ,
দশ, দশাঙ্গুলি দীর্ঘ হইবে ক্রমশঃ।
মটর কলায় ন্যায় স্থূলতা তাহার।
কুলথকলায় পশে ছিদ্র তদাকার॥

ধূম্রগ্রহণ বিধি।

দ্বাদশ অঙ্গুলী, শ্লক্ষ্ণ, শরকাণ্ড এক,
অষ্টাঙ্গুলী ধূম্রকল্কে লেপ করিবেক;
কল্কমাত্রা দুইভরি, শুকাবে ছায়ায়,
শুষ্ক হলে শরকাণ্ড ত্যাগ করি তায়;
কল্কবর্ত্তি-স্নেহসিক্ত করি এক ভাগ,
জ্বালাবে অঙ্গারাগুণে; মুখে অন্যভাগ;
ধূমপান করি মুখে, মুখেই ত্যজিবে।
পরে নাসা পান করি মুখে বির্ব্জবে॥

ব্রণধূপবিধি।

করিয়া অঙ্গারানলে সরাব স্থাপন;
কল্কৌষধ তদুপরি করিবে ক্ষেপন;
সছিদ্র সরাব অন্য করি আচ্ছাদিত,
ছিদ্রমুখে নলমুখ করিবে যোজিত;
ছিদ্রমুখ দিয়া ধূম যখনি আসিবে,
অন্য মুখে ক্ষত স্থানে ধূম প্রয়োগিবে।

শমনে তৈলাদি কল্ক ; স্নিগ্ধ সর্জ্জরস
বৃংহণ ধূম প্রয়োগে হইবে সরস ;
তীক্ষ্ণদ্রব্য-কল্ক ধূম রেচনে হইবে,
কাসঘ্নে মরিচ, কণ্টকারী ধূম নিবে ;
স্নায়ু চর্ম্মাদির ধূম বামনে প্রয়োগ,
নিম্ব, বচাদির কল্ক ব্রণ ধূমযোগ।

অপরাজিতা ধূপ।

শিখিপুচ্ছ, নিম্বপত্র, বৃহতীর ফল,
মরিচ ও জটামাংসী, হিঙ্গু এসকল,
ছাগলোম, সর্পখোস বীজ কার্পাসের,
গজদন্ত, এবসহ বিষ্ঠা বিড়ালের ;
এইসব চূর্ণকরি ঘৃত বিমিশ্রিত,
গৃহমধ্যে ধূম যদি হয় প্রয়োজিত,
পিশাচ, রাক্ষসভয় বিদূরিত হয়।
সর্ব্বজ্বর, বাল-রোগ নাশিবে নিশ্চয়॥
রজঃ, ক্রোধ, মনস্তাপ, ধূমপানে ত্যাগে।
বংশ, স্বর্ণাদি ধাতু ধূম্রনলে লাগে॥

গণ্ডূষবিধি।

স্নেহ, দুগ্ধ, কষায়াদি সম্পূর্ণ মাত্রায়।
মুখেতে ধরিলে বলে গণ্ডূষ তাহায়॥
যতক্ষণ কফ পূর্ণ না হয় বদন,
দোষের বিনাশ আর উদ্রেক বমন ;
জলস্রাব নাহি হয় মুখ নাসিকায়।
গণ্ডূষ ধারণ বিধি ততক্ষণ তায়॥
সুস্থির রাখিয়া রোগী, গণ্ডূষের বিধি।
ভাল-গল-গণ্ডদেশে ঘর্ম্মোদ্গমাবধি॥
নাশনাহি হ'লে দোষ দুই এক বারে।
তিন, পাঁচ, সাতবার গণ্ডূষ আচরে॥

গণ্ডূষের প্রকার ভেদ।

চতুর্ব্বিধ হয় সেই গণ্ডূষ ধারণ।
স্নেহন, শমন আর শোধন রোপণ।
বাতাধিক্য-স্নিগ্ধ উষ্ণদ্রব্যেতে স্নেহন।
মধুর, শীতল দ্রব্যে পিত্তেতে শমন॥
কফাধিক্যে-কটু, অম্ল, লবণ সংযোগ,
উষ্ণদ্রব্যে হইবেক শোধন প্রয়োগ।
কষায়, তিক্ত মধুর কটুরস যোগে,
উষ্ণ দ্রব্যদ্বারা ব্রণ রোপন প্রয়োগে॥
গণ্ডূষ দ্রবেতে চূর্ণ এক তোলা দিবে।
কবলে দ্বিভরি কল্ক দ্রবে মিশাইবে॥
পঞ্চবর্ষ বয়ঃক্রম হইলে তখন,
গণ্ডূষ কবল আদি করিবে ধারণ।
গণ্ডূষে বিনাশে ব্যাধি, অগ্নি ও বিষাদ।
হয় মুখ সন্থলঘু ; ইন্দ্রিয় প্রসাদ॥

গণ্ডূষ।

স্নৈহিক গণ্ডূষে তিলকল্ক বিমিশ্রিত।
জল, দুগ্ধ কিম্বা তৈল স্নেহে হয় হিত॥
তিল, নীলোৎপল, ঘৃত, দুগ্ধ, মধু চিনি,
এসব গণ্ডূষ মুখে ধরিবেন যিনি।
তাঁহার মুখ-বিস্বাদ, দাহ নাশ হয়।
পূরিয়া মুখের ক্ষত উঠিবে নিশ্চয়॥
মধুর গণ্ডূষমুখে করিলে ধারণ।
দাহ তৃষ্ণা আদি তাতে হয় প্রশমন॥
বিষ-ক্ষারদগ্ধ কিম্বা অগ্নিদগ্ধ হ'লে,
ঘৃত বা দুগ্ধ গণ্ডূষে নাশিবে সকলে॥
তৈল ও সৈন্ধবে তথা দন্তচাল নাশে।
মুখশোষ বিরসতা কাঁজিতে বিনাশে॥
আদার রসে মিশ্রিত সৈন্ধব লবণ,
ত্রিকটু, সর্ষপ চূর্ণে কফ প্রশমন॥
ত্রিফলার চূর্ণে মধু করিয়া মিলিত।
গণ্ডূষে কফ ও রক্ত, পিত্ত প্রশমিত।
গুলঞ্চ, ত্রিফলা, দ্রাক্ষা, জাতীপাতা আর।
দারু হরিদ্রা, দুরালভা, কাথ করি তার
তাহাতে ষষ্ঠাংশমধু করিয়া মিশ্রিত।
ত্রিদোষজ মুখপাক হবে বিদূরিত॥

থানকুনি বা থুলকুড়ি।

ইহা এক প্রকার ক্ষুদ্র শাকজাতীয় ভূলুণ্ঠিত উদ্ভিদ্। ইহার পাতাগুলি প্রায় গোলাকৃতি কিন্তু বোঁটার দিকে কিঞ্চিৎ কাটা ও পাতার ধারগুলি করাতের দাঁতের ন্যায় কাটা কাটা। ইহা বাঙ্গালাদেশে প্রায় সর্ব্বত্র সকল সময় জন্মিয়া থাকে এবং বাঙ্গালার স্থান বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়। কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলে ইহাকে থানকুনি বা থুলকুড়ি বলে—কৃষ্ণনগর অঞ্চলে ইহাকে ইন্দুরকানি বলে এবং কোন কোন অঞ্চলে বা ইহাকে "ক্ষুদে মামুদ" বলে। ইহার সংস্কৃত নাম মণ্ডূকপর্ণী।

থুলকুড়ির পরিচয়—মণ্ডূকী, ভেকী, ব্রাহ্মী, ব্রহ্মমণ্ডূকী। যদিও ব্রাহ্মী শাক ও থুলকুড়ি গুণে প্রায়ই সমান—তথাপি উভয়ের আকৃতি গত কিছু ভেদ আছে। ব্রাহ্মীর পত্রের বৃন্ত নাই। ব্রাহ্মীর শ্বেতবর্ণ পুষ্প হয় কিন্তু থুলকুড়ির পুষ্প লোহিতবর্ণ। শিবদাস ও শ্রীকণ্ঠ থুলকুড়ীকে থানকুনীতি-লোকে—মণিমাণাতি লোকে" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। মহারাষ্ট্রদেশে মণ্ডূকপর্ণী বা থুলকুড়ী ব্রাহ্মী নামে পরিচিত। ইহার মূল, শিকড়, পাতা প্রভৃতি সকলই ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়।

আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সকলে ইহার বিবিধ গুণের উল্লেখ আছে। ভাবপ্রকাশকার বলেন "ব্রাহ্মী হিমা সরা তিক্তা লঘ্বী মেধ্যা চ শীতলা। কষায়া মধুরাস্বাদুপাকায়ুষ্যারসায়নী স্বর্য্যা স্মৃতিপ্রদা কুষ্ঠপাণ্ডুমেহাস্রকাসজিৎ। বিষশোথজ্বরহরী তদ্বৎমণ্ডূক পর্ণিনী॥" নিঘণ্ট রত্নাকর বলেন, "ব্রাহ্মী শীতা কষায়াচ তিক্তা বুদ্ধিপ্রদা মতা। মেধ্যাজুরগ্নিজননী সারকা স্বাদুলা লঘুঃ। কণ্ঠশুদ্ধিকরী হৃদ্যা স্মৃতিদাচ রসায়নী। হন্ত্যানাহং বিষং কুষ্ঠং পাণ্ডুকাসং জ্বরং জয়েৎ॥ শোথকণ্ডূপ্লীহবাতরক্তপিত্তা রুচী র্জয়েৎ। শ্বাসং শোষং সর্ব্বদোষং কফ-বাতাময়ঞ্জয়েৎ। সর্ব্বে প্যেতে গুণা ব্রাহ্মমণ্ডূ-ক্যামপি সংস্থিতাঃ॥ অর্থ এই যে ব্রাহ্মী ও থুলকুড়ি শীতল, কষায়, তিক্ত, বুদ্ধিপ্রদ, আশু ও অগ্নিবর্দ্ধক, পবিত্রতাকারক, সারক, লঘু, কণ্ঠশুদ্ধিকরী হৃদ্য স্মৃতিবর্দ্ধক ও রসায়ন। ইহা দ্বারা মেহ, বিষদোষ, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, কাস, জ্বর, শোথ, চুলকনা, প্লীহা, বাত, রক্তপিত্ত, অরুচি, শ্বাস, শোষ ও কফবাত সমুত্থিত সর্ব্ব-দোষ নষ্ট হয়। যে যে গুণ ব্রাহ্মীশাকে আছে সেই সমুদয় গুণই থুলকুড়ী মণ্ডূকপর্ণীতে আছে। চরক বলেন "মণ্ডূকপর্ণ্যাঃ স্বরসঃ প্রযোজ্যঃ" ইত্যাদি (চিঃ ১ অধ্যায়) সুশ্রুত (চিঃ ২৮ অধ্যায়) অর্থ এই যে রসায়নার্থী মণ্ডূকপর্ণীর স্বরস দুগ্ধের সহিত পান করিবে। কিম্বা স্বরস পানানন্তর দুগ্ধ পান করিবে।

উদররোগে থুলকুড়ি—উদররোগী মণ্ডূকপর্ণী শাক মণ্ডূকপর্ণী রসে কিম্বা জলে সুসিদ্ধ বা অর্দ্ধসিদ্ধ করিয়া অম্ল, লবণ ও স্নেহ বিনা ভোজন করিবে। অন্নাহার পরিত্যাগ করিতে হইবে। তৃষিত হইলে জলপান না করিয়া মণ্ডূকপর্ণীর স্বরস পান করিবে। এই বিধি একমাস কাল পালনীয়। (চরক—চিঃ ১৮ অধ্যায়)

ক্ষতক্ষীণ রোগে থুলকুড়ি—চরক বলেন ক্ষতক্ষীণ রোগে থুলকুড়ীর মূল চূর্ণ ক্রমশঃ মাত্রা বর্দ্ধিত করিয়া দুগ্ধের সহিত পান করিবে। ঔষধ সেবনকালে অন্নাহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল দুগ্ধপান করিতে হইবে

ক্ষতক্ষীণ রোগগ্রস্ত ব্যক্তি ইহা সেবন করিলে বল, আরোগ্য ও পুষ্টিলাভ করিবে। (চিঃ ১৮ অঃ)।*

পালাজ্বরে থুলকুড়ীর উপকারিতা—পালাজ্বরে ইহার মূল ও শিকড় পানের সহিত দিবসে তিনবার করিয়া খাইলে দুইতিন দিনের মধ্যে ঐজ্বর আরোগ্য হইয়া যায়। পালাজ্বর যে দিবসে আইসে সেই দিবস প্রাতঃকাল হইতে জ্বরের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত তিনবার খাইতে হইবে। এইরূপে দুইতিন পালার দিন ঔষধ খাইলে জ্বর আর আসিবে না। ইহা দ্বারা একদিন অন্তর দুই দিন অন্তর প্রভৃতি পালা জ্বর আরোগ্য হইবে ইহা দ্বারা নাড়ী পুষ্ট ও বেগবতী হয় এবং কিছুদিন সেবন করিলে অত্যন্ত ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়। এই হেতু পুরাতন আমাশয়, উদরাময় ও অজীর্ণ রোগে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। স্ত্রীগণের স্থতিকা ঘটিত উদরাময় ও বালকদিগের উদাময় রোগে ইহা দ্বারা বিলক্ষণ উপকার হইয়া থাকে।

কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগে ইহার উপকারিতা—কুষ্ঠ ব্যাধিতে ইহার আভ্যন্তরিক ও বাহ্য প্রয়োগ দ্বারা উপকার হয়। যে প্রকার কুষ্ঠব্যাধিতে শরীরের স্থানে স্থানে স্পর্শ শক্তির লোপ হয়, তাহাতে ইহা বিশেষ উপকারী। যে স্থানে স্পর্শ শক্তির লোপ হইয়াছে, সেখানে ইহার পাতা বাটিয়া পুল্‌টিশের ন্যায় প্রয়োগ করিতে হয়। পুরাতন উপদংশ (গর্ মর) পীড়ায়, নানাপ্রকার চর্ম্মরোগে ও ক্ষতে ইহা উপকারী। জিহ্বামূলের ভিতর ঘা হইলে ইহা পাপ্‌ড়ি খয়েরের ও পানের সহিত চিবাইয়া খাইলে উক্ত ঘা আরাম হয়। ইহার বোঁটা সমেত পত্র ছায়াতে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিতে হয় এবং ঐ চূর্ণ ৪।৫ রতি পরিমাণে দিবসে তিনবার করিয়া সেবন করিতে হয়। কিম্বা ঐ পরিমাণ পত্র এক ছটাক গরম জলে ভিজাইয়া পরে পাতাগুলি ছাঁকিয়া ঐ জল পান করিতে হয়। শরীরের কোন স্থানে আঘাত লাগিলে বা মচ্‌কাইয়া গেলে সেই স্থানে ইহার পাতা পুল্‌টিশরূপে বাহ্যিক প্রয়োগ কলিলে শীঘ্র বেদনা নিবারণ হয়।

থুলকুড়ি সম্বন্ধে নব্য বা ডাক্তারি মত—মণ্ডূকপর্ণী বা থুলকুড়ি —রসায়ন, বল্য, মূত্রকর ও ইহার প্রলেপ উষ্ণ। মূত্রেন্দ্রিয় ও জননেন্দ্রিয়ের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে। মণ্ডূকপর্ণী অত্যধিক মাত্রায় সেবিত সেবিত হইলে মূত্রস্রোত ও অণ্ডাধারের (ovary) উত্তেজনা এমন কি সমস্ত শরীরে চুলকনা জন্মায়। যষ্টিমধুসহ থুলকুড়ির মুল উষ্ণ ও রসায়ন বলিয়া পাঁচড়া প্রভৃতি বিবিধ চর্ম্মরোগ, ফিরঙ্গক্ষতে বা কণ্ডূয়নে (Second syphilitic sores or skin erruptions), কুষ্ঠ শ্লীপদ এবং গলগণ্ড, গণ্ডমালাদিরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পীনস রোগে থুলকুড়ীর মূল চূর্ণের নস্য হিতকর। ইহার পুল্‌টিশ্ বা প্রলেপ ফিরঙ্গক্ষত বা অন্যবিধ ক্ষতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চূর্ণদ্বারা ও ক্ষত আরোগ্য হইয়া থাকে।

ঔষধার্থ ব্যবহার সমগ্রক্ষুপ। মাত্রা মণ্ডূপর্ণী বা থুলকুড়ীর স্বরস ১ হইতে দুই তোলা। মূলচূর্ণ ½ আনা হইতে দুই আনা।

ইতিহাস ও দেশবিশেষে

* আয়ুর্ব্বেদোক্ত অপরাপর গুণ রাজবৈদ্য শ্রীযুক্ত বিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ মহাশয়ের রচিত "বনৌষধি দর্পণ" নাম দ্রব্যগুণ পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

ব্যবহার—সংস্কৃত গ্রন্থে ইহা ব্রাহ্মী ও মণ্ডুকপর্ণী এই দুই নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। চক্রদত্ত বলেন ইহার টাট্‌কা রস দুগ্ধ ও যষ্টিমধু সহ খাইলে উত্তম রসায়ন ও বৃষ্য যোগ হয়। নিঘণ্টু গ্রন্থ সকলে ইহার পর্য্যায় বাচক নানাশব্দ আছে। এবং ইহা শীতল, লঘু, স্বাদু ও বলকারক বলিয়া উল্লেখ আছে। শাস্ত্রে আছে যে ব্রাহ্মী বা থুলকুড়ী শাক সেবনে স্মৃতি ও বুদ্ধি বর্দ্ধিত হয় এবং কুষ্ঠ, মেহ ও জ্বর নষ্ট হয়। **এনশ্লি** সাহেব বলেন করোমণ্ডল তীরবাসীরা কোন যায়গায় আঘাত লাগিলে কি আঘাত জনিত ক্ষত হইলে ঐ স্থানে থুলকুড়ীর রস প্রয়োগ করে। ইহাতে ঐ সকল আঘাত বা ক্ষতে প্রদাহ জন্মিতে পারে না। **হুস্‌ফিণ্ড** সাহেব বলেন যাভা দ্বীপের লোকেরা সুপ্রসিদ্ধির জন্য ইহার রস ব্যবহার করে। মালাবার উপকূলের লোকেরা ইহার রসকে কুষ্ঠ নাশক বলে। ১৮৫৯ সালে ইহা কুষ্ঠ রোগের Specific বা নিশ্চয় উপশমকারী কিনা এসম্বন্ধে ডাক্তার **বইলোর** মনোযোগ আকর্ষণ করে। এবং পরে ডাক্তার এ, হার্টার মন্দ্রাজ কুষ্ঠ হাঁসপাতালে ইহার পরীক্ষা করিয়া স্থির করেন যে ইহা কুষ্ঠ রোগের Specific বা নিশ্চয় উপশমকারী হউক বা না হউক পরন্তু ইহা কুষ্ঠরোগ নাশপক্ষে যে বিশেষ সহায়তা করে তাহা নিশ্চিত। ইণ্ডিয়া ফার্ম্মাকোপিয়াতে তাহার পরে এই থুলকুড়ীর কথা গেজেট্‌ হয় এবং ইহাকে বলকারক, রসায়ন ও স্থানীয় উত্তেজক, বিশেষতঃ গর্‌মি এবং উপদংশ জনিত চর্ম্মরোগে ইহার বাহ্যিক প্রয়োগ বিশেষ হিতকর বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। ইহার পাউডার ও পুল্‌টিস্‌ কি করিয়া করিতে হয় তাহা ফার্ম্মাকোপিয়াতে লেখা আছে। ১৮১৮ সালে ইউরোপ হইতে এতৎ সম্বন্ধে যে রিপোর্ট আইসে তাহাতেও ঐ সকল গুণাবলীর কথা দৃঢ়ীকৃত হয়। বোম্বাই প্রদেশে ছেলেদের অল্পস্বল্প পেটের গোলমালে থুলকুড়ীর ৪।৫ টী পাতার রস চিনি ও কামিন অর্থাৎ জীরা দিয়া খাইতে দেয় কঙ্কন প্রদেশে তোত্‌লা তোত্‌লামি (Stammer) আরাম করিবার জন্য লোকে ইহার ২টী কি ১টী পাতা প্রত্যহ খাইতে দেয়। এবং রক্তের উষ্ণতা জন্য যে সকল চর্ম্মরোগ হয় তাহাতে ইহার রস প্রয়োগ করে।

ডাক্তার **গ্রাণ্ডপ্রি** বলেন যে মরিশাস্‌ দ্বীপে এই থুলকুড়ী শাক এত প্রচুর পরিমাণে জন্মে যে সকল লোকে ইহা পশুদিগকে দেয়। ইহা খাইলে পশুর দুগ্ধের পরিমাণ ও স্বাদুতা বৃদ্ধি পায়।

ডারুটীম্‌ সাহেব বলেন কুষ্ঠরোগীকে থুলকুড়ীর রস সেবন করিতে দিলে প্রথমতঃ তাহাদের গাত্রের উত্তাপ বৃদ্ধি পায় এবং তাহাদের গাত্রচর্ম্মে বিশেষতঃ হস্তে ও পদে কাঁটা ফুটানের মত যাতনা হয়। কিছুদিন বাদে গাত্রোত্তাপ এতবৃদ্ধি হয় যে সহ্য করা যায় না। তারপর এক সপ্তাহ বাদে ক্ষুধার বৃদ্ধি হয় ও চর্ম্মগুলি নরম হইতে থাকে। থুলকুড়ী মূত্রনালী ও জঠরক্রিয়ার উত্তেজনা করে। প্রতিদিন ১০ গ্রেণ করিয়া ইহার এক ডোজ তিনবার করিয়া খাইলে ইহা উত্তেজক (ষ্টিমুলেণ্ট) ঔষধের কাজ করে এবং কুষ্ঠ প্রভৃতি চর্ম্মরোগের পক্ষে উপকারী হয়। কিন্তু অধিক মাত্রায় খাইলে ইহাতে ঘোর যন্ত্রণা, মাথাঘোরা, আচ্ছন্ন ভাব ইত্যাদি অনিষ্ট জনক উপসর্গ সকল উপস্থিত হয়।

বাল্য-বিবাহ।

[কবিবর ৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিরচিত]

কবিরাজ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় মহাশয় প্রেরিত

বার বছরের কন্যা, বিশবর্ষ বর।
বিবাহের পরিণাম—অতি শুভ কর॥
মন দিয়া শুন সবে মনুর এ উক্তি।
বাল্য বিয়া পুরুষের কভু নহে যুক্তি॥
বিবাহ উচিত, দেহে ধাতু পুষ্টি হ'লে।
চরক সুশ্রুত ইহা গিয়াছেন ব'লে॥

* * * *

পনর অথবা ষোল বছর বয়সে।
পুরুষ, বয়স্থা ভার্য্যা লভে বঙ্গদেশে॥
যে বয়সে পুস্তকেতে দিবে যুবা মন,
সে বয়সে দেখে যদি নারীর বদন,
লেখা পড়া আর তা'র ভাল নাহি লাগে।
চাঁদমুখ খানি শুধু অন্তরেতে জাগে॥

* * * *

পৌত্র মুখ দরশনে স্বর্গে হয় বাস।
বাপ মারি মনে এই আছয়ে বিশ্বাস॥
দু'বেলায় অন্ন যুটে, এ সঙ্গতি নাই।
পরের মেয়েকে তবু ঘরে আনা চাই॥
'নিজে শুতে ঠাই নাই, শঙ্করাকে ডাকে।'
বাঙ্গালীর এইরূপ বিয়ে হ'য়ে থাকে।
মধুর কি আছে বল বধূর মতন।
"রাঙ্গাবধূ" মামে, গামে শিশুর ক্রন্দন॥
"স্ত্রী ভাগ্যেতে ধন হয়" শাস্ত্রের বচন।
বউ না আনিলে ঘর চলে কি কখন?

* * * *

হ'ক্ ছেলে কাণা খোঁড়া, জ্ঞানহীন গাধা।
সে ছেলের বিবাহে নাহিক কিন্তু বাধা!
কন্যার পিতার পক্ষে মুখ্য উপদেশ—
"গৌরীদানে" মহাপুণ্য, মঙ্গল অশেষ।
চারা-গাছে, চারালতা জড়ায় উত্তম।

* * * *

অল্প বয়সেতে করি নারী সহবাস।
জড়বুদ্ধি যুবাদের ঘটে সর্ব্বনাশ॥
হীনবীর্য্য অলস হইয়া পড়ে ক্রমে।
চক্ষু হয় জ্যোতিঃশূন্য, স্মৃতি শক্তি কমে॥
লাবণ্যেতে ঢল ঢল সুন্দর চেহারা।
শিরাজালে পরিপূর্ণ, যেন টেঁসো মারা!
প্রেমারাধ্য প্রিয়তমা পত্নী দরশনে।
স্বামীর উল্লাস আর নাহি থাকে মনে॥
নেসা ঘোর হয় শেষে বল বাড়াইতে।
কেহ যান বৈদ্যগৃহে "মোদক" খুজিতে॥
কিশোরীর শরীর কি ভাল থাকে এতে?
কচি ছুঁড়ী, সাজে বুড়ী, ভরা যৌবনেতে॥
কলিতে ফুটিতে হয় অলির তাড়নে।
শুকায় প্রেমের মধু, প্রথম জীবনে॥

* * * * *

করিলে অপক্ক বীজ ভূমিতে বপন,
সে বীজ হইতে গাছ জন্মে কি কখন?
জমী-গুণে যদি হয় অঙ্কুর বাহির,
তরু কিন্তু তেজোহীন হবে জেনো স্থির।
প্রায়ই মরিয়া যায়, দু' একটা বাঁচে।
তরু সম নরজাতি, বুঝ সবে আঁচে॥
অপক্ক বীজের ফল দেখ কলিযুগে।
ক্ষীণাঙ্গ অল্পায়ু শিশু রোগে মরে ভুগে!
যে বিবাহে, জলাঞ্জলি দিয়া ভোগ সুখে,
পতি পত্নী উভয়ের দিন কাটে দুঃখে;
হেন বাল্য-বিবাহের পক্ষপাতী যাঁরা,
সমাজের শুভাশুভে দায়ী ন'ন তাঁরা।
চাও যদি দেশ-হিত, ওহে সুধীগণ!
বাল্য বিবাহের প্রথা কর নিবারণ॥
যদি বিয়ে দিতে প্রাণে থাকে খুব সখ।
দম্পতিরে কিছু কাল রাখিও পৃথক॥ ‡

‡ তারা চিহ্নিত স্থানের পাঠোদ্ধার করিতে পারা যায় নাই। কাগজের জীর্ণতা বশতঃ অনেক অক্ষর লুপ্ত ও অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

বাতশ্লেষ্মজ্বরের লক্ষণ—রোগী মনে করে যেন তাহার গায়ে ভিজা কাপড় জড়ান আছে, হাত পায়ের হাড়ে সূচ ফোঁটার মত বেদনা, ঘুম বেশী, সমস্ত দেহ ভারী, মাথা ধরা, নাক হইতে জলের মত শ্লেষ্মা স্রাব, কাসি, সন্তাপ, জ্বরের বেগ মধ্যম—অতি তীক্ষ্ণ নহে মৃদুও নহে।

পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরের লক্ষণ—মুখ বিবর শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত, মুখের স্বাদ তিক্ত, তন্দ্রা (যেন ঘুমাইয়া আছে), অজ্ঞানতা, কাসি, অরুচি, পিপাসা, কখন স্তব্ধভাব কখন ঘর্ম্ম, শ্লেষ্মা পিত্ত মিশ্রিত বমন বা দাস্ত, কখন দাহ, কখন শীত।

সন্নিপাত জ্বর।

সন্নিপাত শব্দের অর্থ মিলন—মিলন দুই বা বহু বস্তুর হইতে পারে। সন্নিপাত জ্বর বলিলে বায়ু, পিত্ত, কফ, এই তিনটী দোষ বিকৃত হইয়া যে জ্বর উৎপাদন করে সেই জ্বর বুঝাইয়া থাকে। এই জন্য সন্নিপাত জ্বরের নামান্তর ত্রিদোষজ জ্বর। তিনটী দোষের—বায়ু, পিত্ত, কফের প্রত্যেকে সমানভাবে কুপিত হইয়া জ্বর জন্মাইতে পারে, আবার তিনটীর মধ্যে কোন একটী বা কোন দুইটী "উল্বণ" অর্থাৎ অত্যন্ত কুপিত হইয়া জ্বর উৎপাদন করিতে পারে। আবার তিনটীর মধ্যে কোনটী হীনভাবে কোনটী বা মধ্যমভাবে কোনটী বা অধিকভাবে কুপিত হইয়াও জ্বর জন্মাইতে পারে। এইরূপে গণনা করিলে সন্নিপাত জ্বর ১৩প্রকার হয়। চরক বলিয়াছেন—

দ্ব্যুল্বণৈকোল্বণৈঃ ষট্ স্যুর্হীনমধ্যাধিকৈশ্চ ষট্।
সমৈশ্চৈকো বিকারাস্তে সন্নিপাতাস্ত্রয়োদশঃ।

দুইটী দোষ 'উল্বণ' অর্থাৎ অত্যন্ত কুপিত এবং একটী দোষ মন্দভাবে কুপিত এইরূপ গণনায় সন্নিপাতজ্বর তিনপ্রকার যথা—(১) বাতপিত্ত উল্বণ কফ মন্দ (২) বাতশ্লেষ্ম উল্বণ পিত্ত মন্দ (৩) পিত্তশ্লেষ্মা উল্বণ বায়ু মন্দ। একটী দোষ উল্বণ, অপর দোষদ্বয় মন্দ এই হিসাবে সন্নিপাত তিনপ্রকার যথা—(১) বায়ু উল্বণ পিত্তশ্লেষ্মা মন্দ (২) পিত্ত উল্বণ বায়ু কফ মন্দ (৩) শ্লেষ্মা উল্বণ বায়ুপিত্ত মন্দ। একটী দোষ হীন, একটী মধ্যম, অপরটী অধিক এইরূপ গণনায় সন্নিপাত জ্বর ছয় প্রকার যথা—(১) হীনবাত, পিত্ত মধ্যম শ্লেষ্মা অধিক (২) হীনবাত, কফমধ্য, পিত্ত অধিক (৩) হীন পিত্ত, কফ মধ্যম, বায়ু অধিক (৪) হীন পিত্ত, মধ্যম বাত, শ্লেষ্মা অধিক (৫) হীন কফ, বাত মধ্যম, পিত্ত অধিক (৬) হীন কফ, পিত্ত মধ্যম, বায়ু অধিক। এই ১২ প্রকার আর তিনটী সমানভাবে কুপিত সন্নিপাত এক প্রকার—এই ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত জ্বর।

জ্বরের সাধারণ কারণ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। দ্বন্দ্বজ ও সন্নিপাত জ্বরের যে কতকগুলি বিশেষ কারণ আছে সেগুলি নিম্নে লিখিত হইতেছে—

অধিক ভোজন, অল্প ভোজন, অসময়ে ভোজন, উপবাস, ঋতু পরিবর্ত্তন, ঋতু-ব্যাপত্তি অর্থাৎ যে ঋতুতে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষণ যে প্রকার হওয়া উচিত তাহা না হওয়া বা তাহার বিপরীত

ভাব—যেমন শীতে শীত ভাল না হওয়া কিম্বা শীতে গ্রীষ্ম হওয়া, যে গন্ধ গ্রহণ করা অভ্যাস নাই বা যাহা অহিতকর এরূপ গন্ধ আঘ্রাণ করা, যেমন—চামড়ার গুদামে কি এসিডের কারখানায় যাহার থাকা অভ্যাস নাই, তাহাকে যদি সেই স্থানে বাস করিতে হয় তাহা হইলে তাহার অসাত্ম্য-গন্ধঘ্রাণ ঘটিবে। স্থাবর বা জঙ্গম বিষ দ্বারা দুষ্ট জলপান, ঝরণার জলপানী, শুষ্ক শাক বা শুষ্ক মাংস ভোজন, অনুচিত ভেষজ-গন্ধঘ্রাণ অর্থাৎ উৎকট তীব্র ঔষধের গন্ধ আঘ্রাণ করা, মেঘাচ্ছন্ন শীতল দিনে পূর্ব্বদিকের বায়ু সেবন, অন্ন পরিবর্ত্তন অর্থাৎ যাহার যাহা ভোজন করা অভ্যাস কোন কারণে তাহার পরিবর্ত্তন।

উক্ত ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত জ্বরের যে সকল লক্ষণ প্রায় দেখা গিয়া থাকে সেইগুলি নিম্নে লিখিত হইতেছে। নিম্নোক্ত ত্রয়োদশবিধ সন্নিপাত জ্বর বিকৃতি-বিষম-সমবায়াবদ্ধ।

(১) **বাতপিত্ত উল্বণ কফমন্দ**—ভ্রম, পিপাসা, দাহ সর্ব্বাঙ্গ ভারি ও মাথায় অত্যন্ত বেদনা।

(২) **বাতশ্লেষ্ম উল্বণ পিত্তমন্দ**—শীতবোধ, কাস, অরুচি, সর্ব্বদা নিদ্রাভিভূতের মত ভাব, পিপাসা, দাহ রুক্ ও ব্যথা।

(৩) **পিত্তশ্লেষ্মা উল্বণ বায়ুমন্দ**—বমন, কখন শীতবোধ, কখন দাহ, তৃষ্ণা, অজ্ঞান ভাবে অবস্থিতি, হাড়ে বেদনা।

(৪) **বায়ু উল্বণ পিত্তশ্লেষ্মা মন্দ**—অস্থিসন্ধি, অস্থি এবং মস্তকে বেদনা, অসম্বদ্ধ বাক্য, সর্ব্বাঙ্গ ভারি, ভ্রম, গলা ও মুখের শুষ্কতা ও তৃষ্ণা।

(৫) **পিত্তউল্বণ বায়ুকফমন্দ**—মল ও মূত্রের সহিত রক্তনির্গম, দাহ, ঘর্ম্ম, তৃষ্ণা, বলহানি ও মূর্চ্ছা।

(৬) **শ্লেষ্মউল্বণ. বায়ু পিত্তমন্দ**—উত্থান উপবেশনাদি কার্য্যেও অনুৎসাহ, অরুচি, গাবমি, দাহ, বমন, কিছু ভাল লাগে না ভাব, ও গাঘোরা সর্ব্বদা তন্দ্রাভাব, ও কাসি।

(৭) **হীনবাত পিত্তমধ্যম শ্লেষ্মা অধিক**—তরুণ শ্লেষ্মস্রাব, বমন, আলস্য, তন্দ্রা, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য।

(৮) **হীনবাত মধ্যকফ পিত্ত অধিক**—চক্ষু ও মূত্র হরিদ্রা বর্ণ, দাহ, তৃষ্ণা, ভ্রম, অরুচি।

(৯) **হীনপিত্ত মধ্যকফ বাত অধিক**—মাথার বেদনা, কম্প, শ্বাস, প্রলাপ বমন, অরুচি।

(১০) **হীনপিত্ত মধ্যকফ বায়ু অধিক**—শীতবোধ, দেহভার, সর্ব্বদা তন্দ্রার ভাব, প্রলাপ অস্থি ও মস্তকে অতীব বেদনা।

(১১) **কফহীন বাতমধ্য পিত্ত অধিক**—পাৎলা দাস্ত, অগ্নি দুর্ব্বল, তৃষ্ণা, দাহ, অরুচি, ভ্রম।

(১২) **কফহীন পিত্তমধ্য বায়ু অধিক**—কাস, শ্বাস, তরুণ সর্দ্দি, মুখ শুষ্কতা, পার্শ্বে অত্যন্ত বেদনা।

(১৩) **সমানভাবে কুপিত বাতপিত্ত কফ**—কখন দাহ, কখন শীত, অস্থির সন্ধি ও মস্তকে বেদনা, চক্ষু হইতে জল পড়ে, চক্ষুর রঙ্ ঘোলাটে, বা রক্তবর্ণ, চক্ষু কোটরে প্রবিষ্ট, কর্ণে বেদনা ও চম্ চম্ রম্ রম্ শব্দ, গলার ভিতর যেন কি লাগিয়া আছে, তন্দ্রা, মোহ, প্রলাপ, কাস, শ্বাস, অরুচি, ভ্রম, জিহ্বা কাল পোড়ার মত এবং খরখরে, অত্যন্ত শ্রান্তাঙ্গতা অর্থাৎ অতিশ্রম করিলে অঙ্গ যেরূপ ক্লান্ত হইয়া থাকে সেইভাব, রোগীর যে শ্লেষ্মা উঠে তাহার সহিত রক্তমিশ্রিত থাকে, মাথা চালা, তৃষ্ণা, নিদ্রানাশ, বুকে বেদনা, ঘর্ম্ম, মূত্র মল অতি বিলম্বে অল্প পরিমাণে নির্গত হয়, রোগী বেশী রোগা হয় না, সর্ব্বদা গলায় বুকে শ্লেষ্মার শব্দ, গায়ে বোল্‌তা কামড়ানর মত দাগ দেখা যায়—এই দাগগুলি গোলাপী রঙের এবং গোল গোল, রোগী অল্প কথা বলে, নাড়ীভুঁড়িতে ও সিরায় সিরায় বেদনা, পেট ভার, বিলম্বে দোষের পরিপাক। কোন কোন ক্ষেত্রে—রোগী দিবাভাগে নিদ্রাচ্ছন্নের মত ও রাত্রিতে জাগ্রত থাকে, কোন সময় অতিরিক্ত ঘর্ম্মহয় কখন বা নাই। কখন হাঁসে কখন নাচে, কখন গান করে, কখন কট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া থাকে, কখন বিছানা আঁচড়ায়, কামড়াইতে যায়, কখন এরূপভাবে অঙ্গুলি সঞ্চালন করে যেন কিছু গুণিতেছে; পায়ের ডিমেতে, পার্শ্বে, মাথায় ও হাড়ে বেদনা, মূত্র ও মল কখন অল্প কখন বা অধিক, রোগীর মুখ তৈল মাখিলে যেরূপ চক্‌চকে হয় সেইরূপ দেখায় এবং স্বরভঙ্গ দৃষ্ট হয়।

সন্নিপাত জ্বরের কষ্টসাধ্যত্ব ও অসাধ্যত্ব।

শাস্ত্রকার বলিয়াছেন সন্নিপাতজ্বরের চিকিৎসা ঠিক্ যেন মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করা। সন্নিপাত জ্বর যেমনই হউক না কেন উহা কদাপি সুখসাধ্য নহে। সন্নিপাত জ্বরে যদি মলবদ্ধ থাকে, পাচক অগ্নির দুর্ব্বলতা হেতু পথ্য যদি পরিপাক না পায় এবং যদি উপরিকথিত লক্ষণের সমস্ত গুলিই প্রকাশ পায় তাহা হইলে সন্নিপাতজ্বর অসাধ্য হইয়া থাকে। আর যদি রোগীর মলবদ্ধ না থাকে, অগ্নির যদি তাদৃশ দুর্ব্বলতা না থাকে, সমস্ত লক্ষণ যদি প্রকাশ না পায়, তাহা হইলে কষ্টে আরাম হইয়া থাকে। সান্নিপাত জ্বর প্রায়ই পিত্তবৃদ্ধি, কফবৃদ্ধি বা বায়ুবৃদ্ধি হেতু যথাক্রমে ১০ দিনের দিন, ১২ দিনের কিম্বা ৭ দিনের দিন অত্যন্ত বাড়িয়া থাকে। কাহার বা এই সঙ্কট অবস্থা হইতেই মৃত্যু হয় কাহারও বা এই সঙ্কট অবস্থার পর ক্রমশঃ আরোগ্যের দিকে গতি দেখা যায়। কেন এইরূপ হয়? সান্নিপাতজ্বরের দোষের কার্য্যকে দুইভাগ করা হইয়াছে—ধাতুপাক আর মলপাক। যদি ধাতুপাক হয় তাহা হইলে রোগীর মৃত্যু হয়; আর যদি মলপাক হয় তাহা হইলে রোগী রক্ষা পায়। কি করিয়া ধাতুপাক, মলপাক বুঝা যায়? লক্ষণ দেখিয়া বুঝিতে হয়। ধাতুপাকের লক্ষণ—উত্তরোত্তর রোগের বৃদ্ধি, বলের হানি, গয়েরের সহিত রক্ত, মূত্রের সহিত শুক্রস্রাব ইত্যাদিরূপে ধাতুনির্গম এবং নিদ্রানাশ, বুকের স্তব্ধভাব,

মলমূত্রাদি রোধ, গাত্রশীত, মাথা বেশীভার, আহারের প্রতি নিতান্ত অনিচ্ছা, সর্ব্বদা ছটফট্ করা, এইগুলি ধাতুপাকের লক্ষণ। মলপাকের লক্ষণ—দোষ প্রকৃতিবৈচিত্র্য, জ্বর ও দোষের লঘুতা, ইন্দ্রিয়ের বিমলতা এইগুলি মলপাকের লক্ষণ। সন্নিপাত জ্বরের চিকিৎসায় তাড়াতাড়ি করা চলে না—সময় অপেক্ষা করিতে হয়। সাধারণতঃ সন্নিপাত রোগীর ২২ দিন পর্য্যন্ত বিশেষ আশঙ্কা থাকে। যে সকল সান্নিপাত জ্বর কষ্টসাধ্য এই সময়ের মধ্যে সেই সকল জ্বরে মলপাকের লক্ষণ ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়। পরে আরাম হইতে হয়ত ৪২।৪৪ দিন বা আরও অধিক কাল সময় লাগে। আর সান্নিপাতজ্বর অসাধ্য হইলে ঐ সময়ের মধ্যেই রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে এই জন্য এই ২২ দিন সন্নিপাত জ্বরের মর্য্যাদা বলিয়া অভিহিত হয়।

সন্নিপাতজ্বরের উপদ্রব।

যে সন্নিপাত জ্বরের যেরূপ মর্য্যাদা কথিত হইয়াছে সেই মর্য্যাদা কালের শেষভাগে যদি রোগীর কর্ণমূল ফুলিয়া উঠে তাহা হইলে সেই রোগীর জীবন সংশয় জানিবে। অতি অল্প রোগীই এই অবস্থা হইতে মুক্তি লাভ করে।

অভিন্যাস জ্বর।

প্রকুপিত বায়ু, পিত্ত, কফ বক্ষোদেশের স্রোতঃসমূহ আশ্রয় করে। আম রসের বৃদ্ধিতে দোষত্রয় আরও কুপিত হইয়া পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এবং হৃদয় আশ্রয় করিয়া মহাঘোর প্রবল অভিন্যাস জ্বর উৎপাদন করে। এই জ্বরে—রোগী চক্ষুতে দেখিতে পায় না, কর্ণে শুনিতে পায় না, গাত্রস্পর্শ করিলে জানিতে পারে না, গন্ধগ্রহণের শক্তি থাকে না বারম্বার মাথা চালে, বিড়বিড় করিয়া কি বলে বুঝা যায় না, এমনভাব প্রকাশ করে যেন ভিতরে কোন অব্যক্ত যন্ত্রণা হইতেছে, একপাশে থাকিতে চায় না এবং অতি অল্প কথা বলে। *

বাগ্ভট বলেন—সন্নিপাত, অভিন্যাস ও হতৌজাজ্বর একই জ্বরের নামান্তর মাত্র। সুশ্রুত অভিন্যাস ও হতৌজাজ্বরের লক্ষণ পৃথক্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রোগীর গাত্র অধিক উষ্ণ বা শীত হয় না, জ্ঞানের অল্পতা, বিস্মিতের ন্যায় ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ গলার আওয়াজ ভাঙ্গা ভাঙ্গা, বা বাক্‌রোধ, জিহ্বা, কর্কশ, কণ্ঠশুষ্ক, ঘর্ম্ম ও মূত্ররোধ, চক্ষু হইতে জলস্রাব, বিভ্রান্ত দৃষ্টি, আহারে দ্বেষ, শরীরের প্রভাহানি, ঘন ঘন শ্বাস পতন, বিছানা হইতে উঠিয়া যায় কখন বা স্থির থাকে এবং অসম্বদ্ধ কথা বলে। এইগুলি অভিন্যাস জ্বরের লক্ষণ। পিত্ত ও বায়ু বর্দ্ধিত হইয়া ওজো ধাতুক্ষয় করিলে রোগীর গাত্র শীতল ও জড়ভাবাপন্ন, অচেতনের মত শয্যায় পড়িয়া থাকা, সর্ব্বদা তন্দ্রার ভাব—জাগিয়া আছে কি ঘুমাইয়া আছে

* মাধব নিদানে অভিন্যাস জ্বরের এইরূপ লক্ষণ লিখিত হইয়াছে। অভিন্যাস জ্বরের এই লক্ষণ—চরক, সুশ্রুত, বাগ্ভট বা অধুনা যে গ্রন্থ হারীত নামে প্রচলিত তাহাতেও নাই। বিজয় রক্ষিতের টীকায় এই অভিন্যাস জ্বরেরব্যাখ্যা নাই।

হইলে বুঝা যায় না, অসম্বদ্ধ কথা বলে, রোমাঞ্চ হয়, সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন এবং উত্তাপ ও বেদনা অল্প ও যোনিরোধ জন্য জ্বর হইয়াছে জানিবে। এই অভিন্যাস জ্বর প্রায়ই অসাধ্য, কচিৎ কোন রোগী আরাম হয়।

আগন্তুজ্বর।

আগন্তুজ্বর চারিপ্রকার—অভিঘাতজ, অভিষঙ্গজ, অভিচারজ ও অভিশাপজ। শস্ত্র, লোষ্ট্র, চাবুক, কাষ্ঠ, মুষ্টি, করতল, পদতল, দণ্ডাদি, পশুদিগের নখরাদি, পতন কিম্বা অন্যপ্রকারে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া যে জ্বর হয় তাহাকে **অভিঘাতজ আগন্তুজ্বর** বলে। অভিঘাত জন্য বায়ু কুপিত হইয়া রক্ত দূষিত করে। আহত অঙ্গে ব্যথা, ফুলা এবং বিবর্ণতা দেখা যায়। অভিলষিত স্ত্রী বা ধনাদির কামনা, পুত্র ধনাদি বিনাশ জন্য শোক, ভয় এবং ক্রোধদ্বারা মানুষের মন অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইলে কিম্বা ভূতাবেশ জন্য যে জ্বর হয় তাহাকে **অভিঘাতজ আগন্তুজ্বর** বলে। অরণ্যস্থিত বিষবৃক্ষে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইলে, সেই পুষ্পপরাগবাহী বায়ু সেবন, কিম্বা অন্য কোন প্রকারে বিষ সংস্রব ঘটিলে যে জ্বর হয় কাহার মতে সেই জ্বরকেও অভিষঙ্গ জ্বর বলে। অনিষ্ট ইচ্ছা করিয়া বিপরীত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক রক্ত, সর্পাদি দ্বারা যে যাগ করা হয় তাহার নাম **অভিচার**। ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ, গুরু বা সিদ্ধপুরুষ অনিষ্ট অভিপ্রায় করিয়া যে বাক্য উচ্চারণ করেন তাহার নাম অভিশাপ। এই অভিচার ও অভিশাপ জন্য যে জ্বর হয় তাহাকে অভিচারজ অভিশাপজ আগন্তুজ্বর বলে।

এযাবৎ আমরা সে সকল জ্বরের উল্লেখ করিলাম সে গুলিকে—নিজ "জ্বর" বলে। অতঃপর আগন্তু জ্বরের হেতু লক্ষণ কথিত হইবে। নিজ শব্দের অর্থ আপনার, আগন্তু শব্দের অর্থ অতিথি বা "উট্‌কো"। জ্বর আবার "আপনার" বা "উট্‌কো" কি? বায়ু, পিত্ত, কফ কুপিত হইয়া যে জ্বর উৎপাদন করে তাহার নাম নিজজ্বর। এই জ্বর নিজ অর্থাৎ আপনার কেন না জ্বরের কারণ বায়ু, পিত্ত, কফ আমাদের শরীরের ভিতরের দ্রব্য বাহিরের কিছু নহে। আগন্তুজ্বরের কারণ কিন্তু এরূপ নহে—উহা সম্পূর্ণ বাহিরের বস্তু। আগন্তুজ্বরের কারণ নানা প্রকার আঘাত, অভিচার ও অভিশাপ। লগুড়াদি দ্বারা আহত হইলে কিরূপে জ্বর জন্মিয়া থাকে? আঘাত জন্য বায়ু কুপিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ আহতস্থানে ব্যথা, ফুলা ও বিবর্ণতার সহিত জ্বর উৎপাদন করিয়া থাকে। অতএব দেখাইতেতে যে আগন্তুজ্বরে লগুড়াদির আঘাত স্বাধীন ভাবে কিছু করিতে পারে না—এখানেও দোষসম্বন্ধ হইয়া তবে জ্বরোৎপত্তি হইয়া থাকে। যাহাকে আমারা নিজজ্বর বলিয়াছি তাহারও কারণ ত লগুড়াদির আঘাতের মতনই বাহিরের বস্তু। মনে কর আমার দধি ভোজন জন্য শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া শ্লেষ্ম-জ্বর হইল—এ স্থলে বাহিরের বস্তু দধিও লগুড়াদির মত স্বাধীন ভাবে কিছু করিতে পারিল না, কিন্তু শ্লেষ্মাকে কুপিত করিয়া জ্বরোৎপাদন করিল। তবে আগন্তুজ্বরে আর নিজ জ্বরে প্রভেদ হইল কি? উভয় জ্বরের এই মাত্র প্রভেদ যে আগন্তু জ্বরে প্রথমে ব্যথা, পরে দোষ

সম্বন্ধ ঘটে, আর নিজজ্বরে প্রথম হইতেই দোষ-সম্বন্ধ, ব্যথাপূর্ব্বকত্ব নাই। এই উত্তর অভিঘাতজ আগন্তুজ্বরের পক্ষ গ্রহণ করা যাইতে পারে কিন্তু আর তিন প্রকার (অভিষঙ্গ, অভিচার, অভিশাপ) আগন্তুজ্বরে আঘাত নাই, শুধু আঘাত কেন, বিশেষ কোন শারীর সম্পর্কই নাই— মনে কর তুমি কলিকাতায় আছ,—প্রয়াগে একজন তোমার প্রতি অভিচার কি অভিশাপ প্রদান করিল -আর তোমার অভিচার বা অভিশাপজ আগন্তু জ্বর হইল। আবার অভিষঙ্গ জ্বরে প্রথমে কামাদি কর্ত্তৃক মন দূষিত হয় পশ্চাৎ দোষ সম্বন্ধ ঘটিয়া জ্বর হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে আগন্তুজ্বরের হেতুর বিশিষ্টত্ব আছে কেবল হেতুর কেন চিকিৎসারও বিশেষত্ব আছে। চরক বলিয়াছেন—

হেত্বৌষধবিশিষ্টাশ্চ ভবন্ত্যাগন্তবোজ্বরাঃ।

আগন্তুজ্বরের চিকিৎসায় লঙ্ঘন উপদিষ্ট হয় নাই। আশ্বাস বাক্য, হর্ষণ, ঈপ্সিত বস্তু দান, হোম, স্বস্ত্যয়ন ও দানাদি দ্বারা আগন্তু জ্বরের চিকিৎসা করিতে হয়।

এক্ষণে উপরিউক্ত বিবিধ আগন্তুজ্বরের লক্ষণ কথিত হইতেছে।

অভিচার ও অভিশাপ জন্য আগন্তুজ্বরে সন্নিপাত জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পায়। যাহার নাম করিয়া আভিচারিক মন্ত্রোচ্চারণ করা হয়, প্রথমে তাহার মন অতি সন্তপ্ত হয় পরে দেহের সন্তাপ জন্মে, গায়ে ফোড়া হয়। তৃষ্ণা, ভ্রম, দাহ, মূর্চ্ছার সহিত প্রত্যহ জ্বর বাড়িতে থাকে।

কামজ জ্বরে মনের ঠিক্ থাকে না, সর্ব্বদা নিদ্রার ভাব, সর্ব্বকার্য্যে অনুৎসাহ এবং আহারে অনিচ্ছা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। **শোকজ জ্বরে**— রোগী নিরন্তর অশ্রুমোচন করে। **ভয়জ্বরে**— রোগীর বাক্য ও আচরণে ভীতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। **ক্রোধজে জ্বরে**—রোগী হস্ত বিক্ষেপ পূর্ব্বক ক্রোধ লক্ষণ প্রকাশ করে। **ভূতাবেশ** জন্য জ্বরে—রোগী মানুষের পক্ষে অনুচিত বাক্য ও আচরণের অনুষ্ঠান করে। **বিষ ভোজন** জন্য জ্বরে—মুখ সাদা হইয়া যায় এবং অতিসার, অরুচি, পিপাসা, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা ও মূর্চ্ছা লক্ষিত হয়। কামাদি জ্বরের যে লক্ষণ কথিত হইল, এই লক্ষণগুলি যে কেবল কামাদি জ্বররোগেই প্রকাশ পায় তাহা নহে কিন্তু কামাদি জন্য অন্যান্য রোগেও দেখা গিয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে আগন্তু জ্বরে প্রথমে মন বা শরীর ব্যথা প্রাপ্ত হয় পরে বাতাদির অন্যতম দোষ প্রকুপিত হইয়া জ্বর জন্মাইয়া থাকে। এক্ষণে আগন্তুজ্বরের সেই দোষ সম্বন্ধ কথিত হইতেছে। কাম ও শোক হেতু বায়ু, ক্রোধহেতু পিত্ত, এবং ভূতাভিষঙ্গ হেতু ত্রিদোষ কুপিত হয়।

শারীর ও মানসজ্বর।

বাতাদি প্রথমে শরীর দূষিত করিয়া যে জ্বর উৎপাদন করে তাহাকে **শারীর জ্বর** বলে। কামাদি প্রথমে মন দূষিত করিয়া যে জ্বর জন্মায় তাহার নাম **মানস**

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

১ম বর্ষ। বঙ্গাব্দ ১৩২৪—জ্যৈষ্ঠ। ৯ম সংখ্যা।

আয়ুর্ব্বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা।

(ঢাকা নগরীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় বৈদ্য-সম্মেলনে পঠিত।)

পূর্ণ-সৎ-চিৎ—আনন্দময়, বেদবক্তা দেবদেবেশ জগদীশ্বরের সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ চরণোদ্দেশে কোটি কোটি প্রণাম করিয়া, গুরুজনের চরণোদ্দেশে প্রণাম করিয়া, সমবেত সভ্য মহোদয় গণকে যথাযোগ্য প্রণাম, অভিবাদন ও অভিনন্দন করিয়া, আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য নিবেদন করিতেছি।

সমবেতসভ্য মহোদয়গণ, বহুদিনের সুপ্ত ভারত আজ আবার জাগিয়া উঠিয়াছে। স্বপ্নে জীব যেমন বাস্তব পদার্থকে অবাস্তব এবং অবাস্তব পদার্থকে বাস্তব দেখে, ভারত স্বপ্নযোগে এতদিন তাহাই দেখিতেছিল। স্বকীয় ভাণ্ডারের কাঞ্চনকে কাচ মনে করিয়া ভারত এতদিন পরকীয় ভাণ্ডারের কাচকে কাঞ্চন জ্ঞান করিতেছিল। এতদিনে সে স্বপ্ন টুটিয়াছে—সে ভ্রম ঘুচিয়াছে। কিন্তু এই এতদিনের সুপ্ততা—এতদিনের ভ্রম, আয়ুর্ব্বেদের যে কি অনিষ্ট করিয়াছে, তাহা কেমন করিয়া বুঝাইব। বুঝাইবার ভাষা জগতে আজিও সৃষ্টি হয় নাই। জগতের যাবতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের সম্রাট্ আয়ুর্ব্বেদ, আজ সর্ব্বস্বান্ত দীনহীন ভিখারী। কোটি কোটি প্রাণীর দেহ যাহার অনুগ্রহে রক্ষিত হইত, সে আজ স্বীয় দেহ রক্ষার জন্য পরের দ্বারস্থ। যাহার জ্ঞানালোকে একদিন জগৎ উদ্ভাসিত হইয়াছিল, সে আজ ঘোরতর অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন। এ দুঃখ প্রকাশের কি ভাষা আছে।

একথা কেন বলিতেছি? আজ এই সুখের দিনে—বঙ্গের বৈদ্য সম্প্রদায়ের এই প্রান্ত সম্মিলনের দিনে, হৃদয় সুখে পরিপ্লুত না হইয়া দুঃখে অভিভূত হয় কেন? হয়—আমরা পুণ্যময়, অনাদি, জগতের যাবতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক আয়ুর্ব্বেদকে তাচ্ছিল্য করিয়াছি বলিয়া, লোভে স্বার্থপরতায় অন্ধ হইয়া আমরা সর্ব্বভূতহিতে রত আয়ুর্ব্বেদকে নষ্ট প্রায় করিয়াছি বলিয়া, অবহেলায় আমরা এই জীবের জীবন শাস্ত্রকে কঙ্কালসার করিয়া তুলিয়াছি বলিয়া।

যে আয়ুর্ব্বেদের অষ্ট মহাশাখা, অসংখ্য প্রশাখা ফলপল্লবকুসুম সমৃদ্ধ হইয়া ভারতে কল্পতরু রূপে অধিষ্ঠিত ছিল, যাহার আশ্রয়ে থাকিয়া প্রাচীন ভারতবাসী জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, মেধা, প্রতিভা ও শৌর্য্যেবীর্য্যে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, যে আয়ুর্ব্বেদের অমৃতময় ফললাভের আকাঙ্ক্ষায় দেশদেশান্তর হইতে বিবিধ জাতি ভিক্ষুকরূপে ভারতে আসিয়াছিল, সেই মহামহিমমণ্ডিত আয়ুর্ব্বেদের অবস্থা এক্ষণে কিরূপ? বলিতে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যায়, অশ্রু দৃষ্টিরোধ করে, হৃদয় শতধা বিচ্ছিন্ন হইতে চায়—সে আয়ুর্ব্বেদ আর নাই, আছে কেবল তাহার অঙ্গহীন কঙ্কাল মাত্র। আয়ুর্ব্বেদ মহাতরু আজ বজ্রাহতবৎ বিশীর্ণ। সে অষ্টমহাশাখা নাই, প্রশাখা নাই, ফলপল্লব কুসুম নাই—কেবল দুই একটী শীর্ণশাখা কোনও রূপে জীবিত রহিয়াছে মাত্র।

একটি অপ্রিয় সত্যকথা বলিতেছি। দেখুন আমাদের আয়ুর্ব্বেদে চিকিৎসকের যে আদর্শ অঙ্কিত দেখিতে পাই সেই আদর্শের শল্যচিকিৎসক এমন কি কায়-চিকিৎসকও এক্ষণে আমরা ভারতে দেখিতে পাইতেছি না। আদর্শ চিকিৎসক ত দূরের কথা তাঁহাদের যোগ্য শিষ্য বলিয়া গণ্য হইবার অধিকারীই বা কয়জন আছেন? এই অবনতি কেন হইল ভাবিয়াছেন কি? এই জিজ্ঞাসার অনেক উত্তর দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু আমার বোধ হয়

প্রধান ও প্রথম কারণ—শাস্ত্র-বিরুদ্ধ অধ্যাপনা প্রণালী।

দেশে এখন যে প্রণালীতে আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপনা হইতেছে তাহা সম্পূর্ণ আর্ষমত বিরুদ্ধ। আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যার্থীর শিক্ষিতব্য বিষয় অতি সংক্ষেপে বলিতে গেলে তিনটী—রোগীর জ্ঞান, রোগের জ্ঞান এবং ঔষধের জ্ঞান। রোগীর শরীরে রোগ, আমাকে তাহার চিকিৎসা করিতে হইবে, সুতরাং রোগীর শরীরটী আমার ভাল করিয়া জানা আবশ্যক। এই জ্ঞান লাভের জন্য যে নরশরীরের রোগের চিকিৎসা করিতে হইবে সেই নরদেহচ্ছেদ করিয়া ধাতু আশয়াদির নিঃসংশয় জ্ঞান লাভ করিতে হইবে—ইহাই আয়ুর্ব্বেদ বক্তা ঋষির উপদেশ। কিন্তু আমরা আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যার্থিগণকে শারীরতত্ত্ব এইরূপে শিক্ষা না দিয়া কাব্যের মত আবৃত্তি করাইতেছি। তারপর রোগের জ্ঞান—রোগের জ্ঞানলাভ বিষয়ক পূর্ণ উপদেশ দিতে হইলে শাস্ত্র এবং প্রত্যক্ষ দর্শন দুইই প্রয়োজন। রোগজ্ঞান শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে আমরা অল্পমেধা ভিষগ্বর্গের জন্য অতি স্থূলভাবে সংগৃহীত সেই মাধবনিদান ভিন্ন আর কিছুই পড়াই না। মাধবনিদানে উল্লিখিত হয় নাই এমন অনেক সুভাষিত আকরগ্রন্থে বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহা বিদ্যার্থিগণের অবশ্য পাঠ্য। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, আজ পর্য্যন্ত ঐ সকল অনুক্ত সুভাষিত সংগ্রহ ও উপদেশের আকাঙ্ক্ষা কোন আয়ুর্ব্বেদ অধ্যাপকেরই হৃদয়ে জাগ্রত হইল না। বিজয় রক্ষিত বুঝিয়াছিলেন যে, মাধবে উপযুক্ত বিষয় অনুক্ত হইয়াছে, কিন্তু তিনি সেই অনুক্তের উল্লেখ কেবল গ্রন্থ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন মাত্র—প্রপূর্ত্তির অভিপ্রায়ে বলেন নাই। ইহা ত হইল গ্রন্থের কথা—প্রত্যক্ষ দর্শনের বিশেষ ব্যবস্থা কিছুই নাই। রোগের লক্ষণ শাস্ত্রে পড়িলেই যথেষ্ট হইল না, রোগীর শরীরে ঐ রোগ লক্ষণ প্রত্যক্ষ করিবার উপদেশ আছে। কিন্তু দেশে "আতুরাশ্রম" (In door Hospital) না থাকায় বিদ্যার্থিগণের সে শিক্ষা হইতেছে না। অধ্যাপকের গৃহে সমাগত রোগী দেখিয়া বিদ্যার্থিগণের

এই জ্ঞান সম্যক্ লাভ করা কেন সম্ভব নহে তাহা ভুক্তভোগী জানেন। অতঃপর ঔষধের জ্ঞানের কথা —ঔষধ শব্দে ঔষধের উপাদানের পরিচয়, গুণ, যোজনা ও ঔষধ নির্ম্মাণের জ্ঞান বুঝিতে হইবে। কিন্তু আমাদের আয়ুর্ব্বেদাধ্যাপকগণের গৃহে বিবিধ ভেষজ দ্রব্য সংগৃহীত না থাকায় এবং দেশে বৈদ্যক বৃক্ষ-বাটিকার অভাব হেতু, দ্রব্যদর্শন করাইয়া দ্রব্যগুণের অধ্যাপনার পরিবর্ত্তে কাব্যের মত দ্রব্যগুণের শ্লোক ছাত্রেরা আবৃত্তি করিতেছে। ইহার ফলে অনেক মহার্ঘ দ্রব্য একবারে অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে, অনেকের পরিচয়ে ঘোরতর সন্দেহ জন্মিয়াছে, কতকগুলি দ্রব্যকে নানালোকে নানানামে ব্যবহার করিতেছে। অধ্যাপনার দোষে ঔষধ নির্ম্মাণের জ্ঞানও ক্রমশঃ খর্ব্বতা প্রাপ্ত হইতেছে। দেশে রীতিমত "রসশালা" প্রতিষ্ঠিত না থাকায় পাকযন্ত্র ও রসৌষধ নির্ম্মাণের পটুতা প্রায় লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। আমার কোন বন্ধু কবিরাজ সেদিন বলিতেছিলেন তাঁহার নিকট কএক বৎসর থাকিয়া কোন ছাত্র দেশে গিয়া তাঁহাকে কজ্জলীর জার চাহিয়াছিল—অবস্থা ত এই। আয়ুঃশাস্ত্র-বক্তা ঋষিগণের উপদেশ মতে যদি আমরা, নরশরীরে প্রত্যক্ষ দর্শন পূর্ব্বক শারীর জ্ঞান, রোগি-শরীরে প্রত্যক্ষদর্শন পূর্ব্বক রোগবিনিশ্চয় এবং দ্রব্য-প্রদর্শন পূর্ব্বক দ্রব্যগুণের অধ্যাপনা করাইতাম, তাহা হইলে আজ আমাদের এই ব্রীড়াজনক দুরবস্থা উপস্থিত হইত না।

অবনতির দ্বিতীয় কারণ—গ্রন্থলোপ।

মহর্ষি আত্রেয়ের শিষ্যগণের প্রত্যেকেই এক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু এক চরকসংহিতা ভিন্ন আত্রেয় সম্প্রদায়ের আর কোন গ্রন্থই আমরা দেখিতে পাইতেছি না। ভগবান্ ধন্বন্তরির বারজন শিষ্য, বারখানি গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু এক সুশ্রুতসংহিতা ভিন্ন ধন্বন্তরিসম্প্রদায়ের আর কোন গ্রন্থই আমরা পাইতেছি না। তারপর এক সুশ্রুতসংহিতারই কত ভাষ্য, টিপ্পনী, টীকা রচিত হইয়াছিল। এগুলির কেবল নাম মাত্র আমরা শ্রুত আছি। চরকসংহিতার দ্বাদশজন টীকাকারের নাম আমরা জানিতে পারিতেছি, কিন্তু অধুনা কেবল চক্রপাণির টীকা মাত্র পাওয়া যায়, তাহাও প্রায় খণ্ডিত। ইহা ভিন্ন গজ, অশ্ব, বৃক্ষ প্রভৃতির পালন ও চিকিৎসা বিষয়ে কত গ্রন্থই রচিত হইয়াছিল। কত নিঘণ্টু, "দ্রব্যচিহ্নের" মত কত দ্রব্য পরিচায়ক গ্রন্থ, কত প্রাণিবিষয়ক পুস্তক, কত সূদশাস্ত্র, কত গন্ধশাস্ত্র, কত মদিরাসব প্রস্তুত বিষয়ক গ্রন্থ ও কত যে ধাতু-মণি-রত্নাদি পরীক্ষার পুস্তক রচিত হইয়াছিল এক্ষণে তাহার সংখ্যা করা অসম্ভব। গ্রন্থ জ্ঞানের ভাণ্ডার—গ্রন্থলোপে অজ্ঞানতার প্রসার অবশ্যম্ভাবী।

তৃতীয় কারণ—অযোগ্য-বিদ্যার্থী।

অধ্যাপক সুযোগ্য হইলে এবং অধ্যাপনার প্রণালী উৎকৃষ্টতর হইলেও যোগ্য পাত্রে যদি উপদেশ প্রদত্ত না হয়, তাহা হইলে ফল লাভের সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং কেবল অধ্যাপক বা অধ্যাপনা প্রণালীর দোষের প্রতীকার করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, ছাত্রের যোগ্যতার প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। রীতিমত সংস্কৃতজ্ঞ ছাত্র না হইলে আয়ুর্ব্বেদ সম্যক্

রূপে আয়ত্ত করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু এক্ষণে যে সকল ছাত্র আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করে তাহাদের মধ্যে শতকরা একটী ছাত্র ব্যাকরণ, কাব্য ও দর্শন শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন কি না সন্দেহ।

পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্য পালন এবং গুরুগৃহে বাস করিয়া যেরূপ নিয়মে বিদ্যাশিক্ষা করিবার রীতি ছিল, এখন আর সেরূপ প্রথা নাই। ছাত্রগণ ব্রহ্মচর্য্য পালন করে না এবং বিদ্যা-গ্রহণান্ত কাল পর্য্যন্ত গুরুগৃহে বাস করে না। যে ছাত্র বৎসরে তিন মাস গুরুগৃহে বাস করে, সে নয় মাস কাল স্বগৃহে অবস্থান করিয়া থাকে। এরূপ অবস্থানও স্বল্পকালের জন্য। ভগবান্ মনু ছত্রিশ বৎসর, অষ্টাদশ বৎসর, নয় বৎসর বা গ্রহণান্তিক কাল পর্য্যন্ত গুরুগৃহ বাসের সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে ছত্রিশ বৎসর স্থলে ছত্রিশ মাস, অষ্টাদশ বৎসর স্থলে অষ্টাদশ মাস, নয় বৎসর স্থলে নয় মাসও গুরুগৃহে অবস্থান করা হয় কিনা সন্দেহ! এইরূপ প্রথা বশতঃ ছাত্রদিগের আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। ব্রহ্মচর্য্য পালন ব্যতীত বুদ্ধি মেধার প্রাখর্য্য সাধিত হইতে পারে না এবং বুদ্ধি ও মেধার প্রখরতা ব্যতীত শাস্ত্রার্থে ব্যুৎপত্তি লাভ করা যায় না। এই জন্য আমাদিগকে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। আমাদের বাল্য বিবাহের দেশে অল্প বয়সে বিবাহ অনেক সময় অনিবার্য্য হইলেও বিবাহের পর গুরুগৃহে নিয়ত অবস্থান করিলে ব্রহ্মচর্য্যের কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

প্রকৃত পক্ষে আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি করিতে হইলে আমাদের কিরূপ উপায় অবলম্বন করা উচিত—এক্ষণে সেই বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে।

১। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

দেখিতেছি সংপ্রতি অনেক সুযোগ্য অধ্যাপক অন্নদান করিয়া ছাত্র রাখিতে অক্ষম, আবার অনেক অধ্যাপক কর্ম্মাতিব্যস্ত বলিয়া ছাত্রদিগের নিকট শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিবার অবসর প্রাপ্ত হন না। যোগ্যাকরণপূর্ব্বক অধ্যাপনার উপকরণ রাশি কাহারই গৃহে সম্যক্ সংগৃহীত নাই। যে সকল কর্ম্মাতিব্যস্ত চিকিৎসকের সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ অধ্যাপনার অবকাশ নাই, তাঁহারা সুবিধা-মত কিঞ্চিৎ মাত্র সময়ক্ষেপ করিয়া এবং যাঁহাদের অবকাশ আছে তাঁহারা প্রচুর সময়ক্ষেপ করিয়া যদি যোগ্যাকরণ সহকারে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন, তাহা হইলে দেশে আর বিজ্ঞ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের অভাব থাকে না। কিন্তু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ভিন্ন এবম্বিধ সম্মেলন নির্ব্বাহ হইতে পারে না। সুতরাং এক্ষণে দেশে আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে।

২। ছাত্র নির্ব্বাচন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছাত্র যথেষ্ট পাওয়া যায় না। তবে উপায় কি? আমাদের মতে সংপ্রতি দেশে যাহা আছে তাহা লইয়াই কাজ করিতে হইবে এবং ভবিষ্যতে যাহাতে অভিপ্রেত উচ্চ আদর্শের চিকিৎসক প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই প্রকৃত হিতৈষী কর্ম্মি পুরুষের পন্থা। যখন কলিকাতায় মেডিকেল কালেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন যদি প্রতিষ্ঠাতৃগণ ইংরাজি ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছাত্র না হইলে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করাইবেন না—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতেন, তাহা হইলে কি এদেশে পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যার এতশীঘ্র এতাদৃশ প্রচার

হইত। দেশের অবস্থানুসারে তখন তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়াই এখন তাঁহারা এত অভিমত, যোগ্য, ব্যুৎপন্ন ছাত্র পাইতেছেন যে স্থান, সঙ্কুলান হয় না। আমাদিগকেও বর্ত্তমানে এই পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। যতদিন দেশে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন বহুসংখ্যক ছাত্র না পাওয়া যাইতেছে, ততদিন বাঙ্গালা ভাষা শুদ্ধ করিয়া পড়িতে লিখিতে পারে এরূপ ছাত্র লইয়া তাহাদিগকে বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দিতে হইবে।

৩। যোগ্যাকরণ—শব ব্যবচ্ছেদাদি।

প্রত্যক্ষদর্শন ও শাস্ত্রদর্শন এই দুইয়ের মিলনেই জ্ঞানবর্দ্ধিত হয়। এই উপদেশটী স্মরণ রাখিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। শবব্যবচ্ছেদ চিকিৎসক মাত্রেরই বিশেষতঃ শল্য চিকিৎসকগণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। শব ব্যবচ্ছেদ করিয়া প্রত্যক্ষ দর্শনমূলক জ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে চিকিৎসায় বিশেষতঃ শল্য চিকিৎসায় নিপুণতা লাভ করিবার অন্য উপায় নাই। সেই জন্য বিদ্যালয়ে শবব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু কাজের সুবিধার জন্য এ সম্বন্ধে প্রাচীন মতের অনুবর্ত্তন না করিয়া বর্ত্তমান প্রণালীর অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

৪। গ্রন্থাগার।

পূর্ব্বে বিবিধ আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের প্রচার ছিল। এই গ্রন্থরাশি কি বাস্তবিকই বিলোপ প্রাপ্ত হইয়াছে? কি করিয়া এ প্রশ্নের উত্তর দিব। অদ্যাপি বৈদ্যক গ্রন্থ অনুসন্ধানের জন্য ভারত-বর্ষব্যাপী কোন আন্তরিক প্রযত্ন অনুষ্ঠিত হয় নাই। দেশের যে যে স্থানে প্রাচীন গ্রন্থরাশি অদ্যাপি সযত্নে রক্ষিত রহিয়াছে, সেই সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করা হয় নাই। সাহিত্য পরিষদের চেষ্টার পূর্ব্বে কে জানিত বাঙ্গলা ভাষায় এত বিচিত্র গ্রন্থরাশি আছে? সুতরাং সংস্কৃতজ্ঞ ভ্রমণকারী পণ্ডিত নিয়োগ করিয়া ভারতের ভিন্ন ভিন্ন দেশে সংস্কৃত বৈদ্যক গ্রন্থের অনুসন্ধান করা এবং প্রাপ্তগ্রন্থ বা তৎপ্রতি-লিপি সংগ্রহ ও মুদ্রিত করিয়া প্রচার করা আবশ্যক।

৫। বৈদ্যক বৃক্ষ-বাটিকা।

যোদ্ধার যেমন অস্ত্র প্রয়োগ কৌশল জানা আবশ্যক, চিকিৎসকেরও তদ্রূপ দ্রব্য-যোজনা-কুশল হওয়া প্রয়োজন। দ্রব্য প্রয়োগ করিতে হইলে দ্রব্যের পরিচয় আবশ্যক। দ্রব্যের পরিচয় আবার দ্রব্যের প্রত্যক্ষ-দর্শন-মূলক, প্রত্যক্ষদর্শন জন্য আবার দ্রব্যের একত্র সমাবেশ আবশ্যক। সুতরাং বৈদ্যকবৃক্ষ-বাটিকা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ হইতেছে।

ভারতের চিকিৎসা-শাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ মহার্হ ভৈষজ্য-রত্নে পরিপূর্ণ। অন্য কোন দেশের চিকিৎসা-শাস্ত্র এরূপ ভৈষজ্য-সম্পদের স্পর্দ্ধা করিতে পারে না। কেবল দেশীয় ঔষধের গুণে কত অনভিজ্ঞ লোকও কত দুরারোগ্য ব্যাধির প্রতীকার করিতেছে, ইহা আমরা নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা দিন দিন কত মহোপকারী দ্রব্য হারাইতেছি। চরক সুশ্রুতোক্ত সন্দিগ্ধ বা অপরিচিত দ্রব্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ভাব-প্রকাশ বা চক্রসংগ্রহোক্ত কত দ্রব্যই ক্রমশঃ আমাদের অপরিচিত হইয়া পড়িতেছে। আমরা বলাডুমুরকে ত্রায়মাণা বলিয়া এবং কোন অজ্ঞাতনামা কাষ্ঠ বিশেষকে প্রপৌণ্ডরিক বলিয়া প্রয়োগ করিতেছি। আজকাল কৃষিকার্য্যের বিস্তার হেতু বৃক্ষ গুল্মাদির বিলোপ সাধিত হইতেছে। দ্রব্যলোপের সহিত দ্রব্যের অপরিচয় অবশ্যম্ভাবী। অতএব দ্রব্যের

লোপাপত্তি নিবারণার্থ বৈদ্যক-বৃক্ষবাটিকা প্রতিষ্ঠার নিতান্ত প্রয়োজন। কেবল দ্রব্যের লোপাপত্তি নিবারণ নহে, দ্রব্যের গুণোৎকর্ষের জন্যও উদ্যান-প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা আছে। আমরা অধুনা যে সমস্ত বৃক্ষ, লতা, গুল্মাদি ঔষধার্থ ব্যবহার করিতেছি দীর্ঘকাল আরণ্য উদ্ভিদের সহিত জীবনসংগ্রামে তাহারা হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল হীনবীর্য্য ওষধি উদ্যানে সযত্ন-পালিত হইলে, তাহারা আবার তাহাদের পূর্ব্ববীর্য্য পুনঃ প্রাপ্ত হইবে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে উদ্ভিদ্ সংগ্রহ এবং সংগৃহীত উদ্ভিদ্গুলিকে তত্তৎ দেশের ভূমি, বায়ু ও প্রাকৃতিক অবস্থানুসারে রক্ষাপূর্ব্বক ভৈষজ্যোদ্যান প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

৬। দাতব্য চিকিৎসালয় ও রুগ্নাবাস স্থাপন।

চিকিৎসা শাস্ত্রের সজীবতা রক্ষা ও উন্নতি কল্পে যেমন সুচিকিৎসকের প্রয়োজন, দরিদ্রদিগের উপকার, ছাত্রদিগের সুশিক্ষা ও চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রসারের জন্য সেইরূপ দাতব্য চিকিৎসালয় ও রুগ্নাবাস (Out-door and In-door Hospital) আবশ্যক। দাতব্য চিকিৎসালয় ও রুগ্নাবাস প্রতিষ্ঠা না করিলে ছাত্রদিগের কার্য্যতঃ চিকিৎসা কৌশল শিক্ষার দ্বিতীয় কোন উপায় নাই। কলিকাতা মেডিকেল কলেজে এইজন্য বহুব্যয় করিয়া দাতব্য চিকিৎসালয় ও রুগ্নাবাস স্থাপন করা হইয়াছে। এখন বলিতে কেমন সঙ্কোচ বোধ হয়, কিন্তু সুদূর ভবিষ্যতে মেডিকেল কলেজের ন্যায় আমাদের ও ধাত্রীবিদ্যা, চক্ষুঃ চিকিৎসা প্রভৃতি শিক্ষা দিবার জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠা করিবার আবশ্যক হইবে।

অধ্যাপনাগত অনর্থ পরম্পরার প্রতিকারের জন্য প্রায় একবৎসর হইল কলিকাতায় অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দাতব্য চিকিৎসালয়, রসশালা, ভেষজ পরিচয়াগার যন্ত্র শস্ত্রাগার, গ্রন্থাগার, গবেষণা মন্দির এবং ক্ষুদ্র বৃক্ষ-বাটিকা ইতি মধ্যেই স্থাপিত হইয়াছে। বহু সংখ্যক ছাত্র সুযোগ্য অধ্যাপকদিগের নিকট সুশিক্ষা লাভ করিতেছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রত্যেক বঙ্গবাসীকে বিশেষতঃ প্রত্যেক চিকিৎসককে এই সুমহৎ মঙ্গলকর অনুষ্ঠানে যোগ দান করিতে অনুরোধ করি। সকলে একত্র মিলিয়া কার্য্য ক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে আমাদের একের ত্রুটি অপরের দ্বারা শোধিত হইবে, একের অজ্ঞাত বিষয়ে অপরের নিকট উপদেশ পাওয়া যাইবে, একের পরিশ্রমের ফল অপরে লাভ করিবে, সকলের জ্ঞান মিলিত হইয়া সকলের হৃদয় আলোকিত করিবে। নব প্রতিষ্ঠিত এই শিশু বিদ্যালয়টীকে সম্পূর্ণাঙ্গ করিয়া আমরা ক্রমে বঙ্গের দেশে দেশে এইরূপ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া আয়ুর্ব্বেদের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিব।

বর্ত্তমান যুগে আবার ভারতবাসী লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদের উদ্ধার কল্পে যত্নবান্ হইয়াছে। ভারতের মোহ নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে বলিয়া, বহুযুগের নিদ্রিত ভারতকে আবার জাগরিত দেখিয়া প্রাণে আশার সঞ্চার হয়, হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়। আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে এই যে ভারত ব্যাপী চেষ্টা—ইহার ফল একদিন অবশ্যই ফলিবে। কিন্তু এই মহান্ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ভারতীয় চিকিৎসক মণ্ডলীর একপ্রাণতা চাই, প্রাণপণ চেষ্টা চাই, সাধারণের

সহানুভূতি চাই, ভারত সম্রাট ও ভারতীয় রাজন্যবর্গের সহায়তা চাই। এই সকল প্রার্থনার বিষয়ের সংযোগ ঘটিলে আবার জীর্ণ শীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ অষ্ট-শাখা-সমন্বিত মহাতরুতে পরিণত হইয়া ছায়া ও ফল দানে ভারতবাসীকে ধন্য করিয়া তুলিবে। আবার আমরা বিগত যুগের বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, শৌর্য্য, বীর্য্য ফিরিয়া পাইব।

কিন্তু সাধনা চাই, একাগ্রতা চাই, শত শত জীবন উৎসর্গ করা চাই—তবে এই মহা সাধনায় সিদ্ধি লাভ হইবে। প্রাচীন কালে মহর্ষিগণ বহু সাধনার ফলে আয়ুর্ব্বেদকে মর্ত্তে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, কোন জাতি কোন কালে কঠোর সাধনা ভিন্ন কোন বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। আমাদের স্বার্থকে শবরূপে পরিণত করিয়া শবসাধনা করিতে হইবে। দ্বেষ, হিংসা, বিদ্রূপ কত মায়াময়ী বিভীষিকা দেখাইবে, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিলে চলিবে না।

হে সমবেত সুধীবৃন্দ, উপসংহারে বিনীত নিবেদন এই যে, আর কথায় নয় কাজে দেখাইতে হইবে। আয়ুর্ব্বেদ সম্মেলন নানা স্থানে অনেক হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঐ সকল সভার উদ্দেশ্য, সিদ্ধির পথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে? চিরদিন কি আমরা এইরূপ বাক্যচ্ছটায় আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধার করিব? সভাই কি চিরদিন আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত হইবে? বাক্যের সময় আর নাই এখন কার্য্যের সময় আসিয়াছে। আসুন আমরা একযোগে কার্য্য ক্ষেত্রে অগ্রসর হই—অবশ্যই সিদ্ধি লাভ হইবে।

প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর অধ্যাপনা আরম্ভ হইয়াছে। অধ্যাপকগণের নাম—

কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ কবীন্দ্র।

" " যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন, এম, এ, এম, বি।

" শ্রীযুক্ত অমিয় মাধব মল্লিক এম, বি,

" " সুরেন্দ্র নাথ গোস্বামী বি, এ, এল, এম্, এস।

" " বিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ।

" " সুবেন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ।

" বামাচরণ চট্টোপাধ্যায় এম, এ।

" দ্বিজেন্দ্রকুমার মজুমদার এম, এ।

" ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী।

প্রথম বার্ষিক শ্রেণী।

বনৌষধি-বিজ্ঞান, দ্রব্যগুণ, রসশাস্ত্র, অঙ্গবিনিশ্চয়-বিদ্যা, শারীরবিজ্ঞান ও এই সকল অধীত অংশের যোগ্যাকরণ। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উন্নীতকরণের পরীক্ষা।

দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী।

পরিভাষা ও রসরত্নাদি-তত্ত্ব, ঔষধ প্রস্তুত শিক্ষা, অঙ্গবিনিশ্চয়-বিদ্যা (তদ্বিদ্যসম্ভাষা [পাঠ চাওয়া] ও ব্যবচ্ছেদ পূর্ব্বক মৃতকপরীক্ষাসহ) শারীর-বিজ্ঞান, রোগবিনিশ্চয়। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উন্নীতকরণের পরীক্ষা।

তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী।

দ্রব্যগুণ, ঔষধ প্রস্তুত শিক্ষা, রোগবিনিশ্চয়, কায়চিকিৎসা, শল্যতন্ত্র প্রসূতিতন্ত্র, (ধাত্রীবিদ্যা), আরোগ্যশালাকর্ম্মাভ্যাস, কৌমারভৃত্য। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে উন্নীত-করণের পরীক্ষা।

চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী।

কায়-চিকিৎসা, শল্যতন্ত্র, (যন্ত্রশস্ত্রকর্ম্মাভ্যাসসহ) শালাক্য-চিকিৎসা, উভয় তন্ত্রগত তদ্বিদ্যসম্ভাষা, ব্রণবন্ধন শিক্ষা, নাড়ীবিজ্ঞান, স্বস্থ-তন্ত্র, অগদতন্ত্র, আরোগ্যশালাকর্ম্মাভ্যাস। সংস্কৃত বিভাগের বুৎপত্তিলাভের সাধারণ প্রশংসাপত্র ও বাঙ্গালা বিভাগের চরম পরীক্ষা।

পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণী।

নাড়ীবিজ্ঞানের বিশেষ আলোচনা, দ্বাদশমাস আরোগ্যশালাকর্ম্মাভ্যাস, কায়-চিকিৎসা ও শল্যশালাক্য তন্ত্রের প্রত্যক্ষদর্শনমূলক বৃদ্ধবৈদ্যোপদেশ। চরম পরীক্ষান্তে উপাধিদান।

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পাঠ্য পুস্তকরূপে গৃহীত হইল—

১। চরক-সংহিতা ২। সুশ্রুত-সংহিতা ৩। অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহ ৪। অষ্টাঙ্গহৃদয় ৫। মাধব-নিদান ৬। হারীত সংহিতা ৭। সিদ্ধযোগ ৮। চক্রদত্ত ৯। ভাবপ্রকাশ ১০। শাঙ্গর্ধর ১১। রসরত্ন-সমুচ্চয় ১২। রসেন্দ্রসার-সংগ্রহ ১৩। বঙ্গসেন ১৪। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু ১৫। রাজনিঘণ্টু ১৬। বনৌষধিদর্পণ ১৭। নাড়ীবিজ্ঞান ১৮। পরিভাষাপ্রদীপ ১৯। পথ্যাপথ্যবিনিশ্চয়।

শিশুর প্রবাহিকা (আমাশয়) ও রক্ত প্রবাহিকা চিকিৎসা।

(ঠাকুর মা জপে নিযুক্তা)

ঠা। নারায়ণ, নারায়ণ, দয়া কর দয়াল ঠাকুর আমার। জীবনের সাধ আমার পূর্ণ হয়েছে, এখন রাঙা পায়ে স্থান দাও।

(লীলার প্রবেশ)

লী। ঠাকুমা, কি করছ?

ঠা। জগন্নাথ, জগদীশ, জগদ্‌বল্লভ, সকলই নিয়েছ, আর প্রাণ টুকু কেন বাকী রাখ ঠাকুর।

লী। (উচ্চবাক্যে) ও ঠাকুমা, আমি এসেছি।

ঠা। কে লীলা, আয়, দিদি আয়।

লী। ঠাকুরকে বল্‌ছিলে কি ঠাকুমা?

ঠা। এই বল্‌ছিলাম, সংসার থেকে কাছে ডেকে নিতে ভাই।

লী। কেন ঠাকুমা, তোমার কি কষ্ট হয়?

ঠা। কষ্ট কেন হবে দিদি। রোগ ত গাছের ফল নয় যে, পথে চল্‌তে চল্‌তে টুপ করে মাথায় প'ড়বে। মানুষ নিজের পাপে রোগে ভোগে, আমি তেমন পাপও করিনি, রোগও শরীরে নেই। তারপর, সোণার চাঁদ তোমরা আমার বেঁচে থাক,—আমার কষ্ট কিসের?

লী। তবে যেতে চাইছ কেন ঠাকুমা?

ঠা। যমরাজা যে শমনের পর শমন দিচ্ছে ভাই। রাজার হুকুম অমান্য করা কি ভাল?

লী। শমন কি ঠাকুমা?

ঠা। প্রথম শমন, চুল পেকে শোণের নুড়ি হয়েছে, তারপর, বত্রিশ দাঁতের একটীও খুঁজে মেলে না, তারপর, চোখেও যেন একটু কম দেখি। কাণেও যেন খাট হয়েছি।

লী। যাই হ'ক দিদিমা, তুমি আছ,—যেন পাহাড়ের আড়ালে আছি। তুমি না থাক্‌লে ছেলে পিলেগুলো কি বাঁচাতে পারতাম? তুমি না থাক্‌লে যে ছেলে পিলে কি ক'রে বাঁচা'ব—সেই ভয়ে অস্থির হই।

ঠা। (হাসিয়া) আঃ পাগলী, বাঁচা'বার কর্ত্তা কি আমি!—সবই সেই ভগবানের হাত।

লী। সে তুমি যাই বল ঠাকুমা, দেখে-শুনে আমার বিশ্বাস হয়েছে,—চিকিৎসার দোষে পরমায়ু থাক্‌তেও রোগী মরে। ভগবান কর্ত্তা সেটা ঠিক, তবে মরা-বাঁচায় মানুষের হাতও কিছু আছে।

ঠা। তা এটা মিথ্যে ব'লিস্‌নি লীলা। সকল জিনিষের মত যত্ন করে রাখ'লেই শরীর বেশী দিন টেঁকে, আর অত্যাচার কর্‌লে শীঘ্র নষ্ট হয়।

লী। সেই জন্যেইত বল্‌ছি, তুমি যত দিন আছ,—পাহাড়ের আড়ালে আছি।

ঠা। তা, আমি আর কতদিন থাকব দিদি। আর তুমিও ত এখন পাক্কা-গিন্নি হয়ে দাঁড়িয়েছ। ঠাকুমার পুঁজিপাটা শেষ যা' আছে,—তা' শিখে নাও।

লী। আমার হয়েছে ঠেকে-শেখা আবার ঠেকিছি ব'লে শিখতে এয়েছি।

ঠা। কেন আবার কি ঠেকলি ?

লী। তা বেশ। ছোট খোকার রক্তামাশা, আর বড় খোকার শাদা আমাশা।

ঠা। তাইত—তোর ছেলে পিলের নিত্যি অসুখ দেখতে পাই। কেন এমন হয়, বল দেখি ?

লী। তা কি ক'রে বল্‌ব ঠাক্‌মা।

ঠা। তবে এতদিন আমার কাছে শিখলি কি ? সব কি ভস্মে ঘি ঢালা হ'ল। এই একটু আগে বল্‌লাম, যে, রোগ গাছের ফল নয়, নিজের দোষে রোগ হয়।

লী। তা কি জানি ঠাক্‌মা, আমিত কিছু বুঝতে পারি নে।

ঠা। আচ্ছা ওরা সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত যা খায়,—যা করে,— সব বল।

লী। সকালে উঠে প্রথমেই তোমার নাত্‌জামায়ের সঙ্গে চা, মাখন্, বিস্কুট আর কোন কোন দিন ডিম সিদ্ধ খায়। তারপর—

ঠা। থাম্। একে ত চা আমাদের দেশের উপযোগী নয়। তারপর, শীতকালে বেশী বয়সের মানুষে বরং খেতে পারে, কিন্তু ছেলেদের পক্ষে ওটা বড় অনিষ্টকর। চা খাওয়াটা, আগে বন্ধ কর।

লী। আচ্ছা তাই কর্‌ব।

ঠা। তারপর, মাখন ছেলেদের পক্ষে খুব উপকারী বটে, কিন্তু সে টাটকা মাখন। লোকনাথ বদ্দি বল্‌ত, যে, বাসি-মাখন বড্ড অপকারী। সেটা ঘি করে খাওয়াই ভাল।

লী। আচ্ছা, আমি বাসি কখন খেতে দেবো না। পারি ত রোজ টাটকা মাখন ক'রে দেবো, ঘরেত ১০।১২ সের দুধ হয়। কিন্তু একটা কথা ঠাক্‌মা, বাসি মাখনত সাহেব-সুবো আর বাবুরা খায়, তবে তাদের রোগ হয় না কেন ?

ঠা। রোগ হয় না,—তোমায় কে বল্লে ? কিন্তু আজ কুপথ্যি করলে কালইত রোগ হয় না। আগেকার লোকে যেমন বলবান আর দীর্ঘজীবি হ'ত, আজ-কালকার লোকে যে এত অল্পজীবী হয় আর রোগে ভোগে, অন্যান্য দোষের মধ্যে খাবার দোষ তার একটা প্রধান কারণ। যাক্ তারপর, তারা আর কি খায় বল।

লী। তারপর দুজনকেই একটু করে দুধ দিই।

ঠা। কতক্ষণ পরে ?

লী। চা খাবার আধ ঘণ্টা পরে। বড় খোকা সেই সঙ্গে বাজারের দু' একখানা কচুরি সিঙ্গাড়া, কি জিলিপি খায়।

ঠা। না, তা' করোনা। ছেলেদের খাবার দেবার একটা নিয়ম ক'রো। বয়স বুঝে তিন চার ঘণ্টা অন্তর খেতে দিবে। তার চেয়ে শীঘ্র শীঘ্র খেলে অসুখ হয়। তারপর কি খায় বল।

লী। তারপর, বেলা নয়টার সময় দুজনকেই পোরের ভাত দিই। ছোট খোকাকে দুধের সঙ্গে চট্‌কে, আর বড় খোকাকে মাছের ঝোল দিয়ে ঐ ভাত দেওয়ার ব্যবস্থা করি।

ঠা। তা' বেশ। কিন্তু তা'র আগে দু'জনকেই অন্য কিছু না দিয়ে সকালে একবার একটু ক'রে দুধই দিও, অন্য কিছু দিও না।

লী। কিন্তু তারা যে তাতে ভোলে না।

ঠা। না ভোলে একটু বেদানা, দুটো আঙ্গুর, দুটো খেজুর, দুখানা বাতাসা, কি এমনই কিছু তার সঙ্গে দিও।

লী। বাজারের খাবার কিছু দেব না?

ঠা। একেবারেই না। তোর ঠাকুর-দাদার এক বন্ধু—তাঁর বাড়ী ভাটপাড়ায়, তিনি বাজারের খাবার খাওয়াকে বজ্রাঘাত বলতেন। বাস্তবিকই তাই। জঘন্য ঘি-ময়দায় প্রস্তুত ধুলো-বালি-মিশান, বা হয়ত হালুই-কারের কোন ছোঁয়াচে রোগ আছে—তার হাতে প্রস্তুত। সে গুলো বিষ বৈকি। কাজেই তিনি যে বজ্রাঘাত বল্‌তেন, সেটা মিথ্যা নয়।

লী। কিন্তু ঠাক্‌মা, এই খাবার খেয়ে শত শত লোক'ও ত বেঁচে রয়েছে।

ঠা। আফিন-সেঁকোর মত বিষ খেয়েও ত কত লোকে বেঁচে থাকে ভাই। তা' ব'লে কি বুঝতে হবে, যে আফিন-সেঁকো আমাদের উপকারী!

লী। না, তা নয়।

ঠা। তাতো নয়ই। বেশীর ভাগ বুঝতে হবে যে, ঐ সব জিনিষ খায় ব'লে, তাদের পরমায়ু ক'মে যায় আর রোগ হয়। ভগবান্ মানুষের শরীরকে অতি আশ্চর্য্যভাবে নির্ম্মাণ ক'রেছেন ব'লে, তাদের সদ্যোমৃত্যু হয় না। যাক্ সে কথা, তার পর ওরা কি খায় বল।

লী। তার পর দশটার সময় তোমার নাতজামাই খেতে বসেন—দুজনেই তাঁর পাশে গিয়ে বসে। আর এটা-সেটা তরকারী, মাছ, মাংস—যেদিন যা হয়, একটু একটু খায়।

ঠা। খবরদার আর এমন কাজ না হয়। কচি-শিশু দুধ ছেড়ে সবে ভাত-তরকারী খেতে শিখেছে। তা'রা কি খুব মসলা দেওয়া নানা রকম তরকারী-মাছ-মাংস হজম করতে পারে? তাদের পেট এখনও ততটা পোক্ত হয় নি। সেই জন্যে বড় বড় মানুষে যা হজম ক'রতে পারে, তা ছেলেরা কখন পারে না এবং সেই জন্যে ও সকল জিনিষ তাদের দেওয়া উচিত নয়।

লী। আচ্ছা ঠাকমা আমি তাই করব। কিন্তু অভ্যাস হয়ে গেছে ব'লে ছেলেদের আট্‌কে রাখা একটু দায় হবে।

ঠা। তা হোক লীলা। প্রাণ যাওয়ার চেয়ে, এমন আটকে রাখা ঢের ভাল। তার পর কি হয় বল।

লী। তার পর আমার শ্বশুর খেতে বসেন প্রায় ১১॥ টা ১২ টার সময়। সে সময়েও খোকারা তাঁর কাছে গিয়ে বসে আর তাঁর সঙ্গে কিছু কিছু খায়।

ঠা। উটিও বন্ধ ক'রে দিতে হবে লীলা। বড় মানুষ আর ছোট মানুষ—দুয়ের যেমন বয়স আলাদা, ভাবনা আলাদা, কার্য্য-ক্ষেত্র আলাদা, তেমনি তাদের খাবার ও আলাদা। আমরা ভালবাসায় ভুলে যদি বুড়োর বা যুবোর খাবার ছেলেকে দিই, সেটা ছেলের অপকার করা বই উপকার করা হয় না।

লী। তা' ঠাক মা, তুমি যা ব'ল্‌ছ এখন আমি তাই করবো।

ঠা। তা হ'লে এখন বুঝতে পার্‌লি ত কেন তোর ছেলেদের রোগ হয়।

লী। হ্যাঁ বুঝেছি ঠাকমা,—রোগ কেবল খাওয়ানর দোষে, এখন থেকে সেটা আমি সব শুধরে নেব। বাজারের খাবার দেবোনা, ওঁদের সঙ্গে খেতে দেব না, চা খেতে দেব না, আর ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াব। এখন এ দুটোর আমাশা আর রক্তামাশা কি করে ভাল হয় বল।

ঠা। তোর ছেলেদের পেটের অসুখের সময় যে সব বলেছিলাম, তা মনে আছে?

লী। খুব মনে আছে ঠাক্‌মা। তোমার

সেই পথ্যি আর টোটকা ওষুধ যে কত রোগী ভাল ক'রেছি তার ঠিক নেই।

ঠা। যাক্ সে কথা, এখন তোর ছেলে-দের অসুখের কথা বল্।

লী। ছোট খোকার আজ ৪।৫ দিন হল অসুখ ক'রেছে। প্রথমে সাদা আমাশয় হয়েছিল, দুইদিন পরে রক্ত দেখা দিলে। প্রথম দু'দিন ২৫।৩০ বার ক'রে বাহ্যে হ'ত—মল আর আম মিশান। তা'রপর থেকে ১৫।১৬ বার ক'রে বাহ্যে করে—মল, আম আর রক্ত। কোন কোন বার শুধু আম আর রক্ত।

ঠা। বাহ্যে অনেক হ'য়ে গেছে ত?

লী। হাঁ বোধ হয় ২। ৩ মালসা।

ঠা। শোন, ছোট খোকাকে ছানার জল, ছাগল দুধ, মুতোর সঙ্গে জল দিয়ে সিদ্ধ ক'রে তার সঙ্গে বার্লি রেঁধে দিবি।

লী। কি রকম করে সিদ্ধ করব?

ঠা। এক পোয়া ছাগল দুধ, এক পোয়া জল আর ৮।১০টা মুতো থেঁতো করে এক সঙ্গে সিদ্ধ কর'ব, জল ম'রে গেলে নামিয়ে ছেঁকে নিবি। তার পর তার সঙ্গে জল মিশিয়ে বার্লি সিদ্ধ করবি। রাঁধা শেষ হলে যেন তাতে দুধের সিকি আন্দাজ জল থাকে।

লী। সব কি একবারে খাওয়াব?

ঠা। না দু'বারে দিবি। দেখিস্ যেন খারাপ না হয়ে যায়।

লী। খারাপ হ'ল কিনা কি করে বুঝব?

ঠা। খারাপ হলে বদ্ রং হবে, বদ্ গন্ধ হবে। ছ্যাকড়া-ছ্যাকড়াও হতে পারে।

লী। দুধ কতটুকু দেব?

ঠা। সহজ বেলায় যা' খায়, তার অর্দ্ধেক দিবি। সঙ্গে সঙ্গে দেখ্‌বি যে দুধ, হজম হচ্ছে কি না। মল দেখে দুধ হজম হচ্ছে কিনা, কি করে বুঝতে হয় তা মনে আছেত?

লী। হাঁ মনে আছে। (পৌষ সংখ্যা ১৪৫ পৃষ্ঠা)

ঠা। দুধ হজম হচ্ছে না মনে হলে আরও কমাতে হবে।

লী। আর বাড়াব কখন?

ঠা যেমন অসুখ কমতে থাকবে, ছেলের ক্ষিদে বাড়বে—অমনি একটু একটু করে বাড়াবি।

লী। আর কি দেব?

ঠা। বার্লির বদলে শঠীর পালো, কি একটু এরারুটও দিতে পার। আর অন্য জিনিষের মধ্যে দাড়িমের রস, মিষ্টি কমলা-লেবুর রস, কচি বেলপাতার রস চিনি মিশা'য়ে, কাপড়ে ছেঁকে কাদার মত ক'রে দিতে পার।

লী। বেলের মোরব্বা দিতে পারি?

ঠা। ও না দেওয়াই ভাল। একত ওতে উপকার নেই, বেলের যেটা উপকারী, সেই কাথটা সিদ্ধ ক'রে ফেলে দেয়। থাকে বেলের ছিবড়ে আর চিনি। তারপর বড় বড় বেলের মোরব্বা করে। কিন্তু বেলের কচিই উপকারী।

লী। তারপর, আর কি বল?

ঠা। রক্তামাশয়ে নাড়ীতে ঘা হয়। সেই জন্যে খাবার এমন দিতে হয়, যা'তে মল খুব কম জন্মায়। যে সব জিনিষ শক্ত, যা'তে ছিবড়ে আছে—এমন জিনিষ দিতে নাই, এটা খুব মনে রাখা চাই।

লী। তা' খুব রাখব। এখন ওষুদ কি দেব বল?

ঠা। দাঁড়া,—পথ্যির কথা আগে শেষ করি, তারপর ব'লব। সকল রোগেই

সুপথ্যির দরকার, কিন্তু রক্তামাশয়ে খুব বেশী। একটু কুপথ্যি হ'লেই রোগ তিল থেকে তাল হ'য়ে উঠে। তারপর ভাল হবার মুখে খুব সাবধান হওয়া চাই। একটু এদিক-ওদিক হ'লেই রোগ পাল্‌টে আসে।

লী। ভাল হবার মুখে কি রকম করবো?

ঠা। যত দিন রক্ত বন্ধ না হয়, তত দিন যা 'বলেছি তা ছাড়া আর কিছু নয়। রক্ত বন্ধ হওয়ার পরেও ৩।৪ দিন ঐ পথ্যি, তবে মাত্রাটা একটু বেশী দিবি এই মাত্র। এই সময়ে কিন্তু ছেলে সামলান দায় হবে, খুব ক্ষিদে হবে কিনা। কেবল খাই-খাই করবে, ভাত আর খাবারের জন্যে জুলুম করবে, সুবিধে পেলে চুরি ক'রে খাবে। কাজেই খুব চোখে-চোখে রাখবে, আর রোজই "কাল ভাত দেব" বলে ভুলিয়ে ৩।৪ দিন কাটিয়ে দিবি। এই সময় মল শক্ত হবে, হয়ত কোন কোন দিন দাস্ত বন্ধও যেতে পারে। তখন খুব পুরাণ মিহি চালের ভাত আর ছোট কৈ, মাগুর, শিঙ্গি মাছ ও কচি কাঁচকলার ঝোল দিবি। সমস্ত কাদার মত ক'রে চট্‌কে খাওয়াবি। ভাত একবারে বেশী নয়,—প্রথম দিন ১ তোলা চালের, তার পর দিন দেড় তোলা চালের,—এমনি করে বাড়াবি। রক্ত বন্ধ হ'বার পনর দিন পরে তবে পেট ভ'রে ভাত দিবি।

লী। তাই ক'রবো। এখন ওষুদ কি দেব বল?

ঠা। ছোট খোকার বয়স হল কত?

লী। এই মাসে ষেটের চার বছরে পা দেবে।

ঠা। সকালে ১০।১২টা কচি দাড়িম পাতা বেশ ক'রে বেটে চেলুনী জল মধু মিশিয়ে কাপড়ে ছেঁকে খাইয়ে দিবি। আর দু'পরে ও বিকালে দু'বার কম-কম আধ ঝিনুক ক'রে মুতোর রস দিবি। চেলুনী জল কি মনে আছে ত?

লী। হাঁ আছে। (পৌষ সংখ্যা)

ঠা। দু'দিন ওষুদ দিয়ে যদি রক্ত ও বাহ্যে কমে, তবে আর কিছু দিতে হবে না, ওতেই সেরে যাবে। আর দু'দিনে যদি উপকার না হয়, তা 'হলে সকালে দাড়িম পাতা বাটা, দু'পরে মুতোর রস এক বার, বিকালে দুই আনা বটের ঝুরি বাটা চেলুনী জলের সঙ্গে, আর সন্ধ্যায় কৃষ্ণ জীরা ও ধুনোর খুব মিহি গুঁড়ো সমান ভাগে মিশিয়ে দুই রতি ৩০।৪০ ফোটা বেল পাতার রসের সঙ্গে খাইয়ে দিবি। এতেই ভাল হ'য়ে যাবে।

লী। এতে যদি ভাল না হয়?

ঠা। এতেই ভাল হ'য়ে যা'বে, ভয় নেই। তবে শিখে রাখ, যে, রক্তামাশয়, বিশেষ পুরাণ রক্তামাশয়ে কুড়্‌চির মত ওষুদ আর নাই। টাটকা কুড়্‌চি ছালের কাথ সিদ্ধ ক'রে যখন ক্ষীরের মত ঘন হবে, তখন আগুণ থেকে নামিয়ে সেই ঘন কাথের সিকি আন্দাজ নিয়ে তা'তে আতইচের গুঁড়ো বেশ করে মেশাবে। সেই ওষুদ এক রতি কি দু'রতি চেলুনী জলে গুলে খাওয়াতে হয়। এ ওষুদটী রক্তামাশয়ে ধন্বন্তরি।

লী। আতইচ কি ঠাকমা?

ঠা। বেণের দোকানে কিন্‌তে পাওয়া যায়,—ময়লা রঙ্গের মাঝারি শিকড়ের মত লম্বা লম্বা; ভাঙ্গলে ভেতর বেশ সাদা।

লী। ওষুদ কি রোজ তয়ের ক'রতে হয়?

ঠা। না, একদিন কর্‌লে ১৪।১৫ দিন, কি এক মাস দেড় মাসও ভাল থাকে।

লী। বড় লোকের কি মাত্রায় দিতে হয়?

ঠা। এক আনা থেকে দু'আনা মাত্রায় দেওয়া চলে।

লী। আচ্ছা এখন বড় খোকার কি ক'রব বল?

ঠা। অসুখের খবর সব বল?

লী। তা'র আজ তিন দিন হল সাদা আমাশা হয়েছে। ১৫।২০ বার বাহ্যে যায়। একটু-একটু বাহ্যে যায়, আর তা'র সঙ্গে থোলো-থোলো আম। বাহ্যের সময় খুব কোঁতায়, আর পেটের কামড়ানিও খুব।

ঠা। এ তিন দিনে কি খুব বেশী বাহ্যে হয়েছে?

লী। না বাহ্যে বেশী কৈ হয়েছে? অনেক বার বাহ্যে যায়, আর খুব কোঁতায় বটে কিন্তু বাহ্যে খুব কম হয়। ছেলেটা তিন দিনে খুব কাবু হয়ে পড়েছে। যা'তে শীঘ্র ভাল হয়, তাই কর ঠাক্‌মা।

ঠা। শোন বলি, প্রথমে একটা জোলাপ দিয়ো।

লী। সে কি ঠাকমা, এই ১৫।২০ বার বাহ্যে, তার ওপর আবার জোলাপ।

ঠা। হাঁ তাই। এ রকম অবস্থায় জোলাপ দিলে রোগী যন্ত্রণা পেয়ে পঞ্চাশ বারে যে বাহ্যে ক'রত, সেটা ২।৩ বারে বেরিয়ে যায়, রোগীর যন্ত্রণা কমে, আর রোগও শীঘ্র ভাল হয়ে যায়।

লী। সব আমাশয়ে কি জোলাপ দিতে হয়?

ঠা। না তা কেন? যেখানে আপনা হতে খুব বাহ্যে হয়, সেখানে জোলাপ দিতে নেই। কিন্তু যেখানে একটু-একটু মল যন্ত্রণার সঙ্গে বারংবার বেরোয়, সেখানে জোলাপ দেওয়া খুব দরকার।

লী। তা'—কি জোলাপ দেব বল?

ঠা। বড় খোকার বয়স কত হল?

লী। এই ষেটের সাত বছরে প'ড়েছে।

ঠা। তা 'হলে এক কাজ ক'র, হর্ত্তকী এক সিকি আর পিপুল আধ আনা বেটে ছটাক খানেক গরম জলের সঙ্গে খাইয়ে দিও।

লী। তারপর কি করব?

ঠা। ৪।৫ বার বাহ্যে হ'য়ে অনেকটা মল আর আম বেরিয়ে গেলে, ছেলে একটু স্বস্তি পাবে, যন্ত্রণা অনেক কম হ'য়ে যাবে। সে দিন আর কোন ওষুদ দিসনে। তার পর দিন থেকে সকালে কাঁচা বেল পোড়া আধ তোলা, আকের গুড় এক সিকি, পিপুলের গুঁড়ো ২ রতি, আর শুঠের গুঁড়ো ২ রতি এক সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াবি। এক পোয়া ছাগল দুধ, তিন পোয়া জল আর ৮।১০ টা থেঁতো করা মুতো এক সঙ্গে সিদ্ধ ক'রে জল মরে গেলে নামা'বি। সেই দুধ এক এক ছটাক ক'রে দু'রতি মরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে দু'বার দিবি। আর বিকালে একবার কচি বেল পোড়া আধ তোলা, খোসাহীন কৃষ্ণ তিল বাটা এক সিকি আর দৈয়ের সর এক সিকি, এক সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াবি। এতেই ভগবানের ইচ্ছায় সেরে যাবে।

লী। আর দুই একটা ওষুদ বল না ঠাকমা?

ঠা। (১) খোসাহীন কৃষ্ণ তিল বাটা দুই আনা, যষ্টিমধুর গুঁড়ো এক আনা, চিনি দু'আনা, মধু ১৫।১৬ ফোঁটা আর তিলের তেল ৩।৪ ফোঁটা এক সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ালে আমাশা নষ্ট হয়। বাহ্যের সঙ্গে রক্ত থাক-

লেও বন্ধ হ'য়ে যায়। (২) থৈয়ের গুঁড়ো এক আনা, যষ্টিমধুর গুঁড়ো এক আনা, চিনি এক আনা, মধু ১৫।১৬ ফোঁটা—এক সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ালে আমাশা ভাল হয়। মুতো, পিঁপুল, আতইচ আর কাঁকড়াশৃঙ্গী সমান ভাগে গুঁড়ো ক'রে ৩ রতি মাত্রায় মধুর সঙ্গে খাওয়ালে আমাশা ভাল হয়। সামান্য জ্বর, কি সর্দ্দি-কাশি থাকলে,—তাও যায়।

লী। কাঁকড়াশৃঙ্গী আবার কি?

ঠা। কাঁকড়ার দাড়ার মত এক রকম ফল; বেণের দোকানে পাওয়া যায়। যে গুলো বেশ লাল থাকে সেই গুলোই ভাল।

লী। সবাইকে কি এক মাত্রায় দিতে হয়?

ঠা। এত দিন শিখে বুঝি এই বিদ্যে হল? আমি সাত বছরের ছেলের পক্ষে যা' মাত্রা, তাই বলেছি। বয়স বুঝে কম-বেশী ক'রে নিতে হয়।

লী। ক'বার ক'রে ওষুদ দেওয়া ভাল?

ঠা। দু'বার, জোর তিনবার। তবে বেলপোড়াটা আহার-ওষুদ দুই। বেলপোড়া ওষুদ ছাড়াও ২।১ বার দেওয়া যেতে পারে। বেলশুঁঠ জলে সিদ্ধ ক'রে নিয়ে, সেই জল দিয়ে বার্লি পাক ক'রে দিলেও চলে।

লী। তারপর পথ্যি কি দেব বল?

ঠা। ছোট খোকাকে যা-যা দিতে ব'লেছি, তাই দিবি। তা'ছাড়া একটু টাট্কা ঘোল কাপড়ে ছেঁকে দিতে পারিস, কিন্তু এটী যদি জ্বর ভাব না থাকে, তবেই দিস্। হাঁ ভাল কথা, ছোট খোকার বেলাও যেমন কাপড়ে ছেঁকে নিতে বলেছি এর বেলাও সেই রকম করবি,—ওষুদ পথ্যি সব। যেন শক্ত কি করকরে কোন জিনিষ পেটে না যায়।

লী। কেন ঠাকুমা এতে ত নাড়ীতে ঘা হয় না।

ঠা। ঘা না হোক, নাড়ী ফোলে, ব্যথা হয়। কাজেই মল যত কম হয় আর মলের সঙ্গে শক্ত ভাবটা না থাকে, সেটা দরকার। ব্যথার উপর সামান্য কিছু লাগ্‌লে কষ্ট হয় আর ব্যথা বেড়ে যায়, তা জানত। তা' এ মনে কর নাড়ীর ভিতর কত নরম জায়গা।

লী। আচ্ছা তাই ক'রবো কিন্তু আর কিছু খেত দেব না?

ঠা। ছোট খোকার মত একে অত ধরা-কাটায় রাখতে হবে না। আম পাক পেলে একটু মসূর দালের যূষ আর মাছের ঝোল কাপড়ে ছেঁকে দিস। কাঁচকলা আর মাছ, ঝোলে চ'ট্‌কে তার পর ছেঁকে দিবি।

লী। তা, আম পাক পাওয়া বুঝবো কি ক'রে?

ঠা। আম বেশী থাকলে মলে দুর্গন্ধ হয়, পেটে গুড় গুড় শব্দ হয়, পেটের শূলুনী হয়, অল্প অল্প মল নির্গত হয়। আর যত আম পাক পায়, তত ঐ সকল উপসর্গ ক'মে আসে। আম পাক পেলে মলে দুর্গন্ধ থাকে না, পেটে গুড় গুড় শব্দ থাকে না, শূলুনী কম হয় আর দাস্ত সহজে হয়।

লী। একেও কি ভাল হবার মুখে ছোট খোকার মত ধরা-কাটায় রাখতে হবে।

ঠা। তত্টা না হোক, দিন কতক বেশ ধরা-কাটায় রাখতে হ'বে বৈকি। একেবারে খুব পেট ভ'রে খেতে দেবে না। দিন কতক যে সব পথ্যি বলেছি, তা ছাড়া আর কিছু দেবে না।

(প্রফুল্লের প্রবেশ)

লী। তুমি আবার এসে হাজির কেন

ঠা। (হাসিয়া) আজ কালকার বাবুরা যে বেজায় মাগমুখো। এতক্ষণ ছিল—সেই বাহাদুরী।

প্র। ঠাকুমা, সত্যি বলছি, আগে মাগ-মুখোই ছিলাম বটে, কিন্তু এখন লীলা যেমন কাজ করে, আমিও তেমনি কাজ করি। হয় না-হয় জিজ্ঞাসা কর।

লী। সত্যি ঠাকমা, এখন সংসারের সকলে কিসে সুখে থাকে তার জন্য চেষ্টা দেখতে পাই। পাড়া-প্রতিবাসী গরীবদুঃখীর উপকারও করেন শুনতে পাই।

ঠা। বেশ, বেশ, শুনে বড় সুখী হলাম। এতেইত মানুষের মনুষ্যত্ব।

প্র। তবেই বোঝ ঠাকমা, এখানে মাগ-মুখো হ'য়ে আসিনি। তবে মাগের ঠাকুমা-মুখো হয়ে এসেছি।

ঠা। হঠাৎ ঠাকুমার উপর বাবুর এত সুনজর পড়লো কেন বল দেখি।

প্র। সেটা সত্যি বলতে কি, ঠাকমা, তোমার জন্যেও নয়, আমার জন্যেও নয়—বড় ছেলেটার জন্যে।

ঠা কেন তার ব্যবস্থাত করে দিলাম।

প্র। সে পেটের কামড়ানিতে এত অস্থির হ'য়েছে যে, সে ব'লে বুঝাবার নয়। আমি ছুটে ডাক্তারের কাছে গেলাম, ডাক্তার বল্লে—হয়—মর্ফিয়া মিক্শ্চার দিয়ে ঘুম পাড়াবে, নয়—মর্ফিয়ার পিচকারী দেবে। তা তোমায় জিজ্ঞাসা না ক'রে কিছু ক'ল্লে লীলা ভারী রাগ করবে। তাই ছুটে তোমার মত জানতে এসেছি। ছেলেটার কষ্ট আর চক্ষে দেখা যায় না।

লী। তুমি কি বল ঠাকুমা?

ঠা। আহা বাছারে, বড় কষ্ট পাচ্ছে। ত' ও ঘুম পাড়ান, কি পিচকরিয়ে দরকার নাই। এই প্রলেপটা দিলে যন্ত্রণা ক'মে যাবে এখন,—থুলকুড়ি পাতা, যোয়ান, আদা আর মৌরী, সমান ভাগে বেটে নাভির চারিদিকে প্রলেপ দিবি। তার পর একখানা লোহার হাতা গরম ক'রে—সয়—এমন ভাবে প্রলেপের ওপর চেপে ধরবি। যখন যন্ত্রণা বেশী হবে, তখন এই রকম ক'রলেই যন্ত্রণা ক'মে যাবে।

লী। তা থুলকুড়ি পাতা এখন কোথায় পাব?

ঠা। বাজারে পাওয়া যায়, বেদেদের কাছে পাওয়া যায়, পাচন ওয়ালার কাছে পাওয়া যায়। অনেক কবিরাজের বাড়ীতেও থাকে। আজ নেহাৎ কাঁচা না পাওয়া গেলে টাটকা শুকনো নিলেও চলবে। কাল থেকে কাঁচা যোগাড় করে নিও।

প্র। দেখ লীলা, আমি তবে মসলাগুলো নিয়ে যাচ্ছি, তুমি আর দেরী ক'রো না।

(প্রফুল্লের প্রস্থান)

লী। আমি তবে আসি ঠাকমা। ছেলে-টার কষ্টের কথা শুনে মনটা বড় খারাপ হ'ল।

ঠা। আহা তা 'হবে না, মার প্রাণ। তা, এস দিদি। আমারও বড় ভাবনা রইল। দু'বেলা খবর দিতে ভুলো না।

লী। সে তোমায় ব'লতে হবে না, এখন আসি।

(লীলার প্রস্থান)

ঠা। ধন্য মহামায়ার মায়া! মায়া-রজ্জুতে বদ্ধ ক'রে ক্ষণবিনশ্বর বস্তুতে আপনার ব'লে ভ্রম জন্মিয়ে কি খেলা খেলাচ্ছ মা মরণের পথে এক পা দিয়েছি, আজ বাদে কাল সকল আপনার-জনকে ছেড়ে যেতে হ'বে, এখন একটা নাতনীর ছেলের রোগ-যন্ত্রণার কথা শুনে মনটা কাতর হয়ে উঠলো। মা! মা মায়ার বাধন কেটে দে মা! এ অন্তিম সময়ে ঐ রাঙা চরণ দুখানি ছাড়া প্রাণে আর যেন অন্য ভাবনা না আসে।

কুষ্ঠ ও বাতরক্তের ভেদ-নির্ণয়।

(আয়ুর্ব্বেদ সভায় পঠিত।)

চিকিৎসকগণের নিকট রোগ সমূহ নানা মূর্ত্তিতে সুপরিচিত। কতকগুলি মারাত্মক, কতকগুলি দারুণ-যন্ত্রণাদায়ক, কতকগুলি পৈতৃক, কতকগুলি স্বোপার্জ্জিত; আবার কতকগুলি একাধারে সর্ব্বগুণ সম্পন্ন। এই শেষোক্ত ব্যাধি সমূহের মধ্যে কুষ্ঠ রোগকে সর্ব্বপ্রধান বলিলে, বোধ হয় কোন দোষ হয় না। নাম মাত্রে ভীতি-উৎপাদক, বন্ধু-আত্মীয়-স্বজনাদির সম্বন্ধচ্ছেদক, সাক্ষাৎ জীবন্মৃত্যু-নিষ্পাদক,—এমন রোগ অতি অল্পই আছে। তাই কুষ্ঠ-চিকিৎসা-প্রশংসায় উক্ত হইয়াছে,—

"কন্যাকোটিপ্রদানেন গঙ্গায়াং পিতৃতর্পণে।
বিশ্বেশ্বরপুরীবাসে তৎফলং কুষ্ঠনাশনে।
গবাং কোটিপ্রদানেন চাশ্বমেধশতেনচ।
বৃষোৎসর্গেচ যৎ পুণ্যং তৎপুণ্যং কুষ্ঠনাশনে॥"

[রসেন্দ্র,—কুষ্ঠ চিকিৎসা]

কোটি কন্যাসম্প্রদান ও গঙ্গাতে পিতৃপুরুষগণের তর্পণ এবং কাশীধামে বাস করিলে যে ফল,—গো-কোটিদান, শত অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং বৃষোৎসর্গ করিলে যেরূপ পুণ্য সঞ্চয় হয়,—কুষ্ঠরোগ আরোগ্য করিলে, সেইরূপ পুণ্য ও সেই ফল হইয়া থাকে। এমন উচ্চ প্রশংসা আর কোন রোগ-চিকিৎসাতেই দেখা যায় না। প্রশংসাও অন্যায্য নহে।

চিকিৎসা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে রোগ-নির্ণয় আবশ্যক। মহর্ষি আত্রেয়ের এই মহতী উক্তি কেবল আয়ুর্ব্বেদের নহে, সর্ব্বদেশীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রেরই মেরুদণ্ড স্বরূপ।

রোগমাদৌ পরীক্ষেত ততোঽনন্তরমৌষধম্।
ততঃ কর্ম্ম ভিষক্ পশ্চাদ্ জ্ঞান পূর্ব্বং
সমাচরেৎ।
যস্তু রোগমবিজ্ঞায় কর্ম্মাণ্যারভতে ভিষক্।
অপ্যৌষধ বিধানজ্ঞ স্তস্য সিদ্ধির্যদৃচ্ছয়া॥

(চরকসূত্র—মহারোগাধ্যায়।)

অর্থাৎ চিকিৎসক সর্ব্বাগ্রে রোগ-পরীক্ষা বা রোগ-নির্ণয় করিবেন। তাহার পর ঔষধ নির্ব্বাচন করিবেন। তাহার পর জ্ঞান পূর্ব্বক অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবেন। যিনি রোগ-নির্ণয় না করিয়া, চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হন, ঔষধ-প্রয়োগ-বেত্তা হইলেও সেই চিকিৎসকের সিদ্ধিলাভ অর্থাৎ রোগ-আরোগ্য সম্পাদন কদাচিৎ বা দৈবক্রমেই ঘটিয়া থাকে।

রোগ নির্ণয় দ্বিবিধ। (১) রোগের স্বরূপ নির্ণয় (২) তৎসদৃশ বা তৎসজাতীয় অন্য রোগ-সমূহ হইতে পার্থক্য নির্ব্বাচন। দার্শনিকের ভাষায় বলিতে হইলে রোগের লক্ষণ দ্বিবিধ * (১) স্বরূপ প্রতিপাদক (২) ইতরব্যবর্ত্তক। আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে রোগসমূহের যে লক্ষণাবলী বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যুগপৎ এই দ্বিবিধ লক্ষণ সন্নিবিষ্ট। ভেদক বা ইতর-ব্যবর্ত্তক লক্ষণ স্বতন্ত্রভাবে প্রায়ই উপদিষ্ট হয় নাই। কিন্তু ব্যাধিসমূহের পরস্পরের সহিত সংশয় উপস্থিত হইলে, ভেদক লক্ষণের সাহায্য

* অব্যাপ্তি ও অতি ব্যাপ্তি লক্ষণের এই দ্বিবিধ দোষ। তাহা নিবারণের জন্যই দ্বিবিধ লক্ষণ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক।

ব্যতীত রোগনির্ণয় সম্ভব নহে। সেইগুলি বিশ্লেষণ পূর্ব্বক উপদেশ করা টীকাকারগণের কর্ত্তব্য। বিজয় রক্ষিত, শ্রীকণ্ঠ, ভাবপ্রকাশকার ভাবমিশ্র প্রভৃতি, অতিসার ও গ্রহণী, মূর্চ্ছা ও অপস্মার, মূত্রাঘাত ও মূত্রকৃচ্ছ ইত্যাদি অনেক রোগেরই ভেদক লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কতকগুলি রোগ সম্বন্ধে তাঁহারা সম্পূর্ণ নীরব রহিয়া গিয়াছেন। সেইগুলির মধ্যে কুষ্ঠ ও বাতরক্তের নাম করা যাইতে পারে, এবং সেই সম্বন্ধে আলোচনা করাই অদ্যকার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সংশয় ভঞ্জনের পূর্ব্বে, সংশয় আছে কিনা, তাহার মীমাংসা প্রয়োজন। ভেদ-নির্ণয়ের পূর্ব্বে কুষ্ঠ ও বাতরক্তের মধ্যে কিরূপ সাদৃশ্য আছে তাহা দেখা কর্ত্তব্য। এই জন্য আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থাবলী হইতে বচন সমূহ উদ্ধৃত করা আবশ্যক। কিন্তু এই সমস্ত অংশই চিকিৎসক মাত্রেরই সুপরিজ্ঞাত বলিয়া অতি সংক্ষেপে একান্ত প্রয়োজনীয় স্থল মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

কুষ্ঠের পূর্ব্বরূপ—

স্পর্শাজ্ঞত্বমতিস্বেদো ন বা বৈবর্ণ্যমুন্নতিঃ।
কোঠানাং লোমহর্ষশ্চ কণ্ডূস্তোদঃ ...
ব্রণানামধিকং শূলম্ ......
সুপ্তাঙ্গতা চেতি কুষ্ঠ লক্ষণমগ্রজম্।

অর্থাৎ স্পর্শজ্ঞানের অন্যথাভাব, অতি স্বেদ, স্বেদাভাব, বিবর্ণতা, কোঠ সমূহের (মণ্ডল বিশেষ) উৎপত্তি; রোমাঞ্চ, কণ্ডূ, সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, ক্ষত সমূহে অত্যন্ত যন্ত্রণা, অঙ্গের সুপ্ততা অর্থাৎ স্পর্শজ্ঞানাভাব ইত্যাদি কুষ্ঠের পূর্ব্বরূপ।

[চরক চিকিৎসা স্থান, কুষ্ঠ চিঃ অঃ]।

অঙ্গপ্রদেশানাং স্বাপ অসৃজঃ কৃষ্ণতা চ... যত্র যত্র দোষো বিক্ষিপ্তো নিঃসরতি তত্র তত্র মণ্ডলানি প্রাদুর্ভবন্তি।

[সুশ্রুত নিদাঃ স্থাঃ—কুষ্ঠ নিদান]

অর্থাৎ দেহের স্থান সমূহে সুপ্তি, রক্তের কৃষ্ণবর্ণতা · যে সমস্ত স্থানে দোষ বিসৃত হইয়া বহির্মুখ হয় সেই সমস্ত স্থানে মণ্ডল সমূহ উদ্গত হইয়া থাকে।

এস্থলে বক্তব্য অষ্টাঙ্গহৃদয়কার বাগ্‌ভট্ট কুষ্ঠপূর্ব্বরূপে চরক ও সুশ্রুতোক্ত লক্ষণগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। মাধবকর বাগ্‌ভটের বচনগুলি অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বাতরক্তের পূর্ব্বরূপ—

স্বেদোঽত্যর্থং নবা কার্ষ্ণ্যং স্পর্শাজ্ঞত্বং
ক্ষতেঽতিরুক্
নিস্তোদঃ...কণ্ডূঃ ..
বৈবর্ণ্যং মণ্ডলোৎপত্তির্বাতাসৃক্-পূর্ব্বলক্ষণম্।

[চরক-বাং শোং চিকিৎসিতাধ্যায়]।

অর্থাৎ অত্যন্ত স্বেদ, স্বেদাভাব, কৃষ্ণবর্ণতা, স্পর্শজ্ঞানাভাব, ক্ষতে অত্যন্ত যন্ত্রণা, জানু, জঙ্ঘা, উরু, কটী, স্কন্ধ ও শরীরের সন্ধি সমূহে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, চুলকানি ..বিবর্ণতা, মণ্ডলোৎপত্তি—এইগুলি বাতরক্তরোগের পূর্ব্বরূপ। বাগভট পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন, বাতরক্তের পূর্ব্বরূপ—কুষ্ঠপূর্ব্বরূপের সদৃশ। "তস্য লক্ষণং ভবিষ্যতঃ কুষ্ঠসমম্"

কুষ্ঠের রূপ—

রৌক্ষ্যং শোষস্তোদঃ শূলং সঙ্কোচনং তথায়াসঃ।
পারুষ্যং খরভাবো হর্ষঃ শ্যাবারুণত্বঞ্চ—
কুষ্ঠেষু বাতলিঙ্গম্—

অর্থাৎ রুক্ষতা, শুষ্কতা, সূচীবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা, শূল, সঙ্কোচ, শ্রমবোধ অর্থাৎ অবসাদ, পরুষতা কর্কশতা, রোমাঞ্চ, শুক্লানুবিদ্ধকৃষ্ণবর্ণত্ব ও রক্তবর্ণত্ব, এইগুলি কুষ্ঠের বাতকৃত লক্ষণ।

—দাহো রাগঃ পরিস্রবঃ পাকঃ। বিস্রগন্ধঃ
ক্লেদ স্তথাঙ্গপতনঞ্চ পিত্তকৃতম্ * * *

অর্থাৎ দাহ, রক্তবর্ণতা, অত্যন্ত স্রাব, পক্কতা, পূতিগন্ধ, ক্লেদ ও অঙ্গপতন,—এইগুলি কুষ্ঠের পিত্তকৃত লক্ষণ।

শ্বৈত্যং শৈত্যং কণ্ডূঃ স্থৈর্য্যং
সোৎসোধগৌরবস্নেহাঃ।
কুষ্ঠেষু তু কফলিঙ্গম্—

অর্থাৎ শুক্লবর্ণতা, শীতবোধ, চুলকানি, কাঠিন্য, উচ্চতা (শোথের) গুরুত্ব ও স্নিগ্ধতা কুষ্ঠের কফকৃত লক্ষণ।

[চরক—কুষ্ঠ চিকিৎসা অধ্যায়]

বাতরক্তের রূপ—

বিশেষতঃ শিরায়ামতোদস্ফুরণ ভেদনম্।
শোথস্য কার্ষ্ণ্য-রুক্ষত্ব-শ্যাবতা-বৃদ্ধিহানয়ঃ ··
অনিলোত্তরে—

অর্থাৎ, বিশেষতঃ শিরাসমূহের আকর্ষণ (টান ধরা), সূচীবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা, স্পন্দন, বিদীর্ণবৎ বেদনা, শোথের কৃষ্ণতা, রুক্ষতা, শ্বেতকৃষ্ণবর্ণতা, বৃদ্ধি ও হ্রাস ইত্যাদি বাতরক্তে বাতাধিক্যের লক্ষণ।

বিদাহো বেদনা মূর্চ্ছা স্বেদ স্তৃষ্ণা মদো ভ্রমঃ।
রাগঃ পাকশ্চ ভেদশ্চ শোষশ্চোক্তানি
পৈত্তিকে ॥"

বিশিষ্টরূপ দাহ, বেদনা, মূর্চ্ছা, স্বেদ, তৃষ্ণা, মত্তা, ভ্রম, লৌহিত্য, পক্কবৎ ভাব, বিদারণবৎ যন্ত্রণা,—এইগুলি বাতরক্তে পিত্তাধিক্যের লক্ষণ।

স্তৈমিত্যং গৌরবং স্নেহঃ সুপ্তির্মন্দা চ রুক্ কফে।

আর্দ্রতাবোধ, গুরুত্ব, স্নিগ্ধতা, সুপ্তি ও বেদনার অল্পতা—এইগুলি বাতরক্তের কফাধিক্যের লক্ষণ।

[চরক-চিঃস্থাঃ বাং শোঃ চিঃ অঃ]।

কুষ্ঠবদুত্তানং ভূত্বা কালান্তরেণ অবগাঢ়ী ভবতি। অর্থাৎ বাতরক্ত প্রথমে কুষ্ঠের মত ত্বক্ ও মাংস আশ্রয় করে, পরে, কালক্রমে গভীর ধাতুগত হয়।

[সুশ্রুত চিঃ স্থাঃ মহাবাতব্যা চিঃ অঃ]

এস্থলে একটু বক্তব্য আছে। চরকে কুষ্ঠ চিকিৎসিতাধ্যায়ে যে গুলি কুষ্ঠের দোষভেদে লক্ষণ বলা হইয়াছে, নিদানস্থানে কুষ্ঠ নিদানে প্রায় সেইগুলিকেই সপ্তাত ক্রিমি-কুষ্ঠের দোষকৃত উপদ্রব রূপে বর্ণিত হইয়াছে। সুশ্রুতের কুষ্ঠ-নিদানে সামান্যতঃ দোষজলিঙ্গ বলিয়াই এই গুলির নির্দ্দেশ আছে। চরকের চিকিৎসিত স্থানে স্বেদের উল্লেখ নাই, নিদান-স্থানে উল্লেখ আছে। সুশ্রুতের নিদান স্থানে, বাতজন্য বলিয়া স্বেদের পাঠ আছে। এই সম্বন্ধে যথা স্থানে বিচার করিব।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, কুষ্ঠ সপ্ত-ধাতুগত ও ত্রিদোষাত্মক, বাতরক্ত প্রধানতঃ বাত ও রক্তদুষ্টিসম্ভূত। উভয়ের কারণ সমূহেরও পার্থক্য আছে। সুতরাং ভেদ-নির্ণয় দুরূহ নহে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে রোগ পরীক্ষার কালে এই সংপ্রাপ্তি ও কারণের পার্থক্য নিরূপণ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নিদান ও সংপ্রাপ্তি প্রায়ই পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপশয় অনুপশয় এই তিনটীই আমাদের রোগ-নির্ণয়ের প্রধান সম্বল। তন্মধ্যে গূঢ় লিঙ্গং ব্যাধিম্ উপশয়ানুপশাভ্যাং পরীক্ষেত" অর্থাৎ চিকিৎসার ফলাফলের দ্বারা রোগ নিরূপণ,—অন্ততঃ কুষ্ঠ ও বাতরক্ত সম্বন্ধে সুসাধ্য নহে। কারণ অধিকার ও ঔষধাবলী স্বতন্ত্ররূপে উপদিষ্ট হইলেও, প্রকৃত পক্ষে আমরা অন্ততঃ সাধারণতঃ চিকিৎসার কোন পার্থক্য করি না। ঔষধ সমূহের ফল-

শ্রুতিতেও প্রায়ই একই ঔষধের বাতরক্ত ও কুষ্ঠ নাশকত্ব উক্ত হইয়াছে।

এস্থলে একটী তর্ক উঠিতে পারে, যদি চিকিৎসারই পার্থক্য না থাকে, তবে ভেদ-নির্ণয়ের কি প্রয়োজন? চিকিৎসার ভেদের জন্যই ত রোগের পার্থক্য নির্ণয় আবশ্যক। কিন্তু এ তর্ক সঙ্গত নহে। চিকিৎসার পার্থক্য করা না হইলেও, প্রকৃতি ও পরিণামের পার্থক্য আছে। কুষ্ঠরোগ দারুণ সংক্রামক এবং পাশ্চাত্য মতে সম্পূর্ণ স্বীকৃত * না হইলেও আয়ুর্ব্বেদ মতে বংশানুক্রমিক। সুশ্রুত বলিয়াছেন—

স্ত্রীপুংসয়োঃ কুষ্ঠদোষাদ্ দুষ্টশোণিতশুক্রয়োঃ
যদপত্যং তয়োর্জাতং জ্ঞেয়ং তদপি কুষ্ঠিতম্।—(কুষ্ঠ নিঃ)

অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের কুষ্ঠ রোগে শুক্র ও শোণিত দূষিত হইলে তাহাদের যে সন্তান জন্মে, সেও কুষ্ঠ রোগ গ্রস্ত হয়। টীকাকার ডল্লনের মতে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত স্ত্রী-পুরুষের বীজ শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। তাহাদের অপত্য জন্মে না, এই মত পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সম্মত। কিন্তু বীজ সম্পূর্ণ নষ্ট না হইলে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত সন্তান উৎপন্ন হয়। অতএব সমাজের ও জাতির মঙ্গলের জন্য কুষ্ঠরোগীকে তদনুযায়ী নিয়মিত ও পৃথগ্‌ভূত রাখা একান্ত প্রয়োজন। ভেদ-নির্ণয় ব্যতীত তাহা সম্ভব নহে। আর চিকিৎসার প্রকৃতই পার্থক্য না থাকিলে বসন্ত চিকিৎসকদের মত স্বতন্ত্র কুষ্ঠ চিকিৎসক গণের (অন্ততঃ সেই নামে পরিচিত) আবির্ভাব ঘটিত না। শাস্ত্রে যখন অধিকার-ভেদ উপদিষ্ট হইয়াছে। রোগের ভেদ-নির্ণয় ব্যতীত তাহার চিকিৎসার ভেদ নির্ণয় করাও অসম্ভব, সন্দেহ নাই।

এক্ষণে কুষ্ঠ ও বাতরক্তের ভেদ-নির্ণয় সম্বন্ধে প্রচলিত ও বহুসম্মত মত সমূহ অগ্রে আলোচনা করা যাউক।

তস্য স্থানং করৌ পাদাবঙ্গুল্যঃ সর্ব্বসন্ধয়ঃ।
কৃত্বাদৌ হস্তপাদেতু মূলং দেহে বিধাবতি।
[চরক—চিঃ স্থাঃ, বাঃ শোঃ চিঃ অঃ]

অর্থাৎ হস্ত ও পদদ্বয়, অঙ্গুলী ও সন্ধি সমূহ বাত রক্তের স্থান। ইহা হস্ত ও পদে আরম্ভ হইয়া দেহে বিস্তৃত হয়।

* Certain Physiopathological qualities, predisposing to leprosy, may be inherited * * Physiological pecularities and susceptibilities may, but parasites cannot be inherited. It is true the ovum may be infected by a germ as in Syphilis, but infection is not heridity * * * Without absolutely denying the possibility of ovum infection, the probability is that such an event is very rare. * * Another powerful argument against the doctrine of heridity is, the circumstance, that lepers become sterile early in the desease.

Sir Patirick Manson
Tropical Deseases,
New edition. (1914)

কুষ্ঠরোগোৎপত্তির অনুকূল কতকগুলি প্রকৃতি ও দোষ সংক্রমিত হইতে পারে * * শরীরপ্রকৃতি ও রোগ-প্রবণতা সংক্রমিত হইতে পারে বটে, কিন্তু রোগ বীজ সংক্রমিত হওয়া সম্ভব নহে। অবশ্য উপদংশের মত রোগে স্ত্রীবীজ (আর্ত্তব) রোগ বীজাণু দুষ্ট হইতে পারে, কিন্তু রোগ সংক্রমণ এবং পুরুষানুক্রম এক কথা নহে * * আর্ত্তববীজ ব্যাধি দুষ্ট হইবার সম্ভাবনা সম্পূর্ণ অস্বীকার না করিতে পারিলেও তাহা অত্যন্ত বিরল একথা বলা যায়। (কুষ্ঠরোগের) বংশানুক্রমের বিরুদ্ধে আর একটী গুরুতর তর্ক এই যে, কুষ্ঠরোগীগণের রোগাক্রমণের অল্পকাল মধ্যেই অপত্যোৎপাদন শক্তি নষ্ট হইয়া যায়।

সুতরাং এ তত্ত্ব পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক মতেরও বিরুদ্ধ হইতেছে না।

পাদয়োর্মূলমাস্থায় কদাচিদ্ধস্তয়োরপি।
আখোর্বিষমিব ক্রুদ্ধং তদ্দেহমুপসর্পতি
(সুশ্রুত—বাতব্যাং নিং)।

অর্থাৎ বাতরক্ত হস্ত ও পদদ্বয়ের মূলে অধিষ্ঠান করিয়া প্রকুপিত মূষিক বিষের মত দেহে বিস্তৃত হয়।

বাগ্‌ভট বলিয়াছেন "তচ্চপূর্ব্বং পাদৌ প্রধাবতি" অর্থাৎ বাতরক্ত প্রথমে পদদ্বয় আক্রমণ করে। মাধবনিদানের টীকাকার বিজয় রক্ষিত রক্তগত বাতের সহিত বাতরক্তের পার্থক্য নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন,—"বাতরক্তে তু স্বকারণা দুভাবপি হস্ত্যাদিগমনকুপিতৌ বিশিষ্ট সংপ্রাপ্ত্যা হস্তপাদগতাবেব বাতরক্তাখ্যং বিকারং জনয়তঃ"। অর্থাৎ স্ব স্ব প্রকোপক কারণ বশতঃ, হস্তী প্রভৃতিতে গমন দ্বারা কুপিত বায়ু ও রক্ত, বিশিষ্ট সংপ্রাপ্তি বশতঃ হস্তপদে অবস্থিত হইয়াই বাতরক্ত নামক রোগ উৎপাদন করে।

এই সকল বচন ও নির্দ্দেশ অনুসারে, পদ মূল ও হস্তমূল হইতে প্রকাশ ও প্রসারই বাতরক্তের ভেদক লক্ষণ বলিয়া অনেক চিকিৎসকের ধারণা। কিন্তু এই লক্ষণ সম্যক্ অবিসম্বাদী বা সংশয় নিবারক নহে। মুখাদি অন্যস্থানে (কুষ্ঠ) রোগ আরম্ভ হইলে, এই লক্ষণের দ্বারা বরং বাতরক্তের ব্যাবৃত্তি বা রোগ নির্ণয় করা গেল, কিন্তু যে স্থলে পদমূলে বা হস্ত মূলে কুষ্ঠ আরম্ভ হয়, সে ক্ষেত্রে এই লক্ষণ অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে। কুষ্ঠ যে পাদমূল বা হস্ত মূলে হইবে না, এরূপ নিষেধ ত কুত্রাপি নাই। বাতরক্তের মত কুষ্ঠের সংপ্রাপ্তি ও স্থান, কোন বিশেষ সীমাবদ্ধ নহে। সুশ্রুতেই কুষ্ঠের পিত্ত লিঙ্গের মধ্যে অঙ্গুলী পতন ও করভঙ্গ উক্ত হইয়াছে। ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধও বটে।

কাহার কাহারও বিশ্বাস, বাতরক্ত বাত ও রক্তদুষ্ট মাত্র। ইহাতে কুষ্ঠের মত মাংস পচা, অস্থি ভঙ্গ প্রভৃতি গুরুতর লক্ষণ প্রকাশ পায়না কিন্তু তাহা যুক্তি সঙ্গত নহে। মাংসক্ষয় ও মাংস কোথ বাতরক্তের বিশেষ উপদ্রব।

"...মাংসকোথশিরাগ্রহাঃ...
এতৈরুপদ্রুতং বর্জ্জ্যম্"
(চরঃ বাঃ শোঃ চিঃ)

অর্থাৎ মাংস পচা, শিরাসঙ্কোচ ইত্যাদি উপদ্রব-পীড়িতকে ত্যাগ করিবে। "আজানুস্ফুটিতং যচ্চ প্রভিন্নং প্রস্রুতঞ্চ যৎ, উপদ্রবৈশ্চ যজ্জুষ্টং প্রাণমাংসক্ষয়াদিভিঃ, শোণিতং তৎ অসাধ্যং স্যাৎ...অর্থাৎ সুশ্রুত বলিয়াছেন যে, যে বাতরক্তে জানুপর্য্যন্ত (ত্বক্) ফাটিয়া বা (মাংসাদি, বিদীর্ণ হইয়া যায়, স্রাব হইতে থাকে এবং বলও মাংসক্ষয় প্রভৃতি উপদ্রব হইয় থাকে, সেই বাতরক্ত অসাধ্য। [সুশ্রুত বাং ব্যাং নিং] অতএব বাতরক্তেও গুরুতর লক্ষণের অসদ্ভাব নাই। অস্থি-ভঙ্গাদি কুষ্ঠের প্রায় চরম লক্ষণ কিন্তু রোগ নির্ণয়ের জন্য ততদিন অপেক্ষা করিলে চিকিৎসকের পূর্ব্বে স্বয়ং রোগীরই চৈতন্য-সঞ্চারের অধিক সম্ভাবনা।

অতএব কুষ্ঠ ও বাতরক্তের ভেদ-নির্ণয় করিতে হইলে, উভয়েরই (অন্ততঃ কুষ্ঠের) এমন ভেদক লক্ষণ বাহির করিতে হইবে, যদ্দারা নিঃসংশয়রূপে সর্ব্বস্থলে অচিরকালেই উভয়েরই স্পষ্ট পার্থক্য নিরূপিত হয় এবং সেই লক্ষণ বলিবার উদ্দেশ্যেই অদ্য এই প্রবন্ধের অবতারণা। কিন্তু সেই লক্ষণগুলি বলিবার পূর্ব্বে ইহা প্রতিপন্ন করা আবশ্যক যে, সেই লক্ষণ যথার্থই বিশিষ্ট ভেদক লক্ষণ।

আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে সামান্যাকারে কথিত লক্ষণ সমষ্টির মধ্য হইতে একটী বা দুইটী লক্ষণকে ইতরব্যবর্ত্তক বলিয়া নির্দ্দেশ মাত্রেই বিনা প্রমাণে সে কথা কেহই স্বীকার করিবেন না।

প্রমাণের কথা বলিতে হইলে, অগ্রে দেখা যাউক, এস্থলে কিরূপ প্রমাণ সম্ভব। চরক মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, যুক্তি ও আপ্ত—এই চতুর্ব্বিধ প্রমাণ। যুক্তি অর্থাৎ অর্থাপত্তি, নৈয়ায়িকগণ স্বতন্ত্র প্রমাণ স্বীকার করেন না। নৈয়ায়িক ও সুশ্রুত সম্মত উপমানও সেইরূপ অনুমানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। অতএব স্থলতঃ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্ত এই ত্রিবিধ প্রমাণ বলা যায়। রোগ বিশেষ বিজ্ঞানীয় বিমানাধ্যায়ে মহর্ষি আত্রেয় ও বলিয়াছেন—"ত্রিবিধং খলু রোগ বিশেষ বিজ্ঞানং ভবতি তদ্‌যথা উপদেশঃ প্রত্যক্ষমনু-মানঞ্চ।" এস্থলে আপ্ত প্রমাণ সম্ভব নহে, কেননা আপ্ত বা ঋষিকৃত লক্ষণাবলীর মধ্যে গৌণমুখ্যভাব নির্দ্ধারণই এই বিচারের উদ্দেশ্য। তজ্জন্য স্বতন্ত্র বিশদ আপ্ত প্রমাণ থাকিলে, এত সংশয় ও গোলযোগ ঘটিত না। অনুমানও প্রত্যক্ষমূলক হওয়া আবশ্যক। অতএব প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই। বিশেষতঃ প্রত্যক্ষফলকশাস্ত্র প্রামাণ্য প্রত্যক্ষ সিদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত।

"চিকিৎসিতজ্যোতিষতন্ত্রবাদাঃ
পদে পদে প্রত্যয়মাবহন্তি"

কিন্তু এক্ষেত্রে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া অতি দুরূহ। বিশেষতঃ শাস্ত্র বচন মাত্রাবলম্বী প্রত্যক্ষবিজ্ঞানক্রিয়াশূন্য আমার পক্ষে তাহা একেবারে অসম্ভব। অতএব অন্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া উপস্থাপিত করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই, কিন্তু কাহার প্রমাণ প্রত্যক্ষ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে? আমরা নিশ্চয়ই ঋষি ব্যতীত অন্যকে আপ্ত বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। *

আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্র লৌকিক প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতি-ষ্ঠিত। অবশ্য তাহার সমস্ত সিদ্ধান্তই অভ্রান্ত বা পরীক্ষক ও প্রত্যক্ষদর্শীর ভ্রমপ্রমাদ দূষিত নহে,—একথা বলিতেছি না, কিন্তু মোটের উপর সেগুলির অধিকাংশই প্রত্যক্ষ মূলক - ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এখন পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে সর্ব্ববাদীসম্মত যদি এমন কোন ভেদক লক্ষণ পাওয়া যায়, যাহা ঋষি বচনেও সুস্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে, তবে সেই লক্ষণ গুলিকে প্রকৃত ভেদক বা ইতর ব্যবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করিতে বোধহয় কাহারও অপত্তি হইবে না। (ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত,
কাব্যতীর্থ, কবিরত্ন।

* কিন্তু ন্যায়দর্শনের ভাষ্যকার বাৎস্যায়নমুনি স্বীকার করিতেন। "আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ" এই ন্যায়-সূত্রের ভাষ্যে বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন "আপ্তঃ খলু সাক্ষাৎ কৃতধর্ম্মা। যথাদৃষ্টস্য অর্থস্য চিখ্যাপয়িষয়া প্রযুক্ত উপদেষ্টা। সাক্ষাৎকরণমর্থস্যাপ্তি স্তয়া প্রবর্ত্ততে ইত্যাপ্তঃ।" অর্থাৎ যিনি পদার্থের স্বরূপ সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়াছেন তিনি আপ্ত। ঋষি আর্য্য ও ম্লেচ্ছ সকলের পক্ষেই ইহা সমান লক্ষণ।

শারীর বায়ু।

—:*:—

(আয়ুর্ব্বেদ সভায় পঠিত।)

আয়ুর্ব্বেদে বায়ু কি, তাহা অবগত হওয়া প্রত্যেক চিকিৎসকের কর্ত্তব্য। কারণ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মাই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব। এই দেহের উৎপত্তি, বৃদ্ধি এবং বিনাশ—সমস্তই বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার কার্য্য। সুতরাং বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার স্বরূপ বিজ্ঞান এবং এই দেহে তাহাদের অবস্থিতি ও কার্য্য এবং তাহাদের প্রকৃতি-বিকৃতি, হ্রাস, বৃদ্ধি প্রভৃতি বিশেষরূপে জানিতে না পারিলে তিনি রোগ নির্ণয় অথবা রোগাপশমের প্রকৃত হেতু নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম হইতে পারেন না। এমন কি, তিনি একজন প্রকৃত চিকিৎসক নামে অভিহিত হইবারও যোগ্য নহেন।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবাদী, বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মা স্বীকার করেন না। কিন্তু পুরাণ-তন্ত্রের আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, যে, অতি প্রাচীনকালে ইউরোপীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানেও বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মাই চিকিৎসার মূলতত্ত্ব রূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল, এবং তাহা এই আয়ুর্ব্বেদ হইতেই গৃহীত। কিন্তু আজকাল কোন কোন পাশ্চাত্য দেশবাসী তাহা স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করেন। তাঁহারা বলেন গ্রীকদেশ হইতেই ভারতবাসিগণ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-তত্ত্ব সংগ্রহ করেন গ্রীকগণ ভারতবর্ষ হইতে গ্রহণ করে নাই। ইহা অতীব হাস্যজনক। আয়ুর্ব্বেদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন চিকিৎসা বিজ্ঞান। যাহার অত্যুজ্জ্বল কিরণমালা ইতস্ততঃ বিস্তৃত হইয়া এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দ্দিকে নানা দিক্‌দেশে ঘোরতর অমানিশার অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন মানবজাতির তমোরাশি বিধ্বংস করিয়াছিল, যাহার প্রভাবে নানাবিধ দুঃখ-যন্ত্রণাগ্রস্ত মানবকুল ব্যাধিমুক্ত হইয়া, সবল ও সুস্থ দেহে দীর্ঘজীবন লাভ পূর্ব্বক পরম সুখে কালাতিপাত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন,—এই সেই আয়ুর্ব্বেদই পৃথিবীস্থ অন্যান্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের জন্মভূমি! উপস্থিত সভ্য মহোদয়গণ! আপনারা অবগত আছেন, যে, ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণের বিশুদ্ধ জ্ঞান-প্রসূত এই আয়ুর্ব্বেদ কি ভাবে পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল, সুতরাং সেই সকল পূর্ব্ববৃত্তের পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়া আপনাদের বিরক্তি উৎপাদন করিব না। বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মা তাহারই মূল স্তম্ভরূপে থাকিয়া আয়ুর্ব্বেদকে বিবিধ ঘূর্ণি-বায়ু, উল্কাপাত প্রভৃতি হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। এ কথা অবশ্যই বলা আবশ্যক, যে, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের চিকিৎসা-শাস্ত্রকে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-শাস্ত্র বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা নিতান্তই অবিজ্ঞান যে, অদ্যাপি তাঁহারা তাঁহাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে এই বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মা ত্রিধাতুকে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মূলস্তম্ভরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই।

শারীর বায়ু কি? ইহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। বায়ু কি, জানিতে হইলে, জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটী কথায় আলোচনা করা আবশ্যক। তাহা হইলে বুঝাইবার এবং বুঝিবার পক্ষে অনেকটা সুবিধা হইবে। আমি এক্ষণে প্রমাণ করিব, যে, কারণভূত জল, বায়ু, অগ্নিই মানবদেহে বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা নামে অভিহিত হয়।

ঋষিগণ বলিয়াছেন যে, এই পরিদৃশ্যমান বিশাল ব্রহ্মাণ্ড পাঞ্চভৌতিক। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ মরুৎ, ব্যোম, এই কয়েকটী পঞ্চ মহাভূতের

সমষ্টি মাত্র। পরম সূক্ষ্ম পরমাণু সকল বিভিন্নরূপে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াই নানাবিধ বৈচিত্র্যময় জগতের সৃষ্টি করিতেছে। মানব-দেহ তাহারই একটী অংশমাত্র। সুতরাং ইহাও পাঞ্চভৌতিক, কিন্তু অপরাপর ভৌতিক দ্রব্যের সহিত বিসদৃশ। পঞ্চমহাভূত হইতে কিরূপে এই জগতের সৃষ্টি হইতেছে, তাহার আলোচনা করিলে, দেখা যাইবে, যে, পার্থিব পরমাণুই সমস্ত কার্য্য-দ্রব্যের আধার। অর্থাৎ কার্য্য-দ্রব্যগুলি পার্থিব পরমাণুতে প্রতিষ্ঠিত। জল দ্রব ও স্নিগ্ধ বলিয়া জলীয় পরমাণু ঐ সকল পার্থিব পরমাণুর সংযোজক। অগ্নি, বায়ু ও আকাশ—সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যারম্ভেই পূর্ব্বোক্ত পরমাণুতে সমবেত থাকিয়া কার্য্য দ্রব্যের সৃষ্টি করে। কার্য্য-দ্রব্যের ভেদ এই, বায়ু, অগ্নি ও আকাশ হইতেই উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ ঘট, পট নয়, অথবা ঘট হইতে পট ভিন্ন, এইরূপ প্রতীতি অগ্নি, বায়ু ও আকাশ হইতেই উৎপন্ন হইতেছে। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন সংযোগ ও পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াই নানাবিধ বৈচিত্র্যময় জগতের সৃষ্টি হইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম প্রাপ্ত হয় বলিয়াই এই পঞ্চ মহাভূত ইতর ভেদ বিশিষ্ট কার্য্য দ্রব্যে পৃথক্ স্বরূপ এবং সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। যেমন একই অগ্নি, বাড়বানল, বিদ্যুৎ, অশনি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে ও স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে, সেইরূপ দৈহিক সেই অগ্নির নামই পিত্ত, জলের নাম শ্লেষ্মা এবং বায়ুর নাম বায়ু। দৈহিক বায়ুর নাম ও বায়ু এবং কারণভূত বায়ুর নাম ও বায়ু, কিন্তু উভয়ের মধ্যে ভেদ আছে, তাহা ক্রমে প্রকাশিত হইবে।

বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মাই দেহের মূল। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, পঞ্চ মহাভূতই এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের মূল কারণ এবং মানবগণ সেই জগতেরই একটী অংশ, সুতরাং মানব-গণের মূলও পঞ্চমহাভূতই হইতেছে, কিন্তু এস্থলে বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মাকে মূল বলায় বিরোধ উপস্থিত হইতেছে। মীমাংসা এই যে, ভৌতিক জল বায়ু ও অগ্নিই বিভিন্ন পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া, দেহে বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মা নামে অভিহিত হয় এবং তাহারাই শুক্রশোণিতে অবস্থিতি করিতেছে, এবং এই শুক্রশোণিত হইতেই মানবের উৎপত্তি হয় বলিয়া, বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মা-কেই দেহের মূল করা হইয়াছে। ফলকথা, এই যে, পরমাণু ভেদে দেখিতে গেলে, পঞ্চ-মহাভূতকেই দেহের মূল বলা যাইতে পারে। কিন্তু ভিন্ন পরিণাম বশতঃ দেহের মূল শুক্র-শোণিত হইতে উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া শুক্র শোণিতকেই দেহের মূল বলা হইয়াছে। এবং ভৌতিক জল-বায়ু-অগ্নিই বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মারূপে অবস্থিত থাকিয়া এই দেহের বৃদ্ধিসাধন করিতেছে। সুতরাং বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মাই দেহ বৃদ্ধির মূল এবং এই বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মাই বিকৃত হইলে শরীর ধ্বংসমুখে পতিত হয়। সুতরাং বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মাই দেহ-বিনাশের কারণ। উপরোক্ত সিদ্ধান্ত দ্বারা দেখা যাইতেছে, যে, বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মা কেবল দেহোৎ-পত্তির কারণ নহে, কিন্তু স্থিতি এবং বিনাশের কারণ।

বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মার নাম দোষ। কারণ বায়ু স্বাভাবিক গতি শক্তি দ্বারা তাপ ও শৈত্যকে সঞ্চালিত করিয়া, পার্থিব পরমাণুকে দূষিত করে এবং স্বয়ংও দূষিত হয়। পার্থিব অথবা আকাশীয় পরমাণুর সেরূপ কোন শক্তি না থাকায় তাহারা অপরকে দূষিত করিতে

পারেনা, এজন্যই বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মার নাম দোষ, অপর ভূতদ্বয়ের নাম দোষ নহে। পিত্ত, শ্লেষ্মা জড়, ইহাদের গতি-শক্তি নাই, স্বয়ং এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে পারেনা। বায়ু সেরূপ নহে, তাহার গতি-শক্তি আছে, সুতরাং অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে এবং অপরকেও চালাইয়া লইয়া যাইতে পারে, সুতরাং **বায়ুই অন্যান্য ভূতের নিয়ন্তা বা চালক**। বায়ুর এইরূপ গতি-শক্তি কোথা হইতে আসিল? অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, যে, বায়ু রজোগুণ বহুল এবং রজোগুণের স্বভাব এই যে, তাহা অত্যন্ত চঞ্চল। এক স্থানে কখনই স্থির থাকিতে পারে না। সুতরাং বায়ুও এক স্থানে স্থির থাকিতে পারে না এবং ইহাই তাহার গতি শক্তি।

জীবদেহের সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে, একটী অতিশয় আশ্চর্য্য কৌশল দেখা যাইবে, যে, প্রাণীগণের জীবনীশক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তি কোন একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ নাই, কিন্তু প্রাণী-শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, অণুতে এবং পরমাণুতেও তাহার উপলব্ধি হয়। ধাতুবাহি এই বায়ুর কার্য্যকলাপ আলোচনা করিলেও তাহা প্রমাণিত হইবে। দেখা যায় যে, মানবদেহের যেখানে যে পরিমাণ রসরক্তাদির আবশ্যক, অসংখ্য বায়বীয় পরমাণু তাহা ইতস্ততঃ বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। আবার যেস্থানে রোগোৎপাদন করিতে হইবে, এই বায়বীয় পরমাণুই বিপথগামী না হইয়া, ঠিক সেই স্থানে ধাতুসকল বহন করিয়া, উপনীত হইতেছে। এই ধাতু-বহন-ক্রিয়া অতি সূক্ষ্ম পরমাণু ভেদে বিভাগ করিয়া দেখিলে মনে হইবে, যেন উহারা প্রত্যেকে এক একটী প্রাণী।

বায়ু সর্ব্বদেহ ব্যাপী। যদিও এই দেহের অভ্যন্তরে বায়ুর কতকগুলি বিশেষ স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু সাধারণতঃ ইহা সর্ব্বদেহ ব্যাপী অর্থাৎ বায়ু অহরহ জীবের সর্ব্ব দেহেই বিচরণ করিতেছে। শুক্রশোণিতান্তর্গত সামান্য পরিমাণ বায়ু এই দেহে কিরূপে ব্যাপ্ত হইতে পারে?—এইরূপ প্রশ্ন হইলে দেখিতে হইবে, বায়ুর হ্রাস বৃদ্ধি কিরূপে হইয়া থাকে। দেখা যায় যে, বায়ু, শুক্রশোণিতের অতি ক্ষুদ্রতম বীজভাগে শক্তিরূপে অবস্থিত থাকিয়া ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মানবের এই স্থূলদেহ যেমন অবিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিত থাকিয়াই প্রতি নিয়ত ক্ষয় ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে,—সেইরূপ শুক্রশোণিতান্তর্গত সূক্ষ্মতম শক্তিরূপী বায়ুও দেহের সহিত অবিচ্ছিন্ন ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়াই ক্ষয় বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। এই বীজরূপী বায়ু ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম হইলেও ইহার শক্তি অচিন্ত্যনীয়। ইহাই প্রাণীগণের প্রাণ, আবার ইহাই প্রলয় কালে বিশ্বসংহারী মহাকাল। এই বায়ু বিকৃত হইলেই বিকৃতাঙ্গ সন্তান প্রসূত হয়, আবার ইহারই সাম্যাবস্থায় অবিকৃত সন্তান প্রসব হইয়া থাকে। যিনি প্রবল শ্বাস রোগে আক্রান্ত হইয়া দিবারাত্রি অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, যিনি বাতরোগে আক্রান্ত হইয়া উত্থান শক্তি রহিত হইয়াছেন, যে বীরপুরুষ এক মন, দেড় মন ভার অবলীলাক্রমে হস্তদ্বারা উত্তোলন পূর্ব্বক শিরে স্থাপন করিতে সমর্থ হইতেন, আবার যখন তিনিই তাঁহার স্বীয় হস্তও উঠাইতে অক্ষম হন এবং যিনি অসহনীয় বেদনায় দিন রাত্রি "হায়রে গেলামরে" বলিয়া কাতর-ক্রন্দনে গৃহবাসী—এমন কি প্রতিবাসীকে পর্য্যন্ত অস্থির করিয়া তুলেন, তিনিই

*—আয়ুর্ব্বেদ

কিয়ৎপরিমাণে এই বায়ুর শক্তি অনুভব করিতে পারেন পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বায়ু ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সুতরাং দেখা উচিত যে, বায়ুর হ্রাস-বৃদ্ধি কিরূপে হয়। আহার বিহার হইতে যেমন অন্যান্য ধাতুর—রস রক্তাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ আহার-বিহার হইতেই বায়ুর ও উৎপত্তি হয়। কষায় রস, কটুরস ও তিক্তরস দ্রব্য হইতেই সাধারণতঃ বায়ুর উৎপত্তি হয়। আবার বাহ্য-বায়ু হইতেও শরীর বহু পুষ্টিলাভ করে। গুণের আলোচনা করিয়া বাহ্য বায়ু হইতে শারীর-বায়ুর বৃদ্ধি প্রতিপন্ন করা যায় না। কারণ, শারীর বায়ু ও বাহ্যবায়ু সমান গুণ বিশিষ্ট নহে। বাহ্যবায়ু অশীতোষ্ণ এবং শারীর বায়ু বহু শীত-যুক্ত। সমান গুণ দ্রব্য দ্বারাই সমান গুণ দ্রব্যের বৃদ্ধিসাধন হয়, অসমান গুণ দ্রব্যদ্বারা হয় না। সুতরাং বহির্বায়ু দ্বারা শারীর-বায়ুর বৃদ্ধি হওয়া অসম্ভব। কিন্তু বায়ুর উৎপত্তি বিষয়ে আলোচনা করিলে, তাহা সপ্রমাণ হইতে পারে। উৎপত্তির আলোচনায় দেখা যায় যে, কারণ ভূত বায়ুর অংশ হইতেই শারীর বায়ু নির্ম্মিত। সুতরাং বাহ্যবায়ু হইতে শারীর-বায়ুর বৃদ্ধি বা পুষ্টি অবশ্যম্ভাবী। শ্বাস-ক্রিয়ার আলোচনায় ইহার সুস্পষ্ট মীমাংসা হইবে।

শারীর বায়ুর স্বরূপ কি? শারীর-বায়ুর কোনপ্রকার বর্ণ বা রূপ নাই। এবং নাই বলিয়াই উহা চক্ষুর অগোচর,—যেমন বাহ্যবায়ু। বাহ্যবায়ুরও কোনপ্রকার রূপ না থাকায় উহা দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহে। ইন্দ্রিয়-গণের স্বভাব এই যে, স্বজাতীয় দ্বারা অভি-ব্যক্ত হইয়া বিষয়ের গ্রাহক হয়; যেমন মধু-রাদি রস, লালা দ্বারা অভিব্যক্ত হইলেই রস নেন্দ্রিয় তাহার গ্রাহক হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত লালার সহিত সংমিশ্রিত না হইবে, ততক্ষণ কি রস,—তাহা রসনেন্দ্রিয় গ্রহণ করিতে পারে না। সেইপ্রকার রূপ বা বর্ণ আলোকের দ্বারা অভিব্যক্ত হইলেই চক্ষুরিন্দ্রিয় তাহা গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু বায়ুর কোনপ্রকার রূপ না থাকায়, উহা আলোকের দ্বারা অনভিব্যক্ত, সুতরাং চক্ষুর অগোচর। কিন্তু গতি-ক্রিয়া দ্বারা উহার সত্ত্বোপলব্ধি সুনিশ্চিত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বায়ু রজোগুণময় এবং সূক্ষ্ম, সুতরাং গতিমান। এতদ্ভিন্ন পিত্ত, শ্লেষ্মার কোন গতি নাই। বায়ুই ইহাদিগকে চালিত করিয়া সর্ব্বদেহে আনয়ন করে। ঠিক্ যেমন বহির্জগতে একমাত্র বায়ুই জলীয় পরমাণু এবং আগ্নেয় পরমাণু বহন করিয়া এই বিশাল-ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে।

কিরূপ দ্রব্য-সেবনে শারীরবায়ুর বৃদ্ধি হয়? এবং কেন হয়?—ইহার মীমাংসা করিতে হইলে, বায়ুর উৎপত্তি এবং তাহার গুণ বিষয়ে আলোচনা করা আবশ্যক। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সমানগুণ দ্রব্য দ্বারাই সমান গুণ দ্রব্যের বৃদ্ধিসাধন স্বাভাবিক। যেমন রসের দ্বারা রসের, রক্তদ্বারা রক্তের, এবং মাংসদ্বারা মাংসের বৃদ্ধি হয়,—সুতরাং বায়ুর তৎসমানগুণ দ্রব্য কি, তাহাই অগ্রে দেখা আবশ্যক। শারীর-বায়ুর উৎপত্তি সম্বন্ধে ঋষি-গণ বলেন যে, "বায়্বাকাশাভ্যাং বায়ুঃ"। অর্থাৎ শারীর বায়ু=কারণভূত—বায়ু এবং আকাশাংশ হইতে উৎপন্ন। সুতরাং এই শারীর বায়ু ও কারণভূত বায়ু যে ঠিক্ একজিনিষ নহে, তাহা সুস্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। এবং এই জন্যই শারীর বায়ু শীত এবং কারণ-বায়ু অশীতোষ্ণ। বিশিষ্ট পরিণতিই ইহার কারণ। শারীর

বায়ুর পরমাণুগুলি অসংঘাত অর্থাৎ একে অন্যের সহিত মিলিত হয় না। পিত্ত, শ্লেষ্মার অবয়বগুলি সেরূপ নহে, সংঘাত। সুতরাং বায়ু সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম অবস্থায় অবস্থিতি করে। বায়ু সুদৃঢ় পাষাণকে ভেদ করিয়া, চলিয়া যাইতে পারে। ইহা দেহের অস্থি মাংস, নখ ও কেশাদিতে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাদের বিকৃতি উৎপাদন করিতেছে।

বায়ুরগুণ—এই বায়বীয় পরমাণুগুলি রুক্ষ, লঘু, চল, বহু, শীঘ্র, শীত, পরুষ এবং বিশদ। এতদ্‌গুণ বিশিষ্ট দ্রব্য সেবনে বায়ুর বৃদ্ধি এবং বিপরীত গুণ দ্রব্যদ্বারা বায়ুর উপশম হইয়া থাকে।

একথা মনে করা উচিত নয় যে, রুক্ষ এবং উষ্ণ কটুরসের দ্বারা বায়ুর যখন বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এবং শীত ও স্নিগ্ধ-মধুর রস দ্বারা যখন বায়ুর প্রশমন দেখা যায়, তখন বায়ু যে শীত, তাহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? সত্য বটে, শীত দ্রব্য দ্বারাও বায়ুর উপশম এবং উষ্ণ দ্রব্য দ্বারাও বায়ুর বৃদ্ধি দেখা যায়, কিন্তু তজ্জন্য বায়ু শীত নয় এরূপ বলা যায় না। কারণ বায়ু শীত হইলেও শীতত্ব প্রধান নয়, রুক্ষতাই প্রধান। কটুরস উষ্ণ হইলেও অতিশয় রুক্ষ, তদ্ভিন্ন লঘুতা, বৈশদ প্রভৃতি আরও কতকগুলি বায়ুর সমান জাতীয়গুণ বিদ্যমান থাকায় উষ্ণতার প্রভাবকে অভিভূত করিয়া বায়ু বৃদ্ধির হেতু হয়। কারণ ইহাতে বায়ু প্রশমক গুণ অপেক্ষা বাত বর্দ্ধক গুণই অধিক বিদ্যমান থাকে। আবার শীত-মধুর রসে, স্নিগ্ধতা, মধুরতা, গুরুতা এবং পিচ্ছিলতা প্রভৃতি বাত বিরুদ্ধগুণ অধিক থাকায় শৈত্যকে অভিভূত করিয়া বাত প্রশমনে সমর্থ হয়। সুতরাং বায়ুর শীতত্বে কোন সংশয় থাকিতে পারে না।

বায়ুর কার্য্য কি? শুক্র, শোণিত, মল, মূত্র এবং গর্ভের নিষ্ক্রামন প্রভৃতি বায়ুর কার্য্য। এতদ্ভিন্ন ধাত্বাদির বহন করা ও শ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতিও বায়ুর কার্য্য। এই যে, গর্ভাশয়ে শুক্র, শোণিতের মিলন, ইহাও বায়ুর কার্য্য। স্ত্রী পুরুষের সহবাসে বায়ু উত্তেজিত হইয়া, শুক্র-শোণিতে যে বেগ উৎপাদন করে, তদ্বারা শুক্র-শোণিত স্বস্থানচ্যুত হইয়া, উভয়ে গর্ভাশয়ে মিলিত হয়। শুক্র-শোণিতের এই বেগের প্রতি অন্য কোন কারণ নাই। জীবিত শক্তি ও অদৃষ্ট প্রভৃতি অন্যতর হেতু হইলেও তাহারা অবেগব-দ্রব্যে গতি শক্তি প্রদান করিতে পারে না। পারিলে পিত্ত, শ্লেষ্মা প্রভৃতিও গতিমান্ হইত।

ইহা যেমন শুক্র-শোণিতকে মিলিত করে তেমনই শুক্র শোণিতে শক্তিরূপে অবস্থিত থাকিয়া, উহাদিগকে নানা আকৃতিতে বিভক্ত করে এবং উহাদের গঠন নির্ম্মাণ করে। ইহাদের কার্য্যগুলি আলোচনা করিলে, ইহাদিগকে কোনরূপ বুদ্ধিজীবি প্রাণী না বলিয়া থাকা যায় না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে যাহা "সেল্" বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা কি এই বায়ু মিশ্রিত ধাতব অণু? পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবাদীগণ বলেন যে "সেল্" গুলি বহুরূপী, ক্ষণে ক্ষণে উহারা আকৃতির পরিবর্ত্তন করে। "আয়ুর্ব্বেদে" ঠিক তদ্রূপ কথা না থাকিলেও ইহার অনুরূপ তত্ত্ব আছে। আয়ুর্ব্বেদে বলা হইয়াছে, যে, শুক্র শোণিতে বীজ রূপ সপ্ত ধাতুই বিদ্যমান আছে। এবং বায়ুই তাহাদিগকে ভাঙ্গিয়া বিভিন্ন আকারে পরিণত করে। আমার বোধ হয়, এই উভয় তত্ত্বেরই বিলক্ষণ সামঞ্জস্য আছে। যাহা হউক এ বিষয়ের অধিক আলোচনা করা অস্মকার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

বায়ুর প্রধান স্থান শ্রোণী প্রদেশ অর্থাৎ বায়ু সর্ব্বশরীর ব্যাপী হইলেও ইহাদিগকে শ্রোণী প্রদেশেই অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পক্কাশয়গত কতকগুলি শোণিত-স্রোতে ইহারা বিশেষ ভাবে বিচরণ করে। তদ্ভিন্ন সমস্ত দেহেই ইহাদের গতি আছে। শিরা, ধমনী, স্রোত প্রভৃতি ইহাদের গমনমার্গ। ইহারা বিশেষ ভাবে অস্থিকে অবলম্বন করিয়া বাস করে। ব্যায়ামাদি দ্বারা বায়ুর বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়, কিন্তু তাহা স্থানচ্যুতিরূপ বৃদ্ধি মাত্র। অর্থাৎ ব্যায়ামাদি দ্বারা বায়ু প্রকুপিত হইয়া, অস্থি হইতে বহির্গত হইয়া সর্ব্বদেহে একটা প্রবল ঝটিকা উৎপাদন করে, আবার পরক্ষণেই তাহার শান্তি হয়। শ্রোণী প্রদেশ বায়ুর সর্ব্ব প্রধান স্থান হইলেও নাভি হৃদয়, কণ্ঠ ও সমস্ত সন্ধিতেই ইহারা বিশেষ ভাবে অবস্থিতি করে।

কি পরিমাণ বায়ু দেহে অবস্থিতি করে, তাহা বলা যায় না। রস-রক্তাদি ধাতু কি পরিমাণ থাকে, তাহা নিরূপিত আছে, কিন্তু বায়ু সম্বন্ধে সেরূপ কিছু নাই, হইতেও পারে না। কারণ-বায়ু অসংঘাত অর্থাৎ মিলিতাবয়ব নহে; এবং অসংঘাত বলিয়াই ইহাকে ধরাও যায় না। কিন্তু ঔষধ দ্বারা ইহার উপশম করা যায়। প্রকুপিত বায়ু, শরীরের যে অংশে থাকে, সেবিত ঔষধের বীর্য্য তথায় প্রবেশ করিলেই বায়ুর সহিত মিলিত হয়, এবং মিলিত হইলেই বিপরীত গুণদ্রব্য দ্বারা তাহার উপশম হয়। দৈহিক অন্যান্য রস-রক্তাদি ধাতুর গতি যেমন নিয়মিত অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট স্রোতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়, বায়ুর গতির সেরূপ কোন বিশেষ নিয়ম নাই। যদি ও কতকগুলি বায়ু-স্রোত ও দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি তাহারা দেহের সকল স্রোতেই গমন করে এবং কখন বা রস-রক্তাদি স্রোতের অনুকূলে, কখন বা প্রতিকূলে গমন করিতে পারে।

বায়ুর দ্বারা দেহের ক্ষয় হইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বায়ুর রুক্ষতাই প্রধান, এবং বায়ু রুক্ষ বলিয়াই অত্যন্ত শোষক। এই বায়ুই রসরক্তাদি ধাতু ও উপধাতু এবং তাহাদের মলাংশ শোষণ করিয়া বহির্মার্গে লইয়া যায়। লঙ্ঘিত ব্যক্তির ধাতুক্ষয় এই প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। শ্বাশ-ক্রিয়া দ্বারাও প্রতি নিয়ত দেহের ক্ষয় হইতেছে। এতদ্ভিন্ন পীড়িতাবস্থায় যে বহির্ম্মুখ-স্রোতঃ দ্বারা অতিরিক্ত ধাতুক্ষয় হইতে দেখা যায়, তাহাও বায়ুর কার্য্য। ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, দোষ-ধাতু-মল প্রভৃতির বহন করা এবং শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করা প্রভৃতিই বায়ুর প্রধান কার্য্য।

বস্তুত বায়ুর কোন ভেদ নাই, একই বায়ু সর্ব্বদেহে বিচরণ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিতেছে। কিন্তু কার্য্য ভেদে ঐ বায়ুকে প্রাণাদি সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া, পাঁচ প্রকারে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যেমন প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। ইহাদের মধ্যে অপান, ব্যান ও সমান বায়ু দোষ-ধাতু-মল প্রভৃতির বহন করে। এবং প্রাণ ও উদান—ইহারা শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়ায় বিশেষ ভাবে নিযুক্ত। বায়ু প্রধান রূপে এই শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া দ্বারাই প্রাণীগণকে জীবিত রাখে। ইতিপূর্ব্বে দোষ-ধাতু-মলাদির সঞ্চালন ক্রিয়া বলা হইয়াছে, অধুনা শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা কি ভাবে বায়ু প্রাণীগণকে সঞ্জীবিত রাখে, তাহা

সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া, এই বায়ু প্রবন্ধের শেষ করিব।

শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রধান স্থান ফুস্‌ফুস্‌। যদিও ফুসফুসের বর্ণনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, তথাপি ফুস্‌ফুস্‌ সম্বন্ধে দুই একটী কথা না বলিলে বিষয়টী সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে না। সুতরাং এ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক।

মানবজাতির ফুসফুসের আকৃতি কোবিদার (কাচনার) পত্র সদৃশ দুই ভাগে বিভক্ত। কণ্ঠ দেশ হইতে শ্বাস নাড়ী নির্গত হইয়া, দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া, ফুসফুসের বাম-দক্ষিণ—দুই অংশে প্রবেশ করিয়াছে। এবং অবশেষে ইহা অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া, সর্ব্বশেষে প্রত্যেকটী শাখা এক একটী ক্ষুদ্র কোটরে পরিণত হইয়াছে। পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানে ফুস্‌ফুস্‌কে একটী স্পঞ্জের ন্যায় বলা হইয়াছে। আমার বোধ হয়, স্পঞ্জের ন্যায় বলিলে উহার বর্ণনা সম্পূর্ণ হয় না। ফুস্‌ফুস্‌কে সমুদ্রফেণের সহিতও কেহ কেহ তুলনা করিয়াছেন। সমুদ্র ফেণের বর্ণ ও ফুস্‌ফুসের বর্ণে সৌসাদৃশ্য আছে, এবং সমুদ্রফেণের উপরিভাগ যেমন নির্ম্মল ও অভ্যন্তর ভাগ সচ্ছিদ্র, ফুস্‌ফুস্‌ও ঠিক তদ্রূপ। স্পঞ্জ সচ্ছিদ্রতায় ফুস্‌ফুস্‌ তুল্য হইলেও অন্যান্য বিষয়ে সামঞ্জস্য নাই। যাহা হউক বুঝিতে হইবে, যে, ফুস্‌ফুস্‌ কোবিদার পত্র সদৃশ দ্বিধাবিভক্ত হইয়াও ঠিক সমুদ্রফেণের ন্যায়। এই সকল ছিদ্র মধ্যে সমল-শোণিতের সহিত উদান বায়ু বাস করে। উর্দ্ধগমনশীল বায়ুর নামই উদান-বায়ু। প্রাণবায়ু ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করিয়া শোণিত মধ্যে আকাশীয় অংশ এবং কিয়ৎ পরিমাণ বিশুদ্ধ বায়বীয় অংশ প্রদান করে। উদান বায়ু তৎক্ষণাৎ শোণিতের মলভাগ লইয়া বহির্গত হয়। এইরূপ আদান-প্রদানের নামই শ্বাস-প্রশ্বাস। বায়ু স্বয়ং অরূপ, তাহার কোন বর্ণই নাই। কিন্তু ইহার সংযোগে এক প্রকার লাল বর্ণ হইতে দেখা যায়। তবে ইহার সংযোগে রস রঞ্জিত হইয়া শোণিত রূপে পরিণত হয় কি না, তাহার আলোচনা করা, এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, সুতরাং সে বিষয়ে কোন কথা বলা হইল না।

উদান বায়ুর প্রধান স্থান ফুস্‌ফুস্‌। উদান-বায়ু এই স্থান হইতে নির্গত হইয়া যায় বটে, কিন্তু একেবারে নিঃশেষ হয় না। দেখা যায় যে, উদান বায়ু উপযুক্তরূপে বহির্গত হওয়ার পরও আমরা ইচ্ছা করিয়া আরও কতকটা নিঃসরণ করিতে পারি।

প্রাণ বায়ুর প্রধান স্থান মস্তক। কারণ প্রাণবায়ুর কতকাংশ মস্তকে থাকিয়া যায়। অথবা উভয়েরই প্রধান স্থান উরঃ। প্রাণ বায়ুর গতি ফুস্‌ফুস্‌ পর্য্যন্ত; ইহার অধিক নয়। প্রাণবায়ু ফুস্‌ফুস্‌ হইতে শোণিতে প্রবেশ পূর্ব্বক সমস্ত দৈহিক ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে। এই প্রাণ-বায়ুকে আমরা চেষ্টা করিয়া কিছুক্ষণ বদ্ধ রাখিতে পারি সত্য, কিন্তু চিরদিনের জন্য বা কিছুদিনের জন্যও বদ্ধ রাখিতে পারি না। সেরূপ বদ্ধ রাখিবার জন্য চেষ্টা করিলে ইহা একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। কেহ যদি সৈন্ধরাশ্ব (উচ্চৈঃশ্রবাঃ) কে বাঁধিয়া রাখে, তবে সে যেমন খুঁটি উঠাইয়া, বৃক্ষাদি উন্মূলিত করিয়া, প্রস্থান করে, এই প্রাণ-বায়ু ও সেইরূপ বাঁধা পড়িলে আর রক্ষা নাই, একেবারে

প্রলয়মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক সমস্ত বায়ু সঙ্গে করিয়া এই দেহ-বূহ ভেদ করিবেই করিবে। তখন তাহার সেই গতিরোধ করিতে পারে, এখন ভগবানও নাই। বলিতে কি,—সেই মূহুর্ত্তেই মানব সর্ব্বপ্রকার ঐহিক সুখদুঃখ, কলহ, বিচার এবং শত্রুতা-মিত্রতা—সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভবলীলা সংবরণ করে।

বায়ুর প্রকৃতি-বিকৃতি ও তাহার বিস্তৃত কার্য্যের অলোচনা করিয়া আর আপনাদের সময় নষ্ট করিব না। *

কবিরাজ শ্রীহরমোহন মজুমদার।

* এই প্রবন্ধ গত ১৩২৩ সালের ২১শে চৈত্র "আয়ুর্ব্বেদ সভা"র ১ম সাধারণ অধিবেশনে কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়ের সভাপতিত্বে পঠিত হইয়াছিল।

"আয়ুর্ব্বেদে"র কষায় মাহাত্ম্য।

—:*:—

গত চৈত্রমাসের ৭ম সংখ্যক "আয়ুর্ব্বেদে" শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় বি, এ, বি, এল, মহাশয়ের লিখিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। যাহাকে লিপি-কৌশল বলে, সুরেন্দ্রবাবুর লেখায় তাহা বহুল পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। একবার পড়িলে, আর একবার পড়িতে ইচ্ছা করে; এরূপ লেখা কচিৎ-কদাচিৎ প্রকাশিত হয়। রায় মহাশয়ের লেখা সুখোদ্য, অক্রুর, বিস্পষ্টার্থ এবং মনোহর। তজ্জন্য বার বার পড়িতে প্রবৃত্তি জন্মে, পড়িয়া বন্ধুজনকে শুনাইতেও ইচ্ছা করে।

লেখকের শ্যালিকা দুরারোগ্য কাস-জ্বর-রক্তপিত্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ডাক্তারি চিকিৎসার আশ্রয় লইয়া এবং ডাক্তারদিগের উপদেশ অনুসারে স্থানে-স্থানে ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া, তাঁহাকে আরোগ্য-দান করিতে সমর্থ হন নাই। তারপর সুরেন্দ্র বাবুর প্রতিবেশ-বাসি বন্ধুজনের কথানুসারে (বোধ হয় তাঁহারা Uneducated) এবং তাঁহার স্ত্রীর আগ্রহাতিশয্যে অগত্যা কবিরাজি চিকিৎসা করাইলে, রোগিণী আরোগ্য লাভ করেন।

সুরেন্দ্র বাবু লোক-হিতৈষণার বশবর্ত্তী হইয়া, পীড়ার অহেতুক-সংক্ষিপ্ত লক্ষণ এবং যে কষায় পান করিয়া রোগিণী রোগের হাত হইতে নিস্কৃতি লাভ করিয়াছেন, তাহা জনসাধারণকে জানাইবার জন্য সরল প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত প্রবন্ধ সাদরে "আয়ুর্ব্বেদে" মুদ্রিত এবং প্রচারিত হইয়াছে। যে কেহ পাচনের পত্রী দেখিয়া প্রশস্ত দ্রব্য যোগে পাচনটী তৈয়ার করিয়া, তথা কথিত রোগে ব্যবহার করিবেন, তিনিই পরমোপকার লাভ করিবেন,—ইহাই প্রবন্ধ রচনায় মুখ্যোদ্দেশ্য। আর একটা গৌণ উদ্দেশ্যও আছে। রায় মহাশয় কৌশলে অনাগত রোগ প্রতিষেধেরও যৎকিঞ্চিৎ ব্যবস্থা দিয়াছেন। আমরা সে কথাটা একটু বিস্তার করিয়া বলিতেছি।

যাদৃশ শিক্ষার গুণে নর-নারীগণ আত্মহিতে রত রহিয়া, পরহিত পরায়ণ হইয়া, সুস্থশরীরে এবং প্রসন্নমনে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ

করিতে পারেন এবং পরকালে তাঁহারা সদ্গতি লাভ করিতে সমর্থ হন, তাদৃশ ঐহিকামুষ্মিক হিতকারী শিক্ষার নাম সুশিক্ষা। কেবল পড়িলে-শুনিলেই শিক্ষার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। শ্রুত এবং অধীত সদুপদেশানুসারে চলিতে শিখিলে শিক্ষার সাফল্য ঘটে। বর্ত্তমানকালে বিদ্যার্থি-বালকবালিকারা নানা সদুপদেশ পূর্ণ গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকেন এবং শিক্ষকের মুখে, ও অন্যসূত্রে বহু সদুপদেশ শ্রবণ করিতেছেন। কিন্তু অধীত এবং শ্রুত উপদেশ অনুসারে কর্ম্মে অভ্যস্ত হইতে অনেকে বাধ্য নহেন। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগের সুফল (Advantage of early rising) বহুজনের জানা-শুনা আছে; কিন্তু কেহ ৭টায়, কেহ বা ৮টায়, কেহ কেহ তাব চেয়েও বেশী বেলায় শয্যাত্যাগ করেন। এ একটা দৃষ্টান্ত মাত্র। পুষ্টিজনক, তুষ্টিবর্দ্ধক, আয়ুষ্য এবং যশস্য বহু সদ্বৃত্ত জানিয়া শুনিয়াও লঙ্ঘন করিতে অনেকে ইতস্ততঃ করেন না। কারণ অধুনা সদাচরণে বাধ্য করিবার কেহই নাই। শিক্ষকেরা উপদেশ দিয়াই কর্ত্তব্য কর্ম্ম শেষ করেন, গুরুজনেরা অগত্যা সে কাজে একান্ত উদাসীন; সমাজের হাত হইতে শাসনদণ্ড স্খলিত-প্রায়। লোক মাত্রেই দণ্ডজিত; স্বভাব শুচি মনুষ্য একান্ত দুর্লভ। দণ্ড-ভয়-ভীত নর-নারীগণ নিয়মিত রহিয়া ঐহিক ভোগ-সুখ উপভোগ করিতে সমর্থ হন। দণ্ডের ভয় নাই; যার যেমন ইচ্ছা সে সেই ভাবেই চলে। বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করিতে অনেকেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে অনেক সদ্বৃত্ত লঙ্ঘন করিতে হয়। হিতায়ুর প্রতিকূল অনুচিত আহার, বিহার, ব্যায়াম, বিশ্রাম, শয়ন, উত্থান প্রভৃতিতে আসক্ত হইয়া শারীর-মানস-স্বাস্থ্য হারাইয়া তাঁহাদিগকে আয়ুষ্কাল কাটাইতে হয়। এই সকল কথা সংক্ষেপে বুঝাইবার জন্য সুরেন্দ্র বাবু একখানি সজীব চিত্রপট অঙ্কন করিয়াছেন। শ্রম-বিমুখতা, অকাল নিদ্রা, অতিনিদ্রা, দেশ কালের অনুপযোগী পরিচ্ছদ ধারণ এবং অপ্রসন্ন-চিত্ততা প্রভৃতি ভাবগুলি সে পট খানিতে বেশ প্রস্ফুটিত হইয়াছে। সুরেন্দ্র বাবু আর একখানি চিত্রে লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি আঁকিয়া দিয়াছেন। সে চিত্রখানির ভাব গ্রহণ করিতে হইলে, অতীতের এবং বর্ত্তমানের সুসমাবেশ হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি।

কিছুকাল পূর্ব্বে এদেশের স্ত্রীলোকেরা বিদ্যালয়ে লেখা পড়া শিখিতেন না। কিন্তু তখন স্বতন্ত্র প্রকার স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন ছিল। সে সময়ে পুরাণ ও ইতিহাস শুনিবার নানা প্রকার উপায় ছিল। পুরাণে উক্ত, সংহিতায় কথিত বিধি পালন এবং নিষেধ পরিবর্জ্জন করাইবার জন্য ব্রাহ্মণ-শাসন দণ্ড পরিচালিত হইত। গুরুজনেরাও স্ব স্ব পরিজনবর্গকে সদাচারে নিয়মিত করিতে প্রয়াস পাইতেন। তদ্বিষয়ে সামাজিক শাসনও দৃঢ়তর ছিল। এই সকল কারণে স্ত্রীজনেরা লেখাপড়া না শিখিয়াও সদুপদিষ্ট হইতেন এবং অনেকে সদাচার পালন করিতে বাধ্য থাকিতেন। যদিচ বর্ত্তমানে হিন্দুসমাজের বন্ধন ছেদ করিবার জন্য নানা দিক দিয়া প্রবল আঘাত, বাঁধন রাখিবার জন্য দুর্ব্বল-প্রতিঘাত চলিতেছে; তথাপি বহুকালের অভ্যস্ত অনেকগুলি সদ্বৃত্ত আজিও সম্যক্ লোপ পায় নাই। তজ্জন্য এখনও আমারা পতি-রতা, ব্রত-নিয়ম পরায়ণা, গুরুজনে ভক্তিমতী, গৃহ কর্ম্ম নিপুণা, আলস্য রহিতা, আশ্রিত জনে দয়াবতী, প্রিয়-

বাদিনী এবং সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যা আর্য্য-ললনায় কচিৎ সাক্ষাৎ পাই। তাঁহারা সন্তান-পালনে আপনাদের অঙ্গবিশেষের সৌষ্ঠব হানি করিতে কুণ্ঠিত নহেন; আর্ত্তজনের সেবায় হাতে ব্যথা পাইবারও ভয় করেন না।

অধুনা কদাচিৎ মণি-কাঞ্চনের যোগ হইতেও দেখা যায়। পুরুষ পরম্পরাগত সদ্বৃত্তে নিরতা পরন্তু আধুনিক রুচির শিল্প-কলায় সিদ্ধ হস্তা হিন্দু রমণী আজিও সমাজে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাদের বলয়মণ্ডিত কোমল হস্তের প্রযত্নে পতিদেবতার গৃহখানি লক্ষ্মীর আবাস ক্ষেত্র হইয়া উঠে, গৃহ প্রাঙ্গণ নন্দনকাননের শ্রী ধারণ করে। সুরেন্দ্র বাবুর অঙ্কিত দ্বিতীয় চিত্রপটে তথাবিধ স্ত্রী-মূর্ত্তির প্রতিকৃতি প্রকটিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য সেখানি তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনী পত্নীর প্রতিকৃতি।

প্রতিকৃতি দেখিয়া প্রাকৃতের ভাব অনুভব করা যাইতে পারে। যাঁহারা সুরেন্দ্র বাবুর কবিকৌশলের প্রতি মনঃসংযোগ করিবেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহার মনোবৃত্ত্যনুসারিনী মনোরমা-গৃহলক্ষ্মীর হৃদয়ে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি সম্যকস্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে, পরোপচিকীর্ষা বৃত্তিও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি আলস্য পরিহীনা। এ সকল গুণ যাঁহার থাকে, তাঁহার আত্মা, মনঃ এবং ইন্দ্রিয়গণ সুপ্রসন্ন। প্রসন্নেন্দ্রিয় মনস্কতা স্বাস্থ্যের লক্ষণ। ভরসা করি, তিনি নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যভ্রষ্ট নহেন। তাঁহার কর্ম্মেন্দ্রিয়, বৃত্তির অনুরূপ সাধনা করিতে আলস্য পরিহীন এবং সুনিপুণ। বাধা না মানিয়া, আপনার অনিষ্টাশঙ্কায় শঙ্কিত না হইয়া, তিনি রোগিণীর মস্তক আপনার অঙ্কে ধারণ করেন, তাঁহার হস্ত রোগি-পরিচর্য্যায় নিরালস্যে সঞ্চালিত হইতে থাকে।

সুরেন্দ্র বাবুর লিখিত প্রবন্ধ-বিশ্লেষণ করিয়া আরও অনেক কথা লেখা যাইতে পারে। কিন্তু কাগজের দাম অসঙ্গত চড়িয়া গিয়াছে, ছাপার এবং কালীর মূল্যও বাড়িয়া গিয়াছে। তজ্জন্য আর অধিক লিখিলাম না। "আয়ুর্ব্বেদে"র পাঠিকাগণ দুইখানি চিত্রপটের প্রতি মনঃসংযোগ করিয়া, ভালমন্দ বিচার করতঃ আপনারা সদ্বৃত্ত-পরায়ণা হইবেন। আর পাঠকগণ আপন আপন গৃহিণীগণকে ভক্তিবিধি শিখাইবার প্রয়াস পাইবেন, ইহাই অকিঞ্চনের সবিনয় প্রার্থনা।

অতঃপর আমরা প্রস্তুত বিষয়ের অনুসরণ করিব। বলাবাহুল্য যে, আয়ুর্ব্বেদের কষায়-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনই এই প্রবন্ধের প্রস্তুত বিষয়।

যে পানীয় ঔষধ এ দেশে পাচন নামে পরিচিত, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে তাহাকে কষায় বলে। শৃত, কাথ এবং নির্য্যূহ,—কষায়ের অপর তিনটী নাম। কষায়ের আর একটী ব্যাপক অর্থ আছে, সে কথা পরে বলিব। আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ জ্বরাদি বিবিধ রোগে, নানা প্রকার কষায় কল্পনা করিয়া, প্রতি রোগের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ কষায় প্রয়োগ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। সে সকল কষায় বহুসংখ্যক,—কেহ গণিয়া দেখেন নাই কত? প্রতি রোগে বর্ণিত সমস্ত কষায় প্রয়োগ করিয়া, তৎসমুদায়ের ফলোপধায়কতা অবধারণ করা কোন চিকিৎসকেরই সাধ্যায়ত্ত নহে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের মধ্যে যিনি যে যে রোগে যে যে কষায় প্রয়োগ করিয়া, বহুস্থলে সুফল পাইয়া

করিয়া আসিতেছেন, তাহা যদি লোক-হিতার্থে "আয়ুর্ব্বেদে" প্রকাশ করেন, তাহাহইলে, কালে "আয়ুর্ব্বেদের কষায় মাহাত্ম্য" প্রকরণটী পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হইতে পারে। চুয়াল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞতায়, বহুস্থলে বহুবার প্রয়োগ করিয়া, আমি যে যে কষায়ের সুফলতা উপলব্ধি করিয়াছি, তাহা ক্রমশঃ এই প্রকরণে প্রকাশ করিব। প্রকরণটী যাহাতে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়, তদ্বিষয়ে বিজ্ঞ এবং অভিজ্ঞতর চিকিৎসকগণ মনঃসংযোগ করিলে, "আয়ুর্ব্বেদে"র কষায়" মাহাত্ম্য" বহু জনের বোধগম্য হইতে পারে।

সহচরাদি কষায়।*

আয়ুর্ব্বেদ-ভাণ্ডারের ঔষধ-রত্ন বহু সংখ্যক। সেই অনন্তকল্প রত্ন সমুচ্চয় গণিয়া শেষ করা অনায়াস সাধ্য-নহে। কেহ বলিতে পারে না—আয়ুর্ব্বেদের ভৈষজ্য-রত্ন সংখ্যায় কত, প্রকার-ভেদেই বা কত প্রকার। উপযুক্ত জহুরির অভাবে অধুনা সকল রত্ন চিনিবার উপায় নাই। সাজাইয়া-গুছাইয়া রাখিবার লোকাভাবে রত্ন সমুচ্চয় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, কতক বা হারাইয়া গিয়াছে। কোন কোন রত্ন কাহার-কাহার গৃহে লুকান রহিয়াছে; হয় ত তাঁহারা নিজস্ব করিয়া লইয়া ব্যবহার করেন, পরকে দেন না। দিবার উপযোগী উদারতা তাঁহাদের নাই।

এক সময়ে একজন বড় রকমের জহুরি অনেকগুলি ভৈষজ্যরত্ন নানা স্থান হইতে আহরণ করিয়া সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সে অনেক দিনের কথা। জহুরির নাম চক্রপাণিদত্ত; যে কোষে তাঁহার সংগৃহীত রত্ন ন্যস্ত রহিয়াছে, তাহার চলিত নাম "চক্রদত্ত সংগ্রহ।"

অলঙ্কার ত্যাগ করিয়া, কথাগুলি সংক্ষেপে বলিতেছি।

চক্রপাণিদত্ত নানা আয়ুর্ব্বেদে বিখ্যাত বহু সদ্‌যোগ আহরণ পূর্ব্বক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। সমস্ত সদ্‌যোগই সুফলপ্রদ। তজ্জন্য চক্রপাণিদত্ত কৃত সংগ্রহ আধুনিক বৈদ্যক মতাবলম্বি-চিকিৎসকগণের শ্রেষ্ঠ উপজীব্য গ্রন্থ। গ্রন্থ-প্রারম্ভে গ্রন্থকার বলিয়াছেন,—গূঢ়-বাক্য-বোধক বাক্যবান্ গ্রন্থ নিবন্ধন করিব। কিন্তু তিনি সর্ব্বত্র প্রতিশ্রুতির অনুরূপ কাজ করেন নাই। অনেক কথাই গূঢ়ার্থক রহিয়া গিয়াছে। সেব্যমান ঔষধ স্বকীয় গুণ-বীর্য্য-প্রভাবানুসারে শরীরের কোন দোষের, কোন ভাবের বৈগুণ্য কিরূপে দূর করিয়া, আরোগ্য বিধান করে, গ্রন্থকার কুত্রাপি তাহা স্পষ্টতঃ বলেন নাই। টীকাকারেরাও তত্তদ্বিষয়ে একান্ত উদাসীন রহিয়াছেন।

একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। সূতিকা রোগাধিকারে "সহচরাদি কষায়ে"র ফলশ্রুতি—"সদ্যো জ্বর-সূতিকারোগহরম্"। কথাটা বিস্পষ্টার্থক নহে। বুঝিলাম, "সহচরাদি কষায়" জ্বরঘ্ন এবং সূতিকারোগ নাশক। সূতিকা রোগাধিকারে কষায়টী লিখিত হইয়াছে, তজ্জন্য কষায়টী যে সূতিকা জ্বরে হিতকর, তাহাও বুঝা গেল। কিন্তু সূতিকার সর্ব্বপ্রকার জ্বরে হিতকর অথবা জ্বর-বিশেষে হিতকর

* সংগ্রহকার কষায়ের কোন নাম দেন নাই। প্রায়শঃ আদ্যদ্রব্যের নামানুসারে কষায়ের এবং অন্য অনেক যোগের নামকরণ করা হয়। সহচর, আদ্য দ্রব্য বলিয়া যোগটীর নাম দেওয়া হইল, "সহচরাদি কষায়।"

তাহা বুঝা গেল না। সূতিকা-রোগ-হর বলিলেই বা কি বুঝিব? প্রসবান্তে সূতিকার শরীরে জ্বর, অজীর্ণ, অতীসার, গ্রহণী, আক্ষেপক এবং উন্মাদ প্রভৃতি নানা রোগ প্রকাশ পাইতে পারে। নবপ্রসূতার শরীরে যে রোগের আবির্ভাব হয়, তাহার পূর্ব্বে সূতিকাশব্দ বসাইয়া রোগের নাম করণের প্রথা পূর্ব্বাপর প্রচলিত আছে, যেমন সূতিকাজ্বর, সূতিকা-গ্রহণী ইত্যাদি। এখানে "সূতিকারোগ হর" —ইহার অর্থ কি বুঝিতে হইবে? যাবতীয় সূতিকা-রোগঘ্ন বুঝিব? অথবা বিশেষ-বিশেষ সূতিকা-রোগ নাশক বুঝিতে হইবে? সূতিকা-রোগ সূতিনীর সর্ব্বরোগবাচী হইলে, জ্বর কথাটা পৃথক্ করিয়া বলা হইল কেন?

এইরূপ সন্দিগ্ধার্থের মীমাংসা আবশ্যক। সূতিকা রোগ বলিলে, অধুনা প্রসূতির অজীর্ণ, অতীসার এবং গ্রহণী রোগের অন্যতম রোগ,—সকলে বুঝিয়া থাকেন। সম্ভবতঃ চক্রদত্তের সময়েও সূতিকারোগের তাদৃশ ব্যাপ্য অর্থও প্রচলিত ছিল। তাহা হইলে শ্লোকাংশের অর্থ করা যায়—সূতিনীর জ্বর এবং অজীর্ণাদি রোগ নাশক অথবা জ্বর সংযুক্ত সূতিকারোগ নিবারক।

বস্তুতঃ নবপ্রসূতার জ্বর সংযুক্ত উদরাময় রোগে "সহচরাদি কষায়" প্রয়োগ করিলে সুফল লাভ করা যায়।

সহচরাদি কষায়,—যথা,—

"সহচর পুষ্কর বেতসমূলং,
বিকঙ্কতং দারু কুলত্থ সমম্।
জলমত্র সৈন্ধব হিঙ্গুযুতং
সদ্যো জ্বর সূতিকা রোগ হরম্"।

কষায়ের পত্রী;—

সহচরমূল	...	২৭ রতি।
পুষ্করমূল	...	২৭ রতি।
বেতসমূল	...	২৭ রতি।
বিকঙ্কতমূল	...	২৭ রতি।
দেবদারু	...	২৭ রতি।
কুলত্থ কলায়	...	২৭ রতি।

ছয়খানি দ্রব্যযোগে উক্ত যোগ পরিকল্পিত হইয়াছে। সমবেত দ্রব্য ছয়খানির পরিমাণ ২ ভরি অর্থাৎ ১৬০ রতি গ্রহণ করিতে হয়। প্রত্যেক দ্রব্যের পরিমাণ ১৬০/৬ রতি। ১৬০ রতিকে ৬ ভাগ করিলে, প্রত্যেক দ্রব্যের পরিমাণ হয়—২৬⅔ রতি। ⅓ রতি ভগ্নাংশ অধিক লইয়া উক্তযোগে প্রত্যেক দ্রব্য ২৭ রতি মাত্রায় দেওয়া হইয়া থাকে।

কষায় পরিকল্পনা কালে সহচরাদি প্রত্যেক দ্রব্য একে একে ওজন করিয়া লইয়া, একসঙ্গে উত্তমরূপে কুটিয়া লইবে। তারপর মেটে পাত্রে কাঠের জ্বালে আধ সের জল সহ পাক করিবে। আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া, তাহাতে ৩ রতি শোধন-করা হিং এবং ৶০ দুই আনা সৈন্ধব চূর্ণ—গুলিয়া পান করিতে দিবে।

সহচরাদি কষায়ের দ্রব্য পরিচয়,—

সহচর—চলিত নাম ঝিণ্টী, ঝাঁটী, ঝিঁটী এবং ঝিটকী প্রভৃতি। ইহা এক প্রকার কণ্টকাকীর্ণ ক্ষুপজাতীয় উদ্ভিদ্। সচরাচর মূল দেশ হইতে একটী দণ্ড বাহির হইয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা বিস্তার করিয়া, বাড়িয়া উঠে। কুত্রাপি মূল হইতে একাধিক দণ্ড বাহির হইয়া ঝাড় বাঁধিয়া জন্মে। উর্ব্বর ভূমি জাত ঝিণ্টীর গাছ ৩।৪ হাত উচ্চ হয়। ইহার কাঁপে কাঁপে পত্র-গ্রন্থি। পত্রগ্রন্থি

বেড়িয়া তীক্ষ্ণাগ্র কাঁটা বাহির হয়। ঝিণ্টীর মূল ঔষধার্থে ব্যবহার্য্য। অভাবে মূল কাণ্ড-দণ্ড-শাখা-পল্লব-সমেত ঝিণ্টীর গাছ অনেকে ব্যবহার করেন। কিন্তু তাহা প্রশস্ত নহে। ঝিণ্টী শুকাইলে গুণ-বীর্য্য-প্রভাবহীন হইয়া যায়। তজ্জন্য ঔষধের কাজে কাঁচা ঝিণ্টী ব্যবহার করিতে হয়।

পুষ্করমূল—অধুনা পুষ্কর মূল পাওয়া যায় না। অভাবে কুড় ব্যবহৃত হয়। গন্ধ-বর্ণ-রসযুক্ত কুড় ব্যবহার করিতে হয়।

বেতসমূল—দুই প্রকার উদ্ভিদ বেতস নামে পরিচিত। এক প্রকার ক্ষীরীবৃক্ষ, অম্লবেতস নামে প্রসিদ্ধ। আর এক প্রকার বহু কণ্টকাকীর্ণ লতা-বিশেষ বেত নামে প্রসিদ্ধ। ইহার মূল "সহচরাদি" কষায়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বিকঙ্কত—বৈথর, বৈঁচি, বৈঁছী, বুঁজ এবং ডুম্‌কুর প্রভৃতি নামে পরিচিত। বিকঙ্কত স্থূল-তীক্ষ্ণাগ্র কণ্টকাকীর্ণ উদ্ভিদ্। ইহার কাঁচা ফল সবুজ বর্ণ, পচ্যমান ফলের বর্ণ লাল। ফল পাকিলে স্নিগ্ধ-কৃষ্ণ-শ্রী ধারণ করে। ক্ষুদ্র গোলাকার ফলের মধ্যে পেয়ারা বীজের ন্যায় বহু বীজ নিহিত থাকে। বালকেরা সাদরে ইহার পাকা ফল খাইয়া থাকে। পক্ক-ফলের আস্বাদ কষায়-মধুর। পাকা ফল মালা গাঁথিয়া অঙ্গাভরণও করে। এই গাছের মূল বা স্থূল শিকড়ের ছাল অথবা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিকড় কষায়-কল্পনার জন্য ব্যবহার করিতে হয়।

দেবদারু—পার্ব্বতীয় বৃক্ষ বিশেষ। ইহার সুস্নিগ্ধ পীত-লোহিতাভ কাষ্ঠ ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গলা দেশে দেবদারু জাতীয় এক প্রকার গাছ জন্মে, তাহা ঔষধের জন্য ব্যবহৃত হয় না।

কুলত্থ—পাণ্ডুবর্ণ, চেপ্‌টা কলায় বিশেষ। বিবর্ণ হইলে ঔষধের কাজে ব্যবহার করা অনুচিত।

বিকঙ্কত কষায়।

সূতিকা রোগের অর্থাৎ প্রসূতির অজীর্ণ ভেদ সংগ্রহণ যোগ্য অতীসার এবং গ্রহণী রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

আমাদের দেশে মুষ্টিযোগ বা টোট্‌কা ঔষধ নামে অনেক ঔষধ অনেকের জানা আছে। যাঁহারা চিকিৎসক নহেন, তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ মুষ্টিযোগ-বিশেষ প্রয়োগ করিয়া, অত্যাশ্চর্য্য সুফল দেখাইয়া থাকেন। চিকিৎসকের অসাধ্য অনেক উৎকৃষ্ট ব্যাধি টোট্‌কা ঔষধে আরাম হইতে দেখিয়া আমরা বহুবার বিস্মিত হইয়াছি। সুদীর্ঘ কালে আমরা যতগুলি টোট্‌কা নানা লোকের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, বিশেষ অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, তন্মধ্যে কতকগুলি ঔষধ প্রচলিত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। হয় ত অন্যগুলি কোন-না-কোন অপ্রচলিত শাস্ত্রে উক্ত রহিয়াছে। নূতন উদ্‌ভাবিত মুষ্টিযোগের প্রয়োগও অসম্ভবপর নহে।

আমরা "বিকঙ্কত কষায়" নাম দিয়া যে কষায়ের গুণ-প্রভাবের কথা বলিতেছি, তাহা একটী টোট্‌কা ঔষধের প্রয়োগ দেখিয়া, কিছু রূপান্তর করিয়া আমরা ব্যবহার করতঃ বড়ই সুফল লাভ করিয়া আসিতেছি। কি উপায়ে এই মহৌষধ জানা গেল এবং প্রয়োগ-সৌকর্য্যার্থে তাহার কিরূপ রূপান্তর করা হইয়াছে, তাহা অতি সংক্ষেপে বলিতেছি।

আমাদের গাঁয়ে একজন ব্রাহ্মণ সওয়া

পাঁচ আনার পয়সা লইয়া সূতিকার ঔষধ দিতেন। এক গোছা সরু সরু শিকড় দিয়া বলিয়া দিতেন,—"এই শিকড়গুলি সাতভাগ করিয়া, তাহার এক ভাগ আর ৭টা কৈ মাছ এবং আবশ্যকানুরূপ তরকারি ও লবণ, হলুদ প্রভৃতি মসলা দিয়া ঝোল রাঁধিবে। সেই ঝোলের সঙ্গে উচিত পরিমিত অন্ন মধ্যাহ্নে ভোজন করিবে। মাছ-তরকারি—সমস্তই খাইবে। ভাতের সঙ্গে আর কিছুই খাইবে না। রাত্রিকালে লঘু-পথ্য করিবে। প্রতিদিন এইরূপ করিলে, ৩ হইতে ৭ দিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ করিবে"। তাঁহার ঔষধে অনেক সূতিনী আরোগ্য লাভ করিতেন। অনুসন্ধানে জানা গেল, উহা বিকঙ্কত অর্থাৎ বৈঁছির শিকড়। আমি বৈঁছির সূক্ষ্ম শিকড় এবং স্থূল শিকড় বা মূলের ছাল লইয়া, কষায় প্রস্তুত পূর্ব্বক প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করি। তাহাতেই সুফল ফলিতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে, বিকঙ্কতের মূলের ছাল এবং সূক্ষ্ম শিকড়ের পরিমাণ ২ তোলা পেষণ করিয়া, আধসের জল সহ পাক করতঃ আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া, ছাঁকিয়া পান করিবে। সাতদিনের মধ্যে দুঃসাধ্য সূতিকা রোগ আরোগ্য হয়। আমাদের "আয়ুর্ব্বেদের" পাঠিকাগণের মধ্যে যিনি এই কষায় ব্যবহার করিয়া সুফল দর্শন করিবেন। তিনি কৃপা পূর্ব্বক তাহা জানাইলে, আমরা অনুগৃহীত হইব।

পিপ্পল্যাদিগণের কষায়।

তিন বা তদধিক ভৈষজ্য সমবায়ে কল্পিত যোগসমূহের মধ্যে কতকগুলি যোগ 'গণ'-সংজ্ঞক। যে সকল দ্রব্যযোগে যে গণ পরিকল্পিত, প্রায়শঃ সেই সকলের আদি দ্রব্যের নামানুসারে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 'গণের' নামকরণ করা হইয়াছে। যেমন বিদারিগন্ধাদিগণ, সারসালাদিগণ ইত্যাদি। মহর্ষি সুশ্রুত যে কয়েকটী গণ কল্পনা করিয়াছেন তন্মধ্যে পিপ্পল্যাদিগণ অন্যতম। সুশ্রুতোক্ত পিপ্পল্যাদিগণের দ্রব্য সংখ্যা দ্বাবিংশতি। চক্রপাণিদত্ত সেই বাইশখানি দ্রব্যের মধ্য হইতে দুইখানি দ্রব্য—বচ আর গজপিঁপুল বাদ দিয়া, কুড়িখানি লইয়া গণকল্পনা করিয়াছেন। "ভাবপ্রকাশে" লিখিত উক্তগণের দ্রব্য-সংখ্যা একবিংশতি। দীর্ঘকাল যাবৎ আমরা কোন স্থলে বাইশখানি দ্রব্য লইয়া, কচিৎ একুশখানি দ্রব্যযোগে, কুত্রাপি বা চক্রদত্তের নির্দেশানুসারে কুড়িখানি দ্রব্য-সমবায়ে পিপ্পল্যাদিগণ কল্পনা করতঃ প্রয়োগ করিয়া দেখিয়াছি, সুফলের তারতম্য অবধারণ করিতে পারি নাই। তজ্জন্য অদ্যাবধি চক্রদত্তের মতানুসরণ করিয়া আসিতেছি। সুশ্রুত বলেন—

"পিপ্পল্যাদি কফহরঃ প্রতিশ্যায়ানিলারুচীঃ।
নিহন্যাদ্ দীপনো গুল্ম শূলঘ্নশ্চাম পাচনঃ।"

অর্থাৎ পিপ্পল্যাদিগণ কফরোগ নাশক, প্রতিশ্যায় নিবারক, বায়ুনাশক এবং অরুচিঘ্ন। দীপন, গুল্মঘ্ন, শূল-প্রশমন এবং আমপাচন—ইহার অপর চারিটী গুণ।

চক্রদত্ত বলেন—

পিপ্পল্যাদি কফহরঃ প্রতিশ্যারোচক-জ্বরান্
নিহন্যাদ্দীপনো গুল্মশূলঘ্নস্ত্বাম পাচনঃ।"

চক্রপাণিদত্ত পিপ্পল্যাদিগণের বায়ুপ্রশমনী শক্তি স্বীকার করিলেননা। সুশ্রুতোক্ত অপরাপর গুণগুলি গাঁথিয়া শ্লোক-রচনা করিলেন। অধিকন্তু বলিলেন,—পিপ্পল্যাদিগণ জ্বরঘ্ন। জ্বরঘ্ন বলিতে, অষ্টবিধ জ্বরনাশক

বুঝায়। সেই ব্যাপক অর্থ—তিনি সঙ্কোচ করিয়াছেন। যে হেতু কফজ্বর-চিকিৎসা প্রকরণেই পিপ্পল্যাদি কষায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। পরন্তু সূতিকারোগাধিকারে, মক্কল বা মক্কল্ল শূল-প্রশমনের জন্য পিপ্পল্যাদিগণের কষায়ে সৈন্ধব প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। পরবর্ত্তি কালে ভাবমিশ্রও এই গণের মক্কলশূল-প্রশমনী-শক্তি উপলব্ধি করিয়াছেন। দীর্ঘকাল যাবৎ বহু বহু স্থলে পিপ্পল্যাদিগণের কষায় এবং ক্বচিৎ পিপ্পল্যাদি গণোক্ত সমুদয় দ্রব্যের সমবেত চূর্ণ প্রয়োগ করিয়া, যেরূপ সুফল জানিতে পারিয়াছি, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

যদি প্রসূতির শরীরে অপানবায়ু স্বস্থানে, স্বভাবে এবং স্বমানে রহিয়া, স্বকীয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, তাহা হইলে, প্রসবান্তে গর্ভ ক্ষেত্রে সঞ্চিত ক্লেদ এবং চ্যুতরুধির নিঃশেষে বাহির হইয়া যায়। গর্ভক্ষেত্র প্রকৃতিস্থ হয়। প্রসূতিও অবিলম্বে স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে। বিগুণ অপান বায়ু কুক্ষিগত অপপদার্থ নিঃসরণের বাধা দেয়। অনিঃসৃত ক্লেদ প্রভৃতি সঞ্চিত রহিলে শোষিত হইয়া রক্তগত হয়, তজ্জন্য প্রসূতির শরীরে নানা রোগ দেখা যায়।

প্রসবের পর কুক্ষিদেশ পরিষ্কার করিবার জন্য যে সকল ঔষধ প্রয়োগ করা যায় এবং যে যে উপায় অবলম্বন করা হয়, তন্মধ্যে কোন ঔষধই পিপ্পল্যাদিগণের কষায় বা চূর্ণ সেবনের ন্যায় সুফলপ্রদ নহে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে গণোক্তবিংশতি দ্রব্যের প্রত্যেক দ্রব্য একে একে ওজন করিয়া লইয়া, একসঙ্গে কুটিয়া, মেটে পাত্রে কাঠের জ্বালে পাক করিবে। পাকসিদ্ধ হইলে পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে। অথবা গণোক্ত প্রত্যেক দ্রব্য একে একে সূক্ষ্মতম চূর্ণ করিয়া, পৃথক পৃথক রাখিয়া দিবে। পরে তুল্য-পরিমাণে সমস্ত দ্রব্য ওজন করিয়া লইয়া, একসঙ্গে উত্তমরূপে মিশাইয়া রাখিবে। মাত্রা ১০ রতি। অবস্থানুসারে উষ্ণজল, কাঁজি, দইয়ের মাত বা সুরার সঙ্গে সেবন করিতে দিবে।

প্রসবান্তে চ্যুতরুধির, প্রসূতির কুক্ষিদেশে আবদ্ধ রহিলে, বায়ু প্রকুপিত হইয়া হৃদয়ে, মস্তকে,—বিশেষতঃ বস্তিদেশে দুঃসহ শূল উৎপাদন করে। সেই শূলের নাম মক্কল্লশূল। মক্কল্লশূল প্রায়শঃ তিনদিন স্থায়ী হয়। কখন-কখন এই শূল দীর্ঘকাল স্থায়ী রহিয়া, সূতিনীকে দুঃসহ যন্ত্রণা দিতে থাকে। এই রোগে জ্বর, অরুচি, মুখদৌর্গন্ধ্য প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়। পিপ্পল্যাদি কষায় পান করাইলে সোপদ্রব মক্কল্লশূল অচিরে প্রশমিত হয়। প্রতিদিন প্রাতঃকালে কষায় পান করিতে দেওয়া উচিত।

প্রসবান্তে গাত্র-বেদনা থাকিলে উক্ত কষায় ব্যবস্থা করিলে, বিশেষ সুফল পাওয়া যায়।

প্রসূতির অঙ্গে আমরস সঞ্চিত রহিলে, আমাপচনার্থ উক্ত পাচন ব্যবস্থেয়। তদ্ভিন্ন মন্দানল রোগে এবং সূতিকা-গ্রহণী রোগেও পিপ্পল্যাদি কষায় হিতকর।

পিপ্পল্যাদিগণের পত্রী—

(১) পিঁপুল, (২) পিঁপুলের মূল, (৩) চই (৪) চিতা, (৫) শুঁঠ, (৬) মরিচ, (৭) এলাচ, (৮) যোয়ান, (৯) ইন্দ্রযব, (১০) আকনাদি, (১১) রেণুকা, (১২) জীরা, (১৩) বামন হাটী, (১৪) মহানিম্বের ফল, (১৫) হিং, (১৬) কটুকী,

(১৭) সর্ষপ, (১৮) বিড়ঙ্গ, (১৯) আতইচ, (২০) মূর্ব্বা।

প্রতিদ্রব্য ৮ রতি (আটটী কুঁচের ওজন) গ্রহণ করিবে। প্রস্তুত-প্রণালী বলা হইয়াছে।

দ্রব্য গ্রহণের নিয়ম—

(১) পিঁপুল—সুপরিচিত ভৈষজ্য। সংস্কৃত নাম পিপ্পলী, কণা প্রভৃতি। পাটনাই পিঁপুলের চেয়ে দেশী পিঁপুল সমধিক গুণশালী। অভিনব পিঁপুল ঔষধার্থ প্রশস্ত নহে। সুপরিপক্ক পিঁপুল সংগ্রহ করিয়া শুকাইয়া রাখিতে হয়। এক বৎসরকাল অতিক্রম করিলে, ঔষধের কাজে ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু গন্ধ-বর্ণ-রসভ্রষ্ট হইলে পিঁপুল এবং অপর সমস্ত ভৈষজ্য নির্গুণ হইয়া যায়। পিঁপুলের মঞ্জরী ত্যাগ করিয়া দানাগুলি গ্রহণ করিতে হয়। (২) পিঁপুলের মূল—পিঁপুলের গাছ লতাজাতীয়। লতিকার মূলদেশে যে সকল গ্রন্থি (গাঁইট) জন্মে, তাহাই ঔষধ কর্ম্মে প্রশস্ত। ইহার সংস্কৃত নাম গ্রন্থিক। চলিত নাম গেঁঠেলা। গ্রন্থির অভাবে মূল বা শিকড় গ্রহণ করা যাইতে পারে। (৩) চই—ইহার সংস্কৃত নাম চবিকা। চই লতা জাতীয় উদ্ভিদ। বৃক্ষমূলে চইর লতা রোপণ করিলে, কাপে কাপে যে গুচ্ছাকার শিকড় জন্মে, তাহা গাছের গায়ে লাগিয়া, গাছ বাহিয়া উঠিতে থাকে। ইহার পাতার আকৃতি পানের ন্যায়। পূর্ব্ব-উত্তর-বঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে চইর চাষ হয়। ইহার মূল, শিকড় এবং কাণ্ড ব্যঞ্জনে কটুরসাধানের জন্য ব্যবহৃত হয়। ঔষধার্থ মূল বা শিকড় ব্যবহার্য্য। কলিকাতার পশারির দোকানে চই চাহিলে এক প্রকার কাষ্ঠ দেয়। তাহার আস্বাদও চইয়ের ন্যায় ঝাল। কিন্তু উহা প্রকৃত চই নহে। বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্যত্র চই জন্মে না। তজ্জন্য অন্যান্য দেশের লোকে চই চিনেন না। তাই প্রসিদ্ধ টীকাকার ডল্লনাচার্য্য চইর অর্থ লিখিয়াছেন—গজপিঁপুলের মূল। (৪) চিতা—ইহার সংস্কৃত নাম চিত্রক, বহ্নি প্রভৃতি। শ্বেত ও রক্ত ভেদে চিত্রক দুই প্রকার। শ্বেত চিতার ফুল শুক্লবর্ণ, রক্তচিতার পুষ্পস্তবক উজ্জ্বল রক্তবর্ণ। সাদা চিতার শিকড় কাষ্ঠগর্ভ; লাল চিতার শিকড় কলার শিকড়ের ন্যায়। শিকড়াভ্যন্তরে একটী আঁশ থাকে। ঔষধার্থে লাল চিতার শিকড় ব্যবহার করিতে হয়। মাত্র যেখানে শ্বেত চিতার শিকড় দিবার উপদেশ থাকে, সেইখানেই তাহা দিতে হয়। শরীরের বহিঃপ্রদেশে রক্তচিতা লাগাইলে বিষক্রিয়া করে। অনেকে স্ত্রীশরীরে রক্তচিতা প্রয়োগ করিতে আপত্তি করেন। বাহ্য প্রয়োগে গর্ভপাতের কথা শুনিয়া, এই প্রকার সংস্কার জন্মিয়া থাকিবে। কিন্তু উপযুক্ত মাত্রায় রক্ত চিতা সেবন করিলে, গর্ভ শয্যায় ইহার কোন মন্দ ফল প্রকাশ পায় না। নির্ভয়ে গর্ভিনী রোগে, সূতিকা পীড়ায় এবং অন্যান্য রোগে স্ত্রীশরীরে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। (৫) শুঁঠ—সংস্কৃত নাম শুণ্ঠী প্রভৃতি। শুঁঠ প্রসিদ্ধ ভৈষজ্য। টাট্কা শুষ্ক শুঁঠ উত্তমরূপে ধুইয়া, শুকাইয়া ঔষধার্থ ব্যবহার করিবে। (৬) মরিচ—প্রসিদ্ধ দ্রব্য। গোল মরিচ নামে বিখ্যাত। মরিচ জলে ফেলিলে যে গুলি ভাসিয়া যায়, সেগুলি ত্যাগ করিয়া, অবশিষ্ট মরিচ শুকাইয়া লইবে। (৭) এলাচ—ছোট এলাচের খোসা ত্যাগ করিয়া দানা গ্রহণ করিবে। (৮) যোয়ান—পিপ্পল্যাদি কষায়ে অজমোদা দিবার উপদেশ আছে। অজমোদার অর্থ বন যোয়ান। আজকাল

প্রযোগে অজমোদা অর্থাৎ বনযোয়ান না দিয়া, প্রসিদ্ধ টীকাকার শিবদাস, যোয়ান দিতে বলেন। বাহ্য প্রয়োগে অজমোদা অর্থে বন যোয়ান বুঝিতে হইবে। (৯) ইন্দ্রযব—কুটজ অর্থাৎ কুড়্চি ফলের বীজ। ক্রীত বীজ জলে ফেলিলে যে গুলি ভাসিয়া উঠে, তাহা ত্যাগ করিয়া, নিমজ্জিত বীজগুলি শুকাইয়া লইবে। (১০) আকনাদি—সংস্কৃত নাম পাঠা। ইহা লতা জাতীয় উদ্ভিদ্। আঁকাসি, আকনাদি, আকনিধি, এবং নিমুখী প্রভৃতি নামে স্থানে স্থানে পরিচিত। লতিকার মূল এবং শিকড় ঔষধার্থ গ্রহণ করিতে হয়। অভাবে লতা-পাতা দিলেও কষায়ের গুণের তারতম্য উপলব্ধি করা যায় না। (১১) বেণুক—অসম গাত্র, গোলাকার, ঈষল্লোহিত পাণ্ডুবর্ণ, মরিচের আকারের ন্যায় বীজ-বিশেষ। পশারির দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়। এই বীজ অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলে গর্ভাশয়ের জরায়ু বললাভ করে এবং সঙ্কুচিত প্রসারিত হইতে থাকে। তজ্জন্য গর্ভাশয়ে সঞ্চিত ক্লেদ প্রভৃতি নিঃসৃত হইয়া যায়। অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে গর্ভাশয় আক্ষিপ্ত হইতে থাকে। গর্ভিনীর পক্ষে বেণুকের প্রয়োগ অনিষ্টকর। (১২) জীরা প্রসিদ্ধ বণিক দ্রব্য। ক্রীত-জীরক ঝাড়িয়া বাছিয়া পরিষ্কার করিয়া লইবে। কারণ জীবার সহিত অন্যান্য বীজ প্রভৃতি মিশান থাকে। (১৩) বামনহাটী—সংস্কৃত নাম ব্রহ্মযষ্টি, ভার্গী প্রভৃতি। বা'নযষ্টি, ভামট প্রভৃতি নামে স্থানে স্থানে পরিচিত। ইহার মূলক বা শিকড়ের ছাল গ্রহণ করিবে। (১৪) মহানিমের ফল—ফলের আবরণ ত্যাগ করিয়া অভ্যন্তরের শাঁস গ্রহণ করিবে। ইহার গাছ অসুলভ নহে। গাছ হইতে ফল আহরণ করা যাইতে পারে। বেণের দোকানেও পাওয়া যায়। (১৫) হিং—মুলতানি হিং গ্রহণ করিবে। পাচনে প্রক্ষেপ দিবে না। অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় ৮ রতি পরিমিত হিং লইয়া একসঙ্গে কুটিয়া লইবে। মাত্রাধিক্যের আশঙ্কা নাই। (১৬) কট্‌কী—প্রসিদ্ধ বণিক্ দ্রব্য। টাট্‌কা কট্‌কী গ্রহণ করিবে। (১৭) সরিষা—সদাসর্ষপ গ্রহণ করিবে। (১৮) বিড়ঙ্গ—বিড়ঙ্গ কিঞ্চিৎকালের পুরাতন প্রশস্ত। ইহার খোসা ছাড়াইয়া অভ্যন্তর ভাগে যে গোলাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা থাকে, তাহা ঝাড়িয়া বাছিয়া গ্রহণ করিবে। (১৯) আতইচ—প্রসিদ্ধ বণিক্ দ্রব্য। ক্রীত আত-ইচ উত্তমরূপে ধুইয়া শুকাইয়া লইবে। (২০) সুচমুখী—সংস্কৃত নাম মূর্ব্বা। বোড়াচক্র নামেও পরিচিত। গাছের পাতা ত্যাগ করিয়া মূল ও কাণ্ড গ্রহণ করিবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কবিরত্ন।

কাজের কথা।

—:*:—

'চা'য়ে অনিষ্ট।—দেশে 'চা' পায়ীর সংখ্যা যে পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে, সেই পরিমাণে সহরের অলিতে-গলিতে 'চা' বিক্রয়ের দোকানও দিন-দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। এক পয়সায় এক পেয়ালা চা,—একটু দুগ্ধ বেশী দিয়া বকমারি 'কাফে' দিলে না হয়—উহার মূল্য দুই পয়সা। ফলে এই এক পয়সা বা দুই পয়সার নেশায় কলিকাতা সহর মাতিয়া উঠিয়াছে। শুধু কলিকাতার কথা কেন, মফঃস্বলের সহর ঘেঁসা স্থানগুলিতেও এইরূপ 'চা'য়ের দোকান অনেক গুলি স্থাপিত হইয়াছে। এই 'চা'-পানে অজীর্ণ-অক্ষুধা প্রভৃতি অন্য অনিষ্ট যাহা হয়—তাহা ত হইতেছেই,—তাহা ভিন্ন ইহার দ্বারা আর একটি যে বিশেষ অনিষ্ট উপস্থিত হইতেছে, তাহা কেহ ভাবিয়াও দেখিতেছেন না। 'চা'য়ের দোকানের প্রায় সকল গুলিতেই এক-একটী বাল্‌তি পূর্ণ যে জল থাকে, উচ্ছিষ্ট বাটি বা কাফ্‌গুলি সেই বাল্‌তির জলে ডুবাইয়া পবিত্র করা হয়! ফলে ঐ একই বাল্‌তিতে এইরূপ ভাবে 'কাফ' পরিষ্কারে, উহা দ্বারা শুধু ব্যক্তি-বিশেষেরই উচ্ছিষ্ট যে পান করা হইতেছে, তাহা নহে,—ঐ জলপূর্ণ বাল্‌তিতে বহু-সংখ্যক ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট মিশ্রিত হওয়ায় বহু-সংখ্যক ব্যক্তিরই উচ্ছিষ্ট উহা দ্বারা গ্রহণ করা হইতেছে। ইহা হইতে দোকানের 'চা'পানে জাতি-ধর্ম্ম ত রসাতলে যাইতেছেই,—তা ছাড়া অনেক সংক্রামক-ব্যাধিও ইহার ফলে বহুলোকের শরীরে প্রবেশ লাভ করিতেছে। দোকানদার ব্যবসায় করিতে বসিয়াছে, কাহার হাঁপ আছে, কাহার কাস আছে, কে সুস্থ, কে অসুস্থ,—এসকল ত তাহার বিচার করিবার আবশ্যক নাই, তাহার ব্যবসায়ের প্রসার বৃদ্ধি হইলেই যথেষ্ট হইল। ফলে বাঙ্গালী সন্তান এই 'চা' পানেও যে স্বাস্থ্যক্ষয় করিতেছে, তাহা সুনিশ্চয়।

* * * *

আমোদে আয়ুক্ষয়।—প্রত্যুষের পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করিতে হয় এবং রাত্রি এক প্রহরের পর শয্যা গ্রহণ করিতে হয়,—ইহাই সেকালে শাস্ত্রীয়-ব্যবস্থা ছিল। এখন সহরের বাবুরা আমোদে উন্মত্ত হইয়া,—সমস্ত রাত্রি জাগরণপূর্ব্বক, রঙ্গমঞ্চগুলির অভিনয় দেখিয়া থাকেন। এই দর্শকগুলির মধ্যে আবার বালক এবং যুবকের সংখ্যাই অধিক। ছাত্র বা Student হিসাবে যাঁহারা অভিভাবক-শূন্য হইয়া, সহরে অবস্থিতি করিতেছেন, বালক এবং যুবকদলের মধ্যে হিসাব-গণনায় তাঁহাদিগেরই সংখ্যা অধিক। শাস্ত্রবাক্য অনুসারে বালক এবং যুবকের শ্রেণী-বিভাগে আমরা ষোড়শ বর্ষীয়গণকে বালক এবং তাহার পর হইতে যুবক বলিয়া স্থির করিয়া লইতেছি। যাহা হউক, উহারা পঠদ্দশায় ব্রহ্মচর্য্য ত্যাগ করিয়া, স্ত্রী-অভিনেত্রীর হাবভাবদর্শনে, রাত্রি-জাগরণের স্বাস্থ্যক্ষয়ের কারণ অপেক্ষাও অধিকতর স্বাস্থ্য ক্ষয়ের যে কারণ উপস্থিত করিতেছে, তাহা অবিসংবাদিত। ইহা হইতে রমণী-সুখ-মিলনের চিন্তা অলক্ষিতভাবে সুকুমার কৈশোর জীবনে প্রবেশলাভ পূর্ব্বক তাহাদিগের ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য-সুখ একেবারে নষ্ট

করিয়া তুলিতেছে, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। হায়! বাঙ্গালী অভিভাবক কবে এ সকল কথা বুঝিবে?

*   *   *   *

ব্যসনে স্বাস্থ্যহানি।—আগে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বাঙ্গালী, তৈলের অভ্যঙ্গ করিত। এখন অনেকস্থলে দেশ হইতে সে প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। এখন একটু সুগন্ধি তৈল—যাহা মাথায় না দিলে নহে, অনেকে তাহাই দিয়া থাকেন, তাহা ভিন্ন দেহের সকল স্থানে 'সাবান'-মর্দ্দনের ব্যবস্থা হইয়াছে। শাস্ত্রে তৈল-মর্দ্দনের উপকারিতা যাহা লিখিত আছে, সাবান-মর্দ্দনে কখনই তাহা সিদ্ধ হয় না। শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন,—তৈল মর্দ্দনে ঘৃতপানেরও অষ্ট গুণ ফললাভ ঘটিয়া থাকে। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রায় সকলপ্রকার তৈলকেই শাস্ত্রকারগণ বল্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তৈল মর্দ্দনে বায়ু-পিত্ত এবং কফ—তিনটি ধাতুর সাম্য-ক্রিয়া সংসাধিত হয়। বাঙ্গালী যুবকের নিকট কিন্তু এ কথা বুঝাইবে কে? ফলে এই তৈলত্যাগী হওয়ার জন্যও বাঙ্গালী স্বাস্থ্যোন্নতির অন্তরায় করিয়া তুলিতেছে।

*   *   *   *

ক্রিয়ার বিপত্তি।—হেঁড়ে ডুডু, হাডুগুডু, লুকোচুরি, কপাটি—সেকালে বাঙ্গালী বালকের জন্য এই সকল খেলার প্রথা নির্দ্দিষ্ট ছিল। তাহার পর, সে সকল উঠিয়া গিয়া, ব্যাটবলে বাঙ্গালী-বালকের খেলার কার্য্য সিদ্ধ হইতে লাগিল। এখন একেবারে তাহাও উঠিয়া 'ফুটবলে' বাঙ্গালী-বালকের খেলার কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। ফুটবল খেলিতে হইলে, যেরূপ আহার্য্যের প্রয়োজন, বাঙ্গালী বালকের জন্য সেরূপ আহার্য্যের ব্যবস্থা কিন্তু নির্দ্দিষ্ট নাই। যে সমাজ হইতে 'ফুটবল' খেলার সৃষ্টি হইয়াছে, সে সমাজে মাংস-ভক্ষণের ব্যবস্থা নিত্য প্রচলিত আছে। এদেশে সেরূপ নিত্য মাংস ভক্ষণ ত দূরের কথা,—অনেকের ভাগ্যে এক সপ্তাহ অন্তরও তাহা জুটিয়া উঠে কি না সন্দেহ। ইহা ভিন্ন দুগ্ধ-দধি-ক্ষীর-ছানা-ভক্ষণের উপায় ত দেশ হইতে লোপ-ই পাইয়াছে। এ অবস্থায় 'ফুটবল' খেলিতে হইলে যেরূপ সামর্থ্যের প্রয়োজন, বাঙ্গালী-বালকের শরীরে সে সামর্থ্য নাই। কাজেই ওরূপ খেলায় মানসিক তৃপ্তি যথেষ্ট স্ফূরিত হইলেও উহাদ্বারা বাঙ্গালী-বালকের শক্তি ক্ষয় ঘটিতেছে। বাঙ্গালী বালকগণের কর্তৃপক্ষ-মণ্ডলী এ সকল কথা চিন্তা করিবেন কি।

*   *   *   *

উপচক্ষুর অপকারিতা।—সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির জন্য আজকাল অনেকেই চস্‌মা বা উপচক্ষু ব্যবহার করিয়া থাকেন দেখিতে পাই। বালক এবং যুবক-মহলেই ইহার প্রচলন অত্যধিক। দৃষ্টিশক্তির কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই, তথাপি সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য Power হীন চস্‌মা গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা অনেকেরই একটা রোগে দাঁড়াইয়াছে। ফলে, অসময়ে এবং অকারণে উপচক্ষু গ্রহণ করায় সত্য সত্যই অনেকের দৃষ্টিশক্তি কমিয়া যাইতেছে। তৈল-মর্দ্দনে চক্ষুর জ্যোতি বর্দ্ধিত হয়, বাঙ্গালী সে তৈল মর্দ্দন ভুলিয়াছে, ঘৃত-দুগ্ধ-মৎস্য ভক্ষণে দৃষ্টিশক্তির প্রখরতা অটুট থাকে, বাঙ্গালীর তাহা পাইবার উপায় কমিয়াছে,—ব্রহ্মচর্য্য-পালনে মানব তীক্ষ্ণদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া থাকে, বাঙ্গালী বালক সে ব্রহ্মচর্য্য-পালনে অনভ্যস্ত হইয়াছে, ইহার উপর উপচক্ষু-ধারণে বাঙ্গালী-

বালকের ভবিষ্যৎ দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইবার কারণ, তাহারা নিজেরাই করিয়া তুলিতেছে। এটও বাঙ্গালী অভিভাবকের চিন্তা করিবার বিষয়।

* * * *

সিগারেটে সর্ব্বনাশ।—সিগারেটে বাঙ্গালীর বিলক্ষণ সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে। ইহার প্রচলন-বিষয়েও বাঙ্গালীর আশা-ভরসা-স্থল—যুবকমণ্ডলীই অগ্রণী। আমাদের দেশে তামাকের ধূমপানের প্রচলন আছে, তাহা শিরোরোগনাশক, ক্ষুধা বৃদ্ধিকারক এবং বমনকারক বলিয়া শাস্ত্রে লিখিত। শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন,—"তামাক স্বয়ং বিষ হইয়াও উপযুক্তরূপে প্রযুক্ত হইলে সকলপ্রকার বিষের নাশক হইয়া থাকে।" সিগারেট কিন্তু আমাদের দেশীয় তাম্রকূট নহে। উহাকে শীতপ্রধান দেশের উত্তেজক মাদক বলা যাইতে পারে। উহার অতিরিক্ত ব্যবহারে মস্তিষ্ক বিকার, বক্ষঃস্থলের পীড়া,—অনেকপ্রকার ব্যাধিই শরীর মধ্যে উপস্থিত হইতে পারে। তামাকের মত সিগারেট কলিকায় সাজিয়া ফুঁ দিয়া ধরাইবার প্রয়োজন হয় না বলিয়া, ইহার ব্যবহারটাও অনেকের নিকট ঘন ঘন দাঁড়াইয়াছে। ফলে অপরিণতবয়স্ক বাঙ্গালী-বালকগণ এই সিগারেটের ধূমেও স্বাস্থ্যরক্ষার অপচয় করিয়া তুলিতেছে। দেশে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যক্ষয়ের কারণ চতুর্দ্দিকে এতই বিস্তৃত হইয়াছে, যে, তাহা হইতে বাঙ্গালীর নিষ্কৃতি পাইবার উপায় সুদূরপরাহত। এই সিগারেটের হস্ত হইতে বাঙ্গালী সন্তান যে কিরূপে নিষ্কৃতি পাইবে, তাহার উপায় ত [illegible] দেখিতেছি না।

শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত।

গ্রীষ্ম-চর্য্যা।

স্বাস্থ্যরক্ষায় যত্নশীল ব্যক্তিদিগের জন্য বর্ত্তমান-গ্রীষ্ম-সমাগমে "গ্রীষ্ম-চর্য্যা"র বিষয় লিখিত হইতেছে। স্বাস্থ্যকামী ব্যক্তিগণ এই সময় এই প্রবন্ধের লিখিত নিয়মগুলি পালন করিলে, স্বাস্থ্য-সুখলাভ করিতে সক্ষম হইবেন।

এই সময় সূর্য্যের তেজ অতিশয় খরতর হয়, এজন্য কফের ক্ষয় এবং বায়ুর বৃদ্ধি ভাব হইয়া থাকে। এই কারণে এসময় লবণ, কটু ও অম্ল-রসযুক্ত দ্রব্য ব্যবহার বিধেয় নহে। শাস্ত্রকার এই ঋতুর পথ্য-নির্ব্বাচনে বলিয়া গিয়াছেন,—

"ভজেন্মধুর যে বান্নং লঘুস্নিগ্ধং হিমং দ্রবম্।
সুশীত তোয়সিক্তাঙ্গো লিহ্যাৎ সক্তূন্ সশর্করান্॥"

অর্থাৎ এ সময় মধুর, লঘু, স্নিগ্ধ, শীতল ও দ্রব অন্ন এবং শর্করা মিশ্রিত সজল শক্তু ভোজন ও প্রত্যহ সুশীতল জলে স্নান করা কর্ত্তব্য।

জাঙ্গল মাংসের সহিত শুভ্র-শালি ধান্যের অন্ন ভোজন এ সময় প্রশস্ত। পানীয় জল কর্পূর সংযোগে সুগন্ধিকৃত করিয়া কুঁজা, কলসী প্রভৃতি মৃৎপাত্রে রক্ষিত করিবে। ব্যায়াম এবং রৌদ্র সেবন এই ঋতুতে বিষবৎ পরিত্যজ্য। দিবানিদ্রা দ্বারা কফ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়—এজন্য ইহা অধিকাংশ স্থলে অহিতকর হইলেও গ্রীষ্মকালে কফের ক্ষয় নিবন্ধন ইহা দ্বারা বিশেষ অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।

এই ঋতুতে মধ্যাহ্ন সময়ে বিশ্রাম করা একান্ত আবশ্যক। শাস্ত্রকার এ সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন,—

অভ্রঙ্কষ মহাশাল তালরুদ্ধোষ্ণ রশ্মিষু।
বনেষু মাধবী শ্লিষ্ট দ্রাক্ষাস্তবক শালিষু॥
কদলীদল-কহ্লার মৃণাল-কমলোৎপলৈঃ।
কোমলৈঃ কল্পিতে তল্পে হসৎকুসুমপল্লবে॥
মধ্যন্দিনেঽর্ক তাপার্ত্তঃ সুপ্যাদ্ধারা গৃহেসুখম্।
নিশাকরকরাকীর্ণে সৌধপৃষ্ঠে নিশাসু চ॥
আসনা স্বস্থ চিত্তস্য চন্দনার্দ্রস্য মালিনঃ।
নিবৃত্ত কাম তন্ত্রস্য সুসূক্ষ্ম তনু বাসবঃ॥

অর্থাৎ অত্যুচ্চ শাল ও তাল বৃক্ষাকীর্ণ, রৌদ্রহীন-মাধবী-জড়িত-দ্রাক্ষাস্তবক শোভিত বনমধ্যে ধারা-গৃহে কোমল-কদলীপত্র, কহ্লার, মৃণাল, পদ্ম ও কুমুদ নির্ম্মিত পুষ্প-সমাস্তীর্ণ-শয্যায় শয়ন করিয়া গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্ন যাপন করিবে। রাত্রিতে চন্দন-চর্চ্চিত দেহ, মাল্যধারী, সুস্থির চিত্ত, সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধায়ী ও কাম কর্ম্ম বিরহিত হইয়া, চন্দ্র-কিরণ প্রদীপ্ত-সৌধোপরি অবস্থিতি করিবে। এ সময় জলযুক্ত তালবৃন্তে ব্যজন গ্রহণ করিবে,—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পদ্মিনী পত্র ও জলসিক্ত চামর বীজন দ্বারা গ্রীষ্ম জনিত ক্লান্তি নিবারণ করিবে

মদ্যপান এ ঋতুতে অতিশয় অহিতকর। নিতান্ত অভ্যাস পরায়ণ ব্যক্তিগণের পক্ষে মদ্যপান করিতে হইলে, সুরার সহিত অত্যধিক পরিমাণে জল মিশাইয়া পান করা কর্ত্তব্য। ইহার অন্যথায় শোথ, দেহের শৈথিল্য, দাহ ও মূর্চ্ছা রোগ হইবার সম্ভাবনা।

শাস্ত্রকার গ্রীষ্মঋতুর বর্ণনায় সকল কথা বলিয়া শেষ কথা বলিয়াছেন,—

মৃণাল বলয়াঃ কান্তা প্রোৎফুল্ল কমলোজ্জ্বলাঃ।
জঙ্গমা ইব পদ্মিণো হরন্তি দয়িতাঃ ক্লেশম্॥

অর্থাৎ এ সময় মৃণাল-বলয়ধারিনী, বিকসিত কমলোজ্জ্বলশালিনী, সুন্দরী রমণী-দিগের সহিত প্রণয়ালাপ দ্বারা নিদাঘ জনিত সকল কষ্ট দূরিভূত হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদে তক্র-রহস্য।

এখনকার দিনে পাশ্চাত্য চিকিৎসক সমাজের পক্ষ হইতে যে সকল তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া থাকে, তদ্দর্শনে আমরা বিমোহিত হইয়া থাকি, কিন্তু সেই সকল তথ্য ইতিপূর্ব্বে আমাদিগের দেশীয় শাস্ত্রবিশারদগণ বলিয়া গিয়াছেন কিনা—সে সম্বন্ধে কোনরূপ বিচার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করি না, ইহা আমাদিগের পক্ষে বড়ই লজ্জার কথা বলিতে হইবে। ডাক্তারি মতে আধুনিক অনেক রোগের পথ্যে ঘোল বা তক্র-পান নির্ণীত হইয়াছে। সে সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রকারগণ ইতিপূর্ব্বে কিছু বলিয়াছেন কিনা, তাহা লইয়া একটু আলোচনা করিব।

আমাদের বেদ পারগ আর্য্যঋষিমণ্ডলী সকল বিষয়েরই আলোচনা করিবার সময় শুধু দ্রব্য মাত্রের নাম এবং সেই সকল দ্রব্য যে সকল রোগের পথ্য—মাত্র তাহাই বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই, সেই সকল দ্রব্য কিরূপ ভাবে প্রস্তুত করিতে হয়, কিরূপ সময়ে—কিরূপ অবস্থায়—কিরূপ ঋতুতে তাহা ব্যবহার করিতে হয়—

এ সকল কথার সকল প্রকার আলোচনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে করিয়া গিয়াছেন। ঘোলের অবস্থা বা তক্র সম্বন্ধে তাঁহারা যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

তক্রের নামকরণে শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,

ঘোলন্তু মথিতং তক্রমুদশ্বিচ্ছচ্ছিকাপিচ
স সরং নির্জ্জলং ঘোলং মথিতং ত্বসরোদকম।

অর্থাৎ—ঘোল, মথিত, তক্র, উদশ্বিৎ ও ছচ্ছিকা এইগুলি ইহার পর্য্যায়। তাহার পর কোন সময়ে কোন অবস্থায় ঐ কয়টি দ্রব্যের কি আখ্যা প্রদান করা হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

"তক্রং পাদজলং প্রোক্ত মুদশ্বিন ত্বর্দ্ধং বারিকম্
ছচ্ছিকা সারহীনা স্যাৎ স্বচ্ছা প্রচুর বারিকা"

অর্থাৎ সরসংযুক্ত নির্জ্জল দধির নাম—ঘোল, সরবিহীন নির্জ্জল দধির নাম মথিত, চতুর্থাংশ জলযুক্ত দধির নাম তক্র, অর্দ্ধেক জল সংযুক্ত দধির নাম উদশ্বিৎ, সারহীন দধির নাম ছচ্ছিকা এবং প্রচুর জল সংযুক্ত দধির নাম স্বাচ্ছা।

ইহাদের গুণ ব্যাখ্যার শাস্ত্রীয় উক্তি এই রূপ বর্ণিত হইয়াছে—

ঘোলন্তু শর্করা যুক্তং গুণৈর্জ্ঞেয়ং রসালবৎ।
বাতপিত্তহরং হ্লাদি মথিতং কফ পিত্তনুৎ।
তক্রং গ্রাহী কষায়াম্লং স্বাদুপাক রসং লঘুঃ।
বীর্য্যোষ্ণং দীপনং বৃষ্যং প্রীণনং বাতনাশনম্।

অর্থাৎ শর্করা মিশাইয়া ঘোল সেবনে রসালবৎ উপকার হইয়া থাকে, ইহা বায়ু ও পিত্তনাশক ও আহ্লাদজনক। মথিত পানে কফ এবং পিত্ত নাশ হইয়া থাকে। তক্র গ্রাহী, কষায় ও অম্লরস। ইহা জীর্ণ হইয়া স্বাদু রস প্রাপ্ত হয়। ইহা লঘু, উষ্ণবীর্য্য, দীপন, বৃষ্য, প্রীতিজনক, বায়ুনাশক।

রোগের পথ্য নির্ণয়ে শাস্ত্রবিদ্‌গণ ইহাকে গ্রহণী রোগের উৎকৃষ্ট পথ্য বলিয়া, তাহার পর অনেক রোগেই ইহা সেবনের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। যথা—

শীতকালেঽগ্নিমান্দ্যে চ তথা বাতাময়েষু চ
অরুচৌ স্রোতাসং রোধে তক্রং স্বাদমৃতোপমম্।
তত্তু হন্তি গরচ্ছর্দ্দি প্রপক বিষম জরান্।
পাণ্ডুমেদো গ্রহণ্যর্শো মূত্রগ্রহ ভগন্দরান্॥
মেহং গুল্মমতীসারং শূল প্লীহোদরারুচী।
শ্বিত্র কোঠ গত ব্যাধিন্ কণ্ঠ শোথ তৃষাক্রিমীন্॥

অর্থাৎ শীতকালে, মন্দাগ্নিতে, বাতরোগে, অরুচিতে ও স্রোতঃসকলের রুদ্ধতা জন্মিলে, তক্র সেবনে অমৃতপানের ফললাভ ঘটিয়া থাকে। বিষ, বমি, প্রসেক, বিষমজ্বর, পাণ্ডু, মেদো রোগ, গ্রহণী, অর্শ, মূত্রগ্রহ, ভগন্দর, মেহ, গুল্ম, অতিসার, শূল, প্লীহা, উদররোগ অরুচি, শ্বিত্র, কোষ্ঠগত ব্যাধি, কুষ্ঠ, শোথ, তৃষ্ণা ও ক্রিমিরোগ—তক্র সেবনে নিবারিত হইয়া থাকে।

উষ্ণকালে এবং ক্ষত, দৌর্ব্বল্য, ভ্রম, দাহ ও রক্তপিত্ত বিকৃতি হইলে তক্র সেবনের নিষেধ করিয়া সুস্থশরীরে তক্র সেবনের ফলশ্রুতি শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন—

"ন তক্র সেবী ব্যথতে কদাচিৎ
ন তক্র দগ্ধা প্রভবন্তি রোগাঃ
যথা সুরানাং অমৃতং সুখায়
তথা নরাণাং ভুবি তক্র মাহুঃ।"

অর্থাৎ—নিয়মিত তক্রসেবনে করিলে রোগ সকলের প্রাবল্য জন্মিতে পারে না। অমৃত পানে দেবতাদিগের যেরূপ সুখোৎপাদন

হইয়া থাকে, পৃথিবীতে মনুষ্যশরীরে তক্র সেই-রূপ উপকারী জানিবে।

মনুষ্য-শরীরের এহেন উপকারী তক্র বায়ু বৃদ্ধি উপলব্ধি হইলে শুণ্ঠী ও সৈন্ধব লবণের সহিত, পিত্ত প্রকুপিত হইলে চিনির সহিত এবং কফ-প্রাবল্যে শুঁঠ পিপুল ও মরিচের গুঁড়া মিশাইয়া সেবন করিলে বিশেষ ফললাভ হইয়া থাকে।

হিং, জীরার গুঁড়া ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া তক্র সেবনে অরুচি অবস্থায় রুচি জন্মিয়া থাকে। এরূপভাবে সেবন করিলে অর্শ ও অতিসার রোগেও বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

পাঠক, এখন দেখিলেন ত, তক্র সেবনের ব্যবস্থা এখনকার নূতন উদ্ভাবনা নহে,—মানব জাতির কল্যাণেচ্ছু আর্য্য ঋষিমণ্ডলী বহুকাল পূর্ব্বে ইহার গুণ-পরিচয় লোকসমাজে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ এবং টোট্‌কা ঔষধ।

দু'দিন অন্তর পালা জ্বরের ঔষধ। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, দু'দিন অন্তর পালাজ্বরে অনেক সময় অনেক ঔষধের প্রয়োগ ব্যর্থ হইয়া থাকে। ডাক্তারেরা প্রথম অবস্থায় পালার পূর্ব্ব দিন হইতে যথেষ্টরূপে কুইনাইন-প্রয়োগের ব্যবস্থা করেন, কিন্তু সকল স্থলে তাহাও কার্য্যকরী হয় না। এ অবস্থায় নিম্নলিখিত যোগটিতে অনেক সময় উপকার পাওয়া যায়, (১) 'বক'-পুষ্প বৃক্ষের ছাল, অনন্তমূল, গোক্ষুর বীজ, (আঁটি বাদ দিয়া) হরিতকীর শাঁস,—প্রত্যেক দ্রব্য আধ তোলা ওজনে লইয়া হামান দিস্তায় কুটিয়া লইবে। তাহার পর পাচন প্রণালীর নিয়মানুসারে আধসের জল দিয়া জ্বালে চড়াইয়া এক ছটাক অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া লও। প্রতিদিন প্রাতে উহা একেবারে পান করিয়া ফেল। এক সপ্তাহকাল এইরূপ ব্যবস্থা করিলেই জ্বরের আক্রমণ বন্ধ হইবে।

সর্দ্দি-কাশীর যোগ।—'বক্' পুষ্প বৃক্ষের মূলের ছাল অর্দ্ধভরি এবং বচ অর্দ্ধভরি একত্র কুটিয়া লইয়া এক পোয়া জলে সিদ্ধ করতঃ এক ছটাক অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া লও। ২।৩ বারে ২।৩ দিন সেবন কর, সর্দ্দি-কাশী সারিয়া যাইবে।

মলবদ্ধতার সহজ ব্যবস্থা।—ধল আঁকোর বা ধল আঁকড়া বৃক্ষের শিকড় তুলিয়া লইয়া, অল্প কুটিয়া পাচন-প্রণালীর নিয়মানুসারে অর্দ্ধ সের জলে জ্বাল দিয়া অর্দ্ধ পোয়া অবশেষে নামাইয়া লইবে। উহার সহিত একটু মধু মিশাইয়া প্রাতে ও বৈকালে দুই বারে পান করিয়া ফেল। যাঁহারা মলবদ্ধতার জন্য কষ্ট পাইয়া থাকেন, তাঁহাদিগের ইহা দ্বারা নিয়মিত দাস্ত পরিষ্কার হইবে।

কোষ্ঠ-কাঠিন্য আর একটি ব্যবস্থা।—সুপক্ক হরিতকীর আঁটি বাদ দিয়া, চারি আনা পরিমিত গুঁড়া এবং চারি আনা পরিমিত মিছরির গুঁড়া বা চিনি এক ছটাক গরম জলে মিশাইয়া রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে পান করিবে। প্রাতে ইহা দ্বারা উত্তমরূপে দাস্ত পরিষ্কার হইয়া যাইবে। যাঁহাদিগের ধাতু অতিশয় রুক্ষ, তাঁহাদিগের জন্য চারি আনা গুঁড়ার পরিবর্ত্তে ছয় আনা বা অর্দ্ধ তোলা সেবন করাও চলিতে

পারে। গুঁড়া করিতে অসুবিধা হইলে হরিতকী বাঁটিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতেও সেবন করিতে পারা যায়।

প্রস্রাবের জন্য পাথরকুচি।—কলেরা এবং অতিরিক্ত উদরাময়ে যেখানে প্রস্রাব হইতেছে না, সেস্থলে কতকগুলি পাথরকুচি, খানিকটা, সোরার সহিত মিশাইয়া তল পেটে প্রলেপ দাও। সহজে মূত্র নিঃসৃত হইবে।

রক্তামাশয়ের একটী ব্যবস্থা—কাঁটান'টের মূল সিকিভরি লইয়া চালুনি জল এবং ২।৩টী গোলমরিচ সহ বাটিয়া, একবার কি দুইবারে খাইয়া ফেল। এইরূপ ২।৩ দিন করিলেই রক্তামাশয় সারিয়া যাইবে।

প্রমেহে সোরা।—প্রমেহের অসহ্য যন্ত্রণার নিবৃত্তি করিবার জন্য সোরা একটী অব্যর্থ ঔষধ। অর্দ্ধ আনা পরিমিত সোরা এক ছটাক জলে ভিজাইয়া সেই জল পান করিলে প্রমেহ রোগের জ্বালা যন্ত্রণা উপশমিত হইয়া থাকে।

প্রদরের ঔষধ।—প্রদর রোগে স্ত্রী জাতির অত্যধিক স্রাব হইতে থাকিলে, কতকগুলি গাঁদা ফুলের পাতা তুলিয়া ছেঁচিয়া রস বাহির কর। উহার রস ১ তোলা এবং চাউল ধোয়া জল একত্র মিশাইয়া দুইবেলা সেবন করাও। এইরূপ ৩।৪ দিন করাইলে স্রাব নিঃসরণের নিবৃত্তি হইবে। (২) এইরূপ অবস্থায় দুগ্ধের সহিত চারি আনা পরিমিত শ্বেত বেড়েলার মূল বাটিয়া সেবন করিলেও উপকার হইয়া থাকে। (৩) যষ্টীমধু দুই তোলা এবং দুই তোলা চিনি চাউল ধোয়া জল সহ বাটিয়া অর্দ্ধেক করিয়া ২ বেলা সেবনে প্রদর রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

শিরঃপীড়ায় সুব্যবস্থা।-(১) অপরাজিতা ফুলের যে লতিকা, তাহার মূলাগ্র লইয়া, নস্য গ্রহণ করিলে শিরঃপীড়ায় উপকার হইয়া থাকে (২) অপরাজিতার মূল কর্ণদেশে বন্ধন করিলে শিরঃপীড়ার শান্তি হইয়া থাকে। (৩) গোলমরিচ ২।৩টী গুঁড়া করিয়া, এক-তোলা ভৃঙ্গরাজ বা ভীমরাজের রসে গুলিয়া বারংবার নস্যগ্রহণ করিলে শিরঃপীড়ায় শান্তি হইয়া থাকে। (৪) চুল্লী বা উননের পোড়া মাটী চারি আনা ও গোলমরিচের গুঁড়া চারি আনা একত্র মিশাইয়া নস্য গ্রহণ করিলে শিরঃপীড়ায় শীঘ্র শান্তি হইয়া থাকে। (৫) দুগ্ধের সহিত শুঁঠের গুঁড়া বাটিয়া প্রলেপ দিলে শিরঃপীড়ায় উপকার হইয়া থাকে।

বহুমূত্রে সুব্যবস্থা।—(১) আমলকীর রস ১ তোলা অল্প মধুর সহিত মিশাইয়া দুই বেলা সেবনে বহুমূত্রের উপশম হইয়া থাকে। (২) কচি তালের মূল চারিআনা, কচি খেজুরের মূল চারি আনা, পাকা কলা একটি, দুগ্ধ সহ মিশাইয়া কয়েকদিন সেবন কর, বহুমূত্রের উপশম হইবে। (৩) চাউল ভাজার গুঁড়া মধুর সহিত মিশাইয়া খাইলে বহুমূত্রের উপশম হইয়া থাকে।

অজীর্ণ রোগে ব্যবস্থা।—(১) খানিকটা পাতি বা কাগজি লেবুর রস জলে গুলিয়া, অল্প চিনি মিশাইয়া, দুই বেলা পান কর, অপাক-অজীর্ণে বিশেষ উপকার হইবে। (২) দিবসে এবং রাত্রিকালে আহারান্তে দুই আনা করিয়া বিটলবণের গুঁড়া জলের সহিত মিশাইয়া সেবন কর, বিশেষ ফলপ্রাপ্ত হইবে। (৩) দুই তোলা মুথা কুটিয়া লইয়া আধ সের জলে জ্বালে চড়াইয়া অর্দ্ধ পোয়া অবশেষে নামাইয়া লও। উহার সহিত একটু চিনি মিশাইয়া অর্দ্ধেক করিয়া দুই বেলা সেবন কর, অজীর্ণ নষ্ট হইয়া অগ্নি বর্দ্ধিত হইবে। এই কয়টি ব্যবস্থা অম্লপিত্তেও উপকার হইয়া থাকে।

শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যপদেশে বিদ্যালয়-ভবনে অনেক গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ মধ্যে মধ্যে শুভাগমন ঘটতেছে। এ পর্য্যন্ত অনেক মহানুভব ব্যক্তি এবং মহামান্য গবর্ণমেণ্ট সংশ্লিষ্ট রাজপুরুষগণ বিদ্যালয়-ভবনে আগমন করেন। বিদ্যালয়ের সকল অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক, ইহার উদ্যোগ কর্ত্তৃগণকে উৎসাহিত করিয়াছেন। সংপ্রতি গত গুড্‌ফ্রাইডের দিন বেলা ১১ ঘটিকার সময় অনারেবল এম, বিটসন্‌বেল সি, এস, আর, সি, আই, ই, সি, এফ, এস, আই, আই, সি, এস, এবং বেঙ্গল সিভিল হস্‌পিটালের ইনেস্‌পেক্‌টার জেনারল অনারেবল কর্ণেল ডব্লিউ, আর এডওয়ার্ড সি, ডি, ব, এম, এণ্ড, আই, সি, এস মহোদয় বিদ্যালয়ের সকল প্রকার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অন্যতম সদস্য অনারেবল নবাব সামসুল হুদা মহোদয় তাহার কিছু পূর্ব্বেই বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। এই সকল উচ্চ রাজপুরুষবৃন্দের শুভাগমনে আমাদের আশা-ভরসা ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের সপ্ত অঙ্গ লুপ্ত দেখিয়া, শ্রী ভগবানের নাম স্মরণ পূর্ব্বক, তাহার উদ্ধার-সাধন মাত্র লক্ষ্য করিয়া, এরূপ একটি অসাধ্য-সাধন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদিগের সকরুণ-দৃষ্টি পতিত হইলে, আমাদের আশা ফলবতী হইতে কয়দিন লাগিবে!

* * * *

কোচবিহারের সুযোগ্য দেওয়ান বাহাদুর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ সেন বি, এল, বার-এট্-ল, মহোদয় অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয় অনুগ্রহ-পূর্ব্বক পরিদর্শন করিয়া, বিদ্যালয়ের সাহায্য-কল্পে মাসিক ১০৲ টাকা দানের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

অনেকে স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া এখন বিদ্যালয় পরিদর্শনে আগমন করিতেছেন। আলিগড়ের লব্ধ প্রতিষ্ঠ উকিল শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীলাল মহোদয় অনুগ্রহপূর্ব্বক বিদ্যালয়ে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি বিদ্যালয় পরিদর্শনান্তর নগদ ৫০৲ বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে সাহায্য প্রদান পূর্ব্বক উদ্যোগ-কর্ত্তৃগণকে প্রোৎসাহিত করিয়াছেন।

* * * *

লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধারের জন্য অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তার বিষয় বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুমহিলাগণও উপলব্ধি করিতেছেন। শুধু যে উপলব্ধি করিতেছেন, তাহাই নহে, একটি হিন্দু মহিলা এই প্রয়োজনীয়তার বিষয় সম্যক উপলব্ধি করিয়া গত ২রা বৈশাখ আমাদিগের নিকট নগদ একশত টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। এই দানশীলা রমণীর নাম—শ্রীমতী রাধাসুন্দরী দেবী। ইনি শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মাতৃদেবী। আমরা তাঁহার পুত্রের মারফৎ এই দান প্রাপ্ত হইয়াছি।

* * * *

বিদ্যালয়ের উন্নতি-কল্পে আর কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি গত বৈশাখ মাসে নগদ অর্থ এবং কতকগুলি বিশেষ মূল্যবান্ পুস্তক যাহা দান করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করাও আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছি। নগদ অর্থ সম্বন্ধে চন্দননগর নিবাসী শ্রীযুক্ত নারাণ-চন্দ্র দে মহাশয় ২৫৲ টাকা এবং পুস্তক সম্বন্ধে খড়দহের স্বর্গীয় যাদব কিশোর গোস্বামী মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত পুলিন কিশোর গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত কিশোরী কিশোর গোস্বামী প্রভৃতি ভ্রাতৃবৃন্দ মিলিত হইয়া, স্বর্গীয় যাদবকিশোর গোস্বামী মহাশয়ের লাইব্রেরীটি

এই বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরীকে দান করিয়াছেন। এই দান প্রাপ্তি হইতে অনেকগুলি বহুমূল্য এবং উৎকৃষ্ট গ্রন্থ দ্বারা বিদ্যালয় লাইব্রেরীর সম্পদ-সম্ভার সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

* * * *

দেশের ছোট-বড় সকল প্রকার জমীদারদিগের দৃষ্টি ইহার উপর অল্পে অল্পে পতিত হইতেছে; ইহা নিশ্চয়ই আশার কথা বলিতে হইবে। গত ৩রা বৈশাখ মেহেরপুরের সুপ্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র মল্লিক ও শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মল্লিক এবং সোমড়া-আবদুল পুরের ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মজুমদার বিদ্যালয়পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহারা বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি কল্পে অনেক প্রকার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন বলিয়া, আমাদিগকে আশাপ্রদান করিয়াছেন। ফল কথা, এ সকলই যে বিদ্যালয়ের পক্ষে আশার বিষয়, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

* * * *

এরূপ একটি মহান্ কার্য্য সিদ্ধ করা একার কার্য্য নহে। ইহার জন্য প্রথমতঃ যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন। সে অর্থ-সংগ্রহের জন্য চেষ্টাশীল, উদ্যোগী এবং উৎসাহী-পুরুষের আবশ্যক। দেশের ধনকুবেরদিগকে মুক্তহস্ত করিবার জন্য সে উৎসাহ প্রয়োগ করিতে হইবে। যাঁহাদিগের ইচ্ছা আছে, শক্তি আছে, সামর্থ্য আছে, দেশের কাজ করিতে, দেশের হিত করিতে,—জগতের মঙ্গলসাধন করিতে যাঁহাদিগের প্রবৃত্তি আছে, তাঁহারা এসময় নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া, এই মহান্ কার্য্যে যোগদান করুন। আরোগ্য এবং দীর্ঘায়ু লাভ,—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—সকল কর্ম্মের মূলসূত্র। যখন আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্বাঙ্গ অক্ষুণ্ণ ছিল, তখন মানবজাতি ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—সকল প্রকার সম্পদ লাভেরই যে অধিকারী হইত—এ কথা বিশেষজ্ঞের অবিদিত নাই। তাহার অভাবের বর্ত্তমান সময়ে ভারতভূমি জরা-মরণের লীলানিকেতন হইয়া পড়িয়াছে। দেশ-রক্ষায় মনোযোগ প্রদান করিতে হইলে, আগে দেশের লোককে স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘায়ুলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা প্রদর্শন করিতে হইবে। অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয় এই উদ্দেশ্য লইয়াই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশের প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি ইহা উপলব্ধি করুন—ইহাই আমাদিগের বক্তব্য।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে প্রবেশার্থি ছাত্রদিগের প্রতি বিজ্ঞাপ্ত।

আগামী আষাঢ় মাসের শেষভাগ হইতে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বিভাগের ছাত্রদিগের নূতন সেসন বা নববর্ষের অধ্যয়ন আরম্ভ হইবে। সংস্কৃত ভাষায় যাঁহাদিগের জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাঁহারাই সংস্কৃত বিভাগে অধ্যয়নের অধিকারীর হইবেন। বাঙ্গালা-বিভাগে, বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকা আবশ্যক এবং কিছু ইংরাজী শিক্ষা সমাপ্তির পর প্রবেশ করিতে হইবে। মধ্য ইংরাজী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা ম্যাট্রিকুলেশন ক্ল্যাস পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন,—বাঙ্গালা বিভাগের জন্য এরূপ ছাত্রদিগের আবেদনই গ্রহণ করা হইবে। এখন হইতে আবেদন করুন, নতুবা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ হইয়া গেলে আর কাহারও আবেদন গৃহীত হইবে না।

আবেদনে জাতি ও বয়সের কথা উল্লেখ করিবেন। অন্যান্য বিষয় জানিবার জন্য অর্দ্ধ আনার টিকিট সহ নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

কবিরাজ শ্রীযামিনী ভূষণ রায়
কবিরত্ন এম্, এ, এম্, বি
অধ্যক্ষ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

১ম বর্ষ। { বঙ্গাব্দ ১৩২৪—আষাঢ়। } ১০ম সংখ্যা।

কাজের কথা।

—:০:—

আহারে অনিষ্ট।—আহারই প্রাণধারণের মূল। আহার্য্যের অভাব হইলে, কি স্থাবর, কি জঙ্গম—এমন কি, জড়পদার্থ—উদ্ভিদ্ পর্য্যন্ত জীবনধারণে সক্ষম হয় না। সেই আহার্য্য কিন্তু পরিমিত এবং বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে অম্ল-অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য—এক কথায় ইংরাজী মতে ডিস্‌পেপসিয়া নামক ভীষণ ব্যাধি—যাহা বাঙ্গালা জুড়িয়া একাধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হইয়াছে, আহার বিষয়ের অমিত আচরণই তাহার একটা বিশেষ কারণ বলিয়া আমরা মনে করি। হিন্দু বাঙ্গালী সাত্ত্বিক আহারে সেকালে বল-সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিত, এখন সে সাত্ত্বিক-আহারের ব্যবস্থা দেশ হইতে একরূপ লুপ্তই হইয়াছে। হিন্দুজনোচিত খাদ্য-বিচারের ব্যবস্থা একালে অনেক হিন্দুসন্তানই যে ভুলিয়াছে, ইহা নির্ভেজাল সত্য কথা। দুগ্ধ-ঘৃত-মাখন দধি—যে সকল দ্রব্য আহার করিলে, শরীর পুষ্ট হইবে, কান্তি-ধৃতি বর্দ্ধিত হইবে, হৃদয়-তন্ত্রী পবিত্রতা পূর্ণ হইবে, বাঙ্গালীর নিকট সে সকল দ্রব্য এখন সহজ-সুলভও নাই,—সেই সঙ্গে সেই সকল দ্রব্যের আস্বাদ লাভে বাঙ্গালীর শ্রদ্ধাও যেন হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ সকল দ্রব্যের রূপান্তরে প্রস্তুত বাজারের খাবারে অনেক বাঙ্গালীই এখন রসনার পরিতৃপ্তি-সাধন করিয়া থাকেন। বাজারের শিঙ্গাড়া-কচুরি, বাজারের চপ্-কাট্‌লেট্—ধর্ম্মাধর্ম্ম ভুলিয়া বাঙ্গালী এখন উদরস্থ করিতে শিখিয়াছে! ধর্ম্মের কথাটা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম,—কেহ হিন্দুয়ানি মানুন আর না মানুন, তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের মোটেই আসিয়া যাইতেছে না, কিন্তু এ কথাটি আমরা জোর করিয়া বলিব,—এই বাজারের খাবার হইতে দেশে অম্ল-অজীর্ণ অগ্নিমান্দ্য বা ডিসপেপ্‌সিয়া রোগ বাঙ্গালায় সংক্রামিত হইয়া পড়িতেছে। সকল বিষয়ের মত খাদ্যেও এখন ভেজালের চলন যথেষ্ট চলিয়াছে। ঘৃত এবং ময়দায় কিরূপ ভেজাল চলিয়া আসিতেছে, তাহা সংবাদপত্র-পাঠকগণের

অবিদিত নাই। দোকানদার লাভ করিতে বসিয়া, খুব দেখিয়া শুনিয়া, বিশেষ বিবেচনাসহ উৎকৃষ্ট ঘৃত এবং ময়দার আমদানি পূর্ব্বক যে খাদ্য প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিবে—এমন কথা ত তাহাকে মাথার দিব্য দিয়া দেওয়া নাই; সুতরাং তাহার দোকানের খাদ্যে বাঙ্গালা দেশ অজীর্ণ-প্রবণ হইবে কি না; তাহা তাহার চিন্তা করিবার ও আবশ্যক নাই। দেশের লোকে এ কথা বুঝেন না—ইহাই দুঃখ। আমাদের মনে হয়, সেকালে পল্লীগ্রামে যে মুড়ি-চালভাজা, আদা-ছোলা, গুড়-চিনির ব্যবস্থা ছিল;—এখনকার বাজারের কচুরি-শিঙ্গাড়া তুলিয়া দিয়া, সকলে যদি জলযোগের সময় সেইরূপ ব্যবস্থা পুনঃ প্রচলিত করেন, তাহা হইলে, দেশ হইতে অম্ল-অজীর্ণ-রোগীর সংখ্যা অনেক কমিয়া যাইতে পারে। দেশের লোকে এ সকল বুঝিবেন কি?

* * * *

পানীয়ে প্রমাদ—আহারের মত অযথা পানীয়-ব্যবহারে ও বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য-ক্ষয় হইতেছে। প্রাণধারণের জন্য আহার্য্যের মত পানীয়েরও প্রয়োজন; কিন্তু সে পানীয়ের ব্যবহার উপযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। চা'য়ের দোকানের মত কলিকাতায় এখন সোডা-লেমনেডের দোকানও অসংখ্য। সকালে-সন্ধ্যায় চা-পান এবং দ্বিপ্রহরে সোডা-লেমনেডের আস্বাদন অনেক বাঙ্গালীই এখন করিয়া থাকেন। ডিস্‌পেপ্‌সিয়া বা অম্ল-অজীর্ণ-অগ্নিমান্দ্যের রোগীদিগের নিকট ইহার ব্যবহার ত খুব বেশীরূপই। ফলে সোডা-লেমনেডের প্রধান উপাদান ক্ষার দ্রব্যের ব্যবহারে তাঁহাদিগের আশু কষ্ট দূরীভূত হইলেও, উহারই ফলে, তাঁহাদিগের ব্যাধি কিন্তু শরীর-মধ্যে বেশ পাকিয়া দাঁড়াইতেছে। ক্ষার-দ্রব্য-ব্যবহারে অম্ল-রোগের আশু-যন্ত্রণা নিবারিত হয়, কিন্তু অম্লরোগীর পক্ষে অধিক পরিমাণে ক্ষার মিশ্রিত দ্রব্য ব্যবহার অবিধেয় —ইহা অভিজ্ঞ চিকিৎসকদিগের অভিমত। তা' ছাড়া, অধিক জলপানে অম্ল-অজীর্ণ এবং অগ্নিমান্দ্যের সৃষ্টি ইচ্ছা পূর্ব্বক আনয়ন করা হয়। ফলে, সুস্থ-শরীরে গ্রীষ্ম-সন্তাপ-নিবারণের জন্য ঐ সকল দ্রব্যের অত্যধিক ব্যবহারে অনেকে অজীর্ণ-প্রবণ হইয়া পড়িতে-ছেন। সেকালে গ্রীষ্ম-সন্তাপ অপোদনার্থ ডাব-বেলের, সরবৎ-মিছরির পানা প্রভৃতি যে সকল পানায়ের ব্যবস্থা ছিল, তদ্দারা বায়ু-পিত্ত-কফের সকল দোষ নষ্ট হইয়া, শারীরিক স্নিগ্ধতা লাভ ঘটিত। এখনকার সোডা-লেমনেড-পায়ীগণ যদি এ সকল কথা বুঝেন, তাহা হইলে একদিকে অর্থের অযথা ব্যয়ের হস্ত হইতে তাঁহারা ত নিষ্কৃতিলাভ করিবেনই, সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যের ও উন্নতি লাভে যে যথেষ্ট সমর্থ হইবেন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

* * * *

আলোকে অপকার।—এখনকার আলোকের কথা তুলিলে, সাধারণতঃ কেরোসিন তৈলের আলোক বুঝাইয়া থাকে। যাঁহাদিগের অর্থ আছে, সঙ্গতি আছে, ইচ্ছা আছে, প্রবৃত্তি আছে, তাঁহারা বৈদ্যুতিক-আলোকের ব্যবস্থাপূর্ব্বক নৈশ-অন্ধকার অপনোদন করিয়া থাকেন, কিন্তু সাধারণতঃ গৃহস্থ-সংসারে কেরোসিন তৈলের আলোকেই নিশার আঁধার দূরীভূত করা হয়। এই কেরোসিন তৈলের যে গ্যাস বহির্গত হয়, তাহা কিন্তু আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকারী। শয্যাকক্ষ, বৈঠকখানা এবং অন্যান্য ঘরগুলিতে এই

কেরোসিনের আলোক চিম্‌নির দ্বারা যে প্রণালীতে ব্যবহার করা হয়, তদ্দারা বড় বেশী অনিষ্ট না হইলেও রন্ধন ঘরে চিম্‌নিবিহীন শুধু 'ডিবা' বা 'কুপি'র আলোকে যে স্বাস্থ্য-হানি অবশ্যম্ভাবী, তাহা আদৌ অস্বীকার করিবার যো নাই। আমাদের মনে হয়, যে সকল কারণে আমাদের অন্তঃপুরচারিণী মহিলাদিগের স্বাস্থ্যের অপচয় ঘটিতেছে, ইহাও তাহার মধ্যে একটি বিশেষ কারণ। পূর্ব্বে রেড়ি বা সর্ষপ তৈলে আমাদের আলোকের কার্য্য সিদ্ধ হইত, এখন সে ব্যবস্থা দেশ হইতে একেবারে লোপ পাইয়াছে। ইহার উপর, এখনকার দিনে সমস্ত রাত্রি আলো-জালিয়া অনেকের নিদ্রা যাওয়া অভ্যাস আছে। দরজা-জানালাগুলিও অনেকে শয্যা গ্রহণের পূর্ব্বে বন্ধ করিয়া থাকেন। এরূপ অবস্থায় রুদ্ধ-গৃহে কেরোসিন তৈলের আলোকে যে বিষবং অনিষ্ট উৎপন্ন হয়, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। যদি কেরো-সিনের আলোকেই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ রন্ধন-গৃহে 'কুপি' বা 'ডিবা'র ব্যবহার বন্ধ করাত কর্ত্তব্যই, নিদ্রার পূর্ব্বেও ওরূপ আলো জালিয়া রাখা কর্ত্তব্য নহে। অধ্যয়নশীল ছাত্রগণও যদি অধ্যয়ন-কালে কেরোসিনের আলোক পরি-ত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের প্রভূত মঙ্গল-সাধিত হইবে।

* * * *

আবরণে অমঙ্গল।—সেকালে দৈহিক আবরণ বা জামার ব্যবহারটা অনেকে যেরূপ অল্প পরিমাণে করিতেন, এখন সেইরূপ তাহার সর্ব্বদা প্রচলন চলিয়াছে। ভূমিষ্ট-কালের পর হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত—সকল অবস্থাতেই সকল সময়ে জামার ব্যবহার না করিলে কাহারও যেন অঙ্গরক্ষা—তথা ভদ্রতা-রক্ষা হয় না,—ইহা এখন দেশের আপামর সাধারণের বদ্ধমূল-ধারণা জন্মিয়াছে। শ্লেষ্মা-প্রধান শিশু-শরীরে এই জামার ব্যবহার সর্ব্বদা করিলে, তাহাদিগের স্বাস্থ্যহানির ততটা কারণ না ঘটিলেও ইহা দ্বারা বয়স্থ ব্যক্তি দিগের স্বাস্থ্যোন্নতির যে বিশেষ বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে, ইহা সুনিশ্চিত। সর্ব্বদা জামা গায়ে দিয়া, দেহ আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলে, দেহ মধ্যে বায়ু-চলাচলের অন্তরায় ঘটিয়া থাকে। আমা-দের পরিত্যক্ত-পল্লীভূমির অনাচ্ছাদিত-দেহ কৃষিজীবি বা শ্রমজীবি সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য এই-জন্যই আমরা অনেক সময় সমুন্নত দেখিতে পাই। আমরা স্বাস্থ্যসুখ-প্রয়াসী দেশবাসী-দিগকে এ কথাটিও চিন্তা করিতে পরামর্শ প্রদান করিতেছি। কর্ম্ম-কাল হইতে অবসর লইয়া অন্ততঃ স্বীয় গৃহে অবস্থিতি কালেও অনাচ্ছাদিত-দেহে সেকালের সভ্যতাবিহীন ব্যক্তিদিগের পন্থা অনুসরণ করিলেও যথেষ্ট পরিমাণে স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটিতে পারিবে।

* * * *

যানারোহনের অপকারিতা-দেশে যখন রেল-ষ্টিমারের চলন হয় নাই,—তখন লোকে পঞ্চাশ মাইলেরও দূরবর্ত্তী স্থান হইলে পদব্রজে যাতায়াত করিত। এখন রেল-ষ্টীমারের প্রবর্ত্তনে বালি-দমদমা হইতেও ত কেহ পদব্রজে যাতায়াত করিবে না,—কলিকাতার মধ্যেও ট্রাম-লাইনে এক পল্লী হইতে অন্য পল্লীতে যাতায়াত করিতে হইলে, ট্রাম ভিন্ন কাহারও গমনাগমনের উপায় নাই। শরীর রক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়া, যত্ন লইয়া, ব্যায়ামকার্য্য ত লোকে ভুলিয়াই গিয়াছে, গমনাগমনের

প্রয়োজনে—হেলায়-শ্রদ্ধায় পদব্রজে যে ব্যায়াম-টুকু হইতে পারে, ক্রমশঃ লোকে তাহাতেও অনভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সুখ-সুবিধার জন্য মোটর-ট্রাম-অশ্বযান প্রভৃতি যানারোহণের প্রয়োজন হইলেও সাধারণ লোকের পক্ষে সিমলা হইতে হেদুয়ার মোড় পর্য্যন্ত যাইতে অবশ্য ট্রামের প্রয়োজন হওয়া উচিত নহে। ইহাতে একদিকে যেরূপ বিলাসিতার প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে, অপর দিকে সেইরূপ এই অকর্ম্মণ্যতার ফলে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যেরও অপচয় ঘটিতেছে। পাঁচ পয়সা, ছয় পয়সা করিয়া, মাসের শেষে অনেকগুলি পয়সাও এজন্য ব্যয়িত হইয়া যাইতেছে। যাহা হউক, দেশের আবহাওয়া যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ-জীবন প্রকৃতই অন্ধকারময়। শুধু কলেজের সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করিয়া, রাশি রাশি অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিলে চলিবে না, স্বাস্থ্য-সুখলাভের জন্য সর্ব্বাগ্রে চেষ্টাশীল হইতে হইবে। আমাদের আশা-ভরসাস্থল প্রত্যেক বাঙ্গালী-সন্তান এ সকল কথা বুঝুন,—বুঝিয়া স্বাস্থ্যসুখ লাভের জন্য সর্ব্ব প্রথম চেষ্টা করুন—ইহাই আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি।

কবিরাজ—শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত।

অনুকরণে আমাদের অবস্থা।

আমরা এখন দু'য়ের বা'র হইয়াছি। সে কালের যে সকল পদ্ধতি আমাদের সর্ব্ব বিষয়ের উপযোগী বলিয়া বিধিবদ্ধ ছিল, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ যেরূপ নিয়মে সংসার-যাত্রার সকল প্রকার কর্ম্ম অবহিত চিত্তে নির্ব্বাহ করিতেন, বৃন্দারকদলের অবতার-কল্প, লোকহিতবৎসল, স্বার্থত্যাগী, ঋষিমণ্ডলী বহুল-গবেষণার ফলে যে সকল বিষয় আমাদের করণীয় বলিয়া শাস্ত্র নামে অভিহিত করিয়াছিলেন, কাল-মাহাত্ম্যে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় প্রণোদিত হইয়া, সে সমস্তই এখন আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা হিন্দু নামে অভিহিত, কিন্তু হিন্দুজনোচিত সকল প্রকার করণীয়ই আমরা করিতে জানি না, বাঙ্গালী বলিয়া আমরা পরিচয় দিয়া থাকি, কিন্তু বাঙ্গালীর অনেকগুলি আচরণই মানিয়া চলিতে এখন আমাদের লজ্জাবোধ হয়, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের প্রাচীন-পন্থা অনুকরণ করিতে এখন আমরা যেন সর্ব্বতোভাবে কুণ্ঠিত হইয়া থাকি। অপর দিকে পাশ্চাত্য শিক্ষায়, পাশ্চাত্য-সমাজের অনুকরণ-প্রয়াস এখন আমাদের সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয় হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সে অনুকরণেও আমরা সাফল্য-লাভ করিতে পারিতেছি না।

কথাটা আর একটু খুলিয়া বলা আবশ্যক। পাশ্চাত্য-সমাজে প্রাতঃসন্ধ্যায় 'চা' পানের ব্যবস্থা আছে, আমাদের সে অনুকরণটা করিতেই হইবে, কিন্তু পাশ্চাত্য-সমাজে কিছু আহার না করিয়া 'চা' পানের ব্যবস্থা নাই, আমরা কিন্তু তাহার অনুকরণ করিতে শিখিব না, শুধু চা পানের

ব্যবস্থা করিলেই সভ্য সমাজের অনুকরণ সুসিদ্ধ হইল! ইহাই হইয়াছে আমাদের অবস্থা! কিন্তু এবম্বিধ অবস্থার ফলে হিন্দু—তথা বাঙ্গালী-সমাজের যে বিলক্ষণ ক্ষতি হইতেছে, আমরা তাহা চিন্তা করিবারও অবসর পর্য্যন্ত পাইতেছি না, ইহাপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? শুধু একটা চায়ের কথা মাত্র উল্লেখ করিলাম; বলিলে এরূপ ভূরি ভূরি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। আমরা অন্যান্য কথার আলোচনা না করিয়া, অদ্য শুধু ব্যায়ামের কথা অবলম্বনে অনুকরণে আমাদের অবস্থা বা আমাদের ক্ষতি-বৃদ্ধির কথা বুঝাইব।

কলির পরমায়ু একশত কুড়ি বৎসর শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট, কিন্তু এখন অনেকের আয়ু-সূর্য্য পঞ্চাশৎ বৎসরের পূর্ব্বেই অস্তমিত হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন জীবিত-কালের অধিকাংশ সময়ই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বা আরোগ্য অবলম্বনে অতিবাহিত করিতেছেন, অধুনা এরূপ ভাগ্যবান ব্যক্তিরও দর্শন অত্যল্প ঘটিয়া থাকে। সে কালের লোকে সভ্য কি অসভ্য ছিলেন, ভদ্রতা অর্থাৎ এ কালের মার্জ্জিত-ভদ্রতা বা 'cticate' দোরস্তে তাঁহারা অভ্যস্ত ছিলেন, কি না, ছিলেন, সে কথা লইয়া আমরা কোন আলোচনা করিতে চাহিনা, কিন্তু ইহা বলিলে বোধ হয় অসঙ্গতি দোষ ঘটিবে না, যে, সে কালের লোকে ঋষি-প্রবর্ত্তিত-পন্থানুসরণে জীবণের সমস্ত ভাগই যেরূপ নিরোগ-দেহে অতিবাহন করিতে সমর্থ হইতেন, আমরা সেই মহাজন পন্থা বা ঋষি-প্রদর্শিত সরণী-ভ্রষ্ট হইয়া, সমস্ত জীবন অতিবাহিত করা ত দূরের কথা, বৎসরের দশমাংশ সময়ও ক্ষেপণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। ইহা ভিন্ন সে কালের হিসাব-গণনায় দীর্ঘজীবি ব্যক্তির সংখ্যা যেরূপ ভূরি ভূরি পাওয়া যাইত, এ কালে অল্প জীবির সংখ্যাই সেইরূপ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। এ অবস্থায় সে কালের আদর্শ অবলম্বনই আমাদের পক্ষে হিতজনক ছিল, কি অনুকরণে আমাদের শ্রেয়ঃ লাভ ঘটিতেছে বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেরই ইহা চিন্তা করা উচিত।

সে কালের লোকে অতি প্রত্যূষেই গাত্রোত্থান করিতেন। গাত্রোত্থান করিয়া, মলত্যাগ ও দন্ত-ধাবনাদি কার্য্য সমাপনান্তর দৈনন্দিন অন্যান্য কর্ম্মের মত দৈহিক লঘুতা-সম্পাদনার্থ, কর্ম্ম-সামর্থ্য-পরিবর্দ্ধনার্থ, অঙ্গ সৌষ্টব দৃঢ়ীকরণার্থ, বায়ু পিত্ত-কফ—ত্রি ধাতুর দোষ নিবারণার্থ—যাহাতে অগ্নি-বৃদ্ধি হয়, দেহ-শিথিল্য নিবারিত হয়, জরা ও নানা প্রকার জটিল-ব্যাধি যাহাতে অকালে আক্রমণ করিতে না পারে—তাহার উপায় বিধান করিবার জন্য—নিয়ম পূর্ব্বক কিছুক্ষণ ব্যায়াম কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। সে ব্যায়াম-কার্য্য কাহার কুস্তির দ্বারা সম্পন্ন হইত, কাহার বা ভ্রমণে সুসিদ্ধ হইত। ফল কথা, দৈনন্দিন স্নান এবং পান-ভোজনের মত নিয়ম পূর্ব্বক ব্যায়াম করিতে হইবে,—ইহা সে কালে অনেকেই মনে করিতেন।

এত গেল, সাধারণ কথা। সাধারণ লোকে এইরূপ ভাবে সে কালে ব্যায়াম-কার্য্য সুসিদ্ধ করিত। কিন্তু ধর্ম্মবৎসল, নিষ্ঠাবান হিন্দুজাতির শ্রেষ্ঠ জাতি—দ্বিজমণ্ডলীর ব্যায়াম-কার্য্য কুস্তি এবং ভ্রমণাদি ব্যতিরেকেও যেরূপ ভাবে নির্ব্বাহিত হইত, তাহার আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে, সংযম-নিয়মপরায়ণ, ব্রহ্মজ্ঞান-পরিপূর্ণ, তপোদীপ্ত-দেহ, ঋষি

পুত্রের হিতাকাঙ্ক্ষী আমাদের আর্য্য ঋষি মণ্ডলী আমাদের জপ-তপ, আহ্নিক-পূজার নিয়ম প্রবর্ত্তনে, তাহার ভিতর দিয়াও সু-কৌশলে এবং অলক্ষিত ভাবে ব্যায়াম-কার্য্য সিদ্ধ করিবার জন্য কি এক অপূর্ব্ব ব্যবস্থারই না বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতির কুস্তি বা মল্ল-ক্রীড়ায় সময় ক্ষেপণ করিলে চলিবে না; দেশ-রক্ষার জন্য, সমাজ-বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, কুশল-কল্যাণ-চিন্তা-প্রসূত-উপদেশ-বর্ষণে সমগ্র মানবজাতির শুভাশুভ বিষয়ের ব্যবস্থা করিবার জন্য, ব্রাহ্মণ-বৈদ্য প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ জাতির লোক-দিগকে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতে হইবে এই জন্য,—সমগ্র মানব জাতির কল্যাণেচ্ছু আর্য্য-ঋষিগণ তাঁহাদিগের ধর্ম্ম-কর্ম্মের ভিতর দিয়াও যাহাতে তাঁহাদের স্বাস্থ্য অবাহত থাকে, যাহাতে তাঁহারা নীরোগ দেহে দীর্ঘায়ু লাভ করিতে সমর্থ হন, ধর্ম্মের সহিত ব্যায়ামের কার্য্য সম্পন্ন হওয়ায় জরা-বার্দ্ধক্য যাহাতে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে না পারে,—ইহার জন্য,—তাঁহাদিগের পূজা-আহ্নিকে, তাঁহাদের ভগবদুপাসনায়, তাঁহাদের পার-লৌকিক ইষ্ট চিন্তার মধ্যে "প্রাণায়ামে"র ব্যবস্থা করিয়া কি অলৌকিক শক্তিরই না পরিচয় প্রদান করিয়াছেন! মানবজাতির দেহরক্ষার জন্য তাঁহাদের সেই অপূর্ব্ব উদ্ভাবনী-শক্তি স্মরণ করিলে চমৎকৃত না হইয়া থাকিতে পারা যায় না।

প্রকৃত পক্ষে ব্যায়াম কার্য্যের মহদুদ্দেশ্য প্রাণায়াম দ্বারা যেরূপ সুসিদ্ধ হইয়া থাকে, সেরূপ আর কিছুতেই হইতে পারে না। শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন,—

ব্যায়াম দৃঢ় গাত্রস্য ব্যাধির্নাস্তি কদাচন।
বিরুদ্ধং বা বিদগ্ধং বা ভুক্তংশীঘ্রং বিপচ্যতে॥

অর্থাৎ ব্যায়ামের দ্বারা গাত্রের দৃঢ়তা লাভ হইয়া থাকেই, কোন ব্যাধিও ব্যায়মশীলের শরীরে প্রবেশলাভ করিতে পারে না। বিরুদ্ধ বা বিদগ্ধ দ্রব্য সকলও ব্যায়ামশীল ব্যক্তি ভোজন করিলে অনায়াসেই জীর্ণ করিতে সমর্থ হন।

এখন কথা হইতেছে; এতগুলি কার্য্য ব্যায়ামের দ্বারা কেমন করিয়া সিদ্ধ হয় এবং সে কালের প্রাণায়াম-পরায়ণ ব্যক্তিগণ কেমন করিয়া সেই সকল কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতেন, এখন আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

শরীর রক্ষার জন্য দেহীগণের শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি অব্যাহত রাখা যে একান্ত প্রয়োজন, একথা লইয়া বোধ হয় কোনও বাদানুবাদই উঠিবার সম্ভাবনা নাই। এই শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য আমাদের হৃৎকোষ্ঠ সংসৃষ্ট ফুস্‌ফুস হইতে সম্পাদিত হইতেছে। শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন—শরীর মধ্যে করোটি, বক্ষঃ ও উদর—এই তিনটি গুহা বা গহ্বর বর্ত্তমান আছে। ইহার মধ্যে করোটিতে মস্তিষ্ক, বক্ষপ্রদেশে উণ্ডূক, ফুস্‌ফুস ও হৃৎকোষ্ঠ এবং উদর প্রদেশে পিত্তাশয়, আমাশয়, ক্লোম, ধমনী, স্কন্ধ, ক্ষুদ্রান্ত্র, স্থূলান্ত্র, প্লীহা, বৃক্কদ্বয়, মূত্রনাড়ী, বস্তি ও স্থূলান্ত্রের নিম্নান্ত বর্ত্তমান থাকে। আমরা এই তিনটী গুহার শ্রেণী-বিভাগ করিয়া, ইহাদিগকে ঊর্দ্ধ, মধ্য এবং নিম্ন-গুহা অভিধানে অভিহিত করিয়া লইতেছি। ঊর্দ্ধ এবং নিম্ন গুহার বিষয় এস্থলে আলোচনা করিবার আবশ্যক নাই। শ্বাস-প্রশ্বাসের বিষয় বুঝিবার জন্য মধ্যগুহা বা বক্ষের বিষয় লইয়া আলোচনা করিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

এই গুহার সম্মুখভাগে উরোঃস্থি, পর্শুকো-ণাস্থি ও পর্শুকাগণ অবস্থিতি করিতেছে। পার্শ্বদ্বয়েও পর্শুকাগণ ও পশ্চাদভাগে কশেরুকা সকল, উপরিভাগে প্রথম-পর্শুকা ও উর্দ্ধপট্ট এবং নিম্নভাগে বক্ষঃস্থল পেশী বর্ত্তমান। এই গুহাতেই হৃৎকোষ্ঠ, উণ্ডূক ও ফুস্‌ফুসের স্থান নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।

হৃৎকোষ্ঠ বক্ষ প্রদেশের মধ্যস্থলে তির্য্যগভাবে একটি আবরণী দ্বারা আবৃত রহিয়াছে। ইহার উপরিভাগেই ফুস্‌ফুসের স্থান। হৃৎকোষ্ঠই বিশুদ্ধ রক্তের আধার এবং ইহা হইতেই ধমনী উত্থিত হইয়াছে। ইহারই উর্দ্ধ ও নিম্নপ্রদেশে দুই দুইটি করিয়া চারিটি গর্ভ-প্রকোষ্ঠ বিদ্যমান। শারীর-যন্ত্রের যাবতীয় শিরা একত্রীভূত হইয়া, দুইটি মহাশিরা রূপে পরিণত হইয়াছে এবং ঐ শিরাদ্বয় উর্দ্ধস্থ দক্ষিণ হৃদ্‌গর্ভে সমাগত হইয়া শরীরের সর্ব্বপ্রকার দূষিত রক্তকে তথায় অর্পণ করিতেছে। অধঃস্থ বামগর্ভ হইতে মূল ধমনী উদ্গত হইয়াছে। দূষিত রক্ত এই গর্ভ চতুষ্টয়ে উপস্থিত হইয়া, বিশুদ্ধতা লাভ পূর্ব্বক প্রাণীগণকে জীবিত রাখিতেছে। জীবের ভূমিষ্ঠকাল হইতে মরণ-কাল পর্য্যন্ত হৃৎকোষ্ঠ একবার স্ফীত ও একবার সঙ্কুচিত হইতেছে,—এমনইভাবে দেহীগণের দেহ-রক্ষার জন্য বিধাতা সৃষ্টি-নৈপুণ্যের অপূর্ব্ব ব্যবস্থা করিয়াছেন। হৃৎপিণ্ডের আকুঞ্চন-প্রসারণ ক্ষণমাত্র নিবৃত্ত হইলেই মৃত্যুসংঘটিত হইবে—ইহাও বিধাতার অপূর্ব্ব নিয়ম বন্ধনী।

যাহা হউক, যেরূপ মধুচক্র বা মৌচাকে কোষ থাকে সেইরূপ ফুস্‌ফুসের মধ্যে যে অসংখ্য কোষ বিদ্যমান রহিয়াছে, উহারই ভিতর শ্বাসাকৃষ্ট বায়ু রক্তনালীর মধ্যে শ্বাসক্রিয়া সম্পাদনান্তর সঞ্জীবনী শক্তি আনয়ন পূর্ব্বক আমাদের জীবনী শক্তি বহন করিতেছে।

কথাটা আর একটু খুলিয়া বলা যাউক। শ্বাস-ক্রিয়া দ্বারা বাহ্যবায়ু নাসিকা ও মুখরন্ধ্র দিয়া শ্বাস নাড়ীতে প্রবেশ পূর্ব্বক ফুস্‌ফুসের অসংখ্য কোষমধ্যে উপস্থিত হইতেছে। যে দুইটি মহাশিরা যাবতীয় শিরা-সম্মিলনে উদ্ভূত হইয়া, দেহ মধ্যস্থ দূষিত রক্ত সকলকে হৃদ্‌-গর্ভে সমাগত করিতেছে, তাহাদেরই দ্বারা আনীত রক্ত হৃদ্‌গর্ভ হইতে ফুস্‌ফুসে উপস্থিত হইতেছে। শ্বাসাকৃষ্ট বায়ুর সাহায্যে এই রক্তই বিশুদ্ধ, সুখোষ্ণ ও লোহিতবর্ণ হইয়া হৃৎকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইতেছে এবং তথা হইতে ধমনীমার্গে অতি প্রবলভাবে সমুদয় দেহ পরিভ্রমণ করিতেছে।

যাহা হউক বুঝা গেল, দেহ রক্ষার জন্য, বল-সঞ্চয়ের জন্য, শ্বাসক্রিয়া দেহী-মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজন। কথা বলিতে, পথ চলিতে, বা নাসা ও মুখবিবর হইতে শ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে, যে পরিমাণ শ্বাস-ক্রিয়া দেহী-শরীরে সম্পন্ন হয়, শরীর ধারণের জন্য তাহা যথেষ্ট নহে। এই জন্যই ব্যায়ামের প্রয়োজন। প্রাণায়ামে এই শ্বাস-ক্রিয়ার কার্য্য যেরূপ সুসিদ্ধ হয়, তাহা কুস্তি, মুগুর-ভাঁজা বা জিম্‌নাষ্টিক অপেক্ষা পরিমাণে অল্প ত নহেই, পরন্তু সে ব্যায়ামে শ্বাস-ক্রিয়ার কার্য্য আরও অধিক পরিমাণে সিদ্ধ হইয়া থাকে। সনাতন আর্য্য-জাতির প্রাচীন ইতিহাস অনুশীলন করিলে, এই জন্যই সেকালের তপঃ নিষ্ঠ ঋষিদিগের পরমায়ু সহস্র সহস্র বৎসর নির্দ্দিষ্ট ছিল দেখিতে পাইয়া থাকি। মহাভারতের ভীষ্মদেব এই জন্যই ইচ্ছা মৃত্যুর অধিকারী হইয়াছিলেন।

অমিততেজা দ্রোণাচার্য্যের বীরত্ব এই জন্যই বুঝি অতুলনীয় বলিয়া পরিগণিত ছিল। ব্রাহ্মণ কৃপাচার্য্য-অশ্বত্থামার অব্যাহত শক্তিও এইজন্য বুঝি অদ্যাপি অমানুষিক বলিয়া ঘোষিত হইয়া আসিতেছে।

যাক্ সে কথা,—এখন আমরা শূর-বীর হইতে চাহি না, অমিততেজা-যোদ্ধৃবৃন্দেরও আসন-পরিগ্রহে আমাদের আশক্তি নাই। আমরা চাহি, এখনকার দিনে মোটা-ভাত, মোটা-কাপড়ের সংস্থান করিয়া, মোটামুটি চালে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া, আরোগ্য এবং দীর্ঘজীবন লাভ পূর্ব্বক, জীবিতকালের সকল সময় টুকু সাচ্ছন্দ্য লইয়া কাটাইতে পারি,—মাত্র ইহাই এখনকার দিনে আমাদের লক্ষ্যস্থল,—সেই লক্ষ্যস্থল হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছি বলিয়াই ব্যায়ামের কথা—তথা সেকালের প্রাণায়ামের কথা স্মৃতিপথে যেন কেমনই জাগরিত হইয়া পড়িতেছে। এই জন্যই এত কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি।

শুধু 'প্রাণায়ামে'র কথা কেন, সেকালে আমরা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য যে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিতাম, সে সকলের মধ্যেই প্রচ্ছন্নভাবে ব্যায়াম-কার্য্যের কতকটা যেন নিহিত থাকিত। বেদপারগ-ব্রাহ্মণগণ, প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া, প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তর "গঙ্গাগঙ্গেতি যো ব্রূয়াৎ যোজনানাং শতৈরপি" বলিতে বলিতে যে গঙ্গাস্নান (বা যে দেশ ভাগীরথি-সুলভ নহে—সেখানে গ্রাম-সান্নিধ্য নদী বা দীর্ঘিকা-সলিলে) প্রাতরবগাহন মানসে গমন করিতেন, তদ্দারা পথ-ভ্রমণে তাঁহাদের ব্যায়ামের কার্য্য কতকটা সিদ্ধ হইত। তাহার পর, পূজোপচার-সংগ্রহের জন্য প্রভাতানিল-প্রবাহিত, পুষ্প-বাটিকার প্রস্ফুটিত-পুষ্পগুচ্ছ-চয়নে তাঁহাদের যে ভ্রমণ টুকু করিতে হইত, তাহারও ফলে কতকটা ব্যায়ামের কার্য্য সিদ্ধ হইয়া যাইত। তাহার পর, আহ্নিক-কালে প্রাণায়ামে'র কথা ত বলিয়াছি-ই। কেবল ব্রাহ্মণের কথা কেন, সকল জাতির মধ্যেই সেকালে সংসার যাত্রা পরিচালন-কার্য্য-ব্যপদেশে, সকলেরই হেলায়-শ্রদ্ধায় ব্যায়ামের কার্য্য কতকটা সম্পন্ন হইত। এখনকার মত সেকালে সার্ট-কোর্ট গায়ে দিয়া, লম্বা কোচা ঝুলাইয়া, কেশ-গুচ্ছের পারিপাট্য সাধন করিয়া, অপরিণত বয়সে এবং নিষ্প্রয়োজনে উপচক্ষু দ্বারা চক্ষুর সম্পদ বর্দ্ধন করিয়া, 'বাবুগিরি'র জন্য কেহ ব্যস্ত হইত না। দরিদ্র-মহৎ, ইতর-ভদ্র, শুদ্র-ব্রাহ্মণ সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই 'স্বাবলম্বন' বলিয়া সেকালে একটা জিনিষ সকলেই মানিয়া চলিত। তাহারই ফলে, স্নান-কার্য্য সমাপনান্তর বস্ত্র প্রক্ষালনের জন্য এ কালের মত সেকালের লোকে দাস-দাসীর অপেক্ষা করিতেন না, উদরপূর্ত্তির উপায়-বিধানের জন্য বিপণি-স্থানে যাইতে লজ্জা বোধ করিতেননা, বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনের সুখদর্শন-মানসে এখনকার মত সামান্য মাত্র পথটুকু চলিবার জন্যও তাঁহাদের ট্রাম অশ্বযান বা মোটর প্রভৃতির প্রয়োজন হইত না।

ইহা ভিন্ন, সেকালে যে জাতীয়-বৃত্তির ব্যবস্থা দেশমধ্যে অক্ষুন্ন ছিল, তাহার ভিতর দিয়াও সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যায়ামের ব্যবস্থা কেমন অলক্ষিতভাবে নিষ্পন্ন হইত। দ্বিজাতিগণের কথা তো বলিয়াছি-ই; দ্বিজাতিদিগের মধ্যে 'বৈদ্য' চিকিৎসা-ব্যবসায় ভিন্ন অন্যবিধ কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন না। রোগী দেখিবার জন্য সেই চিকিৎসা ব্যবসায়ী

বৈদ্যগণ স্বগ্রামে পরগ্রামে রোগি-সন্দর্শনে গমন করিতেন। ঔষধ প্রস্তুতের ব্যবস্থাও একালের মত সেকালে লোকজন দিয়া করাইবার বন্দোবস্ত ছিল না, সে কালের বৈদ্যগণ নিজেরাই সে সকল সম্পন্ন করিতেন। কাজেই তাঁহাদিগের জীবিকা-নির্ব্বাহের বৃত্তির মধ্যেই ব্যায়াম-কার্য্য সিদ্ধ হইত।

কেবল ব্রাহ্মণ-বৈদ্য কেন, সকল জাতির মধ্যেই সেকালে এইরূপে হেলায়-শ্রদ্ধায় কতকটা ব্যায়াম কার্য্য হইয়া যাইত। কর্ম্মকার, কুম্ভকার, মোদক, নরসুন্দর, গোপ, মালি, তিলি, তাম্বুলী এবং অন্যান্য জাতির সকলেই যে সকল নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি লইয়া, সেকালে জীবিকা-নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিতেন, তাহারই ফলে, তাহারই মধ্য দিয়া, তাঁহাদের ব্যায়াম-ক্রিয়া সম্পন্ন হইত। আমাদের আর্য্য-ঋষিমণ্ডলী গবেষণার ফলে সকল বিষয় চিন্তাপূর্ব্বক এই জন্যই আমাদের ধর্ম্মপালন এবং করণীয় সম্পন্নের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক জাতির আশ্রমধর্ম্ম যে সকল কারণে তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, একটু স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখিলে, স্পষ্টই প্রতীতি হইবে, যে, আমাদের স্বাস্থ্য যাহাতে অব্যাহত থাকে, আমরা নীরোগ ও সুস্থদেহে যাহাতে দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারি,—আমাদের উদরান্নের সংস্থানের সহিত, শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিচালন ক্রিয়ার যাহাতে অন্তরায় উপস্থিত হইতে না পারে,—সকল কারণ অপেক্ষা আমাদের করণীয়-নির্দ্ধারণের ইহাই তাঁহাদের মুখ্যতম উদ্দেশ্য ছিল। অধুনা আমরা সে উদ্দেশ্য ভুলিয়াছি, উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া, সমাজ-রক্ষার একমাত্র নিয়ন্তা—ব্রাহ্মণজাতিকে একদেশদর্শী বলিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, কলেজের সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রিলাভের জন্য জীবিতকালের প্রায় অর্দ্ধাংশ অতিবাহিত পূর্ব্বক চিরকাঙ্ক্ষিত-চাকরিগত-প্রাণ সকল জাতির মধ্যেই একাকারের সৃষ্টি আনিয়া ফেলিয়াছি,—সুতরাং কে কাহার কথা শুনিবে? ব্রাহ্মণ-শূদ্র,—সকলই এক পন্থার পথিক হইয়াছে, কেহ কাহাকে বুঝাইবার নাই। এখন আমরা এমনই কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছি যে, সহস্র-উপদেশ-বর্ষণেও বুঝি আমাদের আর উদ্ধারের উপায় নাই, এই পতিত জাতির নিকট কেহ সুপথ দেখাইয়া দিলেও বুঝি সে আর তাহা অবলম্বন করিতে সমর্থ নহে।

দেশের পুরুষগুলির ত দুর্গতি এইরূপই দাঁড়াইয়াছে। সাক্ষাৎ দেবী-প্রতিম-রমণীজাতির দুর্গতিও ইহাপেক্ষা কম হয় নাই। পুরুষের মত তাঁহাদিগেরও ব্যায়াম বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচালন-ক্রিয়ার যথেষ্ট প্রয়োজন। সে কালে তাঁহাদিগের জন্য গৃহস্থলীর কর্ম্ম সকল যাহা বিধিবদ্ধ ছিল, তাহাতেই তাঁহাদের সেই ব্যায়ামের কার্য্য সম্পন্ন হইত। ইদানীন্তন কালে একটু অবস্থাপন্ন-সংসার মাত্রেই দাস-দাসী এবং পাচক নিয়োগের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। দাস-দাসীতে সম্মার্জ্জনীর পরিচালন ক্রিয়া হইতে তাম্বূল রচনা, শয্যা-সংস্কার,—সকল কার্য্য সম্পন্ন করিবে। পাচক, পাক কার্য্যে নিযুক্ত রহিবে—ইহাই অনেক সংসারে আধুনিক ব্যবস্থা! সুন্দরী-সমাজে অনেকে এখন সৌন্দর্য্য নষ্টের আশঙ্কা করিয়া, অপত্যদিগকেও স্তন্য দান করিতে চাহেন না! লজ্জাজড়িত-বিনম্র-বধূ পাছে শয্যাত্যাগের পর লোক-সন্দর্শনে সঙ্কুচিত হইতে হয়,—এই ভয়ে অতি

প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া গৃহস্থলীর বিবিধ কার্য্যে যে অভিহিত হইতেন, সে প্রথাও এখন তিরোহিত হইয়াছে। সকল বিষয়ের মত তরুণী-বধূ বা যুবতী-কন্যাও সেকালের ন্যায় স্বামি সুখ-মিলনে এখন আর সরমজড়িত নহেন! ইহার জন্য অবশ্য আমি সুন্দরী দিগকে দোষী করিতেছিনা, দোষী ইহার জন্য দেশের 'সুন্দর'গণ। 'সুন্দর'গণ, সুন্দরীদিগকে স্বকীয় স্রোতে ভাসমানা করিয়া, তাঁহাদিগের এবম্বিধ অবস্থা উপস্থিত করিয়াছেন। সে ছড়া-ঝাঁট দেওয়া,—সে আলিপনা দেওয়া,—সে দেবগৃহ পরিষ্কার কার্য্য,—সে রন্ধন, সে পরিবেশন, সে শ্বশ্রূ-শ্বশুর, স্বামী, দেবর, পুত্র, কন্যা, অনাহুত-রবাহুত, অতিথি-অভ্যাগত,—সকলকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া, সর্ব্বশেষে অবশিষ্ট মাত্র ভোজনে পরিতুষ্টা হওয়া,—তাহার পর, থালা-বাসন পরিষ্কার, ছিন্ন-বস্ত্র কন্থা-সেলাই, বৈকালে আবার কক্ষ-পরিষ্কার, শয্যা-পরিষ্কার, পুনরায় নৈশ-রন্ধন—প্রভৃতি কোন কার্য্যেই অধুনা আর বঙ্গরমণী অভ্যস্তা নহেন। এখন তাঁহাদের বেলা ৯টার সময় শয্যা-ত্যাগ করিতে হইবে, শয্যা হইতে উঠিয়াই পুরুষদিগের মত চা পান করিতে হইবে, তাহার পর শুধু উদরপূর্ত্তির ব্যবস্থা, আর নভেল-পাঠের ব্যবস্থা! একালের এই আলস্যপরতন্ত্রতার ফলেই সুন্দরীগণ যে হিষ্টিরিয়া এবং ডিস্‌পেপ্‌সিয়া জর্জ্জরিতা, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। প্রসব কালেও এই জন্যই অনেকে প্রসব-বাধা সহ্য করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। দেশে বলিষ্ঠ এবং স্বাস্থ্যবান্ শিশুরও এইজন্য অভাব হইতেছে। এককথায়, কি পুরুষ, কি রমণী,—সকলেই সাবেক-পদ্ধতি ভুলিয়া, অনুকরণে অবস্থার দুর্গতি করিয়া তুলিয়াছেন। ফল কথা, একালে সুখ-সুবিধান্বেষী পুরুষ এবং রমণীমণ্ডলী আলস্য-পরতন্ত্র হইয়া, অঙ্গ চালনায় যে অনভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা যে আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতির পক্ষে সম্যক্ প্রকারে বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে, তাহাতে আর দ্বিধা করিবার কিছুই নাই।

এই স্থলে আমাদের প্রাতস্মরণীয় স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়সংস্পৃষ্ট একটী কাহিনীর উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কিম্বদন্তী,—একদা বিদ্যাসাগর মহাশয় কোন একটী ষ্টেসন-সান্নিধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। হ্যাট-কোট পরিধৃত, সাহেবি পোষাকে মণ্ডিত একটী বাবু একটী ব্যাগ হস্তে সেই সময় ব্যাগটি লইয়া যাইবার জন্য একটী বাহক অন্বেষণ করিতেছিলেন। অদূরে অনাচ্ছাদিত-দেহ-শিখাধারী বিদ্যাসাগর মহাশয়কে মুটিয়া বা বাহক-জ্ঞানে তাঁহাকে ব্যাগগ্রহণে আদেশ প্রদান করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বিনাবাক্যব্যয়ে ব্যাগটি গ্রহণান্তর স্কন্ধ দেশে সংস্থাপন পূর্ব্বক গন্তব্যস্থানে পঁহুছাইয়া দিলেন। ব্যাগের অধিকারী তদীয় শ্রমের বিনিময়ে অর্থদানে উদ্যোগী হইয়াছেন,—এমন সময় ব্যাগের অধিকারীর পরিচিত একজন ভদ্রলোক তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"সর্ব্বনাশ, আপনি করিয়াছেন কি? ইনি যে দেশ-প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর!" ব্যাগের অধিকারী এইকথা শুনিয়া মরমে মরিয়া গিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট ক্ষমার ভিখারী হইলেন। দয়াপ্রবণ মহাত্মা বিদ্যাসাগর ইতিপূর্ব্বেই ত তাঁহাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন।—নতুবা তাঁহার ব্যাগবহন করিবেন কেন?

তিনি বলিলেন, "আমি তোমার ব্যাগ লইয়া আসিয়াছি বলিয়া, ক্ষমা প্রার্থনার কোন কারণ নাই, কিন্তু তুমি যে এই সামান্য মাত্র ব্যাগটি আনিবার জন্য অযথা অর্থের অপব্যয় এবং আলস্য-পরতন্ত্রতার পরিচয় দিয়াছ, ইহার জন্য ভগবদুদ্দেশে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। বাপু, তোমাদের এবম্বিধ অকর্ম্মণ্যতার ফলেই দেশের দুর্গতি আরম্ভ হইয়াছে।"

বাস্তবিক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সেই উক্তি আজি ভবিষ্যদ্বাণীর মত সমগ্র বাঙ্গালা দেশ প্রতিধ্বনিত করিতেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় অনুপ্রাণিত-বাঙ্গালী এখন আর কোন কর্ম্মেই নিজের পায়ে ভর দিয়া চলিতে সক্ষম নহে। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম-জড়িত কি সনাতন ধর্ম্ম—কি করণীয় বিষয়—সে কালের তাবৎ কর্ম্মেই বাঙ্গালী এখন বিপথ-গামী হইয়া, দুর্গতির এরূপ সর্ব্ব নিম্নস্তরে পতিত হইয়াছে, যে, তাহার পুনরুদ্ধার সুদূর পরাহত বলিয়া মনে হয়। সেই ত সব আছে,—বাঙ্গালা দেশে সেই মার্ত্তণ্ড-ময়ুখমালা বাঙ্গালার সকল স্থান টুকু অধিকার পূর্ব্বক বাঙ্গালী জাতিকে কর্ম্ম-কুশল করিতে চেষ্টা করিতেছে,—সেই হিমকুন্দ-মৃণালাভ-শান্তকরুণ-স্নিগ্ধোজ্জ্বল হৃদয়োন্মাদী হিমাংশু-কিরণ-সম্ভারে বাঙ্গালা দেশ আজিও ত স্বর্গীয় সুধা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছে,—সেই মধুর মলয়-অভিষিক্ত প্রাণোন্মত্ত বিমল আনন্দ-বহ সুস্নিগ্ধ-অনিল-ব্যজনে বঙ্গবাসীর হৃদয় তন্ত্রী ত আজিও মাতিয়া উঠিতেছে,—আমাদের পরিতুষ্টির জন্য—আমাদের আনন্দ-বিধানের জন্য—কর্ম্ম-বিজড়িত বাঙ্গালীর দেহ সুগন্ধ প্রদানে ক্ষণকালের জন্যও বিভোর রাখিবার জন্য, অলিকুলসঙ্কুল-কুসুম বাটিকায় আজিও ত অসংখ্য পুষ্পস্তবক প্রস্ফুটিত হইতেছে,—সেই বসন্ত বহিতেছে,—সেই গ্রীষ্ম ছুটিতেছে,—সেই বরষার প্লাবনে পৃথিবী প্লাবিত হইতেছে, সেই সুখদ-শরতে জগজ্জননী-শারদ-প্রতিমার অর্চ্চনা হইতেছে,—হিম প্রবণ হেমন্ত ঋতুতে সেই ত বিশ্বসংসার হিমাঙ্গ বিকম্পিত হইয়া পড়িতেছে। সবই হইতেছে, সবই চলিতেছে—সেকালে যেমনটি, ছিল, প্রকৃতিরাণী সেকালে যেরূপ সজ্জা-সম্ভারে সৌন্দর্য্য প্রদর্শনে দিগ্বধূগণের আনন্দ উৎপাদন করিতেন,—এখন ত তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই? তবে আমাদের অবস্থা এরূপ হইল কেন? আমরা সেকালের স্বাস্থ্য বিজড়িত ধর্ম্ম-কর্ম্ম ভুলিয়া আজি এরূপ অধঃপতিত হইয়া পড়িলাম কেন! ইহার বিষয় চিন্তা করিলে, বুক ফাটিয়া উঠে। হে সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবন্, তুমি এই কর্ম্মফলে-পতিত-অধঃপতিত সমাজকে উদ্ধার কর। তুমি ভিন্ন আর আমাদের গতি নাই। হে অনাথের নাথ, হে বিপদ ভঞ্জন, দরিদ্রের সম্বল, মধুসূদন, এ অবস্থার শোচনীয় সময়ে তুমিই আমাদের একমাত্র ভরসাস্থল।

আমার আর একটি কথা বলিবার আছে। এই কথাটি বলিলেই অদ্য আমার বক্তব্যের পরিসমাপ্তি হইবে। ব্যায়াম, স্বাস্থ্যরক্ষার মূল,—ব্যায়াম বিহীন ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিচালনার অভাব হইলে, তাহার জীবনীশক্তি-বর্দ্ধনের উপায় থাকিবে না,—ইহা যেমন সেকালের সমাজ-তত্বজ্ঞ-ঋষিমণ্ডলী চিন্তা করিতেন, একালেও দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় সে চিন্তায় বিরত নহেন। এই জন্যই অধুনা সমস্ত স্কুল-কলেজে 'ড্রিলে'র ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। প্রত্যেক বিদ্যালয়েই ড্রিল শিক্ষা দিবার জন্য একজন করিয়া ড্রিল-শিক্ষক

নিযুক্ত আছেন। কিন্তু সে শিক্ষার মূলে এমন একটা গলদ রহিয়াছে, যে, সে শিক্ষায় আমাদের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই অধিক হইতেছে। কারণ, আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান-দেশবাসীর ব্যায়ামের ব্যবস্থা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উপযোগী করিয়াই সেকালে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। পাশ্চাত্য জাতির নির্দ্দিষ্ট ব্যায়ামকালে আমাদের ব্যায়ামকাল নির্দ্দেশ করিলে, আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতির সম্ভাবনা নাই। স্কুল-কলেজে এই ব্যায়ামের সময় কিন্তু বেলা দ্বিপ্রহরের পর তৃতীয় প্রহরেই নির্দ্দিষ্ট। এ সময় ব্যায়াম করিলে আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতি ত হইতেই পারে না, স্বাস্থ্যের পক্ষে এ সময় যথেষ্ট অপকারী বলিয়াই শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

ভুক্তবান্ কৃতসম্ভোগঃ কাসী-শ্বাসী কৃশঃক্ষয়ী।
রক্তপিত্তী-ক্ষতী-শোষী ন তং কুর্য্যাৎ কদাচন॥

অর্থাৎ—আহারের পর, মৈথুনের পর, কৃশ ব্যক্তির পক্ষে এবং কাস, শ্বাস, ক্ষয়, রক্তপিত্ত, ক্ষত ও ধাতুশোষ—এই সকল রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে ব্যায়াম সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ।

এই অবাস্থ্য স্কুল-কলেজের অধ্যয়নশীল ছাত্রদিগের জন্য যে ব্যায়ামকাল নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, তাহা শাস্ত্র বিগর্হিত। আমাদের বাঙ্গালী শিশুর পক্ষে ঐ সময় ব্যায়াম-নির্দ্দিষ্টকাল হইতে পারে না। শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ এ সম্বন্ধে চিন্তা করেন—এজন্য আমরা তাঁহাদিগের করুণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ফল কথা,—দেশ বাসীর মতিগতি যদি আবার পরিবর্ত্তিত হয়, সর্ব্ববিষয়ে অনুকরণের প্রথা যদি আবার আমরা ছাড়িয়া দিয়া, সাবেক পন্থায় চলিতে চেষ্টা করি, আমাদের ধর্ম্ম—আমাদের করণীয় বিষয়,—গর্ব্বভরে—মর্ম্মে মর্ম্মে—আবার যদি আমরা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করি,—দেশ রক্ষার জন্য, সমাজ বন্ধনী অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, আমাদের আয়ুষ্কালের সমস্তটুকু অপ্রতিহতভাবে অব্যাহত রাখিবার জন্য,—আমাদের কুশল-কল্যাণেচ্ছু-ত্রিকালদর্শী আর্য্যঋষি প্রবর্ত্তিত—সরণী-অন্বেষণে আবার যদি আমরা প্রয়াস-পরায়ণ হইতে পারি, তাহা হইলে পৃথক্ ব্যায়ামকাল নির্দ্দেশ করিয়া, শরীর-রক্ষার জন্য আমাদের কোন প্রয়োজনই হইবে না,—স্বাস্থ্য-বিজড়িত ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিলেই আমাদের কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারিবে। দেশের পুরুষমণ্ডলী দাসদাসীর এতাদৃশ মুখাপেক্ষী না হইয়া কর্ম্মণ্য হউন,—সুকুমারমতি শিশুজীবনের প্রবৃত্তির অঙ্কুর-কালেই তাহাদিগকে কর্ম্মণ্য করিবার চেষ্টা করুন,—যৌবনে সেই কর্ম্মস্রোত অপ্রতিহতগতি লইয়া যাহাতে সমস্ত জীবনব্যাপী হইতে পারে,—তাহার জন্য চেষ্টাপর হউন,—স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে আর কোন অন্তরায়ই থাকিবে না। দেশের রমণীগুলিকেও আবার কর্ম্মকুশলা করিতে হইবে। তাঁহাদিগকে আলস্য-অবসন্নতা হইতে উদ্ধার করিয়া, তাঁহাদিগের হস্ত হইতে নাটক-নভেল কাড়িয়া লইয়া, বিলাস-ব্যসনে তদ্গত প্রাণা—তাঁহাদিগের চিত্ত বৃত্তির গতির বৈপরীত্য সাধন করিয়া, তাঁহাদিগের কুসুম-কোমল-প্রাণে অরুন্ধতী-কুন্তী-দ্রৌপদী বা বঙ্কিম চরিত্রের অপূর্ব্ব চিত্র—শ্রী-সূর্য্যমুখী-ভ্রমর, অথবা রাজপুতমহিলা সংযুক্তা-কর্ম্মদেবীর কর্ম্মণ্য বিষয়ের জ্ঞাতব্য কথাগুলি অঙ্কিত করিয়া দিতে হইবে। স্বভাব সুলভ বিলাস-বাঞ্ছা,—প্রকৃতিরাণীর সর্ব্বসৌন্দর্য্যের অধিকারিণী,—ইহসংসারে প্রজাসৃষ্টির এক মাত্র সাহায্যকারিণী—দেশের মহিলাদিগকে বলিতে হইবে,—"মা লক্ষ্মীগণ, আমাদের এই

অধঃপতিত জাতির পুনরুদ্ধারের জন্য তোমরা আমাদের সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য-পরায়ণা হও। —তোমরা ত চিরদিনই স্বার্থত্যাগ করিতে জান, আমাদের ছাড়িয়া, তোমাদের স্বাতন্ত্র্য ত কোনকালেই নাই।—আমরাই তোমাদিগকে একদা কর্ম্মকুশলা ভাবে গঠন করিয়া, সমাজ রক্ষার সুব্যবস্থা করিয়াছিলাম, আবার আমরাই এখন তোমাদিগের রুচি-বিপর্য্যয় ঘটাইয়া, তোমাদিগকে নির্জ্জীব-অচেতন পদার্থের মত সজ্জিত করিয়া—সমাজ শৃঙ্খলা নষ্ট করিতে বসিয়াছি। যাহা হউক, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, আর আমরা বিপথগামী হইব না—লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া, কর্ত্তব্যচ্যুত হইয়া, আমাদের স্বাস্থ্যের দুর্গতি যতদূর হইতে পারে, তাহা ত হইয়াছেই, কাণের ভিতর দিয়া মরমে মরমে কে যেন এখন আমাদিগকে আবার সেই কথা বলিয়া দিতেছে—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্ম বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎস্বনুষ্ঠিতাৎ
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ো পরোধর্ম্মে ভয়াবহঃ।

সে ধ্বনি শুনিয়া; আরোগ্যলাভের জন্য, স্বাস্থ্যসুখ অব্যাহত রাখিবার জন্য, দীর্ঘজীবন লাভ করিবার জন্য, ঐকান্তিকমনে আবার আমরা স্ব স্ব ধর্ম্ম মানিয়া চলিব ইচ্ছা করিয়াছি।—স্ব স্ব ধর্ম্ম মানিয়া ঋষিপ্রবর্ত্তিত কর্ম্ম পরায়ণ হইব স্থির করিয়াছি,—জপতপ-পূজা আহ্নিক—সর্ব্বাপেক্ষা প্রাণায়ামের ব্যবস্থা নিয়মপূর্ব্বক পালন করিব, অভীপ্সা করিয়াছি, —তোমরা ত আমাদের সকল কর্ম্মের চির সাহায্য-কারিণী। তোমাদের দয়া—তোমাদের স্নেহ, তোমাদের অনুরাগস্পৃহা স্মরণ করিয়াই ত কবি তোমাদের কত গুণ-গান গাহিয়াছেন। সেইজন্য তোমাদের নিকট প্রার্থনা করিতেছি,—তোমরা আমাদের যেমন ছিলে, তেমনি হও—আমাদের জীবনাধিষ্ঠাত্রী-তোমরা, এস তোমাদের লইয়া আমরা সাবেক পদ্ধতি অবলম্বনে শ্রেয়ো-লাভের চেষ্টা করি।

কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত।

শিশুর ক্রিমি চিকিৎসা।

—:*:—

(মহিলাগণের বিশেষ পাঠ্য।)

(ঠাকুর মা ও লীলা)।

লী। ছেলেগুলো ক্রিমিতে বড় কষ্ট পাচ্ছে ঠাক্‌মা, তাই এলাম।

ঠা। কা'র্ কা'র্ ক্রিমি হয়েছে?

লী। বড় খুকি, ছোট খোকা আর বড় খোকা—তিন জনেরই হয়েছে, ঠাক্‌মা।

ঠা। কি ক'রে বুঝ্‌লি যে ক্রিমি হয়েছে?

লী। মলের সঙ্গে প'ড়েছিল যে। বড় খোকা ও ছোট খোকার পেট থেকে দু'দিন দু'টো কেঁচোর মত বেরিয়েছে। আর বড় খুকির মলের সঙ্গে সুতোর মত শাদা-শাদা ছোট ছোট ক্রিমি প্রায় রোজই পড়ে।

ঠা। বাঃ, একেবারে মাধব-নিদান দেখছি!

লী। মাধব নিদান কি ঠাক্‌মা?

ঠা। তা'র মানে, যত রকম ক্রিমি নিদানে লেখা আছে,—সব রকমই হ'য়েছে।

লী। কেন, এই দুইরকম ছাড়া আর ক্রিমি নেই ?

ঠা। আছে বৈ কি। আমি কথার কথা বলছি। তবে আমাদের দেশে সাধারণতঃ পেটের ক্রিমি এই দুই রকমই দেখা যায়।

লী। পেটে ছাড়া অন্য কোন জায়গায় ক্রিমি হয় নাকি, ঠাকমা ?

ঠা। হয় বৈকি। ছোট ছোট পোকা শরীরে আশ্রয় করে, দেখিস্‌নি! তারাও ক্রিমি জা'ন্‌বি। নিকি-উকুন—এরাও একরকম ক্রিমি। ক্রিমি, রক্তের মধ্যে ঢুকে কুষ্ঠরোগ পর্য্যন্ত জন্মাবার কারণ হয়। মাথায় যে টাক হয়, তারও মূল ক্রিমি জেন। তা সে সব কথা যাক্, এখন আজ এই দুই রকম ক্রিমির কথাই বল্‌বো। কিন্তু আমি ভাব্‌ছি যে, তুই এত সাবধানী মেয়ে, তোর ছেলেদের ক্রিমি হ'ল কি ক'রে।

লী। ভাল কথা ঠাকমা, ক্রিমি কেন হয় বলত ?

ঠা। ওই যে কেঁচোর মত ক্রিমি, ওগুলো যা'র পেটে হয়, তা'র পেট থেকে অসংখ্য ক্রিমির ডিম মলের সঙ্গে বেরোয়। সেই মল কোন রকমে জলে মিশে গেলে, সেই জলে অনেক ক্রিমির ডিম থাকে। আর সেই জল যে খায়, তা'র পেটে সেই ডিম যায়। জল না খেয়ে, সেই জলে শাক-সব্জী, কি ফল যা' কাঁচা খাওয়া যায়,—সেই সব ধুয়ে খেলেও তার সঙ্গে ক্রিমির ডিম পেটে যায়। আর পেটে গিয়ে সেই সব ডিম ফুটে ক্রিমি হয়। তারাও আবার অনেক ডিম্ পাড়ে।

লী। আর সুতো-ক্রিমি কি রকম ক'রে অন্যের শরীরে যায়, ঠাক্‌মা ?

ঠা। সুতো-ক্রিমিও প্রায় এই রকম ক'রেই যায়। তবে সুতো-ক্রিমির ডিম জলে ডুবে থাকলে বেশীক্ষণ বাঁচে না। ফল-ফুলুরি আর শাক-সব্জীর সঙ্গেই এই ক্রিমির ডিম পেটে যায়। এই ক্রিমি-রোগীর মলমিশান ধোয়াটে জল শাক-সব্জীতে লাগ্‌লে, তা'তে ও ক্রিমির ডিম লেগে যেতে পারে। তা' ছাড়া এই রোগে মল-দ্বারের চুল্‌কানি হয়। রোগী মলদ্বার চুলকালে তার নখের ভিতর কি আঙ্গুলে ডিম লেগে যায়। আর সে সেই হাতে যদি কোন খাবার জিনিষ দেয়, তা' হ'লে তা'র সঙ্গে ক্রিমির ডিম মিশে যেতে পারে।

লী। আচ্ছা ঠাক্‌মা, এই ক্রিমিগুলো থাকে কোথায় ?

ঠা। কেঁচোর মত ক্রিমিগুলো প্রায় নাড়ীতেই (অন্ত্র বা Intestine) থাকে। তবে অনেক যায়গায় এমন কি গলা পর্য্যন্ত যেতে পারে। আর সুতোর মত ক্রিমি গুলোর আড্ডা মলভাণ্ড, (Rectum)। তবে মুখ দিয়ে এসে তাদের ডিম ফোটে ব'লে নাড়ীর মধ্যেও তা'দের দেখা যায়। ক্রিমির বিকার জন্যে অনেক উৎকট রোগ হ'তে পারে লীলা।

লী। আচ্ছা ঠাক্‌মা, এক সঙ্গে কত গুলো ক্রিমি থাকে আর তাদের ডিমই বা কত হয় ঠাক্‌মা!

ঠা। কেঁচো-ক্রিমি গুলো একসঙ্গে প্রায় ২৫।৩০টে ক'রে থাকে। আর সুতো ক্রিমি ২০০।৫০০—এরও বেশী থাকে। ডিম হয় এদের মেলা—তা'সংখ্যা করা যায় না।

লী। দেখ ঠাক্‌মা, এইখানে তোমার ভুমি

ধরা পড়েছে। আমি নিদানের বাঙ্গালা প'ড়ে দেখেছি, তা'তে এসব কথা কিছু নেই। এ সব তোমার কবিরাজী নয়, চুরি করা ডাক্তারী বিদ্যে।

ঠা। লীলা, সত্যিই এসব ডাক্তারী কথা। কিন্তু কবিরাজীতে যে এ সব নেই, তা' নয়। আছে বড় গোপন ভাবে, সকলে বুঝতে পারে না। এই বিষয় নিয়ে লোকনাথ বদ্দির সঙ্গে কল্‌কাতার সেই বিজ্ঞ ডাক্তার বাবুটির যে সব কথা হয়েছিল, তা' শুনে, আমি অনেক শিখেছি, সে সব শাস্ত্রের কথা।

লী। ধন্যি তুমি ঠাকমা, মেয়ে মানুষ হ'য়ে, কি ক'রে এত শাস্ত্রের কথা শিখ্‌লে?

ঠা। তোকে কতবার মনে ক'রে দেব, যে, মেয়ে মানুষও মানুষ, তা'রা জন্তু জানোয়ার কি গাছ-পালা কিছু নয়। এ সব কথায় বেটা-ছেলের যতটা দরকার, মেয়ে-মানুষের ততটা বা তারও বেশী দরকার জান্‌বি। প্রাচীনকালে অনেক লেখাপড়া জানা (বিদুষী বা পণ্ডিত) মেয়েমানুষ ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর এখন অনেক মেয়েমানুষ ডাক্তারী ক'রছে, বই লিখ্‌ছে, রাণীগিরি ক'রে রাজ্য চালাচ্ছে,—এওত দেখ্‌তে পাই। মেয়েমানুষ কম কিসে?

লী। ঠিক ব'লেছ ঠাকমা, আমি অতটা ভাবিনি। আর এখন আমাদের দেশের মেয়েমানুষের যে অবস্থা হ'য়েচে, তা'তে, তা'দের আঁতুড় ঘর আর রান্নাঘরের বিষয় শেখা ছাড়া অন্য কিছু শেখ্‌বার দরকার আছে ব'লে যেন মনেই হয় না।

ঠা। লীলা কথাটা ঠিক বলেছিস্‌। সংসারে থাকতে হ'লে, পুরুষকে আর মেয়েমানুষকে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম ক'রতে হ'বে। সেই হিসাবেই মেয়েমানুষ আঁতুড়ঘর, রান্নাঘর আর গৃহস্থালী নিয়ে থাকে। কিন্তু মেয়েমানুষের যদি সকল দিকে হিসাব জ্ঞান না থাকে, তা'হলে সংসারের সুবন্দোবস্ত হ'তেই পারে না। পুরুষ মানুষ,—এনেই খালাস্‌। সেই আনা-জিনিষ ভাগ-বাটোয়ারা ক'রে দেওয়া আরও শক্ত, এই জন্যেই মেয়ে মানুষের সব বিষয়ে জ্ঞান থাকা দরকার।

লী। তা' ঠাকমা, আমরা কিন্তু এত শক্ত কাজ করি, তবু আমাদের দেশের পুরুষেরা আমাদের পায়ের তলায় ফেলে রেখেছে। কিন্তু সাহেবেরা মেয়েদের কত মান্য করে।

ঠা। আঃ পাগ্‌লী, সেটা সম্পূর্ণ ভুল। আমরা যখন পুরুষের মা, তখন তা'রা বলে, জননী আর জন্মভূমি স্বর্গের চেয়ে বড়। আমরা যখন তাদের স্ত্রী, তা'রা আমাদের ছেড়ে কোন কাজ ক'রতে পারে না। তাই রামচন্দ্র যজ্ঞ করবার সময় সোণার সীতা তৈরি ক'রে যজ্ঞ ক'রেছিলেন। পুরুষ মানুষ বলে, যে,—স্ত্রী আর লক্ষ্মীতে কোন প্রভেদ নাই, এটা কি শোননি? আবার দেখ, আমরা যখন মেয়ে বা কন্যা হই, তখন আমরা পিতার স্নেহ মমতা যা' পাই, তা আর কোন দেশে আছে ব'লে আমার মনে হয় না।

লীলা। আজ আমার একটা মস্ত ভুল ভেঙ্গে দিলে ঠাকমা। আমি ভাবতাম, সাহেবদের দেশে মেয়েমানুষের বেশী মান, কিন্তু এখন বুঝ্‌ছি, সেটা মস্ত ভুল। ওদের ভালবাসা বা সম্মান করা অন্তঃসার শূন্য, তবে বাইরে বড় চক্‌চকে। আর আমাদের বাইরে চাকচিক্য না থাকলেও ভিতরে বড় সার আছে।

ঠা। বুঝেছিস্—সেও ভাল। নইলে হয়ত নাতজামাইকে কোন দিন এস্তোপা (Divorce) করতিস্। তা' সে কথা যাক্, এখন যে জন্যে এয়েচিস্, সে কথা বল্।

লীলা তোমার পায়ে পড়ি ঠাকুমা, লোকনাথ বদ্দি আর সেই ডাক্তার বাবুর সঙ্গে কি কথা হ'য়েছিল—বল।

ঠা। সে অনেক কথা, তবে মোটামুটি ব'লি শোন্। ডাক্তারে আর কবিরাজে ক্রিমি নিয়ে কথা হয়। তার পর ডাক্তার বাবু, আমি আগে যে সব কথা বলিছি, সেই সব কথা ব'লে, বললেন, "দেখুন কবিরাজ মশায়, এ সব কথা যখন আপনাদের শাস্ত্রে নেই, তখন এগুলো আপনাদের শাস্ত্রমধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া উচিত।"

লী। কবিরাজ মশায় কি বললেন?

ঠা। কবিরাজ মশায় বললেন,—তার জন্যে আপনাকে ব্যস্ত হ'তে হ'বে না,—রাজার জাতের অনেক জিনিষ বিজিত জাতির মধ্যে প্রবেশ করে—তা' কি ভাষায়, কি পরিচ্ছদে, কি খাদ্যে আর কি ঔষধে। মুসলমান রাজার আমলে আমরা জমি-জমার বন্দোবস্ত কর্‌তাম, গায়ে মেরজাই পর্‌তাম, মাংসের কাবাব খেতাম, মোরব্বা ব'লে ওষুদও তৈয়ের কর্‌তে শিখেছিলাম। ইংরেজের আমলে আমরা গেলাসে জল খাই, গায়ে কোট পরি, বিস্কুট-পাঁউরুটী, চপ-কটলেট খেতে শিখেছি, আর কুইনাইন সালসার ত ছড়াছড়ি! সুতরাং ডাক্তারীর অনেক জিনিষ কবিরাজীর মধ্যে প্রবেশ ক'রেছে এবং করবে। তবে ক্রিমির বিষয় যা' আপনি বললেন, যেটা আমাদের শাস্ত্রে একেবারে নেই, তা' মনে করবেন্ না।

লী। ডাক্তার বাবু কি বল্‌লেন?

ঠা। ডাক্তার বাবু একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্লেন,—"বলেন কি! এসব আপনাদের শাস্ত্রে আছে?" তখন কবিরাজ ম'শায় খুলে বল্লেন, দেখুন, আপনি বিজ্ঞ ব্যক্তি। আপনি জানেন, যে, ফর্ম্মা পূরণ ক'রবার জন্যে আপনাদের অনেক পুস্তক লেখা, আয়ুর্ব্বেদে কিন্তু সে বিষয় দু একটী কথায় বুঝিয়ে দেওয়া হ'য়েছে। এই দেখুন, ক্রিমির উৎপত্তির কারণ "মলিনাশন" একটী। মলিনাশন কিনা—ময়লামিশ্রিত জল আর খাদ্য। আরও দেখুন, আমাশয় আর পক্কাশয়ের মধ্যে ক্রিমির "প্রসব" হয় লেখা আছে। প্রসব মানে উৎপত্তি হ'তে পারে, কিন্তু কেবল উৎপত্তি বোঝাবার জন্যে প্রসব শব্দ আয়ুর্ব্বেদের কোথায়ও প্রয়োগ করা হয়নি। সুতরাং এ শব্দপ্রয়োগে শাস্ত্রকারের বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। সে উদ্দেশ্য হ'চ্ছে—ক্রিমির প্রসব করে এটা বোঝান। আর ক্রিমির বাচ্ছা হয় না,—ডিমই হয়—এটা জীব-জগতের দিকে লক্ষ্য ক'র্‌লে, আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারি। তা' হ'লে ক্রিমির ডিমও পাওয়া গেল, আর সেই ডিম সংযুক্ত জল বা খাদ্যই মলিনাশন।

লী। ডাক্তার বাবু কি বল্‌লেন?

ঠা। তিনি বল্‌লেন, তা' অসঙ্গত নয়, তবে বড় অস্পষ্ট,—কষ্ট ক'রে বুঝতে হয়। আর ক্রিমির অন্যান্য কারণ ত লেখা রয়েছে। তখন কবিরাজ মশায় বল্লেন, কারণ এক রকম নয়, অনেক রকম। ঘট তৈয়ের কর্‌বার কারণ—মাটী আর কুমারের চাক, কিন্তু কুমার সবই। ঐ সব খাদ্য খেলে ক্রিমিরা খুব বাড়্‌তে পায় সে জন্যে ওগুলোও কারণের মধ্যে।

লী। ডাক্তার বাবু তা'র কি উত্তর করলেন?

ঠা। ডাক্তার বাবু বল্লেন, তা' যেন হল, কিন্তু ক্রিমি রোগ যা'তে না জন্মাতে পারে, তা'র জন্যেও ত সবকথা গুলো খুলে বলা উচিত ছিল। কবিরাজ ম'শায় বল্লেন,—অনাবশ্যক কথা বলা শাস্ত্রকারদের স্বভাব নয়। একেত জল আর খাদ্য সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ যেরূপ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপদেশ দিয়েছেন, তা'তেই কার্য্যসিদ্ধ হ'য়েছে,—তা'র উপর ধর্ম্মশাস্ত্র ব'লেছেন,—জল নারায়ণ, জলে কোন রকম মল মিশ্রিত করা নিষিদ্ধ। আর খাদ্য ও জল সম্বন্ধে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কথাও ধর্ম্মশাস্ত্রে অনেক র'য়েছে। তবুও আবার আয়ুর্ব্বেদ সাবধান করে দিয়েছেন যে, ক্রিমি ও অণ্ড দূষিত জল খাবে না।

লী। ডাক্তার বাবু তা' শুনে কি ব'ল্লেন?

ঠা। ডাক্তার বাবু বল্লেন,—হাঁ একরকম বুঝ্লাম, তবে স্পষ্ট নয়। তখন কবিরাজ ম'শায় একটু হেসে বল্লেন,—এখন আমাদের সমস্তই অস্পষ্ট ম'শায়। জানিনে ভগবান্ আবার কবে সুস্পষ্ট করবেন। যাই হ'ক এ সুযোগে একটা বিষয় আপনাকে দেখাই। এই দেখুন কতপ্রকার অদৃশ্য ক্রিমির কথা র'য়েছে। অদৃশ্য জিনিষ যখন তাঁরা দেখ্তে পেতেন, তখন হয় অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছিল, নয় তাঁদের অতীন্দ্রিয় বিষয়ের জ্ঞান ছিল। আর আজকাল যে জীবাণু নিয়ে আপনারা ক্ষেপে উঠেছেন, সেটাও তাঁদের জানা ছিল।

লী। আর কিছু কথা হ'ল?

ঠা। বলবার মত আর কোন কথা হয় নি। এখন তোর কথা বল্।

লী। বলিছি ত,—খোকা দু'টির কেঁচো ক্রিমি, আর বড় খুকির ছোট ক্রিমি হ'য়েছে।

ঠা। বড় ক্রিমির প্রধান লক্ষণ নাক খোঁটা আর ঘুমিয়ে দাঁত কিড়্মিড়্ করা। তা' কিছু করে?

লী। দাঁত কিড়্মিড় খুব করে, আর নাকও খোঁটে।

ঠা। আর কি উপসর্গ আছে?

লী। কেমন ফ্যাকাশে চেহারা হ'য়েছে। ভাল খেতে পারে না, মুখ দিয়ে কেবল থুথু ওঠে, আর কেমন নির্জ্জীব হ'য়ে প'ড়েছে।

ঠা। বাহ্যে কেমন হয়?

লী। বাহ্যে ভাল হয় না। একবার ক'রে শক্ত বাহ্যে হয়।

ঠা। এখন থেকে এ রোগ ভাল না হ'লে এর পর পেটের অসুখ দাঁড়া'বে।

লী। তা'তেই ব'ল্ছি, তোমার শীগ্‌গির ভাল ক'রে দিতে হবে।

ঠা। আচ্ছা তা' হবে, এখন ওষুদের কথা বলি শোন্। কমলাগুঁড়ি ব'লে এক রকম ইটের রঙ্গের ভারি গুঁড়ো বেনের দোকানে পাওয়া যায়। তাই কিনে এনে জলে ফেল্তে হবে। যে গুলো ভেসে থাকবে, তাই নিয়ে শুকিয়ে রাখ্বি।

লী। আচ্ছা জলে ফেলতে হয় কেন ঠাকুমা?

ঠা। ওর সঙ্গে অনেক ধুলো-বালি মিশান থাকে কিনা। জলে ফেল্লে ধুলো-বালি গুলো নীচে প'ড়ে যায়, আর ওষুধ গুলো ওপরে ভাসে।

লী। আচ্ছা আমি ঐরকম ক'রেই নেব।

ঠা। এই কমলাগুঁড়ি তিন রতি মাত্রায় টাট্‌কা ঘোলের সঙ্গে সকালে খালি পেটে খেতে

দিবি। আর শুধু কমলাগুঁড়ি না দিয়ে বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, সাচিক্ষার, হরীতকী আর কমলাগুঁড়ি সমান ভাবে নিয়ে গুঁড়ো ক'রে এক আনা কি দেড় আনা মাত্রায় হয় ঘোল, নয় ত গরম জলের সঙ্গে দিলে আরও ভাল হয়।

লী। সাচিক্ষার জিনিসটা কি আর পাবই বা কোথায়?

ঠা। সাচিক্ষার আর কিছুই নয়, সাজি-মাটি। বেণের দোকানে পাওয়া যায়।

লী। আচ্ছা আর কি ওষুদ দেব বল?

ঠা। সকালে ঐ ওষুদ দিস্, আর বিকালে পলাশ বীজ তিন রতি আর বিড়ঙ্গ তিন রতি হয় ঘোলের সঙ্গে, নয়ত জলের সঙ্গে বেটে দিস্। ক্রিমির পক্ষে বিড়ঙ্গ খুব ভাল জিনিস জান্‌বি। শুধু বিড়ঙ্গের গুঁড়া তিন রতি মাত্রায় দু'বেলা খাইয়েও ক্রিমি ভাল করা যায়।

লী। আর কি দেব?

ঠা। আর কিছু দিতে হবে না, যে সকল বল্‌লাম, ঐ সব দিলেই ভাল হ'য়ে যাবে। এর উপর একটু-একটু চুণের জল দিতে পার।

লী। আচ্ছা তবে খুকীকে কি ওষুদ দেব বল?

ঠা। সকালে খালিপেটে সোমরাজী-বীজের গুঁড়ো তিন রতি, গরম জলের সঙ্গে দিস্। আর বিকালে কেঁউ গাছের মূলের রস আধ তোলা মধুর সঙ্গে দিস্।

লী। যদি কেঁউ মূল না পাই?

ঠা। তা' হ'লে পাল্‌তেমাদারের ছালের রস কি ডালিমের শিকড়সিদ্ধ জল দিস্।

লী। এর চেয়ে সহজ কিছু নেই?

ঠা। আছে বৈ কি,—কচি আনারস পাতার রস, ঘেঁটুপাতার রস, শাঞ্চে শাকের রস—এ সমস্তই ক্রিমির ভাল ওষুদ। আর বিড়ঙ্গ যে খুব চমৎকার ওষুদ তা'ত আগেই ব'লেছি।

লী। তা'র পর পথ্যির কথা বল?

ঠা। পথ্যির কথাও ব'লছি। কিন্তু দেখ, এই যে, সুতোর মত ছোট ক্রিমি এগুলো বড় বিশ্রী। ওষুদে সহজে যেতে চায় না।

লী। ওষুদে না গেলে তবে কিসে যা'বে?

ঠা। পিচকারী ক'রে ওষুদ দিলে খুব শীগ্‌গির যায়।

লী। সে কি ঠাকুমা, কবিরাজীতে আবার পিচকারি ক'রে ওষুদ দেওয়া কি! সে ত ডাক্তারেরাই দেয়!

ঠা। তুই জানিস্‌নে, তাই বল্‌ছিস্। পিচকারী দেওয়াকে কবিরাজীতে 'বস্তি' বলে। বস্তিকে শাস্ত্রে অর্দ্ধেক চিকিৎসা ব'লেছে। ডাক্তারদের পিচকারী দেওয়া, কবিরাজী বস্তির কাছে কিছুই নয়। বস্তি যে কত রকম আছে, তা'র ঠিক নেই।

লী। কিন্তু এখন ত কোন কবিরাজকে বস্তি দিতে দেখিনি?

ঠা। তোকে কতবার বল্‌বো, যে, শাস্ত্রে যে সব চিকিৎসার কথা আছে, তার সিকির সিকিও এখন কবিরাজেরা ক'রতে জানে না। কবিরাজী মতে ক্রিমির চিকিৎসা ক'রতে হ'লে, প্রথমে রোগীকে, ঘি কি অন্য কোন স্নেহ পান করা'তে হয়। তা'র পর বমি করিয়ে, পরে জোলাপ দিতে হয়। তা'র পর বস্তি দিয়ে পরে ওষুদ দিতে হয়। এখন এসব আর কেউ করে না, কেবল খাবার ওষুদ দেয়। আর তাইতে রোগও সহজে ভাল হয় না।

লী। কি ওষুদের বস্তি দিতে হয়?

ঠা। বস্তির কথা আর সে সব ওষুদের কথা এখন ছেড়ে দাও, এখন দরকার হ'লে, ডাক্তারির সাহায্যে পিচকারি দিতে হ'বে। সাবান-ঘসা জল, কি ছোট পেঁয়াজের রস এই দু'টার একটা কিছু নিয়ে পিচকারী দিলেই হয়।

লী। সে পিচকারী দেওয়ার হাঙ্গামায় এখন কাজ নেই ঠাকুমা। ওষুদে ভাল হ'বে না?

ঠা। ভাল হ'বে না এমন কোন কথা নেই। বরং সুপথ্যি আর ওষুদ প'ড়্লে ভাল হবারই কথা। তবে তা'তে ভাল না হ'লে, পিচকারী দিতে হ'বে তাই বলে রাখ্লাম।

লী। আচ্ছা তুমি এখন পথ্যির কথা বল।

ঠা। প্রথমে এ রোগে কি কি খেতে নেই তাই বলি। ঘি, দুধ, দই, মাষকলায়, শাক মাংস, মিষ্টি, টক, পিটে, ঠাণ্ডা জিনিষ, বেশী পাতলা জিনিষ—এ সব খেতে নেই জেনে রেখ।

লী। তা' কচিছেলে দুধ না দিলে কি ক'রে চল্‌বে?

ঠা। না,—দুধ দিতে হবে বৈকি, তবে যা' খায় তা'র অর্দ্ধেক আন্দাজ দিবি। আর ১৫।২০টে বিড়ঙ্গ থেঁতো ক'রে, জল এক পোয়া আর দুধ এক পোয়ার সঙ্গে সিদ্ধ ক'র্‌বি। জল ম'রে গেলে, ছেঁকে নিয়ে সেই দুধ দিবি। যদি বিস্বাদ ব'লে খেতে না চায়, তবে একটু মিছরী মিশিয়ে দিয়ে দিস্।

লী। আর কোন রকম ক'রে দুধ দেওয়া চলে না?

ঠা। কুলত্থি কলায়ের কাথ ক'রে তা'র সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারিস্। যতটা দুধ তা'র সিকি আন্দাজ কাথ মিশিয়ে দিতে হয়।

লী। কাথ কি নিয়মে ক'রতে হয়?

ঠা। এই মনে কর্ আধ ছটাক আন্দাজ কুলত্থিকলায়ের দাল নিয়ে, একসের জলে সিদ্ধ করে একপোয়া থাক্‌তে ছেঁকে নিবি।

লী। আর কোন রকমে দুধ দেওয়া যায় না?

ঠা। যত দুধ তা'র সিকি আন্দাজ চূণের জলের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেও চলে। তবে চূণের জলে একটু বাহ্যে কষা করে ব'লে, যা'দের পাতলা বাহ্যে হয়, কি বেশী বাহ্যে হয়, তা'দের পক্ষেই ভাল।

লী। আচ্ছা ঠাকুমা, কবিরাজীতে ত নানা রকম দুধের ব্যবস্থা আছে; তা' ক্রিমি রোগে কি কোন দুধ ভাল নয়?

ঠা। কেবল উটের দুধ ভাল। তা' সে পশ্চিমে যে দেশে উট আছে, সে দেশের লোকেই কেবল পেতে পারে। তোমরা ত তা' আর' পা'বে না।

লী। আচ্ছা দুধের কথা ত হল, কিন্তু মিষ্টি একটু না দিলে ত চল্‌বে না।

ঠা। মিষ্টির মধ্যে মিছরী, তাও যত কম হয়, ততই ভাল।

লী। আচ্ছা আর কি কি দিতে পারি বল।

ঠা। পুরাণ দাদখানি চালের ভাত, মোচা, কাঁচকলা, উচ্ছে, করলা, পল্‌তাশাক, পটোল, বেতোশাক, নিমপাতা—তরকারীর মধ্যে এই সব সুপথ্য। তবে দু' একখানা আলু, বেগুন মধ্যে মধ্যে না দিলে চল্‌বে না। রুটী, লুচি, পাঁউরুটী, বিস্কুট—এ সব এ রোগে মোটেই চল্‌বে না।

লী। দাল কিছু দেওয়া যেতে পারে?

ঠা। দাল এ রোগে সুপথ্যি নয়, ঝোল-

ভাতই খেতে দিস। তবে নেহাৎ কোন দিন কারে পড়্‌লে, একটু অড়হর,—কি কুলত্থি কলায়ের দালের যুষ দিস।

লী। মাছ-মাংস কিছু দেওয়া যেতে পারে?

ঠা। মাংস এ রোগে একেবারেই কুপথ্যি। মাছও সুপথ্যি নয়।

লী। কেন ঠাক্‌মা, তুমি বল্‌তে, যে, কবিরাজীতে সব রোগেই মাংসের ব্যবস্থা আছে।

ঠা। তা' আছে, কিন্তু সে মাংস কি দিতে পার্‌বি? এ রোগে ইঁদুরের মাংস সুপথ্যি।

লী। সে কি ঠাক্‌মা, ইন্দুরের মাংস কি মানুষে খায়?

ঠা। কেন খা'বেনা? মানুষের অখাদ্য কি আছে! এক দেশের লোকে না খায়,—অন্য দেশের লোকে খায়।

লী। তা থাক্, কিন্তু মাছ একটু-আধটু না হ'লেত ঠেকিয়ে রাখা শক্ত হ'বে।

ঠা। তা' একটু আধটু মাছ দিস্। থল্‌শে, কৈ, মাগুর, শিঙ্গি,—কি মৌরলা মাছ,—যত কম দিয়ে রাখ্‌তে পারিস্, তা'রই চেষ্টা কর্‌বি।

লী। রাত্রে কি খেতে দেব?

ঠা। রাত্রে সহ্য হ'লে, দু'টি ভাত দেওয়াই ভাল। তবে নেহাত যদি ভাত সহ্য না হয়, দুধ-বার্লি, কি, খৈ-দুধ দিস্। কিন্তু দুধ যেমন ক'রে ব'লেছি, তেমনি ক'রে সিদ্ধ ক'রে দিবি।

লী। জলখাবার—কি দিতে পারি?

ঠা। এ বিদ্‌কুটে রোগে পথ্যির বড় ক'টুকেনা। তা' দাড়িম, পানফল, দু' চারটে, কিসমিস, আনারস আর একটু মিছরী,—এই দিস্। আনারসটা এ রোগে সুপথ্যি।

লী। দু'টি মুড়ি দিতে পারিনে?

ঠা। মুড়ি কি অন্য ভাজা-পোড়ার নাম একেবারেই ক'রনা। এ রোগে ও গুলিকে বিষ ব'লে জান্‌বে।

লী। আর কি দেওয়া যেতে পারে?

ঠা। আর কিছু নয়, যা' বল্‌লাম, তাই দিবি। আর ঠাণ্ডা জল না দিয়ে, আগে যেমন গরম জল কি গরম জল ঠাণ্ডা ক'রে দিতে ব'লিছি তাই দিবি।

(মেজ বৌয়ের প্রবেশ)

মে। এই যে ঠাকুরঝি কখন্ এলে?

লী। অনেকক্ষণ এয়েছি। এখন তোর রান্না কেমন চল্‌ছে বল্ দেখি?

মে। এখন আর রাঁধ্‌তে কষ্ট বোধ হয় না, অভ্যাস হ'য়ে গেছে।

লী। দেখ্‌লি ত?—পারিনে—ব'ললে কোন কাজই পারা যায় না, আর পারি ব'ললে,—সব কাজই পারা যায়।

ঠা। শুধু তাই নয় লীলা, মেজ রাঁধতে শিখেছেও বেশ। বড় বৌয়ের চেয়ে ভাল রাঁধে।

লী। সাধ্‌লেই সিদ্ধি, শিখলে সব কাজই ভাল ক'রে ক'রতে পারা যায়।

মে। তা'তে আমার বাহাদুরী কিছু নেই। ঠাকমা হাতে ধ'রে সব শিখিয়েছেন।

লী। সে ত বটেই, সংসারে পাকা-গিন্নি না থাক্‌লে সে সংসারের বৌ-ঝি কি রান্নাই বল, বা কি ছেলে-পিলে মানুষ করাই বল—কোন কাজই ভাল ক'রে শিখ্‌তে পারে না।

(ছোট-বৌয়ের প্রবেশ)

ছো। ঠাকুর শীগ্‌গীর আসবেন, তাঁর চিঠি এসেছে ঠাক্‌মা।

ঠা। কি সুখবর আজ দিলি ছোট। কা'র কাছে চিঠি এয়েছে?

ছো। বড়ঠাকুরের কাছে, তিনি ওপরেই আছেন।

ঠা। চল্ সবাই, কি খবর শুনিগে।

(সকলের প্রস্থান,

আয়ুর্ব্বেদের কথা।

—:*:—

(১)

(আজি) সুপ্তভারত উঠেছে জাগিয়া
লুপ্ত রতন আশে,
(তাই) দীপ্ত-বাসনা জেগেছে এখন
ক্ষিপ্ত-পরাণ পাশে।

ব্যর্থ করিতে বদ্ধ-ধারণা,
মর্ম্ম-মাঝারে কি যেন গাহনা
(ওগো) শুরু করিছে কে যেন গাহিয়া—
স্নিগ্ধ-মধুর ভাবে।

গর্ব্ব করিয়া কে যেন কহিছে,
মর্ম্ম ভিতরে সে কথা পশিছে,
"সেই আয়ুর্ব্বেদ, জ্ঞানের গরিমা
(দেখ) উদেছে ভারতাকাশে।"

(২)

দেখিলা স্রষ্টা সৃষ্টি লোপ হয়,
পাপের ফলেতে ধরা রোগময়,
আয়ুসকালের অগ্র-সময়ে—
ব্যাধি যে বিশ্বনাশে।

(তাই) ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-কারণে
জীবের কুশল আরোগ্য স্থাপনে
লক্ষ শ্লোক পূর্ণ রচিলা সংহিতা,
—যা'তাঁ'র মনেতে আসে।

দক্ষ প্রজাপতি শিখিলা সে বাণী,
অশ্বিনী-কুমার-দ্বয়ে নিলা মানি,
তাঁরাও রচিলা স্বকীয় সংহিতা
কহিলা ইন্দ্রের পাশে।

ইন্দ্র হইতে আর্য্য ঋষিগণ,
আত্রেয়, অঙ্গিরা, শিখিলা চ্যবন,
আর আর ঋষি সকলে শিখিলা—
বসিয়া আত্রেয়াবাসে।

(৩)

যখন কেশব বেদের উদ্ধার
করিতে হইলা মৎস্য অবতার,
এই 'আয়ুর্ব্বেদ' দৈব অনন্ত
লভিলা পরমোল্লাসে।

তিনিই 'চরক,'—মুনিপুত্র হ'য়ে
করিলা সংস্কার পূর্ব্ব শ্লোকচয়ে,
'চরকসংহিতা' রচনা তাঁহারি,
(যাহে) বিশ্ব চমকে ভাসে।

দেব 'ধন্বন্তরি,' 'দিবোদাস' হ'য়ে
জন্মিলা কাশীতে নরদেহ ল'য়ে,
মহর্ষি 'সুশ্রুত' তাঁহারি শিষ্য,—
রোগেরা কাঁপিল ত্রাসে।

শল্য-চিকিৎসা সৃষ্ট তাঁহারি
রোগ ক্লিষ্ট দেখি যত নরনারী,—
লুপ্ত হইয়া গিয়াছে সে সব,
(শুধু) স্মৃতিটি সমুখে আসে।

(৪)

এই 'আয়ুর্ব্বেদ' ভারতে প্রথম,
ভারত হইতে আরবীয়গণ,
আরব হইতে গ্রীসবাসিগণ
লভিল মধুরোল্লাসে।

গ্রীস দেশ হ'তে সমগ্র মেদিনী
শিখিল চিকিৎসা,—শুনিল এ ধ্বনি
শিহরিল সব যুক্তি দেখিয়া ;—
এ শক্তি কেমনে আসে!

(৫)

সব দেশে গেল,—সবাই শিখিল,
ভারত সন্তান কিন্তু গো ভুলিল,
আপনার ধন অপরে প্রদানি,
রহিল নীরব খাসে।

এমনি করিয়া জগত চলিছে,
এমনি করিয়া উঠিছে পড়িছে,
দিবসে মার্ত্তণ্ড, নিশায় চন্দ্রমা
(বুঝি) এমনি করিয়া হাসে।

(৬)

সেদিন বিগত হ'য়েছে এখন,
সেই সুখ-সূর্য্য উদেছে তেমন,
আবার ভারতবাসীর প্রাণে
অতীত আশক্তি আসে।

আবার 'বাসক' 'গুলঞ্চ' 'অশোক'
সেই 'কালমেঘ' দিতেছে পুলক,
(এখন) সকলে বুঝেছে, সবই ত র'য়েছে
—ছড়ান বাড়ীর পাশে।

সেই 'পুনর্ণবা' সেই কণ্টকারী'
সেই সে র'য়েছে 'তুলসী-মঞ্জরী,'
আতপতাপিত সেই 'আয়াপান'।
সেই ত ইঙ্গীতে হাসে।

সেই 'অশ্বগন্ধা' শ্রেষ্ঠ রসায়ন,
আর কোথা পাবে এ হেন রতন।
সেই 'হরীতকী' সেই 'আমলকী'
সেই ত পাতার পাশে।

(৭)

যা' ছিল আবার লভিতে হইলে
শিখিতে হইবে গিয়াছি যা' ভুলে,
তা'রই আয়োজন হ'তেছে আবার,
তা'তেই মনেতে আসে,
(আজি) সুপ্তভারত উঠিল জাগিয়া
লুপ্তরতন আশে,
(তাই) দীপ্ত-বাসনা জেগেছে এখন
ক্ষিপ্ত-পরাণ পাশে।

কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত।

অঙ্গরাগ ও অঙ্গরক্ষা।

—:*:—

অধুনা স্বাস্থ্যরক্ষার ন্যায় সৌন্দর্য্য রক্ষাও সভ্যজগতে আদরের সামগ্রী হইয়াছে। এমন কি, স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়াও অনেককে সৌন্দর্য্য রক্ষার জন্য যত্নবান্ হইতে দেখা যায়। সাধারণতঃ অধিকাংশ লোকেই সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্য দুই প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। একটী পরিচ্ছদ ও অপরটী অঙ্গরাগ। এ দুইটী লাবণ্য বৃদ্ধির পক্ষে যে সহায়তা করিয়া থাকে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেক স্থলেই ইহাদের এরূপ অনুপযুক্ত প্রয়োগ হইয়া থাকে, যে এতদ্দ্বারা কেবল বাহ্যসৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা হয় মাত্র, ইহাতে স্বাস্থ্যরক্ষার কোন সহায়তা ত করা হয়ই না,—বরং ইহার ফলে স্বাস্থ্য বিশেষরূপে বিঘ্ন প্রাপ্ত হইয়া পড়ে। এখনকার দিনে যে সকল মূল্যবান্ পরিচ্ছদ দ্বারা সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়, মূল্যাতিশয্য বশতঃ সেগুলি প্রায় ধৌত করা হয় না, বা যদি করাই হয়, তাহা হইলেও বহুকাল অন্তর তাহার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। আবার হয়ত ধৌত করিলে পরিচ্ছদের সৌন্দর্য্যের লাঘব হইবে বলিয়া, চিরকাল অধৌত অবস্থাতেও উহা রক্ষা করা হয়। এইরূপ আচরণে পরিচ্ছদের বাহ্য সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ থাকে বটে, কিন্তু উহার অভ্যন্তরভাগ স্বেদাদি-

সিক্ত হইয়া স্বাস্থ্যহানি ও রোগোৎপাদনের কারণ উপস্থিত করিয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে, অনেক সময় অঙ্গাবরণ দ্বারা শারীরিক গঠনবিকাশ বর্দ্ধিত হইবে বিবেচনা করিয়া প্রাকৃতিক গঠনের বৈলক্ষণ্য উৎপাদন করতঃ সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়। ইয়ুরোপাদি পাশ্চাত্য সভ্যদেশে রমণীগণের মধ্যে কর্সেট ব্যবহার ইহার একটী উদাহরণ। চীনদেশীয়া সুন্দরীগণের চরণের ক্ষুদ্রতা সাধনও ঐরূপ। অঙ্গলেপন দ্বারা যে সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করা হয়, তাহা প্রায় মুখলাবণ্য-বৃদ্ধির জন্য বা অনাবৃত স্থানের লাবণ্যবৃদ্ধির জন্য। যদি স্বাস্থ্যই ভাঙ্গিতে থাকিল, এইরূপ উপায়ে লাবণ্য কতদিন থাকিবে? ইহাতে স্বাস্থ্যহানির সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য্যহানিও হইতে থাকিবে।

লাবণ্যবৃদ্ধির প্রধান উপায়—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য স্নান ও অঙ্গধাবন অতিশয় প্রয়োজনীয়। যেমন মল, মূত্র, শ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারা দেহাভ্যন্তর হইতে দূষিত পদার্থ বাহির হইয়া যায়, সেইরূপ স্বেদনির্গমনের সঙ্গেও নানা প্রকার দূষিত পদার্থ বাহির হয়। স্বেদের জলীয় অংশ শুখাইয়া যাইলে, ঐ সকল পদার্থ ত্বকের উপর প্রলেপবৎ জমিয়া থাকে। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির শরীরে এইরূপ প্রতিদিন যে ক্লেদ সঞ্চিত হয়, উহার ওজন প্রায় ⁄১ সের। যদি এইগুলি পরিষ্কার না করা হয়, তাহা হইলে উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া স্বেদগ্রন্থি-সমূহের মুখ বন্ধ হইয়া স্বেদনির্গমনের পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলে। উহার ফলে নানাবিধ চর্ম্মরোগ ও অন্যান্য রোগও উৎপন্ন হইতে পারে। সুতরাং উহা পরিষ্কার করা প্রয়োজন। এইজন্য স্নান ও গাত্রধাবন আবশ্যক। স্নান ও গাত্র-ধাবনকালে এই জন্যই গাত্রমল উঠাইয়া ফেলিতে হয়। কেবল জলধৌত করিলেই যে গাত্র পরিষ্কার হয় তাহা নয়। গাত্রমল উঠাইবার জন্য গাত্র ঘর্ষণ আবশ্যক। এই গাত্র-ঘর্ষণের সহায়তার জন্য আমাদের দেশে তৈলাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক্ষণে অনেকে সাবান ব্যবহারও করিতেছেন। সাবানে গাত্র পরিষ্কার অতি সহজে এবং অল্প সময় মধ্যে সম্পন্ন হয় সত্য, কিন্তু উহাতে চূণ ও ক্ষার থাকায় উহা দ্বারা কেবল যে ক্লেদ উঠিয়া যায়, তাহা নহে, উহাতে ত্বকেরও ক্ষতি হইয়া থাকে। তৈল-মর্দ্দনে অধিক সময় আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু উহাতে ত্বকের কোন হানি হয় না, বরং মসৃণতা বৃদ্ধি করে। তবে অধিক পরিমাণ তৈল যদি গাত্রে লাগিয়া থাকে এবং ভাল করিয়া ঘর্ষণ বা মর্দ্দন দ্বারা উঠাইয়া ফেলা না হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা অনিষ্ট হইতে পারে। ধূলি প্রভৃতি বাহ্য পদার্থ এবং স্বেদস্থ দূষিত পদার্থ তৈল সংযুক্ত হইয়া, অনৈসর্গিক গাত্রমলে পরিণত হয়, উহা দ্বারা স্বেদনালীসমূহ বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু তৈল উত্তমরূপে মর্দ্দন করিলে, কিয়ৎ-পরিমাণে শরীর মধ্যে শোষিত হয় ও কিয়ৎ-পরিমাণে গাত্রমলের সহিত সম্মিলিত হইয়া, উহাকে কোমলাকারে পরিণত করে। তখন উহা উঠাইবার সুবিধা হয়। মর্দ্দন দ্বারা মাংসপেশীর ও স্নায়ুমণ্ডলীর অনেক সময় আভ্যন্তরিক যন্ত্রেরও হিত সাধন হয়। গাত্রমল উঠাইবার জন্য কেবল রিক্তহস্ত-ঘর্ষণ কষ্টকর হইয়া পড়ে, তৈলাক্ত হস্তে গাত্র মর্দ্দন করিলে ঘর্ষণ সুখসাধ্য হয়। পরন্তু তৈল দ্বারা গাত্রের কোমলতা, মসৃণতা ও স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কিন্তু তাহা বলিয়া যেন তৈলকূপে নিমগ্ন হইয়া থাকিবেন না। কোন বিষয়েরই আতিশয্য

ভাল নয়। হিতকর বস্তুর ও আতিশয্যে হিতের পরিবর্ত্তে অহিত সাধনই হইয়া থাকে। যাঁহারা সাবান ব্যবহারে অভ্যস্ত তাঁহারা অত্যল্প পরিমাণে সাবান মাখিয়া অঙ্গ ধৌত করিয়া, পরে অল্প পরিমাণে তৈলমর্দ্দন করিতে পারেন।

বেশম ব্যবহার দ্বারাও গাত্রমল পরিষ্কার হয় এবং ইহা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিরও সহায়তা করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা চর্ম্মরোগও নিবারিত হয়। ইহা ব্যবহারে ব্রণাদি চর্ম্মরোগ হইতে পারে না। মসুরের বেশম সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী। ছোলার বেশমও মন্দ নহে।

দুধের সর মাখার প্রথা আমাদের দেশে পূর্ব্বে খুবই প্রচলিত ছিল। এখনও পল্লীগ্রামে স্থানে স্থানে উহার প্রচলন আছে। অধুনা ক্রিম, ভ্যাসেলিন্, পোমেড প্রভৃতি বিলাতী দ্রব্য উহার স্থান অধিকার করিয়াছে। ঐ সকল বিলাতী দ্রব্য ব্যবহারে অর্থব্যয় অধিক হয়। কিন্তু ইহাদের অপেক্ষা দুধের সরের যে লাবণ্যবর্দ্ধিনী শক্তি অধিক, তাহা আমদের পরীক্ষিত। দুধের সর ও বাদাম একত্রে শিলাপিষ্ট করিয়া মুখমণ্ডলে বা অন্যান্য অঙ্গে প্রতিদিন লেপন করিলে, তত্রত্য ত্বকের বর্ণের উৎকর্ষ সাধিত হয় অর্থাৎ গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে হরিদ্রালেপনের প্রথা ছিল। এখনও উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্য, ও পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে হরিদ্রা লেপনের প্রথা আছে। উহাও বোধ হয় সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্য। এইজন্যই পূর্ব্বে বোধ হয় পীতবর্ণকেই লোকে গৌরবর্ণ বলিতেন। এখনকার বিবিয়ানা গৌরবর্ণ বোধ হয় তাঁহারা ভাল বাসিতেননা বা তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ছিল না। পীতবর্ণ যে গৌরবর্ণ বলিয়া অভিহিত হইত, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। 'সোণার বরণ,' 'কাঁচা সোণার রং,' 'তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ' ইত্যাদি কথা প্রাচীন কালের অনেক গ্রন্থে পাওয়া যায়। আধুনিক গ্রন্থকারেরাও এই সকল কথা বহুল ব্যবহার করেন। আমরাও কথায় কথায় বা গল্প করিতে করিতে এই সকল কথা ব্যবহার করিয়া থাকি। সুতরাং সোণার ন্যায় পীতবর্ণ যে এ দেশের গৌরবর্ণ ছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। বিবাহের পূর্ব্বে গাত্রহরিদ্রা নামক যে মাঙ্গলিক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, উহাও বোধ হয় বর-কন্যার সৌন্দর্য্যসাধনের জন্য। আজকাল অনেক সৌখীন বাড়ীতে পাত্রী দেখাইবার সময় পেণ্ট্ করিয়া দেখান হয়। এ পেণ্ট্ অবশ্য কাঁচা সোণার রং নহে, উহা বিবিয়ানা রং। পেণ্টের রং ধৌত করিবামাত্র উঠিয়া যায়, হরিদ্রার রং ধৌত করিলেও সহজে যায় না। কিন্তু আধুনিক সভ্যতায় কাঁচা সোণার রং রুচিবিরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং হরিদ্রালেপনও রহিত হইয়াছে। এমন কি, বিবাহের সময় মাঙ্গলিক ক্রিয়া সম্পাদনার্থ অনেক স্থলে কেবল ললাটে ফোঁটা দেওয়া হয় মাত্র। হরিদ্রা-লেপনে নানারূপ চর্ম্মরোগ নিবারিত হয়। গাত্রে হরিদ্রা লেপন করিলে কীট-মশকাদির দংশন হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। যাহা হউক রুচিবিরুদ্ধ বলিয়া এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনার আবশ্যক নাই।

এইবার পরিধেয় সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া, আমাদের প্রবন্ধ শেষ করিব। তাপ ও শৈত্যের আক্রমণ হইতে স্বাস্থ্যরক্ষা করা ও লজ্জা নিবারণ—এই উভয় উদ্দেশ্যে গাত্রাবরণ প্রয়োজন। তাপ ও শৈত্য হইতে শরীর-রক্ষার জন্য পশু পক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণীর নৈসর্গিক

আবরণ আছে। পরিধেয় বস্ত্র দ্বারা আমরা আমাদের গাত্র আবৃত করিয়া থাকি। দেশ-কাল বিশেষে পরিধেয়ের বিভিন্নতা হইতে পারে। আমাদের উষ্ণপ্রধান দেশে পরিধেয় পাৎলা, লঘু ও শ্বেতবর্ণ হওয়া আবশ্যক। শীত-কালের পরিধেয় অপেক্ষাকৃত মোটা হওয়া উচিৎ। কার্পাস নির্ম্মিত শ্বেতবস্ত্র মন্দ পরিধেয় নয়। গরদ বা তসরের কাপড় সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। ইহা প্রথমতঃ ব্যয়সাধ্য বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু হিসাব করিয়া দেখিলে কার্পাস-বস্ত্র অপেক্ষা সুলভ। এক জোড়া তসর কাপড় ৫।৬ বৎসর খুব টেকে। প্রতিদিন জলধৌত করিয়া ও আট দশ দিন অন্তর একবার করিয়া রিটা দ্বারা ধৌত করিলে বেশ পরিষ্কার থাকে। রেশম তাপ, শৈত্য-রোধক। সুতরাং তসর বা গরদ কাপড় দ্বারা শরীরের উত্তাপ রক্ষিত হয় এবং বাহ্য তাপ-শৈত্যের আক্রমণ হইতে শরীর অক্ষুণ্ণ থাকে। আমাদের পরিধেয় ঢিলা হওয়া আবশ্যক। আঁট বা টাইট পরিচ্ছদ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পুষ্টি-সাধনের বিঘ্ন ঘটায়। শুভ্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছদই স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয়। স্বাস্থ্য ভাল থাকিলেই সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে। পোষাক পরিচ্ছদের চাকচিক্যে সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির চেষ্টা করা,—ছেঁড়া-চুলের খোঁপা বাঁধার ন্যায় অস্থায়ী।

ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস।

হার্ট ডিজিজ্ ও হৃদ্‌রোগ।

মাননীয়

শ্রীযুক্ত আয়ুর্ব্বেদপত্র সম্পাদক মহোদয়গণ

সমীপেষু।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর।)

পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি অনুসারে হার্টডিজিজ্ ও হৃদ্‌রোগ নামক প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশ পাঠাইতেছি। আশাকরি, পূর্ব্ববারের ন্যায় অনুগ্রহ পূর্ব্বক এবারেও আপনাদের বিখ্যাত পত্রের এক পার্শ্বে ইহার জন্য কিঞ্চিৎ স্থান দানে বাধিত করিবেন।

পরিশেষে প্রতিপক্ষ যে একটা সাংঘাতিক আপত্তি উদ্‌ভাবিত করিয়াছেন, তাহা শুনা মাত্র ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর মর্ম্মে যে নিদারুণ শূল বিদ্ধ হইবে এবং আর্য্যজাতির ভবিষ্যৎ ভাবিয়া, তাঁহারা যে শোক-দুঃখে মুহ্যমান হইয়া পড়িবেন, তাহার আর অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

তাঁহারা বলেন,—"তাঁহারা, ডাক্তার বাবুদের কাছে শুনিয়াছেন, এবং নিজেরা ও শবচ্ছেদ করিয়া দেখিয়াছেন যে, আমাদের কথিত হৃদয়ের স্থানে (আমাশয় মুখে) হৃদয়ের আকারের কিছুই দেখিতে পান নাই।" সুতরাং সমস্ত তর্কের মূল হৃদ্মর্ম্মটা "আকাশ-কুসুমবৎ দ্রব্যহীন নাম মাত্র।"

এই আপত্তির কোন উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বে আমরা আপত্তিকারী কবিরাজ মহাশয়

দিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, যে, যেখানে ডাক্তার বাবুরা কিছু দেখেন নাই, আপনারাও কিছু দেখিতে পান নাই, সেই সেই স্থানে কি কিছুই থাকিতে পারে না? শত শত ব্যক্তি যে স্থানে কোনও এক বস্তুর ঘ্রাণানুভব করিতেও পারে না, দুই এক ব্যক্তি সেখানে তীব্র গন্ধ পায়। এইরূপে দৃষ্টিশক্তির প্রখরতার তারতম্য বশতঃ দর্শন শক্তিরও ন্যূনাতিরেক হইতে পারে। হইতে পারে, আপনাদের পরিচিত ডাক্তার বাবুরা বা আপনারা হৃদয়ের স্থলে কিছুই দেখিতে পান নাই। তা' বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ,—কেবল আয়ুর্ব্বেদ কেন, যোগ, তন্ত্র, সাহিত্য, পুরাণ প্রভৃতি হিন্দুর যাবতীয় শাস্ত্রের প্রাণ স্বরূপ এবং আর্য্য চিকিৎসা গ্রন্থের, প্রায় অধিকাংশ প্রধান প্রধান রোগের মূল স্বরূপ এই হৃন্মর্ম্মটার অস্তিত্ব অস্বীকার করা সমীচীন কি? আমরা যাহা দেখিতে পাই না, তাহারই অস্তিত্বে অবিশ্বাস করাটা ত শুভ লক্ষণ নহে।

এই যে আমাদের বাস গৃহে প্রকাণ্ড কাঠের কপাট রহিয়াছে এবং তাহাতে যে অগণিত ছিদ্র রহিয়াছে, তাহার একটাও কি আমরা দেখিতে পাই? না পাইলেও কি উহা সচ্ছিদ্র বলিয়া আমরা সকলেই স্বীকার ও বিশ্বাস করি না। যদি তাহাই করা যায়, তবে যোগবলে অপ্রমেয় শক্তি সম্পন্ন মহর্ষি দিগের উপর আপনাদের এত অকৃপা কেন? এ কি কাল মাহাত্ম্য!

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রটা কিছু "নরু হরু"র লেখা বা উন্মত্ত প্রলাপ কিম্বা অজ্ঞ জনের কপোল কল্পিত কল্পনা বাক্য নয়! যে মহর্ষিগণ ভূতলে থাকিয়া ও লক্ষ লক্ষ যোজন দূরস্থ গ্রহাদির আকার প্রকার, গতি বিধি ও গম্যপথ নখ-দর্পণের মত দেখিয়া, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, যে জ্যোতিষের বার, তিথি, নক্ষত্র ও গ্রহণাদি ব্যাপার অদ্যাপিও ঐ শাস্ত্রের অভ্রান্ততার জাজ্বল্যমান প্রমাণ দিতেছে, এবং অযোগী সাধারণ মনুষ্যের স্থূল দৃষ্টি এবং যন্ত্রাদির অগোচর সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম বস্তুও যাঁহারা সহজ দৃষ্টিতে "করামলকবৎ" প্রত্যক্ষ করণে সমর্থ ছিলেন, সেই সুতীক্ষ্ণ জ্ঞানেন্দ্রিয় শালী সত্যব্রত লোকহিতরত নিঃস্বার্থপর মহর্ষিগণই এই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেরও প্রণেতা। তাঁহারা যে না জানিয়া, না শুনিয়া, না দেখিয়া স্ব স্ব প্রণীত গ্রন্থে এই হৃন্মর্ম্মটার কথা মিথ্যা করিয়া রচিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, যে সাহসে আপনারা এই কথা বলেন, সেই সাহসকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

যোগবলে ইন্দ্রিয় শক্তির যে কতদূর উন্নতি জন্মিতে পারে, তাহা আমাদের মত অযোগী পুরুষের বুদ্ধি ও ধারণারও অতীত।

আর্য্যজাতির এই চরম অধঃপতনের কালেও যোগবলে যেরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হইতেছে এবং যোগীদিগের ইন্দ্রিয় শক্তির বিশেষতঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় শক্তির যেরূপ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে বর্ত্তমান যোগিগণের গুরুস্থানীয় আয়ুর্ব্বেদ প্রণেতা মহর্ষিগণের দর্শন-শ্রবণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় শক্তির একটা ধারণা ও আমাদের আসিতে পারে না।

আয়ুর্ব্বেদানুশীলনকারী ব্যক্তি মাত্রেরই জানা আছে যে, দ্বৈপায়ন বেদব্যাসেরও সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, তাঁহার গুরুকল্প মহর্ষিগণ ভূ-লোকে আয়ুর্ব্বেদ প্রচার উদ্দেশ্যে আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

এই বেদব্যাসই যখন অপর এক ব্যক্তিকে ঘরে বসিয়া সুদূর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ব্যাপার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিবার এবং সমুদ্র কল্লোলবৎ কোলাহলপূর্ণ যুদ্ধস্থলস্থ লোকের পরস্পর কথোপকথন স্পষ্টাক্ষরে শুনিবার শক্তি প্রদান করিতে পারিয়াছিলেন, তখন স্বয়ং বেদব্যাসের দর্শন ও শ্রবণ শক্তির একটা ইয়ত্তা করাও আমাদের সাধ্যাতীত। এখন এই বেদব্যাসের গুরু স্থানীয় আত্রেয়, বশিষ্ট, পরাশর প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ প্রণেতা মহর্ষিগণের দর্শন শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়-শক্তির প্রখরতা যে আমাদের ধারণা এবং কল্পনারও অতীত ছিল, তৎসম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

যোগবলে দর্শন শক্তির একটী বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত আমরা অত্যল্প কাল পূর্ব্বের ঘটনা অবলম্বনে দেখাইতেছি। (ঘটনার সমসাময়িক বহু লোক এখনও জীবিত আছেন)। ঘটনাটি এইরূপ—ঢাকা জেলার অন্তর্গত বারদী গ্রামে ৺লোকনাথ ব্রহ্মচারী নামে এক মহাপুরুষের আশ্রম ছিল। উক্ত মহাপুরুষকে কোনও এক বিচারালয়ে সাক্ষী স্বরূপে উপস্থিত হইতে হইয়াছিল। সাক্ষ্য দেওয়ার সময়ে যতদূর হইতে ঘটনা দেখার কথা, ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিয়াছিলেন, ততদূর হইতে ঐ রূপে ঘটনা দেখা সাধারণ মানুষের পক্ষে একবারেই অসম্ভব। তাই বিপক্ষের মোক্তার বাবু, ব্রহ্মচারী মহোদয়ের উক্তি মিথ্যা প্রতিপন্ন করার অভিপ্রায়ে ব্যঙ্গস্বরে বলিয়াছিলেন, —মহাশয় এতদূর হইতে এইরূপে ঘটনা দেখা কি সম্ভব? তদুত্তরে ব্রহ্মচারী মহাত্মা বলিয়াছিলেন, "দেখ, মোক্তার বাবু! ঐ যে (অঙ্গুলী নির্দ্দেশে দেখাইয়া) দূরে একটা গাছ দেখিতেছেন, ওটা কি গাছ বলিতে পারেন?" উত্তরে মোক্তারবাবু গাছের বিদ্যমানতা মাত্র স্বীকার করিলে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "দেখ বাবু! আমি ঐ গাছের পাতাগুলি স্পষ্ট দেখিতেছি। বলিতেছি ওটা কাঁঠাল গাছ; আর ঐ গাছের মূল দেশ হইতে এক ঝাঁক লাল পিপড়া উহার কাণ্ড পর্য্যন্ত উঠিতেছে; আমি উহার এক একটা পিপড়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ররূপে দেখিতেছি।" এই কথা শুনিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন এবং কৌতুহল পরবশ হইয়া সেই গাছের তলায় যাইয়া দেখিলেন, ব্রহ্মচারীর কথা বর্ণে বর্ণে সত্য।

অতঃপরও যদি প্রতিপক্ষ বলেন, মহর্ষিগণ সহজ দৃষ্টি প্রভাবে সৌর জগতের বিষয় অবগত হইতে পারেন নাই, যন্ত্র বলেই তাঁহারা সৌর জগতের বিবরণ অবগত হইয়া জ্যোতিষশাস্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে, যন্ত্রবলেই মহর্ষিগণ, মানব দেহের অস্থি, মাংস, শিরা, ধমনী এবং মর্ম্মাদি অবগত হইয়াছিলেন এরূপ বিশ্বাসত করা উচিত, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাতেও প্রতিপক্ষের অল্পমাত্রও বিশ্বাস নাই।

শিক্ষিত ভারতবাসীমাত্রেই জানেন, যে, ভারতের চরম উন্নতির সময়ে পূর্ণাবয়ব আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-প্রভাবেই ছিন্ন-শিরস্ক ব্যক্তি যুক্তশির হইয়া পুনর্জ্জীবিত হইতেন। এই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-প্রভাবেই পূর্ব্বদিনের ক্ষত বিক্ষত দেহ যোদ্ধৃবৃন্দ তৎপরদিনই অক্ষত দেহে পূর্ণ বলবীর্য্যে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন—এরূপ ঘটনাও অনেক ঘটিয়াছে। সেই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে, মনুষ্যত্বের বীজ, চেতনার আধার স্বরূপ, বহু রোগের* আশ্রয় স্থল এই হৃন্মর্ম্মটা (শুধু হৃন্মর্ম্ম নয় তদাশ্রিত চতুর্ব্বিংশ ধমনী, তাহাদের নাম, স্থান ও

কার্য্যাদি) মিথ্যা করিয়া লেখা সম্ভবপর কি ?

আমরা স্পর্দ্ধা সহকারে বলিয়া থাকি, "আর্য্য চিকিৎসা শাস্ত্র পৃথিবীর যাবতীয় চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ" এই কথার মূলে কোন সত্য নিহিত আছে, না ইহা অপরিণত বয়স্ক ও অপরিণত মস্তিষ্ক ব্যক্তির স্বভাব-সুলভ চপলতা সম্ভূত ?

এক'টুকু সামান্ত চিন্তা করিয়া দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারি, যে, এই উক্তি একেবারে অসঙ্গত নহে। আমরা দেখিতে পাই যে, পৃথিবীতে প্রচলিত অপরাপর সমস্ত চিকিৎসাই সাক্ষাৎ বা পরম্পরা ভাবে, ন্যূনাধিক পরিমাণে এই আর্য্য চিকিৎসার নিকটে ঋণী। এইটী আমাদের সুখ ও সৌভাগ্যের বিষয় বটে, কিন্তু এতদ্দ্বারা আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্বপ্রাধান্য নিঃসন্দিগ্ধ রূপে প্রমাণিত হইতে পারে না। কালে গুরু হইতেও শিষ্যের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান জন্মিতে পারে। আয়ুর্ব্বেদের প্রাধান্য প্রতিপাদক বহু বিষয় রহিয়াছে। তন্মধ্যে বর্ত্তমান প্রবন্ধের সহিত বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট একটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়া উপরোক্ত বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

দিন দিন উন্নতি অভিমুখে ধাবিত রাজশক্তি পৃষ্ঠপোষিত ইউরোপীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান যে সমস্ত সূক্ষ্ম শারীর তত্ত্বের আবিষ্কারে অকৃত কার্য্য রহিয়াছেন, আর্য্য ঋষিগণ অতুলনীয় শক্তিবলে, বিভিন্ন দেশে চিকিৎসার সূত্রপাতের ও সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, সেই সমস্ত গূঢ় শারীরতত্ত্ব ও তত্তৎ যন্ত্রের ব্যাধি ও চিকিৎসা আবিষ্কার পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, ঐ সমস্ত শারীর যন্ত্র মধ্যে মর্ম্মগুলি এক শ্রেণীর যন্ত্র। সর্ব্বদেহে তাঁহারা ১০৭টী মর্ম্ম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক উহাদিগকে বিভিন্ন শাখা শ্রেণীতে বিভক্ত করতঃ তৎসমস্তের অবস্থিতি স্থান ও ক্রিয়াদি এবং কোন্‌টী আহত হইলে দেহীর কিরূপ অনিষ্ট সংঘটিত হয় তাহাও বিশদরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই অংশে আয়ুর্ব্বেদ অতুলনীয়, এই অংশে আয়ুর্ব্বেদের প্রতিদ্বন্দ্বী চিকিৎসা শাস্ত্র জগতে নাই। এই অংশেই আয়ুর্ব্বেদের অবিসম্বাদী প্রাধান্য, এই শ্রেণীর মধ্যে শিরামর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে আবার হৃন্মর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই হৃন্মর্ম্ম অবলম্বনেই বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিত।

আমাদের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী কবিরাজ মহাশয়েরা প্রায় সকলেই সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত, খাঁটি কবিরাজ, শুধু ডাক্তারী কুহকে মজিয়াই তাঁহাদের এই শোচনীয় পরিবর্ত্তন। ঋষিবাক্যে এই ঘোরতর অবিশ্বাস। জানিনা, তাঁহাদের এই শুভানুধ্যায়ী ডাক্তার বন্ধুগণ কোন্ শ্রেণীর ডাক্তার। খৃষ্টধর্ম্মালম্বী খাঁটী বিলাতী পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিদ্যায়—পারদর্শী সুবিখ্যাত পণ্ডিত ডাক্তার ওয়াইজ প্রমুখ সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার সাহেব মহোদয়গণও ত এই মর্ম্মগুলির অস্তিত্বে অবিশ্বাস করেন নাই। এমন কি তাঁহারা এই বিষয়ে একটুকু সন্দিহানও হন নাই। তাঁহারা যে এই গুলির অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়াছেন, তাঁহাদের কথায় ত ইহাই বুঝা যায়। তাঁহারা বলিয়াছেন, হিন্দু চিকিৎসা বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ, কোন ও অপ্রাকৃত শক্তি (Supernatural power) প্রভাবে এই তত্ত্বের (মর্ম্মের) আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।

ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বিজাতীয় চিকিৎসা-তত্ত্ব-বিদ্ এই সমস্ত বিখ্যাত পণ্ডিতগণের মুখে

আয়ুর্ব্বেদের প্রাধান্য সূচক এই প্রকার কথা শুনিলে, কোন্ আর্য্য বংশধরের অন্তঃকরণ আনন্দে না উৎফুল্ল হইয়া উঠে! কিন্তু আমরা অধঃপতনের এমন চরম সীমায় উপনীত হইয়াছি যে, অতি উপাদেয় হইলেও নিজস্ব বস্তুর উপর আমরা একান্ত বীতশ্রদ্ধ। উহা দেখিলেও যেন আমাদের অশ্রদ্ধার উদয় হয়। হে ভগবন্, কবে আমাদের এই কুহক ভঙ্গ হইবে?

আমাদের করতলে মধ্যাঙ্গুলী মূলে তল মর্ম্ম নামে একটী মর্ম্ম আছে। তাহাতে সূচী বিদ্ধ হইলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে। অথচ হাতের কব্জাটা সমস্ত কাটিয়া ফেলিলেও মানুষ জীবিত থাকে। এই গূঢ় রহস্য আর্য্য চিকিৎসা গ্রন্থ ব্যতীত আর কোথাও আছে কি? বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যেও একটী স্নায়ুমর্ম্ম আছে। এই মর্ম্মে শস্ত্রাঘাতে কালান্তরে আক্ষেপ (ধনুষ্টঙ্কারাদি) জন্মিয়া মৃত্যু হয়। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশস্থ কোনও হাসপাতালে বাতরোগযুক্ত এক রোগী উপস্থিত হইলে, সিবিলসার্জ্জন উহাকে অস্ত্র দ্বারা আরোগ্য করিতে হইবে, ঠিক করিলেন। কিন্তু ভারতবাসী হিন্দু আসিষ্টাণ্ট বাবু, সাহেবকে বলিলেন, হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্রমতে এই স্থানে "ক্ষিপ্রমর্ম্ম নামে" একটী মর্ম্ম আছে, তাহাতে অস্ত্রাঘাত লাগিলে কালান্তরে টিটেনাস হইয়া রোগীর প্রাণ বিনাশের আশঙ্কা। সুতরাং অস্ত্র প্রয়োগে নিরস্ত থাকাই আমার মত। একেত সাহেবের কেতাবে একথা নাই, তাহাতে অধীনস্থ নেটিবের কথানুযায়ী কার্য্য করিলে সাহেবের প্রেস্‌টিজ থাকে না; কাজেই সাহেব নেটিবের কথা অগ্রাহ্য করিয়া, শস্ত্রপাত অর্থাৎ "সক্‌সেস্‌ফুল্ অপারেসন্" করিয়া টেবিল চাপড়াইয়া, শত মুখে হিন্দু চিকিৎসার অসারতা প্রমাণ এবং ত্রিরাত্রি পর্য্যন্ত আসিষ্টাণ্টের শ্রাদ্ধ করিলেন। চতুর্থ দিনে রোগীর টিটানাস্ উপস্থিত হইল। তখন হইতেই সাহেবের মস্তক নত হইল ও বাক্‌শক্তি বিরহিত হইল। (চিকিৎসা সম্মিলনী পত্রিকা দেখুন) অতএব সানুনয় অনুরোধ, কোনও ডাক্তারের কথা শুনিয়া কিম্বা ডাক্তারী পুস্তক পাঠ করিয়া, পরম কারুণিক ঋষিবাক্যে অশ্রদ্ধাপর না হইয়া, আসুন আমরা সকলে মিলিয়া আর্য্য চিকিৎসার বিজয় বৈজয়ন্তী স্বরূপ এই মর্ম্ম গুলি, যত্র তত্র মস্তকে লইয়া বেড়াই।

বিনয়াবনত—

শ্রীরাজকুমার দাশগুপ্ত।

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কা ঔষধ।

অজীর্ণে ব্যবস্থা—অজীর্ণ বশতঃ অপাক দাস্ত হইলে, লবণ দুই আনা এবং যমানি (যোয়ান) দুই আনা না চিবাইয়া একটু জলের সহিত গিলিয়া ফেল, বিশেষ উপকার পাইবে।

অগ্নিমান্দ্যের যোগ।—(১) আঁটি বাদ দিয়া হরীতকীর গুঁড়া দুই আনা, শুঁঠের গুঁড়া দুই আনা, পুরাতন গুড় দুই আনা এবং সৈন্ধব লবণ দুই আনা এই চারিটী দ্রব্য একত্র মিশাইয়া প্রত্যহ সেবন কর,

অগ্নির দীপ্তি হইবে। (২) প্রত্যহ শুঁঠের গুঁড়া দুই আনা একটু গব্যঘৃতের সহিত মিশাইয়া অর্দ্ধ ছটাক গরম জলসহ পান করিলে অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে। (৩) অল্প পরিমাণে আদার কুচি এবং সৈন্ধব লবণ প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন কর, অগ্নির দীপ্তি হইবে। (৪) পিপুলের গুঁড়া চারি আনা ও পুরাতন গুড় চারি আনা প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে মলবদ্ধতা নষ্ট হইয়া অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে।

স্বরভঙ্গে সুব্যবস্থা।—(১) কতকগুলি কচি কুলপাতা তুলিয়া একটু সৈন্ধব লবণের সহিত মিশাইয়া গব্যঘৃতে ভাজিয়া কয়েক দিন সেবন কর,—স্বরভঙ্গ সারিয়া যাইবে। (২) সমান ভাগে হরিতকী ও পিঁপুলের গুঁড়া একটু সরিষার তৈলে মাখাইয়া মুখে ধারণ কর, স্বরভঙ্গে উপকার হইবে। (৩) পাঁপড়িখয়েরের গুঁড়াও ঐরূপ তৈলাক্ত করিয়া মুখে রাখিলে স্বরভঙ্গের উপশম হয়।

দন্তরোগের ব্যবস্থা।—যে কোন কারণে দাঁতের বেদনা হইলে অর্দ্ধআনা সৈন্ধব লবণ অর্দ্ধ গ্ল্যাস জলে ভিজাইয়া রাখ। প্রত্যহ রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে ঐ জলে কুলকুচা কর, যন্ত্রণার নিবৃত্তি হইবে। বেদনার সহিত দাঁত নড়িতে থাকিলেও এই যোগে আশু উপশম হইয়া থাকে। ইচ্ছা করিলে রাত্রির মত দিবসেও ইহার ব্যবহার করিতে পারা যায়।

শূলবেদনার মহৌষধ।—(১) শামুকের খোলা ভস্ম করিয়া, সেই ভস্ম দুই আনা মাত্রায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক ছটাক গরম জলের সহিত পান কর,—শূল বেদনা সারিয়া যাইবে। এই ঔষধ সেবনের পূর্ব্বে একটু গব্য ঘৃত মুখবিবরে মাখাইয়া লইও। (২) প্রত্যহ প্রাতঃকালে আঁটিবাদ দিয়া আমলকীর গুঁড়া চারি আনা লইয়া মধু ও গরম জলের সহিত সেবন করিলে শূল রোগের শান্তি হইয়া থাকে। (৩) প্রত্যহ প্রাতঃকালে মধুর সহিত শতমূলীর রস পান করিলে শূলরোগের উপশম হয়। (৪) বিল্ব (বেল) বৃক্ষের মূলের ছাল, এরণ্ড (বাগ্‌ ভেরেণ্ডা) মূল, চিতামূল, শুঁঠ, হিং ও সৈন্ধব লবণ—সবগুলি সমানভাগে লইয়া, একত্র করিয়া, জল দিয়া বাটিয়া লও। শূল রোগীর বেদনার সময় উহা তাহার উদরে বেশ করিয়া প্রলেপ দাও, যন্ত্রণার আশু শান্তি হইবে।

কর্ত্তিতস্থানের রক্তবন্ধের উপায়।—(১) কতকগুলি আপাং বা অপামার্গের পাতা তুলিয়া রস কর। কর্ত্তিত স্থানে উহা লাগাইয়া দাও, সঙ্গে সঙ্গে রক্ত বন্ধ হইবে। (২) কতকগুলি দূর্ব্বাঘাস তুলিয়া রস বাহির করিয়া কর্ত্তিত স্থানে লাগাইয়া দাও, তৎক্ষণাৎ রক্ত বন্ধ হইবে। (৫) কয়লার গুঁড়া লাগাইলেও সদ্যোঃ রক্তবন্ধ হইয়া থাকে।

পতনের বেদনানাশের ব্যবস্থা—হঠাৎ পড়িয়া গিয়া স্থান-বিশেষে আঘাত লাগিলে, খানিকটা টাট্‌কা গোবর অনেকখানি জলে গুলিয়া ফুটাইয়া লও। তাহার পর, আহত স্থানে সেই জল অল্পে অল্পে ঢালিতে থাক, সঙ্গে সঙ্গে একজন হাত দিয়া মর্দ্দন করিতে থাক। যে কয় দিন না আহত স্থান ভালরূপে সারিবে, সে কয় দিন প্রত্যহ সকালে-সন্ধ্যায় এই ব্যবস্থা করিও।

বৃশ্চিক দংশনে ব্যবস্থা—(১) হুঁকার জল দ্বারা ধৌত করিলে বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা নিবৃত্তি হয়। (২) তুলসীর মূল বাটিয়া একটী গুটিকা কর। সেই গুটিকা বৃশ্চিক দংশন স্থানে লাগাইতে থাক,—বিষ নষ্ট হইবে।

কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত।

আয়ুর্ব্বেদে নিদ্রাতত্ত্ব।

—:*:—

আহার, সুনিদ্রা ও ইন্দ্রিয়-দমন (যম ও দম) এই তিনটী শরীরের উপস্তম্ভ বা ধারক। এই তিনটী উপস্তম্ভ যুক্তি পূর্ব্বক ব্যবহৃত হইলে আয়ুঃ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত শরীরে বল ও বর্ণের উপচয় হয়। আয়ুর্ব্বেদে নিদ্রা, ক্ষুধা, পিপাসা, জরা, মৃত্যু প্রভৃতিকে স্বাভাবিক ব্যাধি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আহার ব্যতীত যেমন আমদের শরীরধারণ অসম্ভব, নিদ্রা ব্যতীতও তদ্রূপ জীবনধারণ করা যায়না। সুখদুঃখ, বলাবল, পুষ্টিকৃশতা, ক্লীবতা, জ্ঞান, অজ্ঞান এবং জীবন, মরণ, নিদ্রা আয়ত্ত। অকালে বা অধিক পরিমাণে নিদ্রা সেবন করিলে অথবা নিদ্রা একেবারে সেবন না করিলে, মনুষ্যের স্বাস্থ্য ও আয়ু শেষ হইয়া থাকে। অপিচ নিদ্রা যুক্তিপূর্ব্বক সেবন করিলে, দেহের সুখ ও দীর্ঘায়ুলাভ হইয়া থাকে। অনাহারের ন্যায় অনিদ্রাও জীবের মৃত্যুর কারণ হয়। ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে চীনদেশীয় জনৈক বণিক হত্যাকরার অপরাধে নিদ্রা-বিহীন মৃত্যুদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হন, প্রহরী বেষ্টিত অবস্থায় তাঁহাকে কারাগারে আবদ্ধ করা হইল। আহার বিহারাদি সম্বন্ধে তাঁহার প্রতি কোনরূপ কঠোরতার ব্যবস্থা করা হইল না। কিন্তু নবম দিনে তাঁহার যন্ত্রণা এত অসহ্য হইয়াছিল যে, তিনি প্রহরীদিগকে তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য কাকুতিমিনতি করিতে-লাগিলেন। এই অবস্থায় অষ্টাদশ দিবসে তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটিল।

যেমন ভুক্তদ্রব্যের সম্যক পরিণত রস অদৃষ্ট কর্ম্ম ও হেতুর দ্বারা আমাদের দেহকে তর্পণ, বর্দ্ধন, ধারণ যাপন করিয়া জীবিত রাখে, তদ্রূপ অদৃষ্ট হেতু ও কর্ম্মের দ্বারা নিদ্রা আমাদের দেহকে তর্পণ, বর্দ্ধন, ধারণ, যাপন করিয়া জীবিত রাখিতেছে। দৈনিক পরিশ্রমে আমাদের শরীরের যে ক্ষয় উৎপন্ন হয়, নিদ্রা-কালে তাহা পূরণ হইয়া থাকে। নিদ্রা বৈষ্ণবী, শান্তিদায়িনী, দুঃখনাশিনী, ভূতধাত্রী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

নিদ্রা আর কিছু নয়,—বোধের অভাব নিদ্রা এবং নিদ্রায় অভাব জাগরণ-বোধ। জীবের বোধ বা বুদ্ধি কি? দৃষ্টি, শ্রবণ, ঘ্রাণ, রসন ও স্পর্শ—এই পঞ্চবুদ্ধি বা জ্ঞানেন্দ্রিয়। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের উপকরণ দ্রব্য যথাক্রমে জ্যোতি, আকাশ, ক্ষিতি, জল, ও বায়ু। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের আশ্রয় বা অধিষ্ঠান স্থান যথা-ক্রমে অক্ষিদ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, জিহ্বা, ও ত্বক্। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয় যথা-ক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ। এই পঞ্চেন্দ্রিয় বোধ যথাক্রমে দর্শন-বোধ, শ্রবণ-বোধ, ঘ্রাণবোধ, স্বাদবোধ ও স্পর্শবোধ, এবং

ইহারা বুদ্ধি নামে অভিহিত। ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থ, মন ও আত্মা এক যোগ হইলেই বোধের উদয় হয়। ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থ ও আত্মা ইহাদের সংযোগ হইলেও মনোযোগ ভিন্ন ইন্দ্রিয় জ্ঞান বা বোধ হয় না।

মনের অস্তিত্ব, জ্ঞান বা জ্ঞানের অভাব দ্বারা জানা যায়। মনঃ একাদশ ইন্দ্রিয়ের অন্যতম—অতএব মন একটি স্বতন্ত্র বস্তু। মনকে অন্তঃকরণ, সত্ত্ব, অতীন্দ্রিয় এবং অন্তরীন্দ্রিয় কহে। যাহা চিন্তা, বিচার, তর্ক, ধ্যান, বা সংকল্প করা যায় এবং যাহা জ্ঞেয়—তৎসমস্তই মনের বিষয়। তর্ক ও বিচার মন হইতে উৎপন্ন হয় এবং তৎপরে বুদ্ধির প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গণ যে ইন্দ্রিয়ার্থ গ্রহণ করে, তাহা মনের সাহায্যেই করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের পর মনের কার্য্য হয়, তাহা স্বগুণ হইতে পারে, সদোষও হইতে পারে। পরে বুদ্ধির প্রবৃত্তি হয়। মনের যে নিশ্চয়তা তাহাকে বুদ্ধি কহে। মনের বিষয় ও আত্মা একত্র হইলে, মনের চেষ্টা নির্ব্বাহিত হয়। মনঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় উভয়াত্মক, মনের অধীনে ইন্দ্রিয়গণের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এস্থলে মনটী আত্মা-সংযুক্ত, নচেৎ মন অচেতন। বোধের অভাব নিদ্রা, নিদ্রায় যে বোধের অভাব হয়, সে সমস্তই বাহেন্দ্রিয়গণের বোধের অভাব। নিরিন্দ্রিয় প্রদেশের মনের অধিষ্ঠানকে নিদ্রা বলে। অন্তরীন্দ্রিয়-মনের বোধের অভাব হয় না। কারণ নিদ্রিতাবস্থায় আত্মা মনের সাহায্যে বিষয় সকল গ্রহণ করিয়া অপরিচিতের ন্যায় ধৃতি, স্মৃতি, জ্ঞান, বিজ্ঞান প্রভৃতি যুক্ত হইয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। বাহেন্দ্রিয় গণের অন্তরীন্দ্রিয় মনের সহিত অযোগই নিদ্রা। এই অযোগের কারণ তমো বা অন্য নৈসর্গীক কারণ। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে হৃদয়ই নিদ্রার স্থান ;

"পুণ্ডরীকেন সদৃশং হৃদয়ং স্যাদধো মুখং।
জাগ্রত স্তদ্বিকগতি স্বপতশ্চ নিমীলতি॥"

হৃদয়ের আকার পদ্মমুকুলের ন্যায়, উহা অধোমুখে থাকে, উহা জাগ্রত অবস্থায় প্রস্ফুটিত এবং নিদ্রিতাবস্থায় নিমীলিত থাকে। সেই হৃদয়ই চেতনার স্থান, তাহা তমোগুণে আবৃত হইলে সর্ব্বপ্রাণী নিদ্রিত হয়।

মহর্ষি সুশ্রুত বলিয়াছেন :—

"হৃদয়ং চেতনা স্থান মুক্তং সুশ্রুত দেহিনাং।
তমো'ভিভূতে তস্মিংস্তু নিদ্রা বিশতি দেহিনাম্॥
নিদ্রাহেতুস্তমঃ সত্বং বোধনে হেতুরুচ্যতে।
স্বভাব এব বা হেতুর্গরীয়ান্ পরিকীর্ত্ত্যতে।"

যে সুশ্রুত সংহিতায় হৃদয়ই চেতনার স্থান উক্ত হইয়াছে, সেই হৃদয়ে তমোগুণ অভিভূত হইলে নিদ্রা প্রাণীদিগের শরীরে আবিষ্ট হয়। তমোগুণ নিদ্রার হেতু (তমো মোহ বা আবরক গুণ, তমো চেতনাকে বা সত্বগুণকে মুগ্ধ বা আবৃত করে) এবং সত্বগুণ জাগরণের হেতু (সত্বগুণই চেতনা) অথবা নিদ্রা বা জাগরণের মুখ্য কারণ স্বভাবই বলা যাইতে পারে।

মহর্ষি চরক বলিয়াছেন :—

ষড়ঙ্গমদ বিজ্ঞান মিন্দ্রিয়ান্যর্থ পঞ্চকং।
আত্মাচ মণ্ডলশ্চেতি চিন্ত্যঞ্চ হৃদসংশ্রিতম॥

দুই হস্ত, দুই পাদ, মধ্যদেহ ও মস্তক এই ছয়টি লইয়া মানব দেহ। চক্ষু কর্ণাদি পঞ্চবুদ্ধীন্দ্রিয় রূপরসমাদি পঞ্চইন্দ্রিয়ার্থ, স্বগুণ আত্মা ও চেতঃ হৃদয় ইহাদের আশ্রয় স্থান। যেমন ঘরের চাল প্রভৃতির আশ্রয় আড়া, সেইরূপ হৃদয় উক্ত দ্রব্য সমূহের আশ্রয় স্থান। বস্তুতঃ

স্পর্শজ্ঞান জন্মিয়া থাকে, তাহা হৃদয়ে আশ্রিত। হৃদয়ই ওজঃধাতু বা বলের প্রশস্ত স্থান। হৃদয়ই চৈতন্যের আশ্রয়। এই চেতনা-স্থান হৃদয় যখন শ্লেষ্মার দ্বারা অভিভূত হয়, তখন প্রাণিগণ নিদ্রা যায়। এই শ্লেষ্মা বুদ্ধির অবরোধ জন্মাইয়া প্রাণিগণের নিদ্রা উৎপন্ন করে। নিদ্রা বা জাগরণ হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাত ব্যতীত অন্য কিছুই নয়।

তমোগুণবশে ইন্দ্রিয়গণ বিকলতা প্রাপ্ত হইলে, অনিদ্রিত যে ভূতাত্মা তাহাকে নিদ্রিতের ন্যায় উপলব্ধি হয়। জীব, নিদ্রা গেলে কর্ম্মীপুরুষ তাহার উপর কর্ত্তৃত্ব করে। এক কথায় ইন্দ্রিয় জ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্নতাই নিদ্রা।

যখন জীব নিদ্রা যায়, তখন কর্ম্মীপুরুষ শুধু যে তাহার উপর কর্ত্তৃত্ব করেন তাহাই নহে, রজোযুক্ত মনের দ্বারা পূর্ব্বদেহ অনুভূত বা শুভাশুভ বিষয় সকলও গ্রহণ করিয়া থাকেন।

যেমন সত্ব জাগরণের কারণ, এবং সত্ব-বিচ্যুত তমো নিদ্রার কারণ, তদ্রূপ সত্ববিচ্যুত রজোযুক্ত মনঃই স্বপ্নের কারণ। জাগরিত অবস্থা ব্যতীত অন্য কোন সময় মনের সহিত সত্বের সংযোগ হয় না। জাগরণের অবস্থায় মনঃ যদি রজোযুক্ত হয়,—তবে কাম, ক্রোধ, মান, দম্ভ, অহঙ্কার প্রভৃতি জীব-দেহে সঞ্চরণ করে, এবং যদি তমোযুক্ত হয়, তবে বুদ্ধিভ্রংশ অজ্ঞানতা আসিয়া জীবদেহে প্রকটিত হয়। মানবজীবন—জাগরণ, নিদ্রা ও স্বপ্নময়।

এইবার আমরা স্বপ্ন সম্বন্ধে কিছু বলিব।

বাতিক প্রকৃতির লোকে স্বপ্নে আকাশে গমন করে, যেন উচ্চস্থান হইতে পতিত হইতেছে মনে করে। কারণ বায়ু চলগুণ বিশিষ্ট।

পৈত্তিকপ্রকৃতির ব্যক্তি স্বপ্নে স্বর্ণ বা নাগকেশর, পলাশ, কর্ণিকার, অগ্নি, বিদ্যুৎ, উল্কা প্রভৃতি আগ্নেয় গুণবিশিষ্ট বিষয় দর্শন করিয়া থাকে। কারণ পিত্ত তৈজস পদার্থ।

শ্লৈষ্মিক প্রকৃতির লোকে স্বপ্নে পদ্ম, হংস, চক্রবাক যুক্ত মনোজ্ঞ জলাশয়াদি দর্শন করিয়া থাকে। কারণ শ্লেষ্মা সৌম্য বস্তু। যাহা হউক উল্লিখিত প্রাকৃতিক স্বপ্ন সকল কোনরূপ ইষ্টানিষ্টের কারণ হয় না।

ইহা ভিন্ন, কতকগুলি শুভাশুভের ভবিষ্যৎ জ্ঞাপক স্বপ্ন আছে। সুহৃৎগণ বা স্বয়ং সেই স্বপ্ন দেখিলে, শুভ বা মরণ হয়। যেমন দেবতা ব্রাহ্মণ, গো, বৃষভ, জীবিত সুহৃৎ, নৃপ, অগ্নি, মাংস, মৎস্য, শ্বেতবর্ণ মালা, শ্বেতবস্ত্র, ফল, নির্ম্মল জল, প্রাসাদ, বৃক্ষ, হস্তী, পর্ব্বতে আরোহণ প্রভৃতি স্বপ্নে দেখিলে, কল্যাণ লাভ এবং ব্যাধির উপশম হয়, এবং কার্পাস, তৈল, তিল লবণ ও ধাতুলাভ, মৎস্যে গ্রাস করা, পর্ব্বতাগ্র হইতে পতিত—কাক, চিতায় অরোহণ প্রদীপ নির্ব্বাণ, দেবতা নাশ, স্রোতে বাহিত হওয়া, প্রেতের সহিত বাক্য-কথন, পক্ক অন্ন ভক্ষণ বা সুরা, মধু ও তৈল পান, পঙ্কে নিমগ্ন হওয়া, মালা বা তারকাদির পতন, শ্বাপদগণ কর্ত্তৃক মস্তকে রক্ত আঘ্রাণ, মুণ্ডিত মস্তক হওয়া প্রভৃতি স্বপ্নে দেখিলে সুস্থের ব্যাধি ও ব্যাধিতের মৃত্যু হয়। ইহা আমরা অনেক স্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

যাহা পূর্ব্বদৃষ্টকৃত বা চিন্তিতপূর্ব্ব নয়, যাহা ইষ্টানিষ্ট সূচক নয় এবং যাহা স্বভাবানুযায়ী নয়—এইরূপ উদ্ভট অচিন্ত্যপূর্ব্ব স্বপ্ন সকলই পূর্ব্বদেহানুভূত স্বপ্ন।

শুভাশুভ স্বপ্ন দেখিলেই যে ইষ্ট বা অনিষ্টের কারণ হয়, তাহা নহে, শাস্ত্রে উক্ত আছে :—

"যথাস্বং প্রকৃতি-স্বপ্নো বিস্মৃতো বিহতশ্চ যঃ।
চিন্তাকৃতো দিবাদৃষ্টো ভবন্ত্যফলদাস্তথে॥"

যদি স্বপ্ন আপনার স্বভাবানুযায়ী হয় অথবা যদি স্বপ্ন দৃষ্ট হইবার পর তাহা বিস্মৃত হওয়া যায় অথবা অশুভ স্বপ্ন দৃষ্ট হইবার পর পুনরায় শুভ স্বপ্ন দৃষ্ট হয় কিম্বা যদি স্বপ্ন চিন্তাকৃত বা দিবা দৃষ্ট হয়, তবে নিষ্ফল হইয়া থাকে।

রাত্রির প্রথম প্রহরে দুঃস্বপ্ন দেখিলে শুভচিন্তা করিতে করিতে পুনরায় নিদ্রা যাওয়া উচিত। অশুভ স্বপ্ন দেখিলে কাহাকেও প্রকাশ করিবে না, দেবতা গৃহে ত্রিরাত্র বাস করিবে। আর বিপ্রদিগের পূজা করিলেও দুঃস্বপ্ন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। দুঃস্বপ্ন দৃষ্ট হইলে প্রভাতে উঠিয়া বিপ্রদিগকে মাষ, তিল, ধাতু ও স্বর্ণদান করিবে এবং শুভমন্ত্রসমূহ ও গায়ত্রী জপ করিবে।

নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখা যায় বলিয়া স্বপ্নকে নিদ্রার রূপান্তর বলা যাইতে পারে। স্বপ্নে আমাদের যথার্থ বোধ বা জাগরণ হয় না—অথচ হেতু ও কর্ম্ম দ্বারা শুভাশুভ স্বপ্নের ইষ্টানিষ্ট ফল সকল আমরা ভোগ করিয়া থাকি। ইহাই কর্ম্মীপুরুষের জীব-দেহের উপর কর্ত্তৃত্ব। ইহা দ্বারা প্রমাণ হয়, আত্মা নিদ্রার আয়ত্ত নয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ মনোযোগের অভাবে ক্রিয়া হীন হইয়াও বিষয় সকল গ্রহণ করে না,—ইহা দ্বারা চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের অচৈতন্যত্ব প্রমাণ হয়। ভূতাত্মাকে চেতন আত্মার সাহচার্য্য হেতু মনের চৈতন্য বলা যাইতে পারে।

মহর্ষি চরক নিদ্রালক্ষণে বলিয়াছেন :—

"যদা তু মনসি ক্লান্তে কর্ম্মাত্মানঃ ক্লমান্বিতাঃ।
বিষয়েভ্যো নিবর্ত্তন্তে তদা স্বপতি মানবঃ॥"

যখন মানগণের মনঃ, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় (একাদশ ইন্দ্রিয়) বিভ্রান্তভাব অবলম্বন করে এবং সমস্ত বিষয়-কর্ম্মে নিবৃত্ত হয়, তখন তাহাকে নিদ্রাভিভূত জানিবে।

স্বপ্ন ও ভ্রম উভয়েই রজোগুণ হইতে উৎপন্ন হয়। স্বপ্ন সুনিদ্রার ব্যাঘাত করে। অতএব স্বাস্থ্য রক্ষায় যত্নশীল ব্যক্তিগণ যাহাতে স্বকৃত বা চিন্ত-প্রসূত স্বপ্ন সকল উপস্থিত হইয়া সুনিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইতে না পাবে, তজ্জন্য যত্নপর হইবেন।

কবিরাজ শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ সেন।

সদ্‌বৃত্ত।

উপক্রমণীয়াধ্যায়।

যাহার শরীরে বায়ু-পিত্ত-কফ, কায়াগ্নি এবং জঠরানল স্বস্থানে, স্বমানে, স্বভাবে রহিয়া স্বস্বকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকে, রসরক্তাদি ধাতুব্যূহ স্বভাব-ভ্রষ্ট ও দোষ-দুষ্ট না হইয়া শরীরের পুষ্টি এবং মনের তুষ্টি বিধান করে, আহার পরিপাকান্তে অসার পার্থিবাংশ মলরূপে এবং জলীয়াংশ মূত্ররূপে পরিণত হইবার বাধা না ঘটে; সঞ্জাত মলমূত্র, শরীরের

বিশীর্ণ বিধ্বস্ত তন্তুকী প্রভৃতি অবাধে মলায়ন পথদিয়া বাহির হইয়া যায়, রক্ত-সঞ্চলন-শ্বাস প্রশ্বাস প্রভৃতি শারীর-ক্রিয়া অবাধে চলিতে থাকে, পরন্তু আত্মা মনঃ এবং ইন্দ্রিয়-গ্রাম সুপ্রসন্ন রহিয়া পরম মঙ্গল বিধান করে, তাহাকে স্বস্থ বলে। স্বস্থ-ব্যক্তি ভাবের নাম স্বাস্থ্য বা আরোগ্যের অপর নাম সুখ।

সুখের কামনা স্বাভাবিকী, সকলেই সুখের কামনা করে; দুঃখ-ভোগ কাহারও অভীপ্সিত নহে। সুখের জন্য প্রাণি সকল প্রাণ-পণ করিয়া মনঃ, বুদ্ধি এবং শরীর পরিচালনা করত নানা প্রকার কাজ করে। তথাপি কেহই দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না। ত্রিবিধ দুঃখ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক—বাহু প্রসারণ করিয়া প্রাণিগণকে আলিঙ্গন করিবার জন্য সতত উদ্যুক্ত রহিয়াছে। দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় কি? ঐকান্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি বা মুক্তির কথা বলিতেছি না। মুক্তি যোগি জনের ভাগ্যে ঘটিতে পারে, সাধারণের অদৃষ্টে ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। কি করিলে দুঃখের অল্পতা ঘটে অর্থাৎ কিরূপ কাজ করিলে সকলে অরোগ শরীরে প্রফুল্ল অন্তঃকরণে সুখায়ুঃ উপভোগ করিতে সমর্থ হন তাহারই কথা হইতেছে।

সত্যবটে—

"সুখার্থাঃ সর্ব্বভূতানাং মতাঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ।

কিন্তু—

সুখঞ্চ ন বিনা ধর্ম্মাৎ তস্মাদ্ ধর্ম্ম-পরো ভবেৎ॥"

ধর্ম্মভিন্ন সুখ হয় না, সুখী হইতে হইলে ধর্ম্মাচরণ করিতে হয়।

ধর্ম্ম না বুঝিলে, ধর্ম্মাচরণ সম্ভবপর নহে। ধর্ম্মাচরণ না করিলে সুখাবাপ্তি এবং দুঃখ হানির সম্ভাবনা নাই। তজ্জন্য ধর্ম্ম কি, তাহা বিশেষরূপে হৃদঙ্গম করিয়া ধর্ম্ম-পথাবলম্বন করত সুখায়ুঃ উপভোগ করিবার চেষ্টা করা মনুষ্যমাত্রেরই সর্ব্বাগ্রগণ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

ধর্ম্ম কাহাকে বলে? এ প্রশ্নের উত্তর অল্প কথায় দেওয়া যায় না। বহু কথা বলিয়াও ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া যায় কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। মহাপ্রাজ্ঞ মহাভারতকার যুধিষ্ঠিরের মুখদিয়া বকরূপী ধর্ম্মের নিকট বলাইয়াছেন—"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং"। যখন দেবকল্প ব্যাসদেবের বিবেচনায় ধর্ম্মতত্ত্ব দুরধিগম্য, তখন ধর্ম্মের লক্ষণ নির্দ্দেশ করা সম্ভবপর কি না তাহা বলা যায় না।

তবে উচ্চার্য্যমান শব্দ মাত্রেই প্রকৃতি-মূলক। ধর্ম্ম শব্দের মূলেও একটী প্রকৃতি রহিয়াছে। সে প্রকৃতি 'ধৃ' ধাতুর। ধৃ ধাতুর অর্থ ধারণ করা। তদুত্তর কর্ত্তৃ-বাচ্যে 'ম' প্রত্যয় বিধান করিলে ধর্ম্ম শব্দ নিষ্পন্ন হয়। "ধরতীতি ধর্ম্মঃ।' অর্থাৎ যে ধারণ করে, তাহার নাম ধর্ম্ম। নিরুক্তিও লক্ষণের মধ্যে পরিগণিত। উক্ত নিরুক্তি বা ব্যুৎপত্তি অনুসারে বুঝিলাম—যে ধারণ করে সেই ধর্ম্ম। এটী ধর্ম্মের ব্যাপক লক্ষণ, কুত্রাপি ইহার ব্যভিচার নাই। সমস্ত জগৎ এবং জগতের চেতনাচেতন পদার্থ সমূহ ধারণাত্মক ধর্ম্মাধীন। সেই ধর্ম্ম বলে সমস্তই বিধৃত হইয়া সুস্থিত রহিয়াছে। ধর্ম্ম-হীন হইলেই সমস্তই বিধ্বস্ত হইয়া যায়। সৃষ্টি কালে বিধাতৃ-বিধানুসারে সৃজ্যমান পদার্থের উপাদান সকল যেমন-যেমন ভাবে সমবেত হইতে থাকে, ধারণাত্মক ধর্ম্ম সেই গুলি সেই-সেই রূপ ভাবে ধারণ করিয়া

রাখিতে থাকে। ধর্ম্মই স্থিতি কালের সুস্থিরতা বিধান করে। বিনাশ কালে বিশ্লিষ্ট উপাদান লইয়া, যাহা যাহার নিকট হইতে আসিয়াছিল, তাহা তাহার অঙ্গে মিশাইয়া ধরিয়া রাখিতে থাকে; কিছুই নষ্ট হইতে দেয় না। ধর্ম্ম সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে বিদ্যমান রহিয়া জগৎ ধারণ করিয়া রাখিয়াছে।

ধর্ম্মের আরও অনেক ব্যাপ্যার্থ আছে, দুই একটীর উল্লেখ করিতেছি। অতি অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া পৃথিবীর সকল মনুষ্যই জানেন যে, এ জগতের একজন স্রষ্টা এবং বিধাতা আছেন। অনেকে পরলোকও স্বীকার করেন। যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং পরলোক মানিয়া চলেন, তাঁহাদিগকে আস্তিক বলে। আস্তিকেরা ইহকালের মঙ্গলের জন্য এবং পরকালের কল্যাণের নিমিত্ত স্রষ্টার অর্চ্চনা করেন এবং বিধাতৃ-বিধান জ্ঞান করিয়া শাস্ত্র বিশেষ মানিয়া চলেন। দেবারাধনা এবং-শাস্ত্র বিশেষের মত অনুসরণ করিয়া চলার নামও ধর্ম্ম। পৃথিবীতে বহু ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে। যেমন হিন্দু ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম এবং খৃষ্টধর্ম্ম প্রভৃতি।

ভগবান্ মনু বলেন,—বেদ-স্মৃতি সদাচার আপনার আত্মার প্রিয় ধর্ম্মের লক্ষণ। অন্যত্র বলিয়াছেন—ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য এবং অক্রোধ —এই দশটী ধর্ম্মের লক্ষণ।

ধর্ম্মের আরও অনেক প্রকার অর্থ প্রচলিত আছে। যেমন চোরের ধর্ম্ম চুরি করা, আগুনের ধর্ম্ম দাহ করা, চুম্বকের ধর্ম্ম লৌহ আকর্ষণ করা—ইত্যাদি। তত কথায় আমাদের প্রয়োজন নাই। যাহা পালন করিলে পৃথিবীর নর-নারীগণ হিতায়ুঃ এবং সুখায়ুঃ উপভোগ করিতে পারেন, তাহাই আমাদের প্রস্তুত বিষয়। সেই ধর্ম্মের নাম সদ্বৃত্ত।

কোন্ কোন্ সদ্বৃত্ত পালন করিলে সুখ বা আরোগ্য লাভ করা যায়, তাহা জানা দুর্ঘট নহে। এখনও আমাদের দেশে প্রাচীন কালের বেদ, স্মৃতি, তন্ত্র, পুরাণ, ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র, কাব্য, কথাগ্রন্থ এবং চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতি রাশি রাশি গ্রন্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই সকল গ্রন্থে সে কালের ঋষি এবং ঋষিকল্প মনীষীগণ নানাছলে অনুষ্ঠেয় সদ্বৃত্ত সমস্তের উপদেশ দিতে কৃপণতা করেন নাই। তার পর বর্ত্তমান সময়ে আমরা নানা দিগ্‌দেশ হইতে আনীত ধর্ম্মগ্রন্থ, নীতিগ্রন্থ এবং নানাবিধ জ্ঞান বিজ্ঞানের বহুগ্রন্থ পড়িবার সুযোগ পাইয়াছি। মনোনিবেশ পূর্ব্বক সেই সকল গ্রন্থ পড়িলে বা তাহার মর্ম্মার্থ শ্রবণ করিলে সমস্ত সদ্‌বৃত্ত জানা যাইতে পারে। তাই বলিতেছিলাম, যে সকল সদ্বৃত্ত পালন করিলে শারীরিক মানসিক স্বাস্থ্য লাভ করা যায়, তাহা অবগত হওয়া অসম্ভব পর নহে, নানা কারণে বর্ত্তমান সময়ে সদ্বৃত্ত পালন করাই দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে।

যে সকল কারণে আমরা সদ্বৃত্ত পালনে অনভ্যস্ত হইয়া অসদাচার-পরায়ণ হইয়া উঠিয়াছি, সেই সকল কারণের মধ্যে শিক্ষা-বিপর্য্যয়ই মুখ্য কারণ। পূর্ব্বে আমাদের দেশে বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রচলন ছিল। হয়ত শূদ্রবর্ণের শিক্ষা সম্বন্ধে তাদৃশ কঠোর নিয়ম না থাকিতে পারে; কিন্তু দ্বিজবর্ণের—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য জাতির সন্তানগণকে বাধ্য করিয়া বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হইত। উপনয়ন সংস্কারের অপরিহার্য্যতাই তাহার প্রকৃষ্ট

প্রমাণ। এখন যেমন প্রাবেশিক শুল্ক বা এড্‌মিশন্ ফি দিলেই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হওয়া যায়, তখন বিদ্যামন্দিরে প্রবেশের পথ সেরূপ সুগম ছিল না। সে সময়ে উপনীত হইয়া কতকগুলি সদাচার পরিপালনে রত রহিয়া, গুরুগৃহে দীর্ঘকাল বাস করত বিদ্যাভ্যাস করিতে হইত।

বালকের নির্দ্দিষ্ট শিক্ষাকাল উপস্থিত হইলেই তাহাকে আচার্য্য-গুরুর নিকট অর্পণ করা হইত। আচার্য্য মানবকের সংস্কার বিধান করিয়া, শিষ্যকে বহু নিয়মে বাধ্য রাখিয়া শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হইতেন। উপনীত মানবক গুরুর অনুশাসনে ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করতঃ কাম, ক্রোধ, মান, অহঙ্কার, লোভ, মোহ, ঈর্ষা, পারুষ্য, অনৃত এবং আলস্য প্রভৃতি পরিহার পূর্ব্বক গুরুগৃহে রহিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেন। দীর্ঘকাল-ব্যাপি-যম-নিয়মে নিয়মিত ব্রহ্মচারিগণের শরীর যথোচিত উপচিত এবং বলিষ্ঠ হইত। অনুশীলনে মনোবৃত্তি স্ফূর্ত্তি লাভ করিত এবং বিদ্যাভ্যাসে বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হইত। তাহার পর তাহারা সদাচারে অভ্যস্ত হইয়া এবং মনুষ্যত্বলাভ করিয়া গৃহ-ধর্ম্ম আচরণের জন্য গৃহে ফিরিয়া আসিতেন।

সে সময়ে গৃহস্থাশ্রম প্রেম-ধর্ম্ম উপার্জ্জনের আশ্রম ছিল। গৃহস্থ হইয়া গৃহিগণ ধর্ম্মাচরণের জন্য ধর্ম্ম-পত্নী গ্রহণ করিতেন তাঁহারা গুরুজনে ভক্তি, বন্ধুজনে সৌখ্য, সন্তানকল্প জনে বাৎসল্য, আর্ত্তজনে দয়া, প্রভুজনে দাস্য, ভার্য্যায় মাধ্বীকতা এবং গৃহাগত জনে পরম প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রেম-ধর্ম্মের সাধনা করিতেন। মনঃ যখন বিশ্বজনীন প্রেমপূর্ণ হইয়া উঠিত, তখন গৃহস্থগণ গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আশ্রমান্তর আশ্রয় করিতেন।

বহুকাল হইল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম উঠিয়া গিয়াছে। শিক্ষার গতিও ফিরিয়াছে। বলবদ্‌ দেশাচার এবং লোকাচারের খাতিরে উপনয়ন সংস্কারটা আজিও সম্যক্ লোপ পায় নাই। ব্রাহ্মণ সন্তানকে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেই হয়, অন্যান্য দ্বিজবর্ণের মধ্যে উপনয়ন সংস্কারের গোলোযোগ ঘটিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, অধুনা বিদ্যাশিক্ষার অধিকারের আশায় কাহাকেও উপনীত হইয়া ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিতে হয় না। এখন প্রাবেশিক শুল্ক বা এড্‌মিশন্ ফি দিলেই যে কেহ কোন বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইতে পারেন।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম-ভ্রংশের এবং সদ্বৃত্তের অননুষ্ঠানের দ্বিতীয় কারণ যুগ-বিপর্য্যয়। কথিত আছে—

"সত্যং ত্রেতা যুগঞ্চৈব দ্বাপরং কলিরেবচ।
রাজ্ঞোবৃত্তানি সর্ব্বাণি রাজাহি যুগমুচ্যতে॥"

বস্তুতঃ রাজাই যুগের প্রবর্ত্তক। দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতবর্ষে নানা জাতীয় অহিন্দু-রাজগণ রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। যখন যিনি রাজা হইয়াছেন, তখন তিনি প্রকৃতিপুঞ্জকে স্বকীয় ধর্ম্ম এবং স্বজাতীয় আচরণ শিক্ষা দিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছেন। সত্য বটে, কোন রাজাই সম্যক্‌প্রকারে সমাজবিজয় করিতে পারেন নাই, কিন্তু রাজপ্রভাব একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। যুগে যুগে ভারতবাসীরা বিদেশী ভাব অনুকরণ করিয়া আসিতেছেন এবং ক্রমশঃ দেশকালোপযোগী সদাচার-ভ্রষ্ট হইতেছেন।

যুগ-চক্রে ঘুরিয়া-ফিরিয়া ভারতের হিন্দুগণ এক অতিভীষণ যুগান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে সময়ের ন্যায় দুঃসময় এদেশে আর কখন উপস্থিত হয় নাই। যে সময়ে

মুসলমান রাজার হাত হইতে রাজদণ্ড স্খলিত-প্রায় অথচ ইংরেজ রাজ্য পত্তন হয় নাই,—সেই সময়ের কথা বলিতেছি। সত্য বটে, সে সময়েও ভারতবর্ষে অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনার প্রথা সম্যক্ লোপ পায় নাই। স্থানে স্থানে প্রাথমিক পাঠশালা স্থাপিত ছিল, স্থান-বিশেষে নানা শাস্ত্র অধ্যাপনার জন্য চতুষ্পাঠীও প্রতিষ্ঠিত ছিল; কোন কোন স্থানে মৌলবীরা পাঠশালা স্থাপন করিয়া আরবী, পার্শী এবং উর্দ্দূ ভাষা শিক্ষা দিতেন। কিন্তু সে সময়ে মনুষ্যত্ব লাভের জন্য কেহ কিছু শিখিতেননা; উপার্জ্জনক্ষম হইবার জন্যই লেখা পড়া শিখিবার প্রয়োজন হইত। আর এক কথা, সে সময়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত জনের সংখ্যা দেশের তদানীন্তন জনসংখ্যার তুলনায় অল্পই ছিল,—হাজার ভাগের এক ভাগ ছিল কিনা, তাহাও সন্দেহস্থল। তখন দেশ অজ্ঞানান্ধ-তমসাচ্ছন্ন হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ত্রিকালদর্শী-মহর্ষিগণ, দূর ভবিষ্যতে দেশের যে এরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইবে, তাহা বুঝিয়া, বেদ-বিহীন জনসাধারণের শিক্ষার জন্য পুরাণ, ইতিহাস, এবং তন্ত্র প্রভৃতি নানাশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বেদার্থের অবিপরীত তত্তৎ শাস্ত্রের উপদেশ যাহাতে এ দেশের নরনারী সকলের হৃদয়ে স্থায়ী আস্পদ লাভ করে, পরবর্ত্তি-মনীষীগণ তজ্জন্য যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে স্মার্ত্ত-শিরোমণি রঘুনন্দন হিন্দু সমাজটাকে কর্ম্মপাশে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য অষ্টাবিংশতি তত্ত্বাত্মক নব্য-স্মৃতি প্রণয়ন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের যত্ন একাণ্ড নিষ্ফল হয় নাই; তবে যুগপ্রভাবে সম্যক্ সাফল্য-লাভও করিতে পারে নাই। শাস্ত্রানুশাসন ছিল বলিয়া হিন্দুসমাজ কোরাণ, কৃপাণপাণি মুসলমান ধর্ম্মপ্রচারকের বশবর্ত্তী না হইয়া এবং অন্ধকার হইতে আলোকে যাইবার লোভ সম্বরণ করিয়া স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করত আপনার বিরাট দেহ বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। শাস্ত্রানুশাসন-ভীতি না থাকিলে এতদিন হিন্দু নর-নারী অন্যান্য সম্প্রদায়ের অঙ্গীভূত হইয়া যাইত, হিন্দুর অস্তিত্ব লোপ পাইত। সত্য বটে, শাস্ত্রানুশাসন ভয়েই হিন্দুর দেশে বর্ণ-বিচার ছিল এবং দশবিধ সংস্কারের মধ্যে কোন কোন সংস্কার, শৌচাচার, সন্ধ্যাবন্দনা, দেবার্চ্চনা, শ্রাদ্ধ-তর্পণ, অতিথি-পোষণ প্রভৃতি শাস্ত্রাদিষ্ট কর্ম্মগুলি অনুষ্ঠিত হইত। কিন্তু কিছুই নির্দ্দোষ ছিল না।

বর্ণ-বিচার ছিল—ভালই ছিল। তবে বর্ণ-বিচারের বড় বাড়াবাড়ি হইয়াছিল। তজ্জন্য নীচজাতীয় অনেক লোক, মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া, উচ্চজাতীয় লোকের অত্যাচারের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিল। শুধু নিষ্কৃতি লাভ করিয়াই তাহারা নিশ্চিন্ত রহে নাই; সময়ে সময়ে হিন্দু জাতির উপর অত্যাচারও করিত। তজ্জন্য এ দেশে বিষম মুসলমান-ভীতি উপস্থিত হইয়াছিল। সে সকল কথা এবং সংস্কার প্রভৃতির দোষের কথা সকলেরই জানা আছে, লিপি-বাহুল্যের প্রয়োজন নাই। ফল কথা এই যে, মুসলমান রাজত্বের অবসানকালে হিন্দুর সমাজ ছিল বটে কিন্তু হিন্দুত্ব কলুষিত হইয়া পড়িয়াছিল।

তাহার পর, যে সময়ে মুসলমানের রাজত্ব যায়-যায় হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময়ে ইংরেজ, বণিক্ সম্প্রদায় এ দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়া, বাণিজ্য ব্যপদেশে বহুধন উপার্জ্জন এবং সঞ্চয় করিতেছিলেন টাকার সঙ্গে সঙ্গে বল-সঞ্চয়ও হইতেছিল। ধনে-জনে এবং বুদ্ধি-বলে বলীয়ান্

ইংরেজ হৃদয়ে রাজ্যলাভের আশার সঞ্চার হইল। ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপায় মুসলমান রাজার হাত হইতে স্খলিতপ্রায় রাজদণ্ড ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি হস্তগত করিলেন। তখন ভারতবর্ষ বিশেষতঃ বঙ্গদেশে আর এক নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত হইল। এ যুগের প্রথম ভাগটা ভারতবাসীর পক্ষে ভাল গেলনা। কিছুকাল পরে, ভারতের সৌভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপায় ইংরেজ রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, রাজপুরুষেরা নানা দুষ্কৃতি-দমনে ব্যাপৃত রহিলেন এবং প্রকৃতিপুঞ্জকে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিখাইবার সুবন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন বাঙ্গালাদেশে অতি অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ-বালক এবং তদপেক্ষা আরও অল্পসংখ্যক বৈদ্যবালক চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ এবং শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিতেন। অন্যান্য বর্ণের উচ্চশিক্ষার উপায় ছিল না। অতি অকিঞ্চিৎকর প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া বা না করিয়া তাহাদিগকে সংসারের কাজে ব্যাপৃত হইতে হইত। ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যামন্দিরের দ্বার সাধারণের জন্য উন্মুক্ত রহিল অর্থাৎ জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে বিদ্যাদানের ব্যবস্থা হইল। পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকে তদানীন্তন ভারতের অজ্ঞানান্ধকার ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল।

সদাশয় ইংরেজের কৃপায় এদেশে বহুজ্ঞানের আকর ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইল বটে, কিন্তু শিক্ষার্থী-বালকগণকে ব্রহ্মচর্য্যাদি সদ্বৃত্ত পালনে বাধ্য রাখিয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইল না। এ ত্রুটি অবশ্য ইংরেজের নহে। তাঁহারা বিদেশাগত। সদ্বৃত্ত ভ্রষ্ট হইয়া এদেশের লোক কতদূর অধঃপতনের সোপানে নামিয়া পড়িয়াছে হয় ত তাহা তাঁহারা জানিতেন না। আর পূর্ব্বকালের আচার্য্যেরা শিষ্যদিগকে কিরূপ নিয়মে আবদ্ধ রাখিয়া বিদ্যাদান করত মানুষ করিয়া দিতেন, সে তত্ত্বও জানিবার সুযোগ তখন তাঁহাদের হয় নাই। যে সময়ে ইংরেজেরা এ দেশে শিক্ষা বিস্তারের সূত্রপাত করেন, সে সময়ে এদেশে বুদ্ধিমান্, জ্ঞানবান্ এবং ক্ষমতাশালী লোকও ছিলেন। ইংরেজের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠতাও ছিল। তাঁহারা যদি ব্রহ্মচর্য্যাদি সদাচারে বাধ্য রাখিয়া বালকদিগকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে পরামর্শ দিতেন, তাহা হইলে সেকালের সদাশয় ইংরেজ সম্ভবতঃ সে পরামর্শ শুনিতেন এবং পরামর্শানুরূপ কাজও করিতেন।

বর্ত্তমান সময়ে সদ্বৃত্তভ্রষ্ট অথচ কঠোর অধ্যয়নেরত কিশোর এবং যুবকগণের শারীরিক এবং মানসিক দুর্দ্দশা দেখিলে মনে হয়, শিক্ষার সুফল কে ভোগ করিবে? আর মনে হয় কি করিলে যেমন ছিল তেমনি হয়? কিন্তু সুদীর্ঘ কালের পর এরূপ চিন্তা সুফলপ্রসূ হইবে বলিয়া মনে হয় না।

যে সময়ে ভারতবর্ষ কান্তারভূয়িষ্ঠ প্রান্তরবহুল, বিমলজলপূর্ণ-সরিৎসরোবরসুলভ এবং বিরল-জনপদ ছিল; যখন গোসর্গে প্রচুর দুগ্ধ দান করিয়া কান্তারে প্রান্তরে চরিয়া-ফিরিয়া গোধূলিসময়ে ভুক্ত-পীত-হৃষ্টপুষ্ট ঘটোঘ্নী গাভীর পাল স্ব স্ব অধিপতির গৃহে ফিরিয়া আসিত; যখন পরিচ্ছদের পারিপাট্য লোকে বুঝিত না; অতি অকিঞ্চিৎকর-বসনে লজ্জা নিবারণ এবং শীতত্রাণ করিতে কেহ লজ্জা বোধ করিতনা বা নিন্দাভাজন হইত না. সংক্ষেপতঃ যে দেশে অন্নবস্ত্রের দায় এবং বিলাসপ্রিয়তা ছিল না, সেই দেশে সেই

সময়ে সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্য ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা ছিল। তদানীন্তন ব্রাহ্মণগণ নিশ্চিন্তমনে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং প্রণয়ন করিতেন এবং সমাগত শিষ্যদিগকে অন্নদানাদি দ্বারা পোষণ করিয়া কুলপতি উপাধি লাভ করত ধন্যমনা হইতেন।

সে দেশ নাই, সে কালও গত হইয়াছে। এখন আর উঞ্ছবৃত্তি এবং সৎপ্রতিগ্রহ প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা যায় না। পেট-কাঁকালের দায়ে এবং অন্য বহুবিধ দায়ে পড়িয়া ব্রাহ্মণগণ স্বতন্ত্র পথে চলিতে বাধ্য হইয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম উঠিয়া গিয়াছে। অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিয়া সম্প্রতি লুপ্তপ্রায় হইয়াছে; যৎকিঞ্চিৎ প্রচলিত আছে তাহা নগণ্যের মধ্যে।

এদেশে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু গৃহে বাস করিয়াও সদ্বৃত্ত পালন করা যাইতে পারে। সেই আশায় আমরা নানা শাস্ত্র হইতে সদ্বৃত্ত সঙ্কলন করিয়া আয়ুর্ব্বেদের পাঠকদিগকে ক্রমশঃ উপহার প্রদান করিব স্থির করিয়াছি।

কবিরাজ শ্রীশীতল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন।

চরকোক্ত ষড়ুপায় বিধি।

—:*:—

কবল বিধি।

বায়ু, পিত্ত, কফনাশী দ্রব্য মুখে দিয়া।
কবলে অর্দ্ধাংশ ত্যাগে চর্ব্বণ করিয়া॥
কবলে আহার্য্য দ্রব্যে অভিরুচি হয়।
নাশে-কফ, তৃষ্ণা, শোষ, বৈরস্য নিচয়॥

প্রতিসারণ বিধি।

চূর্ণ বা কল্কাবলেহ, অঙ্গুলি দ্বারায়।
ঘর্ষিলে 'প্রতিসারণ' দন্তাস্য জিহ্বায়॥
তা'তে-মুখ-বিরসতা, দুর্গন্ধ তাহার।
মুখশোষ, তৃষ্ণারুচি, দন্তাঢ্য সংহার॥
অসম্যক কৃতে হয় মুখের জড়তা।
কফোৎক্লেশ, রসাস্বাদে শক্তির হ্রাসতা।
অতিরিক্তে-মুখপাক, মুখশোষ আর,
তৃষ্ণা, বমি, ক্লান্তি ভাব, হইবে তাহার॥

মূর্দ্ধতৈল বিধি।

অভ্যঙ্গ ও পরিষেক, পিচু, বস্তি আর।
যথাক্রমে বলবান মূর্দ্ধতৈল চার॥
অভ্যঙ্গাদি আদি ত্রয় প্রসিদ্ধ সকল।
শিরোবস্তি বিধি তেঁই কহিব কেবল॥
দ্বিমুখ দ্বাদশাঙ্গুলি, চর্ম্ম বিনির্ম্মিত,
শিরোবস্তি রোগী-শিরে করিয়া যোজিত;
সন্ধিস্থান পিষ্ট মাষকলায়ে রুধিবে।
বস্তি, রোগী-মস্তকের প্রমাণ হইবে॥
ঈষদুষ্ণ স্নেহে তাহা করিয়া পূরণ,
নাশা, কর্ণ, মুখস্রাব নহে যতক্ষণ,
কিম্বা শূল উপশম না হয় যাবৎ,
অথবা সহস্র মাত্রা কাল, এতাবৎ,
রাখিবে ধারণ করি; রাখি অনাহারে,
শিরোবস্তি-দান বৈদ্য করিবে তাহারে॥

পাঁচ কিম্বা সাতদিন মস্তকে ধারণ।
করিবে এ শিরোবস্তি কর্ত্তব্য-কারণ॥
মস্তক হইতে বস্তি করিয়া মোচন।
সেই স্নেহ সর্ব্ব অঙ্গে করিবে মর্দ্দন॥
ঈষদুষ্ণ জলে তা'কে স্নান করাইবে।
দুর্জ্জয় বাতজ রোগ এতে পলাইবে॥
শিরঃকম্পা আদি রোগ নাশিবে নিশ্চয়।
সর্ব্বকালে শিরোবস্তি প্রয়োজিত হয়॥

কর্ণপূরণ বিধি।

কর্ণে স্বেদ দিয়ে, রোগী পার্শ্বশায়ী করি,
দিবে উষ্ণ মূত্র, স্নেহ, মাংস রস পূরি।
কর্ণ-কণ্ঠ-শিরোগত রোগে পাঁচশত,
গুরু উচ্চারণ কাল রাখিবে সেমত॥
মূত্রাদি কর্ণপূরণে আহারের আগে।
সূর্য্যাস্তের পরে, কর্ণে তৈলাদি প্রয়োগে॥
কর্ণ-শূলে-ঈষদুষ্ণ ছাগমূত্র সহ,
সৈন্ধব মিলিত করি দেয় যদি কেহ,
কর্ণশূল, কর্ণপাক প্রভৃতি যে রোগ।
নিশ্চয় বিনাশ হ'বে করিলে প্রয়োগ॥
আদা, যষ্টিমধু, তৈল, সৈন্ধব—এসব।
ঈষদুষ্ণ কর্ণে দিলে বেদনা লাঘব॥
পীতাকন্দ পত্রে ঘৃত করিয়া ম্রক্ষণ।
তপ্ত নিষ্পীড়িত রস শূলঘ্ন তেমন॥

কর্ণপূরণ ঔষধ।

আমলকী, তিলপর্ণী পাতিলেবুর রস,
সোহাগার খৈ কিম্বা কাগজির রস,
ঈষদুষ্ণ, বারি কর্ণে করিলে প্রদান,
কর্ণের বেদনা তা'তে হবে অন্তর্দ্ধান॥
কদ্‌বেল টাবালেবু-আদা-রস কাঁজী।
উষ্ণবারি কর্ণশূলে দিতে হবে রাজী॥

কাঁজীতে আকন্দাঙ্কুর পেষণ করিয়া,
তৈল ও লবণ তা'তে ল'বে মিশাইয়া ;
মনসা-ডালের মধ্য কুরিয়া তৎপরে,
আবরি মনসা পত্রে রাখি তদন্তরে ;
পুট পাক করি তার ঈষদুষ্ণ রসে।
সুদারুণ কর্ণপীড়া পূরণে বিনাশে।
মহাপঞ্চ মূল-কাঠ অষ্টাঙ্গুলমান,
বেষ্টিয়া রেশমী বস্ত্রে তৈলেতে সন্ধান ;
অগ্নি জ্বালাইয়া নিম্নে পাত্রটি রাখিবে,
তাহাতে বিচ্যুত তৈলে দীপিকা জ্বালিবে॥
ঈষদুষ্ণ কর্ণে ইহা করিলে প্রদান।
কর্ণের বেদনা সদ্যঃ হয় অন্তর্দ্ধান॥
এইরূপ দেবদারু, কুড়কাষ্ঠ দিয়া।
দীপিকা প্রস্তুত হয় রাখিবে জানিয়া॥

শোনামূল-কল্কসহ বিহিত বিধানে।
পাকতৈলে ত্রিদোষজ কর্ণশূল হানে।
যষ্টিমধু, অশ্বগন্ধা, ধনে, মাষকলায়ে,
ইহাদের কল্ক কাথ ; শূকর-বসায়ে,
পাক করি কর্ণে তাহা করিলে পূরণ।
কর্ণনাদ রোগ এতে হয় প্রশমন॥

সাচিক্ষার, শুষ্ক মূলা, শুলফা, পিপুল,
হিঙ্গুকল্ক, তৈলএর চতুর্গুণ তুল।
তৈল-চতুর্গুণ শুক্ত করিয়া মিলন।
পাক করি কর্ণে তাহা করিলে পূরণ।
কর্ণনাদ, কর্ণশূল, বাধির্য্য অপর।
কর্ণস্রাব প্রশমিত হইবে সত্বর॥

আপাঙ্গের ক্ষার জল, কল্ক ও তাহার,
সেই তৈলে কর্ণ রোগ হয় প্রতিকার।
শম্বুকের মাংস, কটু তৈলে পাক করি,
কর্ণে দিলে শীঘ্র যায় কর্ণ-নালী সারি,
পঞ্চকষায়ের চূর্ণ কয়েতবেল রস,
মধুযোগে কর্ণে দিলে কর্ণস্রাব রস।

গাব, হরীতকী, লোধ, আমলকী আর,
মঞ্জিষ্ঠা পঞ্চকষায় নামটী ইহার।
সর্জ্জিক্ষার চূর্ণ দিলে টাবালেবু যোগে,
কর্ণস্রাব-দাহ-শূল রোগে নাহি ভোগে।
আম-জাম-মৌল-বট-পত্র কল্ক সহ,
যথাবিধি তৈল পাক করি যদি কেহ,
পূতিকর্ণ রোগে তাহা করিয়ে প্রদান।
অচিরে সে রোগ তবে হয় অন্তর্দ্ধান॥
গোমূত্র ও হরিতাল করিয়া মিলন,
কিম্বা কটুতৈলে কর্ণ কীট-প্রশমন।
সজিনা ও হুড় হুড়ে, আলকুশী রসে,
ত্রিকটুর চূর্ণে তথা কর্ণ কীট নাশে।
মস্ত আর হিঙ্গু কর্ণে করিলে প্রদান।
আশু কর্ণ কীট তাতে হবে অন্তর্দ্ধান॥

লেপ বিধি।

লেপন, লিপ্তক, লেপ, একার্থজ্ঞাপন।
দোষঘ্ন, বিষঘ্ন, বর্ণ্য, ত্রিবিধ লেপন॥
চতুর্থাংশ, তৃতীয়াংশ, অর্দ্ধাঙ্গুলীমান।
পুরু লেপ আলেপনে ত্রিবিধ প্রমান॥
আর্দ্র লেপ ব্যবহার্য্য, ব্যাধি বিনাশক।
বিশুষ্ক প্রলেপ-দেহ-কান্তিসংহারক॥

দোষঘ্ন লেপ।

পুনর্নবা, দেবদারু, সরিষা ধবল,
শুণ্ঠি, সজিনার ছাল মিলিত সকল;
কাঁজিতে পেষণ করি, করিলে লেপন।
সর্ব্ববিধ শোথ এতে হইবে নিধন॥
শিরিষ, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, এলা,
তগর পাদুকা, জটামাংসী, কুড়, বালা;
হরিদ্রা যুগল,—সব চূর্ণ করি নিবে।
পঞ্চমাংস তাতে মিলিত করিবে॥
জল সহযোগে ইহা করিলে লেপন।
বিসর্প, বিস্ফোট, ব্রণ, শোথ বিনাশন॥

বিষঘ্ন লেপ।

ছাগদুগ্ধ, তিলসহ করিয়া মিলিত;
অথবা কৃষ্ণমৃত্তিকা, তিল নবনীত,
পেষণ করিয়া দুই করিলে লেপন।
ভল্লাতকজাত শোথ হইবে নিধন॥

বর্ণ লেপ।

লোহিত চন্দন, লোধ, মঞ্জিষ্ঠা ও কুড়,
প্রিয়ঙ্গু বটের ঝুড়ি, সহিত মসুর;
একত্র পেষণ করি, করিলে লেপন।
ব্যঙ্গনাশী মুখকান্তি করিবে বর্দ্ধন॥

লেপের বিধান।

প্রলেপ প্রদেহ ভেদে দ্বিবিধ কথিত,
লেপের বিধান ক্রমে হইবে বর্ণিত॥
মহিষ চর্ম্মের ন্যায় উন্নত উভয়।
আর্দ্র ব্যবহৃত লেপ জানিবে নিশ্চয়॥
শীতল, পাতলা, শোষী, পিত্তবিনাশক।
তাহাকে প্রলেপ বলি কহিবে ভিষক॥
আর্দ্র, গাঢ়, শুষ্ক লেপ প্রদেহ সংজ্ঞক।
প্রদেহ বাত ও কফ প্রশান্তি কারক॥
নিশিতে ও শুষ্ক লেপ ব্যবহৃত নয়।
ব্রণাদি পীড়ন হেতু শুষ্কতেও হয়॥
তমোতে আবৃত উষ্মা রোমকূপস্থিত।
রাত্রিকালে স্বভাবতঃ হয় বিনিস্থত॥
প্রলেপ থাকিলে উষ্মা বাহিরিতে নারে।
রাত্রিতে প্রলেপ তেঁই কভু না আচরে॥
অপাকী, প্রবল রক্ত শ্লেষ্ম সম্ভূত।
ব্রণে লেপ রাত্রি যোগে অবশ্য সম্ভব॥
যষ্টিমধু, সূচিমুখী, লোহিত চন্দন,
বালা, পদ্ম, চিতামূল, পর্পট, বিরন্,
সমভাগে জলদ্বারা পেষণ করিয়া।
লেপ দিলে পিত্ত-শোথ যাইবে সারিয়া।

প্রদেহ।

ছোলঙ্গ লেবুর মূল, জটামাংসী আর,
দেবদারু, রাস্না, শুণ্ঠী, গণিয়ারীচার,
তুল্য পিষ্ট; উষ্ণ করি করিলে প্রদেহ।
বাত শোথ নিবারিত হয় নিঃসন্দেহ॥

কবিরাজ শ্রীরাসবিহারী রায়
কবিকঙ্কণ।

বর্ষাচর্য্যা।

এই সময়ে আকাশ সর্ব্বদা মেঘে আচ্ছন্ন থাকে এবং সর্ব্বদা প্রচুর বারি বর্ষণে ভূমি আর্দ্র হয়। ফলে বর্ষাকালে প্রাণীগণের শরীরও আর্দ্রতা-প্রবণ হইয়া থাকে। মানব-শরীরে গ্রীষ্মকালের সঞ্চিত বায়ু প্রকুপিত হওয়ায় যাহাতে বায়ু প্রশমিত হয়, বর্ষা-ঋতুতে তাহার চেষ্টা করা উচিত। এই সময়ে আহারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। আহারের ব্যতিক্রমে অগ্নিমান্দ্যের সৃষ্টি ত সকল ঋতুতেই হইয়া থাকে, এই সময় আহা-রের ব্যতিক্রমে তাহার সম্ভাবনা আরও অধিক। গুরুভোজন করিলে এ সময় সহজে পরিপাক হয় না, এজন্য লঘুদ্রব্য আহার করা কর্ত্তব্য। এই ঋতুতে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টির জন্য কখন শীতকালের মত বোধ, কখন অনা-বৃষ্টি জন্য সূর্য্যের তেজে গ্রীষ্মকালের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। এই জন্য এই সময়ে অন্যান্য ঋতুর ন্যায় শয়ন, আহার, শয্যা, পরিচ্ছদ প্রভৃতি সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া পরিবর্ত্তন করিবে। বৃষ্টির সময়ে জলে ভিজিবেনা। গাত্র সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখিবে। কারণ এই সময়ে ভূমি হইতে একরূপ দূষিত বাষ্প উত্থিত হইয়া থাকে। উহা অত্যন্ত অনিষ্ট জনক। সমস্ত পানীয় দ্রব্যের সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে এ সময় সুফলদায়ক হইয়া থাকে। বৃষ্টির জল, কূপ, সরোবর, নদী ও পুষ্করিণীর জল উষ্ণ করিয়া, শীতল হইলে, সেই জলে স্নান করা এ সময় স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী হইয়া থাকে। পানীয় জল সম্বন্ধেও এইরূপ রীতি অবলম্বন করা মন্দ নহে। এই ঋতুতে জাঙ্গল মাংস, পুরাতন চাউলের অন্ন, অম্ল, লবণ ও স্নিগ্ধ দ্রব্য আহার করিবে।

এই সময় নির্ম্মল কার্পাস বস্ত্র পরিধান করা হিতজনক। এই ঋতুতে নদীর জল পান করিতে নাই এবং ভূমিতে শয়ন বিশেষ অহিতকর।

ব্যায়াম সকল ঋতুতেই হিতকর, এ সময়ও সহ্য মত ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য। এই ঋতুর উৎপন্ন ওষধি সকল অল্পবীর্য্য হইয়া থাকে। এই সময়ে চন্দ্র কিরণ দ্বারা পৃথিবী সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ করে। তাহার জন্য অম্ল, লবণ ও মধুর রস বর্দ্ধিত হয়। বর্ষা বিসর্গ ঋতু বলিয়া প্রাণীগণের বল ও বর্ণ এই সময়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, একালে মধুর রস সেবন করিলে রস, রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা, অস্থি ও শুক্র বর্দ্ধিত হয়, এবং তদ্দ্বারা দৃষ্টি শক্তির প্রখরতা জন্মে এবং বল ও বর্ণের উৎকর্ষ সাধিত হয়। এ সময় অম্ল রস সেবনে

বায়ুর অনুলোম সাধিত হয়, কারণ অম্লরস জারক ও পাচক।

লবণ রস দ্বারা পাচক ও সংশোধক শক্তি বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু অতিমাত্রায় কোন দ্রব্য সেবনই কর্ত্তব্য নহে।

সকল দ্রব্যের অপরিমিত সেবনেই অনিষ্ট হইয়া থাকে। অমৃতের ন্যায় উপকারী এমন যে দুগ্ধ, যাহা আমাদের ভূমিষ্ঠ কাল হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত জীবনী-শক্তির পরিবর্দ্ধক বলিয়া শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট, তাহাও যদি অত্যাধিক পরিমাণে পান করা যায়, তাহা হইলেও তদ্দ্বারা অজীর্ণাদি রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফল কথা হিতকর বস্তুরও অধিক মাত্রায় সেবা করিলে রোগের কারণ হইয়া থাকে। শাস্ত্রকার বলেন—

"প্রাণাং প্রাণভৃতামন্নং তদয়ুক্ত্যা হিতস্ত্যসূন্।
বিষং প্রাণহরং তচ্চ যুক্তিযুক্তং রসায়নম্"।

শ্রীসুধাংশু ভূষণ সেন গুপ্ত।

প্রাপ্ত গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

—)✕(—

টাইফয়েড চিকিৎসা।—ডাক্তার শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাস প্রণীত ও "কাজের লোক" সম্পাদক শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত। মূল্য এক টাকামাত্র। সান্নিপাতিক বা টাইফয়েড্ জ্বর কি এবং তাহার লক্ষণাবলী দেখিয়া হোমিওপ্যাথিক্ মতে কিরূপ চিকিৎসা করা উচিত—ইহা লইয়া পুস্তক খানি লিখিত হইয়াছে। এই রোগে নাড়ীর গতি কিরূপ হয়, কিরূপ নাড়ীর অবস্থা হইলে এ রোগে মৃত্যু হইতে পারে, এ সকল কথার আলোচনা করিবার জন্যও গ্রন্থকার যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার শ্রম সার্থক হইয়াছে। তিনি নাড়ীর কথা বলিতে গিয়া একস্থলে বলিয়াছেন, "নাড়ী যদি ক্ষুদ্র ও অত্যন্ত দ্রুত হয়, তাহা হইলে ভয়ানক দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক, টাইফয়েড্ বা সান্নিপাতিক জ্বরের শেষ অবস্থায় এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।" আমাদের আয়ুর্ব্বেদ বলিয়াছেন,—"ক্ষীণে বলবতী নাড়ী, সা নাড়ী প্রাণ ঘাতিকা"। কাজেই গ্রন্থকার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হইলেও আয়ুর্ব্বেদের উপর তাঁহার শ্রদ্ধা আছে বুঝা গেল। কিরূপ ভাবে রোগের বীজাণু শরীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে, এই রোগের আক্রমণে কিরূপ নিয়ম পালন করা উচিত,—এ সকল কথারও বেশ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এইজন্য পুস্তকখানি শুধু চিকিৎসক দিগের পাঠ্য নহে, সাধারণ লোকের পক্ষেও বিলক্ষণ উপকারী হইয়াছে বলা যাইতে পারে। গ্রন্থকার যে উদ্দেশ্য লইয়া পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ পুস্তকের প্রচারে দেশের উপকার হইবে।

আয়ুর্ব্বেদ তত্ত্ব-বিজ্ঞান।—পূর্ব্বখণ্ড।—কবিরাজ শ্রীরাসবিহারী রায় কবিকঙ্কণ কর্ত্তৃক ও প্রণীত প্রকাশিত। এই পূর্ব্বখণ্ড দুইটি ভাগে বিভক্ত। ১ম ভাগে সৃষ্টিতত্ত্ব এবং ২য় ভাগে স্বাস্থ্যতত্ত্ব লিখিত হইয়াছে। চরক, সুশ্রুত, ভাব প্রকাশ

ও মাধবনিদান প্রভৃতির সরল পদ্যানুবাদ করিয়া গ্রন্থখানি রচিত। রচনা অতি সুন্দর হইয়াছে। নীরস ও জটিল আয়ুর্ব্বেদীয় শ্লোকের ভাব-সমষ্টি ঠিক বজায় রাখিয়া, সরল পদ্যে এরূপ ধরণের গ্রন্থ প্রণয়ণ করা বড়ই কঠিন। প্রকৃত কবি এবং ভাবুক ভিন্ন সে সকল শ্লোকের অনুবাদ এরূপ সহজ ভাবে ব্যক্ত করা সম্ভবপর নহে। সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞগণ যদি যত্নপূর্ব্বক এই গ্রন্থ খানি পাঠ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা সৃষ্টিতত্ত্ব, এবং খাদ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা শিক্ষা করিয়া, আপনাপন স্বাস্থ্যোন্নতি লাভে সমর্থ হইবেন। দেশের অঙ্গনাগণ বাজে নাটক-নবেলের পাঠ-স্পৃহা কয়েক দিনের জন্য বন্ধ রাখিয়া যদি এ গ্রন্থ খানি পাঠ করেন, তাহা হইলেও নিজ নিজ সংসারের মঙ্গল সাধন করিতে পারিবেন। মূল্য কত—তাহার উল্লেখ কিন্তু গ্রন্থের কোন স্থানেও পাওয়া গেল না।

আয়ুর্ব্বেদতত্ত্ব বিজ্ঞান।—মধ্যখণ্ড।—কবিরাজ শ্রীরাসবিহারী রায় কবিকঙ্কণ প্রণীত। এখানি মাধবকর কৃত নিদানের পদ্যানুবাদ। অনুবাদ বেশ সহজ ও প্রাঞ্জল হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থগুলিকে এরূপ ভাবে সাধারণের বোধগম্য করিতে চেষ্টা করিলে, দেশবাসীর প্রভূত উপকারের সম্ভাবনা। আমরা এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

যোগবল।—ধর্ম্মতত্ত্ব এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বিষয়ক আয়ুর্ব্বেদীয় মাসিক পত্র। সম্পাদক কবিরাজ শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ। প্রকাশক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গুপ্ত কবিরাজ, ৩নং কাশীনাথ দত্তের ষ্ট্রীট কলিকাতা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুলসহ ১৷৵ আনা। ২য় বর্ষ। তিন খণ্ডে দুই দুইসংখ্যা করিয়া ১ম হইতে ৬ষ্ঠসংখ্যা। সবগুলির প্রত্যেক খণ্ডেই দুই সংখ্যা করিয়া বাহির হইয়াছে, এজন্য এখানিকে ইহার পরিচালকগণ "মাসিক পত্র অভিধান প্রদান করিলেও, ইহা ঠিক মাসিক কি না বুঝা গেল না, দুইমাস অন্তর ইহা বাহির হয় বলিয়াই উপলব্ধি হইল। তাহার পর "ধর্ম্মতত্ত্ব এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বিষয়ক আয়ুর্ব্বেদীয় মাসিক পত্র" নাম কেন যে ইহার পরিচালকগণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাও বুঝিলামনা, শুধু "আয়ুর্ব্বেদীয় মাসিক পত্র" বলিলে, "আয়ুর্ব্বেদ" কথাটির মধ্যে কি ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝাইতনা? তবে "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বিষয়ক আয়ুর্ব্বেদীয় মাসিক পত্র"—এ কথাটি বলায় অবশ্যই বাহাদুরী আছে। এতদিন "আয়ুর্ব্বেদ" বলিলে উহা প্রাচ্য বলিয়াই সকলে জানিত, এখন কিন্তু "যোগবল" প্রচারে লোকে বুঝিবে, আয়ুর্ব্বেদ শুধু প্রাচ্য নহে,—ইহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ে উদ্ভূত হইয়াছে। অবশ্য স্বীকার করি, বর্ত্তমান সময়ে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার স্রোত অনেকটা বদলাইয়া গিয়াছে। সেকালের মত রোগ আরোগ্য করিবার জন্য সকলেই ধন্বন্তরিকল্প চিকিৎসক হইতে ইচ্ছা করেননা, এখনকার দিনে পাশ্চাত্য চিকিৎসা-ব্যবসায়ের পেটেন্ট ঔষধাদির অনুকরণে মফস্বলে ক্যাটালগ-প্রচারেই অনেকের চিকিৎসা-বৃত্তি সিদ্ধ করা হয়। বাস্তবও অনেক গোঁড়া কবিরাজ ম্যালেরিয়া জ্বর তাড়াইবার জন্য নানারূপ চেষ্টা করিয়াও যখন অকৃতকার্য্য হয়েন, তখন অতিসন্তর্পনে রসসিন্দুরাদির সহিত গোপনে কুইনাইন মিশাইয়া "ম্যালেরিয়ার সিদ্ধ বটিকা" প্রয়োগে

রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন। যোগবলের সম্পাদক কি এই অর্থে "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বিষয়ক আয়ুর্ব্বেদীয়" কথার ব্যবহার করিয়াছেন? ফল, কথা, আমরা এ কথাটীর অর্থ বুঝিলাম না। কাগজের বাহিরে ত এই, এইবার ভিতরের প্রবন্ধ প্রকাশের কথা। ১ম ও ২য় সংখ্যা নাম যুক্ত ১ম বহিখানিতে প্রথমেই প্রকৃতি ও বিকৃতির কথা। এই প্রবন্ধে ধান ভান্‌িতে শিবের গীত অনেক গাহা হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা এই প্রবন্ধের লেখক বর্দ্ধমানবাসিনী রমণী সমাজের "বাজখাই আওয়াজ" শ্রবণে প্রথমতঃ "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশায় প্লীহা বিদীর্ণ হইবার উপক্রম" ভয়ে যে ভীত হইয়াছেন, তাহাই আমাদের দুঃখের কারণ। বলি, নাম জাহির করিবার জন্য, কাগজ পুরাইবার জন্য প্রবন্ধ লিখিতেছ, লেখ, তাহাতে কাহারও আসিয়া-যাইতেছে না, কিন্তু তাহাতে রমণী সমাজে বিদ্রূপ-বর্ষণ কি শিষ্টাচারের পরিচায়ক? বাসন-বিক্রেত্রী হইলেও রমণী, রমণী। যদি হিন্দু বলিয়া পরিচয় প্রদান কর, তাহা হইলে তাঁহাদের সম্মান বজায় রাখিয়া তোমাকে চলিতেই হইবে। তাহার ব্যতিক্রমে সৌজন্যগ্লানি অবশ্যম্ভাবী, ইহা প্রত্যেক হিন্দুই স্বীকার করিবেন। ঐ পুস্তকে ইহার পর "নাড়ীজ্ঞান রহস্য"। ইহাতেও রহস্যজনক ব্যাপার-সমাবেশের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। লেখক একস্থলে বলিয়াছেন,—"অনেকের ধারণা যে, নাড়ীজ্ঞানটা কিছুই নহে, উহা লোক ভুলান একটা ছলনা বা চাতুরী মাত্র।" কিন্তু এই "অনেকের ধারণা" শব্দে কাহাদিগকে "অনেক" অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা কিন্তু লেখক খুলিয়া বলেন নাই। শুধু "ক্ষোভ" প্রকাশই করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার সেই ক্ষোভ-প্রকাশ ব্যর্থ হইয়াছে। আমরা খুব জোর-করিয়া বলিতে পারি, "নাড়ী জ্ঞানটা কিছুই নহে, উহা লোক ভুলান ছল বা চাতুরী" এরূপ কথা বাঙ্গালা দেশের কোন স্থলে কোন সম্প্রদায়ের লোকেরই মুখে এপর্য্যন্ত শুনিতে পাওয়া যায় নাই, সুতরাং ইহা এই প্রবন্ধ লেখকের প্রবন্ধ-রচনার চাতুর্য্য ভিন্ন কিছুই নহে। তাহার পর মাসিক পত্র নাম দিয়া কাগজ বাহির করিতে হইলে, এইরূপ একটি বা দুইটি প্রবন্ধ লইয়া সংখ্যা-সমাপ্তিও কর্ত্তব্য নহে। তবে আয়ুর্ব্বেদীয় মাসিক পত্রের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, ততই দেশের মঙ্গলের কথা। সেই হিসাবে ইহার পরিচালকগণ আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত
কবিরঞ্জন।

দুইখানি পত্র।

১ম পত্র।

"ভারতবর্ষের" অশিষ্টাচার।

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের "ভারতবর্ষে" কবিরাজ সম্প্রদায়কে বিদ্রূপ করিয়া একটি অদ্ভুত চিত্র প্রকাশ করা হইয়াছে দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। রোগী ও কবিরাজ-আগমনে

চিত্র ফলিত। রোগী, কবিরাজের নিকট বলিতেছেন,—"মহাশয় প্রস্রাব সরল হইতেছেনা"—অমনি কবিরাজ বলিতেছেন,—'হাতখানি দেখি"—ইহাই চিত্র-কথায় প্রকাশ। প্রস্রাব সরল হইতেছে না বলায়, হাত দেখা'টা "ভারতবর্ষে"র চিত্রকর্ত্তার নিকট আশ্চর্য্য বোধ হইলেও ইহা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার বহির্ভূত বিষয় নহে। বায়ু, পিত্ত ও কফ লইয়াই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার কৃতিত্ব। যে কোন রোগেরই চিকিৎসা করা হউক, ঐ বায়ু, পিত্ত ও কফ—এই তিনটিকে অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে—ইহাও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার বিশেষত্ব। প্রস্রাব সরল না হইলে, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রে তাহাকে মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত বা প্রমেহের অন্তর্ভূত রোগ নামে অভিহিত করা হয়। সেই সকল রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ধাতু বায়ু প্রধান, কি পিত্ত-প্রধান, কি কফ-প্রধান, কি কোন্ দুইটীর সমন্বয়ে দ্বন্দ্বজভাবে উৎপন্ন হইয়াছে, সর্ব্বাগ্রে ইহা জ্ঞাত হইয়া তবে চিকিৎসাকার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত। "ভারতবর্ষে"র চিত্রকর্ত্তা 'এম-বি' উপাধি-যুক্ত ডাক্তার, তিনি এ রহস্য কেমন করিয়া অবগত হইবেন? তিনি ত পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিদ্যায় সুপণ্ডিত; "আয়ুর্ব্বেদ" লইয়া ত ঘাঁটাঘাঁটি করেন নাই, সুতরাং আমরা "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত এই অদ্ভুত ধরণের চিত্র দেখিয়া চিত্রকর্ত্তা ডাক্তার বাবুর চিত্র-কৌশলে আদৌ বিস্মিত হই নাই, "তবে "ভারতবর্ষে"র মত উচ্চ শ্রেণীর মাসিক পত্রের সম্পাদক মহাশয় যে এরূপ চিত্র পত্রস্থ করিয়া পত্রের গৌরব-মর্য্যাদা নষ্ট করিতে পারেন, ইহার জন্যই দুঃখিত হইয়াছি।

২য় পত্র।*

ঢাকার বৈদ্য-সম্মেলন।

বৈদ্য বা আয়ুর্ব্বেদ-সম্মেলনের অধিবেশন হইবার কথা শুনিলেই—আমাদের প্রাণে আশা জাগিয়া উঠে। আমাদের মনে হয়, স্থানে স্থানে এরূপ অধিবেশনের ব্যবস্থা হইলে, ইহা হইতে লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদের মহিমা-কীর্ত্তনে ভারতাকাশে বৈদ্য-চিকিৎসার গরিমা বুঝি আবার ফুটিয়া উঠিবে,—সে গরিমা-স্ফুরণে দেশের লোকে আবার আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রতি যথোচিত সমাদরে অভ্যস্ত হইবে। ইহা ভিন্ন সকল সম্মেলনেই যে একতা বৃদ্ধির উপায় হইয়া থাকে, আমাদের বৈদ্য বা আয়ুর্ব্বেদ সম্মেলনেও বুঝি আমাদের মধ্যে সে একতা-বৃদ্ধি বিশেষরূপে হইতেছে দেখিতে পাইব। পূর্ব্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ সহর—শুধু পূর্ব্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ সহর কেন,—একদা বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান রাজধানী—ঢাকানগরীতে বৈদ্যসম্মেলনের ব্যবস্থা হইতেছে দেখিয়া এই জন্যই আমরা অত্যন্ত আশান্বিত হইয়াছিলাম। আমরা ভাবিয়াছিলাম, এই অধিবেশনে বাঙ্গালার বাঙ্গালী চিকিৎসকগণের সকলেই বুঝি ইহাতে সম্মিলিত হইবেন, সে সম্মিলনে আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে নানা প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইবে,—বাঙ্গালা দেশের কবিরাজগণের মধ্যেও বুঝি এই উপলক্ষে একতা-বৃদ্ধির ব্যবস্থার একটা উপায়-বিধান করা হইবে। কিন্তু সে সব কিছুই হইল না দেখিয়া ঢাকার বৈদ্যসম্মেলনের অধিবেশনের ফলে আমাদিগকে নিরাশই হইতে হইয়াছে। কলিকাতা হইতে সভাপতি

* এই পত্রখানি বহুপূর্ব্বে হস্তগত হইয়াছে, স্থানাভাবে প্রকাশিত হয় নাই। (আঃ সং)

মহাশয় ভিন্ন আর কোন কবিরাজই ঐ অধিবেশন উপলক্ষে গমন করেন নাই,—ইহা নিশ্চয়ই সম্মেলনের সার্থকতার অন্তরায় বলিতে হইবে। কেহ কেহ বলিতেছেন,—সখের থিয়েটারে যাঁহারা main part লইয়া থাকেন, তাঁহাদের অভিনয়ের কৃতিত্ব দেখাইবার জন্যই তাঁহারা অভিনয়ের পুস্তক নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। এক্ষেত্রেও নাকি সেই ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং সেইজন্যই নাকি দেশের নামজাদা কবিরাজদের কেহ সে সম্মেলনে যোগদান করেন নাই। তাহার পর সম্মেলনে অনেকরূপ কেলেঙ্কারীও হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। অনেকে বলিতেছেন,—সমাগত ব্যক্তিদিগকে যথোপযুক্ত আদর ও যত্ন করা হয় নাই। ময়মনসিংহের "চারুমিহির" এবং কলিকাতার "হিতবাদী" পত্রে সে সকল কেলেঙ্কারীর অনেক কথাই প্রকাশ পাইয়াছে। সভাপতির অভিভাষণেও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদিগের নামোল্লেখের সময় প্রায় অধিকাংশ প্রথিতনামা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের নাম বাদ পড়িয়াছিল, এ সকল লইয়াও নানা জনে নানারূপ জল্পনা-কল্পনা পূর্ব্বক ঢাকা সম্মেলনের দোষ বাহির করিতেছে। ফলকথা সম্মেলনের কর্তৃপক্ষগণের ব্যবস্থার ক্রটীতে যে সকল দোষ হইয়াছে, সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণে উল্লেখযোগ্য কবিরাজ মহাশয়দিগের নাম বাদ পড়িয়াছে দেখিয়া আমরা তদপেক্ষা অধিকতর দুঃখিত হইয়াছি। এই জন্যই বলিতে হয়, ঢাকার এই বৈদ্যসম্মেলনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে। অনেকে বলিতেছেন,—এ সম্মেলনের আয়োজন এরূপ ভাবে করা ভাল হয় নাই।

শ্রী—

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে প্রবেশার্থি ছাত্রদিগের প্রতি বিজ্ঞপ্তি।

বর্ত্তমান আষাঢ় মাসের শেষভাগ হইতে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বিভাগের ছাত্রদিগের নূতন সেসন বা নব বর্ষের অধ্যয়ন আরম্ভ হইবে। সংস্কৃত ভাষায় যাঁহাদিগের জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাঁহারাই সংস্কৃত বিভাগে অধ্যয়নের অধিকারী হইবেন। বাঙ্গালা-বিভাগে, বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকা আবশ্যক এবং কিছু ইংরাজী শিক্ষা সমাপ্তির পর প্রবেশ করিতে হইবে। মধ্য ইংরাজী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন,—বাঙ্গালা বিভাগের জন্য এরূপ ছাত্রদিগের আবেদনই গ্রহণ করা হইবে। এখন হইতে আবেদন করুন, নতুবা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ হইয়া গেলে আর কাহারও আবেদন গৃহীত হইবে না।

আবেদনে জাতি ও বয়সের কথা উল্লেখ করিবেন। অন্যান্য বিষয় জানিবার জন্য অর্দ্ধ আনার টিকিট সহ নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

কবিরাজ শ্রীযামিনী ভূষণ রায়
কবিরত্ন এম্, এ, এম্, বি
অধ্যক্ষ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

১ম বর্ষ। } বঙ্গাব্দ ১৩২৪—শ্রাবণ। { ১০ম সংখ্যা।

উদ্বোধন।

—:*:—

(১)

(ওগো) নিখিল বেদের শ্রেষ্ঠ যে টুকু,
—সে টুকু সকলি তুমি,
চতুর্ব্বর্গ লভি, তোমারি গর্ব্বে
ধন্য গো ভারত ভূমি।
প্রথম চিকিৎসা তোমাতে প্রকাশ,
প্রথম বিজ্ঞান তোমাতে বিকাশ,
প্রথম রাগিণী কণ্ঠে তোমারি
উঠিল দিগন্ত চুমি'।

(২)

প্রথমে তুমিই শিখা'লে বিশ্বে
জ্ঞানেরি গরিমা-গান,
প্রথমে তুমিই তুলিলে বিশ্বে
শ্লোকেরি অপূর্ব্ব তান।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ লইয়া,
বায়ু-পিত্ত-কফ মুখ্য করিয়া,
সে শ্লোক সমষ্টি করিলে রচনা
—রাখিতে জগত প্রাণ।

(৩)

প্রথমে তুমিই এসেছিলে যে গো
'শল্য-শালাক্য' বেশে,
প্রথমে তুমিই দিয়েছিলে ঢেলে
যা' কিছু সকলি দেশে।
তোমারি প্রথম সকল 'যন্ত্র'
তোমারি প্রথম 'অগদ তন্ত্র'
'কৌমার ভৃত্য' 'কায়' 'রসায়ন'—
শেখা'লে সকলি এসে।

(৪)

তোমার সেবার ব্রতটি লইয়া
মুখর হইল দিশি,
তোমার সেবক হইবে বলিয়া—
দেবতা আসিল মিশি।
অবতার বেশে এল দেবগণ'
করিল তোমার মহিমা কীর্ত্তন,
উদিল ভারতে সুখের তপন,
ঘুচিল তামসী—নিশি।

একদা তোমার উপদেশ-বাণী
মুগ্ধ করিল দেশ,
দীর্ঘ জীবন লভিল সকলে
ধরিয়া মোহন বেশ।
তোমারি নিয়মে জগত চলিল,
তোমারি নিয়মে সমাজ গঠিল,
(তুমি) বিশ্বে ঢালিলে শক্তি অপূর্ব্ব,
—ছিলনা যাহার শেষ।

(৬)

আরোগ্য-সম্পদ লভিল তাহাতে
দেশেরি যতেক লোক,
(তুমি) আশীষ করিলে অন্তর হইতে
"ধরণী সুখেতে রোক্।"
কি পাপে জানি না গেল সেই দিন,
তাহারি ফলেতে এবে আয়ুঃক্ষীণ,
আবার এস গো তুমি 'আয়ুর্ব্বেদ'—
'ভারত' তেমনি হোক্।

(৭)

আবার তোমার সেবাটি করিয়া
ঘুচুক রুগ্ন-জরা,
আবার তোমার আদেশ-পালনে
মত্ত হউক ধরা।
আবার তোমার শক্তি দেখিয়া,
আবার তোমারে ভক্তি করিয়া—
মত্ত হইয়া তোমারি ভাবেতে
রহুক বিশ্ব গড়া,
(ওগো) এস 'আয়ুর্ব্বেদ' অষ্টাঙ্গ লইয়া—
তেমনি সুখেতে ভরা।

আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি না অবনতি ?

—:*:—

আজ কাল অনেকেরই মুখে শুনিতে পাই যে, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রকারে উন্নতির দিন আসিয়াছে। প্রমাণ স্বরূপে অনেকেই দেখাইয়া থাকেন যে, কলিকাতা এবং মফঃস্বলে—সর্ব্বত্রই আয়ুর্ব্বেদ-ব্যবসায়ীর ও ঔষধালয়ের সংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি,—লোকের যদি আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রতি শ্রদ্ধা না বাড়িত, তাহা হইলে, কলিকাতার প্রত্যেক গলিতে এত অধিক সংখ্যক আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধ বিক্রয়ের দোকান গুলি কখনই টিকিতে পারিত না। তাহার পর আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসায় যে সকল কবিরাজ মহাশয় আজকাল বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছেন, তাঁহাদের প্রণামীর গৌরব, মোটরকার ও জুড়ীগাড়ীর 'স্বচ্ছলতা', প্রকাণ্ড প্রাসাদ প্রভৃতি বাহ্যসম্পদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বেশ বুঝা যায় যে, এখন কলিকাতার এলোপ্যাথিক বা হোমিওপ্যাথিক খ্যাতনামা বড় বড় চিকিৎসকগণ অপেক্ষা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের পসার-প্রতিপত্তি অধিক না হউক কিন্তু কোন প্রকারে ন্যূন ত নহেই। তাহার পর নিখিল

ভারতবর্ষীয় বৈদ্য মহাসম্মেলন প্রভৃতি ভারত-ব্যাপী আন্দোলন-প্রণালী দিন দিন যেপ্রকার প্রসার লাভ করিতেছে, তাহা দেখিলে কাহার না মনে হয় যে, ভারতে অচিরকালের মধ্যেই আবার আয়ুর্ব্বেদের সমধিক উন্নতি হইবে,—দেশের স্বাস্থ্য, সুখ ও সম্পদ্ আবার ফিরিয়া আসিবে,—মোটা-ভাত মোটা-কাপড়ের দেশে সবল ও সুলভ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রভাব আবার সার্ব্বজনীন হইবে। কথাগুলি আপাততঃ বেশ শ্রুতিতৃপ্তিকর ও মুখরোচক বটে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ভিতরে তলাইয়া দেখিলে, অন্যরূপই প্রতীত হয়। এই বাহ্য-সৌন্দর্য্যের আবরণের ভিতরে যে কি ভীষণ ও বীভৎস প্রকৃতি খেলা করিতেছে, তাহা একবার সকলেরই দেখা উচিত। আয়ুর্ব্বেদ প্রেমিক প্রত্যেক ব্যক্তির দৃষ্টি যাহাতে এই বিষয়ে পতিত হয় এবং ইহার প্রতীকার কি ও তাহার উপায় কি, তাহা বুঝিয়া জনসাধারণ মিলিয়া শীঘ্র যাহাতে অনুকূল ভাবে মিলিত হইয়া বিহিত কার্য্য করিতে অগ্রসর হন, তাহারই জন্য গুটিকয়েক কথা অনেকেরই শ্রুতিসুখকর না হইলেও আজ বলিব। আর না বলিয়া থাকা চলেনা,—কারণ একথার আলোচনা স্থগিত থাকিলে, আয়ুর্ব্বেদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হইয়া উঠিবে।

সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, আয়ুর্ব্বেদ দোকানদারীর জিনিষ নহে, আয়ুর্ব্বেদবিদ্যা ধনার্জ্জনের জন্য নহে,—অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদবিদ্যা অর্থকরী বিদ্যা নহে, কোন প্রকার অর্থার্জ্জন করিয়া সমাজে গণ্যমান্য হইয়া বিষয়-ভোগ-লালসার চরিতার্থতা সম্পাদন করাই যাহার লক্ষ্য, সেই ব্যক্তি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রানুসারে চিকিৎসকের পবিত্র পদে অধিষ্ঠিত হইবার যোগ্য নহে।

চরক সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

"বরমাশী বিষবিষং কথিতং তাম্রমেববা।
পীত মত্যগ্নি সন্তপ্তা ভক্ষিতাবাপ্যয়োগুড়াঃ॥
নতু শ্রুতবতাং বেশং বিভ্রতা শরণাগতাৎ।
গৃহীতমন্নং পানং বা বিত্তং বা রোগপীড়িতাৎ॥
ভিষগ্ বুভূষু র্মতিমান্ অতঃ স্বগুণ সম্পদি।
পরং প্রযত্নমাতিষ্ঠেৎ প্রাণদঃ স্যাদ্ যথা নৃণাম্॥"

তাৎপর্য্য এই যে, সর্প বিষ ভক্ষণ করাও বরং ভাল, কথিত তাম্র পান করিয়া প্রাণত্যাগ করাও বরং শ্রেয়ঃ, সন্তপ্ত লৌহগুড়িকা ভক্ষণ করাও বরং প্রশস্ত, তথাপি আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ বৈদ্যের বেশ ধারণ পূর্ব্বক রোগপীড়িত শরণাগত ব্যক্তির নিকট হইতে অন্ন, পান বা কোনরূপ বিত্ত গ্রহণ করা উচিত নহে। অতএব "যে ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে চিকিৎসক হইতে চাহেন, তাঁহাকে প্রাণপণে সেই গুণ-সম্পৎকে অর্জ্জন করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রযত্ন করিতে হইবে,—যাহার প্রভাবে তিনি লোকের প্রাণপ্রদ হইতে পারেন"।

আমাদের দেশের নিতান্ত দুর্ভাগ্য এই যে, আজকাল এইরূপ প্রাণদ অথচ নিঃস্বার্থ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের সংখ্যা নিতান্ত বিরল হইয়া পড়িতেছে,—স্মরণাতীত কাল হইতে পুরুষ-পরম্পরায় চিকিৎসা করা যাঁহাদের ব্যবসায় ছিল, একটী অসাধ্য রোগের চিকিৎসা করিয়া আসন্নমৃত্যুর করাল কবল হইতে রোগীকে রক্ষা করিয়া একজোড়া কাপড়, একটী পিত্তলের ঘড়া এবং একটী রজতমুদ্রা দক্ষিণা পাইলেই যাঁহারা যোগ্য পারিশ্রমিক লাভ হইল বলিয়া সন্তোষ অনুভব করিতেন, পুরুষ-পরম্পরায় লব্ধক্রিয়া-নৈপুণ্য ও অভি-

জ্ঞতার প্রভাবে যাঁহারা ঔষধ নির্ম্মাণে চিকিৎসা-ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, সেই সকল কবিরাজের বরণীয় আসনে আজ যাঁহারা উপবেশন করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই পেটের দায়ে চিকিৎসক—একথা কয়জন অভিজ্ঞ ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারেন? কোনপ্রকারে ৩০।৪০ নং প্রেসে'র প্রসাদে (কাব্যতীর্থ) উপাধিটি হস্তগত করিতে পারিলেই হইল, আর পায় কে? দিন কয়েক কোন খ্যাতনামা কবিরাজ মহাশয়ের বাটীতে অন্নধ্বংসসহকারে 'মাধবনিদান' খানা চোখ কান বুজিয়া গলাধঃকরণ করিতে পারিলেই বাজীমাৎ! তাহার পরই কলিকাতার কোন একটা জনসংকুল পথের ধারে "গভর্ণমেণ্ট ডিপ্লোমা প্রাপ্ত" "ভূতপূর্ব্ব মহারাজ বিশেষের ভূতপূর্ব্ব গৃহচিকিৎসক" ইত্যাদি আড়ম্বরপুর্ণ বাজে কথায়পূর্ণ সাইন-বোর্ড লিখাইয়া দোকান ঘরে—দ্বারের উপর লটকান আর সঙ্গে সঙ্গে 'বৃহদঙ্গার চূর্ণ" "বৃহদিষ্টকচূর্ণ" ও "বৃহদট্টালিকাচূর্ণ" এই জাতীয় নানাবর্ণ ঔষধপূর্ণ ছোট বড় শিশি-বোতলমণ্ডিত একটী বা দুইটী আলমারী স্থাপন ইহাই যথেষ্ট!—ইহারই প্রসাদে "শত মারীভবেদ্বৈদ্য" হইবার জন্য একটা অদম্য উৎসাহ থাকিলেই হইল! ইহাই হইল—বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক হইবার সর্ব্বজনবিদিত সুলভ-পন্থা।

এই জাতীয় চিকিৎসকগণ কিসে অজ্ঞ, আতুরদিগকে বঞ্চনা করিয়া দুই পয়সা হাতাইতে পারিবেন, তাহারই জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিয়া থাকেন। স্কুল-পণ্ডিতী জোটেনা,—বাটীতে চাষবাসের ও কোন সুবিধা নাই,—কেরাণীগিরি করিবারও সামর্থ্য নাই, অথচ ভদ্রবংশোদ্ভব বলিয়া মুটেগিরি করিবারও যো নাই, সামর্থ্যও নাই; সুতরাং কবিরাজী করাই প্রশস্ত! এই ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধির দ্বারা যাঁহারা পরিচালিত, অধিকাংশস্থলে তাঁহারাই ত আজ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের কার্য্যে ব্যাপৃত। এইরূপ ধনলোভে বিবেক-হীন অশাস্ত্রজ্ঞ চিকিৎসানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যদি আয়ুর্ব্বেদের দোহাই দিয়া সাধারণের চক্ষে ধূলিনিঃক্ষেপপূর্ব্বক অর্থার্জ্জন করিতে সমর্থ হয়, তাহাদিগের এই লোক ঠকাইবার কুশলতা দেখিয়া কি বলিব যে, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের উন্নতির দিন আবার ফিরিয়া আসিয়াছে? চিকিৎসকের স্বরূপ-বর্ণন-প্রসঙ্গে (চরকসংহিতা) কি বলিতেছে?

"শীলবান্ মতিমান্যুক্তো দ্বিজাতিঃ শাস্ত্রপারগঃ।
প্রাণিভির্গুরুবৎপূজ্যঃ প্রাণাচার্য্যঃ সহিস্মৃতঃ॥"

সৎস্বভাব, মতিমান্, যুক্তিমান্ ও শাস্ত্রজ্ঞ দ্বিজাতিই প্রাণাচার্য্য বা চিকিৎসক হইয়া থাকেন, এই প্রাণাচার্য্যকে প্রাণীগণ গুরুর ন্যায় পূজা করিবে।

কাহাকে বৈদ্য বলে,—ইহারই উত্তর দিতে যাইয়া চরকসংহিতাকার বলিতেছেন।

"বিদ্যাসমাপ্তৌ ভিষজস্তৃতীয়া জাতিরুচ্যতে।
অশ্নুতে বৈদ্যশব্দং হি ন বৈদ্যঃ পূর্ব্বজন্মনা॥"

"অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যা সম্পূর্ণভাবে লাভ করিলে চিকিৎসক তৃতীয়া জাতি লাভ করিয়া থাকেন, এই বিদ্যালাভ করিবার পূর্ব্বে কেহই বৈদ্যকুলে জন্ম হইয়াছে বলিয়া বৈদ্য হয় না।"

"বিদ্যাসমাপ্তৌ ব্রাহ্ম্যং বা সত্ত্বমার্ষ্যং মথাপি বা।
ধ্রুবমাবিশতি জ্ঞানাৎ তস্মাদ্বৈদ্য স্ত্রিজঃ স্মৃতঃ॥"

আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যায় পারগত হইলে চিকিৎসক সেই জ্ঞানের প্রভাবে ব্রাহ্ম বা আর্যসত্ত্ব

লাভ করিয়া থাকেন, এই ব্রাহ্ম বা আর্ষ সত্ত্ব লাভ করিলেই তাঁহার তৃতীয় জন্ম সিদ্ধ হয় এবং তখনই তিনি বৈদ্য নামে অভিহিত হইবার যোগ্য হইয়া থাকেন।

নাত্মার্থং নাপিকামার্থং অথ ভূত দয়াং প্রতি।
বর্ত্ততে যশ্চিকিৎসায়াং স সর্ব্বমতিবর্ত্ততে॥

নিজে আরোগ্যের জন্য বা নিজের কামনা চরিতার্থ করিবার জন্য চিকিৎসায় প্রবৃত্ত না হইয়া, যে কেবল ব্যাধিপ্রপীড়িত প্রাণীগণের দুঃখমোচনার্থ দয়াপরবশ হইয়া চিকিৎসা কার্য্যে ব্যাপৃত হয়, সে এই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা মহান্ অর্থাৎ সেই প্রকৃত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক-শ্রেষ্ঠ! ইহাই হইল—আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের উন্নত আদর্শ। এই আদর্শের প্রতিষ্ঠা আবার এদেশে যতদিন স্থাপিত না হইতেছে, ততদিন আয়ুর্ব্বেদের প্রকৃত উন্নতি সম্ভবপর কি না, তাহা শিষ্টগণই বিচার করুন।

এই জাতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রে-অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ লোক বঞ্চনা দ্বারা আয়ুর্ব্বেদের দোহাই দিয়া যাহাতে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের উন্নতি-পথকে কণ্টকাবৃত না করিতে পারে, তাহার জন্য আমাদের দেশে আয়ুর্ব্বেদহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। আজকাল দেশের সর্ব্বত্রই ভেজালের আধিক্য। এই ভেজালের বিড়ম্বনায় পড়িয়া ঘৃত দুগ্ধ-তৈল প্রভৃতি অত্যাবশ্যক আহার্য্য দ্রব্যগুলি অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িতেছে বা ব্যবহৃত হইলে স্বাস্থ্যহানিকর হইতেছে; তদ্রূপ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের মধ্যে এই (ভেজাল চিকিৎসকের) অত্যাধিক্যে দেশে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার মূলোচ্ছেদ হইতেছে বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। ইহার প্রতিকার সত্বর আবশ্যক—ইহা কে না বলিবে?

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

প্রাচীন ভারতে পাঁউরুটী।

তখনও ট্রেণ ছাড়িবার একটু বিলম্ব ছিল। রৌদ্র-পীত-মধ্যাহ্নে, মধ্যম শ্রেণীর এক কামরায়, মুখোমুখী হইয়া দুই বন্ধুতে বসিয়াছিলাম। রেল-কোম্পানী ট্রেণের সংখ্যা কমাইয়া দেওয়ায়, প্রত্যেক কামরায় অসংখ্য আরোহীর ভিড় হইয়াছিল। বিশেষতঃ তৃতীয় ও মধ্যম শ্রেণীর অবস্থা দেখিয়া, "অন্ধ-কূপহত্যার" অধিনায়ক 'সিরাজকে'ও অনেকটা নির্দ্দোষ বলিয়া মনে হইতেছিল। নিদাঘের উগ্রতাপস মূর্ত্তি দেখিয়া, হাওড়া ষ্টেশনের অমল কোলাহল-মুখর-বিপুল-বিস্তার-'প্ল্যাটফরম্' স্তম্ভিতভাবে পড়িয়াছিল। যাত্রীদের তৃষ্ণা-কাতর-জিহ্বার সম্মুখ দিয়া, "বরফ সরবতের" ঠেলা গাড়ী খানি পুনঃ পুনঃ আনাগোনা করিতেছিল।

সহসা আমাদের কামরার দ্বারে এক জীবিত কঙ্কাল-বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উপস্থিত। তাঁহার শিরা-বহুল-জীর্ণ-হস্তে এক বিরাট 'পুঁটলী' ঝুলিতেছিল। একে দারুণ গুমোট—তাহাতে গাড়ীর মধ্যে 'তিল-ধারণের'ও স্থান ছিল না,—আরোহীদলের মধ্যে ৫।৭জন উঠিয়া গাড়ীর দ্বার চাপিয়া ধরিয়া ব্রাহ্মণের প্রবেশে বাধা

দিনে লাগিল। কিন্তু দেখিলাম—সেই বৃদ্ধের শরীরে তখনও অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মত অযুত হস্তীর বল! সকলকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করিয়া, দ্বার ঠেলিয়া, ব্রাহ্মণ গাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। আমরা চাহিয়া দেখিলাম,—ব্রাহ্মণের পিছনে-পিছনে ধীরে অথচ অচল মহিমাভরে—এক শুভ্র-বসনা-বিধবাও প্রবেশ করিল। তাহার কোলে গোধূলির প্রথম তারাটীর মত—রূপে উজ্জ্বল ও রোগে ম্লান—একটী ৫ বৎসরের কন্যা!

বিধবা—যুবতী। তাহার লজ্জা-ললিত-মলিন মুখ হইতে অবগুণ্ঠন সরিয়া গিয়াছিল, অর্ক-ময়ূখ-তাপে-অবসন্ন-ললাট-দেশ হইতে স্থূল ঘর্ম্মবিন্দু মুক্তাফলের মত গণ্ডযুগলে গড়াইয়া পড়িতেছিল। সে কোনও কথা না কহিলেও, তাহার নিরাশা-কাতর-মুখখানি—অব্যক্ত মধুর চক্ষের ভাষায়, একটু স্থান পাইবার জন্য যেন সকলের কাছেই মিনতি করিল. সে আর্ত্ত নীরব-নিবেদন যেন নিয়তির অলঙ্ঘ্য আদেশের মতই কঠোর মনে হইতে লাগিল। মুহূর্ত্তের প্রমাদে—যাহারা ব্রাহ্মণকে বসিবার স্থান দিনে স্বীকৃত হয় নাই, যুবতীর নির্ব্বাক্ মুখের কমনীয়তায় তাহাদের সুপ্ত হৃদয় লুপ্তপ্রায় মনুষ্যত্বের তীব্র-কশাঘাতে সহসা সচেতন হইয়া উঠিল। দুই চারি জন যাত্রী আপনা হইতেই দাঁড়াইয়া উঠিয়া, ব্রাহ্মণ ও যুবতীকে বসিবার স্থান করিয়া দিল। বেঞ্চের এক পার্শ্বে, বহু অপরিচিতের ব্যগ্র-কৌতূহলী সেই দৃষ্টির সম্মুখে—দেহমনে একান্ত সঙ্কুচিত হইয়া, শ্রান্ত-রমণী বসিয়া পড়িল, তাহার পর, অন্তরের কোষবদ্ধ মাতৃত্বটুকু বর্ণে গন্ধে ফুটাইয়া তুলিয়া, নিজের অঙ্কেই বালিকার জন্য নিরাপদ নীড় রচনা করিল। শোষ, রোগ-পাণ্ডুর মুখের পানে পলকহীন নতনেত্রে চাহিয়া বালিকার জীর্ণ বক্ষ পঞ্জরে সেবা-নিপুণ শীতল হাত খানি বুলাইয়া দিতে লাগিল।

এইবার ব্রাহ্মণের সঙ্গে কেহ কেহ আলাপ আরম্ভ করিলেন।

মায়ের কোলে শুইয়া, প্রতিপদের ক্ষীণ চন্দ্রলেখার ন্যায়, মেয়েটী, অল্পক্ষণের জন্য ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সহসা জাগিয়া উঠিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহাকে ক্ষুধার্ত্ত ভাবিয়া, ব্রাহ্মণ সেই সুবৃহৎ পুঁটলিটী খুলিয়া ফেলিলেন এবং এক খানি পাঁউরুটী বাহির করিয়া তাহারই কিয়দংশ বালিকার হাতে দিলেন, কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়া সে তাহা চিবাইতে লাগিল।

এই দুঃসহ গ্রীষ্মেও শার্টের উপর 'কোট-ওয়েষ্ট কোট' আঁটিয়া "লম্বসাট পটাবৃত" এক ভদ্র লোক ব্রাহ্মণের পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মেয়েটীর কি অসুখ?" উত্তর হইল,—"পেটের ব্যারাম"। আবার প্রশ্ন হইল,—পেটের অসুখে পাঁউরুটী খাইতে দিতেছেন কেন?" উত্তর—"কি করিব?—কবিরাজ মহাশয় খাইতে বলিয়াছেন।" প্রশ্ন—"তিনি কি রকম কবিরাজ?" উত্তর—"ভাল বলিয়াই বোধ হয়। কলিকাতায় নাম ডাক যথেষ্ট। এই দেখুন না, আমার এই দৌহিত্রীটি প্রায় সাত মাস ভুগিতেছিল, আমাদের দেশের সমস্ত ডাক্তারকে দেখান হইয়াছিল, কেহই স্থায়ী উপকার দেখাইতে পারেন নাই। শেষে রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল, একটু জল বার্লিও হজম করিতে পারিত না। তখন কবিরাজ দেখাইবার ব্যবস্থা হইল। সেই অবস্থায় ইহাকে কলি-

কাতায় আনিলাম। কবিরাজ মহাশয়কে দেখাইলাম। তাঁহার ঔষধ এক মাস খাইতেছে, পেটের অসুখ ভাল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখন এই এক দোষ দাঁড়াইয়াছে—মেয়েটীর ভাত সহ্য হইতেছে না! উপর্য্যুপরি দুই তিন দিন ভাত দিলেই সর্দ্দী হইয়া জ্বর ফুটে। সেই জন্য আজ সকালে ইহাকে কলিকাতায় আনিয়াছিলাম। কবিরাজ মহাশয় দেখিয়া বলিলেন, —"১০।১৫ দিন ভাত না দিয়া পাঁউরুটী খাইতে দিবেন।" আমাদের দেশে প্রত্যহ "রুটিওয়ালা" আসেনা, তাই ২।৪ খানা ভাল রুটী কলিকাতা হইতে কিনিয়া লইয়াছি।" ব্রাহ্মণ নিস্তব্ধ হইলেন। প্রশ্নকর্ত্তা-ভদ্রলোকটী ঈষৎ হাসিয়া, আমাদের দিকে চাহিয়া, জনান্তিকে বলিলেন,—"ব্যাপার বুঝুন মহাশয়। আজকাল কবিরাজরাও পাঁউরুটী পথ্য দেন!" আমার বন্ধু বলিলেন—"তাহাতে আর দোষ কি? ডাক্তাররাও ত মাছের ঝোল, পল্‌তার ডাল্‌না পথ্য দেন, কবিরাজ না হয় পাঁউরুটীর ব্যবস্থা করিয়াছেন।" ভদ্রলোক আবার বলিলেন—"ইহাতে দোষ আছে বৈকি! যিনি শাস্ত্রজ্ঞ-কবিরাজ, তিনি বিদেশী পথ্যের ব্যবস্থা করিবেন কেন? পাঁউরুটী মুসলমানের আমদানি, এদেশের খাদ্য নহে। পাঁউরুটীর দোষ-গুণ কবিরাজ কি বুঝিবেন? তবে আজ কাল দেশে অনেক পেটেণ্ট ঔষধ-বিক্রেতা-কবিরাজ বলিয়া পরিচিত, তাহারা "জ্বরান্তকচূর্ণ" নাম দিয়া গোপনে রং মিশ্রিত কুইনাইন্‌ চালায়, তাহারাই প্রকাশ্যে পাঁউরুটীর ব্যবস্থা করিতে পারে।"

মর্ম্মান্তিক শ্লেষ! কিন্তু সহজ সারল্যে অকুণ্ঠিত!! এ কথার আর কি প্রতিবাদ করিব? এযে সাংঘাতিক সত্য! বাস্তবিক, বিদেশীকে স্বদেশী করিয়া লইবার উদ্যোগ—বৈদ্য সমাজে ত দেখিতে পাই না! সে উদারতা ছিল—ভাব মিশ্রের; সেই আত্ম-সমাহিত মনস্বী চিকিৎসক, জন-হিতৈষণায় অনুপ্রাণিত হইয়া 'কফি' 'তোপচিনী'কেও স্ব-গ্রন্থে সগৌরবে স্থান দিয়াছিলেন! সে ত্রিকালের কারুণিক গুণগ্রাহী-বৈদ্য এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় কি? আয়ুর্ব্বেদের অভাব অপূর্ণতার কথা, ত্যাগশীল-তপস্বীর মত কেহ ভাবিয়া দেখেন কি?

গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। "অগ্নিময় রক্তচক্ষু" মেলিয়া, বাষ্পময় দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, বিরাট দেহ "লৌহ সরীসৃপ" ছুটিতে আরম্ভ করিল। আমি সেই ভদ্রলোকের কথাই ভাবিতে লাগিলাম।

ভাবিতে লাগিলাম—সত্যই কি পাঁউরুটী এদেশের খাদ্য নহে? যে দেশের ভগবান ভোগের জন্যই, "এক" হইয়াও "বহু" হইয়াছেন—সে দেশে কি ভোগের জিনিষের কখনও অপ্রতুল ছিল?

সেই দিন হইতেই—অতীতকে ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছি। সেই দিন হইতেই, প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা আমার হীন-জীবনের ক্ষুদ্র-ইতিহাসে একটা যুগ সৃষ্টিকারী অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে! সেই দিন হইতেই—শ্মশানের অঙ্গার ঘাঁটিয়া, চিতাভস্ম অঙ্গে মাখিয়া, শব-চুল্লীর অর্দ্ধদগ্ধ বংশ খণ্ড বাছিয়া ভবিষ্যতের জন্য সম্বল সংগ্রহ করিতেছি। একটা অনাগত আনন্দের নবীন আলোক রশ্মি, আমার বিগ্রহ-বিহীন-অন্ধকার-মর্ম্ম-মন্দিরে আরতির "পঞ্চ-প্রদীপ" জ্বালিয়া দিয়াছে। সেই পুলকের উন্মাদনায় মনীষী-চিত্তরঞ্জনের মধুর ধ্বনির প্রতিধ্বনি তুলিয়া, স্বর্ণমণ্ডিত অতীতের পানে

চাহিয়া, মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি—"এদেশে নাই কি? ছিল না কি?"

এদেশে পাঁউরুটীও ছিল। আয়ুর্ব্বেদের পাঠকগণের কাছে আজ আমি তাহারই একটু পরিচয় দিব।

ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে "কন্দুপক্ক" নামক একপ্রকার খাদ্য দ্রব্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। "কন্দুপক্ক" শব্দটী যৌগিক,—অর্থাৎ দুইটী শব্দের যোগে নিষ্পন্ন,—উহার অর্থ কন্দুতে যাহা পক্ক। কিন্তু শাস্ত্রে নানা জনে 'কন্দুর' নানা অর্থ করিয়াছেন, ফলে "কন্দু" চেনা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। অতএব প্রথমেই আমাদিগকে "কন্দুর" প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করিতে হইবে, কেননা 'কন্দু' না বুঝিলে "কন্দুপক্ক"ও বুঝা যাইবে না।

প্রসিদ্ধ অভিধান কর্ত্তা—নব রত্নের অন্যতম রত্ন অমর সিংহ—"কন্দুর" পর্য্যায়ে ৪টী শব্দ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। যথা—

ক্লীবেঽম্বরীষং ভ্রাষ্ট্রোনা কন্দুর্বা

স্বেদনী স্ত্রিয়াং।

অমরোক্ত শ্লোকার্দ্ধ পাঠ করিলে আমরা বুঝিতে পারি, "অম্বরীষ" "ভ্রাষ্ট্র" "কন্দু" ও "স্বেদনী"—এই চারিটী শব্দ সমানার্থক। কিন্তু কারিকার টীকাকার ভানুজী দীক্ষিত "অম্বরীষ" ও "ভ্রাষ্ট্র" শব্দকে ভর্জ্জন পাত্রের সংজ্ঞা রূপে ব্যবহার করিয়া, "কন্দু" ও "স্বেদনী" এই উভয় শব্দকে অন্য অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। ভানুজীর সূত্র—

স্কন্দে 'স' লোপশ্চ উঃ।১।১৫ অর্থাৎ শোষণার্থ 'স্কন্দ' ধাতুর উত্তর ঔণাদিক 'উ' প্রত্যয় করিয়া কন্দু শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। আবার 'স্বিদ' ধাতুর উত্তর অধিকরণ বাচ্যে লুট্ প্রত্যয় করিয়া "স্বেদন" শব্দ, এবং তাহাই স্ত্রীলিঙ্গে "স্বেদনী" রূপে সিদ্ধ হইয়াছে। "স্বেদনী"র অর্থ স্বেদ করা হয় যাহাতে, 'কন্দুর' অর্থ ও শোষণ করা হয় যাহাতে, অত এব ভানুজীর মতে "কন্দু" ও "স্বেদনী" অভিন্ন। উভয়েরই এক অর্থ। ভানুজী 'কন্দু' ও "স্বেদনী"কে মদ্য নির্ম্মাণোপযোগী পাত্র বিশেষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এদিকে আচার্য্য হেমচন্দ্র "ভক্ষকার" ও "কান্দবিক" এই দুইটী নামকে এক পর্য্যায় ভুক্ত করিয়া, 'কন্দু' ও 'স্বেদনিকা'কে এক অর্থেই প্রয়োগ করিয়াছেন। * অমর সিংহ "ভক্ষ্যকার ও" "কান্দবিকের" আর একটী নাম দিয়াছেন—"আপূপিক"। এই সকল শব্দ-যোজন ও সংজ্ঞা-রহস্য দেখিলে মনে হয়, সেকালে "ভক্ষ্য" বলিলে "কন্দুপক্ক" ও "অপূপ" [পিষ্টক] প্রভৃতি বুঝাইত।

এইবার আমরা "কান্দবিক" শব্দের ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিব। 'কন্দুতে সংস্কৃত' (সংস্কৃতং ভক্ষ্যাঃ।৪।২।১৬), এই অর্থে "কন্দু" শব্দের উত্তর "অন্" প্রত্যয় হইয়া 'কান্দব'—এই রূপ সিদ্ধ হইয়াছে। পরে 'কান্দব' যাহার 'পণ্য' [বিক্রেয়] এই অর্থে "কান্দব" শব্দের উত্তর ঠক্ প্রত্যয় করিয়া "কান্দবিক" শব্দের উৎপত্তি। অমরসিংহ 'কান্দব' ও অপূপ'কে এক পর্য্যায় ভুক্ত করিলেও "কান্দব" ও অপূপ এক দ্রব্য নহে। 'অপূপ' শব্দে সাধারণ পিষ্টক বুঝায়, 'কান্দব' পিষ্টক জাতীয় হইলেও স্বতন্ত্র পদার্থ। বোধ হয় অমরসিংহ ইহা জানিতেন, নহিলে 'ঋচীষং পিষ্টপবনম্' লিখিয়া তিনি পিষ্টক পাক পাত্রের

* ভক্ষ্যকারঃ কান্দবিবাঃ কন্দু স্বেদনিকে সমে। মর্ত্ত্য কাণ্ড।

নামকরণ করিতেন না। "অপূপ" [পিষ্টক] ও "কান্দবের" পাকপাত্র ও পাকপ্রণালী-সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। "পিষ্টক"—সাক্ষাৎ অগ্নির সাহায্যে পাক করিতে হয়, 'কান্দব' পাকে সাক্ষাৎ অগ্নির আবশ্যক নাই—কেবল পাক করিবার পূর্ব্বে—অগ্নির সাহায্যে "কন্দুটী" গরম করিয়া লইতে হয়। "কন্দু" উত্তপ্ত হইয়া 'স্বেদের' উপযোগী হইলে—তন্মধ্যে "কান্দব" পূর্ণ করিয়া পাকক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়। কন্দু—শোষকযন্ত্র বিশেষ, সুতরাং কন্দুতে যে দ্রব্য সংস্কৃত হইবে, সে দ্রব্য যে সাধারণ পিষ্টক হইতে স্বতন্ত্র—ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। অমরসিংহ—উভয়ের এই ভেদটুকু অগ্রাহ্য করিয়াছেন, পাক-বিশারদ হেমচন্দ্র এ ভেদ ভাল রকমেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাই তিনি "কান্দবিক" শব্দের পর্য্যায় হইতে অপূপিক শব্দটী ছাঁটিয়া ফেলিয়াছেন।

আমাদের বিশ্বাস—এই "কন্দু"-পক্ক দ্রব্যই—পাঁউরুটী। "মালবিকাগ্নি মিত্র" নামক কালিদাস কৃত নাটক পড়িয়া আমাদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে। কথাটা একটু স্পষ্ট করিয়া বলি। সকলেই দেখিয়া থাকিবেন—পাঁউরুটী প্রস্তুতের স্বেদযন্ত্র "তন্দু"—দোকানের মধ্যেই অবস্থিত হইয়া থাকে। "মালবিকাগ্নি মিত্রের রাজা বিদূষককে অনুরোধ করিতেছেন—"কিং বহুনা সখে! চিন্তয়িত ব্যোঽস্মিতে।" সখা! আর অধিক বলিতে চাহিনা, আমার সম্বন্ধে তুমি কিছু চিন্তা করিয়া দেখিও।" উত্তরে বিদূষক বলিতেছেন—ভবদাবি অহং দিঢ় বিপণে কন্দু বিতমে উদরাভ্যন্তরং দজ্ঝই।" "আপনাকেও আমার বিষয় ভাবিতে হইবে, কেননা, বিপণিস্থ "কন্দুর" ন্যায় আমার উদরের অভ্যন্তর দগ্ধ হইতেছে।" ২য় অঙ্ক। এই উক্তি প্রত্যুক্তিতে বেশ বুঝা যায়,—সেকালেও দোকানের মধ্যে 'কন্দু'-যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইত। কান্দবিক জ্বলন্ত অঙ্গার পূর্ণ করিয়া কন্দুর অভ্যন্তর ভাগ উষ্ণ করিয়া লইতেন।

বর্ত্তমান কালে এক শ্রেণীর লোক রুটী বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ইহাদিগকে আমরা "রুটীওয়ালা" নামে অভিহিত করি। পুরাকালেও কান্দব বিক্রয়কারীকে লোকে "কান্দবিক" বলিত। সচরাচর বৈশ্য জাতিই—কান্দব-বিক্রয়ের ব্যবসা করিতেন, বৈশ্যবর্ণ—দ্বিজাতি, সুতরাং তাহাদের প্রস্তুত ভক্ষ্যদ্রব্য ভক্ষণ করিতে কাহারও আপত্তি ছিল না। স্মৃতিশাস্ত্র পড়িলে আমরা বুঝিতে পারি,—বৈশ্যগণের দেখাদেখি শূদ্রগণও একদা কান্দব বিক্রয়ের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিল। শূদ্রস্পৃষ্ট "কান্দব" ভক্ষণেও ব্রাহ্মণের কোন বাধা ছিল না। প্রমাণ—

কন্দুপক্কানি তৈলেন পায়সং দধিশক্তবঃ।
দ্বিজৈরেতানি ভোজ্যানি শূদ্রগেহকৃতান্যপি॥

এ প্রমাণ তিথিতত্ত্বের। "কূর্ম্ম পুরাণেও" এ প্রমাণ সমর্থিত হইয়াছে। প্রধান স্মার্ত্ত হারীত ও ব্যবস্থা দিয়াছেন—

"কন্দুপক্কং স্নেহপক্কং পায়সং দধিশক্তবঃ।
এতানি শূদ্রান্নভুজো ভোজ্যানি মনুরব্রবীৎ॥"

একে কন্দুপক্ক, তাহাতে আবার মনুর দোহাই, এ লোভ সম্বরণ করা—দেবতারও অসাধ্য! ব্যবস্থাপক স্মৃতি এবং প্রায়শ্চিত্তকার শূলপাণিও শূদ্রগৃহজাত "কন্দুপক্ক"কে উপেক্ষা করিতে সাহসী হ'ন নাই।

এ যুগে রুটীর কারখানাতে শৌচাশৌচ

রক্ষিত হয় না। সেকালেও হইত না। শুদ্ধি-তত্ত্বে মহর্ষি শাতাতপ ও বলিয়াছেন—

গোকুলে "কন্দুশালায়াং" তৈলযন্ত্রেক্ষু যন্ত্রায়াঃ।
অমী মাংস্যানি শৌচানি স্ত্রীষু বালাতুরেষু চ॥

মহর্ষি চরক জেন্তাক স্বেদ-প্রসঙ্গে কন্দুর উল্লেখ করিয়াছেন।

"দ্বি-পুরুষ প্রমাণং মৃন্ময়ং কন্দু সংস্থানম্"
সূত্র। ১৪ অঃ

এই সকল শাস্ত্র-বচনের মহিমায় আমরা "কন্দুপক"কে পাঁউরুটী ও বিস্কুট বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছি। আর্য্যযুগে যে পাঁউ-রুটীর প্রচলন ছিল, পাঁউরুটী প্রস্তুতের জন্য যে স্বতন্ত্র শালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সে কালের লোকে যে বহুল পরিমাণে পাঁউরুটী ব্যবহার করিতেন, উণাদিসূত্র, স্মৃতি শাস্ত্র, পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি আর্য্যগ্রন্থে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। কালের অনতিক্রমণীয় বিধান বলে—প্রাচীন "কন্দু" "তন্দু" নামে অপভ্রংশ ও পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। আমা-দের দেশের জিনিষই আজ আমাদের কাছে বিদেশী আগন্তুকরূপে, দেখা দিয়াছে, আর্য্য-যুগের "কান্দব" আজ "পাঁউরুটী" "বিস্কুট" নামে অনার্য্য জুষ্ট অভিধান গ্রহণ করিয়াছে!

"তত্ত্ববোধিনীর টীকাকার হইতে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন পর্য্যন্ত—সকলেই "কন্দু" ও "কন্দুপক" লইয়া আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। কেহ কন্দুকে "ভর্জ্জন পাত্র" কেহ "মদ্য-পাক যন্ত্র", কেহ "ভোগস্থান" কেহবা "করাহী" নামে ব্যাখ্যাত করিয়াছেন। কিন্তু কন্দুপক যে পাঁউরুটী—'বৃন্দ সংহিতা'র কৃতান্নবর্গ হইতে আমরা তাহা সপ্রমাণ করিতেছি।

"বৃন্দ" একজন প্রবীন বৈদ্য ছিলেন, তিনি চক্রপাণি ও ভাবমিশ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী। "চক্র দত্ত" ও "ভাব প্রকাশে—"বৃন্দ-ধৃত বহুযোগ উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং 'বৃন্দকে" অর্ব্বা-চীন বলা চলেনা। 'বৃন্দে'র সময়ে "কন্দুপক" একটী উৎকৃষ্ট পথ্য বলিয়া পরিচিত ছিল। যথা—

বারিণা কোমলাং কৃত্বা সমিতাং লবণান্বিতাং।
বিনীয় সন্ধানং কিঞ্চিৎ স্থাপয়েত্তাজনে নবে।
চণ্ডাতপে তাবদ্রক্ষেৎ যাবদম্লত্ব মাপ্নুয়াৎ।
উদ্ধৃত্য চ পুনঃ পশ্চাৎ সন্নায়ং দৃঢ় পাণি না॥
ততোঽপূপা কৃতি কুর্য্যাৎ খজমূর্চ্ছিতয়া তয়া।
ভূর্ষাঙ্গার প্রতপ্তেতু কন্দুগর্ভে নিবেশ্য চ॥
পঙ্কেন রন্ধ্রমালিপ্য স্বেদায়ত্তাং যথাবিধি।
অনেন বিধিনা সিদ্ধং কান্দবং কথিতঃ বুধৈঃ॥
কান্দবং মলকৃদ্বৃষ্যং ত্রিষু দোষেষু পূজিতং।
সদ্যোরুচি করং হৃদ্যং শীঘ্র মিন্দ্রিয় তর্পণং॥
দুগ্ধে, মাংসরসেঃ বাপি কান্দবং ভক্ষয়েন্নরঃ।
শ্বাস-কাস-জরচ্ছর্দ্দি মেহ কুষ্ঠ ক্ষয়াপহং॥

'বৃন্দ'। কৃতান্নবর্গ। (১)
দ্রব্য বিজ্ঞানীয়-কাণ্ড।

ইহার অর্থ—

ময়দার সহিত লবণ মিশ্রিত করিয়া, জল দিয়া বেশ নরম ভাবে মাখিবে এবং তাহাতে কিঞ্চিৎ সন্ধান [মদ্য জাতীয় অম্ল রসাস্রব দ্রব বিশেষ] নিক্ষেপ করিয়া নূতন মৃন্ময়-পাত্রে রাখিয়া দিবে। ঐ পাত্র রৌদ্রে থাকিবে, যখন দেখিবে, পাত্রস্থ ময়দা অম্লরসযুক্ত হইয়াছে, তখন ভাঁড় হইতে তাহাকে বাহির করিয়া খুব দৃঢ় হস্তে মর্দ্দন করিতে থাকিবে। উত্তমরূপ ছানিত হইলে, তাহার দ্বারা পিষ্টক প্রস্তুত করিবে। পরে "কন্দু নামক পাক

(১) 'বৃন্দে'র অনুকরণ করিয়া ভাবমিশ্র স্বগ্রন্থে "কৃতান্নবর্গ" সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

যন্ত্রের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে প্রজ্বলিত অঙ্গার পূর্ণ করিয়া তাহা উত্তপ্ত করিয়া লইবে। সেই উষ্ণ কন্দুর মধ্যে পিষ্টকগুলি রাখিয়া, কন্দুর ছিদ্র পথ পঙ্কদ্বারা লেপন করিয়া দিবে। এই রূপ উপায়ে সিদ্ধ পিষ্টকের নাম "কান্দব"। দুগ্ধ অথবা মাংস রসের সহিত ইহা ভক্ষণ করিতে হয়।

কান্দবের গুণ—মল-বৃদ্ধিকারক, শুক্র জনক, ত্রিদোষ-নাশক, সন্তোরুচিবর্দ্ধক, হৃদয়ের তৃপ্তিসাধক, ইন্দ্রিয় তর্পণ [ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা সম্পাদক] এবং শ্বাস, কাস, জ্বর, বমি, মেহ, কুষ্ঠ ও ক্ষয় রোগ নাশক।

এই কান্দবই যে পাঁউরুটী—এখন বোধ হয় কেহই আর তাহা অস্বীকার করিবেননা। বর্ত্তমানকালে যেরূপ ভাবে পাঁউরুটী প্রস্তুত হইয়া থাকে, পুরাকালে "কান্দব" ও সেইরূপ প্রণালীতে প্রস্তুত করা হইত।

এখন আমরা "কন্দু" ও "কান্দব" চিনিতে পারিলাম। ব্যাকরণ, অভিধান, স্মৃতি, পুরাণ, যে "কন্দুর" স্বরূপ বুঝাইতে পারে নাই, আয়ুর্ব্বেদের মহিমায় আমরা সেই 'কন্দুর' প্রকৃত রূপ দেখিতে পাইলাম। আয়ুর্ব্বেদের প্রসাদে—আমাদের মনের সন্দেহ সংশয় প্রশ্নের অতীত হইয়া গিয়াছে। এই জন্যই পত্র-"সূচনায়" বলিয়াছিলাম, আমাদের এমন কোনও শিল্প-বিজ্ঞান, শাস্ত্র-নীতি নাই, আয়ুর্ব্বেদের সঙ্গে সঙ্গে যাহার না উন্নতি হইবে। আয়ুর্ব্বেদকে অপূর্ণতা হইতে রক্ষা করিতে পারিলে—আমরা দেব-প্রতিষ্ঠার ফল ভাগী হইব। কিন্তু দুঃখের বিষয়,—আমার ক্ষীণ কণ্ঠের আর্ত্ত নিবেদন অরণ্যের "রোদনের মত নিষ্ফল হইয়াছে। নহিলে, অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদবিদ্যালয়ের পবিত্র- প্রাঙ্গণে—এতদিন "গণনাথ" যোগীন্দ্রনাথ ও রাজেন্দ্রনাথকে আমাদের সহযোগী-সাধক বেশে দেখিতে পাইতাম।

আমাদের শ্লাঘার, স্পর্দ্ধার, গর্ব্বের—যাহা কিছু আছে, তাহা যে সূর্য্যাস্তের বর্ণ-রেখার মত ধীরে ধীরে দিক্ চক্রবালে মিলাইয়া যাইতেছে! কীর্ত্তি-গরীয়ান-ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া, সে দিকে কি তোমরা ফিরিয়াও চাহিবে না?

আমার আয়ুর্ব্বেদ! আমার বিরাট অতীতের গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতি! আমার পার্থিব নন্দনের হরিচন্দন! আমার জাতীয় জীবনের দীপালি-উৎসব! আমার সারা সৃষ্টির কঠোর সাধন! আমার চরম সত্যের দিব্য জ্যোতিঃ! তুমিই বলিয়া দাও—কেমন করিয়া তোমায় রক্ষা করিব? সৃষ্টি-নেপথ্যে, ছিন্নমস্তা সাজিয়া —আমরা যে দলাদলির মোহে আপনার রক্ত আপনিই পান করিতেছি! *

কবিরাজ শ্রীব্রজবল্লভ রায়।

---

* কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, "সাহিত্য" "মর্ম্মবাণী" "ভারতবর্ষ" প্রভৃতি সাময়িক পত্রের লেখক, প্রত্নতত্ত্ব বিশারদ অসাধারণ পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বেদান্ত তীর্থ মহাশয়ের "পাকবিদ্যা" হইতে এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য প্রমাণগুলি সংগ্রহ করিয়াছি। "কন্দুপক"ই যে পাঁউরুটী—একথা তিনিই সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশ করেন। তিনিই আমায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।
—লেখক।

আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসার সূত্র।

—:*:—

পদার্থবিদ্ পণ্ডিতগণের অভিমতে যতগুলি পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সকলই কার্য্য-কারণ সমষ্টি। অর্থাৎ-মহৎ-প্রকৃতি হইতে কীটানুর হৃদপিণ্ডজাত শোণিত পুঞ্জের সূক্ষ্ম পরমাণু পর্য্যন্ত যত কিছু পদার্থ জ্ঞানের সীমায় আসিয়া পৌছিয়াছে. সে সমুদয়ই পরস্পর কারণ-মুখাপেক্ষী।

কোন কোন বিজ্ঞানবিদ্ বলেন,—গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্রমালা শোভিত গগনমণ্ডল অসংখ্য জাতীয় অসংখ্য জীবগণের আধার বায়ুমণ্ডলের সহিত দেদীপ্যমান বসুন্ধরা ঐন্দ্রজালিকের বৈচিত্রের ন্যায় বিচিত্রতা দেখাইয়া অহর্নিশি প্রাণিগণের ইন্দ্রিয়গণকে যথোচিত তৃপ্ত করিতেছে।

এই বিচিত্রতা কেবল কার্য্য-কারণ ভাবের বিকাশ মাত্র। প্রোক্ত মত পোষক বৈজ্ঞানিক আচার্য্যবৃন্দ এই সীমাশূন্য জগৎকে দুই ভাবে বিভক্ত করিয়া, একটী কারণ অপরটি কার্য্য এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে কতকগুলি এরূপ আছে—যাহা এক সময়ে কার্য্য, তাহাই অপর সময়ে কারণ রূপে প্রতীয়মান হয়? যেমন পিতা, পুত্র, পৌত্র ইত্যাদি।

এই কার্য্য-কারণ যেমন সূক্ষ্ম, তেমনি মহৎ ও বিবিধ রাগে রঞ্জিত, জগৎব্যাপক; অতএব মহৎ; অনেক স্থানে অতি নিগূঢ়ভাবে অবস্থিত, —অতএব সূক্ষ্ম। নানা বিচিত্র ভাবে প্রকটিত —সুতরাং বিবিধরাগে রঞ্জিত।

কত সহস্র সহস্র শতাব্দি অতীত হইয়াছে এ অদ্ভুত কার্য্য-কারণ ভাবের ইয়ত্তা হইতে পারে নাই,—পারিবেও না।

সভ্য জগতে যত প্রকার চিকিৎসা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার সকলেরই কতকগুলি মূল নিয়মের নাম সূত্র বা Principle। উক্ত সূত্রের ভেদানুসারে চিকিৎসা এবং উহার নামের ভেদ হইয়া থাকে।

সূত্রই শাস্ত্রের জীবন এবং সূত্রই শাস্ত্রের সোপান। যে কোন বিদ্যাই হউক,—যতদিন সৌত্রিক আকারে উপস্থিত না হয়, সৌত্রিক পন্থায় সম্প্রসারিত না হয়, অথবা সৌত্রিক নিয়মের অধীন হইয়া না চলে, ততদিন উহার প্রকৃতশাস্ত্রে সংজ্ঞা বা (Scince) নাম দেওয়া সমীচীন নহে। সূত্রের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ অনুসারে শাস্ত্রের উন্নতি বা অবনতি সর্ব্বতো ভাবে বিচার্য্য।

শাস্ত্রের সূত্র অতি দুর্বোধ ও জটিল বলিয়া সহসা উহার মর্ম্মোদ্ঘাটন হয় না। এই হেতুবাদ বশতই বিবাদ-বিসম্বাদ চলিয়া আসিতেছে। জ্ঞানের যথার্থ উন্মেষ ও যথার্থ অনুশীলন না জন্মিলে সূত্রের মাহাত্ম্য বুঝা যায় না।

অথর্ব্ব বেদে সূত্রের একটি সুন্দর মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে—,

"যোবিদ্যাৎ সূত্র বিততং"
যস্মিন্নোতাঃ প্রজা ইমাঃ।
সূত্রং সূত্রস্য যো বিদ্যাৎ
সবিদ্যা ব্রাহ্মণং মহৎ॥

যদি ও এই সূত্রটি ব্রহ্ম বিধায়ক; ব্রহ্মপ্রতি

পাদনই এই সূত্রের উদ্দেশ্য, তথাপি ইহার দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাহা মূল—যাহা হইতে সমুদয়ের সূচনা হইয়াছে—যাহা সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ—তাহাতে সমুদয়ই প্রথিত, তাহা জ্ঞাত হওয়াই কর্ত্তব্য।

আমাদের দেশে অনেকেই ব্যাকরণ-সাহিত্যাদি পাঠ করিয়াই বৈদ্যকশাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। সাধারণতঃ বৈদ্য-ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেকেই সংগ্রহক বা তালিকা গ্রন্থপাঠী। শাস্ত্রে যে রোগে যে ঔষধ-তৈল-ঘৃতাদি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহারা তাহার অবিচারিত ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন। আবার যাহারা মূল (আর্ষ) গ্রন্থের অধ্যয়ন অধ্যাপনা করেন। তাঁহাদেরও শাস্ত্রের সূত্রাদির প্রতি দৃষ্টি-নাই বলিলেই হয়।

বৈদ্য শাস্ত্রের আলোচনা করিতে গিয়া ইঁহারা ব্যাকরণের কারক-সমাস প্রভৃতি এবং ন্যায়ের দুই চারিটা অবচ্ছদাবচ্ছিন্ন লইয়াই প্রায়শঃ বৃথা কাল হরণ করেন। বৈদ্য শাস্ত্রের প্রকৃত উন্নতির পক্ষে ইহাও একটি অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাজেই চিকিৎসা বিষয়ক নূতন সংকলন বা আবিষ্কার ও যথার্থ গভীর গবেষণা আর নাই। রোগী, রোগের প্রকৃতি, রোগ প্রতি কারক ঔষধ ও তত্তাবতের অংশাংশ কল্পনা,—দেশ-কাল ইত্যাদির চিন্তা ও অনুধাবনের সহিত অল্প ব্যক্তিরই সংস্রব দৃষ্টি-গোচর হয়। সুতরাং এহিক্ষণ অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, চিকিৎসা শাস্ত্রের আবার সূত্র কি! ইহার সংক্ষিপ্ত উত্তর এই, যে, যুক্তির উপর শাস্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, বিস্তীর্ণ বিষয় যাহা দ্বারা সুসম্বদ্ধ এবং যাহাতে প্রোথিত থাকে এবং অনুক্ত বিষয়ের ও যাহা দ্বারা উপলব্ধি হয় তাহাই সূত্র।

যেমন—দেব+আদি=দেবাদি। দয়া+অর্ণব=দয়ার্ণব। এইরূপ নির্দ্দিষ্ট সংহিত পদ যাহার জানা আছে, তিনি সেই কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট পদেরই সন্ধি করিতে পারিবেন। কিন্তু ঐরূপ উদাহরণ সমূহের সন্ধি যে নিয়মে নিষ্পন্ন হয়, যাহার সেই নিয়মের পরিগ্রহ হইয়াছে, তিনি ঐরূপ অনন্ত পদের সন্ধি নিষ্পন্ন করিতে সর্ব্বথা সমর্থ।

ঐরূপ নিয়মের নামই সূত্র। সূক্ষ্মদর্শী চক্রপাণি বলিয়াছেন।—

"সূত্রনাৎ সূচনাচ্চার্থ সন্ততেঃ সূত্রম্।"

যাহার সূত্র যত ব্যাপক অব্যভিচারী; তাহার সূত্র তত পরিপক্ক ও প্রশংসনীয়। সৌত্রিক লাক্ষণিক প্রথার সন্ধান না পাইলে মনুষ্য কোন বিষয়ই আয়ত্ত করিতে পারিত না।

সেই জন্যই সিদ্ধ পুরুষ বলিয়াছেন।—

ঋষযোঽপি পদার্থানাং
নান্তং যান্তি পৃথক্‌তশঃ।
লক্ষনেনতু সিদ্ধানামন্তংযান্তি বিপশ্চিতঃ॥

কোনরূপ নিদর্শন ব্যতিরেকে শাস্ত্র মাত্রেরই সূত্র পরিস্ফুট ভাবে লক্ষীভূত হয়না। সুতরাং চিকিৎসা শাস্ত্রের ও সূত্র একেবারে বিনা নিদর্শনে নির্ম্মিত হইয়াছে—ইহা সম্ভবপর নহে। কোন স্থানে কোন ঘটনা অগ্রে প্রত্যক্ষ হওয়া চাই। সেই প্রত্যক্ষ দৃষ্টানুসারে অনুমান, অনুভব, যুক্তি—ইত্যাদির বলে সূত্র সকল উদ্ভাবিত হয়।

১। অন্নরন্ধন-স্থালীর উপরস্থিত সরাবের উত্থান ও পতন অবলোকন করিয়া (জেমস্ ওয়াট) জলীয় বাষ্পের যে কার্য্য সাধিকা শক্তি অবধারণ করেন, তাহা হইতেই

এহিক্ষণ বৃহৎ অর্ণবযান, সুদীর্ঘশকটশ্রেণী, শত শত যন্ত্র পরিচালিত হইতেছে।

২। উদ্যানস্থিত য্যাপেল ফলের পতন দেখিয়া সার আইযাক্ নিউটন পৃথিবীর যে আকর্ষণ অনুমান করেন, তাহা জগৎব্যাপী মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কারের মূল সূত্র।

৩। স্নানার্থ জলাধারে অবগাহন কালে শরীরের লঘুত্বা অনুভব করিয়া, আর্ক মিডিশ্ জলাদিতে ভাসমান দ্রব্যের ভারাপচয়ের যে কারণ নিরূপণ করেন, তাহা হইতেই আপেক্ষিক গুরুত্ব বিষয়ক নিয়মের সূত্রপাত হয়।

৪। একদা ঝটিকা কালে ফ্রাঙ্কলিন্ ঘুড়ি উড়াইতে উড়াইতে তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ যে বিদ্যুতের অংশ ইহা অবগত হন্। পরে বিদ্যুৎ ও তাড়িৎ আবিষ্কৃত করেন। তাহাই বর্ত্তমান টেলিগ্রাফ্ যন্ত্রের মূল ভিত্তি।

৫। কোন সময় গ্যালেলিউ এক ধর্ম্ম সভায় উপবিষ্ট ছিলেন; এমন সময় দেখিলেন, সেই গৃহের উপরিভাগে একটি ঘণ্টা দুলিতেছে, এবং দোলন-ক্রিয়ার ক্রমিক-ভাবের হ্রাস হইতেছে,—ইহা হইতেই তিনি প্রমাণ করিলেন, এক নির্দ্ধারিত বিন্দু সংলগ্ন গোলক সমভাবে দুলিতে থাকিবে, এই ঘটনা হইতেই জগতের ঘটিকা-যন্ত্রের সূত্র পাত হয়।

৬। কোন সময়ে গ্যালেলিউ শুনিতে পাইলেন, জন্সন নামে এক ওলন্দাজ পণ্ডিত এমন এক সেন্দার সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা দ্বারা বস্তু সকলকে বিপরীত দেখা যায়। ইহা শুনিবামাত্র তিনি সেই খেল্না ক্রয় করেন এবং এই খেল্না অবলম্বন করিয়া পরিশেষে জ্যোতিষ্ক সমূহের তত্ত্বাবধানের মূল স্বরূপ দূরবীক্ষণ নামক যন্ত্রের সৃষ্টি করেন।

৭। কথিত আছে, অধিক মাত্রায় কুইনাইন্ সেবন করিয়া জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হইতেই হানিমন্ স্বপ্রবর্ত্তিত চিকিসার সূত্রাংশ নিষ্কাশন করেন। সেই সূত্র হইতেই চিকিৎসা বিদ্যার আর একটি ভিন্ন পন্থা আবিষ্কৃত হইয়া আজ বিশ্ব ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্য ভূমিতে সূত্র বিষয়ক এবম্ভূত বহুল ইতিহাসের অভাব নাই। যৎকালে সূত্র দৃঢ় বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়, কোনস্থানেই আর উহার ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না,—তখন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড উহার আয়ত্ত হইয়া পড়ে। সহস্র যোজনান্তরের কার্য্য সকল সহস্র বৎসরের পূর্ব্বের বা পরের ব্যাপার সমূহ তখন আর দূরস্থ বলিয়া মনে হয়না, হস্তামলকের ন্যায় সন্নিহিত বলিয়া নিরূপিত হয়।

অনুধ্যান করিলে সমস্ত জগৎ বুদ্ধি-দর্পণে সংক্রামিত হয়। এই সূত্র সংকলনে যিনি যে পরিমাণে পটু, তিনি সেই পরিমানে যোগী।

আয়ুর্ব্বেদীয় সূত্র সমূহ প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত,—কারণ-সূত্র, লক্ষণসূত্র ও ক্রিয়াসূত্র।

চরকে কথিত আছে—

"হেতুলিঙ্গৌষধ জ্ঞানং
স্বস্থাতুর পরায়ণম্।
ত্রিসূত্রং শাশ্বতং পুণ্যং
বুবুধে যং পিতামহঃ।

কারণ-সূত্রের দ্বারা রোগের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান-হেতু সকল সঙ্কলন করা যায়। লক্ষণ-সূত্রের দ্বারা রোগের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান চিহ্ন ও পীড়ার শুভাশুভ ফল স্থিরীকৃত হয়। ক্রিয়া-সূত্রের দ্বারা রোগের ঔষধ বা রোগ-প্রতিকারের উপায় নিরূপিত হইয়া থাকে। এই সূত্রের দ্বারা প্রতিরোগে যে সকল ঔষধ

প্রয়োজ্য, সেই সকল ঔষধে কিরূপ বীর্য্য—কিরূপ ধর্ম্ম হওয়া চাই,—কিরূপ বীর্য্য বিপাক প্রয়োজন, কোন্ প্রকার দেশে বা কোন্ প্রকার কালে, কোন্ প্রকার প্রকৃতিতে কিরূপ দ্রব্য আবশ্যক, কোন্ ব্যক্তির প্রতি বা কোন্ রোগের প্রতি কিরূপ আহার-আচরণ, পথ্য বা অপথ্য কোন্ কোন্ দ্রব্যের সহিত মানবের কিরূপ সম্বন্ধ ইত্যাদি—অত্যাবশ্যক তত্ত্ব সকল সঙ্কলিত হইয়া থাকে।

রোগের যেমন বিচিত্র অবস্থা অর্থাৎ কোন রোগে মলভেদ জন্মায়, কোন রোগে মল কঠিন করে, কোন রোগে শৈত্য আনিয়া থাকে, কোন রোগে উত্তাপ দান করে,—ঔষধের ও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন শক্তি, কোন ঔষধ ভেদক, কোন ঔষধ ধারক বা গ্রাহক কোন ঔষধ শৈত্যদায়ক, কোন ঔষধ উষ্ণ-তাপাদি জনক ইত্যাদি।

ঈদৃশ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম বা লক্ষণ যুক্ত রোগে কিরূপ ধর্ম্ম বিশিষ্ট ঔষধ প্রয়োগ করা বিধেয়—ইহা বুঝাইবার জন্য ঋষিদিগের অনেক সূত্রের সঙ্কলন করিতে হইয়াছে। আমারা তন্মধ্যে প্রথমে সামান্য সূত্রের আলোচনা করিব। বিশেষ জ্ঞানের পূর্ব্বে সামান্য জ্ঞান হওয়াই উচিত।

চরকের বিমান স্থানে লিখিত আছে—

যথাস্বং সর্ব্বেষাং বিকারানামপি চ নিগ্রহে।
হেতু ব্যাধি বিপরীত মৌষধ মিচ্ছন্তি
কুশলা স্তদর্থকারিণঃ॥"

ইহার মর্ম্মার্থ:—সমুদয় রোগের প্রতিকারার্থে হেতু বিপরীত অথবা হেতু বিপরিতার্থকারী, ব্যাধিবিপরীতার্থকারী এবং উভয় বিপরিতার্থকারী ঔষধ যথাযথ স্থান বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে। এইটিকে সাধারণ সূত্র বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ইহা সমুদয় রোগের চিকিৎসাতেই ব্যাপক। রোগ যেরূপ প্রকৃতির বা যে প্রকার ধর্ম্ম লইয়া হউক না কেন, সমুদয় রোগেরই ঔষধ ইহা দ্বারা নির্ব্বাচিত, হইতে পারে। প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত ও যুক্তিবলে স্থির হইয়াছে যে, বিরোধী পদার্থ বা ক্রিয়ার সম্পর্কে পদার্থ মাত্রেরই হ্রাস বা বিনাশ হইয়া থাকে।

শীত ক্রিয়ায় উষ্ণ নিবারণ, উষ্ণযোগে শীত প্রতিকার—ইত্যাদি ব্যাপার স্বতঃসিদ্ধ। এই নৈসর্গিক কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে সংসাধিত হয়। প্রণালীতে বিভিন্নতা থাকিলেও বৈপরিত্য বা বিরোধিতা হ্রাস বা বিনাশের হেতু।

ইহা চিকিৎসা শাস্ত্রের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত-প্রভাবে ঋষিগণ স্থির করিয়াছেন যে, যে রোগ যে কারণে উৎপন্ন অথবা যেরূপ ধর্ম্মযুক্ত, উহার বিরোধী ধর্ম্ম বা ক্রিয়াই সেই রোগের ঔষধ বা প্রশমক। উক্ত বিরোধিতা বহু প্রকার, প্রথমতঃ আমরা উহাকে তিন ভাগে বিগক্ত করিতেছি, যথা,—সাক্ষাৎ বিরোধিতা ও পরম্পরিত বিরোধিতা, প্রভাবকৃত বিরোধিতা।

১। সাক্ষাৎ বিরোধিতা। ঔষধ শরীরের সহিত সম্পর্কিত হইবা মাত্র সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অর্থাৎ অব্যবহিত পরেই যে বিরুদ্ধ বা বিপরীত ক্রিয়া প্রকাশ করে, তাহা সাক্ষাদ্বিরোধিতা, যথা অগ্নিতাপে শীত নিবারণ, জলসেচনে দাহ বা তাপ প্রশমন।

২। পরম্পরিত বিরোধিতা,—ঔষধ শরীরে সংযুক্ত হইবামাত্র প্রথমতঃ এক প্রকার ক্রিয়া প্রকাশ করে। পরে সেই ক্রিয়ার আনুসঙ্গিক বা সেই ক্রিয়া জন্য ক্রিয়ান্তরের

আবির্ভাব হয় তাহাই পরস্পরিত বিরোধিতা। যথা—

সিদ্ধার্থকবচালোধ্র-সৈন্ধবৈশ্চ প্রলেপনং
বমনঞ্চ নিহন্ত্যাশু-পীড়াকান্‌যৌবনোদ্ভবান্‌ ॥

ভাবপ্রকাশ।

শ্বেত সর্ষপ, বচ্‌, লোধ, সৈন্ধবের প্রলেপে বমন প্রভৃতি দূরীভূত হয়।

এমন স্থান আছে, যে স্থানে কারণের নাশ বা বিলোপ সাধন হইলে কার্য্যেরও বিনাশ ঘটে। আবার এমন ও উদাহরণ পাওয়া যায়,—যে স্থলে কার্য্যের বিনাশ ঘটিলে তাহার কারণ আপনা হইতেই লয় পায়। কোন কোন স্থলে এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়, যে স্থলে কার্য্য ও কারণ উভয়ের যুগপৎ আক্রমণ না ঘটিলে উহাদের বিনাশের সুযোগ ঘটে না। ইহা পরীক্ষা-সিদ্ধ প্রাকৃতিক নিয়ম। এই নিয়মের অধীন বলিয়া ঋষিগণ ঔষধ ত্রিবিধ গণনা করিয়াছেন। তৎ যথা—

হেতু বিপরীত—(নামান্তর হেতু বিরোধী বা হেতু নাশক)।

ব্যাধি বিপরীত—(নামান্তর ব্যাধি বিরোধী বা ব্যাধি নাশক)।

উভয় বিপরীত—(নামান্তর হেতু-ব্যাধি—উভয় বিপরীত বা হেতু-ব্যাধি—উভয় নাশক

১। হেতু বিপরীত ঔষধ—যে সকল ঔষধ হেতু অর্থাৎ উৎপাদক-কারণের বিপরীত ধর্ম্মযুক্ত অথবা উৎপাদক কারণের বিনাশ ঘটিলে যাহা দ্বারা পীড়ার উপশম হয়—সেই সমস্ত ঔষধকে হেতু বিপরীত ঔষধ বলা যায়। যেমন কফজ্বরে শুঁঠ্‌ অথবা ক্রিমিজনিত বমন বা শূল রোগে ক্রিমি নাশক ঔষধ।

২। ব্যাধি বিপরীত ঔষধ—। যে সকল ঔষধে রোগীর শক্তিকে খর্ব্ব করে (যে কারণে রোগোৎপন্ন হইয়াছে, তৎপ্রতি চিকিৎসকের বিশেষ মনোনিবেশ না থাকিলেও চলিতে পাবে), সেই সকল ঔষধের নাম ব্যাধি বিপরীত। যথা—খদির কুষ্ঠ নাশক, হরিদ্রা মেহ নাশক, অহিফেন অতিসার নাশক ইত্যাদি।

৩। উভয় বিপরীত ঔষধ—যে সকল ঔষধ রোগের কারণ এবং রোগ—উভয়কেই এক সময়ে প্রশমিত করিতে সমর্থ, সেই সকল ঔষধকেই উভয়-বিপরীত ঔষধ বলা যায়। যথা বাত জনিত শোথরোগে দশমূল।

৪। হেতু বিপরীতার্থকারী ঔষধ—নামান্তর হেতু সদৃশ। ব্যাধি বিপরীতার্থকারী ঔষধ—নামান্তর ব্যাধি সদৃশ ঔষধ। উভয় বিপরীতার্থকারী ঔষধ, নামান্তর হেতু ব্যাধি উভয় সদৃশ ঔষধ।

হেতু বিপরীতার্থকারী ঔষধ,—যে সমস্ত ঔষধ—হেতুর সমান ধর্ম্ম অর্থাৎ যে কারণে রোগৎপন্ন হয়—তাহার যেরূপ ধর্ম্ম বা ক্রিয়া তদ্রূপ ধর্ম্ম বা ক্রিয়া যুক্ত হইয়াও রোগ প্রতিকারে সমর্থ—সেই সমস্ত ঔষধকে হেতু-বিপরীতার্থকারী ঔষধ বলা যায়। যেমন মদ্য পান জনিত রোগে মদ্য।

ব্যাধি বিপরতীার্থকারী ঔষধ,—রোগের যেরূপ ধর্ম্ম, সেইরূপ ধর্ম্ম বা ক্রিয়াযুক্ত ঔষধকে ব্যাধি-বিপরীত ঔষধ বলা যায়, যথা—উন্মাদ রোগে ধুস্তুর, অম্লপিত্ত রোগে জম্বীর রস, বমন রোগে মদন ফল ইত্যাদি।

উভয় বিপরীতার্থকারী ঔষধ। যে সমস্ত ঔষধ রোগের কারণ এবং রোগ সমধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াও রোগ প্রতিকারে সমর্থ তাহাকে উভয় বিপরীতার্থকারী ঔষধ বলা যায়।

যথা,—অগ্নিদগ্ধ স্থানে অগ্নি সন্তাপ, তথা উষ্ণবীর্য্য বস্তু প্রলেপ ইত্যাদি।

তিন প্রকার সদৃশ ঔষধের মোটামুটি লক্ষণ মাত্র বলা হইল। উহাদের পরস্পরের পার্থক্য প্রণিধান পূর্ব্বক বুঝা আবশ্যক।

হেতু-সদৃশ ও ব্যাধি-সদৃশ—এতদুভয়ের প্রভেদ এই যে, হেতু-সদৃশ কেবল হেতুরই. (যে কারণে রোগ উৎপন্ন হয়) সদৃশ। যে ব্যাধির যে প্রকার লক্ষণ হউক না কেন, তাহার সহিত সাদৃশ্যের কোন আবশ্যকতা নাই। মনে কর, পান-দোষে অজীর্ণ, পিপাসা, দাহ—অনেক প্রকার রোগ হইয়া থাকে। ইহার যে কোন রোগ যেরূপ লক্ষণাক্রান্ত হইয়া উপস্থিত হউক না কেন, সমস্ত রোগেই মদ্য প্রয়োগ করা যায়।

ব্যাধি-সদৃশ ঔষধ ওরূপ নহে,—অর্থাৎ যে কোন কারণে রোগ উপস্থিত হউক না কেন, ঔষধ কারণের সদৃশ না হইয়া রোগের সদৃশ হওয়া চাই। মনে কর, ধুস্তূর সেবনে উন্মাদ রোগ উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু ধুস্তূর ভিন্ন অন্য কোন কারণে যদি উন্মত্ততা উপস্থিত হয়, সে স্থলে ধুস্তূর প্রয়োগ করাই যথার্থ ব্যাধি-সদৃশ ঔষধ।

উভয় সদৃশ ঔষধ,—উভয়ের মিশ্রন লক্ষণ যুক্ত। পারদ জনিত ক্ষত রোগে পারদ প্রয়োগ অথবা অগ্নি দগ্ধ স্থানে অগ্নিরই সন্তাপ প্রদান করা—ইহাই উভয় সদৃশ ঔষধ।

পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার বিপরিতার্থকারী বা সদৃশ ঔষধের উল্লেখ দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, ঐ সকল ঔষধ বর্ত্তমান—হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মতানুযায়ী। কেননা, হোমিওপ্যাথের মতের সহিত অংশ-বিশেষে একতা থাকিলেও সর্ব্বাংশে তৎতুল্য নহে।

ঐ সমস্ত ঔষধের আভ্যন্তরিক ক্রিয়া ও মাত্রাদি বিষয়ে আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মিবে, ঐ সমস্ত ঔষধ বিপরীত ঔষধেরই অর্থাৎ এলোপ্যাথিকেরই অন্তর্নিবিষ্ট। কেবল ধর্ম্ম গত বৈলক্ষণ্য বশতঃ নাম মাত্র পৃথক শ্রেণীভুক্ত। বমন রোগে মদন ফল প্রয়োগ করিবার বিধান থাকিলেও ইহা যাবতীয় বমন রোগে প্রয়োজ্য নহে। যে স্থানে উদরে অথবা হৃদয়ে বহু পরিমাণে শ্লেষ্মা সঞ্চিত থাকে এবং ঐ সঞ্চিত শ্লেষ্মার আধিক্য বশতঃ রোগীর বমন বা বিবমিষা উপস্থিত হয়,—এমন স্থানে উক্ত শ্লেষ্মা নিস্সারণের জন্য বমন কারক ঔষধ প্রয়োগ করাই আশু উপকারক। কেননা, যে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা নির্গত না হইলে বমন নিবারণের সুযোগ নাই। এই বিবেচনায় রোগের কারণীভূত কফের নিবারণ জন্য ঐরূপ ক্ষেত্রে মদন ফল প্রয়োগের বিধান হইয়া থাকে। সুতরাং উহা হেতু বিপরীত ঔষধ বলিয়াই গণ্য।

কবিরাজ
শ্রীদীননাথ কবিরত্ন শাস্ত্রী।

দুইটী চিত্র।

——:*:——

অভিব্যক্তি।

অব্যক্ত চৈতন্য, ক্ষিতি, তেজ, বায়ু ব্যোম্
ইহাতেই প্রকটিত জগৎ যেমন;
অপরূপ অভিনব সৃষ্টির গৌরব
নরদেহে একাধারে বর্ত্তমান তাহা।
মানবের পুণ্য মূর্ত্তি পৃথিবী স্বরূপ,
রস, রক্ত—অপ্; তেজঃ—শারীরিক তাপ্;
প্রাণাদি বায়ুর রূপ, ছিদ্রাদি আকাশ,
নিত্যশুদ্ধ অন্তরাত্মা ব্রহ্মের সদৃশ।
ব্রহ্মার উদ্ভব যথা ঐশ্বর্য্য প্রভাবে,
অন্তরাত্মা বিভূতিতে তথা নর-মন;
ইন্দ্র যিনি নরদেহে অহঙ্কার তিনি,
উজ্জ্বল আদিত্য মাত্র পুরুষে আদান।
এ জগতে অভিহিত যাহা রুদ্র নামে,
তা'রি নাম রোষ ক্রোধ নর দেহধামে।

পূর্ণতা।

জগতের চন্দ্র যাহা, পুরুষে প্রসাদ,
জগতের বসু যাহা, দেহে তাহা সুখ;
দেহ কান্তি—পৌরাণিক অশ্বিনী কুমার
বায়ুর প্রবাহ নরে উৎসাহ অসীম।
ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থ দেবতা স্বরূপ,
জগতের অন্ধকার পুরুষের মোহ;
বিশ্বমাঝে জ্যোতিঃ যাহা, নরে তাহা জ্ঞান,
পুরুষের সৃষ্টি ক্রিয়া রঙ্গ দ্যুলোকের।
সত্যযুগ প্রকাশিত নরের শৈশবে,
ত্রেতাযুগ দৃশ্যমান যৌবনাবস্থায়;
রুগ্নতা ও স্থবিরতা দ্বাপর ও কলি,
যুগান্ত প্রলয় যাহা মৃত্যু তাহা নরে।
অব্যক্ত অচিন্ত্য শক্তি এই নরদেহে,
বিরাজেন চিদানন্দ এই পুণ্য দেহে।

শ্রীমণীন্দ্র প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

শ্বেত প্রদর চিকিৎসা।

——:*:——

ঠাকুমা ও ছোট বৌ।

ছোট বৌ। তোমার দু'টি পা'য়ে পড়ি ঠাকুমা, তুমি ঠাকুরকে বল—আমায় সঙ্গে নিয়ে যেতে। তুমি ব'ল্লে, আর কেউ রদ্ ক'র্‌তে পারবে না।

ঠা। তা' আমার পায়ে না হয় পড়্‌লি, আমি না হয় ব'ল্লাম্, কেউ না হয় রদ্ করতে পারলে না, কিন্তু একটা কাজ করতে গেলে—বিবেচনা ক'রতে হ'বেত—যে কাজটা ভাল কি মন্দ।

ছো। তা' তীর্থ ক'রতে যা'ব,—এ আর কি মন্দ?

ঠা। দেখ্ সব্ কাজেরই একটা সময় অসময় আছে। যে বয়সের যা'—সেই বয়সে সে'টা মানায় ভাল। তোর কি এখন তীর্থ ক'র্‌তে যাবার বয়েস?

ছো। তা' ধর্ম্মের কাজে আবার বয়েস কি ঠাকুমা?

ঠা। সব কাজেরই বয়েস আছে। এখন

সংসারের কর্ম্ম করাই তোমার ধর্ম্ম। সংসার কর, ছেলে-পিলে নাতি-নাতনী হোক, তা'র পর তীর্থ করতে যেয়ো।

ছো। আমার যে যা'বার জন্যে বড় মন কেমন ক'রছে ঠাকুমা।

ঠা। মন এমনই চঞ্চল যে, অনেক সময় অনেক অন্যায় কাজের জন্যে 'কেমন'ই করে—বাকুল হ'য়ে ওঠে। কিন্তু সে প্রবৃত্তিকে দমন করাই মানুষের কর্ত্তব্য। যে দমন না ক'রতে পারে, তার নিশ্চয় অধঃপতন ঘটে।

ছো। কিন্তু এতে'ত পুণ্যি হয় ঠাকুমা।

ঠা। না, এবয়সে সংসার ছেড়ে—নিজের কর্ত্তব্য ছেড়ে কোথায়ও গেলে তা'তে পুণ্যি হয় না, পাপ হয়। সংসারে থেকে পুণ্যি করাই এখন তোমার উচিত।

ছো। সংসারে থেকে আর কি পুণ্যি করবো? তীর্থের মত পুণ্যি কি এখানে হয়?

ঠা। বটে? এ বয়সে সংসারই যে মহা-তীর্থ। স্বামী সেবা কর, গুরুজনের সেবা কর, বাড়ীর জীব-জন্তু, চাকর-বাকর, লোক-জন যা'তে সুখে থাকে, কষ্ট না পায়—তা' কর, অতিথ-ফকিরকে আহার দাও, ভিক্ষা দাও,—এতে এখানে থেকে যে পুণ্য হবে, শত তীর্থে গেলেও সে পুণ্য হবে না। বরং এসব না করার জন্য তা'তে পাপ হবে।

ছো। পাপ কিসে হবে?

ঠা। তোমার গুরুজন, তোমার স্বামী, তোমার সংসারের চাকর বাকর গরু-বাছুর—সকলের প্রতি তোমার একটা কর্ত্তব্য আছে। সে কর্ত্তব্য না ক'রে,—তুমি অন্য যত ভাল কাজই করনা, তাতে পাপ বই পুণ্য হবে না।

(লীলা ও রমার প্রবেশ)

লী। কিসে পুণ্য হবে না ঠাকুমা?

ঠা। এই দেখনা—গোবিন্দ আর বউমা তীর্থ ক'রতে যাচ্চে, ছোট বলে, আমায় ঐ সঙ্গে পাঠিয়ে দাও।

লী। তা'তে বাড়ীর সকলের মত কি?

ঠা। কারুরই মত নেই। ওর স্বামীর নেই, ওর শ্বশুর-শাশুড়ীর নেই, গিন্নি,—এমন কি, ঝি অবধি মানা করছে। ও এখন আমায় এসে ধ'রেছে, যে, আমি ব'লে দিলেই ওর যাওয়া হয়।

লী। হাঁ ছোট বৌ, গুরুজনদের মনে কষ্ট দিয়ে তীর্থ ক'রতে গেলে কি পুণ্য হয়? তুইত এখন মানুষের মত হ'য়েছিস্, এটা আর বুঝতে পার্‌লিনে।

ছো। বুঝ্‌তে একেবারে পারিনি,—তা'নয়, তবে মনে বড় ইচ্ছে হ'চ্ছিল। কত কি দেখ্‌তে পেতাম।

লী। তা' ওর বড় দোষ নেই ঠাকুমা, অনেক নির্ব্বোধ স্ত্রীলোকেরা স্বামীর মনে কষ্ট দিয়ে অনেক সময় লুকিয়ে তীর্থ ক'রতে চ'লে যায়, তা'রা বোঝে না যে, এতে তাদের পুণ্যি হয় না, পাপ হয়। এই রকম ক'রে আমাদের দেশে ধর্ম্মের নামে যে কত অধর্ম্ম হ'চ্ছে তা'র ঠিক নেই।

ঠা। তা'ত হচ্চেই। বিশেষ আমাদের দেশে আগে রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণপাঠ, কথকথা প্রভৃতি খুব চলিত ছিল ব'লে ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে লোকের অনেক জ্ঞান হ'ত। এখন সে গুলো প্রায় লোপ পেয়ে আসছে, মহাভারতে ধর্ম্ম-ব্যাধের যে একটী গল্প আছে—তা'তেই ওই রকম ব্যাপারে ধর্ম্ম আর অধর্ম্ম কি, বেশ বুঝিয়ে দেওয়া হ'য়েছে।

লী। ছোট বৌয়ের কি এখনও যেতে ইচ্ছে আছে নাকি?

ছো। একে ঠাক্‌মা,—তা'তে তুমি, আর ইচ্ছে কি থাকে ঠাকুরঝি। যাই—আমি সব গুছিয়ে-গাছিয়ে দিই গে।

ঠা। লীলা কখন্ এলি? বাড়ীর সব খবর ভাল ত?

লী। এই আস্‌ছি ঠাক্‌মা। বাড়ীর সব খবর তোমার আশীর্ব্বাদে ভালই। বাবা-মা তীর্থ করতে যা'বেন শুনে, একবার দেখ্‌তে এসেছি। আর তোমার একটী রোগী সঙ্গে ক'রে এনেছি। এ আমার সই রমা, তুমিত চেন। তুমি রোগীর ব্যবস্থা কর, আমি সকলের সঙ্গে দেখা করিগে।

(লীলার প্রস্থান)

ঠা। আয় রমা, বোস্। তাইত বড্ড রোগা হ'য়ে গেছিস যে!

রমা। (প্রণাম করিয়া) অনেক দিন থেকে অসুখে ভুগছি ঠাক্‌মা। কত চিকিৎসা করলাম, কিছুতেই কিছু হলোনা। শেষে সইএর পরামর্শে তোমার কাছে এসেছি।

ঠা। তা' কি অসুখ হয়েছে তোর?

র। কবিরাজেরা বলে শ্বেত প্রদর।

ঠা। কত দিন হ'য়েচে?

র। হয়েছে আজ ৯।১০ বছর। প্রথমে রক্ত ভাঙ্গা রোগ ছিল, ক্রমে শ্বেত প্রদরে দাঁড়িয়েছে।

ঠা। ছেলে-পিলে কিছু হয়েচে?

র। দু'টি ছেলে,—একটী আঠার বছর বয়সের সময় হয়েছে, তার তিন বছর আগে থেকে রক্ত ভাঙ্গা রোগ হয়। বড় খোকার হ'বার পরে থেকেই এই রোগের সূত্রপাত। দু'বৎসর পরে ছোট খোকা হয়। তা'র পর পাঁচ বৎসর হ'ল আর ছেলে পিলে কিছু হয় নি।

ঠা। এখন রোগের অবস্থা কি রকম বল দেখি?

র। এখন দিন-রাত জলের মত ভাঙ্গে,—দুর্গন্ধি। মাসিক বেশ পরিষ্কার হয়না। ক্ষিদে নেই, মাথা ঘোরে, বুক ধড়-ফড় করে, মনে কেমন ভয়-ভয় হয়, সংসারের, কিছুই ভাল লাগেনা।

ঠা। তাইত—এ রোগ বড় বিশ্রী, সহজে সারতে চায় না। অনেকদিন ধরা-কাটা করলে—তবে যদি সারে।

র। তা' তুমি আমায় যা' করতে ব'লবে, আমি তাই ক'রবো ঠাক্‌মা।

ঠা। প্রথম কথা এই, স্বামীর কাছ থেকে তফাতে থাকতে হবে।

র। আজ ছমাস থেকে ত'াই আছি ঠাক্‌মা।

ঠা। তা'র পর—এখন কিছু দিন একেবারে শুয়ে থাকতে হবে, কোন কিছু ক'রতে পাবে না। তা'র পর, যত দিন অসুখ না সারে, ততদিন কোন পরিশ্রমের কাজ মোটেই করবে না, সিঁড়ি-ভাঙ্গা হ'বে না, কোন ভারী জিনিষ তুলতে পাবেনা, ফল কথা, যা'তে তলপেটে চাড় লাগে—এমন কোন কাজ করতে পা'বে না।

র। আচ্ছা ঠাক্‌মা, আমি তাই ক'রবো। তুমি ওষুদ-পথ্যির কথা বল।

ঠা। আগে পথ্যির কথা বলি, শোন। দুধ-ভাত, গাওয়া-ঘি, ফুলকো লুচি—এসব খেতে পার। রাত্রে যদি বেশ ক্ষিদে না হয়—তা হ'লে খৈ-দুধ—কি দুধ-বার্লি—মিছরী দিয়ে খাবে। তরকারীর মধ্যে পটোল উচ্ছে, পলতা, কাঁচকলা, ন'টেশাক, পাকা দেশী কুমড়ো—এইসব খেতে পার, কিন্তু তরকারী

যত কম খাও—ততই ভাল। বেশী তরকারী খাওয়া ভাল নয়।

র। তা'তরকারী আমি বেশী খাইওনে। দাল খাওয়া চল্‌বে না?

ঠা। মুগ, মসুর, ছোলা আর অড়হর দাল খেতে পার। কিন্তু দাল ছেঁকে ফেলে দিয়ে কেবল যূষ টুকু খাবে।

র। মাছ মাংস কিছু খাওয়া যায় না?

ঠা। না এখন মাছ-মাংস কিছুই খেয়ে কাজ নেই, একটু ভাল হ'লে তখন দেখা যাবে।

র। জলখাবার কি খাওয়া যেতে পারে?

ঠা। দাড়িম, বেদানা, কেশুর কিসমিস পানফল, মিছরী—জল খাবারে এই সব খেতে পার।

র। খাবার সম্বন্ধে আর কোন নিয়ম আছে?

ঠা। অন্য নুণ না খেয়ে সন্ধব নুণ খাবে, আর তরকারীতে যেন লঙ্কার ঝাল দেওয়া না হয়। শাক্, অম্বল, কলায়ের দাল, দই—এসব একেবারে ছোঁবে না।

র। আচ্ছা, এখন ওষুদ কি খা'ব বল ঠাকুমা?

ঠা। খাবার ওষুদ পরে ব'লছি, জল ভাঙ্গাটা কি খুব বেশী?

র। হাঁ, আজ মাসখানেক থেকে বড্ড বেড়েছে।

ঠা। তা' হলে প্রথমে দিন কতক ডুস নিতে হবে।

র। সে আমি পারবোনা ঠাকুমা, তা'তে মবি আর বাঁচি।

ঠা। কেন পার্‌বিনে? নিজে নিজে নিবি অন্য কারুর সাহায্য দরকার হ'বে না।

র। তা' যদি হয় 'তা'হলে পারবো। আচ্ছা হাঁ ঠাকুমা, তুমিত কবিরাজী মতে ব্যবস্থা দাও, কবিরাজীতে ত ডুসের ব্যবস্থা ছিল না!

ঠা। কেন থাকবে না?—বরং ডাক্তারীতে যা' আছে, কবিরাজীতে তা'র চেয়ে খুব বেশী রকমই ছিল, তবে ডুস নাম ছিলনা, ডুস্ ইংরাজী নাম, আর ওর কবিরাজী নাম বস্তি।

র। আচ্ছা কি ক'রে ডুস নিতে হ'বে বল?

ঠা। শোন বলি। এক ছটাক বাবলা ছাল আর আধছটাক জনকপুরী খয়ের—দু'সের জলে সিদ্ধ ক'রে, এক সের থাকতে নামা'বি। তা'র পর ছেঁকে নিয়ে ঠাণ্ডা হ'লে, ডুসের যে পাত্র থাকে—তাইতে রাখবি। সেই পাত্রটী দেয়ালের গায়ে টাঙ্গিয়ে রাখ্‌তে হয়। তা'র সঙ্গে একটা লম্বা নল থাকে আর সেই নলের গোড়ায় একটা কল থাকে। সেই কল ঘুরিয়ে দিলেই নলের মুখের ভেতর দিয়ে বেগে কাথ বেরিয়ে আসে। ডুস্ এমন ভাবে নিতে হয়—যেন নাড়ীর (জরায়ু uterus) ভেতর পর্য্যন্ত জল যায়।

র। ডুস কি রোজ নিতে হবে?

ঠা। প্রথমে উপরি উপরি ৩।৪ দিন, কি যে কয় দিন নিলে জল ভাঙ্গা খুব ক'মে যায়—কি বন্ধ হ'য়ে যায়—তত দিন নিতে হবে। তা'রপর সপ্তায় দু' দিন করে নিলেই হবে।

র। এরকম কত দিন নিতে হবে?

ঠা। এ রোগের নিয়ম হ'চ্চে যে, ডুস্ নিলেই জল ভাঙ্গা বন্ধ হয়, আর ডুস বন্ধ কর্‌লেই আরম্ভ হয়। প্রথমে তিন মাস যে রকম বল্‌লাম, সেই রকম নিবি। তা'র পর কিছু দিন—সপ্তায় এক দিন—এম্‌নি ক'রে যত দিন না রোগ ভাল হ'য়ে যায়, তত দিন নিবি।

র। আচ্ছা এখন খাবার ওষুদ বল।

ঠা। শ্বেত ধুনা, রসসিন্দূর আর বঙ্গ ভস্ম সমান ভাগে মিশিয়ে দু'রতি মাত্রায় মধু দিয়ে মেড়ে, শ্বেত চন্দনের কাথ—কি রক্ত চন্দনের কাথ মিশিয়ে নিয়ে খা'বি।

র। আর এতে যদি উপকার না হয় ঠাকুমা ?

ঠা। উপকার হ'বে বৈকি। তা' না হয় আরও একটা ওষুদের কথা বল্‌ছি শোন্,—শ্বেত কুঁচের শিকড়, দারুহরিদ্রা, লোধ, রক্ত-চন্দন, অনন্তমূল, অর্জ্জুন ছাল, খয়ের কাঠ আর অশোক ছাল—প্রত্যেক জিনিষ এক সিকি ক'রে নিয়ে, থেঁতো ক'রে, নূতন হাঁড়িতে—কাঠের জ্বালে আধ সের জল দিয়ে সিদ্ধ করবি। আধ পোয়া থাকৃতে নামিয়ে, ছেঁকে নিয়ে কুসুম-কুসুম গরম থাকৃতে খেয়ে নিবি।

র। আচ্ছা ঠাকুমা, রস সিন্দূর আর বঙ্গ পাব কোথায় ?

ঠা। কোন কবিরাজের কাছে থেকে কিনে নিবি। রসসিন্দূর দু'রকম পাওয়া যায়, এক রকম মোটা আর এক রকম চটি ; চটি রস-সিন্দূরই ভাল।

র। আর কোন ওষুদ খেতে হবেনা ?

ঠা। এই ওষুদ খেয়ে জল ভাঙ্গা বন্ধ হলে, কি খুব কমে গেলে, ওলট কম্বলের কাঁচা ছাল আধ তোলা আর মরিচ এক সিকি—এক সঙ্গে বেটে খাবি।

র। তখন কি আগেকার ওষুদ ছেড়ে দেব ?

ঠা। না, সকালে আগেকার ওষুদ খাবি, আর বিকালে ওলট কম্বলের ছাল খাবি। ৫।৭ দিন ওষুদ খেয়ে দু' এক দিন বন্ধ দিবি। ঋতুর তিন দিন কোন ওষুদই খাবিনে। আর সকালের ওষুদ না হ'ক, ওলট কম্বলটা ঋতু হ'বার আগে তিন দিন—আর ঋতুর পরে তিন দিন খাওয়া চাই।

র। আচ্ছা ঠাকুমা, যে রকম ব'ল্‌লে, সবই ঠিক সেই রকম কর্‌বো। আশীর্ব্বাদ কর—যেন ভাল হ'তে পারি।

ঠা। ভাল হবে বৈকি, তবে সময় একটু লাগবে। দেখ্ আর একটা কথা ব'লে দিই,—যে সব ওষুধের কথা বল্‌লাম, সে সব খেলেই সেরে যা'বে, তবে যদি এক সপ্তা' খেয়ে না সারে, তা'হলে ও সব ওষুদ ত খা'বিই, তা' ছাড়া কাঁচা অশোকছাল দু' ভরি, আধ্ পোয়া দুধ ও দেড় পোয়া জল—এক সঙ্গে কাঠের আগুনের জ্বালে সিদ্ধ ক'রে, দুধটুকু মাত্র থাকৃতে নামিয়ে নিয়ে, ঠাণ্ডা হ'লে সেটাও রোজ একবার ক'রে খা'বি। এটাও খুব ভাল ব্যবস্থা,—এ ব্যবস্থায় শ্বেত প্রদর কি রক্ত প্রদর—সব রকম প্রদরেই উপকার পাওয়া যায়। সব কথাই তোকে ব'লে দিলাম, যা' হোক এই সব ক'রে যেমন থাকিস্, মাঝে মাঝে খবর দিস্।

র। খবর দেওয়া কি—আমি নিজেই আস্‌ব।

(লীলার প্রবেশ)

লী। কি গো সই, তোর সব কাজ হ'য়েছে ?

র। হাঁ, যা' জানবার—সব জেনে নিয়েছি।

লী। তবে এখন আসি ঠাকুমা, বাবা-মা চ'লে যা'বেন, বড় মন কেমন ক'র্‌ছে।

ঠা। কা'কে বল্‌ছ, দিদিমণি। তোর বাবা যে আমার নাড়ী-ছেঁড়াধন। আর জীবনে কখন কাছ ছাড়া হয় নি। তা' আমি আশীর্ব্বাদ ক'র্‌ছি—ওর পায়ে কাঁটাটি ফুটবে না। চল্ আমিও একবার দেখে আসি।

(সকলের প্রস্থান)

তামাকের ইতিবৃত্ত।

বর্ত্তমানকালে সমুদায় সভ্যজাতির মধ্যে তামাকের বহুল প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষেও ইহার প্রচলন খুব বাড়িয়াছে। এখন তামাক না দিলে অভ্যাগত ব্যক্তির অভ্যর্থনার ত্রুটি হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজে তামাক খান না, তাঁহাকেও অভ্যাগত ব্যক্তিদিগের ভদ্রোচিত সমাদরের জন্য তামাকের বন্দোবস্ত করিতে হয়। উৎসবাদি ক্রিয়াকর্ম্মে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের অভ্যর্থনার জন্য তামাকের বন্দোবস্ত সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। কিন্তু চারিশত বৎসর পূর্ব্বে সভ্য জগত ইহার অস্তিত্ব অবিদিত ছিল। কেবল আমেরিকার তাৎকালীন অনাবিস্কৃত দেশবাসী কতিপয় অসভ্যজাতির মধ্যে ইহার প্রচলন ছিল।

১৪৯২ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে যখন কলম্বস্ কিউবা দ্বীপ আবিস্কার করেন, তখন তিনি দুইজন নাবিককে উক্ত দ্বীপ পরিদর্শনের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া নবাবিস্কৃত স্থানের যেরূপ অভিনব বর্ণনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটী বিবরণ এই যে, তথাকার অধিবাসীরা প্রজ্জলিত যষ্টিখণ্ড সঙ্গে করিয়া বেড়ায় এবং মুখ ও নাসিকা হইতে ধূম নির্গত করে। এই ঘটনাটীতে নাবিকদ্বয়ের মনে প্রথমে ধারণা হইয়াছিল যে, আদিমবাসীরা তাহাদের দেহ সুগন্ধিকরণের জন্য বোধ হয় এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। পরে তাঁহারা দেখিলেন যে, ঐ নগ্ন অসভ্যেরা বড় বড় পত্রগুচ্ছ একত্র যষ্টির মত পাকাইয়া অগ্নিসংযোগে উহার ধূমপান করিয়া থাকে।

তামাক সেবন-রীতি সভ্যজাতির দৃষ্টিপথে এই প্রথম পতিত হইল। ক্রমে এই জঘন্য রীতি সভ্যজগতে এত প্রচলিত হইল যে, প্রত্যেক নগর, উপনগর, গ্রাম ও পল্লী এই বিষাক্ত পত্রের ধূমে প্রধূমিত হইয়া উঠিল। যাহাহউক এই আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই যে সভ্যজাতির মধ্যে তামাক সেবন প্রচলিত হইয়াছিল তাহা নহে, প্রথমতঃ ইহা অতি ঘৃণিত পদ্ধতি বলিয়াই তখন তামাকের উপর সকলের ধারণা ছিল। এমন কি, ইউরোপের কোন সাম্রাজ্য তামাক সেবন অপরাধে দণ্ডিত হইবে—তখন এরূপ ব্যবস্থাও হইয়াছিল। রুসরাজ্যে তামাক সেবন করার প্রথম অপরাধের জন্য বেত্রাঘাত, দ্বিতীয় বার অপরাধের জন্য নাসাচ্ছেদ ও তৃতীয় অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। দ্বিতীয় অপরাধের জন্য সর্ব্বসমক্ষে কয়েক জনের নাসাচ্ছেদ করাও হইয়াছিল। খৃষ্টীয়ধর্ম্ম সমাজের প্রধান গুরু রোমের পোপ দ্বাদশ ইনসেণ্ট এইরূপ আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন যে, যে কোন ব্যক্তি উপাসনা-মন্দিরে তামাক চর্ব্বন বা ধূমপান বা অন্য কোন উপায়ে উহা ব্যবহার করিবেন, তাঁহাকে সমাজচ্যুত করা হইবে। ইহার বহুকাল পরে পোপ বেনিডিক্ট নিজে ধূমপায়ী হইলেন, এবং তিনি এই দণ্ডবিধি রহিত করিলেন। সুইজারল্যাণ্ড, ইংলণ্ড ও পারস্য দেশেও তামাক সেবন অপরাধের জন্য রাজদণ্ডের নির্দ্দেশ হইয়াছিল। ইংলণ্ডাধিপতি প্রথম জেমসের অনুকরণে আমেরিকার উপনিবেশ সমূহের শাসন-

কর্ত্তারাও এই অপরাধের জন্য দণ্ডবিধি আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কালক্রমে এই সকল দেশের রাজপুরুষেরাও তামাক ভক্ত হইয়া পড়িলেন, ক্রমে ক্রমে দণ্ডবিধি আইন শিথিল হইয়া অবশেষে একেবারেই লোপ পাইল।

ভারতবর্ষেও পুরাকালে তামাকের প্রচলন ছিলনা। কোন্ সময় হইতে ইহার প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহার কোন ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না। অভিধানে যে তাম্রকূট কথা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কোন্ সময় কিরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার কোন ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় না। মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি পৌরাণিক গ্রন্থে ভাঙ্গ, ধুস্তূর, সুরা প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাম্রকূটের উল্লেখ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়না। সুতরাং তাম্রকূটের ব্যবহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষেও ছিল না বলিয়াই বোধ হয়। কি কারণে তাম্রকূট নাম হইয়াছে, তাহারও কোন সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে শব্দের ব্যুৎপত্তি ধরিয়া অর্থ করিলে, তাম্র শব্দে কুষ্ঠরোগ বিশেষ ও কূট শব্দে বৃক্ষ, তাম্ররোগোৎপাদক বৃক্ষ বলা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে ধূমপান দ্বারা স্মোকার্স ক্যান্সার (Smokers cancer) নামক যে রোগ উৎপন্ন হয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাম্ররোগ বোধ হয় তাহারই অনুরূপ। কৃত্তিবাস, কাশীরামদাস, ঘনরাম, মুকুন্দরাম প্রভৃতি বাঙ্গালার কবিগণের গ্রন্থে,—এমন কি প্রাচীন কবিদের শেষ কবি ভারত চন্দ্রের গ্রন্থেও তামাকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়না। ঐ সকল গ্রন্থে ভোজনান্তে মুখশুদ্ধির জন্য তাম্বূলের উল্লেখ আছে, কিন্তু তামাকের উল্লেখ নাই। বর্ত্তমান কবিদের আদিকবি ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থে তামাকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল আলোচনা করিলে বোধ হয়, মুসলমান রাজত্বের শেষ ভাগে এদেশে তামাকের প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে। যাহা হউক এক্ষণে বাঙ্গালাদেশে ইহার বহুল প্রচলন হইলেও ইহা যে অবৈধ প্রথা, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, কারণ এখনও গুরুজন ও মাননীয় ব্যক্তিগণের সমক্ষে তামাক সেবন ভদ্রতা বিরুদ্ধ।

তামাকের পাতা হইতে যে তৈলাক্ত নির্য্যাস প্রস্তুত হয়, তাহাকে নিকোটিন্ বলে। প্রতি পাউণ্ড তামাকের পাতায় ৩৮০ গ্রেণ নিকোটিন্ পাওয়া যায়। ১/২ গ্রেণ নিকোটিন্ দ্বারা ৩ মিনিট কাল মধ্যে একটী কুক্কুরের মৃত্যু হইতে পারে। এই বিষ দ্বারা অর্দ্ধ মিনিট মধ্যে মনুষ্য জীবন নষ্ট হইতে শুনা গিয়াছে। নিকোটিন্ সময়ে সময়ে নরহত্যা বা আত্মহত্যার জন্য ব্যবহৃত হইতে শুনা গিয়াছে। নিকোটিনের মত প্রুসিক্ এসিড্ ভিন্ন অন্য কোন বিষে এত শীঘ্র মৃত্যু হইতে শুনা যায় নাই।

হোটেন্‌টটেরা সর্পাদি বিনাশের জন্য তামাকের তৈল ব্যবহার করে। উদ্যান রক্ষকেরা ইহা প্রচুর ব্যবহার করে। শিশুদের মস্তক বা মুখমণ্ডলের ক্ষততে সামান্য মাত্র এই তৈল প্রয়োগে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে মৃত্যু সংঘটনের দৃষ্টান্ত অনেক স্থলে শুনিতে পাওয়া যায়। একটী চুরুটের পাক খুলিয়া উহাতে যতগুলি পাতা থাকে, সেই গুলি উদরের উপর স্থাপন করিলে অত্যল্পকাল মধ্যেই বমনোদ্রেক হয়। এক সময়ে ইয়ুরোপ খণ্ডের ভীরু সৈনিকেরা

রণক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকিবার জন্য বগলের মধ্যে তামাকের পাতা রাখিয়া দিয়া অত্যন্ত বমন করিত।

ডাক্তার বিচার্ডসন্ সম্প্রতি মনুষ্য দেহে তামাকের ক্রিয়া সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছেন, তাহাতে তিনি যাঁহারা প্রথম তামাক খাইতে শিখিতেছেন, তাঁহাদের জীবনী শক্তি সঞ্চারক যন্ত্র সমূহের নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন বর্ণনা করিয়াছেন,—"মস্তিষ্ক মলিন ও রক্তহীন হয়, আমাশয়ে গোলাকার উচ্চ লাল লাল দাগ হয়; রক্ত অস্বাভাবিক তরল হয়; ফুস্‌ফুস দ্বয় মলিন হয়; হৃৎপিণ্ডে প্রচুর রক্ত জমিয়া থাকে, এবং উহার সঙ্কোচনী শক্তি নষ্ট হইয়া কেবলমাত্র ধীর প্রকম্পন পরিলক্ষিত হয়।"

এক্ষণে এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, তামাক যদি এতই বিষাক্ত, তবে যাবতীয় ধূমপায়ীগণেরই তামাকের বিষে মৃত্যু হয়না কেন? ইহার উত্তর এই যে, আমাদের শরীর ও শরীরাভ্যন্তরস্থ যন্ত্র সমূহ এতই অভ্যাসের বশবর্ত্তী যে, অভ্যস্ত হইলে অস্বাভাবিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, আচার-ব্যবহার, আহার্য্য-পানীয়—সবই সহ্য হইয়া থাকে। অনেককে মর্ফিয়া, ষ্ট্রীকনিয়া প্রভৃতি মারাত্মক বিষ মাদকরূপে সেবন করিতে দেখা যায়। ডাক্তার কিলগ প্রভৃতি এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে. তাঁহাদের মতে অধিকাংশ তামাকসেবনকারী তামাকের বিষেই জীবন ত্যাগ করে। বিষ খাইবা মাত্র মৃত্যু হইলেই যে বিষে মৃত্যু হইল এবং বহু বৎসর পরে মৃত্যু হইলে যে তাহার কারণ পূর্ব্বেকার বিষ-ভক্ষণ নহে—এরূপ বলিতে পারা যায় না। তাঁহারা বলেন, যদি তামাক সেবন জন্য পাঁচ বৎসরও আয়ুঃ হ্রাস হয়, তাহাকেও বিষ ক্রিয়ার ফল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে এবং এই অকাল-মৃত্যুকে বিষ ভক্ষণে মৃত্যু বলিতে হইবে।

জীবন রক্ষার জন্য রক্তই আমাদের শরীরের শ্রেষ্ঠ উপাদান। নৈসর্গিক ক্রিয়াকলাপ দ্বারা অনবরত আমাদের শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের যে ক্ষয় হইতেছে, রক্তই সেই সমুদায় ক্ষতিপূরণ করে। রক্ত আবার আমাশয় ফুসফুস ও চর্ম্মের মধ্য দিয়া প্রয়োজনীয় উপাদান সকল প্রাপ্ত হয়। যে সকল দ্রব্য দ্বারা রক্ত দূষিত হয়, তাহা সমুদায় শরীরেরই বিনাশ সাধন করে। তামাক সেবন দ্বারা রক্তের যে পরিবর্ত্তন ঘটে, তদ্দ্বারা যে কেবল জীবনীশক্তির হ্রাসতা হয়, তাহা নহে, দেহের রোগপরিবর্জ্জনী শক্তিও উহার দ্বারা লুপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং তামাক সেবনকারীর সংক্রামক অসংক্রামক—সকল প্রকার রোগ দ্বারাই আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা।

তামাক সেবনে গলক্ষত, যক্ষ্মা, হৃদপিণ্ডে নানাপ্রকার পীড়া সমূহ, অজীর্ণ, ক্ষুধামান্দ্য, অধর ও জিহ্বায় কর্কশতা, পক্ষাঘাত, দৃষ্টিহীনতা, বর্ণান্ধতা, (Colorblindues), ও নানাপ্রকার স্নায়বীয় রোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।*

ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস।

*বর্ত্তমান সময়ে বাজারে যে তামাক বিক্রীত হয়, উহা সেবনে আমাদের অনিষ্ট আরও বর্দ্ধিত হইতেছে, কারণ উহা শুধু তামাক নহে, সস্তায় বিক্রয় করিবার জন্য উহার সহিত চটছেঁড়া, পাটির কুচি পেঁপের পাতা এবং ঐ জাতীয় আরও অনেক পদার্থ মিশ্রিত করা হয়। ইহা ভিন্ন সুগন্ধিকরণের জন্য এবং মিষ্টতা সাধনার্থ কাঁটালের রস, শিলারস প্রভৃতিও উহার সহিত মিশান হইয়া থাকে। ফলে তামাকের সহিত অন্যান্য দ্রব্য মিশ্রিত করায় তামাক সেবনের অপকারিতা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। দেশে যে যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে, আমাদের মনে হয়, ইহাই তাহার অন্যতম কারণ। তামাকের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ব্যবহারের ফলে শারীর যন্ত্রের নানাপ্রকার বিকলতা উপস্থিত হয়। এই প্রবন্ধের লেখক সেই সকল চিত্র "আয়ুর্ব্বেদে" প্রকাশ করিলে দেশের উপকার করিতে পারিবেন।

আঃ সং।

নারী ও নারায়ণ তৈল।

——:*:——

১৫ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। আমার এক মাত্র কন্যা "সরযূর" সাংঘাতিক রোগ হইয়াছিল। বাঁচিবার কোনও আশাই ছিলনা। একদিকে ভীষণ যমদূত, অপর দিকে আমরা দুই স্ত্রী-পুরুষ—রীতিমত যুদ্ধ চলিয়াছিল। এইরূপে চল্লিশ দিন, দিবা-রাত্রি, যুদ্ধ করিয়া যমদূত গুলার পরাজয় ঘটিল। সরযূ বাঁচিয়া উঠিল। কিন্তু শমন দূতগণ সমরাবসানের যে চিহ্ন রাখিয়া গেল,—তাহাতেই আমায় অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল।

কথাটা এই—"সরযূ" দেখিতে সুন্দরী ছিল না। তাহার উপর এই রোগে তাহার মাথার চুলগুলি একেবারেই উঠিয়া গেল। প্রথমে এদিকে আমাদের লক্ষ্য ছিল না, শেষে সরযূর বয়স যতই বাড়িতে লাগিল, ততই আমাদের চিন্তার কারণ হইয়া উঠিল। আমরা হিন্দু,—কন্যাকে চির কুমারী করিয়া রাখিতে পারিনা। কাজেই সরযূর বিবাহের জন্য আমি বড় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। যিনিই কন্যা দেখিতে আসেন, তিনিই তাহার কেশ-বিরল-মস্তক দেখিয়া পিছাইয়া পড়েন। পাড়ায় দুষ্ট মেয়েগুলা, আমাদের সাক্ষাতেই মেয়েটাকে ক্ষেপাইতে আরম্ভ করিল—

"ও সরযূ! নেড়ী,

নেড়ার পালের নেড়ী"

এই অপূর্ব্ব কবিতার অমিয় রস, আমাদের "শ্রবণ ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো! আকুল করিল বড় প্রাণ।" কন্যায় মলিন মুখ খানি, দুঃস্বপ্নের স্মৃতির মত সর্ব্বদাই অন্তরে জাগিতে লাগিল। আমার ধৈর্য্য টুটিল। আমি বড়ই বিচলিত হইলাম।

বন্ধুগণ পরামর্শ দিলেন, "ডাক্তার দেখাও।" শেষে বালিকার অনুর্ব্বর-মস্তকে "ক্যান্থারাইডিলের" রীতিমত আবাদ আরম্ভ হইয়া গেল। মানে, কিন্তু "লাভ পরং গোবধঃ", চুল গজান দূরে থাক্, কন্যার মাথাটী—ব্রণ-সঙ্কুল হইয়া উঠিল। ঔষধ দেওয়া বন্ধ করিলাম। কিছু দিন পরে অবশ্য ক্ষত শুকাইল। একজন বড় ডাক্তারকে মেয়েটীকে আবার দেখান হইল, তিনি বলিলেন—"যে যে স্থানে ক্ষত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে আর কেশোদ্গমের আশা নাই।" তিনি অনেক ঔষধ দিলেন, কোন ফলই হইল না।

আমাদের পল্লীগ্রামে অনেক প্রবীনা স্ত্রীলোক থাকেন,—যাঁহারা অনেক টোট্‌কা জানেন; কিছু দিন তাঁহাদের কথাও শোনা গেল। কেহ নির্জ্জলা আদার রস মাখাইতে বলিলেন, কেহবা জায়ফল বাটিয়া প্রলেপের ব্যবস্থা করিলেন, আবার কেহবা কণ্টকময় ওক্‌ড়া ফল ঘষিবার পরামর্শ দিলেন। নানা চিকিৎসায়-মেয়েটাও বিরক্ত হইয়া উঠিল।

এই বার কেশ-তৈলের পালা! সেণ্টেড্-ক্যাষ্টরঅয়েল হইতে আরম্ভ করিয়া "জাতি কুসুম" "অপরাজিতা কুসুম" পর্য্যন্ত সমস্ত তৈলই আমার ক্ষুদ্র গৃহে সমবেত হইলেন! হায়! আমি অতি দুর্ভাগ্য! নহিলে যে সকল তৈল মাখিয়া কত নিরক্ষর মূর্খ কবি হইয়াছে, কত ঐশ্বর্য্যশালী-প্রেমিক-পুরুষের কর্মঠ পঠ...

টাকে চমরী লাঙ্গুলের মত চুল গজাইয়াছে,—কত বিরহিনীর মুখে হারাণ-হাসি দেখা দিয়াছে, একে একে সেই সকল ঢক্কা-নিনাদী অপূর্ব্ব কেশ-তৈল আমার কন্যার মস্তকে বসুধারার মত সপ্তধারায় ঢালিয়াও কোন ফল পাইলাম না কেন? অথচ এই সকল তৈল-ব্যবসায়ীরা তৈল বেচিয়া 'ব্রুহামে' চড়িয়া বেড়াইতেছে !!

বিজ্ঞাপনের উপর অশ্রদ্ধা জন্মিল। কেশ তৈলের বাকী শিশিগুলা বণ্ড-বাহিত-মিউনিসিপ্যালিটির ক্যাবেঞ্জারের গাড়ীতে তুলিয়া দিলাম। আবিষ্কারকদের ইহাই যোগ পুরস্কার।

এই সময় একদিন আমার এক সাহিত্যিক বন্ধু * আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। কথা প্রসঙ্গে বন্ধুকে মেয়েটার অবস্থা নিবেদন করিলাম। তিনি বলিলেন—"কোন ও কবিরাজী তৈল ব্যবহার করিয়াছে কি?" আমি উত্তর দিলাম—মাপ করিবেন, আর তৈলে আমার ভক্তি নাই। তৈল মাখিয়াই মেয়েটার মাথা আরও তেলা হইয়া গিয়াছে।

বন্ধু চলিয়া গেলেন। ৬।৭ দিন পরে আমার নামে একটা পার্শেল আসিল, তাহার ভিতরে একটা শিশি ও একখানি পত্র। পত্র খানি পাঠ করিলাম। বন্ধু লিখিতেছেন—

"আমার বাসার পার্শ্বে একজন প্রবীন কবিরাজ আছেন, তাঁহাকে তোমার কন্যার কথা জানাইয়াছিলাম। তিনি এই তৈলটুকু দিয়াছেন। ইহার নাম—"নারায়ণ তৈল"। তোমার কন্যার জন্য পাঠাইলাম। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবে কি?"

বন্ধুর পত্র খানি পড়িয়া ভাবিলাম,—বন্ধুর একটু ভুল হইয়াছে। এ 'নারায়ণ' তৈল আমার কন্যার জন্য নহে; আমারই জন্য; কেন না, কন্যার জন্য ভাবিয়া-ভাবিয়া আমারই উৎকট উন্মাদ রোগের সম্ভাবনা,—কবিরাজ মহাশয় হয়ত আমারই জন্য 'নারায়ণ তৈল' ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমি তৈলের শিশিটি সেল্ফের উপর তুলিয়া রাখিলাম।

বোধ হয় একমাস পরে—একদিন দেখিলাম—আমার কন্যার মাথার স্থানে স্থানে নূতন কেশোদ্গম হইয়াছে। দেখিয়া আমার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। এমন সময় গৃহিণী আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে কন্যার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি হাসিতে-হাসিতে বলিলেন—তোমার বন্ধুর পত্র খানি আমি পড়িয়াছিলাম। তিনি যে তৈল পাঠাইয়াছেন—তাহাও জানিয়াছিলাম। তোমার অজ্ঞাতসারে আমিই মেয়েটাকে জোর করিয়া তৈল মাখাইতে আরম্ভ করি। আমার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। দেখ—মেয়ের মাথায় কেমন চুল উঠিতেছে। আর বেশী তৈল নাই। তোমার বন্ধুকে আর এক শিশি পাঠাইতে বলিও।"

এ কি স্বপ্ন না সত্য! যে 'নারায়ণ তৈল' বায়ু রোগের ঔষধ বলিয়া জানিতাম, তাহাতে কি কেশ-পাতও ভাল হয়? আয়ুর্ব্বেদ তবে অসাধ্য সাধন করিতে পারে! তৎক্ষণাৎ কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বন্ধুকে একখানি পত্র লিখিলাম। আর এক শিশি তৈল আসিল। মধুর ভক্তিরসে আমার হৃদয় ভরিয়া উঠিল।

১০।১২ দিনের মধ্যেই মেয়ের মাথায় অনেক চুল গজাইল, তাহার মুখে শ্রী ফিরিয়া আসিল। আমি আর্য্যঋষির চরণ-উদ্দেশে প্রণাম করিলাম।

* শ্রীযুক্ত তারকনাথ বিশ্বাস।

'নারায়ণ তৈল' যে ইন্দ্রলুপ্ত রোগের ঔষধ,—হয় ত অনেক কবিরাজই একথা জানেননা। অনেক বিলাসী ও বিলাসিনী—চুলের পাট করিয়া থাকেন, চুলের জন্য—ছাই-ভস্ম কিনিয়া অনেক বাজে খরচ করেন; আমি তাঁহাদিগকে একবার "নারায়ণ তৈল" মাখিতে অনুরোধ করি।

প্রাচীনকালে নারী-সমাজে 'নারায়ণ তৈলের' যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। প্রাচীন কাব্যে ইহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। সওদাগর ধনপতি যখন সিংহল হইতে দেশে ফিরিয়াছিলেন, তখন লহনা ও খুল্লনা—দুই সপত্নীর মধ্যে প্রসাধনের ধুম পড়িয়া গিয়াছিল। তখন রমণীদ্বয়কে সাজাইবার জন্য—

"ডানি করে নিল রামা রজতের ঝারি।
বাম করে নারায়ণ তৈল বাটী পুরি॥"

পরিচারিকা নিপুণহস্তে—বিরহিণীর মাথায় নারায়ণ তৈল ঢালিয়া দিয়া খোঁপা বাঁধিয়া দিয়াছিল।

"রুক্ষকেশে নারায়ণ তৈল এক বাটী।
কবরী বান্ধিল রাখা নাম গুয়ামুটী।"

কবিকঙ্কণের অনেক স্থানেই "নারায়ণ তৈলে"র উল্লেখ আছে, ইহাতেই মনে হয়, 'নারায়ণ তৈল' তখন নারীদের প্রসাধানের এক প্রধান সহায় ছিল। তাঁহারা নারায়ণ তৈলের গুণ জানিতেন। "মনসার ভাসানে"ও নারায়ণ তৈলের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

"হরিদ্রা বাটিয়া দিল মাথাইয়া গায়।
নারায়ণ তৈল দিল বেহুলার মাথায়॥"

বৈষ্ণব কবিও লিখিয়াছেন—

'নারায়ণ তৈল দিয়ে যত সহচরী।
বান্ধি দিল শ্রীমতীর মোহন কবরী॥"

পাঠক! বলিতে পারেন, সেকালের নারীগণ কেন নারায়ণ তৈলের এত আদর করিতেন? নারায়ণ তৈল যে শুধু কেশ পোষক, তাহা নহে। যে হিন্দু রমণী মাতৃত্ব লাভকে জীবনের চরম সার্থকতা মনে করেন, যাঁহাদের প্রাণের উদ্দেশ্য—

"কাণা খোঁড়া পুত্র হ'ক তবু দুঃখ ঘোচে।"

'নারায়ণ তৈল'ই তাঁহাদের নিঃসঙ্গ জীবনের অবলম্বন। সেকালের হিন্দু সতী-সৌভাগ্যবতী হইবার কামনায় মাথায় নারায়ণ তৈল মাখিতেন। বৈদ্যক গ্রন্থে যখন নারায়ণ তৈলের ফলশ্রুতি পড়ি—

"বন্ধ্যা চ নারী লভতে চ পুত্রং বীরোপমং সর্ব্বগুণোপ পন্নম্।" তখনই বুঝিতে পারি—নারীর সহিত নারায়ণ তৈলের কি পবিত্র সম্বন্ধ! যখন দেখি,—শাস্ত্রকার জোর করিয়া বলিতেছেন,

গর্ভমশ্বতরী বিন্দ্যাৎ কিং পুনর্ম্মানুষী তথা।
অল্প প্রজা চ যা নারী যা চ গর্ভং ন বিন্দতি।
এতত্তৈল বরং তেষাং নাম্না নারায়ণং স্মৃতং'

তখনই বুঝিতে পারি—সেকালের পতিব্রতা সুন্দরীগণ কেন নারায়ণ তৈল মাখিয়া স্বামী-সোহাগিনী হইতে চাহিতেন।

এখন আমরা কাঞ্চন ফেলিয়া কাচের আদর শিখিয়াছি। বিলাসের মোহে—সুগন্ধের প্রলোভনে—বাজে তৈল কিনিয়া গৃহিণীর হাতে তুলিয়া দিতেছি। আমরা ভাবিবার অবকাশ পাই না—ইহাতে আমাদের কি সর্ব্বনাশ হইতেছে! আমরা বুঝিয়াও বুঝিনা,—যে গৃহে "নারায়ণের" মহিমা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সে গৃহে লক্ষ্মীর পূজা নিতান্তই দুরাশা! আমি এখন বেশ বুঝিয়াছি—নারায়ণ তৈলের প্রসাদেই আমার কন্যা সুকেশী হইয়া স্বামী সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। হৃদয়ের আবেগে কথাটা আজ সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়।

নাভি কাহাকে বলে?

—০:*:০—

ঘটনা—চারিবৎসর পূর্ব্বের। আমারই পাড়ার এক ভদ্রলোকের উদরাভ্যন্তরে অস্ত্র-চিকিৎসার প্রয়োজন হইয়াছিল, একজন বড় ডাক্তারের সহকারী রূপে আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। স্থির হয়—ক্লোরোফর্ম্ম করিয়া রোগির নাভির পার্শ্বে অস্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে। আমরা সেই ভাবেই প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলাম।

কিন্তু প্রথমেই এক বিড়ম্বনা—বাটীর গৃহিনী সেকেলে লোক, তিনি একজন কবিরাজকে ডাকিয়া আনাইয়া ছিলেন। কবিরাজ যখন শুনিলেন—রোগির নাভি ছেদন করা হইবে, তখন তিনি ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করিলেন। তাঁহার কথায় ডাক্তার বাবু যখন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, কবিরাজ তখন বাটী গিয়া একখানি পুঁথি লইয়া আসিলেন। পুঁথি খানির নাম—"সুশ্রুত সংহিতা", বৈদ্যদের অস্ত্রচিকিৎসার স্মৃতি! সেই পুস্তক খানির "মর্ম্ম-নির্দ্দেশ" নামক অধ্যায়টী খুলিয়া, কবিরাজ মহাশয় আমাদের দেখাইলেন—

"পক্কামাশয়োর্মধ্যে শিরা-প্রভবা নাভির্নাম;
তত্রাপি সদ্য এব মরণম্।"

তাঁহার কথায় আমরা ইহার মোটা মুটি অর্থ এই বুঝিলাম, যে—পক্কাশয় ও আমাশয়ের মধ্যে সমস্ত শিরাজালের উৎপত্তিস্থান নাভি নামক মর্ম্ম আছে, সেই নাভি আহত হইলে মানুষ সদ্যঃই মরিয়া যায়।

ডাক্তার বাবু একটু শ্লেষের হাসি হাসিলেন। দক্ষ হস্তে রোগীর নাভি ছেদন করিলেন। বেগতিক বুঝিয়া বৈদ্যবর গা' ঢাকা দিলেন। প্রায় ১ মাস শয্যাগত থাকিয়া রোগী বাঁচিয়া উঠিল। কবিরাজ মহাশয় ত অবাক্? "নাভি কাটিলে কি মানুষ বাঁচিয়া থাকে? বোধ হয় এই প্রশ্নই অতঃপর তাঁহার জপমালা হইল। ইহার উপর,—ডাক্তার বাবু একদিন আর একটু 'রসান্' চড়াইলেন—"কৈ, কবিরাজ মহাশয়! আপনার সুশ্রুতের কথা ত খাটিলনা! 'নাভি-মর্ম্ম' আহত হইয়াও রোগী যে বাঁচিয়া রহিল! আপনাদের শাস্ত্র ভুল!" কবিরাজ মহাশয় নতশিরে নিরুত্তর! তাঁহার এ মর্ম্মান্তিক লাঞ্ছনা—আমার কিন্তু ভাল লাগিল না। আমি হিন্দু—ব্রাহ্মণের সন্তান—আমার সম্মুখে ঋষি রচিত শাস্ত্রের নিন্দা, এ অপমান নিতান্তই অসহ্য। কিন্তু "ঋষি বংশধর" বলিয়া আভিজাত্যের গৌরব মনে মনে থাকিলেও, সে সময় শাস্ত্র-সমর্থনের কোন যুক্তিই আমার জানা ছিলনা। আমিও নীরবে বাটী ফিরিলাম। এই ঘটনার পর হইতেই আমার "আয়ুর্ব্বেদ" শাস্ত্র আলোচনা করিবার প্রবৃত্তি প্রবল হয়। এখন আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি,—ঋষি বাক্য নির্ভুল; আমরা কুলাঙ্গার—শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম না বুঝিয়াই শাস্ত্রের নিন্দা করি। সে দিন কবিরাজ মহাশয় যে নাভিছেদনে বাধা দিয়া অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন,—ইহার কারণ তিনি শাস্ত্র বাক্যের নিগূঢ় অর্থ বুঝেন নাই বলিয়া। কবিরাজ মহাশয়েরা যত বড় বিদ্বান হউন, শারীর বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞতাই তাঁহাদের শিক্ষা-গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। যে শরীর,—চিকিৎসার ক্ষেত্র,

সেই শরীরের সকল রহস্য না জানিলে কি কর্ম্মক্ষেত্রে কৃতকার্য্য হওয়া যায়?

বাজে কথা ছাড়িয়া এইবার কাজের কথা বলি। নাভি অর্থে ঋষিরা কি বুঝিতেন? তন্ত্র-শাস্ত্রে এবং আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে দেখিতে পাই,—নাভি হইতে সমস্ত নাড়ী উৎপন্ন হইয়াছে, ঋষিরা ইহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অতএব নাভি—নাড়ী চক্র। এ নাভি—চর্ম্ম নির্ম্মিত নাভি হইতে পারেনা। 'নাভি' কি এবং তাহার অবস্থান কোথায়?—ইহা বুঝিতে গেলে, প্রথমে তন্ত্রশাস্ত্রের শরণ গ্রহণ করিতে হইবে। কেননা, তন্ত্রে যাহা "মূলধার চক্র", আয়ুর্ব্বেদে তাহারই নাম "নাভি"। এক্ষণে বুঝা যাক্, "মূলধার" কি?

তন্ত্র বলেন—গুহ্যদ্বারের দুই অঙ্গুলি উর্দ্ধে এবং মেঢ্র স্থানের দুই অঙ্গুলি নিম্নে মূলাধার পদ্ম বিরাজিত, উহার বিস্তৃতি চতুরংগুলি পরিমাণ। এই মূলাধারপদ্মের কর্ণিকা মধ্যে একটী ত্রিকোণ মণ্ডল আছে—যোগিগণ তাহাকে যোনি-মণ্ডল বলেন। এই যোনি-মণ্ডলের মধ্যপ্রদেশে—বিদ্যুল্লতার ন্যায় আকার সম্পন্ন সার্দ্ধ ত্রিবলয়া কাঁয়া কুটিলা "কুল-কুণ্ডলিনী" ব্রহ্মপথ রোধ করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। সেই ত্রিকোণ-যোনি হইতে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাম্নী নাড়ী উৎপন্ন হইয়াছে। মূলাধার পদ্ম হইতে অন্য যে সকল নাড়ী উত্থিত হইয়াছে, সেই সকল নাড়ী জিহ্বা মেঢ্র, বৃষণ, পাদাঙ্গুষ্ঠ, নাসিকা, চক্ষু, অঙ্গুষ্ঠ, কর্ণ, পায়ু, কুক্ষি প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে গমন করিয়া, স্বকার্য্য সাধন পূর্ব্বক আবার নিজনিজ উদ্ভবক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছে।

অন্যা যাস্তপরা নাড্যঃ মূলাধারাৎ সমুত্থিতাঃ।
রসনা মেঢ্র বৃষণ পাদাঙ্গুষ্ঠঞ্চ নাসিকাং।
কক্ষা নেত্রাঙ্গুষ্ঠ কর্ণং সর্ব্বাঙ্গং পায়ু কুক্ষিকং।
লব্ধা তা বৈ নিবর্ত্তন্তে যথাদেশ সমুদ্ভবা।

[শিব সংহিতা]

ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে—মানব দেহ-স্থিত ইড়া-পিঙ্গলাদি সমস্ত নাড়ী মূলাধার পদ্মস্থিত "কুল কুণ্ডলিনী" হইতে উৎপন্ন। এই সকল নাড়ী—উদর প্রাচীরস্থ চর্ম্ম নির্ম্মিত নাভি হইতে কখনই উৎপন্ন নহে।

সংস্কৃত ভাষায় চর্ম্মনির্ম্মিত নাভির নাম "নাভি" হইলেও, নাভি শব্দে—দ্রব্যের মধ্য-স্থলকেও বুঝায়। যেমন "চক্রনাভি" বলিলে চক্রের মধ্যস্থল এইরূপ অর্থই প্রকাশ পায়। সূর্য্য সৌর জগতের মধ্যে বিরাজমান,—তাই তিনি জগতের নাভি, অর্থাৎ Cantre. পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা বিজ্ঞান পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন—একখানা লৌহাকর্ষকের সংস্পর্শে আর একখণ্ড লৌহ "চুম্বকত্ব" প্রাপ্ত হয়। এইরূপ চুম্বকধর্ম্মী লৌহখণ্ড, আর একখণ্ড লৌহকে আকর্ষণ করিতে পারে। সকল লৌহেই চুম্বকের ধর্ম্ম আছে, কিন্তু সে শক্তি নিদ্রিত। এই নিদ্রার নাম "যোগনিদ্রা।" পরমাত্মরূপ চুম্বকের সংস্পর্শে প্রকৃতিরূপ লৌহখণ্ডে তিনটী শক্তি জাগ্রত হয়। তাই যোগবাশিষ্টে উক্ত হইয়াছে—

নিরিচ্ছে সংস্থিতে বাস্থ যথা লৌহং প্রবর্ত্ততে।
সত্বামাত্রেণ দেবেন তথৈবেরং জগজ্জনী।

অপ্রকাশিত অবস্থায় এই তিন শক্তি যোগ নিদ্রায় নিদ্রিত থাকে। পরমাত্মার চৈতন্যে চৈতন্যবতী হইয়া প্রকৃতি জীব দেহে তিনভাবে ক্রিয়া করেন। চুম্বকের দুই সীমায় লৌহ

কর্ষণ শক্তি বিদ্যমান, কিন্তু উহার ঠিক মধ্য-স্থলে সে শক্তির সত্ত্বা নাই। এইরূপ লৌহা-কর্ষণ-শক্তিবিহীন-মধ্যস্থল না থাকিলে, চুম্বকের উভয় প্রান্ত কখনও লৌহকে আকর্ষণ করিতে পারিত না।

জগতের অন্যান্য শক্তিগুলিও একটী স্থির মধ্যস্থল না পাইলে, কার্য্য করিতে পারেনা। মানব-দেহে যে জীবনী-শক্তি ক্রিয়া করে—সেও চুম্বকের মত মধ্যস্থলকে অবলম্বন করিয়া। এই স্থির মধ্যস্থল না থাকিলে, মানব-শরীরে কোন জীবনী শক্তিরই বিকাশ ঘটিত না।

এক্ষণে দেখা যাউক মানব-দেহের এই স্থির মধ্যস্থল কোথায় ?

তন্ত্র বলেন—

মহাশক্তি কুণ্ডলিনী নাড়ী হ্যহিস্বরূপিনী।
ততোদশোর্দ্ধগা নাড্যো দশশ্চাধো গতা স্তথা।
তির্য্যগ্ গতে জ্ঞেয়া নাড্যৌ চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যয়া।

অহি স্বরূপিণী মহাশক্তি কুণ্ডলিনী হইতে ২৪ টী প্রধান নাড়ী উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে ১০টী উর্দ্ধগ ১০টী অধোগ এবং বামে ও দক্ষিণে দুইটী দুইটী করিয়া চারিটী নাড়ী তির্য্যগ্ গামী।

মহর্ষি সুশ্রুত বলিয়াছেন ;—

চতুর্ব্বিংশতি ধমন্যো নাভি প্রভবা অভিহিতাঃ। তাসান্ত নাভি প্রভবানাং ধমনীনা মূর্দ্ধগা দশ দশশ্চাধোগামিন্যঃ চতস্র স্তির্য্যগ্ গাঃ

[শা, ৯ম অঃ]

আবার "শিব-স্বরোদয়" নামক তন্ত্রে দেখা যায়—নাভিকন্দ হইতে অঙ্কুরের ন্যায় ৭২০০০ সহস্র ধমনী নির্গত হইয়াছে। নাভিস্থিত কুণ্ডলিনী শক্তি হইতে ১০টী উর্দ্ধগ, ১০টী অধোগ, এবং ৪টী তির্য্যগগত, এই ২৪টী নাড়ী প্রধান।

তান্ত্রিক মূলাধারস্থ ত্রিকোণের আর একটী নাম দিয়াছেন—"কূর্ম্ম"। দত্তাত্রেয় বলেন—

তির্য্যক কূর্ম্মো দেহিনাং নাভিদেশে
বামে বক্ত্রং তস্য পুচ্ছঞ্চ যাম্যে।
উর্দ্ধ ভাগে হস্ত পাদৌ চ যামৌ
তস্যাবিস্তাং সংস্থিতৌ দক্ষিণৌ তৌ ॥
বক্তে নাড়ীদ্বয়ং তদ্য পুচ্ছে নাড়ীদ্বয়ং তথা
পঞ্চ পঞ্চ করে পাদে বাম দক্ষিণ ভাগয়োঃ।

শঙ্কর সেন তাঁহার 'নাড়ী প্রকাশে'—এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া বৈদ্যগণকে এক "গোলোকধাঁধায়" ফেলিয়া দিয়াছেন। দেহিদিগের নাভিদেশে তির্য্যগ্‌ভাবে একটী কূর্ম্ম আছে, তাহার মুখ নাভিদেশের বাম ভাগে, পুচ্ছ দক্ষিণভাগে, উর্দ্ধভাগে তাহার বাম হস্ত ও বাম পদ এবং অধোভাগে দক্ষিণ হস্ত ও দক্ষিণ পদ। ঐ কূর্ম্মের মুখে দুইটী নাড়ী পুচ্ছদেশে ২টী নাড়ী এবং পদদ্বয় ও হস্তদ্বয়ে ৫টী ৫টী করিয়া ২০টী—সর্ব্বসমেত ২৪টী নাড়ী আছে।

এই শ্লোকে রূপকচ্ছলে যে ত্রিকোণযোনি হইতে ২৪টী ধমনীর উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে—শঙ্কর সেন ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করেন নাই। সুতরাং কেবলমাত্র "নাড়ী-প্রকাশ" পাঠে—কূর্ম্মের প্রকৃত অর্থ নিরূপিত হয়না। মানবদেহে বস্তি ও লিঙ্গমূল সম্মুখদিকে এবং ত্রিকাস্থি (Sacrum) পশ্চাদ্দিকে এই অংশই দেহের মধ্যস্থল বা নাভি। সুতরাং সুশ্রুত বর্ণিত নাভিমর্ম্ম—চর্ম্ম নির্ম্মিত নাভি হইতেই পারে না। চর্ম্ম নির্ম্মিত নাভি আহত হইবে কাহারও সদ্যঃ মরণ হয় না। উদর মধ্যস্থিত আমাশয় ও পক্কাশয়—যে স্থান হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রস বহা শিরা উৎপন্ন হইয়াছে—সেই স্থানই সুশ্রুতোক্ত "নাভিমর্ম্ম"। এই

নাভিমর্ম্মে আঘাত লাগিলে—মানুষের সদ্যঃই প্রাণবিয়োগ ঘটে। এই নাভিই প্রাণের আশ্রয় স্থল। ভ্রূণের দেহ প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে মাতৃগর্ভস্থ অণ্ডের (Ovum) মধ্যস্থল হইতে জীবনীক্রিয়া প্রথম বিকাশ পায়, মস্তিষ্ক হস্ত পদাদি ক্রমশঃ পরিলক্ষিত হয়। দেহের নাভি বা মধ্যস্থল জীবনীশক্তির প্রধান স্থান। মস্তিষ্ক ও কশেরুকা মজ্জা (Spinal cord) এই নাভিস্থ প্রাণ দ্বারাই সৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন বটবৃক্ষের অতি সূক্ষ্ম বীজে বটবৃক্ষ সৃজন করিবার শক্তি থাকে, তেমনই মাতৃগর্ভস্থ অণ্ডে মানব-দেহ সৃজন করিবার শক্তি সূক্ষ্ম ভাবেই নিহিত থাকে। বটগাছ যেমন কাণ্ড-শাখা ও পত্র-পল্লবে ক্রমশঃ ভূষিত হইয়া থাকে, —জীবনীশক্তি ও ক্রমশঃ সমগ্র বৃক্ষে বিস্তৃত হইয়া পড়ে; মাতৃগর্ভস্থ অণ্ডেও তেমনি ভ্রূণ দেহের জীবনীশক্তি অণুর অণু ভাবে লুক্কায়িত থাকে। এই শক্তিই শ্রুতির সেই—

"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্।"

সর্ব্বজ্ঞ ঋষি তাই নাভিমর্ম্মকে প্রাণের আশ্রয়স্থল বলিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, আমরা ঋষি বাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম না বুঝিয়াই তাঁহাদের নিন্দা করি।

যেমন পদ্মের কন্দ পঙ্ক মধ্যে থাকে এবং প্রস্ফুটিত পদ্ম জলের উপর ভাসে তদ্রূপ আর্য্য-শাস্ত্র মতে সমস্ত ধমনী নাভিকন্দ অর্থাৎ কটিদেশস্থ ত্রিকাস্থির (Sacrum) সম্মুখস্থ (Pelvicplexus) হইতে উৎপন্ন হইয়া উদরাভ্যন্তরস্থ (Solar Plexus) হইতে বিশেষভাবে ব্যক্ত হইয়া থাকে। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন —

"কন্দস্থানং মনুষ্যানাং দেহমধ্যান্নবাঙ্গুলং"

মূলাধার হইতে ৯ অঙ্গুলি ঊর্দ্ধস্থিত স্থান অবধি সমস্ত নাড়ীর উৎপত্তি স্থান। যখন মানব দেহ প্রথম মাতৃগর্ভে গঠিত হয়, তখন জীবনী-শক্তির প্রথম বিকাশ নাভি প্রদেশে [অর্থাৎ শরীরের মধ্যভাগে] দেখিতে পাওয়া যায়। অজ্ঞতা বশতঃ অনেকে উদর-প্রাচীর স্থিত চর্ম্ম নির্ম্মিত নাভিকে সমস্ত শিরার মূল বলিয়া থাকেন,—ইহা কিন্তু একেবারেই অসম্ভব। তবে চর্ম্ম নির্ম্মিত নাভির ভিতর দিয়া ভ্রূণের নাভি রজ্জু (Umbilical cord) গমন করে বটে, কিন্তু ইহা কেবল মাতৃ-হৃদয়ের সহিত ভ্রূণের হৃদয় সংযোগের জন্য। বাগ্‌ভট এ কথাটী সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন—

গর্ভস্থ নাভৌ মাতুশ্চ হৃদি নাভি র্নিবধ্যতে।
যয়া স পুষ্টি মাপ্নোতি কেদার ইব কুল্যয়া।

প্রকৃত পক্ষে নাভি—কেবল রক্ত চলাচলের জন্য নাভিরজ্জু যাইবার পথ মাত্র।

গর্ভ হইতে নিষ্ক্রমণের পর শিশুর কোন শিরাই চর্ম্ম নির্ম্মিত নাভির সহিত সংযুক্ত থাকে না। শবব্যবচ্ছেদের দ্বারা বেশ বুঝা যায়—সমস্ত শিরাই উদর মধ্যস্থিত Solar Plexus এর সহিত নিবদ্ধ। এই Solar Plexus হইতে শাখা-প্রশাখা অন্যান্য Plexus এর সহিত সংযুক্ত হইয়া শরীরের সমস্ত শিরাজালের প্রাচীর ব্যাপিয়া আছে। Solar শব্দের অর্থ সূর্য্য সম্বন্ধীয়, আর্য্য ঋষিগণও নাভিকে সূর্য্যস্থান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তন্ত্র—এ সকল কথা ভাল রকমই বুঝাইয়াছেন। আমাদের দুইটী কেন্দ্র,—ঊর্দ্ধকেন্দ্র অর্থাৎ মস্তক চন্দ্রের স্থান, অধোকেন্দ্র অর্থাৎ নাভিদেশ সূর্য্যের স্থান।

"তালুমূলে স্থিতশ্চন্দ্রঃ নাভিমূলে দিবাকরঃ"

নাভি যেমন সমস্ত ধমনীর উৎপত্তি স্থান, তেমনি সমস্ত শিরারও উৎপত্তি স্থান।

যে শক্তি Solar Plexus প্রক্রিয়া করে—তাহাই আয়ুর্ব্বেদের সমান বায়ু। এই বায়ু অন্নপরিপাকের সাহায্য করে, এবং পরিপাক প্রাপ্ত অন্নের সারাংশ (রস) আকর্ষণ করিয়া হৃদয়ে প্রেরণ করে। বৃক্ষ যেমন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মূল দ্বারা রস আকর্ষণ করিয়া, পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ জীবনী শক্তির প্রভাবে মানব দেহে আমাশয় ও পক্কাশয় হইতে রস দুইটী মার্গ দিয়া হৃদয়ে প্রেরিত হইয়া শরীরকে পোষণ করে। যে রস দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ—সেই রস Lactial নামক অসংখ্য সূক্ষ্ম রস বহা শিরার দ্বারা শরীরের বাম ভাগস্থিত Tharacic cluct নামক শিরা দিয়া বক্ষের ভিতরে রক্তের সহিত হৃদয়ে উপস্থিত হয়। এবং আহারের সারাংশ রসের কিয়ৎ পরিমাণ আমাশয় ও পক্কাশয় হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রসবহা শিরা দিয়া Portal vein শিরায় প্রবেশ করে। ইহাই হইতেছে—রস প্রবাহের দক্ষিণ মার্গ। Portal vein হইতে এই রস যকৃতে যায়। তাহার পর যকৃতের মধ্যে সংশোধিত হইয়া হৃদয়ে গমন করে। ইহার দ্বারা আয়ুর্ব্বেদ মতের আমাশয় ও পক্কাশয় হইতে রসের হৃদয় পর্য্যন্ত গমন—অনায়াসেই প্রতিপন্ন হইল। এই আমাশয় ও পক্কাশয়ের প্রাচীরে যে সূক্ষ্ম Lactial ও Portal vein এর সূক্ষ্ম অগ্রভাগ আছে, তাহাই রস ও রক্তবহা শিরা সমূহের উৎপত্তি স্থান। এই জন্যই অসাধারণ মনীষী সুশ্রুত বলিয়াছেন—"তাসাং নাভিমূলং ততশ্চ প্রসরন্ত্যূর্দ্ধমধস্তির্য্যক্ চ।" নাভিই শিরা সমূহের মূল, শিরাগণ তথা হইতেই ঊর্দ্ধ, অধঃ এবং তির্য্যক্ ভাবে প্রসারিত হইয়াছে।

সুশ্রুত আরও বলিয়াছেন—

যাবত্যস্ত শিরাঃকায়ে সম্ভবন্তি শরীরিণাং
নাভিস্থাঃ প্রাণিনাং প্রাণাঃ
প্রাণান্নাভিৰ্ব্যুপাশ্রিতাঃ
শিরাভিরাবৃতা নাভিশ্চক্রনাভি রিবারকৈঃ॥

দেহীগণের দেহে যতগুলি শিরা উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই নাভির সহিত নিবদ্ধ, নাভি হইতেই তাহারা সর্ব্বশরীরে প্রসারিত হইয়াছে। প্রাণীগণের প্রাণ নাভিকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, আবার নাভিও প্রাণকে অবলম্বন করিয়া আছে। যেমন চক্রনাভি, চক্র সমূহ দ্বারা বেষ্টিত। চর্ম্ম নির্ম্মিত নাভির সহিত কোন শিরাই নিবদ্ধ থাকেনা। সুতরাং প্রাণীর প্রাণ ও চর্ম্ম নির্ম্মিত নাভিকে আশ্রয় করিয়া থাকেনা। অতএব নাভি অর্থে দেহের মধ্যস্থল—ঋষি উক্তির ইহাই অভিপ্রায়। দেহের মধ্যস্থল কটিদেশে, এই কটি দেশেই মূলাধার চক্র অবস্থিত; সেই চক্রের মধ্যে মহাশক্তি কুণ্ডলিনী বিরাজিত। ইহাই নাভিকন্দ। এই কুণ্ডলিনীর প্রভাবেই Solar Plexus হইতে শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য চলিতেছে।

শার্ঙ্গধরও বলিয়াছেন,—

নাভিস্থঃ প্রাণপবনঃ স্পৃষ্ট্বা হৃৎকমলান্তরং।
কণ্ঠাদ্বহি র্বিনির্যাতি পাতুং বিষ্ণু পদামৃতং।
পিত্বাচাম্বর পীযূষং পুণরায়াতি বেগতঃ।
প্রীণয়ন্ দেহ মখিলং জীবয়ন্ জঠরানলম্॥

অর্থাৎ নাভিস্থ প্রাণবায়ু হৃদয়াভ্যন্তর [Chest] দিয়া গমন করিয়া বিষ্ণুপদামৃত (বাহ্যবায়ু) পান করিবার আশায় কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হয় এবং আকাশ পীযূষ পান করিয়া সমস্ত শরীরকে তর্পিত ও জঠরানলকে বর্দ্ধিত করিয়া নাসিকায় রন্ধ্রপথে স্বস্থানে ফিরিয়া আসে।

আয়ুর্ব্বেদ-রচয়িতৃগণ কাহাকে নাভি বলিয়াছেন, এতক্ষণে পাঠকগণ তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন। অতএব নাভি যে কেন সমস্ত ধমনীর উৎপত্তিস্থান—নিম্নলিখিত যুক্তির বলে আমরা সেই ঋষিবাক্য সমর্থন করিতেছি।

(ক) জীবনী শক্তির প্রথম বিকাশ হয়—দেহের মধ্যস্থল হইতে। জননীর জরায়ুস্থ শিরার সহিত ভ্রূণের নাভি রজ্জুর যে সংযোগ —তাহাই জীবনী শক্তির প্রথম ক্রিয়া।

(খ) Solar Plexus হইতে vasom-odor ধমনী সমূহ সকল শরীরে বিস্তৃত হইয়া থাকে। পোষণ অভাবে কোন ক্রিয়াই হইতে পারে না। শরীরের বিস্তৃতির সহিত রসবহা শিরাগুলিও বিস্তৃত হইয়া থাকে। এই সকল শিরায় প্রাচীরে Varomodor ধমনী জাল আকুঞ্চন ও প্রসারণের কার্য্য করে। এই ধমনীগুলি উদরাভ্যন্তরস্থ Solar Plexus এর সহিত সংযুক্ত বলিয়া, শিরা ও ধমনী সমূহকে নাভি নিবদ্ধ বলা যায়।

(গ) সুশ্রুতোক্ত নাভি-মর্ম্ম কখনই চর্ম্ম নির্ম্মিত নাভি হইতে পারেনা। কেননা চর্ম্ম নির্ম্মিত নাভি ছেদন করিলে মানুষ কখনই মরে না।

(ঘ) উদরের অভ্যন্তরে আমাশয় ও পক্বা-শয়ের মধ্যে যে শিরাজাল আছে,—সেই শিরা-জাল বেষ্টিত স্থানের নামই নাভিমর্ম্ম। এই স্থানে সামান্য মুষ্ট্যাঘাত করিলেও মৃত্যুর সম্ভাবনা।

(ঙ) পৌরাণিক উপাখ্যানে আমরা জানিতে পারি,—বিষ্ণুর নাভি হইতে হংস-বাহন ব্রহ্মার উৎপত্তি। ভ্রূণের মধ্যদেশ হইতে সমস্ত দেহই সৃজিত হয়। হংস অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস (হং—নিশ্বাস, স—উচ্ছ্বাস) অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন। ভ্রূণের দেহের মধ্যস্থলেই শ্বাস-প্রশ্বাস বা প্রাণের বিকাশ স্থান।

ডাক্তার—

শ্রীঅমরনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্, বি।

আয়ুর্ব্বেদের কষায়-মাহাত্ম্য।

দুরালভা-কষায়।

"পিবেদ্ দুরালভা-ক্বাথং সঘৃতং ভ্রম-শান্তয়ে।" দুরালভার ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, ভ্রম-রোগের শান্তি হয়।

ভ্রম-রোগটা কি, তাহা আগে বুঝা যাউক, পরে কষায়ের প্রস্তুতি-বিধি প্রভৃতি বলা যাইবে।

প্রচলিত আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে অন্যান্য রোগের ন্যায়, ভ্রম-রোগের নিদানাদি তত্ত্ব সবিস্তারে বর্ণিত নাই। "নিদানে মাধবঃ শ্রেষ্ঠঃ।" কিন্তু মাধব করও স্বকীয় রোগবিনিশ্চয় সংগ্রহে, "রজঃপিত্তানিলাদ্‌ভ্রমঃ" সুশ্রুতোক্ত এই বাক্যটী উদ্ধার করিয়া নিরস্ত রহিয়াছেন, —লক্ষণ বলেন নাই। নিদানের প্রসিদ্ধ টীকা-কার বিজয় রক্ষিত, মাধব নিদানে ভ্রম-রোগের

লক্ষণ না বলার সপক্ষে একটা কৈফিয়ত দিয়াছেন। বলিয়াছেন যে, "নিদ্রা ভ্রমযোস্ত লক্ষণং নোক্ত মিহাতি প্ররিদ্ধত্বাৎ।" অর্থাৎ অতি প্রসিদ্ধ বলিয়া, নিদ্রার লক্ষণ এবং ভ্রমরোগের লক্ষণ এখানে উক্ত হয় নাই। কিন্তু টীকাকার, "ভ্রমলক্ষণন্তু চক্রস্থিতস্যেব ভ্রমবদ্‌বস্তু দর্শনম্" অর্থাৎ ভ্রমমান চক্রেস্থিত বস্তু দর্শনের ন্যায় বস্তু দর্শনই ভ্রমরোগের লক্ষণ, এই সংক্ষিপ্ত লক্ষণ বলিয়া রোগের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু রোগ-চিকিৎসার পক্ষে এরূপ সংক্ষিপ্ত লক্ষণ পর্য্যাপ্ত নহে। রোগের নিদানাদি তত্ত্ব না জানিলে, সুচারুরূপে রোগ চিকিৎসা করা চলেনা। তজ্জন্য সংক্ষেপে ভ্রম রোগের নিদান, পূর্ব্বিকা, সম্প্রাপ্তি এবং লক্ষণ বলা যাইতেছে।

অনবস্থান বা ভ্রমনার্থক ভ্রম্ ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে অল্ বিধান করিলে 'ভ্রম' শব্দ সিদ্ধ হয়। করণায়তন বা মনোভূমি (Brain) অনবস্থিত হইলে অর্থাৎ সুস্থিত না রহিয়া বিচলিত হইতে থাকিলে ভ্রমরোগ উৎপন্ন হয়।

ঘৃত, তৈল, বসা এবং মজ্জা—এই চারি দ্রব্যের সাধারণ নাম স্নেহ। যে দ্রব্যে ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে, ন্যূনাতিরেক মাত্রায় স্নেহ বিদ্যমান থাকে, তাহাকে স্নিগ্ধ দ্রব্য বলে। অস্নিগ্ধ দ্রব্যের নাম রুক্ষ দ্রব্য।

রুক্ষ ভোজন, মাদক সেবন, ধাতুক্ষয় বিশেষতঃ মজ্জ-ধাতুর ক্ষীণতা, উৎকট চিন্তা, রাত্রিজাগরণ, মস্তকে ভারবহন, অতি মাত্রায় রৌদ্রাগ্নির সন্তাপ গ্রহণ, এবং অতি-ব্যায়াম প্রভৃতি কারণে বায়ু, পিত্ত এবং রজঃসংজ্ঞক মানস দোষ-প্রকুপিত হইয়া যদি উত্তমাঙ্গ আশ্রয় করে, তাহা হইলে দোষ ত্রয়ের রুক্ষোষ্ণ-চাঞ্চল্য গুণে মস্তিষ্কের স্নিগ্ধতা এবং সুস্থিরতা হ্রাস পাইতে থাকে। তজ্জন্য মনঃ অপ্রসন্ন ও ও চঞ্চল হইয়া উঠে, মুখমণ্ডল ম্লান-শ্রী ধারণ করে, ভালরূপ নিদ্রা হয় না, অথবা আদৌ ঘুম আসে না এবং শরীর খুব গরম বোধ হইতে থাকে। এই সময়ে নিদান পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক সাবধান না হইলে ভ্রম রোগ উপস্থিত হয়।

মাথাঘোরা এবং গা-টলা ভ্রমরোগের প্রতিনিয়ত লক্ষণ। হৃৎস্পন্দন, বিবমিষা, বমন, চিত্তের অস্থিরতা, মুখশোষ এবং অরুচি প্রভৃতি এই রোগের অপরাপর লক্ষণ।

সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষণ ভ্রমরোগের লক্ষণ বিদ্যমান থাকেনা। কিন্তু ভ্রম-রোগগ্রস্থ ব্যক্তির শরীর কোন সময়েই স্বচ্ছন্দ লাভ করেনা। কাল বা অপর হেতু বশতঃ দোষ-লব্ধ-বল পীড়া প্রকাশ পায়। দোষের প্রকোপ প্রশমিত হইলে, রোগী কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্য লাভ করে। কাহারও বা ন্যূনাতিরেক পরিমাণে সর্ব্বক্ষণই পীড়া বিদ্যমান থাকে। বসিয়া সুস্থির থাকিলে কিংবা স্থিরভাবে শুইয়া রহিলে, রোগী কিছু স্বস্তি বোধ করে; হঠাৎ আসন-শয়ন ত্যাগ করিলে মাথা ঘুরিয়া আইসে। যখন পীড়া প্রবল হয়, তখন যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠে। বোধ হয় যেন, ব্রহ্মাণ্ড প্রচণ্ড বেগে ঘূর্ণিত হইয়া বিধ্বস্ত হইয়া যাইতেছে। এই সময়ে উপযুক্ত উপাধানে মাথা রাখিয়া, চোক বুজিয়া শয়ন করিলে এবং মাথা চাপিয়া রাখিলে কিছু ভাল বোধ হয়। চোক মেলিয়া চাহিলে এবং মাথা ঘুরাইলে-ফিরাইলে পীড়া বৃদ্ধি পায়।

ভ্রমরোগ, কখন-কখন অন্যরোগের লক্ষণরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকে। বিদগ্ধাজীর্ণ, বাতপিত্তজ্বর এবং শ্রবণ ও নয়ন রোগ বিশেষে

ভ্রম উপস্থিত হয়। এরূপ ভ্রমকে লাক্ষণিক ভ্রম বলা যাইতে পারে। ভ্রমরোগ কখন-কখন অন্য রোগের উপদ্রবরূপেও আবির্ভূত হইতে দেখা যায়। ভ্রম বিষ্টব্ধাজীর্ণ রোগের অন্যতম উপদ্রব।

দুরালভা,—দুরালভা বহুকণ্টকাকীর্ণ ক্ষুপ জাতীয় উদ্ভিদ্। উত্তর-পশ্চিম-বঙ্গের এবং ভারতের অন্যান্য উচ্চপ্রদেশের প্রান্তরে বহু পরিমাণে দুরালভা জন্মিয়া থাকে। নিম্ন বঙ্গে জন্মে না। কিন্তু কুত্রাপি দুরালভা অসুলভ নহে। সর্ব্বত্রই পশারির দোকানে আবশ্যকানুরূপ দুরালভা কিনিতে পাওয়া যায়। হিন্দি ভাষায় এই গাছের নাম জবাসা ও দুরালা।

অযত্নে রক্ষিত, চিরকালোষিত, ভ্রষ্টবর্ণ, গতরস এবং হতবীর্য্য কোন ওষধিই ঔষধার্থে ব্যবহার করা উচিত নহে। টাট্‌কা অথচ শুষ্ক দুরালভা সংগ্রহ করিয়া, ধুইয়া ধূলি-বালি ছাড়াইয়া শুকাইয়া লইবে। তার পর কুটি-কুটি করিয়া কাটিয়া, উদূখলে বা হামানদিস্তায় উত্তম রূপে কুটিয়া লইবে। কুট্টিত দুরালভা ২ ভরি ওজন করিয়া লইয়া মেটে পাত্রে কাঠের জ্বালে, আধসের জল সহ ধীরে ধীরে পাক করিবে। আধপোয়া শেষ থাকিতে নামাইয়া পরিষ্কার পুরু কাপড়ে ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে অর্দ্ধ তোলা পুরাতন গব্যঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া রাখিবে। ঘৃত গলিয়া গেলে এবং কষায় শীতল হইলে এক মাত্রায় পান করিবে। পুরাতন ঘৃতের অভাব হইলে টাট্‌কা গব্য ঘৃত অর্দ্ধ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে।

তরুণ এবং অবৃদ্ধ ভ্রম-রোগে, উক্ত নিয়মে দুরালভার কাথ তৈয়ার করিয়া ৫।৭ দিন ব্যবহার করিলে ভ্রম রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যাইতে পারে। পুরাতন ভ্রম রোগে ইহা দীর্ঘকাল ব্যবহার করিলে সুফল পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য যে, যে কারণে ভ্রম রোগ জন্মে, যত্নপূর্ব্বক সেই সেই কারণ পরিবর্জ্জন করিয়া কষায় সেবন করা উচিত।

কবিরাজ শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কবিরত্ন।

শার্ঙ্গধরোক্ত প্রলেপাবলী।

বিষঘ্নলেপ।

ঈশলাঙ্গলা, আতইচ, তিতলাউ বীজ,
কাঁজীতে পেষণ করি ঝিঙ্গা মূলাবীজ।
প্রলেপন দিলে কোঠ আর বিস্ফোটক।
বিনাশ হইবে ইহা জানিবে ভিষক॥

বন্দ্যলেপ।

টাবালেবুমূল, ঘৃত, মনছাল আর,
গোময়ের রসে লেপ করিবে যাহার।
নীলিকা, পিড়কা, ব্যঙ্গ তার নাশ হবে,
বিশেষ মুখের কান্তি সদা তা'র রবে।

বয়োব্রণে লেপত্রয়।

(১)

লোধ, ধনে, বচ দ্বারা করিলে প্রলেপ;
তথা গোরোচনা আর মরিচের লেপ,
সর্ষপ, বচ ও লোধ, সৈন্ধব লবণ
যৌবন পিড়কানাশে করিলে লেপন।

(২)

অর্জ্জুনের ছাল কিম্বা মঞ্জিষ্ঠা পেষিত,
সংযুক্ত করিয়া তাতে মধু, নবনীত।
অথবা শ্বেতাশ্বখুর ভস্ম তথা করি।
প্রলেপ করিলে ব্যঙ্গরোগ যায় সরি॥

(৩)

আকন্দর আঠা আর হরিদ্রা মর্দ্দিত,
প্রলেপনে মুখকাষ্ঠ্য হয় প্রশমিত॥
বটের কোমল পত্র, মালতী, চন্দন,
কুড় ও দারু হরিদ্রা, লোধ বিলেপন
করিলে নীলিকা, ব্যঙ্গ, বয়োব্রণ নাশ।
শার্ঙ্গধর গ্রন্থে ইহা হইল প্রকাশ॥
তিলের খইল আর কুক্কুটের মল,
গোমূত্রে পেষিয়া লেপ অরুংষি কাজল।
খদির, নিম ও জাম ইহাদের ছাল,
গোমূত্রে পেষণ করি লেপ দিলে ভাল,
কিম্বা কুড়চীর ছাল সৈন্ধবে তেমন
প্রলেপনে আরুংষিকা হয় প্রশমন॥
সৈন্ধব, পিয়ালবীজ, কুড়, যষ্টিমধু,
বাটিয়া মাষকলাই, যুক্ত করি মধু,
মস্তকে প্রলেপ দিলে নাশে দারুণক।
তথা পোস্তদানা দুগ্ধে হয় বিনাশক॥
আম্রবীজ হরীতকী করিয়া চূর্ণিত,
দুগ্ধেতে পেষিয়া লেপে উহা প্রশমিত।
তিক্ত পটোলের পত্র রসের লেপন,
তিন দিনে ইন্দ্রলুপ্ত হয় প্রশমন।
বৃহতীর রসে মধু সংযোগ করিয়া
লেপ দিলে টাকপড়া যাইবে সরিয়া।
গুঞ্জার মূল বা ফল, ভেলারস কিবা
গোক্ষুর ও তিলফুল, সম অংশে নিবা
ঘৃত মধু মস্তকেতে করিলে লেপন।
কেশ বৃদ্ধি হয় তার কহে বুধগণ॥

ছাগদুগ্ধে হস্তিদন্ত ভস্ম, রসাঞ্জন,
পেষণ করিয়া যদি করে বিলেপন;
হাতের তলেও তাতে রোমোৎপন্ন হয়।
টাক বিনাশিবে তার কি আছে সংশয়।
যষ্টিমধু, নীলোৎপল, দ্রাক্ষা, তৈল, ঘৃত
দুগ্ধপেষি লেপ দিলে টাক প্রশমিত।
বিশেষত কেশ সব ঘন দৃঢ় হয়।
অপর রোমসকম শ্রেষ্ঠ অতিশয়
চতুষ্পাদজন্তুদের রোম, নখ, ত্বক্,
শৃঙ্গ, অস্থিভস্ম, তৈলে মর্দ্দিয়া ভিষক
তদ্দারা প্রলেপ দিলে রোমোৎপন্ন হয়।
রোমসজনক ইহা শ্রেষ্ঠ অতিশয়॥
রাখাল শশার বীজ তৈলে বিমর্দ্দিয়া
মাখিলে হইবে কেশ ভ্রমর নিন্দিয়া॥
লৌহচূর্ণ, ভীমরাজ, ত্রিফলা ও মাটি,
একমাস ইক্ষুরসে, রাখিবেক খাটি;
তদ্দারা প্রলেপ দিলে জানিবে নিশ্চয়।
অকাল পলিত কেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়॥
আমলকী, হরীতকী, বহেড়া এ তিন,
ক্রমে সংখ্যা তিন, দুই, একটি প্রবীন।
আমের আটীর মজ্জা পাঁচটি লইবে।
লৌহচূর্ণ দুই তোলা একত্র পেষিবে।
লৌহপাত্রে এক রাত্রি করিয়া স্থাপন
লেপে কৃষ্ণ পক্ক কেশ কৃষ্ণ-ভ্রমর বরণ॥
ত্রিফলা ও নীলপত্র, লৌহচূর্ণ আর,
ভীমরাজ সমভাগে পেষিয়া আবার
ছাগমূত্রে, তাহা দ্বারা করিলে লেপন
কেশ কৃষ্ণবর্ণ হয় শ্রেষ্ঠ একারণ॥
ত্রিফলা, দাড়িমত্বক, পদ্মের মৃণালে।
লৌহ প্রত্যেকের চূর্ণ পাঁচপল তলে।
চারিসের ভীমরাজ রসে নিমজ্জিয়া।
একমাস লৌহপাত্রে রাখিবে পুতিয়া॥

পরে ছাগদুগ্ধে তাহা করিয়া মিলন।
রাত্রিকালে কূর্চ্চে, শিরে করিয়া মর্দ্দন ॥
এরণ্ড পত্রের দ্বারা বেষ্টিত করিয়া
নিদ্রা যাবে, প্রাতে স্নান করিবে উঠিয়া
এইরূপ তিন দিন করিলে লেপন।
নিশ্চয় পলিত কেশ হবে প্রশমন ॥

নেত্রে।

হরীতকী, গেরিমাটী, সৈন্ধব, রসাঞ্জন,
এই সব দ্রব্য জলে করিয়া পেষণ।
নেত্রে বহির্লেপ ইহা করিলে প্রদান।
সর্ব্ব নেত্ররোগ ধ্রুব হবে অন্তর্ধান ॥
ত্রিকটু ও রসাঞ্জন সলিলে পেষিয়া।
বটিকা প্রস্তুতকরি, জলে তা ঘসিয়া,
নেত্রে লেপে, কণ্ডূপাক অন্বিত অঞ্জন।
নেত্ররোগ ইহা হ'তে হয় প্রশমন ॥
সোমরাজী-চাকুন্দের বীজ, তিল, কুড়,
সর্ষপ, হরিদ্রাদ্বয়, মুতা করি চূর,
তক্রেতে পেষণ করি লেপ দিলে তার।
কণ্ডূ, দদ্রু, বিচর্চ্চিকা হইবে সংহার ॥
বিড়ঙ্গ, হিঙ্গুল, হেমক্ষীরী ও গন্ধক;
চাকুন্দের বীজ, কুড়, সিন্দূর ভিষক,
পৃথক্ পৃথক্ নিম ধুতুরাপাতার,
পানের রসেতে মর্দ্দি লেপ দিলে তার ॥
পামা, দদ্রু, বিচর্চ্চিকা, কণ্ডূ, কুষ্ঠরোগ।
(রকসা) বিনাশে আশু—নাহি হয় ভোগ!
দূর্ব্বা, হরীতকী আর চাকুন্দে সৈন্ধব,
অরণ্যতুলসী, তক্রে পেষি এই সব;
তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে কণ্ডূ, দদ্রু দ্বয়।
বিনাশ হইবে তাতে নাহিক সংশয় ॥
শঙ্খচূর্ণ দুই ভাগ, এক হরিতাল।
সর্জ্জিক্ষার তথা, অর্দ্ধভাগ মনছাল।
এই সব দ্রব্য জলে করিবে পেষণ।
কেশ কামাইয়া উহা করিবে লেপন।
সাত লেপে এইরূপ ক্ষপণের ন্যায়।
নির্ম্মূলিত কেশ-শির দেখিবেক তায় ॥

হরিতাল, পলাশের ক্ষার দুইখাণ।
শঙ্খচূর্ণ ছয়মাণ, (ত্রিভরি প্রমাণ)।
কলার থোড়ের রসে, আকন্দপাতার
রসে মর্দ্দি কিম্বা, লেপ দিলে সাতবার
রোম সব উঠে যায়, শ্রেষ্ঠ অতিশয়
রোম কেশ উৎপাটনে ইহাই নিশ্চয়।
পীতবর্ণ হীরাকস, স্বর্ণ গৈরিক,
বিড়ঙ্গ ও মনছাল, গোরচনা ঠিক,
সৈন্ধব, এসব দ্বারা করিলে লেপন।
শ্বিত্র কুষ্ঠ রোগ আশু হবে প্রশমন।
কাকটুটা, চাকুন্দের বীজ আর কুড়।
পিপুল, গোমূত্র লেপে শ্বিত্র হবে দূর ॥

সোমরাজী বীজ, লাক্ষা, বায়সডুমুর,
পিপুল, অম্লবেতস, তিল, লৌহচূর,
রসাঞ্জন এই সব গোপিত্তে পেষিয়া।
গুটীকরি লেপে শ্বিত্র যাইবে সরিয়া।
আমলকী, যবক্ষার, ধুনাচূর্ণ করি।
সৌবীরের সহ লেপে সিধ্মরোগ হরি ॥

দারু হরিদ্রা, মূলাবীজ, হরিতাল, পান।
দেবদারু প্রতি চূর্ণ দুই তোলা মান;
শঙ্খচূর্ণ অর্দ্ধ তোপা সলিলে পেষণ
করিয়া প্রলেপ দিলে সিধ্ম প্রশমন।

বেণামূল, যষ্টিমধু, বেড়েলা, চন্দন,
নখী, নীলোৎপল দুগ্ধে করিয়া পেষণ,
রক্তপিত্ত, শিরোরোগে লেপ দিলে তার,
আশু সেই রোগ হ'তে লভে প্রতিকার।

হরিদ্রা, শ্বেতসর্ষপ, চাকুন্দে ও কুড়।
তিল, কটু তৈল লেপে উদর্দ্দাঙ্গ দূর।

দেবদারু, নীলোৎপল, রাস্না ও চন্দন,
বেড়েলা ও যষ্টিমধু সদুগ্ধে পেষণ,

ঘৃতযুক্ত করি লেপ করিলে তাহার।
বাত বীসর্প নাশ হয় কহিলাম সার।
পদ্মের মৃণাল, লোধ, চন্দন, কমল,
অনন্ত-বেণার মূল আর নীলোৎপল,
আমলকী, হরীতকী করিয়া মিলন।
প্রলেপে পিত্ত বীসর্প হয় প্রশমন॥
ত্রিফলা ও পদ্মকাষ্ঠ, বরাক্রান্ত আর।
করবী, অনন্ত, বেণা, নলমূল চার,
ইহাদের প্রলেপন করিলে প্রদান।
শ্লেষ্মজ বীসর্প রোগ হয় অন্তর্দ্ধান॥
জটামাংসী, ধুনা, লোধ, মূর্ব্বা, নীলোৎপল
রেণুক ও যষ্টিমধু, শিরীষ, কমল,
পিষে শত-ধৌত ঘৃতে করিলে লেপন।
পিত্তজাত বাত রক্ত হয় প্রশমন॥
আমলকী ঘৃতে ভাজি, কাঁজীতে পেষিয়া
শিরোলেপে নাসাস্রাব যাইবে সারিয়া
কাঁজীতে পেষণ করি মুচুকুন্দ ফুল,
এরণ্ডের তৈলে কিম্বা পেষিত থাকুড়,
তদ্দারা প্রলেপ দিলে অনিলজনিত।
মস্তক বেদনা আশু হয় প্রশমিত॥
তগরপাদুকা কুড়, দেবদারু আর,
বেণামূল, শুঁঠ; পিষি কাঁজীতে ইহার
লেপ দিলে তৈল আদি স্নেহযুক্ত করি
বাতজ মস্তক পীড়া শীঘ্র যায় সারি।
আমলকী, বাত্র, পদ্ম, কেশুর, চন্দন,
পদ্মকাষ্ঠ, দূর্ব্বা-বেণা-নলমূলগণ;
এদের প্রলেপে পিত্তশিরঃ পীড়া হরে।
বিশেষত রক্তপিত্ত রোগও দূর করে॥
রেণুক, তগর পাদুকা শৈলজ, অগুরু,
মুতা, এলা, জটামাংসী, রাস্না, দেবদারু,
এরণ্ড মূলের লেপ সুখ উষ্ণ করি।
দানিলে বাতজ রোগ যাইবেক সারি॥
দেবদারু, গন্ধতৃণ, শুঁঠ, কুড়, আর
চাকুন্দ; গোমূত্রে পেষি ঈষদুষ্ণ তার।
প্রলেপ প্রদানে আশু কহে বুধগণ।
শ্লেষ্মজাত শিরঃপীড়া হয় প্রশমন।
যষ্টিমধু, নীলোৎপল, বট ও পিপুল,
কাঁজীতে পেষণ করি কুড়ানন্তমূল,
স্নেহাভ্যক্ত করি তাহা করিলে লেপন।
আধকপালে, সূর্য্যাবর্ত্ত হয় প্রশমন॥
শতমূলী, নীলোৎপল, দূর্ব্বা, পুনর্নবা!
কৃষ্ণতিল; শঙ্খানন্ত বাতে লেপ দিবা॥

কবিরাজ—শ্রীরাসবিহারি রায়।
কবিকঙ্কণ।

প্রতিসংস্কৃত রোগবিনিশ্চয়।

চিকিৎসকের যাবতীয় জ্ঞাতব্যকে আমরা দুইটী বিষয়ে অবরোধ করিতে পারি। প্রথম রোগ-পরিচয়, দ্বিতীয় ঔষধ যোজনা বা চিকিৎসা। যে রোগপরিচয় চিকিৎসকের পক্ষে এত আবশ্যক, সেই রোগ পরিচয়ের জন্য মাধবের রোগবিনিশ্চয় অর্থাৎ নিদান ভিন্ন আর কোন গ্রন্থ নাই। রোগবিনিশ্চয় করিবার জন্য যাহা জ্ঞাতব্য সমস্তই মাধব-নিদানে আছে,—আর কিছুই বক্তব্য নাই এই জন্যই কি মাধবনিদানের পর রোগবিনিশ্চয়ের জন্য আর কোন পুস্তক রচিত হয় নাই? একথা কেমন করিয়া স্বীকার করা যায়।

মাধবনিদানের টীকাকার বিজয়রক্ষিত স্বীকার করিয়াছেন যে, উপযুক্ত অথচ মাধবনিদানে অনুক্ত এমন অনেক বিষয় আছে। আর বলিয়াছেন,—আমি গ্রন্থব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সেই অনুক্ত বিষয়গুলি লিখিব। বিজয়রক্ষিত স্বরচিত টীকার গ্রন্থব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে মাধবের কোন কোন অনুক্ত বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু মাধবনিদানের অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণ করিবার জন্য প্রপূর্ত্তি রচনা করেন নাই। ইহা প্রতিসংস্কর্ত্তার কার্য্য, টীকাকারের কর্ত্তব্য নহে। বোধ হয় এই ভাবিয়াই বিজয়রক্ষিত প্রপূর্ত্তি লেখেন নাই। প্রতিসংস্কর্ত্তার কাজ কি?

"বিস্তারয়তি লেশোক্তং সংক্ষিপত্যতিবিস্তরম্।
সংস্কর্ত্তা কুরুতে তন্ত্রং পুরাণঞ্চ পুনর্নবম্।"
দৃঢ়বলঃ।

প্রতিসংস্কর্ত্তা সংক্ষিপ্ত বিষয় বিস্তৃত করেন, বিস্তীর্ণ বিষয়কে সংক্ষেপ করেন—মোটের উপর বলিতে গেলে তিনি পুরাণ গ্রন্থকে প্রতিসংস্কৃত করিয়া নূতন গ্রন্থ রচনা করেন। মাধবনিদানের কি এইরূপ প্রতিসংস্কর্ত্তার প্রয়োজন নাই? অধুনা সুলভ আকর গ্রন্থ চরক-সুশ্রুতের নিদানস্থানে যে সকল বিষয় আছে, মাধব কি সকল বিষয়েরই যথাযথ সংগ্রহ করিয়াছেন? বাগ্‌ভট কেবল চরকাদির মতের পিষ্টপেষণ নহে, ইহাতেও অনেক অভিনব তত্ত্ব আছে—এ সকলও কি মাধবের নিদানে সুসংগৃহীত হইয়াছে? যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদে কৃতশ্রম, তাঁহারা স্বয়ংই বলিবেন না যে, মাধবনিদানে এ সকল বিষয় সংগৃহীত হয় নাই। সাধারণের বুঝিবার জন্য আমরা কএকটী উদাহরণ দিতেছি—

মাধবনিদানের নিম্নলিখিত স্থলে সংক্ষেপের বিস্তার আবশ্যক।

(১) বাতাদি অতিসারের নিদানসংপ্রাপ্তি পৃথক্ নাই। চরক হইতে লইয়া বিস্তার করিতে হইবে। (২) নাসামুখাদিগত অর্শের (অধিমাংস) লক্ষণ মাধবে নাই, সুশ্রুত হইতে লইয়া লিখিতে হইবে। (৩) পাণ্ডুরোগের পূর্ব্বরূপ, সংপ্রাপ্তি, বাতাদি ভেদে নিদান, লক্ষণ মাধবে সংক্ষিপ্তভাবে আছে, চরক হইতে উদ্ধৃত করিয়া বিস্তার করিতে হইবে। (৪) বেগরোধ, ক্ষয়, সাহস ও বিষমাশন এই চারিটী হেতুজন্য যক্ষ্মা রোগের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ মাধবে নাই, আকর হইতে উদ্ধার করিয়া দেখাইতে হইবে এবং যক্ষ্মার সংক্ষিপ্ত পূর্ব্বরূপকে বিস্তার করিতে হইবে। (৫) যক্ষ্মা ত্রিদোষজ ব্যাধি—ত্রিদোষের প্রত্যেকে কেমন করিয়া একাদশ লক্ষণ উৎপাদন করে, তাহার ব্যাখ্যা মাধবের নিদানে নাই, ইহা পূরণ করিতে হইবে। (৬) বাতাদি ভেদে প্রত্যেক কাসের নিদান মাধবে নাই, লিখিতে হইবে। (৭) ২০টী প্রমেহের মধ্যে কোন্ দশটী কফজ, কোন্ ছয়টী পিত্তজ এবং কোন্ ৪টী বাতজ তাহার নামোল্লেখ মাধবে নাই, আকর হইতে পূর্ণ করিতে হইবে। আর উদাহরণ বৃদ্ধির প্রয়োজন নাই।

মাধবনিদানের বিস্তারের সংক্ষিপ্তকরণ সম্বন্ধে প্রতিসংস্কর্ত্তার সামান্যই কর্ত্তব্য আছে—কারণ মাধবে বিস্তর নাই, সংক্ষেপার্থই মাধবের উদ্যম। তবে শূকদোষের তুল্য যে সকল রোগের উল্লেখ আছে এবং যাহা অধুনা জনসমাজে প্রায় কাহারই হয়না, তাহাই বিস্তারের মধ্যে গ্রহণ করিয়া তৎ পরিবর্জ্জন করিতে হইবে।

বিজয়রক্ষিত টীকারম্ভে—

উপযুক্তমিহানুক্তং নিদানং মাধবেন যৎ।
গ্রন্থব্যাখ্যাপ্রসঙ্গেন ময়া তদপি লিখ্যতে।

বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেও মাধবের যাবতীয় উপযুক্ত অথচ অনুক্ত বিষয়ের উল্লেখ তাঁহার টীকায় আমরা দেখিতে পাইনা। কএকটী উদাহরণ দিতেছি। (১) জ্বরের সৌম্যাগ্নের ভেদ এবং হারিদ্রক ও ঔপত্যকজ্বর মূল বা টীকা কোথাও নাই। (২) অতিসারের পূর্ব্বোৎপত্তি কথা অতিসার ও গ্রহণীর ভেদ এবং ঘটীযন্ত্রাখ্য গ্রহণী মূলে নাই, টীকাতে ও নাই। (৩) মদ্যগুণে কিপ্রকারে ওজোগুণের বিঘাত হইয়া মদাত্যয় রোগ জন্মে তাহা মূলে বা টীকায় কোথাও নাই। (৪) আবরণভেদে কুপিত বায়ুর লক্ষণ মূলে নাই, টীকাতেও নাই। ব্রণায়াম নামক বাতব্যাধি মূলে নাই, টীকাতেও নাই। (৫) শূলাধিকারে পার্শ্বশূল, কুক্ষিশূল, হৃচ্ছূল, বস্তিশূল, মূত্রশূল, বিট্‌শূল নাই, টীকাকারও উহাদের লক্ষণ উদ্ধৃত করেন নাই। (৬) অশ্মরীরোগে—বস্তির আকার, অবস্থিতি ও মূত্রসঞ্চয়-প্রকার সম্বন্ধে আকরে যাহা পাওয়া যায়, তাহা লেখা উচিত ছিল, কিন্তু মাধব বা বিজয় কেহই কিছু বলেন নাই। (৭) মসূরিকার শীতলাদি ভেদের উল্লেখ নাই। আর উদাহরণ দিবার প্রয়োজন কি? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপযুক্ত অথচ অনুক্তের বিষয়ের ত উল্লেখই করিলাম না।

মাধবনিদান ও বিজয় রক্ষিতের ব্যাখ্যা-মধুকোষ লইয়া এই সকল কথা বলিবার আবশ্যকতা এই যে, আমি "প্রতিসংস্কৃত রোগ-বিনিশ্চয়" নামক একখানি পুস্তক পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিতেছি। যাঁহারা "আয়ুর্ব্বেদ" মাসিকপত্র সম্পাদন করিয়া দেশে আয়ুর্ব্বেদ প্রচার করিতেছেন, তাঁহারাই এই গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই গ্রন্থে পূর্ব্বপ্রদর্শিত সমস্ত ত্রুটির সংশোধন জন্য কচিৎ পাদটীকা "প্রপূর্ত্তি" যোজিত হই-য়াছে এবং বহু বিষয় মূলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন উপক্রমণিকাধ্যায়ে প্রকৃতিভূত ও বিকৃতিপ্রাপ্ত বায়ুপিত্ত কফের কর্ম্ম, পঞ্চনিদান, ব্যাধিপরীক্ষা, প্রকৃতি, সাত্ম্য, বয়স এবং অঙ্গোপাঙ্গনিরূপণ নামক কএকটী অধ্যায় লিখিত হওয়ায় গ্রন্থখানি অতীব উপাদেয় হইয়াছে। মাধবে যাহা আছে ইহাতে তাহা ত আছেই, অধিকন্তু অনুক্ত অনেক সুভাষিত সংগৃহীত হইয়াছে, সুতরাং আশাকরি জিজ্ঞাসু বিদ্যার্থী এবং গুণগ্রাহি-অধ্যাপকগণ এই গ্রন্থের অধ্যয়ন অধ্যাপন দ্বারা চিকিৎসক সম্প্রদায়ের জ্ঞান বিবর্দ্ধনে সহায়তা করিবেন।

কবিরাজ শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত
কাব্যতীর্থ কবিভূষণ।

কুষ্ঠ ও বাতরক্তের ভেদ-নির্ণয়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এইবার প্রথমতঃ কুষ্ঠের কথা বলিব।

প্রতীচ্য চিকিৎসাশাস্ত্রানুসারে কুষ্ঠের ভেদক লক্ষণ প্রধানতঃ দুইটী ১। স্পর্শ শক্তি হীনতা ২। স্বেদাভাব (কচিৎ মাত্র দৃষ্ট হয়) স্পর্শজ্ঞানহীনতাই কুষ্ঠের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভেদক লক্ষণ—Sir Malcom Morris K. C. V.

O. F. R. C. S. &c. ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুষ্ঠাদি রোগ বিশেষজ্ঞ, তাঁহার উক্তি প্রামাণিক বলিয়া গণ্য। "Index of differential Diagnosis" গ্রন্থ হইতে তাহার উক্তির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি।

* * * After a time the macules and the neighbouring areas of apparently normal skin become more or less anœsthetic. As soon as anœsthesia arises the diagnosis is settled. This is indeed the crucial test in all cases of doubt as between leprosy and any other affections, for in leprosy it is almost invariably present, if not in the lesions themselves, then in the neighbouriug area of the skin.

অর্থাৎ—কিছু কাল পরে (কুষ্ঠের) মণ্ডলসমূহ এবং তৎসংলগ্ন স্থানের ত্বক্ (আক্রান্ত বলিয়া বোধ না হইলেও অল্প-বিস্তর পরিমাণে স্পর্শশক্তি শূন্য হইয়া পড়ে। যে মুহূর্ত্তে স্পর্শশক্তিহীনতা প্রকাশ পায় তন্মুহূর্ত্তেই রোগ-নির্ণয় স্থিরীকৃত হয়। কুষ্ঠ ও তৎসদৃশ অন্য রোগের সহিত সংশয় স্থলে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নির্ণয়ের উপায় বা ভেদক লক্ষণ, কারণ কুষ্ঠরোগে ক্ষতে অথবা একান্তই ক্ষতে অনুভূত না হইলেও তৎসংলগ্ন স্থানে (ত্বকে), স্পর্শ শক্তিহীনতা প্রায় অব্যভিচারিতরূপেই বর্ত্তমান থাকে।

Sir Patrick Manson কৃত Tropical diseases নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে কুষ্ঠরোগের নির্ণয় প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে "The touchstone in all doubtful cases is the presence or absence of anœsthesia. Anœsthesia is early absent in leprosy. In no other skin diseases is definite anaesthesia a eymptom"

অর্থাৎ—সমস্ত সন্দিগ্ধ স্থলেই স্পর্শশক্তির অস্তিত্ব বা অভাবই রোগ-নির্ণয়ের শ্রেষ্ঠ উপায়। কুষ্ঠ রোগে স্পর্শশক্তি কদাচিৎ অক্ষুণ্ণ থাকে। কুষ্ঠ ভিন্ন আর কোন চর্ম্মরোগেই সুস্পষ্ট স্পর্শজ্ঞানাভাব লক্ষিত হয় না।* আর অধিক উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন, কায় চিকিৎসার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ চরকসংহিতায় ঠিক এই কথাটী এমন সুস্পষ্ট ও অসন্দিগ্ধরূপে কথিত হইয়াছে যে, পড়িলে চমৎকৃত ও উৎফুল্ল হইতে হয়। আমাদের দুর্ভাগ্য তাই প্রতীচ্য চিকিৎসা শাস্ত্রে রোগ নির্ণয়ের প্রমাণ খুঁজিতে হয়। চরকসংহিতায় চিকিৎসিত স্থানের কুষ্ঠ চিকিৎসিতাধ্যায়ের সর্ব্ব প্রথম শ্লোকেই উক্ত হইয়াছে

হেতুং দ্রব্যং লিঙ্গং কুষ্ঠানাম্ আশ্রয়প্রশমনঞ্চ
শৃণ্বগ্নিবেশ সম্যগ্ বিশেষতঃ স্পর্শনঘ্নানাম্

হে অগ্নিবেশ! বিশেষতঃ স্পর্শ জ্ঞান নাশক কুষ্ঠ রোগের কারণ, উপাদান, লক্ষণ, আশ্রয় ও প্রতীকার সম্যকরূপে শ্রবণ কর।

এমন্ অবিসম্বাদিতরূপে এমন লক্ষণ আর কোন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থেই দৃষ্ট হয় না। সাধে কি "চরকস্তু চিকিৎসিতে" বলিয়া চরকের এত প্রশংসা!

* Tabetic ulcer (একজাতীয় বাতব্যাধির ক্ষত) রোগেও স্পর্শশক্তির অভাব লক্ষিত হয়, কিন্তু সে ক্ষেত্রে চাক্ষুষ লক্ষণ প্রভৃতি দ্বারা রোগ নির্ণীত হইয়া পড়ে, অতএব কুষ্ঠ সংশয় থাকিতে পারে না।

কোন কোন কুষ্ঠে বেদনা লক্ষণ আছে, যেমন কপাল ও ঔডুম্বর কুষ্ঠ "কপালং তোদবহুলম্"। "রুগ্‌দাহরাগকণ্ডূভিঃ পরীতম্" ইত্যাদি সে স্থলে বেদনা প্রথমাবস্থার লক্ষণ স্বীকার করিতে হইবে, নচেৎ" বিশেষতঃ স্পর্শনয়নাম্—এই বাক্য-বিরোধ পরিহার হয়না। Sir Malcom Morris ও তাহাই বলিয়াছেন। "They, *i. e.* the nodules in leprosy, are at first sometimes hyperæsthetic, but later very frequently become temporarily or permannently anæsthetic." অর্থাৎ কুষ্ঠরোগের মণ্ডলসমূহ সময়ে সময়ে প্রথমতঃ স্পর্শোদ্বিগ্ন অর্থাৎ বেদনাযুক্ত থাকে কিন্তু কিছুকাল পরে প্রায়ই স্থায়ী বা অস্থায়ী রূপে স্পর্শ শক্তি শূন্য হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয় ভেদক লক্ষণ স্বেদাভাব—*

Sir Malcom Morrisএর উক্তিটুকু এই—"Another distinctive feature of leprous spots is, that they rarely perspire."

Sir Patrick Manson প্রভৃতিরও এই মত।

অর্থাৎ—কুষ্ঠাক্রান্ত স্থানের আর একটী বিশিষ্ট লক্ষণ সেই স্থানে কচিৎ ঘর্ম্ম হয়। এই দ্বিতীয় লক্ষণটী প্রথমোক্ত লক্ষণের মত সুস্পষ্টরূপে কোথায়ও উল্লিখিত হয় নাই, বরং ইহার বিপরীত লক্ষণই স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয় তথাপি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সমূহ আলোচনা করিয়া এই লক্ষণটীও আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণের অনুমোদিত বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছে। কিরূপ বিচার-প্রণালীতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

প্রথমতঃ—কুষ্ঠ রোগের পূর্ব্বরূপ সমূহের মধ্যে "স্বেদবাহুল্য মস্বেদনং বা" (সু-নি-কু-নি) "অতিস্বেদো ন বা" (চ-চি-কু-চি) এই দুইটী লক্ষণ দৃষ্ট হয়। কুষ্ঠের পূর্ব্বরূপের মধ্যে অতিস্বেদ পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রমতেও স্বীকৃত। এখন তর্ক "অস্বেদন" লইয়া। পূর্ব্বরূপ দ্বিবিধ, সামান্য ও বিশিষ্ট, তন্মধ্যে বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপই রূপাবস্থায় বর্ত্তমান থাকে এবং তাহাই ব্যক্তাবস্থায় নামরূপ। অতিস্বেদও সামান্য পূর্ব্বরূপ এবং স্বেদাভাব বিশিষ্ট পূর্ব্ব এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে বোধহয় কোন দোষই হয় না, অথচ প্রত্যক্ষমূলক অন্য শাস্ত্রসম্বাদীও হইতে পারে। পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটী লক্ষণকে সামান্য পূর্ব্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার পক্ষে বিশেষ কোন যুক্তি নাই, অথচ সেরূপ ব্যাখ্যায় স্থানভেদ ও কালভেদ অর্থাৎ কোন স্থানে অতিস্বেদ, কোনস্থানে স্বেদাভাব এবং কখনও অতিস্বেদ, কখনও স্বেদাভাব স্বীকার করিতে হয়, এরূপ ব্যাখ্যায় কল্পনাগৌরব দোষ ঘটে। প্রত্যক্ষসিদ্ধ না হইলে এ ব্যাখ্যা অসঙ্গত। অতিস্বেদন ও অস্বেদন—এই লক্ষণ দ্বয়ের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্দ্দেশও অনুধাবন যোগ্য।

দ্বিতীয়তঃ—পূর্ব্বেই বলিয়াছি চরক সংহিতার কুষ্ঠ-চিকিৎসাধ্যায়ে কুষ্ঠ লক্ষণে কুত্রাপি স্বেদের কথা নাই, নিদান স্থানে

* দার্শনিকের ভাষায় বলিতে হইলে "স্ব (= কুষ্ঠ)-সংশয়ব্যাপ্যত্বে সতি স্পর্শহানিবত্বং কুষ্ঠত্বম্" কুষ্ঠের ইতর ব্যবর্ত্তক লক্ষণ এইরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। 'স্ব-হেতুদ্রব্য-ঘটিতলিঙ্গব্যাপ্যতাবচ্ছিন্ন স্পর্শনয়ত্বং কুষ্ঠত্বম্,' কুষ্ঠের লক্ষণ এইভাবেও নির্দ্দেশ করা যায়।

সঞ্জাতক্রিমি কুষ্ঠের পিত্তকৃত উপদ্রবের মধ্যে স্বেদের কথা আছে, সুতরাং ঐ বিশিষ্ট ক্ষেত্র অতীত চরকের মতে কুষ্ঠলক্ষণে স্বেদাভাব অর্থাপত্তিতন্ত্রযুক্তি বলে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। সুশ্রুতে নিদান স্থানে মহাকুষ্ঠ সপ্তকের সামান্য লক্ষণের মধ্যেও স্বেদের কথা লিখিত নাই। সুতরাং চরক সুশ্রুত উভয় মতেই মহাকুষ্ঠের সামান্য লক্ষণ মধ্যে স্বেদ লক্ষণ নাই ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে।

তৃতীয়তঃ—সুশ্রুতসংহিতার কুষ্ঠনিদানাধ্যায়ের "কুষ্ঠেষু রুক্ত্বক্‌সঙ্কোচস্বাপস্বেদভেদকৌণ্যস্বরোপঘাতা বাতেন" (অর্থাৎ বেদনা, ত্বক্ সঙ্কোচ, স্পর্শজ্ঞানাভাব, ঘর্ম্ম, বিদারণ, করভঙ্গ এবং স্বরভেদ এই গুলি কুষ্ঠের বাতকৃত লক্ষণ) এই বচনে স্বেদ লক্ষণ বিশেষ বিচার্য্য। এস্থলের ডল্লনকৃত টীকা পড়িলে মনে হয়, বিশেষ পাঠপ্রমাদ ঘটিয়াছে। টীকা উদ্ধৃত করিতেছি। সুধীগণদেখিবেন,—ডল্লনের কথা গুলি অতি গুরুতর।

"কুষ্ঠেষু রুগিতি। বাতকার্য্যেষু স্বেদশ্চিন্তা স্বাপভেদাবিত্যপি পঠন্তি। তত্রন অস্বেদপ্রতিষেধার্থঃ। ব্যাধিস্বভাবাৎ স্বেদঃ স্যাদিত্যপরে"। অর্থাৎ—কুষ্ঠে বেদনা ইত্যাদি বাতজনিত লক্ষণ সমুহের মধ্যে ঘর্ম্ম চিন্তা সুপ্তি বিদারণ এইরূপ পাঠ আছে। সেক্ষেত্রে স্বেদাভাবলক্ষণের নিষেধ ঘটিবে না। রোগ স্বভাব বশতঃ স্বেদ হইতে পারে—কেহ কেহ একথা বলেন। অধুনা প্রচলিত সুশ্রুত সংহিতায় চিন্তা ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত তিনটী লক্ষণেরই পাঠ দেখা যায়। ডল্লনের উপজীব্য গ্রন্থে কিরূপ পাঠ ছিল? আর যে পাঠই থাকুক, স্বেদ শব্দের পাঠ ছিল না,—কেননা ডল্লন স্বেদ লক্ষণের পাঠ লইয়াই বিশেষ বিচার করিয়াছেন। এস্থলে সর্ব্বাপেক্ষা প্রণিধানযোগ্য "তত্রন অস্বেদ প্রতিষেধার্থঃ" এই কথা। অস্বেদ লক্ষণ যদি অন্যতন্ত্রস্বীকৃত বা পূর্ব্ববর্ত্তী টীকাকারগণ সম্মত মাত্র হইত, তাহা হইলে নিবন্ধসংগ্রহকার ডল্লনের পক্ষে তাহা উল্লেখ না করার কোন কারণ দেখা যাইত না। অপ্রামাণিক এবং পূর্ব্বাচার্য্য অনুক্ত লক্ষণ দ্বারা মূল গ্রন্থের পাঠান্তরের অর্থ সঙ্কোচ সঙ্গত বা সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং ডল্লন ব্যাখ্যাত গ্রন্থে অস্বেদ লক্ষণের পাঠ নিশ্চয়ই ছিল—এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। ডল্লনের রচনা-ভঙ্গীতে স্পষ্টই প্রতীত হয়, অস্বেদ কুষ্ঠের অতি গুরুতর লক্ষণ। স্বেদের কথা স্বীকার করিলেও তদ্বারা অস্বেদ লক্ষণের নিষেধ ঘটিবে না। যদি অস্বেদ কুষ্ঠের নিয়ত লক্ষণ না হইত, বা বৈকল্পিক বা ব্যভিচারী লক্ষণ হইত, তাহা হইলে এই আশঙ্কা পরিহার নিরর্থক হইয়া পরে। সুশ্রুতে ত্বগাশ্রিত ও রক্তাশ্রিত কুষ্ঠ লক্ষণে স্বেদের কথা আছে। ডল্লন স্বেদ লক্ষণের কথা কিছুই বলেন নাই। বাগ্‌ভট কেবল রক্তাশ্রিত ও মাধবকর কেবল ত্বগাশ্রিত কুষ্ঠে স্বেদ পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু বিজয় রক্ষিত স্বেদ ও অস্বেদ উভয় লক্ষণ প্রতিপাদক স্বতন্ত্র বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রতীচ্য মতেও কচিৎ স্বেদ দৃষ্ট হয় স্বীকৃত হইয়াছে। অধিক আলোচনা অনাবশ্যক। ত্বক্ সঙ্কোচ অঙ্গুলী পতন করভঙ্গ, কর্ণভঙ্গ, নাসাভঙ্গ, অক্ষিরাগ, স্বরভেদ এই লক্ষণ গুলি আয়ুর্ব্বেদ ও প্রতীচ্য চিকিৎসা শাস্ত্র উভয় মতেই কুষ্ঠের বিশেষ লক্ষণ। আমাদের প্রতিপাদ্য ভেদনির্ণয়, সুতরাং রোগের সম্পূর্ণ আলোচনার অবকাশ ও অধিকার নাই, তথাপি

আর একটী কথা বলিয়াই কুষ্ঠরোগ প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব।

আয়ুর্ব্বেদ মতে কুষ্ঠ সপ্তধাতুগত, রাজ যক্ষ্মাও সপ্তধাতুক্ষয়কর। উভয়ের এই সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া Sir Patrick Manson বলিয়াছেন,—রোগ লক্ষণের সাদৃশ্য না থাকিলেও কুষ্ঠ ও যক্ষ্মার মত সর্ব্বদেহগত ব্যাধি এবং এইজন্য কুষ্ঠ রোগে সর্ব্বদেহ গত অবসাদ দৌর্ব্বল্য ক্ষয় * প্রভৃতি দৃষ্ট হয়।

কুষ্ঠ নির্ণয়ের পর বাতরক্তনির্ণয় আমাদের প্রতিপাদ্য। বাতরক্তের নির্ণয় সম্বন্ধে প্রচলিত ভ্রমের একটী উদাহরণ দিব। প্রচলিত মুদ্রিত যে কয় খানি মাধব নিদানে আয়ুর্ব্বেদীয় নামের অনুরূপ ডাক্তারী নাম নিবেশিত হইয়াছে, তাহার সকল গুলিতেই কুষ্ঠ ও বাত রক্তের ডাক্তারী নাম Leprosy লিখিত হইয়াছে। এমন কি, স্বর্গীয় সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত মহোদয়ও তাঁহার মাধব নিদানের অনুবাদে এই ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়াছেন। বস্তুতঃ তাহা নহে। আমার ধারণা হইয়াছে, হস্তমূল গত বাতরক্ত ও পাদমূল গত বাতরক্তের সহিত পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রানুসারে (যথাক্রমে) Erythema Nodosum ও Erythema Induratum Scrofulosorum এর বিশেষ সাদৃশ্য আছে। প্রতীচ্য চিকিৎসা গ্রন্থ হইতে এই দ্বিবিধ রোগের বিস্তৃত বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া উভয়ের ঐক্য প্রতিপাদন করিতে গেলে প্রবন্ধ অতি বিস্তৃত হইয়া পড়িবে এবং আমাদের তাহা উদ্দেশ্যও নহে।

সর্ব্বদোষ সম্বন্ধ থাকিলেও প্রধানতঃ বাতরক্তে বায়ু দুষ্টিরই প্রাধান্য। ভাবমিশ্র বলিয়াছেন—"তৎপ্রাবল্যাদুচ্যতে বাতরক্তম্" তৎ প্রাবল্যাৎ তস্য বাতস্য দোষত্বেন প্রাধান্যাৎ (বাতরক্তাধিকার) অর্থাৎ বায়ুর প্রাধান্য বশতই বাতরক্ত নাম হইয়াছে। যন্ত্রণা এবং স্পর্শশক্তিহীনতা—উভয়ই বায়ুবিকার। এক্ষণে বিচার্য্য এই বাত রক্তে কিরূপ বিকার উৎপন্ন হয়? তদুত্তরে আমরা বলিব বেদনা এবং এই বেদনাই বাতরক্তের প্রথম ও প্রধান ভেদক লক্ষণ *

স্থিতং পিত্তাদি সংসৃষ্টং তাস্তাঃ সৃজতি বেদনাঃ।
কণ্ডুদাহ রুগায়ামতোদ স্ফুরণ কুঞ্চনৈঃ।
অন্বিতা শ্যাবরক্তাত্বক্................॥
গম্ভীরে শ্বয়থুঃ স্তব্ধঃ কঠিনোঽন্ত ভৃশার্ত্তিমান্।
রুগ্বিদাহান্বিতোযু তীক্ষ্ণং বায়ুঃ সন্ধ্যস্থিমজ্জসু।
ছিন্দন্নিব চরত্যন্তং বক্রীকুর্ব্বংশ্চ বেগবান্॥

---

* কুষ্ঠ রোগও মারাত্মক অথবা রাজযক্ষ্মাক্রান্ত হইতে পারে। "It may even prove fatal as a sort of galloping leprosy within a year. * * one must be careful to exclude the possibility of contamination with Bacilus Tuberculosis with which the lepers are often infected". * * অর্থাৎ এই জাতীয় কুষ্ঠ আশুকারী কুষ্ঠরূপে একবৎসরের মধ্যেই জীবনান্ত করিতে পারে। * * কুষ্ঠরোগী অনেক সময় যক্ষ্মারোগ-গ্রস্ত হয়, অতএব কুষ্ঠবীজাণু পরীক্ষাকালে যক্ষ্মাবীজাণু মিশ্রিত না থাকে সে বিষয়ে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। Tropical diseases.

* দার্শনিকের ভাষায় বলিতে হইলে "স্ব (বাতরক্ত) সংশয়ব্যাপ্যাবচ্ছিন্ন-বিশিষ্টবেদনাবত্বং বাতরক্তত্বম্" বাতরক্তের ইতর ব্যবর্ত্তক লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করা যায়। "কুপিত বাতশোণিতজন্যবিশিষ্ট সংপ্রাপ্ত্যবচ্ছিন্ন সঙ্কদাবির্ভাবোপরমপূর্ব্বরূপব্যাপ্যবিশিষ্টবেদনাবচ্ছিন্ন লিঙ্গত্বং বাতরক্তত্বম্" বাতরক্তের লক্ষণ এইরূপ ও বলা যায়।

রক্তমার্গং নিহন্ত্যাশু শাখা সন্ধিষু মারুতঃ
নিবেশ্যান্যোন্যমাবাধ্য বেদনাভির্হরেদসূন্।

(চরক বা শোঃ চিঃ অঃ)

অর্থাৎ (বাতরক্ত) পিত্তাদির সহিত সংযুক্ত সেই সমস্ত (পিত্তাদিকৃত) বেদনা উৎপাদন করে। উত্তাপ বাতরক্তে ত্বক্ চুলকানি, দাহন বেদনা, প্রসারণ, সূচীবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা, স্পন্দন ও কুঞ্চন যুক্ত এবং শুক্লকৃষ্ণবর্ণ ও রক্তবর্ণ হয়। গম্ভীর বাতরক্তে শোথ স্তব্ধ, কঠিন ও অত্যন্ত বেদনা যুক্ত হয়। বেদনা ও বিদাহ যুক্ত বায়ু সন্ধি, অস্থি ও মজ্জাতে প্রকাশিত হইয়া ছেদনবৎ পীড়া উৎপন্ন করে এবং (হস্ত পদাদি) বক্র করিয়া ফেলে। হস্ত পদাদির সন্ধি স্থানে বায়ু প্রবেশ করিয়া রক্তের পথ রুদ্ধ করে এবং পরস্পরকে দূষিত করিয়া বেদনায় প্রাণান্ত করে।

বাতরক্তের সংপ্রাপ্তি এবং সামান্য লক্ষণ সমূহের মধ্যে চরক কুত্রাপি সুপ্তি বা স্পর্শ শক্তি হীনতার কথা বলেন নাই। সুশ্রুতের নিদান স্থানে—"স্পর্শোদ্বিগ্নৌ তোদভেদ প্রশোষস্বাপো পেতৌ বাতরক্তেন পাদৌ"—এই বচনে বাতকৃত লক্ষণের মধ্যে স্পর্শোদ্বিগ্নত্ব অর্থাৎ স্পর্শাসহত্ব এবং সুপ্তি এই দুইটী লক্ষণই উক্ত হইয়াছে। চরকে বাতকৃত লক্ষণে সুপ্তির প্রসঙ্গও পাই বরং—

"বিশেষতঃ শিরায়াম তোদ স্ফুরণ ভেদনম্ ..অঙ্গগ্রহোঽতিরুক্" এই বচনে বিশেষরূপে তোদ অর্থাৎ সূচী বেধবৎ যন্ত্রণা ও অতিরুক্ (বাতশোণিত চিকিৎসিতাধ্যায়) লক্ষণই পাওয়া যায়। অষ্টাঙ্গহৃদয়কার বাগ্ভট গোলযোগ দেখিয়া উভয়েরই মর্য্যাদা রাখিয়াছেন। তিনি বাতাধিক্যের লক্ষণ বলিতে যাইয়া "...অধিকং তত্রশূলং...অতিরুক্" এই দুই লক্ষণের সঙ্গে ২ "স্তম্ভ বেপথু সুপ্তয়ঃ..." বলিয়া সুপ্তির কথাও বলিয়াছেন। চরক সংহিতায় কেবল শ্লেষ্ম লক্ষণের মধ্যে সুপ্তির কথা আছে। মাধবকর বাগ্ভটেরই অনুবর্ত্তী হইয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
কাব্যতীর্থ, কবিরত্ন।

প্রাপ্তগ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

—:০:—

স্বাস্থ্য ও শক্তি।—শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায় এম, এ, বি, এল প্রণীত। প্রকাশক শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র রায়, বীণাপাণি বুকক্লাব, ২১ নং বেচু চাটার্জ্জির ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা। শারীর চর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা হইতে আরম্ভ করিয়া স্বাস্থ্য ও শক্তি সঞ্চয়ের জন্য কিরূপ ভাবে দিন চর্য্যা করা কর্ত্তব্য—এ পুস্তকে তাহা বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ব্যায়ামের দ্বারা মানুষ কতটা উন্নত হইতে পারে—গ্রন্থকার তাহা ভালরূপে বুঝাইয়া অনেক গুলি ব্যায়ামশীলের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও চিত্র ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়া পুস্তকখানির প্রয়োজনীয়তা অধিকতর বর্দ্ধিত করিয়াছেন। ব্যায়ামের প্রথমে গ্রন্থকার সে কালের 'প্রাণায়ামে'র

কথা আনিয়া ফেলিয়াছেন। 'প্রাণায়ামে'র 'পূরক' 'কুম্ভক' ও 'রেচক' প্রক্রিয়ায় ব্যায়ামের উদ্দেশ্য কিরূপ সিদ্ধ হয়, তাহা গত মাসে "অনুকরণে আমাদের অবস্থা" প্রবন্ধের লেখক বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সাবেক 'কপাটী' 'হাডুগুডু'.খেলাই যে আমাদের দেশের বালকগণের পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যায়াম,—গ্রন্থ মধ্যে এ পরিচয় পাইয়াও আমরা সুখী হইলাম। গ্রন্থের ছাপা, কাগজ এবং বাঁধাই অতি উৎকৃষ্ট,—বিষয় গুলি তদপেক্ষা প্রয়োজনীয়। এরূপ গ্রন্থ গৃহ-পঞ্জিকায় ন্যায় প্রত্যেক গৃহে রক্ষিত হওয়া উচিত। শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ এ গ্রন্থ খানিকে ছাত্রদিগের অধ্যয়নের জন্য মনোনীত করিলে দেশের যথেষ্ট উপকার হইতে পারে।

চণ্ডী-চরিতামৃত।—শ্রীরাসবিহারী রায় কবিকঙ্কন কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা ২০১ নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে প্রাপ্ত। মূল্য ।৵০ আনা। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর পদ্য অনুবাদ করিয়া এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। মূলের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া এ ধরণের গ্রন্থের অনুবাদ করা অতিশয় কঠিন। কিন্তু গ্রন্থকারের কবিত্ব নৈপুণ্যে তাহার কিছু মাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। পদ্য গুলি বেশ সরল, সংস্কৃতভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সহজে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে পারিবেন। নানারূপ ছন্দো-বিন্যাসে গ্রন্থখানি বিলক্ষণ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। আমাদের দেশের রমণী মণ্ডলী এই পদ্য অনুবাদ আবৃত্তি করিয়া দেবীমাহাত্ম্য পাঠের পুণ্যলাভ করিতে পারেন।

পরিচারিকা।—মাসিক পত্রিকা। সম্পাদিকা রাণী নিরুপমা দেবী। শ্রীজানকী বল্লভ বিশ্বাস কার্য্যাধ্যক্ষ, কার্য্যালয়—কোচবিহার। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ ২৸০ আনা। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা। প্রথমেই সম্পাদিকার ওঁ (কবিতা)। ভাষার ঝঙ্কারে এবং ভাবের মাধুর্য্যে বড়ই হৃদয়স্পর্শী হইয়াছে, লেখিকার কবিত্ব যেন কবিতার প্রত্যেক কথায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। "জীবরাজ্যে মানুষের যথার্থ স্থান" মানুষের সহিত অপরাপর ইতর জীবের যে একটি রক্তের সম্পর্ক আছে—কয়েকটি যুক্তি দ্বারা তাহা বেশ বুঝান হইয়াছে। "শ্যামা" কবিতাটি খুব ঝঙ্কার পূর্ণ, তবে 'ঢুলাও আঁখি তব নিবিড় চুমে' চুমের এই নিবিড়ত্ব পাঠকের ভাল লাগিলেই ভাল। 'মঙ্গল ঘট' ক্রমশঃ গল্প। নিঃস্বের অধিকার' একটি চলন সই কবিতা। 'বাঙ্গলার ছন্দ ও তাল' প্রবন্ধটি গবেষণা পূর্ণ। 'কল্পনা' কবিতাটি বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'অস্পৃশ্য' গল্পটি মনোরম। 'গৃহের প্রতি' কবিতাটি মন্দ হয় নাই। "পাঠান দিল্লীর প্রতিবাদে" অনেক গুলি নূতন কথা অবগত হওয়া যায়। 'বিস্মৃত দেশে' একটি উৎকৃষ্ট কবিতা। 'ঐশ্বর্য্য', একটি ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস। 'প্রণয় আমার' আদর্শেরই অনুরূপ হইয়াছে। 'দিল্লীর ভীমপাদ তীর্থের আবিষ্কর্ত্তা' প্রবন্ধে শিখিবার বিষয় আছে। 'পরিচারিকা'র সম্পাদন কার্য্য খুব ভালরূপই হইতেছে, ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। মূল্যও যথেষ্ট সুলভ। প্রত্যেক সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিরই 'পরিচারিকা' পাঠ করা উচিত।

নারায়ণ।—মাসিক পত্র। তৃতীয় বর্ষ ২য়খণ্ড—১ম সংখ্যা,—জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪। সম্পাদক শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ। কার্য্যালয় ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। বার্ষিক মূল্য ৩৷০ টাকা। এবারের প্রথমেই কবিতা "পয় আহারী বাবা"। ঠাকুর শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

মহাপ্রভুর কৃপা ভাজন শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী প্রণীত শ্রীশ্রীসদ্গুরু মঙ্গল পুস্তকে কথিত একটী সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। কবিতাটি বেশ হইয়াছে। ২য় প্রবন্ধ "বাঙ্গালার কথা।" অপূর্ব্ব—উপাদেয়—অত্যুৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে ভাবিবার—জানিবার—বুঝিবার এবং শিখিবার অনেক বিষয় রহিয়াছে। এ প্রবন্ধের তুলনা নাই, সকলেরই যত্ন পূর্ব্বক এটি পাঠ করা উচিত। ইহার পর "তিনুর মা"—একটি গল্প। এ গল্পে প্রেমিক-প্রেমিকার বিরহ-মিলন নাই, চাঁদের কিরণ—মলয় মারুত—হা-হুতাশ—লইয়াও এ গল্প রচিত হয় নাই, সেজন্য ইহা নব্য-পাঠকের ভাল লাগিবে কিনা জানিনা, কিন্তু এ গল্পে দরিদ্রা—নীচ জাতীয়া—চণ্ডাল বিধবার স্বার্থ-বলির দৃষ্টান্তে পল্লীচিত্রের একটী বিশেষ অঙ্ক অতি অল্পের ভিতর বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে—গল্প লিখিতে হইলে এইরূপই ত লেখা উচিত। অনেক পল্লীগ্রামেই এই গল্পের অন্যতর নায়ক 'রায় মহাশয়ের' চিত্র খুঁজিলে বাহির হইতে পারে। "সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য" প্রবন্ধে সেরূপ বিশেষত্ব কিছু দেখিলাম না। "বিরহে পাগল" প্রবন্ধে "বিক্রমোর্ব্বশী"র বেশ বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

কাজের লোক।—মাসিক পত্র। ১১শ বর্ষ, ১ম হইতে ৫ম সংখ্যা। সম্পাদক শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—, কার্য্যালয় ৭নং অক্রুর দত্তের লেন। বার্ষিক মূল্য ২৷৹। কৃষি শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য—অনেক বিষয়েরই আলোচনা ইহাতে হইয়া থাকে দেখা গেল। ইহার অধিকাংশ লেখাই কাজের কথায় পূর্ণ। সহযোগী গার্হস্থ্য শিল্প লইয়া যে সকল আলোচনা করেন, তাহা হইতে অনেক বিষয় শিখিতে পারা যায়। হোমিওপ্যাথিক তথ্য এবং মুষ্টিযোগ সংগ্রহ পড়িলে অনেক সময় উপকার হইতে পারে। "কৃষি তথ্যে"ও অনেক নূতন তথ্য প্রকাশ করা হইয়াছে। গল্প ও কবিতাগুলি মুখ-রোচক হইলেও কিন্তু সহযোগীর উদ্দেশ্যের সহায়তা করিতেছে বলিয়া মনে হইলনা, প্রবন্ধ নির্ব্বাচন কালে এ ধরণের লেখা একটু বাছিয়া-গুছিয়া মানানীত করিলে ভাল হয়।

স্বাস্থ্য সমাচার।—মাসিক পত্র। ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ। সম্পাদক ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু, এম, বি। কার্য্যালয় ৪৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা। 'আলোচনা' প্রবন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে। 'মানব দেহে শিল্প সৌন্দর্য্য' সুন্দর প্রবন্ধ। 'রঙের কথা'য় লেখক অনেক নূতন কথা বলিয়াছেন, "কোন লোককে লাল ঘরে পুরিয়া ২১ দিন রাখিলে সে পাগল হইয়া যাইবে"—এ বিষয় কিন্তু পরীক্ষা না করিলে গ্রহণ করা যায় না। ঘরের মধ্যেই যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে লাল বর্ণের পোষাকেও ত কতকটা ঐরূপ হওয়া বিচিত্র নহে, কিন্তু কাহাকেও সেরূপ হইতে ত শুনিতে পাই নাই, তবে লালবর্ণের চেলি পরিধানের ফলে বিবাহের পর অনেক বর-কণে প্রেমে পাগল হইয়াছে—দেখা গিয়াছে! "চন্দন" প্রবন্ধ পাঠে পাঠকের উপকার হইবে। "অহিফেন ব্যবহার" উদ্ধৃত প্রবন্ধ, ইহার সমস্ত কথায় আমরা একমত হইতে পারিলামনা। "ধাতুপাত্র" বিশেষ গবেষণা পূর্ণ।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

১ম বর্ষ। } বঙ্গাব্দ ১৩২৪—ভাদ্র। } ১১শ সংখ্যা।

কাজের কথা।

—*—

স্বাস্থ্য ও সদাচার।—স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সদাচারের অনুষ্ঠান একান্ত কর্ত্তব্য। ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণ আমাদিগকে সদ্বৃত্ত পরায়ণ হইবার জন্য তাঁহাদিগের রচিত নানাবিধ শাস্ত্রে যে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, স্বাস্থ্য রক্ষাই তাহার মূল কারণ। পাপ এবং পুণ্য কেহ মানুন বা না মানুন, পাপ এবং পুণ্যের ফলে স্বর্গ ও নরক-ভোগের চিত্র কল্পনা-প্রসূত বা অতিরঞ্জিত বলিয়া যাঁহারা মনে করিতে হয় করুন, তাহাতে কাহারও আসিয়া-যাইতেছে না; কিন্তু সদাচার-ভ্রষ্ট হওয়ার ফলে নানারূপ ব্যাধি-বিজড়িত-দেহে অনেকে পার্থিব-জীবন বহনই বিড়ম্বনাময় এবং শেষে অকাল-মৃত্যুর পথ পরিষ্কৃত করিয়া তুলিতেছেন, ইহা ত চক্ষের সম্মুখে প্রতিনিয়ত দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রকার ইহাকেই পাপ সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন। ইহারই ফল রোগ। ধর্ম্মপ্রাণ-হিন্দু যে দিন হইতে এই তত্ত্ব ভুলিয়াছে, সেই দিন হইতেই তাহার সংসার নানারূপ ব্যাধির আকর ভূমি হইয়া পড়িয়াছে।

*　　*　　*

অভক্ষ্য ভক্ষণ।—অভক্ষ্য-ভোক্ষণ বলিলে শুধু যে হিন্দু জাতির নিষিদ্ধ মাংস প্রভৃতি আহারই বুঝাইয়া থাকে,—এমন নহে। হিন্দুর অশুচি সমন্বিত আহার্য্য মাত্রেই হিন্দুর নিকট অভক্ষ্য পদবাচ্য। হিন্দুশাস্ত্রে যে সকল মাংস-ভক্ষণের ব্যবস্থা আছে, ছাগমাংস তাহার মধ্যে অন্যতর, কিন্তু এই ছাগ মাংস খাইবার পূর্ব্বে দেবতার উদ্দেশে বলি-প্রদানের ব্যবস্থা না করিয়া, উহা ভক্ষণ করা যে অপকর্ম্ম —ইহাও শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন। এখনকার কালে কিন্তু সকল স্থলে সে শাস্ত্র-বাক্য প্রতিপালিত হয় না। সহরে কসাই-দিগের দোকান গুলিই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ছাগীর মাংস ভক্ষণে আমাদের স্বাস্থ্যহানি হইয়া থাকে, এজন্য উহা ভক্ষণ করা আমাদের শাস্ত্র নিষিদ্ধ। বৃদ্ধ, জরা এবং রোগ পীড়িত

ছাগ মাংসও আমাদের ভক্ষণের বিধিবহির্ভূত। দোকানে কিন্তু ছাগী ও ছাগ—জরা ও রুগ্ন—সকল প্রকার মাংসই বিক্রয় করা হইয়া থাকে। 'বাবু'রা তাহাই সাগ্রহে ক্রয় পূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়া থাকেন! এই সকল মাংস-ভক্ষণে কিন্তু অনেক সময় অপকারই হইয়া থাকে। অজীর্ণ এবং যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা দেশে যে সকল কারণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, ইহাও তাহার একটি কারণ। সকলেরই এ সকল কথা চিন্তা করা উচিত।

* * *

দোকানের রাঁধা মাংস।—দোকানের রাঁধা মাংস, চপ-কাট্‌লেটের প্রচলনও এখন সকল গৃহেই যথেষ্ট বাড়িয়াছে। কসাইয়ের দোকান হইতে ঐ সকল মাংস যে আমদানি করা হয়, তাহা বোধ হয়—না বলিলেও চলিবে। একে মাংসের অবস্থা ঐরূপ, তাহার উপর অপকৃষ্ট ঘৃত-মসলা-সংযোগে ঐ সকল মাংস রন্ধন করা হয়। ধর্ম্ম হানির কথা না হয় বাদই দিলাম, কিন্তু স্বাস্থ্য হানি ত ইহার ফলে অবশ্যম্ভাবী। তাহার পর চেয়ারে বসিয়া, টেবিলে রাখিয়া, যে সকল 'ডিসে' ঐ সকল খাওয়ার ব্যবস্থা হইয়া থাকে, তাহার ফলেও উচ্ছিষ্ট-ভক্ষণের জন্য স্বাস্থ্য হানির কারণ যথেষ্ট ঘটিয়া থাকে। পিতল এবং কাঁসার পাত্র মাজিয়া-ঘসিয়া লইলে শুদ্ধ হইয়া থাকে কিন্তু কাচ এবং এনামেলের পাত্র যেরূপ ভাবে মাজিয়া-ঘসিয়া লওয়া হউকনা কেন, উহা শুদ্ধ হইতেই পারেনা। দৃষ্টান্ত স্থলে আমরা মাটির গ্লাসের কথা উল্লেখ করিতে পারি। তা' ছাড়া, চায়ের দোকানের মত এখানেও 'ডিস' এবং জল পাত্র বা গ্লাসগুলি কখন মৃত্তিকা-সংযোগে পরিষ্কার করা হয়না, শুধু জলে ধৌত করিয়া লওয়া হয় মাত্র। এজন্য দোকানের এই মাংস এবং চপ্-কাটলেট ভক্ষণে একের উচ্ছিষ্ট অপরের ভক্ষণ করার ফলে যে স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে, ইহা নির্ভেজ সত্য কথা। দেশে সংক্রামক রোগ-বাহুল্যের ইহাও কারণ।

* * *

মুখপ্রক্ষালনে বিরক্তি ভাব।—ভোজনান্তে যে মুখ-প্রক্ষালনের রীতি প্রচলিত আছে; এখনকার দিনে অনেকে তাহাও মানিয়া চলেননা। রাঁধা মাংস বা চপ্-কাটলেটের দোকানে যাঁহারা রসনার তৃপ্তি লাভ করিয়া পবিত্র (!) হইয়া থাকেন, তাঁহারা ত এ রীতি মানিতেই পারেননা,—দোকানে ত আর তাঁহাদিগের জন্য সেরূপ ভাবে জল-সরবরাহের আবশ্যকতা দোকানদার মনে করিতে পারেনা,—'বাবু ভায়াদের'ও তাহাতে প্রবৃত্তি নাই, কাজেই তাঁহাদিগের পক্ষে উচ্ছিষ্ট গ্লাসের জলে হস্ত ডুবাইয়া এবং ঐ হস্ত একবার মুখমণ্ডলে বুলাইয়া—রুমাল দ্বারা মুছিয়া ফেলিলেই মুখ-প্রক্ষালনের কার্য্য সিদ্ধ হইয়া গেল,—ইহাই হইল—দোকানে বসিয়া আহারান্তে মুখ প্রক্ষালনের ব্যবস্থা! ইহা ভিন্ন ভোজ-নিমন্ত্রণেও অনেককে ঐরূপ ভাবে মুখ-প্রক্ষালনের বিরত দেখিতে পাই। ফলে ভোজনকালীন চর্ব্বিত দ্রব্য গুলি উত্তমরূপে মুখ-প্রক্ষালনের অভাবে দন্ত-সংশ্লিষ্ট হওয়ায় অনেককেই অসময়ে দাঁত বাঁধাইবার দায়ে পড়িতে হয়। আজকাল যে এত যে dentist বা দন্ত চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়িয়াছে, মুখ প্রক্ষালনে বিরক্তি পূর্ণ 'বাবু ভায়ারা'ই সেই সকল চিকিৎসকের ব্যবসায়-বৃদ্ধির কারণ। ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর

বয়সে যৌবনের বল বীর্য্য অটুট না থাকুক, একেবারে নষ্ট হইবার ত কথা নহে, কিন্তু দন্ত-চিকিৎসকদিগের দোকানে গিয়া অনুসন্ধান করুন, তাঁহাদিগের খরিদদারদিগের মধ্যে ঐ বয়সের লোকের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। ফল কথা, আমাদিগের রুচি-বিপর্য্যয়ে অনেক প্রকারেই আমাদের স্বাস্থ্য হানি ঘটিতেছে।

* * *

তাম্বুলে মুখ শুদ্ধি।—তাম্বুলে মুখ শুদ্ধির ব্যবস্থা বরাবরই প্রচলিত আছে। ইহার গুণ-ব্যাখ্যায় আয়ুর্ব্বেদ বলিয়াছেন,—"ইহা বিশদ, রোচক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কষায়, সর, বশ্য, তিক্ত, কটুক্ষার, রক্তপিত্ত জনক, লঘু, বলকারক, শ্লেষ্ম নাশক, মুখের দুর্গন্ধ নিবারক, মলাপহারক, বায়ু নিবারক ও শ্রম শান্তি কর।" কিন্তু মুখ শুদ্ধি করা ভিন্ন অনেকে যখন-তখন যে ইহার অত্যধিক ব্যবহার করেন, তাহার ফলে দন্তরোগ উপস্থিত হয়। অকালে দাঁত বাঁধাইবার কারণও এই অতিরিক্ত তাম্বুল বা পান চর্ব্বনের ফলে ঘটিয়া থাকে। তা' ছাড়া, ইহা রক্তপিত্তজনক বলিয়া ইহার অধিক ব্যবহারে রক্তপিত্ত রোগ জন্মিবার আশঙ্কা করা যায়। ইহা তীক্ষ্ণ এবং কটুক্ষার বলিয়া ইহার অধিক ব্যবহারে অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। কলিকাতায় আজ-কাল পানের খিলির দোকানও অলিতে-গলিতে, অজীর্ণ রোগে ও অনেক পল্লী জর্জ্জরীত প্রায়। ফল কথা, উপযুক্ত মাত্রায় ব্যবহার করিলে, বিষও অমৃতের ন্যায় উপকারী হইয়া থাকে এবং ব্যবহার-বাহুল্যে অমৃতও জীর্ণ করা অনেক সময় অসম্ভব হইয়া থাকে,—ইহা চির প্রচলিত সত্য কথা। ইহা ভিন্ন পানে যে গুপারি ব্যবহার করা হয়, তাহারও অধিক ব্যবহারে অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হয়। তাম্বুলের অতিরিক্ত ভক্ত ব্যক্তিগণ এসকল চিন্তা করেন,—ইহাই আমাদিগের বক্তব্য।

বঙ্গে ম্যালেরিয়া।

ম্যালেরিয়ায় বাঙ্গালা দেশ ছারখার হইতে বসিয়াছে। প্রতিবৎসরই এই সময় হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত ইহার তাণ্ডব নৃত্য দেখিয়া বাঙ্গালার পল্লীগ্রাম গুলি কিরূপ ভীতি-বিহ্বল চিত্তে ত্রস্তভাবে কালাতিপাত করিয়া থাকে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। প্রথমতঃ যশোহর জেলার গদখালি গ্রামে ইহার উৎপত্তি আরম্ভ হয়, তাহার পর ঐ জেলারই শ্রীনগর গ্রামটী ধ্বংস করিয়া, নদীয়ার উলা বা বীরনগর গ্রামে ইহার প্রকট লীলা পরিলক্ষিত হয়, সে লীলা বড় সহজ হয় নাই, নদীয়া জেলার শান্তিপুরের পর উলা বা বীরনগরের মত পল্লী আর একটিও ছিল না, সেই সুবৃহৎ পল্লীর প্রায় তাবৎ অধিবাসীই এই দুরন্ত রাক্ষসীর করাল গ্রাসে পতিত হওয়ায় আজি সেই সুবৃহৎ পল্লীখানি কয়েকটি মুষ্টিমেয় অধিবাসী লইয়া পূর্ব্ব স্মৃতি রক্ষা করিতেছে দেখিতে পাই। সুবৃহৎ সৌধ-গুলির পতিত ইষ্টকস্তূপ বনাকীর্ণ-পল্লীর মধ্যে অট্টহাস্ত করিয়া এক্ষণে সেই একদা-জনবহুল-পল্লী-স্মৃতির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে মাত্র।

তাহার পর উলা বা বীরনগর ধ্বংস

করিয়া, ম্যালেরিয়া সমগ্র নদীয়ায় বিস্তৃত হইয়া পড়িল,—অনেকগুলি গ্রাম ইহার করাল-গ্রাসে উৎসন্ন-প্রায় হইল। তাহার পর, মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করিয়া, রাজসাহি, দিনাজপুর, বগুড়া, রংপুর প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের প্রায় সকল জেলাই অধিকার পূর্ব্বক ইহার স্বভাব সিদ্ধ প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। এদিকে পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশপরগণা, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর বীরভূম প্রভৃতিও ইহার প্রভাবে অক্ষুণ্ণ রহিল না,—এক কথায় একে একে সমগ্র বঙ্গদেশ ম্যালেরিয়ার লীলাভূমি হইয়া পড়িল। উলা এবং বীরনগরের পর রংপুর, দিনাজপুর এবং জলপাইগুড়ির অবস্থা ইহার আক্রমণে যেরূপ শোচনীয় হইয়াছে, এরূপ আর বাঙ্গালার কোন জেলা হয় নাই। এখন কিন্তু সে কয়েকটি জেলা অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া, যশোহর, খুলনা, হুগলি, বর্দ্ধমান এবং ২৪ পরগণা প্রভৃতির অবস্থাই অধিক শোচনীয়। সর্ব্বাপেক্ষা গঙ্গার তীরবর্ত্তী স্থানগুলির উপর ইহার অনুগ্রহটা যেন অধিক বলিয়া মনে হয়। গঙ্গাতীরবর্ত্তী নদীয়ার শান্তিপুর এবং গঙ্গার শাখা চূর্ণী, নদীর তীরবর্ত্তী রাণাঘাটের কথা আমরা ভালরূপই বলিতে পারি,—গত কয়েক বৎসরে শান্তিপুর এবং রাণাঘাটের মত ম্যালেরিয়ার ভীষণ আক্রমণ এতদ্দেশীয় অনেক পল্লীই সহ্য করিয়াছে কি না সন্দেহ।

বঙ্গে ম্যালেরিয়া ছিল না, কি করিয়া যে ইহার আবির্ভাব হইল, সে সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন। ফলে দেশের জল বায়ু দূষিত হওয়াই ইহার আবির্ভাবের যে কারণ, সে পক্ষে সন্দেহ মাত্র নাই। বাঙ্গালার পল্লীগুলির অধিকাংশ স্থানই এখন পঙ্কিল-খাল-ডোবায় পূর্ণ হইয়াছে। সে কালের মত ধনীর অর্থ এখন আর পুষ্করিণী-দীর্ঘিকা-প্রতিষ্ঠা বা নষ্টপ্রায়-জলাশয় গুলির সংস্কার-কার্য্যে ব্যয়িত হয়না। ফলে দূষিত জল ব্যবহারই যে অনেক পল্লীর ম্যালেরিয়া ভোগের কারণ, তাহা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে। আমরা এমন অনেক পল্লীর কথা অবগত আছি, যে সকল পল্লীতে আদৌ কোনরূপ জলাশয় নাই, বৃষ্টির ধারাপূর্ণ ডোবা বা গর্ত্তের জলেই বর্ষা কালে সেই সকল পল্লীর অধিবাসীগণের স্নান-পানাদি সকল কার্য্য সিদ্ধ হয়, অন্য সময় অর্দ্ধ ক্রোশ—কোন কোন স্থলে তাহারও অধিক দূরবর্ত্তী স্থান হইতে জল আনয়ন পূর্ব্বক সেই সকল পল্লীর আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পন্ন করা হয়। এই জলকষ্ট বাঙ্গালার শুধু ম্যালেরিয়া-বিস্তৃতির কারণ নহে, দেশে ওলাউঠা-উদারাময় প্রভৃতি রোগ-বৃদ্ধিও এই জল কষ্টের হেতুভূত। মালদহ জেলায় প্রতি বৎসর ওলাউঠায় অনেক লোকের মৃত্যু হইয়া থাকে, সে জেলার জলকষ্টই ইহার কারণ বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি।

শুধু জল কষ্ট নহে, বাঙ্গালার পল্লী গুলি এখন বন-বহুলও হইয়া পড়িয়াছে। ফলে এই বন-বিটপী সকল হইতে ম্যালেরিয়ার প্রকৃষ্ট বীজ মশকের উৎপত্তির আধিক্য হইয়া থাকে। সেকালে পল্লীবাসীর কেহ পাথুরিয়া কয়লার জ্বালে রন্ধন-কার্য্য করিতেন, পাথুরিয়া কয়লার আমদানি ত তখন হয় নাই—বন-বিটপী সকলই তখনকার দিনে পল্লীবাসীর ইন্ধনের কার্য্য সিদ্ধ করিত। কাজেই হেলায়-শ্রদ্ধায় তখন পল্লীগ্রামের জঙ্গল গুলি নষ্ট হইয়া পড়িত। এ ছাড়া—সে কালের পল্লী-মাতার সুসন্তানগণ পিতৃপুরুষের কর্ম্মণ্য সকল বজায় রাখিবার জন্য সুমতি পরায়ণ ছিলেন, তাহারা ফলে

বাঙ্গালার পল্লী গুলিতে বার মাসে তের পার্ব্বন হইত, বিশেষতঃ শারদীয় পূজার সময়ে পল্লী মাতার সজ্জা-সম্ভার দেখিয়া দিগ্বধূগণ হাসিয়া উঠিত। সে সজ্জা-সম্ভার বলিতে শুধু সৌধ-প্রাসাদের শোভা-বৃদ্ধি বুঝাইতনা,—অভিনব পরিচ্ছদে পরিবার-পরিজনের সম্পদ-বর্দ্ধনের অনুষ্ঠান বুঝাইত না,—সে সকল ব্যবস্থা যে, সেকালে ছিল না—এমন নহে, সে সকল ব্যবস্থা ত ছিলই, কিন্তু তাহা ভিন্ন পূজা অন্তে—প্রতিমা বিসর্জ্জন উপলক্ষে—প্রতিমা লইয়া যে পল্লী-পরিভ্রমণের ব্যবস্থা ছিল,—তাহারই জন্য পল্লীর বন-জঙ্গল গুলি বাধ্য হইয়া পরিষ্কার করান হইত—প্রতিমা লইয়া পরিভ্রমণ কালে বন-জঙ্গল থাকিলে প্রতিমা ভাঙ্গিয়া যাইবে,—এই আশঙ্কা করিয়াই পল্লী-পথগুলির বন কাটানর ব্যবস্থা করা হইত। ফলে যে কারণেই হউক, এ কালের মত সে কালে বাঙ্গালার পল্লীগুলি বন-বহুল ছিল না। এই সকল ব্যবস্থা যে সময় হইতে দেশে লুপ্ত হইয়াছে, সেই সময় হইতে বাঙ্গালা দেশ ম্যালেরিয়া-প্রবণ হইয়া পড়িয়াছে।

পয়ঃপ্রণালীর অভাব বাঙ্গালার পল্লী ধ্বংসের আর একটি কারণ। পল্লী-ভূমির যে সকল বড় বড় স্থানে পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে; সে সকল স্থানের অধিকাংশ স্থলে জল-নিকাশের ব্যবস্থা নাই, কাজেই সে সকল স্থানে শুষ্ক বৃক্ষপত্র প্রভৃতি পচিয়া তদ্দ্বারা স্বাস্থ্যোন্নতির অন্তরায় ঘটাইতেছে। যে সকল পল্লী মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্নিহিত নহে, সে সকল পল্লীতে ত পয়ঃপ্রণালীর কোনরূপ ব্যবস্থাই নাই। ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, কিন্তু বিশুদ্ধ জল-সংস্থান এবং বন-জঙ্গল পরিষ্কারের মত এটিরও ব্যবস্থা না করিলে চলিবেনা।

গঙ্গার তীরবর্ত্তী পল্লীগুলির উপর ম্যালেরিয়ার আক্রমণ যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়াছি, তাহার প্রধান কারণ—বাঙ্গালায় রেল-বিস্তার। এই রেল-বিস্তারের ফলে যে সকল স্থলে গঙ্গা বা তাহার শাখা নদীগুলির উপর রেলকোম্পানী সেতু-বন্ধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেই সকল স্থলেই ইহার প্রভাবাধিক্য পরিলক্ষিত হয়। দৃষ্টান্তস্থলে আমরা হাওড়া, হুগলি এবং সারা ঘাট অঞ্চলের কথা উল্লেখ করিতে পারি। এই রেল-বিস্তৃতির ফলে নদী সকল যে স্বল্পতোয়া হইয়া পড়িতেছে,—নদীজলে 'পলি' পড়িয়া জলের অবিশুদ্ধ স্রোতঃ সকল নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে, তাহারই ফলে ম্যালেরিয়া-বিষের উৎপত্তি আরম্ভ হইয়া, নদী পার্শ্বস্থ পল্লীগুলি ম্যালেরিয়া-প্রবণ হইতেছে। ইহার প্রতীকারের উপায় আমাদের ক্ষমতার বহির্ভূত। পতিত 'পলি'গুলি তুলিয়া ফেলিয়া, স্বল্পতোয়া নদীগুলির স্রোতঃ-বাহুল্যের ব্যবস্থা করিতে হইলে, বঙ্গীয় সেনেটারি বিভাগকে সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। তাঁহাদিগের সকরুণ দৃষ্টি পতিত না হইলে ইহার প্রতীকারের উপায় নাই।

আমাদের মহামান্য গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর অবশ্য আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার চিন্তায় উদাসীন নহেন। মিউনিসিপ্যালিটি,জেলাবোর্ড,লোকাল-বোর্ড প্রভৃতি স্বায়ত্ব শাসনের ব্যবস্থা এই জন্যই গবর্ণমেণ্ট প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। প্রতি বৎসর রাশি রাশি অর্থও এজন্য ব্যয়িত করার ব্যবস্থা আছে। সংপ্রতি গত ১৯১৬ সালের ভারত গবর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য-বিভাগের কার্য্য-বিবরণী যাহা বাহির হইয়াছে, তাহাতে প্রকাশ, আলোচ্য বর্ষে বাঙ্গালা দেশে মোট ১১১টি মিউনিসিপ্যালিটির ৮৮, ৬০৩, ৬০২

টাকা আয়ের শত করা ৩৭, ১৮ ভাগ স্বাস্থ্যোন্নতি কার্য্যে ব্যয়িত করা হইয়াছিল। ১৯১৫। ১৬ খৃঃ অব্দে রিজার্ভ সেনেটারি কার্য্যে ৩ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়; এবং ২,৯৯,৫৬৮ টাকা ব্যয়িত করা হয়। মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড প্রভৃতি দ্বারা সংগৃহীত ২২, ৯২, ৪২৯ টাকা স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ব্যয় করা হয়। এই রিপোর্টে প্রকাশ, পল্লী গ্রামের জঙ্গল পরিষ্কার. পুরাতন জলাশয়ের সংস্কার-সাধন, ড্রেণ্-পরিষ্কার প্রভৃতি কার্য্যের জন্য আলোচ্য বর্ষে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হইয়াছিল।

যাহাহউক আমাদের সদাশয় গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর যে আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতি কল্পে বিশেষ রূপ মনোযোগী সে পক্ষে সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে উত্তরোত্তর যেরূপ ম্যালেরিয়া বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে, তাহাতে এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট যে টাকা ব্যয় করিতেছেন, তাহাপেক্ষা আরও অধিক ব্যয়িত হওয়া আবশ্যক বলিয়া আমরা মনে করিতেছি। আমাদের নিজেদেরও ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টাশীল হইতে হইবে। সে চেষ্টাশীল হইতে হইলে, কিন্তু কিছু অর্থব্যয়ের আবশ্যক। পল্লী-সংস্কারের জন্য জেলাবোর্ড বা লোকালবোর্ড গুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া শুধু বসিয়া থাকিলে চলিবেনা, যাহা পার, সাধ্যমত গ্রাম্য চাঁদা তুলিয়া, তাঁহাদিগের হস্তে প্রদান পূর্ব্বক পুরাতন পুষ্করিণীর সংস্কার করাইবার জন্য,—জঙ্গল-পরিষ্কার করাইবার জন্য,—রাস্তা গুলি সুসংস্কৃত করিবার জন্য তাঁহাদিগের করুণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে, তবেই দেশ হইতে ম্যালেরিয়া হ্রাস পাইতে পারিবে।

গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে পল্লীবাসীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য জলাশয়ের সংস্কার,—বন পরিষ্কার প্রভৃতির প্রতি মনোযোগ প্রদান করিয়াই শুধু নিশ্চিন্ত নহেন, প্রতি বৎসর নানা পল্লীতে চিকিৎসক প্রেরণপূর্ব্বক যথেষ্ট পরিমাণে কুইনাইন-বিতরণেরও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এজন্য গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর আমাদিগের নিকট নিশ্চয়ই ধন্যবাদার্হ এবং তাহার জন্য আমরা তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ সন্দেহ নাই;—কিন্তু আমাদের মনে হয়,—আমরা ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যদি এ সময় আয়ুর্ব্বেদীয় ব্যবস্থার অনুসরণ করি, তাহা হইলে তাহা আমাদের পক্ষে অধিকতর শুভজনক হইতে পারে। প্রত্যহ একটু-একটু তুলসীর রস বা সিউলির পাতার রস সেবন করা—এ সময় মন্দ ব্যবস্থা নহে। অবস্থায় কুলাইলে সপ্তাহে ২।৩ দিন একটু-একটু "মকরধ্বজের" সহিত ঐ দুইটি দ্রব্যের যে কোনটি ব্যবহার করিলে আরও উপকারের সম্ভাবনা। কুইনাইন-ব্যবহারে ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে আপাততঃ রক্ষা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু উহার অপব্যবহারে পরিণামে দেহ-মন্দির নানারূপ ব্যাধির আকর ভূমি হইয়া থাকে; কিন্তু আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধে সে আশঙ্কা একেবারেই নাই, বিশেষতঃ তুলসীর রস—বায়ু এবং কফ ধাতুকে নষ্ট করিয়া থাকে বলিয়া ইহা সেবনে অন্যান্য অনেক রোগের আক্রমণ হইতেও রক্ষা পাওয়া যায়। সিউলি বা সেফালিকা পত্রের রস কটু ও তিক্ত এবং উষ্ণবীর্য্য, এজন্য ইহা জ্বরনাশক বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে কথিত। ম্যালেরিয়া-প্রবণ-দেশের অধিবাসীগণকে এ দুইটি দ্রব্যের যে কোনটি বা ঐ দুইটি দ্রব্যের এক বেলা একটু

অপর বেলা আর একটি সেবন করিবার জন্য আমরা পরামর্শ প্রদান করিতেছি।

ম্যালেরিয়া আরম্ভের সময় বর্ষার অন্তকাল। বর্ষা ঋতুতে দেহে শীতাধিক্য ও পিত্ত সঞ্চিত হয়। এই ঋতুর অন্তকালে ঐ সঞ্চিত পিত্ত সহসা প্রখর-মার্ত্তণ্ড-কিরণ পাইয়া প্রকুপিত হইয়া থাকে। এজন্য এ সময় তিক্ত-দ্রব্য আহার করিলে এবং যাহাতে নিত্য কোষ্ঠশুদ্ধি থাকে, তাহার জন্য রাত্রে শয়ন-কালে সপ্তাহে ২।৩ দিন অর্দ্ধ তোলা হরিতকী চূর্ণ, অর্দ্ধ তোলা চিনি এবং এক ছটাক গরম জল একত্র মিশাইয়া পান পূর্ব্বক কোষ্ঠ-পরিষ্কারের ব্যবস্থা করিলে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

পল্লীর অনেক ব্যক্তিকে দেখিতে পাই, ইঁহারা ক্রমাগত ভুগিয়া-ভুগিয়া এরূপই সহনশীল হইয়া পড়িয়াছেন যে, অনেক সময় তাঁহাদের নিকট ম্যালেরিয়া রোগটি যেন উপেক্ষার বিষয় হইয়া পড়ে। জ্বর হইল—পড়িয়া থাকিলেন, জ্বর ছাড়িল—কুইনাইন সেবন করিলেন,—অনেক ক্ষেত্রে ইহাই হইয়াছে—তাঁহাদিগের ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা হইতেই ত দেশের সর্ব্বনাশ হইতেছে। এইরূপ ভাবে ভুগিয়া-ভুগিয়া ক্রমশঃ জীবনীশক্তি ক্ষয় হইয়া পড়িতেছে। ম্যালেরিয়া কথনই উপেক্ষনীয় নহে, যাহাতে ম্যালেরিয়া-বিষে শরীর আক্রান্ত হইতে না পারে—প্রথমতঃ তাহাই করা কর্ত্তব্য, সেরূপ চেষ্টা করিয়াও যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে ম্যালেরিয়া-বিষ শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইবা-মাত্র সুচিকিৎসা দ্বারা নিরাময় হইবার চেষ্টা করা উচিত। রোগ মাত্রই উপেক্ষণীয় নহে। শাস্ত্রকার এ সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন,—

"জাতমাত্রশ্চিকিৎস্যঃ স্যান্নোপেক্ষ্যোঽল্পতয়া গদ।
বহ্নিশত্রু বিষৈস্তুল্য স্বল্পোঽপি বিকরোত্যসৌ॥"

অর্থাৎ—রোগ উৎপত্তি হইবামাত্র চিকিৎসা করাইবে, সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করিবেনা, কারণ সামান্য ব্যাধিও অগ্নি, শত্রু ও বিষের ন্যায় অল্প পরিমিত হইয়াও বিশেষ অনিষ্ট উৎপাদন করে।

আমরা সময়ান্তরে এ সম্বন্ধে আরও আলোচনা করিব ইচ্ছা রহিল।

পশ্বায়ুর্ব্বেদ।

বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ ও গবায়ুর্ব্বেদ।

সেকালে কেবল মানুষের জন্যই "আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র" উদ্ভাবিত হয় নাই। আর্য্যঋষিগণ পশু, পক্ষী, বৃক্ষ-লতা প্রভৃতির জন্যও "আয়ুর্ব্বেদ রচনা করিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতে যে পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যার যুগপৎ সাধনা চলিয়াছিল, আমাদের মধ্যে অনেকেই তাহা জানেন না।

বিশ্ব বিশ্রুত কীর্ত্তি—মহাত্মা জগদীশ চন্দ্র

বসু * উদ্ভিদের প্রাণ-সত্তা সপ্রমাণ করিয়া, বিজ্ঞান-বাহন য়ুরোপকেও আজ যে বিস্মিত করিয়াছেন, বহুযুগ পূর্ব্বে আর্য্যঋষিগণও এ উদ্ভিদ-রহস্য অবগত ছিলেন। মনু বলিয়াছেন—

"অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখ দুঃখ সমন্বিতাঃ"

অর্থাৎ বৃক্ষাদিরও অন্তঃসংজ্ঞা আছে, তাহারাও সুখ-দুঃখ-অনুভব করিতে পারে। এইজন্যই আর্য্য-শাস্ত্রে বৃক্ষাদির শ্রাদ্ধ-তর্পণের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকগুলি বৃক্ষকেই ঋষিগণ দেবতার আসনে বসাইয়া পূজা করিয়া গিয়াছেন। উদ্ভিদের পালন, বর্দ্ধন, রোগনির্ণয় ও তাহার প্রতিকারের জন্য, "বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ" রচিত হইয়াছিল। "শার্ঙ্গ-ধর পদ্ধতি" "কেদারকল্প" "কৃষি পরাশর" প্রভৃতি গ্রন্থে আপনারা—"বৃক্ষায়ুর্ব্বেদের" আভাষ পাইবেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আপনাদের কাছে আমি "পশ্বায়ুর্ব্বেদের" পরিচয় প্রদান করিব।

গো, অশ্ব ও হস্তী—মানবের কর্ম্মক্ষেত্রে এই তিনটী পশুর উপযোগিতা বড় বেশী। প্রাচীন ভারতে এই তিন শ্রেণীর পশুর যথেষ্ট সমাদর ছিল। ঋষিগণ—এই তিন শ্রেণীর পশুর জন্য "চিকিৎসা-বিধি" প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রাচীনকালের গো-চিকিৎসা বিষয়ক কোনও গ্রন্থই আমরা এ পর্য্যন্ত সন্ধান করিতে পারি নাই। কেবল "অগ্নিপুরাণ" প্রভৃতি পুরাণে—গো-চিকিৎসা সম্বন্ধে দুই চারিটী উপদেশ লিপিবদ্ধ আছে। মহাভারত পড়িলে আমরা জানিতে পারি,—পঞ্চম পাণ্ডব সহদেব একজন প্রসিদ্ধ "গো-বৈদ্য" ছিলেন। সহদেব যে গো-চিকিৎসা বিষয়ক কোন গ্রন্থই রচনা করেন নাই, এ কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয়না। আমাদের ধারণা, পুরাকালে গো-চিকিৎসার জন্য "গবায়ুর্ব্বেদও" রচিত হইয়াছিল, অবহেলায় তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। গো-জাতির উন্নতি ও অবনতির সহিত ভারতের উন্নতি-অবনতির অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। "গো-পালন" একদিন আর্য্যজাতির প্রধান ধর্ম্ম ছিল। গো-বৃষ,—ঋষি রচিত-পুণ্য-সংসারে-গার্হস্থ্য ধর্ম্মের অনেক সাহায্য করিত, তাই ভারতবাসী একদিন গো-জাতিকে দেবতার যজ্ঞভাগ সমর্পণ করিয়াছিলেন। এখনও পিতৃকার্য্যে "বৃষোৎসর্গ" আভিজাত্য-প্রকাশে "গোত্রের" উল্লেখ, দূর্ব্বা-চন্দনে "হোমধেনুর" আমন্ত্রণ—ভারতে গো-জাতির প্রতি শ্রদ্ধারই পরিচয় দিয়া আসিতেছে! জানিনা, কোন্ মহাপাপে —"গো-দ্যুলোক প্রতিষ্ঠিতঃ" এই মহতীবাণীর মর্য্যাদা এদেশে নষ্ট হইয়া গিয়াছে! যাহাদের পূর্ব্ব পুরুষ একদিন গো-চিকিৎসায় আত্মনিয়োগ করিয়া, ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, সেই বংশের বংশধর আজ গো-বৈদ্যকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে। গো-চিকিৎসা এখন হেয়তর নীচ কার্য্য। পূর্ব্বে অনেক ব্রাহ্মণ—গোরুর চিকিৎসা

---

* ডাক্তার সার জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার রচিত "প্ল্যাণ্টরেস্‌পন্স" নামক পুস্তকের ভূমিকার মধ্যভাগে এবং উপসংহারে বলিয়াছেন, "বৃক্ষের নানাবিধ গতিবিধি, পরিপাক বৃদ্ধি ইত্যাদি কার্য্য ঘাত-প্রতিঘাত-জনিত শক্তি দ্বারা সম্পন্ন হয়, ঐ সমস্ত কার্য্য জীবনী-শক্তির দ্বারা পরিচালিত নহে,—ইহার জন্য একটা অতীন্দ্রিয় জীবনীশক্তির প্রয়োজন হয় না।" যাহা হউক এই প্রবন্ধের লেখকের সহিত আমাদের মতানৈক্য নাই।
আঃ সং

করিতেন। চিকিৎসা করিতে গিয়া—গো-বধ করিয়া ফেলিলেও চিকিৎসাকারী প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতেন না। স্মৃতিশাস্ত্রে ইহার প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়।

দাহচ্ছেদং শিরাবেধং প্রযত্নৈরুপকুর্ব্বতাং।
দ্বিজানাং গো হিতার্থায় প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে।
যন্ত্রেণ গো.চিকিৎসায়াং মূঢ়গর্ভ বিদারণে।
যদি কার্য্যে বিপত্তিঃ স্যাৎ প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে॥

পূর্ব্বোক্ত শ্লোক দুইটী পাঠ করিলে ইহাও বুঝিতে পারা যায়—প্রাচীন আর্য্যগণ গাভীর হিতের জন্য অতি যত্নের সহিত গো-শরীরে অস্ত্রাদি প্রয়োগ করিতেন।

অশ্বায়ুর্ব্বেদ।

প্রাচীন কালে "শালিহোত্র" নামে এক জন ঋষি ছিলেন। ইনি একজন অদ্বিতীয় "অশ্ববৈদ্য" বলিয়া তৎকালে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। "শালিহোত্র" প্রণীত অশ্ব-চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ এখনও লুপ্ত হইয়া যায় নাই। প্রয়োজন মত কেহ কেহ এই বিশাল গ্রন্থের দুই একটী অধ্যায় মুদ্রিত করিয়াছেন। শীঘ্রই ইহার পূর্ণাবয়বে প্রকাশ বাঞ্ছনীয়।

বৈদ্য-কুলতিলক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন, "বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটি" হইতে দুই খানি দুষ্প্রাপ্য অশ্বচিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ সম্প্রতি মুদ্রিত করিয়াছেন। ইহার একখানি চতুর্থ পাণ্ডব শ্রীমৎ নকুল রচিত, অপর খানির নাম—"অশ্ব বৈদ্যক।" এই গ্রন্থের রচয়িতার নাম—জয়দত্ত। নকুল যে একজন অশ্ব চিকিৎসক ছিলেন, একথা বোধ হয় প্রত্যেক হিন্দুই শুনিয়া থাকিবেন। সুতরাং নকুল রচিত অশ্ব-শাস্ত্রের পাণ্ডুলিপি প্রচার করিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয় এদেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। এজন্য ভারতবাসী মাত্রেই উমেশ বাবুর কাছে কৃতজ্ঞ। এই গ্রন্থে বিদ্যারত্ন মহাশয় একটী বিস্তৃত সূচী সংযোজিত করিয়াছেন। এই সূচী—তাঁহার অপরাঙ্মুখ অনুসন্ধানের অবিনশ্বর উদাহরণ। সহৃদয়তা, অন্তর্দৃষ্টি, বহু-অধ্যয়ন, উদারতা, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য ও লিপি-কুশলতা—সাহিত্য জগতে উমেশচন্দ্র এই সকল গুণের অধিকারী। তাঁহার এই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অনুশীলন জাত সূচী পত্রে আমরা অনেক জটিল-দুর্ব্বোধ্য গুরুতর সমস্যার মীমাংসা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। তাঁহার সাধনা, তাঁহার সত্যনিষ্ঠা, তাঁহার অতীতের প্রতি অনুরাগ, তাঁহার মৌলিক গবেষণা শক্তি—সমগ্র বাঙ্গালীর আদর্শ। দুঃখের বিষয়—এরূপ অক্লান্ত শ্রম ও অটুট অধ্যবসায়ের যথার্থ মূল্য—এদেশ এখনও বুঝিতে পারে নাই।

প্রাচীন ভারতে অশ্ব-চিকিৎসার অত্যন্ত প্রচলন ছিল। অশ্ব চিকিৎসা বিষয়ক অনেক গুলি গ্রন্থের আমরা নামোল্লেখ দেখিতে পাই। ভবিষ্যতে পৃথক্ প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিব।

বিদর্ভাধিপতি নল—অশ্বতত্ত্বে অভিজ্ঞ ছিলেন। অশ্বের প্রতিপালন সম্বন্ধে তিনি অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতে অশ্ব-চিকিৎসার কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল, তাহা জানিবার জন্য আমরা পাঠকগণকে উমেশ বাবু কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তক দুই খানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

ইতঃপূর্ব্বে, "জন্মভূমি" পত্রে—বৌদ্ধযুগের অশ্ব চিকিৎসা সম্বন্ধীয় একটী প্রবন্ধ বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল। তাহাতে

অশ্ব রোগের অনেকগুলি মুষ্টিযোগও উদ্ধৃত হইয়াছিল।

গজায়ুর্ব্বেদ।

ভারতে "গজায়ুর্ব্বেদের"ও প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। হস্তী-চিকিৎসার অনেক গুলি পুস্তকও রচিত হইয়াছিল। "অগ্নি-পুরাণে"—একটী শ্লোক দেখিতে পাই—

পালকাপ্যোঽঙ্গ রাজায় গজায়ুর্ব্বেদ মব্রবীৎ।
শালিহোত্রঃ সুশ্রুতায় হয়ায়ুর্ব্বেদ মুক্তবান্॥

ইহাতে আমরা বুঝিতে পারি, "পালকাপ্য" নামক ঋষি অঙ্গাধিপতি লোমপাদকে গজায়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়াছিলেন, আর মহর্ষি শালিহোত্র সুশ্রুতের নিকট "হয়ায়ুর্ব্বেদ" কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শালিহোত্রের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইনিই "অশ্বায়ুর্ব্বেদের" প্রথম প্রচারক, কিন্তু ইঁহার উপদেশ-শ্রোতা 'সুশ্রুত' আর—সংহিতাকার "সুশ্রুত"—একই ব্যক্তি কিনা, তাহা বলা যায়না। আপাততঃ এ সকল তর্কে প্রয়োজন ও নাই। এখন "গজায়ুর্ব্বেদের" কথাই বলি।

"পালকাপ্য"—প্রাচীন ঋষি।—রামায়ণ পাঠে আমরা জানিতে পারি "অঙ্গাধিপতি"—লোমপাদ, রাজা দশরথের পরমাত্মার ও বন্ধু ছিলেন। অযোধ্যানাথ দশরথ নিজ কন্যা "শান্তা"কে লোমপাদের হস্তে "দত্রিমা" রূপে সমর্পণ করেন। রাজা লোমপাদ—বিভাণ্ডক মুনির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত শান্তার বিবাহ দেন। দশরথ—চতুর্বিংশ ত্রেতাযুগে ধরণীতে আবির্ভূত হন। এ সম্বন্ধে মৎস্য পুরাণের প্রমাণ,—

"চতুর্ব্বিংশে যুগে রামো বশিষ্ঠেন পুরোধসা।
সপ্তমো রাবণস্যার্থে জজ্ঞে দশরথাত্মজঃ॥"

এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিলে বলিতে হয়—"পালকাপ্য" দশরথের সমসাময়িক। কেননা দশরথ-সুহৃদ্ অঙ্গাধিপ লোমপাদকেই তিনি গজায়ুর্ব্বেদ শুনাইয়া ছিলেন। এতদ্দ্বারা আমরা পালকাপ্য প্রণীত "গজায়ুর্ব্বেদের" প্রাচীনত্বের নির্দ্দেশ করিতেছি।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত মহেন্দ্র নাথ রায় বিদ্যানিধি যখন "অনুশীলন" নামক সাময়িক পত্রের সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন, তখন সময়ে সময়ে আমি তাহাতে দুই একটী কবিতা লিখিতাম। সেই সূত্রে পণ্ডিত মহাশয় আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, কলিকাতায় যাইলে আমিও তাঁহার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ করিতাম। ক্রমে তাঁহার উদারতায় আমাদের মুখের আলাপ ঘনিষ্টতায় পরিণত হয়। বিদ্যানিধি মহাশয়ের মধ্যস্থতায়—স্বর্গীয় মহাত্মা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে—"সাহিত্যসভার" এক বিশেষ অধিবেশনে, আমি এক মহাপুরুষের কাছে পরিচিত হই। তিনি সুসঙ্গের অধিপতি। আজ তিনি স্বর্গে—এ মর্ত্ত্যের মাটীর কথা বোধ হয় তাঁহার মনে নাই, আমি কিন্তু এখনও সেই চরিত্র-মাধুর্য্যের অপরাজিত বীরকে অন্তরে অন্তরে পূজা করি। সুসঙ্গাধিপতি একদিন আমায় নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাসাদ তুল্য ভবনে—আমি সর্ব্ব প্রথম পালকাপ্যের "গজায়ুর্ব্বেদ" চক্ষে দেখিয়া জীবন ধন্য করিয়াছিলাম। পুস্তকখানি মুদ্রিত ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে—পুণার "আনন্দাশ্রম" হইতে শ্রীযুক্ত মহাদেব চিমনজী আপ্তে মহোদয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মহারাজ যত্নের সহিত পুস্তকখানি আমায় দেখাইয়াছিলেন এবং আমাকে তাহার বঙ্গানুবাদ করিবার জন্য অনুমতি দিয়াছিলেন।

অনুবাদ আরম্ভ ও হইয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য—আরব্ধ কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়াই কালের ইঙ্গিতে মহারাজ পৃথিবীর পান্থশালা পরিত্যাগ করিলেন। মহারাজ পশু-চিকিৎসা বিষয়ক অনেকগুলি দুর্লভ গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল—একে একে সেগুলি মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে সাধারণ্যে প্রচার করিবেন। হায়! তাঁহার সেই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, রাবণের স্বর্গ-সোপান-নির্ম্মাণের কল্পনার মত চিরদিন ব্যর্থ হইয়াই রহিল!!

দেবানাং প্রিয়দর্শী রাজা অশোক পশুর জন্য হাঁসপাতালের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহার আমলে—ভারতে পশু-চিকিৎসার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। এখনও ভগ্ন প্রস্তর-স্তম্ভে, শিলাপট্টে, তাম্রশাসনে,—ইতর জীবের প্রতি অশোকের অসীম করুণার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাজ সুসঙ্গ—সেই বৌদ্ধ সম্রাট অশোকের মতই—"অহিংসা পরম ধর্ম্মের" মর্য্যাদা রক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্কল্প ছিল—ভারতে আবার পশ্বায়ুর্ব্বেদের প্রবর্ত্তন করা। মহারাজের পিতৃব্য ৺রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ "গো-পালন" ও "অশ্বতত্ত্ব" নামক দুইখানি পুস্তক প্রচার করিয়াছিলেন। এই পুস্তকদ্বয়ের রচনা-কৌশলের মধ্যে মহারাজেরও দুইখানি সুনিপুণ হস্তের সন্ধান পাওয়া যায়। কলিকাতার উদ্দেশ্য-হীন কোলাহল, নিরানন্দ ধূমময় আকাশ এবং হৃদয় শূন্য সমাজের মধ্যে থাকিয়াও মহারাজ পশু-রক্ষার কথা ভুলেন নাই।

মহারাজের গ্রন্থাগারে—আর একখানি হস্তি-চিকিৎসার পুস্তক দেখিয়াছিলাম। সেখানি মাদ্রাজের ত্রিবেন্দ্রম্ নগর হইতে প্রকাশিত। তাহাতে হস্তী চিকিৎসা বিষয়ক অনেকগুলি গ্রন্থের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—"করি-কৌতুকসার" "মাতঙ্গদর্পণ" "মাতঙ্গলীলা" "হস্তি-বিলাস" "গজেন্দ্র-চিন্তামণি"—ইত্যাদি। এই সকল পুস্তকের মধ্যে দুই একখানি মহারাজ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন—কিন্তু তাহা হস্ত লিখিত পাণ্ডু-লিপি। আশা করি মহারাজের কোনও যোগ্য বংশধর তাহা মুদ্রিত করিয়া মহারাজের স্মৃতি রক্ষার চেষ্টা করিবেন। *

"বারাহী-সংহিতা" "গর্গসংহিতা" "শার্ঙ্গধর পদ্ধতি" "বসন্তরাজ" "রাজবল্লভ" "জ্যোতির্নিবন্ধ" "ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ" "অগ্নিপুরাণ" "গরুড়পুরাণ" প্রভৃতি প্রাচীন পুস্তকে হস্তি-চিকিৎসার বহু বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক তাহা ঐ সকল গ্রন্থে দেখিয়া লইবেন। যুরোপে হস্তী জন্মেনা, সুতরাং পাশ্চাত্য ভাষায় রচিত হস্তি-চিকিৎসা বিষয়ক কোন গ্রন্থই দেখিতে পাওয়া যায় না। পাশ্চাত্য ভাষায় রচিত যে দুই একখানি গ্রন্থ আছে—তাহাও ভারতপ্রবাসী সাহেব কর্ত্তৃক লিখিত। তন্মধ্যে Gilchrist &c. Major Evans কৃত গ্রন্থই উল্লেখ যোগ্য। আরব্য ও পারস্য ভাষায় রচিত কতকগুলি হস্তি চিকিৎসার গ্রন্থ আছে, এই সকল গ্রন্থ সংস্কৃত সংহিতার অনেকটা অনুকরণেই লিখিত।

এইবার পালকাপ্য রচিত গজায়ুর্ব্বেদ

* মহারাজের যোগ্য বংশধর প্রিয়দর্শন ভূপেন্দ্র চন্দ্র এবার আই এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আমার ভরসা আছে—শ্রীমান্ নাম শেষ পিতৃদেবের রাজবংশের গৌরব অক্ষুণ্ন রাখিবেন।

নামক বিরাট গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

এই গ্রন্থ ১৬০টী অধ্যায় যুক্ত এবং "মহা-রোগ স্থান" "ক্ষুদ্র রোগ স্থান" "শল্যস্থান"ও "উত্তর স্থান"—এই চারিভাগে বিভক্ত। ইহার "মহারোগ স্থানে" ১৮টী, "ক্ষুদ্র রোগ স্থানে" ৭২টী, "শল্যস্থানে" ৫৪টী, এবং উত্তর স্থানে ৩৬টী অধ্যায় আছে। ইহার ভাষাও "চরক সুশ্রুতাদি" আয়ুর্ব্বেদ-সংহিতার ভাষার মত—গদ্য-পদ্যময়ী। সমগ্র গ্রন্থে দুই হাজারেরও বেশী শ্লোক নিবদ্ধ হইয়াছে। পালকাপ্যের মতে—হস্তীদেহে ৩১৫ প্রকার ব্যাধির আক্রমণে সম্ভাবনা। মহর্ষি—ধীর-গম্ভীরভাবে ৩১৫ প্রকার ব্যাধির নিদান ও চিকিৎসাবিধি বুঝাইয়া দিয়াছেন। "শল্য-স্থানে" পালকাপ্য, হস্তিদেহে প্রযোজ্য যে সকল শস্ত্র-যন্ত্রাদির বর্ণনা করিয়াছেন,—তাহা প্রায় "সুশ্রুত-সংহিতায়" বর্ণিত শস্ত্র-যন্ত্রাদির অনু-রূপ। ত্রিংশৎ অধ্যায়ে হস্তীর অবয়বাদির পার্থক্য এবং ছেদ্য, ভেদ্য, লেখ্য, বিস্রাবণীয়, বিদারণীয় এষ্য ও সীবনীয়াদি শস্ত্রোপচার লিখিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অবাক্ হইতে হয়। মহর্ষির রচনার নমুনা স্বরূপ—আমরা "গজায়ুর্ব্বেদের" একটী মাত্র অধ্যায় নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

অথোবাচ ভগবান্ পালকাপ্যঃ ইহ খলু ভো হস্তিনামাগন্তবো দোষসমুত্থাশ্চ ব্রণ-বিধয়ো বহুবিধা ভবন্তি। তেষাং দোষ-প্রশমনার্থং শস্ত্রবিধানং সংস্থানপ্রমাণতশ্চ বক্ষ্যামঃ।

তত্র কুণ্ঠং খরধারং বক্রং হ্রস্বমনতিস্থূলং দীর্ঘমানতং খণ্ডং বর্জ্জয়েৎ। গুণবদ্বিপরীতং ন চাতিনিশিতং শস্ত্রমবচারয়েৎ।

তত্র তীক্ষ্ণেণায়সা বিধিবন্নিষ্পন্নেন কুশল-কর্ম্মারঃ শস্ত্রাণি কুর্য্যাৎ। তদুত্তমেন হি দ্রব্যে-ণোত্তমেন চাচার্য্যেণ ক্রিয়য়া চোত্তময়া কৃতং শস্ত্রং কার্য্যং সাধয়েদিতি। তস্মাৎ প্রযত্নঃ কার্য্যঃ শস্ত্রাণামুত্তমানাং করণে।

তত্র শস্ত্রাণি দশ নাম সংস্থানানি ভবন্তি। তদ্ যথা,—বৃদ্ধি পত্রং, কুশপত্রম্, ব্রীহিমুখম্, মণ্ডলাগ্রম্, কুঠারাকৃতি, বৎসদন্তম্, উৎপল পত্রম্, শলাকা, সূচী, রম্প কশ্চেতি ফালজাম্ববতাপিকা দর্ব্যাকৃতয়শ্চেতি। এতান্যগ্নিকর্ম্মবিধানে চত্বারি চান্যানি শল্যোদ্ধরণানি। যথাযোগং সিংহ-দষ্ট্রং গোধামুখং কঙ্কমুখং কুলিশমুখঞ্চেতি। তিস্রএষিণ্যঃ। একবিংশতিরেব বা অয়ো ময়ানি সাধনানি ভবন্তি। তেষাং সংস্থানং প্রমাণং কর্ম্মাণি বক্ষ্যামঃ—তত্র দশাঙ্গুল প্রমাণং বৃদ্ধিপত্রং ষড়ঙ্গুল প্রমাণং বৃত্তং। চতুরঙ্গুল-প্রমাণং পত্রম্। ত্র্যঙ্গুল-বিস্তীর্ণং পাটনার্থং ছেদনার্থঞ্চেতি। ষড়ঙ্গুলবৃত্তমর্দ্ধা-ঙ্গুলং সর্ব্বতঃ। তৎ পূর্ণচন্দ্রাকৃতিরগ্রে মণ্ডলা-গ্রম্। লেখনার্থমক্ষো ব্রীহিমুখং। উৎপল পত্র-মষ্টাঙ্গুলমেবৈকম্। তচ্চাষ্টাঙ্গুলপ্রমাণং। অধ্য-র্দ্ধাঙ্গুলবিস্তৃতমুভয়তো ধারম্ (ব্রীহিমুখা-কৃতি ব্রীহিমুখং মুঞ্জভেদনার্থং ছেদনভেদানার্থ-ঞ্চেতি। নবাঙ্গুলং কুশপত্রং। পঞ্চাঙ্গুলং বৃত্তম্। চতুরঙ্গুলং পত্রং, অধ্যর্দ্ধাঙ্গুলবিস্তৃত-মুভয়তো ধারম্।) কুশপত্রাকৃতিগম্ভীর-পাকভেদনার্থং ষড়ঙ্গুলবৃত্তম্। অধ্যর্দ্ধাঙ্গুলং পত্রম্। পূর্ণচন্দ্রাকৃত্যগ্রমণ্ডলাগ্রম্। লেখনার্থ মক্ষো ব্রীহিমুখমুৎপলপত্রং ভেদনার্থং কুঠারাকৃতি কুর্য্যাৎ। কুঠারশস্ত্রং প্রচ্ছেদ-নার্থম্। বৎসদন্তাকৃতি বৎসদন্তং দশাঙ্গুলম্। একৈকমধ্যর্দ্ধাঙ্গুলমুখম্। এবমেতানি চ ত্রীণ্যপি যথাযোগং প্রচ্ছন্নার্থং, সূচী লেখনার্থং।

অষ্টাঙ্গুল, নাগদন্তাকৃতি ত্র্যস্রা চতুরস্রা বা দৃঢ়া সমাহিতা সমা বা শলাকা বনে বর্ত্ম বিধ্বত্যর্থম্। বল্পক স্ত্র্যঙ্গুল মুখো দশাঙ্গুল বৃত্তঃ পাদ শোধনার্থং নখচ্ছেদনার্থঞ্চেতি। এষণী দশাঙ্গুলা। বিংশত্যঙ্গুলা ত্রিংশদঙ্গুলা যথাযোগ মঞ্জন শলাকাকৃতিঃ শ্লক্ষ্ণা সমাচৈবমেতা স্তিস্র এষণঃ প্রমাণতঃ কার্য্যাঃ। কোরণ্টকপুষ্পাকৃতি মুখনেত্র তাম্রায়সং ষোড়শাঙ্গুল মনুপূর্ব্বং ব্রণানাং প্রক্ষালনং কুর্য্যাদ্ধড়িসং চক্রাগ্রমষ্টাঙ্গুলপ্রমাণমক্ষোঃ পটলোদ্ধরণার্থঞ্চেতি।

তত্র শ্লোকঃ—

যথাকাম্যেবমেতানি শস্ত্রাণি বিধিবদ্ ভিষক্।
কারয়িত্বা যথাযোগং কুর্য্যাদ্‌ব্রণবিদারণম্।

ইতি শ্রীপালকাপ্যে হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ মহা প্রবচনে তৃতীয়ে শল্যস্থানে ত্রিংশঃ শস্ত্র বিধিরধ্যায়।

পালকাপ্যের "গজায়ুর্ব্বেদ যে বিরাট আয়ুর্ব্বেদেরই এক অবিচ্ছিন্ন অংশ—ইহা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি। তিনি—সহানুভূতি পূর্ণ করুণ-হৃদয়ে—হস্তীর প্রত্যেক অঙ্গ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন, অস্ত্র-সাধ্য রোগে—শস্ত্র-প্রয়োগের কৌশলও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অস্ত্রচিকিৎসার জন্য হস্তীর নানাবিধ বন্ধন-ব্যাপার বর্ণনা করিয়াছেন, দন্তোৎপাটন, মূঢ়গর্ভ বিদারণ, কবল প্রদান, স্বেদকর্ম্ম, বস্তিকর্ম্ম, অগ্নিকর্ম্ম, ক্ষারকর্ম্ম, নস্য, ধূপ, অঞ্জন প্রভৃতি বিষয়েও বিশদ উপদেশ দিয়াছেন। হস্তিশালা নির্ম্মাণ, হস্তি পালন, অতি দক্ষতার সহিত বুঝাইয়াছেন। হস্তি-তত্ত্ব বিষয়ে এমন কোনও তথ্য নাই,—যাহা এই বিপুল কলেবর পুস্তকে পাওয়া যায় না। যুক্তিপূর্ণ মন্তব্যে ইহার এক একটী অধ্যায় যেন সজীব হইয়া উঠিয়াছে। পাঠকগণ পুণা হইতে আনাইয়া,—এই "গজায়ুর্ব্বেদ" একবার পাঠ করিয়া দেখিবেন, ইহাই আমার অনুরোধ।

গারুড় বিদ্যা।

"রারাতী সংহিতা"তে গৃহপালিত ছাগমেষাদি পশুর প্রকৃতি ও রোগ প্রতিকারার্থ সংক্ষেপে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

দয়াময় ঋষিগণ—কোনও জীবকেই উপেক্ষা করেন নাই। যে সকল পশু—রোগযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পাংশুস্তূপে পড়িয়া মৌন ভাষায় মৃত্যুকে আহ্বান করিত, আর্য্যঋষি তাহাদিগকেও ক্রোড়ে তুলিয়া সুধাসেচনে সঞ্জীবিত করিতেন। আকাশের বৃষ্টিধারার মত—সে করুণা স্থান-পাত্রের বিচার করিত না।

প্রচীন ভারতে গারুড়-বিদ্যারও প্রচুর উন্নতি হইয়াছিল। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—এসিয়াটিক সোসাইটীর গ্রন্থাগার হইতে একখানি অভিনব সংস্কৃত পুস্তক প্রচারিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থে শ্যেনপক্ষীপ্রতিপালন ও তদ্দ্বারা মৃগয়া-শিক্ষা প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। অধিকন্তু ইহাতে শ্যেন পক্ষীর রোগ ও তৎ প্রতিকারের উপায় বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের রচয়িতা—কমমুনাধিপতি শ্রীমদ্ রাজা রুদ্রদেব। শাস্ত্রী মহাশয় গ্রন্থের ভূমিকায় রুদ্র দেবের কাল নিরূপণের জন্য—অনেক চেষ্টা করিয়াছেন।

আয়ুর্ব্বেদের অনুশীলন—যাঁহাদের জীবন ব্রত, পশ্বায়ুর্ব্বেদের প্রতি আমি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। পশু-চিকিৎসা সম্বন্ধীয় প্রাচীন পুস্তক গুলির প্রচার ও তাহার বঙ্গানুবাদ সঙ্কলন, আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির এক অপরিহার্য্য অঙ্গ। অতএব, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের শক্তিশালী পরিচালকগণ—যদি আয়ুর্ব্বেদের সঙ্গে সঙ্গে পশ্বায়ুর্ব্বেদের ও অধ্য-

য়ন, অধ্যাপনা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে ভারতের ভবিষ্যৎ অকস্মাৎ স্বর্ণমণ্ডিত হইয়া উঠিবে।

আমার মত নগণ্য ব্যক্তির লিখিত—এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধ—যাঁহারা এতদূর পর্য্যন্ত দয়া করিয়া পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের অতি ধৈর্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া, অদ্য এইখানেই ইতি করিলাম। *

কবিরাজ শ্রীব্রজবল্লভ রায়
কাব্যতীর্থ, কাব্যকণ্ঠ যোগবিশারদ।

* যদিও আমাদের দেশে এখন গো-চিকিৎসার কোনও ধারাবাহিক নিবন্ধ সংগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি পুরাণে যাহা পাওয়া যায়—বর্ত্তমান ক্ষেত্রে—তাহাই যথেষ্ট। সেটুকু রক্ষা করাও কর্ত্তব্য। অযত্নেই আমাদের অনেক অমূল্য রত্ন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে হইলে পশ্বায়ুর্ব্বেদকেও রক্ষা করিতে হইবে। সুসঙ্গের মহারাজের মুখেই শুনিয়াছি—Colonel L. A Waddel নামক একজন বিদ্যোৎসাহী সমদর্শী ইংরাজ তিব্বতের লাসা নগরী হইতে সহস্রাধিক হস্তলিখিত (Mss) পুস্তক সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। সেগুলি লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসস্থিত পুস্তকাগারে রক্ষিত হইয়াছে। প্রকাশ—এই সকল পুঁথির অধিকাংশই আয়ুর্ব্বেদ সংহিতা। ইহার মধ্যে পশু চিকিৎসার কোনও গ্রন্থ আছে কিনা জানিনা। কালে এই সকল গ্রন্থ হইতে আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য প্রচারিত হইবে, কিন্তু আমরা সে গৌরবের ফলভাগী হইব কি না বলিতে পারি না।

তিল।

নামটী ঠিক মনে পড়িতেছেনা—সেদিন একখানি মাসিক পত্রে দেখিলাম, একজন লেখক তিল বিষয়ক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধের সূচনাতেই লেখক বলিয়াছেন, —"তিল ভারতবর্ষের জিনিষ নহে।" স্বীয় মত সমর্থনের জন্য লেখক দু' একটী প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন। কোন কোন য়ুরোপীয় উদ্ভিদ বেত্তার মত—তিল আফ্রিকা দেশ জাত শস্য,—আরবীয়গণ ভারতবর্ষে তিলের আমদানি করিয়াছিলেন।

বিদেশীরা যাহাই বলুন—কিন্তু আমাদের হিন্দু লেখক কোন্ প্রাণে বলিলেন—"তিল এদেশের জিনিষ নহে" ভারতের প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থে তিল শব্দের ভূরি প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। তিল না হইলে আর্য্য ঋষির দৈব কার্য্য, পিতৃ-কার্য্য—কোন কার্য্যই হইত না। আমরা যে "তৈল" ব্যবহার করি—সেই 'তৈল' শব্দই তিল হইতে উৎপন্ন। সর্ষপ, এরণ্ড, নারিকেল প্রভৃতি ফলের শস্য জাত স্নেহ মাত্রকেই আমরা 'তৈল' নামে অভিহিত করিয়া থাকি, পূর্ব্বে কিন্তু তিল জাত স্নেহকেই "তৈল" বলা হইত। পৃথিবীর প্রথম বিজ্ঞান আয়ুর্ব্বেদ, সেই আয়ুর্ব্বেদে তিলের এবং তিল জাত তৈলের আময়িক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের চর্ম্মোপরি তিলাকৃতি এক প্রকার চর্ম্মরোগ দেখিতে পাওয়া যায়—কনি-

বাজেরা তাহাকে "তিল কালক" বলেন! তিল কাষ্ঠের ক্ষার ঐ চর্ম্ম রোগের একমাত্র ঔষধ। তিলের প্রলেপে শূল রোগ ভাল হয়। তিলের কল্ক ছাগীদুগ্ধ সহ সেবনে—রক্তাতিসারের রক্ত বন্ধ হইয়া যায়। তিল বাটা নবনীত সহ স্বেদ দিলে অর্শরোগে বিশেষ উপকারী। আয়ুর্ব্বেদে এইরূপ অনেক রোগেই তিলের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যাওয়া যায়। তিল-তৈলের ত কথাই নাই। "গুড়ূচ্যাদি তৈল" "মধ্যম নারায়ণ তৈল" 'বিষ্ণু তৈল" প্রভৃতি সকল তৈলই তিল তৈল হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে ও তিল কাষ্ঠের জাল দিয়া কবিরাজ মহাশয়েরা "অভয়ালবণ" নামক প্লীহারোগের একটী মহৌষধ প্রস্তুত করেন। আর কত নাম কবিব? তিল যে ভারত জাত শস্য—এ কথার প্রমাণ আপনারা হিন্দুর বেদ, পুরাণ, কাব্য, স্মৃতি, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি নিখিল শাস্ত্র গ্রন্থেই দেখিতে পাইবেন। তথাপি যদি কেহ বলেন,—তিল আফ্রিকার শস্য, তাহা হইলে আমি বলিব—আগে ঋষিরা সমস্ত এসিয়াটাকেই ভারতবর্ষ বলিয়া ধরিতেন। তখনকার ভারত বিরাট-বিশাল-স্থান ছিল,—এখন ত্রিকোণাকৃতি ভারতের নাম "ইণ্ডিয়া"।

ভারতের ঋষিগণ বলেন,—তিল তিন প্রকার,—শ্বেত, কৃষ্ণ ও লোহিত। এই ত্রিবিধ তিলের মধ্যে কৃষ্ণ তিলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

স্নানের অল্পতা বুঝাইতে হইলে হিন্দুরা বলেন,—"তিল স্নানং।" প্রাচীন হিন্দুদের পাক রাজ্যেশ্বর প্রভৃতি পুস্তকে তিল হইতে উৎপন্ন অনেক প্রকার খাদ্য ও মিষ্টান্নের বর্ণনা আছে। "তিল পিষ্টক" "তিল ভৃষ্ট" "তিলান্ন" "তিলহোম" "তিলধেনু" "তিল-কাঞ্চন" তিললড্ডুক প্রভৃতি শব্দ—কোন্ ভারতবাসী না অবগত আছেন? গ্রীক-পর্য্যটকগণ ভারতবর্ষে আসিয়া তিলের অস্তিত্ব দেখিয়া গিয়াছেন। সে আজ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বের কথা। প্লিনি (Plini) বলেন,—সিন্ধু দেশ হইতে লোহিত সাগরের মধ্য দিয়া ভারত জাত তিল য়ুরোপে চালান যাইত।

পূর্ব্বে গুজরাট প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে তিল-তৈল উৎপন্ন হইত, এবং ঐ তৈল বিদেশে প্রেরিত হইত—খাস্ ইংরাজ একথা স্বীকার করিয়াছেন।

"আইন-ই-আকবরী"গ্রন্থে শ্বেত ও কৃষ্ণ—এই দুই জাতীয় তিলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমান শাসনকালে দিল্লী, আগ্রা, লাহোর প্রভৃতি স্থানে—প্রচুর পরিমাণে তিলের চাষ আবাদ হইত। বাহুল্য ভয়ে আমি অধিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিবনা। তবে তিল যে ভারতেরই সম্পত্তি, ধান্যাদি শস্যের সঙ্গে সঙ্গে আর্য্যগণ যে তিলের ও চাষ করিতেন,—ইহা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি।

তিল শিশির-শস্য অর্থাৎ শীতকালেই ইহা জন্মিয়া থাকে। বেলে মাটিতে তিল রোপণ করিতে হয়। কিন্তু কৃষিতত্ত্ববিদ্‌গণ তিল রোপণ সম্বন্ধে সর্ব্বত্র একমত নহেন। মাদ্রাজের লোক ফাল্গুনের শেষে তিল রোপণ করে। রোপণের নিয়ম—প্রথমে জমিতে ২।৩ বার লাঙ্গল দিয়া ফেলিয়া রাখিতে হয়। তাহার পর সেই জমি বৃষ্টিতে ভিজিয়া গেলে—তাহাতে তিল রোপণ করিতে হয়। এক বিঘা জমির পক্ষে—পাঁচ পোয়া বীজই যথেষ্ট। বপনের ৮।১০ দিন পরে বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হইয়া থাকে। অঙ্কুর বাহির হইলে, চারা

একটু বড় হইলে, মাঝে মাঝে জমি নিড়াইয়া দিতে হয়। গাছ বড় হইলে, তাহাতে ফুল ধরে। সেই ফুল কবিকুল কর্ত্তৃক সুন্দরীর নাসিকার সহিত উপমিত হইয়া থাকে।

ফুল হইতে ক্রমে শুঁটী জন্মে। এই শুঁটীর ভিতর তিল থাকে। শুঁটী পাকিলে গাছ শুকাইতে আরম্ভ করে। এই সময় গাছ কাটিয়া এক স্থানে গাদা দিতে হয়। গাছ গুলি বেশ শুকাইয়া গেলে, আছড়াইয়া তিল বাহির করিয়া লইতে হয়।

বঙ্গদেশে মাঘ মাসের প্রথমেই ইহার আবাদ হইয়া থাকে। ঢাকা জেলার লক্ষ্মীয়া নদীর ধারে বহুল পরিমাণে ইহার চাষ দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে এক বিঘা জমিতে দেড়সের তিল ও দশ সের আমন ধান্য এক সঙ্গে রোপণ করা হয়। এই উপায়ে প্রতি বিঘা হইতে ৩ মণ তিল পাওয়া যায়। সেখানকার লোকের বিশ্বাস, ধান্যের সঙ্গে চাষ করিলে তিল নাকি ভাল রকম জন্মায়।

সিন্ধু দেশে প্রায় ৩০ লক্ষ বিঘা জমিতে তিলের চাষ হইয়া থাকে। উত্তর-পশ্চিম দেশে—তুলার সহিত তিলের আবাদ হয়, সেখানে তিলের তৈল খাদ্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। এদেশের লোক আশ্বিনের শেষে তিল রোপণ করে।

ঘানীগাছের সাহায্যে তিল হইতে তৈল বাহির করা হয়। কাঁচা তিলের তৈল কিছু অপরিষ্কার হয় বলিয়া তৈল ব্যবসায়ীগণ প্রথমে তিলকে জলে সিদ্ধ করিয়া লয়। সিদ্ধ করিলে খোসার রং আর কালো থাকে না। তা'র পর তিলকে রৌদ্রে শুকাইয়া তৈল বাহির করিলে, সেই নিষ্কাষিত তৈলের বর্ণ বেশ উজ্জ্বল হইয়া থাকে। বোম্বাই প্রদেশে তিলের সহিত মসিনা প্রভৃতি ভেজাল দিয়া তৈল বাহির করে।

আসল তিল-তৈলের বর্ণ হরিদ্রাভ, ইহার গন্ধ কখনও বিকৃত হয় না। তিলে olein পদার্থ শতকরা ৭৫ ভাগ বর্ত্তমান থাকে। যদি কোনও তৈলে দশভাগ তিল-তৈল মিশ্রিত থাকে, তাহা হইলে তাহা হইতে ১ ড্রাম তৈল লইয়া, ঐ তৈলে ১ ড্রাম সালফিউরিক এসিড্ ও নাইট্রিক এসিড্ মিশাইলে মিশ্রিত দ্রব্য হরিদ্রা বর্ণ ধারণ করে।

এদেশে পাক কার্য্যে, ঔষধে, সাবান প্রস্তুত করিতে, মাখিবার জন্য ও প্রদীপে জ্বালাইবার জন্য তিল-তৈল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিলাতে অনেক সময় অলিভ অয়েলের পরিবর্ত্তে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঔষধার্থে—কৃষ্ণ তিলের তৈলই উত্তম। কোন কোন দুষ্ট ব্যবসায়ী ঘৃতের সহিত তিল-তৈল ভেজাল দেয়। এদেশে যে অলিভ অয়েলের আমদানী হইয়া থাকে, তাহার অর্দ্ধেক প্রায় বিলাতে প্রস্তুত তিল-তৈল। তিল-তৈল—এদেশের বহু গন্ধ দ্রব্যের মূল উপাদান। একগুণ ফুল, তিনগুণ তৈল একত্রে বোতলে পুরিয়া ৪০ দিন পচিলে, ঐ ফুলের গন্ধ তিল-তৈলে মিশ্রিত হয়। এই উপায়ে আমি ফুলেল তৈল প্রস্তুত করিয়াছি। আতর প্রস্তুত করিতেও তিল তৈলের আবশ্যক হয়। ফুলেল তৈল প্রস্তুতকারীরা তিল ও ফুল স্তরে স্তরে সাজাইয়া, তিল পুষ্পগন্ধ অনুপ্রবিষ্ট হইলে, সেই তিল হইতে তৈল বাহির করিয়া লয়, ইহার মূল্য কিন্তু বড় বেশী। সচরাচর তিল তৈলে ফুলের আতর মিশাইয়া ফুলেল তৈল প্রস্তুত হয়।

সিন্ধু দেশে তিলের খৈল কে খাড়রলে।

এই খৈল গো-মেষ-মহিষাদির পক্ষে অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য। তৈলের খৈলে গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধি পায়। পঞ্জাবে অনেক গরীব লোক আটার সহিত মিশ্রিত করিয়া তিলের খৈল ভক্ষণ করিয়া থাকে।

তিলের কল্ক অত্যন্ত বলকারক এবং স্তন্য বর্দ্ধক। ইহাতে কোষ্ঠবদ্ধতা দূর হয়—এই জন্য অর্শরোগীর পক্ষে ইহা অমৃতের ন্যায় উপকারী। তিল আমাশয় রোগীর পক্ষেও মহৌষধ। পঞ্জাবের চিকিৎসকগণ বাত রোগে এবং স্ফোটকে তিল তৈল ব্যবহার করেন। তিল তৈল বিরেচক গুণ বিশিষ্ট। ইহার মালিসে ত্বক্ কোমল হয়, গায়ের জ্বালা কমে, স্বেদ জনিত দুর্গন্ধ নষ্ট হয়, শরীর বেশ স্নিগ্ধ হয়।

বড় গামলার এক গামলা গরম জলে, আধপোয়া তিল চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া, সেই জলে কটি পর্য্যন্ত ডুবাইয়া বসিয়া থাকিলে, স্ত্রীলোকের বাধক-যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। তিলের কাথ চিনি সহ সেবনে সর্দ্দি ভাল হয়। মীরাটবাসীরা চক্ষুরোগে তিল ফুলের শিশির প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

তিলের পাতার এক রকম চট্‌চটে পদার্থ থাকে। এই চট্‌চটে জিনিষ যুক্ত-প্রদেশে কলেরা ও আমাশয়ের ঔষধ। পাতা জলে ভিজাইয়া রগ্‌ড়াইলে চট্‌চটে জিনিষ জলে মিশ্রিত হয়, সেই জল পান করিতে হয়।

তিল পত্রের কাথ কেশ-বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

শ্রীসতীশচন্দ্র দে এম-এ।

গোল-আলুর গর্ব্ব।

[কবিবর ৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত]।

ইংরাজের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপ হ'তে।
উড়ে এসে জুড়ে আমি ব'সেছি ভারতে॥
'পটাটস্' নাম ছিল সাহেবের দেশে।
'গোল-আলু' নাম হ'ল বাঙ্গালায় এসে॥
আনাজের রাজা আমি, মণ্ডল আকার।
ভোগীর ভোগের নিধি, সুখের আহার॥
স্বভাবতঃ নপুংসক, নাহি মোর বীজ।
নিজ রক্তে জন্ম লই যেন 'রক্ত-বীজ"॥
শোধিতে প্রেমের ধার মানিনী রাধার।
আলু-রূপে কলিতে গৌরাঙ্গ অবতার॥
শিশিরে উদ্ভব মোর কৃষির কৃপাতে।
পিরীতে প'ড়েছি ধরা, রাখালের হাতে॥
সত্বগুণ সুপ্রকাশ বিষ্ণু অংশ ব'লে।
প্রেম-ভরে আ-চণ্ডালে তুলে লই কোলে॥
কিবা হিন্দু, কিবা ম্লেচ্ছ, যত জাতি আছে।
আলুর আদর দেখ, সকলের কাছে॥
'আরিস্' * গণের আমি প্রধান সম্বল।
অন্নের সমান গুণ ধরি অবিকল॥

* আইরিস্।

মাংস রুটী কোথা পা'বে দীন হীন যা'রা।
পেট ভ'রে আলু খেয়ে বেঁচে থাকে তা'রা।
আমারে 'বয়েল' ক'রে বিফ্ রোষ্ট দিয়া।
ছেলে বুড়া আদি সবে খায় চিবাইয়া॥
বাঙ্গালীর মত কেউ রাঁধিতে নাহি জানে।
মৌলিক মৌরসী তাই আমার এখানে॥
আনাড়ী 'কুকের' হাতে মসলা না মিলে।
'হাজিরার' কালে, করে হাজির টেবিলে॥
অঙ্গ করে আলিঙ্গন রসবতী রাই †।
আধসিদ্ধ হ'য়ে তবু সুখ কিছু পাই॥
ব'সে হোটেলের 'সপে' সঙ্গে ল'য়ে মিস্।
মুখে দেয় বুকে কাঁটা, মুখে কিন্তু পিস্॥

নিজে ব্যথা পেয়ে, তুষি অপরের মন।
মহৎ কে আছে বল আমার মতন॥
যাতে দাও তা'তে আছি, রুটী লুচী ভাতে।
"একমেবাদ্বিতীয়ম্" ব্যঞ্জন মজা'তে॥
ঝোলে-ঝালে-অম্বলেতে করি বিচরণ॥
চচ্চড়ীতে শুষ্ক তনু 'সুতার' কেমন॥
আলু-ভাতে মেখে কেহ কাঁচা লঙ্কা দিয়া।
দু' রেক ‡ চালের অন্ন দেয় উড়াইয়া।
চাকা চাকা ক'রে যদি ছাঁকা তেলে ভাজে।
জিলাপী পলায় দূরে হেরে মোরে লাজে॥
কৃপণ-গৃহিণীগণ যে গৃহে বিরাজে।
সিদ্ধ ক'রে অল্প তেল দিয়ে তারা ভাজে॥
কাজেই সোণার অঙ্গ জ্ব'লে পুড়ে যায়।
নিজ দোষে, পোড়া-মুখে, পোড়া আলু খায়॥

† মাষ্টার্ড। ‡ কাঠা বা পালি।

উড়েনীর মত গায়ে হলুদ মাখিয়া।
মদের দোকান পাশে ব'সে থাকি গিয়া॥
"আলু দম" বলে তা'রে রসিক সুজন।
মুখে দিলে খুসী বড় মাতালের মন॥
কচুরীর সঙ্গে প্রেম খোট্টার দোকানে।
বৃথা জন্ম তা'র, তা'র 'তার' যে না জানে॥
সুবর্ণ বণিকগণ নহে মাংসাহারী।
আমিই তা'দের ঘরে শ্রেষ্ঠ তরকারি॥
বর্ষাকালে ভর্সা আমি—অধম-তারণ॥
অনেকেরই হয় তাই জীবন ধারণ॥

পরম গোঁসাই যিনি পাঁঠা নাহি খান।
অজা-রসে ভিজা আলু খেয়ে মজা পান।
সধবা—বিধবা ভেদ নাহি রাখি মনে।
সমভাবে সদালাপ সকলেরই সনে॥

প্যাজ্ দিয়া রাঁধে মোরে প্রেমিক-যবনে।
গোপনে সে রসে মজি হিন্দুর ভবনে॥

কোন স্থান পুড়ে গেলে, আলু বেটে দিবে।
ফোস্কা কভু হবেনাক, জ্বালা জুড়াইবে॥

শুচি-বেয়ে-মাগী গুলা জল ঘেঁটে মরে।
হাত পা'র আঙ্গুলে তা'দের হাজা ধরে।
আলু পোড়া সে রোগের পরম ঔষধি॥
দু'বেলা প্রলেপ তা'র দিতে পার যদি॥

যে ভজে আমায় তা'র বৃদ্ধি হয় বল।
মহিমা না জানে শুধু পেট-রোগা দল॥

বহুমূত্র রোগী যা'রা —অতি অভাজন।
আমারে ডরায় তা'রা যমের মতন॥

বৈদ্য-বৃত্তি।

—*—

অনেক দিন ধরিয়া, প্রায় সমস্ত সভ্য-জগতে,—বিশেষতঃ ভারতবর্ষে, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের ক্রম-বিকাশ পরিলক্ষিত হইতেছে; আমাদের এই বঙ্গদেশকেই উক্ত বিকাশের কেন্দ্রস্থল বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি দোষ হয় না। যতদূর অনুধাবন করিতে পারা যায়, তাহাতে আমার মনে হয়, মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভ হইতে তাহার ক্রমোন্নতি সহ অশেষ কল্যাণময় সনাতন চিরারাধ্য আয়ুর্ব্বেদের অধঃপতন আরম্ভ হইয়া ক্রমে ক্রমে প্রায় বিলোপ-দশায় উপনীত হয়। তৎকালে, যেরূপ দ্রুতগতিতে ইহার অবনতি হইতেছিল, দেশের তাদৃশ অবস্থা বর্ত্তমান থাকিলে, এতদিনে ইহার অস্তিত্ব থাকিত কি না, তাহাও সন্দেহের বিষয় হইত।

'আয়ুর্ব্বেদ' শত সহস্র ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়াও, এখন আত্মনির্ভরক্ষম এবং প্রায় সার্ব্বজনীন সত্য স্বরূপে প্রতীত হইয়াছে। সুদূর ইউরোপ আদি বিজ্ঞানময় রাজ্যের অনেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতও এক্ষণে আয়ুর্ব্বেদকে একটী দর্শন ও আলোচনার বিষয় মনে করিয়া, ইহার তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেছেন।

ইহাতে আমাদেরই সমধিক গৌরব। যে হেতু "আয়ুর্ব্বেদ" আমাদেরই পুরুষানুক্রমিক সঞ্চিত সম্পত্তি, রক্ষণাবেক্ষণের দোষে বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছিল, কিন্তু অনুকূল-কাল-প্রবাহে তাহার পুনরুদ্ধার সাধিত হওয়া আমাদেরই পক্ষে শুভলক্ষণ বলিতে হইবে। অগাধ আয়ুর্ব্বেদ-সিন্ধু বর্ত্তমানে যেভাবে মন্থন করা হইতেছে, তাহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে সাফল্য-রত্নের আশা করা যায় কি না,—সম্প্রতি এতদ্বিষয়ের পর্য্যালোচনা ও তদনুসারে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। সেইজন্য আমার এই প্রবন্ধের অবতারণা।

নিজ নিজ স্বার্থ-সাধন জন্য এসময়ে এই জাতীয় মহা গৌরবের প্রতিকূলে যাহাতে আমরা আমাদের শক্তির লেশমাত্রও অপব্যবহার না করি, তৎপ্রতি বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। অনেক সময় অনেকে নিজের দোষ নিজে দেখিতে পায় না—ইহা স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং কোনও সৎপ্রদর্শক যদি তাহা দেখাইয়া দেন, তাহাতে তৎপ্রতি বিরক্ত না হইয়া কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত। আমরা ভ্রম বা অনবধানতা বশতঃ অথবা স্বার্থপরতা-মোহে মুগ্ধ হইয়া আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের মর্য্যাদা যথেষ্ট লঙ্ঘন করিতেছি, কেহ জ্ঞানের অভাবে, কেহ কর্ম্মাভ্যাস অভাবে, কেহ উক্ত উভয়বিধ অভাবে, কেহ বা লোভের বশবর্ত্তিতায়, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-পদ্ধতিকে এমত বিকৃতাবস্থায় পরিণত করিতেছে যে, তাহা চিন্তা করিলে কোন হৃদয়বানই স্থির থাকিতে পারেন না। আয়ুর্ব্বেদের দোহাই দিয়া, স্বেচ্ছাচার-কুঠারাঘাতে, আয়ুর্ব্বেদকেই ক্ষত-বিক্ষত করিতেছে। এই প্রকার যথেচ্ছাচারী হিতাহিত-বোধ-বর্জ্জিত-কুবৈদ্যগণ যেরূপ অপ্রতিহত গতিতে আয়ুর্ব্বেদকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহাতে, জানি না, কোন্ অপার্থিবশক্তি সম্পন্ন মহাত্মার কোন্ মহাপ্রভাববলে ইহা উদ্ধার পাইতে

সমর্থ হইবে। আয়ুর্ব্বেদ কি? তদ্বিধিবিহিত কর্ত্তব্যই বা কি? বৈদ্য কাহাকে বলে? বৈদ্যের বিধেয় ও দায়িত্ব কি? অধিকাংশ কবিরাজই ইহার খবর রাখেন না। অথবা এতদ্বিষয়ক জ্ঞানের অভাবে কোনরূপ কার্য্যেরও অসুবিধা মনে করেন না, ইহা অপেক্ষা আয়ুর্ব্বেদের প্রতি ভীষণ অত্যাচার আর কি কল্পনা করা যাইতে পারে? যে শাস্ত্রের প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থেই, বৈদ্যকে স্বীয় কর্ত্তব্য-সাধন বিষয়ে ভূয়ো ভূয়োঃ সতর্ক করিয়া দিতেছে, গুরুতর দায়িত্ব বিস্মৃত হইয়া বৈদ্য অপথে স্খলিত পদ না হন, সেইজন্য পুনঃ পুনঃ সদুপদেশ ও অনুশাসন প্রদান করিতেছে, আমরা কিন্তু সেই জগদারাধ্য, দেবতুল্য ঋষিদের সৎশিক্ষা ও অনুশাসন বাক্য অসংকোচে লঙ্ঘন করিয়া, অশাস্ত্রীয় যথেচ্ছাচার-বিহিত কুপথে বিচরণ করতঃ মানব জীবনকে একটা অকিঞ্চিৎকর ক্রীড়া-পুত্তলিকা মনে করিয়া, উহার ভবের খেলা সাঙ্গ করাইয়া দিতেছি,—ইহাপেক্ষা দেশের অধোগতি আর কি হইতে পারে?

মহর্ষি সুশ্রুত বলিয়াছেন,—

শাস্ত্রং গুরুমুখোদ্গীর্ণমাদায়োপাস্য চাসকৃৎ।
যঃ কর্ম্ম কুরুতে বৈদ্যঃ স বৈদ্যোঽন্যে তু তস্করাঃ॥

অর্থাৎ—আচার্য্যের মুখ হইতে উপদিষ্ট শাস্ত্র যথার্থ ভাবে গ্রহণ করতঃ পুনঃ পুনঃ তদনুষ্ঠিত বিধির অনুশীলন করিবে এবং পরিণামে তদ্বিষয়ে অন্তঃকরণ সংশয় বর্জ্জিত হইলে, বৈদ্য চিকিৎসা-ব্যাপারে অধিকার লাভ করিতে পারিবেন, উল্লিখিত বিধির বহির্ভূত বৈদ্য, কেবল বৈদ্যনামের অযোগ্য নহে, পরন্ত শাস্ত্রকার তাহাকে তস্কর নামে অভিহিত করিয়াছেন। শাস্ত্রকার যদিও এতাদৃশ বৈদ্যকে তস্কর মাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, কিন্তু বাস্তব পক্ষে উক্ত ব্যক্তি সামান্য তস্কর নহে। সাধারণতঃ তস্কর মানবের পার্থিব সম্পত্তি মাত্রই অপহরণ করে, কিন্তু ঈদৃশ তস্কর-বৃত্তি-বৈদ্য অর্থসহ অমূল্য জীবন রত্নেব অপহরণ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। কি ভয়ানক হিংস্র তস্কর! বাস্তবিক বৈদ্যবৃত্তি সহজ সাধ্য নয়। কেবল আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়নকারী চিকিৎসক নিজবৃত্তি পরিশীলনে অধিকার লাভ করিতে পারেনা। আয়ুর্ব্বেদে সম্যক অধিকার অর্জন করিতে হইলে, ব্যাকরণ, সাংখ্য ও বৈশেষিকাদি দর্শন-শাস্ত্রে ও ব্যুৎপন্ন হইতে হইবে। নতুবা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অধিকার জন্মিতেই পারে না। চরকাদি বৈদ্যকসংহিতার ভাষা সরল নহে; শব্দশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা ব্যতীত কেহই উহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। বিশেষতঃ সাংখ্য ও বৈশেষিকাদি দর্শন-শাস্ত্রের সহিত আয়ুর্ব্বেদের সম্বন্ধ অলঙ্ঘনীয়। ফলতঃ দর্শন-শাস্ত্রকে আয়ুর্ব্বেদের প্রাণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই নিমিত্তই সুশ্রুত সংহিতাকার বলিয়াছেন—

একং শাস্ত্রমধীয়ানো ন বিদ্যাচ্ছাস্ত্রনিশ্চয়ং।
তস্মাদ্ বহুশ্রুতঃশাস্ত্রং বিজানীয়াচ্চিকিৎসকঃ॥

অর্থাৎ—কেবল আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়নে শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করিতে পারা যায় না। প্রয়োজনানুসারে ব্যাকরণ-দর্শনাদি অপরাপর যে যে শাস্ত্রের সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে, সেই সেই শাস্ত্রেও ব্যুৎপন্ন হওয়া আবশ্যক। অতএব বহু শাস্ত্রার্থ বেত্তা ব্যক্তিই প্রকৃত চিকিৎসক হইতে সমর্থ। ইহাই যথেষ্ট নহে, বৈদ্যকে প্রতি পদ-বিন্যাসে সতর্ক করিয়া দিবার নিমিত্ত ও সাধারণ জনগণকে বৈদ্য-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে

অভিজ্ঞান-প্রদানের জন্য বৈদ্যক-শাস্ত্রে ভূরি ভূরি প্রমাণ-প্রয়োগ আছে।

সুশ্রুত সংহিতা—সূত্রস্থান—৩য় অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ—

যে বৈদ্য চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছে, কিন্তু চিকিৎসা কর্ম্মে (ঔষধাদির উপযুক্ত বিধানানুসারে প্রস্তুত করণে ও স্বর্ণাদি ধাতু বা উপধাতু সমূহের জারণ, মারণ, শোধনার্থ কর্ম্মে এবং তৈল, ঘৃত, মোদক, গুড়, আসব, অরিষ্ট, চূর্ণ ও বটিকাদির যথা নিয়মে প্রস্তুত ও প্রয়োগ বিধানে) অবহেলা বশতঃ অনভ্যস্ত হইয়াছে, তাদৃশ বৈদ্য কদাপি চিকিৎসক নামের যোগ্য নহে।

যুদ্ধ-নীতি-বিশারদ—অথচ কোন দিন স্বয়ং রণস্থল দর্শন করেন নাই—এরূপ ব্যক্তি যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য ভয়াবহ ব্যাপার-সন্দর্শনে যেমন ভয়াবিষ্ট ও কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হয়, চিকিৎসা-কর্ম্মে অনভ্যস্ত কেবল শাস্ত্রজ্ঞ বৈদ্যেরও রোগি-সমীপে তাদৃশ অবস্থা উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে যে বৈদ্য যথারীতি চিকিৎসা কর্ম্মে অভ্যস্ত, কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞান পরাঙ্মুখ,—তাহারও চিকিৎসাকার্য্যে অধিকার নাই। আর্য্যযুগে, উক্ত উভয়বিধ বৈদ্যই রাজ-শাসনে, প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইত। ইহাদিগকে অর্দ্ধ শিক্ষিত ও এক পক্ষহীন পক্ষীর ন্যায়, অকর্ম্মণ্য বলিয়া শাস্ত্রকার প্রমাণ করিয়াছেন। অমৃতোপম জীবনপ্রদ ঔষধও কালান্তক যম-সদৃশ মূর্খ বৈদ্য প্রযুক্ত হইয়া, বজ্র ও বিষবৎ, মানবের প্রাণ বিনাশের হেতু হয়। অতএব এতাদৃশ বৈদ্য দ্বারা কদাপি চিকিৎসা করান কর্ত্তব্য নহে।

স্নেহাদি কর্ম্মে অনভিজ্ঞ অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত স্নেহন, স্বেদন, বমন, বিরেচন ও অনুবাসনাদির প্রয়োগ বিষয়ে অপারদর্শী অথবা তৈল-ঘৃতাদির পাক কর্ম্মে অনিপুণ, ও শস্ত্রাবচরণে অনভিজ্ঞ বৈদ্য চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলে, উহা তদ্দেশীয় রাজারই অপরাধ স্বরূপে গণ্য হইত। কারণ রাজার অনবধানতা দোষেই তাদৃশ অনধিকারী বৈদ্য রাষ্ট্রমণ্ডলে রাজবিধি বহিভূর্ত হইয়াও অনধিকার চর্চ্চার অধিকারী হইতে সমর্থ হইত।

বৈদ্যের দায়িত্বের গৌরব বিষয়ে শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

"মাতরং পিতরং পুত্রান্ বান্ধবানপিচাতুরঃ।
অথৈতান্ পরিশঙ্কেত বৈদ্যে বিশ্বাসমেতি চ॥"

মনুষ্য, ব্যাধিক্লিষ্ট হইলে, যন্ত্রণার লাঘব-বিষয়ে মাতা, পিতা, পুত্র ও বান্ধবদিগের প্রতিও বিশ্বস্ত হৃদয়ে নির্ভর করিতে শঙ্কিত হয়। শরীর-তত্ত্বাভিজ্ঞতা এবং রোগাপনয়ন-শক্তি-ব্যতীত কেবল স্নেহ, ভক্তি, প্রীতি, বাৎসল্য বা আত্মীয়তা-প্রদর্শনে রোগার্ত্তের যাতনা নাশের সম্ভাবনা নাই। ইহা নিশ্চয় জ্ঞান করিয়াই রোগী নিঃসন্দিগ্ধ অন্তঃকরণে, বৈদ্যের হস্তে আত্ম সমর্পণ করে। অনেক স্থলে এইরূপ প্রগাঢ় বিশ্বাস বশতঃ অভীষ্ট-চিকিৎসকের দর্শন-স্পর্শনেও রোগী রোগ-যন্ত্রণার উপশম বোধ করে।

এখন একবার চিন্তা করুন, পাঠক! বৈদ্যের দায়িত্ব কি? বৈদ্যের বৈদ্যত্ব কোথায়? যাঁহার নাম শ্রবণে, রোগপীড়িত ব্যক্তি পুলকিত হয়, যাঁহার দর্শনমাত্রে ব্যাধি-যাতনার উপশম অনুভূত হয়, তাদৃশ বৈদ্যের মহত্ত্ব ও পারদর্শিতার পরিমাণ একবার স্মরণ করিয়া, এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধের আলোচনা করুন,—ইহাই একান্ত প্রার্থনা।

এতৎ প্রসঙ্গে বৈদ্যকশাস্ত্রের শীর্ষস্থানীয় চরক-সংহিতার অভিপ্রায় সম্বন্ধে ২।১টী কথা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলামনা। চরকসংহিতাকার বলিতেছেন,—

"দেশ কালানুসারে ব্যক্তিগত বিভিন্ন প্রকৃতির বিশেষত্ব অনুধাবন পূর্ব্বক যিনি ঔষধ প্রয়োগে সমর্থ,—তিনিই প্রকৃত চিকিৎসক। পাত্রাপাত্র অথবা প্রয়োজ্য ঔষধের গুণাদির পরিচয় না জানিয়া, ঔষধ প্রযুক্ত হইলে, উহা শস্ত্র, বিষ, অগ্নি ও বজ্রের ন্যায় রোগীর প্রাণনাশক হয়; অথচ সুবিজ্ঞাত হইয়া, ব্যাধি ও প্রকৃতির অনুকূলে ব্যবহৃত হইলে, পীড়ানাশক, জীবনবর্দ্ধক অমৃতরূপে পরিণত হয়। নাম, রূপ বা গুণাদির দ্বারা অজ্ঞাত, কিম্বা বিজ্ঞাত হইয়াও অযথাবস্থায় দুষ্প্রযুক্ত ঔষধ কোন উপকার সম্পাদন করেনা, প্রত্যুত উহা অনর্থেরই কারণভূত হয়। সুতীব্র-সর্পাদির বিষও প্রয়োগনৈপুণ্যে রোগহারী উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া পরিগণিত হয়, আবার সুধোপম ভৈষজ্যও অযথা-প্রয়োগে বিষত্ব প্রাপ্ত হইয়া রোগীর প্রাণনাশ করে। অতএব প্রয়োগ-জ্ঞানহীন-মূর্খ বৈদ্য প্রযুক্ত ঔষধ প্রাণান্তে ও সেবন করা বিধেয় নয়। দীর্ঘজীবন ও সুস্থতাভিলাষী, বিশেষ পরীক্ষিত বৈদ্যকেই চিকিৎসা কর্ম্মে বরণ করিবেন। ইন্দ্রের বজ্র মস্তকে পতিত হইলেও কদাচিৎ কেহ ত্রাণ পাইতে পারে, কিন্তু অনভিজ্ঞ কুবৈদ্য-চিকিৎসা-ক্রান্ত ব্যক্তি কখনই জীবন ও স্বাস্থ্য-রক্ষার আশা করিতে পারেনা। ব্যাধি-যন্ত্রণাক্লিষ্ট-অকর্ম্মণ্য দশায় শয্যাশায়ী, বিশ্বস্ত-হৃদয় রোগীর প্রতি, যে যথেচ্ছাচারী, মূঢ় বৈদ্য প্রাজ্ঞাভিমানী হইয়া নিজের অপরিজ্ঞাত ঔষধ প্রয়োগ করে, ধর্ম্মহীন, দুরাচার সংসারের মৃত্যুরূপধারী তাদৃশ বৈদ্যের সহিত সম্ভাষণ করিলেও নিরয়গামী হইতে হয়। যথার্থ চিকিৎসক পদলাভেচ্ছু বৈদ্য উক্ত দোষ সমূহ পরিহারকরতঃ, বৈদ্যবিহিত গুণ সম্পন্ন হইবেন, যাহাতে মানবগণ জীবন ও স্বাস্থ্যরক্ষায় সমর্থ হইতে পারেন, তাহাই একমাত্র তাঁহার জীবনব্রত। এই পবিত্র ব্রতপরায়ণতা গুণে তিনি ঐহিক ও পারত্রিক সুখের অধিকারী হয়েন। ফলতঃ যাহা হইতে ব্যাধির যাতনা প্রকৃতরূপে উপশমিত হয়, তাহাই যথার্থ ঔষধ, আর যিনি তাদৃশ ঔষধ-প্রয়োগে রোগীগণকে রোগ যাতনা হইতে মুক্তিদান করেন,—তিনিই যথার্থ বৈদ্য।"

কবিরাজ শ্রীঅমৃত লাল গুপ্ত

কাব্যতীর্থ, কবিভূষণ।

কুষ্ঠ ও বাতরক্তের ভেদ-নির্ণয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, চরক মতে সংপ্রাপ্তি ও সামান্য লক্ষণে সর্ব্বত্রই বেদনার প্রাধান্য বরং বাতলিঙ্গের মধ্যে বিশেষতঃ ও অতিরুক্ শব্দে "অতি" এই বিশেষণ সন্নিবেশানুসারে অন্ততঃ বাতরক্তের বাতলিঙ্গে সুপ্তি লক্ষণ চরকের অনুমত নহে—ইহা অনায়াসেই বলা যায়। বিশেষতঃ চরকোক্ত কুষ্ঠের ইতর ব্যাবর্ত্তক লক্ষণ—"বিশেষতঃ" স্পর্শনঘ্নাণাম্—এই বাক্যের সহিত বিরোধ-ভঞ্জন এবং "বিশেষতঃ" এই বিশেষণের সার্থকতা ও গৌরব রক্ষা করিতে হইলে বলিতেই হইবে, বাতরক্তের সুপ্তি লক্ষণটী সাময়িক * এবং ঈষন্মাত্র হইয়া থাকে। চরকোক্ত কফ লক্ষণে যে সুপ্তির কথা আছে, সে সম্বন্ধেও এইরূপ ব্যাখ্যা অপরিহার্য্য। "সুপ্তির্মন্দা চ রুক্"—এই বচন সন্নিবেশ-প্রণালীতেও তাহাই প্রতীত হয়। মন্দা এই বিশেষণটীর সুপ্তি ও রুক্ এই দুইটী বিশেষ্য বা লক্ষণের মধ্যবর্ত্তিত্ব এবং 'মন্দা' এই বিশেষণের পরই সমুচ্চয় সূচক চকার নিবেশ দ্বারা "মন্দা সুপ্তির্মন্দা চ রুক্" এই অর্থই প্রতিপাদিত হয়। মন্দা শব্দটী কেবল রুক্এর বিশেষণ—চরকের এরূপ অভিপ্রায় থাকিলে 'সুপ্তিশ্চ মন্দরুক্ কফে' এইরূপ বচন সন্নিবেশ হইত। বাগ্‌ভট বোধ হয় এই তর্ক পরিহারের জন্য কফ লক্ষণে "সুপ্তিস্নিগ্ধত্বশীততাঃ কণ্ডূর্মন্দা চ রুক্" এই পাঠ রচনা করিয়াছেন। নিদানকার মাধবকর ও বাগ্‌ভট-বচনই অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। আর্ষনতদ্বৈধ বিচারে সংগ্রহকারের মত বিচার অনাবশ্যক, কেননা সংগ্রহকারের স্বতন্ত্র প্রামাণ্য নাই।

* অর্থাৎ বাতরক্তে পরম্পর স্পর্শাসহ হয় এবং সূচীবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা, বিদীর্ণবৎ বেদনা, গুরুতা ও সুপ্তিযুক্ত হয়।

বাতরক্তের দ্বিতীয় ভেদক লক্ষণ—ইহা প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ সন্ধিসমূহকে আক্রমণ করে।

তস্য স্থানং করৌ পাদাবঙ্গুল্যঃ সর্ব্বসন্ধয়ঃ।

বাতরক্তের আক্রমণ স্থান হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, অঙ্গুলীসমূহ ও সমস্ত সন্ধিস্থল।

তদ্ দ্রবত্বাৎ সরত্বাচ্চ দেহং গচ্ছেৎ শিরায়নৈঃ
পর্ব্বস্বভিহতং ক্রুদ্ধং বক্রত্বাদবতিষ্ঠতে—

রক্তের দ্রবত্ব ও প্রবহন-শীলতাবশতঃ সেই বাতরক্ত শিরাপথে গমন করিয়া পর্ব্ব স্থানের বক্রত্বহেতু রুদ্ধ ও দূষিত হইয়া অবস্থান করে।

"করোতি দুঃখং তেষ্বেব তস্মাৎ প্রায়েণ সন্ধিষু"

সেই কারণে প্রায়ই সেই সমস্ত সন্ধিস্থানে বেদনা উৎপাদন করে।

ধমন্যঙ্গুলীসন্ধীনাং সঙ্কোচঃ .....

ধমনী অঙ্গুলী ও সন্ধিস্থানের সঙ্কোচ হয়।

রক্তমার্গং নিহন্ত্যাশু শাখাসন্ধিষু মারুতঃ
নিবেশ্য......

হস্ত-পদাদির সন্ধিস্থানে বায়ু অবস্থান করিয়া রক্তের পথ রুদ্ধ করে।

[চরক বাতশোথ চিঃ অঃ]

এবং বাতরক্তের পূর্ব্বরূপে—

সন্ধি শৈথিল্যমালস্যং সদনং পিড়কোদ্গমঃ

সন্ধিস্থানের শিথিলতা, অলসতা, অবসাদ পিড়কা প্রাদুর্ভাব হয়।

জানুজঙ্ঘোরুকট্যংস হস্তপাদাঙ্গসন্ধিষু

নিস্তোদঃ স্ফুরণং ভেদঃ......

জানু জঙ্ঘা, উরু, কটি, স্কন্ধ, হস্ত, পদ ও শরীরের সন্ধিসমূহে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, স্পন্দন, বিদীর্ণবৎ যন্ত্রণা হয়।

তৃতীয় ভেদক লক্ষণ :—

কণ্ডূঃ সন্ধিষু রুগ্‌ভূত্বা ভূত্বা নশ্যতি চা সকৃৎ

বৈবর্ণ্যং মণ্ডলোৎপত্তির্বাতাসৃক্‌ পূর্ব্বলক্ষণম্‌

[চরক বাতশোথ চিকিঃ অধ্যায়]

এই শেষোক্ত বচনটীর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য আছে। প্রচলিত ব্যাখ্যা এই—চুলকানি হয়, সন্ধিস্থান সমূহে পুনঃ পুনঃ বেদনা হইয়া প্রশমিত হয় এবং বিবর্ণতা ও মণ্ডলোৎপত্তি হয়। কিন্তু কুষ্ঠরোগের পূর্ব্বরূপের মধ্যে "স্বল্পানামপি ব্রণানাং দুষ্টিরসংরোহণঞ্চেতি" অর্থাৎ অতি সামান্য ব্রণেরও দুষ্টি এবং অশুষ্কতা (চরঃ কুষ্ঠনিঃ) এই লক্ষণ আছে। বস্তুতঃ কুষ্ঠরোগের মণ্ডল বা ব্রণ একবার উৎপন্ন হইলে আর শীঘ্র সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় না—ইহা কুষ্ঠরোগের একটী বিশিষ্ট লক্ষণ। সুশ্রুত কুষ্ঠ পূর্ব্বরূপে বলিয়াছেন,—"যত্র যত্র চ দোষো বিক্ষিপ্তো নিঃসরতি তত্র তত্র মণ্ডলানি প্রাদুর্ভবন্তি এবমুৎপন্ন স্বচি দোষস্তত্র চ পরিবৃদ্ধিং প্রাপ্য অপ্রতিক্রিয়মাণোঽভ্যন্তরং প্রপিপদ্যতে ধাতূন্‌ দূষয়ন্‌" (কুষ্ঠনিঃ) অর্থাৎ যে সমস্ত স্থানে দোষ প্রসৃত হইয়া বহির্ম্মুখ হয় সেই সমস্ত স্থানে মণ্ডলসমূহ উত্থ হয় এবং এই ভাবে ত্বকে দোষ উৎপন্ন হইয়া বর্দ্ধিত হয় এবং প্রতীকার করিতে না পারিলে দেহের ধাতুসমূহ দূষিত করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তাই চরক বলিয়াছেন 'কুষ্ঠং দীর্ঘরোগানাম্‌' (চরক সূত্রং যজ্জঃ পুরুষাধ্যায়) দীর্ঘকাল ব্যাপী রোগনিচয়ের মধ্যে কুষ্ঠ সর্ব্ব প্রধান। কুষ্ঠের সহিত বাতরক্তের পার্থক্য রাখিতে হইলে ঐ বচনের এইরূপ ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। "কণ্ডূঃ সন্ধিষু রুক্‌ বৈবর্ণ্যং মণ্ডলোৎপত্তিশ্চ অসকৃদ্‌ ভূত্বা ভূত্বা নশ্যতি অর্থাৎ এই সমুদয় লক্ষণই বারংবার প্রকাশিত হয় ও নিবর্ত্তিত হয়। এই ব্যাখ্যায় 'নশ্যতি' এই শব্দের অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী লক্ষণাবলী এবং পরবর্ত্তী দুই লক্ষণের মধ্যে সমুচ্চয়সূচক'চ'কার সন্নিবেশের সার্থকতা লক্ষিত হয়, গরুড়পুরাণের বচনের সহিতও এক বাক্যতা রক্ষিত হয় * সুতরাং পুনঃ পুনঃ প্রকাশ ও উপশম এই পূর্ব্বরূপটি ও বাতরক্তের বিশিষ্ট ভেদক লক্ষণ।

এক্ষণে আমরা কুষ্ঠ ও বাতরক্তের পরস্পর ভেদ-নির্দর্শক লক্ষণসূচীবিন্যাস করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

কুষ্ঠ।

১। স্পর্শ শক্তির অভাব হয়।

২। একবার আরম্ভ হইলে শীঘ্র (প্রতিকার না করিলে) উপশমিত হয় না।

৩। ত্বক্‌-সঙ্কোচ, করভঙ্গ ও অঙ্গুলি পতন হয়।

৪। নাসা, কর্ণ, হস্ত প্রভৃতি অঙ্গের পতন হয়।

৫। আক্রমণের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই। মুখমণ্ডলে অনেক সময় দেখা যায়।

বাতরক্ত।

১। অত্যন্ত বেদনা হয়।

২। পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত ও উপশমিত হয়।

* গরুড়পুরাণম্‌ পূর্ব্বখণ্ডম্‌ ১৭১ অধ্যায়ঃ।

৩। ধমনী, অঙ্গুলি ও সন্ধিস্থানের বক্রতা ও সঙ্কোচ হয়।

৪। অঙ্গপতন কখন হয় না।

৫। প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ সন্ধিস্থল আক্রান্ত হয়। হস্ত পদ ও অঙ্গুলি বিশিষ্ট অধিষ্ঠান। বাতরক্ত কখনও মুখে হয় না।

কুষ্ঠ।

৬। অক্ষিরোগ (চক্ষুর লৌহিত্য) হইয়া থাকে।

৭। আক্রান্ত স্থলে স্বেদ হয় না (কচিৎ হয়)

৮। আরম্ভের নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই।

৯। ক্রিমি জন্মে।

বাতরক্ত।

৬। অক্ষিরাগ হয় না।

৭। স্বেদ হইয়া থাকে।

৮। পাদমূল বা হস্তমূল হইতে আরম্ভ হয়।

৯। ক্রিমি দৃষ্ট হয় না।

অনেকে বলিতে পারেন "পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রানুসারে আয়ুর্ব্বেদের ব্যাখ্যা অতি অন্যায়। এরূপ বিজাতীয় সংমিশ্রণ সঙ্গত নহে। ঋষিবাক্যও কি শেষে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কষ্টিপ্রস্তরে পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে?" তাঁহাদের নিকট আমার বক্তব্য এই, আমি আর্ষ বাক্য অপেক্ষা প্রতীচ্য চিকিৎসা-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সমূহ বলবত্তর প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতেছি না। কিন্তু মূল আর্ষ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ অধিকাংশই লুপ্তপ্রায়, যাহা আছে,—তাহাও সর্ব্বত্র সহজ-বোধ্য নহে এবং তজ্জন্য চক্রপাণি, ডল্লণ, বিজয়রক্ষিত, অরুণদত্ত, শ্রীকণ্ঠ এবং বাগ্‌ভট, মাধব ও ভাবপ্রকাশকার ভাবমিশ্র প্রভৃতি টীকাকার ও সংগ্রহকার-গণের শরণাপন্ন হইতে হয়, কিন্তু টীকাকার ও সংগ্রহকারগণও সর্ব্বত্র বিশদ মীমাংসা ও ব্যাখ্যা করেন নাই, অনেক স্থানে "দুর্ব্বোধং যদতীব তদ্বিজহতি স্পষ্টার্থমিত্যুক্তিভিঃ" দুর্ব্বোধ স্থলসমূহ স্পষ্টার্থ বলিয়া ত্যাগ করিয়াছেন। আর্ষমত দ্বৈধক্ষেত্রে "স্মৃতিদ্বৈধবৎ সর্ব্বং প্রমাণং" বলিয়া (অর্থাৎ দুই স্মৃতিকারের ভেদ হইলে উভয়েরই মতের ন্যায় আয়ুর্ব্বেদে আর্ষ মত দ্বৈধ স্থলে উভয় ঋষির মতই প্রমাণ অর্থাৎ গ্রাহ্য) তর্ক পরিহার করিয়াছেন *। আমি সেস্থলে প্রতীচ্য চিকিৎসা-শাস্ত্রকে আয়ুর্ব্বেদের অভিনব টীকাস্বরূপ ব্যবহারের চেষ্টা করিয়াছি,

* অথচ প্রকৃতপক্ষে স্মৃতিশাস্ত্রের মীমাংসকগণ প্রায়ই একের প্রাধান্য অন্যের গৌণত্ব স্বীকার করিয়াছেন। মনুসংহিতার প্রাধান্য দেখাইবার জন্য কুল্লুক ভট্ট বৃহস্পতি প্রভৃতির বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন বেদার্থোপনিবদ্ধত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতমন্বর্থ বিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে ইত্যাদি। অন্যদিকে বঙ্গীয় স্মার্ত্তপ্রধান রঘুনন্দন এক স্মৃতির অনুরোধে অন্য স্মৃতির সঙ্কোচ ও অর্থবাদ কল্পনা করিয়া গিয়াছেন, মনু বচনও তিনি অর্থবাদ বলিয়া উড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন। কেবল আয়ুর্ব্বেদেই সেই তর্ক ও মীমাংসা স্থাপনের চেষ্টা বিশেষ লক্ষিত হয় না। বস্তুতঃ আর্ষত্বেরও ইতর বিশেষ আছে। সকলেই তুল্য বল প্রমাণ নহেন। নচেৎ ভগবান্ পুনর্ব্বসু বিবদমান ঋষিসঙ্ঘের মধ্যস্থতা বা মীমাংসকের পদলাভ করিতে পারিতেন না। চরকপাঠীর তাহা অজ্ঞাত নহে। মহর্ষি আত্রেয়ের ষট্‌ শিষ্য-ঋষিগণের মধ্যে "বুদ্ধেবিশেষে স্তত্রাসীৎ" বলিয়া মহর্ষি অগ্নিবেশের প্রশংসা বচনও এই কথাই প্রতিপাদন করিতেছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের শারীরিকভাষ্যে এইরূপ বিচার প্রণালীতেই সাংখ্য ও পাতঞ্জলাদির মত খণ্ডন করিয়াছেন। সে সকল কথা বলিবার স্থান ও সময় এখন নাই।

এবং তাহা করা অসঙ্গত ও মনে করি না। “গ্রন্থস্য গ্রন্থান্তরং টীকা”—ইহা আমাদেরই শাস্ত্রের কথা। চক্রপাণি, ডল্লন, বিজয়রক্ষিত, শ্রীকণ্ঠ, অরুণদত্ত, এবং বাগ্‌ভট, মাধবকর, ভাবমিশ্র প্রভৃতির তুলনায় আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রকারগণকে সর্ব্বাংশেই নিকৃষ্ট বিবেচনা করার কোন কারণ নাই। আর একটী কথা বলিলে বোধ হয় দোষ হইবে না যে, পারলৌকিক পরোক্ষফলক ও ধর্ম্ম বিষয়ক শাস্ত্র এবং ইহলৌকিক প্রত্যক্ষফলক শাস্ত্রের বিচার ও অনুশীলনের প্রণালী একরূপ হইতে পাবে না—যে শাস্ত্র লৌকিক প্রত্যক্ষফলক বলিয়া প্রসিদ্ধ। তবে তাহা যদি স্থানে স্থানেও প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত কর, তাহা হইলে সেই শাস্ত্রের তৎ তৎ স্থলের সংস্কার আবশ্যক; নচেৎ প্রাকৃতিক নিয়মে তাহা লুপ্ত হইবে। শাস্ত্র বাক্য অর্থাৎ ঋষি প্রভাব শাসিত এই ভারতবর্ষেও তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। অধিক দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নাই,—এই আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাসেই দেখা যায় যে, ভেল, জতুকর্ণ, ক্ষারপাণি এবং ঔপধেনব প্রভৃতি কৃত এমন কি মূল অগ্নিবেশ ও সুশ্রুত কৃত তন্ত্র বিলুপ্ত বা লুপ্তপ্রায়। প্রতি সংস্কৃত চরক ও সুশ্রুতসংহিতা অদ্যাপি বর্ত্তমান। শাকল্য-সংহিতার এই বচনটী মণীষিগণের অনুকরণ যোগ্য।

কিং তেনাপি সুবর্ণেন কর্ণঘাতং করোতি যৎ
তথাকিং তেন শাস্ত্রেণ যন্ন প্রত্যক্ষতঃ স্ফুটম্?

যাহাতে কেবল কর্ণ পীড়া উৎপন্ন হয় এমন কুণ্ডলে কি প্রয়োজন? যাহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ নহে, সে শাস্ত্রে কি লাভ হয়?

উপসংহারে আমার বিনীত নিবেদন, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহাই যে যথার্থ বা প্রামাণিক, আমি এমন স্পর্দ্ধা বা দাবী রাখি না। কিন্তু আপনাদের মত আয়ুর্ব্বেদ প্রবীন সুধীগণের সম্মুখে আমার এই সামান্য প্রবন্ধ পাঠের অধিকার-গৌরব যখন লাভ করিয়াছি, তখন আপনাদের নিকট এ বিষয়ের সমালোচনা ও বিচারের দাবী করিয়া এবং এই বিষয়ে যথার্থ সিদ্ধান্ত স্থাপন—অন্ততঃ রীতিমত আলোচনার সূত্রপাত করিয়া আপনারা আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির এই সামান্য প্রবন্ধের ও সার্থকতা সম্পাদন করিবেন—এমন স্পর্দ্ধাও করিব এবং আপনাদের উপর এই দাবী ও এই স্পর্দ্ধা করিবার অধিকারে বঞ্চিত হইব না—এই আশা লইয়া অদ্য এই স্থানেই অবসর গ্রহণ করিতেছি। *

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত,
কাব্যতীর্থ কবিরত্ন।

---

* ভ্রম সংশোধন।

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশে দুইটী গুরুতর মুদ্রাকর প্রমাদ ঘটিয়াছে। (১) ৩৯৮ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের চতুর্থ এবং পঞ্চম পংক্তিতে “...প্রমাণ প্রত্যক্ষ ...” এইরূপ বিপর্য্যস্তভাবে মুদ্রিত হইয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে “প্রত্যক্ষ প্রমাণ” হইবে। (২) ঐ পৃষ্ঠার টিপ্পনীতে উদ্ধৃত ন্যায়সূত্রের বাৎস্যায়ণ ভাষ্যের “ইত্যাপ্তঃ” (টীপ্পনীর ষষ্ঠ পংক্তি) এই অংশের পর “ঋষ্যার্য্যম্লেচ্ছানাং সমানং লক্ষণম্” এই কথাগুলি সন্নিবিষ্ট হয় নাই। তজ্জন্য আমি পাঠকগণের নিকট লজ্জিত আছি।

—লেখক

মাধবের পঞ্চনিদান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য।

—:*:—

মাধবকৃত রুগ্বিনিশ্চয় গ্রন্থের যে অংশ সাধারণের নিকট পঞ্চ নিদান নামে সুপরিচিত, তাহা মহামতি বাগ্‌ভট প্রণীত অষ্টাঙ্গ হৃদয়ের নিদান স্থানের প্রথম অধ্যায় হইতে সংগৃহীত। কেবল মঙ্গলাচরণ ছাড়া অবশিষ্ট শ্লোক গুলি মাধব অবিকল যেমন বাগ্‌ভট হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, বাগ্‌ভট তেমনি চরক সংহিতাকে মূল করিয়া চরকের গদ্যাংশ পদ্যে—শ্লোকাকারে অনুবাদ করিয়াছেন। চরকসংহিতায় এই অংশের কোন বিশেষ নাম নাই;—বাগ্‌ভট কিন্তু ইহার নামকরণ করিয়াছেন—"সর্ব্বরোগনিদানম্"। জানি না মূল গ্রন্থে—"সর্ব্বরোগ নিদান" এই শব্দটি ব্যবহৃত হইলেও মাধবনিদানে কেন ইহা পঞ্চ নিদান" নামে সমাখ্যাত? যদিও আত্রেয় সম্প্রদায়ের চিকিৎসকগণ রোগবিজ্ঞানের উপায় সংখ্যায় পাঁচটি মাত্র এইরূপ অবধারণ করিয়া থাকেন, কিন্তু ধন্বন্তরি সম্প্রদায়ের মতে, কেবল পাঁচটিই যে রোগ বিজ্ঞানের উপায়, তাহা নহে—আত্রেয়াদি মুনিগণের মতে—

নিদানং পূর্ব্বরূপাণি রূপাণ্যুপশয় স্তথা।
সম্প্রাপ্তিশ্চেতি বিজ্ঞানং রোগাণাং
পঞ্চধাস্মৃতম্॥

কিন্তু ধন্বন্তরি সম্প্রদায় বলেন—

সঞ্চয়ঞ্চ প্রকোপঞ্চ প্রসরং স্থানসংশ্রয়ম্।
ব্যক্তি ভেদঞ্চ যো বেত্তি রোগাণাং
সভবেত্তিষক্॥

অর্থাৎ নিদান, পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপশয়, সম্প্রাপ্তি—যেমন একদিকে রোগ-বিজ্ঞানের উপায় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, সেইরূপ অন্য দিকে আমরা দেখিতে পাই—

সঞ্চয়, প্রকোপ, প্রসর, স্থানসংশ্রয়, ব্যক্তি ভেদ—এই ছয়টিও রোগ বিজ্ঞানের উপায়। সুশ্রুত সংহিতায় ব্রণ প্রশ্নাধ্যায়ে এই শ্লোকটি পঠিত হইয়াছে। সুশ্রুত শল্যতন্ত্র, সুতরাং ব্রণের বিজ্ঞান ইহার লক্ষ্যবস্তু; সেইজন্য ভেদ শব্দ ইহাতে ব্যবহৃত হইয়াছে। ব্রণের সঞ্চয়, প্রকোপ, প্রসর, স্থান সংশ্রয়, ব্যক্তি ভেদ—ইহার প্রধান আলোচ্য বিষয় হইলেও আমরা যখন এই ব্রণ প্রশ্নাধ্যায় মনোযোগের সহিত পাঠ করি, তখন দেখিতে পাই, ব্রণ বিজ্ঞান ইহার লক্ষ্য হইলেও সর্ব্বরোগ নিদানই এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, আত্রেয় সম্প্রদায়ের রোগ-বিজ্ঞানের তালিকা এবং ধন্বন্তরি সম্প্রদায়ের তালিকা সংখ্যায় এক নহে। সঞ্চয়, প্রকোপ, প্রসর ইহাতে অতিরিক্ত। প্রতীচ্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে যাহাকে Pathogenesis বলে—সঞ্চয় প্রকোপ প্রসর তাহাই—Generation and development of diseases। যদিও ইহা সত্য কথা যে, চিকিৎসক যে সময়ে রোগীর চিকিৎসার্থ আহূত হয়েন, সে সময়ে রোগ সঞ্চয়, প্রকোপ, প্রসরের সীমা বা ক্রিয়াকাল অতিক্রম করিয়া স্থানসংশ্রয়ে পর্য্যবসিত হয় এবং এই সময় বা এই অবস্থা হইতে চিকিৎসক রোগ বিনিশ্চয়ার্থ নিদানাদি বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন, সুতরাং তাঁহাকে

নিদান, পূর্ব্বরূপ, রূপ, সম্প্রাপ্তি ও উপশয় এই—পঞ্চধা উপায় অবলম্বন করিয়া রোগ বিনির্ণয় করিতে হয়, কিন্তু তা' বলিয়া রোগের সঞ্চয়, প্রকোপ, প্রসর—এই আদ্য অবস্থাত্রয় শল্যতন্ত্রের ব্রণ বিজ্ঞানেই হউক, আর কায়-চিকিৎসাধিকৃত জ্বরাদি রোগ বিজ্ঞানেই হউক, বিশেষতঃ ব্রণবিজ্ঞানে একবারেই উপেক্ষণীয় নহে—সর্ব্বরোগ নিদানাধিকারে ব্রণ ও যেমন বিচার্য্য বস্তু জ্বর ও তেমনি।

সুশ্রুত সংহিতার ব্রণ প্রশ্নাধ্যায় চিকিৎসা ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন,—ভগবান্ ধন্বন্তরির অক্ষয় কীর্ত্তি। যদি ভগবান্ ধন্বন্তরির এই অধ্যায়ধৃত অমূল্য উপদেশ সকল সুশ্রুত সংহিতায় লিপিবদ্ধ না থাকিত, তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের সহস্র সহস্র পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করিয়া আমরা সম্যকরূপে জানিতে পারিতাম না, বাতপিত্তশ্লেষ্মার প্রকৃত অর্থ কি?—কি করিয়া ত্রিধাতু অব্যাপন্ন হইয়া শরীর রক্ষা করে এবং ব্যাপন্ন হইয়া শরীরের পতন সংঘটন ও ব্যাধির সমুৎপত্তি ঘটায়।

প্রতীচ্য বিজ্ঞানের Pathology বর্ত্তমান সময়ে যে প্রণালীর অনুসরণ করিয়া চিকিৎসা বিজ্ঞান মঞ্চে সর্ব্বশ্রেষ্ঠাসন অধিকার করিয়া দণ্ডায়মান—একটু অনুসন্ধিৎসু হইয়া কেহ যদি চিন্তা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে দেখিবেন, ভগবান্ ধন্বন্তরি প্রোক্ত মহদুপদেশ ইহার প্রতি স্তরে অনুপ্রবিষ্ট,—প্রাচ্যের স্নিগ্ধালোকে প্রতীচ্য বিজ্ঞান কিরূপ মহিমান্বিত!

পূর্ব্বে বলিয়াছি মাধবে যাহা "পঞ্চনিদান" এই আখ্যায় আখ্যায়িত, মূল গ্রন্থ বাগ্‌ভটে তাহার নাম সর্ব্বরোগনিদান। চরক সংহিতায় কিন্তু আমরা দেখিতে পাই—এই অংশ জ্বর নিদানে পরিপঠিত। বাগ্‌ভটে সর্ব্বরোগ নিদান আগে, পরে জ্বর নিদান। সুতরাং স্বীকার্য্য "সর্ব্বরোগ নিদান" বাগ্‌ভটের স্বকৃত সংজ্ঞা। জ্বর নিদানে নিদানাদি-পঞ্চ রোগবিজ্ঞানে প্রকৃষ্ট উপায় এবং ইহাতে সঞ্চয়, প্রকোপ, প্রসরের উল্লেখ না থাকিলেও তত ক্ষতি হয় না, কিন্তু সর্ব্বরোগ নিদান বলিতে গিয়া ত্রিধাতু বা ত্রিদোষের কথা উল্লেখ না করা এবং সঞ্চয়, প্রকোপ, প্রসরের কথা একেবারেই না বলা—সকলেই স্বীকার করিবেন—বিড়ম্বনা মাত্র। বাগ্‌ভট চরকসংহিতার অনুসরণ বা অনুকরণে তাঁহার পঞ্চ নিদানের শ্লোক সকল পরিগঠন করিয়া শেষভাগে ত্রিদোষের পৃথক দ্বন্দ্ব ও সন্নিপাতের বিভাগ ও কারণ বর্ণনা করিয়া, শেষ একছত্রে মোটামুটি সঞ্চয় ও প্রসরের উল্লেখ করিয়া সর্ব্ব-রোগ নিদান শব্দের সার্থকতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু মাধব না এদিক না ওদিক—বাগ্‌ভটের শেষ ১১টি শ্লোক তিনি যেমন তাঁহার গ্রন্থে উদ্ধৃত করেন নাই, তেমনি সুশ্রুতের ব্রণ প্রশ্নাধ্যায় তাঁহার গ্রন্থে কিম্বা টীকাকার গণের টীকায় কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। সর্ব্বরোগনিদানে সঞ্চয়, প্রকোপ, প্রসর জানা যেমন প্রয়োজন, তেমনি জানা উচিত—পঞ্চনিদান যাহার একাঙ্গ উপশয় তাহা General Pathologyর অন্তর্ভুক্ত হইতেই পারে না। তাই বলিতেছি—পঞ্চনিদান নামের পরিবর্ত্তন আবশ্যক কি না এবিষয়ে সকলের পরামর্শ গ্রহণীয়।

লেখক—

আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য কবিরাজ গোস্বামী।

ব্যাধির অস্বাতন্ত্র্য আয়ুর্ব্বেদের মূলমন্ত্র।

—:০:—

স্থান ভেদে বিভিন্ন হইলেও কারণের দিক হইতে দেখিলে ব্যাধি মাত্রেই এক। ইংরাজীতে যাহাকে oneness of diseases বলে এক অর্থ তাহাই—অস্বতন্ত্র। ভগবান্ ধন্বন্তরির উপদেশ ও এইরূপ। তিনি বলিয়াছেন,—একই দোষ, স্থানসংশ্রয়ভেদে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া বিভিন্ন ব্যাধির রূপ প্রদর্শন করে। এই মতে পদাশ্রিত হইলে দোষ শ্লীপদের আকার ধারণ করে। সর্ব্বদেহ আশ্রয় করিলে জ্বরাদি জন্মায়। আয়ুর্ব্বেদের চিকিৎসা তাই দোষের চিকিৎসা——ব্যাধির চিকিৎসা নহে। দোষের বলাবলের উপর তাই আমাদের সম্প্রাপ্তিবিজ্ঞান। জ্বর যেমন বাতাদিরূপে পৃথক্, দ্বন্দ্ব, সান্নিপাতিক, অতিসারও সেইরূপ। কাস, যক্ষ্মা, হৃদ্রোগ—সমস্তই বাতাদিকে অতিক্রম করিয়া অবস্থিত নহে। দশমূল পাচনে বায়ুর শান্তি হয়; দশমূল সেই জন্য বাতজ্বরে, দশমূল সেইজন্য বাতব্যাধিতে, দশমূল সেইজন্য আমবাতে ব্যবহার্য্য। যেখানে বায়ুর প্রকোপ,—সেইখানেই বাতঘ্ন দশমূল—ঔষধ। জ্বরের চিকিৎসায়, যক্ষ্মার চিকিৎসায়, বাতের চিকিৎসায় ধাতু সব গুলিই আছে; শীসা হইতে স্বর্ণ পর্য্যন্ত—তবে—কম বেশী। Oneness of Disease আয়ুর্ব্বেদের Principle। ঔষধও তাই সর্ব্বত্রেই একরূপ। তাই ভগবান্ ধন্বন্তরি তাহার ব্রণ প্রশ্নাধ্যায়ে বলিয়াছেন—"তে যদোদর সন্নিবেশং কুর্ব্বন্তি তদা গুল্ম বিদ্রধি উদরাগ্নিসঙ্গানাহ বিসূচিকাতিসার প্রভৃতীন জনয়ন্তি।—

বস্তিগতাঃ প্রমেহাশ্মরী মূত্রাঘাতী মূত্রদোষ প্রভৃতীন্ * * * *
বৃষণাগতা বৃদ্ধীঃ * * *
সর্ব্বাঙ্গগতা জ্বর সর্ব্বাঙ্গরোগ প্রভৃতীন্।

ভবতি চাত্র—

কুপিতানাং হিদোষাণাং শরীরে পরিধাবতাং।
যত্র সঙ্গং স্ববৈগুণ্যাৎ ব্যাধি স্তত্রোপ জায়তে॥

(তত্র বর্ষন্তি মেঘবৎ)

যদি এই কথা প্রকৃত হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, ব্যাধির বিভিন্নতা নাই। ব্যাধি কতকগুলি রূপের ও লক্ষণের সমষ্টিমাত্র। জ্বরাদির স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নাই। বৈষম্যই ব্যাধি। সাম্য ও বৈষম্য তাই আয়ুর্ব্বেদের মূলমন্ত্র। ত্রিধাতুর সাম্য এবং তজ্জনিত ক্রিয়া আয়ুর্ব্বেদের Physiology। ত্রিধাতুর বৈষম্য এবং তজ্জনিত ক্রিয়া ইহার Pathological Physiology বা Pathology। সঞ্চয়, প্রকোপ, প্রসর ইহার Pathogenesis। স্থান, সংশ্রয় ইহার Morbid Anatomy; পূর্ব্বরূপ রূপ ইহার Symptoms। ডাক্তারেরা Symptomsকে কোন শ্রেণী বিশেষে বিভাগ করেন না, বা করিতে জানেন না। এবিষয়ে একমাত্র আয়ুর্ব্বেদই জগতে আদর্শস্থানীয়। ঘর্ম্ম ছর্দ্দি হয় কেন? এ প্রশ্নের উত্তর কেবল আয়ুর্ব্বেদই তাঁহায় ত্রিধাতুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া দিতে সমর্থ। দোষের অংশাংশ কল্পনা ও বলাবল আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসায় সিদ্ধি আনিয়া দেয়।" যে চিকিৎসক এই বলাবল ও

অংশাংশ কল্পনায় সিদ্ধহস্ত তিনি চিকিৎসা-সংগ্রামে বিজয়ী।

আয়ুর্ব্বেদ বলিয়াছেন, ব্যাধির নাম নির্দ্দেশ করিতে না পারিলেও চিকিৎসকের লজ্জিত হইবার কারণ নাই। ত্রিদোষের প্রকোপ বুঝিলেই যথেষ্ট, এ কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। হাড় কোথায় উচু নীচু, কোথায় কোন্ শির কি ভাবে গিয়াছে, ইহা শল্যতন্ত্রের আলোচনা-বিষয়। কায়-চিকিৎসক কেবল ত্রিধাতুর সাম্য বৈষম্য মনশ্চক্ষুতে পরিদর্শন করিয়া, ইহার সঞ্চয়-প্রকোপ-প্রসরাদি জানিয়া, সংগ্রামজয়ী হইতে পারেন। পারেন যে—তাহার মূলমন্ত্র এই *Oneness of Diseases.*

লেখক—
আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য কবিরাজ গোস্বামী।

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কা ঔষধ। *

'টাকে'র ঔষধ।—(১) কুঁচের মূল বা কুঁচ ফল গুঁড়া করিয়া মধুর সহিত মিশাইয়া 'টাকে' প্রলেপ দিলে চুল গজাইয়া থাকে। (২) হাতীর দাঁত পুড়াইয়া, রসাঞ্জনের সহিত মিশাইয়া মধুসহ 'টাকে' প্রলেপ দিলে মস্তকের চুল গজাইয়া থাকে।

মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করিবার উপায়।—(১) শিমূল কাঁটা বাটিয়া মুখে লাগাইলে মুখের বর্ণ উজ্জ্বল হইয়া থাকে। (২) মসুর দাল ঘৃতে ভাজিয়া এবং দুগ্ধের সহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে মুখের বর্ণ উজ্জ্বল হয়।

মেচেতা রোগের যোগ। (১) কুল আঁটির শাঁস, নবনী, মধু ও গুড় একত্র লেপন করিলে মেচেতা রোগ ভাল হইয়া থাকে। (২) জায়ফল বাটিয়া প্রলেপ দিলে মেচেতা রোগ আরোগ্য হয়।

দন্তশূলে সুব্যবস্থা।—অর্দ্ধভরি পিপুলের গুঁড়া, এক ভরি গব্যঘৃত এবং দুই ভরি মধু একত্র মিশাইয়া মুখে ধারণ করিলে দন্তশূলের উপশম হয়।

কর্ণশূলে ব্যবস্থা।—(১) কয়েদবেলের শাঁস গরম করিয়া কর্ণবিবরে প্রদান করিলে কর্ণশূলের শান্তি হইয়া থাকে। (২) ছোলঙ্গ লেবুর রস গরম করিয়া কর্ণবিবরে প্রদান করিলে কর্ণশূলের যন্ত্রণা নিবারিত হয়। (৩) আদার রস গরম করিয়া কর্ণমধ্যে কিয়ৎকাল রাখিলে কর্ণশূলের যন্ত্রণা নিবৃত্তি হয়। (৪) রসুন কিম্বা সজিনাছালের রস গরম করিয়া কর্ণমধ্যে রাখিলে কর্ণশূলের যন্ত্রণা দূর

---

* কোন চিকিৎসক পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ এবং টোট্‌কা সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া পাঠাইলে, তাহা আমরা সাদরে পত্রস্থ করিব, তবে সেই সকল মুষ্টিযোগ এবং টোট্‌কা তাঁহার নিজের পরীক্ষিত হওয়া চাই।
আঃ সঃ।

হইয়া থাকে। (৫) কলার মাজের রস গরম করিয়া কর্ণবিবরে রাখিলে কর্ণশূলের যন্ত্রণার শান্তি হইয়া থাকে।

পাথুরির ঔষধ।—(১) গোক্ষুর বীজের গুঁড়া, মধু এবং ছাগ দুগ্ধ একত্র পান করিলে পাথুরি রোগে উপকার হয়। (২) রাখালশশার মূল ও তালমূলী একত্র বাসি জলের সহিত বাটিয়া সেবন করিলে পাথুরী রোগে উপকার হয়। (৩) নারিকেলের মূল এবং যবক্ষার একত্র জল দ্বারা বাটিয়া সেবন করিলে পাথুরিরোগে উপকার পাওয়া যায়।

প্রমেহে টোট্‌কা।—(১) পলাশ ফুল এক ভরি এবং অর্দ্ধভরি চিনি শীতল জলের সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে প্রমেহরোগে উপকার পাওয়া যায়। (২) জলপূর্ণ একটি নারিকেলের মধ্যে কিঞ্চিৎ ফটকিরির চূর্ণ গুলিয়া মুখ বন্ধ করিয়া এক রাত্রি কাদার মধ্যে পুতিয়া রাখিবে। প্রাতঃকালে সেই জল বারম্বার পান করিলে বহু দিনের মেহ রোগের কষ্ট নিবারিত হয়। (৩) দুগ্ধ এবং শতমূলীর রস একত্র সেবন করিলে প্রমেহের শান্তি হইয়া থাকে। (৪) কণ্টকারির শিকড় বাটিয়া মিছরির সরবতের সহিত পান করিলে প্রমেহের শান্তি হইয়া থাকে।

আগুনে পুড়িয়া ঘা হইলে ব্যবস্থা।—(১) তিল এবং যব ভস্ম সমান ভাগে লইয়া প্রলেপ দিলে অগ্নিদগ্ধ স্থানের ক্ষত আরোগ্য হয়। (২) তিলের তৈল আর যব ভস্ম একত্র মিশাইয়া প্রলেপ দিলে এরূপ ক্ষতের উপশম হয়। (৩) যব এবং যবচূর্ণ একত্র মিশাইয়া প্রলেপ দিলে জ্বালার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। (৪) পাকা তেঁতুল গুলিয়া লেপ দিলে অগ্নিদগ্ধ ক্ষতের উপশম হইয়া থাকে। (৫) গোল আলু বাটিয়া অগ্নিদগ্ধ স্থানে প্রদান করিলে যন্ত্রণায় আশু নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

তামাকের অপকারিতা।

পূর্ব্ব সংখ্যায় "তামাকের ইতিবৃত্ত' নামক প্রবন্ধে উহার অনিষ্টকারিতার বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে। এক্ষণে ইহার বিশদ বিবরণ জন্য ডাঃ কিলগের মন্তব্য হইতে নিম্নলিখিত কতিপয় বিষয় উদ্ধৃত করিতেছি,—

রক্তের উপর তামাকের ক্রিয়া।—যে কোন প্রকারে তামাক সেবন করা হউক না কেন, অর্থাৎ কলিকায় সাজিয়া, হুঁকা-গড়গড়া দ্বারা, বিড়ি-চুরুট ও সিগারেট আকারে বা পাইপ দ্বারা গুঁড়া তামাক সাজিয়া ধূমপান বা নস্য গ্রহণ বা দোক্তা ভক্ষণ—সকল প্রকারেই এই তামাকের বিষ সত্বর রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। ইহা দ্বারা রক্তের যে কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে, ডাঃ রিচার্ডসন্ তাহার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—"বহুকাল তামাকের ঘ্রাণ লইলে রক্তের যে পরিবর্ত্তন হয়, তাহা সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া

যায়। ইহা স্বাভাবিক অপেক্ষা তরল হয় এবং কঠিন স্থলে ইহার রক্তিমাভ হ্রাস হয়। কোন কোন স্থলে রক্তের এই প্রকার বর্ণ-তারল্য সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া বর্হিত্বক পীতাভ-শ্বেতবর্ণ ও স্ফীত হয়। রক্তের তারল্য বশতঃ ইহার স্রাব অতি সহজেই হয় এবং কর্ত্তিত স্থান প্রভৃতি হইতে বহুক্ষণ রক্ত নির্গত হয়, ঔষধ সেবনেও সহজে বন্ধ হয় না। মনুষ্য-শোণিতে অসংখ্য রক্তকণিকা থাকে, উহাদের আকৃতি গোলাকার, উভয় দিক খাল, ধারগুলি পরিস্কার। তামাকের ধূম রক্তে শোষিত হইয়া সত্বর এই সকল রক্ত-কণিকাগুলির গঠনের পরিবর্ত্তন হয়। গোলাকারের পরিবর্ত্তে ডিম্বাকৃতি ও ধারগুলি অপরিস্কার হইয়া থাকে এবং সুস্থাবস্থার ন্যায় রক্ত-কণিকাগুলি ঘনীভূত না থাকিয়া ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে এবং দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই রক্ত দুর্ব্বল শরীর হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।"

তামাক যে কেবল রক্তের হীনতা ও বিষক্রিয়া সাধন করে এবং তাহার ফলে রক্ত-কণিকাগুলির দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়,—এমন নহে. ইহা হইতে স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ারও যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে।

এইরূপে তামাকের দ্বারা রক্তের হীনতা সাধিত হইয়া, শরীরের রোগ-প্রতিরোধিণী-শক্তি কমিয়া যায়; সুতরাং সেই অবস্থায় সহজেই রোগ জন্মিতে পারে।

তামাক ব্যবহারের অপকারিতা সকল বয়সেই প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু পূর্ণবয়সের পূর্ব্বে বা বাল্যাবস্থায় ইহার অপকারিতা আরও বেশী। ইহা দ্বারা শরীরের বর্দ্ধন-শক্তির হ্রাস, অকাল-বার্দ্ধক্য ও দৈহিক-দৌর্ব্বল্য উৎপন্ন হয়।

ভারতবর্ষের জনৈক ইংরাজ কর্ম্মচারী বর্ণনা করিয়াছেন যে, কোন অভিযাত্রায় ১১ জন কর্ম্মচারী প্রেরিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ২ জন মাত্র সুস্থ শরীরে ফিরিয়া আসে। সেই ২ জন তামাক সেবন করিতেন না।

ধূমপায়ীদের গলক্ষত

(Smoke's Sorethroat)—ধূমপায়ীদের মুখগহ্বর ও গলাভ্যন্তরস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি সমূহের যে আরক্তিম ও শুষ্কতা সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয়, উহা বিষধর্ম্মী-তাম্রকূট পত্রের উত্তপ্ত ধূম জনিত উত্তেজনার ফল। ধূমপান পুরাতন গলক্ষতের একটী সাধারণ কারণ; সেই জন্য পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে Smokers Sore throat বা ধূমপায়ীদের গলক্ষত বলিয়া একটী স্বতন্ত্র রোগের নাম করণ হইয়াছে। কোন কোন ধূমপায়ী গলরোগ শান্তির ভাণ করিয়া, তামাকের ধূমপান করেন; কিন্তু ইহা তাঁহাদিগের কেবল ভ্রান্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে, কারণ তামাকে গলক্ষত রোগ আরোগ্য হয় না, ইহা দ্বারা কথন কথন স্থানীয় উত্তেজনার উপশম হয় মাত্র, কিন্তু ফলে ইহা হইতে রোগ প্রায়ই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে দেখা যায়।

তামাক ও ক্ষয়রোগ।—

অবিশুদ্ধ বায়ু ফুসফুসের পীড়া সমূহের একটী কারণ। শ্বাস দ্বারা অবিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণ ক্ষয়কাশের একটী প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রক্ত ও ফুসফুসের উপর বায়ু মধ্যস্থ বিষধর্ম্মী পদার্থ সমূহের বিষক্রিয়া দ্বারা এই রোগ উৎপন্ন হয়। এমন কি, রক্তের যে সকল দূষিত পদার্থ আমাদের প্রশ্বাস-বায়ু দ্বার পরিত্যক্ত হয়, উহা শ্বাস দ্বারা পুনর্গ্রহণও নিরাপদ নহে। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে

যে, নিকোটিন্ মিশ্রিত উষ্ণ ধূম দ্বারা ফুস্‌ফুস্ যন্ত্র প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা করিয়া পূর্ণ করাও ক্ষয়রোগের একটী প্রধানতম কারণ—পরিদর্শন দ্বারা ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে। লণ্ডনের মেট্রোপলিটান ফ্রি হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক ডাক্তার সি আর, ড্রাইস্‌ডেল পাবলিক 'হেল্‌থ' নামক পত্রে একটী প্রবন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন যে,—বাল্যাবস্থায় বা পূর্ণবয়সের পূর্ব্বে ধূমপান-অভ্যাস ক্ষয় রোগের একটী কারণ।

তামাক হৃদ্‌রোগেরও একটী কারণ।—নাড়ী হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার পরিচায়ক। হৃৎপিণ্ডের উপর তামাকের বিষক্রিয়া নাড়ী-পরীক্ষা দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। তামাক সেবন করার অব্যবহিতকাল পরেই কাহারও নাড়ী-পরীক্ষা করিলে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, হৃৎপিণ্ড কিয়ৎ পরিমাণে অবশ হইয়াছে এবং উহার বেগ ও ক্ষমতা হ্রাস পাইয়াছে। পুরাতন ধূমপায়ীদের মধ্যে হৃৎকম্পন বা বুক ধড়ফড়ানি, সবিচ্ছেদ নাড়ী, হৃদয়ের স্নায়ুশূল ব্যথা ও হৃদ্‌রোগের অন্যান্য লক্ষণ সমূহ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

যাঁহারা কেবল বৎসর কয়েক মাত্র এই অভ্যাস আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কতক লোকের এই সব লক্ষণ দেখা যায়না, কিন্তু ক্রমশঃ বহুকাল সেবন করিতে করিতে একে একে উপরোক্ত লক্ষণাবলী প্রকাশ পাইতে থাকে। তালিকা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, ধূমপায়ীদের প্রত্যেক চতুর্থ ব্যক্তির এই সব লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ চারিজন ধূমপায়ীর মধ্যে অন্ততঃ একজনের এই সব লক্ষণ দেখা যায়। ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, তামাক ব্যবহারে যে কেবল হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার ব্যত্যয় হয় তাহা নহে, ইহার ফলে যান্ত্রিক পীড়াও উৎপন্ন হইতে পারে।

তামাক ও অজীর্ণ রোগ।—কেহ কেহ তামাককে অজীর্ণ রোগের মহৌষধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু শত শত স্থলে পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, ইহা দ্বারা অজীর্ণরোগ আদৌ আরোগ্য হয়না, বরং অনেক স্থলেই ইহা অজীর্ণের কারণ হইয়া থাকে। তামাক একটী অবসাদক মাদক। এই শ্রেণীস্থ মাদক সাধারণতঃ পাকাশয়ের ক্রিয়ার কার্য্যকরী-শক্তি নষ্ট করিয়া আমাশয়িক রসের স্রাবাল্পতা ঘটায়। তামাকের এই গুণ অত্যন্ত প্রবল। তামাক সেবনকারী তামাক বা অন্য কোন মাদক সেবনে ক্ষুন্নিবৃত্তি সাধন করিতে পারে। ইহা দ্বারা আহারেচ্ছা দমন হয় বটে, কিন্তু খাদ্য দ্বারা দেহস্থ যে অভাব পরিপূরণ হইত, সে অভাব মোচন হয় না। তামাকের এই অবসাদক-শক্তিদ্বারাই পরিপাক-ক্রিয়ার বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। নস্য গ্রহণেও ক্ষুধামান্দ্য হয়। ইহা দ্বারা নাসাভ্যন্তরস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিসমূহ উত্তেজিত হয় এবং সহানুভূতিজনক স্নায়ুর ক্রিয়ায় পরে আমাশয় ও আক্রান্ত হয়।

যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে ধূমপান, নস্য গ্রহণ বা দোক্তা চর্ব্বণ করেন,—তাঁহার ক্ষুধামান্দ্য বা অজীর্ণরোগ হইবেই হইবে। এইরূপে পরিপাকশক্তির হ্রাস হইয়া ক্রমশঃ শরীর শীর্ণ ও মাংসহীন হইয়া যায়। অতি স্থূলকায় ব্যক্তিকে দোক্তা খাইয়া অল্পকাল মধ্যে শীর্ণ হইতে দেখা গিয়াছে। যাঁহারা অত্যধিক তামাক সেবন করেন, তাঁহারা অজীর্ণরোগে আক্রান্ত

হইলে, তাঁহাদিগকে তামাক ত্যাগ না করাইয়া কেবল ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করা দুঃসাধ্য।

তামাক ও ক্যান্সার বা কর্কট ঘা।—তামাক সেবন এই ভয়াবহ রোগের একটী নিঃসন্দেহ কারণ। খ্যাতনামা অস্ত্র-চিকিৎসক সকলেই বলেন যে, অধর ও জিহ্বায় ধূমপানজনিত কর্কট ঘা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা (Smoker's Cancer) স্মোকার্স ক্যান্সার নামে অভিহিত হইয়াছে। লণ্ডন নগরের ক্যান্সার হাসপাতালের রোগী-সংখ্যার তালিকা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যদিও তথায় স্ত্রীরোগীর সংখ্যা পুরুষের পাঁচগুণ, তথাপি অধর ও জিহ্বার ক্যান্সার্ পুরুষদের মধ্যে অধিক অর্থাৎ স্ত্রীলোকের তিনগুণ। ইহার কারণ পুরুষদের মধ্যে ধূমপান অধিক প্রচলিত।

তামাকজনিত পক্ষাঘাত।—এক প্রকার পক্ষাঘাত বা অবশতা রোগ দেখিতে পাওয়া যায়, উহাতে ক্রমে ক্রমে মাংসপেশীর ক্ষমতা হ্রাস ও ক্ষয় হয়। গত ৪০।৪৫ বৎসর ধরিয়া এই রোগের অধিক প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। তামাক ব্যবহারের বৃদ্ধিই এই রোগ-বৃদ্ধির কারণবলিয়া অনুমিত হইয়াছে। কারণ এই রোগ অধিকাংশ স্থলে তামাক সেবনকারীদের ভিতর দেখা যায়।

তামাক সেবনে অক্ষিস্নায়ুর এক প্রকার ক্রমিক অবশতা হয়। উহাতে দৃষ্টি হ্রাস হইয়া ক্রমে ক্রমে একেবারে দৃষ্টিহীন হয়। চক্ষু-চিকিৎসকেরা এই রোগকে টোব্যাকো এমোরসিস্ বা টোব্যাকো ব্লাইণ্ডনেস্ অর্থাৎ তামাক জনিত অন্ধত্ব বলেন। এই রোগ তামাক ত্যাগ করিলে সারিয়া যায়, কিন্তু তামাক না ছাড়িলে আরোগ্য হয় না। আয়র্লণ্ডে এই রোগের প্রাদুর্ভাব অত্যধিক, কারণ তথাকার অধিবাসীরা অতি উগ্র তামাক ব্যবহার করেন। ধূমপান এবং দোক্তা চর্ব্বণ—উভয় কারণেই এই রোগ হয়।

বর্ণান্ধতা নামক এক প্রকার রোগ আছে। এই রোগে আক্রান্ত হইলে কোন পদার্থের প্রকৃত বর্ণ রোগীর বোধগম্য হয় না। বেলজিয়ম ও জর্ম্মনিতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। ইহার তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য বেলজিয়াম্ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত জনৈক খ্যাতনামা বেলজিয়াম্-চিকিৎসক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তামাকের বহুল প্রচলনই ইহার কারণ। পরে অন্যান্য চিকিৎসকেরাও তাঁহার এই মতের অনুমোদন করিয়াছেন।

তামাক স্নায়ুদৌর্ব্বল্যের কারণ।—তামাক সেবনকারীর মধ্যে স্নায়ুদৌর্ব্বল্য নানাপ্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ সহজেই চমকিয়া উঠে; কেহ অত্যন্ত উগ্র প্রকৃতি, কোপনস্বভাব ও কটুভাষী; কাহারও বা রাত্রে নিদ্রা হয় না; আবার কাহারও লিখিবার সময় হাত কাঁপিতে থাকে। আবার অনেক স্থলে তামাক ত্যাগ করিয়া এই সকল দোষাবলী অপসারিত হইতেও দেখা গিয়াছে। তামাক সেবনে প্রথমতঃ স্নায়ু সমূহের সাময়িক বলাধান বা শক্তিসাধন হয় বলিয়া অনুমান হয় বটে; কিন্তু এই অনুমান ভ্রমোৎপাদক মাত্র; শেষে দৌর্ব্বল্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বর্দ্ধিত হয়।

স্ত্রী ও শিশুগণের মধ্যে প্রায়ই নানারূপ স্নায়বিক বৈলক্ষণ্য দৃষ্টিগোচর হয়। ইহা তাহাদের কৈশোর-শরীরে ধূমপায়ী স্বামী বা পিতৃদেহ হইতে প্রাপ্ত তামাকের বিষের ফল।

ডাক্তার এল, জি; আলেকজাণ্ডার এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, স্নায়ু-দুর্ব্বল ব্যক্তি, স্নায়ুর ব্যথা, স্নায়ুশূল ও নানাপ্রকার স্নায়ুপীড়ার সংখ্যা অধুনা এত সত্বর বৃদ্ধি হইতেছে যে, এ সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণের মনসংযোগ আবশ্যক। তিনি বলেন যে, তামাক, সুরা ও অহিফেনের বহুল ব্যবহারই এই স্নায়ুরোগের প্রধানতম কারণ।

ফলতঃ ইহা নানাপ্রকারে সপ্রমাণিত হইয়াছে যে, পুরুষত্বহীনতা ও অন্যান্য স্নায়ুপীড়ার একটী প্রধান কারণ তামাক সেবন।

তামাক সেবনের কুলক্রমাগত পরিণাম।—যে সকল কু-অভ্যাসের কু-পরিণাম বংশানুক্রমে ভোগ হইয়া থাকে,তামাক সেবন তাহাদের কোনটী অপেক্ষা ন্যূন নহে। কোন প্রবল বলশালী ব্যক্তি আজীবন নির্ব্বিঘ্নে তামাক সেবন করিয়া মনে করিতে পারেন, তাঁহার কোন অনিষ্টই হইলনা; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তাঁহাব পুত্রেরা অমূল্য বল ও নীরোগ স্বাস্থ্য বস্তুরূপ পিতৃধনে বঞ্চিত হইয়া রোগপ্রবণ ও অকালজবাসঙ্কুল দেহ লইয়া অশান্তিতে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিল। যাঁহারা অতিমাত্রায় তামাক সেবন করেন, তাঁহারা সবল হইলে, তাঁহার পুত্রেরা পিতার ন্যায় সবল দেহ হন না; এবং ঐ পুত্রেরাও যদি তামাক অতি মাত্রায় ব্যবহাব করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পৌত্রেরা নিশ্চয়ই স্নায়ুদুর্ব্বল, ক্ষীণ ও রুগ্নদেহ হয়,—পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বহু পর্য্যালোচনা দ্বারা এই বিষয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

তামাক সেবনে মনোবৃত্তির ব্যত্যয়।—তামাক চরিত্রবল নষ্ট করে, চিত্তের দৃঢ়তা নষ্ট করিয়া চাঞ্চল্য উৎপাদন করে, বিবেককে একেবারে হীনবল করিয়া ফেলে এবং চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির সূক্ষ্মতা ধ্বংস করিয়া স্থূলতা সম্পাদন করে। যাঁহারা যৌবনের প্রারম্ভে তামাক সেবন অভ্যাস করেন অর্থাৎ যে সময় মানসিক বৃত্তি সকলের প্রথম বিকাশ আরম্ভ হয়—সেই সময় তামাক সেবন আরম্ভ করেন, তাঁহাদের মধ্যে উল্লিখিত দোষগুলি সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

নস্যগ্রহণের অপকারিতা।—নস্যদ্বারা অজীর্ণ ও ক্ষুধামান্দ্য রোগ জন্মিতে পারে, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত নাসাভ্যন্তরস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি ক্ষয় হয়, এবং তদ্‌গাত্রস্থ গন্ধবহা স্নায়ুসমূহ অরশ হইয়া পড়ে। এইরূপে ঘ্রাণশক্তির ক্রমশঃ হ্রাস হয়। বহুদিন নস্য ব্যবহারে অনুনাসিক বর্ণ সমূহের স্পষ্ট উচ্চারণ দুরূহ হইয়া পড়ে। প্রায়ই অনুনাসিক বর্ণ উচ্চারণ করিতে পারা যায় না। 'গঙ্গা'র পরিবর্ত্তে "গগ্‌গা" "কোন্নগর" এর পরিবর্ত্তে 'কোল্লগর' ইত্যাদি প্রকার উচ্চারণ হয়। নস্যের সহিত চূণ থাকায় নাসারন্ধ্রে ক্ষতও হয়।

তামাকের বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলা হইল। তামাকের সপক্ষেও দুই এক কথা কেহ কেহ বলেন, এক্ষণে সেই গুলির উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে, সুরার ন্যায় তামাকও শরীরের ক্ষয় নিবারণ করে। সুতরাং খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা কম হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। ইহা দ্বারা স্বাভাবিক স্রাব সমূহ কমিয়া যায় বলিয়া খাদ্যের প্রয়োজনীয়তাও কমিয়া যায়। সে কারণ ইহাকে খাদ্য স্থানীয় করা যাইতে পারে না। নাইট্রিক্ এসিড, পারদ প্রভৃতি দ্রব্য ব্যবহারে যেরূপ শরীরে

ভ্যন্তরস্থ স্রাব কমিয়া থাকে, অলসতার সহচর হইলে যেরূপ ঐ স্রাব কমিয়া থাকে,—ম্যালেরিয়া বিষে শরীর আক্রান্ত হইলেও ঐ স্রাব যেরূপ কমিয়া থাকে, তামাক সেবনের ফলেও দেহাভ্যন্তরস্থ স্রাবাল্পতা সেইরূপ। কিন্তু স্রাব কম হওয়া আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অহিতকর ভিন্ন হিতকারী নহে। যকৃতের ক্রিয়াহীনতা, অর্থাৎ পিত্তনিঃসরণের স্বল্পতা, চর্ম্মের ক্রিয়াহীনতা অর্থাৎ স্বেদনিঃসরণের হ্রাসতা, মূত্রগ্রন্থির ক্রিয়া-ব্যত্যয়, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি দ্বারা যে স্বাভাবিক স্রাব কমিয়া যায়, তাহাতে মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষের ব্যাঘাতই ঘটিয়া থাকে এবং এই সকল ব্যাধি তামাকসেবনের ফল।

আবার কেহ কেহ বলেন যে, অতিরিক্ত সাময়িক শ্রমের পর যখন মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলী উত্তেজিত হয়, তখন তামাক সেবনে মস্তিষ্ক শীতল হয় ও সুনিদ্রা হয়। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। তামাক দ্বারা ইহার বিপরীত ফলই ফলিয়া থাকে।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, যে তামাক সভ্যজগতে বহু প্রচলিত হইয়াছে, যে তামাক সভ্যজাতীর আদরের সামগ্রী হইয়াছে, যে তামাক বৈঠকী-মজলিসে ভদ্রতা ও সম্ভ্রম রক্ষা করিতেছে, যে তামাক অভ্যাগতের যথোচিত সম্ভাষণ প্রকাশ করিতেছে, যে তামাককে আমরা বিশ্রামের সহচর ও সন্তাপের শান্তিদায়ক মনে করিয়া সমাদর করি ও যাহাকে চিরসঙ্গী করিয়া রাখিয়াছি, সেই তামাক যে-আমাদের গুপ্তশত্রু, আমাদের প্রাণহন্তা, আমাদের স্বাস্থ্যহানীর মূল, আমাদের রোগ-ভোগের কারণ, এবং সুখ-শান্তির প্রধান প্রতিবন্ধক, তাহা যদি এই প্রবন্ধ পাঠে পাঠকগণের উপলব্ধি হয়, এবং তাঁহাদের মধ্যে একজনও যদি এই গুপ্তশত্রুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে প্রবন্ধ লেখকের শ্রম সফল হইবে।

ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস।

আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসার মূল সূত্র।

(২)

—:০:—

অগ্নিদগ্ধ স্থানে অগ্নির উত্তাপ।—

আপাত-বুদ্ধিতে বোধ হয় শৈত্য, সংযোগে অগ্নি দাহের উপশম হইতে পারে, অতএব দগ্ধ স্থানে শীতল জল সেচন করাই উচিত। বস্তুতঃ ঐরূপ শীত-প্রক্রিয়ায় উপকার না হইয়া অপকারই ঘটে। কারণ শীতল জল স্বাভাবিক-সঙ্কোচন-শক্তি বশতঃ দগ্ধ স্থানে রক্ত জমাট করিয়া থাকে, পরে ঘনীভূত রক্ত পাক প্রবল হইয়া পড়ে, কিন্তু দগ্ধস্থানে অগ্নির তাপ লাগাইলে তাপের সঞ্চালন শক্তি বশতঃ রক্ত চতুর্দ্দিকে সঞ্চালিত হয়, জমাট বাধিতে পারে না। সুতরাং পাকিবারও আশঙ্কা থাকে না। অধিকন্তু আভ্যন্তরিক-প্রক্রিয়া চিন্তা করিয়া দেখিলে এ তাপও হেতু বিপরীত ঔষধ বলিয়াই নির্দ্ধারিত হইবে।

বিষে বিষ ক্ষয়।—ইহা হইবার তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত বিষের নাশক যেমন স্থাবর মৌল জঙ্গম বিষের ঔষধ; তেমনি জঙ্গম বিষ স্থাবর মৌল বিষের ঔষধ, কেন না উভয় প্রকার বিষ, বিষগত বিষয়ে এক হইলেও বস্তুগত্যা পরস্পর-বিরোধী ক্রিয়াশীল। জঙ্গম বীষ উর্দ্ধগামী, এবং স্থাবর বিষ অধোগামী, ঈদৃশ বিপরীত ক্রিয়াকারী বলিয়া হেতু বিপরীত ঔষধের মধ্যে বলিয়া ধর্ত্তব্য।

মদ্যপান জনিত মদাত্যয় রোগে মদ্যপান।—টীকাকারগণ এই উদাহরণে দুইটী উপপত্তির উল্লেখ করিয়াছেন; প্রথম উপপত্তি—মদ্য মাত্রই সদৃশ গুণযুক্ত এমন কথা হইতে পারে না, কোন মদ্য রুক্ষ, কোন মদ্য বা স্নিগ্ধ ইত্যাদি, সুতরাং কোন মদ্যের সহিত কোন মদ্যের বিরোধিতাও অবশ্যই আছে। অতএব রুক্ষ মদ্যপান করিয়া যাহার পীড়া হইয়াছে তাহাকে স্নিগ্ধ মদ্য পান করাইবে। এইরূপ স্নিগ্ধ মদ্য পানে যাহার পীড়া হইয়াছে, তাহাকে রুক্ষ মদ্য পান করিতে দিবে। কাজেই এবম্বিধ ব্যবহার-কার্য্যও হেতু বিরোধী হইল। দ্বিতীয় উপপত্তি এই যে, যে স্থলে কোনরূপ দ্রব্যান্তরের সহিত ঐ মদ্যের বিপরীত ক্রিয়া আনয়ন করিয়া হেতু-বিরোধী করিয়াই লইতেছে, সুতরাং উহা হেতু-বিপরীত ঔষধের মধ্যেই গণ্য হইল।

ব্যায়াম জনিত বাত রোগীর জল সন্তরণরূপ ব্যায়াম।—যেরূপ কুম্ভকারের পয়োনস্ত অগ্নি, উপরিস্থিত মৃত্তিকালেপের আবরণে সংবৃত থাকায়, অভ্যন্তরে পিণ্ডীকৃত হইয়া সমধিক প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ সন্তরণকারী ব্যক্তির আভ্যন্তরিক তাপ-জলের শৈত্য ক্রিয়া বশতঃ লোমকূপ পথে বহির্গত হইতে না পারিয়া অভ্যন্তরে সঞ্চিত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সেই তাপের সহায়তায় মেদ ও শ্লেষ্মা গলিত হয়, তৎসহকারে সন্তরণ শ্রমোৎপন্ন বায়ু পূর্ব্ব সঞ্চিত বাতকে স্বস্থানে আনয়ন করে, সুতরাং বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাও হেতু-বিপরীত ঔষধের মধ্যেই পরিগণিত হইল। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, এই বিপরীতার্থকারী ঔষধ আভ্যন্তরিক-ক্রিয়া প্রভৃতির কারণ বশতঃ বিপরীত ঔষধ বলিয়াই গণ্য হইল, তাহা হইলেই উহাকে পৃথক শ্রেণীভুক্ত করিবার তাৎপর্য্য কি? এবং (সদৃশ ঔষধ) নাম করণ করিবারই বা সার্থকতা কোথায়? আমরা এ স্থলে টীকাকারগণের ব্যাখ্যা বিবৃত মর্ম্মানুবাদ করিয়া দিতেছি। যদিও বিপরীতার্থকারী ঔষধ প্রকৃত প্রস্তাবে বিপরীত ঔষধেরই অন্তর্নিবিষ্ট, তথাপি উক্ত ঔষধে ধর্ম্মগত আংশিক বৈলক্ষণ্য দেখাইবার জন্য পৃথক্ শ্রেণীতে গণনা করা হইয়াছে। যদি বল, বৈলক্ষণ্য কি? আপাততঃ সমধর্ম্মী বা সদৃশ বলিয়া প্রতীয়মান হওয়াই বৈলক্ষণ্য।

পূর্ব্বে যে হেতু-বিরোধী, ব্যাধি বিরোধীও উভয় বিরোধী ঔষধের উল্লেখ করা হইয়াছে, ঐ সমস্ত ঔষধ যথেচ্ছাভাবে অর্থাৎ যে স্থানে যেমন ইচ্ছা হইল—তদনুসারে প্রয়োগ করিলেই চিকিৎসার সুফল হইতে পারে না। ইহাতে অনেক বিচার ও বিতর্ক করা চাই। ইহাদের প্রয়োগের স্থল সকলও ভিন্ন ভিন্ন রূপ। সেই সকল বিষয় ও ক্ষেত্র প্রণিধান পূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করাই সুচিকিৎসকের কর্ত্তব্য। আজ কাল আমাদের

দেশে যে ভাবে বৈদ্য-চিকিৎসা চলিতেছে, অধিকাংশ বৈদ্য যে হিসাবে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহার আভ্যন্তরীণ বিবরণ অনুসন্ধান করিলে হতশ্রদ্ধ হইতে হয়। শাস্ত্রের প্রকৃত আলোচনার অভাবে উহার অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য লুপ্ত হওয়ায় "ঢেলামারা চিকিৎসার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র পূর্ণ-বিজ্ঞানময় হইয়াও ব্যবহার-দোষে প্রায় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে, এবং তাহা দেখিয়া প্রতিযোগী চিকিৎসকগণ অসার ও অপদার্থ বলিয়া উপহাস করিতেছেন। সুতরাং ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? যতদিন দেশীয় চিকিৎসকগণ শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্যের সম্মাননা না করিতেছেন, প্রকৃত ভাবে ঋষির আদেশ কার্য্যে পরিণত না করিতেছেন, ততদিন উক্ত কলঙ্ক অপনোদনের পন্থা নাই।

১ম। হেতু বিরোধী ঔষধের প্রয়োগস্থল। রোগের হেতু অনেক প্রকার। সংক্ষেপে উহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—বাহ্য হেতু ও আভ্যন্তর হেতু। আহার, আচরণ, শীত, গ্রীষ্ম প্রভৃতিকে বাহ্য হেতু এবং কফ, পিত্ত, রস, রক্ত, মল মূত্র প্রভৃতিকে আভ্যন্তর হেতু বলা যায়। কোনও রোগই হেতু বিনা উৎপন্ন হইতে পারে না, এবং হেতু সংঘটন হইবা মাত্রই আভ্যন্তরিক ক্রিয়া-বিশেষ ব্যতীত কোনও রোগই জন্মিতে পারে না। বীচি তরঙ্গ ন্যায় অনেকগুলি ক্রিয়া অপেক্ষা করে। একটীর পর আর একটী ক্রিয়া; তৎপরে অপর একটী ক্রিয়া—এইরূপ পরস্পরিত ও ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া জন্মাইয়া পরিণামে যে ক্রিয়া বা ফল প্রকাশ করে, তাহারই নাম রোগ। যে সমস্ত রোগ অকস্মাৎ উৎপন্ন হয়, তাহাতেও প্রায় ইহার ব্যভিচার নাই। তবে শত পত্র বেধের ন্যায় অতি অল্প সময়েই উৎপন্ন হয় বলিয়া সর্ব্বদা অনুভূত হয় না। এই সমস্ত ক্রিয়ার যথা ক্রমিক নাম,—(১) সঞ্চয় (২) প্রকোপ (৩) প্রসর (৪) স্থান সংশ্রয় (৫) অভিব্যক্তি এবং (৬) ভেদ। এই ক্রিয়াগুলিকে শরীরের এক একটী অবস্থা বলা যাইতে পারে; এবং ঐ সকল অবস্থার বৃদ্ধির নাম সঞ্চয়, এবং ঐ সঞ্চিত বায়ু প্রভৃতি যৎকালে প্রবল ভাব ধারণ করে, সেই অবস্থাকে প্রকোপ বলা যায়। প্রকুপিত বায়ু প্রভৃতির স্বস্থান ত্যাগ করিয়া স্থানান্তর গমনের নাম প্রসর; এবং স্থানান্তর আশ্রয় করিলে সেই অবস্থাকে স্থান-সংশ্রয় বলে। স্থান-সংশ্রিত বাত বা পিত্ত প্রভৃতি যৎকালে কোন রোগের ধর্ম্ম প্রকাশ করে, সেই অবস্থাকে অভিব্যক্তি এবং বায়ু পিত্ত প্রভৃতি স্পষ্ট ধর্ম্ম যাহাতে প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহাকে ভেদ কহে। অগাধ মতি সূক্ষ্মদর্শী আর্য্য ঋষিগণ ঐ সকল লক্ষণ অবগতির জন্য যেরূপ গভীর চিন্তা-গবেষণা ও সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিয়াছেন তাহা ভাবিলে হৃদয় বিস্ময় রসে প্লাবিত ও ভক্তিভাবে বিগলিত হয়। তাঁহাদের চেষ্টা কেবল লক্ষণানুসন্ধান করিয়াই নিবৃত্ত হয় নাই, প্রত্যেক অবস্থায় চিকিৎসারও বিধান করিয়াছেন। এক এক অবস্থায় চিকিৎসার সময়কে এক এক চিকিৎসা-কাল বলে, তদনুসারে প্রথম চিকিৎসাকাল, দ্বিতীয় চিকিৎসা কাল ইত্যাদি সংজ্ঞা বৈদ্যশাস্ত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত দোষের সঞ্চয় হইতে স্থান-সংশ্রয় পর্য্যন্ত এই চারিটী অবস্থার অর্থাৎ যতদিন রোগ অভিব্যক্ত না হয়,—পূর্ব্বরূপ অবস্থার

থাকে, কিম্বা প্রবলাকার ধারণ না করে, ততদিন হেতু বিরোধী ঔষধ যুক্তিসঙ্গত, অপিচ যে স্থলে কারণের সহিত রোগের অধীনাভাব সম্বন্ধ অর্থাৎ কারণের ধ্বংশ হইলে রোগেরও বিনাশ হইতে পারে, পক্ষান্তরে কারণের অবস্থিতি বশতঃ রোগের স্থায়ীত্ব অনুভূত হয়, সেই স্থলে হেতু-বিরোধী ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এই কথাগুলি উদাহরণ দ্বারা বিশদ করা যাইতেছে,—১ম মনে কর—হিমসম্পকর্ক; দধি সেবন এবং এইরূপ কোন কারণ বশতঃ কোন ব্যক্তির শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়াছে, এবং ঐ সঞ্চিত শ্লেষ্মা প্রকোপ প্রভৃতি ক্রমাগত অবস্থান্তর সকল প্রাপ্ত হইয়া পরিণামে কোন প্রকার রোগ উৎপাদন করিতে পারে, অথবা কোন প্রকার রোগের সূচনা করিয়াছে—এমন স্থলে বমন, লঙ্ঘণ বা এইরূপ কফ নাশক উপায় দ্বারা শ্লেষ্ম-নিঃস্মরণ বা শোষণ করা। এইরূপ প্রতীকার দ্বারা রোগের হেতু বা মূল কারণ বিনষ্ট করা। সুতরাং রোগের ভবিষ্যদাক্রমনেব আশঙ্কা থাকে না। মহর্ষি সুশ্রুত এইরূপ প্রতীকারের বিশেষরূপ প্রশংসা করেন।

সঞ্চয়ঞ্চ প্রকোপঞ্চ প্রসরং স্থান সংশ্রয়ম্
ব্যক্তিং ভেদঞ্চ যো বেত্তি দোষাণাং
সভবেদ্ ভিষক্।
সঞ্চয়েপ হৃতাদোষা লভন্তে নোত্তরাগতীঃ
তাস্বুত্তরাসু গতিষু ভবন্তি বলবত্তরাঃ
সূত্রস্থান।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বায়ু পিত্ত প্রভৃতির সঞ্চয়, প্রকোপ, প্রসর, স্থান, সংশ্রয়, ব্যক্তি ও ভেদের স্বরূপ ও লক্ষণ সুন্দররূপে অবগত আছেন, এবং তৎ-সাময়িক প্রতিকারে সক্ষম, তিনি সুচিকিৎসক। যৎকালে শরীরে দোষের সঞ্চার হয়, সেই সময়ে উহা সমূলে বিনষ্ট হইলে, আর উত্তরোত্তর গতি অর্থাৎ প্রকোপ, প্রসর প্রভৃতি প্রশস্ত হইতে পারে না। দোষ যত উত্তর গতি (Degree) লাভ করে, ততই তাহার প্রবলতা হয়।

ফলতঃ দোষের সঞ্চার হওয়া মাত্র তাহার প্রতি বিধান করাই উত্তম কাজ। এইরূপ ক্রিয়ায় অনায়াসে এবং অল্প সময়ের মধ্যে ভাবী রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

২য়। রোগের অপ্রবল অবস্থায় অর্থাৎ যতদিন সামান্যাকার লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়, বৈদ্যশাস্ত্রে সেই অবস্থাকে বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ বলে। সে অবস্থায়ও হেতু বিপরীত ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু এই মত সর্ব্ববাদী সম্মত নহে।

৩য়। যে স্থলে হেতুর সহিত রোগের অধীনাভাব সম্বন্ধ, সে স্থলে হেতু-বিপরীত ঔষধ প্রয়োগ আবশ্যক। মনে কর, যেমন ক্রিমি বা মল সঞ্চার বশতঃ উদরে বেদনা জন্মিয়াছে—এমন স্থলে বেদনা নিবারক ঔষধ প্রয়োগ করিলে বিশেষ কোন উপকার লাভের প্রত্যাশা নাই, সে অবস্থায় যাহাতে বেদনার কারণ ভূত ক্রিমি বা মল নিঃসারিত হয় তদনুরূপ ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে।

(৪) কেহ কেহ রোগের হেতু ত্যাগকেও হেতু-বিরোধী-চিকিৎসা বা ঔষধের মাত্রা গণনা করিয়া থাকেন। কেননা নৈয়ায়িকেরা বলেন যে, আহার ও আচরণাদি রোগের নিদান, তৎসমুদয়ের নিয়ম পালন না করিলে রোগের উপশম হয় না, কারণ ঐরূপ আহার-বিহারাদি দ্বারা দোষের বল বৃদ্ধি হয়,

দোষ বলীয়ান হইয়া রোগের বল বৃদ্ধি করে অথবা আরোগ্যের প্রতিবন্ধকতা জন্মায়। এমন স্থলে ঔষধ দেওয়া না দেওয়া তুল্য। এজন্য অনেক রোগী সুবিজ্ঞ বৈদ্য কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হইয়াও একমাত্র নিদান সেবনের দোষে আরোগ্য লাভে বঞ্চিত হয়েন্। অতএব আহার, আচার প্রভৃতি যে প্রকার নিদানই কেন হউকনা—প্রথমতঃ তৎসমুদয় পরিত্যাগ করা আরোগ্যার্থী ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। অনেক সময়ে কেবল নিদান পরিত্যাগ করিয়াও অনেক ব্যক্তিকে রোগ হইতে মুক্তি পাইতে দেখা যায়। নিদান-পরিত্যাগের সংক্ষিপ্ত নাম নিদান পরিবর্জ্জন। আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন, "সংক্ষেপতঃ ক্রিয়া যোগা নিদান পরিবর্জ্জনম্" পরন্তু এই মতটী হেতু বিপরীত বলিয়া কেহ কেহ স্মরণ করেন না।

ব্যাধি-বিপরীত ঔষধ প্রয়োগের স্থল।—রোগের অভিব্যক্ত বা পরিস্ফুট অবস্থায় ব্যাধি-বিপরীত ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। এমন অনেকগুলি ঔষধ দ্রব্য আছে, রোগ যে কারণেই হউক না কেন, সেই সমস্ত ঔষধ-প্রভাব-শক্তি বশতঃ কারণ-নির্ব্বিশেষে রোগ প্রতীকারে সমর্থ, অর্থাৎ রোগ বায়ু, পিত্ত বা যে কোন হেতুতেই উৎপন্ন হউক না কেন, তৎপ্রতি ঔষধের লক্ষ্য থাকে না, কেবল রোগ প্রশমনের প্রতিই ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশ পায়। ইংরাজী ভাষায় ঐ সমস্ত পৃথক পৃথক নির্দ্দিষ্ট শক্তি সম্পন্ন ঔষধকে স্পেসিফিক্ মেডিসিন্ (specefic medicene) বলা যাইতে পারে। এরূপ ঔষধের সংখ্যা অতি অল্প। পরন্তু একপ্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিতে চিকিৎসকের চিন্তা এবং শ্রমের লাঘব হইবে বলিয়া লোকহিতৈষী ঋষিগণ উহাদের অনুসন্ধানে সমধিক যত্ন ও প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং ভূবি পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান ইউরোপীয় চিকিৎসকগণ তাঁহাদের ফার্মাকোফিয়া গ্রন্থে যেমন ক্রিয়ানুসারে অল্টার্নেটিব্ পারগেটিব ইত্যাদি শ্রেণীভেদে ঔষধ সমূহের বিভাগ করিয়া থাকেন, আয়ুর্ব্বেদীয় পণ্ডিতগণ তেমনি দাহ নাশক, ইত্যাদি ভেদে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন।

(ক) অনেকের এরূপ বিশ্বাস যে, বৈদ্য-শাস্ত্রের ঔষধ নিতান্ত অন্ধকারে ঢেলামারার ন্যায়। বৈদ্যগণ শবচ্ছেদন করেন না, সুতরাঃ শারীরিক যন্ত্র বা তাহাদের ক্রিয়ার বিষয় ইঁহারা কিছুই জানেন না। ইঁহাদের শাস্ত্রও কেবল অনুমানের উপরে লিখিত, শারীরিক যন্ত্রাদির প্রত্যক্ষের সহিত ইহার কোন সংস্রবই নাই; অতএব উঁহাদের চিকিৎসা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য।

যাঁহারা বৈদ্যশাস্ত্র অধ্যয়ন বা স্পর্শ করেন নাই, তাঁহাদের ঐরূপ সংস্কার হওয়া বিচিত্র নহে। যে সকল জাতি এইক্ষণে সভ্যতম বলিয়া গণ্য, এক সময়ে দেশের অবস্থা এরূপ ছিল যে, এই চিকিৎসা-শাস্ত্র কি? অথবা চিকিৎসার উদ্দেশ্য কি?—ইহা তখন ইহাদের কল্পনায় ও উপস্থিত হয় নাই। তৎকালে হিন্দুগণ শারীরিক চর্চ্চায় নিমগ্ন ছিলেন। নরদেহ কিরূপে ব্যবচ্ছেদ করিতে হয়, যন্ত্রাদির আকারপ্রকার গতিবিধি কিরূপ, এই সকল প্রয়োজনীয় বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে ত্রুটি করেন নাই। যে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া ইংলণ্ড অল্পদিন মাত্র জাত হইয়াছেন, তাহা হিন্দুগণ অনেক

সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পরিজ্ঞাত ছিলেন। হিন্দুগণের শাস্ত্র যাঁহারা কাল্পনিক বলেন, ইহা তাঁহাদের ভ্রান্তি ভিন্ন কিছুই নহে।

আজিকালি কতকগুলি ব্যক্তির এইরূপ সংস্কার দাঁড়াইয়াছে যে, বৈদ্য-চিকিৎসা বৈজ্ঞানিক নহে। উহা যৎপরোনাস্তি ভ্রম-সঙ্কুল। যাঁহারা এইরূপ বলেন, তাঁহারা বৈদ্যশাস্ত্র কখন স্পর্শও করেন নাই, কেবল হুজুগের কল বলেই চালিত।

(খ) দৈহিক উপকরণের অযথা হ্রাস-বৃদ্ধি অথবা ইদানীন্তন বৈজ্ঞানিকদিগের মতে দৈহিক তাড়িতের (পঞ্চোষ্মাণঃ সমাভয়াঃ) অসামঞ্জস্যে (Disturbance of the Equilibrium of the Auinal Mageatisan) যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহা আর্য্য ঋষিগণ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে উপলব্ধি করিয়া সূত্রাকারে গ্রথিত করিয়া গিয়াছেন। কালে বিজ্ঞান জ্যোতিঃ যতই বৃদ্ধি পাইতেছে, উক্ত জ্ঞান-গর্ভ-বাক্যের মহিমা ততই প্রতিপাদন করিতেছে। রোগ মাত্রেই উহা অসমতার পরিণাম মাত্র। শোণিতে জলীয় ভাগ অধিক হইলে উহা রোগ; লৌহের অংশ অল্প হইলে রোগ। পাকস্থলীতে অম্লের আধিক্য হইলে রোগ, অম্লের অল্পতাও রোগ। মস্তিকে শোণিত-প্রভাব অধিক হইলে রোগ, অল্প হইলেও রোগ, অধিক স্নিগ্ধতাও রোগ, অধিক রুক্ষতাও রোগ।

হ্রাসের বৃদ্ধি, বৃদ্ধির হ্রাস, সমতার বিধান, যে চিকিৎসার মূলভিত্তি; তাহা বিজ্ঞান সম্মত নয় কেন? কোন অশিক্ষিত লোকের মুখে জ্বরাদি কোন রোগের উৎপত্তি বিষয়ক রূপকে লিখিত শ্লোক-বিশেষের ব্যাখ্যা শুনিয়া ইহাকে অবৈজ্ঞানিক বলা ধৃষ্টতার কর্ম্ম ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? বৈদ্যক-চিকিৎসার সাষ্টাঙ্গ অনুসন্ধান কর, দেখিবে—শিক্ষা প্রদানের প্রকৃষ্ট পদ্ধতির অভাবেই ইহা অন্ধকার ও অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়াছে। পৃথিবীর সকল জাতিতেই কতকগুলি কুসংস্কারাপন্ন লোক আছেন। যে ইংরাজ জাতি আজ বিজ্ঞান লইয়া এত গরীয়ান হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে চিকিৎসা বিষয়ে কতদূর কুসংস্কার আছে, তাহা শুনিলে হাস্য সম্বরণ করা যায় না। একজন ইংরাজ সমাজ-লেখক বলেন—শিরোবেদনা রোগ সম্বন্ধে ইংরাজদিগের এই কুসংস্কার আছে যে, মাথার চুল কাটিয়া যদি কেহ পথে ফেলিয়া দেয়, এবং একটী পাখী যদি সেই চুলের কয়েকটী মুখে করিয়া উড়িয়া যায়, তাহা হইলে ভয়ানক শিরোবেদনা হয়।

সসেক্স জিলার ইংরাজ কৃষকদিগের মধ্যে এই কুসংস্কারের বিশেষ প্রচলন দেখা যায়। এই কুসংস্কারে বিশ্বাসী ইংরাজগণ মাথার চুল কাটিয়া তাহা অনাবৃত স্থানে ফেলিয়া দিতে দেয় না।

কবিরাজ শ্রীদীননাথ কবিরত্ন শাস্ত্রী।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতির অন্তরায়।—পরশ্রীকাতরতাই যে জাতীয় উন্নতির অন্তরায় জন্মাইয়া থাকে, ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ সত্য কথা। মিরজাফরের পরশ্রী-কাতরতার জন্যই সিরাজের সিংহাসন ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল, জয়চাঁদের পরশ্রী-কাতরতার ফলেই পৃথ্বিরাজের সিংহাসন মুসলমান করতলগত হয়,—দুর্য্যোধনের পরশ্রীকাতরতার জন্যই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সৃষ্টি। লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধার-সাধনের জন্য দেশে নানারূপ আয়োজনের চেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু সে আয়োজনের ভিতরও পরশ্রীকাতরতার স্রোত পূর্ণভাবে প্রবাহিত। আমরা বরাবরই বলিয়া আসিতেছি, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতি করিতে হইলে, আয়ুর্ব্বেদের যে অঙ্গগুলি লুপ্ত হইয়াছে, সর্ব্বাগ্রে সেই অঙ্গগুলির পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। শল্য, শালাক্য, কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্য, অগদতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র, বাজীকরণতন্ত্র—এই অঙ্গগুলি লইয়া আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা। কিন্তু ইহার মধ্যে কেবল মাত্র কায় চিকিৎসার কতকাংশ ভিন্ন আর সমস্ত অংশই বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে। ঐ কায় চিকিৎসার যতটুকু লইয়া বর্ত্তমান সময়ে আমরা চিকিৎসা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকি, তাহাও পূর্ণাবয়বযুক্ত নহে। এমতাবস্থায় দেশে পূর্ব্ববৎ আয়ুর্ব্বেদীয় গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে শল্য চিকিৎসার জন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিত দিগের নিকট শিক্ষালাভ করিতে হইবে। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় সেই চেষ্টাই করা হইতেছে। কিন্তু ইহার ভিতরও পরশ্রীকাতরতার বিদ্বেষবহ্নি ভ্রুকুটি-ভঙ্গিমায় বিঘ্নোৎপাদনের চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া দুঃখিত না হইয়া থাকা যায় না। ইঙ্গীতে আমরা সামান্য আভাষ দিলাম মাত্র, ইহা হইতে যিনি যাহা বুঝিতে পারেন, বুঝিয়া লউন।

ডাক্তারি ও কবিরাজি।—চরক বলিয়াছেন,—"তদেব যুক্তং ভৈষজ্যং যদা রোগ্যায় কল্পতে। স চৈব ভিষজাং শ্রেষ্ঠ রোগেভ্যঃ যঃ প্রমচয়েৎ।" অর্থাৎ তাহাই উৎকৃষ্ট ঔষধ—যাহাতে রোগ প্রশমিত হয় এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক,—যিনি রোগ আরোগ করিতে পারেন। কিন্তু এখনকার দিনে অনেক চিকিৎসকই এ কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। তাহা না ভুলিলে বর্ত্তমান সময়ে ডাক্তার এবং কবিরাজের মধ্যে বিপ্লব-বহ্নি উপস্থাপিত হইবে কেন? আমরা যখন শল্য চিকিৎসা এখন নিজেরা ভুলিয়া নিরক্ষর নাপিতের হাতে অর্পণ করিয়াছি, তখন শিক্ষিত ডাক্তার সম্প্রদায়কে অশ্রদ্ধার চক্ষে না দেখিয়া, তাঁহাদের নিকট হইতে শস্ত্রচিকিৎসা শিক্ষাপূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদের লুপ্ত অঙ্গ পূরণ করিতে চেষ্টা করা সমধিক সঙ্গত নহে কি? আমাদের সুশ্রুত সংহিতায় সকলই আছে স্বীকার করি; কিন্তু আয়ুর্ব্বেদত মাথার দিব্য দিয়াবলিয়াছেন,—শুধু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে চলিবে না, দৃষ্টকর্ম্মা না হইলে চিকিৎসক পদবাচ্য হইতেই পারিবে না। সুতরাং আমাদের লুপ্তরত্ন উদ্ধারের জন্য,—আমাদেরই শল্য-চিকিৎসা যাহা আমরা নিজেরা ভুলিয়া অপরকে প্রদান করিয়াছি,—স্বকার্য্য উদ্ধারের জন্য—তাঁহাদিগের নিকট তাহা গ্রহণান্তর আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা পূর্ব্বভাবে আনয়নের চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের মধ্যে সকলে এ রহস্য বোঝেননা,—বা অন্তরে উপলব্ধি করিলেও মুখে ফুটিতেপ্রারেন না,—বা ফুটিলেও

স্বকীয় জেদ বজায় রাখার জন্য অনুরূপ বুলি ধরিয়া থাকেন, সেই জন্যই এত কথা বলিলাম।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রের ভবিষ্যৎ।—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে যে পাঁচ বৎসর শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে,—সেই পাঁচ বৎসর শিক্ষা-সমাপ্তির পর, উত্তীর্ণ ছাত্রগণ এক এক জন যে ধন্বন্তরি কল্প চিকিৎসক হইয়া দেশবাসীর সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল করণে সমর্থ হইবে,—ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। এই উত্তীর্ণ ছাত্রগণই তখন একদিকে কায়চিকিৎসার কৃতিত্ব দেখাইবে, অপর দিকে শস্ত্র-চিকিৎসায় সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইবে। তখন শস্ত্রকরণ-উদ্দেশে যাঁহারা ডাক্তার দেখাইতে অভিলাষী—এই উত্তীর্ণ ছাত্রগণের নিকট তাঁহারা নির্ভয়ে সে ভার প্রদানে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন। কায়চিকিৎসার জন্য যাঁহারা সুশিক্ষিত কবিরাজ চাহেন, এই উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে আহ্বান পূর্ব্বক তাঁহারা সে উদ্দেশ্যও সিদ্ধ করিতে পারিবেন। এরূপ ব্যবস্থায় যুগপৎ মণিকাঞ্চনের সংযোগ সাধিত হইবে। বিদ্যালয়ের প্রথম বৎসরত অতিবাহিতই হইল, আর চারি বৎসর পরে এই বিদ্যালয় কিরূপ সুফল প্রদান করিবে, তাহা দর্শন করিয়া চক্ষুর তৃপ্তিলাভে সমর্থ হইবেন।

খাদ্যে ভেজাল।—তৈল, ঘৃত, দুগ্ধ প্রভৃতি বিশুদ্ধ পাওয়া ক্রমশঃ দুর্ঘট হইয়া পড়িতেছে, সকল প্রকার দ্রব্যেই এখন 'ভেজালে'র পূর্ণ প্রচলন। এই 'ভেজাল' নিবারণের জন্য অবশ্য গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর আইনের বাঁধন আঁটিয়া রাখিয়াছেন,—কিন্তু সে বাঁধন এত আল্‌গা যে, তাহাতে ব্যবসায়ীরা ভেজাল চালাইবার আরও সুবিধা পাইতেছে। 'ভেজাল তৈল' 'ভেজাল ঘৃত' 'ভেজাল দুগ্ধ' প্রভৃতি কথা সাইন্ বোর্ডে লিখিয়া রাখিলে আর সে ব্যবসায়ীকে আইনের দায়ে পড়িতে হয় না; কাজেই বাঁধনটা শক্ত হয় নাই বুঝিতে হইবে। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট এই ভেজাল নিবারণের জন্য একটা আইন বিধিবদ্ধ করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদন করাইয়া লইয়াছেন। সংপ্রতি মধ্য প্রদেশেরও গবর্ণমেণ্ট উহার নিবারণ কল্পে একটা পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া অনুমোদনের জন্য ভারতগবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। কলিকাতাবমত সহরে এ আইনটার কিন্তু আব ও একটু কড়াকড়ি হওয়া কর্ত্তব্য। 'ভেজাল তৈল' 'ভেজাল ঘৃত' 'ভেজাল দুগ্ধ' প্রভৃতি দোকানের সাইনবোর্ডগুলি হইতে তুলিয়া দিয়া একেবারেই যাহাতে কোন ব্যবসায়ী ভেজাল দ্রব্য চালাইতে না পারে, তাহার চেষ্টা করা উচিত। দেশবাসীর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য আমরা বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরকে এজন্য অনুরোধ করিতেছি।

ধূমপান নিষেধ।—আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, বঙ্গদেশের শিক্ষা বিভাগের সহকারী ডিরেকটার মিঃ এফ, সি, টার্ণার মহোদয় বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর স্কুল ও কলেজ সমূহের ছাত্রগণ যাহাতে ধূমপান করিতে না পায়—, তাহার উপায় বিধান করিবার জন্য সমস্ত স্কুল কলেজে এক একটি সারকুলার জারি করিয়াছেন। তিনি স্কুল-কলেজের শিক্ষক মহাশয়দিগকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, তাঁহারা বিদ্যালয় সান্নিধ্য স্থান সকল হইতে সিগারেট বিক্রয় একেবারে বন্ধ করিয়া দিবেন। ছাত্রদিগকে শিক্ষা-মন্দিরে বা বাহিরেও ধূমপান করিতে দিবেন না, তাঁহারা নিজেরা নিজেরাও বিদ্যা-মন্দিরে—অন্ততঃ পক্ষে ছাত্রদিগের সম্মুখে ও ধূমপান করিবেননা। তাঁহার আরও আদেশ—কোন ছাত্র প্রথম বার ধূমপানের অপরাধ করিলে তাহাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইবে, কিন্তু ২য় বারে তাহার দণ্ডবিধান করা হইবে। সকল প্রকার ধূমপানেই ছাত্র জীবনে অনিষ্ট হইয়া থাকে,—সিগারেটে ত সর্ব্বনাশ হয়ই। বর্ত্তমানে সিগারেটের অত্যধিক প্রচলনের জন্য দেশে অজীর্ণ এবং যক্ষা রোগীর সংখ্যা এত বাড়িয়া উঠিয়াছে। এ অবস্থায় শিক্ষাবিভাগের সহকারী ডিরেক্টার মহাশয় দেশের বালক মণ্ডলীকে রক্ষা করিবার জন্য এইরূপ যে আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাকে আমরা ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

প্রাপ্ত গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

আয়ুর্ব্বেদীয় ধাত্রী বিদ্যা।—শ্রী প্রসন্ন চন্দ্র মৈত্রেয় কবিরাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। কলিকাতা ৮০নং হ্যারিসন রোডে শ্রীযুক্ত দীননাথ শাস্ত্রী কবিরত্নের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য ১৷৷০ টাকা। রমনীগণের গর্ভধারণের প্রথম হইতে প্রসবকাল পর্য্যন্ত যে সকল নিয়মে থাকা কর্ত্তব্য, ঐ সময়ের মধ্যে কোনরূপ ব্যাধি উপস্থিত হইলে যেরূপ ব্যবস্থায় তাহার প্রতিবিধান করা যাইতে পারে, যেরূপ ব্যবস্থায় পাশকরা ধাত্রী বা ডাক্তার দিগের সাহায্য না লইয়া প্রসব-বাধা দূর করা যাইতে পারে, —এই পুস্তকে হর-পার্ব্বতীর কথোপকথনচ্ছলে সেই সকল বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। সূতিকা রোগের ব্যবস্থা এবং শিশু-চিকিৎসা সম্বন্ধেও অনেক কথা লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থ খানি পাঠ করিলে সকলেরই উপকার হইতে পারিবে।

হিন্দু পত্রিকা।—মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার এম, এ, বি, এল। সহঃ সম্পাদক স্মৃতি-সাংখ্য-মীমাংসাতীর্থ শ্রীযুক্ত কেদার নাথ ভারতী। যশোহর হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা। ধর্ম্ম সাহিত্য এবং বিজ্ঞানাদি বিষয়ের আলোচনা করিবার জন্য এ পত্রিকাখানি ২৪ বর্ষ কাল বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। এবারে অনেকগুলি প্রবন্ধই গবেষণাপূর্ণ।

নব্য ভারত।—মাসিকপত্র ও সমালোচনা। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়। বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা। সম্পাদক শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী—২১০।৪ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। "নব্যভারত" আজ পঞ্চত্রিংশ বৎসর কাল পরিচালিত হইতেছে,—ইহাই ইহার যোগ্যতার পরিচয়। ইহার অধিকাংশ প্রবন্ধই ধর্ম্ম কথায় পূর্ণ,—বাজে অসার বিষয়ের আলোচনা ইহাতে নাই। এবারের সকল প্রবন্ধগুলিই মনোজ্ঞ হইয়াছে।

কুষ্ঠ ও বাতরক্তের ভেদনির্ণয় প্রবন্ধে মুদ্রাকর প্রমাদ।

কুষ্ঠও বাতরক্ত প্রবন্ধের ৫৭৪ পৃষ্ঠায় ২য় কলমে ১০মলাইনে যে ফুটনোট দেওয়া হইয়াছে, তাহার পর এই কথাগুলি বসিবে।

"জানুজঙ্ঘোরু কট্যংস হস্তপাদাঙ্গসন্ধিষু
কণ্ডূ স্ফুরণ নিস্তোদ ভেদ গৌরব সুপ্ততাঃ
ভূত্বা ভূত্বা প্রণশ্যন্তি কদাবাবির্ভবন্তি চ।"
গরুড়পুরাণম্ পূর্ব্বখণ্ডম্—১৭১ অধ্যায়।

অর্থাৎ জানু, জঙ্ঘা, উরু, কটী, স্কন্ধ, হস্ত, পদ এবং শরীর সমূহে চুলকানি, স্পন্দন, সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা, বিদারণ, গুরুতাবোধ ও স্পর্শ শক্তির অভাব (এই সকল লক্ষণ) পুনঃ পুনঃ হইয়া প্রশমিত হয়, আবার কখনও আবির্ভূত হয়।

মূলের শব্দার্থ অনুসারে ইহা বাতরক্তের পূর্ব্বরূপ, কিন্তু স্বর্গীয় রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় ও পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত দুইখানি গ্রন্থের অনুবাদেই ইহা বাতরক্তের লক্ষণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই অর্থ টীকাকার সম্মত কিনা বলিতে পারি না তবে বাতপ্রধান রোগে লক্ষণসমূহের অনিয়তত্ব যুক্তিসঙ্গত বটে।

গরুড়পুরাণের এই সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দৃষ্টে অনুমান হয়, লিপিকর প্রমাণ চরকসংহিতায় "নশ্যন্তি" স্থলে "নশ্যতি" পাঠও সন্নিবিষ্ট হইতে পারে।

ঐ প্রবন্ধে কুষ্ঠভেদক লক্ষণ সূচীতে "অঙ্গ পতন হয়" এ কথাটিও দেওয়া হয় নাই। অঙ্গ পতন হয় ইহার প্রমাণার্থ বাগ্ভট বলিয়াছেন, "তস্মাৎ কুষ্ণাতি তদ্বপুঃ" অর্থাৎ অঙ্গপতন কারক বলিয়াই কুষ্ঠ নাম হইয়াছে।

বার্ষিক পরীক্ষার ফল।

এবার অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে বার্ষিক পরীক্ষায় শারীরবিজ্ঞান, অঙ্গনিশ্চয় বিদ্যা বা অ্যানাটমী পদার্থবিদ্যা ও রসশাস্ত্র, উদ্ভিদ বিদ্যা, দ্রব্যগুণ—এই সকল বিষয়ের পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল। মোট ত্রিশটি ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিল, তন্মধ্যে অধিকাংশই উত্তীর্ণ হইয়াছে। আগামী সংখ্যায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণের নাম প্রকাশিত হইবে।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

সম্পাদক—

কবিরাজ শ্রীবিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ।

,, শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম. এ. এম. বি।

সহ-সম্পাদক— ,, শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন।

—:*:—

দ্বিতীয় বর্ষ।

(১৩২৪ আশ্বিন হইতে ১৩২৫ ভাদ্র)

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা, মাশুল।৵৹

২৯ ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে

কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও ৩১ নং

নন্দকুমার চৌধুরীর সেকেণ্ড লেন, সংস্কৃত প্রেস হইতে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

দ্বিতীয় বর্ষের প্রবন্ধ সূচী।

(বর্ণমালানুসারে)

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

২য় বর্ষ। বঙ্গাব্দ ১৩২৪—আশ্বিন। ১ম সংখ্যা।

মঙ্গলাচরণ।

——:*:——

১

শাশ্বত যশঃ সৌরভে যাঁর সফল আত্মদান!
কণ্ঠ যাঁহার গাহিল প্রথম "তৎসবিতুর্" গান!
ভীত কম্পিত আর্ত্ত-নিনাদ বাজিল কোমল প্রাণে,
মৃতের জগতে ভ্রমিলেন যিনি অমৃতের সন্ধানে;
মহৎ হইতে মহীয়ান্ যিনি অণোরণীয়ান্ ধ্রুব;
সেই আত্রেয় এ নববর্ষে—করুণ মোদের শুভ।

২

অতুল শুভ্র-শুচি-গরিমায়-ধন্য গুরুর শিষ্য।
নয়নে যাঁহার উঠিল ফুটিয়া কল্প শেষের দৃশ্য।
গায়ত্রী যাঁর অথর্ব্ব বেদ, সংযম যাঁর শিক্ষা।
সত্য যাঁহার জীবনের ব্রত, ষড়-দর্শন দীক্ষা।
ছত্র চামর হেলায় ফেলিয়া ধরিলেন দীন-বেশ।
করুন্ মোদের মঙ্গল সেই ভিষক্ অগ্নিবেশ।

৩

শ্রীভগবানের "চর" রূপে যাঁর অবনীতে আগমন,
দৃপ্ত প্রতিভা প্রসবিল যাঁর "ছয় শত বিরেচন"
যজ্ঞ যাঁহার "জীব কল্যাণ", "আরোগ্য" যাঁর জপ,
কর্ম্মী, কর্ম্ম, জগৎ, এ তিন—বায়ু পিত্ত ও কফ,

ভূলোক, গোলক, ত্রিলোক, যাঁহার ছিলনাক অগোচর,
সেই **চরকের** আদর্শ পথে হইনু অগ্রসর !

৪

বিন্দুতে করি সিন্ধু সৃজন, কোটি তরঙ্গ দলি'—
সহসা ভাতিল মূর্ত্তি যাঁহার স্বর্ণ শিখায় জ্বলি।
শিরে অপূর্ব্ব অযুত কুম্ভ, দুই করে বরাভয়,
ইঙ্গিতে যাঁর ঘুচিল নরের অকাল মৃত্যু ভয়।
মুক্ত উদার অন্তর যাঁর—দেব **ধন্বন্তরি**
তাঁহার চরণে, সবে মিলে আজ, বিনয়-প্রণাম করি।

৫

"শারীর বিদ্যা" যাঁহার নিকটে ব্রহ্ম-বিদ্যা সম,
অনাথ আতুরে নিজ কোলে তুলে। নন্দ যে নরোত্তম।
পর্ণ-কুটির দ্বারে এসে যাঁর—কত রাজা কত রাণী,
রত্ন খচিত মুকুট নামা'য়ে হইল যুক্ত-পাণি।
করিলেন যিনি প্রথম প্রচার—শস্ত্রের উপচার,
সে **সুশ্রুতের** চরণে মোদের অযুত নমস্কার।

৬

বৌদ্ধ যুগের বৈদ্য-প্রবর, আচার্য্য চূড়ামণি।
কর্ম্ম-ক্ষেত্রে বিভূতি যাঁহার, রোগীর রোদন-ধ্বনি,
আয়ুর্ব্বেদের আটটি অঙ্গে সদা সচেতন দৃষ্টি,
শত আগ্রহে ক্ষুদ্রের মাঝে গড়িলা বিরাট সৃষ্টি,
জুড়া'তে জীবের যন্ত্রণা জ্বালা **বাগ্‌ভট** যাঁর নাম,
তাঁহার প্রসাদে হউক মোদের পূর্ণ মনস্কাম !!

কবিরাজ শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ যোগবিশারদ।

আমাদের নববর্ষ।

আনন্দময় আশ্বিনে আমাদের আদরের ধন "আয়ুর্ব্বেদ" দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। আজ আমাদের আনন্দের দিন।

তোমরা হয় ত বলিবে—"বিশ্বের আয়ুর্ব্বেদের উপর দিয়া কত যুগ যুগান্তর বহিয়া গিয়াছে; তোমাদের আয়ুর্ব্বেদের উপর দিয়া কেবল একটী মাত্র বৎসর চলিয়া গেল; অখণ্ড দণ্ডায়মান মহাকালের একটী ক্ষুদ্র মুহূর্ত্ত—আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া অতীতে গা' ঢালিয়া দিল;—ইহার জন্য আবার গৌরব কিসের? আনন্দই বা কেন?" বাস্তবিক এই "কেন"র উত্তর দিতে আমরা অক্ষম। আমরা জানি, আমাদের এই ক্ষুদ্র "আয়ুর্ব্বেদ" সেই বিশ্বের আয়ুর্ব্বেদের প্রতিনিধি,—তোমরা এই আয়ুর্ব্বেদের মহিমা ভুলিয়া গিয়াছ, তাই ভারত ব্যাপিয়া আজ আর্ত্তের মর্ম্মন্তুদ রোদন ধ্বনি! দেশে দেশে বিলাসীর শ্মশান-শয্যা বিস্তীর্ণ! অনন্ত জ্বালার অনন্ত চিত্র সম্মুখে রাখিয়া—শোকময়ী স্মৃতির সহস্র উৎপীড়ন স্বেচ্ছায় সহিয়া, তাই আমরা প্রাণের শূন্য সিংহাসনে আয়ুর্ব্বেদের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার জন্য বড় ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের কত যত্নের, কত সাধের, কত গৌরবের আয়ুর্ব্বেদ; আমাদের ইহ-পরকালের সর্ব্বস্ব, মানব জীবনের অবলম্বন, পৃথিবীর দর্প-দন্ত "আয়ুর্ব্বেদ",—আজ এই নূতন বর্ষে নূতন হর্ষে,—কেন তাহাকে অভিনন্দন করিব না? অন্তরে-বাহিরে, স্থূলে, সূক্ষ্মে, সামঞ্জস্যের আকাঙ্খায় এতদিন যে মহা মুহূর্ত্তের অপেক্ষা করিয়াছিলাম, এই ত সেই শুভ অবসর! আজ আয়ুর্ব্বেদের "নববর্ষ', আজ 'পুরাতন'কে ভুলিয়া 'নূতন'কে আহ্বান করিতে হইবে। অতীতের সান্দ্র পাষাণ-দ্বার খুলিয়া যুগ যুগান্তের কত আনন্দ, কত বিষাদ, কত অভ্যুদয়, কত বিলয়, কত গঠন, কত ধ্বংস, কত উৎসব-ব্যসনের ইতি কাহিনী মাথায় বহিয়া, হতাশের নেত্রে অশ্রু-গোজ্জ্বল আশার আলোক তরঙ্গিত করিয়া, জরাজীর্ণ জগতে ব্যাধিশীর্ণ-জীবের শ্রবণ-পথে উৎসাহের অমৃত ধারা ঢালিতে, আয়ুর্ব্বেদের এই আত্ম প্রকাশ—এ ত বিধাতারই মঙ্গলাশিষ! ধর ধর বাঙ্গালী! এই মঙ্গলাশিষ মাথায় তুলিয়া ধর। তোমার জীবন কৃতার্থ হইবে! শরীরে—স্বাস্থ্যের অমলিন মণি-দীপ-দীপ্তি ঝরিয়া পড়িবে! উচ্ছৃঙ্খল সংসারে—বিশ্ব লক্ষ্মীর চরণশায়ী পদ্ম শতদলে ফুটিয়া উঠিবে!

এক বৎসর পূর্ব্বে—ঠিক্ এমনি দিনে—কত আকুল আগ্রহে যাহাকে আদর করিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছিলাম—আজ সে "পুরাতন" হইয়া কাল-সাগরে বুদ্বুদের মত মিশিয়া গেল! তাহার উত্তরাধিকারী হইয়া যে আসিয়াছে—সে নিশ্চয়ই "নূতন"। আয়ুর্ব্বেদের আজ "নূতন বর্ষ"; কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ যে চির পুরাতন, তাহার আবার "নূতন বর্ষ" কি? আমরা হতভাগ্য ভারতবাসী—আমাদের জীবনে বৈচিত্র্য নাই, প্রাণে শাশ্বতী তৃপ্তি নাই, হৃদয়ে পাবনী শক্তি নাই, আমাদের

আবার "নববর্ষ" কোথায়? আমরা ত একই ভাবে—চিরকাল বর্ষ ভোগ করিয়া আসিতেছি! আমাদের চতুর্দ্দিকে প্রকৃতি—বিকৃতিময়ী, জল-বায়ু অস্বাস্থ্য কর, ভূমি-সার শস্য-বিরলা, গাভী—ক্ষীণ পয়স্বিনী, তরুলতা—দীন ফলবতী; নদ নদী—শূন্য সলিলা,—আমাদের সবই যে পুরাতন! আমাদের ঋষি-রচিত সুখের সংসার—অনৈক্য-দুষ্ট, শিল্প—স্বল্পাবশিষ্ট; যে দিকে চাহি -সর্ব্বত্র কেবল অভাব, অধর্ম্ম, অকাল মৃত্যু, অশান্তি আর অন্নকষ্ট! আমরা আবার নূতন কোথায় পাইব? আমাদের জীবনে নববর্ষের সার্থকতা কি? বর্ষ যায়, বর্ষ আসে; বর্ত্তমান—অতীতে রূপান্তরিত হয়, আমরা কেবল তাহারই পদক্ষেপ গণনা করি! অশ্রুসিক্ত নয়নে, আমরা কেবল চাহিয়া দেখি—কল্পিত সুখের সহস্র স্মৃতি, সুপ্ত কামনার অযুত স্বপ্নজাল, আর আশা আকাঙ্খার অসংখ্য অবশেষ!!

কিন্তু তবুও নূতনের মোহ অপরিহার্য্য! মানুষ নূতনকেই ভাল বাসে। নূতনের পিপাসা—ভাগ্যের পিপাসা। নায়কের লেখক এবং লেখকের নায়ক একটা বড় পাকা কথা বলিয়াছেন—"প্রেম পুরাতন হইবার উপক্রম হইলে, উহা পুত্র-বাৎসল্যে নূতন করিয়া ফুটিয়া উঠে। পুত্র-কন্যার নবীনতা ক্ষীণ হইয়া পড়িলে, উহা পৌত্রে-দৌহিত্রে প্রবল ভাবে নবীন হইয়া দাঁড়ায়।" সুতরাং নবীনতার আদান-প্রদানেই মানুষের জীবন। মানুষের কর্ম্ম-কোলাহল পূর্ণ প্রাণ-গতি নবীনতার স্বাদ গ্রহণের জন্যই অজানা-পথে অগ্রসর। তাই সে শোকে অশোকে, দুঃখে সুখে, জয়ে পরাজয়ে, অবসাদে উন্মাদনায়,—পুরাতনকে নূতন করিয়া একটু জিরাইবার অবসর খুঁজিয়া লয়। মানব-ইতিহাসে—এই অবসরের নাম "নববর্ষ"।

আমাদের আয়ুর্ব্বেদ ও সেই জীবন-মরণের, অপচয় উপচয়ের, তাপ-শান্তির, গতাগতির অভিব্যক্তি। আয়ুর্ব্বেদ আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের, পিতৃ পিতামহের পুরুষ পরম্পরার অক্ষয় কর্ম্মক্ষেত্র। আয়ুর্ব্বেদের প্রসাদে—এখনও আমরা গৌরবের—মনুষ্যত্বের—বীরত্বের—জগজ্জয়ের শ্লাঘা করিতে পারি! আমাদের অনন্ত অতীতের স্পর্দ্ধা আয়ুর্ব্বেদ—আজ পুরাতন হইয়াও "নূতন", আয়ুর্ব্বেদের "নববর্ষ" আমাদের ত্রুটী সংশোধনের অবসর, পশ্চাদবলোকনের অবকাশ, হৃদয়ের শান্তির শ্বাস, উদ্যমের ক্ষণ-বিশ্রাম, জীবনের আমিত্বের পরিচ্ছেদ।

পল্লবে-পল্লবে সুষমা ছড়াইয়া, মুকুলে-মুকুলে হাসি ফুটাইয়া, বাতাসে-বাতাসে গন্ধ বিলাইয়া শরৎ আসিয়াছে। আকাশ—নীল-স্বচ্ছ-অনুদ্বেল, জলে—কুমুদ কহ্লার কমলদল, মাঠে -দূর বিসর্পি হরিৎ শোভা, আলোক বায়ুর অফুরন্ত হিল্লোলে মেদিনী মোদিনী; কোটি উষার অরুণ রাগ মাখিয়া, কাশ কুসুমের আস্তরণের উপর দিয়া, দশহাতে শেফালীর লাজ বর্ষণ করিতে করিতে—স্থল পদ্মের সঙ্গে রাঙা হাসি হাসিতে হাসিতে,—আনন্দময়ী মা আসিতেছেন! সারা বঙ্গে মহামহোৎসবের সাড়া পড়িয়াছে; এইত আয়ুর্ব্বেদের বিকাশের শুভদিন। আমাদের মানবতার হিমগিরি, জগজ্জননীর লীলাক্ষেত্র। আমাদের দেহ পর্ব্বে-পর্ব্বে উৎপন্ন, মেরুদণ্ড পর্ব্বে-পর্ব্বে সুসজ্জিত,—তাই এ দেহের একটী নাম পর্ব্বত, সেই দেহের কন্যা রূপিনী—মা আমার "পার্ব্বতী"। এই শুভ মুহূর্ত্তে—সাধক পার্ব্বি-

তীর যোগনিদ্রা ভাঙ্গাইবার আয়োজন করিয়াছেন। তবে আমরাই বা নীরব থাকিব কেন? আমাদের কার্য্যও ত উদ্বুদ্ধ শক্তিতে —ষট্‌চক্র ভেদ করা। তবে এসো ভাই! এসো—আজ মঙ্গল শঙ্খ বাজাইয়া, জলের ঝারি দিয়া, এই ফুল্ল শরতে আমরা "নববর্ষের' সাধনা করি। সত্যে, সদ্ভাবে, প্রেমে—হৃদয় পূর্ণ করিয়া, ব্যর্থ আশার বেদনা চাপিয়া, সনাতন ও পুরাতনকে আজ নূতন করিয়া ডাকিয়া লই। ঐ শুন কবি বলিতেছেন,—

"গত আয়ু প্রায় গত বর্ষ যায়,
যাক্, দেও গত হ'তে।
হৃদয়-মন্দিরে অসত্য নিবারি
শিখ'হ পূজিতে সতে।
ঐ বাজে হোরা দিয়া অশ্রুধারা
প্রাচীনে বিদায় দাও।
বাজে সুখ হোরা, আনি আম্রঝারা
নূতনে ডাকিয়া লও।"

পুরাতনে ও নূতনে মিলিয়া আমরা আয়ুর্ব্বেদের সাধনা করিব। নববর্ষে নব-উদ্যমে, সিংহবাহিনীর সন্তাপ-হারিণী মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইব। হয় ত এই সাধনার ফলে, সত্য সত্যই একদিন আমাদের চির পুরাতন "আয়ুর্ব্বেদে" দিব্য জ্যোতির্ম্ময় "নববর্ষ" আসিবে। আমাদের সাধনা কবির হাতে কবিতা হইয়া ফুটিবে। গায়কের কণ্ঠে সঙ্গীত হইয়া ঝরিবে, বাদকের বীণায় ঝঙ্কার হইয়া ক্ষরিবে, মানবের প্রাণে স্বর্গ হইয়া জাগিবে।

এসো তুমি—এসো হে নবীন অতিথি—নববর্ষ! যে ভাবেই আসিয়া থাক'—এসো। তোমার চরণে—আজ আমাদের ভিক্ষা,—এই মহা যুদ্ধে আমাদের সম্রাটকে বিজয় লক্ষ্মী দান কর। তোমার প্রসাদে—আমাদের দেশ ধন-ধান্যে সমৃদ্ধ হউক। আমাদের "আয়ুর্ব্বেদে" পূর্ণ সত্ত্ব ও পূর্ণ তত্ত্ব বিরাজ করুক। আমাদের এই ক্ষুদ্র পত্রিকা তান্ত্রিকের যন্ত্র লিপির মত বিশ্বজনীন হউক।

গতবর্ষে আমাদের অনেক ভুল-ভ্রান্তি হইয়া গিয়াছে। কত সুবর্ণ সুযোগ আমরা হেলায় হারাইয়াছি। কত আত্মীয়ের মনে নিদারুণ ব্যথা দিয়াছি। নিষ্ফল-কামনায় কত অরুন্তুদ যন্ত্রণা প্রাণের ভিতর পোষণ করিয়াছি! আমাদের সে প্রমাদ-অবসাদ, অপ্রেম-অসদ্ভাব, অপূর্ণ অভাব—এ বৎসর যেন আমরা সংশোধন করিয়া লইতে পারি।

ঋষিত্বের দোহাই দিয়া,—নবোদ্যমে আবার আমরা কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম। আমাদের ভরসা—গ্রাহকগণের উদার অনুগ্রহ। উদ্দেশ্য—রোগ-বিজয়। মূলমন্ত্র—বিজ্ঞানের উন্নতি। লক্ষ্য—আয়ুর্ব্বেদের মহিমা প্রচার। সহায়—সর্ব্ব-বিপদহারী নারায়ণ। আমরা জানি, আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি সাধন—অসাধ্য ব্যাপার। ইহাতে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, যুধিষ্ঠিরের সত্যবাদিতা, কর্ণের উদারতা, ভীমের বল, লক্ষ্মণের উৎসর্গ, বিদুরের তেজ এবং কুবেরের ঐশ্বর্য্য চাই। দীন-দরিদ্র-ভিক্ষুক আমরা,—আমাদের তো কিছুই নাই। কিন্তু নিজের দেশের—নিজের জাতির সব ভুলিয়া, যে পাপাচার করিয়াছি, তাহাতে মহর্ষির পুণ্যাশ্রম কলুষিত হইয়াছে। সেই পাপাচারের প্রায়শ্চিত্ত—আয়ুর্ব্বেদকে রক্ষা করা। এক আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিই আমাদিগকে অনন্ত নিরয় হইতে রক্ষা করিতে পারে। আমাদের এই ক্ষুদ্র পত্রিকা—আমাদেরই "কলকভঞ্জনের" প্রথম হেমকুম্ভ। কালদুহিতা কালিন্দীর কাল

লে ঘট পূর্ণ করিয়া, আমরা ত সরম-সঙ্কুচিতা াধার মত ভয়ে ভয়ে শত কৌতূহলী ব্যগ্র-ষ্টির সম্মুখে দাঁড়াইয়াছি—ইহাতে সহস্র ছিদ্র াকুক,—এ যে তোমাদের গর্ব্ব-গৌরব-শ্লাঘার জিনিষ। উৎসাহের হুলুধ্বনি দিয়া, তোমার একবার ইহাকে রত্নবেদীর উপর বসাইয়া দাও। এ জলে তোমারি গৃহে—বিষ্ণুর মঙ্গলস্নান নিষ্পন্ন হইবে।

স্থৌল্য ও কার্শ্য।

স্থূল—রাম ও কৃশ—শ্যাম।

—:*:—

শ্যা। কি হে ভায়া, এ যে ক্রমশঃ বেজায় রকম াজা'চ্চ দেখ্‌ছি! শেষে দরজা কাটা'তে হবে।

রা। তবে কি তোমার মত রোগা হ'তে ল নাকি। কোন্ দিন হাওয়ার সঙ্গে মিশিয়ে যা'বে দেখছি।

শ্যা। হাওয়ায় মিশি আর না মিশি—া'তে বড় এসে-যাবে না। কিন্তু দেশের লাকের সবাই যদি তোমারই মত হইয়া পড়ে, া'হ'লে বসুমতী উদ্ধার করবার জন্যে ভগ-ান্‌কে আবার বরাহরূপ ধারণ ক'র্‌তে হ'বে বাধ হয়।

রা। ভগবান্ বরাহ বা কূর্ম্ম হ'লে তা'তে াড় ক্ষতি হবেনা, বরং অবতারের সংখ্যা বেড়ে াওয়ায় পুণ্যি করবার আর একটা পথ পরি-চার হবে। কিন্তু যাই বল ভাই, আমি তোমার মতন রোগা হতে নারাজ। রোগা 'ব,—বলকি—রোগা খেতে পায় না।

শ্যা। খাওয়ার পরিণাম যদি এই রকম য় ভায়া, তা' হলে আমি না খেয়ে থাকাই ভাল মনে করি। একে জীবন নানা ভারে কাতর, তা'র ওপর দু'চার মোন 'মেদ' চাপিয়ে জীবনটাকে দুর্ব্বিষহ ক'র্‌তে আদৌ ইচ্ছে নেই।

রা। তবে মুখ্যু, একটু ভার থাকা ভাল, হাল্‌কা হওয়া কিছু নয়। শাস্ত্রকারও বলিয়া-ছেন,—শূন্য হ'লে সবই লঘু হয়, আর পূর্ণ হলেই গুরু হয়।

শ্যা। এত পূর্ণ নয় দাদা, পূর্ণতর—পূর্ণ-তমও তোমার কাছে এগুতে সাহস করে না! এযে ভায়া আবার নূতন ক'রে হিমালয়ের সৃষ্টি হ'চ্ছে দেখ্‌ছি।

রা। তা হ'লেই বোঝ—ভারটা কি রকম! একবার যদি তোমার ওপর চেপে প'ড়্‌তে পারি—তা হলেই ফর্সা।

শ্যা। সেটা ঠিক, তুমি একটা জ্যান্ত ষ্টিম্-রোলার। কিন্তু চেপে প'ড়্‌বে কি ক'রে? তোমার ভার তোমায় জড় পদার্থ ক'রে তুলেছে, আমরা ক্ষিপ্র গতিতে স'রে যেতে পারি। এস দেখি ভায়া, একবার দু'জনে একটু দৌড়ে দেখি, বুঝি—তুমি কতটা স্থাবর আর কতটা জঙ্গম!

শ্যা। বলিস্ কি! মানুষ—বিশেষতঃ ভদ্র-লোকে দৌড়্‌বে! শাস্ত্রে বলে,—অশ্বো ধাবতি অর্থাৎ অশ্ব দৌড়িতেছে। তা ঘোড়া দৌড়ুক, হরিণ দৌড়ুক, বাঘ-ভালুক-গরু-বাছুর

দৌড়ুক। আর মানুষের মধ্যে ডাক হরকরা কি—বেহারা-কুলি দৌড়ুক। ভদ্রলোকে দৌড়ুবে কি! ভদ্রলোকে এই রকম গজেন্দ্র গমনে চল্‌বে।

বা। হাঁ গড়নে এবং আকৃতিতে গজেন্দ্রের সাদৃশ্য আছে বটে! পাশা পাশি দু'টো দাঁড়ালে,—কোনটা হাতী—ঠিক করা কঠিন হ'য়ে পড়ে।

(কবিরাজ মহাশয়ের প্রবেশ)

ক। কি হে তোমাদের দুজনের বিতণ্ডা হ'চ্ছে কিসের?

শ্যা। ভাল হ'য়েছে, কবিরাজ মহাশয়কে মধ্যস্থ মানা যা'ক—যে মোটা হওয়া ভাল, কি রোগা হওয়া ভাল?

বা। বেশ কবিরাজ মশায়ই মীমাংসা করুন।

ক। এর মীমাংসা ত প'ড়েই র'য়েছে, অর্থাৎ যে স্থূলদেহ=শ্যাম চন্দ্র, কৃশ দেহ=রাম চন্দ্র। তোমাদের উভয়ের দেহই নিন্দনীয়।

রাম ও শ্যাম। কি রকম কি রকম?

ক। শাস্ত্রে বলে;—

অত্যন্তগর্হিতাবেতাবতিস্থূলকৃশৌ নরৌ।
শ্রেষ্ঠো মধ্যশরীরস্তু কার্শ্যং স্থৌল্যাত্তু পূজিতম্॥

অর্থাৎ অতি স্থূল এবং অতি কৃশ নর অত্যন্ত গর্হিত। মধ্য শরীর ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ। আবার মোটা হওয়ার চেয়ে বরং রোগা হওয়া ভাল।

বা। শুন্‌চো শ্যাম ভায়া?

শ্যা। আরে গর্হিত ত দুজনেই, তা' না হয় এপিট আর ওপিট। তা' মোটা হওয়ার চেয়ে রোগা হওয়া ভাল কেন কবিরাজ মহাশয়?

ক। রোগা লোককে চিকিৎসা ক'র্‌লে তা'র কৃশতা সহজেই দূর করা যায়। কিন্তু মোটা লোককে চিকিৎসা ক'রে তা'র স্থৌল্য কমান অত্যন্ত কঠিন। শাস্ত্রে স্থৌল্যের চিকিৎসা নাই ব'লেই এক রকম লেখা আছে।

শ্যা। আচ্ছা কবিরাজ মহাশয়, মোটা হওয়ার দোষটা কি বলুন?

ক। মোটা হ'লে ক্ষুদ্র শ্বাস হয়—হাঁপাতে হয়। ক্ষুধা, পিপাসা, নিদ্রা ও ঘাম অধিক হয়, গাত্রে দুর্গন্ধ হয়, ঘুমুলে গলা ঘড়-ঘড় করে, শরীর অবসন্ন হয়, কথা অস্পষ্ট হয় কোন শ্রম জনক কার্য্য করা যায় না, মেদ ধাতু অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয় ব'লে, তার পরবর্ত্তী ধাতু অর্থাৎ অস্থি, মজ্জা ও শুক্র পুষ্ট হয় না, আর সেই জন্যে স্ত্রীসহবাসের ক্ষমতা খুব ক'মে যায়, প্রাণশক্তি (Vitality) অল্প হয়, এবং প্রমেহ, পিড়কা জ্বর, ভগন্দর, বড় ফোড়া কিম্বা বায়ু জনিত রোগে আক্রান্ত হ'য়ে প্রাণ ত্যাগ করে।

শ্যা। বলেন কি ম'শায় প্রাণত্যাগ?

ক। হাঁ বাপু! ওটা সকলকেই সময়ে ত্যাগ ক'র্‌তে হয়। তবে মোটা ম'শায়রা কিছু সকালে—সকালে করেন, আর যে রোগ গুলো বল্লাম, ওর মধ্যে একটা না-একটা রোগে ভুগে থাকেন।

রা। আর রোগা লোকেরা নীরোগ-শরীরে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকে, কি বলেন কবিরাজ মশায়?

ক। না বাপু, ততটা সুবিধে ভগবান্ রোগা লোকদের দেন নি।

রা। তবে রোগা হওয়ার দোষটা কি বলুন?

ক। অত্যন্ত কৃশ ব্যক্তি ক্ষুধা, পিপাসা, শীত, গরম, প্রবল বায়ু ও বর্ষা সহ্য ক'র্‌তে পারে না, প্রায়ই বায়ু-রোগে আক্রান্ত হয়, অল্প-প্রাণ হয়, কোন শ্রমজনক কাজ ক'র্‌তে

পারে না এবং শ্বাস, কাস, শেষে প্লীহা, উদর, অগ্নিমান্দ্য, গুল্ম, ও রক্তপিত্ত রোগে প্রাণত্যাগ করে। কৃশ ব্যক্তির যে কোন রোগ জন্মায়, সেটা প্রবল হ'য়েই থাকে।

শ্যা। আচ্ছা কবিরাজ ম'শায়, মোটা হ'বার কারণটা কি বলুন দেখি?

ক। অত্যন্ত পুষ্টিকর দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে খাওয়া, পরিশ্রম না করা, পূর্ব্ব আহার জীর্ণ না হ'তে খাওয়া, দিবাভাগে নিদ্রা যাওয়া, অতিরিক্ত শ্লেষ্মাবর্দ্ধক দ্রব্য খাওয়া প্রভৃতি কারণে মেদের বৃদ্ধি হ'লেই লোকে মোটা হ'য়ে পড়ে।

রা। আর লোকে রোগা হয় কেন কবিরাজ ম'শায়?

ক। অত্যন্ত বায়ু বর্দ্ধক রুক্ষ খাদ্য খাওয়া, অতিরিক্ত পরিশ্রম, অতিরিক্ত মৈথুন অধিক অধ্যয়ন, ভয়, শোক, চিন্তা, রাত্রিজাগরণ, পিপাসা ও ক্ষুধা সহ্য করা, কষা জিনিষ খাওয়া, অল্প পরিমাণে খাওয়া প্রভৃতি কারণে শরীরের রস-ধাতু ক্ষীণ হয় এবং অন্যান্য ধাতুকে ভাল রকম পোষণ ক'র্‌তে পারে না, কাজেই শরীর কৃশ হ'য়ে পড়ে।

শ্যা। আচ্ছা কবিরাজ ম'শায়, আপনি ত ব'ল্লেন যে, স্থৌল্য রোগের চিকিৎসাই নেই। তবে কি আমায় শরীর কমা'বার কোন উপায় নেই?

রা। কেন হে ভায়া, কমা'তে চাও কেন? এই যে ব'ল্‌ছিলে—ভার থাকা ভাল।

শ্যা। আরে রক্ষা কর ভায়া, দু' পা চল্‌তে পারিনে, একটু নড়তে-চড়তে হাঁস-ফাঁস ক'রতে হয়, আর এই গরমে যে কি কষ্ট হয়—তা' ব'লে বোঝাবার নয়।

ক। স্থৌল্য রোগের চিকিৎসা ক'র্‌তে হ'লে—প্রথমেই যে সকল কারণে রোগ জ'ন্মেছে, সে গুলি পরিত্যাগ ক'র্‌তে হ'বে।

শ্যা। কারণ কি—তা' জানবো কি করে?

ক। এই যে আগে ব'লেছি—প্রচুর পুষ্টিকর দ্রব্য খাওয়া, দিনে ঘুমান, পরিশ্রম না করা ইত্যাদি।

শ্যা। হাঁ বুঝেছি, বলুন।

ক। তা'র পর পথ্যের কথা বল্‌ছি। উড়ী ধান বা কাঙ্গনী ধানের চালের ভাত, যবের ভাত, যবের রুটী, কুলথি কলায়, মসুর, মুগ বা বুটের দাল, শাক, বেগুণ পোড়া, খই, মধু, ঘোল, তেঁতো, কষা ও ঝাল জিনিষ, সর্ষপ তৈল, এলা'চ, রুক্ষ খাদ্য, গরম জল—এই সব এ রোগে পথ্য। এ রোগে আহারের পূর্ব্বেই জলপান করা উপকারী। আর চিন্তা, পরিশ্রম, রাত্রিজাগরণ, মৈথুন, উপবাস, রৌদ্রসেবন, পথভ্রমণ, মধ্যে মধ্যে বমি করা ও জোলাপ লওয়া, হাতী-ঘোড়া চ'ড়ে বেড়ান—এই সব উপকারী।

শ্যা। আচ্ছা ভাবনা যদি আপনা হ'তে না আসে, তবে ভাবনা আনবো কি করে?

ক। ভাবনার মত শরীর রোগা কর্‌বার জিনিষ আর কিছু নেই। কথায় বলে—ভেবেভেবে রোগা হয়ে যা'চ্ছে। তা' যে লোকটার রোগ,—তা'র আত্মীয়-স্বজন কোন রকম যোগাড়-যন্ত্র ক'রে তাকে অন্য সম্বন্ধে বা কোন বিষয় সম্বন্ধে ভাবনায় ফেল্‌বে। তা'রপর শরীর রোগা হ'য়ে গেলে তাকে বুঝিয়ে ব'লবে যে, এই জন্যে তোমায় এই রকম ক'রে ভাবনায় ফেলেছিলাম।

শ্যা। আচ্ছা এখন এ রোগের কি কি অপথ্যের কথা বলুন?

ক। ভাল চালের ভাত, গম থেকে প্রস্তুত খাবার জিনিষ, দুগ্ধ বা দুগ্ধ থেকে প্রস্তুত খাদ্য, গুড়, চিনি, মিছরী, মাষ কলায়, ঘৃত প্রভৃতি স্নেহ দ্রব্য, পেস্তা, বাদাম প্রভৃতি স্নেহ-বহুল ফল, আম, কাঁটাল প্রভৃতি মধুর ও পুষ্টিকর ফল, মৎস্য, মাংস, মধুর দ্রব্য, আহারের পর জলপান, মিষ্ট দ্রব্য, প্রভৃতি এ রোগে অপথ্য।

শ্যা। আচ্ছা মাছ কি কিছুই খাবার যো নেই?

ক। মাছের মধ্যে একমাত্র চিংড়ি মাছ খাওয়া যায়। সুখে থাকা ও স্নান করা—স্থৌল্য রোগে যতদূর পারা যায় ত্যাগ করা উচিত।

শ্যা। তা' হ'লে পথ্য ত বড় বিপজ্জনক?

ক। রোগ বিপজ্জনক হ'লেই পথ্যও বিপজ্জনক হয়। একজন কলিকাতার গণ্য মান্য ব্যক্তি এই রোগের প্রতিকারের জন্য কিছু দিন কেবল মুড়ি খেয়ে ছিলেন। তা'তেই তাঁর রোগ ভাল হ'য়ে গিয়েছিল।

শ্যা। আচ্ছা কবিরাজ মশায়, এখন এর ওষুদ কি আছে বলুন?

রা। দাঁড়াও ভায়া—এক যাত্রায় পৃথক ফল! আমি রোগা, আমার কি পথ্য আগে ত জেনে নেই, তা'রপর তোমার কথা।

শ্যা। কেন হে, এই যে ব'ল্‌ছিলে রোগা থাকাই ভাল।

রা। ভাল বটে, তবে এতটা নয়, একটু শাঁসে-জলে হওয়া চাই বৈ কি! শীত কি গরম সহ্য হয় না, কষ্ট সহ্য হয় না, একটা বলবান্ লোক পাশ দিয়ে গেলে মনে হয়—ধাক্কা লেগে প'ড়ে যাই, আর রোজই একটা-না-একটা বায়ুর উপসর্গ আছেই।

ক। আচ্ছা শোন ব'লছি। যে সকল কারণে কৃশতা জ'ন্মেছে—যেমন অল্প আহার, উপবাস, অতিরিক্ত পরিশ্রম, পথ-পর্য্যটন, রাত্রি জাগরণ প্রভৃতি—সে সমস্ত ত্যাগ ক'র্‌তে হ'বে। তা'র পর পুষ্টিকর জিনিষ, ঘৃত দুগ্ধ, লুচি, মৎস্য, মাংস, ক্ষীর, ছানা, মাখন, পেস্তা, বাদাম, আঁম, কলা প্রভৃতি মিষ্ট ফল, চিনি, মিছরী উত্তম চালের ভাত,—এই সব সুপথ্য। কটু, তেতো ও কষা দ্রব্য, শাক, সর্ষপ তৈল, মধু—এ সব দ্রব্য পরিত্যাগ ক'র্‌তে হ'বে। আহারের পূর্ব্বে জলপান না ক'রে—পরে করা উচিত। পরিশ্রম না করা, সুখে থাকা, দিনে নিদ্রা যাওয়া, প্রচুর আহার করা, স্নান—এই সমস্ত কৃশতা রোগে হিতকর।

রা। এ দেখ্‌ছি শ্যাম ভায়ার যা' পথ্য' আমার তাই অপথ্য। আর শ্যাম ভায়ার যা' অপথ্য—আমার তাই পথ্য।

ক। হাঁ ঠিক তাই। কার্শ্য রোগে স্থৌল্য রোগের বিপরীত এবং স্থৌল্য রোগের বিপরীত ক্রিয়া কার্শ্যরোগে ক'র্‌তে হয়।

শ্যা। ভায়া, এখন রোগা হওয়াই ভাল মনে হ'চ্ছে। কেননা তোমার পথ্যের বন্দোবস্তটা বড় লোভনীয়।

রা। আর তোমার পথ্যটা তেমনি শোচনীয়। কোন জন্মে কখন যেন মোটা না হই।

শ্যা। দেখুন কবিরাজ ম'শায়, শ্যামকে ভালভাল জিনিষ খেতে ব'ললেন, আর আমাকে ভাল জিনিষ কিছুই খেতে ব'ল্‌লেন না। এটা আপনার অবিচার হ'ল।

ক। আমার বিচার ক'রবার ত অপেক্ষা রাখনি বাপু, আগে থেকেই মোটা হ'য়ে ব'সে আছ। যদি রোগা হ'তে পারতে,—তা' হ'লে ঐ রকম পথ্যই ঘট্‌তো। তবে একদিকে তোমার জিত আছে, রামের হাতী ঘোড়া চড়া

নিষেধ, কিন্তু তুমি যত খুসী—হাতী ঘোড়া চড়, পরিশ্রম কর, চিন্তা কর, রাতজেগে থিয়েটার দেখ।

রা। আচ্ছা। কবিরাজ মশায়, শ্যামকে দাল খেতে ব'লেছেন, তা' দাল কি আমার পক্ষে নিষেধ ?

ক। দাল বায়ু-বর্দ্ধক ব'লে কৃশব্যক্তির পক্ষে অহিতকর, কিন্তু এর মধ্যে যুক্তি আছে ;—প্রথমতঃ তোমার যদি নিত্য দাল খাওয়া অভ্যাস থাকে এবং দাল নইলে ভাল রূপ আহার ক'র্‌তে না পার—তা' হলে দাল সুপথ্য না হ'লেও অল্প-স্বল্প খেতে হ'বে। তা'রপর দাল রুক্ষ ব'লে বায়ু বর্দ্ধক, সুতরাং তুমি যদি দালে যথেষ্ট ঘৃত দিয়ে খাও—তা' হলে আর বায়ু-বর্দ্ধক হ'তে পারে না ব'লে কুপথ্য হয় না, বরং সুপথ্য হয়। আবার দেখ, শ্যামকে দাল খেতে বলা হ'য়েছে কিন্তু শ্যাম যদি দালে যথেষ্ট ঘৃত মিশ্রিত ক'রে খায়,—তা' হলে সেটা শ্যামের পক্ষে কুপথ্য হবে।

শ্যা। পথ্য সম্বন্ধে আমার সকল দিকেই সুবিধা দেখ্‌ছি। যাক্‌ এখন ঔষধের কথা বলুন।

ক। ওষুদের কথা ব'ল্‌ছি—কিন্তু কারণ পরিত্যাগ,পথ্য সেবন, অপথ্য ত্যাগ—এইগুলি আগে চাই। বরং ওষুদ না খেলে এতেই ফল হয়, কিন্তু এগুলি না ক'র্‌লে ওষুদে কিছু হয় না। শাস্ত্রে বলেছে,—পরিশ্রম, চিন্তা, স্ত্রী-সহবাস, পথভ্রমণ, মধু খাওয়া, রাত্রি জাগরণ, যব ও শ্যামা ঘাসের বীজের চালের ভাত আহার করা—এই সকলের দ্বারা স্থৌল্য রোগ অবশ্যই নষ্ট হ'য়ে থাকে। নিদ্রা না যাওয়া, মৈথুন, ব্যায়াম এবং চিন্তা—এ গুলি যাঁরা স্থৌল্য ত্যাগ ক'রতে ইচ্ছা করেন—তাঁদের ক্রমশঃ বাড়ান উচিত।

শ্যা। তা' একেবারে না ঘুমিয়ে কি থাক্‌তে পারা যা'বে ?

ক। আরে তাও কি হয় ? না ঘুমিয়ে মানুষ কতদিন বাঁচ্‌তে পাবে ? তবে এতে ঘুম যত কমান যায়, ততই ভাল।

শ্যা। এইবার ওষুধের কথা বলুন।

ক। প্রাতে পুরাণ মধু মিশ্রিত কূপ জল পান ক'র্‌লে স্থৌল্য নষ্ট হয়।

শ্যা। কূপ জল যদি না পাওয়া যায়, তা' হ'লে কি হ'বে ? আর মধু ও জলের পরিমাণই বা কি ? কতদিনের পুরাণ মধু ?

ক। কূপ জল না পাওয়া গেলে—পুকুরের জল, তা'ও না হ'লে—নদীর জল, তাও না হ'লে—কলের জল। কূপের জলে ক্ষার থাকে ব'লে বেশী উপকারী। আর মধু সহ্যমত মাত্রায় আরম্ভ ক'রে ক্রমশঃ বাড়া'তে হ'বে। প্রথমে এক তোলা আন্দাজ মধু পাঁচ সাত তোলা জলে মিশিয়ে খেতে হয়, সহ্যমত এক ছটাক পর্য্যন্ত মধু প্রত্যহ খাওয়া যেতে পারে। জলের পরিমাণও ঐ পরিমাণে বা'ড়াতে হবে। গা' জ্বালা হ'লে মধু বাড়াবে না দুই বৎসরের সযত্ন রক্ষিত মধু চাই।

শ্যা। আচ্ছা তা'র পর বলুন।

রা। প্রাতে উষ্ণ অন্নমণ্ড আহার করলে শরীর রোগা হয়।

শ্যা। অন্নমণ্ড মানে কি ? ভাল চাল ত খেতে বারণ ক'রেছেন।

ক। শ্যামা ধানের চাল, কাঙ্গিনী ধানের চাল—এইসব জিনিষের মণ্ড ক'রে খেলেই ভাল হয়। তা' না ঘটলে—যে কোন

পুরাণ চালের মণ্ড ক'রে খাওয়া যেতে পারে।

শ্যা। মণ্ড কি রকম ক'রে তৈরি ক'রতে হয়, কতটা খাওয়া যায়, আর ক'বারই বা খাওয়া যায় বলুন।

ক। চাল গুঁড়ো ক'রে,—যতটা চা'লের গুঁড়ো—তা'র চৌদ্দ গুণ জলে পাক ক'র্তে হয়। তা'রপর চালের গুঁড়ো জলের সঙ্গে ঘোলের মত হ'য়ে গেলে, অথবা খুব তরল থাক্‌তে নামা'তে হয়। মণ্ড একটু গরম থাক্‌তে-থাক্‌তে খাওয়া উচিত। একবার খেয়ে থাক্‌তে পা'র্‌লে ভালই, নয়ত দু'বার খেতে হয়। আর একটা কথা—যতটা খেলে পেট বেশী না ভরে—অথবা যতটুকু খেলে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়—ততটা খাওয়া যেতে পারে।

শ্যা। আচ্ছা আর কি ওষুদ আছে বলুন?

ক। খই; জীরা, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হিং, সচল লবণ ও চিতার মূল—সমান ভাগে চূর্ণ ক'রে একত্র ক'রবে। আর চূর্ণ যত—তা'র ষোল গুণ যবের ছাতুর সঙ্গে মেশা'বে। দধির মাতের সঙ্গে এই ঔষধ মিশ্রিত ছাতু সহ্য মত খেতে পার;—এইরূপ ভাবে ৩।৪ তোলা থেকে ৭।৮ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় দিন কতক সেবন ক'র্‌লে স্থূলতা ক'মে যায়।

শ্যা। খালি এই ছাতু খেয়েই কি থাক্‌তে হ'বে?

ক। না, অন্য যে সব পথ্যের কথা ব'লেছি, সে সবও খা'বে, আর একবার এই ওষুদ মিশ্রিত ছাতু খা'বে। তবে এটা যেন মনে থাকে যে,—বেশী খাওয়া আর পরিশ্রম না করার ফলেই স্থৌল্য রোগ হয়। সুতরাং এ রোগে যত কম ক'রে খাওয়া যায় এবং যত অধিক পরিশ্রম করা যায়—ততই ভাল। কিন্তু কম খাওয়া ব'ল্‌লাম ব'লে একবারে কম বু'ঝতে হ'বে না। কেন না,—শরীর ধারণের উপযোগী আহার চাই ত! আর পরিশ্রমও অধিক বলায় শক্তির অতীত—এমনটা বুঝ্‌তে হ'বে না, কেননা হঠাৎ অধিক পরিশ্রম ক'র্‌লে অনিষ্ট ঘট্‌তে পারে। আবার পূর্ব্বে যে ক্রমশঃ ব'লেছি—সেটা, এই আহার কমান এবং পরিশ্রম বাড়ানোর প্রতি বিশেষ প্রয়োজ্য। ক্রমশঃ আহার কমা'লে এবং পরিশ্রম বাড়া'লে কোন অনিষ্ট হয় না।

শ্যা। আচ্ছা আর কি ওষুদ আছে বলুন?

ক। ওষুদ অনেক আছে। কিন্তু সব ত তোমার ঘরে তৈয়ের ক'রে নিতে পা'রবে না। তবু দু' চারটের কথা বল্‌ছি শোন (১) মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, সজিনা বীজ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কটকী, বৃহতী, কণ্টকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আকনাদি, আতইচ, শালপানি, হিং, কেয়াফুলের গাছের মূল, যমানী, ধনে, চিতামূল, সচল লবণ, কৃষ্ণজীরা ও হবুষা (অভাবে ধনে) সমান ভাগে চূর্ণ ক'রে একত্র মিশিত ক'রে নেবে, আর চূর্ণ যত নেওয়া হ'বে—ঘৃত, মধু ও তিল তৈল প্রত্যেক জিনিষ তত পরিমাণ নিয়ে একত্র মিশ্রিত ক'রবে। তা'রপর সমস্ত মিলিত দ্রব্যের পরিমাণের ষোলগুণ যবের ছাতু নিয়ে সমস্ত একত্র ক'র্‌বে। এই ঔষধ মিশ্রিত ছাতু সহ্য মত মাত্রায় জলের সঙ্গে গুলে খেলে—স্থৌল্য, মেহ, উদর, শোথ, ভগন্দর, পাণ্ডুরোগ প্রভৃতি ভাল হয়। ঔষধ খা'বার সময় কলা, আলু প্রভৃতি কন্দ, কাঁজি, করমচা, বাঁশের কোড় আর করোলা উচ্ছে খেতে নেই। এ ওষুধ ৫।৬ তোলা থেকে ১১।১২ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় খাওয়া যেতে পারে।

(২) কুলের পাতা আট তোলা বেটে কাঁজির সঙ্গে সিদ্ধ ক'রে খেলে স্থৌল্য ভাল হয়। কাঁজি এক সেরের সঙ্গে সিদ্ধ ক'রে যখন ঘন হয়, তখন নামিয়ে নিতে হয়।

শ্যা। অতটা খাওয়া যা'বে কেন?

ক। না পার যতটা পার—ততটা খেও।

রা। আচ্ছা কবিরাজ মহাশয়, ভায়াকে ডাল শুদ্ধ কুলপাতা খাওয়ালে হয় না?

ক। সেটা তুমি তোমার ভায়ার সঙ্গে বোঝ। কিন্তু ছাগলে কুলপাতা খায় ব'লে মনে ক'রনা যে, ইহার আর কোন রোগ-নাশকতা শক্তি নেই। পৃথিবীর অতি তুচ্ছ দ্রব্য দ্বারাও সময়ে মহান্ উপকার পাওয়া যায়।

শ্যা। আপনি তা'রপর বলুন কবিরাজ মশায়। ও পাগলের কথা ছেড়ে দিন।

ক। (৩) বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, আমলকী ও যব চূর্ণ প্রত্যেকে এক তোলা, আর লৌহভস্ম ৪ তোলা একত্র মিশ্রিত ক'রে প্রথমে দুইরতি মাত্রায় আরম্ভ ক'রে তারপর দু' আনা বা তা'রও বেশী প্রয়োগ করা যেতে পারে।

শ্যা। লৌহ ভস্ম পা'ব কোথায়?

ক। লৌহভস্ম তৈয়ের করা ত সোজা নয়, কাজেই কোন কবিরাজের কাছ থেকে এক আধ তোলা খরিদ ক'রে লওয়া ভাল।

(৪) গুলঞ্চ চূর্ণ এক তোলা, ছোট এলা'চ চূর্ণ চার তোলা, ইন্দ্রযব চূর্ণ পাঁচ তোলা, হরীতকী ছয় তোলা, আমলকী চূর্ণ সাত তোলা এবং গুগ্‌গুলু আট তোলা—একত্র মিশ্রিত ক'রে আবশ্যক মত মধুর সঙ্গে বেশ ক'রে মেড়ে নেবে। এই ওষুদ এক সিকি হইতে এক তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় মধুর সঙ্গে মেড়ে খেলে স্থৌল্য ও ভগন্দর রোগ নষ্ট হয়।

শ্যা। আবশ্যক মত মধু কি বলুন? আর গুগ্‌গুলু কি? এই যে ধূনো-গুগগুলু পোড়ান হয়—সেই গুগ্‌গুলু?

ক। আবশ্যক মত মধু মানে হ'চ্ছে—যে পরিমাণ মধু দিয়ে মাড়্‌লে পাতলা হয় না, বা খুব শক্ত থাকেনা এবং বড়ির মত করা যায়। আর গুগ্‌গুলু মানে যা' ব'লছ, তাই বটে, তবে, ওরই মধ্যে যে গুগ্‌গুলু মহিষের চোখের মত লাল আভা দেখ্‌তে—সেইগুলি শোধন ক'রে নিতে হয়।

শ্যা। শোধন আবার কি ক'রে ক'রতে হয়?

ক। শাস্ত্রে বলে গুলঞ্চের কাথ; ত্রিফলার কাথ কিম্বা দুধের সঙ্গে গুগ্‌গুলু সিদ্ধ ক'র্‌তে হয়। সিদ্ধ ক'রবার সময় ন্যাকড়ায় গুগ্‌গুলু নিয়ে হাঁড়ির মুখে একটী কাঠি রেখে—ন্যাকড়া সেই কাঠির সঙ্গে বেঁধে হাড়ির ভিতর ঢুকিয়ে দিতে হয়, যেন হাঁড়ির তলায় না লাগে। তা'রপর সিদ্ধ ক'রতে-ক'রতে গুগ্‌গুলু বেশ নরম হ'লে তুলে নিয়ে মলামাটী বাদ দিয়ে উত্তম গব্য ঘৃত দিয়ে উত্তমরূপে শিলে বাটিয়া লইতে হয়।

শ্যা। আর কি ওষুদ বল্‌বেন বলুন?

ক। গুগ্‌গুলু ঘটিত আর একটা ওষুদ ব'ল্‌ছি,—মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, চিতামূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুতা ও বিড়ঙ্গ—প্রত্যেকের চূর্ণ এক তোলা আর শোধিত গুগ্‌গুল নয় তোলা একত্রে আবশ্যক মত মধুর সঙ্গে মেড়ে রা'খ্‌তে হয়। এই ওষুদ এক সিকি থেকে এক তোলা মাত্রায় মধুর সঙ্গে মেড়ে খেলে—স্থৌল্য, মেহ, গুল্ম ও আমবাত রোগ ভাল হয়।

শ্যা। আর কোন ওষুদ ব'লবেন না?

ক। আর ব'লে লাভ কি, তোমারা ও

ত'য়ের ক'রে নিতে পা'রবে না। আর যে সব ওষুদ ব'ললাম—এর দুই একটা তোয়ের ক'রে খেলে আর সুপথ্যে থা'কলে ভাল হ'য়ে যা'বে।

শ্যা। আচ্ছা, তাই ক'রব আমি। আমার একজন বন্ধু এই রোগের জন্যে আমেরিকা থেকে ওষুদ আনিয়েছিল, দু'মাস খেয়েও কিছু হ'ল না। আমি বিদেশী-ওষুদ ছেড়ে দিয়ে একবার দেশী-ওষুদই চেষ্টা ক'রে দেখি।

ক। শুধু তাই নয়, তোমার সেই বন্ধুটী কেও যে সব নিয়ম ব'ললাম সেই সব নিয়ম পালন ক'রে ওষুদ খাইও। তা' হলে তিনি বুঝতে পারবেন যে, হাতের কাছে প্রতিকারের উপায় থাকতে, তিনি প্রলোভনে প'ড়ে বিদেশের ওষুদ আনিয়ে প্রতারিত হ'য়েছেন। এদেখে অনেকের চোখও ফুটতে পারে।

শ্যা। আচ্ছা কবিরাজ মশায়, আমার শরীরে বড় দুর্গন্ধ হয়,—এর কি কোন প্রতিকার নেই?

ক। তা' আছে বই কি। কিন্তু সে সব ব'লে লাভ নেই, কেননা তোমরা ত'য়ের ক'রে নিতে পা'রবে না। সহজ কতকগুলো মুষ্টিযোগ বলছি। (১) তেজপাতা, কলা, অগুরু, হরীতকী ও রক্তচন্দন সমভাগে বেটে প্রলেপ দিলে গায়ের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়।

শ্যা। অগুরুটা কি? অনেক স্থানে অগুরু নাম শুনতে পাই, আর ব'য়েও দেখ্‌তে পাই, কিন্তু জিনিষটে কি—তা' জানিনে।

ক। চন্দনের মত এক রকম কাঠ। আসাম অঞ্চলে জন্মায়, খুব সদ্গন্ধ,—দামও খুব বেশী। তা তুমি অগুরু না পেলে শ্বেত চন্দন দিও।

শ্যা। সে ভাল কথা। এখন আরও মুষ্টিযোগ বলুন।

ক। (২) শাঁক—কি শাঁক যা'রা তৈয়ের করে,—তা'দের দোকানে শাঁকের এক রকম গোড়া পাওয়া যায়। তাই চূর্ণ ক'রে—বাসক পাতার রস—কি বেলপাতার রসের সঙ্গে বেটে গায়ে মা'খ্‌লে দুর্গন্ধ নষ্ট হয়। (৩) তেঁতুল পাতার রস মালিস ক'রে—তা'র পর হলুদ পোড়া—তেঁতুল পাতার রসে বেটে মর্দ্দন ক'রলে বগলের এবং গায়ের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়। (৪) তেজপাতা, কলা, অগুরু, শ্বেত-চন্দন ও বেণারমূল জলের সঙ্গে বেটে মর্দ্দন করলে দুর্গন্ধ নষ্ট হয়।

শ্যা। এখানে অগুরু ও শ্বেতচন্দন দুই র'য়েছে, তবে অগুরু না পেলে তা'র বদলে কি নেব?

ক। দু'ভাগ শ্বেতচন্দন নেবে, কি অগুরুর বদলে রক্তচন্দন নেবে। কিন্তু বেশ সদ্গন্ধযুক্ত রক্তচন্দন হওয়া চাই। এক রকম গন্ধহীন লালচন্দন কাঠ বাজারে বিক্রী হয়, সেগুলো রক্তচন্দন নয়।

শ্যা। আচ্ছা তা'রপর বলুন।

ক। (৫) শিরীষছাল, বেণারমূল, নাগকেশর ও লোধ ছালচূর্ণ- জলের সঙ্গে বেটে প্রলেপ দিলে ত্বকের দোষ ও ঘাম হওয়া ভাল হয়।

শ্যা। আর কি?

রা। থাম ভায়া। উনি স্থৌল্য নষ্ট ক'রবেন, শরীরের দুর্গন্ধ নষ্ট ক'রবেন,—আর আমি যেন কেউ নই! আমি কি ক'রে মোটা হই—বলুন ত কবিরাজ মশায়।

ক। তোমার পথ অতি সোজা। খুব ঘুমোও, ব'সে ব'সে স্ফূর্ত্তি কর, পরিশ্রম ক'রো না, রাস্তা হেঁট না, গাড়ী ঘোড়া চড়া বন্ধ কর, চিন্তা করো না, শোক বা ভয় ক'রো না, স্ত্রী

সহবাস ক'রো না, আর পোলাও, কালিয়া, মাছ, মাংস, খাও, ঘি যত পার খাও। কিন্তু পেট বুঝে খা'বে, শেষে যেন অজীর্ণ কি অতিসার রোগ ক'রে ব'স না।

রা। তা' একেবারে চিন্তা না ক'রে আর একেবারে পথ না হেটে চ'লবে কি ক'রে মশায়?

বা। চলা ত উচিত, তবে যদি নিতান্ত না চলে, তবে যতটা কম ক'র্‌বে তত ভাল। আর যত বেশী কর্‌বে ততই মন্দ।

রা। আর ওষুদের কথা বলুন।

ক। ঔষধ তোমার বড় দরকার হ'বে না, পুষ্টিকর জিনিষ প্রচুর খেয়ে ঐ সব নিয়ম পালন কর্‌লেই হ'বে। আর আহারের পূর্ব্বে জল না খেয়ে আহারের পরে খা'বে। ঔষধ যদি খেতে চাও—কবিরাজী বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত, অশ্বগন্ধা ঘৃত, চ্যবন প্রাশ, মাখন, মিছরী দিয়ে মকরধ্বজ—এই সব খেতে পার।

রা। বেশ কবিরাজ মশায়?—শ্যামের বেলায় এত মুষ্টিযোগ প্রদান কর্‌লেন, আর আমার বেলায় কি আপনার মুষ্টি শিথিল হ'য়ে গেল?

ক। মুষ্টি শিথিল হয় নি, কিন্তু ক্ষীণ দেহে যোগ করা বিপজ্জনক। তবে নেহাৎ যখন তুমি ছাড়বে না,—তখন দুই একটা শোন,— (১) ক্ষীর কাঁকলা, অশ্বগন্ধা, ভূঁইকুমড়া, ভুঁই আমলা, শতমূলী, শ্বেত বেড়েলা, পীতবেড়েলা, ও গোরক্ষচাকুলে— সমান ভাগে চূর্ণ ক'রে দুই আনা থেকে এক সিকি মাত্রায় দুধের সঙ্গে খেতে পার। (২) অশ্বগন্ধার মূল চূর্ণ বা ভূঁইকুমড়া চূর্ণ—দুধের সঙ্গে একসিকি মাত্রায় খেলে শরীর মোটা হয়। এ ছাড়া রসায়ন ও বাজীকরণ ঔষধগুলি সমস্তই কৃশতা নাশক।

শ্যা। আচ্ছা কবিরাজ মশায়, এই কি আয়ুর্ব্বেদের স্থৌল্য বা কার্শ্য—চিকিৎসার শেষ?

ক। না, কত ঔষধ আছে। কিন্তু সে সমস্ত এখন কেবল পুঁথিগত, ব্যবহার নাই।

রা। তা' কবিরাজ মশায়, আপনিও ব'ল্‌ছেন যে, শ্যামের চেয়ে আমি শীঘ্র ভাল হ'ব?

ক। সেটা নিজের উপর নির্ভর করে। ডাক্তার-কবিরাজে ব্যবস্থা করে, কিন্তু নিয়ম পালন করে—রোগী। যে যেমন নিয়ম পালন করে, সুপথ্যে থাকে, সে তেমনি ফল পায়।

রাম ও শ্যাম। আচ্ছা এখন আসি কবিরাজ মশায়, ভাল হ'লে খুসী ক'রব।

সাধনা ও সিদ্ধি।

—:*:—

যে লোক-হিতৈষণা প্রবৃত্তিবশে একদিন ভারতের আর্য্যঋষিগণ স্বার্থ-পরার্থ সমান ভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন, যে চিন্তার ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞান, কৃষি-শিল্প প্রভৃতি মানুষের ইহ-পরকালের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয়-গুলির ঐকান্তিকী উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, আজি আর ভারতের সে দিন নাই; সে রাম নাই, সে অযোধ্যা নাই! সে সুখের দিন—

সে গৌরবের দিন আর নাই; সে মন্বত্রিবিষ্ণু হারীত—সে ব্যাস-বশিষ্ট-শুক-পরাশর—সে সনক-সনাতন-সনন্দ আর নাই,—সে ধন্বন্তরি-চরক-সুশ্রুত-বাগ্‌ভট আর নাই;—আছে তাঁহাদের অমূল্য উপদেশ—মনুষ্যের সর্ব্ববিধ দুঃখ নিবৃত্তি ব্যপদেশে তাঁহাদের প্রত্যক্ষসিদ্ধ নরলোক-দুর্লভ অত্যদ্ভুত অলৌকিক উপদেশ মালা। যে উপদেশ নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিয়া ভারতবাসীর ভাণ্ডার ধনধান্যেপূর্ণ ছিল, আয়ু-বল-আরোগ্য অক্ষুণ্ণ ছিল, সমাজে শৃঙ্খলা ছিল, ধর্ম্মে আস্থা ছিল, স্নেহ-প্রীতি-বিশ্বাস-ভক্তিতে হৃদয় পূর্ণ ছিল, পরার্থে স্বার্থ উপেক্ষিত হইয়াছিল, সে দিন আর নাই। সে দিন নাই—সে কিছুই নাই। একটী তন্ত্রীতে আঘাত মাত্রে যেমন বীণার প্রত্যেক তন্ত্রীই ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে, একদিন তেমনি ঋষিদিগের একটী অঙ্গুলি হেলনে—একটি ইঙ্গিতে সমগ্র সমাজ পরিচলিত হইত, সে দিন আর নাই। সে একতা নাই, সে নিষ্ঠা নাই, সে সহানুভূতি নাই, সে কৃতজ্ঞতা নাই, সে উপদেশানুবর্ত্তিতা নাই। কেন এমন হইল, কে বলিয়া দিবে—কেন এমন হইল?

ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ প্রভৃতি শ্রেণীগণ আজিও ত সেইরূপ সমাজের উচ্চস্তরে দাঁড়াইয়া আছেন, কিন্তু সে জ্ঞান, সে তপশ্চরণ, সে শিক্ষা কই? সে স্বার্থ-ত্যাগ—সে স্বাবলম্বন—সে সমাজহিতৈষিতা—সে পরস্পরে আত্মবোধ কই? মহর্ষিগণের বংশধর বলিয়া—আর্য্যসন্তান বলিয়া অনেকের ভিতর একটা অভিমানও আছে দেখিতে পাই, কিন্তু তাঁহাদের ন্যায় ইহাদের কোন্ গুণ বর্ত্তমান আছে? তাঁহাদের অন্তর্দ্ধানের পরে ইঁহারা তাঁহাদের অনুরূপ কোন্ কীর্ত্তি স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছেন? নূতন একটা কীর্ত্তি স্থাপন দূরে থাক্, তাঁহারা যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা রক্ষা করিতেই বা তাঁহাদের বংশধরগণের যত্ন-চেষ্টা কই?—আগ্রহ-আকুলতা কই? তাঁহাদের যদি সে সুবুদ্ধি—সে আত্ম-রক্ষার যত্নপরতা দেখা যাইত, তবে কি দেশের এ দুর্গতি হয়—এ অধঃপতন হয়! নিদর্শন থাকিলে সুখ একেবারে অন্তর্হিত হয় না, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশে ভারতের সে সুখ নাই, সুখের সে নিদর্শনও নাই; সুতরাং সুখের সে পূর্ব্বস্মৃতি টুকু পর্য্যন্ত মুছিয়া গিয়াছে। যদি হৃদয়ে পূর্ব্ব গৌরবের সে স্মৃতি বর্ত্তমান থাকিত, তবে কি দেশের এ দারুণ দুর্গতি ঘটে? স্মৃতি গিয়াছে বলিয়াই ত এই অধঃপতন—এই পরমুখাপেক্ষিতা! আজি বৈদেশিক উন্নতি দেখিয়া আমরা মুগ্ধ,—বিজ্ঞান-দর্শন দেখিয়া,—শিল্প-সাহিত্য দেখিয়া,—কাব্য-অলঙ্কার দেখিয়া মুগ্ধ! যাহা বস্তুতঃ ভাল, তাহা দেখিয়া সর্ব্বদেশে—সর্ব্বকালেই লোকে সুখ্যাতি করে,—মুগ্ধ হয়, কিন্তু বিদেশ হইতে যাহা কিছু আমদানী হইবে, তাহা দেখিয়াই মুগ্ধ হইতে হইবে—এ বড় আশ্চর্য্য কথা! দুর্ভাগ্য আর কাহাকে বলে,—দুর্গতি আর কাহাকে বলে,—অবনতি আর কাহাকে বলে! আমাদের যাহা ছিল, তাহা দেখিব না—বুঝিব না—বুঝিবার চেষ্টাও করিবনা;—তাহা ভাল কি মন্দ ছিল, তাহার বিচার করিব না, একটা সূচ-আলপিন্ দেখিয়াই পরের গৌরব করিব,—এ বুদ্ধির বালাই লইয়া মরিতে ইচ্ছা হয়! বৈদেশিকেরা আমাদের বেদ-উপনিষদ, স্মৃতি-দর্শন, পুরাণ-ইতিহাসের অর্থ করিয়া দিতেছেন, তাঁহাদের বুদ্ধির মাপ-কাঠিতে মাপিয়া-জুখিয়া যাহা সিদ্ধান্ত করিয়া

দিতেছেন, তাহাই আমরা মাথা-পাতিয়া লইতেছি। তাঁহারা যাহার অর্থ বুঝিয়া বলিতেছেন—"ইহার অর্থ নাই,—ইহা আধুনিক,—ইহা প্রক্ষিপ্ত,—এটা কল্পিত,—এটা ভ্রম-প্রমাদ,—এটা কুসংস্কার,—শ্রম-বিনোদনে ইহা চাষার গান,"—আর অমনি আমরা তাহাই বুঝিতেছি;—ভাগ্য! যাহা আমাদের নিতান্ত নিজস্ব—নিতান্ত ঘরের কথা,—নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া-কাণ্ডের কথা, যে কথা আমাদের জীবন-মরণের সহিত জড়িত, যাহা আমাদের অতি প্রয়োজনীয় কথা—যে কথা আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ বলিয়া গিয়াছেন—বুঝাইয়া গিয়াছেন, সে কথার অর্থ আজি আমরা নিজের বুঝিতে পারি না—বুঝিবার চেষ্টাও করি না, এ দুঃখের কথা বলিই বা কাহাকে—শুনেই বা কে? যে কথা শুনিবার জন্য—বুঝিবার জন্য—এক দিন সহস্র সহস্র লোকের আগ্রহ-আকুলতা ছিল, সহস্র সহস্র লোক সেই-তপোনিষ্ঠ আচার্য্য-সন্নিধানে সমবেত হইয়া তত্বার্থ জিজ্ঞাসু হইত, সেই কথা শুনিবার জন্য এখন আমরা বিদেশীর মুখপানে চাহিয়া আছি! দুর্ভাগ্য কি আমাদের অল্প! এক্ষণে যদি কেহ আমাদের সেই কথা শুনাইবার—বুঝাইবার জন্য অগ্রসর হয়, চেষ্টা-যত্ন করে, তবে সে সহজেই উপ-হাসাস্পদ হয়,—মতিচ্ছন্ন আর কাহাকে বলে? আজি আর অন্য কথা বলিব না—তুলিব না; বর্ত্তমানে যাহা আমাদের বড় প্রয়োজনীয় কথা, আমাদের মরণ-জীবনের কথা, সেই আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব, পরে আমার যাহা বক্তব্য, তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ করিব।

যদি সুস্থ-শরীরে বাঁচিয়া থাকি, তবেই অন্য বিষয়ের প্রয়োজন হয়, নচেৎ কিছুরই প্রয়োজন নাই। আমি বাঁচিলে তবে দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্য, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য, রাজনীতি-সমাজ-নীতি-অর্থনীতির প্রয়োজন; এমন কি, যে ধর্ম্ম আমাদের ইহ-পরকালের সহচর, শরীর সুস্থ-সবল-কর্ম্মক্ষম না থাকিলে সে ধর্ম্ম-সাধন অসম্ভব হইয়া পড়ে। জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত কখনও রোগাক্রান্ত হয় নাই,—মৃত্যু সময়ে সহসা একদিন রোগ আক্রমণ করিল—আর মৃত্যুমুখে পতিত হইল, এমন দেহধারী জীব জগতে নাই; সকলকেই জীবিতকাল মধ্যে বহুবারই রোগ-কবলে পতিত হইতে হয়। রোগ যখন আক্রমণ করিবেই, তখন যে সদুপায় দ্বারা সেই রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, তাহাই অবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে জ্ঞান দ্বারা সেই সদুপায় নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহাই চিকিৎসা। এই চিকিৎসা যে শাস্ত্র নির্দ্দেশ করে, তাহাকে আয়ুর্ব্বিজ্ঞান বা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র বলে। এই আয়ুর্ব্বেদের রক্ষা কল্পে,—শিক্ষা কল্পে,—প্রচার কল্পে এই ভারতবর্ষে অনাদি কাল হইতে চেষ্টা চলিতেছে। ব্রহ্মা বিষ্ণু-রুদ্র-অশ্বিনী কুমারদ্বয়-ধন্বন্তরি প্রভৃতি দেবগণ; দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণ, আত্রেয়, অঙ্গিরা, চ্যবন, চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি ঋষিগণ এই পবিত্র লোকহিতকর আয়ুর্ব্বিজ্ঞান শিক্ষা ও প্রচার করিয়া জীবকুলকে রোগমুক্ত ও দীর্ঘায়ুযুক্ত করিতে যত্নপর হইলেন। তাঁহাদের সে চেষ্টা—সে যত্ন—সে সাধনা সার্থক হইল; আয়ুর্ব্বেদ জীব-জগতে বরণীয় হইল; আয়ুর্ব্বেদের উপকারিতা লোকে হৃদয়ঙ্গম করিল; আয়ু-র্ব্বেদ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য দ্বিতীয় দেহরক্ষাপঞ্জীরূপে পরিগৃহীত হইল। যে মহাপুরুষগণ আপনাদের স্বার্থ উপেক্ষা পূর্ব্বক

লোকহিতার্থে সেই আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, জীবকুলকে রোগমুক্ত করিতে আত্ম-নিয়োগ করিলেন, প্রাচীন ঋষিগণ তাঁহাদের এই স্বার্থত্যাগ, পরোপকারিতা, অধ্যবসায় দর্শনে প্রীত হইয়া পরম পবিত্র অমূল্য সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং তাঁহাদের আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যায় বংশানুক্রমিক উন্নতি-কামনায়—আয়ুর্ব্বেদ বিদ্ করিবার অভিপ্রায়ে "বৈদ্য" এই বিজ্ঞান-বিদ্ অভিধান প্রদান করিয়া গৌরবান্বিত করিলেন। তদবধি প্রধানতঃ বৈদ্যগণই এই শাস্ত্রের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা দ্বারা এবং স্বয়ং শাস্ত্র সম্মত চিকিৎসাবিধান করিয়া আসিতেছেন। ইঁহাদের সাতিশয় যত্নে এই এই চিকিৎসার যথেষ্ট উন্নতিও হইয়াছিল। উন্নতি হইবারই কথা। ইহা আমাদের দেশের লোকের ধাতুর সম্পূর্ণ উপযোগী, বিশেষতঃ আমাদেরই গৃহ পার্শ্বে, পল্লী-প্রাঙ্গনে, পর্ব্বতে-কাননে দেশের যত্র-তত্র ঔষধের উপাদান সকল ছড়ান রহিয়াছে, অনায়াসেই এই সকল উপাদান চিকিৎসক-গণ সংগ্রহ করিতে পারেন। আমরা যেমন চিরদরিদ্র, আমাদের চিকিৎসার ব্যয়ও সেইরূপ অল্প হইল। কেবল ইহাই নহে, এক পক্ষে এই বৈদ্য বা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ যেমন অভিজ্ঞ ও বিলাস-বিহীন থাকিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, অন্যপক্ষে ঔষধাদির ব্যয়ও তেমনি স্বল্প হইল, সুতরাং মণিকাঞ্চন যোগের ন্যায় হওয়াতে এই চিকিৎসা-প্রণালীর যথেষ্ট উন্নতি হইতে লাগিল, কিন্তু কেমন যে বিধাতার অভিশাপ, উন্নতি হইতে না হইতে ঘোর অবনতি আরম্ভ হইল। যেমন ভারতের জ্ঞান-ধর্ম্ম দর্শন-বিজ্ঞান-শিল্প-সাহিত্যের অবনতি হইল, তেমনি আয়ুর্ব্বেদের ও অবনতি হইল! প্রদীপ্ত প্রাতঃসূর্য্য উদয় মাত্রেই চির মেঘাবৃত হইল! সত্যবটে কাল-ধর্ম্মে উন্নতির পরে অবনতি অবশ্যম্ভাবী, আবার অবনতির পরে উন্নতিও অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু ভারতের যে অবনতি ঘটিল, তাহার আর পরিবর্ত্তন হইল না। তাই বলিতে ছিলাম, ভারতের উন্নতিতে বুঝি দেবকুলেরও ঈর্ষা হইয়াছিল, সেইজন্য দেবশ্রেষ্ঠ বিধাতার অভিসম্পাতে আজ আমাদের এ দারুণ দুর্গতি,—এ অপ্রতিবিধেয় অবনতি।

অনেকে বলেন যে, আজ কাল আবার আমরা ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছি, কিন্তু হায়, কোথায় সে উন্নতি! যদি উন্নতিই হইতেছে, তবে সে একতা কৈ—সে এক প্রাণতা কৈ,—সে বিশ্বজনীন হিতৈষণা কৈ,—সে জ্ঞান কৈ? ধর্ম্মে সে আস্থা কৈ,—আপ্তবাক্যে সে বিশ্বাস কৈ,—সে ত্যাগ কৈ,—সে তিতিক্ষা কৈ,—সে ব্রহ্মচর্য্য কৈ?—কৈ সে স্বজাতি-প্রীতি? কৈ সে স্বদেশ-প্রীতি? মুখের কথায় যদি উন্নতি সম্ভব হয়, তবে সেটা আমাদের যথেষ্টই হইয়াছে, তাহাতে সংশয় নাই। কথায় আমরা কি করিতে না পারি? কথার চটকে আমরা লোকের মন ভুলাইতে পারি,—লোক মজাইতে পারি,—কথায় আমরা দিগ্বিজয় করিতে পারি;—আকাশের চাঁদ পাড়িয়া হাতে দিতে পারি,—কথার উন্নতি আমাদের যথেষ্ট হইয়াছে! কিন্তু কার্য্যতঃ আত্মোদারপরায়ণতা ব্যতীত আর আমাদের কিছুই শিক্ষা হয় নাই; আত্মোদরপূরণে এতটুকু বিঘ্ন ঘটিলে আমরা অস্থির হই। আমরা আপনার কাহিনী আপনি লিখি,

আপনার ধ্বজা আপনি কাঁধে করি, আপনি আপনার ঢাক বাজাই, আপনার কথাই "পাঁচ কাহন" করি! ইহাই আমদের জ্ঞান, ইহাই আমাদের শিক্ষা, ইহাই আমাদের বুদ্ধি, আর ইহাই আমাদের বর্ত্তমান উন্নতি!

যাক্, বলিতেছিলাম—আয়ুর্ব্বেদের অবনতির কথা। আয়ুর্ব্বেদের অবনতিতে আমাদের যতটা ক্ষতি হইয়াছে, অন্য কিছুতে বোধ হয় এত ক্ষতি হয় নাই। বলিয়াছি ত, যদি আমাদের আয়ু বল-আরোগ্য অক্ষুণ্ণ থাকে, তবেই আমাদের অন্য বিষয় আলোচনার অবসর হয়—প্রয়োজন হয়; সুতরাং ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষের নিদান স্বরূপ আয়ু-বল-আরোগ্যহীন হইয়া আমরা সকল হারাইতে বসিয়াছি। যাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ সর্ব্বলোকরক্ষাকর এই আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের বিজয়-বৈজয়ন্তী মালা গলদেশে ধারণ করিয়া সগৌরবে জীবরক্ষাব্রতে আত্মশক্তির সম্পূর্ণ নিয়োগ করিয়াছিলেন, আজ তাঁহাদের বংশধরগণ পূর্ব্বগৌরব সম্পূর্ণ রূপে বিস্মৃত। সেই প্রাণাচার্য্যগণের সন্ততি আজি আর প্রাণিগণের প্রাণ রক্ষায় যত্নশীল নহেন।

এ দেশে একটা প্রবাদ আছে,—"বৈদ্যগণ বড় স্বজাতিপ্রিয়।" বর্ত্তমানে কৈ, তাহারও ত সার্থকতা দেখিতে পাই না। যদি পরস্পরে সে সহানুভূতি থাকিত, তবে আজি সমুদয় বৈদ্য-চিকিৎসক-সমাজকে "অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয়ের" প্রাঙ্গনে সমবেত দেখিতাম। এই আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ-আয়োজন করিয়া ইহার উদ্যোক্তৃগণ যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহার যে গুরুত্ব কত, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। আজ আমাদের দেশে হাকিমি, এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি প্রভৃতি নানা প্রকার চিকিৎসার ছড়াছড়ি;—এই সময়ে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের প্রতিষ্ঠা! ব্যাপার বড়ই গুরুতর! কোথায় পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানসম্মত, রাজাধিরাজের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত পরিরক্ষিত চিকিৎসাগার—পরীক্ষাগার—শিক্ষাগার—যেখানে বর্ত্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতমণ্ডলী—তাঁহাদের জীবনব্যাপী শিক্ষা-উদ্যম-অধ্যবসায় লইয়া শিক্ষা-পরীক্ষা-চিকিৎসা-ব্যপদেশে নিযুক্ত, আর কোথায় সহায়-সহানুভূতি বিহীন আয়ুর্ব্বেদ-কলেজ! অবস্থা বুঝিয়া অনেকেই বলিবে—'আয়ুর্ব্বেদ-কলেজের প্রতিষ্ঠা—পাগলামীর পরিচয়।" আমরা কিন্তু তাহা বলি না। আমরা বলি, ঠিক উপযুক্ত সময়েই ইহার কার্য্যারম্ভ হইয়াছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকিলে জিনিসের ভাল মন্দ বুঝা যায় না, প্রতিযোগি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে জিনিষের আদর হয় না। এই ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে আয়ুর্ব্বেদের প্রাধান্য রক্ষা করিতে যাঁহারা অগ্রসর হইবেন, তাঁহারা সমগ্র দেশবাসীর নিকট বরেণ্য হইবেন—দেব-ঋষিগণের আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইবেন।

আমার আয়ুর্ব্বেদ বলিয়া আমি গৌরব করিতে পারি, কিন্তু অপরের নিকট তাহার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতে না পারিলে তাহার গৌরব রক্ষা হইবে কেমন করিয়া? প্রতিযোগিতার তুলনায় দেখাইতে হইবে যে, আমার আয়ুর্ব্বেদই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাশাস্ত্র, আমার আয়ুর্ব্বেদই সকল প্রকার চিকিৎসার নিদান—অন্যান্য দেশের চিকিৎসাপ্রণালী আমার আয়ুর্ব্বেদ হইতেই সমুদ্ভূত।

কেবল বক্তৃতামুখে—প্রবন্ধে-নিবন্ধে একথা বলিলে চলিবে না,—এ বিজ্ঞানের যুগে—এ পরীক্ষা-প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগে—মুখের বৃথা আস্ফালন কেহ শুনিবে না—মানিবে না। তাই বলিতেছিলাম, আজি ঠিক্ উপযুক্ত সময়েই "অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের" প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কিন্তু এ প্রতিষ্ঠাকে যথোপযুক্তভাবে রক্ষা করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। ইহাতে এক পক্ষে যেমন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, অন্যপক্ষে তেমনি প্রত্যেক আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণের ঐকান্তিক সাহায্যেরও প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে আমরা বলি, যিনি শাস্ত্র মানেন, দেবতা মানেন, ঋষি মানেন, ঋষিদিগের বংশধর বলিয়া আপনার পরিচয় প্রদানে কুণ্ঠিত নহেন, তিনিই আসুন,—এই দেব-ঋষি রচিত আয়ুর্ব্বেদের মহিমা রক্ষা করিতে অগ্রসর হউন। এই আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয়ের সর্ব্ববিধ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদনার্থ যত্ন-প্রকাশে—আয়াস স্বীকারে—সাহায্য সহানুভূতিতে পুরস্কার নাই—অথচ না করিলে প্রত্যবায় আছে—এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া যিনি এ ক্ষেত্রে কার্য্য করিবেন, তিনি যথার্থ ত্যাগশীল-ঋষি-সন্তান, তিনি দেশের সুসন্তান, তিনি ধন্য।

ইহার উদ্যোক্তৃগণের কার্য্যকলাপে—বিধি-ব্যবস্থায় ভ্রম-প্রমাদ আছে, তোমরা আসিয়া সে ভ্রম-সংশোধন করিয়া দাও, "অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয়কে" আপনাদের নিজ প্রতিষ্ঠিত কার্য্য বলিয়া গ্রহণ কর, দেশে-দেশে ভারতের বৈদ্য-কুলের যশঃ বিঘোষিত হউক, দেশে দেশে আয়ুর্ব্বেদের মহিমা প্রচারিত হউক, দেশে-বিদেশে আয়ুর্ব্বেদের গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হউক; স্বর্গ হইতে দেশের সুসন্তানগণের মস্তকে—অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদ প্রচারের অনুষ্ঠাতৃগণের মস্তকে পুষ্পাশিস্ বর্ষিত হউক। সাধনায় সিদ্ধি আছে, কে তাহা অস্বীকার করিবে? অষ্টাঙ্গ-যোগ-সাধনায় যদি সর্ব্বেষ্ট সিদ্ধিলাভ সম্ভব হয়, তবে অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদের সাধনাও ব্যর্থ হইবে না।—সাধনা কর, সিদ্ধিলাভ নিশ্চিত।

ডাঃ শ্রীকালীকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

শঙ্খ।

হিন্দুর গৃহে শঙ্খ বড় পবিত্র জিনিষ। শঙ্খের ধ্বনিতে হিন্দুর দেবতা তুষ্ট। হিন্দুর সকল মঙ্গল কার্য্যেই শঙ্খ-ধ্বনির প্রয়োজন। শাঁখা-সাড়ী ও সিন্দূরের প্রসাদে, হিন্দু রমণী দেবীর মহিমায় মহিমান্বিতা। যে বিষ্ণু হিন্দুর সর্ব্বপ্রধান দেবতা, পুরাণে তিনি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী রূপে বর্ণিত।

এক সময় এ দেশে শঙ্খের আদর যথেষ্ট ছিল। এ দেশের রথি-মহারথিগণ শঙ্খনাদে সমর ঘোষণা করিতেন। এক জোড়া শাঁখার জন্য মা দুর্গা শিবের সঙ্গে কতই না ঝগড়া করিয়াছিলেন! শাঁখা পরিবার জন্য—দেবী মানবী সাজিতেন! শঙ্খ নির্ম্মিত অলঙ্কার হাতে না থাকিলে, মেয়ে মানুষের হাতের জল শুদ্ধ হইত না। যে নারীর হাতে শঙ্খ শোভা পাইত না, তাহার হস্ত হইতে

ভিখারী ভিক্ষা লইত না। শঙ্খ মধ্যস্থিত জলকে হিন্দুগণ তীর্থ-সলিলের মত অতি পবিত্র ভাবিয়া থাকেন। "মহাভারতে" শঙ্খের অনেকগুলি নাম দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ, "পাঞ্চজন্য" শঙ্খ বাজাইতেন, অর্জ্জুনের হস্তে "দেবদত্ত" নামক শঙ্খ শোভা পাইত। বীর-হস্তের শঙ্খ—"পৌণ্ড্র" "অনন্ত" "বিজয়" "সুঘোষ" "মণিপুষ্পক" প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত হইত।

প্রাচীন কালে বঙ্গরমণীগণও শাঁখা পরিতে ভাল বাসিতেন। তাঁহাদের এই শঙ্খ-প্রীতির প্রতি কটাক্ষ করিয়া ইতালী দেশের পরিব্রাজক "গার্সিয়া" তদীয় ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন—"শঙ্খ উপঢৌকন পাইলে বাঙ্গালীর মেয়ে উপহার-প্রদাতার হস্তে অনায়াসেই নিজের সতীত্ব অর্পণ করিতে পারে।" এ কথা সাহেব কৌতুক করিয়া লিখিয়াছেন কি না জানি না, এখন কিন্তু এ দেশে শঙ্খ নির্ম্মিত অলঙ্কারের তত আদর নাই। "বেলোয়ারী চুড়ী" এখন শঙ্খের স্থলে অভিষিক্ত হইয়াছে। যদিও কোন কোন ভদ্র-মহিলার হাতে ঢাকার শাঁখার বালা—এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আমার মনে হয় সেটা বাদলার দিনে বড়লোকের মুড়ী খাওয়ার মত—কেবল সখের খাতিরে। কিছু দিন পরে হয় ত শাঁখার আদর একবারেই উঠিয়া যাইবে।

শাঁখার আদর এখনও আসাম প্রদেশের বন্য জাতিদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কুকি, মিকির, মালা, প্রভৃতি বর্ব্বর জাতিরা—স্ত্রী-পুরুষে মিলিয়া এখনও নানাবিধ শাঁখার গহনা পরিয়া থাকে। এখনও তাহারা সভ্য হয় নাই।

পুরাণে শঙ্খধ্বনির অনন্ত মহিমা উক্ত হইয়াছে। "শঙ্খশব্দো ভবেৎ যত্র তত্র লক্ষ্মীশ্চ সুস্থিরা"—যে স্থানে শঙ্খধ্বনি হয়, লক্ষ্মী সেখানে সুস্থিরা হইয়া থাকেন, এইজন্যই আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণ সন্ধ্যাকালে শাঁখ বাজাইয়া মা কমলার অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রকারগণ—মেয়ে মানুষকে শাঁখ বাজাইতে বারণ করিয়াছেন যথা,—

স্ত্রীণাঞ্চ শঙ্খধ্বনিভিঃ শূদ্রাণাঞ্চ বিশেষতঃ।
ভীতা রুষ্টা যাতি লক্ষ্মীঃ স্থলমন্যৎ স্থলাত্ততঃ।

অর্থাৎ স্ত্রীজাতি ও শূদ্রজাতি যদি শাঁখ বাজায়, তাহা হইলে লক্ষ্মী ভয় পাইয়া ও রাগ করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করেন। পূর্ব্বে বোধ হয়—পুরুষেরাই শাঁখ বাজাইতেন, কাল ক্রমে ব্রত নিয়মানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খধ্বনির ভারটাও পুরুষদের হাত হইতে মেয়েদের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এদেশে শঙ্খবাদ্যের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। ইহা কখনই কুসংস্কার নহে। নিশ্চয়ই পুরাকালের আর্য্য ঋষিগণ শঙ্খধ্বনির কোন অলৌকিক শক্তির বিষয় অবগত ছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গের দিগ্বিজয়ী বৈজ্ঞানিক আচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় শঙ্খধ্বনির অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ দিয়া দেশবাসিগণকে চমৎকৃত করিয়াছেন। এস্থলে সে ঘটনার সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি—

কীট পতঙ্গ ধরিয়া জীবিত রাখিবার জন্য এক রকম কাচপাত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই কাচপাত্র এরূপ ভাবে নির্ম্মিত, যে ইহার মধ্যে বায়ু অনায়াসে চলাচল করিতে পারে, অথচ ইহার ভিতরে রক্ষিত কীট বা জীবাণু কোনওরূপে বাহিরে বাহির হইয়া পলাইতে

পারে না। রাসায়নিক পরীক্ষাগারে শত শত ছাত্রের সম্মুখে, এইরূপ একটী কাচপাত্র বহু সংখ্যক জীবাণু দ্বারা পূর্ণ করিয়া, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র তন্মধ্যে শঙ্খের শব্দ প্রবেশ করাইয়াছিলেন। শঙ্খধ্বনি প্রবিষ্ট হইবার অল্পক্ষণ পরেই দর্শকবৃন্দ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন—পাত্রস্থিত অসংখ্য জীবিত জীবাণু পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। একমাত্র শঙ্খধ্বনিই যে জীবাণুগুলির মৃত্যুর কারণ—পরীক্ষায় ইহা স্বীকৃত হয়। শঙ্খধ্বনির এই অপূর্ব্ব শক্তির কথা আর্য্য ঋষিদের অজ্ঞাত ছিলনা। শঙ্খস্তুতি স্থলে তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন—

গর্ভা দেবারিনারীণাং বিনশ্যন্তি সহস্রধা।
তব নাদেন পাতালে পাঞ্চজন্য নমোঽস্তুতে॥

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, এদেশে যখন জনপদ-বিধ্বংসী মহামারীরূপে বিউবনিক প্লেগ রোগ দেখা দিয়াছিল, তখন জনৈক সাধু দেশবাসিগণকে শঙ্খধ্বনি করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন।

শঙ্খের যে রোগনাশিকা শক্তি আছে, আমাদের জীবন্ত বিজ্ঞান "আয়ুর্ব্বেদ"ই তাহার একমাত্র সাক্ষী। অনেক রোগেই কবিরাজ মহাশয়েরা শঙ্খভস্ম ব্যবহার করিয়া থাকেন। শঙ্খ—বহু ঔষধেরই উপাদান। নিম্নে দুই চারিটীর উল্লেখ করিতেছি।

জ্বরে শঙ্খ প্রয়োগ—

দগ্ধশঙ্খং ত্রিকটুকং টঙ্গনং সমভাগিকং।
বিষঞ্চ পঞ্চভিস্তুল্যং মার্দ্রতোয়েন মর্দ্দয়েৎ।
গাবত্রয়ং রক্তিকাভাং বটীং কুর্য্যাৎ বিচক্ষণঃ।
কফকেতুঃ কণ্ঠরোগ, শিরোরোগঞ্চ নাশয়েৎ॥

শঙ্খভস্ম, শুঠ, পিপুল, মরিচ, সোহাগার খৈ, প্রত্যেক এক ভাগ, শোধিত কাঠবিষ ৫ ভাগ, আদার রসে মাড়িয়া ১ রতি বটী করিবে। ইহার নাম "কফকেতু"। ইহাতে শ্লেষ্মঘটিত জ্বর, কণ্ঠরোগ ও শিরোরোগ নষ্ট হয়।

জ্বরাতিসারে শঙ্খ প্রয়োগ—

শঙ্খং মোচরসং লোধ্রং ধাতকী বটশুঙ্গকং।
পিষ্ট্বা তণ্ডুলতোয়েন গুড়িকাশ্চাক্ষসম্মিতাঃ।
ছায়া শুষ্কাঃ পিবেৎ ক্ষিপ্রং জ্বরাতিসারশান্তয়ে।

শঙ্খভস্ম, মোচরস, লোধকাষ্ঠ, ধাতকীফুল এবং বটের ঝুরি, সমভাগে তণ্ডুল জলে বাটিয়া অক্ষ তুল্য গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুকাইবে। এই গুড়িকা সেবনে জ্বরাতিসার ভাল হয়।

শূলরোগে—শঙ্খ প্রয়োগ—

শঙ্খচূর্ণং সলবণং সহিঙ্গুব্যোষসংযুতং।
উষ্ণোদকেন তৎপীতং শূলং হন্তি ত্রিদোষজং।

শঙ্খভস্ম, সৈন্ধবলবণ, ভাজা হিং, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, প্রত্যেক দ্রব্য চূর্ণ করিয়া সমভাগে লইয়া মিশাইয়া রাখিবে। এই চূর্ণ গরম জল সহ সেবনে তৎক্ষণাৎ শূল রোগের যন্ত্রণা দূর হয়।

চর্ম্মরোগে—শঙ্খ প্রয়োগ—

দগ্ধশঙ্খং মনঃশিলা প্রপুন্নাড়শ্চ লাঙ্গলী।
গোমূত্রে রারণালৈর্বা পিষ্ট্বা লেপঞ্চ কারয়েৎ।
দদ্রুমণ্ডল-কণ্ডুঞ্চ বিচর্চ্চাঞ্চ বিনাশয়েৎ॥

শঙ্খভস্ম, মনছাল, চাকুন্দের বীজ ও ঈশলাঙ্গলার মূল গোমূত্র অথবা কাঞ্জিক দ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিলে, দদ্রুমণ্ডল, কণ্ডূ এবং বিচর্চ্চী রোগ নষ্ট হয়।

স্ত্রীরোগে—শঙ্খপ্রয়োগ—

শঙ্খং ত্রিকত্রয়যুতং ধাত্রীরসবিভাবিতং।
হন্তি ঋতুশূলং পীতং ত্র্যহং তণ্ডুলবারিণা॥

শঙ্খ ভস্ম ও ত্রিকত্রয় (শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরিতকী, বহেড়া, আমলা, চিতা, মুথা, বিড়ঙ্গ—এই নয়টী দ্রব্য ত্রিকত্রয় নামে বৈদ্যক শাস্ত্রে অভিহিত) আমলকীর রসে ভাবনা দিবে। এই চূর্ণ—তণ্ডুল জল সহ তিন দিন সেবনে ঋতুশূল নষ্ট হয়।

লোম-শাতনে—শঙ্খ প্রয়োগ

দগ্ধশঙ্খং ক্ষিপেদ্রম্ভাস্বরসে তপ্ত পেষিতং।
* * * লেপতো হন্তি লোম গুহ্যাদিসম্ভবম্॥

এইরূপে—আয়ুর্ব্বেদের বহু রোগাধ্যায়ে—শঙ্খ ভস্ম ঔষধ রূপে কল্পিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে সে সকল উদ্ধৃত করিতে বিরত হইলাম। অনুসন্ধিৎসু পাঠক, "ভৈষজ্য রত্নাবলী," "সার কৌমুদী" "সার কণিকা" প্রভৃতি বৈদ্যকগ্রন্থ দেখিয়া লইবেন।

"শঙ্খ-দ্রাবক" প্লীহা যকৃৎ-গুল্মাদি রোগের একটী প্রসিদ্ধ ঔষধ। শঙ্খভস্ম—যক্ষ্মা, কাস, ক্রিমি, পাণ্ডু, ও অজীর্ণ রোগে—বিশেষ ফলপ্রদ। "শঙ্খ বটী" "মহাশঙ্খ বটী" "শঙ্খ রস গুড়িকা" প্রভৃতি—নামজাদা ঔষধ—কবিরাজ মহাশয়গণ সর্ব্বদাই ব্যবহার করেন। অম্ল রোগে—শঙ্খভস্ম ঠিক্ Sodi Bi Carbএর মত উপকারী।

বৈদ্যশাস্ত্র মতে—শঙ্খ শোধন করিয়া পরে ভস্ম করিয়া লইতে হয়। শঙ্খকে গোঁড়ালেবুর রসে সিদ্ধ করিয়া উষ্ণ জল দিয়া ধৌত করিয়া লইলেই শঙ্খ শোধিত হইল। এইরূপ শোধিত শঙ্খ—শরার মধ্যে পূরিয়া উপরে আর একখানি শরা চাপা দিয়া উভয় শরার সন্ধিস্থানে কর্দ্দমের লেপ দিয়া, ঘুঁটের আগুণে পোড়াইলেই উত্তম শঙ্খভস্ম প্রস্তুত হয়। ঔষধার্থে এইরূপ শঙ্খভস্মই ব্যবহার করা উচিত।

শঙ্খের উৎপত্তি সম্বন্ধে পুরাণে অনেক আশ্চর্য্য গল্প প্রচলিত আছে। কিন্তু সে সকল গল্প—এ যুগের লোক বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না। সংহার-কর্ত্তা শঙ্কর "শঙ্খচূড়" নামক অসুরের প্রাণ বধ করিলে সেই অসুরের অস্থিখণ্ড হইতে শঙ্খের উৎপত্তি হইয়াছে। পুরাণের মতে ক্ষীরোদ সমুদ্রের নীরেই শঙ্খের জন্মস্থান। পূর্ব্বে সৌরাষ্ট্র [সুরাট্] দেশে প্রচুর পরিমাণে শঙ্খ পাওয়া যাইত। এখন সেতুবন্ধের সমুদ্রগর্ভ হইতে প্রতিবৎসর অসংখ্য শঙ্খ উত্তোলিত হইয়া থাকে। টুটিকোরিণ ও সিংহলের সমুদ্র ভাগেও যথেষ্ট শঙ্খ পাওয়া যায়। সমুদ্র গর্ভে—প্রায় ৪০ হাত গভীর জলে—শঙ্খ বাসক রে, ইহারা বালির মধ্যে লুকাইয়া থাকে। শঙ্খ দলবদ্ধ হইয়া এক সঙ্গে থাকিতে ভাল বাসেনা,—ইহারা 'শ্বেতাঙ্গ' কিনা!—বোধ হয় তাই একান্নবর্ত্তী প্রথার বিরোধী।

অগ্রহায়ণ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত ডুবুরীগণ শঙ্খ উত্তোলন কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। এক হাজার শাঁখ তুলিলে, তাহারা ২০৲ টাকা পারিশ্রমিক পায়।

সমুদ্রতীরের খানিকটা স্থান প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া রাখা হয়,—ইহার নাম "কোট্টু"। শাঁখ তোলা শেষ হইলে, শাঁখগুলিকে আগে বাছাই করিয়া পরে এই "কোট্টুতে" রাখা হয়! বড়, মাঝারী, ছোট—সকল শাঁখের জন্য পৃথক্ পৃথক্ "কোট্টু" নির্দ্দিষ্ট আছে। যে শাঁখ গুলি খুব ছোট, সেগুলিকে আবার জলে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য—সেগুলি আবার বড় হইবে। কিন্তু নর-করস্পর্শে—জলে পড়িয়াও তাহারা পুনর্জীবিত হয় কি না সন্দেহ। কিছুদিন কোট্টুতে থাকিলে, শঙ্খের মধ্যস্থিত মাংস বা শাঁস পচিতে আরম্ভ করে। সে সময় সেস্থান হইতে

ভয়ানক দুর্গন্ধ বাহির হইয়া থাকে। মাংস পচিয়া গেলে শাঁখগুলিকে জল দ্বারা ধৌত করিয়া পবিষ্কার করা হয়। তাহার পর সেই সকল পরিস্কৃত শঙ্খ নীলামের ডাকে বিক্রীত হইয়া থাকে।

শঙ্খের অনেক রকম জাতি আছে। সকল জাতীয় শঙ্খেরই দুইটী শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়—"বামাবর্ত্ত" ও "দক্ষিণাবর্ত্ত"। যে শঙ্খের চক্র বাম দিকে হেলিয়াছে—তাহার নাম "বামাবর্ত্ত", আর যাহার চক্র দক্ষিণাভিমুখী, তাহার নাম "দক্ষিণাবর্ত্ত"। "দক্ষিণাবর্ত্ত" শঙ্খ—দুষ্প্রাপ্য। শ্রীহরির পাঞ্চজন্য "দক্ষিণাবর্ত্ত "ছিল। এই শঙ্খ গৃহে থাকিলে, গৃহের অমঙ্গল দূর হয়—অনেক গৃহস্থের মনে এইরূপ ধারণা আছে। শুনিয়াছি—দু'একটী "দক্ষিণাবর্ত্ত' শঙ্খ নাকি লক্ষাধিক মুদ্রায় বিক্রীত হইয়াছে। সিংহলের জাফ্না নামক স্থানে—১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে একটী লোক একটী "দক্ষিণাবর্ত্ত" শঙ্খ পাইয়াছিল,—সেটী মাত্র ৭০০৲ সাত শত টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল।

শ্রীসতীশচন্দ্র দে, এম্ এ।

[প্রফেসর]

আহার ও স্বাস্থ্য।

আহারই প্রাণ রক্ষার মূল। ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইয়া দেহী দিগের দেহ রক্ষা করিতেছে। জীব-জগতে বিশ্বনিয়ন্তার ইহাই অপূর্ব্ব বিধান। শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন, যেরূপ যথা সময়ে দহনীয় পদার্থ প্রাপ্ত না হইলে বাহ্যাগ্নি মন্দবল হইয়া থাকে, সেইরূপ, ক্ষুধার সময় আহার না করিলে দৈহিক পাচকাগ্নিও হীনশক্তি হইয়া থাকে। অগ্নি প্রথমে ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক করে, তাহার অভাবে কফাদি দোষ সকলকে, তদভাবে রসাদি ধাতু সমস্তকে এবং তৎপরে জীবন পর্য্যন্ত পরিপাক করিয়া থাকে। আহার দ্বারা প্রীতি, সত্ত্বঃবল-সঞ্চার, দেহ-রক্ষা এবং স্মরণশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

কিন্তু তাই বলিয়া যখন তখন যা' তা' দ্রব্য আহার করিলে চলিবে না। নিয়ম পূর্ব্বক উপযুক্তকালে এবং বিশুদ্ধ দ্রব্য আহার করা কর্ত্তব্য। যে কাল পর্য্যন্ত আমাদের দেশের লোক এ সকল কথা বুঝিয়াছিল, সে কাল পর্য্যন্ত নানারূপ আধিব্যাধি এবং অকালমৃত্যু আমাদের দেশে উপস্থিত হইতে পারে নাই।

মনুষ্য প্রকৃতি ত্রিবিধ—সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—মিশ্র প্রকৃতিযুক্তও মানুষ দেখা যায়। শাস্ত্রে ত্রিবিধ প্রকৃতি ও লক্ষণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

সত্ব গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিগণ সাধু স্বভাব এবং ধর্ম্ম, মোক্ষ ও পরলোকে শ্রদ্ধাবান হন। ইহারা অক্রোধি ও সত্যবাদী। মেধা, বুদ্ধি, ধৃতি, ক্ষমা এবং দয়া— এইগুলিকে হৃদয়ে রক্ষা করিয়া ইহারা আত্ম-তত্বান্বেষী হইয়া থাকেন। রজোগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিরা অত্যন্ত সুখান্বেষী হওয়ায় ক্রোধ, দুঃখ, অধীরতা, দম্ভ, অভিমান এবং ঐশ্বর্য্যের দাস। মিথ্যাবাক্য-প্রয়োগ ইহাদিগের অঙ্গের ভূষণ, কামুকতায় ইহারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য। তমোগুণযুক্ত ব্যক্তিরা

নিতান্তই দুষ্ট বুদ্ধি সম্পন্ন। নিন্দিত-কর্ম্মজনিত সুখেই ইহাদিগের তৃপ্তি। ইহাদিগের মূর্খতা এবং ক্রোধান্ধতা সর্ব্বদ প্রকাশমান হইয়া থাকে।

খাদ্যবিচার সম্বন্ধেও ঐ ত্রিধাতুর ব্যক্তি দিগের ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে।

সত্বগুণ প্রকৃতির যে মহাপুরুষগণ দেশ রক্ষার ব্রতী হইয়াছিলেন, যাঁহারা ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও সমাজের হিতের জন্য বিবিধ শাস্ত্র-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সাত্বিক ও পরিমিতভোজী ছিলেন—কেহই মৎস্য-মাংস-পলান্নে উদরপূর্ত্তি করিতেন না। যে সকল দেশের লোকের আচার ব্যবহার দেখিলে মনে হয়, যেন তাহারা আহার করার জন্যই বাঁচিয়া আছে, সেই জাতির মধ্যেও যাঁহারা জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রচারে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারাও "উচ্চ জ্ঞানচর্চ্চা ও সাদাসিদে আহারের" পক্ষপাতী। দেশ, প্রকৃতি ও কর্ম্মভেদে লোকের আহারের পার্থক্য অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু যিনি যাহাই আহার করুন, খাদ্য বস্তুর বিশুদ্ধতা সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে যে নিতান্ত আবশ্যক, এ বিষয়ে মতভেদ নাই! আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য বলিয়াছেন—"শরীরাস্ত অন্নপানমূলা" সমস্ত শারীর রোগ অন্নপান দোষে জন্মিয়া থাকে। সুতরাং এই অন্নপানের বিশুদ্ধতা ব্যাধি হইতে রক্ষা পাইবার কবচ স্বরূপ।

সত্বগুণবর্দ্ধক দুগ্ধ-ঘৃত আমাদের দেশের লোকে প্রচুর পরিমাণে ভোজন করিয়া থাকে কিন্তু সংপ্রতি এই সকল বস্তু আর বিশুদ্ধ পাওয়া যাইতেছে না—অধুনা আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য খাদ্যদ্রব্যগুলির সংগ্রহ-প্রণালীর ঘোরতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সেকালে ভদ্র-ইতর, দরিদ্র-মহৎ—সকল সংসারেই গাভী-পালনের ব্যবস্থা ছিল। সেই গাভী পালনের ফলে সকল গৃহেই বিশুদ্ধ দুগ্ধ এবং ঘৃত যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইত; গৃহজাত দ্রব্য অস্বাস্থ্যকর হইবার কোন কারণই ছিল না। আটা বা ময়দা এমন কি চাউল পর্য্যন্ত এখনকার মত সে কালে বিপণীস্থান হইতে ক্রয় করিবার ব্যবস্থা ছিলনা,—গম কিনিয়া জাঁতায় পিষিয়া ইতর ভদ্র—সকল গৃহের রমণীরাই আপনাপন সংসারে আটা প্রস্তুত করিতেন। ঢেঁকি গৃহস্থমাত্রেরই গৃহস্থলীতে প্রতিষ্ঠিত থাকিত। নিজ তত্বাবধানে ধান ভানিয়া চাউল প্রস্তুত করা হইত। সেই বিশুদ্ধ তণ্ডুলের অন্ন ও আটার রুটি বা লুচি গৃহললনাগণ স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া স্বামী-পুত্র-আত্মীয় বর্গকে আহার করিতে দিতেন। সে ব্যবস্থা ক্রমশঃ হ্রাস পাইলেও এখনও অনেক পল্লীগৃহস্থ এইরূপেই অন্ন সংগ্রহ করিতেছে। কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত মাড়োয়ারী-পরিবারের বাটীর স্ত্রীলোকেরাই গম পিষিয়া আটা প্রস্তুত করেন, ইহাতে ব্যায়াম ও বিশুদ্ধ ভোজ্য সংগ্রহ দুইই নির্ব্বাহ হয়। সর্ষপ তৈলও এখনকার মত তখন বাজার হইতে ক্রয় করিবার ব্যবস্থা ছিল না, সর্ষপ কিনিয়া, উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়া, কলুদিগের নিকট হইতে সকলে ঘানিতে ভাঙ্গাইয়া লইতেন। ইক্ষু চাষ সেকালে অধিকাংশ গৃহস্থেরই ছিল, খর্জ্জুর বৃক্ষের চাষের জন্য সেরূপ কেহ মনঃসংযোগ না করিলেও গৃহ সন্নিহিত বৃক্ষ-বাটিকায় প্রায় সকল গৃহস্থেরই অল্পাধিক পরিমাণে অযত্ন সম্ভূত খর্জ্জুর বৃক্ষ বিদ্যমান থাকিত। ফলে ইক্ষু গুড় এবং খর্জ্জুর গুড় ক্রয় করিবার জন্য সেকালে প্রায় কাহাকেও পণ্য-বিক্রেতার

আলয়ে গমন করিতে হইত না। মাঠে চাষ হইত, বাগানে তরকারি হইত, হয় তো অনেকের গৃহ-প্রাঙ্গনেই শাক সব্জি উৎপন্ন হইত। ইহা ভিন্ন এখনকার মত তখনকার দিনে পল্লীগ্রামে জল-কষ্ট উপস্থিত হয় নাই, অনেক গৃহস্থই দীর্ঘিকা-পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠায় যত্নপর ছিলেন। তদ্দারা উৎকৃষ্ট পানীয়ের ব্যবস্থা তো হইতই, অধিকন্তু ঐ জলাশয়গুলি হইতে গৃহস্থের মৎস্যের ব্যবস্থা হইত। ফলে এইরূপ ব্যবস্থায় সেকালে এক দিকে অর্থ-ব্যয়ের হ্রাস হইত, অপর দিকে শরীর রক্ষার উপযোগী পুষ্টিকর দ্রব্য সকল আহার করিতে পাইয়া আমরা নীরোগ ও সুস্থ শরীরে দীর্ঘায়ু লাভে সমর্থ হইতাম। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন,—এ ব্যবস্থা তো পল্লীগ্রামেই সম্ভব ছিল,—সহরে তখনকার দিনে এ ব্যবস্থা কিরূপ ভাবে চলিত? ইহার উত্তর অতি সহজ। সে কালের সহর গুলি এরূপ অন্তঃসারশূন্য বাহ্যিক-সম্পদে বিভূষিত ছিল না, পল্লীগ্রামের এই আবহাওয়া সেকালে সহরেও বহমান ছিল।

যাহা হউক ক্রমশঃ এ সকল ব্যবস্থা দেশ হইতে লুপ্ত হইল। ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত-দেশে আমরা সভ্যতার শিক্ষা পাইয়া স্বাস্থ্য-হিতকর দীক্ষা বিস্মৃত হইলাম। কাঞ্চনের পরিবর্ত্তে কাচের আদর করিতে শিখিলাম। কি করিলে,—কিরূপ নিয়মে থাকিলে—কিরূপ দ্রব্য আমাদের শরীরপুষ্টির উপযোগী—এ সকল কথা ভুলিয়া গিয়া আমরা একটু আলস্য-পরতন্ত্র হইয়া পড়িলাম। জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য স্ব স্ব ব্যবসায়-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবার স্পৃহাটা অনেকেরই বলবতী হইল। ফলে নগদ অর্থের মুখ আমরা বেশী করিয়া দেখিতে লাগিলাম বটে, কিন্তু তাহাতে অর্থকৃচ্ছ্রতা বৃদ্ধি হইয়া পড়িল। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন কিরূপে করিতে হয়,—হিন্দুর দেশে—হিন্দু-সন্তানের কিরূপ আহার করা কর্ত্তব্য—এ সকল কথা তো ক্রমশঃ ভুলিতেই ছিলাম, অর্থ কৃচ্ছ্রতার জন্য সেই বিস্মৃতিটা আরও অধিক হইয়া পড়িল। চাকরিগত-প্রাণ ভারতবাসীর রুচি তো পরিবর্ত্তিতই হইয়াছিল, এক্ষণে সৎ-প্রবৃত্তিও লোপ পাইল। এমনই করিয়া দেশের অধঃপতন আরম্ভ হইল।

ক্রমশঃ সে অধঃপতনটা অল্প দূর গড়াইল না। করণীয় বিষয় তো ভারতবাসী ইতঃ-পূর্ব্বেই ভুলিয়া গিয়াছিল, এক্ষণে ধর্ম্ম ও ভুলিল। যে গোপ জাতি গো-মাতার সেবা-ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিয়া এবং নন্দবংশ সম্ভূত বলিয়া সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সেই গোপ-নন্দনগণ সুযোগ বুঝিয়া—ধর্ম্ম ভুলিয়া—তাহাদিগের বিক্রেয় দুগ্ধে প্রচুর পরিমাণে জল মিশাইতে আরম্ভ করিল, ঘৃতে নানারূপ ভেজাল মিশাইতে লাগিল, অন্যান্য ব্যবসায়ী-রাও ইহাদিগের অনুকরণে আটা এবং ময়দায় জীর্ণশক্তির অপকারী পাথর এবং কত কি মিশাইতে লাগিল। দেশের দীর্ঘিকা-পুষ্করিণী মজিয়া আসিল, কাজেই দেশের লোক পচা জল পানে অভ্যস্ত হইল। আমরা শুধু সারাদিন প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া—চাকরি করিয়া অর্থ আনিতে শিখিয়াছি; ঐ অর্থ দ্বারা কিরূপভাবে দেহ রক্ষা করিতে হয়, তাহা আমরা আদৌ শিক্ষা করি নাই, কাজেই আমাদের দুর্গতি হইবে না তো দুর্গতি হইবে

কাহাদের? আজ যে পণের আনা বাঙ্গালী-সন্তান অম্ল, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্যে জর্জ্জরিত হইয়া অস্বস্তি-হৃদয়ে কালাতিপাত করিতেছে, ইহা তো তাহাদেরই—কৃত কর্ম্মের ফল! কবি কি সাধ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"কারো দোষ নয় গো মা,
আমি স্বখাদ-সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।"

বাঙ্গালীর চক্ষু ফুটে নাই, কিন্তু এ দুর্দ্দিনে একটা আশার অলোক দেখা দিয়াছে। মারওয়ারি সম্প্রদায় ভেজাল ঘৃতের ব্যবসায়ীদিগকে শাস্তি দিবার জন্য ভাগীরথী-তীরে যে উপবাস ব্রত করিয়াছিলেন, দ্বারবঙ্গের মাহারাজা প্রমুখ দেশের ধর্ম্ম প্রাণ হিন্দুগণ সে ব্রতের উদযাপন করিয়া ঐ দুর্ব্বৃত্ত ব্যবসায়ী দিগকে অর্থ এবং সামাজিক দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। মারওয়ারি-সমাজে এখনও সামাজিক দণ্ডের ভয়ে সকলে ভীত হইয়া থাকেন, সেইজন্য এ দণ্ড অপরাধীগণ ঘাড় পাতিয়া মানিয়া লইয়াছে। বাঙ্গালীর এ দণ্ড-ভয় নাই, বাঙ্গালী এ দণ্ড-ভয় রাখেও না, বাঙ্গালীসমাজ যে উৎসন্ন গিয়াছে, সুতরাং বাঙ্গালী দণ্ড-ভয় রাখিবে কেন? মারওয়ারি সমাজে তো এত কাণ্ড হইল, কিন্তু কলিকাতার খাবারওয়ালার দোকান গুলিতে বাঙ্গালী গ্রাহকের দ্রব্য ক্রয় কি কম হইয়াছে? সে কালের বাঙ্গালী কচুরি-জিলিপিতে জলযোগ করিতনা। সে কালে ঐ ধরণের দোকানও ছিলনা,—সমাজভয়ে বাঙ্গালীর ঐ সকল দ্রব্য ক্রয় করিয়া রসনার পরিতৃপ্তি সাধনের প্রবৃত্তিও হইত না। সেকালের বাঙ্গালীর জলখাবার ছিল—আদা-ছোলা, গুড়-মুড়ি, চালভাজা-মুড়্‌কি বা নানারূপ ফল। এখনকার দিনে ফল খাইবার প্রবৃত্তি কাহারও কাহারও থাকিতে পারে, কিন্তু আদা-ছোলা বা মুড়ি-মুড়্‌কি, কি গুড়-চালভাজা খাইলে তো তোমাকে ভদ্র-সমাজে স্থানই দেওয়া হইবেনা।

এই দুর্দ্দিনে সেকালের আহারের বিশুদ্ধতা স্মরণ করিয়া ভাবি, কি করিলে দেশের লোকে আবার সেইরূপ বিশুদ্ধ খাদ্য পাইতে পারে? অবশ্য পাঠক-পাঠিকাগণ মনে করিবেন না যে, আমরা আবার সেকালের মত সকল গৃহস্থকেই ধান ভানিয়া, কলায় ভাঙ্গিয়া খাইবার ব্যবস্থা দিতেছি,—কারণ দেশকালভেদে এখন হয় ত তাহা কার্য্যকর হইবে না, কিন্তু তাহা না হইলেও খাদ্যের বিশুদ্ধতার জন্য তখন যে যথেষ্ট শ্রম করা হইত, সে কথা আমরা চিরকালই মনে করিব। গৃহস্থ আর জাঁতায় ভাঙ্গিয়া দাল করেনা, ফলে দালের কারবার, দালের দোকান অনেক হইয়াছে, কিন্তু কলিকাতার যে কোনো দালের আড়তে গিয়া দেখুন—কি বিভীৎস ব্যাপার, অতি কদর্য্য-স্থানে পর্ব্বতপ্রমাণ ভাল মন্দ মিশ্রিত ভাঙ্গা কলায় রহিয়াছে, বহুসংখ্যক স্ত্রীপুরুষে কলায় ভাঙ্গিতেছে, আর সেই দালের স্তূপের উপর কত থু থু পড়িতেছে, পিষণওয়ালীর শিশু সন্তান মলমূত্র ত্যাগ করিতেছে, ইহা ভিন্ন তাহাদের শ্রমজাত ঘর্ম্ম-মিশ্রণের ত কথাই নাই। এরূপ ত হইবেই, তাহাদের ত কোন কদর নাই, ইহা তাহাদের ব্যবসা। এই দাল আমরা আনিয়া বাছিবার ও ধুইবারও অবসর পাই না—হাঁড়িতে দিয়া তাহাই আহার করিতেছি।

চাউলের ও ঘৃতের আড়তে, তৈলের ও ময়দার কলে, সন্দেশের-খাবারের দোকানে—যাহা যাহা থাকে, তাহাতে ঐ সকল দ্রব্যের পবি,

ত্রতা ও বিশুদ্ধতা কিছুমাত্র রক্ষিত হইতেছে না। এখন চর্ব্বিও তৈল-ঘৃত বলিয়া বিক্রীত হইতেছে। বিভিন্ন তৈল-যোনি-বীজ হইতে তৈল নিষ্কাশিত হইয়া সার্ষপ তৈল নামে চলিয়া যাইতেছে,—তেলের কলের ট্যাঙ্ক ও এক নরক বিশেষ—ময়লার কথা ছাড়িয়া দাও, ইহাতে ২।৫ টা পচা ইন্দুরও না পাওয়া যায় এমন নহে। বণিক্‌গণের অর্থলোভ অতিরিক্ত-বর্দ্ধিত হওয়ায় এই সকল অনর্থ-পরম্পরা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। ইহার উপর খাদ্যের বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা রক্ষার প্রতি আমাদের উদাসীনতা মিলিত হওয়ায় স্বাস্থ্য-নাশের পক্ষে মণিকাঞ্চন যোগ উপস্থিত হইয়াছে। অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, পশ্চিমে খোট্টা-চাপরাসী সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পরেও আপনার খাবার—চা'ল-দাল-গুলি এক একটী করিয়া খুঁটিয়া-বাছিয়া তবে পাক করে, সমস্ত পাকপাত্র রোজ মাজিয়া-ঘসিয়া পরিষ্কার করে, কারণ পবিত্রতা রক্ষা ইহাদের স্বভাবসিদ্ধ। প্রকৃতই পবিত্রতা রক্ষায় অনেক ব্যাধি হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। আমাদের আজকালকার মধ্যবিত্ত গৃহস্থের স্ত্রীলোকগণ (বড় মানুষদের ত কথাই নাই) খাদ্যের পবিত্রতা রক্ষার দিকে তত নজর দেন না, শরীরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি কিন্তু বেশ দৃষ্টি আছে, ছেলেকে সাবান মাখান, পোষাক-পরাণর জন্য যত যত্ন লওয়া হয়, তাহাদের আহারের পবিত্রতা রক্ষার জন্য তাহার চতুর্থাংশের একাংশও যত্ন নাই! খাবার জিনিষ দোকান হইতে আসিতেছে, নিযুক্ত ভৃত্যে পাক করিতেছে! দেহটী ফিট্‌ফাট্ রাখা এবং আহারের পবিত্রতার প্রতি এতাদৃশ উদাসীন হওয়া—এই ভাবটী ইংরাজি অনুকরণের বিষময় ফল। উহাদের রান্নাঘরটী নরক বিশেষ হউক তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু বাবুর্চি উত্তম শুভ্রবস্ত্রধারী হইয়া খাবার সরবরাহ করিলেই হইল—পাচক হয়ত সপ্তাহাধিক কাল স্নানই করে নাই—তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু পাণিতল ও অঙ্গুলি মাত্র সাবান-বিধৌত হইলেই হইল।

এদেশে এই যে অজীর্ণ ও ক্ষয় রোগের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে, আহারের অবিশুদ্ধতাই যে ইহার অন্যতম কারণ—একথা বিজ্ঞ লোক মাত্রেই স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু প্রতীকারের উপায় কি? অনেকেরই ধারণা, কঠোর-রাজশাসন প্রবর্ত্তিত না হইলে খাদ্যে ভেজালের এই সর্ব্বনাশকর প্রথা রহিত, হইতে পারেনা। কিন্তু, আমরা যদি অবিশুদ্ধ ঘৃত-তৈলাদি সর্ব্বান্তঃকরণে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলেই ত ভেজালের প্রতিকার হইতে পারে। এবং প্রজা যাহা আন্তরিকতার সহিত প্রার্থনা করে, তদ্বিষয়ক রাজশাসন প্রবর্ত্তিত হইতেও বিলম্ব হয়না, সংপ্রতি সেইজন্যই আইনের ব্যবস্থাও হইয়াছে। যাহা হউক কলিকাতার মাড়োয়ারী এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের অনশনপূর্ব্বক অশুদ্ধ ঘৃত বর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা আমাদের চিরস্মরণীয় হউক এবং ইহার সুফল স্থায়ী হইয়া দেশবাসীর স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হউক—ইহাই আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি।

ম্যালেরিয়া ও পল্লীগ্রাম।

কি কুক্ষণে জানিনা,—ম্যালেরিয়া বিষ বাঙ্গালার পল্লীগুলিতে প্রবেশ করিয়াছিল! এই বিষের জ্বালায় বাঙ্গালার কত পল্লীরই যে সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে, তাহা ভাবিলে ও বুক ফাটিয়া যায়। কত ধনীর কত অর্থ এই বিষ ঝাড়াইতে গিয়া নষ্ট হইয়াছে, কত গৃহস্থ অর্থাভাবে বিষ ঝাড়াইবার প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা করিতে পারে নাই, ফলে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ইহার দংশনে কালকবলিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক কথায় সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা আমাদের পল্লী-মাতার দুর্গতি যে ম্যালেরিয়া হইতেই আরম্ভ হইয়াছে, ইহা নির্ভাজ সত্য কথা। যখন পল্লীবাসিগণ দেখিল, ম্যালেরিয়া-রাক্ষসী বিকট-বদন-ব্যাদানপূর্ব্বক গ্রামের পর গ্রাম—পল্লীর পর পল্লী—এক ঘর গৃহস্থের পর আর এক ঘর গৃহস্থ গ্রাস করিতে বসিয়াছে, তখন উপায়ান্তর রহিত হইয়া, জননী-জন্মভূমি-পল্লীমাতাকে চিরদিনের মত প্রণাম করিয়া, পল্লী-সন্তানগণ সহরের সম্পদ-বৃদ্ধি করিতে লাগিল। শুধু কলিকাতার কথা নহে, এমনই করিয়া দেশের জেলা এবং মহকুমাগুলিও আজি জনবহুল হইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতা ও মফঃস্বলের জেলা এবং মহকুমাগুলির বর্ত্তমান বাসিন্দা দিগের নিকট পূর্ব্ব নিবাসের তথ্য সংগ্রহ করিলে আমাদের কথিত বিষয়ের প্রমাণ সহজেই নির্ণীত হইতে পারিবে। ফলে বাঙ্গালার সহরগুলিও জনবহুল হওয়ায় সহরেও রোগ-বাহুল্য ঘটিতেছে। পল্লীগ্রাম অপেক্ষা সহরে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ কম হইলেও অন্য রোগের আধিক্য—জন-বাহুল্য-নিবন্ধন অনেক বেশী। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পল্লীগ্রামের ম্যালেরিয়া-বৃদ্ধিই সহরের জন-বাহুল্যের কারণ। এ অবস্থায় ম্যালেরিয়াই যে আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতির সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় ঘটাইতেছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

নানা কারণে এখন অনেকের আবার পল্লীবাস-স্পৃহা জাগিয়া উঠিয়াছে শুনিতে পাই। কিন্তু উহা জাগিলে কি হইবে? পাছে আবার ম্যালেরিয়ার আক্রমণে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়—এই ভয়ে সে স্পৃহা অনেকের মনে-মনেই বিলয়প্রাপ্ত হইতেছে। ম্যালেরিয়ার বিষ তো যেমন-তেমন নহে,—এ বিষে আক্রান্ত হইলে সদ্যঃমরণের আশঙ্কা সকল স্থলে থাকুক বা না থাকুক, ইহার দ্বারা যে শনৈঃ-শনৈঃ পরমায়ুর হ্রাস হইয়া থাকে, তাহা অবিসংবাদিত। একটী প্রবাদ আছে—"কাচা লম্বা কোঁচা টান, বাড়ী জেন বর্দ্ধমান" সেইরূপ পেট জোড়া-প্লীহা, উদর-জোড়া-যকৃৎ এবং বক্ষঃস্থলের নিম্নদেশ জোড়া কড়া বা অগ্রমাস দেখিলেই বুঝিতে হইবে, ইহার পরমায়ুর কতকাংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। অম্ল, অজীর্ণ, অক্ষুধা বা ইংরাজী মতে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া নামক যে ব্যাধি আজি বাঙ্গালার চিরসহচর হইয়া পড়িয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না, অনেকস্থলে ইহার মূলীভূত কারণও ম্যালেরিয়া। কোন কোন স্থলে থাইসিসের সূচনাও এই ম্যালেরিয়া হইতে আরম্ভ হয় দেখা গিয়াছে।

অনেক বৈজ্ঞানিক-পণ্ডিতের মতে অনেকগুলি কারণের মধ্যে প্রধানতঃ বাঙ্গালার

মশক বংশের আধিক্যই ম্যালেরিয়া-বিস্তৃতির কারণ। কথাটা অসঙ্গত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায়না। বর্ষার ধারাসিক্ত-কর্দ্দমাক্ত পল্লী-পথ,—বন-বহুল-পল্লীপার্শ্বস্থ অটবী সকল—বহুকালাবধি অসংস্কৃত পঙ্কিল-ডোবা-পুষ্করিণীর পার্শ্বস্থ অবিন্যস্ত জঙ্গলগুলি যে মশক উৎপন্নের স্বভাব-সুলভ-সুখদ স্থান এবং তাহা হইতে যে বাঙ্গালার পল্লীগুলির ম্যালেরিয়া বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, ইহা তো সুনিশ্চয়। কিন্তু তাহার জন্য আমরা করিতেছি কি ?

পল্লী ছাড়িয়া সহরে বাস করিলে তো দেশ হইতে ম্যালেরিয়ার উচ্ছেদ-সাধন করা হইবে না। দেশ ছাড়িয়া আমরা আত্মরক্ষার উপায় করিতে পারি বটে, কিন্তু পল্লী-জননীর সমগ্র সন্তানেরই তো পল্লী ছাড়িয়া সহর-বাসের উপায় নাই। আর সকলেই যদি সহরে বাস করিতে থাকে, তাহা হইলেই বা চলিবে কেমন করিয়া! সহরের অনায়াস-লভ্য কলের জল পাইয়া বা মফঃস্বলের যে সকল সহরে জলের কলের প্রতিষ্ঠা হয় নাই—সে সকল সহরে ইন্দারা হইতে জল তুলিয়া লইয়া আমরা পিপাসার শান্তি করিতে পারি বটে, কিন্তু সকলেই যদি সহরবাসী হয়, তাহা হইলে আমাদের আহারীয় সংগ্রহ হওয়া যে ভার হইয়া পড়িবে। আমাদের অন্ন-সংস্থানের জন্য—আমাদের জীবনব্যাপী চিরন্তন সুহৃদ—আমাদের কৃষিজীবি—পল্লী-সন্তানদিগকেও তো অন্ততঃপক্ষে অধঃপতিত—দুর্দ্দশাগ্রস্ত পল্লী-প্রান্তরে পড়িয়া থাকিয়া আমাদের আহার্য্য-সংস্থানে সচেষ্ট থাকিতে হইবে! বুদ্ধি দান করিয়া—উপদেশ প্রদান করিয়া—নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া আমরা তো তাহাদিগকে আমাদের মত সহরবাসী হইবার দলপুষ্ট করিতে পারিব না! কাজেই ম্যালেরিয়ার জন্যই হউক, বা যে কারণেই হউক, আমরা পল্লীভূমি পরিত্যাগ করিলেও পল্লী-মায়া পরিত্যাগ করিতে পারিবনা,—পল্লী চিন্তায় আমাদিগকে ব্যাপৃত থাকিতেই হইবে। আমরা নিষ্কামধর্ম্মী হইতে পারি বা না পারি,—অন্ততঃপক্ষে আমাদের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য ও পল্লী-চিন্তা আবশ্যক। সেজন্য সর্ব্বাগ্রে আমাদের চিরত্যক্ত পল্লীগুলিকে ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে হইবে। পল্লী-মাতাকে রক্ষা করিতে পারিলে তবে আমরা নিজেরা রক্ষা পাইতে পারিব।

পল্লীগ্রামগুলি ম্যালেরিয়ার লীলা-নিকেতন হইয়াছে বলিয়া পল্লী পরিত্যাগ করিলে চলিবেনা, পল্লী-রক্ষার জন্য চেষ্টাশীল হইতে হইলে দেশ-মাতার সুসন্তানগণকে আবার পল্লীগ্রামে ফিরিয়া যাইতে হইবে। মাতৃ-সন্নিধানে ফিরিয়া গিয়া, অর্থে পার,—সামর্থ্যে, পার—যত্ন লইয়া—চেষ্টা করিয়া,—কতক নিজেরা চাঁদা তুলিয়া—কতক বা লোকাল-বোর্ড-ডিষ্ট্রিক্‌বোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, যাহাতে গ্রামের বন-জঙ্গলগুলি বিদূরিত হয়—রাস্তাঘাটগুলির সংস্কার-সাধন করা হয়—সুপেয় জল-সংস্থানের ব্যবস্থা হইতে পারে,—তাহার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রমপূর্ব্বক চেষ্টা করিতে হইবে, তবেই পল্লী-রক্ষা হইবে, এবং সে রক্ষায় আমরা নিজেরা রক্ষা পাইব। দেশ রক্ষা করিতে হইলে—সমাজ রক্ষা করিতে হইলে—বাঙ্গালীজাতির অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হইলে, এরূপ ব্যবস্থা ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নাই।

ম্যালেরিয়া বড় সহজ ব্যাধি নহে, কেবল যে শুধু মশক হইতেই ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি

হয়—এমনও নহে,—ম্যালেরিয়াগ্রস্থ ব্যক্তির শরীর হইতেও ম্যালেরিয়া-বিষ অন্য দেহে প্রবেশ করিয়া থাকে। সংপ্রতি আমেরিকার একজন বিচক্ষণ ডাক্তার স্পষ্টতঃই এই কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে মশক হইতে ম্যালেরিয়া উৎপত্তির কোন কারণই নাই, ম্যালেরিয়া-বিষ মানবের শরীর হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, ক্রমাগত ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া-ভুগিয়া যাঁহারা জীর্ণতনু হইয়াছেন, তাঁহারা যে বাজারের 'আর্সেনিক', 'কুইনাইন' প্রচুরভাবে মিশ্রিত কতকগুলি উগ্রবীর্য্য পেটেণ্ট ঔষধ সেবন করিয়া আরও স্বাস্থ্যহানি ঘটাইতেছেন, তাহা সত্য কথা। আমরা ইহার পূর্ব্বে বলিয়াছি, কুইনাইনের অপব্যবহার কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। ম্যালেরিয়া জ্বর পুরাতন হইলে তো আর একজ্বরি থাকে না, অনেক সময় প্রাতঃকালে সে জ্বর আপনা আপনই ছাড়িয়া যায়। সেই সময় অনেকে কোন একটা পেটেণ্ট ঔষধ বা যথেষ্ট পরিমাণে কুইনাইন সেবন করিয়া জ্বর বন্ধ করিতে চেষ্টা করেন। তাহার ফলে দুই চারিদিন জ্বর চাপা থাকে, কিন্তু দুই চারিদিন পরেই পূর্ব্ববৎ স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে। এজন্য ওরূপ ভাবে জ্বর চাপা দিবার চেষ্টা করায় কুইনাইনের অপব্যবহারেও দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় নিজের মতে কার্য্য না করিয়া সুচিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

তৈল-মর্দ্দন।

শরীরে তৈল-মর্দ্দন পদ্ধতি ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। ধর্ম্মসংহিতা, পুরাণ, ইতিবৃত্ত ও প্রাচীন কাব্যাদির পর্য্যালোচনায় ইহার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। আর্য্যঋষিগণ তৈল-মর্দ্দনের বিশেষ গুণপাতী ছিলেন, সুতরাং তৎপ্রয়োগ বিষয়ে নানা প্রকার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তৈল-ব্যবহার বহু প্রকারে বিধিবদ্ধ আছে, কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে শরীরে তৈল মর্দ্দনের উপকারিতা ও তদানুসঙ্গিক বিধি-ব্যবস্থাই আলোচিত হইবে।

তিল হইতে জাত এই অর্থে তৈল শব্দটী ব্যুৎপাদিত হইলেও সাধারণতঃ যে কোন বস্তুর স্নেহভাগই তৈল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ অন্যান্য স্নেহ অপেক্ষা তিলনিষ্পন্ন স্নেহে স্নিগ্ধতা এবং ব্যবহারোপযোগিতা অধিকভাবে থাকার জন্যই তিল জাত স্নেহই মুখ্যভাবে তৈল নামে কথিত হইয়াছে। সে যাহা হউক শব্দ ব্যুৎপত্তি-বিচারে দ্রব্যগুণের কোন তারতম্যের শঙ্কা নাই, সুতরাং উপস্থিত প্রস্তাবে উহা নিষ্প্রয়োজন।

শরীরে তৈল-মর্দ্দনের আবশ্যকতা নির্দ্ধারণ করার জন্য আমাদের শাস্ত্র নির্দ্ধারিত যুক্তি-প্রমাণ অনুসন্ধানের পূর্ব্বে বাহ্য জগতে তৈলের

সাধারণ প্রয়োগ ও উপকারিতার প্রতি একটু লক্ষ্য করিলেই বোধ হয় এতদ্বিষয়ে অনেকটা অভিজ্ঞতা লাভ হইতে পারে।

যে সমস্ত যন্ত্র বা শস্ত্রাদি প্রতিনিয়ত ব্যবহার করিতে হয়, তাহাকেই কার্য্যক্ষম রাখিবার জন্য তৈলসিক্ত করা হইয়া থাকে। ইঞ্জিনের সন্ধানভাগে মাঝে মাঝে তৈল-নিষেক ব্যতীত উহা পূর্ণবেগে চলিতে সমর্থ হয় না এবং বহুকাল কার্য্যোপযোগীও থাকেনা। স্নেহাক্ত না থাকিলে শকট-চক্র বেগে ঘুরিতে পারে না। ফলতঃ যেখানেই আকুঞ্চন-প্রসারণ ক্রিয়ার আবশ্যক, সে খানেই মাঝে মাঝে তৈল-সেক প্রয়োজনীয়।

আমাদের দৈহিক-যন্ত্রগুলির পরিচালনার জন্যও উক্ত কারণে ঠিক ঐ ভাবেই তৈলের আবশ্যক করে। তৈলসিক্ত না থাকিলে শারীরিক যন্ত্র সবল ও কার্য্যক্ষম থাকিতে পারেনা। অধিকাংশ দৈহিক যন্ত্রই আকুঞ্চন-প্রসারণ ব্যাপার দ্বারাই স্ব স্ব প্রয়োজন সম্পাদন করে।

তৈল স্বাভাবিক প্রসারণ শক্তির আধিক্য গুণে অল্পকাল মধ্যেই সর্ব্বশরীর গত শিরা সমূহ দ্বারা দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে এবং স্নিগ্ধতা গুণে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে দৃঢ়, কার্য্যক্ষম ও কষ্ট-সহিষ্ণু করিয়া থাকে। ইহার সম্পর্কে চর্ম্মের প্রসন্নতা, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের পরিপুষ্টি ও বাতাদি দোষের আনুলম্য সাধিত হয়। স্নায়ুমণ্ডলী দোষমুক্ত ও পরিষ্কৃত থাকার জন্য রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়।

প্রথমে পদদ্বয়ে পরে অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তৈলমর্দ্দনের ব্যবস্থা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ পদদ্বয়ের স্নিগ্ধতাগুণে সর্ব্বশরীরই স্নিগ্ধ হইতে পারে বলিয়া এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পৃথক্ পৃথক্ অবয়বে তৈলমর্দ্দনে যে সমস্ত উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে সাধারণ ভাবে কিছু বলা যাইতেছে। মস্তকে তৈল মর্দ্দন করিলে শিরঃশূল, খালিত্য (টাক), অকালে কেশ-পকতা প্রভৃতি রোগ প্রায়ই জন্মিতে পারেনা এবং ইহাতে কেশ সকল দৃঢ়মূল, দীর্ঘ ও কৃষ্ণবর্ণ হয়, মস্তিষ্ক সবল থাকে, ঊর্দ্ধগত জত্রুইন্দ্রিয় সকল স্নিগ্ধতা সম্পন্ন হওয়ায় নিজ নিজ বিষয়-গ্রহণে অধিক সামর্থ্য লাভ করে, সুনিদ্রা হয়, এবং তন্নিবন্ধন দৈহিক সমস্ত যন্ত্রের ক্রিয়াই অব্যাহত ভাবে কার্য্য করিতে পারে। শ্রুতি-বিবরে তৈল-প্রয়োগে বায়ুর প্রকোপজনিত কর্ণনাদ প্রভৃতি রোগ জন্মিতে পারে না এবং মন্যাস্তম্ভ, হনুগ্রহ প্রভৃতি বাতব্যাধিরও আশঙ্কা দূরীভূত হয়, কর্ণস্রোত বিশুদ্ধ ও সবল থাকায় বধিরতা অথবা শ্লেষ্মাদি জনিত মল সঞ্চয় হইতে পারেনা। পদতলে তৈল-মর্দ্দনে পাদ-সুপ্তি (স্পর্শানভিজ্ঞতা) পাদশোষ প্রভৃতি ব্যাধি নষ্ট হয় এবং সৌন্দর্য্য ও কার্য্য ক্ষমতাগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অধিকন্তু পদগত স্নায়ুমণ্ডলী সঙ্কুচিত হয়না বলিয়া পাদস্ফুটন, গৃধ্রসী প্রভৃতি অতি কষ্টদায়ক বাতব্যাধি জন্মিতে পারেনা। পাদাঙ্গুষ্ঠের কণ্ডরার সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ থাকায় ঐ কণ্ডরার স্নিগ্ধতাগুণে দৃষ্টি শক্তিও প্রবল থাকে। নাভি মণ্ডলে তৈল-মর্দ্দনে কোষ্ঠগত বায়ুর আনুলম্য হয়, তাহাতে আধ্মানাদি রোগ জন্মিতে পারে না এবং সহজে ও সুচারুরূপে ভুক্ত পদার্থ জীর্ণ হয়। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গত তৈল মর্দ্দনে পৃথক্ পৃথক্ উপকার আমরা

প্রাপ্ত হইয়া থাকি। তৈল ব্যবহার সম্বন্ধে একটি প্রাচীন উপদেশ আছে, যথা—"ঘৃতাদষ্ট গুণং তৈলং মর্দ্দনাৎ নতু ভোজনাৎ" তৈল-মর্দ্দনে ঘৃত-ভোজনের অপেক্ষা আটগুণ উপকার হইয়া থাকে। বাস্তবিক আমাদের দেশে আহারার্থ তৈলের এরূপ ব্যবহার প্রাচীন সময়ে কখন ছিলনা। পূর্ব্বে তৈল মর্দ্দনের জন্যই প্রায় ব্যবহৃত হইত। কালক্রমে আহারের রুচি-পরিবর্ত্তন সহ তৈল-সংস্কৃত ও ভর্জ্জিত দ্রব্যাদির ব্যবহার ক্রমে ক্রমে বাহুল্য রূপে প্রবেশ করিয়াছে। তাহাতে আমাদের স্বাস্থ্যেরও যথেষ্ট হানি হইতেছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সময়ান্তরে তদ্বিষয়ক আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

আমরা সাধারণতঃ তিল, সর্ষপ ও নারিকেল জাত তৈলই অভ্যঙ্গের জন্য ব্যবহার করি, সুতরাং এস্থলে উক্ত ত্রিবিধ তৈলের গুণাগুণ প্রকাশ করা আবশ্যক। ইহাতে ব্যবহারকারীগণ নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে তৈলের উপকারিতা বুঝিতে পারিবেন।

প্রায় সর্ব্ববিধ তৈলই স্বীয় উপাদান দ্রব্যের গুণানুবর্ত্তী হয়। তন্মধ্যে **তিল তৈল** গুণে অন্যান্য তৈলাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহা তীক্ষ্ণ, শীঘ্র প্রসারণশীল, চর্ম্মদোষ নাশক (কিন্তু ভোজনে বিপরীত) সূক্ষ্ম স্রোত প্রবেশক্ষম, নেত্র রোগীর অহিতকর, স্নিগ্ধ অথচ শ্লেষ্মার অপ্রকোপক, স্থূলতানাশক অথচ কৃশতা হারক, মলস্তম্ভক, ক্রিমি-বিনাশক। ইহার আর একটী বিশেষ গুণ এই যে, যে দ্রব্যের সহিত পাকাদি দ্বারা ইহা সংস্কৃত হয়—তাহারই গুণ গ্রহণ করিতে পারে। এই জন্যই আয়ুর্ব্বেদোক্ত অধিকাংশ তৈল ইহার দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

নারিকেল তৈল—অতি স্নিগ্ধ, ধাত্বাদির পোষক, মালিন্য হারক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, কেশের সৌন্দর্য্যকারী, কফপ্রকৃতি ও কফ-প্রধান রোগীর অহিতকর।

সর্ষপ তৈল—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘু, রক্তপিত্তকারী, কফ, শুক্র, বায়ু, কুষ্ঠ, অর্শ, ব্রণ ও ক্রিমি নাশক।

কবিরাজ শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত
কাব্যতীর্থ-কবিভূষণ।

শিশুর কণ্ঠরোগ চিকিৎসা।

—:*:—

(ঠাকুরমা ও বড়বৌ।)

বড়-বৌ। আমি ত আর পেরে উঠিনে ঠাক্‌মা।

ঠা। নতুন নতুন একটু কষ্ট হ'বে, দিন কতক পরে অভ্যাস হ'য়ে গেলে আর কষ্ট হ'বে না।

ব। আমার যে রকম কষ্ট হয় ঠাক্‌মা, তা'তে সে অভ্যাস হ'তে হ'তে প্রাণ বেরিয়ে যা'বে। তুমি একটা বামন কি বামনী ঠিক্ ক'র্‌তে বল।

ঠা। দেখ বুদ্ধু বউ, আমি বেঁচে থাকতে

এ বাড়ীর ভেতর বামুন ঢুক্‌বে, তা' মনেও করিস্‌নে। কল্‌কাতায় যা'রা বামুন-বাম্‌নী ব'লে পরিচয় দেয়,—তা'র পনর আনা তিন পাই অন্য জাত্‌। চাকর থাকার চেয়ে বেশী রোজগার হ'বে ব'লে বামুন সাজে। তা'দের হাতে খেয়ে কি জাতের মাথা—ধর্ম্মের মাথা খাবি?

ব। কেন?—দেশেও জানা-শুনা ত কত গরীব-দুঃখী-বামুন-বামনী আছে!

ঠা। আছে বটে, কিন্তু তা'রা না খেতে-পেয়ে ম'র্‌বে সেও স্বীকার,—তবু লোকের বাড়ী মাইনে নিয়ে র'াধতে আসবেনা, তা'দের মধ্যে দৈবাৎ কেউ কখন এ কাজ করে।

ব। আচ্ছা ঠাক্‌মা, তুমি ব'ল্‌ছ যে, অচেনা-বামুনের হাতে খেলে জাত যায়, কিন্তু এই ক'লকাতা সহরে কাজ কর্ম্ম উপলক্ষে ত বামুনেরাই র'াধে!

ঠা। দেখ, জগন্নাথের মহিমায় শ্রীক্ষেত্রে যেমন জাত-বিচার নেই, কলির মহিমায় ক'ল্‌কাতায়ও তেমনি জাত-বিচার নেই। এখনকার যেমন ব্রাহ্মণ—তেমনি ব্রাহ্মণ-ভোজন!

ব। তা'র মানে কি ঠাক্‌মা।

ঠা। ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণের মত সম্মানের সহিত খায় না,—কাঙ্গালীর মত খায়। আমরা আগে দেখেছি—ব্রাহ্মণ-ভোজন করা'তে হ'লে ব্রাহ্মণদের কত সম্মান ক'রতে হ'ত, বাড়ীর কর্ত্তা সর্ব্বদা তটস্থ—পাছে কোন ত্রুটি হয়, আর যতক্ষণ না ব্রাহ্মণ-ভোজন শেষ হয়,—ততক্ষণ কর্ত্তার আহার করা হ'ত না।

ব। আর এখন কি হয় ঠাক্‌মা?

ঠা। এখন কোথায় কর্ত্তা—আর কোথায় সম্মান! কর্ত্তা খেয়ে-দেয়ে নিদ্রা দিচ্ছেন, ব্রাহ্মণেরা কাঙ্গালীর মত খেতে বসে। যে কর্ত্তার ব্রাহ্মণদের ওপর বড় দয়া, তিনি এক-বার দেখা দিয়ে যান, দৈবাৎ দু'টো-একটা মিষ্টি কথা বলেন। তা' ছাড়া—সব একাকার, পরস্পর চেনা নেই—ব্রাহ্মণ-শূদ্র এক সঙ্গে খাচ্চে! আগে শূদ্রদের দিয়ে, পরে সেই পাত্র থেকে ব্রাহ্মণদের দেওয়া হ'চ্চে। ঐ সেদিন পাশের বাটীর বাবুটী ব'লছিলেন যে, সকালে ব্রাহ্মণ-ভোজন হ'বে, আর রাত্রে 'ভদ্রলোকদে'র খাওয়ান হবে। এতেই বোঝনা—যে ব্রাহ্মণে কত ভক্তি।

ব। আচ্ছা ঠাক্‌মা, তুমি যে বল্‌লে,—কলির মহিমায় জাত-বিচার নেই, কিন্তু পাড়াগাঁয়েও ত জাত-বিচারের এখনো ব্যতিক্রম হয়নি!

ঠা। তা' হয়নি বটে, কিন্তু তা'ও আর থাকে না। প্রথমে ক'ল্‌কতায় আড্ডা গেড়ে কলি এখন পাড়াগাঁয়ের দিকে হাত বাড়া-চ্ছেন। পাড়াগাঁয়েও এখন বামুন ঢুকেছে।

ব। আচ্ছা ঠাক্‌মা, পাড়াগাঁয়ে আগে কাজকর্ম্ম হ'লে কা'রা র'াধত?

ঠা। র'াধ্‌ত—গ্রামের ভদ্রঘরের মেয়েরা,—যারা ভাল র'াধ্‌তে পা'রত। তা' আবার কেমন কড়াকড়ি। রান্না চড়া'বার আগে গ্রামের কোন প্রবীন লোক কি বাড়ীর কর্ত্তা গিয়ে জিজ্ঞেসা ক'র্‌তেন—হেঁসেলে কে কে আছে? তা'র পর দরকার বুঝে নাম জেনে একজনকে ডেকে বল্‌তেন, কে ক্ষীরো, তুমি এখানে কেন? সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে ইসারা কর্‌তেন, পালা পালা। ক্ষীরোদা লজ্জায় অধোবদন হ'য়ে পালা'ত। কেন জান?

ক্ষীরোদার কোন দোষের কথা শোনা যেত ব'লেই এমনটা ক'র্‌তে হ'ত।

ব। আর পরিবেশন কা'রা করত?

ঠা। পুরুষদের পরিবেশন ক'রত—গ্রামের কিশোর আর যুবকের দল। আর মেয়েদের পরিবেশন মেয়েরাই কর্‌ত।

ব। আচ্ছা লুচিও কি মেয়েরা ভাজ্‌ত?

ঠা। না, লুচি হ'লে গ্রামের মধ্যে যুবক বা প্রৌঢ়—যা'দের লুচি ভাজার ভাল শিক্ষা ছিল, তা'রাই ভা'জ্‌ত, শূদ্রেরা ময়দা মেখে—বেলে দিত।

ব। কিন্তু থাজা, গজা, পান্তুয়া—এ সব ত আর হালুইকর-বামুন ভিন্ন হ'বার যো নেই।

ঠা। ও সকলের আগে বড় চল্‌তি ছিল না। পরমান্ন হ'ত, গোয়ালা দই-ক্ষীর দিত, আর ময়রা সন্দেশ দিত। আমাদের সময়ে পান্তুয়া-বোঁদেও আরম্ভ হ'তে দেখেছি, আর সে গুলি হালুইকর বামুনেই ক'রত বটে, কিন্তু কলি তখন ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণের আচার পরিত্যাগ ক'র্‌তে আর অন্য নীচ জাতকে বামুন সাজ্‌তে শিখিয়ে উঠতে পারেননি।

(লীলার প্রবেশ)

ব। এই যে ঠাকুরঝি এয়েছে, এখুনি তোমাদের শাস্ত্রালাপ হ'বে। আমার কি ক'রবে বল?

ঠা। তুই মেজ বৌ আর ছোট বৌকে ডেকে নিয়ে আয়, আমি বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছি।

ব। আচ্ছা তোমাদের কথা শেষ হোক, আমি একটু পরে ডেকে নিয়ে আস্‌ছি।

ঠা। আয় লীলা, ব'স। সব খবর ভালত?

লী। খবর আর ভাল কই ঠাক্‌মা, খুকির আলজিব ফোলা রোগ হয়েছে, ঘং-ঘং ক'রে কাশে, গা-টাও একটু ছ্যাঁক্‌-ছ্যাঁক্‌ ক'রে। আর ছোট খোকার গলার ভেতর ফুলেছে, কাশি আছে, আর গলায় ব্যথা হ'য়েছে।

ঠা। তাই ত তোর ছেলে-পিলের যে নিত্যই অসুখ দেখ্‌তে পাই। তা', ওষুদ কিছু দিয়েছিস?

লী। হাঁ, আজ চার পাঁচ দিন হ'ল হোমিওপ্যাথিক ওষুদ দেওয়া হ'চ্ছে, তা'তে কিছুই হ'ল না। সেই জন্যে তোমার কাছে এসেছি।

ঠা। এ বড় বিশ্রী রোগ, অনেক সময় ওষুদে ভাল হয়না। অস্ত্র ক'রতে হয়। তা', প্রথমে ওষুদ দিয়েই দেখ্‌।

লী। সে কি ঠাক্‌মা, তুমি যে ব'ল্‌তে—কবিরাজী ওষুধেই সব রোগ ভাল হয়।

ঠা। তা' কবিরাজীতেই ত এ রোগে অস্ত্র ক'রবার নিয়ম আছে।

লী। তা, কই কবিরাজেরা ত অস্ত্র করে না?

ঠা। কবিরাজীতে অস্ত্র-চিকিৎসা খুব ভালই ছিল, এখন সেটা লোপ পেয়ে গেছে। কাজেই এখন অস্ত্র কর্‌তে হ'লে ডাক্তারের কাছেই যেতে হ'বে।

লী। কচি ছেলে—অস্ত্র করবার নাম শুনেই যে ভয় করে ঠাক্‌মা।

ঠা। না ভয় কিছু নেই। আর অস্ত্র ক'রতেই হবে—তা'রও মানে নেই; ওষুদেও সা'রতে পারে।

লী। আচ্ছা ওষুদ আর পথ্য কি দেব তা' বল।

ঠা। আগে পথ্যির কথা বলি, দু'জনকে প্রায় একই রকম পথ্যি দিতে হ'বে। অল্প—

কি জ্বরভাব আর খুব সর্দ্দি-কাস থা'ক্‌লে ও সব রোগে দিন কতক ভাত বন্ধ ক'রে যব কি বার্লির রুটী দেওয়াই ভাল।

লী। আর যদি জ্বর না থাকে ?

ঠা। জ্বর না থা'কলে—কি খুব সর্দ্দি-কাসি না থা'ক্‌লে,—এক বেলা দুটি পুরাণ চা'লের ভাত দেওয়া চলে। সাধারণ চা'লের বদলে কাঙ্গনি ধানের চা'লের ভাত দিতে পা'রলে ভাল হয়।

লী। কাঙ্গনি ধানের চা'ল আবার কি, সে কোথায় পাওয়া যায়।

ঠা। শ্যামা ঘাসের বীচির চেয়ে একটু বড় দে'খতে। বড় বড় পাচনওয়ালা-বেনের দোকানে পাওয়া যায়।

লী। দাল-তরকারী কি দেওয়া যেতে পাবে ?

ঠা। দালের মধ্যে মুগের দালের যূষ। উচ্ছে করলা, কচিমূলো আর পটোল এই কয় রকম তরকারী।

লী! মাছ কি দেওয়া যায় ?

ঠা। এ রোগে মাছ কুপথ্যি, তবে কচি ছেলে—যদি কান্না-কাটি করে, কুপথ্যি হ'লেও একটু-আধটু খল্‌সে, শিঙ্গি, কি মাগুর মাছ দিতে হবে। অমনি ভুলুতে পারিস্ ত ভালই।

লী। দুধ কি রকম দেব ?

ঠা। যা খায়, তার অর্দ্ধেক, আগে যেমন ব'লেছি—পিপুল দিয়ে সিদ্ধ ক'রে দিবি। মিছরী ও মরিচের গুড়ো দিয়ে দুধ দিলেও হয়।

লী। জলখাবার কি দেব ?

ঠা। একটু দেশী চিনির মিছরী, বেদানা, কিসমিস্, দু' একটা খেজুর—এই দিস্।

লী। আর কি দেওয়া যেতে পারে ?

ঠা। আবার কি দিবি ? তবে গরম জল একটু-একটু ক'রে দিন—তিন চা'র বারে খাওয়াতে পার্‌লে ভাল হয়। আর যখন জল খেতে চা'বে, তখন ঠাণ্ডা জল না দিয়ে গরম জল দেওয়াই ভাল। তবে যদি গরম জল না খাওয়াতে পারিস, তা' হ'লে গরম জল ঠাণ্ডা ক'রে দিস্। কিন্তু দিনমানের গরম করা জল রাত্রে, কি রাত্রের গরম করা জল দিনে দেওয়া হ'বে না আর গরম জল ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলে, সে জল আর গরম ক'রে দেওয়া হ'বে না।

লী। খাবার সম্বন্ধে আর কোন নিয়ম আছে ?

ঠা। সব খাবারই গরম-গরম খেতে দিবি, ঠাণ্ডা জিনিষ কিছুই দিস্‌নে, আর বেশী ক'রে না খাইয়ে বরং কম ক'রে খাওয়া'বি।

লী। আচ্ছা, এখন ওষুদ কি দেবে বল ?

ঠা। ছোট খুকির আলজিব্ ফুলেছে বল্‌ছিস্ ? তা' বাহ্যে কেমন হয় ?

লী। বাহ্যে ভাল হয়না। প্রায় এক-বার ক'রেই কঠিন মল বাহ্যে ক'রে', এক আধ দিন মোটেই বাহ্যে হয় না।

ঠা। হুঁ, দেখ্, বাহ্যেটা যা'তে রোজ দু'বারের কম আর তিন বারের বেশী না হয়—তা' ক'রতে হ'বে। এক কাজ করিস্; সোঁদালের পাকা ফলের ভেতর যে আফিমের মত আটা থাকে—তাই দু' আনা ভ'র নিয়ে গরম দুধে গুলে একবার সকালে খাইয়ে দিস। যদি তা'তে বাহ্যে হয়—ভালই, নয় ত দু' আনার জায়গায় তিন আনা—কি এক সিকি সোঁদালের আটা দিতে হ'বে।

লী। আচ্ছা খাবার ওষুদ কি দেব বল।

ঠা। আগে লাগাবার ওষুদের কথা বলি। রান্নাঘরের ধোঁয়ার যে ঝুল হয়—

সেই ঝুল, সৈন্ধব আর মধু এক সঙ্গে বেশ ক'রে মেড়ে তাই, আলজিবের ওপরে আর চা'র পাশে লাগিয়ে দিবি, আর মুখ হাঁ ক'রে হেঁট হ'য়ে ব'সে লাগা'বি। খানিকক্ষণ পরে অনেক লালা কেটে প'ড়বে।

লী। ক'বার ক'রে দেব ?

ঠা। সকালে বিকালে ছ'বার দিলেই হ'বে।

লী। আর কোন লালা কাটার ওযুদ নেই ?

ঠা। আছে, কিন্তু এইটে খু: সহজ। আর একটা বলি শোন্,—মরিচ, বচ, আতইচ, আকনাদি, কুড়, সোণাছাল আর সন্ধব—সমান ভাগে নিয়ে, মধু মিশিয়ে—আগে যেমন ব'লেছি তেমনি ক'রে লাগালেও হয়, নয় ত ঐ সব দিয়ে বাতির মত ক'রে—সেই বাতি আলজিবের উপর আর তা'র চারদিকে ঘ'সে দিলেও হয়। বাতি কিন্তু খুব গরম হওয়া দরকার।

লী। আচ্ছা হাত দিয়ে যদি লাগা'বার অসুবিধা হয় ?

ঠা। তা' হ'লে পাতলা কাদার মত ক'রে তুলোর তুলিতে মাখিয়ে লাগা'লেও চলে।

লী। আর লাগাবার ওযুধ কিছু আছে ?

ঠা। আছে অনেক, তবে এখন এইটাই দিগে যা'। আর একটা কুলকুচো ক'রবার ওযুধ আছে, তা' বড্ড ছেলেমানুষ,—পা'র্বে কি ?

লী। তুমি বল, আমি চেষ্টা ক'রে দেখবো।

ঠা। তবে শোন্। বচ, আতইচ, আকনাদি, রাস্না, কটকী আর নিমছাল—এইগুলো সমানভাগে নিয়ে কাথ তৈয়ের ক'রে, একটু একটু গরম থাকতে কুলকুচো ক'রতে হয়। যেমন তেমন কুলকুচো নয়—খুব এক মুখ নিয়ে খানিকক্ষণ রেখে তা'রপর ফেলে দিতে হয়। আবার নিয়ে ঐ রকম ক'র্তে হয়। এই রকম ৪।৫বার ক'র্তে হয়।

লী। আচ্ছা ঠাকমা, লাগা'বার ওযুদ—কি কুলকুচা ক'রবার ওযুদ একটু-আধটু পেটে গেলে কি কিছু দোষ হয় ?

ঠা। বিশেষ দোষ কিছু হয়না, তবে যে সব ওযুদ গলায় লাগাবা'র নিয়ম থাকে, সে সব ওযুদ পেটে যত না যায়, ততই ভাল। কেননা, ওগুলো পেটে যাবার জন্যে ত দেওয়া হয়না।

লী। আচ্ছা এখন খা'বার ওযুদ কি দেব তা' বল।

ঠা। খুকির বয়স কত হ'ল।

লী। এই ষেটের কোলে চার বছরে পা দিয়েছে।

ঠা। তিনবার ক'রে ওযুদ দিতে হ'বে। ওযুদ ক'টাও এমন কিছু নয়—হরীতকী, শুঁঠ আর দেবদারুর গুঁড়ো সমান ভাগে মিলিয়ে তা'র তিন রতি ক'রে নিয়ে সকালে, বিকালে আর সন্ধ্যায়—তিনবার ক'রে মধুর সঙ্গে মিশিয়ে চেটে খেতে দিবি।

লী। দেবদারু কি এই দেবদারু ?

ঠা। না এ দেবদারু নয়। এর কাঠ হাল্কা আর গন্ধ নেই। সে দেবদারু সুগন্ধ যুক্ত। বেণের দোকানে কিন্‌তে পাওয়া যায়।

লী। আচ্ছা খুকীর ব্যবস্থা ত হল, এখন খোকার কি করবো বল।

ঠা। খোকার কি হ'য়েছে ভাল ক'রে বল্ দেখি।

লী। তার গলার ভেতর—গ্রীবের নীচে ফুলে উঠেছে, বড্ড ব্যথা আর কাসি আছে।

ঠা। সর্দ্দি আছে খুব ?

লী। না সর্দ্দি বেশী নেই। নাকে ত নেইই, কাসির সঙ্গে একটু-আধটু গয়ের ওঠে।

ঠা। বাহ্যে কেমন হয়?

লী। বাহ্যে ভাল হয়না। কোন দিন একবার হয়—কোন দিন বা হয় না।

ঠা। বাহ্যেটা যা'তে পরিষ্কার হয়—তা' ক'রতে হ'বে।

লী। তুমি আগে পথ্যির কথা বল।

ঠা। খুকিকে যেমন পথ্যি দিতে বলিছি, একেও সেই রকম দিতে হ'বে। তবে এর যখন সর্দ্দি কি জ্বর নেই, তখন এক বেলা ডুটি পুরাণ চালের ভাত, আর একবেলা বার্লি কি যবের রুটী দিস্।

লী। আচ্ছা ঠাকমা বার্লি কি যবের রুটী যদি কোন দিন না যোগাড় হয়, তা' হ'লে সুজির রুটী কি পাউরুটী দেওয়া চলেনা।

ঠা। যবের রুটীই উপকারী। তবে যদি কোন দিন নেহাত না যোগাড় ক'রতে পারিস্, তা'হলে সুজির রুটী দিস্। পাউরুটীতে আর দরকার কি?

লী। আচ্ছা ঠাকমা বিসকুট ডু' একখানা দেওয়া চলে না?

ঠা। ওগুলো বড় ভাল জিনিস নয়, ওগুলো না দেওয়াই আমাদের উচিত। লোকনাথ বদ্দি দুঃখ ক'রে বলতেন, বড় গিন্নি, সময়ের গতি রোধ করবা'র সাধ্য কা'রও নেই। আমাদের চৌদ্দ পুরুষ—চৌদ্দই বা বলি কেন, হাজার হাজার পুরুষ এই দেশের পথ্যি আর অন্ন খেয়ে সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবী হ'য়ে কাটিয়ে গেছেন, কিন্তু আমাদের ছেলে-পিলেকে আমাদের দেশের খাবার দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবার ক্ষমতা আর আমাদের জননী জন্মভূমির নেই; বিলেতের যব-গম আর সুইজারলণ্ডের গাইয়ের দুধ পেটে না প'ড়লে এরা যেন এখন মানুষই হয় না।

লী। সে কথা ঠিক ঠাকৃমা, আবশ্যক হ'লেও অপকারী জেনেও আমরা দেশের উপকারী জিনিষ ছেড়ে বিদেশী জিনিষ ব্যবহার করি! আমার কিন্তু সেটা একে-বারেই ইচ্ছে নয় ঠাকৃমা, কিন্তু কি করবো ছোট খোকা অন্য বাড়ীর ছেলেদের বিস্কুট খেতে দেখে এমন আবদার করে যে, ডু' এক খানা না দিয়ে থাকা যায় না। তা' তুমি কি বল?

ঠা। আমি আর বলবো কি? না দিলে যদি নেহাৎ না চলে, তা' হ'লে ডু' এক খানা দিস্, আর ত উপায় নেই। তবে পৈতে হ'বার পর থেকে এ রকম অনাচার যা'তে না হয়, তা' করিস্।

লী। সে আর তোমায় ব'লতে হ'বেনা ঠাকৃমা। পৈতে হ'বার পর থেকে আমি আর কোন রকম অনাচার ক'রতে দেবনা। তা' ছেলে বাঁচুক আর মরুক।

ঠা। ছেলেপিলের মন কাদার মত নরম, যেমন গ'ড়বে, তেমনি হ'বে। ওদের যা' শেখাবে তাই শিখ্‌বে। তা' ডু একখানা বিস্কুট দিস্। অনেক বামুন-বিস্কুট-ওয়ালার দোকানে বাতাসার মত ছোট ছোট খুব হাল্কা এক রকম এরারুটের বিস্কুট পাওয়া যায়, সে গুলো খুব সহজে হজম হয়। আর তা' না হয়তো—এক রকম এরারুটের পাতলা বিলিতী বিস্কুট পাওয়া যায়, তাকে কি বলে—দূর ছাই—ও সব বিলিতী নাম মনেও আসেনা, পাকা পরাণের বিস্কুট বলে বুঝি।

লী। (হাসিয়া) পাকা পরাণ নয় ঠাকৃমা; পিকৃফ্রিয়াণ।

ঠা। হাঁ তাই হ'বে, সেই পাতলা এরা-রুটের বিস্কুট গুলো যা'দের পেট নরম—তা'দের পক্ষেই ভাল, ওতে একটু বাহ্যে কম করে। তবে দু' এক খানা দিলে দোষ নেই।

লী। আচ্ছা ঠাক্‌মা, দু' এক খানায় দোষ কিছু নেই ব'লছ, কিন্তু একে এদের বাহ্যে কম, তা'তে যদি আবার কম পথ্যি দেওয়া যায় তা' হ'লেত আরও বাহ্যে কমে যা'বে।

ঠা। এত দিনে তোর একটু জ্ঞান হ'য়েছে দেখ্‌ছি। তবে একটা উপলক্ষ্য ক'রে বুঝিয়ে দিই শোন। দেখ এই গুরুপাক জিনিষ দু' রকম; এক স্বভাব গুরু আর মাত্রা গুরু। স্বভাব গুরু বলি কা'কে? - না যে জিনিষ স্বভাবতঃ গুরুপাক, যেমন কালিয়া, পোলাও, ক্ষীর চিড়ে, দাল—এই সব জিনিষ খাওয়া; আর মাত্রা গুরু বলি কাকে—না যে সব জিনিষ লঘুপাক,—যেমন সাগু, খৈ, ভাত প্রভৃতি জিনিষ বেশী ক'রে খাওয়া। তা' দেখ্‌ মাত্রা গুরু জিনিষ যদি রোগী খুব কম খায়—যেমন অজীর্ণ রোগী যদি একটা ছোলা খায়, তা' হ'লে তা'র অপকার করেনা, আবার লঘু পাক জিনিষ যদি মাত্রা গুরু হয়, যেমন ধর—একটা সুস্থ লোক যদি পাঁচ সের খৈ কি সাগু খায়, তা' হ'লেও তা'র অপকার হয়। সেই জন্যে বল্‌ছি—যে দু' এক খানা বিস্কুটে ওদের কিছু অনিষ্ট হবে না।

লী। ঠিক বল্‌ছ ঠাক্‌মা, আমি এতটা ভাবিনি। তা' দেখ ঠাক্‌মা, তুমি আগে ব'লেছিলে যে, মেলিন্সফুডে বাহ্যে পরিষ্কার হয়। মেলিন্স ফুডের এক রকম বিস্কুট হয়—তা' এক আধ্‌ খানা দিতে পারি?

ঠা। মেলিন্স ফুড মিষ্টি। এ সব রোগে মিষ্টি, নোন্‌তা আর্‌ টক জিনিষ কুপথ্যি। মিষ্টির মধ্যে মিছরী আর নুণের মধ্যে সন্ধব—তা'ও কম ক'রে দিতে হয়। কাজেই মেলিন্স-ফুড না দেওয়াই ভাল।

লী। আচ্ছা ঠাক্‌মা, পথ্যির কথাত হ'ল নাওয়ার ব্যবস্থা কি রকম করবো?

ঠা। নাওয়া এখন বন্ধ থাক কিছু দিন। তবে মধ্যে মধ্যে গরম জলে গামছা ভিজিয়ে, নিংড়ে—সেই গামছা দিয়ে গা মুছিয়ে দিস্‌। একটা ঘরের মধ্যে গা মুছিয়ে দিবি, সে সময় কি তা'র পরে যেন ঠাণ্ডা হাওয়া না লাগে। আর গা মোছানর পরেই একটা মোটা জামা গা'য়ে দিয়ে দিস।

লী। কতদিন অন্তর গা মুছিয়ে দেব।

ঠা। সেটা বিবেচনা ক'রে দিতে হ'বে। মোটামুটি ৩।৪ দিন অন্তর দিলেই হ'বে। শরীরের অবস্থা বুঝে এর চেয়ে দেরী করেও দেওয়া যেতে পারে।

লী। আচ্ছা আর কোন নিয়ম ক'রতে হ'বে।

ঠা। দিনমানে ঘুমানটা এ রোগে বড় ভাল নয়। আর গলায় একটা গরম কাপড় জড়িয়ে রাখা ভাল। আর গরম জল যে ঠাণ্ডা ক'রে দিবি, তা'তে একটু কর্পূর দিয়ে দিস।

লী। পথ্যি ত হ'ল, এখন ওষুদের কথা বল।

ঠা। বাহ্যে ভাল হয়না ব'লছিস্‌। তা' বাহ্যেটা যা'তে দু'বার ক'রে হয়, তা' ক'র্‌তে হ'বে। তা' রাত্রে শোবার সময় তেউড়ীর শিকড়ের গুড়ো এক আনা আর কাশীর চিনি এক আনা এক সঙ্গে মিশিয়ে জলের সঙ্গে খেতে দিস।

লী। তেউড়ী কি ঠাক্‌মা?

ঠা। তেউড়ী এক রকম লতানে গাছ

বেদেদের কাছে পাওয়া যায়। সেই তেউড়ীর শিকড়ের ভিতরকার কাঠটা ফেলে দিয়ে, ছাল শুকিয়ে গুড়ো ক'রে নিতে হয়। আর এ ছাড়া বেণের দোকানে পশ্চিমে-তেউড়ী এক রকম পাওয়া যায়, টুকরো টুকরো ছাল। তা'তে যে কাঠ থাকে, তা' ফেলে দিয়ে গুঁড়ো ক'রে নিতে হয়।

লী। কোন তেউড়ী ভাল ঠাকুমা ?

ঠা। পশ্চিমে-তেউড়ীর চেয়ে দেশী তেউড়ীতেই কাজ হয় বেশী।

লী। আর তেউরী যদি না পাই।

ঠা। তা' হলে জাঙ্গীহরীতকী ছ' আনা আর পিপুল তিন রতি বেটে গরম জলের সঙ্গে খাইয়ে দিস।

লী। এখন ওষুধ কি দেব বল।

ঠা। দেখ্, খুকিকে যে ওষুদ দিতে ব'লেছি খোকাকে ত'ার একটু বেশী মাত্রায় দেওয়া চাই। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, উননের পোড়া মাটি—এক ক'রে বেটে জাল দিয়ে গরম কোরে সেই গরম জল—আগে যেমন কুলকুচো ক'রতে বলিছি, একেও সেই রকম রোজ কুলকুচো ক'রতে দিবি। কুলকুচো এমন ভাবে করা চাই—যেন গলায় তাব্‌টা লাগে,—বুঝলি।

লী। হাঁ তা ত বুঝলাম। খুকীর আর খোকার ওষুদের তফাৎ কি ব'লবে বলেছিলে ?

ঠা। হাঁ ব'লছি! এই খোকার জন্যে কুলকুচো করবার যে ওষুদ ব'ললাম এটায় শুঁঠ পিপুল, মরিচ আছে ব'লে বড্ড ঝাল হ'বে। খুকি বড্ড কচি ব'লে অত ঝাল সহ্য ক'রতে পারবেনা। সেই জন্য তাকে এটা দিতে নেই। আর খোকাও ত ছেলে মানুষ, তা'কেও এমন করে দিবি—যেন খুব ঝাল না হয়।

লী। তাই দেব, আমি নিজে আগে মুখে ক'রে দেখব। যদি বেশী ঝাল বোধ হয় আরও খানিক গরম জল মিশিয়ে নেব। তা' তুমি কুলকুচো করবার এমন আর একটা ওষুদ বল—যেটা ঝাল না হয়।

ঠা। বচ, আতইচ আকনাদি, রাস্না, কটকী আর নিমপাতা সিদ্ধ ক'রে কুলকুচো ক'রলে হয়।

লী। আচ্ছা ঠাকুমা; ডাক্তারে একবার একজনের এই অসুখে একটা যন্ত্রের মধ্যে কি রেখে তার ধোঁয়া গলায় লাগা'তে দিয়েছিল। কবিরাজীতে কি তা' নেই।

ঠা। আছে, ধোঁয়া লাগান আর তাপ নেওয়া এরোগে উপকারী, কিন্তু খুকি কচি ব'লে তা'কেত দেওয়া চলবেনা। তবে খোকাকে দিতে পার। মরিচের গুড়ো, দারচিনির গুঁড়ো আর কর্পূর—জলে গুলে একটী ঘটী কি হাঁড়িতে রেখে জ্বালে চড়া'তে হয়। আর তা' থেকে যে ধোঁয়া ওঠে, হাঁ করে সেটা গলার ভেতর লাগা'তে হয়।

লী। সে কি সুবিধে হ'বে ঠাকুমা ?

ঠা। না হয় একটা গাড়ুর মুখ ঢাকা দিয়ে তাইতে সিদ্ধ ক'রবি, আর নল দিয়ে যে ধোঁয়া বেরুবে—সেইটে যা'তে গলায় লাগে—তাই ক'রবি।

লী। আর কোন ভাল উপায় নেই ?

ঠা। আছে বৈকি,—ওষুদ মিশান জল একটা হাঁড়ির মধ্যে রেখে ত'ার মুখে একখানা সরা ঢাকা দিয়ে যোড়ের মুখ—মাটী কি ময়দা দিয়ে লেপে দিবি। সরার মাঝখানে আগেই একটা ফুটো ক'রে রাখতে হয়। তা'র

পর পাতার একটা লম্বা নল ক'রে ত'ার এক মুখ সেই ফুটোয় বসিয়ে দিতে হয়, আর অন্য মুখ দিয়ে গলায় ধেঁায়া লাগাতে হয়।

লী। আর কি কোন রকম ক'রে ধেঁায়া লাগান যায়না?

ঠা। আর এক রকম উপায়ে যায়, বলি শোন্; ইঙ্গুদী, লতাফট্‌কী, দন্তী, তেউড়ী আর দেবদারু সমান ভাগে নিয়ে অল্প তেজপাতা আর দাবচিনি মিশিয়ে ছোট ছোট বাতির মত ক'রতে হয়। ত'ার পর শুকিয়ে সেই বাতি একটা নলের একমুখে রাখতে হয়, আর তা'তে আগুণ ধরিয়ে দিয়ে নলের অন্য মুখ দিয়ে চুরুটের মত ধেঁায়া টানতে হয়। আর তা' না হ'লে একটা শুকনো আট আঙ্গুল ন্যাকড়া জড়িয়ে, তা'র ওপর ওষুদ্ লাগা'তে হয়, তা'র পরে শুকিয়ে চুরুট খাওয়ার মত খেতে হয়।

লী। বাবা, কবিরাজীতে এত আছে ঠাক্‌মা?

ঠা। এ আর কি শুনলি? আমি লোক-নাথ-বদ্দির মুখে শুনিছি যে, বুকের, গলার, মুখের, মাথার, কাণের আর চোখের অনেক রোগে ধূমপান খুব উপকারী, আর অনেক রকম ধূমপানের ব্যবস্থা আছে। আর আগে ঐ সকল রোগ যা'তে না জন্মায়—তা'র জন্যেও ধূমপানের ব্যবস্থা ছিল।

লী। ঠিক্ কথা ঠাক্‌মা, কাদম্বরী ব'লে একখানা সংস্কৃত বই আছে, তা'র বাঙ্গালা প'ড়ে দেখিছি ধূমপানের কথা আছে। আমি ভেবেছিলাম—বুঝি তামাক, তা' নয় এই ওষুদের ধেঁায়া। এ সব উঠে গেল কেন ঠাক্‌মা?

ঠা। কালের গতিতে ওলট-পালট হওয়াটা সংসারের নিয়ম। আর একটা কথা, সব ওষুদই যেমন ঠিক্ বুঝে দিতে না পা'রলে অনিষ্ট হয়, ধূমপানও ঠিক্ মত না হ'লে অপ-কারী হয়, সে জন্যেও কতকটা উ'ঠ গেছে বটে। তা' তুই জিজ্ঞাসা করলি, তাই বললাম, কচি ছেলে-পিলেকে চুরটের মত ধেঁায়া না খাইয়ে আগে যা' গলায় লা'গাবার কথা বলেছি তাই দেওয়াই ভাল।

লী। আচ্ছা ঠাক্‌মা, আগে যে নাসের কথা ব'লেছিলে—সে কিসের নাস বলনা?

ঠা। নাস এ রোগে খুব উপকারী বটে, তবে ছেলে মানুষ। তা' সপ্তায় দু তিন দিন ক'রে দিস না হয়। পিপুল, সজ্‌নের বীচি, মরিচ, শুঁঠ, বচ—এর যে কোন একটা জিনিষের গুঁড়ো অল্প ক'রে দিস, যাতে ২।৪ টা হাঁচি হয়।

লী। আচ্ছা এখন খাবার আর গলায় লাগাবার কি ওষুদ দেব বল?

ঠা। খুকির অসুখের জন্য যা' ব'লেছি, তা' দিতে পারিস। তা' ছাড়া আরও দুটো একটা বলছি শোন্। হরীতকী বেশ মিহি ক'রে বেটে গলার ভিতর লাগা'তে পারিস। আদার রস, মরিচের গুঁড় আর সন্ধব—এক সঙ্গে মিশিয়ে লা'গাতে পারিস। আর গলার চা'রদিকে টুটীর উপর একটা প্রলেপ দিস্।

লী। কিসের প্রলেপ দেব?

ঠা। উননের পোড়া মাটী, সমুদ্রফেনা আর গোল মরিচ—আদার রস কি ধুতরো-পাতার রসে বেটে গরম ক'রে প্রলেপ দিস।

লী। ক'বার প্রলেপ দেব? আর সমুদ্র ফেনা কি?

ঠা। দিনে ৩।৪ বার দিলেই হ'বে।

সমুদ্রফেনা এক রকম হাল্‌কা শাদা জিনিষ, বেণের দোকানে পাওয়া যায়।

লী। সমুদ্রফেনা যদি না পাওয়া যায়?

ঠা। তা' হলে সমুদ্রফেনার বদলে কালকাশুন্দের পাতা দিলে চ'লবে।

লী। আচ্ছা এখন খাবার ওষুধ কি দেব বল?

ঠা। আগেই ব'লেছি যে, খুকিকে যে ওষুদ দিতে ব'লেছি তা' একটু বেশী মাত্রায় খোকাকেও দিতে পারিস, তা' ছাড়া আরও দু' একটা বলি শোন্। দারচিনি, লবঙ্গ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ আর কুড় সমান ভাগে মিশিয়ে, গুঁড়ো ক'রে, তা'র ৪৫ রতি মধু দিয়ে মেড়ে চেটে চেটে খেতে দিবি। আর একবার বচ, খই, শুঁঠ আর পিপুল এই চা'রটে জিনিষের গুঁড়ো সমান ভাগে মিশিয়ে ৩।৪ রতি মাত্রায় মধুর সঙ্গে মেড়ে চেটে খেতে দিবি। আর এক টুক্‌রো বচ আর দেশী চিনির মিছরি মুখে রেখে দিতে ব'লবি।

লী। আর কোন কিছু ক'রতে হ'বে ঠাক্‌মা?

ঠা। পারিস্ ত খোকাকে ভাত খা'বার শেষে দু'আনি ভ'র পুরাণ ঘি অল্প একটু গরম দুধে গুলে খেতে দিস্। আর ভাত খেয়ে উঠেই যাতে জল না খায়, আর জল কি দুধ খেয়েই না শোয়—তা'র ব্যবস্থা করিস।

লী। আচ্ছা ঠাক্‌মা, তুমি অনেক রোগেই পুরাণ ঘি—খাবার—নয় মালিষ ক'রবার ব্যবস্থা কর, পুরাণ ঘি কি এমন ভাল জিনিষ?

ঠা। অমন ভাল জিনিষ কি আছে? লোকনাথ বলতেন, শাস্ত্রে আছে যে, পুরাণ ঘিয়ে না সারে—এমন রোগ নেই।

(বড় বৌ, মেজ বৌ ও ছোট বৌয়ের প্রবেশ)

বড় বৌ। এই বড়দি-মেজদিকে ডেকে এনেছি ঠাক্‌মা।

ঠা। হ্যাঁরে, বৌমা নেই ব'লে তোরা কি ক'টা দিন তিন জায়ে রান্না ক'রতে পা'র্‌বি নে?

লী। পারবেনা কি ঠাক্‌মা, পার্‌তেই হ'বে।

ছোট বৌ। তা' তোমাদের দু'জনকে এক জায়গায় দেখেই বুঝেছি।

লী। তা' বুঝেছিস যদি তো তিন জায়ে গিয়ে রাঁধ্‌গে।

মেজ বৌ। আমার যে আগুন-তাতে গেলে মাথা ঘোরে ঠাকুরঝি।

লী। মাথাটা খুব ক'রে দড়ি-দড়া দিয়ে বেঁধে আগুন তাতে যাস, তাহ'লে আর ঘুরবে না। আর তাতেও যদি ঘোরে,—মাথাটা কেটে রেখে যাস্।

মেজ বৌ। তুমি এমনি মাথা-কাটা-ঠাকুরঝিই বটে।

লী। আর তোমরা এমন গুণের ভাজ যে, রাঁধতে পারবেনা, একটা অজাতের হাতে খাইয়ে সকলের জাত মার্‌বে। রেঁধে পাঁচ জনকে খাওয়াবে—এও যে ভাগ্যির কথা।

ঠা। শোন্ বলছি। বড় বৌ তিন দিন,—মেজ বৌ দুদিন—আর ছোট বৌ এক দিন,—পালটা-পালটা ক'রে রাঁধবি। যদি এর মধ্যে কারও অসুখ করে, কি কোথাও যাওয়া হয়, তা' হ'লে তা'র পর যা'র পালা, সেই রাঁধবে। কিন্তু তা'কে আবার পরে সেই ক'দিন পুষিয়ে দিতে হবে।

মেজ বৌ। তা' আমরা যে রান্নার কিছু জানি নে, দু'এক দিন দেখিয়ে না দিলে কি ক'রে হ'বে।

ঠা। চল্ আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

লী। আমিও যাই চল ঠাক্‌মা।

(সকলের প্রস্থান)

মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কা ঔষধ।

বমন রোগের যোগ।—(১) শ্বেতচন্দন ঘসা ২ তোলা ও আমলকীর রস ২ তোলা একত্র করিয়া মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বমন নিবারণ হয়। (২) ভাজামুগ ৪ তোলা, পাকার্থ জল এক সের আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া খৈচূর্ণ ৪ তোলা দু' তিন ফোঁটা মধু ও চিনি মিশাইয়া পান করিলে বমন, তৃষ্ণা ও দাহ নিবারণ হয়। (৩) অশ্বত্থবৃক্ষের শুষ্কছাল দগ্ধ করিয়া কোন মাটির পরিষ্কার জলে রাখিয়া দিবে। শীতল হইলে উপরিতন স্বচ্ছজল পান করিলে সর্ব্ব-প্রকার বমন প্রশমিত হয়। (৪) আমলকী ২ তোলা ও কিস্‌মিস্‌ ২ তোলা আধপোয়া শীতল জলের মধ্যে রগড়াইয়া ছাঁকিয়া ২ তোলা পরিষ্কার চিনি মিশাইয়া অল্প অল্প পান করিলে বমন রোগের শান্তি হয়।

ক্রিমি নিবারণের উপায়।—(১) কট্‌কী ।০ সিকি তোলা, দাড়িম মূলের ছাল ॥০ তোলা, বিড়ঙ্গ ॥০ আধ তোলা আপাঙ্গের পাতা ॥০ আধ তোলা ও দারুচিনি ।০ সিকি তোলা। আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া এক ছটাক থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ৪।৫ ফোঁটা তার্পিন তৈলের সহিত পান করিলে কোষ্ঠে আবদ্ধ সমস্ত ক্রিমি নিশ্চিত সমূলে নষ্ট হয়। (২) বিড়ঙ্গ ৶০ আনা, পলাশ পাঁপ্‌ড়া ৶০ আনা একত্রে জলের সহিত বাটিয়া প্রতিদিন প্রাতঃ-কালে সেবন করিলে ক্রিমি নাশ হয়। (৩) ভাঁট্‌ পাতা ও আনারসের পাতা এক সঙ্গে মিশাইয়া সেই রস দুই তোলা লইয়া ৩।৪ রতি বিটলবণের সহিত সেবন করিলে নানাপ্রকার ক্রিমি বিনষ্ট হয়। (৪) পালিধামাদারের ছাল পরিষ্কার চূণের জলে ছেঁচিয়া তাহার রস সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়। (৫) পালিধামাদারের পাতার রস মধু সহ সেবন করিলে বিশেষ ফল দর্শে।

কর্ণশূলে ব্যবস্থা।—(১) হুড়-হুড়ে পাতার রস গরম করিয়া কর্ণের ভিতর দিলে প্রবল কর্ণশূল আরোগ্য হয়। (২) অল্প উষ্ণ নারিকেল তৈলের মধ্যে ১ রতি আফিং ঘসিয়া কর্ণবিবরে প্রদান করিলে কর্ণশূলের নিবারণ হয়। (৩) পাকা আকন্দ পাতায় ঘৃত মাখাইয়া আগুনে সেকিয়া তাহা হইতে রস বাহির করিয়া সেই ঈষদুষ্ণ রস পুনঃ পুনঃ কর্ণে পূরণ করিলে শীঘ্র শীঘ্র বেদনার শান্তি হয়। (৪) ছাগমূত্রের সহিত সৈন্ধবলবণ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া উষ্ণ করিয়া পুনঃ পুনঃ কর্ণে প্রদান করিলে কর্ণশূলের শান্তি হইয়া থাকে, (৫) সরিষার তৈল, মধু ও আদার রস একত্রে অগ্নিতে পাক করিয়া গরম গরম ২।৪ বিন্দু কর্ণ বিবরে প্রদান করিলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা দূর হইয়া থাকে।

শূলবেদনার মহৌষধ।—(১) শামুকের খোলা ভস্ম ১ তোলা, সৈন্ধব-লবণ ২ তোলা, বিটলবণ ৩ তোলা ও যোয়ান

৪ তোলা,—গাছ পাকা ঝুনা নারিকেল ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে উক্ত চারি দ্রব্য প্রবেশ করাইয়া নারিকেলের ছিদ্রমুখে, সেই নারিকেলের মালা ভাঙ্গার টুকুরা বসাইয়া কাদা মাখা বস্ত্রখণ্ড জড়াইয়া কাদা দ্বারা গোলাকার করিয়া শুষ্ক হইলে, বহ্নি সংযুক্ত ঘুঁটের আগুনে পোড়াইয়া লইবে। শীতল হইলে যন্ত্রটী বাহির করিয়া সেই নারিকেলের দগ্ধ শস্য ও ঔষধ বাহির করিয়া একত্রে পেষণ পূর্ব্বক কাঁচ পাত্রে রাখিবে। এই ঔষধ দুই আনা মাত্রায় প্রতিদিন প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যায় গরম জলসহ সেবন করিলে শূল বেদনা সারিয়া যাইবে। (২) কর্পূর, বড় এলাচের দানা ও মিশ্রী এক টুকরা মুখের মধ্যে রাখিয়া চুষিলে শূল বেদনার উপশম হয়। (৩) শুঁঠ চূর্ণ ৬ তোলা, জাঙ্গীহরীতকী চূর্ণ ৬ তোলা, বিটলবণ চূর্ণ ৯ তোলা, সোহাগার খৈ চূর্ণ ৬ তোলা, যোয়ান চূর্ণ ৬ তোলা, মৌরীচূর্ণ ৩ তোলা, জীরাচূর্ণ ৩ তোলা, হরিদ্রা চূর্ণ ৩ তোলা—এই সমস্ত চূর্ণ একে একে মিশাইয়া বহুক্ষণ মাড়িয়া উপযুক্ত পাত্রে রাখিয়া দিবে। ইহার দুই আনা, তিন আনা বা চারি আনা মাত্রায়—শীতল জলের সহিত দুইবার আহারান্তে সেবন করিলে শূল বেদনা অল্পকাল মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে।

দন্তশূলে ব্যবস্থা।—কাঁচা পাথুরিয়া কয়লায় অগ্নি সংযোগ করিয়া সুদগ্ধ হইলে যে কোমল সাদা ভস্ম হয়, সেই ছাই গাবভেরেণ্ডার পাকা গাকা গাছের আঠা সংগ্রহ করিয়া সিক্ত করতঃ রৌদ্রে শুকাইবে। তা'রপর উত্তমরূপে গুঁড়া করিয়া সেই গুঁড়া দিয়া প্রত্যহ ২।৩ বার দাঁত মাজিয়া মুখ ধুইলে দাঁতবেদনা, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁতের গোড়া হইতে রক্তস্রাব ও পূয়স্রাব আরোগ্য হইয়া দন্তমূল দিন দিন দৃঢ় হইতে থাকে।

কবিরাজ শ্রীগোষ্ঠবিহারী গোস্বামী
ভিষগাচার্য্য।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

গ্রাহকদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা।—গ্রাহক বৃন্দের অনুকম্পাই সাময়িক পত্রের জীবন। নানা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আমাদের আয়ুর্ব্বেদ ২য় বর্ষে পদার্পণ করিল। আমাদের গ্রাহক মণ্ডলীর নিকট এই শুভ সুযোগে আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। তাঁহাদের কৃপা-দৃষ্টি না থাকিলে আমরা ইহার পরিচালন কার্য্যে কখনই সক্ষম হইতামনা। অধুনা আয়ুর্ব্বেদের এই ঘোর দুর্দ্দিনে আমাদের এই ক্ষুদ্র "আয়ুর্ব্বেদে"র প্রতি তাঁহাদিগের করুণদৃষ্টি যেন পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ থাকে, ইহাই আমরা এই নববর্ষের আরম্ভকালে তাঁহাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি।

মৃত্যুর হিসাব।—সরকারি বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায়, গত ১৯১৬ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালা দেশে মড়কের হার অনেক কম হইয়াছিল। ঐ বৎসর সমগ্র বঙ্গদেশের মৃত্যুর সংখ্যা ১২, ৪১, ২, ৪১, উহার পূর্ব্ববৎসর

মরিয়াছিল ১৪, ৮৮, ৫, ৬৭। ইহার মধ্যে আলোচ্য বর্ষে জ্বর এবং ম্যালেরিয়ায় মরিয়াছে, ৯,৯,৮৮০ জন। তৎপূর্ব্ব বৎসর জ্বর এবং ম্যালেরিয়ায় মরিয়াছিল—১০,৬৪,১,৫৯ জন। আলোচ্য বর্ষে কলেরায় মরিয়াছে ৭০,৮,৩৬ এবং তৎপূর্ব্ব বৎসর মরিয়াছিল—১৩০,৬,৭৯। বসন্তে মৃত্যু ১৯১৫ খৃঃঅব্দে ৩২,৭,৮৫ এবং ১৯১৬ খৃঃঅব্দে ঐ রোগের মৃত্যুর সংখ্যা ১৩,৮,৯০। ১৯১৫ সালে প্লেগে মরিয়াছিল ১৯৯ জন। ১৯১৬ সালে ১১০। হিসাব দৃষ্টে জানা যায়, গত বৎসর বঙ্গে শিশু-মৃত্যুও কিছু কম হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন—মৃত্যু অপেক্ষা জন্মের সংখ্যা গত বৎসর অনেক বেশী হইয়াছিল। ১৯১৫ সালে জন্ম-সংখ্যা ১৪,৪১,৩,২৮ এবং ১৯১৬ সালে জন্ম-সংখ্যা ১৪,৪৫,৫,৯২। উভয় বৎসরের তুলনায় জন্ম-সংখ্যা খুব বেশী না হইলেও গত বৎসর জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু-সংখ্যা ছাড়াইয়া গিয়াছিল, আলোচ্য বর্ষে মৃত্যু অপেক্ষা জন্ম-সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। আশার কথা সন্দেহ নাই।

স্বাস্থ্যরক্ষায় সার্ আশুতোষ।—বাল্যকালে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য পিতা-মাতার চেষ্টা থাকিলে ভবিষ্যৎ সন্তানের অকালে যে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে পারেনা—আমাদের দেশপূজ্য সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয় তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থল। নানারূপ কঠোর পরিশ্রম সত্বেও ভগবৎ কৃপায় ইহার স্বাস্থ্যভঙ্গের কথা এ পর্য্যন্ত শুনিতে পাওয়া যায় নাই। ইহার প্রধান কারণ, শিশুকালে ইনি যখন বিদ্যালয়ে পাঠ করিতেন, ইহার স্বর্গীয় পিতৃদেব সেই সময় হইতেই নিয়ম করিয়াছিলেন,—'টিফিনে'র সময় ইহাকে বাজারের খাবারের জন্য পয়সা দেওয়া হইবেনা। উহার পরিবর্ত্তে ১ গ্লাস দুগ্ধ এবং দু' একটি সন্দেশ দিয়া ঝিকে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। ইহা ভিন্ন ইঁহার পিতৃদেব ব্যায়ামের জন্য ইহাকে নিয়মিত প্রাতঃকালীন ভ্রমণে অভ্যস্ত করাইয়াছিলেন, সার আশুতোষ অদ্যাপি সে অভ্যাস পরিত্যাগ করেন নাই। যাহা হউক সার আশুতোষ অদ্যাপি কর্ম্মবীর হইয়া দেশের—দশের—সমাজের সর্ব্ববিধ কর্ম্মেই অগ্রণীর আসন অধিকারে সমর্থ হইতেছেন; আর তাঁহার সম-সাময়িক দেশের ভবিষ্যৎ ভরসাস্থল কত ছাত্র অকালে কাল-কবলিত হইয়াছে। বালকাল হইতে বাজারের খাবার খাওয়া এবং ব্যায়াম অভ্যাস না করার জন্য আমাদের যে স্বাস্থ্যরক্ষার অন্তরায় ঘটিতেছে, তাহারই ফলে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা নানারূপ আধিব্যাধি লইয়া এক এক জন অকর্ম্মণ্যের অবতার হইয়া পড়িতেছি। প্রত্যেক অভিভাবকই সার্ আশুতোষের পিতৃদেবের পন্থা অনুসরণ করিলে তাঁহাদিগের বংশধরদিগের সর্ব্ববিধ কল্যাণ সাধিত হইতে পারিবে।

ম্যালেরিয়ার নূতন ঔষধ।—ডাক্তার হেরেস্ উইলিশ নামক ব্রহ্মদেশের এক পুলিশ ডাক্তার পুরাতন উর্দ্দূ-চিকিৎসা পুস্তকগুলি হইতে এক নূতন ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। এক প্রকার লেবু হইতে ক্যালশিয়ম নামক ধাতুর তিনপ্রকার লবণ মিশ্রিত করিয়া এই ঔষধ প্রস্তুত করিতে হয়। ম্যালেরিয়া জ্বর পুরাতন হইলে কুইনাইনে ফল হয়না, কিন্তু উক্ত ডাক্তার সাহেব যে সকল ম্যালেরিয়া গ্রস্ত রোগীকে তাঁহার আবিষ্কৃত ঐ ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহারা সকল গুলিই আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

ডাক্তারের মতে কুইনাইন সেবনে রক্তকণা নষ্ট হইয়া যায়, তাঁহার আবিষ্কৃত এই নূতন ঔষধে উহা তো নষ্টই হই না, বরং রক্ত-বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। উক্ত ডাক্তার এখনও এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেছেন। এসম্বন্ধে তাঁহার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিবার জন্য আমরা উৎসুক রহিলাম।

বিবাহের বয়স।—বিবাহের বয়ঃ-নির্দ্ধারণ লইয়া সংপ্রতি একটা আন্দোলন চলিতেছে। এক পক্ষ বলেন, কন্যা এবং পুত্র উভয়েই বয়স্থ হইলে বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য, অপর পক্ষের মতে কন্যা-পুত্র—সকলের পক্ষেই বিবাহটা অল্প বয়সেই প্রশস্ত। ১ম পক্ষের মত লইয়াই ছাত্র-মহলে ষোড়শী-বিবাহের হুজুগ আরম্ভ হয়। বর্ত্তমান সময়ে সহযোগী "বেঙ্গলী"তে বাল্য-বিবাহ কল্যাণকর বলিয়া একটী মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। যাহা হউক এ সকল আন্দোলন শুভজনক বলিয়া আমরা মনে করি। ত্রেতা-দ্বাপরে যে সময় স্বয়ম্বরা হইবার প্রথা প্রচলিত ছিল, সে সময় অধিক বয়সে বিবাহ হইত আমরা গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাই, কিন্তু বর্ত্তমানযুগের প্রারম্ভ কাল হইতে বরাবরই বাঙ্গালী-সন্তান অষ্টম বর্ষে কন্যাকে পাত্রস্থ করিয়া গৌরী-দানের ফললাভ করিত। সে ফললাভে দেশের—দশের—সমাজের অমঙ্গল ত হইত না। অষ্টম বা নবম বর্ষের কন্যা এবং অষ্টাদশ কি বিংশ বর্ষীয় পুরুষের বিবাহ-ক্রিয়া সে কালে সমাজে চলিত। ইহার ফলে বালক মণ্ডলী কুপথগামী হইবার সুযোগ না পাওয়ায় এখনকার মত নানারূপ কুৎসিত ব্যাধিও তাহাদিগের শরীরে প্রবেশ করিতনা। স্ত্রী লোকেরাও এখনকার মহিলা কুলের মত নানা রূপ রোগে আক্রান্ত হইতেননা। কি স্ত্রী, কি পুরুষ—সকলেই তখন সংযম-ধর্ম্ম পালন করিয়া নীরোগ ও দীর্ঘায়ু লাভে সক্ষম হইতেন। কাজেই বাল্য-বিবাহের দোষ দিব কেমন করিয়া। বাল্য-বিবাহের উপকারিতা উপলব্ধি করিয়াই শাস্ত্রকারগণ 'গৌরীদানে'র ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

ম্যালেরিয়া নিবারণের চেষ্টা।—বঙ্গের বিখ্যাত স্বাস্থ্য-কমিশনার ডাক্তার বেণ্টলী মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর-রঘুনাথগঞ্জের অধিবাসীদিগকে ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য কতক গুলি উপায় প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ঐ স্থানের ডোবা এবং নিম্নভূমি গুলি জলপূর্ণ করিয়া রাখিবার জন্য পয়ঃ প্রণালী নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। গঙ্গার জল এই পয়ঃ প্রণালীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঐ ডোবা ও নিম্নভূমি গুলি সর্ব্বদা জল পূর্ণ করিয়া রাখিবে—এই রূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। বর্ষাকাল গত হইলে আবার সমস্ত জল ঐ প্রণালীর দ্বারা বাহির করিয়া দেওয়া হইবে, সুতরাং এই সকল স্থান হইতে মশকের উৎপত্তি হইতে পারিবেনা। ডাক্তার সাহেব বলিয়াছেন, বর্ত্তমান বর্ষেই ইহার ফল জানিতে পারা যাইবে। দেখা যাউক, ফল কি হয়।

ভেজালঘৃত।—ব্যবসায়ীগণ ঘৃতে চর্ব্বি এবং নানারূপ ভেজাল মিশ্রিত করিয়া জন সাধারণের ধর্ম্ম এবং স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া আসিতেছিল বলিয়া কলিকাতা ভাগীরথীতীরে মারওয়ারি-ব্রাহ্মণগণ কয়েকদিন অনশনে থাকিয়া যজ্ঞ কার্য্যের বৃহদনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। দ্বারবঙ্গের মহারাজা প্রমুখ—ধর্ম্ম-প্রবণ মহাত্মাগণের তদ্দর্শনে আসন টলিল,

তাঁহারা সকলকে আহ্বান করিয়া, সভা করিয়া ব্যবসায়ী দিগকে অর্থ এবং সামাজিক দণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। বর্ত্তমান যুগে ইহা এক অভূত পূর্ব্ব ঘটনা। যাহা হউক সংপ্রতি বর্দ্ধমানের মহারাজ প্রমুখ কয়েক জন হিন্দু-সন্তান আইনের বাধনে ইহার প্রতীকারপ্রার্থী হইয়া বঙ্গেশ্বর রোনাল্ডসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর প্রধান পর্ব্ব দুর্গোৎ-সবের আর বিলম্ব নাই—ইহারই মধ্যে আইনটা যাহাতে দৃঢ়ীভূত হয়—তাহার জন্যও সাক্ষাৎকারীরা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বঙ্গেশ্বর এ কথায় কর্ণপাত করিয়া আইনের প্রবর্ত্তনে দেশবাসীর আশা পূর্ণ করিয়াছেন।

সুচিকিৎসকের পরলোক।—গত ৫ই আষাঢ় বহরমপুরের স্বনামধন্য চিকিৎসক হরচরণ সেন মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি ভারতের শেষ ঋষি গঙ্গাধরের শিষ্য ছিলেন। ইঁহার পরলোক গমনে বহরমপুর হইতে গঙ্গা-ধরের শিষ্য লোপ পাইল। ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার বিদগাঁ নামক গ্রামে ১২৫১ সালের ৩রা ভাদ্র ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম ৺ অভয়চন্দ্র সেন। ১৪ বৎসর বয়সে বিক্রমপুর—ভরাকর নিবাসী ৺বিশ্বেশ্বর দাশ গুপ্তের দশম বর্ষীয়া কন্যা নিত্যতারা দেবীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। এক্ষণে তাঁহার পাঁচটি পুত্র ও দুইটি কন্যা বর্ত্তমান। আমরা তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবার-বর্গের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও ধন্বন্তরি।—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে গত শ্রাবণ মাসের "ধন্বন্তরি" লিখিয়াছেন,—

"আজ কাল ইংরাজীভাষা সমগ্র সভ্য জগতের প্রচলিত ভাষা। ইংরেজী ভাষায় কথা বার্ত্তা বলিতে—বুঝিতে অসমর্থ, সমগ্র সভ্য জগতে এরূপ স্থান নাই বলিলেই হয়। অতএব যদি আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা প্রণালীর ক্ষেত্রের বিস্তৃতি সাধন করিতে হয়, এবং এই চিকিৎসা-প্রণালীর প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বত্র প্রতিপন্ন করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে এই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও বাঙ্গালার সঙ্গে ইংরাজী ভাষায় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অধ্যাপনার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের বিশ্বাস, এরূপ ব্যবস্থায় এই বিদ্যালয়ের আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থীর অভাব হইবে না।" আমরা ইহার উত্তরে ধন্বন্তরি-সম্পাদক মহাশয়কে জানাইতেছি যে,—আমরাও এ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি—সমগ্র জগতে পূর্ব্ববৎ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রসার বৃদ্ধি করিতে হইলে, ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দান ভিন্ন সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবেনা। আমাদের ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য আমরা যথেষ্ট আয়োজনও করিতেছি, সাধারণের সহানুভূতি পাইলে অচিরেই ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিব। ধন্বন্তরি-সম্পাদক যে বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে চিন্তা করিয়াছেন, সেজন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

পদক ও ছাত্রবৃত্তি দান।—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য ভবানীপুর নিবাসী এবং কলিকাতা হাইকোর্টের বদান্যবর উকীল শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একটি রৌপ্য পদক ও মাসিক চারি টাকা করিয়া এক বৎসরের জন্য বৃত্তি বা সুবর্ণপিণ্ড

দান করিয়াছেন। ১ম বার্ষিক শ্রেণীর পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগের মধ্যে যে ছাত্র সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবে, তাহার জন্য ঐ বৃত্তি এবং অঙ্গবিনিশ্চয় বা অ্যানাটমী বিদ্যাতে উত্তীর্ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র রৌপ্য পদক পুরস্কার পাইবে। এই পদক ও বৃত্তি মোহিনীবাবুর স্বর্গীয়া জননী বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর স্মৃতি কল্পে "বিন্ধ্যবাসিনী পদক" এবং "বিন্ধ্যবাসিনী বৃত্তি" নামে অভিহিত হইবে। মোহিনী বাবু ইহা ভিন্ন মাসিক পঁচিশ টাকা হিসাবে এই বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে সাহায্য করিয়া থাকেন। আমরা এজন্য যে মোহিনী বাবুর নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ, তাহা বলাই বাহুল্য। দেশের দানশীল ব্যক্তিগণ মোহিনী বাবুর দানের অনুসরণ করুন—ইহাই আমরা তাঁহাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি।

সমালোচনা।

ম্যালেরিয়া।—শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত এল-এম্-এস্ প্রণীত। শ্রীকিরণচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মুঙ্গের। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। ম্যালেরিয়ায় বাঙ্গালা দেশ ছার খারে যাইতে বসিয়াছে। এ দুর্দ্দিনে এরূপ পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। ম্যালেরিয়ার ইতিবৃত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া, কিরূপ ব্যবস্থায় দেশ হইতে ম্যালেরিয়ার নিবৃত্তি হইতে পারে, গ্রন্থকার সে সম্বন্ধে অনেক কথাই ইহাতে বিবৃত করিয়াছেন। শুধু ম্যালেরিয়ার কথা নহে, স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধেও এ গ্রন্থে অনেক কথার উল্লেখ করা হইয়াছে। দু'এক স্থল উদ্ধৃত করিতেছি,—

'আমাদের দেশে এত রোগ কেন? দ্বাদশী ত্রয়োদশীর পরই আমাদের দেশে যুবতীরা কেন অমাস্যায় ঢলিয়া পড়ে? পুরুষের "বয়স না হ'তে কুড়ি আগে পাকে কেশ কেন?" ইহার কারণ কি! স্বাস্থ্য প্রকৃতির দান। মাতার দান বলিয়া কখনই আমরা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করি নাই, ধর্ম্মভ্রষ্ট—আচারভ্রষ্ট আমরা বরং পদে পদে প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া চলিয়াছি। তাঁহার নির্ম্মল বায়ু রুদ্ধদ্বার ও জানালায় আবদ্ধ করিয়াছি, সর্ব্বশক্তি দাতা ও সর্ব্বপাবন সূর্য্যালোক আমাদের কুটীরের রুদ্ধদ্বার দেখিয়া চলিয়া যান, গৃহের কলুষ গৃহেই রহিয়া যায়। বিছানাপত্র, আসবাব প্রভৃতি প্রত্যহ রোদে দেওয়ার আবশ্যক মনে করিনা।"

"তা'র পর জল; জলের একটী নাম জীবন, আর একটি নাম নারায়ন। ইহা হইতেই ইহার উপকারিতা ও পবিত্রতা সূচিত হইতেছে। পুষ্করিণী হাজিয়া মজিয়া উঠিতেছে, কেহ পঙ্কোদ্ধার করেনা, পাড়ে বসিয়া অনেকে মলমূত্র ত্যাগ করে, বর্ষার জলে তাহা ধুইয়া আবার পুষ্করিণীতেই পড়ে। পানা ও আগাছায় ভরা সেই এক পুষ্করিণী, যেখানে দন্তধাবন, ধৌতিকার্য্য, গাত্র মার্জ্জনা ও সর্ব্ববিধ রোগের মল মূত্রাদিময় কাপড় কাচা হয়, অথচ তাহা স্বল্পজলা, এবং কস্মিনকালে তাহার পঙ্কোদ্ধার হয় না; সেই জল উত্তপ্ত মাত্র না করিয়া আমরা পান করি, পরিণাম, উদরাময়, অতিসার, জ্বরাতিসার, বিসূচিকা এবং অজস্র লোকের মৃত্যু।"

"জমিদারেরা গোচারণ ভূমি জমা বিলি করিয়া দিয়া ভোগ-বিলাসের আয় যথারীতি বর্দ্ধিত করিতেছেন। এদিকে গ্রামের গাভী কুল কঙ্কাল সার হইতেছে, দুধ কম দেয়, বৎসরা দুর্ব্বল হয়, নয় অকালে মারা পড়ে। দুধের যোগান কম, কিন্তু চাহিদা বেশী, গয়লারা কাজেই প্রাণপণে যেখান-সেখানকার জল মিশায়। দুধের মাখন তুলিয়া লয়। মহিষ দুধে ও গরুর দুধে মিশায়। সেই দুধ খাইয়া আমাদের ছেলেরা মানুষ হয়। সকলে আবার দুধের দুর্ম্মূল্যতার জন্য তাহাও পেট ভরিয়া খাইতে দিতে পারে না, ভাত হজম করিবার শক্তি না হইতে-হইতেই তাহারা ভাত ও অন্যান্য দুষ্পাচ্য দ্রব্যাদি খাইতে সুরু করে, পরিণাম—যকৃৎ রোগ, উদরাময় ও অকাল মৃত্যু।"

এই রোগ-প্রবণ দেশের প্রত্যেক ব্যক্তি-রই এ গ্রন্থ পাঠ করিলে অনেক উপকার হইবে। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট।

আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ। মাসিক পত্র। শ্রীসুধাংশু ভূষণ সেন কাব্যতীর্থ বাচস্পতি সম্পাদিত। মূল্য ২৲ টাকা। ৫ম বর্ষ, ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা। বসন্ত-চিকিৎসার যে মুষ্টিযোগগুলি প্রকাশিত হইতেছে তদ্বারা পাঠকের উপকার হইতে পারিবে। "আয়ুর্ব্বেদ বিষয়ক প্রস্তাব" চিন্তা প্রসূত। "আয়ুর্ব্বেদ" শীর্ষক প্রবন্ধটিও মন্দ হয় নাই। ছাপা ও কাগজ কিন্তু আর একটু ভাল হওয়া উচিত। এবারের ২ সংখ্যার কাগজ যাহা দেখিলাম, তাহাতে আকারও বৃদ্ধি করা উচিত। "অশ্বিনীকুমার সংহিতা"র অসম্পূর্ণ বাক্যে যে সংখ্যা শেষ করা হইয়াছে, তাহাও অসঙ্গত বলিয়া আমাদের বিবেচনা হয়।

পরীক্ষার ফল।

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে ২য় বার্ষিক শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
„ বিশ্বনাথ সেন গুপ্ত
„ যতীন্দ্রকুমার মজুমদার
„ রজনীকান্ত গুপ্ত
„ মণীদাস রাজপক্ষ
„ সতীশচন্দ্র সেন গুপ্ত
„ প্রফুল্লচন্দ্র রায়
„ জ্ঞানচন্দ্র গুপ্ত
„ সারদাকান্ত দাশ গুপ্ত
„ ধনঞ্জয় সেন গুপ্ত
„ বিমলা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ রাজেন্দ্রচন্দ্র দাশ গুপ্ত
„ যোগেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
„ কিরণ্ময় দাশ গুপ্ত
„ মোহিত কুমার সেন গুপ্ত
„ ভোলানাথ রায়
„ দেবনাথ মজুমদার
„ বিশ্বনাথ তালুকদার
„ বিজয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়
„ হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
„ প্রমথনাথ দত্ত গুপ্ত
„ নরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত
„ গৌরদাস অধিকারী
„ পি, এম, অভয় সিংহ
„ ফণিভূষণ সেন গুপ্ত

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

২য় বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৪—কার্ত্তিক। | ২য় সংখ্যা।

এস মা।

—:০:—

এস মা জগজ্জননি,—তোমার আগমনের সাড়া পাইয়া আমার বঙ্গভূমি আবার মাতিয়া উঠিয়াছে। বর্ষব্যাপি দারিদ্র-দুঃখ আমার বঙ্গজননী আজি সকলি ভুলিয়া গিয়া, তোমার দর্শন আকাঙ্ক্ষায় হর্ষ-সুখ অনুভব করিতেছে। তুমি আসিতেছ—এই গর্ব্বে দিগ্বধূগণ শারদ-শুভ্র-জ্যোৎস্না-কিরণ অঙ্গোপরি তুলিয়া লইয়া সেই কিরণ রাশি যেন সমগ্র বঙ্গদেশ খানিতে ছড়াইয়া দিয়াছে। দিগ্বধূগণের এবম্বিধ গর্ব্ব দর্শনে রাগালস-লোচনে রক্তজবা ফুটিয়া উঠিয়াছে। রক্তজবার দেখা দেখি ঈর্ষাভরে পদ্মগুচ্ছও তোমার শ্রীপদযুগলে লুটাইয়া কৃতকৃতার্থ হইবার জন্য প্রাণভরা হাসির উৎস ঢালিয়া দিয়াছে। এস মা, বাঙ্গালীর শোকোত্তপ্ত প্রাণের ভিতরও আজি বড় আনন্দের দিন। বাঙ্গালীর মা—বাঙ্গালীর পূজা লইতে আসিতেছেন, বাঙ্গালীর এ আনন্দের বুঝি আর তুলনা নাই।

'মা'কে দেখিলে সন্তানের সকল ব্যথা ফুটিয়া উঠে। সকল দুঃখ, সকল কষ্ট, সকল অশান্তির কাহিনী 'মা'য়ের নিকট বলিয়া যে কত সুখ—কত তৃপ্তি, তাহা মাতৃবৎসল-সন্তান ভিন্ন আর তো কাহারও বুঝিবার শক্তি নাই। নৈরাশ্যের ঘোরঘনান্ধকার যখন হৃদয় আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া তুলে, দৈন্য-দুঃখের দীন চাহনিটির ভিতর শুষ্ক ভ্রুকুটির ভঙ্গিমাটুকু যখন বিদ্যুৎ-প্রভার মত নিমেষ কালের জন্যও নেত্রপথে পতিত হয়, রোগে-শোকে-জীর্ণতনু হইয়া, জাগতিক সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, নিষ্ফলকাম-মানব যখন সংসারের অসারতা সর্ব্বপ্রকারে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়, তখন প্রাণের আবেগে আকুল হইয়া মর্ম্মগ্রন্থির ভিতর হইতে ক্ষীণ কণ্ঠে 'মা' 'মা' বুলি উচ্চারণ করিয়া থাকে। তোমার অকৃতি সন্তান আমাদেরও তো মা এখন সেই অবস্থা। সেই অবস্থায় পতিত হইয়াছি বলিয়াই আজি আমাদের কাতর কণ্ঠ হইতে ধ্বনিত হইতেছে —এস মা।

সেই অবস্থায় পতিত হই নাই তো কি? অবস্থার দীনতায় আমাদের বাকী তো আর কিছুই নাই মা! ম্যালেরিয়া-রাক্ষসী বাঙ্গালার পল্লীগুলির সকল টুকু গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। ম্যালেরিয়ার জ্বালায় অনেকে পল্লী-মায়া পরিত্যাগ করিয়াছে মা, কিন্তু পল্লী ছাড়িয়াও সুখ নাই,—সহরে অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য এবং যক্ষ্মারোগীর হিসাব প্রতি নিয়তই বর্দ্ধিত। ফলে সেকালের মত তোমার সন্তানগণের আর সে বলবীর্য্য নাই, সে কান্তি-ধৃতি নাই, সে প্রভা-প্রতিভা নাই,—নানারূপ আধিব্যাধি-পরিপূর্ণ দেহে প্রতি পলে তাহাদের আয়ু ক্ষয় হইতেছে। ধর্ম্ম তো দেশ হইতে লোপই পাইয়াছে, সমাজের নিয়মও এখন কেহ আর মানিতে চাহেনা। পুরুষ স্বেচ্ছাচারী,—রমণী কর্ত্তব্যচ্যুতা,—বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণ বালকমণ্ডলীর কর্ত্তব্য-পথ প্রদর্শনে অক্ষম, যুবকগণ স্বাধীন পন্থা চিনিয়া কাহারও অনুজ্ঞা পাইবার অপেক্ষা রাখে না। ফলে কি করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হয়—তাহা বৃদ্ধগণও চিন্তা করেন না, বালকগণও শিখিতে চাহে না, যুবক-যুবতীগণও সে সংযম হারাইয়া আত্মোন্নতির পথ রুদ্ধ করিতেছেন। ধর্ম্ম বল, অর্থ বল, কামনা বল, মোক্ষ বল,—স্বাস্থ্যই তো মা সকল সুখের মূল। সে স্বাস্থ্য-সুখই যখন তোমার সন্তানদের নাই মা, তখন তাহাদের আর অধঃপতনের বাকী কি! তাই তোমায় এই দুর্দ্দিনে তোমার এই বাঙ্গালী সন্তানের জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে তোমার অমোঘ আশীর্ব্বচনে ক্ষীণ-দেহে সঞ্জীবনী-শক্তি আনিবার উদ্দেশ্যে ডাকিতেছি—এস মা!

অধঃপতনটা কি কম হইয়াছে মা! ধর্ম্মবিগলিতপ্রাণ-আর্য্য-ঋষিমণ্ডলী আমাদের ভবিষ্যৎ শুভেচ্ছা পরবশ হইয়া রাশি রাশি গ্রন্থের যে সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, আমাদের দৈহিক উন্নতি বা স্বাস্থ্য রক্ষাই তো সে সকল গ্রন্থের মূলীভূত বিষয়। সমাজ-বন্ধনের জন্য, স্বদেশ রক্ষার জন্য তাঁহাদের ঐকান্তিক চেষ্টার ফল প্রসূত যে পুস্তকাবলী,—তাহারও তো উদ্দেশ্য মা এই স্বাস্থ্যরক্ষা। তিথি-বিশেষে দ্রব্য-বিশেষেরনিষিদ্ধ-ভক্ষণের ব্যবস্থায় যে স্বাস্থ্য-রক্ষার কল্যাণকর বিধিটুকু অলক্ষিতভাবে লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা অনুসন্ধিৎসু-ব্যক্তিগণ ভিন্ন কেহ তো মা বুঝিতে পারিবেননা। সম্প্রদায় বিশেষের লোলুপ-লালসায় তৃপ্তিপ্রদ হইলেও নিষ্ঠাবান আর্য্য-সন্তানের পক্ষে এই জন্যই অনেক দ্রব্য আহারই নিষিদ্ধ বলিয়া শাস্ত্রবিধি হইয়াছে। ব্রাহ্মণ-শূদ্র,—ভদ্র-ইতরের শ্রেণী-বিন্যাসে এই জন্যই আর্য্য জাতির সমাজ ভিত্তি গঠিত। সে ভিত্তি-গঠনে গঠন-কর্ত্তার কৃতিত্বের পারদর্শীতা পূর্ণ ভাবে ছিল বলিয়াই সমাজস্থ আচার ভ্রষ্ট ব্যক্তিগণের সকল ঝঞ্ঝাবাৎ সহ্য করিয়াও অদ্যাপি ইহা বিলয় প্রাপ্ত হয় নাই, নতুবা অনেক কাল পূর্ব্বেই ইহার অস্তিত্বের চিহ্ন লুপ্ত হইয়া যাইত।

যাক্,—এক কথায় তোমার সন্তানগণের অবস্থা বড়ই ভীষণ হইয়াছে মা! স্বধর্ম্ম হারাইয়া অধুনা আমরা সমাজমধ্যে একাকারের স্রোত পূর্ণভাবে প্রবাহিত করিয়াছি। সে শিক্ষালাভের প্রবৃত্তিও আমাদের নাই, সে দীক্ষা-দানের যোগ্য ব্যক্তিরও সমাজমধ্যে অভাব হইয়াছে। সে সামর্থ্য ও আমাদের ঘুচিয়া গিয়াছে, সে সামর্থ্য আনয়নের চেষ্টাও আমাদের লুপ্ত হইয়াছে। ফলে অধঃপতনটা ক্রমেই যে ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতেছে

মা! তুমি বর্ষে বর্ষে যেমন আসিয়া থাক,—এবারও তো তেমনি করিয়া আসিতেছ মা! তুমিই আমাদের বলদাও, বুদ্ধি দাও, আমাদের অজ্ঞান-তমঃ অপনয়ন করিয়া আমাদিগকে স্বাস্থ্যবান্ ও দীর্ঘজীবি হইবার জন্য একটা অদম্য স্পৃহা আবার আমাদের হৃদয় মধ্যে জাগরিত করিয়া তুল মা। অতীত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া লোক-হিতবৎসল-ঋষি-প্রদর্শিত শাস্ত্ররূপ সরণী অন্বেষণে আবার যেন আমরা অবহিত চিত্ত হই, ভূঃ—ভুবঃ—স্বঃ—ত্রিলোকের সৃষ্টি-স্থিতি পালনকর্ত্রী—জননী আমার,—তোমার চরণে ইহা ভিন্ন এই দুর্দ্দিনে আর আমাদের অন্য প্রার্থনা নাই।

শরতে—শারদা।

(১)

নিরাশ-কাতর প্রাণে　চেয়ে শুধু ঊর্দ্ধ পানে,
কতদিন আছি যে গো! দুঃখ জ্বালা স'য়ে
একে একে "শুভক্ষণ" গেল কত ব'য়ে!
লক্ষ্মী সরস্বতী গুহ গজাননে ল'য়ে—
অসময়ে, আজ কেন এলি মা! অভয়ে?
কুবের ভাণ্ডারী যা'র—সন্তান—ভিখারী তা'র
বিশ্ব—এ ভীষণ দৃশ্য—দেখে সবিস্ময়ে!
তাই কি এলি মা! আজ 'দশভুজা' হ'য়ে?

(২)

এ দীন-দরিদ্র-দেশে—আরো কতবার এসে—
দেখে গেছ তনয়ের ঘোর অমঙ্গল,
তোমার চরণ পূজে, কে পেয়েছে ফল?
কা'রে বা সুমতি দিলে, কা'রে দিলে বল?
কোন্ ভাগ্যবান্—পেলে আশার সম্বল?
সেই মুহুঃ অশ্রুপাত,　সেই বিঘ্ন ঝঞ্ঝাবাত,
সেই হিংসা লোভে পাপে ম্লান মহীতল!
গাছেতে ফলেনা ফল—মেঘে নাই জল!

(৩)

ভাই—মারে বুকে ছুরি,　বন্ধু করে নারী চুরী,
বিধবা—করেনা ব্রহ্মচর্য্যের পালন,
নিত্য নিত্য আত্মহত্যা অকাল মরণ।
অন্নকষ্ট—চিরস্থায়ী—দুর্ভিক্ষ-তাড়ন—
সৃষ্ট ছাড়া সৃষ্টি—এ কি তোমারি সৃজন?
কোথা তোর পুত্র সব? এরা তো নির্জীব-শব
কা'র গৃহে পূজা খেতে কর আগমন?
ধনী, দীন—সবাই ত বিলাসে মগন!

(৪)

তোর এ সাধের ধরা—দারুণ অশান্তি ভরা,
মরীচির অভিশপ্ত মরুভূমি প্রায়!
বল্‌মা! দাঁড়াবি কোথা? বসিবি কোথায়?
ডেকে এনে, পথ থেকে ফিরাব কি হায়!
মাটির আসনে—ব্যথা বাজিবে যে পায়!
চিন্তা-বহ্নি জ্বলে বুকে, 'দেহি দেহি' শব্দ মুখে,
মৃত্যু-ছায়া অন্ধকারে ব'সে আছি ঠায়!
তা'র মাঝে, মা তোমারে বসানো কি যায়?

(৫)

"রাজ রাজেশ্বরী" বেশে—
কেন দেখা দিলি এসে?
'মা' ব'লে ডাকিতে যে মা! বড় ভয় করে,
হাতে ধ'রে আনিতে কি পারি ভাঙা ঘরে?
মাতা-পুত্রে—কান্না কাটি কতদিন পরে—

বল্ মা! একটী কথা—সুধাই কাতরে—
অমৃতান্নে পরিপূর্ণা—মা যা'দের "অন্নপূর্ণা"—
কোন্ মহাপাপে তা'রা অন্নাভাবে মরে?
বস্ত্রাভাবে—কেন তা'রা ছিন্ন-বাস পরে?

(৬)

ছি ছি মা! হৃদয় তোর
কি পাষাণ! কি কঠোর!
কন্যা অন্তরীপ হ'তে হিমাদ্রি শিখর—
ঘরে ঘরে মহামারী ম্যালেরিয়া জ্বর!
মরণে আহ্বান করে কোটি নারী-নর,
এরাই কি—হা জননি—আর্য্য বংশধর?
বিধাতার বজ্র বোষে,
মুষ্টি ভিক্ষা, গোষ্ঠী পোষে—
শোণিতে শোণিমা নাই, শুষ্ক ওষ্ঠাধর!
রোগে অস্থি চর্ম্মসার—কম্ম-কলেবর!

(৭)

কি দিয়ে গো দশভুজা! করিব ও পদ পূজা?
দেবতার যোগ্য আছে কি উপকরণ?
পুষ্পে কীট, গন্ধে স্প্রীট, দূষিত পবন,
ভুজঙ্গের সহবাসে, বিষাক্ত চন্দন,
শশাঙ্কের অঙ্গে মাখা রাহুর বমন;
নিজ হস্তে বস্ত্র বোনা—ভুলে গেছি ত্রিনয়না!
তীক্ষ্ণ কাঁটা বিল্বদলে, কে করে চয়ন?
গঙ্গাজলে "সেপ্টিকট্যাং" ব্যাধি-নিকেতন!

(৮)

দুগ্ধে সে মাধুরী নাই, ঘৃতে ঘৃণা-চর্ব্বি পাই,
গোহাড়ে শর্করা-শুভ্র—উজ্জ্বল প্রভায়!
রবিকরে কৃষি-জাত জ্ব'লে পুড়ে যায়!
ধনরত্ন সবই গেছে—বিলাসের দায়!
জননী কি উপচারে তুষিব তোমায়?
দেহ? সে ত রোগে ক্ষীণ, হৃদয় কলুষে লীন,
মন?—সেও অপবিত্র—স্বার্থের চিন্তায়;
ভক্তি—কুকার্য্যের প্রতি, আসক্তি নেশায়

(৯)

যুগান্তের চিন্তা রাজি,. একত্র করিয়া আজি,
চিনেছি তোমায় ওমা! এতক্ষণ পরে,
তুমিই যে "আয়ুর্ব্বেদ" বিশ্ব চরাচরে!
অষ্টাদশ কোটি ব্যাধি বিনাশের তরে—
দশ হাতে "দশমূল" ধ'রেছ সাদরে।
কাম-ক্রোধ শত্রু-বলে—দলিয়া চরণ-তলে—
রোগরূপী অসুরের স্কন্ধের উপরে,
"স্বাস্থ্য"রূপে "মহাশক্তি" আনন্দে বিহরে!

(১০)

এতদিন—মোহ ঘোরে—
চাহিয়া দেখিনি তোরে,
সকল সংশয় মাগো! ঘুচিল এখন,—
তুমি "আয়ুর্ব্বেদ" নিত্য সত্য-সনাতন!
"যুক্তি" "দৈব"ব্যপাশ্রয় বক্ষে দু'টি স্তন,
"বায়ু পিত্ত কফ" তিন, তোরই ত্রিনয়ন!
অষ্ট-অঙ্গ পূর্ণ করি'—এসো তুমি হে শঙ্করি!
"বৈদিক" "তান্ত্রিক" তোর দু'খানি চরণ,
বিপন্ন-জগৎ-শিরে করুক ধারণ।

শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ,
কাব্যকণ্ঠ বিশারদ।

কাজের কথা।

স্ত্রীসমাজে স্বাস্থ্য-হানি।—অধুনা নানা কারণে দেশের পুরুষ মণ্ডলীর মত বাঙ্গালীরমণীগণেরও স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে। অম্ল এবং অজীর্ণ রোগে বাঙ্গালী পুরুষ দিগের মত অনেক মহিলাই ভুগিতেছেন। ইহা ভিন্ন 'হিষ্টিরিয়া' বা মূর্চ্ছা রোগটি অনেকের তো জীবন ব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে। 'ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাওয়া'র কথা এখন আর কাব্য পুস্তকে পড়িয়া অনুমান করিবার দরকার হয়না,—আমাদের মহিলা সমাজে লক্ষ্য করিলেই উহার যাথার্থ্য প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। একটু সামান্য অভিমান হইলেই,—একটু সামান্য দুঃখ পাইলেই,—একটু সামান্য কথান্তর হইলেই—এখন আমাদের মেয়েরা 'মূর্চ্ছা' গিয়া থাকেন। শারীরিক সামর্থ্য এবং মানসিক দৃঢ়তার অভাবই ইহার সর্ব্ব প্রধান কারণ। সেকালে স্ত্রীসমাজে এই দুইটি বিষয়েরই অভাব ছিলনা। ভোরে উঠিয়া ছড়া ঝাঁট দেওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া, রন্ধন-পরিবেশন প্রভৃতি সাংসারিক সকল কার্য্যই সেকালে আমরা স্ত্রীজাতির উপর নির্ভর করিতাম,—ইহাতে তাঁহাদিগের গৃহস্থলীর সহিত ব্যায়ামকার্য্যও সিদ্ধ হইয়া যাইত। অবকাশ-কালে বৃদ্ধ মহিলা দিগের নিকট বসিয়া যুবতারা রামায়ণ-মহাভারত পাঠ করিতেন, কখন বা ঠানদিদির নিকট উপকথা বা গল্প শুনিতেন। মনোবৃত্তির দার্ঢ্য সেই রামায়ণ-মহাভারত পাঠ বা গল্প শ্রবণে সিদ্ধ হইত। আদর্শ যেরূপ, অনুকরণও সেইরূপ হইত। এখন ছড়া ঝাঁট দেওয়া, থালা বাসন পরিষ্কার করা, রন্ধন-পরিবেশন করা—এ সকল তো অনেক সংসার হইতে উঠিয়াই গিয়াছে, রাঁধুনি-চাকরাণীতে অনেক সংসারে এখন সে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে! নূতন নূতন নাটক-নভেল এখন রামায়ণ-মহাভারতের স্থল অধিকার করিয়াছে। ঠাকুমার নিকট গল্প শোনা—সে প্রথা তো দেশ হইতে একেবারেই বিলুপ্ত। সে ঠাকুমাও এখন নাই, সে গল্প শুনিবার জন্য যুবতীগণেরও ইচ্ছা নাই। ফলে শারীরিক এবং মানসিক দুর্ব্বলতার অভাবে অধুনা আমাদের রমণী-সমাজের যেরূপ ক্ষতি হইতেছে, তাহা চিন্তা করিবার বিষয়।

* * *

ভবিষ্যৎ চিন্তা।—আমাদের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিলে তবে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধর দিগের স্বাস্থ্য যে উন্নত হইতে পারিবে, এ বিষয়ে বোধ হয় কাহারও সহিত মতদ্বৈধ ঘটিবার কারণ নাই। বীজ যেরূপ, চারাও সেইরূপ হইবে,—ইহা তো চলতি কথা। অস্বাস্থ্যকর পিতামাতার শুক্র-শোণিত মিশ্রিত হইয়া কখন 'ভীম অর্জ্জুনে'র মত সন্তান উৎপন্ন করিতে পারেনা। প্রত্যেক পিতার—প্রত্যেক মাতার ইহার জন্য ও স্বাস্থ্যবান ও স্বাস্থ্যবতী হইতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পিতার রক্তদুষ্টি এবং পারদ-বিকৃতির ফলভোগ—সন্তানকে যে করিতে হয়, ইহা তো সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই জন্যই আমাদিগকে সদাচার ও সদ্বৃত্তি-পরায়ণ হইবার জন্য আমাদের শাস্ত্রকারগণ রাশি রাশি উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। সেকালে আমাদের গৃহস্থলীর সকল

কার্য্য যেরূপ ভাবে নির্ব্বাহিত হইত, তাহার সহিত সে উপদেশের যথেষ্ট সম্বন্ধ ছিল। আমাদের করণীয় সকল বিষয়েই সুকৌশলে শাস্ত্র বা শাসন-প্রণালী বিজড়িত। আমরা সে সকল এখন ভুলিয়া গিয়াছি এবং তাহারই ফলে যে আমাদের স্বাস্থ্যের দুর্গতি ঘটিয়াছে —একথা ধ্রুব সত্য।

* * *

আমাদের কর্ত্তব্য।—স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য আমাদের সদাচার পালন যেরূপ কর্ত্তব্য, বংশধর দিগকে সুশিক্ষা দিবার জন্য ও আমাদের সেইরূপ সদ্বৃত্তি-পরায়ণ হওয়া উচিত। তাহারা তো যেরূপ দেখিবে, সেই-রূপই শিখিবে। কিন্তু সেই শিক্ষার সহিত তাহাদের যে জীবন-মরণের সম্বন্ধ নিহিত রহিয়াছে। এখানে একটা গল্পের উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবেনা। কতকগুলি মুনিকুমার এক বিটপিস্থ কুলায়ে দুইটী পক্ষী-শাবকদেখিয়া একটীকে কুটীরে লইয়া গেলেন। ঐ শাবকটী ঋষিকুমারদিগের ব্যবহার-দর্শনে ঋষি-স্বভাব প্রাপ্ত হইল। অতিথি অভ্যাগত কুটীরে আগমন করিলে পক্ষী—ঋষিদিগের মত মিষ্ট বচনে অভ্যর্থনা করিতে শিখিল। মুনিকুমারগণ তদ্দর্শনে চিন্তা করিলেন,—কুলায় মধ্যে যে আর একটি পক্ষী আছে, তাহাকেও লইয়া আসা যাউক। ফলে তাঁহারা কুলায় মধ্যে পক্ষীটি না পাইয়া পথিমধ্যে আসিতে আসিতে এক চর্ম্মকার-গৃহের নিকটবর্ত্তী হইবা-মাত্র শুনিতে পাইলেন, কে তাঁহাদের উদ্দেশে গালি-বর্ষণ করিতেছে। ফিরিয়া দেখিলেন, একটি শুকপক্ষী। তাহার পর কুটীরে ফিরিয়া গিয়া নিজেদের পালিত শুকপক্ষীর নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, পক্ষী বলিল,—

"মাতাপ্যেকঃ পিতাপ্যেকো মম তস্য চ পক্ষিণঃ।
অহং মুনিভিরানীতঃ সচানীতো গবাশনৈঃ।
অহং মুনীণাং বচনং শৃণোমি
গবাশনানাং বচনং শৃণোতি সঃ,
ন তস্য দোষোঃ ন চ মে গুণো বা
সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি॥"

অর্থাৎ—"আমাদের পিতা এবং মাতা একই, কিন্তু আমি মুনিদিগের দ্বারা আনীত এবং সে চর্ম্মকারের দ্বারা নীত। আমি মুনি-দিগের বাক্য শিক্ষা করিয়াছি, আর সে চর্ম্ম-কারদিগের বাক্য শিখিয়াছে। অতএব তাহা-রও কোন দোষ নাই, আমারও কোন গুণ নাই, সংসর্গ ই এই দোষ এবং গুণের কারণ-ভূত।"

আমাদের সংসর্গে আমাদের বংশধরগণ যাহাতে মুনিবৃত্তি প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা কি আমাদের করা কর্ত্তব্য নহে। সেই মুনি-বৃত্তিলাভ করিলেই তো তাহাই তাহাদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার কারণ জন্মাইতে পারিবে।

* * *

সংযম শিক্ষা।—স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আমাদের চেষ্টা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আমা-দিগকে সংযম শিক্ষা করিতে হইবে। সংযম শিক্ষা করিতে পারিলেই মনোবৃত্তির আবিলতা আমাদিগের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইতে পারিবে। সাংখ্য বল, পাতঞ্জল বল, বৈশে-ষিক দর্শনের কথাই উত্থাপন কর—এই সংযম শিক্ষা-দানই তো দর্শনশাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। দর্শনশাস্ত্র যোগ কি বুঝাইতে গিয়া প্রথমেই তো বলিয়াছেন, — "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" — অর্থাৎ "চিত্তের বৃত্তির নিরোধ করার নামই যোগ।" এই একটি মাত্র উপদেশ যদি আমরা মানিয়া চলি,—তাহা হইলে আর

কোন বিষয়েরই বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা থাকেনা, ই একই কথা গুরুমন্ত্রের মত মানিতে পারিলে তাহারই ফলে আমাদের দেশরক্ষা,—ধর্ম্মরক্ষা,—স্বাস্থ্যরক্ষা—সকলই রক্ষা হইতে পারিবে।

*   *   *

ব্রহ্মচর্য্যের অভাব।—আমরা সংযম ভুলিয়াছি, সদাচারভ্রষ্ট হইয়া অপকর্ম্মে রত হইয়াছি। আমাদের কুদৃষ্টান্তে আমাদের বংশধরগণ কুপথগামী হইতেছে। ফলে ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া দেশে যে সর্ব্বরোগের হস্ত হইতে অব্যাহত থাকিবার একটা উৎকৃষ্ট বিষয় ছিল, তাহার নাম দেশ হইতে লোপ পাইতে বসিয়াছে। চৌদ্দ-পনের বৎসরের বালকদিগের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলে দেখা যায়, তাহাদিগের গণ্ডদ্বয়ে ব্রণ সঞ্চার আরম্ভ হইয়াছে, চক্ষুদ্বয়ের নিম্নভাগে—কালিমা-রেখা দেখা দিয়াছে! এই অবস্থা হইলেই বালজীবনের ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ আরম্ভ হইয়াছে, সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। পিতামাতার এদিকে লক্ষ্য নাই,—বিদ্যাভ্যাসের জন্য তাড়না করিলেই তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য পালিত হইল বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। ফলে এমনই করিয়া বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব ক্রমে লুপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

*   *   *

বংশরক্ষার চিন্তা।—বাস্তবিক বালকবৃন্দকে এই ব্রহ্মচর্য্যার পদস্খলন হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমাদের উপায়-চিন্তন কর্ত্তব্য। বালকবৃন্দকে রক্ষা করিতে পারিলে তবে বাঙ্গালীর বংশরক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। "শৈশব-যৌবন দুঁহু মিলি গেল"—বালকদিগের যখন এই অবস্থা উপস্থিত হয়, তখনই তাহাদিগের কুসুম-কোমল-প্রাণে কাল-কীট দংশনের সূচনা আরম্ভ হয়। এই সময়ই তাহাদিগকে রক্ষা করিবার উপযুক্ত কাল। এ সময় যদি উপেক্ষার হাসি হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সারাজীবন চেষ্টা করিয়াও আর তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারা যায়না। কিশোর কাল অতিক্রম করিয়া যৌবনের সমস্ত বৃত্তি স্ফুরিত হইলে, তখন তো নাটকীয় নায়িকা লাভের ইচ্ছা তাহাদিগের যে বলবতী হইবে, ইহা স্বতঃ সিদ্ধকথা। সে অবস্থা উপস্থিত হইলে, তখন আর ঔষধে রোগ সারাইবার চেষ্টা না করিয়া বিবাহ দিলে কতকটা সুফল ফলিতে পারে। কিন্তু ঘুণ ধরা বাঁশের সহন-ক্ষমতা যেরূপ অল্প, কীটদষ্ট-যুবকমণ্ডলীর অবস্থাও তদ্রূপ। সেই জন্য ছেলে বিগড়াইতেছে জানিবা মাত্র পিতা মাতা যদি তাহাদিগের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রদান করেন, সেই সময় হইতে কাছে কাছে রাখিয়া যাহাতে তাহারা ব্রহ্মচর্য্যের অন্তরায় না ঘটাইতে পারে, সর্ব্ব কর্ম্ম ফেলিয়া তাহার জন্য চেষ্টাশীল হইতে পারেন, তাহা হইলে বালক রক্ষা—তথা বংশরক্ষার ব্যবস্থা সুগম হইতে পারে। দেশের বালকবৃন্দের পিতা-মাতাগণ এ সকল কথা চিন্তা করিবেন কি!

চিকিৎসা-তত্ত্ব।

——*——

(ভূমিকা অংশ)

বাড়ীর কোন ব্যক্তি পীড়াক্রান্ত হইলে রোগীর আত্মীয়-স্বজন অনেক সময় কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়েন। হয়ত একমাত্র উপার্জ্জন-ক্ষম কর্ত্তা, কি লক্ষ্মীস্বরূপিণী গৃহিণী, স্নেহের সহোদর, প্রাণাধিক পুত্রকন্যা যে কেহই হউক না,—রোগযন্ত্রণার কাতর হইলে বাড়ীর সকলেরই বিচলিত হইবার কথা। ইহার ফলে অনেক সময় চিকিৎসা-বিভ্রাট ঘটিয়া পীড়িতের যন্ত্রণা বৃদ্ধি ও বৃথা অর্থব্যয় হইয়া থাকে; এমন কি অনেক সময় রোগীর জীবন-সংশয়ও হইয়া পড়ে। সুতরাং যাহাতে চিকিৎসা-বিভ্রাট না ঘটে, তাহার জন্য পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত থাকা আবশ্যক।

কলিকাতার ন্যায় চিকিৎসক-বহুল-নগরীতে এইরূপ চিকিৎসা বিভ্রাট-ফলে যে বিষময় ফল আমার শ্রুতি গোচর হইয়াছিল, তাহা আমার মানস-পটে চিরাঙ্কিত রহিয়াছে। ঘটনাটি,—কলিকাতার কোন সম্ভ্রান্ত ধনীর একমাত্র পুত্র বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হন; রোগ প্রকাশ হইবা মাত্র বালকের পিতা অতিমাত্র কাতর হইয়া তাঁহার পারিবারিক চিকিৎসকের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন, এদিকে তাঁহার বাড়ী অপেক্ষাকৃত দূর বলিয়া নিকটস্থ অপর একজন চিকিৎসককে আহ্বান করিলেন। নবাগত চিকিৎসক রোগ-পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিলেন, ঔষধ আনা হইল, কিন্তু উহা সেবন করাইবার পূর্ব্বেই তাঁহার পারিবারিক ডাক্তার আসিলেন, তিনি ব্যাধি-পরীক্ষা করিয়া পূর্ব্বপ্রদত্ত ঔষধের পরিবর্ত্তন আবশ্যক বোধে নূতন ব্যবস্থা করিলেন। পুনরায় ঔষধ আনাইবার ব্যবস্থা হইল। এদিকে রোগীর পিতা ডাক্তার বাবুর নিকট পীড়ার জটিলতার বিষয় অবগত হইয়া, অপর একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার আনাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। পারিবারিক চিকিৎসকের ব্যবস্থামত ঔষধ সেবনের পূর্ব্বে পুনর্ব্বার নূতন ডাক্তার ও নূতন ব্যবস্থায় রোগীর ঔষধ সেবনের বিঘ্ন উপস্থিত হইল।

রোগীর মাতামহও কলিকাতার অপর একজন ধনবান ব্যক্তি। তিনি দৌহিত্রের কঠিন পীড়ার বিষয় জ্ঞাত হইয়া তাঁহার বিশ্বাসী একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন তৃতীয় বারের আনীত ঔষধ ব্যবহার না করাইয়া কোন্ মতে চিকিৎসা চলিবে পরামর্শ করিতে কিয়ৎক্ষণ অতীত হইল। এইরূপে চারিজন চিকিৎসক আসিলেন, অজস্র টাকা ব্যয় হইল, অথচ অচিকিৎসায় রোগ উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া যখন রোগীর অবস্থা নিতান্তই শঙ্কা জনক হইল, তখন যৎকিঞ্চিৎ হোমিওপ্যাথী ঔষধ রোগীর ভোগে আসিল। রোগীর উপস্থিত অবস্থা দেখিয়া ডাক্তার বাবু সেখানে অবস্থান করা সমিচীন বোধ করিলেননা। তিনি কয়েক মাত্রা ঔষধ ও সেবনের নিয়মাদি বলিয়া দিয়া যেমন থাকে—সংবাদ দিবার জন্য উপদেশ দিয়া বাড়ীর বাহির হইলেন; কিয়ৎক্ষণ পরেই ক্রন্দনের রোল উঠিল।

এই ঘটনায় বাহিরের লোকে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে,—"যা'র আয়ু নাই তা'কে কে বাঁচাবে বল। এত ডাক্তার এল, পয়সা-টাই কি কম খরচ হ'ল, চিকিৎসার ত্রুটী কিছুই হয়নি, দিন ফুরাইয়াছে, চলে গেল" ইত্যাদি। সত্য,—ডাক্তার বা ব্যবস্থা-পত্রের ত্রুটী কিছু না থাকিতে পারে, কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের কাতরতায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় পিতা-মাতার বুদ্ধির দোষে এক প্রকার বিনা ঔষধেই বালকের মৃত্যু হইল। ইহা অপেক্ষা মর্ম্মান্তিক ঘটনা আর কি হইতে পারে? অনেক সময় মেহ, উপদংশ প্রভৃতি লজ্জাকর কুৎসিত পীড়াক্রান্ত হইয়া অনেকে আত্মীয়-স্বজনের নিকট গোপন করিতে গিয়া চিকিৎসা-বিভ্রাটে নিজে চিরদিন জীবন্মৃত হইয়া থাকেন, এবং ভবিষ্যৎ সন্তানগণেরও জীবন দুর্ব্বিসহ এবং বিষময় করিয়া রাখেন।

এই সমুদয় বিপত্তি হইতে উদ্ধারের উপায় পূর্ব্ব হইতে সাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া চিকিৎসক মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা। যখন প্রিয় পরিজন রোগ-যন্ত্রণায় কাতর হইয়া বাড়ীর সকলকেই কাতর করিয়াছেন,—মানবের সেই সর্ব্বাপেক্ষা বিপত্তির কালে এ সকল তত্ত্ব অবগতি থাকিলে সদ্বন্ধু ও সুচিকিৎসকের উপদেশ পাইবেন।

ব্যাধি প্রতিকারের সময়।—চরকাদি আয়ুর্ব্বেদ তন্ত্র ঋষি প্রণীত। প্রাচীন ঋষিগণ নির্লোভ, জিতেন্দ্রিয়, সত্যপ্রিয় ও পরোপকার-পরায়ণ ছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের বাক্যে কোন প্রকার স্বার্থপরতার বিষয় নিহিত আছে, ইহা কাহারও মনে উদয় হওয়া সম্ভবপর নহে। আমার এ প্রবন্ধ তাঁহাদেরই আদর্শ উপদেশের মর্ম্ম লইয়া লিখিত।

চরকসংহিতায় একস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে,—বুদ্ধিমান ব্যক্তি বাহ্য অথবা অভ্যন্তরস্থ রোগ উৎপন্ন হইবামাত্র তাহার প্রতিকারে যত্নশীল হইবেন। নির্ব্বোধ ব্যক্তি-রাই অজ্ঞানতা অথবা অনবধানতা বশতঃ রোগের প্রথমোৎপত্তিকালে তাহাকে শত্রু বলিয়া বুঝিতে পারেনা। ব্যাধি সমূহ প্রথমে অল্পভাবে উৎপন্ন হইয়া, ক্রমশঃ, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও জাতমূল হইয়া নির্ব্বোধ ব্যক্তির বল ও আয়ুনাশ করে। মূঢ় ব্যক্তিগণ অতি পীড়িত না হইলে তাহার প্রতিকারে যত্নশীল হয়না, আর অতি পীড়িত হইলে তখন ব্যাধি নিগ্রহে যত্নশীল হইয়া,—

"অথ পুত্রাংশ্চ দারাংশ্চ জ্ঞাতীশ্চাহূয় ভাষতে
সর্ব্বস্বেনাপি মে কশ্চিদ্ ভিষগানীয়তামিতি॥"

অর্থাৎ পুত্র, পরিবার, আত্মীয়বর্গকে ডাকিয়া বলে,—"আমার সর্ব্বস্ব দিয়াও কোন একজন চিকিৎসক আনিয়া দাও।" কিন্তু ঐ প্রকার ব্যাধি-পীড়িত, দুর্ব্বল, কৃশ, ক্ষীণেন্দ্রিয়, ক্লান্তচিত্ত-মুমূর্ষুকে কোন্ চিকিৎসক রোগ মুক্ত করিতে সমর্থ হইবেন! এই কারণে জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী মহর্ষিগণ। বলিয়াছেন—

তস্মাৎ প্রাগেব রোগেভ্যো রোগেষু তরুণেষু বা
ভেষজৈঃ প্রতিকুর্ব্বীত য ইচ্ছেৎ সুখমাত্মনঃ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপনার সুখ অর্থাৎ স্বাস্থ্য লাভে ইচ্ছুক, তিনি রোগের পূর্ব্বাবস্থায় অথবা তরুণাবস্থায় ঔষধের সাহায্যে প্রতি-কার-পরায়ণ হইবেন।

তরুণাবস্থায় চিকিৎসিত হইলে যে সহজে আরোগ্যলাভ ঘটিয়া থাকে তাহা নহে, যুক্তযুক্ত

অম্লতা এবং অর্থের সাশ্রয়ও ইহার ফলে হইয়া থাকে। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি—ব্যাধি অল্প হইলেও অবহেলা না করিয়া সত্বর প্রতিকারে যত্নশীল হইবেন।

ঔষধ।—যে সমুদয় ঔষধ আমাদের উপস্থিত ব্যাধি নষ্ট করিতে পারে, অথচ ভবিষ্যৎ ব্যাধির কারণ হয় না, সেই ঔষধই আমাদের হিতকর।

বয়স, প্রকৃতি, ঋতু, দেশ, স্ত্রী, পুরুষ প্রভৃতি ভেদে আমাদের যেরূপ অন্ন-বস্ত্রাদির পার্থক্য রক্ষার আবশ্যক হইয়া থাকে, ঔষধ সম্বন্ধেও সেই প্রকার পার্থক্য-রক্ষার আবশ্যক হইয়া থাকে। এইজন্যই শিশু, বৃদ্ধ, গর্ভিণী, যুবক ভেদে, শীতোষ্ণাদি কালভেদে, আর্দ্র-শুষ্কাদি দেশভেদে, ঔষধের পৃথক পৃথক প্রয়োগ-ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এদেশবাসীর সম্পূর্ণ অনুপযোগী শীতপ্রধান দেশীয় ঔষধ সকল বিনা বিচারে সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইতেছে। এই জাতীয় ঔষধ কোন কোন ক্ষেত্রে উপস্থিত কার্য্যকরী হইলেও ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যের উপযোগী কিনা তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা সকলেরই কর্ত্তব্য।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের জল-বায়ু প্রভৃতি হইতে খাদ্যাদির গুণান্তর হইয়া মানবের বল, বর্ণ, আকৃতি, প্রকৃতির কত তারতম্য হইয়া থাকে, ইহা আমরা সর্ব্বদা দেখিবার সুযোগ পাই। এক ভারতবর্ষের মধ্যেই জল-বায়ুর বিভিন্নতা বশতঃ বহু বিভিন্ন প্রকৃতি, বল, বর্ণাদি যুক্ত মানব দেখিতে পাওয়া যায়।

খাদ্য হইতে যখন এইপ্রকার বিচিত্র পার্থক্য সম্পাদিত হয়, তখন শক্তিশালী ঔষধ হইতে যে আরও অধিক পরিমাণে ভিন্ন ফল ফলিবার সম্ভাবনা, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই ফল বিভিন্নতা জন্যই আয়ুর্ব্বেদের ঔষধগুলি ভারতের সর্ব্বত্র সমান ফলদায়ক হয় না। যে ঔষধ এক প্রদেশের অত্যন্ত হিতকর, তাহাই আবার অন্য প্রদেশের পক্ষে সেরূপ কার্য্যকর হয় না। এইজন্যই আয়ুর্ব্বেদের অগণ্য শক্তিশালী ঔষধের মধ্যে স্থান-বিশেষের হিতকর ঔষধগুলি বিশেষ ভাবে সেই সেই প্রদেশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক ভারতবর্ষের মধ্যেই যখন এই প্রকার বিভিন্ন ভাব উপস্থিত হয়, তখন সম্পূর্ণ বিভিন্ন জল-বায়ু সম্পন্ন বিদেশীয় ঔষধগুলি আমাদের স্বাস্থ্যের কিরূপ বিরোধী, তাহা সহজেই অনুমেয়। ইহা যে শুধু আমাদেরই অনুমানের কথা তাহা নহে, ইহা সত্যানুসন্ধি ঋষিগণের পরীক্ষিত সত্য; তাই তাঁহারা বলিয়াছেন,—

"যস্য দেশস্য যো জন্তু তজ্জন্তস্যৌষধং হিতং।"

অর্থাৎ যে দেশের যে প্রাণী, তাহার পক্ষে সেই দেশের ঔষধই হিতকর।

পথ্য।—বিদেশীয় চিকিৎসায় যে কেবল ঔষধই বিরুদ্ধ হয়, তাহা নহে, অনেক ক্ষেত্রে পথ্যও বিরুদ্ধ হইয়া থাকে। অথচ এই পথ্য অর্থাৎ হিতকর আহার-বিহার সুস্থ-রোগী কাহারও উপেক্ষার বস্তু নহে। প্রথম যে ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহা কেবল স্বাস্থ্য-বিরুদ্ধ পথ্য অর্থাৎ অহিত আহার-বিহার উপভোগ জন্য। যদি পীড়িত অবস্থাতেও পুনরায় বিরুদ্ধ আহার-বিহার হয়, তবে তাহা আরও বিষময় হইবে। অল্প ব্যাধি অনেক সময় পথ্য বা হিতকর আহার-বিহার সাহায্যে দূরীভূত হয়, কিন্তু বিরুদ্ধ পথ্যসেবী শত শত ঔষধেও আরোগ্য লাভ করিতে

পারেনা। তাই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ দেশ, কাল, রোগ, বয়স প্রভৃতি ভেদে পীড়িতের আহার-বিহারের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কিন্তু বিদেশীয় চিকিৎসায় উষ্ণ প্রধান দেশের একান্ত উপযোগী ডাবের জলের পরিবর্ত্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'সোডা' পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়। স্বাস্থ্য ও দেশোপযোগী যবমণ্ড পথ্য হয় না, কৌটায় ভরা বিলাতী বার্লি (যব চূর্ণ) পথ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। বিশুদ্ধ সদ্যঃপ্রাপ্ত দুগ্ধের পরিবর্ত্তে দেশান্তর হইতে আনীত সমধিক বায় সাপেক্ষ জমাট দুগ্ধ পথ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। চিরদিনের অভ্যস্ত দেশ-হিতকর পথ্যের পরিবর্ত্তে আমাদের অনভ্যস্ত ও অনুপযোগী খাদ্যগুলি কি সর্ব্বিক ফলপ্রদ হইতে পারে? দুঃখের বিষয় সুস্থ—পীড়িত—সকলেই এক্ষণে বিদেশীয় আহার আচারের অনুষ্ঠানে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু তাহাতে দেশের স্বাস্থ্য বৃদ্ধি হইতেছে কোথায়? এই প্রকার অনুপযোগী আহার আচারে আমাদের উপকার ত হইতেই পারে না, বরং অনিষ্টই হইতেছে। পথ্য সম্বন্ধে উদাসীনতা অবলম্বন বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে কখনই উচিত নহে। কারণ,—

"বিনাপি ভৈষজৈর্ব্যাধিঃ পথ্যাদেব নিবর্ত্ততে।
নতু পথ্য বিহীনস্য ভেষজানাং শতৈরপি॥"

ঔষধ-পথ্য সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য।—বিদেশীয় ঔষধ ও পথ্যের অপকারিতা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহাতে বিদেশী-ঔষধ-প্রিয় ব্যক্তিবর্গ মনে করিতে পারেন—যে, আমি সাধারণের হিতের পরিবর্ত্তে এ ক্ষেত্রে দেশীয় ঔষধ প্রচারের চেষ্টাই করিতেছি। সে জন্য এ সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিত বলিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। অনেকে বলেন, তরুণক্ষেত্রে ডাক্তারী ঔষধে শীঘ্র উপকার পাওয়া যায় এবং পুরাতন ও জটিল রোগেই কবিরাজী ঔষধ বেশী কার্য্যকরী হয়। কিন্তু পরীক্ষা করিলে একথার কোনও সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়না। অতিসার, পাণ্ডু, গুল্ম, মূত্রাশয়পীড়া, মেহ, কাস, হৃদ্‌রোগ, আমবাত, বাতরক্ত, অম্লপিত্ত, বাধক, মৃতবৎসা প্রভৃতি কোন পীড়াতেই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার ন্যায় জগতের কোন চিকিৎসায় সত্বর ও সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভের শক্তি নাই। হইতে পারে, একটি পুরাতন গ্রহণী, বাধক বা কাসের পীড়ার চিকিৎসা করাইতে হইলে একমাস বা ততোধিক কাল কবিরাজী ঔষধ সেবন করিতে হয়, কিন্তু অন্য যে কোন মতের চিকিৎসায় উক্ত কালের মধ্যে আরোগ্য করিবার ক্ষমতা দূরে থাক, বিশেষ উপকার পর্য্যন্ত হইবেনা—ইহা সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়। এক মাত্র নবজ্বরের চিকিৎসায় কুইনাইন প্রয়োগে ডাক্তারি মতে শীঘ্র জ্বর রোধ হয়, কিন্তু প্রকৃত আরোগ্য সম্পাদন হয় না। কুইনাইন অপেক্ষা তীব্র ও অল্প সময়ে জ্বররোধকারক ঔষধ আয়ুর্ব্বেদে অভাব নাই, কিন্তু দোষ পরিপাক না করিয়া আয়ুর্ব্বেদ মতে জ্বর-রোধের চেষ্টা বিশেষভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। দেশীয় চিকিৎসায় জ্বর বন্ধের চেষ্টা না করিয়া প্রথম হইতে দোষ হানিরই চেষ্টা করা হয়, ডাক্তারি মতে প্রথম হইতে জ্বর বন্ধের চেষ্টা করা হয়। এই চেষ্টার ফলেই দেশে লোকের প্রধান ব্যাধিই

এখন দাড়াইয়াছে—একমাত্র জ্বর। যদি ডাক্তারি চিকিৎসা আমাদের উপযোগী হইত, কুইনাইনের প্রকৃত জ্বরারোগ্য শক্তি থাকিত, তবে পুনঃ পুনঃ একই ব্যক্তির জ্বর হইবার কারণ ছিল না। যাঁহারা ৭।৮ দিন ধৈর্য্য রাখিয়া দেশীয় ঔষধে দোষের পরিপাকের পর আরোগ্যলাভ করেন, তাঁহাদের এইপ্রকার পুনঃ পুনঃ জ্বর হইতে দেখা যায়না। আয়ুর্ব্বেদে বিশেষভাবে উল্লেখ হইয়াছে যে, লালাস্রাব বমনভাব, হৃদয়ে অশুদ্ধি, অরুচি, তন্দ্রা, আলস্য, অপরিপাক, মুখের বিরসতা, গাত্রের গুরুতা, ক্ষুধার অভাব, মূত্রের আধিক্য স্তব্ধতা এবং জ্বরের প্রাবল্য—এইগুলি আম-জ্বরের চিহ্ন। এই চিহ্ন যে কাল পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যাইবে, সেকাল পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে—জ্বরারম্ভক দোষের পরিপাক হয় নাই এই সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান থাকিতে জ্বররোধক ঔষধ প্রয়োগ আয়ুর্ব্বেদ মতে বিশেষভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে, এসময়ে মুখ্য অর্থাৎ জ্বর শান্তিকারক ঔষধ প্রয়োগ করিলে, পুনর্ব্বার জ্বর বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু ডাক্তারি চিকিৎসায় এই সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান সত্ত্বেও জ্বর কম দেখিলেই কুইনাইন-সাহায্যে রোধ করিতে দেখা যায়। আয়ুর্ব্বেদ মতে অন্নলিপ্সা জ্বর মুক্তির একটি বিশেষ লক্ষণ। যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ মতে দোষের হানি করিয়া আরোগ্যলাভ করেন, তাঁহাদের জ্বরমুক্তির পর ক্ষুধা এবং খাইবার ইচ্ছা বেশ প্রবল হয়, কিন্তু কুইনাইনে যাঁহাদের জ্বররোধ হয়, তাঁহারা বহুদিন পর্য্যন্ত অরুচি ও অক্ষুধার কথা বলিয়া থাকেন। সুতরাং এপ্রকার আরোগ্যে আমাদের সার্থকতা কি থাকিতে পারে? কুইনাইন সাহায্যে জ্বর রোধ করা ভিন্ন যখন কোন ব্যাধিতেই দেশীয় চিকিৎসার ন্যায় নির্দ্দোষ ও সত্বর আরোগ্য অন্য কোন চিকিৎসায় দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং একমাত্র এই চিকিৎসার অবলম্বনেই যখন প্রাচীন ভারতবাসিগণ বর্ত্তমানকাল অপেক্ষা নির্দ্দোষ আরোগ্য ও অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্যলাভ করিয়া দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন কোন্ গুণে আমরা ঘরের অর্থ বিদেশে পাঠাইয়া সম্পূর্ণ বিজাতীয় চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করি, তাহা ভাবিবার সময় আসে নাই কি? আর যে কুইনাইনের জন্য আজ বিদেশীয় চিকিৎসার এত আদর, তাহা আমাদের কিরূপ উপযোগী তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিয়া আমার এসম্বন্ধে বক্তব্য শেষ করিব। ইহা আমাদের কথা নহে, বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য বিবরণীতেই প্রকাশ,—

"The Governor in council is also disappointed to find that despita the employment of Sub-Assistant Surgeons in the distribution of quinine in the District of Nadia and Murshidavad there has been no diminution in fever mortality but the reverse."

The Government Resolution on the Sanitary Reports for the year 1912.

ইহার মর্ম্ম,—নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় ম্যালেরিয়া জ্বরে মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় কুইনাইন বিতরণের জন্য ডাক্তার নিযুক্ত করিয়া কোন ফল পাওয়া যায় নাই, উপরন্তু মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

কবিরাজ শ্রীজীবনকালী রায়
বৈদ্যরত্ন।

সদ্বৃত্ত।

প্রথমাধ্যায়।

"শরীরেন্দ্রিয়সত্ত্বাত্মসংযোগবৎ-পুরুষ" অর্থাৎ জীবন্ত মানুষ নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেনা,—হয় কিছু করে, নয় কিছু বলে অথবা কিছু ভাবে। সকলকেই কায়বাঙ্মানস-ব্যাপারে ব্যাপৃত রহিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়। কায়বাঙ্মনসী চেষ্টা সাধু হইলে, নিয়মিত কাল সুখায়ুঃ উপভোগ করিয়া অক্লেশে জীর্ণ-শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সদ্‌গতি লাভ করা যায়; অসাধু হইলে দুঃখায়ুঃ উপভোগ করিতে হয়, অকাল মৃত্যুর পরও দুঃখ ভোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায় না। সুখে সুদীর্ঘকাল সুখায়ুঃ উপভোগ করিতে হইলে পরম সাবধানে অসদাচরণ পরিত্যাগ করিয়া পরম যত্নে সদ্বৃত্তি পরায়ণ হওয়া উচিত। সদ্বৃত্তি পরায়ণ হইতে হইলে আদৌ সুশিক্ষা লাভ করিয়া, শিক্ষানুরূপ কর্ম্মাভ্যাস করিতে হয়। যে শিক্ষার গুণে ইহকালে আত্ম-হিতে রত রহিয়া পরহিত পরায়ণ হইয়া এবং জীবন-যাত্রার উপযোগী উপকরণ উপার্জ্জনে সামর্থ্য লাভ করিয়া, স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করা যায়, পরন্তু পরকালে সদ্‌গতি লাভ ঘটে,—তাহার নাম সুশিক্ষা। সুশিক্ষিত, সৎকর্ম্মে অভ্যস্ত এবং আরিষ্ঠ পুরুষেরা যেরূপ আচরণ করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাহার নাম সদ্বৃত্ত।*

এই প্রবন্ধে আমরা নানা শাস্ত্র হইতে কায়বাঙ্মানস সদ্বৃত্ত সঙ্কলন করিয়া, সেই সমস্তের বিশদ ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইব। প্রথমতঃ শারীর সদ্বৃত্ত বলা যাইতেছে।

শারীর সদ্বৃত্ত।—বিধি বিহিত আহার, ব্যায়াম, ব্যবায়, নিদ্রা স্নানাদি, শৌচকর্ম্ম এবং অপরাপর বিধি বিহিত শারীরিক কর্ম্মকে শারীর-সদ্বৃত্ত বলে। শরীর পরিচালন করিয়া, এই সকল সদাচার সম্পাদন করিতে হয়, এইজন্য এই সমস্ত সদ্বৃত্তের সাধারণ নাম শারীর-সদ্বৃত্ত। তন্মধ্যে আহার শরীর ধারণের মূল। তজ্জন্য শারীর-সদ্বৃত্ত-নিচয়ের মধ্যে আহার অগ্রগণ্য। এই নিমিত্ত অগ্রে আহার বিধি বলা যাইতেছে।

আহার—আহার প্রবিচার।—ঋষি বলিয়াছেন—"ইষ্টবর্ণ রস-গন্ধ-স্পর্শং বিধি বিহিতমন্ন পানং প্রাণিনাং প্রাণসংজ্ঞ-কানাং প্রাণ মাচক্ষতে কুশলাঃ। প্রত্যক্ষফলদর্শনাৎ। তদিন্ধনাৎ হ্যন্তরগ্নেঃ স্থিতিঃ। তৎসত্ত্বমূর্জ্জয়তি, তচ্ছরীর ধাতুব্যূহ বল বর্ণেন্দ্রিয় প্রসাদ করং যথোক্ত মুপমেত্যমানং।"

ইহার ভাবার্থ এইরূপ;—যে সমস্ত বিধি বিহিত অন্ন-পানের বর্ণ মনোজ্ঞ, গন্ধ মনোরম, রস অভীপ্সিত এবং স্পর্শ প্রীতিকর, চিকিৎসা-কুশল পণ্ডিতগণ বলেন, প্রত্যক্ষ ফল-দর্শন হেতু, সেই সকল অন্ন পান, মনুষ্যের এবং অপর প্রাণিগণের প্রাণ স্বরূপ। তথাবিধ অন্নপান ইন্ধন (জ্বাল দিবার কাষ্ঠ) স্বরূপ। সেই

---

* সদ্ভিরিন্দ্রিয়-পঞ্চকেন মনসা বাচা কায়েন প্রত্যহংস্মিন্ কর্ম্মনীতি তৎ সদ্বৃত্তং। জলকল্পতরুঃ।

ইন্ধন-যোগে অন্তরগ্নি সুস্থিত থাকে। যাবতীয় অন্ন পান যথা বিধানে নিষেবিত হইলে, জীবের সত্ত্ব সম্বর্দ্ধিত হয় এবং শরীরের রসাদি ধাতু সমূহ, বল, বর্ণ ও ইন্দ্রিয় সকল সুপ্রসন্ন হইয়া উঠে।

"প্রাণাঃ প্রাণভৃতামন্নং তদযুক্ত্যা হিনস্ত্যসূন্।" অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত অন্ন প্রাণিগণের প্রাণ স্বরূপ। বিধি গ্রাহ্য না করিয়া, যথেচ্ছ আহারে প্রবৃত্ত রহিলে, নানা রোগ-ভোগ করিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। তজ্জন্য সকলকেই সর্ব্বাগ্রে আহার-নির্ব্বাচনে মনোনিবেশ করিয়া, আহার-বিধি-পালন করা উচিত। নিম্নে প্রয়োজনীয় আহার-বিধি সকল উদ্ধৃত হইল।

১। হিতাশী স্যাৎ। যদাহার জাত মগ্নিবেশ। সমাংশ্চৈব শরীর ধাতূন্ প্রকৃতৌ স্থাপয়তি, বিষমাংশ্চ সমীকরোতি তদ্হিতং বিদ্ধি তদ্বিপরীতন্ত্বহিতং।

হিতাহার পরায়ণ হইবে। হে অগ্নিবেশ! যে সমস্ত আহার, রস-রক্তাদি ধাতুগণের সমতা রক্ষা করে অর্থাৎ স্বস্থানেস্বমনে এবং স্বভাবে রাখে, কোন ধাতুর বৈষম্য ঘটিলে সমতা বিধান করে, তাহাকে হিতাহার বলিয়া জানিও।

সকল নর-নারীর প্রকৃতি একরূপ হয় না। কেহ বাত প্রকৃতি, কেহ পিত্ত প্রকৃতি, কেহ শ্লেষ্ম প্রকৃতি, কেহ কেহ বা মিশ্র প্রকৃতি। তজ্জন্য সকলের পক্ষে একই প্রকার আহার হিতকর হয়না। যাহার যেরূপ প্রকৃতি, তদ্বিপরীত গুণসম্পন্ন আহারই তাহার পক্ষে হিতাহার। যেমন পিত্ত প্রকৃতি পুরুষের পক্ষে পিত্তঘ্ন আহারই হিতাহার।

সকল ঋতুতে একই প্রকার আহার হিতকর হয় না। ঋতু-গুণ-বিপরীত-গুণ বিশিষ্ট আহারই হিত সাধন করে। যেমন বসন্ত ঋতুতে কফঘ্ন আহার, শরৎকালে পিত্তনাশক খাদ্য, বর্ষা ঋতুতে বায়ু-প্রশমন অন্ন-পানীয় ঋতুজন্য দোষ প্রশমন করিয়া স্বচ্ছন্দে শরীরের পুষ্টি সাধন করে।

দেশভেদে আহার্য্য দ্রব্য হিত সাধন করে। যে খাদ্য একদেশীয় লোকের পক্ষে হিতকর, হয় ত সেই দ্রব্য অন্য দেশীয় লোকে আহার করিলে বিসদৃশ ফল লাভ করে।

বয়ঃক্রম ভেদেও আহার্য্য দ্রব্যে ভেদ এবং পরিমাণ কল্পনা করিতে হয়। এই সকল বিবেচনা করিয়া প্রকৃতিসাত্ম্য, ঋতুসাত্ম্য, দেশসাত্ম্য, বয়ঃসাত্ম্য এবং অভ্যাসসাত্ম্য আহার করা উচিত। এই অনুচিত কার্য্যে উদাসীন হইলে আহার-দোষ জন্য ক্লেশভোগ করিতে হয়।

২। মাত্রাশী স্যাৎ। পরিমিত আহার গ্রহণ করিবে।

কথিত আছে—"আহার মাত্রা পুনরগ্নিবলাপেক্ষিণী। যাবদ্‌ধ্যশ্যাশনমশিতমনুপহত্য প্রকৃতিং যথা কালং জরাং গচ্ছতি তাবদস্য মাত্রা প্রমাণং বেদিতব্যন্তবতি।"

ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—সকলের পরিপাক শক্তি একরূপ নহে। কেহ বা সমাগ্নি, তজ্জন্য উপযুক্ত পরিমিতাহার সুখে জীর্ণ করিতে পারে। কোন কোন ব্যক্তি মন্দাগ্নি, তজ্জন্য তাহার পরিপাক শক্তিও দুর্ব্বল। কেহ বা তীক্ষ্ণাগ্নি, যা খায় তাহা সহসা জীর্ণ করিয়া ফেলে অথচ পুষ্টি তুষ্টি লাভ করে না। কেহ কেহ বিষমাগ্নি, কখন তাহার জঠরে খাদ্য দ্রব্য অনায়াসে পরিপাক পায়, কখনও বা সম্যক্ পরিপাক পায় না। তজ্জন্য ঋষি

বলিয়াছেন,—"আহার মাত্রাগ্নিবলাপেক্ষিণী।" আহার যে পরিমিত আহারে শারীর ভাবের কোন ব্যতিক্রম ঘটেনা, অথচ যথাকালে জীর্ণ হইয়া যায়, সেই পরিমিত আহারই তাহার পক্ষে উচিত মাত্রাহার। আপনার পরিপাক শক্তির বলাবল বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় হিতাহার সেবন করা উচিত।

অতিমাত্রাহার অহিতকর। হীনমাত্র আহারও অনিষ্ট সাধন করে। অল্পাহারে শরীরের ধাতু সকল সম্যক্ পুষ্টি লাভ করিতে পারেনা। তন্নিবন্ধন শরীর দুর্ব্বল হইতে থাকে। দুর্ব্বল শরীরে ক্রমশঃ নানা প্রকার রোগ দেখা দিতে থাকে। তজ্জন্য—"মাত্রাশী-স্যাৎ" এই বিধি সর্ব্বতোভাবে পরিপালন করা উচিত।

৩। কালভোজীস্যাৎ। যথাকালে ভোজন করিবে, কদাচ অসময়ে আহার করিবে না।

কথিত আছে—"যামমধ্যে ন ভোক্তব্যং যামযুগ্মং ন লঙ্ঘয়েৎ।" অর্থাৎ এক প্রহর বেলা না হইলে আহার করিবেনা; দুই প্রহরের মধ্যেই ভোজন করা কর্ত্তব্য। রাত্রিকালেও এক প্রহরের পর দুই প্রহরের পূর্ব্বেই আহার করা উচিত। অধুনা নানা কারণে এই উচিত কাজের বিঘ্ন ঘটিতেছে। বাধ্য হইয়া বহু লোককে অসময়ে আহার করিতে হয়। পূর্ব্বে এদেশে প্রাতঃকালে ও বৈকালে কাজের সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। দেশের উপযোগী প্রথাই ছিল। শিক্ষার্থী পূর্ব্বাহ্নে এবং অপরাহ্নে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন; রাজকার্য্যালয়েও দু'বেলা কাজ করিবার সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল; শ্রমজীবীরাও দু'বেলা কাজ করিত। অধুনা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং আর আর কাজের সময় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অনেক স্থলে শ্রমজীবীরাও দু'বেলা কাজ না করিয়া, পূর্ব্বাহ্ন ১০টা হইতে অপরাহ্ন ৫টা পর্য্যন্ত কাজ করে। এই নিয়মে বাধ্য হইয়া কাজের লোকদিগকে অসময়ে আহার করিতে হয়। বিশেষতঃ রেল-ষ্টিমারযোগে প্রতিদিন আবাস ক্ষেত্র হইতে কর্ম্মক্ষেত্রে যাইয়া যাঁহাদিগকে কাজ করিতে হয়, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ অতি প্রত্যূষে কেহ কেহ বা ৭টা ৮টার মধ্যে আহার করেন। আহার-বিধি-লঙ্ঘনের ফলও হাতে হাতে ফলিতেছে। অজীর্ণ, অম্লাজীর্ণ এবং গ্রহণী প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া বহুলোক যৌবনে জরাগ্রস্ত হইতেছেন, অনেকে অকালে কালকবলে পতিত হইতেছেন। নিদান পরিবর্জ্জন না করিলে আরোগ্যের আশা করা যাইতে পারা যায়না; কাজের দায়ে সকলে তাহা পারেননা। তজ্জন্য বিশিষ্ট চিকিৎসাও তত্তদ্ রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা দুর্ঘট হইয়া উঠে।

৪র্থ। জীর্ণে হিতং মিতং চাদ্যাৎ। অর্থাৎ পূর্ব্বভুক্ত অন্ন-পানীয় সুজীর্ণ হইলে হিত এবং পরিমিত আহার করিবে।

"অজীর্ণে ভোজনং বিষং।" কথাটা অতি প্রসিদ্ধ। প্রায় সকলেই জানেন, অজীর্ণে ভোজন করা বিষপানের তুল্য অনর্থকর। বিধি জানিয়া পালন না করা অনর্থের হেতু। অনেকেই অজীর্ণে ভোজন করিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া থাকেন দেখিতে পাই। অজীর্ণে ভোজন বহুরোগের কারণ। তজ্জন্য আহার্য্য জীর্ণের লক্ষণ উপলব্ধি না করিয়া কদাচ ভোজন করিবেনা।

উদ্‌গার শুদ্ধিকৎসাহো বেগোৎসর্গ যথোচিতঃ। লঘুতা ক্ষুৎ পিপাসেচ জীর্ণাহারস্য লক্ষণং।” যে সময়ে উদ্‌গত উদ্‌গারের গুরুত্ব থাকেনা, নির্গত উদ্গারে কোন প্রকার গন্ধ অনুভূত না হয়, সঞ্চিত মল-মূত্র নিঃশেষে আপন পথে নিঃসৃত হইয়া যায়, শরীর বেশ হাল্‌কা বোধ হয় এবং ক্ষুধা তৃষ্ণা উপস্থিত হয়; তখন বুঝিবে যে, আহার সুজীর্ণ হইয়াছে। জীর্ণাহারের লক্ষণ বুঝিলে, ভোজন করা উচিত।

আমরা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের কোন কোন স্থানে, অজীর্ণে ভোজন এবং অধ্যশন এই দুইটি কথার একত্র সমাবেশ দেখিতে পাই অধ্যশন শব্দের অর্থ পূর্ব্বদিনের আহারাজীর্ণে ভোজন। ৪ সংখ্যক নিষেধ বিধির অর্থ অধ্যশন করিবে না। যে স্থানে দুইটী কথার একত্র সমাবেশ থাকে, সেখানে অজীর্ণে ভোজনের অর্থ স্বতন্ত্র। তথায় অজীর্ণ শব্দের অর্থ পরিপাক যন্ত্রের কোন না কোন নির্ম্মাণ বা ক্রিয়া বিকার ঘটিত ব্যাধি বিশেষ। তাদৃশ অজীর্ণে চিকিৎসকের উপদেশ লইয়া আহার গ্রহণ করিতে হয়।

৫ম। উষ্ণমশ্নীয়াৎ। সুখোষ্ণ অন্ন ভোজন করিবে।

শূকধান্য এবং শমীধান্য জাত চা'ল, ডা'ল এবং নানা প্রকার কন্দ, মূল ফল, শাক, মাছ, মাংস প্রভৃতি আহরণ করিয়া আমরা খাদ্যোপযোগী অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করি। জল ও অনল যোগে অন্ন এবং উপযুক্ত পরিমিত তৈল, ঘৃত, লবণ আর নানা প্রকার মসল্লা মিশাইয়া ব্যঞ্জন সংস্কার করিতে হয়। অন্ন-ব্যঞ্জনার্থ গৃহীত দ্রব্যে যে কোন প্রকার শরীরের অনিষ্টকর জীবাণু অথবা অন্য কোন প্রকার অপদার্থের যোগ থাকে, বিধি বিহিত সংস্কার দ্বারা তাহা নষ্ট হইয়া যায়। যতক্ষণ উষ্ণ থাকে, ততক্ষণ তাহা নিঃশঙ্কচিত্তে আহার করা যাইতে পারে। জুড়াইয়া গেলে মক্ষিকা-সর্পণাদি দোষ-দুষ্ট হইতে পারে, পরন্তু দুর্জ্জর হইয়া উঠে। তজ্জন্যই সুখোষ্ণ অন্নব্যঞ্জন ভোজন করা উচিত। পরন্তু উষ্ণ অন্ন তৃপ্তিকর, অগ্নিবলবর্দ্ধক, সুখপাচ্য, বায়ুর অনুলোমন এবং কফনাশক। কিন্তু অত্যুষ্ণ অন্ন-ভোজন করা উচিত নহে। কথিত আছে;—অত্যুষ্ণান্নং বলংহন্তি শীতশুষ্কঞ্চ দুর্জ্জরং। অতি ক্লিন্ন গ্লানি করং যুক্তিযুক্তং হি ভোজনং।

৬। স্নিগ্ধমশ্নীয়াৎ। স্নিগ্ধ অন্ন-পানীয় নিষেবন করিবে।

ঘৃত, তৈল, বসা এবং মজ্জা—এই চারি দ্রব্যের সাধারণ নাম স্নেহ। স্নেহযুক্ত ভক্ষ্যের নাম স্নিগ্ধাহার। শীতগুণযুক্ত দ্রব্যকেও স্নিগ্ধদ্রব্য বলে। মৎস্য, মাংস, বাদাম, পেস্তা এবং নারিকেল প্রভৃতি অনেক প্রকার দ্রব্য স্বভাবতঃ স্নিগ্ধ। দধি, দুগ্ধও স্নেহবদ্ দ্রব্য। সুশীতল পানীয় প্রভৃতিও স্নিগ্ধ দ্রব্যের মধ্যে পরিগণিত। যে সকল আহার্য্য দ্রব্য গুণবৎ অথচ পরিপাকের উপযোগী স্নেহ বিদ্যমান থাকে, সেই সকল আহার্য্য গ্রহণ করা উচিত। আবশ্যক হইলে ঘৃত, তৈল এবং মাখন যোগে রুক্ষান্নকে স্নিগ্ধ করিয়া লইয়া খাইতে হয়। সমস্ত পুরুষই স্নেহসাত্ম্য। তজ্জন্য স্নিগ্ধাহার সকলের পক্ষে হিতকর।

স্নিগ্ধাহার সুস্বাদু; স্নিগ্ধাহার উপযুক্ত মাত্রায় ভক্ষণ করিলে ঔদর্য্যাগ্নি সন্ধুক্ষিত হয়, মেদোমাংস মজ্জধাতু পরিপুষ্ট হয়, শরীরের বর্ণ উজ্জ্বল হয় এবং মস্তিষ্ক পুষ্ট হয় ও সুস্থির থাকে।

৭। বীর্য্যাবিরুদ্ধ মশ্নীয়াৎ। অবিরুদ্ধ বীর্য্য আহার করিবে।

বীর্য্য দ্রব্যনিষ্ঠ ধর্ম্ম বিশেষ। "যেন কুর্ব্বন্তি তদ্বীর্য্যং।" অর্থাৎ যাহার প্রভাবে কর্ম্ম সমাধা হয়, তাহার নাম বীর্য্য। বীর্য্য দুই প্রকার এক শীতবীর্য্য অপর উষ্ণবীর্য্য। কাহারও পক্ষে উষ্ণবীর্য্য অন্ন-পানীয় হিতকর, কাহারও শরীরে অহিতকর। শীতবীর্য্য দ্রব্যও শরীর ভেদে হিতাহিত সাধন করে। যেরূপ বীর্য্যবদ্দ্রব্য দেহের অনিষ্ট সাধন করে, তাহারই নাম বিরুদ্ধ বীর্য্যদ্রব্য। কোন কোন দ্রব্য স্বভাবতঃ বিরুদ্ধবীর্য্য, যেমন গোমাংস প্রভৃতি। দুই বা তদধিক দ্রব্য মিলিত হইলে কখন কখন সংযোগ-বিরুদ্ধ হয়। যেমন লবণ যোগে উষ্ণ দুগ্ধ, মৎস্য যোগে দুগ্ধ ইত্যাদি। বীর্য্য-বিরুদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ করিবেনা। করিলে কুষ্ঠ, বিসর্প এবং অন্ধতা প্রভৃতি রোগগ্রস্ত হইতে হয়।

৮। নাতিদ্রুত মশ্নীয়াৎ। অতিদ্রুত ভোজন করিবেনা।

চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য এবং পেয় ভেদে আহার্য্য দ্রব্য চারি প্রকার। চতুর্ব্বিধ খাদ্যের কোন খাদ্যই অতিদ্রুত গলাধঃকরণ করিবেনা। বিশেষতঃ চর্ব্ব্য বস্তু ধীরে ধীরে চর্ব্বণ করিয়া খাইতে হয়। নতুবা খাদ্য পাচক রসে সহসা দ্রবীভূত হয় না, কোন খাদ্য আদৌ দ্রবীভূত হয় না। তজ্জন্য প্রথমতঃ দন্তদ্বারা ছেদ-ভেদ এবং পেষণ করিয়া, লালাসংজ্ঞক রসযোগে ক্লিন্ন করত গলাধঃকরণ করিলে কোষ্ঠস্থ পাচক রসে অনায়াসে পরিপাক পাইতে পারে। ভাত এবং রুটি প্রভৃতি শ্বেতসারযুক্ত খাদ্য উত্তমরূপে চর্ব্বিত এবং লালা সংযোগে মধুরী-ভূত হইলে খাওয়া উচিত। তাহা না হইলে ঐ সকল দ্রব্য ভালরূপে পরিপাক পায় না। অন্ন জল অতি দ্রুত নিষেবন করিলে বিমার্গগত হইয়া বিষম পীড়া উপস্থিত হইতে পারে। ভুক্তদ্রব্য আমাশয়ে সুস্থিত হয়না, তজ্জন্য পরিপাক কার্য্যে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। ইত্যাদি কারণে অতিদ্রুত আহার করিবেনা।

৯। নাতি বিলম্বিত মশ্নীয়াৎ। অনাবশ্যক বিলম্ব করিয়া ভোজন করিবেনা।

দীর্ঘকাল বসিয়া খাইলে আহার গুরুতর হয়। আহার-সামগ্রী জুড়াইয়া যায়, তজ্জন্য দুর্জ্জর হইয়া উঠে।

১০। অজল্পন্নহসন্ তন্মনা ভুঞ্জীত। কথা বলিতে বলিতে, হাসিতে হাসিতে ভোজন করিবে না। তন্মনা হইয়া ভোজন করিবে।

"উচ্চারে মৈথুনে চৈব প্রস্রাবে দন্তধাবনে। স্নানে ভোজন কালে চ ষট্সু মৌনং সমাচরেৎ।" অর্থাৎ মলত্যাগ কালে, মৈথুন সময়ে, প্রস্রাব ত্যাগ কালে, দাঁত মাজিবার সময়, স্নান করিবার সময়ে এবং ভোজন কালে মৌনাবলম্বন করিবে। মৌনাবলম্বন করত মনোযোগ পূর্ব্বক উক্ত কার্য্যগুলি করিলে, কাজগুলি সুসম্পাদিত হয়। হাসিতে হাসিতে, কথা বলিতে বলিতে বা অন্যমনে খাইলে চর্ব্বণের ব্যাঘাত ঘটে, অন্ন-পানীয়ের স্বাদ-গ্রহণে সুপ্রীত হওয়া যায় না, ভক্ষ্যদ্রব্যের সহিত যদি অন্য কোন দ্রব্যের মিশ্রণ থাকে, তাহা বুঝা যায় না, অন্নপানীয় বিপথগামী হইতে পারে এবং অপরিমিত অন্ন উদরস্থ হইবারও সম্ভাবনা।

১১। ইষ্টেদেশেঽশ্নীয়াৎ। মনোজ্ঞস্থানে ভোজন করিবে।

অনাবৃত, অপরিষ্কৃত এবং দুর্গন্ধযুক্ত কদর্য্য স্থানে বসিয়া আহার করা অতিগর্হিত কর্ম্ম।

তাদৃশ স্থানে দৃশ্য এবং চক্ষুর অগোচর বহুতর কীট-পতঙ্গ সঞ্চরণ করে। তৎসম্পর্কে অন্ন-জল দূষিত হয়। হয় ত চক্ষুর অগোচর নানা রোগের হেতু বিবিধ প্রকার দোষবীজ-জীবাণু অন্নের সহিত মিশিয়া উদরস্থ হয়। অনিষ্ট দেশে বসিয়া আহার করিলে মনও অপ্রসন্ন হইয়া উঠে, পরন্তু ঘৃণার উদয় হয়। মনো-বিষাদ বহুরোগের কারণ। তজ্জন্য সুপবিস্কৃত এবং মনোজ্ঞ গন্ধ বিশিষ্ট স্থানে আহার করা উচিত। সুশ্রুত বলেন—ভোক্তারং বিজনে রম্যে নিঃসম্পাতে শুভে শুচৌ। সুগন্ধ পুষ্প রচিতে সমে দেশেঽথ ভোজয়েৎ।”

১২। তথেষ্ট সর্ব্বোপকরণঞ্চাশ্নীয়াৎ। ভোজনের সমস্ত উপকরণই মনোজ্ঞ হওয়া উচিত।

১৩। নাশ্নীয়াৎ সন্ধিবেলায়াং। রাত্রি-দিবার সন্ধিক্ষণে ভোজন করিবেনা।

অপরাহ্নে সমস্ত নরনারীর শরীরে স্বভা-বতঃ বায়ু প্রকুপিত হয়, রাত্রিকালের প্রথম প্রহর শ্লেষ্মা প্রকোপের প্রাকৃত সময়। সন্ধ্যাকালে কালের স্বভাবানুসারে বায়ু প্রশমিত হয়, শ্লেষ্ম-ধাতু প্রকুপিত হইতে থাকে। রাত্রিকালের শেষ যাম বায়ু প্রকোপের সময়। প্রত্যূষে বায়ু প্রশমিত হয় এবং শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইতে আরব্ধ হয়। উভয় সন্ধি কালে, উভয় দোষের প্রকোপ-প্রশমন সন্ধিস্থলে পরিপাক যন্ত্র—আমাশয়াদি সম্যক্ সক্রিয় থাকে না, শরীর কিঞ্চিৎ অবসন্ন এবং চিত্ত ন্যূনাতিরেক পরিমাণে অপ্রসন্ন হইয়া উঠে। তজ্জন্য সেই সেই সময়ে আহার করা অনুচিত। যখন কফ প্রশমিত হয়, শরীর এবং মনঃ সুস্থির হয়, ক্ষুধা-তৃষ্ণা উপস্থিত হয়, তখনই আহার করিবে।

১৪। উদ্ধৃত-স্নেহং ন ভুঞ্জীত। স্নেহময় দ্রব্যের, স্নেহ মন্থন করিয়া উঠাইয়া ফেলাইয়া অথবা স্নেহ নিষ্পীড়ন করিয়া সেই দ্রব্য ভক্ষণ করিবেনা। যেমন মাখন তোলা দুধ, তিলের খইল প্রভৃতি।

অধুনা তিলের খইল, কেহ আহার্য্য-রূপে ব্যবহার করেননা। পূর্ব্বে নিষ্পীড়িত স্নেহ তিলকল্ক খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হইত। মাখন তোলা দুধ নিঃসার পানীয়, তজ্জন্য শরীরের পুষ্টি এবং মনের তুষ্টি বিধান করে না। তবে রোগের কোন কোন অবস্থায় মাখন তুলিয়া দুধ পথ্য দিতে হয়। ঘোল এবং তক্র উদ্ধৃত স্নেহ হইলেও অনেক স্থলে এবং অনেক রোগে উত্তম পথ্য।

১৫। নাতি সৌহিত্যমাচরেৎ। দিবা ভাগে, বিশেষতঃ রাত্রিকালে অতি তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করিবে না।

“জঠরঃ পুরয়েদর্দ্ধমন্নৈর্ভাগং জলেন চ।
বায়োঃসঞ্চলনার্থঞ্চ চতুর্থমবশেষয়েৎ।”

ভোজনকালে উদরের অর্দ্ধভাগ অন্নে, এক চতুর্থাংশ জলীয় দ্রব্যে পূরণ করিয়া অবশিষ্ট পাদাংশ বায়ুর চলাচলের জন্য খালি রাখিবে। এই নিয়ম অতিক্রম করিয়া ভোজন করিলে তাহাকে সৌহিত্য বলে।

দিবাভাগে গুরু ভোজন করিলে, রাত্রি-কালে অনশনে থাকা উচিত। সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত যে, “একাহারঃ সুখ-জরানাং” অর্থাৎ ভুক্ত অন্ন অনায়াসে সুজীর্ণ করাইবার যতগুলি উপায় আছে, তন্মধ্যে একাহারই শ্রেষ্ঠ উপায়।

১৬। শয়নস্থো ন ভুঞ্জীত। শুইয়া আহার করিবে না।

একই ভাবে শরীরের অবয়ব বিন্যাস

করিয়া সকল কাজ করা চলেনা, করাও উচিত নহে। কার্য্য-বিশেষে অঙ্গের স্থিতি-বিশেষের প্রয়োজন। আহারে, ব্যায়ামে, মৈথুনে, গমনে, উপবেশনে এবং শয়নে বিশেষ বিশেষ ভাগে অঙ্গ-বিন্যাসের আবশ্যক। যে কাজের জন্য যেরূপ অঙ্গবিন্যাস করা উচিত, তাহার ব্যতিক্রম করিয়া কাজ করিলে শরীরের বাধা উপস্থিত হয়। বাধামাত্রেই পীড়াদায়ক। তজ্জন্য যথা-প্রয়োজন সুস্থিত না হইয়া কাজ করিবেনা। কাজে বাধা না পাওয়া এবং কষ্টানুভূতি না হওয়াও সুস্থিতির লক্ষণ। সুখাশনে সুস্থিত হইয়া আহার করিলে আহার্য্য দ্রব্যও আমাশয়ে সুস্থিত হয় এবং আহার পরিপাকার্থ পাচক রস নিঃসরণেরও কোন বাধা হয়না।

১৭। আত্মানমভিসমীক্ষ্য ভুঞ্জীত সম্যক্। এত পরিমিত এবং এই প্রকার আহার পানীয় আমার শরীরের হিত সাধন করে ; এতদতিরিক্ত পরিমাণে আহার আমার পক্ষে অনিষ্টকর, পরন্তু এবম্বিধ আহার আমার শরীরের অনুকূল নহে। ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া আহার করা উচিত।

"ব্যক্তি নিয়তত্ত্ব" সম্ভবতঃ অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এমন লোক আছেন, ডিম খাইলে তাঁহার বমন হয়। অথচ অনেক লোক ডিম খাইয়া অনায়াসে পরিপাক করিতে পারেন এবং ডিম্ব ভক্ষণ জন্য ফলও লাভ করেন। ডিমের ন্যায় আরও অনেক খাদ্য ব্যক্তি-বিশেষের অনিষ্ট সাধন করে। কিন্তু জনসাধারণের পক্ষে অহিতকর হয়না। ডিম্ব প্রভৃতি ভোজন জন্য বমনাদি "ব্যক্তি নিয়তত্ত্ব।" "ব্যক্তি নিয়তত্ত্বের" অপর নাম "প্রতি পুরুষত্ব।" বিশেষ বিবেচনা করিয়া, প্রতিপুরুষত্ব অবধারণ করিয়া আহার্য্য নির্ব্বাচন পূর্ব্বক আহার করা উচিত।

'ব্যক্তি নিয়তত্ত্বের' ন্যায় 'জাতি-নিয়তত্ত্বও' প্রমাণসিদ্ধ। একজাতির সমস্ত আহার অপর জাতির পক্ষে হিতকর হয়না। যাঁহারা উভয় নিয়তত্ত্ব অগ্রাহ্য করিয়া অন্য পুরুষের বা অপর জাতির অনুকরণে আহার করেন, তাঁহাদিগকে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে দেখা যায়। তজ্জন্য আত্ম-সাত্ম্য এবং জাতিসাত্ম্য অন্ন জল গ্রহণ করা উচিত।

১৮। নাশ্নীয়াৎ ভার্য্যয়া সার্দ্ধং। ভার্য্যার সঙ্গে ভোজন করিবেনা। স্ত্রী-পুরুষে এক সঙ্গে আহার করিতে থাকিলে—"অজল্পন্নহসন্ তন্মনা ভুঞ্জীত।" এই বিধি নিশ্চয়ই লঙ্ঘন করিতে হয়। আরও দোষ ঘটে। চরক বলেন—

"কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহের্ষ্যা-হ্রী-শোক-মনোদ্বেগ ভয়োপতপ্তেন মনসা বা যদন্নপান মুপযুজ্যতে তদপ্যামমেব প্রদূষয়তি।" অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঈর্ষা, লজ্জা, শোক, অন্যবিধ মনোদ্বেগ এবং ভয়যুক্ত হইয়া যে সকল অন্ন-পান সেবন করা যায়, তাহা পরিপাক পায় না, আমাবস্থায় রহিয়া শরীরকে দূষিত করে। স্ত্রীর সহিত একাসনে এক ভাজনে বসিয়া আহার করিবার সময় অনেকের মনঃ কামমোহিত হইতে পারে। তজ্জন্য অষ্টাদশ সংখ্যক বিধি পালন করা উচিত।

১৯। না প্রক্ষালিত পাণি-পাদ বদনোঽন্ন মাদদীত। হাত, পা, এবং মুখ ভালরূপে না ধুইয়া আহার করিবেনা।

উক্ত বিধির যুক্তিবাদ অনাবশ্যক। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া আহার করার

যৌক্তিকতা সকলেই অবগত আছেন। বিশেষতঃ ভোজনের অব্যবহিত পূর্ব্বে হাত-মুখ ভাল করিয়া ধুইয়া লইতে হয়। নখের মধ্যে কত জীবাণু আশ্রয় গ্রহণ করে, অনুবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে তাহা প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। তজ্জন্য আহারের পূর্ব্বে হস্ত-নখ-মল ভাল করিয়া ধুইয়া লইতে হয়। মুখমধ্যে যে সকল মল সঞ্চিত থাকে, তাহা অন্নপানের সহিত উদরস্থ হইলে, নানা প্রকার অনিষ্ট ঘটিতে পারে।

২০। আর্দ্রপাদস্তু ভুঞ্জীত। ভিজা-পা'য়ে ভোজন করিবে।

ভগবান্ মনু বলেন—আর্দ্রপাদস্তু ভুঞ্জানঃ শতং বর্ষাণি জীবতি।"

আরও কথিত আছে—"আর্দ্রপাদস্তু ভুঞ্জানো দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াৎ।"

কি জন্য ভিজা পায়ে ভোজন করিলে আয়ুবর্দ্ধিত হয়, তাহা আমরা অদ্যাপি অবগত হইতে পারি নাই। তবে আপ্তোপদেশের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিলেও প্রতিপালন করা উচিত।

শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন।

মহিলাগণের চিকিৎসা শিক্ষা।

(অগ্নিদগ্ধে ব্যবস্থা)

সে অনেকদিনের কথা। আমার স্বামী তখন মুর্শিদাবাদে নবাব-সরকারে চাকরি করিতেন। এখনকার মত পরিবার লইয়া বিদেশবাসী হইবার ব্যবস্থা তখন 'চাকুরে পুরুষ'দের মধ্যে বড় প্রচলিত হয় নাই। স্বামীও আমার সেই পন্থা অনুসরণ করিয়াছিলেন। তিনি মুর্শিদাবাদে চাকরি করিতেন, মাসটি গত হইলে যাহা পারিতেন, পাঠাইয়া দিতেন, আমি একটি ছেলে, একটি মেয়ে এবং এক বিধবা পিসীমাকে লইয়া সুখে-দুঃখে দিন অতিবাহিত করিতাম। আমার বয়স হইয়াছিল তখন আঠার' বৎসর। ছেলেটি যেটের কোলে তিন বছরে পা দিয়াছিল, মেয়েটি এক বছর উত্তীর্ণ হইয়াছিল মাত্র,—হামাগুড়ির সহিত তখন কখন কখন দাঁড়াইয়া উঠিবার চেষ্টা করিত। আর পিসীমা,—তাঁহার বয়সটা যে কত হইয়াছিল, তাহা তাঁহাকে দেখিয়া বুঝিবার শক্তি আমার ছিলনা, তিনি বলিতেন, তিন কুড়ি পার হইয়া আর তিন বৎসর হইয়াছে, কিন্তু সাত বৎসর আমি পিতৃগৃহ হইতে আমার এই নূতন সংসারে আসিয়াছি, আমি ইহার মধ্যে তাঁহার বয়সের পরিবর্ত্তন কখন বুঝিতে পারি নাই। তাঁহার সঙ্গিনীরা তাঁহাকে পরিহাস করিয়া এই জন্যই বোধ হয় বলিত—"তারা! তুই চিরকালই কুমারী থাকিলি।" পিসীমার নাম ছিল তারাসুন্দরী। এখনকার মত নামের ভিতর রূপ-মাধুরী বুঝাইবার চেষ্টা তখন হয় নাই। যাহাহউক পিসীমা তারাসুন্দরীর রূপ-রাশির ভিতর হইতে তেষট্টি বৎসর বয়সের যে সৌন্দর্য্য

দিব্য-জ্যোতিঃ বাহির হইত, তাহার নিকট রূপ-গর্ব্ব-মোহিতা অনেক সুন্দরী যুবতীও তখন হারি মানিতেন।

সন্ধ্যার রাগোদ্দিপ্ত-সূর্য্যকিরণ যখন পশ্চিম গগনে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সমস্ত দিনের কর্ম্ম-নিরত-শ্রান্ত-হৃদয়ে তাবৎ প্রাণীই যখন আলস্যের আবিলতাটুকু সম্বল করিয়া স্ব স্ব কক্ষ প্রান্তে ধাবমান হইয়াছে, এক কথায় কার্য্য-কুশলা-প্রকৃতিরাণী যে সময় বিশ্রাম-সুখ-লালসায় স্তব্ধ ভাব অবলম্বনের প্রয়াস করিতেছেন, ঠিক সেই সময় একদিন আমি রন্ধনগৃহে বসিয়া ছেলে মেয়ে এবং নিজের জন্য উনুনের জ্বালে ফুঁ পাড়িতেছিলাম। পিসীমা দাওয়ায় বসিয়া হরিনামের মালা লইয়া জপ করিতেছিলেন। আমাকে উদ্দেশ করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"বউমা, এ বড় অন্যায় কথা, এই ভর্ সন্ধ্যেবেলা রান্না-বান্নার কাজে কখন ব্যস্ত থেকনা মা—এ তোমায় কত দিন ব'লেছি। এ সময়ট 'রাক্ষসী বেলা'। এ সময় রান্না-বান্না কি খাওয়া-দাওয়ার কার্য্যটা ভুলে যেতে হয়। তোমায় এত ক'রে বলি, তুমি কিছুতেই শিখ্‌লেনা!"

আমি একটু অপ্রতিভ হইলাম,—আমি একালের শিক্ষা তো পাই নাই, সুতরাং কেহ তিরস্কার করিলে অপ্রতিভ হইতে হয়—ইহা আমার আবাল্য অভ্যাস ছিল। অপ্রতিভ হইয়া আমি বলিলাম,—"এমন কর্ম্ম আর ক'রবনা পিসীমা,—আজ যা' হ'ল তা' হ'ল। যাই এখন ঘর-দুয়োরে সন্ধ্যে দিই গে।" এই বলিয়া আমি রন্ধন-গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

সন্ধ্যা জ্বালিয়া সকল ঘর গুলিতে প্রদীপ লইয়া দেখাইলাম। শাঁখ বাজাইলাম, ঘরে নারায়ণ শিলার অধিষ্ঠান ছিল, গললগ্নী কৃত-বাসে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্বামীর মঙ্গল কামনা করিতেছি, এমন সময় শব্দ পাইলাম,—খুকীটি আমার বিকট স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু চীৎকার করিয়াই সে থামিয়া গেল, আর কোন সাড়া শব্দ পাইলাম না। নারায়ণ শিলাকে প্রণাম করিয়া তুলসী তলায় প্রণাম করিতে যাইতেছি এমন সময় তাড়া-তাড়ি পিসীমা ডাকিলেন,—"বউমা, শিগ্‌গির্ এস, খুকী পুড়িয়া গিয়াছে।"

রান্নাঘরে যখন উনুনে ফুঁ পাড়িতেছিলাম, তখন খুকীটি মাই খাইতে-খাইতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। আমি তাহাকে সেই ঘুমন্ত অবস্থায় এক পার্শ্বে শোয়াইয়া প্রদীপ জ্বালিতে আসিয়াছিলাম। ইহার মধ্যে খুকী উঠিয়া হামাগুড়ি দিয়া উনুনের পাশে গিয়া আগুনের মধ্যে হাত ঢুকাইয়া দিয়াছে, তাহাতেই এই বিভ্রাট। আমি তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গেলাম।

গিয়া দেখিলাম,—ডান হাতখানির আঙ্গুল গুলি এবং তলদেশের সকলটুকু পুড়িয়া গিয়াছে, ফোস্কা হয় নাই, কিন্তু যন্ত্রণা এতই বেশী হইয়াছে যে, সেই যন্ত্রণার ঘোরে তাহার অজ্ঞানতা আসিয়া পড়িয়াছে। ভাবিলাম, কি সর্ব্বনাশই হইল। অধীর হইয়া পিসী-মাকে বলিলাম,—"পিসীমা উপায় কি হইবে?" আমার দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল।

পিসীমা বকিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"মিছামিছি চীৎকার ক'রে সব ঘুলিয়ে দিস্‌নে। তুই কোলে তুলে মাই মুখে দিতে চেষ্টা কর্ দেখি। তা'র পর আমি উপায় ক'রে দিচ্ছি।"

আমি খুকীকে ক্রোড়োপরি তুলিয়া লইলাম। কিন্তু কাঁদিতে কাঁদিতে আমার বলি-লাম,—"মাই কা'কে দেবো পিসীমা! মাই

খা'বার শক্তি কি আর আছে?" পিসীমা বলিলেন,—"শক্তি এখনি হ'বে, তুই মাই মুখে দেবার চেষ্টা কর্‌তো। আর এই পাখা খানা নে, পাখা খানা নিয়ে আস্তে আস্তে বাতাস কর্।" আমি তাহাই করিতে লাগিলাম। পিসীমা ইত্যবসরে করিলেন কি,—রান্নাঘরের একপার্শ্বে কতকগুলি আলু ছিল, শিলের নুড়িটি লইয়া তাহার কতকগুলি ছেঁচিয়া আনিয়া অগ্নিদগ্ধ স্থানে লাগাইয়া তাহার উপর এক টুক্‌রা পরিষ্কার ধপ্‌ধপে নেকড়া আনিয়া এক ফর্দ্দা করিয়া আস্তে আস্তে জড়াইয়া দিলেন। আমি বলিলাম,—পিসীমা, একি হইতেছে, ডাক্তার-বড়ঠাকুরকে ডাক্‌লে ভাল হ'তনা।" পিসীমা বলিলেন,—"ডাক্তার এসে কি মন্তরে ভাল ক'রে দেবে নাকি! ডাক্তার-বদ্দিরাও তো এই সবই ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই ক'র্‌তে পা'র্‌বেনা। আর তোমার ডাক্তারবড়ঠাকুরের বাড়ীও তো এ পাড়ায় নয়। তাঁকে খবর দিলে তাঁ'র আস্‌তে যে সময় লাগবে,—সে সময়টা চুপ ক'রে ব'সে থেকে তোমার মত কান্নাকাটি না ক'রে—যা' দু' একটা টোট্‌কা-মুষ্টিযোগ জানি, তা'র ব্যবস্থা ক'র্‌লে লাভ ভিন্ন তো ক্ষতি নাই। দেখ্‌না এতে কি হয়।

বাস্তবিক পিসীমার ব্যবস্থা ব্যর্থ হইল না; মাই মুখে দিতে-দিতে, বাতাস করিতে করিতে খুকীর অজ্ঞানের ভাব অপনোদিত হইল। নেকড়া খুলিয়া হাতের পাতা এবং আঙ্গুল কয়টির দিকে চাহিয়া দেখিলাম—একটিও ফোস্কা হয় নাই। আমি খুকীকে চুম্বন করিয়া পিসীমার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম।

খুকী যখন মাই খাইতে খাইতে শান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল, তখন আমি বলিলাম, "পিসীমা, এ আলু পোড়া লাগাইলে আগুনে পোড়ার যন্ত্রণার শান্তি হয়—এ কথা তুমি কোথায় শিখিয়াছিলে,—এ যে অপূর্ব্ব ঔষধ।"

পিসীমা একটু হাসিয়া বলিলেন,—এখন এ সকল ব্যবস্থা লোপ পাইতেছে বউমা। এ সকল ব্যবস্থা আগে শুধু আমিই শিখিতাম না,—আমার বয়সের অনেক স্ত্রীলোকই আমার মত এ সকল টোট্‌কা-ওষুদ বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদের কাছ থেকে মন দিয়ে শিক্ষা ক'র্‌ত। সে শিক্ষায় সময় অসময়ে বড়ই সুন্দর ফল ফ'লত।

আমি বলিলাম,—"আচ্ছা পিসীমা, তা' যেন হ'ল, কিন্তু আলু তো আমাদের দেশের জিনিস নয়; আমাদের দেশে আগে রাঙ্গা আলু ছিল, আলু বা গোল আলু তো আমাদের দেশে ইংরাজ জাতির আসার পর লোকে দেখ্‌তে পেয়েছে। তা' হ'লে আমাদের দেশে যখন আলু ছিলনা, তখন এ রকম পুড়িয়া গেলে কি দেওয়ার ব্যবস্থা হ'ত পিসীমা।"

পিসীমা আবার হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন,—কি দেওয়া হ'ত? এক আলু দেখেই ভাব্‌লে বুঝি বউমা—এর মতন ওষুদ আর নেই! এ রকম ওষুদ আমাদের আনাচে-কানাচে যে কত প'ড়ে র'য়েছে, তা'র সংখ্যা করা যায় না।"

রান্নাঘরের দাওয়ার নীচে এক পার্শ্বে কতকগুলি পাথরকুচির গাছ ছিল। পিসীমা কথা শেষ করিয়া আমাকে বলিলেন,—ওরই দু'চারটে পাতা তুলিয়া আনগে দেখি।" আমি তুলিয়াআনিলাম। পিসীমা বলিলেন—"ঈশ্বর না করুন, এরূপ ঘটনা যদি আর কখন হয়,—তা' হ'লে এই হিমসাগর বা পাথরকুচির পাতা থেঁতো ক'রে লাগিয়ে দিলে তেমনি যন্ত্রণার

নিবৃত্তি হ'বে জেনে রেখে দাও। এও একটা ভাল ওষুদ।"

আমি চুপ করিয়া থাকিলাম। পিসীমা আবার বলিতে লাগিলেন,—"ডিমের যে সাদা অংশ সে জিনিসটাও পোড়া ঘায়ের মহৌষধ। পুড়িয়া যাইবা মাত্র ঐ সাদা অংশটা লাগাইলে তখনি যন্ত্রণার শান্তি হইয়া থাকে।"

আমি বলিলাম—"ডিম সব সময় কোথায় পাওয়া যা'বে? ডিম তো আর সকল সংসারে সব সময় থাকে না! আর একটা কথা, তুমি যে হিমসাগরের কথা ব'ল্লে, সে হিমসাগর বা পাথরকুচিও যদি সব সময় পাওয়া না যায়? যা'রা সহরে থাকে, তা'দের পক্ষে তো এটিও যখন-তখন পা'বার উপায় নেই! তা'রপর যদি আলুও ঘরে না থাকে? আসল কথা, তুমি, যে তিনটি জিনিষের কথা ব'ল্লে, এই তিনটের কোন একটাও যদি তখনি না পাওয়া যায়, তা' হ'লে কি ব্যবস্থা করা উচিত?"

পিসীমা বলিলেন,—"তা'হ'লে খানিকটা মধু নিয়ে আস্তে আস্তে লাগিয়ে দিলে যন্ত্রণার নিবৃত্তি হ'বে। ছেলে পিলে নিয়ে যা'রা ঘর-সংসার ক'রে, হঠাৎ দরকার হ'লে ওষুধ খাওয়াবার জন্য তা'দের সকলের ঘরেই একটু আধটু মধু থাকে। আর যদি বল,—তাও যদি না পাওয়া যায়, তা'হ'লে খানিকটা মাই-য়ের দুধ গেলে নিয়ে লাগিয়ে দিও—উপকার হ'বে। আরও যদি বল, স্তনের দুধও যদি সে সময় শুকিয়ে যায়,—তা'হ'লে মুখের থুঁতু তো আর শুকায় না, সেই থুঁতু খানিকটা লাগিয়ে দিও, তা'তেই উপশম বুঝ্তে পা'র্বে।"

পিসীমা আবার বলিলেন,—"পুঁইশাকের পাতার রস, ঘরের চা'লের পচা খড়, ইংরাজী কালী, ছাগল দুগ্ধ—এ সকলের যেটি পাওয়া যায়, মাখাইয়া দিলেও যন্ত্রণার উপশম হয় আর ফোস্কা হয় না। এগুলিও ভাল ক'রে মনে রেখ।"

আমি পিসীমার বিচক্ষণতা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। বলিলাম,—"গৃহস্থলীর সকল বিষয়ের শিক্ষাতেই তো তুমি আমাকে শিষ্যা করিতেছ পিসীমা। এই টোট্‌কা-শিক্ষার শিষ্যা করিবে?"

পিসীমা বলিলেন,—"করিব। কিন্তু তুমি তাহার বিনিময়ে আমাকে কি দিবে বল।"

আমি বলিলাম,—"আমি আর কি দিব,—আমি রোজ রোজ তোমার মাথার পাকা চুল তুলিয়া দিব। দিনের বেলায় পাকা চুল তুলিয়া দিব, আর রাত্রে যখন শুইবে, তখন পায়ের তলায় তেল মালিস করিয়া দিব, গ্রীষ্ম বোধ হইলে পাখা লইয়া বাতাস করিব। আমি এই করিতে পারি, এ ছাড়া আমার আর কিছু তো ক্ষমতা নাই পিসীমা।"

চিরসুন্দরী-পিসীমা আমার কথার ভঙ্গিমা দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। হাসিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা শিখাইব"। আমি আশ্বস্তা হইলাম।

বহুমূত্র ও বাঙ্গালী।

—:*:—

ম্যালেরিয়ার চেয়েও "বহুমূত্র" বাঙ্গালীর পরম শত্রু। ম্যালেরিয়ায় ছোট, বড়, ভদ্র, অভদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত—সকল রকম লোক মরে, কিন্তু বহুমূত্র রোগে যাঁহারা মরেন, তাঁহারা এ দেশের গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত বাছা বাছা লোক। যে সকল মহাত্মা দীর্ঘজীবী হইলে বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল হইত, বাঙ্গালার সমাজ, শ্রীসম্পন্ন হইত,—এই কালোপম কঠোর রোগ দেশের সেই অমূল্য রত্নগুলি একে একে আত্মসাৎ করিতেছে! বহুমূত্রের আক্রমণে বঙ্গ জননীর ক্রোড় শূন্য হইয়া পড়িতেছে, সমাজের অস্থিপঞ্জর খসিয়া যাইতেছে, ঘরে ঘরে আর্ত্তনাদ ও মর্ম্মভেদী হাহাকার উঠিতেছে! যাঁহাদের লইয়া দেশের গৌরব,—যাঁহাদের ভরসায় বিদেশীয়কে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করি, বহুমূত্র রোগে তাঁহাদের শোচনীয় অকাল মৃত্যু ঘটিতেছে। বহুমূত্র রোগ শুধু আমাদের দেশেরই যে ক্ষতি করিতেছে এমন নহে, বহুমূত্রের প্রভাবে আমাদের ভাষা-জননী ও সাহিত্যেরও সর্ব্বনাশ হইতেছে। আমাদের বড় বড় কবি, বড় বড় দার্শনিক, বড় বড় সাহিত্যিক—বহুমূত্র রোগেই প্রাণ হারাইতেছেন। দুঃখের বিষয়—জানিয়া শুনিয়াও এ বিষয়ের জন্য কাহাকেও চিন্তিত দেখিতেছি না! কেহই এ মহা অনিষ্টের প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছেন না।

বহুদিন হইতেই আমরা দেখিয়া আসিতেছি—সাহিত্যসেবী, হাকিম, উকীল, চিকিৎসক—অর্থাৎ যাঁহাদিগকে অতিরিক্ত মস্তিষ্ক চালনা করিতে হয়, তাঁহারাই এ রোগে আক্রান্ত হ'ন। ইহার কারণ,—তাঁহারা শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেননা। দেশ-হিতকর কার্য্যে লিপ্ত হইতে হইলে, দীর্ঘ-জীবনের আবশ্যকতা আছে। দীর্ঘজীবী না হইলে ব্রত-ধারণ সার্থক হয়না। এই জন্য দেশের বিদ্বান ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ—তাঁহারা যেমন মানসিক পরিশ্রম করিবেন, সেই সঙ্গে কিছু কিছু শারীরিক-পরিশ্রমও অভ্যাস করিবেন। তাহা হইলে আর বহুমূত্র রোগ হইবার তত্টা আশঙ্কা থাকিবেনা।

বহুমূত্র—প্রতিষেধ যোগ্য রোগ। যিনি মানসিক পরিশ্রমের সহিত কায়িক-পরিশ্রমের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন, এবং স্বাস্থ্যকর নিয়মগুলি প্রতিপালন করেন, এ রোগ কখনই তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না।

বিশেষতঃ যে রোগ একবার দেহে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, দেহ অন্তঃসার-শূন্য ও মৃত্যু-ভঙ্গুর হইয়া পড়ে, সে রোগ যাহাতে শরীরে প্রবেশ করিতে না পারে—তৎপ্রতি সকলেরই দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য নহে কি?

ঔষধ প্রয়োগ অপেক্ষা পথ্যের সুব্যবস্থায় বহুমূত্র রোগের উপশম হইয়া থাকে। আমি স্বয়ং বহুমূত্রের আক্রমণে বহুকষ্ট পাইয়াছি, শেষে বৈদ্য মতের প্রভাবে প্রাণে-প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছি। সুতরাং বহুমূত্র রোগ সম্বন্ধে আমার মত লোকের মতামত নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় নহে। কিন্তু সে কথা বলিবার পূর্ব্বে - বহুমূত্র রোগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চাই। কেননা রোগের প্রকৃতি না বুঝিতে

পারিলে তাহাকে উন্মূলিত করা কঠিন সমস্যার কথা!

কেবল বেশী মাত্রায় বা বেশী বার প্রস্রাব হইলেই তাহাকে বহুমূত্র রোগ ভাবিয়া ভীত হওয়া অনুচিত। অথবা প্রস্রাব পরীক্ষা করিয়া তাহাতে চিনী দেখিতে পাইলে, তাহাতেও আশঙ্কার কারণ নাই। যাঁহারা অতিরিক্ত মিষ্টান্ন ভোজন করেন, তাঁহাদের মূত্র পরীক্ষা করিলে প্রায়ই শর্করার অস্তিত্ব জানিতে পারা যায়। আবার "মূত্রাতিসার" নামক রোগে—বারম্বার মূত্র পরিত্যাগ করিতে হয়, এরূপ রোগীর মূত্রে চিনীর নাম-গন্ধও থাকে না। তবে বহুমূত্র রোগ ধরিবার উপায় কি? উপায় অতি সহজ। যথা—

১। প্রস্রাবের পরিমাণ বেশী হইবে।

২। তাহাতে শর্করা থাকিবে।

৩। সঙ্গে সঙ্গে শরীরের বলক্ষয় এবং মাংস ক্ষয় হইবে।

৪। প্রবল গাত্রদাহ থাকিবে।

৫। অত্যন্ত পিপাসা হইবে।

এই পাঁচটী লক্ষণ যুগপৎ উপস্থিত হইলেই, তাহাকে মারাত্মক বহুমূত্র বা Diabetes বলিয়া স্থির করিবেন। এই পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত-ব্যক্তি যদি রোগের প্রতিকার করিতে অবহেলা করেন, তাহা হইলে পরিণামে ক্ষয়, ব্রণরোগ, [পৃষ্ঠব্রণ, উরুস্তম্ভাদি] বিসর্প [ইরিসিপ্ল্যাস্], মূত্রগ্রন্থির পীড়া, প্রভৃতি সাংঘাতিক আনুসঙ্গিক রোগে—তাঁহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের দেহে যকৃৎ নামক যে যন্ত্রটী আছে, কেবল পিত্ত নিঃসরণ বা ভুক্তদ্রব্যের পরিপাকই তাহার এক মাত্র কার্য্য নহে। এই যকৃৎকে মানব-দেহের ভাণ্ডারী বলিতে পারা যায়। আমরা ভাত, রুটী, আলু প্রভৃতি শ্বেতসারময় যে সকল খাদ্য আহার করি, তাহাদের সারাংশ শর্করায় পরিণত হইয়া যকৃতের কাছে সঞ্চিত থাকে। রক্তাদিতে যখন শর্করার প্রয়োজন হয়, যকৃৎ তাহা নিজের ভাণ্ডার হইতে বাহির করিয়া দেয়। কোন কারণে যকৃত বিকৃত হইলে, সে আর আবশ্যক মত শর্করা যোগাইতে পারেনা, কেননা সে শর্করা স্ব-ভাণ্ডারে সঞ্চিতই রাখিতে পারেনা। সুতরাং আহার জাত শর্করা সমস্তই রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। শর্করার গুণ—মূত্রকারক, এই জন্যই মূত্রের ভাগ বৃদ্ধি হয়,—তাহার সঙ্গে শরীরস্থ শর্করাও বাহির হইতে থাকে। সেই সময় পিপাসা, গাত্রদাহ প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। খাদ্য দ্রব্যের যে যে অংশ শরীর-পোষণের সাহায্য করে, যদি প্রস্রাব-দ্বার দিয়া তাহা বহির্গত হইয়া যায়, তাহা হইলে বল ও মাংস ক্ষয় অনিবার্য্য।

কেহ কেহ বলেন—এ রোগের বলবৎ কারণ—মানসিক আঘাত। সর্ব্বশরীর ব্যাপি স্নায়ুমণ্ডলের আকস্মিক আঘাত প্রাপ্তিতে, Depression এবং শোক-মোহাদি মনোবিকারে, বহুমূত্র রোগ জন্মিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। যে কোন প্রকারে হউক, স্নায়ুমণ্ডল আহত হইলেই এ রোগ মানব-দেহে প্রবেশলাভ করে। যাহারা অন্নাদি শ্বেতসারময় দ্রব্য আহার করে, অথচ কায়িক-পরিশ্রম একেবারে করিতে চাহেনা, যদি কোন কারণে তাহাদের স্নায়ুমণ্ডল সহসা আঘাত প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা বহুমূত্র কর্তৃক আক্রান্ত হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—বহুমূত্র রোগ উৎপন্ন

চেয়ে পথ্যের ব্যবস্থাতেই শমতা প্রাপ্ত হয়। এ রোগে প্রস্রাবে চিনি বাহির হয়। সুতরাং যে সকল খাদ্য-ভক্ষণে শরীরে চিনি উৎপন্ন হইয়া থাকে—সেরূপ খাদ্য বহুমূত্র রোগীর বর্জ্জন করা উচিৎ। চাউল, চিনী ও শ্বেতস্বারময় দ্রব্য—এ রোগে এই সকল জিনিষ সর্ব্বাগ্রে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। আপনারা হয়ত বলিবেন, অন্নগতপ্রাণ-বাঙ্গালী অন্ন না খাইয়া কয়দিন থাকিবে? কিন্তু ইহা ধ্রুব, সত্য, নিশ্চিত—যে বহুমূত্র-রোগী যদি অন্নের মায়া না ছাড়িতে পারেন, তাহা হইলে অচিরেই তাঁহাকে প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিতে হইবে। যাঁহারা বহুমূত্র রোগের আক্রমণ ব্যর্থ করিতে চাহেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গুলি যথাসাধ্য পালন করিবেন।

প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ব্যায়াম করিতে হইবে। যিনি অন্যরূপ ব্যায়াম করিতে পারিবেননা, তাঁহাকে অন্ততঃ ৪ মাইল পদব্রজে ভ্রমণ করিতে হইবে।

মেদোময় ও যবক্ষারজানময় দ্রব্য—মাংস, মৎস্য, ডিম্ব, ঘৃত, মাখন, শাক সব্‌জি, পটোল, ডুমুর, কুম্‌ড়া (দেশী) শশা, মোচা, থোড় প্রভৃতি—ভোজন করিবেন।

ফলের মধ্যে—ঈষৎ অম্লরসযুক্তফল ব্যবহার করা চলে। কিন্তু মিষ্টফল একেবারেই নিষিদ্ধ। ফলসা, আমড়া, আনারস, কালো জাম, পিয়াল, করমর্দ্দী, আমপিচ—এই সকল ফলই এ রোগে খাইতে পারা যায়।

কেহ কেহ এ রোগে দুগ্ধ খাইবার উপদেশ দেন। কিন্তু ডাক্তার জগবন্ধু বসু মহাশয় দুগ্ধ ব্যবহারে আপত্তি করিতেন। তাঁহার আপত্তির কারণ;—দুগ্ধে শর্করার অংশ আছে। তবে যিনি অত্যন্ত শ্রমশীল, তিনি অল্প পরিমাণে দুগ্ধ ব্যবহার করিতে পারেন, আর এ রোগে যাঁহারা অহিফেন-সেবী হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারাও দুগ্ধ পান করিতে পারেন। বহুমূত্র রোগে, কেবল মাত্র দুগ্ধ পথ্য দিয়া এক প্রকার চিকিৎসা-প্রণালী প্রচলিত আছে। এই চিকিৎসা-পদ্ধতির নাম—Skimmed milk treatment. এই মতে রোগীকে নবনীত-শূন্য-দুগ্ধ পান করিতে দেওয়া হয়। দুগ্ধ হইতে মাখন তুলিতে গেলে তাহার শর্করাংশ Lactic Acid এ পরিণত হয়, এই এসিড্ বহুমূত্র রোগে উপকারী।

ছোলাকে জাঁতায় পিষিয়া আটা প্রস্তুত করিবেন। ইহার নাম "বেশম্"। এই বেশমের রুটী কিম্বা লুচি ভক্ষণ করিবেন। এমন উপকারী পথ্য আমি আর দেখি নাই। ১দিন খাইলেই প্রস্রাব কমিয়া যায়।

প্রত্যহ প্রাতে ৪ আউন্স আন্দাজ জলে, ১০।১৫ ফোঁটা লেবুর রস (কাগজী বা পাতি) দিয়া পান করিবেন। ইহাতে প্রস্রাবের চিনী কমিয়া যায়।

প্রত্যহ ১ বার মেরুদণ্ডের উপর শীতল জল মাখাইবেন।

যে দ্রব্য সহজে পরিপাক হয়, অথচ পুষ্টিকর, তাহাই ভক্ষণ করা উচিত। যাহাতে পরিপাক-শক্তির ব্যাঘাত না হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন।

লবণ সংযুক্ত ঘোল পান করিলে অনেক সময় বিশেষ উপকার হয়।

চিন্তার কার্য্য বাড়িলে, সঙ্গে সঙ্গে কায়িক পরিশ্রম অবশ্য বাড়াইতে হইবে।

এই নিয়ম গুলি পালন করিলে, যাঁহারা

এ রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহারা অনেকটা ভাল থাকিবেন, যাঁহারা আক্রান্ত হ'ন নাই—ভবিষ্যতে তাঁহাদের আক্রান্ত হইবার ভয় থাকিবেনা।

এ রোগে—সকল চিকিৎসার চেয়ে কবিরাজী-চিকিৎসাই উৎকৃষ্ট। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে বহুমূত্র রোগের অব্যর্থ ঔষধ আছে। বারান্তরে আমি তাহার উল্লেখ করিব।

শ্রীক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়,
এল, এম, এস্।

গ্রহণী কাহাকে বলে ?

যে নাড়ী অন্নকে গ্রহণ করে, আয়ুর্ব্বেদ মতে তাহার নাম—"গ্রহণী"। সুতরাং গ্রহণী অগ্নিরও অধিষ্ঠাত্রী। সংক্ষেপে—ইহাই গ্রহণীর সংজ্ঞা, কিন্তু গ্রহণীর অবস্থান বুঝাইতে গেলে—আরও দুই চারিটী কথা বলিতে হইবে।

সাধারণতঃ আমাশয় ও পক্কাশয়ের মধ্যস্থিত পিত্তধরা-কলাকে গ্রহণী নামে নির্দ্দেশ করা হয়। আমরা যে আহার করি, তাহা পরিপাক হয় আমাশয়ে ও পক্কাশয়ে। আমাশয়ে অন্ন আম বা অপক্কাবস্থায় থাকে বলিয়া ইহার নাম "আমাশয়।" পক্কাশয়ের অনেক স্থলেই অন্ন পরিপাক হয়—সুতরাং ইহার "পক্কাশয়" নাম সার্থক এবং সঙ্গত। কবিরাজেরা যাহাকে আমাশয় বলেন, ডাক্তারী মতে তাহার নাম Stomach এবং কবিরাজী মতের পক্কাশয়কে ডাক্তারেরা—Small Intestine বলিয়া থাকেন। এই আমাশয় ও পক্কাশয়ের মধ্যেই 'পিত্তধরা-কলা' বর্ত্তমান। আমাশয় ও পক্কাশয় উভয়ের ভিতর হইতেই রস গৃহীত হইয়া থাকে।

সে দিন একখানি চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পুস্তক পড়িতেছিলাম। ঐ গ্রন্থে Deodenum কে গ্রহণী নামে অভিহিত করা হইয়াছে। আমার কিন্তু এ আখ্যা সঙ্গত বলিয়া মনে হইলনা। গ্রহণী অর্থে আমি যাহা বুঝিয়াছি, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারই উল্লেখ করিব। আমার ভ্রম-প্রমাদ—যোগ্যতর হস্তে সংশোধিত হইবে,—এই টুকুই আমার আশা।

Deodenum নামক নাড়ীর অংশ প্রত্যেক লোকেরই স্ব-হস্তের দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমিত। ঐ দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমিত স্থান, আমাশয়ের (Stomach) শেষ প্রান্ত হইতে আরম্ভ হইয়া Jejunumas এ গিয়া শেষ হইয়াছে। Deodenum এর ভিতর পিত্তনিঃসরণের মার্গ অবস্থিত, যকৃৎ হইতে পিত্ত নিঃসৃত হইয়া সেই স্থানে গিয়া পতিত হয়। আবার Pancrens হইতেও ঐ যন্ত্রের রস Deodenum এ আসিয়া সম্মিলিত হইয়া থাকে। ভাবমিশ্র বলেন—নাভিমণ্ডলস্থিত সমান বায়ু দ্বারা রস প্রেরিত হইয়া গ্রহণীতে উপনীত হয়। আমাশয় ও পক্কাশয়ের মধ্যবর্ত্তী পাচক নামক পিত্তের দ্বারা আহার্য্য দ্রব্য পরিপাক পাইয়া থাকে। পাচক পিত্তই—অগ্নির অধিষ্ঠান,—গ্রহণী সেই পিত্তকে ধারণ করে বলিয়াই তাহার আর একটী নাম—"পিত্তধরকলা"।

ডাক্তারী মতে Gastric juice. Pancreatic juice. Bile (পিত্ত) এবং ক্ষুদ্রান্ত্রের রস—এই কয়টী পদার্থ হইতে অন্নের পরিপাক-ক্রিয়া সাধিত হয়। যে যে স্থান হইতে এই সকল রস নিঃসৃত হইয়া থাকে, বৈদ্যমতে সেই সেই স্থানের নামই পিত্তধরাকলা বা গ্রহণী।

শারীর-বিজ্ঞানে অসাধারণ পণ্ডিত মহর্ষি সুশ্রুত—মানবদেহে সাতপ্রকার কলার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তন্মধ্যে পিত্তধরা কলার নামই গ্রহণী। ইহা আমাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্যস্থিত শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী। গ্রহণীতে যে শক্তি পরিপাক করে, সেই শক্তির নাম ও গ্রহণী। সুশ্রুত বলেন—

ষষ্ঠী পিত্তধরা নাম যা কলা পরিকীর্ত্তিতা।
পক্বাশয় মধ্যস্থা গ্রহণী সা প্রকীর্ত্তিতা।
গ্রহণী বলমগ্নির্হি সা চাপি গ্রহণী মতা।
তস্মাদগ্নৌ প্রদুষ্টেতু গ্রহণ্যপি প্রদুষ্যতি।

ষষ্ঠী পিত্তধরা নাম যা চতুর্ব্বিধং অন্নপান মুপযুক্তং আমাশয়াৎ প্রচ্যুতং পক্বাশয়োপস্থিতং ধারয়তি। অর্থাৎ এই পিত্তধরা কলা, চতুর্ব্বিধ [চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়] আহার্য্য পদার্থ যখন আমাশয় হইতে বাহির হইয়া পক্বাশয়ে উপস্থিত হয়—তখন সেই সকল খাদ্য সম্যক পরিপাক না হওয়া পর্য্যন্ত পিত্তধরা কলাই ধারণ করিয়া থাকে, পরে পরিপক্ব আহারের সারভাগ স্বরূপ যে রস, তাহা সমান-বায়ু কর্ত্তৃক হৃদয়ে প্রেরিত হয় এবং গ্রহণীস্থিত অবশিষ্টাংশ মলদ্রব নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মলদ্রবের জলীয় ভাগ বস্তিদেশে নীত হইয়া মূত্ররূপে পরিণত হয়। অবশিষ্ট কীট্টপুরীষ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই পুরীষ সমান বায়ুকর্ত্তৃক মলাশয়ে (Large intestine) উপস্থিত হয়।

চরকও বলিয়াছেন—

অগ্ন্যধিষ্ঠান মন্নস্য গ্রহণাদ্ গ্রহণী মতা।
নাভেরুপরি সা হ্যগ্নি বলোপস্তম্ভ বৃংহিতা।
অপক্বং ধারয়ত্যন্নং পক্বং ত্যজতি চাপ্যধঃ॥

গ্রহণী অগ্নির অধিষ্ঠান অন্নকে গ্রহণ করে বলিয়াই ইহার নাম "গ্রহণী"। ইহা নাভির উপরে অবস্থিত। অধিকন্তু ইহা পাচকাগ্নি ও বলের আশ্রয় স্বরূপ, ইহার কার্য্য অপক্ব অন্নকে গ্রহণ করা এবং পক্ব অন্নকে অধঃপ্রেরণ করা।

সুতরাং দেখা যাইতেছে—সমগ্র আয়ুর্ব্বেদের প্রতিনিধি সুশ্রুত এবং চরক—উভয়েরই মতে—গ্রহণী পিত্তধরা-কলা অর্থাৎ পাচকাগ্নির স্থান। এই কলাকে আশ্রয় করিয়াই জীবের পরিপাক শক্তি "বৈশ্বানর অগ্নি" রূপে উদ্ভাসিত।

অন্ন গ্রহণ—গ্রহণীর প্রধান কার্য্য। এই কার্য্য আমাশয় ও পক্বাশয়ের অভ্যন্তরস্থিত শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লির দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে। এই শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে Lacteals [সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রস বাহিনী শিরা] এবং Portal veinএর সূক্ষ্মাগ্রভাগ দ্বারা গৃহীত রস সমান-বায়ুর সাহায্যে হৃদয়ে নীত হয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় বিজ্ঞানেরই ইহাই অভিমত। কিন্তু ১২শ অঙ্গুলি পরিমিত Deodenumকে গ্রহণী বলিলে, চরক সুশ্রুতের কথার তাৎপর্য্যই থাকে না। কেননা, আমাশয় এবং পক্বাশয় এই উভয় স্থলেই ত অন্নের পরিপাক এবং উভয় স্থল হইতেই ত অন্নরস গৃহীত হইয়া থাকে। যদি Deodenumএ পরিপাকের সমস্ত কার্য্যই হইত, এবং ইহা আহারের অসারাংশকে মল-মূত্ররূপে অধঃপ্রেরণ

করিতে পারিত, তাহা হইলেও Deodenum কে না হয় গ্রহণী বলিতে পারিতাম। অতএব এস্থলে অনায়াসেই বলিতে পারি—Deodenum কখনই গ্রহণী নহে।

কেহ কেহ আমাশয়ের Pyloric প্রান্তকে গ্রহণী বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু ইহাও একটী গুরুতর প্রমাদ! কেননা, Pyloric প্রান্ত-পাচক পিত্তের আধার হইতে পারে না। চরক বলিয়াছেন—গ্রহণী অন্নরস গ্রহণ করে। কেবল মাত্র Pyloric প্রান্ত হইতে একার্য্য হয় না---সমস্ত আমাশয় এবং পক্কাশয় দ্বারা একার্য্য হইয়া থাকে। "গ্রহণী অপক্ক অন্ন গ্রহণ করে এবং পক্ক অন্নকে অধঃপ্রেরণ করে" --চরকের এই নির্দ্দেশে আমরা বুঝিতে পারি - যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্ন সম্যক্ পরিপাক না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই অন্নকে আমাশয় ও পক্কাশয়ের ঝিল্লীর সংস্পর্শে গ্রহণী ধারণ করিয়া রাখে। ইহাতে অন্ন গ্রহণীস্থ পাচকাগ্নির প্রভাবে পরিপাক পায় এবং পরিপাকের পর সারাংশ গৃহীত ও অসারাংশ অধঃপ্রেরিত হইয়া থাকে। অতএব গ্রহণীর তিনটী কার্য্য—১। অপক্ক অন্ন পরিপাক, ২। সারাংশ গ্রহণ, ৩। অসার ভাগকে অধঃপ্রেরণ। গ্রহণীতে যে বায়ু কার্য্য করে, তাহার নাম সমান বায়ু। যে ধমনী-মণ্ডলে সমান বায়ুর কার্য্য প্রকাশ পায়—তাহার ইংরাজী নাম Solarplexces,- এই সোলার প্লেক্সেস্ই গ্রহণীর অবস্থিতি স্থান।

ডাঃ শ্রীঅমরনাথ চট্টোপাধ্যায়
এম্, বি।

বাল্য-বিবাহের বৈজ্ঞানিক যুক্তি।

——:*:——

বৈদিক যুগের আর্য্য সমাজে—নারীগণ যৌবনাবস্থায় পরিণীতা হইতেন। তখন ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত--রমণীদের যুবতী সংজ্ঞা দেওয়া হইত।

রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণের যুগেও সমাজে যৌব-বিবাহ প্রচলিত ছিল। সাবিত্রী, দময়ন্তী, রুক্মিণী, শকুন্তলা প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়-মহিলাগণ—পূর্ণ যৌবনে স্বামী-সঙ্গে সম্মিলিতা হইয়াছিলেন।

প্রথম স্মার্ত্তযুগেও—যৌবন কালেই স্ত্রীলোকদের বিবাহ হইত। তবে তখন ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ—বয়সের একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন। যথা,—

"ত্রিংশদ্বর্ষঃ ষোড়শাব্দাং ভার্য্যাং বিন্দেত নগ্নিকাং" ইহার অর্থ—ত্রিশ বৎসরের বর ষোড়শী কন্যাকে বিবাহ করিবে।

মনুর আমলে—কন্যার বিবাহের বয়স আরও কমিয়া গিয়াছিল। ষোল বৎসর,—বার বৎসরে নামিয়াছিল। মনুর উপদেশ—"ত্রিংশদ্বর্ষো বহেদ্ ভার্য্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশ বার্ষিকীং।" তখন ত্রিশ বৎসরের বর, বার বছরের কন্যাকে বিবাহ করিত।

ইহার পরবর্ত্তী যুগে—শাস্ত্রকারগণের মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। সমাজে বাল্য-বিবাহের আদর বাড়িয়াছিল। এ সময় শাস্ত্রকারগণও ব্যবস্থা দিয়াছিলেন—

"দশ-বর্ষাষ্ট বর্ষাবা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ।
অতোঽপ্রবৃত্তে রজসি কন্যাং দদ্যাৎ পিতা সকৃৎ।"

অর্থাৎ কন্যার দশবর্ষ কিম্বা আটবর্ষ বয়সে বিবাহ হইলে, সে গার্হস্থ্যধর্ম্মের বিশেষ সহায় হইয়া থাকে। অতএব রজস্বলা হইবার পূর্ব্বেই পিতা একবার মাত্র কন্যাদান করিবেন।

যৌবন-বিবাহ কিরূপে বাল্যবিবাহে পরিণত হইয়াছিল, প্রবন্ধের সূচনাতে অতি সংক্ষেপে তাহা বিবৃত হইল। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, বিবাহ সম্বন্ধে-ঋষিগণের এরূপ মত-পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্য কি? হিন্দুর বিবাহ-বন্ধন বড় কঠোর, অতি কঠিন; দম্পতির মধ্যে একের মরণেও তাহা শিথিল হইবার নহে। এ বন্ধন পরলোকেও অবিচ্ছিন্ন থাকে। এমন স্থলে কন্যার পক্ষে স্বয়ং পাত্র নির্ব্বাচন করিয়া লওয়াই ত স্বাভাবিক, অভিভাবকের কথায় নির্ভর করিয়া একজন অজ্ঞাত ব্যক্তির হস্তে চিরদিনের জন্য আত্ম-সমর্পণ—কখনই যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে না। এই জন্যই বোধ হয় সেকালে স্বয়ম্বর বা গান্ধর্ব্ব-বিবাহ সমাজে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। কন্যা যুবতী না হইলে কেমন করিয়া বর পছন্দ করিবে! সুতরাং যৌবনাবস্থায় বিবাহ, দম্পতির জীবনে ভাবী সুখের হিসাবে—বৈধ। আট দশ বৎসরের কন্যা—বর নির্ব্বাচনের ভার গ্রহণ করিতে অক্ষম। অতএব বাল্য-বিবাহ প্রথা—সমাজে শুভকরী হইতে পারে না। স্বাস্থ্যের দিক দিয়া ধরিলেও—বাল্য-বিবাহ প্রথার সমর্থন করা চলেনা। পৃথিবীর প্রথম বিজ্ঞান "আয়ুর্ব্বেদে"ও বাল্য বিবাহের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। কেননা বাল্য বিবাহের বিষময় ফলে—সন্তান-সন্ততি অল্পায়ু হয়, দম্পতির সংসার-সুখ ও অকাল-বার্দ্ধক্যে পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে।

তবে ত্রিকালদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণ বাল্য-বিবাহের এত পক্ষপাতী হইলেন কেন? হিন্দু সমাজে, ক্রমশঃ বাল্য-বিবাহই বা প্রচলিত হইল কেন? ইহার কি কোনও উদ্দেশ্য নাই? ইহার কি কোনও বৈজ্ঞানিক যুক্তি নাই? আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব—নিশ্চয়ই আছে। আর্য্য ঋষিগণ যে আট নয় দশ বৎসর বয়সে কন্যার বিবাহ দিবার জন্য ব্যবস্থা দিয়াছেন,—শুধু ব্যবস্থা নহে—ঐরূপ বয়সে কন্যাকে পাত্রস্থ করিতে না পারিলে, কন্যার পিতৃপুরুষের নরক-সম্ভাবনারও ভয় দেখাইয়াছেন, শাস্ত্রের অনুশাসনকে কঠিন শপথগর্ভ করিয়া তুলিয়াছেন, নিশ্চয়ই ইহার কারণ আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি সেই কারণনির্ণয়েরই প্রয়াস পাইব। ইহাতে পাঠকগণও বুঝিতে পারিবেন—নিষ্প্রয়োজনে ঋষিগণ কিছুই করেন নাই। তাঁহাদের সকল মতই "বৈজ্ঞানিক" যুক্তির উপর একদা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল,—ভ্রান্ত, অন্ধ, মোহমুগ্ধ আমরা—সে কথা ভাবিয়া দেখিবারও চেষ্টা করি না।

যুক্তি তর্কের দ্বারা—ঋষি-বাক্যের ব্যাখ্যা করা উচিত কিনা?

আমি ত ঋষি-বাক্যের বৈজ্ঞানিক অর্থ আবিষ্কার করিতে বসিতেছি, কিন্তু আমার এ স্পর্দ্ধা নিতান্তই অজ্ঞানোচিত। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ যোগ-বলে যাহা বুঝিয়াছেন, যোগের অণুবীক্ষণে যে সকল সূক্ষ্ম তত্ত্ব দেখিয়াছেন, আমাদের মত ক্ষুদ্র কীটাণু কি তাহা সকল তত্ত্ব বুঝিতে পারে? এই জন্যই ঋষি

ঋষি-সিদ্ধান্ত অবনত শিরে বরাবরই মানিয়া আসিতেছে। ঋষি-বাক্যে হিন্দুর কখনই সংশয় হয় নাই, ঋষিরা যাহা মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন, হিন্দুর যুগান্তরের বিশ্বাস—সে মীমাংসা অভ্রান্ত, অতর্কনীয়, তাহার কারণ অনুসন্ধান করা, তাহা লইয়া বাদ-প্রতিবাদ করা—প্রকৃত হিন্দুর পক্ষে মহাপাপ। যোগ বলে বলীয়ান্-ঋষি—এমন অনেক অনুশাসন লিখিয়া গিয়াছেন, লৌকিক বিজ্ঞান বা যুক্তিতে তাহার রহস্য বুঝিতে যাওয়া, কেবল মানবের ধৃষ্টতা মাত্র। তাই মানবধর্ম্ম-শাস্ত্র প্রণেতা মনু বলিয়াছেন—

"হৈতুকান্ বকবৃত্তিংশ্চ বাঙ্ মাত্রেণাপি
নার্চ্চয়েৎ।"

যাহারা ঋষি-নির্ণীত তত্ত্বের হেতু অনুসন্ধান করিবে, তাহারা নাস্তিক; তাহাদের সহিত কখনও কথা কহিও না। বাচস্পতি মিশ্র ইহার যুক্তিও দেখাইয়াছেন—"আর্ষন্তু যোগিনাং বিজ্ঞানং লোকাবুৎপাদনায়নালং" যেমন অণুবীক্ষণের সাহায্যে অতি সূক্ষ্ম দ্রব্যও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, চর্ম্মচক্ষুতে তাহা দেখা যায় না, সেইরূপ ঋষিগণের যোগ-নেত্র-দৃষ্ট পদার্থ,মানবের দর্শনযোগ্য হইতে পারেনা।

তবে আবার ঋষিবাক্যের বিজ্ঞান তত্ত্ব বাহির করিতে চেষ্টা করিতেছি কেন? ইহার উত্তর—এখন আর সেকাল নাই। এখন আমরা সভ্যতাগর্ব্বী হইয়া, আমাদের চিরাচরিত ধর্ম্ম-কর্ম্মেরও বৈজ্ঞানিক যুক্তি জানিতে চাই। এখন যুগ ফিরিয়াছে, "কেন"র যুগ আসিয়াছে। অতএব বাল্য বিবাহের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া আমি যে অপরাধী হইতেছি, পাঠকগণ তাহা ক্ষমা করিবেন।

দেহে—বিষ প্রবাহ।—তন্ত্র-শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে—"ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে" অর্থাৎ বৃহদ্ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের শরীরেও তাহা বর্ত্তমান আছে। বৃহদ্ ব্রহ্মাণ্ডে যেমন চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, গিরি, নদী, বন, পর্ব্বত, উদ্ভিদ্, জীব, বিষ, অমৃত, স্বর্গ, নরক, প্রভৃতি স্থূলরূপে বিরাজিত, আমাদের দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডেও সেইরূপ গ্রহ-নক্ষত্রাদি সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত। কথাটা আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বলি। আমাদের চক্ষু দু'টী, দেহ ব্রহ্মাণ্ডের চন্দ্র-সূর্য্য। জিহ্বা—জলময়ী নদী, জঠরানল—অগ্নি, কেশশ্মশ্রু-লোম—উদ্ভিদ, অরণ্য মৃগাদির বিহার ক্ষেত্র, আমাদের কেশ ভূমিও উৎকুনাদির বিচরণ স্থান;—এইরূপ সমস্ত বিষয়েই ব্রহ্মাণ্ডের সহিত দেহের সাদৃশ্য দেখিতে পাইবেন। বহির্জগতে যেমন অমৃত ও বিষ আছে, মানব দেহেও সেইরূপ অমৃত ও বিষের অস্তিত্ব আছে। মানবের নখাগ্রে ও দশনাগ্রে বিষের প্রভাব উত্তমরূপেই উপলব্ধি হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন—শরীরের রক্ত, মজ্জা, বসা, শুক্র, মূত্র, বিষ্ঠা, শ্লেষ্মা, অশ্রু, ঘর্ম্ম—সমস্তই বিষ।

"বিষস্য বিষমৌষধং"—বিষের ঔষধ বিষ—একথা বৈজ্ঞানিকের সিদ্ধান্তের কথা। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক দেশে দেখা গিয়াছে—কেহ বিষ পান করিলে বিষ-বৈদ্য তাহাকে বিষ্ঠা খাওয়াইয়া দেন। আমাদের দেশেও দেখিয়াছি—কাহারও মুখমণ্ডলে 'যুবান্ পীড়কা' বা ব্রণ হইলে, তাহাতে নাসিকার শ্লেষ্মার প্রলেপ দেওয়া হয়। ইহাতে ২।১ দিনের মধ্যেই পীড়কার স্ফীতি ও বেদনা কমিয়া যায়। দেহমলে বিষ না থাকিলে,—এরূপ উপকার কখনই হইত না।

সেই বিষ বিশেষ অসাধু ব্যক্তির শরীরে "পাপ" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অসাধু শরীরের সেই পাপ আবার আলাপ, গাত্রস্পর্শ, নিঃশ্বাস, একত্র ভোজন, একত্র উপবেশন, ইত্যাদি কারণে অপরের দেহে সংক্রমিত হইয়া থাকে। এইরূপে অসাধু-শরীরের পাপসংসর্গ-কারীকে অসাধু করিয়া তোলে; ক্রমে সংসর্গ-কারী বিকৃত স্বভাব ও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে।

সাধুর শরীরেও এরূপ বিষ আছে, কিন্তু পুণ্যকর্ম্মের অমৃত সেচনে তাহা স্নিগ্ধ ও মৃদু-বীর্য্য হইয়া পড়ে, তাহা আর অপর দেহে প্রবেশ করিয়া বিষক্রিয়া উৎপাদন করিতে পারেনা।

অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, কোন কোন ব্যক্তি কাহারও কাহারও সংসর্গে যেন জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়ে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে—যাহার শরীরে বিষ-প্রবাহ বেশী, তাহার সংস্পর্শে থাকিলে সংসর্গকারী ক্ষীণ-পুণ্য ও হৃত বল হইয়া যায়। কাহার শরীরে বিষ-প্রবাহের আধিক্য আছে, আর্য্য ঋষিগণ তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের লক্ষণাদি দেখিয়া ইহা বুঝিতে পারিতেন। কাহার সংসর্গ কাহার সহ্য হইবে, কাহার বা সহ্য হইবে না, দেহের চিহ্ন দেখিয়াই তাঁহারা ইহার নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। বিবাহের পূর্ব্বে—বর কন্যার রাশি-বিচার, গণ-বিচার, লক্ষণালক্ষণ-বিচার প্রভৃতি বিষয় যিনি মনোযোগের সহিত আলোচনা করিবেন, তিনিই আর্য্যঋষির অভিজ্ঞতার প্রশংসা করিবেন।

এখন লোকে বরং কন্যার লক্ষণালক্ষণ কতকটা দেখে, বর-সম্বন্ধে কোনও বিচার করেনা। পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। তখন কন্যাপক্ষ বরের লক্ষণালক্ষণ দেখিতেন, বর পক্ষও কন্যাকে যাচাই করিয়া লইতেন। জ্যোতিষশাস্ত্র, সামুদ্রিকশাস্ত্র স্মৃতিশাস্ত্র—এই পরীক্ষা কার্য্যের সহায়ক হইত।

এখন বরপক্ষ দেখেন—কন্যার রূপ ও কন্যার পিতার ঐশ্বর্য্যসম্পদ, আর কন্যাপক্ষ দেখেন—বরের পাশ বা ডিগ্রীর গৌরব। ইহাতে যে দেশের শোচনীয় সর্ব্বনাশ হইতেছে, বড় বড় বংশ ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইতেছে, পুত্রকন্যার দাম্পত্য-জীবন বিঘ্ন-সঙ্কুল হইয়া উঠিতেছে—স্বার্থমুগ্ধেরা তাহা ভাবিয়াও দেখিতেছে না।

বালিকা বিবাহের গুণ ও যুবতী বিবাহের দোষ।—যে সকল রমণীর দেহে বিষের প্রবাহ বেশী থাকিত, সেকালে তাহারা "বিষকন্যা" নামে অভিহিত হইত; বিষকন্যার সংসর্গে—পুরুষ জীর্ণশীর্ণ হইয়া প্রাণ হারাইত। এ কথা পৃথক প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব। এক্ষণে আমার বক্তব্য শেষ করিয়া যাই।

বিষকন্যার সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়া, অনেকেই তাহাদিগকে বিবাহ করিবার জন্য লালায়িত হইত। ফলে এইরূপ বিবাহের বিষময় ফলে সমাজের অত্যন্ত অনিষ্ট হইত। এই অনিষ্ট নিবারণের জন্যই—আর্য্য ঋষিগণ বাল্যবিবাহ-প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। যুবতীর দেহে বিষপ্রবাহের আধিক্য লক্ষ্য করিয়া, তাঁহারা বালিকা অবস্থায় কন্যার বিবাহ দিতে সমাজকে বারংবার উপদেশ দিয়া ছিলেন। সংক্রামক বিষ-দোষ হইতে পুরুষকে রক্ষা করিবার জন্যই—বালিকা-বিবাহের ব্যবস্থা। ঋষিগণ বুঝিয়াছিলেন—বালিকা অবস্থায় কন্যাকে বিবাহ করিলে [illegible]

ততটা সম্ভাবনা থাকিবে না। যেমন আধপক্ক অজ্ঞাত-সার বিষতরুর বিষভক্ষণে, কথঞ্চিৎ ক্লেশ হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে মৃত্যুর ভয় থাকে না। ক্রমশঃ অল্পপরিমাণ হইতে আরম্ভ করিয়া পরে অধিক পরিমাণ আফিম্ অভ্যাস ও প্রযুক্ত ভক্ষণকারিকে মারিতে পারে না, সেই প্রকার যে বালিকার শরীরে বিষের অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছে মাত্র,—সেই নব বিবাহিতা বালিকা-বধূর সংসর্গে তাহার স্বামী বিষদোষ আক্রান্ত হয় না! যুবতী-বিবাহে এ সুবিধা নাই। যুবতী প্রবল বিষময়ী, পতি গৃহে আসিয়াই সে পতিকে আয়ত্ত করিয়া ফেলে, বিবাহের কন্যা হইলেও—সে ততটা লজ্জাশীলা হয় না, সকলকে অতিক্রম করিয়া সে একেবারেই স্বামীর সহচরী হইয়া পড়ে। কিন্তু বালিকা-বধূর এতটা স্বাধীনতা থাকেনা, লজ্জায় জড়সড় হইয়া—পতিগৃহে আসিয়া সে কিছু দিন কাহারও সঙ্গে তত কথাবার্ত্তা কহে না, কন্যার মত স্নেহের পাত্রী ও আদ-রিণী হইয়া শাশুড়ীর কাছে কাছে থাকে, তাঁহার কাছেই রাত্রে শোয়, দিবাভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহকর্ম্মে রত থাকে। ক্রমে যত শ্বশুর বাড়ীতে তাহার কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত হয়। সে শাশুড়ীকে রন্ধনকালে সাহায্য করে, স্বামীর ছাড়া-কাপড় কাচিয়া শুকাইতে দেয়,—পাদ-প্রক্ষালনের জল রাখে, স্বামীর ভোজনান্তে উচ্ছিষ্ট ভোজন করে। এইরূপে সেই বালি-কার শারীরিক উষ্মা অল্পে অল্পে তাহার স্বামীর সহ্য হইয়া যায়। প্রথম বিষের বেগ শ্বশুর-শাশুড়ী-ননদী ও দেবর প্রভৃতি পরি-জনের সম্পর্কে অনেকটা সাম্য লাভ করে, পতির দেহে প্রবেশ করিয়া আর ততটা বিকৃতি জন্মাইতে পারে না। প্রথমে, অল্পে অল্পে সহিয়া সহিয়া অভ্যস্ত হইয়া গেলে, শেষে গুরুতর সংসর্গেও ততটা অনিষ্ট হয় না। বরং অহিফেনের মতই অভ্যস্ত ব্যক্তির দেহের উপকারই করিয়া থাকে।

মানুষের শরীরগত উষ্মা বা তাড়িত শক্তি স্বভাবতঃ ইতস্ততঃ বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে। কিন্তু আলাপ-গাত্রস্পর্শাদি সংসর্গে পাপ নামক দৈহিক বিষ উক্ত তাড়িত-প্রবাহের সঙ্গে—এক দেহ হইতে অন্য দেহে প্রবিষ্ট হয়। এই জন্যই "প্রায়শ্চিত্ত বিবেকে"র পতিত সংসর্গ প্রকরণে লিখিত হইয়াছে—

আলাপাদ গাত্র সংস্পর্শান্নিঃ শ্বাসাৎ
সহ ভোজনাৎ।
সহশয্যাসনাধ্যায়াৎ পাপং সংক্রমতেনৃনাং॥

পরস্পর আলাপ, গাত্র-স্পর্শ, নিঃশ্বাস, একত্র ভোজন, শয়ন, উপবেশন ও অধ্যয়ন—এই সকল কারণে এক দেহের পাপবৃত্তি অন্য দেহে প্রবেশ করিয়া থাকে। দেবল ও পরা-শরের মতে—যাজন, অধ্যাপন, যৌন-সংসর্গ, যানারোহণ—ইত্যাদি কারণেও এক দেহ হইতে অন্য দেহে দোষ বা পাপ অন্য শরীরে সংক্রমিত হইয়া থাকে।

স্ত্রীলোকের রজঃনিঃস্রাবের সঙ্গে তাহার শরীর গতবিষ চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত হইতে থাকে, তখন তাহার সহিত অল্পমাত্র সংস্রবও ভয়ানক অনর্থের সৃষ্টি করে। এই জন্যই—ধর্ম্ম-শাস্ত্রে রজঃস্বলা স্ত্রীকে স্পর্শ করা মহাপাপ বলিয়া বর্ণিত। চরক সুশ্রুত প্রভৃতি বিজ্ঞানা-চার্য্যগণও—রজঃস্বলা নারীর সংসর্গ হইতে পুরুষকে দূরে থাকিবার পরামর্শ দিয়াছেন।

এই জন্যই রজঃপ্রবৃত্তির পূর্ব্বে বালিকাকে বিবাহ করিবার ব্যবস্থা। শাস্ত্রের অনুশাসন —"যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে- বিষবেগ পরিস্ফুট

ভাবে উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিয়া থাকে, অতএব যে ব্যক্তি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া সুখ-শান্তিতে থাকিতে ইচ্ছা করে, সে কখনও বয়োধিকা-কন্যার পাণিপীড়ন করিবে না" * "ঘর্ম্ম, মূত্র, আর্ত্তবাদি দূষিকা বা বিষে করাল কবল হইতে আত্মরক্ষার জন্য, নারী-দেহস্থ বিষ প্রচ্ছন্ন ভাবে অঙ্কুরাবস্থায় থাকিতে থাকিতে বালিকা কন্যাকেই বিবাহ করা উচিত।"

অনেক দেখিয়া-শুনিয়াই—লোক চরিত্রজ্ঞ, ধর্ম্মতত্বজ্ঞ, এবং শরীর তত্বজ্ঞ ঋষিগণ এক-বাক্যে বলিয়া গিয়াছেন—"অষ্টম, নবম ও দশম বর্ষ বয়স্কা বালিকাই বিবাহযোগ্যা।"

এদিকে সামাজিক ব্যাপারের হিসাবে দেখিতে গেলেও—বালিকা বিবাহই প্রশস্ত মনে হয়। কেন না, পুষ্পবতী প্রমদার মানসিক চাঞ্চল্য অনিবার্য্য। সুতরাং সে অবস্থায় তাহারা পঞ্চশরের পাড়নে উৎপথবর্ত্তিনী হইয়া, পিতৃকুল কলুষিত করিতে পারে। অতএব রজঃপ্রবৃত্তির পূর্ব্বেই বালিকাকে পাত্রসাৎ করিলে, পিতামাতা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন।

যদি নিতান্ত ভদ্র কুলের কন্যা—লোক লজ্জায় এবং অন্যান্য কারণে, পুষ্পিতা হইয়াও উৎপথবর্ত্তিনী না হয়, কিন্তু মানসিক কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনায় অস্বাভাবিক উপায়ে নিজেরই আর্ত্তব জরায়ু মধ্যে নিহিত করিয়া, হংসের অসংযোগে হংসীর অসার ডিম্ব প্রসবের মত—সর্প বৃশ্চিক-কুষ্মাণ্ডাকৃতি বিকৃত-প্রসব জন্মাইতে পারে। এরূপ ঘটনা ঘটা অসম্ভব ও নহে। শারীর তত্ত্ববিদ্ অসাধারণ পণ্ডিত ভগবান্ সুশ্রুত অপ্রাকৃত গর্ভের যে আভাষ দিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব জ্ঞান-গবেষনার বড়ই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শারীর স্থানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আচার্য্য যে উপদেশ দিয়াছেন, পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

রজঃস্বলাচ যা নারী বিশুদ্ধা পঞ্চমে দিনে।
পীড়িতা কামবাণেন ততঃ পুরুষমীহতে॥
যদানার্য্যাকুপেয়াতাং বৃষস্য স্ত্যো কথঞ্চন।
মুঞ্চস্ত্যো শুক্র মন্যোন্য মনস্থি স্তত্র জায়তে॥
ঋতুস্নাতা তু যা নারী স্বপ্নে মৈথুনমাচরেৎ।
আর্ত্তবং বায়ুরাদায় কুক্ষৌ গর্ভং করোতি হি॥
মাসি মাসি বিবর্দ্ধেত গর্ভিণ্যা গর্ভ লক্ষণং।
কললং জায়তে তস্যা বর্জ্জিতং পৈত্রিকৈ গুণৈঃ॥
সর্প-বৃশ্চিক কুষ্মাণ্ড বিকৃতাকৃতয়শ্চ যে।
গর্ভাস্ত্বেতে স্ত্রিয়াশ্চৈব জ্ঞেয়াঃ পাপকৃতা ভৃশং॥

অধিকন্তু, বালিকা অবস্থায় বিবাহ হইলে বধূকে শিক্ষাদ্বারা সুগঠিত করিয়া পতিকুলের অবস্থানুরূপ স্বভাবা করিয়া লইতে পারা যায়। অতএব যে দিক দিয়াই বিচার করুন না কেন, বালিকা বিবাহই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হইবে।

শ্রীরাম সহায় কাব্যতীর্থ
বেদান্ত শাস্ত্রী।

---

* পণ্ডিত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্ত ভূষণের "বৈবাহিক বিজ্ঞান" পড়ুন।

প্রার্থনা।

সমুদ্র মন্থনকালে বিশ্বসংসারের হিতের জন্য যে দেব, অমৃতপূর্ণ কমণ্ডলু হস্তে বপুষ্মান ধন্বন্তরি মূর্ত্তিতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, যিনি বিশ্বসংসারের অমঙ্গলময় বিষপান করিয়া শিবনাম ধারণ করিয়াছেন সেই সর্ব্বসুখ দাতা সর্ব্বরোগ নিবারক শিবস্বরূপ আদিদেব ধন্বন্তরিকে নমস্কার। হে দেব! "ভেষজমসি" তুমিই ভবসংসারের ভেষজ স্বরূপ,—"ভেষজম্ গবেঽশ্বায়, পুরুষায় ভেষজম্" তুমি গো অশ্বাদি প্রাণীসকল এবং মনুষ্যগণের ভেষজ স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার করি। "অধ্যবোচদধিবক্তা প্রথমো দৈব্যো ভিষক" তুমিই অধিবক্তা সম্বাদে তুমিই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের উপদেশ দিয়াছিলে, অতএব আঁয়ুর্ব্বেদ গুরো! তোমাকে নমস্কার করি।

দেব, বর্ত্তমান বিপদে তুমিই আমাদের একমাত্র শরণ্য, তাই আমাদের হৃদয় তোমার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা বারম্বার তোমাকে অহ্বান করিতেছি, তুমি আমাদের পুত্র ও পৌত্র যুবা ও বৃদ্ধ, গো ও অশ্ব প্রভৃতি—আমাদিগকে রক্ষা কর।

দেব! "কালশ্চায়ং আঁয়ুর্ব্বেদোপদেশস্য" এই সেই আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির যথার্থ কাল উপস্থিত হইয়াছে, এই ভারতবর্ষের ত্রিশকোটী প্রজার মধ্যে এমন একজনও নাই যে, তাহার দেহ কোন না কোন রোগে আক্রান্ত নয়, অম্ল, অজীর্ণ জ্বর যক্ষ্মা, ধাতুদৌর্ব্বল্য, মেহ, মহামারী বিসূচিকা প্রভৃতি কত প্রকারের ভীষণ রোগ সমূহ যে এই ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইয়া ভারতবাসীর দেহ, প্রাণ অকালে হরণ করিতেছে তাহার ইয়ত্ত্বা করা যায় না। একা এই বঙ্গদেশেই কেবলমাত্র জ্বর রোগে বৎসর বৎসর অসংখ্য লোক মৃত্যু মুখে পতিত হইতেছে। উদরে অন্ন নাই পরিধানে বস্ত্র নাই, তার উপর এই সকল সাক্ষাৎ কৃতান্তের অনুচর রূপ রোগের দৌরাত্ম্যে লোক সমূহ অস্থির হইয়া পড়িয়াছে, সম্বাদপত্রের বিজ্ঞাপন স্তম্ভগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়, কেবল মাত্র ঔষধের বিজ্ঞাপনেই সম্বাদপত্র পরিপূর্ণ। যেন এদেশের লোক আর কোন কিছু চায় না, কেবল ঔষধ ঔষধ করিয়াই চারিদিকে চীৎকার করিতেছে। হে অমরাময়-নিসূদন, ভগবান, ধন্বন্তরি! কি পাপে ভারতবাসীর এরূপ দুর্দ্দিন উপস্থিত হইল! ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসীর পক্ষে এরূপ দুর্দ্দিন বুঝি আর কোন কালে হয় নাই। এলাহাবাদ, পঞ্জাব, নর্ম্মদাতীর, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি যে সকল পৃথিবীর সর্ব্বোত্তম স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল, যে সকল স্থানের মনুষ্যেরা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট দেহ ধারণ করিয়া যাবতীয় জাতির মধ্যে প্রধানতম বীর জাতীয় বলিয়া খ্যাত ছিল। সে সকল, স্থান এক্ষণে সর্ব্বপ্রকার ব্যাধির আবাসভূত হইয়া উঠিয়াছে। এবং সেই সকল স্থানের লোকেরা এক্ষণে নিজ নিজ দেহ ও প্রাণ লইয়া ব্যতিব্যস্ত। হে কাশিরাজ! হে আদিদেব! ভারতবর্ষে প্রতিদিন যেরূপ লোকক্ষয় হইতেছে, তাহাতে এক্ষণে খণ্ড প্রলয় উপস্থিত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অতএব তুমি আবার জাগ্রত হও, জাগ্রত হইয়া

আবার ভারতবাসীকে স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও রোগ-তত্ত্বের উপদেশ প্রদান কর।

করুণাময় ইংরেজরাজ ভারতবাসীর এই শোচনীয় দশা দর্শন করিয়া সর্ব্বতোভাবে যাহাতে ভারতবর্ষের রোগনিকর নিবারণ হয় এবং ভারতবাসী সুস্থ থাকে বিধিমত প্রকারে তাহার চেষ্টা করিতেছেন। রাজনীতির চর্চ্চা, শিক্ষা বিস্তারের চর্চ্চা, শাসন-ব্যবস্থা প্রভৃতি রাজ্যের অপরাপর বিষয় চিন্তা করা অপেক্ষা প্রজার স্বাস্থ্যচিন্তা করা যে সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য, রাজা এক্ষণে তাহা বুঝিয়াছেন, এই কারণে ম্যালেরিয়া-কমিশন প্লেগ-কমিশন্, খালখনন্, হেল্থ আফিসার নিয়োগ, প্রভৃতিতে প্রতিবৎসর অসংখ্য অসংখ্য মুদ্রা ব্যয় করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই কোন উপায় উদ্ভাবন বা রোগাদি নিবারিত হইতেছে না। লক্ষ লক্ষ টাকা জলের ন্তায় ব্যয় করিয়া রাজা কখনও স্থির করিতেছেন,—মূষিকের বাহুল্য প্লেগের কারণ,—মশকের দৌরাত্ম্যে ম্যালেরিয়ার বীজ সংক্রামিত হইতেছে বা গোময়ের ব্যবহারে রোগের উৎপত্তি হইতেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরূপ বহুল পরিমাণে রোগ নিবারণের চর্চ্চা হইতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এপর্য্যন্ত কিছু নিশ্চিত বা স্থির হইল না, বা হইতেছে না। মনুষ্যসাধ্য যতটা যত্ন ও চেষ্টা হইতে পারে রাজা তাহা করিতে পশ্চাৎপদ হইতেছেন না। কিন্তু কিছুতেই ফলোদয় হইতেছে না, পরন্তু এত যত্ন, এত চেষ্টা, কিজন্য ব্যর্থ হইতেছে,—কেন ফলোদয় হইতেছে না, এ প্রশ্নের উত্তর ভারতবাসী তুমি কি আজ দিতে পার? পার না ভারতবাসী,—তুমি যে এক্ষণে স্বাবলম্বন ও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, ধর্ম্মবুদ্ধি বিনষ্ট করিয়াছ, সেই অধর্ম্ম সঞ্চয়েই আজি ব্যাধি ও বিপত্তি প্রাদুর্ভাবের একমাত্র কারণ হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবাসী আজি ইহা ভুলিয়া গিয়াছে।

অতএব হে ধন্বন্তরি! তুমি আবার জাগ্রত হও, আবার তুমি "অহংহি ধন্বন্তরি রাদিদেবো জরারুজোমৃত্যুহরোঽমরাণাং" বলিয়া অনাথ-ভারতবাসীর হৃদয়কে আশ্বস্ত করিয়া তাহাদিগকে দেহতত্ত্ব স্বাস্থ্যতত্ত্ব, আয়ুতত্ত্ব ও আহারতত্ত্ব, ভেষজতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ব ইত্যাদির উপদেশ দান কর। তুমি আবার বুঝাইয়া দাও যে, ধর্ম্ম সহায় ব্যতীত কেবল মনুষ্যসাধ্যে যত্নে দেহতত্ত্ব বা স্বাস্থ্যতত্ত্ব জানিবার উপায় নাই। পরন্তু যাঁহারা "রজস্তমোভ্যাং নির্ম্মুক্তা স্তপোজ্ঞানবলেন যে। যেষাং ত্রৈকাল মমলং জ্ঞানমব্যাহতং সদা। আপ্তাঃ শিষ্টা বিবুদ্ধাস্তে তেষাং বাক্যমসংশয়ং। সত্যং বক্ষ্যন্তি তে কথান্ নাসত্যং নীরজস্তমাঃ॥ যাঁহারা জ্ঞান ও তপোবলে রজঃ ও তমোগুণ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, যাঁহারা ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান এই ত্রিকালজ্ঞ, সেই আপ্ত পুরুষগণ স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও রোগতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই সত্য। হে দেব! তুমি আবার দেশবাসিবর্গকে বুঝাইয়া দাও যে, বাহ্য জল বায়ু, বা বলকর আহার বিহারাদির দ্বারা কেবল নীরোগ হইতে পারা যায় না। পরন্তু সমুদয় স্বাস্থ্যের মূল কারণ ধর্ম্ম ও সমুদয় রোগের মূল কারণ প্রজ্ঞাপরাধ বা অধর্ম্ম। এখনকার উচ্চ শিক্ষিতগণ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, শৌচাচার বা সদাচার প্রভৃতি রোগ নিবারণের কারণ বলিয়া স্বীকার করেন না, কিন্তু হে ধন্বন্তরি, তুমি আবার বুঝাইয়া দাও যে, বর্ত্তমান প্রথাই সংক্রামক রোগনিবৃত্তির প্রকৃত উপায়। স্লেচ্ছত্ব হইতেই সংক্রামক ব্যাধির [illegible]

শৌচাশৌচ ও সদাচার সেবনই দীর্ঘায়ুর মূল-কারণ।

হে দেব! তুমি আবার লোক সকলকে বুঝাইয়া দাও যে, "উৎপদ্যন্তে ব্যবন্তে চ যান্যনানি কানিচিত। তান্যর্বাক্ কানিকতয়া নিষ্কলান্য নৃতানি চ" বেদ বহিষ্কৃত শাস্ত্র সকল নিষ্ফল ও তমোনিষ্ঠ। প্রাচীন কাল হইতে এ পর্য্যন্ত কি গ্রীক্, কি রোম, কি মিসর কত দেশে কত প্রকার চিকিৎসা শাস্ত্রের উদ্ভাবন ও লয় হইয়া গেল তাহা বলা যায় না। এক্ষণে সেই সকল শাস্ত্রের কার্য্যকারিতা আর নাই, তাহারা সকলেই নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। পরন্তু আমাদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অপরিবর্ত্তিত ও নিত্যরূপে থাকিয়া তাহার কার্য্যকারিতা আজও সমানভাবে দেখাইয়া বেদের অপৌরুষেয়ত্ব প্রমাণ ও ঘোষণা করিতেছে। প্রাচীন কেন, বর্ত্তমান কালের ও অন্যান্য দেশের চিকিৎসা পুস্তক সকল ও তাহাদের অনুমোদিত ঔষধাদির বিচার কর, দেখিবে যে, আজ যাহাকে কার্য্যকর বলিয়া পুস্তক প্রণেতাগণ যুক্তি সহকারে প্রমাণ করিতেছেন—কল্য আবার তাহাদেরই স্বতন্ত্র যুক্তি বলেই তাহাই আবার নিষ্ফল ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া নির্ণীত হইতেছে। কখনও বা যুক্তি বলে প্রমাণীকৃত হইতেছে—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করা ভাল, প্রাতঃস্নান করা ভাল, শবদাহ প্রথা ভাল, ক্যালামেল প্রয়োগ, রক্তমোক্ষণ ক্রিয়া, বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ ইত্যাদি ভাল, আবার হয়ত পরদিনেই যুক্তি বলে বুঝান হইতেছে যে, সূর্য্যোদয়ের পর গাত্রোত্থান করা ভাল। শবদাহ অপেক্ষা সমাধি প্রথা ভাল। ক্যালামেল প্রয়োগ ও রক্তমোক্ষণ ক্রিয়ায়, দেহের অনিষ্ট করে অথবা কুইনাইন অপেক্ষা ফেনাসিটি-প্রয়োগে জ্বর আশু নিবারিত হয়। এইরূপ যুক্তিমূলক শাস্ত্রের অকিঞ্চিৎকরতা দেখাইয়া হে দেব! তুমি লোক-সমাজকে দেখাইয়া দাও যে, আয়ুর্ব্বেদ প্রতিপাদ্য-স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও রোগতত্ত্বই যথার্থ সত্য। কিন্তু একালে আর সে ব্রহ্মচর্য্য নাই, সে তপস্যা নাই প্রকৃত সে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নাই, যাহাতে লোকে বেদ-বাণীর যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া তন্মতানুবর্ত্তী হইবে, এক্ষণে তমোগুণের আতিশয্য হেতু জনপদোধ্বংশীয় কারণ সমূহের অনুশীলনে সমাজ দিন দিন অগ্রসর হইতেছে, পূজ্যপূজা-ব্যতিক্রম সমাজের এক্ষণে যশও গৌরবের কারণ হইয়াছে, জীবন্ত দেবতা মাতা-পিতাকে বা স্নেহাস্পদ ভ্রাতা-ভগ্নিকে অন্ন বা আশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া লোক আর মনে করেনা। সত্বগুণের আধার দেবতা, ব্রাহ্মণ সমাজে আর পূজা পায়না, নিতান্ত আসুরিক ভাবে উন্মত্ত হইয়া সমাজ এক্ষণে সত্বগুণের যাহা কিছু বিপরীত, জনপদোধ্বংসের যত কিছু কারণ,—সেই সকলের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত রহিয়াছে। শাঠ্য ও কাপট্য, লাম্পট্য প্রভৃতি এখন সমাজের ভূষণ স্বরূপ ব্যাপৃত রহিয়াছে! পবিত্র চন্দনের পরিবর্ত্তে অপবিত্র দ্রব্যসকল অঙ্গে লেপন করিয়া সমাজ এক্ষণ নিজেকে পবিত্র মনে করিতেছে। বিল্ব-পত্র বা তুলসী পত্রের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া সমাজ এক্ষণে ক্রোটন রোপিত করিয়া ভদ্রাশনের শোভা বাড়াইতেছে। দুগ্ধ ও ঘৃতের উপর তাহার দিন দিন অশ্রদ্ধা বাড়িতেছে। এমন এক তরঙ্গ আসিয়াছে যে, তাহার প্রভাবে কে প্রকৃত আত্মীয়, কে প্রকৃত পর, এক্ষণে সে তাহা চিনিতে পারিতেছে না। সমাজ এক্ষণে ঘৃত দুগ্ধের পরিবর্ত্তে মাংস [illegible]

সদ্যঃ গাভী দুগ্ধ অপেক্ষা বৈদেশিক পর্য্যুষিত জমাট দুগ্ধে তাহার বড়ই আদর, নারিকেল জলের পরিবর্ত্তে সোডাওয়াটার তাহার অধিকতর প্রিয় বস্তু হইয়াছে। হস্ত মৃত্তিকা ও তৈল মর্দ্দনের পরিবর্ত্তে সে সাবানের উপকারিতা বুঝিয়াছে, পিতল বা কাঁসার বাসনের পরিবর্ত্তে সে কাঁচের বা লোহার (এনামেলের) বাসনের আদর করে, গোময়ের পরিবর্ত্তে সে ফেনাইনকে ভাল বলে। ফলতঃ যাহা কিছু সাত্ত্বিক বা পবিত্র—সকলই তাহার চক্ষে এক্ষণে বিষবৎ প্রতীত হইতেছে। সুতরাং জনপদ ধ্বংসীয় কারণ সমূহের একত্র সমাবেশের আর বাকী কি রহিয়াছে, সকলই পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছে।

অতএব হে দেব! হে সর্ব্বাময় নিসূদন! তুমি আবার জাগ্রত হও, আবির্ভূত হও, তুমি আবার ভারত বাসীর কর্ণকুহরে বেদমন্ত্রের অমৃতময় ধারা ঢালিয়া দিয়া তাহাদের অন্ধকারময় অন্তঃকরণে সত্ত্বগুণের উজ্জ্বল আলোক জ্বালিয়া দাও শান্তিময় গন্তব্য পথ দেখাইয়া দাও, এবং বুঝাইয়া দাও যে, সত্ত্ব, রজঃ, তম যেমন তিনই আত্মার গুণ, তদ্রূপ বায়ু, পিত্ত, কফ—এই তিনই আয়ুস্তন্ত্রের মূল, এই তিনেরই বিষমাবস্থায় সমুদয় রোগের উৎপত্তি, অতএব এই তিনেরই প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের আহার্য্য-বিচার ও ঔষধ-বিচার করিতে হইবে, কিন্তু এক্ষণকার সমাজে এই সকল সূক্ষ্মতম তত্ত্ব ধারণা করিবার সামর্থ্যই বা কোথায়? কাল, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ার্থের যোগ, অযোগ ও মিথ্যাযোগ যে সমুদয় রোগোৎপত্তির হেতু, মানব সমাজের অধর্ম্মেই যে, সূর্য্য, চন্দ্র, জল, বায়ু, ওষধি বনস্পতি প্রভৃতি সমুদয় বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, এই জগৎ যে মনোময়, রোগের যে সাধ্যত্ব অসাধ্যত্ব ও যাপ্যত্ব আছে, কতকগুলি রোগ যে, পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মজ, কতকগুলি যে ইহজন্মজ বা অভিশাপাদি জনিত, কাল যে রোগ আরোগ্য বা রোগ প্রবর্ত্তনের প্রধান কারণ,—সকলে যাহাতে আমরা বিশদ রূপে উক্ত সূক্ষ্মতম তত্ত্ব সকল বুঝিতে পারি, হে ভগবন্! তুমি আমাদিগকের প্রতি সেই শুভ বুদ্ধি প্রেরণ কর। যে দেশের জল বায়ুতে যে রোগ জন্মে, সেই দেশের ওষধি-বনস্পতিতে সেই রোগ আরোগ্য হয়, বেদানুমোদিত পথ্যে যাহাদের আহার বিহার স্নান, পান ও আচার-ব্যবহারাদি সম্পন্ন হয়, স্নান পান আহার বিহারাদির সময় নিশ্চিত করিয়া আমরা যে আয়ুর্ব্বেদের কৃপায় জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করি, সেই আয়ুর্ব্বেদ উপর নির্ভর করিয়া আমদের রোগযাত্রা নির্ব্বাহ করাও উচিত, এই তথ্য হে দেব! আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও, হে দেব! এই সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে—যাহাতে তোমার উপদিষ্ট স্বাস্থ্যের তত্ত্ব, আহার তত্ত্ব, দ্রব্য তত্ত্ব, কৌমার ভৃত্য, শল্য শাস্ত্র, অগদতন্ত্র প্রভৃতি অষ্টাঙ্গের বিচার হয়। অতএব তুমি আবার জাগ্রত হও, ভারতবাসী তোমাকে নতশিরে বারম্বার নমস্কার করিতেছে, তুমিই ভারতের আদিগুরু, ভারতবাসী তোমার শরণাপন্ন হইতেছে, দেশরক্ষকগণ দেশের হিতার্থে যত্নবান হইয়া, স্বাস্থ্যতত্ত্বান্বেষী হইয়া রোগ নিবারণোপায় সকল আবিষ্কারে যত্নবান হইয়াছেন, এ সময়ে হে ধন্বন্তরি! তুমি আমাদের বুদ্ধিগত করিয়া তোমার বেদবাণী সকল প্রচার পূর্ব্বক আমাদিগকে রোগ শোক, পাপ-তাপ হইতে পরিত্রাণ কর,—এই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীবারাণসীনাথ গুপ্ত
বৈদ্যরত্ন, ভিষগাচার্য্য।
ভূতপূর্ব্ব "বৈদ্য সঞ্জীবনী" সম্পাদক।

ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায়।

—:*:—

ম্যালেরিয়া আমাদের দেশে ছিলনা, ইহা কিরূপভাবে আমাদিগকে আক্রমণ করিল, তাহার তথ্যও কেহ বলিতে পারেন। ১৮০৪ খৃঃঅব্দে মুর্শিদাবাদ ও কাশিমবাজারে এই রোগের প্রথম আবির্ভাব হয়। তাহার ২০ বৎসর পরে ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজা সীতারাম রায় প্রতিষ্ঠিত যশোহর জেলার মহম্মদপুর ম্যালেরিয়ার আক্রমণে বিধ্বস্ত প্রায় হইয়াছিল —ম্যালেরিয়ার ইতিবৃত্তে জানিতে পারা যায়। ঐ আক্রমণে মহম্মদপুরের পাঁচ হাজার লোক কাল-কবলিত হইয়াছিল। এই সময় হইতেই বাঙ্গলাদেশের লোক ম্যালেরিয়ার নাম ভাল করিয়া জানিতে পারে। মহম্মদপুর ধ্বংসপ্রায় করিয়া নলডাঙ্গা, গদখালি প্রভৃতি যশোহরের চিত্রা নদীর উভয় পার্শ্বস্থ গ্রামগুলির লোক ধ্বংস করিয়া ম্যালেরিয়া-রাক্ষসী নদীয়ায় প্রবেশ করিল। এই সময় উলা বা বীরনগরের ৯০০০ লোক ইহার শুভাগমনে একই সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

তাহার পর ২৪ পরগণায় ইহার প্রভাব—বিস্তারও বড় কম হইল না। কাচড়াপাড়ার লোক সংখ্যা ৩০০০ এর মধ্যে ১৩৫৫ জন ইহার আক্রমণে কাল-কবলিত হইল। ১৮৫৭ সালে নৈহাটি ও হালিসহর গ্রাম দুইখানি ম্যালেরিয়ার আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়া পড়িল। ১৮৬১ সালে হুগলি নিবাসীগণ ইহার প্রকট মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিল। হুগলি জেলার ত্রিবেণীতে ম্যালেরিয়া আরম্ভ হইয়া বার-বাসিনী আক্রমণ পূর্ব্বক বারাসত অধিকার করিল।

ইহার কয়েক বৎসর পরে ১৮৬৫ খৃঃঅব্দে কাঁটোয়া, মেহেরপুর এবং গোবরডাঙ্গার লোকে ইহার তাণ্ডবলীলা প্রত্যক্ষ করিয়া ম্যালেরিয়া কি—জানিতে পারিল। ক্রমে সমগ্র বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়া—সকল রোগকে ছাড়াইয়া উঠিয়া স্বীয় আধিপত্য প্রবলভাবে বিস্তার করিতে সমর্থ হইল।

এই ম্যালেরিয়া কি এবং কি কারণে বাঙ্গালাদেশে অবাধ আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইল, এইবার সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাউক।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, "ম্যালেরিয়া জীবাণু পররুহ উদ্ভিদ শ্রেণীর অন্তর্গত।" ১৮৮০ খৃঃঅব্দে ফরাসী দেশীয় ডাক্তার ল্যাভেরণ অনুবীক্ষণ দ্বারা ম্যালেরিয়াক্রান্ত রোগীর শোণিতে এই জীবাণু সকল অবলোকন করেন। তাহার পর ১৮৯৭ খৃঃ-অব্দে ডাক্তার ম্যান্‌সন্ মশক হইতে এ জীবাণু সকলের উৎপত্তি হইয়া থাকে—এ কথা দেশ মধ্যে প্রচার করেন। ১৮৯৯ খৃঃঅব্দে ডাক্তার 'রস'ও এই মতের পোষকতা করেন। তিনি পরীক্ষা দ্বারা স্থির করেন যে, মশক—নর শোণিত হইতে জীবাণু ভ্রূণ উদরস্থ করিয়া জীবাণু সকল নরদেহে বৃদ্ধি প্রাপ্ত করিয়া জীবকোরক রূপে মশকের হুলের গোড়ায় বংশ বিস্তার করিতেছে।

ইটালীতে যখন ম্যালেরিয়া বিস্তৃত হইয়া পড়িল, তখন 'লো' এবং 'সামবিল' নামক দুই-জন ডাক্তার মশকের আক্রমণ হইতে অব্যাহত থাকিবার জন্ত লৌহ-তারের জাল দেওয়া

বাড়ীতে অবস্থিতি পূর্ব্বক ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। করমোসা দ্বীপে ম্যালেরিয়ার বিস্তৃতিকালে জাপান গবর্ণমেণ্ট মশক-দংশনেই ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি হয় কিনা—ইহা নির্ণয় করিবার জন্য ঐ দ্বীপে দুই দল সৈন্য প্রেরণ করেন। একদল ইটালিতে ডাক্তার 'লো'য়ের মত—ঘেরা-যায়গায় বাস করিয়াছিল, আর একদলের লোকের মশক হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য কোনরূপ বন্দোবস্ত ছিল না। উভয় সৈন্যই ১৬ দিন কাল ঐরূপভাবে অবস্থান করে। ফলে যাহারা জালদ্বারা ঘেরা স্থানে অবস্থিত ছিল, তাহাদের কাহারও ম্যালেরিয়াজ্বর হয় নাই, অন্যদলের ২৫৯ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছিল।

আমাদের বাঙ্গালা দেশে ম্যালেরিয়ার আধিক্যের কারণ যে আমরাই উপস্থিত করিয়াছি, ইহা বলিলে অসঙ্গত হইবে না। যে মশক হইতে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি হয়, সে মশক-ধ্বংসের জন্য আমাদিগের কোনরূপই চেষ্টা নাই। আগে আমাদের দেশে প্রকৃতির বিকৃতি ভাব পরিলক্ষিত হইতনা, সময়ে বৃষ্টি হইত, সে বৃষ্টিরফলে পল্লী-পথের আবর্জ্জনা সকল উত্তমরূপে ধৌত হইয়া পল্লীভূমির লোকসঙ্কুল স্থানগুলি হইতে প্রান্তর ভূমিতে চলিয়া যাইত, ফলে সময়ের সুবৃষ্টি হইতেই পল্লীগ্রামের জলনিকাশের কার্য্য সম্পন্ন হইত। এখন সময়েও সুবৃষ্টি হয় না, জল-নিকাশের সুবন্দোবস্ত করিবারও আমাদের মতিগতি নাই। দেশে মশক বংশের বৃদ্ধি এই জন্যই হইতেছে, এবং ম্যালেরিয়ারও প্রাদুর্ভাব বিলক্ষণ বাড়িয়াছে। ইস্‌ম্যালিয়া এবং সুইট্‌হেম বন্দরে এই জলনিকাশের বন্দোবস্ত করিয়াই ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে সে অঞ্চলের লোক রক্ষা পাইয়াছিল। ১৯০২ সালে ইসমালিয়া'তে ১৫৫১ জন ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়। জলনিকাশের বন্দোবস্ত করিয়া ১৯০৫ সালে ৩৭ জনের বেশী ম্যালেরিয়াক্রান্ত রোগী সেখানে দেখা যায় নাই। ক্ল্যাং এবং সুইটেন হামে ১৯০১ সালে ৩১০ জন ম্যালেরিয়া রোগী দেখা যায়, ১৯০৫ সালে ঐরূপ চেষ্টায় ২৩ জনের অধিক ম্যালেরিয়াক্রান্ত হয় নাই। হংকংয়ে ১৯০১ সালে ১২৯৪ জন ম্যালেরিয়া রোগী ছিল, ১৯০৫ সালে জলনিকাশের বন্দোবস্তের ফলে ৪১৯ জন মাত্র ম্যালেরিয়াক্রান্ত হইয়াছিল জানিতে পারা যায়। জল-নিকাশের বন্দোবস্ত করিয়া ইটালি, হল্যাণ্ড, আলজিরিয়া এবং আমেরিকার অনেক স্থানই স্বাস্থ্যকর হইয়াছে। আমাদের সে চেষ্টা নাই, আমরা ম্যালেরিয়ার ভয়ে পল্লী ছাড়িয়া সহরে আবাসস্থান নির্ণয় করিলেই কর্ত্তব্য সাধিত হইল বলিয়া মনে করি, সুতরাং আমাদের দেশ হইতে ম্যালেরিয়া নষ্ট হইবে কি করিয়া? ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে অব্যাহত থাকিতে হইলে জল-নিকাশের বন্দোবস্ত করিতে হইবে, কোন পল্লীই যাহাতে বনবহুল হইয়া মশক বৃদ্ধির কারণ উপস্থিত করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, বাড়ীর নিকটে যে সকল ডোবা বা গর্ত্ত আছে, তাহা বুজাইয়া ফেলিতে হইবে, জলাশয় গুলি যাহাতে কলুষিত না হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন মশক দংশন হইতে অব্যাহত থাকিবার জন্য সন্ধ্যার পর নগ্নগাত্রে থাকা হইবে না, জামা বা কাপড় গায়ে দিয়া এবং শয়ন কালে মশারি খাটাইয়া [illegible] ব্যবস্থা করিতে হইবে। [illegible]

হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঘরের জানালাগুলি তার দ্বারা ঘিরিয়া লইলে ভাল হয়।

ইহা ভিন্ন সন্ধ্যাকালে গৃহমধ্যে ধূপ-ধুনা দিবার ব্যবস্থা যাহা আমাদের বরাবর চলিয়া আসিত, এখন অনেক গৃহস্থ তাহা ভুলিয়া যাই-লেও নূতন করিয়া আবার তাহার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। ধূপ-ধুনার গন্ধ মশকগণ সহ্য করিতে পারেনা। ইহা বোধ হয় সক-লেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

হিন্দু সংসারে আগে তুলসী এবং কৃষ্ণচূড়া ফুলের গাছ যত্নপূর্ব্বক পুঁতিয়া রাখা হইত। ইহারা রস টানিয়া স্যাঁৎসেতে জমি শুষ্ক করে বলিয়া ইহাদিগকে পুঁতিয়া রাখায় হিন্দুসন্তান ধর্ম্ম ভিন্ন স্বাস্থরক্ষার সুখও অনুভব করিতে সক্ষম হইত। এখন এ প্রথাও দেশ হইতে বিলুপ্ত। কিন্তু ম্যালেরিয়া হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে আবার সে প্রথা প্রচলিত করিতে হইবে।

ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাই-বার জন্য আরও কতকগুলি নিয়ম পালন করিবার প্রয়োজন। শয়ন-ঘরে খাট-পালঙ্গ তক্তাপোষ ভিন্ন আর কিছুই রাখা হইবে না। আলনা-বাক্স-সিন্দুক, এ সকল অন্য ঘরে রাখাই প্রশস্ত। তরকারি, গুড় এবং ঘৃত-তৈলাদির ভাণ্ডও শয়ন-গৃহ হইতে তফাৎ করিতে হইবে। সাবান মর্দ্দনে অঙ্গ পরি-ষ্কারের ব্যবস্থাটি ছাড়িয়া দিয়া বাঙ্গালী-সন্তানকে আবার তৈল মর্দ্দনে অভ্যস্ত হইবে। দেহের লঘুতা সম্পাদক, ত্বকের স্বাস্থ্যরক্ষক, বাতশ্লেষ্মকনাশক—তৈলের মত এরূপ আর একটি দ্রব্যও নাই আমরা এই তৈলের ব্যবহার এখন যে ভুলিয়াছি, ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আবার তাহার প্রচলন করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণও স্থির করিয়াছেন, উত্তমরূপে তৈল মর্দ্দনকারী ব্যক্তিদিগের ম্যালেরিয়ার আক্রমণ অনেক কম হইয়া থাকে। কিন্তু দেশের যেরূপ রুচি-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তাহাতে এ সকল যুক্তি কেহ শুনিবেন কি!

পরিপাক।

অগ্নি আহার পরিপাক করে, আহার না পাইলে দোষ পরিপাক করে, ধাতুর অভাবে প্রাণ পরিপাক করে। ১ম আহার পরিপাক, ২য় দোষ পরিপাক, ৩য় ধাতু পরিপাক, ৪র্থ প্রাণ পরিপাক।

আহার পরিপাক অর্থাৎ আমরা যে ভাত, দা'ল, শাক, মাছ প্রভৃতি খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহারা আমাদের পাচক অগ্নির সাহায্যে রূপান্তরিত হইয়া রসে পরিণত হয়। তখন ঐ খাদ্য সকলের শ্যাব, কৃষ্ণ, অরুণ প্রভৃতি বর্ণ, লম্বা, গোল, চ্যাপ্টা প্রভৃতি আকৃতি, কটু তিক্ত, অম্ল প্রভৃতি রস সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। কারণ রস [illegible] তরল গতিশীল মধুর ভূয়িষ্ঠ দ্রব্য।

ঐ রস আবার পরিপক্কতা লাভ করিয়া রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র নামক ধাতুতে পরিণত ও শরীরের [illegible] [illegible] রক্ত, মাংস [illegible]

প্রভৃতি ধাতু সকল রস হইতে পৃথক পদার্থ ও তাহাদের একটী অপরটীর সহিত সমজাতীয় নহে। তবেই দেখা যাইতেছে যে ভৌম্য, আপ্য, বায়ব্য, তৈজস ও নাভস এই পঞ্চ অগ্নির সাহায্যে, ভৌম, আপ্য, তৈজস প্রভৃতি পঞ্চবিধ আহার্য্য পদার্থ রূপান্তরিত হইয়া রসে ও ধাতুতে পরিণত হয়, সেই যে প্রক্রিয়া-বলে আহার্য্যের এই পরিণতি সুসম্পন্ন হয়, তাহাকে আহার পরিপাক কহে।

আহার্য্য পদার্থ পরিপাক হইলে, তাহা আর শরীরে বাহ্য পদার্থ রূপে বর্ত্তমান থাকে না, তখন তাহারা শারীর-পদার্থের সহিত সম্পূর্ণভাবে এক হইয়া যায়। আহার্য্য সম্পূর্ণরূপে পরিপাক প্রাপ্ত হইলে শরীরে যে লক্ষণ উৎপন্ন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। যথা—

উদ্গারশুদ্ধিরুৎসাহোবেগোৎসর্গ যথোচিত।
লঘুতা ক্ষুৎপিপাসা চ জীর্ণাহারণ্য লক্ষণম্॥
(ইতি ভাব)

উদ্গার শুদ্ধি (ধুমোদ্গার বা আহার দ্রব্যের গন্ধোস্বাদ বিবর্জ্জিত উদ্গার) শরীরের প্রসন্নতা অর্থাৎ চক্ষু ও মুখের বর্ণ ও স্বরের স্বাভাবিক ভাব। মনের প্রসন্ন ভাব বা সুখীভাব, মলমূত্রাদির যথোচিত প্রবর্ত্তন, দেহের লঘুতা ক্ষুধা ও পিপাসা বোধ হইলে ভুক্তাহার জীর্ণ হইয়াছে বুঝা যায়।

দোষ পরিপাক।—দোষ অর্থে বায়ু পিত্ত কফ। নানারূপ অহিতকর দ্রব্য যথা, অতি গুরু অর্থে অজীর্ণকর দ্রব্য, অতি স্নিগ্ধ যাহাতে বেশী পরিমাণ ঘৃত তৈল আছে—এমন পদার্থ, অতি শীতল, অতি উষ্ণ দ্রব্য। পচা দ্রব্য অপরিষ্কার দ্রব্য। ধুলা, ধুম, বিষ বাষ্প, হাম, বসন্ত, কলেরা, মেলেরিয়া প্রভৃতির জীবাণু, পান-ভোজন-শ্বাস গ্রহণ প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা বাহ্যজগত হইতে শরীর ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া তত্রস্থ দোষ সকলকে অতি মাত্রায় বর্দ্ধিত ও বিকৃত করে। ঐ সমস্ত দূষিত পদার্থসমূহ-সংশ্লিষ্ট দোষই অশেষ প্রকার পীড়ার কারণ। এখন আমাদের শারীর-প্রকৃতি যে প্রক্রিয়ার দ্বারা বায়ু, পিত্ত, কফ হইতে ঐ সমস্ত দূষিত পদার্থকে পৃথক করিয়া তাহাদিগকে পুনরায় বাহ্যজগতে নিক্ষেপ করে, সেই প্রক্রিয়াকে দোষ-পরিপাক-ক্রিয়া কহে। এই বিক্ষেপ কার্য্য ফুস্‌ফুস্, স্বেদনাড়ী, মূত্রগ্রন্থি, মলভাণ্ড প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে সেইজন্য ঐ যন্ত্র সকলকে সংশোধন যন্ত্র ও বলা যাইতে পাবে।

দোষ পরিপাকের লক্ষণ-যথা—

দোষ প্রকৃতি বৈকৃত্যং লঘুতা দেহয়োঃ।
ইন্দ্রিয়নাথ বৈমল্যং মলানাং পাক লক্ষণম্।

দূষিত বায়ুপিত্ত কফের যে প্রকৃতি, তাহার বিপরীত ভাব হইলে অর্থাৎ বায়ু দূষিত হইলে যেমন কম্প, মুখশোষ গাত্র-বেদনা উপস্থিত হয়, পিত্ত দূষিত হইলে যেমন শরীর উষ্ণ হয়, দাহ, পিপাসা, ঘর্ম্ম, দেহে ক্ষত—প্রভৃতির উৎপত্তি হয়; দূষিত কফের প্রকৃতি যেমন শরীর ভার হওয়া ক্ষুধারাহিত্য, অরুচি, কাস, সর্দ্দি প্রভৃতি দেখা দেওয়া—এই সমস্ত লক্ষণের বিপরীত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, জ্বরের অন্ততা হইলে ইন্দ্রিসমূহের বিমলতা হইলে, অর্থাৎ চক্ষের লালবর্ণতা, পীতবর্ণতা ও শুক্লবর্ণতা না থাকিলে চক্ষের দৃষ্টি পরিষ্কার হইলে, কর্ণে কোন অস্বাভাবিক শব্দ প্রভৃতি না থাকিলে বা শব্দবোধ্য পরিষ্কার না [illegible] কোন ময়লা না [illegible]

হইলে, ত্বকে গুড় গুড় শিড় শিড় অনুভূতি না হইলে, স্পর্শশক্তি অব্যাহত থাকিলে, দোষ পরিপাক হইয়াছে জানিবে।

ধাতু পরিপাক। জীবগণের নিমেষ, উন্মেষ, ধাবন, কুর্দ্দন, হাসন, ভাষন উত্থান, পতন, চিন্তন, প্রভৃতি কার্য্যে পঞ্চভূত সম্বয়োৎপন্ন রস, রক্ত, অস্থি, মজ্জা প্রভৃতি ধাতুগণ অনবরত ক্ষয় হইতেছে। অর্থাৎ ঐ সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা তাহারা পুনরায় ক্ষিত্যপ-তেজ, মরুদ্দেশ রূপে পরিণত হইয়া বাহ্য জগতস্থ স্বজাতীয় গণের সহিত মিলিয়া যাইতেছে। যে প্রক্রিয়া বলে ঐরূপ কার্য্য সুসম্পন্ন হইতেছে, তাহাকে ধাতুপাক ক্রিয়া কহে। ধাতু পরিপাক ক্রিয়া যে সকল সময়েই শারীর প্রকৃতির প্রতিকুলতা করে, তাহা নহে, বরং অনেক সময় ইহার অনুকুলতাই করিয়া থাকে। এইরূপ পরিপাক ক্রিয়া-বলে শরীর হইতে ধাতুগণ অনবরত বহির্গমন করিতেছে বলিয়াই আহার পরিপাক ক্রিয়া বলে তাহারা পুনরায় সৃষ্ট হইয়া দেহ ধারণ করিতেছে। এইরূপ ক্ষয় কার্য্য না হইলে পুরণ কার্য্য হয় না। ক্ষয় ও পুরণ এই দুই প্রক্রিয়ার উপরই প্রাণ শক্তির ক্রিয়া নির্ভর করিতেছে। ইহাদের একের ক্রিয়ার উপরেই অন্যের ক্রিয়া নির্ভর করিতেছে, একের অভাবে অন্যের বিকাশ অসম্ভব। কিন্তু যখন এই দুই ক্রিয়ার সামঞ্জস্য লোপ পায়, অর্থাৎ পুরণ অপেক্ষা ক্ষয় বেশী হয়, অথবা ক্ষয় অপেক্ষা পুরণ বেশী হয়, তখনই শরীর অসুস্থ হইয়া উঠে। এইরূপ ধাতু পাককে লক্ষ্য করিয়া এখানে ধাতু পাকশব্দ লিখিত হইয়াছে। নিম্নে ইহার লক্ষণ লেখা যাইতেছে, যথা—

"নিদ্রা নাশঃ হৃদিস্তম্ভো বিষ্টম্ভ গৌরবারুচি।
অরতির্ব্বল হানিশ্চ ধাতুনাম পাক লক্ষণম" ॥

নিদ্রা নাশ হয়, হৃদয় স্তম্ভিত হয় অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অল্প হইয়া যায়, উদরের বিষ্টম্ভ হয়। বল হ্রাস বশতঃ পরিপাক অল্প হইয়া যায়, তাহাতে পেট ফাঁপিয়া থাকে এবং পেটের ভিতরকার বায়ু নিঃসরণ হয়না। শরীর ভার হয় অর্থাৎ বলক্ষয় জন্য রোগী নিজ শরীরকে সঞ্চলিত করিতে কষ্ট বোধ করে বলিয়াই তাহাকে ভারী বলিয়া বোধ করে। বস্তুতঃ তাহার শরীর ক্ষয় জন্য লঘুই হয়। তাহার অরতি হয় অর্থাৎ কোন বিষয়েই তাহার ভাল ইচ্ছা বোধ হয় না ও বলক্ষয় হয় এবং দৃষ্টিশক্তি, আস্বাদশক্তি, ঘ্রাণশক্তি অন্নপাকশক্তি প্রভৃতি সমস্ত শক্তির ক্ষয়বশতঃ তাহার দৈহিক কোন কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না।

কবিরাজ শ্রীউমাচরণ ভারতী ভূষণ

ব্যায়াম।

স্বাস্থ্যরক্ষার্থ যে শারীরিক পরিশ্রম আবশ্যক, তাহাকেই সাধারণতঃ ব্যায়াম বলা যায়। ব্যায়াম নানাবিধ—যথা পথভ্রমণ, অশ্বারোহণ, নৌকাচালন, সন্তরণ, মুগুর বা ডম্বল ভাঁজা, কুস্তি, ডনফেলা, দৌড়াদৌড়ি, হাডুডু, কপাটি, ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ব্যাডমিণ্টন, রগবি, টেনিস্ ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি আধুনিক। ফুটবল, ক্রিকেট

কি প্রভৃতি কতকগুলি ইউরোপীয়গণ কর্ত্তৃক দেশে প্রচলিত হইয়াছে সুতরাং এগুলি াধুনিক। ব্যায়াম সমূহকে দুইটী প্রধান শ্রণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা াধারণ বা অবিমিশ্র ব্যায়াম এবং ক্রীড়া-ংযুক্ত ব্যায়াম বা ব্যায়াম ক্রীড়া। ব্যায়াম ারা মাংসপেশী সমূহের পুষ্টিসাধন হয়। ব্যায়াম ারা মাংসপেশী সমূহের নিয়মিত পরিচালনা য়, তজ্জন্য ঐ সকল স্থানে রক্তসঞ্চালনের াধিক্য হয়, সুতরাং মাংসপেশী সমূহ সমধিক ারিপুষ্ট ও সবল হয়। জগতে সকল পদার্থের নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া আছে। জীবদেহস্থ ন্ত্র ও উপাদান সমূহেরও তদ্রূপ স্ব স্ব ক্রিয়া াছে। যদি কাহাকেও তাহার ক্রিয়া-ম্পাদনে ব্যাঘাত দেওয়া হয় অর্থাৎ তাহাকে কান ক্রিয়া করিতে না দেওয়া হয়, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। াংসপেশী সম্বন্ধেও ঠিক এই নিয়ম। যদি কান মাংসপেশীকে নিষ্ক্রিয় রাখা হয়, তাহা হইলে উহা ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ ও অকর্ম্মণ্য হয়। ঊর্দ্ধবাহু সন্ন্যাসিগণের ঊর্দ্ধোত্থিত বাহু ইহার একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত। উহা ক্ষীণ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, নাড়িতে চাড়িতে পারা যায় না তদ্রূপ অপর দিকে ক্রিয়া দ্বারা উহারা পুষ্ট, সবল ও কর্ম্মঠ হয়। শ্রমজীবীদের মধ্যে উপ-জীবীকার ক্রিয়ানুযায়িক মাংসপেশী-বিশেষের পুষ্টির আধিক্য ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এইজন্য ভার বাহকেদের গ্রীবার মাংসপেশী, যান-বাহকদের স্কন্ধের মাংসপেশী, নর্ত্তক-নর্ত্তকীদের চরণের মাংসপেশী, দাঁড়ি-মাঝিদের বাহুর মাংসপেশী, অপর সাধারণ অপেক্ষা অধিকতর পুষ্ট, স্থূল ও সবল।

এক্ষণে কেহ বলিতে পারেন যে, আমার ধনের অভাব নাই, আমাকে খাটিয়া খাইতে হইবে না, পদব্রজে পথভ্রমণও করিতে হইবে না, সুতরাং আমার মাংসপেশীর পরিপুষ্টির বা কি আবশ্যক এবং ব্যায়ামেরই বা কি আবশ্যক?

ইহার উত্তর এই যে ব্যায়ামের দ্বারা যে কেবল হস্তপদাদির মাংসপেশীর পরিপুষ্টি সাধন হয়—তাহা নহে। হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, পাকাশয়, অন্ত্র, যকৃৎ মূত্রগ্রন্থি প্রভৃতি আভ্যন্তরিক যন্ত্র-সমূহের মাংসপেশীর ও পুষ্টিসাধন হয়। ব্যায়ামকালে হস্তপদাদির ন্যায় আভ্যন্তরিক যন্ত্রসমূহের ও পরিচালনা হয়। সেইজন্য ঐ সকল যন্ত্রের ক্রিয়ার ও উৎকর্ষসাধন হয়। ক্ষুধামান্দ্য ও অজীর্ণরোগে ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক সময় ঔষধ দ্বারা কোনও উপকার উপলব্ধি হওয়া না কিন্তু কেবল ব্যায়াম দ্বারা ক্ষুধা ও পরিপাক-শক্তি বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়।

ব্যায়াম স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর বটে, কিন্তু ব্যায়ামের আতিশয্য বা ক্লেশকর ব্যায়াম দ্বারা আবার স্বাস্থ্যহানি হয়। যদি স্বাস্থ্য-রক্ষার্থ প্রয়োজনীয় শারীরিক শ্রমকে ব্যায়াম নামে অভিহিত করা হয়, তাহা হইলে ক্লেশ শূন্য শ্রমই প্রকৃত ব্যায়াম। অধুনা ছাত্রবৃন্দ মধ্যে ব্যায়ামের বিশেষ প্রচলন হইয়াছে। যুবক কর্ম্মচারিগণও অনেকে ব্যায়ামপ্রিয়। পিতামাতা প্রভৃতি কর্ত্তৃপক্ষেরা বালকদের ব্যায়াম শিক্ষার জন্য উৎসাহ দিয়া থাকেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও তত্ত্বাবধায়কগণও ব্যায়ামের বিশেষ পক্ষপাতী। আজকাল সকল বিদ্যালয়েই ব্যায়ামের বন্দোবস্ত আছে। কিন্তু ব্যায়ামের পরিমাণের [illegible] কাহারও লক্ষ্য নাই। [illegible]

যে ব্যায়াম দুই প্রকার, সাধারণ বা অবিমিশ্র ব্যায়াম এবং ক্রীড়াসংযুক্ত ব্যায়াম বা ব্যায়াম ক্রিয়া। অধুনা শেষোক্ত ব্যায়ামই সচরাচর লোকে শিক্ষা করিয়া থাকে, কিন্তু ক্রীড়াসংযুক্ত হওয়ায় উহা স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর না হইয়া বরং অহিতকর হইয়া থাকে। কিসে খেলায় জিতিব, কিসে আমার খেলা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও প্রশংসনীয় হইবে—এই আশায় শ্রমাতিশয্য ঘটিয়া থাকে। শুধু তাহা নহে, আবার ছাত্রদের মধ্যে কেহ কেহ জল খাবারের পয়সা জমাইয়া বা খোরাকির ব্যয় সংকোচ করিয়া খেলার সরঞ্জাম ও ক্লাবের চাঁদা জোগাড় করিয়া থাকে। ইহাদের পক্ষে ব্যায়ামক্রীড়া অত্যন্ত অনিষ্টদায়ক। একদিকে শ্রমাতিশয্য ও অপরদিকে খাদ্যের অনাটন। সুতরাং উপযুক্ত পরিপোষণের অভাবে শরীর সত্বর দুর্ব্বল ও রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি যে সকল ব্যায়াম পাশ্চাত্য অনুকরণে এদেশের সহর ও পল্লীগ্রাম সকল স্থানেই বহু প্রচলিত হইয়াছে, সেগুলি কেবল বিলাসিতা মিশ্রিত, স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর বলিয়া বোধ হয় না, কাজেই অর্থনাশক ও বিলাসিতাবর্দ্ধক। দেশকালঅবস্থা—ভেদে ব্যায়ামের প্রকারভেদ হওয়া আবশ্যক। যে ব্যায়ামে অর্থক্ষয় না হইয়া বরং অভাব আরম্ভ হয় সেরূপ ব্যায়াম অভ্যাস কি যুক্তি-সঙ্গত! পল্লীগ্রামবাসী বালক ও যুবক-বৃন্দ ফুটবলক্ষেত্রে নৃত্য করিয়া হাত পা ভাঙ্গার পরিবর্ত্তে যদি কৃষিক্ষেত্রে একটু একটু নিয়মিত পরিশ্রম করেন, তাহা হইলে স্বাস্থ্যরক্ষা ও তৎফলাধিক্য—এককালে উভয় কার্য্যই সমাধা হয়। সহরবাসীরাও ইচ্ছা করিলে সময়ে সময়ে নিকটবর্ত্তী পল্লীগ্রামে গিয়া এইরূপ হল চালনাদি ব্যায়াম অভ্যাস করিতে পারেন।

ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস।

"নবেগান্ ধারণীয়"।

স্বাভাবিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই রোগোৎপাদন হইয়া থাকে—ইহা স্বতঃসিদ্ধ। আমরা বহু সময় স্বাভাবিক নিয়মের প্রতি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া বহুবিধ উৎকট ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া থাকি, স্বাস্থ্যরক্ষার কতকগুলি নিয়ম সাধারণ রূপে সকলেরই জ্ঞাত হওয়া উচিত।

আমাদিগের বর্ত্তমান বিষয়ের আলোচ্য বিষয়—"নবেগান্ ধারণীয়" অর্থাৎ মল-মূত্রাদির বেগ ধারণ করিবেনা। এ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য মহর্ষি চরক যাহা উপদেশ দিয়াছেন এস্থলে ঐ মূল্যবানীয় শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম—

"নবেগান্ ধারয়েদ্ধীমান জাতান্ মূত্রপুরীষয়োঃ
ন রেতসো নবাতস্য নবম্যাঃ ক্ষবথোর্নচ॥
নোৎকারস্য ন জৃম্ভায়া ন বেগান্ ক্ষুৎপিপাসয়োঃ।
ন বাষ্পস্য ন নিদ্রায়া নিশ্বাসস্য শ্রমেনচ।
এতান্ ধারয়তো জাতান্ বেগান্ রোগা
ভবন্তিয়ে॥

(চরক)

অস্যার্থ ধীমান ব্যক্তি মূত্র, পুরীষ (মল) অধোবায়ু, বমি, ক্ষবথু (হাঁচি) উদ্গার, জৃম্ভা (হাইতুলা) ক্ষুধা, পিপাসা, অশ্রু (চোখের জল) নিদ্রা, কিম্বা শ্রমজন্য নিশ্বাসের বেগ

ারণ করিবে না। ঐ সমস্ত ধারণ করিলে বগরোধ জন্য ব্যাধি জন্মে।

বেগরোধ জনিত যে সকল ব্যাধি জন্মে, ায়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে তাহাকে "উদাবর্ত্ত" বলে,— উদাবর্ত্তে বায়ুর প্রাধান্য অধিক থাকে।

ভাবমিশ্র বলিয়াছেন—

াতবিন্মূত্র জিম্ভাশ্রু ক্ষবোদ্গার বমীন্দ্রিয়ঃ।
ক্ষুত্তৃষ্ণোচ্ছ্বাস নিদ্রানাং ধৃত্যোদাবর্ত্তসম্ভবঃ॥
(ভাবপ্রকাশঃ)

উল্লিখিত শ্লোকের অর্থও চবোক্ত শ্লোকের অনুরূপ।

এক্ষণ কোন্ কোন্ বেগধারণ করিলে কোন্ কোন্ ব্যাধি জন্মিতে পারে ক্রমশঃ তাহার উল্লেখ করা যাইবে এবং ঐ সমস্ত কারণ জাত ব্যাধির চিকিৎসা-তত্ত্বও পরে বলা হইবে।

চরক-ঋষি বলিয়াছেন বেগধাবণ জন্য যক্ষ্মা রোগ জন্মিয়া থাকে।

অধোবায়ুর বেগধারণে—মূত্র ও মলের রুদ্ধতা, উদরাধ্মান (পেট ফাঁপা) ক্লান্তি বোধ, উদরে বেদনা ও স্থঁচ ফুটার ন্যায় যাতনা, এবং গুল্মাদি দুঃসাধ্য ব্যাধি সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পুরীষ (মল) বেগধারণে—পেটে বেদনার সহিত গুড়্গুড় শব্দ, পক্কাশয়ে (পাকস্থলীতে) শূলবৎ বেদনা, গুহ্যদ্বারে কর্ত্তন বং পীড়া অনুভব, মল রুদ্ধতা, উদ্গার, এবং কখনও কখনও মুখের দ্বারা মল নির্গত হইয়া থাকে।

মূত্রবেগ ধারণে—বস্তি ও (তল পেটের নিম্নভাগ) শিশ্নে বেদনা, মূত্রকৃচ্ছ্র, মস্তকে বেদনাপ্রযুক্ত দেহ বক্র, এবং বঙ্ক্ষণদেশে (কুচ্‌কি) বেদনা হইয়া থাকে।

জৃম্ভা (হাই) বেগধারণে—মন্যা (গ্রীবার পশ্চাৎ ভাগের শিরা) ও গলদেশের স্তব্ধতা, বায়ু প্রধান তীব্র শিরোরোগ, চক্ষুরোগ, নাসারোগ, মুখরোগ, ও কর্ণরোগ জন্মিয়া থাকে।

অশ্রু (নেত্রজল) বেগধারণে—আনন্দাশ্রু অথবা শোকাশ্রু রোধে মস্তক ভারবোধ, তীব্র চক্ষুরোগ ও সর্দ্দি উৎপন্ন হয়।

হাঁচি বেগধারণে-মন্যার—(ঘাড়) স্তব্ধতা, শিরঃশূল, অর্দ্দিত (মুখ বাঁকিয়া যাওয়া) অর্দ্ধাবভেদক (আধকপালে মাথা ধরা) ও ইন্দ্রিয় সকলের দুর্ব্বলতা হইয়া।

উদ্গার বেগধারণে—কণ্ঠ ও মুখের পূর্ণতা, হৃদয় ও আমাশয়ের স্থঁচী বিদ্ধ বৎ অত্যন্ত বেদনা, কণ্ঠে অব্যক্ত শব্দ, উচ্ছ্বাসাদিরোধ, হিক্কা, প্রভৃতি বায়ুজনিত ব্যাধি জন্মে।

বমি বেগধারণে—শরীরে কণ্ডু (চুল্‌কান) স্ফোট (বোলতা দংশনের ন্যায় ফুলিয়া উঠা) অরুচি, মুখ-বিকৃতি, শোথ, পাণ্ডু, জ্বর, কুষ্ঠ, হৃল্লাস ও বিসর্প (কুষ্ঠের প্রকার ভেদ রক্ত দূষিত ব্যাধি) রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শুক্র বেগধারণে—মূত্রাশয়ে মলদ্বারে ও অণ্ডকোষে শোথ, বেদনা জন্মে, মূত্র রোধ হয়, শুক্রাশ্মরী (পাথরী) বৃথা শুক্র স্রাব ও বাত কুণ্ডলিকা (বাধিয়া বাধিয়া মূত্র নির্গত) প্রভৃতি বিবিধ কঠিন রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ক্ষুধা বেগধারণে—তন্দ্রা, শারীর-বেদনা, অরুচি, শ্রান্তি বোধ এবং চক্ষুর দীপ্তি হ্রাস হইয়া থাকে, ইহাতে শিরের বিকৃতি হইয়া ক্ষুধামান্দ্য হয়।

তৃষ্ণা বেগধারণে—কণ্ঠশোষ, মুখশোষ, শ্রবণশক্তির হ্রাস, হৃদয়ে বেদনা, জিহ্বার জড়তা হইয়া থাকে।

শ্বাস বেগধারণে—(পরিশ্রান্ত ব্যক্তির দীর্ঘ শ্বাস ধারণে) হৃদ্‌রোগ, মোহ এবং গুল্ম প্রভৃতি কঠিন রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

নিদ্রা বেগধারণে—জৃম্ভা (হাঁই তোলা) শরীর বেদনা, তন্দ্রা এবং দেহ, চক্ষু ও মস্তকে অত্যন্ত জড়তা হইয়া থাকে।

উল্লিখিত কারণ সমূহ ব্যতীত রুক্ষ অন্নাদি ভোজন জন্য বায়ু বৃদ্ধি হেতু উদাবর্ত্ত রোগ জন্মিয়া থাকে।

এখন পাঠক পাঠিকাগণ বুঝিয়া দেখুন যে সমস্ত নিয়ম রক্ষা আমরা সামান্য জ্ঞানে অবহেলা করি, ঐ সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘনের কুফল কত দূর পর্য্যন্ত হইতে পারে। সামান্য কারণে উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া স্বাস্থ্য হারাইতে হয়।

বর্ত্তমান কালে সভ্যতার অনুরোধে, সভ্যতার খাতিরে আমরা যে কত প্রকারে স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ব্যাধিগ্রস্থ হইতেছি, তাহার ইয়ত্তা নাই, দেখা যায় কোন সভ সমিতিতে উপস্থিত হইলে হাঁচি, কাসি, অধোবায়ু নিরোধ পূর্ব্বক ৪।৫ ঘণ্টাকাল অতিবাহিত করিতে হয়, সময় সময় মল-মূত্রের বেগ ধারণ করিতে ও হইয়া থাকে। ইহাতে কি স্বাস্থ্যহানি হইয়া থাকে না!

চাকরী বৃত্তি যাহাদিগের অভ্যাস, তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি অনেক সময় মল মূত্রের বেগ রোধ করতঃ কত দূর শারীরিক অনিষ্ট সাধিত করিয়া থাকেন, তাহা আমরা বলিলাম, আশাকরি আমাদিগের "আয়ুর্ব্বেদ" পাঠক পাঠিকাগণ বেগ ধারণের কুফল বুঝিয়া বিশেষ সতর্ক থাকিবেন। অতঃপর আমরা বেগ ধারণ জন্য ব্যাধি সমূহের চিকিৎসা তত্ত্ব আলোচনা করিব।

কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন।

সমালোচনা।

কলিত চিকিৎসা বিধান। কবিরাজ শ্রীরাখালচন্দ্র দত্ত প্রণীত। শ্রীশশীভূষণ দত্ত কবিরাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পোঃ সাভার, কবিরাজবাটী, ঢাকা। মূল্য ৩৲ টাকা। এই গ্রন্থে প্রত্যেক রোগের নিদান এবং রোগ প্রশমনের জন্য ঔষধগুলি বাঙ্গালা-ভাষায় লিখিত হইয়াছে। বিশাল আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে চিকিৎসা পুস্তকের অভাব নাই, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় সকল গুলির সারসঙ্কলন পূর্ব্বক যদি কোন গ্রন্থ প্রকাশ করা যায়, তাহা হইলে এখনকার দিনে অল্প শিক্ষিত চিকিৎসক মণ্ডলীর তাহা বিশেষ উপকারে আসিতে পারে। আমাদের দেশে এখনকার সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ চিকিৎসক যথেষ্ট, পরলোকগত ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় এই জন্যই অশিক্ষিত ডাক্তারগণের শিক্ষা-উদ্দেশ্যে "সরল জ্বর চিকিৎসা" প্রণয়ণ করিয়াছিলেন। সে গ্রন্থের প্রচারে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধও হইয়াছিল, অনেক হাতুরে চিকিৎসক সে পুস্তকের কৃপায় অনেক স্থলে চিকিৎসার কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থও হইয়াছিল। হাতুরে চিকিৎসকদিগের জন্য এক দিকে সমাজের ক্ষতি হইতেছে সত্য, অপর দিকে কিন্তু দেশে যে পর্য্যন্ত সুচিকিৎসকের সংখ্যা পূরণ যথেষ্ট ভাবে না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত তাহাদের আবশ্যকতাও আছে। ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা এবং সুশিক্ষিত চিকিৎসকের তুলনায় এখনও আটচল্লিশ হাজার চিকিৎসকের প্রয়োজন। সেই আটচল্লিশ হাজারের সংখ্যা পূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত হাতুরে চিকিৎসকদিগকে সমাজে [illegible]

না দিলে আপাততঃ উপায় নাই। আর এক কথা, যে সময় দেব ভাষা বা সংস্কৃত ভাষা দেশ মধ্যে প্রচলিত ছিল, সেই সময় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষাতেই রচিত হয়। সাধারণ লোকের মধ্যেও সে সময় সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন চলিত, সেজন্য আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার্থির পক্ষে সংস্কৃত ভাষায় আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষায় কাহারও অসুবিধা হইত না। এখন দেশ-কালোপযোগী আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত হওয়া আবশ্যক হইয়াছে; শুধু বাঙ্গালায় কেন, আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি করিতে হইলে—ইংরাজীতেও আয়ুর্ব্বেদের অনুবাদ প্রকাশিত হওয়া উচিত। কিন্তু সে অনুবাদ গ্রন্থ মূলের সহিত ঠিক থাকা কর্ত্তব্য। "ফলিত চিকিৎসাবিধান"—প্রণেতার উদ্দেশ্য মন্দ নহে, তিনি শাস্ত্র অবলম্বনে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা অনেকের উপকারে আসিবে, কিন্তু যে সকল স্থলে নিজের মত চালাইয়াছেন, সে গুলি সাহস করিয়া সকলে মানিতে পারিবে কিনা—সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এক এক স্থলে শাস্ত্রীয় মত ছাড়িয়া এরূপই নিজের মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাহা কোন ক্রমে গ্রহণ যোগ্য নহে। ৩য় পৃষ্ঠায় সততক জ্বরের চিকিৎসায় "হরীতকী বটী" ব্যবহারের পর প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করিবার পরামর্শ দিয়াছেন, ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় "প্রবাহিকারি লেহ" প্রস্তুতে স্পিরিট মিশাইতে উপদেশ দিয়াছেন—এ সকল মত কেমন করিয়া গ্রহণ করা যাইবে? ৫০ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন,—যে জ্বর উৎপত্তি মাত্রেই বিষমে পরিণত হয় তাহা অসাধ্য। আমাদের মতে উহা দুঃসাধ্য।" এ স্থলে শাস্ত্রীয় মত ছাড়িয়া তাঁহাদের মত গ্রহণ সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে। এক এক স্থলে নিজেদের ঔষধ প্রচারের বিজ্ঞাপনের মত "এইরূপ বেদনায় আমাদের বাতকুলান্তক ঘৃতমালিস করিলে সদ্য সদ্য ফল দর্শিয়া থাকে"—প্রভৃতি কথাগুলি ব্যবহার না করিলেই ভাল হইত। যাহা হউক গ্রন্থ-প্রচারের উদ্দেশ্য যে সাধু, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মচর্য্য সাধন।—শ্রীযোগেশ-চন্দ্র সেন, এল, এম, এস এবং শ্রীহেমচন্দ্র সেন এল, এম, এস প্রণীত। কলিকাতা ৭৮ নং রসারোড, (নর্থ) হইতে গ্রন্থকারদ্বয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা। ব্রহ্মচর্য্য পালনে শারীরিক সামর্থ যেরূপ বর্দ্ধিত হয়, ইহা দ্বারা সেইরূপ মানসিক পবিত্রতাও সাধিত হইয়া থাকে। বাল্যকাল হইতেই ইহাতে অভ্যস্ত হওয়া উচিত। সেকালে গুরু গৃহে অধ্যয়ন নিরত বালকমণ্ডলী ইহাতে অভ্যস্তও থাকিত লোকে সুস্থকায় এবং দীর্ঘজীবিও হইত, এখন তাহা লোপ পাইয়াছে। ফলে অপরিণত বয়স হইতে অযথা শুক্রক্ষয়ে বাঙ্গালার যে ভীষণ সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা ভাবিলেও শিহরিতে হয়। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—'মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ"। অর্থাৎ শুক্রক্ষয়ের ফল মৃত্যু এবং শুক্র ধারণের ফল দীর্ঘজীবন। এই দীর্ঘজীবন লাভ করিবার জন্য সকল সময়ে প্রকৃতি-পুরুষের মিলনের ব্যবস্থা শাস্ত্রে কোন স্থানেই নাই। এ গ্রন্থে এ সকল কথার আলোচনা অতি উত্তমরূপে করা হইয়াছে। আমরা এ সকল বিষয়ের আলোচনা খুব বেশী পরিমাণেই করিয়া থাকি। ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে মহিলামহলেও যে ক্ষতি হইতেছে, তাহার কথাও গ্রন্থ মধ্যে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু উহা বড় সংক্ষিপ্ত। শুক্রমেহ এবং পুরুষত্ব হানির কারণই যে অপরিণত বয়সে ব্রহ্মচর্য্যের অভাব সে বিষয়ে আর কথা কি? প্রত্যেক অভি-ভাবকের এ সকল কথা যত্নপূর্ব্বক মনে রাখিয়া এই গ্রন্থের উপদেশ পালন করা উচিত। ব্রহ্ম-চর্য্যের ফল-কীর্ত্তন ব্যপদেশে গ্রন্থমধ্যে অমর কবি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতাপ, সত্যানন্দ, জীবানন্দ, মহেন্দ্র সিংহের নামোল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার প্রথমে মহাভারতের দেবব্রত বা ভীষ্মের নাম উল্লেখ করিলে কিন্তু আমরা বেশী সুখী হইতাম। ওরূপ আদর্শ ব্রহ্মচারী-চিত্র আর যে একটিও পাওয়া যায় না। য[illegible] আমরা এই ব্রহ্মচর্য্য পালনই তাঁহার ইচ্ছ[illegible] মৃত্যুর কারণ নির্দ্দেশ করি, তাহা হইলেই [illegible] দোষ কি! যাহা হউক এই দুর্দ্দিনে এর[illegible] একখানি সর্ব্ব প্রধান প্রয়োজনীয় গ্রন্থে[illegible] প্রচারে সমাজের মঙ্গল হইবার আশা ক[illegible] যায়। প্রত্যেক বালক, [illegible] প্রত্যেক বৃদ্ধ ব্যক্তি [illegible] [illegible]

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

২য় বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৪—অগ্রহায়ণ। | ৩য় সংখ্যা।

বিজয়া-সম্মিলন।

আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠক, পৃষ্ঠপোষক এবং অভিভাবকগণকে আমরা বিজয়ার [illegible] প্রণাম, নমস্কার, আশীর্ব্বাদ ও সম্ভাষণ জানাইতেছি।

বিজয়াদশমী চুকিয়া গিয়াছে—সে ত অনেক দিন; আজ তবে "বিজয়ার সম্ভাষণ" কেন? কিন্তু সত্য করিয়া ব'ল দেখি ভাই! এই কয়টা দিনের ব্যবধানে কি "বিজয়ার" সম্বন্ধ ফুরায়? আমাদের বিজয়াই যে চিরদিন! আমাদের শত সাধের মহিমময়ী মহাসপ্তমী দেখিতে দেখিতে চলিয়া যায়; অষ্টমী—চ'ক্ষের পলকে কালের কোলে ঢলিয়া পড়ে, নবমী—বিদায় নিঃশ্বাসে কাঁপিয়া উঠে; ষষ্ঠী আলোক-পুলকের উদ্বোধন—"আগমনীর" আকাঙ্ক্ষাময়ী সাধনায়, বেহাগের বিরহ ঢালিয়া মুহূর্ত্তেই নিস্পন্দ হয়; থাকে কেবল—বেদনা-বিদ্ধ—"বিজয়াদশমী" আমাদের উৎসব দুর্দ্দিনের জন্য, আমাদের উল্লাস প্রকৃতির তীব্র বিদ্রূপ; আমাদের দুঃখ দৈন্যের মধ্যে জাগিয়া থাকে—কেবল সেই শুভ্রবসনা উদাসিনী "বিজয়া দশমী!"

মা আসিয়াছিলেন—তিনটী দিনের জন্য। মা আসিয়াছিলেন—সন্তানকে কর্ম্মক্ষেত্রে শিক্ষা দিতে। সে শিক্ষা বুঝিয়াছ কি ভাই? অসি-পাশ-মেখলা রত্নোজ্জ্বল-কিরীটিনী আনন্দময়ী মা—সাক্ষাৎ "দেব শক্তি," পাশব বলের প্রতি-কৃতি পশুরাজ সিংহের পৃষ্ঠদেশে—মা'র পূর্ণ স্ফুরণ রাতুল চরণ! কাম ক্রোধাদি পশু শক্তিকে সংযম বলে পদ-দলিত করিতে পারিলে,—তোমার হৃদ্-কমলে দেবশক্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। সে মহাশক্তি তোমারই স্বাস্থ্যরূপে—তোমায় ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলিবে। জগজ্জননীর ইহাই ত শিক্ষা!

মা'র দক্ষিণে রাজরাজেশ্বরী লক্ষ্মী, বামে—বিজ্ঞান-বিদ্যা-রূপিণী সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী। ইহাতে

কি বুঝিলে ভাই? শুধু শক্তিতে কাজ হয় না। বিপুল-বিদার কর্ম্মক্ষেত্রে—শক্তির সঙ্গে ধনও বিদ্যা থাকা চাই। শক্তি, ধন ও বিদ্যা এই তিনটি থাকিলেই জগতে কার্য্য সিদ্ধি হয়। তাই মার সঙ্গে—সিদ্ধিদাতা গণ-নায়ক। কিন্তু, তুমি ক্ষীণ-পুণ্য দীনবুদ্ধি মর্ত্ত্যের মানব—যদি শক্তি ধন ও বিদ্যার গর্ব্বে—উচ্ছৃঙ্খল হও—তোমার শাসনের জন্য পুঙ্খিতশর দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়। তোমার দেশ—ঋষির দেশ,—শান্তির নিকুঞ্জবন, এখানে রক্তমাংসের দুর্নিবার ক্ষুধা—ভোগের ইন্ধনে জ্বলিয়া উঠে না। এখানে লালসার তাড়নায় শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ ব্যাকুল হইয়া ছোটে না, এখানে অসংযমের দীপ্ত আকাঙ্ক্ষায় খাদ্য খাদকে বিরোধ ফোটে না। এখানে ভগবতীর চরণ প্রান্তে, মূষিক, সর্প, ময়ূর একসঙ্গে বিহার করে। হায় রে! মাতৃদত্ত এমন শিক্ষাও আমরা বুঝিতে পারি না! মার বিশ্বব্যাপিনী বিরাট প্রতিমা - আমরা ত চাহিয়া দেখি না! আমরা শুধু দেখি —চিন্ময়ীর মৃন্ময়ী ঠাট, শুনি অর্থশূন্য অসার মন্ত্র পাঠ।

তোমার সকল শাস্ত্রের একমাত্র কেন্দ্র "আয়ুর্ব্বেদ"—তোমার শূন্য "চণ্ডী-মণ্ডপ",—তোমার মুহূর্ত্তের প্রমাদ—উৎসব ব্যসনের ক্ষণিক লোভে—তোমার স্বাস্থ্য সমুজ্জ্বল, "শক্তির" প্রতিষ্ঠাকে বিস্মৃতির জলে বিসর্জ্জন দিয়াছে। তোমার সকল ঐশ্বর্য্য সকল সুখ—স্বপ্নেরই মত শেষ হইয়া গিয়াছে! তোমার বুকের ভিতর "বিজয়া" আসিয়াছে। তবে, বিজয়ায় ব্যথা পাও কেন? বিজয়ার দীর্ঘশ্বাসে—মিলনের আনন্দ ভুলিয়া যাও কেন? কে বলে তোমার বিজয়া দশমী বিষাদময়ী? তুমি হিন্দু সন্তান, ঋষি বংশধর,—"বিজয়া দশমী" তোমার মহাপর্ব্ব, তোমার মিলনের পর্ব্ব, সিদ্ধির পর্ব্ব, আনন্দের পর্ব্ব। বিজয়ায় তোমার নবজীবনের আরম্ভ, সাধনার নব সূচনা; বিজয়ার পবিত্র স্মৃতি বুকে করিয়া আজ তোমায় অগ্রসর হইতে হইবে। আজ তোমায় সকল জীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়া পুরাতন হিংসা দ্বেষ ভুলিতে হইবে। সিদ্ধির হর্ষ ধারায় মনের মালিন্য মুছিয়া ফেলিয়া, শান্তিজল গ্রহণ করিতে হইবে। আজ তুমি —বাধা বিঘ্নহীন,—চাপল্য-বর্জ্জিত সাধক; তোমার বোধনের উল্লাস থামিয়া গিয়াছে, আরাত্রিকের বাদ্য-ভাণ্ড নীরব হইয়াছে, সপ্তমীর স্বপ্ন টুটিয়াছে, অষ্টমার জ্যোতিষ্ময়ী দীপমালা নিবিয়াছে, নবমীর উৎসবানন্দ অতীতে মিশিয়াছে;—আজ তোমার সম্মুখে - মাধুর্য্যময়ী "বিজয়া"। দালানে মা'র প্রতিমা নাই, উৎসবে কোলাহল নাই,—"বিসর্জ্জন আসিয়া আজ হর্ষ প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গিয়াছে।" আজ আর তোমার কিছু নাই. কিন্তু আজ যাহা তুমি লাভ করিয়াছ, তাহা অতি অপূর্ব্ব; সে জিনিষ—সপ্তমী অষ্টমী নবমীর উৎসব-কোলাহলের মধ্যে তুমি ত খুঁজিয়া পাও নাই।

"নব পত্রিকা"—তোমার পল্লী-প্রীতির শেষ স্মৃতি, দুর্গাপ্রতিমা তোমার স্বাস্থ্যরূপা মহাশক্তি। আজ তোমার মণ্ডপ শূন্য, কিন্তু তোমার নাই কি? আকাশে এখনও সেই কৌতুকতরল জ্যোৎস্নালোক, বাতাসে বিকশিত পদ্মের মৃদু সুরভি, জলে—কামনার বীচি-চাঞ্চল্য, স্থলে সুপক্ক শস্যের স্বর্ণ সঞ্চয়। তোমার কিসের অভাব? আজ তোমার "বিজয়া দশমী,"—শূন্য মণ্ডপে দাঁড়াইয়া, শত্রু মিত্রকে আলিঙ্গন করিয়া, আজ তোমাকে বিজয়ার মহামন্ত্র পাঠ করিতে হইবে,—

পুনরাগমনায় [illegible]

হে আমার আয়ুর্ব্বেদ! হে আমার স্বাস্থ্য-রূপা মহাশক্তি! হে আমার "আমিত্বের" আধার! স্বাবলম্বনের বিকাশ! তুমি আবার আসিও। আমি তোমায় বুঝি আর না বুঝি, তোমার সেবা করি আর না করি - তুমি আবার আসিও। যে মূর্ত্তিতে—সরস্বতী-দৃষদ্বতীর কূলে ঋষি-পরিষদের অক্লান্ত সাধনায়—তুমি স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে নামিয়াছিলে,—আবার তুমি সেই মূর্ত্তিতে প্রকট হইও। আমরা তোমায় প্রণাম করিব—

"য ওষধীষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।"

নাগার্জ্জুন।

ভারতীয় চিকিৎসা-ক্ষেত্রে—"নাগার্জ্জুনের" নাম সুবিদিত, তাঁহার জীবন-কাহিনী তাদৃশ সুপরিচিত নহে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি সংক্ষেপে নাগার্জ্জুনের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিব।

"নিবন্ধ-সংগ্রহ" নামক টীকা-কার ডল্লনাচার্য্যের মুখেই আমরা নাগার্জ্জুনের নাম প্রথম শুনিতে পাই। "প্রতিসংস্কর্ত্তাপি ইহ নাগার্জ্জুন এব"—অর্থাৎ নাগার্জ্জুন সুশ্রুত সংহিতার প্রতিসংস্কার করিয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদ-তন্ত্রকর্ত্তা বাগ্‌ভটও নাগার্জ্জুনের নামোল্লেখ করিয়াছেন। চক্রপাণি দত্তের "চক্র-দত্ত" নামক প্রসিদ্ধ সংগ্রহ পুস্তকে "নাগার্জ্জুনাঞ্জন" এবং "নাগার্জ্জুন যোগ" নামক দুইটী ঔষধ উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐ দুইটী ঔষধ নাকি—পাটলীপুত্র নগরে স্তম্ভে নাগার্জ্জুন স্বয়ং উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন।

"কক্ষপুট" নামক একখানি চিকিৎসাগ্রন্থ —নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক বিরচিত বলিয়া বিখ্যাত। নাগার্জ্জুন যেখানে যাইতেন, গ্রন্থখানি সঙ্গে লইতেন। কক্ষপুটে ধারণ করিতেন বলিয়াই "কক্ষপুট" নামে উক্ত গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে।

অতএব দেখা যাইতেছে নাগার্জ্জুন একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানে তাহার অসাধারণ অধিকার ছিল।

এক্ষণে দেখা যাউক নাগার্জ্জুন কোন্ শতাব্দির লোক? কাশ্মীরের ইতিহাস "রাজতরঙ্গিনী" একখানি প্রাচীন গ্রন্থ। এই রাজতরঙ্গিনীর মতে—কাশ্মীর দেশ নাগার্জ্জুনের জন্মভূমি। যথা—

"ততঃ ভগবতঃ শাক্যসিংহস্য পুর-নিবৃতেঃ॥
অস্মিন্ সহলোক ধাতৌ সার্দ্ধং বর্ষশতং হ্যগাৎ
বোধিসত্বশ্চ দেশেঽস্মিন্ একভূমীশ্বরোঽভবৎ।
স তু নাগার্জ্জুনঃ শ্রীমান্ ষড়র্হ বনসংশ্রয়ী॥"

ভগবান বুদ্ধদেবের পরি নির্ব্বাণের দেড়শত বৎসরের পর, কাশ্মীর দেশে নাগার্জ্জুন প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধ তিব্বতীয় গ্রন্থ "জাম—পাল—ৰ্চ—গ্যুই" প্রামাণিক বলিয়া বিখ্যাত। এই গ্রন্থে একটী শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়।

দে—সিন্ শেগ—প-ও-দেস্—নেস্
লো—নি—যি—গ্যু লোন্—প ন।
গে—লোঙ—লু-যিস্ দো—বোদ্ ভুঙ
তন্—প—ল—দদ্ চিঙ্ কন্॥

ইহার অর্থ বুদ্ধদেব ইহ জগৎ হইতে মহাপ্রস্থান করিবার চারিশত বৎসর পরে ভিক্ষু—নাগার্জ্জুন জন্মগ্রহণ করিয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অনেক উপকার করিয়াছিলেন। এই তিব্বতীয়

গ্রন্থের মতে—দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত বিদর্ভ দেশ—নাগার্জ্জুনের জন্মভূমি। তিনি ব্রাহ্মণকূলে আবির্ভূত হইয়া, প্রথম যৌবনেই বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তাঁহার উপদেশে মুগ্ধ হইয়া—বহু সহস্র নর নারী বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। নাগার্জ্জুন রাজার মত সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, বৈদিক ধর্ম্মের উপর বৌদ্ধ-প্রভাব সংস্থাপন করিয়াছিলেন, পর্য্যটকের ব্রতগ্রহণ করিয়া সমগ্র এসিয়ায় ভারতের গৌরব প্রচার করিয়াছিলেন। কত দেশের কত পণ্ডিত তাঁহার কাছে পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল। কত রত্ন-কিরীটী রাজমস্তক তাঁহার পদতলে বিলুণ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহার কর স্পর্শে—কত জীর্ণ দেহে নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছিল, কত অনাথ আতুর ব্যাধি-যন্ত্রণা ভুলিয়াছিল, কত তাপিত তৃষিত ব্যথিত হৃদয়ের আকুল বেদনা জন্মের মত ঘুচিয়া গিয়াছিল।

কিন্তু এমন যে নামজাদা নরনারায়ণ নিত্য-নিরত-কীর্ত্তি নির্ব্বেদ মুক্ত নাগার্জ্জুন—এদেশে তাঁহার পবিত্র জীবনের ধারাবাহিক কোনও ইতিহাস দেখিতে পাওয়া যায় না। কবিরাজ মহাশয়েরা তাঁহার কোনও খবর রাখেন না। নাগার্জ্জুনের জীবন কাহিনী জানিতে হইলে, আমাদিগকে তিব্বত চীন বা জাপানে গিয়া তথাকার মনীষিবৃন্দের শরণাগত হইতে হয়! ইহার চেয়ে বিস্ময়-কর ব্যাপার আর আছে কি?

বৌদ্ধযুগে—ভারতবর্ষে একজন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন—তাঁহার নাম "ভোজভদ্র।" ইনি অত্যন্ত "বৌদ্ধ বিদ্বেষী" এবং চণ্ড-স্বভাব শাসন কর্ত্তা ছিলেন। চিকিৎসক রূপে নাগার্জ্জুন—এই ভোজভদ্রের রাজধানীতে আহূত হন। প্রথমে—নাগার্জ্জুনের চিকিৎসা-কৌশলে—ভোজভদ্রের শ্রদ্ধা জন্মিলে, নাগার্জ্জুন ধর্ম্মোপদেশ দানে রাজার মতের পরিবর্ত্তন করেন। রাজা—বৌদ্ধধর্ম্মী, নাগার্জ্জুনের শিষ্য হন। এই ব্যাপারে—রাজ সংসারে নাগার্জ্জুনের এতদূর প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল যে অনেকে নাগার্জ্জুনকেই প্রকৃত রাজা বলিয়া জানিত। ক্রমাগত ৭ বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিয়া, নাগার্জ্জুন ভোজভদ্রকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

নাগার্জ্জুন—বৌদ্ধাচার্য্য শরহের শিষ্য ছিলেন। নালন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ে নাগার্জ্জুন বিদ্যাশিক্ষা করেন। বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া—পরোপকার-বৃত্তি-প্রণোদিত হইয়া তিনি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র ও পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভা-বলে—আয়ুর্ব্বেদের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। তিনি রাসায়নী বিদ্যার বহু রহস্যই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই জন্য "রসরত্ন সমুচ্চয়" নামক রসগ্রন্থের রচয়িতা—নাগার্জ্জুনের প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা দেখাইয়াছেন।

অভিধানে নাগার্জ্জুনের অনেকগুলি নাম দেখিতে পাওয়া যায় যথা;—

নাগার্জ্জুনঃ সুরানন্দো
নাগবোধির্যশোধনঃ।
খণ্ড কাপালিকো ব্রহ্মা
গোবিন্দো লপকো হরিঃ॥

তিব্বতীয় গ্রন্থে * নাগার্জ্জুন সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। কিন্তু—নাগার্জ্জুনের ঠিক আবির্ভাব কাল স্থির করা দুরূহ ব্যাপার। এখন কেহ কেহ প্রমাণ করিতে চাহেন—সুশ্রুত সংহিতা খৃষ্ট পুর্ব্ব তৃতীয় কিম্বা চতুর্থ শতাব্দিতে রচিত হইয়াছিল। নাগার্জ্জুন এই সুশ্রুতের প্রতি সংস্কার এবং উত্তর তন্ত্র রচনা করেন। আবার কেহ কেহ বলেন—নাগার্জ্জুন খৃষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। পঞ্চম শতাব্দিতে [illegible]

Manuscript" হইতে জানা যায়—পঞ্চম শতাব্দির মধ্যেই সুশ্রুত একখানি অতি প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল।

বাগ্‌ভট রচিত গ্রন্থে নাগার্জ্জুনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং নাগার্জ্জুন বাগ্‌ভটের পূর্ব্ববর্ত্তী। বাগ্‌ভট তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দির লোক—ইহাই অনেকের অনুমান। নাগার্জ্জুন ইহার বহু পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন।

রসায়ন শাস্ত্রের তির্য্যাগ্‌পাতন-প্রণালী—নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রথম উদ্ভাবিত হইয়াছিল। তির্য্যাগ্‌ পাতনের ইংরাজী নাম--Distillation. নাগার্জ্জুন বৌদ্ধধর্ম্মালবম্বী হইলেও তাঁহার-অমলে এদেশে উন্নত প্রণালীর অস্ত্র চিকিৎসা ও সম্মোহিনী (Anœsthetic) বিদ্যার প্রভৃত প্রচলন ছিল। তিনি "আরোগ্য শালা" (Hospital) ও "ভেষজাগার" (Dispensary) স্থাপন করিয়া প্রকৃতি-পুঞ্জের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দিতে চীন দেশীয় পরিব্রাজক হিয়াংসাং তদীয় ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন - "যে চারিটী সূর্য্যের উদয়ে সমস্ত জগৎ আলোকিত হইয়াছে—"নাগার্জ্জুন" তাহাদের একটী।" চীন ভাষায় নাগার্জ্জুনের একখানি জীবন চরিত রচিত হইয়াছিল। একজন জাপানী পণ্ডিত বলেন—ঐ-জীবন চরিত, সংস্কৃত ভাষায় রচিত নাগার্জ্জুন কাহিনীর অনুবাদ। খৃঃ ৪০০ অব্দে বহু ভাষাবিদ্ পণ্ডিত- কুমারজীব ঐ গ্রন্থ চীন ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

শতক-শাস্ত্র প্রণেতা আর্য্যদেব নাগার্জ্জুনের অতিপ্রিয় ছাত্র ছিলেন।

নাগার্জ্জুন বহু গ্রন্থই রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলিই সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়া আসিতেছে।

১। নাগার্জ্জুন কক্ষপুট। ২। সুশ্রুতের প্রতি সংস্কার ও উত্তর তন্ত্র। ৩। প্রজ্ঞা পারমিতা টীকা। ৪। দ্বাদশ নিকায় শাস্ত্র। ৫। ধর্ম্ম সংগ্রহ। ৬। প্রজ্ঞাদণ্ড। ৭। প্রজ্ঞাশতক। ৮। মাধ্যমিক সূত্র।

শেষোক্ত মাধ্যমিক সূত্রের—টীকাকার—নাগার্জ্জুনকে প্রণিপাত করিয়াছেন—

নাগার্জ্জুনায় প্রণিপত্য তস্মৈ
তৎ কারিকাণাং বিবৃতিং করিষ্যে।
(চন্দ্রকীর্ত্তি রচিত মাধ্যমিক বৃত্তি)

সংস্কৃত ভাষায় রচিত নাগার্জ্জুনের যে জীবন চরিত কীট-দষ্ট অবস্থায় পাওয়া যায়, তাহার অনুবাদ এই প্রবন্ধ লেখক কর্ত্তৃক আরম্ভ হইয়াছে। এই অনুবাদ মুদ্রিত হইলে—অনেকে নাগার্জ্জুনের অনেক কথা জানিতে পারিবেন।

তন্ত্রে নাগার্জ্জুনকে "মুনি" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। শৈবসিদ্ধান্ততন্ত্রে বাধক রোগের একটী যোগ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই যোগটী নাগার্জ্জুন-পরিকল্পিত। তন্ত্রকার নিম্নলিখিত শ্লোকে তাহা স্বীকার করিয়াছেন—যথা শিব পার্ব্বতী সংবাদে শিব বলিতেছেন—

"ইত্যুচে রুচিরালাপে! নাগার্জ্জুনোমুনিঃ স্বয়ং।"

ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায়—তান্ত্রিক যুগেও বৌদ্ধ নাগার্জ্জুনের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। শাবর-তন্ত্রে দ্বাদশ শিবের মধ্যে নাগার্জ্জুনের নামও উল্লিখিত হইয়াছে। এইজন্য কেহ কেহ বলেন—নাগার্জ্জুন দুইজন ছিলেন, [illegible] বৌদ্ধ নাগার্জ্জুন, অপর নাগার্জ্জুন [illegible] নাগার্জ্জুন নামে তন্ত্রশাস্ত্রে বিখ্যাত।

বারান্তরে আমরা ইহার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব।

পণ্ডিত—শ্রীবিজোদবিহারী [illegible]

শর্করা-তত্ত্ব।

—:০:—

"রাজা অশোকের ক'টা ছিল হাতী,
টোডর মল্লের ক'ছেলে, ক' নাতি?
যুধিষ্ঠিরের বাবা কোন্ জাতি?
এ সব করিয়া বাহির,
ক'রেছি বিদ্যা জাহির!"

কবি এ সকল কথা কৌতুক করিয়াই লিখিয়াছেন: আমরা কিন্তু পদে পদে তাঁহার অমর বাক্যের সার্থকতা অনুভব করিতেছি। দেশে যেন একটা আবিষ্কারের যুগ আসিয়াছে। নিত্য নিত্য নূতন নূতন প্রত্নতত্ত্ব বাহির করিয়া সকলেই বাহাদুরী দেখাইতে চাহেন। কেহ হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম আচার ব্যবহার রীতি নীতির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বাহির করিতেছেন, কেহ বিক্রমপুরের বল্লালসেনকে বর্দ্ধমানে ভূমিষ্ঠ হইতে দেখিতেছেন,—কেহবা রাম রাবণের ব্যক্তিত্ব ভুলিয়া রামায়ণকে কৃষিকর্ম্ম বলিয়া বক্তৃতা দিতেছেন; কালিদাসকে বাঙ্গালী করিয়া তুলিতে পারিলে, রামপ্রসাদের জাতি মারিলে, আত্ম গৌরব খ্যাপনের সুবিধা হয়। যাঁহারা এরূপ কার্য্য করেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি। কিন্তু যাঁহারা এ দেশের যুগযুগান্তরের আপনার ধনকে —নিজের ক্ষুদ্র অনুমানের সাহায্যেই অপরিচিত ও পর করিয়া দিতে চাহেন—তাঁহাদের মহৎ উদ্দেশ্য তো আমার মোটা বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না। তাই, "ভারতবর্ষে পূর্ব্বে চিনি ছিল না"—নামজাদা লোকের মুখে এরূপ কথা শুনিলে আমরা বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া পড়ি।

আসল কথাটা হইতেছে এই—একখানা বড় কাগজে একজন বড় লেখক লিখিয়াছেন —"ভারতবাসীরা পূর্ব্বে চিনি প্রস্তুত করিতে জানিত না, ভারতে চিনি ছিল না; চিনি চীন দেশ হইতে ভারতে আসিয়াছে—সেইজন্য ইহার নাম "চিনি"। সেইরূপ মিসর দেশ হইতে ভারতে যে মিষ্ট দ্রব্য আসিয়াছে তাহার নাম "মিশ্রী"।"

চিনি ও মিছরীর ব্যুৎপত্তিবাদ এইরূপ। অতএব আমাদিগকে বুঝিতে হইবে—আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ চিনি কিম্বা মিছরী প্রস্তুত করিতে জানিতেন না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—ঋষি যুগে এ দেশে চিনি ও মিছরীর অত্যন্ত ব্যবহার ছিল। ভারতের আয়ুর্ব্বেদে চিনি মিছরীর গুণ বর্ণিত হইয়াছে। সে কালের বৈদ্যগণ—কথায় কথায় "সিতা" ও "শর্করার" ব্যবস্থা করিতেন। "সিতোপল" ও মৎস্যণ্ডিকা"—তাঁহাদের আদরের জিনিষ ছিল। আমাদের বিশ্বাস সেই সুদূর অতীতের আচার্য্য যুগে—ভিন্ন দেশ-জাত, কোনও পদার্থই আয়ুর্ব্বেদে গৃহীত হয় নাই। চিনি ও মিছরী যখন বহু ঔষধের উপাদান স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তখন নিশ্চয়ই ঋষিগণ চিনি ও মিছরী প্রস্তুত করিতে পারিতেন।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি "চিনির" গুণ কিছু সবিস্তারে প্রকাশ করিব। আমাদের খাদ্য দ্রব্যের ভিতর এমন অল্প জিনিসই আছে, যাহা উপকারিতায় চিনির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে। আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষায় চিনির শক্তি বড় বেশী। মানব জাতির জীবন ধারণে—চিনি একটী অনুকূল সহচর। চিনি সকল খাদ্যের শ্রেষ্ঠ।

চিনির সংস্কৃত নাম—"সিতা" ও "শর্করা।"

অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে চিনির আদর দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে মধু হইতে শর্করা প্রস্তুত হইত তাহার নাম ছিল—মধু-সিকতা অর্থাৎ মধু জাত বালুকা। চিনি বালির মতই ঝরঝরে জিনিষ, তাই মধু-জাত চিনির "মধু সিকতা" নাম সঙ্গত ও স্বাভাবিক।

ইহার পর, ইক্ষুরস হইতে চিনি প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কিন্তু কোন্ রাসায়নিক ইহা প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এখন তাহা বলিতে পারা যায় না।

ইতিহাস পড়িলে জানা যায় মহাবীর আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সর্ব্ব প্রধান সেনাপতি "নিয়াকাস"—ভারতবর্ষ হইতে গ্রীক দেশে ইক্ষু-বৃক্ষ লইয়া গিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই য়ুরোপের কৃষিক্ষেত্রে—মধুর রসের অবতার ইক্ষুর আবাদ আরম্ভ হয়।

এক্ষণে—ইক্ষু ভিন্ন, খর্জ্জুর তাল ও নারিকেল বৃক্ষের রস এবং বিটপালম্ প্রভৃতি কন্দ হইতে চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ম্যাকগ্রাফ্ নামক একজন জার্ম্মান্ বৈজ্ঞানিক ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে বিটপালম্ হইতে প্রথম চিনি বাহির করেন। নেপোলিয়নের আমলে- ফ্রান্স দেশে—বিট্ চিনির অত্যন্ত আদর বাড়িতে থাকে। এখন—বিটের চিনি সর্ব্বত্র ছাইয়া ফেলিয়াছে। এখন ঔষধের অনুপান স্বরূপ চিনির আবশ্যক হইলে কবিরাজ মহাশয়কে "ইক্ষু চিনি" এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হয়। এদিকে খাঁটী ইক্ষুজাত চিনি খুঁজিয়া বাহির করা—এক্ষণে বড় সহজ সাধ্য ব্যাপার মনে হয় না।

পাশ্চাত্যমতে চিনির উপকারিতা।

পাশ্চাত্য রাসায়নিকের পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে চিনি কার্ব্বন, হাইড্রোজেন্ ও অক্সিজেন —এই তিন মৌলিক পদার্থের সংমিশ্রণে উৎপন্ন। চিনি ভক্ষণ করিবামাত্র—উহা আমাদের রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়, তাহার পর মৃদুভাবে দগ্ধ হইয়া, কার্ব্বণিক এসিড্ বাষ্প ও জলে পরিণত হয়। এই দগ্ধ হইবার সময়েই, চিনি কর্ত্তৃক যে তাপের উদ্ভব হইয়া থাকে—সেই তাপের কিয়দংশই শরীরের শক্তিতে পরিণত হয়। সুতরাং শর্করাজাত তাপ হইতে আমাদের শারীরিক তাপ সংরক্ষিত হইয়া থাকে। সেই তাপজাত শক্তির সাহায্যেই আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে সকলই কার্য্যই করিতে পারি।

ভক্ষিত চিনি পাকস্থালীতে উপস্থিত হইলে, তাহার কিয়দংশ পাকস্থালীর রসের সঙ্গে মিলিয়া Grape Sugarএ রূপান্তরিত হয়, তাহার পর অন্ত্রের মধ্যে উপস্থিত হইলে, অন্ত্রস্থিত রসের সহিত মিলিত হইয়া অবশিষ্টাংশও Grape Sugarএ পরিণত হয়। ঐ গ্রেপ সুগার রক্তের সহিত মিলিত হইয়া রক্তবাহিনী শিরার সাহায্যে যকৃত নামক যন্ত্রে গমন করিয়া Glycogenএর রূপ ধরিয়া, যকৃতের মধ্যেই বাস করে। আবশ্যক হইলে এই গ্লাইকোজেন্ শারীরিক তাপও শক্তির সাহায্য করিয়া থাকে। সংক্ষেপে ইহাই চিনির উপকারিতা।

চিনির বিশেষ গুণ।

১। অতি সহজে পরিপাক হয়। ২। শরীর মধ্যে অতি সত্বর শোষিত হয়। ৩। তাপ ও শক্তি বৃদ্ধি করিয়া শরীরের পোষণ করিয়া থাকে। চিনির আরও গুণ—

প্রথমতঃ। আমরা ডাল ভাত, আলু, গম প্রভৃতি যাহা কিছু শ্বেতসারময় দ্রব্য আহার করি,—ঐ সকল পদার্থ মুখের লালা ও অন্ত্রের পাচক রসের সাহায্যে চিনিতে পরিণত হইয়া শরীরে শোষিত হয়। কিন্তু চিনি খাইলে—উহা একেবারেই শরীরে শোষিত হইয়া থাকে, সুতরাং শারীর যন্ত্রগুলিকে অকারণে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না।

দ্বিতীয়তঃ। আমরা ডাল ভাত—ফল মূল যাহা কিছু ভক্ষণ করি, সে সকল জিনিষের সমস্ত টুকু হজম হয় না, তাহার অপরিপাচ্য অংশ, মলমূত্রের সহিত শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। চিনি খাইলে, চিনির সমস্ত অংশই জীর্ণ হইয়া দেহ মধ্যে অবস্থিতি করে। এজন্য ও শারীরযন্ত্র গুলিকে বেশী পরিশ্রম করিতে হয় না।

তৃতীয়তঃ। চিনি হইতে মেদ [চর্ব্বি—Fat] উৎপন্ন হইয়া থাকে সেই মেদ দেহের ভিতর সঞ্চিত থাকিয়া আবশ্যক মত তাপ ও শক্তির উৎপাদন করে। একজন বিচক্ষণ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক চিনির গুণ পরীক্ষা করিয়া নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন ;—

(ক) চিনি খাইলে মাংস পেশীর ক্ষমতা বাড়ে। (খ) শরীর যন্ত্রের অযথা ক্ষয় নিবারিত হয়। (গ) মুখরোচক বলিয়া শীঘ্র পরিপাক হয়। (ঘ) চিনি—বহুদিন অবিকৃত থাকে। (ঙ) চিনি মিশ্রিত খাদ্য পচিয়া নষ্ট হয় না।

চিনির এই সকল গুণের একে একে উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

(ক) চিনি খাইলে মাংসপেশীর ক্ষমতা বাড়ে। সেই জন্য চিনি ভক্ষণকারী খুব পরিশ্রম করিতে পারে; কষ্ট সহ্য করিতে পারে, উদ্যমশীল হয়। আরব দেশের মানুষ এবং আরব দেশের পশু উষ্ট্র—অত্যন্ত খর্জ্জুর ভক্ষণ করে। খর্জ্জুরে শত করা ৫৮ ভাগ চিনি বর্ত্তমান। এই জন্য আরব দেশের লোক কষ্ট সহিষ্ণু, উষ্ট্রও অত্যন্ত পরিশ্রমী। সুমাত্রার নাবিকেরা যথেষ্ট ইক্ষুরস পান করে, তাই তাহারা দাঁড় টানিতে ক্লান্তি বোধ করে না। ইংরাজ জাতি খুব চিনি খায়, তাই তাহারা উদ্যম শীলতার আদর্শ।

(খ) গুরুতর পরিশ্রমে মাংস পেশীর দৌর্ব্বল্য জন্মে। চিনি খাইবামাত্র সে দৌর্ব্বল্য তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়। য়ুরোপের বিখ্যাত ভ্রমণ কারিগণ—চিনির ডেলা মুখে করিয়া চুষিতে চুষিতে দীর্ঘ পথ এবং উচ্চ পর্ব্বত অতিক্রম করিতে কোনও কষ্ট বোধ করেন না।

(গ) শিশুরা চিনি খাইতে ভাল বাসে,—এই জন্য শিশুর পাকস্থালীতে শীঘ্রই খাদ্যাদি পরিপাক হইয়া থাকে। মুহুর্মুহুঃ তাহাদের ক্ষুধারও উদ্রেক হয়।

(ঘ) মিছরী, বাতাসা, ওলা প্রভৃতি জিনিষ—চিনিরই রূপান্তর। এসব দ্রব্য অনেক দিন পর্য্যন্ত নষ্ট হয় না।

(ঙ) মোরব্বা, জেলী, জ্যাম প্রভৃতি খাদ্য গুলিতে অতিরিক্ত চিনি মিশ্রিত থাকায় নষ্ট হয় না। দিল্লীর হালুয়াসান্ নামক উপাদেয় মিষ্টান্ন, ৩ মাস পর্য্যন্ত ব্যবহার যোগ্য থাকে। তাহার স্বাদ গন্ধ সমস্তই টাট্‌কা প্রস্তুতের মত মনে হয়।

প্রাচ্যমতে চিনির গুণ।

আর্য্য ঋষিগণ—চিনির অনেক গুণ জানিতেন। "আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে" ইহার অনেক প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়।

চিনি পুষ্টি কারক। অতি কৃশ ব্যক্তি ও চিনি ভক্ষণ করিয়া মোটা হইতে পারে। এই জন্য—"অশ্বগন্ধা ঘৃত" "অমৃতপ্রাশ" "মদনানন্দ মোদক" প্রভৃতি বলকারক ঔষধে চিনির বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

চিনি ক্ষয় নিবারক। যক্ষা রোগী ও জীর্ণজ্বর রোগীকে চিনি খাওয়াইলে,—তাহাদের শরীরের ক্ষয় নিবারিত হইয়া ওজন বৃদ্ধি হয়। এইজন্য "তালীশাদি চূর্ণ"-"সিতোপলাদি-চূর্ণ"-"সম-শর্করচূর্ণ" "ভার্গীগুড়" "চ্যবনপ্রাশ" "বাসাবলেহ"-"কুষ্মাণ্ডখণ্ড"-প্রভৃতি ক্ষয়রোগ-নাশক ঔষধ গুলির—চিনি একটী প্রধান উপাদান।

চিনি—রক্তরোধক। কোনও স্থান কাটিয়া গেলে, চিনির প্রলেপ দিলে তৎক্ষণাৎ রক্ত বন্ধ হয়। চিনির নস্য গ্রহণ করিলে—নাসিকা হইতে রক্ত স্রাব বন্ধ হয়। চিনির পানকপানে—মুখ দিয়া রক্ত উঠা রোগ প্রশমিত হয়।

চিনি—রক্তহীনতা ও ব্যাধিজনিত দৌর্ব্বল্যে বিশেষ উপকারী পথ্য। এইরূপ অবস্থায় ডাক্তারগণ মল্ট ব্যবস্থা করেন। মল্ট এর উপাদান যব-শর্করা। মল্টের কাজ চিনিতেই চলিতে পারে; অধিকন্তু চিনি মল্টের চেয়ে সস্তা।

চিনি ভক্ষণে প্রকুপিত বায়ু ও পিত্ত প্রশমিত হইয়া থাকে।

চিনি—শরীরের সপ্ত ধাতু বর্দ্ধক, অতএব শিশুদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে চিনি খাইতে দেওয়া উচিত। চিনির দ্বারা শারীরিক তাপ বৃদ্ধি হয়, বৃদ্ধ বয়সে শারীর তাপ স্বভাবতঃই কমিয়া যায় বলিয়া, বৃদ্ধদের পক্ষে—চিনি একটী অত্যুৎকৃষ্ট খাদ্য। হিন্দুশাস্ত্রে যে বৃদ্ধাবস্থায় বান-প্রস্থের ব্যবস্থা আছে, আমার মনে হয়—এইরূপ ব্যবস্থায় বনে থাকিয়া মিষ্ট ফল মূল খাওয়ার সুবিধা হয়। পাকা ফলে—চিনির অংশ যথেষ্ট থাকে, সুতরাং ফল ভক্ষণে চিনি ভক্ষণেরই কাজ হয়।

অনশন ব্রতধারী ভগবান্ বুদ্ধকে তাঁহার এক শিষ্যা গোপনে চিনি খাওয়াইত।

চিনির দোষ।

এইবার চিনির দুই চারিটী দোষের কথাও পাঠকগণের কাছে প্রকাশ করিব।

চিনি—শ্লেষ্মাকারক। সুতরাং নূতন সর্দ্দি কাসিতে চিনি খাওয়া উচিত নহে। নিতান্ত খাওয়া আবশ্যক হইলে—গরম করিয়া অথবা কোনও কটু পদার্থ (ঝাল) মিশাইয়া খাইতে হয়। মিছরী মরিচ সিদ্ধ গরম জল পানে সর্দ্দি কমে।

চিনি মেদো বর্দ্ধক। সুতরাং যাঁহারা অত্যন্ত স্থূলকায়, তাঁহারা চিনি খাইবেন না। কিছু দিন চিনি বা চিনিঘটিত খাদ্য পরিত্যাগ করিলে, মোটা মানুষের বিশাল ভুঁড়িও কমিয়া যায়। স্থূলব্যক্তির দেহে যদি বাত রোগের আবির্ভাব হইয়া থাকে,—তিনি চিনিকে বিষের মত পরিত্যাগ করিবেন।

যাঁহারা শারীরিক পরিশ্রম আদৌ করেন না, তাঁহারা যদি চিনি খান, তাহা হইলে সে চিনি শর্করা হইয়া সম্পূর্ণ দগ্ধ হইতে পারে না, মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া যায়, মূত্রের সহিত চিনি নির্গত হইলে সেই রোগকে মূত্রশর্করা বা "গ্লাইকোসুরিয়া" বলে। এ রোগে চিনি ভক্ষণ পরিত্যাগ না করিলে—রোগ শীঘ্রই সাংঘাতিক ডায়েবিটিসে পরিণত হইতে পারে। ডায়েবিটিসে চিনি ও চিনি-[illegible]

খাদ্য (অন্ন, আলু প্রভৃতি শ্বেতসারময় দ্রব্য) —প্রাণঘাতী কালকূটের মত অনিষ্টকারী।

যাঁহারা অধিক চিনি বা চিনি জাতীয় খাদ্য ব্যবহার করেন,—তাঁহারা রীতিমত পরিশ্রম করিলে, চিনির উপকারিতা বুঝিতে পারিবেন। চিনি খাওয়া খুব ভাল, কিন্তু চিনির অল্প ব্যবহার কখনই ভাল নহে। আমাদের দেশের চিনির অপব্যবহারই ঘটিয়া থাকে।

উপবাসের পর—প্রথমেই চিনির পানা খাওয়া ভাল। ইহাতে পিত্ত প্রকৃতিস্থ হয়, মুখশোষ, শরীরের ক্লান্তি ও অবসাদ দূরীভূত হয়।

ঈষদুষ্ণ দুগ্ধের সহিত চিনি ভক্ষণ করিলে— হৃৎপিণ্ডের বলবৃদ্ধি ও শরীরে রক্তস্রোতের বেগ বৃদ্ধি হয়।

ঘৃতের সহিত চিনি খাইলে শুক্র বৃদ্ধি হইয়া থাকে। নবনীতের সহিত চিনি ভক্ষণে নার্ভের বল বাড়ে স্মরণ শক্তি প্রখর হয়।

দধির সহিত চিনী খাইলে কোনও উপকার হয় না। অধিকন্তু—দধি সেবনের গুণ নষ্ট হইয়া যায়। বাঙ্গালী বাবুদের মুখে কিন্তু চিনি পাতা দধি ভিন্ন রোচে না। দধির সহিত চিনি— চিনির অপব্যবহার মাত্র।

যাঁহাদের দেহে রক্তের বিকৃতি [খোস্ পাচড়া, কণ্ডূ, ক্ষত, কুষ্ঠ প্রভৃতি] আছে. যাঁহারা জোলাপ লইয়াছেন. যাঁহাদের অন্ত্রে কৃমি সঞ্চিত আছে, যাঁহারা প্রায়ই যকৃতের পীড়ায় আক্রান্ত হন—তাঁহারা চিনি খাইবেন না। নবপ্রসূতা নারীর পক্ষেও চিনি ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

চিনি প্রস্তুতের সহজ প্রণালী।

এক কলসী ইক্ষুগুড় লইয়া কলসীর তলদেশে ছিদ্র করিয়া উহা একখানি গামলার উপর ২৪ ঘণ্টা বসাইয়া রাখিবেন। ইহাতে ঐ গুড়ের সমস্ত তরলাংশ (মাত্) ঝরিয়া পড়িবে। তাহার পর কলসীর সারগুড় বাহির করিয়া—ঝুড়ীতে কিম্বা ডালায় রাখিয়া— তাহার উপর জলজাত শৈবাল চাপা দিবেন। এইভাবে একদিন একরাত্রি থাকিলে, শৈবাল তুলিয়া দেখিবেন উপরের গুড় বেশ শুভ্রবর্ণ হইয়াছে। উহাই চিনি। যতটা গুড় শুভ্রবর্ণ হইয়াছে—ততটুকু গুড় চাঁচিয়া অন্যপাত্রে রাখিবেন। বাকী গুড়ের উপর আবার নূতন শৈবাল চাপা দিবেন। এইরূপ ভাবে পূর্ব্বে— আমাদের দেশে চিনি প্রস্তুত হইত। এখনও 'দলুই' উপাধিধারী একশ্রেণীর হিন্দুরা—এইরূপ প্রণালীতে চিনি প্রস্তুত করিয়া থাকে। সেই চিনিকে লোকে দলুই বা দোলো বলে। এইরূপে চিনিকে কাষ্ঠের পাটার উপর রাখিয়া —দলিয়া লইতে হয় বলিয়াও ইহার নাম "দোলো" হইতে পারে।

গুড়কে শুভ্র করিবার জন্য—পাঁচ প্রকার জলজ শৈবাল ব্যবহৃত হয়। তাহাদের নাম— "দাম"—(পাটা সেওলা), "শিয়াল লাঙলী"— (দেখিতে শৃগাল লাঙুলের মত) "ঝাঁজি" (অতি সূক্ষ্ম—অথচ লম্বা) পাতাড়ী (এই জাতীয় শেওলায় ছোট ছোট গোলাকার পাতা হইয়া থাকে) "কোতোকুয়া" (জলা জমীতে জন্মে— দেখিতে কলমীলতার মত - অত্যন্ত কোমল) —এই সকল শেওলার সাহায্যে গুড় হইতে অনায়াসেই চিনি করিতে পারা যায়। প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষেই ইহা সহজ সাধ্য কাজ। কিন্তু আমাদের মধ্যে সে "স্বাবলম্বন" কোথায়? আমরা—।৶০ ছয় আনা মূল্য দিয়া—সহস্রহস্তের দ্বারা অপবিত্র চিনি অনায়াসেই কিনিয়া খাইব, তথাপি নিজে চিনি প্রস্তুত করিয়া খাইব

পারিব না। আমাদের এক সাধক গাহিয়া গিয়াছেন—

"চিনি হ'তে চাইনেকো মা!
আমি চিনি খেতে ভালবাসি"

এই গানটী—সারা বঙ্গের প্রতিধ্বনি। আমরা চিনি খাই—কিন্তু সে চিনি যোগাইবার ভার চিন্তামণির উপর।

শ্রীসতীশচন্দ্র দে এম্ এ।

রোগ-পরীক্ষা।

চিকিৎসা করিবার পূর্ব্বে চিকিৎসক রোগীর রোগ পরীক্ষা করা উচিত। পরীক্ষাদ্বারা রোগ সুনির্দ্দিষ্ট হইলে তাহার চিকিৎসা সম্ভব; নতুবা রোগ স্থির করিতে না পারিলে তাহার চিকিৎসা অসম্ভব। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে "রোগমাদৌ পরীক্ষেত" অর্থাৎ সর্ব্ব প্রথমে রোগ পরীক্ষা করিবে। বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া রোগ নির্দ্ধারণপূর্ব্বক চিকিৎসাকর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

রোগ পরীক্ষা সম্বন্ধে মহর্ষি সুশ্রুত বলেন "আতুর গৃহমভিগম্য উপবিশ্য আতুরমভিপশ্যেৎ স্পৃশেৎ পৃচ্ছেচ্চ। ত্রিভিরেতৈ বিজ্ঞানোপায়ৈ রোগাঃ প্রায়শো বেদিতব্যা ইত্যেকে। তত্তু ন সম্যক্, ষড়বিধোহি রোগানাং জ্ঞানোপায়াঃ। তদ্যথা পঞ্চভিঃ শ্রোত্রাদিভিঃ প্রশ্নেন চেতি"। অর্থাৎ আতুর গৃহে গমন করিয়া উপবেশনান্তর আতুরকে দেখিবে, স্পর্শ করিবে এবং প্রশ্ন করিবে। কেহ কেহ বলেন এই তিন প্রকার পরীক্ষা দ্বারা প্রায়ই রোগ জ্ঞান হয়; কিন্তু তাহা সম্যক্ নহে। রোগ জ্ঞানের উপায় ছয় প্রকার; শ্রোত্রাদি পঞ্চেন্দ্রিয় এবং প্রশ্ন।

১। তত্র শ্রোত্রেন্দ্রিয়বিজ্ঞেয়া বিশেষা রোগেষু ব্রণাস্রাববিজ্ঞানীয়াদিষু বক্ষ্যন্তে সফেনং রক্তমীরয়ন্ননিলঃ সশব্দো নির্গচ্ছতি ইত্যেবমাদয়ঃ।

অর্থাৎ শ্রোত্রেন্দ্রিয় বিশেষজ্ঞানযোগ্য, যেমন ব্রণবিজ্ঞানীয়াধ্যায়ে ব্রণস্রাব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে 'সফেণ রক্তের সহিত শব্দযুক্ত বায়ু নির্গত হয়'। এখানে এই শব্দ শ্রোত্রেন্দ্রিয় গ্রাহ্য। এইরূপ উদ্গার অধোবায়ু, কাস, হিক্কা প্রভৃতির শব্দও শ্রোত্রেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য।

২। স্পর্শনেন্দ্রিয় বিজ্ঞেয়া শীতোষ্ণ-শ্লক্ষ্ণ-কর্কশ মৃদু-কঠিনত্বাদয়ঃ স্পর্শবিশেষা জ্বর-শোথাদিষু।

অর্থাৎ জ্বর, শোথ প্রভৃতি রোগে শৈত্য ঔষ্ণ্য শ্লক্ষ্ণতা, কার্কশ্য, মৃদুতা এবং কঠিনত্ব প্রভৃতি স্পর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। নাড়ী পরীক্ষাও এই স্পর্শনেন্দ্রিয় জ্ঞানদ্বারা সম্পাদিত হয়।

৩। চক্ষুরিন্দ্রিয়বিজ্ঞেয়া শরীরোপচয়া-পচয়ায়ুর্লক্ষণবলবর্ণ বিকারাদয়ঃ।

অর্থাৎ শরীরের স্থৌল্য, কৃশতা, আয়ুঃলক্ষণ, বল (উৎসাহ), বর্ণবিকৃতি প্রভৃতি চক্ষুরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য। নেত্রপরীক্ষা, জিহ্বা পরীক্ষা, মূত্রের বর্ণ পরীক্ষা প্রভৃতিও চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য।

৪। রসনেন্দ্রিয়বিজ্ঞেয়াঃ প্রমেহাদিষু রস বিশেষাঃ।

অর্থাৎ প্রমেহাদি রোগে মূত্র প্রভৃতির রস-বিশেষ রসনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য। যদিও মূত্রাদি চিকিৎসক স্বয়ং মুখে লইয়া রস গ্রহণ করিতে পারেন না কিন্তু মূত্রে মধুর রস থাকিলে তাহাতে

পিপীলিকাদির সঞ্চরণ দেখিয়া মূত্রে মধুর রসের অবধারণ করিতে পারেন। এখানে চিকিৎসকের রসনেন্দ্রিয়জ্ঞান না হইলেও পিপীলিকাদির রসজ্ঞান হইতেছে বলিয়া রসনেন্দ্রিয়বিজ্ঞেয় বলায় কোন দোষ হয় না।

৫। ঘ্রাণেন্দ্রিয়বিজ্ঞেয়া অরিষ্টলিঙ্গাদিষু ব্রণানামব্রণানাঞ্চ গন্ধবিশেষাঃ।

অর্থাৎ ব্রণ কিম্বা ব্রণেতর রোগের অরিষ্টাদি লক্ষণে (নিয়ত মরণাখ্যাপক লক্ষণকে অরিষ্ট কহে অর্থাৎ যে লক্ষণ প্রকাশ পাইলে জীব নিশ্চয়ই মরিবে বুঝা যায় তাহার নাম অরিষ্ট) যে সকল বিশেষ গন্ধ উপস্থিত হয় তাহা ঘ্রাণেন্দ্রিয় বিজ্ঞেয়।

৬। প্রশ্নেন চ জানীয়াৎ দেশং কালং জাতিং সাত্ম্যমাতঙ্কসমুৎপত্তিং বেদনাং সমুচ্ছ্রায়ং বলমন্তরগ্নিং বাতমূত্রপুরীষাণাং প্রবৃত্ত্যপ্রবৃত্তী কালপ্রকর্ষাদীংশ্চ বিশেষান্। আত্মসদৃশেষু বিজ্ঞানাভ্যুপায়েষু তৎস্থানীয়ৈ র্জানীয়াৎ।

অর্থাৎ প্রশ্নদ্বারা নিম্নলিখিত বিষয় জানিতে হইবে।

(ক) আনূপ, জাঙ্গল এবং সাধারণভেদে যে ত্রিবিধ দেশ আছে ইহার কোন দেশে রোগের উৎপত্তি এবং শরীরের কোন দেশের পীড়া। দেশ বলিতে শরীর ও ভূমি উভয়ই বুঝায়।

"ভূমিদেহপ্রভেদেন দেশমাহুরিহ দ্বিধা।"
বাগ্‌ভট।

(খ) ক্ষণাদিরূপ কালের কোন সময়ের পীড়া; বাল্য, যৌবন এবং বার্দ্ধক্য ইহার কোন কালের পীড়া এবং ব্যাধির অবস্থা—যেমন কম্পের সময়, দাহের সময় পিপাসার সময় ইত্যাদি। "ক্ষণাদির্ব্যাধ্যবস্থাচ কালঃ" বাগ্‌ভট।

(গ) স্ত্রী, পুরুষ অথবা ক্লীব ইহার কোন জাতীয় রোগীর রোগ এবং ব্রাহ্মণাদি কোন জাতীয় রোগীর রোগ।

(ঘ) আহার এবং আচার যাহা সেবিত হইলে সুস্থ থাকা যায় তাহার নাম সাত্ম্য।

(ঙ) আতঙ্কসমুৎপত্তি অর্থে যে কারণে রোগ উৎপন্ন হয় সেই কারণ।

(চ) বেদনাসমুচ্ছ্রায় অর্থাৎ পীড়ার উদ্‌গতি। যে প্রকারে রোগ উৎপন্ন হইয়াছে তাহা।

(ছ) বল অর্থাৎ কার্য্য করিবার শক্তি এবং উৎসাহ।

(জ) সম, বিষম কিংবা মন্দভেদে পাচকাগ্নিকে অন্তরগ্নি কহে।

(ঝ) বাত মূত্র পুরীষের যথাকালে প্রবৃত্তি হওয়া না হওয়া। এস্থলে পুরীষের পর লুপ্ত আদিশব্দ উদ্ধার করিয়া স্বেদ, আর্ত্তব, রক্তপিত্ত প্রভৃতি বুঝিতে হইবে।

(ঞ) কতদিনের রোগ ইত্যাদিকে কাল প্রকর্ষাদি বলা হয়।

(ট) যে স্থানের পীড়া সেইস্থান কোন দোষের আশ্রয় এবং পূর্ব্বোক্ত ছয় প্রকার পরীক্ষা দ্বারা দোষেরও পরীক্ষা।

মহর্ষি চরক বলেন "ত্রিবিধং রোগবিশেষবিজ্ঞানং ভবতি। আপ্তোপদেশঃ প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চেতি।" রোগের বিশেষ জ্ঞানোপায় তিন প্রকার যথা—আপ্তোপদেশ, প্রত্যক্ষ এবং অনুমান। "ত্রিবিধেন খল্বনেন জ্ঞানসমুদায়েন পূর্ব্বং পরীক্ষ্য রোগং সর্ব্বথা সর্ব্বমেবোত্তরকালমধ্যাবসানমদোষং ভবতি। নহি জ্ঞানাবয়বেন কৃৎস্নে জ্ঞেয়ে জ্ঞানমুৎপদ্যতে। ত্রিবিধেত্বস্মিন্ জ্ঞানসমুদায়ে পূর্ব্বমাপ্তোপদেশাদ্ জ্ঞানং ততঃ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং পরীক্ষোপপদ্যতে। কিং হ্যনুপদিষ্টং পূর্ব্বং যৎ তৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং পরীক্ষ্যমানো বিদ্যাৎ।"

অর্থাৎ এই তিন প্রকার [illegible] দ্বারা পূর্ব্বে সর্ব্ব প্রকারে [illegible]

উত্তর কালে রোগ সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ হয় তাহা সর্ব্বপ্রকারে অদোষ। জ্ঞানাবয়ব দ্বারা সকল জ্ঞেয় পদার্থের জ্ঞান লাভ অসম্ভব। এই তিন প্রকার পরীক্ষার মধ্যে পূর্ব্বে আপ্তোপদেশ দ্বারা যে জ্ঞান হয় তাহাই প্রত্যক্ষ এবং অনুমান দ্বারা পরীক্ষা করা চলে। অনুপদিষ্ট বিষয়কে প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা পরীক্ষার বিষয়ীভূত করা অসম্ভব।

রোগ বলিলে যাহা বুঝায় তাহার দুইটী অবস্থা; প্রকৃতি ভূত ব্যাধ্যবস্থা এবং বিকৃতি ভূত ব্যাধ্যবস্থা। নিদান সেবন জন্য স্বস্থানে দোষের সঞ্চয় হয়; পরে দোষ-প্রকোপক নিদান সেবন জন্য সেই সঞ্চিত দোষের প্রকোপ হয়। প্রকোপের পর প্রসর, অর্থাৎ দোষ তখন স্বস্থান ত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে যাইতে থাকে। এই অবস্থা পর্য্যন্ত যে শারীরিক পীড়া অনুভূত হয় তাহার নাম প্রকৃতিভূত বিকার। প্রসরের পর দোষ কোন স্থান সংশ্রয় করিয়া কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ করে যাহাদ্বারা ভবিষ্যতে কোন বিশিষ্ট রোগ হইবে ইহা বুঝা যায়। ইহাকে রোগের পূর্ব্বরূপ কহে। পরে পূর্ব্বরূপাবস্থা দূর হইয়া কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশিত হয় যাহা দ্বারা বুঝা যায় যে কোন বিশিষ্ট রোগ উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার পর আর একটী অবস্থা আইসে যখন ব্রণশোথ ফাটিয়া গিয়া ব্রণ ভাব প্রাপ্ত হয় কিংবা জ্বরাতিসারাদি রোগ দীর্ঘ কালানুবন্ধী হয়। এই দুই অবস্থার নাম ব্যাধির রূপাবস্থা। পূর্ব্বরূপ ও রূপাবস্থায় যে পীড়া অনুভূত হয় তাহার নাম বিকৃতিভূত ব্যাধি। যখন প্রকুপিত দোষ হইতে কোন রোগ উৎপন্ন হয় তখন সেই প্রকুপিত দোষকে নিদানার্থকর বলা হয়। অর্থাৎ নিদান যেমন দোষ প্রকোপরূপ প্রকৃতিভূত ব্যাধির উৎপাদক, সেইরূপ প্রকুপিত দোষ বিকৃতিভূত ব্যাধি-উৎপাদক। বিকৃতিভূত ব্যাধি আবার অপর বিকৃতিভূত ব্যাধি উৎপাদনে সমর্থ, যেমন জ্বর সন্তাপ হইতে রক্তপিত্ত, রক্তপিত্ত হইতে জ্বর, উভয় হইতে যক্ষ্মা এবং প্লীহা বৃদ্ধি হইতে জঠর রোগ ইত্যাদি।

নিদান, পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপশয় এবং সম্প্রাপ্তি দ্বারা রোগের উপলব্ধি হয়।

নিদান ;—যে কারণে রোগের উৎপত্তি হয় সেই কারণকে নিদান কহে।

কালবুদ্ধীন্দ্রিয়ার্থানাং যোগো মিথ্যা নচাতি চ।
দ্বয়াশ্রয়নাং ব্যাধীনাং ত্রিবিধো হেতু সংগ্রহঃ।
চরক

অর্থাৎ কাল বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ার্থের অযোগ, অতিযোগ ও মিথ্যাযোগ সর্ব্ব প্রকার শারীর ও মানস রোগের হেতু অর্থাৎ নিদান। হেতু বা নিদান সাধারণতঃ তিন প্রকারের দৃষ্ট হয় যথা দোষ হেতু, ব্যাধি হেতু এবং দোষ ব্যাধি উভয় হেতু। ১ যেখানে নিদান দোষবৈষম্য উৎপাদন করে কিন্তু তজ্জন্য কি রোগ হইবে তাহা বুঝা যায় না তাহাকে দোষহেতু বলা হয়। যেমন মধুর রসাদি (২) যেখানে নিদান আদৌ ব্যাধি উৎপাদন করিয়া পশ্চাৎ দোষানুবন্ধী হয় তাহাকে ব্যাধিহেতু কহে। যথা ভূতাভিষঙ্গ অভিঘাত প্রভৃতি। (৩) যেখানে নিদান পূর্ব্বে দোষবৈষম্য উৎপাদন করিয়া বিশিষ্ট রোগ উৎপাদন করে, তাহাকে উভয় হেতু বলা হয় যেমন মক্ষিকা ভক্ষণ ছর্দ্দিরোগের, মৃৎ ভক্ষণ পাণ্ডুরোগের এবং হস্তি, অশ্ব বা উষ্ট্র গমন বাতরক্ত রোগের নিদান। এখানে নিদান সেবন জন্য পূর্ব্বে দোষবৈষম্য হইলেও [illegible] দোষ-বৈষম্যকারক নিদানের ন্যায় না [illegible] ইহারা দোষ-বৈষম্যের নিদান [illegible]

তজ্জন্য বিশিষ্ট রোগেরও কারণ হইতেছে বলিয়া ইহাদিগকে উভয়হেতু বলা হয়। কোন টীকাকার মক্ষিকা ভক্ষণ ছর্দ্দিরোগের এবং মৃদ্ ভক্ষণ পাণ্ডু রোগের নিদান বলিয়া ইহাদিগকে ব্যাধিহেতু বলিয়াছেন। কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে; কারণ ছর্দ্দি ও পাণ্ডুরোগ আগন্তু ব্যাধি নহে নিজব্যাধি। নিজ ব্যাধি উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে দোষ বৈষম্য থাকা অনিবার্য। সুতরাং মৃদ্‌ভক্ষণ ও মক্ষিকাভক্ষণ যেমন নির্দ্দিষ্ট ব্যাধির হেতু সেই প্রকার দোষবৈষম্যেরও হেতু সুতরাং ইহাদিগকে উভয় হেতু বলাই সঙ্গত।

পূর্ব্বরূপ;—যে যে লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ভবিষ্যতে কোন বিশিষ্ট রোগ হইবে বুঝা যায় তাহার নাম ব্যাধির পূর্ব্বরূপ। এই পূর্ব্বরূপ দুই ভাগে বিভক্ত। একের নাম সামান্য পূর্ব্বরূপ এবং অপরের নাম বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ। সামান্য শব্দের অর্থ জাতি। যে যে লক্ষণ দ্বারা মাত্র কোন্ জাতীয় রোগ হইবে ইহার উপলব্ধি হয় তাহার নাম সামান্য পূর্ব্বরূপ। আর যে যে লক্ষণ দ্বারা ভবিষ্যৎ রোগের বিশেষ অবধারণ হয় তাহার নাম বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ। সামান্য পূর্ব্বরূপের দ্বারা ভবিষ্যতে অমুক ব্যাধি হইবে ইহা জানা যায়; কিন্তু ইহা কোন্ দোষজ হইবে তাহার উপলব্ধি হয় না। বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপের দ্বারা তাহার অবধারণ করা যায়।

রূপ;—যে যে লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগ উৎপন্ন হইয়াছে বুঝা যায় তাহার নাম ব্যাধির রূপ বা লক্ষণ। রূপ দ্বারা বর্ত্তমান ব্যাধি নির্দ্দেশ করা যায়। পূর্ব্বরূপের ন্যায় রূপও দুইভাগে বিভক্ত। যে যে লক্ষণের দ্বারা অমুক জাতীয় রোগ হইয়াছে ইহা নির্দ্দেশ করা যায় তাহাকে সামান্যরূপ এবং যে যে লক্ষণের দ্বারা বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, দ্বন্দ্বজ বা সান্নিপাতিক ইহার কোন বিশিষ্টাবস্থা—এরূপ নির্দ্ধারিত হয় তাহাকে বিশিষ্টরূপ কহে। যেমন স্বেদাবরোধ, সন্তাপ এবং সর্ব্বাঙ্গ গ্রহণ জ্বরের সামান্যরূপ; সেইরূপ অংস-পার্শ্বাভিতাপ, হস্ত ও পদের সন্তাপ এবং সর্ব্বাঙ্গগ জ্বর যক্ষ্মার সামান্যরূপ। যে দোষ হইতেই উৎপন্ন হউক না কেন জ্বর এবং যক্ষ্মারোগে এ লক্ষণগুলি থাকিবেই থাকিবে। অপর যে লক্ষণ আছে দোষ ভেদে তাহার ভেদ হয় এবং সেই লক্ষণ দ্বারা ব্যাধির দোষাবধারণ হয় বলিয়া ইহাদিগকে বিশিষ্টরূপ বলা হয়।

উপশয়;—হেতু বিপরীত, ব্যাধি বিপরীত এবং হেতুব্যাধি উভয় বিপরীত অথবা হেতু বিপরীতার্থকারী, ব্যাধি বিপরীতার্থকারী, অথবা হেতুব্যাধি উভয় বিপরীতার্থকারী ঔষধ, অন্ন এবং বিহারের যে সুখানুবন্ধ তাহাকে উপশয় বলে। অর্থাৎ যে প্রকার ঔষধ, অন্ন কিংবা বিহারের উপযোগ তাহা যদি হেতুর বিপরীত ধর্ম্মী, ব্যাধির বিপরীত ধর্ম্মী কিংবা হেতু ব্যাধি উভয়ের, বিপরীত ধর্ম্মী অথবা হেতুর সমান ধর্ম্মী হইয়াও বিপরীত অর্থকারী, ব্যাধির সমান ধর্ম্মী হইয়াও বিপরীত অর্থকারী কিংবা উভয়ের সমান ধর্ম্মী হইয়াও বিপরীত অর্থকারী, তাহা দ্বারা যদি আরোগ্যলাভ হয় তবে তাহাকে উপশয় বলা যায়। যে রোগে কতকগুলি লক্ষণ একত্রে মিলিয়াছে বলিয়া কিংবা লক্ষণগুলি গূঢ় আছে বলিয়া রোগের সম্যক্ উপলব্ধি হয় না, সেখানে উপশয় দ্বারা রোগজ্ঞান হয়। উপশয় দ্বারা ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান ব্যাধির বোধ হয়। পূর্ব্বরূপাবস্থায় প্রযুক্ত হইলে ভবিষ্যৎ এবং রূপাবস্থায় প্রযুক্ত হইলে বর্ত্তমান ব্যাধিবোধক।

সম্প্রাপ্তি ;—ব্যাধির উৎপত্তিকে সম্প্রাপ্তি কহে। সম্প্রাপ্তি, সংখ্যা, প্রাধান্য, বিধি, বিকল্প এবং বলকাল বিশেষে ভেদ হয়।

(১) সংখ্যা যেমন আটটী জ্বর এবং অষ্টাদশটী কুষ্ঠ ইত্যাদি।

(২) প্রাধান্য—দ্বন্দজ এবং সান্নিপাতিক স্থলে দোষের তর এবং তম দ্বারা প্রাধান্য নির্দিষ্ট হয় অর্থাৎ দুই দোষের মধ্যে প্রধানকে তর এবং তিন দোষের মধ্যে প্রধানকে তম কহে; দোষের এই তর কিংবা তমভাব দ্বারা প্রাধান্য নির্ণীত হয়। অথবা যে দোষ স্বতন্ত্র অর্থাৎ নিজেই প্রধান তাহারই প্রাধান্য এতদ্ভিন্ন যাহা পরতন্ত্র অর্থাৎ যাহা অপর দোষের অধীনে থাকে তাহার অপ্রাধান্য।

(৩) বিধি অর্থে প্রকার। রোগ নিজ ও আগন্তুক ভেদে দুই প্রকার, ত্রিদোষ ভেদে তিন প্রকার; অথবা সাধ্য, অসাধ্য, মৃদু এবং দারুণ ভেদে চারি প্রকার।

(৪) বিকল্প—মিলিত দোষের অংশাংশ নিরূপণকে বিকল্প কহে। যেমন রুক্ষ, সূক্ষ্ম, লঘু, শীত চল, বিশদ ও খর এইগুলি বায়ুর ধর্ম্ম। ঈষৎ স্নেহ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, দ্রব, অম্ল, সর ও কটু এইগুলি পিত্তের ধর্ম্ম। গুরু, শীত, মৃদু, স্নিগ্ধ, মধুর, স্থির ও পিচ্ছল এইগুলি শ্লেষ্মার ধর্ম্ম। দ্বন্দজ এবং সান্নিপাতিক দোষে কোন দোষের কোন ধর্ম্মের প্রকোপ তাহার নিরূপণকে বিকল্প কহে।

(৫) বলকাল বিশেষ—ঋতু, দিন, রাত্রি ও আহার—কালভেদে ব্যাধির বলভেদ হয়। যেমন শরৎ ঋতু পিত্তজ ব্যাধির বলকাল। প্রাতঃকাল কফজ ব্যাধির, মধ্যাহ্ন পিত্তজ ব্যাধির এবং অপরাহ্ন বাতজ ব্যাধির; রাত্রির প্রথমভাগ কফজ ব্যাধির, মধ্যভাগ পিত্তজ ব্যাধির এবং শেষভাগ বাতজ ব্যাধির; আহারের প্রথমভাগ কফজ ব্যাধির, মধ্যভাগ পিত্তজ ব্যাধির বলকাল বিশেষ।

সম্প্রাপ্তি না জানিলে সংখ্যাদি এবং দোষের অংশাংশাদি জ্ঞান ভিন্ন রোগের বিশেষ জ্ঞান লাভ অসম্ভব। সংপ্রাপ্তি বর্ত্তমান ব্যাধিবোধক। নিদানাদি যে পাঁচ প্রকার রোগ জ্ঞানের উপায় কথিত হইল, রোগ জ্ঞানের জন্য এই পাঁচটীরই আবশ্যকতা আছে। নিদানের দ্বারা ভবিষ্যতে রোগ হইবে বুঝা যায়। বহু রোগের নিদান এক প্রকার বলিয়া সর্ব্বত্র কোন রোগ হইবে তাহার নিশ্চয়াবধারণ করা যায় না; এইজন্য পূর্ব্বরূপাদিরও আবশ্যকতা আছে। পূর্ব্বরূপ দ্বারা কোন রোগ হইবে ইহা জানিতে পারিলেও দোষের বিশেষ অবধারণ হয় না বলিয়া রূপ জানা আবশ্যক। রূপ দ্বারা রোগ জ্ঞান হইলেও সর্ব্বত্র চলে না; যেখানে তুল্য লক্ষণ দৃষ্ট হয় সেখানে পূর্ব্বরূপ স্মরণের আবশ্যকতা আছে। যেমত রক্তপিত্ত এবং রক্ত প্রমেহ সন্দেহস্থল।

হারিদ্রবর্ণং রুধিরঞ্চমূত্রং
বিনা প্রমেহস্য হি পূর্ব্বরূপৈঃ।
যো মূত্রয়েৎ তং ন বদেৎ প্রমেহং।
রক্তস্য পিত্তস্য হি স প্রকোপঃ॥

ব্যাধির সাধ্যত্বাসাধ্যত্বও জ্ঞাত হওয়া যায় না।

পূর্ব্বরূপাণি সর্ব্বাণি জ্বরোক্তান্যতিমাত্রয়া।
যংবিশন্তি বিশত্যেনং মৃত্যুর্জ্বরপূরঃসরঃ॥
অন্যস্যাপি চ রোগস্য পূর্ব্বরূপাণি যং নরম্।
বিশত্যনেন কল্পেন তস্যাপি মরণং ধ্রুবম্॥

পূর্ব্বরূপ এবং রূপ দ্বারা রোগ জ্ঞান হইলেও গূঢ়লিঙ্গ ব্যাধি জ্ঞান হয় না এইজন্য উপশয় অবশ্য জ্ঞাতব্য। "গূঢ়লিঙ্গং ব্যাধিমুপশয়ানুপশয়াভ্যাং পরীক্ষেত।" পূর্ব্বরূপ, রূপ,

শয় দ্বারা পরীক্ষিত হইলেও সংখ্যাদি এবং দোষের অংশাংশাদির কোপ অবধারণ করা যায় না। বলিয়া সম্প্রাপ্তি জ্ঞান ও আবশ্যক।

পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপশয় এবং সম্প্রাপ্তি দ্বারা রোগ জ্ঞান হইলে নিদান জানা না থাকিলে চিকিৎসা অসম্ভব; "সংক্ষেপতঃ ক্রিয়াযোগো নিদানপরিবর্জ্জনম্।" নিদানত্যাগই সংক্ষেপ চিকিৎসা। যেমন সন্তর্পণোত্থে ব্যাধিতে অপতর্পণ প্রয়োজন এবং অপতর্পণোত্থে সন্তর্পণ প্রয়োজন। এই সকল নিদান পরিবর্জ্জন। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, রোগ জ্ঞানের পক্ষে নিদান, পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপশয়, সম্প্রাপ্তি এই পাঁচটীরই কারণতা বিদ্যমান। বুদ্ধিমান বৈদ্য প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আগমের সাহায্যে এই পাঁচটী উপায় দ্বারা রোগ পরীক্ষা করিলে রোগ সম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মে তাহা অভ্রান্তই হইয়া থাকে।

শাস্ত্রে বহু প্রকার রোগের বিবরণ আছে এবং সেই সকল রোগের নিদান, পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপশয় এবং সম্প্রাপ্তি লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বেদনা, বর্ণ, নিদান, স্থান, লক্ষণ এবং নামভেদে ব্যাধির অসংখ্য ভেদ হয়; সেইজন্য সকল রোগের বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। সেরূপ স্থলে যে প্রকারে রোগ নির্দ্দেশ সম্ভব হয় তজ্জন্য নিম্নলিখিত উপদেশ দেওয়া হইয়াছে—

"উক্তাস্ত্রবাপরিসংখ্যেয়া ভিদ্যমানা ভবন্তি হি।
রুজাবর্ণ-সমুত্থান-স্থান সংস্থান-নামভিঃ॥
ব্যবস্থাকরণং তেষাং যথাস্থূলেষু সংগ্রহঃ।
তথা প্রকৃতিসামান্যং বিকারেষূপদিশ্যতে॥
বিকারনামাকুশলো ন জিহ্রীয়াৎ কদাচন।
নাহি সর্ব্ববিকারাণাং নামতেহস্তি ধ্রুবা স্থিতিঃ॥
স এব কুপিতো দোষঃ সমুত্থানবিশেষতঃ।
স্থানান্তরগতশ্চৈব জনয়ত্যাময়ান্ বহূন্॥
তস্মাদ্বিকারপ্রকৃতী রধিষ্ঠানান্তরাণি চ।
সমুত্থানবিশেষাংশ্চ বুদ্ধা কর্ম্ম সমাচরেৎ॥
যো হ্যেতৎ ত্রিতয়ং জ্ঞাত্বা কর্ম্মাণ্যারভতে ভিষক্।
জ্ঞানপূর্ব্বং যথান্যায়ং স কর্ম্মসু ন মুহ্যতি॥"

অর্থাৎ বেদনা, বর্ণ, নিদান, স্থান, লক্ষণ ও নাম ভেদে ব্যাধির অসংখ্য ভেদ হয়। মোটামুটি নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদের সংগ্রহ করা গেল। অমুক্তস্থলে প্রকৃতি-সাদৃশ্য দেখিয়া অর্থাৎ যে ব্যাধির প্রকৃতি বায়ু তাহাকে বাতিক, যাহার প্রকৃতি পিত্ত তাহাকে পৈত্তিক এবং যাহার প্রকৃতি শ্লেষ্মা তাহাকে শ্লৈষ্মিক ইত্যাদি নির্দ্দেশ করিতে হইবে। জ্বর, রক্তপিত্তাদিবৎ সকল রোগের নাম করণে অসমর্থ হইলেও লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই; যেহেতু সর্ব্ব প্রকার রোগের নাম শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট নাই। একই দোষ, বিশেষ বিশেষ কারণে কুপিত ও বিশেষ বিশেষ স্থান প্রাপ্ত হইয়া বহুবিধ রোগ উৎপাদন করিতে পারে। অতএব রোগের প্রকৃতি, অধিষ্ঠান (যে স্থানে রোগ উৎপন্ন হয়) ও নিদান লক্ষ্য করিয়া চিকিৎসা করিতে হয়। যে চিকিৎসক এই তিনটী অর্থাৎ রোগের প্রকৃতি, অধিষ্ঠান ও নিদান লক্ষ্য করিয়া চিকিৎসা করেন; তিনি চিকিৎসা কার্য্যে কখন মোহগ্রস্ত হয়েন না।

এ বিষয়ে একটী উদাহরণ লইলে বিষয়টি বেশ সুগম হইবে। আজকাল একটী রোগ দেখা যায় তাহার কোন উল্লেখ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। আর্য্যজাতির এরোগ ছিল না। পর্ত্তুগিজ নাবিকগণের সহিত উহা এদেশে আমদানি হয়। এই রোগকে ডাক্তারগণ Gonorrhœa কহেন। দুষ্ট যোনি প্রভৃতির জন্য দূষিত বিষ এক শরীর হইতে অন্য শরীরে সংক্রমিত হইয়া এই রোগ [illegible]

সংক্রামিত বিষই এরোগের নিদান। পুরুষের মূত্রনালী এবং স্ত্রীলোকের যোনিমার্গ এ রোগের স্থান। বিষ সংক্রমণের তিন কিংবা চারিদিনের দিন, সাধারণতঃ রোগের সূত্রপাত হয়। দুই দিনের পর দশ দিনের মধ্যেও কখন কখন রোগের সূত্রপাত দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ লিঙ্গস্ফীতি, প্রদাহ, বেদনা, মূত্রাবরোধ, মূত্রত্যাগকালে অসহ্য যন্ত্রণা এবং জ্বরভাব বা প্রকৃত জ্বর হয়। কখন কখন রক্তাগম দেখা যায়। তৎপরে রূপাবস্থা দৃষ্ট হয়। এই সময় আপনা হইতে পূযের ন্যায় স্রাব, মূত্রত্যাগকালে জ্বালা ও বেদনা উপস্থিত হয় এবং অতিকষ্টে মূত্রত্যাগ করিতে হয়। এ অবস্থায় যদি রোগের প্রতীকার করা না হয় তবে রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়; তখন জ্বালা যন্ত্রণা আর বড় থাকে না, একপ্রকার স্বচ্ছস্রাব (glairy discharge) হয় এবং মূত্রমার্গের অবরোধ (stricture) উপস্থিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে দুর্ব্বলতা, বাত (Gonorrhœal Rheumatism) (অভিষ্যন্দ Gonorrhœal opthalmia) প্রভৃতি উপদ্রব আইসে। স্ত্রী শরীরে অধিকন্তু জননেন্দ্রিয়ের প্রদাহ উপস্থিত হয়।

আয়ুর্ব্বেদমতে এই রোগ নির্দ্দেশ করিতে হইলে যাহা করা উচিত তাহা দেখা যাউক।

১। লিঙ্গস্ফীতি—শ্লেষ্মার লক্ষণ।

২। প্রদাহ—পিত্ত ও শ্লেষ্মার লক্ষণ।

৩। বেদনা—বায়ুর লক্ষণ।

৪। মূত্রাবরোধ—বায়ুর লক্ষণ।

৫। জ্বরজ্বরভাব বা জ্বর—ত্রিদোষের লক্ষণ।

৬। মূত্রত্যাগকালে অসহ্যযন্ত্রণা—বায়ু ও পিত্তের লক্ষণ।

৭। রক্তাগম—পিত্তের লক্ষণ।

এই সকল লক্ষণ দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে শরীরে বিষ সংক্রমণজন্য বায়ু, পিত্ত ও কফ প্রকুপিত হইয়া লিঙ্গাভ্যন্তরে স্থান সংশ্রয় পূর্ব্বক যে রোগ উৎপাদনের চেষ্টা পাইতেছে তাহা ভবিষ্যতে একটী ত্রিদোষজ ব্যাধিরূপে প্রকাশ পাইবে। উক্ত লক্ষণগুলি ইহার পূর্ব্বরূপ।

ইহার পর যে যে লক্ষণ দেখা যায় তাহা দ্বারা নিম্নলিখিতভাবে অবধারিত হয়।

১। পূয—কফের লক্ষণ।

২। পাক—পিত্তের লক্ষণ।

৩। স্বভাবতঃ পূযের স্রাব—বায়ুর লক্ষণ।

৪। মূত্রত্যাগকালে জ্বালা—পিত্তের লক্ষণ।

এই সকল লক্ষণের দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে যে রোগ উৎপন্ন হইয়াছে তাহা ত্রিদোষজ। ইহার পরের অবস্থা—

১। জ্বালা যন্ত্রণা কমিয়া যাওয়া—ক্ষীণপিত্তের লক্ষণ।

২। স্বচ্ছস্রাব—বায়ু ও শ্লেষ্মার লক্ষণ।

৩। মূত্রমার্গের অবরোধ—বায়ু ও শ্লেষ্মার লক্ষণ।

এই দুই অবস্থার লক্ষণগুলি ইহার রূপ। তাহা হইলে এই সকল পরীক্ষার দ্বারা জানা যাইতেছে যে (১) দুষ্ট যৌন সম্মিলন জন্য বিষ সংক্রমণ এই রোগের হেতু অর্থাৎ নিদান।

(২) পুরুষের মূত্রনালী এবং স্ত্রীলোকের যোনিমার্গ এই রোগের অধিষ্ঠান অর্থাৎ বিষ সংক্রমণ জন্য দোষ প্রকুপিত হইয়া এই স্থানে আশ্রয় করিয়া রোগ উৎপাদন করে।

(৩) লিঙ্গের স্ফীতি, লিঙ্গের প্রদাহ, লিঙ্গের বেদনা, মূত্রাবরোধ, মূত্রত্যাগকালে অসহ্য যন্ত্রণা, লিঙ্গপথে রক্তাগম এবং জ্বরভাব বা জ্বর এইগুলি ইহার পূর্ব্বরূপ।

(৪) (ক) আপনা হইতে পূযের স্রাব, মূত্রত্যাগ কালে জ্বালা ও বেদনা এবং অতি কষ্টে মূত্রত্যাগ। (খ) রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে জ্বালা যন্ত্রণা কমিয়া যাওয়া, স্বচ্ছ স্রাব (Glairy discharge) এবং মূত্রমার্গের অবরোধ (stricture) এইগুলি ইহার রূপ। দুর্ব্বলতা, বাত (Gonorrhœal Rheumatism), অভিষ্যন্দ (Gonorrhœal opthalmia) এবং স্ত্রীলোকের জননেন্দ্রিয়ের প্রদাহ (Inflamation of the productive organs) এইগুলি এই রোগের উপদ্রব।

এক্ষণে এই রোগকে যে নামেই অভিহিত করা হউক না কেন তাহাতে কিছু আসে যায় না। এইরূপে সকল প্রকার অনুক্ত রোগের—যেমন প্লেগ, বেরিবেরি, সিফিলিস্ ইত্যাদির নির্দ্দেশ করা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের পক্ষে অসম্ভব নহে। এক্ষণে পাঠক বিচার করিয়া দেখুন আয়ুর্ব্বেদ মতে রোগপরীক্ষার কেমন সুন্দর ব্যবস্থা রহিয়াছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং তাঁহাদের অনুচিকীর্ষু অনেকের নিকট শুনিতে পাই যে কবিরাজগণ রোগ নির্দ্ধারণে একেবারে অসমর্থ। কারণ শারীর জ্ঞান লাভের জন্য শব-ব্যবচ্ছেদ তাঁহারা করেন না সুতরাং শরীরের ভিতর কোথায় কোন রোগ হই য়াছে তাঁহারা নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রক্ত, মল, মূত্র, থুতু প্রভৃতির রাসায়নিক এবং আণু-বীক্ষণিক পরীক্ষা তাঁহাদের নাই। শরীর পরীক্ষার জন্য থার্ম্মমিটার, ষ্টেথিস্কোপ, স্পেকিউলাম প্রভৃতি যন্ত্র তাঁহাদের নাই এবং রনজেন্ লাইট যাহার সাহায্যে ভিতরের যান্ত্রিক বিকৃতির জ্ঞান হয়, তাহা নাই সুতরাং কিসের বলে তাঁহারা রোগ নির্ণয়ে সমর্থ? এতদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে প্রাচ্য-বিজ্ঞান চিরকালই প্রাচ্যবিজ্ঞান এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান চিরকালই পাশ্চাত্য বিজ্ঞান। রোগ সম্বন্ধে প্রাচ্য মনীষিগণ এক প্রকার স্থির করিয়াছেন; পাশ্চাত্য মনীষিগণ অপর প্রকার স্থির করিতেছেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের মতে রোগ কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ নহে। যে স্থানেই তাহার প্রকাশ হউক না কেন, রোগ মাত্রেই সর্ব্বাঙ্গীন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে নিদান সেবন জন্য দোষের চয় হয়, পরে সেই চিত দোষ প্রকুপিত হইয়া গতিশীল হয়; পরে সেই প্রকুপিত দোষ কোন স্থান সংশ্রয় করিয়া রোগ উৎপাদন করে। ব্যাধি মাত্রেই প্রকুপিত দোষের কার্য্য এবং ধর্ম্মের সমষ্টি; তাহা যেখানেই উৎপন্ন হউক না কেন, স্থান ও লক্ষণভেদে ব্যাধির নাম ভেদ হয় মাত্র। যে কোন ব্যাধি উৎপন্ন হউক না কেন তদ্দ্বারা সমস্ত শরীর ও মন উপতপ্ত হয়, তখন সর্ব্বাঙ্গ প্রবাহী রক্তের গতির প্রকার উপলব্ধি করিয়া এবং পূর্ব্বোক্ত চরক ও সুশ্রুতের মতানুযায়ী পরীক্ষায় রোগের যে জ্ঞান লাভ হয় আয়ুর্ব্বেদমতে চিকিৎসা করিতে হইলে তাহাই যথেষ্ট। রক্তের গতির প্রকার উপলব্ধিকে নাড়ী পরীক্ষা কহে। নাড়ী পরীক্ষার দ্বারা রোগের যে সর্ব্ব প্রকার জ্ঞান হয় তাহা অনেক

পাশ্চাত্য চিকিৎসকেও স্বীকার করেন। এমন কি অনেক ডাক্তার নাড়ী পরীক্ষার দ্বারা কবিরাজ কর্তৃক রোগ নির্ণয় দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়াছেন, পাশ্চাত্য শিক্ষিত লোক এ সকল কিছু বুঝিতে পারেন না; কারণ তাঁহারা এরূপ শিক্ষা পান নাই। ডাক্তার এক প্রকারে রোগ নির্দ্ধারণ করেন; কবিরাজ অন্য উপায়ে রোগ নির্দ্ধারণ করেন। উভয় বিজ্ঞানে যখন রোগও তাহার পরীক্ষা ভিন্ন তখন ঐ সকল যন্ত্রদ্বারা আমাদের কি উপকার হয় পাঠক তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারেন? ডাক্তার বলিলেন রোগীর অমুক অঙ্গের অমুক স্থানের এই বিকৃতি হইয়াছে। কবিরাজকে যদি সেই রোগের চিকিৎসা করিতে হয় এবং ডাক্তার তাঁহাকে রোগের কথা বলিয়া দেন যে অমুক রোগ হইয়াছে; তাহা দ্বারা কবিরাজের কোনই উপকার হইবে না তাঁহাকে আবার নিজের মত করিয়া পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে নতুবা আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসা অসম্ভব।

কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

চিকিৎসা তত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

দেশীয় চিকিৎসায় অনাস্থা।

দেশীয় ঔষধ পথ্যের উপযোগিতা সম্বন্ধে সংক্ষেপে যাহা বলা হইল, বুদ্ধিমান আরোগ্যকামি তাহার সাহায্যে আপনাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন। এক্ষণে যাঁহাদের শিক্ষা ও সংস্কার বশতঃ দেশীয় চিকিৎসায় আস্থা নাই, তাঁহাদের উদ্দেশে কিছু বলিতে হইবে। অনেকের বিশ্বাস বেরি বেরি (Beri-Beri) নিমোনিয়া (Pneumonia) প্রভৃতি ব্যাধিগুলি বিদেশের নূতন আমদানি, সুতরাং প্রাচীনতম আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে তাহার কোন প্রতিকার থাকিতে পারে না। ইহা তাঁহাদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অনভিজ্ঞতার ফল। আয়ুর্ব্বেদের রোগনিরূপণ ও তাহার প্রতিকার পদ্ধতি অতি সুকৌশলে গ্রথিত; এ প্রণালীতে নূতন হউক, পুরাতন হউক, দেশীয় হউক, বিদেশীয় হউক সকল প্রকার ব্যাধিরই অনিন্দিত চিকিৎসা করিতে পারা যাইবে। ইহা আমাদের নিজের কথা নহে। আয়ুর্ব্বেদের অন্যতম প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ চরকসংহিতার সূত্রস্থানের বিংশ অধ্যায়টি ভালরূপ আলোচনা করিলে ইহার সত্যতা সম্যক্ উপলব্ধি হইবে। * অদ্য এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া সাধারণ বোধ্য "চিকিৎসা তত্ত্বে"র জটিলতা বৃদ্ধি করিব না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি, আয়ুর্ব্বেদে বিজাতীয়

* এ সম্বন্ধে প্রবন্ধান্তরে বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে।

'বেরি বেরি' শব্দ না থাকিলেও উক্ত ব্যাধির সমলক্ষণ বিশিষ্ট রোগের নাম রহিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদের 'বাতবলাসক' জ্বরের লক্ষণ,—নিত্য মন্দ মন্দ জ্বর থাকিবে, পদাদিতে শোথ অর্থাৎ ফোলা দেখা যাইবে এবং তজ্জন্য শরীর অত্যন্ত অবসন্ন হইবে। শরীর রুক্ষ স্তব্ধ ও শ্লেষ্মাবহুল হইবে। আধুনিক বেরি বেরি রোগেও ঠিক এই সকল লক্ষণই দেখা যায়। এই রোগে কবিরাজি চিকিৎসায় সমধিক ফল লাভও হইয়া থাকে। এই যে নিমোনিয়া রোগে এ দেশে সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, এই জ্বর সংযুক্ত শ্লৈষ্মিক কাস রোগ শীতপ্রধান ইউরোপবাসীর নিকট করালকৃতান্ত স্বরূপ হইলেও উষ্ণপ্রধান দেশে মারাত্মক হয় না। ইউরোপীয় চিকিৎসায় এই রোগের মৃত্যুর হার দেখিয়া ভালরূপ প্রতিকার আছে বলিয়া মনে হয় না, তথাপি এ দেশের অনেকেই উক্ত রোগে অনুপযোগী ডাক্তারি চিকিৎসায় মৃত্যুপথের পথিক হইতেছেন। অথচ এরূপ অনেক রোগেরই প্রতিকারে আয়ুর্ব্বেদীয় ভেষজের আরোগ্যকারিতা অনেক বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল অন্ধ সংস্কারবশে এদেশের অনেক ব্যক্তির বিদেশীয় চিকিৎসায় ধন ও প্রাণহানি হইয়া থাকে।

অনেকের আবার দেশীয় চিকিৎসায় আস্থা আছে,কিন্তু ঔষধে বিশ্বাস নাই.ইহারও কোন মূল্য নাই। শাস্ত্রজ্ঞ, কর্ম্মনিপুণ, চিকিৎসা ব্যবসায়ীর ঔষধে অবিশ্বাসের কোন কারণ থাকিতে পারে না। সন্ধান না লইয়া অবিশ্বাস করিলে সর্ব্বত্রই অবিশ্বাসের কারণ রহিয়াছে। এইযে ডাক্তারি ঔষধ, ইহাতে কি অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই? ভিন্ন ভিন্ন কারখানায় প্রস্তুত একই ঔষধের এরূপ মূল্যের তারতম্য হয় কেন? এক কুইনাইনই পৃথক্ পৃথক্ মূল্যে বিক্রয় হয় কেন? বিভিন্ন প্রস্তুতকারকের প্রস্তুতপ্রণালীর পার্থক্য হইতে ঔষধের ভালমন্দজন্য এরূপ মূল্য পার্থক্য নহে কি? বাজারে যখন ভালমন্দ দুই প্রকার ঔষধই বিক্রয় হইতেছে,দেশীয় ডাক্তারেরা অপকৃষ্ট ঔষধটিও যখন খরিদ করিয়া রোগিদের খাওয়াইতেছেন, তখন মাত্র কবিরাজি ঔষধে অবিশ্বাস করিলে চলিবে কেন?

বলিতে পারেন, চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিলে ভাল ডাক্তারি ঔষধ সংগ্রহ করিতে পারা যায়, সেরূপ করিলে কবিরাজি ঔষধও বিশ্বাসের সহিত পাওয়া যাইত; সে কথা পরে বলিতেছি। এখন যাঁহারা কবিরাজি ঔষধের অবিশুদ্ধতা সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাসী তাঁহাদিগকে একবার দেশীয় ডাক্তারি ঔষধালয় গুলির ভিতরের অবস্থা গোপনে অনুসন্ধান করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। আধুনিক উন্নত প্রণালীতে অ-হস্তস্পৃষ্ট যন্ত্রপ্রস্তুত ঔষধগুলির দেশীয় ডাক্তারখানায় কি অবস্থা হয়, ভেষজমিশ্রণগৃহে "সাধারণের প্রবেশ নিষেধ" থাকায় অনেকেই জানিতে পারেন না। আমি একটি বড় ডাক্তারি ঔষধালয়ে যে পাত্র হইতে জল লইয়া ঔষধে মিশাইতে দেখিয়াছি, স্বচক্ষে দেখিলে বোধ হয় কোন ব্যক্তিরই সে ঔষধ সেবনে প্রবৃত্তি হইত না। অনেক ঔষধালয়েই পুরাতন বীর্য্যহীন ঔষধ পরিত্যক্ত না হইয়া ব্যবহৃত হয়। কোন একটি ঔষধ উপস্থিত না থাকিলে তাহা যে বাদ দেওয়া হয় না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? ব্যবস্থাপত্রের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ঔষধ হইতে

মিশ্রকারিগণ অনেক সময় কিছু কিছু ঔষধ কম দিয়া নিজেরা গোপনে দু'পয়সার সংস্থান করিয়া থাকে, এরূপ কথাও কোন কোন ক্ষেত্রে শুনিতে পাওয়া যায়। সুতরাং অবিশ্বাস করিবার কারণ সর্ব্বত্রই রহিয়াছে।

দেশীয় চিকিৎসকগণের সহিত এক শ্রেণীর ঔষধ বিক্রয়কারি মিশিয়া গিয়া দেশীয় ঔষধে অবিশ্বাসের কারণ কিছু বেশী হইয়াছে। এই শ্রেণীর ঔষধ বিক্রয়কারিগণ কেবলমাত্র বিজ্ঞাপনের সাহায্যে ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকে, যাহার যত বিজ্ঞাপনের অধিক আড়ম্বর, তাহার বিক্রয় ও সেই অনুপাতে অধিক। সেই জন্য ইহারা ঔষধের বিশুদ্ধতা রক্ষায় অর্থ ব্যয় করা অপেক্ষা বিজ্ঞাপনের জন্য অর্থ ব্যয় করাই সঙ্গত মনে করে। অবশ্য এই শ্রেণীর অব্যবসায়িগণের উপর নিজেদের চিকিৎসাভার অর্পণ করিতে সাধারণেও সাহসী হয় না; সে কারণেই ইহারা পীড়িতের উপযোগী ঔষধ প্রচার করা অপেক্ষা মকরধ্বজ, চ্যবনপ্রাশ প্রভৃতি সুস্থ শরীরেও সর্ব্বদা ব্যবহারোপযোগী ঔষধ গুলির প্রচারেই সমধিক সচেষ্ট, কিন্তু এই সকল সুপরিচিত ঔষধগুলিও অব্যবসায়ীকে বিক্রয় করিতে হইলে সাধারণকে এমন একটা সুবিধা দেওয়া আবশ্যক, যাহাতে তাহাদের ন্যায় অচিকিৎসকের নিকট ঔষধ খরিদ করিতে প্রবৃত্তি হয়। তাই ইহারা সুলভের প্রলোভনে সাধারণকে এই সকল বিষতুল্য অনৌষধগুলি খরিদ করিতে প্রলুব্ধ করিতেছে। এই ঔষধের মূল্যনির্দ্দেশেও তাহাদের অনেক প্রকার চাতুরী দেখিতে পাওয়া যায়, সর্ব্বদা, ব্যবহৃত ঔষধগুলির মধ্যে যেগুলি উচ্চ মূল্যের ঔষধ, সেগুলিকে ইহারা অতি সুলভে দিয়া সস্তা বিক্রেতা সাজিয়া আবার অনেক অল্প মূল্যের ঔষধ উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকে।*

আর এক শ্রেণীর পীড়িতের উপর বিজ্ঞাপনে ঔষধ বিক্রয়কারিদিগের অত্যন্ত প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল অপরিণামদর্শি ব্যক্তি অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়দোষে মেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, উপদংশ প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত, তাহাদের অনেকে লজ্জাবশতঃ স্থানীয় চিকিৎসকের সাহায্য না লইয়া গোপনে ও ২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য লাভের আশায় ইহাদের ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকে। ঔষধ বিক্রেতাগণ এই সকল পীড়ার লক্ষণগুলি সকৌশলে লিখিয়া ও হাতেহাতে ফল লাভের লোভ দেখাইয়া ইহাদের ধন, প্রাণ উভয়ই নষ্ট করিতেছে। একথাটা লোকে একবার ভাবিবার সময় পায় না যে, ইহাদের সস্তা ঔষধে অসম্ভব অল্প সময়ে, প্রকৃতই যদিব্যাধি আরোগ্য হইত, তবে সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া এত বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর করিবার আবশ্যকতা কি ছিল? কোন চিকিৎসক ত কখনও বিজ্ঞাপন দেন না, কিন্তু তাঁহাদের

* দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা ঢাকার বিজ্ঞাপনে ঔষধ বিক্রয়কারি মথুর বাবুর সুলভ মূল্যের মকরধ্বজ, চতুর্ম্মুখ প্রভৃতি এবং উচ্চ মূল্যের বৃঃ গুড়পিপ্পলী, পুরাতন গুড় প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিতে পারি। আমি তাহাদের মকরধ্বজের হিসাব লইয়া প্রথমে তাঁহাদের সহিত পত্র ব্যবহার, করিয়াছিলাম, কিন্তু যথাযথ উত্তর না পাওয়ায় গত জৈষ্ঠ মাসের ধন্বন্তরি পত্রে ইহাদের ঔষধগুলির প্রস্তুত খরচা ও মূল্য নির্দ্ধারণ লইয়া প্রকাশ্য আন্দোলন করিয়াছি। তথাপি তাঁহারা নিজেদের পক্ষ সমর্থন করিতে পারেন নাই। যাঁহারা বিজ্ঞাপনের সুলভ ঔষধের ভক্ত, তাঁহাদিগকে উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

কার্য্যনৈপুণ্যই বিজ্ঞাপন অপেক্ষাও দেশ বিদেশে তাঁহাদিগকে পরিচিত করিতেছে। দেশের কোন শিক্ষিত বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিজ্ঞাপন দেখিয়া ঔষধ ব্যবহার করেন না, যদি বিজ্ঞাপনের ঔষধ ভাল হইত, তবে তাঁহারা অধিক অর্থ ব্যয় করিয়া চিকিৎসকের নিকট ব্যবস্থা ও উচ্চ মূল্যের ঔষধ লইবেন কেন? মনে রাখিবেন বিজ্ঞাপনের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া ও সুলভে যাহাদিগকে ঔষধ বিক্রয় করিতে হয়, তাহারা ঔষধের জন্য আর সেরূপ অর্থ ব্যয় করিতে পারে না, আর এই সকল মূল্যবান উপাদান-হীন ঔষধে কোন উপকার হয় না, বলিয়াই প্রতিবৎসরই বহু অর্থ ব্যয় করিয়া নিত্য নূতন রোগী সংগ্রহ করিতে হয়।

আরও এক কথা রোগ বা স্বাস্থ্যভঙ্গ যেজন্যই হউক না কেন, ঔষধ ব্যবহার করিতে হইলে চিকিৎসকের পরামর্শ মত ঔষধ ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। কারণ; দেশ. কাল, বয়স, প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়, এজন্য একই রোগে এক প্রকার ঔষধ সকলের পক্ষে সমান ফল দায়ক হয় না। চ্যবনপ্রাশ মকরধ্বজ প্রভৃতি রসায়ন ঔষধগুলি বিবিধগুণকর ও স্বাস্থ্যোপযোগী হইলেও সকলের পক্ষে সমান ফলদায়ক হয় না। এজন্য বিজ্ঞাপনের গুণাগুণ দেখিয়া বা অচিকিৎসকের পরামর্শ শুনিয়া কোনও ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। মনে রাখিবেন অশেষ গুণকর ঔষধও অপ্রযুক্ত হইলে উপকারের পরিবর্ত্তে ক্ষতিকর হইয়া থাকে। শাস্ত্রেও উল্লেখ আছে,—

"ভেষজং বাপি দুর্যুক্তং তীক্ষ্ণং সম্পদ্যতে বিষম্॥"

অর্থাৎ উত্তম ঔষধ ও অপ্রযুক্ত হইলে তীক্ষ্ণ বিষের ক্রিয়া সম্পাদন করে। সুতরাং এই সকল অচিকিৎসক ঔষধ বিক্রয়কারিগণের জন্য আয়ুর্ব্বেদের চিকিৎসা বা ঔষধের প্রতি দোষারোপ করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। যাঁহাদিগকে রোগী আরোগ্য করিয়া যশঃ ও অর্থ উপার্জ্জন করিতে হয়, কার্য্যনৈপুণ্যই যাঁহাদের উন্নতিসোপান, তাঁহারা কোন্ লাভের আশায় ঔষধের পবিত্রতা ও শক্তি হানি করিবেন। যে কার্য্যে চিকিৎসক সম্প্রদায়ের কোন ইষ্ট নাই, বরং সম্পূর্ণ অনিষ্ট, তাঁহারা সে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া নিজের সর্ব্বনাশের পথ মুক্ত করিতে পারেন না।

চিকিৎসক।

শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, রোগ শান্তির নিমিত্ত ভিষক্, ঔষধ, পরিচর্য্যাকারক ও রোগী এই চারিটিই সগুণ যুক্ত হওয়া আবশ্যক। ইহাদের মধ্যে আবার চিকিৎসকই প্রধান, কারণ শাস্ত্রজ্ঞ, কার্য্যনিপুণ চিকিৎসকই প্রকৃত ঔষধ প্রদান এবং রোগীও সুশ্রূষাকারিকে সদুপদেশ দ্বারা পরিচালিত করিতে পারেন।

ব্যাধি মানব মাত্রেরই অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং প্রত্যেক গৃহস্থেরই পূর্ব্ব হইতে একজন পারিবারিক চিকিৎসক স্থির করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। চিকিৎসক স্থির করিবার পূর্ব্বে তাঁহার শিক্ষা ও কার্য্য কুশলতার পরিচয় বিশেষরূপে সন্ধান লইতে হইবে। যিনি গুরুর নিকট শাস্ত্র ও কর্ম্মাভ্যাসী, স্বয়ং দৃষ্টকর্ম্মা ও কর্ম্মনিপুণ এবং শাস্ত্র বিশ্বাসী ও পবিত্রাচারী তিনিই প্রকৃত আরোগ্যদাতা। চিকিৎসক কর্ম্মনিপুণ হইলেও দয়ালু, নির্লোভও জিতেন্দ্রিয় হওয়া আবশ্যক।

মমতাহীন, স্বার্থপর, অর্থলোলুপ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করান কর্ত্তব্য নহে।

সদ্বংশজাত, দয়ালু, কার্য্যকুশল, শাস্ত্রজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসিত হইলে কোন কালে মনস্তাপের কারণ হয় না।

চিকিৎসকের নিকট রোগ ও আর্থিক অবস্থা গোপনের চেষ্টা করা উচিত নহে। চিকিৎসা যাহাদের জীবিকার উপায় তাহাদিগকে সাধ্যমত অর্থদানে কৃপণতা করা উচিত নহে। অকারণ চিকিৎসকের ক্ষোভ জন্মাইলে লাভের পরিবর্ত্তে ক্ষতিই হইয়া থাকে। প্রকৃত অর্থহীন ব্যক্তি দয়াবান চিকিৎসকের করুণা নিশ্চয়ই পাইবেন।

রোগী ও তাঁহার আত্মীয় স্বজন সর্ব্বদা চিকিৎসকের উপদেশ মানিয়া চলিবেন। চিকিৎসকের উপদেশ পালন, ঔষধের তিক্ত, কষায়াদি স্বাদ, রোগকালীন পথ্য তৎকালে সুখকর না হইলেও পরিণামে শুভকর হয়।

দাস দাসী অপেক্ষা আত্মীয় জনেরই রোগীর পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য দৈন্যশীল ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের হাতে সুশ্রূষার ভার দেওয়া উচিত নহে। মধুরভাষী, রোগীর প্রতি অনুরক্ত, জ্ঞানবান, কর্ম্মকুশল, প্রত্যুৎপন্নমতি, রোগীর সুশ্রূষাভার গ্রহণ করিবেন। বালক, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, অল্পে কাতর, কর্কশভাষী, নির্ব্বোধ, লোভী, অহিতচারী ব্যক্তির হস্তে রোগীর ভারার্পণ করা কর্ত্তব্য নহে। বহুব্যক্তি একত্র হইয়া পরিচর্য্যাভার গ্রহণ করিলে অনেক সময় বৃথা গোলযোগ হইয়া থাকে। রোগীর অপ্রিয় ব্যক্তিকে নিকটে যাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। অতি সঙ্কটাবস্থায় সমুপস্থিত প্রিয় পরিজনেরও অকস্মাৎ রোগীর নিকট যাওয়া উচিত নহে।

এক্ষণে চিকিৎসা ও চিকিৎসক সম্বন্ধে সাধারণের উদ্দেশে আরও কয়েকটি কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। যে চিকিৎসার আশ্রয় সর্ব্বদা গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার মতবাদ সম্বন্ধে যতটুকু পারা যায় অভিজ্ঞতা লাভের চেষ্টা করা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। এজন্য অবকাশ মত তৎ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ ও পত্রিকাদি পাঠ করিতে হইবে, চিকিৎসকের সহিত আলাপ, প্রশ্নাদি করিয়া শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত তথ্য বুঝিতে হইবে। ইহাতে স্বাস্থ্যরক্ষা ও সুশ্রূষা-প্রণালী অবগত হইতে পারা যাইবে।

আলাপ পরিচয় হইতে লোকের সদ সৎ-প্রবৃত্তি জানিতে পারা যায়, চিকিৎসকের সহিত শাস্ত্র ও ভেষজাদি সম্বন্ধে আলাপ পরিচয় করিলে, তাঁহার কর্ম্ম নৈপুণ্য বিশুদ্ধ ঔষধ প্রস্তুত অনুরাগ বুঝিতে পারা যাইবে।

আবার আলাপ পরিচয়ে চিকিৎসককে শাস্ত্রচর্চ্চাহীন, অসৎকর্ম্মী, লোভী, কদাচার, কর্ত্তব্য কর্ম্মে অর্থ ব্যয়ে কুণ্ঠিত, ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী অনভিজ্ঞ বুঝিলে, সুপণ্ডিত হইলেও তাহার দ্বারা চিকিৎসিত হইবে না। সকল সময়ে সকল দেশেই কতকগুলি ভিষক্-বেশধারী কপট ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, এই সকল কুবৈদ্য মৃত্যুর অগ্রদূত। সুতরাং ইহাদের সম্বন্ধে সাবধান হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। এই সকল কুবৈদ্যগণ নিজেদের বৃথা প্রশংসা করিয়া লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণের চেষ্টা করে, রোগের সংবাদ পাইলেই গৃহস্থের বাটীর সন্নিকটে ঘুরিয়া বেড়ায়, অথবা আহ্বান না করিলেও স্বয়ং উপস্থিত হইয়া নিজের কার্য্য প্রশংসা করিতে থাকে। কেহ না বলিলেও নিজেই রোগীর ঔষধ পথ্যের

ব্যবস্থা করে এবং কোনরূপে ঔষধ ব্যবহার করাইবার জন্য সচেষ্ট হয়। ইহাদের নিকট শাস্ত্র প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেই অন্য কথায় চাপা দিবার চেষ্টা করে, কিম্বা বিরক্তির সহিত অসংলগ্ন উত্তর দিয়া থাকে। অচিকিৎসিত থাকাও ভাল, কিন্তু একপ কুবৈদ্যের দ্বারা চিকিৎসা করান উচিত নহে।

ধনজনবহুল স্থান ব্যতীত সুচিকিৎসকগণ থাকিতে পারেন না, এজন্য ক্ষুদ্র পল্লীতে অনেক সময় চিকিৎসকের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকল স্থানে কুচিকিৎসক ও বিজ্ঞাপন ব্যবসায়িদিগের প্রভাব দে'খতে পাওয়া যায়। পল্লীর জনসাধারণ দলাদলি মামলা মোকর্দ্দমার জন্য অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয় না, কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষা বা আরোগ্যের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে কষ্ট বোধ করেন। অনেক পল্লীবাসী ঔষধের যে, কোন মূল্য দিতে হয় তাহাও জানেনা, এ জন্যই পল্লীতে কোন ভাল চিকিৎসক থাকিতে চাহেন না,—আর থাকিলেও উপযুক্ত মূল্যের অভাবে ব্যয়সাপেক্ষ কোন ঔষধই প্রস্তুত রাখিতে পারেন না।

এরূপ ক্ষেত্রে পল্লীর অবস্থাপন্ন ও শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের কর্ত্তব্য, সমগ্র গ্রামবাসিগণের সহিত একত্র হইয়া গ্রামের লোকসংখ্যানুযায়ী একজন বা দুইজন চিকিৎসা-নিপুণ ভিষক্‌কে স্বগ্রামে প্রতিষ্ঠিত করা,—এবং ধনিগণের নিজের অর্থ ব্যয় করিয়া ও বিশেষ প্রয়োজনীয় ঔষধগুলি প্রস্তুত করিয়া রাখা। কোন জটিল রোগে গ্রাম্য-চিকিৎসকের চিকিৎসায় উপকার না পাইলে অথবা ঔষধের অভাব হইলে নিকটবর্ত্তী নগর—মহকুমা বা জেলায় যে সকল চিকিৎসকের চিকিৎসায় সুখ্যাতি আছে, তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া বা তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া গ্রাম্য-চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। বঙ্গের কোন কোন পল্লীতে ভাল চিকিৎসকের অভাব থাকিলেও জনবহুল নগর, মহকুমা বা জেলায় সুচিকিৎসকের অভাব নাই। চিকিৎসার জন্য সাধ্যমত অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে, কারণ সামান্য অর্থের জন্য স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইলে চিরদিনের জন্য অর্থাগমের পথ রুদ্ধ হয়। আরোগ্য—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের মূল। সুতরাং নির্দ্দোষ আরোগ্যের জন্য কিঞ্চিৎ অধিক অর্থ ব্যয় হইলেও তাহাতে অর্থাগমের পথ মুক্ত হইবে। যাঁহারা নির্দ্দোষ আরোগ্য, অর্থের সাশ্রয় ও অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্যলাভে ইচ্ছুক, তাঁহারা কখনও কুবৈদ্যের অথবা বিজ্ঞাপনের ঔষধ ব্যবহার করেন না, কারণ ইহাদের অশাস্ত্রীয় ও অব্যবস্থা প্রদত্ত ঔষধগুলি আরোগ্যদান করিতেত পারেই না, অনেক সময় ভবিষ্যৎ ব্যাধির কারণ হইয়া চির জীবনের মত ভগ্নস্বাস্থ্যের ও অর্থনাশের কারণ হয়।

শ্রীজীবনকালী রায় বৈদ্যরত্ন।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতি সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য।

:০:

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতি সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য কি—তাহা এখন ভাবিবার সময় আসিয়াছে। মুসলমান রাজত্বে ইউনানি বা হেকিমি চিকিৎসার পূর্ণসমাদর লাভ ঘটিলেও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রাধান্য-হানি ঘটে নাই। বাদসাহ এবং আমীর ওমরাহগণ চিকিৎসাব্যপদেশে সুদক্ষ হেকিম চিকিৎসকদিগকেই আহ্বান করিতেন সত্য কিন্তু হিন্দু বংশধরগণ পারত্ পক্ষে হেকিম চিকিৎসকের শরণাপন্ন না হইয়া আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদিগেরই শরণ গ্রহণ করিতেন। কাজেই হেকিমি চিকিৎসা রাজকীয় সাহায্য প্রাপ্ত হইলেও প্রকৃতি পুঞ্জের অনুরাগাধিক্য বশতঃ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাই দেশে যে সমুজ্জ্বল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারই ফলে তাহার ঔজ্জ্বল্যের কিয়দংশ এখনও পর্য্যন্ত বাত্যাবিক্ষুব্ধ হইয়াও নষ্ট হইতে পারে নাই। এই জন্যই মুসলমান রাজত্বের অবসান এবং ব্রিটিশ রাজত্বের অভ্যুদয় কালে প্রাতঃস্মরণীয় গঙ্গাধরের আয়ুর্ব্বেদসিদ্ধি জনসাধারণকে মুগ্ধ করিয়াছিল। গঙ্গাধরের শিষ্যগুলিও ইহার ফলে প্রভূত খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্জ্জন পূর্ব্বক যশস্বী হইতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু সেদিন এখন চলিয়া গিয়াছে। সেই জন্যই এখন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার পুনরুন্নতি সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য কি,—তাহা ভাবিবার সময়ও আসিয়াছে।

কেমন করিয়া কিরূপভাবে সেদিন আমাদের চলিয়া গেল এক্ষেত্রে সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইংরাজ রাজত্বের দৃঢ় ভিত্তি গ্রথিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবন যাত্রা পরিচালন ব্যাপারেও যেন একটা অভিনব ভাব আসিয়া প্রবেশ করিল। আমাদের সাহিত্য, আমাদের শিল্প, আমাদের কৃষি—এক কথায় আমাদের সকল বিষয়েরই শ্রীবৃদ্ধি কামনায় ইংরাজ রাজ যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভাষা-জননী সংস্কৃত ভাষার শিক্ষা প্রচার উদ্দেশে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল, চতুষ্পাঠিগুলিতে এইজন্য বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইল, কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য agriculture ফারম সকল স্থাপিত হইল। আমাদের রাজা এ সকল চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু আমরা সে সকল চাহিলাম না,—আমরা চাহিলাম,—আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি গুলিকে পদদলিত করিয়া,—আমাদের ধর্ম্ম,—আমাদের কর্ম্ম;—আমাদের জাতীয় ভাব,—আমাদের শিক্ষা,—আমাদের দীক্ষা,—সকলই জলাঞ্জলি দিয়া পরকীয় ভাবে আমরা গঠিত হই—ইহাই হইল আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহারই ফলে আমাদের কি অশন,—কি বসন,—কি বিলাস, কি বাসনা—সকলই যেন পরকীয় ভাবে গঠিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণের

পৌরহিত্যের স্পৃহা লুপ্ত হইল, বৈদ্যের পুঁটুলি বা মোড়কের অনুরাগ নষ্ট হইল, কর্ম্মকার-নন্দনের মনে ইংরাজী শিখিয়া চাকুরে পুরুষ হইবার আশা জাগিয়া উঠিল, কলু তৈলের ব্যবসায় ছাড়িয়া দিল, গোয়ালা দুগ্ধের কেঁড়ে পরিত্যাগ করিল,—এক কথায় সকল জাতির ভিতরই জাতীয় বৃত্তির স্পৃহা লোপ পাইল,—সকলেই এ-বি-সি-ডি'তে হাতে খড়ি দিয়া জজিয়তি বা ম্যাজেষ্টেট চাকরি পাইবার জন্য লালায়িত হইয়া পড়িলেন। আমাদের অবনতির পথ এমনই করিয়াই পরিষ্কার করিতে লাগিলাম।

শুধু ইহাই নহে, সমাজের ব্যবস্থা-বিপর্য্যয় তো এইরূপ ভাবে ঘটিলই, সংসারপরিচালনার বিষয়গুলির ভিতরও আমরা অভিনব ব্যবস্থা আনিয়া ফেলিলাম। এই জন্যই আমাদের কাঞ্চন ফেলিয়া কাচের আদর, এই জন্যই আমাদের টিকি কাটিয়া টেড়ির ব্যবস্থা,—এই জন্যই আমাদের তৈল-ভুলিয়া সাবানের স্পৃহা। অধুনা সুরাপায়ীর সংখ্যা অনেকটা কমিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু ইংরাজ রাজত্বের প্রথমাবস্থায় দেশের শিক্ষিত পুরুষদিগের ভিতর সুরার স্রোতটা পূর্ণভাবেই চলিয়াছিল। "সধবার একাদশী"তে "নিমচাঁদে"র প্রতিকৃতি সে কালের কবি কুল কেশরীর উজ্জ্বল চিত্র। সে চিত্র প্রকাশে যে শুভ ফল ফলিয়াছিল, এখনকার শিক্ষিত পুরুষদিগের চরিত্রোন্নতি তাহারই স্বাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যাক্—যে কথা বলিতে-ছিলাম,—সমাজের মত সাংসারিক ব্যবস্থা-তেও আমরা অন্যভাব আনিয়া ফেলিলাম,—রোগাক্রমণে ঔষধ সেবন সম্বন্ধে ও বড়ি গুঁড়া ছাড়িয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দাগ কাটা শিশি হইতে লাল সবুজ রংয়ের তরল ঔষধের অনুরাগী হইলাম। ক্যাম্বেল এবং মেডিকেল কলেজের কৃপায় উত্তরোত্তর ডাক্তারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহাদিগের ষ্টেথেস্কোপ-থার্ম্মোমিটারের নিকট টিকিধারী বৈদ্যের নাড়ী টেপার ব্যবস্থা টিকিতে পারিল না।

এছাড়া আরও কতকগুলি কারণ ঘটিল। ১৮০৪ খৃঃ অব্দে মুর্শিদাবাদ এবং কাশিম বাজারে ম্যালেরিয়া জ্বরের যে নূতন সূত্র আরম্ভ হইল, ১৮২৪ সালে যশোহর নদীয়া এবং ২৪ পরগণায় তাহা পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইয়া, পশ্চিম বঙ্গের অনেকগুলি পল্লী ধ্বংস করিয়া ফেলিল। ক্রমে পশ্চিম বঙ্গ ছাড়াইয়া পূর্ব্ববঙ্গে ইহা বিস্তৃতি লাভ করিল। সে ম্যালেরিয়া বিস্তৃতির বিশদ বিবরণ আমরা ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। ফলে বাঙ্গালা দেশে ম্যালেরিয়া প্রবেশে দেশীয় চিকিৎসায় তাহার আশু দমন হয় না দেখিয়া অনেকে বড়ি গুঁড়া ছাড়িয়া ডাক্তারি চিকিৎসার পক্ষপাতী হইল।

তাহার পর বিসূচিকা। বিসূচিকা নিবারণে আমাদের ঔষধ যথেষ্ট থাকিলেও ক্যাম্ফার এবং ক্লোরোডাইনে শীঘ্র কার্য্য হইতে লাগিল। তাহার পর আবার যখন লোকে আমেরিকার হোমিপ্যাথিতে কলেরা চিকিৎসার সুফল প্রত্যক্ষ করিল, তখন এলোপাথিক ছাড়িয়া তাহার গোঁড়া হইতে আরম্ভ করিল। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় যে কলেরা আরোগ্য হইতে পারে, ক্রমশঃ এ কথাটা লোকে একবারে ভুলিয়া গেল।

তাহার পর "শস্ত্র চিকিৎসা।" "আসুরী মানুষী দৈবী চিকিৎসা ত্রিবিধা মতা।"—এ

...ন যখন প্রণীত হইয়াছিল, তখন অবশ্য ...ক্রান্ত চিকিৎসার কথা আর্য্য ঋষিগণও অবগত ছিলেন না। এইজন্য "আসুরী" চিকিৎসাই যে আমাদের অস্ত্র চিকিৎসা—সে কথা বোধ হয় না বলিলেও চলিবে। যখন দেশ হইতে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার সমাদর হ্রাস পাইতে লাগিল তখন উপযুক্ত ভাবে আয়ুর্ব্বেদ চর্চ্চা করিতে বৈদ্যদিগের প্রবৃত্তিও নষ্ট হইল। ফলে যে কোন কারণেই হউক শস্ত্র চিকিৎসাটি দেশ হইতে একবারে বিলুপ্ত হইল। সাধারণে দেখিল,—ম্যালেরিয়া জ্বরে ডাক্তারি ঔষধে যে সত্বর সুফল হইয়া থাকে, কবিরাজীতে বহুদিন চিকিৎসা করিয়াও সে ফল পাওয়া যায় না। কলেরায় এলোপ্যাথি বা হোমিওপ্যাথিতে যে ফল পাওয়া যায়, কবিরাজী চিকিৎসা তাহার অনেক পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। আর শস্ত্র চিকিৎসা—ফোড়া কাটা, পোয়াতি খালাস—এ সকল চিকিৎসায় তো আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক ঘেঁসিতেই পারে না। সুতরাং কবিরাজ অপেক্ষা ডাক্তারের প্রাধান্য শুধু বেশভূষা এবং ব্যবহারিক যন্ত্রের চাকচিক্য নিবন্ধনই যে উপস্থিত হইল তাহা নহে, কার্য্যতঃ ও কবিরাজ অপেক্ষা ডাক্তারদিগের নিকট অতি শীঘ্র অধিকতর সুফল হইয়া থাকে দেখিয়া লোক ডাক্তারি চিকিৎসারই সমধিক অনুরাগী হইয়া পড়িল। অবস্থার বিপর্য্যয়ে বৈদ্য চিকিৎসকগণের দৈন্য বর্দ্ধিত হইল। তাঁহারাও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতির প্রতি আর মনোযোগ প্রদান না করিয়া নিজের জীবন কোনরূপে অতিবাহিত করিবেন এই সংকল্প করিয়া ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকে ইংরাজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত করিয়া চাকরিজীবি সাজাইয়া তাহাদিগের উদরান্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। ফলে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার আর উন্নতি হইল না,—এ চিকিৎসা জাগতিক সকল প্রকার চিকিৎসার মূল হইলেও ইহার উন্নতির পথে তো বাধা পড়িয়াছিলই, এক্ষণে তাবৎ চিকিৎসার নিম্নস্তরে পতিত হইয়া কেবল পূর্ব্ব সমৃদ্ধির উল্লেখ বিস্তারে আত্মতৃপ্তি লাভ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কেবল কতকগুলি রোগে ইহা ভিন্ন অন্য গতি নাই দেখিয়া সাধারণে ইহাকে ছাড়িল না; সেইজন্য এখনো ইহার অস্তিত্ব একবারে লুপ্ত হয় নাই,—নতুবা অনেক কাল পূর্ব্বেই সমাজের সর্ব্বপ্রকার আভিজাত্যের মত অধুনা শিক্ষিতাভিমানী নব্যযুগে মিশিয়া ইহার অস্তিত্বও চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া কোন অতীত প্রদেশে মিলাইয়া যাইত—তাহা বলা যায় না।

আমরা যে বিষয় লইয়া অদ্য এই প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছি—'আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতি সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য কি'—ইহা যদি স্থির করিতে হয়, তাহা হইলে যে যে কারণে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অবনতি হইয়াছে দেখাইলাম, সে গুলির উন্নতি করিতে হইবে। শল্য, শালাক্য, কায়-চিকিৎসা ভুতবিদ্যা, কৌমার ভৃত্য, অগদ তন্ত্র, রসায়ন তন্ত্র, বাজীকরণ তন্ত্র—সকল শাস্ত্রগুলি আবার আমাদিগকে আয়ত্ত করিতে হইবে। শুধু আলমারি সাজাইয়া, সাইনবোর্ড দিয়া লম্বা লম্বা বাক্য বিন্যাসে 'ছদ্মচর' সাজিয়া সাজিয়া রোগিসংগ্রহের চেষ্টা করিলে চলিবে না,—শাস্ত্র শিক্ষা পূর্ব্বক দৃষ্টকর্ম্মা হইয়া সর্ব্ব প্রকার চিকিৎসায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইবে। দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া—যাহা কুই-

নাইন ভিন্ন নিবারণ করিবার কোন উপায় নাই বলিয়া একবাক্যে স্থিরীকৃত হইয়াছে, 'নাটা'য় পার, 'গুলঞ্চে' পার, 'ভাঁটপাতা'র রস সেবন করাইয়াই পার,—তোমাদিগকে তন্নিবারণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কলেরা তাড়াইবার জন্য হোমিওপ্যাথের নিকট যাইবার স্পৃহা রহিত করিয়া বর্ত্তমান সময়ের রোগের প্রকৃতির গতি উপলব্ধি করিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হইবে। আর ফোড়া কাটা, পোয়াতি খালাস—এ সকলও আয়ত্ব করিবার জন্য এনাটমি, সার্জ্জারির পূর্ণ সাধনা করিতে হইবে। যদি এ সকল ব্যবস্থা করিয়া সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পার,—এই প্রতিযোগিতার যুগে এলোপাথিক এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা অপেক্ষা তোমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় যদি সর্ব্ব বিষয়ে কৃতিত্ব দেখাইতে পার, তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির পথ আপনা হইতে এমনই উন্মুক্ত হইয়া পড়িবে যে, সহস্র ঝঞ্ঝাবাতেও কেহ তাহা রুদ্ধ করিতে পারিবে না।

সে উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইবার সময়ও উপস্থিত হইয়াছে। তোমাদের "মকরধ্বজে"র গুণ পরিচয় এখন বিলাতী চিকিৎসকেরাও অবগত হইয়াছেন,—জ্বর বিকারের যে অবস্থায় 'গার্লিসাই' সেবন করাইয়া ফল পাওয়া যায় না, সে অবস্থায় তোমাদের 'মকরধ্বজ মৃগনাভি'র সদ্যঃ কার্য্যকরী শক্তি দেখিয়া ডাক্তারগণ মুগ্ধ হইতেছেন। তোমাদের 'কালমেঘ,' তোমাদের 'অশোক', তোমাদের 'অশ্বগন্ধা'—তোমাদের 'কণ্টকারি'—রোগ আরোগ্যে কিরূপশক্তি সম্পন্ন—ইহা যদি এক্ষণে বিলাতী চিকিৎসক মণ্ডলী অবগত না হইতেন, তাহা হইলে বেঙ্গল কেমিকাল ওয়ার্কসে আজি এ সকল প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইত না। সেইজন্য বলিতেছি, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতির পথ এখন আর রুদ্ধ নাই,—এখন চেষ্টা করিলেই ইহার উন্নতি করা যাইতে পারে। কিন্তু সে চেষ্টার মূলীভূত বিষয় অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদে সম্পূর্ণ শিক্ষা লাভ। সে শিক্ষায় সাফল্য লাভ করিলেই যে আয়ুর্ব্বেদের পুনরুন্নতি লাভ ঘটিবে—ইহা ধ্রুব সত্য কথা।

মহিলাগণের চিকিৎসা-শিক্ষা।

(২)

প্লীহা ও যকৃৎ রোগের ব্যবস্থা।

আমার একটি বাল্যসঙ্গিনী—তাহার নাম ছিল সুরমা। আমি যখন প্রথম শ্বশুর-ঘর করিতে আসিয়াছিলাম, তখন সুরমাই হইয়াছিল আমার সুখ-দুঃখের, আশা নিরাশার, কামনা-বাসনার এক মাত্র সহচরী। অন্যায় কার্য্যে গুরু গঞ্জনায় যখন আমার মুখে বিষাদের কালিমা প্রতিফলিত হইত, দারুণ অভিমানে আত্মহারা হইয়া যখন নৈরাশ্যের ঘনান্ধকার আমার বাহ্য মূর্ত্তিতে প্রকটমান হইত, মর্ম্মব্যথা মুখে

না ফুটিয়া যখন অন্তস্তল দেশে সিন্ধুবারির মত গুর্ গুর্ করিয়া বহিয়া যাইত, তখন সুরমা আসিয়া আমার সকল কথা জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত। আমি বলিতে না চাহিলে সে সকল কথা খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া জোর করিয়া আমার নিকট হইতে বাহির করিয়া লইত। সকল কথা বাহির করিয়া লইয়া কত সান্ত্বনার কথা বলিত। তখন বয়সটা খুবই অল্প ছিল, সংসারের রহস্য যে তখন কিছুই বুঝিতাম না, কাজেই প্রতিপদে কত ভুলই না করিয়া বসিতাম।

খুকীটি আমার যেদিন পুড়িয়া গিয়াছিল, তা'র পর দিন সকালে উঠিয়া শুনিলাম, সুরমা শ্বশুর বাড়ী হইতে পিত্রালয়ে আসিয়াছে। তাহার পিত্রালয় ছিল আমাদেরই বাড়ীর পার্শ্বে। আমি পিশিমার নিকট অনুমতি লইয়া সংবাদ শুনিবা মাত্র সুরমাকে দেখিবার জন্য ছুটিয়া গেলাম।

অনেক সুখ দুঃখের কথার পর সুরমা বলিল, "আমার ছেলেটি ভাই কিছুতেই সারিতেছে না, পেট জোড়া প্লীহা, লিভারটাও বড় হইয়াছে। জ্বর রোজ হয়না বটে কিন্তু এমন মাস নাই, যে মাসে দু'বার তিন বার করিয়া না হয়। কত চেষ্টা করা হইল, কিন্তু তাহাকে ভাল করিতে না পারিয়া মনের সুখ কিছুতেই পাইতেছিনা ভাই।

আমি বলিলাম—"ডাক্তার বদ্দিরা কেউ কিছু করিতে পা'রলনা।"

সুরমা বলিল—বদ্দি দেখাই নাই, কারণ বদ্দি-চিকিৎসার উপর ওঁদের বড় ভক্তি নাই, একবার নাকি কোন্ একটা বদ্দি আসিয়া ওঁর কি একটা অসুখে আস্ত একটা ভুল করিয়া বসিয়াছিল, সেই থেকে উনি বদ্দি চিকিৎসার উপর বড় চটা। ডাক্তার অনেক দেখান হইয়াছে কিন্তু তা'রা কেবল গাদা গাদা কুইনাইন দেয়, তা'খেয়ে জ্বর বন্ধ হয় বটে কিন্তু একবারে যায় না।

আমি বলিলাম,—তা' তোমার স্বামী তো ভাই বদ্দি চিকিৎসার উপর একেবারেই চটা। আমি কিন্তু তা'র চেয়েও একটা অন্যায় কাজ ক'রতে বলি, তা' তুমি ক'রবে কি!

সুরমা বলিল—কি!

আমি বলিলাম আমার পিসীমা, ডাক্তার বদ্দি না হ'লেও চিকিৎসার অনেক বিষয় জানেন। আমি বলি কি,—দিন কতক তাঁর উপর নির্ভর ক'রলে মন্দ হ'তনা।

সুরমা সম্মতি প্রকাশ করিল। বলিল, তা' ক্ষতি কি, তিনি তো এখানে নাই, ভাল দেখাই যা'ক্না,—যদি পিসীমা সারাইতে পারেন, তখন তাঁকে সব্ কথা ব'লব, নইলে কিছুই ব'লবার দরকার নাই।

এই পরামর্শের পর আমরা দুইজনে পিসীমার নিকট আগমন করিলাম, সুরমার ছেলেটীও অবশ্য আমাদের সঙ্গে আসিল।

আসিয়াই আমি পিসীমাকে পাইয়া বসিলাম। বলিলাম,—পিসীমা আমাকে সেবার শিক্ষা করিবে বলিয়াছিলে, শুধু মুখের উপদেশে শিক্ষা দিলে চলিবেনা, চিকিৎসার ধরণ দেখাইয়া শিক্ষা করিতে হইবে।

এই বলিয়া সুরমার ছেলেটির অসুখের কথা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলাম।

পিসীমা সুরমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—খোকার বয়স কত হইয়াছে।

সুরমা বলিল—এই বেটের কোলে তিন বছরে প'ড়েছে।

পিসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন,—মাই খায়?

সুরমা বলিল—খায় বইকি? মাই না দিলে কচি ছেলে থাক্‌বে কি ক'রে?

পিসীমা বলিলেন ওইটা আগে বন্ধ কর্‌তে হ'বে। যে সব ডাক্তারদের দেখাইয়াছিলে তাঁরা কি মাই বন্ধ ক'র্‌তে বলেনি!

সুরমা বলিল,—কেউ কেউ বলেছিল, কিন্তু খোকা মাই না পেলে যে অস্থির হ'য়ে উঠে, পিসীমা। কাজেই মাই বন্ধ ক'র্‌তে পারিনি।

পিসীমা বলিলেন,—যদি সহজে বন্ধ ক'র্‌তে না পার, তা'হ'লে মাইতে তেতো জিনিস মিশিয়ে দিতে হবে। নিমপাতা বেটে, ভাঁটপাতা বেটে কি বেনের দোকানে যে চিরাতা পাওয়া যায়, তাই বেটে, কি কালমেঘের পাতা বেটে মাইতে লাগা'তে হয়, ওরই কোন একটা জিনিষ লাগা'লে মাইয়ের দুধের মিষ্টিভাব তেতো হ'য়ে যায়, তখন আর মাই খেতে চা'বেনা। এমনই ক'রে মাই বন্ধ ক'র্‌তে হ'বে। মাই বন্ধ না ক'র্‌লে হাজার ডাক্তার বদ্দি দেখা'লেও এ রোগ কিছুতেই সার্‌বেনা।

সুরমা বলিল,—আচ্ছা আমি ঐরূপ ক'রে বন্ধ ক'রব পিসীমা। এখন তার পর কি ক'রব—তা'বল।

পিসীমা ব'ললেন,—আগে নিয়ম, তা'র পর ওষুধ। অনেক সময় ওষুধ না খাইয়েও শুধু নিয়মে রেখে অনেককে ভাল করা যায়। যা'হোক নিয়মগুলার কথা আগে বলি শোন। দুধ যা' দেবে, তাতে প্রত্যেকবারেই একটু পিঁপুলের গুঁড়া মিশিয়ে দেবে আর দুধ গরম ক'রবার সময় অর্দ্ধেক দুধ আর অর্দ্ধেক জল দিয়ে আর তা'তে একখানা আস্ত পিঁপুল ফেলে দিয়ে সিদ্ধ ক'রে নেবে। খাঁটি ঘন দুধ এ রোগে মোটেই ভাল নয়।

সুর। খাঁটি দুধ ভাল নয় কেন পিসীমা?

পিসী। খাঁটি দুধ ভাল নয় এইজন্য যে খাঁটি দুধ হজম ক'রতে যে শক্তি দরকার, পীলে নীবার বড় হ'লে সে শক্তি ক'মে যায়। পীলেয় দুধ দেওয়া চলে কিন্তু নাগাদে দুধের মাত্রাটা যত কম দেওয়া যায় ততই ভাল।

সুর। তা' পিসীমা আমি দুধ না হয় কমই দেবো কিন্তু দুধ কম দিলে আরও তো কিছু খেতে দিতে হ'বে। তা' আর কি খেতে দেবো—তা'রও দু'একটা ব্যবস্থা ব'লে দাও।

পিসী। দেখ,—শঠীর পালো ব'লে আজকাল এক রকম খাবার বাজারে পাওয়া যায়। সেই শঠীর পালো দিয়ে দুধ সিদ্ধ ক'রে দিতে পরে্‌লে এ রোগে খুব উপকার পাওয়া যায়।

সুর। শঠীর পালো পিসীমা ডাক্তারেরাও ব্যবস্থা ক'রেছিল। এখনো মাঝে মাঝে দিয়ে থাকি।

পিসী। মাঝে মাঝে নয়, ওটা রোজই দিও;—শঠী নীবারের একটা মস্ত ওষুধ। তা'ছাড়া দু'টি দু'টি পোরের ভাত দিতে পারলে ভাল হয়।

সুর। তা' আর পা'রবনা কেন পিসীমা, তা' খুবই পারবো। তবে ভাত খাওয়ান এখনো অভ্যাস ক'রেনি—এই যা' কথা।

পিসী। ভাত খাওয়ান অভ্যাস ক'র্‌তে হ'বে। ভাত খাওয়ান এ রোগে খুব উপকারী। তবে সে ভাতটা পোরে'র

ওষুধ চাই। আর তা'র সঙ্গে কাঁচা পেপে, মানকচু, ওল—এসব কিছু কিছু সিদ্ধ ক'রে খুব টিপে একটু আধটু খাইয়ে দেওয়া ভাল। পেঁপে, মানকচু আর ওল—এ তিনটি জিনিস আহার, ওষুধ দুইই জান্‌বে। পাকা পেঁপেও একটু একটু দিতে পার। তাতেও বেশ উপকার হ'বে।

সুর। জল খাবারের সময় দু'টি কিস্‌মিস্, খেজুর, মিছরি এ সব দিতে পারি কি।

পিসী। খুব পার। এ গুলিও ও রোগের আহার ওষুধ। তবে মিছরিটা খুব বেশী দিও না—মিছরি বা কোন মিষ্টি বেশী খেলে ক্রিমির সৃষ্টি হয় আর ছেলে বয়সে বেশী মিষ্ট অভ্যাস ক'র্‌লে তোত্‌লা হ'য়ে পড়ে।

সুর। পিসীমা, আমরা যেখানে থাকি, সেখানে আনারসটা খুব বেশী পাওয়া যায়, এইজন্য আমরা আনারসটা খেতে একটু বেশী ভালবাসি। খোকাকে কি সে আনারসের দু'এক টুক্‌রা দিতে পারি?

পিসী। জ্বর ভাল হলে আর খুব মিষ্টি আনারস হলে পার। আনারসে নীবারের ক্রিয়া ভাল হয় ক্রিমি থাক্‌লেও আনারস খেলে তাহা নষ্ট হ'য়ে যায়। পীলে আর নীবার—এ দু'টা রোগে যাতে রোজ দাস্ত পরিষ্কার হয় এমন ব্যবস্থা করা দরকার। আনারসে কোন কোন ক্ষেত্রে সেটা সহজেই হ'য়ে থাকে ব'লে আনারস পীলে নীবারে উপকারী।

সুর। থাক্—তা'র পর এখন ওষুধের কথা বল।

পিসী। হাঁ এইবার তাই ব'ল্‌ব। কালমেঘের গাছ দেখেছিস্‌তো? সেই কালমেঘের ১০।১২টা পাতা আর আড়াইটে গোলমরিচ একসঙ্গে বেটে ৪টে ক'রে বড়ি ক'র্‌বি—তাই সকাল বেলা একটা, দু'পর বেলা একটা আর সন্ধ্যাবেলা ১টা দুধের সঙ্গে কি জলের সঙ্গে গুলে খাইয়ে দিবি। এই শুধু কালমেঘই জান্‌বি নীবারের মহা ওষুধ। এই কালমেঘের আরক তৈরি ক'রে এখন নাকি অনেক ডাক্তারেও বিক্রি ক'র্‌ছে। তা' তার চেয়ে কিন্তু টাট্‌কা কালমেঘ তুলেনিয়ে বড়ি তৈরি ক'রে নেওয়া কি কালমেঘের রস খাওয়ান অনেক ভাল। এতে উপকার বেশী পাওয়া যায়।

সুর। মাঝে মাঝে যে জ্বর হয়, তা'র জন্য কি ক'রব?

পিসী। এতে জ্বরও যা'বে। তা' ছাড়া আর একটা কাজ ক'র্‌তে পারিস্‌। শিউলি-পাতা, ক্ষেৎপাপড়া আর গাঁট বাদ দিয়ে গুলঞ্চলতা—এক একটা জিনিস ।৵০ আনা ওজনে নিয়ে বেশ ক'রে থেঁতো ক'রে কলার পাতায় জড়িয়ে একখানা তাওয়া বা চাটুর ওপর আগুনের জ্বালে গরম ক'রে নিয়ে সমস্ত রাত্রি শিশিরে রেখে দেবে। তা'র পর সকাল বেলা কলার পাতাটা খুলে ফেলে নেকড়ার পুঁটুলি ক'রে রসটা নিঙ্‌ড়ে নেবে। এই রকম ভাবে যতটা রস হ'বে, তা'র অর্দ্ধেকটা ফেলে দেবে, বাকী অর্দ্ধেকটা খুব ভোরবেলা ঝিনুকে নিয়ে খাইয়ে দেবে। দিন কতক এই রকম ব্যবস্থা ক'রলেই জ্বর বন্ধ হ'য়ে যা'বে। এটাকে চল্‌তি কথায় 'ঘুসড়ো' ব'লে থাকে।

সুর। যে ক'টা জিনিসের নাম ক'র্‌লে ওর সব গুলিই যে বড় তেতো পিসীমা, অত তেতো জিনিস কচি ছেলে খা'বে কি ক'রে?

পিসী। একটুখানি মধু মিশিয়ে দিও, তা'হ'লে তেতোটা কিছু কম লাগ্‌বে। আর একটা কাজ ক'র্‌তে হবে,—রোজ একটু একটু চোণা খাওয়াতে হ'বে, তা' সে চোণা আবার যে সে গরুর হ'লে হ'বে না, কৈলে বাছুরের হওয়া চাই।

সুর। কৈলে বাছুরের ভাবনা নাই, কৈলে বাছুর আমাদের বাড়ীতেই আছে কিন্তু চোণা যে খেতে বড্ড খারাপ, খা'বে কি রকম ক'রে?

পিসী। ঝিনুকে নিয়ে ঢক্‌ ক'রে গিলিয়ে খাইয়ে দিবি,—আর খা'বে কেমন ক'রে? আর শুধু খাওয়ান নয়, একটা ভাঁড়ে ক'রে খানিকটা চোণা গরম ক'রে সেই ভাঁড়টা পীলে আর নীবারের উপর দু'বেলা সেঁক্ও দিতে হ'বে।

সুর। সে কি পিসীমা, কচিছেলে, গরম তাত্‌ সইতে পা'র্‌বে কেমন ক'রে?

পিসী। খুব পা'র্‌বে, যা'তে সয়, তাই ক'রে দিতে হ'বে। চোণার সেঁকতো নয়, আমরা ওকে সেঁক বলি কিন্তু বদ্যিরা ওকে স্বেদ বলে। চোণার স্বেদের মত উপকারী পীলে নীবারে আর অন্য জিনিস নাই।

সুর। ওষুদপত্তরের আর কি ব্যবস্থা ক'র্‌তে হ'বে?

পিসী। তোর ছেলের জন্য আর কিছু ব্যবস্থা ক'র্‌তে হ'বেনা, যে সব ব্যবস্থা ব'লে দিলাম, শুধু এই সব ক'র্‌লেই তোর ছেলে বেশ্‌ সেরে উঠ্‌বে। লোকনাথ বদ্যি ব'লত শাস্তরে কচিছেলেদের জন্য নাকি বেশী ওষুদ দেওয়ার ব্যবস্থা নাই। কচি ছেলেদের যত অল্প ওষুদ খাইয়ে রোগ সারাতে পারা যায় তা'রই চেষ্টা করা উচিত।

সুর। তবু পিসীমা আরও গোটাকতক মুষ্টিযোগ ব'লে দাওনা, যদি এতে না সারে, তা'হ'লে সেই সকল ব্যবস্থা ক'রব।

পিসী। আচ্ছা তোর ছেলের জন্য যা বল্লুম আগে তা করে দেখ্‌—পরে ছেলে আরাম হলে যদি বদ্যিগিরি করবার জন্যে আরও কিছু জানিবার ইচ্ছা হয় তখন বল্‌বো।

সুরমা বলিল—আচ্ছা পিসীমা, তুমি আমার ছেলের জন্য যে সকল ব্যবস্থার কথা ব'লেছ, আমি সেই সকলই পালন কর'ব। এই বলিয়া সুরমা পিসীমাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

কিছুদিন পরে শুনা গেল, সুরমার ছেলেটি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছে। আমার পিসীমার উপর আরও ভক্তি বাড়িয়া উঠিল। আমার অপেক্ষা আরও বাড়িল সুরমার স্বামীর। তিনি শ্বশুরালয়ে আসিয়া সমস্ত কথা অবগত হইলেন এবং সেই সময় হইতে স্থির করিলেন, যে কোন রোগই হউক না কেন, বৈদ্যচিকিৎসা ভিন্ন আর কিছুই করাইবেন না।

সাল্‌সার মস্‌লা।

দেশে আজকাল সাল্‌সার ছড়াছড়ি। যত-গুলি কবিরাজ—তত সংখ্যক "সাল্‌সা"তো আছেই তাহা ছাড়া—মুদী, পশারী, দোকানী, কোম্পানী, অনেকেই সাল্‌সার আবিষ্কারক। সাধুভাষায় সালসার এত নাম প্রচারিত হইয়াছে যে, সে নামের "নামাবলী" গায়ে দিয়া বঙ্গ জননী কিছু ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সাল্‌সার বিজ্ঞাপনেরই বা চটক কত! সকলেই বলিতেছেন—"আমার সাল্‌সাই আদি ও অকৃত্রিম, এমন সাল্‌সা এ পর্য্যন্ত মর্ত্ত্যধামে আর আবির্ভূত হয় নাই, ভবিষ্যতেও হইবে না।" সাল্‌সার গুণ শুনিয়া খরিদ্দার কোন্‌টা ছাড়িয়া কোন্‌টা কিনিবে,—তাহা স্থির করিতে পারে না। বিজ্ঞাপনের লিখন-ভঙ্গী এমন চমৎকার—যে, তুমি রোগী হও, নিরোগী হও, ভোগী হও, যোগী হও—কিছুতেই তোমার পরিত্রাণ নাই, তোমাকে সাল্‌সা কিনিতেই হইবে। কাশি হইতে বাঘী পর্য্যন্ত সকল রোগেই সাল্‌সার ব্যবহার। সাল্‌সার কাট্‌তি—বৈষ্ণবের মালসা ভোগকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছে।

আমিও আজ সালসা লইয়া পাঠকগণের সম্মুখে হাজির হইলাম। তবে আমার সাল্‌সা আমার আবিষ্কৃত নহে। আমার পিতামহ—এই সাল্‌সার ফর্দ্দখানি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি,—আমার পিতার আমলেও দেখিয়াছি—এই সাল্‌সা সেবন করিয়া অনেকে উৎকট রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। আমিও অনেককে এই সাল্‌সা ব্যবহার করাইয়া বিশেষ ফল পাইয়াছি।

সাধারণের উপকারের জন্য—নিম্নে সাল্‌সার ফর্দ্দখানি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

মস্‌লা।	ওজন।	গুণ।
অনন্তমূল	॥০ আধ ভরি	শোণিত শোধক
সাল্‌সা রুট্	।০ চারি আনা,	শোণিত শোধক
জাঙ্গী হরিতকী	৵০ আনা,	সারক,
বড় হরিতকী	৵০ „	„
যষ্টিমধু	৵০ „	বলকারক,
তোপচিনী	৵০ „	পারার দোষ নাশক, বাত নাশক,
সাচি ফরাস্	৵০ „	পিত্ত নাশক,
মিএন্	৵০ „	কফ নাশক,
ইশবগুল	৴০ „	ঠাণ্ডা ও বায়ুনাশক,
অশ্বগন্ধা	৵০ „	বলকারক রসায়ন,
গোয়াকম্	৵০ „	বেদনা নাশক,
আরবী গঁদ	৴০ „	মেহ নাশক,
মৌরী	৴০ „	ঠাণ্ডা, তৃষ্ণা নাশক,
পদ্মকাষ্ঠ	৩ রতি,	জ্বর ও দাহনাশক,
ছোট এলাচ	৩ „	গরম, কফ নাশক,
বড় এলাচ	৩ „	ঠাণ্ডা পিত্ত নাশক,
সফেদ্ মুষলী	৴০ „	শুক্রবর্দ্ধক,
জৈত্রী	৩ রতি,	গরম, উত্তেজক,
তেজবল	৴০ „	উত্তেজক,
তিখুর	৵০ „	পাচক,
কাবাব চিনী	২ রতি,	স্বপ্নদোষ ও মেহনাশক।
তোক্‌মারী	৩ রতি,	শুক্র কারক,

বিহীদানা ৩ রতি, মূত্রকারক,
সালম্ বিছরী /০ ,, বলকারক,
শ্বেত চন্দন /০ ,, মেহ নাশক,
রক্ত চন্দন /০ ,, পিত্ত নাশক,
তেজপাত ২ রতি, কফ নাশক,
জাফ্রাণ ১ রতি, উত্তেজক,
দারুচিনী ৩ রতি, উত্তেজক, কফনাশক,
জোলাফা ৩ ,, সারক,
তোক বলাঙ্গু ৩ ,, ক্ষত নাশক,
কাল্‌পিন্ ফুল ৩ ,, মেদোবৰ্দ্ধক,
রেউচিনি /০ ,, সারক,
লবঙ্গ /০ ,, কফনাশক, পাচক,
যোয়ান ৩ রতি, পাচক,
গোক্ষুর বীজ ৩ ,, মূত্র কারক
বংশলোচন ৩ ,, হৃদ্‌পিণ্ডের বল বৰ্দ্ধক,
গোলাপ ফুল /০ আনা, ঠাণ্ডা, সারক,
সোণামুখী ৩ রতি, সারক,
কালাদানা ৩ রতি, ঐ
ধনে /০ আনা, পিত্তনাশক,
পিপুল /০ ,, অগ্নি বৰ্দ্ধক।

মস্‌লাগুলি বেশ করিয়া ঝাড়িয়া হামামদিস্তায় কুটিয়া, মাটীর হাঁড়িতে কাঠের জ্বালে, তিন সের জলে সিদ্ধ করিতে হয়। তিন পোয়া থাকিতে নামাইয়া, ছাঁকিয়া বোতলে পুরিয়া রাখিতে হইবে। এক ছটাক মাত্রায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিতে হইবে। এই সাল্‌সা, পুরাতন মেহ, রক্তদুষ্টি উপদংশ, বাত, ঘুষ্‌ঘুষে জ্বর, পুরাতন সর্দ্দি, কোষ্ঠবদ্ধতা, অনিদ্রা, দৌর্ব্বল্য, রক্তহীনতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা ৪২ দিন খাইতে হয়। এই সালসার উপকরণগুলি কতক কবিরাজী কতক হাকিমী। আমি যতগুলি রোগীকে এ সালসা খাওয়াইয়াছি—সকলেই ইহার প্রশংসা করিয়াছেন।

এই সালসা সেবনে—দাস্ত, মূত্র ও ঘর্ম্ম হইয়া এক সপ্তাহেই শরীর গ্লানি-শূন্য হইবে। দ্বিতীয় সপ্তাহে—ক্ষুধা বাড়িবে, তৃতীয় সপ্তাহে—দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হইবে, চতুর্থ সপ্তাহে নূতন রক্ত-কণিকা জন্মিবে; পঞ্চম সপ্তাহে ব্যাধি নষ্ট হইবে। ষষ্ঠ সপ্তাহে শরীরের বল বৃদ্ধি হইবে।

সালসা সেবন কালীন—শাক, অম্ল, পিষ্টকাদি গুরুপাক দ্রব্য, ডিম্ব, মাংস, গুড়, দধি, পাকাকলা তৈলের তরকারী এবং কলায়ের দাল খাইতে পাইবে না। কাঁচা-পাকা জলে স্নান করিবে। রাত্রি জাগরণ, দিবা নিদ্রা ও স্ত্রী-সঙ্গ—পরিত্যাগ করিবে।

মুন্সী শ্রীআস্‌রাফ আলি হাকিম।

চূড়ান্ত-সস্তার চ্যবন প্রাশ।

—:০:—

[ভুক্তভোগীর ইতিহাস]

তিন বৎসর পূর্ব্বে বর্ষার আর্দ্র বাতাসে—আমার সর্দ্দী কাসি আরম্ভ হয়। ১০।১২ দিনেও যখন কাসি কমিল না, তখন আমাদের ফ্যামিলি ডাক্তারকে ডাকা হয়। ডাক্তার আসিয়া বলেন—"ও সামান্য ব্রঙ্কাইটিস্—দুইদিনে সারিয়া যাইবে।" কিন্তু

আমার ভাগ্যদোষে—দুই দিনের স্থানে দুই বৎসরেও রোগ সারিল না। স্থান-পরিবর্ত্তন, পেটেণ্ট ঔষধ সেবন—কিছুই বাকি থাকিল না। কিছুতেই কিছু হইল না। আমার স্ত্রী কত দেশ হইতে কত মাদুলী আনাইয়া আমার কটী কণ্ঠ ও বাহু-যুগলে ঝুলাইয়া দিলেন, কত জাগ্রত দেবতার পাষাণ মন্দিরে 'ধর্ণা' দিয়া আসিলেন, কত "সোমবার" "মঙ্গলবার" "রবিবার" করিলেন, তাঁহার প্রাণের কামনা সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল। কত 'কফ রেমিডি' 'কডলিভার' অতলে গেল। আমার দেহ ও দিন দিন অস্থিচর্ম্ম-সার হইয়া পড়িল। গৃহে অবিবাহিতা দুই কন্যা—নিজে সামান্য কেরাণীগিরি করি মাত্র—পৈতৃক সম্বল কিছুই নাই—ছুটির অল্প বেতনে সংসারই চলে না, কাজেই সকল ছেড়ে সেই অগতির গতি ভগবানকেই ডাকিতে লাগিলাম।

এই সময় আমার এক মাতুল পুত্র আসিয়া বলিলেন—"দাদা! দিন কতক কবিরাজী চ্যবনপ্রাশ খাইয়া দেখনা কেন?" গৃহিণীও তাহার মতে সায় দিলেন। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন পড়িয়া ভিঃ পিঃ ডাকে ঔষধ পাঠাইতে পত্র লিখিলাম। ৫।৬ দিন পরে দিব্য চক্‌চকে টিনের কৌটায় ভরা লেবেল আঁটা, ব্যবস্থাপত্র সম্বলিত নিকষ-কৃষ্ণ মেঘের বর্ণ 'চ্যবনপ্রাশ' আমার হস্ত-গত হইল। আমি আশ্বস্ত হৃদয়ে "চ্যবনপ্রাশ" সেবন আরম্ভ করিলাম। চ্যবণপ্রাশের গুণাবলী পাঠ করিয়া মনে হইল—এমন চমৎকার ঔষধ থাকিতে এতদিন বৃথাই কষ্ট পাইয়াছি। ইহার মূল্যই বা কত সুলভ—একসের ঔষধের "মূল্য ৩৲ টাকা" মাত্র। আহা! যাহারা এ ঔষধ বেচিতেছে—তাহারা প্রকৃতই নিষ্কাম ধর্ম্মী,—পরোপকারই তাহাদের জীবনের ব্রত!

একমাসে একপোয়া ঔষধ আমি খাইয়া ফেলিলাম। কিন্তু রোগের কিছুই উপশম হইল না। যাঁহারা ঔষধ পাঠাইয়াছিলেন তাঁহাদের কাছে রিপ্লাই কার্ডে পত্র লেখা হইল। উত্তর আসিল—"আপনার অসুখ অনেক দিনের, আরও কিছু দিন চ্যবনপ্রাশ সেবন করুন"। কথাটা সম্ভব বলিয়াই বিশ্বাস হইল। তৎক্ষণাৎ অর্ডার দিলাম, আবার ঔষধ আসিল। আবার একমাস খাইলাম; কিন্তু রোগের অবস্থা "যথা পূর্ব্বম্ তথা পরং"! আবার পত্র লিখিলাম, শরীরের অবস্থার কথাও জানাইলাম। এবার চ্যবনপ্রাশের সঙ্গে এক রকম ঔষধ আসিল, তাহার নাম "চন্দ্রামৃত", ভাবিলাম—একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব তায় মিতে—আর আমার ভয় কি? এবার নিশ্চয়ই ভাল হইব। আমি আশায় বুক বাঁধিলাম। পত্নীর মুখ প্রফুল্ল হইল। আমাদের ভাগ্য-দেবী, অলক্ষ্যে একবার হাসিয়া লইলেন।

এই "চ্যবনপ্রাশ" ও "চন্দ্রামৃত"—ভক্তিপূর্ব্বক ৬ মাস কাল যথাবিধি সেবন করিলাম! ইহাতে লাভ এই হইল—আমলকী পিণ্ড খাইয়া খাইয়া আমার পেটের অসুখ দেখা দিল। দিনে রেতে ১০।১৫ বার করিয়া আমসংযুক্ত তরল ভেদ হইতে লাগিল। মাতুল পুত্র আমার অবস্থা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। তখন স্থির হইল—"চ্যবনপ্রাশ" বিক্রেতার সঙ্গে—মাতুল পুত্র সাক্ষাৎ করিবেন। আমার এমন শক্তি ছিল না যে আমি নিজে যাই।

মাতুল পুত্র সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার মুখে সংবাদ পাইলাম—"চ্যবনপ্রাশের" কারখানার মালিক আমার জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার ঔষধালয়ে ৫।৭ জন বৈদ্য কর্ম্মচারী আছেন, তাঁহারা এক একজন ঋষিতুল্য ব্যক্তি, আমার এই অসুখটী আরাম করিবার জন্য—তাঁহাদের অনন্ত—গবেষণা—প্রসূ বিরাট মস্তিষ্ক আন্দোলিত হইয়াছে। সেই আন্দোলনে—মহাসিন্ধু-আলোড়নে অমৃত উত্থানের মত 'শঙ্খবটী' ও "ভুবনেশ্বর" নামক দুইটী অমৃত আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পেটের অসুখ না সারা পর্য্যন্ত আমি ঐ দুইটী ঔষধ আপাততঃ খাইব। তাহার পর আবার চ্যবনপ্রাশও চলিবে! আত্মীয় জনের অনুরোধে পড়িয়া—'শঙ্খবটী' ও "ভুবনেশ্বর" ৬ দিন সেবন করিলাম। আমাশয় বাড়িতেই লাগিল। শেষে ডাক্তার আসিয়া—'বিষমথ্' খাওয়াইয়া অকূলে কূল দেখাইয়া দিলেন। সে যাত্রা তাহাতেই বাঁচিয়া গেলাম। ঔষধ খাওয়া বন্ধ করিয়া দিলাম।

কিন্তু বেশীদিন চুপ্ করিয়া থাকা ভাল বোধ হইল না। কেন না—কাসি তখন বৃদ্ধি পাইয়া বারাণসীতে দাঁড়াইয়াছে।' প্রতিবাসীরা পরামর্শ দিলেন—"একবার কলিকাতায় গিয়া কবিরাজ দেখাও।" বলাবাহুল্য আমাদের পল্লীগ্রামে একজনও কবিরাজ ছিল না।

কলিকাতায় গিয়া—একজন নামজাদা কবিরাজের শরণাপন্ন হইলাম। তিনি আমার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"ভরসার মধ্যে জ্বর নাই। আপনি ভাল হইবেন।" তাঁহার ঔষধে আমার বিশেষ উপকার হইল। কিন্তু তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত,—অতি কষ্টে দাম যোগাইয়াছিলাম, আর পারিলাম না। কবিরাজ মহাশয়কে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। তিনি ঈষৎ হাস্য করিলেন। তাঁহার সহকারী এক ছাত্রকে বলিলেন—"এই ভদ্রলোক বড় গরীব, ইহাকে আধপোয়া চ্যবনপ্রাশ দাও—একটা টাকার বেশী মূল্য লইওনা।"

চ্যবনপ্রাশের নাম শুনিয়া ঘৃণায় আমার মুখ বিবর্ণ হইল। আমি বলিয়া ফেলিলাম—"দোহাই আপনার, আমায় 'চ্যবনপ্রাশ' আর দিবেন না। আমি তিন টাকা সেরের চ্যবনপ্রাশ—৯ মাস /১।০ পোয়া খাইয়াছি। তাহাতেই আমার পেট ভাঙ্গিয়াছিল। আপনি দয়া করিয়া আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন, চ্যবনপ্রাশ দিয়া আর আমায় হত্যা করিবেন না।" কবিরাজ মহাশয় কৌতূহলী হইয়া—আমার চ্যবনপ্রাশ সেবনের ইতিহাস আনুপূর্ব্ব শুনিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে—তাঁহার ঔষধালয়ের সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই একটী টীনের কৌটা আমার হস্তে দিয়া বলিলেন—'এই ঔষধ আপনি প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আধতোলা ওজনে সেবন করিবেন। ঔষধ সেবনের পর একটু উষ্ণ দুগ্ধ পান করিবেন।" আমি তাঁহার কর্ম্মচারীর হাতে একটী টাকা দিয়া কৌটাটি লইয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন ঔষধ খাইতে গিয়া দেখিলাম—কৌটার গাত্রে নাম লেখা রহিয়াছে—"ভার্গ্যাদি লেহ" কিন্তু ভিতরে সেই মসীকৃষ্ণ পিণ্ডাকার ঠিক চ্যবনপ্রাশের মুর্ত্তি

[illegible] কিমাকার বস্তু! মনে সন্দেহ হইল—"চ্যবনপ্রাশই" বুঝি "ভার্গ্যাদি লেহ" নাম ধরে। আবার এই ভক্তাধমকে ছলনা করিতে আসিয়াছেন! হে অখণ্ড মণ্ডলাকার চ্যবনপ্রাশ! তুমি কি আমায় ছাড়িবে না?

পত্নী—আমার কোনও কথা শুনিলেন না, তিনি জোর করিয়া আমায় ঔষধ খাওয়াইলেন। বলিলেন—"এ চ্যবনপ্রাশ নয়, অন্য ঔষধ—তুমি খাও। কবিরাজদের কাছে—একরকম চেহারার অনেক ঔষধ থাকে।"

আমি ঔষধ খাইতে লাগিলাম। দুই তিন দিন পরেই ক্ষুধা বৃদ্ধি হইল, বেশ কোষ্ঠ পরিষ্কার হইতে লাগিল। একটু বলও যেন পাইলাম, ১০।১৫ দিন পরে—সকাল সন্ধ্যায় মাঠে দুই এক মাইল বেড়াইতে পারিলাম, ঔষধের উপর বড় ভক্তি হইল। কৌটাটি নিঃশেষ হইলে আবার একদিন কবিরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। একটী টাকা তাঁহার আসনের সম্মুখে রাখিয়া বলিলাম—"আমাকে আর একটু "ভার্গ্যাদি লেহ" দিন।" কবিরাজ মহাশয় হাস্য মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন চ্যবন প্রাশে উপকার হইয়াছে কিনা? বল পাইয়াছেন কিনা?" আমি বলিলাম—চ্যবন প্রাশতো আমি খাই নাই। আপনি প্রথমে চ্যবন প্রাশ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন বটে:—কিন্তু শেষে আমাকে "ভার্গ্যাদি লেহ" দিয়াছেন। উহাতে আমার বিশেষ উপকার হইয়াছে। কাসি—একদম নাই, ক্ষুধা ও বল বাড়িয়াছে। মনে হই-হইতেছে—এইবার ভাল হইয়া গিয়াছি।

কবিরাজ মহাশয় বলিলেন—হাঁ—আপনি এবার ভাল হইয়া গিয়াছেন। চ্যবন প্রাশ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের মধ্যে একটি উল্লেখ যোগ্য মহৌষধ। আপনার চ্যবন প্রাশে অভক্তি দেখিয়া—"ভার্গ্যাদি লেহ" নাম দিয়া, আমি আপনাকে সেই চ্যবন প্রাশই দিয়াছি। সুধু আপনি কেন? অনেকের মুখেই আমরা চ্যবন প্রাশের নিন্দা শুনিতে পাই, চ্যবন প্রাশের নকলে—দেশ ছাইয়া গিয়াছে। কাজেই অনেক স্থলে—আসল চ্যবন প্রাশকে নকল নাম দিয়া—আমরা ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হই।"

আমি অবাক্ হইয়া বৈদ্যরাজের মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। ভাবিতে লাগিলাম—আমাদের দেশে যেমন খাদ্য দ্রব্যগুলি ভেজালে পূর্ণ হইয়াছে,—জীবন রক্ষক ঔষধের ভিতরেও কি তেমনি ভেজাল চলিতেছে? শাস্ত্রীয় ঔষধের ভিতরেও এত প্রতারণা? দরিদ্র বাঙ্গালী জাতিকে—অল্প মূল্যের প্রলোভন দেখাইয়া—এমন সর্ব্বনাশ কি করিতে আছে?

হায়!—আমার এ কথা—কোন্ হৃদয়-বান্ ভাবিয়া দেখিবেন? যাহারা বড়ী বেচা বাড়ির মহিমা বুঝিয়াছে, তাহারা আমার মত লোকের অনুরোধে—"ধর্ম্মের কাহিনী" শুনিবে কেন? তাহাদের ব্যবসায়ের "মূল" যে অক্ষয় বটের মত বহু শাখা প্রশাখায় দেশ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

এবার অতি বর্ষার ফলে—অনেকেই কফ রোগে আক্রান্ত হইতেছেন, সম্মুখে—শীত ঋতু,—অনেকেই ফুস্‌ফুস-প্রদাহ ও কাসির পীড়ায়—কষ্ট পাইতে পারেন। তাই পাছে কেহ-রামা শ্যামার অপূর্ব্ব আবিষ্কার আমলকী পিণ্ড খাইয়া "চ্যবন প্রাশ" খাইতেছি মনে করেন,—সেইজন্য আমার চ্যবন

প্রাশ সেবনের ইতিহাস আজ সর্ব্বসমক্ষে প্রচার করিলাম।

আমার বিশ্বাস—কবিরাজী চিকিৎসার উপর সাধারণের যেমন দিন দিন শ্রদ্ধা বাড়িতেছিল, যা'র তা'র হাতের নকল ঔষধ—সে শ্রদ্ধা আর বেশী দিন থাকিতে দিবে না। আমরা অতি পশু জাতি, একদিকে আমরা ঘৃত বলিয়া বিষ খাইতেছি, ভেজাল খাদ্য ভক্ষণে স্বাস্থ্য হারাইতেছি; অন্যদিকে—মকরধ্বজের পরিবর্ত্তে—পারা গন্ধক মনছালের সংযোগ, চ্যবন প্রাশের পরিবর্ত্তে 'আমলকী পিণ্ড' খাইতেছি। আমাদের ঔষধ পথ্য দুইই বিগড়াইয়াছে, অতএব আমাদের ভাগ্যে—'ফলং অপ মৃত্যুঃ'

কবিরাজী ঔষধ আমাদের প্রকৃতির প্রকৃত উপযোগী। কিন্তু আমার অনুরোধ—জীর্ণ জটিল ও দুশ্চিকিৎস্য রোগে যাঁহারা কবিরাজী চিকিৎসা করাইবেন,—তাঁহারা যেন বিজ্ঞাপনের চটকে বিড়ম্বিত হইয়া নিজের সর্ব্বনাশ নিজে না করেন। যাঁহারা কবিরাজের বংশে জন্মিয়াছেন, কবিরাজের শিষ্য হইয়াছেন, কবিরাজী শাস্ত্র পড়িয়াছেন,—তাঁহারা ভিন্ন কবিরাজী ঔষধের গূঢ়রহস্য অপরের বোধগম্য নহে। রোগিগণ আমার এই কথা স্মরণ রাখিবেন।

আর কবিরাজ মহাশয়দের কাছে ও আমার একটী ভিক্ষা আছে।—তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ দেখিতেছি—কতকগুলা অর্থলুব্ধ অব্যবসায়ীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে গিয়া সাধারণকে সস্তার প্রলোভন দেখাইতেছেন। তাঁহাদের জানা উচিত—শাস্ত্রীয় ঔষধ—এরূপ "হেলাফলা" সামগ্রী নহে। শাস্ত্রীয় ঔষধ—"নকড়া-ছকড়ার" নিলামী মাল নহে। শাস্ত্রীয় ঔষধ—সেই সত্য যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত—চিরদিন দেব-নির্ম্মাল্যের মতন পবিত্র।

অনুকরণের হনুকরণে—আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্বনাশ করিও না। যাহারা চাকুরী জুটাইতে না পারিয়া, কবিরাজী ঔষধের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে—তাহারা সামান্য দোকানদার, জগতে তাহারা গৌরব-প্রতিষ্ঠার ধার ধারে না, তাহারা আয়ুর্ব্বেদের মহিমা বুঝে না, তাহারা—চায়—যেন তেন প্রকারেণ কর্ত্তব্যো ধনসংগ্রহঃ।—

আর তোমরা—বৈদ্য, ঋষি—বংশধর, আয়ুর্ব্বেদের প্রতিষ্ঠাতা, সমাজের শিরোভূষণ, জগজ্জীবের জীবনদাতা—ক্ষুদ্র দোকানদারের সঙ্গে তোমরা কেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে চাও? তাহাদের সঙ্গে তোমাদের কি তুলনা হয়?

একজন সুরসিক সাহিত্যসেবীর মুখে গল্প শুনিয়াছিলাম—পি, সি, মার "দদ্রু দমন" নামক ঔষধের প্রচার দেখিয়া,—কেবলরাম নিজ পুত্রের নাম পীতাম্বর রাখেন। তাহার সাধু উদ্দেশ্য—পি, সি, মার ঔষধটীর নাম ও মার্কা আত্মসাৎ করা। শেষে পিনাল কোর্টের ভয়ে—"পি সি, মার দদ্রু দমন মলম" ছাপাইয়া দিলেন। এবং পি, সি, মার দোকানের পার্শ্বেই একখানি দোকান খুলিলেন। পি, সি, মারের শুধু "দদ্রু দমন"—কেবল রামের—"দদ্রু দমনের" পর "মলম" প্রত্যয়। বিক্রী দেখে কে? ইহা দেখিয়া ক্রমে ক্রমে—অনেকেই দোকান খুলিতে লাগিল। 'মা' সি, মার,' "পি, সি, মাঁর" পি, চ, মার, পি, এস, মার—একে একে মাটী ফুঁড়িয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে—স্থানীয় মিউনি-

সাহেব সে রাস্তাটীর নাম রাখিয়াছিলেন "বিদ্রোহদমন রোড"। সস্তায় চ্যবন প্রাশ বেচিবার ও অনেকগুলি দোকান হইয়াছে, এখন দেখিয়া আমাদেরও মনেও ভরসা হইতেছে শীঘ্রই সহরের একটী রাস্তার নাম হইবে—"চ্যবন প্রাশ রোড।" সেই দৃশ্য দেখা পর্য্যন্ত—ভগবান্ আমাকে বাঁচাইয়া রাখুন। প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় দাড়াইয়া—দিন কয়েকের জন্য আজ আমি জীবন ভিক্ষা চাহিতেছি।*

শ্রীকেদার নাথ মুখোপাধ্যায়।

* সত্য মিথ্যা জানি না। একজন অতি বিশ্বস্ত ভদ্রলোকের মুখে শুনিয়াছি, তাঁহার এক বন্ধু—কেরাণীগিরির সঙ্গে সঙ্গে একটু আধটু চিকিৎসা ব্যবসাও করেন। এই বন্ধু—একজন সস্তায় চ্যবন প্রাশ বিক্রেতাকে—রাঙ্গা আলু সিদ্ধ করিয়া সেই রাঙ্গা আলুপিণ্ডকে তেল তেলে ভাজিয়া, কিঞ্চিত আমলা চূর্ণ ও পিপুল চূর্ণ সহযোগে চ্যবন প্রাশ প্রস্তুত করিতে দেখিয়াছেন।

—লেখক।

রক্তপিত্ত।

আজকাল আমাদের দেশে দিন দিনই যেন রক্তপিত্তরোগের প্রাদুর্ভাব বর্দ্ধিত হইতেছে বলিয়া অনুমান হয়। এই ভীষণ ব্যাধির আক্রমণে প্রতিবৎসর শত শত নরনারী অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন দিতেছেন। ইহা চির পরিবর্ত্তনশীল কাল-মাহাত্ম্যজনিত অথবা আহার, বিহার ও সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্ত্তনে সম্ভূত, তাহা তত্ত্বানুসন্ধিৎসু মহাত্মাগণ তাহার কারণ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন, ফলকথা, যাহাই হউক একটা কিছু কারণ ঘটিয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যদিও ব্যাধির হেতু নির্ণয় করতঃ তাহার পরিবর্জ্জন করাই প্রথম চিকিৎসা বলিয়া শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং রোগোৎপাদকহেতুর পরিহার ব্যতীত, আরোগ্যলাভ সম্ভবপর হইতে পারে না, তথাপি বর্ত্তমান সময়ে, দেশ ও সমাজের অবস্থা অনুসারে বিবেচনা করিলে, উক্ত কারণের পরিত্যাগ বিষয়ে, ব্যর্থ চিন্তা করিয়া হতাশ হওয়া অপেক্ষা সাক্ষাৎ কার্য্যকারণের আলোচনা অথবা ব্যাধিপ্রতীকার কল্পে সাধ্যমত কর্ত্তব্য নির্ণয় করাই সমিচীন ও সম্ভাবিত বলিয়া মনে হয়। সমাজের মতিগতি শিক্ষার অপ্রতিবিধেয় সংস্কার, কাল মাহাত্ম্যের অলঙ্ঘনীয়তা প্রভৃতি দুরতিক্রমনীয় কারণে যাহা ঘটিবার তাহাকে কে প্রতিরোধ করিবে? তথাপি যতদূর সাবধানতা অবলম্বন করা সম্ভবপর হইতে পারে, তৎপ্রতি সকলেরই মনোযোগ কর্ত্তব্য। ইহাতে সম্পূর্ণভাবে না হইলেও সমাজের ও দেশের কতকটা উপকার সাধিত হইতে পারে বর্ত্তমান সময়ে আমাদের জীবনযাত্রা, যেমত কার্য্য শৃঙ্খলার দ্বারা আবদ্ধ, তাহাতে শাস্ত্রীয় বিধির অনুসারে যথাযথ আচার ব্যবহার সর্ব্বসাধারণ পক্ষে কখনই সম্পাদ্য হইতে পারে না; সুতরাং তন্নিবন্ধন শারীরিক বা মানসিক বৈষম্য যাহা ঘটিবে, তাহা প্রতিরোধ করিবার সাধ্য কাহারও নাই, কিন্তু, তথাপি আমরা যদি অবান্তর ও প্রতিবিধান-

যোগ্য কারণগুলির প্রতি সাবধান থাকি, তাহা হইলেও অনেকটা সুখ শান্তিতে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতে পারিব, সেই অভিপ্রায়েই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

রক্ত ও পিত্ত উভয়ের প্রকোপজনক যে সমস্ত কারণ, তাহা অত্যধিক পরিমাণে সেবিত হইলে রক্তপিত্ত রোগ জন্মিতে পারে। সাধারণতঃ আতারক্ত কটুদ্রব্য (মরিচ, পিপুল প্রভৃতি) অম্ল ও লবণরসযুক্ত বস্তু, আদা, রসোন প্রভৃতি তীক্ষ্ণবীর্য্য পদার্থ, ক্ষারপদার্থ, অধিক রৌদ্র বা অগ্নিসন্তাপ, অতিরিক্ত পথপর্য্যটন, গুরুতর শোকপ্রাপ্তি, অপরিমিত ব্যায়াম, অধিক স্ত্রীসংসর্গ প্রভৃতি কারণে পিত্তের প্রকোপ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। পূর্ব্ববর্ত্তি-কারণ বশতঃ বিদগ্ধভাবাপন্ন পিত্ত যদি এই সমস্ত হেতু জন্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে শরীরস্থ যাবতীয় রক্তকেও কুপিত ও বিদগ্ধ করে, এবং দ্রবস্বভাববশতঃ ঐ রক্ত ও পিত্ত উভয়েই মিলিত ও সমবর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বাবয়বে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। পিত্তের বৃদ্ধির সহিত ঐ দুষ্ট রক্তও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। যেহেতু পিত্তই রক্তোৎপাদনের কারণ। সুতরাং তাহার প্রকোপ, দুষ্টি, ও বৃদ্ধিতে রক্তও কুপিত, দুষ্ট ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ। এবম্বিধ পিত্ত ও রক্ত প্রমাণাতিরিক্ত রূপে সঞ্চিত হইলে, রক্তবাহি শিরাসমূহের দ্বারা নাসা, কর্ণ, মুখ, পুরুষাঙ্গ, যোনিদেশ, গুহ্যদ্বার প্রভৃতি স্থান হইতে বাহিরে নির্গত হইতে থাকে। এই অবস্থাপন্ন ব্যাধির নাম রক্তপিত্ত।

এই রোগের উৎপত্তির প্রথমাবস্থায় নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি প্রায়ই উপস্থিত হয়, যথা মস্তকে ভারবোধ, আহারে অরুচি, শীতল বস্তু ব্যবহারে অভিলাষ, ধূমবৎ উদ্গার, বমি, নিজের বমন দর্শনে ঘৃণাবোধ, কাস, শ্বাস, ভ্রমি, শরীরের অবসন্নতা, মুখ ও নাসিকামধ্যে লৌহ, রক্ত বা মৎস্যের ন্যায় গন্ধানুভব, চর্ম্ম, চক্ষু, মল ও মূত্রাদিতে হরিদ্রা, রক্ত কিম্বা পীতবর্ণতা, স্বপ্নাবস্থায় সমস্ত দৃশ্যে রক্তবর্ণ দর্শন। উক্ত লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইলেই অচিরভাবী রক্তপিত্তের আবির্ভাব বুঝিতে পারাযায়, এই জন্য এই সমুদয় লক্ষণ রক্তপিত্ত রোগের পূর্ব্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

রক্তপিত্ত, ঊর্দ্ধ, অধঃ ও উভয়মার্গ ভেদে তিন প্রকার জন্মিয়া থাকে। ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তে নাসিকা, চক্ষু, মুখ ও কর্ণ দ্বারা রক্ত নির্গত হয়, অধোগত রক্তপিত্তে পুরুষাঙ্গ, যোনিদেশ ও গুহ্যদ্বার হইতে এবং উভয় মার্গগত রক্তপিত্তে একদা উক্ত উভয়বিধ মার্গ দ্বারা রক্ত বহির্গত হয়। রক্তপিত্ত রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে সমস্ত রোমকূপের ছিদ্র হইতেও রক্ত নির্গত হইয়া থাকে।

মুখ নাসিকাদির দ্বারা অমিত রক্তস্রাব, তৎসহচরিত জ্বর এবং রোগীর পাণ্ডুবর্ণতাদি লক্ষণ দেখিয়া আজকাল কোন কোন চিকিৎসক এই ব্যাধিকে ক্ষয়জ ব্যাধি মনে করতঃ বিষম ভ্রমে পতিত হয়েন, বস্তুতঃ রক্তপিত্ত রোগের সহিত যক্ষ্মা শোষ প্রভৃতি ক্ষয়জনিত ব্যাধির কোন কার্য্য কারণতা সম্বন্ধ নাই। এই রোগে যে রক্ত নিঃসৃত হয় তাহা সমস্ত রক্ত নহে, অধিকাংশই রঞ্জিত পিত্ত ও কতকাংশ দূষিত রক্ত। এ বিষয় রোগের উৎপত্তি বর্ণনকালেই বলা

হইয়াছে, পিত্তের বিকৃতি দোষেই বিকৃত ও পিত্তযুক্ত উদ্রিক্ত রক্তগুলি নিঃসৃত হইয়া থাকে। বাস্তবিক যদি ঐ রক্ত শরীরস্থ বিশুদ্ধ রক্তধাতু হইত তবে তৎপরিমিত রক্তস্রাবে রোগী অত্যল্প সময় মধ্যেই নিতান্ত অবসন্ন বা মৃত্যুমুখে পতিত হইত, সন্দেহ নাই। রক্তপিত্তে সময়ে সময়ে এক-সের বা ততোধিক পরিমাণে রক্তস্রাব দৃষ্ট হইয়া থাকে, রোগী যদিও স্রাবসময়কালে কতকটা অবসন্নতা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সুপথ্য ও যথোচিত পরিচর্য্যাদিগুণে, সে অবস্থা দীর্ঘ সময় থাকে না।

আবও দেখা যায়, অনেক সময়ে রক্ত বা পিত্তের শমনকারী সাধারণ মুষ্টিযোগ ঔষধ ২।৩ বার সেবনেই রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া যাওয়ায়, রোগী অল্পকাল মধ্যেই পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতা লাভ করিতে সমর্থ হয়। ক্ষয়জনিত রোগে ঈদৃশ পরিবর্ত্তন কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না, ইহা সাধারণ জ্ঞানেই বুঝিতে পারা যায়। যদিও "কাসোজ্বরোরক্তপিত্তং ত্রিরূপেরাজযক্ষ্মণি" এই ভোজোক্ত বচন-প্রমাণে যক্ষ্মারোগ মধ্যে রক্তপিত্ত ও একটা লক্ষণ স্বরূপ কথিত হইয়াছে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে উহা দ্বারা রক্তপিত্তের রাজযক্ষ্মত্ব প্রতিপন্ন হয় না,—বরং স্বতন্ত্রতাই বুঝা যায়, তবে যক্ষ্মারোগের সহিত রক্তপিত্তাদি রোগ সংসৃষ্ট হইলে উহা অতি দুঃসাধ্য হয়, কিন্তু রক্তপিত্তে যদি কাসি বা জ্বর বর্ত্তমান থাকে, তাহা কখনই রাজযক্ষ্মা নামে অভিহিত বা অসাধ্য বলিয়া পরিগণিত নহে।

সর্ব্ববিধ রক্তপিত্ত মধ্যে ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্ত অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। কারণ উক্ত রোগে পিত্তের সহিত কফের অনুবন্ধ থাকে। পিত্ত-দোষ নিবারণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বিরেচনই প্রধান ঔষধ, অথচ বিরেচন প্রয়োগে ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তে যে কফের অনুবন্ধ থাকে তাহারও উপশম হয়, অধিকন্তু তিক্তকষায়-রসবিশিষ্ট বিবিধ ঔষধ পথ্যাদির প্রয়োগে ঐ পিত্ত ও শ্লেষ্মাকে সহজে উপশমিত করা যায়। অনেক সময়ে একমাত্র বিরেচন প্রয়োগেই এ অবস্থায় বিশেষ উপকার দেখা গিয়াছে।

এতৎ সম্বন্ধে চরক সংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে—

"সাধ্যং লোহিত পিত্তং তৎ যদূর্দ্ধং প্রতিপদ্যতে
বিরেচনস্য যোগিত্বাৎ বহুত্বাদ্ভেষজস্য চ।
বিরেচনং হি পিত্তস্য জয়ার্থে পরমৌষধং।
যশ্চ তত্রানুগঃ শ্লেষ্মা তস্য চানধমংস্মৃতম্॥
ভবেদ্ যোগাবহং তত্র কষায়ং তিক্তমেবচ।
তস্মাৎ সাধ্যতমং রক্তং যদূর্দ্ধং প্রতিপদ্যতে"॥

অর্থাৎ—ঊর্দ্ধগামী রক্তপিত্ত বিরেচনোপযোগী বলিয়া সাধ্য হইয়া থাকে। বিশেষতঃ উহার প্রতিবিধানার্থ নানাবিধ পিত্তকফনাশক যোগবাহী ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে, পিত্তদোষ হরণে বিরেচনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা, উহাতে পিত্ত ও তৎসংসৃষ্ট শ্লেষ্মার ও উপশম হয় সুতরাং ঊর্দ্ধগরক্তপিত্তী সহজেই আরোগ্যলাভ করে।

অধোমার্গরক্তপিত্ত প্রায়ই যাপ্য (অর্থাৎ যথোপযুক্ত ঔষধ পথ্যাদি প্রয়োগে সাম্যভাবে) থাকে। এই রোগে পিত্তের সহিত বায়ুর অনুবন্ধ থাকায় প্রধানতঃ মধুর রস-বিশিষ্ট ঔষধপথ্যই উপযোগী। যদিও ঐ অবস্থায় বমনের দ্বারা চিকিৎসার বিধান উক্ত আছে, কিন্তু বমন ক্রিয়া সঞ্চিত পিত্তনাশে উপযোগী হইলেও পিত্তদোষ হরণে বিশেষ

ফলপ্রদ নহে। পিত্তহর তিক্তকষায় রস বায়ুর প্রকোপজনক সুতরাং ইহাতে প্রয়োগ করা যায় না। অপরন্তু এ অবস্থায় যে বায়ুর অনুবন্ধ থাকে, বমন দ্বারা তাহার উপশম হওয়া সম্ভবপর নহে। সুতরাং বায়ু ও পিত্তের উপশমকারী মধুররসাদিযুক্ত ঔষধ ও পথ্যাদি প্রয়োগে এবং অনুকূল স্বাস্থ্যকর দেশে অবস্থানাদির দ্বারা যতদূর সম্ভবপর হয় উক্ত ব্যাধিকে উপশান্ত রাখিতে চেষ্টা করিবে।

উভয় মার্গগত রক্তপিত্ত রোগ প্রায়ই অসাধ্য হয়। রোগজনক দোষ সমূহের পরস্পর বিপরীত ধর্ম্মবশতঃ একের প্রতী-কারে অন্যের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়, সুতরাং ঔষধাদির প্রয়োগে বিশেষ সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব এ অবস্থায় দোষের বলাবল বিবেচনা পূর্ব্বক যথাবথ ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা দ্বারা রোগীকে কোন প্রকারে সাম্যাবস্থায় রাখাই চিকিৎসকের কর্ত্তব্য।

রক্তপিত্তে দোষের ও সাধ্যাসাধ্যত্বের পরিচয়।

ঊর্দ্ধগামী রক্তপিত্ত শ্লেষ্মসংসৃষ্ট। অধোগত রক্তপিত্ত বাতানুগত এবং উভয় মার্গগত রক্তপিত্ত, কফ-বাতানুগত হইয়া থাকে।

১। এক মার্গগামী (এস্থলে টীকাকার ঊর্দ্ধগামীকেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই মতই সর্ব্বসম্মত ও সমীচীন) রক্তপিত্ত যদি প্রবল স্রাবযুক্ত না হয় ও রোগী সবল থাকে এবং শিশির বসন্তাদি সুখকর সময়ে যদি চিকিৎসার সুযোগ ঘটে ও রক্তপিত্তোক্ত উপদ্রবগুলি যদি উপস্থিত না থাকে তাহা হইলে সুখসাধ্য হয়।

২। এক দোষানুগত রক্তপিত্ত সাধ্য, দ্বিদোষানুগামী যাপ্য এবং সর্ব্বদোষযুক্ত হইলে অসাধ্য হয়।

৩। অগ্নিমান্দ্যরোগীর প্রবল বেগযুক্ত রক্তপিত্ত অসাধ্য।

৪। অন্য ব্যাধির দ্বারা ক্ষীণদেহ, বৃদ্ধ, অরুচিবশতঃ যথোচিত ভোজনে অসমর্থ ব্যক্তির রক্তপিত্ত অসাধ্য।

৫। যে সমস্তদৃশ্যপদার্থ বা নভো-মণ্ডল রক্তবর্ণময় দর্শন করে, তাদৃশ রক্তপিত্ত রোগী অসাধ্য।

৬। রক্তপিত্তে যদি রোগীর চক্ষু লোহিত বর্ণ হয় এবং বমন বা উদ্গার সময়ে সমস্তই রক্তবর্ণ বলিয়া অনুভূত হয় তাহাকেও অসাধ্য বুঝিতে হইবে।

রক্তপিত্তের উপসর্গ।

দৌর্ব্বল্য, শ্বাস, কাস, জ্বর, বমন, মত্ততা, শরীরের পাণ্ডুবর্ণতা, দাহ, মূর্চ্ছা, ভুক্তান্নের বিদাহ, সর্ব্বদা অধীরভাব, বক্ষঃপ্রদেশে প্রবল ব্যথা, পিপাসা, তরল মলভেদ, মস্তকে সন্তাপবোধ, মুখ ও নাসিকার দ্বারা দুর্গন্ধ-যুক্ত শ্লেষ্মার নিঃসরণ, ভোজনে অরুচি, অন্নের অপরিপাক। এই সমস্ত উপদ্রবের ন্যূনতা ও আধিক্য অনুসারে রক্তপিত্ত কষ্ট-সাধ্য এবং অসাধ্য হয়। যদি উপদ্রব একেবারেই না থাকে তবে সুখসাধ্য হয়। ইহাব্যতীত উক্ত রোগের সাধ্যাসাধ্যত্ব নির্ণয়ের জন্য প্রস্রুতরক্তের ও প্রকারভেদ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। যথা—এইরোগে রক্তেরবর্ণ মাংসধোয়া জলের ন্যায় অথবা কর্দ্দমার্দ্র জলের তুল্য হইলে

কিম্বা বসা, পূয, বা যকৃৎ খণ্ডেরন্যায় রক্ত নির্গত হইলে উহা অসাধ্য। যদি পক্ক জামফলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, বা গাঢ় কৃষ্ণ-বর্ণ, নীলবর্ণ অথবা ইন্দ্রধনুর মত নানাবর্ণ বিশিষ্ট রক্তস্রাব হয় তাহা হইলেও উহা অসাধ্য হইয়া থাকে। প্রস্রুত শোণিতের গন্ধ যদি শবের (মৃতদেহের) গন্ধবৎ অনুভূত হয় তবে উক্ত রক্তপিত্তও অসাধ্য বলিয়া জানিতে হইবে। বারান্তরে আমরা রক্ত-স্রাবমূলক অন্যান্য রোগের সহিত রক্তপিত্তের পার্থক্য নির্দ্দেশ এবং রক্তপিত্তের চিকিৎসা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

(ক্রমশঃ)

কবিরাজ শ্রীঅমৃতলাল কবিভূষণ
কাব্যতীর্থ।

ম্যালেরিয়া ও বিষমজ্বর।

অধুনা বাঙ্গালার পল্লীগুলি শুধু ম্যালেরিয়ায় উৎসন্ন যাইতেছে না, ম্যালেরিয়ার সহিত কালাজ্বরও বাঙ্গালার পল্লীগুলিতে প্রবেশ করিয়াছে। অনেক সময় এই দুইটি জ্বরের ভেদ নির্ণয় করা বাহ্যিক অবস্থা দেখিয়া বড় শক্ত হইয়া পড়ে,—অনেক চিকিৎসক-কেই এজন্য বিভ্রাটে পড়িতে হয়। সঠিক অবস্থা বুঝিতে না পারিয়া অনেকে কালা-জ্বরকেও ম্যালেরিয়া জ্বর মনে করিয়া সেই ধরণের চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করেন কিন্তু যথোপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে যেরূপ চিকিৎসককেও ব্যর্থ মনোরথ হইতে হয়, সেইরূপ অচিকিৎসায় রোগীর অবস্থাও ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া উঠে। এজন্য ম্যালেরিয়ায় অগ্রে রোগনির্ণয় ভালরূপে করিয়া তাহার পর চিকিৎসায় হস্তক্ষেপ করা উচিত।

আমরা গতবারে বলিয়াছি—ম্যালেরিয়া জীবাণু পররূহ উদ্ভিদ শ্রেণীর অন্তর্গত ইহারা রক্ত কণিকার ভিতর এক পার্শ্বে অবস্থিতি করে। জীব শরীরে রক্তের তিনটি বিভাগ,—একটি রক্তকণিকা, একটি শ্বেতকণিকা ও অপরটি জলীয় পদার্থ। ম্যালেরিয়ার আক্রমণে রক্ত ও শ্বেত কণিকা—উভয়ই তুল্যরূপে ধ্বংস হইতেছে—পরীক্ষা করিলে বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু কালাজ্বরে শ্বেত কণিকাই বেশী ধ্বংস হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা পরীক্ষাদ্বারা স্থির করিয়াছেন,—কালাজ্বরে শ্বেত কণিকা $\frac{১}{২০০}$ হইতে $\frac{১}{২০}$ পর্য্যন্ত কমিয়া গিয়া থাকে। শ্বেত কণিকাগুলি রক্তের ভিতর অবস্থিত থাকিয়া সর্ব্বদাই আমাদের দেহ রক্ষার কার্য্য করিতেছে কাজেই উহারা কমিয়া গেলে শরীর নানারূপ ব্যাধি সঙ্কুল হইয়া পড়ে।

ম্যালেরিয়ার সকল জীবাণু এক রকমের নহে। সাদাসিদা জ্বর একরূপ জীবাণু হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর এক রকমের জীবাণু হইতে সাংঘাতিক জ্বরের উৎপত্তি হয়। সহজ জ্বর-জীবাণু আবার

কয়েক রকমের জ্বর উৎপন্ন করিয়া থাকে,—এক রকম প্রাত্যহিক, এক রকম তৃতীয়ক ও এক রকম চতুর্থক। ইহার নিদান আমরা অনেকটা বিষম-জ্বরের মত দেখিতে পাই। "রোগ বিনিশ্চয়" গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে—

"দোষোল্পো হহিত সংভূতো জ্বরোৎ সৃষ্টস্য বা পুনঃ।
ধাতুমন্যতমং প্রাপ্য করোতি বিষমজ্বরম্॥"

অর্থাৎ জ্বর-মুক্তির পর দেহের ক্ষীণতা থাকিতে অবৈধ আহার বিহার করিলে অনতি বল দোষও প্রবৃদ্ধ এবং বায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া রস রক্তাদি কোন ধাতুকে আশ্রয় করিয়া বিষমজ্বর উৎপাদন করে।

বর্ত্তমান সময়ে সেকালের মত রস পরিপাক করাইয়া চিকিৎসার বিধি একরূপ উঠিয়াই গিয়াছে। এমতাবস্থায় ম্যালেরিয়া জ্বর বা বিষমজ্বর উপস্থিত হইবার কারণ তো যথেষ্টই রহিয়াছে। তা' ছাড়া কখন কখন প্রথম হইতেই বিষমজ্বরের উৎপত্তি হইয়া থাকে—ইহার প্রমাণও চিকিৎসা গ্রন্থে পাওয়া যায়, সুতরাং ম্যালেরিয়া জীবাণু রক্তকণিকায় মিশ্রিত হওয়ার জন্যই বিষমজ্বর বা ম্যালেরিয়া জ্বরের উৎপত্তি হইয়া থাকে—একথা বলা যাইতে পারে।

"রোগ বিনিশ্চয়" গ্রন্থে সতত, সন্তত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, চতুর্থক—এই কয় শ্রেণীতে যে বিষমজ্বরের বিভাগ করা হইয়াছে, ম্যালেরিয়া জ্বরের লক্ষণ সম্বন্ধেও তাহার যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সহজ জ্বর-জীবাণু হইতে অন্যেদ্যুষ্ক বা প্রাত্যহিক জ্বর এবং তৃতীয়ক ও চতুর্থক জ্বরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। আর এক প্রকার জীবাণু সততক ও সন্তত জ্বরের উৎপত্তি করিয়া থাকে। সততক জ্বরের জীবাণু সুরঞ্জিত, এজ্বর অতি সাংঘাতিক; ইহার অপর নাম দ্বৈকালিক,—এ জ্বর দিনে একবার ও রাত্রিতে একবার অথবা কেবল দিনেই দুইবার বা রাত্রিতেই দুইবার হইয়া থাকে। এ জ্বরের চিকিৎসা বিশেষ বিবেচনা করিয়া করা উচিত।

যে জ্বর সাতদিন, দশদিন ও দ্বাদশ দিন নিয়ত ভোগ করে তাহার নাম সন্তত। এ জ্বরটি বিষমজ্বর কি না, সে সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ-বেত্তাদিগের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও বর্ত্তমানের ম্যালেরিয়ার সহিত ইহার সম্বন্ধ যথেষ্ট নিহিত রহিয়াছে।

দোষ রসস্থ হইয়া সন্তত জ্বরের সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই জ্বরে দেহের গুরুতা, বমনেচ্ছা, অবসাদ, বমি, অরুচি ও চিত্তের ক্লান্তিভাব প্রকাশিত হয়। যে ম্যালেরিয়া জ্বরে দশ দিন বা দ্বাদশ দিন নিয়ত কাল ভোগ হইয়া থাকে, সে জ্বরের সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হওয়ায় আমরা ইহাকে বিষম জ্বরের অন্তর্গত সন্তত জ্বর বলিয়া গণ্য করিতে পারি।

দোষ রক্তস্থ হইয়া সততজ্বরের উৎপত্তি হয়। এই জ্বরে মুখ হইতে রক্তোদ্গিরণ, দাহ, মোহ, বমন, বিভ্রম, প্রলাপ, পিড়কা ও তৃষ্ণা—এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। ম্যালেরিয়া জ্বরের যে অবস্থায় সমস্ত দিবা রাত্রির মধ্যে দুইবার করিয়া জ্বর হইতেছে দেখা যায়, সে জ্বরের লক্ষণও এইরূপ। এই জ্বরে ম্যালেরিয়া-জীবাণু রক্তকণিকায় আশ্রয় করিয়া থাকে একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আয়ুর্ব্বেদ সেই

রক্তকাণকাকেই রক্তস্থ বলিয়াছেন। সুতরাং বুঝা গেল এশ্রেণীর ম্যালেরিয়া জ্বর ও আয়ুর্ব্বেদের বিষমজ্বর একশ্রেণীর অন্তর্নিহিত।

এইরূপ দোষ মাংসাশ্রিত হইয়া অন্যেদুষ্ক, মেদোগত হইয়া তৃতীয়ক ও অস্থি মজ্জাগত হইয়া চতুর্থক জ্বর উৎপাদন করে। এই মাংসাশ্রিত বা অন্যেদুষ্ক জ্বরে জানুর অধোজঙ্ঘা মাংসপিণ্ডে অর্থাৎ পায়ের ডিমে দণ্ডাদ দ্বারা পীড়নবৎ বেদনা, তৃষ্ণা, মলমূত্রের অতিপ্রবৃত্তি, বাহিরে তাপ, অন্তরে দাহ, হস্তপদাদি সঞ্চালন ও গ্লানি—এই সকল লক্ষণ যাহা উপস্থিত হয় তাহাও ম্যালেরিয়া জ্বরের উপদ্রবের সদৃশ। মেদোগত জ্বরে অতিশয় ঘর্ম্ম, পিপাসা, মূর্চ্ছা, প্রলাপ, বমন, শরীরে দুর্গন্ধ, অরুচি, গ্লানি ও অসহিষ্ণুতা,—অস্থিগত জ্বরে অস্থিসমূহে ভঙ্গবৎ বেদনা, কুন্থন, শ্বাস, মলরোধ, বমন ও হাত-পা ছোড়া,—মজ্জাগত জ্বরে অন্ধকার দর্শন, হিক্কা, কাস, শীত, বমি, অন্তর্দাহ, মহাশ্বাস ও হৃদয়চ্ছেদবৎ বেদনা—ম্যালেরিয়ার জ্বর বিশেষের সহিত একই প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়।

কালাজ্বরও আয়ুর্ব্বেদের বিষমজ্বরের অন্তর্গত কিন্তু ইহা ম্যালেরিয়ার সহিত সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যাহাহউক ম্যালেরিয়া জ্বরের নাম আমাদের দেশের লোকে আগে না জানিলেও ইহার সহিত আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিষমজ্বরের যে সাদৃশ্য রহিয়াছে—সে সম্বন্ধে সন্দেহমাত্র নাই। সেই জন্য আমাদের মনে হয়, ম্যালেরিয়া জ্বরে যদি প্রথমেই সাবধানতাসহ আয়ুর্ব্বেদোক্ত পাচন এবং ঔষধ সকল সেবন করা যায়, তাহা হইলে রোগ আর ভীষণভাব ধারণ করিতে পারে না। কিন্তু জ্বরের বিরামকালে ডাক্তারেরা যেরূপ কুইনাইন প্রয়োগে উহা বন্ধ করিতে চেষ্টা করেন, সেইরূপ আয়ুর্ব্বেদোক্ত হরিতাল প্রভৃতি তীব্র ঔষধ ব্যবহারে উহা বন্ধ করিতে চেষ্টা করা উচিত, কিন্তু উহা কালাজ্বর কি না ইহা ঠিক বিবেচনা করিয়া তবে ম্যালেরিয়া নিবারণের ঔষধ দেওয়াও কর্ত্তব্য।

ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ।

[নিম্নলিখিত মুষ্টিযোগগুলি আমাদের বাটীতে পুরুষ পরম্পরায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। সাধারণের উপকার হইবে ভাবিয়া "আয়ুর্ব্বেদে" ইহা মুদ্রিত করিলাম। এই সকল মুষ্টি যোগের মধ্যে—আমি স্বয়ং কতকগুলি পরীক্ষা করিয়াছি এবং চমৎকার ফল পাইয়াছি। আমার বিশ্বাস—পাঠকগণ ইহা ব্যবহার করিলে বুঝিতে পারিবেন, ঈশ্বরের অনুগ্রহে—কত সামান্য জিনিষে কত উৎকট ব্যাধিও আরাম হইতে পারে।

মুষ্টিযোগগুলি আমার পিতৃদেবের একখানি খাতায় লিপিবদ্ধ ছিল।]

আধ কপালে—

পেটারীর মূল ছেঁচিয়া, নেকড়ায় পুঁটুলীতে বাঁধিয়া নস্য লইলে তৎক্ষণাৎ—আধ কপালে নামক শিরোরোগ নষ্ট হয়।

অনিদ্রায়—

কাকমাচী, পিপুল, মুগাই, এই তিনটী গাছের যে কোনও একটীর মূল- সূতায় বাঁধিয়া মাথায় বাঁধিলে নিদ্রাকর্ষণ হইয়া থাকে।

নিদ্রায়—

কান্দু কুড়িয়ার মূল সূতায় করিয়া মাথায় বাঁধিলে—সে দিন আর নিদ্রা হইবে না।

কাঞ্জিড়ার পাতা বাটিয়া চক্ষুর চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিলে—ঐ প্রলেপ যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ আর নিদ্রা হইবে না।

দন্তশূলে—

কুড়চীর ছাল বাটিয়া দাঁতের গোড়ায় দিবে তৎক্ষণাৎ দন্তশূল আরোগ্য হয়।

দাঁতের পোকায়—

হাঁচুটি কিম্বা কান্দু কুড়িয়ার শিকড় চিবাইলে দাঁতের পোকা মরে।

যে দাঁতে পোকা হইয়াছে—সেই দাঁতের পোকার স্থানে নির্জ্জল আদার রস পুরিয়া দিবে। পরে, ডানিপানার মূল চিবাইতে বলিবে। ইহাতে পোকা মরে।

দন্ত চালে—

হেজল গাছের ছাল গুঁড়া করিয়া দাঁত মাজিলে, নড়া দাঁত শক্ত হয়।

বকুলের ছাল বাটিয়া দন্তমূলে লেপ দিলে দাঁত খুব শক্ত হয়।

প্রত্যহ নীল ঝাটীর পাতা চিবাইলে দাঁত খুব শক্ত হয়।

পিপুলের মূল চিবাইলেও দাঁত শক্ত হয়।

দন্ত কড় মড়িকায়—

কান্দড়ের পাতা দুগ্ধে বাটিয়া, পদতলে রাত্রিকালে প্রলেপ দিলে দাঁত কড়মড় করা ভাল হয়।

কাস রোগে—

পিপুলের গুঁড়া /০ আনা, শুঁঠের গুঁড়া /০ আনা, সৈন্ধব লবণ /০ আনা। একত্রে মিশাইয়া ভোজনের প্রথম গ্রাসের সহিত প্রত্যহ খাইলে শীঘ্রই কাস রোগ ভাল হয়।

রাম বাসকের মূল।০ আনা, কাল তুলসীর পাতা ২১ খানা, মরিচ ৫টা একপোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া এক ছটাক থাকিতে নামাইয়া গরম গরম ঠিক সন্ধ্যার সময় খাইবে। ইহাতে সকল রকম কাশি ভাল হয়।

অনুমৃতার কড়ি ১ কড়া, ছোট সবুজ রঙের মাকড়সা ১টা—একত্রে ন্যাকড়ায় বাঁধিয়া কণ্ঠে ধারণ করিলে সকল রকম কাসি ভাল হয়।

প্রত্যহ ভোজন শেষে এক আনা সৈন্ধব লবণ—একটু গরম জল সহ খাইলে বহুদিনের পুরাতন কাস রোগ ভাল হয়।

রক্ত পিত্তে—

গাম্ভারীর পাকাফল ৪।৫টী চুষিয়া খাইলে তৎক্ষণাৎ মুখ দিয়া রক্ত ওঠা বন্ধ হয়। টাট্‌কা ফল না পাইলে শুষ্কফল চূর্ণ করিয়া—মধুর সহিত চাটিয়া খাইতে হইবে।

লাক্ষার গুঁড়া ৵০ আনা কিস্‌মিস্‌।০ আনা, একত্রে বাটীয়া বড়ী করিবে। এই বড়ি চুষিয়া খাইলে—রক্ত ওঠা নিবারিত হয়।

অজীর্ণে—

শুঁঠের গুঁড়া /০ আনা, ১ ঝিনুক গরম দুগ্ধ সহ রাত্রে আহারের পর খাইলে—অজীর্ণ ভাল হয়।

আধপোয়া ডাবের জলে—১০।১২টা পুদিনার পাতা, এক আনা মৌরী, এক আনা যোয়ান, ১ কুঁচ সৈন্ধব—রাত্রে ভিজাইয়া প্রাতঃকালে সেই ডাবের জলটুকু ছাঁকিয়া খাইলে সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ রোগ ভাল হয়।

বায় শূলে—

হিজলের ফল ১টা, মরিচ ১২টা—জল দিয়া বাটায়া খাইলে বাই শূল ভাল হয়।

প্লীহায়—

কেয়া গাছের পাতা শুকাইয়া,—হাঁড়ির ভিতর পুরিয়া, অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিবে। সেই ক্ষার ৩ রতি, একটু মাৎ গুড়ের সহিত খাইলে প্লীহা ভাল হয়।

নিসন্দা গাছের শিকড়ের সূক্ষ্মচূর্ণ এক আনা; এক ঝিনুক বাছুরের চোনার সহিত এক মাস কাল ব্যবহার করিবে। ইহাতে প্লীহা, যকৃৎ ও জর নিশ্চয়ই ভাল হইবে।

আম বাতে—

বিছাটী গাছের পাতা ৫।৬টী গব্য ঘৃতে ভাজিয়া ভাতের সঙ্গে খাইলে আমবাত ভাল হয়।

বাতে—

শিরীষ মূলের ছাল ২ ভরি, দেড় পোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া দেড় ছটাক থাকিতে নামাইয়া সেই কাথ পান করিলে বাতের বেদনা নষ্ট হয়।

আধ ছটাক—পাকা পুঁই মেটুলী, এক পোয়া রেড়ীর তৈলে চোঁয়া চোঁয়া করিয়া ভাজিবে। সেই তৈল বাতের বেদনা স্থানে মালিশ করিবে। ২।৩ দিবসেই উপকার জানা যাইবে।

প্রমেহ—

একখানি বাতাসায় ১ ফোঁটা বটের আটা দিয়া খাইলে, ৩ দিনে মেহ রোগের জ্বালা যন্ত্রণা নষ্ট হয়।

কাবাব চিনির গুঁড়া।০ আনা, কলমী সোরা আধ ভরি, সাদা চন্দনের গুড়া ⁄০ আনা, সকলের দ্বিগুণ মিছরীর গুঁড়া দিয়া ১৭ পুরিয়া করিবে। এই পুরিয়া ২ বেলা ২টী জল দিয়া গিলিয়া খাইবে। ইহাতে মেহ, প্রস্রাবকালীন অসহ্য জ্বালা, ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হওয়া, সপূয ধাতু নির্গম প্রভৃতি উপসর্গ—সত্বর প্রশমিত হয়।

রক্তামাশায়—

বেলশুঁঠা চূর্ণ ⁄০ আনা, আমের কোশী চূর্ণ ⁄০ দাড়িম্ব ফলের গুঁড়া ⁄০ শিমূল আঠা চূর্ণ ⁄০, মুথা চূর্ণ ⁄০ আনা, সাদা ধূনার গুঁড়া ৷⁄০ আনা, একত্র মিশাইবে। ১৪টী পুরিয়া বাঁধিবে। ২ বেলা ২ পুরিয়া ছাগল দুগ্ধ অনুপানে খাইলে অসাধ্য কষ্টকর রক্ত-আমাশয়ও আরোগ্য হয়। এই ঔষধটী আমাদের বংশে প্রায় ৬০ বৎসর ধরিয়া ব্যবহার হইয়া আসিতেছে এমন চমৎকার ঔষধ প্রায় দেখা যায় না।

আম ছাল বাটীয়া, পুরু করিয়া নাভিস্থানে প্রলেপ দিলে—আমাশয় ভাল হয়।

গ্রহণী রোগে—

বকুল ছালের রস, আমছালের রস, আধ ঝিনুক পরিমাণে লইয়া ঘোলের মথিত করিয়া খাইলে গ্রহণী ভাল হয়।

শঙ্কর জটার শিকড় /০ আনা, পাঁচটী গোল মরিচ সহ বাটিয়া খাইলে গ্রহণী ভাল হয়।

হারিষে—

লাল আপাং গাছের শিকড় এক আনা, বাটিয়া ইক্ষুরস সহ ভক্ষণ করিলে হারিষের রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

আফুলা শিমুলের মূল বাটিয়া ছাগল দুগ্ধে সহ সেবনে হারিষ ভাল হয়।

দন্তোৎপলের মূল ⁄০, ২১ গোল মরিচ সহ বাটীয়া খাইলে রক্ত বন্ধ হয়।

বাতশিরা ও কুরণ্ডে—

মাল কাঁকড়া ঘাসের শিকড় দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া খাইলে, বাতশিরা ভাল হয়।

কুমিরে পোকার বাসা—জলে গুলিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলে কুরণ্ড ও একশিরার ফুলা এবং যন্ত্রণা সত্ত্ব সত্ত্ব কমিয়া যায়।

তৃষ্ণায়—

কাঁকড়ার গর্ত্তের মাটী লইয়া ৭টী ভাঁটা প্রস্তুত করিবে। ঐ ভাঁটাগুলি আগুণে পোড়াইতে দিবে। লাল বর্ণ হইলে চিম্‌টায় দ্বারা তুলিয়া ভাঁটাগুলি গরম থাকিতে ২ একে একে তিন পোয়া জলে ডুবাইবে। সেই জল ছাঁকিয়া রোগিকে খাইতে দিবে। এক পোয়া আন্দাজ জল খাওয়ার পরই আর সে জল খাইতে চাহিবে না।

কলমী শাকের গাঁইট ২১টা মরিচ পাঁচটা —একত্রে বাটিয়া আধ পোয়া জলে গুলিবে। ওই জল ২।১ ঝিনুক খাইবামাত্র রোগীর অসহ্য পিপাসা নিবারিত হইবে।

হিক্কায়—

রজনী গন্ধ ফুল ৪।৫টা শিলে বাটিবে,— পরে তাহা আধ পোয়া জলে গুলিয়া, সেই জলে ২ তোলা চিনি মিশাইয়া সরবত প্রস্তুত করিবে। এই সরবত পান করিলে, অজস্র উত্থিত হিক্কাও ভাল হয়। মৃত্যুকালে—বিদ্যাসাগর মহাশয়কে খাওয়ান হইয়াছিল।

কেশের (কসার) শিকড় শুকাইয়া গুঁড়া করিবে, এই গুঁড়া মধুর সহিত অবলেহ করিলে প্রবল হিক্কা নিবারিত হয়।

মূর্চ্ছায় —

ছোট্ট চাঁদের পাতা হাতে রগড়াইয়া রোগির নাকের কাছে ধরিলে, মূর্চ্ছা ভাল হয়।

পা ফাটায়—

গুড় আধ ছটাক, সর্ষপ তৈল আধ ছটাক, সৈন্ধব লবণ ⁄০ আনা, এক পোয়া চোনা—একত্রে মিশাইয়া ৭ দিন রৌদ্রে রাখিবে। চোনা শুকাইয়া গেলে মলমের মত হইবে। ইহা মাখাইলে পা ফাটা ভাল হয়।

পিত্ত বৃদ্ধিতে—

হিংচা পাকের রস ১ কাঁচ্চা, ধনের গুঁড়া /০ আনা, হরিতকী চূর্ণ /০, গুড় ।০, একত্র মিশাইয়া খাইলে, হাত পা চখ মুখ জ্বালা প্রশমিত হয়।

বায়ু বৃদ্ধিতে—

অম্ল দধি ও মাৎ গুড় একত্র মিশাইয়া—স্নানের পূর্ব্বে গাত্রে মাখিবে, পরে স্নান করিবে। ইহাতে উন্মাদ পর্য্যন্ত ভাল হয়।

স্নানের পর—পায়রার ডিমের শাঁস কাঁচা হলুদের রসের সহিত মিশাইয়া মাথায় লেপ দিলে মাথা ঠাণ্ডা হয়।

কামলা রোগে—(ন্যাবা)—

আঁকোতে মূল বাটিয়া নাশ লইবে। আমলার গুঁড়া ঘোল সহ খাইবে।

দারু হরিদ্রা—চন্দনের মত জলে ঘসিয়া খাইবে, চক্ষে কেশুরে পাতার রসের অঞ্জন দিবে। ইহাতে ন্যাবা ভাল হয়।

(ক্রমশঃ)

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

২য় বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৪—পৌষ। | ৪র্থ সংখ্যা।

স্বাস্থ্যকর স্থান।

[দার্জ্জিলিং]

প্রাকৃতিক পরিচয়—

ডাক্তার যখন রোগীকে কোথাও 'চেঞ্জে' যাইবার পরামর্শ দেন, তখন অনেকেই বলেন—"এটা ডাক্তারী মতের গঙ্গা যাত্রা!" কিন্তু এরূপ বিদ্রূপ—ব্যঙ্গ নিতান্ত অকারণ নহে। অনেক সময় দেখা যায়—চেঞ্জে গিয়া রোগীর স্বাস্থ্যের কোন উন্নতিই হইল না,—বরং রোগ বাড়িয়াই গেল, হয়ত তাহাতেই তাহাকে পৃথিবীর পান্থশালা পরিত্যাগ করিতে হইল। এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু, জল-বায়ুর পরিবর্ত্তনে নষ্টস্বাস্থ্য ফিরিয়া আসা—ইহাও ত নিত্যদৃষ্ট ঘটনা। দেশে দীর্ঘ কাল ধরিয়া রোগ ভোগ করিলে অনেক সময়—'স্থানত্যাগেন দুর্জ্জনং," এই মহানীতির বলে জল বায়ু পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইয়া থাকে। আমাদের বিশ্বাস,—চেঞ্জে গিয়া যাঁহারা কোনও উপকার পান না, তাঁহারা হয়ত নিজের উপযোগী স্থান নির্ব্বাচন করিতে পারেন না। সকল স্থান সকলের পক্ষে স্বাস্থ্যকর হইতেই পারেনা। সেইজন্য আমরা সাধারণের উপকারার্থে—প্রসিদ্ধ স্থানগুলির স্বাস্থ্যকারিতার যথাসাধ্য পরিচয় দিব। ইহাতে—কোন্ স্থানে গেলে কিরূপ রোগীর উপকার হয়—সকলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। দেশের প্রকৃতি-নির্ব্বাচন দোষে কাহাকেও আর বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইবে না।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা দার্জ্জিলিংয়ের স্বাস্থ্যকারিতার উল্লেখ করিব। সম্প্রতি আমাদের এক বন্ধু রোগ-মুক্তির পর দার্জ্জিলিংয়ে হাওয়া খাইতে গিয়াছিলেন। তিন মাসের পর তাঁহাকে রুগ্ন-ভগ্ন দেহ লইয়া ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। বন্ধুর যেরূপ শরীর, তিনি যেরূপ ব্যাধিতে কষ্ট পাইয়াছেন,—তাঁহার দার্জ্জিলিংয়ে যাওয়াই উচিত হয় নাই। অবশ্য দার্জ্জিলিং একটী

স্বাস্থ্যকর স্থান,—কিন্তু সকলের পক্ষে দার্জ্জিলিংয়ের বায়ু শুভকর নহে।

কলিকাতা হইতে প্রায় ৪০০ শত মাইল দূরে, ৭১৬৯ ফিট উচ্চে—হিমালয়ের একটী শৃঙ্গের উপর দার্জ্জিলিং অবস্থিত। যখন "দার্জ্জিলিং-হিমালয়ান্ রেলওয়ে" ছিল না, তখন দার্জ্জিলিং যাওয়ার অনেকটা অসুবিধা ছিল,—পয়সা খরচও কিছু বেশী হইত। তখন শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত ট্রেণে গিয়া, পরে টোঙ্গা বা পাল্কীতে চড়িয়া দার্জ্জিলিং সহরে যাইতে হইত। এখনও প্রাচীনকালের পথের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। শুনিয়াছি, বৰ্দ্ধমানের মহারাজগণ তখন দার্জ্জিলিং যাত্রীদের জন্য যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দিতেন। এখন দার্জ্জিলিং গমনের আর কোন কষ্ট নাই। বিকালে শিয়ালদহ ষ্টেশনে—দার্জ্জিলিং মেলে চড়িলে,—একেবারেই দার্জ্জিলিং যাওয়া যায়। বিশেষতঃ পথের উভয় পার্শ্বের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে গেলে পথশ্রমের কথা মনেই থাকে না।

হিমালয়ের সিকিম গিরিশ্রেণীর মধ্যে দার্জ্জিলিং। স্থানটী তত প্রশস্ত না হইলেও অসংখ্য অট্টালিকায় পূর্ণ, দেখিতে অতি সুন্দর—যেন স্বর্গের নন্দন কানন! পর্ব্বতের যে ভাগে দার্জ্জিলিং সহর রচিত হইয়াছে, সে অংশ তত উচ্চ নহে। দার্জ্জিলিংয়ের বাজার দেখিবার জিনিষ। এখানে গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করিবার জন্য—মহামান্য বঙ্গেশ্বরের একটী প্রাসাদ আছে। দার্জ্জিলিংয়ে বৰ্দ্ধমান ও কুচবিহারের মহারাজার অনেক জায়গা জমী-দেখিতে পাওয়া যায়। ভাড়াটে বাড়ীরও এখানে অভাব নাই তবে ভাড়ার হার বড় বেশী।

দার্জ্জিলিংয়ে বৃষ্টি পতনের মাত্রাটা অতিরিক্ত, আসাম, কুচবিহার ব্যতীত ভারতের আর কোনও দেশে এত বৃষ্টি হয় না। বৃষ্টিপাতের গড় পরিমাণ ১২০ ইঞ্চি থাকে। এত বৃষ্টি—কিন্তু বৃষ্টি ধরিয়া গেলেই পথ ঘাট খুব শীঘ্র শুকাইয়া যায়। কলিকাতার মত এক হাঁটু কাদা হয় না। সকল ঋতুতেই এখানকার বায়ু আর্দ্র—শীতে ও বর্ষায় আরও অধিক। এখানে বায়ুর তাপের মাঝামাঝি পরিমাণ, ৫৯, ৫১ ও ৩৬ ডিগ্রী। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ৬৫, আষাঢ় শ্রাবণে ৭০, অগ্রহায়ণ পৌষে ৬২ ডিগ্রী হইয়া থাকে।

অতি চমৎকার পরিচ্ছন্ন সহর! ময়লা পরিষ্কারের বন্দোবস্ত এত সুন্দর যে, চক্ষে না দেখিলে বুঝানো যায় না। সহরের ড্রেণ—"রণজিৎ" নামক নদে মিশিয়াছে। জলের কল, বৈদ্যুতিক আলো—কিছুরই অভাব অপ্রতুল নাই। বাজারে সকল জিনিষই পাওয়া যায়। কিন্তু দাম বেশী। বিলাতী শাক সব্জী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রতি রবিবারে একটী হাট বসে। ভুটিয়া, নেপালী, লেপ্‌ছা, সিকিমী প্রভৃতি পাহাড়ী জাতিরা হাটের শোভা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। কত ফুল, ফল, মধু, এলাচ, তরিতরকারীই যে আমদানী হয়, তাহার ইয়ত্তা হয় না।

পথে বেড়াইতে বেড়াইতে যখন,—ঊর্দ্ধে তুষার-মণ্ডিত অচল শ্রেণী, নিম্নে নেত্রোৎসব উপত্যকা ভূমির দিকে দৃষ্টি পতিত হয়, তখন প্রাণে এক অপূর্ব্ব ভাবের আবেশ হয়। প্রভাতে ও প্রদোষে উপত্যকাগুলি তিমিরাবৃত, শিখরগুলি রবিকর দীপ্তিতে স্বর্ণোজ্জল, কি রমণীয় মহান দৃশ্য! আপনারা

যদি সেঞ্চালের প্যারেড্ হইতে তুষারাবৃত ভূগিনাচলের মধুর দৃশ্য দেখেন, বোধ হয় জীবনে তাহা ভুলিতে পারিবেন না! ঐ গিরি-শ্রেণীর উপর—২৮ হাজার ফিট উচ্চ 'কাঞ্চন জঙ্ঘা' ভীমকান্ত মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান! পশ্চিম দিকের দৃশ্য—১২ মাইল দূরবর্ত্তী একটী পাহাড়ে অবরুদ্ধ, পূর্ব্ব দিকে তিস্তা অতিক্রান্ত! দক্ষিণে সেঞ্চালের নিবিড় বনানি—যেন তরঙ্গায়িত মহাসমুদ্রের ন্যায় অনন্তে মিলিয়া গিয়াছে! উত্তর দিকের দৃশ্য —উন্মুক্ত, কেবল পর্ব্বত শ্রেণী মেঘের ন্যায় থরে থরে সাজানো। ১০।১২ হাজার ফিট উর্দ্ধে আরোহণ করিয়া নেপাল ও সিকিমের মধ্যবর্ত্তী গিরি শিখরে দণ্ডায়মান হইলে দক্ষিণে অনন্ত সৌন্দর্য্যের আধার "কাঞ্চন জঙ্ঘা" এবং বামে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ গিরি "এভারেষ্ট" দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে 'রণজিতের" স্ফটিক-স্বচ্ছ-সলিলে তিস্তা শাখার হরিৎবর্ণ বারিরাশি মিশিয়াছে—সেখানকার দৃশ্য দেখিলে মনে হয়, এতদিনে আমার মানব জন্ম সার্থক!

দার্জ্জিলিংয়ে একটী অপূর্ব্ব উদ্যান আছে —পৃথিবীর সকল দেশের উদ্ভিদ্ তাহাতে সযত্নে সংগৃহীত হইয়াছে। দার্জ্জিলিংয়ের "সিনকোনা" ক্ষেত্রও দেখিবার জিনিষ। এখানে মক্ষিকা ও মধু উৎপাদনের বিস্তৃত কারবার আছে।

দার্জ্জিলিং যে কিরূপ স্বাস্থ্যকর মনোরম স্থান, তাহা বুঝাইবার জন্যই আমি প্রাকৃতিক দৃশ্যের কথঞ্চিৎ আভাষ দিলাম, নহিলে দার্জ্জিলিংয়ের সকল চিত্রকটো, কেবল ভারতের কবি কালিদাসের এবং বাঙ্গালার কবি বিহারীলালের ক্যামেরাতেই উঠিতে পারে।

জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত, এখানে প্রবল বারিবর্ষণ হইয়া থাকে। এই সময় এখানকার স্বাস্থ্য খুব ভাল। মার্চ্চ ও মে মাসে দার্জ্জিলিংয়ের জল বায়ু ঠিক ইংলণ্ডের মত হয়। বাঙ্গালী বাবুরা এই সময় দার্জ্জিলিংয়ে বেড়াইতে যান। যদিও বর্ষার শৈত্যেও এখানে স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা থাকে না, তথাপি নবেম্বর মাসেই এ দেশের স্বাস্থ্য সব সময়ের চেয়ে ভাল। নবেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত—প্রায়ই ঝড়বৃষ্টি দেখা যায় না। এই সময় দিবসে সূর্য্যোদয় দেখিতে পাওয়া যায়, রাত্রে সুনীল নভোমণ্ডলে তারা সনাথ চন্দ্রদেব মজলিসি দরবার বসান।

জল বায়ু।

এইবার দার্জ্জিলিঙের জল বায়ুর কথা বলিব। যে সকল শিশু রোগে জীর্ণ ও অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছে, দার্জ্জিলিংয়ের জল বায়ুতে তাহাদের অত্যন্ত উপকার হয়। অল্প দিনের মধ্যেই তাহারা হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়া পিতামাতার আনন্দ বর্দ্ধন করে। বয়োপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাও দার্জ্জিলিংয়ে আসিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পর্ব্বতের "কঠিন শক্ত ঠাঁই" তথায় ম্যালেরিয়া সুন্দরী ঘেঁসিতে পারেন না।

আর্দ্র ভূমিতে বাস করিলে যে সকল রোগ জন্মিতে পারে, দার্জ্জিলিংয়ে সে সকল রোগের ভয় নাই। তবে খুব শীতের সময় একটু আধটু সর্দ্দী কাসি হয় বটে, কিন্তু সে সর্দ্দী প্রায়ই বুকে বসে না বা ফুস্ ফুস্ বিকৃত করে না।

যাঁহারা জ্বর জ্বালায় ভুগিয়া ভুগিয়া অস্থি-চর্ম্ম সার হইয়াছেন, তাঁহারা অন্ততঃ দুই মাস কাল দার্জ্জিলিংয়ে বাস করিলে, জল বায়ুর গুণে নিশ্চয়ই নবজীবন লাভ করিবেন।

যাঁহারা অসুস্থ শরীর লইয়া দার্জ্জিলিংয়ে যাইবেন,—সে সময়টা যদি শীতকাল হয়,—তবে তাঁহারা পথিমধ্যে 'খরসান' নামক স্থানে কিছুদিন থাকিবেন। একেবারে ৭ হাজার ফিট উচ্চ দার্জ্জিলিংয়ে যাইবেন না।

দার্জ্জিলিংয়ে গেলে, ত্বকে অধিক পরিমাণে শোণিত সঞ্চালিত হয়। তাহাতে ত্বক পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, শরীরেও বলাধান হইয়া থাকে। এইজন্য—এই হিমজাড্য দেশের অতিরিক্ত শৈত্য সেবনেও দেহের কোনও অপকার হয় না। আমাদের দেশে তাপাধিক্যের জন্য ত্বক স্বভাবতঃ শিথিল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে, ফলে এদেশে সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই সর্দ্দী হয়। কিন্তু শীত-প্রধান দার্জ্জিলিংয়ে ত্বকের তেজ ও স্থিতিস্থাপকতা শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে—সুতরাং শৈত্য সেবনে অপকার না হইয়া উপকারই হইয়া থাকে। আবার পর্ব্বতারোহণ কালে হৃদ্‌পিণ্ডের শোণিতস্রোত দ্রুতবেগে বহিতে থাকে। কি সুস্থ, কি অসুস্থ, দার্জ্জিলিংয়ে গেলে সকলেরই জঠরাগ্নি বৃদ্ধি হয়। সে ক্ষুধা কাহারও আগাগোড়া সমান থাকে, কাহারও বা দিন কতক পরে কমিয়া যায়। পরিপাক শক্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীরের বল ও মাংস বৃদ্ধি হয়, পেশী সমূহ এতদূর দৃঢ় হয় যে, গুরুতর পরিশ্রম করিয়াও লোকে ক্লান্তি বোধ করে না।

এদেশে নিদ্রা দেবীর সঙ্গে যাঁহার প্রণয় নাই, দার্জ্জিলিংয়ে গেলে নিদ্রা তাঁহার সহচরী হইয়া দাঁড়ান। আমাদের দেশে বায়ুর উত্তাপে ও মানসিক উদ্বেগে প্রায়ই নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। দার্জ্জিলিংয়ের প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়া মনে বিপুল আনন্দ জন্মে, এবং শৈত্য সেবনে মস্তিষ্কও শীতল হয়, এই উভয় কারণে দার্জ্জিলিংয়ে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা মূর্ত্তিমতী হইয়া দেখা দেয়। কিন্তু এমন নিদ্রাকর স্থানে আসিয়াও দু'এক জনকে নিদ্রার জন্য আক্ষেপ করিতে শুনা যায়। দার্জ্জিলিংয়ে পৌঁছিবামাত্র—১০।১৫ দিন কাহারও কাহারও ভাল ঘুম হয় না, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই এ কষ্ট ঘুচিয়া যায়।

কোন্ ব্যক্তির দার্জ্জিলিং যাওয়া উচিত নহে।

যে সকল ব্যক্তি বা রোগী জল-বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য দার্জ্জিলিংয়ে যাইবেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন।

১। সমতলের বায়ু অবসাদক, পাহাড়ের বায়ু উত্তেজক। সুতরাং চেঞ্জে যাইবার পূর্ব্বে, সুযোগ্য চিকিৎসকের দ্বারা শারীরিক বল পরীক্ষা করান উচিত। যে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল, দেহ কঙ্কাল-সার, তাহাকে কখনও দার্জ্জিলিংয়ে পাঠাইবেন না, পাঠাইলে উপকার ত হইবেই না, বরং এমন অপকারের সম্ভাবনা যে, দেশে ফিরিয়া আসিলে হয়ত তাহার মৃত্যুও ঘটিতে পারে। পর্ব্বতবাসে যে উত্তেজনা জন্মে, রোগীর তাহা সহ্য করিবার শক্তি থাকা চাই।

আমবাত রোগের পর, বসন্ত রোগের পর, কোন কারণে হৃদ্‌পিণ্ডের আকারগত

দোষ জন্মিলে, দার্জ্জিলিং অথবা কোন পার্ব্বত্য প্রদেশে যাওয়া উচিত নহে।

বৃদ্ধাবস্থায়, পুরাতন গ্রহণী বা আমাশয়াদি উদরাময়ে, যকৃৎ প্লীহার অতি বৃদ্ধিতে পুরাতন কাসে, ফুস্ ফুসের যান্ত্রিক বিকারে, দার্জ্জিলিং যাওয়া নিষিদ্ধ।

কাহার পক্ষে দার্জ্জিলিং যাওয়া উচিত ?

সমতল ক্ষেত্রে বাস করিয়া, অধিক পরিশ্রম বা জনতা-বহুল সহরে থাকিয়া শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য ঘটিলে, দার্জ্জিলিং যাওয়া কর্ত্তব্য।

দীর্ঘকালব্যাপী রোগ ভোগের পর শরীর দুর্ব্বল হইলে, 'ম্যালেরিয়া' বিষে রক্ত দূষিত হইলে, শিশুদিগের শরীর পোষণের যে কোন কারণে ব্যাঘাত ঘটিলে, দার্জ্জিলিং যাওয়া কর্ত্তব্য।

অধিক শ্লেষ্মাস্রাব যুক্ত কাস রোগে, ক্ষয় রোগের প্রথমাবস্থায়—পর্ব্বত বাসের মত ঔষধ ও পথ্য আর নাই।

বহুমূত্র রোগে পর্ব্বতবাস বড়ই উপকারী। কিন্তু শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, পর্ব্বতবাস অনুচিত। অন্ততঃ রোগীর দেহে ভ্রমণ করিবার সামর্থ্য থাকা চাই। পর্ব্বতারোহণে ৫।৭ দিনের জন্য প্রস্রাব বাড়িতে পারে, কিন্তু তাহাতে ভয় নাই, উহা স্বাভাবিক।

ম্যালেরিয়া রোগী দার্জ্জিলিংয়ে গেলে, প্রথম প্রথম তাহার ২।৪ বার জ্বর হইতে পারে, সে জন্য ভয় পাইয়া চলিয়া আসিলে চলিবে না। কিছুদিন বাস করিলেই দার্জ্জিলিং বাস স্বর্গবাসে পরিণত হইবে।

শ্বাস রোগে—দার্জ্জিলিং গেলে কাহারও রোগ বাড়ে, কাহারও কমে।

স্থূলকায় ব্যক্তি পাহাড়ে উঠিলে তাহার হৃদ্রোগ হইতে পারে, কিন্তু কিছু দিন পরেই তাহা সারিয়া যায়।

দার্জ্জিলিংয়ে এক প্রকার উদরাময় হইয়া থাকে। ইহার কারণ—সেখানকার জলে এক রকম খনিজ পদার্থ মিশ্রিত থাকিতে দেখা যায়, সেই জল পান করিলে উদরাময় হয়। দার্জ্জিলিং যাত্রীর প্রথমে এই উদরাময় জন্মিতে পারে। কিন্তু পাষ্টারকৃত ফিল্টারের জল ব্যবহার করিলে, উদরাময় সারিয়া যায়। বেলা ৫ টার পর কোন তরল দ্রব্য পান না করিলেও উদরাময় নিবৃত্ত হয়।

দার্জ্জিলিং গিয়া খুব বেড়াইতে হয়। নহিলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় না। তবে ক্ষমতায় অতিরিক্ত পরিশ্রম করা কি বেড়ানো-উচিত নহে।

সারাঘাট হইতে শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত যাইবার সময়—প্রায়ই যাত্রীর নিদ্রাকর্ষণ হইয়া থাকে। নিদ্রা যাইবার সময় গাত্র অনাবৃত রাখা অনুচিত। তাহাতে শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে। তিন্ ধরিয়া ষ্টেশন হইতেই ভাল রকম শীত বস্ত্র ব্যবহার করা উচিত। খুব বলবান ও নীরোগ ব্যক্তিও যেন সোনাদহ ষ্টেশনের পর শীতবস্ত্র ব্যবহার করেন। কোনও রকমে ঠাণ্ডা না লাগে,—এ কথাটী সকলেই স্মরণ রাখিবেন।

দার্জ্জিলিংয়ে বেড়াইবার সময় যেরূপ বস্ত্রাদি ব্যবহার করিবেন, মুক্ত স্থানে বসিয়া থাকিবার সময়, তাহার চেয়ে মোটা কাপড় ব্যবহার করিতে হইবে।

দার্জ্জিলিংয়ে উপস্থিত হইয়াই, ঈষদুষ্ণ জলে বেশ করিয়া স্নান করিবেন, ইহাতে শরীর সুস্থ ও মন প্রফুল্ল হয়।

ডাক্তার শ্রীনগেন্দ্রকুমার দে।
(ক্যাম্বেলের ভূতপূর্ব্ব হাউস্ সার্জ্জন।)

ব্রহ্মচর্য্য ও বিবাহ।

প্রবন্ধ লিখিবার সেই বিগত সুখ শান্তির স্মৃতি হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া তুলে। যাহা গিয়াছে, আর কি তাহা ফিরিয়া আসিবে না?

মনে পড়ে প্রাচীন ভারতের কথা, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কথা, নিবৃত্তি পথ-গত প্রাচীন ভারতবাসীর কথা, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কথা, আর দেশব্যাপী সুখ শান্তির কথা। তখন ধর্ম্ম-নিষ্ঠ সর্ব্বত্যাগী ঋষিগণ সমাজের নিয়ামক ছিলেন, তাঁহাদের উপদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া রাজা দেশ রক্ষা করিতেন, চতুর্ব্বর্ণ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। তখন-রোগ-শোক অকাল মৃত্যুর প্রাদুর্ভাব ছিল না, নিত্য অভাব অনটনে লোকে উৎ-পীড়িত হইত না, প্রবৃত্তি-রাক্ষসীর মোহিনী রূপে মুগ্ধ হইয়া মানব ইহ ও পরলোকে শ্রেয়োলাভে বঞ্চিত হইত না।

মাতৃক্রোড়ে শিশু যেমন স্বচ্ছন্দে থাকে, নিবৃত্তি জননীর ক্রোড়ে থাকিয়া প্রাচীন ভারতবাসীও সেইরূপ স্বচ্ছন্দে জীবন অতি-বাহিত করিত।

প্রাচীন বিজ্ঞান নিবৃত্তিমার্গানুসারী ছিল, নবীন বিজ্ঞান প্রবৃত্তিমার্গানুসারী। এক্ষণে দেখা যাউক—কোন পথ শ্রেষ্ঠ, নিবৃত্তিমার্গ না প্রবৃত্তি মার্গ?

যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের জনক স্বরূপ মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—

ন জাতু কামঃ কাম্যাণা মুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।
যশ্চৈতান্ প্রাপ্নুয়াৎ সর্ব্বান্ যশ্চৈতান্ কেবলং ত্যজেৎ।
প্রাপণাৎ সর্ব্ব কামানাংতেভ্য এব বিশিষ্যতে॥

অনুবাদ—কাম্য দ্রব্যের উপভোগে কামনার শান্তি হয় না। পরন্তু অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে তাহা যেমন প্রবলতর হইয়া উঠে, কাম্য দ্রব্য পাইলে কামনাও সেইরূপ অধিকতর প্রকাশ হয়। যে ব্যক্তি কাম্য দ্রব্য সকল প্রাপ্ত হয়, তাহা অপেক্ষা যে ব্যক্তি কাম্য দ্রব্য সকল ত্যাগ করে সেই শ্রেষ্ঠ।

অপিচ—

ন মাংস ভক্ষণে দোষো ন মদ্যে নচ মৈথুনে।
প্রবৃত্তি রেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলঃ॥

অনুবাদ—মাংস ভক্ষণ, মদ্য পান এবং মৈথুনে কোন দোষ নাই। পরন্তু ভূত (মানব) গণের প্রবৃত্তি এইরূপ (মাংসাদিতে অনুরক্ত)। কিন্তু নিবৃত্তি অর্থাৎ ঐ সকল পরিত্যাগ মহা ফলপ্রদ। সে ফল কি? ইহা ও পরলোকে শ্রেয়োলাভ।

ইহাই প্রাচীন ভারতের মূল মন্ত্র ছিল। আর সেই মন্ত্র বলেই প্রাচীন ভারতবাসী সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করিত। হায়! কুক্ষণে আমরা সে মন্ত্র বিস্মৃত হইয়াছি।

নিবৃত্তি ভোগ বিলাস চায় না, পরিণাম ভয়াবহ বলিয়া ভোগবিলাসকে দূরে রাখিতে চায়। সেইজন্য পূর্ব্বতন মনস্বিগণ এক্ষণ-কার ন্যায় বিবিধ ভোগ-বিলাসের দ্রব্য সৃষ্টি করেন নাই। কিন্তু এক্ষণে অল্প বুদ্ধি মানব-গণ আপাতমধুর প্রবৃত্তির মোহে মুগ্ধ হইয়া বিবিধ বিলাসের দ্রব্য সৃষ্টি করিতেছে, যাহাতে জগৎ হাহাকারে পূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

আধুনিক বিজ্ঞান এক্ষণে যে সকল বিস্ময়কর এবং মনোরম পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছে ও করিতেছে, সে সকলের নিন্দাবাদ করিতেছি বলিয়া অনেকে প্রতিবাদ করিতে পারেন, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত দ্রব্য সকল কি পরিমাণে জগতের হিত বা অহিত সাধন করিতেছে—প্রথমে তাহা দেখা কর্ত্তব্য।

মানুষ চায় কি? মানুষ চায়—সুখ ও শান্তি। এ বিষয়ে বোধ হয় কাহারও মত দ্বৈধ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত পদার্থ সকল জগতের সুখ ও শান্তি কিছু বর্দ্ধিত করিতে পারিয়াছে কি? জরা ও মৃত্যুর প্রভাব কিছু রোধ করিতে পারিয়াছে কি? মানবের জঠর-জ্বালা নিবারণের কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিয়াছে কি?

কেহ বলিতে পারেন যে, আধুনিক বিজ্ঞান দারুণ তৃষ্ণার সময় বরফ দেয়, দারুণ গ্রীষ্মে বৈদ্যুতিক পাখার সাহায্যে গ্রীষ্ম নিবারণ করে, আয়াস গম্য দূর দেশে বিনা আয়াসে সত্বর লইয়া যায়। তবে জগতের সুখ শান্তি কিছু বর্দ্ধিত করে নাই—ইহা কি করিয়া বলিব?

কিন্তু যিনি এরূপ বলেন তিনি ভ্রান্ত। সুখ দ্রব্য-সাপেক্ষ নহে। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে :—

তস্মাৎ দুঃখাত্মকং দ্রব্যং নাস্তি কিঞ্চিৎ সুখাত্মকং।
মনসঃ পরিণামোঽয়ং সুখদুঃখোপলক্ষণঃ॥

সুখ দুঃখ দ্রব্য সাপেক্ষ নহে, উহা কেবল মনের পরিণতি মাত্র। একটা উদাহরণ দ্বারা বুঝান যাইতেছে।

আমরা যে গৃহে যেরূপ শয্যায় শয়ন করি, একজন বৃক্ষতলবাসী ভিক্ষুক যদি সেই শয্যায় শয়ন করে তবে তাহার কতই সুখবোধ হয়। কিন্তু একজন প্রাসাদবাসী মহার্ঘ শয্যায় শয়নে অভ্যস্ত ধনবান যদি সেই শয্যায় শয়ন করে তবে তাহার কতই কষ্ট বোধ হয়। পদার্থ সেই এক শয্যা কিন্তু ব্যক্তি ভেদে সুখ ও দুঃখ অনুভূতি হইয়া থাকে। সুতরাং সুখ ও দুঃখ পদার্থে আছে এরূপ বলা যায় না। সুখ মনে, প্রাচীন যুগে ভারতবাসী নিবৃত্তিমার্গের অনুসরণ করিয়া অনায়াসে সেই মানসিক সুখের অধিকারী হইতেন।

আধুনিক প্রবৃত্তিমার্গানুসারী বিজ্ঞান দ্রব্য সংযোগে সুখোৎপাদনের যতই চেষ্টা করিতেছে, লব্ধেন্ধন অগ্নির ন্যায় ততই প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে। বাষ্পীয় শকটের দ্রুত গমন এক্ষণে আর আমাদের সন্তুষ্ট করিতে পারে না, আমরা আরও দ্রুতগামী যান আকাঙ্ক্ষা করি। বৈদ্যুতিক পাখা সঞ্চালিত বায়ু, বরফ, লেমনেড প্রভৃতিতে আমরা অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। অভ্যস্ত দ্রব্য সুখকর হয় না, কিন্তু তাহার অভাব দুঃখপ্রদ। প্রবৃত্তি অনাবশ্যক অসংখ্য বিলাসিতার উপকরণ সৃষ্টি করিয়া মানব-জাতিকে তাহাতে এমন অভ্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে যে, তাহাদের সংযোগে সুখ না হউক—অভাবে দুঃখ হইয়া থাকে। এইরূপে প্রবৃত্তি ক্রমশঃ বিলাসিতা ও তৎসহচর রোগ এবং অভাব, অনটন ও দুঃখের সৃষ্টি করিয়া মানব জাতির ঘোরতর অসুখ ও অশান্তি উৎপাদন করিয়াছে। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে,—

সর্ব্বং আত্মবশং সুখং সর্ব্বং পরবশং দুখম্।

এই মহাবাক্য বিস্মৃত হইয়াই আমরা দুঃখভোগ করিতেছি। ভ্রমণে, আহারে, শয়নে, বিলাসে মানব এক্ষণে নিতান্ত পরবশ। এই পরবশতা এক্ষণে কেবল ব্যক্তিগত নহে পরন্তু জাতিগত ও দেশগত হইয়া পড়িয়াছে।

মানব সমাজে শত অভাব অনটনের সৃষ্টি করিয়াই প্রবৃত্তি ক্ষান্ত হয় নাই। সুখ শান্তি বৃদ্ধির আশায়, রাজ্য রক্ষার আশায় কুহকিনী প্রবৃত্তি পাশ্চাত্য জাতিকে জল স্থল ও আকাশচারী অসংখ্য রণ সম্ভার নির্ম্মাণ করিতে প্ররোচিত করিয়াছিল। পাশ্চাত্য জাতি কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয়ে তাহা সুসম্পন্ন করিয়াছিল। কিন্তু আজ তাহার ভীষণ পরিণাম দেখুন। হিতের চেষ্টায় তাহারা যাহা করিয়াছিল, আজ তাহা দ্বারা কি অহিতই না সঙ্ঘটিত হইতেছে। দেশের পর দেশ, গ্রামের পর গ্রাম ছারখার হইয়া যাইতেছে। কত ধর্ম্মমন্দির, পুস্তকাগার কল কারখানা ভূমিসাৎ হইতেছে। এই ভীষণ বিপ্লবে সমগ্র য়ুরোপ মহাদেশ বিধ্বস্ত এবং বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ভবিষ্যতে আরও কি ঘটিবে তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু এই লোক-ক্ষয়কর মহান অনর্থের মূল কে? মূল প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তি মূলক অযথা রাজ্যলিপ্সা এবং অসংখ্য রণসম্ভার নির্ম্মাণের ইহা অবশ্যম্ভাবী ফল।

রাজা দুর্য্যোধনের প্রবৃত্তি মূলক অযথা রাজ্য লিপ্সার ফলে ভারতেও এইরূপ কুরুক্ষেত্রের লোক-ক্ষয়কর মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।

প্রবৃত্তি মানুষকে স্বার্থপর করে, নিবৃত্তি স্বার্থত্যাগ করিতে শিখায়। প্রবৃত্তির দাস আমরা এতই স্বার্থপর হইয়া পড়িয়াছি যে, গৃহপার্শ্বে দরিদ্র ভিক্ষুককে এক মুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত দেখিয়াও অক্লেশে বিবিধ সুখাদ্য আহার করিতে পারি। প্রতিবাসীর ঘোরতর অর্থকষ্ট উপেক্ষা করিয়া অনায়াসে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিতে পারি। ইহার ফলে জগতে স্বল্প সংখ্যক মানব প্রচুর বিভবশালী হইয়া, বিলাসিতায় লক্ষ লক্ষ মুদ্রা অপব্যয় করিতেছে, আর অপর দিকে অধিক সংখ্যক মানব অশন-বসন আবাসের অভাবে দারুণ কষ্ট পাইতেছে।

প্রবৃত্তি মূলক বিলাসিতার সহিত মানব সমাজে বিদ্যারও লাঘব ঘটিয়াছে। ব্যাস, বাল্মীকী, কালিদাস, বরাহমিহির, গ্যালিলিও, সক্রোটিস, হোমার, নিউটন, সেক্সপীয়র এখন আর জন্মগ্রহণ করেন না। আড়ম্বরহীন থাকের কলম আর ভূর্জ্জপত্রই বোধ হয় ভারতীর প্রিয়। তাই আজ ষোড়শ মুদ্রা মূল্যের ফাউণ্টেন পেন এবং চিত্র বিচিত্র কাগজ দেখিয়া তিনিও ক্রমশঃ অন্তর্হিতা হইয়াছেন।

বাহুল্য ভয়ে আমরা এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা করিলামনা। ফলতঃ নিবৃত্তি মৃৎপাত্রে গঙ্গোদক, প্রবৃত্তি স্বর্ণপাত্রে কূপোদক, নিবৃত্তি হীন দীনবেশে সুখ ও শান্তি, প্রবৃত্তি মনোহর বেশে অসুখ ও অশান্তি। নিবৃত্তি পয়োকুম্ভ বিষমুখ, প্রবৃত্তি বিষকুম্ভ পয়োমুখ, নিবৃত্তি করুণাময়ী জননী; প্রবৃত্তি মনোহারিণী রাক্ষসী।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মনুষ্য প্রবৃত্তির পথেই যাইতে চায়, কিন্তু নিবৃত্তি মহাফল প্রদ। তবে কি উপায়ে প্রাচীন ভারতবাসী প্রবৃত্তির কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া

নিবৃত্তির সেবা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন? কিরূপ শিক্ষার বলে ঋষিগণ ভারতবাসীকে প্রবৃত্তিমূলক বিলাসিতা হইতে দূরে রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন? কোন্ দীক্ষার বলে ভারতবাসী শত সহস্র অনাবশ্যক বিলাসিতার দ্রব্য নির্ম্মাণ করিয়া দেশব্যাপী অভাব অনটনের সৃষ্টি করে? ইহার একমাত্র উত্তর ব্রহ্মচর্য্য।

খনিতে স্বর্ণ উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাহা ভূষণ বলিয়া পরিগণিত হয় না। প্রথমে তাহাকে মল ভাগ হইতে বিযুক্ত করিতে হয়, পরে গলাইয়া আবশ্যক মত আকৃতি বিশিষ্ট করিতে হয়, তা'র পর তাহাতে কারুকার্য্য করিতে হয়। তবে সেই স্বর্ণ—অলঙ্কার বলিয়া পরিগণিত হয়। স্বর্ণপ্রসূ ভারতের সেই সোনার মানুষ বাল্যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে এইরূপে পরিবর্ত্তিত ও গঠিত হইয়া মানব সমাজে শোভন অলঙ্কাররূপে শোভা পাইত।

বাল্যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে থাকিয়াই ভারতবাসীর মন ও চরিত্র গঠিত হইত। ইহাতে তাহাদিগের দেহ ক্লেশসহিষ্ণু, দৃঢ়, কর্ম্মঠ, রোগহীন ও অকাল-বার্দ্ধক্য-বর্জ্জিত হইত এবং পরমায়ু দীর্ঘ হইত। মন—নিবৃত্তি-প্রিয়, পরদুঃখ-কাতর, সুখে বিগতস্পৃহ, দুঃখে অনুদ্বিগ্ন, কামক্রোধাদি রহিত, প্রশান্ত ও উদার হইত। ব্রহ্মচর্য্য ভারতের প্রাণ ছিল, ভারতের উন্নতির মূল ছিল, ভারতের সুখশান্তির হেতুভূত ছিল। ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত চিত্তস্থির হয় না এবং চিত্তের স্থিরতা ব্যতীত ধী, ধৈর্য্য ও আত্মজ্ঞান সম্যকরূপে জন্মিতে পারেনা। ভারতের চির আদৃত সেই ব্রহ্মচর্য্য বিসর্জ্জন দিয়াই আমাদের এতদূর শারীরিক ও মানসিক অধঃপতন ঘটিয়াছে।

নিবৃত্তিমার্গাশ্রয় ব্যতীত জগতে সুখশান্তি লাভ করা যায়না, আর ব্রহ্মচর্য্য ভিন্ন নিবৃত্তি-মার্গের অনুসরণ করিবার উপযুক্ত মানসিক বল জন্মিতে পারেনা। সেই জন্য সুখ-শান্তি লাভ করিতে হইলে ব্রহ্মচর্য্য পালন নিতান্ত আবশ্যক।

এক্ষণে ব্রহ্মচর্য্য কিরূপে পালন করিতে হয় তাহাই বলিব।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মচর্য্য একটী আশ্রম। আর্য্য শাস্ত্রমতে আশ্রম চারিটী, যথা—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, গার্হস্থ্যাশ্রম, বাণপ্রস্থাশ্রম এবং সন্ন্যাসাশ্রম। উপনয়নের পরে গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া বেদাধ্যয়ন করার নাম ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। ইহা দুই প্রকার যথা, উপকুর্ব্বান এবং নৈষ্টিক। দুই প্রকার ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের নিয়ম একই। প্রভেদ এই যে, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের শেষে বিবাহ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলে তাহাকে উপকুর্ব্বাণ বলে। আর যাবজ্জীবন গুরুগৃহে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিলে তাহাকে নৈষ্টিক বলে।

কেবল ব্রাহ্মণগণই যে এই আশ্রমের অধিকারী তাহা নহে। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, গার্হস্থ্যাশ্রম এবং বাণপ্রস্থ আশ্রমের অধিকারী। কেবল সন্ন্যাসাশ্রমে একমাত্র ব্রাহ্মণেরই অধিকার। কিন্তু মতান্তরে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যেরও সন্ন্যাসাশ্রমে অধিকার আছে এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। রঘুবংশে "স কিলা শ্রমমন্ত্যমাশ্রিতঃ" অর্থাৎ তিনি (রঘু) অন্ত্য আশ্রম (সন্ন্যাস আশ্রম) করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলেই যে ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ করিতে হইবে তাহা নহে। ভগবান মনু বলিয়াছেন—

বেদান অধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমম্।

অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যোব গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ ॥

অনুবাদ—সমস্ত বেদ, দুই বেদ বা এক বেদ অধ্যয়ন করিয়া—ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম পালন করিয়া গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিবে।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে যে সকল নিয়ম পালন করিতে হয়, গৃহস্থাশ্রমে তাহা পালন করা চলে না। কারণ গৃহীর পক্ষে অপত্যোৎপাদন, জীবিকা অর্জ্জন প্রভৃতি করিতে হয়। তবে এস্থলে ব্রহ্মচর্য্য শব্দের অর্থ কি? আয়ুর্ব্বেদেও কথিত হইয়াছে যে "ব্রহ্মচর্য্য মায়ুষ্যকরাণাং" অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য আয়ুষ্যকর পদার্থ সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অপিচ শরীর ধারণের উপায় তিনটী, যথা আহার, নিদ্রা ও ব্রহ্মচর্য্য। আয়ুর্ব্বেদ সর্ব্বসাধারণের জন্য। সুতরাং এখানেও ব্রহ্মচর্য্য অর্থে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে পালনীয় ব্রহ্মচর্য্য হইতে পারে না। তবে এ ব্রহ্মচর্য্য কি?

এক কথায় বলিতে গেলে এই ব্রহ্মচর্য্য-নিবৃত্তি মার্গের আশ্রয় গ্রহণ করা। হিন্দু বিধবারা যেরূপ সংযত ভাবে থাকেন, তাহাও এই ব্রহ্মচর্য্যের অন্তর্ভুক্ত। মদ্য, মাংস, মৈথুনপরিত্যাগ, ক্রোধ-লোভাদি পরিত্যাগ, সর্ব্বভূতে দয়া প্রভৃতি এই ব্রহ্মচর্য্যে পালন করিতে হয়। অনুসন্ধিৎসু পাঠক মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায় পাঠ করিলে গৃহস্থাশ্রমে কিরূপ নিয়ম পালন করিতে হয়, তাহা অবগত হইতে পারিবেন।

গৃহস্থের পক্ষে পুত্রোৎপাদন যখন কর্ত্তব্য, তখন মৈথুন-পরিত্যাগ করা কিরূপে সঙ্গত? পরিত্যাগ অর্থে এক্ষণে অতিরিক্ত সংযতভাব বুঝিতে হইবে। তাহা একতণ্ডুলন্যায়ে একটী তণ্ডুল আহার করিলে যেমন সে ব্যক্তি আহার করিয়াছে বলা যায় না, সেইরূপ পরিত্যাগের মধ্যে গণ্য। এ বিষয়ে নিবৃত্তি এতদূর প্রবলা হইয়া উঠিয়াছিল যে, শাস্ত্রকার নিম্নলিখিত আইন জারী করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যথা:—

ঋতুমতীন্তু যো ভার্য্যাং সন্নিধৌ নোপসর্পতি।

অবাপ্নোতি স মন্দাত্মা ভ্রূণহত্যা মৃতাবুতৌ॥

অনুবাদ—ভার্য্যার ঋতুকালে নিকটে থাকিয়াও যে ব্যক্তি ভার্য্যাতে উপগত হয় না, ঋতুকাল শেষ হইলে সে ব্যক্তি ভ্রূণহত্যার পাতক গ্রস্ত হয়।

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, প্রবৃত্তিমূলক বিলাসিতার ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার অভাবে ফরাসী দেশের অনেকে বিবাহ করে না। এই জন্য পাছে লোক সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পায় বলিয়া ফরাসী গবর্ণমেণ্ট অবিবাহিত ব্যক্তিগণের উপর করস্থাপন করিয়া তাহাদিগকে বিবাহিত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। আর আমাদের নিবৃত্তির দেশে ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ জিতেন্দ্রিয় পুরুষগণ পাছে পত্নীতে উপগত না হইয়া পুত্রোৎপাদন করিতে না থাকে সেই ভয়ে এইরূপ ধর্ম্মমূলক আইন রাখিতে হইয়াছে। এইরূপ নিবৃত্তি সম্বন্ধে অনেক কথা পুরাণাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। অগস্ত্য, জরৎকারু প্রভৃতি মুনিগণ পুত্রোৎপাদনে পরাঙ্মুখ ছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগের পিতৃপুরুষদিগকে গর্ত্তমধ্যে হেঁটমুণ্ডে লম্বমান থাকিতে হইয়াছিল। সেই সকল পিতৃপুরুষকে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহারা বিবাহ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পত্নীর গর্ভাধান করিয়াই তাহার সঙ্গ বর্জ্জন করিয়াছিলেন।

এ সম্বন্ধে একটী নাতি প্রাচীন [illegible]

উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ভামতী নামক ভাষ্যকার বাচস্পতিমিশ্র বাল্যকালে—বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিবাহের পরে গুরুগৃহে বাস করেন এবং বিবাহ সম্বন্ধে কোন চিন্তাই তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। প্রৌঢ় বয়সে তিনি স্বগৃহে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার স্ত্রী স্বামি-ভবনে বাস করিতেন, গৃহ কার্য্য করিতেন, রন্ধন করিতেন, কিন্তু স্বইচ্ছায় স্বামীকে দর্শন দিতেন না। বাচস্পতি মিশ্র মনে করিতেন যে, তাঁহার শিষ্যেরাই রন্ধনাদি করিয়া থাকে শিষ্যেরাও তাঁহাকে তাঁহার স্ত্রী সম্বন্ধে কোন কথা বলিত না। এইরূপে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইল। ভামতী অন্তরাল হইতে স্বামীকে দেখিয়া এবং তাঁহার অধ্যাপনা শুনিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন। ঘটনাক্রমে একদিন সমস্ত ছাত্র অন্যত্র গিয়াছিল। বাচস্পতি স্বয়ং রন্ধন করিয়া আহার করিতে হইবে বিবেচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু যথা সময়ে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, অন্ন প্রস্তুত রহিয়াছে। তখন তিনি আপনার মনে বলিলেন,—এই অন্ন কেরন্ধন করিয়াছে না জানিলে আমি আহার করিতে পারিব না। তাঁহার স্ত্রী এই কথা শুনিয়া তাঁহার সমীপে আগমন পূর্ব্বক স্বামীকে প্রণাম করিলেন। বাচস্পতি জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে? ভামতী কহিলেন আপনার দাসী, পরিণীতা পত্নী। তখন বাচস্পতি বিস্মিত হইয়া কহিলেন, দেবি! আমি তোমাকে বিস্মৃত হইয়া বড়ই কুকার্য্য করিয়াছি। এক্ষণে তোমার কি প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিব বল। ভামতী আকার ইঙ্গিতে অপত্য কামনা করিলেন। বাচস্পতি বলিলেন, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, পুত্রোৎপাদনের কাল অতীত হইয়াছে। তবে লোকে খ্যাতির জন্য পুত্র কামনা করে। আমি তোমার নামে যে টীকা রচনা করিব—তাহাতে তোমার খ্যাতি তাহাতেই বহুদিন স্থায়ী হইবে। হায়! সেই নিবৃত্তির দেশে আজ প্রবৃত্তির কি ভীষণ তাণ্ডব নৃত্য!

যে বর্ণের যে প্রকার কর্ম্ম, সূত্র, দণ্ড, মেখলা ও বসন উপনয়নকালে ধারণ করিতে হয়, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে তাহাই পালন করিতে হয়। ব্রহ্মচারী গুরুর নিকটে বাস করিয়া স্বীয় তপস্যার বৃদ্ধির জন্য এই সকল নিয়মের অনুষ্ঠান করিবে। প্রতিদিন প্রাতে স্নান করিয়া, শুচি হইয়া, দেবতা, ঋষি ও পিতৃদিগের তর্পণ করিবে, দেবতাদিগের পূজা করিবে এবং সায়ং-প্রাতে সমিধের দ্বারা হোম করিবে। মধু, মাংস, কর্পূরাদি গন্ধদ্রব্য, ও মাল্য পরিত্যাগ করিবে, গুড়াদি আহার করিবে না, স্ত্রী সংসর্গ করিবে না, শুক্ত (মধুর দ্রব্য ও জল-সংযোগে প্রস্তুত অম্লরস যুক্ত তরল পদার্থ) সেবন করিবেনা এবং প্রাণী হিংসা করিবে না। শরীরে তৈল মর্দ্দন করিবে না, চক্ষুতে অঞ্জন (কাজল) পরিবেনা, চর্ম্মপাদুকা ও ছত্র ব্যবহার করিবেনা, কাম (বিষয়াভিলাষ, ভোগেচ্ছা), ক্রোধ, লোভ, নৃত্য-গীত-বাদ্য পরিত্যাগ করিবে। দ্যূত (অক্ষক্রীড়াদি ব্যসন), লোকের সহিত অকারণ-কলহ, পরের দোষের বিষয় কথন, মিথ্যা বাক্য, কামভাবে স্ত্রীলোক দর্শন বা আলিঙ্গন এবং পরের অনিষ্টাচরণ হইতে বিরত থাকিবে। নিম্ন শয্যায় একাকী শয়ন করিবে, কদাচ ইচ্ছাপূর্ব্বক শুক্রপাত করিবে না। কারণ ইচ্ছাপূর্ব্বক শুক্রপাত করিলে স্বকীয় ব্রত নষ্ট

হইয়া যায়। অকাম ব্রহ্মচারীর স্বপ্নে বা অনিচ্ছায় রেতঃপাত হইলে স্নান করিয়া সূর্য্যের অর্চ্চনা করিবে এবং "পুনর্ম্মাম্ এতু ইন্দ্রিয়ং" এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে। জল, কলস, পুষ্প, গোময় ও মৃত্তিকা যত প্রয়োজন হয় গুরুকে সংগ্রহ করিয়া দিবে, গুরুর অন্যান্য যে দ্রব্য প্রয়োজন হয় তাহাও সংগ্রহ করিয়া দিবে এবং নিত্য ভিক্ষা করিয়া অন্ন সংগ্রহ করিবে। যে সকল গৃহস্থ বেদবিহিত যজ্ঞাদি করিয়া থাকেন এবং সর্ব্বদা আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, এইরূপ গৃহস্থের নিকট হইতে ব্রহ্মচারী প্রতিদিন পবিত্রভাবে সিদ্ধান্ন ভিক্ষা করিবে। গুরুকুলে, জ্ঞাতিকুলে ও বন্ধুকুলে ভিক্ষা করিবে না। অন্য গৃহের অভাবে প্রথমে বন্ধুকুলে, তদভাবে জ্ঞাতিকুলে এবং তদভাবে গুরুকুলে ভিক্ষা করিবে। পূর্ব্ব কথিত গুণ-সম্পন্ন গৃহস্থ না পাইলে শুচি ও মৌনী হইয়া সমস্ত গ্রামে ভিক্ষা করিবে। কিন্তু মহাপাতকগ্রস্ত গৃহস্থকে পরিত্যাগ করিবে। ব্রহ্মচারী দূরস্থিত বৃক্ষ হইতে সমিধ আহরণ করিয়া কুটীরের চালে অথবা কোন আবৃত স্থানে রাখিবে এবং সেই সমিধ দ্বারা নিরলস ভাবে সায়ং-প্রাতে হোম করিবে। রোগশূন্য ব্রহ্মচারী ক্রমাগত সপ্তদিন ভিক্ষান্ন আহার এবং সমিধের দ্বারা হোম না করিলে তাহার ব্রত নষ্ট হয় ও তজ্জন্য অবকীর্ণি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ব্রহ্মচারী ভিক্ষান্ন একজনের নিকট না লইয়া বহু লোকের গৃহ হইতে সংগ্রহ করিবে। কারণ এইরূপ ভিক্ষা-সমূহ দ্বারা ও সংগৃহীত ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবন ধারণ করাকে মহর্ষিগণ উপবাসের তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু ব্রহ্মচারী দেবতার উদ্দেশে অথবা পিতৃ উদ্দেশে শ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধকর্ত্তা-কর্ত্তৃক আহূত হইয়া যদি সেই একজনের নিকট হইতে মধুমাংসাদি বর্জ্জিত অন্ন আবশ্যকমত সংগ্রহ করেন, তাহা হইলে ব্রত লোপ হয় না। তবে কেবল ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচারীর পক্ষেই এই বিধি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য ব্রহ্মচারীর পক্ষে একজনের অন্ন ভোজন করা বিহিত নহে। গুরু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া অথবা আদিষ্ট না হইলেও স্বয়ং ইচ্ছা পূর্ব্বক নিত্য অধ্যয়নে এবং গুরুর হিত সাধনে যত্নবান হইবে। শরীর, বাক্য, বুদ্ধি ও মন সংযত করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া গুরুর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দণ্ডায়মান থাকিবে, গুরুর অনুমতি ব্যতীত উপবেশন করিবেনা। সদাচারসম্পন্ন শিষ্য উত্তরীয় দ্বারা শরীর আচ্ছাদিত করিয়া দক্ষিণ হস্ত বহিস্কৃত রাখিবেন এবং গুরু "উপবেশন কর" বলিলে উপবেশন করিবেন। গুরুর নিকটে গুরু যেরূপ বস্ত্র পরিধান ও অন্ন আহার করেন, তাহা অপেক্ষা হীনবস্ত্র পরিধান ও হীন অন্ন আহার করিবে। রাত্রিশেষে গুরু শয্যা হইতে উঠিবার পূর্ব্বে—উঠিতে হইবে এবং রাত্রিতে গুরু শয়ন করিবার পরে শয়ন করিবে। শয়ন করিয়া, উপবেশন করিয়া, আহার করিতে করিতে অথবা গুরুর দিকে মুখ না রাখিয়া দণ্ডায়মান অবস্থায় গুরুর আজ্ঞা শ্রবণ বা গুরুকে সম্ভাষণ করিবেনা। গুরু আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া আজ্ঞা করিলে, শিষ্য দণ্ডায়মান হইয়া, গুরু দণ্ডায়মান থাকিয়া আজ্ঞা করিলে, শিষ্য গুরুর দিকে কয়েকপদ গিয়া, গুরু আগমন করিতে করিতে আজ্ঞা করিলে, শিষ্য তাঁহার অভিমুখে

যাইয়া, গুরু বেগে গমন করিতে করিতে আজ্ঞা করিলে, শিষ্য তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান্ হইয়া, গুরুর আদেশ গ্রহণ করিবে এবং তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিবে। গুরু অন্য দিকে মুখ রাখিয়া আদেশ করিলে, শিষ্য তাঁহার সম্মুখে গিয়া, গুরু দূরে থাকিয়া আদেশ করিলে, শিষ্য প্রণত হইয়া, গুরু নিকটে থাকিয়া আদেশ করিলে শিষ্য অবনতভাবে আজ্ঞা শ্রবণ করিবে এবং সম্ভাষণ করিবে। গুরুর নিকটে তাঁহার আসন ও শয্যা অপেক্ষা নিম্নস্তর আসন গ্রহণ করিবে। গুরুর দৃষ্টির সম্মুখে কখন হস্তপদ বিস্তার করিয়া যথেষ্ট ভাবে অবস্থান করিবেনা। শিষ্য অন্যের নিকটেও গুরুর নামের পূর্ব্বে—আচার্য্য বা উপাধ্যায় না বলিয়া কেবল গুরুর নাম উচ্চারণ করিবে না এবং গুরুর গতি, হাস্য বা চেষ্টার অনুকরণ করিবেনা। যেখানে গুরুর পরীবাদ (বিদ্যমান দোষের বর্ণন) অথবা নিন্দা (অবিদ্যমান দোষের কথন) হয়, শিষ্য সেই স্থান হইতে চলিয়া যাইবে বা হস্ত দ্বারা কর্ণ আচ্ছাদন করিবে। শিষ্য গুরুর পরীবাদ করিলে গর্দ্দভযোনি, নিন্দা করিলে কুক্কুরযোনি, অন্যথারূপে গুরুধন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিলে কৃমি যোনি এবং গুরুর প্রশংসা সহ্য করিতে না পারিলে কীট যোনি প্রাপ্ত হয়। শিষ্য স্বয়ং গমনে আশক্ত না হইলে অন্যের হস্তে মাল্য-চন্দনাদি পাঠাইয়া গুরুর অর্চ্চনা করিবেনা, ক্রুদ্ধ হইয়া গুরুর অর্চ্চনা করিবে না, গুরু স্ত্রীলোকের নিকট—থাকিলে গুরুর অর্চ্চনা করিবে না এবং শিষ্য যান বা আসনে উপবিষ্ট থাকিলে তথা হইতে অবতরণ করিয়া গুরুর অর্চ্চনা করিবে। যে ভাবে উপবেশন করিলে বায়ু গুরুর দিকে যায় তাহাকে প্রতিবাত এবং যে ভাবে উপবেশন করিলে বায়ু শিষ্যের দিক হইতে গুরুর দিকে যায় তাহাকে অনুবাত বলে। এইরূপ প্রতিবাত বা অনুবাত ভাবে গুরুর সহিত উপবেশন করিবে না। শিষ্য গোযান্ অশ্বযান, বা উষ্ট্রযানে, প্রাসাদের উপরে, দীর্ঘ আসনে, তৃণ নির্ম্মিত আসনে, শিলাতলে, কাষ্ঠময় দীর্ঘ আসনে এবং নৌকায় গুরুর সহিত উপবেশন করিতে পারে। গুরুর গুরুর নিকটে গুরুর ন্যায় ব্যবহার করিবে। গুরুর গৃহে অবস্থান কালে পিতা, পিতৃব্য প্রভৃতি গুরুজনকে গুরুর অনুমতি ব্যতিরেকে অভিবাদন করিবে না। উপাধ্যায়াদি বিদ্যাদাতা গুরু দিগকে, পিতৃব্যদিগকে অধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে নিষেধকারককে এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানে উপদেশদাতাকে গুরুর ন্যায় ব্যবহার করিবে। বিদ্যা ও তপঃসম্পন্ন ব্যক্তিকে, শিষ্য ভিন্ন বয়োজ্যেষ্ঠ স্ববর্ণ ব্যক্তিকে, গুরু-পুত্রকে এবং গুরুর পিতৃব্যাদি জ্ঞাতিকে গুরুর ন্যায় সম্মান করিবে। কনিষ্ঠই হউন, সমান বয়স্কই হউন বা জ্যেষ্ঠই হউন, গুরু-পুত্র বেদজ্ঞ হইলে, যজ্ঞ ক্রিয়ায় অধিকারী; কিন্তু গুরুপুত্র যজ্ঞ কার্য্যে নিযুক্ত হউন বা না হউন গুরুর ন্যায় সম্মানিত হইবেন। গুরুপুত্রের গাত্রে বিলেপন প্রদান, স্নান করান, গুরুপুত্রের উচ্ছিষ্ট ভোজন বা পদ প্রক্ষালন করিবে না। গুরুর সবর্ণা স্ত্রী গুরুর ন্যায় পূজনীয়া কিন্তু অসবর্ণা স্ত্রী কেবল প্রত্যুত্থান এবং অভিবাদন দ্বারা পূজনীয়া। গুরুপত্নীর গাত্রে তৈলাদি মর্দ্দন করিবে না, তাঁহাকে স্নান করাইবে না, গাত্রে সুগন্ধ লেপন করিবে না এবং তাঁহার কেশ [illegible]

করিয়া দিবে না, বিংশতি বর্ষ বয়স্ক যুবক-শিষ্য যুবতী-গুরুপত্নীর পাদগ্রহণ পূর্ব্বক অভিবাদন না করিয়া কেবল ভূমিতেই অভিবাদন করিবে। কিন্তু বালক শিষ্য যুবতী-গুরুপত্নীর পদ গ্রহণ পূর্ব্বক অভিবাদন করিতে পারে। স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃই মনুষ্যদিগকে দূষিত করিয়া থাকে। সুতরাং স্ত্রীলোক সম্বন্ধে পণ্ডিত ব্যক্তির বিশেষ সাবধান থাকা কর্ত্তব্য। অবিদ্বান ব্যক্তি বা বিদ্বান ব্যক্তি (আমি জিতেন্দ্রিয় মনে করিয়া) কেহই স্ত্রীলোকের নিকট অবস্থান করিবে না। কারণ দেহধর্ম্মবশতঃ কাম, ক্রোধ-যুক্ত পুরুষকে রমণীরা অনায়াসেই বিপথগামী করিতে পারে। মাতা, ভগিনী বা কন্যার সহিতও নির্জ্জন গৃহে বাস করিবে না। কারণ বলবান ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্বান ব্যক্তিকেও কুপথগামী করিতে পারে। যুবা শিষ্য যুবতী গুরুপত্নীর পাদগ্রহণ না করিয়া "আমি অমুক" এই বলিয়া ভূমিতে যথাবিধি অভিবাদন করিবে। যুবা-শিষ্য বিদেশ হইতে সমাগত হইলে শিষ্টাচার স্মরণ করিয়া প্রথম দিন বয়োধিকা গুরুপত্নীর বামহস্তে বামপদ এবং দক্ষিণ হস্তে দক্ষিণ পদ গ্রহণ করিবে। কিন্তু তাহার পর প্রতিদিন ভূমিতে অভিবাদন করিবে।

(আগামী বারে সমাপ্য)

ঘৃত।

:০:

ঘৃত ভারতবাসীর প্রধান খাদ্য। পণ্ডিতেরা ঘৃতহীন ভোজনকে উপযুক্ত ভোজন বলিয়া স্বীকার করেন না। অনেকস্থলে ঘৃতহীন-ভোজনকে বারিহীন নদী প্রভৃতি অনুপযোগী পদার্থের সহিত তুলনা করিয়াছেন। ঘৃত শ্রেষ্ঠ পুষ্টিকর ও বলবর্দ্ধক খাদ্য। অধিক পরিমাণে খাইলে মেদো বৃদ্ধি হয়।

সাধারণতঃ দুই প্রকার ঘৃতের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। মাহিষ ঘৃত ও গব্য ঘৃত। মাহিষ ঘৃত, গব্য ঘৃত অপেক্ষা অধিকতর শুভ্র, এবং ইহাতে দ্রবনীয় এসিড্ অপেক্ষাকৃত অধিক, অর্থাৎ ৫ গ্রাম মাহিষ ঘৃতে সাধারণতঃ ৩৪ কিউবিক সেন্টিমিটর এসিড্ পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ পরিমাণ গব্য ঘৃতে এসিডের পরিমাণ ৩২ কিউবিক সেণ্টিমিটার মাত্র। গব্য ঘৃত অতি সদ্‌গন্ধযুক্ত।

ঘৃত নানা প্রকারে ব্যবহার করা হয়। লুচি, কচুরি, গজা, মিঠাই প্রভৃতি খাবার প্রস্তুতের জন্য ঘৃত ব্যবহার হয়। ডাল, তরকারি প্রভৃতি রন্ধনের জন্য ঘৃত ব্যবহার হয়। রুটিতে ঘৃত মাখান হয়। ভাতের সহিত ঘি ব্যবহার হয়। হোম, যাগ প্রভৃতি দেবার্চ্চন ক্রিয়ার জন্য ঘৃত ব্যবহার হয়। দেবার্চ্চন ক্রিয়ার জন্য কেবল বিশুদ্ধ গব্যঘৃত ব্যবহার হয়। অন্যোষ্টি ক্রিয়ার জন্যও ঘৃত ব্যবহার হয়। পুরাতন গব্য ঘৃত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হয়। দশবর্ষাধিককাল [illegible]

পুরাণ ঘৃত বলে। ঔষধার্থে ঘৃত যত অধিক পুরাতন হয়, ততই উহার গুণাধিক্য হয়।

অধুনা ঘৃত প্রস্তুতকরণের জন্য দুই প্রকার উপায় অবলম্বন করা হয়। প্রথম দধি হইতে, দ্বিতীয় কাঁচা দুধ হইতে। সাধারণতঃ দধিতে জলমিশ্রিত করিয়া মন্থন করিলে মাখন বাহির হইয়া উপরে ভাসিতে থাকে। পরে ঐ মাখন তুলিয়া লইয়া একটী পাত্রে সংগ্রহ করিতে হয়। এইরূপে সংগৃহীত মাখন লৌহ-কটাহে করিয়া অগ্নিতে পাক করিতে হয়। মাখন তুলিয়া লইয়া যে তরল অংশ অবশিষ্ট থাকে তাহাকে তক্র বা ঘোল বলে। প্রথমতঃ অগ্নির তাপে মাখন গলিয়া গিয়া ছানার অংশ ও জল কটাহের তলদেশে পতিত হয়। পরে ক্রমশঃ অধিক তাপযোগে জল বাষ্পাকারে পরিণত হয় এবং ছানার অংশগুলি খাঁকৃরিরূপে পরিণত হয়। পরে ঘৃত ছাঁকিয়া লইয়া খাঁকৃরি ফেলিয়া দেওয়া হয়। ইহাকে পাকা ঘি বলে। কাঁচা ঘৃতের জল বাষ্পাকারে পরিণত করা হয় না এবং ঘৃতেও প্রখর তাপ প্রয়োগ করা হয় না। পাকা ঘি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। ইহা যে কেবল খাবার প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার হয় তাহা নহে, অন্ন বা অন্যান্য খাদ্যে মাখিয়াও খাওয়া হয়।

কাঁচা ঘি খাবার প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার হয়। যদি কাঁচা ঘি ক্রয় করা হয় ও উহা ভোজনকালে ভাতে বা রুটিতে মাখিয়া খাইবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে উহা লৌহ পাত্রে উত্তপ্ত করিয়া লইলে পাকা হয়।

ঘৃত প্রস্তুত করণের দ্বিতীয় উপায়ে দধি না করিয়া কাঁচা দুধ হইতে মন্থন করিয়া মাখন উঠাইয়া ঐ মাখনের ঘৃত প্রস্তুত হয়। গোয়ালারা সাধারণতঃ এই উপায় অবলম্বন করে। তাহারা কাঁচা দুধ মন্থন করিয়া কিয়ৎপরিমাণ মাখন তুলিয়া লইয়া অবশিষ্ট অংশ দুধ বলিয়া বিক্রয় করে। মাহিষ দুগ্ধে ঘৃত অধিক, সেইজন্য মাহিষ ঘৃত সাধারণতঃ এইরূপে প্রস্তুত হয়। বাজারের অধিকাংশ দুগ্ধই মাখন তোলা দুধ।

বাজারে যে সুলভ মূল্যের ঘৃত বিক্রয় হয়, উহা সাধারণতঃ ভেজাল বা অন্য দ্রব্য মিশ্রিত। ঘৃতে সচরাচর মাটকলাই বা চীনাবাদামের তৈল, বসা, মৌয়া তৈলের ভেজাল দেওয়া হয়। মাট কলাইয়ের তৈলে এক প্রকার গন্ধ পাওয়া যায়, মৌয়া তৈলের কিয়দংশ জমাট ও কিয়দংশ তরল, বসা ঠিক ঘৃতের মত, দেখিয়া প্রভেদ বুঝা যায় না, তবে আপেক্ষিক গুরুত্ব অধিক। এতদ্ব্যতীত নারিকেল, পোস্তদানা, তিল ও ভেরেণ্ডার তৈল ঘৃতে ভেজাল দেওয়া হয়। আজকাল ঘৃতের সহিত কেহ কেহ পেট্রোল মিশ্রিত করেন। ময়রারা প্রায় ভেজাল ঘৃতে খাবার প্রস্তুত করে। সেইজন্য দোকানের খাবার খাইয়া অম্ল ও অজীর্ণ রোগ উৎপন্ন হয়।

ঘৃত মেদো বর্দ্ধক, সুতরাং ক্ষয়রোগ নিবারক। অজা ঘৃত অর্থাৎ ছাগীদুগ্ধ হইতে প্রস্তুত ঘৃত ক্ষয়রোগে বিশেষ উপকারী।

ঘৃত স্বাস্থ্যের পক্ষে এতই উপকারী যে "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" কথার বহুকাল হইতে প্রচলন আছে। এ কথার উদ্দেশ্য এই যে, যতই কেন দুরবস্থা হউক না, তথাপি ঘি খাইতে বিরত থাকিবে না। ঘৃতের পুষ্টিকারিতা এত অধিক যে, সামান্য পরিমাণ খাইলেই অধিক পরিমাণ শক্তি পাওয়া

কায হয়। সেই কারণ চলিত কথায় বলে "পরে তসর খায় ঘি, তার আবার দুঃখ কি?" অর্থাৎ তসর দীর্ঘকাল স্থায়ী, সুতরাং তসর পরিলে কাপড়ের খরচের সাশ্রয় হয়, এবং ঘি অত্যন্ত পুষ্টিকর, সুতরাং ঘৃতপায়ীদের অন্যান্য খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা কম হয়।

কিছুদিন হইল মাড়োয়ারী সম্প্রদায় বসা মিশ্রিত ঘৃত খাইয়া ধর্ম্মহানি হইয়াছে বিবেচনা করিয়া দলে দলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, এবং ঘৃত ও ঘৃতপক্ক মিষ্টান্নাদি ত্যাগ করিয়াছেন। উক্ত সম্প্রদায়স্থ ঘৃত ব্যবসায়িগণ বসামিশ্রিত ঘৃত বেচিবেন না বলিয়া ধর্ম্মঘটও করিয়াছেন। কেবল বসামিশ্রিত ঘৃত বন্ধ করিলেই যে অবিশুদ্ধ ঘৃতের অপকারিতা দমন হইবে তাহা নহে। বসা নিরামিষ ভোজীদের অপবিত্র বটে এবং মৎস্যমাংস-ভোজী হিন্দুসমাজে আবার বিরুদ্ধ খাদ্য বটে কিন্তু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তত দূষণীয় নহে। কারণ ঘৃত মেদের রূপান্তর মাত্র; সুতরাং বসা ও ঘৃত ধরিতে গেলে একই পদার্থ। তবে মৃত বা পীড়িত জন্তু বা সর্পাদির বসা অস্বাস্থ্যকর। যাহা হউক ধর্ম্মঘটের ফলে যদি দেশে পবিত্র ও বিশুদ্ধ ঘৃতের প্রচলন হয়, তাহা হইলে হিন্দুসমাজ কেন—সমগ্র ভারতবাসীর মহদুপকার সাধিত হইবে। দেশের লোকের স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ নিবারণ হইবে। পবিত্রতা দেখিলে চলিবে না, বিশুদ্ধতার দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। কারণ ঘৃতে এমন সব দ্রব্য মিশান যাইতে পারে যাহা অপবিত্র না হইলেও অস্বাস্থ্যকর।

কিন্তু একটী কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ঘৃতে চর্ব্বি মিশ্রণের কথা বালক কাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, এবং আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই একথা জানেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মাড়োয়ারী ঘৃত-ব্যবসায়িগণ কি এ সম্বন্ধে এতদিন অনভিজ্ঞ ছিলেন? তাই আজ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ধর্ম্মরক্ষা করিতেছেন? যাহা হউক ইহার ফলে যদি অবিশুদ্ধ ঘৃতের চলন বন্ধ হইয়া বিশুদ্ধ ঘৃতের প্রচলন হয়, তাহা হইলে দেশবাসীর পক্ষে নিশ্চয়ই হিতকর বটে। কিন্তু যদি পবিত্রতার ভানে ঘৃতের মূল্যবৃদ্ধি হইয়া যায় ও অবিশুদ্ধতা রহিয়া যায়, তাহা হইলে পরিণাম বড়ই বিষময় হইবে। যাহাতে দেশে বিশুদ্ধ ঘৃত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় ও পাওয়া যায়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত। গোহত্যা-নিবারণ করিতে পারিলে ইহার প্রতিকার হইতে পারে, কিন্তু তাহা দুঃসাধ্য; তবে যদি কৃষক, গোপালক, গোপ, গো-রক্ষকগণ সকলেই ধর্ম্মঘট করিয়া কষাইদের গো-বিক্রয় বন্ধ করেন তাহা হইলে কতকপরিমাণে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। আর যদি সমগ্র ভারতবাসী খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি সকলেই গোমাংস ত্যাগ করেন, তাহা হইলে গোকুল বর্দ্ধিত হইয়া বিশুদ্ধ ঘৃতের অভাব নিশ্চয় মোচন হইতে পারে। যাহাহউক বিশুদ্ধ ঘৃতের প্রচলনের জন্য দেশবাসীর যে চেষ্টা চলিয়াছে তাহা স্থায়ী হউক। আমাদের চিররুগ্ন-বাঙ্গালী সন্তান বিশুদ্ধ ঘৃতের মর্য্যাদা বুঝিয়া চা-সরবৎ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিয়ম পূর্ব্বক প্রতিদিন ঘৃত সেবনে অভ্যস্ত হউন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তাগণ ঘৃতের গুণ বর্ণনে বলিয়া গিয়াছেন,—

ঘৃতং রসায়নং স্বাদু চক্ষুষ্যং বহ্নি দীপনম্
শীতবীর্য্যং বিষালক্ষ্মী পাপপিত্তা নিলাপহম্।
অল্পাভিষ্যন্দি কান্ত্যোজঃ তেজো লাবণ্যবৃদ্ধিকৃৎ
স্বর স্মৃতিকরং মেধামায়ুষ্যং [illegible]

উদাবর্ত্ত জরোন্মাদ শূলানাহ ব্রণান্ হরেৎ।
স্নিগ্ধং কফকরং রুক্ষং ক্ষয় বীসর্প রক্তনুৎ॥

অর্থাৎ ঘৃত রসায়ন, স্বাদু, চক্ষুষ্য, অগ্নি-দীপ্তিকারক, শীতল বীর্য্য, বিষঘ্ন, দারিদ্রনাশক, পাপধ্বংসী, পিত্তনাশক, বায়ু শান্তিকারক, অল্প অভিষ্যন্দী, লাবণ্যজনক, ওজোবর্দ্ধক, তেজস্কর, কান্তিকারক, বুদ্ধি উৎপাদক, স্বর বিশোধক, স্মরণশক্তি বর্দ্ধক, বায়ু বৃদ্ধিকর, বলকারক, গুরু, স্নিগ্ধ ও শ্লেষ্মাজনক। ঘৃত পান করিলে উদাবর্ত্ত, জ্বর, উন্মাদ, শূল, আনাহ, ব্রণ, উরক্ষত, বীসর্প ও রক্তদোষ উপশমিত হয়।

শাস্ত্রে কথিত স্বাস্থ্যের পক্ষে এরূপ উপকারী দ্রব্যের ব্যবহারে সকলেই অভ্যস্ত হউন—ইহাই আমাদিগের বক্তব্য।

ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস।

হামজ্বরে কবিরাজ চিকিৎসা।

গত ফাল্গুন মাসে আমাদের বাড়ীতে একটী মেয়ের হাম হয়। মেয়েটীর বয়স চারি বৎসর। প্রথমে খুব জ্বর হয়। তিন চারি দিন প্রবল ১০২ ডিগ্রি হইতে ১০৫ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিতে থাকে। সেই অবস্থায় তিনদিনের পর হাম দেখা দেয়, অনেকক্ষেত্রে প্রবল জ্বর ছাড়িয়া যাওয়ার পর হাম দেখা দেয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তাহা না হইয়া জ্বরের উপরই হাম দেখিতে পাওয়া গেল। যখনই হাম দেখা দিল, সেই সময় হইতে পেটের অসুখও আরম্ভ হইল। দিনে রাত্রিতে দশ বার, বার করিয়া মল হইত। মলের রং বিভিন্ন প্রকারের। কখনও সবুজ, কখন হলদে, কখনবা মিশ্রিত রঙের এবং সেই সঙ্গে আমও ছিল এবং ফেণা ফেণা মল হইত। এই ভাবে জ্বর ও পেটের অসুখের উপর হামও ভীষণ মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইতে লাগিল। সমস্ত শরীর লেপিয়া হাম বাহির হইলেও জ্বর এবং পেটের অসুখ কিছুমাত্র কমিল না। বরং সেই সঙ্গে পিপাসা ও গায়ের জ্বালায় কন্যাটী খুব ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। এইরূপ ভাবে পাঁচ ছয় দিন কাটিয়া গেলেও যখন রোগের কিছুমাত্র উপশম বুঝিতে পারা গেল না, তখন একজন ডাক্তার বন্ধুকে ডাকিলাম। তিনি আসিয়া বিশেষ করিয়া দেখিয়া-শুনিয়া ঔষধ দিয়া গেলেন। আমরাও তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া সে সময়কার মত নিশ্চিন্ত হইলাম।

বন্ধু ডাক্তারটী তিন চারিদিন চিকিৎসার পর একদিন বলিলেন,—বুকের দক্ষিণদিকে একটু সর্দ্দি বসিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। সেজন্য একটু চিন্তার কারণও ইঙ্গিত করিয়া গেলেন। আমরা তো কন্যাটিকে লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলাম। এবং অন্য প্রকার নূতন কিছু ব্যবস্থা না করিয়া পূর্ব্ববৎ ডাক্তারী চিকিৎসা চালাইতে লাগিলাম। তবে ভগবানের কৃপায় ইতমধ্যে হামগুলি ক্রমশঃ মিলাইয়া যাইতে লাগিল। হামগুলি মিলাইতে লাগিল বটে, কিন্তু আবার এক আগন্তুক রোগ আসিয়া আমাদিগকে

হতাশ করিয়া দিল। ডাক্তার বাবু বলিলেন,—বুকের দুই দিকেই নিউমোনিয়া দেখা দিয়াছে। কন্যাটীকে লইয়া শুধু আমরা নয়, ডাক্তার বাবুও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন; তথাপি আমরা তাঁহারই হাতে রোগী রাখিয়া দিয়া ভগবানের করুণার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

কিন্তু যখন পাঁচ ছয় দিন কাটিয়া গেল, অথচ জ্বর, পেটের অসুখ, পিপাসা, ও নিউমোনিয়া কিছুই কমিল না, তখন আমাদের মনও বিশেষ চঞ্চল হইয়া উঠিল। একদিন বৈকালে কন্যাটী জ্বরের আধিক্যে খুব অভিভূত হইয়া পড়িলে, আমি কলিকাতার একজন বহুদর্শী কবিরাজ মহাশয়ের নিকটে গিয়া কন্যাটীর সমস্ত অবস্থা বলিলাম। তিনি শুনিয়া বলিলেন,—"কাল সকালে দেখিয়া ব্যবস্থা করিব।"

পরদিন কবিরাজ মহাশয় আসিয়া একটী পাচনের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। তখন ডাক্তার বাবুটীও ভাগ্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন,—তিনি বলিলেন;—আমাদের মতে কন্যাটীর বাঁচিবার আশা খুব কম। তদুত্তরে কবিরাজ মহাশয় আমাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন,—কোন ভয় নাই,—এই পাচনটী খাওয়াইতে থাক ইহাতেই সারিয়া যাইবে—অন্য কোন ঔষধ-পত্র দিতে হইবে না।

কবিরাজ মহাশয় যে পাচনটী বলিয়া দিলেন,—তাহা এই,—যোয়ান, বাবুইতুলসী, মেথী ও সাদা পেঁয়াজ, প্রত্যেকটী আধতোলা পরিমাণে লইয়া ছেঁচিয়া দুইসের জলে সিদ্ধ করিয়া একসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেই জল একটু একটু করিয়া পিপাসার সময় অথবা অন্য সময় খাওয়াইতে হইবে। একসের জলে সমস্ত দিন ও রাত্রি চলিবে। সমস্ত না খাইতে পারিলেও ক্ষতি নাই। পথ্য দুধ সাগু।

আমরা যথা নিয়মে উক্ত জিনিস কয়টী সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইতে লাগিলাম। প্রথম দিনে পিপাসার আধিক্যে সমস্ত পাচনটাই দিনে রাতে শেষ হইয়া গেল। পরদিন সকালে দেখা গেল, অন্যদিন অপেক্ষা জ্বর কম; রাত্রিতে মলের সংখ্যাও কম হইয়াছিল। এইরূপে একই পাচন আমরা পাঁচ ছয় দিন চালাইয়া গেলাম। দিনের পর দিন কাটার সঙ্গে সঙ্গে—জ্বর, পেটের অসুখ, নিউমোনিয়া, পিপাসা প্রভৃতি সবই কমিয়া গেল। ডাক্তারবাবুও অনুগ্রহ করিয়া প্রতিদিন আসিয়া দেখিয়া যাইতেন। তিনিও কবিরাজী চিকিৎসার—অত্যাশ্চর্য্য ফল দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন।

তা'রপর আমাদের বাড়ীতে আবার দুইটী ছেলের হাম দেখা দিল। একটীর বয়স দুই বৎসর, অপরটীর বয়স এক বৎসর। এবার প্রথম হইতে উক্ত কবিরাজ মহাশয়কে সংবাদ দিলাম। তখনও হাম বাহির হয় নাই। কেবলমাত্র জ্বর দেখা দিয়াছে। তিনি জ্বর শুনিয়াই হাম হইবে স্থির করিয়া ব্যবস্থা বলিয়া দিলেন,—আধ তোলা আন্দাজ ব্রাহ্মী শাকের রস প্রত্যেক ছেলেটীকে খাওয়াইয়া দাও এবং পথ্য সাগু দাও। এইরূপে তিনদিন পাতে একবার করিয়া ব্রাহ্মীশাকের রস খাওয়াইলাম। হামও খুব বাহির হইয়া গেল। কন্যাটীর মত ছেলে দুইটীরও জ্বর, পেটের অসুখ ও অত্যন্ত পিপাসা ছিল। তার মধ্যে ছোটটীর বুকে একটু সর্দি বসিয়াছিল

এবং চক্ষু দুইটীর মধ্যেও অত্যন্ত হাম দেখা দিল। এবারেও আমরা তিন দিন ব্রাহ্মী শাকের রস দেওয়ার পর কবিরাজ মহাশয়ের আদেশক্রমে পূর্ব্ববৎ,—যোয়ান, বাবুইতুলসী, মেথী ও সাদা পেঁয়াজের জল তৈয়ারী করিয়া খাওয়াইতে লাগিলাম। ভগবানের কৃপায় ছেলে দুইটীও ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিতে লাগিল।

ছোট ছেলেটীর চোকে যে হাম বাহির হইয়াছিল। সে জন্য তাহার বাম চক্ষুটী হাজিয়া যাওয়ার মত হইল এবং চোকের তারার মাঝটার উপর একটা সাদা বিন্দুর মত দাগ দেখা যাইতে লাগিল। যদিও এই ছেলে দুইটীর চিকিৎসা কবিরাজী মতে চলিতেছিল, তথাপি ডাক্তার বন্ধুটী অনুগ্রহ করিয়া প্রত্যহ আসিয়া দেখিয়া যাইতেন। তিনি ছোট ছেলের চোকটী দেখিয়া ভয়ের কারণ বলিয়া গেলেন এবং একজন অভিজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসককে ডাকিয়া দেখাইবার ব্যবস্থা করিতে বলিলেন এবং যতক্ষণ না চোকের ডাক্তার আসেন ততক্ষণ দুই তিন ঘণ্টা অন্তর "বোরিক্ এ'সড" (ডাক্তারী ঔষধ, সোহাগা হইতে প্রস্তুত) গরম জলে গুলিয়া সেই জলে চোক ধুইয়া দিতে বলিলেন।

ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয়কেও একবার চোকের কথা জানাইলাম। তিনি যষ্টিমধু ও গুলঞ্চ ছেঁচিয়া রস করিয়া সেই রস দিনে তিন চারিবার ফোঁটা ফোঁটা করিয়া চোকে দিতে বলিলেন। এদিকে অভিজ্ঞ চক্ষুচিকিৎসক ডাকিতে এবং তাঁহার আসিতেও দুইদিন বিলম্ব ঘটিয়া গেল। এই দুইদিন আমরা উক্ত যষ্টিমধু ও গুলঞ্চ ছেচিয়া রস করিয়া দিতে লাগিলাম। দুইদিন পরে আমার বন্ধু ডাক্তারটী বলিলেন, চোকের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। যাহা হউক কবিরাজী ঔষধেই উপকার হইল বলিয়া আমরা আর ডাক্তারী ঔষধ না আনাইয়া ঐ কবিরাজী ব্যবস্থাই চালাইতে লাগিলাম। সপ্তম দিনে দেখা গেল, —চোকের আর কোন প্রকার দোষ নাই, সব সারিয়া গিয়াছে।

তা'রপর আমি বহুস্থলে উক্ত কবিরাজী পাচন প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল লাভ করিয়াছি। হাম হইবার সম্ভাবনা থাকিলে অথবা সামান্য পরিমাণে হাম দেখা দিলে প্রথম তিন দিন প্রাতে একবার করিয়া ব্রাহ্মীশাকের রস দিতে হয়। তাহাতে ভিতরকার সমস্ত হাম বাহির হইয়া পড়ে। বাহির না হইলেও আর কোন ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না। তা'রপর হামের অবস্থায় পেটের অসুখ, জ্বর, সর্দ্দি, কাসি প্রভৃতি যাহাইথাকুক না কেন,—সেই সময়ে যোয়ান, বাবুই তুলসী, মেথী ও সাদা পেঁয়াজ সিদ্ধ জল একটু একটু করিয়া সমস্ত দিন খাওয়াইয়া গেলে সব উপসর্গ ও হাম সারিয়া যাইবে এবং হাম অথবা বসন্ত চোকে বাহির হইলে, যষ্টিমধু ও গুলঞ্চ একটু জল দিয়া ছেঁচিয়া রস বাহির করিয়া চোকে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া দিলে চক্ষুও নষ্ট হইবে না।

হাম একটী সাধারণ ব্যাধি। প্রতিবৎসরই উহা একবার করিয়া অনেক গৃহস্থের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে। সেই সময় আমার লিখিত মত ব্যবস্থা করিয়া সকলেই দেখিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে যে পাচনটীর কথা উল্লেখ করা গেল, উহা নির্দ্দোষ ভেষজ। উহা ব্যবহার করিয়া কোন প্রকার কুফল ফলিবে না। অধিকন্তু অল্প সময়ের মধ্যে রোগও সারিয়া যাইবে—ইহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

শ্রীরাখালদাস সেন গুপ্ত।

আয়ুর্ব্বেদ বায়ু।

(তুলনা মূলক আলোচনা)

সে এক স্মরণাতীত যুগের স্বপ্নময়ী কাহিনী। ভারতের সুপবিত্র সাধনা-কুঞ্জ নৈমিষ-কাননে সমবেত ঋষিগণ জরাব্যাধিগ্রস্ত মানবের দুঃখ-কষ্ট মোচনকল্পে যে মহান তথ্য সমূহের আলোচনা করিয়াছিলেন—যে সনাতন চিকিৎসাতন্ত্রের প্রচারদ্বারা ভবিষ্য-দ্বংশীয়দের জন্য অমূল্য রত্নপেটিকা সাদরে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই অবলম্বনে বহুশতাব্দীকাল ভারতের সিদ্ধ সাধকগণ অকাল মৃত্যুর কবল হইতে দেশ-বাসীদিগকে রক্ষা করিয়া তাহাদের ইহ-কালের ও সঙ্গে সঙ্গে পরকালেরও মঙ্গল বিধান করিয়া গিয়াছেন।

তা'রপর নানারূপ বিরুদ্ধভাবের তরঙ্গ-তাড়নায়, নানাপ্রকার সামাজিক আন্দোলন ও রাষ্ট্রীয়-বিপ্লব-প্লাবনে ভারতবর্ষ ওলট পালট হইয়া গেল। অত্যাচারের নির্ম্মম পেষণে ক্লিষ্ট—তাচ্ছিল্যের হিমানী প্রবাহে জড়ীভূত ভারত, আপনার অতীত কীর্ত্তির গরিমাময় স্মৃতিটুকুমাত্র আঁকড়াইয়া ধরিয়া নিষ্ক্রিয়ভাবে পড়িয়া রহিল। সমগ্র ভারত-বর্ষ যখন এমনি অবসাদ ক্লিষ্ট হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল, তখন বাঙ্গালার ভাব-সাগরে একটা চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইল—একটা সুমধুর কলনাদে বাঙ্গালার আকাশ-বাতাস ধ্বনিত হইয়া উঠিল—বাঙ্গালীর অন্তরে একটা প্রবল কর্ম্মস্পৃহা জাগ্রত হইল। তাহারই ফলে বাঙ্গালায় গীতি কবিতার সৃষ্টি হইল—নব্য ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হইল—আয়ু-র্ব্বেদের বিরাট বিস্তৃতি আরব্ধ হইল।

যে স্পন্দন-প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া সেই যুগের বাঙ্গালী এমনি জাগ্রত হইয়া এই তিনটি বিষয়কে গৌরবের উচ্চতম সৌধে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল—বাঙ্গালীর ভাগ্যদোষে সে স্পন্দন একেবারে থামিয়া গেল।

বাঙ্গালার সে দিন আর নাই! বাঙ্গালার গীতি কবিতা আর বাঙ্গালীর কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া, প্রাণ আকুল করে না—নবদ্বীপের পুণ্য প্রাঙ্গনের প্রজ্জ্বলিত জ্ঞান প্রদীপ জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিবিয়া গিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ বলিতেও কেবল চরক ও সুশ্রুতের কঙ্কাল, মাধবকর ও চক্রদত্ত, বিজয় রক্ষিত ও শ্রীকণ্ঠের প্রাণহীন দেহগুলি জড়াইয়া ধরিয়া দেশমাতৃকার সুসন্তান কতিপয় প্রবীণ চিকিৎসক হিন্দুর গৌরবের এতবড় একটা জিনিষ সাদরে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন।

আয়ুর্ব্বেদ যে কতবড় উচ্চাঙ্গের চিকিৎসা বিজ্ঞান, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য সুধীবচন উদ্ধৃত করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন হইতে পারে না। শত শত শতাব্দী ধরিয়া এত আবর্ত্তন, বিবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আজও যে ইহার স্বাতন্ত্র রক্ষা করিয়া সনাতন শাস্ত্ররূপে পুজিত হইতেছে—ইহাই তাহার শ্রেষ্ঠতার চরম নিদর্শন। কিন্তু মধ্যাহ্ন তপনের উজ্জ্বল আলোক যেমন সঞ্চারমান জলদজালে আবৃত হয়, তেমনি স্বীকার করিতেই হইবে যে, আয়ুর্ব্বেদের গৌরব-ভাতি আজ ম্লান হইয়া গিয়াছে।

দীর্ঘকালের এই চিকিৎসাতন্ত্রের কোন্ কোন্ অংশ পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত [illegible]

ত্যক্ত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা অতীব দুরূহ ব্যাপার,—তবে ইহা সুনিশ্চিত যে, আধুনিক গ্রন্থসমূহ ভ্রম-প্রমাদশূন্য নহে। মাঝে মাঝে এমন সব পরস্পর বিরোধী অসংলগ্ন প্রয়োগ লক্ষিত হয় যে, তাহাতে বর্ণিত বিষয়গুলি ত মীমাংসীত হয়ইনা—অধিকন্তু উহাদিগকে প্রহেলিকার মতই দুর্ব্বোধ করিয়া তোলে।

আধুনিক গ্রন্থসমূহে এইরূপ যে সকল ত্রুটি দেখা যায়, তাহার জন্য আয়ুর্ব্বেদ প্রচারকগণ দায়ী নহেন। পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতি ইহার জন্য অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিলে আমাদিগকে নিরয়গামী হইতে হইবে। তাঁহারা রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া আজও আয়ুর্ব্বেদ বাঁচিয়া আছে—নতুবা ভারতের অন্যান্য বহু অমূল্য রত্নের ন্যায় ইহাও বহুদিন পূর্ব্বে লুপ্ত হইয়া যাইত।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত কোন জটীল বিষয় মীমাংসা করিবার চেষ্টার মত ধৃষ্টতা আমার নাই, তবে অধ্যয়নকালে যে সকল প্রশ্নের সদুত্তর না পাইয়া পাশ্চাত্য-চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ পূর্ব্বক একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, আয়ুর্ব্বেদের সিদ্ধসাধকগণ সমীপে তাহাই নিবেদন করিতেছি মাত্র। যদি কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক কৃপা পূর্ব্বক আমার ভ্রম প্রদর্শন করতঃ বিষয়গুলির যথানুরূপ ব্যাখ্যা করিবার কষ্টস্বীকার করেন, তাহা হইলে এই দীন লেখক এবং অন্যান্য বহু আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন।

শাস্ত্রকারদিগের মতে 'দোষধাতুমলমূলং হি শরীরম্'। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থীর সর্ব্ব প্রথমেই দোষত্রয়ের সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক। বাতাদি দোষত্রয়ের মধ্যে বায়ুই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান ও সর্ব্বকর্ম্ম নিয়ন্তা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং বক্ষ্যমান প্রবন্ধে আমরা বায়ুসম্বন্ধেই আলোচনা করিব

"বায়ুস্তন্ত্র যন্ত্রধরঃ প্রণোদানসমানব্যানাপানাত্মা, প্রবর্ত্তকশ্চেষ্টানাম্……" প্রভৃতি চরক বর্ণিত বায়ুর কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা করিলে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ—ব্যাখ্যাত 'নার্ভের' ক্রিয়ার অনুরূপ বলিয়াই মনে হয়। আমাদের এই ধারণা যে নিতান্ত অমূলক নহে তাহাই দেখাইবার জন্য তুলনা-মূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। বলা আবশ্যক যে, পশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া আমরা আয়ুর্ব্বেদের মূল্য নিরূপন করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। বিদেশীয় পণ্ডিত দিগের নব-লব্ধ-জ্ঞানালোকের সাহায্যে অধুনাতন কুহেলিকা সমাচ্ছন্ন আর্য্যরত্নরাজি সন্ধানের প্রয়াস পাইয়াছি। প্রতীচ্যবুধমণ্ডলীর সাধনার ফল এত তুচ্ছ ও এত অকিঞ্চিৎকর নয় যে, আমরা তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিবনা। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে উন্নতিলাভ করিয়া প্রতীচির পণ্ডিতগণ যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের জ্ঞানসীমা অতিক্রম করিয়া বহুদূরে অগ্রসর হইয়াছেন, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই; তবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, শরীর ও শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের গবেষণা গভীর ও ব্যাপক। যাহা হউক, ঋষিগণ শারীর বায়ুকে পঞ্চধা বিভক্ত করিয়া তাহাদের যে সকল কার্য্য নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন একণে আমরা তাহার সহিত প্রতীচ্য মতের সামঞ্জস্য দেখাইবার চেষ্টা করিব।

১। প্রাণবায়ু।—চরক প্রাণবায়ুর স্থান মস্তক, কর্ণ, জিহ্বা মুখ ও নাসিকা এবং তাহার কার্য্য "ষ্ঠীবনক্ষবথূদ্গার শ্বাসাহারাদি কর্ম্মচ" বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন মহাশয় প্রাণবায়ুকে অম্লজান বাহক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।* পশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ ষ্ঠীবন প্রভৃতি কার্য্য নিম্নলিখিত ভাবে সম্পন্ন হয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

(ক) ষ্ঠীবন—Chorda Iympanii নামক মস্তিষ্কাভ্যন্তরস্থ "নার্ভ"-কেন্দ্রের উত্তেজনা বশতঃ সম্পন্ন হইয়া থাকে। কখনও কখনও ঘ্রানস্বাদের প্রতিক্রিয়া-জনিত কার্য্যের (Reflex action) দ্বারা সম্পাদিত হয়। যেমন দূষিত গন্ধ আঘ্রান করিলে অথবা বিরস দ্রব্য রসনাসংস্পর্শে আনয়ন করিলে নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করিতে হয়।

(খ) ক্ষবথু—নাসারন্ধ্রের কলা সমূহ উত্তেজিত হইয়া Superior Laryngeal ও vagus ফুস্‌ফুসের বায়ু সশব্দে নির্গত করে। এই বায়ুর সহিত শ্লেষ্মাও নির্গত হয়।

(গ) উদ্গার—বমনের বাচক শব্দ। কণ্ঠনালীর উত্তেজনা বশতঃ Fifth nerve ও Glosso-pharyngeal নার্ভদ্বয় উদ্রিক্ত হইয়া উদরের মাংসপেশী-সমূহের আকুঞ্চন দ্বারা পক্কাশয়ের দূষিত দ্রব্যের সঞ্চার হইলে Vagus নার্ভ দ্বারা বমন কার্য্য সম্পাদিত হয়। কখন কখন মস্তিস্কের (Vomitting centre in the medulla) উত্তেজিত হইয়া বমন করায়। যেমন কোন ঘৃকারজনক পদার্থ দেখিলেই আমরা বমন করি। এখানে সাক্ষাৎভাবে পক্কাশয় অথবা উদরে মাংসপেশী সমূহের সঙ্কোচ হয়না। দুষ্ট পদার্থ আমাদের মনে যে ঘৃণার ভাব জাগাইয়া দেয়, তাহাই Vomitting centre কে উদ্রিক্ত করিয়া বমন করায়।

(ঘ) শ্বাস—ফুস্‌ফুসের নিজের আকুঞ্চন প্রসারনের শক্তি নাই। বক্ষ ও উদরের মাংসপেশী সমূহের আকুঞ্চনপ্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে ফুস্‌ফুস কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইয়া থাকে। (The movements of the lug are therefore passive, not active, and depend upon the changes of shape of the closed cavity in which they are contained -Halliburton.)

Vagus, Splanchuick এবং Glosso-pharyngeal নামক নার্ভ'এর শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য সম্পন্ন করে।

(ঙ) আহার—অন্ন চর্ব্বণ ও অধঃকরণের সমবেত কার্য্যদ্বারা আহারক্রিয়া সম্পাদিত হয়। 5th Nerve, Gloss-pharyngeal Sup—Laryngeal এবং Hypoglossas 'নার্ভের' সাহায্যে খাদ্য দ্রব্য চর্ব্বিত হয়। চর্ব্বিত অন্ন অধঃকরণকালে যাহাতে নাসিকা বা ফুস্‌ফুস-পথে প্রবেশ না করে, তজ্জন্য উপজিহ্বা দ্বারা এই দুই ছিদ্র-পথ রুদ্ধ হইয়া যায় এবং অন্ননালীর আকুঞ্চন দ্বারা উহা পক্কাশয়ে পতিত হয়।

উপযুক্ত কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা করতঃ

* শরীর প্রচারাম্মলিনীভূতং হি শোণিতং ফুস্‌ফুসপ্রচারেণ প্রাণবায়ুসমানীত বিশু পদার্থ (oxygen) সংযোগাৎ শুক্লীভূতং হৃদযন্ত্রেণ বিক্ষিপ্যতে সর্ব্বতো ধমনীভিঃ—প্রত্যক্ষ শারীরম্।

আমরা দেখিতে পাইলাম যে, মস্তিষ্কাভ্যন্তরস্থ 4th Ventricle নামক স্থান কতগুলি 'নার্ভ' বাহির হইয়া শীর্ষোরঃ কর্ণ জিহ্বাস্যে নাসিকায় ব্যাপ্ত হইয়া "ষ্ঠীবনক্ষবথূদ্গার শ্বাসাহারাদি কর্ম্ম" সম্পাদন করে।

উদান বায়ু।—চরকে উদান বায়ুর স্থান "নাভ্যুরঃ কণ্ঠ" এবং তাহারকার্য্য 'বাক্‌প্রবৃত্তি প্রযত্নোর্জ্জবল বর্ণাদি কর্ম্ম' বলিয়া বিবৃত হইয়াছে। সুশ্রুতে 'প্রযত্নোর্জ্জ' বল বর্ণাদির উল্লেখ নাই। সুশ্রুতের মতে উদান বায়ু "ভাষিতগীতাদিবিশেষোঽভি-প্রবর্ত্ততে।"

পশ্চাত্য মতে মস্তিস্ক স্থিতবাক্‌কেন্দ্রে (Speech Sup. Laryngeal ও vagus প্রবৃত্তির উদ্রেক হয় এবং 'নার্ভদ্বয়ের কার্য্যদ্বারা স্বার যন্ত্র ও উদরের মাংস পেশীর সঙ্কোচ-জনিত নিঃসৃত-বায়ুই শব্দে সৃষ্টি করে। বাক্‌কেন্দ্র কোনরূপে নিষ্ক্রিয় করিয়া ফেলিলে মানব-মূকত্ব প্রাপ্ত হয়। বাদকের চেষ্টা—যন্ত্র এবং বায়ু নির্গমের সমবেত কার্য্য দ্বারা যেরূপ বংশীবাদন সম্পন্ন হয় তেমনি বক্তার ইচ্ছা—স্বরযন্ত্র ও উদরের পেশীসমূহের সমবেত কার্য্যদ্বারা বাক্য নির্গত হয়। বায়ুকে স্বরযন্ত্র দিয়া বাহির করিতে হইলে নাভির উপরের মাংসপেশী সমূহ এবং মহাপ্রচারিকা পেশীর (Diaphgram) আকুঞ্চন আবশ্যক। এই সকল মাংসপেশীর কার্য্য তত্তৎ স্থানের নার্ভ সমূহের কার্য্য ব্যতীত সম্পাদিত হইতে পারে না। সুতরাং 'নাভ্যুরঃ কণ্ঠ' দেশের নার্ভের সাহায্যে 'ভাষিত গীতাদি' সম্পন্ন হয়।

৩। সমান বায়ু।—সমান বায়ুর স্থান আমাশয় ও পক্কাশয়। অন্নপাক ও পুষ্টিকর রস সমূহ এবং মূত্রপুরীষাদি যথাস্থানে প্রেরণ করা সমান বায়ুর কার্য্য। প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের মতে ভুক্ত অন্ন পক্কাশয়ে প্রবেশ করিলে পক্কাশয়ের উর্দ্ধ ও অধঃ প্রদেশের ছিদ্রদ্বয় রুদ্ধ হইয়া যায় এবং পক্কাশয়ের সূক্ষ্ম পেশী সমূহ সঙ্কুচিত হইয়া ভুক্তদ্রব্যকে মৃদু পেষণ করে। অন্ন চর্ব্বণ ও অধঃকরণের সঙ্গে সঙ্গে পক্কাশয়ে Pepsin Hydrochoric acid' নামক এক প্রকার অম্ল-দ্রাবক রস ক্ষরিত হয়। এই দ্রাবক রস পক্কাশয়স্থ অন্ন কিয়ৎপরিমাণে জীর্ণ করে। অন্ন অর্দ্ধ জীর্ণ হইলে পক্কাশয়ের অধঃ দেশস্থ ছিদ্র উন্মুক্ত হয় এবং অর্দ্ধ জীর্ণান্ন আমাশয়ের ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে। এই স্থানে অন্ন কিম্বে (clylc) পরিণত হইয়া Thorocic duel নামক প্রণালী বহিয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় এবং খাদ্যের অজীর্ণাংশ পুরীষে পরিণত হইয়া স্থূলান্ত্রে জমিয়া থাকে। (kidney) নামক যন্ত্র রক্ত হইতে মূত্র পৃথক করিয়া লয়। (The main function of the kidneys is to seperate the urine from the blood) পক্কাশয় ও আমাশয়ের এই সমস্ত কার্য্য vagus ও solar Plexus নামক Sympathetic nerves কর্তৃক সম্পাদিত হয়। পাশ্চাত্য শারীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ Solar Plexus কে Abdominal Brain (উদরের কর্ম্মকেন্দ্র) বলিয়া বর্ণনা করিয়া উহার স্থান পক্কাশয়ের পশ্চাতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চরকে সমানবায়ু স্বেদ, দোষ ও অম্বুবাহী বলিয়া কথিত হইয়াছে। Sympathetic নার্ভের বিকৃতিবশতঃ ঘর্ম্ম নির্গমের যে ব্যাঘাত ও ব্যতিক্রম হয়, তাহা প্রতীচ্য চিকিৎসকগণও স্বীকার করেন (··increase of tem-

perature on the same side, alteration of the sweat secretion on the side, sometimes dimunition at other even an increase.) সুতরাং এক্ষেত্রেও সমান বায়ুর স্থান ও কার্য্যের সহিত পাশ্চাত্য নার্ভকেন্দ্র ও তাহাদের কার্য্যাবলীর সহিত কোন অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় না।

৪। ব্যান বায়ু।—ব্যান বায়ু "দেহং ব্যাপ্নোতি সর্ব্বত্ত' এবং উহার কার্য্য গতি, প্রসারণ, আক্ষেপ ও নিমেষাদি ক্রিয়া। পাশ্চাত্যমতে শরীরের যাবতীয় কার্য্যই ত্রিবিধ নার্ভ-ক্রিয়াদ্বারা সম্পাদিত হয় (ক) Efferent (খ) Afferent ও (গ) Reflex অথবা প্রতিক্রিয়া জনিত কার্য্য পুনরায় Excito motor Excito-secretory Excito-accelerator এবং Excito Inhibitory—এই চারি প্রকারে কার্য্য করে। শেষোক্ত দুই প্রকার প্রতিক্রিয়া জনিত কার্য্যের উপর আমাদের "নাড়ী" বিজ্ঞানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। রক্তবাহী প্রণালী সমূহ (arteries and veins) sympathetic nerves দ্বারা চালিত ও পুষ্ট হইয়া থাকে, প্রতীচ্যবুধমণ্ডলী এ বিষয় জ্ঞাত থাকিলেও, আর্য্য চিকিৎসকদিগের ন্যায় তাঁহারা এ সম্বন্ধে এখনো যে পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই, তাহা তাঁহারাই স্বীকার করিয়াছেন। (Morbid his to logical changes, such as atrophy, pigmentary or patty deegenarations fibrosis and homorrohage, have been found in the ganglia of the sympathetic system, but little appears to be known of definite association between such changes and functional disturbances or symptoms as a consequence —Joylor) সুতরাং গতিপ্রসারণ, আক্ষেপ, নিমেষাদি ক্রিয়া যে নার্ভদ্বারা সম্পাদিত হয় এবং ঐ সকল নার্ভ যে সর্ব্বদেহে ব্যাপ্ত রহিয়াছে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। এখানেও ব্যান বায়ু ও Motor sensory নার্ভ সমূহের কার্য্যাবলীতে কোন পার্থক্য দেখা যায় না।

৫। অপান বায়ু।—অপান বায়ুর স্থান "বৃষণৌ বস্তি মেঢ্রঞ্চ নাভ্যূরু বংক্ষণৈ গুদম্" এবং তাহার কার্য্য শুক্র, মূত্র, পুরীষ, গর্ভ ও আর্ত্তব পরিত্যাগ করা। পাশ্চাত্য মতে মূত্র, পুরীষ ত্যাগ প্রভৃতি কখনো কখনো volition বা স্বতঃপ্রবৃত্তির দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। শিশুদিগের মূত্র, বিষ্ঠা-ত্যাগ, ক্রিমি অথবা অন্য কোন দ্রব্যের উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সম্পন্ন হয় (It also may be reflexly in children, who suffer from intestical worms, or other such irritation—Hallsburton) সাধারণতঃ শুক্র, মূত্র, পুরীষ, গর্ভ ও আর্ত্তব নির্গমের মার্গসমূহের মাংসপেশীগুলির আকুঞ্চনের দ্বারা উহারা নির্গত হইয়া থাকে। Lower dorsals, upper lunbers, sympathetics, Hypogastric, pudic ও sacoral নার্ভ সমূহ সাক্ষাৎভাবে মূত্র পুরীষ প্রভৃতি নির্গমের সাহায্য করে। উহাদের স্থান "বৃষণৌ বস্তি'..." ইত্যাদি। সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে এখানেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতের কোন বিরোধ বা ব্যতিক্রম দেখা যায় না। (ক্রমশঃ)

কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্রনাথ [illegible]

আজকাল কাস রোগের এত আধিক্য কেন ?

——:০:——

আয়ুর তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক গুহ্য তত্ত্ব সমস্ত একমাত্র আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেই আছে। ইহা তন্ত্রোক্ত শাস্ত্র এবং অথর্ব্ব ও ঋগ্বেদের অংশ। ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অত্রি প্রভৃতি ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ ব্যাধি প্রপীড়িত জন সমূহের মঙ্গলার্থে ভারতবর্ষেই ইহা প্রথম প্রচার করেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ব্যাধি চতুর্ব্বিধ,—যথা দোষজ, কর্ম্মজ, কুলজ ও পাপজ। দোষজ অর্থাৎ ইহ জন্মে পাপাচার জনিত বাতাদি দোষের প্রকোপ হেতু যে ব্যাধি। কর্ম্মজ অর্থাৎ ইহ জন্মে নিজকর্ম্ম দোষে অর্থাৎ জ্ঞানকৃত পাপাচরণ হেতু যে ব্যাধি। কুলজ অর্থাৎ বংশ পরম্পরা ক্রমে যে ব্যাধির উৎপত্তি। আর পাপজ অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের অপরাধ হেতু যে ব্যাধি। এই চতুর্ব্বিধ কারণে রোগোৎপত্তি হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে মহাদেবকে (মহারুদ্রকে) সংহার কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই মহারুদ্রদেবের ক্রোধজনিত নিশ্বাস হইতে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অসংখ্য রুদ্রানুচর উৎপন্ন হইয়া ব্যাধিরূপে পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতেছে এবং অধর্ম্মাচারীদিগকে শাস্তি দিতেছে ও নাশ করিতেছে। তাই যজুর্ব্বেদে রুদ্রাধ্যায়ে উক্ত আছে যে "অসংখ্যাতা সহস্রাণি যে রুদ্রা আবিভূম্যাম্। তেষাং সহস্র যোজনে অবধন্বানি তন্মাস" ইত্যাদি। অর্থাৎ হে ভগবন্, যে সকল অসংখ্য অসংখ্য অমঙ্গলময় রুদ্র মৃত্তিকার উপর (পৃথিবীতে) বিচরণ করিতেছে, আমরা যেন তাহাদিগের নিকট হইতে সহস্র যোজন দূরে থাকি। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রুদ্রানুচর বা (সংহার বীজের) সহিত ডাক্তারদিগের বীজানুর কতকটা সাদৃশ্য আছে বলিয়া বোধ হয়। পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান-বিদ ডাক্তারদিগের মতেও অধিকাংশ রোগই বীজানু সমুদ্ভূত। আর আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের মতে পৃথিবী অধর্ম্ম বহুল হইলেই রুদ্রানুচরেরা অধর্ম্মচারীদিগকে বায়ু, জল, আকাশ প্রভৃতি নানামূর্ত্তি ধারণ করিয়া ধ্বংস করিয়া থাকেন। এজন্য আর্য্য ঋষিগণ, অযথা আহার-বিহার নিবারণ কল্পে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া (অর্থাৎ অমুক তিথিতে অমুক দ্রব্য ভক্ষণ করিলে ব্রহ্মহত্যা পাতকগ্রস্ত হইতে হয় ইত্যাদি) সমুদায় কার্য্যই শুদ্ধাচার সম্পন্ন হইয়া নির্ব্বাহ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এইজন্য আর্য্যগণ স্নান, পান, ভোজন, শয়ন প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়েই সেকালে শুদ্ধাচার সম্পন্ন থাকিতেন, এবং স্পর্শাক্রামক রোগের ভয়ে নীচ জাতির কথা দূরে থাকুক, স্বজাতি ভিন্ন কোনও জাতির সহিত একাসনে উপবেশন করিতেন না, এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, শুদ্ধসত্বতা ও নিষ্ঠাবান থাকিয়া সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ অধিকাংশ রোগই যে, সংক্রামক, এ তথ্য জ্ঞাত ছিলেন বলিয়াই সংস্পর্শ দোষ ও শুদ্ধাচারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন। আর একণে পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানবিদ-ডাক্তারেরা চিকিৎসা বিজ্ঞান অপেক্ষা (হাইজিন) স্বাস্থ্য-

বিজ্ঞানেই বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। ডাক্তারদিগের মতে সর্দ্দি-কাসি-নিউমোনিয়া প্রভৃতির বীজানু সর্ব্বদাই দেহ মধ্যে অবস্থান করিতেছে। আয়ুর্ব্বেদ মতে "প্রতিশ্যায়াদথোকাসঃ কাসাৎ সংজায়তে ক্ষয়ঃ।" উপেক্ষিত হইলে প্রতিশ্যায় অর্থাৎ নাসাস্রাব (সর্দ্দি) হইতে কাস এবং কাস হইতে ক্ষয়রোগ জন্মিয়া থাকে। কিন্তু হায়, কালস্রোতে আমাদিগের কি অধঃপতনই হইয়াছে! পেটের দায়ে অর্থোপার্জ্জনের জন্য আমরা এক্ষণে আহার, বিহার, শয়ন, উপবেশন প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়েই নানা জাতীয় লোকের সংস্পর্শে থাকিয়া স্পর্শাক্রামক ব্যাধি সকল দ্বারা আক্রান্ত হইতেছি। ডাক্তারদিগের মতে লোক সংখ্যা যেখানে অধিক, তথায় বীজানু সংখ্যাও অধিক, এবং রোগ-বীজানু রোগী-দেহ হইতে সুস্থ ব্যক্তির দেহে সংক্রামিত হইয়া থাকে। আর আমাদিগের মতে অল্পস্থানে অধিক লোকের অবস্থান ও নানা জাতীয় লোকের সহিত সহবাসহেতু সংস্পর্শ দোষই কাস রোগের প্রধান কারণ, দ্বিতীয় কারণ বদ্ধ বায়ুতে অবস্থান, তৃতীয় কারণ চাকুরির জন্য অসময়ে ও অযথা আহার। এইজন্য কলিকাতা মহানগরীতে কাসরোগের এত আধিক্য দেখা যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্ ডাক্তারদিগের মতে অধিকাংশ রোগই বীজানু সমুদ্ভূত। এই বীজানু আবার দুই অংশে বিভক্ত, জীবানু ও উদ্ভিজ্জানু। প্রাণীদেহের ন্যায় উদ্ভিদ-দেহও অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ দ্বারা গঠিত। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি কয়েকপ্রকার রোগ শুদ্ধ জীবানু কর্ত্তৃক উৎপন্ন। উদ্ভিজ্জানু হইতে অধিকাংশ রোগোৎপত্তি হইয়া থাকে। এই বীজানু দ্বারা আকাশ, বায়ু, জল প্রভৃতি পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই পূর্ণ। তবে যে স্থানে জল সংখ্যা অধিক, তথায় বীজানুর সংখ্যাও অধিক। এই বীজানু শ্বাস-প্রশ্বাস, পানীয় জল, আহার্য্যসামগ্রী, ধূলিকণা এবং মশা-মাছি ইত্যাদি দ্বারা মনুষ্যদেহে প্রবেশ করে। তবে সকল প্রকার বীজানু রোগোৎপাদন করে না। রোগোৎপাদনকারী বীজানু সংখ্যা অল্প। মানবদেহে দেহস্থ রসের এবং কোষ সমূহেরও বীজানু নাশক ক্ষমতা আছে, এজন্য সর্ব্বদা রোগাক্রমণ করিতে পারে না। কিন্তু কোন কারণ বশতঃ শরীরস্থ রোগ-প্রতিষেধক শক্তির হ্রাস হইলে, অর্থাৎ শারীরিক অত্যাচারবশতঃ বা অত্যধিক ইন্দ্রিয়সেবা বশতঃ অতিরিক্ত পরিশ্রম বা ব্যায়াম বশতঃ, অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম বশতঃ এবং রাত্রি জাগরণ, অনুপযুক্ত আহার, রুদ্ধগৃহে অবস্থান, উদ্বেগ, ভয় ও মানসিক অবসন্নতা প্রভৃতি কারণে কোষ সমূহের বীজানু নাশক ক্ষমতার হ্রাস হইলে রোগোৎপত্তি হইয়া থাকে। সাধারণতঃ রোগ-বীজানু রোগীর দেহ হইতে সুস্থ ব্যক্তির দেহে সংক্রামিত হইয়া থাকে, এইজন্য রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্রাদি, আহার্য্য-পাত্র প্রভৃতি ব্যবহার করা উচিত নহে। অধিক কি—রোগীর মল, মূত্র, থুথু, কফ, বমিত পদার্থ, এমন কি নখ লোমাদি কর্ত্তিত পদার্থের সহিত তাহার শরীরের অসংখ্য বীজানু নির্গত হইয়া দেহান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করে। এইজন্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ ডাক্তারেরা আজকাল চিকিৎসা-বিজ্ঞান ছাড়িয়া স্বাস্থ্যবিজ্ঞানেই বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। অর্থাৎ সুস্থাবস্থায়, কিরূপ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

আবশ্যক, কিরূপ আচার ব্যবহারে থাকা কর্ত্তব্য, কিরূপ জলবায়ু ব্যবহার্য্য, কিরূপ আহারাদি আবশ্যক ও শ্রেয়স্কর এবং কিরূপ লোক সমূহের সংস্পর্শ ত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ইত্যাদি বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানেই অধিকভাবে মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন। ইঁহাদিগের মতে সর্দ্দি-কাসি-নিউমোনিয়া প্রভৃতি বীজাণু সর্ব্বদাই দেহ মধ্যে অবস্থান করিতেছে। হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া বা অন্য কোন কারণবশতঃ দেহের রোগপ্রতিষেধক ক্ষমতার হ্রাস হইলেই কাস রোগোৎপত্তি হইয়া থাকে। *

শ্রীশশিভূষণ গুপ্ত।

আয়ুর্ব্বেদ-সমস্যা।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধসমূহের ফল যেরূপ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, আজকাল অনেক ঔষধেই তাহার কিয়ৎপরিমাণও প্রত্যক্ষীভূত হয়না দেখিয়া, আমার মনে কতগুলি গুরুতর সমস্যার উদয় হইয়াছে। যে সর্ব্বরোগহর মহৌষধ জরামরণনাশন, তাহা অবিশ্রান্ত সেবন করিয়া আমরা সামান্য ব্যাধির উৎপীড়ন হইতেও অব্যাহতি পাইতেছিনা, এবং যে পরম রসায়নের প্রভাবে বিগতেন্দ্রিয় চ্যবন মুনি "সুবৃদ্ধোঽভূত পুনর্য্যুবা", তাহা অবিরত উদরস্থ করিয়া যৌবনেও আমরা আমাদের সামান্য শক্তিটুকু পর্য্যন্ত কয়েক দিন মাত্র অব্যাহত রাখিতে পারিতেছি না, এতদপেক্ষা বিস্ময় ও পরিতাপের বিষয় আর কিছু হইতে পারে কি! এই বৈচিত্র্যের নিশ্চয়ই কোন গূঢ় কারণ বিদ্যমান আছে। আর্য্যঋষির উক্তি যদি প্রমত্তের প্রলাপ না হয়, তাহা হইলে আমরা যে এখন ঠিক সেই ঔষধই পাইতেছি, অথচ উহাতে পূর্ব্ববৎ সুফললাভ হইতেছে না, এমন কথা কখনই অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার করিতে পারা যায় না। সত্য বটে, বর্ত্তমান সময়ে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার ফল যতটুকু দেখা যায়, তাহাও অনেকস্থলে অন্যান্য চিকিৎসা-প্রণালী অপেক্ষা

---

* সংস্পর্শ দোষই সংক্রামক রোগ বৃদ্ধির কারণ। এক হুঁকায় তামাকুসেবন, এক পেয়ালায় চা পান—এ সকল কারণেও যে দেশে কাস রোগের আধিক্য ঘটিতেছে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? ইতঃপূর্ব্বে আমাদের "কাজের কথা" শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা এ সকল কথার উল্লেখ করিয়াছি। সিগারেটের প্রচলনাধিক্যও কাসরোগ বাড়িবার একটি কারণ। আমাদের এই যুক্তির সহিত মাধবের কাস নিদানের ত মতানৈক্য নাই। মাধব ত বলিয়াই গিয়াছেন,—

"ধূমোপঘাতাদ্রজসস্তথৈব ব্যায়াম রুক্ষান্ন নিষেবণাচ্চ
বিমার্গগত্বাচ্চ হি ভোজনস্য বেগাবরোধাৎ ক্ষবথোস্তথৈব।"

—আঃ সং

অধিক ; কিন্তু আমার মনে হয়, আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধগুলি যদি যথোচিত ফলবিধানে সমর্থ হইত, তাহা হইলে তাহাদের আশ্চর্য্য প্রতীকার-শক্তি দর্শনে নিশ্চয়ই জগদ্বাসী স্তম্ভিত হইয়া যাইতেন।

অবশ্য কালধর্ম্মে বনজ ভেষজাদির কথঞ্চিৎ হীনবীর্য্য হওয়ার আশঙ্কা একেবারে অমূলক নহে ; কিন্তু দ্রব্যাদির শক্তি কথঞ্চিৎ হ্রাসপ্রাপ্ত হইলেও তন্নিমিত্ত ফলের এত পার্থক্য কখনই সংঘটিত হইতে পারে না। অধিকন্তু, কালধর্ম্মের প্রভাব হইতে যখন আমরাও অব্যাহতি পাই নাই, তখন দ্রব্যাদির এই শক্তিহীনতা আমাদের তত ক্ষতির কারণ না ও হইতে পারে। বিগত কয়েক বৎসর যাবত আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের প্রস্তুত-প্রণালী সম্বন্ধে সন্ধান লইয়া আমি যে সকল বৈচিত্র্যের পরিচয় পাইয়াছি, আমার বিশ্বাস, ঔষধের ফলহানির নিমিত্ত তাহাই প্রধানতঃ দায়ী ; সুতরাং আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতির নিমিত্ত যে সকল গোলযোগের মীমাংসা করিয়া, ঔষধপ্রস্তুতের প্রকৃতপ্রণালী-প্রচারই আমি এখন আয়ুর্ব্বেদ-হিতৈষিগণের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। এ সম্বন্ধে বহু বিষয়েরই আলোচনা করা আবশ্যক হইলেও, প্রধানতঃ যে সকল ব্যাপারে আয়ুর্ব্বেদব্যবসায়িগণের এবং দেশবাসী সর্ব্বসাধারণের সমান স্বার্থ বিজড়িত রহিয়াছে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি নিম্নলিখিত বিষয় কয়টী মাত্র সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি :—১। ঔষধার্থ ব্যবহৃত ভেষজাদি, ২। মান-পরিভাষা, ৩। ঔষধের মাত্রা, ৪। ঔষধের উপাদান-বৈষম্য, ৫। ঔষধ-প্রস্তুত-প্রণালী, ৬। জারিত ধাতু, ৭। ঘৃত, ৮। মকরধ্বজ ও স্বর্ণসিন্দূর, ৯। চ্যবনপ্রাশ।

ঔষধার্থ ব্যবহৃত ভেষজাদি

—ঔষধ-প্রস্তুতের জন্য যে সকল দ্রব্য গৃহীত হয়, তৎসম্বন্ধে নানাপ্রকার গোলযোগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। উপযুক্ত অভিজ্ঞতার অভাবে এখন অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকই উদ্ভিজ্জ ও খনিজ ভেষজাদি নিঃসংশয়িতরূপে চিনিতে সক্ষম নহেন ; কাজেই ঔষধ-সরবরাহ-কারী “বেদে” ও “বেদে”দিগের উপর এ নিমিত্ত তাঁহাদিগকে নির্ভর করিতে হয়। এই বেদে এবং বেদেরা যে সকল সময় প্রকৃত জিনিষ আহরণ করিয়া থাকে, এমন কথা বোধ হয় কেহই শপথ করিয়া বলিতে প্রস্তুত হইবেন না।

ঔষধার্থ গৃহীত দ্রব্যাদির কথাই আমার এস্থলে বিশেষভাবে আলোচ্য। সকলেই জানেন, শার্ঙ্গধর বলিয়াছেন—

“শুষ্কং নবীনং যৎ দ্রব্যং যোজ্যং সকলকর্ম্মসু”।
“গুড়ূচী কুটজো বাসা কুষ্মাণ্ডশ্চ শতাবরী,
অশ্বগন্ধা সহচরো শতপুষ্পা প্রসারণী।
প্রযোক্তব্যা সদৈবার্দ্রা।”

সুতরাং শার্ঙ্গধরের মতে গুড়ূচী, কুটজ প্রভৃতি দশটী, এবং মতান্তরে “বাসানিম্বপটোলকেতকি” প্রভৃতি বচনানুসারে বাসকাদি উনিশটী দ্রব্য ব্যতীত ঔষধার্থ ব্যবহার্য্য অপর সমস্ত দ্রব্যই “নবীন অথচ শুষ্ক” হওয়া আবশ্যক। “শুষ্কদ্রব্যস্য যা মাত্রা আর্দ্রস্য দ্বিগুণা হি সা” এই বচন যে কেবল নিতান্ত প্রয়োজনের সময় অভাবপক্ষেই প্রযোক্তব্য, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই ; বিভিন্ন ঔষধ সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন কাল নির্দ্দিষ্ট হওয়াতেই শাস্ত্রকার

গণের উক্ত উদ্দেশ্য উত্তম রূপে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। কিন্তু আমি বহু স্থলে দেখিয়াছি, উল্লিখিত তালিকার বহির্ভূত অনেক দ্রব্য কাঁচা অবস্থায়ই ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং কোন কোন প্রধান চিকিৎসকও আমাকে বলিয়াছেন যে, কাঁচা জিনিষই নাকি অধিকতর ফলপ্রদ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দশমূলের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। দশমূলে মূলের পরিবর্ত্তে অনেক স্থলে যে কেবল বল্কলই প্রদত্ত হয়, এমন নহে, ঐ সকল দ্রব্যাদি উল্লিখিত তালিকার অন্তর্ভূত না হইলেও বেল, শোণা, গণিয়ারী, শালপানি প্রভৃতি প্রায় সকলই কাঁচা গৃহীত হইতে দেখা গিয়া থাকে। তা'রপর, যে কয়েটী জিনিষ কাঁচা ব্যবহার করার কথা উল্লিখিত বচনে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার মধ্যেও যে কোন কোন জিনিষ শুষ্কই গ্রহণ করা হয়, অশ্বগন্ধাই তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এতদ্ব্যতীত বেণেরা যে সকল বনজ ভেষজের সরবরাহকারী, সে সকল অতিশুষ্ক দ্রব্যের "নবীনত্বের" সীমা কোথায়, তাহা বোধ হয় কোন আয়ুর্ব্বেদব্যবসায়ীরই অবিদিত নহে। বেণের দোকানে ঐ সকল দ্রব্যাদি কিভাবে রক্ষিত হয়, তাহাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শিক্ষিত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক ভেষজসরবরাহের ভার স্বহস্তে গ্রহণ না করিলে ইহার সমুচিতপ্রতিকারের আশা সুদূরপরাহত। এইরূপে শুষ্কদ্রব্যের স্থলে কাঁচা জিনিষ, কাঁচার স্থলে শুষ্ক পদার্থ ও অতিপুরাতন শুষ্ক দ্রব্যাদি এবং মূলের স্থলে বল্কল গ্রহণের ফলে ঔষধের গুণবৈষম্য ঘটিতেছে কি না এবং ঘটিলেই বা কিরূপে ইহার প্রতিকার করা যাইতে পারে, আশা করি, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক মাত্রেই তাহা বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

এ প্রসঙ্গে আমি আর একটী বিষয়েও চিকিৎসকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমি দেখিয়াছি, একই নামে বিভিন্ন জিনিষ বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; দৃষ্টান্তস্বরূপ রাখাল-শশা, গাম্ভারী প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল একই নামের বিভিন্ন জিনিষের মধ্যে কোন্‌টী প্রকৃত ভেষজ—তাহা নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত একই জিনিষের বহু প্রকারভেদও দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে; যেমন "তুলসী", "ধুতুরা", "পান" প্রভৃতি। ইহাদের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে কোন্‌টী ঔষধে ব্যবহার্য্য, তাহা নির্দ্ধারিত এবং সাধারণের অবগতির নিমিত্ত প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। প্রসিদ্ধ ভেষজ বিদারী সম্বন্ধেও নানা গোলযোগ চলিতেছে। এই বিদারী দুই প্রকার; ইহাদের লতা যেমন ভিন্ন রকমের, স্বাদও তেমনি বিভিন্ন, এবং সম্ভবতঃ গুণেও কতক বৈষম্য থাকিতে পারে। এদেশে সাধারণতঃ ইহার একটীকে ক্ষীরবিদারী এবং অপরটীকে ভূমিকুষ্মাণ্ড বলা হয়। আমি যতদূর দেখিয়াছি, ঔষধাদির বর্ণনায় প্রায় সর্ব্বত্রই "বিদারী" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং কচিৎ দুই এক স্থলে "ভূকুষ্মাণ্ড" (যথা—সিদ্ধশাল্মলীকল্পে) এবং কোথায়ও বা "বিদারীদ্বয়ং" (যথা—শিবাগুড়িকায়) এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রকার যে উভয় প্রকার বিদারীই গ্রহণ করিয়াছেন, "বিদারীদ্বয়ং" কথা হইতেই তাহা প্রকাশ পাইতেছে। এখন যে স্থলে কেবল বিদারী লিখিত আছে, তথায় উভয় প্রকার বিদারীর মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণীয়

তাহা নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক; নচেৎ যাহার যেটি ইচ্ছা, সেটি ব্যবহার করিলে, ঔষধের ফলবৈষম্য অবশ্যম্ভাবী· সুতরাং কোন্ শ্রেণীর বিদারী কোন্ স্থলে গ্রহণ করিতে হইবে, চিকিৎসকগণ তাহা নির্ণয় না করিলে অসুবিধা দূরীভূত হইবেনা।

মান-পরিভাষা—ঔষধ প্রস্তুতের জন্য গৃহীত দ্রব্যাদির পরিমাণ সম্বন্ধে নানা স্থানে বিভিন্নমত দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। শাস্ত্রে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের মান অনেকস্থলে মাষা ও কর্ষ হিসাবে প্রদত্ত হইয়াছে, এই মাষা এবং কর্ষের পরিমাণ লইয়াই মতভেদ। মাগধ এবং কালিঙ্গ ভেদে আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে দ্বিবিধ মানের পরিচয় পাওয়া যায়; এই মাগধ মানের পরিমাণ কালিঙ্গ মানের পরিমাণ অপেক্ষা অনেক অধিক। শার্ঙ্গধর মাগধ ও কালিঙ্গ মানের যে পরিভাষা দিয়াছেন, "পরিভাষা-প্রদীপ"—স্থূত বচনে তাহার কথঞ্চিৎ পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। শার্ঙ্গধরের মতে মাগধ মানে মাষার পরিমাণ ৬ রতি যথা—

ষড়্ভিস্তু রক্তিকাভিঃ স্যান্মাসকো হেমধান্যকৌ।"

কিন্তু পরিভাষাপ্রদীপে ঐ মাষার পরিমাণ ১০ রতি যথা :—

"গুঞ্জাভি র্দশভিঃ প্রোক্তো মাষকো ব্রহ্মণা পুরা।"

ইহার পর শার্ঙ্গধর এবং পরিভাষাপ্রদীপ উভয় গ্রন্থেই মাগধমানে ৪ মাষায় ১ শাণ, ২ শাণে ১ কোল এবং ২ কোলে ১ কর্ষ ধরা হইয়াছে। পরন্তু কালিঙ্গ মানে শার্ঙ্গধরের মতে ১ মাষার পরিমাণ ৮ কদাচিৎ বা ৭ রতি—

"মাষো গুঞ্জাভিরষ্টাভিঃ সপ্তভির্বা ভবেৎ ক্বচিৎ"।

কিন্তু পরিভাষা প্রদীপে দেখা যায়, কালিঙ্গমানের মাষা ৬ রতি। কালিঙ্গ মানের কর্ষ শার্ঙ্গধরের মতে ১০ মাষায় (কর্ষ স্যাদ্দশমাষকঃ); কিন্তু পরিভাষা-প্রদীপের মতে এই মানের কর্ষ ১৬ মাষায় (মাষৈশ্চতুর্ভিঃ শাণঃ স্যাৎ • তদ্বয়ং কোল উচ্যতে • কোলদ্বয়ঞ্চ কর্ষঃ স্যাৎ)। এই উভয় মতের মধ্যে কোন্‌টী প্রকৃত, তাহা বুঝিবার উপায় আমাদের নাই; তবে শার্ঙ্গধর মৌলিক গ্রন্থ বলিয়া উহাই প্রামাণ্য মনে হয়। দেশবাসীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া শার্ঙ্গধর কালিঙ্গমানকেই এ কালের উপযুক্ত মান করিয়াছেন যথা—

যতো মন্দাগ্নয়ো হ্রস্বা হীনসত্বা নরাঃ কলৌ।
অতস্তু মাত্রা তদ্যোগ্যা প্রোচ্যতে সুজ্ঞসম্মতা॥

চরক এবং সুশ্রুতের মান আবার অন্যরূপ। চরক ১০ রতিতে এবং সুশ্রুত তাহার অর্দ্ধ অর্থাৎ ৫ রতিতে মাষা নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু এ দেশের আয়ুর্ব্বেদীয় ব্যবসায়িগণের মধ্যে কেহ বা চরক, কেহ বা শার্ঙ্গধর এবং কেহ বা পরিভাষা-প্রদীপের মত অনুসরণ করিলেও, অধিকাংশ চিকিৎসকই আর এক অভিনব মানের মাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন; সেই হিসাবে ১ মাষার পরিমাণ ১২ রতি বা ৵০ আনা। মাষার পরিমাণের এইরূপ হ্রাসবৃদ্ধি দ্বারা ফলের কোনরূপ বৈষম্য ঘটে না, এমন কথা বোধ হয় কেহই দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারিবেন না।

চরকসংহিতার প্রণেতা যদি অগ্নিবেশ ঋষি হইয়া থাকেন, তাহা হইলে উহা নিশ্চয়ই শার্ঙ্গধর ও সুশ্রুতের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ। এ

অনুমান সত্য হইলে, চরকের মাষার মান-বৃদ্ধির একটা যুক্তিযুক্ত কারণ কল্পনা করা যাইতে পারে; কারণ সে সময় মানবগণ অতিশয় বীর্য্যবান ছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে মানবগণের দুর্ব্বলতা দর্শন করিয়া, শার্ঙ্গধর ৬ রতিতে এবং সুশ্রুত ৫ রতিতে মাষা গ্রহণই সমীচীন মনে করিয়া থাকিবেন। আমাদের বর্ত্তমান বল-বীর্য্যাদি বিবেচনা করিয়া, বিশেষতঃ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান ঔষধের অত্যল্পতার যে অত্যধিক ক্ষমতা প্রতিপাদন করিয়াছেন, তদ্বিষয় চিন্তা করিয়া, একালে শার্ঙ্গধর কি সুশ্রুতের অনুসরণই সুসঙ্গত মনে হইলেও, এ দেশের আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ ১২ রতিতে মাষা ধরার আবশ্যকতা অনুভব করিলেন কেন, তাহা বুঝিবার শক্তি আমার মত অবোধের নাই। কাযেই এই মানের গোলযোগে ঔষধের ফলবৈষম্য ঘটিতে পারে কি না, এবং ঘটিলেই বা তাহার কিরূপ প্রতিকার করা যাইতে পারে তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত আমি কবিরাজ মহাশয়দিগকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীমুকুন্দবিহারী চক্রবর্ত্তী।

পুরাতন চিকিৎসা শাস্ত্রগুলি সম্বন্ধে আলোচনা।

আধুনিক্ চিকিৎসা শাস্ত্র (Modern Medicine) প্রবর্ত্তন হইবার পূর্ব্বে জগতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রবর্ত্তন হয়। তন্মধ্যে কতকগুলিও লোপ পাইয়া গিয়াছে, কতক গুলি কঙ্কালসার অবস্থায় পরিণত হইয়া কোন মতে জীবন ধারণ করিতেছে। ঐ পুরাতন চিকিৎসা শাস্ত্র গুলির মধ্যে আমরা অগ্র প্রধান গুলির উৎপত্তি বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ১। পুরাতন "মিশর" দেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্র (old Egyptian Medicine.) ২। পুরাতন "গ্রীক্" চিকিৎসা শাস্ত্র (old Greek Medicine) ৩। আরব চিকিৎসা শাস্ত্র যাহাকে আমাদের দেশে "হেকিমী" চিকিৎসা শাস্ত্র কহে এবং যাহার অপর একটীর নাম "ইউনানি" চিকিৎসা শাস্ত্র। (Arabian Medicine) ৪। আমাদের "আয়ুর্ব্বেদ"—চিকিৎসা শাস্ত্র। (Hindu Medicine) এইসব চিকিৎসা শাস্ত্রের উৎপত্তি—সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনিষী-গণের মধ্যে বিশেষ মতভেদ দৃষ্ট হয়। নিম্নে ভিন্ন ভিন্ন মতগুলি প্রদর্শিত হইল।

১। আয়ুর্ব্বেদ সর্ব্বপ্রথম চিকিৎসা শাস্ত্র। উহা হইতে মিশর, মিশর হইতে গ্রীক্ এবং গ্রীক্ হইতে আরব চিকিৎসা শাস্ত্রের উৎপত্তি। ২। আয়ুর্ব্বেদ ও প্রাচীন মিশর চিকিৎসা শাস্ত্র উভয়েই পরস্পরের সাহায্য ব্যতিরেকে উন্নত ও পরিবর্দ্ধিত। মিশর হইতে গ্রীক্ এবং গ্রীক হইতে আরব চিকিৎসা শাস্ত্রের উৎপত্তি। ৩। প্রাচীন মিশর চিকিৎসা শাস্ত্র—সর্ব্বপ্রথম চিকিৎসা শাস্ত্র। উহা

হইতে গ্রীক ও আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি। গ্রীক হইতে আরব চিকিৎসা শাস্ত্রের উৎপত্তি। ৪। গ্রীক চিকিৎসা শাস্ত্র পুরাতন মিশর ও হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্র এই উভয়বিধ চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে উৎপত্তি। গ্রীক হইতে আরব চিকিৎসা শাস্ত্রের উৎপত্তি। ৫। পুরাতন মিশর হইতে গ্রীক্, গ্রীক হইতে আরব এবং আরব চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি।

পুরাতন মিশর চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে আমরা সামান্য অবগত আছি। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ মিশর হইতে চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে ছয়টা হস্তলিপি (papyrus) উদ্ধার করিয়াছেন।

১। ইবারর্স বা লিপ্‌জিক্ প্যাপিরাস্ অনুমান খৃষ্ট জন্মিবার সাড়ে ষোলশ শত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত। ২। প্রধান বার্লিন বা লিডেন প্যাপিরাস্ অনুমান খৃষ্ট জন্মিবার চতুর্দ্দশ শত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত। ৩। দ্বিতীয় বার্লিন প্যাপিরাস্। ৪। ডিয়ার্ট প্যাপিরাস্। ৫। বৃটীশ মিউজিয়ামে রক্ষিত প্যাপিরাস্। ৬। প্যারিসে রক্ষিত প্যাপিরাস্।

উপরিউক্ত ছয়টা প্যাপিরাস্ মধ্যে "ইবারর্স প্যাপিরাস্" অতি পুরাতন এবং উহা হইতে পুরাতন মিশর দেশীয় চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হওয়া যায়। প্রধান বার্লিন প্যাপিরাসের সহিত আমাদের "অথর্ব্ববেদের" অনেক বিষয়ে ঐক্যতা দেখা যায়।

যাঁহারা বলেন যে প্রাচীন মিশর চিকিৎসা শাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ হইতে উদ্ভূত তাঁহাদের ঐরূপ মতের প্রধান কারণ যে ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্বে ভারতবাসী মিশরে যাইয়া সভ্যতার আলোক বিস্তার করেন। অপর পক্ষে বলেন যে আয়ুর্ব্বেদ ও পুরাতন মিশর চিকিৎসা শাস্ত্র পরস্পরের সাহায্য ব্যতিরেকে উন্নত ও পরিবর্দ্ধিত। আমাদের শেষোক্ত মতই বিশ্বাস যোগ্য বলিয়া মনে হয়, কারণ অধিকাংশ পণ্ডিতগণের মত এই যে, মিশরের সভ্যতা আমাদের সভ্যতা হইতে অতি প্রাচীন। আমাদের অথর্ব্ববেদ ও মিশরের প্যাপিরাস্ যদি সমসাময়িক বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে সে সময়ের চিকিৎসা শাস্ত্র চিকিৎসার প্রাথমিক অবস্থা অর্থাৎ স্বাভাবিক বুদ্ধি প্রসূত; যুক্তি বা পরীক্ষাপ্রসূত নহে। "Primitive stage by Instinct"। অবশ্য মিশর চিকিৎসা শাস্ত্র প্রাথমিক অবস্থা হইতে অনেক অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের গৌরবের বিষয় এই যে, উহা আমাদের আয়ুর্ব্বেদের ন্যায় এত উন্নত হয় নাই এবং মিশরের সভ্যতার সহিত মিশরের চিকিৎসা শাস্ত্র কালের সুদূর-গর্ভে লীন হইয়া গিয়াছে। বাজ সাহেবের মত হইতেও জানিতে পারা যায় প্রাচীন মিশর-চিকিৎসা প্রাচীন গ্রীক বা আয়ুর্ব্বেদের ন্যায় উন্নতি সাধন করে নাই।

(২) প্রাচীন গ্রীক ও রোমক চিকিৎসা শাস্ত্র

—এই শাস্ত্রের ক্রমোন্নতি চারিটা ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১। প্রথম অবস্থা—primitive stage derived from instinct up to 1200 B.C.

৪। দ্বিতীয় অবস্থা—Sacred or mystic stage—Rise of Pythagorian school up to 500 B C.

৩। তৃতীয় অবস্থা—Philosophic stage—Rise of Hippocratic and other schools up to 300 B.C.

৪। চতুর্থ অবস্থা—Anatomic stage —up to Gahn is 200 A D.

গ্রীক্ চিকিৎসা শাস্ত্র, পুরাতন মিশর চিকিৎসা শাস্ত্র উদ্ভূত—ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত মত। এখন দেখা যাউক, আয়ুর্ব্বেদের সহিত গ্রীক্ চিকিৎসা সম্বন্ধে কি সম্পর্ক? এ বিষয়ে তিনটী মতভেদ আছে।

১। গ্রীক্ চিকিৎসা শাস্ত্র মিশর ও হিন্দু উভবিধ চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে উদ্ভূত।

২। গ্রীক্ ও আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা পরস্পরের সাহায্য ব্যতিরেকে উন্নত ও পরিবর্দ্ধিত অর্থাৎ উভয়ই এক বৃক্ষের ফল।

৩। গ্রীক্ হইতে আরব এবং আরব হইতে হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্রের উৎপত্তি।

প্রাথমিক অবস্থা—কি মনুষ্য কি জীবজন্তু, প্রাণীমাত্রেরই চিকিৎসা সম্বন্ধে স্বাভাবিক বুদ্ধি প্রসূত একটা জ্ঞান ছিল। অসভ্য মানবদিগের এবং জাতি মাত্রেরই সভ্যতার পূর্ব্বে ঔষধাদির একটা জ্ঞান ছিল। সেই জ্ঞান সভ্যতার উন্নতির সহিত বর্দ্ধিত হইয়া চিকিৎসাশাস্ত্রের উৎপত্তি হয়। গ্রীক, হিন্দু প্রভৃতি সভ্যজাতির সভ্যতার প্রথম অবস্থায় কতকটা সাধারণ জ্ঞান ছিল।

দ্বিতীয় অবস্থা—এই অবস্থায় চিকিৎসা শাস্ত্রের সূত্রপাত হয়। এই সময়ে পণ্ডিত প্রবর পাইথেগোরাসের অভ্যুদয় হয়। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের অনেক উন্নতি সাধন করেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁহার প্রধান দান—রোগ ভোগের দিন নিরূপণ "the celebrated doctrine of numbers—the doctorin of critical days"—Encyclopardia Britannica.

রোগভোগের দিন সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ বিশেষ-রূপে নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, বায়ুজ্বরের ভোগ ৭ দিন, পিত্তজ্বরের ১০ দিন, কফ জ্বরের ১২ দিন প্রভৃতি।

আয়ুর্ব্বেদের ন্যায় হেকিমী চিকিৎসাশাস্ত্রেও রোগ-ভোগের দিন সম্যকভাবে নির্দ্ধারিত আছে। অবশ্য হেকিমগণ গ্রীক চিকিৎসাশাস্ত্র হইতে উহা গ্রহণ করিয়াছেন।

আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্র রোগভোগের নিরূপিত দিনের কথা বিশ্বাস না করিলেও একেবারে উহা বিস্মৃত হয় নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—নিউমোনিয়ার ক্রাইসিস্ (নিরাম অবস্থা) সাত দিনে হয় পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে লিখিত আছে—উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিন দিনের জ্বর (Three day Fever) সাত দিনের জ্বর (seven day fever) প্রভৃতি আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষিত ডাক্তারগণও স্বীকার করেন।

ইলিয়ট সাহেব তাঁহার গ্রীক্ ও রোম্যান মেডিসিন্ নামক পুস্তকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, নাইথেগোরাস,মিশর, ফিনিসিয়া, ব্যালডিয়া এবং সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে জ্ঞান অর্জ্জন করিতে আসিয়াছিলেন।

তৃতীয় অবস্থা—এই সময়ে গ্রীক্ চিকিৎসা শাস্ত্রে দুইটা ভিন্ন মতাবলম্বী দলের অভ্যুদয় হয়। এক দলের নাম এম্পিরিক্স (Empirics)। উহাঁদের বিদ্যামন্দির সিনিডস্ (cenidos) নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। অন্য দলের নাম ডগ্‌মেটিষ্ট (Dogmatists) ইহাঁদের বিদ্যামন্দির কস্ (cos) নামক স্থানে অবস্থিত ছিল।

১। এম্পিরিক্স—ইহাঁরা চিকিৎসার জন্য রোগের কারণ নির্ণয় বা শরীর ব্যব-

চ্ছেদ বিদ্যা (Anatomy) শিক্ষা আবশ্যক মনে করিতেন না। চিকিৎসার জন্য পর্য্যবেক্ষণ (observation) প্রত্যক্ষ লব্ধজ্ঞান (experience) এবং পরীক্ষিত ঔষধ সকল প্রকৃতির রোগে ব্যবহার করা চিকিৎসার উপায় বলিয়া যাইতেন।

২। ডগ্‌মেটিস্ট (Dogmatists)—ইহাঁরা চিকিৎসার জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রোগের "হেতু", "পূর্ব্বরূপ" (remote and proximate cause) হাওয়া, জল ও দোষের গুণাগুণ, রোগী যে কার্য্য করিতেন তাহা, আদ্য ঋতুর ক্রিয়া প্রভৃতি শরীরের উপর কিরূপ কার্য্য করে, তাহার অনুসন্ধান করিতেন। রোগের চিকিৎসার জন্য এম্‌পিরিক্সদের ন্যায় সাধারণ নিয়মানুযায়ী চিকিৎসা করিতেন না। প্রত্যেক রোগীর রোগোৎপত্তির বিশেষ কারণগুলি প্রত্যক্ষ করিয়া উপযুক্ত চিকিৎসা করিতেন। অবশ্য ইহাঁরা ইহা ব্যতীত এম্‌পিরিক্সদের ন্যায় পর্য্যবেক্ষণ, প্রত্যক্ষ লব্ধজ্ঞান প্রভৃতির সহায়তা চিকিৎসার জন্য গ্রহণ করিতেন।

আয়ুর্ব্বেদও ঠিক্ এই মতাবলম্বী ও এই ভাবে চিকিৎসা করেন। গ্রীক চিকিৎসা শাস্ত্রের তৃতীয় অবস্থায় সুবিখ্যাত হিপোক্রেটাসের অভ্যুদয় হয়। তিনি এ সময়ের গ্রীক্ চিকিৎসকগণের অগ্রণী ছিলেন। (the central figar of this stage). আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্র তাঁহাকে চিকিৎসার জন্মদাতা (Father of medicine) বলিয়া স্বীকার করেন। সুখের বিষয় পাশ্চাত্য শিক্ষিত চিকিৎসকগণ আমাদের চরক ও সুশ্রুতকে হিপোক্রেটিসের ন্যায় সর্ব্বোচ্চ আসন দিয়াছেন।

১। রোগোৎপত্তির কারণ—হিপোক্রেটিসের মতে রোগোৎপত্তির কারণ চারিটী "দোষ"—যাহাকে তিনি "ক্রেসিস্" (crasis) বলিয়াছেন এবং যাহাকে আরবগণ খিল্ট (khilt) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসকগণ "দোষ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই "দোষ"গুলির বিকৃত অবস্থা হওয়া রোগের কারণ বলিয়া সর্ব্ব পুরাতন চিকিৎসা শাস্ত্রগুলি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

এই দোষগুলি গ্রীক, রোমক ও আরব চিকিৎসকগণ চারিটী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা সোফ্‌রা (sofra—yellow bile) সউদা (souda—Black Bile) বল্‌গম্ (Balgam phlym) খুন (Khun—Blerod)। আয়ুর্ব্বেদ মতে দোষ তিনটী—"বায়ু পিত্ত কফ"।

২। দেহের "মূল" ধাতু—গ্রীক্, আরব ও হিন্দু চিকিৎসকগণ বলেন কতকগুলি মূল ধাতুর (elements) সমষ্টি দেহোৎপন্ন হয়। হিপোক্রেটিসের মতে মূল ধাতু চারিটী—"ক্ষিত্যপ তেজো মরুৎ" হিন্দু চিকিৎসকগণের মতে এই মূল ধাতু পাঁচটী—"ক্ষিত্যপ তেজো মরুদ্ব্যোম্"

৩। শরীরের সুস্থতা ও অসুস্থতা—হিপোক্রেটিসের মতে চারিটী দোষের সমতা ও চতুর্ভূতের বিশেষ সংযোগে (proper combination) শরীর সুস্থ থাকে। হিন্দু মতেও তাই। তিনটী "দোষের" সমতা ও পঞ্চভূতের বিশেষ সংযোগে শরীর সুস্থ থাকে। হিন্দু চিকিৎসকগণ পঞ্চভূতের বিশেষ সংযোগে যে সপ্ত ধাতুময় শরীর বর্ণন করিয়াছেন, সেই সপ্ত ধাতু সাম্য অবস্থায় না থাকিলে শরীরে অসুস্থতা উৎপাদন করে। শরীরের অসুস্থতা সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ বলেন কতকগুলি রোগ দোষের বিকৃত অব

জন্য উৎপন্ন হয়, আবার কতকগুলি দোষ ও ধাতুর বিকৃত অবস্থার জন্য উৎপন্ন হয়।

৪। রোগের ফলাফল নিরূপণ —রোগীর সাধারণ অবস্থা জানিয়া রোগের ফলাফল নিরূপণ (Prognosis) সম্বন্ধে হিপক্রেটাস অদ্বিতীয় ছিলেন। "In prognosis the Hippocratic school have perhaps never been excelled"—Encyclepardia Britannica.

এবিষয়ে আমাদের আয়ুর্ব্বেদ হিপক্রেটাস্ অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। চরকের সূত্রস্থানে সুখসাধ্য, কষ্টসাধ্য ও অসাধ্য রোগীর লক্ষণ যাহা বর্ণিত আছে এবং ইন্দ্রিয়স্থানে ইন্দ্রিয় সকলের পরীক্ষা সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত আছে—তাহা হইতে রোগের ফলাফল সম্বন্ধে সম্যকভাবে নিরূপণ করা যায়।

৫। রোগের পরিচয় (Diagnosis)—এবিষয়ে হিপোক্রেটাসের জ্ঞান সামান্যই ছিল। এবিষয়ে আমাদের আয়ুর্ব্বেদ অদ্বিতীয় তাহারা হেতু, সামান্য ও বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ, রূপ, সংখ্যা, বিকল্প, প্রাধান্য বলাবল, কাল প্রভৃতি নির্ণয় করিয়া রোগের প্রকৃতির নিরূপণ করিতেন।

নাড়ী (Pulse) সম্বন্ধে হিপোক্রেটাস্ কিছুই জানিতেন না। এবিষয়ে পাশ্চাত্য গ্রীক ও রোমক চিকিৎসকগণের মধ্যে গ্যালেন (Galen) অদ্বিতীয় ছিলেন। আমাদের আয়ুর্ব্বেদে কনাদ কৃত নাড়ীবিজ্ঞান, গ্যালেনের নাড়ীবিজ্ঞান অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট।

প্রস্রাব (urine) হিপোক্রেটাসের এফরিয়ম্ (aphoriam) নামক পুস্তকে বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। আয়ুর্ব্বেদের প্রয়োগ-চিন্তামণি নামক গ্রন্থে আমরা এ সম্বন্ধে বিশেষরূপে অবগত হই।

প্রয়োগ-চিন্তামণি গ্রন্থে আমরা জিহ্বা পরীক্ষা, মূত্র পরীক্ষা, নাসা পরীক্ষা, নেত্র পরীক্ষা প্রভৃতির বিষয় বিশদভাবে বর্ণিত আছে দেখিতে পাই, ইহা হইতে আমরা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রমতে রোগ নির্ণয় (diagnosis) করিয়া থাকি। হিপোক্রেটাসের রোগ নির্ণয় ও রোগের ফলাফল বিচার সম্বন্ধেও বিশেষ বর্ণনা আছে।

৬। চিকিৎসা (Treatment)—আয়ুর্ব্বেদের ন্যায় হিপোক্রেটাস ও ঔষধ অপেক্ষা পথ্যের বিশেষ উপকারিতা বলিয়া গিয়াছেন। "Great importance was given to diet medicines were regarded as secondary"—Encyclopardia Britannica.

আয়ুর্ব্বেদ—এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

বিনাপি ভেষজৈর্ব্যাধি পথ্যাদেব নিবর্ত্ততে।
নতু পথ্য বিহীনস্য ভেষজানাং শতৈরপি॥

আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রও ঐ মতের অনুমোদন করেন।

স্বাভাবিক ক্রিয়া দ্বারা শরীর ব্যাধি বিমুক্ত হয়—হিপোক্রেটাস বলিয়াছেন, রোগের কারণ দোষগুলি প্রথম অশুদ্ধ হইয়া রোগ উৎপন্ন করে; পরে সেগুলি স্বাভাবিক ক্রিয়া দ্বারা পরিপাক (digested) হইয়া দূরীভূত হয়। এই ভাবটী আমাদের আয়ুর্ব্বেদেও দেখিতে পাই। তরুণ জ্বরের সাম্যাবস্থায় লঙ্ঘনাদি ক্রিয়া দ্বারা রসের পরিপাক হইয়া নিরাম অবস্থায় পরিণত হয়। দূষিত রস শরীর হইতে দূরীভূত হওয়ার পর রোগী ব্যাধিমুক্ত হয়।

উপরিলিখিত বিষয়গুলি হইতে সম্যক অবগত হওয়া যায় যে, হিপোক্রেটাস্ লিখিত অনেকগুলি সত্যের সহিত আমাদের আয়ুর্ব্বেদের অনেক মিল আছে। এখন প্রশ্ন এই যে, হিপোক্রেটাস আয়ুর্ব্বেদকে এই সত্যগুলি দান করিয়াছেন বা আয়ুর্ব্বেদ হইতে হিপোক্রেটাস্ এই সত্যগুলি লইয়াছেন।

এসম্বন্ধে নিম্নে কতকগুলি মত দেওয়া গেল।

ডাক্তার পি, সি, রায় মহাশয় বলেন যে, হিপোক্রেটাস জন্মিবার পূর্ব্বেই হিন্দুরা "হিমারেল প্যাথলজির" উপর ভিত্তি করিয়া চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি বিধান করেন।

ডাক্তার এল্ডো, ক্যাষ্টাননি, বামার্গ সাহেবদের মতে হিপোক্রেটাস্ চিকিৎসা-সম্বন্ধে হিন্দু ও মিশর চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে অনেক বিষয় গ্রহণ করেন "Hoppocratus owes his medical inspirations to Egyptian and Indian medicine.

ডাক্তার ইলিয়ট সাহেব বলেন যে, হিপোক্রেটাসের সময় অস্ত্র চিকিৎসায় দ্বারা অর্ব্বুদ কর্ত্তন করা সাধারণ অস্ত্রচিকিৎসাভূত ছিল না, যদিও হিন্দুশল্য-চিকিৎসকগণ বহুপূর্ব্ব হইতেই এই চিকিৎসাতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

রোগোৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে হিপোক্রেটাস "চারিটী দোষের" কথা ও হিন্দুগণ ৩টা দোষের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতে বোধ হয় হিপোক্রেটাস্ হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে প্রথম তত্ত্ব অবগত হন। পরে নিজের বুদ্ধি অনুসারে আরও বিশদভাবে রোগোৎপত্তি বর্ণনা সম্বন্ধে চারিটী "দোষের" কথা বলিয়াছেন। যদিও হঠাৎ মনে হয়—হিপোক্রেটাসের ক্রেসিস্ (crasis) ও হিন্দুদের "দোষ" এক জিনিষ, অন্ততঃ আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ দুইটীকেই Homour বলিয়াছেন—তথাপি ক্রেসিস্ ও দোষের" মধ্যে অনেক প্রভেদ।

শ্রীআশুতোষ রায়, এল্ এম্ এস্।

শাক সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মত।

শাক আমাদের দেশে বহুল পরিমাণে ব্যবহার হয় বটে, কিন্তু শাকের সুখ্যাতি আদৌ নাই। যাবতীয় খাদ্যের মধ্যে শাক নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য। কর্ম্ম-কর্ত্তা লোক-জন খাওয়াইয়া জোড় হাত করিয়া বলেন—গরীবের শাক অন্ন। নীতিশাস্ত্রকার বলেন,—স্বচ্ছন্দ বনজাত শাকান্ন আহারে যে উদর পূর্ণ হয় সে দগ্ধোদরের জন্য কে মহা পাপ করিবে? পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, অঋণী এবং অপ্রবাসী হইয়া দিবসের তৃতীয় প্রহরে শাকান্ন আহার করাও সুখের। এইরূপ যেদিক দিয়াই দেখুন—শাক আমাদের দেশে জঘন্য খাদ্য বলিয়া পরিগণিত। গ্রাম্য কবির মুখ দিয়া শাকেরা স্বয়ং এ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে। সকল শাকের আত্ম কাহিনী আমার মনে নাই। একটু নমুনা দেখুন,—

সজনের শাক বলে আমি সকল শাকের হেলা।
আমায় মনে পড়্‌বে শুধু টানাটানির বেলা।

এদিকে ত শাকের এইরূপ নিন্দা, আয়ুর্ব্বেদও শাকের মাথায় একেবারে বজ্রাঘাত করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদ বলেন :—

শাকেষু সর্ব্বেষু বসন্তি রোগাস্তে হেতবো
দেহ বিনাশনায়।
তস্মাদ্ বুধঃ শাক বিবর্জ্জনন্তু কুর্য্যাৎ তথাম্লেষু
এব দোষঃ।

অনুবাদ ;—সকল প্রকারে শাকেই রোগ সকল বাস করিয়া থাকে এবং সেই সকল রোগ দেহ নাশের হেতু স্বরূপ। এই জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তির শাকাহার পরিত্যাগ করা উচিত। অম্লেও এইরূপ দোষ আছে।

এদেশে শাকের এইরূপ অপমান, কিন্তু য়ুরোপে শাকের খুব আদর। য়ুরোপীয় চিকিৎসকগণ বলেন যে, নিত্য কিছু কিছু শাক-সবজী বিশেষতঃ সবুজ রঙ্গের শাক-সবজী খাওয়া উচিত। এদেশে শাকের এইরূপ অনাদর এবং য়ুরোপে শাকের আদরের কারণ কি?

শাকের একটী গুণ এই যে, শাক আহার করিলে কোষ্ঠ শুদ্ধি হয়। "ঘৃতে বল বৃদ্ধি শাকে মল বৃদ্ধি" আমাদের দেশে প্রবাদ স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে যথেষ্ট মাংসের প্রচলন আছে। মাংসাহারে স্বভাবতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মে। শাক খাইলে মাংসের উক্ত দোষ নষ্ট হয় বলিয়া শাক মাংসাহারী দিগের পক্ষে আবশ্যক পদার্থ। আমাদের দেশে মাংসের ব্যবহার খুব কম এবং যেরূপ খাদ্য লোকে আহার করে, তাহাতে কোষ্ঠ বদ্ধতা হয় না। সুতরাং শাক এতদ্দেশীয় গণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় নহে।

কিন্তু শাক যতই নিন্দিত বা অপ্রয়োজনীয় হউক, আমরা নিত্য যথেষ্ট শাক আহার করিয়া থাকি এবং শাক নহিলে আমাদের চলেনা। ভোজের জন্য আজকাল লুচি-পোলাও ব্যবহৃত হইতেছে, কিন্তু পূর্ব্বে অন্নই ব্যবহৃত হইত এবং অন্নের সহিত প্রথমে পত্র-শাক হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বপ্রকার শাকই নিমন্ত্রিতের রসনার তৃপ্তি সম্পাদন করিত। এখনও আমাদের দেশে চতুর্দ্দশীর চৌদ্দশাক বিশেষ আদরের সহিত গৃহস্থ মাত্রেই আহার করিয়া থাকে।

শাক বলিতে এখন আমরা কেবল পত্র-শাক এবং নাল শাকই বুঝিয়া থাকি, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদে আমরা যেগুলিকে তরকারি বলি, সে সমস্তই শাক বলিয়া অভিহিত, পশ্চিমাঞ্চলেও তরকারী অর্থে শাক শব্দ হইয়া ব্যবহৃত থাকে।

শাক পাঁচ প্রকার। যথা পত্র-শাক, যেমন পালংশাক, নটে শাক, বেতো শাক প্রভৃতি, পুষ্প শাক, যেমন সজিনা ফুল, কুমড়া ফুল, সরিসার ফুল প্রভৃতি; ফল-শাক, যেমন লাউ, কুমড়া, বেগুন প্রভৃতি, নালশাক, যেমন লাউডাঁটা, পুঁই ডাঁটা, কুমড়াডাঁটা, প্রভৃতি এবং কান্দ শাক, যেমন - ওল, গাজর, মাণকচু মূলা প্রভৃতি। শাস্ত্রে এই পাঁচ প্রকার উত্তরোত্তর গুরু অর্থাৎ পত্রশাক হইতে পুষ্পশাক, পুষ্পশাক অপেক্ষা ফলশাক, ফলশাক হইতে নাল শাক এবং নাল শাক অপেক্ষা কন্দশাক গুরুপাক বলিয়া কথিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদে এই পাঁচ প্রকার শাক ব্যতীত সংস্বেদজ শাক বলিয়া আর এক প্রকার কথিত হইয়াছে এবং ইহা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুপাক।

আয়ুর্ব্বেদে শাক মাত্রেই বিষ্টম্ভী অর্থাৎ পেট ভার করে, রুক্ষ, অতিশয় মল বর্দ্ধক এবং মল-মূত্র নিঃসরক বলিয়া কথিত হইয়াছে। পত্র শাকের মধ্যে বেতো শাক এবং পল্‌তা নিন্দাবাদ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। যাঁহারা অপকারিতার ভয়ে শাক ব্যবহার করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা বেতোশাক এবং পল্‌তা যথেষ্ট আহার করিতে পারেন। পল্‌তা পিত্তনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, এবং জ্বর, কাস,ও ক্রিমিনাশক; বেতোশাক ত্রিদোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফনাশক, অগ্নি বর্দ্ধক. পাচক, লঘুপাক এবং প্লীহা, রক্ত পিত্ত, অর্শ ও ক্রিমিনাশক।

লাউ কচিই খাওয়া ভাল, পাকা লাউ অপথ্য কিন্তু কুমড়া কচি অপকারী, পাকা কুমড়াই সুপথ্য। পাকা কুমড়া বস্তি শোধক বলিয়া যাহাদের প্রস্রাবের দোষ, পাথরী প্রভৃতি রোগ আছে তাহাদের পক্ষে উপকারী। পাকা কুমড়া ত্রিদোষ নাশক, লঘু, অগ্নিদীপক এবং উন্মাদ, মূর্চ্ছা প্রভৃতি মানসিক রোগে হিতকর। এখানে কুমড়া অর্থে দেশী বা চালকুমড়া। বিলাতী বা মিষ্ট কুমড়ার উল্লেখ আয়ুর্ব্বেদে নাই।

পটোল একটী উৎকৃষ্ট তরকারি। ইহা ত্রিদোষ নাশক, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিজনক এবং জ্বর, কাস, শ্বাস, ও ক্রিমিনাশক। কচি বেগুন অগ্নিদীপক, লঘু এবং সুপথ্য। পাকা বেগুন পিত্ত বর্দ্ধক ও গুরু। বেগুন-পোড়া খুব লঘুপাক। হংস ডিম্বের ন্যায় যে এক প্রকার শাদা বেগুন আছে তাহা অর্শ রোগে বিশেষ হিতকর।

ওল - অর্শঃ রোগে বিশেষ হিতকর, কিন্তু দ্রদ্রু, কুষ্ঠ ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগে অহিতকর। ওল অগ্নিদীপক ও লঘু। কচি মূলাই সুপথ্য, বড় কাঁচা মূলা ত্রিদোষ বর্দ্ধক এবং গুরু। তবে সিদ্ধ করিয়া স্নেহ পদার্থ সহ সেবন করা যাইতে পারে। অন্য সমস্ত শাকই শুষ্ক হইলে অপকারী হয় কিন্তু শুষ্ক মূলা উপকারী।

উচ্ছে ও করলা—উচ্ছের সুপথ্য বলিয়া খ্যাতি আছে। উহারা পিত্তনাশক, বায়ুবর্দ্ধক নহে, লঘু, অগ্নিদীপক এবং জ্বর, কফ, পাণ্ডু রোগ ও ক্রিমি নাশক। ঝিঙ্গে পিত্ত নাশক কিন্তু কফ ও বায়ুবর্দ্ধক। চিঁচিঙ্গে (হোপা) পটোল হইতে কিঞ্চিৎ হীন গুণ এবং শোষ রোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকর।

নানা প্রকার শাকের নানা প্রকার গুণ শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে সে সকলের উল্লেখ করা হইলনা। যে সকল শাক তিক্ত, সেগুলি প্রায়ই পিত্ত ও কফ নাশক। যে সকল শাক মধুর রস-বহুল—সেগুলি কফবর্দ্ধক এবং পিত্ত নাশক। তিক্ত ও কষায় রস বিশিষ্ট শাক সকল প্রায়ই বায়ুবর্দ্ধক।

কর্কশ, পুরাতন, পোকালাগা, শুষ্ক, অকালজাত অর্থাৎ যে সময়ে যে শাক সাধারণতঃ জন্মেনা—সেই সময়ে উৎপন্ন,—এরূপ শাক আহার করা উচিত নহে। শাক সিদ্ধ করিয়া এবং ঘৃত-তৈলাদি স্নেহ পদার্থ সংযুক্ত করিয়া আহার করা উচিত। কিন্তু কচি এবং যাহা সম্যক পুষ্ট হয় নাই—এরকম কন্দশাক ব্যবহার করা উচিত নহে।

এক্ষণে শাক সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মত লিখিত হইতেছে। কন্দ-শাককে ইংরাজীতে

রুটস এবং টিউবরস (Roots and Tubers) এবং অন্যান্য শাককে গ্রীন ভেজিটেবলস, (Green vegetables) বলে।

কন্দশাক ব্যতীত অন্যান্য শাকে পুষ্টিকর পদার্থ খুব কম আছে এবং প্রায় শতকরা নব্বই ভাগ জল আছে। সিদ্ধ করিলে জলীয়াংশ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। জল ব্যতীত অল্প কার্ব্বোহাইড্রেট, অত্যল্প প্রোটিড়, চিনি চর্ব্বি, এবং সেলুলোজ ও ধাতব লবণ থাকে।

এইখানে প্রোটিড় প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া উচিত। কেননা সকল পাঠকের উহা জানা নাও থাকিতে পারে। পাশ্চাত্য মতে খাদ্যে পাঁচ প্রকার পদার্থ থাকে। যথা প্রোটিড়, কার্ব্বোহাড্রেট, চর্ব্বি, নানা প্রকার ধাতব লবণ এবং জল। মাংস, ডিম, ছানা প্রভৃতি প্রোটীড় বহুল খাদ্য এবং মনুষ্য শরীর প্রধানতঃ প্রোডিড় জাতীয় খাদ্য দ্বারা নির্ম্মিত। কার্ব্বোহাইড্রেট তিন প্রকার, যথা—শ্বেতসার (struch), চিনি এবং সোলুলোজ। চাউল প্রভৃতির অধিকাংশই শ্বেতসার, এবং শ্বেতসারই পরিপাক প্রাপ্ত চিনির আকারে উদ্ভিদ দেহে সঞ্চারিত হয়। আর যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষের মধ্যে শ্বেতসার থাকে, সেলুলোজ সেই গুলিকে আবৃত এবং পরস্পর সংযুক্ত করিয়া রাখে। কচি সেলুলোজ হজম হয়, কিন্তু পাকা সেলুলোজ কাষ্ঠবৎ কঠিন বলিয়া হজম হয় না। আর ধাতব লবণ নানা প্রকার। আমরা সাধারণতঃ যে লবণ আহারকরি—তাহাও এক প্রকার ধাতব লবণ। এই সকল দ্রব্য শরীরে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিয়া থাকে।

শাকে যথেষ্ট পরিমাণে ধাতব লবণ—বিশেষতঃ পটাশ (Potash) ঘটিত লবণ আছে, সেইজন্য ইহা শরীরের পক্ষে বিশেষ হিতকর। শাকে প্রচুর সেলুলোজ থাকে বলিয়া উহার অল্প অংশই জীর্ণ হয়, অধিকাংশ মল রূপে নির্গত হইয়া যায়। কিন্তু যে অংশ জীর্ণ হয়না, তাহা অন্ত্রের কার্য্যকারী শক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এইজন্য শাক খাইলে কোষ্ঠশুদ্ধি হয়।

যাঁহাদের পরিপাক শক্তি কম, তাঁহারা শাক সহজে জীর্ণ করিতে পারেনা। কাহারও কাহারও শাক খাইলে উদরে বায়ু সঞ্চয় হয়। শাক হজম হওয়া—নাহওয়া কিন্তু অনেকটা রন্ধনের উপর নির্ভর করে, সুসিদ্ধ হইলে শাক সহজে জীর্ণ হয়। পাকা শাকে সেলুলোজ অধিক থাকে এবং উহা কাষ্ঠবৎ কঠিন হইয়া পড়ে বলিয়া পাকা শাক হজম হয়না। শাক বাসি হইলে উহার স্বাদ নষ্ট হইয়া যায় এবং সহজে হজম হয় না। এই জন্য শাক টাট্‌কা খাওয়াই ভাল।

অন্যান্য শাক অপেক্ষা কন্দশাকের মধ্যে গোল আলুই শ্রেষ্ঠ এবং উহা সকল পরিবারেই নিত্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।*

গোল আলুতে শতকরা ৭১·৭৭ ভাগ

* গোল আলু পূর্ব্বে এসিয়া বা য়ুরোপে ছিলনা। স্যার ওয়ালটার ব্যালে কর্ত্তৃক আমেরিকা হইতে আনীত হয়। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই ইহা সর্ব্ব দেশে যথেষ্ট প্রচলিত হইয়াছে। এখন আলু না [illegible] গৃহস্থের চলেনা। সুতরাং আলুর আবিষ্কারে যে যথেষ্ট উপকার হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা [illegible] কিন্তু এই আলু আবিষ্কার করিয়া তজ্জন্য স্যার ওয়ালটার ব্যালেকে অনেক নির্য্যাতন সহ্য [illegible]

জল, ১'৭৯ ভাগ প্রোটিড, ০'১৬ ভাগ চর্ব্বি, ২০'৫৬ ভাগ কার্ব্বোহাইড্রেট্, ০'৭৫ ভাগ সেলুলোজ, এবং ০'৯৭ ভাগ লবণ আছে। প্রোটিড এবং চর্ব্বির ভাগ অত্যন্ত কম বলিয়া কেবল মাত্র আলু খাইলে মনুষ্যের দেহ রক্ষার উপায় হয় না। মৎস্য, মাংস, প্রভৃতি প্রোটিড বহুল খাদ্যের সহিত আলু আহার করিলে উহা উৎকৃষ্ট খাদ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। এদেশে চাউল যেমন প্রধান খাদ্য, আর্য্যাবর্ত্ত দেশে আলু সেইরূপ প্রধান খাদ্য। একজন পূর্ণবয়স্ক আইরিস প্রত্যহ ২।৩ সের আলু খাইয়া থাকে।

আলু সুসিদ্ধ হইলে বেশ সুস্বাদু এবং সহজ-পথ্য হইয়া থাকে। আলু সিদ্ধ করিয়া খাইতে হইলে খোসা শুদ্ধ সিদ্ধ করা উচিত। খোসা ছাড়াইয়া সিদ্ধ করিলে কতক লবণ বহির্গত হইয়া যায়, কিন্তু আমাদের দেশে ঝোল, দালনা, চড়চড়ি প্রভৃতির জল ফেলিয়া দেওয়া হয়না বলিয়া তরকারিতে আলুর খোসা ছাড়াইয়া দেওয়া ভাল।

যে আলু সিদ্ধ করিলে বেশ মাখা-মাখা বা বালি-বালি হয়, তাহাই উৎকৃষ্ট এবং সহজ পাচ্য। কিন্তু যদি আলু কঠিন থাকে, তাহা হইলে মাখা-মাখা হয় না এবং তাহা সহজে জীর্ণ হয় না। যাহাদের পরিপাক শক্তি দুর্ব্বল তাহাদের ঐরূপ আলু খাওয়া উচিত নহে।

গোল আলু ব্যতীত রাঙ্গা আলু, মৌ আলু, চুবড়ি আলু ও শাঁক আলু আমাদের দেশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রাঙা আলু ও মৌ আলু এক জাতীয় এবং কাঁচা বা রাঁধিয়া খাওয়া যায়। রাঙ্গা আলু ও মৌ আলুতে যথেষ্ট ষ্টার্চ্চ ও চিনি আছে এবং ইহা বেশ পুষ্টিকর। চুপ্‌ড়ি আলুতেও যথেষ্ট ষ্টার্চ্চ আছে; উহা সিদ্ধ করিলে গোল আলুর ন্যায় সুস্বাদু হয় এবং উহা প্রায় তদ্রূপ গুণযুক্ত। শাঁক আলু কাঁচা খাওয়া যায়। ইহাতে যথেষ্ট জলও যথেষ্টও চিনি আছে।

বিটের কন্দে প্রায় ৮৭ ভাগ জল, ৯ ভাগ কার্ব্বোহাইড্রেট, প্রধানতঃ চিনি ১½, প্রোটিড, এবং একভাগ লবণ আছে। বিট পাকা এবং কঠিন না হইলে সহজে হজম হয়। শালগম, গাজর, মানকচু প্রভৃতিতে যথেষ্ট ষ্টার্চ্চ আছে, কিন্তু অন্যান্য দ্রব্য খুব কম। ইহাদের উপাদানের অল্প-বিস্তর পার্থক্য থাকিলেও সাধারণতঃ ইহারা প্রায় এক প্রকার। কন্দে প্রোটিড ও চর্ব্বি কম বলিয়া মাংস, মৎস্য প্রভৃতি প্রোটিড ও চর্ব্বি বহুল খাদ্যের সহিত আহার করা উচিত।

পেঁয়াজ পুষ্টিকর কিন্তু গরম। পেঁয়াজে কিছু প্রোটেড এবং চিনি আছে। গন্ধক বহুল এক প্রকার তীক্ষ্ণ তৈল থাকায় পেঁয়াজে ঐরূপ গন্ধ অনুভূত হয়। কাঁচা পেঁয়াজ অপেক্ষা সিদ্ধ পেঁয়াজ লঘুপাক। রসুন—পেঁয়াজের ন্যায় গুণযুক্ত কিন্তু তীক্ষ্ণ।

কোঁড়ক বা ভুঁই কোঁড়ে যথেষ্ট প্রোটিড, কিছু চর্ব্বি ও চিনি এবং একপ্রকার অম্লরস আছে। কোঁড়ক যদি সহজে হজম হইত, তাহা হইলে উহা পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে

ইয়াছিল। মানুষ এমনই অকৃতজ্ঞ। এক্ষণে যাঁহারা আলু ভক্ষণ করেন, তাঁহাদের স্যার ওয়ালটার [illegible]দের আত্মার সদ্গতির জন্য প্রার্থনা করা উচিত।

পরিপোষিত হইতে পারিত। কিন্তু কোঁড়ক অত্যন্ত দুষ্পাচ্য এবং অনেকেরই উহা সহ্য হয়না। কোঁড়ককে ইংরাজিতে মশরুম (Mushroom) বলে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মাংস খাইলে কোষ্ঠ বদ্ধতা জন্মে বলিয়া শাক খাওয়া আবশ্যক। তাহা ব্যতীত শাক না খাইয়া, কেবল মাংস খাইলে, স্কার্ভি রোগ হয় বলিয়াও য়ুরোপীয়দিগের পক্ষে শাক খাওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের দেশে শাকের এত অধিক ব্যবহার যে শাক কমাইয়া দুগ্ধ, ডিম্ব, ঘৃত, মৎস্য প্রভৃতি বেশী খাওয়া উচিত। কিন্তু দেশের এমনই দুর্ভাগ্য, অন্য সুখাদ্য দূরে থাকুক—শাকও দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িতেছে।

তবে দুষ্প্রাপ্য হইলেও অনেক সময় লোকে প্রচুর মূল্য দিয়া শাক ক্রয় করিয়া থাকে। সেই পয়সায় অন্য শ্রেষ্ঠ সুখাদ্য অনায়াসে খাওয়া যাইতে পারে। খাদ্যহিসাবে শাকের উপযোগিতা যে অতি কম, তাহা পাঠকগণ এই প্রবন্ধ হইতে বুঝিতে পারিবেন।

মহিলাগণের চিকিৎসা শিক্ষা।

(৩)

(অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য)

আমি আজ কা'র মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম জানি না,—স্নান করিয়া আসিয়া পিসীমার জন্য পূজার যায়গা করিতে বসিয়াছি—এমন সময় আমার স্বামী আসিয়া ডাকিলেন—"পিসীমা।"

পিসীমা তখন বাড়ীতে ছিলেননা, স্নান করিতে গিয়াছিলেন। আমি তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বলিলাম—"এত ভাবাইতে হয়? সাত আট দিন কোন খবরই নাই, আমরা ভাবনায় মরিয়া যাইতেছিলাম আর কি! যা' হো'ক এসেছ, বাঁচাইলে।"

স্বামী বলিলেন,—"রোজই আসিব-আসিব কথা হইতেছিল, সেইজন্য ৭।৮ দিন খবর পাও নাই।"

আমি বলিলাম,—"তা' যা' হোক, এখন ঘরে চল, কাপড় চোপড় ছাড়, হাতে-মুখে জল দাও।"

স্বামী বলিলেন,—"পিসীমা কোথায়?"

আমি বলিলাম,—"তিনি এখনি আসিবেন, স্নান করিতে গিয়াছেন।"

স্বামী বলিলেন,—"আমি একটু পরে আসিয়া বসিতেছি, তোমাদের খবর দিতে আসিলাম। আমার সঙ্গে আমাদের খাজাঞ্চি বাবু ও তাঁহার স্ত্রী আসিয়াছেন, খাজাঞ্চি বাবুর স্ত্রীর বড় ব্যারাম, তাঁহারা নৌকাতেই আছেন। আমি একখানা গাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাদের লইয়া আসিতেছি। তাঁহারা আজ আমাদের বাড়ীতে থাকিবেন, তা'র পর কাল ক'লকাতায় যাইবেন। সেইখানে

ভাল ডাক্তারের দ্বারা খাজাঞ্চি বাবুর স্ত্রীর চিকিৎসা হইবে। আমিও বোধ হয় সঙ্গে যাইব।"

আমি বলিলাম—"তা' বেশ। তা'—তাঁ'রা কি জাতি? আমাদের রান্না খাইবেন তো'?

স্বামী বলিলেন,—"খাইবেন, তাঁ'রা আমাদেরই জাতি।" কথা শেষ করিয়া স্বামী চলিয়া গেলেন। আমি নির্নিমেষ-নেত্রে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম।

অল্পক্ষণ পরে পিসীমা স্নান করিয়া আসিলেন। আমি বলিলাম—"পিসীমা, তাড়াতাড়ি পূজা সাঙ্গ করিয়া লও, আমাদের বাড়ীতে দুইজন কুটুম্ব আসিতেছেন। শুধু তাই নয়, তোমাকে বোধ হয় আবার একটী রোগীরও চিকিৎসা করিতে হইবে।"

পিসীমা বলিলেন—"কি রকম?"

আমি সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম।

পিসীমা পূজা করিতে গেলেন। আমি বাহিরের ঘরটা একটু ঝাঁট-ঝোট্ দিয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়া আসিলাম। স্বামী, খাজাঞ্চি বাবু ও তাঁহার পত্নীও অল্প কাল পরে আসিয়া পঁহুছিলেন। আমাদের বাড়ীতে একটা যেন মহা সমারোহ পড়িয়া গেল।

খাজাঞ্চি বাবুর স্ত্রী একে অভ্যাগত হইয়া আসিয়াছেন, তাহার উপর রোগী,—আমি ও পিসীমা তাঁহার যত্ন বিশেষ করিয়াই করিতে লাগিলাম। তাঁহার সহিত আলাপ আপ্যায়নে আমরাও বড় সন্তুষ্ট হইতে লাগিলাম। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার সহিত আমার যেন সখীত্ব জন্মিয়া গেল।

আহারাদির পর, বিশ্রামের পর—বৈকালে বেলা তাঁহার ধরণী-চুম্বিত-নিবিড়কৃষ্ণ অলকারাশি বন্ধন করিয়া দিতে দিতে বলিলাম, —"আপনারা কালই যাইবেন? আমার ইচ্ছা, এখানে দিন কয়েক কাটাইয়া যান, কিন্তু সে কথা শুনিবেন কি?"

খাজাঞ্চী বাবুর স্ত্রী বলিলেন,—"শুনিব না কেন? খুবই শুনিব। আপনাদের আদর-যত্ন দেখিয়া এস্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে দুঃখ হয়, কিন্তু শুনিয়াছেন তো, আমি রোগে ভুগিতেছি, আর তাহারই জন্য তো কলকাতা যাইতেছি, সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও তো থাকিবার যো নাই।"

আমি বলিলাম, "আর যদি আপনার রোগ সারাইবার উপায় এইখানেই করা হয়। তা' হ'লে তো থাকিতে রাজি আছেন?"

তিনি বলিলেন —"তা' হ'লে আর রাজি হইব না কেন? কিন্তু এত বড় শক্ত রোগ—এখানে কে সারাইবে? সেখানকার বড় বড় ডাক্তারেরা তো হারি মানিয়াছে। সেই জন্যই তো কল্'কাতায় যাওয়া, নইলে আর ছুটী লইয়া—পয়সা খরচ করিয়া লইয়া যাইবেন কেন?"

আমি বলিলাম—"আপনি যদি নির্ভর ক'রতে পারেন, তা' হ'লে বড় বড় ডাক্তারেরা যা' আরাম ক'রতে পারেননি, তা' আমার পিসীমা-ডাক্তারে মন্ত্রের মত আরাম ক'রে দেবেন। পিসীমা আমার এমনতর অনেক রোগই আরাম ক'রেছেন। কিন্তু আপনি নির্ভর ক'রতে পারবেন কি?"

খাজাঞ্চী বাবুর পত্নী বলিলেন,—"[illegible], উপকার দেখতে পেলে নির্ভর ক'রতে পা'রব না কেন; তা' যদি [illegible]

তো আমাদের ক'লকাতা যাওয়ার জন্য অনেক টাকা খরচও বেঁচে যেতে পারে, আর উনিও দিন কতক আমাকে এখানেই রেখে চাকরি স্থানে গিয়ে আবার চাকরিতে লাগ্‌তে পারেন।"

আমি বলিলাম—"দেখুন, আপনারা যে নৌকায় আসিয়াছেন, তা' এখান থেকেই ছাড়িয়া দিন। আপনার স্বামীকে ব'লে এখানে এক সপ্তাহ থেকে যদি কোন ফল বুঝ্‌তে না পারেন, তা'র পর কল'কাতা যা'বেন। তখন এখান থেকেই নৌকা ক'রে গেলে চ'লবে, এখানেও তো নৌকা পাওয়া যায় না—এমন নয়।"

খাজাঞ্চী বাবুর পত্নী সে কথায় সম্মত হইলেন, তাঁহার স্বামীও এপ্রস্তাবে অসম্মত হইলেন না, পিসীমাও তাঁহার চিকিৎসার ভাব গ্রহণ করিতে রাজি হইলেন।

পিসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বয়সটা কত হইয়াছে?" খাজাঞ্চী বাবুর গৃহিণী বলিলেন,—"সতের বৎসর।"

পিসীমা শুধাইলেন—"ছেলে পিলে হয় নি?"

খা-স্ত্রী।—না।

পিসী। অসুখের অবস্থাটা সব খুলে বল দিকিনি।

খা-স্ত্রী। এক বছর থেকে এ রকমটা হ'য়েছে। রোগটা কবিরাজেরা ব'লেছিল—অজীর্ণ। নানা রকম ব্যবস্থাও করা হ'য়েছিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না।

পিসী। কি হয়?—যা' খাও—তা' জীর্ণ হয় না। দাস্ত কেমন হয়?

খা-স্ত্রী। রোগই তো ঐ। দাস্ত প্রায়ই ভাল হয় না, দশ পনের দিন পরে আবার বা একদিন খুব খানিক হড়্‌হড়্‌ ক'রে দশ পনের বার দাস্ত হ'য়ে প'ড়ল।

পিসী। অম্বল হয়? বুক জ্বলে কি?

খা-স্ত্রী। হাঁা। বিকেল বেলা রোজই বুক জ্বলে। সকাল বেলা পেটটা ফেঁপে থাকে। খেলেও হয়,—না খেলেও হয়—সর্ব্বদাই যেন পেটটা ভ'রে আছে বোধ হয়।

পিসী। তুমি পরিশ্রম কি রকম কর? রান্না-বান্না—সংসারের কাজ-কর্ম্ম কি নিজেই কর,—না সংসারের অন্য লোকজন আছে?

খা-স্ত্রী। কাজ-কর্ম্ম আমি বড় ক'র্‌তে পারি না,—রান্নাবান্না আমাকে ক'র্‌তেও হয় না—অন্য লোকজন বাড়ীতে নাই কিন্তু ঝি ঠাকুর চাকর—সবই আছে,—সেই জন্য আমাকে কাজ কর্ম্ম বড় একটা ক'র্‌তে হয় না।

পিসী। ঐ তো হ'চ্ছে তোমার রোগের কারণ, ও সব যদি না থাক্‌তো, তা' হ'লে তোমার কোন রোগই হ'ত না। আমার চিকিৎসায় থা'ক্‌তে হ'লে তোমাকে খাট্‌তে হ'বে, চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌লে চ'ল্‌বে না।

খা-স্ত্রী। তা' খাট্‌তে আমি রাজি আছি, কিন্তু খাট্‌বার শক্তি তো থাকা চাই;—কাজ কর্ম্ম ক'র্‌তে গেলে যে বড্ড কষ্ট বোধ হয়।

পিসীমা। অভ্যাস ওই রকম ক'রেছ—তাই কষ্ট হয়, আবার খাট্‌বার অভ্যাস ক'র্‌লে খাট্‌তে পা'র্‌বে।

খা-স্ত্রী। তা' ওষুধের ব্যবস্থাটা কি ক'র্‌বেন?

পিসী। ওষুধের ব্যবস্থা ব'লব বই কি! তা' ওষুধের ব্যবস্থা তো তোমায় শুধু ব'ল্‌লে হ'বেনা, আমার বউমায়েরই ওষুধের কথা

গুলি ভাল ক'রে শুন্‌তে হ'বে। বউমাই তো ব্যবস্থা শুনে ওষুধ তৈরি ক'রে দেবেন।

আমি বলিলাম—তুমি বল না পিসীমা, আমি তো সব শুনছি।

পিসীমা বলিলেন,—আমাদের বাগানের গাছের পাতি লেবুর গাছটার লেবুগুলো যে ফুরিয়ে গেল। কাল বাজার থেকে কতকগুলো পাতিলেবু আনা'তে হ'বে। আর খানিকটা বিট নুন আনা'তে হ'বে। কতক গুলো ডাবও চাই। সকাল-সন্ধ্যেয় দু'বার ক'রে দু'আনা ভ'র বিট নুনের গুঁড় মুখে ফেলে একটু জল খেতে হ'বে। সকালে ঐটে খাওয়ার এক ঘণ্টা পরে—বড় হ'লে আধখানা—আর ছোট হ'লে একটা পাতি লেবুর রস এক ছটাক জলে গুলে সেই জলটা চুমুক দিয়ে খেতে হ'বে। দু'পর বেলা ভাত খাওয়ার একঘণ্টা পরে আধ পোয়া টাটকা ঘোল ঐ রকম দু'আনা ভ'র বিট নুনের গুঁড় মিশিয়ে সেইটে খেয়ে ফেল্‌বে। বিকাল বেলা খানিকটা ডাবের জল—এ ছাড়া আমি আর কোন ওষুধের ব্যবস্থা ক'রব না,—এই আমার ওষুধ।

খা-স্ত্রী। সে কি!—এত বড় রোগ, এতেই সেরে যা'বে?

পিসী। এসব রোগ মা, ওষুধে সারে না, এ সব রোগ সারে নিয়মে। একটু বেছে-গুছে খাওয়া, পরিশ্রম করা—এই সবই হ'ল—এসব রোগের ওষুধ। লোকনাথ বদ্দি ব'লত—অজীর্ণ সারা'তে হ'লে পরিশ্রমের মত ওষুধ নেই, কোন ওষুধ না খেয়ে শুধু পরিশ্রম ক'র্‌লেও নাকি অজীর্ণ রোগ সেরে থাকে।

খা-স্ত্রী। তা' আমি আপনার ব্যবস্থা-তেই দিন কতক থা'কব, কিন্তু শুধু এতে সা'র্‌বে কিনা তাই ভাবছি।

পিসী। ওই ভাবনাইতো হ'য়েছে রোগ না সার্‌বার কারণ। মনটা যদি স্থির ক'র্‌তে পার এবং আমার কথাগুলি যদি সব পালন কর—তা' হ'লে তুমি যে এখান থেকেই সার্‌তে পা'রবে, তা' আমি খুব জোর ক'রে ব'ল্‌তে পারি। তবে আরও কতকগুলি নিয়ম পালন ক'র্‌তে হ'বে। দিনের বেলায় ঘুমাও কি?

খা-স্ত্রী। একটু ঘুমাই বই কি, খাওয়ার পর দু'তিন ঘণ্টা ঘুমান অভ্যাস আছে।

পিসী। তা'তে আর অজীর্ণ হ'বে না। লোকনাথ বদ্দি ব'লত—

দিবা নিদ্রা আয়ু হরে।
এ কাজ যেন কেউ না করে॥

লোকনাথ বদ্দি আরও ব'লত—যতগুলি কারণে অজীর্ণ রোগের উৎপত্তি হয়, তা'র মধ্যে দিনে ঘুমানো একটি প্রধান কারণ। দিনে ঘুমানো, রাত্রি জাগরণ, অধিক জলপান, অল্প খাওয়া, বেশী খাওয়া বা অসময়ে খাওয়া, মল মূত্রাদির বেগ ধারণ করা—এই সব কারণে অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হয়। তা' এখনকার দিনে হেলায়-শ্রদ্ধায় এর অনেকগুলি কারণই অনেকে ক'রে থাকে। বাঙ্গালা দেশে অজীর্ণ রোগেও সেইজন্য লোকে বেশী ভোগে শুন্‌তে পাওয়া যায়।

আমি বলিলাম,—কি রকম নিয়মে থাক্‌লে অজীর্ণ রোগ হয় না পিসীমা?

পিসীমা বলিলেন,—লোকনাথ বদ্দি অজীর্ণ রোগ জন্মাবার যে কারণগুলি ব'লত—ব'ললাম, সেগুলি না ক'র্‌লেই অজীর্ণ রোগ জন্মা'বার কোন ভয় থাকে না।

কালে মেয়েমানুষদের রোগের কথা কে কবে আবার জান্‌তে পা'র্‌তো। সেকালের মেয়েমানুষেরা—যত বড় ঘরের মেয়েই হোন,—ছড়া-ঝাঁট দেওয়া, ঘর-দুয়ার পরিষ্কার করা রান্না বান্না করা—এই সব নিয়েই থাকত। গৃহস্থ-সংসারের মেয়েরা সকাল বেলা এক পেট ক'রে পান্ত ভাত খেয়ে নিয়ে তা'রপর কাজ কর্ম্ম ক'রত। পরিশ্রমের গুণে সে পান্ত ভাত দণ্ড দু' তিনের মধ্যে কোথায় যে হজম হ'য়ে যে'ত তার ঠিক থা'কত না। শ্বশুর-শাশুড়ী, স্বামী-দেওর, ছেলে-মেয়ে সকলকে খাইয়ে বেলা আড়াই প'র —তিন প'রের সময় আবার তা'রা বেশ করে আহার ক'রত। এখন সেরূপ কাউকে করাও দেখি? অমনি বুক জ্ব'ল্‌বে—অমনি ঢেকুর উঠ্‌বে—অমনি অম্বল হ'বে। এখন পান্ত ভাতের স্থানে হ'য়েছে চা। পুরুষেরা ও চা খান, দেখাদেখি মেয়েরাও তা' খেতে শিখেছেন। অনেকের আবার এক বেলা কি দুই বেলা খেয়েও তৃপ্তিলাভ হয় না, দিনের মধ্যে পাঁচ সাতবার এই চা'ই খাচ্ছেন। এত চা খেয়ে ক্ষিদে থা'কবে কোত্থেকে! অজীর্ণ হ'বেনা কেন? এই রকম ক'রেই তো আমাদের দেশ নষ্ট হ'তে ব'সেছে।

আমি বলিলাম—পিসীমা, তুমি এতও জান!

পিসীমা বলিলেন,—না জান্‌লে আর তোমাকে মনের মত ক'র্‌তে পেরেছি। আমাদের পাড়ার সবাই পান্ত ভাত খাওয়া বন্ধ ক'রেছে, কিন্তু আমি তোমাকে সেই সাবেক চালে রেখেছি, সেইজন্যই ব'লতে নেই,—তোমার শরীরটে এত খাটুনিতেও এখনো ভেঙ্গে প'ড়েনি।

খাজাঞ্চি বাবুর স্ত্রী সকল শুনিয়া বলিলেন, "আমি আপনার উপদেশ শুনিয়া নিয়ম পালন কর্‌ব। আহারের ব্যবস্থাটা আমার কি হবে?"

পিসী।—দু'বেলাই ভাত, মাছের ঝোল, পটল বেগুন-ঝিঙ্গে-উচ্ছে-করলা-ডুমুর মান কচু-ওল-পেঁপে—এই সমস্তর তরকারি। ডালের মধ্যে শুধু মুগের ডাল। জল খাবার অন্য কিছু খেতে দেবনা—খুব ভাল সন্দেশ হ'লে দু' একটা দিতে পারি, তা'ছাড়া মুড়ি-নারকেল—আদা-নুন। দিনের বেলা ঘুমা'তে পা'বে না, রাত্রিও জা'গতে পা'বে না। দিনের বেলা দুই প্রহরের মধ্যে এবং রাত্রিতে এক প্রহরের মধ্যে আহার ক'রতে হ'বে। আর সকাল থেকে আমার বউমার সঙ্গে সংসারের কাজ কর্ম্ম ক'র্‌তে হ'বে।

খাজাঞ্চি বাবুর স্ত্রী বলিলেন, "আমি আপনার উপদেশ বর্ণে বর্ণে পালন ক'রব।"

তাহার পর দিন হইতে তাঁহার চিকিৎসার সকল ব্যবস্থার ভার আমার উপর পড়িল। আমি পিসীমার ব্যবস্থানুসারে সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম। ফলে এক সপ্তাহেই তিনি এরূপ উপকার বোধ করিলেন যে, তখন আর তাঁহার জন্য আমাকে আর বেশী ব্যস্ত হইতে হইল না, তিনি নিজেই নিজের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

এইরূপ ভাবে যখন একমাস কাটিয়া গেল—তখন আর তাঁহার রোগের চিহ্ন মাত্র থাকিল না। এই সময় তাঁহার স্বামী বাড়ী যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। পিসীমার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করা হইল। পিসীমা অনুমতি প্রদান করিলেন, কিন্তু

বলিয়া দিলেন, —এইরূপ নিয়মে ৬ মাস থাকিতে হইবে।

সে আজ দশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এই দশ বৎসরের মধ্যে তাঁহার পত্রে অবগত আছি—তাঁহার তিনটি পুত্র ও একটি কন্যা সন্তান হইয়াছে এবং অজীর্ণ কাহাকে বলে—একদিনও তাহা জানিতে পারেন নাই। আমি তাঁহা অপেক্ষা বয়সে একটু বড় বলিয়া তিনি আমাকে 'দিদি' সম্বোধন করিয়া পত্র লেখেন। শেষ চিঠি খানিতে লিখিয়াছেন,—"দিদি, আপনাদের কৃপায় আমিতো নির্ব্ব্যাধি হইয়াছিই, তা'ছাড়া পিসীমার উপদেশে রাঁধুনি-বামুন ছাড়াইয়া দিয়া রান্না-বান্নার কাজ আমি সহস্তে করিয়া থাকি বলিয়া স্বামীর অর্থও অনেকটা বাঁচাইতে পারিতেছি। এখন বুঝিয়াছি, রাঁধুনি রাখা একটা অপব্যয় মাত্র এবং শুধু অপব্যয় নহে,—শরীর নষ্টেরও একটি কারণ। আমার মেয়েটির বয়স আট বৎসর, আমি এই বয়স হইতেই তাহাকে আমার কাজ কর্ম্মের-সাহায্যকারিণী করিয়া তুলিতেছি।"

আমি পিসীমাকে পত্রের কথা শুনাইলাম। তিনি আহ্লাদে আটখানা হইলেন।

ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ।

—:•:—

পালি জ্বরে—

পালির দিন,—অধৌত মুখ রোগীকে স্তাকড়ার পুঁটলী করিয়া আঃসেওড়ার পাতা শুঁকিতে দিবে। ইহা অব্যর্থ।

পালি দিনে—নিমুকার লতা—পুরুষ ডান হাতে, স্ত্রীলোক বাম হাতে বাঁধিবে, সে দিন আর জ্বর আসিবেনা।

ধবল কুষ্ঠে—

ওকড়ার ফল গোমূত্রে বটিয়া প্রলেপ দিবে।

দদ্রু রোগে—

বড় এলাচের গুঁড়া—ঘোল সহ প্রলেপ দিবে।

মুখের ব্রণে—

(ক) নির্ম্মিশীর পাতা দুগ্ধে বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

(খ) মহিষির গোবর নেকড়ায় বাঁধিয়া গরম করিয়া—ব্রণের উপর সেক দিবে।

(গ) পানবাইয়ের পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

মসূরিকায়—

কণ্টকারীর শিকড়, গোল মরিচ সহ বাটিয়া খাইলে—বসন্তের আর ভয় থাকে না।

কাটা ঘায়ে—

(ক) আপাং গাছের শিকড় বাটিয়া প্রলেপ দিবে। (খ) গোরক্ষ চাকুলের পাতা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। তৎক্ষণাৎ রক্ত বন্ধ হইবে, ব্যথা থাকিবেনা, ঘা' জুড়িয়া যাইবে। (গ) খয়েরের গুঁড়া ছড়াইয়া দিলে কাটা ঘা শুকায়। (ঘ) কেশুরের পাতার রস দিলে, ব্যথা থাকেনা, রক্ত বন্ধ হয়, ঘাও শীঘ্র শুকায়।

অজীর্ণে ব্যবস্থা।—

(১) দুই আউন্স বা একছটাক জলে একটি পাতি বা কাগজি লেবুর রস নিঙড়াইয়া মিশাইয়া লও। সেই রস মিশ্রিত জল প্রাতে ১ বার ও বৈকালে ১ বার পান কর, উপকার হইবে। (২) প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ গরম জল পান করিলে অজীর্ণ রোগে উপকার হইয়া থাকে। (৩) দিবসে আহারের পর টাট্‌কা ঘোল পান করিলে অজীর্ণ-রোগীর উপকার হইয়া থাকে।

শ্রীনন্দলাল বসু রায়।

সমালোচনা।

ধর্ম্মের তিনটি পথ।—ডাক্তার শ্রীমহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ৵০ আনা। কর্ম্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ—এই ত্রিবিধ পথই যে ধর্ম্ম অর্জ্জনের উপায়—"গীতার" বিশ্লেষণ করিয়া এই গ্রন্থে তাহাই সহজ ভাবে বুঝান হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে জন্ম ও মৃত্যু কি?—এসকল কথাও বুঝাইবার জন্য গ্রন্থকার প্রয়াস করিয়াছেন। তাঁহার এ প্রয়াস সিদ্ধও হইয়াছে। গীতার বিশ্লেষণে গ্রন্থকারের গীতা আয়ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। জীবে দয়া সর্ব্ব প্রধান ধর্ম্ম। জীবে দয়া করিতে হইলে জীবের সেবা করিতে হয়। সে সেবায় পরম পুরুষেরই সেবা করা হয়। কর্ম্ম-মার্গ, জ্ঞান মার্গ এবং ভক্তি-মার্গ—সকল মার্গেরই মুখ্য-পন্থা যদি এই "জীবে দয়া" বা "জীবে সেবা করা উচিত" ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে স্বতন্ত্র ভাবে আর কোন মার্গ অনুসরণেরই আবশ্যকতা হয় না। তখন ধর্ম্ম-মার্গ, জ্ঞান মার্গ এবং ভক্তিমার্গ—একই বলিয়া প্রতীতি হইবে। সহজ ভাবে, সরল করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকে অনেক ধর্ম্ম কথাই বলা হইয়াছে। ধর্ম্ম-পিপাসুগণ এ গ্রন্থে ধর্ম্ম রহস্য জানিতে পারিবেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

সুচিকিৎসকের লোকান্তর।—পাশ্চাত্য-চিকিৎসকমণ্ডলীর অগ্রণী সার চার্লস পার্ড্রে লিউকিস লোকান্তরিত হইয়াছেন শুনিয়া আমরা যারপরনাই দুঃখিত হইয়াছি। ইনি পাশ্চাত্য-চিকিৎসা-বিদ্যায় সুপণ্ডিত হইয়া শুধুই যে পাশ্চাত্য চিকিৎসার পক্ষপাতী ছিলেন এমন নহে, আয়ুর্ব্বেদের সুগভীর রহস্যগুলি ইনি অবগত ছিলেন, এজন্য আয়ুর্ব্বেদীয়-চিকিৎসার যথেষ্ট সমাদর করিতেন। আমাদের অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে ইঁহার মুখে সর্ব্বদাই আশার কথা শুনা যাইত। মেসোপোটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে হাসপাতাল, ঔষধপত্র, সেবা, চিকিৎসা প্রভৃতির সুব্যবস্থা করিবার জন্য ইনি ভারতের বৈদ্যক বিভাগের নায়কের আসন গ্রহণ করিয়া প্রশংসিত হইয়াছিলেন। ইঁহার বিয়োগে আমরা যথেষ্ট বেদনা অনুভব করিয়াছি।

ধন্বন্তরির পূজা।—কিছু দিন হইল মাদ্রাজের আয়ুর্ব্বেদ কলেজে 'ধন্বন্তরি'র পূজা হইয়া গিয়াছে। সহযোগী 'নায়ক' এই

উপলক্ষে বলিয়াছেন,—"আমাদের দেশে বৈদ্যমণ্ডলে মতান্তর ও মনান্তর ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইনা।" আমরা নিজেরা ইহার উপর আর অধিক কি বলিব? এই জন্যই তো আমাদের দেশে বৈদ্য-চিকিৎসার উন্নতি নাই।

কবিরাজের বিয়োগ।—গত ৩১শে অগ্রহায়ণ কবিরাজ প্রকৃতিপ্রসন্ন সেন হৃদ্‌রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম ৫২ বৎসর হইয়াছিল। হুগলি জেলার সোমড়া গ্রামে ইঁহার পৈত্রিক নিবাস। কালকাতা সিমলা অঞ্চলে থাকিয়া ইনি চিকিৎসা-ব্যবসায় করিতেন। বেঙ্গল কেমিকেল ওয়ার্কসের ঔষধ প্রস্তুতের সহিত ইঁহার সম্বন্ধ ছিল। বিচক্ষণতা-গুণে ইনি এই সহরে একজন সুচিকিৎসক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। ইঁহার বিয়োগে আমরা বিশেষ ব্যথা অনুভব করিতেছি। ভগবান ইঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রাণে শান্তিবারি প্রদান করুন।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়।—সহযোগী "ধন্বন্তরি" সংবাদ দিতেছেন,—"ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত টাঙ্গাইল মহকুমার সদর ষ্টেসনে একটি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।" সুখের কথা সন্দেহ নাই। আমরা অনেকবারই বলিয়াছি,—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের পূর্ণ সাধনা না করিলে লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতির সম্ভাবনা নাই। সুতরাং মফঃস্বলেও এরূপ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার শুভ চিহ্ন বলিতে হইবে।

আমাদের সম্বন্ধে 'ধন্বন্তরি'।—কিন্তু এই উপলক্ষে 'ধন্বন্তরি' আমাদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের বেতন-নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে একটু কটাক্ষ করিয়াছেন। টাঙ্গাইলের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে বেতন-গ্রহণের ব্যবস্থা নাই, উপরন্তু আহার ও বাসস্থানও দেওয়া হয়, কিন্তু আমাদের বিদ্যালয়ে বেতন গ্রহণ করাও হয়—আহার—বাসস্থানও দিবার নিয়ম নাই—ইহাই তাঁহার বলিবার বিষয়। তিনি এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—আমাদের এ ব্যবস্থার খরচটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যয় অপেক্ষা কম পড়িবে না। ব্যয় সম্বন্ধে 'ধন্বন্তরি' যাহা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু এই বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের চরম উপাধি প্রাপ্ত ছাত্রগণ অপেক্ষা দেশের কাজেই হউক—আর আত্মোন্নতির পক্ষেই হউক—সকল বিষয়েই যে অধিক উৎকর্ষ লাভ করিবে, ইহা তো নিশ্চিত কথা। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত এই বিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যয় সমান হইলেও লাভ ভিন্ন তো ক্ষতির কারণ কিছুই দেখিনা। তাহার পর, টাঙ্গাইলে ছাত্রগণকে কোন ব্যয়ভারই বহন করিতে হয় না, আমাদের বিদ্যালয়ে করিতে হয়; আমাদের ব্যয়াধিক্যই তো ইহার কারণ। কলিকাতার মত সহরে এরূপ বিদ্যালয়ের পরিচালনায় আমাদিগকে যে কিরূপ ব্যয়ভার বহন করিতে হয়, তাহা কি আর বলিতে হইবে?

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

২য় বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৪—মাঘ। | ৫ম সংখ্যা।

কাজের কথা।

—:০:—

ধর্ম্ম ও স্বাস্থ্য।—ধর্ম্মের সহিত স্বাস্থ্যের যে অতি নিকট সম্বন্ধ—একথা লইয়া বাদানুবাদ করিবার কিছুই নাই। সদাচার-পালনে স্বাস্থ্যরক্ষা হইয়া থাকে, ইহা তো সর্ব্ববাদিসম্মত। পক্ষান্তরে সদাচার-পালনে মানসিক প্রফুল্লতা সাধিত হইয়া থাকে। সেই মানসিক প্রফুল্লতাই মানবের স্বাস্থ্যোন্নতির কারণ। সেকাল অপেক্ষা একালে স্কুল-কলেজে বিদ্যাশিক্ষার জন্য রাশি রাশি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হয়, কিন্তু সদাচার-পালন-শিক্ষা করিবার জন্য কোন গ্রন্থই নাই। ফলে দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসার স্থল যুবকগণ কর্ম্মময় জীবনে প্রস্তুত হইবার জন্য যেরূপ চেষ্টা করিতেছেন, স্বাস্থ্য-সুখলাভের জন্য সেরূপ কষ্ট হইতে প্রয়াস পাইতেছেন না। বাঙ্গালাদেশ হইতে ব্রহ্মচর্য্য পালনে অভ্যস্ত হওয়ার বিধি এইরূপেই উঠিয়া গিয়াছে। ফলে অধুনা অনাচারের আবিলতায় বাঙ্গালী—সন্তানের দেহ যেরূপ কলুষ-পঙ্কিল হইয়া পড়িতেছে, বাঙ্গালী-বয়স্কের অকালে জরা ও মরণ উপস্থিত হওয়ার ইহাই কারণ।

* * *

অমৃতে অরুচি।—দুগ্ধের অপর নাম পয়ঃ। এই পয়ঃ অর্থে অমৃতও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শাস্ত্রকার দুগ্ধের গুণ ব্যাখ্যায় ইহাকে অনেকগুলি অভিধান প্রদানের ভিতর বলকর, মেধাজনক, আয়ুস্কর ও বয়ঃসংস্থাপক আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। সেকালে বাঙ্গালী এ সকল শাস্ত্রকথা মানিত, সেইজন্য আহারকালে পরম সুখে পয়ঃ বা দুগ্ধ পানও করিত। এখন সে দুগ্ধ-পানের স্পৃহা দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। দুগ্ধ, ঘৃত, ছানা, মাখন—এ সকল পুষ্টিকর আহারীয়ের স্থলে অধুনা চপ-কাটলেট, কোর্ম্মা-দোর্ম্মাই বাঙ্গালী যুবকের নিকট অধিক আদরণীয় হইয়া পড়িয়াছে। ফলে ব্রহ্মচর্য্য হারাইয়া, অনাচারে অভ্যস্ত হইয়া, বাঙ্গালী যুবক—একদিকে যেমন

বলক্ষয়ের কারণ করিয়া তুলিতেছে, আয়ুস্কর দ্রব্য সেবনের অভাবে সে ক্ষয় আব পূর্ণ হইতেছে না। অধুনা অনেকের মুখেই শুনা যায়—তাঁহার দাস্ত পরিষ্কার হয় না। ইহার জন্য তাঁহারা ঔষধ সেবনে প্রস্তুত, তথাপি দুগ্ধ—পয়ঃ বা অমৃতের আস্বাদন লইবেন না। ফলে এই অমৃতে অরুচি উপস্থিত হওয়াও বাঙ্গালী-যুবকের স্বাস্থ্যোন্নতির বিঘ্ন জন্মাইবার আর একটি কারণ।

* * *

শাক-সব্জির উপকারিতা।—সেকালে দেহের পুষ্টি বিধানের জন্য দুগ্ধ-ঘৃত-ছানা-মাখন—এ সকলের ব্যবস্থা যেরূপ দেশমধ্যে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল, শাক-সব্জির উপকারিতাও দেশের লোকে সেইরূপ বিলক্ষণ উপলব্ধি করিত। এখন বাঙ্গালী-যুবকের রসনায় আর শাক-সব্জির আস্বাদ-গ্রহণ রুচেনা। কিন্তু যে সময়ে শুশুনি কলমে-হেলেঞ্চার আস্বাদনে বাঙ্গালী বীত-শ্রদ্ধ হয় নাই, সে সময়ে এখনকার মত বাঙ্গালা দেশ অজীর্ণ-প্রবণ হইয়া পড়ে নাই। সে কালের দুগ্ধ-ঘৃতের মত বা এ কালের কোর্ম্মা-দোপ্পার মত শাক-সব্জির ভিতর সেরূপ প্রত্যক্ষভাবে পুষ্টিবর্দ্ধনের শক্তি থাকুক আব না থাকুক, পরোক্ষভাবে সেই সকল শক্তি উহাতেও নিহিত আছে, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। বিশেষ-বিশেষ শাক-পাতারি সেবনে পাকস্থালীর ক্রিয়া সুপরিস্কৃত হইয়া থাকে। সেই পাক-স্থালীর ক্রিয়া সুপরিস্কৃত হইলেই তো তাহা হইতে বল-সঞ্চয়ের উপায়-বিধান হইয়া থাকে। বাঙ্গালীর শ্যামাপূজার চতুর্দ্দশী তিথিতে এইজন্যই চৌদ্দশাক মিশাইয়া একত্র খাইবার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ। শাক-পাতারি-সেবী বাঙ্গালী বিধবাদিগের স্বাস্থ্যোন্নতিও আমরা এ কথার পোষকতায় স্বাক্ষ্য প্রদান করিতে পারি। বায়ু শান্তির জন্য বৈদ্য প্রদত্ত ঔষধের অনুপানেও অনেক সময় যে শাক-পাতারির রসের আবশ্যক হয়,—ইহাও আমাদের কথার অন্যতর প্রমাণ। আমাদের দেশের লোকে এ সকল কথা চিন্তা করিবেন কি?

* * * *

শিক্ষায় ব্রহ্মচর্য্য।—আমাদের মনে হয়—ব্রহ্মচর্য্য পালনের উদ্দেশ্য বুঝাইবার জন্য শিক্ষা বিভাগ হইতে ঐ বিষয়ক এক-খানি পুস্তক পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। বাল্যজীবনই ব্রহ্মচর্য্য-পালনের প্রকৃষ্ট সময়। সে কালে গুরুগৃহে অধ্যয়ন-নিরত-বালকমণ্ডলীর ব্রহ্মচর্য্য-পালনের কথা আমরা অনেকবারই বলিয়াছি। এখন সে গুরুগৃহও নাই, সেরূপ শিষ্যেরও অভাব ঘটিয়াছে। দেশের দুর্গতি তো এইজন্যই। অল্পমতি বালকদিগকে কীট-দংশন হইতে রক্ষা করিবার জন্য দেশের কৃতিপুরুষগণ এ বিষয়ে চিন্তা করুন—ইহাই আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি।

* * * *

আহারে আয়ুরক্ষা।—আয়ুরক্ষার জন্য উপযুক্ত আহারের নিতান্তই প্রয়োজন। আহারীয় সারাংশই রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জারূপে আমাদের যে আয়ুরক্ষার সহায়তা করিতেছে, এ কথা আমরা ইতঃপূর্ব্বে অনেক বার বলিয়াছি। ধর্ম্ম বল, অর্থ বল, কাম বল, মোক্ষ বল—আরোগ্যই এ সকল বিষয়ের মূল [illegible]

মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া গিয়াছেন। সেই আরোগ্য লাভ করিলেই আয়ু রক্ষার উপায় করা হইবে। আরোগ্য লাভের জন্য যত-গুলি নিয়মের প্রয়োজন, আহারের ভক্ষ্যা-ভক্ষ্যের বিচারকরণ তাহার অন্যতর। সেইজন্যই আমাদের পক্ষে শাস্ত্রবিধি-পালনের একান্ত প্রয়োজন। একালে—পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের যুগে যখন আমরা আহার-বিহার—সকল বিষয়েই স্ব স্ব মত প্রচলনে নানা-রূপ আধি-ব্যাধির চির সহচর হইয়া পড়িতেছি, তখন সে সকল মত ছাড়িয়া দিয়া ঋষি প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিলে হানি কি? শাস্ত্র শব্দের অর্থ শাসন-বাক্য। দেশ রক্ষার জন্যই তো সে শাসন-বাক্যের প্রয়োজন হইয়াছিল। সে বাক্যের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া যখন আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতির অন্তরায়ই ঘটিতেছে, তখন আবার সেই শাস্ত্রবাক্য পালন করিবার প্রয়োজনীয়তা হয় নাই কি? এখনও যদি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আর কবে হইবে?

*　　*　　*　　*

বাঙ্গালীর ব্যাধি।—আগেকার সহিত তুলনা কর, বাঙ্গালী আগে অধিক ব্যাধি প্রবণ ছিল, না এক্ষণে অধিক ব্যাধি সঙ্কুল হইয়াছে? জ্বর জ্বালার নাম বাঙ্গালী আগে খুব কমই জানিত, অজীর্ণ-উদরাময়—এ সকলেও সেকালে বঙ্গবাসী বেশী ভুগিত—এরূপ কথা শুনা যায় নাই। এখন বাঙ্গালাদেশে জ্বর জ্বালাও যেরূপ, অজীর্ণ-উদরাময়ও তাহাপেক্ষা কম নহে। অগ্নি-মান্দ্য তো স্ত্রী পুরুষ সকলেরই। ইহা ভিন্ন শত করা নিরানব্বই জন বাঙ্গালা দেশে ধাতু দৌর্ব্বল্যগ্রস্ত। শাস্ত্রবাক্য ভুলিয়া, অনাচার-স্রোতে গা ঢালিয়া দেওয়াই কি ইহার কারণ নহে! অভক্ষ্য-ভোজনে পাকস্থলীটির ক্রিয়া সুচারুরূপে হইতে না দেওয়া এবং শুক্রের পূর্ণ পরিণতি হইতে না হইতে অযথা এবং অস্বাভাবিক ভাবে উহা ব্যয় করাই এই সর্ব্বনাশকর ব্যাধি উপস্থিতির সর্ব্ব প্রধান কারণ। ব্রহ্মচর্য্য পালনের অভাবে দেশের যে ভীষণ সর্ব্বনাশ হইতেছে, একথা আমরা বরাবরই বলিয়া আসিতেছি। ব্রহ্মচর্য্য পালন বলিলে আহার-বিহার—সকল বিষয়েরই সংযম বুঝাইয়া থাকে। বাঙ্গালী যে পর্য্যন্ত সে সকল বিষয়ে সংযমী না হইবে, সে পর্য্যন্ত তাহার এই অধঃপতিত জীবন পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

অপত্য-বিজ্ঞান।

—:•:—

(প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মত)

ইংরাজী শিক্ষিত মাত্রেই জানেন—১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে অসাধারণ প্রতিভাবান্ প্রাণি-তত্ত্ববিদ ডার্ব্বিন্ সাহেবের "জাতি-বৈচিত্র্যের উদ্ভব" নামক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হওয়ার পর হইতেই প্রাণি-জগতের অনেক রহস্যই সাধারণের বোধগম্য হইয়া গিয়াছে।

ডার্ব্বিনের অমানুষিক প্রতিভাবলে আমরা জীবোৎপত্তির বহুতথ্যই জানিতে পারিয়াছি। আমরা জানিতে পারিয়াছি—একটী শুক্রাণু [Spermatozon] গর্ভকোষ নিঃসৃত পরিণতাবস্থ একটী ডিম্বাণু সহ সংযুক্ত হইলে সেই বিশেষ ডিম্বাণুটীর অভ্যন্তরীণ জীবন্ত পদার্থের [Porto Plasm] নিশ্চেষ্টতা ভঙ্গ হইয়া অপূর্ব্ব কার্য্যকারিতার বিকাশ ঘটিয়া থাকে। প্রাণির উৎপত্তি সেই কার্য্যকারিতার ভাবী ফল। আমরা আরও জানিতে পারিয়াছি—নিষেকিত ডিম্বাণু হইতেই মাতৃগর্ভে কখনও পুত্র, কখনও বা কন্যা জন্মগ্রহণ করে। এক্ষণে, জীব-বিজ্ঞানের সর্ব্বাপেক্ষা জটিল ব্যাপার—সন্তানোৎপত্তি রহস্য—আমাদের কাছে অনেকটা সরল ও সহজ হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু ভ্রূণ পরিণতি লাভ করিয়া, কি কারণে যে স্ত্রী বা পুরুষের মূর্ত্তিতে প্রকাশ পায়, এ তথ্য এখনও আমাদের কাছে অস্পষ্ট। বিজ্ঞান ইহার মীমাংসা করিতে পারে না। কোন্ অনিবার্য্য নিয়মে—গর্ভস্থ ভ্রূণ পুত্রের আকার ধারণ করে, কেনই বা তাহা কন্যারূপেই বা ভূমিষ্ট হয়,—অমন যে 'জল জীয়ন্ত' য়ুরোপীয় বিজ্ঞান—, তাহাতেও এ প্রশ্নের অসন্দিগ্ধ সদুত্তর অদ্যাবধি রচিত হয় নাই। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়—য়ুরোপ সভ্য হইবার বহু শতাব্দি পূর্ব্বে—আর্য্যঋষি এই অপত্য তত্ত্বের অপূর্ব্ব রহস্য অনায়াসেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি সেই অপত্যতত্ত্বেরই আলোচনা করিব।

কিন্তু প্রাচ্য-মত আলোচনা করিবার পূর্ব্বে—আমা[illegible]পাশ্চাত্যমতের অনুসরণ করিতে হইবে। নতুবা আমার বক্তব্য সাধারণের কাছে পরিস্ফুট হইবে না। অতএব প্রথমেই দেখা যাউক, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভ্রূণতত্ত্বের কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

বিজ্ঞান বলে—গর্ভবাসের প্রারম্ভ অবস্থায় ভ্রূণ কিছুকালের জন্য ক্লীব অবস্থায় থাকে—লিঙ্গ বিশেষের দিকে প্রবণতা দেখায় না। এই ক্লীব অবস্থা উচ্চ শ্রেণীর জীবের মধ্যে ক্ষণকালস্থায়ী, নিম্নশ্রেণীর মধ্যে অধিককাল স্থায়ী। স্তন্যপায়ী জীব ও পাক্ষিদিগের ভ্রূণের প্রাথমাবস্থার অল্পকাল পরেই বলা যায়—উহা পুং বা স্ত্রী অঙ্গ সমন্বিত হইবে। কিন্তু অমেরুদণ্ডক জাতীয় অতি নিম্নশ্রেণীর জীব সম্বন্ধে এরূপ বলা একেবারেই অসম্ভব। ভেক জাতিই এই অমেরুদণ্ডক শ্রেণীর উদাহরণ। ভেকের অপেক্ষাকৃত বর্দ্ধিত ভ্রূণ দেখিয়াও উহা স্ত্রী কি পুরুষ হইবে, তাহা বলা যায় না।

ডিম্বাণু—শুক্রাণু সহযোগে নিষেকিত হইয়া নিশ্চেষ্টতা ভঙ্গ করিয়া ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তাহার এই আদিম অবস্থা অল্পক্ষণ স্থায়ী। অতি সত্বরই ভ্রূণ উভ-লিঙ্গাবস্থ প্রাপ্ত হয়। পরে কোন একটী বিশেষ লিঙ্গ-বিকাশ প্রবল হইয়া দাঁড়ায়। শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মৌলিক উপাদান প্রায়ই এক - প্রকার। প্রভেদের মধ্যে—ডিম্বাণু বৃহৎ, শুক্রাণু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। ডিম্বাণু নিশ্চেষ্ট ও স্থির; শুক্রাণু - কার্য্যশীল ও চঞ্চল। এই উভয় অণুর সংমিলনেই—ভাবী জীবের সূচনা। এককোষী জীবের পরিবর্দ্ধন ব্যাপার পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, একটী ক্ষুদ্রতম জীবাণু [illegible]

হইয়া দুইটী হইল। সেই দুইটী আবার পূর্ণায়তন প্রাপ্ত হইয়া চারিটীতে দাঁড়াইল। চারিটী পরিপুষ্ট হইয়া আটটীতে পরিণত হইল। এইরূপে বিভাজন দ্বারা তাহাদের বংশবৃদ্ধি হইতে লাগিল। কিন্তু এই একটী কোষ [Cell] দেখিতে দেখিতে দ্বিভাগে বিভক্ত হয় কেন? ইহার কারণ আর কিছুই নহে—কেবল দুইটী বিপরীতধর্ম্মী শক্তির ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া মাত্র। এই শক্তি দ্বয়ের মধ্যে একটী গঠন মূলক, অপরটী বিনাশ মূলক। ঐশ্বরিক লীলার আশ্চর্য্য মহিমায়—গঠন ও বিনাশের সম্পাতেই জীবন্ত পদার্থের উৎপত্তি। আপনি যত বড়ই পণ্ডিত হউন না, একথা অবিশ্বাস করিতে পারিবেন না। এই বিরাট বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে এমনি দুইটী বিপরীত শক্তির ক্রিয়ার ফলে—প্রাথমিক নীহারিকার অবস্থা হইতে এই বিপুলায়তন বিস্ময়কর বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে। এ সকল কথা বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষিত সত্য কথা। অত্যুন্নত মানবজাতির পক্ষেও এই নিয়ম। স্ত্রী ও পুরুষের মিলনে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর সংযোগে জীবের উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে। পূর্ণায়তন প্রাপ্ত হইয়া লিঙ্গ উদ্ভাবন করে। এই লিঙ্গ ভেদের মূলে—জনক-জননীর স্বাস্থ্য ও শরীর গঠন; ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর পুষ্টতা বা পরিপক্কতা—প্রভৃতি কারণ বর্ত্তমান। এই লিঙ্গভেদ বুঝাইবার জন্য য়ূরোপে বহু মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। সকল মত সবিস্তারে আলোচনা করিবার আবশ্যক নাই। আমি কেবল প্রধান মত গুলিরই উল্লেখ করিব।

১ম। দুই বিভিন্ন প্রকারের ডিম্বাণুবাদ।

এই মতবাদীরা—স্ত্রী ও পুং এই দুই প্রকারের ডিম্বাণু কল্পনা করেন। ইঁহারা বলেন,—স্ত্রী-ডিম্বাণু হইতে কন্যা এবং পুং-ডিম্বাণু হইতে পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। এ মতবাদটী অতি সহজ এবং সরল। কিন্তু তলাইয়া বুঝিতে গেলে—লিঙ্গ-বিকাশ-রহস্য কখনই এত সহজ হইতে পারে না। এই মতবাদীগণকে যদি প্রশ্ন করা যায়—স্ত্রী ও পুং প্রকৃতির স্বতন্ত্র ডিম্বাণু কিরূপে উৎপন্ন হয়? ইঁহারা সে প্রশ্নের যুক্তিপূর্ণ উত্তর দিতে পারেন না। বিশেষতঃ—বিজ্ঞান যখন বলিতেছে—জরায়ু-বাস কালে আবেষ্টন গত-কারণে অবস্থাধীন ভ্রূণ এক লিঙ্গের লক্ষণাক্রান্ত হইয়াও অপর লিঙ্গ উদ্ভাবন করিতে পারে, তখন আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি,—এ মত অযৌক্তিক। স্বতন্ত্র প্রকৃতির ডিম্বাণুর অস্তিত্ব—গভীর সন্দেহাকীর্ণ।

২য়। নিষেক-প্রণালী।

এই মতাবলম্বীগণ বলেন—নিষেকপ্রণালীর উপরই লিঙ্গ-পার্থক্য নির্ভর করে। অর্থাৎ ডিম্বাণু প্রবিষ্ট শুক্রাণুর সংখ্যার তারতম্য অনুসারেই ভ্রূণের লিঙ্গ ভেদ ঘটিয়া থাকে। অধিক সংখ্যক শুক্রাণু প্রবেশ করিলে পুত্র এবং অল্প সংখ্যক প্রবেশ করিলে কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। বলা বাহুল্য এ মতটিও নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। কেন না, ডিম্বাণুর প্রবেশ পথ এতদূর সূক্ষ্ম যে, অনুবীক্ষণের সাহায্য ভিন্ন তাহা দেখিতে পাওয়া অসম্ভব। অধিকন্তু একটীমাত্র শুক্রাণু প্রবেশ করিলেই সে পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। যদি দৈবাৎ একাধিক শুক্রাণু—ডিম্বাণুর সহিত সম্মিলিত হয়, তাহা হইলে তাহা অস্বাভাবিক উৎপত্তিতে পরিণত হইয়া থাকে।

৩য়। নিষেক কাল।

এই মতের সিদ্ধান্ত—যদি একটী ডিম্বাণু ডিম্বকোষ হইতে নিঃসৃত হইয়াই শুক্রাণুর সহিত মিশ্রিত হয়, তবে তাহা পুরুষরূপে বিকশিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, শুক্রাণু ও ডিম্বাণু নূতন হইলে স্ত্রী এবং প্রাচীন হইলে পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। এ মত উদ্ভিদ সম্বন্ধে খাটিতে পারে বটে, কিন্তু জীব সম্বন্ধে ইহা একেবারেই খাটেনা।

৪র্থ। জনক জননীর বয়স।

বিলাতের দুইজন বড় বৈজ্ঞানিক বহু দিন পরীক্ষা করিয়া এই তথ্যে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—যদি পিতা—মাতার চেয়ে বয়সে বড় হয়, তাহা হইলে সে দম্পতির কেবল পুত্র সন্তানই জন্মিয়া থাকে। আবার মাতা—পিতার চেয়ে বয়সে বড় হইলে তাহাদের সন্ততির মধ্যে অধিকাংশই কন্যা হইয়া থাকে। উভয়ের বয়স সমান হইলে,—কখন বা পুত্র কখনও বা কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। য়ুরোপের লোক এ মতের যথেষ্ট আদর করিয়া থাকেন। আমরা কিন্তু এমতের সারবত্তা স্বীকার করিতে অক্ষম। এ মতটী সত্য হইলে—ভারতবাসীর গৃহে আর কন্যা ভূমিষ্ট হইত না। ভারত-বাসী—নিজের চেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠা নারীকেই পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। এ সিদ্ধান্ত নির্ভুল হইলে এতদিন বাঙ্গালীর ঘরে আর মেয়ে জন্মগ্রহণ করিত না, গরীব-গৃহস্থকে কন্যাভার-কাতর হইতে হইত না, বর-পণের অত্যাচারে গৃহস্থকে সর্ব্বস্বান্ত ভিখারী সাজিতে হইত না;—বাঙ্গালী জাতি তাহা হইলে পুরুষ-প্রধান জাতিতে পরিণত হইত।

৫ম। শারীরিক বল।

স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে—যাহার দৈহিক বল অধিক, সন্তান তাহার অনুরূপ লিঙ্গ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। অর্থাৎ স্বামী বলিষ্ঠ হইলে পুত্র এবং স্ত্রী বলিষ্ঠা হইলে কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। এ মতটীও নিতান্ত অমূলক। আমরা অনেক সময় দেখিয়াছি, যক্ষারোগ পীড়িতা মাতাই অধিক সংখ্যক কন্যা প্রসব করিয়া থাকে। আবার অতি ক্ষীণকায় পুরুষও—বহুসংখ্যক পুত্রের জন্মদাতা—ইহা বোধ হয় অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। অতএব এ মতটীও সমীচিন বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

৬ষ্ঠ। মিলন স্পৃহা।

পুরুষের যদি স্ত্রীর সহিত মিলনে বেশী আগ্রহ থাকে, তবে পুত্রাধিক্য ঘটিবারই সম্ভাবনা। পক্ষান্তরে পুরুষের সহিত মিলনে স্ত্রীর যদি অধিক স্পৃহা হয়—তাহা হইলে কন্যার ভাগই বেশী হইয়া থাকে। এ মতও সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয় না। কেন বিশ্বাস হয় না—সে কথা প্রাচ্য-মত আলোচনার সময় বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

৭ম। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই পণ্ডিতগণের বিশ্বাস—স্ত্রীজাতি হইতে পুরুষজাতিই শ্রেষ্ঠ। প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রের মত—স্ত্রী জাতি অবিকাশিত পুরুষ বই আর কিছুই নহে। পুরুষের দেহের ও মনের যখন উচ্চ বিকাশ থাকে, অথচ মাতারও উৎপাদিকা শক্তির পূর্ণতা দেখিতে পাওয়া যায়—তখনই পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করে। মাতা যখন কন্যা—অপূর্ণ-বিকাশ-সম্পন্না—তখন কন্যা সন্তানই জন্মিয়া থাকে।

কেন পুত্র বা কন্যা জন্মে, যে সম্বন্ধে পরীক্ষালব্ধ মতবাদ সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি।

(ক) দৈহিক হিসাবে জননীর শরীর ও স্বাস্থ্যের প্রতিকূল অবস্থা, আহারের অপ্রাচুর্য্য, অপেক্ষাকৃত বয়োল্পতা—ইত্যাদি অবস্থায় পুত্র এবং ইহার বিপরীত অবস্থায় কন্যা হইয়া থাকে।

(খ) জনন উপাদান হিসাবে অপুষ্ট ডিম্বাণু অপেক্ষা পুষ্ট ডিম্বাণু স্ত্রীত্বে পরিণত হয়। নূতন, পূর্ণায়তন, সতেজ ডিম্বাণু হইতে কন্যার উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে।

এই স্থানেই আমি পাশ্চাত্য-মত পরিত্যাগ করিয়া প্রাচ্যমতের অনুসরণ করিব।

প্রাচ্য-মতে—রজঃস্রাবের আরম্ভ দিবস হইতে ষোড়শ দিন পর্য্যন্ত—স্ত্রীজাতির গর্ভ গ্রহণ কাল। এই গর্ভগ্রহণ কালের মধ্যেও আবার ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়াণী, বৈশ্যাণী ও শূদ্রাণীর—বিশেষ নিয়ম ও বিচার দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সে সকল কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক, আয়ুর্ব্বেদ তন্ত্র ও স্মৃতি সংহিতা পড়িয়া দেখিবেন।

ঋষিগণ ঋতুমতী নারীকে অনেকগুলি নিয়মের অধীনে রাখিয়াছেন। সে নিয়মগুলি লঙ্ঘন করিলে অপত্য উৎপত্তির দোষ জন্মিয়া থাকে। যে নারী ঋষি রচিত নিয়মের শাসন মানিতে চাহে না, তাহার গর্ভস্থ ভ্রূণ বিকৃত দোষদুষ্ট হইয়া ভূমিষ্ট হয়। ভারতের ভ্রূণতত্ত্ব—বিরাট্ ও বিশাল, সংক্ষেপে তাহার আলোচনা অসম্ভব। আমি কেবল অতি সংক্ষেপে তাহার আভাস দিব।

তন্ত্র বলেন—জরায়ুর মুখে সমীরণা, চান্দ্রমসী ও গৌরী নামে তিনটী নাড়ী অবস্থিত, নিষেকিত শুক্রাণু যদি সমীরণার মুখে প্রবেশ করে, তাহা হইলে সন্তানোৎপত্তিই হয় না। 'চান্দ্রমসী'তে প্রবিষ্ট হইলে কন্যা এবং গৌরী-মুখে প্রবেশ করিলে পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

ঋতুকালে—যুগ্মরাত্রে [৪র্থ ৬ষ্ঠ, ৮ম, ১০ম, ১২শ রাত্রিতে] পুরুষ ভার্য্যাতে উপগত হইলে পুত্র এবং অযুগ্ম রাত্রে [৫ম, ৭ম, ৯ম ১১শ, ১৩শ রাত্রে] উপগত হইলে কন্যা জন্ম গ্রহণ করে।

শুক্রের আধিক্যে পুত্র ও আর্ত্তবের আধিক্যে কন্যা জন্মিয়া থাকে। শুক্রশোণিত উভয় সমান হইলে নপুংসকের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যাহার সুরতস্পৃহা অধিক—সন্তান তাহার স্বরূপ হইয়াই জন্ম গ্রহণ করে।

গর্ভবস্থায় যে নারীর দক্ষিণ চক্ষু বৃহত্তর হয়, দক্ষিণ স্তনে অগ্রে দুগ্ধ জন্মে, দক্ষিণ উরু একটু স্থূলতর হয়, মুখ ও বর্ণের প্রসন্নতা দেখা যায়, তাহা হইলে সে নারীর গর্ভে পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে বুঝিতে হইবে। ইহার বিপরীত লক্ষণ দেখিলে,—কন্যা জন্মিবে বুঝিতে হইবে *

বারান্তরে আমি আয়ুর্ব্বেদের অপত্য তত্ত্বের আলোচনা করিব। আজ এই পর্য্যন্ত।

[ক্রমশঃ]

শ্রীসতীশ চন্দ্র রায়, এম্ এ।

* তন্ত্রে পুত্র ও কন্যা জন্মিবার এইরূপ অনেকগুলি কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। বাহুল্য ভয়ে

আয়ুর্ব্বেদে বায়ু।

(তুলনা-মূলক আলোচনা)

(১)

পূর্ব্বে আমরা বায়ু এবং নার্ভের পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, ঋষিগণ বায়ুর কার্য্য বলিতে যাহা বুঝিতেন, পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ তাহাকেই নার্ভের ক্রিয়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা নার্ভের পীড়া এবং বাতব্যাধি সম্বন্ধীয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

অঙ্গ সঞ্চালন (motion) অনুভূতি (Sensation) পঞ্চেন্দ্রিয়ের কার্য্য (Functions of the special senses) মানসিক-বৃত্তি (Intellect) এবং হর্ষ বিষাদ ও রাগ-দ্বেষাদির (Emotions) অস্বাভাবিক বৃদ্ধি বা হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে শরীরে যে বিকার উপস্থিত হয়, প্রতীচ্য-চিকিৎসাতন্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাহাকে নার্ভের পীড়া বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে 'মোটরনার্ভ' সমূহ (যে সকল নার্ভ দ্বারা সর্ব্বাবয়বের মাংসপেশী ও যন্ত্রসমূহের আকুঞ্চন-প্রসারণ ক্রিয়া এবং অঙ্গচালনা সম্পাদিত হয়) বিকৃত হইলে গাত্রস্তম্ভ, অসমবায় কার্য্য (Incoordination) প্রভৃতি উপদ্রব এবং 'সেন্সরি' বা প্রেরণাপ্রদায়ক নার্ভসমূহ ব্যাধিগ্রস্ত হইলে গাত্রসুপ্তি (Anoathesia) স্পর্শদ্বেষ (Hypersesthesia) বেদনানুভূতি (Analgesia) এবং দ্রব্যসমূহের আকৃতি বিনিশ্চয়ে অক্ষমতা (Asterognosis) প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হয়।

কুপিত বায়ুর উপদ্রব বর্ণনায় চরক বলিয়াছেন—"

"সঙ্কোচঃপর্ব্বানাং স্তম্ভো ভঙ্গোহস্থাং পর্ব্বনামপি
রোমহর্ষঃপ্রলাপশ্চ পাণিপৃষ্ঠশিরো গ্রহঃ ॥
খাঞ্জাপাঙ্গুল্যকুব্জত্বং শোষোহঙ্গানাম নিদ্রতা
গর্ভশুক্র রজোনাশঃ স্পন্দনং গাত্রসুপ্ততা ॥
শিরোনাসাক্ষিজত্রূনাং গ্রীবায়াশ্চাপি হুণ্ডনম্
ভেদস্তোদোহর্ত্তিরাক্ষেপো মুহুশ্চায়াস এবচ॥"

শাস্ত্রকারগণ নিম্নলিখিত কারণগুলি বাতব্যাধি জনক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"

রূক্ষশীতাল্পলঘ্বন্ন-ব্যবায়াতি প্রজাগরৈঃ।
বিষমাদুপচারাচ্চ দোষাসৃকস্রবণাদপি ॥
লঙ্ঘনপ্লবনাত্যধ্ব-ব্যায়ামাদিবিচেষ্টিতৈঃ।
ধাতূনাং সংক্ষয়াচ্চিন্তা-শোকরোগাতি-
কর্ষণাৎ ॥
বেগসন্ধারণাদামাদভিঘাতাদভোজনাৎ।
মর্ম্মাবাধাদ্গজোষ্ট্রাশ্ব-শীঘ্রযানাপতংসনাৎ
দেহে স্রোতাংসি রিক্তানি পূরয়িত্বানিলোবলী
করোতি বিবিধান্ ব্যাধীন্ সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গ-
সংশ্রয়ান্ ॥"

সে সকল উদ্ধৃত হইল না। কেবল আভাষ মাত্র দেখাইলাম। কেন না, তন্ত্রের যুক্তি বুঝিবার শক্তি বর্ত্তমান লেখকের নাই। অপত্য তত্ত্ব সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের মন্তব্য সবিস্তারে আলোচিত হইবে। এই কন্যাদায়ের বিড়ম্বনার দিনে সে সকল কথা সকলেরই জানা উচিত।

পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণও অতিশয় ক্লান্তি (Excessive Fatigue) অত্যধিকশ্রম (over exertion) আঘাত (Injury) হিম ও বর্ষা হইতে শরীরকে অরক্ষিত রাখা (Exposure to cold and wet) অতিব্যবায় (Sexual excesses) উচ্চ হইতে নিম্নে পতন (Falls) মূত্রবিবন্ধ (Retention of urine) রক্তস্রাব (Hœmorrhage) মানসিক অশান্তি (Mental distress) অতিরিক্ত মদ্যপান (Alcoholic indulgence) রাগ-দ্বেষ, হর্ষ-বিষাদ ও শোকভয় (Emotions) প্রভৃতির জন্য নার্ভের পীড়া উৎপন্ন হয় বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। কোন কোন রোগ হইতে বাতব্যাধি উৎপন্ন হইতে পারে এবং সকল রোগেই যে বায়ুর অল্পবিস্তর বিকার পরিলক্ষিত হয়, তাহা পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণও স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ নার্ভের পীড়ার যে সকল লক্ষণ ও উপদ্রব নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আয়ুর্ব্বেদ-বিশারদ ঋষিগণ-নির্দ্ধারিত বাতব্যাধির হেতু ও উপদ্রবের সহিত তাহার বিশেষ কোন পার্থক্য নাই।

পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এক্ষণেও পুনরুল্লেখ করিতেছি যে, সামান্য অসামঞ্জস্যে আলোচ্য বিষয়ের কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। প্রতীচ্য-তত্ত্ব এবং তদ্দেশীয় পাণ্ডিতদিগের রোগ বিনিশ্চয় প্রণালীর সহিত অস্মদ্দেশীয় চিকিৎসা-বিধি ও ব্যাধিনিরূপণপদ্ধতি যে অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া যাইবে, এরূপ আশা করা সঙ্গত নহে। দেখিতে হইবে,—ভারতীয় চিকিৎসকগণ কর্তৃক ব্যাখ্যাত এমন কোন ব্যাধি মানবসমাজের অমঙ্গল সাধন করিতেছে কিনা,—পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ যাহার সন্ধান এখনও পান নাই—অথবা প্রতীচির পণ্ডিতগণ এমন কোন ব্যাধির অস্তিত্ব জ্ঞাত হইয়াছেন কি না—যাহা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের অগোচর ছিল।

চরক বাতব্যাধির সংখ্যা অশীতিপ্রকার বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। একটিমাত্র প্রবন্ধে সকল প্রকার রোগের আলোচনা সম্ভবপর নহে। সুতরাং অপেক্ষাকৃত প্রবলবান কয়েকটি রোগের আলোচনা করিয়া আমরা নার্ভের পীড়া ও বাতব্যাধি যে একই শ্রেণীর রোগ তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

১। আক্ষেপক।—সুশ্রুতমতে শরীরের ধমনীসকল কুপিত বায়ু কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া মুহুর্মুহুঃ দেহকে আক্ষিপ্ত করে। এই আক্ষেপ-জনিত ব্যাধিই আক্ষেপক নামে অভিহিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ বিশারদগণ প্রকরণভেদে আক্ষেপক ব্যাধিকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন।

দণ্ডাপতানক ব্যাধিক্লিষ্ট রোগীর সর্ব্ব-শরীর দণ্ডের ন্যায় স্তব্ধ এবং তাহার এরূপ হনুগ্রহ উপস্থিত হয় যে, যে অতিকষ্টে অন্ন-সেবন করিতে পারে। আক্ষেপক রোগে শরীর ধনুর ন্যায় নমিত হইলে তাহাকে ধনুস্তম্ভ কহে। ধনুস্তম্ভ দ্বিবিধ—অন্তরায়াম ও বাহরায়াম। যে ধনুস্তম্ভে শরীর সম্মুখের দিকে নমিত হয়, তাহাকে অন্তরায়াম এবং যাহাতে শরীর পশ্চাৎদিকে নমিত হয়, তাহাকে বহিরায়াম বলে। চতুর্থ প্রকার আক্ষেপক অভিঘাতজ। বিজয়রক্ষিত অভিঘাতজ অর্থে 'দণ্ডাদ্যভিঘাতকুপিত বাতজং' বলিয়াছেন।

গঙ্গাধর দোষত্রয়ের প্রবলতা অনুসারে আক্ষেপকের শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন।

(গদাধরস্থাহ কফপিত্তান্বিত ইত্যাদিনা নিমিত্তভেদেনাক্ষেপকাশ্চতুর্দ্ধা ভবন্তি, তদ্যথা একঃ কফান্বিতেন বাতেন, দ্বিতীয়ঃ পিত্তান্বিতেন, তৃতীয়ঃ কেবলেন, চতুর্থোঽভিঘাতেনেতি—মধুকোষ।)

পাশ্চাত্যমতে 'মোটরনার্ভ' সমূহের বিকার বশতঃ বিরুদ্ধকার্য্যকরী মাংসপেশী সকলের অতিক্রুত আকুঞ্চন-প্রসারণ ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। ইহারই ফলে অবয়ব সমূহ আক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত হয়। মোটর নার্ভের বিকৃতি যে সর্ব্বদাই অঙ্গসমূহকে আক্ষিপ্ত করে; তাহা নহে। কখনো কখনো কম্পন (rigor) স্পন্দন (tremors) ও কেবলমাত্র আকুঞ্চন (Contraction) সম্পাদিত হয়।

প্রতীচ্য চিকিৎসকগণ-ব্যাখ্যাত 'এপিলেপ্‌সি', 'হিষ্টিরিয়া' ও 'টিটেনাস্' প্রভৃতি রোগের লক্ষণ ও উপদ্রবের সহিত আক্ষেপক ও তাহার প্রকরণ চতুষ্টয়ের সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সুতরাং আমরা উক্ত ব্যধিত্রয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

(ক) Epilepsy (এপিলেপ্‌সি)—নার্ভের বিকার বশতঃ সংজ্ঞালোপ হইয়া এই রোগ উৎপন্ন হয়। কখনো আক্ষেপ হয়, কখনো হয় না। যে শ্রেণীর Epilepsyতে সংজ্ঞা লোপ হয় কিন্তু আক্ষেপ হয় না—তাহাকে Pattifmal বলে এবং যাহাতে সংজ্ঞা লোপ ও আক্ষেপ উভয়ই পরিলক্ষিত হয়, তাহাকে Grandmal বলে।

অপরিমিত মদ্যপান, অত্যধিক ইন্দ্রিয় সেবা, হস্তমৈথুন (masturbation) ভয় শোক, চিন্তা, অভিঘাত (injuries) এবং ক্রিমির (presence of worms in intestines) উপদ্রব বশতঃ Epilepsy উৎপন্ন হয়। পিতামাতা উন্মাদরোগগ্রস্ত অথবা অন্য কোন প্রকার নার্ভের পীড়া কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে সন্তানসন্ততিগণও Epilepsy কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে পারে।

Grandmal অর্থাৎ যে এপিলেপ্‌সিতে সংজ্ঞা লোপ ও আক্ষেপ উভয়ই পরিলক্ষিত হয়, তদ্দারা আক্রান্ত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে রোগীর সর্ব্বশরীর ঝিম্-ঝিম্ ঝিম্-ঝিম করে, সে কোন বিষয়ে মনসংযোগ করিতে পারে না—পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলী এবং ঘটনাসমূহ তাহার নিকট স্বপ্নবৎ ও অস্পষ্ট বলিয়া মনে হয়। ব্যাধির আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে রোগী চীৎকার করিয়া উঠে এবং আত্মরক্ষার কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া বাণবিদ্ধ হরিণের ন্যায় ভূমিতলে পতিত হয়। তাহার শরীরের মাংসপেশীসকল সঙ্কুচিত হইয়া মস্তক, গ্রীবা ও মেরুদণ্ড বক্রীভূত করে এবং বিষম ধনুষ্টম্ভ লক্ষিত হয়।

রোগের দ্বিতীয় স্তরে মাংসপেশী সকল থাকিয়া থাকিয়া সঙ্কুচিত হয়। প্রথমতঃ শরীর কম্পন এবং পরে আক্ষেপ আরম্ভ হয়। কখনো কখনো রোগীর মুখ দিয়া রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হয়।

'পেষ্টিমল্' শ্রেণীর 'এপিলেপ্‌সি'তে আক্ষেপ পরিদৃষ্ট হয় না। রোগী সহসা চেতনা হারাইয়া পড়িয়া যায়।

(খ) Hysteria (হিষ্টিরিয়া)—এই ব্যাধিও নার্ভের বিকারবশতঃ উৎপন্ন হয়। ইহার কারণ, লক্ষণ ও উপদ্রব অনেকটা 'এপিলেপসির'ই অনুরূপ। হিষ্টিরিয়া ও এপিলেপ্‌সিতে প্রভেদ এই যে, প্রথমোক্ত রোগে রোগীর বিশেষ কোন কার্য্য করিবার সঙ্কল্প পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু এপিলেপ্‌সিতে

সেরূপ কিছুই দেখা যায় না। হিষ্টিরিয়া আক্রান্ত লোককে তাহার অভিলষিত কার্য্যে বাধা দিলে, সে বল প্রকাশ করে। তাহার মুখের মাংসপেশী সমূহ সঙ্কুচিত হয় এবং মুখ দিয়া ফেন নির্গত হয়; কিন্তু 'এপিলেপ্সির' ন্যায় তাহা রক্তমিশ্রিত থাকে না। মুখমণ্ডল পাণ্ডু অথবা রক্তবর্ণ ধারণ করে। ওষ্ঠ নীলবর্ণে রঞ্জিত হয়—কিন্তু এপিলেপসির' ন্যায় মুখ পাংশুবর্ণ (cyanosis) ধারণ করে না। হিষ্টিরিয়ার আক্ষেপ বহুক্ষণস্থায়ী, এপিলেপসির আক্ষেপ স্বল্পস্থায়ী। হিষ্টিরিয়ায় ধনুস্তম্ভ পরিলক্ষিত হয়—এপিলেপসিতে তাহা হয় না; তবে হিষ্টিরিয়া লক্ষণাক্রান্ত এপিলেপ্সিতে (Hystars-epilepsy) ধনুস্তম্ভ হইয়া থাকে।

(গ) Tetanus (টিটেনাস)—শরীরের কোন স্থান ক্ষত হইলে সেইস্থানে 'ব্যাসিলাস্ টিটেনি' নামক এক প্রকার জীবাণু প্রবেশ করে এবং ক্রমে ঐ ক্ষতেই পুষ্ট হয়। এই জীবাণু কর্তৃক যে বিষ উদ্গীরিত হয়, তাহাই 'নার্ভ' সমূহকে বিকৃত করে। এইজন্য পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ এই ব্যাধিকে Infections disease বা জীবাণু-দুষ্ট-ব্যাধি পর্য্যায়-ভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাকেও নার্ভের পীড়া বলা যায়; কারণ অহিত আহার-বিহার যেমন নার্ভ সমূহকে বিকৃত করিয়া ব্যাধি উৎপাদন করে, তেমনই টিটে নাই' জীবাণু শরীরে বৃদ্ধি পাইয়া নার্ভসমূহকে বিকারগ্রস্ত করে। নার্ভের বিকার ব্যতীত আক্ষেপ প্রভৃতি হইতে পারে না।

হনুগ্রহ, ধনুস্তম্ভ ও আক্ষেপ—টিটেনাস্ রোগের প্রধান উপদ্রব। ধনুস্তম্ভ যে প্রকার-ভেদে বহিরায়াম ও অন্তরায়াম উভয়বিধ হইয়া থাকে, তাহা প্রতীচির চিকিৎসকগণও নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং অঙ্গসমূহ যে কঠিনতা প্রাপ্ত হয়—তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বর্ণিত এই ত্রিবিধ ব্যাধির সহিত আক্ষেপ ও তাহার প্রকরণ চতুষ্টয় তুলনা করিয়া আমরা যাহা দেখিলাম নিম্নে তাহাই সংক্ষেপে সন্নিবেশ করিলাম;—

পাশ্চাত্য ব্যাধি	মত ব্যক্ত উপদ্রব	আয়ুর্ব্বেদোক্ত উপদ্রব	ব্যাধি
Grandmal বা আক্ষেপযুক্ত এপিলেপ্সি	মেরুদণ্ড ও গ্রীবা বক্রীভূত, আক্ষেপ, হনুগ্রহ, সংজ্ঞা লোপ ইত্যাদি	তদাক্ষিপত্যাশু মুহুর্মুহুর্দেহং মুহুশ্চরঃ	আক্ষেপক
Hyster-Epilepsy বা	হনুগ্রহ, দীর্ঘকালস্থায়ী আক্ষেপ, ধনুস্তম্ভ ইত্যাদি।		

পাশ্চাত্য ব্যাধি	মত বাক্ত উপদ্রব	আয়ুর্ব্বেদোক্ত উপদ্রব	ব্যাধি
হিষ্টিরিয়া লক্ষণাক্রান্ত এপিলেপসি			
Petitmal বা আক্ষেপ বিহীন এপিলেপ্‌সি	হনুগ্রহ, আড়ষ্ট দেহ, সংজ্ঞালোপ ইত্যাদি।	দণ্ডবৎ স্তম্ভয়তি কৃচ্ছ্রো দণ্ডাপতানকঃ। হনুগ্রহ স তেন স্যাৎ কৃচ্ছ্রাচর্ব্বণভাষণম।	দণ্ডাপতনকাঃ
টিটেনাস্	হনুগ্রহ আক্ষেপ, ধনুস্তম্ভ—বাহ্যায়াম ও অন্তরায়াম ইত্যাদি	ধনুস্তুল্যং নমেদ যস্তু সঃ ধনুস্তম্ভ সংজ্ঞকঃ	ধনুস্তম্ভ।
		অভ্যন্তরং ধনুরিব যদা নমতিমানবম্ তদা-স্যাৎ ভ্যন্তরায়ামং।	অন্তরায়াম
		বাহ্যস্নায়ু প্রতানস্থো বাহ্যায়ামং করোতি চ।	বহিরায়াম

২। পক্ষাঘাত—কুপিত বায়ু অধঃ ঊর্দ্ধ ও তির্য্যকগামিনী ধমনী-সমূহকে এক-কালে বিকৃত করিলে যে ব্যাধির প্রকোপ হয়, সুশ্রুত তাহাকে পক্ষাঘাত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

"অধোগমাঃ সতির্য্যগগা ধমনীরার্দ্ধদেহগাঃ।
যদা প্রকুপিতোহত্যর্থং মাতরিশ্বা প্রবদ্ধতে॥
তদান্যতরপক্ষস্য সন্ধিবন্ধান্ বিমোক্ষয়ন্।
হন্তি পক্ষং তমাহুর্হি পক্ষাঘাতং ভিষগ্বরাঃ॥

এই ব্যাধিতে শরীরের যে দিকের বায়ু প্রকুপিত হয়, তদ্বিপরীত দিক অকর্ম্মণ্য ও অসাড় হইয়া যায়। পক্ষাঘাত সম্বন্ধে চরকে উক্ত হইয়াছে—

"হত্বৈকং মারুতঃ পক্ষং দক্ষিণং বামমেব বা।
কুর্য্যাচ্চেষ্টানিবৃত্তিং হি রুজং বাকস্তম্ভমেব চ॥
গৃহীত্বা বা শরীরার্দ্ধং শিরাঃস্নায়ুঃ বিশোষ্য চ।
পাদং সঙ্কোচয়ত্যেকং হস্তং বা তোদশূলকৃৎ॥
একাঙ্গ রোগং তং বিদ্যাৎ সর্ব্বাঙ্গঃ সর্ব্বদেহজম্

সুতরাং একাঙ্গগত ও হইতে পারে, আবার সর্ব্বাঙ্গগত অথবা অর্দ্ধশরীর গত হইতে পারে। অর্দ্ধশরীর গত পক্ষাঘাত সম্বন্ধে মধুকোষ টীকায় বিজয় রক্ষিত বলিয়াছেন

অর্দ্ধমিতি অর্দ্ধমর্য্যাদয়া অর্দ্ধনারীশ্বর বং। পক্ষং বাহুকক্ষ পার্শ্বাদিভাগঃ ”

পাশ্চাত্যমতে কোন কোন নার্ভের বিধানবশতঃ উৎপন্ন ব্যাধিতে মাংসপেশী-সমূহ আড়ষ্ট হয়, অঙ্গসঞ্চালনের ক্ষমতা লুপ্ত হয় এবং স্পর্শজ্ঞান বিরহিত হয়। যে ব্যাধিতে এই সব উপদ্রব লক্ষিত হয়, তাহাকে তাঁহারা ‘প্যারালিসিস্’ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। প্রতীচ্য চিকিৎসকগণও প্যারালিসিস্‌কে একাঙ্গগত, সর্ব্বাঙ্গগত এবং অর্দ্ধশরীরগত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যথা ‘হেমিপ্লেজিয়া’ বা অর্দ্ধশরীর গত, ‘প্যারাপ্লেজিয়া’ বা সর্ব্ব-শরীরগত এবং ‘মনোপ্লেজিয়া’ বা একাঙ্গ গত প্যারালিসিস্। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ গবেষণা দ্বারা তাহা নিরূপণ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া আমরা প্যারালিসিসের বিশেষ গুণ বিশিষ্ট (Typical) উদাহরণ-স্বরূপ একটি মাত্র ব্যাধির আলোচনা করিব।

পাশ্চাত্যমতে Facialnerve (যে নার্ভ-দ্বারা মুখের যাবতীয় কার্য্য সম্পাদিত হয়) বিকৃত হইলে মুখার্দ্ধের সকল প্রকার কর্ম্ম-শক্তি লুপ্ত হয়—ললাট-রেখা অদৃশ্য হয়—রোগীর চক্ষু স্তব্ধ ও আবিলভাব ধারণ করে—অক্ষিপল্লবদ্বয় নিমীলিত করা যায় না,—ওষ্ঠ বক্রীভূত হয় এবং বাক্‌সঙ্গ উপস্থিত হয়। নাসিকার মাংসপেশী সমূহ আড়ষ্ট হয় বলিয়া রোগী হাঁচিতে পারে না—তাহার জিহ্বা সমুৎক্ষিপ্ত হয় এবং কখনো কখনো তাহার শ্রবণশক্তিও লোপ পায়। প্রতীচ্য চিকিৎসকগণ এই ব্যাধিকে Paralysis of the Seventh Nerve অথবা ‘বেলস্‌প্যালসি’ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

আয়ুর্ব্বেদে অর্দ্দিত রোগের যে সকল লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে তাহার সহিত প্রতীচ্য চিকিৎসকগণ বর্ণিত Bells Palsy র লক্ষণ ও উপদ্রবের সম্পূর্ণ ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। অর্দ্দিত রোগ সম্বন্ধে চরকে উক্ত হইয়াছে—

“অতিবৃদ্ধঃ শরীরার্দ্ধমেকং বায়ুঃ প্রপদ্যতে।
যদা তদোপশোষ্যাসৃক বাহুং পাদঞ্চ জানু চ
তস্মিন সঙ্কোচয়ত্যর্দ্ধে মুখং জিহ্বাং করোতি চ
বক্রীকরোতি নাসাভ্রূ ললাটাক্ষিহনুং তথা।
ততো বক্রং ব্রজত্যাস্যে ভোজনম্ বক্র-নাসিকম্।
স্তব্ধং নেত্রং কথয়তঃ ক্ষবথুশ্চ নিগৃহ্যতে॥
দীনা জিহ্বা সমুৎক্ষিপ্তা কলা সজ্জতি চাস্য বাক্
দন্তাশ্চলন্তি বধ্যেতে শ্রবণৌ ভিদ্যতে স্বরঃ॥
পাদহস্তাক্ষিজঙ্ঘোরুশঙ্খশ্রবণগণ্ডরুক্।
অর্দ্ধে তস্মিন মুখার্দ্ধে বা কেবলেস্যাৎ তদর্দ্দিতম্॥

সুশ্রুতও অর্দ্দিত রোগের উল্লিখিত উপদ্রব সমূহ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু চরকের সহিত এ বিষয়ে সুশ্রুতের মতভেদ লক্ষিত হয়। চরক অর্দ্দিত রোগ অর্দ্ধশরীর ব্যাপ্ত এবং উহাতে পাদহস্তাক্ষিজঙ্ঘোরু প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রকুপিত হইতে পারে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুশ্রুতের মতে অর্দ্দিত রোগ কেবলমাত্র বক্ত্রার্দ্ধ ও গ্রীবাদেশের পীড়া। মাধবকার সুশ্রুতের পোষকতা করিয়া তদীয় সংগ্রহে তাহাই উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—

“উচ্চৈর্ব্যাহরতোহত্যর্থং খাদতঃ কঠিনানি বা।
হসতো জৃম্ভতো বাপি-ভারাদ্বিষমশায়িনঃ॥
শিরোনাসৌষ্ঠচিবুক-ললাটেক্ষণসন্ধিগঃ।
অর্দ্দয়ত্যনিলো বক্ত্রং অর্দ্দিতং জনয়ত্যতঃ॥

বক্রীভবতি বক্ত্রার্দ্ধং গ্রীবা চাপ্যপবর্ত্ততে।
শিরশ্চলতি বাকসঙ্গো নেত্রাদীনাঞ্চবৈকৃতম্॥
গ্রীবাচিবুকদন্তানাং তস্মিন পার্শ্বে চ বেদনা।
যস্যাগ্রজো রোমহর্ষো বেপুথর্নেত্রমাবিলম্।
বায়ুরূর্দ্ধং ত্বচি স্বাপস্তোদো মন্যাহনুগ্রহঃ।
তমর্দ্দিতমিতি প্রাহুর্ব্যাধিং ব্যাধিবিচক্ষণাঃ॥"

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সুশ্রুত চরকোক্ত "অর্দ্ধে তস্মিন্ মুখার্দ্ধে বা কেবলং স্যাৎ-তদার্দ্দিতম্।" সংজ্ঞার পোষকতা করেন নাই। এই মতবৈষম্য সম্বন্ধে মধুকোষ টীকায় বিজয়রক্ষিত লিখিয়াছেন—তন্ত্রান্তরে তু মুখাবর্দ্ধবচ্ছরীরার্দ্ধব্যাপকোহপ্যর্দ্দিত যদাহ দৃঢ়বলঃ "অর্দ্ধে তস্মিন মুখার্দ্ধে বা কেবলস্যাত্তমর্দ্দিতং ইতি। নমু সম্ভেবং তদা অর্দ্দিতাৎ অর্দ্ধাঙ্গবাতয়োঃ কো ভেদঃ? উচ্যতে, বেগিত্বেনার্দ্দিতে কদাচিদ্বেদনা ভবতি, অর্দ্ধাঙ্গবাতে তু সর্ব্বদৈবেতি ভেদঃ, অথবা যথোক্ত সর্ব্বলিঙ্গোহর্দ্দিত-স্তদ্বিপরীতস্ত্বর্দ্ধাঙ্গবাত ইত্যাহুঃ।"

পাশ্চাত্য মতে এই ব্যাধি কেবল মাত্র মুখার্দ্ধেও হইতে পারে—আবার অর্দ্ধশরীর ব্যাপ্তও হইতে পারে। সুতরাং এক্ষেত্রেও দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতে কোন পার্থক্য লক্ষিত হইতেছে না।

৩। গৃধ্রসী।—পায়ের গোড়ালী এবং অঙ্গুলি সমূহকে আশ্রয় করিয়া যেসকল বস্তু আছে, তাহা বায়ু কর্তৃক বিকৃত হইলে পদদ্বয়ের চালনা কষ্টকর হইয়া উঠে। সুশ্রুত এই ব্যাধিকে গৃধ্রসী আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

চরকের মতে গৃধ্রসী রোগে প্রথমতঃ নিতম্বদ্বয়ে শূল, তোদ, স্তম্ভ এবং মুহুর্মুহুঃ স্পন্দন অনুভূত হয়—ক্রমে উহা প্রসারিত হইয়া কটি পৃষ্ঠ, উরু, জানু, জঙ্ঘা এবং পদদ্বয় আক্রমণ করে।

"স্ফিক পূর্ব্বা কটিপৃষ্ঠোরু জানুজঙ্ঘাপদংক্রমাৎ
গৃধ্রসী স্তম্ভরুকতোদৈগৃহ্লাতি স্পন্দতে মুহুঃ॥

পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ sciatica নামক ব্যাধির উপদ্রব সম্বন্ধে বলেন যে, প্রথমে উরুর পশ্চাৎদেশে বেদনার অনুভূতি হয় এবং ক্রমে বেদনা তীক্ষ্ণ হইয়া সমগ্র পদদেশ ব্যাপিয়া যাতনার সৃষ্টি করে।

টেইলর এই ব্যাধিজাত বেদনাকে burring and gnawing (শূল ও তোদ) বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, এই ব্যাধির প্রকোপে কখনো কখনো মাংসপেশীর স্পন্দন পরিলক্ষিত হয়। কখনো কখনো এই শ্রেণীর বাতব্যাধি মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ গর্ভকেন্দ্রকে পর্য্যন্ত বিকৃত করে।

৪। কলায়খঞ্জ।—পাশ্চাত্য-মতে নার্ভের পীড়াজনিত অব্যবস্থিত গতিকে (Inco ordination) লোকোমোটর এটাক্সী বলে। এই ব্যাধি কর্তৃক আক্রান্ত হইলে রোগী অন্ধকারে শরীরের সাম্যাবস্থা সংরক্ষণ করিতে পারে না। চলিবার সময় তাহার দৃষ্টি নিম্নদিকে সংবদ্ধ থাকে—শরীর সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়ে এবং সে পদদ্বয় অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যবধানে স্থাপন করে। পদ বিক্ষেপকালে তাহার শরীর কম্পিত হয় এবং পদানুরূপ স্থানে পদস্থাপন করিতে পারে না। চলিতে চলিতে সহসা গতি পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিলে সে ঘুরিয়া মাটিতে পড়িয়া যায়।

সুশ্রুত এইরূপ ব্যাধিকে কলায়খঞ্জ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

"প্রক্রামন্ বেপতে যস্তু খঞ্জনিব চ গচ্ছতি।
কলায়খঞ্জ তং বিদ্যান্মুক্তসন্ধিপ্রবন্ধনম্॥

মধুকোষে বিজয় রক্ষিত বলিয়াছেন—"প্রক্রামন্নিতি গমনমারভমাণো বেপতে। প্রশব্দোহয়ং আদিকর্ম্মণি। খঞ্জন্নিব গচ্ছতি বিকলয়ন্নিব গচ্ছতি, গমনারম্ভবেপনেন খঞ্জাদস্য ভেদঃ।"

আমরা বিভিন্ন প্রকারের এই চতুর্ব্বিধ বাতব্যাধির আলোচনা করিয়া দেখিতে পাইলাম যে, পাশ্চাত্য চিকিৎসা-তন্ত্রে বর্ণিত নার্ভের পীড়া এবং আয়ুর্ব্বেদোক্ত বাতব্যাধি সমূহ বস্তুতঃ পক্ষে একই শ্রেণীর রোগ। বাহুল্য বিবেচনায় এবং পাঠকবর্গের বিরক্তি-ভাজন হইবার আশঙ্কায় অন্যান্য বাতব্যাধির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম না। বধিরতা বাকস্তম্ভ, খঞ্জ দৃষ্টিনাশ, অববাহুক বিশ্বাচী এবং মলমূত্রের বিবন্ধ প্রভৃতি যে নার্ভের বিকারবশতঃ হইয়া থাকে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সার্দ্ধদ্বিসহস্রবর্ষপূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ অপূর্ব্ব সাধনার বলে যে তথ্য সমূহের আবিষ্কার দ্বারা মানব সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন, শত শত শতাব্দীপরে প্রতীচির চিকিৎসকগণ আজ বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহারই পুনঃ-প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন। ইহা পাশ্চাত্য জাতি সমূহের জ্ঞানোন্নতির নিদর্শন হইতে পারে সত্য, কিন্তু ফলমূলসেবী ভারতীয় ঋষিগণ পূর্ব্বে যে জ্ঞান প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তদপেক্ষা অধিকতর উন্নত কিছুর সন্ধান না পাইলে কেমন করিয়া বলিব যে, পাশ্চাত্য-চিকিৎসা-তন্ত্র বিশ্বমানবের জ্ঞান বৃদ্ধি করিয়াছে।

এমন গভীর সাধনা, এত অর্থব্যয়, থিয়রী লইয়া এত বাদ প্রতিবাদ করিয়াও তাঁহারা বিশ্ববাসীকে নূতন কিছু শিখাইতে পারিয়াছেন, বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, শস্ত্রোপচার বিধি পাশ্চাত্য চিকিৎসা তন্ত্রের একটী অভিনব আশ্চর্য্য ব্যবস্থা। কিন্তু তাহাতেও নূতনত্ব কিছুই নাই।

ঋষিগণ বর্ণিত সেই (১) শিরাবাধন, (২) উদরপাটন, (৩) অন্ত্রছেদন, (৪) নাসাকর্ণোষ্ঠ বন্ধন, (৫) দোষোদকনিষ্কাশন, (৬) অশ্মরী আকর্ষণ, (৭ (মূঢ়গর্ভ শল্যোদ্ধরণ প্রভৃতিই (১) Venesection, (২) Laparotomy, (৩) Operations on the Intestines, (৪) Plastic operations, (৫) Tapping, (৬) Lithotomy, (৭) Embriyotomy প্রভৃতি নূতন নামে, নবীন মূর্ত্তিতে আমাদিগকে বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছে।

এ সবই সে পুরাতনের পুনরাবৃত্তি। *

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত।

* পুরাতনের পুনরাবৃত্তি সন্দেহ নাই, কিন্তু ঋষি প্রচারিত সেই শল্য চিকিৎসা যে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক সমাজ হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়াছে। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ আমাদেরই পুরাতন জিনিসকে যে আমাদের সম্মুখে নূতন করিয়া ধরিতেছেন, তদ্দর্শনে আমরা বিস্মিত না হইলেও তাহা দেখিয়া আমাদের শিখিবার বিষয় যে যথেষ্ট রহিয়াছে। শুধু মুখে আমাদের অতীত গৌরবের স্মৃতি আনিয়া সুপ্ত থাকিলে চলিবে না, সেই সব লুপ্ত বিষয়ের পুনরুদ্ধারের প্রয়াসে জাগরিত হইতে হইবে। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাও তো এইজন্যই করা হইয়াছে। আঃ সঃ।

আয়ুর্ব্বেদ-সমস্যা

(২)

এইবার আমরা ঔষধের মাত্রা লইয়া আলোচনা করিব। আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থাদিতে প্রায় সর্ব্বত্রই ঔষধের একটা মাত্রা নির্দ্ধারিত আছে; এই মাত্রার হিসাবে ঔষধাদি প্রস্তুত করাই যে আবিষ্কর্ত্তাদিগের অভিপ্রেত, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। মাত্রার পরিমাণ সর্ব্বত্রই নির্দ্দিষ্ট, উহা সের প্রতি বা তোলা প্রতি এত, এইরূপ হারাহারি হিসাব নহে। কিন্তু আমি অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি, এদেশে বহুদিন হইতে মাত্রা-ব্যতিক্রমের বিধান চলিয়া আসিতেছে, নির্দ্ধারিত তালিকার হারাহারি করিয়া কেহ বা কম, কেহ বা বেশী মাত্রার ঔষধ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। এরূপ মাত্রা-ব্যতিক্রমের ফল-বৈষম্য ঘটে কি না, তাহা বিশেষভাবে বিবেচ্য। পাকের ঔষধে মাত্রা-ব্যতিক্রমের সঙ্গে অগ্নিতাপের বিভিন্নতা অবশ্যম্ভাবী; দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটা বুঝাইয়া বলিতেছি; মনে করুন, মহামাষ তৈলের পূর্ণমাত্রায় মাষকলাই ৪ সের, দশমূল ৬॥ সের, ছাগ-মাংস ৩০ পল, ৬০ সের জলে জ্বাল দিয়া ১৬ সের থাকিতে কাথ গ্রহণ করিতে হয়; এই কাথ যেরূপ হইবে, কেহ যদি অদ্ধমাত্রায় ঔষধ গ্রহণ করিয়া ৩০ সের জলে সিদ্ধ করতঃ ৮ সের কাথ গ্রহণ করেন, অথবা দ্বিগুণ মাত্রায় ১২৮ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৩২ সের কাথ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সেই কাথ ঠিক তেমন হইবে কি না, কে বলিতে পারে? ঋষিকল্প আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ বিজ্ঞানে অগাধ অধিকারের বলে যে মাত্রা নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন, নিশ্চয়ই তাহার একটা গভীর রহস্য আছে। আমি অনেক প্রবীণ চিকিৎসকের নিকট শুনিয়াছি, পূর্ণমাত্রার ব্যতিক্রম করিলে ঔষধ তেমন ফলপ্রদ হয় না। বস্তুতঃ এইরূপ মাত্রার কোন অর্থ না থাকিলে, বিভিন্ন ঔষধের বিভিন্ন মাত্রা (যেমন ত্রিশতীপ্রসারণী তৈল /৪ সের, কুব্জপ্রসারিণী ১৬ সের, অষ্টাদশশতিকপ্রসারণী ৬৪ সের) নির্ণয় করা হইয়াছে কেন? যাহা হউক ঔষধের মাত্রার সহিত ফলের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, এ বিষয় ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া চিকিৎসক মণ্ডলী যদি তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত সাধারণ্যে প্রচার করেন, তাহা হইলে দেশের বিশেষ কল্যাণ হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

ঔষধের উপাদান-বৈষম্য—সামান্য অভিজ্ঞতার ফলেই এমন অনেক ঔষধের পরিচয় আমি পাইয়াছি, যে সকলের বিভিন্ন প্রকার উপাদানের তালিকা দেশে প্রচলিত আছে। একই ঔষধের ২।৩ রকম তালিকার কথা বোধ হয়, চিকিৎসক মণ্ডলীর অবিদিত নহে; আমি কোন কোন ঔষধের ৪৫ টী তালিকাও দেখিয়াছি। একই ঔষধ বিভিন্ন উপাদানে প্রস্তুত হইলে, উহার ফল কখনই একরূপ হইতে পারে না। এই উপাদান-বৈষম্য দর্শনেই আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের আলোচনায় আমার মনোযোগ প্রথম আকৃষ্ট হইয়াছিল। এক্ষণে আমার বিনী[illegible]

স্বর্ণসিন্দূর প্রস্তুত করাইবার প্রয়োজন হওয়াতে, কবিরাজদিগের নিকট উহার প্রস্তুতপ্রণালীর সন্ধান লইয়া আমি দুই রকম তালিকা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। একজন কবিরাজ আমাকে যে তালিকা দিলেন, তাহাতে স্বর্ণ ১ তোলা, পারদ ৮ তোলা, এবং গন্ধক ১৬ তোলা ছিল; অপর এক জনের প্রদত্ত তালিকায় স্বর্ণের পরিমাণ ১ তোলা, পারদ ৮ তোলা এবং গন্ধক ৮ তোলা। এই পার্থক্য দেখিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে স্বর্ণসিন্দূরের সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হই; দেখিলাম, ভৈষজ্য রত্নাবলীতে স্বর্ণসিন্দূরের যে বচন আছে, তাহার সহিত উল্লিখিত তালিকাদ্বয়ের একটীরও মিল নাই। এখানেই আমার আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধাদি সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত হয়, এবং তৎফলে নানাপ্রকার সমস্যা আমার মনে জাগিয়া উঠে। তদবধি আমি আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধাদি প্রস্তুত করাইতে প্রবৃত্ত হইয়া এই সকল সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করিতেছি, এবং যথাসাধ্য অনুসন্ধানের ফলেও সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। যাহা হউক, আমি অনুসন্ধানে এপর্য্যন্ত স্বর্ণসিন্দূরের নিম্নলিখিত দুইটী পৃথক বচন, এবং একটী বাঙ্গালা তালিকা প্রাপ্ত হইয়াছি:—

১। "পলং রসেন্দ্রস্য চ গন্ধকস্তুহেম্নোঽপি কর্ষংপরিগৃহ্য সম্যক।" অর্থাৎ—পারদ ৮ তোলা, গন্ধক ১ তোলা ও স্বর্ণ ২ তোলা।

২। রসগন্ধকয়োগ্রাহ্যং পলং হেম্নঃ কোলমুখা। অর্থাৎ—পারদ ৮ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা।

৩। পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা এবং স্বর্ণ ১ তোলা।

এই তিনটী তালিকার পার্থক্য পাঠক স্পষ্টই দেখিতেছেন। শেষোক্ত তালিকায় শার্ঙ্গধরের মান পরিভাষা অবলম্বনেই বোধ হয় এইরূপ পরিমাণ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় তালিকায় স্বর্ণের ভাগ যথাক্রমে ২ তোলা ও ১ তোলা। আমি অনুসন্ধানে জানিয়াছি, এদেশে এই দ্বিতীয় তালিকা অনুসারেই অধিকাংশ স্থলে স্বর্ণসিন্দূর প্রস্তুত করা হয়; কিন্তু বর্ত্তমান যুগের একজন প্রধান কবিরাজ আমাকে বলিয়াছেন,—স্বর্ণ ২ তোলা দ্বারা স্বর্ণসিন্দূর প্রস্তুত করিলে ফল অনেক অধিক হইয়া থাকে।

বসন্তকুসুমাকর একটী প্রধান ঔষধ। এ পর্য্যন্ত এই ঔষধের চারিটী তালিকা আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। প্রত্যেক তালিকাতেই কিছু কিছু পার্থক্য বিদ্যমান আছে। রসেন্দ্রসারসংগ্রহের রসায়নাধিকারোক্ত এবং ভৈষজ্যরত্নাবলীর প্রমেহাধিকারোক্ত বসন্তকুসুমাকরের এক উপাদান হইলেও ভাবনাতে পার্থক্য আছে; যথা—রসেন্দ্রসারসংগ্রহে—"মালত্যাঃ কুঙ্কুমোদকৈঃ", ভৈষজ্যরত্নাবলীতে—"মালত্যাঃ কুসুমেন চ।" পরন্তু যোগরত্নাবলীর বচনে অনেক পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ভৈষজ্যরত্নাবলীর রসায়নাধিকারোক্ত বসন্তকুসুমাকরেও অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

রসেন্দ্রসারসংগ্রহ এবং ভৈষজ্যরত্নাবলী ধৃত মন্মথাভ্ররসের বচনেও পার্থক্য দেখা যায়। প্রথম গ্রন্থে রস ও গন্ধকের মাত্রা ২ তোলা [রসগন্ধকয়োর্গ্রাহ্যং কর্ষমেকং এবং কর্পূর অর্দ্ধ তোলা (কর্পূরং শাণকং) কিন্তু দ্বিতীয় গ্রন্থের রস ও গন্ধকের মাত্রা

৮ তোলা (রসগন্ধকয়োর্গ্রাহ্যং পলমেকং) এবং কর্পূরের মাত্রা ১ তোলা (কর্পূরং তোলকং দদ্যাৎ)। বৃহৎ কস্তুরী ভৈরবেরও দুইটী তালিকা আমি দেখিয়াছি; একটী ১৪ পদী এবং আর একটী ১৮ পদী।

বহু ঔষধেরই এইরূপ উপাদান-বৈষম্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ঈদৃশ উপাদান-বৈষম্যে যে ফলবৈষম্য নিশ্চয়ই হয়, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এখন এই সকল বিভিন্ন তালিকার মধ্যে কোন্ তালিকানুযায়ী ঔষধ অধিক ফলপ্রদ, দেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ যদি ধীরভাবে তাহার আলোচনা করিয়া সুমীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-প্রণালীর একটী গুরুতর অভাব অপসারিত হইবে।

ঔষধপ্রস্তুত-প্রণালী—আয়ুর্ব্বেদীয় তৈল, ঘৃত, বটিকা প্রভৃতির প্রস্তুতপ্রণালীতেও আমি স্থানেস্থানে অনেক পার্থক্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি; দৃষ্টান্তস্বরূপ তৈলপাকের প্রণালী এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এ অঞ্চলের অনেক স্থানে মূর্চ্ছাপাকের পরই তৈলে কল্কদ্রব্যাদি প্রদত্ত হয়, এবং তৎপর ঐ কল্কদ্রব্যযুক্ত তৈলে ক্বাথ পাক করা হইয়া থাকে; কিন্তু অনেক স্থানে আবার মূর্চ্ছা পাকের পরই তৈলের সহিত ক্বাথ পাক করিয়া, সেই তৈলে কল্কদ্রব্য প্রদানপূর্ব্বক জলসহ কল্ক-পাক করা হয়। ঐ উভয় প্রণালীতে পক্ক তৈল কখনই একরূপ ফল-প্রদ হইতে পারেনা। ঔষধপ্রস্তুত-প্রণালীতে যখন এইরূপ বহু পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তখন চিকিৎসকগণ তৈল ঘৃত, বটিকা প্রভৃতি প্রস্তুতের একটা সাধারণ নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়া যদি সাধারণ্যে প্রচার করেন, তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের রোগপ্রতিকার-ক্ষমতা নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাইতে পারে।

জারিত ধাতু—স্বর্ণ, লৌহ ও অভ্র এই তিনটি প্রধান ধাতুর জারণ ও মারণ সম্বন্ধে উপযুক্ত উপদেশ প্রচারিত হওয়া আবশ্যক; এ কার্য্যে নানারূপ উপায় অবলম্বিত হইতে দেখা যায়। শাস্ত্রানুসারে লৌহ ও অভ্র অন্ততঃ শতপুটিত না হইলে ব্যবহারের যোগ্য হয় না; কিন্তু অনেক চিকিৎসক আমার নিকট সরলভাবে স্বীকার করিয়াছেন, ভালরূপ ২০।২৫ টা পুট হইলেই লৌহ ও অভ্র ব্যবহারের যোগ্য হয়, আজকাল সাধারণতঃ যে সকল লৌহ ও অভ্র বিক্রয় হয় —তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বড় বেশী 'পুটের' বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। যাহা হউক এই লৌহ এবং অভ্রই যখন আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের এক প্রধান উপাদান, তখন এ সকলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা আমি চিকিৎসকদিগের নিকট নিবেদন করিব, আমি অনেক প্রবীণ চিকিৎসকের নিকট শুনিয়াছি, হীরাকস হইতে ১০।১৫ পুটের নাকি অতি উৎকৃষ্ট লৌহ প্রস্তুত হইতে পারে, এবং তদ্দ্বারা প্রচলিত লৌহ অপেক্ষা নাকি অধিক ফল পাওয়া যায়। চিকিৎসকগণ ইহা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। ঢাকার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক আমাকে সম্প্রতি জানাইয়াছেন, পর্প টী এবং চতুর্ম্মুখ এই দুইটী ঔষধে তিনি জারিত স্বর্ণ অপেক্ষা কাঁচা সোনা মিশ্রিত কজ্জলী ব্যবহার করিয়া

অনেক অধিক ফল লাভ করিয়াছেন। বংশ-পরম্পরা ব্যবহার দ্বারা এইরূপ কাঁচা সোনার গুণ পরীক্ষিত হইয়াছে বলিয়া তিনি বলিলেন। আয়ুর্ব্বেদীয় উন্নতির নিমিত্ত চিকিৎসকদিগকে আমি ইহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

ঘৃত—আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুতের জন্য নূতন কি পুরাতন ঘৃত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, সে সম্বন্ধে এক গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। আজকাল দেখা যায়, অনেকেই নূতন ঘৃত ঔষধার্থ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু ঔষধপ্রস্তুত-প্রণালীতে শাস্ত্রকার স্পষ্টবাক্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

দ্রব্যাণ্যভিনবান্যেব প্রশস্তানি ক্রিয়াবিধৌ।
ঋতে গুড় ঘৃত ক্ষৌদ্র ধান্য কৃষ্ণা বিড়ঙ্গতঃ॥

এরূপ সুস্পষ্ট নিষেধ বাক্য সত্বে নূতন ঘৃত ব্যবহৃত হইতে পারে কিরূপে, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। চরক, হারীত, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট চক্রপাণি প্রমুখ আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ পুরাতন ঘৃতের অশেষ গুণ বর্ণন করিয়াছেন। এস্থলে আমি মহর্ষি হারীতের বচনটী মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

সর্পিঃ পুরাণং বিজ্ঞেয়ং দশবর্ষস্থিতং তু যৎ।
সর্পিঃ পুরাতনং শ্রেষ্ঠং ত্রিদোষতিমিরাপহম্॥
মূর্চ্ছা-কুষ্ঠ বিষোন্মাদগ্রহাপস্মারনাশনম্।
দশ সম্বৎসরাদূর্দ্ধং আজ্যমুক্তং রসায়নম্॥
শতবর্ষস্থিতং যত্তু কুম্ভসর্পিস্তদুচ্যতে।
রক্ষোঘ্নং কুম্ভসর্পিঃ স্যাৎ পরতস্তু মহাঘৃতম্॥
পেয়ং মহাঘৃতংভূতৈঃ সর্ব্বতোঽপি গুণাধিকম্।
যথা যথা জরাং যাতি গুণবৎ স্যাৎ তথা তথা।

এখানে দেখা যায়, দশ বৎসরের না হইলে ঘৃতকে পুরাতন বলা যায় না এবং দশ বৎসরের অধিক পুরাতন হইলেই ঘৃত রসায়ন গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে। শত বৎসরের অধিক সময়ের পুরাতন ঘৃত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুণযুক্ত; ফলতঃ ঘৃত যত অধিক পুরাতন হইবে, উহার উপকারিতাও তত অধিক বলিয়াই নির্ণীত হইয়াছে। ভাব-প্রকাশের—

"বর্ষাদূর্দ্ধং ভবেদাজ্যং পুরাণং তৎ ত্রিদোষণুৎ"

এই বচনের দোহাই দিয়া এক বৎসরের অতিরিক্ত সময়ের ঘৃতকে পুরাতন বলা কেবল নিতান্ত অনুপায় স্থলেই চলিতে পারে, কারণ উহার পরই ভাবপ্রকাশ বলিতেছেন :—

"যথা যথাখিলং সর্পিঃ পুরাণমধিকং ভবেৎ।
তথা তথা গুণৈঃ স্বৈঃ স্বৈরধিকং তদুদাহৃতম্।

সুতরাং বেশীদিনের পুরাতন ঘৃত ঔষধে ব্যবহার করা যে ভাবপ্রকাশেরও অভিপ্রেত তৎপক্ষে সংশয় নাই। এ অবস্থায় নূতন বা দশ বৎসরের কম সময়ের পুরাতন ঘৃত ঔষধার্থ ব্যবহার করা যাইতে পারে কি না, এবং ঐরূপ ব্যবহারে ঔষধের উপকারিতা হ্রাস পাইতেছে কি না, তাহা সকলে ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখেন,—ইহাই আমার প্রার্থনা।

মকরধ্বজ ও স্বর্ণসিন্দূর।—জানি না, কোন্ ঋষিবাক্যের অনুবলে এ দেশে কিয়ৎকাল যাবৎ মকরধ্বজ ও স্বর্ণ-সিন্দূর এক ও অভিন্ন পদার্থরূপে প্রচারিত হইতেছে। আজ কাল "মকরধ্বজ" (স্বর্ণ-সিন্দূর) এইরূপ এক অপূর্ব্ব আখ্যা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। আমি যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে মকরধ্বজ ও স্বর্ণসিন্দূর দুইটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে; ইহাদের উপাদানের জিনিষ এক

হইলেও, ঐ সকল জিনিষের মাত্রা এবং উভয়ের প্রস্তুতপ্রণালীতে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। মকরধ্বজ প্রস্তুত করিতে হইলে—

স্বর্ণদলং পলমেকং রসেন্দ্রস্য পলাষ্টকম্।
রসসাং দ্বিগুণং গন্ধং তেনৈব কজ্জলীকৃতম্॥
কুমারিকা রসৈর্ভাব্যং কাচপাত্রে নিধাপয়েৎ
বালুকাযন্ত্রগং কৃত্বা ক্রমশ স্ত্রিদিনং পচেৎ॥

স্বর্ণ ৮ তোলা, পারদ ৬৪ তোলা এবং গন্ধক ১২৮ তোলা দ্বারা কজ্জলী করিয়া কুমারীরসে ৭টী ভাবনা পদানপূর্ব্বক বালুকা-যন্ত্রে তিন দিন পাক করিতে হয়। কিন্তু স্বর্ণসিন্দুরের জন্য—

পলং রসেন্দ্রস্য চ গন্ধকস্য হেম্নোঽপি কর্ষং পরিগৃহ্য সম্যক্।
বটপ্ররোহস্য রসেন যামং যামং বিমর্দ্যাথ কুমারিকায়াঃ।
তৎ কাচ কুপ্যাং নিহিতং প্রযত্নাৎ পচে-দ্দিনিক্তঃ সিকতাখ্য যন্ত্রে।

৮ তোলা পারদ ও ৮ তোলা গন্ধক ২ তোলা স্বর্ণের সঙ্গে কজ্জলী করিয়া, বটাঙ্কুরের রস দ্বারা এক প্রহর এবং কুমারী-রস দ্বারা এক প্রহর মর্দ্দন পূর্ব্বক বালুকা-যন্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে যতক্ষণ আবশ্যক তত সময় পাক করিতে হইবে। সুতরাং এই উভয় পদার্থে পার্থক্য কত—তাহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। মকরধ্বজ আয়ুর্ব্বেদের শ্রেষ্ঠরত্ন; এই মহৌষধিই সর্ব্বরোগহর এবং জরা-মরণ-নাশন বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু বড় দুঃখের সহিত আমাকে বলিতে হইতেছে, এমন পরমকল্যাণকর পদার্থের প্রস্তুতপ্রণালী বোধ হয় এখন এ দেশের অতি অল্প লোকই অবগত আছেন। আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও মকরধ্বজ প্রস্তুতে প্রকৃত পারদর্শী কোন মহাজনের সন্ধান এ পর্য্যন্ত করিয়া উঠিতে পারি নাই। কি উপায়ে যে তিন দিন জ্বাল দিয়া ঠিক অবিকৃত অবস্থায় ঔষধ রক্ষা করিতে পারা যায়, তাহা এখন অনেকেই অবগত নহেন।

"মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)" নামে এখন যে অপূর্ব্ব পদার্থ প্রচারিত হইতেছে, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান লইয়া আমি জানিতে পারিয়াছি, ১ তোলা স্বর্ণ, ৮ তোলা পারদ এবং ১৬ তোলা গন্ধক দ্বারা কজ্জলী করিয়া কুমারীরসে মর্দ্দন পূর্ব্বক বালুকা যন্ত্রে ৮।১০ ঘণ্টা জ্বাল দিয়া উহা প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, উপাদান ও জ্বালের অল্পতা নিবন্ধন ইহাকে শাস্ত্রানুসারে মকরধ্বজ তো বলা যায়-ই না, পরন্তু গন্ধকের আধিক্য ও স্বর্ণের অল্পতায় ইহা খাঁটি স্বর্ণসিন্দুর নামেও অভিহিত হইতে পারে না। এভাবে ঔষধ প্রস্তুত হইলে, তদ্দ্বারা জরামরণ কেন, সামান্য ব্যাধির বিনাশ না হইলেও তাহাতে বিস্মিত হইবার কোনই কারণ নাই! যাহা হউক প্রকৃত মকরধ্বজ প্রস্তুত সম্বন্ধে যাঁহাদের যথার্থ অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা যদি কৃপাপূর্ব্বক সকলকে বুঝাইয়া দেন যে, অগ্নিতাপের পরিমাণ কি ভাবে রক্ষা করিলে তিন দিনে পাক-কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, এবং কিরূপ চিহ্ন দেখিয়া ঔষধ পাক শেষ হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে, তবেই একমাত্র এই পরম-কল্যাণকর ঔষধ অচিরে বিলুপ্তি হইতে রক্ষিত হইতে পারে। দেশের ও আয়ুর্ব্বেদের যথার্থ কল্যাণসাধন করিতে হইলে, যাহাতে মকরধ্বজের প্রস্তুতপ্রণালী সকলের শিখিবার সুবিধা হয় তদ্রূপ [illegible] করিবার

জন্য দেশের ভিষকবর্গ বদ্ধপরিকর হইবেন, ইহাই আমি যুক্তকরে প্রার্থনা করিতেছি। যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটিতে যদি এই অমূল্যরত্ন বিস্মৃতিসলিলে বিসর্জ্জিত হয়, তাহা হইলে তদপেক্ষা অধিকতর দুর্ভাগ্যের বিষয় এদেশবাসীর আর কিছুই হইতে পারে না। স্বর্ণসিন্দুর প্রস্তুতের "বিধিজ্ঞ" ব্যক্তি এদেশে অনেক আছেন, যথার্থ জিনিষ দ্বারা শাস্ত্রোক্ত প্রণালীতে উহা প্রস্তুত করিলে, নিশ্চয়ই অতি উত্তম ফললাভ হইবে। তবে, বরিশালের স্বর্ণসিন্দুর ব্যবসায়িগণের অতি সুলভ পদার্থের মায়ায় যাঁহারা মুগ্ধ হইতেছেন তাহারা কখনই সেই জিনিষ হইতে শাস্ত্রোক্ত স্বর্ণসিন্দুরের সুফল প্রত্যাশা করিতে পারেন না।

চ্যবনপ্রাশ।—অবশেষে আমি আয়ুর্ব্বেদের "পরম রসায়ন" চ্যবনপ্রাশ সম্বন্ধে দুই একটি কথা নিবেদন করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব। আপনারা সকলেই জানেন, এই মহৌষধের প্রভাবে অতিবৃদ্ধ ও বিগতেন্দ্রিয় চ্যবনমুনি পুনর্ব্বার নবযৌবন লাভ করিয়াছিলেন। এমন একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ অন্য কোন ঔষধের বর্ণনায় আছে বলিয়া আমি অবগত নহি। কিন্তু, সেকালের চ্যবনমুনির ভাগ্যে যাহাই ঘটিয়া থাকুক, চ্যবনপ্রাশ একালের সুকুমার বালক ও যুবকদিগের স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য রক্ষায়ও সমর্থ হইতেছে না, তাহা আমাদের নিয়তই প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে! এরূপ ফলবিপর্য্যয়ের যে নিশ্চয়ই কোন গূঢ় কারণ আছে, তৎপক্ষে সন্দেহ করা যাইতে পারে না। কি সেই কারণ, এবং কিরূপেই বা তাহার প্রতিকার করা যাইতে পারে, আয়ুর্ব্বেদের সম্মান ও গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, তদ্বিষয়ে চিকিৎসকদিগের দৃষ্টিপাত একান্ত আবশ্যক। আমি এ বিষয়ে আয়ুর্ব্বেদ-হিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

চ্যবনপ্রাশে ৫০০ শত আমলকী প্রদানের বিধান রহিয়াছে, অথচ অন্যান্য ঔষধ সমস্তই পল-মানে ব্যবস্থিত আছে। আজকাল দেশে যে সকল বিভিন্ন আকারের আমলকী দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার সহিত নির্দ্দিষ্ট পলাদিমানের অন্যান্য ঔষধ সম্মিলিত হওয়াতে ফলবৈষম্য ঘটিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, কারণ ৫০০ শত বৃহদাকারের কাশীর আমলকী এ দেশের ৫০০ শত আমলকী অপেক্ষা পরিমাণে দ্বিগুণেরও অধিক হইবে। সুতরাং অন্যান্য ঔষধাদির সহিত সামঞ্জস্য দ্বারা সুফললাভের নিমিত্ত এই পাঁচশত আমলকীর একটা পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া সঙ্গত কি না, চিকিৎসকগণ তাহা বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন। ভৈষজ্যরত্নাবলীতে এই ৫০০ শত আমলকীর জন্য /৭৸০ সাত সের তের ছটাক মাত্রা নির্দ্ধারিত হইয়াছে; ইহা কতদূর সমীচীন, তাহাও চিন্তনীয়।

তার পর, চ্যবনপ্রাশের জন্য গৃহীত আমলকী শুষ্ক কি অশুষ্ক হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধেও মতভেদ চলিতেছে। আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অশুষ্ক আমলকী দ্বারা চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু আমি কোন প্রবীণ চিকিৎসকের নিকট শুনিয়াছি, কাস অধিকারে শুষ্ক আমলকী দ্বারা প্রস্তুত চ্যবনপ্রাশই যে সমধিক ফলপ্রদ, তাহা তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। আম-

লকীর আমরস কফরোগের পক্ষে হিতকর নহে, এ অবস্থায় অশুষ্ক আমলকী ব্যবহারের যৌক্তিকতা বিশেষভাবে বিবেচ্য। পরিভাষা-প্রকরণে শুষ্ক আমলকীই অধিকতর গুণ-সম্পন্ন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

"দ্রাক্ষা-বিল্ব-শিবাদিনাং ফলং শুষ্কং গুণাধিকম্।"

পরিভাষা প্রথমতঃ সাধারণভাবে শুষ্ক দ্রব্য গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া, পরে যখন বিশেষভাবে শিবাদি (আমলকী, হরিতকী, বহেড়া) সম্বন্ধে সেই শুষ্কতার পুনরুক্তি করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই ইহার গূঢ় অর্থ আছে। চরকোক্ত চ্যবনপ্রাশে আমলকী শুষ্ক কি অশুষ্ক হইবে, তৎসম্বন্ধে কোন কথাই নাই, কিন্তু হারীত সংহিতায় চ্যবনপ্রাশের বচনে দেখা যায়—

"ধাত্রীফলং পঞ্চশতং সুপক্ক রসসংযুতম্

আমার মনে হয়, হারীতের এই বচন হইতেই অশুষ্ক আমলকী গ্রহণের বিধান হইয়াছে। কিন্তু চরক ও হারীতোক্ত চ্যবনপ্রাশে অনেক পার্থক্য আছে। এখন সকলে চরকোক্ত চ্যবনপ্রাশই প্রস্তুত করিয়া থাকেন, সুতরাং চরকের বচনে হারীতের বিধান অনুসৃত হওয়া বোধ হয় সমীচীন নহে। হারীত চ্যবনপ্রাশের যে সকল উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সমবায়ে অশুষ্ক আমলকীরসের দোষ দূরীভূত হওয়া অসম্ভব নহে, আমি কিন্তু হারীতোক্ত "পিপ্পলীনাং সহস্রৈকং" কথা দ্বারা ইহাই বুঝিয়াছি। চরকের চ্যবনপ্রাশে মাত্র "পিপ্পল্য দ্বিপলং" ব্যবস্থিত আছে। এক সহস্র পিপুলের তেজে আমলকীর আমদোষ নষ্ট হওয়া অসম্ভব নহে। যাহা হউক, আজকাল চরকোক্ত যে চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করা হয়, তাহাতে শুষ্ক কি অশুষ্ক আমলকী প্রদান করা কর্ত্তব্য, চিকিৎসকগণ যদি দয়া করিয়া তাহা নির্ণয় করিয়া দেন, তাহা হইলে দেশবাসীর প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।

শ্রীমুকুন্দবিহারী চক্রবর্ত্তী।

সভ্যতায় আয়ুক্ষয়।

জগতের যাবতীয় সভ্যজাতিদিগের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানবের আয়ুর হ্রাস হইতেছে। এই কথায় অনেকেই আশ্চর্য্য হইতে পারেন। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, মানবের আয়ুঃ ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে বটে, কিন্তু সভ্যতা ইহার কারণ নহে। কিন্তু বর্ত্তমানকালে যে যে অরণ্যবাসী নগ্ন অসভ্য জাতি আছে, যাহারা সভ্যতার আলোক আদৌ প্রাপ্ত হয় নাই, তাহারা সভ্যজাতীয় মানবগণ অপেক্ষা সুস্থ, সবল ও দীর্ঘায়ু। কথাটী প্রথমতঃ আশ্চর্য্যজনক বলিয়া বোধ হয় বটে ; কেননা সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কত বিস্তার আলোচনা, জ্ঞানের উৎকর্ষ, বিজ্ঞানের নব নব আবির্ভাব, কত নূতন বিষয়ের আবিষ্কার, শ্রম লাঘবের জন্য কত নূতন

নূতন কল-কারখানা, স্বাস্থ্যরক্ষার অভিনব উপায়াবলী, রোগ নিবারণের জন্য নূতন নূতন কত ঔষধাবলী, কত নূতন নূতন তত্ত্ব প্রভৃতির অভ্যুদয় হইতেছে, তাহার ফল কি মানবের আয়ুর্হ্রাস? বাস্তবিকই কথাটা প্রাণে লাগে, এত উন্নতির ফল কি না আয়ুহ্রাস!

কিন্তু একটু চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, সভ্যতার অনুরোধে আমাদিগকে নানাবিধ অনৈসর্গিক ক্রিয়ার বশবর্ত্তী হইতে হয় এবং আহার, বিহার, পরিধেয়, বাসস্থান প্রভৃতি সম্বন্ধে সভ্যতা বজায় রাখিতে গিয়া অনেক অনৈসর্গিক উপায় অবলম্বন করিতে হয়। সুতরাং স্বাস্থ্য ও জীবনরক্ষায় প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে। আমরা অপ্রাকৃতিক উপায়ে শরীর রক্ষা করি। সভ্যতার অনুরোধে নানাবিধ পরিচ্ছদে আমাদের দেহ সর্ব্বাঙ্গ আবৃত রাখিতে হয়। ইহার ফল এই হয় যে, আমাদের ত্বকের তাপ-রক্ষিণী ও শৈত্যনিবারণী শক্তি হ্রাস হইয়া থাকে। পরিচ্ছদের ঔচিত্যানুচিত্যের জন্য শরীরে নানাপ্রকার রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। শুধু তাহাই নহে, সভ্যতার অনুরোধে পরিচ্ছদ-পারিপাট্যে আমাদের অযথা অর্থব্যয়ও হইয়াই থাকে, তাদ্ভিন্ন এই সভ্যতা বজায় রাখিতে গিয়া হয়ত পরিপোষণাপযোগী খাদ্যাদির অনটন হইয়া পড়ে, তজ্জন্য জীবনী-শক্তির হ্রাস হয়। পাঁচসিকা দেড়টাকা মূল্যের কম্বল দ্বারা যথেষ্ট শীত নিবারণ হইতে পারে, কিন্তু সভ্যতার খাতিরে অনেককে ৫০৲, ১০০৲, ২০০৲ টাকা বা তদধিক মূল্যের শাল ব্যবহার করিতে হয়। এই অযথা ব্যয় কাহারও কাহারও পক্ষে অতি স্বচ্ছন্দভাবে হইয়া উঠে বটে, কিন্তু কাহারও কাহারও পক্ষে অতিশয় কষ্টকর হয়, এজন্য তাঁহাদিগকে অনুকরণের বশবর্ত্তী হইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা পূর্ণভাবে না করিয়াও সভ্যতা বজায় রাখিতে হয়। কারণ কম্বল গায়ে দিয়া সমাজে মিশিলে লোকে নিন্দা করিবে, অনেকস্থলে ঘৃণার্হ হইতে হইবে। আবার এমনও দেখা যায়, অনেক সময় পরিচ্ছদের আবশ্যক নাই, গ্রীষ্মে প্রাণ ওষ্ঠাগত, শীতল বায়ুসেবন আবশ্যক, কিন্তু সেইরূপ সময়েও সর্ব্বশরীর আবৃত করিয়া স্বেদসিক্ত কলেবরে কর্ম্মস্থলে বা সমাজে বাহির হইতে হয়। তাহা না করিলে সভ্যতা বজায় থাকে না। শুধু ইহা নহে, অনেক সময় সভ্যতার খাতিরে মলমূত্র বায়ুনিঃসরণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক ক্রিয়ারও রোধ করিতে হয়। এই সকল দ্বারা স্বাস্থ্য-হানি হয়, সুতরাং এ সকল জীবনের পক্ষে হানিকর।

আবার বিজ্ঞানের প্রভাবে নানাবিধ বিরামের দ্রব্য আবিষ্কৃত হওয়ায় কায়িক পরিশ্রমের লাঘব হইয়াছে। যে কায়িক শ্রম দেশের লোকের নিকট একসময়ে অপরিহার্য্য ছিল, তাহা এক্ষণে সখের বা বিরামের সামগ্রী হইয়াছে। যে দূরবর্ত্তী স্থানে পূর্ব্বে লোকে অনায়াসে হাঁটিয়া যাইতেন, এক্ষণে তাহার একচতুর্থাংশ দূরও লোকে ট্রামে না চড়িয়া যাইতে পারেন না। অনেক সময় হয়ত সময়ের লাঘবের জন্য ট্রামে চড়িতে হয় বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই আরামের জন্য ট্রামে চড়া হয়। আবার লজ্জার খাতিরে অনেক শ্রমজনক কর্ম্ম পরিচারক বা ভৃত্য দ্বারা করাইতে হয়। স্ত্রীলোকদের ভিতর

জল তোলা, বাটনাবাটা, কাপড়কাচা, গৃহ পরিষ্কার, রন্ধনাদি—যে সকল তাঁহাদিগের করণীয় বিষয় বলিয়া বিধিবদ্ধ ছিল, তাহাতে যে স্ত্রীজাতির মধ্যেও কায়িক শ্রমের ব্যবস্থা হইত, তাহাও এক্ষণে সমাজে ঘৃণার কার্য্য হইয়াছে। এমন কি—সন্তানপালনও এখনকার দিনে কোন কোন স্থলে লজ্জাস্কর বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, এখন অনেকে পরিচারিকা দ্বারা উহা ও সম্পন্ন করাইয়া থাকেন!

এখন ভোজন সম্বন্ধেও এইরূপ ব্যবস্থা। রসনাতৃপ্তির জন্য আমরা আমাদের খাদ্য নানাবিধ সুগন্ধি ও উগ্র মশল্লাদি দ্বারা রন্ধন করি। ইহাতে খাদ্যগুলি খুব মুখরোচক হয় বটে, কিন্তু প্রায়ই গুরুপাক হয়। কেবল তাহা নহে, উগ্র মশল্লা থাকায় লালাগ্রন্থিস্থ স্নায়ুসমূহ উত্তেজিত হয়। সেই কারণে প্রচুর লালা নিঃসরণ ও ভোজনেচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হয়, তজ্জন্য অতিভোজন হয় অর্থাৎ আমাদের শরীর রক্ষার জন্য যতটুকু আহার আবশ্যক, তাহা অপেক্ষা অধিক মাত্রায় আহার করা হয়। সুতরাং পরিপাক যন্ত্র সমূহের অতিরিক্ত শ্রম হয়, কাজেই সেগুলি শীঘ্র অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। সেইজন্য প্রায় অনেক লোকই অল্পবয়সে অজীর্ণপ্রবণ হইয়া স্বাস্থ্যভঙ্গ করিতেছেন দেখিতে পাওয়া যায়। আবার শস্যাদি অগ্নিতে পাক করায় উহার মধুরতা ও সারাংশ কিয়ৎপরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং আমরা যাহা আহার করি, উহাতে সারাংশ কম থাকায় খাদ্যের পরিমাণও অধিক হওয়া আবশ্যক হয়। এইজন্য বাধ্য হইয়া অনেক সময় অতি ভোজন করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু অতি ভোজনে পরিপাক যন্ত্র যে দুর্ব্বল হইয়া থাকে, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

বাসভবন সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ। সহরেরত কথাই নাই। জমীর দুর্ম্মূল্য বশতঃ অল্প পরিসর স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বহুলোককে বাস করিতে হয়। সুতরাং কক্ষগুলিও যে অল্পায়তন হইবে তাহাতে আর কথা কি! তাহার উপর সেই সকল কক্ষও আবার নানাবিধ বিলাস সজ্জায় সজ্জিত, কাজেই বায়ু সমাগমের স্থান অতি সঙ্কীর্ণ। ঐ সকল ক্ষুদ্র সৌধাবলীর উচ্চতাও আবার অত্যন্ত অধিক, অনেকগুলি সৌধ চতুস্তল, পঞ্চতল, কতকগুলি ষড়তলও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার প্রত্যেক তলে লোকের বাস। একতল অপেক্ষা অন্যান্যতলে চতুর্গুণ, পঞ্চগুণ বা ষড়গুণ করিয়া লোক বাস করিয়া থাকে, কিন্তু বায়ু চলাচলের পরিমাণ প্রথমতল অপেক্ষা অন্যান্য তলগুলিতে কিছু বিভিন্ন নাই। যাহা হউক উপরতলের লোকদিগের শ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারা দূষিত বায়ুর গুরুত্ব আকাশ বায়ু অপেক্ষা অধিক হওয়ায় নিম্নে নামিয়া পড়ে, সুতরাং ইহাতে নিম্নতলবাসী লোকদিগের স্বাস্থ্যহানি বিলক্ষণরূপে হইয়া থাকে। ইহা ত গেল কলিকাতার ন্যায় সহরের কথা। পল্লীগ্রামের জমীর প্রাচুর্য্য থাকিলেও এখন অনেকে সহরের অনুকরণে অল্পায়তনে হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিতেছেন এবং অবশিষ্ট জমি ফেলিয়া রাখিতেছেন। তবে পল্লীগ্রামের গৃহ সমূহের পরিসর সহরের গৃহাবলীর পরিসর অপেক্ষা অধিক ও বাসযোগ্য। ইহা ভিন্ন অন্যান্য অনেক কারণেও পল্লীগ্রামের এখন যে স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে, তাহাও

সভ্যতার ফলে অর্থাৎ সহরের অনুকরণে—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। যেমন এখন কার দিনে পল্লীগ্রামেও বাসগৃহের সংলগ্ন পায়খানার ব্যবস্থা হইয়াছে কিন্তু সহরের ন্যায় ড্রেণের বন্দোবস্ত নাই, কাজেই মেথর দ্বারা ময়লা পরিষ্কার করান হয় না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, এ সমস্তই সভ্যতার পরিণাম। অধুনা রাজবর্ত্ম, রেলপথ প্রভৃতি উচ্চ করিয়া নির্ম্মাণ করিবার দরুণ জলনিকাশের পথরোধ বা সঙ্কীর্ণ হওয়ায় আবাসভূমি সমূহের আদ্রতা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং তাহারই ফলে ঐ সকল স্থান অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়িয়াছে, ইহারও মূলে সভ্যতা নিহিত।

এইরূপ আমাদের প্রত্যেক নিত্য ক্রিয়া-বলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বাস্থ্যহানি ও আয়ুর্হ্রাস হইতেছে। বাইবেলে কথিত আছে "যে পরমেশ্বর সৃষ্টিকালে পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী প্রভৃতি সৃজন করিয়া অবশেষে একটী নর ও একটী নারী সৃষ্টি করিলেন। নরের নাম আদম ও নারীর নাম ইভ্। উক্ত নরনারীকে তিনি তাঁহার সৃষ্ট ইডেন্ নামক উদ্যানে বাস, যথেচ্ছ বিচরণ ও তাঁহার সৃষ্ট পদার্থ সমূহের যথেচ্ছ উপভোগের অধিকার দিলেন। কেবল জ্ঞান বৃক্ষ ও জীবনবৃক্ষ নামক দুইটী গাছের ফল খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। আদমের অনুপস্থিতিকালে ভুজঙ্গরূপধারী শয়তানের কুপরামর্শে ইভ্ ভগবন্নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাইয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন। পরে আদম প্রত্যাবর্ত্তন করিলে স্ত্রীর অনুরোধে তিনিও সেই ফল খাইলেন। অন্তর্য্যামী ভগবান্ মানবের এই পাপের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাদের সম্মুখীন হইলেন। আদম ও ইভ পূর্ব্বে নগ্নাবস্থায় বিচরণ করিতেন কিন্তু আর সে অবস্থায় পরমেশ্বরের সম্মুখে বাহির হইতে পারিলেন না, কারণ জ্ঞানফল খাইয়া তাঁহারা জ্ঞানলাভ করিয়াছেন সুতরাং লতাপাতা দ্বারা কোনরূপে লজ্জা নিবারণ করিয়া তবে বাহির হইলেন এবং আপনাদের কৃত পাপের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইলেন। এই জ্ঞানলাভই সভ্যতার প্রথম সোপান। যদি বাইবেল কথিত আদম ও ইভ জ্ঞান ও জীবন বৃক্ষদ্বয়ের ফল না খাইতেন, তাহা হইলে মানব ভেদজ্ঞান রহিত হইয়া অমরত্ব লাভ করিতেন,—ইহা নিশ্চিত।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে জ্ঞানের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার বৃদ্ধি ও তদনুযায়িক আয়ুরও হ্রাস আমাদের যেন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে।

ডাঃ শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র দাস।

ব্রহ্মচর্য্য ও বিবাহ।

—:০:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম সম্বন্ধে শাস্ত্রে আরও বিবিধ উপদেশ আছে। বাহুল্য ভয়ে আমরা সে সমস্ত উদ্ধৃত করিলাম না। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পর গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে হয়।

এই সময়ই দার পরিগ্রহের উপযুক্ত কাল শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, ক্ষণমাত্রও অনাশ্রমী থাকিবে না। সুতরাং ব্রহ্মচার্য্যাশ্রম হইতে বহির্গত হইয়াই দার পরিগ্রহ করিবে। কেননা গৃহিণীই গৃহ পদ বাচ্য। গৃহিণী হীন গৃহকে গৃহ বলা যায় না।

বিবাহের উপযুক্ত বয়ঃক্রম সম্বন্ধে ভগবান মনু বলিয়াছেন ;—

ত্রিশ বৎসর বয়স্ক পুরুষ দ্বাদশবর্ষীয়া মনোরমা কন্যাকে এবং চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ বয়স্ক পুরুষ অষ্টম বর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে। ইহা অপেক্ষা শীঘ্র করিলে ধর্ম্মহানি ঘটে।”

ইহা দিগদর্শন মাত্র হইলেও এইরূপ বয়সেই বিবাহ করার নিয়ম পূর্ব্বে ছিল। কারণ গুরু গৃহে অধ্যয়ন শেষ করিতে প্রায় এইরূপ বয়স হইত। সুতরাং পূর্ব্বে পুরুষের বাল্য বিবাহ ছিল না।

কন্যার বিবাহও তখনকার দিনে অল্প বয়সেই হইত। কিন্তু বিবাহ হইলেই স্বামী স্ত্রীতে উপগত হইত না। কারণ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—ঋতু কালেই ভার্য্যাতে উপগত হইবে। স্ত্রীলোকের ঋতু সাধারণতঃ দ্বাদশ বৎসর বয়সেই এ দেশে হইয়া থাকে। সুতরাং দ্বাদশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে স্ত্রীতে উপগত হইবার নিয়ম পূর্ব্বে ছিল না।

আবার বিবাহ ও গর্ভাধানের মধ্যে আর একটী কার্য্য ছিল দ্বিরাগমন অর্থাৎ বিবাহের পরে পিতৃগৃহ হইতে বধূকে ভর্তৃগৃহে পুনরা গমন! এখনও অনেক স্থলে বিবাহের পরে এক বৎসর কাল অতীত না হইলে কন্যাকে পিতৃগৃহে পাঠাইবার নিয়ম নাই। কিন্তু সেকালে যেরূপ স্বামী-স্ত্রীর মিলনের মধ্যে একটা সংযতভাবের ব্যবস্থা ছিল, তাহারই ফলে তিথি নক্ষত্র বাছিয়া—পক্ষ দিন বাছিয়া স্ত্রী-পুরুষের মিলনের ব্যবস্থা হইত, এখন তাহা উঠিয়া গিয়াছে। যাহা হউক আমরা শাস্ত্রকারগণ পুত্রোৎপাদন সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে ;—

বিশুদ্ধ গর্ভাশয় এবং রজো সমন্বিতা ষোড়শ বর্ষ বয়স্কা স্ত্রীতে ত্রিংশ বৎসর বয়স্ক পুরুষ উপগত হইলে উত্তম পুত্র জন্মিয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা ন্যূন বয়সের স্ত্রী পুরুষ সঙ্গত হইলে অধম পুত্র জন্মিয়া থাকে।

ষোড়শ বৎসর অপেক্ষা কম বয়সের স্ত্রীতে পঁচিশ বৎসর অপেক্ষা কম বয়সের পুরুষ গর্ভাধান করিলে সেই গর্ভ কুক্ষিতেই মরিয়া যায়। যদি জীবিত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়, তাহা হইলেও অধিক কাল বাঁচে না, যদিই বা অধিক কাল বাঁচে, তাহা হইলে দুর্ব্বলেন্দ্রিয় হইয়া থাকে। এইজন্য অত্যন্ত বালিকাতে গর্ভাধান করিবে না।

পুরুষের বিংশতি বর্ষে গর্ভাধানের উল্লেখ দুই এক স্থলে থাকিলেও তাহা প্রামাণ্য নহে, কারণ পুরুষের বিংশ বৎসর বয়সে ব্রহ্মচর্য্যা-শ্রম শেষ হয় না। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পরে বিবাহ, পরে দ্বিরাগমন পরে গর্ভাধান, সুতরাং পঞ্চবিংশতিবর্ষ বয়সের পূর্ব্বে গর্ভাধানের প্রথা প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল না ইহা যুক্তি যুক্ত। মনু কথিত বিবাহের বয়স ধরিলেত কথাই নাই।

পূর্ব্বে স্ত্রীলোকের বিবাহ যে আট বৎসর বয়সে হইত, মনুর বচনেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অষ্টম বৎসরে গৌরীদানের ফল হয় এবং একাদশ বৎসরের উর্দ্ধে রজস্বলা কন্যাদানে মহাপাপ হয়। কিন্তু ইহা কেবল বিবাহ সম্বন্ধে;—গর্ভাধান সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কথা।

ধর্ম্মশাস্ত্রে এবং আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ষোড়শ বৎসরের পূর্ব্বে স্ত্রীলোকের গর্ভাধান করা উচিত নহে বলা হইয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রে ঋতুকালে সহবাস না করা পাপজনক বলি-য়াও কথিত হইয়াছে। অথচ ঋতুকাল রমণীর দ্বাদশ বৎসর হইতেই আরম্ভ হয়। এই অসামাঞ্জস্যের মীমাংসা কি?

প্রাচীন ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ঋষি কন্যা এবং রাজকন্যাদিগের অধিক বয়সে বিবাহ হইত ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অল্প বয়সে ঋষি কন্যাদিগের বিবাহের নিয়ম থাকিলে শকুন্তলা, দুষ্মন্তের হাতে না পড়িয়া কোন তপস্বীর হাতেই পড়িতেন গুরুকন্যার প্রতি অত্যাচার করার ফলে রাজার রাজ্য দগ্ধ হইয়া খাণ্ডব বনে পরিণত হইত না। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতি রাজকন্যার বিবাহ যৌবনকালেই হইয়াছিল। অতি প্রাচীনকালে বিক্রমাদিত্য যখন ভোজ রাজার দ্বিতীয়া কন্যাকে বিবাহ করেন, তখন তিনি যুবতী। শান্তনু যখন সত্যবতীকে বিবাহ করেন, তখন তিনি ছেলের মা। এত দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রাচীন যুগে স্ত্রীলোকদিগের অধিক বয়সে বিবাহ যথেষ্ট প্রচলিত ছিল।

সাধারণের মধ্যে অষ্টম হইতে একাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত বিবাহের বয়স নির্দ্ধারিত থাকিলে ষোড়শ বৎসরের পূর্ব্বে গর্ভাধান হইত বলিয়া মনে হয় না। কেননা তাহা হইলে ধর্ম্ম-শাস্ত্রে এবং আয়ুর্ব্বেদে ষোড়শ বৎসর অপেক্ষা কম বয়সে গর্ভাধান হইলে যে অপকৃষ্ট পুত্র হইবার কথা লিখিত হইয়াছে, তাহার সম্মান থাকে না। অপিচ সেই নিবৃত্তির দিনে উত্তম পুত্রলাভের প্রত্যাশায় দুই তিন বৎসর সংযত হইয়া থাকা, সেকালের লোকের পক্ষে কিছুমাত্র কষ্টকর ছিল না। সুতরাং গর্ভাধানের উপযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কন্যা পিতৃগৃহে থাকিত। এখনও বিবাহের পর এক বৎসর কন্যা না পাঠাইবার রীতি অনেক গৃহস্থের মধ্যে প্রচলিত আছে। সম্ভবতঃ ইহা গর্ভাধানকালের জন্য প্রতীক্ষা করার রূপান্তর মাত্র।

সেকালে কন্যা গর্ভাধানের পূর্ব্বে ভর্তৃ গৃহে আসিলেও পতির সহিত সাক্ষাৎ ঘটিত না।

বিবাহ করিবার পর বিদ্যাদিলাভার্থ ভর্ত্তা অন্যত্র গমন করিতেন এবং তাহারই জন্য যে বিবাহের পরেই গর্ভাধান হইত না শাস্ত্রে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা:—

"বিদ্যার্থং প্রোষিতস্য ব্রাহ্মণস্য দ্বারা অপত্যোৎপাদনার্থ তদভিগমনে দ্বাদশবর্ষাণি

প্রতীক্ষেরস্তু গৌতম।" অর্থাৎ স্বামী বিদ্যা শিক্ষার জন্য অন্যত্র যাইলে স্ত্রী দ্বাদশ বর্ষ অপেক্ষা করিয়া অপত্যোৎপাদনার্থ তাহার নিকটে যাইবে। এরূপ ক্ষেত্রে কন্যার আট বৎসর বয়সে বিবাহ হইলে কুড়ি বৎসরের পরে এবং দ্বাদশ বৎসরে বিবাহ হইলে চব্বিশ বৎসরের পরে গর্ভাধান হইত।

সাত বা আট বৎসর হইতে একাদশ বৎসর পর্য্যন্ত বিবাহ কাল নির্দ্দিষ্ট হইলেও এবং রজঃস্বলা কন্যার বিবাহ না দেওয়া নরক গমনের কারণ বলিয়া কথিত হইলেও উপযুক্ত পাত্র না পাইলে রজঃস্বলা কন্যার বিবাহ দেওয়া সেকালে দোষাবহ ছিল না। মনু বলিয়াছেন,—

"কন্যা ঋতুমতী হইয়া আমরণ গৃহে থাকে, সেও ভাল তথাপি কোন গুণহীন পাত্রকে দান করিবে না।

এ সম্বন্ধে মনু আরও বলিয়াছেন:—

ঋতুমতী হইলেও কুমারী উপযুক্ত পাত্রের অভাবে তিনবৎসর কাল উপযুক্ত পাত্রের অনুসন্ধান করিবে এবং তিন বৎসর পরে উপযুক্ত পাত্র নির্ব্বাচন করিয়া লইবে। এরূপ ক্ষেত্রে দ্বাদশ বৎসরে রজঃ প্রবৃত্ত হইলেও গর্ভাধানের কাল ষোড়শ বর্ষ হইয়া পড়ে।

গুণবান পাত্র না পাওয়া যাইলে অধিক বয়সে বিবাহ দেওয়া সেকালে যে দোষাবহ ছিল না, হরধনুভঙ্গ, লক্ষ্যভেদ প্রভৃতি দ্বারা তাহা অবগত হওয়া যায়। যাহা হউক অনেক কারণে পূর্ব্বে অনেক কন্যার অধিক বয়সে বিবাহ হইত। অধুনা গুণবান পাত্রের যেরূপ অভাব, তাহাতে ধর্ম্মে আস্থাবান হিন্দু যদি গুণবান পাত্রের অনুসন্ধান করিবার জন্য বহু বিলম্ব করিয়া কন্যার বিবাহ দেন তাহা হইলে সেকালের দৃষ্টান্ত অনুসারে পাপভাগী হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কারণ ইহা ঋষিবাক্য; যাঁহারা ঋতুর পূর্ব্বে কন্যাকে বিবাহ না দেওয়া পাপের কারণ বলিয়াছেন, ইহাও তাঁহাদেরই কথা।

দ্বাদশ বৎসর সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের রজঃ প্রবৃত্তির কাল বলিয়া নির্দ্ধারিত হইলেও এখনও দেখা যায় যে, ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ বা ষোড়শ বৎসরেও স্ত্রীলোক ঋতুমতী হইয়া থাকে। প্রবৃত্তি মার্গানুযায়ী আধুনিক ভারতে কন্যাগণ যত শীঘ্র রজঃস্বলা হইয়া থাকে, নিবৃত্তি মার্গানুযায়ী প্রাচীন ভারতে বোধ হয় ইহা অপেক্ষা বিলম্বে রজঃস্বলা হইত। প্রবৃত্তিমূলক বিবিধ উত্তেজক খাদ্য, নাটক, নভেল পাঠ, থিয়েটার দেখা প্রভৃতি কারণে অল্প বয়সেই বালকবালিকাদিগের মনের উত্তেজনা ঘটে, ফলে জননেন্দ্রিয়েরও উত্তেজনা ঘটায় অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে এখনকার দিনে পুষ্প দর্শন হয়। পূর্ব্বে পুরুষদিগের মন এ বিষয়ে কতদূর নির্লিপ্ত থাকিত, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শিক্ষা-দীক্ষাপ্রভাবে প্রাচীনকালে নারীদিগেরও চিত্তের উত্তেজনা ঘটিত না বলিয়া পূর্ব্বে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে রজঃপ্রবৃত্তি হইত। মহাভারতে লিখিত আছে:—

"ত্রিংশদ্বর্ষ ষোড়শবর্ষাং ভার্য্যাং বিন্দেত নগ্নিকাং।" অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর বয়স্ক পুরুষ ষোড়শ বৎসর বয়স্কা নগ্নিকা (যাহার রজোদর্শন হয় নাই) কন্যা বিবাহ করিবে। ষোড়শ বর্ষ বয়স্কা নগ্নিকা কন্যার উল্লেখ

থাকায় পূর্ব্বে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে রজঃ প্রবৃত্তি হইত বলিয়া প্রতীতি হয়। সংবাস সম্মতি, (consent act) আইন প্রচলিত করিবার সময় ভারত গবর্ণমেণ্ট ভারতের নানা প্রদেশস্থ বহু পণ্ডিত ব্যক্তিরমত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাতে বিবাহ এবং গর্ভাধানের বয়স লইয়া পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেক মতভেদ ঘটিয়াছিল। আমরা এ সম্বন্ধে বাহুল্য ভয়ে সে সকল বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া কয়েকটী সারগর্ভ বক্তৃতার কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

কলিকাতা মেডিকেল সোসাইটীতে ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের ধাত্রীবিদ্যার শিক্ষক ডাক্তার দয়াল চন্দ্র সোম মহাশয়ের অভিমত অনুযায়ী একটী প্রবন্ধ ডাক্তার বলাই চন্দ্র সোম কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছিল। তাহাতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, 'এগার হইতে তের বৎসর বয়স্কা একুশটী বালিকার প্রসব ব্যাপারে পাঁচটী স্বাভাবিক রূপে প্রসব করিয়াছিল, পাঁচটী অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া প্রসব করিয়াছিল। পাঁচটীকে যন্ত্র দ্বারা প্রসব করাইতে হইয়াছিল এবং ছয়টী বালিকা মৃত সন্তান প্রসব করিয়াছিল। এই সকল বালিকা-প্রসূতির অনেকেরই স্বাস্থ্য প্রথম প্রসবের পরে একরূপ ভালই ছিল, দুই জনের জ্বর হইয়াছিল এবং শরীর দীর্ঘকাল দুর্ব্বল ও রক্তহীন ছিল কিন্তু দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রসবের পর অনেকেই বিবিধ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে পাঁচজন দীর্ঘকাল জ্বর ও অতিসার রোগে ভুগিয়া মারাত্মক রক্তহীনতা রোগে মারা যায়, দুই জনের ক্ষয়রোগে মৃত্যু হয়।"

"যে সকল শিশু জীবিত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, তাহারা ক্ষুদ্রকায় বা অসম্যকপুষ্ট হয় নাই কিন্তু জন্মের পর তাহাদের বৃদ্ধি ভালরূপ হয় নাই। একটী শিশু ধনুষ্টঙ্কার রোগে এবং দুইটী এক প্রকার ক্ষয় রোগে জন্মের দুই মাসের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, দুইটী শিশু জন্মের পাচ মাস পরে অতিসার রোগে এবং তিনটী দাঁত উঠিবার সময় জ্বর এবং আক্ষেপক রোগে মারা যায়। অবশিষ্ট সাতটী শিশু দুর্ব্বল ও হীনস্বাস্থ্য সম্পন্ন হইয়াছিল*।"

"বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে শাস্ত্রার্থের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের পণ্ডিতগণ তাহা গ্রহণ করেন নাই এবং এ সম্বন্ধে যুক্তি ও আপ্তবাক্যের প্রাধান্য আইনের সমর্থকদিগের পক্ষেই দেখা যায়। যদি এরূপ নাই হইত এবং আমি যদি এক জন হিন্দু হইতাম তাহা হইলে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি এবং তিলকের মতানুযায়ী ন্যায় পথ অবলম্বন করা অপেক্ষা অধ্যাপক ভাণ্ডারকর, জষ্টিস তেলাং এবং দেওয়ান বাহাদুর রঘুনাথ রাওয়ের মতানুযায়ী অন্যায় পথ অবলম্বন করাই আমি শ্রেয়োবোধ করিতাম। জয়পুরের মহারাজের বিবেচনায় গোঁড়া সম্প্রদায় যে আপ্ত পুরুষদিগের বাক্য

* পূর্ব্বে অল্প বয়স্কা বালিকার গর্ভাধানবস্থার যে কুফল লিখিত সুশ্রুত মতে হইয়াছে, তাহার সহিত সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺দয়াল চন্দ্র সোমের এই বিবরণ বর্ণে বর্ণে মিলিয়া গিয়াছে। ঋষি বাক্য যে কি অভ্রান্ত এবং সত্য ইহাতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। লেখক।

সাহায্যে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেছে, তাঁহারা যদি এ সময়ে জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তাহারা স্বয়ং এ বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন। মহারাজের এই মতের আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি।"

"কৃত্রিম উত্তেজনার দ্বারা এ দেশের স্ত্রী বালিকাদিগের পুষ্পদর্শন কাল যে অপেক্ষাকৃত শীঘ্র উপস্থিত হয় বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। ময়মনসিংহের সিভিল সার্জ্জন মেজর জেনারেল ডাক্তার বসু ইণ্ডিয়ান মিরর নামক সংবাদ পত্রে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, স্বাভাবিক ব্যাধিনা সাহায্যে পুষ্পদর্শন বঙ্গদেশে নিতান্ত দুর্লভ। অনারেবল স্যার এনগুস্কাবল এক দিকে অনেক পণ্ডিত শাস্ত্রকার এবং ভাষ্যকারদিগের মতানুসারে স্ত্রীলোকের বয়ঃপ্রাপ্তির প্রথম চিহ্ন (ঋতু) প্রকাশ পাইবার সময়কে গর্ভাধানের কাল বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। অপরদিকে অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি যাঁহারা বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে বিদ্যালোচনা করিয়া থাকেন এবং আধুনিক ও প্রাচীন ইতিহাসের ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া শাস্ত্রীয় সমস্যার সমাধান করেন, তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের লিখিত পাঠ এবং সেই গুলির উদ্দেশ্য এই যে, ঋতুর প্রথম বিকাশেই গর্ভাধান যে কেবল অনাবশ্যক তাহা নহে, পরন্তু ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং কর্ত্তব্য জ্ঞানসম্পন্ন স্বামীর পক্ষে যতদিন নিজের বয়স পঁচিশ বৎসর এবং স্ত্রীর বয়স ষোড়শ বৎসর পূর্ণ না হয়—ততদিন অপেক্ষা করা উচিত। ডেকান কলেজের অধ্যাপক ডাক্তার আর, জি, ভাণ্ডারকর, বঙ্গের সিভিল সার্ব্বিশ বিভাগের মিষ্টার আর, সি, দত্ত অনারেবল জষ্টিস কে, টি তেলাং এবং অন্যান্য জগৎ প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ ব্যক্তিগতভাবে নিজের যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। বঙ্গের ছোট লাট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর জেনারেল সুপণ্ডিত স্যার এলফ্রেড ক্রফট কলিকাতার প্রধান পণ্ডিতদিগের সহিত পরামর্শ ও বাদানুবাদ করিয়া সেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অনারেবল রাও বাহাদুর কৃষ্ণজী লক্ষ্মণ নলকার।"

"এই দেশের লোকের মধ্যে যে এইরূপ অস্বাভাবিক ইচ্ছার অস্তিত্ব দেখা যায়, তাহা সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা এবং ভারতের অধঃপতিত সময়ের হিন্দু ও মুসলমান কবিদিগের লিখিত কবিতাপাঠের ফল। ভারতের বিগত সময়ে যে অরাজকতা এবং শাসন বিভ্রাট ঘটিয়াছিল, যখন শাসন বিহীন ইন্দ্রিয় পরায়ণতা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময়ে এই সকল কবিতার সৃষ্টি হয়। এক হিন্দি ভাষাতেই অবৈধ প্রণয় সম্বন্ধে নায়ক ভেদ নামে প্রসিদ্ধ অন্যূন এক শত গ্রন্থ আছে এবং ঐ সকল গ্রন্থে অল্প বয়স্কা বালিকার সহিত সম্মিলন সম্বন্ধে ঘৃণিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। মনুষ্যত্বের গ্লানিজনক এই প্রথা যত শীঘ্র তিরোহিত হয় ততই দেশের মঙ্গল। অনারেবল রাজা অফ ভিঙ্কা।"

এই সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ এবং পদস্থ কয়েক জনের বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এবং

তাহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। কৌতূহলী পাঠক সহবাস সম্মতির বয়স সম্বন্ধে বক্তৃতা নামক পুস্তিকা পাঠে সমস্ত অবগত হইতে পারিবেন।

ব্রহ্মচর্য্য এবং বাল্য বিবাহ সম্বন্ধে শাস্ত্রের মত কি তাহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে এই বর্ত্তমান বাঙ্গালীর শোচনীয় স্বাস্থ্যের উন্নতি সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য কি তাহা আলোচনা করা যাইতেছে।

শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের অষ্টম বর্ষ, ক্ষত্রিয়ের একাদশ বর্ষে, এবং বৈশ্যের দ্বাদশ বৎসর বয়সে উপনয়নের বিধি আছে*। উপনয়নের পর ছত্রিশ বৎসর, আঠার বৎসর, নয় বৎসর বা যত দিনে অধ্যয়ন শেষ না হয়—ততদিন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম পালন করিবার উপদেশ আছে। সাধারণতঃ প্রায় চব্বিশ হইতে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম শেষ হয় বলিয়া মনু ঐরূপ বয়সে বিবাহের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে কোন ছাত্র ষোল বৎসরে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়া বি, এ, বা এম, এ পাশ দিলে তাহার বয়স ২০।২২ বৎসর হয়। তাহার পর আইন, ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারী বা যাহা হউক পড়িতে ৪।৫ বৎসর লাগে সুতরাং শিক্ষা শেষ করিতে এখন ২৫।২৬ বৎসর বয়স হইয়া পড়ে।

এখনও শিক্ষার বয়স সেই একই আছে, নাই কেবল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। স্বল্প সংখ্যক ছাত্রই এক্ষণে গুরু গৃহে থাকিয়া অধ্যয়ন করে। সকলের গুরুগৃহে অধ্যয়নের ব্যবস্থা একরূপ দেশ হইতে চলিয়া গিয়াছে ১ কিন্তু তাহা নাই থাকুক, তথাপি নিজের পুত্র কন্যার এবং দেশের হিতের জন্য যদি পাঠ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বিবাহ না দেওয়া হয়, তাহা হইলেইত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। অথবা ঘটনা ক্রমে বিবাহ দিতে হইলেও অধ্যয়ন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কন্যাকে পিতৃ গৃহে রাখাই কর্ত্তব্য। এইরূপ নিয়ম করিলে গর্ভাধানের বয়স পুরুষের পঁচিশ এবং স্ত্রীর ষোল হইয়া পড়ে। যাঁহারা দেশের প্রকৃত হিতকামী তাঁহারা এ বিষয়ে এইরূপ সুপথ অবলম্বন করুন ইহাই আমাদিগের বক্তব্য।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম যে পূর্ব্বে কিরূপ মঙ্গলজনক ছিল তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এখন দেশে ঠিক সেরূপ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ব্যবস্থা না থাকিলেও ছাত্রগণ যদি অধ্যয়ন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, তাহা হইলে নিজের পুত্র-কন্যার এবং সমাজের শ্রেয়োলাভ হইবে।

ব্রহ্মচর্য্যভ্রষ্ট বাঙ্গালী জাতি অস্থি চর্ম্মসার বল-বীর্য্য-মেধাহীন কণ্ঠাগত-প্রাণ হইয়া পড়িয়াছে। দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসারস্থল হে বঙ্গীয় ছাত্রবৃন্দ, এই মরণোন্মুখ বাঙ্গালী জাতিকে পুনঃ সঞ্জীবিত করিবার ভার তোমাদেরই উপর। যদি এই কঠিন কর্ত্তব্য পালন করিতে চাও—ছাত্র জীবনে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর। যদি বিদ্যাবুদ্ধি-যশঃ সম্মানের অধিকারী হইয়া সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চাও—ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর, যদি স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে সুস্থ ও সুখী দেখিতে চাও—ছাত্র জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন কর।

শ্রী—

* ব্রাহ্মণের পাঁচ হইতে ষোল বৎসর, ক্ষত্রিয়ের একাদশ হইতে বাইশ বৎসর, এবং বৈশ্যের দ্বাদশ হইতে চব্বিশ বৎসর উপনয়নের কাল—মনু।

বিসূচিকা ও কলেরা।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিসূচিকা রোগ কলেরা কিনা এই বিষয় লইয়া বিভিন্ন চিকিৎসক সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুদিন হইতে বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। কেহ কেহ বলেন, বিসূচিকাই কলেরা; আবার কেহ কেহ বলেন যে, কলেরা—বিসূচিকা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাধি। অধিকাংশ এলোপ্যাথ এবং হোমিওপ্যাথ শেষোক্ত মতের পক্ষপাতী। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা এ সম্বন্ধে সত্যোদ্‌ঘাটন করিতে প্রয়াস পাইব।

যাঁহারা বিসূচিকাকে কলেরা বলিতে আপত্তি করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের প্রথম আপত্তি এই যে, বিসূচিকা—অজীর্ণ রোগ হইতে উৎপন্ন হয় এবং কলেরা জীবাণু বিশেষের সংক্রমণ বশতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের মতে এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া বিসূচিকা—কলেরা হইতে পৃথক রোগ—একথা বলা চলে না। আমরা তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিব।

প্রথমতঃ দেখা উচিত যে, কলেরা জীবাণু হইতে উৎপন্ন হয় কিনা? এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বহু পরীক্ষা করিয়া উহা সত্য বলিয়াই প্রমাণিত করিয়াছেন। কিন্তু আবার ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, কেবল কলেরার জীবাণু উদরস্থ হইলেই কলেরা হয় না। অনেকে পরীক্ষার্থ কলেরার জীবাণু খাইয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের কলেরা হয় নাই। অনেক সুস্থ ব্যক্তির মলে কলেরার জীবাণু পাওয়া যায়। সুতরাং কেবল কলেরার জীবাণুকেই কলেরা রোগ উৎপন্ন হইবার কারণ বলা যায় না। কলেরা—জীবাণু ব্যতীত আরও কিছু চাই—যাহাতে রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। ন্যায়শাস্ত্রে কারণ তিন প্রকার বলিয়া কথিত হইয়াছে। প্রথমতঃ সমবায়ি কারণ—যেমন সূত্র-বস্ত্রের সমবায়ি কারণ। দ্বিতীয়তঃ অসমবায়ি কারণ; যেমন সূত্র সমূহের একত্র যোজনে বস্ত্রের অসমবায়ি কারণ। তৃতীয়তঃ নিমিত্তকারণ; যেমন বায়দণ্ড (মাকু) বস্ত্রের নিমিত্ত কারণ। এখানে কলেরা জীবাণুকে যদি কলেরা রোগের সমবায়ি কারণ বলা যায়, তাহা হইলেও অন্য কারণের আবশ্যক। আর দুইটি কারণ কি? জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া জীবাণুর শরীরে প্রবেশ অসমবায়ি কারণ এবং অজীর্ণকে যদি নিমিত্তকারণ বলা যায়, তাহা হইলে কলেরা-জীবাণুও কলেরার কারণ এবং অজীর্ণও কলেরার কারণ বলা যাইতে পারে। সুতরাং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয়বিধ শাস্ত্রের নির্দ্দেশই যথার্থ।

দ্বিতীয়তঃ—অধুনা যে সকল ব্যাধি জীবাণুজাত বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে (যেমন যক্ষ্মা প্রভৃতি) আয়ুর্ব্বেদকারগণ সে সকল ব্যাধিকে জীবাণুজাত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন কিনা? ইহার উত্তরে বলিতে হইবে—করেন নাই। (ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে জীবাণু তথ্যকে (Germ-Theory) আমরা সত্য বা মিথ্যা বলিয়া ধরিয়া লইতেছি। কেবল একমাত্র ক্রিমি-নিদানে বলা হইয়াছে যে, ছয় প্রকার ক্রিমি কুষ্ঠ রোগ

উৎপন্ন করে। এতদ্বারা বুঝা যায় যে, চক্ষুর অদৃশ্য রোগোৎপাদক জীবগুলি তাঁহাদের জ্ঞান দৃষ্টির সীমার বহির্ভূত ছিল না। তাহাই যদি হইল, তবে অন্যান্য জীবাণুজাত রোগের জীবাণুর বিষয় তাঁহারা উল্লেখ করেন নাই কেন? ইহার উত্তরে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, জীবাণু-তথ্য মিথ্যা—পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ ভ্রমাত্মক পরীক্ষায় সম্পন্ন মিথ্যাকে সত্য বলিয়া মনে করিতেছেন, নচেৎ শাস্ত্রকারগণ অতীন্দ্রিয় জ্ঞান সম্পন্ন বলিয়া জীবাণু-তথ্য অবগত থাকিলেও সে সময়ে আমাদের দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সৃষ্টি না হওয়ায় উহা সাধারণের পক্ষে কোনরূপ কার্য্যকরী হইবে বলিয়া উল্লেখ করেন নাই।

কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে না। জীবাণুর উল্লেখ না থাকিলেও বহু রোগের সংক্রামকতার বিষয় শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যথা—

প্রসঙ্গাৎ গাত্রসংস্পর্শাৎ নিঃশ্বাসাৎ সহ যোজনাৎ।
এক শয্যাসনাচ্চৈব বস্ত্র মাল্যানুলেপনাৎ॥
জ্বর কুষ্ঠশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এবচ।
ঔপসর্গিক রোগাংশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরাং॥

অনুবাদ—একত্র অবস্থান, গাত্র সংস্পর্শ, নিঃশ্বাস, একত্র ভোজন, একশয্যা ও আসন ব্যবহার, একবস্ত্র, মাল্য ও অনুলেপন (চন্দনাদি গায়ে মাখিবার দ্রব্য) ব্যবহার বশতঃ জ্বর, কুষ্ঠ, যক্ষ্মা, নেত্রাভিষ্যন্দ (চোখ উঠা) এবং ঔপসর্গিক রোগ সকল একজনের শরীর হইতে অন্যের শরীরে সংক্রমণ করে। কতকগুলি রোগের নাম বলা হইয়াছে এবং এই সকল রোগ যে একের শরীর হইতে অন্যের শরীরে প্রবেশ করে তাহা বলা হইয়াছে। তা'রপর বলা হইয়াছে ঔপসর্গিক রোগ সকল। এক্ষণে দেখা যাউক, ঔপসর্গিক রোগ কাহাদের বলে। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—প্রথমে উৎপন্ন যে রোগ পশ্চাৎ কালজাত ব্যাধির সৃষ্টি করে তাহাকে ঔপসর্গিক রোগ বলে। আর সেই রোগ হেতুক পশ্চাৎ কালজাত ব্যাধিকে উপসর্গ বলে।

বিসূচিকা রোগে অতিসার, মূর্চ্ছা প্রভৃতি রোগ উপদ্রব রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। সুতরাং বিসূচিকা রোগও ঔপসর্গিক রোগের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং সংক্রামক।

এতদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, অধুনা পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের মতে যে সকল ব্যাধি জীবাণু কর্তৃক উৎপন্ন হয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, আয়ুর্ব্বেদকারগণ তাহা অবগত থাকুন আর নাই থাকুন, রোগ প্রসঙ্গে সেরূপ কোন কথার উল্লেখ নাই, সুতরাং যক্ষ্মারোগের জীবাণুর উল্লেখ না থাকিলেও কোন সুধী ব্যক্তি যক্ষ্মারোগকে থাইসিস্ হইতে ভিন্ন রোগ নির্দ্দেশ করিবেন না, সেইরূপ বিসূচিকা রোগের জীবাণুর উল্লেখ নাই বলিয়াই উহাকে কলেরা হইতে পৃথক রোগ বলা চলে না।

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, বিসূচিকা কলেরার মত সদ্যোমারাত্মক নহে। কিন্তু এই আপত্তি নিতান্ত অযৌক্তিক। কারণ আয়ুর্ব্বেদে স্পষ্টতঃ এরূপ উল্লেখ না থাকিলেও বিসূচিকা যে আরও মারাত্মক তাহা বলা হইয়াছে। প্রমাণ দেখুন।

বিসূচিকা রোগের চিকিৎসার প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে :—

"সাধ্যাসু পার্ষ্ণ্যোর্দহনং প্রশস্তমগ্নি প্রতাপো
বমনঞ্চ তীক্ষ্ণং।"

অর্থাৎ—সাধ্য রোগে পার্ষ্ণি (গোড়ালি) উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা পুড়াইয়া অগ্নিক্রিয়া (স্বেদ) এবং তীক্ষ্ণ বমন প্রয়োজ্য।

প্রথমে বলা হইল সাধ্য রোগের এইরূপ চিকিৎসা করিবে। এতদ্দ্বারা এই রোগের বাহুল্যভাবে অসাধ্যত্ব নির্দ্দেশ করা হইল। তার পর রোগের চিকিৎসার প্রথমেই পার্ষ্ণি দাহের ব্যবস্থা। আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন যে, রোগের মারাত্মক অবস্থায় এইরূপ দাহক্রিয়া প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সাধারণ পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা দুইটী অনুরূপ প্রয়োগ দেখাইতেছি। সন্নিপাত জ্বরের চিকিৎসা প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে:—

"পাদয়োর্হস্তয়োর্মূলে কণ্ঠকূপে চ শঙ্খয়োঃ।
স্বেদেষু চ কুলত্থানং কণানং চূর্ণ ঘর্ষণম॥"

অর্থাৎ সন্নিপাত জ্বরে (রোগী অচৈতন্য হইলে) হস্ত ও পদদ্বয়ের কণ্ঠকূপে এবং উভয় শঙ্খদেশে উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা দগ্ধ করিবে। অত্যন্ত ঘর্ম্ম নির্গম হইতে থাকিলে কুলথি কলায় বা পিপুলের চূর্ণ শরীরে মর্দ্দন করিবে।

সংন্যাস রোগের চিকিৎসায় কথিত হইয়াছে:—

"সূচীভিস্তোদনং শস্তং দাহপীড়ানখান্তরে।
লুঞ্চনং কেশ রোমাঞ্চ দন্তৈর্দংশন মেবচ।
আত্মগুপ্তাবঘর্ষশ্চ হিতাস্তস্যাববোধনে।"

অর্থাৎ সংন্যাস রোগে নখের অভ্যন্তরে সূচী বিদ্ধ করা, উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা দগ্ধ করা, কেশ রোমাদি আকর্ষণ করা, দন্ত দ্বারা দংশন করা এবং আলকুশী ফল গাত্রে ঘর্ষণ করা এই সকল ক্রিয়া দ্বারা রোগীর সংজ্ঞা লাভ হয়।

উপরোক্ত দাহ ক্রিয়া যে রোগের মারাত্মক অবস্থায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। সুতরাং কলেরা যে প্রথম হইতে মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং অসাধ্য স্থলে সদ্যোমারাত্মক হইয়া থাকে তাহা বুঝা যাইতেছে। আর একটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বিষয়টী নিঃসংশয়রূপে প্রতিপন্ন করা যাইতেছে।

বিলম্বিকা—বিসূচিকা রোগের অবস্থা ভেদ মাত্র; সে কথা পরে বলিব। বিলম্বিকা রোগ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে:—

দুষ্টন্তু ভুক্তং কফমারুতাভ্যাং প্রবর্ত্ততেনোর্দ্ধ-
মধশ্চযস্য।
বিলম্বিকাং তং ভৃশদুশ্চিকিৎস্যামাচক্ষতে
শাস্ত্রবিদঃ পুরাণাঃ॥"

অর্থাৎ—যে রোগে বায়ু ও কফ কর্ত্তৃক দূষিত ভুক্ত দ্রব্য উর্দ্ধ বা অধোদিক দিয়া নির্গত হইতে পারে না, তাহাকে বিলম্বিকা রোগ বলে। পুরাতন শাস্ত্রবিদগণ বলেন এই রোগীকে পরিত্যাগ করা উচিত অর্থাৎ রোগীর চিকিৎসা করা উচিত নহে।

পরিত্যাগ করা উচিত কেন? রোগ ভাল হইবে না বলিয়া। যে রোগ প্রথম হইতেই অসাধ্য এবং বিসূচিকার ন্যায় দারুণ উপসর্গযুক্ত, সে রোগ যে আশু মারাত্মক হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি। তাই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন যে এ রোগ নহে সাক্ষাৎ যম ইহার চিকিৎসা করায় ফল নেই।

ইহার ঠিক অনুরূপ কথা পাশ্চাত্য চিকিৎসাকোবিদ ডাক্তার অসলরের (osler) চিকিৎসা গ্রন্থে (Practice of Medicine) দেখিতে পাওয়া যায়।

এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, যাঁহারা বিসূচিকা কলেরার ন্যায় সদ্যো-মারাত্মক নয় বলিয়া উভয় রোগকে পৃথক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন তাঁহাদের যুক্তি সমীচীন নহে। কেননা বিসূচিকা আশুমারাত্মক। এইস্থলে একটী অবান্তর কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি, বিলম্বিকা রোগীকে পরিত্যাগ করার কথা বলা হইয়াছে বলিয়া যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ পাঠ করেন নাই, তাঁহারা শাস্ত্রকারদিগকে দোষ দিতে পারেন। যত কঠিন রোগই হউক রোগীর চিকিৎসা করিবে না এ কিরূপ উপদেশ? কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উক্ত বচনের উদ্দেশ্য রোগের অসাধ্যত্ব এবং আশু মারকত্ব নির্দ্দেশ করা, রোগীকে পরিত্যাগ করা নয়। কারণ শাস্ত্রকারেরাই উপদেশ দিয়াছেন :—

যাবৎ কণ্ঠগতাঃ প্রাণা যাবন্নাস্তি নিরিন্দ্রিয়ঃ।
তাবচ্চিকিৎসা কর্ত্তব্যা কালস্য কুটিলা গতিঃ।

অর্থাৎ—যতক্ষণ ইন্দ্রিয় শক্তি একেবারে লোপ না পায়, যতক্ষণ প্রাণ কণ্ঠাগত থাকে, ততক্ষণ চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। কারণ কালের গতি অতি কুটিল অর্থাৎ জানি কি যদি রোগী ভালই হয়! শুধু ইহাই পর্য্যাপ্ত নহে।

চরক সংহিতায় এই রোগ আশু-প্রাণনাশকারী বলিয়া পরম অসাধ্য বলা হইয়াছে।

বায়ু এবং জল দূষিত হইয়া এই রোগের সংক্রমণ ঘটে, একথা পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণও স্বীকার করিয়া থাকেন এবং সংক্রামক রোগের প্রাবল্য নিবারণের জন্য বায়ুশোধনের কারণ ধুনা প্রভৃতি পুড়াইতে ও জল শোধনের জন্য পটাসপারামেঙ্গন্যাট ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন। রোগ বীজ মিশ্রিত হইয়াই হউক বা অন্য যে কোন কারণেই হউক বায়ু ও জল দূষিত হইলে পীড়াদায়ক হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদ বলেন,—কালের অযোগ, অতিযোগ এবং মিথ্যাযোগ বশতঃ ব্যাধির প্রাবল্য ঘটে। তদ্ব্যতীত কাল-বিশেষে সংক্রামক রোগ বিশেষেরও প্রাবল্য ঘটে। এখনকার দিনে শীতকালে প্লেগ, বসন্তকালে বসন্ত রোগ এবং বসন্ত বা গ্রীষ্মে বিসূচিকা বা কলেরা রোগের প্রাবল্যের উল্লেখ করিয়া আমরা একথা প্রমাণ করিতে পারি।

দেশ দূষিত হইলে সংক্রামক রোগের প্রাবল্য ঘটে। সংক্রামক রোগ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সেই দেশ পরিত্যাগ করিবার উপদেশ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় চিকিৎসা শাস্ত্রেই আছে। আয়ুর্ব্বেদে জনপদোধ্বংস কালে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

হিতং জনপদানাঞ্চ শিবানাং উপসেবনম্।

অর্থাৎ নির্দ্দোষ জনপদে বাস করা হিতকর ও পর্য্যাপ্ত যাহা লিখিত হইল—ইহাতে বুঝা যায় যে, বিসূচিকাদি সংক্রামক রোগ সময়ে প্রবল হইয়া বহু লোকের প্রাণসংহার করিয়া থাকে।

এই যে দেশ-কালাদির উপলক্ষে রোগের প্রাবল্য, ইহার সহিত অজীর্ণের সম্বন্ধে কি? এসব ক্ষেত্রেও কি অজীর্ণ বিসূচিকা রোগের কারণ স্বরূপ হইয়া থাকে।

অধিকাংশ রোগের সহিতই অজীর্ণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—"রোগাঃ সর্ব্বেঽপিমন্দেঽগ্নৌ" অর্থাৎ প্রায় সমস্ত রোগই অগ্নিমান্দ্য হইতে জন্মিয়া থাকে। সুতরাং

প্রধানতঃ পরিপাক বস্তু আশ্রয় করিয়া যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহা যে অজীর্ণমূলক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে, কলেরা জীবাণু উদরস্থ হইলেই রোগ উৎপন্ন হয় না, আরও কিছুর সাহায্য আবশ্যক, সে জিনিসটী আর কিছুই নহে—অজীর্ণ। কলেরার সময় একস্থানের বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং বহুলোক বাঁচিয়া যায়। যাহাদের মৃত্যু হয়, তাহাদের অজীর্ণ ছিল এবং যাহারা বাঁচিয়া যায় তাহাদের অজীর্ণ ছিল না—এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। কলেরার প্রাবল্যের সময় নিমন্ত্রণ খাওয়ার পর দিন কলেরা রোগে অনেক লোককে আক্রান্ত হইতে দেখা গিয়াছে; আর কলেরা হইলেও কলেরার পরে যে পরিপাক শক্তি কিরূপ ক্ষীণ হইয়া পড়ে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কালী তাঁহার লিখিত "ওলাউঠা সংহিতা" নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে কলেরার যে কয়টী প্রধান উপসর্গ যথা, প্রস্রাব বন্ধ হওয়া কোমা (coma—অজ্ঞান হওয়া) এবং চাউল ধোয়া জলের ন্যায় ভেদ হওয়া এ সকল বিষয়ের উল্লেখ যখন আয়ুর্ব্বেদে নাই, তখন বিসূচিকাকে কলেরা বলা যাইতে পারে না। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, লেখক নিতান্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ভাব প্রকাশের যে বচনটী আছে তাহার অর্থ এইরূপ;—"নিদ্রানাশ, অস্থিরতা, কম্প, প্রস্রাব বন্ধ হওয়া এবং অজ্ঞান হওয়া এই পাঁচটী বিসূচিকা রোগের ঘোর উপদ্রব।" সুতরাং আয়ুর্ব্বেদের বিসূচিকা ও এখনকার কলেরা কেন এ রোগ হইবে না?

আয়ুর্ব্বেদকারগণ বিসূচিকার অসাধ্য লক্ষণে বলিয়াছেন -"যঃ শ্যাবধ দন্তৌষ্ঠ নখোহল্প সংজ্ঞো" অর্থাৎ রোগীর দন্ত ওষ্ঠ ও নখ শ্যামবর্ণ সংজ্ঞা অল্প প্রভৃতি উপসর্গ ঘটিলে রোগী বাঁচে না। পূর্ব্বে যে মূর্চ্ছার কথা বলা হইয়াছে তাহাকে কোমা (coma) বলিতে আপত্তি থাকিলেও এই অল্প সংজ্ঞ অর্থাৎ অল্প জ্ঞান থাকা যে কোমা আরম্ভ হওয়ায় পরিচায়ক তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তারপর শাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে বিসূচিকা রোগে অতিসার হয়। বাতজ অতিসারের লক্ষণ এইরূপ:—

"অরুণং ফেনিলং রুক্ষমল্পমল্পং মুহুর্ম্মুহু।
শকৃদামং সরুকশব্দং মারুতেনাতিসার্য্যতে।"

অর্থাৎ—বাতজ অতিসারে সফেন রুক্ষ ও অরুণবর্ণ মল বায়ুর সহিত অল্প অল্প করিয়া নির্গত হয়, শূলবৎ বেদনা হয় প্রস্রাব হয় না, পেট ডাকে, মলদ্বার নির্গত হইয়া পড়ে এবং কটি, উরু ও জঙ্ঘা অবসন্ন হয়।

সুতরাং এতদ্দ্বারা বুঝা যায় বিসূচিকায় প্রস্রাব বন্ধ হইতে পারে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, এখানে অন্যান্য অতিসারের লক্ষণ না ধরিয়া বাতজ অতিসারের লক্ষণ ধরা হইল কেন? কিন্তু বিসূচিকা রোগে বায়ুরই প্রাধান্য থাকে বলিয়া বাতজ অতিসারের লক্ষণ ধরা অসঙ্গত হয় নাই। বিসূচিকায় যে বায়ুরই প্রাধান্য থাকে, তাহা নিম্নলিখিত বিসূচিকার সাধারণ লক্ষণ দ্বারা জানা যায়।

সূচীভিরিব গাত্রানি তুদন সন্তিষ্ঠতেঽনিলঃ।
যস্যাজীর্ণেন সা বৈদ্যৈ বিসূচিতি নিগদ্যতে॥

অর্থাৎ—অজীর্ণ বশতঃ বায়ু অত্যন্ত কুপিত হইয়া শরীরে সূচিবেধবৎ যন্ত্রণা উৎপন্ন করে বলিয়া বৈদ্যগণ ইহাকে বিসূচিকা রোগ বলিয়া থাকেন।

তারপর বিসূচিকা রোগীর মলের কথা। বিসূচিকা রোগ প্রসঙ্গে মলের কথা কিছুই বলা হয় নাই, অতিসারের উপর বরাত দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং অতিসারের মলের উপর নির্ভর করিয়াই আমাদের বিসূচিকার মলের বিষয় স্থির করিতে হইবে।

কলেরায় শরীরের জলীয়াংশ নির্গত হইয়া যায়, আয়ুর্ব্বেদের অতিসারের শেষ পরিণাম বিসূচিকাতেও তাহাই হইয়া থাকে। প্রমাণ যথা:—

সংশম্যাপাং ধাতুরগ্নিং প্রবৃদ্ধঃ
শকৃন্মিশ্রোবায়ুনাধঃ প্রণুন্নঃ।
সরত্যতীবাতিসারং তমাহুর্ব্যাধিং ঘোরং ষড়্-
বিধং তং বদন্তি॥

অর্থাৎ—শরীরস্থ জলীয় ধাতু সমূহ অর্থাৎ কফ, পিত্ত, রস, রক্ত, জল, মূত্র, স্বেদ ও মেদ প্রভৃতি বর্দ্ধিত হইয়া কোষ্ঠাশ্রিত অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিয়া বায়ু কর্তৃক অধোদেশে প্রেরিত হইয়া অতিরিক্ত পরিমাণে নিঃসৃত হইলে অতিসার রোগ জন্মিয়া থাকে। এই ঘোর ব্যাধি ছয় প্রকার।

এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, এই রোগে অর্থাৎ বিসূচিকায় শরীরের জলীয় পদার্থই বহুলরূপে নির্গত হইয়া থাকে। সুতরাং রোগীর মল প্রথমে মল সংযুক্ত থাকিলেও শেষে যে জলবৎ হইবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি।

তারপর প্রতিপক্ষগণ চাল ধোয়া জলের ন্যায় মলভেদ হওয়ার উল্লেখ নাই, এইরূপ বলিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শরীরের জল নির্গত—জলের ন্যায় মল ভেদ হওয়া সহজে স্থির করা যাইতে পারে। কিন্তু উহা শারীরিক অন্যান্য পদার্থ সংযুক্ত থাকায় ঠিক জলের ন্যায় বর্ণযুক্ত হয় না—একটু আবিল হয়। অতিসারে যে বহুপ্রকার মলের বর্ণের কথা উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে আবিল কথাটীও আছে। ইহা জল বা দুগ্ধের ন্যায় ভেদ হয় বলিয়াও লিখিত হইয়াছে। সুতরাং বিসূচিকার চালধোয়া জলের ন্যায় ভেদ হয় এরূপ স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও বুদ্ধিমান চিকিৎসকের বুঝিবার পক্ষে কোন বাধা হয় না।

কেহ বলিতে পারেন যে, এতরূপ সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় আয়ুর্ব্বেদে স্পষ্টরূপে বলা হয় নাই কেন; অবশ্য পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগের রোগ বর্ণনার প্রণালী দেখিয়াই লোকে এইরূপ প্রশ্ন করিয়া থাকে। পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগের রোগবর্ণন প্রণালী হইতে আয়ুর্ব্বেদকারগণের বর্ণনার চেষ্টা প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যে বিষয়টা ভাল করিয়া বলা পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বিশেষ আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করেন—এমন অনেক বিষয় আয়ুর্ব্বেদকারগণ সামান্যভাবে বলিয়াছেন। কোথাও চিকিৎসক অনায়াসে বুঝিয়া লইতে পারিবে বলিয়া আদৌ বলেন নাই। বাহুল্য ভয়ে আমরা এ সম্বন্ধে সে সকল কথার আলোচনা করিলাম না। অনুসন্ধিৎসু পাঠক একই রোগের বর্ণনা উভয় চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে পাঠ করিলে ইহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন।

প্রতিপক্ষগণ যে সকল যুক্তি অবলম্বন করিয়া বিসূচিকা রোগকে কলেরা বলিতে

চাহেন না, আমরা তাহা দেখাইলাম এবং ঐ সকল যুক্তির বিরুদ্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা বলিলাম। এক্ষণে কলেরা আর বিসূচিকা রোগ যে এক তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব।

আয়ুর্ব্বেদে প্রায় সকল রোগেরই পূর্ব্বরূপ অর্থাৎ কোন রোগ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় স্পষ্ট বলিয়াছেন, পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রেও তাহাই বলা হইয়াছে। কিন্তু বিসূচিকা বা কলেরার উভয় শাস্ত্রেই কোন পূর্ব্বরূপ নাই।

পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র বলেন,—"কলেরার প্রথম অবস্থায় যে অতিসার হয় তাহাতে পূর্ব্বে কোন লক্ষণ প্রকাশ না পাইয়া সহসা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।"

পূর্ব্বে মূর্চ্ছা, অতিসার, বমি প্রভৃতি যে সকল উপসর্গের কথা লিখিত হইয়াছে, কলেরায় এ সকল লক্ষণ ঘটিয়া থাকে, নিম্নে তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। তদ্ব্যতীত বিসূচিকার অসাধ্য লক্ষণে যে সকল উপসর্গের কথা লিখিত আছে, সেগুলি কলেরা রোগেও ঘটিয়া থাকে। লক্ষণগুলি এই :—

যঃ শ্যাবদন্তোষ্ঠ নখোঽল্পসংজ্ঞো
বম্যর্দ্দিতোভ্যন্তর যাত নেত্রঃ।
ক্ষামস্বরঃ সর্ব্ব-বিমুক্ত সন্ধির্যায়ান্নরঃ সোহ-
পুনরগমায়। অর্থাৎ :—বিসূচিকা রোগে যদি রোগীর দন্ত, ওষ্ঠ ও নখ শ্যাববর্ণ, সংজ্ঞা লুপ্ত প্রায়, অত্যন্ত বমি, নেত্রদ্বয় কোটরগত, স্বর অতিক্ষীণ এবং সন্ধি শিথিল হয়, তাহা হইলে রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে।

এক্ষণে কলেরার লক্ষণ দেখুন। পূর্ব্বে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, ডাক্তারি শাস্ত্রে তাহার পর যাহা লিখিত আছে :—তাহার অনুবাদ :—(ক) "অধিকাংশস্থলে দুই এক দিন উদরে শূলবৎ বেদনা হইয়া থাকে, তরল মলভেদ হয়, বমি এবং তদানুসঙ্গিক মস্তকের যন্ত্রণা ও মানসিক অবসন্নতাও থাকিতে পারে। জ্বর নাও থাকিতে পারে।

(খ) প্রবল অবস্থায়—অতিসার বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কখন বা প্রাথমিক অবস্থা প্রকাশ না পাইয়া প্রবল অতিসার হয় এবং শীঘ্র শীঘ্র প্রচুরতর মলভেদ হইতে থাকে। কোন কোন স্থলে শূলুনি এবং (প্রবাহিকা বা আমাশয়ের ন্যায়) কোঁথানি থাকে। অধিকাংশ স্থলে রোগী অবসন্ন ও নির্জীব হইয়া পড়ে। প্রবল পিপাসা হয়, জিহ্বা শ্বেতবর্ণ হয়, হাতে পায়ে অত্যন্ত খাল ধরে। কয়েক মিনিটের মধ্যে বমি আরম্ভ হয় এবং অবিরত হইতে থাকে। রোগী একেবারে নির্জীব হইয়া পড়ে, গাত্র-চর্ম্ম ছাইয়ের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট হয়, চক্ষু দুইটী কোটরে ঢুকিয়া যায়, নাক সরু হইয়া যায়, গাল তুবড়িয়া যায়, স্বরভঙ্গ হয়, হাত পা ফ্যাকাশে হইয়া পড়ে, গাত্রচর্ম্ম শুষ্ক কুঞ্চিত এবং চটে চটে ও ঘামযুক্ত হয়।......ক্রমে রোগী অচৈতন্য হইতে থাকে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত প্রায়ই অল্প চৈতন্য থাকে।

পাঠক ইহা দ্বারা বুঝিতে পারিতেছেন যে, অতিসার, বমি, শূল পিপাসা, খালধরা, বিবর্ণতা, মস্তকের যন্ত্রণা, মূর্চ্ছা বা সংজ্ঞার অল্পতা, চক্ষুকোটর প্রবিষ্ট হওয়া, স্বরভঙ্গ বা স্বরের ক্ষীণতা, ক্ষোমস্বর এবং হস্তপদাদি ফ্যাকাশে হওয়া শ্যাব দন্ত, ওষ্ঠ, নখ প্রভৃতি লক্ষণ কলেরা এবং বিসূচিকা উভয় রোগেই দেখা যায়।

পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে আর এক প্রকার কলেরা আছে, তাহাকে কলেরা-সিক্কা বলে। তাহার লক্ষণ এইরূপ :—

"এই রোগে রোগ প্রকাশ পাইবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অতিসার না হইয়াই রোগীর মৃত্যু হয়।"

পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের এই কলেরা-সিক্কা আয়ুর্ব্বেদোক্ত অলসক এবং বিলম্বিকা বা দণ্ডালসক রোগ। অলসক রোগের লক্ষণ যথা :—

কুক্ষিরানহ্যতেঽত্যর্থং প্রতম্যেৎ পরিকূজতি।
নিরুদ্ধো মারুতশ্চৈব কুক্ষাবুপরি ধাবতি ॥
বাতবর্চ্চো নিরোধশ্চ যস্যাত্যর্থং ভবেদপি।
তস্যালসকমাচষ্টে তৃষ্ণোদ্গারৌ চ যস্য তু ॥

অর্থাৎ পেট অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে, রোগী অবসন্ন হইয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে (The collapse.), যন্ত্রণায় অব্যক্ত শব্দ করে, রুদ্ধ বায়ু পেটের উপর দিকে উঠিতে থাকে, মল মূত্র রোধ হয় এবং হিকা ও উদ্গার হইয়া থাকে। এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহাকে অলসক রোগ বলা যায়। বিলম্বিকা বা দণ্ডালসক রোগ অলসক রোগের ভেদ মাত্র।

এইস্থানে পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের সহিত যে একটু মতদ্বৈধ আছে, তাহা দেখাইতেছি। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বলেন, যে কলেরা-সিক্কাতে ভেদ হইবার পূর্ব্বেই রোগীর মৃত্যু হয়। ইহাতে বুঝা যায়, রোগী আর কিছুক্ষণ জীবিত থাকিলে ভেদ হইত। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদমতে দুষ্ট-ভুক্ত-দ্রব্য আমাশয়ে অলস হইয়া থাকে বলিয়াই ইহার নাম অলসক রোগ। সুতরাং এই রোগে রোগের ধর্ম্ম-বশতঃ ভেদ হয় না।

চরকে কথিত হইয়াছে :—আমদোষ বা অজীর্ণদোষ দুই প্রকার, বিসূচিকা ও অলসক। পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের মত ও এইরূপ।

তাঁহারা বলেন, অজীর্ণ রোগ দুই প্রকার এক প্রকার অজীর্ণ রোগে পরিপাক যন্ত্রের আক্ষেপ হয় এবং আর এক প্রকার অজীর্ণ রোগে পরিপাক যন্ত্র নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকে।

বিসূচিকা বা কলেরায় প্রথমোক্ত এবং অলসক বা কলেরা-সিক্কায় দ্বিতীয়োক্ত অজীর্ণ দোষ ঘটে এই সকল প্রমাণ সত্ত্বেও যাঁহারা বিসূচিকাকে কলেরা হইতে পৃথক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন তাহাদের মত ভ্রমাত্মক।

বিসূচিকা বা কলেরা চিকিৎসা সম্বন্ধেও, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিকিৎসা শাস্ত্রের মত প্রায় একরূপ। আমরা তাহার প্রমাণের অনুবাদ দিতেছি।

"মুখ দিয়া ঔষধ প্রয়োগ না করাই ভাল কারণ তাহাতে পাকস্থলীর আরও উত্তেজনা ঘটিয়া থাকে। আমাদের বাভটকার বলিয়াছেন :—

বিসূচিকা রোগে তীব্র বেদনা হইলেও শূলনাশক (শূলনাশক শব্দে বমন ও অতিসারাদিনাশক ঔষধ বলা হইল ইতি টীকাকার) ঔষধ সেবন করা উচিত নহে; কেননা দোষ কর্তৃক অবসন্ন অগ্নি দোষ, ভুক্ত দ্রব্য এবং ঔষধ পরিপাক করিতে সমর্থ হয় না।

সাধ্য বিসূচিকা রোগে উত্তপ্ত লৌহ

শলাকা দ্বারা পায়ের গোড়ালি পুড়াইয়া দেওয়া অগ্নিতাপ, তীক্ষ্ণ বমন ও ভুক্ত দ্রব্য পক্কাভিমুখ হইলে লঙ্ঘন-স্বেদাদি দোষপাচক ক্রিয়া ও ফলবর্ত্তী দ্বারা বিরেচন হিতকর। এইরূপে বিশুদ্ধ দেহ ব্যক্তির মূর্চ্ছা অতিসার প্রভৃতি সদ্যই নিবৃত্তি পাইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে আস্থাপন প্রয়োজন হিতকর।”

এতদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, কলেরা বা বিসূচিকার প্রথমে মুখ দিয়া ঔষধ সেবন উভয়বিধ চিকিৎসা শাস্ত্রেরই অভিপ্রেত নহে।

এস্থলে পাঠকগণের বোধ-সৌকার্য্যার্থ বলিতে হইতেছে যে, বমন, ফলবর্ত্তি প্রভৃতি প্রয়োগের যে উপদেশ আছে, তাহা বিসূচিকা বা অলসক রোগভেদে বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিতে হয়। যেমন ফলবর্ত্তি—অলসক রোগে প্রযোজ্য।

“শাস্ত্রে বিসূচিকায় যেরূপ অগ্নিতাপ দিবার উপদেশ আছে, কলেরা রোগে পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রেও সেইরূপ আছে। যথা :—

“উত্তাপের বাহ্য প্রয়োগ করা উচিত এবং উষ্ণ জল পান করাইয়া দেখা যাইতে পারে। উদরে তাপ প্রয়োগ বিশেষ উপকারী।

আয়ুর্ব্বেদে যে অগ্নি তাপ দিতে বলা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বোদ্ধৃত বচনের অর্থ হইতেই জানা যায়। এ সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট একটী বচনের অর্থ দেখুন ;—

“যবের চূর্ণ ও যবক্ষার (সোরার ন্যায় গুণবিশিষ্ট) ঘোলের সহিত বাটিয়া উষ্ণ করিয়া উদরে প্রলেপ দিলে বেদনা নষ্ট হয়। ইহা দ্বারা বহু উষ্ণ বাষ্পপূর্ণ ঘটে ; হাত গরম করিয়া বা অন্য প্রকারে উদরে স্বেদ দিবে।”

পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের মতে উষ্ণ জল দ্বারা আমাশয় ধৌত করিবার বিধি আছে।

আয়ুর্ব্বেদে আমাশয় ধৌত করার কথাটা উল্লিখিত না হইলেও নিম্নলিখিতরূপ বমন দ্বারা তাহা সাধিত হইয়া থাকে। যথা,—

“সাধ্য আমদোষে দুষ্ট অলসীভূত আমদোষ প্রথমে লবণমিশ্রিত উষ্ণ জল সেবন করাইয়া নির্গত করিয়া ফেলিবে।”

“আরও দেখুন,—করঞ্জ, ফল, নিমছাল, আপাংবীজ, গুলঞ্চ, বাবুইতুলসী এবং কুড়চি ছালের কাথ প্রস্তুত করিয়া তদ্বারা বমন করাইলে ঘোরতর বিসূচিকা রোগ প্রশমিত হয়।”

পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে, আয়ুর্ব্বেদে বিসূচিকা রোগে নিরূহ প্রয়োগের বিধি আছে। পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রেও অন্ত্র ধৌত করিবার বিধি আছে।

“ঈষদুষ্ণ জল ও সাবান কিম্বা শতকরা দুইভাগ ট্যানিস এসিড দিয়া অন্ত্র ধৌত করিয়া ফেলা উচিত।”

বিসূচিকা রোগ ভাল হইবার মুখে পথ্য প্রয়োগ সম্বন্ধে যে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক—তাহা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় চিকিৎসা শাস্ত্রেই বলা হইয়াছে। সুশ্রুত বলিয়াছেন,—বিসূচিকা রোগে যথাযোগ্য বমন, বিরেচন ও লঙ্ঘনের পর ক্ষুধার্ত্ত রোগীকে পাচক ও অগ্নিদীপক ঔষধ-সংস্কৃত-পেয়াদি লঘুপাক পথ্য দিবে।

ডাক্তারি শাস্ত্র বলিয়াছেন,—“রোগ ভাল হইবার মুখে রোগীর আহার সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য এবং প্রবল অতিসার

যাহাতে পুনরায় না হইতে পারে, সে সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকা আবশ্যক।"

আমরা এ পর্য্যন্ত যে রোগের লক্ষণ, উপসর্গ, চিকিৎসা ও পথ্য সম্বন্ধে বলিলাম, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিসূচিকা রোগই কলেরা। তবে কি জন্য যে কতকগুলি চিকিৎসক বিসূচিকাকে কলেরা নয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না।

বিসূচিকা রোগ বহুকাল পূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষে বিদ্যমান আছে—ইহা পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণও স্বীকার করিয়া থাকেন। ডাক্তার অসলার প্রমুখ মনস্বিগণ বলেন,—"কলেরা প্রাচীন কাল হইতে দেশগত-ভাবে ভারতবর্ষে বিদ্যমান আছে। বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই যদি কলেরা রোগ ভারত-বর্ষে বিদ্যমান থাকে, তবে আয়ুর্ব্বেদে তাহার চিকিৎসাদি সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ থাকিবে না, ইহাও কি সম্ভব? যাহা হউক বিসূচিকা ও কলেরা যে একই রোগ—তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রী—

মহিলাগণের চিকিৎসা-শিক্ষা।

(৪)

(রক্ত প্রদর)

আহারাদির পর পিসীমার পাকা চুল তুলিয়া দিতেছিলাম। তখন শীতকাল,—পিসীমা রোদে পিঠ দিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছিলেন—"আমার মাথার যতগুলি চুল—বউমা, তোমার সেইরূপ পরমায়ু হোক"।—

আমি বলিলাম—সেকি—পিসীমা—তা হ'লে তো আর মরাই হ'বেনা দেখ্‌ছি, তোমার মাথার চুল তো অগুণ্‌তি—তা' তোমার চুলের মত আমার অগুণতি পরমায়ু হ'বে নাকি? আমি তোমার ও রকম আশীর্ব্বাদ চাই না।"

পিসীমা বলিলেন—"কেন বউমা, বেশী পরমায়ু চাওনা কেন? বেশীদিন বাঁচা তো মা, পুণ্যের লক্ষণ। যা'রা পাপী—তা'রাই অল্পদিনে ম'রে যায়। তুমি মা তো আমার সে রকম কোন পাপ করনি যে তোমাকে অল্পায়ু হ'তে হ'বে। তুমি মা আমার সর্ব্ব-সুখী হও—তোমার পরমায়ু অক্ষয় হোক।"

আমি বলিলাম—"শুধু আমার পরমায়ু অক্ষয় হ'লেই বুঝি আমার সব হ'বে—তা'র চেয়ে আমাকে বেশী আশীর্ব্বাদ ক'রবার আর কিছুই নেই পিসীমা?"

পিসীমা আমার মনের কথা বুঝিলেন। বুঝিয়া একটু হাসিলেন। তা'রপর বলিলেন—"মা, সে আশীর্ব্বাদ আমি রোজই

ক'রে থাকি। তোমাকে শুনিয়ে কি সে আশীর্ব্বাদ ক'রব? সে আশীর্ব্বাদই তোমা তোমাকে সব আশীর্ব্বাদের মূল।"

আমিও পিসীমার কথা শুনিয়া একটু হাসিয়া ফেলিলাম। কিন্তু তখনি সে কথা চাপা দিয়া বলিলাম,—"আচ্ছা পিসীমা, তুমি যে আমাকে তোমার চিকিৎসা-শিক্ষার শিষ্যা ক'র্বে ব'লেছিলে, তা' কই ক'রলে না? তা' যতদিন তুমি না আমাকে সে সব শে'খাচ্ছ—ততদিন কিন্তু আর আমি তোমার পাকা চুল তুল্‌ব না।"

পিসীমা আবার হাসিলেন। হাসিয়া আমার চিবুক ধরিয়া বলিলেন,—"পাগ্‌লি আর কি?—তা' শিষ্যা কি তোমায় ক'র্‌ছি না বউ মা! এই স্বরমার ছেলের অসুখ হ'ল, খাজাঞ্চীবাবুর স্ত্রীর অসুখ হ'ল—সে সব যা' ক'রে সার্‌'ল—তা' তে কি তুমি কিছু শিখ্‌লে না? শুধু মুখে উপদেশ দিয়ে তোমায় শিষ্যা ক'রব কেন?—তোমায় তো হাতে-কলমে সকল ব্যবস্থা শিখিয়ে খুব ভাল শিষ্যা তৈরি ক'রছি। তবে তুমি আমার পাকা চুল তুল'বে না কেন?"

আমি বলিলাম—রোজ রোজ রোগী পাবে,—তবেতো তুমি আমায় হাতে-কলমে শিষ্যা তৈরি কর্ব্বে। রোগী না পেলে বুঝি মুখের কোন উপদেশ দিতে নেই?"

পিসীমা বলিলেন,—"তা' থা'ক্‌বেনা কেন?—তা' আছে। তবে রোগী পেলে যে শিক্ষা দেওয়া হয়--সে শিক্ষা অকাট্য হয়।"

আমাদের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় পশ্চাদ্দিক হইতে কে আসিয়া আমার চোখ টিপিয়া ধরিল। টেপনটা একটু জোরে হইয়াছিল, কাজেই আমার একটু লাগিয়াও ছিল। আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম—"কে—কে,— ছাড়িয়া দাও।"

যে চোখ টিপিয়াছিল, সে ছাড়িল না, খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল।

আমি তাহার হাসি শুনিয়া আরও বিরক্ত হইলাম, তাহার হাতটা জোর পূর্ব্বক সরাইয়া দিলাম। তাহার পর ফিরিয়া যাহা দেখিলাম—তাহাতে রাগ হইল না, রাগের পরিবর্ত্তে আনন্দ হইল। স্বরমা আমার চোখ টিপিয়াছিল, পিসীমা চুপ করিয়া রঙ্গ দেখিতেছিলেন। আমি একটু অপ্রতিভ হইলাম। বলিলাম—"স্বরমা—তুমি! কখন্ এলে! বড় জোরে টিপিয়াছিলে, তাই একটু লাগিয়াছে।"

স্বরমা আমার চোখের নিকট হাত লইয়া গিয়া, যে স্থানে টিপিয়া ধরিয়াছিল, সেই স্থানে একটু হাত বুলাইয়া দিল। তাহার পর বলিল,—"এই বুঝি তুমি আমায় ভাল-বাস! একটু টিপিয়া দিলে সহ্য করতে পারনা!"

আমি পুনরপি অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম, "—না—না—তেমন লাগে নি, তা—তা—তুমি কখন এলে ভাই! অনেক দিন চিঠি-পত্তর লেখনি কেন? ছেলে-পিলে সব ভাল আছে তো?"

স্বরমার পার্শ্বে আর একটি যুবতী দাঁড়াইয়াছিল, আমি বলিলাম,—"এটি কে ভাই! বেশ মেয়েটি তো!"

স্বরমা বলিল—"অনেক কথা বললে যে! চিঠি-পত্তর তুমিও যে অনেক দিন আমাকে লেখনি—সে কথা তো ব'ললে না! বয়স হ'লে এই রকমই হয়!"

আমি বলিলাম—"ভাই, আমাকে সংসারের সবই একা দেখ্‌তে হয় সেটাতো জান, সুতরাং আমার সাত খুন মাপ। তা, যা হোক, এ মেয়েটী কে—পরিচয় দিলে না তো!

সুরমা বলিল—"আমার জা,—ছোট দেওয়ের স্ত্রী। রক্তভাঙ্গা রোগ হ'য়েছে, তাই পিসীমার নিকট নিয়ে এসেছি।"

পিসীমা বলিলেন,—"দেখ্‌লে বউমা, যে যা চায়—সে তাই পায়। তুমি চিকিৎসা শিখ্‌তে চাহিলে,—এই তো তোমার আর একটি রোগের চিকিৎসা শেখ্‌বার উপায় হ'ল।"

সুরমা ও তাহার জা এ কথার অর্থ বুঝিল না,—তাহারা আমাদের দিকে তাকাইল। পিসীমা কিন্তু অর্থ বুঝাইয়া দিলেন। সুরমা সে অর্থ শুনিয়া হাসিতে লাগিল।

তাহার পর পিসীমা রোগী লইয়া পড়িলেন। প্রথমেই তাঁহার বা চিকিৎসক-দিগের স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাস মত বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

সুরমা বলিল—"কুড়ি বৎসর।"

পিসী। ছেলে পিলে ক'টি?

সুরমা। দুটি।—একটি আমার ষোল বছরের সময় হয় আর একটি তা'র দু' বছর পরে হয়েছে।

পিসী। অসুখটা হ'য়েছে কদ্দিন?

সুর। প্রায় এক বছর।

পিসী। ঋতুটা কি ফি মাসে নিয়ম মত হয়?

সুর। না, কখন বা ঠিক সময়ে মাসে একবারই হয়, আবার কখন বা মাসে দু' বারও হয়। কিন্তু যখনই হোক—দশ বার দিন ক'রে রক্ত ভাঙ্গতে থাকে। ঋতুর সময় ছাড়া অন্য সময়ে বেদনার সহিত কখন কখন স্রাব হয় বুঝা যায়।

পিসী। অম্বল আছে? যা' খায়—হজম হয়!

সুর। না—অম্বল হয় না, তবে রাত্রিতে ক্ষিদেও বড় থাকে না—যেন খেলেও হয়, না খেলেও হয়।

পিসী। তা' হলেই তো যা' খায়—তা' ভাল জীর্ণ হয় না। জীর্ণ হ'লে আর ক্ষিদে হ'বে না কেন। দাস্ত কিরূপ হয়!

সুর। প্রায়ই ভাল হয় না!

পিসী। ছেলে কি এই দুটিই—না আর হইছিল!

সুর। না, আর হয় নি, তবে আর একবার গর্ভ হ'য়ে ছ' মাসের সময় নষ্ট হ'য়ে গি'ছল।

পিসী। সে কত দিনের কথা?

সুর। প্রায় দেড় বৎসর, তা'র কিছু দিন পর থেকেই এই অসুখটা হ'য়েছে।

পিসী। তবেই তো এ রোগ জন্মাবার একটা কারণ র'য়েছে বুঝ্‌তে পারা গেল। লোকনাথ বদ্দি বলত—এক সঙ্গে ক্ষীর-মাছ প্রভৃতি বিরুদ্ধ আহার ক'রলে, অপক্ক জিনিস আহার করলে, মদ্য পান ক'রলে, অত্যন্ত স্বামী সহবাস ক'র্‌লে, আর অকালে গর্ভ নষ্ট হ'লে এ রোগ জন্মে থাকে। শোক এবং বেশী উপবাস থেকেও এ রোগ জন্মে থাকে। দিনে ঘুমান, বেশী ভারি জিনিস ব'য়ে নিয়ে যাওয়াও এ রোগ জ'ন্মাবার একটা কারণ। তা' যে কারণেই হোক একটা কারণ গর্ভ নষ্ট—এটা বোঝা গেল।

পিসী। চেহারা কি এর চেয়ে বেশী ভাল ছিল? জল কি রকম খায়? কখন মূর্চ্ছা হয় কি!

সুর। চেহারা এর চেয়ে আগে ভাল ছিল,—এখন ফ্যাকাশে হ'য়ে গিয়েছে। জল বড্ড খায়—আমরা বারণ করি, বলি—অত জল খেওনা—বেশী জল খেলে জীর্ণের পক্ষে ব্যাঘাত হয়—কিন্তু সে কথা শোনে কে?

পিসী। গা-হাত-পা জ্বলে!

সুর। খুব। রোজই বলে—দিদি, গা-হাত-পা জ্বলার একটা উপায় করে দাও।

পিসী। ঘুম কেমন হয়?

সুর। ঘুমের পরিমাণটাও বেশী—তা' কি দিন, কি রাত। তবে ঘুমের পরিমাণ বেশী হ'লেও—ডাক্‌লেই ঘুম ভাঙ্গে, ঘুমটা যেন তন্দ্রার মত।

পিসী। যে স্রাবটা নির্গত হয়—সেটা কি মাংস ধোয়া জলের মত? পরিমাণে বেশী না কম? ফেনা ফেনা মনে হয় কি!

সুর। কখন কখন মাংস ধোয়া জলের মতই হয় বটে, আবার কখন কখন রাঙ্গা টকটকে দেখা যায়, কিন্তু বড় রুক্ষ। আর স্রাবের সময় বেদনা বড় বেশী।

পিসী। এটা হ'চ্ছে, বাতিক প্রদর—এ বায়ুজনিত প্রদর সার্‌বে। লোকনাথ বদ্যি বলিত—প্রদর রোগ চার প্রকার,—কফজ, পিত্তজ, বাতজ ও ত্রিদোষজ। ত্রিদোষজ মানে হ'চ্ছে—বায়ু, পিত্ত ও কফ—তিনটে মিশে যে রোগ জন্মায়—সেইটা ত্রিদোষজ। তা' এ ত্রিদোষজ কবিরাজদের সকল রোগেই আছে। যা'ক্—এ রোগ একটু যত্ন নিলেই সহজে সা'র্‌বে। কোন চিকিৎসা হইছিল কি?

সুর। ডাক্তারি ওষুধ অনেক খাওয়ান হ'য়েছে, কিন্তু কিছুই হয় নি।

পিসী।—ওই তো তোমাদের দোষ,—ডাক্তারি ছাড়া আর কিছু জা'ন্‌লে না। এদ্দিন যদি কোন কবিরাজকে দেখা'তে, তা'হ'লে সে টোট্‌কা-মুষ্টিযোগে এ রোগ সারিয়ে দিতে পা'রত।

সুর।—তা' যা' হ'য়েছে—তা' হ'য়েছে, এখন তো সারিয়ে দাও পিসীমা।

পিসী। স্বামীর কাছে কিন্তু এক বছর শু'তে পা'বে না, আগে এ কথায় রাজি হ'তে হ'বে।

সুরমা হাসিয়া ফেলিল। আমিও হাসি চাপিতে পারিলাম না। পিসীমা একটু রাগের ভরে বলিলেন,—"হাসছ কি—ওরই বেশী বাড়াবাড়ি ক'রেই তো রোগের উৎপত্তি, এখন কিছুদিনের জন্য ওটা বন্ধ না ক'র্‌লে চ'লবে না।"

সুরমা তাহার জায়ের দিকে চাহিয়া বলিল,—"শুন্‌ছ তো—একবছর একা শুয়ে থা'ক্‌তে হ'বে, পা'রবে তো!"

সুরমার জা লজ্জিতভাবে নতবদনা হইল। উত্তর দিল না।

সুরমা বলিল—"তা' হ'চ্ছেনা, আগে উত্তরটা দাও। সুরমার দেবরপত্নী ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

তাহার পর পিসীমা বলিলেন,—"প্রধান নিয়মের কথাটা তো হ'ল, তার'পর আরও কতকগুলি নিয়মের কথা বলি। এগুলিও পালন ক'র্‌তে হ'বে। শাক, অম্বল, কলাইয়ের দালটা মোটেই খেতে পা'বে না, লঙ্কার ঝাল, গুরুপাক এবং তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য, দই, বড় মাছ, বেশী নুন, কুমড়া, বেশী দুধ

এ সব খাওয়াও বন্ধ ক'র্‌তে হ'বে। রোদে বেড়া'তে পা'বে না, ভারি জিনিস নিয়ে তুলতে পা'বে না, সিঁড়ি বা বেশী উঁচু যায়গা থেকে বেশী ওঠা-নামা ক'র্‌তে পা'বে না, মল-মূত্রাদির বেগ মোটেই ধারণ ক'র্‌তে পা'বে না, হিম লাগান, রাত্‌জাগা, রোজ স্নান করা, বেশী জোরে কথা কওয়া, আগুণ তাতে বেশীক্ষণ থাকা—এ সবও ক'রতে পাবে না, এই সব যদি ক'র্‌তে পার, তা'হ'লে আমি চিকিৎসার ভার নিতে পারি, নইলে চিকিৎসা করান মিছে মাত্র।

সুর। এ সব নিয়ম খুব পালন করা চ'ল্‌বে পিসীমা, এ সব তো খুব সহজ নিয়ম। যেটা সব চেয়ে শক্ত—সেইটা যদি পালন ক'রতে পারে—তা' হ'লে এ সবের জন্যে কিছু আট্‌কাবে না।

পিসী। খাওয়ার কথাটা একটু বলি শোন। দিনের বেলা পুরাণ দাদ্‌খানি চালের ভাত, মুগ, ছোলার দাল, ডুমুর, পাকা কুমড়ো, মোচা, বেগুণ আলু উচ্ছে কাচ-কলা—এই সবের তরকারি, মাছটা দিন কতক না খেলেই ভাল হয়, খেলে ছোটমাছ এবং পরিমাণে খুব অল্প। রাত্রিতে রুটী বা লুচি এবং দিনের মত তরকারি। তেলে পাক করা তরকারি না খেয়ে ঘিয়ের তরকারি খেলে বেশী উপকার হয়। জলখাবার—ময়দা, সুজি, ছোলার বেশম, ঘি এবং অল্প মিষ্টি দিয়ে যে সব জিনিস ত'য়ের হয়। ফলের মধ্যে খেজুর, দাড়িম, পানফল, কিস্‌মিস্, মিছরি, আক প্রভৃতি। স্নানটা যত কম হয়, তাও' যে দিন স্নান করা হ'বে—সে দিন ঠাণ্ডা জলে নয়, জল গরম ক'রে নিয়ে স্নান ক'র্‌তে হ'বে।

সুর। তা' এসব নিয়ম খুব পালন করা চ'ল্‌বে পিসীমা। এইবার তুমি ওষুধের কথা বল।

পিসী। হাঁ ব'ল্‌ছি। কাঁটান'টের গাছ চেন তো? সকালবেলা সেই কাঁটা ন'টের শিকড় এক সিকি ভ'র ওজনে নিয়ে আলোচাল ধোয়া জলের সঙ্গে বেটে তা'রপর আর একটু আলোচাল ধোয়া জল নিয়ে ঐটে পাতলা ক'রে তা'র সঙ্গে একটু মধু মিশিয়ে খেতে হ'বে। সন্ধ্যেবেলা কুশ'রমূল—কুশ চেনতো!—গঙ্গার ভাঙ্গনে ঘাসের মত যে গাছগুলো হয়—গঙ্গা নাইতে গিয়ে দেখেছ বোধ হয়—সেই কুশের মূল ঐ রকম সিকি ভ'র ওজনে নিয়ে ঐ রকম ক'রে আলোচা'ল ধোয়া জলে বেটে পাতলা ক'রে মধু মিশিয়ে খা'বে। আর বিকেল বেলা একবার ক'রে অশোকের কাথ খেতে হ'বে। অশোক এ রোগের একটা মহা ওষুধ।

সুর। অশোকের কাথ কি পিসীমা?

পিসী। অশোকের ফুল দেখেছ তো? অশোকষষ্ঠীতে অশোকের ফুল লাগে জান না?—সেই অশোকের ছাল ২ তোলা—২ তোলা মানে হ'চ্ছে দু টাকা ভ'র ওজনে নিয়ে একটু কুটে নিয়ে একছটাক দুধ আর সাতছটাক জল একটা মাটির হাঁড়িতে কাঠের জ্বালে সিদ্ধ ক'রে দুধটুকুমাত্র থাকতে নামিয়ে ক'স্‌টে ছেঁকে নিয়ে ঠাণ্ডা হ'লে তা'তে একটু চিনি মিশিয়ে সেইটে বিকাল বেলা তিনটা চা'রটা বেলার সময় খেতে দেবে। একে বলে—অশোক-ক্ষীর বা অশোক-দুগ্ধ। এটি সকল প্রকার প্রদর রোগেরই মহৌষধ। কবিরাজেরা এই

অশোক-ক্ষীর বা অশোক-দুধের বদলে তৈরি করা "অশোকঘি" দিয়ে থাকে, যদি কোন ভাল ক'ব্‌রেজের দ্বারা সেই অশোক-ঘি তৈরি ক'রে নিতে পার—তা' হ'লে এ না ক'রে তা' দিতেও পার। তবে জিনিসটা খাঁটি হওয়া চাই—সেই জন্যই তৈরি করিয়ে নিতে ব'লছি, বাজারে কবিরাজী ওষুধ বিক্রীর অনেক দোকানে তৈরি অশোকঘি পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আজকাল অনেকেই ক'বরেজি ব্যবসা ক'রছে। তা'রা চিকিৎসার ধার ধারেনা—শুধু লাভের জন্য ওষুধ বিক্রীই তা'দের উদ্দেশ্য। এইসব গোলযোগের জন্য কোন ক'বরেজের দ্বারা তৈরি ক'রিয়ে নেওয়াই ভাল।

সুর। আর কোন ওষুধ খাওয়াতে হবেনা? শুধু এই ক'রলেই সেরে যাবে?

পিসী। এতেই সা'র্‌বে বোধ হয়। তবে আরও দু'একটা মুষ্টিযোগ ও পাচন বলছি, শুনে রাখ, যদি দরকার বোঝ, অর্থাৎ যদি এই সকল ব্যবস্থা দিন প'নের কি মাসখানেক ক'রেও না সারে, তা' হ'লে সেই সব ব্যবস্থা ক'রতে পার। কিন্তু কতকগুলো ওষুধ একসঙ্গে খাওয়াইওনা, কতকগুলো ওষুধ একসঙ্গে খাওয়ান ভাল নয়। এ ব্যবস্থায় যদি না সারে, তা' হ'লে কাঁটান'টে আর কুশের কথা যা' ব'লেছি—সেই দু'ট বদলে দিয়ে তা'রই যায়গায় আর দু'বার দু'-রকম ওষুধ দিতে পার। কিন্তু অশোক ছেড়না, অশোক এ রোগের পরম ওষুধ জেনে রেখ।

সুর। তাই ক'রব পিসীমা, এখন তুমি আরও গোটাকতক ওষুধ ব'লে দাও। শিখে রাখলেও অনেক কাজ হ'বে।

পিসী। কাকমাচীমূল কিম্বা কাপাসের মূল চা'ল ধোয়া জলের সঙ্গে খেলে প্রদর রোগে উপকার হয়। মধুর সহিত কাঠডুমুরের রস কিম্বা বেড়েলারমূল ছাগল-দুধে বেটে খেলে প্রদর রোগ ভাল হ'য়ে থাকে। কুশমূল ও বেড়েলামূল এক একটি সিকি ভ'র ওজনে নিয়ে চা'ল ধোয়া জলের সঙ্গে বেটে খেলেও প্রদর ভাল হয়। কাকমাচী কি কাপাসের মূল বা কাঠডুমুরের রসের কথা যা' ব'লেছি—ওদের পরিমাণও সিকি ভ'র জান্‌বে। কুড়, শুকনাকুল আর শুকনা কাচাকলার গুঁড় এক একটি সিকি ভ'র ক'রে নিয়ে দুধ বা ঘিয়ের সঙ্গে মিশিয়ে খেলেও প্রদর রোগ সেরে থাকে। কুড় বেণের দোকানে কিন্‌তে পাওয়া যায়। বেশী রক্ত-স্রাব থামাবার জন্য শরপুঙ্খ বা বননীলের মূল একভরি নিয়ে চালধোয়া জলের সঙ্গে খেতে দিলে সদ্যঃ ফল হ'য়ে থাকে।

সুর। তা' তো বুঝলাম পিসীমা,—এখন কোন্ ব্যবস্থাটা ক'রব—ব'লে দাও।

পিসী। সে কথাতো ব'লে দিইছি, আগে যে রকম ব্যবস্থায় থাকতে ব'লেছি, তাই ক'র্‌বে, তা'তে না সারে, তবে এ সকল কথা। তবে আমার মনে হয়—যে তিনটি ওষুধের কথা আগে ব'লেছি তাই ক'রলেই সেরে যা'বে।

সুর। তাই বল পিসীমা—অমনেই সেরে যাক্। বড্ড কষ্ট পাচ্ছে, দেখলে আমাদেরো কষ্ট হয়।

তাহার পর সুরমা আমার দিকে চাহিয়া বলিল,—আমি তো এসেই তোমাদের বাড়ী এইছি ভাই—তুমি কি আমাদের বাড়ী যা'বে না?

আমি বলিলাম—তুমি তো এসেছ নিজের গরজে। আমিও আমার গরজ প'ড়্‌লে যা'ব, এখনও তো আমার কোন গরজ প'ড়েনি।

সুর। তবে তুমি থাক, আমি চ'ল্‌লাম। এই বলিয়া সুরমা চলিয়া গেল। সুরমা চলিয়া যাওয়ার পর আমি পিসীমাকে বলিলাম—"পিসীমা, সুরমা আসিয়া কেবল তো রোগেরই কথা কহিল। তাহার সহিত আমার কোন কথাই হইল না, একবার দেখা করিয়া আসিব?

পিসীমা বলিলেন,—"যাও।" আমি পিসীমার অনুমতি পাইয়া বাল্য সঙ্গিনীর সহিত মিলিত হইয়া পরমাল্লাসে সুখ-দুঃখের কথা কহিতে লাগিলাম।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

মানুষের বদলে কুমীর।—কলিকাতার রাস্তা গুলির গর্ত্তের ভিতরএখন ধাঙ্গর নামাইয়া নর্দ্দামা পরিষ্কার করান হয়। আমেরিকার ফ্লোরিডা নগরের নর্দ্দামা কুমীরের দ্বারা পরিষ্কার করানর ব্যবস্থা আছে। কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তারা এখানে সেই নিয়ম চালাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। মন্দ কি! ইহাতে ধাঙ্গরদিগের স্বাস্থ্য হানি ঘটিবে না। তাহারও তো মানুষ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

আয়ুর্ব্বেদ সভার অভাব।—গত বড় দিনের সময় জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন উপলক্ষে এবার কলিকাতায় নানারূপ সভারই আয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ সভা বাদ পড়িয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন,—ইতঃপূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির জন্য কলিকাতা হইতে কয়েকজন খ্যাতনামা কবিরাজ দিল্লী পর্য্যন্ত ছুটিয়া গিয়াছিলেন, সে অবস্থায় কলিকাতায় এত জনসংঙ্ঘ উপলক্ষে তাঁহাদের চেষ্টা করিয়া একটা আয়ুর্ব্বেদ সভার আয়োজন করা উচিত ছিল।

পরিদর্শন।—কিছুদিন হইল কোচ বিহারের মহামান্য ভূপ বাহাদুর অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়-পরিদর্শনে যথেষ্ট প্রীতি-প্রকাশ করিয়া এই বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠাতৃ বর্গকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়া গিয়াছেন। এজন্য উক্ত মহারাজা বাহাদুরের নিকট আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ।

বালকরক্ষার ব্যবস্থা।—বালক মহলে সিগারেটের অবাধ প্রচলনের ফলে তাহাদিগের যে স্বাস্থ্যোন্নতির বিঘ্ন জন্মাইতেছে এ কথা আমরা অনেকবার বলিয়াছি। সংপ্রতি শুনিয়া সুখী হইলাম, গবর্ণমেন্ট আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া ইহা

রহিত করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। ২১ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক কোন বালককে কোন দোকানদার, সিগারেট, বিড়ি, সিগার বা নল বিক্রয় বা দান করিলে প্রথম অপরাধের জন্য অনধিক ১০৲ টাকা, দ্বিতীয় অপরাধের জন্য ২০৲ এবং তৎপরবর্ত্তী প্রত্যেক অপরাধের জন্য অনধিক ৫০৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে—ইহাই পাণ্ডুলিপিতে লিখিত হইয়াছে। পুলিশ কর্ম্মচারী, শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারী, প্রিভেণ্টিভ সার্ভিসের কর্ম্মচারী অথবা পশু ক্লেশ নিবারণী সভার কর্ম্মচারীরা ২১ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক কোন বালককে ধুমপান করিতে দেখিলে তাহার নিকট হইতে উহা কাড়িয়া লইতে পারিবেন—ইহাও পাণ্ডু-লিপিতে উল্লেখ করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এ আইন বিধিবদ্ধ করিয়া ভাল কাজই করিতেছেন।

দীর্ঘ জীবন।—কলির পরমায়ু ১২০ বৎসর, কিন্তু এখন কোনরূপে ৫০ হইলেই যেন যথেষ্ট হইল। এ অবস্থায় কাহারও দীর্ঘ জীবনের কথাশুনিলে আনন্দিত হইতে হয়। রাণাঘাটের "বার্ত্তাবহ' সংবাদ দিতে-ছেন,—"রাণাঘাটের বিশ্বাস বংশের গোষ্ঠী-পতি গোপালচন্দ্র বিশ্বাসের দেহান্তর হইয়াছে। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়স ৮২ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি সুস্থ সবল ও কর্ম্মক্ষম ছিলেন ও নিত্য নৈমিত্তিক সান্ধ্যাহ্নিক সমাপন করিয়া-ছিলেন। "এই নিত্য নৈমিত্তিক সান্ধ্যাহ্নিক সম্পন্ন—তথা হিন্দুজনোচিত আচার ব্যবহার মানিয়া চলাই তাঁহার দীর্ঘজীবন লাভের কারণ বলিয়া আমরা মনে করি। আমরা যখন ইন্দোরে গিয়াছিলাম, তখন ইন্দোরের মহারাণীর পিতামহের মৃত্যু আমাদের সম্মুখেই হইয়াছিল। একশত বৎসরেরও অধিক বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। তিনিও আমরণ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। এখন লোকে স্বধর্ম্ম পালনও ভুলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে অল্পায়ুও হইয়াছে।

চায়ের আমদানী।—"এডুকেশন গেজেট" সংবাদ দিতেছেন,"—১৯১৭—এপ্রিল হইতে অক্টোবর মধ্যে আসাম হইতে প্রায় ৮০ কোটী পাউণ্ড চা কলিকাতায় আসিয়াছিল; বাঙ্গালার বিভিন্ন জিলা হইতে ৬ কোটি ৬৮ লক্ষ, নিজাম রাজ্য হইতে ৩০ লক্ষ, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে ১৮০ লক্ষ এবং বিদেশ হইতে জাহাজে ১৯ লক্ষ পাউণ্ড চা আসিয়াছিল। বিদেশ হইতে আমদানির পরিমাণ ১৯১৬ অব্দের ঐ ছয় মাসে ৪ গুণ বাড়িয়াছে ঐ ১৯ লক্ষ পাউণ্ড বৈদেশিক আমদানীর ১৭ লক্ষ পাউণ্ড অক্টোবর মাসে।" এত চায়ের আমদানিতে কলিকাতার লোকে অত্যধিক চা খোর হইবে না কেন? কিন্তু ইহার ফল যে বিষময় হইতেছে—তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখিতেছেন?

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

২য় বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৪—ফাল্গুন। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

কাজের কথা।

—————:০:—————

সিদ্ধিতে আসক্তি।—আজকাল মদ [illegible]। চলনটা শিক্ষিত সমাজ হইতে [illegible] উঠিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু সিদ্ধির [illegible] খুবই বাড়িয়াছে, তাহার প্রত্যক্ষ [illegible]কাতার আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়গুলির [illegible] মোদক বিক্রয়। সস্তার এই মোদক [illegible] ফলে অনেক বাঙ্গালীই সিদ্ধিখোর [illegible]ড়িতেছে। মোদক সেবনের প্রাথমিক [illegible] মানসিক প্রবৃত্তি চরিতার্থকরণের [illegible] তৃপ্তি অনুভব হয় বটে, কিন্তু ইহার [illegible]ক ব্যবহারে পরিণামে অবসাদ জন্মাইয়া [illegible] সকলের সাফল্য সাধন দূরে থাকুক, উহা হইতে দৌর্ব্বল্যই উপস্থিত হইয়া থাকে। [illegible] ব্যাখ্যায় আয়ুর্ব্বেদকারগণ ইহাকে [illegible]কারক বলিয়াছেন। এ অবস্থায় ইহার অত্যধিক ব্যবহারে যকৃৎদুষ্ট-ব্যাধি [illegible] বিশেষ সম্ভাবনা। সিদ্ধিঘটিত [illegible] সেবনে আপাতমধুরফলভোগী ব্যক্তি-[illegible] এ সকল কথা ভাবিবার বিষয়।

* *

মাদক সেবনের পরিণতি।—কোন মাদকেরই পরিণতি শুভজনক নহে। নীরোগ ব্যক্তির পক্ষে মাদক দ্রব্য ব্যবহারে সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করা ভিন্ন কিছুই ফললাভ হয় না। সে ব্যস্ততার ফলে শরীরে অন্যরূপ ব্যাধি উপস্থিত হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা। সামান্য অসুখের চিকিৎসায় এইজন্যই বৃহৎ ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতে আয়ুর্ব্বেদকারগণ মাথার দিব্য দিয়া বারণ করিয়া গিয়াছেন। সামান্য সর্দ্দি-কাশিতে যক্ষ্মা বা ক্ষয়কাসের ঔষধ ব্যবহার করিলে তখনকার জন্য সর্দ্দি কাশি সারিয়া যায় বটে, কিন্তু পরিণামে যক্ষ্মা বা ক্ষয় কাসের সৃষ্টিই হইয়া থাকে। সিদ্ধি ঘটিত মোদক সেবনে ব্যাধির অবস্থা ভেদে উপকার হইলেও সকল অবস্থায় উহার ফল শুভ জনক হয় না। এইজন্যই বিজ্ঞাপন দেখিয়া নিজে নিজে মোদক সেবনের ব্যবস্থা না করিয়া সুচিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ পূর্ব্বক যদি উহা ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে উপকার হইতে পারে, নতুবা নিজে নিজে ব্যবস্থা করিয়া উহা

ব্যবহার করিলে অনেক সময় অনিষ্টেরই সম্ভাবনা।

*　　*　　*

বিজ্ঞাপনের ঔষধ।—তা' ছাড়া বিজ্ঞাপনের চটক দেখিয়া যা' তা' ঔষধ ব্যবহার করা তো কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। বিজ্ঞাপনের অনেক ঔষধে অনেক সময় 'গরু হারাইলে গরু পাওয়া যায়'—এমন সকল কথাও বাহির হইয়া থাকে। কিন্তু সত্য সত্য তাহা যদি হইত, তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদের রোগ-চিকিৎসার এক এক অধিকারে রাশি রাশি ঔষধের ব্যবস্থা কখনই সন্নিবেশিত হইত না। শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন প্রকৃত চিকিৎসকের পক্ষেও রোগ-নির্ণয় করিয়া ঔষধ-নির্ব্বাচনের সময় বিশেষ চিন্তা করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। যে ঔষধের গুণ জানা নাই, সে ঔষধ ব্যবহার করিতে আয়ুর্ব্বেদবেত্তাগণ এইজন্যই নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদ এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"যথাবিষং যথাশস্ত্রং যথাগ্নিরশনির্যথা।
তথৌষধম বিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমমৃতং যথা॥"

অর্থাৎ—যে ঔষধের গুণ অজ্ঞাত থাকে, সেই ঔষধ শস্ত্র, অগ্নি ও বজ্র সদৃশ অনিষ্টকারী, কিন্তু যে ঔষধের গুণ জ্ঞাত থাকে, তাহা অমৃতের ন্যায় উপকারী। এ সকল কথা এখনকার দিনে কেহ চিন্তা করেন না—ইহাই দুঃখের বিষয়।

*　　*　　*

বঙ্গে শিশু-মৃত্যু।—বাঙ্গালা দেশে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। সরকারি হিসাবে প্রকাশ—গত ১৯১১ খৃঃ অব্দে সমগ্র বাঙ্গালা দেশে যত শিশু জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেক পাঁচ জনের মধ্যে একজন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। আমরা নিম্নে কয়েক বৎসরের জন্ম ও মৃত্যুর তালিকা প্রদান করিতেছি,—

খৃঃ অব্দ	জন্ম	মৃত্যু
	(হাজার করা)	
১৯১২	৩৫.৩০	২৯.৭৭
১৯১৩	৩৩.৭৮	২৯.৯
১৯১৪	৩৩.৮৬	৩৪.৫
১৯১৫	৩১.৮০	৩২.৮৩

সুতরাং দেখা যাইতেছে, জন্ম ও মৃত্যুর তুলনায় বাঙ্গালা দেশে মৃত্যুর হার ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে।

*　　*　　*

শিশুমৃত্যুর কারণ।—এই শিশু-মৃত্যুর কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে মৃত শিশু-দিগের পিতা মাতাকে সর্ব্ব প্রধান দোষী করিতে হয়। ব্রহ্মচর্য্যভ্রষ্ট অস্বাস্থ্যকর পিতা মাতার শুক্র শোণিত মিলনের ফলে যে সকল শিশু জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে, ভূমিষ্ঠ হওয়ার অল্পকাল পরে তাহারাই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। সুতরাং বাঙ্গালীর ব্রহ্ম-চর্য্যের অভাবই সাধারণতঃ বাঙ্গালা দেশে শিশু-মৃত্যু বৃদ্ধির সর্ব্ব প্রধান কারণ। তা' ছাড়া বিশুদ্ধ গব্য দুগ্ধের অভাবে শিশু-শরীরে যে যকৃত রোগের আক্রমণ হইয়া থাকে, তাহাও শিশু মৃত্যুর আর একটি কারণ। ইহা ভিন্ন সামান্য 'বালসা' হইবামাত্র বড় বড় ঔষধ প্রয়োগে যে তাহা আরোগ্য করিবার চেষ্টা করা হয়, তাহার ফলেও তাহাদিগকে অকাল-মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করা হয়। বাঙ্গালী যখন ব্রহ্মচর্য্য হারায় নাই, সভ্যতার চাকচিক্যে বঙ্গ জননী যখন সৌন্দর্য্যশালিনী হন নাই, হলুদ-

তেল মাখাইয়া, রোদে রাখিয়া প্রকৃতির সহজ-জাত স্বভাবের উপর নির্ভর করিয়া যখন শিশু রক্ষার ব্যবস্থা করা হইত, তখন কিন্তু বাঙ্গালী শিশুর অকাল মৃত্যুর কথা বড় শুনা যাইত না। সামান্য সামান্য অসুখে আলুইয়ের বটি, মধু আদার রস সেবনে তাহারা নিরাময় তো হইতই এবং তাহারই ফলে দীর্ঘজীবনও লাভ করিত। বর্ত্তমান সময়ে শিশুমৃত্যুর হার দেখিয়া সে সকল অতীত কাহিনী চিন্তা করিবার সময় আসে নাই কি ?

পরিবর্ত্তিত প্রণালীতে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত উচিত কিনা ?

আমাদের দেশে দুইশ্রেণীর কবিরাজ দেখিতে পাওয়া যায়। ১ম। রক্ষণশীল, ২য়। পরিবর্ত্তনশীল। যাঁহারা রক্ষণশীল—তাঁহাদের বিশ্বাস—আয়ুর্ব্বেদ অপৌরুষেয়, ব্রহ্মাদি দেবগণ ইহার প্রবর্ত্তক। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদের কোন পরিবর্ত্তন—একেবারেই অনুচিত। অন্ততঃ আমাদের মত মানুষ আয়ুর্ব্বেদের উপর কলম চালাইতে পারিবেনা।

পক্ষান্তরে যাঁহারা পরিবর্ত্তনশীল, তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদকে ভাঙিয়া গড়িতে চাহেন, আয়ুর্ব্বেদকে অন্য জাতির বিজ্ঞানের সাহায্যে বিশ্লেষণ করিতে চাহেন, আয়ুর্ব্বেদকে সম্পূর্ণাবয়বে দেখিতে ইচ্ছা করেন। বলা বাহুল্য—আমি এই দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিরাজদেরই পক্ষপাতী। শুধু আমি কেন যিনি আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি দেখিতে চাহেন, তিনি কখনই রক্ষণশীলের অনুদারতা ও সঙ্কীর্ণতার পোষকতা করিবেন না।

আমরা সকলেই প্রতি নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছে। ইহার একমাত্র কারণ—অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা সাম্প্রদায়িক নহে। হিন্দুর বিজ্ঞানে, মুসলমানের বিজ্ঞানে —যাহা কিছু সার ও সত্য দেখিতে পাওয়া যায়, অ্যালোপ্যাথেরা তাহা অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করেন। কোন নূতন ঔষধের সন্ধান পাইলে, তাহা পরীক্ষা করিয়া সাদরে লইয়া থাকেন। এটী আমার—সুতরাং উৎকৃষ্ট, ওটী পরের অতএব নিকৃষ্ট,—ডাক্তারী মতে এরূপ সঙ্কীর্ণতা স্থান পায় না। এই উদারতার জন্যই ডাক্তারি চিকিৎসার এতদূর প্রবল প্রভাব। দুঃখের বিষয় কবিরাজ মহাশয়দের মধ্যে অনেকেই এরূপ উদারতা দেখাইতে পারেন নাই। তাই আয়ুর্ব্বেদের এতদূর অধঃপতন হইয়াছে। খ্রীষ্টিয় ষোড়শ শতাব্দিতেও যে আয়ুর্ব্বেদ—অপরের কাছে অপরাজেয় ছিল, সনাতন, জ্ঞানময়, আদি বিজ্ঞান আয়ুর্ব্বেদ আজ ডাক্তারী চিকিৎসার নিকটে হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে। অথচ অনেকেরই মুখে শুনিতে পাই, আজকাল দেশের লোকের মতি ফিরিয়াছে, আয়ুর্ব্বেদের আদর বাড়িয়াছে, উন্নতি হইয়াছে। এই উন্নতির পরিমাপ কতটুকু ? দুই চারিজন শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত কবিরাজ—

কলিকাতায় বসিয়া সিভিল সার্জ্জনের ফিঃ আদায় করিতেছেন, মোটর চাড়তেছেন—ইহাতেই কি বুঝিব, আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি হইয়াছে? কোন চিকিৎসায় যে রোগী আরাম হয় নাই, সে রোগী যে আয়ুর্ব্বেদের অমৃত সেচনে পুনর্জীবিত হইতেছে এরূপ ঘটনা আমরা শত শত প্রত্যক্ষ করিতেছি—বল দেখি সে আয়ুর্ব্বেদের কি ইহাই উন্নতির লক্ষণ? তিন টাকা সেরের চ্যবণপ্রাশ"—৪৲ টাকা তোলার "স্বর্ণ টিত মকরধ্বজ" ৬৲ টাকা সেরের "মহারাজ প্রসারিণী তৈল—পথে পথে, গলিতে গলিতে, মোড়ে মোড়ে—নানা বর্ণ রঞ্জিত সাইন বোর্ড দোদুল্যমান—দেয়ালে-প্রাচীরে খবরেরকাগজে-পাঁজিতে স্বয়ম্ভু কবিরাজ মহাশয়দের নবাবিষ্কৃত ঔষধাবলীর বিরাট বিজ্ঞাপন, ইহাই কি আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির পরিচায়ক? তোমরা একবার ভাবিয়া দেখ দেখি এগুলি আয়ুর্ব্বেদের অবনতির চিহ্ন কিনা? যে উদারতার গুণে ডাক্তারী চিকিৎসা জীবন্ত বিজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে, সেই উদারতার অভাবেই আয়ুর্ব্বেদ হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছে। নহিলে, যাহার পিতৃপিতামহ আয়ুর্ব্বেদের কল্যাণে সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া সংসারে সুখী হইয়া গিয়াছেন, সে আজ আয়ুর্ব্বেদের মহিমা ভুলিবে কেন? আর আয়ুর্ব্বেদ যে দেশের কল্প-পাদপ, সেই দেশের ভ্রান্ত নর-নারীরে আয়ুর্ব্বেদের গৌরব আজ নূতন করিয়া বুঝাইতে হইবে কেন?

যখন দেখিব এ দেশে আবার নাগার্জ্জুন-ভাব মিশ্রের মত সাহসী চিকিৎসক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যখন দেখিব কবিরাজ মহাশয়েরা যাহা নিজে জানিয়াছেন,—তাহা অপরকে জানাইতেছেন, যখন দেখিব বৈদ্যগণ বৈদ্যক গ্রন্থে স্ব স্ব পরীক্ষালব্ধ ফল লিপিবদ্ধ করিতেছেন,—তখনই বুঝিব আয়ুর্ব্বেদের পুনরুন্নতি হইয়াছে।

এটা উন্নতির যুগ। আমাদের সৌভাগ্য—সকল জাতির মধ্যেই একটা সজীবতা দেখা দিয়াছে। জাতীয় উন্নতির প্রতি সকলের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। তবে আয়ুর্ব্বেদের বা উন্নতি হইবে না কেন? কবিরাজ মহাশয়েরা এ কথাটা একটু ভাবিয়া দেখিবেন কি?

আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি করিতে হইলে, কি কি করিতে হইবে,—আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ আমার চেয়ে তাহা ভাল বুঝিবেন। আমি সে সকল কথা বলিতে চাহিনা। আমি কেবল বলিতে চাই—যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদে পরিবর্ত্তনের বিরোধী আয়ুর্ব্বেদ দেবরচিত শাস্ত্র—অতএব নূতন কিছু করা চলিবে না—যাঁহাদের এইরূপ ধারণা, তাঁহারা যত বড় পণ্ডিতই হউন—তাঁহাদের হস্তে আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি হইবে না, অনুসন্ধিৎসুর সাহস ভিন্ন আয়ুর্ব্বেদের গৌরব রক্ষা অসম্ভব। যাহারা আয়ুর্ব্বেদকে বাচাইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে দুইটি কাজ করিতে হইবে;—১ম। পুরাতনকে অন্বেষণ, ২য়। নূতনকে সমাদর। আয়ুর্ব্বেদকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে হইলে ডাক্তারী বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ—নিন্দা বা অগৌরবের কথা নহে। যিনি এ কথায় সম্মত হইবেন না, তাঁহাকে একটা দৃষ্টান্ত দিয়াই বুঝাইতেছি। ধরুন—মৃগনাভি ও এরণ্ড তৈল, এ দুইটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। আয়ুর্ব্বেদে যখন এই মৃগনাভি ও এরণ্ড তৈলের গুণ লিখিত হইয়াছিল—তখন হয়ত ডাক্তারী বিজ্ঞান অতি শিশু। কিন্তু পরে,—বড় বড় ডাক্তারেরা বারংবার পরীক্ষা করিয়া মৃগনাভি ও এরণ্ড তৈলের এত গুণ আবিষ্কার করিয়া

দিয়াছেন যাহাতে বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়। আমাদের দেশীয় অনেকগুলি গাছ-গাছড়ার আময়িক প্রয়োগ ডাক্তারেরা এরূপ বিশদ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সে সকল দ্রব্যের ব্যবহার শিখিতে হইলে আমাদিগকে আবার ডাক্তার দের শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে হয়। "কালমেঘ" এ দেশের একটী স্বচ্ছন্দ বনজাত উদ্ভিদ। এ দেশের প্রাচীনাগণ শিশু-যকৃতের উপর "কালমেঘের" কার্য্যকারিতাশক্তি সর্ব্ব প্রথমেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এখন ডাক্তারী গ্রন্থে -"কালমেঘের" যেরূপ অদ্ভুত বিশ্লেষণ দেখিতে পাই, তাহাতে মনে হয় -ডাক্তারেরাই বুঝি এ উদ্ভিদের আবিষ্কার কর্ত্তা। ডাক্তারী পুস্তকে আমরা "কালমেঘ" সম্বন্ধে বহু রহস্য জানিতে পারি। এক্ষণে পাঠকগণ ভাবিয়া দেখুন - এইরূপ স্থলে —আয়ুর্ব্বেদকে পরিস্ফুট করিবার জন্য— ডাক্তারী বিজ্ঞানের সাহায্য লওয়া উচিত কি না? হইতে পারে—ইহা লজ্জার কথা, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের মধ্যে স্বাধীনভাবে গবেষণা করিবার প্রবৃত্তি না দেখা দিবে, ততদিন আমরা আয়ুর্ব্বেদের শাখা কেমন করিয়া করিব ? সুতরাং ডাক্তারী ভৈষজ্য বিদ্যার সাহায্যে আমরা যদি আয়ুর্ব্বেদের ভেষজতত্ত্ব পরীক্ষা করিয়া লই— তাহা বোধ হয় নিতান্ত দোষের বিষয় হইবে না। কেননা ইহাতে লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই। আলোচনা বাহুল্যে, বিজ্ঞতাই বাড়িতে থাকে।

আজ কাল কেহ কেহ মেডিক্যাল কলেজে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কবিরাজী চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছেন। ইঁহাদের চেষ্টায় কার্য্যতঃ ডাক্তারী চিকিৎসার উৎকৃষ্ট ও গ্রহণীয় অংশ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় প্রবর্ত্তিত হইতেছে। ইহাতে আয়ুর্ব্বেদের কতদূর উন্নতি হইতেছে, তাহা বিশেষজ্ঞরাই বলিতে পারিবেন। আমি কিন্তু সকলকেই আয়ুর্ব্বেদের বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে অনুরোধ করি।

আয়ুর্ব্বেদের শারীরবিজ্ঞান ও ডাক্তারী মতের শারীর বিজ্ঞান—এক নহে। আয়ুর্ব্বেদে বায়ু পিত্ত-কফের যে অসীম প্রভাব উল্লিখিত হইয়াছে, ডাক্তারেরা তাহা স্বীকার করেন না। আবার ডাক্তারী মতকে অনেক স্থলে আয়ুর্ব্বেদ মতের বিরোধী বলিয়া মনে হয়। এরূপ স্থলে —উভয় বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য রাখা অসম্ভব। তবে যেখানে উভয়ের একই উদ্দেশ্য—রোগ চিকিৎসা, সেখানে ডাক্তারী ভৈষজ্য তত্ত্বের সাহায্যে আয়ুর্ব্বেদের ভেষজ কল্পনা—অবশ্যই তুলনা করিয়া পরীক্ষা করা চলে। সেরূপ পরীক্ষা করাও উচিত।

যাঁহারা ডাক্তারী মতের গোঁড়া তাঁহারা ডাক্তারী চিকিৎসা গ্রন্থকে ভ্রমপ্রমাদশূন্য বলেন। কিন্তু, ডাক্তারী চিকিৎসা বিধিও যে Empirical—তাহা অস্বীকার করা চলেনা। শরীরের উপর কোন ঔষধ কি প্রকারে কায করে, ডাক্তারী গ্রন্থে অনেক স্থলেই তাহা নিরূপিত হয় নাই। ফিনোলপ্‌থেলিন, বিরেচক, কিন্তু উক্ত পদার্থ শারীরিক যন্ত্রে কি কার্য্য করিয়া যে বিরেচন করিয়া থাকে, ডাক্তারী বিজ্ঞান তাহার সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে না। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ যেস্থানে বলিতেছেন—"বিরেচনীয় বর্গের মধ্যে এরণ্ড তৈল প্রধান'—সে স্থলে বিশুদ্ধ এরণ্ড তৈল প্রাপ্তির জন্য ডাক্তারী ভৈষজ্যতত্ত্বের উপদেশ লইলে বোধ হয় কাজটী খুব ভালই হয়। আমি এই একটী মাত্র দৃষ্টান্ত দিলাম। আমার বক্তব্য—যদি আয়ুর্ব্বেদোক্ত উপায় অপেক্ষা, দ্রব্যের বিশুদ্ধিতা রক্ষার কোনও সরল উপায় ডাক্তারী বিজ্ঞানে দেখিতে পাওয়া যায়, সে

উপায়টীকে আয়ুর্ব্বেদের অঙ্গীভূত করিয়া লইলে মন্দ হয় না। যেমন আয়ুর্ব্বেদে—"গুলঞ্চ" বাতরক্তের একটী মহৌষধ—সুতরাং কবিরাজ মহাশয়েরা গুলঞ্চ প্রয়োগেই বাত রক্তের চিকিৎসা করুন; কিন্তু কিরূপ নিয়মে প্রস্তুত হইলে—গুলঞ্চ অধিক ফলপ্রদ ও বীর্য্যবান হইয়া থাকে, কি করিলে গুলঞ্চের কাথ বা স্বরস দীর্ঘকাল অবিকৃতভাবে রাখিতে পারা যায়; সে সম্বন্ধে ডাক্তারী বিজ্ঞানের পরামর্শ লইলে ক্ষতি কি? যাঁহারা এ কথা শুনিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারা স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দ্রব্যের বীর্য্যাধিক্যের বিচার করুন। প্রত্যেক দেশেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের 'ফার্ম্মাকোপিয়া' দেখিতে পাওয়া যায়, জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে—ঐ সকল ফার্ম্মাকোপিয়া মধ্যে মধ্যে সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। তবে কবিরাজ মহাশয়েরাই বা কেন আয়ুর্ব্বেদের "ফার্ম্মাকোপিয়ায়' সংস্কার করিবেন না? আয়ুর্ব্বেদ যে স্মরণাতীতকালে সংকলিত হইয়াছিল। তারপর কত যুগযুগান্তর চলিয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দুই চারি জন মনস্বী চিকিৎসকও আবির্ভূত হইয়া আয়ুর্ব্বেদের রত্নভাণ্ডারে—নিজ নিজ জ্ঞান লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এখনকার বৈদ্যগণের ভিতর সেরূপ সংস্কার ও বর্দ্ধনের প্রয়াস—কেন আমরা দেখিতে পাইব না?

আমি কিরূপ পরিবর্ত্তনের অভিলাষী বর্ত্তমান প্রবন্ধে ধারাবাহিক নিয়মে তাহা লিপিবদ্ধ করিব। প্রথমে "অরিষ্ট বিধি"ই আলোচনা করা যাউক।

অরিষ্ট।—চরক-সুশ্রুতাদি প্রাচীনতম গ্রন্থেও আমরা আসব অরিষ্টের প্রয়োগ দেখিতে পাই। ঋষিগণ দ্রবাবস্থায় ঔষধ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা বহুকাল পূর্ব্বেই অবগত হইয়া ছিলেন। তাঁহারাই ভেষজ পদার্থকে গুড়, চিনী বা মধু সংযোগে সন্ধিত করিবার প্রথা চিকিৎসা-জগতে প্রথম আবিষ্কার করিয়া ছিলেন। অম্ল, খর্জ্জুররস প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন সুরার—কার্য্য ও গুণাবলী সম্বন্ধে তাঁহাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা দেখিতে পাওয়া যায়। সন্ধিত দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা দিয়া—তাঁহারা রসায়ন জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। "বিনষ্টঃ সন্ধিতো বস্তু তচ্চুক্রম্ অভিধীয়তে।" এই শ্লোকার্দ্ধ পাঠ কালেই আমরা বুঝিতে পারি—Alcoholic fermentation হইলে যে—Acetic fermentation আরম্ভ হয়, আমাদের ঋষিদের কাছে এ রহস্য অপরিজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু সুরা পরিশ্রুত না হইলে যে তাহার রক্ষণ ক্ষমতা জন্মিতে পারে না,—এ টুকু বোধ হয় ঋষিরা তত ভাবিয়া দেখেন নাই। য়ুরোপীয় বিজ্ঞানের উপদেশ—কোনও জিনিষকে সুরা সংযোগে পচন হইতে রক্ষা করিতে হইলে—কম পক্ষে তাহাতে শতকরা ১২॥০ ভাগ সুরাসার থাকা চাই। আয়ুর্ব্বেদ মতে আসব, অরিষ্ট প্রস্তুত করিতে হইলে,—জলে গুড়, মউল ফুল, মিশাইতে হয়,—তাহার সঙ্গে কাথ বা কুট্টিত ঔষধ মিশ্রিত করিলে, তাহা পচিতে আরম্ভ হয়। শেষে এই দ্রব দ্রব্যে—নানাবিধ অনাবশ্যক ও হানিকর পরিবর্ত্তন চলিতে থাকে। কাজেই প্রাচীন মতের অরিষ্ট, আসবে আমরা ভেষজ পদার্থের পূর্ণ গুণ দেখিতে পাই না। শুধু পাই—কতকগুলি অহিতকর জিনিষ মাত্র। ঋষি বলিয়াছেন—"যদপক্কৌষধাম্বুভ্যাং সিদ্ধং মদ্যং স আসবঃ" অর্থাৎ অপক্ক ঔষধ ও জলদ্বারা যে মদ্য প্রস্তুত হয় তাহার নাম—

আসব। কিন্তু এইভাবে প্রস্তুত আসব আমরা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি—তাহাতে মদ্যের ভাগ অতি অল্পই থাকে বোধ হয় শতকরা পাচ ভাগও হইবে না। আবার শাস্ত্রমতে—কোনও আসব একমাস, কোনও আসব বা ১৫ দিন কাল পর্য্যন্ত মুখবদ্ধ অবস্থায় রাখিয়া দিবার আদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। একমাস পরে যে আসব ভাণ্ড হইতে উদ্ধৃত হয়,—তাহাতে সুরাসার আরও অল্প থাকে। সুতরাং দ্রব্যের সহিত ভেষজ একত্র করিয়া রাখিলে, সে দ্রব্যে ভেষজ-গুণের যৎসামান্যই অস্তিত্ব থাকে। অতএব আয়ুর্ব্বেদের আসব, অরিষ্ট-কল্পনার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন বড়ই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আমার মনে হয়, আর্য্য ঋষিগণ যে যুগে ঔষধ রূপে আসবাদির কল্পনা করিয়াছিলেন, সে সময় তাঁহারা কেবল সন্ধান প্রক্রিয়া (fermentation) পর্য্যন্তই—যথেষ্ট মনে করিয়াছিলেন। সন্ধিত দ্রব্যকে চোয়াইয়া 'সুরাসার' করিলে তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে—তাঁহারা এ টুকু ভাবিয়া দেখেন নাই। কেন না আয়ুর্ব্বেদের শেষ স্বাধীন সংগ্রহ "ভাব প্রকাশেও" তরল পদার্থ চোয়াইবার প্রণালী দেখিতে পাই না।

তবে আধুনিক কবিরাজ মহাশয়দের দ্বারা প্রকাশিত "ভৈষজ্য রত্নাবলী" গ্রন্থে—"মৃত সঞ্জীবনা সুরা" প্রস্তুতের যে প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়—তাহার উপরে ততটা আস্থা স্থাপন করা চলে না। 'মৃত সঞ্জীবনী' সুরা 'ময়ূরাখ্য যন্ত্রে' পাতন করিয়া লইতে হয়—কেবল ভৈষজ্য রত্নাবলীতেই আমরা ইহা দেখিতে পাই। হস্ত লিখিত গোবিন্দ দাসের ভৈষজ্য রত্নাবলীতে এই মৃত সঞ্জীবনীর নাম গন্ধও নাই। শার্ঙ্গধর, চক্রদত্ত, বৃন্দ, বঙ্গসেন, এমন কি ভাবপ্রকাশ গ্রন্থেও—এই মৃত সঞ্জীবনী সুরার উল্লেখ দেখা যায় না। কাজেই বলিতে হয় "মৃত সঞ্জীবনী" নিতান্তই আধুনিক। অতএব আমার বিশ্বাস—আসব অরিষ্ট প্রস্তুত করিতে হইলে, তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী করিবার জন্য—তাহার সহিত পরিশ্রুত সুরা যোগ করা কর্ত্তব্য। কুট্টিত ঔষধ—দ্রব মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া, তাহাতে গুড়াদি প্রক্ষেপ দিয়া সন্ধিত না করিয়া, ঔষধ দ্রবগুলি সুরা মিশ্রিত জলে ভিজাইয়া রাখিলে আসব বা অরিষ্টের উল্লেখ সিদ্ধি হইতে পারে। এই সুরা মিশ্রিত জলে ঔষধ দ্রব্যের সার উত্তমরূপে মিশিয়া যায়। ইহাতে আর পক্ষ কাল বা একমাস পর্য্যন্ত আসবের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না। ঔষধ দ্রব্য কুট্টিত করিয়া সুরা মিশ্রিত সলিলে ভিজাইয়া ৪।৫ দিন মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। পরে বেশ করিয়া নিঙ্গড়াইয়া ছাঁকিয়া লইলেই আসব প্রস্তুত হইল। এই প্রক্রিয়ার ইংরাজী নাম—Maceration.

ডাক্তারী মতে টিংচার প্রস্তুত প্রক্রিয়ার অনুরূপেও অতি সহজে উৎকৃষ্ট আসব প্রস্তুত হইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ "কনকাসব" নামক প্রসিদ্ধ আসবের প্রস্তুত-বিধি নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"কনকাসব" শ্বাস রোগের একটী মহৌষধ। আমার এক আত্মীয়ার জন্য—কাঁচরাপাড়ার দুর্গাগতি কবিরাজ এই কনকাসব ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহার উপাদান—

সংক্ষুদ্য কনকং শাখা মূল পত্র ফলৈঃ সহ।
ততশ্চতুঃপলং গ্রাহ্যং বৃষ মূলত্বচস্তথা॥
মধুকং মাগধী ব্যাঘ্রী কেশরং বিশ্বভেষজং।
ভার্গী তালীশপত্রঞ্চ সংচূর্ণৈষং পলদ্বয়ং।

সংগৃহ্য ধাতকী প্রস্থং দ্রাক্ষায়াঃ পল বিংশতিং।
জল দ্রোণদ্বয়ং দত্ত্বা শর্করায়াস্তুলাং তথা।
ক্ষৌদ্র স্যার্দ্ধ তুলাঞ্চাপি সর্ব্বং সংমিশ্র্য যত্নত।
ভাণ্ডে নিক্ষিপ্য যাবৃত্য নিদধ্যান্মাস মাত্রকং।
(বিনোদলাল সেনের ভৈঃ রত্না।)

অর্থাৎ ধুস্তুরা [শাখা, মূল, পত্র ও ফল সহিত—কুট্টিত] ৪ পল, বাসক মূলের ছাল ৪ পল, যষ্টিমধু, পিপুল, কণ্টিকারী, নাগেশ্বর, শুঁঠ, বামনহাটী ও তালীশ পত্র প্রত্যেকের চূর্ণ ২ পল, ধাতকীপুষ্প ১৬ পল, দ্রাক্ষা ২০ পল, জল ১২৮ সের, চিনা ১২৷৷০ সের মধু ৬৷০ সের। এই সমুদয় দ্রব্য উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া, আবৃত পাত্রে ১ মাস রাখিয়া, পরে দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইবে।

এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া আমার পিসীমা কিছুদিন হাঁপানার কষ্ট হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু অনুমান ৩ বৎসর পরে তাঁহার আবার হাপানা হয়। কাজেই তিনি 'কনকাসব' সেবনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। দুঃখের বিষয়—দুর্গাগতি গুপ্ত অতি অল্প বয়সেই ইহলোক হইতে অপসারিত হ'ন। পিসীমার দ্বিতীয় বার অসুখের সময় দুর্গাগতি জীবিত ছিলেন না। কি করি! সে সময় এত কবিরাজী ঔষধালয় ছিল না যে, কনকাসব ক্রয় করিয়া লইব। আমি তখন ইউ-নিভার্সিটীর উপাসক—কালেজের ছাত্র। অন্ন চিন্তায় নিরুদ্যম হইয়া পড়ি নাই। উপেন্দ্র বরাট তখন কাঁচরাপাড়ার কবিরাজ। আমি তাঁহার কাছেই কনকাসবের প্রার্থী হইলাম। তিনি বলিলেন—"কনকাসব প্রস্তুত নাই। প্রস্তুত করিয়া দিতে পারি, কিন্তু একমাস সময় লাগিবে। রোগিণী রোগের যন্ত্রণায় অধীরা—এ অবস্থায় ১ মাস ঔষধের প্রতিক্ষা করা চলে না। আমি উপেন বাবুর নিকট হইতে "কনকাসবের" ফর্দ্দ লিখিয়া লইলাম। মসলা যোগাড় করিয়া তাঁহাকে দেখাইলাম। শেষে, স্বয়ং উহা য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে দুই দিনের মধ্যেই প্রস্তুত করিলাম। আমার নিজ কৃত 'কনকাসব' অত্যন্ত ফলপ্রদ হইয়াছিল। দেশে কাহারও কাসি বা হাঁপানী হইলে,—আমার কাছে ছুটিয়া আসিত। দেখিতাম—সকলেরই বিশেষ উপকার হইয়াছে। বন্ধুবর—রাধা জীবন- আমার ঔষধ বিতরণ দেখিয়া শ্লোক আওড়াইতেন—

ব্রাহ্মণং ভিষজং দৃষ্টা স চেল জলমাচরেৎ

আমি যে উপায়ে অল্প সময়ের মধ্যে সমধিক বীর্য্যবান কনকাসব প্রস্তুত করিয়াছিলাম, তাহাও লিখিতেছি।

ধুস্তুরাদি সমস্ত দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইয়া, সুরা মিশ্রিত জলে (শতকরা ৪৫ ভাগ সুরা) চূর্ণগুলি ভিজাইতে হয়। পরে "পার কোলেটার" যন্ত্রে ঐ আর্দ্র দ্রব্য পূর্ণ করিয়া 'পার কোলেশন' বিধি অনুসারে আসব প্রস্তুত করিতে হয়। এইরূপে প্রস্তুত আসবের পূর্ণ মাত্রা ১ ড্রাম। ইহাতে ১ মাত্রা আসবে ৫ রতি পরিমাণে চূর্ণ ঔষধ থাকে। কনকাসবে যে যে ঔষধ দ্রব্য ব্যবহৃত হয়,—সে গুলির মধ্যে প্রায় সকলেরই সার ভাগ জলে দ্রবণীয়। সুতরাং এই ধুস্তুরাদি পদার্থকে প্রাচীন আসব প্রক্রিয়া মতে প্রস্তুত না করিয়া বক্ষ্যমান মতে অরিষ্ট করা উচিত। যথা—ধুস্তুরাদি দ্রব্য ৩৮ পল, দ্বিগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। আবার ঐ ভেষজ দ্রব্য গুলিকে দ্বিগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া লইয়া, উভয় ক্বাথ একত্র মিশ্রিত কর। এই ক্বাথ বাষ্প উত্তাপে ঘনীভূত করিতে হইবে—ঘনীভূত ক্বাথের

পরিমাণ হইবে—২৮৷৷০ পল। ইহার সহিত ৯৷৷০ পল সুরাসার মিশাইয়া ৩৮ পল অরিষ্ট করিতে হইবে। এই কনকাসব ৫ গুণ অধিক বীর্য্যবান হইবে। ইহার ২।১ ফোঁটা খাইলেই উপকার হয়, শ্বাসের টান কমে। (ক্রমশঃ)।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্ এ।

বাল্য বিবাহের বৈজ্ঞানিক যুক্তি।

—:০:—

[বিষ কন্যা]

দ্বিতীয়-প্রস্তাব।

যাঁহারা "মুদ্রা রাক্ষস" পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে "বিষ-কন্যার" কথা বোধ হয় আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। বাস্তবিক "বিষ-কন্যার" মারণী-শক্তি অতি ভয়ানক ছিল। আমার বিশ্বাস—এই জন্যই সেকালে পুত্র-কন্যার বিবাহে পাত্র ও পাত্রী উত্তমরূপে পরীক্ষা করা হইত।

সে পরীক্ষা কিরূপ? নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

প্রথমে বর-পরীক্ষার একটু আভাষ দিতেছি। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন তাঁহার উদ্বাহ-তত্ত্বে লিখিয়াছেন—

ন মূত্রং ফেনিলং যস্য বিষ্ঠাচাপ্সু নিমজ্জতি।
মেঢ্রশ্চোন্মাদ শুক্রাভ্যাং হীনঃ ক্লীবঃ স উচ্যতে।

"যাহার প্রস্রাবে ফেনা জন্মে না, এবং যাহার বিষ্ঠা জলে ডুবিয়া যায় * * * * সেই ব্যক্তি ক্লীব; তাহাকে কখনও কন্যাদান করিবে না।" বর-পরীক্ষার এইরূপ অনেক লক্ষণই উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু সে সকল কথা অদ্যকার প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। অতএব এইস্থানেই আমি সে প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিতেছি।

এইবার কন্যা-পরীক্ষার কথা বলিয়া যাই।

ত্রীণি যস্যাঃ প্রলম্বানি ললাটং উদরং ভগং।
ক্রমেণ ভক্ষায়ন্নারী শ্বশুরং দেবরং পতিং॥

যে কন্যার ললাট, উদর ও জননেন্দ্রিয় লম্বমান দীর্ঘাকার হয়, সে কন্যা যথাক্রমে শ্বশুর, দেবর ও পতিকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। কন্যা পরীক্ষারও এইরূপ অনেকগুলি লক্ষণ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে আমি কেবল তাহার একদেশ মাত্র দেখাইতেছি। এখন সমাজে—এইরূপ কন্যা-পরীক্ষার প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। যে অবধি পণ-প্রথা সমাজে প্রবেশ করিয়াছে—সেই অবধিই কন্যা-পরীক্ষা উঠিয়া গিয়াছে। বরের বাপ টাকা পাইলেই তুষ্ট,—তাহার উপর পুত্রবধূর রংটা যদি একটু ফরসা হয়, তাহা হইলে ত কথাই নাই। সে কন্যা বিষকন্যা কিনা? সে কন্যা পতিঘাতিনী হইবে কিনা?—ধনলুব্ধ-বরকর্ত্তা—একবারও [illegible] ভাবিবার অবকাশ পান না!

আমি ব্রাহ্মণ। সমাজে একটা [illegible] ব্যবস্থা চালাইবার অবশ্যই আমার [illegible] আছে। আমি প্রত্যেক হিন্দুকে, [illegible] [illegible] [illegible] অনুরোধ করিতেছি [illegible]

তাঁহারা পুত্র-কন্যার বিবাহে—এইরূপ পরীক্ষা আরম্ভ করুন, দীন-নির্য্যাতন-বর-পণ উঠাইয়া দিন, দেখিবেন—তাঁহাদের পুত্র-কন্যাদের মধ্যে—অকাল মৃত্যু তিরোহিত হইবে। হৃত স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিবে। তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি যাহা ভূমিষ্ঠ হইবে, সেগুলি বলবান্ ও দীর্ঘজীবী হইবে। দম্পতির মনের মিল হইবে। সংসারে মঙ্গল ও শান্তি যুগপৎ বিরাজ করিবে।

অবশ্য পুরাকালের মত কন্যা-পরীক্ষা একালে হয় ত চলিবে না। কেন না দৈহিক লক্ষণ দেখিয়া কন্যা নির্ব্বাচন করিতে হইলে—ভূয়োদর্শিতা ও সূক্ষ্মদৃষ্টির প্রয়োজন। কিন্তু জ্যোতিষ মতে কন্যা ও পাত্র পরীক্ষা করা, গণ-রাশি-যোটক প্রভৃতির বিচার করা—নিতান্ত কঠিন ব্যাপার নহে। দম্পতীর মনোমালিন্য, কামোন্মত্ত হইয়া ব্যভিচার প্রবৃত্তি, ক্ষীণাঙ্গ অল্পায়ু সন্তান প্রসব—এই যে আধি বিড়ম্বনায় হিন্দুর ঋষি-রচিত সংসার দিন দিন ধ্বংস হইতে বসিয়াছে—ইহার মুখ্য কারণ—বিবাহের পূর্ব্বে পাত্র ও পাত্রীকে পরীক্ষা না করা। কন্যাদায়ের জ্বালায় অনেক গৃহস্থেরই সে স্বাধীনতা নাই। অনেক গৃহস্থই পাত্র নির্ব্বাচনের সাহস করেন না, যেমন তেমন একটার হাতে মেয়েটাকে তুলিয়া দিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু বরের বাপের ত সে অসুবিধা নাই। তিনিত অনায়াসেই কন্যাকে পরীক্ষা করিয়া গৃহে আনিতে পারেন;—তিনি কেন তাহা করেন না? ইহার কারণ—তাঁহারও সে সাহস নাই। তিনি অর্থ লোভী, রূপ-পিপাসু,—তিনি তো সংসারের শান্তি চাহেন না; তিনি চাহেন—কন্যাকর্ত্তার রত্ন মঞ্জুষা। তিনি চাহেন—পুত্রবধূর অনিন্দ্য সুন্দর রূপ। সেই রূপবতী কন্যা হয় ত বিষ কন্যা—সে স্বামী গৃহে আসিয়া স্বামীকে ধীরে ধীরে বিষ জর্জ্জর করিয়া অকালে মৃত্যুপথে অগ্রসর করিয়া দিল; বরের বাপ তাহা বুঝিলেন না। নহিলে তাঁহারই বাটীর পার্শ্বে এক গরীব গৃহস্থের একটী শ্যামাঙ্গী কন্যা ছিল—সে কন্যার সহিত তাঁহার পুত্রের কোষ্ঠীর উত্তমরূপ মিলনও হইয়াছিল, তথাপি সে কন্যাকে পুত্রবধূ করিতে তাঁহার অসম্মতি হইবে কেন? অর্থের লোভে, রূপের লোভে—এইরূপে দেশের সর্ব্বনাশ হইতেছে! কত মণিভূষিতা ভুজঙ্গিনী সৌন্দর্য্যের আবরণে আত্মগোপন করিয়া রত্নের ঝাঁপি কক্ষে লইয়া শ্বশুর-গৃহে প্রবেশ করিতেছে! কর্ত্তাদের সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই!

এই বিষ কন্যার বিষ সহ্য করাইবার জন্যই প্রাচীন আর্য্যগণ সমাজে বাল্য বিবাহের প্রচলন করিয়াছিলেন। এ সকল কথা আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধে সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এক্ষণে "বিষ কন্যা" সম্বন্ধে আরও দুই চারিটী কথা লিখিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।

অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন,—একটা কিম্বদন্তী আছে যে, যে সকল ক্ষিপ্ত কুক্কুর বা শৃগাল অথবা বিষধর সর্প—বারম্বার অপর প্রাণীকে দংশন করিতে থাকে, তাহাদের বিষবেগ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া কমিয়া যায়। তখন তাহারা আর কাহাকেও দংশন করিলে, দংশিত ব্যক্তি আর মরে না। এই নিয়মটী বিষকন্যা সম্বন্ধেও খাটে। "জ্যোতিঃসারার্ণব" গ্রন্থে ইহার অনেক প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা :—

লম্বোদরী স্থূল জঙ্ঘা স্থূল নাসা চ যা ভবেৎ।
পতয়োষ্টৌ ম্রিয়েরন্ সা নবমে তু প্রসীদতি॥

যে কন্যার উদর লম্বা, জঙ্ঘা ও নাসিকা স্থূল,—তাহার আটটী পতি মরিবে, নবম পতিতে সে নারী প্রসন্না থাকিবে।

এই শ্লোকটী পড়িয়া স্পষ্টই বুঝা যায়—যখন একে একে আটটী পতি বিষ কন্যার বিষ-সংসর্গে মরিয়া গিয়াছে, তখন তাহার বিষের আর কোন জোর নাই, কাজেই সে কন্যা নবম পতিকে লইয়া সুখে ঘরকন্না করিবে।

ভূমির্নস্পৃশ্যতে যস্যা অঙ্গুষ্ঠা চ কনিষ্ঠয়া।
ভর্ত্তারং প্রথমং হন্যাৎ দ্বিতীয়ঞ্চাভি নন্দতি॥

যে কন্যার চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলী ও কনিষ্ঠাঙ্গুলী—চলিবার সময় ভূমি স্পর্শ করে না, সে কন্যার প্রথম স্বামী মরিয়া যাইবে। দ্বিতীয় স্বামী লইয়া সে সুখিনী হইবে।

যস্যা মধ্যং ভবেদ্দীর্ঘং সা স্ত্রী পুরুষ ঘাতিনী।
ভূমির্নস্পৃশ্যতেঽঙ্গুল্যা সা নিহন্যাৎ পতিত্রয়ং॥

যে কন্যার মধ্যদেশ দীর্ঘ, সে পুরুষ ঘাতিনী, যাহার মধ্যাঙ্গুলী মৃত্তিকা স্পর্শ করে না, সেই কন্যা তিনটী পতির প্রাণ বিনাশ করিয়া থাকে।

প্রদেশিনী ভবেদ্দীর্ঘা সা স্যাৎ সৌভাগ্যশালিনী
ঊর্দ্ধা যস্যা ভবেদ্দীর্ঘা পতিং হন্তি চতুষ্টয়ং॥

যে কন্যার চরণের প্রদেশিনী অঙ্গুলী বৃদ্ধাঙ্গুলীর চেয়ে দীর্ঘ হয় সে কন্যা সৌভাগ্যশালিনী হইয়া থাকে। কিন্তু সেই প্রদেশিনী দীর্ঘ হইয়া যদি উপরে উঠিয়া থাকে, তবে সে একে একে চারিটী স্বামীকে বিনষ্ট করিবে।

বিরলা দশনা যস্যাঃ কৃষ্ণাক্ষী কৃষ্ণ জিহ্বিকা।
ভর্ত্তারং প্রথমং হন্তি দ্বিতীয়মপি বিন্দতি॥

যে কন্যার দন্ত বিরল, নেত্রদ্বয় ও জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ তাহার প্রথম স্বামী মরিবে এবং সে দ্বিতীয় পতি লাভ করিবে।

যস্যা অত্যুৎকটৌ পাদৌ বিস্তৃতঞ্চ মুখং ভবেৎ।
উত্তরোষ্ঠে চ রোমানি সা শীঘ্রং ভক্ষয়েৎ পতিং॥

যে কন্যার পদদ্বয় উৎকট (সম্পূর্ণরূপে ভূতল স্পর্শ করে না) আস্য কুহর অতি বিস্তৃত ঠোঁটের উপর লোম রেখা দৃষ্ট হয়, সে শীঘ্রই স্বামীকে ভক্ষণ করে।

জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিষ কন্যার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়—

রিপুক্ষেত্র গতৌ তৌতু লগ্নে যদি শুভ গ্রহৌ।
ক্রুরস্তত্র গতোপ্যেকো ভবেৎ স্ত্রী বিষ কন্যকা॥

যে কন্যার জন্ম লগ্নে দুইটী শুভগ্রহ থাকে, এবং ঐ শুভগ্রহদ্বয়ের যদি সেই লগ্নস্থান অরি স্থান হয়, এবং একটা ক্রুর গ্রহ সেখানে বিদ্যমান থাকে, তবে সে কন্যা বিষকন্যা নামে অভিহিতা হইবে।

ভদ্রা তিথি র্যদাশ্লেষা শতভিষাচ কৃত্তিকা।
আঙ্গার রবিবারেষু ভবেৎ স্ত্রী বিষ কন্যকা॥

মঙ্গলবারে বা রবিবারে, দ্বিতীয়া সপ্তমী অথবা দ্বাদশী তিথিতে, অশ্লেষা শতভিষা কিম্বা কৃত্তিকা নক্ষত্রের যোগে যে কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহাকে বিষ কন্যা বলা যায়।

বিষ কন্যার সংসর্গে স্বামীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। বিষকন্যা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করা উচিত। এইরূপ বিষকন্যার সংক্রামক বিষদোষ হইতে—পুরুষদিগকে রক্ষা করিবার জন্যই ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ বাল্য বিবাহের ব্যবস্থা প্রচলিত করিয়াছিলেন। আমরা নির্ব্বোধ—ঋষি-বাক্যের গূঢ় রহস্য না বুঝিয়া বাল্য-বিবাহের দোষ কীর্ত্তন করি।

এক্ষণে আমরা পণের লোভে, রূপের মোহে, কন্যার লক্ষণালক্ষণ দেখিবার অবকাশ পাই না। রাশি-নক্ষত্র-গণ-যোটকের মহত্ত্ব বুঝিতে পারি না। ফলে, আমাদের সংসারে বধূরূপে কত বিষকন্যাই স্থান লাভ করিতেছে। তাহাদের দৈহিক বিষের প্রভাবে—আমাদের আশার অবলম্বন বংশধরগণ—দিন দিন

রোগ্য রোগে আক্রান্ত হইতেছে, যৌবনে উদ্যম-উৎসাহ হারাইতেছে, অকালে বলিপলিত জরাগ্রস্ত হইয়া মানসিক কষ্টে কালযাপন করিতেছে! তাহাদের চক্ষুজ্যোতিঃ ভ্রষ্ট—তাই অকালে চস্‌মা পরিতে হইতেছে! মস্তিষ্ক মেধাধৃতি হীন, শরীর কান্তি ভ্রষ্ট,—যুবাদের দুর্দ্দশা চরমে উঠিয়াছে। তবুও বরপণ আদায় করিতে হইবে, রূপসী বধূ গৃহে আনিতে হইবে,—এতদপেক্ষা মানুষের আর কি অধঃপতন হইতে পারে? *

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ—
বেদান্ত শাস্ত্রী।

বঙ্গে অজীর্ণ রোগের এত প্রাদুর্ভাব কেন?

আজকাল বঙ্গদেশে অজীর্ণ রোগের বিষম প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। শতকরা নব্বই জন বা ততোধিক ব্যক্তি অজীর্ণ রোগে ভুগিয়া থাকে। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমরা এই দেশ ব্যাপী অজীর্ণ রোগের কারণ নির্দ্দেশ করিতে প্রয়াস পাইব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে অজীর্ণ রোগ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, জীবন বলের উপর নির্ভর করে এবং বল অগ্নির উপর নির্ভর করে। বাঙ্গালী জাতির অগ্নিবল কমিবার সঙ্গে সঙ্গে জীবনও কমিতেছে। শতবর্ষ জীবী লোক বাল্যকালেও আমরা অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু এখন তাহাদের সংখ্যা বিরল হইয়াছে। এখন বাঙ্গালী গড়ে পঞ্চাশ বৎসর বাঁচে কি না সন্দেহ। পূর্ব্বে লোকে যেরূপ আহার করিতে পারিত, এখন আর সেরূপ আহার করিতে পারে না। একটা সহজ দৃষ্টান্ত দিই। পৌষপার্ব্বন এক সময়ে বঙ্গের একটী মহৎ ব্যাপার ছিল। বর্ষার মেঘমুক্ত শরতের সুনীল আকাশ যখন চন্দ্র কিরণে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে, নিদাঘতাপতপ্ত পৃথিবী বর্ষার জলে স্নান করিয়া তৃপ্ত হইবার পর শরতে যখন আর্দ্র দেহ শুষ্ক করিয়া কাশপুষ্পময় বসন পরিধান করে, যখন আশু ধান্য ভাণ্ডারজাত হয় এবং হৈমন্তিক ধান্য ক্ষেত্রের পর ক্ষেত্র শ্যামল বর্ণে আচ্ছাদিত করিয়া বায়ুভরে দুলিতে থাকে, তখন যেমন বঙ্গ শারদীয় মহাপূজার মহানন্দে মাতিয়া উঠিত, তেমনি যখন স্বর্ণ বর্ণ হৈমন্তিক ধান্য ভাণ্ডার জাত হইত, মসুর-কলায়-তিল, অতশী, যব, গোধূম প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রে

---

* এখনকার দিনে বিষকন্যা নিরূপণ করিতে হইলে জ্যোতিষ ও সামুদ্রিক শাস্ত্রে জ্ঞান থাকা চাই। আমাদের মধ্যে অনেকেরই তাহা নাই। সুতরাং এ অবস্থায় বাল্য বিবাহ প্রথাই নিরাপদ। কিন্তু যাঁহারা "ভদ্র" আখ্যাধারী, তাঁহারা যেরূপ শোষণ বৃত্তি অবলম্বন করিতেছেন, তাহাতে দরিদ্র কন্যা কর্ত্তাকে বাধ্য হইয়াই অধিক বয়স পর্য্যন্ত কন্যাকে অনূঢ়া রাখিতে হইতেছে, অতএব পাত্র মাত্রেরই বরপণ উঠাইবার [illegible]।

শোভা সম্পাদন করিত, কৃষক সারা বৎসর পরিশ্রমের পরে যখন দুই দিন বিশ্রামের অবসর পাইত, বৃত্তিভোগী রজক, ক্ষৌরকার হইতে ব্রাহ্মণগণের ভাণ্ডার পর্য্যন্ত ক্ষেত্রজাত শস্যে পূর্ণ হইত, বর্ষার ক্ষীণ অগ্নিবল হেমন্তে যখন প্রবল হইয়া উঠিত, তখন বঙ্গ পৌষপার্ব্বণের মহানন্দে বেশ মাতিয়া উঠিত। বঙ্গে এমন গৃহ ছিল না, যে গৃহে বিবিধ পিষ্টকের আবির্ভাব না হইত। ধনীর গৃহে ব্যয়সাধ্য খাদ্যাদির আয়োজন হইত, দরিদ্র চালের গুঁড়া, ময়দা, মুগের দাল, নারিকেল, গুড় প্রভৃতি সংযোগে নানাপ্রকার পিষ্টক প্রস্তুত করিত। আমরা বাল কালে এই মহাপার্ব্বণ দেখিয়াছি, আর দেখিয়াছি লোকে বহু পরিমাণে পিষ্টক আহার করিতে পারিত।

সে পৌষপার্ব্বণ এখন আর নাই বা নাম মাত্র আছে। কেন এমন হইল? ইহার কারণ দুইটী, পিষ্টক বিলাসিতা। লোকে গৃহ প্রস্তুত পবিত্র পিষ্টক অপেক্ষা বাজারের জঘন্য কৃত্রিম দ্রব্যে প্রস্তুত দুই পয়সার কচুরী কিনিয়া খাওয়া শ্রেয়ঃ বোধ করে। দ্বিতীয় কারণ—লোকের অগ্নিবল কমিয়া গিয়াছে, পিষ্টক জীর্ণ করিবার শক্তি এক্ষণে অনেকেরই নাই। আয়ুর্ব্বেদে পিষ্টক অন্ন অপেক্ষা আট গুণ পুষ্টি কর বলিয়া কথিত হইয়াছে। বাঙ্গালী জাতি এক্ষণে এই পুষ্টিকর খাদ্যে বঞ্চিত হইয়াছে। কবি প্রবাসিনী কন্যার হইয়া যাহা বলিয়াছেন, আমাদের বঙ্গ জননীর নিকট সেই কথা বলিতে ইচ্ছা হয়;—

আসিলে পৌষমাস বদনে মৃদুহাস
আর কি পিঠে পুলি ভাজিবি নাগো।

কেবল পৌষপার্ব্বণ বলিয়া নহে, ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বের কথা যাঁহাদের স্মরণ আছে, তাঁহারা জানেন যে এই ৫০ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালী জাতির আহার কত কমিয়া গিয়াছে। আহারই জীবন, সুতরাং আহারের সহিত জীবনও যে কমিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি।

আয়ুর্ব্বেদ বলেন যে, অগ্নিমান্দ্য হইতেই সমস্ত রোগ জন্মিয়া থাকে। সুতরাং মন্দাগ্নির ফলে বাঙ্গালী জাতি যে বিবিধ রোগ পীড়িত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? প্রকৃত সুস্থ দেহ ব্যক্তি বাঙ্গালী জাতির মধ্যে নিতান্ত বিরল, আবাল বৃদ্ধ বনিতার কোন না কোন পীড়া আছেই। প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা কর, কাহারও একটা দিন বিনা উপসর্গে কাটে না। কেহ বলিবে—একটা অম্বল ঢেকুর উঠিয়াছিল, কেহ বলিবে ভাল ক্ষুধা হয় নাই, কাহারও পেট ভার, কাহারও মাথা টিপ-টিপ, কাহারও শরীরটা কেমন ম্যাজ ম্যাজে, কাহারও ভাল দাস্ত হয় নাই ইত্যাদি একটা না একটা উপসর্গ আছেই আছে। রাজপথে দাঁড়াইয়া একবার পথবাহী জনস্রোতের দিকে লক্ষ্য করিতে থাক, দেখিবে মানুষের মত মানুষ কোথায়? হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ তেজোব্যঞ্জক মূর্ত্তি নিতান্ত বিরল। প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তিরই জীর্ণ শীর্ণ, ম্লানমুখ, চক্ষু কোটর গত, তেজের লেশমাত্র নাই, কোনও রূপে দেহভার বহন করিয়া চলিয়াছে। এক কথায় বাঙ্গালী জাতির জীবন রোগে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছে।

অজীর্ণ রোগ হইতে কোন্ কোন্ রোগ জন্মিতে পারে তাহার দিগদর্শন স্বরূপ শাস্ত্রকার বলিয়াছেন:—অগ্নির দৌর্ব্বল্য হেতু অন্নজীর্ণ না হইলে অম্লত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিষবৎ অগ্নি কমিয়া থাকে। উহা পিত্তের সহিত সংসৃষ্ট হইয়া দাহ তৃষ্ণা, মুখরোগ, অম্লপিত্ত এবং পিত্ত জনিত অন্যান্য রোগ উৎপন্ন করে। কফের [illegible]

সংসৃষ্ট হইয়া যক্ষ্মা, পীনস, মেহ এবং অন্যান্য কফ জনিত রোগ উৎপন্ন করে। বায়ুর সহিত মিলিত হইলে বায়ুজনিত রোগ সমূহের সৃষ্টি করে। মূত্রের সহিত মিলিত বিবিধ মূত্র রোগের সৃষ্টি করে। মলের সহিত মিলিত হইয়া বিবিধ কুক্ষিগত রোগ উৎপন্ন করে এবং রস রক্তাদি ধাতুর সহিত মিলিত হইয়া রসরক্তাদি গত বিবিধ রোগ উৎপন্ন করে।

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, অগ্নি নষ্ট হইলে মৃত্যু হয়, আর অগ্নি উপযুক্তভাবে থাকিলে নীরোগ শরীরে দীর্ঘকাল জীবিত থাকা যায়। শুধু ইহাই নয়, স্বাস্থ্য, উৎসাহ, উপচয় (পুষ্টি) প্রভা, বল, আয়ু, সমস্তই অগ্নিবলের উপর নির্ভর করে। বাঙ্গালীর সেই অগ্নিবল ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, তাই বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য উৎসাহ উপচয়, প্রভা, বল ও আয়ু ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে বাঙ্গালীর অগ্নি বল পুনরায় প্রবল হইয়া তাহাদিগকে স্বাস্থ্য, বল, আয়ু প্রভৃতির অধিকারী করিবে, কি নির্ব্বাপিত হইয়া বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্বের বিলোপ সাধন করিবে,তাহা বিধাতাই জানেন। অনেকের ধারণা আছে যে, তরল দাস্ত হইলেই অজীর্ণ বলা যায়। কিন্তু তাহা যথার্থ নহে, কোষ্ঠকাঠিন বা কোষ্ট বদ্ধতা ও অজীর্ণ জন্য জন্মিতে পারে। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, আম দোষ (অজীর্ণ) দুইপ্রকার, যথা বিসূচিকা ও অলসক। তন্মধ্যে বিসূচিকা (Spasmodic dyspepsia) রোগে অন্ত্রের ক্রিয়া শীঘ্র শীঘ্র হয়। ভুক্ত দ্রব্য যাহা জীর্ণ হইবার তাহা শীঘ্র হয় এবং অজীর্ণ অংশ বমি বা মলরূপে শীঘ্র শীঘ্র নির্গত হইয়া যায় আর অলসক রোগে (Paralytic dyspepsia) ভুক্ত দ্রব্য অত্যন্ত বিলম্বে জীর্ণ হয় এবং মলও বিলম্বে নির্গত হইয়া থাকে। সুতরাং কোষ্ঠবদ্ধতাও অজীর্ণ রোগের পরিচায়ক।

শাস্ত্রে অগ্নি চতুর্ব্বিধ বলিয়া কথিত হইয়াছে যথা সমাগ্নি, বিষমাগ্নি তীক্ষ্ণাগ্নি ও মন্দাগ্নি। এতন্মধ্যে দোষশূন্য বা অবিকৃত অগ্নিকে সমাগ্নি বলা যায়। সমাগ্নি উপযুক্ত অন্নকে যথাকালে সম্যক পরিপাক করে। অপর তিনটী অগ্নি দূষিত বা বিকৃত। বায়ু কর্তৃক দূষিত অগ্নিকে বিষমাগ্নি বলা যায়। এই অগ্নি কখন ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করে, এবং কখন কখন পেটফাঁপা, শূলবৎ বেদনা, উদাবর্ত্ত (ভুক্তদ্রব্য উপর দিকে ঠেলিয়া উঠা,) অতিসার, পেটভার, পেটে গুড় গুড় শব্দ এবং প্রবাহন (মলত্যাগ কালে কুন্থন) উৎপাদন করে। পিত্ত দূষিত অগ্নিকে তীক্ষ্ণাগ্নি বলে। তীক্ষ্ণাগ্নি প্রচুর অন্নকে শীঘ্র পরিপাক করে এবং পরিপাকের পরে গলদেশ তালু ও ওষ্ঠের শুষ্কতা ও দাহ উৎপাদন করে। তীক্ষ্ণাগ্নি অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইলে অত্যগ্নি বা ভস্মকাগ্নি বলা যায়। কফদূষিত অগ্নিকে মন্দাগ্নি বলে। এই অগ্নি অল্প পরিমিত অন্নকেও যথাকালে পরিপাক করিতে না পারিয়া দীর্ঘকালে পরিপাক করে এবং পেট ও মাথা ভার, কাশ, শ্বাস, থুথু উঠা, বমি ও শরীরের গ্লানি উৎপাদন করে।

এই তিন প্রকার অগ্নিই অনিষ্টকর। তন্মধ্যে তীক্ষ্ণাগ্নি কদাচিৎ দেখা যায়। বিষমাগ্নি বা মন্দাগ্নি রোগেই অধিকাংশ বাঙ্গালী ভুগিয়া থাকে। সংগ্রহকারগণের গ্রন্থে অম্লপিত্ত স্বতন্ত্র রোগ,—ইহা স্বতন্ত্র ভাবে লিখিত হইলেও প্রাচীন সংহিতায় উহা অজীর্ণেরই অন্তর্ভূক্ত ছিল। পিত্তজনিত যে বিদগ্ধাজীর্ণ, হয় তাহাই অম্লপিত্ত। বিদগ্ধাজীর্ণে ভুক্তদ্রব্য [illegible] কর্ত্তৃক বিদগ্ধ হইয়া [illegible]

জাতীয় অম্লপিত্ত রোগ আজকাল বাঙ্গালা দেশে নিতান্ত প্রবল। সহজে বোধ হয় শতকরা ৭৫ জন এই রোগে পীড়িত।

পূর্ব্বে পিত্ত জনিত তীক্ষ্ণাগ্নির কথা বলা হইয়াছে, উপরে বিদগ্ধাজীর্ণের কথা বলা হইল। সংপ্রাপ্তি ভেদে পিত্ত হইতে এই দুই প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়। পিত্তের জলীয়াংশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইয়া যদি কেবল তেজাংশ বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে তীক্ষ্ণাগ্নি রোগ জন্মিয়া থাকে। আর যদি পিত্তের জলীয়াংশ বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে উত্তপ্ত জল যেমন অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করে, বর্দ্ধিত পিত্তও সেইরূপ জঠরাগ্নিকে দুর্ব্বল করিয়া তোলে। ইহাতেই বিদগ্ধাজীর্ণ বা অম্লপিত্ত রোগ জন্মিয়া থাকে।

অজীর্ণ রোগ যে কেবল শরীরকে কালান্তরে (দীর্ঘকালে) প্রাণনাশ করিয়া থাকে তাহা নহে, সময়ে সময়ে সদ্যোমারাত্মকও হইয়া থাকে। কফ জনিত আমাজীর্ণ, বায়ু জনিত বিষ্টব্ধাজীর্ণ এবং পিত্তজনিত বিদগ্ধাজীর্ণ হইতে বিসূচিকা, অসলক এবং বিলম্বিকা রোগ জন্মিয়া থাকে।

এই বিসূচিকা রোগে কুপিত বায়ু শরীরে সূচীবিদ্ধ হওয়ার ন্যায় যন্ত্রণা উপস্থিত করে বলিয়া, ইহা বিসূচিকা নামে খ্যাত। এই রোগে মূর্চ্ছা (সংজ্ঞাহীনতা coma), অতিসার, বমি, পিপাসা, শূলবেধবৎ বেদনা, ভ্রম, উদ্বেষ্টন (খাল ধরা), হাই উঠা, দাহ, দেহের বিবর্ণতা, কম্প, হৃদয়ে বেদনা ও মস্তকে বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় পীড়া হয়। গ্রন্থান্তরে লিখিত হইয়াছে যে, এই রোগে নিদ্রানাশ, অস্থিরতা (Restless), কম্প, মূত্রাঘাত (প্রস্রাব বন্ধ হওয়া) ও সংজ্ঞাহীনতা এই পাঁচটী ভীষণ উপদ্রব ঘটিয়া থাকে। অধুনা এই রোগ কলেরা নামে সুপরিচিত।

অসলক রোগে পেট অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে, রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া কূজন করে (গোঁঙ্গায়), মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, রুদ্ধ বায়ু হৃদয় কণ্ঠাদি দেশে প্রধাবিত হয়, বায়ু ও মল রুদ্ধ হয় এবং হিক্কা ও উদ্গার হইয়া থাকে। ইহার ডাক্তারী নাম কলেরা-সিক্কা (cholera sicca)। এই রোগে ভেদ-বমি হয় না।

বিলম্বিকা অলসক রোগের প্রকার ভেদ মাত্র। এই রোগে বায়ু ও কফ কর্ত্তৃক দূষিত ভুক্ত দ্রব্য ঊর্দ্ধ বা অধোদিক দিয়া নির্গত হইতে পারে না। শরীর দণ্ডবৎ হইয়া যায় বলিয়া গ্রন্থান্তরে এই রোগকে দণ্ডালসক বলা হইয়াছে।

পূর্ব্বে দুই প্রকার আমদোষের প্রসঙ্গে যে বিসূচিকা ও অলসকের কথা বলা হইয়াছিল তাহা সাধারণ সংজ্ঞা, যেমন অগ্নি। আর এক্ষণে যে বিসূচিকা ও অলসক রোগের বিষয় লিখিত হইল—তাহা বিশেষ সংজ্ঞা, যেমন দাবানল। পাঠকের সন্দেহ নিরাকরণ জন্য ইহা লিখিত হইল। শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে যে অজীর্ণ রোগে বমি, থুথু উঠা, শরীরের অবসন্নতা, ভ্রম, মূর্চ্ছা, প্রলাপ এবং মরণ পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত বিসূচিকা ও অলসক রোগের আরম্ভ বমি প্রভৃতি উপসর্গ যুক্ত; আর শেষোক্ত বিসূচিকা ও অলসক রোগের শেষ —মরণে পর্য্যবসিত।

এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, অজীর্ণ বিবিধ রোগের কারণ; অজীর্ণ স্বল্পজীবী হইবার কারণ; অজীর্ণ—সময়ে সদ্যোমরণের কারণ। ইহা ব্যতীত অজীর্ণের আরও একটী বিষময় ফল আছে; সেটী বংশানুক্রমিক অপকর্ষ (Hereditary degeneration)। বিষয়টি স্পষ্ট করিয়া বলা যাইতেছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ৫০ বৎসর পূর্ব্বে

লোকে বহু ভোজন করিতে পারিত এবং অজীর্ণ রোগের এত প্রাদুর্ভাব ছিল না। সে সময়ে শিশুদিগের যকৃৎ সংক্রান্ত পীড়া এত প্রবল ছিল না। এত প্রবল ছিল না বলিলেও ঠিক বলা হইল না—নিতান্ত কম ছিল। অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে শিশুর যকৃৎ রোগ এত প্রবল হইল কেন? দুগ্ধপোষ্য শিশু দোকানের খাবার কিনিয়া খায় না যে, দোকানের খাবারের উপরে এই দোষ আরোপ করা যাইবে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, বাজারের দুগ্ধই দোষী। কিন্তু গৃহ পালিতা গাভীর দুগ্ধ পান করিয়াও যখন শত শত শিশু যকৃৎ-রোগে আক্রান্ত হইতেছে দেখিতেছি, তখন সে কথা কি করিয়া বলিব? আমাদের বিশ্বাস,—পিতামাতার অজীর্ণ রোগ থাকাই ইহার কারণ। অম্লপিত্ত রোগে পিত্ত দূষিত হইয়া থাকে। পিত্তের সহিত যকৃতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। আয়ুর্ব্বেদে যকৃৎ বিকৃতিকেই প্রকারান্তরে পিত্ত বিকৃতি বলা হইয়াছে। সুতরাং পিত্ত বিকৃতিবশতঃ যকৃতের বিকৃতি ঘটে। পিতা বা মাতার অথবা পিতামাতা উভয়ের এইরূপ যকৃৎ বিকৃতি ঘটিলে তাহাদের সন্তান যে যকৃৎ রোগগ্রস্ত হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

আমরা দিগ্‌দর্শন মাত্র কেবল যকৃৎ রোগের কথা বলিলাম। অজীর্ণ রোগগ্রস্ত পিতামাতার সন্তান কখনই সুস্থ-সবল হইতে পারে না। তাহাদের পরিপাক শক্তি দুর্ব্বল হয় এবং আহারাদি সম্বন্ধে একটু অনিয়ম হইলেই সহজে রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। বঙ্গদেশের শিশুদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। সুস্থ, সবল, পুষ্টদেহ শিশু কম, অধিকাংশ শিশুই শীর্ণ ও রুগ্ন। এই সকল শিশুর আবার যখন পুত্র-কন্যা হইবে তখন তাহারা আরও দুর্ব্বল, শীর্ণ ও রুগ্ন হইয়া পড়িবে। এইরূপ ক্রমাপকর্ষ ঘটিলে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের বর্ত্তমান অবস্থার ভবিষ্যতে যে কি ভীষণ হইবে, তাহা চিন্তা করিতেও অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠে।

পার্ব্বত্য অজগর যেমন আক্রান্ত পশুকে সম্যক বেষ্টন করিয়া ধীরে ধীরে গ্রাস করে, এই ভীষণ অজীর্ণ রোগও সেইরূপ সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে আক্রমণ করিয়া ধীরে ধীরে গ্রাস করিতেছে। বাঙ্গালী এখনও সাবধান হও। এখনও চেষ্টা করিলে এই ভীষণ অজগরের কবল হইতে পরিত্রাণ পাইতে পার, এখনও তোমার ক্ষীণ শরীর পুষ্ট করিবার,—স্বল্প আয়ু দীর্ঘ করিবার, অসুস্থ দেহ সুস্থ করিবার সময় আছে। কিন্তু আর কিছুদিন অবহেলা করিলে আর তোমাদের পরিত্রাণের উপায় থাকিবে না। অজীর্ণ রোগের পরিণাম যে কি ভয়ঙ্কর এবং উহা যে কিরূপে বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব বিলোপ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। এক্ষণে এই দেশব্যাপী অজীর্ণ রোগ কি কারণে দেশে এত প্রবল হইয়াছে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ৫০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী জাতি প্রচুর আহার করিতে পারিত এবং বাঙ্গালা দেশে এমন অজীর্ণ রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল না। এই ৩০ বৎসরের মধ্যে এমন কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যাহাতে অজীর্ণ রোগ এরূপ বিষম প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহার কারণ অনেক, সংক্ষেপত:—১। পরিশ্রম হীনতা ও বিলাসিতা। ২। তামাক, সিগারেট ও চায়ের প্রচলন। ৩। [illegible] প্রচলন। ৪। [illegible]

প্রচলন। ৫। খাদ্যাভাব। ৬। ভেজাল দ্রব্যের প্রচলন। ৭। জীবনসংগ্রামে ও জীবিকা উপার্জ্জনে পশ্চাৎপদতা। ৮। সংযমাভাব। ৯। বিবিধ ব্যাধির প্রাচুর্ভাব ১০। মানসিক বিকৃতি। ১১। ধর্ম্ম হীনতা।

অন্যান্য বিবিধ কারণ পৃথক না লিখিয়া উহাদের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। প্রত্যেকের বিষয় পৃথকভাবে আলোচনা করা যাইতেছে

১। পরিশ্রম হীনতা ও বিলাসিতা। পূর্ব্বে বাঙ্গালীর আচার ব্যবহার যেরূপ ছিল এক্ষণে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বাঙ্গালী-জাতি পূর্ব্বাপেক্ষা এখন বিলাসী হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে যে বাঙ্গালী অনায়াসে দুই চারি ক্রোশ পথ চলিত, সেই বাঙ্গালী এখন একক্রোশ বা দুই ক্রোশ পথ চলিতে হইলে রেল, ট্রাম বা সেয়ারের গাড়ীর আশ্রয় গ্রহণ করে। পূর্ব্বে আধমন ত্রিশসের একটা মোট লোকে অকুণ্ঠিত চিত্তে বহিয়া লইয়া যাইত, কিন্তু এখন একটা পাঁচ সের জিনিষ বহিয়া লইয়া যাওয়াও আমরা অপমান বোধ করি। পূর্ব্বে গৃহস্থ মাত্রেরই গৃহ সংলগ্ন একটু ফুলের বাগান বা তরকারীর ক্ষেত ছিল, এবং সেই বাগান বা ক্ষেতের সমস্ত কার্য্য যেমন বেড়া বাঁধা, জমী কোপান, বীজ বা গাছ রোপণ করা, গাছে জল দেওয়া প্রভৃতি সমস্তই গৃহস্থ মাত্রেই নিজে নিজে সম্পন্ন করিত। কিন্তু এখন চাকরীজীবী-বাঙ্গালী তাহাতে অপমান বোধ করে। অথচ সময়ে পয়সা জোটে না যে, মজুর খাটাইয়া বাগানের কার্য্য করান হইবে। কাজেই এখন গৃহস্থের গৃহ সংলগ্ন জমীতে ফলের বাগান বা তরকারীর ক্ষেত দেখা যায় না। সেগুলি জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে।

জগতের অন্যান্য সভ্য জাতির মধ্যে ব্যায়াম করিবার একটা ধরা বাঁধা প্রথা আছে। কিন্তু বাঙ্গালী জাতির মধ্যে তাহা নাই। যদি কেহ সে নিয়ম পালন করেন, তাহা দুই চারি মাসের জন্য মাত্র।

এদিকে ব্যায়াম করা হয় না, অপর দিকে শ্রমজনক গৃহকার্য্য অপমান জনক বলিয়া পরিত্যাগ করা হইয়াছে ;—তাহার উপর রেল, ট্রাম, গাড়ী প্রভৃতির বাহুল্যবশতঃ হাঁটিতেও বড় হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে শ্রমহীনতা বশতঃ অজীর্ণ রোগ যে প্রশ্রয় পাইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি।

কেবল পুরুষ বলিয়া নহে—মহিলাদিগের মধ্যেও এই দোষ ঘটিতেছে। আজ কাল অবস্থা একটু স্বচ্ছল হইলেই ঝি চাকর বামুন রাখা একটা রোগের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে বিশেষ বড়লোক না হইলে ঝি-চাকর কেহ রাখিত না, বামুন তো (পাচক) বড় লোকেও রাখিত না। যাহাদের চাষ আবাদ ছিল তাহারা কৃষক নিযুক্ত করিত বটে, কিন্তু তাহাতে গৃহলক্ষ্মী দিগের কাজ বাড়িত ভিন্ন কমিত না। কেননা, কৃষক কৃষি কাজ ব্যতীত আর কিছু করিত না। অধিকন্তু তাহাকে আহার, জলখাবার পুর-মহিলাগণকেই দিতে হইত। কিন্তু এখন সে প্রথা উঠিয়া গিয়াছে, কাজেই মহিলাদিগকে পরিশ্রম খুব কমই করিতে হয়। এ অবস্থায় তাহারা যে অজীর্ণ, অম্লপিত্ত এবং তদানুসঙ্গিক বিবিধ রোগে ভুগিবেন, তাহাতে আর কথা কি !

ফল কথা বলিতে গেলে আমরা বাবু হইয়া পড়িয়াছি এবং মহিলাদিগকেও সম্ভবমত বাবু করিয়া তুলিতেছি। বঙ্গদেশে অজীর্ণ রোগের প্রাচুর্ভাবের ইহা একটী প্রধান কারণ।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, কৃষক সম্প্রদায়কে তো যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হয়,—তবে তাহাদের মধ্যে এই রোগ প্রবেশ করিতেছে কেন? কিন্তু আমরা অজীর্ণ রোগের একটি মাত্র কারণ নির্দ্দেশ করি নাই। স্বাস্থ্যের চিরশত্রু বিলাসিতা ধীরে ধীরে সমাজে প্রবেশ করিতেছে একথা বলিয়াছি। শ্রমজীবীলোকেও আজ কাল অনেক স্থলে পরিশ্রম করিতে অনিচ্ছুক; তাহাদিগের অজীর্ণ তাহারই ফল সম্ভূত। বহুদিনের একটি ঘটনা প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

কোন সময়ে পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের আড়ংঘাটা ষ্টেশনে এই প্রবন্ধের লেখককে গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। একটী বৃদ্ধ ভদ্রলোক এবং তিন জন মুসলমান শ্রমজীবীও সেই সময় গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। ভদ্রলোকটী তাহাদের সহিত কথা কহিয়া অবগত হইলেন যে, তাহারা দৈনিক পাঁচ আনা পারিশ্রমিক পায়, সংপ্রতি রাণাঘাট যাইবে। রাণাঘাট, আড়ংঘাটা হইতে ২॥০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী এবং তখনও গাড়ী আসিবার দুই ঘণ্টা বিলম্ব আছে। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটী তাহাদের বলিলেন, বাপু তোমরা তো অনায়াসে হাঁটিয়া যাইতে পার। তবে কেন অকারণ ছয় পয়সা করিয়া ভাড়া দিবে? ঐ পয়সা পেটে খাইলে উপকার হইবে। আমিও বৃদ্ধের উপদেশের সমর্থন করিলাম। শ্রমজীবী কয়জন চলিয়া গেল। কিন্তু তাহারা অন্তরালে ছিল মাত্র; গাড়ী আসিলে গাড়ীতে উঠিল। ধন্য রেল-ট্রাম; তোমাদের মোহিনী শক্তি। আমরা পেটে না খাইয়া তোমাদের বক্ষে আরোহণের সুখ অনুভব করি।

২। তামাক, সিগারেট ও চায়ের প্রচলন।—তামাক বঙ্গদেশে বহুপূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না। সম্রাট আকবরের সময় হইতে আমাদের দেশে উহার প্রচলন হয়। ক্রমে তামাক সেবনের কদভ্যাস পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতেও অতি শীঘ্র প্রচলিত হইয়া পড়ে। তামাক যে অজীর্ণ রোগ জন্মাইয়া থাকে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাহা বহু পরীক্ষার দ্বারা স্থির করিয়াছেন। আমরা যে সময়ের সহিত বর্ত্তমান সময়ের তুলনা করিতেছি, সে সময়েও তামাকের প্রচলন ছিল বটে কিন্তু এত অধিক—বিশেষতঃ সিগারেট-বিড়ি প্রভৃতি আকারে প্রচলিত ছিল না। বিশেষতঃ তখন বহু অনুকূল কারণের সহিত সংগ্রাম করিয়া তামাক একাকী কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই। এক্ষণে বহু প্রতিকূল কারণের সহিত মিলিয়া তামাক অজীর্ণরোগের প্রাবল্য বৃদ্ধি করিয়া তুলিতেছে।

আমরা অনেক তামাক, চুরুট ও দোক্তা-সেবী অজীর্ণ রোগী ও রোগিণীর তামাক-চুরুট-দোক্তা বন্ধ করিয়া রোগ প্রশমিত হইতে দেখিয়াছি। তামাক—নস্য, দোক্তা, গুড়ুক বা চুরুট যে আকারেই ব্যবহৃত হউক—সমান অপকারী। তবে হুঁকায় খাইলে তামাকের ধূম জলের ভিতর দিয়া যায় বলিয়া অনেকটা বিষ জলে মিশিয়া থাকে এবং সেই জন্য কম অপকারী হইয়া থাকে।

চায়ের প্রচলন পূর্ব্বে এ দেশে ছিল না, অল্প দিন হইল চলিতেছে। এই অনাবশ্যক ও অহিতকর পদার্থের প্রচলন যে দেশের মঙ্গলজনক নহে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। উষ্ণ প্রধান দেশে চা পান করিলে অজীর্ণরোগ জন্মিয়া থাকে। শীত প্রধান দেশেও [illegible] অহিতকর বলিয়া বহু [illegible]

প্রকাশ করিয়াছেন। বঙ্গে চায়ের বহুল প্রচলন অজীর্ণ রোগের অন্যতম কারণ। চা-পায়ী অজীর্ণরোগী চা পান ত্যাগ করিয়া অজীর্ণ রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছে—এরূপ প্রমাণ আমরা যথেষ্ট পাইয়াছি।

৩। কয়লার জাল।—সহরে এবং আজকাল অনেক পল্লিগ্রামে কয়লার প্রচলন হইয়াছে। পূর্ব্বে মাটীর হাড়িতে কাঠের জালে অন্নাদি রন্ধন করা হইত। এক্ষণে ধাতু পাত্রে কয়লায় জালে রন্ধন করা হয়। মৃদু জালে রন্ধন করিলে তাহা যেমন সুসিদ্ধ ও সুপাচ্য হয়, প্রখর জালে সেরূপ হয় না। তাহার উপর ধাতু পাত্রের ব্যবহার বশতঃ তাপ অধিক হয় এবং ধাতুর সংসর্গে খাদ্য অল্প বিস্তর দূষিত হইয়া থাকে। বঙ্গে ইহাও অজীর্ণ রোগের প্রাদুর্ভাবের অন্যতম কারণ। যে অজীর্ণ ও অম্লপিত্ত রোগী কয়লার জালে এবং ধাতু পাত্রে সিদ্ধ করা অন্ন ব্যঞ্জন আহার করিয়া থাকেন, তিনি মাটীর হাড়ীতে এবং কাঠের জালে প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জন আহার করিলে উভয়ের পার্থক্য বুঝিতে পারিবেন।

৪। দোকানের খাবার।—সহরে এবং পল্লিগ্রামে এক্ষণে অসংখ্য খাবারের দোকান হইয়াছে। সহরে মাংসের হোটেলের সংখ্যাও কম নহে। ঐ সকল দোকানের এবং হোটেলের প্রস্তুত খাদ্য দেশে অজীর্ণ রোগের প্রাবল্যের আর একটী কারণ। অনেক অম্লপিত্ত রোগীর মুখে শুনা যায় যে, দোকানের খাবার খাইলেই তাঁহাদের অম্বল হয়, কিন্তু ঘরে প্রস্তুত খাবার খাইলে অসুখ হয় না। দোকানের প্রস্তুত খাদ্য সুলভ মূল্যের নিকৃষ্ট উপকরণে প্রস্তুত হয় এবং প্রস্তুতের সময়ে ও পরে রাস্তার ধুলা ও অন্যান্য পদার্থমিশ্রিত হওয়ায় সহজেই অপকারী হইয়া পড়ে। এ সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে যথেষ্ট আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এই প্রবন্ধে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

৫। খাদ্যাভাব।—খাদ্যাভাব অজীর্ণরোগের আর একটী প্রধান কারণ। দুগ্ধ, ঘৃত এবং মৎস্য—এই তিনটী দ্রব্যই বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য ছিল। কিন্তু এক্ষণে দুগ্ধাদি নিতান্ত দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে। ধনবান ভিন্ন ঐ সকল দ্রব্য আহার করা অন্য কাহারও ভাগ্যে বড় একটা ঘটিয়া উঠে না। যে গৃহস্থ পরিবারে ১০।১২টী লোক আছে—তাহাদের বাড়ীতে জোর ২।৩ পয়সার ঘৃত তরকারীতে দেওয়া হইয়া থাকে। তাহাতে বোধ হয় প্রত্যেকের এক বেলায় এক ফোঁটা করিয়া ঘৃত উদরস্থ হয়। মৎস্য সম্বন্ধেও প্রায় সেইরূপ। এইরূপ অবস্থাহীন একটি পরিবারের মধ্যে প্রত্যহ এক পোয়ার অধিক মৎস্য ক্রয় করা হয় না। কাজেই ঐ এক পোয়া মৎস্য মেছুনীর বাটখারা, আঁইস এবং কাঁটা মুক্ত হইয়া আধ পোয়ার অধিক দাঁড়ায় না। আধপোয়া বা দশ তোলা মৎস্য দশ জনে দুই বেলা খাইলে এক বেলায় এক জনের আধ তোলা মৎস্য উদরস্থ হয়। তা'রপর দুগ্ধ,—শিশুদিগকে উদর পূর্ণ করিয়া দুগ্ধ দিতে এক্ষণে অনেক গৃহস্থেরই শক্তি নাই। তার উপর বৃদ্ধ বৃদ্ধা থাকিলে তাহাদের একটু দেওয়া আবশ্যক। সুতরাং বয়স্কদিগের ভাগ্যে দুগ্ধ বড় একটা জুটিয়া উঠে না।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, অতিরিক্ত আহার বশতঃই অজীর্ণ হয়, আহার অল্প হইলে অজীর্ণ হইবে কেন? কিন্তু অগ্নি উপযুক্ত ইন্ধন না হইলে যেমন প্রজ্বলিত থাকিতে পারেনা, সেইরূপ জঠরাগ্নি উপযুক্ত খাদ্য না পাইলে প্রবল থাকিতে পারে না।

দুর্ভিক্ষের সময় ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। দুর্ভিক্ষ পীড়িত নর-নারী কয়েক দিন অনশন অথবা যৎসামান্য আহার করিয়া জীবন রক্ষা করিবার পর যদি সহসা অতিরিক্ত আহার করে, তাহা হইলে অসুস্থ হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয়। ইহার কারণ এই যে, অল্পাহারে বা অনাহারে থাকিয়া তাহাদের জঠরাগ্নি নির্ব্বাপিত প্রায় হইয়া গিয়াছিল। এরূপ অবস্থায় সহসা প্রচুর আহার সেই নির্ব্বাপিত প্রায় অগ্নি পরিপাক করিতে অসমর্থ হইয়া থাকে। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, হীন মাত্রায় আহার করিলে তাহা বল ও পুষ্টির হানি করে এবং নানা প্রকার বায়ু রোগ উৎপন্ন করে। কাজেই হীন মাত্রার আহারের ফলে বল ও পুষ্টিহানি ঘটার পর অতিমাত্রায় আহার জন্য যে অসুস্থ হইতে হইবে, তাহাতে আর কথা কি?

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, উপযুক্ত ইন্ধন না পাইলে যেমন অগ্নি প্রজ্বলিত থাকিতে পারেনা, সেইরূপ উপযুক্ত ইন্ধন না পাইলে জঠরাগ্নি প্রবল থাকিতে পারে না এস্থলে উপযুক্ত শব্দের অর্থ কি? অগ্নিতে শুষ্ক কাষ্ঠ, ঘৃত প্রভৃতি দিলে উহা জ্বলিতে থাকে, কিন্তু আর্দ্র কাষ্ঠ, ধূলা, বালি দিলে জ্বলে না, নিবিয়া যায়,—সুতরাং ঘৃত ও শুষ্ক কাষ্ঠাদিই অগ্নির উপযুক্ত ইন্ধন। জঠরাগ্নির ইন্ধনও সেইরূপ উপযুক্ত হওয়া আবশ্যক। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, হিতকর অন্নপান রূপ সমিধের দ্বারা নিত্য সমাহিত চিত্তে মাত্রা ও কাল বিচার করিয়া অন্তরাগ্নিতে হোম করিবে। হায়! সমিধ ও হবির অভাবে আমাদের হোমাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে। অন্তরাগ্নিও কি সেইরূপ সমিধ ও হবির অভাবে নির্ব্বাপিত হইবে?

খাদ্যের অভাব ঘটায় উপযুক্ত খাদ্য এক্ষণে বাঙ্গালী জাতির উদরস্থ হয় না। চাউল বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য। উহা ঘৃত, মৎস্য, মাংস ও দুগ্ধের সহিত সংযুক্ত হইলে উপযুক্ত খাদ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, কিন্তু কেবল চাউল উপযুক্ত খাদ্য নহে। পাশ্চাত্য দেশীয় মনস্বিগণও ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন। ঘৃত ও মৎসাদির অভাবে বাঙ্গালী জাতি এক্ষণে শাক ও অন্ন আহার করিয়া থাকে। এইরূপ অনুপযুক্ত আহার জঠরাগ্নির উপযুক্ত ইন্ধন নহে। সুতরাং বাঙ্গালীর জঠরাগ্নি প্রজ্বলিত থাকিবে কিরূপে। দুঃখের বিষয় এই যে, এক্ষণে শুধু শাকও অনেকের জুটেনা। তরি-তরকারী যেরূপ দুর্ম্মূল্য, তাহাতে অল্প লোকেই যথেষ্ট তরি তরকারী কিনিয়া খাইতে পারে। অপরং বা কিং ভবিষ্যতি।

বাঙ্গালী জাতির আর দুই প্রকার খাদ্যের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। দাল এবং ফল। দাল বেশ পুষ্টিকর, প্রায় মাংসের সমতুল্য। অধিকাংশ দরিদ্র পশ্চিম দেশবাসীর চানা ও রহরকি দাল প্রিয় এবং প্রবল খাদ্য। কিন্তু পশ্চিম দেশের ন্যায় বঙ্গদেশে দালের প্রচলন নাই এবং উহাদিগের ন্যায় দাল হজম করিতে বাঙ্গালী অক্ষম। বাঙ্গালায় দালের ব্যবহারও অল্প এবং যেরূপ ভাবে রাঁধিয়া আহার করা হয়, তাহাতে যৎসামান্য দালই উদরস্থ হইয়া থাকে। সুতরাং দালের দ্বারা বাঙ্গালীর খাদ্যাভাবের প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ করা হয় না।

ফল বাঙ্গালায় প্রচুর জন্মিত এবং এখনও অনেক জন্মে। ফল সুখাদ্য হইলেও উহা সকল গুলিতে পুষ্টিকর পদার্থ বিশেষ কি[illegible] নাই। বাদাম, পেস্তা প্রভৃতি ফল [illegible] পুষ্টিকর বটে, [illegible]

এবং যেরূপ মূল্যে এদেশে বিক্রীত হয়, তাহাতে ধনবান্ ব্যতীত অপরের ক্রয় করিয়া আহার করাও সম্ভব নহে। সুতরাং ফলের দ্বারা বাঙ্গালীর আহারাভাবের কিছু প্রতিকার হয় না। তবে মন্দের ভাল যে, এই দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশে আমের সময় রসালের আস্বাদনে অনেক দরিদ্রের জঠর জ্বালার অনেকটা নিবৃত্তি ঘটে।

বর্ত্তমানে কিরূপ শোচনায় খাদ্যাভাব ঘটিয়াছে, তাহা দেখান হইল। এই খাদ্যাভাবই দেশব্যাপী অজীর্ণ রোগের একটা কারণ। যাহা হউক এক্ষণে দেখা যাউক পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল ? কারণ সে সময়ে দেশে অজীর্ণ রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল না।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এমন গৃহস্থ কম ছিল, যাহাদের দুই তিনটা বা তদধিক গাভী ছিলনা। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রয়োজন মত দুগ্ধ খাইতে পাইত। গৃহিণীরা দুগ্ধ হইতে মাখন, ঘৃত এবং বিবিধ সুখাদ্য প্রস্তুত করিতেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কাহাকেও ঘৃতহীন ভোজন করিতে হইত না। গব্য ঘৃত বঙ্গের সর্ব্বত্রই পাওয়া যাইত এবং মূল্যও সুলভ ছিল। এই সময়ে টাকায় দেড় সের হইতে দুই সের ঘৃত বাজারে বিক্রীত হইত। এখন পল্লিগ্রামেও সহজে ঘৃত পাওয়া যায় না এবং মূল্য ও ৫ গুণ অধিক দাঁড়াইয়াছে। কার্য্যোপলক্ষে আমি বর্দ্ধমান, হুগলী, নদীয়া, যশোহর এবং ২৪ পরগণা জেলার বহু পল্লিগ্রামে ভ্রমণ করিয়াছি। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যেখানে নিমন্ত্রিত বা আতথি হইতাম, সেখানে গৃহস্থ নিজগৃহ হইতেই প্রচুর দুগ্ধ-ঘৃত দিতে পারিত। এখন সেই সকল পল্লিগ্রামে গৃহস্থ নিজ গৃহ হইতে দুগ্ধ-ঘৃত দিতে তো পারেই না, অধিকন্তু পাড়ার ঘুরিয়া হয়ত সামান্য মাত্র সংগ্রহ করিতে পারে, কখন বা তাহাও পারে না।

মৎস্য ও পূর্ব্বে দেশে বেশ সুলভ ছিল। বঙ্গ দেশে খানা, ডোবা, খাল, বিল ও নদী প্রচুর। পূর্ব্বে ঐ গুলিতে জল থাকিত এবং জলে প্রচুর মৎস্য থাকিত। ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলের ঘরে জাল ছিল। স্নান করিতে যাইবার সময় প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থেরই কোন না কোন ব্যক্তি জাল, খালুই (মাছ রাখিবার পাত্র) লইয়া বাহির হইত এবং খাল-বিল বা পুষ্করিণীতে জাল ফেলিয়া খালুইটী পূর্ণ করিত, পরে স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিত। সর্ব্বত্র যে এইরূপ উপায়ে মৎস্য সংগৃহীত হইত তাহা নহে, কিন্তু আমি অনেক স্থলে এইরূপ দেখিয়াছি। মৎস্য তখন এত প্রচুর জন্মিত যে ভদ্রঘরের বালিকা, যুবতী এবং প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকগণের অনেকেও স্নান করিতে গিয়া মৎস্য দেখিয়া ধরিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিত না,—কাপড় ছাঁকা দিয়া প্রচুর মৎস্য ধরিয়া আনিত। এখন খাল, বিল, ডোবায় আর জল থাকে না, জলে আর তত মৎস্য থাকে না, গৃহস্থের ঘরে আর জাল থাকে না।

মৎস্য পূর্ব্বে এত প্রচুর ও সুলভ ছিল যে যাহাদের ধরিয়া লইবার সুবিধা ঘটিত না তাহারা স্বল্প মূল্যে অনায়াসেই উহা ক্রয় করিতে পারিত। এখন এত দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্মূল্য হইয়াছে যে, উপযুক্ত পরিমাণ মৎস্য ক্রয় করিবার সাধ্য অধিকাংশ গৃহস্থেরই নাই।

দিগদর্শন স্বরূপ আমরা কয়েকটী খাদ্য বিষয় আলোচনা করিলাম। তাহা ব্যতীত অন্যান্য সর্ব্ব প্রকার খাদ্যই এখন দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে। ফলে বাঙ্গালী আর উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য সংগ্রহ করিতে

না। বাঙ্গালী এখন পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। অপকৃষ্ট খাদ্য হীন মাত্রায় খাইয়া জঠর জ্বালা নিবৃত্তি করে মাত্র। এই সকলই বঙ্গে অজীর্ণ রোগের প্রাদুর্ভাবের প্রধান কারণ। আগামীবারে এ সম্বন্ধে আমরা আরও বিস্তৃত আলোচনা করিব।

শ্রী—

স্বাস্থ্যরক্ষায় ভোজন বিধি।

সুস্থ, সবল ও নিরোগী হইয়া দীর্ঘায়ু লাভ করিতে হইলে আমাদিগের নিত্য আহার্য্য বস্তু গুলির গুণ, মাত্রা, সংযোগ, বিরুদ্ধ ক্রিয়া, ভোজনের কালাকাল, গুরু-লঘুপাক প্রভৃতির বিষয় বিশেষরূপে জ্ঞাত থাকা আবশ্যক। নিত্য আহার্য্য দ্রব্যের সহিত শরীরের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। আমরা অনভিজ্ঞতা বশতঃ কত প্রকার অহিত জনক, অপকৃষ্ট, সংযোগ বিরুদ্ধ পান-ভোজন দ্বারা স্বাস্থ্য হারাইয়া চিররুগ্ন হইতেছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। সেইজন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা নিত্য আহার্য্য দ্রব্যগুলির গুণাগুণ, সংযোগ, বিরুদ্ধ ক্রিয়া, দ্রব্যের গুরু-লঘুপাক, মাত্রা, কালাকাল, কোন্ ঋতুতে কোন্ দ্রব্য হিত-জনক ইত্যাদি আবশ্যকীয় বিষয় গুলির আলোচনা করিব।

আহার্য্য দ্রব্য ছয় প্রকার—চূষ্য, পেয়, লেহ্য, ভোজ্য, ভক্ষ্য ও চর্ব্ব্য। ইহাদিগের মধ্যে চূষ্য হইতে পেয়, পেয় হইতে লেহ্য, লেহ্য হইতে ভোজ্য, ভোজ্য হইতে ভক্ষ্য, ভক্ষ্য হইতে চর্ব্ব্য দ্রব্য গুরু পাক।

চূষ্য—ইক্ষু, দাড়িম প্রভৃতি। পেয়—চিনি মিশ্রির সরবত প্রভৃতি। লেহ্য—রসালা অর্থাৎ কাঁঠাল প্রভৃতির রসাস্বাদন। ভোজ্য—অন্ন-ব্যঞ্জনাদি, ভক্ষ্য—লাড়ু, মোয়া প্রভৃতি। চর্ব্ব্য—চিপিটক (চিড়া) প্রভৃতি।

ভোজনের পূর্ব্বে হস্ত-মুখ-পদদ্বয় উত্তমরূপে ধৌত এবং দন্ত ও জিহ্বা পরিষ্কৃত করিবে। উপবেশনের জন্য কাষ্ঠ আসন (পীড়া) অপেক্ষা কম্বল ও গালিচার আসন প্রশস্ত ও সুখজনক। সুখজনক আসনে অঙ্গাদি বিকৃত ভাবাপন্ন না করিয়া সরলভাবে উপবেশন পূর্ব্বক ভোজ্য দ্রব্যাদি পরীক্ষা করিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইবে। ভোজন সময়ে শ্রুতিমধুর সুখজনক গল্প শ্রবণ করিতে করিতে ভোজন করা উচিত।

প্রত্যহ ভোজনের প্রাক্কালে সামান্য কয়েক টুকরা আদা সৈন্ধবলবণ সহযোগে সেবন করিবে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এ সম্বন্ধে উক্ত আছে—

"ভোজনাগ্রে সদাপথ্যং লবণাদ্রক ভক্ষণম্।
অগ্নি সন্দীপনং রুচ্যং জিহ্বা কণ্ঠ বিশোধনম্॥"

ভোজনের পূর্ব্বে লবণ (সৈন্ধবলবণ) সংযুক্ত আদ্রক ভক্ষণ হিতজনক, অগ্নির উদ্দীপক, রুচি জনক, জিহ্বা ও কণ্ঠের শোধক।

আদ্রকের সহিত লবণ খাওয়ার যে উল্লেখ আছে, তাহা সৈন্ধব লবণ বুঝিতে হইবে। কড়্কচ এবং বিলাতি লবণ [illegible]

পারিভাষিক শব্দানুসারে লবণ স্থানে সৈন্ধব লবণ প্রযুক্ত। এই প্রকার আরও বহু শব্দ আছে যেমন, গুড় বলিতে ইক্ষু গুড়, চন্দন বলিতে রক্তচন্দন ইত্যাদি। সৈন্ধব লবণ ত্রিদোষঘ্ন, ঈষৎ মধুর, অগ্নিদ্দীপক, পাচক, লঘু, স্নিগ্ধ রুচিজনক, শীতবীর্য্য শুক্রজনক, চক্ষুর হিতকারক। এজন্য ভোজনে সৈন্ধব লবণই প্রশস্ত। পঞ্চ লবণের মধ্যে সৈন্ধব লবণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

আদ্রকের গুণ—মলভেদক, গুরু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, কটু রস (ঝাল) মধুর, সূক্ষ্মস্রোতানুগামী, বায়ু ও কফনাশক। আদ্রক ও সৈন্ধব—এই দুইটী দ্রব্যের সংযোগে পিত্তের প্রকোপ হয় না, ও ক্ষুধা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

গুরু দ্রব্য।—গুরু দ্রব্য তিন প্রকার,—

মাত্রা গুরু—(অতিরিক্ত মাত্রায় সেবন)

স্বভাব গুরু (দ্রব্যের স্বাভাবিক গুরুত্ব গুণযুক্ত—যাহা বিলম্বে পরিপাক হয়) পলান্ন, পেঁয়াজ, মাংস ইত্যাদি।

সংস্কার গুরু—নানাবিধ দ্রব্য ও গরম মসল্লাদি সংযোগে প্রস্তুত। এই ত্রিবিধ গুরুদ্রব্যই মন্দাগ্নি ব্যক্তি কখনই সেবন করিবে না ফল-মূলাদি আহার করিতে হইলে অন্ন আহারের অন্ততঃ এক ঘণ্টা পূর্ব্বে করিবে। অনেকের অভ্যাস আছে, ভাতের পাতে লুচি, রুটি ভোজন করিয়া থাকেন, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ইহা নিষিদ্ধ।

"গুরু পিষ্টময়ং দ্রব্যং তণ্ডুলান্ পৃথকানপি।
ন জাতু ভুক্তবান্ খাদেন্মাত্রাং খাদে দ্বুভুক্ষিতঃ॥

গুরু দ্রব্য, পিষ্টময় দ্রব্য (লুচি প্রভৃতি) তণ্ডুল ও চিপিটক (চিড়া) এই সকল দ্রব্য ভুক্ত ব্যক্তি কখনই ভোজন করিবেনা। ভুক্ত ব্যক্তি অর্থে এ স্থলে ভোজন শেষে অথবা ভোজনের অব্যবহিত পরে বুঝাইবে। তবে আবশ্যক হইলে ঐ সকল দ্রব্য অতি অল্প মাত্রায় ভক্ষণ করিতে পারা যায়।

ভোজনের সময়—ভোজনের উপযুক্ত সময় অতীত করিয়া ভোজন করিলে বায়ু কর্ত্তৃক জঠরাগ্নি উপহত হইয়া ভুক্ত দ্রব্য অতিকষ্টে পরিপাক করে এবং পুনর্ব্বার ভোজনে অভিলাষ থাকে না। এজন্য ভোজনের নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত করিয়া ভোজন করিবে না। এস্থলে বলা আবশ্যক, যাহার চির অভ্যাস বশতঃ যে সময় ভোজন কাল নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার পক্ষে সেই সময়ই উপযুক্ত কাল জানিবেন।

পাকস্থলীর চারি অংশের দুই অংশ ভোজ্য দ্রব্যের দ্বারা পূর্ণ করিবে, এক অংশ পানীয় দ্বারা পূর্ণ করিবে, অবশিষ্ট এক অংশ বায়ু সঞ্চালনের নিমিত্ত শূন্য রাখিবে, আকণ্ঠ পুরিয়া কখনও ভোজন করিবে না। এস্থলে আমা-দিগের দেশ-প্রথানুসারে বহুস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়,—নিমন্ত্রণের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ কর্ত্তার আগ্রহাতিশয্যে ভোজন কর্ত্তার মাত্রাতিরিক্ত ভোজন করিতে হয়। ইহাতে দুইটি বিষয়ে বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে, কর্ত্তার [illegible] অপচয় এবং ভোক্তার স্বাস্থ্য হানি; এমনকি ইহাতে কোন কোন স্থলে ভোক্তার বিসূচিকা, উদরাময়, উদরাধ্মান পর্য্যন্ত জন্মিয়া মৃত্যুও [illegible] পারে। এমত স্থলে নিমন্ত্রিত কর্ত্তা ও ভোক্তা —উভয়েরই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন [illegible] একটী প্রবাদ বাক্য আছে "আপ রুচি [illegible] পর রুচি পরনা";—সকলেরই [illegible] উচিত, এক কথাটির মূল্য আছে।

ভোজনের সময় জল পান— অধিক জলপান করিলে ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হয় না, এবং একবারে জলপান না করিলেও পরিপাক হয় না. এস্থলে আয়ুর্ব্বেদে উক্ত আছে

অত্যম্বু পানান্ন বিপচ্যতেঽন্ন মনম্বু পানাচ্চ স এব দোষঃ।
তস্মান্নরো বহ্নি বিবর্দ্ধনায় মুহুর্মুহুর্বারি পিবেদ ভুরি॥ (ভাব প্রকাশ)।

অতএব একেবারে জলপান না করা এবং অতি জলপান করা—কোনটাই সঙ্গত নহে।

বিষমাশন।—ভোজনের সময় অধিক মাত্রায় আহার কিম্বা অসময়ে অধিক বা অল্প আহার করিলে তাহাকে বিষমাশন বলে। ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অতিশয় অহিতকর। আবার ক্ষুধার উপযুক্তরূপ অন্ন ভোজন না করিলে শরীর কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া থাকে।

অকাল ভোজন—ক্ষুধা উপস্থিত না হইতে আহার করিলে, বলহানি, শিরোরোগ, বিসূচিকা, অলসক ও বিলম্বিকা রোগ জন্মে। ঐ সকল রোগ কালে বর্দ্ধিত হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটাইতে পারে।

কিরূপ অন্ন ভোজন করা উচিত? —যে অন্ন মনের প্রফুল্লতাজনক, বল ও পুষ্টি-কারক, ও পরমায়ুবর্দ্ধক—এরূপ অন্ন ভোজনের উপযুক্ত। অতিশয় উষ্ণ অন্ন বলনাশক, অতি শীতল ও শুষ্ক অন্ন দুষ্পাচ্য, অতিশয় ক্লিন্ন অন্ন (গলা ভাত) বিস্বাদকর। নাতি উষ্ণ, নাতি শীতল, নাতি কঠিন, নাতি দ্রব অন্ন ভোজনই প্রশস্ত। অন্নের মাড় পরিত্যাগ না করিয়া অন্ন—মাড়ের সহিত মিশ্রিত থাকিয়া প্রস্তুত হইলে তাহা অত্যন্ত বলকারী। সিদ্ধ চাউলের অন্ন অপেক্ষা আতপান্ন বলকারী।

আহারের নিয়ম—অতিশয় দ্রুত আহার করিবে না, ভক্ষ্য বস্তু উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া উদরস্থ করিবে।

ভক্ষ্য বস্তু উত্তমরূপে চর্ব্বণ না করিয়া ভোজন করিলে অজীর্ণ ও অম্ল পিত্ত রোগাক্রান্ত হইতে হয়। অতি বিলম্বেও আহার করিবে না, তাহাতে প্রস্তুতিকৃত আহার্য্য সামগ্রী অতিশয় শীতল হইয়া পরিপাক শক্তির হ্রাস হয়।

ঋতু অনুযায়ী আহার—শীত কালে, ও হেমন্ত-শিশির ঋতুতে এবং বর্ষাকালে—অম্ল, মধুর ও লবণ রসযুক্ত, বসন্ত কালে—কটু, (ঝাল) তিক্ত, এবং কষায় রসযুক্ত, গ্রীষ্ম কালে মধুর রসযুক্ত শরৎ কালে—মধুর, তিক্ত এবং কষায় রস সংযুক্ত অন্ন-পানীয় সেবন করিবে।

শরৎ ও বসন্ত কালে রুক্ষ দ্রব্য এবং হেমন্ত, শিশির, গ্রীষ্ম ও বর্ষা কালে স্নিগ্ধ দ্রব্য সেবন করিবে।

গ্রীষ্ম ও শরৎ কালে শীতল দ্রব্য, তদ্ভিন্ন অন্যান্য ঋতুতে (হেমন্ত শিশির, বসন্ত ও বর্ষা) উষ্ণ গুণ যুক্ত দ্রব্য সেবন বিধি। মধুরাদি করিয়া ছয়টী রস—(মধুর, অম্ল, কটু, তিক্ত, কষায়, লবণ) সকল ঋতুতেই সেবন করিবে, তন্মধ্যে যে সকল ঋতুতে যে যে রসের সেবন বিশেষ করিয়া বলা হইল—সেই সেই রস অধিক মাত্রায় সেবন করা কর্ত্তব্য।

• **ঋতু ভেদে সেবন বিধি**—বর্ষাকালে বায়ু কুপিত হয়, এজন্য বর্ষাকালে বায়ু প্রশমিত পান, আহার করিবে। মধুর, অম্ল ও লবণ রস বায়ু প্রশমক।—শরীর গ্লানি যুক্ত হয় বলিয়া এই ঋতুতে কটু (ঝাল) তিক্ত ও কষায় রস যুক্ত দ্রব্য বিশেষ রূপে সেবন করিতে হয়।

স্বেদকর দ্রব্য [illegible] ভোজনে ও [illegible]

সেই সকল দ্রব্যও দধি, উষ্ণ দ্রব্য, জাঙ্গল মাংস, গোধূম, তণ্ডুলের অন্ন, মাষ কলায়ের যূষ, কূপ জল—প্রভৃতি সেবন বিধি।

বর্ষাকালে বর্জ্জনীয় বিধি।—পূর্ব্বদিক হইতে প্রবাহিত বায়ু, বৃষ্টি- রৌদ্র, হিম, অতি পরিশ্রম, নদীতীরে ভ্রমণ, দিবানিদ্রা, রুক্ষদ্রব্য সেবন; নিত্য মৈথুন স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এইগুলি বর্ষাকালে বর্জ্জনীয়।

বর্ষার অবসানে হিতজনক বিধি।—ঘৃত, মধুর দ্রব্য, কষায় ও তিক্ত রস সংযুক্ত দ্রব্য, লঘু দ্রব্য, দুগ্ধ, ইক্ষু-বিকার (ইক্ষু চিনি গুড়) লবণ, অল্প পরিমাণে জাঙ্গল মাংস, গোধূম, যব, মুগ, শালিতণ্ডুল, কর্পূর, চন্দন, রাত্রির প্রথম ভাগের চন্দ্র কিরণ, মাল্য ধারণ, অল্প ব্যায়াম, সরোবরে জল ক্রীড়া, এবং পিত্তাধিক্য ব্যক্তির বিরেচন—বর্ষা অন্তে প্রশস্ত ব্যবস্থা।

বর্ষার অবসানে বর্জ্জনীয় বিষয়।—দধি, অতিরিক্ত ব্যায়াম, অম্ল দ্রব্য, কটু দ্রব্য (ঝাল) উষ্ণ দ্রব্য, তীক্ষ্ণ দ্রব্য, দিবা নিদ্রা, হিম, রৌদ্র সেবন—এ গুলি বর্ষা ঋতুর অবসানে আদৌ কর্ত্তব্য নহে।

শরৎ কালে সেবন বিধি।—ইক্ষু বিকার (গুড় চিনি) শালিতণ্ডুল, মুগ, সরোবরের জল, দুগ্ধ, সন্ধ্যাকালের চন্দ্র কিরণ হিতজনক।

শিশির কালে (শীত কালে) হেমন্ত কাল অপেক্ষা অধিক শীত হয়, এজন্য আদান কালের স্বভাব জনিত শরীর বিশেষ রুক্ষ হয়, অতএব এইকালে হেমন্ত কালের নিয়ম সকল পালন করাই প্রশস্ত ব্যবস্থা।

হেমন্ত কালের বিধি।—প্রাতে বেলা এক প্রহরের মধ্যে ভোজন, অম্ল দ্রব্য, মধুর দ্রব্য, লবণ রস সংযুক্ত দ্রব্য, তৈল মর্দ্দন রৌদ্র সেবন, ব্যায়াম, গোধূম, ইক্ষুবিকার, শালিতণ্ডুল, মাষকলাই, মাংস, পিষ্টান্ন, নূতন তণ্ডুলের অন্ন, তিল, মৃগনাভি (কস্তুরী) কুঙ্কুম, অগুরু, শৌচাদি কার্য্যে গরম জল ব্যবহার, স্নিগ্ধ দ্রব্য, স্ত্রী সংসর্গ, মোটা এবং গরম পশমাদি নির্ম্মিত বস্ত্র ইত্যাদি ব্যবহার করিবে।

বসন্তে ব্যবস্থা।—বমন, নস্যগ্রহণ, মধুর সহিত হরীতকী সেবন, ব্যায়াম, উদ্বর্ত্তন, জাঙ্গল মাংস, গোধূম প্রভৃতি কফ নাশক দ্রব্য ব্যবহার, শালি তণ্ডুলের অন্ন, মুগ, যব, চন্দন, কুঙ্কুম, অগুরু প্রভৃতি গাত্রে অনুলেপন, রুক্ষ, কটু, উষ্ণ এবং লঘু দ্রব্য ভোজন এই ঋতুতে হিতজনক।

বসন্ত কালে বর্জ্জন বিধি।—অম্ল দ্রব্য, দধি, স্নিগ্ধদ্রব্য (যাহাতে কফ বৃদ্ধি হয়) দুষ্পাচ্য দ্রব্য ভোজন, দিবানিদ্রা, হিম সেবন বসন্তকালে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়।

গ্রীষ্ম ঋতুর বিধি—মধুর দ্রব্য, স্নিগ্ধ-দ্রব্য, শীতল ও লঘু দ্রব্য, রসালা (কাঠাল) চিনি, শক্তু (ছাতু) দুগ্ধ, চিনির সহিত খরমুজা, শালি তণ্ডুল, মাংস রস প্রভৃতি আহার, কর্পূর ও চন্দনাদির অনুলেপন, শীতল জল পান, এই ঋতুতে হিতকর। কটু দ্রব্য (ঝাল) ক্ষার দ্রব্য, অম্লদ্রব্য, রৌদ্র ও অতিরিক্ত পরিশ্রম এই সময়ে একেবারেই বর্জ্জন করিবে।

এই প্রসঙ্গে আমরা ভোজনান্তর ক্রিয়াগুলির কথা বলিয়া অদ্যকার বক্তব্য শেষ করিব। ভোজন অন্তে উত্তমরূপে আচমন করিতে হয়—ইহাই শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা কিন্তু আজকাল অনেকে ভুলিয়া দিয়াছেন। আচমনের ফলে জিহ্বা ও দন্তমূল পরিষ্কৃত হয়, এই জন্যই আচমনের ব্যবস্থা। শুধু তাহাই নহে, খড়িকা

দ্বারা দন্তমূল পরিষ্কৃত করাও আবশ্যক, নতুবা দন্ত সংযোগ স্থলে আহার্য্য দ্রব্যের কণিকা থাকায় উহা পচিয়া মুখে দুর্গন্ধ হয় এবং ক্রমশঃ দন্ত বেষ্টিত মাংস শিথিল হইয়া—দন্তমূল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এখনকার দিনে অনেকেরই অতি শীঘ্র যে দন্তরোগ জন্মিয়া থাকে এবং উহার পরিণামে দন্তোৎপাটন পূর্ব্বক কৃত্রিম দন্ত ব্যবহারের প্রয়োজন হয়—আচমনের অভাবই তাহার কারণ। আচমনের শেষে জল সিক্ত হস্ত দ্বারা ৩।৪ বার চক্ষু মার্জ্জনা করিবে, ইহাতে চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি সতেজ থাকে, এবং তিমির রোগ নষ্ট হয়। আয়ুর্ব্বেদে উক্ত আছে—

আচম্য জলযুক্তাভ্যাং পাণিভ্যাং চক্ষুষী স্পৃশেৎ।
ভুক্ত্বাপাণি তল ঘৃষ্ট্বা চক্ষুষো যদি দীয়তে।
অচিরেনৈব তদ্বারি তিমিরাণি ব্যপোহতি॥

(ভাব প্রকাশঃ)

তাম্বূল (পান) সেবন বা (মুখশুদ্ধি) আচমনের পর কর্ত্তব্য। কটু, তিক্ত, কষায়-বিশেষ ফল, হরীতকী, শুপারি, লবঙ্গ, জাতিফল প্রভৃতি দ্বারা, অথবা কর্পূর, কস্তূরী সুগন্ধি দ্রব্য মিশ্রিত তাম্বূলের দ্বারা মুখশুদ্ধি করিবে। কিন্তু অতিরিক্ত তাম্বূল সেবন অতিশয় অবৈধ, ইহার ফলে অকালে দন্ত সকল তো নষ্ট হইয়া থাকেই, অজীর্ণ রোগও ইহার ফলে জন্মিয়া থাকে। তাহার পর, আমরা যে তাম্বূল সেবন করি, তাহাও বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবহার কর্ত্তব্য। শাস্ত্রকার তাম্বূলের গুণ ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—তাম্বূল তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক, মলসারক, ক্ষার সংযুক্ত তিক্ত ও কটু রস বিশিষ্ট, কামোদ্দীপক, রক্তপিত্তজনক, লঘু, বশ্যতাজনক, কফঘ্ন, মুখের দুর্গন্ধ ও মল-নাশক, বাতঘ্ন, শ্রমপনোদক, মুখের বিশুদ্ধ-কারক, কান্তিজনক, হনু (চোয়াল), ও দন্ত-গত মল নাশক, রসনেন্দ্রিয় শোধক, মুখস্রাব ও গল রোগনাশক। কিন্তু নূতন তাম্বূল—ঈষৎ কষায় সংযুক্ত, মধুর রস, গুরু, কফকারক। বঙ্গদেশজাত তাম্বূল অত্যন্ত কটুরস (ঝাল) যুক্ত সারক, পাচক, পিত্ত বর্দ্ধক, উষ্ণবীর্য্য, কফ নাশক ও পুরাতন তাম্বূল—কটুরসবিহীন, লঘু, কোমলতর, পাণ্ডুরবর্ণ—সেইজন্য ইহাই তাম্বূলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শুপারি সম্বন্ধেও এইরূপ বিবেচনা করিয়া ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। আয়ুর্ব্বেদ শুপারির গুণ-ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—শুপারি গুরু, শীত-বীর্য্য রুক্ষ, কষায় রস যুক্ত, কফঘ্ন, পিত্তনাশক, মত্ততাজনক, অগ্নিপ্রদীপক, রুচিকারক, মুখের দুর্গন্ধনাশক। কিন্তু পক্ক শুপারি ও সিদ্ধ করা শুপারি ত্রিদোষ (বায়ু পিত্ত, কফ) নাশক, অপক্ক শুপারি ব্যবহার করা প্রশস্ত নহে।

খদির বা খয়েরে সম্বন্ধেও বিচার আবশ্যক। খদির এক প্রকার বৃক্ষের নির্য্যাস। বিশুদ্ধ খয়ের প্রায়ই দুষ্প্রাপ্য। খদির বৃক্ষের নির্য্যাস গ্রহণ করিয়া ব্যবসায়ীগণ নানাবিধ দ্রব্য সংযোগে কৃত্রিম খয়ের প্রস্তুত করিয়া থাকে। এজন্য পানের সহিত আমরা যে সকল খয়ের ব্যবহার করি, তাহা বিশুদ্ধ নহে বলিয়া অপকারীই হইয়া থাকে। নতুবা বিশুদ্ধ খয়ের কফঘ্ন এবং পিত্তনাশক, সেইজন্য ইহা ব্যবহারে উপকারই হইবার কথা।

চূর্ণ বা চূণ—সম্বন্ধেও বিবেচনা করিবার বিষয় আছে। চূণ দ্বিবিধ,—পাথর হইতে জাত—(যাহা কলিকাতা অঞ্চলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে) ও শম্বুক হইতে জাত। ইহার মধ্যে শম্বুক জাত চূণ অম্লনাশক, কফ ও বাতনাশক। কিন্তু এ চূণ আমরা ব্যবহার করি না বলিয়া তাম্বূল সেবনে আমাদের অনিষ্ট হইয়া থাকে। পান, শুপারি, খয়ের, চূণ—এই কয়েকটী দ্রব্যের

যোগে এবং সুগন্ধি মসল্লা দ্বারা যে পান প্রস্তুত হয়, তাহা সেবনে কফ, পিত্ত ও বায়ু জন্য দোষ নষ্ট করে। প্রাতঃ কালে পান সেবন করিতে হইলে, শুপারি, মধ্যাহ্নে খদির, এবং রাত্রিতে চূণের ভাগ কিছু অধিক দিবে।

তাম্বূলের শীস্ ও বোঁটা,—অজীর্ণ কারক, বুদ্ধি ভ্রংশজনক—স্মৃতি শক্তিনাশক। তাম্বূল চর্ব্বণ করিয়া প্রথম অংশ (পিক্) ফেলিয়া দিবে, উহা বিষাক্ত। ২য় বার চর্ব্বণে যে রস উৎপন্ন হয় তাহা ভেদক ও দুষ্পাচ্য। তৃতীয় বার চর্ব্বণে যে রস প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই গুণ-দায়ক।

ভোজনের পর আচমন—আচমনের পর মুখশুদ্ধি, তা'রপর বিশ্রাম, এ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ যে ব্যবস্থা দিয়াছেন,—তাহা আমরা বলিলাম।

ইহার পর উপবেশন, শয়ন—অথবা দ্রুত গমন নিষিদ্ধ। ভোজনান্তে ধীর পদে একশত পদ হাটিবে, তাহাতে আলস্যাদির শিথিলতা দূর হয়। ভোজনের পরক্ষণেই উপবেশন করিলে ভুঁড়ি বৃদ্ধি হয় (পেট মোটা হয়)। শয়ন করিলে দেহ পুষ্টি ও দ্রুত গমন করিলে মৃত্যু তাহার পশ্চাদানুসরণ করে, অর্থাৎ উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। ভোজনের পর ধীরে ধীরে একশত পদ ভ্রমণ করিলে পরমায়ু বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

ভ্রমণের পর অষ্টশ্বাস পরিমিত কাল (আটবার শ্বাস প্রশ্বাস বহনে যে সময় ক্ষেপ হয়) তৎকাল পর্য্যন্ত উত্তানভাবে সুখে শয়ন করিবে, তৎপর ষোলবার ঐ প্রকার শ্বাস বহনের সময় পর্য্যন্ত দক্ষিণ পার্শ্বে (ডাইন কাতে) শয়ন করিবে, অতঃপর তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ বত্রিশ বার পর্য্যন্ত শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের সময় অতিক্রম করিয়া ইচ্ছামত ভাবে শয়ন করিবে।

নাভির উর্দ্ধদেশে বাম পার্শ্বে পক্বাশয় (অগ্নির স্থান)। এজন্য ভুক্ত বস্তু জীর্ণ হইবার জন্য বাম পার্শ্বে শয়ন করা কর্ত্তব্য।

আগেকার লোকে এ সকল বিধি মানিতেন, তাহার ফলে তাঁহারা নীরোগ দেহে দীর্ঘজীবন লাভ করিতেন। এখন আমরা তাহা মানি না বলিয়াই আমরা যে স্বাস্থ্য-সুখ হারাইয়া অল্পায়ু হইয়া পড়িয়াছি—তাহা ধ্রুব—সত্য কথা।

শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন।

বায়ু সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ।

পাঠক, প্রবন্ধের নাম দেখিয়া মনে করিবেন না যে, সেই পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি হইতেছে। বায়ু আমরা শ্বাস লই; বায়ু আমাদের প্রাণ, বায়ু বৃক্ষলতাদির প্রাণ ইত্যাদি, কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই সকল বিষয় আমাদের আলোচ্য নহে।

ভিন্ন ভিন্ন শিরাবাহী বায়ু জীব শরীরের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে—তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। প্রসঙ্গ ক্রমে আয়ুর্ব্বেদের বায়ু সম্বন্ধেও কিছু কিছু আলোচনা করা যাইবে।

কিরূপ বায়ু দূষিত—তাহা বলিবার উপলক্ষে

আয়ুর্ব্বেদে অনার্ত্তব বায়ুর উল্লেখ আছে দেখিয়া আসিতেছি। কিন্তু টীকা-টিপ্পনীতে তাহার বিশেষ ব্যাখ্যা কিছুই পাই নাই। সম্প্রতি ঘটনাক্রমে উক্ত কথাটীর একটী সুন্দর ব্যাখ্যা পাইয়াছি। পাঠকদিগকে আজ তাহা উপহার দিব।

ব্যাখ্যা কোথায় পাইয়াছি জানিবেন?—কৃষকদিগের নিকট। মিটিয়রোলজিষ্ট—যাহারা আবহাওয়ার বিষয় জানে তাহাদিগের নিকট হইতে। কবে মনসুন (Monsoon (ইহা এক প্রকার বায়ু—যাহাতে জল বর্ষণ করায়) আরম্ভ হইবে—বায়ুর হিউমিডিটি (Humidity—আদ্রতা) এবং ভেলোসিটী (Velocity—বেগ) কত—প্রভৃতি বিষয় জানিতে আমরা ব্যস্ত হই, কিন্তু এই নিরক্ষর কৃষকদিগের নিকট বায়ু সম্বন্ধে যে সকল বিস্ময়কর জ্ঞাতব্য বিষয় আছে—তাহা জানিবার চেষ্টা করিনা। বলিতে পারিনা—হয়ত পূর্ব্বে এ বিষয়ে কেহ লিখিয়া থাকিবেন, হয়ত অনন্ত শাস্ত্রের মধ্যে কোথাও এ সম্বন্ধে আলোচিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত উহা আমাদের এবং সম্ভবতঃ অনেকের দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

বিষয়টী যেরূপে যে স্থানে আমার শ্রুতি-গোচর হইয়াছিল, তাহা পাঠকদিগকে সবিস্তার নিবেদন করিতেছি। কেননা ইহার সহিত আমাদের আহারীয় দ্রব্যের উৎপাদক কৃষক কুলের সুখ-দুঃখ উন্নতি-অবনতির বিশেষ সম্বন্ধ আছে। সুতরাং তাহা সাধারণের অপ্রীতিকর হইবে না।

গঙ্গাতীরে বালির চড়া। পূর্ব্বে এই সকল স্থান দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইত। গঙ্গা ক্রমে সরিয়া সরিয়া গিয়া এখন চড়া পড়িয়াছে। মৃত্তিকা-বালুকাময়। দিবসে খুব গরম, রাত্রে ঠাণ্ডা। চড়া বলিয়া অনেক পরিসর স্থান মনে করিবেন না। দৈর্ঘে ৫।৬ ক্রোশ, বিস্তারে কোথাও এক, কোথাও দেড়, কোথাও বা দুই ক্রোশ। মধ্যে মধ্যে গ্রাম,—অধিবাসিগণ সকলেই কৃষিজীবী। পূর্ব্বে এই সকল জমিতে বিবিধ শস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতে দেখিয়াছি। এক্ষণে বহুকাল শস্যোৎপাদন করা অথচ সার না দেওয়ার ফলে জমীগুলি অনুর্ব্বর হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে অধিবাসিগণ নীরোগ, বলিষ্ঠ এবং স্বচ্ছন্দ অবস্থা সম্পন্ন ছিল ও প্রচুর দুগ্ধ ঘৃত খাইতে পাইত। এক্ষণে তাহাদিগের মধ্যে বিবিধ রোগের প্রাবল্য। তাহাদের শরীর দুর্ব্বল, অবস্থা শোচনীয়,—এবং দুগ্ধ ঘৃত একেবারেই আহার করিতে পায় না।

এইরূপ গঙ্গার চড়ায় একটী গ্রামের প্রান্তে বসিয়া রোগী দেখিতেছিলাম। সম্মুখে মাঠের পর মাঠ, তাহার উপর জ্যোৎস্না পড়িয়াছে। কিন্তু বিশ বৎসর পূর্ব্বে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত মাঠের যে সৌন্দর্য্য দেখিয়াছি, এখন সেরূপ দেখিলাম না। সৌন্দর্য্যের ভিতর কি যেন একটা আতঙ্ক, একটা বিভীষিকার মূর্ত্তি পরিস্ফুট থাকিয়া সৌন্দর্য্যকে মলিন এবং অপ্রিয়দর্শন করিয়া তুলিয়াছে। রোগী দেখিবার সময় নিম্নলিখিত রূপ কথোপকথন চলিতে লাগিল।

আমি—প্রশ্ন। তোমাদের এখানে আগে তো ম্যালেরিয়া ছিল না, তবে ম্যালেরিয়া কিসে হ'ল বাপু?

উ। আজ্ঞে বোধ হয় পাট থেকেই ম্যালেরিয়া হ'য়েছে।

প্র। কেন পাটের চাষ ত আগেও ছিল?

উ। ছিল বটে, কিন্তু সে না থাকাই। ঘর বা বেড়া বাঁধবার মত অল্প অল্প পাটের চাষ লোকে করত। এখন পাটের খুব খুব,

তাহার ফলে নগত টাকাটা হাতে পাওয়া ও যায়, সেই জন্যে লোকে পাটের চাষ খুব করে। ওই যে গ্রামের নীচে সব খাত্ দেখচেন্ ওই থেকে মাটী তুলে আমরা ঘরের পোতা (মেঝে) উঁচু করি। ওই সব খাতে পাট পচাইতে দেওয়া হয়। সে সময়ে দুর্গন্ধে গ্রামে টেকা যায় না, আর মশার তো অবধিই নাই। তারপর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত জলে দাঁড়িয়ে পাট কাচ্‌তে হয়। কাজেই আশ্বিন মাস থেকে ভয়ানক ম্যালেরিয়া আরম্ভ হয়।

আমি। তা' বাপু তোমরা এমনি ক'রে টাকার লোভে প্রাণে মারা যাচ্ছ। আর সে টাকাওতো চিকিৎসায় খরচ হয়ে যায়। এক কাজ ক'রতে পার না, অনেক গ্রামের লোক মিলে কিছু দূরে একটা খাল, বিল জমা নিয়ে সেই খালে পাট পচাতে পার না?

উঃ। তেমন উপযুক্ত লোক এ তল্লাটে কেউ নেই। তা'রপর আজকাল কেউ কারো কথা শোনেনা।

এই নিরীহ অসহায় ধ্বংসাভিমুখী কৃষক দিগের অবস্থা দেখিয়া মনে বড় কষ্ট অনুভব করিলাম। ইহাদিগের পরিত্রাণের কি কোন উপায় নাই? দেশের হিতসাধনের জন্য কংগ্রেস প্রতিষ্টিত হইয়াছে শুনিয়াছি। যদি কংগ্রেস এই সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইলে সার্ব্বজনীন সুখ্যাতিলাভ করিতে পারেন।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে এই বিষয় চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তা' কেবলতো ম্যালেরিয়া নয়, অন্য অনেক রোগও হচ্ছে দেখছি?

উঃ। তা' হ'বে না মশায়, পরিশ্রম করতে হয়, অথচ লোকে খেতে পায় না। আগে দুধ ঘি, মাছ খুব ছিল, আমরা প্রচুর খেতে পেয়েছি. তাই এ বুড়ো বয়সে যা' খাটতে পারি, আজ কাল জোয়ান ছেলেরা তা খাটতে পারে না। সেইজন্য টপ টপ ক'রে মরেই যাচ্ছে সব।

আমি। তাইত দুধ-ঘি এ অঞ্চলে আগে খুব ছিল, এখন নেই বল্লেই চলে।

উঃ। আর গরুই সব গেল মশায়।

আমি। হাঁ, যাও আছে তা, মানুষের চেহারাও যেমন, গরুর চেহারাও তেমনি। শুধু তাই নয়, পূর্ব্বে যে সব জমিতে সোণা ফ'লত—এখন সে সব জমীতে কিছুই ফলে না। চৈত্র মাসের শেষে এ অঞ্চলে কত পটোল হত, কিন্তু এবারতো কিছু হয় নাই।

উঃ। হ'বে কি মশায়, চোত মাস শেষ হতে চললো, আজও দখিণে বাতাস নেই, দখিণে ভিন্ন তো পটোল হয় না।

এইবার বাদল প্রসঙ্গে ফসলের উপর বিভিন্ন দিগদিগন্ত বায়ুর প্রভাবের বিষয় আসিয়া পড়িল। আমি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিয়া লিখিয়া লইতে লাগিলাম।

আমি। বল কি দখিণে বাতাস ভিন্ন পটোল হয় না?

উঃ। আজ্ঞে না—দখিণে বাতাস নইলে লতা বাড়ে না, কাজেই পটোল হয় না। ফুল বা ফল ধরলে চুঁয়াইয়া যায়। আমরা দেখেছি—দখিণে বাতাসে ডগা এক দিনে ৪।৫ আঙ্গুল বড় হয়, কিন্তু অন্য বাতাসে প্রায়ই বাড়ে না, ডগা কুক্‌ড়ে থাকে, হয়ত একটু আধটু বাড়ে।

আমি। আচ্ছা এবারতো বলছ—দখিণে বাতাস হয় নি, তবুও দু চারটা পটোল হচ্ছে।

উঃ। আজ্ঞে তা হবে না কেন? গাছ যখন হয়েছে—তখন ফল হবে বৈকি। তবে দশটা জালি নষ্ট হয়ে একটা হয়—তাও বড় হয়

না। কিন্তু দখিণে পেলে সব জালিতেই পটোল হয়, আর বেশ পুষ্ট হয়।

প্রঃ। আচ্ছা দখিণে বাতাসে এমন হয় কেন বল দেখি?

উঃ। দখিণে বাতাসে মাটী রসে, আর শিশির পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে লতা লতিয়ে যায়। এই দেখুন—আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে আমরা পটোলের গেঁড়ো (মূল) পুঁতি, আর মাঘ মাস পর্য্যন্ত এই ৪।৫ মাসে লতা ৫।৬ আঙ্গুলের বেশী বড় হয় না, কিন্তু দখিণে পেলে একমাসেই ৪।৫ হাত বাড়ে, শীতের মধ্যে দখিণে পেলেও বাড়ে।

প্রঃ। আচ্ছা দখিণে বাতাস কোন সময়ে হয়?

উঃ। এই ধরুন—ফাল্গুন থেকে বৈশাখ মাস পর্য্যন্তই বেশী হয়।

আমি। দিন রাত সমান থাকে?

উঃ। না দিনে পশ্চিমে-বাতাস হয়। তা'রপর সন্ধ্যার সময় একটু আগুনের হলকার হাওয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণে-বাতাস হইতে আরম্ভ করে।

আমি। দখিণে-বাতাসে আর কি হয়?

উঃ। আজ্ঞে পটোল, উচ্ছে, তরমুজ, ভুঁয়েশশা, মেঠো কুমড়ো—এসবই দখিণে পেলে ভাল হয়। দখিণে ভিন্ন এ সকল ভাল হয় না।

আমি। আচ্ছা জলের সঙ্গে কি এ সকলের সম্বন্ধ নেই?

উঃ। একটু আধটু থাকতে পারে কিন্তু বেশী নয়. দখিণের সঙ্গেই এর সম্বন্ধ। এই দেখুন—গত বৎসরে এ সময়ে জল হয় নি, কিন্তু দখিণে হাওয়া ছিল, পটোল ও খুব হইয়াছিল। এবৎসর জল হয়েছে, কিন্তু দখিণে না হওয়ায় পটোল হচ্ছে না।

আমি। আচ্ছা ফাল্গুন থেকে বৈশাখ মাস পর্য্যন্তই কি কেবল দখিণে-বাতাস বয়?

উঃ। বেশীর ভাগ তাই, তবে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসেও মধ্যে মধ্যে দখিণে হয়। আর একদিন দখিণে পেলেই খুব পটোল ধরে সে সব পটোলের মার নেই।

আমি। আচ্ছা পূবে বাতাস কবে হয়?

উঃ। আষাঢ়, শ্রাবণ আর ভাদ্র মাসে পূবে বাতাস হয়, মাঝে মাঝে দখিণে কি পশ্চিমে বাতাস হয়. উত্তুরে বাতাস প্রায় হয় না।

আমি। পূবে বাতাসের সঙ্গে ফসলের কি কোন সম্বন্ধ নাই?

উঃ। আজ্ঞে আছে বৈকি। পূবে বাতাসে পাটে পোকা হয়।

আমি। আচ্ছা পূবে বাতাসে যদি পাটে পোকা হয় তা' হলে পোকায় পাট নষ্ট হবারই কথা। কেননা বর্ষায় পূবে বাতাসই বয়।

উঃ। হা—পাটে পোকা হয় বৈকি। কিন্তু একদিন পশ্চিমে জল আর বাতাস পেলেই সব পোকা ম'রে যায়।

আমি। পশ্চিমে জল কি রকম?

উঃ। এই পশ্চিম দিক থেকে মেঘ এসে যে জল হয়, তা'কে পশ্চিমে-জল বলে। আশ, ধান ফোলার মুখে ২।১ দিন পশ্চিমে জল-বাতাস পেলে ধানের খুব যুত হয়।

আমি। আচ্ছা পূবে ছাড়া অন্য বাতাসে পোকা হয় না?

উঃ। হাঁ, দখিণে বাতাসেও হয়।

আমি। আচ্ছা পূবে-বাতাসে কোন জিনিষের ভাল হয় না?

উঃ। শাক আলু ভাল হয়। পূবে বাতাস না পেলে শাক আলুর গাছ বেরোয় না। শাক আলু আষাঢ় মাসে পোঁতে আর অঘ্রাণ মাসে তোলে।

আমি। আচ্ছা, আশ্বিন মাস থেকে কি রকম বাতাস হয়?

উঃ। আশ্বিন মাসে পূবে-পশ্চিমে আর দখিণে—এই তিন রকম বাতাসই দেখা যায়। কার্ত্তিকের প্রথমেই আমন ধান ফোলে। সেই সময় পশ্চিমে জল পেলে খুব ভাল হয়। পূবে বাতাসে আমন ধানের অনিষ্ট হয়। ফোলার মুখে বাতাস হ'লেই ধানে আগড়া (শস্যহীন ধান্য) বেশী হয়।

আমি। আচ্ছা উত্তুরে-বাতাশে কোন্ ফসল ভাল হয়?

উঃ। যব, গম, ছোলা, মটর, মসূরী—রবিং খন্দই উত্তুরে বাতাসে ভাল হয়। দখিণে বাতাস পেলে চু'ইয়ে যায়, দানা ভাল হয় না।

কৃষকদিগের নিকট যাহা অবগত হইয়াছি, তাহা লিখিত হইল। এক্ষণে শাস্ত্রে এ সম্বন্ধে কি আছে—তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। সুশ্রুতে বিভিন্ন দিগাগত বায়ুর গুণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—"পূর্ব্ব বায়ুর গুণ—মধুর, স্নিগ্ধ, লবণ রসাত্মক গুরু, বিদাহজনক, রক্তপিত্তবর্দ্ধক, এবং ক্ষতরোগী এবং শ্লেষ্ম রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের রোগ বৃদ্ধি করে, বিশেষতঃ ব্রণে ক্লেদ বৃদ্ধি করে। ইহা বাত প্রকৃতি, শ্রান্ত ও কফক্ষীণ ব্যক্তিদিগেরও পক্ষে হিতকর। দক্ষিণ বায়ুর গুণ—মধুর, অবিদাহী, কষায় রসাত্মক, লঘু, চক্ষুর হিতকর বলবর্দ্ধক, রক্তপিত্তনাশক, এবং বায়ু প্রকোপক নহে।"

"পশ্চিম বায়ুর গুণ—বিশদ (পিচ্ছিলের বিপরীত) রুক্ষ, পরুষ (খরখরে) খর (প্রচণ্ড বেগ বিশিষ্ট), স্নেহ ও বলনাশক, তীক্ষ্ণ, কফ ও মেদ শোধক, সদ্যঃ প্রাণক্ষয়কারক এবং শরীর শোষক।"

"উত্তর বায়ুর গুণ—স্নিগ্ধ, মৃদু, মধুর, কষায়-রসযুক্ত। শীতল, সুস্থ ব্যক্তিগণের ক্লেদ ও বল বর্দ্ধক, ক্ষীণ, ক্ষয় ও বিষ পীড়িত ব্যক্তিগণের পক্ষে বিশেষ হিতকর এবং দোষ প্রকোপক নহে।"

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে হেমন্ত ও শীতকালে উত্তর বায়ু, বসন্তকালে দক্ষিণ বায়ু, গ্রীষ্মে নৈঋত বায়ু, প্রাবৃটকালে পশ্চিম বায়ু, প্রবাহিত হয় বলিয়া লিখিত আছে, তাহার অন্যথা ঘটিলে তাহাকে অনাবর্ত্ত বায়ু বলে। শাস্ত্রে অনার্ত্তব বায়ু অহিতকর বলিয়া কথিত হইয়াছে।

অনাবর্ত্ত বায়ু উদ্ভিদ জগতের পক্ষে যে অহিতকর, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। যেমন উত্তরে বায়ুর সময় দক্ষিণে বায়ু প্রবাহিত হইলে যব, গম, ছোলা প্রভৃতি ভাল জন্মে না। সুতরাং অনাবর্ত্ত বায়ু মনুষ্য শরীরেও যে অনিষ্ট উৎপাদন করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি।

বসন্তে দক্ষিণ বায়ুর স্পর্শে শরীর তৃপ্ত হয়, শারীরিক ও মানসিক একটা স্ফূর্ত্তির উদ্রেক হয়, যৌবনোচিত ভাব প্রবলতর হয়। ইহা আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। শীত পীড়িত তরুলতাগুলিও বসন্ত বায়ুর স্পর্শে পুষ্প-পল্লবে সজ্জিত হইয়া যেন নব যৌবন প্রাপ্ত হয়। শীতকালে প্রবল উত্তরে বায়ুর স্পর্শ সুখকর না হইলেও আমাদের শরীরকে সবল এবং অগ্নিকে উদ্দীপিত করিয়া তু । ইহার অন্যথা ঘটিলে বিবিধ রোগ উৎপন্ন হয়।

অনাবর্ত্ত বায়ু ব্যতীত দিবা সংযোগে যে বায়ু হিতকর বা অহিতকর হইয়া থাকে, তাহা সুশ্রুতের বচন দ্বারা অবগত হওয়া যায়। সুশ্রুতের টীকাকার ডল্লনাচার্য্য বলেন যে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম বায়ু অহিতকর এবং দক্ষিণ ও উত্তর বায়ু হিতকর।

সুশ্রুতে কথিত হইয়াছে যে, উষ্ণ বায়ু বা আতপ কর্ত্তৃক দগ্ধ হইলে শীত ক্রিয়া করিবে। উষ্ণ বায়ু বা আতপ দগ্ধের অর্থ টীকাকার "আতপে দগ্ধবৎ" বলিয়াছেন। পশ্চিম দেশে "লু" নামক যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহাতে "বৎ"এর ব্যবহার চলে না, দগ্ধই হইয়া যায়।

বর্ষার অহিতকর জল সংযুক্ত পূর্ব্ব বায়ু দ্বারা পীড়িত হইলে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সুশ্রুত বলিয়াছেন,—

"শীত বর্ষানিলৈর্হতে উষ্ণং স্নিগ্ধঞ্চ শস্যতে॥"

"শীত (হিম, তুষার) বা বর্ষার সজল বায়ু দ্বারা অভিভূত হইলে উষ্ণ এবং স্নিগ্ধ ক্রিয়া করিবে।"

অনাবর্ত্ত এবং বিভিন্ন দিগাগত বায়ুর বিষয় কথিত হইল। আয়ুর্ব্বেদে ও বিবিধ শাস্ত্রে বায়ু সম্বন্ধে যে সকল তথ্য নিহিত আছে, পরে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে. এক্ষণে যেমন সময়ে বৃষ্টি হয় না. বায়ুও সেইরূপ ঋতু অনুযায়ী প্রবাহিত হয় না। কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি এই বিকৃতির কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করিবেন কি?

শ্রী—

শিশু জীবন।

'শরীমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্।" ইহ জগতে ধর্ম্মার্থ অর্জ্জনের একমাত্র উপায় সুস্থ শরীর ও মন। এই শরীর ও মন সুস্থ রাখিতে আমাদের যে কত পরিশ্রম করিতে হয়—কত অর্থরাশি অকাতরে ব্যয় করিতে হয়, তাহার ইয়ত্তা কোথায়?—কিন্তু একবার অসুস্থ হইলে তা'রপর তা'র প্রতিবিধান, দেহ রোগের আকর হইলে তা'রপর তা'র নিরাকরণ অপেক্ষা স্বাস্থ্য ও সময় থাকিতে থাকিতে উপায় করাই ভাল, সুযুক্তি। Prevention is better than cure. অনেক সময়ই দেখিতে পাই—চিকিৎসকের বিনা প্রয়োজনে—চতুর গৃহস্থ বা শিক্ষিত পিতামাতা—বা সুযোগ্য গৃহিণী তাঁহাদের সুশিক্ষা ও সুবন্দোবস্তের গুণে সহজেই রোগের হাত এড়াইয়া যান। এজন্য হয়ত অনেকখানি ধৈর্য্যের আবশ্যক, অনেকটা স্বার্থত্যাগের দরকার, অনেক সংযমের প্রয়োজন। অবশ্য হিন্দুর দেশে. গৃহস্থের লক্ষ্মীর সংসারে, দেবতা-ব্রাহ্মণের মিলনমন্দিরে দৈনিক জীবনে আচার-বিচার-সংযম-নিষ্ঠার পরিচয়ই অধিক ছিল—তা'র ব্যবস্থাই তিন ভাগ; তা'রই উপর হিন্দুর বিশাল ধর্ম্মের অতুল্য ভিত্তি—আর তা'র ফল ইহলোকে অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য, অনন্ত শান্তি—পরলোকে—অক্ষয় স্বর্গ।

আজ অজ্ঞান-তমসায় দেশ ভরিয়াছে, হিন্দু জ্ঞান কর্ম্ম ভুলিয়াছে—তা'র শিক্ষা, দীক্ষা সে বিপুল আদর্শ আজ অতল তলে,—তাই দেশে রোগ শোক, অশান্তি ও দারিদ্র্য জীবন, যেন একটী মহাবিড়ম্বনা মাত্র। এইরূপ দারিদ্র বিহীন জীবন বহন করিয়া মানুষ নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধেই এত উদাসীন যে, অপরের—এমন কি নিজ শিশু সন্তানদের সম্বন্ধেও ঠিক লক্ষ্য রাখিতে পারে না বা রাখিতে চাহে না।

সামান্য একটী বীজ বপন সময় হইতে—চারা অবস্থায় ও পরে তাহার কত তত্ত্বাবধান করিলে তবে সময়ে বর্দ্ধিত সে বৃক্ষের ফলভোগের অধিকারী আমরা হই।—তুলনায় মানুষের জন্য —তাহা হইলে আমাদের কত অধিক যত্ন ও পরিশ্রম আবশ্যক। "আত্মাবৈজায়তে পুত্র"—এ হেন আদরের পুত্র—স্নেহের পুতলী—নয়নানন্দ —প্রাণারামকে যথাযথভাবে গড়িয়া তুলিতে পিতামাতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—সযত্ন আবশ্যক। শিশু জীবন সুনিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে পিতা মাতাকে পুত্র জননের পূর্ব্ব হইতেই বেশ সাবধান—বেশ প্রস্তুত থাকিতে হইবে—পিতার শুক্র যাহাতে শিশুর বল ও মাতার শোণিত যাহাতে তাহার পুষ্টি অবিকৃত ও বিশুদ্ধ থাকা নিতান্তই আবশ্যক। তা'রপর শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে ও গর্ভধারণ কালেও শিশুর জননীর কত দায়িত্ব তাহা আধুনিক শিশু-জননীরা একেবারেই ভুলিয়াছেন। গর্ভস্থ শিশু ঠিক এক খানি ক্যামরা—প্লেটের ন্যায় চতুর্দ্দিকের ঘটনাবলীর একটা ছাপ লইবার জন্য যেন প্রস্তুত ও উন্মুখ, এ অবস্থায় জননীর চিত্ত প্রফুল্ল ও সংযত রাখার জন্য—ভাল ভাল পুস্তক পাঠ সুন্দর সুন্দর মনোহারী চিত্রাদি দর্শন—সুশ্রাব্য সঙ্গীতাদি শ্রবণ অতিশয় হিতকর। শারীরিক গুরুতর পরিশ্রম, রাত্রি জাগরণ ইত্যাদি একেবারে নিষিদ্ধ, আচার্য্য মনু—গর্ভিণীর উপবাসাদি নিষেধ করিয়াছেন।—তাহাতে মাতৃ শোণিত পুষ্ট—শিশুর স্বাস্থ্যের বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা।—শিশু জননের অতিরিক্ত কষ্ট সহ্য করিবার নিমিত্ত সভ্য দেশীয়া অনেকানেক শিক্ষিতা মহিলা alcohol (সুরা) সেবন অভ্যাস করিয়া থাকেন,—এটী শিশুর স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের একটী প্রধান কারণ ও ভবিষ্যতে তাহার মাদক প্রিয়তার একটী পূর্ব্ব পত্তন। দয়াময় ভগবান যাহার জন্য গর্ভ ধারণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাকে তদুপযুক্ত ধারণ ক্ষমতাশক্তিও দিয়াছেন, কার্য্যেই "খোদার উপর খোদকারী" ঠিক নহে। তবে রোগী বা দুর্ব্বলের কথা স্বতন্ত্র, গর্ভিণীর পক্ষে বিশ্রাম—শারীরিক ও মানসিক —সর্ব্ববিধ নিশ্চিন্ততাই বলাধানের একমাত্র সুযোগ—একমাত্র সুপথ্য।

—ক্রমশঃ

শ্রীঅমরনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ বি

ব্রণলেপ বিধি।

প্রথম শোথঘ্ন, দুই শোণিত-মোক্ষণ,
তৃতীয়েতে উপনাহ, চতুর্থ পাটন,
পঞ্চম শোধন আর ষষ্ঠেতে রোপন,
সপ্তমে বর্ণকরণ ব্রণের লেপন॥
রক্ত-আগন্তুজ শোথে হরিদ্রা [illegible]

হরীতকী, পুনর্নবা, দূর্ব্বা, পদ্মক,
বেণামূল, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, গেরীমাটী,
রসাঞ্জন, লেপ দিলে মিলায়ে একটী।
সর্ষপ ও স্বর্ণমূলা, সজিনার বীজ,
তিল, [illegible] তিন্তিড়ি, [illegible] বীজ,

এদের প্রলেপ হয় ব্রণের পাচক
ব্রণ পাকাইতে ইহা প্রয়োগে ভিষক ॥
দন্তীমূল, চিতা ছাল, মনসার আটা,
গুড়, ভেলা, হারাকস, সৈন্ধব—এ ক'টা,
আকন্দের আটা সহ প্রলেপ প্রদানে।
ব্রণ বিদীরণ হয় জানিবা সন্ধানে॥
দন্তী-চিতা-করবীর মূল আর ভেলা,
করঞ্জ ; পায়রা, চীল-গৃধ্র-বিষ্ঠাগুলা ;
সর্জ্জি-যবক্ষার আদি ক্ষার বিলেপনে।
শীঘ্র ব্রণ ফাটি যায় এ ক'টি লেপনে ॥
যষ্টিমধু, নিমপাতা, হরিদ্রা যুগল,
তেউড়ী, সৈন্ধব, তিল,—দন্তী এ সকল,
পেষণ করিয়া লেপ করিলে প্রদান।
বিশুদ্ধ হইবে ব্রণ করিবে সন্ধান।
নিমপাতা, ঘৃত, মধু, যষ্টিমধু, তিলে,
দারুহরিদ্রার সহ পেষি লেপ দিলে—
ব্রণের শোধন আর রোপণ হইবে।
(বিশুদ্ধ হইয়া ব্রণ পূরিয়া উঠিবে)।
করঞ্জ, নিসিন্দা, নিমপত্র-লেপ দিলে
কিম্বা হিং—রশুনের প্রলেপ দানিলে,
নিমের প্রলেপে ক্ষত ক্রিমি নাশ হয়,
শার্ঙ্গধরে সংগৃহীত এই সমুদয় ॥
নিমপাতা, তিল, দন্তী, তেউড়ী, সৈন্ধব,
মধু সহ প্রলেপনে মিলে এই সব।
দুষ্ট ব্রণ প্রশমিত, বিশোধিত হয়।
বিশেষ পূরিয়া উঠে ইহাতে নিশ্চয় ॥
কটূকী, মদন ফল—কাঁজীতে বাটিয়া।
উষ্ণ লেপে নাভিশূল যাইবে সারিয়া।
সজিনা, এরণ্ড ; মুগ, শেফালিকা, যব,
গোধুম, সহিত বাটি উষ্ণ করি সব ;
বাত বিদ্রধিতে তাহা গাঢ় লেপ দিবে,
ইহাতে সুফল লাভ অবশ্য হইবে ॥
পৈত্তিক বিদ্রধিতে খৈ, যষ্টিমধু ঘৃত,
চিনি কিম্বা দুগ্ধ দ্বারা করিয়া পেষিত—
বেণা, ক্ষীরককোলীর মূল ও চন্দন।
প্রলেপ দানিলে উহা হয় প্রশমন ॥
ইষ্টক, বালুকা আর মণ্ডুর, গোময়,
গোমূত্রে পেষিয়া যদি অগ্নি-তপ্ত হয়,
সুখোষ্ণাবস্থায় তা'র প্রলেপ দানিবে
কফ বিদ্রধি তা'তে বিনাশ পাইবে।
মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা আর লোহিত চন্দন,
যষ্টিমধু, গেরীমাটী, দুগ্ধেতে পেষণ
করিয়া প্রলেপ তার অবশ্যই দিবে।
রক্তজ ও আগন্তুজ বিদ্রধি জানিবে।
হিজল, সজিনা বীজ, দশমূল কিম্বা
জলে পেষি অগ্নুত্তাপে উষ্ণ করি' নিবা।
অপর রাখালশসা, দেবদারু ল'য়ে
উষ্ণ করি লও তাহা শিলাতে পিষিয়ে,
বাত-কফ গলগণ্ড বুঝিবে যখন,
উপশম এ প্রলেপে হইবে তখন।
সর্ষপ ও নিমপত্র, ভেলা পোড়াইয়া
ছাগমূত্রে লেপে যায় অপচী সারিয়া।
সর্ষপ, মসিনা, যব মূলা-শন বীজ,
অম্লতক্রে পেষি সহ সজিনার বীজ।
প্রলেপ প্রদানে এর প্রশমন হয়,
গণ্ডমালা, গলগণ্ড, অর্ব্বুদ নিচয়।
শুধু বাত প্রপীড়িত অঙ্গ ক্ষুরে চিরি,
কুঁচের প্রলেপ তথা রাখিবেক পুরি ;
বিশ্বচী, অববাহুক, গৃধ্রসী অপর
অন্য বাতব্যাধি শান্তি লভিবে সত্বর।
ধুতুরা, এরণ্ড আর নিসিন্দার পাতা,
সর্ষপ, সজিনা-ছাল, পুনর্নবা তথা।
ইহাদের প্রলেপেতে দীর্ঘকাল জাত।
দারুণ শ্লীপদ রোগ হইবে সংঘাত।
কৃষ্ণজীরা, কুড়, কুল, হবুষ, এরণ্ড,
কাঁজিতে পেষিয়া লেপে [illegible]

করবীর মূল জলে করিয়া পেষণ।
প্রলেপে লিঙ্গ সম্ভূত পীড়া প্রশমন
ত্রিফলা—লৌহ কটাহে অগ্নি দগ্ধ করি,
সেই ভস্ম মধুসহ লইবেক মারি',
উপদংশ ক্ষতে তাহা করিলে লেপন,
রোপিত হইয়া হবে সদ্যঃ প্রশমন ॥
রসাঞ্জন, হরীতকী—শিরীষ বাটীয়া,
প্রলেপনে উপদংশ যাইবে সারিয়া।
পাকুড়, বংশলোচন, গেরিমাটী আর
গুলঞ্চ, রক্তচন্দন, কল্ক করি তা'র ;
ঘৃত বিমিশ্রিত করি করিলে লেপন।
অগ্নিদগ্ধ স্থানে তাহা হয় প্রশমন।
ক্বাথ করি কাঁটানটে, গাব ছাল নিয়ে
অগ্নি দগ্ধ ভাল হয় ঘৃত লেপ দিয়ে।
যব ভস্ম করি তাতে তৈল মিশাইয়া,
লেপে অগ্নিদগ্ধ ক্ষত উঠিবে পূরিয়া।
বাটীয়া পলাশ আর উড়ুম্বর ফল,
তৈল মধুযুক্ত লেপে যোনি দৃঢ়বল।
কার্পাস মূলের ক্বাথে নিত্য ধৌত হলে।
যোনির দৃঢ়ত্ব হয় সেইরূপ বলে ॥
আম্র-মূল, ফল কিম্বা করিয়া পেষণ।
মধু ও কর্পূর যোগে করিলে লেপন,—
যোনিতে. গত যৌবনা নারীর নিশ্চয়
যোনি দৃঢ় হয় তাতে নাহিক সংশয়।

মরিচ. তগর পাদুকা, পিপুল. সৈন্ধব,
আপাঙ, বৃহতীফল তিল, কুড়, যব,
সর্ষপ, মাষকলাই, অশ্বগন্ধা আদি
চূর্ণ করি, মধু দ্বারা বিমর্দ্দিয়া যদি,
লেপন মর্দ্দন করে তা দ্বারা সতত,
তাতে লিঙ্গ বৃদ্ধি হয়, স্তন উপগত।
বাহু ও কর্ণের তাতে পরিপুষ্টি হয়.
লিঙ্গ বৃদ্ধি তরে অন্য ব্যবহৃত হয়।
চিনি. অশ্বগন্ধা আর সৈন্ধব লবণ.
ছাগ দুগ্ধে পক্ক ঘৃত করিবে লেপন।
সঘন রাখালশসা পাতার স্বরসে
লাল করবীর দণ্ডে বিমর্দ্দিয়া রসে,
তাহা দ্বারা হয় যদি লিঙ্গ বিলেপিত।
তার যোগে শুষ্ক যোনি হয় স্রাবান্বিত।
জলে পেষি পান, কুড়, হরীতকী চুর,
প্রলেপে গাত্র দৌর্গন্ধ হয়ে যায় দূর।
কুলথ কলায় আর ছোলা. ছাতু, কুড়.
জটামাংসী, দারুচিনি, চন্দনের চুর,
—এসব একত্র করি করিলে লেপন।
স্বেদ ও গাত্র দৌর্গন্ধ্য হয় নিবারণ।
সচললবণ কুড়, হরিদ্রা উভয়.
বচ ও মরিচ লেপে সর্ব্বেবশ্য হয়।

শ্রীরাসবিহারী রায় কবিকঙ্কণ

মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কা।

—:০:—

অগ্নিমান্দ্য যোগ—

(১) প্রত্যহ প্রাতঃকালে অল্প লবণের সহিত আদার কুচি সেবন করিলে অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (২) গব্য ঘৃতের সহিত শুঁঠ চূর্ণ মিশাইয়া সেবন করিলে অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে। (৩) হরীতকী শুঁঠের গুঁড়া প্রত্যেক দ্রব্য চারি আনা মাত্রায় অল্প ইক্ষু গুড় ও সৈন্ধবের সহিত সেবন করিলে অগ্নি বর্দ্ধিত হয়।

ক্রিমি নিবারণের উপায়—

(১) কাঁচা সুপারি বাটিয়া লেবুর রসের সহিত সেবন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়। (২) খেজুর পাতার রস ও লেবুর রস একত্র সেবন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়। (৩) নারিকেলের জল মধুর সহিত সেবন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়। (৪) সুপারিগাছের শিকড়ের রস ইক্ষুচিনি মিশাইয়া পান করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়।

উকুন নিবারণের যোগ।—

ধুতুরা পাতার রস কিম্বা পানের রস খানিকটা কর্পূরের সহিত মিশাইয়া মাথায় প্রলেপ দিলে উকুন মরিয়া যায়।

উৎকাসি নিবারণের ব্যবস্থা—

(১) দুই তোলা মিছরি—নেকড়ার পুঁটলি করিয়া খানিকটা জলে টাট্‌কা ভিজাইয়া সরবৎ প্রস্তুত কর। তাহার পর সেই সরবৎ অগ্নিসন্তাপে চড়াইয়া মধুর মত ঘন করিয়া লও। তাহার পর সেইটি সমস্ত দিনে অল্প অল্প অবলেহ কর। সঞ্চিত কফ উঠিয়া যাইবে। (২) দুইতোলা বাসক-পাতার রস গরম করিয়া মধু মিশাইয়া সেবন কর, উপকার হইবে। (৩) ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম অর্দ্ধ আনা, পিপুলের গুঁড়া অর্দ্ধআনা, ৫।৬ ফোঁটা মধু একত্র মিশাইয়া উভয় বেলা কর, উপকার হইবে।

আধকপালে নিবারণের ব্যবস্থা—

(১) অতি প্রত্যুষে ডুব দিয়া স্নান করিলে আধকপালে রোগে উপকার হইয়া থাকে। (২) খানিকটা ঠাণ্ডা জল নাক দিয়া পান করিতে পারিলে সদাঃ আধকপালে রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। (৩) চারিআনা কুঙ্কুম ও চারি আনা চিনি একত্র মিশাইয়া চারিতোলা ঘৃতে ভাজিয়া নস্য গ্রহণ করিলে অর্দ্ধ শিরঃশূল বা সুর্য্যাবর্ত্ত নিবারিত হয়।

শয্যা মূত্র নিবারণের ব্যবস্থা—

তেপাকুচা মূলের রস সিকি ভ'র ওজনে লইয়া দিন কয়েক প্রত্যহ বালককে খাওয়াইয়া দিলে শয্যামূত্র নিবারিত হয়।

পাথরি রোগে যোগ—

(১) গুড় ও কাঞ্জি ১ তোলা হিসাবে লইয়া তাহার সহিত কাঁচা হরিদ্রা চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা মিশাইয়া ১ সপ্তাহ সেবন করিলে অশ্মরী বা পাথরি রোগের শর্করা নষ্ট হয়। (২) শসার বীজ বা নারিকেলের ফুলের চূর্ণ সিকি ভ'র ওজনে লইয়া দুগ্ধ সহ মিশাইয়া ১ সপ্তাহ সেবন করিলে শর্করা নষ্ট হয়। (৩) পাষাণভেদা, শুঁঠ ও গোক্ষুর প্রত্যেক দ্রব্য ৷৵৹ হিসাবে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া যে কাথ প্রস্তুত হইবে, সেই কাথ সিকি ভ'র যবক্ষার ও সিকি ভ'র চিনি মিশাইয়া দিন কয়েক সেবন করিলে শর্করা নষ্টহয়।

শ্রীঅতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কবিভূষণ।

সরস্বতী স্তোত্র।

—— :o:——

অমলধবলপদ্মন্যস্তপাদাব্জযুগ্মা
জিতশশধরকান্তিঃ কম্রন্ধপচ্ছটাভিঃ।
বশগঙ্গদয়বাসা জ্ঞানদা সেবকানাং
জয়তু জয়তু দেবী ভারতী বিশ্ববন্দ্যা ॥ ১ ॥

কুকৃতিচয়তমোভিঃ সন্ততৈর্ব্বোধনেত্রম্
পরিবৃতমিতিমাতঃ কিঞ্চিদিষ্টং ন বীক্ষে।
হৃদপথগতদাসং বোধদীপং প্রকাশ্য
স্বসহজকরুণাভি দর্শ্যতাং কৃত্যমার্গঃ ॥ ২ ॥

ক বত কলুষকর্ম্মা মাদৃশো হীনবুদ্ধিঃ
ক চ শুভমতিবন্দ্যা ত্বং বুধস্বান্তকান্তা।
তদপিযদহমজ্ঞো লব্ধুকামঃ কৃপান্তে
নখলু স মম দোষঃ কো ন ভদ্রে প্রয়াসী ॥ ৩ ॥

অথ ন মম দুরাশা সাহসং বেত্তি বাণি!
প্রমতিকৃতিবুধাপ্যাং ত্বাং যদস্ম্যাপ্তুকামঃ।
ত্বমসি নিখিললোকে দেবি! তুল্য-প্রসাদা
ত্যজতি কিমু বিমূঢ়ং পুত্রমজ্ঞং প্রসূঃ স্বম্ ॥ ৪ ॥

কুমতিকলুষজালৈরপ্রকাশান্তরাত্মা
কথমিহ মহিমানং বাণি বুধ্যে ভবত্যাঃ।
প্রকৃতিরনুগবৃন্দাজ্ঞত্বহন্ত্রী তবাস্তি
ধ্রুবমিতিমিতিহীনং সাহসং মেঽপ্যবুদ্ধেঃ ॥ ৫ ॥

ভজনকুসুমমাল্যৈ র্জ্ঞানসূত্রৈ র্নিবদ্ধৈঃ
সুবচনরচনাভিঃ প্রার্চ্চতি ত্বাং সুবিজ্ঞঃ।
ইতি কিমকৃতবুদ্ধিঃ স্যান্নিরস্তস্বদর্চ্চা
সুকৃতিত ইহ কশ্চিৎ ত্বং সমা মাতৃরূপা ॥ ৬ ॥

ন সুমতিরতিহীনস্যাস্তি মে নৈব বিদ্যা
নচ ভজনজপুণ্যং যেন তোষোভবত্যাঃ।
তদপি তব মহিম্না ত্বৎপ্রসাদং হি লপ্স্যে
জগতি ন খলু নশ্যেৎ ক্বাপি বস্তুস্বভাবঃ ॥ ৭ ॥

চিদমৃতময়বোধং দেহি দুর্ধীতমো মেঽ—
পসরতু হরিদশ্বে ধ্বান্তবৎ প্রোদ্যতীহ।
অহমপি চিরকাম্যং প্রাপ্যতেঽঙ্ঘ্রিপ্রসাদং
জগতি তব লভেয়ং সেবকত্বং যথার্থম্ ॥ ৮ ॥

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের
ছাত্রবৃন্দ।

সমালোচনা।

আয়ুর্ব্বেদ বিষয়ক প্রস্তাব।— কবিরাজ শ্রীহরিমোহন দাশ গুপ্ত কবিরত্ন লিখিত। জেলা ঢাকা, পোঃ আঃ বেজগাঁও— এই ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। এ পুস্তকের মূল্য নাই। দেশে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রচলনাধিক্যের জন্ত এ পুস্তকখানি লিখিত। আয়ুর্ব্বেদ প্রণেতা ঋষিগণের কাল নিরূপণ করিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থগুলির উৎপত্তির বিবরণ এবং ঐ সকল গ্রন্থ লিখিত বিষয়গুলির বক্তব্য এ পুস্তকে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার পুনরুন্নতির জন্ত গ্রন্থকার যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার সকল গুলিই গ্রহণযোগ্য। তবে শুধু সংস্কৃত ভাষায় নহে, বাঙ্গালা এবং ইংরাজী ভাষাতেও

আয়ুর্ব্বেদীয় শাস্ত্রগুলির অনুবাদ প্রকাশ করিয়া সেই সকল ভাষাতেও ভারতীয় সকলপ্রদেশের ছাত্রবৃন্দকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এ সকল কথা আমরা অনেকবার বলিয়াছি। আমাদের ধাতুতে আমাদের দেশীয় ঔষধই যে সমধিক উপকারী—সে বিষয়ে আর কথা কি! বর্ত্তমান সময়ে যে সকল কারণে আমরা স্বাস্থ্যহীন ও অল্পায়ু হইতেছি,—আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা পরিত্যাগও যে তাহার একটী কারণ, তাহাতো নিশ্চয় কথা। দেশের লোকে এসকল কথা বুঝেন না—ইহাই তো দুঃখ! পল্লীস্থ প্রধান প্রধান জমীদার ও ধনীদিগের বাটীতে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করা সম্বন্ধে গ্রন্থকার যাহা বলিয়াছেন,—আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক সমাজ হইতে তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। দেশের জমীদার এবং ধনী সম্প্রদায়ের সেকালের মত এদিকে দৃষ্টি পুনঃ পতিত হইলে আয়ুর্ব্বেদের পুনরুন্নতি হইতে কতক্ষণ লাগে? এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

—:০:—

ম্যালেরিয়া দমন।—ম্যালেরিয়ায় বাঙ্গালা দেশের যে ভীষণ সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে,আমাদের মহামান্য গবর্ণর লর্ড রোণাল্ডশে বাহাদুর তাহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়া উহা দমন করিবার জন্য চেষ্টাশীল হইয়াছেন। ফলে গত ২৯শে জানুয়ারি প্রাতঃকালে কলিকাতা লাট প্রাসাদে ২৪ পরগণা, নদীয়া ও যশোহর জেলা বোর্ডের সদস্যগণ—নদীয়ার মহারাজ প্রমুখ কয়েকজন জমীদার ও সেনেটারি বোর্ডের সভ্যগণকে লইয়া এক অধিবেশন হইয়াছিল। বঙ্গেশ্বর ম্যালেরিয়ায় বঙ্গবাসীর যে সকল ক্ষতি হইতেছে তাহার সমস্ত অবস্থা বুঝাইয়া উহা নিবারণের জন্য বলিয়াছেন, "এনাফেলিস্ মশকের দংশনেই যখন ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে পরীক্ষা দ্বারা এক বাক্যে স্থিরিকৃত হইয়াছে, তখন উহাদিগকে ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা করা অপেক্ষা বাঙ্গালা দেশে যাহাতে উহাদিগের জন্মিবার কারণই না হইতে পারে, ম্যালেরিয়া দমনের জন্য তাহারই উপায় বিধান করিতে হইবে। এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইলে—হয় বাঙ্গালাকে জলশূন্য করিতে হইবে, নয় ক্ষুদ্রক্ষুদ্র স্বল্প জলাশয়গুলির পরিবর্ত্তন করিয়া বৃহৎ জলাশয়ের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বর্ষাকালে নদীর উচ্ছ্বসিত জল আটক করিয়া রাখিয়া আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যাইতে পারে।" এই কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি সমবেত সদস্যগণকে এই কার্য্যের সাহায্যকারী হইবার জন্য অনুরোধ করেন। স্বয়ং লাট বাহাদুর যখন উদ্যোগী হইয়াছেন,তখন আমাদের মনে হয়—এইবার বোধ হয় সত্য সত্যই দেশ হইতে ম্যালেরিয়া দমনের একটা উপায় হইবে। ম্যালেরিয়ায় তো বাঙ্গালার কম সর্ব্বনাশ হইতেছে না! বঙ্গেশ্বরের বক্তৃতাতেই প্রকাশ,—বাঙ্গালায় প্রতি বৎসর কেবল ম্যালেরিয়া রোগে সাড়ে তিন হইতে চারি লক্ষ লোক প্রাণত্যাগ করে! লর্ড রোণাল্ডশের চেষ্টায় বাঙ্গালা দেশ ম্যালেরিয়া

শূন্য হইলে তাঁহার যশোগীতি প্রতিদিন বাঙ্গালা পল্লীপ্রান্তরে বিঘোষিত হইয়া তাঁহাকে চির স্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

দান।—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম,—সুদূর হৃষিকেশের প্রখ্যাত নামা বাবা রামনাথ কালী কমলীওয়ালা আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি ও প্রসার কল্পে নগদ ৫২ হাজার টাকা মূল্যের ভূ-সম্পত্তি দান করিয়াছেন। এ টাকায় তত্রত্য আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের পরিচালন কার্য্য চলিবে।

আয়ুর্ব্বেদিক প্রাকটিসনার্স বিল।—অনারেবল কুমার শ্রীযুক্ত অরুণ চন্দ্র সিংহ বাহাদুর আয়ুর্ব্বেদিক প্রাকটিসনার্স বিল নামক একখানি আইনের পাণ্ডুলিপি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ডাক্তারির মত কবিরাজীতেও হাতুরে কবিরাজ যাহাতে দেশে স্থান পাইতে না পারে—ইহাই সে বিলের উদ্দেশ্য ছিল। গত ১৩ই মাঘ কলুটোলায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের বাড়ীতে ইহার প্রতিবাদের জন্য এক প্রকাণ্ড সভা হয়। কলিকাতা এবং মফস্বলের অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকই সে সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। এরূপ বিল পাশ হওয়া কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে—সভায় ইহাই স্থির করা হয়। কুমার বাহাদুর ইহার প্রত্যাহার না করিলে সভায় কার্য্যবিবরণী মাননীয় গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরে নিকট জ্ঞাপন করা হইবে—ইহাও সভার স্থিরিকৃত হয়। ফলে কুমার বাহাদুর বিলের প্রত্যাহারই করিয়াছেন। এই উপলক্ষে যে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের সম্মিলন ঘটিল—ইহাই লাভের কথা।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা। আগে দেশের রাজন্যবর্গ এবং জমীদার সম্প্রদায় মাসিক বেতন দিয়া অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসককে পারিবারিক চিকিৎসক নিযুক্ত করিতেন। ফলে উদর চিন্তার উপায় থাকায় সেই সকল চিকিৎসক আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি কল্পে মনোযোগ প্রদান করিতেও সক্ষম হইতেন। সেই রাজন্যবৃন্দ এবং জমীদার বর্গের জন্য তাঁহাদিগেরই ব্যয়ে আয়ুর্ব্বেদীয় অনেক মূল্যবান্ ঔষধও সেকালে প্রস্তুত হইত। যাঁহারা প্রস্তুত করাইতেন, তাঁহাদিগের রোগ সারাইতে উহার অল্পই ব্যয় হইত, অবশিষ্ট দরিদ্র জন সাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে প্রদান করার ব্যবস্থা হইত। এখন সে প্রথা দেশ হইতে একরূপ উঠিয়া গিয়াছে। এখন দেশের নরপতিগণের অনেকে রাজ্যমধ্যে দাতব্য অ্যালোপ্যাথিক ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠায় যেরূপ মনোযোগী, বেতন দিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক নিযুক্ত করিতে সেরূপ ইচ্ছুক নহেন। যতগুলি কারণে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অবনতি ঘটিয়াছে, ইহার প্রতি দেশের ধনকুবের দিগের ঔদাসিন্য তাহার অন্যতর কারণ।

আয়ুর্ব্বেদের সমাদর।—দেশের এ হেন দুর্দ্দিনে কোন দেশীয় নরপতি কোন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসককে পারিবারিক চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়াছেন শুনিলে আনন্দিত হইতে হয়। সংপ্রতি মালদহ—চাঁচোলের মহামান্য রাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী বাহাদুর "আয়ুর্ব্বেদ" পত্রের সহঃ সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জনকে তাঁহার কাশীপুর-প্রাসাদের পারিবারিক চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া আয়ুর্ব্বেদের সমাদর প্রদর্শন করিয়াছেন। মালদহ-চাঁচোলেও এই রাজা বাহাদুরের অনেকগুলি দাতব্য-ডাক্তারি ঔষধালয় আছে, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়াও ইনি চিরদিন আয়ুর্ব্বেদের

প্রতি সমাদর দেখাইয়া আসিতেছেন। দেশের সমস্ত নরপতি এবং জমীদার যদি এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন, তাহা হইলে লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার পুনরুন্নতি হইতে কয় দিন লাগে!

স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ম্মচারীদের কর্ত্তব্য পালন। সঞ্জীবনীতে প্রকাশ—"সংপ্রতি কলিকাতার জগন্নাথঘাটের নিকটবর্ত্তী এক গুদামে স্বাস্থ্যবিভাগের এক কর্ম্মচারী ব্যবহারের অনুপযোগী ২ মণি ৭৮টা বস্তা ময়দা পাইয়াছেন। উহা মানুষের ব্যবহারের পক্ষে একান্ত অনুপযুক্ত ও অস্বাস্থ্যকর বলিয়া স্বাস্থ্যবিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।" ভেজাল খাদ্যের প্রতীকার করিতে হইলে এইরূপ ব্যবস্থাই করিতে হইবে।

চিকণচালে দেশের অবস্থা।—রাণাঘাটের "বার্ত্তাবহ" গত ২৭ শে মাঘের সংখ্যায় "মোটা ভাত, মোটা কাপড়" শীর্ষক প্রবন্ধের একস্থলে বলিয়াছেন,—"হাটে যাও, বাটে যাও, সহরে যাও নগরে যাও,—যেখানেই যাও, দেখিবে সর্ব্বত্রই এক "চিকণ চাল" সমভাবে বর্ত্তমান! কৃষক সন্তান দেখ,—চিকণ জুতা, চিকণ ধুতী, চিকণ পীরাণ, চিকণ ওড়নী, চিকণ চুল, চিকণ টেড়ী, চিকণ ছড়ী, চিকণ ঘড়ী, চিকণ চুরুট, (সিগারেট!) চিকণ হাসি, (চিকণ কাশী ও বা!) চিকণ আহার, চিকণ বিলাস! ঐ মুটে মজুর দেখ, মোট ফেলিয়া চিকণ চা'য়ের পিয়ালায় চুমুক দিতেছে, চিকণ চুরুটে চিত্ত মস্‌গুল করিতেছে! চিকণ চা'লে ঘরে যাঁহার মোটা ভাত নাই, পরিবারবর্গের পরিধানে মোটা কাপড়ও বুঝি যোটে নাই, তাঁহার চিকণ চা'ল দেখিলে কি মনে হয় বল দেখি!" এই চিকণ চালেই তো বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ হইতেছে। শুধু অর্থ কৃচ্ছ্রতায় পুষ্টিকর আহারের অভাবে নহে, চিকণ চালে স্বাস্থ্যহানি করিয়া আমরা যে অল্পায়ু হইয়া পড়িতেছি, তাহা অবিসংবাদিত।

বৃদ্ধ বৈদ্যের বিয়োগ।—আমরা নিতান্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, গত ১লা ফাল্গুন কলিকাতার বৃদ্ধ বৈদ্য কালিদাস বিদ্যাভূষণ ৬২ বৎসর বয়সে নিউমোনিয়া রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। চিকিৎসা ব্যবসায়ে ইনি যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট হইতে ইনি "বৈদ্যরত্ন" উপাধি প্রাপ্ত হন। নদীয়া জেলার হরিপুর গ্রামে ইহার নিবাস, ইহা ভিন্ন কলিকাতা—রায় বাগানেও ইঁহার একখানি খরিদ করা বাড়ী আছে। শেষ জীবনে সেই বাড়ীতেই অবস্থিতি পূর্ব্বক ইনি ব্যবসায় পরিচালন করিতেন। আমরা ইঁহার বিয়োগে যথেষ্ট ব্যথা অনুভব করিয়াছি ভগবান ইঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার বর্গের প্রাণে শান্তিবারি প্রদান করুন।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

২য় বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৪—চৈত্র। | ৭ম সংখ্যা।

আর্য্যঋষি জীবাণুতত্ত্ব জানিতেন কি না?

—০*০—

সংক্রামক রোগপ্রসঙ্গে সে দিন এক বড় ডাক্তারের সঙ্গে কথা হইতেছিল; ডাক্তার বাবু বলিতেছিলেন—“জীবাণুর রোগ-জননশক্তি আবিষ্কার য়ুরোপীয় বিজ্ঞানেরই নিজস্ব। হিন্দু ঋষিরা জীবাণু তত্ত্ব বুঝিতেন না। তাঁহারা কেবল আহার বিহারের অনিয়মকেই সকল রোগের কারণ বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছেন।”

হিন্দু হইয়া আমি কিন্তু এ কথায় সায় দিতে পারিলাম না। ঋষিরা জীবাণুতত্ত্বের যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছিলেন। আমরা ঋষি রচিত সংহিতা কয়খানিই বা পড়িয়াছি? ঋষিরা যে জীবাণুরহস্য য়ুরোপীয় বিজ্ঞানের ভূমিষ্ঠের বহুকাল পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি তাহার আভাষ দিব।

জীবাণুজাত রোগ মাত্রেই সংক্রামক। সেই সংক্রামক রোগ দুই প্রকার। ১ম। বাহ্য প্রকৃতি প্রকোপজ। ২য়। অন্তঃ প্রকৃতি প্রকোপজ। সাধারণতঃ বিজ্ঞান সংক্রামক রোগকে এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। সংক্রামক রোগের এ প্রকৃতি আর্য্য-ঋষির অগোচর ছিল না। আধুনিক বিজ্ঞান মতে যে সকল সংক্রামক রোগ বাহ্য প্রকৃতি প্রকোপজ, ঋষিদের মতে—তাহার নাম জনপদধ্বংসী মহামারী। ঋতু বিপর্য্যয়ের জন্য—দেশ-কাল-জল ও বায়ু প্রভৃতি বিকৃত হইলে, সংক্রামক রোগ জনপদ সমূহ ধ্বংস করিয়া থাকে। মানুষের দেহ, প্রকৃতি, আহার বল, বয়ঃক্রম, সাত্ম্য, সত্ত্বাদি ভিন্ন প্রকারের হইলেও, একই জনপদে বাস করার জন্য জল বায়ু-কাল প্রভৃতির তুল্যতা থাকে। কাজেই সাধারণ ভোগ্য জল-বায়ু প্রভৃতি বিকার প্রাপ্ত হইলে, এক প্রকার রোগ সংক্রমিত হইয়া মহামারী রূপে আবির্ভূত হয়। ডাক্তারেরা যাহাকে “ম্যালেরিয়া” বলেন, তাহা বাহ্য প্রকৃতি প্রকোপজ সংক্রামক ব্যাধি, তাই ম্যালেরিয়ার প্রতিকার করিতে গেলে, হয় জল-বায়ুর বিশুদ্ধতা সম্পাদন, অথবা সেস্থান পরিত্যাগ—এই দুইটীর একটী করিতেই হইবে।

অন্তঃপ্রকৃতি প্রকোপজ সংক্রামক রোগ অনেক গুলি আছে। আর্য্যঋষি বলেন—

জ্বরঃকুষ্ঠঞ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এব চ।
উৎসর্গিক রোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরৎ।

অর্থাৎ জর, কুষ্ঠ, যক্ষ্মা, নেত্রাভিষ্যন্দ প্রভৃতি উপসর্গিক রোগ (বসন্ত, বিসূচিকা, হাম, বিষ, মেহ, উপদংশাদি)—ইহারা পাপজ—এক দেহ হইতে অন্যদেহে সংক্রামিত হইয়া থাকে। কিরূপে ইহার সংক্রমণ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়? ঋষি কহিয়াছেন—

প্রসঙ্গাৎ গাত্র সংস্পর্শান্নিঃশ্বাসাৎ সহ ভোজনাৎ
একশয্যাসনাচ্চৈব গন্ধ মাল্যানুলেপনাৎ॥

মৈথুন, গাত্র সংস্পর্শ, নিঃশ্বাস, একত্রভোজন, একশয্যায় শয়ন, রোগীর ব্যবহৃত গন্ধ মালা, অনুলেপন (বস্ত্রাদিও বটে) ব্যবহার—ইত্যাদি কারণে সংক্রামক রোগের সংক্রমণ হইয়া থাকে।

সংক্রমণের উপায়গুলি পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায়—যে সকল ব্যাধি সংক্রামক, তাহাদের মধ্যে এমন একটা শক্তি বা পদার্থ আছে, যাহা নিঃশ্বাস প্রভৃতির দ্বারা শরীর মধ্যে প্রবেশ করে। অতএব ঐ সকল ব্যাধির প্রত্যক্ষদৃশ্য কোন মূর্ত্তি না থাকিলেও উহাদের এমন একটা অদৃশ্য ও অমূর্ত্ত মূর্ত্তি আছে—যাহা রোগির নিঃশ্বাসাদির সহিত যাতায়াত করিতে পারে। তাই দার্শনিক ঋষি বলিয়াছেন—"সৌক্ষ্মাৎ কেচিদ্দর্শনাঃ" অর্থাৎ ঐ সকল রোগ-বীজ সৌক্ষ্ম হেতু সাধারণ লোকলোচনে দেখা যায় না। তপঃ প্রভাবে ঋষিদের যে দিব্যদৃষ্টি লাভ হইত, সে দৃষ্টি অতি শক্তিশালী—সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণকারী—অনুবীক্ষণকেও পরাজিত করিত। তাঁহারা রোগের অমূর্ত্ত বীজ—দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

রোগের বীজ—জীবন্ত ও অণুপরিমিত, তাই তাহারা "জীবাণু" নামে অভিহিত। কিন্তু ঋষিরা এই রোগ-বীজাণুকে 'কৃমি' বলিতেন। কৃমি বলিলে—আমরা এখন বিষ্টাজাত এক প্রকার দৃশ্য কীট বুঝিয়া থাকি। ঋষিরা কৃমির এরূপ অর্থ বুঝেন নাই। তাঁহাদের মতে জীবশরীর সম্ভূত যাবতীয় রোগ বীজাণুই 'কৃমি' নামে অভিহিত। ঐ সকল কৃমি—মল অর্থাৎ পুরীষ, মূত্র, শ্লেষ্মা প্রভৃতি শারীরিক ক্লেদ হইতে উৎপন্ন। এইজন্য আমাদের বিশ্বাস—মহর্ষি সুশ্রুত যে সংক্রামক রোগের পর্য্যায়ে জ্বরেরও নাম করিয়াছেন, সে জ্বর সাধারণ শ্রেণীর জ্বর নহে। সে জ্বর—এমন জ্বর—যাহার কৃমি জনকতা আছে। সে জ্বর—'ম্যালেরিয়া' 'ব্লাক্ ফিবার' ও 'টাইফয়েড' শ্রেণীর বিষম জ্বর।

শরীরে যে সকল রোগ জন্মে, তাহাদের নিদান বা কারণ শরীরেরই অধর্ম্ম। যে সকল নিয়মে শরীর সুস্থ থাকে, তাহার অন্যথাচরণই শরীরের অধর্ম্ম। সংক্রামক রোগ সম্বন্ধেও ঋষিরা ঐ কথা বলিয়াছেন। য়ুরোপের বিজ্ঞান যেমন—'জীবাণু'কেই সংক্রামক রোগের কারণ বলে; ঋষিদের মতে 'বীজাণু' সেরূপ মুখ্য কারণ নহে, গৌণ কারণ মাত্র। কেননা আমরা বেশ বুঝিতে পারি—শুধু সংক্রমণের দ্বারাই রোগের উৎপত্তি হয় না, যদি সেরূপ সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে সংক্রামক রোগীর কাছে—তাহার আত্মীয় স্বজন, দাসী, পরিচারক, চিকিৎসক, যিনিই থাকিতেন, তাঁহারই রোগ জন্মিত। আমি স্বয়ং দেখিয়াছি—একজন বসন্ত রোগীর সুশ্রূষা-কারিণীর বসন্ত হইল না, অথচ অন্যত্র আর এক পল্লীতে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

এই জন্যই ঋষিগণ সংক্রামক রোগের উৎপত্তির কারণকে শরীরের অধর্ম্ম বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে অহিত ও অমিত পাপজনক পান-ভোজন দ্বারা সংক্রামক রোগ আপনা হইতেই জীবদেহে উদ্ভূত হইয়া থাকে। এবং ক্রমে সে রোগ নিঃশ্বাসাদির দ্বারা এক দেহ হইতে অন্যদেহে সংক্রমিত হইয়া থাকে। যদি কেবল জীবাণু হইতেই রোগের উৎপত্তির সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে এক-সঙ্গে সকলেরই রোগ জন্মিত। অতএব শারীরিক অধর্ম্মই রোগ-জননের মুখ্য নিদান। নিঃশ্বাসাদির দ্বারা সমাগত জীবাণু হইতে যে রোগোৎপত্তি—তাহা রোগের গৌণ নিদান। য়ুরোপের বিজ্ঞান সংক্রামক রোগ-প্রসঙ্গে এক 'জীবাণুর' দোহাই দিয়াই নিশ্চিন্ত। ঋষি-গণ সংক্রামক রোগগুলির পৃথক্ পৃথক নিদান-নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সে নিদান জীবাণু হইতে পৃথক্। ঋষি বলেন—যদি দেহে তাদৃশ নিদান সমূহ নিষেবিত হয়, তবে বিনা সংক্রমণেও রোগের উৎপত্তি ঘটিতে পারে। এ কথা পাকা দার্শনিকের কথা।

আপনারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—"সংক্রামক রোগের যখন জীবাণু আছে এবং ঐ জীবাণু হইতে অপর জীবাণুর উৎপত্তিও ঘটিয়া থাকে—ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য; তখন জীবাণু ব্যতিরেকে কেমন করিয়া সর্ব্বপ্রথম মানব-শরীরে সংক্রামক রোগ জন্মিতে পারে? একথা কেমন করিয়াই বা বিশ্বাস করিব? যদি অচেতন পদার্থ হইতে চেতন পদার্থের সৃষ্টি সম্ভব হইত, তাহা হইলে না হয় ঋষিদের "নিদানের" রোগজনন শক্তির কথা স্বীকার করিয়া লইতাম।" এ প্রশ্নের উত্তরে—আমরা বলিতে পারি—অচেতন হইতে চেতনের উৎপত্তি জগতে অসম্ভব বা বিরল নহে। হিন্দুর বিশ্বাস—শ্রীভগবানের উক্তি—"ময়া ততমিদং বিশ্বং জগদব্যক্ত মূর্ত্তিনা।" জগতের প্রতি অণু-পরমাণুতেই ভগবানের সত্বা বিরাজিত। কি চেতন কি অচেতন, কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম কি দৃষ্ট কি অদৃষ্ট—সর্ব্বত্রই এক চৈতন্যময় পদার্থ অব্যক্ত ভাবে বিরাজ করিতেছে। সাংখ্য মতে তাহার নামই পুরুষ। সেই অব্যক্ত, অমূর্ত্ত, নিষ্ক্রিয়, চৈতন্যময় পুরুষ যখনই প্রকৃতির সহিত মিলিত হইতেছেন, তখনই তিনি ব্যক্ত, মূর্ত্ত পরিস্ফুট, সক্রিয় ও কর্ত্তা বলিয়া প্রতীত হইতেছেন। অতএব মানুষ যখন অহিত, অমিত অমেধ্য পাপজনক আহার বিহারে আত্ম-নিয়োগ করিতেছে, তখন তাহার শরীরে ভুক্ত পদার্থের মধ্যস্থিত অব্যক্ত চৈতন্য বিকৃত বাত-পিত্ত-কফ-ময়ী প্রকৃতির সহিত সম্মিলিত হইয়া রোগের জীবাণুরূপে পরিস্ফুট হইতেছে। অপর কোনও জীবাণুর সাহায্যের অপেক্ষা করিতেছেনা। দর্শন্ শাস্ত্রের মতে—নির্বীজ সৃষ্টি বিরল নহে। উদ্ভিজ সৃষ্টি সম্বন্ধে—রাঘব ভট্ট বলিয়াছেন—

"তত্র সিক্তা জলৈর্ভূমিরন্ত রুষ্ম বিপাচিতা।
বায়ুনাব্যূহ মানাত্তু বীজত্বং প্রতি পদ্যতে

জল সিক্ত ভূমি স্বীয় অভ্যন্তরস্থ উষ্মার দ্বারা বিপাচিত এবং বায়ু কর্ত্তৃক সঙ্ঘাত ভাব প্রাপ্ত হইলে বীজরূপে পরিণত হইয়া থাকে। অচেতন হইতে সচেতনের উৎপত্তি—আয়ুর্ব্বেদ দুইখানি গ্রন্থেও স্বীকৃত হইয়াছে। যথা,—

"স্বেদজঃ স্বিদ্যমানেভ্যো ভূবহ্নিকম্ভাঃ প্রজায়ন্তে যুক মৎকুন কীটাদ্যা যে চান্যে ক্ষণ ভঙ্গুরাঃ"

—বিশ্বসার।

সিদ্যমান (অন্তরুষ্মা কর্ত্তৃক পচ্যমান) মৃত্তিকা, অগ্নি ও জল হইতে যুক মৎকুন প্রভৃতি

নানাবিধ ক্ষণভঙ্গুর কীট জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে।

মহর্ষি অগ্নিবেশও বলিয়াছেন---

"ত্বঙ্-মাংস শোণিত-ললিকা কোথ ক্লেদ
সংস্বেদজাঃ ক্রিমায়হভি মূর্চ্ছন্তি।"

বৈদ্যরাজ সুশ্রুতও বলিয়াছেন—

"কৃমি কীট পিপীলিকা প্রভৃতয়ঃ স্বেদজা"

ঋষিদের এই সকল উক্তি ভাবিয়া দেখিলে আমরা বেশ বুঝিতে পারি—ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই চৈতন্যময় পদার্থ নিয়ত অনভিব্যক্ত অবস্থাতে বর্ত্তমান রহিয়াছে, কালক্রমে তাহা অভিব্যক্ত হইতেছে। ঐ অভিব্যক্তির নাম সৃষ্টি। যেমন একই মাটী, ঘটাদি আকারে গঠিত হইয়া নানাবিধ সংজ্ঞালাভ করিয়া নানাকার্য্যে নিয়োজিত হইয়া থাকে, তেমনি একই অনভিব্যক্ত চৈতন্য পঞ্চভূতে মিশিয়া নানাবিধ দোষ-গুণের অধিকার লাভ করে। এই জন্যই কুষ্ঠ রোগের বীজাণু, যক্ষ্মা জনক অনুচিত আহার বিহারে জাত ক্ষয় বীজাণু হইতে স্বতন্ত্র। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন---"স্বকর্ম্ম ফলভূক পুমান্"—মানুষের সুখ দুঃখ তাহার কর্ম্মফল হইতে উৎপন্ন। যে ব্যক্তি অনাচারী অভক্ষ্যভোজী, অসংযমী, ও অধর্ম্মাচারী—তাহার শরীরে—সর্ব্বনিয়ন্তা স্রষ্টা পাপরোগ—জীবাণুরূপে প্রকাশিত হইয়া তাহাকে সংহার করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে যিনি সদাচারী—ধার্ম্মিক, হইয়া পবিত্রভাবে জীবন যাপন করেন, ভগবান তাহার শরীরে সঞ্জীবনী মহাশক্তিরূপে বিরাজমান থাকিয়া সেই ব্যক্তিকে রোগ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। প্রহ্লাদ যাঁহাকে জীবন-দাতা রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিল, হিরণ্যকশিপু তাঁহাকেই সংহারকর্ত্তারূপে লাভ করিয়াছিল। পুরাণের এ উপাখ্যান নিরর্থক নহে।

আমরা হিন্দু—অদৃষ্টবাদী—দার্শনিক জাতি, আমরা নির্বীজ-সৃষ্টি বিশ্বাস করি আবার বীজ সৃষ্টিও স্বীকার করি। বীজ হইতে বৃক্ষ জন্মিতেছে—ইহাকে আমরা স্থূল সৃষ্টি বলি; আর অমূর্ত্ত [অব্যক্ত ভাব] হইতে যে জীবের সৃষ্টি হইতেছে—তাহাকে সূক্ষ্মসৃষ্টি নামে অভিহিত করি। আর্য্য বিজ্ঞানের মতে—মানব সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সংহারক জীবাণু জন্মগ্রহণ করে নাই। মানব সৃষ্টির যুগ-যুগান্তর পরে—দেশে অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলে তবে পাপরোগ জীবাণুর সৃষ্টি হইয়াছে। কিছুকাল পরে মানব যদি আরও উৎকট পাপানুষ্ঠান করে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আরও অসংখ্য নূতন নূতন পাপরোগের জীবাণু জন্মগ্রহণ করিতে পারে। শাস্ত্রের উপর শ্রদ্ধা রাখিয়া আমরা এইরূপ ভবিষ্যৎ বাণী করিতে পারি।

আর্য্য-বিজ্ঞান আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র আলোচনা করিয়া আমরা এইটুকু বুঝিতে পারিয়াছি—সংক্রামক রোগ কেবলমাত্র জীবাণু হইতেই উৎপন্ন হয় না, উহাদের মুখ্য নিদান আহার-বিহার আচরণ; গৌণ নিদান জীবাণু। আমরা দেখিয়াছি-শরীরে জীবাণু আশ্রয় গ্রহণ করিলেই—রোগ জন্মে না। বীজ হইতে গাছের উৎপত্তি সত্য, কিন্তু ঊষর ভূমিতে বা পাষাণ স্তূপে বীজ পতিত হইলে সে বীজ কখনই অঙ্কুরিত হয় না। সৃষ্টি-সাধিকা-কারণ-সমষ্টির ভিতরে একটুও বৈলক্ষণ্য থাকিলে, বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হইতে পারে না। এ রহস্য মহর্ষি চরক গর্ভাবক্রান্তি নামক অমূল্য অধ্যায়ে বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গমের জন্য কর্ষিত, সারযুক্ত, উর্ব্বর ভূমি আবশ্যক। তদ্রূপ

জীবাণু হইতে রোগোৎপত্তি হইবার পূর্ব্বে জীবাণুর বিকাশ উপযোগী অহিত আহার অনুষ্ঠানাদি সেবিত, পাপময় শরীর চাই। এ কথা অস্বীকার করা চলে না।

শৈশবে বিষ্ণুশর্ম্মার গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম—

শঙ্কাভিঃ সর্ব্বমাক্রান্ত মন্নপানঞ্চ ভূতলে।
প্রবৃত্তিঃ কুত্র কর্ত্তব্যা জীবিতব্যং কথং নু বা॥

আমরা প্রত্যহ যে সকল জিনিষ পানভোজন করিতেছি, অনবরত যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিতেছি,—কে বলিতে পারে, তাহাতে আমাদের শরীরে জীবাণু প্রবেশ করিতেছে কি না ?—তথাপি আমরা সকল সময়েই তো রোগাক্রান্ত হই না। এই জন্যই—যাহার ঐকান্তিকতা নাই, আয়ুর্ব্বেদ তাহাকে নিদানের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। নতুবা জীবাণুতত্ত্ব ঋষিরা ভাল রকমই জানিতেন।

আয়ুর্ব্বেদে চিকিৎসার মূল মন্ত্র –

"সংক্ষেপতঃ ক্রিয়াযোগোনিদান পরিবর্জ্জনম্॥"

ইহার অর্থ—রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে, নিদান-পরিবর্জ্জন—সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। বাস্তবিক, যে সকল কারণে রোগোৎপত্তি হইয়া থাকে, সেই সকল কারণ ত্যাগ করিতে না পারিলে, রোগ কখনই সারে না। সংক্রামক রোগীর সাহচর্য্য হইতে দূরে থাকিলে সংক্রামক রোগ জন্মিবার ভয় নাই। কিন্তু যদি তাদৃশ রোগোৎপাদক অনুচিত আহার—বিহারাদি প্রতিনিয়তই আচরিত হয়, তাহা হইলে সংক্রামক রোগীর নিকট হইতে লক্ষ যোজন দূরে থাকিলেও আপনা হইতে শরীরে সংক্রামক রোগ উৎপন্ন হইবে—ইহাই ঋষিদের উপদেশ—ইহাই আর্য্য বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত।

অতএব যদি সংক্রামক রোগ হইতে রক্ষা পাইতে চাও, তাহা হইলে শুধু সংক্রামক রোগীর সামীপ্য ছাড়িলেই চলিবে না। তোমাকে শারীরিক ও মানসিক—উভয় অধর্ম্মই পরিত্যাগ করিতে হইবে। ঋষিদের উপদেশ পালন করিলে, তুমি নিশ্চয়ই স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন পুরস্কার পাইবে। আর যদি তুমি সদাচারী না হও, নিয়ত অহিত-অমিত অপবিত্র-পান-ভোজন পরিত্যাগ না কর, শাস্ত্র বাক্য না মান, পূজ্য ব্যক্তির অবমাননা কর, উপভোগকেই জীবনের সর্ব্বস্ব ভাব, লোভ-মোহে মত্ত হও—তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও—তোমার আচরিত পাপ কর্ম্ম—তোমাকে ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত করিবে,—তোমার কৃত পাপই একদা রোগ জীবাণুরূপে তোমার দেহে জন্ম গ্রহণ করিয়া তোমাকে ধ্বংস মুখে প্রেরণ করিবে। তখন বায়ু পরিবর্ত্তন, ঔষধ সেবন, আহার্য্য দ্রব্য হইতে মক্ষিকা তাড়ানোর ব্যবস্থা,—যাহাই কিছু কর না কেন, কিছুতেই তোমার রক্ষা নাই। পৃথিবীতে দীর্ঘজীবী হইতে হইলে—অটুট স্বাস্থ্য ভোগ করিতে হইলে—আবার তোমাকে ঋষি-মতেরই উপাসনা করিতে হইবে।

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ
বেদান্ত শাস্ত্রী

পরিবর্ত্তিত প্রণালীতে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত করা উচিত কিনা ?

——:০:——

(২)

"কনকাসবের" কথায় আরও একটা বিষয় মনে পড়িতেছে। গ্রন্থকর্ত্তার উপদেশ—ধুস্তুরের শাখাপত্র ও ফল—সমস্তই গ্রহণ করিতে হইবে। ধুতুরা বৃক্ষে সকল সময় সমান ফল থাকে না। আবার কোনও গাছে বা অধিক ফল, কোনও গাছে বা কম ফল দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন ঋতুতে গাছে মোটেই ফল ফল ধরে না। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় স্থিরীকৃত হইয়াছে—ধুতুরা বৃক্ষের মূল ও শাখার চেয়ে ফল ও পত্র—তেজস্কর। প্রাচীন মতে তৈয়ারী "কনকাসবে" ধুতুরার বীর্য্য কতটা থাকিল, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। এদিকে ঋতুভেদেও বৃক্ষের তেজ বা বীর্য্যের হ্রাস হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালের শীর্ণ বৃক্ষ হইতে প্রস্তুত আসব যে মাত্রায় রোগীকে দেওয়া যায়, শীতকালের পুষ্ট বৃক্ষজাত আসব —সে মাত্রায় ব্যবহার করা চলে না। বিশেষতঃ ধুতুরা যখন—উপবিষ, উহার মাত্রাতিশয় জীবনকে বিপন্ন করিতে পারে, তখন ধুতুরা হইতে জাত ঔষধে একটুও অনিশ্চিত থাকা উচিত নহে। কেবল মাত্র—ধুতুরার পাতা ব্যবহার করিলে, আর কোন গোলযোগ থাকে না। ধুতুরার পত্র—শাখা ও মূলের চেয়ে বীর্য্যবান।

কনকাসবের আর একটী উপাদান—বাসক মূলের ছাল। আয়ুর্ব্বেদে যে যে ঔষধে বাসকের প্রয়োগ আছে, সেই সেই ঔষধে বৈদ্যগণ বাসকের মূল ব্যবহার করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস—মূলের বীর্য্যই বেশী। কিন্তু রাসায়ণিক পরীক্ষায় সম্প্রতি জানা গিয়াছে—বাসকের বীর্য্যাংশ মূলের চেয়ে পাতাতেই বেশী থাকে। এরূপ অবস্থায় কষ্টলব্ধ মূল পরিত্যাগ করিয়া, বাসকের পাতাকেই ঔষধের উপাদান স্বরূপ গ্রহণ করা উচিত।

পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকারগণ বরং আসব অরিষ্ট প্রয়োগ করিতেন। কিন্তু বৌদ্ধযুগের পর—ভিষক সমাজে আসব অরিষ্টের আর আদর ছিল না। বৌদ্ধযুগের "অর্ক প্রকাশ" ও "আসব বিধান" নামক দুইখানি ক্ষুদ্র পুস্তকে আসব ও অরিষ্ট প্রয়োগের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধ শ্রমণগণ ধর্ম্ম প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেন—তাঁহাদের সঙ্গে জীবের যন্ত্রণা নিবারণের জন্য নানাবিধ ঔষধ থাকিত। পান্থের পক্ষে স্বরস বা টাটকা ঔষধ সংগ্রহ করা সম্ভব হইত না। কাজেই শ্রমণগণ—আসব প্রস্তুত করিয়া লইতেন। দুই একখানি তন্ত্রেও আসব অরিষ্টের প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। শার্ঙ্গধর ও চক্রদত্ত কতকগুলি আসব অরিষ্টের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের পরবর্ত্তী কোন গ্রন্থকারই আসব অরিষ্টের তেমন উল্লেখ করেন নাই। অত বড় সংগ্রহ গ্রন্থ "ভাব প্রকাশ"—যাহাতে নষ্ট প্রায় শল্যতন্ত্রও স্থান পাইয়াছে—সে ভাবপ্রকাশেও কেবল মাত্র "লৌহারিষ্ট" ছাড়া অন্য অরিষ্টের ব্যবহার দেখিতে পাই না। ইহাতেই অনুমান হইতেছে—প্রস্তুতের দোষে

সেকালে অরিষ্টের ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে অনেকেই বাধ্য হইয়াছিলেন। এক্ষণে নূতন করিয়া, আসব অরিষ্টের প্রচলন আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। পরিবর্ত্তিত প্রণালী মতে শাস্ত্রোক্ত আসব অরিষ্ট ছাড়া—অনেকগুলি ঔষধের জার হইতেই নূতন আসব অরিষ্ট প্রস্তুত হইতে পারে। অধিকন্তু—বটিকা, চূর্ণ প্রভৃতির চেয়ে, রোগির দেহে আসব অরিষ্ট যে শীঘ্রই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে—ডাক্তারী মতের টিংচার গুলিই তাহার একমাত্র প্রমাণ।

পরিবর্ত্তিত প্রণালীতে প্রস্তুত আসব, অরিষ্ট ব্যবহার করিতে—কবিরাজ মহাশয়েরা আপত্তি করিতে পারেন। কিন্তু প্রকারান্তরে অনেক কবিরাজ মহাশয়ই তো পরিবর্ত্তিত প্রণালী অবলম্বন করিতেছেন। কবিরাজী ক্যাটালগে যে "কর্পূরাসব" নামক আসবের বিজ্ঞাপন দেখিতে পাই, উহা যে শাস্ত্রীয় প্রণালীতে প্রস্তুত আসব—একথা কেহই বোধ হয় সাহস করিয়া বলিতে পারিবেন না। ডাক্তারেরা যে "টিঞ্চার ক্যাম্ফার" বা "স্পিরীট ক্যাম্ফার" ব্যবহার করেন, "কর্পূরাসব" তাহাই। কেবল জমকালো নাম লইয়া "কর্পূরাসব" ও মৃগমদাসব" শাস্ত্রের দোহাই দিতেছে মাত্র। যে সকল আসব বা অরিষ্ট পেটেন্ট ঔষধের মত বিক্রয় হয়, সেগুলির কেহই প্রায় শাস্ত্রীয় আসব নহে। যে জিনিস শাস্ত্রীয় খোলস পরিয়া সমাজে বাহির হইয়াছে, তাহা প্রকাশ্যে কেন গৃহীত হইবে না ?

পরিবর্ত্তিত প্রণালীতে আসব অরিষ্ট প্রস্তুত করিলে, আর একটী মহদুপকার হইবে। অনেক ঝঞ্ঝাট বলিয়া আজকাল পাচনের ব্যবহার উঠিয়াই গিয়াছে। কবিরাজ মহাশয়গণ যদি পাচনের কাথ-সংরক্ষণ নিয়মে রক্ষা করিয়া রোগীকে প্রদান করিতে পারেন, রোগী তাহা আনন্দের সহিত ব্যবহার করিবে, যেখানে কাঁচা স্বরস আবশ্যক, সেখানে এইরূপ কাথ অনায়াসেই ব্যবহার চলিবে। প্রয়োজনানুযায়ী—চরক-চক্রদত্তোক্ত অনেক পাচনও আসব, অরিষ্টের আকারে রক্ষা পাইবে। আমি যতদূর জানি, পাচন ও অনুপানের ভয়ে—অনেকেই কবিরাজী ঔষধ সহসা ব্যবহার করিতে স্বীকৃত হন না। পাচনের কাথকে আসবে পরিণত করিতে পারিলে—রোগী ও চিকিৎসক—উভয়ের পক্ষেই সুবিধা হয়।

যাঁহারা রক্ষণশীল—তাঁহারা বোধ হয় আমার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন না। সুরাসারের সাহায্যে—আসব-অরিষ্ট সংরক্ষণ—তাঁহারা অনুমোদন করিবেন না। তাঁহাদের প্রতি এ অধমের নিবেদন—সুরাসারের পরিবর্ত্তে তাঁহারা গ্লিসারিন ব্যবহার করিতে পারেন। গ্লিসারিং, মধুর সুযোগ্য প্রতিনিধি, অতএব কবিরাজ মহাশয়েরা যেখানে মধু ব্যবহার করিতে পারেন, সেখানে অনায়াসেই গ্লিসারিন প্রয়োগ করা চলে। যে ভেষজ দ্রব্যের স্বরস খুব উপকারী—অথচ সর্ব্বদা স্বরস প্রাপ্তির সুবিধা নাই, সে স্থলে কাথের মত স্বরসকেও রক্ষা করা উচিত। ইহা একেবারেই কঠিন নহে। কাঁচা দ্রব্যের নিষ্পীড়িত স্বরসে কিয়ৎ পরিমাণে গ্লিসারিং মিশাইলেই স্বরস রক্ষিত হয়। এইরূপ সংরক্ষিত স্বরস ঠিক Suocusএর মতই হইবে। তবে এইরূপ সংরক্ষিত স্বরস, দীর্ঘকাল ফেলিয়া রাখা অনুচিত। তাহাতে স্বরস [illegible] যাইবে, ফলে স্বরস কিছু পরিমাণে [illegible] হইবে।

অবলেহ বা লেহ।—অবলেহ [illegible] রকম ঘন সার। ভেষজ দ্রব্যের কাথ[illegible]

চিনী বা গুড় সংযোগে ঘন করিলে লেহ প্রস্তুত হয়। সুতরাং লেহ এক প্রকার কাথ সংরক্ষণেরই নামান্তর। কিন্তু লেহ প্রক্রিয়ার প্রধান দোষ ইহাতে ক্বাথকে যেরূপ ঘন করিতে হয়, তাহাতে ক্বাথ পুড়িয়া যাইতে পারে। বাষ্পতাপে ক্বাথকে ঘন করিয়া লইলে—সে ভয় থাকে না। আমি "কুটজাবলেহ" নামক প্রসিদ্ধ ঔষধটীকে জলে ফেলিয়া দেখিয়াছি—তাহার কতক অংশ জলে অদ্রবনীয় ভাবে রহিয়া গিয়াছে বাষ্পতাপে লেহ পাক করিলে, লেহের কোনও অংশই জলে অদ্রবনীয় থাকিবে না।

চূর্ণ, বটিকাদি।—ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নাই। কেবল উপাদানগুলি, টাটকা এবং চূর্ণগুলি যতদূর সম্ভব সূক্ষ্মভাবে প্রস্তুত করা চাই।

ঘৃত ও তৈল।—"ঘৃত" ও "তৈল"—কবিরাজী চিকিৎসার একটা প্রধান উপকরণ। আমি নিজে দেখিয়াছি—এক ভদ্রলোক প্রায় ৩ বৎসর কাল ঘুষঘুষে জ্বরে ভুগিয়াছিলেন। প্রত্যহ একই সময়ে তাঁহার জ্বর আসিত। ডাক্তার দেখাইতে তিনি ক্রটী করেন নাই। শেষে ডাক্তারেরা জবাব দিলে, তিনি বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য দেশে দেশে ভ্রমণ করেন। তাহাতেও কোন ফল হইল না, ভদ্রলোক দেশে ফিরিয়া আসিলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন—তিনি মরিবার জন্যই প্রস্তুত, ঔষধ আর খাইবেন না। এইবার কবিরাজী চিকিৎসার পালা। কবিরাজ বড় সঙ্কটে পড়িলেন, রোগী পাচন বটীকা-চূর্ণ-বটক—কিছুই খাইতে সম্মত নহে। কবিরাজ মহাশয় তখন—রোগীকে কিরাতাদি তৈল ব্যবস্থা করিলেন। এই তৈল ১৫।১৬ দিন ব্যবহার করিতেই রোগীর জ্বর ত্যাগ হইল, টেম্পারেচার সবনর্ম্মাল হইল, তিনি অনেকটা স্বস্তিবোধ করিতে লাগিলেন। ক্ষুধা বাড়িল। গায়ের জ্বালা কমিল। প্রায় দুই মাসে তাঁহার শরীরে পূর্ব্বস্বাস্থ্য অনেকটা ফিরিয়া আসিল। এ ঘটনা আমার শোনা কথা নহে, প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট ব্যাপার। আমি নিজে ১২ মাস গুড়ূচ্যাদি তৈল ব্যবহার করি—আমার বয়স ৫৮।৫৯, কিন্তু আমাকে দেখিলে ৩০।৩৫ বোধ হয়। আমি কবিরাজী তৈলের অনন্য শরণ ভক্ত।

এই জন্যই তৈল পাক সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে কল্ক, ক্বাথ, এবং দ্রব পদার্থ (দুগ্ধ, দধির মাত, শতাবরী প্রভৃতির রস, কাঞ্জিকাদি) এইগুলি তৈল ও ঘৃত পাকের অঙ্গ। ঘৃত ও তৈল পাকের নাম "স্নেহ-পাক"। স্নেহপাকের সাধারণ নিয়ম—স্নেহের চতুর্থাংশ কল্ক, চতুর্গুণ দ্রব দিয়া স্নেহ পাক করিতে হয়। স্নেহে ক্বাথ দিতে হইলে, ক্বাথ্য দ্রব্য ৪ গুণ, ৮ গুণ, অথবা ১৬ গুণ জল দিয়া সিদ্ধ করিতে হয়।

কাঁচরাপাড়ার কবিরাজদের মত—স্নেহের সহিত দধি, দুগ্ধ, তক্র, কাঞ্জিক, মাংসের ক্বাথ প্রভৃতি দিতে হইলে,—এই দ্রব পদার্থের সংখ্যা যদি পাঁচ বা ততোধিক হয়, তবে প্রত্যেকটী স্নেহের সম পরিমাণে দিতে হয়। আর যদি দ্রবের সংখ্যা একটী, ২টী, ৩টী বা ৪টী হয়—তাহা হইলে প্রত্যেকটী স্নেহের চতুর্গুণ দিতে হইবে। কাঁচরাপাড়ায় ৺ উপেন্দ্র বরাট, দুর্গানন্দ, প্রভৃতি বৈদ্যগণ এই নিয়মে ঘৃত বা তৈল পাক করিতেন।

যদি স্নেহ পাকে কেবল কল্কের উল্লেখ থাকে, অথচ কোন দ্রবের উল্লেখ না থাকে তবে কল্ক দ্রব্যগুলি জলে পেষণ করিয়া

তাহার সহিত স্নেহের ৪ গুণ জল মিশাইয়া পাক করিতে হয়। আবার যেখানে কেবল মাত্র ক্বাথ দিয়া স্নেহ পাকের ব্যবস্থা আছে, সেখানে ক্বাথ্য দ্রব্য গুলিকে কল্ক স্বরূপেও দ্বিতীয় বার গ্রহণ করিতে হয়। মোটামুটী নিয়ম—কল্কের সহিত স্নেহ পাক কিম্বা ক্বাথের সহিত স্নেহ পাক। কিন্তু ক্বাথের সহিত পাচিত, উৎপন্ন স্নেহে আমরা পাই—অর্দ্ধ দগ্ধ ঘনীভূত ক্বাথ ও স্নেহ পদার্থ। ইহা ছাড়া আর নূতন কিছু পাই না। ক্বাথ প্রস্তুত করিবার সময়—ক্বাথ্য দ্রব্যের জলে দ্রবনীয় অংশ ক্বাথে মিশিয়া যায়। এই ক্বাথকে ঘৃত বা তৈলের সহিত দ্বিতীয়বার পাক করিলে—ক্বাথ্য দ্রব্যের যে অংশ জলে অবিকৃত ভাবে নিষ্কাশিত হইয়াছিল, ফুটন্ত ঘৃতের উত্তাপে তাহার কিয়দংশ অঙ্গারে পরিণত হইয়া যায়। সুতরাং ক্বাথকে ঘৃত বা তৈলের সহিত পাক করায় ক্বাথের অনেকটাই নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু শিলা পিষ্ট কল্ক দ্রব্য যদি স্নেহের সহিত পাক করা যায়, তাহা হইলে, কল্কের দ্রবনীয় সকল অংশই স্নেহে মিশ্রিত হয়। ইহাতে আর এক লাভ—জল যাহা গ্রহণ করিতে পারে নাই, ভেষজ দ্রব্যের সে অংশও স্নেহ আকর্ষণ করিয়া লইতে পারে। যেমন ভল্লাতক, ভেলাকে জলে সিদ্ধ করিলে, ভেলার অনেক অংশ বা বীর্য্য—জল গ্রহণ করিতে পারে না, ঐ অগ্রাহ্য অংশ তৈলের মত জলে না মিশিয়া, উপরে বিন্দুর মত ভাসিতে থাকে। কিন্তু ঘৃত বা তৈলের সহিত সজল ভেলা সিদ্ধ করিলে, ভেলার সমস্ত বীর্য্য ঘৃতে বা তৈলে উত্তমরূপে মিশ্রিত হয়। হয়। মোট কথা—যে ভেষজ দ্রব্যে তৈলের অস্তিত্ব আছে, সে তৈলাংশ, জল গ্রহণ করিতে পারে না অথবা সামান্য পরিমাণে পারে। ঘৃত বা তৈল দ্রব্যের সমস্ত বীর্য্যই গ্রহণ করিতে সক্ষম। আমার বিশ্বাস—যদি বিজ্ঞানকে সম্মান করিতে হয়, তবে—কল্কের সহিত স্নেহ পাকের সার্থকতা আছে। ক্বাথের সহিত স্নেহ পাক—না করাই ভাল। আমি কবিরাজ মহাশয়দিগকে এই কথা বলিতে চাহি—তাঁহারা ক্বাথের সহিত স্নেহ পাক না করিয়া কল্কের সহিত স্নেহ পাক করুন। ইহাতে পাক করা ঘৃত-তৈল যথেষ্ট বীর্য্যবান্ ও ফল-প্রদ হইবে। স্নেহের সহিত দধি-দুগ্ধাদির পাকে—আমার কোনও অভিজ্ঞতা নাই, এ কার্য্য শাস্ত্রকারদের উপদেশ মত করাই উত্তম।

এ সম্বন্ধে আমি দুই একজন পাক বিদ্ কবিরাজের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছিলাম। তাঁহারা আমাকে বলিয়াছিলেন—পাকের দ্বারা ঘৃত বা তৈল অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। যে রোগী কাঁচা ঘৃত বা তৈল সহ্য করিতে পারে না; ভেষজপক্ক ঘৃত-তৈল সে অনায়াসেই সহ্য করিতে পারে। কথাটা অসঙ্গত নহে। কিন্তু আমার বক্তব্য—ঘৃত বা তৈল পাকে, উহারা উদ্দেশ্য নহে, নিমিত্ত মাত্র। কেবল ঘৃত বা তৈল সহ্য করাইবার জন্য কবিরাজেরা উহাদের ব্যবস্থা করেন না। যদি ঘৃতের সহিত ভেষজ দ্রব্যের পূর্ণ গুণের সত্বার আবশ্যক থাকে, তবে আধুনিক বিজ্ঞানের মতে—কেবল কল্কের দ্বারাই স্নেহ পাক করিতে হইবে। আমার এই কথাটী কবিরাজ মহাশয়েরা কি ভাবে গ্রহণ করেন, আশা করি এই "আয়ুর্ব্বেদ" পত্রেই আমি তাহা জানিতে পারিব। *

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্ এ,

* এই প্রবন্ধের রচনাকালে রাসায়নিক পরীক্ষক শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয়ের নিকট ঋণী।

"অপত্য তত্ত্বের" উপসংহার

---:০:---

প্রবন্ধের প্রথমেই একখানি পত্র অবিকল উদ্ধৃত করিলাম ;—

"ভাই!

"অপত্যতত্ত্ব" শীর্ষক আমার একটী প্রবন্ধ সম্প্রতি 'আয়ুর্ব্বেদ' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তুমি তাহা অবশ্যই পাঠ করিয়াছ। প্রবন্ধটী সম্পূর্ণ করিবার জন্য, পাঠক মহল হইতে ৪।৫ খানি তাগিদ-পত্র পাইয়াছি। কিন্তু অপত্যতত্ত্ব সম্বন্ধে য়ুরোপীয় বিজ্ঞানের মত আমি আলোচনা করিয়াছি, ঋষিদের সিদ্ধান্তও যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছি, সাধারণের কাছে তথাপি প্রবন্ধটী অসম্পূর্ণই রহিয়া গিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ ও তন্ত্র রহস্য আমি বড় বেশী বুঝিনা, সুতরাং অপত্যতত্ত্বের উপসংহার ভাগ তোমাকেই লিখিতে হইবে। ইতি।

শুভাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীসতীশ চন্দ্র রায়।"

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, আমার অগ্রজ স্থানীয় সতীশ বাবু যখন আমাকে এতটা দিগ্‌গজ ঠাওরাইয়াছেন, তখন ত আর চুপ করিয়া থাকা চলেনা! পতঙ্গের উপর মাতঙ্গের ভার আজ আমার মত মহা মূর্খকেও যে অস্বাভাবিক আত্মাভিমানে স্ফীত করিয়া তুলিয়াছে—বর্ত্তমান প্রবন্ধে পাঠকগণ কেবল সেই টুকুই বুঝিতে পারিবেন। সতীশ বাবুর আদেশেই আজি আমি আমার জীবনব্যাপী মনীষাদৈন্যকে লোক চক্ষুর সম্মুখে সপ্রমাণ করিতে অগ্রসর হইতেছি। পাঠকগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন।

সন্তানোৎপাদনের জন্য স্ত্রী ও পুরুষের সম্মিলন চাই। কেননা, পুরুষ অনুপ্রাণয়িতা, স্ত্রী তাহার বশবর্ত্তিনী শক্তি। বেদে—পুরুষ হোতা, স্ত্রী ঋত্বিক ; বৌদ্ধে—স্বামী প্রবুদ্ধাচার্য্য, স্ত্রী—অনুবর্ত্তিনী শিক্ষা। তন্ত্রে—স্বামী চিদাধার, স্ত্রী বিশ্ব প্রকৃতি। পুরুষ—সন্ন্যাস, স্ত্রী সংসার। ঈশ্বরের অপ্রতিহত বিধান বলে—স্ত্রী-পুরুষের ভেদ আমরা অতি সহজেই বুঝিতে পারি। কিন্তু কেন যে পুত্র জন্মায়, কেন বা কন্যা জন্মায়, ইহার মিমাংসা করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। রমানাথ বাবু পুরুষ, তাঁহার পুত্র আছে, কন্যাও আছে, অতএব ভিতরকার রমানাথ—কতকটা পুরুষ, কতকটা স্ত্রী, নতুবা রমানাথ হইতে পুত্র-কন্যার উৎপত্তি হইতেই পারেনা, অথবা রমানাথ এমন একটী পদার্থ, যাহার কোন লিঙ্গ নাই, যাহা স্ত্রী ও নহে, পুরুষ ও নহে, অথচ তাহার পুত্র-কন্যা উৎপাদনের শক্তি বর্ত্তমান। সন্তানের লিঙ্গভেদ-ক্রিয়া তাহার বশবর্ত্তী; যদিও রক্ত মাংসের বা স্থূল রমানাথের নিজের ইচ্ছায় সে ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে না। আবার ইহাও মনে হইতে পারে, গর্ভযোগ সময়ে এমন একটা কিছু ঘটিয়াছিল, এমন কোনও পদার্থের

যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য পাইয়াছি। আমার অনুজোপম, বঙ্গ সাহিত্যে প্রথিত যশা লেখক শ্রীযুক্ত ব্রজ বল্লভ রায়, কতকগুলি গ্রন্থ যোগাড় করিয়া দিয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন। —লেখক।

হ্রাস বা আধিক্য হইয়াছিল, যে জন্য রমানাথের পুত্র বা কন্যা জন্মিয়াছে। ঋষিদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন,—ইহজন্মে পুত্র বা কন্যা রূপে সৃষ্টি হওয়া—শিশুর অদৃষ্ট-ফল মাত্র। পূর্ব্ব জন্মের কামনা পূর্ণ করিবার জন্য জীবাত্মা প্রয়োজন মত পুরুষ বা স্ত্রীর আকারে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাঁহাদের জড়াত্মিক বিজ্ঞানে জীবের জন্মান্তর পরিগ্রহ মানিতে চাহেন না। আমরা কিন্তু জন্মান্তরের কথা মর্ম্মে মর্ম্মে বিশ্বাস করি।

আমাদের শাস্ত্রে যম ও নিয়ম এক। আমার সাহিত্য গুরু, আচার্য্য অক্ষয় চন্দ্র "পূর্ণিমা" পত্রিকায় এ সম্বন্ধে একটি যুক্তিপূর্ণ সন্দর্ভ লিখিয়া ছিলেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ১৩০৬ সালের পূর্ণিমা পড়িলে তাহার রসাস্বাদন করিতে পারিবেন। আমরা চিত্রে দেখি—হরের কোলে গৌরী বিরাজিতা, ইহার অর্থ মৃত্যুর কোলে জীবন, বিশ্লেষের বুকে সংশ্লেষ, অচেতনের মধ্যেই চেতনের লীলা। জীবনের উন্মেষ—কর্ম্মক্ষেত্রে যবনিকা উত্থান মাত্র। জীবন হইতে মরণ, মরণ হইতে জীবন, ইহা দার্শনিক সত্য। হরগৌরী মূর্ত্তি—তাই চতুষ্পাদ বৃষের উপর অধিষ্ঠিত। এই বৃষ—ধর্ম্মরূপী—মহাসত্য। ইহা তন্ত্রের রূপক।*

সাংখ্যকার জড়পরমাণুর (পঞ্চতন্মাত্র) ন্যায় জীবনের পরমাণু নামক একটী স্বতন্ত্র পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন। এই জীবনের পরমাণুই পুরুষ। ইহার জন্য উদ্ভিদ, মানুষ প্রভৃতি বিভিন্ন জৈবিক পদার্থে একই রূপ জীবন উৎপন্ন হইয়া থাকে। এ সকল কথার বিস্তৃত ব্যাখ্যা আপাততঃ নিষ্প্রয়োজন। আবশ্যক হইলে, শারীরবিদ্যা-অধ্যায়ে ইহার আলোচনা করিব।

'অপত্য তত্ত্ব' আলোচনা করিবার সময় আমাদের মনে স্বতঃই তিনটী প্রশ্ন উদিত হইয়া থাকে।

(১) স্ত্রী-পুরুষ ভেদ কত দিনের?

(২) সৃষ্টির প্রথম হইতেই কি এইরূপ লিঙ্গভেদ আছে?

(৩) তাহা না হইলে, ইহা কবে বা কেমন করিয়া হইল?

তন্ত্রই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। মানুষের কেন পুত্র বা কন্যা জন্মায়? এই পুত্র বা কন্যা উৎপাদন তাহার নিজের ইচ্ছামত হয় কিনা? তন্ত্র ভিন্ন তাহার উত্তর আর কোথাও মিলিবে না। সুতরাং প্রথমেই আমি তন্ত্রের যুক্তি অনুসন্ধান করিব। আমাদের তন্ত্রের আগা গোড়াই রূপকে পরিপূর্ণ। তন্ত্রের রূপক—আর্য্য-সিদ্ধান্তের অস্থি মাংসময় প্রতিমূর্ত্তি। দার্শনিক সত্য সকলে ধারণা করিতে পারে না, তান্ত্রিক তাই সেই সত্যকে রক্ত মাংসের সংযোগে স্থূল দেহাবয়ব প্রদান করিয়াছেন। পুরাণের দেবতাগণ—তন্ত্রের রূপক। পাঠকগণ তন্ত্রে অর্দ্ধ নারীশ্বর নামক রূপকটীর কথা অবশ্যই অবগত আছেন। আমি এই অর্দ্ধ নারীশ্বরের কথায় ঋষি-মতের লিঙ্গভেদ বুঝিবার চেষ্টা করিব।

মনুসংহিতার জগতোৎপত্তি অধ্যায়ে মনু বলিয়াছেন—

"অর্দ্ধেন নারীং * * বিরাজ মসৃজৎ প্রভুঃ"

ইহার অর্থ—সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর অনন্ত বিরাজ মূর্ত্তিকে দুই অংশে বিভক্ত করিলেন। তাহারই একাংশ স্ত্রী এবং অপরাংশ পুরুষ হইল। মনুসংহিতার এই মহাসত্যকে তন্ত্র সাধারণ বোধ্য করিবার জন্য স্থূলরূপে অর্দ্ধ নারীশ্বর মূর্ত্তিতে গঠন করিলেন। অর্দ্ধ নারীশ্বর মূর্ত্তির

অর্থ—জীব-জগৎ উৎপত্তি কালে স্ত্রী-পুরুষ তত্ত্ব বিশিষ্ট ভাবে পৃথক হয় নাই। অর্থাৎ বর্ত্তমান জগতে যে সকল পুরুষ বা স্ত্রী-জীব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের আদি পুরুষের (কারণের) লিঙ্গ ভেদ ছিল না। সে আদি কারণ—স্ত্রীও বটে পুরুষও বটে। সেই মৌলিক উভয় লিঙ্গত্ব হইতে স্ত্রী-পুরুষ ভেদের উৎপত্তি।

সুশ্রুতসংহিতা পাঠ করিলে আমরা জানিতে পারি—আর্য্য ঋষিগণ পুং-বীর্য্যের মত স্ত্রী-বীর্য্যেরও অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। তাঁহারা আর্ত্তব ও স্ত্রী বীর্য্য একার্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। আর্ত্তবের অর্থ—ঋতু-ভব শোণিত হইলেও, সে রক্তে স্ত্রী-বীর্য্য (ovum) ভাসিয়া আসে। অতএব শুক্রার্ত্তবের সম্মিলনে গর্ভোৎপত্তি হইয়া থাকে। এস্থলে আর্ত্তব অর্থে স্ত্রী শুক্র বা ' ওভম্ ' বুঝিতে হইবে।

চরক বলেন—" গতে পুরাণে রজসি নবে চাবস্থিতে পুনঃ শুদ্ধ স্নাতাং স্ত্রিয়্ মব্যাপন্ন-যোনি শোণিত গর্ভাশয়া মৃতুমতাং আচক্ষহে।" পূর্ব্ব মাসের পুরাতন রজঃ ঋতু শোণিতে নিঃসৃত হইয়া নূতন রজঃ প্রস্তুত হইলে সেই শুদ্ধ স্নাতা, অদুষ্ট যোনি-শোণিত-গর্ভাশয় বিশিষ্টা স্ত্রীকে "ঋতুমতী" বলা যায়। এইরূপ ঋতুমতী স্ত্রীতে অদুষ্ট বীর্য্য পুরুষ উপগত হইলে, রজঃ শুক্রের সংযোগে গর্ভ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুশ্রুতের মতে—" শুক্র বাহুল্যাৎ পুমান আর্ত্তব বাহুল্যাৎ স্ত্রী সাম্যাদুভায়ার্নপুংসকমিতি। [শারীর স্থান, ৩য় অধ্যায়] অর্থাৎ শুক্র বাহুল্যে পুত্র, আর্ত্তব বাহুল্যে কন্যা এবং শুক্রা-র্ত্তব তুল্য হইলে সন্তান নপুংসক হইয়া থাকে। ঋতুর দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত গর্ভকাল। ঋষিদের মতে—নূতন রজঃ বা স্ত্রী বীর্য্য না হইলে গর্ভোৎপত্তি ঘটে না। সুতরাং ঋতুর দ্বাদশ দিন পর্য্যন্ত গর্ভ গ্রহণের প্রশস্ত কাল। একথা আজ কাল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও স্বীকার করিতেছেন।

এক্ষণে দেখা যাউক—"শুক্র বাহুল্য" ও "আর্ত্তব বাহুল্য"—ইহাদের অর্থ কি? বাহুল্য শব্দের অর্থ প্রাবল্য, সুতরাং শুক্র বাহুল্যের সাধারণ অর্থ পিতৃ অংশের প্রাবল্য, আর আর্ত্তব বাহুল্যের অর্থ মাতৃ অংশের (রজঃ) প্রাবল্য। যেখানে পিতৃশক্তি—মাতৃশক্তি (রজঃ) হইতে প্রবলা, সেখানে পুত্র হইবার সম্ভাবনা।

এইবার দর্শনের কথা একটু ভাবিতে হইবে। দর্শন শাস্ত্রের মতে—প্রথমে ইন্দ্রিয় তত্ত্বের "উৎপত্তি। সেই ইন্দ্রিয়তত্ত্ব হইতে স্থূল ইন্দ্রিয় (ঐন্দ্রিয়িক অবয়ব) উৎপন্ন হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় তত্ত্ব অহঙ্কারের প্রসব। সুতরাং এস্থলে বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন, ইন্দ্রিয় তত্ত্ব পুরুষ বা পুরুষের ইচ্ছা শক্তির বশবর্ত্তী। বাগভট বলেন—" কারণানু বিধায়িত্বাৎ কার্য্যানাং তত্ত্ব ভাবতা।" অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ একই পদার্থ। এ উক্তির যাথার্থ্য স্বীকার করিলে বলিতে হয়—সন্তানোৎপাদিকা ইচ্ছা ও তাহার স্থূল ফল শুক্র বা রেতঃ করণ একই ধর্ম্মযুক্ত। পিতার কাম ভাব বা সন্তানোৎপাদন ইচ্ছা বলবতী হইলে পিতৃ শুক্রে পিতৃ অংশ অত্যন্ত বলবান হইয়া থাকে। আবার মাতার সন্তানোৎপাদিকা শক্তি বলবতী হইলে, মাতৃবীর্য্যে (ovum) যে মাতৃ অংশ প্রবল হইবে, ইহা সহজেই অনুমেয়। গর্ভোৎপাদনকালে যাহার ইচ্ছা যত বলবতী, সেই পরিমাণে তাহার বীর্য্য শীঘ্রই স্খলিত হইবে। তন্ত্রমতে—পিতৃ অংশ উদাসীন, বৈশেষিক, জীবের উন্মেষক মাত্র। মাতৃ অংশ—[illegible]

সঙ্কয়ক, স্থিতিকারী। এস্থলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, যে অংশ যত বলবান, গর্ভাধান-কালে সে অংশ তত শীঘ্রই ক্ষরিত হয় এবং ভ্রূণের লিঙ্গত্ব নিরূপণ করিয়া দেয়। মাতৃ ইচ্ছা প্রবল হইলে, মাতৃবীর্য্য অগ্রে ক্ষরিত হইয়া সে গর্ভে কন্যা জন্মগ্রহণ করে। সেই রূপ পিতৃ ইচ্ছা প্রবল হইলে, সে গর্ভে পুত্রই জন্মগ্রহণ করে।

এস্থলে—ঋষি মতের "শুক্র বাহুল্য" বা "আর্ত্তব বাহুল্যের" অর্থ বহু পরিমাণে শুক্র বা আর্ত্তবের প্রাচুর্য্য হইতে পারে না। কেন না, তাহা হইলে, বহু অপত্যের সম্ভাবনা হইতে পারে। তবে 'বাহুল্য' শব্দের অর্থ কি? সেই কথাই বলিতেছি। "বাহুল্য" শব্দের অর্থ—মাতৃ বা পিতৃ ইচ্ছার প্রাবল্য জন্য স্ব স্ব বীর্য্যে স্ব স্ব অংশের সংশ্লেষিকা (সংগঠিনী—সংযোগিনী) বা বিশ্লেষিকা (বিয়োগিনী—বিক্ষেপিকা) শক্তির প্রাবল্য বুঝিতে হইবে। এই 'বাহুল্যের' অর্থ বুঝাইতে গিয়া আচার্য্য দারুবাহি অনেক কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—সহবাস কালে পিতৃবীজ যদি মাতৃবীর্য্যের পূর্ব্বে ক্ষরিত হয়, তবে সে গর্ভে পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। অনুরূপ কারণে মাতৃবীজ অগ্রে ক্ষরিত হইলে, কন্যাই হইয়া থাকে। যথা,—

স্ত্রী পুংসয়োঃ স্বসংযোগে যত্নাদৌ বিসৃজেৎপুমান্।
শুক্রং ততঃ পুমান্ বীরো জায়তে বলবান্ দৃঢ়ঃ।
অথ চেৎ বনিতা পূর্ব্বং বিসৃজেদ্রক্ত সংযুতং।
ততো রূপান্বিতা কন্যা জায়তে দৃঢ় সংহিতা।

অরুণদত্তোদ্ধৃত শ্লোকঃ।

এইবার আপনারা বিশ্বোৎপত্তির সহিত জীবোৎপত্তি—মিলাইয়া লউন। প্রকৃতি সত্ত্ব রজঃ-তমোময়ী। ত্রৈবিকত্ব, কৌশিকত্ব, বিশ্লেষত্ব প্রভৃতি গুণের প্রসুপ্ত অবস্থায় অ-কার্য্যকরী) পুরুষ তাহাতে অধিষ্ঠিত হইলে, তবেই জগতের বিকাশ। মাতৃ রজঃ প্রসুপ্ত শক্তি বুকে লইয়া পিতৃ বীজকে ধরিল, অমনি তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির নিদ্রাভঙ্গ হইল; সে অবস্থায়—যে শক্তি, যে ইচ্ছা, বা যে অংশ তাহার নিদ্রা ভাঙাইয়া তাহাকে অ কার্য্য হইতে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিবে,—তাহার লিঙ্গত্বে, তাহার বিশিষ্ট বর্ণে, তাহার—বিশিষ্ট ধর্ম্ম বা বিশিষ্ট লিঙ্গত্ব হইবে। অতএব মাতৃ ইচ্ছা বা তাহার স্থূল অভিব্যক্তি স্বরূপ মাতৃ অংশ (সংগঠিকা) যদি প্রবল হয়, তাহা হইলে সে গর্ভে কন্যাই হইবে—ইহার বিপরীত হইলে পুত্রই জন্মিবে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নূতন আবিষ্কার "অগনা বলিজিম্" ও "ক্যাটা বলিজিম"—কত যুগ যুগান্তর পূর্ব্বে "সংগঠিকা" ও "বিক্ষেপিকার" রূপকে সজ্জিত হইয়া অর্দ্ধ নারীশ্বর মূর্ত্তিতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষের মহিমাকীর্ত্তন করিতেছে! আমরা মূর্খ—সে তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করি না! বল দেখি ভাই! কিমাশ্চর্য্য মতঃ পরং? পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ভূমিষ্ঠ হইবার বহুকাল পূর্ব্বেই আর্য্য ঋষি বলিয়াছিলেন—পিতৃ অংশে বিক্ষেপিকা শক্তির আধিক্য, মাতৃ অংশ চিরদিনই সংগঠিকা। এই যে স্ত্রী পুরুষ লিঙ্গভেদ, ইহার আদিকারণ—"অর্দ্ধ নারীশ্বর" অর্থাৎ উভয় লিঙ্গাত্মক। আর্য্য ঋষি জানিতেন—প্রাণী বিকাশের এমন কোন অবস্থা বা যুগ ছিল—যখন স্ত্রী প্রাণী বা পুরুষ প্রাণী ছিল না, সকল প্রাণীই অর্দ্ধ নারীশ্বর হয়-গোছ অর্থাৎ উভয় লিঙ্গাত্মক ছিল।

ইচ্ছা সত্ত্বেও—এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধটি সহজবোধ্য ভাষায় লিখিতে পারিলাম না। ইহাতে মাদৃশ ক্ষুদ্রজনের অক্ষমতাই প্রতিপন্ন হইতেছে। কিন্তু কি করিব? দার্শনিক

বৈজ্ঞানিক শব্দের পরিভাষা এখনও বঙ্গভাষায় রচিত হয় নাই। এ পরিভাষা রচনা করিতে পারেন—বঙ্গের উজ্জ্বল বত্ন ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র—পণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

আর দুই একটী কথা বলিয়াই এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

আয়ুর্ব্বেদে পড়িয়াছি—বৈদ্য ইচ্ছা করিলে মানুষের পুত্র বা কন্যা উৎপাদন করাইয়া দিতে পারেন। কিন্তু সাধারণে এ কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে অক্ষম। পিতৃশক্তি ও মাতৃশক্তি—দুইটী বিভিন্ন শক্তি, ইহাদের ভিতর পরস্পর বিনিময় সংসাধিত হইতে পারে কিনা? মাতৃ অংশ বা সংগঠিকা শক্তিকে কোনওরূপে বিশ্লেষিকা শক্তি বা তাহার স্থূল অভিব্যক্তিরূপ পিতৃ অংশে পরিণত করা যায় কিনা? এই রহস্যটুকু বুঝিতে পারিলেই আমাদের সকল সন্দেহ মিটিয়া যায়। ঋষি বলিয়াছেন—জৈবী শক্তির কেন্দ্র ভিন্ন তার দুইটী বিভাগ থাকিলেও পুরুষ অর্থাৎ দেহবদ্ধ চৈতন্যই তাহার আধার। যাহার ধর্ম্ম আছে, সেই মানুষ। ধর্ম্ম লইয়াই না পশুত্বে নরত্বে প্রভেদ? কণাদের মতে—"যতোভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।" যাহা হইতে অভ্যুদয় ও কল্যাণ সাধিত হয় তাহার নামই ধর্ম্ম। আবার সাংখ্যের মতে—"অথ ত্রিবিধ দুঃখস্যাত্যন্ত নিবৃত্তি রত্যন্ত পুরুষার্থ"—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক [মানসিক, শারীরিক, প্রাকৃতিক] এই তিন প্রকার দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি করিবার জন্যই মনুষ্যের দেহ ধারণ। চরকও বলিয়াছেন—মানুষ প্রাণরক্ষার জন্য, ধন উপার্জ্জনের জন্য এবং পারলৌকিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করিবে। অতএব দেখা যাইতেছে—মানুষের মানসিক, শারীরিক ও প্রাকৃতিক ভেদে তিন প্রকার ধর্ম্ম আছে। জৈবী শক্তির সংগঠিকা বা বিশ্লেষিকা ভেদে যে দুইটী বিভিন্ন কেন্দ্র আছে—প্রাকৃতিক বা যৌগিক ক্ষেত্রে যাহা প্রবর্ত্তক বা নিবর্ত্তক—তাহা এই ক্ষেত্রেই কার্য্যকরী। আমরা যে পঞ্জিকায় বিভিন্ন রাশিযুক্ত লোকের আয়-ব্যয়ের কথা শুনিয়া থাকি, তাহা এই বিশ্লেষিক (নিবর্ত্তক) বা সংশ্লেষিক প্রবর্ত্তক) অর্থাৎ দেহস্থ পিতৃ বা মাতৃ শক্তির আধ্যাত্মিকভেদে ত্রিবিধ কোন আয়-ব্যয় অর্থাৎ কোন রাশিতে মানুষের আত্মিক, শারীরিক বা প্রাকৃতিক বিশ্লেষিকা-শক্তি বৃদ্ধি পায়, কোন রাশি বা কোন নক্ষত্রে তাহার সংশ্লেষিকার (মাতৃকা শক্তি) শক্তি বর্দ্ধিত হয়। ধর্ম্ম লইয়াই যখন মানুষের মনুষ্যত্ব, তখন ঋষিরা মানুষের সকল কার্য্যেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান দেখিবেন না কেন? তোমরাই বা পঞ্জিকার কথা অবিশ্বাস করিবে কেন? ঋষি বলিয়াছেন—তিথি অনুসারে, নক্ষত্রানুসারে, পক্ষানুসারে, দিবা ও রাত্রিভেদে—পিতৃ ও মাতৃ শক্তির আয় ব্যয়ের ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। তুমি যত বড় নাস্তিকই হওনা কেন, অমাবস্যা-পূর্ণিমায় শরীরে যে রস সঞ্চার হইয়া থাকে, শরৎকালে যে পিত্ত প্রকুপিত হয়, বাল্যে ও প্রভাতে যে শ্লেষ্মা বর্দ্ধিত হয়, সান্নিপাতিক বিকারে—৭ম, ৯ম ১১শ, ১৪শ দিবসে যে দৈহিক শক্তি অত্যন্ত হ্রাস হইয়া যায়—একথা তুমি অস্বীকার করিতে পারিবে না। দৈহিক হ্রাস-বৃদ্ধি প্রত্যহ সমান ভাবে হয় না। দিবা-রাত্রির মধ্যে—জীবের জন্ম মৃত্যুর কালও বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। পঞ্জিকার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। তিথি বিশেষে, নক্ষত্র বিশেষে, দিন বিশেষে, পিতৃ, মাতৃ যুগ্ম শক্তিরও হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। একটী শক্তির হ্রাস হইলে

অপত্যটী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যাহার যাহা সহজ ধর্ম্ম, তাহাকে কৃত্রিম উপায়ে সেই ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতে পারা যায়। ঋষিগণ দ্রব্যের সাহায্যে, উপায়ের সাহায্যে জৈবী শক্তির আয় ব্যয়ের কেন্দ্র আয়ত্ত করিতে পারিতেন, সুতরাং পিতৃকা ও মাতৃকা শক্তির উপর তাঁহাদের যথেষ্ট প্রভুত্ব ছিল। মানব বিজ্ঞান স্বকল্পিত উপায়ে মাতৃ-দেহের সংশ্লেষিকা বা বিশ্লেষিকা, প্রবর্ত্তক বা নিবর্ত্তক, আয় বা ব্যয়, আনাবলিজিম বা ক্যাটা বলিজিম প্রভৃতির হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া মানুষের পুত্র বা কন্যা উৎপাদনের সহায়তা করিতে পারে। ঋষিরা ইহা জানিতেন। তাই তাঁহারা এরূপ ঔষধের কল্পনা করিয়া গিয়াছেন, যে ঔষধ খাইলে—কন্যা প্রসবিনী-রমণী পুত্রেরও জননী হইতে পারে। আয়ুর্ব্বেদে এমন ঔষধ আছে—যাহা সেবনে বন্ধ্যানারী গর্ভিণী হইতে পারে, পুরুষ ইচ্ছামত পুত্র বা কন্যা উৎপাদন করিতে পারে। বহু প্রসবিনী নারীর গর্ভগ্রহণের শক্তি হ্রাস হইয়া যাইতে পারে। আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ মাত্রেই আমার এ কথার সত্যতা বুঝিতে পারিবেন।

তান্ত্রিক ঋষি বলিয়াছেন—জৈবী-শক্তির দুইটী বিভিন্ন কেন্দ্র মানুষের শরীরের বাম ও দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত। পিতৃকা কেন্দ্র (Katabolism) শরীরের দক্ষিণার্দ্ধে এবং মাতৃকা কেন্দ্র বামার্দ্ধে প্রবাহিত হইয়া থাকে। নিখিল শক্তি-কেন্দ্রের ন্যায়, জৈবীশক্তির ও প্রবর্ত্তক বা পিতৃকা কেন্দ্র, নিবর্ত্তক বা মাতৃকা কেন্দ্রকে আকর্ষণ করে। এক জাতীয় দুইটী কেন্দ্র পাশাপাশি থাকিলে বিক্ষেপণ বিশ্লেষণও চলিতে থাকে। অর্দ্ধ নারীশ্বর মূর্ত্তির বামভাগে গৌরী দক্ষিণ ভাগে—শিব। স্ত্রী তাই স্বামীর বামার্দ্ধ ভাগিনী। মহর্ষি সুশ্রুতের উপদেশ—"সহদেবানা মন্যতমং ক্ষীরে নাভি যুক্ত্যং ত্রীংশ্চতুরু বা বিন্দুন দত্বা দাক্ষিণে নাসা পুটে পুত্র কামায়ৈ। নতান নিষ্ঠিচেৎ।" আমার পুত্র হউক মনে এইরূপ ইচ্ছা হইলে গৃহীতগর্ভা স্ত্রীর দক্ষিণ নাসাপুটে [পিতৃকা কেন্দ্র] দুগ্ধ যুক্ত, লক্ষণা বিশ্ব বা সহদেবাদির যে কোনও একটীর মূলের ৩।৪ বিন্দু রস টানিয়া লইতে বলিবে। সে রস যেন সে আর থুতুর সহিত ফেলিয়া না দেয়। আচার্য্য বাগভটও বলিয়াছেন—

ক্ষীরেণ শ্বেত বৃহতী মূলং নাসা পুটে স্বয়ং।
পুত্রার্থং দক্ষিণে সিচেদ্বামে দুহিতৃ বাঞ্ছয়া।

শ্বেত বৃহতী মূলের রস দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া পুত্রার্থিনী নারী দক্ষিণ নাসাপুটে এবং কন্যার্থিনী গর্ভিণী বাম নাসাপুটে টানিয়া লইবে।

চরক স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"সব্যাঙ্গ গর্ভা * * সব্য প্রদুগ্ধে স্ত্রিয়ন্বেন সুতে"

যে নারীর গর্ভ বাম ভাগে অবস্থিত, বামস্তনে যাহার প্রথম দুগ্ধ সঞ্চারিত হয়, সে নারী নিশ্চয়ই কন্যা প্রসব করিবে।

আয়ুর্ব্বেদে, তন্ত্রে, জ্যোতিষশাস্ত্রে—অপত্য তন্ত্রের বহু রহস্যই জানিতে পারা যায়। ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সে সকল তত্ত্বের আলোচনা অসম্ভব। আমি কেবল এই টুকু বলিতে চাই—যে রহস্যের মীমাংসার জন্য য়ুরোপের বড় বড় বৈজ্ঞানিক মাথা ঘামাইয়াছেন,—পরন্তু স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই; ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ বহুযুগ পূর্ব্বে—যুক্তিপূর্ণ গবেষণার সাহায্যে—সে সকল রহস্যের মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। এক অর্দ্ধ নারীশ্বর মূর্ত্তির কল্পনা দেখিয়াই—আমরা বুঝিতে পারি—স্ত্রী বা পুং তত্ত্বের প্রাকৃভাব উভয় লিঙ্গাত্মক। এই

উভয় লিঙ্গাত্মক আদি কারণ হইতেই স্ত্রী ও পুরুষের উৎপত্তি। পিতৃকেন্দ্রের ক্রিয়াতিশয্যে পুরুষ বা পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে মাতৃকা কেন্দ্র যখন কার্য্যকরী,—তখনই কন্যার উৎপত্তি। মানব দেহের বাম ও দক্ষিণার্দ্ধে —এই দুই শক্তিকেন্দ্র, এই দুই আয়-ব্যয়ের হিসাব অবস্থিত। নবাবিষ্কৃত ইলেক্ট্রোহোমিও প্যাথি বা তাড়িতবিজ্ঞান পাশ্চাত্য জগতে এই তত্ত্বই প্রতিপন্ন করিতেছে। আর্য্য ঋষি কিন্তু অনেক আগেই—এই উভয় শক্তির কেন্দ্রের উপর পাকা বৈজ্ঞানিকের প্রভুত্ব করিয়া গিয়াছেন। আমাদের দুঃখ—তোমরা তাহা দেখিয়াও দেখিলেনা। একটু সন্ধানও লইলে না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান—জড়শক্তির প্রবর্ত্তক (Positive) কেন্দ্রের দুই একটা কথা আজ ১৯০০ বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায় জানিতে পারিয়াছে। জৈবী শক্তির নিবর্ত্তক বা মাতৃকা (Negative) কেন্দ্রের রহস্য—তান্ত্রিকের নেত্রে সৃষ্টির প্রথম বিস্ফুরণেই ধরা পড়িয়াছিল। প্রাকৃতিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক—সকল ক্ষেত্রেই তান্ত্রিক এই মাতৃকাশক্তির ইন্দ্রজাল ভেদ করিয়াছিলেন। মাতৃকা শক্তির জীবনীয় প্রবাহ তান্ত্রিকের হৃদপিণ্ডের ভিতর প্রাণ স্পন্দনে নাচিয়া উঠিয়াছিল। তাই তন্ত্রের মর্ম্ম বেদিকায় নারী—লিখনের অধিনায়িকা। ভ্রূণতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য জানিতে পারিয়াই তান্ত্রিক নারীকে মা বলিয়া পূজা করিয়াছিলেন, জগদ্ধাত্রী জগদম্বা ভাবিয়া নারীর চরণে প্রণত হইয়াছিলেন। স্ত্রী যে স্বামীকে স্বর্গরাজ্যের শেষ সোপানে তুলিয়া দিয়াছিল,—তন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ এ উপন্যাস জলন্ত অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছে। মাতৃ রহস্য ভেদ করিয়া আর্য্য ঋষি বিশ্বমাতাকে জীবনের আরাধ্যা বলিয়া বন্দনা করিয়াছিলেন। গর্ভাধান ব্যাপার অদ্ভুত রহস্য জালে জড়িত, আর্য্য ঋষি তাহা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের এ তত্ত্ব বুঝিবার শক্তিও ছিল না। প্রবীণ তান্ত্রিকের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া আজ আমরা সর্ব্বসমক্ষে প্রচার করিতেছি—"মাতৃত্বের মৃত্যু নাই। মাতৃগর্ভে জন্ম পরিস্ফুট হয়। মাতৃস্তন্যে শিশু যুবা হয়। যুবতীর হাসিতে সন্ন্যাসী ও সংসারী—জীবনের পূর্ণ অর্থ খুঁজিয়া পায়।" মাতৃত্ব ও নারীত্ব বুঝিতে হইলে মহাদেব হইতে হইবে। তন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ—পূর্ণ নারীত্বের অক্ষুন্ন সংহিতা। যখন অপত্যতত্ত্ব বুঝিবার আবশ্যক হইবে, তখন সকল দম্ভ, পরিহার করিয়া তন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদের শরণ লইও,—তোমার জম্বুদ্বীপে জন্মগ্রহণ সার্থক হইবে।*

কবিরাজ শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ।

* গর্ভস্থ ভ্রূণ যে প্রথমাবস্থায় উভয় লিঙ্গে থাকে, স্মৃতি শাস্ত্রের পুংসবন প্রক্রিয়াই তাহার আর একটী জ্বলন্ত প্রমাণ। পুংসবন বিধির আলোচনা করিলে, আমরা অপত্যতত্ত্বের বহু রহস্য বুঝিতে পারি। আর এক সময়ে তাহার চেষ্টা করিব।
—লেখক।

দীর্ঘজীবন লাভের উপায়।

——:০:——

আমাদের গুরুজনের প্রধান আশীর্ব্বাদ—"দীর্ঘজীবী হও"। কেননা মানুষ ধনী হউক, দরিদ্র হউক, সে বেশীদিন বাঁচিতেই ভালবাসে।

"কথামালার" বৃদ্ধ যখন শ্রান্ত দেহে, শুষ্ক কণ্ঠে, কাতর ভাবে যমকে ডাকিয়াছিল, তখন সে ভাবে নাই—তাহার আহ্বানে সত্য সত্যই যমরাজ স-শরীরে হাজির হইবেন। কিন্তু যম আসিয়া যখন সেই বৃদ্ধ কাঠুরিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমাকে ডাকিতে ছিলে কেন?" বৃদ্ধ অমনি উত্তর দিল—"এই কাঠের বোঝাটা আমার মাথায় তুলিয়া দিতে ডাকিয়াছিলাম।" দীন দরিদ্র-অসহায়-জরাজীর্ণ-বৃদ্ধ মরিবার সুযোগ পাইয়াও সে মরিতে চাহিল না। জগতে কেহই মরিতে চাহেনা, সকলেই চায় বাঁচিয়া থাকিতে। দীর্ঘজীবন সকলেরই কামনার ধন। সাংসারিক আধিব্যাধির তাড়নায় অস্থির হইয়া অনেকেই বলে "মরণ হইলে বাঁচি", এটা কিন্তু প্রাণের কথা নহে। বেঁচে থাকাই মানুষের চরম লক্ষ্য। দীর্ঘজীবী হইবার জন্য মানুষ অনেক দিন হইতেই চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। ভারতের মুনি-ঋষিরা দীর্ঘ জীবন লাভের জন্য যোগাভ্যাস করিতেন, ভারতের আয়ুর্ব্বেদে—দীর্ঘজীবন লাভের অনেক মহৌষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ পাঠ করিয়াছেন,—তাঁহারা ইহা অবশ্যই জানেন।

দীর্ঘজীবন লাভের জন্য য়ুরোপের মনীষিগণ যে কিরূপ চেষ্টা করিয়া থাকেন, আজ আমি তাহারই একটু পরিচয় দিব। আজ কাল আমাদের দেশে দীর্ঘজীবী লোক বড় একটা দেখা যায় না। অতএব যাহাতে পরমায়ু বৃদ্ধি পায়, এমন কথা সকলেরই শুনা উচিত। আমার যাহা বলিবার, বলিয়া যাই,—ঋষিরা দীর্ঘজীবন লাভের যে সকল উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—কোনও সুবিজ্ঞ আয়ুর্ব্বেদবেত্তা তাহা সাধারণের গোচরীভূত করিবেন।

"সঞ্জীবনী সুধা" পান করিলে, মৃত্যুকে জয় করা যায়। এই জন্যই সুধাভাণ্ড লইয়া দেবাসুরে বহুকাল ধরিয়া যুদ্ধ চলিয়াছিল,—আর্য্যজাতির ইহাই কল্পনা। এ কল্পনায় আর্য্যজাতির মধ্যে দীর্ঘজীবন লাভের যে কত দূর আগ্রহ ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। ৩য় খৃষ্টাব্দে—চীন-রাজ চীহংটী 'সুখদ্বীপের' সন্ধানে সমুদ্র যাত্রা করিয়াছিলেন। সম্রাট এক বাজীকরের মুখে সংবাদ পাইয়াছিলেন—সুখদ্বীপের অধিবাসীরা এক প্রকার সরবৎ প্রস্তুত করিয়া থাকে, সে সরবৎ পান করিলে আর মৃত্যুর ভয় থাকে না। বলা বাহুল্য এ পানীয়—সুধারই প্রকার ভেদ।

এ কলুষময়ী কলিযুগে কাহারও ভাগ্যে সুধা প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। তবে কি কলির মানব দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারিবে না? অধ্যাপক মেচিনি কফ—মর্ত্ত্যে বসিয়াই এক স্বর্গীয় সুধার আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। সে সুধা দুর্ল্লভ নহে, মূল্যবানও নহে, অথচ তাহাতে মানুষ দীর্ঘজীবী হইতে পারে। সেই সুধার ইতিহাসই আজ আমি পাঠকগণের কাছে কীর্ত্তন করিব।

অধ্যাপক মেচিনী কফ—১৮৪৫ খৃঃ অব্দে রুষ রাজ্যের চার্কোভো প্রদেশে [illegible]

হইয়াছিলেন। সামান্য কৃষক কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ভাগ্য-দেবতার অনুগ্রহে—তিনি ওডেসার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদে বরিত হইয়াছিলেন। ইহা ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের কথা। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে—বিসূচিকা রোগ রুষসাম্রাজ্যের মহামারীর আকারে প্রকাশ পাইয়াছিল। সেই সময়, রুষ গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে মহাত্মা মেচিনিকফ্ জীবাণুতত্ত্বের পরীক্ষায় আত্ম নিয়োগ করেন। সেই অবধি জীবাণুতত্ত্ববাদে তাঁহার অসাধারণ অভিজ্ঞতা পাশ্চাত্য জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। তিনি অনেক রোগেরই যে ফ্যাগোসাইট্ (Phagocyte) নামক জীবাণুর আবিষ্কার করিয়াছেন, ইহাতেই তিনি বৈজ্ঞানিক জগতে অমর হইয়া থাকিবেন।

মানবদেহ বহুবিধ জীবাণুর দ্বারা পূর্ণ, ফ্যাগোসাইট্ তাহাদেরই অন্যতম। ইহারা রক্তের সহিত মিশিয়া সর্ব্ব শরীরে বিচরণ করে। ইহাদের কার্য্য—শান্তিরক্ষক পুলিশের কার্য্য। অর্থাৎ পুলিশ যেমন রাষ্ট্রের শান্তি রক্ষা করিয়া থাকে, সমাজের অহিতকারী ব্যক্তিগণের অপরাধের শাস্তি-বিধান করিয়া থাকে, অন্যায় কার্য্যের প্রতিবিধান করিয়া দেশ রক্ষা করিয়া থাকে, ফ্যাগোসাইট্ শরীরের মধ্যে ঠিক এইরূপ কার্য্যেই দীক্ষিত। যদি কোন রোগ-বীজাণু শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া শরীরকে ধ্বংস করিতে অগ্রসর হয়, ফ্যাগোসাইট্ তাহাতে বাধা দেয়। ফ্যাগোসাইট্—বিদ্যুতের মত দ্রুতগামী, ইহাদের ঘ্রাণশক্তিও বড় তীক্ষ্ণ; কোন রোগ-বীজাণু শরীরে আশ্রয় গ্রহণ করিবা মাত্র—ফ্যাগোসাইট্ তাহাদের আক্রমণ করে। সে আক্রমণে রোগ-জীবাণু প্রায়ই ধ্বংস হইয়া যায়। ইহারা যখন আক্রমণ করে, দল বদ্ধ হইয়াই করে। সুতরাং ইহাদের হস্ত হইতে রোগবীজাণুর পরিত্রাণের আশাই নাই। শরীর সুস্থ থাকিলে, এই ফ্যাগোসাইট্ অতি সহজেই রোগ-বীজাণুকে নিঃশেষ করিতে পারে। কিন্তু মানুষের দেহ যদি স্বাভাবিক অবস্থায় না থাকে, তাহা হইলে ফ্যাগোসাইট্ বা বীজাণু ধ্বংসের জন্য গুরুতর পরিশ্রম করিতে হয়। ইহাতে তাহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তখন রোগ-বীজাণুগুলির সহিত মহা যুদ্ধে ফ্যাগোসাইট্ পরাস্ত হইয়া পড়ে। সেই অবস্থায় রোগ-বীজাণু—মানব-দেহে প্রবেশ লাভ করিয়া, দেহকে রোগপ্রবণ করিয়া তুলে। মেচিনিকফ্ সাহেব---২৫ বৎসর ধরিয়া পরিশ্রম করিয়া এই ফ্যাগোসাইট্ জীবাণুর কার্য্য-কারিতা শক্তির আবিষ্কার করিয়াছেন।

সম্প্রতি তিনি পরীক্ষা করিয়াছেন, মানব—দেহে এই ফ্যাগোসাইটের সংখ্যা বাড়াইতে পারিলে, দেহে আর রোগ-বীজাণু প্রবিষ্ট হইতে পারেনা। আবার দেহ রোগাক্রান্ত না হইলে সে দেহে জরা বা বার্দ্ধক্য দেখা দেয় না। অধ্যাপক মেচিনিকফের বিশ্বাস—মানব-দেহে যে জরা বা বার্দ্ধক্য দেখা দেয় এবং শরীরে বিকলতা বা জড়তা আসিয়া উপস্থিত হয়,—তাহা জীবাণুরই কার্য্য। অনেক জীবাণু আছে, যাহারা পেশী ও স্নায়ুর ক্ষয় সাধন করিয়া থাকে, তাহারই ফলে মানুষ জরাগ্রস্ত হইয়া পড়ে, তাহার জীবনী-শক্তিও হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

এই জরা সংঘটনকারী জীবাণুর দল মানব দেহের উদরের ভিতর বৃহৎ নালীর মধ্যে বাস করিয়া থাকে। অনেক রকম পরীক্ষার পর মেচিনিকফ এই বার্দ্ধক্য [illegible] জীবাণুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় [illegible]

সকল ক্ষয়কারী জীবাণুর হস্ত হইতে মানুষ কিসে মুক্তি লাভ করিতে পারে, মেচিনিকফ তাহারও উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। সে উপায় আর কিছুই নয়, দুগ্ধ বা দুগ্ধজাত পদার্থ ভক্ষণ করা। কথাটা আরও একটু বিস্তৃত ভাবে বলিতেছি।

প্রথমতঃ দুগ্ধ হইতে মাখন তুলিয়া লইতে হয়। তৎপরে, সেই দুগ্ধ জ্বাল দিয়া হঠাৎ ঠাণ্ডা করিতে হয়। এইরূপ দুগ্ধে অল্প পরিমাণে দম্বল দিয়া দধি পাতিতে হইবে। এই দধি আহার করিলে, জরা সংঘটনকারী জীবাণুর পতনশক্তি নষ্ট হইয়া যায়। অধিকন্তু এই দধির অম্লরসে—শরীর রক্ষক ফ্যাগোসাইট্ গুলিরও পুষ্টিসাধিত হইয়া থাকে।

দধি প্রস্তুত করা কঠিন কার্য্য নহে। কিন্তু ইহার একটু বিশেষত্বও আছে। দধি পাতিবার দুগ্ধটী যেন বিশুদ্ধ হয়। আর দম্বলটী যেন বুলগেরিয়া প্রদেশ হইতে সংগৃহীত হয়। মেচিনী-কফ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, বুলগেরিয়া প্রদেশের দুগ্ধজাত দধিতেই— সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী বীজাণু জন্মিয়া থাকে।

আমাদের দেশে—মুনি ঋষিগণ—ফল-মূল ভক্ষণ ও দুগ্ধ পান করিয়া দীর্ঘ কাল জীবিত থাকিতেন। এদেশে দধি ও তক্রের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। আয়ুর্ব্বেদে দধি ও তক্রের নানা গুণ বর্ণিত হইয়াছে। আমরা দধি ভক্ষণ করি বটে, কিন্তু তাহা "চিনী পাতা।" এরূপ দধি শরীরের কোনও উপকারে আসে না। অম্লদধির উপকারিতা আমরা ভুলিতে বসিয়াছি! তাই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়— সৌখীন বাঙ্গালি! তুমি "চিনি পাতার" মায়া কাটাইতে পারিবে কি? অম্লদধি ভক্ষণ করিয়া, মেচিনিকফের কথার সত্যতা পরীক্ষা করিবে কি?

ডাক্তার শ্রীনগেন্দ্রনাথ দে।
(ক্যাম্বেল হস্পিট্যালের ভূতপূর্ব্ব হাউস সার্জ্জন)

বঙ্গে অজীর্ণ রোগের এত প্রাদুর্ভাব কেন ?

(২)

বাঙ্গালী জাতির বিলাসিতাও বহুকারণে পরোক্ষভাবে অজীর্ণ রোগের হেতুভূত হইয়াছে। পূর্ব্বে আমরা বিলাসিতার জন্য পরিশ্রম-হীনতার উল্লেখ করিয়াছি। পূর্ব্বে পরিচ্ছদের জন্য এক জন বাঙ্গালীর যাহা ব্যয় হইত, এখন তাহার অনেক অধিক ব্যয় হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এক জোড়া চটী জুতা, একখানা ধুতি ও চাদর হইলেই চলিত। প্রাতঃস্মরণীয় ৺বিদ্যাসাগর মহাশয় চটীজুতা এবং মোটা চাদর ব্যবহার করিয়াই দেশীয়-বিদেশীয়গণের নিকট সর্ব্বত্র সম্মানিত হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু এখন আর সার্ট, কোট, মোজা, বহুমূল্য জুতা, কাপড়, রেশমী চাদর নহিলে সম্মান থাকে না। কাজেই খোরাকীর পয়সা হইতে যতদূর পারি

পয়সা কাটিয়া লইয়া আমরা পরিচ্ছদ ক্রয় করি। সোজা কথায় আমরা পেটে না খাইয়া বাবুয়ানা করি।

পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বিলাসিতা পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অধিকতর প্রবল। "তরল আলতা" হইতে আরম্ভ করিয়া বহুমূল্য নেকলেশ পর্য্যন্ত ইহার ক্ষেত্র। রমণীদিগের এই বিলাসিতা অনেক শিশুপুত্রকে উপযুক্ত পরিমাণ দুগ্ধ হইতে এবং অনেক স্বামীকে উপযুক্ত পরিমাণ সুখাদ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া থাকে।

অনাবশ্যক বিলাসিতাকে আমরা এত বাড়াইয়া তুলিয়াছি যে, তাহা হিসাব করিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। দুই একটী উদাহরণ দেওয়া যা'ক।

পথে যাইতেছি, দেখিলাম—এক জন ফেরীওয়ালা চিড়িয়া বাঁশী বিক্রয় করিতেছে। ৩।৪ পয়সা দিয়া একটী বাঁশী কিনিয়া আনিলাম এবং পুত্রের হাতে দিলাম। পুত্র আনন্দে বাঁশী বাজাইয়া নাচিতে লাগিল। পিতা মাতার কি আনন্দ? কিন্তু বাঙ্গালী-পিতা-মাতা, তোমাদের বুদ্ধি যদি বিলাসিতায় বিকৃত না হইত, তাহা হইলে তোমরা ইহাতে আনন্দিত না হইয়া দুঃখিত হইতে। পুত্রদিগকে বাঁশী বাজাইতে না দিয়া, সে পয়সা যদি তাহাদের পেটে খাওয়াইতে, তাহা হইলে কি শুভ ফলই না হইত!

বিলাসিতার আর একটী দ্রব্যের বিষয় উল্লেখ করিব,—সেটী কাঁচের চুড়ি। পূর্ব্বে স্ত্রীলোকেরা শাঁখা ব্যবহার করিত। একবার দুই গাছি শাঁখা কিনিলে বহুকাল চলিত। যাহাদের শাঁখা জুটিত না, তাহারা দুই গাছি কড় হাতে দিয়াই সন্তুষ্ট থাকিত। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রমানাথের স্ত্রী রাঙা সুতা হাতে বাঁধিয়াই কত সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু এখন নিত্য নূতন চুড়ি উঠিতেছে, আর বাঙ্গালীর মেয়েরা নিত্য তাহা ক্রয় করিতেছে। নূতন এক রকম উঠিলে পুরাতন আর কেহ পরে না। বাঙ্গালী জাতির এমনই করিয়াই না ক্রমশঃ অধঃপতন ঘটিতেছে। এই অধঃপতনই বাঙ্গালীর খাদ্যাভাবের কারণ এবং তাহারই ফলে অজীর্ণ রোগের বাহুল্য ঘটিতেছে।

ভেজাল খাদ্যের প্রচলনও বঙ্গে অজীর্ণ রোগের একটি প্রধান কারণ। একে ত বাঙ্গালী খাইতে পায় না, তাহার উপর কষ্ট সৃষ্টে যদি কোন রকম করিয়া একটু তৈল, ঘৃত, ময়দা, চিনি সংগ্রহ করিতে পারে, তাহাও ভেজাল। সর্ষপ তৈলে শোরগোজা প্রভৃতির তৈল, ঘৃতে বাদাম তৈল, ময়দায় শাদা পাথর চূর্ণ প্রভৃতি কত রকম ভেজাল যে চলিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। এই সকল ভেজাল খাদ্য খাইলে যে অজীর্ণ হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি! খাদ্য নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে আমরা ইতঃপুর্ব্বে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

জীবন সংগ্রাম ও জীবিকা।—এই বিষম প্রতিযোগিতার দিনে জীবিকার্জ্জনের জন্য যে সকল সদ্‌গুণ অন্যান্য জাতির মধ্যে আছে, বাঙ্গালীর তাহা নাই। একজন হিন্দুস্থানী লোটা-কম্বল হাতে করিয়া বাঙ্গালায় আসে। কিছুদিন ভিক্ষা করিয়া অথবা অন্য কোন উপায়ে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া কাপড়, ঘৃত বা পাপর মাথায় করিয়া বিক্রয় করে। কিছুদিন পরে একখানি ছোট দোকান করিয়া বসে। শেষে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়া ধনী হইয়া পড়ে। প্রথম অবস্থায় সে ২।৪ পয়সার চানা বা ছাতু খাইয়া জীবন ধারণ করিত, শেষে বিবিধ বহুমূল্য [illegible]

ও দেহের তৃপ্তি ও পুষ্টি সাধন করে। এরূপ সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় বাঙ্গালীর নাই।

একজন কাবুলী কিছু হিং ও সালম মিছরি প্রভৃতি লইয়া বাঙ্গালায় আসে। প্রথমে ঐ সকল দ্রব্য ফেরি করিয়া বেচিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করে। তা'র পর দুই আনা সুদে টাকা ধার দিতে আরম্ভ করে, সঙ্গে সঙ্গে গরম কাপড়ের ব্যবসায়ও (?) চলিতে থাকে। বাঙ্গালায় দরিদ্র কৃষক, কুলি, মজুর, এমন কি, অনেক দরিদ্র ভদ্রলোক তাহাদের নিকট টাকা ধার লয়, কাপড় খরিদ করে। ফলে তাহারা কৃষক-কুলি-মজুরদিগের অর্থ শোষণ করিয়া ক্রমশঃ অর্থবান হইয়া পড়ে, আর কৃষক প্রভৃতি ক্রমশঃই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে থাকে। একজন কাবুলীর যেরূপ সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায়, স্বজাতি প্রীতি ও পরাক্রম আছে, বাঙ্গালীর তাহা নাই।

সর্ব্বত্র একজনের এমন যথেষ্ট অর্থ থাকে না, যদ্দ্বারা সে একাকী একটী ব্যবসায় চালাইতে পারে। সেইজন্য পাশ্চাত্য দেশে কয়েক জন লোকে মিলিয়া একটী কোম্পানী গঠিত করে এবং বহুলোকে সেই কোম্পানীর অংশ ক্রয় করে। ইহার ফলে একটী প্রকাণ্ড কারখানা বা ব্যবসায় স্থাপিত হয়। দেশের বহুলোক সেই কারখানায় প্রতিপালিত হয়, অনেকে অর্থবান হইয়া পড়ে, অংশ ক্রয়-কারীরাও যথেষ্ট লাভ পায়। এরূপ কোন কারখানা বা ব্যবসায় চালাইবার ক্ষমতা বাঙ্গালীর নাই। বাঙ্গালা দেশে যে কয়েকটী ব্যবসায়ের কারখানা এইরূপে করা হইয়াছিল, সে গুলির শোচনীয় পরিণাম—বাঙ্গালীর এ বিষয়ে অক্ষমতার জলন্ত নিদর্শন। যদি এইরূপ করিয়া দুই একটী কোনমতে টিকিয়া থাকে, তাহা ধর্ত্তব্য নহে। কেননা বড় ধরণের সবগুলি কারখানারই অধঃপতন ঘটিয়াছে।

জীবন-সংগ্রামে এইরূপে পশ্চাৎপদ হওয়ায় বাঙ্গালী জাতি অন্যান্য জাতির সহিত প্রতি-যোগীতায় যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতে পারে না। উপার্জ্জন যখন যথেষ্ট হয় না, তখন যথেষ্ট আহার জুটিবে কোথা হইতে? সুতরাং উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে বাঙ্গালী জাতির অগ্নি-বল যে ক্ষীণ হইয়া পড়িবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

ফলে কৃষি এবং চাকরিই এক্ষণে বাঙ্গালীর জীবিকার্জ্জনের প্রধান উপায়। তদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়াদিতেও অনেক লোকে জীবিকার সংস্থান করে। কিন্তু এই সকল লোকেও জীবিকা অর্জ্জনের নিমিত্ত এরূপ অনিয়ম করিতে বাধ্য হয় যে, তাহারই ফলে অজীর্ণ রোগ জন্মিয়া থাকে। বাহুল্য ভয়ে আমরা সে বিষয় বাদ দিয়া কেবল চাকরিজীবী দিগেরই কথা বলিব।

আমাদের দেশে পূর্ব্বে লোকে সকালে-বিকালে কাজ করিত, মধ্যাহ্নে আহার করিয়া বিশ্রাম করিত। এখনও কৃষিজীবী এবং অনেক শ্রমজীবী তাহাই করিয়া থাকে। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে এই প্রথা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। কেননা দ্বিপ্রহরে অগ্নিবল প্রবলতর হয় এবং আহারের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলে ভুক্ত দ্রব্য সুজীর্ণ হয়। কিন্তু এখন চাকরির জন্য সকলকেই ৮।৯টা বা দশটার মধ্যেই আহার করিতে হয়, আর আহার করিয়াই কার্য্যক্ষেত্রে ছুটিতে হয়। [illegible] কথিত হইয়াছে যে, আহারের পর বসিয়া থাকিলে ভূঁড়ি হয়, শুইয়া থাকিলে শরীর [illegible] হয়, ধীরে ধীরে পাদচারণা করিলে [illegible] বর্দ্ধিত হয়, আর ছুটিলে মৃত্যু [illegible]

ছুটিতে থাকে অর্থাৎ ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ হয় না বলিয়া সে ব্যক্তি শীঘ্রই কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয়। এক্ষণে চাকুরী-জীবী বাঙ্গালীর পশ্চাতে অজীর্ণরূপী মৃত্যু নিয়ত ছুটিতেছে।

শাস্ত্রে আরও কথিত হইয়াছে যে, আহার করিয়া ধীরে ধীরে একশত পদ চলিয়া বাম পার্শ্বে শয়ন করিবে এবং মনের প্রিয় রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ উপভোগ করিবে। এরূপ করিলে ভুক্তদ্রব্য অদূষিত থাকে। দুঃখের বিষয় শাস্ত্রের এই হিতকর বাক্য পালন করা চাকরিজীবী বাঙ্গালীর অসাধ্য। আহারের পরে বিশ্রাম না করিয়াই কেহ পদব্রজে, কেহ ট্রামে, কেহ রেলে—কার্য্যস্থলের উদ্দেশে গমন করেন, কার্য্যস্থলে গিয়া বিলম্বে আগমন জনিত ক্রুদ্ধ মণিবের রূপ-শব্দাদি অবশ্যই মনের প্রিয় হয় না। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে যে অজীর্ণ রোগ জন্মিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি!

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, আহারের পর দুই দণ্ড কাল শরীর ও মনের আয়াসজনক কোন কার্য্য করিবে না। পাশ্চাত্য দেশের চিকিৎসকগণও এই মতের পোষকতা করিয়া থাকেন। আহারের পর ভুক্ত দ্রব্য পরিপাকের জন্য পাকস্থালীর কার্য্য আরম্ভ হয়। শরীরের যে অঙ্গ যখন কোন কার্য্য করে, তখন সেই অঙ্গে অধিকতর রক্ত সঞ্চালনের আবশ্যকতা ঘটিয়া থাকে। হস্ত দ্বারা কোন কার্য্য করিলে সঙ্গে সঙ্গে হস্তে অধিকতর রক্ত সঞ্চালিত হয়—ইহা সহজেই প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। আহারের পর হস্ত-পদাদির অতিরিক্ত চালনা করিলে সেই সেই স্থানে অধিকতর রক্ত সঞ্চালিত হয় বলিয়া পাকস্থালীতে যথেষ্ট রক্ত যাইতে পারে না এবং সেই জন্য অজীর্ণ রোগ জন্মিয়া থাকে। অধিকাংশ চাকরিজীবী বাঙ্গালীই এই জন্য অজীর্ণ রোগে ভুগিয়া থাকে।

সংযমাভাব।—সংযমের অভাবও অজীর্ণ রোগের অন্যতম কারণ। অতিরিক্ত স্ত্রী-সহবাস বশতঃ অজীর্ণ রোগ জন্মে, অতিরিক্ত স্ত্রী সহবাসে শরীর দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইয়া পড়ে এবং পরমায়ু হ্রাস পায়। পূর্ব্বে লোকে ধর্ম্মপালন করিত বলিয়া এ সম্বন্ধে তিথি—নক্ষত্র বিচার করিত। তাহাতে অনেকটা সংযম আসিয়া পড়িত। কিন্তু এক্ষণে লোকে ধর্ম্মে আস্থা শূন্য, বিধি-নিষেধ মানেনা এবং পালন করে না। ফলে সংযম একেবারেই দেশ হইতে লোপ পাইয়াছে। আর সংযমের অভাবে লোকে হীনবীর্য্য দুর্ব্বল দেহ ও দুর্ব্বলাগ্নি হইয়া পড়িতেছে।

বিবিধ ব্যাধির প্রাদুর্ভাব।—অজীর্ণ যেমন বহু রোগের কারণ; প্রায় সমস্ত রোগই সেই-রূপ অজীর্ণের কারণ। শাস্ত্রে অজীর্ণরোগের যে সমস্ত কারণ লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ব্যাধি দ্বারা শরীর কৃশ হওয়া একটী। বঙ্গে আজকাল বিবিধ রোগের বিষম প্রাদুর্ভাব এবং সেই সকল রোগে ভুগিয়া বাঙ্গালী জাতি দিন দিন কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। কৃশ ও দুর্ব্বল শরীরে অগ্নিবল কখনই প্রবল থাকিতে পারে না। সুতরাং বঙ্গে বিবিধ ব্যাধির প্রাদুর্ভাবও অজীর্ণ রোগের প্রাবল্যের অন্যতর কারণ।

মানসিক বিকৃতি।—মনের সহিত শরীরের নিকট সম্বন্ধ। মন অসুস্থ হইলে শরীর এবং শরীর অসুস্থ হইলে মন অসুস্থ হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে বাঙ্গালীজাতির মনের যেরূপ অশান্তি ঘটিয়াছে, তাহাতে তাহার শরীর যে অসুস্থ হইবে

অসুস্থ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, ঈর্ষ্যা, ভয়, ক্রোধ, রোগ, দৈন্য প্রভৃতি দ্বারা পীড়িত হইলে অন্ন সম্যক পরিপাক প্রাপ্ত হয় না। বর্ত্তমানকালে বাঙ্গালীজাতির মন ঐ গুলির অন্ততঃ দুই তিনটী বিষয়ে পীড়িত। দৈন্যের ত কথাই নাই। দেশের প'নর আনা তিন পাই লোক দারিদ্র্যপীড়িত। বাঙ্গালী জাতির গৃহ ভগ্ন, শয্যা ছিন্নভিন্ন—মলিন, খাদ্যের পরিমাণ স্বল্প এবং জঘন্য, দেহ শীর্ণ ও দুর্ব্বল, কান্তি ম্লান, মুখ বিষণ্ণ। এই আমজ্জা পরিব্যাপ্ত দৈন্যকে পরিচ্ছদের আবরণে বৃথা ঢাকিয়া বাঙ্গালী জীবন যাপন করিতেছে। বৃথা বলিলাম—কেন না, বাঙ্গালার আকৃতিতে, ভঙ্গীতে, গমনে, উপবেশনে দৈন্য স্বতঃই প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। সুদূর পল্লী-গ্রামের অবস্থা দেখিলে বুক ফাটিয়া যায়। দরিদ্র পল্লীবাসীর চালে খড়, ঘরে অন্ন নাই; পরিধানে ছিন্ন-মলিন বসন, মুখ বিষাদমাখা, শরীর জীর্ণশীর্ণ। এই বিষম দৈন্যদশায় পতিত-বাঙ্গালী যৎসামান্য শাক-অন্ন যাহা আহার করিতে পায়—তাহাও জীর্ণ করিতে পারে না। সুতরাং জাতীয় দৈন্যও অজীর্ণ-রোগের প্রাদুর্ভাবের একটী প্রধান কারণ।

দৈন্য কেবল বাঙ্গালীর আহার এবং বাস-স্থানেই সীমাবদ্ধ নহে। এই দৈন্য অবস্থার উপর বাঙ্গালী বিবাহ করে তাহার ফলে পুত্র-কন্যা হয়। পুত্রকন্যা জন্মিবামাত্র তাহাদের আহারের জন্য দুগ্ধ এবং গাত্রাবরণের জন্য বস্ত্রের চিন্তা করিতে হয়। তা'র পর পুত্র-কন্যা বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের শিক্ষার ব্যয় এবং ভরণ-পোষণের ব্যয় ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। হয়ত ইতিমধ্যে আবার দুই একটী নূতন শিশু আসিয়া পিতামাতার আনন্দ এবং দুশ্চিন্তা যুগপৎ বর্দ্ধিত করিয়া তুলে। তা'র পর কন্যার বিবাহের দায়। অধঃপতিত বঙ্গদেশের অধঃপতিত সমাজে কন্যার পিতাকে পাত্র ক্রয় করিতে হয়! ইহার উপর পিতৃদায়, মাতৃ-দায়, পুত্রের শিক্ষার ব্যয়, লৌকিকতা প্রভৃতি নানা উপসর্গ আছে। এই শত অভাব—অনটনের মধ্যে পড়িয়া বাঙ্গালীর জঠরাগ্নি ক্রমশঃ মাথায় উঠিয়া পড়িতেছে। সুতরাং অন্ন জীর্ণ হইবে কিরূপে? দেশে একটা প্রবাদ আছে "ভাবনায় পেটের ভাত চা'ল হ'য়ে যাচ্ছে" বা "ভাবনায় পেটের ভাত হজম হয় না?" ইহা অতি সত্য কথা-দেশব্যাপী। দৈন্য যে দেশব্যাপী অজীর্ণ রোগের একটী প্রধান কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বে বাঙ্গালীর যে মানসিক বল ছিল, তাহা বাঙ্গালী হারাইয়াছে, দুর্ব্বল চিত্ত সহজেই ক্রোধে-ঈর্ষ্যায়-ভয়ে বা শোকে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে মন—ক্রোধাদি দ্বারা অভিভূত হইলে অন্ন সহজে জীর্ণ হয় না। সুতরাং মানসিক দুর্ব্বলতাও অজীর্ণের একটী কারণ। বাঙ্গালী জাতি মানসিক বল হারাইল কিরূপে? সে সম্বন্ধে আরও একটু আলোচনা করা যাউক।

ধর্ম্মহীনতার ফলে—আমরা মানসিক বল হারাইয়াছি। কেবল মানসিক বল নহে, বল ভিন্ন আরও অনেক জিনিষ হারাইয়াছি। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করে, ইতর ব্যক্তিগণ তাহার অনুকরণ করিয়া থাকে। হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ। এই সমাজের শ্রেষ্ঠ—ব্রাহ্মণ জাতির ধর্ম্মহীনতার পরিচয় পাইলেই [illegible]

জাতিরও ধর্ম্মহীনতার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালীর ধর্ম্মে আস্থা ছিল। তখন প্রায় প্রত্যেক ব্রাহ্মণের গৃহে শালগ্রাম শিলা গৃহ-দেবতা রূপে বিদ্যমান থাকিতেন। ঠাকুর পূজার জন্য বাড়ীর সংলগ্ন একটু ফুলের বাগান করা হইত, ফুলের বাগান রক্ষার জন্য ব্যায়াম করা হইত, ফুলের সৌরভে মন প্রফুল্লিত হইত। গৃহস্থ যে কোন দ্রব্য গৃহ দেবতাকে নিবেদন না করিয়া আহার করিত না। ইহার ফলে সমস্ত খাদ্যাদি পবিত্র-ভাবে রক্ষিত হইত,—কোনরূপ মলিনতা বা অশুচি খাদ্যাদি সংস্পর্শ হইত না। সুখে গৃহস্থ গৃহ দেবতাকে অগ্রণী করিয়া উৎসব করিত। দুঃখে গৃহস্থ গৃহ দেবতাকে অবলম্বন করিয়া শান্তিলাভ করিত। সুখদুঃখ গৃহ দেবতার ভিতর দিয়া গৃহস্থকে স্পর্শ করিত, তাই তাহাদের তীক্ষ্ণতা অনুভূত হইত না। পুত্র যেন পিতার অধীনে থাকিয়া, প্রজা যেন রাজার অধীনে থাকিয়া দিন যাপন করিত। এখনও যেন মধ্যাহ্ন সূর্য্যকর প্রতি-ভাসিত ঘণ্টারব মুখরিত পল্লী-ভবনের "সহস্রশীর্ষ পুরুষ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাদ"—এই মহামন্ত্র আমার কর্ণবিবরে ধ্বনিত হইয়া শরীর পুলক কণ্টকিত করিতেছে।

আত্মপরতা চিত্তকে সঙ্কীর্ণ ও দুর্ব্বল করিয়া তুলে আর পরার্থপরতা চিত্তকে উদার ও সবল করিয়া তুলে। আমরা এত স্বার্থপর হইয়া পড়িয়াছি যে, এখনকার দিনে অতিথি আমাদের নিকট এক মুষ্টি অন্ন পায় না। কিন্তু ৬০ বৎসর পূর্ব্বে মধ্যাহ্নে সমাগত অতিথিকে নিজের আহারীয় দ্রব্য দিয়া যৎ-সামান্য কিছু আহার করিয়া গৃহস্থ আহ্লাদিত হইয়াছে দেখিয়াছি। এইরূপ দেব-সেবা এবং অতিথি-সেবা করিয়া তখনকার দিনে গৃহস্থের যে একটা আত্মপ্রসাদ জন্মিত, সে আত্মপ্রসাদ শরীরকে ও মনকে সবল করিত।

অনেকে জানেন যে, সাহেবেরা ছুটির দিনে মধ্যে মধ্যে ভ্রমণ করিতে যাইয়া থাকেন। ইহাতে শরীর ও মন প্রফুল্ল হয়, অগ্নি বর্দ্ধিত হয় এবং শরীর সুস্থ থাকে। পূর্ব্বে ধর্ম্মাচরণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যেও এইরূপ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। গ্রামের অনতি-দূরে একটী বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ পঞ্চানন ঠাকুর নামে খ্যাত ও পূজিত হইত। চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বহু গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা—সকলে মিলিয়া সেই পঞ্চানন তলায় মধ্যে মধ্যে বাঁধিয়া খাইত। তাহাতে যে কি আনন্দ—কি স্ফূর্ত্তি—তাহা যিনি না দেখিয়াছেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন না। আরবদেশে একটী প্রবাদ আছে যে, যে দিন শিকার করিয়া বেড়ান হয়, সে দিন জীবনের দিনের মধ্যে গণনা করা হয় না। আমরাও বলি,—সেকালে যে দিন পঞ্চানন তলায় রাঁধিয়া খাওয়া হইত, সে দিন জীবনের দিনের মধ্যে গণনা করা হইত না। অপিচ এইরূপ দিনে যে কি ক্ষুধা হইত, তাহা অনুভব করিবার সৌভাগ্য লেখকের বাল্য-কালেই ঘটিয়াছিল।

একাদশী, অমাবস্যা এবং ভিন্ন ভিন্ন পর্ব্ব দিনে উপবাস করা আমাদের ধর্ম্মাচরণের মধ্যে পরিগণিত। মধ্যে মধ্যে এইরূপ উপবাস করিলে যদি কিছু অজীর্ণ হইয়া থাকে, তাহা নষ্ট হইয়া যায় এবং অগ্নি বলবান হইয়া থাকে। ধর্ম্মের অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ভিতর [illegible] প্রথাও দেখ [illegible]

ধর্ম্মহীনতার সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনেক হিতকর অনুষ্ঠান হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। বাহুল্য ভয়ে আমরা সে সকল বিষয়ের আর আলোচনা করিলাম না। অজীর্ণ রোগ যে কিরূপ পরিণাম-ভয়াবহ এবং কিরূপে বিবিধ কারণের সমবায়ে অজীর্ণ রোগের এত প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে—সেই বিষয়ই বলা হইল। এক্ষণে স্থূলতঃ অজীর্ণ রোগ কি কি কারণে জন্মিয়া থাকে তাহার আলোচনা করিব।

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, অতিরিক্ত জল পান, বিষমাশন (অর্থাৎ কোন দিন অল্প, কোন দিন অধিক, কোন দিন ১০ টায়, কোন দিন ৩টায়—এইরূপ অনিয়মে ভোজন), মল-মূত্রাদির বেগ ধারণ করা, নিদ্রা-বিপর্য্যয় (দিবসে নিদ্রা যাওয়া বা রাত্রি জাগরণকরা) প্রভৃতি কারণে কালে লঘু এবং সাত্ম্য দ্রব্য ভোজন করিলেও তাহা জীর্ণ হয় না। অপিচ, অভোজন, অতি-ভোজন, অসাত্ম্য দ্রব্য (যাহা শরীরের পক্ষে হিতকর নহে) ভোজন, গুরু-শীতল ও অতি রুক্ষ দ্রব্য ভোজন, সংদুষ্ট দ্রব্য (পচা, বাসি, কৃত্রিম প্রভৃতি) ভোজন, দেশ কাল ও ঋতুর বৈষম্য (স্বাভাবিক অবস্থার বিকৃতি) প্রভৃতি কারণে অগ্নি দূষিত হয় এবং সেই দূষিত অগ্নি লঘুপাক অন্নও জীর্ণ করিতে পারে না।

পরিপাক যন্ত্রের কোন অংশের বিকৃতি ঘটিলেও অজীর্ণ রোগ জন্মিয়া থাকে। দন্ত খাদ্যদ্রব্য পেষণ করিয়া পরিপাক কার্য্যের সহায়তা করে বলিয়া দন্তগুলিও পরিপাক যন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া আহার না করিলে ভুক্তদ্রব্য ভালরূপ জীর্ণ হয় না। দন্ত রোগ বশতঃ দন্ত—বিকৃত, শিথিল বা দুর্ব্বল হইলে খাদ্যদ্রব্য উত্তমরূপে চর্ব্বিত হয় না, কাজেই ভুক্ত দ্রব্য ভালরূপ জীর্ণ হয় না বলিয়া দন্তের অসুস্থতা বশতঃ অনেকের অজীর্ণ, উদরাময়, আমদোষ প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় অসুস্থ দন্তগুলি ফেলিয়া, কৃত্রিম দন্ত বাঁধাইয়া লওয়া উচিত। এইরূপ করিলে অজীর্ণাদি রোগ উৎপন্ন হইতে পারে না।

লালা গ্রন্থি (Salivary gland), আমাশয় (Stomack), এবং অন্ত্রের বিকৃতি ঘটিলেও অজীর্ণ-রোগ উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বে যে অভোজন, অতিভোজন প্রভৃতি অজীর্ণের কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সেই সকল কারণেই উহাদের বিকৃতি ঘটিয়া থাকে।

শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গই পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট, এক অঙ্গ অসুস্থ হইলে, অন্য অঙ্গও অল্প-বিস্তর অসুস্থ হইয়া পড়ে। আমাশয়ে কোন গোলযোগ ঘটিলে মাথা ধরে, আবার প্রবল মাথাধরা হইলে ক্ষুধা বা আহারে ইচ্ছা হয় না। বৃক্ষের একটী শাখা ধরিয়া আকর্ষণ করিলে অন্যান্য শাখাও যেরূপ আন্দোলিত হয়, ইহাও প্রায় তদ্রূপ। সুতরাং শরীরের যে কোনস্থান পীড়িত হইলেই অল্পাধিক পরিমাণে অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে সেই পীড়িত অঙ্গেরপীড়ার উপশম হইলেই অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য প্রসারিত হইয়া যায়। এক্ষণে অজীর্ণ রোগে পথ্যাপথ্য এবং অজীর্ণ রোগে যে সকল নিয়ম পালন কর্ত্তব্য, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

অজীর্ণ রোগে 'পথ্য।—পুরাতন মিহি চাউলের অন্ন, ক্ষুদ্র মৎস্য, শাকে শাক, বেতো শাক, কচি মূলা, বেতের ডগা, সজিনার ডাঁটা, পাকা দেশী কুমড়া, কচি কাঁচকলা, থুড়ি শাক, গাঁদাল, পটোল, বেগুন, ... উচ্ছে, কাকরোল প্রভৃতির তরকারী। ...

মধ্যে মুগের দাউলের যূষ মাত্র, দাল নহে। সর্ষপ তৈল, হিং, লবণ, আদা, যোয়ান, মরিচ, মেথী, ধনে, জীরা প্রভৃতি মসলার সংযোগে তরকারী রন্ধন করা যাইতে পারে। যেমন সহ্য হয়—অল্প অল্প মাখন বা ঘৃত সেবন করা কর্ত্তব্য। কেন না—ঘৃত দ্বারা অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। প্রথমে খুব অল্প মাত্রায় আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ মাত্রা বাড়াইতে হয়।

দুগ্ধ অজীর্ণ রোগে সুপথ্য নহে। কারণ দুগ্ধ খাইলে জীর্ণ হয় না এবং উদরে বায়ু জন্মায়। কিন্তু দুগ্ধ পান অভ্যাস থাকিলে অপেক্ষাকৃত অল্প মাত্রায় দুগ্ধের সমান পরিমাণ জল-বার্লি মিশ্রিত করিয়া খাওয়া যাইতে পারে। কোষ্ঠবদ্ধতা যুক্ত অজীর্ণ রোগে কখন কখন ইষদুষ্ণ দুগ্ধ পান করিলে বেশ উপকার হয়। অজীর্ণ রোগে তরল দাস্ত হইতে থাকিলে তক্র বিশেষ উপকারী। দধির সিকি পরিমাণ জলের সহিত মিলাইয়া মন্থন করিয়া মাখন উদ্ধৃত করিয়া লইলে তাহাকে তক্র বলা যায়। এইরূপ অবস্থায় ছানার জলও সুপথ্য। সর্দ্দি-কাস প্রভৃতি উপসর্গ না থাকিলে অজীর্ণ রোগে দধি সুপথ্য।

সর্ব্ব প্রকার লেবু, দাড়িম, আঙ্গুর, পানি-ফল, ও মিছরি অজীর্ণ রোগে হিতকর। গরম জল এবং কটু ও তিক্ত দ্রব্য এই রোগে সুপথ্য।

সহ্য হইলে দুই বেলা অন্নাহার করা যাইতে পারে। সহ্য না হইলে একবেলা অন্ন, আর একবেলা খৈয়ের মণ্ড, যবের রুটী বা জলবার্লি সেবন করা কর্ত্তব্য। প্রবল অজীর্ণ রোগে আবশ্যক হইলে দুইবেলা অন্নাহার বন্ধ করিয়া অন্ন মণ্ড, খৈয়ের মণ্ড প্রভৃতি খাওয়া যাইতে পারে। এই রোগে তরকারী ব্যবহার যত কম হয়—ততই ভাল। তরকারী চুষিয়া ছিবড়া ফেলিয়া দেওয়া উচিত। খাদ্য সংস্কার প্রসঙ্গের উপদেশ অনুসারে হিং, আদা, মরিচ প্রভৃতি পাচক দ্রব্য সংযোগে তরকারী প্রস্তুত করিলে সহজে জীর্ণ হয়।

অপথ্য—জোলাপ লওয়া, মল মূত্রের বেগ ধারণ, রাত্রি জাগরণ, পূর্ব্বাহার জীর্ণ না হইতে ভোজন, দাল, মৎস্য, মাংস, পুঁইশাক, পিষ্টক, গুড়, তালশাঁস, তালের ফোঁপল, দুগ্ধ, ছানা, ক্ষীর, সরবৎ, অধিক জলপান এবং সর্ব্ব প্রকার গুরুপাক দ্রব্য অজীর্ণ রোগে অহিত-করি।

এক্ষণে অজীর্ণ রোগে বিশেষ হিতকর কতকগুলি নিয়মের উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। ঔষধ সেবন অপেক্ষা এই সকল নিয়ম পালনে অধিক উপকার হওয়া সম্ভব।

১। ব্যায়াম।—রীতিমত দুই বেলা ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য। অন্য ব্যায়ামের অভাবে সামর্থ্য অনুসারে প্রত্যহ দুই এক ক্রোশ করিয়া দুই বেলাই ভ্রমণ করা কর্ত্তব্য।

২। আহার। (ক) উত্তমরূপে চর্ব্বন করিয়া আহার করিবে। (খ) আহারের পূর্ব্বে এবং পরে কিছুক্ষণ (প্রায় একঘণ্টা) পরিশ্রম করিবে না। (গ) আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে জলপান করিবে না, এক ঘণ্টা পরে জল পান করিবে। (ঘ) মনে ক্রোধাদির উদ্রেক হইলে সে সময়ে আহার না করিয়া মন প্রশান্ত হইলে আহার করিবে। (ঙ) আহারের সময় এবং পরে কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত মন যাহাতে প্রফুল্ল থাকে তাহা করা কর্ত্তব্য। (চ) উষ্ণ খাদ্য আহার করিবে। (ছ) অত্যন্ত দ্রুত বা অত্যন্ত বিলম্ব করিয়া আহার করিবে না। [illegible]

আহার করিবে। (ঝ) নিত্য এক সময়ে আহার করিবে।

৩। জলপান।—অজীর্ণ রোগে অল্প জল পান করা উচিত। বাতশ্লেষ্ম প্রধান অজীর্ণ রোগে দিন তিন চারিবার তিন ছটাক বা এক পোয়া করিয়া গরম জল খাইলে বিশেষ উপকার হয়। পিত্ত ও বাতপিত্ত প্রধান অজীর্ণ রোগে উষা পান অর্থাৎ সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে শীতল জল আধ সের তিন পোয়া পান করিলে সুফল পাওয়া যায়।

৪। নিদ্রা।—দিবা নিদ্রা এবং রাত্রি জাগরণ উভয়ই অজীর্ণ রোগের কারণ, সুতরাং দিবানিদ্রা এবং রাত্রিজাগরণ বর্জ্জনীয়। রাত্রি ৯।১০ টার সময় নিদ্রিত হইয়া প্রত্যূষে শয্যা-ত্যাগ করিবে।

৫।—নিত্য কিছুক্ষণ মন যাহাতে প্রফুল্ল থাকে এরূপ নির্দ্দোষ ক্রীড়া বা আমোদ আহ্লাদ করিবে।

৬।—সংযম অভ্যাস করিবে।

দিনচর্য্যা।

—০✱০—

যেরূপ নিয়মে নিত্য আহার-বিহারাদি করিলে শরীর সুস্থ থাকে এবং দীর্ঘজীবন লাভ করা যায়. আয়ুর্ব্বেদে সেই সকল নিয়ম দিন-চর্য্যা ও সদাচারের অন্তর্ভুক্ত। ডাক্তারীতে যাহাকে হাই-জিন (Hygiene) বলে, শাস্ত্রোক্ত দিনচর্য্যা ও সদাচার বলিতে তাহাই বুঝায়। তবে স্বাস্থ্যনীতির (Hygiene) কয়েকটী প্রধান অঙ্গ ধর্ম্ম-শাস্ত্রের অনুশাসন বিধির অন্তর্ভুক্ত আছে। অপিচ, ঋতুচর্য্যাকেও ইহার মধ্যে গণনা করা উচিত।

শাস্ত্র বলিয়া গিয়াছেন,—

আহার, নিদ্রা ও ব্রহ্মচর্য্য—এই তিনটি শরীর ধারণের তিনটী স্তম্ভ স্বরূপ। এই তিনটী, যথাযথরূপে সেবিত হইলে—বল, বর্ণ পুষ্টি এবং দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করা যায়।

ইতঃপূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্য প্রবন্ধে, ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র। তবে এখানে ব্রহ্মচর্য্য অর্থে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নহে, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমোচিত সংযম অবলম্বন বুঝাইতেছে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে শরীর রক্ষার অপর দুইটী প্রধান উপায়;—আহার ও নিদ্রা বিষয় আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ শয্যাত্যাগ হইতে আলোচনা করা যাউক। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে (অর্থাৎ রাত্রি দুই দণ্ড বা ৪৮ মিনিট থাকিতে) শয্যাত্যাগ করিবে।

প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করা স্বাস্থ্য রক্ষা ও দীর্ঘায়ু লাভের প্রশস্ত উপায়। শাস্ত্রে প্রাণনাশক যে ছয়টী বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, * তন্মধ্যে প্রভাত কালে নিদ্রা সেবন একটী। প্রকৃতির অনুবর্ত্তনকারী রোগহীন পশু পক্ষীদিগের প্রতিও দৃষ্টিপাত করিলে, তাহারাও অতি প্রত্যুষে জাগরিত হইয়া থাকে দেখিতে পাই। যাহা হউক স্বাস্থ্যকামী ব্যক্তি মাত্রেরই প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করা উচিত। শয্যাত্যাগ করিবার পরেই ভগবানের নাম স্মরণ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে মনের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়, মন প্রশান্ত হয়, এবং অল্প কারণে বিচলিত হয় না। এই-জন্য আর্য্য ঋষিগণ প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া মহাবাক্য সকল অন্তরের সহিত আবৃত্তি করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

অনন্তর শরীরের বিষয় চিন্তা করিয়া শৌচ-কার্য্য সমাধা করিবে। শরীরের বিষয় চিন্তা অর্থে শরীর কেমন আছে, পূর্ব্বাহার জীর্ণ হইয়াছে কিনা ইত্যাদি। এই প্রাতঃকালের শরীর চিন্তার উপরেই সমস্ত দিনের কর্ত্তব্যের অবধারণ নির্ভর করিতেছে। অবশ্য সুস্থ দেহে সুস্থ ব্যক্তির ন্যায়ই দিনচর্য্যা করিতে হয়। কিন্তু অজীর্ণাদি ঘটিলে তাহাতে বিবেচনা পূর্ব্বক স্নান, আহার, পরিশ্রম প্রভৃতি দৈহিক ব্যাপার নিয়মিত করিতে হয়। এক কথায় প্রকারান্তরে—এই স্থলে বলা হইল যে, শরীরের সামান্য কিছু ভাবান্তর ঘটিলেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতিকারে মনোযোগী হইবে।

ইহার পর, শৌচ-কার্য্য সমাধা করিবে। প্রত্যহ প্রাতে যথোচিত মলোৎসর্গ হওয়া সুস্থের লক্ষণ এবং স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল, তাহার পর, দন্ত ধাবন ও জিহ্বা নির্লেখন করিতে হয়। কষায়, মধুর, তিক্ত বা কটু রসাত্মক দন্ত কাষ্ঠ (দাঁতন) প্রশস্ত। নিম্ব, খদির, মৌল, করঞ্জ, কবরী, আকন্দ, অর্জ্জুন প্রভৃতি বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার্য্য। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়ার চূর্ণ, মধু, তৈল ও লবণ সহ মিশ্রিত করিয়া দন্ত কাষ্ঠের অগ্রভাগ চিবাইয়া কুঁচির ন্যায় করিয়া উক্ত পদার্থ মাখাইয়া এক একটী দন্ত ঘর্ষণ করিবে। কিন্তু যেন দন্তমাংস আহত না হয়। এইরূপে দন্তধাবন করিলে জিহ্বা, দন্ত ও মুখের মল বহির্গত হইয়া যায়, মুখের দুর্গন্ধ ও বিরসতা নষ্ট হয়, দন্ত সকল পরিষ্কৃত হয় এবং আহারে রুচি জন্মে।

গলরোগ, তালুরোগ, ওষ্ঠরোগ, জিহ্বা-রোগ, মুখ ক্ষত, শ্বাস, কাস, হিক্কা, বমি, মূর্চ্ছা, মদাত্যয় (Alcholiolism), অর্দ্দিত; (Facial paralysis), কর্ণশূল, দন্তরোগ ও হৃদ্রোগ থাকিলে দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করা উচিত নহে। কেবল পূর্ব্বোক্ত চূর্ণ দ্বারা দন্ত মার্জ্জনা করা কর্ত্তব্য।

দন্তধাবনের পর স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীসক, টিন বা লৌহ নির্ম্মিত জিহ্বানির্লেখন (জিব-ছোলা) দ্বারা জিহ্বা পরিষ্কার রাখা উচিত। ইহাতে জিহ্বার মল দূরীভূত হয় এবং মুখ

* স্ত্রিয়ো বৃদ্ধা পূতি মাংসং বালার্কস্তরুণং দধিঃ।
প্রভাতে মৈথুনং নিদ্রা সদ্য প্রাণ হরাণি ষট্॥

অর্থাৎ বৃদ্ধা স্ত্রী গমন, পচা মাংস আহার, শরৎকালের রৌদ্র সেবন, অসম্যক জাত দধি সেবন এবং প্রভাতে মৈথুন ও নিদ্রা সেবন এই ছয়টী সদ্যো প্রাণনাশক। প্রাণ-অর্থে এখানে জীবনী শক্তি (vitality).

বিবরে সৌগন্ধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার পর গণ্ডূষধারণ করিবার জন্য শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন। প্রত্যহ প্রাতঃকালে তৈলের গণ্ডূষ ধারণ করিলে হনুতে (চোয়ালে) বলজন্মে, স্বর বর্দ্ধিত হয়, অন্নে রুচি জন্মে, কণ্ঠশোষ ও মুখশোষ হয় না, ঠোঁটফাটার আদৌ ভয় থাকে না, দন্ত সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না এবং দৃঢ় মূল হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা দন্তশূলও নিবারিত হয়। এরূপ করিলে অম্লদ্রব্য ভক্ষণ করিলেও দন্তহর্ষ (দাঁত শির শির করা) হয় না এবং কঠিন দ্রব্য চর্ব্বণ করিয়া খাইতে পারা যায়। তৈলের গণ্ডূষ-ধারণ এরূপ উপকারী, কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে, এদেশে একেবারে ইহা চলিত নাই। যাহা হউক প্রত্যহ এক গণ্ডূষ তৈল খরচ করিয়া দেশের সকল ব্যক্তিই এই হিতকর নিয়মটী পালন করিলে বিশেষ উপকার পাইবেন। তৈল-গণ্ডূষ ১৫ মিনিট মুখে ধারণ করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে।

অনন্তর তৈল মর্দ্দন করিয়া স্নান করিবে। কুম্ভকে পুনঃ পুনঃ তৈলাক্ত করিলে, চর্ম্মে বারবার তৈল মাখাইলে—গাড়ীর ধুরায় তৈল দিলে—উহারা যেমন ভারসহ হইয়া থাকে, সেইরূপ তৈলাভ্যঙ্গ দ্বারা শরীর দৃঢ় ও উত্তম ত্বক্ বিশিষ্ট হয়, বায়ুরোগ জন্মিতে পারেনা।

মস্তক তৈল দ্বারা আর্দ্র রাখিলে শিরঃশূল হয় না, খালিত্য (টাক) ও পালিত্য (চুল-পাকা) জন্মে না, কেশ সকল পতিত হয় না, কেশ সকল দীর্ঘ, কৃষ্ণবর্ণ ও দৃঢ় হয়, মস্তকের অস্থি সমূহের বল বর্দ্ধিত হয়, ইন্দ্রিয় সকল প্রসন্ন হয়, ত্বক সুন্দর ও নির্ম্মল হয়, এবং সহজে নিদ্রা হয়।

নিত্য কর্ণকুহরে তৈল প্রদান করিলে বায়ুজনিত কর্ণরোগ হয় না, মন্যাস্তম্ভ (ঘাড়ের শির টানিয়া ধরা) কিম্বা হনুগ্রহ (চোয়াল নাড়িতে না পারা), উচ্চৈঃ শ্রুতি (চেঁচাইয়া বলিলে শুনিতে পাওয়া) কিম্বা বধিরতা রোগ জন্মে না।

বায়ু দ্বারা স্পর্শশক্তি জন্মে এবং ত্বক্‌ই স্পর্শ জ্ঞানের আশ্রয় স্বরূপ। অথচ তৈল ত্বকের পরম হিতসাধক। এইজন্য নিত্য তৈলাভ্যঙ্গ করিবে। নিত্য তৈলাভ্যঙ্গ সেবীর গাত্রে আঘাত লাগিলে অভিঘাতজনিত পীড়া প্রবল হইতে পারে না, বল প্রয়োগ কার্য্য করিলেও সহসা শরীর পীড়িত হয় না। অভ্যঙ্গ বশতঃ জরা সহজে আক্রমণ করিতে পারে না।

পাদদেশে নিত্য তৈল মর্দ্দন করিলে পদের ক্ষয়ত্ব শুষ্কতা, রুক্ষতা, অবসন্নতা এবং গ্লানি সদ্যঃই নষ্ট হয়, পদদ্বয় সুকুমার, সবল ও দৃঢ় হয়, দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধিত হয়, বায়ু প্রশমিত হয়, গৃধ্রসী রোগ (Sciatica) হয় না, পা ফাটিয়া যায় না। এবং পাদের শিরা বা স্নায়ুর সঙ্কোচ হয় না।

শরীরে আমদোষ থাকিলে, অজীর্ণরোগে এবং বমন-বিরেচনের পর তৈলাভ্যঙ্গ নিষিদ্ধ। কারণ ইহাতে অগ্নিমান্দ্যাদি বিবিধ রোগ উৎপন্ন হইতে পারে।

স্নান—পবিত্রতাজনক, শুক্রবর্দ্ধক, আয়ুর্বর্দ্ধক। শ্রম স্বেদ ও মলনাশক, বলকারক এবং অত্যন্ত ওজোবর্দ্ধক, অপিচ স্নান করিলে দাহ ও পিপাসা দূর হয়, সমস্ত ইন্দ্রিয় বিশোধিত হয়, মনের প্রীতি হয়, রক্ত পরিষ্কৃত হয় এবং অগ্নি উদ্দীপিত হয়।

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, উষ্ণ জল দ্বারা অধঃকায় (মস্তক ব্যতীত সমস্ত শরীর) ধৌত করা সুখজনক। কিন্তু মস্তকে উষ্ণ জল দিলে কেশ ও চক্ষুর বলহানি হইয়া থাকে। সেইজন্য উষ্ণ জল দ্বারা অধঃশরীর ধৌত করিয়া মস্তকে শীতল জল বা উষ্ণজল শীতল করিয়া তদ্দ্বারা ধৌত করা উচিত। কিন্তু বাত-শ্লেষ্মপ্রকোপজনিত রোগে অবস্থা বিবেচনায় উষ্ণ জলদ্বারা মস্তক ধৌত করা ও যাইতে পারে।

শীতকালে অত্যন্ত শীতল জলে স্নান করিলে বায়ু ও শ্লেষ্মা প্রকুপিত হয়। আবার উষ্ণকালে অত্যন্ত উষ্ণ জলে স্নান করিলে রক্ত ও পিত্ত কুপিত হইয়া থাকে। সুতরাং এতদুভয়ই বর্জ্জনীয়।

যাহাদের শরীর সুস্থ,—তাহাদিগের পক্ষে স্রোত-জলে স্নান করাই প্রশস্ত। কলের জল বহুক্ষণ মৃত্তিকার নিম্নে রুদ্ধ থাকে বলিয়া রৌদ্র ও বায়ুর সংস্পর্শবশতঃ কিঞ্চিৎ দূষিত হইয়া পড়ে। যাহারা নিত্য গঙ্গাস্নানে অভ্যস্ত, কলের জলে স্নান করিলে তাহাদের সর্দ্দি হয় দেখিয়াছি। কলের জলে স্নান করিতে হইলে জল ধরিয়া প্রথমে কিছুক্ষণ রৌদ্রে রাখা উচিত।

যাহাদের শরীরে বায়ু বা শ্লেষ্মা অথবা বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ আছে, তাহাদের পক্ষে অধঃশরীর উষ্ণজলে ধৌত করিয়া মস্তকে উষ্ণজল শীতল করিয়া তদ্দ্বারা ধৌত করা কর্ত্তব্য। পিত্তপ্রধান ব্যক্তির পক্ষে শীতল জলে স্নান করাই হিতকর।

উষ্ণ জলে স্নান করিতে হইলে কিরূপ উষ্ণ জলে স্নান করা উচিত? এক কথায় ইহার উত্তর—সুখোষ্ণ জলে অর্থাৎ জলের যে পরিমাণ উত্তাপ থাকিলে তাহা শরীরের সুখকর হইয়া থাকে—তাহাতেই স্নান করা উচিত। উষ্ণজলই হউক, শীতল জলই হউক—যাহা শরীরের সুখকর হয়, সেইরূপ জলে স্নান করা উচিত।

অতিসার, জ্বর, কর্ণশূল, বিবিধ বায়ুরোগ, আধ্মান (পেটফোলা) রোগ, অরুচি এবং অজীর্ণ রোগে স্নান করা নিষিদ্ধ। আহার করিয়া, পরিশ্রম করিয়া, রৌদ্র সেবন ও ভয় পাইবার পর কিম্বা শরীর ও মন সুস্থ না হইলে কদাচ স্নান করিবে না।

প্রসঙ্গ ক্রমে শাস্ত্রোক্ত কতকগুলি নিত্য ব্যবহার্য্য বিষয়ের গুণ লিখিত হইতেছে।

বস্ত্র ধারণ—নির্ম্মল বস্ত্রধারণ আয়ুঃপ্রদ ও অলক্ষ্মী নাশক।

গন্ধমাল্য সেবন—পুংস্ত্ব বর্দ্ধক, সুগন্ধজনক, আয়ুঃপ্রদ, পুষ্টি ও বলপ্রদ। ইহা মনের তৃপ্তিজনক।

রত্নালঙ্কার ধারণ—শ্রেষ্ঠতাব্যঞ্জক, মঙ্গলকর, আয়ুঃপ্রদ, শ্রীজনক, মনের হর্ষজনক, এবং ওজোবর্দ্ধক।

পাদুকা ধারণ—চক্ষুঃ ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের হিতকর, পদদ্বয়ের বিপদ নিবারক, বলকর, গমনে সুখকর এবং পুংস্ত্ববর্দ্ধক।

শরীরের কেশাদিকর্ত্তন—কেশ, নখ, শ্মশ্রু কর্ত্তন—দেহের হর্ষও লঘুতা সম্পাদক, সৌভাগ্যজনক, উৎসাহ বর্দ্ধক, পবিত্রতা সম্পাদক এবং রূপ ব্যঞ্জক।

কেশ প্রসাধন—কেশ প্রসাধন (চুল আচড়ান) দ্বারা মস্তকের ধুলি, উকুন ও মল দূর হয়, কেশের উৎকর্ষ ঘটে এবং শ্রী সম্পাদিত হয়।

অনুলেপন (গাত্রে চন্দনাদি [illegible] লেপন)—ইহা সৌভাগ্যজনক, [illegible]

ওজঃ ও বলবৰ্দ্ধক এবং স্বেদ দুর্গন্ধ, বিবর্ণতা ও শ্রমনাশক। যাহাদিগের পক্ষে স্নান নিষিদ্ধ বলা হইয়াছে, তাহাদিগের পক্ষে অনুলেপনও নিষিদ্ধ।

ছত্র ধারণ—ছত্র ধারণ দ্বারা বৃষ্টি, বায়ু, ধূলি, রৌদ্র ও হিম নিবারিত হয়। শরীরের বর্ণ ভাল থাকে, চক্ষুদ্বয়ের হিত হয়, ওজঃ বৰ্দ্ধিত হয়।

দণ্ড ধারণ—দণ্ড (লাঠি) ব্যবহার করিলে কুক্কুর, সর্প প্রভৃতির ভয় নিবারিত হয়, পদ স্খলন হয় না, শ্রমের লাঘব হয় এবং উৎসাহ, বল, স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্য বৰ্দ্ধিত হয়।

উষ্ণীষ ধারণ—মস্তকে উষ্ণীষ ধারণ করিলে কেশ পবিত্র থাকে এবং বায়ু, আতপ ও ধুলা লাগিতে পারে না।

শৌচ—পাদদ্বয় এবং মল মার্গ সকল ধৌত করিয়া শুচি রাখিলে আয়ু ও মেধা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, শরীর পবিত্র থাকে।

শরীর পরিমার্জ্জন—নিত্য গাত্র মার্জ্জনা করিলে শরীরের দুর্গন্ধ ও গুরুতা নষ্ট হয়, তন্দ্রা, কণ্ডু ও মল দূর হয়, শরীরের কদর্য্য ভাব নষ্ট হয় এবং আহারে রুচি জন্মে।

উদ্বর্ত্তন—অঙ্গে কুঙ্কুম-হরিদ্রাদি মর্দ্দনকে উদ্বর্ত্তন বলে। ইহা দ্বারা মেদ, কফ ও বায়ু নষ্ট হয়, অঙ্গ সকল দৃঢ় হয় এবং চৰ্ম্ম নির্ম্মল হইয়া থাকে।

সংবাহন (গা টেপান)—সংবাহন নিদ্রা ও প্রীতিজনক। পুংস্ত্ব বৰ্দ্ধক, কফ, বায়ু ও শ্রম নাশক, মাংস, রক্ত ও চর্ম্মের প্রসন্নতা কারক এবং সুখজনক।

পাদ প্রক্ষালন—পদ প্রক্ষালন করিলে পদের মল দূর হয়, পদে রোগ হয় না শ্রম দূর হয়, চক্ষু ভাল থাকে, পুংস্ত্ব বৰ্দ্ধিত হয় এবং প্রীতি জন্মে।

উপবেশন—বসিয়া থাকিলে স্থৌল্য, সৌকুমার্য্য ও সুখ বৰ্দ্ধিত হয়।

পথ পর্য্যটন—পথ পর্য্যটন করিলে স্থৌল্য ও সৌকুমার্য্য নষ্ট হয়। অতিরিক্ত পথ পর্য্যটন করাও দৌর্ব্বল্য জনক।

সংক্রমণ (পাইচারী করা)—পাইচারি করিলে দেহের কষ্ট হয় না, আয়ু, বল, মেধা ও অগ্নি বৰ্দ্ধিত হয় এবং ইন্দ্রিয় সকল শক্তি শালী হইয়া থাকে।

শয্যাশন—উৎকৃষ্ট অর্থাৎ কোমল বিস্তীর্ণ, এবং যথেষ্ট উপাধানাদিযুক্ত শয্যায় শয়ন করিলে সুখে নিদ্রা হয়, শ্রম ও বায়ু নষ্ট হয় এবং বীর্য্যের পুষ্টিলাভ হয়। দুঃখজনক শয্যায় শয়ন করিলে ইহার বিপরীত ফল হইয়া থাকে।

ব্যজন (পাখার বাতাস)—ব্যজন দ্বারা মুখাদির শুষ্কতা, দাহ, ব্রণ, মূৰ্চ্ছা ও ঘৰ্ম্ম নিবারিত হয়।

বায়ু সেবন—নির্ম্মল বায়ু সেবন করিলে আয়ু ও আরোগ্য লাভ হয়।

আতপ ও ছায়া—রৌদ্র সেবন করিলে তৃষ্ণা, পিত্ত, শরীরের উত্তাপ, স্বেদ, মূৰ্চ্ছা, ভ্রম ও রক্তদোষ জন্মে এবং ছায়া সেবন দ্বারা ঐ সকল নষ্ট হয়।

ব্যায়াম—শরীরের আয়াস অর্থাৎ পরিশ্রম জনক কার্য্যমাত্রকেই ব্যায়াম বলা যায়। নিয়মিতরূপে ব্যায়াম করিলে অতিরিক্ত জনিত কোন রোগই আক্রমণ করিতে পারে না। ব্যায়ামের পর সর্ব্ব শরীর উত্তমরূপে এবং সুখজনক ভাবে মর্দ্দন করান উচিত।

ব্যায়াম দ্বারা শরীরের পুষ্টি হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল সুবিভক্ত হয়, কান্তি বৰ্দ্ধিত হয়, অগ্নির দীপ্তি হয়, আলস্য থাকে না, শরীর [illegible] লঘু ও দৃঢ় হয়, শ্রম, ক্লান্তি, পিপাসা, শীত,

ও গ্রীষ্ম সহ্য করিতে পারা যায় এবং পরম আরোগ্য লাভ হইয়া থাকে। ব্যায়ামের ন্যায় শরীরের স্থৌল্যনাশক আর কিছুই নাই। ব্যায়ামশীল ব্যক্তিকে সহজে জরা আক্রমণ করিতে পারে না। ব্যায়ামশীল ব্যক্তির শরীরের মাংস দৃঢ় হয়। ক্ষুদ্র মৃগ সকল যেমন সিংহকে আক্রমণ করিতে পারে না, সেইরূপ ব্যায়াম ও উদ্বর্ত্তনকারী ব্যক্তিকে রোগ সকল আক্রমণ করিতে পারে না, ব্যায়ামকারী ব্যক্তির তরুণ বয়স না থাকিলেও তাহাকে দেখিলে সুন্দর বোধ হয়। নিত্য ব্যায়াম করিলে বিরুদ্ধ (দুগ্ধ মৎস্য একত্র ভোজন)—যে কোন প্রকার গুরু খাদ্য আহার করা যাউক না কেন, তাহা নির্দ্দোষরূপে পরিপাক প্রাপ্ত হয়।

বলবান এবং স্নিগ্ধ ভোজনকারী ব্যক্তির পক্ষে ব্যায়াম বিশেষ হিতকর। শীতকালে এবং বসন্ত কালে ব্যায়াম বিশেষরূপে হিতকর।

বলের অর্দ্ধেক পরিমাণ ব্যায়াম করিবে। ইহার অধিক করিলে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। হৃদয়াস্থিত বায়ু যখন মুখে উপস্থিত হয় অর্থাৎ যখন হাঁপাইতে হয় বা হাঁ করিয়া শ্বাস টানিতে হয়, তখন অর্দ্ধেক বল পরিমাণ ব্যায়াম করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রান্তরে কথিত হইয়াছে যে, যখন বগল, কপাল, নাসিকা, এবং হস্ত পদাদিতে ঘর্ম্ম সঞ্চার হইবে এবং মুখ শুষ্ক হইবে তখন বলের অর্দ্ধেক পরিমাণ ব্যায়াম করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

বয়স, বল, দেহ, দেশ, কাল, ও খাদ্য সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখিয়া ব্যায়াম করিতে হয়। ইহার অন্যথা করিলে রোগ জন্মিয়া থাকে।

অতিরিক্ত ব্যায়ামবশতঃ ক্ষয়, তৃষ্ণা, অরুচি, বমি, রক্তপিত্ত, ভ্রম, ক্লান্তি, কাস, শোষ, জ্বর ও শ্বাস প্রভৃতি রোগ জন্মিয়া থাকে।

রক্তপিত্ত, শোষ, শ্বাস, কাস, ভ্রম ও ক্ষত রোগগ্রস্ত ব্যক্তির এবং স্ত্রীসহবাসবশতঃ ক্ষীণ ব্যক্তির পক্ষে ব্যায়াম নিষিদ্ধ। আহারের পর ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য নহে।

শাস্ত্রে ব্যায়াম সম্বন্ধে যথেষ্ট লিখিত হইয়াছে। শাস্ত্রোক্তি নিম্নে পরিস্ফুট করা যাইতেছে।

ব্যায়ামের উপকারিতা—ব্যায়ামের উপকারিতা সম্বন্ধে যাহা শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে, তাহার উপর কিছু বলা ধৃষ্টতা মাত্র। কিন্তু ব্যায়াম ব্যতীত শরীর যে সুস্থ থাকিতে পারে না. সে সম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্প আছে। নিম্নে তাহা লিখিত হইল।

কোন সময়ে এক ঋষি—মানব কিসে নীরোগ হয়—এই বিষয় বৃক্ষতলে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময় একটী পক্ষী যদৃচ্ছা ক্রমে উড়িয়া আসিয়া সেই বৃক্ষের শাখায় উপবিষ্ট হইল। পক্ষীমাত্রেই মধ্যে মধ্যে ডাকিয়া থাকে, এই পক্ষীটীও বৃক্ষ শাখায় বসিয়া ডাকিল। কিন্তু পাখীর ডাকে একটু বিশেষত্ব ছিল। পাখী ডাকিল, "কোহরুক্।" পক্ষী আপনার অভ্যস্ত শব্দই করিয়াছিল, কিন্তু তরুতলস্থ ঋষি সেই ডাক শুনিয়া মনে করিলেন, যে আমি যাহা ভাবিতে ছিলাম,—পাখী সেই বিষয়েই প্রশ্ন করিয়াছে "কোহরুক" অর্থাৎ নীরোগ কে? কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া ঋষি উত্তর করিলেন, "হিতভুক" অর্থাৎ যে ব্যক্তি হিতকর দ্রব্য ভোজন করে সেই নীরোগ। কিন্তু ইহাতে পাখীর ডাক থামিল না। পাখী আবার ডাকিতে লাগিল "কোহরুক।" ঋষি ভাবিলেন যে,—উত্তর [illegible]

চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, কেবল হিতকর দ্রব্য খাইলেই নীরোগ হওয়া যায় না, সমান পরিমাণে আহার করা আবশ্যক। কারণ হিতকর দ্রব্যও অল্প বা অধিক পরিমাণে আহার করিলে রোগ হইয়া থাকে। সুতরাং তিনি উত্তর করিলেন,'—হিতভুক্ মিতভুক্' অর্থাৎ হিতকর দ্রব্য পরিমিত মাত্রায় যে আহার করে সেই নীরোগ। কিন্তু অদ্যাপি পাখীর ডাক থামিল না। পাখী আবার ডাকিতে লাগিল 'কোহরুক্?' ঋষি ভাবিলেন, এবারেও উত্তর সম্যক হয় নাই। তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, কেবল হিতকর দ্রব্য পরিমিত ভাবে আহার করিলেই শরীর সুস্থ থাকেনা, পরিমিত আহার ব্যতীত ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইবে কিরূপে? এবার তিনি উত্তর করিলেন, 'হিতভুক্ মিতভুক্ শ্রমোপভুকরশ্চ,' অর্থাৎ যে ব্যক্তি হিতকর দ্রব্য পরিমিত ভাবে আহার করে এবং পরিশ্রম করিয়া আহার করে, সেই নীরোগ। পাখীটী যেন উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়াই অন্যত্র চলিয়া গেল।

ব্যায়াম কাহাকে বলে,—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে! শরীরের আয়াস বা শ্রমজনক কার্য্যের নাম ব্যায়াম। অন্যত্র কথিত হইয়াছে যে, শরীরের যে চেষ্টা দ্বারা দেহ দৃঢ় ও সবল হয় তাহাকে ব্যায়াম বলে। ফলতঃ যাহাতে শরীরের যাবতীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দৃঢ় হয়, তাহাকেই সম্পূর্ণ ব্যায়াম বলা যায়। পথ পর্য্যটন দ্বারাও আয়াস হয় বটে কিন্তু পদদ্বয় যেরূপ সঞ্চালিত হয়, অন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সেরূপ সঞ্চালিত হয় না। কুস্তি, ডন করা প্রভৃতিও ব্যায়াম পদ বাচ্য। অধুনা স্যাণ্ডো সাহেবের আবিষ্কৃত নানা প্রকার উত্তম ব্যায়ামের প্রচলন হইয়াছে।

কুলি-মজুর প্রভৃতি ইতর শ্রেণীর লোক যথেষ্ট পরিশ্রম করে বলিয়া তাহাদের আর স্বতন্ত্র ব্যায়াম করিবার আবশ্যক হয় না। যে সকল দরিদ্র স্ত্রীলোক সংসারের যাবতীয় কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহাদেরও যথেষ্ট শ্রম হয় বলিয়া স্বতন্ত্র ব্যায়াম অনাবশ্যক। এতদ্ভিন্ন অন্য সকলেরই নিত্য নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ আজকাল গাড়ী-ঘোড়া—যান বাহনের প্রাচুর্য্যের দিনে লোকে বেশী হাঁটিয়া চলে না, পূর্ব্বে ভদ্রলোকে কোন দ্রব্যাদি বহিয়া লইয়া যাইতে সঙ্কুচিত হইতনা। কিন্তু এখন লোকে শ্রমসাধ্য কোন কার্য্য স্বহস্তে করা অপমানজনক বোধ করে। সেইজন্য সকলের পক্ষেই নিত্য কিছুক্ষণ ব্যায়াম করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এই ব্যায়াম হীনতা দেশে অজীর্ণাদি বিবিধ রোগের প্রাবল্যের মূল।

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, বলবান এবং স্নিগ্ধ ভোজনকারীদিগের পক্ষে ব্যায়ামে অভ্যস্ত হওয়া হিতকর। ইহাতে বিপর্য্যয় বাক্যের বৈপরীত্য দ্বারা বুঝা যায় যে, দুর্ব্বল এবং রুক্ষভোজীদিগের পক্ষে ব্যায়াম হিতকর নহে। বাঙ্গালী জাতি এক্ষণে দুর্ব্বল এবং রুক্ষভোজী। সুতরাং এখনকার বাঙ্গালীর ব্যায়াম করিতে হইলে অল্প মাত্রায় ব্যায়াম করা উচিত। অল্প ব্যায়াম দ্বারা ক্রমশঃ শরীরের বল বর্দ্ধিত হইলে পরে সম্যক্ ব্যায়াম [illegible]রা যাইতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ (ঘৃত মাখন প্রভৃতি) ভোজনও আবশ্যক।

বয়স, বল, শরীর, দেশ, কাল ও খাদ্য সম্বন্ধে বিচার করিয়া ব্যায়াম করা উচিত। বয়স অর্থে বাল্য ও বৃদ্ধ অবস্থায় ব্যায়াম করা উচিত নহে। বালকেরা যে ছুটাছুটি করিয়া

খেলা করে, তাহাতেই তাহাদের যথেষ্ট ব্যায়াম হয়। বৃদ্ধ বয়সে ব্যায়াম করিবার সামর্থ্য থাকে না এবং এই বয়সে সংক্রমণ (পাইচারি করা) হিতকর। যৌবনে সম্যক্ এবং প্রৌঢ় বয়সে সহ্য মত ব্যায়াম করা উচিত। বলবানের পক্ষে সম্যক্ ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য। দুর্ব্বলের পক্ষে অল্প ব্যায়াম বা সংক্রমণ হিতকর। কৃশ শরীরে অল্প ব্যায়াম করা বা সংক্রমণ করা উচিত। মধ্য-শরীরীর সম্যক ব্যায়াম করা উচিত। স্থূল শরীরে সহ্যমত ব্যায়াম করা উচিত। অবশ্য ব্যায়াম স্থৌল্য নাশক বলিয়া স্থূল শরীরীর যথেষ্ট ব্যায়াম হিতকর। কিন্তু সহ্য না হইলে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

শীতপ্রধান দেশে অধিক এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অল্প ব্যায়াম সহ্য হয়। শীত ও বসন্তকালে অধিক এবং অন্যান্য ঋতুতে অল্প ব্যায়াম করা উচিত। স্নিগ্ধ ও বহুভোজীদিগের পক্ষে অধিক এবং রুক্ষ ও অল্প ভোজীদিগের পক্ষে অল্প ব্যায়াম করা উচিত।

অতিরিক্ত ব্যায়ামের দোষ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। গ্রন্থান্তরে লিখিত আছে যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি ব্যায়াম, হাস্য, ভাষ্য (কথা বলা), পথ-পর্য্যটন মৈথুন ও রাত্রিজাগরণ—কর্ত্তব্য হইলে অতিরিক্ত মাত্রায় সেবন করিবে না। কারণ এই সমস্ত এবং এইরূপ অন্যান্য বিষয় যে ব্যক্তি অতিরিক্ত মাত্রায় সেবন করে,—গজ যেমন সিংহকে আকর্ষণ করিলে বিনষ্ট হয়—সেইরূপ সে ব্যক্তিও সহসা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে আজকাল অনেক দুর্ব্বল বালকদিগকে অতিরিক্ত ব্যায়াম করিতে দেখা যায়। শাকান্নাহারী দুর্ব্বল বাঙ্গালী যুবক জলে ভিজিয়া বা রৌদ্রে পুড়িয়া একঘণ্টা বা ততোধিক কাল ফুটবল খেলিলে অতিরিক্ত ব্যায়াম করা হয় বলিয়াই আমাদের মনে হয়। এইরূপ অতিরিক্ত ব্যায়াম সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। অতিরিক্ত নিদ্রা সেবনও অহিতকর। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে ;—

"সুখ, দুঃখ, পুষ্টি, কৃশতা, বল, অবল, সমস্তই নিদ্রার আয়ত্ত। অকালে নিদ্রা সেবন করিলে বা একেবারে নিদ্রা সেবন না করিলেও পরমায়ু ক্ষয় করিয়া থাকে।

সত্য ও সিদ্ধিপ্রদ বুদ্ধি যেমন যোগিগণকে ভজনা করে, সেইরূপ যুক্তিযুক্তভাবে নিদ্রা সেবন করিলে সুখ ও দীর্ঘ আয়ুঃ মনুষ্যকে আশ্রয় করে।

এক্ষণে দেখা যাউক—যুক্তিযুক্ত রূপে নিদ্রা সেবন কাহাকে বলে? প্রথম রাত্রিতে শয়ন করিয়া শেষরাত্রে গাত্রোত্থান করিলেই যুক্তিযুক্ত রূপে নিদ্রা সেবন করা হয়। দিবসে নিদ্রা যাওয়া এবং রাত্রিজাগরণ—উভয়ই অহিতকর। অত্যধিক দিবানিদ্রা সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ, শিরঃশূল, শরীর আর্দ্রবস্ত্রাবৃতবৎ বোধ, শরীরের গুরুতা, অঙ্গ মর্দ্দ (গা আড়ামোড়া করা,) অগ্নিমান্দ্য, হৃদয়ের কফপিত্ততা, শোথ, অরুচি, গা বমি বমি করা, নাকমুখ দিয়া জল পড়া, আধ্‌কপালে, গাত্রে চাকা চাকা দাগ হওয়া, পিড়কা, কণ্ডু, তন্দ্রা, গলরোগ, স্মৃতি ও বুদ্ধির নাশ, স্রোতঃ সমূহের রোধ, জ্বর, ইন্দ্রিয় সমূহের দুর্ব্বলতা প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়। অপিচ, দিবানিদ্রা শরীরের স্নিগ্ধতা কারক এবং রাত্রি জাগরণ রুক্ষতা জনক। কিন্তু বসিয়া বসিয়া ঘুমান বা তন্দ্রা—রুক্ষ নহে এবং অভিষ্যন্দীও নহে।

দিবানিদ্রা এইরূপ অহিতকর [illegible]

কালে শরীর অত্যন্ত রুক্ষ হয়, বায়ু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং রাত্রি অত্যন্ত ছোট বলিয়া এই সময়ে দিবানিদ্রা হিতকর। অপিচ যে সকল ব্যক্তি গীত, অধ্যয়ন, মদ্য, মৈথুন শ্রমজনক কর্ম্ম, ভারবহন ও পথ পর্য্যটন বশতঃ কৃশ হইয়াছে, অজীর্ণরোগ গ্রস্ত, ক্ষত রোগ গ্রস্ত, ক্ষীণ, বৃদ্ধ, বালক, ও দুর্ব্বল ব্যক্তি, তৃষ্ণা, অতিসার, শূল, শ্বাস ও হিক্কা রোগগ্রস্ত ব্যক্তি, কৃশ উচ্চস্থান হইতে পতিত ও আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তি, উন্মাদ-রোগী, যানারোহণ ও রাত্রি জাগরণ বশতঃ ক্লান্ত ব্যক্তি, ক্রোধ, শোক ও ভয়পীড়িত ব্যক্তি এবং দিবানিদ্রায় অভ্যস্ত ব্যক্তির পক্ষে দিবানিদ্রা হিতকর।

যাহাদের শরীর মেদো বহুল, যাহারা নিত্য স্নেহ পান করে, যাহাদের শরীরে শ্লেষ্মা অধিক, যাহারা শ্লেষ্মা জনিত রোগগ্রস্ত এবং যাহারা বিষপীড়িত—তাহাদিগের পক্ষে দিবা নিদ্রা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

যে সকল ব্যক্তির নিদ্রা হয় না, তাহাদের পক্ষে তৈলাভ্যঙ্গ, গাত্রে হরিদ্রাদি মর্দ্দন, স্নান, জলচর জন্তুর মাংসরস, শালি তণ্ডুল, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মদ্য, মনের সুখ, মনের প্রিয় গন্ধ ও শব্দ, গা টেপান, চক্ষুর তর্পণ, মস্তকে ও মুখে সুগন্ধি দ্রব্য লেপন, প্রশস্ত শয্যায় শয়ন, সুখময় গৃহে বাস প্রভৃতি হিতকর। এই সকল দ্রব্য নষ্ট-নিদ্র ব্যক্তির নিদ্রা পুনরানয়ন করে।

দেহ সম্বন্ধে আহার যেরূপ আবশ্যক, নিদ্রাও সেইরূপ আবশ্যক। আহার ও নিদ্রা হইতে শরীরের কৃশতা বা স্থূলতা সম্পাদিত হয়।

নিদ্রা নানা প্রকার, যথা, তমোগুণ বশতঃ উৎপন্ন, শ্লেষ্মাধিক্য হইতে উৎপন্ন, মন ও শরীরের শ্রম হইতে উৎপন্ন, আগন্তুক হেতু হইতে উৎপন্ন, রোগ ধর্ম্মে উৎপন্ন এবং রাত্রির স্বভাব হইতে উৎপন্ন। তন্মধ্যে রাত্রির স্বভাব হইতে যে নিদ্রা উৎপন্ন, সেই নিদ্রাকেই যথার্থ ভূতধাত্রী (জীবের প্রতিপালন কারিণী) বলা যায়। যে নিদ্রা তমোগুণ হইতে উৎপন্ন, তাহা পাপের মূল এবং অন্যান্য নিদ্রা রোগের কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

চরকোক্ত পঞ্চকর্ম্ম সাধন।

[বমন ও বিরেচনের ক্রিয়া]।

বমনেতে ঊর্দ্ধদিকে দোষ হৃত হয়।
বিরেচনে অধোদিকে হরে তা' নিশ্চয়॥
অথবা শরীর মল করে নিঃসরণ।
উভয়ের সংজ্ঞা তাই হয় বিরেচন॥
বিরেচন দ্রব্য সব করিলে সেবন।
স্ববীর্য্য প্রভাবে করে হৃদয়ে গমন॥
ধমনী সংযোগে স্থূল সূক্ষ্ম স্রোতঃ হতে।
শুধু দোষ দ্রব করে আগ্নেয় হেতুতে॥
স্ব স্ব স্থান হইতে উহা তীক্ষ্ণতা কারণ।
বিচ্ছিন্ন হইয়া পরে হয় নিঃসরণ॥
বিচ্ছিন্ন ও দ্রবীভূত হইবার আগে।
শরীরেতে যেই জন স্নেহাদি প্রয়োগে॥
তাহাতে সংলগ্ন তাহা না থাকে কখন।
স্নেহাভ্যক্ত পাত্রে মধু না লাগে যেমন॥
প্রবলত্ব হেতু তাহা আমাশয়ে যায়।
অগ্নি, বায়ু গুণে উহা ঊর্দ্ধদিকে ধায়॥

ক্ষিতি—জলাত্মক হেতু অধোগামী হ'বে।
উভয় সংযোগে উহা দু'দিকে বহিবে॥

তীক্ষ্ণ মধ্য ও মৃদু বিরেচনের লক্ষণ।

তীক্ষ্ণ, মধ্য মৃদুভেদে বমি-বিরেচন।
বিশেষ লক্ষণ তার করহ শ্রবণ॥
বিনা বেগে দ্রব মল মহা বেগে বয়।
পায়ুতে অত্যল্প ক্লেশ অশূল হৃদয়॥
আমাশয় ক্ষীণ করি কৃৎস্ন দোষ সরে।
সে নিরূহ বিরেচনে তীক্ষ্ণ বলি ধরে॥
ঔষধ জলাগ্নি কিম্বা কীটে দুষ্ট নহে।
দেশ কাল গুণ যুক্ত তুল্য বীর্য্য রহে॥
প্রয়োগ হইলে কিছু অধিক মাত্রায়।
স্নেহ স্বেদ পরে যুক্ত তীক্ষ্ণ হয় তায়॥
পূর্ব্বোক্ত মাত্রা ও গুণে কিছু হীন হ'লে।
স্নেহ স্বেদ যোগে যুক্ত মধ্য বীর্য্য বলে॥
রুক্ষ জনে মন্দ বীর্য্য, হীন মাত্রা আর।
বিরুদ্ধ দ্রব্য সংযোগে মৃদু সংজ্ঞা তার॥
ইহাতে সম্যক দোষ না করে হরণ।
শুদ্ধ নাহি হয় তাতে বলবানগণ॥
এ ঔষধে সিদ্ধি লাভে ইচ্ছা করে যেই।
মধ্যম ও দুর্ব্বল জনে প্রয়োগিবে সেই॥
সমস্ত মধ্যম, অল্প ব্যাধির লক্ষণ।
তীক্ষ্ণ মধ্য, মৃদু তারে কহে সুধিগণ॥
রোগী ও রোগের বল অপেক্ষা করিয়া।
তীক্ষ্ণাদি ঔষধ বৈদ্য দেখে প্রয়োগিয়া॥

ঔষধ প্রয়োগের নিয়ম।

বমন-ঔষধ পান করিবার পরে।
দোষ না সারিলে তাহা পুনঃ পান করে।
পিত্ত দরশন নাহি হয় যতক্ষণ।
পুনঃ পুনঃ বমি তারে করাবে তখন॥
ত্রিবিধ রোগ ও রোগী বল অপেক্ষিয়া।
প্রয়োগ বা সর্ব্বত্যাগে কালাদি বুঝিয়া॥
ঔষধ নির্গত কিম্বা জীর্ণ যদি হয়।
অথবা দোষ নির্গত যদি তাতে নয়॥
তবে পুনর্ব্বার সিদ্ধি লিপ্সু চিকিৎসক।
প্রয়োগ করিবে তাকে দোষ নিঃসারক॥
পরিপাক পূর্ব্বে দোষ করে নিঃসরণ।
বমন ঔষধে, তথা দিলে বিরচন॥
পচ্যমান কালে দোষ নিঃসরণ করে।
পাকের অপেক্ষা তেঁই বমনে না ধরে॥
দোষ নিঃসারণ বিনা জীর্ণ বা বমিত।
হ'লে বিরেচনৌষধ পুন তাতে হিত।
দীপ্তাগ্নি ও বহুদোষ, স্নিগ্ধ অতিশয়।
তাহাদের কষ্টে হয় শোধন নিশ্চয়॥
শোধনের দিন তার ক্রিয়া না হইলে।
ভুক্তান্তে পাইবে ক্রিয়া পরে দিন দিলে॥
বহু দোষ দুর্ব্বলের সহজে না সরে।
দোষ পরিপাক পরে মলাদি নিঃসরে॥
বিরেচন দিয়া তারে না দিবে রেচন।
সারক আহারে হবে মল নিঃসরণ॥
বমি বিরেচনে যদি বিশুদ্ধ না হয়।
পানাহার অন্তরে শেষ দোষ ক্ষয়॥

শ্রীরাসবিহারী রায় কবিকঙ্কণ।

টোট্‌কা ও মুষ্টিযোগ।

—ঃ০ঃ—

শরীরের দুর্গন্ধ—

(১) কদমের পাতা, লোধ ও অর্জ্জুন পুষ্প এই তিন দ্রব্য সমানভাগে [illegible] বাটিয়া গাত্রে লেপন [illegible]

নষ্ট হয়। (২) রক্তচন্দন বেণারমূল, বালা, তেজপত্র, কুলের আটীর শাঁস, অগুরু ও নাগকেশর এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া, জল দ্বারা উত্তমরূপে বাটিয়া গাত্রে মাখিলে শরীরের চিরকালের দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া থাকে। (৩) হরিতকী, লোধ, নিমপাতা, ছাতিম ছাল ও দাড়িমের খোসা এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া একত্রে পেষণ করিয়া শরীরে লেপন করিলে শরীরের দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া থাকে (৪) হরিতকী, মুথা, রক্তচন্দন, নাগকেশর বেণার মূল, লোধ, কুড় ও হরিদ্রা এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া বাটিয়া একত্রে গাত্রে লেপন করিলে ঘর্ম্মজনিত দুর্গন্ধ নিবারণ হয়। (৫) মোটা এলাচ, শঠী, তেজপত্র, রক্তচন্দন, হরীতকী, সজিনাছাল, মুথা, কুড় এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া বাটিয়া গাত্রে লেপন করিলে শরীরের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়। (৬) কাঁচা হরিদ্রা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া গাত্রে মাখিলে শরীরের দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া থাকে।

মুখের দুর্গন্ধ—

(১) আমের আটির শাঁস, জামের আটির শাঁস ও পদ্মের মূল উত্তমরূপে পেষণ করিয়া রাত্রে মুখে ধারণ করিলে মুখে দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া সুগন্ধ উৎপন্ন হয়। (২) পিপ্পলী চুর্ণ, ঘৃত ও মধু একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া সুগন্ধ বাহির হয়। (৩) মুরামাংসী, নাগকেশর ও কুড় এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে চুর্ণ করিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যা-কালে লেহন করিলে সকল প্রকার দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া থাকে।

ব্রণ ও মেচেতা—

(১) মসুর, কলাই ও কর্পূর সমান ভাগে লইয়া জলে উত্তমরূপে চন্দনের [illegible] বাটিয়া বহুবার প্রলেপ দিলে মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়। (২) শিমুল বৃক্ষের কাঁটা, কাঁচা দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে গণ্ডস্থলজাত ব্রণ আরোগ্য হইয়া থাকে। (৩) ধনে, বচ, শৈলজ ও লোধ এই চারি বস্তু সমান রূপে লইয়া জলে পেষণ করতঃ মুখে লেপন করিলে মুখ জাত ব্রণ আরোগ্য হয়। (৪) শ্বেত সর্ষপ ও তিল তৈল সমান ভাগে দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া লেপন করিলে মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি হয়। (৫) মনছাল, লোধ, দারু হরিদ্রা, হরিদ্রা ও সর্ষপ সম ভাগে জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পেষণ করিয়া মুখে প্রলেপ দিলে মুখের ব্রণ ও কৃষ্ণবর্ণ দাগ নষ্ট হইয়া সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়।

কেশের সৌন্দর্য্য সাধন—

(১) পুরাতন লোহার ঝামা, জবাপুষ্প ও আমলকী সমান ভাগে জলে বাটিয়া মস্তকে লেপন করিলে অতি অল্পকাল মধ্যে অকাল পক্ক শুক্লবর্ণ কেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়। (২) হরিতকী বহেড়া, ইক্ষুরস, ভৃঙ্গরাজের রস এবং কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা সম ভাগে লইয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে শীঘ্র শুক্লবর্ণ কেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়। (৩) গুঞ্জা ফল, মধুর সহিত পেষণ করিয়া মস্তকের যে স্থানে চুল উঠিয়া যায়, সেইস্থানে লেপন করিলে কৃষ্ণবর্ণ অতি সুশ্রী চুল উৎপন্ন হয়। (৪) যষ্টিমধু, নীলসুন্দী পুষ্প, সূচমুখীর মূল তিল, গব্যঘৃত, ছাগ দুগ্ধ ও ভৃঙ্গরাজ পত্র সম ভাগে জলে বাটিয়া কেশহীন স্থানে প্রলেপ দিলে কৃষ্ণবর্ণ ঘন কেশ উৎপন্ন হয়। (৫) [illegible] বৃক্ষের মূল, গাভী দুগ্ধ ও লোধ ছাল সম [illegible] জলে পেষণ করিয়া গব্য ঘৃতের সহিত মি[illegible] লেপন করিলে সত্বর ঘন কৃষ্ণবর্ণ কেশ [illegible] হয়। (৬) হাতীর দাঁত পোড়াইয়া [illegible]

করিয়া তাহার সহিত সম ভাগে রসাঞ্জন মিশ্রিত করিয়া কেশহীন স্থানে লাগাইলে শীঘ্র কৃষ্ণবর্ণ কেশ উৎপন্ন হইয়া হইয়া থাকে।

খুসকি, মরামাস ও উকুন—

(১) বেলের মূলের ছাল, গোমূত্রের সহিত বাটিয়া মস্তকে লেপন করিলে সমস্ত উকুন মরিয়া যায়। (২) তিল তৈল, বিড়ঙ্গ ও গোমূত্র প্রক্ষেপ দিয়া জ্বাল দিয়া নামাইয়া লইবে। উহা মস্তকে মর্দ্দন করিলে চুলের উকুন, খুসকি ও মরামাস নষ্ট হইয়া থাকে।

দদ্রু রোগের ব্যবস্থা—

(১) দদ্রু স্থান ভাল করিয়া চুলকাইয়া সোঁদালপাতার রস মর্দ্দন করিলে শীঘ্র প্রশমিত হয়। (২) শোধিত গন্ধক ওজন করিয়া সমভাগে চিনির সহিত লইয়া সরিষার তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে দদ্রু নষ্ট হইয়া থাকে। (৩) দদ্রুস্থান ভাল করিয়া চুলকাইয়া রসুনের রস মর্দ্দন করিলে সকল প্রকার দদ্রুই শীঘ্র আরোগ্য হইয়া থাকে।

ছুলির ঔষধ—

(১) পাতিলেবু, বচ ও সোহাগার খই একত্রে মিশাইয়া ছুলির উপর মর্দ্দন করিলে ছুলি শীঘ্র আরোগ্য হয়। গেঁড়োলেবুর রস মর্দ্দন করিলেও ছুলি আরোগ্য হয়।

পদ্ম কাঁটা—

মুখে সাদা সাদা চক্রের ন্যায় দদ্রুর মত একরূপ চর্ম্মরোগ উৎপন্ন হয়, উহাকে সাধারণ লোকে পদ্মকাঁটা বলে।

পদ্মের পাতা ও ডাঁটা অগ্নিতে ভস্ম করিয়া লইয়া সর্ষপ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে পদ্মকাঁটা শীঘ্র আরোগ্য হইয়া থাকে।

পাঁকুই বা হাজা—

(১) পাঁকুই বা হাজা অতি জঘন্য রোগ। উহা প্রায় স্ত্রীলোক দিগের হাতে ও পায়ে দেখিতে পাওয়া যায়। অতিরিক্ত জলে থাকিলে ঐ রোগ উৎপন্ন হয়। (২) বাবলা পাতার কাথ, অশ্বত্থের আঠা ও খদির সম ভাগে মিশ্রিত করিয়া অগ্নিতে জ্বাল দিয়া উহা একটু নরম অবস্থায় নামাইবে। ঐ কাথ লাগাইলে অচিরে পাঁকুই বা হাজা বিদূরিত হয়। (৩) ভাল আল্‌তা জলে গুলিয়া গরম করিয়া লাগাইলে পাঁকুই নষ্ট হইয়া থাকে।

শ্রীসুধাংশু ভূষণ সেন গুপ্ত।

সমালোচনা।

আয়ুর্ব্বেদীয় ধাত্রী বিদ্যা সংগ্রহ

১ম খণ্ড। কবিরাজ শ্রীহরিমোহন দাশগুপ্ত কবিরত্ন প্রণীত। প্রকাশক—কবিরাজ শ্রীনিখিল রঞ্জন সেন গুপ্ত, কবিভূষণ, বহরমপুর, ধন্বন্তরি ঔষধালয়। মূল্য ১৲ টাকা। সাধারণ লোকের বিশ্বাস, কেবল জীর্ণ-জটিল রোগেই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা চলিতে পারে, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক শস্ত্র প্রয়োগ-বিধিতে অভ্যস্ত নহেন, ধাত্রী বিদ্যার শিক্ষাও তাঁহাদের নাই। ঐ ধারণা যে অমূলক, তাহাই সপ্রমাণ করিবার জন্য গ্রন্থকার এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের [illegible]

নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত ভাবে যে সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, শৃঙ্খলার সহিত শ্রেণীবদ্ধ করিয়া তাহাই এ পুস্তকে লিখিত। প্রত্যেক শ্লোকের সরল বাঙ্গালা অর্থ লিখিয়া তন্নিম্নে প্রমাণকরণ উদ্দেশে মূল শ্লোক গুলিও দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য অতি মহৎ। ধাত্রীবিদ্যার সকল গূঢ় রহস্যই তিনি এ পুস্তকে সুকৌশলে গ্রথিত করিয়াছেন। ঋতুকাল হইতে সন্তান পালন পর্য্যন্ত কিরূপ নিয়মে স্ত্রীজাতির কালক্ষেপ করা কর্ত্তব্য, তাহার কোন কথাই গ্রন্থকার বাদ দেন নাই। রমণিগণ এ গ্রন্থ পড়িয়া অনেক কথা শিখিতে পারিবেন। তবে পুস্তক খানির মূল্য আর একটু কম করিলে ভাল হইত। ৮০ পৃষ্ঠার পুস্তকের মূল্য ১৲ টাকা হওয়া উচিত নহে, প্রতি ফর্ম্মা ⁄০ হিঃ ৷৵০ এবং বাঁধানর জন্য আরও ৵০—মোট ৸০ করিলেই বেশ হইত। যাহা হউক আমরা এ পুস্তক পড়িয়া সুখী হইয়াছি।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

:o:

মাদক দ্রব্য।—সুরা, সিদ্ধি, গাঁজা, অহিফেন, চরস এবং কোকেন প্রভৃতি মাদক দ্রব্য ব্যবহারে ভারতবাসীর যে ভয়ঙ্কর অনিষ্ট হইতেছে, ইহা উপলব্ধি করিয়া, সংপ্রতি ইংলণ্ড, আফ্রিকা এবং ভারতবর্ষের অনেক গুলি প্রথিত নামা চিকিৎসকের স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞাপন পুস্তিকা প্রচারিত হইয়াছে। উহাতে এইরূপ লিখিত আছে,—"বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষা দ্বারা ও ভূয়োদর্শনের ফলে জানিতে পারা গিয়াছে,—(ক) সুরা, কোকেন, অহিফেন, সিদ্ধি, গাঁজা ও চরস বিষ। (খ) ভারতবর্ষের ন্যায় উষ্ণ প্রধান দেশে ঐ সকল বিষ অত্যল্প মাত্রায় ব্যবহার করিলেও স্বাস্থ্যের অপচয় ঘটিয়া থাকে। ঐ সকল মাদক দ্রব্য কোনরূপ শারীরিক বা মানসিক কষ্ট দীর্ঘকালের জন্য দূর করিতে পারে না। (গ) যাঁহারা সুরাপান বা অন্য কোন মাদক দ্রব্য ব্যবহার করেন না, তাঁহারা মাদকসেবীদিগের অপেক্ষা অধিক কষ্ট সহ্য করিতে সক্ষম এবং সকল প্রকার সংক্রামক পীড়ার হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হন। (ঘ) সুরাপানের কুফল এক পুরুষ পরেও প্রকাশ পাইয়া থাকে। (ঙ) দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে সুরাপায়ী ব্যক্তিগণ অতি শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। (চ) সুরাপানের ফলে প্লেগ নিবারণ করিতে পারা যায় না। (ছ) ম্যালেরিয়া এবং যক্ষ্মারোগের বীজাণু শরীরে প্রবেশ করিলে সুরাপায়িগণ অতি শীঘ্র ঐ রোগে আক্রান্ত হয়। যাঁহারা সুরাপায়ী নহেন, ঐ সকল বীজাণু তাঁহাদিগকে সহজে ক্লিষ্ট করিতে পারে না। (জ) সুরা সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইল, সিদ্ধি, গাঁজা, চরস, অহিফেন সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যাইতে পারে। (ঝ) এইজন্য আমরা ভারতবাসীদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা সকল প্রকার মাদক দ্রব্যের হস্ত হইতে [illegible] থাকিয়া তাঁহাদের সনাতন শাস্ত্রাদেশ [illegible] সামাজিক প্রথানুসারে পানাহারের [illegible] করুন।" সনাতন শাস্ত্রাদেশ এবং সামাজিক প্রথা ভুলিয়াই তো আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

বিশ্বৎ সভা।—নিখিল [illegible]

জাতির সম্মিলনে কলিকাতায় যে "বিদ্বৎ সভার" প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্যাবলীর ৬ষ্ঠ উদ্দেশ্য—"আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি ও সুশিক্ষার ব্যবস্থা।" কিন্তু এ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে তাহার কিরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। ঐ সভার মুখপত্র—'ধন্বন্তরিতে'ও চিকিৎসা বিষয়ক কোন প্রবন্ধ বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের মনে হয়,—সভা এখনো এ বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিতে সক্ষম হন নাই। কিন্তু বৈদ্যজাতির অবস্থা দিন দিন যেরূপ চাকরিতগত প্রাণে শোচনীয় হইতেছে, তাহাতে বরপণ নিবারণের মত আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার জন্যও এই সভার কর্ত্তৃপক্ষগণের উঠিয়া-পড়িয়া লাগার দরকার হইয়াছে। আমরা আশা করি, সভার কর্ত্তৃপক্ষগণ আমাদের এই যুক্তিপূর্ণ কথা-গ্রহণে কালবিলম্ব করিবেন না।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মেলন।—শ্রীযুক্ত রাজা নরেন্দ্রনাথ নিখিল ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদ সম্মেলনের নবম বার্ষিক অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, শ্রীযুক্ত লালা সৈন্দদাস আয়ুর্ব্বেদ প্রদর্শনী সমিতির সভাপতি এবং কবিরাজ শ্রীযুক্ত কাশীরাম প্রদর্শনীর তত্ত্বাবধায়ক মনোনীত হইয়াছেন।

দান।—মালদহ-চাঁচোলের বদান্যবর রাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী বাহাদুর সংপ্রতি কলিকাতা-অনাথ আশ্রমে পাঁচ হাজার, বোবা ও কালাদিগের স্কুলে দুই হাজার এবং বৈদ্যনাথ কুষ্ঠাশ্রমে দুই হাজার টাকা দান করিয়াছেন। আগামী ৮ই চৈত্র তাঁহার পুত্রের উপনয়ন, সেই উপলক্ষে নৃত্য গীতাদিতে অর্থের অপব্যয় না করিয়া এই দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। দেশের ধনকুবেরদিগের তো এইরূপ মতি গতি হওয়াই কর্ত্তব্য।

পরলোক।—কলিকাতার অতিবৃদ্ধ কবিরাজ কুমারটুলির দুর্গাপ্রসন্ন সেন মহাশয় গত ১ চৈত্র পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৯০ বৎসর হইয়াছিল। ইনি একজন সুপণ্ডিত ও সুচিকিৎসক ছিলেন। ইদানিন্তনকালে ইঁহার মত বৃদ্ধ বৈদ্য কলিকাতায় আর কেহ ছিলেন না। আমরা ইঁহার বিয়োগে যথেষ্ট ব্যথা অনুভব করিয়াছি। ভগবান ইঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রাণে শান্তি প্রদান করুন।

অকাল মৃত্যু।—আমরা আর একটি উদীয়মান যুবক কবিরাজের অকাল মৃত্যুতে বিশেষ ব্যথিত হইয়াছি। ইঁহার নাম কবিরাজ রাখালচন্দ্র সেন, এল-এম-এস। গত ১লা চৈত্র ইনি আত্মীয় স্বজনকে কাঁদাইয়া, বন্ধু-বান্ধব দিগকে শোক সাগরে নিমজ্জিত করিয়া, চির দিনের জন্য অনন্ত ধামে গমন করিয়াছেন। মেডিকেল কলেজের চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ইনি সনাতন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক যথেষ্ট উন্নতি করিতেছিলেন। ইনি যুবা মাত্র—ইঁহার বিয়োগে ইঁহার পরিবার বর্গের বিলক্ষণ ক্ষতি হইল।

বৈদ্য বান্ধব সমিতি।—গত ৩রা চৈত্র ৩১-৩৫, শিবনারায়ণ দাসের লেনে বৈদ্য বান্ধব সমিতির তৃতীয় বার্ষিক সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। অনেক গুলি বৈদ্য সন্তান এই সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ সেন সভাপতি হইয়াছিলেন। সময়োপযোগী দুই খানি সঙ্গীত গীত হইয়াছিল। কয়েকজন বক্তা বক্তৃতাও করিয়াছিলেন। এরূপ জাতীয় সম্মিলনের ফল [illegible] সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক

২য় বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৫—বৈশাখ। | ৮ম সংখ্যা।

নব বর্ষে প্রার্থনা।

—o✻o—

এস নূতন বর্ষ—হর্ষ-ভরেতে স্পর্শ করহ ধরা,
তাহে হউক মত্ত চিত্ত তাহারি ক্ষিপ্ত আকুল করা।
তব হাস্য জড়িত আস্যখানি
অঙ্গ মাঝারে রঙ্গে ছানি'—
ওগো হউক মগ্ন ভগ্ন-হৃদয়—ঘুচুক রুগ্ন-জরা।

এস নূতন বর্ষ হর্ষ-ভরেতে স্পর্শ করহ ধরা,
এস শান্ত করিতে স্তব্ধ-হিয়াটি—রুদ্ধ যাতনা ভরা।
কণ্ঠে তোলহ রাগিণী-দীপ্ত,
অমিয়-বর্ষণে করহ সিক্ত,—
ওই সুধার বর্ষণে স্নাত-তনুটি রহুক তোমাতে গড়া।

এস নূতন বর্ষ হর্ষ-ভরেতে স্পর্শ করহ ধরা,
তব মঙ্গল-গীতি বহুক বঙ্গে তাপ-দহন-হরা।
ক্ষুব্ধ স্মৃতিটি করহ লুপ্ত,
লুব্ধ আশাটি রাখহ গুপ্ত,
ওগো স্নিগ্ধ করহ দগ্ধ-হৃদয়—তপ্ত বালুকা-চড়া।

এস নূতন বর্ষ হর্ষ-ভরেতে স্পর্শ করহ ধরা,
ওগো অতীত কাহিনী লুপ্ত করিয়া লইয়া নূতন ছড়া।
মর্ম্ম মাঝারে ধর্ম্ম রাশি
গর্ব্ব-বাতাসে বহুক আসি'—
তাহে পুণ্য-হাসিটি উঠুক ফুটিয়া—শুভ্র-বসন পরা।
এস নূতন বর্ষ হর্ষ-ভরেতে স্পর্শ করহ ধরা,
তাহে হউক মত্ত চিত্ত তাহারি ক্ষিপ্ত আকুল করা।

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন।

SURGEON সুশ্রুত।

:o:

[প্রথম অধ্যায়]

সে এক উন্মাদনাময় সাহসের কথা। এখনও সে ঘটনা, নীলাকাশে নক্ষত্র-ধবল-ছায়াপথের মত, প্রাচীনের স্মৃতি-পথে সমুজ্জ্বল! দেশের তখন বড় দুর্দ্দিন। সমাজে দুইটী দলে রীতিমত সমর ঘোষণা আরম্ভ হইয়াছে। এক-দল অতীতের অনুরাগী হইয়া "রক্ষণ শীলতার" পরিচয় দিতেছেন। অপর দল "সংস্কারের ধুয়া ধরিয়া প্রাচীন প্রথা পদদলিত করিতেছেন! একে অন্যের ছলান্বেষণ করিয়া, হাসি-কান্নার ইন্দ্রধনু গড়িতেছেন! বাঙ্গালার তখন এইরূপ বিভীষিকাময়ী অবস্থা। সর্ব্বত্রই ভাঙা-গড়ার বিপুল আয়োজন, উত্থান-পতনের অপূর্ব্ব দ্বন্দ্ব!

এই উদয়াস্তের সন্ধিস্থলে—নবযুগের অভ্যুদয়ের সূচনায় বাঙ্গালার সকল কেন্দ্রেই এক একজন মহাপুরুষ "অবতারের" মত অবতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সকলের কথা আজ আমাদের আলোচ্য নহে। আমরা কেবল মধুসূদন গুপ্তের কীর্ত্তি-কাহিনী ইঙ্গিতে উল্লেখ করিব।

যে সময়ের কথা বলিতেছি—সে সময় বাঙ্গালার বিজ্ঞান-জগতও বিশৃঙ্খল। যদিও বৌদ্ধযুগে ভারতের শল্যতন্ত্র নাম-শেষে পরিণত হইয়াছিল, তথাপি সেই ধ্বংসাবশেষ হইতে ইষ্টক-প্রস্তরাদি আহরণ করিয়া অনেকেই শিল্প-সুষমাময়-সৌধ-হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। ভারতেরই কেবল এ চেষ্টা ছিল না। ভারতের দেখাদেখি—বাঙ্গালারও অধঃপতন ঘটিয়াছিল। বাঙ্গালী অতীতের শ্লাঘাময়ী স্মৃতি ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। স্বাধীন চিন্তাকে অভিনন্দন করিবার প্রবৃত্তিই বাঙ্গালীর ছিল না। শাস্ত্রের শাসন- নীতির অনুজ্ঞা, বাঙ্গালীর মেধা-মনীষার বিকাশ-পথ বিঘ্ন-বাধায় নিবিড় করিয়া তুলিয়াছিল।

"আয়ুর্ব্বেদ" যাহাদের জাতীয় জীবনে সারাদপিসার স্বর্গীয় বিভূতি, তাহাদেরই অধস্তন পুরুষ—ঘৃণা-কুটিল-নেত্রে আয়ুর্ব্বেদের [illegible] উপেক্ষার অপাঙ্গ নিক্ষেপ [illegible]

বর্ণের গুরু—তাঁহারাই প্রথমে প্রত্যক্ষের অমর্যাদায় আত্মনিয়োগ করিয়া, আপ্তবাক্যের উপর নিভরশীল হইয়াছিলেন। যে শরীর—"শারীর বিজ্ঞানের" সর্ব্বস্ব, বাঙ্গালার বৈদ্য সে শরীরের গঠন-কৌশল বুঝিতে চাহিতেন না। তাঁহারা শিখিয়াছিলেন—মৃত শরীর স্পর্শে অশুচি হইতে হয়। সমাজে তখন শব-ব্যবচ্ছেদ মহা পাপের কার্য্য। তপোবনের পাষাণ-বেদিকায় বসিয়া ঋষি যে দিন—"কুশলেনাভিপন্নং তদ্ বহুধাভি প্ররোহতি" বলিয়া রক্ষামন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সেদিন সেই জীবন্মুক্ত বৈজ্ঞানিক ত্রিকালজ্ঞ হইয়াও বুঝিতে পারেন নাই—তদীয় আবির্ভাবকালের সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বর্ষ পরে তাঁহারই বংশধরগণ—তাঁহার আশা আকাঙ্ক্ষাকে এইরূপে অন্তর্জলি করিবে।

অন্যূন আড়াই হাজার বৎসর পরে—অপ-ধর্ম্মের মালিন্য ও অজ্ঞানতার গাঢ় অন্ধকারের মাঝে, বঙ্গের দুঃখ-শোকদীর্ণ-জরা-মরণ-জীর্ণ নরলোকে, বিপদ ভঞ্জন মধুসূদনের আবির্ভাব। ঋষি যুগের শল্যতন্ত্র তখন নরসুন্দরের নিজস্ব সম্পত্তি। সমাজ শাসন শিথিল করিয়া, কেহই তখন শবদেহ স্পর্শ করিতে সাহস করে নাই। অথচ তখন সারাবঙ্গে একটা অভূতপূর্ব্ব "ওলট-পালট চলিতেছিল। হিন্দুর গোঁড়ামী—শিক্ষিত সমাজে ধিক্কৃত হইতেছিল। হিন্দু সন্তান মরীচিকার পশ্চাতে ছুটিয়া, পাদ্রির বক্তৃতা শুনিয়া অনায়াসেই ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিতেছিল। কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া—সৌম্যমূর্ত্তি ইংরাজ—বাঙ্গালীর শিক্ষা-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিজ্ঞানে, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সাম্প্রদায়িক প্রভেদ নাই। বিশ্বের বিজ্ঞানে বিশ্ববাসী মাত্রেরই সমান অধিকার। বিজ্ঞান—সাধারণতন্ত্র সম্ভূত সামগ্রী;—সুতরাং সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বজনিক। তাহা একের বলিয়া, অন্যের হেয় বা অন্যকে অদেয় হইতে পারে না। বিজ্ঞান ঐশ্বরিক আশীর্ব্বাদ, প্রকৃতির প্রধান প্রসাদ, বিজ্ঞানের মুক্ত প্রাঙ্গণ—পৃথিবীর জগন্নাথ ক্ষেত্র। সেখানে যবন নাই, ব্রাহ্মণ নাই,—জাতিভেদ সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না। যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণের মত, ইংরাজ যখন সাম্য-নাদের ফুৎকার দিয়া, বিজ্ঞানের 'পাঞ্চজন্য' বাজাইতেছিলেন, হিন্দু-সমাজ তখন শুদ্ধিতত্ত্বের উদ্ভট শ্লোক আওড়াইয়া, বাস্তবকে কল্পনার মাধুরী মাথাইতেছিল। দেশের এই স্মৃতি-সর্ব্বস্ব যুগে, শুভ-মুহূর্ত্তে—বিজ্ঞানের উদার আহ্বান, একমাত্র মধুসূদনেরই কর্ণবিবরে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। সে দিন বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর বড় শুভদিন। চতুর্দ্দিকের বিঘ্ন-বহুল বাধা, দুই পায়ে ঠেলিয়া, মহা মনস্বী-মধুসূদন মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদের জন্য সব্যসাচীর মত নিপুণ হস্তে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। সে'দিন উৎসবময়ী কলিকাতা অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছিল। বিরাট বিশ্বমণ্ডলে—এই মহানন্দের মহা কাহিনী ঘোষণা করিবার জন্য—ইংরাজের বিজয়-দুর্গ হইতেও মুহুর্ম্মুহুঃ তোপধ্বনি হইয়াছিল। যে দেশে শবদেহ স্পর্শ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, সমাজে পতিত হইতে হয়, সেই দেশে এক তরুণ সুন্দর যুবা—স্বয়ংসিদ্ধ সঙ্কীর্ণচেতাদের বিরাগ-বিদ্রূপ নীরবে সহিয়া, অবজ্ঞা ও উপেক্ষার মাঝে বীরের মত দাঁড়াইয়া, বিশ্ব-মানবের কল্যাণ-সাধনে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়া, বিজ্ঞান-রাজ্যের সার্ব্বজাতিক ভূমি মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিয়াছে—একথা যে শুনিয়াছিল, সেই বিস্মিত হইয়াছিল। দেশ-মুক্তি-

মধুসূদনকে দেখিবার জন্য—রাজপথের মহতী জনতা বাত্যা-তাড়িত-সমুদ্রের মত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। মধুসূদনকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য—সেদিন নগরবাসীগণ নগর-সজ্জার ত্রুটী করে নাই। হিন্দুর চিন্তাশক্তির অধোগতির এই জ্বলন্ত উদাহরণ প্রত্যক্ষ করিয়া, সুরলোকের সারস্বত-মন্দিরে কেবল একজনের চক্ষু অশ্রুবাষ্পে ভরিয়া উঠিয়াছিল। তিনি মহর্ষি সুশ্রুত। তাঁহারই স্মৃতি-চর্চ্চার জন্য—এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধের অবতারণা।

"সার্জ্জন সুশ্রুত" নামে প্রবন্ধের নামকরণ হইয়াছে। বাস্তবিক 'সুশ্রুতে'র মত পাকা সার্জ্জন বোধ হয় পৃথিবীতে অল্পই আবির্ভূত হইয়াছেন। আমাদের নরজন্ম লাভ করিবার এই প্রধান সফলতা যে, আমরা সেই মহাত্মার দেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। তাঁহারই মাতৃভূমির জল-বায়ু ও সূর্য্যালোক, আমাদের শরীরে প্রাণস্পন্দন আনিয়া দিয়াছে। কিন্তু আমরা ত সে অপূর্ব্ব মহত্বের সমাদর করিতে শিখি নাই। তাই ভারতের অস্ত্র-চিকিৎসা ভারতবাসীর অবহেলায় নির্ব্বাসিত-অপরাধীর মত, বিস্মৃতির ক্রোড়ে নীরবে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছে। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ যে অস্ত্র চিকিৎসায়—সকল দেশের শিক্ষাগুরু ছিলেন, আজ আমরা তাহা বিশ্বাস করি না। আজ আমরা য়ুরোপের শল্যতন্ত্র দেখিয়া তাহার নৈপুণ্যের প্রশংসা করি,—কিন্তু সে নৈপুণ্য যে ঋষিযুগের সাধনার একটু ক্ষীণ আভাষ মাত্র—আমরা তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। ইতিহাস আমাদের সে ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। এখন আমরা অনেকেই জানিতে পারিয়াছি—পৃথিবীর শল্যতন্ত্র ভারতের অপরাঙ্মুখ অনুসন্ধানের কাছেই ঋণী। অঙ্গ বিনিশ্চয় বিদ্যায় 'সুশ্রুত' যাহা বলিয়া গিয়াছেন.—পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান তাহার অতিরিক্ত বড় কিছু বলিতে পারেন নাই।

সুশ্রুত প্রণীত গ্রন্থের নাম "সুশ্রুত সংহিতা"। বর্ত্তমান যুগে "সুশ্রুত সংহিতা" আয়ুর্ব্বেদের অন্যতম প্রতিনিধি। সুশ্রুত চরকের অপেক্ষাও প্রাচীন হইতে পারেন, কেন না, চরকসংহিতায় সুশ্রুতের ইঙ্গিতোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সুশ্রুত একজন আদর্শ অস্ত্র-চিকিৎসক, কাশীরাজ 'ধন্বন্তরি' তাঁহার উপদেষ্টা; সুশ্রুতের পিতার নাম "বিশ্বামিত্র।" সুশ্রুতের ব্যক্তিগত জীবনের কথা, ইহার চেয়ে বেশী জানা যায় না।

শারীর বিদ্যা, শারীর তত্ত্ব, নিদান, শল্যতন্ত্র (Surgical Treatment), ধাত্রীবিদ্যা, স্ত্রীরোগ, অস্ত্রবিধি, অগদ [Antedotes to Poisons], কৌমার ভৃত্য [The treatment of Infants and of the Puenpen at state), শস্ত্রসাধ্য-চিকিৎসা, ইন্দ্রিয়-বিজ্ঞান, গর্ভ ব্যাক্রান্তি, ভৈষজ্যবিধান, ভূতবিদ্যা [ইহার মধ্যে জীবাণু তত্ত্বেরও আভাষ পাওয়া যায়], রসায়ন,—চিকিৎসা বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই সুশ্রুতের অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। ব্রাহ্মণের সূক্ষ্ম হেতুবাদ, উপনিষদের তত্ত্বস্পর্শী গভীরতা, বিজ্ঞানের বাস্তব রহস্য,—সুশ্রুত রচিত সংহিতার প্রত্যেক অধ্যায়ে সত্যের নিশ্বাসে জাগ্রত! সে জন্ম-মৃত্যুর-আক্ষেপ-বিক্ষেপ, সে অকপট-অধ্যবসায়, সে উদার অগ্রগামিত্ব,—বুঝি আর কোথাও এমন যুগপৎ সম্মিলিত হয় নাই! মানুষকে ঈশ্বর বলিলে যদি দেবতার অবমাননা না হয়, আমরা 'সুশ্রুতকে'ই ঈশ্বর বলিতে পারি। [illegible] মত বৈজ্ঞানিক, সুশ্রুতের মত [illegible] প্রকৃতির বকে আর বুঝি [illegible]

নাই। তত্ত্বদর্শীর নিপুণ দৃষ্টি লইয়া, একবার যদি তোমরা সুশ্রুতসংহিতার হিরণ্ময় অধ্যায় পড়িতে পার, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি—তোমাদের নব্যতা-সুলভ-জ্ঞানের অহঙ্কার চির-দিনের মত চূর্ণ হইয়া যাইবে। সে স্বভাব-বিপুলা-প্রতিভার চরণে—তোমাদের সভ্যতাভি-মানী-উচ্চশির আপনা আপনি নত হইয়া পড়িবে। তোমরা যতই আত্মবিস্মৃত হইয়া থাক না কেন, ইংরাজী শিক্ষার গৌরব-গর্ব্বে তোমাদের স্নায়ু মণ্ডলের যতই উত্তেজনা থাকুক না কেন, "সুশ্রুত" পড়িলে তোমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবে—মৃত্যু-মলিন-মর্ত্ত্যের মাটিতে সে যে জ্ঞান-গবেষণার অনন্ত ভাণ্ডার! সুশ্রুতের ভিতর যে সকল তত্ত্ব নিহিত, অদ্যাপি তাহা অনেক জাতির জ্ঞান-গোচরও হয় নাই। সুশ্রুতের পদতলে বসিয়া পৃথিবীর বিজ্ঞান এখনও অনেক বিষয় শিখিতে পারে। য়ুরোপের অমন জীবন্ত বিজ্ঞানও—এমন কোন নূতন কথা বলিতে পারে নাই,—যাহার 'স্বপ্ন-ছায়া' সুশ্রুতে দেখিতে পাওয়া যায় না।

সার্জ্জন সুশ্রুতের সর্ব্ব প্রধান বিশেষণ—"পুরুষ ছেত্তা"। এই 'পুরুষছেত্তা' শব্দের অপভ্রংশেই প্রাচীন মিশরের 'পয়স ছিস্তাস' (ডিসেক্টার) শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। যিনি শবচ্ছেদ করেন—তাঁহারই গরীয়ান্ অভিধান-'পুরুষ ছেত্তা'। সুশ্রুত শবচ্ছেদ করিতেন। ভগ্নাস্থির সন্ধান, প্রনষ্ট শল্যের উদ্ধার, ব্রণের শোধন, রোপণ, উৎসাদন, অবসাদন প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহার মত কৃতিত্ব কোন চিকিৎসকই দেখাইতে পারিবেননা। সুশ্রুতের সময় "এক্সরে" ছিল না, কিন্তু তিনি এমন প্রলেপ জানিতেন—যাহার সাহায্যে শল্যের অবস্থান-স্থান সহজেই নিরূপিত হইত।

যকৃত বা প্লীহায় ফোঁড়া হইলে সুশ্রুত তাহা শস্ত্র প্রয়োগে ভেদ করিতে পারিতেন। তিনি মূত্রাশয়ের অশ্মরী (পাথুরী) কাটিয়া বাহির করিতেন। যন্ত্রের সাহায্যে মূঢ়গর্ভ আহরণ করিতেন। উদরে আঘাত লাগিয়া ছিন্ন অন্ত্র বাহির হইয়া পড়িলে, তিনি তাহা যথাস্থানে পুনঃ স্থাপিত করিয়া সেলাই করিয়া দিতেন। জলোদরের জলস্রাব করাইতেন। চক্ষুরোগে তাঁহার মত লঘু হস্তে অস্ত্র প্রয়োগ করিতে কয়জন চিকিৎসক পারেন? বিবর্ত্তন (flexion) আবর্ত্তন ক্রমে তিনি যে গর্ভিণীর সুখ-প্রসবের বিধি-ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন, ধাত্রী-পরীক্ষা, সন্তান পরীক্ষা অধ্যায়ে তিনি যে সকল যুক্তিপূর্ণ উপদেশ দিয়াছেন, একবার তোমরা তাহা প্লেফেয়ারের 'মিড্‌ওয়াইফারির' সঙ্গে মিলাইয়া দেখিও—মনে হইবে উহা বুঝি সুশ্রুতেরই ইংরাজী অনুবাদ। আজকাল তোমরা যে 'ব্যাসিলি থিওরীর' গুমর করিয়া থাক, তাহাও সুশ্রুতের অজ্ঞাত ছিলনা। সুশ্রুত মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন.—রাজযক্ষ্মা,—কতকগুলি জ্বর, কতকগুলি পাপজ ব্যাধি,—ইহারা সংক্রামক। কুষ্ঠের কৃমি আছে। গর্ভাবস্থায়, পাণ্ডুরোগে রক্তের লাল কণিকা কমিয়া যায়। রক্তাতিসার ও ক্ষয়রোগ জনিত উরঃক্ষতে আভ্যন্তরিক ক্ষতের চিকিৎসা করিতে হয়। বিসর্প রোগের (ইরিসিপ্লাস্) পরিণামে সর্ব্ব শরীরস্থ রক্ত বিষাক্ত হইয়া উঠে। রক্তার্ব্বুদ থাকিলে রোগী কিছুতেই বাচেনা। সর্প দংশন করিলে হৃদয়ে রক্তশল্য জন্মায়, সেই জন্য শ্বাস কৃচ্ছ্রতায় দংশিত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। সন্নিপাত ও বিসূচিকা রোগে, হৃদয়ে রক্তের চাপ বাঁধিতে থাকে.—তাই সদৃশ চিকিৎসা তত্ত্ব মতে—উক্ত রোগে সর্পবিষ মহৌষধি।

ক্ষয়রোগে হৃদপিণ্ডে কোটর উৎপন্ন হয়। কি অমানুষিক দক্ষতার সহিত—সুশ্রুত যে এ সকল তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছেন, তাহা দেখিলে বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়!

এক্ষণে অনেকের বিশ্বাস—১৬২৮ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম হার্ভি নামক এক সাহেব, শরীরে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার (circulation of the blood প্রথম আবিষ্কার করেন। কিন্তু য়ুরোপের বৈজ্ঞানিকগণ শুনিয়া বিস্মিত হইবেন—হার্ভির জন্মগ্রহণের বহু শতাব্দি পূর্ব্বে, ভারতেরই এক ফল-মূলাশী বৃক্ষতলবাসী ঋষি, এই রক্তের গতি আবিষ্কার করিয়া ছিলেন। তাঁহার নাম সুশ্রুত। 'সুশ্রুত' কৃত সংহিতায় লিখিত হইয়াছে—" * * * তস্য চ হৃদয়, স্থানং। স হৃদয়াচ্চতুর্বিংশতীং ধমনী রন্থপ্রবিশ্য * * কৃৎস্নং শরীর মহরহস্তর্পয়তি, বর্দ্ধয়তি ধারয়তি যাপয়তি জীবয়তি যাদৃষ্ট হেতুকেন কর্ম্মণা।" আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে—মহর্ষি সুশ্রুত শোণিত-সঞ্চালন-ক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক-মীমাংসা করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—রক্ত বাহিনী-শিরামণ্ডলীর দ্বারা, রক্ত সমস্ত দেহে চলাচল করিয়া থাকে। এই সকল শিরা যকৃৎ ও প্লীহা হইতে উদ্গত হইয়া সমগ্র শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। প্রকৃতিস্থ অবস্থায় রক্ত যতক্ষণ স্বীয় শিরায় বিচরণ করে, ততক্ষণ ধাতুর পূরণ, বর্ণের ঔজ্জ্বল্য সাধন স্পর্শ জ্ঞানের তীক্ষ্ণতা—প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে। সেই রক্ত দূষিত হইলে শরীরে রক্ত জন্য নানাবিধ ব্যাধির আবির্ভাব হইতে দেখা যায়। হার্ভি সাহেব রক্তের গতির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—কিন্তু এ তত্ত্ব যে সর্ব্ব প্রথম ভারতেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল,—একথা আর অস্বীকার করা চলে না।

'পুরুষ ছেত্বা' সুশ্রুত—শিরা, ধমনী, স্নায়ু, প্রভৃতির প্রসার সংস্থিতি, রসাদি ধাতুর পরস্পর পরিণতি,—বাতবাহী শিরামণ্ডলীর কার্য্য প্রভৃতি, যেরূপ নিপুণভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পড়িলে মনে হয়,—মহর্ষির মত চিন্তাশক্তি প্রতিভা ও গবেষণা—অদ্যাপি বিজ্ঞান-জগতে দুর্ল্লভ। কেবলমাত্র সুশ্রুত পড়িলেই তোমরা বুঝিতে পারিবে—আয়ুর্ব্বেদের মত সম্পূর্ণ চিকিৎসা—পৃথীবীর আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

য়ুরোপের জীবন্ত-বিজ্ঞান বলিতেছে,—সেল্ প্রটোপ্ল্যাসমের বিপাকই জীবন। কিন্তু ইহাতেও গুরুতর সংশয় বিদ্যমান। সেলের জীবন আছে, জীবন তাহাতে উৎপন্ন হয় না। তবে জীবনীশক্তি কি? সে শক্তি তোমার সেলপ্রটোপ্ল্যাসমের চেয়েও সূক্ষ্ম—তাহার নাম "ওজঃ বিন্দু"। তাই সুশ্রুত আত্মজ্ঞ জীবনীশক্তিকে পুরুষ নামে অভিহিত করিয়াছেন। তোমাদের নিদান বা আময়িক শারীর (Morbid Anatomy) ব্যাধির স্বরূপ বলিতে পারে না, তাহার বাসস্থানের নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারে। আমাদের সুশ্রুত বলেন—"তদ্দুঃখসংযোগাশ্চ-ব্যবধায়ঃ। স এব অনুষ্ঠানম্।" ইহা—পাকা দার্শনিকের কথা, ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষের কথা, সর্ব্বজ্ঞ ভগবানের কথা। জগতে সকল শক্তির ন্যায় জীবনী শক্তিরও বিকাশ—ব্যোমিক বিস্ফুরণের ভিতর দিয়া। "প্রণব" এই বিস্ফুরণেরই সঙ্কেত মাত্র। তুমি, আমি, জগৎ—ওঙ্কার বা আদিম বিস্ফুরণের প্রসব, তাই আমাদের শারীরিক পরমাণু নিয়তই বিস্ফুরণশীল॥ ইহাকেই কি তোমরা "[illegible] মুভমেণ্ট" বল না? [illegible] স্ফুরণের সাম্যাবস্থা [illegible]

বিকার। সুশ্রুতের এই বার্ত্তিক, হারীত সংহিতায় বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। সে সত্য বহুযুগ পরে মহাত্মা হ্যানিম্যানের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। সত্য চিরদিন এক। বিজ্ঞান-জগতে—সুশ্রুত, হারীত ও হ্যানিমানে কোন প্রভেদ থাকিতেই পারে না।

সুশ্রুত যেখানে ঔষধের কথা বলিতেছেন, সেখানে তিনি একজন পাকা রসায়নবিদ্। আয়ুর্ব্বেদ বলেন—" দ্রব্যের বীর্য্যে ব্যাধি নষ্ট হয়।" সুশ্রুত বলেন—গুণের গুণ থাকিতে পারে না, কেন না গুণ—নির্গুণ, " নির্গুণাশ্চ গুণা স্মৃতাঃ।" অতএব ঔষধি তত্ত্বে সুশ্রুতের স্থির সিদ্ধান্ত, দ্রব্যের পরিণতি অপরিণতি ভেদে বৈষম্য থাকিতে পারে, রসের পরিবর্ত্তন হইতে পারে, বিপাক ও সকল ক্ষেত্রে একরূপ হইতে পারে না। সুতরাং আরোগ্য-কল্পে—দ্রব্যের বীর্য্যই প্রধান। কিন্তু রস গুণ, বীর্য্য—দ্রব্য ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না, অতএব দ্রব্য লইয়াই অনুসন্ধান আরম্ভ করিতে হইবে। বীর্য্য যদি অচিন্তনীয় ও অবিনশ্বর হয়, তবে দ্রব্যের বিশুদ্ধ বীর্য্যই সেবন করা উচিত। তাহার সঙ্গে কতকগুলা জড় আবর্জ্জনা মিশাইবার আবশ্যকতা নাই। এই জন্যই মর্দ্দন, সন্তাপ, পীড়নপ্রভৃতির সাহায্যে—সুশ্রুত দ্রব্যের জড়ধর্ম্ম নষ্ট করিবার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। সুশ্রুতের অনুজ্ঞা—তৈল বা ঘৃত শতবার ধৌত করিও, সহস্রবার পাক করিও, লক্ষবার মর্দ্দন করিও। তাহাতে দ্রব্যের বীর্য্য বিশুদ্ধ হইবে, তাহার জড়াত্মিকা ধর্ম্ম নষ্ট হইবে। জীবনও শক্তি, বীর্য্যও শক্তি, শক্তি না হইলে শক্তিকে আহত করিতে পারে না। সূক্ষ্ম না হইলে সূক্ষ্মে আঘাত করা অসম্ভব।

সুশ্রুত যেখানে রোগ তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতেছেন, সেখানেও তিনি অন্যের কাছে অপরাজেয়—আদর্শ বৈজ্ঞানিক। আনবিক বিস্ফুরণের সাম্যাবস্থা নষ্ট হইলে, পরমাণু পুঞ্জের তাপের তারতম্য হয়। শারীর ক্ষেত্রে এরূপ তাপ বৃদ্ধি হইলে পিত্ত বৃদ্ধি হয়, বায়ু অর্থাৎ দৈহিক তাড়িৎ শক্তি বিপর্য্যস্ত হয়, শৈত্য বা শ্লেষ্মা কমিয়া যায়। এই সকল কথা ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিও, সেলপ্রটোপ্লাসম্ তত্ত্বকে অনেক স্থূল বলিয়াই মনে হইবে।

সুশ্রুত ছিলেন "বৈজ্ঞানিক" ও "দার্শনিক"—অতি সংক্ষেপে আমি তাহার পরিচয় দিলাম। সুশ্রুত-প্রণীত-সংহিতার সমালোচনা করিতে পারি, সে শক্তি আমার নাই। সুশ্রুতের আমলে এ দেশের অস্ত্র চিকিৎসা কত উন্নত ছিল, এইবার তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিব। ইহাতে আর কিছু উপকার না হউক—ভারতের অতীত গৌরবের একটী জ্যোতির্ম্ময় অধ্যায় এই আত্মবিস্মৃত জাতির নয়ন-সমক্ষে নিশ্চয়ই উদ্ঘাটিত হইবে। নব্য যুবকগণেরও সুশ্রুত পাঠে অনুরাগ জন্মিবে।

অস্ত্র চিকিৎসার উৎপত্তি।—প্রাচ্য-পাশ্চাত্য—উভয় দেশেরই পণ্ডিত মণ্ডলী—"অথর্ব্ব বেদকে" চিকিৎসা বিজ্ঞানের আদি গ্রন্থ বলিয়া থাকেন। আমার গুরু স্থানীয় অসাধারণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ১৩১২ সালে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি প্রমাণ করিয়াছিলেন—সাম বেদেই শারীর বিদ্যা ও শল্য বিদ্যার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। ত্রিবেদী মহাশয়ের মত মৌলিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ—বাঙ্গালা ভাষায় বড় বেশী দেখিয়াছি

বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার বিশ্বাস—বৈদিক যজ্ঞে নিহত পশুর ছেদিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নাম হইতে আয়ুর্ব্বেদীয় শারীরবিদ্যার উৎপত্তি। বাস্তবিক সামবেদ আলোচনা করিয়া লেখকের মনেও এ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে। রামেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন – 'নিহত পশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শাম নামক ছুরিকা দ্বারা কাটিয়া পৃথক করা হইত। যে ব্যক্তি এই কর্ম্ম করিত, তাহার নাম শমিতা। যজ্ঞ ভূমির সংলগ্ন যে স্থানে এই কর্ম্ম নিষ্পাদিত হইত, সেই স্থানের নাম শামিত্র দেশ। সেই খানেই অগ্নি জ্বালিয়া পশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পাক করা হইত। যে অগ্নিতে পাক হইত, তাহার নাম শামিত্র অগ্নি।"

এইরূপে পশুর বিবিধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জ্ঞান হইতে বৈদিক-যুগের পরবর্ত্তী কালে, শারীরবিদ্যার অঙ্গবিনিশ্চয় ব্যাপার ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদে আমরা অনেক গুলি বৈদিক পরিভাষার সংগ্রহ দেখিতে পাই। বাহুল্য ভয়ে তাহাদের আর উল্লেখ করিলাম না।

সুশ্রুতের সময়ে আয়ুর্ব্বেদীয় অস্ত্র চিকিৎসার প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। এখন পাশ্চাত্য-জগৎ যেমন তাহার "শল্য বিদ্যা" লইয়া সর্ব্ব সমক্ষে সগৌরবে দণ্ডায়মান, সুশ্রুতের যুগে ভারতবাসীও সেইরূপ শল্যতন্ত্রের গর্ব্ব প্রকাশ করিতে পারিত। কিন্তু সুশ্রুতের অত্যুন্নত শল্যতন্ত্র একেবারেই—অতটা বিপুল বিস্তার লাভ করে নাই। সুশ্রুতের পূর্ব্ব হইতেই তাহার ক্রম-বিকাশের সম্ভাবনা। তবে বৈদিক-যুগের পর হইতে সুশ্রুতাবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত —এই সুদীর্ঘকালের কোন ইতিহাসই আমরা পাই নাই। বেদের গল্প-গাথায়, পুরাণের মনোজ্ঞ উপন্যাসে, কেবল এই মাত্র জানা যায়, —দেবাসুরের যুদ্ধের সময় জগতে প্রথম শল্য বিদ্যার উৎপত্তি। সেকালে অশ্বিনী-কুমারদ্বয় —নামজাদা অস্ত্র চিকিৎসক। তাঁহারা সৃষ্টি-কর্ত্তা ব্রহ্মারও ছিন্নশির সংযোজন করিয়াছিলেন। ইহার পরই স্বর্গবৈদ্য 'ধন্বন্তরি' কাশীরাজ 'দিবোদাস' নামে—অস্ত্র চিকিৎসার প্রবর্ত্তক।

সুশ্রুতের আবির্ভাব কাল।—

ধন্বন্তরির দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে সুশ্রুত সর্ব্ব প্রধান। সুশ্রুত স্বকৃত সংহিতায় নিজের মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে সতীর্থ ঔপধেনব, ঔরভ্র, পৌষ্কলাবত—এই তিনজনেরও মত সংকলন করিয়াছেন। সুশ্রুত-সহাধ্যায়ীগণের শল্যতন্ত্র অধুনা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং, শল্যতন্ত্রে তাঁহাদের অভিজ্ঞতার ফল কিছুই জানিবার উপায় নাই। তবে বৈদিক যুগের পর, সুশ্রুতের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে সময়—তাহার মধ্যেও ভারতে বহু শল্যতন্ত্র রচিত হইয়াছিল। এখন সুশ্রুতই আমাদের অস্ত্র চিকিৎসার আদি ও প্রধান গ্রন্থ। 'বাগভট' সুশ্রুতের বহু পরবর্ত্তী, অস্ত্র চিকিৎসার উপদেষ্টা হইয়া 'বাগভট' কেবল সুশ্রুত হইতেই সার সঙ্কলন করিয়া নিরস্ত হইয়াছেন। কিন্তু 'বাগভটে'র গ্রন্থে সুশ্রুতোক্ত ব্যতীত কতকগুলি নূতন অস্ত্রেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

হর্ণেল সাহেব সুশ্রুতকে বৈদিক-যুগের লোক বলিয়াছেন। আমরা কিন্তু সুশ্রুতকে অথর্ব্ব বেদের পরবর্ত্তী বলিয়াই বিশ্বাস করি। হইতে পারে এ ধারণা ভ্রান্ত। অথর্ব্ব বেদের "আয়ুষ্যানি" ও "ভৈষজ্যানি" মন্ত্র [illegible] করিলে, সে সময়ের চিকিৎসা-প্রণালী [illegible] মন্ত্র-তন্ত্র-প্রধান ছিল—[illegible]

সন্দেহই থাকে না। কিন্তু চরকও সুশ্রুতের চিকিৎসার মত যেরূপ সুসংবদ্ধ, যুক্তিপূর্ণ, ও গবেষণাময়, তাহাতে চরক-সুশ্রুতকে অথর্ব্ব বেদের পরবর্ত্তী বলিয়াই মনে হয়। এই উভয় গ্রন্থের ভাষাও—শেষ ব্রাহ্মণের ভাষা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—সুশ্রুতের প্রকৃত কাল-নির্ণয় কখনই সম্ভবপর নহে। সুশ্রুত সম্বন্ধে কেবল এইটুকু বলিতে পারা যায় যে, ডল্বনাচার্য্য বলিয়াছেন—নাগার্জ্জুন সুশ্রুতের প্রতি-সংস্কার কর্ত্তা। তিনি নাকি উত্তর তন্ত্রেরও রচয়িতা। ইহা যদি বিশ্বস্ত প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে বলিতে হয়,—সুশ্রুত হয় ত খৃষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দিতে বর্ত্তমান ছিলেন। কেননা নাগার্জ্জুনের জন্মকাল—খৃষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দি বলিয়া, কেহ কেহ প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়াছেন। নাগার্জ্জুন সুশ্রুতের নিশ্চয়ই পরবর্ত্তী। আবার সুশ্রুত যে প্রাচীন গ্রন্থ, পঞ্চম-শতাব্দির সংকলিত—Bower Manuscript পাঠে আমরা ইহা জানিতে পারি। বার্ত্তিক সূত্রে লিখিত হইয়াছে—"সুশ্রুতেন প্রোক্তং সৌশ্রুতং।" ইহার দ্বারাও সপ্রমাণ হইতে পারে—সুশ্রুত খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দিরও পূর্ব্বে ভারতভূমিতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

অঙ্গ বিনিশ্চয় বিদ্যা।—সুশ্রুত কর্ত্তৃক উপদিষ্ট "অঙ্গ বিনিশ্চয় বিদ্যা", য়ুরোপের শারীর তত্ত্ব অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। শারীরতত্ত্বে সুশ্রুত যাহা লিখিয়াছেন—তাহা তাঁহার 'শোনা কথা' নহে,—"প্রত্যক্ষ দর্শনে"র অভিজ্ঞতা।

মানব দেহে সুশ্রুত—ত্বক ৭টী,

কলা	৭টী
আশয়	৭টী
দ্বার	৯টী
কন্তরা	১৬টী
জাল	১২টী
কূর্চ্চ	৬টী,
রজ্জু	৪টী,
সেবনী	৭টী,
অস্থি	৩০০ খানি
অস্থিসন্ধি	২১০টী
স্নায়ু	৯০০
পেশী	৫০০
শিরা	৭০০
মর্ম্ম	
অন্ত্র	১০৭

বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছিলেন। ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ, স্বরূপ, অবস্থান, কার্য্য, শক্তি, সন্ধান—সুশ্রুত বেশ নিপুণতার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত কথা উদ্ধৃত করিতে পারি, আমাদের সে শক্তি ও সময় নাই। আমরা কেবল উদাহরণ স্বরূপ যৎ-কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান করিতেছি। যিনি বিশেষ বিবরণ জানিতে চাহেন, তিনি সুশ্রুত-সংহিতা পাঠ করিবেন।

অস্ত্র-চিকিৎসা।

এইবার সুশ্রুতোক্ত অস্ত্র চিকিৎসার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিব।

অস্ত্র-চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ভারত যে পৃথিবীর সকল দেশেরই শিক্ষাগুরু—অনেক উদারহৃদয় মহাপ্রাণ য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক একথা মুক্তকণ্ঠে অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করিয়াছেন। শরীরের একস্থান হইতে চর্ম্ম কাটিয়া লইয়া যে অন্য স্থানে তাহা লাগানো যাইতে পারে,—য়ুরোপ এ

রহস্য সুশ্রুতের নিকটই অবগত হইয়াছিল। ওয়েবার সাহেব স্বয়ং ইহা স্বীকার করিয়াছেন। চক্ষুরোগে অস্ত্রপ্রয়োগ—ইহাও ইউরোপ ভারতীয় শল্য বৈদ্যের নিকট শিক্ষা করিয়াছে। ডাক্তার হির্সবার্গ ইহা স্বীকার করিয়াছেন। এ বিদ্যা—প্রাচীন গ্রীক, মিসর বা অন্যজাতি, পূর্ব্বে জানিত না।

এখন যে যে স্থলে বা যে যে রোগে—ডাক্তারগণ অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া থাকেন, সুশ্রুত তাহা সমস্তই জানিতেন। সুশ্রুতোক্ত অস্ত্র চিকিৎসা আট ভাগে বিভক্ত। যথা—

১। ছেদ্য। (ছেদন করা)
২। ভেদ্য। (ভেদ করা)
৩। লেখ্য। (চর্ম্ম চাঁচিয়া তোলা)
৪। বেধ্য। (শিরা বিদ্ধকরণ)
৫। এষ্য। (নাড়ীব্রণাদির সীমা সন্ধান)
৬। আহার্য্য। (অশ্মরী, মূঢ়গর্ভ প্রভৃতি আহরণ বা বাহির করা)
৭। বিস্রাব্য। (স্রাব করণ)
৮। সীবন। (সেলাই করা)

ইহা ভিন্ন—বন্ধন ক্রিয়া, বস্তিকার্য্য (ডুস্, পিচকারী প্রয়োগ) ক্ষার ও অগ্নিকার্য্যে—সুশ্রুতের অনানুষিক দক্ষতা ছিল। অস্ত্র প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে তৎ-কর্ম্মোপযোগী যন্ত্র অস্ত্র, বস্ত্রখণ্ড, তুলা, সূত্র, পাখা, উষ্ণজল, হিম-জল, প্রভৃতি—বলবান্ পরিচারকগণ সংগ্রহ করিয়া রাখিত। অর্শ, অশ্মরী, উদর, মূঢ়গর্ভ ভগন্দর, ও মুখরোগাদিতে অস্ত্র প্রয়োগ করিতে হইলে,—রোগীর আহারের পূর্ব্বেই তাহা সম্পন্ন হইত। পাছে কোন সূক্ষ্মশিরা বা স্নায়ু কাটিয়া গিয়া রোগীর কোনও অত্যাহিত ঘটে,—সে বিষয়ে সুশ্রুতের বড় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।

অস্ত্রোপচারের শেষে—

অস্ত্রোপচারের শেষে—ক্ষতস্থানের রক্তপূয় নিষ্কাষিত করিয়া কষায় জলে, ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া, তিল, মধু প্রভৃতি পচন নিবারক ভেষজ বস্ত্রখণ্ডে মাখাইয়া তাহার দ্বারা ক্ষত আবৃত করা হইত। ইহার পর স্নিগ্ধ, স্বেদ ও বন্ধন। বন্ধন প্রত্যহই খোলা হইত এবং ক্ষতস্থান প্রত্যহ কষায় জলে প্রক্ষালিত হইত। ডাক্তারেরা যেমন ড্রেস্ করিয়া থাকেন, সুশ্রুত ঠিক্ তেমনি করিতেন। অস্ত্র ক্রিয়ায় তাঁহার উপদেশ গুলি, কি ডাক্তার, কি কবিরাজ—সকলেরই পাঠ করা উচিত। সুশ্রুতের ব্রণ চিকিৎসা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।

সার্জ্জন সুশ্রুত ১২৫ প্রকার অস্ত্র ব্যবহার করিতেন। ঐ সকল অস্ত্রের দুইটী শ্রেণী ছিল। এক শ্রেণীর নাম যন্ত্র, অপর শ্রেণীর নাম শস্ত্র। যন্ত্রের সংখ্যা ১০১ প্রকার, শস্ত্র ২৪টী। ঐ সকল যন্ত্র ও শস্ত্রের আকার, তাহাদের প্রস্তুত প্রণালী, উপাদান সমূহ, সুশ্রুত তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। চিত্রের অভাবে আমরা পাঠকগণকে বুঝাইতে পারিলাম না। আমরা কেবল যথাসম্ভব সংক্ষেপে—তাহার পরিচয় দিতেছি।

সুশ্রুতের মতে—চিকিৎসকের হস্তই সর্ব্ব প্রধান যন্ত্র। কেননা সকল যন্ত্রই হস্তের সাহায্যে প্রয়োগ করিতে হয়। সুশ্রুত যন্ত্রের ভিতর নিম্নলিখিত যন্ত্রগুলিকে স্থান দিয়াছেন—

স্বস্তিক যন্ত্র। ইহা চতুর্বিংশতি প্রকার। ১৮ অঙ্গুলী দীর্ঘ, দুই খণ্ড লৌহ, একটী কীলক দ্বারা আবদ্ধ। এই যন্ত্রের মুখ—সিংহ-ব্যাঘ্র, মৃগ প্রভৃতি দশবিধ পশুর এবং কাক, চিল,

শকুনি প্রভৃতি চতুর্দ্দশ প্রকার পক্ষীর মুখের আকারে নির্ম্মিত হইত।

সন্দংশ যন্ত্র। ইহা সাঁড়াশী ও সন্নার আকারে, প্রয়োজনের অনুরূপ নির্ম্মিত হইত।

তাল যন্ত্র। দৈর্ঘ্যে দ্বাদশাঙ্গুলী। কর্ণ-নাসিকাদির অভ্যন্তরে প্রয়োগ হইত।

নাড়ীযন্ত্র। নানা আকারে নির্ম্মিত এবং নানাকার্য্যে ব্যবহৃত হইত। অঙ্গুলিগ্রহণ প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

শলাকা যন্ত্র। ২৮ প্রকার। ইহাদের আকার নানারকম, নানাকার্য্যে ব্যবহৃত হইত।

শস্ত্রাবলী।

সুশ্রুতোক্ত শস্ত্রাবলীর নাম; যথা—১। মণ্ডলাগ্র। ২ করপত্র। ৩ বৃদ্ধি। ৪ নখ-শস্ত্র। ৫। মুদ্রিকা। ৬। উৎপল পত্র। ৭। অর্দ্ধধার। ৮। সূচী। ৯। কুশ পত্র। ১০। শারীর মুখ। ১১। আটী মুখ। ১২। অন্তর্ম্মুখ। ১৩। ত্রিকূর্চ্চক। ১৪। কুঠারিকা। ১৫। ব্রীহিমুখ। ১৬। আরা। ১৭। বেতস পত্রক। ১৮। বড়িশা। ১৯। দন্তশঙ্কু। ২০। এষণী।

বারান্তরে এই সকল শস্ত্রের ব্যবহার-প্রণালী বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ।

বৈদিক বৃক্ষাবলী।

——:o:——

বেদে অনেকগুলি ঔষধের গাছের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী চিকিৎসা গ্রন্থে ঐ সকল নামের বহু পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি বৈদিক-সাহিত্য হইতে কতকগুলি ভেষজ-বৃক্ষের নামের তালিকা প্রকাশ করিতেছি। আশা করি কবিরাজ মহাশয়েরা, তাহাদের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া দিবেন।

উদ্ভিদ্ জাতি বৈদিক যুগে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। ১ম। বনস্পতি। ২য়। বীরুধ্। বৃক্ষ বলিলে বীরুধ, বনস্পতি—দুইই বুঝাইত। ইংরাজী ভাষায় যাহার নাম Tree, বেদে তাহাই বনস্পতি, যাহাকে ইংরাজী ভাষায় plant বলে—তাহার বৈদিক নাম "বীরুধ"। এই বীরুধবর্গের মধ্যে যেগুলি ঔষধের উপাদান রূপে ব্যবহৃত হইত, ঋষিগণ তাহাদিগকে "ওষধি" নামেও অভিহিত করিতেন। বৃক্ষের যে অঙ্গকে আমরা পল্লব বলি, বৈদিক-সাহিত্যে তাহার নাম ছিল—"বল্‌শ"। বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষের বায়বীয় মূলকে বৈদিক-সাহিত্যে "বয়া" নাম দেওয়া হইয়াছিল। বয়াকে "ঝুরি" বলে, কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় "বয়া" বা তাহার কোনও প্রতিশব্দ দেখিতে পাওয়া যায় না। নিম্নে বর্ণমালার অকারাদি ক্রমে বৈদিক-সাহিত্যে উল্লিখিত ভেষজবৃক্ষের নামের তালিকা সংগৃহীত হইল।

অ—

অজশৃঙ্গী। ইহার অর্থ বাবলাগাছ। ইহার অপর একটী নাম "বল্ক"। পরবর্ত্তী সংস্কৃত গ্রন্থে "বল্ক" শব্দ পাওয়া যায় না, "বল্কল" শব্দ পাওয়া যায়। তাহার অর্থ বৃক্ষের ত্বক।

অপামার্গ। বাংলা নাম—আপাং।

অমলা। আমলকী।

অমূলা। ইহা বৃক্ষের উপর ঝুলিত, মৃত্তিকায় ইহার মূল থাকিত না। ইহার রসে শরের মুখ বিষাক্ত করা হইত। অথর্ব্ব বেদে এই পরিচয় জানা যায়।

অরটু। ইহা যে কোন্ বৃক্ষ, যায় না। ইহার কাষ্ঠে গাড়ীর চাকার "ধুরো" নির্ম্মিত হইত।

অরাটকী। ইহাকেও চিনিতে পারা যায় না।

অরুন্ধতী। ইহা লতা বিশেষ; হিরণ্যবর্ণ, ইহার নাড়িকা বা ডাঁটায় হুল থাকিত; দেখিলে 'লোমশ' মনে হইত। ইহার একটী বিশেষণ "লোমশবক্ষণা"। অথর্ব্ববেদে উল্লিখিত হইয়াছে—ঋষিগণ এই গাছ হইতে লাক্ষা সংগ্রহ করিতেন এবং ইহার রস খাইলে গো-জাতি প্রচুর দুগ্ধবতী হইত।

অর্ক। আকন্দ।

অলাপু। লাউ।

অবকা। ইহার আর একটী নাম শীপাল। গন্ধর্ব্বগণ, কণ্ঠস্বর প্রসাধনের জন্য ইহার পত্র ভক্ষণ করিতেন।

অশ্বগন্ধা। প্রস্তর গন্ধি বলিয়া বৈদিক যুগে এই ঔষধের—"অশ্ম" এইরূপ বানান ছিল। পরবর্ত্তী যুগে ইহার নাম হইয়াছে "অশ্বগন্ধা"। 'ম'য়ের স্থানে "ব" বসিয়াছে।

অশ্বত্থ।

অশ্ববার। নল জাতীয় তৃণ বিশেষ।

আ—

আদার। সংস্কৃত নাম আদ্রক। আদা।

আবয়ু। সর্ষপ।

আণ্ডীক। পদ্ম।

আল। শস্যক্ষেত্রে জন্মিত, কোন্ জাতীয় গাছ এখনও বুঝিবার উপায় নাই।

আহা। দূর্ব্বা বিশেষ।

উ

উশনা। শত পথ ব্রাহ্মণে লেখা আছে, সোমলতা না পাইলে, ঋষিরা এই গাছের রস বাহির করিয়া সোমের কাজ সারিতেন।

উদুম্বর। ডুমুর, যজ্ঞডুমুর।

উশীর। তৃণ বিশেষ, বেণা। অনুলেপনে রমণীরা ব্যবহার করিতেন। পরবর্ত্তী যুগে—বহুরোগে ইহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগ দেখিতে পাই।

ঊ

ঊষা। জ্যোতির্ম্ময়ী লতা বিশেষ।

এ

এরণ্ড। বেদে ইহার উল্লেখ নাই, কিন্তু ব্রাহ্মণে আছে।

ঐ

ঔক্ষগন্ধি। সুগন্ধি ওষধি বিশেষ। ইহার অর্থ—ষাঁড়ের গাত্রের গন্ধবিশিষ্ট দ্রব্য। কিন্তু জিনিষটা যে কি?—ঠিক্ জানা যায় না।

ক

কিয়াম্বু। শব-দাহস্থানের নিকটস্থ জলাশয়ে এই গাছ লাগাইতে হইত। মৃতদেহের সং-

কারার্থে ইহার প্রয়োজনীয়তা ছিল। ইহা শাক বিশেষ।

কুমুদ।

কুষ্ঠ। সকল রোগেই ব্যবহৃত হইত। তাই ইহার আর একটী নাম "বিশ্বভেষজ"। আয়ুর্ব্বেদে কিন্তু বিশ্বভেষজ অর্থে শুণ্ঠী বুঝায়। কুষ্ঠ হিমালয় জাত, সুগন্ধি ওষধি।

জ

জঙ্গিড়। বুঝিতে পারা যায় না। কেহ কেহ ইহাকে Terminuatia Arjuneya বলিয়া অভিহিত করেন।

কর্কন্ধু। কুষ্মাণ্ড জাতীয়। বোধ হয়—লাল কুমড়া (বিলাতী কুমড়া) হইতে পারে। উড়িষ্যা দেশে বিলাতী কুমড়ার নাম "বাঘারু"। দেশ-বিশেষে সাদা কুমড়াকেও কর্কন্ধু বলে. ইহারই অপভ্রংশ কধু বা কদু।

কাকম্বীর। কি বৃক্ষ, জানা যায় না।

কুশ।

কাশ।

কুশর। তৃণ জাতীয়, আকার বৃহৎ। ইক্ষু হইতে পারে। সংস্কৃতে "কুশর" নাম ব্যবহার হয় না। যশোহরে, উত্তর বঙ্গে কুশারি ও কুশর শব্দে ইক্ষু বুঝায়।

কিংশুক।

খ

খদির।

খর্জ্জূর। বৈদিক যুগে দীর্ঘ উকার বানান ছিল।

ত

তিল।

তিল্বক। কোন্ জিনিষ জানা যায় না।

ত্রায়মাণা। কেহ বলেন, বলাড়ুমুর, কেহ বলেন—নয়।

ন

ন্যগ্রোধ। বট।

নারাচী। বিষাক্ত গাছ। শরে ইহার রস মাখানো হইত।

প

প্লক্ষ। পাকুড়।

পাটা। শৈবাল। বাংলায় গুড় পরিষ্কারের জন্য যে পাটাশেহালা ব্যবহার হয়, তাই কি?

পিপ্পল। অশ্বত্থ।

পৃতদ্রু। পৃতদারু। হিমালয় জাত সরল বৃক্ষ।

পলাশ।

পূতিক। পূতীক। পুঁই।

প্রস্বু। চেনা যায় না।

ব

বদর। কুল।

বিল্ব।

বজ। বচ হইবে কি?

বিম্ব। তিক্তলকুচ।

বিষাক্কা। বিষাক্ত বৃক্ষ।

ভ

ভঙ্গ। অথর্ব্ব বেদোক্ত মাদকদ্রব্য। "ভাং" কি?

ম

মঞ্জিষ্ঠা।

মদুঘ। মধু উৎপাদক বৃক্ষ বিশেষ।

শ

শণ। ইংরাজী নাম hemp.

শফক। চেনা যায় না।

শালুক। জলজ পুষ্প।

শমী। Mimosa Suma। অথর্ব্ববেদে

উক্ত হইয়াছে, ইহার পত্র-রসে নেশা হয়। কেশবহুল স্থানে লাগাইলে চুল উঠিয়া যায়।

শল্মলী। শিমুল। পরবর্ত্তীযুগে আকার বসিয়া শাল্মলী হইয়াছে।

স

সোমলতা। এখন ব্যবহার নাই, চেনাও যায় না।

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ বেদান্তশাস্ত্রী।

আয়ুর্ব্বেদে ভারত বাণিজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

পূর্ব্বে চীণ, উত্তরে তুরস্ক, দক্ষিণে সমুদ্র এবং পশ্চিমে ইজিপ্ট, আরব ও য়ুরোপ—এই সকল দেশের সহিত যে ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধ—বহুযুগ পূর্ব্বেই স্থাপিত হইয়াছিল, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ভেষজ দ্রব্যের নাম-রহস্যের আলোচনা করিলেই আমরা তাহা বুঝিতে পারি। ভারতের অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য—ভারতকে একদা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে পরিণত করিয়াছিল এবং সেই সিদ্ধমন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়া, ভারত পৃথিবীর গুরুপদে অভিষিক্ত হইয়াছিল।

পিঁপুল।—আয়ুর্ব্বেদে পিঁপুলের অনেকগুলি নাম। তাহার মধ্যে "উপকুল্যা" "বৈদেহী" এবং "মাগধী" এই তিনটী প্রধান। আমার মনে হয়, এই তিনটী নামের সার্থকতা বোধ হয়—পূর্ব্বে বিদেহ বা মগধ দেশ হইতে এদেশে প্রথম আমদানি হইয়াছিল। পুরাতত্ত্ব বিষয়ক পুস্তক পাঠে আমরা বুঝিতে পারি—বিদেহ এবং মগধ দেশের লোকেই ভারতে প্রথম বাণিজ্যের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কোষকার অমর সিংহ বণিক্ পর্য্যায়ের প্রথমেই "বৈদেহকঃ" শব্দ বসাইয়াছেন। এই বিদেহ দেশ মগধেরই অন্তর্গত। য়ুরোপীয় বণিক্গণের কাছে ভারতীয় পিপ্পলীই প্রথম পরিচিত হইয়াছিল। ইংরাজীতে পিপ্পলীর নাম—pepper, ইহা পিপ্পলীরই অপভ্রংশ। বণিকগণ মলবার উপকূল হইতেই পিঁপুল, গোল মরিচ প্রভৃতি মস্‌লা সংগ্রহ করিতেন। এই উপকূলের সহিত সম্বন্ধ থাকার জন্যই বোধ হয় পিঁপুল ও মরিচের নাম "উপকুল্যা" হইয়াছে।

এলা।—এলা বা এলাইচ আয়ুর্ব্বেদোক্ত বহু ঔষধেরই উপাদান। আয়ুর্ব্বেদে—"যক্ষ কর্দ্দম" নামে একটী প্রলেপ দেখিতে পাওয়া যায়। এলাচ, কর্পূর, কস্তুরী, অগুরু—এই গন্ধ চতুষ্টয়ের সংমিশ্রণের নামই—"যক্ষ কর্দ্দম।" অমর কোষেও "যক্ষ কর্দ্দম" প্রলেপের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যক্ষ কর্দ্দমের প্রধান ও প্রথম উপাদানের নাম "এলা"। এই "যক্ষ কর্দ্দমের" কর্দ্দম হইতেই বোধ হয় এলাচের ইংরাজী নাম cardamom হইয়াছে। পূর্ব্বে এদেশ হইতে ভারতীয় বণিকগণ—এলাচ রপ্তানী করিতেন। রাজনির্ঘণ্টে এলাচের নাম "দ্রাবিড়ী" ও "সাগর গামিনী"; ইহাতে বেশ বুঝা যায়, এলাচ দ্রাবিড় দেশে উৎপন্ন হইত এবং তথাকার অনার্য্যগণ এলাচকে সাগর পথে য়ুরোপে চালান দিতেন।

লবঙ্গ।—লবঙ্গের একটী সংস্কৃত নাম—"বারি সম্ভব"। ইহা সমুদ্র মধ্যস্থিত দ্বীপে উৎপন্ন হইত, তথা হইতে ভারতে আসিত এবং বিদেশে প্রেরিত হইত।

কুষ্ঠ।—"কুষ্ঠ"—একটী গন্ধ দ্রব্য। অনেক রোগে, ঔষধার্থে ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাই। ডাক্তার অপার্ট বলেন,—ভারতীয় বণিকগণ অতি উচ্চমূল্যে ইহা রোমান্‌দের নিকট বিক্রয় করিতেন। কুষ্ঠের ইংরাজী নামও—costus.

নলদ।—"নলদ"—সুগন্ধী দ্রব্য। কবিরাজেরা তৈল পাকের সময় ইহার ব্যবহার করেন। ভারতীয় বণিক্‌গণ—ইহাও য়ুরোপে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিতেন। ইহার য়ুরোপীয় নাম Nard.

বোল (Myrrh)—"বোল" একটী প্রাচীন গন্ধ দ্রব্য। ঔষধার্থে এদেশে ইহার বহুল প্রচলন ছিল। ইজিপ্টে ইহার নাম—"বল"। "বোল" ভারত হইতে ইজিপ্টে যাইত। পরে ইজিপ্ট হইতেই ইহা য়ুরোপে চালান হইয়াছিল।

কস্তুরী।—"কস্তুরী" ভারতের একটী মূল্যবান্ গন্ধ দ্রব্য। সান্নিপাতিক রোগে, কফ রোগে, স্নায়ুদৌর্ব্বল্যে,—নাড়ীর ক্ষীণতায়, দৈহিক তাপের অভাবে, ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। সাধারণের বিশ্বাস—"কস্তুরী" মৃগ নামক পশুর নাভিদেশে জন্মে। এই জন্য ইহার নাম "মৃগনাভি"। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা হরিণের নাভি ও অণ্ডকোষের মধ্যবর্ত্তী কোষ বিশেষ। অণ্ডকোষের সংস্কৃত নাম—"মুষ্ক"। এই "মুষ্ক" শব্দ হইতেই মৃগনাভির আরবী নাম হইয়াছে—"মেস্ক"। "মেস্ক" হইতে ইহার ইংরাজী নাম—Musk। ইহার দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে—"কস্তুরী" ভারত হইতে প্রথমে আরব দেশে গিয়াছিল, পরে আরবীয়গণের নিকট হইতে—ইহা য়ুরোপের মেটিরিয়া মেডিকাতে স্থান পাইয়াছিল।

শর্করা।—"শর্করা"—ইক্ষুজাত বিকার। ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদার্থ। বৈদিক যুগ হইতে যজ্ঞ কার্য্যে এবং ঔষধার্থে ইহার যথেষ্ট ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবাসীর নিকট হইতেই য়ুরোপ শর্করার প্রস্তুত-প্রণালী এবং গুণাবলী শিক্ষা করে। তাই চিনীর ইংরাজী নাম Sugar। য়ুরোপের মহিয়সী মহিলা, মিসেস্ মেনিং—শর্করাকে ভারতজাত পদার্থ বলিয়াই স্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়াছেন। শর্করা হইতে প্রাচীন ভারতবাসীরা মিছরী প্রস্তুত করিতেন। মিছরীর সংস্কৃত নাম—"শর্করা খণ্ড"। ইহার ইংরাজী নাম Sugar candy। এমন নামগত সামঞ্জস্য সত্ত্বেও কেহ কেহ বলিয়াছেন—ভারতবাসীরা শর্করার ব্যবহার শিখিয়াছে—চীনদেশবাসীর কাছে,—তাই শর্করার নাম "চিনী"—আর মিছরী আসিয়াছিল—মিসর দেশ হইতে, তাই—তাহার অপভ্রংশে মিস্‌রী বা মিছরী নামের উৎপত্তি। তাঁহাদের ধারণা যে ভ্রান্ত, এ কথা সাহস করিয়া বলা যায়।

বাণিজ্যের রীতি—আদান ও প্রদান। ভারত যেমন বহু জিনিষ বিদেশে প্রদান করিয়াছে, তেমনি বিদেশ হইতে কিছু কিছু আদান বা গ্রহণও করিয়াছে।

যোয়ান।—যোয়ানের সংস্কৃত নাম—"যবানিকা"। তাই মনে হয়, হয়ত ইহা যবন দেশ হইতে ভারতে আসিয়াছে। তবে ইহা আমার অনুমান মাত্র—নিশ্চয় কিনা বলিতে পারি না।

সিহল।—"সিহল"—গন্ধদ্রব্য বিশেষ। অমরকোষে ইহার উল্লেখ আছে; "তুরুষ্কঃ পিণ্ডকঃ সিহেলা যবনোঽপি"। আবার বিশ্ব মেদিনীকারও লিখিয়াছেন—তুরুষ্কঃ সিহলকে ম্লেচ্ছ জাতৌ দেশান্তরেঽপিচ।" ইতিহাস পাঠে জানা যায়—আওনিয়ান গ্রীকগণকেই হিন্দুরা যবনাখ্যা দিয়াছিলেন। এই জন্যই মনে হয়—তুরুষ্ক ও গ্রীকগণ ভারতে "সিহল" নামক দ্রব্য লইয়া আসিয়াছিলেন।

রৌমক লবণ।—প্রাচীন হিন্দুগণ "রৌমক" নামক লবণ ব্যবহার করিতেন। অমর কোষেও "রৌমক" নাম লবণ বিশেষের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক ভানুজী দীক্ষিত বলেন—"রুমায়াং ভবং"। অতএব রৌমক লবণ যে রুমা বা রোম দেশ হইতে ভারতে আসিয়াছে, ইহা আমরা অনুমান করিতে পারি।

হিঙ্গু ও কুঙ্কুম।—"হিঙ্গু" ও "কুঙ্কুম" এই উভয় দ্রব্যের নামের পর্য্যায়ে "বাহ্লিক" শব্দটী স্থান পাইয়াছে। সুতরাং মনে হয়—এই দুই জিনিষ বাহ্লিক দেশ হইতে এদেশে আসিয়াছে।

রসোন।—"রসোন"—ইহার সংস্কৃত নাম—ম্লেচ্ছকন্দ। আয়ুর্ব্বেদে ইহার আর একটি নাম "যবনেষ্ট"। হয়ত ইহা বহুযুগ পূর্ব্বে ম্লেচ্ছ দেশ হইতে এদেশে আসিয়াছিল।

তাম্র।—তাম্রের একটী নাম—"ম্লেচ্ছ" মুখ"। ভানুজী দীক্ষিত বলেন ম্লেচ্ছদেশে মুখমুৎপত্তি যস্য। আবার তাম্রের আর একটী বিশেষণ—"নৈপালী"। ম্লেচ্ছ দেশ ও নেপাল হইতে এদেশে তাম্রের আমদানী হইয়াছিল।

কর্পূর, লৌহ ও সীসা।—কর্পূরের নাম "চীণজ"। লৌহেরও একটী নাম চীণজ। সীসকের নাম "চীণবঙ্গ"—এই তিন দ্রব্য যে চীণদেশ জাত, ইহাই তাহার প্রমাণ।

হিঙ্গুল।—হিঙ্গুলের নাম দরদ। বোধ হয়—হিঙ্গুল দরদ অর্থাৎ দর্দ্দিস্থান হইতে এ দেশে আমদানী হইয়াছিল।

লঙ্কা।—লঙ্কা। লঙ্কাদ্বীপ হইতে এ দেশে আসিয়াছিল।

এই কয়টীমাত্র দ্রব্যের নাম-রহস্য হইতে আমরা বুঝিতে পারি ভারত বিদেশ হইতে যাহা আমদানি করিয়াছিল, তাহার শতগুণ দ্রব্য রপ্তানি করিয়াছিল।

ডাক্তার শ্রীঅমরনাথ চট্টোপাধ্যায়
এম্‌ বি।

চিকিৎসকের দুঃখ।

—০:০—

স্কুলমাষ্টার, কেরাণী প্রভৃতির দুঃখের কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। তাহারা প্রায়ই দরিদ্র। বাস্তব-জগতে দরিদ্রের জীবন দুঃখপূর্ণ। যতকাল সমাজবন্ধন থাকিবে, ততকাল ধনী-দরিদ্রের ভেদ থাকিবে এবং দারিদ্র্যদুঃখ অনিবার্য্য বোধ হইবে। কিন্তু দারিদ্র্য ব্যতীতও

দুঃখের অনেক কারণ থাকিতে পারে, তবে সেগুলি প্রায়ই শ্রুতিগোচর হয় না। এই নিরন্ন বহুলসমাজে দারিদ্র্যের আর্ত্তনাদ-কল্লোলে তাহা ডুবিয়া যায়। আমি আজ সেই কথা বলিব।

অনেকে ভাবিতে পারেন,—চিকিৎসকের আবার দুঃখ কি? অবশ্য অর্থসম্পৎশূন্য-প্রতিপত্তিহীন-চিকিৎসকের দুঃখ থাকিতে পারে, তাহা ত দারিদ্র্যদুঃখ ব্যতীত আর কিছুই নয়। আমি সে কথা বলিতেছিনা। আমি যে দুঃখের কথা বলিতেছি, ছোট হউক, বড় হউক—চিকিৎসক-জীবনের তাহা নিত্য সহচর।

এই বিরাট বিশ্বমণ্ডলের মত ক্ষুদ্র মনুষ্য-সমাজমণ্ডলের ভিত্তিও কর্ম্মভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বদেহে যেমন ক্রিয়াভেদে ভূতসমষ্টির বিকাশ, সমাজদেহেও সেইরূপ কর্ম্মবৈচিত্র্য ব্যষ্টির প্রতিষ্ঠা এবং যেমন বিশ্ব-ক্ষেত্রে, সেইরূপ সমাজক্ষেত্রে কর্ম্মানুসারেই ভূত-বিশেষের উৎকর্ষ অপকর্ষ কল্পনা। অবশ্য সূক্ষ্মদৃষ্টিতে কেহই ক্ষুদ্র বা নিকৃষ্ট নহে, কিন্তু স্থূল-জগতে সে সূক্ষ্মের সম্পর্ক অতি বিরল—অন্ততঃ সাক্ষাৎসম্বন্ধে নহে। স্থূলের সহিতই তাহার আদান প্রদান ও সম্বন্ধ।

চিকিৎসা অতি মহৎ ও পুণ্যকর্ম্ম,—ইহা অনেকেরই বিশ্বাস। অন্ততঃ চিকিৎসকগণকে সমাজ এই চাটুবাক্যেই অভিনন্দিত করে। কিন্তু চিকিৎসা ব্যবসায় কি সত্যই মহৎ? মানুষ—রোগযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, প্রাণের মমতায় দুঃখনিবৃত্তির আশায় চিকিৎসকের নিকট ছুটিয়া আসে, চিকিৎসক অর্থের বিনিময়ে তাহার চিকিৎসা করেন, কেননা, অর্থ গ্রহণ না করিলে চিকিৎসকের জীবিকা নির্ব্বাহ হয় না। অবশ্য অনেক মহানুভব আছেন—যাঁহারা বিনামূল্যে দীনদরিদ্রের চিকিৎসা করেন, তাঁহাদের সংখ্যা অতিঅল্প। আবার ধনবানের গৃহে আহূত হইলে প্রভূত অর্থপ্রাপ্তি-সম্ভাবনা ত্যাগ করিয়া, সমকালীন নিঃস্বদরিদ্রের আহ্বান যাঁহারা বরণ করিয়া লইতে পারেন, তাদৃশ চিকিৎসক একান্তই দুর্লভ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে রাজ্যৈশ্বর্য্যপরাঙ্মুখ আকুমার ব্রহ্মচারী ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন

অর্থস্য পুরুষো দাসোহর্থোদাসোনকস্যচিৎ
ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ।

অর্থাৎ—মহারাজ, পুরুষই অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে, একথা সত্য (তাহার উদাহরণ) কৌরবেরা আমাকে অর্থ দ্বারা বন্দী করিয়াছে।

চিকিৎসকগণও রোগীদিগকে ঠিক এই কথাই বলিতে পারেন। বরং ভীষ্মের পক্ষে অনুকূল একটা কথা বলা যাইতে পারে, উভয় পক্ষই রাজ্যলাভের জন্য জ্ঞাতিবিরোধে প্রবৃত্ত। চিকিৎসকের পক্ষে সে কথাও বলা চলে না। ধনী-দরিদ্র—উভয়েই প্রাণের মমতায় তাঁহার দ্বারস্থ হয়। চিকিৎসক অর্থের মানদণ্ডেই উভয়ের প্রাণের তুলনা করিতে বাধ্য হন।

অবশ্য পৃথিবীতে প্রায় সমস্ত জিনিষেরই মূল্য লওয়ার রীতি আছে। যে খাদ্য সামগ্রী ব্যতীত কেহ জীবন ধারণ করিতে পারে না, তাহা মূল্য দিয়া কিনিতে হয়। যে জল জগতের জীবন, তাহাও স্থান-বিশেষে ও সময় অনুসারে ক্রয় করিতে হয়। কিন্তু সে সকল ক্ষেত্রে লোকে তাহাদের কষ্টোপার্জ্জিত অর্থের বিনিময়ে একটা দ্রব্য পাইয়া থাকে, কিন্তু প্রভূত অর্থ-বিনিময়েও মানুষ চিকিৎসকের নিকট কি পাইয়া থাকে? জীবন কি চিকিৎসকের আয়ত্ত? চিকিৎসা-বিদ্যা অদ্যাপি অসম্পূর্ণ এবং

অনিশ্চিত। নিত্য নব বিজ্ঞানালোকে উদ্ভাবিত পাশ্চাত্য ভূখণ্ডেও অদ্যাপি চিকিৎসাবিদ্যা বিজ্ঞান পদবী লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। আধুনিক চিকিৎসা বিদ্যা-বিশারদ-গণও স্বীকার করিতেছেন—মানুষের প্রকৃতিই তাহার রোগ প্রতিষেধক। চিকিৎসক সেই প্রকৃতির সহায়তা করিতে পারেন মাত্র। সেই প্রকৃতির সম্পূর্ণ স্বরূপ কোন চিকিৎসক জানিতে পারিয়াছেন? এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর রূপক * আছে। গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহে রোগীর জীবন এবং রোগের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। রোগীর আত্মীয়-স্বজনগণ রোগীর সাহায্যার্থ চিকিৎসককে আহ্বান করিলেন। চিকিৎসক বৃহৎ লগুড় স্কন্ধে রোগীর কক্ষে আবির্ভূত হইলেন। গভীর অন্ধকারে কিছুই লক্ষ্য হয় না, চিকিৎসক অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া লগুড় প্রহার আরম্ভ করিলেন। যদি চিকিৎসক এবং রোগী উভয়ের ভাগ্যবশে রোগের উপর লগুড় নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে, তবে রোগ সে যাত্রা পলায়ন করে, আর যদি রোগ ছাড়িয়া জীবনের উপর লাঠি পড়ে, তবে রোগীর জীবলীলা সাঙ্গ হইয়া যায়।

তাই দেখা যায়—লোকে চিকিৎসার জন্য যে অর্থব্যয় করিতে বাধ্য হয় তাহা প্রায়ই অপব্যয় মনে করিয়া থাকে। একটা উদ্ভট শ্লোক আছে

রোগকালে পিতা বৈদ্যঃ রোগ শেষে সহোদরঃ
রোগমুক্তৌ মাতুলস্তু, দানকালে চ শ্যালকঃ। †

প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রে দেখ, † চিকিৎসক অপাঙ্‌ক্তেয় বলিয়া নিন্দিত, তাহার অন্ন অভক্ষ্য বলিয়া কথিত। সুদূর অতীতের কথা ছাড়িয়া দেই, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বর্ত্তমান যুগে যুগাবতার বলিয়া অনেকের নিকট পূজিত। তিনি যে একজন জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ ছিলেন, সে সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ নাই। তিনি চিকিৎসকের অন্ন গ্রহণ করিতে পারিতেন না বলিতেন, ‡ উহাদের অর্থ লোকের দুঃখকষ্টের উপর উপার্জ্জিত। এই তত্ত্ব পরম দূরদর্শী আর্য্য ঋষিগণ বুঝিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সর্ব্বতত্ত্বভেদিনী প্রতিভার আলোকে ইহার যথাসম্ভব এবং কথঞ্চিৎ প্রতিকারের উপায় ও উদ্ভাবিত হইয়াছিল। মর্ত্ত্যভূমিতে হিমগিরির পাদমূলে সম্মিলিত ঋষিসঙ্ঘ কর্ত্তৃক সর্ব্ব প্রথম আয়ুর্ব্বেদের অবতারণা হইয়াছিল, তাহার পর কিছুদিন পর্য্যন্ত আয়ুর্ব্বেদের ভার তাঁহাদেরই হস্তে ছিল। কিয়ৎকাল পরে তাঁহারা বুঝিতে পারেন,—আয়ুর্ব্বেদ চর্চ্চার ফল আধ্যাত্মিক অবনতি। পরমার্থ ভগবচ্চিন্তা ত্যাগ করিয়া কেবল লোকের রোগের—পাপের চিন্তা করা তপস্যার প্রতিকূল। তখন তাঁহারা স্থির করেন, সত্ত্বগুণ প্রধান ব্রাহ্মণের পক্ষে এ বিদ্যা ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু কাহার হস্তে আয়ুর্ব্বেদের ভার ন্যস্ত করেন? কেননা এ শাস্ত্র সমাজের পক্ষে কথঞ্চিৎ হিতকর এবং প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই, অতএব লুপ্ত হওয়া প্রার্থনীয় নহে। ক্ষত্রিয়ের হস্তে দেশরক্ষার ভার। সে কার্য্য মহত্তর

* স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু কথিত।

† এই অভ্যাসটী কেবল মানুষের নহে। স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে দেবগণের সহিত তুল্যাংশে অধিকারী হইলেও যজ্ঞীয় সোমভাগ গ্রহণে বহুকাল বঞ্চিত রাখিয়াছিলেন এবং এইজন্য অবশেষে মহর্ষি চ্যবনের সহিত তাঁহার বিষম বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। মহাভারত ও দেবীভাগবত।

‡ মনু, বিষ্ণু ও যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।

এবং পবিত্রতর। অতএব ক্ষত্রিয়ের পক্ষেও এ বিদ্যা উপযোগিনী নহে। বৈশ্য—বাণিজ্য-জীবী। সে—ব্যবসায়ের হিসাবে এ বিদ্যা গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু তাহা হইলে লোকের উপকার অপেক্ষা পীড়নের মাত্রাই বাড়িবে। অথচ ব্যবসায়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না করিলে—কেবল সখের হিসাবে এ কার্য্য স্থায়ী হইবে না। এই সমস্ত আলোচনা করিয়াই মহর্ষিগণ ব্রাহ্মণ-পিতা এবং বৈশ্য-মাতার সহযোগে অম্বষ্ঠজাতির সৃষ্টি করিয়া তাহাদের হস্তে আয়ুর্ব্বেদ অর্পণ করিলেন। পিতৃবীজের প্রাধান্য হেতু ব্রাহ্মণ সুলভ জীবদুঃখকারতা এবং ধর্ম্মভাবের আধিক্য এবং মাতৃবীজ জনিত বণিগ্‌-বৃত্তির গৌণভাব লইয়া যে জাতির উদ্ভব,—তাহার দ্বারা লোক পীড়ন অধিক হইবে না—অথচ এ বিদ্যাও বিস্তৃত এবং প্রচলিত থাকিবে—এই উদ্দেশ্যেই তাঁহারা বিধান করিয়াছিলেন,—'অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্'।

ইহকাল ও পরকালের উপর মানুষের আশা ও স্থিতি। ইহকালের হিসাবে চিকিৎসকের কোন সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ঘটিয়া থাকে? অন্যান্য ব্যবসায় যেরূপ অর্থকর, তাহার তুলনায় চিকিৎসা-ব্যবসায় অনেক হীন। জগতে ঐশ্বর্য্যবানদের গণনা-মুখেই হউক আর অবসানেই হউক—কোন চিকিৎসকের নাম কীর্ত্তিত কি হয়?

তাহার পর যশঃ। আমাদের দেশেই বল, আর পাশ্চাত্য দেশেই বল,—কোন দেশের ইতিহাসেই চিকিৎসকের নাম উল্লিখিত হয় নাই। কোন সার্থকজন্মা কবির লেখনীমুখে চিকিৎসকের কীর্ত্তি-সঙ্গীত হইয়াছে? এই বর্ত্তমান অর্দ্ধ মহাদেশব্যাপী ভীষণ লোকক্ষয়কর যুদ্ধে উভয় পক্ষীয় বীরেন্দ্রগণ পরস্পরকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত। আর চিকিৎসকগণ শত্রুমিত্র নির্ব্বিশেষে সকলেরই প্রাণ রক্ষায় যত্ন করিতেছেন, কিন্তু যখন কোলাহল নিস্তব্ধ হইবে, ধরিত্রী আবার শান্তি-শীতলা হইবেন, তখন ইতিহাসে—কবিমুখে—জনকণ্ঠে দিগ্বিজয়ী বলিয়াই হউন, আর দেশরক্ষাকারী বলিয়াই হউন—শত্রুজয়ী বীরেন্দ্রগণেরই যশঃ ধ্বনিত হইবে—কৃতজ্ঞতা মুগ্ধ সমগ্র দেশের সম্মান-ঐশ্বর্য্য তাহাদের চরণেই অঞ্জলিরূপে প্রদত্ত হইবে। রাজনীতিক বল, ব্যবসায়ীবল ধনী ভূস্বামীগণই বল,—অল্প বিস্তর সকলেই যে মহোৎসবে সমাদৃত হইবেন, কেবল চিকিৎসকগণের ভাগ্যে হয়ত ক্ষীণকণ্ঠের মৃদু ধন্যবাদ মাত্র—আর না বলাই ভাল।

কেবল চিকিৎসকগণের নিকট চিকিৎসা গ্রন্থে চিকিৎসকের নাম বিখ্যাত এবং প্রশংসিত। যাহার কথা অন্যে বলে না—তাহার কথা নিজেকেই বলিতে হয়।

যশের কথা যখন উঠিল, তখন অযশের কথাও বলিতে হয়। চিকিৎসক জন সাধারণের রোগাকাঙ্ক্ষী,—সমাজের ইহাই বিশ্বাস। কেননা লোকের রোগ না হইলে চিকিৎসকের ব্যবসায় চলে না। তাই কি দূরদর্শী গভর্ণমেণ্ট স্বাস্থ্য বিভাগে নিযুক্ত চিকিৎসকগণের চিকিৎসাবৃত্তি নিষিদ্ধ করিয়াছেন? চিকিৎসা-ব্যবসায়িগণ দেশের স্বাস্থ্যবৃদ্ধির পরিপন্থী,—এই ধারণার ফলেই কি এই ব্যবস্থা?

পুরাণকার ঋষি এই তত্ত্ব বুঝিয়াছিলেন কিনা জানিনা কিন্তু যিনি আদি চিকিৎসক স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সূর্য্যপুত্র অর্থাৎ শনির (গ্রহ) বৈমাত্র এবং যমের সহোদর ভ্রাতা * বলিয়াছিলেন—তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টি অন্ততঃ বর্ত্তমান যুগের হিসাবে প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

* মার্কণ্ডেয় পুরাণ এবং হরিবংশ।

ইহা যদি বিশুদ্ধ রসিকতা হয়, তবে তাহা তীব্র এবং চিকিৎসক-মর্ম্মভেদিনী বটে।

সংসার মরুক্ষেত্রে বন্ধুলাভ বড় শান্তিপ্রদ, কিন্তু চিকিৎসকের ভাগ্যে তাহা দুর্ঘট। আমি প্রকৃত বন্ধুত্বের কথা বলিতেছি না, ঘনিষ্ঠতা-সৌহৃদ্যের কথাই বলিতেছি। ব্যবসায়ের অনুরোধে তাহা রক্ষা করা চিকিৎসকের পক্ষে অতি দুরূহ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, অন্যান্য ব্যবসায়ে বন্ধু বান্ধবের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ দোষাবহ বিবেচিত হয় না, বরং তাহারাই যথা-সাধ্য পৃষ্ঠপোষণ এবং সহায়তা করিয়া থাকে, কিন্তু চিকিৎসকের পক্ষে তাহা করা আর বন্ধু বিচ্ছেদ হওয়া একই কথা। বন্ধু বান্ধবগণের এমন কি—দূর আত্মীয়গণের রোগ হইলে অন্য সকলেই যাইয়া সংবাদ লইয়া থাকে, সমবেদনা-সৎপরামর্শ জ্ঞাপন করিতে পারে, কেবল চিকিৎসকের পক্ষে তাহা সকল সময় সম্ভব হয় না। যে ক্ষেত্রে রোগী—চিকিৎসক-বন্ধু বা আত্মীয়কে আহ্বান করে নাই, সে ক্ষেত্রে অনাহূত এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যাইতে চিকিৎসক সঙ্কোচ এবং আত্মমর্য্যাদা-লাঘবকর বিবেচনা করেন। রোগীও কুণ্ঠিত হয়, অনেকে পছন্দও করেন না। চিকিৎসক উপস্থিত হইলেও অকপট ভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করিতে পারেন না।

চিকিৎসককে কদাচিত দীর্ঘজীবন লাভ করিতে দেখা যায়, বিষাক্ত, দূষিত, সংক্রামক মারাত্মক নানারূপ রোগ লইয়া তাঁহাকে সর্ব্বদা নাড়াচাড়া করিতে হয়, শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক—চিকিৎসককে তাহার ফলভোগ করিতে হয়। একটা প্রবাদ আছে, ভূতের ওঝার মৃত্যু ভূতের হাতে আর, সাপের ওঝার মৃত্যু সর্পাঘাতে হইয়া থাকে। চিকিৎসকের ভাগ্যে এই প্রবাদের সম্পূর্ণ সার্থকতা দেখা যায়।

ভোগ-সুখ চিকিৎসকের ভাগ্যে দুর্লভ। তাঁহাদের নিকট "ভোগে রোগভয়ম্" বলিয়া ইচ্ছামত আহার বিহার বিভীষিকা-সঙ্কুল হইয়া উঠে। কর্ম্মক্লান্ত জীবনে বিশ্রাম গ্রহণ বা অবকাশ লাভ সকলের ভাগ্যেই সুলভ, কেবল চিকিৎসকের অদৃষ্টে অবকাশের অবকাশ ঘটিয়াছে।

ইহকালে চিকিৎসকের সুখ ও সুবিধা ত এই। পরকালের পথও তাঁহার ভাগ্যে কণ্টকাকীর্ণ। চিকিৎসককে সর্ব্বদা যেরূপ প্রলোভনের মধ্যে থাকিতে হয়, সর্ব্বদা যেরূপ কুচিন্তা ও জঘন্য বিষয়ের আলোচনা করিতে হয়, তাহার ফলে "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" বিধি অনুসারে চিকিৎসকের ভাবনানুযায়ীই জীবন যে গঠিত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় নাই। পাঁচজন কঠিন রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে নিরাময় করিলে চিকিৎসক যে আত্মপ্রসাদ বা পুণ্য সঞ্চয় করেন, বুদ্ধি বা চিকিৎসার দোষে একজনের ভবলীলা অবসান করাইলেই তাহা নিঃশেষ হইয়া যায়। অথচ চিকিৎসাক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির অর্থ তাহাই। এই প্রাচীন শ্লোকার্দ্ধেও এই কথাই সমর্থিত হইয়াছে—

"শতমারী ভবেদ্বৈদ্যঃ সহস্রমারী চিকিৎসকঃ।"

গড়ে কি এই এই দুই ফলের কাটাকাটি হয়? যদি তাহা না হয়, তবে চিকিৎসক কি জন্য এই ভীষণ দায়িত্ব-মহান্ প্রত্যবায় স্বীকার করেন? বিলাতী আইনের একটা মূলসূত্র এই—বরং দশজন দুষ্ট নিষ্কৃতি লাভ করুক; কিন্তু একজন নিরপরাধও যেন দণ্ডিত না হয়। চিকিৎসার মূলসূত্র কি তাহার বিপরীত? অথচ তাহা না

হইলে হাসপাতালে পরীক্ষা-পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতি উঠাইয়া দিতে হয় এবং চিকিৎসা বিদ্যার উন্নতি বা অভিজ্ঞতা লাভ অসম্ভব। পরীক্ষাযূপে কত মানবের জীবন উৎসর্গীকৃত হইয়াছে—বর্ত্তমান চিকিৎসা বিদ্যার ভিত্তিমূল কত প্রাণীর রুধির-প্লুত—তাহা সৃষ্টিকর্ত্তাই একমাত্র অবগত আছেন।

ধর্ম্ম জগতেও কোন চিকিৎসকের জীবন আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভে ধন্য এবং প্রসিদ্ধ হইয়াছে? প্রাচীন পুরাণ—মহাভারত-রামায়ণাদির ব্রাহ্মণ, মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষিগণের কথা ছাড়িয়া দিই, জনক তুল্য রাজর্ষি, ভীষ্ম অর্জ্জুনাদি তুল্য ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ ক্ষত্রিয়গণের কথাও ধরিব না, কিন্তু গুহক চণ্ডাল বণিক তুলাধার ও সমাধি, ব্যাধ দাসী পুত্রাদিও ধর্ম্মরাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত বলিয়াই পুরাণকার ঋষিমুখে অভিনন্দিত হইয়াছেন। প্রাচীন এবং মধ্যযুগের সাহিত্যেও কবিগণ যাঁহাদিগের উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়াছেন, যাহাদের ভগবদ্‌ভক্তি ও পরমার্থ লাভ স্মরণ করিয়া অদ্যাপি কোটী ভক্ত-হৃদয় বিগলিত, জ্ঞানী চিত্ত আর্দ্র এবং সংসার তাপ দগ্ধের হৃদয় আশা এবং সান্ত্বনায় উচ্ছ্বসিত হইতেছে—তাহাদের মধ্যে ত কোন চিকিৎসকের নাম দেখি না! কোন কাহিনী—কোনউপাখ্যান—কোন সঙ্গীতে চিকিৎসকের পুণ্যস্মৃতি সঞ্জীবিত করিয়া রাখে নাই। যুগে যুগে লোকপাবন অবতার ও লোকোত্তর মহাপুরুষগণ অবতীর্ণ হইয়া পদরেণু স্পর্শে কত কামকাঞ্চনাসক্ত পাপিষ্ঠের উদ্ধার করিয়াছেন, হীন অস্পৃশ্য জাতি সর্ব্বজন ঘৃণ্য পতিতা গণিকাও তাঁহাদের কৃপালাভে বঞ্চিত হয় নাই, কেবল চিকিৎসকই সে অক্ষয় করুণা লাভে অধিকারী হয় নাই। পূর্ব্ব এবং পশ্চিম উভয় মহাদেশেরই ধর্ম্মের এবং সাধনার ইতিহাসে নৃপতি, মন্ত্রী, যোদ্ধা, পণ্ডিত, বণিক, দাস, ধীবর, রজক, মালাকার, চর্ম্মকার, ব্যাধ সকল শ্রেণীর লোকই স্থান পাইয়াছে,—পায় নাই কেবল চিকিৎসক।* জগতে এমন হতভাগ্য বুঝি আর নাই।

কিত ধাতু হইতে চিকিৎসক শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। কিত ধাতুর দুই অর্থ। সংশয় এবং রোগ প্রতীকার। চিকিৎসা-ব্যবসায়ীর ইহ-পরকাল গভীর সংশয়াচ্ছন্ন, এই মনে করিয়াই কি শব্দশাস্ত্রকার চিকিৎসক শব্দের ওরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছিলেন?

শুনিতে পাই, লোকে অসহ্য যন্ত্রণার হাত এড়াইবার জন্য সুরা পান করে। পূর্ব্বেও বহু চিকিৎসক সুরাসক্ত ছিলেন, এক্ষণেও সে দৃষ্টান্তের অভাব নাই। তাঁহারা কি এই দুঃখ নিবারণের জন্যই সেই সন্তাপহারিণীর আশ্রয় লইয়াছেন?

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত কাব্যতীর্থ।

* কেবল মাত্র মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি ২১ জন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের করুণালাভের অধিকারী হইয়াছিলেন।

দিন চর্য্যা।

———:o:———

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

এইবার আহারের কথা বলিব। আহার সম্বন্ধে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে,—"বল, আরোগ্য, আয়ু এবং প্রাণ অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই অগ্নি অন্ন-পানারূপ ইন্ধন পাইলে প্রজ্জ্বলিত থাকে, অন্যথা নির্ব্বাপিত হইয়া যায় অন্নই প্রাণীদিগের প্রাণ স্বরূপ, লোকে অন্নেরই আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। বর্ণের উৎকর্ষ, সুস্থিরতা, জীবন, প্রতিভা, সুখ, তুষ্টি, পুষ্টি, বশ ও মেধা সমস্তই অন্নে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।"

এই যে প্রাণ স্বরূপ অন্ন—ইহা আহার করা বিশেষ বিবেচনা সাপেক্ষ্য। কেননা, অন্ন প্রাণীদিগেব প্রাণস্বরূপ বটে, কিন্তু অযুক্তিযুক্ত ভাবে সেবন করিলে প্রাণ নাশক হইয়া থাকে, অতএব আহার সম্বন্ধে যুক্তি কি—এই প্রসঙ্গে তাহা আলোচনা করা যাইতেছে।

চরক সংহিতায় কথিত হইয়াছে যে, আহার বিধি আটটী বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যথা, প্রকৃতি, করণ, সংযোগ, রাশি, দেশ, কাল, উপযোগ, সংস্থান ও উপযোক্তা। প্রত্যেকের বিষয় পৃথকভাবে আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রকৃতি—আহার দ্রব্যের যে স্বাভাবিক গুণ তাহার নাম প্রকৃতি। যেমন মাষকলায় স্বভাবতঃ গুরু এবং এবং মুগ স্বভাবতঃ লঘু, শূকর মাংস স্বভাবতঃ গুরু এবং হরিণ মাংস স্বভাবতঃ লঘু। এইরূপ অম্লদ্রব্য শ্লেষ্মা ও পিত্ত বর্দ্ধক, কষায় ও তিক্ত দ্রব্য বায়ু বর্দ্ধক। দাল উদরে বায়ু সঞ্চয়কারক, তিক্ত দ্রব্য পিত্ত নাশক, কটু দ্রব্য কফ নাশক, মাংস পুষ্টিজনক শাক মলবর্দ্ধক প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। দ্রব্যের প্রকৃতি বুঝিয়া ক্ষীণাগ্নি ব্যক্তি মাষকলায় পরিত্যাগ এবং মুগ আহার করিবে না। শ্লেষ্মা বা পিত্ত প্রধান ব্যক্তি অম্ল দ্রব্য আহার করিবে না। বায়ু প্রকৃতি ব্যক্তি তিক্ত ও কষায় দ্রব্য আহার করিবে না। যাহাদের উদরে বায়ু সঞ্চয় হয়, তাহারা দাল আহার করিবে না। পিত্ত প্রধান ব্যক্তি তিক্ত দ্রব্য এবং কফ প্রধান ব্যক্তি কটু দ্রব্য আহার করিবে। শীর্ণ ব্যক্তি পুষ্টির জন্য মাংস আহার করিবে এবং অল্প মল ব্যক্তি মল বৃদ্ধির জন্য শাক আহার করিবে —ইত্যাদি।

করণ—স্বাভাবিক পদার্থের সংস্কারকে করণ বলে। সংস্কার দ্বারা দ্রব্যের গুণান্তর হয়। জল ও অগ্নির সংযোগ, শোধন, মন্থন, দেশ-কাল ভাবনাদি, কাল-প্রকর্ষ এবং পাত্রাদি দ্বারা দ্রব্যের সংস্কার হইয়া থাকে। জল দ্বারা সংস্কার—যেমন চিড়া ভিজাইয়া খাইলে অপেক্ষাকৃত লঘু পাক হয়। অগ্নিদ্বারা সংস্কার—যেমন ধান্য হইতে চাল হয়, বেগুণ পোড়াইয়া খাইলে লঘুপাক হয়। জল ও অগ্নির দ্বারা সংস্কার—যেমন বিবিধ খাদ্য সিদ্ধ করিয়া খাইলে লঘু পাক হয়। শোধন—যেমন ফলাদির বীজ ও ত্বক ফেলিয়া দিয়া খাইলে লঘুপাক হয়। মন্থন—যেমন মথিত দধি ঘোল রূপে পরিণত হয় এবং মাখম উৎপন্ন হয়। দেশ—আনূপ দেশের জল অভিষ্যন্দী, এবং জাঙ্গল দেশজাত জল ও প্রাণীর মাংস অভিষ্যন্দী

নহে। কাল—যেমন উত্তরায়ণ কালে কটু তিক্ত ও কষায় রসের বৃদ্ধি হয় এবং দক্ষিণায়ণে অম্ল লবণ ও মধুর রস বর্দ্ধিত হয়, শরৎকালে জল নির্ম্মল হয়। ভাবনা—যেমন চড়াই পক্ষীর ডিম্বের অভ্যন্তরস্থ পদার্থ দ্বারা চাউল ভাবনা দিলে তাহা অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক হয়। কাল-প্রকর্ষ—যেমন কুষ্মাণ্ড পক্ক হইলে সুপথ্য হয়। অত্যন্ত অল্প বয়স্ক পশুর মাংস অপথ্য ও মাংস কাল প্রকর্ষবশতঃ সুপথ্য হইয়া থাকে। পাত্রভেদে—যেমন ধাতুপাত্রে অম্লরস এবং কাংসাদি নির্ম্মিত পাত্রে ঘৃতাদি বিকৃত হয়। যেমন ঘৃত লৌহময় পাত্রে, পেয়া রৌপ্যময় পাত্রে, ফল ও ভক্ষ্য (লাড়ু প্রভৃতি) কদলী পত্রে, পরিশুষ্ক ও প্রদিগ্ধ মাংস সুবর্ণ পাত্রে, মণ্ডাদি ও মাংস, যূষ রৌপ্য ময় পাত্রে, সিদ্ধ শীতল দুগ্ধ তাম্রময় পাত্রে* জল সরবৎ প্রভৃতি মৃন্ময় পাত্রে রাজ ষাড়ব (সরবৎ বিশেষ) কাচ বা স্ফটিক নির্ম্মিত পাত্রে দিলে গুণশালী হয়।†

সংযোগ—দুই বা বহুদ্রব্যের একত্র মিলনকে সংযোগ বলে।* একটী দ্রব্যের যেরূপ গুণ থাকে, ভিন্ন দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হইলে তাহার পার্থক্য ঘটে, ঘৃত ও মধু স্বতন্ত্রভাবে সেবন করিলে অনিষ্ট হয় না, কিন্তু একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বিষবৎ অনিষ্ট করে! আবার সংযোগ দ্বারা দ্রব্য লঘুপাক বা গুরুপাক হইয়া থাকে। হিং, লবণ, মরিচ প্রভৃতি পাচক দ্রব্যের সংযোগে খাদ্য লঘুপাক হয়। ঘৃত, পেস্তা, ছোলা, বড়ি প্রভৃতির সংযোগে খাদ্য গুরুপাক হয়। লঘুপাক অন্ন মাংস-ঘৃতাদি সহ মিশ্রিত করিয়া পোলাও প্রস্তুত করিলে গুরুপাক হয়। রাশি—রাশি দুই প্রকার, যথা—সর্ব্বগ্রহ রাশি ও পরিগ্রহ রাশি। মোটের উপর সমস্ত দ্রব্য যাহা আহার করা হইল, তাহাকে সর্ব্ব গ্রহ রাশি, আর পৃথক দ্রব্যের পরিমাণকে পরিগ্রহ রাশি বলে, যেমন তিন পোয়া দুগ্ধ, এক পোয়া চাল, আধ পোয়া দাল, তিনছটাক মাংস ইত্যাদি। এই রাশি জ্ঞান না থাকায় একবার একটী ভদ্র মহিলা বিষম অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন। গল্পটি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, পরন্তু উপদেশ জনক হইবে বলিয়া নিম্নে লিখিতেছি।

কোন সময়ে এক ধনবান গৃহস্থের বাড়ীতে একজন সন্ন্যাসী অতিথি হইয়াছিলেন। অতিথি-বৎসলা গৃহিণী স্বয়ং অতিথির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং আহারাদির বন্দোবস্তের ভার গ্রহণ করেন। বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় অতিথি স্বয়ং

---

* আয়ুর্ব্বেদে তাম্রময় পাত্রে দুগ্ধ দিবার নিয়ম আছে, কিন্তু স্মৃতি শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে "তাম্র পাত্রে পানং সদ্যো গোমাংস ভোজনম" অর্থাৎ তাম্রপাত্রে দুগ্ধ পান করিলে সদ্যো গোমাংস ভোজন করা হয়। এই বিরুদ্ধ মতবাদের মীমাংসা এই, তাম্র পাত্রে দেবাদির, উদ্দেশে দুগ্ধ আহরণ করা প্রচলিত আছে। এ স্থলে দুগ্ধ অর্থে উদ্ধৃত সার (মাখম তোলা) দুগ্ধ। সসার দুগ্ধ তাম্রময় পাত্রে দেওয়া যাইতে পারে।

† সুশ্রুত সূত্রস্থান, ৪৯ অধ্যায়, ৮৯ সংখ্যক শ্লোক।

* করণের কাল, ভাবনা, পাত্রভেদ সম্বন্ধে সুশ্রুতের টীকাকারের যে মত আমি তাহার অনুসরণ করি নাই। সুশ্রুতের টীকাকারের মত গতবর্ষের মাঘ মাসের আয়ুর্ব্বেদে ২১৩।১৪ পৃষ্ঠায় আয়ুর্ব্বেদ কি Emplrical নামক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। আহার সম্বন্ধে আটটী বিষয়ের কথা যখন বলা হইয়াছে, তখন আহারের দেশ সম্বন্ধে ঔষধ বিশেষকে ধান্য রাশির মধ্যে রাখিলে গুণান্তর সংযোগ হয়, তিলকে ফুলের সহিত অধিবাসিত করিয়া পীড়ন করিলে ফুলেল তেল হয়।

পাক করিয়া আহার করেন। এক সের চাউলের অন্ন দুইটী কাচকলা ভাতে, কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও ঘৃত লইয়া অতিথি আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। গৃহিণী যখন দেখিলেন যে, অতিথি সমগ্র অন্ন উদরস্থ করিলেন, তখন নিজের পুত্র তিন ছটাক চাউলের অন্ন মাত্র আহার করে মনে করিয়া তাঁহার চিত্ত কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইল। তিনি অতিথিকে বলিলেন, সন্ন্যাসীঠাকুর-আপনি বেশ আহার করিতে পারেন। আমার ছেলেটী কিছুই খেতে পারে না। সন্ন্যাসী তদুত্তরে কিছু বলিলেননা। কিন্তু ক্ষুব্ধা গৃহিণী কথাটা একবার বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই, দুই তিনবার বলিয়াছিলেন। তিন বার বলিবার পর অতিথি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন আরে বেটী, আমি বেশী খাই না তোর ছেলে বেশী খায়! চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমি একবার মাত্র আহার করি, আর তোর ছেলে দশবার আহার করে। দশবারে তোর ছেলে যা খায়—সব্ একত্র কর্ দেখি—আমার আহারের চেয়ে বেশী হয় কিনা! গৃহিণীর মুখে আর কথা নাই। তিনি সন্ন্যাসীর সর্ব্ব গ্রহ রাশি এবং নিজের পুত্রের পক্ষে পরিগ্রহ রাশি লইয়া বিচার করিয়াছিলেন বলিয়া এইরূপ ঘটিয়াছিল। আশা করি আয়ুর্ব্বেদের পাঠিকা কোন গৃহিণী এইরূপ ভ্রমে পতিতা হইবেন না এবং আয়ুর্ব্বেদের পাঠকগণ সর্ব্বগ্রহরাশি এবং পরিগ্রহ রাশি বিচার করিয়া আহার করিবেন।

দেশ—দ্রব্যের উৎপত্তি ও প্রচার এবং যে দেশে যাহা সাত্ম্য—দেশ সম্বন্ধে তাহাই বিচার্য্য। উৎপত্তি—যে দেশে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয়, সেই দেশের লোকের পক্ষে তাহাই সুপথ্য। প্রচার—বঙ্গে মাংস ও মৎস্যের প্রচলন আছে, পশ্চিমাঞ্চলে অনেক স্থানে নাই, ইংরাজ পণির আহারে অভ্যস্ত, ভারতবর্ষের উহার প্রচার নাই, দেশসাত্ম্য—মধ্যদেশবাসীর পক্ষে শীতল ও স্নিগ্ধ দ্রব্য এবং আনূপ দেশবাসীর পক্ষে উষ্ণ ও রুক্ষ দ্রব্য হিতকর। শীত প্রধান দেশবাসীর পক্ষে উষ্ণ বীর্য্য ও উত্তেজক খাদ্য এবং গ্রীষ্ম প্রধান দেশবাসীর শীতল ও অনুত্তেজক খাদ্য হিতকর।

কাল—ঋতু সাত্ম্য ভেদে কালের বিচার করিতে হয়। কাল রোগকে অপেক্ষা করে। এই ব্যক্তির অগ্নিমান্দ্য আছে, অতএব ইহাকে লঘুপাক আহার দাও, এই ব্যক্তির শরীরে পিত্ত প্রকোপ আছে, অতএব ইহাকে পিত্তনাশক আহার দাও ইত্যাদি বিষয় কাল লইয়া বিচার্য্য। আর শীতকালে অগ্নি প্রবল হয় বলিয়া অধিক আহার হিতকর, গ্রীষ্মকালে অগ্নি দুর্ব্বল হয় বলিয়া অল্প আহার হিতকর—ইত্যাদি বিষয় ঋতু সাত্ম্য লইয়া বিচার করিতে হয়।

উপযোগ সংস্থা—অর্থাৎ খাদ্যাদি প্রয়োগের নিয়ম, ইহা জীর্ণ লক্ষণকে অপেক্ষা করে। এই ব্যক্তির ভুক্ত অন্ন জীর্ণ হইয়াছে—অতএব ইহাকে পুনরায় আহার দাও, এই ব্যক্তির ভুক্ত অন্ন জীর্ণ হয় নাই—সুতরাং ইহাকে পুনরায় আহার দেওয়া যাইতে পারে না—ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া খাদ্য উপযোগ করিতে হয়।

উপযোক্তা—যে ব্যক্তি আহার করে তাহাকে উপযোক্তা বলে। যেরূপ আহার দ্বারা যে ব্যক্তি সর্ব্ব ঋতুতেই ভাল থাকে—তাহাকে সেইরূপ আহারই সকল সময়ে দিতে হয়।

এই সমস্ত আহার-বিধির বিশেষ ভাব অনুসারে শুভ বা অশুভ ফল ঘটিয়া থাকে। এই সকল বিষয় বুঝিয়া হিতকর উপায় অবলম্বন করিবে। মোহ বা প্রমাদবশতঃ কখনও

আপাত প্রিয় কিন্তু পরিণামে অহিতকর ও অসুখ জনক আহার করিবে না।

নিম্নলিখিত আহার-বিধি সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে এবং কোন কোন আতুরের পক্ষে হিতকর। যথা, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, মাত্রাবৎ, পূর্ব্বাহার জীর্ণ হইলে, বীর্য্য বিরুদ্ধ নহে এমন দ্রব্য, ইষ্টদেশে ইষ্ট উপকরণ যুক্ত, নাতি দ্রুত, নাতি বিলম্বিত-ভাবে, না কথা কহিতে, না হাসিতে হাসিতে তন্মনা হইয়া এবং আপনার অবস্থা বিবেচনা করিয়া ভোজন করিবে।

উষ্ণ খাদ্য আহার করিবে। উষ্ণদ্রব্য আহার করিতে ভাল লাগে, ইহা জঠরাগ্নি উদ্দীপিত করে, শীঘ্র পরিপাক পায়, শ্লেষ্মাকে শুষ্ক করে। এই জন্য উষ্ণ খাদ্য আহার করা উচিত। কিন্তু এস্থলে উষ্ণ বলিতে অত্যুষ্ণ নহে, সুখোষ্ণ অর্থাৎ যেরূপ উষ্ণদ্রব্য খাইতে সুখজনক।

স্নিগ্ধ (ঘৃত তৈলাদি সংযুক্ত) দ্রব্য আহার করিতে ভাল লাগে, অগ্নিকে উদ্দীপিত করে, শীঘ্র পরিপাক পায়, বায়ুর অনুলোম করে, শরীর পুষ্ট ও দৃঢ় করে, বল বৃদ্ধি করে ও বর্ণের প্রসন্নতা সম্পাদন করে। এই জন্য স্নিগ্ধ দ্রব্য আহার করা উচিত।

মাত্রাবৎ অর্থাৎ পরিমিত মাত্রায় ভোজন করিলে তাহা বায়ু, পিত্ত ও কফকে পীড়িত না করিয়া আয়ুরই বৃদ্ধি সাধন করে, ইহা সহজে গুহ্য নাড়ীতে উপস্থিত হয়, জঠরাগ্নিকে দুর্ব্বল করে না এবং অক্লেশে পরিপাক পায়। এইজন্য পরিমিত মাত্রায় ভোজন করা উচিত। পরিমিত মাত্রা কি তাহা পরে লিখিত হইবে।

(ক্রমশঃ)

সন্ন্যাসীর হাতে সোণা প্রস্তুত।

—•:•—

[রসায়ন-তত্ত্ব]

তান্ত্রিক যুগে—পিত্তল আবিষ্কার।

আমরা উপকথায় শুনিয়া আসিতেছি, সেকালে অনেক সন্ন্যাসীই স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে পারিতেন। ভক্তিভরে সাধু সেবা করিয়া গৃহস্থ—গৃহস্থ, কৃত-সুবর্ণের প্রসাদে সম্পন্ন হইয়া উঠিতেন। এখনও অনেকের বিশ্বাস, সন্ন্যাসীরা মনে করিলে স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে পারেন। তবে, তাঁহারা যাহাকে-তাহাকে স্বর্ণের প্রস্তুত প্রণালী শিখাইতে চাহেন না। এই বিশ্বাসে এদেশের বহুলোকের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। আমরা এমনও শুনিয়াছি— জুয়াচোরেরা সন্ন্যাসীর বেশে পল্লীবধূর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, রূপার মুদ্রাকে স্বর্ণে পরিণত করিবার প্রলোভন দেখাইয়া গৃহস্থের যথাসর্ব্বস্ব লইয়া চম্পট দিয়াছে। সংবাদপত্রেও মাঝে মাঝে এইরূপ বুজরুকির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। সরল-প্রাণ হিন্দু—চিরদিন সাধু ভক্ত, সে ধর্ম্ম-বিশ্বাসে সাধু অসাধু চিনিতে পারে না। বাটীতে সন্ন্যাসী থাকিলে সে

কৃতার্থ হয়, অতিথিকে দেবতার মত পূজা করে, ঘরের কথা, মনের কথা অকপটে খুলিয়া বলে। শেষে প্রবঞ্চকের হাতে পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, হাহাকার করিতে থাকে।

সাধু সন্ন্যাসীরা যে স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে পারে—হিন্দুর মনে এ বিশ্বাস কেমন করিয়া জন্মিল? এ বিশ্বাসের মূলে কি কোনও সত্য নাই? ইহা কি কেবল গল্প কথা? না, তাহা হইতেই পারে না। হয়ত কোনও ভস্ম-ধূসর সন্ন্যাসী—কোন্ সুদূর অতীতে, এই স্বর্ণ-ভূমি ভারতে একদিন সত্য সত্যই রাসায়ণিক উপায়ে স্বর্ণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সে ঘটনা গল্পে-গাথায় চিরজীবী হইয়া, ভারতের জন সমাজে পরিচিত হইয়া পড়িয়াছিল। হিন্দু এখনও তাহা ভুলিতে পারে নাই। এখনও সে বিশ্বাস করে,—দুর্গম-বন-কান্তারে, দুরারোহ অচল শিখরে, এখনও সেরূপ মহাপুরুষের অভাব নাই।

গল্পের কথা ছাড়িয়া দিই। "ইন্দ্রজাল" "কক্ষপুট" "উড্ডীশ" "তন্ত্র" প্রভৃতি গ্রন্থেও আমরা স্বর্ণ প্রস্তুতের প্রকরণ দেখিতে পাই। তান্ত্রিকযুগের যোগী ও সিদ্ধপুরুষগণ—নাগ খর্পর জশদ প্রভৃতি স্বল্পমূল্যের নিকৃষ্ট ধাতুকে, নানাদ্রব্যের সংমিশ্রণে—উৎকৃষ্ট ধাতুতে পরিণত করিতে পারিতেন। তাঁহাদের রাসায়নিক কৌশলে—তাম্র স্বর্ণকান্তি ধারণ করিত। জশদ-বঙ্গ—রৌপ্যে রূপান্তরিত হইত। আমরা সে সকল পুটের অর্থ বুঝিনা, উপাদান চিনিনা, যৌগিক পদার্থের অর্থও জানিনা। তন্ত্র এখন আমাদের কাছে, প্রহেলিকা, আগম্ শাস্ত্র পাগলের প্রলাপ।

হউক্ প্রলাপ, হউক মিথ্যা, আজ আমি তান্ত্রিক যুগের সেই স্বর্ণপ্রকরণ লিপিবদ্ধ করিব। ইহাতে আর কোনও উপকার না হউক, সেকালের রাসায়ণিক অনুসন্ধিৎসার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় ত জানা যাইবে। এ আত্ম বিস্মৃত জাতির পক্ষে—তাহাই যে পরম লাভ।

অনেক তন্ত্রেই স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রস্তুতের জন্য "রসায়ন প্রকরণ" লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অধিকন্তু বলা হইয়াছে—সিদ্ধপুরুষ ভিন্ন রসায়ন কার্য্যে অপরেব অধিকার নাই। পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণের জন্য, আমরা তন্ত্রোক্ত "রসায়ন বিধি" নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি;

তাম্রং পলমিতং গ্রাহ্যং তদর্দ্ধে বঙ্গ-খর্পরৌ।
কুশারি পত্র রসেন মর্দ্দয়েৎ প্রহর দ্বয়ং॥
উর্দ্ধাধো লবণং দত্ত্বা স্থাল্যাগর্ভেনিধাপয়েৎ।
অজা শকৃত্তুষাগ্নিনা পচেৎ কুণ্ডে দিনত্রয়ং।
স্বাঙ্গশীতং ক্ষিপেৎ দুগ্ধে তত্তাম্রং স্বর্ণতাং
ব্রজেৎ।

—সিদ্ধান্ত। ১১শ অঃ

৮ তোলা তাম্র, ৪ তোলা রাং ও দস্তার সহিত মিশ্রিত করিয়া, কুশারি-পত্র রসে দুই প্রহর মর্দ্দন করিবে। একটী হাঁড়ীর মধ্যে উক্ত মিশ্রিত দ্রব্য রাখিয়া, উর্দ্ধ ও অধোদিকে লবণ চাপা দিবে। পরে—ছাগ-বিষ্ঠা ও তুষাগ্নি-পূর্ণ গর্ত্তে—উক্ত ভাণ্ড তিন দিন ধরিয়া পাক করিবে। ভাণ্ড শীতল হইলে, ভাণ্ড মধ্যস্থ পদার্থ—দুগ্ধে নিক্ষেপ করিবে। ইহাতে ঐ তাম্র স্বর্ণ হইবে।

প্রক্রিয়া কঠিন নহে। কিন্তু কুশারি পত্র কি? তন্ত্রে কুশারি বৃক্ষের বর্ণনা যেটুকু পাওয়া যায়, তাহাতে বুঝা যায়—ঐ বৃক্ষ ঠিক ছোলাগাছের ন্যায়। বৃক্ষের তলদেশের মৃত্তিকা ঠিক্ ঘৃতাক্তের মত বোধ হয়। আমরা এরূপ বৃক্ষ দেখি নাই। কোথায় পাওয়া যায় তাহাও জানি না।

সূক্ষ্মাণি তাম্র পত্রাণি কৃত্বা চাগ্নৌ প্রতাপয়েৎ।
রুদন্তী-মূল রসেচ নিষিঞ্চেৎ বার পঞ্চকং।
চুল্ল্যাং দৃঢ়তরে পাত্রে স্থাপয়িত্বা চ শুল্বকং।
পাদাংশং যশদং দত্বা লোহদার্ব্ব্যা প্রচালয়েৎ।
যাসৈকেন ভবেত্তাম্রং স্নিগ্ধং কাঞ্চন সন্নিভং॥

ক্রিয়োড্ডীশ। ৭ম পটল

তাম্রের সূক্ষ্ম পত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাকে অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে। উত্তপ্ত হইলে, রুদন্তী মূলের রসে ফেলিবে। এইরূপে ৫ বার তাম্রকে তপ্ত করিয়া উক্ত রসে ফেলিতে হইবে। তারপর, প্রজ্বলিত অগ্নির উপর লৌহ পাত্র রাখিয়া তাহাতে ঐ তাম্রপত্র গুলি দিবে এবং তাম্রের চতুর্থাংশ দস্তা দিয়া লৌহদণ্ডের দ্বারা মর্দ্দন করিতে থাকিবে। এক প্রহরের মধ্যেই উক্ত তাম্র কাঞ্চন তুল্য হইবে।

এ প্রক্রিয়াটীও বেশ সরল। কিন্তু ইহাতেও একটু গোলোযোগ আছে—রুদন্তীর মূল দুষ্প্রাপ্য। রুদন্তী একপ্রকার ক্ষুপজাতীয় বৃক্ষ—ইহার পত্রও "চণকপত্র নিভং" অর্থাৎ ছোলাগাছের পাতার মত। অধিকন্তু এই বৃক্ষের "পত্রে পত্রেচ দৃশ্যতে তোয়বিন্দু সমন্বিতং"। পাতায় পাতায় জল বিন্দুর মত পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য—কুশারি ও রুদন্তী কি একই বৃক্ষ? রুদন্তীর জন্ম-বৃত্তান্ত বড় অদ্ভুত। একদা কোন কারণে পার্ব্বতীর একগাছি কেশ ছিঁড়িয়া মাটিতে পড়িয়াছিল। সেই কেশ ক্রমে বৃক্ষরূপে পরিণত হয়। এই বৃক্ষ জন্মগ্রহণ করিয়াই দেখেন,—পৃথিবীর নরনারী রোগে ও জরায় জীর্ণ! জীবের এই কষ্ট দেখিয়া বৃক্ষ কাঁদিয়া ফেলিল—

"রোদিতীব জনান্ পূর্ব্বান্ জরয়া জর্জ্জরীকৃতান্।
ময়ি ভুবি বিদ্যমানে কথং ক্লিশ্যন্তি মানবাঃ॥

আমি পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকিতে মানুষ কেন রোগে কষ্ট পাইতেছে? এই বৃথা জীবের দুঃখ দেখিয়া, জাত মাত্রই রোদন করিয়াছিল, এই জন্যই ইহার নাম রুদন্তী। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও রুদন্তীর নামোল্লেখ আছে। রুদন্তী—জরা অর্থাৎ অকাল বার্দ্ধক্য নাশক, অত্যন্ত বলকারক, কান্তি-মেধা ও আয়ুবর্দ্ধক। আমরা এ গাছ অদ্যাপি দেখি নাই। বোধ হয় সোম বৃক্ষের মত, ইহা ধরণী হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

গোমূত্রং হরিতালঞ্চ গন্ধকঞ্চ মনঃশিলা।
সমং সমং গৃহীত্বা তু যাবৎ শুষ্যাতি পেষয়েৎ।
একাদশ দিনং যাবৎ যত্নেন রক্ষয়েৎ শুচি।
মন্ত্রেণ ধূপ দীপাদি নৈবেদ্যৈ দুগ্ধ মিশ্রিতৈঃ।

মন্ত্রস্ত—ওঁ নমো হরিহরায় রসায়ন, সিদ্ধিং কুরু কুরু স্বাহা। অযুত জপেন সিদ্ধিঃ।

* * * * *

তদ্বটীং গোলকং কৃত্বা বস্ত্রেণ বেষ্টয়েৎ পুনঃ।
মৃত্তিকাং লেপয়ে তস্য ছায়া শুকস্তু কারয়েৎ।
মহাকুণ্ডে বিনিক্ষিপ্তে পলাশ কাষ্ঠ বহ্নিণা।
জ্বালায় দগ্ধ যামস্তু ——
তদ্ভস্ম জায়তে সিদ্ধি র্ব্বিদ্ধি সিদ্ধি সমাকুলং।
তাম্র পাত্রে অগ্নি মধ্যে বিন্দুমাত্রং নিষচ্ছতি।
তৎক্ষণাজ্জায়তে স্বর্ণং নান্যথা শঙ্করোদিতং।
দাতব্যং গুরু ভক্তায় ন দদ্যাৎ দুষ্ট মানসে।
গোপ্যং গোপ্যং মহাগোপ্য দেবানামপি দুর্ল্লভং।
সিদ্ধ পীঠে ভবেৎ সিদ্ধি গায়ত্রী লক্ষ জাপনৈঃ॥

* * *

দত্তাত্রেয়ঃ

"মহাদেব দত্তাত্রেয়ের নিকট রসায়ন বলিতেছেন; গোমূত্র, হরিতাল, গন্ধক ও মনঃশিলা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া খলে

পেষণ করিবে। যাবৎ না শুষ্ক হয়, তাবৎকাল উত্তমরূপ পেষণ করিয়া, যত্ন পূর্ব্বক বিশুদ্ধ স্থানে রাখিয়া দিবে। পরে একাদশ দিবস গত হইলে, ধূপ দীপ ও দুগ্ধ মিশ্রিত নৈবেদ্যাদি নানাবিধ উপচারে যক্ষিণীর পূজা করিবে। অনন্তর, ওঁ নমো * * এই মন্ত্র দশ সহস্র জপ করিয়া সিদ্ধি হইলে পূর্ব্বপিষ্ট দ্রব্য গোলাকার করিয়া বস্ত্রদ্বারা বেষ্টন করিবে। পরে মৃত্তিকার দ্বারা লেপ দিয়া গর্ত্ত মধ্যে পলাশ কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিয়া তদুপরি ঐ গোলক রাখিবে এবং উপরে পলাশ কাষ্ঠ দ্বারা অষ্ট প্রহর পর্য্যন্ত জ্বাল দিবে। তৎপরে ঐ ভস্ম সংগ্রহ করিয়া রাখিবে। অনন্তর এক খণ্ড তাম্রপাত্র অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাহাতে ঐ ভস্ম একবিন্দু দিলে তৎক্ষণাৎ ঐ তাম্র পাত্র স্বর্ণ হইবে। ইহা মহাদেবের উক্তি, কদাচ ইহার অন্যথা হয় না। ইহা গুরুভক্তকে দিবে, সন্দিগ্ধমনা অবিশ্বাসীকে দিবে না। এই রসায়ন-প্রক্রিয়া করিবার পূর্ব্বে কোন সিদ্ধ-ক্ষেত্রে বসিয়া লক্ষ সংখ্যক গায়ত্রী জপ করিতে হইবে।”

—রসিক মোহন চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদ।

আনীয় বহু যত্নেন সম্বলং তোলকদ্বয়ং।
বসুরাগ্নং শিবঞ্চান্তং মায়াবিন্দু সমন্বিতং॥
বীজত্রয়ঞ্চাষ্ট শতং প্রজপেৎ সম্বলোপরি।
অশীতি তোলক মানং কৃষ্ণধেনু সমুদ্ভবং।
দুগ্ধ মানীয় যত্নেন চাষ্টোত্তর শতং জপেৎ॥
বস্ত্রযুক্তেন সূত্রেন দুগ্ধ মধ্যে বিনিঃক্ষিপেৎ।
উত্তাপং জ্বালয়দ্ধীমান্ মন্দ মন্দেন বহ্নিণা।
রিপুর্ব্বেদার্দ্ধ পর্য্যন্ত মর্দ্ধ শেষং ভবেৎ যদি।
তদৈবোত্তোল্য তদ্দ্রব্যং দগ্ধং তোয়ে বিনিক্ষিপেৎ
ততঃ পরীক্ষা কর্ত্তব্যা।
নির্ধূমং পাবকে দ্রব্যং দৃষ্ট্বা উত্থাপ্য যত্নতঃ।
তত্রৈব প্রজপেন্মন্ত্রং সর্ব্বমঙ্গল-মাত্মকং॥
সার্দ্ধেন তোলকং তাম্রং বহ্নি মধ্যে বিনিক্ষিপেৎ।
যথা বহ্নিস্তথা তাম্র দৃষ্ট্বা উত্থাপ্য যত্নতঃ॥
গুঞ্জা প্রমাণং তদ্দ্রব্যং, সত্যং সত্যং হি শঙ্করি।
রৌপ্যং ভবতি তদ্দ্রব্যং, নান্যথা শঙ্করোদিতং॥

দত্তাত্রেয়। ১৩শ পটলঃ।

“দুই তোলা পরিমাণ সম্বল আনিয়া তাহার উপরে ওঁ হুং হ্রীং এই ত্র্যক্ষর মন্ত্র আটশত বার জপ করিয়া, কৃষ্ণবর্ণ গাভীর দুগ্ধ ৮০ তোলা আনিয়া তাহার উপরে উক্ত মন্ত্র আটশত বার জপ করিবে। তৎপরে ঐ সম্বল বস্ত্রখণ্ডে পুটলী করিয়া তাহাতে সূত্র বন্ধন দ্বারা উক্ত দুগ্ধ মধ্যে নিক্ষেপ করত মন্দ মন্দ অগ্নিতে জ্বাল দিবে। যৎকালে ঐ দুগ্ধের অর্দ্ধ অর্থাৎ ৪০ তোলা শেষ হইয়া ৪০ তোলা মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, তৎকালে ঐ সম্বলের পুটলী দুগ্ধ হইতে উঠাইয়া জল মধ্যে নিক্ষেপ করিলে, যদি তাহা হইতে ধূম নির্গত না হয় তবেই সম্বল যথার্থ কার্য্যার্হ হইয়াছে জানিবে। পরে ঐ সম্বলের উপরে পূর্ব্বলিখিত মন্ত্র অষ্ট সহস্র জপ করিবে। অনন্তর অর্দ্ধ তোলা পরিমিত তাম্র অগ্নিতে দগ্ধ করিবে. যখন ঐ তাম্র অগ্নিবৎ হইবে, তখন উহা অগ্নি হইতে উঠাইয়া তাহাতে একগুঞ্জা পরিমিত উক্ত সম্বল দিলেই তৎক্ষণাৎ রূপা হইবে।”

রসিক মোহন চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদ।

“কৃষ্ণসর্প মেকং গৃহীত্বা তস্য মুখে শিববীর্য্যং দূরয়িত্বা সর্পস্য মুখং গুদঞ্চ বদ্ধা নূতন মৃন্ময় স্থালী মধ্যে সংস্থাপ্য স্থালীমুখং মৃদাদিনা সংলিপ্য নির্জ্জন স্থানে প্রাতরারভ্য পুনঃ। প্রাতর্যাবৎ বহ্নিনা জ্বালং দদ্যাৎ। ততঃ শুভক্ষণে স্থালীমুখ মুদ্ধৃত্য সর্পভস্মঃ বিহায় শিববীর্য্যং গৃহ্নীয়াৎ। তত তোলকমিতং তাম্রং গালয়িত্বা তস্মিন্ গলিত তাম্রে রক্তিক মাত্রং তচ্ছিববীর্য্যং

দত্বাৎ। তেন তৎক্ষণাদেব তত্তাম্রং সুবর্ণী ভূতং জাতমিতি।"

রসিক চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত তন্ত্র সংগ্রহ।

ইহার বঙ্গানুবাদ নিষ্প্রয়োজন। আমি কেবল দেখাইতে চাই—দ্রব্যগুণের প্রভাবেই হউক আর মন্ত্র তন্ত্রের মহিমাতেই হউক—মানুষের চেষ্টায় যে নিকৃষ্ট ধাতু হইতে উৎকৃষ্ট ধাতু উৎপন্ন হইতে পারে, সে কালের লোকের ইহা দৃঢ় ধারণা ছিল। সুতরাং রাতারাতি বড়লোক হইবার আশায় গৃহস্থগণ সাধু সন্ন্যাসীর শরণাগত হইতেন।

এক্ষণে কথা হইতেছে এই—বাস্তবিক কি সাধু সন্ন্যাসীরা স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে পারিতেন? বা সরল প্রাণ গৃহস্থকে ভুলাইবার জন্য ইহা তাঁহাদের স্বানুষ্ঠিত ইন্দ্রজাল? এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে, আমাদিগকে আরও একটু অগ্রসর হইতে হইবে। তন্ত্র ছাড়িয়া বিজ্ঞানময় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে। আমরা মন্ত্রের অর্থ বুঝি না, তন্ত্রের মহিমা জানি না, সুতরাং তন্ত্রের প্রভাব আমাদের মত মহামূর্খের কাছে, অনেক দিন হইতেই ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু দ্রব্যের বীর্য্য বিপাক-প্রভাব, আমরা ত অস্বীকার করিতে পারি না। আমাদের জীবন্ত বিজ্ঞান আয়ুর্ব্বেদ দ্রব্যের গুণ অনুসন্ধান করিয়া আমাদের সভ্যতার অতীত সাক্ষীরূপে, এখনও দণ্ডায়মান। এখন দেখা যাউক—আয়ুর্ব্বেদে স্বর্ণ প্রস্তুত প্রক্রিয়া সমর্থিত হইয়াছে কিনা?

আয়ুর্ব্বেদের চরক ও সুশ্রুত নামক সংহিতাদ্বয় অতি প্রাচীন গ্রন্থ। এই দুই গ্রন্থে কৃত্রিম উপায়ে স্বর্ণ প্রস্তুত—প্রক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না।

বৌদ্ধ নাগার্জ্জুন ৭ম শতাব্দিতে—যে রস রত্নাকর নামক চিকিৎসা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা একটী শ্লোক দেখিতে পাই—

কি মত্র চিত্রং রসকো রসেন
* * * * * ভাবিতঃ।
ক্রমেন কৃত্বাম্বু ধরেণ রঞ্জিতঃ
করোতি শুল্বং ত্রিপুটেন কাঞ্চনং॥

ইহার অর্থ—ইহাতে আশ্চর্য্য আর কি আছে? রসক নামক রসের দ্বারা ভাবিত তাম্র রঞ্জিত হইয়া, তিন পুটে কাঞ্চনত্ব লাভ করে। ইহার দ্বারা বেশ বুঝা যায়—তাম্র যে কাঞ্চনে পরিণত হইতে পারে, রসরত্নাকর-রচয়িতার তাহা অজ্ঞাত ছিল না। আর রসক নামক পদার্থের সংযোগেই তাম্র সুবর্ণ হইয়া যায়। এক্ষণে দেখা যাউক এই রসক কোন পদার্থ?

ভিক্ষু-গোবিন্দের "রস হৃদয়" পাঠে আমরা জানিতে পারি—"রসক" অষ্টরসের মধ্যে একটী রস। "রসার্ণব" নামক গ্রন্থকার রসকের আর একটি নাম দিয়াছেন—"খর্পর"। কিন্তু খর্পর যে কোন্ পদার্থ, এ গ্রন্থে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। "রসক" অষ্ট রসের অন্যতম। যথা—

"বৈক্রান্ত-কান্ত সস্যক-মাক্ষিক-বিমলাদ্রি দরদ রসকশ্চ।
অষ্টৌ রসাস্তথৈষাং সত্বানি রসায়ানি স্যুঃ॥

হিন্দু কেমিষ্ট্রী, ২য় ভাগ, ৩৪ পৃঃ।

মতান্তরে অষ্ট মহারস, যথা—

মাক্ষিকং বিমলং শৈলং চপলো রসকস্তথা।
সস্যকো দরদশ্চৈব স্রোতোঽঞ্জনমথাষ্টকম্।
—রসার্ণব।

এই অষ্ট রসের অন্যতম রস "রসক" যে তাম্রাদি ধাতুকে সুবর্ণে পরিণত করিতে পারে, তাহার প্রমাণ—

"তীক্ষ্ণং নাগং তথা শুল্বং রসকেন তু রঞ্জয়েৎ।
সমস্তং জায়তে হেম কুষ্মাণ্ড কুসুম প্রভং॥
হিন্দু কেমিষ্ট্রী, ১ম ভাঃ। ৮ পৃঃ।

তীক্ষ্ণ (লৌহ) নাগ (সীসা) শুল্ব (তাম্র) রসক দ্বারা রঞ্জিত হইলে, কুষ্মাণ্ড কুসুমের বর্ণযুক্ত সুবর্ণ হইয়া পড়ে।

"রস প্রকাশ সুধাকর" একখানি রস-গ্রন্থ, ইহার রচয়িতার নাম যশোধর। এই গ্রন্থে রসক ও খর্পরের শুদ্ধি প্রণালী সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বলিয়াছেন—

খর্পরং রেচিতং শুদ্ধং স্থাপিতং নরমূত্রকে।
রঞ্জায়েন্মাস মেকং হি তাম্রং স্বর্ণপ্রভং বরং॥
হিঃ কেঃ ২য়, ৬০ পৃঃ।

অর্থাৎ নরমূত্রে স্থাপিত হইবে, খর্পর বিশুদ্ধ হয়। সেই খর্পর একমাসে তাম্রকে স্বর্ণ বর্ণে রঞ্জিত করে।

রসক যে তাম্রকে স্বর্ণ বর্ণে রঞ্জিত করিবার শক্তি ধরে, নাগার্জ্জুন রচিত "রসরত্ন সমুচ্চয়" গ্রন্থে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বাহুল্য ভয়ে, তাহা আর উদ্ধৃত করিলাম না। এই সকল গ্রন্থের মতামত দেখিয়া, রসক ও খর্পরকে অভিন্ন বলিয়াই আমার মনে. হইতেছে। বিশেষতঃ "রুদ্র যামন তন্ত্রে"র ধাতু মঞ্জরী পড়িয়া আমার আরও বিশ্বাস হইয়াছে—"খর্পর" ও "রসক" অভিন্ন পদার্থ। "ধাতুমঞ্জরীতে" যে পিত্তল প্রস্তুতের প্রক্রিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাই—

শুদ্ধ খর্পর সংযোগে জায়তে পিত্তল শুভং।"
হিঃ কেঃ ১ম, ৫২ পৃষ্ঠা।

অর্থাৎ তাম্র ও খর্পর সংযোগে উত্তম পিত্তল প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই গ্রন্থের মতে—"খর্পর' অর্থে জশদ। জশদ দস্তা ধাতু। খর্পরের পর্য্যায়ে রসক নামও পাওয়া যায়। যথা,—

জাসত্ব চ জরাতীতংরাজতং যশদায়কং।
রূপ্য ভ্রাতা বরীয়শ্চ ত্রোটকং কোমলং লঘু॥
চর্ম্মকং খর্পরং চৈব রসকং রস বর্দ্ধকং।
সদা পথ্য বলোপেতং পীতরাগং সুভস্মকং।
এতত্তু খর্পর নাম কার্য্য কর্ম্মসু সিদ্ধিদং॥
হিঃ কেঃ ২য়, পৃঃ ১০৬ ও ৭।

জাসত্ব, জরাতীত (যাহাতে জরা অর্থাৎ মরিচা ধরেনা) রাজত (রৌপ্য সদৃশ) যশদায়ক, রূপ্য ভ্রাতা, বরীয়, ত্রোটক, কোমল, লঘু. চর্ম্মক, খর্পর রসক, রসবর্দ্ধক, সদাপথ্য, বলোপেত, পীতরাগ (পীতবর্ণে রঞ্জিত কারী) সুভস্মক (সহজে ভস্ম করা যায়)—খর্পরের এই সকল নাম।

আমার বিশ্বাস—সেকালের তান্ত্রিকগণ তাম্র ও দস্তা সংযোগে যে উত্তম পিত্তল প্রস্তুত করিতেন, সাধারণে তাহাকেই স্বর্ণ বলিয়া বিশ্বাস করিত। ১৭৮০ খৃঃ পর্য্যন্ত তাম্র রসক (Calumine) ও অঙ্গার মিশ্রিত করিয়া য়ুরোপের রাসায়নিকগণও পিত্তল প্রস্তুত করিতেন। কিন্তু ইহার বহুকাল পূর্ব্বেই ভারতে তাম্র ও জশদ সংযোগে পিত্তল প্রস্তুত প্রক্রিয়া প্রচলিত ছিল। পিতলের আদরও স্বর্ণের অপেক্ষা ন্যূন ছিল না।

তাঁহারা স্বর্ণের উৎপত্তি তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ স্বর্ণ তিন প্রকারে উৎপন্ন হয়, ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল। যথা;—

রসজং ক্ষেত্রজং চৈব লোহ সঙ্করজং তথা।
ত্রিবিধং জায়তে হেমং চতুর্থং লোপলভ্যতে॥
হিঃ কেঃ (রসার্ণব) ১ম, ১৪ পৃঃ।

স্বর্ণ ত্রিবিধ উপায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ক্রিয়া দ্বারা (২) ভূমি হইতে, (৩) ধাতু সংমিশ্রণ হইতে। এই তিন প্রকার ছাড়া আর কোন উপায়ে স্বর্ণ প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। এই ধাতু সংমিশ্রণ জাত স্বর্ণকে আমি পিত্তল নামে অভিহিত করিতেছি। আমার বিশ্বাস—তান্ত্রিক সন্ন্যাসীরা বসক বা খর্পর সংযোগে যে ধাতু প্রস্তুত করিতেন—তাহার বর্ণ পীতবর্ণ হইত। এবং তাহাই স্বর্ণ নামে কথিত হইত। স্বর্ণের মত বর্ণ হইলেই—তাহাকে স্বর্ণ বলা চলিত। কবিরাজী মতে স্বর্ণবঙ্গ নামক একটী ঔষধ আছে,- উহাতে স্বর্ণের সংস্পর্শ নাই, উহার উপাদান রাঙ, পারদ ও লবণ। কেবল স্বর্ণের বর্ণ বিশিষ্ট বলিয়াই উক্ত ঔষধের নাম "স্বর্ণ বঙ্গ" হইয়াছে। সেইরূপ তাম্র হইতে জাত পিত্তলকে তাহার উজ্জল বর্ণের জন্য—তান্ত্রিকগণ স্বর্ণের সম্ভ্রম প্রদান করিতেন। ইহাই আমার বক্তব্য। তবে—মন্ত্রের প্রভাবে তাম্র যে স্বর্ণে পরিণত হইতে পারে না,—এ কথা আমি বলিতেছিনা। কেননা, মন্ত্রের অসীম শক্তি—সে শক্তি আমাদের মত সীমা-বদ্ধ-জ্ঞান মানবের সমালোচনার বহির্ভূত।

গ্রীক্ দার্শনিক অরিষ্টটনের বর্ণনায় দেখা যায়—কৃষ্ণ সাগরের তীরে একরকম মাটী পাওয়া যাইত। ঐ মৃত্তিকার সহিত তাম্রকে গালাইলে তাহার রক্তবর্ণ হরিদ্রাবর্ণে পরিণত হইত। এই মৃত্তিকার নাম—"কাদমিয়া"। এই কাদমিয়ায় রসকের অংশ বিদ্যমান ছিল। তাই পারসিক আলকেমিষ্ট উহাকে সফেদ তুতিয়া বলিয়াছেন।

বেদে পিত্তলের নাম পাওয়া যায় না। স্বর্ণের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু অথর্ব্ব বেদে রয়ি নামক ধাতুর উল্লেখ আছে। যথা—"রয়িমুরুং পিশঙ্গ সদৃশন্"। সায়ণ রয়িকে স্বর্ণ নামে অভিহিত করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস—এই রয়িই পিত্তল। চরকে পিত্তলের নাম হইয়াছে—"রীতি"। বেদে হরিৎ শব্দে —পীতবর্ণ বুঝায়। সুতরাং বেদের হরিতায়স্ শব্দও পিত্তলের নামান্তর হইতে পারে। "হরিতায়স্ সংক্ষিপ্ত হইয়া হয়ত হরিতী হইয়াছিল, শেষে চরকের সময়ে "হরিতীর" আদিবর্ণ লুপ্ত হইয়া তাহা "রীতি নাম পাইয়া থাকিবে। কিন্তু এ সমস্ত অনুমানের কথা নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না।*

শ্রীসতীশ চন্দ্র রায় এম, এ।

পরিবর্ত্তনের প্রতিবাদ।

—:০:—

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র রায় মহাশয়—একজন প্রবীণ সাহিত্যিক। বিবিধ মাসিক পত্রে তাঁহার বহু প্রবন্ধ পড়িয়াছি, ছাত্রের মত —তাঁহার প্রবন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা শিখিয়াছি। সম্প্রতি "আয়ুর্ব্বেদ" পত্রে আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে তাঁহাকে আলোচনা করিতে দেখিয়া

---

* এই প্রবন্ধের রচনাকালে, ডাঃ পি, সি, রায়ের "হিন্দু কেমিষ্ট্রী," কবিরাজ ব্রজবল্লভ রায়ের "আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস" এবং তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের "জনদ" নামক সন্দর্ভ হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি।

—লেখক।

আমার অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছে। আনন্দের একমাত্র কারণ—তিনি যোগ্য ব্যক্তি, তাঁহার কাছে আমরা এমন কিছু পাইব, যাহা অন্যত্র দুর্ল্লভ।

"পরিবর্ত্তিত প্রণালীতে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত করা উচিত কি না?"—সতীশ বাবুর লেখনী-প্রসূত সুচিন্তিত সন্দর্ভ। সাধারণের অনুধাবন যোগ্য, কবিরাজ মহাশয়দের পক্ষেও প্রবন্ধটী অবশ্য পাঠ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়—উক্ত প্রবন্ধটী মনোযোগের সহিত পড়িয়াও আমি অনেক স্থলে তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি নাই। হইতে পারে—ইহা আমার অজ্ঞতা, আমি হয়ত তাঁহার কথা ঠিক বুঝিতে পারি নাই। তথাপি,—কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাঁহার দুই একটী মন্তব্যের প্রতিবাদ করিব। আশা করি সে জন্য সতীশ বাবু আমাকে ক্ষমা করিবেন।

সতীশ বাবুর প্রশ্ন—কবিরাজী ঔষধ প্রস্তুতের প্রণালী—ডাক্তারী মতে পরিবর্ত্তন করা উচিত কি না? আমার উত্তর—সর্ব্বত্র নহে। কেন নহে, তাহা বলিতে গেলে, প্রথমেই আমাদের দেখা উচিত—কবিরাজী ঔষধ প্রস্তুত-প্রক্রিয়ার অনুরূপ-প্রক্রিয়া ডাক্তারী মতেও আছে কি না? অবশ্য সতীশ বাবু ইহার বিচার করিয়া দেখিয়াছেন। আমিও দেখিয়াছি - কবিরাজী মতে যাহার নাম "স্বরস",—তাহা ডাক্তারী মতের Sucous বই আর কিছুই নহে। ইহা ভিন্ন -

কবিরাজী কাথ	ডাক্তারদের	Decoction.
„ হিম	„	Maceration.
„ ফাণ্ট	„	Infusion.
„ চূর্ণ	„	Powder.
„ বটক বটী	„	Pills.
„ লেহ	„	Syrups বা Confection.
„ তৈল	„	Oils, Ointments.

উভয় মতে পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়াগুলির অনেকটা মিল দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে আমার বক্তব্য—যে প্রক্রিয়া উভয় মতেই অবিকল এক, যেস্থলে সতীশ বাবুর প্রস্তাব আমি সাদরে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। যেমন, কবিরাজী মতে ফাণ্ট প্রস্তুত করিতে হইলে, উষ্ণ জলে কুট্টিত ঔষধ নিক্ষেপ করিতে হয়। ডাক্তারী মতে Infusion প্রস্তুত-প্রণালীও ঠিক তাই। এখানে ডাক্তারী মতের অনুসরণে আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ যেখানে, ঔষধ-বিশেষকে রাত্রে জলে ভিজাইয়া প্রভাতেই তাহাকে গ্রহণ করিবার উপদেশ দিতেছেন, সেই আয়ুর্ব্বেদীয় মতের "হিম" প্রক্রিয়ার সহিত ডাক্তারী মতের Maceration এর প্রক্রিয়ার অনেকটা ঐক্য থাকিলেও যৎকিঞ্চিৎ পার্থক্য বর্ত্তমান। আবার কতকগুলি প্রক্রিয়ায়—কবিরাজী মতে ও ডাক্তারী মতে বিস্তর প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। এরূপ স্থলে, ডাক্তারী প্রক্রিয়ার অনুসারে কবিরাজী ঔষধ প্রস্তুত করা কতদূর সঙ্গত তাহা বলিতে পারি না। ডাক্তারী Liquid Extract, Solid Extract, Tincture প্রভৃতির অনুরূপ প্রক্রিয়া আয়ুর্ব্বেদে আছে বলিয়া মনে হয় না। এরূপ স্থলে ডাক্তারী প্রণালীতে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত করিলে, ঔষধের উপকারিতার তারতম্য হয় না কি? যেখানে প্রক্রিয়া উভয় মতেই এক, সেখানে ঔষধ প্রস্তুতের মূলসূত্র একই হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই—বরং লাভ আছে। দুইটী

স্বরূপ "কূটজাবলেহ"কে আমি পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

কূটজত্বক্ তুলাং দ্রোণে জলস্য বিপচেৎ সুধীঃ।
কষায়ং পাদশেষঞ্চ গৃহ্নীয়াদ্ বস্ত্র গালিতং।
ত্রিংশৎ পলং গুড়স্যাত্র দত্বা চ বিপচেৎ পুনঃ।
সান্দ্রত্বমাগতং দৃষ্টা চূর্ণানীমানি দাপয়েৎ।
রসাঞ্জনং মোচরসং ত্রিকটুং ত্রিফলাং তথা॥
লজ্জালু চিত্রকং, পাঠাং বিল্বমিন্দ্রযবং বচাং।
ভল্লাতকং প্রতিবিষাং বিড়ঙ্গানি চ বালকং।
প্রত্যেকং পলসম্মানং ঘৃতস্য কুড়বং তথা।
সিদ্ধ শীতে ততো দদ্যান্মধুনঃ কুড়বস্তথা॥

ইহার অর্থ কুড়চীর ছাল ১ তুলা ১ দ্রোণ (৬৪ সের) জলে সিদ্ধ করিবে, ।৬ সের জল থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। ঐ ক্বাথে ৩০ পল পরিমিত গুড় মিশ্রিত করিয়া আবার জ্বাল দিবে। ক্বাথ গাঢ় হইলে নামাইবে।

সতীশ বাবুর মত অনুমোদন করিতে হইলে, এই ধনত্ব পর্য্যন্তই কূটজাবলেহের পাক শেষ হইত। এবং তাহা হইলে ডাক্তারী Syrup বা Confectionএর সহিত এই কবিরাজী লেহ প্রস্তুত-প্রক্রিয়ার সামঞ্জস্য থাকিত। কিন্তু কূটজ ক্বাথের সিরাপ হইয়া গেলেও, তাহাতে আবার রসাঞ্জনাদি চূর্ণগুলি পক্ক ক্বাথে প্রক্ষেপ দিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং তাহার সঙ্গে ঘৃত ও মধু মিশাইবারও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। যদি ডাক্তারী মতে—কূটজ ক্বাথে গুড় বা চিনী সংযোগে সিরাপ প্রস্তুত করিতে হয়, তবে পাকশেষে চূর্ণ দ্রব্যগুলির সংমিশ্রণ কখনই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। এই লেহ-পাকের প্রণালী দেখিলেই বেশ বুঝা যায়—কবিরাজী লেহ এবং ডাক্তারী সিরাপ, উভয়ের পাকে অনেক পার্থক্য আছে। এই চূর্ণ পদার্থের প্রক্ষেপই উভয়কে তফাৎ করিয়া দিয়াছে। কুড়চীর ক্বাথের সিরাপ প্রয়োগ করিলে যে ফল পাওয়া যায়, চূর্ণ পদার্থ মিশ্রিত কুটজাবলেহে তাহার চেয়েও বেশী উপকারিতা দেখা যায়। এরূপ স্থলে, ডাক্তারী সিরাপের প্রক্রিয়ায় কবিরাজী লেহ পাক করা সমীচিন কিনা, সতীশবাবু তাহা ভাবিয়া দেখিবেন কি? আমার বিশ্বাস, ডাক্তারী সিরাপে আর কবিরাজী লেহে আকাশ-পাতাল তফাৎ, উভয় ঔষধ এক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হইতে পারে না।

আবার কবিরাজী মতের বটিকা, ডাক্তারী মতের pills এর সমান নহে। কবিরাজী বটিকা দ্রব পদার্থ দিয়া মাড়িতে হয়, কতরকম রসের ভাবনা দিতে হয়, বরং ডাক্তারী পিল—কবিরাজী মতের "বটক", "মোদক" বা পিণ্ডেরই অনুরূপ। কবিরাজেরা ঘন সারকে চূর্ণ দ্বারা দৃঢ় করিয়া বটিকা প্রস্তুত করেন না। গুড় ঘন ক্বাথ ও চূর্ণ সহযোগে কবিরাজের লেহ প্রস্তুত করেন। এই লেহই ডাক্তারদের মতে কতকটা pills এর মত। দুঃখের বিষয়—বহুযুগ পরে, কৃতৌষধের সংজ্ঞা বদলানো—একেবারেই অসম্ভব।

তৈল পাক ও ঘৃত পাক—ডাক্তারী বিজ্ঞানের উপদেশে হইতে পারে না। কেন না ডাক্তারদের Oils ও Ointments এর সঙ্গে কবিরাজী ঘৃত-তৈলের তুলনাই হয় না। কবিরাজেরা ঘৃত ও তৈল পাক করিবার সময়—প্রথমে মূর্চ্ছা-বিধি, তা'রপর কল্ক-বিধি, ক্বাথ বিধি, গন্ধপাক প্রভৃতি বহুবিধ প্রক্রিয়াই করিয়া থাকেন। অয়েল, অয়েন্টমেণ্ট করিতে হইলে এ সব কোন বালাই নাই।

আসব অরিষ্ট সম্বন্ধেও সতীশবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহাও আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি।

আসব ও অরিষ্ট চিনী, মধু বা গুড়ের সহিত রুদ্ধ ভাণ্ডে একটা নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত সন্ধিত হয়। সেই সন্ধিত প্রক্রিয়ার (fermented) সময়ই তাহা গুড়-চিনীর সহিত পচিতে থাকে। পাত্র হইতে তুলিয়া, তাহাকে ছাঁকিয়া অন্য পাত্রে রাখিলে, আর তাহা পচে না। অন্ততঃ সেরূপ আসব অরিষ্টে ছাতা ধরিতে বা গাজনা জমিতে আমি দেখি নাই। আসব, অরিষ্ট প্রস্তুত হইয়া গেলে তাহাতে ঠিক্ ভিনিগারের মত গন্ধ বাহির হয়। আমার বিশ্বাস—আসব বা অরিষ্টকে তজ্জাত অম্লরসই পচন হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। কবিরাজগণ—নির্ম্মাল্য ফলাদির চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া, সন্ধিত দ্রবপদার্থের নির্ম্মলতা সম্পাদন করিয়া,—উপরিস্থিত দ্রবাংশ গ্রহণ করেন, অধঃপতিত ঘনক্বাথ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। আমার নিজের অভিজ্ঞতায়—আমি আসব, অরিষ্টকে একবৎসর পর্য্যন্ত সমান গন্ধবর্ণ যুক্ত ভাবে থাকিতে দেখিয়াছি। সতীশ-বাবু আমার কথার সত্যতা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। আমি দুইবৎসর পূর্ব্বের প্রস্তুত "উশীরাসব" প্রয়োগ করিয়া একটী রক্তপিত্ত রোগীকে আরোগ্য করিয়াছিলাম।

সতীশবাবু সুরামিশ্রিত জলে ভিজাইয়া ঔষধ-দ্রব্যের সারগ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। তিনি বলেন—ইহাতে আসব বা অরিষ্টের উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। আমি বলি, পারে না। সুরামিশ্রিত জলে ঔষধ ভিজাইয়া রাখিলে, আসব বা অরিষ্ট হয় না, ইহাকে বরং "পরিবর্ত্তিত হিম" বলিতে পারি; যাহার ডাক্তারী নাম—Maceration—আয়ুর্ব্বেদ মতে "হিম" ১ রাত্রি ভিজাইতে হয়, সেইজন্যই "পরিবর্ত্তিত হিম নাম দিলাম।

সতীশবাবু "স্বরস" ও "ক্বাথ" সংরক্ষণের জন্য—সুরাসার ব্যবহারের পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে ফলপ্রাপ্তি সম্বন্ধে একটু সন্দেহ আসিয়া পড়ে। বিশেষতঃ—কবিরাজেরা ক্বাথকে বাসি করিয়া ব্যবহার করেন না। তাঁহারা সদ্য প্রস্তুত ক্বাথের আদর করিয়া থাকেন। সুরাসারের কার্য্য গ্লিসারিং দ্বারাও চলিতে পারে—সতীশবাবুর ইহাও একটী মন্তব্য। আমার বিশ্বাস—সর্ব্বত্র গ্লিসারিং প্রয়োগ চলে না। মধুর দ্বারাও সতীশবাবু ক্বাথ সংরক্ষণের পক্ষপাতী—কিন্তু ইহারও দোষ আছে—মধুসংযুক্ত ক্বাথ আসবের মত Farmented হইতে পারে। মধু পচন নিবারক বটে, কিন্তু দ্রবপদার্থের সহিত মিশিলে মধু বিকৃত হইয়া যায়। সুপক্ক ফল—খণ্ড মধুতে ভিজাইয়া রাখিলে, সে ফল অনেকদিন অবিকৃত থাকে, এইটুকুই মধুর ক্ষমতা।

সুরাসার যে পচন নিবারক—এ জ্ঞান আর্য্য ঋষিদের ছিল। সুরাসারের সংস্কৃত নাম—"কোহল"। এই কোহল শব্দ হইতে আরবী ও ইংরাজী "আলকোহল" শব্দের উৎপত্তি। আসবে "কোহল" মিশানো হয় ত ঋষিদের উদ্দেশ্য ছিলনা। তাহাতে আসবারিষ্টের গুণান্তর হইতে পারে। আসব বা অরিষ্ট মদ্য জাতীয় হইলেও, তাহা সুরা নহে। মদ্য—সন্ধিত দ্রব মাত্র, মদ্যকে চুয়াইলে 'সুরা' হয়। সেকালে মদ্যের অনেক শ্রেণী ছিল। সুরা—অন্ন বা তণ্ডুল হইতে প্রস্তুত হইত। যথা মনুর উক্তি—"সুরা বৈ মল মন্নানাং।" অমরকোষের মতে সুরার আর একটী নাম—"পরিস্রুতা"। ইহা দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে—"সন্ধিত" পদার্থকে চুয়াইয়া লইতে হয়, আর্য্য ঋষিদের সে জ্ঞান ছিল। তথাপি যে তাঁহারা আসব অরিষ্টকে চুয়াইয়া

লইবার উপদেশ দেন নাই,—ইহার কারণ—তাঁহাদের সেরূপ উদ্দেশ্য ছিল না। অথবা তাঁহারা আসব অরিষ্ট—সকল জাতিকেই ঔষধার্থে ব্যবহার করিতে দিতেন, "সুরা"-পান তাঁহাদের কাছে অত্যন্ত নিন্দনীয় ছিল। এই-জন্যই সম্ভবতঃ তাঁহারা আসব অরিষ্টকে দীর্ঘ-কাল স্থায়ী করিবার জন্য চুয়াইয়া সুরাতে পরিণত করিতে ইচ্ছা করেন নাই। চাণক্যের অর্থশাস্ত্র পাঠে আমরা বুঝিতে পারি—সেকালের নৃপতিগণ সুরার শুল্ক আদায় করিতেন। আসব ও অরিষ্টের শুল্ক ছিল না। যে কারণেই হউক—ঋষিরা যখন আসব ও অরিষ্টকে চুয়াইবার ব্যবস্থা করেন নাই, আমরাই বা তাহা করিতে যাই কেন? আধুনিক বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে—ঋষি-প্রতিভা মাপা হয় না।

সতীশবাবুর যে সকল প্রস্তাবে আমার আপত্তি ছিল, উপরে অতিসংক্ষেপে আমি তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার অনেকগুলি কথা আমার বেশ ভাল লাগিয়াছে। সুতরাং তাঁহার অনেকগুলি প্রস্তাবের সহিত আমি একমত। যদি পরি-বর্ত্তিত প্রণালীতে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত করিতে হয়,—তাহা হইলে প্রক্রিয়ার পরিবর্ত্তন করিলে হইবে না। যেখানে রস বাহির করিতে হইবে, সেখানে "টিঞ্চার প্রেস" যন্ত্র ব্যবহার করা হউক,—ঔষধ বিশেষে "পারকোলেটার" ব্যবহার করা হউক, সহজে ঔষধদ্রব্যকে চূর্ণ করিবার জন্য Disintegrator, 'বলমিল' পটমিল, প্রভৃতি যন্ত্র ব্যবহার করা হউক, ছাঁকিবার জন্য সূক্ষ্ম চালুনী ও রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করা হউক। দ্রব বিশেষকে পরিষ্কার করিবার জন্য ফিলটার পেপার ব্যবহার করা হউক, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। আমি ডাক্তার, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধও আমাকে নির্ব্বাচন করিতে হয়। তাই সতীশ-বাবুর প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইলাম।

ডাক্তার শ্রীক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়
এল্, এম্, এস্।

মনুষ্য রক্তের লোহিত কণিকার আকার।

সহস্রাধিক ছাত্রের রক্ত অনুবীক্ষণ যন্ত্র সহযোগে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমার ধারণা হইয়াছে যে, রক্তের লোহিত কণিকার আকার সম্বন্ধে প্রচলিত শারীর-বিদ্যা-সংক্রান্ত পুস্তক সমূহে যে বর্ণনা আছে, তাহার পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক।

প্রচলিত মতানুসারে উক্ত কণিকাগুলির আকার—গোলাকৃতি, চেপ্টা এবং ধার অপেক্ষা মধ্যস্থল পাৎলা। রুটী প্রস্তুত করিবার লেচিকে দুইদিকে বুড়া আঙ্গুল দিয়া চাপ দিলে যে আকার হইবে, তাহা ঐ কণিকা-গুলির আকারের সদৃশ। ঐ মতানুসারে

কণিকাগুলির মধ্যস্থলে একটা পাৎলা ত্বক্ আছে।

আমার মতে ঐ কণিকাগুলির মধ্যস্থল একেবারে ফাঁক, উহাতে কোনও ত্বক নাই। অর্থাৎ কণিকাগুলির আকার মোটা ও গোল তারে নির্ম্মিত আংটী বা বলয়ের অনুরূপ। ষ্টীমারে যেরূপ Life belt দেখা যায়, তদনুরূপ।

কণিকাগুলির ঐরূপ আকার পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইলে একটা কাচ স্লাইডের [Slide] উপর বড় এক ফোঁটা রক্ত লইতে হইবে। পর্য্যবেক্ষণের জন্য একটী পুরাণ অনুবীক্ষণ যন্ত্র (যাহার stage ক্ষয় হইয়া গিয়া অসমতল হইয়াছে) হইলে ভাল হয়। ঐরূপ অসমতল অনুবীক্ষণে দেখিবার সময় কণিকাগুলি ক্ষেত্রের বন্ধুরত্ব-নিবন্ধন কোনও একদিকে স্রোত-প্রবাহে চালিত হইতে দেখা যাইবে। নূতন অনুবীক্ষণ হইলে একটু আধটু কাগজের দ্বারা অসমতল ষ্টেজ করিয়া লওয়া যায়। Cover slip খানি খুব পাৎলা হওয়া আবশ্যক। বেশী ভারি হইলে উহার চাপে কণিকাগুলি নড়িতে পারিবে না। রক্তের প্রবাহ দেখিয়া তদুপরি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সংযোগ করিতে হইবে। প্রবাহে রক্ত কণা-গুলি আকৃষ্ট হইয়া চলিতেছে, দেখা যাইবে। এইরূপ অবস্থায় কয়েকটী কণা উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া চলিতেছে দেখা যাইবে। ঐরূপ চলন-শীল দুই একটী কণার আকারের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই স্পষ্ট বোধ হইবে যে, উক্ত লোহিত-কণাগুলির মধ্যস্থলে বাস্তবিক ত্বক্ নাই।

কোনও যন্ত্রের উপকারিতা বা অপকারিতার দিক্ দিয়া দেখিলেও বুঝা যাইবে যে, কণা-গুলির নূতন আকার ধরিয়া লইলে তাহাদের স্বকার্য্য সম্পাদনের বিশেষ সুবিধা হয়।

(১ম) কণাগুলির বহিরাবরণের আয়তন বৰ্দ্ধিত হয়, ইহাতে তাহাদের অক্সিজেন আদান-প্রদানের খুব বেশী সুবিধা হইবে।

(২য়) মধ্যস্থানে একটি অনাবশ্যক ত্বকের পরিবর্ত্তে ছিদ্র বা ফাঁক থাকিলে ঘন রক্ত রসের মধ্য দিয়া কণাগুলির গমনাগমনের পক্ষে বাধা কম পড়ে।

(৩য়) ঐরূপ আকারে কণাগুলি অধিক-তর নমনীয় হইবে; তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র Capillury-র মধ্য দিয়া যাইবার সময় ও অধিকতর সুবিধা হইবে।

মাছ, বেঙ্ প্রভৃতি যে সকল জীবের লোহিত কণিকায় Nucleus আছে,—তাহাদিগের কণা পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা-যায় যে—Nucleus এর চারিদিকে একটা গভীর খাঁজ আছে। আমার বিবেচনায় উচ্চতর জন্তুদিগের লোহিত কণিকা সৃষ্টি হইবার কালে Nucleus এর চারিধারের খাঁজ গভীরতর হইয়া Nucleusটী কণিকা হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, মধ্য স্থানটা এইরূপে ফাঁক হইয়া যায়। পরে Nucleusটী ভঙ্গ হইয়া Bleod platelets-এ পরিণত হয়।*

শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

* এই প্রবন্ধ বিজ্ঞান সভার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম্ এ, মহাশয়ের সভাপতিত্বে, ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডি, এস্, সি; পিএচ্ ডি, সি, আই, ই, মহোদয়ের সম্মুখে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

টোট্‌কা ও মুষ্টিযোগ

—:০:—

বসন্তে প্রতিষেধক বিধি।—

(১) এই রোগের প্রাদুর্ভাবকালে পুরুষের দক্ষিণ হস্তে ও স্ত্রীলোকের বাম হস্তে হরিতকীর একটি বীজ ধারণ করিলে এই রোগে আক্রান্ত হইবার ভয় থাকে না। (২) তেলাকুচা, মাধবীলতা, অশোক, পাকুড় ও বেতস— ইহাদের পত্রের কাথ পর্য্যুষিত করিয়া পান করিলে বসন্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না।

ব্রণে ব্যবস্থা।—

(১) ধুতুরার মূল বাটিয়া সৈন্ধব লবণ মিশাইয়া এবং ঐ দুইটি দ্রব্য অল্প গরম করিয়া ব্রণ হইবামাত্র প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। (২) টাবালেবুর মূল, গণিয়ারি, দেবদারু, শুঁঠ, কেলেকোড়া ও রাস্না—এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ব্রণ-শোথে ফল দর্শিয়া থাকে।

যকৃৎ রোগে সুব্যবস্থা।—

কুলেখাড়া পাতার রস প্রাতে ও বৈকালে এক তোলা লইয়া অল্প মধুর সহিত সেবন করাও—সদ্যঃ উপকার পাইবে। ইহাতে যকৃতের ক্রিয়া ভাল তো হইবেই, তদ্ভিন্ন ইহা সেবনের ফলে রক্তবৃদ্ধি হইয়া দেহ সবল ও সুস্থ হইবে।

দূষিত জল জনিত জ্বরে।

বাসক ছাল, মুতা, গুলঞ্চ (গাঁট বাদ), পলতা, শুঁঠ, ধনে ও চিরাতা—এই কয়টি দ্রব্যের প্রত্যেকটি ১৩।০ কুঁচ ওজনে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া প্রাতে ও বৈকালে এক ছটাক করিয়া অল্প মধুসহ পান করিতে দাও। এই-রূপ ব্যবস্থায় দূষিত জল সেবন জনিত জ্বর ৩।৪ দিনে আরোগ্য হইবে।

অজীর্ণে মুষ্টিযোগ।—

অজীর্ণ হইয়া ভেদ হইতে থাকিলে চারি আনা যোয়ান ও চারি আনা লবণ—একত্র মিশাইয়া না চিবাইয়া একটু জলসহ গিলিয়া ফেল, সদ্যঃ সুফল পাইবে।

শ্রীঅতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কবিভূষণ

সমালোচনা।

—:০:—

চিকিৎসা সার সংগ্রহ। ১ম খণ্ড।— ৺পীতাম্বর কবিরাজ সংগৃহীত ও ঢাকা—মুড়াপাড়া হইতে শ্রীমদনমোহন কবিরঞ্জন কবিরাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।৴০ আনা। এখণ্ড কেবল জ্বর-চিকিৎসা লইয়া লিখিত। সকল প্রকার জ্বরে যে সকল নিয়মে [illegible]

উচিত,—যে সকল পাচন, মুষ্টিযোগ ও ঔষধাদি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য—শাস্ত্রীয় শ্লোক হইতে অনুবাদ করিয়া সেই সকল কথা ইহাতে বলা হইয়াছে। বলিবার প্রণালী মন্দ হয় নাই। তবে কবিরাজী পুস্তকে কুইনাইন ঘটিত ঔষধ দিবার ব্যবস্থা করা—সঙ্গত মনে করিতে পারি না।—তাহা হইলে আর আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার বিশেষত্ব রহিল কি! এ পুস্তকের সঙ্কলনকার কম্পজ্বরে যে হরিতাল ঘটিত ঔষধ প্রয়োগের কথা বলিয়াছেন, সেই হরিতাল ঘটিত ঔষধই তো জ্বরের বিরাম অবস্থায় ব্যবহার করিলে সুফল পাওয়া যাইতে পারে। কুইনাইনের ম্যালেরিয়া ভিন্ন অন্য জ্বর বন্ধ করিবার শক্তি নাই; হরিতালের ম্যালেরিয়া ছাড়া অনেক জ্বর বন্ধেরই ক্ষমতা আছে। যাহা হউক এ সকল কথা বাদ দিলে গ্রন্থখানি মন্দ হয় নাই।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

—:০:—

গাভীর হিসাব।—গত আদম সুমারীতে প্রকাশ,—সমগ্র ভারতে গাভীর সংখ্যা ৩৭৪০০০০০। ইহার মধ্যে যুক্তপ্রদেশেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বাঙ্গালা প্রদেশে গাভী, ষাঁড়, বাছুর এবং মহিষ মিশাইয়া একত্র হিসাব ২৫৩০০০০০। হিসাবে যাহা বুঝা যায়, তাহাতে বাঙ্গালা দেশ হইতে এখনো গো-কুল নির্ম্মূল হয় নাই। তবে বাঙ্গালায় দুগ্ধের দুর্দ্দশা হইল কেন?

ঘৃতে চর্ব্বি।—কলিকাতা সহরে আবার নাকি ঘৃত বলিয়া চর্ব্বি চলিতেছে, মফঃস্বলে তো কথাই নাই। তবে ঘৃত আইন পাশ হইয়া কি ফল হইল।

পূর্ব্ববঙ্গে বৈদ্য-সম্মেলন।—গত ২৪শেও ২৫শে চৈত্র ঢাকা সহরে পূর্ব্ববঙ্গ বৈদ্য সম্মেলনের ২য় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। চট্টগ্রামের কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেন কবিরত্ন সভাপতি হইয়াছিলেন।

টীকায় জুলুম।—'বরিশাল হিতৈষী'-তে প্রকাশ—বরিশালের কতিপয় পল্লীতে টীকাদারেরা জ্বর এবং উদরাময় পীড়াগ্রস্থ শিশুদিগকে জোর করিয়া টীকা দিতেছে। ইহার ফলে বরিশালের ফাগুপাশা গ্রামের একটী শিশুর জীবন-সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল! পীড়িতাবস্থায় টীকা দেওয়া কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে, ইহা আইনেরও বিরুদ্ধ। আমরা এজন্য বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেটের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শিশু মৃত্যু।—কলিকাতা সহরে জন্ম হিসাবে প্রত্যেক নয় জনের মধ্যে তিন জন করিয়া শিশুর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। অস্বাস্থ্যকর পিতামাতার শুক্র শোণিতের সংমিশ্রণের ফলেই যে এই অকাল মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, তাহা কি আর বলিতে হইবে?

যক্ষারোগীর হিসাব।—সরকারি হিসাবে প্রকাশ,—পৃথিবীতে প্রতি বৎসর মৃ

লোকের মৃত্যু হয়, তাহার ৭ ভাগের এক ভাগ যক্ষ্মারোগে মরিয়া থাকে। ব্রিটিশ ভারতের বার্ষিক লোক সংখ্যা ৬ লক্ষ। এই হিসাবে মাসে ৪৩ হাজার ২ শত, প্রত্যেক দিন ১৪৪০, প্রত্যেক ঘণ্টায় ৬০ জন এবং প্রত্যেক মিনিটে ১ জন করিয়া যক্ষ্মা রোগে ইহলীলা সম্বরণ করিতেছে।

চিকিৎসকের মৃত্যু।—আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, কলিকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার সার্জন জেনারাল কর্ণেল বার্ড সাহেব লোকান্তরিত হইয়াছেন। ইনি মেডিকেল কলেজের অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন এবং দিশের একজন কৃতী চিকিৎসক বলিয়া ইঁহার প্রসিদ্ধি ছিল।

বাঙ্গালীর ব্যয়।—বাঙ্গালী স্বাস্থ্যরক্ষা কল্পে ১২ লক্ষ, শিক্ষায় ১ কোটী ৬০ লক্ষ এবং স্বাস্থ্য নষ্ট বা মদ্যপানের জন্য ৮ কোটী মুদ্রা বৎসরে ব্যয় করিয়া থাকে। বাঙ্গালীর অকাল মৃত্যু ঘটিবে না তো কাহার ঘটিবে?

স্বাস্থ্য শিক্ষা।—কিছুদিন হইল, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে অনারেবল মিঃ এইচ্, আর, আর উইন এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব পেশ করেন যে, বঙ্গদেশের গভর্ণমেণ্ট সাহায্য কৃত বালক এবং বালিকা বিদ্যালয় সমূহে যথাপ্রয়োজন গুণসম্পন্ন শিক্ষকগণ কর্ত্তৃক স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হউক। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেট্রিকুলেশন পরীক্ষারও ইহা বাধ্যতামূলক পাঠ্য হউক। আগামী বৎসরের বজেটে এতদুপযোগী ব্যবস্থা করা হউক। ইহা লইয়া অন্যান্য সভ্যগণের মধ্যে নানারূপ আলোচনার পর "বাধ্যতামূলক" কথাটির স্থলে "স্বেচ্ছাধীন" কথাটি গৃহীত হইয়াছে। একজন ইয়ুরোপীয় সদস্য বাঙ্গালা দেশের মঙ্গলোদ্দেশ্যে এরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন,—ইহা আমাদের সৌভাগ্য বলিতে হইবে।

ভারতের রসায়ন।—কিছুদিন পূর্ব্বে ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে "হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের প্রাচীন তত্ত্ব" সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন,—তাহাতে প্রকাশ,—"হিন্দুগণ রসায়ন ও গণিত শাস্ত্র আরব দেশ হইতে যে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, তাহা সত্য নহে। আরবগণই ভারতীয়দিগের নিকট হইতে ঐ দুই শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছেন, প্রাচীন আরব গ্রন্থকারগণ কৃতজ্ঞতা সহকারে একথা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের গ্রন্থে প্রকাশ,—খলিফ হারুণ অল্ রসিদের রাজত্বকালে চরক ও সুশ্রুতের অনুবাদের জন্য ভারতীয় পণ্ডিতগণ বোগদাদে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। চরক ও সুশ্রুত ভিন্ন চিকিৎসা সম্বন্ধীয় আরও বহুগ্রন্থ হিন্দুগণ কর্ত্তৃক আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল"। এ সব কথা আমরা বরাবরই জানি। যাঁহাদের এ বিষয়ে অন্যরূপ ধারণা আছে, তাঁহারা ডাক্তার রায়ের কথায় ইহা শিক্ষা করুন।

আমাদের "নববর্ষ"।

* * *

সেই চম্পক-মালতী-মল্লী-নাগেশ্বরের গন্ধ,
সেই চঞ্চল-মুক্ত-উদাস-পবনের গতি মন্দ,
সেই ফল দোলে শ্যাম-পল্লব-শোভন-বৃক্ষের শাখে,
সেই বিহঙ্গ, স্তবক-নম্র লতার কুঞ্জে ডাকে,
সেই সুন্দর স্বপ্ন-রচিত রক্তাশোকের বীথি,
সেই লালসায় অলস নেত্র, অলির গুঞ্জ গীতি,
সেই উজ্জ্বল চন্দ্র-তপন, সেই নিশি, সেই দিবা,
সেই সৃষ্টির জীবন-মৃত্যু, নূতন হ'য়েছে কিবা ?
সেই পুরাতন, সব "এক ঘেয়ে" গঠন-রক্ষা-নাশ,
নিখিলের "নব বর্ষ" তথাপি, শুভ বৈশাখ মাস !!

* * *

সেই দলাদলি—রুধির-লিপ্ত, অন্যের শুভ-দ্বেষ,
সেই শত্রুতা—স্বার্থপরতা—বিঘ্ন-বিপদ-ক্লেশ,
সেই দরিদ্র অর্থ যোগায় ধনীর বিলাস তরে,
সেই ক্ষুধার্ত্ত-শীর্ণ-শরীর—অন্ন অভাবে মরে,
সেই সন্তাপ-শোক-যন্ত্রণা, রোগীর আর্ত্তনাদ,
সেই সংসার চির-অপূর্ণ—আশা-আকাঙ্ক্ষা-সাধ,
সেই জলাভাব পল্লীগ্রামের—জ্বলে দাবাগ্নি শিখা,
সেই ম্যালেরিয়া-কলেরা ও প্লেগে শমনের বিভীষিকা,
কিছুরি হলোনা পরিবর্ত্তন—কিছুরি নাহিক ক্ষয়,
তবে কারে বল "নূতন বর্ষ" ? গাও বল কার জয় ?

* * *

ঘুচিবে যে'দিন সারা বিশ্বের দৈন্য ও গ্লানি খেদ,
হৃৎ-স্বাস্থ্যের মাঝে—প্রতিষ্ঠা লভিবে "আয়ুর্ব্বেদ,"
ঘৃণ্য-বিলাস ত্যজিয়া মানব দীক্ষিত হ'বে ধর্ম্মে,
স্বর্গ আসিবে মর্ত্ত্যে নামিয়া, কামনাশূন্য কর্ম্মে,
নদীর শীর্ণ বক্ষে—ছুটিবে বীচি-বিক্ষোভ-বাণ,
স্নিগ্ধ-শ্যামল-ক্ষেত্রে শোভিবে কনক শীর্ষ ধান,
আসিবে ফিরিয়া "আচার্য্য যুগ" ল'য়ে ঔষধ পথ্য,
সার্থক হ'বে শাস্ত্র-মহিমা—জ্ঞান-বিজ্ঞান তথ্য,
অকাল মৃত্যু দূর হবে, প্রাণে জাগিবে নূতন হর্ষ,
সৃষ্টির মাঝে আসিবে সে'দিন আমাদের "নব বর্ষ"।

শ্রীব্রজবল্লভ রায়, কাব্যতীর্থ।
[ভূতপূর্ব্ব "বঙ্গদর্শী" সম্পাদক]

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

২য় বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৫—জ্যৈষ্ঠ। | ৯ম সংখ্যা।

জাতীয় সঙ্গীত।

১

তোমরা কি সেই বৈদ্য-সন্তান আর্ত্ত-হৃদয়ে অভয়-দাতা ?
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-স্থাপনে তোমাদেরি কি সৃজিল ধাতা ?
নিখিল বেদের শ্রেষ্ঠ যেটুকু—তোমাদেরি কি সে আয়ুর্ব্বেদ ?
যাহার প্রসাদে রোগ-নাশিয়ে তোমরা জীবের ঘুচা'তে খেদ ?
শল্য-শালাক্য-কায়-চিকিৎসা—সকলি যা'দের আয়ত্ত ছিল !
জরায় যৌবন যা'দের প্রসাদে ধরণীর মাঝে আসিয়াছিল ?
তোমরা কি সেই তেজো-নৈপুণ্যে জ্ঞানের জ্বলন্ত উজ্জ্বল ছবি ;
আছে কি না লুপ্ত হ'য়েছে এখন তোমাদের আজি সে সুখ-রবি ?

২

তোমরা কি সেই জ্ঞান অর্জ্জনে আগেকার মত লুব্ধপ্রাণ ?
পীড়িতের তরে মর্ম্ম-মাঝারে তুলিয়া থাক কি করুণ-তান ?
সামর্থ্য-প্রকাশে অর্থ অপেক্ষা অধিক তৃপ্তি যা'দের ছিল,
বাসনা যা'দের গুপ্ত-সাফল্য—এ মন্ত্র যাহারা শিক্ষা নিল,
রাজন্য-সমাজে মান্য যা'দের, কীর্ত্তি যা'দের ধরণী ভরা,
ধর্ম্ম-যা'দের আর্ত্ত সেবাই,—এমন ভাবেতে হৃদয় গড়া।
সে দেশ-বরেণ্য-বংশ-মাঝারে জন্ম লভিয়া পুণ্য-ফলে
সে সব কর্ম্ম যত্নে রেখেছ ?—না ভাসা'য়ে দিয়েছ অতল জলে ?

৩

তোমাদের বিদ্যা বিশ্ব ঘোষিত—'মাধব নিদান' সাক্ষ্য তা'র,
তোমরাই ভাষা করিলে সৃষ্টি'—'মুগ্ধবোধ' খানি জাননা কা'র ?
তোমাদের বংশে জন্ম লভিলা 'চক্রপাণিদত্ত'—কোথায় সে দিন ?
তোমাদেরি বংশে 'বিজয় রক্ষিত'—সে টীকার জ্যোতিঃ হয়নি ক্ষীণ।
তোমাদেরি রত্ন মুগ্ধ হইয়া গ্রীস্-আরবেরা সাধিয়া নিল,
আরব হইতে সমগ্র বিশ্ব চিকিৎসা-বিদ্যা শিখিয়াছিল।
তোমরাই আগে সেবার ব্রত বিজ্ঞানের ওগো করিয়াছিলে,
সে সকল আজি করিছ চর্চ্চা ?—না সমাজ হইতে তুলিয়া দিলে !

৪

দাসত্ব করিয়া ক্লান্ত কখন হওনি তোমরা আছে কি মনে ?
জ্ঞানেরি চর্চ্চায় শ্রান্ত হৃদয়, আপনা ভাবিতে জগত-জনে।
তোমাদের দেখি, আর্ত্ত ভাবিত—বুঝি দেবগণ সমুখে মোর,
তোমাদেরো হৃদি সে ভাবে মুগ্ধ,—তোমাদেরো নেত্রে বহিত লোর।
তোমরা ভাবিতে অপত্য তা'রে,—শাস্ত্র-উপদেশ শিক্ষা করি,—
সে শিক্ষার স্রোতঃ রুদ্ধ এখন,—দুঃখ হয় না সে সব স্মরি'।
কোথা তোমাদের সে সব শিক্ষা ? সে দীক্ষা দিবার ক'জন আছে ?
তা'রি ফলভোগ, ভিক্ষা-করুণা, আর আঁখিজল তাহার পাছে !

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন।

মকরধ্বজের প্রস্তুত-প্রণালী।

——:০:——

[বৃদ্ধবৈদ্যের উপদেশ]

আমার বাটী পল্লীগ্রামে। বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তিন পুরুষ ধরিয়া বৈদ্য-বৃত্তিই আমাদের অবলম্বন। কিন্তু আমার উত্তরাধিকারিগণ কেহই জাতীয় ব্যবসায়-লিপ্ত নহে। ইহা অবশ্যই দুঃখের কথা ! এ দুঃখের কথা আমি এতদিন মনেই রাখিয়াছিলাম, আজ কিন্তু সকলের কাছে প্রকাশ করিতেছি। ইহার কারণ—আমার মত বুড়ার কাছে আমার বংশধরেরা কিছুই শিখিল না। আমাদের বংশ-পরম্পরা-প্রচলিত এমন কতকগুলি ঔষধ

আছে, আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলি লুপ্ত হইয়া যাইবে। আমার জীবন-নাটকে এখন পঞ্চম অঙ্ক চলিতেছে, যবনিকা-পতনের আর বিলম্ব নাই। আর ত অপেক্ষা করিতে পারি না। আজীবন চিকিৎসা-ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া আমি যেটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, আমার ইচ্ছা তোমরা তাহা শিখিয়া লও। আমি জানি, তোমরা আমার চেয়ে পণ্ডিত, যশস্বী ও কীর্ত্তিমান; কিন্তু আমি যে তোমাদের চেয়ে বয়সে বুড়া—তাহা ত অস্বীকার করিতে পারিবে না। সত্য বটে, একালের শিক্ষিত কবিরাজ তোমরা;—তোমরা রোগীর বাড়ী গেলে ১৬ টাকা দর্শনী পাও, তোমরা ল্যাণ্ডো-লেটে চড়, পেটেণ্ট ঔষধ আবিষ্কার কর। আমার চেয়ে তোমাদের কত বেশী সম্ভ্রম! আমি ফাটা পায়ে চটী পরিয়া, ধূলায় ধূসর হইয়া, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া চিকিৎসা করি। টাকাটা সিকেটা যে' যা' দেয়—হাসি মুখে লই। ইহাতেই আমার মরাই ভরা ধান, গোয়াল ভরা গাই, বাগান ভরা গাছ, পুকুর ভরা মাছ। আমি কি শুধু আমার দেশের কবিরাজ? আমি দলাদলিতে মধ্যস্থ, বারয়ারীতে প্রধান পাণ্ডা, পল্লীর উন্নতি-কামনায় পরামর্শ দাতা, আমি আমার দেশের লোকের বিপদে বন্ধু, সম্পদে সহায়, সান্ত্বনায় সুহৃদ,—আমি নই কি? নাই বা হইলাম আমি—"বিদ্যারত্ন" "বৈদ্যরত্ন" "কাব্যতীর্থ" "কবিভূষণ"? আমার জন্যই ত আমার দেশবাসী—চিকিৎসকের অভাব এখনও টের পায় নাই। এই টুকুই আমার সুখ, এইটুকুই আমার গর্ব্ব।

আমি কোন্ ঔষধ কেমন করিয়া প্রস্তুত করি, কোন্ রোগে কিরূপ ব্যবস্থা দিয়া কেমন ফল পাইয়াছি, তোমাদের কাছে একে একে তাহা বলিয়া যাইব। তোমরা শুনিবে কি?

আজ প্রথমেই "মকরধ্বজের" কথাটা বলি। "মকরধ্বজ" বড় নামজাদা ঔষধ। সাহেবেরাও ইহার গুণের প্রশংসা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়—অনেক কবিরাজ মহাশয়ই ইহা প্রস্তুত করিতে জানেন না। অথচ লেবেল আঁটিয়া "ষড়্গুণ", "সিদ্ধ" নাম দিয়া—কেনা "রস সিন্দুর" বিক্রয় করেন। আমি স্বহস্তে "মকরধ্বজ" প্রস্তুত করিয়া থাকি। অনেকের বিশ্বাস—"মকরধ্বজ" প্রস্তুত করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। আবার কেহ কেহ এমন কথাও বলিয়া থাকেন,—"মকরধ্বজ প্রস্তুত করিলে বংশ থাকে না।" একথার মূলে কোনও সত্য আছে বলিয়া মনে হয় না। আমার বয়স ৭৬ বৎসর, সংসারে আমি মহাসুখী। ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে—আমার ৪টী পুত্র ও ৩টী কন্যা বর্ত্তমান। তাহাদের সন্তান-সন্ততি হইয়াছে, তাহারা দশের মাঝে একজন হইয়া সংসার-ধর্ম্ম করিতেছে। যাক্,—বাজে কথা ছাড়িয়া এইবার কাজের কথা বলি।

আমি যে উপায়ে ষড়্গুণ বলিজারিত মকর-ধ্বজ প্রস্তুত করি, তোমাদিগকে তাহা বলিতেছি।

প্রথমে পারা লইতে হইবে। পারার যত ওজন—তাহার ৬ গুণ গন্ধক লইয়া বেশ করিয়া চূর্ণ করিয়া একটা পাত্রে রাখিয়া দিবে। এই পারা বা গন্ধক শোধন করিবার আবশ্যক নাই।

কবিরাজদের কাছে "বালুকা যন্ত্র" সবিশেষ পরিচিত। একটা বড় হাঁড়ীতে এক হাঁড়ি বালি [গঙ্গার বালি হইলেই ভাল হয়] পুরিলেই বালুকা যন্ত্র হইল। এইরূপ "বালুকা যন্ত্রের"

ঠিক মধ্যস্থলে একটী ছোট হাঁড়ি বসাইবে। হাঁড়ির তলদেশ যেন সমতল হয়। সেই ছোট হাঁড়িতে পারা রাখিবে, তা'র পর পারার হাঁড়ি শুদ্ধ বালুকা যন্ত্রটী উনানের উপর বসাইবে এবং উনানটী আগুন দিয়া ধরাইয়া দিবে। উনানটী কাঠের কিম্বা ঘুঁটিয়ার দ্বারা জ্বালিবে। পাথুরে কয়লা দিবে না। পূর্ব্বে যে পারার ৬ গুণ গন্ধক গুঁড়াইয়া রাখিয়াছ, সেই গন্ধকের কিয়দংশ লইয়া—যে হাঁড়িতে পারা রাখিয়াছ—তাহাতে দিবে। এমনভাবে গন্ধক দিবে, যেন পারা চাপা পড়ে। গন্ধক গলিয়া তৈলের মত হইলে, আবার তাহাতে গন্ধক দিবে। সে গন্ধক গলিয়া গেলে আবার দিবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে সেই ৬ গুণ ওজন করা গন্ধকের সমস্ত টুকু পারার হাঁড়িতে দিতে হইবে। গন্ধক দেওয়া হইয়া গেলে, গলিত গন্ধক তরল থাকিতে-থাকিতে, চিম্‌টা বা সাঁড়াশী দিয়া পারার হাঁড়ি নামাইয়া ফেলিবে। কিছুক্ষণ পরে—হাঁড়ি ঠাণ্ডা হইলে এবং গন্ধক জমিয়া কঠিন হইলে—ভাঁড়ের তলা ছিদ্র করিয়া পারা বাহির করিয়া লইবে। এই পারার নামই "ষড়্‌গুণ বলিজারিত" পারা। গন্ধকের নাম—বলি। ৬ গুণ বলির দ্বারা জারিত, তাই ইহার নাম "ষড়্‌গুণ বলিজারিত।" রস-গ্রন্থে ষড়্‌গুণ বলি জারণ প্রথা যাহা উক্ত হইয়াছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

"ক্ষুদ্র ভাণ্ডে রসং ক্ষিপ্ত্বা বালুকা যন্ত্র-মধ্যতঃ।
ষড়্‌গুণং গন্ধকং দত্ত্বাদল্পাল্পঞ্চ শনৈঃ শনৈঃ
তৈলরূপো যদা গন্ধ স্ততোহব তারয়েৎ দ্রুতং।
স্বাঙ্গ শীতে দৃঢ়ে গন্ধে স্ফোটয়িত্বা রসং নরেৎ॥

এইরূপ বলিজারিত পারা ৮ তোলা এবং গন্ধক ৮ তোলা লইবে। এই গন্ধক শোধন করিয়া লইতে হইবে। গন্ধক শোধন সকলেই জানেন। গন্ধকের ডেলায় একটু ঘৃত মাখাইয়া লোহার হাতায় করিয়া মৃদু আগুনে গলাইতে হয় এবং সেই গলিত গন্ধক জল মিশ্রিত দুগ্ধের পাত্রে ফেলিতে হয়। ইহাই হইতেছে—গন্ধক শোধনের সর্ব্বাপেক্ষা সহজ বিধি। দুগ্ধ নির্ব্বাপিত গন্ধককে রৌদ্রে শুকাইয়া লইয়া ব্যবহার করিবে।

প্রথমে পারা ৮ তোলা খলে ঢালিবে, তাহার সঙ্গে ২ ভরি সোণার পাত দিবে। আমি চীনে সোনার পাত ব্যবহার করিয়া থাকি। চীনা পাত—পোদ্দারের দোকানে বিক্রয় হয়। তাহা কিনিয়া আনিয়া কাঁচি দিয়া ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া পারার সহিত মিশাইবে। পারার সহিত সোণা খুব শীঘ্র মিশিয়া যায়। পারা ও সোণা খলে ফেলিয়া নুড়ী দিয়া আধ ঘণ্টা আন্দাজ মাড়িলেই সোণা পারার সঙ্গে মিশিয়া যায়। সোণা মিশ্রিত পারা একটু ঘন হয়—মাড়িলে যেন সূতার মত হইয়া যায়। পারাও সোণা মিশিয়া গেলে—তাহাতে ৮ ভরি শোধিত গন্ধক দিবে। তা'র পর খুব ধীরে ধীরে লঘু হস্তে মাড়িতে থাকিবে। জোরে মাড়িলে পারা গন্ধক শীঘ্র মেশে না, কখনও বা সমস্ত অংশও মেশে না। যত আস্তে মাড়িবে, ততই ভাল। মাড়িতে মাড়িতে পারা ও গন্ধক মিশিয়া ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইবে। এই কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণের নাম—"কজ্জলী।" সোণা না দিয়া, শুধু পারা গন্ধক একত্র মাড়িলেও কজ্জলী হয়। এই কজ্জলী—কবিরাজদের অনেক ঔষধেই ব্যবহার হইয়া থাকে।

এক্ষণে, পারা-গন্ধক ও স্বর্ণ-সংমিশ্রণে যে কজ্জলী প্রস্তুত হইল, সেই "কজ্জলী" ঘৃত কুমারীর রসে মাড়িয়া রৌদ্রে শুকাইবে

তিনবার মাড়িবে, তিনবার শুকাইবে। এই রূপ মাড়া ও শুকানোর নাম—“ভাবনা।”

এইবার একটী মাটির থালী যোগাড় করিবে। মাটীর থালী—এখন আর বড় কুমারেরা প্রস্তুত করে না। আগে বাজারে যথেষ্ট বিক্রয় হইত। চাষা-ভূষা লোকে—থালীতে তৈল পূরিয়া লইত। ইহার আকার ছিল—ঠিক কুঁজার মত, অথচ ক্ষুদ্র। থালী না যোগাড় করিতে পারিলে—সমতল কাল পাঁইট বোতল লইবে। বোতলটীর গাত্রে—কাদা ও বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা বেশ করিয়া লেপ দিবে। পরে রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। এই লেপ দেওয়া বোতলটীর ভিতর—পূর্ব্বোক্ত ভাবনা দেওয়া কজ্জলী পূরিবে। পরে—বোতলটী বালুকাযন্ত্রের মধ্যে বসাইবে। বালুকা-যন্ত্রের কথা আগেই বলিয়াছি—৬ গুণ গন্ধকের সহিত যে যন্ত্রে পারাকে জ্বাল দেওয়া হইয়াছিল—সেইরূপ “বালুকা যন্ত্র।” কিন্তু বালুকাযন্ত্রের হাঁড়িটী এমন হওয়া চাই—যেন বোতলের গলা পর্য্যন্ত—বালিতে ঢাকা পড়ে, অর্থাৎ হাঁড়িটী—যেন গভীর হয়,:ভাত-রাঁধা-তোল-হাঁড়ি হইলেই চলিবে।

বোতল বসানো বালুকা যন্ত্রটী উনানের উপর রাখিয়া—কাঠের আগুণে জ্বাল দিবে। সকালে—যদি ৮টার সময় চড়ানো হয়, তাহা হইলে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে জ্বাল দিতে হইবে। জ্বালের এই নিয়ম। খুব খর-জ্বাল হইলে—ভাল ‘চ’টা’ বাধেনা।

“বালুকা যন্ত্রের” বালি গরম হইবামাত্র—বোতলের মুখ হইতে গন্ধকের ধোঁয়া এবং গন্ধ বাহির হইতে থাকিবে। অনুমান ২ ঘণ্টা জ্বাল দেওয়ার পর আর ধোঁয়া দেখিতে পাওয়া যাইবে না। এই সময় হইতে পাক শেষ হওয়া পর্য্যন্ত ১ ঘণ্টা অন্তর, ১০।১৫ মিনিটের জন্য—বোতলের মুখ, এক খণ্ড প্রস্তর বা লৌহখণ্ডের দ্বারা ঢাকিয়া দিতে হইবে। অর্থাৎ মাঝে মাঝে বোতলের মুখ ঢাকিবে এবং মাঝে মাঝে খুলিয়া দিবে। এইরূপে ১২ ঘণ্টা জ্বাল দিলেই মকরধ্বজ প্রস্তুত হইল। ১২ ঘণ্টার পর জ্বাল দেওয়া বন্ধ করিবে। তা'রপর—সাঁড়াশী দিয়া বোতলের গলা ধরিয়া, বোতলটী নামাইয়া কোনও শীতল বাতাস যুক্ত স্থানে, সে দিনের মত রাখিয়া দিবে। পরদিন বোতলের নীচের দিক ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, দেখিবে—বোতলের মধ্যস্থল হইতে গলা পর্য্যন্ত—মকরধ্বজের উজ্জ্বল দানা লাগিয়া রহিয়াছে। ছুরি দিয়া চাঁচিয়া উহা—শিশির মধ্যে পুরিয়া রাখিবে। ইহাই—মকরধ্বজ। বোতলের নীচে—ঝামার গুঁড়ার মত—এক প্রকার পদার্থ পড়িয়া থাকে। এই ভস্মাবশেষ—স্বর্ণ ভস্মের স্থানে অনায়াসেই ব্যবহার করিতে পার। কেননা, ইহাতে সোণার ভাগ থাকিয়া যায়। আবার সোণা ভস্ম করিতে হইলে তাহার সঙ্গে পারা ও গন্ধক মিশাইতে হয়। সুতরাং বোতলের নীচে যাহা পড়িয়া থাকে—তাহাতে স্বর্ণভস্মের গুণ সমস্তই থাকে। এই জিনিষ আমি “সোণা জারা” নাম দিয়া মেহ, বহুমূত্র ও ক্ষয়কাসে ব্যবহার করিয়া চমৎকার ফল পাইয়াছি। পুরাতন উদরাময়েও ইহা অত্যন্ত উপকারী।

আমি যে ষড়্‌গুণ বলি জারিত মকরধ্বজের প্রস্তুত-প্রণালী লিখিলাম, ইহা আমার স্ব-কপোল কল্পিত নহে। ইহা শাস্ত্রীয়-বিধি। যথা,—

পল মাত্রং রসং শুদ্ধং তাবন্মাত্রন্তু গন্ধকং।
শাণং তনূকৃতং স্বর্ণং সর্ব্বমেকত্রমর্দ্দয়েৎ॥

বিধিবৎ কজ্জলী কৃত্বা ভাবয়েৎ কন্যকা দ্রবৈঃ।
বারত্রয়ং ততঃ ঘর্ম্মে শোষয়েদতি যত্নতঃ॥
পশ্চাৎ স্থালীং গৃহীত্বা তু সবস্ত্র কুট্টিত মৃদা।
বিলিপ্য ত্রিবারং তাঞ্চ চণ্ডাতপে চ শোষয়েৎ॥
তন্মধ্যে কজ্জলীং ক্ষিপ্তা শুভেঽহ্নি পাকবিদশুচিঃ
বালুকা পূর্ণ ভাণ্ডেচ তদ্যন্ত্রং স্থাপয়েৎ ভিষক॥
ততঃ বহ্নি জ্বালাং দত্ত্যাৎ মন্দং মন্দং নিশাবধি।
স্বাঙ্গ শীতে সমুদ্ধৃত্য গ্রাহ্য মূর্দ্ধগতং রসং॥
যোজয়েৎ সর্ব্ব রোগেষু গুঞ্জৈকং মাক্ষিকৈঃ সহ
মৃত্যুঘ্নচ্চ মহাবীর্য্যো খ্যাতোঽয়ং মকরধ্বজঃ॥
রস কুলার্ণব ২য় উঃ।

যে কেহ ইচ্ছা করিলে এই মকরধ্বজ প্রস্তুত করিতে পারিবেন। পূর্ণ মাত্রায় পাক করিলে, ১০।১২ ভরি পর্য্যন্ত জিনিষ প্রস্তুত হইতে পারে। যিনি প্রস্তুত করিবেন, তিনি মনে করিলে পূর্ব্বোক্ত মাত্রার অর্দ্ধ, সিকি বা ৮ ভাগের এক ভাগ—যে কোনও মাত্রায় প্রস্তুত করিতে পারেন। কম মাত্রায় করিলে, খরচ অবশ্যই কম হইবে, তবে পরিশ্রম—সব তাতেই সমান।

আর একটী কথা, মকরধ্বজ প্রস্তুত করিবার সময়—একটু শুদ্ধাচারে থাকা ভাল। পাকের দিন হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিলে বড়ই ভাল হয়। অগ্নি-তাপে বসিয়া পারায় জ্বাল দিতে গেলে, একটু বেশী করিয়া ঘৃত পান করা কর্ত্তব্য।

জ্বালের প্রথম মুখে—যখন বোতল হইতে পারা ও গন্ধকের ধূম বাহির হইবে, তখন যন্ত্রের নিকট হইতে একটু দূরে থাকিতে হয়। সকলেই জানেন—পারা ও গন্ধকের ধূমে হাঁপানী ও বাতরক্তের পীড়া হইতে পারে। একটু দূরে থাকিয়া জ্বাল দিলে আর সে ভয় নাই।

এখন দেখি—যে-সে যেখানে-সেখানে মকরধ্বজ বেচিতেছে। আমার বিশ্বাস—তা'দের অনেকেই নিজের হাতে মকরধ্বজ করে না। বরিশালের ব্যবসায়ীদের কাছে কেনা-"রসসিন্দূর" "সিদ্ধ", "ষড়গুণ বলিজারিত"—ইত্যাদি বড় বড় বিশেষণ দিয়া "মকরধ্বজ" বলিয়া চালাইতেছে। আবার কেহ কেহ এমন অজবুক যে, মকরধ্বজের বিজ্ঞাপন দিবার সময়—"ইহা আসল স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ।" বলিয়া লিখিতে লজ্জিত হয় না। ইহাদের জানা উচিত, "মকরধ্বজের "স্বর্ণঘটিত" বিশেষণ দেওয়া চলেনা, কেননা—সোণা না দিলে সে ত "মকরধ্বজই" হইবে না। শুধু পারা-গন্ধকে যাহা প্রস্তুত—তাহার নাম যে "রসসিন্দূর'। তা'রা সেই "রস সিন্দূর" ১ টাকায় ২ ভরি কিনিয়া, প্রত্যেক তোলা ৪৲ টাকায় অনায়াসে বেচিতে পারে। তাহাতে আর কৃতিত্ব কি? বরং ১ টাকার রস সিন্দূর বেচায় তা'দের ৭৲ টাকা লাভ। আসল যা "মকরধ্বজ", সে যে জরামৃত্যুনাশক অমৃত,—ধন্বন্তরির কুম্ভ না হইলে সে ত কখনই থাকিতে পারে না।

শ্রীসদানন্দ সেন গুপ্ত কবিরাজ।

অতিসার রোগ।

———:o:———

অতিসার রোগের প্রাবল্য আমাদের দেশে অত্যধিক। অতিসার রোগ উৎপন্ন হইবার কারণ, লক্ষণ; মুষ্টিযোগ-দ্বারা চিকিৎসা প্রভৃতি জানিয়া রাখিলে অনেক জনসাধারণে উপকৃত হইবেন। সেই জন্য এই প্রবন্ধে অতিসার রোগ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

অত্যন্ত সরণ অর্থাৎ মলভেদ হয় বলিয়া এই রোগের নামক অতিসার। কেহ বলিতে পারেন যে অতিশয় মলভেদ হইলেই যদি তাহাকে অতিসার বলা যায়, তবে বিসূচিকায়, ক্রিমিরোগে বা অর্শরোগ প্রভৃতিতে তরল মল-ভেদ হইলে তাহাকে অতিসার বলিনা কেন? কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রে অতিসার মূল রোগ নহে, বিসূচিকা, ক্রিমি প্রভৃতি মূল রোগ এবং অতিসার উপসর্গ।

প্রবাহিকা—চলিত ভাষায় যাহাকে আমাশয় বলিয়া জানেন, তাহা অতিসার হইতে স্বতন্ত্র রোগ নহে। উহা অতিসারেরই অবস্থা-ভেদ মাত্র। অনেকে গ্রহণী রোগকে পুরাতন অতিসার বলিয়া থাকেন। কোন কোন মতে গ্রহণী—অতিসার হইতে স্বতন্ত্র রোগ। আমরা গ্রহণী—রোগ-প্রসঙ্গে এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে চেষ্টা পাইব।

অতিসার রোগ সকল ঋতুতে উৎপন্ন হইলেও গ্রীষ্মকালে প্রবল হইয়া থাকে। এই-জন্য পাশ্চাত্য চিকিৎসক গ্রীষ্মকালীন অতিসার (Summer diarrhoea) এই বিশেষ সংজ্ঞা দিয়া উষ্ণকালের অতিসার রোগকে পৃথক করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরূপ বিশেষত্ব নির্দ্দেশ করার কোন সার্থকতা নাই। গ্রীষ্ম-কালে অগ্নি দুর্ব্বল হয় বলিয়া সামান্য কারণেই অতিসার রোগ উৎপন্ন হয়—এবং এইজন্য গ্রীষ্মকালে অতিসার রোগের প্রাবল্য ঘটে। গ্রীষ্মকাল ব্যতীত বর্ষাকালেও অগ্নি দুর্ব্বল থাকে এবং নদী ও সরোবরের জল বর্ষার ধোয়াট জল মিশ্রিত হইয়া দূষিত হয় বলিয়া সে সময়ে অতিসার রোগের প্রাবল্য ঘটিয়া থাকে। অনেক স্থলে বর্ষার পঙ্কিল জল শোধন করিবার প্রক্রিয়ার দোষে—যেমন অতিরিক্ত ফটকিরী প্রয়োগ করিয়া জল শোধন করা প্রভৃতি কারণেও অতিসার রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অতিসার রোগ উৎপন্ন হইবার কারণ—শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, পুরাকালীন এক রাজা দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া অন্যান্য পশুর অভাবে যজ্ঞে গো-সমূহের ব্যবহার প্রবর্ত্তিত করিয়া দেন। ইহা দেখিয়া সমস্ত প্রাণী গো-সমূহের উপযোগিতা স্মরণ করিয়া যারপর নাই ব্যথিত হইয়াছিল এবং যজ্ঞে হত সেই গো সমূহের মাংস ভোজন করায়, গোমাংসের গুরুতা, উষ্ণতা ও অসাত্ম্যতা (অহিতকারিতা) হেতু এবং উহা অযথারূপে ভোজন করায় তাহাদিগের মন ও অগ্নি উপহৃত হয়। এইরূপে পূর্ব্বে অতিসার রোগ উৎপন্ন হইয়াছিল।

উপরোক্ত শাস্ত্রবাক্য হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, গুরু, উষ্ণ ও অসাত্ম্য (অনভ্যস্ত ও অহিতকর) দ্রব্য ভোজন করিলে, অযথারূপে (অতিরিক্ত, পূর্ব্ব অন্ন জীর্ণ না হইতে, দুগ্ধ ও মৎস্যাদি বিরুদ্ধ দ্রব্য একত্রে—প্রভৃতি)

ভোজন করিলে এবং মন ব্যথিত হইলে অতিসার রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। উপরোক্ত কুপথ্য সেবনের সঙ্গে সঙ্গে যদি চিত্তের বৈকল্য জন্মে, তবে অতিসার রোগ সহজেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং অতিসার রোগ হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে কুপথ্য আহার বা গুরুতর আহার করা উচিত নহে। অপিচ গুরুতর আহার করিয়া যাহাতে মনের কোন প্রকার ক্ষোভ না জন্মে, তাহা করা উচিত। কুপথ্য সেবন ব্যতীত মনের সহিত অতিসার রোগের যে সম্বন্ধ আছে —উপরোক্ত শাস্ত্রোক্তি দ্বারা তাহাও প্রমাণিত হইতেছে।

সুশ্রুত বলিয়াছেন,—গুরুপাক দ্রব্য, অত্যন্ত ঘৃতাদি স্নেহযুক্ত দ্রব্য, অতিরিক্ত রুক্ষ দ্রব্য, অত্যন্ত উষ্ণ দ্রব্য, অত্যন্ত তরল দ্রব্য, অত্যন্ত কঠিন দ্রব্য, অত্যন্ত শীতল দ্রব্য, বিরুদ্ধ দ্রব্য (মৎস্য ও দুগ্ধ একত্রে), পূর্ব্বাহার জীর্ণ না হইতে ভোজন, অজীর্ণকর দ্রব্য ভোজন, অসাত্ম্য-দ্রব্য-ভোজন, বমন-বিরেচনের অযথা প্রয়োগ বা অতিরিক্ত প্রয়োগ, বিষবিশেষ ভয়, শোক, দুষ্ট জল বা মদ্য অধিক পরিমাণে পান করা, ঋতু-বিপর্য্যয় (শীতকালে বর্ষা হওয়া বা শীত না হওয়া ইত্যাদি), অতিরিক্ত জলক্রীড়া, মল-মূত্রের বেগধারণ এবং ক্রিমিদোষ এই সকল কারণে অতিসার রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। চরক সংহিতায় অতিসার রোগ ছয় প্রকার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ, শোকজ এবং ভয়জ। সুশ্রুতে আমজ অতিসার ধরা হইয়াছে। যাহা হউক সুশ্রুতের উপদেষ্টা ধন্বন্তরির মতে অতিসার ছয় প্রকারই বটে; তবে অবস্থাভেদে নানাপ্রকার লক্ষণ প্রকাশ পায়।

চরকের সহিত সুশ্রুতের মতভেদ থাকিলেও চরকের মতই প্রামাণ্য। কারণ চরক কায়তন্ত্র-প্রধান এবং সুশ্রুত শল্যতন্ত্র-প্রধান গ্রন্থ। সুশ্রুতের টীকাকার আমাজীর্ণ লক্ষণের টীকায় বলিয়াছেন যে, "ভয়, অজীর্ণ বিসূচিকা, অর্শ, অজীর্ণ প্রভৃতি নিমিত্ত যে অতিসার তাহাদের পৃথক গণনা করা হয় নাই। অতিসার রোগের ছয় সংখ্যা রক্ষার জন্য ইহাদের দোষজ বলা হইয়াছে। কিন্তু ভয়জ অতিসার দোষজ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। চরকে স্পষ্টই বলা হইয়াছে। কিন্তু ভয়জ অতিসার দোষজ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। চরকে স্পষ্টই বলা হইয়াছে ঃ—

ভয়জ ও শোকজ দুই প্রকার অতিসার আগন্তু। সুশ্রুতে ভয়জনিত জ্বরকে আগন্তু-জ্বর বলা হইয়াছে সুতরাং ভয়জনিত অতি-সারকে কি প্রকারে আগন্তু না বলিয়া দোষজ বলা যাইতে পাইতে পারে?

পাশ্চাত্য চিকিৎসা গ্রন্থেও ভয় হইতে যে অতিসার রোগ জন্মিয়া থাকে, তাহা পৃথকভাবে বলা হইয়াছে, অতএব আমরা চরক সংহিতার মতানুসারেই অতিসার রোগের গণনা করি-তেছি। প্রকৃতি ভেদে কি কারণে অতিসার রোগ উৎপন্ন হয়, সে সম্বন্ধে চরক সংহিতায় নিম্নোক্ত বিবরণ আছে।

বায়ু প্রকৃতি ব্যক্তি যদি অতিরিক্ত বায়ু, রৌদ্র ও ব্যায়াম সেবা করে, রুক্ষ দ্রব্য বা অল্প ভোজন করে, অথবা নিত্য একরূপ রস (মধুর, কটু, তিক্ত প্রভৃতির একটি) ভোজন করে, নিত্য তীক্ষ্ণ মদ্যপান বা স্ত্রীসহবাস করে, অথবা মলমূত্রাদির বেগ ধারণ করে, তাহা হইলে বায়ু কুপিত হইয়া অগ্নিকে নষ্ট করে। অগ্নি নষ্ট হইলে সেই কুপিত বায়ু মূত্র ও শ্লেষ্মকে মল-

শয় আনে এবং উহাদের সহযোগে পুরীষ তরল হইয়া নির্গত হইতে থাকে। এইরূপে বাতাতিসার উৎপন্ন হয়।

পিত্তপ্রকৃতি ব্যক্তি যদি অম্বল, লবণ, কটু, ক্ষার, উষ্ণ ও তীক্ষ্ণ (হিং প্রভৃতি) দ্রব্য অতিরিক্ত আহার করে, নিয়ত অগ্নি, রৌদ্র বা উষ্ণ বায়ুসেবন করে, অথবা অত্যন্ত ক্রোধ ও ঈর্ষাসক্ত হয়, তাহা হইলে পিত্ত কুপিত হয়। সেই কুপিত পিত্ত তরলতা হেতু উষ্ণ জল যেমন অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করে, সেইরূপ জঠরাগ্নিকে নষ্ট করিয়া মলাশয়ে গমন করে এবং মলকে তরল করিয়া অতিসার রোগ উৎপন্ন করে। শ্লেষ্ম-প্রকৃতি ব্যক্তি যদি গুরু-পাক, মধুর, শীতল ও স্নিগ্ধদ্রব্য ভোজন করে বা অতিরিক্ত ভোজন করে, চিন্তাহীন হয়, দিবানিদ্রা সেবন করে, এবং আলস্য-পরবশ হয়, অর্থাৎ কোনরূপ পরিশ্রম না করে, তাহা হইলে শ্লেষ্মা কুপিত হয়। শ্লেষ্মা স্বভাবতঃ মধুর, শীতল ও স্নিগ্ধ বলিয়া অধঃপতিত হইয়া অগ্নিকে নষ্ট করে এবং আমাশয়ে আসিয়া মলকে বিপন্ন করিয়া অতিসার রোগ উৎপন্ন করে।

অত্যন্ত শীতল, অত্যন্ত রুক্ষ, অত্যন্ত উষ্ণ, অত্যন্ত কঠিন, অত্যন্ত গুরুপাক, অত্যন্ত খর (কর্কশ), অত্যন্ত কঠিন দ্রব্য সেবন, বিষম (কখন অল্প, কখন অধিক, কখন সকালে, কখন বিকালে) আহার, বিরুদ্ধ ভোজন, অসাত্ম্য-দ্রব্য ভোজন, আহারের কাল অতিক্রম করিয়া ভোজন, অল্প মাত্রায় ভোজন, দূষিত মদ্য বা জল পান, অতিরিক্ত মদ্যপান, ঋতুভেদে সঞ্চিত দোষের (যেমন বসন্তকালে কফের) প্রতিকার না করা, বমন-বিরেচনাদি পঞ্চ-কর্ম্মের অযথা প্রয়োগ, অগ্নি, রৌদ্র-বায়ু ও জলের অতিসেবন, নিদ্রা না যাওয়া বা অত্যন্ত নিদ্রা যাওয়া, ঋতু-বিপর্য্যয়, অযথা-বলপ্রয়োগ, অত্যন্ত ভয়, অত্যন্ত শোক, অত্যন্ত মনের উদ্বেগ, ক্রিমি, শোষ, জ্বর ও অর্শোরোগের দ্বারা কৃশ হওয়া—এই সমস্ত কারণে অগ্নি বিপন্ন হইয়া থাকে এবং বায়ু, পিত্ত ও কফ তিনটী দোষই কুপিত হয়। কুপিত দোষত্রয় অগ্নিকে অধিকতর দুর্ব্বল করিয়া পক্বাশয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক ত্রিদোষজ অতিসার রোগ উৎপন্ন করিয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ভয়জ এবং শোকজ অতিসার আগন্তু। ভয় বা শোক হেতু বায়ুকুপিত হইয়া অতিসার রোগ উৎপন্ন করে। অপিচ ত্রিদোষজ অতিসার-নিদানে কথিত হইয়াছে যে, অত্যন্ত শোক বা ভয় হেতু ত্রিদোষ কুপিত হইয়া থাকে। শোক এবং ভয়ের অতিযোগজাত যে অতিসার,—তাহা দুশ্চিকিৎস্য।

প্রকৃতিভেদে যে সকল কারণ বশতঃ অতিসার রোগ জন্মিয়া থাকে বলিয়া কথিত হইয়াছে, বিভিন্ন প্রকৃতির স্বাস্থ্যকামী ব্যক্তি-গণের পক্ষে সেইসকল কারণ পরিত্যাগ করা উচিত। আর ত্রিদোষজ অতিসারের কারণ—সকলের অতিযোগ বশতঃ ঘটিয়া থাকে। সুতরাং এ সকল কারণের অতিযোগ যাহাতে, না ঘটে, তাহার উপায় করিলে—ত্রিদোষজ অতিসার জন্মিতে পারে না। ভয়জ ও শোকজ অতিসার মানস অর্থাৎ মনকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয় বলা হইয়াছে। সুতরাং চিত্ত-স্থৈর্য্যই উক্ত অতিসারের প্রতিষেধের উপায়। অতিসার রোগের পূর্ব্বরূপ (কোন রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহাকে পূর্ব্বরূপ বলে) হৃদয়, নাভি, মল-

দ্বার, উদর ও কুক্ষি (নাভির অধোভাগ) দেশে সুচিবেধ যাতনা, শরীরের অবসন্নতা, অধো বায়ু নির্গত না হওয়া, মলরোধ, পেটফোলা, অপরিপাক—এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পাইলে যদ্যপি সাবধানতা অবলম্বন করা যায়, তাহা হইলে রোগ আর প্রবল হইতে পারে না। এই পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পাওয়ার অবস্থাকে সুশ্রুত চিকিৎসার চতুর্থ-কাল এবং রোগ-লক্ষণ প্রকাশ পাইলে পঞ্চম-কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতিসারে পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পাইলে--উপবাসই সর্ব্ব প্রধান চিকিৎসা।

ভিন্ন ভিন্ন অতিসার রোগের লক্ষণ ;—বাতজ অতিসারে—রুক্ষ, ঈষৎ-রক্তবর্ণ-ফেনাযুক্ত মল বায়ুর সহিত অল্প অল্প করিয়া নির্গত হইতে থাকে, কটিদেশ, উরু ও জঙ্ঘা অবসন্ন হয়, শূলুনী হয়, প্রস্রাব বন্ধ হয়, পেট ডাকে এবং মলদ্বার নির্গত হইয়া পড়ে।

পিত্তজনিত অতিসারে—পীত, নীল, বা ঈষৎ লোহিতবর্ণ মল অতিবেগে নিঃসৃত হয়, শরীরে ঘাম হয় এবং তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, দাহ, জ্বর ও মলদ্বারের পাক হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মজ অতিসার রোগে—শ্বেতবর্ণ, ঘন, শ্লেষ্মামিশ্রিত মলনিঃসৃত হয়, মলত্যাগ কালে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, মলত্যাগ করিবার পরেই আবার দাস্ত হইবে বলিয়া মনে হয়, মলত্যাগ কালে শব্দ হয় না, এবং আহারে অরুচি, তন্দ্রা নিদ্রাধিক্য, শরীরের গুরুতা, অগ্নির অবসন্নতা ও উকি উঠা উপসর্গ ঘটে।

ত্রিদোষজ অতিসার রোগে রক্তাদি ধাতুর দোষ অনুসারে মলের বিবিধ বর্ণ হয়। ইহাতে হরিদ্রা বর্ণ, হরিত বর্ণ, নীলবর্ণ, মঞ্জিষ্ঠার কাথের ন্যায় রক্ত বর্ণ, মাংসধোয়া জলের মত, রক্তবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, শ্বেতবর্ণ বা শূকরের চর্ব্বির ন্যায় বর্ণযুক্ত মলভেদ হয়, বেদনা থাকিতেও পারে,—নাও থাকিতে পারে। কোথাও ভিন্ন ভিন্ন দোষজ অতিসারের সমস্ত লক্ষণ, কোথাও কয়েকটী লক্ষণ প্রকাশ পায়। মল কখন গ্রথিত, কখন তরল হয়। বালক ও বৃদ্ধের ত্রিদোষজ অতিসার অসাধ্য। রোগীর মাংস, রক্ত ও বল অত্যন্ত ক্ষীণ না হইলে কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে। ত্রিদোষজ অতিসারে রোগীর মল—কাথের ন্যায়, রক্তবর্ণ, যকৃৎ-পিত্তের ন্যায়, দধির ন্যায়, মাংস ধোয়া জলের ন্যায়, ঘৃতের ন্যায়, মজ্জার ন্যায়, তৈলের ন্যায়, চর্ব্বির ন্যায়, দুগ্ধের ন্যায়, ঘৃতাদি মিশ্রিত কুট্টিত অস্থিরহিত মাংসের ন্যায়, অত্যন্ত নীল, রক্ত বা কৃষ্ণবর্ণ, জলের ন্যায় স্বচ্ছ, অত্যন্ত স্নিগ্ধ, হরিত-নীল বা কষায়ের ন্যায় বর্ণ, নানাবর্ণ, ঘোলাটে, ময়ূর পুচ্ছের ন্যায় বিচিত্রবর্ণ, আঁসটে গন্ধ, বা পচা শবের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত, পূয়ের ন্যায় গন্ধযুক্ত, বহু মক্ষিকা দ্বারা আক্রান্ত অনেক পচা দ্রবধাতু (রক্তাদি) মলের সহিত বা মল রহিত হইয়া অল্প অল্প নির্গত হইতে থাকে। এরূপ হইলে রোগ অসাধ্য হইয়া থাকে। তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, ভ্রম, হিক্কা ও শ্বাস উপদ্রব ঘটিলে, বেদনা একেবারে না থাকিলে বা অত্যন্ত থাকিলে, মলদ্বারের অভ্যন্তরস্থ শঙ্খের গ্রীবার ন্যায় আবর্ত্তাকার, বলি পতিত হইলে, লালাস্রাব, বল, মাংস ও রক্তের ক্ষয়, পার্শ্ব ও অস্থি সমূহে শূলবৎ বেদনা হইলে, অরুচি, প্রলাপ, ও মোহ ঘটিলে—রোগ অসাধ্য হইয়া থাকে। প্রবল অতিসার রোগ সহসা নিবৃত্ত হইলে রোগীর মৃত্যু হয়।

শোকজ ও ভয়জ অতিসারে বাতজ

অতিসারের ন্যায় লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। শোক বা ভয়ের অতিযোগ ঘটিলে ত্রিদোষজ অতিসারের ন্যায় উপসর্গ ঘটে। সুশ্রুত বলিয়াছেন যে, শোকজ অতিসারে রক্ত দূষিত হয় এবং কুচের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট সেই দূষিত রক্ত মলের সহিত বা মল ব্যতীত, দুর্গন্ধযুক্ত বা গন্ধহীন হইয়া নির্গত হইতে থাকে।

অতিসারের প্রথম অবস্থায় পথ্য,—অতিসারের প্রথম অবস্থায় বলবান রোগীর পক্ষে উপবাসের ন্যায় উৎকৃষ্ট চিকিৎসা আর নাই। কেননা, লঙ্ঘনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দোষ সকল প্রশমিত ও পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু এখানে বলবান শব্দ প্রযুক্ত হওয়ায় বুঝিতে হইবে যে, দুর্ব্বলের পক্ষে উপবাস নিষিদ্ধ। বালক, বৃদ্ধ, গর্ভিণী প্রভৃতিকে উপবাস দেওয়া কর্ত্তব্য নহে কারণ উহারা অল্পপ্রাণ বলিয়া উপবাসের দ্বারা ক্ষীণ হইয়া সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে।

বলবান রোগীকে উপযুক্ত উপবাস দিবার পর এবং দুর্ব্বল, বালক, বৃদ্ধ প্রভৃতি উপবাসের অযোগ্য ব্যক্তিদিগকে ঔষধ-সিদ্ধ-পেয়া, খৈয়ের গুঁড়া, কাপড়ে-ছাঁকা-মণ্ড এবং মসুর দালের যূষ পথ্য দিতে হয়। মণ্ড ও পেয়ার জন্য পুরাতন দাদখানি চাউলের গুঁড়া ব্যবহার্য্য। চাউলের গুঁড়ার চৌদ্দ গুণ জল সহ মণ্ড এবং ছয় গুণ জল সহ পেয়া প্রস্তুত করিতে হয়। মণ্ড পাতলা এবং পেয়া কিছু ঘন হয়। আজ কাল যে বার্লির গুঁড়া জল সহ সিদ্ধ করিয়া দিবার নিয়ম আছে, তাহাও বার্লির মণ্ড। দালের যূষ, মণ্ড বা পেয়া—যে কোন তরল পদার্থই পথ্য দেওয়া হউক—সমস্তই কাপড়ে ছাঁকিয়া দেওয়া উচিত। মণ্ডাদির সহিত পাতি বা কাগচি লেবুর রস মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হিতকর। শৈত্য-স্তম্ভন (ধারক) গুণ বিশিষ্ট বলিয়া মণ্ডাদি শীতল অবস্থায় প্রয়োগ করাই হিতকর। কিন্তু অত্যন্ত বায়ু অথবা শ্লেষ্মার প্রকোপ থাকিলে ঈষদুষ্ণ অবস্থায় প্রয়োগ করাই হিতকর। কেননা, শৈত্যগুণ প্রযুক্ত বায়ু বা শ্লেষ্মা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

খৈয়ের গুঁড়া পথ্য দিতে হইলে জলের সহিত চট্‌কাইয়া, মাখনের মত করিয়া, দেওয়া উচিত। খৈয়ের পিণ্ড কঠিন হইলে তাহা গুরুপাক হইয়া থাকে। এইজন্য চাটিয়া খাইবার মত কোমল করিয়া পথ্য দেওয়া উচিত।

ছানার জল (whey) অতিসার রোগে একটী উৎকৃষ্ট পথ্য। গরম দুধে লেবুর রস দিলে ছানা কাটিয়া যায়। উহা কাপড়ে ছাঁকিয়া ঈষন্নীলবর্ণ যে জলীয়াংশ পাওয়া যায়, তাহার সহিত একটু লবণ ও আবশ্যক মত লেবুর রস মিশ্রিত করিয়া পথ্য দেওয়া উচিত।

অতিসারের প্রথম অবস্থায় দাড়িমের রস, পেয়া ও ছানার জলই একমাত্র সুপথ্য। দুই তিন দিন এই পথ্য সেবন করিয়া রোগের প্রাবল্য হ্রাস হইলে; মসুর দালের যূষ, বা ঘোল, মাছের ঝোল,—পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। মাছের ঝোলের সহিত কচি কাঁচকলা ভিন্ন অন্য তরকারী না দিয়া এবং তৈল-ঘৃতাদি না দিয়া প্রস্তুত করা উচিত। মাছ না ভাজিয়া কাঁচা মাছের ঝোল করা ভাল। মাছের ঝোল প্রস্তুত হইলে, মাছ এবং কাঁচকলা—ঝোলের সহিত চটকাইয়া, কাপড়ে ছাঁকিয়া, পথ্য দিতে হয়। ঘোলও কাপড়ে ছাঁকিয়া দিতে হয়।

অতিসার রোগে ঔষধ অপেক্ষা পথ্য সম্বন্ধে সতর্কতাই বিশেষ আবশ্যক। কারণ পথ্য

সম্বন্ধে সামান্য দোষ ঘটিলে রোগ বৃদ্ধি পায় এবং কোন ঔষধেই তাহা নিবারণ করা যায় না। এক্ষণে অতিসার রোগের প্রথম অবস্থায় চিকিৎসার বিষয় কথিত হইতেছে।

অতিসার রোগের প্রথম অবস্থায় আমের প্রাবল্য থাকে, এজন্য উহাকে আমাতিসার বলা যায়। আম-মল গুরু বলিয়া জলে ফেলিলে ডুবিয়া যায় এবং পক্ক মল জলে ভাসিয়া থাকে। কিন্তু মল অত্যন্ত তরল, কঠিন, বা শ্লেষ্ম সংস্পর্শ জনিত শৈত্য গুণ বিশিষ্ট হইলে উক্ত পরীক্ষার ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। কারণ আম-মল অত্যন্ত তরল হইলে লঘুত্ববশতঃ জলে ভাসিতে পারে। আবার কঠিন মল-পক্ক হইলেও গুরুত্ব বশতঃ ডুবিয়া যাইতে পারে। শ্লেষ্ম-সংস্পর্শে শীতল ও গুরু হইলেও পক্ক মল ডুবিয়া যায়। এইজন্য কেবল মল পরীক্ষার উপর নির্ভর না করিয়া অন্য পরীক্ষা দ্বারাও আমাবস্থা ও পক্কাবস্থা স্থির করিতে হয়। কারণ অতিসারের আম ও পক্কাবস্থা অনুসারে চিকিৎসার পার্থক্য ঘটিয়া থাকে।

অতিসারের আমাবস্থায় মলে দুর্গন্ধ থাকে, পেট গুড়্ গুড়্ করিয়া ডাকে, ভার হইয়া থাকে, পেটে যন্ত্রণা হয় এবং অল্প অল্প করিয়া বারংবার মল নির্গত হয়। ইহার বিপরীত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ মলে দুর্গন্ধ না থাকিলে, পেট না ডাকিলে, ভার না থাকিলে, যন্ত্রণা না হইলে এবং অল্প অল্প মল বারংবার নিঃসৃত হওয়া বন্ধ হইয়া বিলম্বে অধিক মল নির্গত হইতে থাকিলে—অতিসারের পক্কাবস্থা বুঝিতে হইবে।

আমাতিসারে সঙ্কোচক (ধারক ঔষধ) প্রয়োগ করা কদাচ উচিত নহে। মসুর দালের যূষ এবং ঘোল—ধারক বলিয়া পথ্য-প্রসঙ্গে আমাতিসারে—প্রথমে উহাদের প্রয়োগ নিষেধ করা হইয়াছে। আমাতিসারের প্রথম অবস্থায় ধারক ঔষধ প্রয়োগ করিলে দোষ সকল রুদ্ধ হইয়া শোথ, পাণ্ডু প্লীহা, কুষ্ঠ, গুল্ম, উদর, জ্বর, দণ্ডক ও অলসক (বিসূচিকা, ভেদ) পেটফোলা, গ্রহণী, অর্শ প্রভৃতি বহুরোগ উৎপন্ন করিয়া থাকে। সুতরাং অতিসারের আমাবস্থায় পাচক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া মলভেদ বন্ধ করা অত্যন্ত অন্যায়। কিন্তু বহু দোষের অতি নিঃসরণ হেতু রোগীর ধাতু ও বল ক্ষীণ হইয়া পড়িলে, আমাবস্থাতেও ধারক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া মলভেদ বন্ধ করা উচিত। কেন না, এরূপ ক্ষেত্রে ধারক ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া পাচক ঔষধের দ্বারা চিকিৎসা করিলে রোগী ক্রমে ক্ষীণতর হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। কিন্তু এরূপ স্থলে যে মলরোধক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া করা উচিত।

অজীর্ণ আহার কর্ত্তৃক দোষ সকল বর্দ্ধিত হইয়া যাহাকে অতিসার রোগ উৎপন্ন করে অথবা যাহার অল্প অল্প মল পেট-বেদনার সহিত নির্গত হয়,—তাহাকে হরীতকী এবং পিপুল বাটিয়া গরম জলের সহিত খাওয়াইয়া বিরেচন করাইবে। অল্প অল্প করিয়া মল বারংবার যন্ত্রণার সহিত নির্গত হইতে থাকিলে বিরেচন-প্রয়োগ যে কিরূপ সুচিকিৎসা—তাহা যে সকল চিকিৎসক এরূপ ক্ষেত্রে বিরেচন-প্রয়োগ করিয়াছেন. তাঁহারাই ইহার গুণ সম্যক অবগত আছেন। ইহাতে বারংবার অল্প অল্প করিয়া ৫।৭ দিনে দুইশত বারে যে মল ও দোষ নির্গত হইত, বিরেচনের সাহায্যে একদিনে ৫।৭।১০ বারে সেই মল নির্গত হইয়া যাইল। অতিসার রোগের অসহ

শূলুনি—বিরেচন-প্রয়োগের ফলে, বিরেচন আরম্ভ হইবার আধ ঘণ্টা মধ্যে অবস্থা ভেদে ষোল আনা —বার আনা—অন্ততঃ পক্ষে অর্দ্ধেক কমিয়া যায়।

আবার এরূপ ক্ষেত্রে বিরেচন-প্রয়োগ না করিলে রোগীর দীর্ঘকাল ভোগ এবং কষ্টের একশেষ তো হয়ই, তাহার উপর ধারক ঔষধ-প্রয়োগের ফলে যথেষ্ট দোষ শরীরে আবদ্ধ থাকিয়া যায় এবং তজ্জন্য রোগী সুদীর্ঘ কাল ভুগিয়া কখন বা পরিত্রাণ পায়, কখন বা পায় না,—বহু স্থলে এরূপ ব্যাপার আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অতিসার রোগে যাহারা ভুগিতেছে—এরূপ অনেক রোগীকে বিরেচন-প্রয়োগ করিয়া আমরা বিশেষ উপকার দেখাইয়াছি। একবার আমাশয় রোগে একটী বালক দীর্ঘকাল পীড়িত থাকিয়া নিতান্ত জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া পড়ে। কলিকাতার একজন সুপ্রসিদ্ধ এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার শেষ কালে তাহাকে দেখিয়া বলেন যে, ইহার অন্য কোন উপায় নাই,—ক্যাষ্টর অয়েলের জোলাপ দিতে হইবে। ইহাতে যদি রোগী সহ্য করিতে পারে, তাহা হইলে ভাল হইবে। সুবিজ্ঞ ডাক্তারের উপদেশ মত রোগীকে জোলাপ দেওয়া হইল এবং তাহাতেই সে আরোগ্য লাভ করিল।

জোলাপ নানা প্রকারে প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কিন্তু আমরা শাস্ত্রোক্ত হরীতকী এবং পিঁপুল প্রয়োগ করিয়া উত্তম ফল পাইয়াছি বলিয়া উহারই প্রয়োগ-বিধি লিখিত হইতেছে। সাধারণতঃ হরীতকী আধ তোলা এবং পিঁপুল দুই আনা একত্রে বাটিয়া গরম জল সহ প্রাতঃকালে খাইতে হয়। বলবান্ বা বৃহৎ কায় ব্যক্তির পক্ষে বার আনা বা একতোলা হরীতকী এবং তিন আনা বা এক সিকি পিঁপুল প্রযুক্ত হইতে পারে। আবার দুর্ব্বল এবং অল্প বয়স্ক বালকের পক্ষে বয়স-ভেদে মাত্রার কম প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ঔষধ সেবন করিয়া ঠাণ্ডা বা হাওয়া না লাগান এবং গরমে থাকা দরকার। ইহাতে দেড় বা দুই ঘণ্টার মধ্যে বিরেচন আরম্ভ হয়। বিরেচন হইতে বিলম্ব হইলে, দুই একবার গরমজল তিন ছটাক-এক পোয়া করিয়া খাওয়া উচিত। বিরেচন আরম্ভ হইলে দুই একবার গরম জল খাইলে সম্যক বিরেচন হইয়া থাকে। বিরেচনের পর ক্ষুধার উদ্রেক হইলে, বিকালে জল-বার্লি লেবুর রস মিলিত করিয়া পথ্য দেওয়া যাইতে পারে।

(আগামী বারে সমাপ্য।)

কালাজ্বর।

আজকাল কলিকাতা সহরে এবং মফঃস্বলের স্থানে স্থানেও কালাজ্বর নামক এক প্রকার জ্বরের বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। বহুপ্রকার ঔষধ সেবন করাইয়াও এ রোগে সুফল না পাইয়া ডাক্তারগণ এ রোগকে এক প্রকার অসাধ্য রোগ বলেন। তজ্জন্য আজকাল ডাক্তার মহলে এই জ্বর লইয়া বিশেষ আন্দোলন

চলিতেছে। সম্প্রতি ইতালির আবিষ্কৃত Intervenous injection of choridal antimony-প্রচার কল্পে যথেষ্ট চেষ্টাও চলিতেছে। কিন্তু ইহার সুফলতা আজও নিশ্চিত হয় নাই; বিশেষতঃ anti-monyর cloride ঘটিত কোন প্রস্তুতি-সম্ভব কিনা, তদ্বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান চলিতেছে। আশা করি অনুসন্ধানকারিগণ এ বিষয়ে সত্বর কৃতকার্য্য হইবেন।

কালাজ্বর বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা যে আমাদের দেশে একটী নূতন ব্যাপার তাহা নহে। মহর্ষি চরকের আমলেও যে এ রোগ ছিল—তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ডাক্তারি মতে ম্যালেরিয়ার সমলক্ষণান্বিত—বিশেষতঃ প্লীহাযুক্ত এবং কুইনাইন দ্বারা অপ্রতিক্রিয় বিশিষ্ট জ্বরকে কালাজ্বর বলে। কালাজ্বরে যে যে লক্ষণ উপস্থিত হয়-আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে সেই সেই লক্ষণ দেখিলে স্পষ্টই জানা যায়, যে ইহা আয়ুর্ব্বেদের জীর্ণ জ্বরের অন্যতম। আয়ুর্ব্বেদে জীর্ণ জ্বরের লক্ষণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

ত্রিসপ্তাহ ব্যতীতস্তু জ্বরো যস্তনুতাং গতঃ।
প্লীহাগ্নিসাদং কুরুতে সজীর্ণ জ্বর উচ্যতে॥

অর্থাৎ যে জ্বর তিন সপ্তাহ ভোগের পর তনুতা প্রাপ্ত হইয়া প্লীহা ও অগ্নিসাদ উৎপাদন করে, তাহাকে জীর্ণ জ্বর বলা হয়। সুতরাং জীর্ণ জ্বরে প্লীহা থাকা অবশ্যম্ভাবী। যকৃৎ আদি স্থল বিশেষে থাকে এবং স্থল বিশেষে থাকেনা। জীর্ণজ্বর সন্তত, সতত, অন্যেদ্যু, তৃতীয়ক ও চাতুর্থক ভেদে পাঁচ প্রকার। ইহার মধ্যে সন্তত জ্বর অবিচ্ছেদী অর্থাৎ ইহার বিরাম হয় না, সামান্য কমে, তাহার উপর আবার জ্বর আসে। ইহাকে ডাক্তারগণ Malarial Remittent fever কহেন। সতত জ্বর দিবসে ২বার বেগ করিয়া আসে। ইহার ডাক্তারি নাম Double quotidian fever- সাধারণে ইহাকে দ্বৈকালীন জ্বর কহে। যে জ্বর প্রত্যহ ছাড়িয়া এবং প্রত্যহই আসে, তাহার নাম অন্যেদ্যু জ্বর। ইহার ইংরেজী নাম quotidian fever। একদিন অন্তর যে জ্বর আসে, তাহার নাম তৃতীয়ক জ্বর। ইংরাজী নাম tertian fever। দুই দিন অন্তর যে জ্বর আসে—তাহার নাম চাতুর্থক জ্বর, ইংরেজীতে ইহাকে quartan fever বলে। বিপর্য্যয় ভেদে আর এক প্রকার চাতুর্থক জ্বর আছে— যাহাতে দুইদিন জ্বর থাকে এবং এক দিন জ্বর থাকে না।

আজকাল যে জ্বরকে ম্যালেরিয়া জ্বর বলা হয়, তাহা উক্ত পাচ প্রকারেরই দেখা যায়। কালা জ্বর বলিলে যে জ্বরকে বুঝায়—তাহা সততক জ্বর। ম্যালেরিয়ার অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র কুইনাইন, কালাজ্বর কুইনাইনে আরোগ্য হয় না। ম্যালেরিয়া জ্বরের রোগ-বীজাণু এবং কালাজ্বরের রোগ-বীজাণু এক নহে, এই জন্য পাশ্চাত্য মতে উভয়ের পার্থক্য স্বীকৃত হইয়াছে। ম্যালেরিয়াই হউক আর কালাজ্বরই হউক— উভয় প্রকার জ্বরই জীর্ণ জ্বরের অন্তর্ভুক্ত।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র বলেন, যে কোন শারীর-রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে অহিত আহার-বিহারাদি দ্বারা শরীরস্থ বায়ু-পিত্ত এবং কফ নামক দোষত্রয়ের পৃথক অথবা মিলিতভাবে প্রকোপ থাকা আবশ্যক। দোষ প্রকোপই সর্ব্বরোগ উৎপত্তির হেতু।

"সর্ব্বেষামেব রোগানাং নিদানং কুপিতামলাঃ।
তৎপ্রকোপস্যতু প্রোক্তং বিবিধাহিত সেবনম্॥"

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বলেন যে, শরীর অসুস্থ না হইলে, রোগ-বীজাণু শরীরের ভিতর প্রবেশ

করিয়া বংশ বিস্তার পূর্ব্বক লব্ধবল হইয়া বিশিষ্ট রোগ উৎপাদনে সমর্থ হয় না। কারণ জীবদেহে সর্ব্বদাই নানাপ্রকারে নানারূপ রোগের বীজাণু প্রবেশ করে, কিন্তু শরীর সুস্থ থাকিলে, পালনী শক্তির প্রভাবে—হয় তাহারা ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়—না হয় কার্য্যকরণে অসমর্থ হইয়া পড়ে। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, দোষ প্রকোপের পর শরীরের এমন একটি অবস্থা উপস্থিত হয়, যখন বিশেষ এক জাতীয় রোগ-বীজাণু শরীরের ভিতর পুষ্ট হইয়া বিশেষ এক প্রকার রোগ উৎপাদন করে। বাহ্য জগতের যে অবস্থায় যে প্রকার রোগ-বীজাণু লব্ধবল এবং বংশ বিস্তারে সমর্থ হয়, শরীরের ভিতরের অবস্থা দোষ প্রকোপ জন্য ঠিক সেইরূপ হইলে সেই প্রকার বীজাণু শরীরের ভিতর লব্ধবল এবং বংশবিস্তারে সমর্থ হয়। আয়ুর্ব্বেদ মতে বলিতে হইলে—এই প্রকার বলা যায় যে, প্রকুপিত দোষ যখন ব্যাপারশীল হইয়া রোগ উৎপাদনের আয়োজন করে, তখন শরীর—বাহ্য জগতের যে অবস্থায় যে বীজাণু লব্ধবল এবং বংশ বিস্তারে সমর্থ হয় তদবস্থা প্রাপ্ত হয়, ফলে তজ্জাতীয় বীজাণু শরীরে প্রবেশ করিয়া লব্ধবল এবং বংশ বিস্তারে সমর্থ হয়। বাহিরের জীব—ভিতরে থাকিয়া নানাপ্রকার উৎপাৎ আনয়ন করে। বস্তুতঃ তাহারা রোগ উৎপাদন করে না। রোগীর যন্ত্রণা বাড়াইয়া দেয় মাত্র। বীজাণুর পুষ্টিলাভ এবং বংশ বিস্তার—রোগের হেতু নহে, উহা প্রকুপিত দোষের কার্য্য।

পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মতে বীজাণু ধ্বংস করিতে পারিলে রোগ আরোগ্য হয়। আয়ুর্ব্বেদ বলেন, কারণ-ভূত-প্রকুপিত-দোষ প্রকৃতিস্থ না হইলে কার্য্য-ভূত-ব্যাধি নিবৃত্ত হয় না অর্থাৎ কারণভূত প্রকুপিত দোষকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিলে কার্য্যভূত ব্যাধি দূর হয়।

এতৎ প্রসঙ্গে একটী কথা বলা বোধ হয় অবান্তর হইবে না,—জীবদেহে এমন একটী শক্তি আছে—যাহা জীবকে সর্ব্বদা নীরোগ রাখিতে চেষ্টা করে এই শক্তির প্রাচ্যনাম বৈষ্ণবী শক্তি বা পালনী শক্তি। অহিত আহারাদি দ্বারা দোষ-প্রকোপ উপস্থিত হইলে, এই শক্তি সেই প্রকুপিত দোষকে দূর করিবার জন্য প্রবলা হইয়া উঠে। প্রকুপিত দোষ এবং পালনী-শক্তির সংঘর্ষে শরীরে যে সমস্ত পীড়া দায়ক লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহাকেই রোগ বলা হয়। শক্তি—দোষাপেক্ষা প্রবলতরা থাকিলে, বিনা চিকিৎসাতেই রোগী আরোগ্যলাভ করিতে পারে, কিন্তু দোষ প্রবলতর থাকিলে দোষ-প্রত্যনীক-ঔষধ-পথ্যাদির প্রয়োগ করিলে রোগী আরোগ্য লাভ করে। দোষ যদি অধিকতর প্রবল হয় এবং শক্তি যদি ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া আসে, তবে চিকিৎসায় কোনই ফল ফলেনা।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে জ্বর দিবসে দুইবার করিয়া আসে এবং যাহার সহিত প্লীহা থাকে, তাহাকে কালাজ্বর বলে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যে জ্বরকে সতত জ্বর কহে, তাহাও দিবসে দুইবার করিয়া আসে। "অহোরাত্রে সততকো দ্বৌকালাবনুবর্ত্ততে।" ইহা এক প্রকার জীর্ণজ্বর, সুতরাং ইহার সহিত প্লীহাও থাকে।

রক্তধাত্বাশ্রয়ঃ প্রায়োদোষঃ সততকং জ্বরম্।
স প্রত্যনীকং কুরুতে কাল বৃদ্ধি ক্ষয়াত্মকঃ॥

চরক চিঃ স্থান, ৩য় অধ্যায়।

অর্থাৎ দোষ প্রায় রক্ত ধাতুকে আশ্রয় করিয়া

সততজ্বর উৎপাদন করে। এই জ্বর প্রতীকার্য্য। যে দোষ ইহাকে উৎপাদন করে, কালে তাহার বৃদ্ধি এবং কালে তাহার ক্ষয় হয়। এখানে বলা হইয়াছে যে, দোষ 'প্রায়' রক্তধাতুকে আশ্রয় করে; এই 'প্রায়' কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে—দ্বৈকালীন জ্বর বা Double Quotidion fever Remittent, Typhoid জ্বরেও দেখা যায়, কিন্তু যেখানে দোষ—রক্তধাতুকে আশ্রয় করে না, তাহাকে কালাজ্বরও বলা হয় না।

রক্তধাত্বাশ্রয়ীদোষ কর্তৃক উৎপন্ন যে সতত জ্বর তাহা সাধারণতঃ দুই প্রকারের দেখা যায়। প্রথম জ্বরোৎসৃষ্ট ব্যক্তির অর্থাৎ যাহাদিগের কোন প্রকারের জ্বর কেবল মাত্র সারিয়াছে, দোষশেষ অহিত আহার-বিহারাদির দ্বারা লব্ধ বল হইয়া রক্ত ধাতুকে আশ্রয় করিয়া সতত জ্বর উৎপাদন করে। দ্বিতীয়—আরম্ভ কালেই প্রকুপিত দোষ রক্ত ধাতুকে আশ্রয় করিয়া সতত জ্বর উৎপাদন করে। এই জ্বরের বেগ যে কখন্ হইবে—তাহার নিশ্চয়তা থাকে না। দিবা-রাত্রের মধ্যে দুইবার বেগ হয়। সচরাচর দিবসে একবার এবং রাত্রিতে একবার—এই দুইবার বেগ হইতে দেখা যায়, কিন্তু তাহারও কোন স্থিরতা নাই। দিবসেই দুইবার বা রাত্রেই দুইবার জ্বর আসিতেও পারে। দিবা ভাগে যে সময়ে জ্বর আসে, রাত্রিতেও ঠিক সেই সময় জ্বর আসিতেও দেখা গিয়াছে। জ্বর আসিবার কালে হাত-পা ঠাণ্ডা হইয়া শীত করিয়া জ্বর আসে, কখনও বা শীত মোটেই অনুভূত হয় না। যেখানে শীত করিয়া জ্বর আসে, সেস্থলে শীত দূর হইলে দাহ, পিপাসা এবং সন্তাপাধিক্য পরিলক্ষিত হয়।

প্লীহা এই রোগের সহচর। প্লীহারোগেও রক্তদুষ্টি থাকে। সুতরাং সতত জ্বরগ্রস্ত রোগীর রক্তের অবস্থা বড়ই খারাপ হয়। প্লীহারোগ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদে এই প্রকার উক্ত হইয়াছে।

বিদাহ্যভিষ্যন্দিরতস্যজন্তোঃ
প্রদুষ্টমত্যর্থমসৃক্ কফশ্চ।
প্লীহাভিবৃদ্ধিং কুরুতঃ প্রবৃদ্ধৌ-
প্লীহোত্থমেতজ্জঠরং বদন্তি॥
তদ্বামপার্শ্বেপরিবৃদ্ধিমেতি
বিশেষতঃ সীদতি চাতুরোঽত্র।
মন্দজ্বরাগ্নিঃ কফপিত্তলিঙ্গৈঃ
রুপদ্রুতঃ ক্ষীণবলোঽতি পাণ্ডুঃ॥

অর্থাৎ বিদাহী ও কফ জনক দ্রব্য ভোজনরত-ব্যক্তির রক্ত ও কফ প্রদুষ্ট হইয়া প্লীহার বৃদ্ধি সাধনকরে। ইহার নাম প্লীহোত্থজঠররোগ। প্লীহা—উদরের বাম পার্শ্বে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহাতে রোগী অত্যন্ত অবসন্ন, মন্দজ্বর, অগ্নি-শক্তি হীন, কফ-পিত্তজ উপদ্রবে উপদ্রুত, ক্ষীণবল ও পাণ্ডুবর্ণ হয়।

কোন কোন স্থলে যকৃতের বৃদ্ধি এবং যকৃতে বেদনা দেখা যায়। কাসিও স্থল-বিশেষে দেখা যায় এবং তাহার ফলে কখন কখন ক্ষয়রোগ আসিতে দেখা গিয়াছে। এই জ্বরে জ্বরজন্য এবং প্লীহার জন্য রক্তের বিশেষ দুষ্টি হয় বলিয়া রোগীর গায়ে চুলকনা, খোস-পাঁচড়া দেখা দেয়। দন্তবেষ্ট (মাড়ি) ফুলিয়া উঠে, বেদনা ও শূল যুক্ত হয়। মুখের মধ্যেও স্থানে স্থানে ক্ষত প্রকাশ পায় এবং নাকদিয়া ন্যূনাধিক পরিমাণে রক্ত-নির্গত হয়। ক্রমশঃ প্লীহা-যকৃতের আকার বাড়িতে থাকে, ক্রমে শক্ত হইয়া উঠে। পাদশোথ, মুখশোথ বা সর্ব্বাঙ্গীন শোথ প্রকাশ পায় এবং উদরাময় প্রভৃতি উপদ্রব সর্ব্বশেষে আসিয়া উপস্থিত হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে [illegible] এলোপ্যাথি

চিকিৎসায় এ রোগ আরোগ্য হয় না, তাহার কারণ এই যে, এলোপ্যাথি মতে এরোগ বিশিষ্ট-বীজাণু কর্ত্তৃক উৎপন্ন। বীজাণু-ধ্বংস হইলে রোগ সারিয়া যাইবে—এই সিদ্ধান্তে তাঁহারা চিকিৎসা করেন। যে দ্রব্যে বীজাণু ধ্বংস হয়, সেই দ্রব্য শরীরের ভিতর প্রবেশ করিলে বীজাণুর কারণভূত প্রকুপিত দোষকেও কিয়ৎ পরিমাণে প্রকৃতিস্থ করিতে পারে—সেই জন্য বীজাণুপ্রত্যনীক-চিকিৎসায় অনেক রোগ সারিতে দেখা যায়। কিন্তু কালাজ্বরে রক্তের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয় বলিয়া বীজাণু ধ্বংস করিতে পারিলেও রোগীর উপদ্রবের কিয়ৎ-পরিমাণে শান্তি ভিন্ন আর কিছুই হয় না। কারণ দোষ প্রকৃতিস্থ না হইলে বীজাণু পুনঃ পুনঃ পুষ্টিলাভ করিতে পারে।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা দোষ-প্রত্যনীক। এই চিকিৎসায় প্রকুপিত দোষ প্রকৃতিস্থ হয়, তাহার ফলে বীজাণু—শরীরের যে অবস্থায় পুষ্ট হয়, সেই অবস্থা দূর হয় বলিয়া তাহারা আর বাঁচিতে পারে না এবং দোষ প্রকৃতিস্থ হইলে তাহার প্রকোপ জন্য উৎপন্ন যে রোগ—"কারণ ধ্বংসে কার্য্য ধ্বংস" এই নিয়মে দূরীভূত হয়।

রোগমাত্রেই সাধ্যাসাধ্য ভেদে দুই প্রকার; সুতরাং কালাজ্বরের ভিতরও সাধ্যাসাধ্যভেদ আছে। অসাধ্য লক্ষণ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে দোষ-প্রত্যনীক-চিকিৎসা করিলে রোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। কিন্তু অসাধ্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে কোন চিকিৎসায় সুফল পাওয়া যায় না।

আমরা অবগত হইয়াছি,—অনেক কালাজ্বরাক্রান্ত রোগী,—যাঁহারা অন্যরূপ চিকিৎসায় কোন ফলই পান নাই, আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসিত হইয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। কিন্তু হইলে কি হইবে?—আজকাল দেশের লোকের রুচি ভিন্ন প্রকারের। যতক্ষণ অর্থ ও সামর্থ্যে কুলায়, ততক্ষণ কেহই আয়ুর্ব্বেদ-মতে চিকিৎসিত হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন না। যখন রোগের প্রতীকার হইবার কোন উপায় থাকে না, তখন কবিরাজের কাছে রোগী আসে। দেশের লোকের বুঝা উচিত,—যে আয়ুর্ব্বেদ এই দেশেরই চিকিৎসা-বিজ্ঞান এবং ইহার ঔষধাদি—এদেশীয় উপাদানে প্রস্তুত। আমাদের জন্ম এই দেশে এবং রোগও এই দেশের, সুতরাং ঔষধ যে ভিন্ন দেশে প্রস্তুত হইবে, ইহা প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত। আমাদের উষ্ণ প্রধান দেশের রোগে আমাদের ঔষধ—পথ্যই যে বেশী উপকারী, সে সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোন কারণই তো নাই।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

বন্ধ্যার পুত্রলাভ।

—:০:—

[সত্যঘটনামূলক গল্প]

(১)

বিয়ের ক'নে সুধাকে যখন নানারূপ বাদ্য-কোলাহলের মধ্য হইতে বরণ করিবার জন্য পাল্কী হইতে নামান হইল, তখন তাহার শাশুড়ী আনন্দে আট খানা হইলেন।

প্রলোভনে ছেলের বিয়ে দিয়া—তাঁহার স্বামী যে এমন চাঁদপানা বউ ঘরে আনিতে পারিবেন,—ইহা তিনি আগে ভাবিতেই পারেন নাই,—তাই তাঁহার আনন্দ—হাসিতে যেন ফুটিতে লাগিল। সুধার শ্বাশুড়ী হাসিমুখে সুধাকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন। সুধা যে একটি পরমা সুন্দরী নারী-রত্ন-বিশেষ—গ্রামের মধ্যে এরূপ একটা সাড়া পড়িয়া গেল। দিন কতক এই আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে থাকিয়া নববধূ পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। তাহার পর বর্ষ ঘুরিল, সুধা স্বামী-ঘর করিতে আসিল। তখন তাহার বয়স তের বৎসর। পতি, মনোমত পত্নী পাইয়া স্বর্গ-সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। এমনি করিয়া সুধার প্রথম জীবন কাটিয়া গেল।

কিন্তু মানুষের সুখ বুঝি চিরদিন সমান ভাবে থাকেনা,—পরিবর্ত্তনশীল-জগতে বিধাতার ইহাই অপূর্ব্ব নিয়ম! যে সুধা—একদিন শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর শুভ দৃষ্টি লাভ করিয়া ধন্যমনা হইয়াছিল, সে এখন তাঁহাদের উভয়েরই বিষ-নেত্রে পড়িয়াছে। তাহার কারণ, সুধার এখন বয়স হইয়াছে—বিংশের কাছাকাছি। অথচ এপর্য্যন্ত সে পুত্রবতী হইল না। সুধার স্বামীর এজন্য দুঃখ বা ক্ষোভ ছিলনা. কিন্তু তাহার শ্বশুর-শ্বাশুড়ী ইহার ফলে তাহার উপর বিষম চটিয়া গেলেন, তাঁহারা স্থির করিলেন,—আবার ছেলের বিবাহ দিবেন। নানা স্থানে এজন্য পাত্রী-অনুসন্ধানও চলিতে লাগিল।

সুধার স্বামীর কিন্তু এ সকল ভাল লাগিল না, কিন্তু পিতৃ-মাতৃভক্ত পুত্র প্রকাশ্য ভাবে ইহার প্রতিবাদ করিতে না পারিয়া, যাহাতে সুধা পুত্রবতী হইতে পারে—তাহার জন্য—কত সাধু-সন্ন্যাসী—কত অতিথ-ফকির,—কত লোকের শরণাপন্ন হইল,—কত লোকে কত বুজরুগী করিয়া—কত ঔষধ বলিয়া দিয়া, কত পয়সা লইল,—কিন্তু কিছুতেই কিছু হইলনা,—এমনি করিয়া কত দিন কাটিয়া গেল।

এ দিকে সুধার শ্বশুর এক পাত্রী স্থির করিয়া ফেলিলেন। এ পাত্রী—সুধার মত সুন্দরী নহে,—সুধার বর্ণ—ফুটন্ত জোৎস্নার মত,—ইহার বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। ছেলের পছন্দ হইবে কিনা—তাহা লইয়া প্রথমতঃ তাঁহার একটু চিন্তা হইল, কিন্তু শেষে ভাবিলেন, বয়স্থা মেয়ে—চৌদ্দবৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে, সুতরাং ছেলে—যুবতী পত্নী পাইয়া ভুলিয়া যাইবে। ফলে সম্বন্ধটা একরূপ পাকা পাকিই হইল, তবে সংপ্রতি পাত্রীর মাতা পরলোক গমন করায় আর একবৎসর গত করিয়া—কালাশৌচ অন্তে বিবাহ হইবে স্থির হইল।

সুধার স্বামী—সুধাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন। পিতা তাঁহার ভবিষ্যৎ সুখের জন্য এতটা চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহার কিন্তু ইহা বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। একদিন শারদীয়-জ্যোৎস্নায়,—চন্দ্রালোকে সুধার স্বামী ও সুধা দ্বিতলের ছাদের উপর বসিয়া এই বিষয়ে প্রসঙ্গ করিতেছিল। সুধা বলিল—, "তুমি যাহাতে সুখী হও, আমি তাহাতেই সুখী, তুমি বিবাহ কর, আমি তাহাতে সুখী হইব।"

সুধার স্বামী বলিলেন,—"আমি ইহাতে সুখী—তা' তোমাকে কে বলিল সুধা! পিতা-মাতা এরূপ চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু ইহার সহিত আমার যে জীবন-মরণ-সম্বন্ধ [illegible] তাঁ'রা তা' বুঝিতেছেন না—[illegible]

বিবাহ করিয়া সুখী হইব না সুধা। পিতামাতা যদি আমার পুনরায় বিবাহ দেন, তাহা হইলে আমি মরিয়া যাইব।”

সুধা একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। তাহার পর ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—“আমার একটা কথা শুনিবে?”

সুধার স্বামী বলিলেন,—বলনা!

সুধা বলিল—“দেখ আমার বাপের বাড়ীর দেশে একটি স্ত্রীলোক আছেন, তিনি অনেককে অনেক রকম ঔষধ দেন, অনেক লোক তাঁর চিকিৎসায় সারিয়াছে। বাবা আর মাকে ব’লে, আমাকে দিন কতক বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও,—পাঠিয়ে দেবে কেন?—তুমিও দিন কতক চল। তাঁ’র সঙ্গে দেখা ক’রে, তিনি কি বলেন—শোনা যাক্, তা’র পর ভগবানের যা’ ইচ্ছা—তা’ তো হ’বেই।”

এই পরামর্শই সাব্যস্থ হইল। সুধার শ্বশুর-শাশুড়ী সুধাকে পিত্রালয়ে পাঠাইতে রাজি হইলেন, কিন্তু ছেলে সঙ্গে যায়—এ ইচ্ছা তাঁহাদের বড় একটা ছিল না। যাহা হউক সুধাকে রাখিয়া সে চলিয়া আসিবে, এইরূপ সাব্যস্থ করিয়া, সুধাকে পিত্রালয়ে পাঠান হইল।

সুধা চলিয়া যাইলে পর, তাহার শ্বশুর,—গৃহিণীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—“মন্দ হ’ল না, ছেলেটা বউমার কাছ থেকে যত তফাৎ থাকে—ততই ভাল, ওর মনটা বদ্‌লানর এ একটা সুযোগ।

(২)

দু’পর বেলা রান্না ঘরে বসিয়া ডালের হাঁড়িতে আমি কাঠি দিতেছি—এমন সময় ‘কেমন আছ’ বলিয়া সুধা রান্নাঘরে প্রবেশ করিল। আমি অনেক কাল তাহাকে দেখি নাই—তাহার এখন বাপের বাড়ী আসারও কোন কথা শুনি নাই,—তাহাকে দেখিয়া একটু চমকিয়া উঠিলাম। তাহার পর বলিলাম,—ভাল আছি,—তুই কখন্ এলি,—বস।

রান্নাঘরের সানের উপরে শুধু আসনে সুধা বসিয়া পড়িল। বসিয়া আমার ছেলে-মেয়েদের কথা জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম—এই তো খেলা করিতেছিল, বোধ হয় রায়েদের বাড়ী থেকে বিন্দী আর ভবি এসেছিল—তা’দের সঙ্গে খেলা ক’র্‌তে ক’র্‌তে তা’দের বাড়ী চ’লে গিয়েছে।”

সুধার হাতে এক ঠোঙ্গা খাবার ছিল। সে উঠিয়া কুলুঙ্গি হইতে একখানি থালা লইয়া, ঠোঙ্গা হইতে খাবারগুলি তাহাতে ঢালিয়া আবার কুলুঙ্গিতে তুলিয়া রাখিল। তাহার পর বলিল—“খোকা-খুকীকে এইগুলি দিও।”

আমি বলিলাম—“খোকা-খুকীর জন্য তো খাবার এনেছিস্। আর তা’দের মায়ের জন্য কি এনেছিস্!”

সুধা হাসিল। হাসিয়া বলিল—“তোমার জন্যও এনেছি দিদি! তোমার জন্য ভাল গন্ধ-ওয়ালা তেল এনেছি। আজ বিকালে এসে সেই তেল দিয়ে—তোমার চুল বেঁধে দেব এখন।”

আমি বলিলাম—“আমার যে আর গন্ধ-ওয়ালা তেল মাখবার বয়স নেই। যাক্—তা’ তুই আছিস্ ভাল তো? একলা এইছিস্—না জোড়ে এইছিস্!”

সুধা বলিল—“ওঁরাও এয়েছেন, কিন্তু দু’ জনের কেহই ভাল নেই।”

আমি বলিলাম—“কেন?”

সুধা সমস্ত ঘটনা আদ্যন্ত বিবৃত করিল।

পিসীমা এতক্ষণ পূজায় ব্যস্ত ছিলেন।

তিনি পূজা শেষ করিয়া এই সময় রান্নাঘরে আসিলেন। সুধা তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। আমি বলিলাম—"পিসীমা, অনেক দিন রোগী পাওনি, আজ এই রোগীটি জুটিয়াছে।"

পিসীমা কি অসুখ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সমস্ত বলিলাম।

পিসীমা বলিলেন,—"আহা লোকনাথ বদ্দি যে ম'রে গেল, ত'ার হাতে এ রকম কত বন্ধ্যা স্ত্রীরই যে ছেলে হ'তে দেখেছি, তা' ব'লতে পারি না। 'ফলকল্যাণ' নামে একটা ঘি খাওয়াইয়া তিনি কত বন্ধ্যাকেই যে পুত্রবতী করেছেন ত'ার ঠিক নাই। তোমার স্বামীকে কোন একটা ভাল ক'বুরেজের কাছ থেকে সেই ফলকল্যাণ ঘিটা তৈয়ার ক'রে নিতে বল, আমার খুব মনে হয়—তাই খেলে তোমার বন্ধ্যাত্ব দোষ কেটে যা'বে।"

আমি বলিলাম—"সে তো তৈরি ক'র্‌তে দেরী হ'বে পিসীমা,—এদিকে যে সতীন ঘটবার আর এক বচ্ছর মাত্র সময়।"

পিসীমা বলিলেন,—হ্যাঁ সে ঘি তৈরি ক'র্‌তে একটু সময় লাগ্‌বে। এক বর্ণা জীবিত বৎসা গরুর দুধ দিয়ে সে ওষুধ তৈরি ক'র্‌তে হয়। তা' কোন ভাল ক'বরেজের কাছে তৈরিও থাক্‌তে পারে।

আমি বলিলাম—"এর কোন মুষ্টিযোগ খা টোট্‌কা নেই ?"

পিসীমা বলিলেন,—"আছে, কিন্তু বাঁজা কে —সেটা বোঝা বড় শক্ত। বাঁজা মেয়ে মানুষও হ'তে পারে—আবার অনেক পুরুষও বাঁজা থাকে। যদি পুরুষ মানুষ বাঁজা হয়,—তা' হ'লে মেয়েমানুষকে ওষুধ খাইয়ে কি হবে ?"

আমি বলিলাম—"দু'জনকেই খাওয়ালে হয় না ?"

পিসীমা বলিলেন—"তা' হয়। আচ্ছা আমি গোটাকতক মুষ্টিযোগ ব'লে দিই, এইটা দিন কতক সুধা ক'রে দেখুক, আর 'ফল কল্যাণ ঘি'টাও এর মধ্যে কোন ক'বরেজের দ্বারা তৈরি ক'রে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক্‌।"

আমি বলিলাম—"সেই বেশ।"

পিসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন—"মাসিক ঋতুটা ঠিক হয় ?"

সুধা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—ঠিক হয়।

ত'ারপর পিসীমা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর কোন অসুখ আছে ব'লে মনে হয় ?"

সুধা বলিল—"না।"

পিসীমা বলিলেন—"দেখ এক কাজ ক'র্‌তে হ'বে—অশ্বগন্ধা মূল ২ তোলা, জল এক সের এবং দুগ্ধ এক পোয়া—এক সঙ্গে সিদ্ধ ক'রে, এক পোয়া থাক্‌তে নামিয়ে, ত'ার সঙ্গে আধতোলা গাওয়া ঘি মিশিয়ে ঋতু স্নানের পর পান ক'র্‌তে হবে। এটা লোকনাথ বদ্দির একটা বড় মুষ্টিযোগ ছিল—এতে অনেকেই ফল পেয়েছে। আরও একটা ব্যবস্থা ব'লে দিই—সেটাও ক'র্‌তে হ'বে! ঋতু স্নানের পর তো যেটা ব'ললাম—সেটা খাবেই, তা'ছাড়া ঋতুর তিন দিন ওলটকম্বলের মূলের ছাল ৩।৪ রতি, আর গোলমরিচ ৮।১০টী—বেশ ক'রে জল দিয়ে বেটে সকাল বেলা খা'বে। আমার বোধ হয় দুটো কি তিনটে ঋতুতে এই ব্যবস্থা দু'ট ক'রলে যদি সুধা বাঁজা হয়, নিশ্চয় সে দোষ কেটে যা'বে।

আমি বলিলাম—"আর যদি সুধার স্বামী বাঁজা হয় ?"

পিসীমা বলিলেন—[illegible]

তৈরি করার কথা ব'ললাম—তিনি সেটা দিন কতক রোজ খেতে আরম্ভ করুন। যদি তিনি বাঁজা হন, তা'হলে ওতেই তাঁর বন্ধ্যাত্ব নষ্ট হ'য়ে যা'বে।

আমি পুনরপি বলিলাম—"আর কিছু ব্যবস্থা ক'র্‌তে হ'বে না? আর গোটাকতক মুষ্টিযোগ বলনা।"

পিসীমা বলিলেন—"এক সঙ্গে তো সব খাওয়ান হয় না? নইলে এর মুষ্টিযোগ আমি অনেক রকমই জানি। সে সব কথা তোমায় আর একদিন ব'লব।"

সুধা বলিল—"পিসীমা আমি তোমাকে ধন্বন্তরি মনে ক'রে এই ব্যবস্থায় চ'লব—তা'রপর আমার অদৃষ্ট।"

(৩)

পিসীমার ব্যবস্থামত সুধা, স্বামীকে রোজ অশ্বগন্ধা সিদ্ধ দুগ্ধ সেবন করাইতে লাগিল এবং নিজে পিসীমা যেরূপ বলিয়া দিয়াছিলেন, সেইরূপ দুইটী ঋতুতে অশ্বগন্ধা ও ওলট কম্বল সেবন করিল।

সুধার স্বামী এ সকল ব্যবস্থার উপরও একজন ভাল কবিরাজের দ্বারা "ফলকল্যাণ ঘৃত" তৈয়ার করাইয়া লইলেন, কিন্তু তাহার আর প্রয়োজন হইল না, কারণ পিসীমার ব্যবস্থায় ২ মাসের পরই সুধার গর্ভ সঞ্চার হইয়াছে—প্রকাশ পাইল। ফলে যথা সময়ে সুধা একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিল, সুধার স্বামীর এবং তাহার শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর আর আনন্দের সীমা রহিল না।

এইবার সুধার স্বামীর তাহার পিতার নিকট কথা ফুটিল। তিনি বলিলেন—"বাবা, যে মেয়েটির সহিত আমার সম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাদের অবস্থা ভাল নয়—আমাদের কথার উপর তাহারা নির্ভর করিয়া আছে, অতএব তাহার জন্য একটি সুপাত্রের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া আমাদেরই কর্ত্তব্য।"

সুধার পিতা বলিলেন—"ঠিক।—তা' চেষ্টা করা যাউক।"

সুধার স্বামী বলিলেন—"সে পাত্র আমি ঠিক করিয়া রাখিয়াছি। আমারই একটী বন্ধু—এবার বি-এস-সি পাস করিয়াছে—কিছু লইবে না, আপনার সম্মতি পাইলে আমি তাহার সহিত বিবাহের বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারি।"

পিতা সম্মতি দিলেন। পুত্র নিজের জন্য যে পাত্রী স্থির করা হইয়াছিল, তাহার সহিত বন্ধুর বিবাহ দিলেন। সুধা, পিসীমার কৃপায় সপত্নীর ভয় হইতে নিষ্কৃতি পাইল। এখন সংসারে সুধার সম্মান কত! সে তো এখন আর বন্ধ্যা নহে,—সে যে এখন পুত্রবতী,—জননীপদবাচ্য হইয়াছে।

শ্রীমতী কমলাবালা দেবী।

দিন-চর্য্যা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

গতবারে যে পরিমিত মাত্রায় আহার করিবার কথা আমরা বলিয়াছি,—প্রত্যেক স্বাস্থ্যকামীর পক্ষে তাহা পালন করা কর্ত্তব্য। পরিমিত আহার করিবে এবং পূর্ব্বাহার জীর্ণ

হইলে ভোজন করিবে। পূর্ব্বাহার জীর্ণ না হইতে হইতে ভোজন করিলে পূর্ব্বাহারের অপরিণত রসের সহিত পরবর্ত্তী আহারের রস মিলিত হইয়া--সত্বর দোষ সকলকে কুপিত করে। কিন্তু পূর্ব্বাহার জীর্ণ হওয়ার পরে যখন দোষ সকল স্বস্থানে অবস্থান করে, অগ্নি উদ্রিক্ত হয়, ক্ষুধা হয়, স্রোতঃ মুখ সকল বিবৃত হয়, বিশুদ্ধ উদ্গার হয়, বায়ুর অনুলোম হয়, বায়ু, মল ও মূত্র নির্গত হয়,—সেই সময়ে আহার করিলে ভুক্তদ্রব্য শরীরের ধাতু সমূহকে দূষিত করে না, পরন্তু আয়ুবৃদ্ধি করিয়া থাকে। এইজন্য পূর্ব্বাহার জীর্ণ হইলে ভোজন করা উচিত। অবিরুদ্ধ-বীর্য্য-খাদ্য আহার করিবে। ইহাতে বিরুদ্ধবীর্য্য খাদ্য সেবনজনিত রোগ জন্মিতে পারে না। বিরুদ্ধবীর্য্য খাদ্য কি, তাহা পরে বলা যাইবে।

পবিত্র হইয়া, পবিত্র উপকরণ সংযুক্ত আহার করিবে। পবিত্র হইয়া আহার না করিলে, অনভিলষিত স্থানে আহার করিলে, তাহাতে অপ্রিয় আহার জন্য মন উপহত হয়।

অতিদ্রুত ভোজন করিবে না। অতিদ্রুত ভোজন করিলে ভুক্ত দ্রব্যের স্বাদগ্রহণও হয় না এবং ভোজ্য পদার্থের দোষ-গুণের উপলব্ধি হয় না, এজন্য অতিদ্রুত ভোজন করা উচিত নহে।

অতি বিলম্ব করিয়া ভোজন করিবে না। অতি বিলম্ব করিয়া ভোজন করিলে তৃপ্তি হয় না, অতিরিক্ত ভোজন করা হয় (যেমন নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়া অধিক খাওয়া হয়), খাদ্য শীতল হইয়া যায়, ভুক্ত দ্রব্যের বিষম পাক হয় অর্থাৎ কতক খাদ্য পরিপাক হয় এবং আবার কতক খাদ্য নূতন করিয়া আমাশয়ে প্রবেশ করে—এইজন্য সমস্ত খাদ্য এক সঙ্গে পরিপাক পায় না।

কথা না কহিয়া, না হাসিয়া এবং তন্মনা হইয়া ভোজন করিবে। অতিদ্রুত ভোজন করিলে যে দোষ হয়, এই সকল কারণে সেই সকল দোষ ঘটিয়া থাকে।

আপনার অবস্থা সম্যক বিবেচনা করিয়া আহার করিলে সেই আহার সাত্ম্য অর্থাৎ হিতকর হয়।

এক্ষণে পরিমিত আহার কি তাহা লিখিত হইতেছে।

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, উদরের দুই অংশ অন্নের দ্বারা এবং এক অংশ পানীয়ের দ্বারা পূর্ণ করিবে এবং পানাদির আশ্রয় জন্য চতুর্থভাগ অবশিষ্ট রাখিয়া দিবে। এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, সম্পূর্ণ পেট ভরিয়া আহার করা উচিত নহে। বাল্যকালে বৃদ্ধাদিগের মুখে এ সম্বন্ধে একটা বাঙ্গালা ছড়া শুনিয়াছিলাম।

"উনভাতে দুনো বল
বিস্তর ভাতে রসাতল ?"

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, আহারের মাত্রা অগ্নি-বলের অপেক্ষা করে অর্থাৎ যাহার অগ্নিবল অধিক, তাহার খাদ্যের মাত্রা অধিক, এবং যাহার অগ্নিবল কম, তাহার খাদ্যের মাত্রা কম হওয়া উচিত। যাহার যেরূপ মাত্রায় আহার করিলে প্রকৃতির (অর্থাৎ স্বাভাবিক স্বাস্থ্য, মল মূত্রাদির প্রবৃত্তি ইত্যাদি) বাধা জন্মেনা,—অথচ ভুক্তদ্রব্য যথাকালে বিনাক্লেশে জীর্ণ হয়, তাহার পক্ষে তাহাই পরিমিত মাত্রা।

রক্ত শালি ও ষষ্টিক প্রভৃতির তণ্ডুল, মুগের দাল, তিত্তির পক্ষীর মাংস, কৃষ্ণ সার হরিণ, শশক, শরভ ও শম্বর নামক হরিণের মাংস প্রভৃতি লঘুপাক হইলেও পরিমিত মাত্রায় আহার করা উচিত। আবার পিষ্টক, ইক্ষু-বিকৃতি (গুড় চিনি) [illegible]

(দধি ছানা, ক্ষীর) মাষ কলায়, আনূপ দেশজাত মাংস, কচ্ছপ প্রভৃতি জলজ মাংস স্বভাবতঃ গুরুপাক হইলেও পরিমিত মাত্রায় আহার করা উচিত। গুরু লঘু সকল দ্রব্যই মাত্রাপেক্ষী হওয়া উচিত—এইরূপ বলায় দ্রব্যের গুরুত্ব ও লঘুত্ব অকারণ মনে করিবে না।

লঘুপাক দ্রব্য সকল বায়ু ও অগ্নিগুণ বহুল এবং গুরুপাক দ্রব্য সকল ভূমি ও সোম-গুণ বহুল। এইজন্য লঘুদ্রব্য স্বয়ং অগ্নিকে বর্দ্ধিত করে বলিয়া অতিরিক্ত পরিমাণে সেবিত হইলেও অল্প দোষ জন্মায়। আবার গুরুদ্রব্য অগ্নির বিপরীত-ধর্ম্মী বলিয়া, অগ্নি বৃদ্ধি করিতে পারেনা, সুতরাং অতিরিক্ত মাত্রায় সেবিত হইলে অত্যন্ত দোষ জন্মাইয়াথাকে। এইজন্য ব্যায়াম দ্বারা অগ্নিবল প্রবল না হইলে, গুরু-দ্রব্য কখনই অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে সেবন করা উচিত নহে।

দ্রব্য-বিবেচনায় আহার করিতে হইলে, গুরুপাক দ্রব্য অর্দ্ধতৃপ্তি বা ত্রিভাগ তৃপ্তি পর্য্যন্ত সেবন করা উচিত। লঘু দ্রব্য তৃপ্তি পর্য্যন্ত ভোজন করা যাইতে পারে, কিন্তু তৃপ্তির অতিরিক্ত ভোজন করা উচিত নহে। পরি-মিত ভাবে আহার করিলে প্রকৃতি উপহত হয় না এবং তদ্দ্বারা বল, বর্ণ, সুখ, ও আয়ুবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

পিষ্টক চিপিটক প্রভৃতি তণ্ডুলজাত পদার্থ গুরুপাক বলিয়া ভুক্ত অবস্থায় কদাচ সেবন করা উচিত নহে এবং ক্ষুধিত ব্যক্তির পরিমিত মাত্রায় আহার করা উচিত। শুষ্ক মাংস, শুষ্ক শাক, কৃশ পশুর মাংস, ক্ষীর, ছানা, মৎস্য, দধি, মাষকলায় প্রভৃতি দ্রব্য গুরুপাক বলিয়া নিত্য ভোজন উচিত নহে।

ষেটে-ধান, শালিধান, মুগের দাল, সৈন্ধব, আমলকী, যব, বৃষ্টির জল, দুগ্ধ, ঘৃত, জাঙ্গল মাংস ও মধু নিত্য—সেবন করা উচিত। যে সকল দ্রব্য সেবন করিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং রোগের উৎপত্তি না হয় সেই সকল দ্রব্য ভোজন করিবে।

উপরে যে সকল খাদ্য নিত্য সেবন করিবার কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে বর্ত্তমান কালের বৈজ্ঞানিকগণের মতের সহিত সম্পূর্ণ—সামঞ্জস্য আছে। পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত আমরা তাহা দেখাইতেছি। অবশ্য উপরোক্ত খাদ্যের তালিকা দিগদর্শন মাত্র। উহার সহিত ফল ও তরকারী ধরিয়া লইতে হইবে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে; পাঁচ প্রকার দ্রব্য আহার করা উচিত। যথা প্রোটিড (Proteid) কার্ব্বোহাইড্রেট (car-bohydrate), চর্ব্বি (fost), ধাতব লবণ (Mineral salts) এবং জল। কথিত খাদ্যে এই সমস্ত দ্রব্যই উপযুক্ত মাত্রায় বর্ত্তমান আছে। আধুনিক মতানুযায়ী খাদ্য গুলির উপাদানের তালিকা পরপৃষ্ঠায়প্রদত্ত হইল। প্রত্যেক দ্রব্যে শতকরা যে উপাদান যত থাকে, তাহা লিখিত হইল। বিজ্ঞ পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন যে, ঐ সকল খাদ্যদ্রব্য আহার করিলে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক দিগের কথিত শরীরের প্রয়োজনীয় সমস্ত খাদ্যই আহার করা হয়। এক্ষণে বিরুদ্ধভোজন কি—তাহাই সংক্ষেপে কথিত হইতেছে।

বিরুদ্ধ-ভোজন নানা প্রকার,—যথা দেশ-বিরুদ্ধ, সংযোগ বিরুদ্ধ, সংস্কার-বিরুদ্ধ, দোষ, কাল ও মাত্রা-বিরুদ্ধ এবং স্বভাবতঃ বিরোধ

	প্রোটিড	কার্ব্বোহাইড্রেট	চর্ব্বি	লবণ	জল
চাউল	৬০৯	৭৯·৪	·৪	·৫	১২·৪
যব	১০·১	৭১·২	১·৯৭	১·৯	১২·৩
দাল	২৩·১	৫৩·৬	২·২	৩·৫	১৩·৬
দুগ্ধ	৩·৯৭	৪·৮	৪·২৮	·৬	৮৬·৮
ঘৃত		—	১০০	৬	—
মাংস	১৮·১১	—	৭·৭৭	—	৭৫·৯৯
লবণ		—	—	১০০	

দুগ্ধ ও মৎস্য সংযোগ বিরুদ্ধ বলিয়া একত্রে আহার করা উচিত নহে। মধু, গুড়, তিল, দুগ্ধ-মাষকলায়, মূলা, অঙ্কুরিত ধান্যের অন্ন—ইহাদের কোনটীর সহিত ছাগাদি মাংস, এবং মৎস্যাদি ভক্ষণ করা উচিত নহে। মূলা রসুন বা সজিনা শাক আহার করিয়া দুগ্ধ পান করিবে না। মধু ও দুগ্ধের সহিত অথবা মাষকলায়, গুড় ও ঘৃতের সহিত একত্র আহার করিবে না। দুগ্ধের সহিত সর্ব্বপ্রকার অম্ল দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না।

বিরুদ্ধ দ্রব্য সেবন করিলে উৎকট রোগ—এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঈর্ষা, লজ্জা, শোক, অভিধান, উদ্বেগ ও ভয়দ্বারা মন পীড়িত হইলে, সে সময়ে আহার করিবে না, কারণ তাহাতে অন্ন জীর্ণ হয় না এবং আম দোষ জন্মে।

আচমন—আহারের পর আচমন করিবে এবং দন্ত মধ্য গত অন্ন তৃণাদি দ্বারা নির্গত করিয়া ফেলিবে। কেননা উহা বাহির করিয়া না ফেলিলে মুখে দুর্গন্ধ জন্মে এবং দন্তের অনিষ্ট হয়।

তাম্বূল সেবন—আহারের পর সুপারী, কর্পূর, লবঙ্গ, জায়ফল প্রভৃতি সংযুক্ত তাম্বুল সেবন করিবে। তাম্বূল সেবন করিলে মুখ পরিষ্কৃত ও সুগন্ধ যুক্ত হয়, দন্ত, মল, স্বর, জিহ্বা ও ইন্দ্রিয় বিশুদ্ধ হয়, কফাদির স্রাব নষ্ট হয় এবং গলরোগ নষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু রক্তপিত্ত, উরঃক্ষত, ক্ষীণ, পিপাসা ও মূর্চ্ছা রোগে এবং রুক্ষ ও দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে তাম্বূল হিতকর নহে।

আহারান্তে কর্ত্তব্য—আহারের পরে ধীরে ধীরে এক শত পদ চলিয়া বাম পার্শ্বে শয়ন করিবে এবং মনের প্রিয়রূপ রস ও গন্ধ উপভোগ করিবে। ইহাতে ভুক্ত অন্ন [illegible] হয় না।

আহারান্তে অগ্নি বা রৌদ্রের তাপ লাগান এবং অশ্বাদি যানে আরোহণ পূর্ব্বক ভ্রমণ প্রভৃতি শ্রমজনক কার্য্য অহিতকর।

জলপান,—শরীরে জলের যতটুকু আবশ্যকতা ঘটে তাহার অধিকাংশ খাদ্য ও জলীয়ের সহিত উদরস্থ হয়, তদ্ব্যতীত বিশুদ্ধ জল পান করিয়াও আমরা তাহার কিয়দংশ পূরণ করি। শাস্ত্রে শরৎ ও গ্রীষ্মকাল ভিন্ন অন্য ঋতুতে সুস্থ ব্যক্তিকেও অল্প মাত্রায় জলপান করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। আহারের পূর্ব্বে জল পান করিলে শরীর কৃশ এবং আহারের পরে জলপান করিলে শরীর স্থূল হইয়া থাকে।

শাস্ত্রে আন্তরীক্ষ-গাঙ্গ নামক জলকেই উৎকৃষ্ট বলা হইয়াছে। যে আন্তরীক্ষ-জল রজত পাত্রস্থিত শাল্যন্নকে ক্লিন্ন করে না, তাহাকে গাঙ্গ-জল বলে। এতদ্ভিন্ন অন্য আন্তরীক্ষ-জলকে সামুদ্র বলে। সামুদ্র এবং আন্তরীক্ষ-জল আশ্বিন মাস ব্যতীত অন্য সময়ে পান করিতে নাই।

আন্তরীক্ষ-জলের অভাবে ভৌম জল গ্রহণ করিতে হয়। মৃত্তিকা ভেদে এবং নাদেয়, কৌপ প্রভৃতি ভেদে জলের নানা প্রকার গুণ শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে। অনাবশ্যক বিবেচনায় সে সমস্ত লিখিত হইল না। ভৌম (ভূমি জাত) জল প্রাতঃকালে গ্রহণ করিতে হয়। যে জল আস্বাদন ও গন্ধহীন, বিবর্ণ নহে, স্বচ্ছ এবং মল রহিত—তাহাই বিশুদ্ধ। বিশুদ্ধ জলের অভাবে অবিশুদ্ধ জল অগ্নিতে সিদ্ধ করিয়া স্থূল বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে।

পিত্ত-প্রধান ব্যক্তির পক্ষে শীতল জল; বায়ু ও কফ প্রধান ব্যক্তির পক্ষে ঈষদুষ্ণ জল হিতকর। দিবসের সিদ্ধ জল—রাত্রিতে এবং রাত্রির সিদ্ধ করা জল দিবসে ব্যবহার করা উচিত নহে।

বর্ষাকালে নদীর জল কর্দ্দম এবং বিবিধ প্রাণীর লালা, মূত্র, অণ্ডাদি দ্বারা দূষিত হয় বলিয়া সে সময়ে নদীর জল ব্যবহার করা উচিত নহে। শরৎকালে সর্ব্বপ্রকার ভৌম জল হিতকর হইয়া থাকে।

তৃষিত ব্যক্তি জল না পাইলে মোহ প্রাপ্ত হয় এবং মোহ হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে, সেইজন্য কোন অবস্থাতেই জল পান নিষেধ করা উচিত নহে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, রোগ প্রতিকার এবং দীর্ঘ জীবন লাভের উপায় স্বরূপ বহুবিধ নীতি—ধর্ম্ম শাস্ত্রের আদেশ অবশ্য পালনীয় বলিয়াই সম্ভবতঃ আয়ুর্ব্বেদে ঐ সকলের পুনরুক্তি করা হয় নাই। অথবা ধর্ম্মশাস্ত্রের বিবিধ বচন যখন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, তখন হয়ত সে সকল বিষয়ও আয়ুর্ব্বেদের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। বহুকালব্যাপী বিপ্লবের ফলে সেই সকল গ্রন্থ বা গ্রন্থাংশ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। নচেৎ এরূপ নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে সূক্ষ্মদর্শী আয়ুর্ব্বেদকারগণের দৃষ্টি পতিত হয় নাই,—ইহা সম্ভবপর নহে।

মনু সংহিতায় লিখিত হইয়াছে;—"জলে—মূত্র, পুরীষ, থুথু, পূয়াদি অমেধ্য বস্তু-লিপ্ত দ্রব্য, রক্ত বা বিষ নিক্ষেপ করিবে না। এই বিধি পালন করিলে—পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ কলেরা রোগের প্রতিষেধের জন্য যাহা প্রধান উপায় বলেন—তাহা অবলম্বন করা হয়। তাঁহাদিগের মতে কলেরা রোগীর মল কোনরূপে জলে মিশ্রিত হইলে রোগের সংক্রমন ঘটে। এই উপদেশ পালন করিলে ইহা ঘটিতে পারে না।"

মনু সংহিতায় আরও লিখিত আছে,—

"মূত্র, পা ধোয়া জল, উচ্ছিষ্টান্ন, শুক্র প্রভৃতি গৃহ হইতে দূরে (একটী তীর ছুড়িলে যত দূর যায়—তত দূরে) পরিত্যাগ করিবে। এই বিধি পালন করিলে গৃহাদি পবিত্র থাকে,—কোনরূপ আবর্জ্জনা গৃহের নিকটে জমিতে পায় না, কোনরূপ দুর্গন্ধ আঘ্রাণ করিতে হয় না এবং স্বাস্থ্য ভাল থাকে।" বাহুল্য ভয়ে আমরা অধিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম না। অনুসন্ধিৎসু পাঠক মনু সংহিতা পাঠ করিলে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত বহু স্বাস্থ্য-নীতি নিহিত আছে তন্মধ্যে দেখিতে পাইবেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, গৃহাদি নির্ম্মাণ করা সম্বন্ধে পূর্ব্বে আমাদের দেশে এরূপ সুনিয়ম ছিল যে, সেই সকল নিয়মানুসারে গৃহ নির্ম্মাণ করায় গৃহমধ্যে যথেষ্ট বায়ু ও রৌদ্রের সমাবেশ ঘটিত। সেই নিয়ম অনুসারে এই কারণেই আজিও দক্ষিণদ্বারী ঘর-ঘরের রাজা এই প্রবাদ বাক্যের প্রচলন দেখা যায়।

আয়ুর্ব্বেদের সদাচার বিধি রোগ প্রতিষেধক এবং দীর্ঘজীবন লাভ সম্বন্ধীয় নীতির অন্তর্ভুক্ত। এই জন্য সদাচার বিষয়ক কয়েকটী নীতি লিখিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

নিত্য পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করিবে, প্রসন্নমনা ও সুগন্ধধারী হইবে। শ্রান্তি বোধ হইবার পূর্ব্বেই শ্রমজনক কার্য্য পরিত্যাগ করিবে। দুষ্ট ঘোটকাদি-যানে আরোহণ করিবেনা। উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের প্রতি চাহিয়া থাকিবেনা। ঊর্দ্ধ জানু হইয়া অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিবেনা। শ্রান্তি দূর না হইলে স্নান করিবেনা। স্নান করিয়া সেই বস্ত্র পরিধান করিয়া, অধিকক্ষণ থাকিবেনা। শরীর বক্রভাবে রাখিয়া হাঁচিবেনা, আহার করিবেনা এবং শয়ন করিবেনা।

চঞ্চল মনকে অধিকতর চঞ্চল করিবে না। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অতি চালনা করিবেনা। অতিশয় দীর্ঘসূত্রী হইবেনা। ক্রোধ ও হর্ষের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিবেনা। শোকের বশীভূত হইবে না। কার্য্য সিদ্ধিতে অত্যন্ত আনন্দিত কিংবা কার্য্যের অসিদ্ধিতে অত্যন্ত দুঃখিত হইবে না। কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে নিশ্চিত-বুদ্ধি হইবে অর্থাৎ এইরূপ কার্য্য করিলে এইরূপ ফল হইবে ইহা নিশ্চয় বুঝিবে।

হর্ষ-পরায়ণ হইবে, অর্থাৎ সর্ব্বদা আনন্দিত চিত্তে কাল অতিবাহিত করিবে। ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ হইবে। উপেক্ষা পরায়ণ হইবে অর্থাৎ মান-অপমান, জয়-পরাজয়, সুখ-দুঃখ প্রভৃতিতে উত্তেজিত বা ক্লিষ্ট না হইয়া, সমভাবাপন্ন হইবে, কিছুতেই মনের শান্তিকে নষ্ট হইতে দিবে না।

রসায়ন ও বাজীকরণ।

—০:০—

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রোক্ত রসায়ন এবং বাজীকরণ—দুইটী অপূর্ব্ব পদার্থ। দুঃখের বিষয় আজকাল বাজীকরণ আদৃত হইলেও রসায়নের ব্যবহার এক প্রকার লোপ পাইয়াছে। অপিচ, বাজীকরণ-ঔষধ প্রচলিত থাকিলেও [illegible] এবং সহজলভ্য বাজীকরণ [illegible]

নিতান্ত কম। চিকিৎসকের নিকট—যে সকল বাজীকরণ ঔষধ কিনিতে পাওয়া যায়,—সেগুলি বহুমূল্য। এই প্রবন্ধে আমরা রসায়ন ও বাজীকরণ ঔষধ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। প্রথমে রসায়নের বিষয় কথিত হইতেছে।

রসায়ন ঔষধ দুই প্রকার, কতকগুলি সুস্থ ব্যক্তির ওজোবর্দ্ধক এবং কতকগুলি রুগ্নের রোগ নাশক। যে সমস্ত ঔষধ সুস্থ ব্যক্তির ওজোবৰ্দ্ধক, সেইগুলি রসায়ন ও বাজীকরণ নামে খ্যাত।

রসায়ন ও বাজীকরণ প্রধানতঃ সুস্থ ব্যক্তির জন্য কল্পিত হইলেও রোগীর রোগ প্রশমনের জন্যও উপযুক্ত ক্ষেত্রে ঐ সকল ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যদুক্তং চরকে,—

প্রায়ঃ প্রায়েণ রোগাণাং দ্বিতীয়ং প্রশমেমতং।
প্রায়োঃ শব্দো বিশেষার্থেহ্যুভয়ং হ্যভয়ার্থকৃৎ॥

অর্থাৎ রসায়ন প্রায় সকল প্রকার রোগ-নাশক। কিন্তু প্রায় শব্দ এখানে বিশেষার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, কারণ দুইটীই (রসায়ন এবং বাজীকরণ) সুস্থের ওজোবর্দ্ধক এবং রুগ্নের রোগাপহরণ—এই উভয় কার্য্য সাধক।

রসায়ন ঔষধ প্রায় সর্ব্বপ্রকার রোগনাশক—এই কথায় কেহ এমন বুঝিবেন না যে, নবজ্বরে, সান্নিপাতিক জ্বরে, বা অতিসারে রসায়ন ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। পাছে কেহ এইরূপ মনে করেন—সেই জন্য শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—"সুস্থব্যক্তির ওজস্কর ঔষধের বিষয় বলা যাইতেছে। যে সকল ব্যাধিনাশক তাহা চিকিৎসা স্থানে বলা যাইবে। রোগ সমূহের যাহা ঔষধ তদ্বারাই চিকিৎসা করা যায়।"

এখন সহজেই মনে হইতে পারে, পূর্ব্বে বলা হইল যে, রসায়ন ঔষধ প্রায় সমুদায় রোগনাশক, এবং পরে বলা হইল যে, ভিন্ন ভিন্ন রোগের যে সকল ঔষধ,—তদ্বারাই তাহাদের চিকিৎসা করিবে। ইহাতে বুঝিবে কি?

ইহার মীমাংসা এই ;—রোগনাশের জন্য রোগনাশক ঔষধ এবং সুস্থের ওজোবর্দ্ধন জন্য রসায়ন ও বাজীকরণ ঔষধ প্রধানতঃ প্রয়োজ্য। কিন্তু রসায়ন ও বাজীকরণ বিশেষতঃ রসায়ন ঔষধ-প্রয়োগ দ্বারা অধিকাংশ রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। রসায়নের রোগনাশকতা সম্বন্ধে একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

গত বর্ষের ২য় ও ৩য় সংখ্যক "আয়ুর্ব্বেদে" "হরীতকী" শীর্ষক প্রবন্ধে ঋতু হরীতকী নামক রসায়নের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। অপিচ, উক্ত প্রবন্ধে হরীতকী যে সকল রোগ-নাশে সক্ষম, তাহাও বলা হইয়াছে। এতদ্বারা বুঝা যায়—হরীতকী যে সকল রোগনাশে সক্ষম, ঋতু হরীতকী সেবনে সেই সকল রোগ নিরাকৃত হয়। কিন্তু এইটুকু বুঝিলেই চলিবে না। ঔষধ প্রয়োগ সর্ব্বত্রই যুক্তির উপর নির্ভর করে। কারণ হরীতকী-গুণ প্রসঙ্গে—হরীতকী অতিসারনাশক বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু অতিসার হইলেই তাহাকে ঋতু হরীতকী প্রয়োগ করা চলে না। বিবদ্ধতাযুক্ত পুরাতন অতিসারে ঋতু হরীতকী ফলপ্রদ। সর্ব্বত্রই এইরূপ বিচার করিয়া রসায়ন ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে।

"যজ্জরা ব্যাধি বিধ্বংসী ভেষজং তদ্রসায়নম্"
অর্থাৎ যে ঔষধ জরারূপ ব্যাধি বিধ্বংসী তাহাই রসায়ন।

এস্থলে জরারূপ ব্যাধি-বিধ্বংসী অর্থে জরার প্রতিষেধক,—জরা নাশক নহে। কারণ, জরা-মৃত্যুরূপ স্বাভাবিক ব্যাধির কবল হইতে কেহই রক্ষা পায় না। স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব একদিন ক্ষুন্নমনে কার্ত্তিককে বলিয়াছিলেন,—

"মমায়ুর্গ্রসতে কালঃ কুতো পুত্র রসায়নম্।"
অর্থাৎ,—হে পুত্র, কাল আমার আয়ুঃ গ্রাস করিতেছে, রসায়ন ঔষধে আর কি ফল হইল!

তবে রসায়ন ঔষধ একেবারে জরার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে না পারিলেও মনুষ্যকে সুদীর্ঘকাল জরার আক্রমণ হইতে অব্যাহত রাখিতে পারে। রোগভোগ, শরীরের প্রতি অত্যাচার এবং অত্যধিক দুশ্চিন্তা প্রভৃতি কারণে মনুষ্য যেমন অকালে জরাগ্রস্ত হয়, সেইরূপ সুনিয়মে থাকিয়া রসায়ন ঔষধ সেবন করিলে মনুষ্য দীর্ঘকাল জরার আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে।

চ্যবন প্রাশ নামক সুপ্রসিদ্ধ রসায়নের ফল-শ্রুতিতে লিখিত হইয়াছে :—
অস্য প্রয়োগাচ্চ্যবনঃ সুবৃদ্ধোঽভূত পুনর্যুবা।

অর্থাৎ,—এই ঔষধ প্রয়োগের দ্বারা বৃদ্ধ চ্যবনঋষি পুনরায় যৌবন লাভ করিয়াছিলেন।

রসায়ন ঔষধ সেবন দ্বারা কি ফল পাওয়া যায়,—সে সম্বন্ধে শাস্ত্রকার লিখিয়াছেন,—
দীর্ঘমায়ুঃ স্মৃতিং মেধামারোগ্যং তরুণং বয়ঃ।
প্রভাবর্ণ স্বরৌদার্য্যং দেহেন্দ্রিয়বলং পরং।
বাকসিদ্ধিং প্রণতিং কান্তিং লভতে না রসায়নাৎ।
লাভোপায়ো হি শস্তানাং রসাদীনাং রসায়নং॥

অর্থাৎ—রসায়ন ঔষধ সেবন দ্বারা মনুষ্য দীর্ঘ পরমায়ু, স্মৃতি, মেধা, আরোগ্য, (অর্থাৎ রোগ না হওয়া), তরুণ বয়স (অর্থাৎ দীর্ঘ স্থায়ী যৌবন), প্রভা, বর্ণ ও স্বরের উৎকর্ষ; দেহ ও ইন্দ্রিয়ের অতিশয় বল, বাকসিদ্ধি, বিনয় এবং কান্তিলাভ করিতে পারে। উৎকৃষ্ট রসাদি ধাতু লাভের উপায় স্বরূপ বলিয়া ইহা রসায়ন নামে কথিত হইয়াছে।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দীর্ঘ আয়ুঃ প্রভৃতি লাভ করা কি এতই সহজ যে, কেবল মাত্র কিছু ব্যয় করিয়াই রসায়ন সেবন করিলে, দীর্ঘ আয়ু লাভ ঘটিয়া থাকে? যদি তাহা হইত তাহা হইলে পৃথিবী স্বর্গাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ লোক বলিয়া বিবেচিত হইত। রসায়ণ ঔষধের সম্যক ফল লাভ করিতে হইলে বিশেষ আয়াস স্বীকার আবশ্যক।

শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন,—শারীরিক ও মানসিক দোষ রহিত না হইলে মনুষ্য কখনই রসায়ন ঔষধ সেবনের ফলপ্রাপ্তি হয় না। যাহারা শারীরিক ও মানসিক দোষ রহিত এবং সংযতাত্মা—তাহারাই পরমায়ুবর্দ্ধক এবং জরাব্যাধি প্রতিষেধক রসায়নের ফল লাভ করিয়া থাকেন।

শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন,—"যে ব্যক্তি সত্যবাদী, অক্রোধী, মদ্য ও মৈথুন সেবায় বিরত, অহিংস্রক, অধিক পরিশ্রমী নহে, প্রশান্তচিত্ত, প্রিয়বাদী, জপ ও শৌচ পরায়ণ, ধীর, নিত্য দানশীল, তপস্যা পরায়ণ, দেব-গো-ব্রাহ্মণ-আচার্য্য-গুরু ও বৃদ্ধের অর্চ্চনায় রত, ক্রুর কার্য্যে বিরত, নিত্য করুণাশীল, সমভাবে জাগরণ ও নিদ্রাশীল, নিত্য দুগ্ধ ঘৃতসেবী, দেশ কাল প্রমাণজ্ঞ (অর্থাৎ দেশ কাল বুঝিয়া চলেন), যুক্তিজ্ঞ, নিরহঙ্কার, সদাচারী, সঙ্কীর্ণ চিত্ত নহে, এবং যে ইহকাল ব্যতীত পরকাল ভাবিয়া ইন্দ্রিয় সকলের চালনা করে) তাহারই রসায়ন সেবন উচিত।

জিতাত্ম-বৃদ্ধ আস্তিকগণের সেবক এবং ধর্ম্মশাস্ত্র পরায়ণ (অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে চলেন)—সে ব্যক্তি নিত্য রসায়ন সেবনের ফললাভ করিয়া থাকেন।

রসায়নের সম্যক্ ফল লাভ করিতে হইলে যে সকল গুণের প্রয়োজন, [illegible]

গুণের অধিকারী কেহ আছেন কি না সন্দেহ। সুতরাং রসায়ন ঔষধ সেবন অধুনা প্রচলিত হইতে পারে কি না, সে বিষয়ে বিষম সন্দেহ। তবে সেবন একেবারে নিরর্থক হইবার নহে, কাজেই যথাযথ নিয়মে থাকিয়া উহা সেবন করিতে না পারিলেও ইহা সেবনে যে কথঞ্চিৎ ফল পাওয়া যায়, তাহা নিশ্চিত।

এক্ষণে দেখা যাউক—রসায়ন ঔষধ কিরূপ বয়সে সেবন করিলে ফলপ্রদ হইয়া থাকে! শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে :—

পূর্ব্বে বয়সি মধ্যে বা—(অর্থাৎ পূর্ব্ব বয়সে যৌবন কালে) অথবা মধ্য বয়সে (প্রৌঢ়াবস্থায়, রসায়ন ঔষধ সেবন করা উচিত। এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, বালক বা কৃশ—রসায়নের অধিকারী নহে।

রসায়ন ঔষধ সেবন করিতে হইলে পূর্ব্বেই শরীর শুদ্ধ করিয়া লওয়া আবশ্যক।

শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—শুদ্ধ দেহ হইয়া রসায়ন ঔষধ সেবন করা উচিত। কারণ মলিন বস্ত্র রং করিলে যেমন সে রং বেশ লাগেনা, সেইরূপ অবিশুদ্ধ দেহে রসায়ন সেবন করিলে সম্যক্ ফল হয় না।"

এখন কথা হইতেছে যে, শুদ্ধ দেহ কি—এবং অশুদ্ধ দেহই বা কি? সাধারণতঃ আমাদের শরীর অশুদ্ধ। কারণ আমাদের শরীর গ্রাম্য আহার বিহারাদির দ্বারা দূষিত। এই গ্রাম্য-আহার-বিহারাদি বশতঃ শরীরের যে দোষ জন্মে, বমন-বিরেচনাদি দ্বারা সেই দোষ সংশোধন করিয়া, পরে রসায়ন ঔষধ সেবন করিতে হয়।

রসায়নের প্রয়োগ দুই প্রকার। এক কুটী প্রাবেশিক, অপর বাতাতপিক। কুটী প্রাবেশিক বিধি যেরূপ কঠিন, তাহাতে অধুনা কেহ যে কুটী প্রাবেশিক বিধি অনুসারে রসায়ন সেবন করিতে পারিবেন, এরূপ মনে হয় না। শাস্ত্রে কথিত আছে, যাঁহারা সমর্থ, নীরোগ, ধীমান্, সংযতাত্মা, সহিষ্ণু এবং ধন-জনসম্পন্ন,—তাঁহাদের পক্ষে কুটী প্রাবেশিক রসায়নই প্রশস্ত। অন্যান ব্যক্তির পক্ষে সৌর্য্য মারুতিক অর্থাৎ বাতাতপিক রসায়ন সেবন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু বাতাতপিক অপেক্ষা কুটী প্রাবেশিক রসায়ন শ্রেষ্ঠ, কিন্তু উহা দুষ্কর।

কুটী অর্থাৎ গৃহমধ্যে থাকিয়া বাতাতপ বর্জ্জন করিয়া ঔষধ সেবন করিতে হয় বলিয়া উহাকে কুটী প্রাবেশিক রসায়ন বলে। কুটী প্রাবেশিক বিধি সম্বন্ধে শাস্ত্রে নিম্নলিখিত রূপ উপদেশ আছে।

রাজা, বৈদ্য, ব্রাহ্মণ এবং পুণ্যকর্ম্মা সাধুদিগের আবাসস্থানের নিকটে, সর্পাদির ভয় রহিত, প্রশস্ত রসায়নের আবশ্যকীয় উপকরণযুক্ত এবং উত্তম মৃত্তিকাবিশিষ্ট স্থানে পূর্ব্ব বা উত্তর দিকে কুটী প্রস্তুত করিবে। কুটী বেশ বিস্তৃত ও উচ্চ, ত্রিগর্ভ এবং সূক্ষ্মলোচনা (যাহাতে বহু বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে তজ্জন্য ভিত্তির উপরিভাগে বহু ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত) হইবে। কুটী ঘন ভিত্তিযুক্ত, সকল ঋতুতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং মনের প্রিয় হওয়া উচিত। কুটী যেন স্ত্রীবর্জ্জিত হয় এবং তাহার মধ্যে যেন অপ্রিয় শব্দাদি প্রবেশ করিতে না পারে। উপযুক্ত উপকরণ এবং বৈদ্য, ঔষধ ও ব্রাহ্মণ—কুটীর মধ্যে থাকা উচিত।

অনন্তর উত্তরায়ণ কালে—শুক্ল তিথিতে, শুভ নক্ষত্রে, ক্ষৌরকার্য্যাদি করিয়া, ধৃতিমান, স্মৃতিমান শ্রদ্ধাবল ও সমাহিত চিত্ত হইয়া, রাগ দ্বেষাদি মানস দোষ পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্বজীবে মিত্রতা চিন্তা করিয়া, প্রথমে দেবতা ও ব্রাহ্মণ

গণের পূজা করিবে। পরে দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গো প্রদক্ষিণ করিয়া কুটী প্রবেশ করিবে। কুটীতে প্রবেশ করিয়া প্রথমে বমন-বিরেচনাদি দ্বারা শরীর শুদ্ধ করিয়া লইবে। অনন্তর রসায়ন ঔষধ সেবন করিবে।

ইহার পর কি প্রকারে শরীর শুদ্ধ করিতে হয়, তাহা বলিয়া পরে নানা প্রকার রসায়ন ঔষধের বিষয় লিখিত হইয়াছে। রসায়নার্থ ঔষধ সকল শৈল সত্তম হিমবান পর্ব্বত হইতে গ্রহণ করা উচিত এবং ঐ সকল ওষধি কাল জাত, পূর্ণবীর্য্য ও কোনপ্রকার দূষিত না হয়, এরূপভাবে গ্রহণ করা উচিত—এইরূপ উপদেশ আছে। আমরা অনাবশ্যক বিবেচনায় ঐ সকল বিষয় আলোচনা করিলাম না। তবে কেহ রসায়ন সেবনেচ্ছু হইয়া জানিতে ইচ্ছা করিলে, আমাদের সাধ্যমত উপযুক্ত উপদেশ পাইতে বিলম্ব হইবে না।

রসায়নের জন্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে নানাপ্রকার দিব্য ওষধির উল্লেখ আছে। ঐ সকল ওষধি সম্বন্ধে আমাদের কোনই জ্ঞান নাই এবং উহারা সাধারণ মানবের লভ্য এবং সেব্য নহে। সুশ্রুত গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে, যাহারা অধার্ম্মিক, কৃতঘ্ন, ঔষধদ্বেষী ও ব্রাহ্মণ-দ্বেষী,—তাহারা কদাচ সোমলতা নামক দিব্যৌষধি দেখিতে পায় না। ভগবান আত্রেয় অগ্নিবেশ ঋষিকে নানাপ্রকার দিব্যৌষধি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া পরে বলিয়াছেন,—"দিব্যৌষধির প্রভাব আপনার ন্যায় সুকৃতাত্ম ব্যক্তিই সহ্য করিতে পারে, অকৃতাত্ম ব্যক্তিগণ সহ্য করিতে পারে না।"

দিব্যৌষধি সেবনের যে নিয়ম বলা হইয়াছে, তাহা শুনিলেও ভয় হয়, নিয়ম পালন করাতো বহুদূরের কথা। পাঠকদিগের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য উক্ত বিধির বিষয় লিখিত হইতেছে।

ব্রহ্মা সুবর্চ্চলা, আদিত্যপর্ণী, বা সূর্য্যকান্তা, নারী বা অশ্ববলা, কাষ্ঠ-গোধা, সর্প, সোমলতা, পদ্মা, অজা বা অজশৃঙ্গী, এবং নীলা—এই আট প্রকার ওষধির মধ্যে যাহা পাওয়া যায়, তাহাদের রস তৃপ্তিপূর্ব্বক পান করিয়া, কাঁচা পলাশকাষ্ঠের স্নেহভাবিত সিন্ধুকের মধ্যে উলঙ্গ হইয়া শয়ন করিবে। ঐ সিন্ধুকের উপরে যে আবরণ থাকিবে তাহাতে একটী গর্ত্ত করিবে এবং ঐ গর্ত্তের মধ্য দিয়া রসায়ন সেবনকারীর জীবন ধারণার্থ একটু একটু করিয়া ছাগদুগ্ধ পান করিতে দিবে। এইরূপ ভাবে ছয়মাস কাল থাকিলে দেবতার ন্যায় বয়স, বর্ণ, স্বর আকৃতি বল ও প্রভা লাভ করা যায়।

(ক্রমশঃ)

ধল্ আঁকোড়্ বা ধল্ আঁকুড়া।

—:o:—

বাতে।—

ধলআঁকড়ার পাতা বা ছাল প্রলেপ দিলে—
বাতের ফোলা-ব্যথা যায় গো চ'লে।

বিসর্পে।—

ধল আঁকড়ার পাতার রস [illegible]
ক্ষতস্থানে দিলে [illegible]

মলবদ্ধতায়।—

(১) ধল আঁকড়ার শিকড় আধভরি সিদ্ধ
পান ক'র্‌লে যায় মল বদ্ধ।

(২) সিকি ভরি ধলআঁকড়ার গুঁড়—
গরম জলে সেবন কর।

ইঁদুর ও সর্প বিষে।—

ইঁদুর ও সর্পবিষে
ধল আঁকড়ার পাতা দাও পিষে।
ক্ষেপা কুকুরে কামড়ায় যা'রে—
তা'রও এতে সুফল ধরে।
পাচন ক'রেও ধলআঁকড়ার
খেতে দাও গে বারম্বার।

ফোড়া বসান।—

ধল আঁকড়ার ফল মরিচ সহ—
ফোড়া ব'স্‌বে দিতে কহ।

বাতরক্তে।—

ধল আঁকড়া, অনন্তমূল,
ছাতিমছাল আর গুগ্‌গুল,
এক একটি নাও—আধ্‌ আধ্‌ ভরি,
আধসের জলে সিদ্ধ করি,
একছটাক থা'ক্‌তে নামিয়ে নিয়ে,
রক্ত দোষে খাও চুমুক দিয়ে।
পারা দোষ, বাত, বাতরক্ত, শূল
কুষ্ঠ পর্য্যন্তের ঘোচে মূল।

ক্রিমিতে।—

(১) ধল আঁকড়ার পাতার রস ছটাক সিকি,
দু'রতি কর্পূরের মিশাও ফাঁকি,
ক্রিমি সারে ক'র্‌লে সেবন,
ধল্‌আঁক্‌ড়ার গুণ জেন' এমন।

(২) ধল আঁকড়া, দাড়িমছাল আধ্‌ আধ্‌ ভরি,
সোঁদাল ছাল নাও দ্বিগুণ করি,—
আধ্‌সের জলের একছটাক শেষ,
সেবনে রয়না ক্রিমির লেশ।

শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন।

প্রেরিত পত্র।

—:০:—

(পরীক্ষিত দুইটী ঔষধ।)

(১ম—মূর্চ্ছা বা অপস্মার রোগে।)

আমার জনৈক কবিরাজ বন্ধু একটি রোগীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিতে অসমর্থ হইয়া ডাক্তারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ডাক্তার বাবুকে Ammon carbএর সহায়তায় মুহূর্ত্তমধ্যে রোগীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিতে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন এবং ডাক্তারী চিকিৎসার অশেষবিধ প্রশংসা করিলেন। তিনি আরও বলিলেন, আয়ুর্ব্বেদীয় মতে কি এরূপ একটি ঔষধ আবিষ্কৃত হইতে পারে? [illegible] সেইদিন হইতে বন্ধুবরের [illegible]

ডাক্তারী মেটিরিয়া মেডিকা অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এবং অল্পদিনের চেষ্টাতে নিম্নলিখিত ঔষধটি আবিষ্কার করিলাম।

প্রথমতঃ Ammon carb এর প্রস্তুত-প্রণালী লইয়া অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাহাতে কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। একদিন হঠাৎ Liquor Ammonia Fortis এর প্রস্তুত-প্রণালীর প্রতি লক্ষ্য করি এবং নিম্নলিখিত বিষয়টি জানিতে পারি। "Ammon chloride (নিশাদল) কে Slaked lime (আদ্র চুণ) এর সহিত উত্তপ্ত করিলে য়্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন হইবে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আমি নিশাদলকে আদ্র চূণের সহিত মিশ্রিত করিবামাত্র দেখিলাম যে—একটি গ্যাস উঠিতেছে এবং ঐ গ্যাস ঠিক য়্যামোনিয়ার ন্যায় তীব্র গন্ধবিশিষ্ট। অতঃপর আমি কয়েকটি মূর্চ্ছারোগীকে ইহা প্রয়োগ করিয়া আশানুরূপ সুফল পাইয়াছি। সম পরিমাণ নিশাদল ও আদ্র চুণ লইয়া যে কেহ এই ঔষধটিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। ইহার ঘ্রাণ লইলে মাথার বেদনারও উপকার হয়।

(২য়—প্রদর রোগে)

রোগিণীর বয়স ১৭।১৮ বৎসর। কোন সন্তানাদি হয় নাই। ৩।৪ বৎসর যাবত অনিয়মিত ঋতু স্রাব হইতেছিল। ততদিন কোনরূপ চিকিৎসা নাই। তাহার পর একমাস যাবত অনবরত ঋতুস্রাব হইতে আরম্ভ হওয়ায় ডাক্তারী মতে, পরে আয়ুর্ব্বেদীয় মতে চিকিৎসার ব্যবস্থা করান হয়। কিন্তু কিছুতেই ফল লাভ হয় নাই। ক্রমে রোগিণী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল, ঘন ঘন মূর্চ্ছা হইতে লাগিল। একদিন রোগিণী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছে এরূপ সময়ে আমি চিকিৎসার জন্য আহূত হইলাম। আমার ব্যবস্থায় অনেক চেষ্টায় মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল বটে, কিন্তু রোগিণী বুকের বেদনায় বড়ই অস্থির হইয়া পড়িল। আমি বিশেষ কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া একমাত্রা মকরধ্বজের ব্যবস্থা করিয়া পূর্ব্বে যে সমস্ত ঔষধ সেবন করান হইয়াছিল তাহাই পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। ডাক্তারী মতে পটাশ পার ম্যাঙ্গেনাস্ লোসন্ দ্বারা পিচকারী প্রয়োগ করা হইয়াছিল। সেবনের জন্য কি কি ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল তাহা জানিতে পারিলাম না। পিচ্‌কারী প্রয়োগে ২।৩ দিবস কিছু কম থাকিয়া পুনরায় মাংস ধৌত জল সদৃশ অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত অত্যধিক পরিমাণে স্রাব আরম্ভ হইয়াছিল—জানিলাম। সেই সময় আয়ুর্ব্বেদীয় মতে চিকিৎসা করান হয়। যে কবিরাজ মহাশয়কে ডাকা হইয়াছিল, তিনি প্রদরান্তক লৌহ, খণ্ডকাদ্য লৌহ, অশোকারিষ্ট, কুটজাষ্টক প্রভৃতি অনেক ঔষধ ও মুষ্টিযোগ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমি সেই ব্যবস্থার উপর অন্য কোন নূতন ব্যবস্থা খুঁজিয়া না পাইয়া রাত্রির জন্য আর একমাত্রা মকরধ্বজ প্রয়োগ করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

রাত্রে আমার মাথায় সহসা এক খেয়াল চাপিল। পরদিবস, খানিকটা জলে কিছু ফটকিরী চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা দুই বেলা দুইটি বস্তি (ডাক্তারী মতে পিচ্‌কারী) প্রয়োগ ও দুই বটি প্রদরান্তক রস (অনুপান আয়াপান রস) ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া আসিলাম। সেবনের জন্য একটি ঔষধ না দিলে নয় বলিয়াই প্রদরান্তক রস ব্যবস্থা করিয়াছিলাম।

তৃতীয় দিবস যাইয়া শুনিলাম, [illegible] মাত্রায় স্রাব হইয়াছে। [illegible]

[illegible] আসিলাম। চতুর্থ দিবস স্রাব [illegible] হয় নাই। ঔষধ পূর্ব্ববৎই [illegible], অধিকন্তু অশোকারিষ্ট ব্যবস্থা করিলাম।

সুখের বিষয় এক সপ্তাহ মধ্যেই রোগিণী অনেকটা সুস্থ হইল। একমাস পর্য্যন্ত উক্তরূপে চিকিৎসা চলিল। মাসাতিবাহিত হইলে দেখা গেল—নিয়মিত ভাবেই ঋতুস্রাব হইতেছে। তখন প্রাতে অশোক ঘৃত, বৈকালে প্রদরান্তক রস ও রাত্রে অশোকারিষ্ট ব্যবস্থা করিলাম। ছয় মাস পরে শুনিলাম রোগিণা সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে। অদ্যাবধি তাঁহার অন্য কোন অসুখ হয় নাই।

কবিরাজ—শ্রীমৈত্র।

"চিকিৎসকের দুঃখ" প্রবন্ধের প্রতিবাদ।

——:০:——

শ্রীযুক্ত "আয়ুর্ব্বেদ" সম্পাদক
মহাশয়গণ সমীপেষু—

মহাশয়গণ, গত বৈশাখমাসের "আয়ুর্ব্বেদে" "চিকিৎসকের দুঃখ"—শীর্ষক প্রবন্ধটি যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া দুঃখিত হইয়াছি। লিখিবার ভুলে কেহ হয়তো ঐরূপ প্রবন্ধ লিখিতে পারেন, কিন্তু কেমন করিয়া আপনারা "আয়ুর্ব্বেদে"র মত উচ্চ শ্রেণীর চিকিৎসা বিষয়ক পত্রে উহা স্থান দান করিলেন বুঝিতে পারিলাম না। আমার দুঃখের কারণ ইহাই,—নতুবা ওরূপ প্রবন্ধ কেহ পড়িয়া শুনাইলে, উহাকে প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিতাম।

লেখক বলিয়াছেন,—"চিকিৎসা অতি মহৎ ও পুণ্য কর্ম্ম,—ইহা অনেকেরই বিশ্বাস, অন্ততঃ চিকিৎসকগণকে সমাজ এই চাটুবাক্যেই অভিনন্দিত করে। কিন্তু চিকিৎসা-ব্যবসা কি সত্যই মহৎ?"

লেখকের এই স্থানেই তো মহা গলদ দেখিতেছি। "চিকিৎসা যে অতি মহৎ ও পুণ্যজনক কর্ম্ম—,—তাহা অনেকের বিশ্বাস" হইলেও লেখক তাহা বিশ্বাস করেন না। এই জন্য সমাজের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া সমাজকে চাটুকার বলিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। বলি, সমাজ এই চাটুবৃত্তি করিবে কিসের জন্য? লেখক তো একটু পরেই বলিয়াছেন,—"অর্থের বিনিময়ে চিকিৎসা করা হয়।" যদি অর্থ লইয়াই চিকিৎসা করা হইল, তবে সমাজ—চিকিৎসকের নিকট কোন্ বাধ্যতা গুণে তাহার চাটুবৃত্তি অবলম্বন করিবে? সমাজ চিকিৎসা কার্য্যকে মহৎ ও পুণ্যকর্ম্ম কেন বলেন, লেখক তাহা খুলিয়া বলিতে পারেন নাই, আমরা বলি শুনুন—শাস্ত্রে আছে,—

"কপিলা কোটী দানাদ্ধি যৎফলং পরিকীর্ত্তিতম্
ফলং তৎ কোটীগুণীতমেকাতুর-চিকিৎসয়া।"

অর্থাৎ কোটী কপিলা দান করিলে যে ফল লাভ হয়, একটীমাত্র রোগীকে আরোগ্য

করিলে তাহারও কোটীগুণ ফললাভ হইয়া থাকে। চিকিৎসক এবম্বিধ পুণ্যজনক কার্য্যে ব্রতী বলিয়াই তিনি সমাজের চক্ষে প্রকৃতই মহান এবং পুণ্যবান। লেখক কি এ কথা অবগত নহেন?

মহাপুরুষ চাণক্য চিকিৎসকের গুণব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—

"আয়ুর্ব্বেদ কৃতাভ্যাসঃ সর্ব্বেষাং প্রিয় দর্শনম্
আর্য্যশীল গুণোপেত এষ বৈদ্যো বিধীয়তে॥"

অর্থ লইয়া চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন সম্বন্ধে লেখক যে উহা অপকর্ম্ম বলিয়াছেন—ইহাও অতি বিস্ময়ের কথা। তিনি তো নিজেই বলিয়াছেন,—"অর্থগ্রহণ না করিলে চিকিৎসকের জীবিকা নির্ব্বাহ হয় না।" এ স্থলে একই লেখকের উভয় কথার সামঞ্জস্য কিরূপ রহিয়াছে—তদৃষ্টে হাস্য সম্বরণ করা যায় না।

অর্থ গ্রহণ না করিয়া চিকিৎসক করিবেন কি? পেটের দায়ে তাঁহাকে অর্থ গ্রহণ করিতে হয়। শাস্ত্রও তো সকলের নিকট অর্থ লইতে নিষেধ করেন নাই। শাস্ত্রকার তো বলিয়া গিয়াছেন,—জীবিকানির্ব্বাহার্থ রাজা এবং ধনবান ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে অর্থ অবশ্য গ্রহণীয়। যথা—

"ঈশ্বরাণাং বসুমতাং লিপ্সেতার্থন্তু বৃত্তয়ে।"

লেখক এক স্থলে বলিয়াছেন,—"মানুষের প্রকৃতিই রোগ প্রতিষেধক। চিকিৎসক সেই প্রকৃতির সহায়তা করিতে পারেন মাত্র। সেই প্রকৃতির সম্পূর্ণ স্বরূপ কোন চিকিৎসক জানিতে পারিয়াছেন?"

হা অদৃষ্ট, লেখক আয়ুর্ব্বেদর শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আয়ুর্ব্বেদের মূলমন্ত্রটুকুও যে ভুলিয়া গিয়াছেন, তাহা জানিতাম না! আয়ুর্ব্বেদের মূল মন্ত্র—

"ব্যাধেস্তত্ত্বঃ পরিজ্ঞানং বেদনায়াশ্চ নিগ্রহম।
এতৎ বৈদস্য বৈদ্যত্বং নবৈদ্যঃ প্রভুরায়ুষঃ॥"

অর্থাৎ ব্যাধির তত্ত্ব অবগত হইয়া উপদ্রবের দূর করাই চিকিৎসকের কার্য্য; বৈদ্য কখন আয়ুর প্রভু নহেন। এই কথাতেই তো সব কথা বলা হইয়াছে। তবে লেখক মহাশয় আবল-তাবল বকিতে বসিয়াছেন কেন?

লেখক বৈদ্যের জন্ম বৃত্তান্তের সহিত তাহার যে বৃত্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা একেবারেই অসঙ্গত। কোন শাস্ত্রে-কোন পুরাণে—ব্যবসায় স্থির করিবার জন্য বৈদ্যের জন্ম রহস্য লিপিবদ্ধ হয় নাই। নিজের জাতিগত ব্যবসায়ের কথা বলিতে গিয়া তাহার জন্ম-রহস্য আনিয়া—তাহাকে যে এতাদৃশ নীচতার আসনে স্থান দান করিতে কুণ্ঠিত নহে, তাহার কল্পনা,—তাহার লেখনী—তাহার প্রবন্ধ—বৈদ্য সমাজে যে ধিক্কৃত হইবার উপযুক্ত, সে বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই; আমাদিগকেও ধিক যে,—সে লেখার আবার আমরা প্রতিবাদ করিতেছি।

লেখক বলিয়াছেন,—"আমাদের দেশে কি পাশ্চাত্য দেশে—কোন দেশের ইতিহাসে চিকিৎসকের নাম উল্লিখিত হয় নাই।" বাহবা বুদ্ধি! এত বুদ্ধি না হইলে আর কেহ নিজের দুঃখ সমাজে প্রকাশ করিতে বসে! পাশ্চাত্য সমাজের কথায়-কাজ নাই, আমাদের সমাজের কথা বলি।—চিকিৎসক-অশ্বিনী কুমারদ্বয় ছিন্নশিরঃ-ব্রহ্মার শিরোযোজনা করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা যজ্ঞভাগী হইয়াছিলেন। রামায়ণ জানা আছে তো? ভিন্ন জাতি হইলেও সুষেণ যে বৈদ্য বা চিকিৎসক ছিলেন তাহাতো অস্বীকার করিবার জো নাই। সে সুষেণের নাম রামায়ণে কীর্ত্তিত কেন? এই বৃত্তির জন্য।

সকল কথার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিবাদ করিলে প্রবন্ধ বড়িয়া যাইবে। তাই আর বেশী বলিব না। সংক্ষেপে আর দু' একটা কথা কহিয়া লই।

লেখক বলিয়াছেন,—"চিকিৎসা বৃত্তির দ্বারা সংসারে বন্ধুতা লাভ হয় না।" আত্মমতের সমর্থনের জন্য কেহ যে শাস্ত্রের সকল কথাও উপেক্ষা করিতে পারে, ইহা জানিতাম না। চিকিৎসা বৃত্তির ফলে—

ক্বচিদর্থঃ ক্বচিন্মৈত্রী কচিদ্ধর্ম্মঃ কচিদযশঃ।
কর্ম্মাভ্যাসঃ ক্বচিচ্চাপি চিকিৎসা নাস্তি নিষ্ফলা।

অর্থাৎ চিকিৎসাবৃত্তির ফলে কোন স্থানে অর্থ লাভ, কোন স্থানে মিত্রতালাভ, কোন স্থানে ধর্ম্মলাভ, কোন স্থানে যশঃলাভ এবং যেথানে কিছুই লাভ হয় না, সেথানে কর্ম্মাভ্যাস বা Practical knowledge লাভ হয়—অতএব এ বৃত্তি নিষ্ফল নহে,—এ কথা যে লেখক ভুলিয়া গেলেন—ইহা খুবই আশ্চর্য্যের বিষয়।

লেখক একস্থলে বলিয়াছেন,—"চিকিৎসক অপাংক্তেয় বলিয়া নিন্দিত, তাহার অন্ন অভক্ষ্য বলিয়া কথিত।" আমরা পরাশর সংহিতার মত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি, চিকিৎসক অপাংক্তেয় নহেন। যথা—

"বৈশ্যকন্যাসমুৎপন্নম্ ব্রাহ্মণেনতু সংস্কৃতম্
অম্বষ্ঠ জায়তে নামাঃ ব্রাহ্মণেন সহ ভোজনৈঃ॥"

এ অবস্থায় বৈদ্য বা চিকিৎসককে অপাংক্তেয় বলিব কেমন করিয়া? লেখক বলিয়াছেন—"রামকৃষ্ণ পরমহংস চিকিৎসকের অন্নগ্রহণ করিতেন না।" জানিনা রামকৃষ্ণ পরমহংস কি করিতেন, কিন্তু সাক্ষাৎ শঙ্করের অবতার শঙ্করাচার্য্য চিকিৎসককে সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করিতেন, তাহারই প্রমাণ স্বরূপ তিনি বলিয়া গিয়াছেন,—

"বৈশ্যঃ নারায়ণঃ হরিঃ।"

লেখক সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ কি না জানিনা, কিন্তু সকল কথা তাঁহার মনে নাই—এবং সকল কথা না জানিয়া—না বুঝিয়া এরূপ প্রবন্ধের অবতারণা যে করিতে নাই—ইহা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে।

শ্রীবিনোদবিহারি রায় গুপ্ত ধন্বন্তরি।

ক্ষয়রোগ।

—০:০—

যক্ষ্মা পৃথিবী ব্যাপী এবং বহু প্রাচীন রোগ। পৌরাণিক কাহিনীতে চন্দ্রের যক্ষ্মারোগ হইয়াছিল এইরূপ কথিত হইয়াছে। তারকারাজ—চন্দ্রের ক্ষয়রোগ 'রাজ'-যক্ষ্মা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। রসাদি ধাতুর ক্ষয় করে বলিয়া ইহার নাম ক্ষয় এবং শরীরকে শুষ্ক করে বলিয়া ইহার নাম শোষ।

ক্ষয়রোগ যে সংক্রামক—আয়ুর্ব্বেদে তাহা সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। যথা,—

প্রসাঙ্গাদ্ গাত্রসংস্পর্শাৎ নিঃশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ
এক শয্যাসনাচ্চৈব বস্ত্রমাল্যানুলেপনাৎ।
কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এবচ।
ঔপসর্গিক রোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরম্

অর্থাৎ একত্র অবস্থান, গাত্রসংস্পর্শ, নিঃশ্বাস লাগা, একত্র ভোজন, এক শয্যা বা আসনে শয়ন বা উপবেশন, এক বস্ত্র, মালা বা অনুলেপন, চন্দনাদি ব্যবহার প্রভৃতি কারণে কুষ্ঠ, জ্বর, শোষ, নেত্রাভিষ্যন্দ (চোখ উঠা) এবং উপসর্গিক রোগ সকল এক ব্যক্তির শরীর হইতে অন্য ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে।

ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, উপরি উক্ত কারণে রোগ বীজ একের শরীর হইতে অন্যের শরীরে প্রবেশ করে। পাশ্চাত্য চিকিৎসক গণের মতেও এক প্রকার জীবাণু একের শরীর হইতে অন্যের শরীরে প্রবেশ করিয়া ক্ষয় রোগ উৎপন্ন করে।

কিন্তু রোগবীজ শরীরে প্রবেশ করিলেই যদি রোগ উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে এতদিন পৃথিবী হইতে মানব জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইত।

মানব শরীরে একটী পালিনী শক্তি আছে। সেই শক্তি শরীরের অনিষ্টকারক যাবতীয় কারণের ধ্বংস সাধন করিয়া শরীরকে রক্ষা করিয়া থাকে। যতদিন সেই শক্তি প্রবল থাকে, ততদিন কোন রোগই শরীরকে আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিতে পারেনা। বিবিধ অত্যাচারের ফলে দেহস্থ ঐ পালিনী শক্তি যখন অত্যন্ত দুর্ব্বলা হইয়া পড়ে, তখন সেই দুর্ব্বলা শক্তির বাধা অতিক্রম করিয়া দেহ প্রবিষ্ট রোগবীজ রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

শাস্ত্রে যক্ষ্মারোগের চারিটি কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা সাহস, বেগরোধ, ক্ষয় এবং বিষমাশন। প্রত্যেকের বিষয় পৃথক ভাবে বলা যাইতেছে।

সাহস—নিজের শরীরে যেরূপ বল, তাহার অতিরিক্ত বল-প্রয়োগ-সাধ্য কোন কার্য্য করাকে সাহস বলে। গুরুভার বহন, অতিরিক্ত বলবান ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ (কুস্তি করা), দ্রুতগামী অশ্বকে, বৃষকে বলপূর্ব্বক ধাবন করা, সন্তরণ করিয়া মহানদী পার হওয়া—প্রভৃতি সাহস পদ কার্য্য।

এইরূপ সাহসের জন্য বক্ষঃস্থলে ক্ষত হয় এবং বায়ু সেই ক্ষতকে আশ্রয় করে। অনন্তর সেই বায়ু বক্ষঃস্থ শ্লেষ্মার সহিত ঊর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যক দিকে প্রসরণ করে।

দোষ সকল মস্তকে আশ্রয় করিয়া শিরঃশূল, গলদেশ আশ্রয় করিয়া কণ্ঠোদ্ধংস (গলা খুস খুসি), কাস, স্বরভঙ্গ ও অরুচি, পার্শ্বদেশ আশ্রয় করিয়া মলভেদ, সন্ধি আশ্রয় করিয়া জৃম্ভণ (হাই-উঠা) ও জ্বর, বক্ষ আশ্রয় করিয়া বক্ষোবেদনা উৎপন্ন করে। বক্ষে ক্ষত হওয়ায় কাসের সহিত কফ মিশ্রিত রক্ত নির্গত হয় এবং কাসের সময় বক্ষে শূলনিঘাতবৎ বেদনা অনুভূত হয়। শাস্ত্রে সাহসজ যক্ষ্মারোগের এই একাদশ প্রকার উপদ্রবের বিষয় লিখিত হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বত্র সবগুলিই যে প্রকাশ পায় তাহা নহে।

বেগধারণ—লজ্জা, ঘৃণা বা ভয় বশতঃ অধোবায়ু, মূত্র ও পুরীষের উপস্থিত বেগ ধারণ করিলে বায়ু কুপিত হইয়া এবং অন্যান্য দোষের সহিত মিলিত হইয়া ঊর্দ্ধ তির্য্যক ও অধোদেশে প্রসারিত ক্ষয়রোগ উৎপন্ন করে।

প্রতিশ্যায়, কাস, স্বরভেদ, অরুচি, পার্শ্বশূল, শিরঃশূল, জ্বর, অঙ্গবেদনা, গা আড়া-মোড়া করা, বার বার বমি হওয়া এবং মলভেদ—এই সকল লক্ষণ—এইরোগে প্রকাশ পায়।

ক্ষয় যক্ষ্মা—অতিমাত্র শোক, চিন্তা, ঈর্ষা, উৎকণ্ঠা, ভয়, ক্রোধ, প্রভৃতি কারণে, কৃশ ব্যক্তির উপবাস এবং রুক্ষ অন্ন পান-সেবন হেতু, দুর্ব্বল প্রকৃতির অনাহার বা অল্পাহার হেতু, এবং অতিরিক্ত স্ত্রী সহবাস বশতঃ শরীর ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং তজ্জন্য কুপিত বায়ু অন্যান্য দোষের সহিত মিলিত হইয়া ক্ষয় রোগ উৎপন্ন করে।

ক্ষয়জ যক্ষ্মারোগে প্রতিশ্যায়, জ্বর, কাস, অঙ্গমর্দ্দ, শিরোবেদনা, শ্বাস, মলভেদ, অরুচি, পার্শ্বশূল, স্বরভঙ্গ, এবং স্কন্ধ দেশে বেদনা—এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

বিষমাশন—কোন সময়ে অল্প, কোন সময়ে অধিক, কখন বিকালে, কখন দু'পরে, কখন সকালে আহার করাকে বিষমাশন বলে। এই বিষমাশন ক্ষয় রোগের হেতু। বাভট বলিয়াছেন "অন্ন পান বিধি ত্যাগ" অর্থাৎ আহার ও পানের নিয়ম পরিত্যাগ যক্ষ্মারোগের হেতু। সুতরাং পানাহার সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার অনিয়ম হইতেই যক্ষ্মারোগ উৎপন্ন হইতে পারে। চরকে কথিত হইয়াছে যে, বিষমাহার বশতঃ ত্রিদোষ প্রকুপিত হইয়া শরীরস্থ স্রোতঃ সকলের মুখ রুদ্ধ করে। স্রোতোমুখ রুদ্ধ হওয়ায় ভুক্ত দ্রব্য সম্যক রূপে শরীর পোষণ করিতে পারে না। পরন্তু অধিকাংশ মল-মূত্র রূপে পরিণত হয়। এইজন্য পোষণাভাবে দেহ ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকে।

বিষমাশন জনিত যক্ষ্মারোগে প্রতিশ্যায় মুখ দিয়া থুথু উঠা, কাস, বমি, অরুচি, জ্বর, স্কন্ধ দেশে বেদনা, রক্তবমন, পার্শ্বদেশে এবং মস্তকে শূল নির্ঘাৎ-বৎ বেদনা এবং স্বরভঙ্গ হয়। এই চারিটী কারণ বশতঃ যক্ষ্মারোগ উৎপন্ন হয়। এতদ্ভিন্ন শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে:—

প্রতিশ্যায়াদথো কাসঃ কাসাৎ সংজায়তে ক্ষয়ঃ।

অর্থাৎ প্রতিশ্যায় (সর্দ্দি লাগা—নাক মুখ দিয়া জলপড়া) রোগ উপস্থিত হইলে কাস এবং কাসরোগ উপেক্ষিত হইলে ক্ষয়রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ইহার সার্থকতা অনেক সময় প্রত্যক্ষ করা যায়, সামান্য কারণ হইতে (যেমন এক দিন জলে ভেজা বা অন্য কারণে ঠাণ্ডা লাগা)—পরিণামে উৎকট যক্ষ্মারোগ উৎপন্ন হয়। ইহার কারণ রোগকে উপেক্ষা করা। ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি হইল, তাহা গ্রাহ্য না করিয়া সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় স্নানাহার চলিতে লাগিল, হয়ত কিছু অত্যাচারও হইল, ফলে কাস রোগ জন্মিল। সেই কাস রোগও উপেক্ষিত হইল, ক্রমে ফুস্‌ফুস্‌ বিকৃত হইল, শরীরের রোগ প্রতিষেধক শক্তি কমিয়া গেল তখন কোনরূপে যক্ষ্মারোগের বীজ শরীরে প্রবেশ করিলে আর নিস্তার নাই। চাষ করা সার দেওয়া জমিতে উক্ত বীজ যেমন সহজে বৃক্ষরূপে বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, সেইরূপ রুগ্ন দেহে রোগ-বীজ সহজেই যক্ষ্মা রোগ উৎপন্ন করিয়া থাকে। এই জন্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে:—

"রোগ জন্মিবামাত্র প্রতিকার করা উচিত সামান্য রোগকেও উপেক্ষা করিবে না। কারণ অগ্নি, শস্ত্র ও বিষের ন্যায় সামান্য রোগও মহান অনিষ্ট উৎপাদন করিতে পারে।"

সর্ব্বপ্রকার কাস রোগই উপেক্ষিত হইলে ভবিষ্যতে যক্ষ্মারোগ উৎপন্ন হইতে পারে। কাস নিদানে কথিত হইয়াছে, "সর্ব্বপ্রকার কাস (বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, ক্ষতজ, এবং ক্ষয়জ পাঁচ প্রকার) উপেক্ষিত হইলে ক্ষয় রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে:—
"অজীর্ণ অন্ন ঘোর বিষ। এই অজীর্ণ অন্ন

কফের সহিত মিশ্রিত হইয়া যক্ষ্মা ও পীনসাদি রোগ সকল উৎপন্ন করিয়া থাকে।"

পূর্ব্বে সাহসাদি ক্ষয়রোগের চারিপ্রকার নিদান বলিয়া কথিত হইয়াছে, এই দুইটীও তাহার অন্তর্ভুক্ত। নচেৎ পূর্ব্বোক্ত কারণ চতুষ্টয়ের অব্যাপ্তি দোষ হইয়া পড়ে। কাস রোগে শরীর ক্ষয় প্রাপ্ত হয় বলিয়া কাস হইতে ক্ষয়রোগ জন্মে, তাহাও ক্ষয় বা যক্ষ্মা রোগের অন্তর্ভুক্ত।

অজীর্ণ হইতে যে ক্ষয় রোগ জন্মে, তাহাও এইরূপ বুঝিতে হইবে। কারণ অজীর্ণ অন্ন সম্যক জীর্ণ হয় না বলিয়া ধাতু সমূহের পোষণ করিতে পারে না। পোষণাভাবে ধাতু সমূহ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে। সুতরাং ইহাকে ক্ষয়জ যক্ষ্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

ক্ষয় দুই প্রকারে হইয়া থাকে; যথা অনুলোম ক্ষয় এবং বিলোম ক্ষয়। রস ধাতুর ক্ষয় ঘটিলে পরবর্ত্তী রক্তাদি ধাতুর ক্রমশঃ ক্ষয় হয়। ইহাই অনুলোম ক্ষয়। আবার শুক্র ধাতুর ক্ষয় ঘটিলে পূর্ব্ববর্ত্তী মজ্জাদি ধাতুর ক্রমশঃ ক্ষয় হয়। ইহাকে বিলোম ক্ষয় বলে। অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাস, শোক প্রভৃতি কারণে শরীর শুষ্ক হইতে থাকিলেই তাহাকে ক্ষয়রোগ বলা যায় না। যতক্ষণ ক্ষয়রোগের বীজ শরীরে প্রবেশ না করে, ততক্ষণ ক্ষয়রোগ উৎপন্ন হয় না। এই পার্থক্য বুঝাইবার জন্য শাস্ত্রকার পৃথক শোষ রোগের নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাস, শোক, বার্দ্ধক্য, ব্যায়াম, পথ-পর্য্যটন, উপবাস—এই সকল কারণে এবং ব্রণ (ক্ষত) ও উরঃক্ষত (অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করিয়া কার্য্য করার জন্য বক্ষের অভ্যন্তর ভাগে ক্ষত হওয়া) হইতে শোষরোগ উৎপন্ন হয়" কোন কোন চিকিৎসক এইরূপ বলিয়া থাকেন।

বুদ্ধিমান পাঠক, লক্ষ্য করিয়া দেখুন যে, অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাস, শোক, অতিরিক্ত বল প্রয়োগ পূর্ব্বক কার্য্য করার জন্য বক্ষে ক্ষত হওয়া প্রভৃতি কারণে ক্ষয়রোগ উৎপন্ন হয় তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আবার ঐ সকল কারণে রোগ উপস্থিত হয়—নির্দ্দেশ করা হইল, এই পার্থক্যের মধ্যে কি আছে? আছে "সংক্রামন্তি নরান্নরং"—রোগবীজ সংক্রমণ হওয়া চাই। ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে, আধুনিক যক্ষ্মারোগের জীবাণু তত্ত্ব শাস্ত্রকারদিগের সুবিদিত ছিল।

কেহ বলিতে পারেন যে, জীবাণুতত্ত্ব যদি সুবিদিতই ছিল—তবে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই কেন? তাঁহাদিগের বুঝা উচিত যে, বর্ত্তমানে আমরা কেবল আয়ুর্ব্বেদের কঙ্কালটুকু মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। আয়ুর্ব্বেদের রক্ত-মাংস-মেদে কি ছিল না ছিল—তাহা কি করিয়া বলিব? জানিনা আবার কতদিনে আয়ুর্ব্বেদের কঙ্কালে রক্ত-মাংস-মেদ সংযুক্ত হইবে।

(ক্রমশঃ)

মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কা

ক্রিমিতে ব্যবস্থা।—(১) পালিধা মাদারের পাতার রস প্রাতঃকালে পান করাও, শিশুদিগের ক্রিমি সারিয়া যাইবে। ৫ বৎসরের শিশুর পক্ষে মাত্রা সিকি ঝিনুক। উহার কম বয়স্কের এক ঝিনুকের ৮ অংশ। (২) দাড়িমের শিকড়ের ক্বাথ পান করাইলে ক্রিমি মরিয়া যায়। উহার মাত্রাও পূর্ব্ববৎ। (৩) পলাশ-বীজ ইন্দ্রযব, বিড়ঙ্গ, নিমছাল ও চিরাতা চুর্ণ প্রত্যেক দ্রব্য দুই রতি এবং গুড় একআনা, একত্র সেবন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়। (৪) পলাশবীজ আধআনা ও যমানী একআনা একত্র করিয়া কয়েক দিন সেবন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়। (৫) ঘেটুপাতার রস ও আনারসের কচি পাতার রস এক একটি সিকি ঝিনুক লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশাইয়া শিশু-দিগকে পান করাও,—ক্রিমি নষ্ট হইবে।

হৃদ্‌শূল ও হৃদ্‌রোগে।—(১) দুই-তোলা শুঁঠ, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ-পোয়া থাকিতে নামাইয়া পান কর—হৃদ্‌শূল ও হৃদ্‌রোগ প্রশমিত হইবে। (২) অর্জ্জুন ছালের গুঁড়া দুইআনা লইয়া একছটাক গরম দুগ্ধের সহিত পান কর—হৃদয়ের যন্ত্রণার আশু নিবৃত্তি হইবে।

মূত্রকৃচ্ছ্রে সুব্যবস্থা।—(১) কুশ মূল, কেশে মূল, শরমূল, খাগড়ামূল ও ইক্ষু মূল—প্রত্যেক দ্রব্য ।৵১০ সাড়ে ছয় আনা ওজনে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া পান করিলে সহজে প্রস্রাব হইয়া মূত্রকৃচ্ছ্রের যন্ত্রণা নিবৃত্তি হয়। (২) গোক্ষুর বীজ দুইতোলা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া তাহাতে এক আনা পরিমিত সোরা ফেলিয়া মিশাইয়া লইয়া পান কর,—মূত্রকৃচ্ছ্রের যন্ত্রণার সদ্যঃ শান্তি হইবে। (৩) শ্বেত বেড়েলা দুইতোলা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া লইয়া পান কর, মূত্রকৃচ্ছ্রের শান্তি হইবে।

প্রমেহ চিকিৎসা।—(১) দূর্ব্বা, কেশুর, নাটাকরঞ্জার ছাল, টোকাপানা, কৈবর্ত্ত মুতা ও শেওলা—প্রত্যেক দ্রব্য ।৴১০ সাড়ে পাঁচ আনা ওজনে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া পান কর, শুক্রমেহ প্রশমিত হইবে। (২) হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, (প্রত্যেক দ্রব্যের আঁটি বাদ) সোঁদাল ফলের শাঁস ও কিস্‌মিস্—এই পাঁচটী দ্রব্যের প্রত্যেকটি ।৵১০ সাড়ে ছয় আনা ওজনে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া একটু মধু মিশাইয়া পান কর—ফেনা যুক্ত মেহের সদ্যঃ শান্তি হইবে। (৩) দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, হরীতকী, আমলা, বহেড়া (এই তিনটি দ্রব্যের আঁটি বাদ) ও চিতামূল প্রত্যেক দ্রব্য ।৴১০ সাড়ে পাঁচ আনা ওজনে লইয়া আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া কয়েক দিন পান কর,—প্রমেহের শান্তি হইবে।

বহুমূত্রে যোগ।—(১) কলার এঁটের রস প্রাতে দুই তোলা ও বৈকালে ২ তোলা লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন কর, উপকার হইবে। (২) পাকা কলা ২টা, আমলকীর রস ২ তোলা, মধু ।৶১০ সাড়ে ছয় আনা, চিনি ।৶১০ সাড়ে ছয় আনা ও দুগ্ধ এক পোয়া একত্র মিশাইয়া কয়েক দিন সেবন কর,—বহুমূত্রে উপকার হইবে।

শ্রীঅতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিভূষণ।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

দান।—মাননীয় জজ শ্রীযুক্ত এ, চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী মিসেস চৌধুরী মহোদয়া সংপ্রতি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় পরিদর্শনে তৃপ্তি লাভ করিয়া বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে ১০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

রোগীর হিসাব।—বাঙ্গালা দেশে প্রত্যেক ১৫ জনের মধ্যে ৬ জনের চক্ষুরোগ; প্রত্যেক ৫ জনের মধ্যে ১ জনের দন্তরোগ, প্রত্যেক ৬ জনের মধ্যে ২ জনের আল্‌জীব বৃদ্ধি বা টন্‌সিল রোগ এবং প্রত্যেক ৭ জনের মধ্যে ১ জনের করিয়া অন্ত্র ফুলা রোগ।

মাদক দ্রব্য।—সমগ্রবঙ্গে গত ১৯১৫ খৃঃ অব্দে মদ্ বিক্রয় হইয়াছিল—৩১৩৯৫৯০ সের, গাজা বিক্রয় হইয়াছিল—৯২০১৬ সের; অহিফেন বিক্রয় হইয়াছিল—৫২৮২৩ সের। ১৯১৬ খৃঃ অব্দে মদ ৩০১০০০০ সের, গাঁজা ৭৩২১৮ সের এবং অহিফেন ৪৩৪৭৯ সের। ১৯১৭ খৃঃ অব্দে মদ ৩১৮৫০০০ সের, গাঁজা ৭৫১৯৩ সের এবং অহিফেন ৩৮১১৮ সের। হিসাবে বুঝা যায়—বাঙ্গালা দেশ নেশায় মজ-গুল্ হইয়া পড়িয়াছে। গাঁজা ও আফিংখোর অপেক্ষা মাতালের সংখ্যাই হিসাবে অধিক।

মত্ততায় দণ্ড।—বাঙ্গালা দেশে মাতলা-মির জন্য ১৯১০-১১ খৃঃ অব্দে দণ্ড পাইয়াছিল ৯২৮৭ জন। ১৯১৫-১৬ খৃঃ অব্দে ঐরূপ দণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা ৯৩৭৮ জন এবং ১৯১৬-১৭ খৃঃ অব্দে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি ৯৮৬৫ জন। ইহার মধ্যে কেবল কলিকাতায় ১৯১০-১১ খৃঃ অব্দে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি ৮২১৬ জন; ১৯১৫-১৬ খৃঃ অব্দে ৬৭৬৩ জন এবং ১৯১৬-১৭ খৃঃ অব্দে ৬৯৬৫ জন। কলিকাতা বাঙ্গালার সকল স্থানের সেরা, কাজেই কলিকাতায় সব বিষয়েরই বাড়াবাড়ি।

শোকসভা।—৺দুর্গাপ্রসাদ সেন কবি-রাজ মহাশয়ের জন্য গত ৮ই বৈশাখ কলিকাতা ইন্‌ভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে এক বিরাট শোকসভা হইয়াছিল। অনেকেই বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই বৃদ্ধ বৈদ্যের সম্বর্দ্ধনার জন্য একটি স্মৃতি সংরক্ষণ করা হইবে সাব্যস্ত হইয়াছে।

করপোরেসনের সাহায্য।—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের দাতব্য চিকিৎসা-লয়ের জন্য কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি এ বৎসর আড়াই হাজার টাকা দান করিয়াছেন। আমরা এজন্য তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

২য় বর্ষ। বঙ্গাব্দ ১৩২৫—আষাঢ়। ১০ম সংখ্যা।

স্বাস্থ্যরক্ষায় সমুদ্রতীর।

তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া মুক্তাজাল ছড়াইতে ছড়াইতে গভীরগর্জ্জনে বেলাভূমির দিকে পুনঃ পুনঃ সমুদ্র বেগে ছুটিয়া আসিতেছে, আবার মাথা আছড়াইয়া তীরস্থ যা' কিছু লইয়া মুহূর্ত্তে সরিয়া যাইতেছে, আবার তরঙ্গ তুলিতেছে, মুক্তাবৃষ্টি করিতেছে, তীরের দিকে ছুটিতেছে, আবার সরিয়া যাইতেছে, এ আসা-যাওয়ার বিরাম নাই, এ লীলা-খেলার অন্ত নাই; অনন্ত অগাধ অকূল অসীম সমুদ্র আপনার লীলায়, আপনার খেলায় আপনিই বিহ্বল, আপনিই উন্মত্ত, আপনিই মোহিত! লহরে লহরে হীরা, চুণি, পান্নার গড় বাঁধিতেছে, পলকে ভাঙ্গিয়া দিতেছে. বুক ফুলাইয়া আপনার মনে আপনি হাসিতেছে, শতবজ্রধ্বনিকে ছাপাইয়া গভীর-গর্জ্জনে নিজের বল বিক্রম বিশ্ববাসীকে বুঝাইয়া দিতেছে। চক্ষুঃ পলক তুলিয়া নিয়ত এই দৃশ্য দেখিতে চায়, গড়ের মাঠে ঘোড়ার মত সমুদ্রের বুকে ছুটিয়া যায়, আকাশ নুইয়া পড়িয়া সমুদ্রের বুকে আবরণের সৃষ্টি করিয়াছে; সেইখানে বাধা পাইয়া আবার ফিরিয়া আসে। সমুদ্রের বুকে পলকে পলকে যে কত রঙের পরিবর্ত্তন, কত রঙের একত্র সমাবেশ হইতেছে, কত রঙের কতরকমের ছোট বড় কত যে উজ্জ্বল চকচকে—ঝকঝকে ফুল ফুটিতেছে, তাহা দেখিয়া চোখ ফিরিতে চায়না, দেখিতে দেখিতে পরিশ্রান্ত হয়না, অবসাদ পায়না, আনন্দে বিস্ফারিত হইয়া থাকে।

বৃদ্ধযুবকের চক্ষুও বালকের চক্ষুর মত জিজ্ঞাসু হইয়া পড়ে, বিস্ময়ে সাগরে ভাসিয়া বেড়ায়। দৃষ্টিশক্তি তাহার পুনঃ পুনঃ নূতন নূতন খাদ্য পাইয়া বাড়িয়া উঠে, সবল হয়। সমুদ্রের বক্ষঃস্থল অসীম, কেবল ধুধু করিতেছে, বায়ু কোনস্থলেই বাধা পায় না, সমুদ্রের বুকে অসীম নির্ম্মল আকাশ পাইয়া কেবল খেলিয়া

বেড়াইতেছে, কাচস্বচ্ছ লবণাম্বুর তরঙ্গে শত শত শ্বেতপদ্ম ফুটাইতেছে, তরঙ্গে তরঙ্গে সন্তরণ করিয়া আকাশ সাগরে ভাসিয়া পুনঃপুন আসিয়া মানবমানবীর সর্ব্বাঙ্গ আঁকড়াইয়া পুনঃপুন আলিঙ্গন করিতেছে। বায়ুর সেই অনুষ্ণাশীত স্পর্শে সর্ব্বাঙ্গে এক নবভাব আসিতেছে, সন্তাপ ও জড়তা দূরে সরিয়া পড়িতেছে। বায়ু-হিল্লোলে ভাসিয়া মানবের কর্ম্মশক্তি চতুর্গুণ বাড়িয়া উঠিতেছে। হস্ত, পদ, সবল হইতেছে, মনে স্ফূর্ত্তি ও উৎসাহ জন্মিতেছে। সমুদ্র গর্জ্জনের বিরাম নাই, শতশত ঝড়, শতশত সাইক্লোন—সমুদ্রবক্ষে ঘনীভূত হইয়া অবিশ্রাম শব্দ উঠাইতেছে, তরঙ্গের উপরে সবেগে সবলে তরঙ্গ পড়িয়া শতকামানের ঘোরগর্জ্জনকে ছাপাইয়া নবীন মেঘের শতবজ্রপাতী ঘনগভীরধ্বনিকে নীচু নীচু করিয়া অনবরত গুড়ুম গুড়ুম শব্দ তুলিতেছে। এই শব্দরাশির ভিতরে পড়িয়া কর্ণের বিশ্রাম নাই, শব্দেও কঠোরতা নাই, জল ও বায়ুর মিলনে সেই গভীর ঘোরগর্জ্জনের মধ্যেও কোমলতা আসিয়াছে।

গাম্ভীর্য্য ভীষণতা ও কোমলতার একত্র মিলন ঘটিয়াছে। এই গভীর ঘোর গর্জ্জন গ্রহণে কর্ণ সমর্থ। কর্ণ প্রস্তুত হইয়া এই সব গ্রহণ করিতেছে, করিতে করিতে তাহার সামর্থ্য বাড়িতেছে, শক্তিবর্দ্ধিত হইতেছে। স্নানার্থী সমুদ্রজলে আবক্ষঃ মগ্ন করিয়া সমুদ্রের দিকে পৃষ্ঠ রাখিয়া দাঁড়াইয়াছে; সমুদ্র পর্ব্বত-প্রমাণ তরঙ্গ তুলিয়া বেগে আসিয়া তাহার গায়ে ছুটিয়া পড়িতেছে, সর্ব্বাঙ্গ আপ্লাবিত করিয়া মাথার উপর দিয়া সেই পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গ চলিয়া যাইতেছে, আবার ফিরিবার সময়েও সবলে নাকে, মুখে, লবণাম্বুর ঝটকা লাগাইয়া স্থানভ্রষ্ট করিয়া আছড়াইয়া ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছে। এইভাবে সমুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে স্নানার্থীর ব্যায়াম হয়, সেই ব্যায়ামে সর্ব্বশরীর দৃঢ় হয়, শরীরে বলের প্রতিষ্ঠা হয়, লবণাম্বুর ঝটকায় লোমকূপগুলি পরিস্কৃত হয়, শরীরের মল অপসারিত হয়, নিয়তচঞ্চল ফেনিল লবণাম্বুর পুনঃপুন সবেগ-স্পর্শে শরীরে উত্তাপবৃদ্ধি পায়, বাতরোগ বিদূরিত হয়, আর যে সকল রোগ কীটাণু-পুঞ্জের আশ্রয়ে জন্মিয়াছে; সেই সকল রোগের কীটাণুপুঞ্জও জলৌকার ন্যায় লবণাম্বুর সংস্পর্শে একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। পচা জীবদেহে, পচা উদ্ভিদে, পচা আবর্জ্জনায় দুষ্ট কীটাণুর বর্দ্ধন হয়, অগাধ অসীম আবর্ত্তময় লবণাম্বু রাশির বক্ষে কিছুই পচিতে পারে না, তাহাতে দুষ্ট কীটাণুরও অস্তিত্ব নাই।

যক্ষ্মার কীটাণু মানুষের ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করিয়া সেইখানে ঘরবাড়ী করিয়া লয় সত্য, কিন্তু কেবল সেই কীটাণুই মানুষকে মারে না; দূষিত বায়ুর কৃপায় অন্যজাতীয় দুষ্ট কীটাণুও নাসারন্ধ্রের পথে ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করিয়া যক্ষ্মার কীটাণুর সহায়তা করে। এই দ্বিবিধ কীটাণুর যুগপৎ আক্রমণ আর মানুষ সহ্য করিতে পারে না, অল্পদিনেই তাহার ভবলীলার শেষ হইয়া যায়। সমুদ্রবক্ষে অবাধ সঞ্চারী স্বচ্ছন্দ বিহারী বায়ুতে দুষ্ট কীটাণুর সম্পর্ক নাই; সুতরাং সেই নির্ম্মল বায়ুগ্রহণে যক্ষ্মার কীটাণু আর নিজের সহায়তাকারী অন্যকীটাণু পাইতে পারে না। তাপের বৈষম্য যক্ষ্মা-ক্রান্তের বিশেষ অপকারী, সমুদ্রে তাপের বৈষম্য নাই, সর্ব্বদা তাপের সাম্যই তাহাতে বিরাজ করে। এই তাপসাম্যেই সমুদ্রের বায়ু নাতিশীত, নাত্যুষ্ণ। এই বায়ু এই তাপ

যক্ষ্মাক্রান্তের উপকারী, হৃদরোগেও উপকারী, শ্বাস রোগেও উপকারী। কেন উপকারী বলিতে গেলে অল্পকথায় হয় না, অনেক কথা বলিতে হয়।

মেঘের উপরে মেঘ পড়াতে মেঘে যেমন বিদ্যুতের সঞ্চার হয়; সেইরূপ তরঙ্গের উপরে প্রবলবেগে তরঙ্গ পড়াতে সমস্ত সমুদ্র বিদ্যুন্ময় হইয়া উঠে; সেই বিদ্যুৎ সাগরবিহারী বায়ুকে মুহূর্ত্তে অম্লজানে পরিণত করে, আবার বিদ্যুতের সংস্পর্শে সেই অম্লজান বায়ু মুহূর্ত্তে ওজনে (ভঙ্গপ্রবণ বায়ুতে) পরিণত হয়। ওজন আবার দূষিত পদার্থের সম্মুখীন হইলে মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া চূরিয়া সহস্র সহস্র ভাগে বিভক্ত হইয়া 'ও' রূপ (বায়ুবিশেষের রূপ) ধারণ করে। এই 'ও' এর এত শক্তি বাড়ে যে, সে সেই দুষ্ট কীটাণুরাশিকে ও তাহার বিষকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হয়। সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্রে, চিকিৎসাশাস্ত্রে বা কাব্যসাহিত্যে অম্লজান, ওজন 'ও' প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত কোন শব্দ এ পর্য্যন্ত স্পষ্টতঃ পাই নাই। না পাইবার অনেক কারণ আছে, জল-বায়ুদোষে অনেক পুস্তক নষ্ট হইয়াছে, অনেক পুস্তক অগ্নি ও কীটে নষ্ট করিয়াছে, রাশিরাশি পুস্তক বর্ব্বর সেনানীর হস্তে অগ্নিসাৎ হইয়াছে, অনেক পুস্তক অধ্যয়ন অধ্যাপনার অভাবে হতাদরে জীর্ণ হইতে হইতে মৃত্যুমুখে পড়িয়াছে। যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহার অনেকগুলি দুর্লভ, সুলভ পুস্তকের মধ্যেও সকলগুলি পুস্তকে চক্ষুঃ সংযোগ হয় নাই, চক্ষুঃসংযোগ হইলেও সমস্ত অংশের অর্থাবগতি করিতে সামর্থ্য হয় নাই। নয় ত যে আর্য্য ঋষিগণ প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এই পাঁচপ্রকারে ও নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয় এই পাঁচপ্রকারে বায়ুকে বিভক্ত করিয়াও সন্তুষ্ট হয়েন নাই, আবার উনপঞ্চাশৎ প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন; তাঁহারা যে সামান্য অম্লজান, ওজন 'ও' জানিতেন না, একথা বলিতে পারিনা। না জানিলেই বা কেন তাঁহারা ধর্ম্ম-ব্যাজে সমুদ্র-তীরে বাসের ব্যবস্থা দিয়াছেন? যে বায়ু গ্রহণ করিয়া আমরা জীবন রক্ষা করি; তাহার নাম প্রাণবায়ু, যাহা ত্যাগ করি, তাহার নাম অপানবায়ু। এই প্রাণবায়ুকে কি অম্লজান বলা যাইতে পারে না? স্বাস্থ্যের কথা বলিলে, রোগবিনাশের কথা বলিলে, শরীর রক্ষার কথা তুলিলে, ধর্ম্মপ্রাণ ভারতের নরনারী শুনিবে না; জগতের একান্ত কল্যাণ কাম ঋষিবৃন্দ সেইজন্য সেই কথা না উঠাইয়া সমুদ্রকে তীর্থরাজ বলিয়াছেন। সমুদ্রের জলে দাঁড়াইয়া অঘমর্ষণ মন্ত্রজপ ও সন্ধ্যা তর্পণ করিবার বিধিপ্রদর্শন করিয়াছেন, পুণ্যতীর্থ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, পুণ্যতিথিতে অব-গাহন স্নানের ব্যবস্থা দিয়াছেন, সমুদ্রে স্নান, দান, তর্পণ, শ্রাদ্ধ, পূজা—যাহা করিবে, তাহাতেই অনন্ত ফল হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, দুন্দুভিনাদে এইরূপ ঘোষণা করিয়াও তাঁহারা পরিতৃপ্ত হয়েন নাই; মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকে আদেশ করিয়া সমুদ্রতীরে দেবাদিদেব পুরুষোত্তমের ত্রিমূর্ত্তির স্থাপন করাইয়াছেন। শক্তির উপাসকদিগকে পীঠভূমি বলিয়া বিমলার অধিষ্ঠান বিমলাক্ষেত্র বলিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন, আবার শৈবদিগকে সপ্তকল্পান্তজীবী মার্কণ্ডেয় ঋষির আশ্রম দেখাইয়া মার্কণ্ডেয় পূজিত মার্কণ্ডেয়েশ্বরের পূজার উপদেশ দিয়াছেন, ও এস্থানে অবস্থিতি করিলে অল্পায়ুও দীর্ঘজীবন লাভ করে ইঙ্গিত করিয়াছেন। সমুদ্রতীরে অদূরে সৌরদিগের জন্য কোণার্কে বক্ত্র

ভাস্করক্ষেত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। গাণপত্যদিগের জন্যও গণেশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই সকল ব্যবস্থা দেখিয়া ও শুনিয়া কি বলিব, আর্য্য ঋষিগণ সমুদ্রতীরে বাসের উপকারিতা জানিতেন না? সমুদ্রজলে অবগাহনের রোগসংহারতা বুঝিতেন না? ধর্ম্মশাস্ত্রের অনেক উপদেশেই যে চিকিৎসা শাস্ত্রের অনেক ব্যবস্থা নিহিত আছে, যিনি মহর্ষি জৈমিনি প্রণীত পূর্ব্বমীমাংসা অধ্যয়ন করিয়াছেন; তিনি তাহা জানেন। এই পুণ্যক্ষেত্রে বাস করিবার জন্য ঋষি বলিয়াছেন, "সংবৎসর মুপোষিত্বা মাসত্রয় মথা পিবা। তেন যষ্টং হুতং তেন তেন তপ্তং তপো মহৎ। সযাতি পরমং স্থানং যত্র যোগেশ্বরো হরিঃ। যে ব্যক্তি সংবৎর কাল, অগত্যা তিন মাস কাল এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বাস করিয়া (অন্যত্র না যাইয়া) অবস্থান (উহ্য) করে; তদ্বারা সে মহতী দেবপূজা, মহাযজ্ঞ, মহতীতপস্যা করিয়াছে; যেস্থানে যোগেশ্বর হরি বাস করেন; দেহাবসানে (উহ্য) সেই পরমস্থানে তাহার গতি হয়।

"বার্ষিকাং চতুরোমাসান্ যাবৎ স পুরুষোত্তমে। কাশীবাস যুগান্যাটৌ দিনেনৈকেন লভ্যতে"। আটযুগ পর্য্যন্ত কাশীতে বাস করিলে যে পুণ্য হয়; বৎসরে চারিমাস পর্য্যন্ত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বাস করিলে তাহার একদিনে সেই পুণ্য হয়।

"বট সাগরয়োর্ম্মধ্যে যে ত্যজন্তি কলেবরং। তে দুর্লভংপরংমোক্ষমাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ"। অক্ষয়বট ও সমুদ্রের মধ্যস্থলে যে সকল ব্যক্তি দেহত্যাগ করে; তাহারা পরম দুর্লভ মুক্তি লাভ করে, এ বিষয়ে সংশয় নাই। কত বচন দেখাইব? উদ্ধৃত বচন কয়েকটির ন্যায় পুরাণ শাস্ত্রে অনেক বচন আছে, অনেক আখ্যায়িকা আছে। বিমলস্বাস্থ্যে যাহার দেহপুষ্ট, মনঃ হৃষ্ট ও সবল; সে কখনও মৃত্যুর জন্য চিন্তা করে না, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয় না, যাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে, উৎকটরোগের হাতে পড়িয়া চিকিৎসায় যাহার কোন ফল হইতেছে না; সেই ব্যক্তিই মৃত্যুসম্মুখীন হইতেছে মনে করে, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়; তাহাকেই ঋষি "বটসাগরয়োর্ম্মধ্যে" ইত্যাদি বলিয়া মোক্ষের প্রলোভনে প্রলোভিত করিয়া রোগমুক্তির উদ্দেশে সমুদ্রতীরে বাসের ব্যবস্থা দিতেছেন। যিনি একবৎসরকাল—অন্ততঃ তিনমাসকাল সমুদ্রতীরে বাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন, সকলের পক্ষে প্রতিবর্ষে চারিমাস সমুদ্রতীরে বাসকরা কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহার যে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে কতদূর পারদর্শিতা ছিল ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়, ঋষিদিগের উপরে ভক্তিস্রোতঃ বর্দ্ধিত হইয়া পড়ে।

"প্রাণস্ত্বং সর্ব্বভূতানাং যোনিস্ত্বং সরিতাংপতিঃ।
তীর্থরাজ নমস্তভ্যং ত্রাহিমামচ্যুতপ্রিয়"।
"ত্বমগ্নি দ্বিপদাং নাথ রেতোধাঃ কাকদীপনঃ।
প্রধানঃ সর্ব্বভূতানাং জীবানাং প্রভুরব্যয়ঃ"।
"অমৃতস্যারণিস্ত্বংহি দেবযোনি রপাং পতিঃ।
বৃজিনং হরমে সর্ব্বং"—
"অগ্নিশ্চ তেজো বড়বাচ দেহো রেতোধাঃ"।
ইত্যাদি ইত্যাদি।

তুমি সকল প্রাণীর প্রাণ; সকল প্রাণীর উৎপাদক, অচ্যুতপ্রিয় (ভগবানের প্রিয়, যা চ্যুত হয় না প্রিয় যাহা হইতে) তোমাকে নমস্কার, তুমি আমার নিস্তার কর। হে নাথ, তুমি দ্বিপদদিগের (মনুষ্যদিগের) অগ্নি, তুমি তাহাদিগের রেতোধাঃ (বীর্য্যধারণকারী বা বীর্য্যদানকারী) তুমি তাহাদিগের কাকদীপন (কাকের [illegible]

গ্নির—উদ্দীপক) পঞ্চভূতের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ, তুমি সর্ব্বজীবের প্রভু (রক্ষাকর্ত্তা) তুমি সমস্ত পাপ নষ্টকর। সমুদ্রই অগ্নি, সমুদ্রই বড়বা ; সমুদ্রই দেহ, সমুদ্রই রেতোধাঃ।

যখন বায়ুকে প্রথমে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার একটি বায়ুর নাম প্রাণ বলা হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে, সংস্কৃত সাহিত্যে যে বায়ুকে জগৎপ্রাণ বলা হইয়াছে, সে জগৎ প্রাণ অর্থে সমস্ত বায়ু নহে, বায়ু বিশেষ। এই বায়ু সমুদ্রে নিয়ত উৎপন্ন হইতেছে, এইজন্য মন্ত্রে সমুদ্রকেই প্রাণীর প্রাণ বলা হইয়াছে। "অপেয়শ্চ মহোদধিঃ" ইত্যাদি বলিয়া ঋষি সমুদ্রের জলপান অকর্ত্তব্য বলিয়া নিষেধ করিয়াছেন। লবণ স্বাদ ও তিক্তস্বাদ বলিয়াই কেবল নিষিদ্ধ নহে, অজীর্ণতার উৎপাদন করে বলিয়াও সমুদ্রজল নিষিদ্ধ, এরূপ অবস্থায় কাকের জঠরাগ্নির ন্যায় সমুদ্র জঠরাগ্নির উদ্দীপক কি করিয়া হয় চিন্তা করিবার বিষয়। সমুদ্রতীরে বাস করিলে নানাপ্রকারে স্বাস্থ্যোন্নতি হয়, শরীরের উন্নতি, শারীরিক যন্ত্রের উন্নতি হয়, শরীর সবল হয়। ঋষি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন ; "জীর্ণত্বচইরোরগঃ" সর্প যেমন পুরাতন ত্বক্ ত্যাগ করিয়া নব কলেবর লাভ করে ; সমুদ্রতীরে বাস করিলে মানুষও সেইরূপ পূর্ব্ব শরীর ত্যাগ করিয়া নব কলেবর লাভ করে। শারীরিক বল লাভ করিলে তাহার জীর্ণ করিবার শক্তিও বাড়ে ; এইজন্য মন্ত্রে "কাকদীপনঃ" পদ রহিয়াছে, আর যদি "কাকদীপনঃ" না হইয়া "কাম দীপনঃ" পাঠ হয় ; তবে আর তাহার ব্যাখ্যা করিবার জন্য বেগ পাইতে হয় না। "অমৃতস্যারণি" অর্থ কি ? ভাববাচ্যে ক্ত প্রত্যয় করিলে মৃত অর্থে মৃত্যু বুঝায়, মৃত্যুর অভাব অমৃত; অমৃত্যু অর্থ জীবন, জীবন আত্মা নয়। মোটরকার বা ট্রেনের কল বিগড়াইলে বা তাহাতে তাপ না থাকিলে কেহ তাহাতে আরোহণ করে না ; সেইরূপ শরীরের যন্ত্র বিগড়াইলে বা তাপ না থাকিলে তাহাতে আর আত্মার অধিষ্ঠান থাকে না ; সুতরাং শরীর যন্ত্রের পরিচালন ও শরীরস্থ তাপই জীবন। সমুদ্র—ফুস্‌ফুস্ ও হৃদয় যন্ত্রের উপকারক ; এজন্য সমুদ্রকে অমৃতের অরণি বলা হইয়াছে। আর্য্য বিজ্ঞানে অগ্নি, বিদ্যুৎ, তাপ—এ সমস্তকে সামান্যতঃ অগ্নি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। তাপ যখন অগ্নি—তাহাকে জালাইবার জন্য কাষ্ঠ চাই, এই কাষ্ঠ সমুদ্র ; কাষ্ঠেরই নামান্তর অরণি। সমুদ্র মন্থনের আধ্যাত্মিকা ভারতবাসী মাত্রেই অবগত রহিয়াছে। এই মন্থন কার্য্যের পরিসমাপ্তি আজও হয় নাই। তরঙ্গের উপরে তরঙ্গের সবেগে পতন ও সেইরূপ আলোড়নই সমুদ্র মন্থন ; সেই মন্থনের ফলে বিদ্যুতের আবির্ভাব, তাহার ফলে বিশুদ্ধ অম্লজানের আবির্ভাব ; সেই অম্লজানই অমৃত—সুধা। নাসারন্ধ্রে সেই সুধা পান করিয়া মানব অমরত্ব লাভ করে, এতত্ত্বও আমরা সেই মন্ত্রস্থ 'অমৃতস্যারণি' এই পদদ্বয়ের অর্থে অবগত হই। সমুদ্রস্থ বিদ্যুতের নাম বাড়বাগ্নি ও ফস্‌ফরাসের নাম ঔষধ।

বড়বা শব্দের অভিধানিক অর্থ ঘোটকী ; সমুদ্রের তরঙ্গগুলি ঘোটকীর মত তীরের দিকে ছুটিয়া আসে ; সেই জন্য কবির ভাষায় তাহাকে বড়বা বলা হইয়াছে। সেই বড়বা হইতেই সামুদ্রিক বিদ্যুতের উৎপত্তি ; সেইজন্য তাহার নাম বাড়ব। সেইজন্য মন্ত্রে সমুদ্রের সমস্ত দেহকেই বড়বাময় বলা হইয়াছে। "রেতোধা" শব্দের অর্থ=স্পষ্ট। শাস্ত্রে অনেক পক্ক অন্ন ভোজনেরই প্রশংসা, তাহার অনেক

বিধানের উদ্দেশেও সমুদ্রতীরে রোগীর পক্ষে বাসের ব্যবস্থা; আগুন জ্বালাইয়া আগুনের কাছে বসিয়া স্বহস্তে পাক করিলে তাপের বৈষম্য হইবে; এইজন্য স্বয়ং পুরুষোত্তম প্রকাণ্ড হোটেল খুলিয়া বসিয়াছেন। শাস্ত্রকার ঋষিরাও উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, এই ক্ষেত্রে পাক করিয়া খাইবে না, খাইলে পাপ হইবে, এই হোটেলের অন্ন না খাইলেও পাপ হইবে। উড়ে ঠাকুরেরা সম্প্রতি বঙ্গ গৃহিণীদিগের শিষ্যত্বে আদ্যার সন্তার প্রভৃতি শিখিয়াছে; পূর্ব্বে জানিত না, তাহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরাও জানিত না; আদি ঠাকুর ও আদি ঠাকুরাণী আর কি করিয়া তাহা জানিবেন? তারপর তাঁহাদিগের হাতের আগাও নাই, কষ্টে স্বষ্টে না হয় একবার হাঁড়ী উঠাইতে ও নামাইতে পারেন; পুনঃ পুনঃ নামান উঠান তাঁহাদিগের সাধ্যাতীত; কাজে কাজে সন্তার, সাতলান প্রভৃতি তাঁহাদিগের দ্বারা হওয়া একেবারেই অসম্ভব। এজন্য ইন্দুমাধব মল্লিকের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের জন্মিবার যুগ যুগান্তর পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত ইউপিক্‌কুকারে তাঁহারা সেই হোটেলের অন্ন ব্যঞ্জনাদি সমস্তই রাঁধিতেন। এখন ভাবিয়া দেখুন, এইরূপ প্রসাদী অন্ন ব্যঞ্জন কত সহজে হজম হইয়া যাইতে পারে; রোগীর পক্ষেও ভাল, ভোগীর পক্ষেও ভাল। এক প্রসঙ্গে অনেক বলিলাম, আর বলিব না, আধ্যাত্মিকতার কথা আর উঠাইব না।

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন।

সার্জ্জন-সুশ্রুত।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

—:*:—

(ধাত্রী-বিদ্যা।)

ধাত্রী বিদ্যায় সুশ্রুতের কিরূপ পারদর্শিতা ছিল, নিম্নে তাহার একটু আভাষ দিতেছি।

সুশ্রুত গর্ভস্থিত মৃত সন্তান বাহির করিবার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে শিষ্যগণকে উপদেশ দিতেছেন;—"যদি গর্ভস্থ মৃত সন্তান হাতের সাহায্যে বাহির করিতে না পার, তাহা হইলে অস্ত্র দ্বারা ভ্রূণ ছেদন করিয়া বাহির করিবে। কিন্তু সাবধান—সন্তান জীবিত থাকিলে, কখনও অস্ত্র প্রয়োগের চেষ্টা করিও না, তাহাতে গর্ভ ও গর্ভিণী উভয়েরই বিপদ ঘটিতে পারে। মৃত সন্তান প্রসব করাইবার পূর্ব্বে, গর্ভিণীকে মধুর বচনে আশ্বস্ত করিবে। তাহার পর মণ্ডলাগ্র নামক অস্ত্রের দ্বারা ভ্রূণের মস্তক বিদীর্ণ করিয়া ফেলিবে, এবং খর্পর গুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া শঙ্কু অর্থাৎ আকর্ষণী অস্ত্রের সাহায্যে বাহির করিবে। শেষে বক্ষঃ ও কক্ষদেশ ধরিয়া ধীরে ধীরে মৃত সন্তানকে বাহির করিবে। যদি মস্তক বিদীর্ণ করিয়া [illegible]

তাহা হইলে অক্ষিপুট ও গণ্ডদেশ ধরিয়া সন্তানকে বাহিরে আনিবে। সন্তানের স্কন্ধদেশ অপত্য পথে আবদ্ধ হইলে, বাহুদ্বয় ছেদন করিবে। ভ্রূণের উদর বায়ু কর্তৃক ফুলিয়া থাকিলে, তাহা চিরিয়া অন্ত্র সমূহ বাহির, করিয়া ফেলিবে। ইহাতে শিশুর দেহ শিথিল হইয়া পড়ায় তাহাকে অনায়াসে বাহিরে আনা যায়। জঘন-দেশ দ্বারা অপত্য পথ অবরুদ্ধ হইলে, জঘনাস্থি ছেদন করিবে। * * মৃতগর্ভ নিষ্কাসনের পক্ষে মণ্ডলাগ্র অস্ত্রই খুব ভাল। তীক্ষাগ্র বিশিষ্ট বৃদ্ধি পত্র অস্ত্র প্রয়োগে গর্ভিণীকে আঘাত লাগিতে পারে।”

অতি সংক্ষেপে আমি মহর্ষির উপদেশের মর্ম্মানুবাদ লিপিবদ্ধ করিলাম। বলিতে লজ্জা হয়—সেই সুশ্রুতের বংশধর আমরা—গর্ভস্থ মৃত সন্তান ছেদনের কথা শুনিলে এখন আমাদের হৃদ্ কম্প হইয়া থাকে। প্রসব-সাধনের প্রধান অস্ত্র মণ্ডলাগ্রের আকারও আমরা চ'ক্ষে দেখিবার সুযোগ পাইলাম না! এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য!

বন্ধন।

পতন, আঘাত প্রভৃতি কারণে দেহের অস্থি সমূহ ভগ্ন হইলে, “বন্ধনের” প্রয়োগ করিতে হয়। বন্ধনের ইংরাজী নাম Bandage. অস্ত্র প্রয়োগের পর আহত বা ক্ষত স্থানেও অস্ত্র চিকিৎসকগণ বন্ধনের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। সুশ্রুত এই বন্ধন ব্যাপারেও বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে অনেকগুলি বন্ধনের নাম পাওয়া যায়। যথা;—১। কোশ বন্ধন, ২। দাম বন্ধন, ৩। স্বস্তিক বন্ধন, ৪। অনু বেল্লিত বন্ধন, ৫। ছ তোলী বন্ধন, ৬। মণ্ডল বন্ধন, ৭। স্থগিকাবন্ধন, ৮। যমক বন্ধন, ৯। খট্টা বন্ধন, ১০। চীন বন্ধন, ১১। বিবন্ধ বন্ধন, ১২। বিতান বন্ধন, ১৩। গোফণা বন্ধন, ১৪। পঞ্চাঙ্গী বন্ধন। এই সকল বন্ধনের প্রণালীই য়ুরোপের ডাক্তারগণ ভারতবাসী বৈদ্যের কাছে বহুযুগ পূর্ব্বে শিক্ষা করিয়াছিলেন।” ‘ভারতী’ পত্রে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ, মহাশয় চিত্রের সাহায্যে তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন।

সুশ্রুত বন্ধন কার্য্যের জন্য প্রয়োজনমত—কার্পাস বস্ত্র, মেষ লোম নির্ম্মিত বস্ত্র, রেশমী-ক্ষৌম বস্ত্র, চর্ম্ম, বংশাদির চটা বা চেয়াড়ী, সূত্র, লৌহ এবং কাষ্ঠ ফলক প্রভৃতি ব্যবহার করিতেন। দেহের স্থান বিশেষে যেরূপ যেরূপ বন্ধন সু-নিবিষ্ট হইতে পারে, সুশ্রুত তাহা উত্তমরূপেই অবগত ছিলেন। এই সকল বন্ধন আবার তিন প্রকার ছিল। যে বন্ধন খুব শক্ত অথচ বেদনা প্রদ নহে, তাহার নাম ছিল—“গাঢ় বন্ধন”। যে বন্ধনের ভিতর দিক ফাঁপা থাকিত তাহার নাম “শিথিল বন্ধন”। যে বন্ধন খুব শক্তও নহে, শিথিলও নহে—তাহার নাম “সমবন্ধন”।

সুশ্রুত শুধু সার্জ্জন ছিলেন না, তিনি এক জন ফিজিসিয়ান ও ছিলেন। সুশ্রুত সংহিতায় কায় চিকিৎসার অনেক অমূল্য উপদেশ আছে। কায় চিকিৎসক-শিরোমণি চরক ৫০০ ভেষজের উল্লেখ করিয়াছেন, ৩৭টী গুণে সুশ্রুত ৭৬০ টী গুণ বর্ণনা করিয়াছেন। সুশ্রুতের গ্রন্থে আমরা বিবিধ লবণ, ধাতু দ্রব্য, এবং নানা খনিজ পদার্থের ঔষধার্থে প্রয়োগ দেখিতে পাই।

সুশ্রুতের মতের আদর।

আজ কাল যে সকল রোগে অস্ত্র প্রয়োগ অতি কঠিন বলিয়া সুধীগণ স্বীকার করিয়া

থাকেন, সুশ্রুতের সময় তাহার অধিকাংশই প্রচলিত ছিল। major operation. Amputation Abdominal Section—সুশ্রুত এসব ভালরকম জানিতেন। ৯৭৭ খৃঃ পূঃ অব্দে ও—ভারতে সুশ্রুতের অস্ত্র চিকিৎসা প্রচলিত ছিল। পাঠক মহাশয় বল্লাল পণ্ডিতের "ভোজ প্রবন্ধ" পড়িলে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাইবেন সুশ্রুত এবং তাঁহার মতাবলম্বী শল্য বৈদ্যগণ রোগীর শরীরে অস্ত্র প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে, "সম্মোহিনী" ঔষধ প্রয়োগ করিয়া রোগীর জ্ঞান তিরোহিত করিতেন। অস্ত্র চিকিৎসার পরে, "সঞ্জীবনী" নামক ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহারা রোগীর চেতনা সম্পাদন করিতেন। এখন ডাক্তারদের "ক্লোরোফর্ম্ম" "সম্মোহিনীর" স্থান অধিকার করিয়াছে, কিন্তু "সঞ্জীবনীর ন্যায় কোনও ঔষধ অদ্যাবধি য়ুরোপের Pharmacopoeu তে দেখিতে পাওয়া যায় না।

খৃষ্টীয় যুগের প্রারম্ভে আরব দেশের বিখ্যাত চিকিৎসক সিরারিয়ন, স্ব প্রণীত চিকিৎসা-গ্রন্থে, সুশ্রুত ও চরকের বহু মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। আফলাটুন্ (Aflutoon) নামক মুসলমান চিকিৎসক নবম শতাব্দিতে ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইঁহার গ্রন্থে সুশ্রুত প্রভৃতির নাম স-সম্মানে উল্লিখিত হইয়াছে। ৭ম শতাব্দিতে খালিফ্ আল্ মল্সুরের আদেশ, "সুশ্রুত সংহিতা" আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। ঐ গ্রন্থ "খালেল সাওর আল হিন্দি" [Khalale Shaw shooral Hindi] নামে পরিচিত। এই সময় "চরক" প্রভৃতি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ ও আরবী ভাষায় অনুবাদিত হয়। এই সকল অনুবাদিত গ্রন্থ আবার লাটিন্ ভাষায় অনুবাদিত হয়। সেই সকল অনূদিত গ্রন্থই য়ুরোপীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তি। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দি পর্য্যন্ত, য়ুরোপে চিকিৎসা শাস্ত্র, ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিল। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণ—মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। গোড়ার কথাটা যাঁহারা ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পান না, "আয়ুর্ব্বেদের" বিজ্ঞান রহস্য যাঁহাদের ভেদ করিবার শক্তি নাই, আয়ুর্ব্বেদের বিরাট বিস্তৃতি যাঁহারা কখনও চ'ক্ষেও দেখেন নাই, কেবল সেই ক্ষীণ বুদ্ধি, মোহ মুগ্ধ ব্যক্তির কাছেই আয়ুর্ব্বেদ—Quackery! প্রার্থনা করি ভগবান্ এরূপ আত্মঘাতী মানবের মনোদৈন্য নিবারণ করুণ। ইহারা আয়ুর্ব্বেদের অঙ্গে বিশ্বরূপের প্রকট মহিমা দেখিয়া জীবন সার্থক করুক।

প্রসিদ্ধ চিকিৎসক মহাত্মা নুরুদ্দীন মহম্মদ আবদুল্লা সিরাজী সাহেব, সম্রাট সাহজাহানের পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন। ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি যে "আল্ ফাজেল আদ্বিচ" [Alfazl Adwich] নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে সুশ্রুতোক্ত অনেকগুলি ঔষধই গৃহীত হইয়াছে। সম্রাট্ ঔরংজেবের প্রিয়তম হাকিম মহম্মদ আকবর মার্জ্জানি, ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে "কারাবাদিন্ কাদেরি" (Karabadino Kaderi) নামক গ্রন্থে সুশ্রুতের বহু ব্যবস্থা অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতে বেশ বুঝা যায়—অবনতির দিনেও, মুসলমান প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে হিন্দুর আয়ুর্ব্বেদ কত আদৃত ছিল।

সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা কে?

আমরা দেখিলাম—সুশ্রুত একজন বড় দরের বৈজ্ঞানিক ও [illegible]

রসায়ন-শাস্ত্রে তাঁহার রীতিমত অধিকার ছিল। কিন্তু তাহার গ্রন্থখানি কেবল চিকিৎসা-শাস্ত্র নহে,—তাহাকে ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, ব্যবহার শাস্ত্র, এমন কি সকল শাস্ত্রের সমন্বয় বলিতে পারা যায়। বিশ্ব রহস্যের বিপুল আবর্ত্তনে—তাঁহার ঋষিত্ব গঠিত হইয়াছিল। তাঁহার সর্ব্ব ভেদিনী দূর প্রসারিণী অক্ষুণ্ণ দিব্য দৃষ্টি—মানব-মর্ম্মের মায়ালোকে প্রবেশ করিয়া, যে অপার্থিব রত্নরাজি আহরণ করিয়াছিল, তাহা তাঁহারই অমর-রশ্মি-রেখাময়ী সংহিতা খানিকে জগতের চিরন্তন সম্পত্তিরূপে পরিণত করিয়াছে! যিনি সুশ্রুত পাঠ করিবেন, তিনিই বুঝিবেন—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ণ জ্ঞান—কেবল মানব দেহ হইতেই লাভ করা যায়। সুশ্রুতের প্রত্যেক "স্থান"—প্রতিভার জ্বালাময় ফুৎকারে উদ্দীপ্ত-চেতন, প্রত্যেক অধ্যায়—বিজ্ঞানের হিল্লোলে ও কল্লোলে স্পন্দমান, প্রত্যেক শ্লোক ওঙ্কারের মত পবিত্র! সুশ্রুতের ভাষা সুন্দর, সরল, যেন অবিরাম গতিতে অনাবিল জলস্রোতের ন্যায় কলকলে ছুটিয়া চলিয়াছে! তাহাতে আবেগ আছে, আবর্ত্ত নাই, কল্লোল আছে, কোলাহল নাই। একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধে—সুশ্রুতের সকল কথা আলোচনা করিতে পারি, আমার সে শক্তি নাই। সুতরাং সমালোচনা হিসাবে আজ আমার ক্ষীণ উদ্যম নিতান্তই নিস্ফল। আমার সৌভাগ্য—যৌবনোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে আমি সুশ্রুত পাঠের একটু সামান্য অধিকার লাভ করিয়াছিলাম। ভিষক্ কুল তিলক পাতিলপাড়া নিবাসী শ্রীত্রৈলোক্য নাথ মল্লিক মহোদয়ের চরণ তলে বসিয়া অস্ফুট অভ্যর্থনায় আমি সুশ্রুতকে বন্দনা করিবার অবকাশ পাইয়াছিলাম। সাধক যেমন একে একে পদ্মবীজ মালার এক একটী বীজ ধরিয়া মন্ত্রের আবৃত্তি করে, আমিও তেমনি এক একটী করিয়া সুশ্রুতের মহাশ্লোক মালা জীবন-মন্ত্রের মত উচ্চারণ করিয়াছিলাম; কিন্তু কৈ সিদ্ধিলাভ করিতে ত পারি নাই। এখনও ইচ্ছা হয়—যোগ্যগুরুর মুখোদ্গীর্ণ সুশ্রুতোক্তি কর্ণভূষণ করিয়া জন্ম ও জীবন সার্থক করি। কিন্তু হায়, সেরূপ গুরু যে আর খুঁজিয়া পাইনা। সে ঋষির আত্মা যে চিরদিনের মতই নেপথ্য-চারী হইয়া রহিয়াছে!

সুশ্রুত সম্বন্ধে আর আমার একটী কথা বলিবার আছে। বৈদ্য সমাজের বিশ্বাস—বৌদ্ধ নাগার্জ্জুন সুশ্রুত সংহিতার প্রতি সংস্কার করিয়া গিয়াছেন। আমি কিন্তু এ মত সমর্থনের কোনও প্রমাণ এ পর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই। আপনারা বলিবেন,—"কেন প্রমাণের অভাব কি? সুশ্রুতের টীকাকার স্বয়ং ডল্লনাচার্য্যইত এ কথা বলিয়া গিয়াছেন।" আমি কিন্তু ডল্লনাচার্য্যের কথা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়া লইতে অক্ষম। কেননা, ডল্লনাচার্য্য নাগার্জ্জুনকে যে সুশ্রুতের প্রতি সংস্কার কর্ত্তা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারই যেন সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে। সুশ্রুতের এক স্থানে "সুভূতি গৌতম" এই নামটি দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাতেই যত গোলযোগের সৃষ্টি। মহাত্মা চক্রপাণি দত্ত—সুশ্রুতের টীকাকার গণের অন্যতম। নাগার্জ্জুন—সুশ্রুতের প্রতি সংস্কর্ত্তা—ডল্লনের এই কথায় চক্রপাণিও একটু সন্দিগ্ধ হইয়াছেন।

সংহিতাগ্রন্থে সাধারণতঃ চারিপ্রকার [illegible] দেখিতে পাওয়া যায়। এই চারি প্রকার [illegible] মধ্যে [illegible] সংকর্ত্তা [illegible] রচিত [illegible] থাকিবে। কবিরাজ মহাশয়গণ [illegible]

জানেন। অগ্নিবেশ কৃত সংহিতার মহর্ষি চরক সংস্কার করিয়াছিলেন, আবার চরক সংহিতারও অংশ বিশেষ "দৃঢ়বল" কর্ত্তৃক প্রতি-সংস্কৃত হইয়াছিল। চরক গ্রন্থেই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। সুশ্রুতগ্রন্থে সেরূপ স্পষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। সুশ্রুতের প্রতি সংস্কর্ত্তা থাকিলে সুশ্রুত গ্রন্থেই তাহার উল্লেখ থাকিত। অনেকে "সুভূতি গৌতম" নামক বুদ্ধদেবের শিষ্যকে সুশ্রুতের প্রতি সংস্কারক বলেন। কিন্তু ইহাকেও প্রমাণ বলা যায় না, বরং অনুমান বলা চলে। বিশেষতঃ গৌতম নামটি বংশ পরিচায়ক, শাক্য সিংহের বহুকাল পূর্ব্বে উহা যে বর্ত্তমান ও প্রসিদ্ধ ছিল একথা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে।

পক্ষান্তরে—সুশ্রুত সংহিতার সর্ব্বত্রই আমরা সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের অনুশাসন দেখিতে পাই। বৌদ্ধ নাগার্জ্জুন যদি সুশ্রুতের প্রতি সংস্কার করিবেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এরূপ থাকিত না। বেদ বিরোধী বৌদ্ধ কর্ত্তৃক বৈদিক অনুশাসন কখনই সমর্থিত হইতে পারে না। সুশ্রুতের কোন স্থানেই—বৌদ্ধ ধর্ম্মের একটু আভাষও দেখিতে পাওয়া যায় না।

আবার নাগার্জ্জুনও একজন ছিলেন না। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ—অনেকগুলি নাগার্জ্জুন প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা জিজ্ঞাসা করি, যদি নাগার্জ্জুনকে সুশ্রুতের সংস্কারকর্ত্তা বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যায়—তবে তিনি কোন্ নাগার্জ্জুন? বৃন্দ; চক্রপাণি প্রভৃতি উত্তর কালীন তন্ত্রকারগণ এক নাগার্জ্জুনকে 'আচার্য্য' "রসায়নবেত্তা" "মুনীন্দ্র" ইত্যাদি সম্মানে সম্মানিত করিয়াছেন। নাগার্জ্জুন বহুশাস্ত্রের প্রণেতা। কিন্তু রসায়নবেত্তা নাগার্জ্জুন আর বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জ্জুন কি একই ব্যক্তি? আমরা "যোগসার" নামক একখানি গ্রন্থ পড়িয়া দেখিয়াছি, উহা নাগার্জ্জুন নামধেয় জনৈক আচার্য্যের লেখনী প্রসূত। এই গ্রন্থে মাধবকর, 'চক্রপাণি' বঙ্গসেন প্রভৃতি নব্য পণ্ডিতগণের নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি আবার কোন নাগার্জ্জুন? নাগার্জ্জুন—যিনি রসায়নবেত্তা বলিয়া বিখ্যাত—তিনি ত বাগভটের ও পূরোবর্ত্তী।

সুশ্রুতে অনেক পাঠ পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং সুশ্রুতের ভিতর যুগ যুগান্তর ধরিয়া, বহু ব্যতিক্রম ঘটিয়া গিয়াছে। উহাতে অনেক অনবধান ও ভ্রম থাকিয়া গিয়াছে। সুতরাং কোনও অর্ব্বাচীন নামের উল্লেখ মাত্র দেখিয়া প্রাচীন সংহিতার বিচার করা সমীচীন নহে।

সুশ্রুতের গুরু ভগবান ধন্বন্তরি। এই জন্য—সুশ্রুত সংহিতাকে ধন্বন্তরি সম্প্রদায়ের গ্রন্থ বলিয়া অনেকেই প্রচার করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে—"চরক সংহিতা" আত্রেয় সম্প্রদায়ের গ্রন্থ। কিন্তু পৌরাণিক প্রমাণে আমরা দেখিতে পাই—

"তস্য গেহে সমুৎপন্নো দেব ধন্বন্তরি স্তদা।
কাশীরাজো মহারাজঃ সর্ব্বরোগ প্রণাশনঃ॥
আয়ুর্ব্বেদং ভরদ্বাজাৎ প্রাপ্যেহ স ভিষগ্ক্রিয়াং।
তমষ্টধা পুনর্ব্বস্য শিষ্যেভ্যঃ প্রত্যপাদয়ৎ॥"

অর্থাৎ কাশীরাজ ধন্বের গৃহে ভগবান ধন্বন্তরি পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ভরদ্বাজের নিকট আয়ুর্ব্বেদ [illegible] এবং সেই আয়ুর্ব্বেদকে অষ্টভাগে [illegible] করিয়া শিষ্যগণকে শিক্ষা দেন।

এই পৌরাণিক [illegible] হইলে,—আত্রেয় [illegible]

এক হইয়া যায়। মৎপ্রণীত "আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাসে" আমি এ সকল কথার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। এইবার সুশ্রুতের মধ্যে যে বৈদিক অনুসাসন আছে, তাহারই দিঙ্মাত্র নির্দ্দেশ করিব।

সুশ্রুতের প্রথমেই আয়ুর্ব্বেদের গুরু পরম্পরা ধন্বন্তরি কর্ত্তৃক এইরূপে কথিত হইয়াছে,—"ব্রহ্মা প্রোবাচ, ততঃ প্রজাপতি রধিজগে, তস্মাদশ্বিনৌ, অশ্বিভামিন্দ্রঃ ইন্দ্রাদহং।" তাহার পর দীক্ষা-বিধির অনুষ্ঠান বৈদিক-বিধানে অনুপ্রাণিত। রোগীর রক্ষাবিধি সুশ্রুত যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেও দৈবাচারের পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। হোম স্বস্তিবাচন কিছুই বাদ পড়ে নাই। সুশ্রুতের আয়ুর্ব্বৈদ্ধিক সন্নীতি ব্রাহ্মণ পূজায় ও বেদান্তাদি শাস্ত্রের অনুশীলন উপদেশে পরিপূর্ণ। সুশ্রুত দৈব ব্যাপাশ্রয় চিকিৎসা বিধিকেও উপেক্ষা করেন নাই। মন্ত্র শক্তিকেও অবিশ্বাস করেন নাই। স্মৃতিশাস্ত্রের সকল বিধান সুশ্রুত অবনত শিরে গ্রহণ করিয়াছেন। কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মফলকে প্রাধান্ত দিয়াছেন। পূর্ব্ব জন্ম, পর জন্ম মানিয়া লইয়াছেন। যাগযজ্ঞের শুদ্ধসত্ব স্বীকার করিয়াছেন সর্ব্বোপরি পারমেশ্বরী ইচ্ছাকেও প্রশ্রয় দিয়াছেন। যে গ্রন্থ এত মন্ত্র বহুল, যে গ্রন্থ এত ধর্ম্মভাবে পূর্ণ, যে গ্রন্থ এত যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী, সে গ্রন্থ কি নীরীশ্বর বৌদ্ধ মতাবলম্বী নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত হইতে পারে? যদি ইহা হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বৌদ্ধ নাগার্জ্জুন সুশ্রুত হইতে বৈদিক প্রভাব একেবারেই দূর করিয়া দিতেন। সুশ্রুতের কোথাও না কোথাও বৌদ্ধমত লিপিবদ্ধ করিতেন। আয়ুর্ব্বেদের অপৌরুষেয়ত্ব অস্বীকার করিতেন। আমরা জানি, বৌদ্ধযুগে আয়ুর্ব্বেদ যথেষ্ট উন্নত হইয়াছিল, বৌদ্ধ নৃপতিগণ—জীবের কল্যাণ-কামনায় আয়ুর্ব্বেদের চর্চ্চা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অসীম অনুগ্রহের ফলে এ দেশে "আয়ুর্ব্বেদ কলেজ' পশুমানবের জন্য রুগ্নাবাস বা আতুরাশ্রম (হাসপাতাল) স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধগণ যে আয়ুর্ব্বেদের বৈদিকাচার অক্ষুণ্ণ রাখিবেন, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

মহর্ষি সুশ্রুতকে উদ্দেশ করিয়া—একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক বলিয়াছেন—"হে ঋষি! শুনিয়াছি তুমি সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলে। কিন্তু তুমি এ মর জগতে চিরকালই অমর হইয়া রহিয়াছ—তোমার রচিত সংহিতা চিরকালই তোমায় অমর করিয়া রাখিবে। তুমি যে অসামান্ত অস্ত্র চিকিৎসার উপদেশ জগৎকে দিয়া গিয়াছিলে, আমরা ভারতবাসী হইয়াও তাহার সম্যক সমাদর করিতে পারি নাই, তোমার উপদিষ্ট অস্ত্র-শস্ত্র স্বচক্ষে কখন দেখিতেও পাইলাম না। আশীর্ব্বাদ কর—ভারতের অতীত গৌরবের, অতীত জ্ঞান, গরিমায়, অতীত স্বাধীন চিন্তার নিদর্শন স্বরূপ তোমার সংহিতার গৌরব করিবার অধিকার যেন আমরা কখনও বিস্মৃত না হই।"

আয়ুর্ব্বেদের সেই অস্ত্র চিকিৎসার গৌরব রক্ষা করিবার জন্যই—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। সুশ্রুতের স্বর্গীয় আত্মা দেব-নির্ম্মাল্য নিক্ষেপ করিয়া—ইহার উদ্যোগকারিগণের প্রাণগত চেষ্টাকে সফলতায় মণ্ডিত করুন,—ভারতে আবার [illegible] ফিরিয়া আসুক,—ভগবচ্চরণে ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যকণ্ঠ।

ম্যালেরিয়ার দেশীয় মহৌষধ।

—-:*:—-

আমি ডাক্তার। আমার কর্ম্মক্ষেত্র—পল্লীগ্রামে। আমার বাসগ্রামের আসে পাশে অনেকগুলি গ্রাম আছে। সে সকল গ্রামেও আমাকে সর্ব্বদা যাইতে হয়। আমি যে সকল রোগীর চিকিৎসা করিয়া থাকি, তাহার পনেরো আনাই ম্যালেরিয়া। আমার কর্ম্মাভ্যাস অর্থাৎ প্রাক্‌টিস ১৬ বৎসর চলিতেছে। সুতরাং ১৬ বৎসর কাল ম্যালেরিয়ার লীলাভুমিতে বাস করিয়া, অসংখ্য ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর চিকিৎসায় ব্যাপৃত থাকিয়া ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে আমার একটু অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে।

আমাদের বিজ্ঞান বলে—ম্যালেরিয়া দমন করিতে কুইনাইনের মত আর দ্বিতীয় ঔষধ নাই। এই বিশ্বাস আমারও বরাবর ছিল। যেখানেই দেখিয়াছি—"ম্যালেরিয়া" সেখানেই আমি রোগীকে উপদেশ দিয়াছি—"কুইনাইন মেব কেবলং।" কিন্তু এখন আমার মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কেন হইয়াছে? সেই কথাটাই বলিব।

বোধ হয় ৭।৮ মাস পূর্ব্বের কথা। আমার এক আত্মীয়াকে লইয়া তাহারই চিকিৎসার জন্য এক বয়োবৃদ্ধ ডাক্তারের পরামর্শ লইতে গিয়াছিলাম। সেখানে বন্ধুবর ব্রজবল্লভ বাবু এবং বঙ্কিম যুগের লোক দীননাথ ধর বি-এ বি-এল মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বিশ্রম্ভালাপ চলিতেছিল। সহসা এক ভদ্রলোক ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ডাক্তার বাবু! আগে ত এ দেশে এত জর হইত না, এখন এমন ঘন ঘন জর হয় কেন?" ডাক্তার বাবু বলিলেন,—"আগে দেশের জলবায়ু ভাল ছিল, তাই জর হইত না, এখন জল বায়ু খারাপ হইয়াছে, দেশে ম্যালেরিয়া প্রবেশ করিয়াছে, তাই এত জর হইতেছে।" ডাক্তার বাবুর কথায় বৃদ্ধ সুরসিক দীন বাবু একটু হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"তা' নয় ডাক্তার, আগে জরের নাম ছিল "জর" এখন তোমরা জরের নাম দিয়াছ "ফিবার"—কাজেই সে হয়ও ফি—বার। "দীনবাবুর কথায় সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। ডাক্তারের পরামর্শ লইয়া আত্মীয়ার সঙ্গে আমি আমার বাস-গ্রামে ফিরিয়া আসিলাম। ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রুপসনে নূতন কিছুই ছিলনা, আমি যাহা যাহা ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, অবিকল সে সমস্ত ঔষধ বজায় রাখিয়া তিনি কেবল কুইনাইনের মাত্রা একটু বাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

ঔষধ সেবন চলিতে লাগিল। কিন্তু যে জন্য অপর ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন বুঝিয়াছিলাম, তাহার কিছুই হইল না। আমার আত্মীয়ার অসুখ এমন কিছু বেশী নহে, ২।৩ দিন অন্তর কাঁপিয়া জর হয়। উপবাস দেন, কুইনাইন খান, জর বন্ধ হয়। কিন্তু বেশী দিন বন্ধ থাকেনা। কুইনাইনের [illegible] খাইতে খাইতেই আবার জর হয়। [illegible] পুনরাবর্ত্তনের কোন প্রতিকারই হইতে [illegible] না। বড় বড় নাম [illegible] করিয়াও জর [illegible]

ফলে রোগিণী ডাক্তারী ঔষধের উপর বীতশ্রদ্ধ হইতেছিলেন, আমি বাড়ীর ডাক্তার—তাঁহাকে কেবল বুঝাইতেছিলাম—"আপনি ভাবিবেন না, জর নিশ্চয়ই বন্ধ হইবে। এ ম্যালেরিয়া—ইহার একমাত্র ঔষধ—কুইনাইনমেব কেবলং!"

এইভাবে, দুইমাস কাটিয়া গেল। আমি ত সাধ মিটাইয়া কুইনাইন চালাইতে লাগিলাম। শেষে তিনি আর কুইনাইন খাইতে চাহেননা, কি করি? কুইনাইনের ইন্‌জেক্‌সন্‌ দিতে লাগিলাম। তাহার পরই তিনি আমার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য—পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন। পিত্রালয়—আমার বাস গ্রামের এক ক্রোশ দূরে, সে গ্রাম অতি ভয়ানক গ্রাম, ম্যালেরিয়ায় পরিপূর্ণ, সেখানকার লোক মরিয়া ভূত হয়, তথাপি ম্যালেরিয়া তাহাকে ছাড়ে না! এমন স্থানে তিনি প্রায় একমাস থাকিলেন। যখন ফিরিয়া আসিলেন, আমি আশ্চর্য্য হইলাম—তাঁহার জর বন্ধ হইয়া গিয়াছে। একি স্থান পরিবর্ত্তনের গুণ? অসম্ভব! ম্যালেরিয়াগ্রস্থ স্থানে বাস করিলে কি ম্যালেরিয়া ভাল হয়? তবে কি? আত্মীয়াকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন—"বাপের বাড়ীতে গিয়া আমি আর একদিনও কুইনাইন খাই নাই। আমার এক মাসী আছেন, তিনি আমাকে নাটার ডগা বাটিয়া খাইতে বলেন। তাহাতেই আমার জর বন্ধ হইয়াছে। আমি ৫।৭টা নাটার ডগা শিলে বাটিয়া ৩টা বড়ী তৈয়ার করিয়া লই, সেই বড়ী মাঝে মাঝে একটা করিয়া জল দিয়া গিলিয়া খাই। নাটা—জরে বড় উপকারী" একজন পাশ করা উপাধিধারী ডাক্তারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একজন অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক বলিতেছে কিনা—নাটা জরে বড় উপকারী! হা—ভাগ্য! ইহাও আমাকে শুনিতে হইল? যে জর কুইনাইনে বন্ধ হয় নাই—সে জর নাটায় বন্ধ হইল? ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা? আমার মুখে হাসি আসিল। আমি আত্মীয়াকে বলিলাম—বোধ হয় নাটার কাঁটার ভয়ে জর আপনার দেহে প্রবেশ করিতে সাহস করে নাই! আমার কথায় তিনিও একটু হাসিলেন। আমি কিন্তু নাটার কথা মনে করিয়া রাখিলাম।

এই মহাযুদ্ধে সকল দ্রব্যই মহার্ঘ হইয়াছে। ডাক্তারী ঔষধের দাম চতুর্গুণ চড়িয়াছে, অনেক ঔষধ দুষ্প্রাপ্যও হইয়াছে। আমি পাড়াগেঁয়ে ডাক্তার, বিশেষতঃ গরীব-দুঃখী ও মধ্যবিত্ত লোক লইয়াই আমার কাজকর্ম্ম, ঔষধের মূল্য-বৃদ্ধি হওয়ায় আমি বড় বিব্রত হইলাম। অসুখ হইলেও লোকে হঠাৎ দেখাইতে চাহে না, কেননা ভিজিটের টাকা যোগাইবে কেমন করিয়া? ইহার উপর ঘরে ঘরে হোমিও-প্যাথীর বার্ণিস করা বাক্স, নিতান্ত দরিদ্রগ[illegible] বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথী ঔষধ সেবন করিতে লাগিল। বিনা চিকিৎসায় যাহাদের রো[illegible] বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, কেবল তাহারই ডাক্তা[illegible] ডাকিল। কিন্তু ইহাও প্রাণের দায়ে, কেননা দুই এক শিশি ঔষধ খাওয়াইয়া তাহারা চিকিৎসা বন্ধ করিয়া দিল। ঔষধের দাম আর যোগাইতে পারিল না। ২০ গ্রেণ কুইনাইন না খাইলে যাহার জর বন্ধ হয় না, সে দশ গ্রেণ কুইনাইন খাইয়াই নিরস্ত হইল।

এইবার আমারও মতি ফিরিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম—যখন এ দেশে কুইনাইন আবিষ্কৃত হয় নাই, তখন কি এদেশের লোকের জর ভাল হইত না? [illegible]

জ্বর বন্ধ করিতে পারে, এমন ঔষধ কি রত্নগর্ভা ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী ভারতভূমিতে দুর্লভ? যে দেশে "চরক" "সুশ্রুত" "বাগভট" "হারীতের" গবেষণাময়ী সংহিতা এখনও অতীতের গৌরব ঘোষণা করিতেছে, যে দেশে জ্বরঘ্ন বর্গের মধ্যে—নিম, নিসিন্দা, সেফালী গুলঞ্চ, ক্ষেৎপাপড়া, চিরাতা, ছাতিম, আতিষ, কট্‌কী, পল্‌তা প্রভৃতি—তিক্তগণ ঋষি-প্রতিভার অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ-জগতকে এখনও দেখাইয়া দিতেছে,—সে দেশ কি চিরদিনই কুইনাইনের উপাসনা করিবে?

সহসা নাটার কথা আমার মনে পড়িয়া গেল। পল্লীগ্রামে পথে-ঘাটে-বনে-জঙ্গলে যথেষ্ট নাটার গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। আমি তাহা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলাম। আয়ুর্ব্বেদের কোন্ গ্রন্থে নাটার গুণ বর্ণিত হইয়াছে, কবিরাজ মহাশয়দের নিকট তাহার সন্ধান লইতে লাগিলাম। কিন্তু পরিতাপের বিষয় কোন কবিরাজই আমার আশাপূর্ণ করিতে পারিলেন না। সকলেই মুখে বলেন,——"নাটা জ্বরঘ্ন বটে।" তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ কেহই দেখাইতে পারিলেন না। অনেকেই বলিলেন—"আমরা নাটার গুণ পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই।" হতাশ হইয়া আমি ইংরাজী ভাষায় রচিত মেটিরিয়া মেডিকা অফ ইণ্ডিয়া এবং "ফার্ম্মাকোগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা" নামক গ্রন্থ দ্বয় অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। আমি বিস্মিত হইলাম—কবিরাজ মহাশয়েরা যে নাটার গুণ কেবল পুঁথিগত বিদ্যায় পর্য্যবসিত করিয়া নিশ্চিন্ত, ডিমক ও ক্ষোরি সে নাটার গুণ তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আচার্য্য অক্ষয় চন্দ্র একদিন দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—"ভারতবাসী ভারত দেখিল না, ভারত বুঝিল না, এত বড় মহাদেশ—তাহার কোথায় কি আছে—তাহার খোঁজ লইল না" তখন আমার সেই আক্ষেপোক্তির চরম সার্থকতা মনে পড়িতে লাগিল।

দরিদ্রের দেশে, দরিদ্রের সমাজে, দরিদ্রের মাঝে বসিয়া আমি নাটার পরীক্ষা আরম্ভ করিলাম। যে রোগীকে কুইনাইন-প্রয়োগের উপযুক্ত দেখিতাম, তাহাকে নাটা খাওয়াইতে লাগিলাম। অল্পদিনের মধ্যেই আমি বুঝিতে পারিলাম—নাটার জ্বর নাশিনী শক্তি অদ্ভুত। নাটার বড়ী—২।৩টী খাইয়াই অনেক রোগীর জ্বর বন্ধ হইতে লাগিল। নাটার আর একটি মহৎ গুণ দেখিলাম—নাটা জ্বরের রিল্যাপ্স বা পুনরাক্রমণ বন্ধ করে। ইহাতে রোগিগণ—অপব্যয়ের হাত এড়াইল, আমার ঔষধের তারিফ করিতে লাগিল। আমারও উপকার হইল—এই মহার্ঘের দুর্দ্দিনে, চড়ার বাজারে, আমি একটী মহৌষধ বিনামূল্যে লাভ করিলাম। নাটা বিনা যত্নে বনে জন্মায়, পয়সা দিয়া কিনিতে হয় না, কেবল একটু পরিশ্রম করিয়া লইয়া আসা এবং তাহা চূর্ণ করিয়া শিশিতে পুরিয়া রাখা। নাটার প্রসাদে আমিও খরচার দায় হইতে মুক্তি পাইলাম।

প্রথমে আমি নাটার ডগা বাটীয়া বটী প্রস্তুত করিতাম, তাহার পর—মূলের ছাল চূর্ণ করিয়া ব্যবহার করিতাম। কিন্তু ইহা বড় অধিক মাত্রায় দিতে হইত, নইলে জ্বর আটকাইত না। রোগীকে অনেকবারও খাইতে হইত। শেষে বীজের চূর্ণ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলাম। দেখিলাম নাটার গুণ ও বীর্য্য তাহার বীজেই অধিক পরিমাণে নিহিত আছে। নাটা [illegible] ওজনে একবার [illegible]

জ্বরের বেগ অতি মন্দ হইয়া যায়, পরদিন আর একবার খাইলে জ্বর আর আসে না। তৃতীয় দিন আর নাটা সেবনের আবশ্যকতা নাই।

আমি যে প্রণালীতে নাটা ব্যবহার করিতেছি, পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা লিখিতেছি।

নাটার ফল ঠিক কণ্টকময় বস্ত্ররঞ্জক লটকান ফলের মত। এই ফলের মধ্যে ১টী বা ২টী কখন বা ৩টী পর্য্যন্ত বীজ থাকে। বীজের উপরের আবরণ বড় কঠিন। বীজ গুলি দেখিতে ঠিক কড়ীর মত। উপরের আবরণ মোচন করিলে—ভিতরে শ্বেতবর্ণের শস্য বা শাঁস দেখিতে পাওয়া যায়। এই শাঁস কিঞ্চিৎ তৈলাক্ত। শাঁসগুলি রৌদ্রে দিলে বেশ খটখটে হইয়া যায়, তখন তাহাকে হামান দিস্তায় গুঁড়া করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রে ছাকিয়া লইতে হয়। এই চূর্ণ ৩ ভাগ, পিঁপুল চূর্ণ ১ ভাগ, একত্র মিশাইয়া জল দিয়া মাড়িয়া বড়ী করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া রাখিলে অনেক দিন পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকে। কিন্তু সেরূপ কঠিন বটীকা সেবনকালীন আবার জল দিয়া মাড়িতে হয়। সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা মধু দিয়া মাড়িয়া বড়ী পাকানো। এই বড়ী জল দিয়া গিলিয়া খাইলেই নাটার উপকারিতা দেখিতে পাওয়া যায়।

যে জ্বর কম্প দিয়া আসে, মাথার যন্ত্রণা, পিপাসা, হাত-পা কামড়ানি প্রভৃতি উপসর্গ যে জ্বরে থাকে, অথচ জ্বরের উত্তাপ খুব বেশী হয়, —এইরূপ জ্বরে—বিরাম কালে অথবা জ্বর কমিবার মুখে নাটা ব্যবহার করিতে হইবে। নাটা সেবনের পূর্ব্বে—রোগীকে একটু গরম দুগ্ধ পান করান উচিত, খালি পেটে নাটা সেবনে গা বমি বমি করে। নাটা শিশু-বৃদ্ধ —সকলকেই খাওয়ান চলে। এমন কি উদরাময়, মূর্চ্ছা, গর্ভাবস্থা—সকল অবস্থাতেই নাটা ব্যবহার করা যায়। ইহাতে কোনও বিপদের ভয় নাই। ঘুষঘুষে পিত্ত প্রধান পুরাতন জ্বরেও নাটা অত্যন্ত উপকারী। আমি প্রায় ৪ মাস কাল অনেক রোগীর দেহে নাটা প্রয়োগ করিতেছি, সর্ব্বত্রই নাটা ব্যবহারে উপকার পাইয়াছি। আমি নাটার নিম্নলিখিত গুণাবলীর পরিচয় পাইয়াছি।

১। নাটা—অত্যন্ত জ্বরঘ্ন। একমাত্রা সেবনেই উপকার জানিতে পারা যায়। সদ্যঃই জ্বর বন্ধ করে।

২। নাটা সকলকেই খাওয়ান চলে। উদরাময়, গর্ভাবস্থাতে, নিষিদ্ধ নহে।

৩। নাটা সেবনে জ্বর বন্ধ হইলে প্রায়ই রিলাপ্স হয় না।

৪। নাটা সেবন করিলে মাথা ঘোরা, কান ভোঁ ভোঁ করা কোন উপসর্গই হয় না।

৫। নাটা ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে—রোগীকে একবার জোলাপ দিতে পারিলে ভাল হয়।

৬। নাটা—নূতন—পুরাতন উভয়বিধ জ্বরেই ব্যবহার্য্য।

৭। নাটার বীজে একটা বুনো গন্ধ আছে, এই গন্ধ নিবারণের জন্য আমি ২।১ ফোঁটা মৌরী বা দারুচিনির তৈল নাটার সহিত ব্যবহার করি।

৮। নাটার আস্বাদ তিক্ত—কিন্তু কুইনাইনের মত বিকট নহে।

৯। নাটা—প্লীহা ও যকৃতের বিকৃতি দূর করে, বিবৃদ্ধির হ্রাস করে। শরীরে নূতন রক্ত কণিকার উদ্ভব করিয়া থাকে।

১০। নাটা ঘর্ম্ম ও মূত্রের প্রবর্ত্তক। কোষ্ঠগত বায়ু নাশক।

কুইনাইন ভিন্ন ম্যালেরিয়ার ঔষধ নাই—এ ভ্রান্ত ধারণা অনেকেরই আছে। আমার বিশ্বাস—সে শক্তি নাটারই আছে। যাঁহারা ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণের জন্য রোগীকে ক্রমাগত কুইনাইন খাওয়ান, তাঁহাদিগকে আমি ডাক্তার রসের উক্তি পাঠ করিতে বলি।

ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্বিসের খাস গোরা ডাক্তার মেজর রস্ বলিয়াছেন,—"ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক বলিয়া অনেকে কুইনাইন ব্যবহার করে; কিন্তু তাহাতে উল্টা ফল হয়। কুইনাইন খাইলে ম্যালেরিয়া দিন কতক দমনে থাকে বটে, কিন্তু একেবারে যায় না। ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির মত উহা মানুষের শরীর-যন্ত্রে অবস্থান করিতে থাকে।"

ইহার পরও কি আপনারা বলিতে চাহেন—কুইনাইনে ম্যালেরিয়া নষ্ট হয়? আমি স্বয়ং একজন কুইনাইনের গোঁড়া ভক্ত ছিলাম। অনেক রোগীর দেহেই আমি কুইনাইনের ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি! পরে আমার মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। নাটার জ্বরনাশিনী শক্তি দেখিয়া আমি বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়াছি। সেকালের বৃদ্ধদের মুখে শুনিয়াছি—পূর্ব্বে কবিরাজী ঔষধ খাইয়া যাহাদের জ্বর ভাল হইত, ১০।১৫ বৎসরের মধ্যে আর তাহাদের জ্বর হইতে দেখা যাইত না। এখনকার কবিরাজেরা সেরূপ ঔষধ প্রয়োগ করেননা কেন? আগেকার কবিরাজেরা যে নাটার যথেষ্ট ব্যবহার করিতেন, নিম্নলিখিত ছড়াটিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। "সংবাদ প্রভাকরের" পুরাতন ফাইলে আমি এই পদ্যটী দেখিতে পাইয়াছি। যথা,—

"চিরাতা, নাটার ডগা, পল্‌তা, ধনিয়া।
ক্ষেৎপাপড়া, নিমছাল, গুলঞ্চ আনিয়া।
প্রত্যেক জিনিষ ল'বে ভরি পরিমাণে।
তিন সের জলে সিদ্ধ—বিহিত বিধানে।
ছটাকার্দ্ধ মাত্রা—দিনে দুইবার খা'বে।
যেরূপ হউক জ্বর অবশ্যই যাবে॥"

এমন সহজ লভ্য ঔষধটীও লোকে পরীক্ষা করিয়া দেখেন না, ইহাই গভীর পরিতাপের বিষয়।

নাটা সম্বন্ধে আমি আমার পরীক্ষালব্ধ ফলই প্রকাশ করিলাম। আশা করি এ দেশের চিকিৎসকগণ—কুইনাইনের পরিবর্ত্তে এই বিনামূল্যে প্রাপ্ত সামান্য উদ্ভিদের একটু আদর করিবেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে নাটার কিরূপ গুণ লিখিত হইয়াছে, আমি তাহা অবগত নহি। আমার অনুরোধ—কোনও কবিরাজ মহাশয় নাটার গুণ সাধারণের গোচরীভূত করুন। ইহাতে দেশের অনেক উপকার হইবে, দরিদ্র রোগিগণও বাঁচিয়া যাইবে। এই দুঃসময়ে আমাদের দেশীয় ঔষধগুলির গুণাগুণ পরীক্ষিত হওয়া উচিত। কত বিদেশী আসিয়া আমাদের দেশের উদ্ভিদের গুণ পরীক্ষা করিয়া তাঁহাদের মতামত সাধারণের উপকারার্থে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, আর আমরা এমনি অলস ও কর্ত্তব্য বিমুখ যে, নিজের হাতের নিধি হেলায় হারাইতে বসিয়াছি! এজন্য আমাদের লজ্জা কি অনুতাপও হয় না। আমাদের [illegible] কি চিরদিনই এইরূপে জগতের [illegible] হইবে? আমরা কি [illegible] চিনিবার চেষ্টা [illegible]

আমি অনেকগুলি দেশীয় উদ্ভিদের ক্রিয়া-শক্তি পরীক্ষা করিয়াছি। সুযোগ ও সুবিধা পাইলে একে একে তাহা প্রকাশ করিব।*

ডাক্তার শ্রীক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়
L. M. S

অতিসার রোগ।

(২)

—— :*: ——

অতিসারে প্রচুর পরিমাণে মলস্রাব হইতে থাকিলে প্রথমে পাচক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করিতে হয়। শূল ও আধ্মান থাকিলে বিশেষতঃ আমাশয়ে দোষ সঞ্চার অনুভূত হইলে পিপুল চূর্ণ ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত জল প্রয়োগ করিয়া বমন করান উচিত। বমনের পর লঙ্ঘন এবং লঙ্ঘনের পর পেয়া পথ্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

উদরে যন্ত্রণা থাকিলে স্বেদ দেওয়া কর্ত্তব্য। গরম জল পূর্ণ বোতল, বস্ত্রখণ্ড বা হস্ত উত্তপ্ত করিয়া স্বেদ দেওয়া যাইতে পারে।

অতিসারে জল প্রয়োগ;—অতিসার রোগে পিপাসা থাকিলে কলা ও শুঁঠের সহিত অথবা মুতা ও ক্ষেৎ পাঁপড়ার সহিত কিম্বা মুতা ও কলার সহিত জল সিদ্ধ করিয়া প্রয়োগ করিবে। সমভাগে মোট দুই তোলা দ্রব্য লইয়া থেঁতো করিয়া চারি সের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে। দুই তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া সেই জল পানার্থ প্রয়োগ করিবে। ধনে এবং কলার সহিতও এইরূপ নিয়মে জল সিদ্ধ করিয়া প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এইরূপে সিদ্ধ জল প্রয়োগ করিলে তৃষ্ণা ও অতিসার প্রশমিত হইয়া থাকে।

অতিসারে ঔষধ সিদ্ধ পেয়া;—আয়ুর্ব্বেদে ভিন্ন ভিন্ন রোগে ঔষধ সহ পেয়াদি সিদ্ধ করিয়া প্রয়োগ করিবার বিধি আছে। ঐ সকল ঔষধ সিদ্ধ পেয়া পরম হিতকর এবং একমাত্র আর্য্য চিকিৎসাশাস্ত্রেই উহাদিগের প্রয়োগ দেখা যায়। নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, এক্ষণে এইরূপ পথ্য-প্রয়োগ একরূপ লোপ পাইয়াছে। আধুনিক বিলাসিতার যুগে ঐ সকল পরম হিতকর পথ্যের পুনঃ প্রচলন হওয়া সম্ভব পর বলিয়া মনে হয় না। তথাপি পাঠকগণের অবগতির জন্য এবং যদি কেহ এইরূপ পথ্য সেবন করিতে ইচ্ছা করেন বলিয়া ঐরূপ কতকগুলি পথ্যের বিষয় লিখিত হইতেছে।

এইরূপ পথ্য প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে কাথ করিয়া লইতে হয়। বীর্য্যভেদে ঔষধ দ্রব্য তিন প্রকার। তীক্ষ্ণবীর্য্য—যেমন পিপুল,

---

* অমাবস্যা পূর্ণিমা বা একাদশীর সময় যাঁহাদের জ্বর হয়, তাঁহারা ঐ সময়ের ২।১ দিন পূর্ব্ব হইতে [illegible] ব্যবহার করিলে তাঁহাদের আর জ্বর হইবে না।" ইহাও আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।—লেখক।

মরিচ প্রভৃতি। মধ্যবীর্য্য যেমন বেলছাল, গনিয়ারী ছাল, শোণা ছাল প্রভৃতি। মৃদুবীর্য্য— যেমন আমলকী, কিসমিস প্রভৃতি। পূর্ব্বে তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য দুইতোলা, মধ্যবীর্য্য দ্রব্য চারি তোলা এবং মৃদুবীর্য্য দ্রব্য আটতোলা লইবার বিধি ছিল। কিন্তু এক্ষণে অল্পপ্রাণ মানব গণের এরূপ মাত্রা সহ্য হয় না। পূর্ব্বে এইরূপ মাত্রাও আবার কল্কসাধ্য যবাগূ সম্বন্ধে অর্থাৎ ঔষধ বাটার সহিত পাক করিয়া পেয়াদি প্রস্তুত করার রীতি ছিল। ক্কাথ সাধ্য যবাগূর অর্থাৎ ঔষধের ক্কাথ করিয়া সেই ক্কাথের সহিত যে পেয়াদি পাক করা হয়, তাহার মাত্রা আরও অধিক। কিন্তু এক্ষণে পূর্ব্বে যে কল্ক সাধ্য যবাগূর ঔষধের মাত্রা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই বা তদপেক্ষা কম মাত্রায় ক্কাথ সাধ্য যবাগূ প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার করা উচিত। কল্ক সাধ্য যবাগূর জন্য উহার সিকি মাত্রায় দ্রব্য লওয়া সঙ্গত।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ঔষধ দ্রব্য দুইতোলা, চারি তোলা বা আট তোলা লইয়া চারি সের জলে সিদ্ধ করিয়া দুই সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া লইবে। পরে যে দ্রব্যের যবাগূ প্রস্তুত করিতে হইবে, মণ্ড করিতে হইলে তাহার চতুর্দ্দশ গুণ; পেয়া করিতে হইলে ছয় গুণ এবং বিলেপন করিতে হইলে চার গুণ উক্ত ক্কাথ জলের সহিত পাক করিয়া লইতে হয়। মণ্ড খুব তরল (যেমন জল বার্লি) হয়, পেয়া কিঞ্চিৎ সিটাযুক্ত হয় এবং বিলেপী বহু সিটাযুক্ত এবং যৎসামান্য তরল দ্রব্য সমন্বিত হয়।

শালপানি, বেড়েলা, বেলশুঁঠ ও চাকুলের সহিত পেয়া পাক করিয়া দাড়িমের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া পিত্তশ্লেষ্ম জনিত অতিসার রোগে পথ্য দিবে। ধনে ও শুঁঠের সহিত পেয়া পাক করিয়া বাতশ্লেষ্ম বা অতিসার রোগে প্রয়োগ করিবে। বাতপিত্তজ অতিসারে শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুরের ক্কাথে পেয়া প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে। কফজনিত অতিসারে পিঁপুল, পিঁপুলমুল, চৈ, চিতামুল ও শুঁঠের ক্কাথ সহ পেয়া প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

এক্ষণে আমাতিসারের কয়েকটি ফলপ্রদ ঔষধের বিষয় কথিত হইতেছে।

ধান্যপঞ্চক—ধনে, শুঁঠ, বালা, মুতা ও বেলশুঁঠ—প্রত্যেক দ্রব্য সম পরিমাণে—মোট দুইতোলা লইয়া আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া, আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে, এই ক্কাথ পান করিলে আমদোষ, শূলুনি ও মলের বিবদ্ধতা নষ্ট হয় এবং অগ্নিদীপ্তি হয়।

সমস্ত ক্কাথই এইরূপ নিয়মে প্রস্তুত করিতে হয়, অর্থাৎ দ্রব্য যতই হউক সমভাবে মোট দুইতোলা লইতে হইবে।

একটী দ্রব্য হইলে তাহাই দুইতোলা, দুইটী হইলে একতোলা করিয়া দুইতোলা, চারটী হইলে আধতোলা করিয়া দুইতোলা, আটটী হইলে এক সিকি করিয়া মোট দুই তোলা, এইরূপ নিয়মে দ্রব্য লইতে হয়। পরে উক্ত দ্রব্য উত্তমরূপে ধৌত ও কুট্টিত করিয়া আধসের জল সহ মৃদু জ্বালে সিদ্ধ করিতে হয়। আধ পোয়া শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তাহা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

ধান্যচতুষ্ক—ধনে, মুতা, বালা ও বেলশুঁঠের ক্কাথ পিত্ত প্রধান অতিসারে হিতকর।

পিপুল, শুঁঠ, ধনে, যমানী ও [illegible] ক্কাথ কফজ অতিসারে, [illegible] শুঁঠ ও [illegible]

চাকুলে, গোক্ষুর, বরাহক্রান্তা ও কণ্টকারী বাতজ অতিসারে হিতকর। এই সকল যোগ অগ্নিদীপক ও আম পাচক।

শুঠ, পিপুল, মরিচ, আতইচ, হিং, বেড়েলা সচল লবণ ও হরীতকী ইহাদের চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় উষ্ণ জল সহ সেবন করিলে প্রবল আমাতিসার প্রশমিত হয়। পিঁপুলমূল, পিঁপুল, গজপিঁপুল ও চিতামুল চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া কিম্বা সচল লবণ, বচ, মরিচ, পিঁপুল, শুঁঠ, হিং আতইচ ও হরীতকী চূর্ণ উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে শ্লেষ্মজনিত অতিসারের শান্তি হয়। এই সকল চূর্ণ দুই আনা হইতে এক সিকি মাত্রায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

লঙ্ঘন এবং উপরোক্ত ঔষধাদি প্রয়োগ করার পর রোগীকে পূর্ব্ব কথিত ঔষধ সিদ্ধ যবাগূ, বিলেপী, এবং মাংসরস পথ্য দিবে। অতিসারে রোগী ক্ষুধার্ত্ত হইলে লঘু পাক দ্রব্য পথ্য দেওয়া উচিত। কেননা লঘু পথ্য ভোজন দ্বারা অতিসার রোগী শীঘ্রই রুচি, অগ্নি ও বল লাভ করিয়া থাকে।

তক্র চার সের, মরিচ, জীরা ও চিতামূল প্রত্যেকে সমভাগে মোট দুই তোলা কদ বেল ও আমরুল শাক প্রত্যেকে চারি তোলা ও কাঁচা মুগের দাল এক ছটাক একত্র পাক করিয়া দুই সের থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। ইহা আহার এবং ঔষধ—উভয়ের কার্য্যই করিয়া থাকে।

শশক, হরিণ, কুক্কট বটের ও তিতিরের মাংসরস অতিসার রোগীর পক্ষে হিতকর। শিঙ্গি, ছোট মাগুর সর্ব্বপ্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য এবং মৌরলা মৎস্য অতিসার রোগে পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু প্রবল অবস্থায় পূর্ব্ব কথিতরূপে যূষ মাত্র দেওয়া উচিত।

এইরূপ পথ্য ও ঔষধ প্রয়োগের পর অতিসারের পক্ব অবস্থা ঘটিলে স্তম্ভন অর্থাৎ ধারক ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত।

এক সিকি হইতে অর্দ্ধ তোলা ধলআঁকড়ার মূলের ছাল বাটিয়া ঘোলের সহিত সেবন করিলে অতিসার প্রশমিত হয়। কচিবাবলা পাতা এক সিকি হইতে আধতোলা মাত্রায় চালুনী জলের সহিত বাটিয়া সেবন করিলে অতিসার ভাল হয়। বটের ঝুরি এক সিকি বা আধ তোলা চেলুনী জলের সহিত বাটিয়া কিঞ্চিৎ ঘোলের সহিত সেবন করিলে অতিসার প্রশমিত হয়।

কাঁচড়া দাম, জামপাতা, দাড়িমপাতা, পানিফলের পাতা, বেলশুঁঠ, বাল্মা, পাথরকুচি, মুতা ও শুঁঠ সমভাগে দুই তোলা লইয়া কাথ করিয়া সেবন করিলে প্রবল অতিসারের বেগও রুদ্ধ হয়। কুড়চিছাল, ইন্দ্রযব ও মুতার কাথে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে অতিসার ভাল হয়। বেলশুঁঠ ও আমের আটির শাঁসের কাথে চিনি ও মধু মিশাইয়া সেবন করিলে বমি ও অতিসার নষ্ট হয়।

'অতিসারে দুগ্ধ প্রয়োগ—অতিসারের প্রথম অবস্থায় দুগ্ধ হিতকর নহে। কিন্তু পক্কাতিসারে এবং পুরাতন অতিসারে দুগ্ধ, অমৃতের ন্যায় হিতকারী। অতিসার রোগে বায়ু ও মল বিবদ্ধতার সহিত অল্পে অল্পে নির্গত হইতে থাকিলে, তৃষ্ণা থাকিলে অথবা রক্ত কি পিত্তের দোষ থাকিলে—দুগ্ধ প্রয়োগ বিশেষ হিতকর। অধিক দিনের অতিসারে যে দোষের শেষ থাকে, তাহা দুগ্ধ পান দ্বারা প্রশমিত হয়। তিন ভাগ জল এবং এক ভাগ দুগ্ধ একত্র

পাক করিয়া দুগ্ধ শেষ থাকিতে নামাইয়া প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

গো দুগ্ধ অপেক্ষা ছাগল দুগ্ধ লঘুপাক এবং ধারক বলিয়া অতিসার রোগে ছাগ দুগ্ধ প্রশস্ত। কিন্তু ছাগদুগ্ধের অভাব ঘটিলে গো দুগ্ধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কুড়িটী মুতা, ছাগ দুগ্ধ এক পোয়া এবং জল তিন পোয়া একত্র পাক করিয়া দুগ্ধ শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেবন করিলে অতিসার রোগ প্রশমিত হয়। এইরূপ নিয়মে বেল শুঁঠের সহিত সিদ্ধ করা দুগ্ধও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অতিসারে ঔষধ ও জল সহ সিদ্ধ দুগ্ধই হিতকর।

অতিসার রোগের অবস্থা ভেদে চিকিৎসা—অতিসার রোগে আমদোষ পরিপাক পাইলেও যে রোগীর মলের বিবদ্ধতা অর্থাৎ আটকে আটকে দাস্ত হওয়া ও পিচ্ছিলতা এবং শূলুনি থাকে, তাহাকে মূলা কি কুলের যুষের সহিত পুঁইশাক, বেতোশাক, ব্রাহ্মীশাক, আমরুল শাক, দধি ও দাড়িম ছাল সিদ্ধ ও স্নেহ সংযুক্ত করিয়া পথ্য দিবে।

অতিসার রোগে মলক্ষয় বশতঃ অত্যন্ত মুখ শোষ হইলে যব, মুগ, মাষকলাই, শালি তণ্ডুল, তিল, কুল, কচি বেল—এই সকল দ্রব্য ধনে, দধি ও দাড়িমের সহিত পাক করিয়া যূষ প্রস্তুত করিবে এবং সেই যূষ, ঘৃত ও তৈলে সাঁতলাইয়া পথ্য দিবে। কিম্বা কচ্ছপের মাংস রস—ঘৃত ও দধি সংযুক্ত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

গুদভ্রংশ (হারিশ মলদ্বার বাহির হওয়া)—অত্যন্ত বেগ দিয়া মল ত্যাগ করিবার কালে অনেক সময় মলদ্বার নির্গত হইয়া পড়ে। সাধারণ গুদভ্রংশ রোগে মলদ্বারে শূকরের চর্ব্বি মাখাইয়া ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিতে হয় এবং গো ফণা নামক বন্ধন দ্বারা মলদ্বারের বহির্নির্গমন পথ রুদ্ধ করিয়া মূষিক মাংসের সেক দিতে হয়। কিন্তু অতিসার প্রশমিত হইবার পর উপরোক্ত চিকিৎসা অবলম্বন করা উচিত।

এইরূপ ক্ষেত্রে শাস্ত্রে অম্ল দ্রব্য সহ সিদ্ধ ঘৃত পান এবং অনুবাসন (স্নেহ বস্তি Enema) প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে। আমরুল শাক, কুল, দধি, কাঁজি, শুঁঠ ও যবক্ষার সহ সিদ্ধ ঘৃত পান করিতে হয়। মলদ্বারে স্নেহ প্রয়োগ (চর্ব্বি মালিষ) ও স্বেদ দিয়া মল দ্বার স্নিগ্ধ ও মৃদু হইলে তুলা দ্বারা ধরিয়া ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিবে।

মল দ্বারের পাক—মলদ্বার পাকিয়া উঠিলে পটোলপত্র ও যষ্টিমধুর ক্বাথ, অথবা বট, অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমুর, পাকুড়, বেতস ইহাদের ক্বাথে শর্করা ও মধুমিশ্রিত করিয়া অথবা ইক্ষুরস, ঘৃত, ছাগ দুগ্ধ বা গো দুগ্ধ মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। কিম্বা পূর্ব্বোক্ত বটাদির ছাল বাটিয়া ঘৃত সহ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে বা উহাদের চূর্ণ মলদ্বারে সংলগ্ন করিবে। ইহাতে ধাইফুল ও লোধ চূর্ণও যোগ করা যাইতে পারে। ইহাতে রক্ত নির্গত হইলে ঘৃত বা শত ধৌত ঘৃত মালিষ করিয়া মলদ্বার ও কুঁচকিতে পূর্ব্বোক্ত শীতল ক্বাথ সেচন করিবে।

রক্তাতিসার—পিত্তজঅতিসারে—পিত্ত বর্দ্ধক অনুপান সেবন করিলে পিত্ত অত্যন্ত প্রবল হইয়া রক্তকে দূষিত করে এবং দারুণ রক্তাতিসার তৃষ্ণা, শূল, দাহ [illegible] পাক হয়। রক্তাতিসার [illegible] যূষ ঘৃতে সাঁতলাইয়া [illegible]

পথ্য দিবে। কিম্বা হরিণ বা ছাগের রক্ত ঘৃতে সাতলাইয়া আহার করিতে দিবে। শশক প্রভৃতি শীতবীর্য্য বনচর পশু-পক্ষীর মাংস-রসও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইন্দ্রযবের সহিত সিদ্ধ পেয়া এই রোগে বিশেষ হিতকর।

রক্তাতিসারে অন্ত্র মধ্যে ক্ষত হইয়া থাকে। সুতরাং এই অবস্থায় কঠিন খাদ্য না দিয়া তরল খাদ্য (পেয়াদি) প্রয়োগ করা উচিত। এই অবস্থায় পেয়া, মাংসরস, ছাগ দুগ্ধ, ছানার জল প্রভৃতি সুপথ্য।

আম, জাম ও আমলকী পাতার রস ছাগ দুগ্ধ ও মধু সহ সেবন করিলে রক্তরোধ হয়, বাবলা, কুল, জাম, আম ও অর্জ্জুন—ইহাদের কোন একটি গাছের ছাল—আধ তোলা বা এক তোলা বাটিয়া ছাগদুগ্ধ ও মধুসহ সেবন করিলে রক্তাতিসার ভাল হয়। কাঁটানটের মূল এক সিকি হইতে অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় কিঞ্চিত চেলুনী জলের সহিত বাটিয়া এবং মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে রক্তাতিসার প্রশমিত হয়। কৃষ্ণ তিল এক তোলা এবং চিনি এক তোলা বাটিয়া ছাগ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে সত্বর রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

কুড়চি ছাল, আতইচ বেলশুঁঠ, বালা ও মুতার ক্বাথ—আম ও বেদনা যুক্ত রক্তাতিসার প্রশমিত করে। কুড়চি ছাল এবং দাড়িম বৃক্ষের ছালের ক্বাথ—মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে প্রবল রক্তাতিসার প্রশমিত হয়। কুড়চি ছাল আট তোলা, একসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং দাড়িমের কচি ফল আট তোলা বাটিয়া ঐরূপ নিয়মে ক্বাথ করিয়া লইবে। অনন্তর এই দুই প্রকারে ক্বাথ একত্র করিয়া পাক করিবে এবং একটু ঘন হইলে নামাইয়া লইবে। এই ঔষধ একসিকি হইতে আধ তোলা মাত্রায় তক্রের সহিত সেবন করিলে মৃতপ্রায় রক্তাতিসার রোগীও আরোগ লাভ করে।

পুট পাক প্রয়োগ—অধিকদিনের অতিসার রোগে মলের আমাবস্থা দূর হইয়া যদি অগ্নির দীপ্তি হয় এবং বেদনা না থাকে, অথচ নানা বর্ণে মল নিঃসৃত হয়—তাহা হইলে পুট পাক প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

স্নিগ্ধ, ঘন, অথচ কীটাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত নহে—এরূপ কুড়চিছাল লইয়া থেঁতো করিয়া জাম পাতার ঠোঙ্গায় স্থাপিত করিয়া তাহাতে চেলুনীর জল সিঞ্চন করিবে। পরে উক্ত ঠোঙ্গা কুশের দ্বারা জড়াইয়া বহির্ভাগ দুই অঙ্গুলি পুরু করিয়া কর্দ্দম দ্বারা লেপ দিবে। অনন্তর ঘুঁটের আগুনের রাখিয়া পোড়াইবে। পরে মৃত্তিকা রক্তবর্ণ হইলে উহা বাহির করিয়া অভ্যন্তরস্থ কুড়চিছালের রস এক তোলা হইতে দুইতোলা মাত্রায় মধুসহ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অতিসার—বিশেষতঃ রক্তাতিসার প্রশমিত হইয়া থাকে। ইহাকে কুটজ পুটপাক বলে।

কুটজ পুটপাকের ন্যায় শোণা ছালের পুট পাক প্রস্তুত করিলে তাহাকে শোণাক পুটপাক বলা যায়। প্রভেদ এই যে, শোণা ছাল কুটিয়া গাম্ভীর পাতার ঠোঙ্গায় রাখিয়া কুশ দ্বারা জড়াইয়া লেপ দিয়া পোড়াইতে হয়। ইহাও অতিসারের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অতিসারে যে সকল যোগ-সুলভ এবং সহজ প্রাপ্য—সেই সকলের বিষয় কথিত হইল। এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রে বহুবিধ যোগের বিষয় লিখিত আছে। অতিসারের অবস্থাভেদে নানা প্রকার বস্তি প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে। [illegible]

নানাপ্রকার ঘৃতও অতিসারের অবস্থাভেদে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

পুরাতন অতিসারে পথ্য—অতিসার রোগ পুরাতন হইলে এবং অগ্নির দীপ্তি হইলে অন্ন পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। পুরাতন দাদখানি চাউলের সুসিদ্ধ অন্ন এবং কচি কাঁচ কলা ও পূর্ব্ব কথিত মৎস্যের ঝোল সুপথ্য। মাংস-সাত্ম্য রোগীকে পূর্ব্বোক্ত মাংসের যূষ পথ্য দেওয়া পারে। তদ্ব্যতীত ছাগদুগ্ধ ও গোদুগ্ধ কথিত নিয়মে সিদ্ধ করিয়া এবং অবস্থাভেদে দধি, তক্র ও সদ্যোজাত মাখন দেওয়া যায়। কচি বেলপোড়া, দাড়িম, পাকা গাব জল খাবার দেওয়া যাইতে পারে। ক্ষুধা বুঝিয়া এক বেলা অন্ন ও একবেলা পেয়াদি পথ্য দেওয়া উচিত। রোগ সম্পূর্ণ প্রশমিত না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপ নিয়মে পথ্য দিতে হয়। রোগ প্রশমিত হইলেও অতি সাবধানে পথ্যের মাত্রা বাড়ান উচিত। কেননা সহসা অধিক মাত্রায় আহার করিলে অথবা কুপথ্য আহার করিলে, রোগ পুনরাক্রমণ করিতে পারে। অতিসারে অপথ্য—গোধূম, মাষ কলায় যব, শিম, ওল, সজিনার ফুল বা ডাঁটা, কাঁটাল, কুমড়া, লাউ, কুল, গুরুদ্রব্য, পান, ইক্ষু গুড়, মদ্য, কিসমিস, রশুন, দূষিত জল, নারিকেল, সর্ব্বপ্রকার পত্র শাক, ক্ষার দ্রব্য, লবণ মসলা-যুক্ত ব্যঞ্জন, অম্ল রসযুক্ত দ্রব্য, স্নান, তৈলাদি মর্দ্দন স্নিগ্ধ দ্রব্য, ব্যায়াম ও অগ্নি সন্তাপ অতিসার রোগীর পক্ষে অহিতকর।

প্রবাহিকা—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রবাহিকা অতিসার রোগের প্রকার ভেদ মাত্র। অহিতকর আহার হেতু বায়ু কুপিত হইয়া সঞ্চিত মল সহ মুহুর্মুহু অধঃপ্রেরণ করিতে থাকে। এই রোগে মল ত্যাগ কালে অতিরিক্ত প্রবাহন (কোঁথান) করিতে হয় বলিয়া ইহাকে প্রবাহিকা বলে।

প্রবাহিকা রোগে বায়ুর প্রকোপ থাকিলে অত্যন্ত শূলুনি, পিত্ত প্রকোপ থাকিলে দাহ এবং কফ প্রকোপ থাকিলে অত্যন্ত কফ নির্গম হয়। আর রক্তের প্রকোপ থাকিলে মলের সহিত কখন বা মল ব্যতীত রক্ত নির্গত হয়। ইহাই সাধারণতঃ রক্তামাশয় নামে খ্যাত। প্রবাহিকা রোগের অন্যান্য লক্ষণ অতিসারের ন্যায় এবং অতিসারের ন্যায় ইহার আম ও পক্ক অবস্থা নির্ণয় করিতে হয়।

অতিসার রোগের প্রথমাবস্থায় যেরূপ হরীতকী ও পিপুল বাটিয়া জোলাপ লইবার কথা বলা হইয়াছে, প্রবাহিকা রোগে রক্তভেদ থাকুক আর নাই থাকুক, সেইরূপ নিয়মে জোলাপ লইতে হয়। ইহাতে রোগী কষ্ট পায় না এবং রোগও সত্বর প্রশমিত হইয়া থাকে।

বিরেচনের পর অতিসার রোগের প্রথমে যে সকল তরল পদার্থ পথ্য দিবার কথা বলা হইয়াছে, প্রবাহিকা রোগেও সেই সকল পথ্য প্রয়োগ করিতে হয়।

প্রবাহিকার ঔষধ—কচি বেলপোড়ার শাঁস দুইতোলা, ইক্ষু গুড় এক তোলা, পিপুল চূর্ণ এক আনা, শুঁঠ চূর্ণ এক আনা ও কিঞ্চিৎ তিল তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে প্রবাহিকা রোগ প্রশমিত হয়। ছাগদুগ্ধ আট তোলা এবং মরিচ চূর্ণ দুই আনা বা পিপুল চূর্ণ এক সিকি একত্র করিয়া সেবন করিলে মল-বিবদ্ধতা যুক্ত প্রবাহিকা রোগ প্রশমিত হয়। কচি বেলশোঁঠার [illegible] এক তোলা, তিলবাটা একতোলা [illegible] একতোলা একত্র মিশ্রিত [illegible] করিলে প্রবাহিকা [illegible]

শুঁঠ, মরিচ ও লোধ কাষ্ঠ সমভাগে চূর্ণ করিয়া এক সিকি মাত্রায় তিল তৈলের সহিত লেহন করিলে প্রবাহিকা রোগ প্রশমিত হয়।

ছাগ দুগ্ধ বা গো দুগ্ধের মধ্যে রক্তবর্ণ উত্তপ্ত লৌহ নিক্ষেপ করিয়া সেই দুগ্ধ শীতল হইলে মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে প্রবাহিকা রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। স-সার দধি, মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে প্রবাহিকা রোগ নষ্ট হইয়া থাকে। প্রবাহিকা রোগীর অগ্নি প্রদীপ্ত হইলে অথচ ভালরূপ মল নির্গত না হইয়া ফেণা ফেণা মল নির্গত হইলে মাত গুড়, ১ তোলা, শুঁঠ চূর্ণ দুই আনা, সারযুক্ত দধি দুইতোলা, তিল তৈল আধ তোলা, দুগ্ধ আট তোলা ও ঘৃত আধ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে এই রোগ প্রশমিত হয়।

প্রবাহিকা রোগে যে সকল বস্তি প্রয়োগের উপদেশ আছে, সেগুলি বিশেষ হিতকর। কিন্তু ঐ সকল বস্তি আর এক্ষণে প্রযুক্ত হয় না বলিয়া সে সকলের বিষয় উল্লিখিত হইল না।

প্রবাহিকায় রক্তস্রাব হইতে থাকিলে রক্তাতিসারের কথিত যোগ সকল প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করিবে।

রুক্ষতা বশতঃ অতিসার জন্মিলে স্নিগ্ধ ক্রিয়া এবং স্নিগ্ধতাবশতঃ জন্মিলে রুক্ষ ক্রিয়া করিবে। ভয় ও শোক জন্য অতিসারের প্রথমে সান্ত্বনা বাক্য দ্বারা ভয় ও শোক নাশক বাক্যাদি দ্বারা শোক নাশ করিবে। বিষ, অর্শঃ ও ক্রিমি জনিত অতিসারে ঐ সকল রোগ এবং অতিসার উভয়ের প্রতিকারক চিকিৎসা করিবে। বমন, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে অতিসারের অবিরোধীভাবে তাহাদের চিকিৎসা করিবে।

জ্বরাতিসার—জ্বরাতিসার একটী পৃথক রোগ নহে। জ্বর ও অতিসার একই সময়ে এক ব্যক্তির শরীরে উৎপন্ন হইলে তাহাকে জ্বরাতিসার বলা যায়। যদি পিত্তজ্বরে পিত্ত জন্য অতিসার হয় অথবা অতিসার রোগে জ্বর হয়, তবে ঐ মিলিত রোগকে জ্বরাতিসার বলা যায়।

জ্বরাতিসারে বিরুদ্ধ চিকিৎসা আবশ্যক। বৈদ্যগণ জ্বরাতিসারকে কষ্টসাধ্য বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ জ্বরে বিরেচন হিতকর, অথচ বিরেচন অতিসার রোগ বর্দ্ধক। আবার অতিসার রোগে ধারক ঔষধ প্রয়োগ হিতকর, অথচ ধারক ঔষধ জ্বর বর্দ্ধক।

অতিসারের ন্যায় জ্বরাতিসারেও আম ও পক্ব অবস্থা বিবেচনা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। পথ্য প্রয়োগও অতিসারের ন্যায়, তবে যাহাতে পথ্য জ্বরের বিরুদ্ধ না হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

জ্বরাতিসারের নিম্নলিখিত যোগ সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। (১) আকনাদি, ইন্দ্রযব, চিরাতা, মুতা, ক্ষেৎ পাঁপড়া, গুলঞ্চ ও শুঁঠ ইহাদের কাথ জ্বরযুক্ত আমাতিসার নাশক। (২) বেণার মূল, বালা, মুতা, ধনে, বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, লোধ ও বেলশুঁঠ ইহাদের কাথ জ্বরাতিসার, অরুচি, ও আম দোষ নাশক।

(৩, ৪) ইন্দ্রযব, আতইচ, শুঁঠ, চিরাতা, বালা ও দুরালভার কাথ অথবা ইন্দ্রযব, দেবদারু, কটকী ও গজপিপ্পলীর কাথ সেবন করিলে জ্বরাতিসার ও দাহ প্রশমিত হয়।

(৫) বেণারমূল, বালা, ধনে, মুতা, [illegible] শুঁঠ, বেড়েলা, ও ধাইফুল ইহাদের কাথ [illegible] আম যুক্ত জ্বরাতিসার নাশক। (৬) [illegible]

আতইচ, মুতা, বেলশুঁঠ, শুঁঠ, ও ধনের ক্বাথ পান করিলে রক্তস্রাবযুক্ত জ্বরাতিসার প্রশমিত হয়। (৭) গুলঞ্চ, আতইচ, ধনে, শুঁঠ, বেল-শুঁঠ, মুতা, বালা, আকনাদি, চিরাতা, কুড়চি ছাল, রক্তচন্দন, বেণার মূল ও পদ্ম কাষ্ঠ ইহাদের ক্বাথ শীতল অবস্থায় পান করিলে জ্বরাতিসার, বমন বেগ, অরুচি, বমি, পিপাসা ও দাহ নষ্ট হয়। অতিসারের ঔষধ সকল বিবেচনা পূর্ব্বক জ্বরাতিসারে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

আরোগ্য লক্ষণ—যাহার অধোবায়ু সম্যক-রূপে নির্গত হয়, দাস্ত ব্যতীত প্রস্রাব হয়, অগ্নির দীপ্তি ও কোষ্ঠ লঘু হয়, তাহার রোগ ভাল হইয়াছে জানিবে।

শ্রী—

চক্রপাণির জাতি নাশ।

চক্রপাণি দত্ত—একজন প্রসিদ্ধ বৈদ্যক গ্রন্থ প্রণেতা। তাঁহার সর্ব্বপ্রধান চিকিৎসা গ্রন্থখানি "চক্রদত্ত" নামে বিখ্যাত। বঙ্গের বৈদ্য সমাজে "চক্রদত্তের" অসাধারণ সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক "চক্রদত্তের" মত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ—এ দেশে আর দ্বিতীয় আছে বলিয়া মনে হয়না। চক্রপাণি একজন স্বাধীন-চিন্তাশীল চিকিৎসক ছিলেন। বৌদ্ধ যুগের শেষাবস্থায় যখন আয়ু-র্ব্বেদের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল,—আয়ুর্ব্বেদের প্রধান অঙ্গ—শল্য-তন্ত্র একরকম উঠিয়া গিয়াছিল, সেই সময় চক্রপাণি—লতাগুল্মের অদ্ভুত বীর্য্য সংযোগে শল্য-তন্ত্রের সকল প্রয়োজন সাধন করিয়াছিলেন; চক্রপাণির এ ঋণ বৈদ্য সমাজ কখনও পরিশোধ করিতে পারিবেনা।

আমি চক্রপাণির জীবনী লিখিতে বসি নাই, তাঁহার চিকিৎসা-গ্রন্থের সমালোচনা করাও আমার উদ্দেশ্য নহে। আমরা চিরদিনই চক্র-পাণিকে বৈদ্য বলিয়া জানিতাম, সম্প্রতি একজন কায়স্থ, সেই চির বৈদ্য—চক্রপাণিকে নিজের দলে টানিবার চেষ্টা করিতেছেন। চক্রপাণির জাতি মারা যাইতেছে,—"ভেড়ার শৃঙ্গে" পড়িয়া হীরার ধার ভাঙ্গিতে বসিয়াছে, সেই টুকু জানাইবার জন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

সকলেই জানেন—আমাদের দেশে এখন জাতীয়তার একটা সাড়া পড়িয়াছে। সকলেই আপনার জাতিকে বড় করিবার চেষ্টা করি-তেছে। এক সময় সাম্যের অভিনয় দেখাইবার জন্য অনেক ব্রাহ্মণও "পৈতা" ফেলিয়া ভগবান হইয়া ছিলেন, এখন আবার উপনয়নে অনধি-কারী দল, সেই কুড়ানো পৈতা গলায় পরিতে চাহিতেছেন! এ রহস্য মন্দ নহে। আমি এ উন্নয়ন চেষ্টারও নিন্দা করিতেছি না। [illegible] বলিতে চাই—নিজে উন্নত [illegible] কিন্তু সে জন্য পরের জাতি [illegible]

বড়কে ছোট কর কেন? কথাটা একটু বিস্তৃত করিয়াই বলি।

"কায়স্থ পত্রিকা" কায়স্থ সমাজের এক খানি মুখপত্র। উহার এখন "নব পর্য্যায়।" ঐ পত্রিকায়—"মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণি দত্তে"র বর্ণ নির্ণয় শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটী নিতান্তই অসার, একজন বৈদ্যকে নিজের স্বজাতি শ্রেণীভুক্ত করা হইতেছে—বোধ হয় এইজন্যই সম্পাদক এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধ পত্রস্থ করিয়াছেন! চক্রপাণি দত্ত—বৈদ্যই ছিলেন, কিন্তু হইলে কি হয়—তাঁহার উপাধি যে "দত্ত", আর রক্ষা আছে? নিশ্চয়ই চক্রপাণি কায়স্থ ছিলেন! এরূপ যুক্তির বালাই লইয়া মরিতে ইচ্ছা হয়। এইরূপ যুক্তির বলে, সুবর্ণ বণিক, তন্তুবায় প্রভৃতি যে সকল জাতির দত্ত উপাধি আছে—তাহারা সকলেই মহাত্মা চক্রপাণিকে স্বজাতি বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিতে পারে! যুক্তিটী পাঠক লেখকের কথাতেই শুনুন—

"চক্রদত্ত মধ্যে তিনি যে আত্ম-পরিচয় মূলক শ্লোকটী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাও এত সংক্ষিপ্ত যে, তাহা হইতে প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করা দুঃসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শ্লোকটী এই—

গৌড়াধি নাথ রসবত্যধিকারি পাত্র—
নারায়ণস্য তনয়ঃ সুনয়োঽন্তরঙ্গাৎ।
ভানোরণু প্রথিত লোধ্রবলী কুলীনঃ
শ্রীচক্রপাণিরিহ কর্তৃ পদাধিকারী।

উক্ত শ্লোকের টীকায় প্রসিদ্ধ টীকাকার শিবদাস সেন লিখিয়াছেন—গৌড়াধিনাথো নর পাল দেবঃ, তস্য রসবতী মহানসং তস্যাধিকারী, তৎপা পাত্র মিতি মন্ত্রী; ঈদৃশো যো নারায়ণস্তস্য তনয়ঃ সুনঃ ইতি নীতিমান্, অন্তরঙ্গাদিতি লব্ধান্তরঙ্গ পদবিকাৎ ভানোরনু নারায়ণস্য তনয় ইতি যোজ্যং. তেন ভানোরনুজ ইত্যর্থঃ। বিদ্যাকুল সম্পন্নো হি ভিষগন্তরঙ্গ ইত্যুচ্যতে। লোধ্রবলী কুলীন ইতি লোধ্রবলী সংজ্ঞকঃ দত্ত কুলোৎপন্নঃ।

"উদ্ধৃত শ্লোক ও টীকাই আমাদের প্রধান অবলম্বন। উহা হইতে জানা যাইতেছে যে, গৌড়াধিপতির [নর পাল দেব] নারায়ণ দত্ত নামক মন্ত্রী ছিলেন। তিনি রাজার রন্ধন শালার তত্ত্বাবধান করিতেন। নীতিমান্, লোধ্রবলী ও কুলীন (লোধ্রবলী সংজ্ঞক দত্ত কুলোৎপন্ন) চক্রপাণি দত্ত উক্ত নারায়ণ দত্তের পুত্র ছিলেন। চক্রপাণির জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম ভানু দত্ত—তিনি রাজার অন্তরঙ্গ (অর্থাৎ বিদ্যা কুল সম্পন্ন ভিষক্) ছিলেন। বলা বাহুল্য বন্ধনীর মধ্যবর্ত্তী বাক্যগুলি টীকাকারের। তাহা মূলে নাই।

"পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকে (এমন কি টীকায় যদিও চক্রপাণি দত্ত মহাশয় (কিম্বা তাঁহার টীকাকার শিবদাস সেন) তাঁহার জাতি সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ কোনই পরিচয় প্রদান করেন নাই, তথাপি নিজেকে 'লোধ্রবলী কুলীন' সংজ্ঞায় পরিচিত করায় তাহা হইতেই তাঁহার জাতি-তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। টীকাকার শিবদাস সেন তাহা শত চেষ্টাতেও লোপ করিতে পারেন নাই। আজীবন মিথ্যাকে সত্যরূপে প্রচার করিবার অনর্থক চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকা প্রযুক্ত কায়স্থদ্বেষী শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয়ও গ্রন্থকারের ইঙ্গিত সম্যক প্রণিধান করিতে পারেন নাই। কেবলমাত্র 'দত্ত' উপাধি দেখিয়াই নির্ব্বিচারে তাঁহাকে 'বৈদ্য' সাব্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছেন।

"চক্রপাণি নিজেকে 'লোধ্রবলী কুলীন' বলিয়া পরিচয় প্রদান করায় ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভানু দত্ত (শিব দাস সেনের মতে) "বিদ্যাকুল সম্পন্ন" হওয়ায় চক্রপাণির বংশ যে মহা কুলীন ছিলেন তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে একমাত্র কায়স্থজাতি ব্যতীত অন্য কোন জাতি মধ্যেই দত্ত উপাধিধারী ব্যক্তি (শ্রেষ্ঠ) কুলীন বলিয়া স্বীকৃত হ'ন নাই। বৈদ্য জাতি মধ্যে 'দত্ত' উপাধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ নিকৃষ্ট বলিয়াই পরিগণিত।

* * * *

"অন্য কোন জাতিতে বিশেষতঃ বৈদ্যজাতির মধ্যে 'দত্ত বংশ' কুলীন বলিয়া কখনই গণ্য ছিল না। এরূপ স্থলে চক্রপাণি দত্ত শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করায় তিনি কায়স্থই হইতেছেন। * * শুধু 'কুলীন' শব্দের প্রয়োগ দ্বারাই মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণি দত্তের কায়স্থ জাতির পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, এবং তিনি যে কুলীন শ্রেষ্ঠ কায়স্থ পুরুষোত্তম দত্তের বংশ সম্ভূত ছিলেন তাহাই সূচিত করিয়া দিতেছে। সম্ভবতঃ আধুনিক কালের গঙ্গা স্রোতঃ" প্রভৃতি কুলসংজ্ঞার ন্যায় 'লোধ্রবল' শব্দ তাৎকালিক (পুরুষোত্তম দত্তের) দত্ত কুলের কুলীনত্ব প্রকাশক বিশেষ সংজ্ঞা ছিল। দত্ত কুলের কৌলিন্য লোপের সহিত উক্ত "লোধ্রবলী সংজ্ঞাটিও কুলশাস্ত্র হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন বর্ম্মা।"

এক্ষণে পাঠক মহাশয়! বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছেন—এই সেনবর্ম্মা স্বাক্ষরকারী প্রভাস চন্দ্র—একজন বৈদ্য দ্বেষী বটেন। তাই প্রাচীন পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্নের মত একজন শাস্ত্র-বিশারদকে আক্রমণ করিতে ইনি একটুও সঙ্কুচিত হন নাই। ইহা অবশ্যই নূতন ক্ষাত্র ধর্ম্মের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ। এ সম্বন্ধে আমি একটী কথাও কহিতে চাহিনা।

লেখক প্রকাশ করিয়াছেন—"টীকাকার শিবদাস সেন তাহা শত চেষ্টাতেও লোপ করিতে পারেন নাই।" ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে, চক্রপাণি যে কায়স্থ ছিলেন, শিবদাস সেন কৌশলে তাহা গোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমি বিস্মিত হইতেছি, —লেখকের এ ধারণা কেমন করিয়া হইল? শিবদাস সেনের সময়ে ত "বৈদ্য বড় কি কায়স্থ বড় ?"—এরূপ আন্দোলনের সূত্রপাতও ছিল না। উমেশচন্দ্র কায়স্থ দ্বেষী হইতে পারেন, কিন্তু তাহা নগেন্দ্র নাথ বসুর বৈদ্য বিদ্বেষের পুরোবর্ত্তী নহে। নগেন্দ্র বাবু নিজের স্বজাতিকে বৈদ্যের চেয়ে বড় বলিয়া প্রকাশ করিবার পর, বাধ্য হইয়াই শাস্ত্রজ্ঞানী উমেশচন্দ্র, বৈদ্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। উমেশ বাবুর উপর এই রূপ মন্তব্য প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে—লেখক যদি নগেন্দ্র বাবুর বৈদ্য বিদ্বেষের কথাটা একবার ভাবিয়া দেখিতেন, আমরা তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারিতাম। তিনি (অর্থাৎ লেখক) সংস্কৃত ভাষা জানেন না, ইতিহাসের ধার ধারেন না, বৈদ্যের কুলকারিকা বুঝেন না, অথচ সাদা কাগজে কালির অক্ষরে চক্রপাণিকে কায়স্থ লিখিয়া নিজের অজ্ঞতারই পরিচয় দিয়াছেন।

লেখক প্রভাস চন্দ্র সম্ভবতঃ শুনিয়া থাকিবেন—এক সময় এই বঙ্গদেশে বৌদ্ধ প্রভাব বড় প্রবল হইয়াছিল। [illegible] রাজা প্রজা সকলেই বৌদ্ধ [illegible] ব্রাহ্মণ বৈদ্য, রাজা [illegible]

আভিজাত্যের গর্ব্ব —উপবীত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহার পরই নবীন হিন্দুত্বের অভ্যুত্থান। দেশে তখন বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় নাই। মহারাজ আদিশূরকে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য বঙ্গের বাহির হইতে ব্রাহ্মণ আনাইতে হইয়াছিল। পাল রাজগণ যে বৌদ্ধমতাবলম্বী রাজা ছিলেন, এ কথাও শ্রীমান্ প্রভাসচন্দ্র শুনিয়া থাকিবেন। এই বৌদ্ধ প্রভাব—পূর্ব্ববঙ্গের বহু বৈদ্য-সন্তানকে উপবীত ত্যাগ করাইয়াছিল। বৌদ্ধ শাসনে যাহারা উপবীত ত্যাগ করেন নাই, নিজের জাতির গৌরব বজায় রাখিয়াছিলেন,—তাঁহাদের নাম হইয়াছিল "লোধ্রবলী"। এরূপ ব্যক্তির সমাজ-সম্ভ্রম যথেষ্ট ছিল। এরূপ ব্যক্তিরা যেস্থানে বাস করিতেন, সেই স্থানকে "লোধ্রবল" বলিত। বৈদ্যদের কুলপুস্তকেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়;—যথা,—

মালঞ্চঃ সেন কুলস্য গুপ্তানাং খণ্ডমেবচ।
লোধ্রবলশ্চ দত্তানাং কুলস্থানং প্রকীর্ত্তিতং॥

বৈদ্য পঞ্জী। ২য় অঃ।

চক্রপাণি, পিতা নারায়ণের নামেরই উল্লেখ করিয়াছেন, পিতামহের নাম লিপিবদ্ধ করেন নাই। 'সেনবর্ম্মা' (?) জোর করিয়া সেই নারায়ণকে পুরুষোত্তমের পুত্র বলেন কোন্ সাহসে?

সেন বর্ম্মা বোধ হয় এতক্ষণে বুঝিয়াছেন,—"লোধ্রবল" দত্ত উপাধিধারী বৈদ্যদের একটি কুল স্থানের নাম। দত্তোপাধিক যে সকল বৈদ্য উপবীত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সামাজিক সম্মান ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। চক্রপাণি এ শ্রেণীর বৈদ্য ছিলেন না, পাছে তাঁহার দত্তান্ত নাম দেখিয়া কাহারও মনে সে সন্দেহ হয়, সেই আশঙ্কা দূর করিবার জন্যই, তিনি যে লোধ্রবলী কুলীন—এরূপ কথায় "চক্রদত্তের" 'উপসংহারে—যৎকিঞ্চিৎ আত্ম পরিচয় দিয়াছিলেন। শিবদাস সেন সে পরিচয় ঢাকিবার চেষ্টা করেন নাই। চক্রপাণি যে বৈদ্য ছিলেন—চক্রপাণিশিষ্য হরিশ্চন্দ্র 'ক্রিয়া কৌমুদী' গ্রন্থে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। হরিশ্চন্দ্র তাঁহার গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে শিবকে প্রণাম করিয়া তাহার পরেই চক্রপাণিকে নমস্কার করিয়াছেন—

"অম্বষ্ঠ বংশোদ্ভব চক্রপাণি রাজন্ম পুণ্য
প্রথিতঃ স্বনামা।"

অতএব চক্রপাণি দত্তের জাতি মারিবার চেষ্টা করিয়া "সেন বর্ম্মা" কেবল উপহাসাস্পদই হইয়াছেন। সেনবর্ম্মা নিজেই ভাবিয়া দেখুন—চক্রপাণির "দত্ত উপাধি দেখিয়াই নির্ব্বিচারে তাঁহাকে" তিনি কায়স্থ সাব্যস্ত করিয়াছেন কি না? গ্রন্থ শেষে চক্রপাণি লিখিয়াছেন—

যঃ সিদ্ধযোগ লিখিতাধিক সিদ্ধ যোগা
নত্রৈব নিক্ষিপতি কেবল মুদ্ধরেদ্বা।
ভট্টত্রয়-ত্রিপথ-বেদ-বিদা জনেন
দত্তঃ পতেৎ সপদি মূর্দ্ধনি তস্য শাপঃ।

ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্য ভিন্ন এরূপ শপথ কি কায়স্থ কখনও উচ্চারণ করিতে সাহস করে?

চক্রপাণির বংশ এখনও চৌপীড়া গ্রামে—বর্ত্তমান রহিয়াছে, "সেন বর্ম্মা" সে সন্ধান লইয়াছেন কি?*

শ্রীরাম সহায় কাব্যতীর্থ বেদান্ত শাস্ত্রী, ভট্টাচার্য্য।

*এরূপ জাতি মারিবার চেষ্টা, ইহাই নূতন নহে। "নব্য ভারত" নামক প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রে কৈলাস চন্দ্র সিংহ, বৈদ্য রাম প্রসাদ সেনকে কায়স্থ বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাম প্রসাদের

'বকে'র গুণ।

—:*:—

সর্দ্দিতে।

বকের ফুল সর্ষের তেলে
সর্দ্দি ভাল হয় ভেজে খেলে।

সর্দ্দি-কাশিতে।

বক মূলের ছাল আধ ভরি,
বচ নাও সমান করি—
এক পোয়া জলের এক ছটাক শেষ,
মধু দিয়ে লাগ্‌বে বেশ।
দু' তিন বারে সেবন কর,
সর্দ্দি-কাসিতে উপকার বড়।

জ্বরে।

বকছাল, অনন্তমূল, আধ আধ ভরি,
গোক্ষুর বীজ, হরীতকী সমান করি,
আধসের জলের এক ছটাক শেষ,
বাত-জ্বর এতে হয় বিশেষ।
ওষুধ এটি চাতুর্থক জ্বরেও,
প্রয়োগ কর আর ত্র্যাহিকেও।

চাতুর্থক জ্বরের পরিচয়।

এক দিন হ'য়ে দু' দিন পর
আবার দেখা দেয় জ্বর,
চাতুর্থক জ্বর নাম তাহার,
বকফুল ভাজা খেলে হয় উপকার।

কফ-পিত্তরোগে।

কফ-পিত্ত রোগ যাহার
বক ফুলের মধু উপকার তা'র।

রাতকাণা রোগে।

এক সের গাওয়া ঘৃত নিয়ে
বকের পাতা এক পোয়া-মিশিয়ে দিয়ে,
মৃদু আগুনে পাক কর,
রাতকাণায় খেলে উপকার বড়।

অপস্মারে।

বকের পাতা দুই ভরি,
গোল মরিচ তার সিকি করি,
চোণা দিয়ে বেটে নিয়ে
অপস্মারে দাও নস্য দিয়ে।

বাতরক্তে।

ম'ষের দুধে বকফুলের গুঁড়
ভাল ক'রে মিশাল কর,
তা'র পর তাহার দধি থেকে—
ননিটা দাওগে গলায় মেখে।

দৌহিত্র বংশের বংশধর একজন উকীলের এবং শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের কণ্যাতে কৈলাস চন্দ্রের চৈতন্ত হইয়াছিল। আমরা চক্রপাণির পরিচয় জানি, পৃথক প্রবন্ধে তাহা প্রকটিত হইবে। "পুরুষোত্তম দত্ত" কায়স্থ কুলে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। চক্রপাণি যদি তাঁহার পৌত্র হইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপন বিশ্ব বিখ্যাত পিতামাতার নামোল্লেখ করিতে বিরত হইতেন না।—আঃ সং।

বাতে।
বক গাছের মূল আর ধুতুরা মূল
সমান ভাগে কর তুল্,
ব্যথা—ফোলায় প্রলেপ দাও
হাতে হাতে যদি সুফল চাও।
শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন।

রসায়ন ও বাজীকরণ।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত অংশের পর।)

—:০:—

শাস্ত্রে নানা প্রকার রসায়নের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি বহুব্যয়-সাধ্য এবং বহু উপকরণ সাপেক্ষ। এই প্রবন্ধে আমরা সেই সকলের উল্লেখ না করিয়া অনায়াস লভ্য কতকগুলি ঔষধের উল্লেখ করিতেছি। "হরীতকী" শীর্ষক প্রবন্ধে ঋতু হরীতকী নামক রসায়নের বিষয় লিখিত হইয়াছে বলিয়া এস্থলে তাহার উল্লেখ করা হইল না। সর্ব্বজন পরিচিত চ্যবনপ্রাশও একটী উৎকৃষ্ট রসায়ন।

(১) মণ্ডুকপর্ণীর (থুলকুড়ির রস, (২) দুগ্ধের সহিত যষ্টিমধু চূর্ণ, (৩) মূল ও পুষ্প সহ গুলঞ্চের রস সেবন করিলে আয়ু, বর্ণ, বল, স্বর ও স্মরণ শক্তি বৰ্দ্ধিত হয়।

অশ্বগন্ধা চূর্ণ পিত্ত প্রধান ধাতুতে দুগ্ধ সহ, বাত-পিত্ত প্রধান ধাতুতে তিল তৈল সহ এবং বায়ু ও কফ প্রধান ধাতুতে উষ্ণ জল সহ সেবন করিলে শরীর পুষ্ট হয়। সহমত একটী হইতে ৪।৫ টী পিঁপুল, ঘৃত ও মধু সহ এক বৎসর কাল সেবন করিলে রসায়ন হয় এবং কাস, শ্বাস গলরোগ, পাণ্ডু, বিষম জ্বর, স্বরভঙ্গ, পীনস, শোথ প্রভৃতি বিবিধ রোগ নষ্ট হয়।

পিপ্পলী বর্দ্ধমান যোগ,—প্রথম দিন তিনটী পিপ্পলী সেবন করিয়া, প্রত্যহ তিনটী করিয়া বৃদ্ধি করিবে, অর্থাৎ প্রথম দিন তিনটী, দ্বিতীয় দিন ছয়টী, তৃতীয় দিন নয়টী, এইরূপ দশ দিন করিতে হইবে। দশ দিনের পর আবার তিনটী করিয়া প্রত্যহ কমাইতে থাকিবে। আবার দশ দিন পরে তিনটী করিয়া বর্দ্ধিত করিয়া, আবার দশ দিন পরে তিনটী করিয়া কমাইবে। এইরূপ নিয়মে এক সহস্র পিঁপুল সেবন করিতে হয়। এই পিপ্পলী-রসায়ন পুষ্টিকর, সুস্বর জনক, আয়ুবর্দ্ধক, প্লীহানাশক, বয়োস্থাপক এবং মেধাজনক। শাস্ত্রে যাহা অধম মাত্রা—তাহাই লিখিত হইল। এই মাত্রায় সহ্য না হইলে, আরও কম মাত্রায় সেবন করা উচিত। বলবান ব্যক্তির পক্ষে পিঁপুল পেষণ করিয়া দুগ্ধের সহিত সেবন করা উচিত, মধ্য-বল ব্যক্তিগণের পক্ষে কাথ-প্রশস্ত এবং হীন বল ব্যক্তিগণের শীত-কষায় করিয়া সেবন করা কর্ত্তব্য। ঔষধ জীর্ণ হইলে ঘৃত ও দুগ্ধ সহ ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন পথ্য করিবে।

(১) লৌহভস্মের সহিত, (২) স্বর্ণভস্মের সহিত, (৩) বচের সহিত, (৪) ঘৃত ও মধুর

সহিত, (৫) বিড়ঙ্গ ও পিঁপুল চূর্ণের সহিত, (৬) অথবা সৈন্ধব লবণের সহিত একবৎসর কাল ত্রিফলা সেবন করিলে মেধা, স্মৃতি, বল ও পরমায়ু বৃদ্ধি হয় এবং জরা নষ্ট হয়।

পূর্ব্বদিনের আহার জীর্ণ হইলে প্রাতে একটী হরীতকী, মধ্যাহ্ন আহারের পূর্ব্বে দুইটী বহেড়া এবং আহারের পরে চারিটী আমলকী (প্রত্যেকটী) ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে সুস্থ শরীরে একশত বৎসর জীবিত থাকা যায় এবং সহজে জরা আক্রমণ করিতে পারে না। আমলকী ও কৃষ্ণ তিল ভৃঙ্গরাজের (ভীমরাজ) রসে পেষণ করিয়া প্রত্যহ সেবন করিলে কেশ কৃষ্ণবর্ণ, ইন্দ্রিয় নির্ম্মল, শরীর ব্যাধিহীন এবং দীর্ঘ পরমায়ু লাভ হয়।

বৃদ্ধদারকের (বীজতারক) মূল চূর্ণ করিয়া, শতমূলীর রসে আর্দ্র করিয়া, রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। শুষ্ক হইলে পরদিন পুনরায় শতমূলীর রসে মাখিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। ইহাকে ভাবনা দেওয়া বলে। এইরূপ সাত দিন করিয়া সেই ঔষধ সহ্যমত মাত্রায় (দুই আনা হইতে আধতোলা) কিঞ্চিৎ ঘৃত সহ সেবন করিলে বলিপলিত নষ্ট হয় এবং মেধা ও স্মৃতি বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে।

হস্তিকর্ণ পলাশের মূল চূর্ণ, ঘৃত কিংবা মধুর সহিত সেবন করিলে দীর্ঘ আয়ু এবং মেধা লাভ করা যায়। ইহা একটী উৎকৃষ্ট বাজীকরণও বটে।

আমলকী চূর্ণ আট সের—এক সহস্র আমলকীর রসে একুশ বার ভাবনা দিবে। পরে উহার সহিত ঘৃত ৮ আটসের, মধু আটসের, পিঁপুল চূর্ণ একসের ও চিনি দুই সের মিশ্রিত করিয়া একটী পাত্রে রাখিয়া পাত্রের মুখ রুদ্ধ করিবে। বর্ষারম্ভে উক্ত পাত্র ভস্মরাশির মধ্যে রাখিয়া, শরৎ কালে উদ্ধৃত করিয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় (আধ তোলা হইতে দুই তোলা) সেবন করিলে বল, বর্ণ, মেধা, স্মৃতি, জীবনীশক্তি ও আয়ু বৰ্দ্ধিত হয়।

বিড়ঙ্গ রসায়ন—বিড়ঙ্গ চূর্ণ, যষ্টিমধু ও শীতল জল কিম্বা মধু ও কিসমিসের কাথ, অথবা মধু ও আমলকীর কাথ কিম্বা গুলঞ্চের কাথের সহিত সেবন করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে ঘৃত সংযুক্ত লবণ-বিহীন মুগের যূষ প্রস্তুত করিয়া তৎসহ যথেষ্ট ঘৃতযুক্ত অন্ন আহার করিবে। ইহাতে অর্শরোগ ও ক্রিমি নষ্ট হয় এবং মেধা ও আয়ু বৰ্দ্ধিত হয়।

শ্বেত বেড়েলা, পীত বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, ভুঁইকুমড়া ও শতমূলী—ইহাদের যে কোন একটীর মূল চূর্ণ, দুগ্ধের সহিত পান করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে ঘৃত-দুগ্ধ-প্রধান খাদ্য আহার করিবে। এই ঔষধ পরমায়ু বৰ্দ্ধক, বলকারক এবং রক্তপিত্ত রোগনাশক। পীত বেড়েলা ও গোরক্ষ চাকুলে জলের সহিত সেবন করা প্রশস্ত। গৃহমধ্যে থাকিয়া এই ঔষধ সেবন করিলে সমধিক ফল লাভ হয়।

শ্বেত সোমরাজী, রৌদ্রে শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া ইক্ষু গুড় মাখিয়া ঘৃতাক্ত কলসের মধ্যে রাখিবে এবং কলসের মুখ রুদ্ধ করিয়া তাহা ধান্য রাশির মধ্যে স্থাপিত করিবে। সাত দিন পরে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সহ্য মত মাত্রায় সেবন করিয়া উষ্ণ জল পান করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে শরীর শীতল জলে ধুইয়া ফেলিবে এবং শালিধান্যের অন্ন দুগ্ধ ও চিনি সংযোগে আহার করিবে। ইহা বল, বর্ণ, স্মৃতি ও পরমায়ু বৰ্দ্ধক।

কৃষ্ণবর্ণ সোমরাজী চূর্ণ, গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে কুষ্ঠ, পাণ্ডু, ও উদর রোগ নষ্ট হয় এবং বল, স্মৃতি ও পরমায়ু বর্দ্ধিত হয়। এই ঔষধ প্রাতে সূর্য্যের রক্তিমবর্ণ দূর হইলে সেবন করিতে হয় এবং লবণবিহীন আমলকীর যূষের সহিত সংযুক্ত অন্ন পথ্য করিতে হয়।

মণ্ডূক পর্ণী রসায়ন—মণ্ডুক পর্ণীর (থুলকুড়ির) রস দুগ্ধসহ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে অথবা রস সেবন করিয়া দুগ্ধ পান করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে দুগ্ধ, ঘৃত, তিল এবং যব দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য আহার করিবে। অন্ন (ভাত) পরিত্যাগ করা উচিত। এই ঔষধ সেবন করিলে মেধা ও আয়ু বর্দ্ধিত হয়। কুটী প্রাবেশিক নিয়মে ঔষধ সেবন করিলে অধিক ফল হয়। প্রথমে ২।১ দিন উপবাস করিয়া ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য।

ব্রাহ্মী রসায়ন অন্নাহার পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মী শাকের রস সহ্য মত মাত্রায় পান করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে লবণ বিহীন মণ্ড, পেয়াদি দুগ্ধ সহ সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে অত্যন্ত মেধা বৃদ্ধি হয় এবং দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করা যায়।

প্রাতঃকালে ধারোষ্ণ দুগ্ধ বা শীতল জল পান করিলে কাস, শ্বাস, অতিসার, জ্বর, পীড়কা, কুষ্ঠ, কোঠ, মুত্রাঘাত, অর্শঃ, শোথ, গলরোগ, শিরোরোগ, কর্ণরোগ, চক্ষুরোগ, বাত, পিত্ত, কফ ও ক্ষত জনিত রোগ সকল নষ্ট হয় এবং দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করা যায়।

প্রাতঃকালে শীতল জলের নস্য গ্রহণ করিলে ব্যঙ্গ, বলি, পলিত, পীনস, স্বরভঙ্গ ও কাস ভাল হয় এবং শরীর পুষ্ট ও দৃষ্টি শক্তি বর্দ্ধিত হয়।

নিশুণ্ডী কল্প—নিসিন্দা মূলের ছাল চূর্ণ এক সের ও মধু দুই সের একত্র মিশ্রিত করিয়া একটী ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। পরে উক্ত ভাণ্ডের মুখ রুদ্ধ করিয়া একমাস ধান্য রাশির মধ্যে স্থাপিত করিবে। অনন্তর উদ্ধৃত করিয়া তক্র বা গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে বলি-পলিত নষ্ট হয়, বল, বীর্য্য, আয়ু, মেধা ও দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধিত হয় এবং বিবিধ রোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

ভৃঙ্গরাজ চূর্ণ এক ভাগ, তিল অর্দ্ধভাগ এবং আমলকী চূর্ণ অর্দ্ধভাগ—একত্র করিয়া চিনি বা গুড়ের সহিত সেবন করিলে অকাল জরা ও বিবিধ রোগ নষ্ট হয়।

খণ্ডাম্রক—সুপক্ক মিষ্ট আম্রের রস ৬৪ সের, চিনি ৮ সের, গব্য ঘৃত ৪ সের, শুঁঠ চূর্ণ ৩২ তোলা, মরিচ চূর্ণ ৩২ তোলা, পিঁপুল চূর্ণ ১৬ তোলা এবং জল ৮ সের একত্র করিয়া মৃৎ পাত্রে পাক করিবে। যখন হাতায় লাগিবে, এরূপ ঘনীভূত হইলে তখন নামাইয়া তেজপাতা চূর্ণ ৩২ তোলা এবং গেঁটেলা, চিতামূল, ধনে, মুতা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, জায়ফল, তালীশপত্র, দারুচিনি, ছোট এলাচ ও নাগকেশর প্রত্যেকের চূর্ণ আট তোলা প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লইবে। অনন্তর শীতল হইলে ৪ সের মধু মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ একতোলা হইতে [illegible] তোলা মাত্রায় আহারের পূর্ব্বে সেবন ক[illegible] অর্শঃ, অম্লপিত্ত কাস, শ্বাস, ক্ষয়, মূর্চ্ছা, [illegible] বমি, মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি বিবিধ রোগ নষ্ট [illegible] মেধা ও পরমায়ু বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। [illegible] উৎকৃষ্ট বাজীকরণ।

যষ্টিমধু চূর্ণ, বংশলোচন চূর্ণ, পিপ[illegible] চিনি অথবা মধু ও ঘৃত—ইহার [illegible]

একটীর সহিত ত্রিফলা চূর্ণ সেবন করিলে উৎকৃষ্ট রসায়ন হয়।

লৌহ ভস্ম বা স্বর্ণ ভস্ম, বচের চূর্ণ সহ অথবা ঘৃত ও মধুসহ কিম্বা বিড়ঙ্গ ও পিপুল চূর্ণের সহিত এক বৎসর সেবন করিলে জরা নষ্ট হয় এবং মেধা, স্মৃতি, বল ও পরমায়ু বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে।

রসায়নের পুষ্টিজনক অনেক ঔষধ প্রয়োগে বাজীকরণ এবং বাজীকরণের অনেক ঔষধ প্রয়োগে রসায়ন হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিবেচনা পূর্ব্বক এক অধিকারের ঔষধ অন্য অধিকারে প্রয়োগ করিতে পারেন।

ক্ষয়রোগ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

যক্ষ্মারোগের সাধারণ লক্ষণ—স্কন্ধ ও পার্শ্ব দেশে বেদনা, গাত্র গরম হওয়া ও জ্বালা করা এবং সর্ব্বদা জ্বর থাকা ক্ষয়রোগের সাধারণ লক্ষণ। এই কয়টি উপসর্গ যুগপৎ ঘটিলে ক্ষয় রোগ বলিয়া আশঙ্কা করিবে।

যক্ষ্মার একটি প্রধান উপসর্গ অতিরিক্ত ঘাম হওয়া। অনেকে যক্ষ্মা রোগের নিদানে ইহার উল্লেখ না দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকেন। কিন্তু ক্ষুণ্ণ হইবার কোন কারণ নাই। জ্বর-নিদান অনুসন্ধান করিলেই ইহার মীমাংসা হয়। ক্ষয়রোগে জ্বর হইলে ঘর্ম্ম হইয়া থাকে। ক্ষয় রোগে প্রলেপক নামক জ্বর হয়। প্রলেপক জ্বরের লক্ষণ যথা :—

প্রলিম্পন্নিব গাত্রাণি ঘর্ম্মেণ গৌরবে ন চ।
মন্দ জ্বর বিলেপী চ সশীতঃ স্যাৎ প্রলেপকঃ॥

অর্থাৎ যে জ্বরে শরীর ঘর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত ও গুরু হয় এবং শীত লক্ষণ বিশিষ্ট মন্দ মন্দ জ্বর হয় তাহাকে প্রলেপক জ্বর বলে। ক্ষয়রোগে প্রচুর ঘর্ম্ম হয়, ইহা তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ক্ষয়রোগের পূর্ব্বরূপ—ক্ষয়রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রকাশ পায়। কাস, অঙ্গ মর্দ্দ (গাত্র বেদনা), কফ নির্গম, তালুশোষ, বমি, অগ্নিমান্দ্য, মত্ততা, নাসিকা দিয়া জল ও কফস্রাব, শ্বাস, পীনস ও নিদ্রাধিক্য উপসর্গ ঘটে। রোগীর চক্ষু শ্বেত বর্ণ হয় এবং মাংস ভক্ষণ ও স্ত্রী সহবাসে ইচ্ছা হয়। রোগী স্বপ্ন দেখে—কাক, শুক, নীলকণ্ঠ, শকুন—এই সকল পক্ষী এবং বানর ও কৃকলাস যেন তাহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, নদী জলশূন্য হইয়াছে, শুষ্ক বৃক্ষ সকল যেন বায়ু ও ধূমে আচ্ছন্ন রহিয়াছে।

রোগ মাত্রেই প্রবল বা মৃদুভাবে প্রকাশ পাইতে পারে। জ্বর বলিতে দুই এক দিনে মারাত্মক জ্বরও বুঝায়, আবার সামান্য-সাধ্য জ্বরও বুঝায়। যক্ষ্মা রোগও সেইরূপ প্রবল বা অপ্রবল ভাবে প্রকাশ পাইতে পারে। রোগের প্রাবল্য বা অল্পতা রোগীর শরীরের অবস্থা ও রোগবীজের উপর নির্ভর করে। প্রবল রোগে হঠাৎ শীত করিয়া জ্বর হয়, ...

শ্বাসকৃচ্ছ্র ও পাঁজরার বেদনা উপসর্গ ঘটে এবং উপসর্গ সকল ক্রমে বাড়িতে থাকে। নীলবর্ণ পূয়ের ন্যায় কফ নির্গত হয়, কখন কখন মুখ দিয়া রক্ত উঠে! ক্রমে পূর্ব্ব কথিত উপসর্গ আসিয়া জোটে।

অপ্রকাশ যক্ষ্মা নানা আকারে প্রকাশ পায়। অনেক স্থলে রোগ এরূপ ভাবে প্রকাশ পায় যে, সহজে ক্ষয়রোগ বলিয়া ধরা পড়ে না। কার্য্যক্ষেত্রে আমরা যত প্রকার দেখিয়াছি, নিম্নে লিখিত হইতেছে।

ঘুষ ঘুষে জ্বর, ঘুষ ঘুষে কাস—এইরূপ আকারে অনেক স্থলে প্রকাশ পায়। রোগী প্রথমে গ্রাহ্যই করে না, বিশেষ বিজ্ঞ চিকিৎসক ব্যতীত সহজে রোগ ধরিতে পারে না। জ্বর ও কাসের চিকিৎসা চলিতে থাকে। কখন কখন হঠাৎ রোগ প্রবল আকারে প্রকাশ পায়, কখন বা ধীরে ধীরে রোগীর দেহ ও প্রাণ ক্ষয় করিতে থাকে। যখন ধরা পড়ে, তখন রক্ষার আর উপায় থাকে না। মুখ দিয়া রক্ত উঠা—কখন কখন হঠাৎ মুখ দিয়া রক্ত উঠে, সঙ্গে সঙ্গে জ্বর বুকে বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ ঘটে। কখন বা একদিন মুখ দিয়া রক্ত উঠে, দীর্ঘকাল পরে আবার একদিন উঠে, কিছুদিন পরে আবার উঠে, শেষে রোগ প্রবল ভাবে প্রকাশ পায়। একবার রক্ত উঠার পর দুই বৎসর রক্ত উঠে নাই, দুই বৎসর পরে রক্ত উঠার পর আবার এক বৎসর উঠে নাই, কিন্তু ছয় মাস পরে রোগ প্রবলভাবে প্রকাশ পাইল এবং রোগী সত্বর মৃত্যুমুখে পতিত হইল—ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

স্বপ্নদোষ ও রক্তহীনতা—রোগীর বয়স ১৯।২০ বৎসর, নিত্য স্বপ্নদোষ হয়, শরীর অত্যন্ত রক্তহীন হইয়া পড়িতেছে, ক্ষুধা ও কোষ্ঠশুদ্ধি ভাল হয় না, বিকালে একটু জ্বর ভাব হয়।—কবিরাজ জ্বরের চিকিৎসা করেন, কোন ফল হয় না। ২।৩ মাস পরে অন্য একজন বিজ্ঞ কবিরাজের চিকিৎসায় কিন্তু আরোগ্য লাভ করিল—এমনও দেখা গিয়াছে।

অজীর্ণ ও রক্তহীনতা—রোগীর বয়স ২৭।২৮ বৎসর, আসিয়া বলিল—অজীর্ণ রোগে কষ্ট পাইতেছি, অম্ল ঢেকুর উঠে, বমি হয়। অমুক অমুক দেখিয়াছেন কিছু হয় নাই। অজীর্ণ রোগের যেরূপ অবস্থা এবং যে ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল—তাহাতে উপকার হইবার কথা—তবে হইল না কেন? জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার শরীর কি এইরূপ কৃশ? রোগী বলিল, না মহাশয়, আমি এর ডবল ছিলাম, দেড়মাসে এইরূপ হইয়া গিয়াছি। ক্ষয় রোগ স্থির করিলাম, রোগীর বোধ হয় বিশ্বাস হয় নাই। অন্য চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে ক্ষয়রোগে মৃত্যু হইল—এরূপ কথাও শুনিয়াছি।

স্বরভঙ্গ, গলা বেদনা—রোগী আসিয়া বলিল, কবিরাজ মহাশয়, স্বরভঙ্গ হ'য়েছে, গলায় বড় বেদনা আর সর্ব্বদা সর্দ্দি জ'মে আছে। অমুক অমুক দেখিয়াছে, কোন ফল হয় নাই। দুই সপ্তাহ চিকিৎসা করা হইল, কোন ফল হইল না। তৃতীয় সপ্তাহে রোগী আসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, কখন গরমীর ব্যারাম হ'য়েছিল কি? উত্তর "না।" রোগীর শরীর ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতেছে দেখিয়া ক্ষয় রোগ স্থির করিয়া চিকিৎসা করা হইল, রোগী আরোগ্য লাভ করিল। এরূপ অবস্থাও দেখা গিয়াছে।

পাণ্ডু রোগ, উদরী।—রোগী পরিচিত, নিবাস ইটালিতে ছিল। পাণ্ডুরোগের মত লক্ষণ প্রকাশ পায়। কলিকাতার কয়েকজন সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ, এলোপ্যাথ ও হোমিওপ্যাথ চিকিৎসা করেন। তাঁহারা রোগীর পেটে জল হইবে বা হইয়াছে সন্দেহ করেন। ইঁহাকে কিন্তু গুপ্ত যক্ষ্মা মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বীয় মূর্ত্তি দেখাইয়াছিল

আশ্চর্য্য রোগী।—রোগীর বয়স প্রায় চল্লিশ। মুদিখানার দোকান আছে, বাগানে তরকারী করিয়া বিক্রয় করে। আসিয়া অবস্থা জানাইল, —জ্বর, কাস, মুখ দিয়া রক্ত উঠে, অন্যান্য উপসর্গ আরও ছিল, স্মরণ নাই। ক্ষয়রোগ স্থির করিলাম। রোগী—ম'শায় দু বৎসর হ'ল বিয়ে করেছি বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। দুই সপ্তাহ চিকিৎসার পরে রোগী কোথায় গেল জানিনা। এক বৎসর পরে দেখি, রোগী এক প্রকাণ্ড বস্তা মাথায় করিয়া বাজারে চলিয়াছে। কি ব্যাপার, অপ্রবল ক্ষয়রোগ,— না ক্ষয় রোগ নয়, না তাহার নব বিবাহিতা পত্নীর এয়োতের জোর,—এ সমস্যার মীমাংসা হয় নাই।

ম্যালেরিয়ার বেশে যক্ষ্মা।—কখন কখন যক্ষ্মারোগ ম্যালেরিয়ার আকারে প্রকাশ পায়। কিন্তু ইহা প্রায়ই ম্যালেরিয়া-প্রধান-স্থানে হইয়া থাকে, প্রথমে ধরা পড়ে না। ম্যালেরিয়া অপেক্ষা শরীরের অধিকতর ক্ষয় হয় বলিয়া বিজ্ঞ চিকিৎসক কিছুদিন পরে ধরিতে পারেন।

(ক্রমশঃ)

মকরধ্বজের প্রস্তুত প্রণালী।

(২)

আমি যে নিয়মে "মকরধ্বজ" প্রস্তুত করিয়া থাকি, পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে "মকরধ্বজ" সম্বন্ধে আরও দুই একটী কথা বলিব।

অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বে আমার এক পৌত্র একখানা ঔষধের তালিকা পুস্তক আনিয়া আমায় দেখায় এবং রহস্য করিয়া আমাকে বলে—"দাদামশায়! তোমাদের মকরধ্বজ প্রস্তুতের সমস্ত বুজরুকী এইবার ধরা পড়িয়া গিয়াছে। এই দেখ—এই পুস্তকে লেখা রহিয়াছে—মকরধ্বজ খুব কম খরচে তৈয়ার হয়। কবিরাজেরা অনর্থক বহুমূল্য লইয়া মকরধ্বজ বিক্রয় করে। মকরধ্বজের ভরি ৪৲ টাকার বেশী হইতে পারে না।"

নাতী আমাকে বইখানা পড়িতে দিয়া চলিয়া গেল। মাধ্যাহ্নিক আহারের পর আমি বেশ অভিনিবিষ্ট হইয়াই বইখানা পড়িয়া ফেলিলাম, পড়িয়া বুঝিলাম—এক ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইয়াও ঔষধের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে, তাহার অপূর্ব্ব মূল্য-নিরূপন পুস্তিকায় সমস্ত কবিরাজের বিরুদ্ধেই এক চাতুরীময় মন্তব্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে! বইখানা পড়িয়া আমার হাসি আসিল। কেননা ঐ ব্যক্তি লিখিয়াছে —"আমি যে গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ

করিলাম, তাহাতে অনেক কবিরাজই আমাদের ঘোরতর বিরোধী ও শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে, এ বিষয় সুনিশ্চিত।” অর্থাৎ এই লোকটীর বিশ্বাস—এ যে তিন টাকায় এক সের চ্যবনপ্রাশ এবং চারি টাকায় একভরি “স্বর্ণঘটিত বিশুদ্ধ আসল মকরধ্বজ” দিতেছে—ইহাতে স্বার্থে আঘাত লাগিবে বলিয়া বঙ্গদেশের সমস্ত কবিরাজ অসন্তুষ্ট হইবেন! কিন্তু সুখের কথা—কোন শিক্ষিত কবিরাজ—এই ঢক্কানিনাদী-বিজ্ঞাপন পড়িয়া,—লোকটীর একটী কথাও প্রতিবাদ যোগ্য মনে করেন নাই। তাঁহারা জানেন—কালই আসল নকলের বিচার করিয়া দিবে। অনাদিকাল হইতে কবিরাজ মহাশয়গণ যে সম্মান উপভোগ করিয়া আসিতেছেন, একজন অজ্ঞাতকুলশীলের ব্যবসাদারী কথায় সে সম্মানের অণুমাত্রও নষ্ট হইবে না।

এই ব্যক্তি কেমন করিয়া “আসল মকরধ্বজ” সস্তা দিতেছে, তাহার কৈফিয়ৎ দিতে ছাড়ে নাই। পাঠকগণ অগ্রে তাহার কথা গুলা পড়ুন, তাহার পর আমার বক্তব্য আমি বলিব।

“অতি পাতলা স্বর্ণপত্র ১ পল (৮ তোলা) পারদ ৮ পল (৬৪ তোলা) এবং পারদের দ্বিগুণ গন্ধক অর্থাৎ ১৬ পল (১২৮ তোলা) লইয়া একত্র কজ্জলী করিয়া ঘৃত কুমারীর রসে ভাবনা দিয়া সমতল বোতলে পুরিয়া বালুকা যন্ত্রে ৩ দিন পাক করিবে। এবং শীতল হইলে পুষ্পরেণুর ন্যায় লালবর্ণ ঔষধ উঠাইয়া লইবে।”

“পূর্ণমাত্রায় হিসাব দেখাইতে একটু অসুবিধা বলিয়া ৮ ভাগের একভাগের হিসাব দেওয়া গেল।”

“শোধিত স্বর্ণ ১ তোলা ২৫৲ টাকা+ হিঙ্গুলোত্থ পারদ ৮ তোলা ৪৲ টাকা+শোধিত আমলাসা গন্ধক ১৬ তোলা ২৲ টাকা+কাষ্ঠ ১৲ টাকা+বোতল বালি, হাড়ী ইত্যাদি ১৲ টাকা+একটী দক্ষ লোকের পারিশ্রমিক ২৲ টাকা মোট ৩৫৲ টাকা। খরচ একটু বেশী করিয়াই ধরা গেল।”

* * * * * *

“স্বর্ণ যদিও মকরধ্বজের গুণ জন্মায় কিন্তু তাহা কখনও মকরধ্বজের সহিত মিশ্রিত হয় না। বোতলের নীচে যে স্বর্ণভস্ম পড়িয়া থাকে, তাহা আয়ুর্ব্বেদোক্ত কোন ঔষধে ব্যবহৃত হইতে পারেনা বটে, কিন্তু সোহাগা দিয়া গালাইয়া পোদ্দার দোকানে বিক্রী করা যায় অথবা তাহা দ্বারা অলঙ্কারাদিও প্রস্তুত হয়। অতএব পূর্ব্ব প্রদর্শিত মোট খরচ ৩৫৲ টাকা হইতে ২৩৲ টাকা বাদ দেওয়া যাইতে পারে। ৩৫৲—২৩=১২৲ টাকায় অন্ততঃ ৭ তোলা মকরধ্বজ প্রস্তুত হয় অর্থাৎ প্রত্যেক তোলা মকরধ্বজে কোন ক্রমেই ২৲ টাকার অধিক খরচ পড়িতে পারেনা।”

সুতরাং এই ব্যক্তির মতে কবিরাজগণ যে ৩২৲।২৪৲।১৬৲।৮৲ টাকা দরে মকরধ্বজ বিক্রয় করেন, ইহা অতিবড় অমানুষিক নৃশংস ব্যাপার!!

আমি স্বয়ং স্বহস্তে মকরধ্বজ প্রস্তুত করিয়া থাকি। মকরধ্বজ পাক সম্বন্ধে আমার যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে। সেই অভিজ্ঞতার বলে আমি বড় গলা করিয়া বলিতে পারি—বাপু হে! বৈদ্যের ব্যবসায় ধরিয়া পরিবার পালন করিতেছ, কর, তাহাতে কেহ বাধা দিবেনা, কিন্তু বি এ পাশ করিয়া বিজ্ঞান বিরুদ্ধ কথা বলিতে যাও কেন? নিজের কথাতেই

তুমি যে ধরা পড়িয়াছ। তিন দিন মকরধ্বজে জ্বাল দিতে পারে—এমন "দক্ষ লোকের" পারিশ্রমিক কি ২৲ টাকায় হয়? তুমি কি সত্য-যুগের লোক? আমরা ২৫৲ টাকার কম পারিশ্রমিকে ত দক্ষ লোক পাইতেই পারিনা। ৮ ভরি হিঙ্গুলে এক ভরি পারা বাহির হয়—এটা বোধ হয় তোমার জানা আছে। এখন হিঙ্গুলের ভরি ৶০ আনা, এই হিসাবে এক পারার দামই যে ৮৲ টাকা হয়। হিঙ্গুলের দাম বাড়িয়াছে, তোমার মকরধ্বজের দাম তো বাড়ে নাই।

তোমার নিজের কি হিঙ্গুলের খনি আছে? না, "কাশীমপুরের ও ভাওয়ালের গড় এবং টেঙ্গর (পার্ব্বত্য ভূমি) নিকটে থাকাতে"—তোমাকে হিঙ্গুল কিনিতে হয় না? তুমি বোধ হয় হিঙ্গুল "সজীব অবস্থায়" "সকল সময়" "অতি সহজে" ও "সুলভে" মিলাও!

তোমার কামদুঘা দেশে—জ্বালানী কাষ্ঠ একটাকায় ৪ মণ পাওয়া যায়, কিন্তু ৩ দিন মকরধ্বজে জ্বাল দিতে যে ১২ মণেরও বেশী কাঠ লাগে! তোমার দেশের কাঠ কি বৈদিক যুগের অগ্নিমন্থ—অরণি? সে কাঠ কি অতি ধীরে ধীরে পোড়ে?

আমরা মকরধ্বজে যে স্বর্ণ দিয়া থাকি, তাহার ভস্মাবশেষ—ঔষধে প্রয়োগ করিয়া থাকি। তুমি তাহা "সোহাগা দিয়া গালাইয়া" "পোদ্দার দোকানে" বিক্রী কর, অথবা পরিবারের গহনা গড়াও! তোমার হাতের বাহাদুরী আছে। কিন্তু তুমি রসায়ন শাস্ত্রে এমনই অজ্ঞ যে—পারদ ও গন্ধক সংযোগে তিন দিন জ্বাল প্রাপ্ত হইলে স্বর্ণ যে "নিরুত্থ" ভাবে ভস্ম হইয়া যায়, সে জারিত স্বর্ণ যে আর পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে না—এ সহজ বুদ্ধিটুকুও তোমার 'ঘটে' নাই। মকরধ্বজের বোতলের নিম্নদেশে পতিত স্বর্ণ—ঠিক ঝামার মত হইয়া যায়, তাহা আঙুল দিয়া চাপিলে ছাইএর মত চুর্ণ হইয়া যায়। তুমি তো তুমি, স্বয়ং ভরদ্বাজ, অগ্নিবেশ, অত্রি মুনিও সে স্বর্ণ "সোহাগা সংযোগে গালাইয়া"—পূর্ব্বাবস্থায় পরিণত করিতে পারেন না। ধন্য তুমি—সমস্ত বাঙ্গালা দেশটাকে ন্যাকা বুঝাইয়া দিতে চাও! তুমি যখন এত বড় রাসায়নিক—ভস্ম সোণাকেও আসল সোণা করিতে পার—তখন নিশ্চয়ই মুকুন্দ সুরি রচিত "রস-হৃদয়" গ্রন্থখানা পড়িয়াছ। তিনি কি বলিয়াছেন, একবার পড়িয়া দেখ;—

"রসস্যৈকং দ্বিধা গন্ধং সন্ধেম রসপাদিকং
মৃণ্মূষাভ্যন্তরে ক্ষিপ্ত্বা। পুটৈস্ত্রিংশদ্বনোপলৈঃ
এবং পুটদ্বয়াৎ স্বর্ণং নিরুত্থং ভস্ম জায়তে।

রস হৃদয়।

অর্থাৎ একভাগ পারদ, দুইভাগ গন্ধকের সহিত, পারদের সিকিভাগ স্বর্ণকে মুষার মধ্যে রাখিয়া ত্রিশখানি বিল ঘুঁটিয়ার দ্বারা পুট দিবে। এইরূপ দুইটী পুটে স্বর্ণ নিরুত্থ ভস্ম হইয়া থাকে। "নিরুত্থং যৎ পুনর্নজীবতি"—ইতি ভাব মিশ্র। ধাতু যেরূপ ভাবে ভস্ম হইলে, আর পুনর্জীবিত অর্থাৎ পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় না,—তাহার নামই নিরুত্থ। ৬০ খানি ঘুঁটিয়ার জ্বালেই যখন স্বর্ণ নিরুত্থ ভস্ম হয়, তখন ৩ দিনের ক্রমাগত জ্বালে কি হয় ভাব দেখি।

রসজ্ঞ পাঠক! বোধ হয় এইবার বুঝিয়াছেন—পারা ও গন্ধক সংযোগে পাচিত স্বর্ণ আর পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় না। এরূপ অসম্ভবকে সম্ভব করিতে যিনি সক্ষম, তিনি মানুষ নহেন. তিনি সর্ব্বশক্তি[illegible]

এক্ষণে পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—"তবে ৪৲ টাকায় এক ভরি মকরধ্বজ অন্যে বিক্রয় করে কেমন করিয়া ?"

আমিই উত্তর দিতেছি।

অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন—বরিশাল জেলার কাউগাছী গ্রাম, যশোহর জেলার সিন্দ্রানী গ্রাম এবং পূর্ব্ববঙ্গের অন্য কতকগুলি গ্রাম হইতে—কায়স্থ এবং জুগী জাতীয় ঔষধ বিক্রেতারা মধ্যে মধ্যে ঔষধ বিক্রয় করিবার জন্য দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া থাকে। ইহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে এক একটী টিনের বাক্স—বাক্সটী লালবর্ণের "খেরো" বস্ত্রে মণ্ডিত। এই বাক্সে বিক্রেতাগণ "লৌহ" "তাম্র" "বঙ্গ" "খর্পর" "স্বর্ণবঙ্গ" "রসসিন্দুর" প্রভৃতি ধাত্বৌষধ লইয়া—বৈদ্যব্যবসায়ীগণের দ্বারে উপস্থিত হয়। ক্রেতাকে ইহারা ১৲ টাকায় ৮ ভরি "সহস্র পুটিত লৌহ" ১০ ভরি "সহস্র পুটিত অভ্র", ৪ ভরি "বঙ্গ" ও "স্বর্ণবঙ্গ", ১৬ ভরি 'খর্পর' এবং ৪ ভরি "রস সিন্দুর" বিক্রয় করিয়া থাকে। অনেকেই না জানিয়া ইহাদের নিকটে—ধাতুদ্রব্য কিনিয়া থাকেন। কিন্তু ইহারা যে লৌহের পরিবর্ত্তে গেরিমাটী, অভ্রের পরিবর্ত্তে অভ্রচূর্ণ মিশ্রিত-উনানের দগ্ধ মৃত্তিকা, (পাছে কেহ অভ্র বলিয়া বিশ্বাস না করে, সেইজন্য ইহারা কাঁচা অভ্রের বস্ত্র গালিত সূক্ষ্মচূর্ণ—পোড়ামাটীর সহিত মিশায়) বঙ্গের পরিবর্ত্তে হোয়াইট লেড বা রং সফেদা, খর্পরের পরিবর্ত্তে বিলাতীমাটী দিয়া খরিদ্দারগণকে প্রবঞ্চিত করে,—এখন অনেকেই তাহা জানিতে পারিয়াছেন। ইহাদের প্রস্তুত "রস সিন্দুর" অতি উজ্জ্বলবর্ণ, তাহার চটি—দিব্য পরিপাটী, মূল্যও কত সুলভ—একটাকায় ৪ ভরি! এই "রস সিন্দুরই"—শিব কণ্ঠস্থিত সর্পের মত কখনও "আসল স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ" কখনও "ষড়গুণ বলিজারিত সিদ্ধ মকরধ্বজ" কখনও বা "স্বর্ণসিন্দুর" নামে—আলমারী শিশিতে স-গৌরবে শোভা পাইয়া থাকে এখন পাঠক মহাশয় বিবেচনা করিয়া দেখুন—এক টাকায় ৪ ভরি "মকরধ্বজ" কিনিয় তাহার প্রত্যেক তোলা আমি যদি প্রলোভ পূর্ণ বিজ্ঞাপনের সাহায্যে ৪৲ টাকা দরে বিক্র করি, তাহা হইলে ১৲ টাকায় আমার ১৫ টাকা লাভ হয় কিনা ?

এই সকল "লৌহ-অভ্র-মকরধ্বজ" বিক্র কারিগণ—ইহাদের কুলক্রমাগত শিক্ষার ফলে ৩ ঘণ্টায় এক পাক "মকরধ্বজ" প্রস্তুত করিতে পারে। এই "মকরধ্বজ" হিঙ্গুলেরই রূপান্ত মাত্র। সামান্য পারিশ্রমিক পাইলে এবং এব বেলা পেট ভরিয়া খাইতে দিলে—ইহারা কবিরাজের বাটীতে বসিয়া তথা-কথিত "মক ধ্বজ' পাক করিয়া দেয়। পারায় জাল দিবে বংশ থাকেনা—যাহাদের মনে এইরূপ ভ আছে, তাঁহারা ইহাদের দ্বারাই "রস সিন্দুর ওরফে "মকরধ্বজ" প্রস্তুত করাইয়া লন রসসিন্দুরকে সুদৃশ্য চাকচিক্যশালী করিবার জন্য ইহারা কজ্জলীর সঙ্গে মনছাল এবং তাম্র চূর্ণ মিশ্রিত করে। ইহাতে চটি বেশ ঝকঝকে এবং পাতলা হয়, কখনও বা ময়ুরপুচ্ছের চন্দ্রিকার' মত বিচিত্র বর্ণের আভাও ধারণ করে।

কিন্তু, যাহা প্রকৃত 'মকরধ্বজ', তাহা কখনই অল্প মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে না। আমি ইহার উদাহরণ দিতেছি। ভারতের অদ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক ডাঃ পি,সি রায়, যাহার প্রতিষ্ঠাতা, সেই জগদ্বিখ্যাত বেঙ্গলকেমিকেল ও ফার্মাসিটিকেল ওয়ার্কসে—আজ কাল ব

ধ্বজ প্রস্তুত হইতেছে, এ মকরধ্বজের কাটতিও খুব, কিন্তু এই ঔষধালয়ের সুবিজ্ঞ কার্য্যাধক্ষ —৪৲ চারি টাকায় ১ ভরি মকরধ্বজ বিক্রয় করেন না। ডাক্তার কার্ত্তিক চন্দ্র বসু এম বি —তাঁহার প্রসিদ্ধ ল্যাবরেটরীতে বিশুদ্ধ "মকরধ্বজ" প্রস্তুত করিতেছেন, তিনিও ১৬৲ টাকা ও ২৪৲ টাকার কমে "মকরধ্বজ" বিক্রয় করেন না। বসুর ল্যাবরেটরীর "মকরধ্বজ"ও লোকে আদর করিয়া কিনিয়া থাকে। বেঙ্গল কেমিকেল এবং বসুর ল্যাবরেটরীতে—এক সপ্তাহ মকরধ্বজের মূল্য ৸৵০ চৌদ্দ আনা। মকরধ্বজ যদি সস্তা দামে বিক্রয় করা সম্ভব হইত, তবে সর্ব্বাগ্রে এই উভয় কারখানার স্বত্বাধিকারিগণ সস্তায় দিতে পারিতেন।

এইবার "মকরধ্বজের" অনুপানের একটু আলোচনা করা যাউক। পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ—যিনি বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া "চূড়ান্ত সস্তায় ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন," তিনি মকরধ্বজ সেবনের এক অনুপানের তালিকাও ছাপিয়াছেন। নহিলে অনুষ্ঠানের ত্রুটি হইবে যে! পাঠক মহাশয়! একটু নমুনা দেখিবেন কি? যথা;—

"স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ও বায়ুর জন্য—চাউল ধোয়া জল ও মিশ্রী অথবা মাখন বা দুধের সর এবং মিশ্রী, ত্রিফলা (হরিতকী বহেড়া আমলকী) ভিজানো জল, মিশ্রি অথবা বাদাম কিম্বা বড় এলাচি বাটা মিশ্রী সহ বৈকালে উপযুক্ত মাত্রায় মকরধ্বজ সেবনীয়।"

"পিত্ত রোগে—ধনে মৌরী ভিজান জল মিশ্রী সহ অথবা গুলঞ্চ বা পটোল পাতার রস মধু সহ প্রাতে উপযুক্ত মাত্রায় মকরধ্বজ সেব্য।"

"কফরোগে—আদার রস মধু অথবা আদার রস মিশ্রী সহ কিম্বা তুলসী পাতার রস আদা ও মধুসহ, পানের রস মিশ্রী কিম্বা পিপুল চূর্ণ ও মধু সহ মকরধ্বজ সেব্য।"

"নব জ্বরে—তুলসী পাতার রস, পানের রস আদার রস মধু অথবা পানের রস, সৈন্ধব লবণ (শরীরে বেদনা থাকিলে) বেল পাতার রস ও মধু সহ মকরধ্বজ সেব্য।"

"পুরাতন জ্বরে—সেফালিকা পাতার রস মধু বা গুলঞ্চের রস মধু অথবা চিরতা ভিজান জল মধু সহ সেব্য।"

"প্রমেহ রোগে—কাঁচা হরিদ্রা রস মধু বা কেশুর্ত্তার রস মধু অথবা কাবাব চিনী চূর্ণ মধু কিম্বা গঁদ বা ঈসবগুল ভিজান জল মিশ্রী সহ * * সেব্য।"

"অর্শোরোগে—নাগেশ্বর ফুলের রেণু চূর্ণ এবং মাখন মিশ্রী অথবা গাঁদা ফুলের পাতার রস ও সাফ চিনী সহ কিম্বা যমানী চূর্ণ বিট লবণ ও ঘোল সহ * * সেব্য।"

মকরধ্বজের এইরূপ অনুপানের সুদীর্ঘ তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। অধিক উদ্ধৃত করিব না। এক কথায় ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে,—যে যে মুষ্টিযোগে যে যে রোগ ভাল হয়—ব্যবসায়ী বাবুটীর পুস্তকে তাহা অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে। রসুন বাটা, এরণ্ডমূল, কিছুই বাদ যায় নাই। দুঃখের বিষয়—শাস্ত্রে এরূপ অনুপানে মকরধ্বজ সেবনের ব্যবস্থা আদৌ লিখিত হয় নাই। বাবু যে রোগে যে টোটকার ব্যবহার দেখিয়াছেন তাহাই মকরধ্বজের অনুপান করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমার বক্তব্য—ঐ সকল অনুপান শুধু সেবন করিলেই ত ফল পাওয়া যায়। উহার সঙ্গে "মকরধ্বজ" মিশাইবার প্রয়োজন কি? কাঁচা হলুদের রস মধুসহ সেবনে প্রমেহ রোগ আরোগ্য হয়,—তবে ইহার সঙ্গে মকরধ্বজ প্রয়োগের

সার্থকতা কোথায়? ঘুঁটেরছাই, সিউলী পাতার রসের সহিত সেবন করিলে পুরাতন জ্বর ভাল হইতে পারে। এ আরোগ্য ফল— সিউলী পাতারই প্রাপ্য, ঘুঁটের ছাইয়ের নহে। ইহার দ্বারা ঘুঁটের ছাইএর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা যায় না। অনুপানের অর্থ—ঔষধের সহিত কোনও বিকট বিস্বাদ পদার্থের মিশ্রণ নহে। অনুপান অর্থে পশ্চাৎ পান বুঝায়। ঔষধ সেবন করিয়া মুখ বিকৃত হইলে, সেই বিকৃতি সংশোধনের জন্য যাহা সেবন বা চর্ব্বণ করা যায়—তাহারই নাম "অনুপান"। এই সাদা কথাটা যে বুঝেনা, সে যদি আপনাকে আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ বলিয়া জাহির করিতে চায়, হাসি পায় না কি?

পরিভাষায় বৈদ্যরাজ শ্রীকণ্ঠ বলিয়াছেন—
ভক্ষয়েৎ ভেষজং মুখ্যং জলৈর্বা মধুনা সহ।
ক্ষীরমিক্ষুরসং যূষমনুপানং প্রশস্যতে॥

ধাতুঘটিত মুখ্য ঔষধ জল অথবা মধুর সহিত মাড়িয়া খাইবে। অনন্তর দুগ্ধ, ইক্ষুরস, মুদ্গ বা মসুরাদির যূষ অনুপান করিবে। বলা বাহুল্য মকরধ্বজ একটী মুখ্য ভেষজ ইহা অকৃত্রিম হইলে কেবল মধু দিয়া মাড়িয়া খাইলেই যথেষ্ট। সেবনান্তে ইচ্ছামত দুগ্ধাদি পান করিতে পার। ইহাই হইতেছে অনুপান। রসুনবাটা, পলতা ছেঁচা, এরণ্ড মূলের রস, প্রভৃতির দ্বারা মকরধ্বজ মাড়িয়া খাওয়া— আয়ুর্ব্বেদ সম্মত নিয়ম নহে। উহার নাম অনুপান নহে, উহা সহপান। তোমরা এইরূপ উৎকট উদ্ভট বিকট স্বরস কল্ক চূর্ণাদি— ঔষধের সহিত মিশাইবার ব্যবস্থা দিয়া, লোকের পক্ষে কবিরাজী ঔষধ সেবন—বিভীষিকাময় করিয়া তুলিয়াছ। তোমাদের মত শাস্ত্রে অনধিকারী অথচ অহঙ্কারে স্ফীত ব্যক্তির সহিত তর্ক করিতেও আমাদের প্রবৃত্তি হয় না।

কত ওজনের মসলা আগুণে চড়াইলে, কতটা মাল উৎপন্ন হইতে পারে, এ জ্ঞানও তোমার নাই। কেননা তুমি যে ৮ ভাগের এক ভাগের হিসাব দিয়াছ, তাহাতে ৭ ভরি মকরধ্বজ উৎপন্ন হইতে পারে না। বিশেষতঃ ৩ দিন পাক করিলে পারা অনেকটা উড়িয়া যায়। এমন কি, সাড়ে তিন ভরি কিম্বা পৌনে চার ভরির বেশী মাল জন্মে না। তুমি নিজে "কাজের কাজী" নহ, কেবল পরের কথায় বিশ্বাস করিয়া হিসাব দিয়াছ! আগে নিজে মানুষ হও, পরে—অপরের কার্য্যের সমালোচনা করিও। নহিলে তোমাকে দেখিয়া বৈদ্য সমাজ "ভূতাপ সরণ" মন্ত্রই পাঠ করিবে।

শ্রীসদানন্দ সেন গুপ্ত।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

বিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষ।—করুণাময় জগদীশ্বরের অপার করুণাবলে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষ পূর্ণ হইয়া আসিল। এইবার এই বিদ্যালয় তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিবে। লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধারের জন্যই এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। বর্ত্তমান সময়ের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের চিকিৎসা যে ভুলিয়া গিয়াছেন, এ কথা

অস্বীকার করিবার যো নাই। যতগুলি কারণে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অবনতি ঘটিয়াছে,—আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক মণ্ডলী অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদে সুশিক্ষিত না হওয়া তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ। এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় ছাত্রগণকে সেই লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষাই যত্নপূর্ব্বক দেওয়া হইতেছে। সুতরাং এই বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রগণ কায়-চিকিৎসার মত কাটাফাড়া, পোয়াতিখালাস প্রভৃতি সকল প্রকার চিকিৎসাতেই কৃতিত্ব লাভ করিয়া আয়ুর্ব্বেদের গৌরব বর্দ্ধনে যে সক্ষম হইবে, সে পক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

বৈদ্যের কর্ত্তব্য।—চিকিৎসা বৃত্তিতে বৈদ্যজাতির যেরূপ গৌরব, এমন আর কিছুতে নাই। রাজা—মহারাজা হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য গৃহস্থ পর্য্যন্ত—সকলকেই চিকিৎসকের বশ্যতা স্বীকার করিতে হয়। পক্ষান্তরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভে বঞ্চিত হইয়া যাঁহারা জীবিকা নির্ব্বাহের কোন পন্থাই স্থির করিতে পারিতেছেন না, তাঁহাদিগের পক্ষে পাঁচ বৎসর কাল অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষা সমাপ্তি পূর্ব্বক স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বনের,ইহা যে মাহেন্দ্র সুযোগ, সে কথা স্বীকার করিতেই হইবে। চিকিৎসায় সিদ্ধিলাভ করিলে অর্থপ্রাপ্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের চিন্তা তো থাকেই না, তদ্ভিন্ন মিত্রতা, ধর্ম্মসঞ্চয় এবং যশঃ লাভও যে ইহা দ্বারা ঘটিয়া থাকে ইহা সুনিশ্চয়। সেইজন্য আমরা অণ্ডার গ্রাজুয়েট ছাত্রবৃন্দকে—পরামর্শ প্রদান করিতেছি, তাঁহারা সামান্য চাকরির চেষ্টায় সময় নষ্ট না করিয়া এই নূতন সেসন্সের আরব্ধ কালেই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষায় মনোভিনিবেশপূর্ব্বক নিজের জীবিকা নির্ব্বাহের সংস্থান এবং সেই সঙ্গে দেশের-দশের-সমাজের মঙ্গল সাধনে যত্নবান হউন। পরোপকার করিবার এরূপ বৃত্তি জগতে যে আর একটিও নাই।

আয়ুর্ব্বেদের উপর আবগারি।—গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠের "হিতবাদী"তে ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত রাখাল চন্দ্র দত্ত কবিরাজ একখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ,—

> "প্রায় দুইমাস হইল একটি সাহেব Excise Inspector ঢাকা বাবু বাজারস্থিত কবিরাজ শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র কবিরঞ্জন মহাশয়ের একটি রোহিত কারিষ্টের বোতল খরিদ করিয়া কবিরাজ মহাশয়ের সম্মুখেই খুলিয়া লইয়া যান। ইহাতে নাকি Chemical Examinationএ শত করা ১৭ এলকোহল পাওয়া গিয়াছে। সেই উপলক্ষে গত কল্য সন্ধ্যাকালে কবিরাজ মহাশয়কে গ্রেপ্তার করিয়া অদ্য ম্যাজিষ্ট্রেট সমক্ষে উপস্থিত হইবার জন্য জামিন লওয়া হইয়াছে। গতকল্য কবিরাজ মহাশয়ের দোকানের অমৃতারিষ্ট প্রভৃতি সকলপ্রকার অরিষ্টই পুলিশ লইয়া গিয়াছে।"

বিচারে ইহার কি হইল, তাহা এখনও প্রকাশ হয় নাই, সুতরাং সে সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিবনা, তবে কবিরাজী আসব এবং অরিষ্টে যে অ্যালকোহলের বিন্দুমাত্রও পাওয়া যায় না—ইহাতো নিশ্চয় কথা, সেই জন্য ধৃত কবিরাজ মহাশয়ের আসবাদিতে কি করিয়া অ্যালকোহল পাওয়া গেল, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছিনা। মৃত সঞ্জীবনীর মত যে ঔষধ চুঁয়াইয়া প্রস্তুত করা হয়, তাহাতে অ্যালকোহল আছে এবং সেইজন্য সে ঔষধের প্রচলন দেশ হইতে একরূপ লোপই পাইয়াছে। আসব এবং অরিষ্টকেও যদি সেই শ্রেণীতে ফেলা হয়, তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা করা যে দায় হইয়া উঠিবে। যাহা হউক আমরা এই মকদ্দমার বিচার ফল জানিবার জন্য উৎসুক রহিলাম।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

২য় বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৫—শ্রাবণ। | ১১শ সংখ্যা।

কাজের কথা।

বালক রক্ষা।—বাঙ্গালীর অকালমৃত্যুর পরিমাণ যত অধিক, পৃথিবীর কোনো দেশে আর এমনটা নাই। ইহার প্রধান কারণ বাঙ্গালীর ব্রহ্মচর্য্যের অভাব। একদিন অবশ্য এমনটা ছিল না, একদিন বাঙ্গালী ব্রহ্মচর্য্য-পালনই ধর্ম্মরক্ষার মূলগ্রন্থি বলিয়া মনে করিত। তাহার ফলে বাঙ্গালী-বালকের গুরুগৃহে অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার ব্যবস্থা হইত। এখন সে পদ্ধতি দেশ হইতে লোপ পাইয়াছে, ফলে চিররুগ্ন-বাঙ্গালীজাতি পরমায়ু থাকিতেও মৃত্যুকে প্রিয় সুহৃদ জ্ঞানে অকালে আলিঙ্গন করিতেছে।

* * * *

ব্যাধির কারণ।—ব্যাধির কারণ যে পাপ-প্রবণতা, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আজি বাঙ্গালীর শতকরা নিরানব্বই জন ডিস্‌পেপসিয়া বা অজীর্ণ রোগগ্রস্থ কেন?—ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে পাপের প্রসার বৃদ্ধিই তাহার কারণ। অজীর্ণরোগে ভুক্ত অন্ন সম্যকরূপে পরিপাক প্রাপ্ত হয় না কেন?—অগ্নির অভাবে। পরিপাক ক্রিয়ার সম্পাদন করাই তো অগ্নির কার্য্য, তবে তাহার ব্যতিক্রমের কারণ কি?—পাপ সঞ্চয়। শুক্ররক্ষা জঠরাগ্নির ক্রিয়া সম্পাদনের মূল। বাঙ্গালী সেই শুক্র রক্ষার অভাবে যে পাপ সঞ্চয় করিতেছে, বাঙ্গালীর অজীর্ণ তাহারই মুখ্যতম কারণ। আজি অজীর্ণ সারাইবার জন্য বাঙ্গালী ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সে অজীর্ণ সারিবে কেমন করিয়া! আগে শুক্ররক্ষার চেষ্টা কর, তাহার পর রোগ আরোগ্যের চেষ্টা করিও।

* * * *

অকাল মৃত্যু।—শুক্রক্ষয়ই অকাল মৃত্যুর সর্ব্বপ্রধান কারণ। শুক্ররক্ষা করিতে পারিলে, যে সকল সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করে, তাহারা সবল, সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া থাকে। বাঙ্গালী অপেক্ষা অন্যান্য জাতি

এই জন্যই সবল, সুস্থ ও দীর্ঘায়ু। তাহার পর পিতামাতার মনোপ্রবৃত্তির সহিত অপত্য কুলের মনো প্রবৃত্তি স্বভাবতঃই সুসম্বদ্ধ। কাজেই ব্রহ্মচর্য্য বিহীন পিতামাতার বংশধরগণ যে শুক্ররক্ষায় একান্ত উদাসীন হইবে, তাহা তো নিশ্চয় কথা। বালক রক্ষা করিতে হইলে,—সমাজ রক্ষা করিতে হইলে—দেশ রক্ষা করিতে হইলে—আমাদিগকে এ সকল বিষয় বিশেষরূপে চিন্তা করিতে হইবে। প্রত্যেক জনক-জননীকে অপত্যগণের দীর্ঘ জীবন-কামনায় নিষ্কলঙ্ক চরিত্র—আদর্শ পুরুষ-প্রকৃতি হইতে হইবে,—শুধু বচনে চলিবেনা.—কার্য্যতঃ ব্রহ্মচর্য্যরক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বালক রক্ষার—বাঙ্গালী-রক্ষার ইহা ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই।

* * * *

ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্য।—ছাত্র জীবনে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ একটু চিন্তাশীল হইয়াছেন জানিয়া আমরা সুখী হইয়াছি, কিন্তু এ শিক্ষাটা অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের মত একান্ত প্রয়োজনীয় হইবে না। আমাদের মনে হয় এ শিক্ষাটাও অন্যান্য শিক্ষার মত একান্ত প্রয়োজনীয় হইলে মন্দ হইত না। আমাদের দেশের বালকগণ অধঃপতনের পথ কিরূপ পরিষ্কার করিতেছে, রেলে-ষ্টীমারে এবং কলিকাতার সৌধগুলির দেওয়ালগুলি লক্ষ্য করিলেই তাহার যাথার্থ্য নির্ণীত হইতে পারে। বালকগণের পাপাশক্তির আবেশ উচ্ছাস যখন প্রবল হইয়া পড়ে, তখনই এই সকল স্থলে কুৎসিত কথা লিখিয়া তাহাদিগের শিরিষ কুসুম-সুকোমল-হস্ত কলুষিত করিতে তাহারা কুণ্ঠিত হয় না। দেশের-চিন্তাশীলগণ এ সকল বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন কি? এই সকল বিভৎস ব্যাপার যখনই আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া থাকে, তখনই আমরা দেশের অধঃপতন কতটা গড়াইয়াছে, বুঝিতে পারি,—বুঝিয়া মর্ম্মাহত হই; কিন্তু প্রতীকার করিবার উপায় আমাদের ক্ষমতা-বহির্ভূত।

* * * *

প্রতীকারের উপায়।—প্রতীকারের উপায় কিন্তু আছে, তবে সে উপায়টার জন্য আমাদিগকে রাজকীয় শাসনের শরণ গ্রহণ করিতে হইবে। প্রাসাদের দেওয়ালে হউক, রেল গাড়ীতে বা ষ্টীমারে হউক—কেহ ঐরূপ লিখিতেছে দেখিলেই, আগে আইনের বন্ধন আঁটিবার ব্যবস্থা করিয়া, পুলিশ কর্ম্মচারীর হস্তে তাহাদিগকে অর্পণ করিতে হইবে। যদি এইরূপ ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে এরূপ কুৎসিত লেখার চলনটা হাটে-ঘাটে আর দেখিতে পাওয়া যাইবে না। এরূপ লেখার ফলে—যাহারা ঐরূপ লিখিয়া থাকে—শুধু তাহাদেরই যে অবনতি ঘটিতেছে তাহা নহে, এরূপ লেখা পাঠ করিয়া অনেক চরিত্রবান-বালকও চরিত্রহীনতার পথে উপস্থিত হইবার সুযোগ পাইতেছে। বাস্তবিকই আমরা যখন রেল বা ষ্টিমার যোগে গমন করি, তখন আমাদের সহিত আমাদের সন্তান-সন্ততি বা ঐ শ্রেণীর কেহ থাকিলে, লজ্জায়—ঘৃণায় অধোবদন হইয়া থাকি। ইহার প্রতীকারের জন্য কর্ত্তৃপক্ষগণের যে হস্তক্ষেপ করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন।

হোমিওপ্যাথি—আয়ুর্ব্বেদ সমুদ্রের একটী তরঙ্গ।

——:০:——

বর্ষকাল পূর্ব্বে, এই "আয়ুর্ব্বেদেরই" অবতরণিকায় আমরা শিখিয়াছিলাম—"আয়ুর্ব্বেদ একটী মহা সমুদ্র, অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, হাইড্রোপ্যাথি, টিস্যুরেমিডি, হাকিমী—সেই মহা সমুদ্রের এক একটী তরঙ্গ।" আজ আবার সেই কথার পুনরুক্তি করিতেছি।

আমেরিকার অদ্বিতীয় হোমিওপ্যাথ, ডাক্তার ন্যাশ্—তাঁহার অসাধারণ অভিজ্ঞতা ও কর্ম্মক্ষেত্রের যুক্তিময়ী গবেষণা—একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ঐ পুস্তক খানির নাম—How to take the case. সম্প্রতি ঐ পুস্তকের এক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। বন্ধুবর ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্—এই পুস্তকখানি আমাদিগকে পড়িতে দিয়াছেন। গ্রন্থের বিশেষত্ব—গ্রন্থকার প্রকৃত সাধকের ন্যায় হোমিওপ্যাথির বিজ্ঞান-বৈচিত্র্যকে মহত্তর করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার অপূর্ব্ব লিপি-কৌশলে, মহা প্রলয়ের নিরালোক শূন্যতা—অভয়হস্তের সেবা-সান্ত্বনায় ভরিয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ে আমরা এক ত্যাগশীল তপস্বীর উদার হৃদয়ের পূর্ণ পরিচয় পাইয়াছি।

এখন বাঙ্গালার ঘরে ঘরে—"পল্‌সেটিলা-নক্স-সম্বলিত বক্স!" অনেকের ধারণা—হোমিওপ্যাথি ঔষধে উপকার না হইলেও অপকার হয় না। এইরূপ হোমিওপ্যাথকে সম্বোধন করিয়া ডাক্তার বলিতেছেন—"উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগে শরীর হইতে যেমন উৎকট ব্যাধি দূরীভূত হয়, তেমনি অনুপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগে নূতন ব্যাধির সৃষ্টি হয়। সুস্থের প্রাণ বিনাশ করিবার ক্ষমতা যদি আমাদের ঔষধের না থাকে, তবে অসুস্থকে আরোগ্য করিবার ক্ষমতাও তাহার নাই।" কেমন সরল সুন্দর সত্য কথা! গ্রন্থকার আরও বলিয়াছেন—"একখানা তীক্ষ্ণ ধার ক্ষুর ব্যবহারে যেরূপ বিপদের সম্ভাবনা, ঔষধের অনুপযুক্ত ব্যবহারেও তদ্রূপ বিপদের সম্ভাবনা। * * এই সকল ঔষধ দ্বারা যেরূপ মহা উপকার সাধন করা যাইতে পারে, তদ্রূপ মহা অনিষ্টও করা যাইতে পারে।"

যাঁহারা বলেন হোমিওপ্যাথি ঔষধে উপকার না হইলেও কোন অপকার হয় না;—আশা করি আস্ফালন করিবার পূর্ব্বে, তাঁহারা ডাক্তার ন্যাশের কথাটা একবার ভাবিয়া দেখিবেন। যাঁহারা হোমিওপ্যাথি-বিজ্ঞানের রহস্য বুঝেন না, তাঁহারা হোমিওপ্যাথি ঔষধের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য যে সকল কৌশল অবলম্বন করেন, পূর্ব্বোক্ত মন্তব্যটী (অর্থাৎ হোমিও ঔষধের দ্বারা অপকার হয় না) তাঁহার অন্যতম। এইরূপ যুক্তিহীন মতবাদীগণকে আমরা মহাত্মা কেণ্ট ও ডাক্তার ন্যাশের উপদেশ অনুধাবন করিতে পরামর্শ দিতেছি।

ডাক্তার ন্যাশ হোমিওপ্যাথিকে ব[illegible] করিবার জন্য আর একটী কথা বলিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

"হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে কোনও রোগী নীরোগ হইতে না

হইবেও না। কারণ এই চিকিৎসা ভিন্ন 'রোগের' সমূল উৎপাটন করিবার আর অন্য পন্থা নাই।" একথাটা অবশ্যই ন্যাশ সাহেব অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন; আমরা কিন্তু হোমিপপ্যাথির এই দাবীটুকু সমূলক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। ডাক্তার ন্যাশ যদি মনোযোগ দিয়া ভারতের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র পাঠ করিতেন, আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি—নিশ্চয়ই তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন ঘটিত। কেননা আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধগুলি রোগীর নির্গদ-রূপে ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ কর্ত্তৃক পরিকল্পিত হইয়াছিল। তাহা শিশ্নোদর-পরায়ণ-মানব মস্তিষ্কের বৈজ্ঞানিক বুদ্বুদ নহে। আয়ুর্ব্বেদের যুক্তি ব্যাপাশ্রয় চিকিৎসা, আজ যাহাকে "হয়" বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, কাল তাহাকে "নয়" বলিয়া বিসর্জ্জন দিতে পারে নাই। বিশেষতঃ আয়ুর্ব্বেদ বেত্তাগণ—যেরূপ অমানুষিক প্রতিভাবলে ব্যাধির স্বরূপ নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন,—সেরূপ প্রতিভা স্বল্পজীবী কলির মানবে বিকশিত হইতে পারে না। তবে ইহাও নিশ্চয়—আমরা সে লোকাতীত জ্ঞানের যথার্থ উত্তরাধিকারী নহি।

ডাক্তার ন্যাশ যে হোমিওপ্যাথির একনিষ্ঠ সাধক, সেই হোমিওপ্যাথিও—ভারতের আয়ুর্ব্বেদের অঙ্গীভূত। আয়ুর্ব্বেদ সমুদ্র, হোমিওপ্যাথি তাহার একটী তরঙ্গ মাত্র। এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে আমরা তাহা দেখাইয়া দিব।

জগতে সকল শক্তির ন্যায় জীবনী শক্তিরও বিকাশের পথ ব্যোমিক বিস্ফুরণের ভিতর দিয়া। প্রণব—এই বিস্ফুরণের সঙ্কেত। তুমি, আমি, বৃক্ষ, লতা, বিশ্বের যাহা কিছু সর্ব্বস্ব—সমস্তই ওঁকার বা আদিম বিস্ফুরণের প্রসব। তোমার আমার দৈহিক পরমাণুপুঞ্জ নিয়তই বিস্ফুরণশীল। য়ুরোপের বিজ্ঞানে ইহারই নাম "অ্যানিবিক মুভমেণ্ট।" যে কোন কারণেই হউক—এই আনবিক স্ফুরণের সাম্যাবস্থা নষ্ট হইলে তাহাকে বিকার বা রোগ বলে। আত্মজ্ঞ জীবনী শক্তি—পুরুষ-শরীরের সর্ব্বত্র ব্যাপী, শরীরের সূক্ষ্ম (অনু ধাতু) উপাদানের উপর আদেশ চালাইয়া—এই পুরুষই আপনার ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্ত করেন। ঋষিকল্প বৈজ্ঞানিক হানিমান বলিয়াছেন—

When a person falls ill, it is only this spiritual self acting vital force, every where Present in the organism, that is Primurily deranged by the dynamic influence of a morbific agent' inimical to life or genon. বিজ্ঞান যেখানে সত্য প্রচার করিতেছে সেখানে হারীত ও হানিমানে প্রভেদ কোথায়?

ধন্বন্তরি কল্প বাগভট একজন পাকা বৈজ্ঞানিক ছিলেন। বাগ্‌ভট বলিয়াছেন—"লক্ষণ ভিন্ন ব্যাধির স্বরূপ মানুষে জানিতে পারে না।" পঞ্চ-তন্মাত্র স্পৃষ্টা প্রকৃতি দ্রৌপদীকে বিবসনা করিয়া, তাহার স্বরূপ দেখিবার শক্তি কাহার আছে? বিপর্য্যস্ত প্রকৃতির আর্ত্তস্বরের নামই ব্যাধি; প্রকৃতি যখন প্রকৃতস্থা হইবার জন্য মানবের সাহায্য প্রার্থনা করেন, তখন তিনি নিজের অভাব অভ্রান্ত রূপেই ব্যক্ত করিয়া থাকেন। শবচ্ছেদের প্রয়োজন নাই, শারীর তত্ত্ব নিরূপণের জন্য নর-বলি অনাবশ্যক; লক্ষণই সব। সম্পূর্ণ লক্ষণে সম্পূর্ণ রোগ [illegible]

কার্য্যও কারণ একই পদার্থ।" এই বাগ্ভটের যুগেই পৃথিবীতে প্রথম লাক্ষণিক চিকিৎসার আবির্ভাব হইয়াছিল। এই মহাকথাই, বহু শতাব্দি পরে, মহাত্মা হ্যানিমানের কর্ণে প্রতিধ্বনি তুলিয়াছিল।

আয়ুর্ব্বেদের "সদৃশ সূত্র" যাহা, য়ুরোপের হোমিওপ্যাথিও তাহা। এই সদৃশ-সূত্রের ভিত্তির উপর—হ্যানিমান যে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন. একথা অস্বীকার করা চলে না। "সমঃ সমং শময়তি" এই সদৃশ সূত্রের ইংরাজী অনুবাদ—Similia Similibus carantur. সদৃশ চিকিৎসার মুখ্য উপদেশ—"রোগের সমস্ত লক্ষণগুলি সম্পূর্ণরূপে না জানিলে চিকিৎসক তাহার প্রতিকার করিতে পারেন না। অতএব রোগমাদৌ পরীক্ষেতঃ ততোঽনন্তর মৌষধং। ততঃ কর্ম্ম ভিষক্ পশ্চাৎ জ্ঞান পূর্ব্বং সমাচয়েৎ।"

আয়ুর্ব্বেদের সদৃশ-সূত্র যে কি গবেষণা-ময় —এক কথায় তাহা বুঝান যায় না। এই মতে চিকিৎসা করিতে গেলে চিকিৎসককে রোগের অবস্থান স্থান," অনুভূতি "উপচয়" "অপচয়" "কারণ [বিপ্রকৃষ্ট, সন্নিকৃষ্ট] ধাতু" "প্রকৃতি" 'পূর্ব্বরূপ" „লক্ষণ" বিশেষ লক্ষণ সাম্য প্রভৃতি সকল তত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে হইবে। উপাদানের বিশ্লেষণ করিয়া নিপুণ হস্তে ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। হোমিওপ্যাথির Location, sensasion, modality, causes, constitution and temperement প্রভৃতির সহিত আয়ুর্ব্বেদের সদৃশ সূত্রের রীতি-মত ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাতঃকালে শিশির পড়ে, মধ্যাহ্নে তাপ বৃদ্ধি হয়, সন্ধ্যায় বায়ু বলবান হইয়া উঠে। বাল্যে শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হয়, যৌবনে পিত্ত, বার্দ্ধক্যে বায়ু—কালের ধর্ম্ম শারীর মানস ও জড় ভেদে ত্রিজগতেই এক, এই ত্রিতত্ত্বের একীকরণ—আয়ুর্ব্বেদের বিশেষত্ব। ইহা হইতেই রোগের উপচয় উপশমের কারণ বুঝিতে পারা যায়। বহু যুগ পূর্ব্বে ভারতের ঋষি এ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। হিন্দু সন্তান এ সকল তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়াছে, তাই সে অন্যের মুখের একটা কথা শুনিলে বিস্ময়-মুগ্ধ হইয়া পড়ে। অতীতের প্রতি অশ্রদ্ধা—তাহাকে আত্মহারা করিয়াছে। বিপুলায়তন ভারতে যে জিনিষ অতি পুরাতন, তাহাকেই সে অপরের আবিষ্কার মনে করে।

আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি—আয়ুর্ব্বেদই জগতের একমাত্র আয়ুর্ব্বেদ ছিল। বেদ-অনন্তকাল ব্যাপী, "আয়ুর্ব্বেদও সেই বেদ,—সকল রূপ চিকিৎসা তত্ত্বই আয়ুর্ব্বেদের ভিতর নিহিত. রহিয়াছে। এখন আয়ুর্ব্বেদের, অবনতির যুগ, তথাপি সমগ্র চিকিৎসার মৌলিক তত্ত্বগুলি আজিও আয়ুর্ব্বেদ-সূত্রের উপর স্থাপিত। খৃষ্ট-ধর্ম্ম—যেমন বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনুবাদ, জগতের চিকিৎসা গ্রন্থ তেমনি আয়ুর্ব্বেদের প্রভা-পুষ্ট। জীবের দেহ ধাতু সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন-শীল—স্বতঃই ক্ষয়-প্রবণ, "তোমরা ধাতুর সেই সাম্য দিয়া ক্ষয় পূরণ কর —তোমাদের দেশ হইতে অকাল মৃত্যু অকাল বার্দ্ধক্য, অস্বাভাবিক রোগ শোক, বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।"—ভারতের উদার-বিজ্ঞানের ইহাই একমাত্র উপদেশ। আয়ুর্ব্বেদে যে তত্ত্ব নাই, সে তত্ত্ব জগতের কোথাও নাই। চরকের উক্তির চরম সার্থকতা—

"যন্নেহাস্তি নতৎ কচিৎ!"

তাই বলিতেছিলাম—আয়ুর্ব্বেদে যাহা নাই, —হোমিওপ্যাথি তাহা কোথায় পাইবে? হোমিওপ্যাথির ঔষধ-নির্ব্বাচনে আয়ুর্ব্বেদের

সেই দ্রব্যের বীর্য্য ও শক্তি-রহস্যই পরিস্ফুট, হোমিওপ্যাথেরা অল্প মাত্রায় ঔষধ ব্যবহার করেন। আয়ুর্ব্বেদও তীক্ষ্ণ ঔষধের সূক্ষ্ম মাত্রার নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। আপনারা মান পরিভাষার উপক্রমণিকা পড়িলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। যথা ;—

জালান্তর গতৈঃ সূর্য্য করৈ র্ধ্বংসী বিলোক্যতে।
ষড়্ ধ্বংসীভির্ম্মরীচিঃ স্যাৎ তাভিঃ ষড়্ ভিশ্চ
রাজিকা॥"

কালিঙ্গ মানং।
[পরিভাষা প্রদীপ]

ত্র্যাস রেণুস্তু বিজ্ঞেয় স্ত্রিংশতা পরমাণুভিঃ।
ত্র্যাস রেণুস্তু পর্য্যায় নাম্না ধ্বংসী নিগদ্যতে॥

মাগধ পরিমাণং।
[পরিভাষা প্রদীপ]

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী আলোচনা করিলেও আমরা জানিতে পারি—ভেষজ দ্রব্যের জারণ-মারণ-মর্দ্দন-সন্তাপন সমস্তই তাহার জড় ধর্ম্ম নষ্ট করিবার জন্য। কেননা শক্তি না হইলে শক্তিকে আঘাত করিতে পারেনা।

হোমিওপ্যাথির যাহা মূলসূত্র—তাহাও অনন্ত আয়ুর্ব্বেদের এক ভগ্নাংশ। আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিয়া এই স্থানেই এ প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

যদ্বিষং ভক্ষণাদ্দেহে যদ্রূপ মুপলক্ষ্যতে।
তস্য তদগদং জ্ঞেয় মিত্যুচে হারীতঃ স্বয়ং॥

অর্থাৎ যে বিষ ভক্ষণ করিলে শরীরে যে যে লক্ষণ উপস্থিত হয়, সেই বিষই সেই লক্ষণ নিবারক অগদ (ঔষধ)—স্বয়ং হারতীঋষি একথা বলিয়াছেন। "বিষস্য বিষ মৌষধং"—ভারতের পুরাতন সিদ্ধান্ত। এখন পাঠক মহাশয় ভাবিয়া দেখুন—হোমিওপ্যাথি—আয়ুর্ব্বেদ মহা সাগরেরই একটী তরঙ্গ কি না?

শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ।

রসায়ন ও বাজীকরণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

——:*:——

এইবার বাজীকরণের কথা বলা যাউক। বাজীকরণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে ;—"যাহা বহু পুত্রজনক, সদ্যঃই স্ত্রীতে হর্ষজনক, যাহাতে অপ্রতিহত বলের সহিত স্ত্রীগমনে সামর্থ্য জন্মে, যাহাতে স্ত্রীলোকের অত্যন্ত প্রিয় হওয়া যায়, যদ্দারা জরাগ্রস্ত পুরুষেরও শুক্রবৃদ্ধি প্রাপ্ত ও পুত্রোৎপাদন ক্ষমতা জন্মে, যাহাতে বহুশাখা বিশিষ্ট মহান চৈত্য বৃক্ষের ন্যায় মনুষ্য বহু অপত্য বিশিষ্ট হইয়া লোকের সম্মানভাজন হয়েন, যাহা দ্বারা ইহ ও পরলোকে সন্তান মূলক যশঃ, শ্রী, বল ও পুষ্টিলাভ করা যায়, তাহাকে বাজীকরণ বলে।"

বাজীকরণ ঔষধ [illegible] বলিয়াছেন ;—"আত্মবান [illegible]

বাজীকরণ ইচ্ছা করিবেন। কারণ বাজী করণ দ্বারা পুত্র হয় এবং পুত্র হইতে ধর্ম্ম, অর্থ, প্রীতি ও যশোলাভ হয়। সুতরাং বাজীকরণ ঐ সকল লাভের হেতু স্বরূপ" শাস্ত্রে অপুত্রক পুরুষকে ছায়াহীন, বলহীন, একশাখাবিশিষ্ট এবং পূতিগন্ধযুক্ত বৃক্ষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, অপিচ শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"অপুত্রক পুরুষ চিত্রিত দীপের ন্যায়, জলশূন্য পদার্থের ন্যায়, আকৃতি বিশিষ্ট কিন্তু অধাতব পদার্থের ন্যায় এবং তৃণ নির্ম্মিত প্রতিকৃতির ন্যায়। অপুত্রক পুরুষ প্রতিষ্ঠা রহিত, নগ্ন, একচক্ষুঃ এবং নিষ্ক্রিয়।"

বহু সন্তান বিশিষ্ট পুরুষ বহুমূর্ত্তি, বহুমুখ, বহুব্যূহ, বহুক্রিয়, বহুচক্ষুঃ, বহুজ্ঞান ও বহু আত্মাযুক্ত। বহুপুত্রক ব্যক্তি মঙ্গলময়, প্রশস্ত ধন্য, বীর্য্যশাখ এবং বহুশাখ বলিয়া প্রশংসিত হয়েন। প্রীতি, বল, বিস্তার, বিভব, কুল, যশ, প্রভৃতি অপত্য সংশ্রিত। সুতরাং যিনি ঐ সকল গুণ লাভে ইচ্ছা করেন, তিনি যেন নিত্য ভোগ সুককর বীর্য্য বর্দ্ধন এবং অপত্য বর্দ্ধন বাজীকরণ পরায়ন হয়েন।

মনের হর্ষোৎপাদনকারিণী স্ত্রীই বাজীকরণের প্রধান ক্ষেত্র। কারণ অভিলষিত রূপ রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের এক একটীর দ্বারাই মনের প্রীতি সম্পাদিত হইয়া থাকে। স্ত্রী শরীরে ঐ পাঁচটীই যখন একত্র অবস্থিত, তখন স্ত্রীই যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হর্ষোৎপাদনকারিণী তাহাতে আর সন্দেহ কি। স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোথাও রূপ-রসাদি পাঁচটীর একত্র সমাবেশ দেখা যায়না। স্ত্রীতেই বিশেষরূপে প্রীতি, অপত্য, ধর্ম্ম, অর্থ, লক্ষ্মী ও লোক সকল প্রতিষ্টিত। তবে শাস্ত্রকার ইহাও বলিয়াছেন, যেস্ত্রী সুরূপা, যৌবন সম্পন্না, সুলক্ষণা, বশীভূতা এবং সুশিক্ষিতা সেই স্ত্রীই শ্রেষ্ঠ বাজীকরণ।

শাস্ত্রকার বাজীকরণ সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন,—"বিবিধ মনোজ্ঞ ভোজ্যদ্রব্য আহার, নানাবিধ পানীয় দ্রব্য, পান, শ্রুতি মধুর বাক্য শ্রবণ, সুখকর স্পর্শ, জ্যোৎস্নারাত্রি, নবযৌবন সম্পন্না কামিনী, শ্রুতি মধুর সঙ্গীত শ্রবণ, তাম্বুল ভক্ষণ, মদ্যপান, পুষ্পমাল্য ধারণ, ও মনের প্রফুল্লতা, প্রভৃতি দ্বারা বাজীকরণ হইয়া থাকে।"

বাজীকরণ ত্রিবিধ, যথা, শুক্রজনক, শুক্র প্রবর্ত্তক এবং শুক্রের জনক ও প্রবর্ত্তক। ঘৃতাদি শুক্রজনক, কুঁচের মূল চূর্ণ প্রভৃতি শুক্র প্রবর্ত্তক এবং গোধূম, মাষ কলায় ডিম্ব প্রভৃতি শুক্রজনক ও প্রবর্ত্তক।

এক্ষণে বাজীকরণ যোগ সকল লিখিত হইতেছে। এই সকল যোগ সুস্থ ব্যক্তির শুক্রবর্দ্ধক এবং ক্ষীণ শুক্র ও শুক্র দৌর্ব্বল্য বিশিষ্ট পুরুষের পক্ষে পরম হিতকর। সুস্থ ব্যক্তি এই সকল যোগ সেবন করিলে শুক্র ক্ষয় জনিত কোন প্রকার রোগ জন্মিতে পারে না।

পাঁঠার কোষ জলে সিদ্ধ করিয়া লইবে, পরে একটী পাত্রে দুগ্ধজাত গব্য ঘৃত চড়াইয়া তাহাতে সেই জল সহ কোষ, সৈন্ধব লবণ, এবং পিঁপুল চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া পাক করিয়া লইবে। ইহা অত্যন্ত রতি শক্তিবর্দ্ধক।

পাঁঠার কোষ এক ছটাক, দুগ্ধ আধ সের, এবং জল দুই সের একত্র সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধা-বশেষ থাকিতে অর্থাৎ আধ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া দুগ্ধ গ্রহণ করিবে। এই দুগ্ধ দ্বারা খোসা রহিত তিল সাতবার ভাবনা দিয়া সেই তিল সেবন করিলে রতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়। ইহা অপেক্ষা অল্প মাত্রায় ভাবনা [illegible] দুগ্ধ প্রস্তুত করিতে হইলে, পাঁঠার [illegible]

আটগুণ পরিমাণ দুগ্ধ এবং দুগ্ধের চারিগুণ জল একত্র সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া লইবে।

ভূমিকুষ্মাণ্ড চূর্ণ, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসে সাত দিন ভাবনা দিবে। এই চূর্ণ ঘৃত ও মধু সহ সেবন করিলে বাজীকরণ হয়। এইরূপে আমলকীর চূর্ণ আমলকীর রসে সাতদিন ভাবনা দিয়া ঘৃত, চিনি ও মধুসহ সেবন করিলেও ফল হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া দুগ্ধ পান করা কর্ত্তব্য।

ভূমি কুষ্মাণ্ড বাটিয়া দুগ্ধ ও ঘৃতসহ সেবন করিলে যৌবন দীর্ঘস্থায়ী হইয়া থাকে।

আলকুশী বীজের শস্য এবং কুলেখাড়ার বীজ চূর্ণ করিয়া বা বাটিয়া চিনি ও ধারোষ্ণ দুগ্ধ সহ পান করিলে রতিশক্তি বৰ্দ্ধিত হয়। দুগ্ধ দোহন কালে যতক্ষণ উষ্ণ থাকে, ততক্ষণ তাহাকে ধারোষ্ণ দুগ্ধ বলে।

কুলেখাড়ার বীজ চূর্ণ বা কুঁচের মূল চূর্ণ, চিনি ও ধারোষ্ণ দুগ্ধ সহ সেবন করিলে বাজীকরণ হয়।

শতমূলী ও কুঁচের মূল চূর্ণ করিয়া চিনি ও ধারোষ্ণ দুগ্ধসহ পান করিলে অথবা যষ্টিমধু চূর্ণ ঘৃত ও মধু সহ সেবন করিলে রতিশক্তি বৰ্দ্ধিত হয়।

গোক্ষুর বীজ, কুলে খাড়ার বীজ, শতমূলী, আলকুশী বীজ, গোরক্ষ চাকুলের মূল ও বেড়েলার মূল ইহাদের চূর্ণ সমভাগে একত্র করিয়া সহ্যমত মাত্রায় দুগ্ধ সহ রাত্রে সেবন করিলে বাজীকরণ হয়।

মাষকলায় ঘৃতে ভাজিয়া দুগ্ধ ও চিনি সহ পাক করিয়া পায়স প্রস্তুত করিবে। ইহা উত্তম বাজীকরণ। দধির সর, চিনি, মধু, মরিচ চূর্ণ, ছোট এলাচ চূর্ণ ও বংশলোচন চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া সুগন্ধযুক্ত ভাণ্ডে রাখিবে। ঘৃত বহুল যষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন সেবন করিয়া এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে বর্ণ, স্বর, বল ও রতিশক্তি বৰ্দ্ধিত হয়।

এই স্থলে দধির সর এক পোয়া, চিনি এক ছটাক, ঘৃত ১ তোলা, মধু ১ তোলা এবং অন্যান্য দ্রব্য উপযুক্ত মাত্রায় (এক সিকি বা তদ্রূপ) গ্রহণ করিতে হইবে।

টাটকা মাংস ও রোহিত মৎস্য আহার করিলে বাজীকরণ হয়। বিশেষতঃ বড় পুঁটি (সরল পুঁটী) ঘৃতে ভাজিয়া সেবন করিলে রতিশক্তি বৰ্দ্ধিত হয়।

পিঁপুল, মাষকলায়, শালিধান্যের তণ্ডুল, যব ও গোধুম একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃত সহ পিষ্টক প্রস্তুত করিবে। এই পিষ্টক ভক্ষণ করিয়া চিনি মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিলে রতিশক্তি বৰ্দ্ধিত হয়। এই স্থলে পিঁপুল চূর্ণ এক সিকি এবং অন্যান্য দ্রব্য উপযুক্ত মাত্রায় লইতে হইবে।

কাঁকড়া, কচ্ছপ ও কুম্ভীরের ডিম্ব ভক্ষণ করিলে অত্যন্ত শুক্রবৃদ্ধি হয়।

অশ্বত্থের ফল, মূল, ছাল ও কুঁড়ির সম ভাগে দুই তোলা, দুগ্ধ ১৬ তোলা এবং জল ৬৪ তোলা একত্র পাক করিয়া ১৬ তোলা থাকিতে নামাইয়া লইবে। এই দুগ্ধ ছাঁকিয়া চিনি ও মধুসহ পান করিলে রতিশক্তি বৰ্দ্ধিত হয়।

মাষকলায় চূর্ণ, ঘৃত ও মধু সহ সেবন করিয়া দুগ্ধ পান করিলে রতি শক্তি বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে।

প্রথম প্রসূতা গাভীর বৎস বড় হইলে তাহার দুগ্ধ পান করিলে অথবা যে গাভী মাষ কলায়ের পত্র ভক্ষণ করে, তাহার দুগ্ধ পান করিলে বাজীকরণ হয়।

আলকুশী বীজ চূর্ণ ও গোধূম চূর্ণ দুগ্ধ সহ পাক করিয়া ঘৃত মিশ্রিত করিয়া শীতল হইলে ভোজন করিবে; এবং পরে দুগ্ধ পান করিবে। ইহা উত্তম বাজীকরণ।

চড়াই পাখীর মাংস তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করিয়া দুগ্ধ পান করিলে রতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়। কলায়ের যূষের সহিত ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিয়া দুগ্ধ পান করিলে বাজীকরণ হয়। মৎস্য ও হংস, ডিম্ব—ঘৃতে ভাজিয়া খাইলে বাজীকরণ হয়।

আলকুশী বীজ, মাষকলায়, পিণ্ডখর্জ্জুর, শতমূলী, পানিফল ও কিসমিস সমানভাগে মোট দুই সের, দুগ্ধ চারি সের এবং জল চারি সের একত্র সিদ্ধ করিয়া চারি সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে, পরে তাহার সহিত চিনি তিন পোয়া, বংশলোচন তিন পোয়া এবং নূতন ঘৃত দেড় সের মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ সহমত মাত্রায় সেবন করিয়া ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিলে বহু পুত্র লাভ করা যায়।

টাট্‌কা রোহিত মৎস্য ঘৃতে ভাজিয়া দধি, দাড়িমের রসের সহিত প্রস্তুত ছাগমাংসের যূষের সহিত পাক করিয়া অগ্রে মৎস্য, পরে যূষ ইহা সেবন করিবে, বৃষ্য ও পুত্রজনক।

মৎস্য বা মাংস কুট্টিত করিয়া তাহার সহিত হিং, সৈন্ধব, ধনে ও গোধূম চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ঘৃতে পাক করিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিবে। ইহা উত্তম বাজীকরণ।

ছাগাদির মাংস রসে দধি ঘৃত, লবণ এবং দাড়িমের রস সংযোগে মৎস্য পাক করিবে। মাংস রস মৎস্যের মধ্যে প্রবেশ করিলে উহা পেষিত ও কণ্টক শূন্য করিয়া মরিচ, জীরা, ধনে, অল্প হিং এবং নূতন ঘৃত মিশ্রিত করিবে। অনন্তর মাষকলায়ের ধূলি প্রস্তুত করিয়া উক্ত মৎস্য তন্মধ্যে পূর দিয়া ঘৃতে ভাজিয়া লইবে। ইহা পুষ্টিকর, বলকর, পুত্রোৎপাদক, শুক্রবর্দ্ধক এবং হর্ষজনক।

বৃষ্যলপ্সিকা—চিনি দশসের, নূতন ঘৃত পাঁচ সের মধু আড়াই সের, এবং জল আড়াই সের একত্র পাক করিবে। অনন্তর ঘন হইয়া আসিলে উহাতে গোধূম চূর্ণ আড়াইসের নিক্ষেপ করিবে। অল্প পাকের পরে নামাইয়া শিলায় উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবনে রতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

যে সকল দ্রব্য মধুর, স্নিগ্ধ, জীবনীশক্তিবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, গুরু ও মনের হর্ষজনক তৎসমস্তই বৃষ্য, সুতরাং বাজীকরণের জন্য এবম্বিধ দ্রব্য প্রয়োগ করিবে।

শ্রী—

ছাত্র জীবনে—স্বাস্থ্যরক্ষা।

—:*:—

আয়ুর্ব্বেদের সহযোগী সম্পাদক কবিরঞ্জন মহাশয় এবার কুম্ভকারকে দিয়া কর্ম্মকারের কাজ করাইবেন। আমায় নাকি 'আয়ুর্ব্বেদ' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেই হইবে। অথচ আয়ুর্ব্বেদ শব্দের যোগরূঢ় অর্থটাই আমার জানা নাই। সেক্সপিয়র-মিল্টন্ ও চরক-সুশ্রুত

সম্পূর্ণ বিভিন্ন জগতে বাস করেন, ইহা মহামান্য কবিরঞ্জন মহাশয় কিছুতেই শুনিবেননা। তিনি বলিলেন,"কিছু না কিছু আয়ুর্ব্বেদ নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে। এক কথায় যাহা আয়ুর্ব্বৃদ্ধির নিদান, তাহাই আয়ুর্ব্বেদ। এত শত বহি পড়িলেন, কোন গ্রন্থেই কি আয়ুর্ব্বৃদ্ধির কথা নাই? এ হইতেই পারেনা।" সত্য বলিতে কি, বুদ্ধিমান ও বিজ্ঞের সঙ্গে তর্কে আমি অজ্ঞ—হারিয়া গিয়াছি। তিনিই আমাকে লিখিতব্য প্রবন্ধের শিরোনামা ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন। আপনারা জানেন, চোখে ঠুলি দেওয়া-জন্তু-বিশেষ বাধ্য হইয়া কিরূপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া তৈল বাহির করে। আমারও চোখে ঠুলি দেওয়া,—এ শাস্ত্র আমার নিকট অন্ধকার ময়। তা'র পরে বাধ্যবাধকতাও যথেষ্ট। প্রথমতঃ অজানা বিষয়েও আমাকে লিখিতে হইবে, অধিকন্তু আবার নির্দ্ধারিত বিষয়ে! যখন ছিঁড়িয়া পলাইবার সাধ্য নাই, তখন আমাকে ঘুরিতেই হইবে। আমি বেশ বুঝিতেছি, আপনারা হাসিতেছেন, কিন্তু কি করিব—কপালের লেখা—উপায় নাই। অতএব আপনারা হাসুন, আমি ঘুরিতে থাকি।

প্রথমেই বলিয়া রাখি আমি ভাণধরিব না, যাহা জানি না—সে বিষয়ে পাণ্ডিত্য দেখাইতে গেলে ঘোরাই সার হইবে—তৈল বিন্দুও বাহির হইবে না। আমার প্রবন্ধ দয়াবান্ সম্পাদক মহাশয়ের প্রশস্ত হৃদয়ের প্রশস্ত অর্থ অনুসারে কতকটা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রসম্মত হইতে পারে, কিন্তু নিশ্চয়ই আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র-সংগৃহীত নহে। আমি যাহা লিখিতেছি, তাহা কতকটা নিজের অভিজ্ঞতা প্রসূত, কতকটা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—অবশ্য পঠিতব্য পুস্তক পাঠের ফল। তবে আমার বিশ্বাস, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এরূপ প্রবন্ধেরও কথঞ্চিৎ সার্থকতা থাকিতে পারে—কারণ যাহা সহজ, যাহা সবাই জানে বা বুঝিতে পারে—অথচ আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, তাহা সংগ্রহ করিলেও তাহার ভ্রমপ্রমাদের মধ্যে হয়ত কিঞ্চিৎ এমন সত্য নিহিত থাকিতে পারে, যাহা বিশেষজ্ঞেরা নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে না দেখিবার সম্ভাবনা। আরও এক কথা,—সহজ কথা—প্রাণের কথা প্রায়শঃই সত্য হয়,—কেন না তাহা অনেক সময়েই ঈশ্বরানুপ্রেরিত। এই জন্যই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের যুগেও গ্রাম্য নিরক্ষর কবির সহজ সরল কবিতা প্রবাসী ভারতবর্ষের পৃষ্ঠায় স্থান লাভ করিতেছে এবং এই জন্যই হয়ত গুণগ্রাহী আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র নিজ সুবিশাল ঔষধাগারে সামান্য মুষ্টিযোগের জন্য ও স্থান নির্দ্দেশ করিতে ভুলিয়া যায় নাই।

ছাত্র জীবন, শিক্ষার জীবন—সর্ব্ব বিষয়ে। এ শিক্ষা আবার লাভ করিতে হইবে সামঞ্জস্যের ভিতর দিয়া,—শারীরিক ও মানসিক যাহা কিছু ধর্ম্ম, আছে তাহাদের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ক্রমোন্নতি করিতে হইবে—সামঞ্জস্য ভিন্ন ক্রমোন্নতি সম্ভব হইবে না। কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলি। ছাত্রদের অবশ্য মানসিক উন্নতি—মুখ্য উদ্দেশ্য, তাই বলিয়া শরীরের স্বাস্থ্যে অবহেলা করিলে চলিবে না, কেন না শরীরে মনে বড় নিকট সম্বন্ধ, একের ভাল-মন্দ অন্যের ভাল-মন্দের সঙ্গে একই সূত্রে গ্রথিত। শরীর ও মন যেন একই জিনিসের দুইটা দিক—এই দুই দিক লইয়াই জিনিষটার সম্পূর্ণতা, এক-দিকের অভাবে আসল জিনিসটার হ্রাস হইয়া পড়ে। অতএব গৌণ হইলেও শরীররক্ষা ছাত্র-জীবনের একটা উদ্দেশ্য। [illegible] মুখ্য উদ্দেশ্য হইতে পারে, কিন্তু [illegible] প্রদীপ। [illegible]

দীপে তৈল প্রদান গৌণ হইলেও একটী উদ্দেশ্য। মনের কাজ করিতে হইবে, শরীরের সাহায্যে—তাই স্বাস্থ্যরক্ষায় মনোযোগী না হইলে উপায় নাই। এই কারণেই ছাত্র-জীবনেও দুইটী ঋষিবাক্যের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া চলিতে হইবে—একটী "ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ," অপরটী "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং।" তপশ্চর্য্যাই প্রধান উদ্দেশ্য কিন্তু তপোবিঘ্ন নিরাকরণের জন্য সুগঠিত, সুবেষ্টিত, সুসজ্জিত-শরীর-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে তপস্বী মনকে স্থাপন করিতে হইবে। 'ব্যাধি মন্দির'—তপস্যার পক্ষে কখনই সুকর নহে।

আগে শরীর মন্দির নির্ম্মাণের কথাই বলি। মন্দির নির্ম্মাণের কথাতেই তপস্যার কথাটাও আপনা আপনি যেন আসিয়া পড়ে; কেননা নির্ম্মাণ করিবার সময়ে সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে, মন্দির সম্পূর্ণরূপে তপশ্চর্য্যার উপযোগী হইতেছে কি না।

মন্দিরের সঙ্গে শরীরের সনাতন প্রথানুসারে উপমা স্থাপন করিয়াছি বটে, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে—দুইয়ের মধ্যে বিশেষ একটু প্রভেদ আছে। মন্দিরের সম্বন্ধে ভিত্তি স্থাপন হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ চুণকাম পর্য্যন্ত সমস্তই মানুষকে নিজে করিতে হয়, মন্দির নিজে অচল জড়; কিন্তু শরীরের উপযুক্ত আহারীয় সংগ্রহ করিয়া দিয়া, একটু যত্ন করিতে থাকিলে, শরীর নিজেকে নিজে গড়িয়া তোলে। দুইটী ইংরাজী শব্দে এ পার্থক্য বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়। মন্দির mechanical জিনিস, শরীর organic সৃষ্টি। আর একটু কথা এই;—তপস্যার উপযোগী করিয়া মন্দির নির্ম্মিত হইবে, কিন্তু তপস্যা—মন্দিরকে গড়িতে পারে না, কিম্বা মন্দির তপস্যাকে উন্নত করিতে পারে না, কিন্তু শারীরিক অবস্থা অনেক সময়েই মনের অবস্থার সৃষ্টি করে এবং মানসিক অবস্থা প্রায়শঃই শরীরকে গড়িয়া লয়। অর্থাৎ তপস্যা ও মন্দিরের মধ্যে co-existence সম্বন্ধ থাকিলেও শারীর ও মানসিক অবস্থার মধ্যস্থিত interaction সম্পর্ক নাই। এই interaction সম্পর্ক আছে বলিয়াই সর্ব্ব চিকিৎসা শাস্ত্রেই অনেক সময় শরীরের চিকিৎসা করিতে যাইয়া বিশেষজ্ঞেরা অগ্রে মনের চিকিৎসা করিয়া থাকেন এবং মনের চিকিৎসা প্রধানতঃ শারীর-চিকিৎসা দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

শরীর তিনটী প্রক্রিয়া দ্বারা নিজেকে গঠন, পরিপোষণ ও রক্ষণ করে, যথা আহার্য্য গ্রহণ, গৃহীত আহার্য্যের পরিপাক, পরিপাক প্রাপ্ত সারাংশের দেহ মধ্যে স্থিতি।

আহার্য্য গ্রহণ—সরল চিত্তে নিয়মিত সময়ে পরিমিতরূপে পুষ্টিকর ও সহজপাচ্য লঘু আহার্য্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ছাত্রের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি মানসিক উন্নতি বিধানের জন্য শরীরের পুষ্টি করিবেন। অতএব মন উত্তেজিত হয়—ধারণা শক্তির হ্রাস হয় বা কুপ্রবৃত্তির উদ্রেক হইতে পারে এমন আপাততঃ রসনাতৃপ্তিকর আহার্য্য তিনি কদাপি গ্রহণ না করেন। মাদক দ্রব্য বা কোনোরূপ stimulant দ্রব্যমাত্রই বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য; কেননা ইহা মানুষকে একটা সাময়িক অনুপ্রেরণা প্রদান করে বটে, কিন্তু পুনঃ পুনঃ অস্বাভাবিকরূপে উত্তেজিত হইয়া স্নায়ুমণ্ডলী যখন নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তখন শরীর নানা রোগ-কবলিত হইয়া পড়ে। মাছ-মাংস অপেক্ষা দুধ-ঘি ব্যবহার বেশী হওয়া আবশ্যক। আমিষ ও নিরামিষ—উভয়বিধ খাদ্যই বলকারক [illegible] বটে, কিন্তু আমিষ-ভোজীরা [illegible] যেন [illegible]

ব্যাঘ্রাদির মত হিংসার পক্ষে উপযোগী ও নিরামিষ ভোজীর বল যেন হাতীর মত সৌশীল্য ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনের পক্ষে হিতকর। কেহ কেহ স্থির করিয়াছেন—মানুষের মাংস হজম করিবার উপযোগী পাকস্থলী ও মাংস ছিঁড়িয়া খাইবার উপযোগী মাংসাশী জন্তুর মত চারটী সূক্ষ্মাদন্ত আছে এবং বঙ্গদেশে মাংস না হউক, মৎস্য গ্রহণ না করিলে নাকি শরীরের বিশেষ কিছু প্রত্যবায় হইয়া থাকে। তা' যাই-হউক এগুলি যখন রজোগুণের বর্দ্ধক, তখন খুব বিবেচনার সহিত নিতান্ত কম মাত্রায় ছাত্রগণের এগুলি গ্রহণ করা বিধেয়।

আহার্য্য পরিপাক।—আহার্য্য গ্রহণ করিলেই হইল না। শরীর রক্ষা পরিপাক ক্রিয়ার উপরে সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করে। খাদ্যের সারাংশ হইতেই রস উৎপন্ন হয় এবং রসই ক্রমান্বয়ে রক্তাদিতে পরিণত হইয়া শরীর পোষণের কারণ হয়। আয়ুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে :—

রসাদ্রক্তং ততো মাংসং মাংসান্মেদঃ প্রজায়তে।
মেদসোঽস্থি ততো মজ্জা ততঃ শুক্রস্য সম্ভবঃ॥

কিন্তু খাদ্য পরিপাক না হইলে শরীর খাদ্যের এই সারাংশ গ্রহণ করিতে পারে না, কাজেই শরীরের পক্ষে অত্যাবশ্যক উপাদানগুলির স্বল্পতা বশতঃ শরীর ক্রমেই নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

এই অজীর্ণ রোগ নানাকারণে ঘটিয়া থাকে। ছাত্রদের পক্ষে সাধারণতঃ অনিয়মিতাহার অপরিমিতাহার, আবদ্ধ বায়ুতে অধিকক্ষণ যাপন করিয়া অধ্যয়নাদি, মানসিক পরিশ্রমজনক কর্ম্মকরণ, অধিক রাত্রিজাগরণ, দুশ্চিন্তা বা অতিচিন্তা ইত্যাদিতে অজীর্ণরোগ উদ্ভব হইয়া থাকে। রাত্রিজাগরণের মত দুষ্কর্ম্ম অতি কমই আছে। ইহাতে শরীর নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে। আহার যেমন প্রয়োজনীয়, আরাম দায়িনী নিদ্রা ততোধিক আবশ্যক। পরিপাকক্রিয়ায় নিদ্রা অত্যন্ত সাহায্য করে। বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা বলেন,— রজনীর শেষার্দ্ধে একঘণ্টা জাগিলে যে ক্ষতি হয়, পূর্ব্বার্দ্ধে দুই ঘণ্টা নিদ্রা যাইলেও তাহার পূরণ হয় না। তৎপরে দুশ্চিন্তায়ও শরীরের কম ক্ষতি হয় না। দুশ্চিন্তা যে একরূপ মর্ম্মান্তিক জ্বর—সে বিষয়ে সন্দেহ কি?

ভারতবাসী ছাত্রদের সম্বন্ধে কম পড়া অপেক্ষা বেশী পড়ার অভিযোগই অধিকতর শ্রুত হওয়া যায়। প্রাণের দায়ে উদরান্নের সংস্থানের জন্য যাহাদের পড়া, তাহাদের পক্ষে অধ্যয়নের জন্য অতিশ্রমকরা খুব সম্ভবপর। কিন্তু প্রকৃতি তা' বুঝিবে কেন? এই অতিরিক্ত মানসিক শ্রমের শাস্তি তাহাদিগকে ভোগ করিতে হয়। অনেক ছাত্র মানষিক শ্রমানুযায়ী আহারীয় পান না বলিয়া তাঁহার পিত্তাধিক্য জন্মে তাহাতে শরীর গরম হয়, হাত-পা চক্ষু জ্বালা করে। অধিকন্তু ভারতবাসী অনেক সময় বিনা কাজে এত ব্যস্ত যে, শারীরিক ব্যায়াম করিবার জন্য দশ মিনিট সময় তাহার দিবারাত্র মধ্যে হইয়া উঠে না। অনেক ব্রাহ্মণ ছাত্রের কথা শুনিয়াছি, তাঁহারা পড়াশুনা নষ্ট হইবার ভয়ে সন্ধ্যাবন্দনাদি করেন না, তাঁহারা অবশ্য ব্যায়াম করার কথা ভ্রমেও মনে আনিতে পারেন না। ফলে এই হয়—উষ্ণ পাকস্থলীতে যে খাদ্য পড়ে, তাহা হজম হয় না। কাজেই উদর [illegible] বায়ু এবং অম্ল ক্লেদের আশ্রয় [illegible] অনেক সময় নির্ম্মল বায়ু [illegible]

শরীরে উপযুক্ত পরিমাণে রক্ত সঞ্চারিত হয় না। কাজেই পাকস্থলী দুর্ব্বল বা অসাড় হইয়া পড়ে। সুতরাং খাদ্য-পরিপাকের জন্য পাকস্থলীর নিয়মিত সঞ্চালন হয়না বলিয়া খাদ্যের পরিপাক হয় না কিম্বা আংশিক পরিপাক হয়। কাজেই হয় উদরাময়, না হয় কোষ্ঠবদ্ধ রোগের সৃষ্টি হয়।

অজীর্ণ রোগে প্রথমতঃ সেই সনাতন উপদেশ—যে সকালে-সন্ধ্যায় পর্য্যাপ্ত নির্ম্মল বায়ু সেবন করিতে হইবে,—সমুদ্র বা নদী তীরস্থ বায়ুই হউক বা বিস্তীর্ণ প্রান্তরের বায়ুই হউক, অগত্যা পার্ক প্রভৃতির বায়ুতেও চলিতে পারে। সম্ভব হইলে প্রতিদিনই কয়েক মিনিট ধরিয়া শারীরিক ব্যায়াম করিয়া বায়ু সেবনে বহির্গত হওয়া উচিত। কোষ্ঠ যাহাতে পরিষ্কার হইয়া যায়—কয়েকদিন অন্তর বিবেচনা করিয়া এইরূপ মৃদু বিরেচক ঔষধ বা জোলাপ লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু মনে রাখা কর্ত্তব্য - ঔষধ সেবন যতটা পারা যায়, না করাই ভাল, কারণ পুনঃ পুনঃ ঔষধ সেবনে ঔষধ নিত্য খাদ্যের মধ্যে পরিণত হইয়া যায় এবং শেষে ঔষধে আর ফললাভ হয় না। অধিকন্তু প্রকৃতির যে স্বাভাবিক রোগ-নিবারিণী শক্তি আছে, সেটা লোপ পাইয়া যায়।

অজীর্ণরোগীর খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। আহার করা সম্বন্ধে সর্ব্ব সময়েই সেই সনাতন প্রথাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়—"বরং কম খাইয়া পস্তাইও, তবু বেশী খাইয়া ভুগিও না।" এ বিষয়ে পাশ্চাত্য ডাক্তার Andrew Wilson এবং Robert Bell বলিতেছেন,—"muscular exercise is essential to the proper performance of the intestinal functions. Therefore, those who must sit fo[r] hours at a desk for a livelihood shoul[d] make it a rule to have their morning and evening walks regularly, when constipation would trouble them but little. * * * *

If individuals would systematically conform to a well-considered dietic regimen, and would, moreover, give full attention to a daily and complete clearance from their bodies of the waste products of food, indigestion would cease to trouble and dyspepsia would vanish."

এইরূপ ভাবে যিনি জীবন যাপন করেন, তাঁহার সহজে কোন রোগের করালগ্রাসে পতিত হইবার আশঙ্কা করিতে হয় না। যিনি যাহা আহার করেন, তাহাই হজম করিয়া ফেলেন—তিনি বাস্তবিকই সুখী। কারণ তিনি সুনিশ্চিত শারীরিক স্বাস্থ্যলাভ করেন এবং শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান হইলে মনের স্বাস্থ্য আপনিই ফুটিয়া উঠে।

তার'পর অতিরিক্ত পাঠের জন্য যে রোগ উপস্থিত হয় তাহা প্রত্যেক ছাত্রই অনায়াসে এড়াইয়া চলিতে পারেন। পড়া-শুনার work while you work, play while you play এ বড় সুন্দর রীতি। কিন্তু দুঃখের বিষয়—আমরা স্বতঃই

পড়ার সময় খেলি, খেলার সময় পড়ি
আর পরীক্ষার আগে রাত জেগে জেগে [illegible]

পরিপাক প্রাপ্ত সারাংশের দেহ মধ্যে স্থিতি।—এখন হইতেছে [illegible] কথা। খাদ্যগ্রহণ করিয়া পরিপাক [illegible] রক্তমাংসে পরিণত করিতেই [illegible]

এরূপ যত্নবান হইতে হইবে—যাহাতে ঐ সারাংশ শরীরের মধ্যেই অবস্থিতি করিয়া ক্রমান্বয়ে শরীরের ও তৎসঙ্গে মনের শক্তি-বর্দ্ধন করিতে পারে। ওজো ধাতুর বর্দ্ধন করাই শারীরিক স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেশ্য, কেননা এই ওজঃই মানসিক উৎসাহ-প্রতিভাদি বর্দ্ধনের কারণ। বাগভট এই ওজো ধাতুর গুণ নিম্ন লিখিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন,

"নিষ্পাস্ততে যতো ভাবা বিবিধা দেহ সংশ্রয়াঃ
উৎসাহ-প্রতিভা-ধৈর্য্য-লাবণ্য সুকুমারতাঃ॥"

সুশ্রুত বলেন,

রসাদীনাং শুক্রান্তানাং ধাতুনাং
যৎপরং তেজস্তৎ খল্বোজ স্তদেবলমিতি।"

অর্থাৎ রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত সপ্তধাতুর যে পরম তেজোভাগ তাহাই ওজঃ। ওজঃই বলের কারণ।

তাহা হইলে ওজঃ বৃদ্ধি করিতে হইলে শরীর মধ্যে ওজো ধাতুর কারণ ভুত এই সপ্ত ধাতুর সংরক্ষণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। সুতরাং বীর্য্যধারণ বা বিন্দু ধারণ করিতে হইবে। "মা রেতঃ স্কন্দয়েৎ কচিৎ" এ ঋষিবাক্য ছাত্রগণের পক্ষে সর্ব্বথা পালনীয়। বাস্তবিকই "মরণং বিন্দু পাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ।" বীর্য্যের ক্ষয় প্রায় অধিকাংশ রোগেরই মূলীভূত কারণ বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্র একবাক্যে ঘোষণা করিতেছে।

আমার মনে হয়, এই বীর্য্যধারণই শরীর রক্ষার পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। শরীর মধ্যে বীর্য্যের স্তম্ভন করিতে পারিলে আহার-বিহারের সামান্য নিয়ম ভঙ্গ শরীরের বেশী কিছু ক্ষতি করিতে পারে না। কিন্তু বীর্য্যধারণের ক্ষমতা না থাকিলে অন্য দুইটী নিয়ম খুব যত্ন সহকারে পালন করিলেও ফল মর্ম্মন্তুদই হইয়া থাকে। কিন্তু বীর্য্যধারণ কিরূপে সম্ভবে?

মনের চিকিৎসা।—বীর্য্যরক্ষার কথায় মনের চিকিৎসায় আসিয়া পড়িলাম। কাম বাসনা মনের বিকার হইতে উৎপন্ন। বাস্তবিক পক্ষে পরিশুদ্ধ মন না হইলে মানবের পদে পদে বিপদ। শত চেষ্টার ফলে শরীর মধ্যে যে শুক্রধাতু উপার্জ্জিত হয়, মানসিক ক্ষণিক চাঞ্চল্যে তাহার স্কন্দন করিয়া, মানব নিজ শরীরকে "ব্যাধি-মন্দির" করিয়া তুলে। অনেক সময় শরীরের চিকিৎসায় যে রোগের বিন্দু মাত্রও আরোগ্য লাভ হয় না, তাহার কারণ, যে পাপমন পাপের স্রষ্টা, তাহার ত কোন চিকিৎসা হয় না। তাই ম্যাকবেথ শারীরিক চিকিৎসায় লেডি ম্যাক্‌বেথের কোন ফল হইতেছে না দেখিয়া ডাক্তারকে বলিয়াছিলেন,—

"Canst thou not minister to a mind diseased etc.?" কিন্তু মনের চিকিৎসা অনেক সময়েইত শারীরিক চিকিৎসা দ্বারা সম্ভবে না। কেননা, মানসিক যে রোগ শারীরিক রোগের ফল মাত্র, শারীরিক ঔষধ প্রয়োগে সেই মানসিক রোগের কথঞ্চিৎ উপশম সম্ভবপর, কিন্তু মানসিক রোগই যেখানে শারীরিক রোগের কারণ, সেখানে ঔষধ সেবন নিস্ফল। সেখানে প্রক্রিয়া দ্বারা চিকিৎসা করিতে হইবে। রোগীকেই চিকিৎসকের আসন গ্রহণ হইবে। তাই ডাক্তার, ম্যাক্‌বেথকে বলিলেন—"Therein the patient must minister to him self."

মনের চিকিৎসা, মনের উন্নতি বিধান—তাহাকে কলুষের অন্ধকূপ হইতে পবিত্রতার বিমল আলোকে আনয়ন করা। সাধুসঙ্গ, সর্ব্বদা সদ্ বিষয়ে চিন্তা ও আলাপন, [illegible] পরিবর্ত্তে স্নেহের ও ভগবদ্ভক্তির [illegible] দুশ্চিন্তার উপস্থিতি [illegible]

সর্ব্বদা প্রফুল্ল চিত্তে অবস্থান, প্রভৃতি মনকে উন্নত করিবার প্রধান উপায়।

একদিনে মন বশ না হইতে পারে পুনঃ পুনঃ চেষ্টার ফলে হইবেই হইবে। তৎপরে শরীরের স্বাস্থ্য ও বলবৃদ্ধি করিতে পারিলে মনের অনেকটা স্বাস্থ্য বিহিত হওয়া খুবই সম্ভব। "sound mind in a sound body" —এ আজগুবি কথা নয়। দেবমন্দিরে পিশাচের বাস কচিৎ সম্ভবপর। পরিশুদ্ধ শরীরে কলুষিত মন থাকিতে লজ্জা বোধ করে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাই মনকে অনেকটা পরিশুদ্ধ হইতে বাধ্য করে।

বাস্তবিকই সেদিন ভারতের কি আনন্দের দিন—যে দিন ভারতে এমন ছাত্রবৃন্দ দেখা দিবেন—যাঁহাদের বার্য্যবান্ দেহ ওজো লাবণ্যে দেদীপ্যমান্, এবং সেই দেহে যাঁহাদের বিমল মন সুশিক্ষার আলোকে ভাস্বর। এমন দিন ভারতবর্ষেই একদিন ছিল—যেদিন ছাত্রজীবন ব্রহ্মচর্য্যের সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত ছিল। এ যুগে যদি পুনরায় ভারতের শুভার্থিগণ শরীর-মনের সামঞ্জস্যকে ভিত্তি করিয়া ছাত্র-শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে পারেন, তবে আবার আমরা উপলব্ধি করিতে পারি, ছাত্র জীবনে শীর্ণ দেহ, নিরুৎসাহ মন, স্মৃতিশক্তিহীনতা, অকালবার্দ্ধক্য অবশ্যম্ভাবী নহে বরং ছাত্র জীবনেই শারীরিক ও মানসিক সর্ব্ববিধ গুণের পূর্ণ সুষমা বিকাশ হইয়া থাকে এবং ইহাও উপলব্ধি করিতে পারি—কেমন করিয়া গৃহে গৃহে ছাত্রের মুখে প্রফুল্লতার সঙ্গে গাম্ভীর্য্যের সংযোগ হয়,—প্রতিভার সঙ্গে সুশিক্ষাজনিত বিনয়ের একত্র সমাবেশ হইতে পারে এবং বীর্য্যের সঙ্গে প্রতিভার শুভ পরিণয় সম্ভবে। ভারতের জীবন তখন পরিপূর্ণতার, সফলতার আনন্দে শিহরিত হইবে। ভারতের মনস্বী চিন্তাপ্রসূত-আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা সার্থক হইবে, আয়ুর্ব্বৃদ্ধি তখন নিরর্থক হইবে না, বাঁচিয়া থাকা তখন লাঞ্ছনার হইবে না। তখন বাঁচিবার জন্য লোক পাগল হইবে। কারণ, তখন দীর্ঘজীবন, সুস্থ শরীর, জ্ঞানময় মন—একই স্থানে বাস করিবে, কারণ তখন বাঁচিবার আশা ও জ্ঞানলাভের তৃষা করবদ্ধ হইয়া ভবিষ্যের আলোকময়-লোকের পথে যাত্রা করিবে।

আয়ুর্ব্বেদ আমাদের অতীত গৌরবের চিহ্ন। এ অতীত মহিমার গৌরব যখন আমরা বুঝিয়াছি, যখন এই পাশ্চাত্যশিক্ষা-প্লাবনের যুগেও আবার "আয়ুর্ব্বেদ কলেজ" স্থাপিত হইয়াছে, খুব আশা হয়—এই আয়ুর্ব্বেদ কলেজই আমাদিগকে সেই অতীত সামঞ্জস্য-শিক্ষার পুনরুদ্‌যাপনের গৌরবে গৌরবান্বিত করিবে।

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ

বর্ষা-বন্দন।

এস, স্নিগ্ধ শ্যাম শান্ত প্রকৃতি মোহন!
বারি বরিষণ! এস, সন্তাপ হরণ!
নিদাঘে দারুণ রবি
শীর্ণ করি দেহ-ছবি—
প্রখর কিরণে বল করেছে হরণ,
তপ্ত শুষ্ক দেহে তাই করি আবাহন।

কদম্ব পরাগ-বাহী সুরভি সমীর
মথি সারা কায়ে এস শীতল-শরীর!
জলদের নীলাম্বর
পরি অঙ্গে ঋতুবর!
এস সাজি বিদ্যুতের কণক-মালায়,
তাপিত ধরণী আছে তব প্রতীক্ষায়।

যাবে এবে দিনকর দক্ষিণ অয়ন
শুনিয়ে তোমার সনে অবনী মিলন,
বলীয়ান সোম-সখা
আসিয়া করিবে দেখা
বাড়াইবে মানবের ক্ষীণ দেহে বল,
নব পল্লবিত হবে ওষধি সকল।

তাই বলি এস ত্বরা তাপিত জীবন!
আদেশ জানাও নরে করি গরজন,
তোমার পরশ লাভে
ভূবায়ু শীতল হ'বে
মন্দ হবে মানবের জঠর অনল,
লঘুভোজী নর নারী পাবে নব বল।

ধৌত শুভ্র বাস যার সুগন্ধ বিলাসী
শীতল-শীকর-বায়ু-হীন-হর্ম্ম্যবাসী
দিবানিদ্রা পরিহরি
ব্যায়াম বর্জ্জনকারী
রবির কিরণ ত্যাগী রবে নিরাময়
এসে এই বলে দাও জীবে দয়াময়।

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ

আয়ুর্ব্বেদে ক্ষার-কল্পনা।

[রসায়ন তত্ত্ব]

এ দেশে এখনও এমন অনেকে আছেন, যাঁহাদের চক্ষে বৈদিক ঋষি বর্ত্তমান হটেনটট্ বা সাওতালেরই একটু মার্জ্জিত সংস্করণ মাত্র। য়ুরোপ সভ্য হইবার পূর্ব্বে—আর্য্য ঋষি যে পার্থিব বিজ্ঞানেও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, একথা হয়ত তাঁহাদের কাছে আরব্য উপন্যাসের আখ্যায়িকার মতই অসম্ভব শুনাইবে। তথাপি আজ আমরা আয়ুর্ব্বেদের "ক্ষার কল্পনাকে" উপলক্ষ করিয়া ঋষি প্রতিভার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব।

অনেকের ধারণা—আর্য্য ঋষিগণ মনস্তত্ত্বের যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভৌতিক বিজ্ঞানে তাঁহাদের আদৌ কোন অধিকার ছিল না। আমরা তাঁহাদিগকে ভারতের জীবন্ত বিজ্ঞান আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

য়ুরোপের "রসায়নী বিদ্যা"—এখন সভ্য সমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে, কিন্তু বলিতে লজ্জা নাই—এই রসায়নী বিদ্যাও সর্ব্ব প্রথম ভারতবর্ষেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

* আয়ুর্ব্বেদীয় ঋতুচর্য্যা অবলম্বনে লিখিত।

বৈদিক যুগের সোম-সন্ধান যিনি মন দিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাকে আর নূতন করিয়া বুঝাইতে হইবে না—হিমালয়ের সানুপর্ণকুটিরে যেদিন হৈম পাত্রে সোম বিন্দুর উচ্ছ্বাস উঠিয়াছিল, সেই দিন ভারতেই জগতে রসায়নশাস্ত্রের জাতোৎসব সম্পন্ন করিয়াছিল।

সুশ্রুতের ত্রিবিধ ক্ষার কল্পনা পাঠ করিলে প্রাচীন হিন্দুর রসায়নের ইতিহাস বেশ বুঝিতে পারা যায়। সে ক্ষার প্রস্তুত প্রণালী আধুনিক উন্নত বিজ্ঞান সম্মত। শাস্ত্রকারের উপদেশ —যে সকল পদার্থের ক্ষার প্রস্তুত করিতে হইবে, প্রথমেই তাহা অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। পরে সেই ভস্মাবশেষ জলে গুলিয়া অগ্নির তীব্র তাপে জ্বাল দিলে যে চূর্ণবৎ পদার্থ পাক পাত্রে অবশিষ্ট থাকিবে, উহারই নাম ক্ষার। আয়ুর্ব্বেদে অনেক প্রকার ক্ষার ও তাহাদের বিভিন্ন কার্য্য প্রণালীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সকলগুলির পরিচয় দেওয়া চলে না। আমি কেবল প্রধান ক্ষার গুলির উল্লেখ করিব।

যবক্ষার।—বহু শতাব্দি অতীত হইল - ভারতের প্রাচীন বিজ্ঞান চরক ও সুশ্রুতে, এই যবক্ষারের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে এই যবক্ষারের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। ইহার অনেকগুলি পর্য্যায় আছে, যথা—"যবাগ্রজ" "যবলাস" "যবশূক" "যবনালজ" "যবজ" ও "যবাপত্য"। এই প্রতিশব্দগুলি বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায়—যব ভস্ম করিয়া যে ক্ষার পদার্থ পাওয়া যায়—তাহার নামই যবক্ষার। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ ;—

প্রথমে যবের শূক (শিষ বা শুঁয়া) অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া, সেই ভস্ম একসের পরিমাণে লইবে, এবং তাহা ৬৪ সের জলে গুলিবে। পরে সেই ক্ষার মিশ্রিত জলকে উপর্য্যুপরি একবিংশতি বার বস্ত্র খণ্ডে ছাঁকিয়া লইবে। শেষে সেই জল কোনও পাত্রে রাখিয়া তীব্র অগ্নিতাপে জ্বাল দিবে। জলীয়াংশ মরিয়া গিয়া যখন দেখিবে পাত্রে একরকম চূর্ণ পদার্থ অবশিষ্ট রহিয়াছে—তাহা গ্রহণ করিবে। ইহাই হইল যবক্ষার। এই প্রণালীতে যে ক্ষার প্রস্তুত হইয়া থাকে, ডাক্তারেরা তাহাকে Corbouate of Potash বলেন। কিন্তু অনেকস্থলেই আমরা দেখিতে পাই—আধুনিক বিজ্ঞানে যবক্ষারকে 'সোরা' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই জন্য—নাইট্রোজেন গ্যাসের বাঙ্গালা নাম "যবক্ষার জান"।

সোরার ইংরাজী নাম—"নাইট্রেট অফ্ পটাস্"। যব হইতে জাত যবক্ষারের সঙ্গত অভিধান—"কার্ব্বনেট অফ্ পটাস্"। এই দ্রব্য সম্পূর্ণ পৃথক্।

ক্ষারতত্ত্বের সম্যক্ আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি,—প্রাচীন কালে স্থলজ বৃক্ষ পোড়াইয়া ঋষিরা তাহার ক্ষার ব্যবহার করিতেন। ডাক্তারী বিজ্ঞানেও দেখা যায়—অধিকাংশ স্থলজ বৃক্ষ আছে, যাহা পোড়াইলে—অবিশুদ্ধ পোটাসিয়ম কার্ব্বনেট পাওয়া যায়। পল্লীর অশিক্ষিত সমাজেও আমরা দেখিয়াছি—কদলী বৃক্ষের ভস্ম দ্বারা লোকে বস্ত্রাদি ধৌত্ করিয়া থাকে। যুগ যুগান্তর পূর্ব্বে যুগাবতার সুশ্রুত নিম্নলিখিত বৃক্ষগুলি পোড়াইয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। যথা ;—

ঘণ্টাপারুল, কুড়চী, অশ্বকর্ণ, পারিভদ্রক, বহেড়া, সোঁদাল, তিল্বক (লোধবৃক্ষ) আকন্দ, মনসাসিজ, আপাং, পারুল, [illegible],

বাসক, কদলী, রক্তচিত্রক, নাটাকরঞ্জ, ইন্দ্রবৃক্ষ (কুটজ ভেদ) আস্ফোতা, অশ্বমারক (করবীর), ছাতিম, গণিয়ারী, কুঁচ এবং ঘোষাবৃক্ষ।

কেনেডা, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ রুষিয়া প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে স্থলজ বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে।—ঐ সকল দেশবাসীরা এখনও পর্য্যন্ত বৃক্ষাদি দগ্ধ করিয়া কার্ব্বনেট অফ্ পটাস প্রস্তুত করিয়া থাকে।

সর্জ্জিক্ষার—আয়ুর্ব্বেদে আর একটী ক্ষারের নাম—সর্জ্জিক্ষার। ইহার অপভ্রংশে—সাচিক্ষারের নামের সৃষ্টি। স্থলজ বৃক্ষ-লতাদি দগ্ধ করিয়া যেমন কার্ব্বনেট অফ পটাশ পাওয়া যায়, সেই রূপ জলজ ও সমুদ্রতীর জাত বৃক্ষ-লতাদি দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম হইতে কার্ব্বনেট অব সোডা পাওয়া যায়। অতি প্রাচীনকালে মিশ্র (মিশর) দেশে এই সোডা—সাবান ও কাচ-নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। চরক ও সুশ্রুত পাঠেও আমরা জানিতে পারি—স্মরণাতীত কাল হইতেই এই জ্ঞান-পুণ্য-বহুলা ভারত ভূমিতেও ইহার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে।

বাজারে সচরাচর সাজিমাটী নামে যাহা বিক্রয় হইয়া থাকে, তাহা আর কিছুই নহে—মৃত্তিকা মিশ্রিত কার্ব্বনেট অফ সোডা। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কোন কোন দেশের লবণাক্ত ভূমিতে একপ্রকার সামুদ্রিক লতা জন্মিয়া থাকে, তাহা দগ্ধ করিলে যথেষ্ট পরিমাণে সর্জ্জিক্ষার সংগৃহীত হইয়া থাকে।

বহুকাল পূর্ব্বে—চরক ও সুশ্রুত প্রভৃতি বৈদ্যকাচার্য্যগণ, যবক্ষার (Carbonate of Potash) এবং সর্জ্জিকা ক্ষার (Carbonate of Soda)—এই দুইটী যে পৃথক পদার্থ তাহা জানিতেন। কিন্তু য়ুরোপে বহুদিন পর্য্যন্ত এই দুইটী ক্ষার একই পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছিল ;—এখন সে সন্দেহের নিরসন হইয়া গিয়াছে।

সুশ্রুত একজন অদ্বিতীয় অস্ত্র চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার শল্য-তন্ত্রের প্রভাব—য়ুরোপ সভ্য হইবার পূর্ব্বে—নিখিল বিশ্বকে একদা বিস্ময়-বিমুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। দুঃখের বিষয়—সেই সুশ্রুতের বংশধরগণ, আজ সুশ্রুতোক্ত যন্ত্রশস্ত্রের আকৃতি চিনিতে পারিল না! সুশ্রুত অস্ত্র চিকিৎসার অঙ্গ স্বরূপ—ক্ষার প্রস্তুত প্রণালীর আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সে ক্ষার ত্রিবিধ। ১। মৃদু। ২। মধ্যম। ৩। তীক্ষ্ণ। মৃদুক্ষার (mild) মধ্যম ক্ষার (caustic) সুশ্রুতের তীক্ষ্ণক্ষার ভিন্নপ্রকারের ক্ষার পদার্থ নহে। মৃদুক্ষারে দন্তী দ্রবন্তী প্রভৃতির সংমিশ্রণ ঘটাইয়া তীক্ষ্ণক্ষার প্রস্তুত হইয়া থাকে। সুশ্রুতের মধ্যম ক্ষারকে caustic Alkali বলা যায়। মহাত্মা সুশ্রুত তীক্ষ্ণক্ষার প্রস্তুতের যে প্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, বিলাতী বৈজ্ঞানিকগণও তাহার অনুসরণ করিয়াছেন। ঘণ্টাপারুল, কুটজ প্রভৃতি বৃক্ষের ক্ষারাত্মক ভস্মাবশেষ জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া লইয়া, তাহাতে ভস্ম শর্করা, ঝিনুক, শঙ্খনাভি—অগ্নিদগ্ধ করিয়া যে চূর্ণ (caustic lime) পাওয়া যায়—সেই চূর্ণ মিশাইয়া অগ্নিতে পাক করিলেই তীক্ষ্ণক্ষার প্রস্তুত হইয়া থাকে। সুশ্রুতের আবির্ভাব কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত—বহুযুগের ব্যবধান, কিন্তু এখনও য়ুরোপের রাসায়নিকগণ সুশ্রুতের মতেরই অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা এখনও মৃদুক্ষারের সহিত চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া জ্বাল দিয়া তীক্ষ্ণক্ষার প্রস্তুত করিয়া

থাকেন। সুশ্রুত লৌহ-কলসীর মধ্যে মুখবন্ধ করিয়া তীক্ষ্ণক্ষার সংরক্ষণের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও এই ব্যবস্থামত ক্ষার রক্ষা করিয়া থাকেন।

তীক্ষ্ণক্ষার হীনবীর্য্য হইলে, অর্থাৎ Carbonated হইয়া গেলে, পুনরায় চূণের সহিত তাহাকে জ্বাল দিয়া লইতে হয়। এই আধুনিক বিজ্ঞানের মতটীও সুশ্রুতের মতের প্রতিধ্বনি মাত্র।

সুশ্রুতের মতে—ক্ষার ঈষৎ শ্বেতবর্ণ ও পিচ্ছিল। নব্য রাসায়নিকগণও এই কথা স্বীকার করিয়া থাকেন। অম্লরসের (Acids) দ্বারা যে তীক্ষ্ণক্ষারের তেজ নষ্ট (Neutralisation) হয়,—ভারতের অদ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক সুশ্রুতই ইহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সুশ্রুত বলেন—ক্ষার পদার্থে লবণ রস আছে, সেইজন্য অম্লরসের সহিত লবণ রস মিশ্রিত হইলে, ক্ষারের তীক্ষ্ণতা দূর হয়—ক্ষার মধুরগুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নব্য রসায়ন শাস্ত্রেও প্রকারান্তরে—এই মত সমর্থিত হইয়াছে। অম্ল ও ক্ষার সংযুক্ত হইয়া যে এক নূতন পদার্থ উৎপাদিত হয়, তাহার নাম লবণ (Salt) ; এই লবণ জাতীয় পদার্থে অম্ল বা ক্ষারের গুণ না থাকায়, অম্ল ও ক্ষারের সংযোগে—ক্ষারের তেজ প্রশমিত হয়। ইহাই নব্য রসায়নের সিদ্ধান্ত।

মৃদুক্ষার।—যব ভিন্ন বহু স্থলজ বৃক্ষের ভস্ম হইতে যে ক্ষার পদার্থ পাওয়া যায়, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ তাহা জানিতেন। ঘণ্টাপারুল, কুড়চী, পারিভদ্র প্রভৃতি বৃক্ষ ভস্ম করিয়া মৃদুক্ষার প্রস্তুত-প্রণালী অনুধাবন করিলেই আমরা তাহা বুঝিতে পারি। বাহুল্য ভয়ে সে সকল বিধি আমরা উদ্ধৃত করিলাম না। অনুসন্ধিৎসু পাঠক সুশ্রুতোক্ত "ক্ষার পাক বিধি" পড়িয়া দেখিবেন। ঘণ্টাপারুল, কুড়চী প্রভৃতির ভস্ম এক এক ভাগ লইয়া (মোট ৩২ সের) ১৯২ সের জলে (অথবা গোমূত্রে) গুলিয়া, তাহা উপর্য্যুপরি ২১ বার বস্ত্র পরিশ্রুত করিয়া সেই ক্ষারজল গ্রহণ করিবে। পরে ঐ জল কটাহে চড়াইয়া অগ্নির জ্বালে পাক করিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে হাতা দিয়া উহা নাড়িয়া দিবে। যখন দেখিবে উহা স্বচ্ছ রক্তবর্ণ ও পিচ্ছিল হইয়াছে, তখন নামাইয়া ছাঁকিয়া সিঠা বাদ দিবে। ইহারই নাম মৃদুক্ষার।

মধ্যম ক্ষার।—মৃদুক্ষার অর্থাৎ কার্ব্বনেট হইতেই মধ্যম ক্ষার প্রস্তুত হইয়া থাকে। নব্য রাসায়নিকগণ—চূণের সহিত কার্ব্বনেটকে উত্তপ্ত করেন। সুশ্রুতেরও ইহাই অভিমত।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে প্রস্তুত ক্ষারজল হইতে ৵১৷৹ জল পৃথক করিয়া রাখিয়া বাঁকি জল কড়ায় করিয়া জ্বাল দিবে। পরে নাটা, ভস্ম শর্করা, ঝিনুক ও শঙ্খ নাভি এই ৪ দ্রব্য অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া যে চূর্ণ প্রস্তুত হইবে—সেই চূর্ণ ৵৪ সের লইয়া—পৃথক রক্ষিত দেড় সের ক্ষার জল সহ পেষণ করিয়া চুল্লীস্থ ক্ষার মধ্যে উহা নিক্ষেপ করিবে। হাতা দিয়া ঘন ঘন নাড়িতে থাকিবে—যেন উহা তরল হইয়া না যায়। পাকশেষে নামাইয়া, লৌহ কলসে পুরিয়া মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিবে। ইহারই নাম মধ্যম ক্ষার।

তীক্ষ্ণ ক্ষার।—তীক্ষ্ণক্ষার—একটী স্বতন্ত্র ক্ষার নহে। মৃদুক্ষারে, দন্তী, দ্রবন্তী, রক্ত চিত্রক, গণিয়ারী, নাটাকরঞ্জ, তালমূলী, বিটলবণ, সুবর্চ্চিকা, কনকক্ষীরী, হিং, বরু, এবং কাষ্ঠ বিষ—ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪

তোলা মাত্রায় নিক্ষেপ করিয়া পাক করিলে তীক্ষ্ণক্ষার প্রস্তুত হয়।

ক্ষার-কল্পনায়—সুশ্রুতোক্ত প্রণালীই যে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ গ্রহণ করিয়াছেন, সংক্ষেপে আমরা তাহা দেখাইলাম। সুশ্রুত অস্ত্র চিকিৎসার সময় প্রয়োজনীয় স্থলে এই সকল ক্ষারের প্রয়োগ করিতেন। সুশ্রুত বলিয়াছেন, পীড়িত স্থান ক্ষার দ্বারা দগ্ধ করিলে জ্বালা করিতে থাকে। সেই জ্বালা নিবারণের জন্য, সুশ্রুত দগ্ধ স্থানে ঘৃত ও মধুসহ অম্ল বর্গের প্রলেপ দিবার উপদেশ দিয়াছেন। ক্ষার দ্রব্যে অম্লরস ব্যতীত সকল প্রকার রসেরই অস্তিত্ব আছে। তবে ইহাতে কটুরস ও লবণ রসের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

হায়! সুশ্রুতের যুগ ত অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে, তাঁহার শল্যতন্ত্রও নামশেষ হইয়াছে, কিন্তু তিনি যে জগতের প্রথম বৈজ্ঞানিক—কেবল এই কথা বলিয়াই আমরা সভ্যজগতে এখনও গর্ব্ব প্রকাশ করিতে পারি।

শ্রীসুধাংশুভূষণ সেন গুপ্ত।

ক্ষয়রোগ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

স্ত্রীলোকের ঋতু বন্ধ।—ক্ষয়রোগ জন্মিলে স্ত্রীলোকের ঋতু বন্ধ হইয়া যায়। ধাতু সকলের ক্ষয় এবং শরীর রক্তহীন হয় বলিয়া এইরূপ ঘটে। যেমন প্রসবের সময় অতিরিক্ত রক্ত স্রাব হয় বলিয়া শরীরে পুনরায় যথেষ্ট রক্ত সঞ্চয় না হওয়া পর্য্যন্ত ঋতুস্রাব হয় না, ইহাও সেইরূপ রক্তের অভাবে ঘটিয়া থাকে।

জ্বর, অরুচি ভয়ানক উৎকাসি।—রোগিনী মুসলমান জাতীয়। কথিত উপসর্গ ব্যতীত আর কোন উপসর্গ ছিলনা। প্রথমে কাস সংযুক্ত জ্বর মনে করিয়া চিকিৎসা করি। কিন্তু কাস, কিছুতেই কমে না। দিবারাত্রি রোগী কাসে, বিরাম নাই বলিলেই চলে। কাস যখন কিছুতেই কমিল না, জ্বর সর্ব্বদাই থাকে এবং শরীরে অত্যন্ত ক্ষয় হইতেছে দেখিলাম, তখন ক্ষয়রোগ বলিয়াই স্থির করি। অল্পদিন পরেই রোগী মারা যায়।

যত প্রকার ছদ্মবেশে যক্ষ্মারোগ উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে যাহা দেখিয়াছি তাহাই লিখিলাম। বোধ হয় ইহার আরও প্রকারভেদ থাকিতে পারে। ফলকথা যক্ষ্মা রোগ এইরূপভাবে চোরের মত লুকাইয়া আক্রমণ করে বলিয়া অনেক সময় প্রথমে রোগ ধরা পড়ে না, সেইজন্য প্রায়ই মারাত্মক হয়। সুতরাং এ সম্বন্ধে সাধারণের ও চিকিৎসকগণের যথেষ্ট সতর্ক হওয়া উচিত।

ক্ষয়রোগের অসাধ্য লক্ষণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে,—"পূর্ব্ব কথিত একাদশ প্রকার উপসর্গ, অথবা কাস, অতিসার, পার্শ্ব বেদনা, স্বরভঙ্গ, অরুচি ও জ্বর এই ছয়টী উপসর্গ, অথবা জ্বর, কাস ও রক্ত নির্গমন এই তিনটী উপসর্গ ঘটিলে, রোগী বাঁচে না।" গ্রন্থান্তরে কথিত হইয়াছে—"কাসও মাংসের ক্ষয় ঘটিলে, ক্রিয়া অমর

লক্ষণ, অৰ্দ্ধেক লক্ষণ বা তিনটী (পূর্ব্ব কথিত) লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগী রক্ষা পায় না।”

অপর অসাধ্য লক্ষণ যথা—“যে ক্ষয়রোগী প্রচুর আহার করা সত্বেও ক্ষীণ হইতে থাকে, যাহার অতিসার হয় এবং মুষ্ক ও উদর ফুলিয়া উঠে সে রোগী বাঁচে না। যে রোগীর চক্ষু শুক্লবর্ণ, অন্নে দ্বেষ হইয়াছে, কষ্টে প্রস্রাব করে এবং উর্দ্ধশ্বাস হয়, সে রোগীর শীঘ্র মৃত্যু হয়।

চিকিৎসাযোগ্য ক্ষয় রোগীর সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে,—

“যে রোগীর জরানুবন্ধ নাই; যে রোগী বলবান, যে রোগী চিকিৎসা ক্রিয়া (বমন, বিরেচন, ঔষধ) সহ্য করিতে সক্ষম, যে রোগী অত্যাচারী নহে), দীপ্তাগ্নি সম্পন্ন এবং অকৃশ —এইরূপ রোগীর চিকিৎসা করিবে।

ফলতঃ ক্ষয় রোগীর আরোগ্য লাভের পক্ষে দুইটী বিষয় প্রধান, বল, মাংস প্রথমতঃ ক্ষয় না হওয়া এবং দ্বিতীয়তঃ অগ্নি প্রবল থাকা। অবশ্য ক্ষয়রোগ জন্মিলে বল, মাংসের কিছু ক্ষয় হইবেই, কিন্তু অতিরিক্ত ক্ষয় হইলে আর আরোগ্য লাভের আশা থাকে না। তারপর অগ্নিবল। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

“পুরুষের জীবনের মূল বল এবং বলের মূল অগ্নি। সুস্থ ব্যক্তির পক্ষেই এই,—ক্ষয় রোগীর ত কথাই নাই। ক্ষয়রোগীর অগ্নি যদি যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য পরিপাক করিয়া ক্ষয়ের পূরণ করিতে না পারে, তবে সে রোগীর জীবনের আশা কম।

ক্ষয়রোগ ভাল হয় কি না?—এ সম্বন্ধে আমাদের ভাবিবার কিছু নাই। পৌরাণিক কাহিনীতে বহু প্রাচীন কালে চন্দ্রদেবের যক্ষ্মা রোগ হইতে মুক্ত হইবার পরিচয় পাওয়া যায়। চিকিৎসা শাস্ত্রেও ক্ষয়রোগের সাধ্যাসাধ্য অবস্থা লিখিত হইয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এই বিষয় লইয়া বহুকাল হইতে মাথা ঘামাইয়া আসিতেছেন। এতদিন যক্ষ্মারোগ ভাল হয় না বলিয়া তাঁহাদের ধারণা ছিল। সুখের বিষয় এক্ষণে তাঁহারা ইহা সুখসাধ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। অবশ্য প্রথম হইতে চিকিৎসা করা আবশ্যক এ কথাও তাঁহারা বলেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত সকল, মুক্তবায়ু —সেবনই ক্ষয়রোগের প্রধান চিকিৎসা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র—সার-বান পদার্থ—যথা দুগ্ধ, মাংস, স্বর্ণভস্ম, মুক্তাভস্ম প্রভৃতির পক্ষপাতী। একথায় কেহ যেন মনে না করেন যে আয়ুর্ব্বেদ ক্ষয়রোগে মুক্তবায়ু-সেবনের উপকারিতা বুঝেন না; আয়ুর্ব্বেদ মুক্তবায়ু সেবনের উপকারিতা বিলক্ষণই বুঝিতেন। তাই শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, “বায়ুই আয়ু।” তদ্ব্যতীত শাস্ত্রে আরও কথিত হইয়াছে যে, ঋতুবিষম অর্থাৎ যে ঋতুতে যেরূপ হওয়া উচিত তাহার বিপরীত—যেমন বসন্তকালে উত্তরবায়ু, অতি স্তিমিত (স্তব্ধ), অতি চল (দ্রুতগামী), অতি পরুষ (খরখরে), অতি শীতল, অত্যন্ত উষ্ণ, অত্যন্ত রুক্ষ, অত্যন্ত অভিষ্যন্দী (জল সংযুক্ত), অতি ভয়ঙ্কর শব্দযুক্ত, ও পরস্পর অতি প্রতিহত, অতি (ঘূর্ণমান) এবং অহিতকর গন্ধ, বাষ্প (গ্যাস), সিকতা, ধূলি ও ধূম সংযুক্ত বায়ু দূষিত। আবার ধূমও শোথ ও কাস রোগের কারণ স্বরূপ। সুতরাং ক্ষয়রোগীর পক্ষে যে দূষিত বায়ু সেবন পরিত্যাগ করা উচিত—সে বিষয়ে সন্দেহ কি? আবার সহরের ধূলিধূমসংযুক্ত বায়ু অপেক্ষা পল্লীর নির্ম্মল বায়ু যে হিতকর তাহা নিশ্চয়

প্রকৃত কথা, বিশুদ্ধ বায়ু যে ক্ষয়রোগীর পক্ষে হিতকর এবং ধূমধূলি সংযুক্ত বায়ু যে অনিষ্টকর ইহা অবিসংবাদিত। কিন্তু তদ্ব্যতীত ক্ষীণমাম যক্ষ্মারোগীর দেহের ক্ষয় নিবারণ জন্য পুষ্টি-জনক ঔষধও নিতান্ত আবশ্যক। ফলতঃ ক্ষয়রোগীর শরীরের পুষ্টি সাধনই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা। সেইজন্যই আয়ুর্ব্বেদে ক্ষয়রোগীকে ক্ষয়নিবারক এবং ধাতুপোষক ঔষধ দিবার ব্যবস্থা আছে।

স্বর্ণভস্ম, রৌপ্য, তাম্র, হীরকভস্ম, মুক্তাভস্ম লৌহভস্ম প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার পুষ্টিকর ধাতু, উপধাতু যক্ষ্মারোগে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যক্ষ্মা রোগীর যে ক্ষয়কর ঘর্ম্ম হয়, তাহা নিবারণের জন্য ক্ষয়নিবারক অনেক ঔষধের সহিত প্রবাল ভস্ম সংযুক্ত করা হইয়াছে। প্রবালের ন্যায় উৎকৃষ্ট ঘর্ম্ম-রোধক ঔষধ আর নাই। যাহাদের স্বভাবতঃ অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয়, তাহাদিগের পক্ষে প্রবালের মালা ধারণ করিলে ঘর্ম্মাধিক্য নিবারিত হইয়া থাকে।

কস্তূরী বা মৃগনাভিও ক্ষয়রোগের একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহা যে কেবল পুষ্টিকর এবং ক্ষয়নাশক তাহা নহে। ইহা শারীরিক ক্রিয়ার উত্তেজক বলিয়া যক্ষ্মারোগে মহোপকার সাধন করিয়া থাকে। অপিচ কস্তূরী কফ, বায়ু, শীত এবং বিষনাশক।

ক্ষয়নিবারণের জন্য শাস্ত্রকারগণ চ্যবনপ্রাশ, ছাগলাদ্য ঘৃত প্রভৃতি বিশিষ্ট পুষ্টিকর ঔষধ প্রয়োগের বিধি দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ঘৃতাদি ক্ষয়রোগীর সকল অবস্থায় প্রযুজ্য নহে। জ্বর, অজীর্ণ, উদরাময় প্রভৃতি থাকিলে ঘৃত সহ্য হয় না। তবে অজীর্ণ সত্ত্বেও ভোজনের প্রথম গ্রাসের সহিত অল্প মাত্রায় ছাগলাদ্য ঘৃত প্রয়োগ করিয়া সহ্য হইতে দেখিয়াছি। যাহা হউক জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ না থাকিলে ঘৃত প্রয়োগে বিশেষ ফল হইয়া থাকে।

পথ্য সম্বন্ধে কবিরাজদিগের একটু দুর্ণাম আছে। জ্বর, অতিসার প্রভৃতি রোগের প্রথমা-বস্থায় তাঁহারা রোগীকে লঙ্ঘন দিয়া থাকেন। কিন্তু ক্ষয়রোগের পথ্য সম্বন্ধে ঠিক তাহার বিপরীত। ক্ষয়রোগে সর্ব্বপ্রকার পুষ্টিকর পথ্য দিবার বিধি আছে। যব, গম, মুগ, ছোলা, উত্তম চাউল, মাখন, ঘৃত প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত নানাপ্রকার খাদ্য এই রোগে সুপথ্য। মাংসেরত কথাই নাই, মাংসের যূষ, মাংসের বড়া, মাংস রৌদ্রে শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া তাহা হালুয়ার ন্যায় করিয়া, মাংসের লাড়ু—এইরূপ বিবিধ উপায়ে ক্ষয়রোগীকে মাংস দিবার ব্যবস্থা আছে। জাঙ্গল দেশজ মৃগ, পক্ষীর মাংস, যক্ষ্মারোগে হিতকর। যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসায় সর্ব্বাপেক্ষা ছাগের বড়ই আদর। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"ছাগমাংস, ভক্ষণ, ছাগদুগ্ধ চিনি সংযুক্ত পান, ছাগী ঘৃত, ছাগসেবা এবং ছাগমধ্যে শয়ন—ক্ষয়রোগ নাশক।

সুশ্রুতে—লিখিত আছে যে, ছাগবিষ্ঠা, ছাগমূত্র, ছাগদুগ্ধ, ছাগঘৃত, ছাগরক্ত ও ছাগ-মাংস সেবন যক্ষ্মারোগ নাশক।

ছাগের যে যক্ষ্মারোগ প্রতিষেধক শক্তি আছে, তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরাও প্রমাণ করিয়াছেন। ছাগের শরীরে যক্ষ্মা-রোগের বীজ প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেও উহাদের যক্ষ্মারোগ হয় না।

যক্ষ্মারোগের পথ্যাপথ্য শাস্ত্রে যাহা লিখিত হইয়াছে,—আমরা নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

মোচা পাকা কাঁঠাল, পাকা আম,

খেজুর, ফলসা ফল, আমলকী, কিসমিস, সজিনার ফুল ও ডাঁটা, পলতা, কচি তালশাঁস, কর্পূর, মিছরী প্রভৃতি ক্ষয়রোগে হিতকর।

মলমূত্রাদির বেগধারণ, পরিশ্রম, স্ত্রীসহবাস, স্বেদ, রাত্রিজাগরণ, বলপ্রয়োগসাধ্য কার্য্য করা রুক্ষ অন্নপান, তাম্বূল, তরমুজ, কুলথ কলায়, মাষকলায়, রশুন, বাঁশের কোঁড়, হিং, অম্লদ্রব্য, তিক্ত দ্রব্য কষায় দ্রব্য, কটু দ্রব্য, সর্ব্বপ্রকার পত্র-শাক, ক্ষারদ্রব্য, শিম, প্রভৃতি ক্ষয়রোগে অপথ্য।

ক্ষয় রোগীর মন যাহাতে প্রফুল্ল থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিবার উপদেশ শাস্ত্রে বিশেষ-ভাবে দেওয়া হইয়াছে। সুবেশবিন্যাস, মাল্যধারণ, হর্ষজনক বাক্যশ্রবণ, সঙ্গীতশ্রবণ, নৃত্যদর্শন, চন্দ্রকিরণ দর্শন, মুক্তামণি নির্ম্মিত প্রচুর ভূষণধারণ, যজ্ঞ, দান, দেবতা ও ব্রাহ্মণের পূজা—ক্ষয়রোগীর পক্ষে হিতকর। এই সমস্ত কার্য্যদ্বারা রোগীর মন বেশ প্রফুল্ল ও সন্তুষ্ট থাকে। অপিচ, সর্ব্বদা রোগের বিষয় ভাবিয়া রোগী রোগকে বর্দ্ধিত করিয়া তুলিতে পারে না। মনের সুখ আরোগ্যের সর্ব্বপ্রধান সহায়।

ক্ষয়রোগীর মল ও শুক্র যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করা উচিত, কারণ ক্ষীণমান যক্ষ্মারোগীর সর্ব্বধাতুসার শুক্র—ক্ষয় হইলে তাহাকে আর কতদিন বাঁচাইয়া রাখা যাইতে পারে! সেই-জন্য যক্ষ্মারোগীর শুক্র-ক্ষয় যাহাতে না হয়, তাহার জন্য সর্ব্বতোভাবে যত্ন করা কর্ত্তব্য।

ক্ষয় রোগীর মল রক্ষা সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন, –রাজযক্ষ্মারোগীর মল বিশেষভাবে রক্ষা করা উচিত। কারণ সর্ব্বধাতুক্ষয় পীড়িত রোগীর মলই বলস্বরূপ হইয়া থাকে।

এক্ষণে আমরা বঙ্গদেশে ক্ষয়রোগের প্রাবল্যের কারণ আলোচনা করিব। পূর্ব্বে যক্ষ্মারোগের সাহসাদি যে কয়টী কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, প্রত্যেকটী অবলম্বন করিয়া বলা যাইতেছে।

সাহস।—সাহস বল প্রয়োগসাধ্য। বাঙ্গালীর বলই নাই, সুতরাং বল প্রয়োগ করিবে কিরূপে? যদিও এইজন্য দুই চারি জনের ক্ষয়রোগ হয়, কিন্তু তাহা রোগের প্রাবল্যের কারণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

বিষমাশন—কোন দিন অল্প, কোন দিন অধিক কোন দিন সকালে, কোন দিন বিকালে, এইরূপ অনিয়মে আহার করাকে বিষমাশন বলে। আমাদের দেশে ইহার অভাব নাই সেইজন্যই ইহাকে ক্ষয় রোগের প্রাবল্যের কারণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে।

সুশ্রুতে কথিত হইয়াছে, রন্ধনশালা বিশ্বস্ত-জন পরিবেষ্টিত, প্রশস্ত এবং পবিত্র স্থানে হওয়া উচিত। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের রন্ধনশালার "বামুন ঠাকুর" বা রসুয়ে বামুন বা চপ-কাটলেট প্রস্তুতকারী ইতর জাতীয় লোক, ময়রার দোকানের ময়রা বা অন্যজাতি একেবারেই বিশ্বস্ত নহে। ইহারা অর্থোপার্জ্জনের দিকে লক্ষ্য রাখে, ভোক্তার মঙ্গলামঙ্গলের দিকে একেবারেই লক্ষ্য রাখে না। ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, মাতাকে বা মাতৃতুল্য ব্যক্তিকে আহারীয় প্রস্তুতের ভার প্রদান করিবে। হায় বঙ্গজননীগণ; তোমরা আজ ইহার ব্যতিক্রম করিতেছ বলিয়াই বঙ্গের আজ এই দুর্দ্দশা।

খাদ্য রক্ষা সম্বন্ধে সুশ্রুত বলেন যে, বিবিধ গুণযুক্ত সুসংস্কৃত অন্ন গোপনভাবে পবিত্রস্থানে রাখিয়া দিবে। কিন্তু আমাদের ময়রার

দোকানের খাবার, হোটেলের চপ-কাটলেট পথের ধূলি রঞ্জিত হইয়া প্রকাশ্য এবং অপবিত্র স্থানে আনন্দে বিরাজ করে। রসুয়ে বামুনের রন্ধন করা অন্ন আহার করা যাঁহাদিগের ভাগ্যে ঘটে, তাঁহাদের অবস্থাও এইরূপ।

তারপর, শাস্ত্রে ঘৃত, দুগ্ধ, জাঙ্গলমাংস, প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য নিত্য আহার করিবার উপদেশ আছে। আমাদের অনেকেরই ভাগ্যে ঐ সকল জোটে না। বাঙ্গালীর ঘরে শাক আর ভাত! তাহাও আবার অনেকের ভাগ্যে টাটকা মেলে না, অনেককে বাসী ও শুষ্ক তরকারীই প্রায় আহার করিতে হয়। বাঙ্গালী ক্ষয়রোগগ্রস্ত না হইবে না তো হইবে কাহারা?

আহারের সময় সম্বন্ধে শাস্ত্রোপদেশের অনুসরণ আমরা করিতে পারিনা। ইহার প্রধান কারণ—চাকরী বা অন্য কাজ কর্ম্মের অনুরোধে অনেককেই ৮।৯।১০ টা'র মধ্যে খাইতে হয়। আর খাইয়াই কর্ম্মস্থলের উদ্দেশে বেগে ধাবিত হইতে হয়। কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আহারের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার বিধি শাস্ত্র যে মাথার দিবা দিয়া বলিয়া গিয়াছেন! আমরা সে সকল কথা মানিনা বলিয়াই তো আমাদের এই দুঃখ! আমরা নিজের দোষে রোগ ভোগ করিতেছি—আমাদের ব্যাধি আমাদেরই অনিয়মের ফল সম্ভূত। কবি এইজন্যই না বলিয়া গিয়াছেন,—

"কারো দোষ নয় গো মা!
আমি স্বখাদ-সলিলে ডুবে মরি শ্যামা!"

(আগামী বারে সমাপ্য)

শ্রী—

সূচিকাভরণ ও INJECTION

—:*:—

আয়ুর্ব্বেদ অনন্ত ঔষধের ভাণ্ডার—এ কথা সত্য। কিন্তু তথাপি অনেক স্থলেই আধুনিক আয়ুর্ব্বেদজ্ঞকে অপদস্ত হইতে হয়। নিম্নে এরূপ একটি উদাহরণ দেওয়া গেল।

আমি এক বৎসর হইল কার্য্যোপলক্ষে মুক্তা-পাছার নিকটবর্ত্তী এক পল্লীতে গিয়াছিলাম। সেখানে একটি জ্বর রোগীর আয়ুর্ব্বেদীয় মতে চিকিৎসা হইতেছিল। সন্ধ্যার সময় রোগীর নাড়ীর গতি বিশৃঙ্খলা, বাক্‌রোধ ও হিমাঙ্গ উপস্থিত হইল। কবিরাজ মহাশয় ঔষধ দিলেন, কিন্তু রোগীর গলাধঃকরণের শক্তি নাই। বেগতিক বুঝিয়া তিনি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন।

তৎক্ষণাৎ একজন sub assistant surgeonকে ডাকা হইল। সেই সময় আমিও সেখানে উপস্থিত হইলাম। ডাক্তার বা[বু] রোগী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "অবস্থা খারাপ আরও পূর্ব্বে যেমন তেমন একজন এলো-প্যাথিক ডাক্তার আনাইলে ভাল হইত এরূপ অবস্থায় কবিরাজের উপর নির্ভর করি[য়া] থাকা সঙ্গত হয় নাই।" কথা শুনিয়া আ[মি] লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া পড়িলাম। ডাক্তারবা[বু] রোগীকে Injection করিলেন। রাত্রি ১[...] টার সময় রোগী কথা কহিল। তখন তি[নি] 'মকরধ্বজের' ব্যবস্থা করিলেন। উহা আমা[র] সঙ্গেই ছিল। এক মাত্রা প্রয়োগ করিয়া বেশ ফল পাওয়া গেল। দুই ঘণ্টা পরে আ[র] এক মাত্রা দিতে বলিলেন। আমি বলিলা[ম]

কি ডাক্তার বাবু। ডাক্তারীতে বুঝি কুলাই-তেছে না—রীতিমত যে কবিরাজী আরম্ভ করিয়া দিলেন? এখন দেখছি ডাক্তারের উপর নির্ভর করিয়া থাকাই অসঙ্গত হইয়া দাঁড়াইল! ডাক্তার বাবু হাসিয়া বলিলেন, "আমি মকরধ্বজের খুব পক্ষপাতী এবং চিরদিন ইহা ব্যবহার করিয়া আসিতেছি।" এই সূত্রে তাঁহার সহিত আমার বেশ আলাপ-পরিচয় হইল। তিনি কথায় কথায় বলিলেন, "আয়ুর্ব্বেদে কি Injectiou নাই?" আমি বলিলাম, "ডাক্তারী মতে Injection করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়, কিন্তু আমাদের মতে ওরূপ ভাবে ঔষধ প্রয়োগের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। এরূপ অবস্থায় সূচিকাভরণ শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহা সেবন করাইতে না পারিলে রোগীর মস্তকে কিঞ্চিৎ স্থান ক্ষত করিয়া লাগাইয়া দিলে বিদ্যুদ্বেগে সমস্ত শরীরে উহার ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহাতে আপনাদের মত Spirit Lamp, Syringe প্রভৃতি কোন আপদ বালাইয়ের দরকার হয় না।" ডাক্তার বাবু বলিলেন, "উনি সূচিকা-ভরণ প্রয়োগ করিলেন না কেন?" আমি বলিলাম, "উহাতে সর্পবিষ আছে, কাজেই উহা সকলে প্রয়োগ করিতে পারেন না।" তিনি সর্প বিষের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া দুঃখের সহিত বলিলেন, "আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের শ্রেষ্ঠ উপাদান-গুলির ব্যবহার সম্বন্ধে যদি এখন এইরূপই হইয়া থাকে, তবে আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি কিরূপে সম্ভব? কবিরাজ মণ্ডলী যদি এখনও এবিষয়ে ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন, তবে নানাস্থানে সভাসমিতি করিয়াই বা লাভ কি?" বলাবাহুল্য যে, আমি ডাক্তার বাবুর এ কথার কোন প্রত্যুত্তর দিতে সক্ষম হই নাই। কিন্তু ডাক্তার মহাশয়ের কথা অনুসারে আমি বলিতে বাধ্য যে, ইহা কবিরাজ মহাশয়দের পক্ষে বিশেষ লজ্জার কথা।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিষ-চিকিৎসাগুলি ক্রমেই কালের করালগর্ভে বিলীন হইয়া যাইতেছে। প্রত্যক্ষ ঔষধগুলি লুপ্ত হওয়ার দুইটী কারণই প্রধান। (ক) উপকরণের অভাব, (খ) প্রাচীন চিকিৎসকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ঔষধের লোপ। এক সময়ে এতদঞ্চলে কয়েকজন প্রাচীন কবিরাজ বিষ-চিকিৎসায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ঔষধগুলি প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ডাক্তারী Injectionএর সঙ্গে ঐ সকল ঔষধের বেশ তুলনা হইতে পারে। রোগীর যখন জীবনের আশা থাকিত না, তখন শরীরের কোন স্থানে ক্ষত করিয়া তাঁহারা ঐ সকল ঔষধ প্রয়োগ করিতেন। প্রাচীন লোকমুখে শুনা যায়, এই উপায়ে অনেক মুমূর্ষু রোগী বাঁচিয়া গিয়াছে। আমরা বহু অনুসন্ধানে এইরূপ একটি চিকিৎসকের আত্মীয়ের নিকট হইতে ৪০ বৎসরের পূর্ব্বেকার তৈয়ারী তিনটি বটি প্রাপ্ত হইয়াছি। দুঃখের বিষয় কিন্তু উহার প্রস্তুত প্রণালীর লিখিত কোন ফর্দ্দ পাই নাই। অন্য এক স্থান হইতে সংগৃহীত একখানি হস্তলিখিত ছিন্ন পুস্তকে মাত্র কয়েকটি ঔষধের ফর্দ্দ পাইয়াছি, তাহার একটি নিম্নে প্রকাশ করিলাম।* কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসক মহোদয় ইহা প্রয়োগ করিয়া ফলাফল 'আয়ুর্ব্বেদে' প্রকাশ

* সোদর প্রতিম কবিরাজ শ্রীমান্ যোগেন্দ্রকিশোর-লোহ এই পুস্তকখানি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

করিলে বাধিত হইব। আমরা উহা কাহাকেও প্রয়োগ করিতে সাহসী হই নাই। কেননা অজ্ঞাত ঔষধে রোগমুক্তি অপেক্ষা জীবন মুক্তির আশঙ্কাই বেশী বলিয়া বোধ হয়।

বিশ্বনাথ রস।

বংশপত্র হরিতাল	১
মনঃশিলা	১
শিমুলক্ষার	১
অমৃত	১
তুঁতে ভস্ম	১
শ্বেত করবীর মূলেরছাল	১
কজ্জলী	।০

চিতামূলের রসে ৭ ভাবনা ও নিসিন্দা পত্র রসে একদিন মর্দ্দন করিয়া ১ রতি বটী করিতে হইবে। হরিতালকে কুষ্মাণ্ডরস, তিল তৈল ও ত্রিফলার কাথে পৃথক পৃথক দোলাযন্ত্রে শোধন। তুঁতে পায়রার বিষ্ঠাসহ একটি মুছিতে ভরিয়া গজপুট। অনুপান দুগ্ধ। পথ্য দুগ্ধ, ঘৃত, মিঠাই, অন্ন, অবস্থাদৃষ্টে দেয়। লবণ জল বর্জ্জিত। সন্নিপাতে, বাক্‌রোধে নাড়ী ডুবিলে।

বারান্তরে অন্যান্য ঔষধ গুলিও প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীশ্যামাচরণ মৈত্র কবিরত্ন।

উচ্ছে।

("পল্লীবার্ত্তা" হইতে উদ্ধৃত)।

উচ্ছে দুই প্রকার। ১। বড় উচ্ছে ও ২। ছোট উচ্ছে। বাজারে বড় উচ্ছেকে করেলা এবং ছোট উচ্ছেকে শুধু উচ্ছে বলে।

কারবেল্ল বড় উচ্ছের সংস্কৃত নাম। ইহার অপভ্রংশ করেলা। কারবেল্লী ছোট উচ্ছের সংস্কৃত নাম। বড় উচ্ছের ইংরাজী নাম Momordica Charantia; হিন্দি নাম করেলা; এবং ছোট উচ্ছেকে ইংরেজীতে M. Muricata এবং হিন্দিতে করেলী বলে।

সুশ্রুত মতে উচ্ছেলতার কাথ দ্বারা পক্ক ঘৃত বাতরক্তে বিশেষ হিতকর ঔষধরূপে গণ্য। (চিঃ—৫ অঃ।) ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে—উচ্ছে রক্ত শোধক; ডাক্তারেরা বলেন, "ব্যাসিলাস লেপ্রি" বলিয়া এক প্রকার কীটাণু বাতরক্ত জন্মাইয়া থাকে, তবে উচ্ছে এই কীটাণু ধ্বংস করিতে পারে বলিয়াই উচ্ছেকে বাতরক্ত রোগের ঔষধ একথা বলা যাইতে পারে। কীটাণু শরীরে থাকিলে রোগের উপশম হয় না, বাতরক্ত রোগ হইতে মুক্তি পাইলেই যে শরীরের ঐ কীটাণু নষ্ট হইয়াছে এরূপ মনে করা অযৌক্তিক হইতে পারে না। মসূরিকা রোগের চিকিৎসা-ব্যবস্থায় ভাব প্রকাশে কুষ্ঠ রোগে যে সকল লেপনাদ ক্রিয়া উক্ত হইয়াছে এবং পিত্তশ্লেষ্ম বিসর্পে যে সকল ক্রিয়া কথিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই ঐ, রোগ হিতকর ও প্রশস্ত বলা হইয়াছে।

ভাব প্রকাশ বলেন, করেলা পত্রের রসে হরিদ্রাচূর্ণ সংযুক্ত করিয়া পান করিলে রোমান্তী

জ্বর, বিসর্প ও ব্রণের প্রশমন হয় (মঃ খঃ ১ম ভাঃ)।

চক্রদত্ত বলেন,—জ্বর রোগীর সেবনার্থ উচ্ছে শাক ব্যবস্থা করিবে (জ্বর - চিঃ)।

Its action & uses—

Stimulent and alternative; the fruit pulp & juice of the leaves & also seeds are anthelmintic & given in lumbrici. The fruit is also tonic and alternative & given in rheumatism, gout and deseases of the liver & spleen. The whole plant powdered is used for dusting over leprous & other intvactable ulcers. (Materia Madica of India— R. N. Khory, part II, p, 314)

উচ্ছে শীতবীর্য্য, ভেদক, লঘু ও তিক্ত রস। ইহা জ্বর, পিত্ত, কফ, কণ্ডু ও ক্রিমিনাশক এবং রক্তশোধক। ফল, বীজ এবং পত্ররস ক্রিমিঘ্ন, প্রশমন, বিবিধ বাত ও প্লীহা যকৃৎ পীড়ার উত্তম পথ্য। দুই প্রকার উচ্ছের একই গুণ। ছোট উচ্ছে লঘু ও অগ্নি দীপক। মাত্রা ১ তোলা হইতে ২ তোলা, নিত্য ব্যবহারে মাত্রা দুই একটু কম বেশী হইলে কোনও অপকার হয় না।

উচ্ছে সর্ব্বপ্রকার বসন্ত রোগের উত্তম প্রতিষেধক; ইহা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কোন বহুদর্শী ব্যক্তির নিকট হইতে অবগত হইয়াছিলাম। এ কথা প্রমাণার্থ আমি নিজে ক্রমান্বয়ে সাত দিবস কাল উচ্ছে খাইলাম,—তাহার পর বসন্তের টিকা লইলাম। বসন্তের টিকা লইবার পরও উচ্ছে খাইতে লাগিলাম; তিন বারই তুল্য ফল ফলিয়াছিল। ১৩২০ সনে অন্য সাত ব্যক্তিকে দিয়া আমি এই পরীক্ষা করিয়াছিলাম, ১৩২১ সনে ৫১ জনকে দিয়া এই পরীক্ষা করিয়াছি,—ইহাদের কোনও ব্যক্তির টিকা উঠে নাই। ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে উচ্ছে বসন্ত ব্যাধির প্রতিষেধক। একই 'লিম্প' হইতে দুই জনকে টিকা দিয়া দেখা হইয়াছে,—যে উচ্ছে খাইয়াছে তাহার টিকা উঠে নাই, আবার যে উচ্ছে খায় নাই—তাহার টিকা হইয়াছে; ইহাতে "লিম্প্" যে কার্য্যক্ষম ইহা প্রমাণিত হয়। এ বৎসরও বহু প্রকার পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, সমফল।

যাঁহারা প্রবল বসন্ত রোগীর চিকিৎসা বা শুশ্রূষা করেন, তাঁহাদের প্রত্যহ এই উচ্ছে আহারীয়ের সঙ্গে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। প্রবল বসন্ত ও হাম রোগীকেও উচ্ছে ভাতে সিদ্ধ করিয়া পথ্য স্বরূপে প্রত্যহ খাওয়ান একান্ত প্রয়োজন; ইহাতে এ পর্য্যন্ত কোন রোগীর মৃত্যুসংবাদ আমরা পাই নাই; রোগও ধীরে ধীরে বেশ সারিয়া যায়। কোনও দুষ্ট উপসর্গ দেখা দেয় না। যাঁহারা বসন্ত রোগীর শুশ্রূষা করেন, তাঁহারা প্রত্যহ উচ্ছে ব্যবহার করিলেও প্রবল বসন্ত-বিষের একান্ত সংশ্রব থাকা হেতু কোন কোন সময়ে ২।৪টি বসন্ত গাত্রে উঠিতে পারে, কিন্তু ইহাতে প্রবল জ্বর হয় না। শরীরে সামান্য বেদনা মাত্র হয়, মারাত্মক হইতে দেখি নাই। * * * *

উচ্ছে ভাত ও ডালের সহিত সিদ্ধ করিয়া, তরকারীরূপে অথবা তৈল বা ঘৃতে ভাজিয়া আহারের প্রথমেই অন্নের সহিত খাইবার ব্যবস্থা বহু প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। সেইরূপই ব্যবহার করিতে হয়। শুধু খাইলেও হয়—অন্য কোন নূতন প্রণালীতে খাইবার নিয়ম নাই। উচ্ছে সপ্তাহে ২।১ দিন না খাইয়া বসন্ত রোগের সময় প্রত্যহ ব্যবহার করা প্রয়োজন; নতুবা উপরোক্ত

ফল নাও ফলিতে পারে—একথা স্মরণ থাকা প্রয়োজন। উচ্ছে খাদ্য ও ঔষধ উভয়ই; ইহা ব্যবহারে কাহারও কোনও ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। * * *

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়, কবিভূষণ।

শিশুর ক্রিমি-চিকিৎসা।

(মহিলাদিগের জন্য ছড়ায় লিখিত)

ক্রিমি শিশুদের শত্রুবড়,
উপেক্ষা কভু নাহি ক'র।
রস্তড়্কা যা' শিশুর হয়,
ক্রিমি প্রায়ই তা'র মূলে রয়।
ক্রিমি নাশক ঔষধ দিলে,
রস্তড়্কায় সুফল মিলে;
ক্রিমি নাশক ঔষধ সহ,
বিরেচন তড়কার ব্যবস্থা দেহ।
ক্রিমি থেকে হয় ওলাউঠা,
জ্বর, অতিসার—এটা—ওটা।

বিছানা আঁচড়ায় মাথা টানে,
নাক চুলকায় দেখ্বে যেখানে,
সেখানে ক্রিমি বুঝে নিও,
বিবেচনা ক'রে ঔষধ দিও।

দাত কিড়্মিড়্ চিহ্ন ক্রিমির,
পেটের ব্যথায় করায় অস্থির।
মুখে জল উঠে—থুতু ফেলে,
ক্রিমিতে জোর দাও সে স্থলে।
শয্যামূত্রও এই কারণে,
প্রায়ই হয়—ক'ন্ বিজ্ঞগণে।

বিড়ঙ্গের অল্প গুঁড় নিয়ে,
ক্রিমি হ'লে দাও খাওয়াইয়ে।
বিড়ঙ্গ বড় উপকারী,
ব্যবস্থা ক'র সদা এরি।

চূণের উপরকার থিতান জল
দ্বিগুণ জল নাও—শীতল,
আর একটু সৈন্ধব নিয়া,
ক্রিমি হ'লে দাও খাওয়াইয়া।

কচি পাতা আনারসের,
মধুসহ খাওয়ালে উপকার ঢের।

কালমেঘের পাতা বড় উপকারী,
ক্রিমিতে ব্যবস্থা দিও এরি।
মাঝে মাঝে কালমেঘ দিলে,
শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নতি মিলে।

পাল্তে মাদার বা চাঁপা ফুলের
পাতার রসে উপকার ঢের।
ক্রিমি রোগে মধুর সহ
যে কোনটি দিতে কহ।

ভাট বা কদম পাতার রস
মধু সহ খেলে ক্রিমি বশ।

চাঁপাফুল, শুঁঠ এক এক আনি,
দাড়িম শিকড়, বিড়ঙ্গ তিনগুণ জানি,

—

আধ আধ আনা সোমরাজ, সোনামুখী,
এক পোয়া জলের এক ঝিনুক রাখি,
অল্প গরম—চারি বারে,
খাইয়ে দিলে ক্রিমি সারে।

—

ছাতিম শিকড়, বিড়ঙ্গ এক এক আনি,
চাপাফুল, শুঁঠ অৰ্দ্ধেক জানি,
নিম শিকড়ের ছাল রতি দুই,
সোমরাজীরও মাপ নাওগে ওই।
পাল্‌তেমাদার আর সোনামুখী,
ওজন কর তিনটি কুঁচ রাখি।
আধ আনা নাও বীজ পলাশের,
দু' আনা কিস্‌মিস্ নাওগে ফের।
সিদ্ধ কর এক পোয়া জলে
নামিয়ে নাও এক কাচ্চা র'লে।
দু'রতি বিট নুন প্রক্ষেপ দিয়ে,
দু' তিন বারে দাও খাওয়াইয়ে।

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত, কবিরঞ্জন।

গর্ভিণীর সাধভক্ষণ।

—:*:—

এতদ্দেশে "গর্ভিণীর সাধভক্ষণ" প্রথাটি যে কতকাল হইতে প্রচলিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা জ্ঞাত না থাকিলেও প্রথাটি যে, বহুকালের এবং আর্য্যঋষিগণ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ও উন্নত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে সংস্থাপিত তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। কেন না, চরক, সুশ্রুত এবং ভাবপ্রকাশ, প্রভৃতি প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থাদিতে এতদ্বিষয়ক বহু গবেষণা পূর্ণ যুক্তি এবং ব্যবস্থাদির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অপিচ জ্যোতিষাদি দর্শনশাস্ত্রেও সাধভক্ষণ ব্যাপারের জন্য শুভদিন ও শুভক্ষণের ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করা গিয়া থাকে। এই সাধভক্ষণ ব্যাপারটি গর্ভিণীর স্বাস্থ্য এবং ভ্রূণের ভাবি জীবনের উন্নতির দিকে বৈজ্ঞানিক লক্ষ্য রাখিয়া প্রবর্ত্তিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অধুনা সে পরিণাম হিতকর উচ্চ বৈজ্ঞানিক-লক্ষ্য-যুক্তির দিকে আদৌ দৃষ্টি না করিয়া একটা যথেচ্ছভাবের প্রথা গঠন করিয়া লওয়ায় মহর্ষিদের বাক্যটির অস্তিত্বমাত্র রক্ষিত হইতেছে। কারণ এক্ষণে আয়ুর্ব্বেদীয় ভিষক্ বা জ্যোতিষ পণ্ডিত গ্রহাচার্য্য প্রভৃতি অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সমাদর আর পূর্ব্বের ন্যায় গৃহস্থগণের গৃহে নাই। সুতরাং গৃহে সমাদরের ত্রুটি প্রযুক্ত তাদৃশভাবে কবিরাজ এবং গ্রহাচার্য্যগণ আর শিক্ষিত হইতেছেন না। ফলতঃ সাধভক্ষণের উদ্দেশ্য কি? উহাতে প্রসূতি এবং গর্ভস্থ ভ্রূণের কি কি উপকার হয়, সাধভক্ষণ না করিলেই বা প্রসূতির ও ভ্রূণের কি কি অপকার হয়, এসকল প্রয়োজনীয় বিষয়ের সমালোচনা দেশমধ্যে আদৌ অনুশীলন না থাকায় ইহা একটা কথার কথামধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িয়াছে।

আজকাল সাধভক্ষণে ভাল কাপড়, উত্তম অলঙ্কার আর পরমান্ন ও মিষ্টদ্রব্য অথবা মৎস্যাদির অনুষ্ঠান করিয়া প্রতিবেশীবর্গকে নিমন্ত্রণ এবং বাদ্যভাণ্ড প্রভৃতি ধূমধাম করিলেই যথেষ্ট হইয়া গেল মনে করা হয়।

কিন্তু সাধভক্ষণ ব্যাপার যে শুভক্ষণেই শেষ নহে, উহা আরম্ভমাত্র এবং উহা এক-দিনের ব্যাপার নহে, উহার সহিত ভাবি সন্তানের সুখ দুঃখ বিজড়িত আছে, তাহা যদি বুঝাইয়া দিবার লোক এখনকার দিনে বর্ত্তমান থাকিতেন, তাহা হইলে শতকরা হয়ত দুইচারজনও উহার উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া তদনুসারে কার্য্য করতঃ দেশমধ্যে আদর্শ সাজিতে পারিতেন।

অদ্য আমরা প্রাচীন শাস্ত্রাদি হইতে এতদ্বিষয়ক বৈজ্ঞানিক হেতুবাদ সকল উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ভরসা করি ইহা দ্বারা পাঠকগণ নিশ্চয়ই উপকৃত হইবেন।

সাধভক্ষণের প্রয়োজনীয়তা।—

শাস্ত্র বলেন—চতুর্থমাস গর্ভের বয়স হইলে তথন ভ্রূণের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়, হৃদয় জন্মে ও চৈতন্য প্রকাশ হয়; এ নিমিত্ত চতুর্থমাসে গর্ভস্থ সন্তান নানাবিধ ভোগ করিতে অভিলাষ করে। আমাদের হোমিও-প্যাথিক শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক যুক্তি অনুসারে এরূপ ভোগবিলাসও শিশু এবং জননীর ভাবি-মঙ্গলজনক। অর্থাৎ যাহার ভাবি মঙ্গল জননে যেরূপ বস্তুর প্রয়োজন, সে তাহাই আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, তৎকালে প্রসূতির দেহ দুইটি হৃদয়বিশিষ্ট (নিজের ও গর্ভস্থ সন্তানের) হয় বলিয়া তাৎকালিক আকাঙ্ক্ষাকে দৌহৃদ বলা যায়। সেই আকাঙ্ক্ষা যথোচিত ভাবে পূর্ণ না হইলে গর্ভস্থ সন্তান কুব্জ, কুনি খঞ্জ, বামন, বিকৃতাক্ষ অথবা অন্ধ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, একদিন একবার মাত্র কতকগুলি মিষ্টান্ন ভক্ষণেই গর্ভিণীর সাধ পূর্ণ হইতে পারে না। বিশেষতঃ সাধ যে শুধু মিষ্টান্নেই পূর্ণ হইতে পারে, এরূপ বলা যাইতে পারে না। ইহাতে অনেকপ্রকার দ্রব্যের জন্যই আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে। নিম্নে সে সকল বিষয়ের বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হইতেছে।

যতঃ স্ত্রী দৌহৃদং প্রাপ্যবীর্য্যবন্তং চিরায়ুষম্।
পুত্রং প্রসূয়তে তস্মাতস্মৈ বাঞ্ছিতমর্পয়েৎ।

(ভাবপ্রকাশ)

অর্থাৎ গর্ভিণী দৌহৃদ প্রাপ্ত হইলে সন্তান বলবান ও আয়ুষ্মান্ হয়। অতএব গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকদিগের অভিলষিত সামগ্রী দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য।

উক্তবচনেও একদিন মাত্র শুভক্ষণ দেখিয়া একবার যে কোন মিষ্টদ্রব্য বা বস্ত্রালঙ্কার দিবার ব্যবস্থা নাই। আবার—

ইন্দ্রিয়ার্থানসৌ যান্ যান্ ভোক্তুমিচ্ছতিগর্ভিণী।
গর্ভবাধাভয়ন্তাসাং ভিষগাহৃত্যদাপয়েৎ॥

ভাবপ্রকাশ।

গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর ইন্দ্রিয়দিগের যাহা যাহা ভোগ করিবার অভিলাষ জন্মে গর্ভপীড়া বা গর্ভবাধা জন্মিবার আশঙ্কায় সেই সকল অভিলাষ পূর্ণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

ভাবপ্রকাশ আরও বলিয়াছেন,—

"গর্ভিণীর যে যে ইন্দ্রিয়ের অভিলাষ পূর্ণ না হয়;—সন্তানের সেই সেই ইন্দ্রিয়ের পীড়া জন্মে।"

এ সম্বন্ধে শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন,—গর্ভিণীর রাজদর্শনে ইচ্ছা হইলে, সন্তান মহাভাগ্যবান ও ধনবান হয়। পট্টবস্ত্র বা রেশমী-বস্ত্র কিম্বা অলঙ্কারের জন্য গর্ভিণীর আকাঙ্ক্ষা হইলে, সন্তান অলঙ্কার-প্রিয় হয়।

উক্ত কথায় ইহাও প্রতীয়মান হইতেছে, যে, আকাঙ্ক্ষিত বিষয়গুলির উপভোগ করাইলে তবে ঐ সকল সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, নতুবা গর্ভপীড়া হইবার সম্ভাবনা।

"গর্ভিণীর তপস্বীদিগের আশ্রমদর্শনে অভিলাষ হইলে পুত্র ধর্ম্মশীল ও সংযতাত্মা হয়। দেবপ্রতিমা দর্শনাভিলাষী গর্ভিণীর গর্ভস্থ সন্তান সভাসদ ও প্রমথোপম হয়। গর্ভিণীর সর্পাদি-ব্যাল জাতি দর্শনে আকাঙ্ক্ষা হইলে সন্তান হিংসাশীল হয়।"

"গর্ভধারিণীর মহিষমাংস ভক্ষণে অভিলাষ জন্মিলে সন্তান পরাক্রমশীল, রক্তাক্ষ ও লোম-দক্ষ হয়। বরাহমাংসে লোভ হইলে সন্তান নিদ্রাশীল ও পরাক্রমশালী হয়। মৃগমাংসের অভিলাষে সন্তান দ্রুতগমনশীল ও বিক্রমশালী এবং বনচর হইয়া থাকে।"

উক্ত সকল জন্তু ব্যতীত অন্য কোন জন্তুর মাংসভক্ষণে গর্ভবতীর অভিলাষ জন্মিলে সেই সেই জন্তুর স্বভাবানুসারে সন্তানের স্বভাব ও আচরণ হওয়া স্বাভাবিক বুঝিতে হইবে।

হিন্দুশাস্ত্রকর্ত্তা মহর্ষিগণ হিন্দু সন্তানকে জগতে অজেয় এবং দীর্ঘায়ু, স্বাস্থ্যবান, বলবীর্য্য এবং সৌন্দর্য্য ও অসীম মেধাবী হইবার উপযুক্ত উপায়ের যে সকল সুপথ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহার কিছুরই সম্মান করিতে শিক্ষা করি নাই বলিয়াই আজি চিররুগ্নতা লাভ করিতেছি।

আর্য্যঋষিগণ আমাদিগের জন্মের পূর্ব্ব হইতেই যেরূপে বিবাহ, রজঃসলা—গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন এবং সাধ ভক্ষণাদির সুব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার সকল গুলিই আমাদের দীর্ঘজীবনও উন্নত স্বাস্থ্য লাভের বিবিধ উপায় স্বরূপ। ব্রহ্মচর্য্যাদির ব্যবস্থা ও এই জন্য। আর্য্য মহর্ষিগণ আমাদের মঙ্গলার্থে যে সকল ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, সেই ব্যবস্থাগুলিকে সমাদরপূর্ব্বক তাহাদিগের অনুষ্ঠানে বদ্ধপরিকর থাকিতে পারিলে আর আমাদের চিন্তা কি?

বর্ত্তমানকালে এ সকল আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে নিতান্ত উপহাসাস্পদ হইতে হয়। কারণ অনেকেই উক্ত সংস্কারগুলিকে বড়ই বাড়াবাড়িযুক্ত কুসংস্কার বলিতে ত্রুটি করেন না। যাহা হউক আমাদের অধঃপতন যখন অনেকদূরে আসিয়া পড়িয়াছে, তখন ইহা হইতে পুনরুত্থান আমাদের পক্ষে বড়ই শক্ত কথা। জানিনা, এ স্রোত আর কতকাল চলিবে??

শ্রীনলিনীনাথ মজুমদার।

সে কালের চিকিৎসা।

—:*:—

প্রথমে একটা গল্প বলি।—জনৈক ব্রাহ্মণ স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া দরিদ্র ক্লিষ্ট হইয়া অতি কষ্টে কালাতিপাত করিতেন। এমন কি মধ্যে মধ্যে অনাহারেও তাঁহাকে দিনাতিপাত করিতে হইত, তথাপি অপমানিত হইবার ভয়ে তিনি ধনী লোকের দ্বারস্থ হইতে পারিতেননা। একদিন বিপ্র পত্নী শুনিলেন যে, এক রাজা দানছত্র খুলিয়া আগন্তুক বিপ্রবর্গকে বহুল অর্থদানে সন্তুষ্ট করিতেছেন। তিনি স্বীয় স্বামীকে উক্ত রাজ সভায় উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ কিন্তু প্রথমে অপমানিত হইবার ভয়ে কিছুতেই যাইতে সম্মত হইলেন না। পরে স্ত্রীর বারম্বার অনুরোধে এবং পরিবারবর্গের অন্নকষ্টে ব্যথিত হইয়া রাজ সভায় যাইবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। রাজভবনে যাইবার পথে একটী ক্ষুদ্র সরিৎ পার হইতে হয়। সেই সরিৎ পার হইবার সময় ব্রাহ্মণের পরিধেয় বস্ত্র জলসিক্ত হইয়া গেল। দ্বিতীয় পরিধেয় না থাকায় তিনি আর্দ্র বস্ত্রেই রাজসভায় উপনীত হইলেন। ব্রাহ্মণ স্বস্তিবাদনপূর্ব্বক রাজ সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে, রাজা আর্দ্রবস্ত্রের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নদীপার হইবার সময় যেরূপে পরিধেয় জলসিক্ত হইয়াছিল, ব্রাহ্মণ তাহার আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। রাজা সবিশেষ শ্রবণ করিয়া সহাস্যবদনে ব্রাহ্মণের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক—"সেই আর এই" এই কথা বলিয়া সভাত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণ ভগ্নহৃদয়ে রিক্ত হস্তে নিজ কুটীরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পত্নীকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করতঃ দুঃখপ্রকাশ ও নিজ ভাগ্যে দোষারোপ করিতে লাগিলেন। বিপ্রপত্নী বড়ই চতুরা ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক গৃহে যে যৎকিঞ্চিৎ আহার্য্য ছিল—তাহাই স্বামী ও পুত্র সন্তানগণকে আহার করাইলেন। পরে ব্রাহ্মণকে পুনরায় পরদিবস রাজসভায় যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ব্রাহ্মণ একবার অপমানিত হইয়া আর কিছুতেই রাজসভায় যাইতে সম্মত হইলেন না। ব্রাহ্মণী কহিলেন, "আপনাকে ভিক্ষার জন্য আর রাজসভায় যাইতে বলিতেছিনা। রাজা যে কথা বলিয়াছেন, তাহার উত্তর দিয়া চলিয়া আসিবেন।" ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"রাজাকে কি উত্তর দিব?" ব্রাহ্মণী বলিলেন, "কল্য প্রাতে যাইবার সময় শিখাইয়া দিব।" পরদিন প্রাতে বিপ্রপত্নী একটী জলপূর্ণ পাত্র ও একটী ক্ষুদ্র লোষ্ট্র স্বামীর হস্তে দিয়া তাঁহাকে রাজসভায় পাঠাইলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, এই জলপাত্রটী রাজহস্তে দিয়া তন্মধ্যস্থ জলে লোষ্ট্রটী নিক্ষেপ করিতে বলিবেন। লোষ্ট্রটী জলমগ্ন হইলে বলিবেন যে, "এই আর সেই"। বিপ্রবর জলপাত্র ও লোষ্ট্র লইয়া রাজভবনাভিমুখে গমন করিলেন। রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া জলপাত্রটী নৃপকরে সমর্পণ পূর্ব্বক লোষ্ট্রটী পাত্রস্থ জলে নিক্ষেপ করিতে বলিলেন। রাজা জলে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিবামাত্র উহা জলমগ্ন হইলে

ব্রাহ্মণ বলিলেন 'এই আর সেই'। রাজা সুপ্রীত হইয়া ব্রাহ্মণকে প্রচুর অর্থদান করিলেন। ব্রাহ্মণ অর্থরাশি সমভিব্যাহারে হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ভিক্ষালব্ধ ধনরত্নাদি স্বীয় পত্নীকে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয়ে। গত কল্যই বা নরপতি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন কেন, আর অদ্য বা তোমার শিক্ষামত কথাটী বলায় লজ্জিত হইয়া ধনরাশি দান করিলেন কেন? আমি ইহার কারণ বুঝিতে পারিতেছি না।" বিপ্রপত্নী বলিলেন "পুরাকালে অগস্ত্য মুনি গণ্ডূষপূর্ব্বক সমুদ্র শোষণ করিয়াছিলেন, আর আপনি সেই বিপ্র বংশোদ্ভব হইয়া একটী ক্ষুদ্র সরিৎ পার হইতে গিয়া জলসিক্ত হইয়াছিলেন। ইহা ব্রাহ্মণদিগের অবনতির পরিচায়ক। সেই জন্য রাজা বিদ্রূপ করিয়া "সেই আর এই" বলিয়াছিলেন। অদ্য আপনার নিকট ইহার উত্তর পাইলেন যে, যখন রামচন্দ্র রাজা ছিলেন, তখন সাগর জলে প্রস্তর ভাসাইয়া সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, আর এখনকার নরপতিদের লোষ্ট্র মাত্রও ভাসাইবার সামর্থ্য নাই। আপনার এই উত্তরে লজ্জিত হইয়া রাজা পুরস্কার স্বরূপ অর্থদান করিয়াছেন।" ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া স্বীয় পত্নীর বুদ্ধিমত্তার বহুল প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

ইহা ত গেল যুগ যুগান্তরের কথা। আমরা যাহা শুনিয়াছি ও দেখিয়াছি এক্ষণে আর তাহা দেখিতে পাই না। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা সম্বন্ধে যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি এক্ষণে তাহা দেখিতে পাই না,—এক্ষণে তাহা অলৌকিক বলিয়া বোধ হয়।

শৈশবাবস্থায় আমার স্বাস্থ্য এরূপ খারাপ ছিল যে, স্নান করিলেই জ্বর হইত। ডাক্তারি (এলোপ্যাথিক) চিকিৎসায় জ্বর আরোগ্য হইত, কিন্তু কিছুদিন ভাল থাকিয়া যে দিন স্নান করিতাম, সেই দিন হইতে আবার জ্বর হইত। আমাদের জনৈক কর্ম্মচারী (সরকার) আমাকে স্নান করাইবার জন্য একেবারেই নিষেধ করিতেন। আমার ভাগ্যে স্নান প্রায় ঘটিত না, মাসান্তে হয়ত একদিন স্নান করিতাম ও সেই দিন হইতেই আবার জ্বরভোগ করিতাম। স্বর্গীয় কবিরাজ ৺নবীনচন্দ্র সেন গুপ্ত মহাশয় মদীয় পিতৃদেবের বন্ধু ছিলেন। তিনি প্রায়ই আমাদের বাটীতে আসিতেন। একবার গল্পচ্ছলে আমার কথা উঠিল। তিনি বলিলেন,— এবার জ্বর হইলে যেন তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হয়। পর বার জ্বর হওয়ায় ডাক্তারি চিকিৎসা না করিয়া উক্ত কবিরাজ মহাশয়কে সংবাদ দেওয়া হইল ও তিনিই চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেবার জ্বর আর কিছুতেই ছাড়ে না। অনেক দিন ভোগ হইয়া একটু কমিল। একদিন কবিরাজ মহাশয় আসিলে আমি সাগু বা খই আর খাইব না বলিয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিলাম। সে দিন তিনি অর্দ্ধখানি বড়ী দিলেন এবং তাহার অর্দ্ধখানি অর্থাৎ সিকিখানি খাওয়াইতে বলিলেন। আর অন্ন পথ্যের ব্যবস্থা করিলেন ও ২।১টা জামরুল খাইতে বলিলেন। অনেক দিন পীড়ার পর একেবারে অন্নপথ্য না দিয়া মাতৃঠাকুরাণী আমাকে সে দিন রুটি খাইতে দিলেন। বহু দিনের পর পথ্য পাইব, অনেক রুটি খাইব আশা করিয়া আছি। কিন্তু একগ্রাস মাত্র মুখে তুলিয়া বমি করিতে লাগিলাম। পরদিন মাতৃঠাকুরাণী অন্ন পথ্য দিলেন। তাহাও সামান্য মাত্র খাইয়া আর খাইতে পারিলাম না। প্রত্যহ পেট ফাঁপিতে লাগিল। কবি-

মহাশয়কে পুনরায় সংবাদ দেওয়া হইল। তিনি আসিয়া প্রত্যহ স্নানের ব্যবস্থা করিলেন, স্নানের পর ভিজা ভাত ও মাগুর মাছের ঝোল, আহারের পর পানার্থ ডাবের জল। সেই হইতে আমার প্রত্যহ স্নান সহ্য হইতে লাগিল। এমন কি, এখন গ্রীষ্মকালে ২।৩ বারও স্নান করিয়া থাকি। আমার সম্বন্ধে যে কথা বলিলাম, ইহা চল্লিশ বৎসরের পূর্ব্বেকার কথা।

আবার মদীয় পিতৃদেবের নিকট গল্প শুনিয়াছি যে, বাল্যাবস্থায় তাঁহার বাতশ্লেষ্মা জ্বর হয়। স্বর্গীয় ৺রামেশ্বর কবিরাজ মহাশয় তাঁহার চিকিৎসা করেন। একদিন তিনি জ্বরত্যাগের জন্য ঔষধ দিয়া গেলেন। সেই ওষধ সেবনে একেবারে বিজ্বর হইয়া হিমাঙ্গ (collapse) হইয়া যাইলেন, সেই রাত্রে সকলেই ভীত হইয়া পড়িলেন। প্রতিবাসী সকলে মিলিয়া কবিরাজ মহাশয়ের নিকট ছুটিলেন। তাঁহাকে পাওয়া গেল না। তিনি স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। পরদিন প্রাতে তিনি স্বয়ং আসিলেন। রোগীকে স্নান করিতে বলিলেন এবং সদ্যঃ দধি ও পান্তভাত পথ্যের ব্যবস্থা করিলেন। আরও বলিলেন যে, জীবনে কথনও জ্বর হইবে না। যদি কখনও জ্বর হয়, স্নান করিয়া সদ্যঃ দধি ও পান্ত ভাত খাইলেই জ্বর ত্যাগ হইবে। এই ঘটনার পর হইতে আমরাও তাঁহাকে জ্বর হইলে স্নান করিয়া সদ্যঃ দধি ও পান্ত ভাত খাইতে দেখিয়াছি। কিন্তু আজীবন মাষকলাই খাইতে নিষেধ ছিল।

এরূপ চিকিৎসা আর এখন দেখিতে পাওয়া যায় না।

ইহা যে কেবল চিকিৎসকের অভাবে হইয়াছে—তাহা নহে। চিকিৎসক, চিকিৎসার্থী—উভয়েরই অভাব। চিকিৎসার্থীর অভাবে চিকিৎসকেরা নিজেদের বিদ্যোন্নতি ও মূল্যবান ঔষধাদি প্রস্তুত করিবার সুযোগ পান না। আবার আজকাল চিকিৎসকেরা অধিকাংশই পরস্পরের ছিদ্রান্বেষী। চিকিৎসার্থিরাও অধিক দিনের জন্য একজনের চিকিৎসাধীনে থাকিতে ভালবাসেন না। তাহাতেও সুচিকিৎসার আশা করা যায় না। কারণ রোগের লক্ষণাবলী ক্রমশঃ প্রকাশিত হয় এবং এই লক্ষণ সমষ্টির উপর রোগ-নির্ণয় নির্ভর করে। সুতরাং চিকিৎসা বিভ্রাট হইয়া পড়ে। কেহই রোগনির্ণয়ের উপযুক্ত সুযোগ পান না। আবার ডাক্তারি চিকিৎসার উপর লোক দীর্ঘকাল নির্ভর করিয়া থাকে, কিন্তু কবিরাজী চিকিৎসার উপর সেরূপভাবে নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে না, যদি থাকে তাহা একেবারে শেষ অবস্থার উপর, যখন ডাক্তারীতে আরোগ্যের আশা একেবারে থাকে না। এই সব নানা কারণে বোধ হয় কবিরাজ মহাশয়েরা উপযুক্ত ফলপ্রদ ওষধ প্রস্তুত রাখিতে সক্ষম হন না।

ফলে দেশের লোকের রুচি বিপর্য্যয়ে অধুনা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অবনতি তো ঘটিয়াছেই, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক মণ্ডলী ও যে ইহার জন্য দোষী নহেন, তাহা নহে, সে কালের মত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র মন্থনপূর্ব্বক প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ সকলের প্রস্তুত কার্য্যেও তাঁহারা বুঝি আর মনোযোগী নহেন।

ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস।

স্বর্ণ সিন্দুর বা মকরধ্বজ।

—:*:—

স্বর্ণ সিন্দুর বা মকরধ্বজের ন্যায় ঔষধ পৃথিবীতে আবিষ্কৃত হয় নাই বা অন্য কোন দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রে নাই। ইহার প্রস্তুত প্রণালী কেবল আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতগণ জানিতেন। এই ঔষধ প্রত্যেক আর্য্য সন্তানের পক্ষে গৌরবের বিষয়। মকরধ্বজের উপাদান পারদ, গন্ধক ও সোনা। পারদ ও সোনা একত্র মর্দ্দন করিয়া মিশ্রিত হইলে তাহার সহিত গন্ধক মিশাইয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিতে হয়। পরে উক্ত কজ্জলী মৃত্তিকালিপ্ত বোতলে পূর্ণ করিয়া বালুকা যন্ত্রে পাক করিলে গন্ধক উড়িয়া যায়, সোনা বোতলের নিম্নে পতিত হয়, মকরধ্বজ বোতলের গলদেশে সংলগ্ন হইয়া থাকে।

রসায়ন বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত এ দেশের কেহ কেহ বলেন, মকরধ্বজ প্রস্তুত করিতে স্বর্ণের ব্যবহারের কোন তাৎপর্য্য নাই। যদিও ইহাতে স্বর্ণ সংযুক্ত করা হয়, কিন্তু তাহাতে ও বিনা স্বর্ণে প্রস্তুত রসসিন্দূর নামক পদার্থে কোন পার্থক্য থাকে না। যেহেতু উভয়ের রাসায়নিক পরীক্ষায় কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। এ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

মকরধ্বজে সোণাও থাকে না, গন্ধকও থাকে না। কিন্তু সোণা বা গন্ধকের স্থূলাংশ মকরধ্বজে না থাকিলেও তাহাদের গুণ, বীর্য্য প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে এবং তদ্দ্বারা অনন্ত-কাল যাবৎ মহোপকার সাধিত হইতেছে। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এভাবে ইহা বুঝিতে রাজী হইবেন না। আজকালকার দিনে অনেকেরই ঋষি বাক্য গুলির প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। তাই তাঁহারা অবলীলাক্রমে প্রাচীন ঋষি বাক্যগুলি পদদলিত করিতে পরাঙ্মুখ নহেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, এফ, সি, এস্ মহাশয় তাঁহার "আয়ুর্ব্বেদ ও নব্য রসায়ন গ্রন্থে স্বর্ণ সিন্দুর ও রসসিন্দূরের রাসায়নিক পরীক্ষায় কোন পার্থক্য নাই বলিয়া স্বর্ণ সিন্দুরের প্রস্তুত প্রক্রিয়ায় "স্বর্ণ নিরর্থক ব্যবহৃত হয়,……স্বর্ণ সিন্দূর প্রস্তুত কালে স্বর্ণ একেবারে বাদ দেওয়া উচিত"—ইত্যাদি অনেক কথাই বলিয়াছেন। এমন কি ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র রায় প্রমুখ বিশিষ্ট রাসায়নিকগণের দ্বারা পরিচালিত "বেঙ্গল কেমিকেল এণ্ড ফার্ম্মাসিউ-টিক্যাল ওয়ার্কস" নামক রাসায়নিক কারখানায় এখন পর্য্যন্তও এই "স্বর্ণ ঘটিত" স্বর্ণ সিন্দূর ২৪৲ টাকা ভরি বিক্রয় হইতেছে বলিয়া বড়ই দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। পঞ্চানন বাবু এক-জন এম-এ ও রাসায়নিক পণ্ডিত। কাজেই তাঁহার মত বিজ্ঞানাচার্য্য ব্যক্তির কথার প্রতি-বাদ করিবার ক্ষমতা আমাদের আদৌ নাই। কোট পেণ্টুলন-বুট বিহীন-নিরামিষভোজী জীর্ণ শীর্ণ কলেবর ঋষিদিগের বাক্যগুলি তিনি যে শ্রদ্ধার সহিত মানিয়া লইবেন, সে আশা সুদূর পরাহত। কাজেই বাধ্য হইয়া আমাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণের আশ্রয় লইতে হইবে।

দ্রব্য মাত্রেরই রাসায়নিক (Chemical action] ও শারীরিক কার্য্যকারিতাশক্তি (Physislogical action) এক প্রকার নহে। রসায়নবিদ দ্রব্য পরীক্ষা করিয়া তাহার সাধারণ গুণ প্রকাশ করিলে ভিষক মানব শরীরে প্রয়োগ পূর্ব্বক তাঁহার শারীরিক কার্য্য কারিতা শক্তি নির্ণয় করেন। তৎপর তাহা ঔষধরূপে পরিগৃহীত হয়। কেবল রসায়নবিদের পরামর্শানুসারে প্রাচীন ঋষিগণ ঔষধ নির্ণয় করেন নাই এবং বর্ত্তমানেও বোধ হয় পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান কেবল রসায়ন শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। তাহা হইলে সর্ব্বাবস্থায় সাপের বিষও মানব শরীরের বিশেষ উপযোগী হইয়া পড়িত। * সর্প বিষের মধ্যে রাসায়নিক পরীক্ষায় যে পদার্থ পাওয়া যায়, তাহা মানব শরীরের বিশেষ পুষ্টি সাধনেই সক্ষম। দ্রব্যের বিশ্লেষণ-বিচার করিলেও বর্ত্তমান রসায়নবেত্তাগণ এখনও বহু পদার্থের গুণ বিচারে অক্ষম। সুতরাং এস্থলে ভিষক্‌দিগের ব্যবহারিক বচনই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যে স্থলে রসসিন্দূর "অনুপান বিশেষণ করোতি বিবিধান গুণান্" সে স্থলে স্বর্ণ সিন্দূর "রসায়নং বৃষ্যতরঞ্চ বলং মেধাগ্নি কান্তিস্মবর্দ্ধনচ্চ।" সুতরাং 'বল ও বৃষ্যতরঞ্চ' ইহার বিশেষ গুণ বলিতে হইবে। রোগীর অবসন্নতায় একমাত্রা স্বর্ণ সিন্দূরে যে কাজ হয়, তাহা রস সিন্দূরে হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে বুঝা যায়—রাসায়নিক পরীক্ষায় স্বর্ণ সিন্দূর এবং রসসিন্দূর একই পদার্থ হইলেও তাহাদের গুণগত পার্থক্য অবশ্যই আছে। দ্রব্যগত উপাদান এক হইলেই যদি তাহার গুণগত কোন পার্থক্য না থাকে, তবে আজ চিনীর জন্য এত ভাবনা ভাবিতে হইত না। আধুনিক রাসায়নিক পণ্ডিতগণ সর্ব্বত্র অল্প সুলভ কয়লা ১২ ভাগ ও জল ১১ ভাগ মিশ্রিত করিয়া চিনীর পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিতেন। (came & sugar = C 12 H 22011.)

স্বর্ণ সিন্দূরের ন্যায় স্বর্ণবঙ্গও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, স্বর্ণ সিন্দুর স্বর্ণের সহিত এবং স্বর্ণ বঙ্গ বঙ্গের সহিত রাসায়নিক ক্রিয়ায় সাধিত হইয়া থাকে। বঙ্গ মেহ নাশক। স্বর্ণবঙ্গ বঙ্গের সহিত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হয় বলিয়া স্বর্ণ বঙ্গ প্রমেহ রোগের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ। এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি পারদের আকর্ষণী শক্তিতে স্বর্ণ সিন্দূরে স্বর্ণের গুণ, বীর্য্য ও প্রভাব না থাকে তবে ঐ প্রক্রিয়াতেই প্রস্তুত স্বর্ণবঙ্গে বঙ্গের গুণ, বীর্য্য, প্রভাব কেমন করিয়া আসিল? এবং স্বর্ণ বঙ্গ ও স্বর্ণ সিন্দূর দেখিতে একই রকম পদার্থ না হইয়া ভিন্নাকৃতি ও ভিন্ন গুণ বিশিষ্ট হইল কেন পঞ্চানন বাবু ইহা ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন কি তিনি যেন একথা স্মরণ রাখেন, আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ মাত্রেরই ভিত্তি বর্ত্তমান রসায়নী বিদ্যা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত!

আয়ুর্ব্বেদীয় যে সমস্ত ভেষজপক্ক-তৈল—ঘৃত আছে, উপাদান জানা না থাকিলে কোন্ দ্রব্যে উহা প্রস্তুত রাসায়নিক পরীক্ষায় তাহা জানা যায় না। কেননা বহুগুণ বিশিষ্ট বহু ভেষজের গুণে উহা প্রস্তুত হয় এবং

* Chemistry has not yet succeeded in separating the active snake-poison. Ency, 9th Edition, 22 vol 191 p. p.

সিন্দুরে যেমন সোনার স্থূলাংশ থাকে না, তদ্রূপ ভেষজপক্ক-তৈল-ঘৃতেও ভেষজের স্থূলাংশ থাকে না, কেবল মাত্র গুণ, বীর্য্য ও প্রভাব উহাতে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। কাজেই আমরা ঔষধের ফল প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। সামান্য একটু তৈলের নস্য গ্রহণ করিলেই মাথার বেদনা ছাড়িয়া যায়, শূলরোগে তৈল মর্দ্দনে তৎক্ষণাৎ বেদনার লাঘব হয়, এইরূপ প্রত্যক্ষ ফল দর্শন করিয়াও কেহ কি বলিতে সাহস করেন—উহা কিছুই নহে?

অপামার্গের শিকড় হস্তে ধারণ করিলে ঐকাহিক জ্বর আরোগ্য হয়, কার্পাস মূল পদদ্বয়ে বন্ধন করিলে শোথ প্রশমিত হয়, পশুর ক্ষতে পোকা হইলে অগ্নেশ্বর লতার অগ্রভাগ ছিঁড়িয়া ফেলিবামাত্র সমস্ত পোকা পড়িয়া যায়। পঞ্চানন বাবু রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া ইহার কি কোন মীমাংসা করিতে পারিবেন? অথবা কোন রসায়নবিদ্ বলিতে পারিবেন যে, অপামার্গ, কার্পাস মূল ও অগ্নেশ্ব লতার মধ্যে এমন কি শক্তি বিদ্যমান আছে—যদ্দ্বারা জ্বরাদি রোগের উপশম হইতে পারে এই শক্তিকে আর্য্য ঋষিগণ "প্রভাব" বলিয়া ছেন। এখানেই বৈজ্ঞানিকের পরাজয়। এ শক্তি জড়তত্ত্ববাদীগণের জ্ঞানের অতীত। ই মনোবিজ্ঞানের বিষয়ীভূত। বস্তুতঃ মনোবিজ্ঞানে সীমায় না পৌঁছিতে পারিলে জ্ঞানের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা নাই। পৃথিবীতে কেবলমাত্র আর্য্যেরা ইহা অবগত ছিলেন।

আমাদের শেষ বক্তব্য এই যে, ন রসায়নের দ্রব্য-বিশ্লেষণী-শক্তি থাকিলে গুণ ও প্রভাব নির্ণয়ে সর্ব্বথা প্রভুত্ব নাই স্নতরাং পঞ্চানন বাবুর মত যাঁহারা কেবলমা রসায়নী বিদ্যার সাহায্যে প্রাচীন চিকিৎসা সম্ম ভেষজ সমূহ পরিবর্ত্তন করিতে বাসনা করে তাঁহাদের যে বিশেষ ভ্রম হইয়াছে, সে বিষ কোন সন্দেহ নাই।

কবিরাজ শ্রী—মৈত্র

সমালোচনা।

সুবর্ণ বণিক সমাচার।—আষাঢ়। সম্পাদক শ্রীযুক্ত নৃসিংহ প্রসাদ দত্ত বি এল। কার্য্যালয় ২৭ নং মদন বড়াল লেন, বহুবাজার, কলিকাতা। বার্ষিক মূল্য ২।০ টাকা। ইহা নামে "সুবর্ণ বণিক সমাচার" হইলেও এখানি প্রকাশ করিয়া ইহার কর্ত্তৃপক্ষগণ মাসিক সাহিত্য-বিপণির সম্পদ-বৃদ্ধিই করিয়াছেন। সাহিত্য বিষয়ক অনেকগুলি সারগর্ভ প্রবন্ধ এ সংখ্যায় স্থান পাইয়াছে। "শ্রীশ্রীনিবাস আ ঠাকুরের জীবনী"তে বৈষ্ণব সাহিত্যের অ কথা অবগত হওয়া যায়। "যোগিনী" এ ক্রমশঃ প্রকাশ্য উৎকৃষ্ট গল্প। "কর্ম্মনীতি মানুষকে কর্ম্মী করিবার গবেষণা মূলক প্র "দেবতা আমার" শ্রীমতী ক্ষণ প্রভা মত অপরিচিতা লেখিকার লেখা হইলেও অস্তিত্ব কিন্তু ক্ষণমুহূর্ত্তে লয় পাইবে

"ঠাকুর উদ্ধারণ দত্ত" পাকা হাতের লেখা। "সংবাদ পূর্ণ চন্দ্রোদয়ে" অনেক কথা শিখিবার আছে। "হরিশ-ভাণ্ডারী" গল্পে মুন্সীয়ানা যথেষ্ট। "মহাযুদ্ধে" সাময়িক কবিতা। "জাতিভেদ" অনেক যুক্তি অবলম্বনে লিখিত। "শ্রীপাট পানিহাটী" প্রাচীন কীর্ত্তি কথায় পূর্ণ। "মধুমক্ষিকার চাষ" পাঠে অনেকের উপকার হইবে। মোটের উপর এ সংখ্যার সকল প্রবন্ধই বিশেষ মনোমদ হইয়াছে। প্রবন্ধ নির্ব্বাচনে সম্পাদক মহাশয় সুখ্যাতি পাইবারই উপযুক্ত। কাগজ ও ছাপা অতি উৎকৃষ্ট। বর্ত্তমান এই দুর্দ্দিনে এরূপ উৎকৃষ্ট কাগজে এখনও ইঁহারা এ পত্র বাহির করিতে পারিতেছেন দেখিয়া আমরা আরও সুখী হইয়াছি।

নূতন জ্বর।

কলিকাতার অবস্থা।—কলিকাতায় যে নূতন সংক্রামক জ্বরের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাতে কলিকাতার প্রায় তৃতীয়াংশ অধিবাসী পীড়িত। এ জ্বর বেশী দিন স্থায়ী নহে, সাধারণতঃ ৩ দিন বা ৫ দিন ভোগের পর এই জ্বর ছাড়িয়া থাকে। কিন্তু ইহার ফলে সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, অরুচি এবং দৌর্ব্বল্য দীর্ঘকাল ভোগ করিতে হয়। এই জ্বরাসুরের আক্রমণে কলিকাতার স্কুল-কলেজ-অফিসাদির কার্য্য-পরিচালন বিষয়েও বহু বিঘ্ন ঘটিয়াছে। আমাদের সহযোগী সম্পাদক এই জ্বরে বিশেষ পীড়িত হইয়াছিলেন। প্রেসের অধিকাংশ কর্ম্মচারীও এই জ্বরে আক্রান্ত হন। "আয়ুর্ব্বেদ কলেজে"র অনেক ছাত্রও এই জ্বরে পীড়িত। এবারের "আয়ুর্ব্বেদ" বাহির করিতে সেই জন্য আমাদিগকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছে।

এই নূতন জ্বরটি কি ?—এই নূতন জ্বরটি যে কি,—তাহা লইয়া অনেকে অনেক কথা কহিতেছেন। কেহ বলিতেছেন, ইহা ডেঙ্গো জ্বর, কেহ বলিতেছেন, ইহা ইনফ্লুয়েঞ্জা, কেহ বলিতেছেন, ইহা যুদ্ধ জ্বর। প্রথমে এ জ্বর বোম্বাইয়ে আসিয়াছিল। বোম্বাইয়ের প্রায় সমগ্র অধিবাসীকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ইহা কলিকাতায় আগমন করে। কলিকাতা হইতে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী মফঃস্বলের অনেক স্থানেও ইহা সংক্রামিত হইয়া দেশে একটা বিষম বিভীষিকার সঞ্চার করিয়া তুলিয়াছে।

এই জ্বরের পরিণাম।—এই জ্বরের পরিণামে ভয়ানক গাত্র দাহ, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, অরুচি এবং দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয়। জ্বর বন্ধ হইলেও শ্লেষ্মা দূর হয় না, তাহার ফলে কাসিটা অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকে। দাহ হওয়ার ফলে শৈত্য ক্রিয়ায় স্বভাবতঃই আসক্তি জন্মে। সে আসক্তি সম্বরণ করিতে না পারিলে পুনরাক্রমণ ঘটিয়া নিউমোনিয়া উপস্থিত হয়। এই অবস্থা উপস্থিত হইলে জীবন রক্ষার আর আশা থাকে না। সংপ্রতি কলিকাতায় এই ভাবের মৃত্যু সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। একবার জ্বর ভোগের পর আবার যাহারা

পাল্টাইয়া পড়িতেছে, নিউমোনিয়া হইয়া তাহারা প্রায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। সেই জন্য এই জ্বর হইতে মুক্ত হওয়ার পর শৈত্য ক্রিয়া একেবারেই বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য।

এই জ্বরে সংক্রমণের কারণ।—এই জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির নিঃশ্বাসে অন্যের শরীরে এই বিষ প্রবেশ করে, সেই জন্য এই জ্বরে আক্রান্ত রোগীর অঙ্গস্পর্শ যতটা না করিতে পারা যায় ততই ভাল। এই সকল রোগী হাঁচিবার, কাসিবার এবং কথা কহিবার সময় অপরকে আক্রান্ত করিতে পারে। এই জ্বরে আক্রান্ত রোগীর গামছা ও গ্লাস ব্যবহার করিলে, এক শয্যায় শয়ন করিলে, থুঁতু এবং সিকৃনি স্পর্শ করিলে—এই জ্বরের বিষ অন্যের শরীরে প্রবেশ করিতে পারে। যে বাড়ীতে এই জ্বরে একজন আক্রান্ত হইতেছে, সে বাড়ীর সকল লোকের জ্বর হইবার ইহাই কারণ। এই জন্যই এ জ্বর এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

প্রতিষেধক বিধি।—(১) বিশেষ ক্লান্তিজনক কার্য্য এ সময় করা উচিত নহে। (২) মুক্ত বাতাসে অবস্থিতি—বিশেষতঃ রাত্রি কালে গ্রীষ্মাতিশয্যে খোলা যায়গায় শয়ন করা একেবারে পরিহার করা উচিত। (৩) অত্যধিক জনতার সমাগমে গমন অবিধেয়। (৪) শরীর সামান্য মাত্র অসুস্থ বোধ করিলেই সতর্কতা অবলম্বন করিবে। (৫) এ জ্বরে আক্রান্ত হইবামাত্র শয্যা গ্রহণ করিবে এবং সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত শয্যাত্যাগ করিবে না। (৬) বাটীতে কেহ এই জ্বরে আক্রান্ত হইলে তাহাকে পৃথক রাখিবে। (৭) এই জ্বরে আক্রান্ত রোগীর থুঁতু এবং কাস ফেলিবার স্থান স্বতন্ত্র করিয়া দিবে। (৮) থিয়েটার ও বায়স্কোপ দেখিবার স্পৃহা এ সময় একেবারেই পরিত্যাগ করিবে।

মৃত্যুর কথা।—এই জ্বর প্রথমে একবার হইয়া ৩ দিন বা ৫ দিনের মধ্যে ছাড়িয়া যায় বটে, কিন্তু ইহাতে পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা ঘন ঘন। দুর্ব্বল শরীরে এই ঘন ঘন আক্রমণের ফলে জীবনী শক্তি কতক্ষণ স্থির থাকিতে পারে? তাহার উপর শৈত্য ক্রিয়ায় যে বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, তাহার কথা তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেই জন্য দেশবাসীর সকলেই এ সময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করুন—ইহাই আমাদিগের পরামর্শ। স্মরণ রাখিবেন, কলেরা এবং প্লেগের বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি অপেক্ষা এ জ্বরের মূর্ত্তি কোন অংশে কম নহে। বায়ু এবং শ্লেষ্মার আধিক্য লইয়াই এ জ্বরের উৎপত্তি হইয়া থাকে—সেইজন্যই ইহার পরিণাম ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিতেছে। আমরা এইজন্য পরামর্শ দিতেছি, দেশবাসিগণ এ সময় বিশেষ সতর্ক হউন, একবার যাঁহারা এই জ্বরে আক্রান্ত হইয়া মুক্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা আর যাহাতে পাল্টাইয়া না পড়েন, তাহার জন্য যতটা নিয়মে থাকিতে পারেন—তাহার চেষ্টা করুন। পানীয় জল গরম করিয়া প্রতিগৃহে পান করিবার ব্যবস্থা করুন। কদাচ ঠাণ্ডা ক্রিয়া করিবেন না। এই রূপ করিলেই এ জ্বর দেশ হইতে পলায়ন করিবে।

ঔষধের কথা।—দুই বেলা এক রত্তি করিয়া "মকরধ্বজ" সেবন এ সময় বিশেষ হিতকর। আমরা চা পানের পক্ষপাতী না হইলেও এ সময় চা পানের পরামর্শ দিতে পারি। 'চা'য়ের সহিত একটু আদার রস মিশাইয়া পান করিলে আরও সুফল লাভের সম্ভাবনা। আমরা এই জ্বর সম্বন্ধে পরবর্ত্তী প্রবন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিব।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

—:*:—

ঢাকার মামলা।—ঢাকার কবিরাজ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সরকার "রোহিতকারিষ্টের" জন্য যে বিপন্ন হইয়াছেন, তাহার প্রতীকার কল্পে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক সম্প্রদায় হইতে আবগারি কর্ম্মপক্ষদিগকে উহার প্রত্যাহার করাইবার চেষ্টা চলিতেছে। গত ৫ই জুলাই এই মামলার প্রতিবাদ করিবার জন্য কলুটোলায় সেন মহাশয়দিগের বাটীতে কলিকাতার সমস্ত কবিরাজদিগকে লইয়া এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। কলিকাতার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ সেনের মামলা যে নজীরে তুলিয়া লওয়া হইল, ঢাকার মামলাও সেই নজীরে তুলিয়া লওয়া হউক এবং ভবিষ্যতে আবগারি বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ কোন স্থানেই যাহাতে এরূপ মামলা দায়ের করিতে না পারেন, ভারতগবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে তাহার জন্য সার্কুলার জারি করা হউক—এই সকল প্রসঙ্গ ঐ সভায় বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হইয়াছিল। ঐ সভার অধিবেশনের ফলে অনারেবল শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বলিয়াছিলেন, এই অভিযোগ সম্বন্ধে যাবতীয় কাগজ পত্র ব্যবস্থাপক সভায় দাখিল করা হউক। গবর্ণমেণ্ট কিন্তু ইহাতে সম্মত হন নাই। এই মামলা রুজু করিবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট হইতে উকীলের পরামর্শ গ্রহণ করা হইয়াছিল কিনা—ব্রজেন্দ্রবাবু সে সম্বন্ধেও প্রশ্ন করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট উত্তর দিয়াছিলেন,—"করা হয় নাই।" পুনরায় ব্রজেন্দ্র বাবু প্রশ্ন করেন,—"ইহা কি একটা পরীক্ষা স্বরূপ মামলা?" গবর্ণমেণ্ট উত্তর দিলেন,—"না।" গবর্ণমেণ্টের এইরূপ উত্তরে আমরা আরও শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছি। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট এরূপ মামলা চালানয় কবিরাজী চিকিৎসার মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে বলিয়া ইহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই দৃষ্টান্ত অনুসারে এই মামলাও উঠাইয়া লইয়া বাঙ্গালাদেশে কবিরাজী চিকিৎসার বাধা বিঘ্ন দূর করা কি কর্ত্তৃপক্ষের 'কর্ত্তব্য' নহে। একদা সার পারডি লিউকিসের মত একজন বিশেষ অভিজ্ঞ চিকিৎসক বলিয়াছিলেন যে, "অ্যালোপাথির মত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার সমর্থনও গবর্ণমেণ্টের করা একান্ত কর্ত্তব্য।" দেশে এরূপ মামলা চলিলে আয়ুর্ব্বেদের প্রসার বৃদ্ধি আর কেমন করিয়া হইবে?

সংক্রামক জ্বরে 'নায়ক'।—সহযোগী 'নায়ক' সংক্রামক জ্বরের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য বলিয়াছেন,—"পূর্ব্বে সকালে সন্ধ্যায় প্রতিঘরেই ধূপ ধূনা জ্বলিত। ইহা নিত্য নৈমিত্তিক কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল। পিতৃ পিতামহাদির আচরিত নিয়মাদি পরিহার করিয়া আমরা পদে পদে ভুগিতেছি। প্রাণ রক্ষার জন্য আমাদের কথামত সকলে চলিয়া দেখুন। ধূপ ধূনা গঙ্গাজল ব্যবহার করুন। শরীর ও মন পরিষ্কার ও পবিত্র রাখুন। আচার মত অন্ততঃ কয়েক দিন চলুন। দেখিবেন, ধীরে ধীরে রোগ পলায়ণ করিবে।" সহযোগীর পরামর্শ যে খুবই সঙ্গত সে বিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

২য় বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৫—ভাদ্র। | ১২শ সংখ্যা।

কাজের কথা।

—:*:—

অতীত ও বর্ত্তমান।—অতীত ও বর্ত্তমানের কথা চিন্তা করিলে আমাদের অনেক কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে,—যখন আমরা সভ্য হই নাই,—ইংরাজী শিক্ষা পাই নাই, উদরান্নের সংস্থানের জন্য যখন আমাদিগকে পল্লী মায়া বিসর্জ্জন দিয়া বিদেশবাসী হইতে হয় নাই, তখন—সেই অতীত কালে শান্তি বলিয়া আমাদের মধ্যে যে একটা জিনিস ছিল, এখন আর তাহা নাই। সুজলা-সুফলা-মলয়জ শীতলা-শস্যশ্যামলা-পল্লী-প্রান্তরে মার্ত্তণ্ড-ময়ুখ-পীড়িত কৃষকের গানে আমাদের প্রাণের মধ্যে যে একটা স্ফূর্ত্তি আনিয়া দিত, সহরের জন কোলাহলের মধ্যে সে স্ফূর্ত্তি আমরা যেন আদৌ উপলব্ধি করিতে পারিনা। পল্লীবাসী অবস্থায় পোলাও-কালিয়া-লুচি-কচুরির আস্বাদনে রসনা তৃপ্ত করিবার ক্ষমতা তখন কার দিনে আমাদের ভাগ্যে অল্প ঘটিলেও—ক্ষেতের ধান, বাগানের তরকারী এবং পুকুরের মাছে আমরা যে তৃপ্তিলাভ করিতাম, সে তৃপ্তি—সে আনন্দ—সে সুখভোজন এখন যেন আর আমাদের ভাগ্যে জোটেনা। বাঙ্গালী যে আজি এত রোগক্লিষ্ট, তাহার অনেকটা কারণও ইহাই।

*　　*　　*　　*

খাদ্যাভাব।—সহরে অবশ্য খাদ্য সম্ভারের অভাব নাই। অর্থও এখনকার দিনে যথেষ্ট সুলভ। কিন্তু হইলে কি হয়? আমরা এখন যে পরিমাণ অর্থ উপার্জ্জন করি, সে অর্থে শুধু উদরান্নের ব্যবস্থা করিলেই তো হইবেনা—এখন সে অর্থে আমাদের অবস্থোচিত তাবৎ বিষয়ই রক্ষা করিতে হয়। যিনি যেরূপ চাকরি করেন, তাঁহাকে সেইরূপ styleএ থাকিতে হয়। ভিতরের অবস্থা যাহাই হউক, বাহ্য সম্পদটা সকলকেই ঠিক রাখিতে হয়। সেই সকল ঠিক রাখিয়া তাহার পর আমাদের জীবন ধারণের ব্যবস্থা। কাজেই

এই অবস্থায় অনেকস্থলে ব্যবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। তাহারই ফলে দেশে এখন এত রোগের সৃষ্টি। অকাল মৃত্যু—শিশু মৃত্যু—আজীবন মৃতকল্প অবস্থা—সকলই এই ব্যবস্থা-বিপর্য্যয়ে ঘটিতেছে।

* * * *

শাস্ত্র-বিধি।—শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন,—"শরীরমাদ্যং।" সে কথাটা এখনকার দিনে দেশের লোক বাস্তবিকই বোঝে না। শাস্ত্রের তাবৎ বিধিই তো এখন আমরা উল্লঙ্ঘন করিতে বসিয়াছি। সদাচার-পালনে শুধু যে ধর্ম্মরক্ষা হয়,—তাহা নহে, সদাচার-পালন স্বাস্থ্যোন্নতিরও মূল; কিন্তু সে সদাচার-পালনের বিধিটা এখন দেশ হইতে একরূপ লোপ পাইতেই বসিয়াছে। সহরে আসিয়া এখন আমরা যথেষ্ট মাংসাশী হইয়াছি, দোকানের জবাই করা মাংস কিনিয়া লইয়া গিয়া আমরা খাইতে শিখিয়াছি। কিন্তু এইরূপ আহারে আমরা যে সদাচার-বিধি উল্লঙ্ঘন করিতেছি—আমাদের অজীর্ণ—আমাদের যক্ষ্মা—আমাদের ক্ষয়রোগ তাহারই ফল সম্ভূত।

* * * *

'খনার' বচন।—মাংস শরীর ধারণের সহায়তা করে সত্য, কিন্তু সে মাংস উপযুক্ত হওয়া চাই। ছাগ মাংস ভক্ষণে—কচি ছাগই ব্যবহার করা উচিত। দোকানের মাংস যে কি—তাহা কিন্তু কাহারও দেখিবার প্রয়োজন হয় না। শাস্ত্রবিধি অবলম্বনে 'খনা' আমাদের আহারীয়ের ব্যবস্থায় বলিয়া গিয়াছেন—

"শাকের ছাঁ, মাছের মা'—
কচি পাঠা, বৃদ্ধ মেষ,
দধির অগ্র, ঘোলের শেষ।"

অর্থাৎ শাক কচি অবস্থায়, মাছের মাথা, কচি পাঠা, বৃদ্ধ মেষ, দধির অগ্রভাগ—এবং ঘোলের শেষ—শরীর পুষ্টির সহায়তা করে। কিন্তু এখন এ সকল কথা, শোনেই বা কে?—আর মানেই বা কে?

* * * *

দুগ্ধ ও ঘৃত।—দুগ্ধ ও ঘৃত শরীর রক্ষার যে দুইটি দ্রব্য সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী, সে দুইটির আস্বাদন সহরের বাঙ্গালী তো এখন একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ!" কিন্তু খাঁটি ঘৃত পাইবার উপায় নাই, ঘৃত সেবনে সহরবাসীর প্রবৃত্তিও নাই।—তাহার পর পল্লী-মায়া ত্যাগ করিয়া সহরে আসিয়া, বাঙ্গালী সন্তান অর্থের মুখ অধিক করিয়া দেখিতে পাইতেছে সত্য, কিন্তু যে কোন কারণেই হউক, পুষ্টিকর আহারীয় গ্রহণ অনেকের ভাগ্যেই যে ঘটিতেছেনা—ইহা অবিসংবাদিত। সহর প্রবাসী-বাঙ্গালীর রোগ-প্রবণতার প্রসার-বৃদ্ধির ইহাই কারণ। কিন্তু ইহার আর প্রতীকার নাই।

* * * *

পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়া।—আমাদের পল্লী-জননী আজি কানন-বহুলা হইয়া—ম্যালেরিয়া প্রপীড়িতা সত্য, দারুণ গ্রীষ্মাতিশয্যে পল্লীমাতার পুষ্করিণীগুলি দাম-শৈবালে সমাচ্ছন্ন হইয়া নষ্ট হইতে বসিয়াছে সত্য, নৈশ অন্ধকারে পল্লী-ভিটায় ব্যাঘ্রের হুঙ্কারে ভীতির সঞ্চার হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু যদি আমরা—কায়মনোপ্রাণে সহর বাসের স্পৃহা ছাড়িয়া দিই,—আমাদের পরিত্যক্তা পল্লী-জননীর শান্তিময় ক্রোড়ে আবার যদি আমরা স্থান লইতে পারি, ক্ষেতের ধান, বাগানের তরকারি, পুকুরের মাছের ব্যবস্থা করিয়া আবার যদি আমরা অন্নে সন্তুষ্ট থাকিতে পারি, তাহা

হইলে আবার আমাদের শরীর রক্ষার উপযোগী পুষ্টিকর আহারীয়ের ব্যবস্থা হইতে পারে। বনজঙ্গলগুলি কাটাইয়া, সুপেয় জল সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া, পল্লীভূমির ম্যালেরিয়া দূর করা যাইতে পারে। কিন্তু সহর প্রবাসী বাঙ্গালী বাবুর সে প্রবৃত্তি কি আর হইবে?

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন।

শিক্ষায় স্বাস্থ্য হানি।

—:*:—

আবার ফরমাস্‌।—'আয়ুর্ব্বেদ' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে হইবে—তাহা শুদ্ধ একটী নহে, মাসে মাসে—ধারাবাহিক রূপে। অধিকন্তু ফরমাস এবার একজনের নহে;—শুদ্ধ সহৃদয় সহযোগী সম্পাদক কবিরঞ্জন মহাশয়ের নহে। কবিরাজ শিরোভূষণ মাননীয় সম্পাদক শ্রীযুক্ত যামিনী ভূষণ রায় এম, এ, এম্, বি মহাশয়ের ও সুলেখক সুসাহিত্যিক-বিদ্বান শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ কাব্যকণ্ঠ বিশারদ মহাশয়েরও এ ফরমাসে যোগাযোগ আছে। আমা হেন অকিঞ্চনের পক্ষে এপরম সৌভাগ্য-সঞ্চার—সন্দেহ নাই।

কিন্তু মানি—এ সৌভাগ্য তাঁহাদের সহৃদয়তা ও স্নেহ প্রসূত, মানি তাঁহাদের উদ্দেশ্য কখনই এ দীনকে অপদস্থ করা নহে, কিন্তু তথাপি প্রাণ যে অত্যন্ত ব্যস্ত না হইয়া পারিতেছে না। মুচিরাম গুড় recommendation বলে ডেপুটী হইতে পারিলেন বটে, কিন্তু জনসাধারণের পক্ষ হইতে গ্রন্থকার তাহাতে 'হরিবোল' দিতে বিরত হইলেন কই? আমি মহাজনের অনুগ্রহে লেখক মহলেই যেন চলিয়া গেইলাম, কিন্তু এ পদোন্নতিতে পাঠকের কণ্ঠে অবাক্ 'হরিবোল' ফুটিতে চাহিবে না কি? কুসুমের প্রসাদে কীট যেন সুর-শিরই প্রাপ্ত হইল, কিন্তু কীটের তাহাতে গৌরব বাড়িল কই?

এবারের প্রবন্ধটীও সহযোগী সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক অবধারিত। ও বারের প্রবন্ধটী যে মোটেই ভাল হইয়াছিল—সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও প্রতীতি আমার নাই। আমার মনে হয়, ও বারে সহৃদয় হইলেও কবিরঞ্জন মহাশয় আমাকে একটা কড়া প্রশ্নের সমাধান করিতে দিয়াছিলেন,—কারণ সে প্রবন্ধে আমার গণ্ডীর বাহিরে আমার ভ্রমণ পথ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল,—রোগীকে চিকিৎসকের কাজ করিতে বলা হইয়াছিল,—ভগ্নস্বাস্থ্য—ছাত্রকে স্বাস্থ্যরক্ষা-বিধান করিবার ভার দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু এবারের প্রশ্ন পত্র অনেক সহজ,—রোগীকে তাহার রোগের ইতিহাস বলিতে হইবে,—সে যে বিষয়ে ভুক্তভোগী, তাহাই তাহাকে বর্ণন করিতে হইবে,—ছাত্রকেই জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে—"আধুনিক শিক্ষায় তোমার স্বাস্থ্য কেন ভগ্ন হইতেছে লিখ।" ছাত্রের কার্য্য যখন উত্তর-প্রদান, তখন আমি অবশ্য এ প্রশ্নের উত্তর দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। কিন্তু প্রশ্ন সহজ বলিয়া যে উত্তর

সুন্দর দিতে পারিব—তেমন গর্ব্ব করিতে পারি না। হয়ত কঠিন প্রশ্নের ছাত্র যাহা উত্তর দেয়, সহজ প্রশ্নের উত্তর তাহা হইতেও খারাপ দিয়া ফেলে,—উত্তরের এই অনিশ্চয়তা আছে বলিয়াই ছাত্র—ছাত্র, এবং অজ্ঞতার এই অনিশ্চয়তাকে নিরাকরণ করিবার জন্যই শিক্ষকের আবশ্যকতা। তবে ভরসা মাত্র এই যে, দয়া ও স্নেহের চক্ষে সর্ব্বদোষের ক্ষমা মিলে। তাই কবির বাণী সার্থক—"How sweet is mercy" এবং "mercy is twice blessed."

পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম—উপযুক্ত শিক্ষা দেহ ও মনের সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়া লাভ করিতে হইবে। এখন শিক্ষায় কতটা স্বাস্থ্য হানি হইতেছে বুঝিতে হইলে, প্রথমেই দেখিতে হইবে—বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীতে এই সামঞ্জস্য বিধানের কতটা ত্রুটি পরিলক্ষিত হইতেছে। বলা বাহুল্য, আমি এই পন্থা অবলম্বন করিয়াই আমার বক্তব্যের অবতারণা করিব।

আর একটি কথা এখানে বলিয়া রাখা ভাল মনে করি,—পূর্ব্ব প্রবন্ধের মত এ প্রবন্ধেও আমি 'স্বাস্থ্য' শব্দটির অর্থ একটু বিশদ করিয়া ধরিয়াছি। এই শব্দটাতে আমি শরীর ও মন—উভয়ের স্বাস্থ্যের কথাই বুঝিয়া লইয়াছি। তবে বর্ত্তমান প্রবন্ধে মনের স্বাস্থ্য হানি সম্বন্ধে পৃথক করিয়া বলিব না; কারণ পূর্ব্ব প্রবন্ধে এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছি—তাহাই যথেষ্ট।

আর একটা কথা এই যে, রোগের চিকিৎসার কথা বলিতে গেলেই রোগের কথা পূর্ব্বেই বলিতে হয়। সুতরাং পূর্ব্ব প্রবন্ধেও যে স্বাস্থ্যহানির কথা মোটেই বলি নাই, তাহা নহে। এ প্রবন্ধে,—পূর্ব্ব প্রবন্ধে স্বাস্থ্যহানি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহার পুনরুক্তি যতটা পারি—না করিতে চেষ্টা করিব। পুনরুক্তির জন্যই যে এ বিষয় ত্যাগ করিতেছি তাহা নহে, স্থানাভাবের কথাও ভাবিতে হইতেছে। বলা বাহুল্য পুনরুক্তির ভয় করিলে বিষয় অনেক সময়ই বিশদ করিয়া বলা যায় না, তাই বিশেষ আবশ্যক মনে হইলে পূর্ব্ব প্রবন্ধের কথাও পুনরুক্ত হইবে। পুনরুক্তি বা অন্ততঃ পুনর্ধারণা ভিন্ন মানুষ এ জগতে কি বলিতে পারে? মানুষের মৌলিকতা যে অনুচিন্তনকে আশ্রয় করিয়াই জন্মগ্রহণ করে। এমন কথা কি কেহ কখন ভাবিতে বা বলিতে পারিয়াছে—যাহা অন্য কেহ না হউক—অন্ততঃ ঈশ্বরও কখনও ভাবিয়া দেখেন নাই?

আশা করি যাহা বলিয়াছি তাহাতে আমার প্রবন্ধ কোন্ ধারা বাহিয়া চলিবে—তাহা বুঝিতে আর বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না। আমার এই দুইটী প্রবন্ধ একই সময়ে "companion pieces" ভাবে পড়িলে আমার বক্তব্য আরও সহজ বোধ্য হইবে।

যতদূর দেখা যাইতেছে, বিদেশীয় ও বিজাতীয় শিক্ষার সংঘর্ষে আমাদের শিক্ষার যতটা অবনতি হইয়াছে ও তজ্জন্য আমাদের স্বাস্থ্যের যতটা হানি হইতেছে ততটা আর কিছুতেই হইতেছে না। স্বীকার করি, মানুষকে চরম শিক্ষা পাইতে হইলে, মাত্র নিজের শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে তাহার চলিবে না,—তাহাকে বিদেশীয়ের নিকট হইতেও সংগ্রহ করিতে হইবে। এইরূপ সব জাতিই করিয়াছে। স্বয়ং ইংরাজ জাতি—যাহাদের শিক্ষা আজ আমরা চরম আদর্শ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছি ও এখনও [illegible]

করিতেছি—তাহারাও বিভিন্ন সময়ে ফরাসীয়, জর্ম্মান, ইতালীয় প্রভৃতি জাতির শিক্ষা হইতে অনুকরণ করিয়াছে; ফ্রান্স-ইংরাজী রোমান্সের আবহাওয়া না পাইলে, ত্রুভেয়ার (Trouvere) ও ত্রুবেদুর (Troubadour) কবিগণ তাহার যে শিশুশিক্ষা যুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছিল, তাহার শেষ হইত না। আবার ইউরোপীয় সর্ব্বসাহিত্যই গ্রীক্ ও রোমান্ সাহিত্যের নিকট চিরঋণী। কিন্তু তাই বলিয়া এত অনুকরণের মধ্যেও ঐ ঐ জাতি তাহাদের নিজ জাতীয় শিক্ষার প্রাণটাকে হারাইয়া ফেলে নাই,—এই প্রাণটা অটুট ছিল বলিয়াই উহারা আজ নিজ নিজ সাহিত্যের গর্ব্ব করিতে পারিতেছে।

নর্ম্মানাধিকারের ঘোর ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে ইংরাজী ভাষা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইতেছিল। কিন্তু সেই চূর্ণ—পুনরায় যে মহা সৌধ হইয়া গড়িয়া উঠিল—তাহার কারণ, সে ভাষা, সে সাহিত্য এই অবসানের মহাঝড়ের মধ্যেও তাহার জাতীয় প্রাণটাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিল, কিন্তু ভারতীয় শিক্ষার অদৃষ্ট অন্যরূপ, এ অনুকরণশীল, কিন্তু রক্ষণশীল নহে, এ হুজুগে মাতিয়া চলিয়াছে, নিজের দিকে ইহার লক্ষ্য নাই, এ কেবল গ্রহণ করিতেছে, কিন্তু হজম করিতেছে না। অধিকন্তু ইহার আহরণ স্পৃহা এতদূর বলবতী হইয়া উঠিয়াছে যে, নিজস্ব ত্যাগ করিয়াও পরস্ব সমাদরে বক্ষে তুলিয়া লইতে ইহার লজ্জা বোধ হয় না। এই জন্যই ত ইহার নিজস্ব প্রায় বিলুপ্ত, জীবনী শক্তি ক্ষীণা। এই লুপ্তপ্রায় প্রাণকে সজীব করিতে পারিলে তবে ইহার বাড়িবার আশা। নতুবা ভগ্নস্বাস্থ্য ইহাকে মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত করিবে। সময়ানুযায়ী অনুকরণ করা ভাল, অন্যের নিকট হইতে গ্রহণ করা ভাল, কিন্তু গ্রহণ করিবার সময় বিশেষ বিবেচনা করিতে হইবে—সমীকরণ করিতে পারিব কিনা। বিদেশীয় শিক্ষা যতটা আমার শিক্ষার সহিত সামঞ্জস্য লাভ করিতে পারে, ততটাই গ্রহণ করা উচিত।—তদতিরিক্ত গ্রহণ করিলে, সে শিক্ষাকে আমি 'আমার ঘরে' রাখিতে পারিব না, সে শিক্ষা আমাকে 'তাহার ঘরে' লইয়া যাইবে। পর-শিক্ষা—পর-ধর্ম্মেরই মত অনেক সময় ভয়াবহ হইয়া উঠে। আমরা কিন্তু এ সব বুঝি না—আমাদের শিক্ষক ছিলেন—গুরু, পিতা; এখনকার শিক্ষক হইয়াছেন—বন্ধু, সখা! আগের শিক্ষক—ছাত্রকে সম্বোধন করিতেন—'বৎস', এখন স্কুলের শিক্ষক ডাকিবেন,—'my dear boy'—কলেজের শিক্ষক ডাকিবেন 'gentleman'। এসম্বন্ধে কি আমাদের চলে? ফল তাই বিষময় দাঁড়াইতেছে। etiquette রূপ বিদেশীয় মদিরা প্রথম হইতেই আমাদের ছাত্রের মাথা নষ্ট করিয়া দেয়। তাই বালক এই ভ্রাতৃভাবের শিক্ষায় প্রথম হইতেই একটু স্বেচ্ছাচারী হইয়া গড়িয়া উঠে,—এই স্বেচ্ছাচারীতাই পরে তাহার মনের ও শরীরের স্বাস্থ্য-হানির কারণ হয়,—যথেচ্ছাহার, যথেচ্ছ পরিচ্ছদ ধারণ, উচ্ছৃঙ্খল চিন্তাকরণ, ছাত্রদের বি[illegible] ক্ষতি করিতেছে,—তাই বলিবার জন্যই য[illegible] আজ উপস্থিত হইয়াছি।

ছাত্র-শিক্ষকে এই সখ্যভাব—ছাত্রকে নিজেকে শিক্ষকের সহিত সমান গণ্য করিতে শিক্ষা দিয়াছে,—তাই ছাত্র আজ আর বড় একটা শিক্ষককে মানিয়া চলিতে চাহেনা,—তাই ভারতীয় শিক্ষার একটা কেন্দ্রস্থলে,—এই কলিকাতা সহরেও শিক্ষকের সহিত ছাত্রের

Strike রূপ অভাবনীয় ব্যাপারের আবির্ভাব সম্ভব হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যাপার কি ছাত্রের ঘোর মানসিক স্বাস্থ্যহানির পরিচায়ক নহে? আজকালকার ছাত্র-সমাজ শিক্ষককে ধরিয়া লইয়াছে—শুদ্ধ বাহিক শৃঙ্খলা সাধনের একটা যন্ত্র স্বরূপ। তিনি দেখিবেন—শুদ্ধ তাঁহার ক্লাসে ছেলেরা অসদ্ব্যবহার—পাশ্চাত্য ধরণের অসদ্ব্যবহার না করে। ছাত্রের মন—তাহার চরিত্র—শিক্ষকের শিক্ষকতার বাহিরে। তিনি শুধু বলিবেন পুস্তকের উপদেশ; কিন্তু কোন কিছু সৎশিক্ষা মনে প্রবেশ করাইয়া দিবার ইচ্ছা ও অনেক সময় ক্ষমতা তাঁহার নাই। ব্যবসায়ী জাতির নিকট হইতে আমরা শিখিয়াছি, শিক্ষাও ব্যবসাগত। টাকা দাও, পড়। শিক্ষক বলিবেন,—তুমি শুনিবে। তিনি তোমার নিকট পুস্তকের বুলি আওড়াইবেন, তুমি ঘরে গিয়া তোতা পাখীর মত তাহা মুখস্থ করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিবে।—সে উপদেশ তোমার মস্তিকে প্রবেশ করিয়া, তোমার জীবনের প্রতি কার্য্য কলাপের সহিত যাহাতে সংমিশ্রিত হইয়া যায় তাহা দেখা শিক্ষকের গণ্ডীর বাহিরে। শিক্ষক তাহা দেখিবেন না—তিনি দেখিবেন—তাঁহার ক্লাসে 'ডিসিপ্লিন্' নামক পাশ্চাত্য etiquette রক্ষিত হইতেছে কিনা। ঘরে তুমি যদিচ্ছা ব্যবহার করিতে পার, শিক্ষকের তাহাতে কি আসিয়া গেল? আজকাল আইন-কানুনের শিক্ষা,—আইন মানিয়া চলিলেই হইল—আইনের একচুল ব্যবধান করিলেই শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েই দণ্ডনীয়। Law must be observed to the letter. আইন Shylock এক পাউণ্ড মাংস দোষ পাইলেই বুক হইতে ছুরি দিয়া কাটিয়া লইবে। Mercy এখানে নাই—দয়া ও স্নেহের শিক্ষা ভারতের নিজস্ব ছিল, সে শিক্ষার নির্ব্বাসনের ষড়যন্ত্র চলিতেছে। শিক্ষক আইনের সদা ভীতি লইয়া নিজে দেখিবেন? না ছাত্রের শিক্ষায় মনোযোগী হইবেন? পূর্ব্বে এটা ছিল না। পড়ার বয়স হইবামাত্র শিক্ষক ছাত্রকে নিজ গৃহে লইয়া যাইতেন। সেখানে পুস্তকের শিক্ষা ত হইতই, অধিকন্তু ছাত্রের জীবন সুখে অতি-বাহিত হইতে পারে—এমন যাবতীয় শিক্ষায় তাহাকে শিক্ষিত করা হইত। তাহার চরিত্র, তাহার শরীরপোষণ, তাহার খাদ্যাখাদ্যের ব্যবস্থা, তাহার ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উন্মেষ সাধন—এইরূপ সর্ব্ব বিষয়ে শিক্ষা দিয়া,তাহাকে একটী 'কাজের লোক' করিয়া পুনরায় পিতৃ ভবনে হাজির করিয়া দেওয়া হইত। এখনকার মত শিক্ষাকে 'পুস্তক গত শিক্ষা' এইরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থে তখন ধরা হইত না। সুখের বিষয় এ আদর্শে এ যুগেও অন্ততঃ একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে—বোলপুরে—কবীন্দ্র রবীন্দ্র নাথের প্রসাদে। সেখানে ছাত্রগণ কিরূপে যুগপৎ শরীর ও মনের স্বাস্থ্যলাভ করিয়া শিক্ষিত হইতেছে তাহা প্রণিধান যোগ্য। কিন্তু কে প্রণিধান করে! ভারতের সে জাতীয় প্রাণ যে মৃত্যুশয্যায় অচেতন? তাই কবির যে কবিত্ব—কল্পনার আতিশয্যে মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়াছে এ ভারতে তাহা হয়ত আর তা'র অনুরূপ সৌন্দর্য্যকে খুঁজিয়া পাইবে না, হয়ত তাই আপনাকেই বরণ করিয়া ক্ষোভে Narcissus এর মত যৌবনেই আত্মহত্যা করিয়া বসিবে।

আমি পাশ্চাত্য শিক্ষার নিন্দা করি না,—বরং কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করি, পাশ্চাত্য শিক্ষাই আমাদের চক্ষু ফুটাইয়াছে—আমাদের অতীত গৌরবকে সম্মান করিতে শিখাইয়াছে

—আমাদের চতুর্দ্দিকে যে জাতীয়তার অভাবের সাড়া পড়িয়াছে, তাহাও ভাবিয়া দেখিলে পাশ্চাত্য শিক্ষাই জাগাইয়া দিয়াছে। আমার উদ্দেশ্য—পাশ্চাত্য শিক্ষার নিরাকরণ নহে, আমার উদ্দেশ্য—পাশ্চাত্য শিক্ষাকে আমাদের অতীত শিক্ষার সহিত একীকরণ, আমার উদ্দেশ্য এই দেখান যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা অন্যায়-ভাবে গ্রহণ করিয়া আমরা জাতীয় শিক্ষাকে হারাইয়া ফেলিতেছি ও সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষার শক্তির অভাবে স্বাস্থ্যহীন হইতেছি।

দেশ-কাল পাত্র ভেদে সবটারই পরিবর্ত্তন আবশ্যক—এটা আমাদের বুঝিতে হইবে। না বুঝিয়া স্বাস্থ্যের কি অবনতি সাধিত হইতেছে শুনুন।

শীত প্রধান দেশে প্রভাতে বরফের গুতায় বাহির হওয়া হায় না, গায়ের রক্ত জমাট বাঁধে, তাই বিলাতে বেলা ১০টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত স্কুলে, কলেজে, পড়ার সময়। বিলাতে এটা সুনিয়ম সন্দেহ নাই। তাই বলিয়া যে দেশে দ্বিপ্রহর রৌদ্রে কাঠ ফাটে, সে দেশে ১০টার সময় জামাজুতা আঁটিয়া, ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে, রাস্তার ধূলা খাইয়া, জনাকীর্ণ ক্লাসে ৪।৫ ঘণ্টা গিয়া একই ভাবে বসিয়া থাকিলে ছাত্রের রক্ত যে দিন দিন শোষিত হইতে থাকিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? এইরূপ ভাবে গিয়া বসিয়া থাকিলেই মাথা ঘুরিতে থাকে, তদুপরি সেখানে লিখিতে-পড়িতে হইলে, শিক্ষক মহাশয় কি বলিতেছেন—তাহাতে মনোযোগী হইতে হইলে, মস্তিষ্কটা যে অল্পেই নষ্ট হইবে সেটা কি বড়ই অস্বাভাবিক? কাজেই ১৬ বৎসর না হইতেই ছাত্র যে চস্‌মা লইবেন, নানারূপ আধিব্যাধি যে তাঁহার জীবনের সাথী হইবে তিনি যে ক্রমে 'তালপাতার সিপাই' হইয়া গড়িয়া উঠিবেন, তিন হাতের বেশী বাড়িবেন না, না হাসিলেও যে তাঁহার দশন পংক্তি বিকশিত হইয়াই থাকিবে, ২০ বর্ষেই তাঁহার চুল পাকিবে, ৩০ বর্ষে তিনি উন্মাদ হইবেন বা ৪০ বর্ষের মধ্যেই 'থাইসিসে' মারা যাইবেন—এ কি বড়ই আশ্চর্য্য কথা?

এত গেল মুখবন্ধের কথা। কোন কোন ছাত্রের অভিভাবক শিক্ষা বিষয়ে এতদূর অনু-রাগ-পরায়ণ যে, হয়ত ৪।।০ টার সময় স্কুল হইতে আসিয়াই ছাত্র দেখিলেন, গৃহ-শিক্ষক মহাশয় অবতীর্ণ হইয়াছেন। মনোযোগে বা অমনো-যোগে তাঁহাকে অন্ততঃ দুই ঘণ্টা কাল পড়ি-তেই হইবে—তা'হয়ত বা চারিটী মুড়ি খাইয়া বা ২টী সন্দেশ জলযোগ করিয়া। মাষ্টারমহাশয় ত চলিয়া গেলেন, তবু কি ছাত্রের নিস্তার আছে? সান্ধ্যভোজন—বোর্ডিং বা মেসের অপক্ক অন্ন ব্যঞ্জন বা গৃহের প্রায়শঃ অসার খাদ্যে যেমনই হউক—তাঁহার ঘুমাইবার জো' টী নাই। পরদিনকার স্কুল বা কলেজের পড়া তাঁহাকে শিক্ষা করিতে হইবে। এ পর্য্যন্ত ত পড়া কেবল বুঝিলেনই, এবার তাঁহার মুখস্থের পালা। নিদ্রাভরে চক্ষু ঢুলু ঢুলু—তথাপি ছাত্র পড়িতেছেন—তা "A point has position but no magnitude" ই হউক বা "The total quantity of energy is conserved"ই হউক—তাহার পাঠে কতকটা আত্মকাহিনীই তাহার বিবৃত করিতেছে তাহার নিজেরও স্থিতি আছে, কিন্তু বিস্তৃতি ক্রমে কমিয়া আসিতেছে, শরীর মনের energy ত ক্ষয় হইতেছে, কোন্ জগতে যাইয়া যে তাহার ক্ষতি পূরণ হইবে তাহা বিধাতাই জানেন। রাত্রি ১২টার সময় ত ছাত্র শয়ন করিলেন,—বাড়ির চড়িয়া যাওয়ায় সমস্ত রাত্রি দুঃস্বপ্ন দেখিলেন, আর নিদ্রা ঘোরে অনন্ত স্বপ্ন, নয় ভুগিলেন [illegible]

দায় । ক্রমে দেখা যাইতে লাগিল—ছাত্রের চক্ষু কোটর-গত, গণ্ডস্থল শুকাইয়া যাইতেছে, কিছুই হজম হয় না—কখনও উদরাময়,কখনও কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ লাগিয়াই আছে। প্রাতভ্র্মণ ও ব্যায়াম সম্বন্ধে অভিভাবক ও অভিভাবকের প্ররোচনায় ছাত্র ক্রমে নিতান্ত অমনোযোগী—কেন না সেটা বাজে কাজে সময় ক্ষেপ মাত্র। *

যে জাতির শিক্ষাকে আদর্শ করিয়া মানুষ চলে, ক্রমে সেই জাতির আচার নীতিও তাহার মজ্জাগত হইতে থাকে। ছাত্রও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিখিতে লাগিলেন—এই দুনিয়ার সব খাওয়া যায়—জাতিভেদ বর্ব্বর জাতিসুলভ কুসংস্কার,—সাহেবের আদর্শানুকরণ শততীর্থ দর্শনফলের সমান,—কেন না তাঁহাদের আদর্শই সভ্যতার চরম,—কেন না তাঁহারা সভ্য ধরণে পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন, সভ্যধরণে বসেন, পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইয়া সিগারেট খান, অভিনব ধরণে হাসেন, কাসেন, আহার করেন। ফলে ছাত্র খাইতে লাগিলেন—যাবতীয় রেষ্টরেণ্টে উচ্ছিষ্ট পাত্রে—যেমন তেমন রকমের মাংসাদি—যাহার তাহার হাতে। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে অত হংসডিম্ব, গরম মাংস, পেঁয়াজ-রসুন, হজম হইবে কেন? অম্লরোগ, দদ্রু হইতে আরম্ভ করিয়া কুষ্ঠ পর্য্যন্ত যাবতীয় চর্ম্মরোগ, ওলাউঠা প্রভৃতি নিত্য নূতন রোগ দল বাঁধিয়া ভারত ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া ছাত্রের জীবন শেষ করিতেছে। আঁটা পোষাকে ছাত্রের রক্ত সঞ্চারণ বন্ধ, শরীরটী ঠেঙ্গার মত টিক্‌টিকে, রক্তহীনতায় সেঁতসেতে। যথেচ্ছাহারে মন উত্তেজিত হইতে লাগিল, নৈতিক জীবনের অধঃপতন জন্য ব্রহ্মচর্য্যের অভাব ঘটিতে লাগিল—ছাত্র শীর্ণ দেহে মরণের পথের যাত্রী হইলেন। ছাত্রদের আদর্শ সাহেব, —কাজেই যে যত বেশী সিগারেট বিষপান করিবে, ভেস্‌লিন্ মাথায় মাখিবে, সোপ্ গায়ে ব্যবহার করিবে সে তত বেশী সভ্য ও শিক্ষিত। সরবতের পরিবর্ত্তে চা, তৈলের পরিবর্ত্তে লোশন্, কাপড়ের পরিবর্ত্তে হ্যাট্‌কোট্ চলিতেছে। চা—ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, লোসন—চর্ম্ম ফাটা বা চর্ম্মরুক্ষতা, কোট পেণ্টালুন—বুদ্ধিহীন শীর্ণদেহ, হ্যাট্—অকালে পক্ককেশ বা মস্তকদেশে টাকরূপ মরুস্থলের সৃষ্টি করিতেছে—মাঝে মাঝে দুই একটী oasis পরিদৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু কতটা প্রাণারাম তাহা ছাত্রগণই মাত্র উপলব্ধি করিতে পারেন।

শীতপ্রধান দেশে গ্রীষ্মকালে অপরাহ্ণ চারিটা পাঁচটার সময় ধরণী শীতল হইতে থাকে, তখন একপেট মাংস বিস্কুট টিফিন্ খাইয়া পাশ্চাত্যেরা যে খেলা খেলেন, এতদ্দেশে সেই প্রাণহরণকারী foot-ball খেলা ঐ চারিটা পাঁচটার সময়ই যখন রৌদ্রে ছাতি ফাটে, তখন সুবিস্তীর্ণ ময়দানে যৎকিঞ্চিৎ কচুরি-সন্দেশ জলযোগ করিয়া, খেলিয়া, ছাত্রেরা কি সুন্দর স্বাস্থ্যই লাভ করেন, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। শীতকালের cricket খেলাটাই কি কম? এটী শীতকালের খেলা। বিলাতে ১১টায় আরম্ভ—এখানেও তাই—দর্শকেরা

* প্রবন্ধ লেখক সতীশবাবু B. A পাস করিলেও এখনও ছাত্র, M A এবং আইন শিক্ষা করিতেছেন। উচ্চশিক্ষার উচ্চ আকাঙ্খায় তাঁহার নিজের স্বাস্থ্য প্রায়শঃই ভাল নয়, সেইজন্য তিনি বর্ত্তমান শিক্ষার স্বাস্থ্যহানি কিরূপ ঘটিয়া থাকে, সে সম্বন্ধে বিলক্ষণ ভুক্তভোগী। এইজন্যই তাঁহার কথাগুলি বড় [illegible] হইয়াছে। —আং সং।

রৌদ্রে ছত্র মাথায় দিয়া বা ছায়ায় দাঁড়াইয়া দেখেন,—আর যুবক-ছাত্রেরা বিলাতের অনুকরণে একরাশ কোট পেণ্টালুন আঁটিয়া হ্যাট মাথায় খেলেন —মুখটী কাল, চক্ষু দুইটী কোটর গত, গণ্ডস্থল শুষ্ক। ইংলণ্ডে এ খেলা স্বাস্থ্যকর, এখানে ইহা প্রাণান্তকর।—ভারতের মাঠ শীতকালের মধ্যাহ্ন রৌদ্রে যেরূপ উত্তপ্ত থাকে, তাহা মানুষের রক্ত শোষণ করিবার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী।

এতটা গেল মোটা মোটা অনুকরণে কথা। একটু তলাইয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি——বিলাতের সংঘর্ষে আমাদের শিক্ষার আদি হইতে বড় একটা ভুল চলিয়া আসিয়াছে। যে জাতির যেটা মাতৃভাষা, সেই ভাষার ভাব সে জাতি খুব সহজে হৃদয়ঙ্গম করে এবং সেই ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইলে অন্যভাষা শিক্ষা সে জাতির পক্ষে আর ততটা কষ্টকর হয় না। স্বীকার করি ভারতের আধুনিক চলিত ভাষাগুলি এখনও দরিদ্র এবং বিভিন্ন ভাষার ভাব প্রবাহ দ্বারা ইহাদের ক্ষীণ কলেবরের পুষ্টি সাধন করিতে হইবে। কিন্তু আগে আমার কি আছে—সেটা বুঝিয়াই কি অন্যের গৃহে ধার করিতে যাওয়া উচিত নহে?

বিশেষতঃ মানুষের ভাব প্রবাহ ও সাহিত্য অনেকটা একই নিয়মপথে অগ্রসর হয়—যেমন সর্ব্বদেশের ভাষাতেই পদ্যের জন্ম গদ্যের পূর্ব্বে হইয়াছিল। মানুষমাত্রেই যখন একজাতি—অবশ্য বিস্তৃত অর্থে—তখন মানুষের চিন্তাপ্রণালী প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী অনেকটা এক পথই বাহিয়া চলে। "Greatmen think alike" না বলিয়া "Men as men think alike" বলিলেও একেবারে অসত্য বলা হয় না। ভাষাপেক্ষা ভাবের বড়ত্ব চিরকালই জগতে স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। এই ভাব গ্রহণের জন্যই এক ভাষা অন্যভাষার নিকট প্রধানতঃ ঋণী। ভাব আসল জিনিস, ভাষা তাহার পরিচ্ছদ—যদিও ভাষারও ভাবকে সুস্পষ্ট, সুন্দর ও সুসজ্জিত করিবার জন্য সময় সময় বিশেষ আবশ্যকতা থাকুক এবং এই আবশ্যকতার জন্যই সময়ে সময়ে এই ভাষারও অনুকরণ হইয়া থাকুক। ভাবকে চিনিতে পারাই তাই বেশী কষ্ট, ভাষাকে আয়ত্ত করা ততটা নহে। এই ভাব সব জাতির মধ্যেই যখন একই পন্থাবলম্বন করিয়া বর্দ্ধিত হয়, তখন আমরা নিজের ভাষার পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া যদি ইহাকে আগে ভাল করিয়া চিনিয়া লই তবে যতটা হৃদয়ঙ্গম হয়, পরের ভাষার পরিচ্ছদে ততটা হয় কি? পরের ভাষা দিয়া আরম্ভ করিলে ভাষা ও ভাব দুইটাই নূতন ঠেকে—শিশুর কোমল মস্তিষ্কে এতটা নূতনত্ব অসহ হইয়া পড়ে।—প্রথম হইতেই তাহার মাথা ঘুলাইয়া দিলে সে শিখিবে কি? জাতীয় ভাষায় প্রথম শিক্ষার প্রবর্ত্তন হইলে চিরপরিচিত মাতৃভাষার পরিচ্ছদে জাগতিক ভাবের প্রাণটাকে যদি একেবার বুঝিয়া ধরিয়া লইতে পারি, ভাব কি প্রণালীতে জগতে প্রসারিত হইয়া গিয়াছে—যদি এই মূল সত্যের বোধটা আমার কোনক্রমে জন্মিয়া যায়,—তবে তারপরে—যে কোন দেশের সাহিত্যে প্রবেশ লাভ আর কি কঠিন বোধ হইবার সাধ্য আছে?—তখন ভাষা শিক্ষাটাই যা কষ্ট। একবার ভাষাটা শিক্ষা হইলে পূর্ব্বপরিচিত ভাবকে ধারণা করা আর তখন কঠিন হয় না। বরং নূতন পোষাকে তাহাকে আরও বেশী করিয়া সুন্দর দেখি বলিয়া আরও বেশী করিয়া বুঝিতে পারি। তখন সেই বিদেশীয় সাহিত্য চর্চ্চাকালে যত নূতন ভাবই আমার অনুভব

আসিয়া উপস্থিত হউক না কেন, স্বদেশভাষার ভাবের সঙ্গে তাহাকে একীভূত করিয়া লইতে পারি। তখনই শিক্ষার সার্থকতা। নূতন ভাষার নূতন ভাবে নিজভাষার ক্ষীণতা পরিপুষ্টি লাভ করিতে থাকে।

কিন্তু আমরা ত তাহা করি না! ইংরাজী আমাদের ধ্যানজ্ঞান হইয়াছে—কারণ ইংরাজী না শিখিলে মোটা চাকরি মেলে না। 'ক, খ', এর সঙ্গে 'A, B, C'র পাঠ আরম্ভ করি। কিছুদিনের মধ্যেই ক-খ'য়ের পাঠ বন্ধ হইয়া A, B, C'র ধারা ক্রমেই বাড়িয়া চলে।

বর্ত্তমান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষার স্থান প্রসারিত করা হইয়াছে বটে কিন্তু মান বাড়ে নাই। বাঙ্গালা পড়িয়া এখনও ত বড় চাকরি জুটে না! অধিকন্তু যেরূপ প্রশ্ন পত্র হয় তাহাতে বাঙ্গালার জ্ঞানোন্নতির উপর বিশেষ দাবী করা হয় না—বাঙ্গালীর ছেলে যা বাঙ্গালা স্বভাবতঃ জানে ও বোঝে তাহা লিখিয়াই অনায়াসে পরীক্ষা বৈতরণী পার হইয়া যায়। ইংরাজীর আসন এতটা উচ্চ হওয়ায় ছাত্রগণের এইরূপ একটা কঠিনভাষাকে ইহার অভিনব ভাবসহ আয়ত্ত করিতে কঠোর প্রয়াস পাইতে হয়—যাবতীয় শিরোরোগ, চক্ষুরোগ, অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু যে এই চেষ্টার, এই অন্যায় শক্তিপ্রয়োগের, অন্ততঃ কতকটাও পরিণাম নহে—এ কথা কি কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারেন?

এ পর্য্যন্ত যা দেখিলাম—অনুকরণের,—Servile imitation এর শিক্ষা আমাদের কাল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা শুধু জানি আহরণ করিতে, কিন্তু সমীকরণ করিতে পারি না—কারণ দিন দিন আমাদের জাতীয় জীবনীশক্তি হ্রাস হইয়া যাইতেছে—তাই এত স্বাস্থ্যহানি,—দৈহিক, নৈতিক ও ধর্ম্মজীবনের ধ্বংস লক্ষণ যুগপদ্ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এই স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার সাধন করিতে হইলে আমাদের জাতীয় জীবনীশক্তির সজীবতা আনয়ন করিতে হইবে, এবং তাহা করিতে হইলে প্রথমতঃই স্বীয় স্বীয় ভাষার উন্নতির জন্য আমাদের নিতান্ত মনোযোগী হইতে হইবে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে আমরা শিখিব সবই, কিন্তু শিখিব নিজের ভাবে, এবং নিজের ভাষার উন্নতিই তাহার চরম উদ্দেশ্য থাকিবে। আমাদের দেশকাল পাত্রের অনুসারে অস্মদ্দেশীয় শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। পরের শিক্ষায় যেটুকু ভাল সেটুকুই আমরা গ্রহণ করিব; কিন্তু পরের শিক্ষার যাহা আমাদের অহিতকর তাহা গ্রহণ করিয়া আমরা মরিব না। আমাদের দেশে যখন প্রাতঃকালেই শিক্ষাদানের উপযুক্ত সময়, তখন সেই সময়েই যাহাতে শিক্ষাদান করা হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। আমাদের দেশ—মুনিঋষির দেশ—এখানে গুরু—জনক,—'ইয়ার' নহে; কারণ তাঁহার নিকট হইতে ছাত্রের ইহকাল ও পরকালের শিক্ষা হইয়া থাকে। গুরু বাস্তবিকই ছাত্রের জ্ঞানজীবনের জন্মদাতা।

এ আমাদের দেশ চিরকাল ধর্ম্মকে কর্ম্মের অগ্রে রাখিয়া চলিয়াছে—সেই ধর্ম্মের ভাবের অভাবে এ দেশ যে কর্ম্ম জীবনে ও নৈতিক শিক্ষায় অধঃপতিত হইতে থাকিবে সে বিষয়ে সন্দেহ কি? অতএব এ ভারতভূমিতে শিক্ষাকে সংকীর্ণ অর্থে বুঝিয়া—ছাত্রকে পুস্তকের বুলি মুখস্থ করাইয়া ছাড়িয়া দিলেই চলিবে না। তাহার চরিত্র গঠিত হইতেছে কিনা—তাহার ব্রহ্মচর্য্য ব্রত রক্ষিত হইতেছে কিনা, শিক্ষার

তাহার শরীর ও মনের পূর্ণ সামঞ্জস্য সাধিত হইতেছে কিনা—এ সব বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে,—তবে ছাত্রের দেহ-মন স্বাস্থ্য-সৌরভে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিবে। আমাদের বুঝিতে হইবে—কেবল কতকগুলা পুঁথি মুখস্থ করাইয়া বেদম লেখাইয়া এক একটী উচ্ছৃঙ্খল ভবঘুরে—গোলামপ্রস্তুত করিবার জন্য শিক্ষা মোটেই নহে—পুস্তক পাঠ শিক্ষার Medium মাত্র। পুস্তকের শিক্ষা শারীরিক-মানসিক ও আধ্যাত্মিক—এই তিন উন্নতিকে বক্ষে ধারণ করিয়া পরিপূর্ণত্ব লাভ করে। তাই মানসিক বৃত্তির পরিচালনের ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত আমাদের দেশের উপযোগী শারীরিক ব্যায়াম শিক্ষা দিবার সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য—আপনার,—স্বদেশের ও জগতের উন্নতি সাধন। কিন্তু সুস্থ দেহ জ্ঞানময় মন ও ধর্মেচ্ছা ব্যতিরেকে এ উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না। তাই সর্ব্বপ্রথমে ছাত্রগণ যাহাতে নীরোগ হইয়া সুস্থ দেহের অধিকারী হইতে পারে ও তাহাদের পরস্পরের সংঘর্ষে বা অন্য কোনও উপায়ে যাহাতে তাহাদের মধ্যে আধি ব্যাধির প্রসার বৃদ্ধি না হয়—এইরূপ ভাবে শিক্ষাদানের চেষ্টা করিতে হইবে। নির্ম্মল বায়ুর উপভোগ সম্ভব হয়—এমন স্থানে বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া উচিত। Cleanliness যে godliness—ইহা ছাত্রের মনে প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে। কেননা অপরিচ্ছন্নতা অনেক সময়েই ব্যাধির মূলীভূত কারণ। ছাত্রের খাদ্যাখাদ্য বিষয়েও বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে—খাদ্যের অনুরূপ যে মনোবৃত্তির স্ফূরণ হয় খুব সত্য কথা।

এইরূপ শিক্ষার বন্দোবস্ত হইলে ছাত্র সুস্থ শরীরে নিয়মিত সময়ের অল্পপরিশ্রমে এখনকার প্রাণহানিকর শিক্ষার ব্যবস্থায় যতটা সময়ে যতটা শিক্ষা করে, তাহা হইতে অনেক কম সময়ের মধ্যে অনেকটা বেশী শিক্ষা করিতে পারিবে। তদুপরি যদি ছাত্রের মনে ধর্ম্মভাবের পূর্ণ বিকাশ করিয়া দিতে পারা যায়, তাহা হইলে ছাত্রের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন উত্তরোত্তর সজীবতার আনন্দে হাসিয়া উঠিবে—সে স্বেচ্ছায় জগতের মঙ্গল বিধান—আপনার মঙ্গল সাধন বলিয়া ধরিয়া লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবে।

মনে রাখিতে হইবে—ধর্ম্মশিক্ষা যে জাতির নাই, সে জাতি কখন আদর্শ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারে না। নৈতিক অধঃপতন তাহার শিক্ষা-গর্ব্বের মূলচ্ছেদন করিয়া দেয়। বাস্তবিকই যে জাতির নৈতিক মেরুদণ্ড নাই, সে জাতি কখন জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে পারে না। তাই বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে হইবে। কিন্তু সে ধর্ম্মশিক্ষা যেন আজকালকার বিদ্যালয়-বিশেষের মত সাম্প্রদায়িক-ধর্ম্ম শিক্ষা না হয়। যেখানে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ছাত্রগণের সম্মিলন হইয়া থাকে, সেখানে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মে চলিবে কেন? সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম সেখানে গোঁড়ামি করিয়া ছাত্রের প্রাণে শুদ্ধ বিদ্রোহের সৃষ্টি করে। সে নিজ ধর্ম্মমতের সঙ্গে এ ধর্ম্মের সমতা করিতে না পারিয়া অবিশ্বাসী হইয়া পড়ে। বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য থাকিবে—ছাত্রের নিজ ধর্ম্ম মতের পরিবর্ত্তন নহে। যা'র যা'র ধর্ম্ম, তা'র তা'র থাকিবে, কারণ কোনও ধর্ম্মই মানিয়া চলিলে মানুষের পক্ষে অহিতকর নহে। কিন্তু বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিবে—সার্ব্বজনীন—ধর্ম্ম—মানুষের আদি ধর্ম্ম, যে ধর্ম্ম না হইলে কোন মানুষেরই চলে না, ধর্ম্মের সেই মূল সত্যগুলি।—বেদ

ঈশ্বর আছেন, তিনি অধর্ম্মের শত্রু, কারণ তিনি ধর্ম্মময়, যাহা সত্য তাহার উৎসাহ দানই ধর্ম্ম ইত্যাদি। ছাত্রের মনে এই সনাতন ধর্ম্মের সৃষ্টি করিতে পারিলে, সে একটা প্রকৃত মানুষ হইয়া উঠিবে,—কাজেই মানুষ মাত্রকে সে তাহার নিজ জাতিভুক্ত করিয়া লইতে পারিবে, মানুষমাত্রের মঙ্গলই তাহার মঙ্গল বলিয়া তাহার পূর্ণ প্রতীতি জন্মিবে, তাহার মনের সর্ব্ব কুসংস্কারের নিরাকরণ হইয়া যাওয়ায় তাহার মনের পূর্ণ স্বাস্থ্য ফুটিয়া উঠিবে।

ভারত তপস্বীর দেশ। এ তপোবনে ধর্ম্ম সহযোগে শিক্ষার যে বিমল জ্যোতিঃ-প্রকাশ হইয়াছিল, তাহার প্রভাবে এ জাতির মহিমোজ্জ্বল হইয়াছিল ও সে জ্যোতিঃর মহা-প্লাবন উছলিয়া পড়িয়া সুদূর পাশ্চাত্য শিক্ষাকেও ভাস্বর করিয়া দিয়াছিল। যে জাতি শরীরকে আগে রাখিয়া শিক্ষা ও সাধনা করিয়াছিল, যে জাতিই প্রচার করিয়াছিল—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনং"—সে জাতির বংশধর আজ শরীরকে অবমাননা করিয়া যদি কেবলই শিক্ষায় দীক্ষিত হইতে চাহে, তবে কি বুঝিতে হইবে না যে,এজাতি তাহার অতীত মহিমাকে অবজ্ঞা করিতেছে, তাহার জাতীয়তাকে ভুলিয়াছে, তাহার নিজস্ব সম্পত্তিকে তুচ্ছ করিয়া পরের অজানিত অনিশ্চিত 'অম্বর্গ্য' ধনের লোভে দিগন্তের পানে ভাসিয়া চলিয়াছে! এটা কি বোঝা বড় শক্ত কথা যে, যে দেশে যে প্রণালীতে ব্যাস-বাল্মিকী, কালিদাস-ভবভূতি, কপিল-পাতঞ্জল, চরক-সুশ্রুত শিক্ষিত হইয়াছিলেন, সেই দেশের পক্ষে সেই শিক্ষা-প্রণালীই সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত, ফলপ্রদ ও মহিমময়? সে দেশের কি অনুকরণের শিক্ষায় স্বাস্থ্যহানি অশেষ লজ্জাকর নহে? হইতে পারে—সে সময় আজ নাই, সে পাত্র নাই, বিভিন্ন জাতির সংস্পর্শে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। কিন্তু সে দেশত তেমনি আছে, সে দেশের অতীত মহিমার জাজ্জ্বল্যপ্রমাণ অতুলনীয় গ্রন্থ-রাজি ত এখনও বর্ত্তমান! তবে কেন সে জাতি নিজস্বকে ভুলিয়া গেল? নর্ম্মান সভ্যতা-লালিত ইংরাজের মত পরস্বকে সমীকৃত করিয়া আপন গৌরবে আপন আদর্শে দেহ-মনের সামঞ্জস্যে সে কেন আপন শিক্ষা-সৌধ গড়িয়া তুলিল না? কবি বুঝি তাই কাঁদিয়াছিলেন—

"হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,
তা' সবে অবোধ আমি অবহেলা করি,
পরধন লোভে মত্ত।"

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ।

চিকিৎসকের কর্ত্তব্য।

[ময়মনসিংহ বৈদ্যসম্মেলনীর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মৈত্র কর্ত্তৃক পঠিত প্রবন্ধের সারাংশ।]

ভারতবর্ষে হিন্দুরাজগণের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে রাজানুগ্রহের অভাব এবং বৈদেশিক চিকিৎসার অভ্যুদয় বশতঃ আয়ুর্ব্বেদের বিশেষ অবনতি ঘটিয়াছিল। মুসলমানদিগের রাজত্ব কালে ভারতব্যাপী যে বিপ্লববহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, তাহাতে অনেক গ্রন্থ ভস্মীভূত হইয়া

গিয়াছে। বিশেষতঃ মুসলমান রাজগণ হেকিমি চিকিৎসারই প্রাধান্য স্থাপনের প্রয়াসী ছিলেন। তৎপরে ইংরেজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য চিকিৎসা প্রসার লাভ করিয়া জগদ্ব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু হেকিমি চিকিৎসা ও বর্ত্তমান উন্নতশীল পাশ্চাত্য চিকিৎসাও যে আয়ুর্ব্বেদ সমুদ্র মথিত—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চরক এবং সুশ্রুত সংহিতা প্রথমতঃ আরব্য ভাষায় ও পরে তাহা হইতে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে—ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। উক্ত ল্যাটিন ভাষার অনুবাদই চিকিৎসা শাস্ত্রের মূলভিত্তি। ইউরোপীয় ভৈষজ্যশাস্ত্র সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত প্রাচ্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের নিকট ঋণী। আজিও ইউরোপের চিকিৎসা-বিজ্ঞানবিদ্‌গণ ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থগুলি আবিষ্কারের জন্য সমুৎসুক। সুখের বিষয় ভারতবাসীও এজন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন।

কিন্তু কেবল গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইলেই আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি হইবে না। আধুনিক অনেকেই নিদান মুখস্থ করিয়াই আয়ুর্ব্বেদের পাঠ সমাপন করেন ও ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। কাজেই প্রত্যক্ষভাবে রোগ-পরিচয় না হওয়ার ব্যবস্থার ব্যতিক্রমে অনেক স্থলে ফল বিপরীত হইয়া দাড়ায়, চরক সংহিতায় লিখিত আছে ;—

শ্রুতেপর্য্যবদাতত্বং বহুশো দৃষ্ট কর্ম্মতা।
দাক্ষং শৌচমিতিজ্ঞেয়ং বৈদ্যেগুণ চতুষ্টয়ম্॥

সূত্র স্থান, নবম অধ্যায়।

শুধু পড়িয়া বিদ্বান হইলে চলিবেনা, হাসপাতাল স্থাপন করিয়া আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থিদিগকে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে—এজন্য শরীর তত্ত্ববিৎ উপযুক্ত কৃতবিদ্য অধ্যাপকের প্রয়োজন। কাজেই প্রথমতঃ উপযুক্ত আয়ুর্ব্বেদজ্ঞকেই পাশ্চাত্যমতে অস্ত্রচিকিৎসাদি শিক্ষা করিয়া অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এই মহদুদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তই কলিকাতা মহানগরীতে "অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়" নামে একটি কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপিত হইয়াছে। শুনেতেছি টাঙ্গাইল অঞ্চলেও এইরূপ একটী কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব চলিতেছে।† দেশে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসকের যেরূপ অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহাতে দুই একটি কলেজে অভাব পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। কাজেই যাহাতে প্রত্যেক জেলায় অন্ততঃ পক্ষে একটি করিয়া কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্টিত হইতে পারে, তজ্জন্য সকলেরই যথাসাধ্য চেষ্টা ও যত্ন করা কর্ত্তব্য।

ঔষধ প্রস্তুত বিষয়েও আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন। অনেক সময় ছাত্র ও ভৃত্যের উপর ভার দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকি। ঔষধ প্রস্তুত করিতে যে শুদ্ধাচার সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন, পাশ্চাত্য সংসর্গে পড়িয়া আমরা এ কথা একরূপ ভুলিয়া গিয়াছি। অশুচি শরীরে ঔষধ প্রস্তুত করিলে ঔষধের গুণেরও তারতম্য হইয়া থাকে। প্রমাণ স্বরূপ আমি এ স্থলে 'কাসন্দের' কথা উল্লেখ করিতে পারি। 'কাসন্দ'—সরিষা বাটা ও কতিপয় মসলার একটি সংমিশ্রণ আমাদের ময়মনসিংহ অঞ্চলে ইহা যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। ইহা প্রস্তুতকালে শরীর কোনরূপ অশুচি থাকিলে,—এমনকি অশুচি ব্যক্তির ছায়া পর্য্যন্ত লাগিলেও নষ্ট হইয়া যায় এবং আ

† প্রস্তাব চলিতেছে,—না আমরা শুনিয়াছি, টাঙ্গাইলেও অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।
—আং-সং

গন্ধ সমস্তই বিকৃত হইয়া পড়ে। তখন ইহা পচিতে আরম্ভ হয়। কিন্তু শুদ্ধাচারে প্রস্তুত 'কাসন্দ' দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকে। আমাদের আয়ুর্ব্বেদোক্ত আসব-অরিষ্ট সমূহও কাসন্দের মত শুদ্ধাচারের সামান্য ব্যতিক্রমেই নষ্ট হইয়া যায়—তাহা আমি অনেকস্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কাজেই প্রত্যেক চিকিৎসকের শুদ্ধাচার পরায়ণ হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

ঔষধের উপাদান সমূহ যাহাতে পচা ও কীটদংষ্ট না হয় সে বিষয়ে তীব্রদৃষ্টি রাখিতে হইবে। কেবল ব্যবসায়ী বেণে ও বেদে' জাতির উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবেনা।

দেবতালয়-বল্মীক-কূপ-রথ্যা-শ্মশানজাঃ।
অকাল তরুমূলোত্থা ন্যূনাধিক চিরন্তনাঃ।
জলাগ্নি ক্রিমি সংক্ষুন্না ওষধাস্ত ন সিদ্ধিদাঃ॥

এই বাক্য প্রতিপালন করিতে হইলে চিকিৎসককে স্বহস্তে দেখিয়া-শুনিয়া বনজ ওষধি সমূহ সংগ্রহ করিতে হয়। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত ও আমরা ইহাতে সম্পূর্ণ উদাসীন। এরূপ অবস্থায় আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি কিরূপে সম্ভবে? ওষধি উদ্ধৃত করিবার কালাকালও আমরা বিচার করিনা।

মূলানি শিশিরে গ্রীষ্মে পত্রং বর্ষা বসন্তয়োঃ।
ত্বকন্দো শরদি ক্ষীরং যথর্ত্তুং কুসুমং ফলম্।
হেমন্তে সারমোষধ্যা গৃহ্নীয়াৎ কুশলো ভিষক্॥

আমরা এই বাক্যের কি সার্থকতা রক্ষা করি? পূর্ব্বকালে চিকিৎসকগণ মন্ত্রপূতঃ করিয়া শ্রদ্ধার সহিত ওষধি উত্তোলন করিতেন। আর বর্ত্তমানে আমরা পায়খানা হইতে ফিরিবার সময়ও ওষধি উদ্ধৃত করি। আয়ুর্ব্বেদের কি শোচনীয় অধঃপতন! এরূপ অনাচার সত্ত্বেও যে ঔষধের ক্রিয়া হয়, ইহাই ত আশ্চর্য্যের বিষয়!

কতকগুলি বনৌষধির অপ্রাপ্তি এবং অপরিচয়ও আয়ুর্ব্বেদের অবনতির অন্যতম কারণ। মেদ, মহামেদ, জীবক, ঋষভক প্রভৃতির অভাব সত্ত্বেও চ্যবনপ্রাশ প্রভৃতি ঔষধের আশ্চর্য্য ফল পরিলক্ষিত হইতেছে। মেদ, মহামেদ প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়া ঔষধগুলি যথাযথভাবে প্রস্তুত হইলে বৃদ্ধব্যক্তিও যে চ্যবন মুনির ন্যায় পুনর্যৌবনত্ব প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বন জঙ্গলে যে সমস্ত অপরিচিত গাছগাছড়া দেখা যায়, অনুসন্ধান করিয়া ঐ সমস্ত অপরিচিত গাছগাছড়ার আকৃতি, গুণ ক্রিয়া, স্বাদাদি পর্য্যালোচনা করিয়া চিনিয়া লইতে পারিলে আয়ুর্ব্বেদের মহোপকার সাধিত হয়। আবার কতকগুলি বনৌষধি আছে—তাহা এক নামে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন কোকিলাক্ষ, বৃহতী, বিদ্ধড়ক ইত্যাদি। কোকিলাক্ষের সন্দেহ মীমাংসার জন্য কলিকাতার জনৈক বিখ্যাত কবিরাজ মহাশয়ের নিকট হইতে কিছু কোকিলাক্ষ-বীজ আনাইয়াছিলাম। তিনি কোকিলাক্ষ নাম দিয়া এলবালুকা * পাঠাইয়াছিলেন। কোকিলাক্ষ কখন ও এলবালুকা হইতে পারে না। ইহাকে হিন্দুস্থানে তালমখনা, উৎকলে 'মাখুরেণ' নামে অভিহিত করা হয়। তবে কি কোকিলাক্ষ আমাদের দেশে তালমাখনারই নামান্তর নহে? পল্লকাষ্ঠস্থলে কেহ

* এ কবিরাজ মহাশয়টি কে—তাহা প্রবন্ধ লেখকের বলা উচিত। যে কবিরাজ 'কোকিলাক্ষ' চাহিলে 'এলবালুকা' দিয়া থাকেন, তিনি কবিরাজ নামেরই অনুপযুক্ত। আমরা জানিতে চাহি—তিনি কি জাতিতে বৈদ্য? না বৈদ্যের ব্যবসায়ী? আঃ সং।

স্থলপদ্ম কেহ বা বেনে দোকানের একপ্রকার কাষ্ঠ (যে কাষ্ঠ দ্বারা কেরোসিনের বাকস প্রস্তুত হয় দেখিতে অনেকটা সেইরূপ) ব্যবহার করেন। আমি অনেক প্রাচীন কবিরাজকে আমাদের দেশীয় পাউড়া কাঠ (রঙ্গি কাঠ) ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। পাউয়া— বকম ও নিম জাতীয় বৃক্ষ বিশেষ। ইহার সার পদ্ম গন্ধ বিশিষ্ট ও দেখিতে ঠিক পদ্মবর্ণ। কাজেই আমারও ইহাই পদ্মকাষ্ঠ বলিয়া বিশ্বাস। তবে পার্ব্বত্য প্রদেশজাত রঙ্গিকাঠ ব্যবহার করা উচিত। বিদ্ধড়ক আমাদের দেশে-ঘিন্নি গোটা নামক একপ্রকার লতার বীজ ব্যবহৃত হয়। ইহার পাতা গুলঞ্চ পাতা সদৃশ, তলদেশ মসৃন ও শ্বেতবর্ণ। ফুলগুলি ঠিক কলমী লতার ফুলের ন্যায়। গাছ পান,—সাঁচি, কাল, সাদা ভেদে পান যদিও চারিপ্রকার, কিন্তু সাঁচি পান ব্যবহারই অমি যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করি। হবুষের পরিবর্ত্তে ধনের ব্যবহার দৃষ্ট হয় এবং উহা পাওয়া যায় না বলিয়া অনেকে ধারণা। আমি আইশ্নে নামক একপ্রকার লতাপ্রাপ্ত হইয়াছি। উহার ডাঁটা, পাতা পিঁপুল গাছের মত। ফল অশ্বত্থ ফল সদৃশ। পাতা ও ফলে মৎস্যের ন্যায় গন্ধ পাওয়া যায়। মাছের আঁইশের ন্যায় গন্ধ বলিয়াই বোধ হয় ইহার নাম আইশ্নে হইয়াছে। হবুষের আকৃতির সহিত সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান বলিয়া আইশ্নেকেই হবুষ বলিয়া ধারণা হয়। বৃহতীদ্বয়ের স্থলে কোথাও ছোট ব্যাকুড় ও বড় ব্যাকুড়, কোথাও বা ছোট ব্যাকুড় ও কণ্টকারী ব্যবহৃত হয়। আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি করিতে হইলে ইহার মীমাংসা এবং অপ্রাপ্য ও দুষ্প্রাপ্য বনৌষধি গুলি আবিষ্কারের জন্য একটি অনুসন্ধান সমিতি গঠিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

প্রতিবৎসর আয়ুর্ব্বেদ সভার সঙ্গে প্রদর্শনী খুলিলে অনেক উপকার হয়। অনুসন্ধান সমিতিতে যে সমস্ত বনৌষধির আবিষ্কার হইবে, তাহা প্রতিবৎসর উক্ত প্রদর্শনীতে প্রদত্ত হইলে অপরিচিত বনৌষধির পরিচয় ও অকৃত্রিম ঔষধ প্রস্তুত—যুগপৎ সম্পাদিত হইবে।

লৌহ, অভ্র প্রভৃতি ধাতুসমূহের যত অধিক পুট দেওয়া হয়, ততই তাহার কার্য্যকারিতা-শক্তির বৃদ্ধি হইতে থাকে। ধাতু সমূহ অত্যধিক জারিত হইয়া সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম অণুপরমাণুতে বিভক্ত হইয়া অসংখ্য পরমাণুর সমষ্টি মানব দেহে ক্রিয়া প্রকাশ করে। শরীরাবয়ব অসংখ্য পরমাণুর সমষ্টি মাত্র।

শারীরাবয়বাস্তু পরমাণু ভেদেনাপরিসংখ্যেয়া ভবন্তি,
অতি বহুত্বাদতি সৌক্ষ্ম্যাদতীন্দ্রিয়ত্বাচ্চ।

চরকসংহিতা, শারীর স্থান, সপ্তম অধ্যায়।

এই যে পরমাণু—এই পরমাণুর সহিতই বর্ত্তমান হোমিপপ্যাথিক তত্ব নিহিত আছে। শরীরস্থ এই সূক্ষ্মতত্ব অবগত হওয়াতেই হোমিওপ্যাথিক ঔষধগুলি ডাইলিউসন্ দ্বারা ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম পরমাণুতে বিভক্ত হইয়াছে। অণুর সহিত অণু, পরমাণুর সহিত পরমাণু মিশ্রিত হয়। পরমাণুর সহিত অণু মিশ্রিত হইতে পারে না। সমধর্ম্মীর সহিত সমধর্ম্মীর মিলন স্বাভাবিক। এই জন্যই জলের সহিত জল, তৈলের সহিত তৈল মিশ্রিত হয়। তৈলের সহিত জল মিশ্রিত হইতে পারে না। মানবদেহের সমধর্ম্মী করণার্থই মহর্ষিগণ লৌহ, অভ্র প্রভৃতি ধাতু সমূহ সহস্রাধিকবার জারণ-মারণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কাজেই জারণ-মারণে বিশেষ সূক্ষ্মদৃষ্টি রাখিতে হইবে। এরূপ অনেক কবিরাজ আছেন—যাঁহারা বরিশালের জারিত

দ্রব্য বিক্রেতাদের নিকট হইতে টাকায় ১৫।১৬ তোলা লৌহ, অভ্র, বঙ্গ প্রভৃতি ধাতু সমূহ খরিদ করিয়া ব্যবসায় করিতেছেন। আবার অনেক নব্য কবিরাজ গেরিমাটি ও হীরাকস ভস্ম হইতে কৃত্রিম উপায়ে লৌহ ভস্ম প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতেছেন। কিন্তু একথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে—চিকিৎসা বিষয়টা অর্থকরী বিদ্যা বা সাধারণ ব্যবসায়ের জিনিষ নহে।

চর্চ্চা না থাকায় আয়ুর্ব্বেদের সুন্দর সুন্দর বিষয়গুলি আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। কাহারও স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইলে ডাক্তারের সাহায্যে স্থান নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হয়। অথচ চরকের সূত্রস্থানে স্থান-নির্ব্বাচনের অতি সুন্দর পন্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। বস্তিকর্ম্মও চর্চ্চাভাবে আজ লুপ্ত প্রায়। ইহাতে বুঝা যায়, আমাদের যাহা আছে, তাহার চর্চ্চাই রীতিমত হইতেছে না। অথচ বর্ত্তমানে আমাদের কিছু নাই বলিয়াই চীৎকার করিতেছি।

উপসংহারে আমার শেষ বক্তব্য এই যে, আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি করিতে হইলে হিংসা, দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে এক মহামন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। আমাদের সব ছিল বা আছে—একথা বলিলে কেহ শুনিবে না। যতদিন আমরা কার্য্যক্ষম না হইব বা কার্য্যের দ্বারা জনসাধারণকে মুগ্ধ করিতে না পারিব—ততদিন আয়ুর্ব্বেদ যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকিবে—ইহা সুনিশ্চিত। নিঃস্বার্থভাবে ও সমবেত চেষ্টায় আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে আত্ম-নিয়োগ করিলে আবার ইহার পুনরুত্থানের আশা করা যায়।

শ্রীযোগেন্দ্র কিশোর লোহ।

মানব-জন্ম-রহস্য।

—:*:—

পূর্ব্ব প্রকাশিত—"গর্ভিণীর সাধ ভক্ষণ" প্রবন্ধে বলিয়াছি,—চতুর্থ মাস গর্ভকালেই দৌহৃদ্ প্রাপ্তিবশতঃ গর্ভিণীর সাধ ভক্ষণ কাল আরম্ভ হয়, এবং তৎকাল হইতেই নিম্নলিখিত রূপে ভ্রূণ বর্দ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার অভিলাষ জন্মিতে আরম্ভ হয়, সে জন্য সন্তান তুষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত গর্ভিণীর অভিলাষ পূর্ণ করা গৃহস্থ মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য, নতুবা ভাবী অনিষ্ট হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। আমাদের এতদ্দেশে এতদ্বিষয়ক সমালোচনা মোটেই না থাকায় চতুর্থ মাসের স্থলে অধিকাংশই সপ্তম মাসে মাত্র একটি দিন শুভক্ষণ দেখিয়া নির্ব্বাচন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন বা পরমান্ন গর্ভিণীকে ভক্ষণ করিতে দিয়াই সাধ ভক্ষণ কার্য্য শেষ হয়। এক্ষণে পঞ্চম মাস গর্ভ কাল হইতে সন্তানের জন্মকাল পর্য্যন্ত রহস্য বিষয়ক আর্য্য শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তগুলি বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। আয়ুর্ব্বেদ বলেন,—

"পঞ্চম মাসে গর্ভস্থ ভ্রূণের মন জন্মে। ষষ্ঠ মাসে বুদ্ধি জন্মে। সপ্তম মাসে [illegible]

সন্তানের দেহে ওজঃ ধাতু জন্মে, এবং গর্ভিণী ও গর্ভস্থ সন্তান মুহুর্মুহুঃ পরস্পর পরস্পরের ওজঃ গ্রহণ করে—অর্থাৎ কখন বা গর্ভিণীর ওজঃ ধাতু সন্তান গ্রহণ করে, আবার কখন বা সন্তানের ওজঃ গর্ভিণীর দেহে সঞ্চরণ করে, এ নিমিত্ত গর্ভিণী ও সন্তান ওজের অভাব ও পূরণ হেতু যথাক্রমে ম্লান ও প্রফুল্ল হয়; অর্থাৎ যখন গর্ভিণীর ওজধাতু গর্ভস্থ শিশু গ্রহণ করে, তৎকালে গর্ভিণী ম্লান ও শিশু প্রফুল্ল হয়. আবার যে সময় শিশুর ওজঃধাতু গর্ভিণীর দেহে সঞ্চরণ করে, তখন গর্ভস্থ শিশু ম্লান এবং গর্ভিণী প্রফুল্ল হইয়া থাকে। সুতরাং অষ্টম মাসে ওজের স্থিরতা না থাকা জন্য তৎকালে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে প্রায়ই জীবিত থাকে না।*

অষ্টম মাসে নৈঋত কোণের অধিষ্ঠাতার উদ্দেশ্যে বলি (মাংস অন্ন) প্রদান করা কর্ত্তব্য। † যেহেতু উক্ত নৈর্ঋত কোণের অধিষ্ঠাতাও গর্ভস্থ শিশুর অংশভাগী। এমন কি স্বয়ং ব্যাসদেবও উক্ত রাক্ষসকে সন্তান রক্ষার নিমিত্ত বলি প্রদান করিয়াছেন।

কুমার তন্ত্রে উক্ত আছে যে, গর্ভিণীর অষ্টম মাসে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের অধিপতিকে মাংস ও অন্ন দ্বারা বলি প্রদান করিবে।

যথা—"নবম, দশম একাদশ অথবা দ্বাদশ মাসে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে।* ইহার অতিরিক্ত বিলম্ব হইলে বিকার প্রাপ্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে।" (যদিও এদেশে দশ মাস ও দশ দিনের প্রসবকেই স্বাভাবিক প্রসব বলা হইয়া থাকে, তথাপি উহার ব্যতিক্রমে যথা নবম বা একাদশ ও দ্বাদশ মাসে প্রসবকেও যে অস্বাভাবিক বলা যায় না এতদ্দারা সেই জ্ঞান লাভ করিবার সুযোগ হইতেছে।)

এক্ষণে গর্ভের মধ্যে ভ্রূণের কোন্ অঙ্গ সর্ব্বাগ্রে জন্মে, তাহাই কথিত হইতেছে।

শৌনক বলেন যে, গর্ভের অগ্রে শিরোদেশই জন্মে। কারণ মস্তকই দেহ ও ইন্দ্রিয়ের মূল। কৃতবীর্য্য মুনি কহেন যে, অগ্রে হৃদয় জন্মে, কারণ হৃদয়ই বুদ্ধি ও মনের স্থান। ব্যাসদেব কহেন যে. নাভি অগ্রে জন্মে, কারণ প্রাণ তৎস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক তেজঃ সহকারে দেহীর সমস্ত দেহ বর্দ্ধন করে। মার্কণ্ডেয়ের মতে অগ্রে হস্তপদ উৎপন্ন হয় বলিয়া কথিত আছে, কারণ হস্ত পদই দেহীর সকল ক্রিয়ার মূল। মুনি শ্রেষ্ঠ গোতম বলেন যে, কোষ্ঠ অর্থাৎ দেহের মধ্যভাগ অগ্রে জন্মে, কারণ তাহাতেই সমস্ত অবয়ব উৎপন্ন হয়, কিন্তু উক্ত মত সকল সঙ্গত নহে। কেননা ধন্বন্তরি বলেন যে,—সমগ্র অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এককালেই জন্মে, চ্যুত ফলের ন্যায় অতি সূক্ষ্মতা প্রযুক্ত তাহার উপলব্ধি হয় না। যেমন আম্র ফল পাকিয়া উঠিলে তাহার কেশর, মাংস, অস্থি ও মজ্জা প্রভৃতি পৃথক রূপে দৃষ্ট হয়। সেই ফলের

* কারণ ওজঃ ধাতুই মানবের জীবন স্বরূপ। যেহেতু দোহস্থ বস্তুর রস হইতে শুক্র পর্যন্ত সপ্ত ধাতুর মধ্যে শুক্রের পূর্ব্ববর্ত্তী ছয়টী ধাতুতেই মল থাকে, কিন্তু শুক্রে মল থাকে না, সেই শুক্র আবার পরিপাক হইয়া দুইভাগে বিভক্ত হয়। উহার স্থূলভাগ শুক্র এবং স্নেহময় সূক্ষ্ম ভাগ, ওজঃরূপে পরিণত হয়। এস্থলে অষ্টম মাসের সন্তান যাহারা মাতৃ ওজঃ গ্রহণ কালে অত্যন্ত প্রফুল্লাবস্থায় জন্মে, সেই সকল অধিকাংশ ছেলেকে জীবিত থাকিতে দেখা যায়। আর যাহারা মাতাকে ওজঃ অর্পণ কালে ভূমিষ্ঠ হয় তাহারাই অত্যল্প কালে মরিয়া যায়। এরূপ অনুমান বোধ হয় ভ্রমাত্মক বলিয়া সিদ্ধান্ত না হইতেও পারে।
—লেখক।

† এরূপ প্রথা আদৌ প্রচলিত দেখা যায় না।

তরুণাবস্থায় ঐ সকল কেশর প্রভৃতি অতি সূক্ষ্মভাবে থাকে বলিয়া দেখা যায় না, ক্রমশঃ কাল সহকারে তাহারা প্রকাশ পায়; সেইরূপ গর্ভেরও তরুণ অবস্থায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল থাকা সত্ত্বেও অতীব সূক্ষ্মত্ব প্রযুক্ত তাহার উপলব্ধি হয় না। ক্রমশঃ কাল সহকারে সেই সকল প্রকাশিত হয়।

উক্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলের মধ্যে পিতৃজ, মাতৃজ, রসজ, আত্মজ, সত্বজ ও সাত্মজ এই সকল ভাগের বিবরণ—ক্রমান্বয়ে বিবৃত করা যাইতেছে। যথা,—

পিতৃজাঙ্গ,—কেশ, শ্মশ্রু, লোম, অস্থি, নখ, দন্ত, শিরা, স্নায়ু, ধমনী ও রেতঃ এই গুলি পিতা হইতে জন্মে।

মাতৃজাঙ্গ,—মাংস, শোণিত, মেদ, মজ্জা, হৃদয়, নাভি, যকৃৎ, প্লীহা, অন্ত্র ও গুহ্য এই গুলি নিতান্ত কোমল পদার্থ এবং ইহারা মাতা হইতে জাত।

রসজাঙ্গ। শারীরিক বৃদ্ধি, বল, বর্ণ ও স্থিতি এ সমুদয়ই রস হইতে উৎপন্ন।

আত্মজাঙ্গ।—ইন্দ্রিয় সমূহ, জ্ঞান বিজ্ঞান, পরমায়ু, সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি আত্মজাত বিষয়। আত্মজ অর্থাৎ আত্মজাত বিষয় মধ্যেই সত্বজ ও সাত্মজ বিষয় সকল অন্তর্ভূত থাকে। কারণ দেহীর আত্ম ইচ্ছানুরূপেই আহার-বিহার ও ব্যবহারাদি সংঘটিত হওয়াতে ইন্দ্রিয় সমূহ পরিচালিত হইয়া স্বীয় কর্ম্মানুসারে—জ্ঞান, বিজ্ঞান, পরমায়ু এবং সুখ ও দুঃখাদি পরিণাম উপস্থিত হইয়া লইয়া থাকে। যদিও উক্ত বিষয় সকল পূর্ব্ব জন্মের অদৃষ্ট ফলের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে বটে, কিন্তু সংসর্গ ও আচার ব্যবহার প্রভৃতি আত্মজ কর্ম্ম দ্বারা সে অদৃষ্টকে বহু পরিমাণে আয়ত্ত করা যাইতে পারে। ফল যে কর্ম্মের আয়ত্ত এবং কর্ম্ম যে আত্মজ ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত।

গর্ভের বিশিষ্ট উপকারী পদার্থ বর্ণিত হইতেছে। অগ্নি, সোম, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সত্ব, রজঃ, তম, পঞ্চেন্দ্রিয় এবং কর্ম্ম পুরুষ—ইহারা গর্ভকে জীবিত রাখে।

অগ্নি শব্দে এখানে পাচক, আলোচক, রঞ্জক, ভ্রাজক ও সাধক এই পাঁচ প্রকার, আর পঞ্চভূতগত পঞ্চ প্রকার এবং ধাতু গত উষ্মাকে বুঝিতে হইবে। উক্ত অগ্নি শক্তিরূপবান বলিয়া বাক্যের অধিদেবত্ব প্রাপ্ত হয় ও পরিপাকাদি ক্রিয়া দ্বারা গর্ভস্থ শিশুকে জীবিত রাখে। তারপর সোম (জল) পঞ্চাত্মক—শ্লেষ্মা, রস ও শুক্র প্রভৃতি সোমাত্মক যে সকল পদার্থ—শরীরে নিহিত আছে, তাহাদিগের এবং রসনেন্দ্রিয়ের শক্তি স্বরূপ হইয়া দেহে অবস্থিতি করতঃ মনের অধিদেবতা স্বরূপ হইয়া সেই সোমাত্মক পদার্থ শুক্রঃ প্রভৃতি সম্পূরণ এবং পঞ্চ প্রকার আগ্নেয় পদার্থ ও বায়ু দ্বারা শোধিতাংশকে আর্দ্রতা বিধান করতঃ জীবনের অনুকূলতা সম্পাদন করিয়া থাকে। পৃথিবী, জলদ্বারা ক্লিন্নাবস্থা প্রাপ্ত গর্ভের কাঠিন্য বিধানে শরীরস্থ দোষ, ধাতু, মল এবং তদবয়ব অঙ্গ, উপাঙ্গ প্রভৃতির সঞ্চারণ ও উচ্ছ্বাস, নিঃশ্বাস দ্বারা আকাশ, বায়ু ও অগ্নি কর্তৃক বিদারিত স্রোতঃ সকলকে উর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যগ গমনে অবকাশ প্রদান পূর্ব্বক শিশুর জীবন রক্ষা করে। স্বত্ব, রজঃ ও তম এই তিনটি গুণ মনের স্বরূপতায় পরিণত হইয়া—জীবাত্মার শরীরান্তর গ্রহণ ও মোক্ষণের কারণ বলিয়া গর্ভস্থ শিশুকে জীবিত রাখে।

পঞ্চেন্দ্রিয় অর্থাৎ—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা জিহ্বা, ত্বক—ইহারা স্ব স্ব কার্য্য অর্থাৎ শব্দ,

স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ গ্রহণ রূপ ক্রিয়া দ্বারা গর্ভের আনুকূল্য করিয়া থাকে।

ভূতাত্মা অর্থাৎ কর্ম্ম-পুরুষ। এই কর্ম্ম-পুরুষ জাগরিক অনন্ত জন্তু সমূহের চৈতন্য স্বরূপ হইয়া প্রাণ ধারণ করিতেছে।

ডাঃ শ্রীনলিনী নাথ মজুমদার।

ক্ষয়রোগ।

——:*:——

ক্ষয়—ক্ষয় বশতঃই ক্ষয় রোগ বঙ্গদেশে এত প্রাবল্য লাভ করিয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে (১) শোক, চিন্তা, ঈর্ষ্যা, উৎকণ্ঠা, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি কারণে (২) কৃশ ব্যক্তি রুক্ষ অন্ন পান সেবন করিলে, (৩) অনাহার করিলে হৃদয়স্থ রস ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং রক্তাদি পরবর্ত্তী ধাতু সকলেরও ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া থাকে। (৪) অতিরিক্ত স্ত্রী সহবাস বশতঃ শুক্রক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং মজ্জাদি পূর্ব্ব-বর্ত্তী ধাতু সমূহ ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

(১) শোক, চিন্তা, ঈর্ষ্যা, উৎকণ্ঠা, ভয় ও ক্রোধ প্রভৃতি উপসর্গগুলি আজকাল বাঙ্গালার ঘরে ঘরে সম্যকরূপে বিদ্যমান। বর্ত্তমান অকাল মৃত্যুর যুগে পুত্রকন্যার শোক পাইতে হয় নাই—এমন গৃহস্থ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। চিন্তার ত অবধি নাই। অন্ন চিন্তায় সমস্ত বাঙ্গালা জর্জ্জরিত। তাহার উপর মাতৃদায়, পিতৃদায়, কন্যাদায়, সামাজিক দায় প্রভৃতি আছে। শাস্ত্রে চিন্তাদি কারণে হৃদয়স্থ রস শুষ্ক হয় লিখিত হইয়াছে। চলিত কথায় বলে—"ভাবনায় বুকের রক্ত শুকিয়ে যা'চ্ছে।" বাস্তবিকই এখন সমগ্র বাঙ্গালী জাতির এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে।

ঈর্ষ্যাও বাঙ্গালায় বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। প্রতিবাসী দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাইলে অনেকে ঈর্ষ্যা পরতন্ত্র হন। আত্মীয় স্বজনের উন্নতি দেখিলে হিংসায় জ্বলিয়া উঠেন।

উৎকণ্ঠারও অবধি নাই। আজ ছেলে—কাল মেয়ের রোগ, কখন কি হয়। কাল সাহেব চটিয়াছে, বুঝি চাকরী যায়।...তার উপর ঋণ আছে, মহাজন আছে, কুটুম্ব-কুটুম্বিতা আছে। ভয় আমাদের সর্ব্বদাই। পথে গাড়ী-ঘোড়া চাপা পড়িবার বা বলবান ব্যক্তির অঙ্গ সংঘর্ষণ ভয়, আপিষে সাহেবের ভয়, গৃহে গৃহিণীর অলঙ্কারের ও মুদির-ধোপার তাগাদার ভয়! আমরা এখন ভয়ে ভয়ে যাই—ভয়ে ভয়ে চাই!

শরীর দুর্ব্বল এবং মন নানা কারণে বিরক্ত, কাজেই অল্পেই বাঙ্গালীর ক্রোধের উদ্রেক হয়। সে ক্রোধ—ভৃত্য-গৃহিণী ও পুত্র কন্যার উপরে বা অনুপস্থিত প্রতিবাসী প্রভৃতির উদ্দেশে প্রকাশিত হয়।

২। শাস্ত্রে কৃশ ব্যক্তির রুক্ষান্ন সেবন ক্ষয় রোগের কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। বাঙ্গালী মাত্রেই এক্ষণে কৃশ। দুই একজন স্থূল বা অতিস্থূল থাকিতে পারেন, কিন্তু মাথরাশির

ন্যায় (অর্থাৎ এক রাশি মাষ কলায়ের মধ্যে দুই একটা ছোলা থাকার মত) তাহা নগণ্য। এই কৃশ বাঙ্গালী জাতি এক্ষণে রুক্ষান্নই সেবন করিতেছে। স্নেহ প্রধান বিশুদ্ধ ঘৃত এক্ষণে অবিশুদ্ধ। যাহা পাওয়া যায় তাহাও অতীব দুর্ম্মূল্য। গড়ে একজন বাঙ্গালীর প্রত্যহ দুই বেলা দুই ফোঁটা ঘৃত উদরস্থ হয় কিনা সন্দেহ। তৈল সম্বন্ধেও প্রায় তদ্রূপ। যাহাদের শাকান্ন জুটে না, তাহারা ঘৃত-তৈলাদি পাইবে কোথায়? এই স্নেহের অভাবে ক্ষয় রোগ আমাদের প্রতি এত নিঃস্নেহ হইয়া পড়িয়াছে।

৩। দুর্ব্বল ব্যক্তির অনশন বা অল্পাশন ক্ষয় রোগের অন্যতম কারণ। দুর্ব্বল বাঙ্গালী জাতির এক্ষণে অনশন করিতে না হইলেও অল্পাশন প্রায় পনর আনা বাঙ্গালীকে করিতে হয়। যে সকল বস্তু মানবের উপযুক্ত এবং হিতকর খাদ্য, সে সকল বস্তু এক্ষণে দুর্লভ। ঘৃতাদি যে সকল বস্তু আহার করিলে অগ্নি প্রদীপ্ত হয়—সে সকল বস্তু এক্ষণে অপ্রাপ্য বা দুষ্প্রাপ্য। উহাদের অভাবে বাঙ্গালীর অগ্নি-বল এক্ষণে ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। ক্ষীণাগ্নি বাঙ্গালী এখন আর অধিক আহার করিতে পারে না, যাহা আহার করে তাহাও কুখাদ্য। কাজেই দুর্ব্বল ব্যক্তির অনশন এক্ষণে বঙ্গদেশে বিশেষরূপে ঘটিতেছে। সুতরাং বঙ্গদেশে ক্ষয় রোগের যে প্রাবল্য ঘটিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি!

৪। দুর্ব্বল শরীরে কাম রিপুর উত্তেজনা অধিক হয়। অপিচ, এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে থাকিয়া সংযম শিক্ষা করার নিয়ম নাই। শুধু তাহাই নহে, এখন আর বাঙ্গালী স্ত্রী সহবাস সম্বন্ধে তিথি-নক্ষত্র-পর্ব্বদিন বিচার করে না। সুতরাং দুর্ব্বল, অল্পাহারী, রুক্ষাহারী, অপুষ্টিকরদ্রব্যাহারী বাঙ্গালীর স্ত্রী প্রিয়তা যে বঙ্গদেশে যক্ষ্মা রোগের কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

(ক) শুক্রক্ষয় দিগদর্শন মাত্র হইলেও সমস্ত ধাতুক্ষয়ই-ক্ষয় রোগের কারণ এবং এই কারণে অনেক প্রসূতি ক্ষয়রোগগ্রস্তা হইয়া থাকে। আজকাল ১২।১৩।১৪ বৎসর বয়সে স্ত্রীলোকের সন্তান হয়। প্রথম সন্তান হইবার পরে আবার বৎসরে বৎসরে সন্তান হইতে থাকে। ইহার ফলে প্রসূতির শরীর নিতান্ত রক্তশূন্য এবং ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এইরূপ রক্ত- এবং ক্ষীণ দেহে ক্ষয় রোগ সহজেই স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে পারে।

এতদ্ব্যতীত অজীর্ণ রোগও যে ক্ষয় রোগের প্রাবল্যের অন্যতম কারণ, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অজীর্ণ এক্ষণে বঙ্গদেশব্যাপী। বঙ্গে অজীর্ণ রোগের প্রাবল্য নামক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বঙ্গদেশে ক্ষয় রোগের এইরূপ প্রাবল্য নিবারণের উপায় কি? উত্তরে বলিতে হয় যে, যে সমস্ত কারণে বঙ্গে ক্ষয় রোগের প্রাবল্য ঘটিতেছে—সেই সকল দূর করা। কিন্তু তাহা দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সম্ভব পর নয়। সম্ভবপর নয় বলিলেও ঠিক বলা হইল না, সম্ভবপর হইলেও বর্ত্তমানে আমরা যেরূপ স্রোতে গা ঢালিয়া চলিয়াছি, তাহাতে আমরা পারি বলিয়া বোধ হয় না। কিসের স্রোতে আমরা গা ঢালিয়া চলিয়াছি?—বিলাসিতার। কিসের জন্য আমাদের এ[illegible] অভাব অনটন?—বিলাসিতার। কিসের জ[illegible] আমাদের এত চিন্তা-ভয়-উৎকণ্ঠা?—বিলাসি[illegible]তার। কিসের জন্য আমরা দুই বেলা পে[illegible]

ভরিয়া খাইতে পাই না?—বিলাসিতার। বিলাসিতা ব্যতীত আমাদের এই দুর্দ্দশার যে অন্য কোন কারণ নাই, আমরা এমন কথা বলিতেছি না, কিন্তু বিলাসিতাই এজন্য অধিক পরিমাণে দায়ী। ব্যক্তিগত ভাবে,—সমাজগত ভাবে—দেশগত ভাবে এই বিলাসিতা বঙ্গে ওতঃপ্রোতঃ ভাবে বিদ্যমান। দুই একটা উদাহরণ দেওয়া বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। ব্যক্তিগত ভাবে বলিতেছি এইজন্য যে, যাহার উদরে দিবারাত্রিতে দুই পয়সার ঘৃত,এক পোয়া দুগ্ধ বা এক ছটাক মাংস পড়ে না, চা, চুরুট, সোডা, সার্ট, কোট, ষ্টকীনে তাহার যথেষ্ট ব্যয় হয়। সমাজগত ভাবে বলিতেছি এইজন্য যে, যে সমাজের লোক দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না—সেই সমাজে কন্যার বিবাহ দিতে হইলে কন্যার পিতাকে মূল্যবান বস্ত্র, বডি জ্যাকেট, বহুমুল্য স্বর্ণালঙ্কার, অসংখ্য কন্যাযাত্রী ও বরযাত্রীর ষোড়শোপচারে আহার্য্য প্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয়। দেশগত হিসাবে বলিতেছি এইজন্য যে, এই দরিদ্র দেশ হইতে কৃত্রিম মণিকার—কাঁচের চুড়ি-পুতুল বাঁশি প্রভৃতি প্রস্তুত কারক বিদেশী বণিক লক্ষ লক্ষ টাকা লুটিয়া লইয়া যায়। এই বিলাসিতা যদি আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের অভাব-অনটন, আমাদের চিন্তা-উৎকণ্ঠা—একদিনও স্থায়ী হইতে পারে না। কিন্তু বিলাসিতা-স্রোতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত দুর্ব্বলচিত্ত-বাঙ্গালী তোমরা—তাহা পারিবে কি?

পারিবে না। আর পারিবে না বলিয়াই বলিতেছিলাম যে, সম্ভবপর হইলেও আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা তাহা করিতে অক্ষম। সেই জন্য অভাব, অনটন, চিন্তা, উৎকণ্ঠা, ভয়-ভীতি হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায় এক্ষণে আর নাই। তথাপি যে কারণগুলি পরিত্যাগ করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত—অন্ততঃ সেইগুলি পরিত্যাগ করা উচিত। ইহাতেও দেশের অনেক কল্যাণ সাধিত হইবে এবং রোগ-শোক-জর্জ্জরিত-বঙ্গদেশে ক্ষয় প্রভৃতির প্রাবল্য অনেক কম হইবে।

সংযম শিক্ষা—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় বশতঃ ক্ষয় রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা কেবল শাস্ত্রে পাঠ করি নাই, অনেক স্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এইজন্য বাল্যকাল হইতে দেশের বালকগণকে সংযম শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক—একথাও আমরা অনেক সময় বলিয়া থাকি। প্রকৃত কথা,—কুসংসর্গে পড়িয়া অপরিণত বয়সে অবৈধ উপায়ে শুক্রক্ষয় করা দেশে একটা বিষম কুপ্রথা হইয়া পড়িয়াছে। ইহার ফলে ভবিষ্যতে অনেক বালক—যৌবনের প্রারম্ভে ক্ষয় রোগগ্রস্ত হইতেছে। এই জঘন্য রীতি বঙ্গদেশের যে কি অনিষ্ট করিতেছে, তাহা অনেকেই অবগত নহেন। যাহাতে এই সর্ব্বনাশী প্রথার একেবারে মূলোচ্ছেদ হয়—যেমন করিয়া হউক, তাহার চেষ্টা করা প্রত্যেক স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তির নিতান্ত কর্ত্তব্য।

একেত বাল্যকালে এইরূপ ক্ষয় ঘটে, তাহার পর বাল্যাবস্থার শেষে, যৌবনের প্রারম্ভে বা যৌবনে বিবাহ করিয়া অনেকে রিপুর দাস হইয়া পড়ে। শরীরের প্রতি লক্ষ্য নাই ভবিষ্যৎ অনিষ্টের ভয় নাই,—অপকৃষ্ট পুত্র কন্যা জন্মিবার আশঙ্কা নাই, বিধি-নিষেধ না মানিয়া যথেচ্ছভাবে রিপু চরিতার্থ করাই তাঁহারা জীবনের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। তখন একবার বুঝিয়াও দেখেন না যে,

ভোগে রোগের ভয় আছে। ফলে সেই ক্ষয়িত দেহে যখন যক্ষারোগ আশ্রয় করে, তখন দারুণ অনুতাপ উপস্থিত হয়। কিন্তু হায়, তখন আর নিষ্কৃতির উপায় থাকে না। যে ব্যক্তি রোগ-মুক্ত হইয়া দীর্ঘকাল বাঁচিতে ইচ্ছুক, তাহার পক্ষে সংযম শিক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। শুক্রই জীবন—ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিবেন—, শুক্রক্ষয় অর্থে জীবন ক্ষয় করা। দেশের লোকে এই বিষয় সম্যক বিবেচনা করিয়া সংযম শিক্ষা করিলে বঙ্গদেশে ক্ষয় রোগের প্রাদুর্ভাব অনেক কম হইবে।

রক্তক্ষয়—স্ত্রীলোকগণ অল্প বয়সে অনেক-গুলি সন্তান প্রসব করার ফলে প্রচুর রক্ত ক্ষয় বশতঃ ক্ষয়রোগ গ্রস্থ হইয়া থাকে—এ কথা বলিয়াছি। এ বিষয়ের প্রতিকার করিতে হইলেও স্ত্রীপুরুষের সংযত হওয়া আবশ্যক। সহধর্ম্মিণীর স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কে না কামনা করে? কিন্তু আমরা জানিয়া শুনিয়া আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারি, প্রসবের পর প্রসূতির শরীর যতদিন না পূর্ব্ববৎ সুস্থ ও সবল হয়—ততদিন সংযত হওয়া উচিত একথা মনে করি না। অল্প বয়সে অধিক সন্তান হওয়ার বিষময় ফল সম্বন্ধে আমরা অন্যত্র বিশেষ আলোচনা করিয়াছি। যাহা হউক দেশের লোকে এ বিষয়ে মনোযোগী হইলে বঙ্গে ক্ষয়রোগের প্রাদুর্ভাব অনেক কম হইবে এবং যেখানে এখন রোগ-পীড়িতা শীর্ণ-দেহা বিষন্নবদনা গৃহ কার্য্যে অসমর্থা জননী জীর্ণ-শীর্ণ-বালকবালিকা-বেষ্টিতা হইয়া অকাল মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছে দেখিতেছি, সেইস্থান সুস্থদেহা, রোগহীনা, গৃহকার্য্য-নিপুণা-প্রফুল্লবদনা জননী সুস্থ সকল বালকবালিকা বেষ্টিত হইয়া মাতৃত্বের মহিমায় গৃহস্থলী মণ্ডিত করিতেছে দেখিতে পাইব।

কাস রোগ হইতে ক্ষয়রোগ উৎপন্ন হইতে পারে, সুতরাং কাসরোগকে কদাচ উপেক্ষা করা উচিত নহে,। অজীর্ণ রোগ হইতেও কালে ক্ষয়রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। সুতরাং অজীর্ণরোগ-গ্রস্ত ব্যক্তির সুনিয়মে এবং সাবধানে থাকা কর্ত্তব্য। অপিচ সুপথ্য ও সুচিকিৎসা দ্বারা রোগ নিরাকরণ করা উচিত। পূর্ব্বে অজীর্ণ-রোগ সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গে এ বিষয়ের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। এক্ষণে ক্ষয় রোগের বীজ যাহাতে এক ব্যক্তির শরীর হইতে সংক্রমিত না হইতে পারে, তজ্জন্য কি উপায় অবলম্বন করা উচিত, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

ক্ষয়রোগ সংক্রামক। এই রোগীর সহিত একত্র অবস্থান, রোগীর ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ব্যবহার প্রভৃতি কারণে রোগ অন্যের শরীরে সংক্রমিত হয়। এইজন্য ক্ষয়রোগীকে স্বতন্ত্র রাখা কর্ত্তব্য। রোগীকে স্বতন্ত্র রাখিলে অন্যের সহিত তাহার সংস্পর্শ ঘটে না, সুতরাং রোগও সংক্রমিত হইতে পারে না।

কিন্তু রোগীকে স্বতন্ত্র রাখিলেও তাহার সুশ্রূষার জন্য লোকের আবশ্যক। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সুস্থ ও সবল ব্যক্তির দেহে রোগবীজ প্রবেশ করিলেও রোগ উৎপন্ন করিতে না। সুতরাং সুস্থ ও সবল ব্যক্তির দ্বারাই ক্ষয়রোগীর সুশ্রূষা করা উচিত। শীর্ণ-দুর্ব্বল-দেহ এরূপ ব্যক্তির যক্ষারোগীর নিকটে যাওয়া কদাচ উচিত নহে। এই নিয়মটি পালন করিলে যক্ষারোগের সংক্রমণ ঘটে না। কিন্তু আমাদের দেশে কাহারও ক্ষয়রোগ হইলে তাহাকে পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তি—এমন কি বালকবালিকাগণের সহিত একত্র থাকিতে

দেখা যায়। ইহা অত্যন্ত অন্যায় প্রথা এবং ইহার ফলে ক্ষয়রোগ বিস্তৃতি লাভ করিয়া সমাজের মহান্ অনিষ্ট সাধন করিতেছে। পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ—যাহারই কেন ক্ষয়রোগ হউক না, তাহাকে এইরূপ স্বতন্ত্র রাখিতে হইবে। পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণের হিত কামনায় ক্ষয়রোগগ্রস্তেরও স্বতন্ত্র থাকা বিশেষ কর্ত্তব্য।

ক্ষয়রোগের বীজ বিষরূপে অন্যের শরীরে সংক্রমিত হয়। এই রোগে দোষ সকল কফ, থুথু এবং রক্তের সহিত নির্গত হয়, সুতরাং ঐ সকল পদার্থে রোগবীজ থাকে। এই জন্য ক্ষয় রোগীর কফ, থুথু, রক্ত প্রভৃতি যেখানে সেখানে ফেলা উচিত নহে। ঐ সমস্ত একটী পাত্রে সংগ্রহ করিয়া নির্জ্জন স্থানে পুঁতিয়া ফেলা বা ফেলিয়া চূর্ণ ঢাকা দেওয়া উচিত। রোগীর কফ থুথু বস্ত্রাদিতে লাগিলে, সেই বস্ত্রাদি ফেলিয়া দেওয়া বা গরম জলে সিদ্ধ করিয়া লওয়া উচিত। ফলতঃ কফ ও থুথুর সহিত যখন রোগ-বিষ থাকে, তখন সেই কফ ও থুথুকে বিষবৎ বিবেচনা করিয়া যাহাতে কোন উপায়ে অপরের দেহে প্রবেশ করিতে না পারে, সেইরূপ উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। এমন হইতে পারে যে, কোন ব্যক্তির ক্ষয়রোগ হইয়াছে অথচ ধরা পড়ে নাই, সে লোকের সঙ্গে মিলিতে হয়। অথবা রোগ হইয়াছে জানিয়াও সে স্বতন্ত্র না থাকিয়া লোকালয়ে যাইতেছে। ইহার প্রতিকারের জন্য কাহারও উচ্ছিষ্ট দ্রব্য খাওয়া, কাহারও সহিত একত্র খাওয়া, অন্যে যে দ্রব্যে মুখ দিয়াছে, তাহাতে মুখে দেওয়া বা অন্যের ব্যবহৃত বস্ত্র মালাদি ব্যবহার পরিত্যাগ করাই উচিত।

যক্ষ্মারোগের কীট পিপীলিকা দ্বারা সংক্রমিত হইতে পারে। ইহার প্রতিষেধের জন্য যক্ষ্মারোগীর কফ ও থুথুতে যাহাতে পিপীলিকা বসিতে না পারে—তাহা করা উচিত এবং খাদ্য ও পানীয়ে যাহাতে কীট-পিপীলিকা বসিতে না পারে এরূপ সাবধানে রাখা কর্ত্তব্য।

ক্ষয়রোগীর হাচিবার বা কাশিবার সময় সূক্ষ্ম থুথু কফের ফেণার সহিত রোগবীজ নির্গত করিয়া শরীরে প্রবিষ্ট হইতে পারে। এইজন্য শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

"মুখ আবৃত না করিয়া হাচিবে না এবং হাই তুলিবে না।" এই নিয়মটী সকলে পালন করিলে কথিত সংক্রমণ ঘটিতে পারে না।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের মতে গৃহ মধ্যে নির্ম্মল বায়ু এবং রৌদ্র প্রবেশ করিলে ক্ষয় রোগের জীবাণু মরিয়া যায়। আমাদের দেশে বাস্তু গৃহ নির্ম্মাণ করিবার যে সকল নিয়ম আছে, সেই সকল নিয়ম অনুযায়ী গৃহ প্রস্তুত করিলে গৃহে যথেষ্ট বায়ু ও রৌদ্র প্রবেশ করে। সেই জন্যই বোধ হয় আয়ুর্ব্বেদে এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা হয় নাই। আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধীয় অনেক নীতি ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট আছে দেখা যায়। ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ পালন করিলেই সেই সকল নীতির অনুসরণ করা হয়। ধর্ম্মের সঙ্গে আমরা যে কত অমূল্য জিনিষ হারাইয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই এবং তাহারই ফলে আমরা আজি এত ব্যাধি সঙ্কুল। যদি আবার আমরা সে কালের মত শাস্ত্রবিধি মানিয়া চলি—সে কালের রীতি-নীতি—সে কালের শিক্ষা-দীক্ষার অনুকরণ করিয়া আবার যদি আমরা অতীত গৌরবকে সমাদর করিতে শিক্ষা করিতে পারি;—সকল বিষয়ে সংযমী হইবার জন্য আবার যদি আমরা কায়মনো-

বাক্যে বদ্ধ পরিকর হই—তাহা হইলে নষ্ট প্রায় সোনার বাংলা আবার পূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে। কিন্তু দেশের লোকে এ সকল কথা বুঝিবেন কি ?

শ্রী—

ম্যালেরিয়া তত্ত্ব।

ইহা আনন্দের বিষয় যে, বাঙ্গালী জাতির কিসে উন্নতি হয় এ বিষয়ে বাঙ্গালী মাত্রেই অনুসন্ধিৎসু হইয়াছেন এবং বাঙ্গালী জাতির বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি অনেক পর্য্যালোচনা করিতেছেন। লেফটেনাণ্ট কর্ণেল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গবাসী হিন্দুগণকে "ধ্বংসোন্মুখ জাতি" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি কয়েক বৎসরের সেন্সস-বিবরণী হইতে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা ক্রমশঃই হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। তিনি মুসলমান জাতির সংখ্যা-বৃদ্ধি ও হিন্দু জাতির সংখ্যা-হ্রাস দেখাইয়া হিন্দুর সামাজিক রীতি-নীতির মধ্যে তাহার ধ্বংসের কারণ নিহিত আছে ইহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল সরকার মহাশয় ঐ প্রবন্ধের উত্তরে ঐ সকল সেন্সস বিবরণী হইতেই দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালী-হিন্দু ক্ষয় হইতেছে ইহা সত্য, কিন্তু তাহার কারণ হিন্দুর আচার-ব্যবহারে নহে, তাহার কারণ অন্যত্র। তাহার প্রধান কারণ বাঙ্গালার ম্যালেরিয়া।

শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধে আর কিছু উপকার হউক বা না হউক—বাঙ্গালী প্রকৃতই ধ্বংসোন্মুখ কিনা সে বিষয়ে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে ও তাঁহারা সকলেই সেন্সস বিবরণী যথেষ্ট যত্ন সহকারে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেক বিষয়ে অনেক মতভেদ থাকিলেও ইহা সর্ব্বসম্মতিমতে স্বীকৃত হইয়াছে যে, বাঙ্গালী হিন্দু জাতির সংখ্যাবৃদ্ধি কমিয়া আসিতেছে এবং শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় ব্যতীত অপর সকলেই স্বীকার করেন যে, বাঙ্গালী জাতির কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেরই সংখ্যাবৃদ্ধি কমিয়া আসিতেছে। এই সংখ্যাহ্রাসের কারণ এবং তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে বহু মতভেদ দৃষ্ট হয় কিন্তু এ কথা অবিসম্বাদিত সত্য যে, বঙ্গদেশে জন্মের হার অপেক্ষা মৃত্যুর হার অধিক এবং এদেশে মৃত্যুর হার যেরূপ ভীষণ, পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে সেরূপ আছে কিনা সন্দেহ। জন্মের হার এবং মৃত্যুর হার হাজার-করা হিসাবে ধরা হইয়া থাকে এবং সে সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। বাঙ্গালা দেশে জন্মহার খুব অধিক, কিন্তু মৃত্যুহার দেখিলে মনে হয়—এ কেবল মরিবার জন্যই জন্ম।

জন্মহার

দেশ	১৮৮১	১৮৯০	১৯০১	১৯০৪	১৯০৫
বঙ্গদেশ	৪৭.৯	৫১.৮	৪৩.৯	৪২.৩৯	৩৯.৫ [illegible]
ইংলণ্ড	৩৪.৭	৩৫.২			

মৃত্যুহার—

দেশ	১৮৮৫	১৮৯১	১৮৯৩	১৯০৩	১৯০৪	১৯০৫
ইংলণ্ড		১৯.৮	১৭	১৫.৪	১৫.৩	১৫.২
বঙ্গদেশ	২২.৭৮	২৬.৯৪	৩১.৩২	৩৩.৩৩	৩২.৪৫	৩৮.৩
ব.ম্ব	২১.২৬	৩২.৩০	৪১.৩৯	৩১.৮৪		
মাদ্রাজ	২৬.২	২২.৩	২২০৫	২১০৪		

বাঙ্গালা দেশে মৃত্যুর বন্যা যে রূপ প্রবলভাবে বহিয়া চলিয়াছে, এমন আর কোথায়? মৃত্যু সকল দেশেই আছে, সকল মানবেরই আছে, জন্মিলে মরিতে হইবে, কিন্তু আমাদের একি মরণ? স্বাভাবিক বার্দ্ধক্য অনেক সময় মৃত্যুর কারণ; আকস্মিক আধিদৈবিক ঘটনা বহুশঃ মৃত্যুর কারণ, অনেক ব্যাধি—যাহার হস্ত হইতে মানুষ আপনাকে রক্ষা করিতে সক্ষম—সেই সকল নিবার্য্য-ব্যাধিতেও অনেকে মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

এই সকল নিবার্য্য-ব্যাধির প্রতিপত্তি ইংলণ্ডে কিরূপ শুনিবেন!—তাহা দ্বারা হাজার করা ৭ জনের অধিক মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। বঙ্গদেশে হাজার করা প্রায় ৩০ জন ঐরূপ ব্যাধিতে জীবন ত্যাগ করে। আর ঐ ৩০ জনের মধ্যে ২০।২১ জনের একমাত্র জ্বর রোগেই জীবনের অবসান হয়। এ কি মরণ! মৃত্যু চাহি না—একথা আমি একবারও বলিবনা, মৃত্যু ত চাহি, কিন্তু পৃথিবীর লোক যেমন করিয়া মরে—তেমনি করিয়া মরিতে চাহি—এ সৃষ্টিছাড়া মরণ চাহি না। এ পৃথিবীর আঁস্তাকুড়ে পচিয়া পচিয়া মরিতে চাহি না। বাঙ্গালা দেশে এখন কিরূপ মৃত্যু বিচরণ করিতেছে, তাহার প্রকৃষ্ট জ্ঞানের জন্য জন্ম-মৃত্যুর তালিকা পরীক্ষা করা আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু পরিপূর্ণ পূর্ণিমার সৌন্দর্য্য বুঝিবার জন্য যেমন রুদ্ধ গৃহে বসিয়া চাঁদের ছবি না দেখিয়া মুক্ত আকাশতলে দাঁড়াইয়া জ্যোৎস্না-সাগরে ডুবিয়া যাইতে হয়, তেমনি বঙ্গদেশের এখন কি অবস্থা, তাহা হৃদয়ে অনুভব করিতে হইলে, সেন্সস-বিবরণী ফেলিয়া রাখিয়া বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে যাইতে হয়। সেখানে গেলে আর বিচার-বিতর্ক মনে আসিবে না,—বাঙ্গালার যে কি অবস্থা হইয়াছে—তাহা আর বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। কোথায় গেল পল্লীবাসীর সে সৌন্দর্য্য, সে উচ্চহাস্য, সে ক্রীড়া-কলরোল, সে আত্মীয়-স্বজন-ভরা-প্রফুল্ল সংসার! কোথায় গেল সে সন্মুখ সংগ্রাম—সে জীবন্ত জীবন!—কোথায় গেল সে আনন্দ উৎসব,—কোথায় গেল সে পূজা-পার্ব্বণ? বাঙ্গালার পল্লীগ্রাম—যাহা একদিন উৎসবের আনন্দ ভবন ছিল, যেখানে একদিন বালকের কলরোলে, যুবকের সঙ্গীতে, বৃদ্ধের ক্রীড়ায় আনন্দের অসীম প্রস্রবন উন্মুক্ত ছিল,—যেখানে একদিন কুলবধূগন সুস্থ-সুন্দর দেহে সবল শিশু ক্রোড়ে লইয়া "আয় চাঁদ আয়" বলিয়া মধুর কণ্ঠে আকাশের দেবতাকে মুগ্ধ করিত—নারীগণের ব্রতে—দেবার্চ্চনায়, গুরুসেবায় দেব ভাব জাগরিত হইত—যুবক ও প্রৌঢ়জনের কীর্ত্তনে, তর্জ্জায়, যাত্রায়, পাঁচালীতে অনন্ত স্ফূর্ত্তি মুখরিত হইয়া উঠিত—সেই পল্লীগ্রাম আজ নিরানন্দের ছায়ায় অন্ধকার,—সেখানে আজ লোকসংখ্যা বিরল,—যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহারা কঙ্কালসার, ম্রিয়মান, আনন্দের,—স্ফূর্ত্তির চিহ্ন মাত্র নাই—সে স্থান শ্মশানের পূর্ব্বাভাষ মাত্র।

কোনও কোনও গ্রামে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেক গৃহ জনশূন্য, কোথাও বা একটি বৃহৎ অট্টালিকা, একদিন সে বাটীতে দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি বারমাসে

তের পার্ব্বণ হইত এখন সে অট্টালিকা ভগ্নপ্রায়,—তাহারাই একটী ঘরে দুইটী বিধবা,—কেবল বিধবা বলিয়াই প্রাণে বাঁচিয়া আছেন।

অনেক বাটীতে ঘরে ঘরেই জ্বর, শুশ্রূষা করিবার লোক পাওয়া যায় না। কাহারও জ্বর আসিয়াছে—কাহারও আসিতেছে—কাহারও বা কিছুক্ষণ পরে আসিবে। কেহ মুমূর্ষু, কেহ বা উত্থানশক্তি রহিত। পাঁচ-জনে দেখা হইলে রোগের কথা, শোকের কথা, দুঃখের কথা। এই ত এখন বাঙ্গালার প্রাণের কথা,—আমি একথা চাহি না। একদিন জন্ম—একদিন মৃত্যু; মাঝের দিন কয়টা প্লীহা-যকৃতের বেদনা—জ্বর। এই ত এখন বাঙ্গালার জীবন! এ জীবন-কি জীবন—না একটা দুর্ব্বহ ভার! এ জীবনে কি আনন্দ আছে, উৎসাহ আছে, না আশার আলো আছে? আমি এ জীবন চাহি না। ১৯১৬ সালের যে সরকারী স্বাস্থ্য বিবরণ (Report on sanitation in Bengal for the year 1916) প্রকাশিত হইয়াছে, তদবলম্বনে "ভারতবর্ষ" পত্রিকার গত মাঘ মাসের সংখ্যায় বঙ্গদেশে ১৯১৬ সালের একটী মৃত্যু সংখ্যার তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, ১৯১৬ সালে সারা বঙ্গদেশ হইতে সর্ব্বশুদ্ধ ১২,৪১,০২১ জন যমপুরে প্রেরিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একমাত্র জ্বর রোগেই ৯,০৯৮৮০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে বর্দ্ধমান বিভাগ হইতে ১৭৪৬৮০, প্রেসিডেন্সি বিভাগ হইতে ১,৮১,৫৮৩; রাজ-সাহী বিভাগ হইতে ২,৮২১৮৭; ঢাকা বিভাগ হইতে ১৮৫৩৭৬ এবং চট্টগ্রাম বিভাগ হইতে ৮৬০৫৪ একুনে ৯০৯৮৮০ জন একমাত্র জ্বর রোগেই যমালয়ে গমন করিয়াছে। কি ভীষণ অবস্থা!

ম্যালেরিয়া যে বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে এবং এই ম্যালেরিয়াকে বঙ্গ-দেশ হইতে বিদূরিত করিতে না পারিলে যে দেশের মঙ্গল নাই—সে বিষয়ে দুইমত হইবার কারণ দেখা যায় না।

এই "আয়ুর্ব্বেদের" এক সংখ্যায় পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে—"কি কুক্ষণে জানিনা ম্যালেরিয়া-বিষ বাঙ্গলার পল্লীগুলিতে প্রবেশ করিয়াছিল। এই বিষের জ্বালায় বাঙ্গালার কত পল্লীরই যে সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে, তাহা ভাবিলেও বুক ফাটিয়া যায়। সর্ব্বাগ্রে আমাদের চিরত্যক্ত পল্লীগুলিকে ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে হইবে। পল্লীমাতাকে রক্ষা করিতে পারিলে তবে আমরা নিজেরা রক্ষা পাইব।" কিন্তু ম্যালেরিয়া বিদূরিত করিবার কথা চিন্তা করিতে গেলে প্রথমেই একটা আতঙ্ক উপস্থিত হয়,—"একি সম্ভব? এত বড় ভীষণ রাক্ষস—যে সমস্ত দেশকে গ্রাস করিয়া বসিয়াছে—তাহাকে বিতাড়িত করিবার শক্তি-সামর্থ্য কোথায়? আমরা অর্থহীন—শক্তি-হীন—আমরা দেশ হইতে ম্যালেরিয়া তাড়াইয়া দিব—ইহা অসম্ভব।" কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীভগবানের রাজ্যে কিছুই অসম্ভব নহে। তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া দেশবাসীগণ ম্যালে-রিয়াকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলে তাঁহারা যে কৃতকার্য্য হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বসু-বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার দিবসে প্রতি-ষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত সার জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয় এই কথাই দেশ জননীকে নিবেদন করিয়াছেন—"কি সেই মহাসত্য—যাহার জন্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল? তাহা এই যে, মানুষ যখন তাহার জীবন ও সমস্ত আরাধনা কোন

উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, সেই উদ্দেশ্য কখনও বিফল হয় না, যাহা অসম্ভব ছিল, তাহা সম্ভব হইয়া থাকে।" আমাদের দেশে সকলের মনে এই ভাবটা জাগরিত করিতে হইবে, তাহা হইলে সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার বিদূরিত হয়, তেমনই এদেশ হইতে ম্যালেরিয়া দূরীভূত হইবে।

ম্যালেরিয়াকে তাড়িত করিতে হইলে আমাদের কয়েকটী বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করা আবশ্যক :—

১ম—ম্যালেরিয়া উৎপত্তির কারণ কি?

২য়—ম্যালেরিয়া নিবার্য্য ও প্রতিকার যোগ্য কি না এবং কোনও দেশ হইতে দূরীভূত করা গিয়াছে কি না?

৩য়—ম্যালেরিয়া নিবারণের কি সহজ উপায় আমাদের দেশে অবলম্বিত হইতে পারে?

এই সকল বিষয়ের আলোচনা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারাই হওয়া সম্ভব ও বাঞ্ছনীয়। তবে এবিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার জন্য আমি কিঞ্চিৎ আভাস দিবার চেষ্টা করিব।

প্রথম কথা ম্যালেরিয়া উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে। যে দেশ নিম্ন, জলাময়—যেখানে পয়ঃপ্রণালীর সুব্যবস্থা নাই, যেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ের আধিক্য—যেস্থান জঙ্গলাকীর্ণ—সেই সকল স্থলেই ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। আমাদের দেশে পূর্ব্বে ম্যালেরিয়া ছিল না, এখন সমস্ত দেশ ম্যালেরিয়ায় আচ্ছন্ন হইয়াছে ইহার কারণ কি?

এত আমাদের সেই পুরাতন দেশ? কোথা হইতে ম্যালেরিয়া আসিল?

(১) অনেক মনীষী এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন—"পীড়া যত কারণেই হউক, তাহার মধ্যে নবাগত মানব সংসর্গ একটী প্রধান কারণ। যখন কোন দেশে অন্যত্র হইতে নূতন মানবের সমাগম হয় তখন কি এক অদ্ভুত কারণে নূতন নূতন পীড়াও আসিয়া উপস্থিত হয়। নূতন জাতির সংস্পর্শে পুরাতন জাতির জাতীয় আচার-ব্যবহার-রীতি-নীতির যে পরিবর্ত্তন হয়, তাহা আপাত দৃষ্টিতে কুফল প্রসূ বলিয়া অনুমিত না হইতে পারে, কিন্তু তাহার ফলও যে মারাত্মক তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আহার-পরিচ্ছদ, উৎ-উৎসব, আনন্দ, ক্রীড়া—সকল বিষয়েই জাতীয়তা বিসর্জ্জন করিয়া নূতন পন্থা অবলম্বনে সেই জাতি যে ধ্বংসোন্মুখ হয়, তাহার নিদর্শন পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সঙ্গে আমরাও হইয়াছি।

(২) এদেশে রেলওয়ে-বিস্তারের সহিত ম্যালেরিয়ার আবির্ভাব বিশেষ সংশ্লিষ্ট আছে। রেলপথের দুইধারে যে নালা থাকে, তাহাতে জল জমিয়া থাকে এবং রেলপথের দ্বারা গ্রামের জল নিঃসরণের পথ অনেক স্থলে বন্ধ হইয়া যায়। রাজা দিগম্বর মিত্র এইমত সর্ব্বপ্রথমে সাধারণের গোচরে আনয়ন করেন।

দেশের উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান দারিদ্র্য যে দেশবাসীকে দুর্ব্বল করিয়া আনে, তাহার ফলে নূতন রোগের আবির্ভাব সুগম হয়।

আমাদের বিলাস-বাসনা প্রবল, অথচ আমাদের ক্ষেত্রে ধান্য জন্মেনা, যে উপায় অবলম্বনে ধান্য জন্মিতে পারে, তাহা আমাদের সাধ্যাতীত, আমাদের শিল্প নাই, বাণিজ্য নাই। আমাদের খাইবার সংস্থান নাই পরিবার সঙ্গতি নাই এরূপ ক্ষেত্রে রোগের বীজ যেমন ফলে এমন আর কিছুই নহে।

উপরে যে তিনটী কারণের কথা উল্লেখ করিলাম, উহারা সম্পূর্ণ পৃথক নহে, পরস্পর

সংশ্লিষ্ট। ঐ সকল কারণ এবং আরও কতকগুলি কারণ পরোক্ষভাবে ম্যালেরিয়া উৎপাদনের সহায়তা করে। ম্যালেরিয়ার প্রত্যক্ষ কারণ সম্বন্ধে এক্ষণে বিজ্ঞান স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ম্যালেরিয়া শব্দটী ইটালীয়, উহার ধাতুগত অর্থ মন্দ বাতাস (mala—মন্দ aria—বাতাস) ইংরাজী বৈদ্যক সাহিত্যে ১৮২৭ সালে এই কথাটী প্রবেশলাভ করে। ম্যালেরিয়া জ্বরের লক্ষণাবলী এত সুস্পষ্ট যে, ম্যালেরিয়া-নির্ণয় আদৌ দুঃসাধ্য নহে এবং যে দেশে এই ম্যালেরিয়া রোগ প্রবেশ লাভ করিয়াছে, সেই দেশবাসীর দেহের ও মনের যে ইহা সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে তাহাও সর্ব্ববাদী সম্মত। কিন্তু ইহার নিদান সম্বন্ধে পূর্ব্বে কেহই কোনও সিদ্ধান্ত স্থির করিতে পারেন নাই। সাধারণতঃ ইহা একপ্রকারের বিষ বলিয়া অনুমিত হইত, কোনও প্রকারে উক্ত বিষ শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জ্বর আনয়ন করিত। বৈজ্ঞানিকেরা উক্ত বিষের অনুসন্ধান অনেকস্থলে করিয়াছেন, আর্দ্রভূমিতে, জলায় উদ্ভিদরাজ্যে,—কিন্তু তাহাতে সফলতা লাভ করেন নাই।

অনেকে অনুমান করিতেন যে, দিবসের অতিরিক্ত উত্তাপের পর সহসা নৈশ আর্দ্র শীতবায়ু দেহে সংলগ্ন হইয়া ম্যালেরিয়া উৎপাদন করিত। ম্যালেরিয়ার-কারণ অনুসন্ধিৎসুগণ অবশেষে দেখিতে পাইলেন, যে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর রক্তমধ্যে একপ্রকার জীবাণু পরিলক্ষিত হয়—অপর কোন রোগীর রক্তে উক্ত জীবাণুর অস্তিত্ব নাই এবং যাহারই রক্তমধ্যে উক্ত জীবাণু পুষ্ট হইতেছে দেখিতে পওেয়া গিয়াছে, তাহারই ম্যালেরিয়া জ্বর হইয়াছে। উক্ত জীবাণু যে ম্যালেরিয়ার নিদান তাহা বুঝিতে বাকী থাকিল না, কিন্তু কোথা হইতে ঐ জীবাণু আইসে, উহা কি জাতীয় এবং কিরূপে উহা দেহ হইতে দেহান্তরে পরিচালিত হয়, তাহার অনুসন্ধান চলিতে লাগিল।

অনুসন্ধানে যিনি সফলকাম হইলেন তিনি নিজের আত্ম প্রসাদের সহিত পৃথিবীর ধন্যবাদ ও তৎসহ নোবেল পারিতোষিক প্রাপ্ত হইলেন। সে অধিক দিনের কথা নহে, ১৮৯৯ সালে মাদ্রাজের জনৈক I, M, S, কাপ্তেন Ranold Ross তাঁহার আবিষ্কার সভ্যজগতের সমক্ষে উপস্থিত করেন। তখন হইতে ম্যালেরিয়ার নিদান সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক দিগের মধ্যে আর মতদ্বৈধ বা সন্দেহ নাই। এক্ষণে ইহা অবিসম্বাদিত রূপে স্থির হইয়াছে যে, ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর রক্তে যে বিশেষ জীবাণু দেখিতে পাওয়া যায়, উক্ত জীবাণুর দেহের মধ্যে প্রবেশই ম্যালেরিয়ার একমাত্র কারণ—কোনও রূপে কোনও দেহে উক্ত জীবাণু-প্রবেশ নিবারণ করিতে পারিলে সেই দেহে ম্যালেরিয়া জ্বর কিছুতেই আসিবে না। সুতরাং উক্ত জীবাণু দেহের মধ্যে কি প্রকারে সংক্রামিত হয়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞাতব্য বিষয়। নিঃশ্বাসে বায়ুর সহিত, পানে জলের সহিত খাদ্যের সহিত বা অপর কোন প্রকারে উহা সংক্রামিত হইতে পারে কিনা—তাহা পরীক্ষা করা হইয়াছে। পরীক্ষার চরম সিদ্ধান্ত Ranold Ross-এর কীর্ত্তি এই যে, একজাতীয় মশক আছে—কেবল তাহারাই উক্ত জীবাণু একদেহ হইতে দেহান্তরে লইয়া যাইতে পারে এবং লইয়া গিয়া থাকে। ঐ মশকের নাম anopheles উক্ত মশক রক্ত শোষণ কালে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর রক্তসহ উক্ত জীবাণু

শোষণ করিয়া লয়—উক্ত জীবাণু উক্ত মশক দেহে বিনষ্ট না হইয়া পুষ্টি ও বল লাভ করে। পরে জীবাণুবাহী এনোফিলিস মশক নীরোগ ব্যক্তির গাত্রে দংশন কালে উক্ত জীবাণু তাহার দেহে প্রবিষ্ট করাইয়া দেয়। উক্ত জীবাণু মনুষ্য রক্ত মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া শীঘ্র শীঘ্র বংশ বৃদ্ধি করিতে থাকে এবং তাহার ফলে সাধারণতঃ ১০।১১ দিবস পরে উক্ত ব্যক্তির শীত, কম্প পিপাসা হইয়া জ্বর আইসে। ইহা হইতে পরিলক্ষিত হইবে যে, এনোফিলিস মশক ম্যালেরিয়াগ্রস্ত লোকের রক্ত হইতে ম্যালেরিয়া বীজাণু গ্রহণ পূর্ব্বক নীরোগদেহে দংশন কালে উক্ত জীবাণু প্রবিষ্ট করাইয়া ম্যালেরিয়া রোগের প্রসার করিয়া থাকে—ইহাই ম্যালেরিয়ার প্রত্যক্ষ কারণ। দ্বিতীয় কথা—ম্যালেরিয়া নিবার্য্য ও প্রতিকার যোগ্য কিনা? মানব শরীরের গঠন প্রণালীর মধ্যে এমন কিছুই নাই যে, তাহার ম্যালেরিয়া হইবেই হইবে। পৃথিবীর অনেক স্থানেই ম্যালেরিয়া আদৌ নাই, সুতরাং ম্যালেরিয়া নিবার্য্য ও প্রতিকার যোগ্য—তদ্বিষয়ে দ্বিধা করিবার কোনও কারণ নাই। পৃথিবীর যে সকল স্থানে ম্যালেরিয়া সংক্রামক রূপে লোকক্ষয় করিয়া থাকে, তাহার মধ্যে যে যে স্থানে তাহা নিবারণ করিবার উপায় বিধিমত অবলম্বিত হইয়াছে সেই সেই স্থানে ম্যালেরিয়া প্রশমিত হইয়াছে।

ম্যালেরিয়া যে নরশক্তির নিকট পরাজয় স্বীকার করে, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে—তাহার কয়েকটী এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

(১) হাভানায় ম্যালেরিয়া জ্বরে মৃত্যু সংখ্যা-

বৎসর	সংখ্যা
১৮৮০	৩২৫
১৮৮৮	১০১
১৮৯০	১৭০
১৮৯৫	২০৬
১৯০০	৩৪৪

তৎপরে ১৯০১ সাল হইতে ম্যালেরিয়া বিদূরিত করিবার ব্যবস্থা হইয়া থাকে—

সাল	১৯০১	১৯০২	১৯০৩	১৯০৪	১৯০৫	১৯০৬
সংখ্যা	১৫১	১৭৭	৫১	৪৪	৩২	২৬

(২) সুইডেনহাম বন্দরে

১৯০১ সালে জ্বর বিদূরিত করিবার চেষ্টার সূত্রপাত হয়।

বৎসর	১৯০১	১৯০২	১৯০৩	১৯০৪	১৯০৫
মৃত্যু সংখ্যা	৬১০	১৯৯	৬৯	৩২	২৩

(৩) হং কং

বৎসর	১৮৯৭	১৮৯৮	১৮৯৯	১৯০০
মৃত্যু সংখ্যা	১৯৭	১২৬	৬৩	১৬৩

তৎপরে ১৯০১ সালে ম্যালেরিয়া দমনের চেষ্টার ফলে—

বৎসর	১৯০১	১৯০২	১৯০৩	১৯০৪	১৯০৫
মৃত্যু সংখ্যা	১৩২	১২৮	৬৩	৫৮	৫৪

(৪) ইসম্যালিয়াতে ১৯০২ সালে ম্যালেরিয়া দমনের চেষ্টা হয়। ১৯০২ সালের পূর্ব্বের ও পরের মৃত্যুসংখ্যা বিশেষ বিবেচনার বিষয়—

বৎসর	মৃত্যুসংখ্যা
১৮৭৭	৩০০
১৮৮২	৪৮০
১৮৮৭	১৮০০
১৮৯২	২০৫০
১৮৯৭	২০৮৯
১৮৯৯	১৭৮৪
১৯০০	২২৮৪

১৯০১	১৯৯০
১৯০২	১৫৫১
১৯০৩	২১৪
১৯০৪	৯০
১৯০৫	৩৭

ইহা দেখিলে কে না বলিবে যে, ম্যালেরিয়াকে দূর করা মানবের শক্তির অধীন। ইহা দেখিলে নিজের দেশে ম্যালেরিয়ার এরূপ অক্ষুণ্ণ ও অপ্রতিহত প্রভাব দেখিয়া কে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? পানামা খাল খনন কালে সহস্র সহস্র কুলিরা কার্য্য করিয়াছিল। প্রথম বার পীত জ্বরে ও ম্যালেরিয়ায় বহু সহস্র কুলি প্রাণত্যাগ করে কিন্তু দ্বিতীয় বারে বিশেষ সতর্কতার সহিত কার্য্য করায় ঐদুইটী রোগের প্রভাব লক্ষিত হয় নাই। সেই জন্য দ্বিতীয় বারে যাঁহার চেষ্টায় সুফল ফলিয়াছিল—তিনি বলিয়াছিলেন "আমি বিবেচনা করি যে, স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ এক্ষণে সহজেই দেখাইতে পারেন যে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যে কোনও স্থানের অধিবাসীগণকে পীতজ্বর ও ম্যালেরিয়া হইতে রক্ষা করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত এবং তাহার জন্য যে সকল ব্যবস্থার প্রয়োজন তাহাও সহজ এবং অল্পব্যয়সাধ্য।" তিনি আরও বলিয়াছিলেন—"গ্রীষ্ম প্রধান দেশের যে সকল স্থান এক্ষণে ম্যালেরিয়ার কবলগ্রস্ত, সেই সকল স্থান মানব ইতিহাসের প্রভাত কালে ধনে-জনে-জ্ঞানে যেমন পরিপূর্ণ ছিল, আবার তেমনি হইবে।" এই আশার বানী এদেশে কি পরিপূর্ণ হইবে না?

তৃতীয় কথা ম্যালেরিয়া নিবারণ সম্বন্ধে।—ম্যালেরিয়ার যে সকল পরোক্ষ কারণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে বা অন্য যে সকল পরোক্ষ কারণ আছে, তৎ সম্বন্ধে কোন আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ম্যালেরিয়ার যাহা প্রত্যক্ষ কারণ তাহা কিরূপে দূর করা যায়—তাহাই আমাদের এক্ষণে প্রধান ও প্রথম আলোচ্য বিষয় হইতেছে। এনোফিলিস বা ম্যালেরিয়া মশক ম্যালেরিয়ার প্রত্যক্ষ কারণ বলিয়া উক্ত মশকের নির্ব্বাচন ও উহার আকৃতি-প্রকৃতি, উদ্ভব-স্থিতি লয় ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের অত্যাবশ্যকীয়। তৎপরে উক্ত মশক যাহাতে আমাদিগকে দংশন করিতে না পারে—তাহার উপায় স্থির করা এবং অবলম্বন করা প্রয়োজন।

এনোফিলিস বা ম্যালেরিয়া মশকের আকৃতি—সাধারণ মশকের আকৃতি হইতে কিছু ভিন্ন আছে।

উক্ত মশক সাধারণতঃ দূষিত জলে ডিম্ব ত্যাগ করে—যেখানে ডোবার চতুষ্পার্শ্বে নলখাগড়া বা অন্য উদ্ভিজের বাহুল্য আছে সেই স্থানই ডিম্ব ত্যাগের প্রকৃষ্ট স্থল। ডিম্ব হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট উৎপন্ন হয়, উক্ত কীট কিছুদিন পরে রূপান্তরিত হইয়া গুটী হয় ও পরে গুটী হইতে মশক দেহ ধারণ করিয়া জল পরিত্যাগ করিয়া বায়ুতে বিচরণ করিতে আরম্ভ করে। জলে অবস্থান কালে ইহারা মৎস্যের খাদ্য।

ম্যালেরিয়া-মশকের জন্ম ও পুষ্টি—দূষিত জলাশয়ে, সেইজন্য সকল দেশেই দূষিত জলাশয়ের সংস্কার ও পয়ঃপ্রণালীর সুব্যবস্থাই ম্যালেরিয়া-নিবারণের প্রথম উপায় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এক্ষণে আমাদের দেশে কি প্রকারে দূষিত জলাশয়ের সংস্কার ও পয়ঃপ্রণালীর সুব্যবস্থা হইতে পারে, তাহাই প্রধান বিবেচনার বিষয়।

বাঙ্গালা দেশে অনেক নদী পুরাতন প্রবাহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন পথে চলিতেছে, অনেক

নদী শুকাইয়া গিয়াছে—এই সকল নদীর সংস্কার করিয়া গ্রাম সমূহের জলপ্রণালী উক্ত নদীর সহিত সংযোগ করিয়া দিবার কল্পনা অনেকের মনে আসিয়া থাকে। কিন্তু একেবারে সমগ্র বঙ্গদেশের উন্নতিসাধন করিবার চেষ্টা যে কিরূপ ব্যয় ও শক্তি-সামর্থ্য সাপেক্ষ ও সেরূপ বিপদ সঙ্কুল, তাহাতে সে কল্পনা করিতে সাহস হয় না। আমি এমন উপায় চিন্তা করিতে বলি—যাহা আমাদের সাধারণের সাধ্যায়ত্ত অথচ যাহার ফলও সুনিশ্চিত।

আমি একএকটী বিশেষ গ্রাম অথবা পরস্পর সংলগ্ন দুই তিনটী গ্রামের এক একটী গ্রাম মণ্ডলী সম্বন্ধে পৃথক ভাবে ম্যালেরিয়া দমনের চেষ্টা করিবার কথা বলি। এইরূপ পৃথক চেষ্টায় প্রথম ও প্রধান ফল এই যে, যে গ্রামের উন্নতির চেষ্টা হইবে—সেই গ্রামের আপামর সাধারণ সকল ব্যক্তির উৎসাহ, উদ্যম ও চেষ্টার অবধি থাকিবে না। নিজের সংসার রক্ষা, বংশ রক্ষা, প্রাণরক্ষায় কে উদাসীন থাকিতে পারে? গ্রামের মধ্যে এই উন্নতির আবশ্যকীয়তা পরিস্ফুট হইয়া উঠিলে উক্ত উন্নতির জন্য কার্য্য করা সহজ হইবে।

কোনও একটী গ্রামের অধিবাসীগণ তাঁহাদের গ্রামে ম্যালেরিয়া দমনে অভিলাষী হইলে কি প্রণালী অবলম্বন করিবেন? সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাদের মনের একাগ্রতা আবশ্যক এবং তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে দলাদলি, বিরোধ, স্বার্থপরতা—এ সকল ভুলিয়া যাইতে হইবে। গ্রামের মধ্যে বুদ্ধিমান, বলিষ্ঠ ও ক্লেশসহিষ্ণু অল্পসংখ্যক কয়েক জন ব্যক্তির উপর সাধারণতঃ সকল বিষয়ের ভার অর্পণ করিতে হইবে। তাঁহারা গ্রামে যে সকল পুষ্করিণী ডোবা, জলপ্রণালী আছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। যে সকল পুষ্করিণী বৃহৎ—যাহাতে মৎস্য আছে—সেই সকল পুষ্করিণীতে ম্যালেরিয়া মশকের ডিম্ব মৎস্যের কলেবর বৃদ্ধি করে মাত্র, সুতরাং সেই সকল পুষ্করিণী দ্বারা বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু যে সকল জলাশয় ক্ষুদ্র, জঙ্গলাকীর্ণ, সেই সকল পুষ্করিণীর সংস্কার করা আবশ্যক, কিন্তু পল্লীগ্রামে পুষ্করিণী-সংস্কার এক দুঃসাধ্য বিষয় হইতেছে। অনেক পুষ্করিণীর অধিকারী এক্ষণে নিঃস্ব হইয়াছেন—তাঁহাদের সংস্কার করিবার সামর্থ্য নাই। এরূপ স্থলে গ্রামের অন্য অধিবাসীগণ অপরের পুষ্করিণী সংস্কারে অর্থব্যয় করিতে কখনই স্বীকার করেন না এবং এমন কি—পুষ্করিণীর মালিকও অপরের সাহায্য লইতে প্রস্তুত হয়েন না। অনেকস্থলে একটী পুষ্করিণীর অনেকগুলি 'সরিক' থাকায় কেহই তাহার উন্নতি কল্পে কোনও চেষ্টা করেন না। কিন্তু এখন আর সে গোলযোগ করিবার দিন নাই—যে পুষ্করিণীর সংস্কার গ্রামের স্বাস্থ্যের জন্য আবশ্যক, তাহা সকলে মিলিয়া করিতে হইবে—তাহাতে সরিকের তর্ক, স্বত্বের তর্ক, হিন্দু মুসলমানদের তর্ক করিবার আর অবসর নাই। পুষ্করিণী অসংস্কৃত থাকিলে তাহার বিষময় ফল গ্রামের সকলকেই সমানভাবে ভোগ করিতেই হইবে—সুতরাং পুষ্করিণী-সংস্কারের ভারও সকলকেই লইতে হইবে। বৃহৎ পুষ্করিণী ব্যতীত গ্রামে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় আছে, তন্মধ্যে কতকগুলির সহিত গ্রামের পয়ঃপ্রণালীর কোনও সংযোগ নাই, তাহারা বদ্ধ জল মাত্র,—তাহাদিগকে বুজাইয়া ফেলিতে হইবে। আবার কতকগুলি জলাশয়—যাহা আপাততঃ দৃষ্টিতে বদ্ধজল বলিয়া প্রতীয়মান

হয়—প্রকৃতপক্ষে পয়ঃনালীর অংশমাত্র পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে, সেইগুলি পরস্পর সংলগ্ন করিয়া সমতলে এক বা বহু পয়ঃপ্রণালী গঠিত করিতে হইবে—যাহা দ্বারা গ্রামের কলুষ জলরাশি কোন স্থানে আবদ্ধ না থাকিয়া দূরে নদীগর্ভে বা অন্যত্র নিঃসারিত হইতে পারে।

এই প্রকারে কোন গ্রামের উন্নতি করিতে গেলে গ্রামবাসীগণকে প্রথমেই একটী অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে,—কোন্ পুষ্করিণীর সংস্কার আবশ্যক, কোন্ জলাশয় পূর্ণ করা প্রয়োজন, কোন্ স্থান দিয়া কি ভাবে পয়ঃপ্রণালী গঠন করিতে হইবে, কোথায় ম্যালেরিয়া-মশকের নিবাস—এই সকল বিষয়ে সাধারণ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া গ্রামবাসীগণের কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সাহস না হওয়া সঙ্গত ও স্বাভাবিক। গ্রামবাসীগণের দ্বিতীয় অসুবিধা—যাহা না হইলে কোন কাজই হয় না সেই অর্থের জন্য। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমরা যদি একবার বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়া দাঁড়াই, তবে ঐ দুইটি অসুবিধার কোনটাই আমাদের পথে অন্তরায় হইবে না।

যেমন পল্লীসংস্কারের ভার একদিকে পল্লীবাসীর উপর ন্যস্ত থাকিবে, তেমনি অপরদিকে যাঁহারা কৃতবিদ্য, জ্ঞানবৃদ্ধ বিশেষজ্ঞ, তাঁহারা পল্লী হইতে হইতে পলাইয়া সহরে আসিয়া অর্থ সঞ্চয় করিলেই তাঁহাদের সকল কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইবে না। সহর হইতে তাঁহাদের পল্লীর দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। পল্লীবাসীর উদ্যম ও চেষ্টার সহিত তাঁহাদের সহানুভূতি ও জ্ঞানের সম্মিলন করিতে হইবে। এই সম্মিলনেই আমাদের সকল আশা ও ভরসা নিহিত আছে।

সহরের মধ্যে কলিকাতা প্রধান—জ্ঞানে ও অর্থে কলিকাতা দেশের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। এই কলিকাতা হইতে বঙ্গদেশের অর্দ্ধেক বিচ্ছিন্ন হইতেছিল বলিয়া সমস্ত বঙ্গদেশ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল—, সমগ্র বঙ্গদেশের প্রতিও কলিকাতার অনেক কর্ত্তব্য আছে। সৌভাগ্যক্রমে এই কলিকাতা সহরে কয়েকটী দেশবৎসল-কৃতবিদ্য চিকিৎসক Anti Malarial League (ম্যালেরিয়া দমন সমিতি) নামে একটী সমিতি গঠিত করিয়াছেন এবং তাঁহারা দেশ মধ্যে যে কোনস্থানে গিয়া পল্লীবাসীদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। এই সমিতিকে লোকবল, অর্থবল দিয়া স্থায়ী করিতে হইবে,—জেলায় জেলায়—এমন কি প্রতি মহকুমায় যাহাতে উহার শাখা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা করিতে হইবে।

কলিকাতায় উক্ত 'ম্যালেরিয়া দমন সমিতির' নির্দ্দিষ্ট পন্থা আশ্রয় করিয়া কলিকাতার অদূরবর্ত্তী পানিহাটী মিউনিসিপ্যালিটিতে ম্যালেরিয়া নিবারণ সম্বন্ধে যে সকল কার্য্য হইয়াছে ও তাহা যেরূপ ফলদায়ক হইয়াছে তাহা নিতান্তই আশাপ্রদ। সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুরের নিকট আমি এই প্রবন্ধের প্রত্যেক তথ্যের জন্য ঋণী। তিনিই দশবর্ষাধিক কাল উক্ত পানিহাটী মিউনিসিপ্যালিটীতে ধীরে ধীরে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। প্রথম প্রথম তাঁহার অভিজ্ঞতা, লোকবল বা অর্থবলের কিছুই ছিল না, তজ্জন্য কোনও কার্য্য করাও অত্যন্ত কঠিন হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাতে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। গ্রামের মধ্যে ম্যালেরিয়া-মশকের আবাসভূমি খুঁজিতে লাগিলেন,—দেখিলেন যে, বৃহৎ জলাশয়গুলিতে ম্যালেরিয়া-মশকের ডিম্ব নাই।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলস্থলীগুলি প্রতি বৎসর মিউনিসিপ্যালিটী হইতে কয়েকজন কুলি পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিত—কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন্‌গুলি পূর্ণ করা প্রয়োজন, কোন্ গুলি পরিষ্কার করা প্রয়োজন—তাহার প্রভেদ বিচার না করায় তাহাদের দ্বারা ক্ষতিই হইত। সেই মহানুভব ব্যক্তি গ্রামের সর্ব্বস্থান দর্শন করিয়া গ্রামের একটী প্ল্যান প্রস্তুত করিয়া কোন্ জলাশয়গুলির কোনও সংস্কারের আবশ্যক নাই এবং কোন্ গুলির কিরূপ সংস্কার প্রয়োজন—তাহা স্থির করিলেন। গ্রামের পয়ঃপ্রণালী গুলি দ্বারা জল নিঃসরণের পথ স্থির করিলেন এবং সেই পথ গুলি যাহাতে ভবিষ্যতে বিলুপ্ত না হইয়া যায় এবং তাহার কোথায় কিরূপ সমতল রাখা আবশ্যক—তাহা স্থায়ী করিবার জন্য সেই পথ গুলিতে প্রায়শঃ ৫০ ফিট অন্তরে একটী করিয়া পাকা গাথনী ইটের চিহ্ন রাখিলেন। পানিহাটী-মিউনিসিপ্যালিটীতে ম্যালেরিয়া দমন সংক্রান্ত এই কার্য্য ধীরে ধীরে বৎসরে বৎসরে অল্প অল্প করিয়া হইয়া আসিতেছে। ইহার ফল কি শুনিবেন? কার্য্য আরম্ভ হইবার ৮ বৎসর পরে যখন ম্যালেরিয়ায় উক্ত গ্রামের সংলগ্ন দুইটী গ্রামে মৃত্যুসংখ্যা ১৫৯ হইয়াছিল, তখন উক্ত গ্রামে ম্যালেরিয়ায় একটী লোকও মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই! উক্ত গ্রামের কার্য্য এখনও সুসম্পন্ন হয় নাই, এখনও কার্য্য চলিতেছে। কার্য্যে কত ব্যয় হইয়াছে জানেন? বৎসর বৎসর মাত্র ৬০।৭০ টাকা করিয়া ব্যয় হইয়া আসিতেছে। এ কথা শুনিলে কাহার না আশা হয়?

বিদেশে যাইবার আবশ্যক নাই—নিজের দেশে—নিজের চক্ষে যখন দেখিতে পাইতেছি যে, সামান্য ব্যয় করিয়া ম্যালেরিয়া-রাক্ষসীকে দমন করা যায়, তখন কি আমাদের নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা উচিত? পানিহাটীতে যাহা হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালা দেশের সকল মিউনিসিপ্যালিটীতে ও সকল গ্রামেই হইতে পারে। ম্যালেরিয়া দমন করিতে হইলে একটা রাজশক্তির প্রয়োগ এবং ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে—এ ধারণা পরিত্যাগ করিতে হইবে। বৎসর বৎসর ৫০।৬০ টাকা খরচ করিলে এবং ধীরভাবে অগ্রসর হইলে যদি ম্যালেরিয়া দমন করা যায়, তবে আমাদের নিরাশ হইবার কারণ কি? প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা দেখিতে পাইতেছি যে, গ্রামের মধ্যে সামান্য ব্যয়ে—অবশ্য এক বৎসরে নহে—কয়েক বৎসর ধরিয়া কার্য্য করিয়া একটি গ্রামের ও প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। যে উপায়ে এই গ্রামের উন্নতিলাভ হইয়াছে, তাহা বহুকষ্ট-সাধ্য অথবা বহু ব্যয়সাধ্য নহে,—ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত সমস্ত গ্রামের অধিবাসীদিগেরই ইহা হৃদয়ঙ্গম হওয়া আবশ্যক যে প্রকৃত প্রস্তাবে ম্যালেরিয়া দমন করা সহজসাধ্য ও অল্পব্যয়সাধ্য। কিন্তু গ্রামের মধ্যে পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও একমত তত সুলভ নহে। কিন্তু ইহা কি চিরকালই দুর্লভ থাকিবে?—কেবল এক প্রাণ হইলে, কেবল চেষ্টা, যত্ন, উদ্যম করিলে দেশের সর্ব্বাপেক্ষা যাহা অমঙ্গল, আমরা তাহাকে দূর করিতে পারি। এ অবস্থায়ও কি আমরা পরস্পরের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিরোধ সৃষ্টি করিয়া, আমাদের যাহা কিছু শক্তি ও যাহা কিছু বুদ্ধি আছে, তাহা ঐ বিরোধ-বহ্নিতে আহুতি অর্পণ করিয়া দেশের কল্যাণকে ভস্মীভূত করিব? না—দেশের কল্যাণের কথা স্মরণ করিয়া—নিজেদের অতি তুচ্ছ, অতি

সামান্য বিরোধের কথা বিস্মৃত হইব? এক্ষণে গ্রামে গ্রামে গ্রামবাসীগণ নিজের চেষ্টায় যাহাতে গ্রাম হইতে ম্যালেরিয়া বিদূরিত করিতে পারেন, তাহার জন্য কৃতসঙ্কল্প হউন, এবং সহজে ও অল্পব্যয়ে সঙ্কল্প সিদ্ধি করিবার জন্য উপায় নির্দ্ধারিত করিয়া লইয়া সেই পথে অগ্রসর হউন।

যাহাতে অল্পব্যয়ে, সহজে, নিজের চেষ্টায় নিজের কল্যাণ হইতে পারে, আমি সেই কথাই বলিতেছি। আমি অপর কাহারও উপর নির্ভর করার কথা বলি নাই। যাঁহারা নিজের সাহায্য করেন—ভগবান, এমন কি গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত তাঁহাদের সাহায্য করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ আমাদের বর্ত্তমান গভর্ণর বাহাদুর বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়া দমনের জন্য বিধিমত চেষ্টা করিবেন তাহাতে আমাদের অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ম্যালেরিয়া দমনের চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া আমরা যদি নিশ্চিন্ত হই, তাহা হইলে আমাদিগকে আত্ম প্রতারিত হইতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট যে সকল কার্য্য করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা কবে আরম্ভ হইবে, বা কবে শেষ হইবে—তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। বিশেষতঃ গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশের অনেক বৃহৎ ও প্রধান নদীর সংস্কার করিতে পারেন। তাহা সর্ব্বাংশে সুসম্পন্ন হইলেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীর পয়ঃ প্রণালী সম্বন্ধে আমি যে ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়াছি, তাহার প্রয়োজনীয়তা কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হইবে না। বৃহৎ নদীর সংস্কার এবং ক্ষুদ্র পল্লীর পয়ঃ-প্রণালীর সুব্যবস্থা পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করে। বরঞ্চ পল্লীর পয়ঃনালীর ব্যবস্থা অধিকতর প্রয়োজনীয় এবং তাহা পল্লীবাসীকেই করিতে হইবে। নিজের কর্ত্তব্যভার নিজের মাথার উপর বহন করিতে হইবে, পরের মুখের দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিলে—চারিদিকে ঘূর্ণমান কালচক্রের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, আশায় প্রাণ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। মনে হয়—সে দিন বহুদূরে নাই—যেদিন বঙ্গবাসী বিলাস-ব্যসনের কুহক বিস্মৃত হইবে, যেদিন সেই পুরাতন পরিত্যক্ত পল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে,—যেদিন বাঙ্গলার পল্লী লক্ষ্মী পরিপূর্ণ পূর্ণিমায় অগাধ অনন্ত জ্যোৎস্না সমুদ্রের মধ্যে বসিয়া পল্লীবাসীর পূজা গ্রহণ করিবেন। সে দিন দূরবর্ত্তী নহে—যে দিন এই অসংখ্য স্রোতস্বতী বিভূষিত, দিগন্ত প্রসারী-হরিত-ক্ষেত্র-বিমণ্ডিত, শ্যামা-দোয়েল-পিকবব মুখরিত, বিবিধ ফুলফল ভরা তরুরাজি সমলঙ্কৃত সোণার বাঙ্গালা সুস্থ-সবল-সন্তান ক্রোড়ে ধরিয়া গৌরব অনুভব করিবে। সে দিন কল্পনার কুআশায় আচ্ছন্ন নহে-যেদিন বাঙ্গালী বিদ্যায়—জ্ঞানে—স্বাস্থ্যে—বলে—নিজের শির উন্নত করিয়া রাখিতে পারিবে। সেদিন আসিবেই আসিবে—যে দিন বাঙ্গালী হৃদয়ের অন্তস্তলে অনুভব করিবে, যে, বাঙ্গলার জলে—বাঙ্গালার মাটীতে বিধাতার করুণ আশীর্ব্বাদ নিহিত আছে। শুধু আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে—একথা ভুলিলে চলিবে না যে, আমরা মানুষ,—আমাদের মানুষের মত বাঁচিতে হইবে, আর আমাদের মানুষের মতই মরিতে হইবে আমরা সমস্ত জীবন ধরিয়া প্রতিদিন মরিতে মরিতে বাঁচিয়া থাকিতে চাহিনা।*

শ্রীরামরতন চট্টোপাধ্যায়।

* "ভারতবর্ষ" পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত "কি চাহিনা" শীর্ষক প্রবন্ধ লেখক কর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত হইয়া প্রকাশিত হইল।

আয়ুর্ব্বেদ।

মাসিক পত্র ও সমালোচক।

সম্পাদকগণ—

কবিরাজ শ্রীবিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ

কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন, এম-এ, এম-বি

কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন।

তৃতীয় বর্ষ।

(সন ১৩২৫ আশ্বিন হইতে ১৩২৬ ভাদ্র পর্য্যন্ত)

বাৎসরিক মূল্য ডাকমাশুলসহ ৩।৵

কলিকাতা।

১২৪।২।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট—সংস্কৃত প্রেসে কবিরাজ শ্রীহরি প্রসন্ন রায়
কবিরত্ন কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২৯ নং ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট—
অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে মুদ্রাকর
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

তৃতীয় বর্ষের প্রবন্ধ সূচী।

(বর্ণমালানুসারে)

বিষয় লেখকের নাম পৃষ্ঠা

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৩য় বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৫—আশ্বিন। | ১ম সংখ্যা।

মঙ্গলাচরণ।

—:*:—

যে গান গাহিয়া 'হিরণ্যগর্ভ' মুগ্ধ করিলা বিশ্ব,
যে গান শিখিতে 'দক্ষ' সানন্দে হইলা 'তাঁ'র শিষ্য।
যে গান আবার 'অশ্বিনীকুমার' করিলা দু'য়ে শিক্ষা,
যে গান আবার তাঁদের স্থানে 'ইন্দ্র' লইলা দীক্ষা।
যে গান শিখিয়া 'আত্রেয়' ঋষি রক্ষা করিলা আর্ত্তে,
যে গান 'অনন্ত'—'চরক' হ'য়ে আনিলা এই মর্ত্তে।
যে গান শুনাতে 'ধন্বন্তরি'র 'দিবোদাস' রূপে জন্ম,
যে গান শিখিয়া 'সুশ্রুত' ঋষি বুঝা'ল তাহারি মর্ম্ম।
যে গান শুনিয়া প্রাচ্য জগত দীক্ষা লইল তা'র,
যে গান সমগ্র বেদেরি ব্যাখ্যা—বেদত্রয়ের সার।
যে গানের মূল—ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ উঠুক ফুটি,
যে গানের তানে স্বাস্থ্যরক্ষার শিক্ষা উঠিছে ছুটি।
যে গানে বিজ্ঞান প্রদানি' আলো দীপ্ত করিল দেশ,
যে গানে মুমূর্ষু প্রাণ পাইয়া ছুটায় হাস্য রেশ।
যে গান শুনিয়া নীরোগ দেহে দীর্ঘজীবন বয়,
যে গান জানায় রোগ নাশিয়ে আয়ুর্ব্বেদের জয়।

সে গান গাহি এ সবে মিলি আবার নূতন বর্ষে,
অমৃতবর্ষণ আবার হ'বে—বিশ্ব মাতিবে হর্ষে।

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন।

'আয়ুর্ব্বেদে'র নববর্ষ।

আজি আবার আমাদের নববর্ষ। আশ্বিনে আনন্দময়ীর আগমনের সাড়া পাইয়া, শ্যামল শস্য সম্ভারের ডালি সাজাইয়া, ধরিত্রী হাসিতেছে। কাননে কাননে রক্তজবা ফুটিয়া,—পুষ্করিণী গুলিতে ইন্দিবর স্তবক প্রস্ফুটিত হইয়া,—বৃক্ষবাটিকায় নবপল্লবে বিল্ব বিটপি সজ্জা-সম্পদে সৌন্দর্য্যশালী হইয়া, মায়ের আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছে।—সুকুমার মতি বালকবৃন্দ নবীন পরিচ্ছদে অঙ্গ সম্পদ বৃদ্ধি করিবার জন্য আশার অপেক্ষায় বসিয়া আছে।—কর্ম্মকুশল-কেরাণীকুল আকুল অন্তরে অবকাশের দিন গণনায় সময়ক্ষেপ করিতেছে।—পল্লীপ্রান্তরে নবোঢ়া পত্নী প্রবাসী পতির আসঙ্গ-কামনায় অবশ-অলস-দেহে, অধীর হইয়া ক্রোড়স্থ শিশুকে স্তন্যদানের কালে তাহার চাঞ্চল্য দর্শনে তাহাকে প্রহারোদ্যতা হইতেছেন। কোনো যুবতী বহুকাল বিরহ সহিয়া, মিলনের দিন নিকট জানিয়া আনন্দে এরূপ বিহ্বলা হইয়াছেন যে, রন্ধন সময়ে ব্যঞ্জনে লবণাধিক্য করিয়া বসিয়াছেন—ফলে সেজন্য তদীয়া শশ্রূদেবী তাঁহাকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিতেছেন। কোনো প্রৌঢ়া রমণী অল্পকাল পূর্ব্বে তাঁহার পুত্রের বিবাহ দিয়া অর্দ্ধেক রাজত্ব সহ এক রাজকন্যা আনিয়া জীর্ণ প্রাসাদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, এক্ষণে তত্ত্বের চিন্তায় জাগ্রত অবস্থাতেই যেন স্বপ্ন জালে মিশিয়া পড়িয়াছেন। কোথাওবা দীন দরিদ্র-ভক্ত-সাধক তাহার প্রাণান্ত পরিশ্রম লব্ধ অর্থে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া, সম্বৎসরে যাহা কিছু উদ্বৃত্ত করিয়াছে, তদ্বারা জগজ্জননী—শিবমনোমোহিনীকে জীর্ণ আটচালায় আনিয়া কৃতকৃতার্থ হইবার জন্য বোধনের অপেক্ষা করিতেছে। এম্নি দিনে আজি আমাদের আবার নববর্ষ। দুইবৎসর পূর্ব্বে—এমনই দিনে—এমনি সময়ে আমরা "আয়ুর্ব্বেদে"র উদ্বোধন আরম্ভ করিয়াছিলাম। ইহার উদ্‌যাপন নাই, চিরদিনই এই ব্রত পালন করিয়া যাইব—জীব কুশলেচ্ছু ত্রিকালজ্ঞ আর্য্য ঋষির প্রগাঢ় জ্ঞান গভীর-গবেষণা সম্ভূত উপদেশরাজি স্মরণ করিয়া, পুনঃ পুনঃ তাহারই পুনরাবৃত্তি পূর্ব্বক, পতিত—অধঃপতিত—স্বাস্থ্যহীন—অল্পায়ু বাঙ্গালী জাতির কল্যাণ কামনায় চিরদিনই ঋষিপন্থা অনুসরণ করিব—ইহাই আমাদিগের ব্রতপালন। সুতরাং এ ব্রত পালন করিতে হইলে ইহার আদি আছে—অন্ত নাই,—আরম্ভ আছে—পরিসমাপ্তি নাই,—উদ্বোধন আছে—উদ্‌যাপন নাই।

একদা যে সময়ে আমাদের দেশ ধর্ম্ম কর্ম্মের আদর্শস্থান বলিয়া গর্ব্বপ্রবণ ছিল,—আহারে-বিহারে, কর্ম্মে-বিশ্রামে, ক্রীড়ায়-পরিহাসে যে সময় দেশের মধ্যে ব্যভিচার-স্রোত বাত্যা বিক্ষুব্ধভাবে প্রবাহিত হয় নাই,—শিক্ষাকাল হইতে সূচনা করিয়া, কর্ম্মকালের সকলটুকু যে জাতি শাস্ত্রোপদেশের প্রত্যেক অক্ষর মানিয়া চলিত, বার্দ্ধক্যে যে জাতির বানপ্রস্থের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইত,—পতি-বিয়োগে যে জাতির পত্নী জ্বলন্ত চিতায় আত্ম-সমর্পণ পূর্ব্বক সতীধর্ম্মের আহুতি প্রদান করিত,—অভক্ষ্য ভক্ষণ—অখাদ্য ভোজন তো পরের কথা—যে স্থানে অখাদ্য-কুখাদ্য রন্ধন হইত—সেস্থান দিয়া গমনের ফলে 'পিরালী' বলিয়া যে জাতির মধ্যে একদা এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি পর্য্যন্ত হইয়াছিল, সে ধর্ম্মপ্রাণ-কর্ম্মকুশল সর্ব্বশক্তিমান জাতির বংশধর হইয়া, অধুনা আমরা দৈনন্দিন যে পাপ-পণ্য অর্জ্জন করিতেছি,—তাহারই ফলে আজি আমাদের আত্মরক্ষা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। বিলাস-পরিতৃপ্তির জন্য—অদম্য আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন্য—অতৃপ্ত পিপাসার আহুতি সম্পাদনের জন্য অধুনা আমরা ধর্ম্মাধর্ম্ম-কুকর্ম্ম সুকর্ম্ম মনে না করিয়া অখাদ্য—কুখাদ্য অমিত—অহিত—সকল দ্রব্যই ভক্ষণ করিতেছি।—পানে-ভোজনে, বাহ্যদৃশ্যে আত্মার পরিতৃপ্তিই এক্ষণে আমাদের সর্ব্বস্ব হইয়াছে,—স্থান নাই—কাল নাই,—ভালমন্দের বিচার বুদ্ধি নাই—যেরূপ ভাবেই হউক আত্মতৃপ্তির পরাকাষ্ঠা পরিপূর্ণ করিতে পারিলেই হইল!—আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা—আমাদের প্রাণস্পর্শী স্পৃহা—তা' যেমন করিয়া হউক মিটাইতে পারিলেই হইল! এই না হইয়াছে আমাদের অবস্থা। ফলে এই অবস্থার জন্য যেরূপ ব্যবস্থা-বিপর্য্যয় সংঘটন সম্ভব—আমাদের ঘটিয়াছে তাহাই। তাহারই ফলে সোণার বাঙ্গালা আজি আধি-ব্যাধির লীলা নিকেতন—জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালা-বশেষ প্রতিকৃতির জ্বলন্ত আদর্শভূমি!—বাঙ্গালা জুড়িয়া শ্মশান ভূমির আর্ত্তনিনাদ!

বাঙ্গালার কিছু নাই, বাঙ্গালার আবহাওয়া একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার সন্তানগণের পরমায়ু আগে আশী নব্বই—একশ' বছর পর্য্যন্ত ছিল,—এখন তাহাদের পরমায়ুর হিসাব উর্দ্ধ সংখ্যা পঞ্চাশৎ। তাহাদের আবার যে সকল সন্তান সন্ততি জন্মগ্রহণ করিতেছে—তাহাদের অনেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার অত্যল্পকাল পরেই মানবলীলা সম্বরণ করিতেছে, অদৃষ্টবশতঃ—পরমায়ুর জোড়ে যাহারা না মরিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে—প্লীহা-যকৃৎ তাহাদের গ্রাস করিয়া বসিতেছে! তাহার পর, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৈশোর-যৌবনের সন্ধি ক্ষণে উপনীত হইবামাত্র ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র হওয়ার ফলে অজীর্ণ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্য রোগাক্রান্ত হইয়া সংসার সুখের বিষম অন্তরায় ঘটাইয়া জীবনযাপন ভীষণ দুর্ব্বহ করিয়া তুলিতেছে। বাঙ্গালী যে আজি এত যক্ষ্মারোগাক্রান্ত—বহুমূত্র বা ডাইবিটিসে আজি বাঙ্গালার যে অসংখ্য লোকক্ষয় হইতেছে, সরকারি বাতুলা-লয় সমূহে বাঙ্গালীর সংখ্যা যে সকল জাতির শীর্ষস্থান অধিকার করিতেছে,—বাঙ্গালীর ইন্দ্রিয় সংযমের অভাবই তাহার একমাত্র কারণ!

দেশের মহিলা কুলের অবস্থা আরও শোচনীয়। পুরুষ অত্যাচারী হউক—কদাচারী হউক—ধর্ম্মাধর্ম্ম ভুলিয়া কুকর্ম্মনিরত হউক,—কিন্তু পুরুষ যখন স্বীয় কুকর্ম্মের ফলে ব্যাধি প্রপীড়িত হইয়া অশান্তি উপলব্ধি করে—

তখনই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইয়া প্রতি বিধানের ব্যবস্থার জন্য প্রয়াসপরায়ণ হয়। রমণীর নিকট কিন্তু সেইটিরই অভাব। অধুনা পুরুষ সম্প্রদায়ের মত রমণীগণও অত্যাচারের হস্ত হইতে অব্যাহত থাকিতে পারেনা,—অবশ্য দেশের পুরুষগণই সে জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। কিন্তু যে কারণেই হউক দেশের মহিলাকুলের অবস্থাও পুরুষদিগের মত দাঁড়াইয়াছে। মহিলা দিগেরও অধিকাংশ নানারূপ রোগে আক্রান্ত, কিন্তু আরোগ্যের জন্য তাহাদের যত্ন নাই,—চেষ্টা নাই, প্রতীকারের ব্যবস্থা নাই। কাজেই দেশের অবস্থা—বাঙ্গালার অবস্থা—আমাদের জননী জন্মভূমি মাতৃভূমির অবস্থা বড়ই বিপদ সঙ্কুল! কলুষ-পঙ্কিলে দেশমাতৃকার সন্তানগণ প্রায় জানুদেশ পর্য্যন্ত মজ্জমান হইয়া পড়িয়াছে,—এ সময় তাহাদের উদ্ধারের একমাত্র উপায় সনাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার। বেদ বিহিত সনাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিয়া—দেশের আবাল বৃদ্ধ-বনিতাকে তাহাদের প্রকৃত সরণি দেখাইয়া দিতে হইবে,—শুধু দেখাইলেই হইবে না, সরণি দেখাইয়া দিয়া সেই মার্গ অনুসরণ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ পরামর্শ প্রদান করিতে হইবে। আমাদের "আয়ুর্ব্বেদ" সেই পরামর্শ-সভার কর্ণধার। আয়ুর্ব্বেদের উপদেষ্টা স্বয়ং হিরণ্যগর্ভ। আয়ুর্ব্বেদের বনজ ভেষজ সমূহের বৃক্ষবাটিকা সেই পরমেষ্টিরই চিত্রকলায় পরিপূর্ণ। আয়ুর্ব্বেদের দিব্যৌষধি সেই আত্মভূর কমণ্ডলু হইতেই নির্গত হইয়াছে। দেশরক্ষা করিতে হইলে, দেশবাসীর সম্মুখে আবার সেই ব্রহ্মার কমণ্ডলু-নিঃসৃত দিব্যৌষধি সকল ধারণ করিতে হইবে। এককথায় ইহাই আমাদের জীবন ব্যাপি মহাব্রত। কাজেই এ ব্রতের উদ্বোধন আছে, কিন্তু কোনোকালেই ইহার উদযাপন হইবে না।

আয় মা।

——ঃ*ঃ——

আয় মা আনন্দময়ী নিরানন্দ বঙ্গে,
দনুজ দলনী দেবী —দেবদূত সঙ্গে।
পাইয়া তোমার সাড়া, বঙ্গবাসী মাতোয়ারা,
বাঙ্গালীর প্রাণ আজি পুলকিত রঙ্গে,
রোগ-শোক-জ্বালা তা'র নাই যেন অঙ্গে।

রোগে জীর্ণ তনুখানি—মলিন বদন,
সব যেন ভুলে গেছে দেখে শ্রীচরণ।
পেটে অন্ন নাই তা'র, বস্ত্রাভাবে হাহাকার,
অভাব—অভাব শুধু—শুধু অনটন,
তবু তোরে পেয়ে আজি হরষে মগন।

প্রতি বর্ষে আস তুমি—প্রতি বর্ষে যাও,
তিনটি দিনের তরে শুধু দেখা দাও।
সে দর্শনে উথলিয়া ওঠে মা বাঙ্গালী-হিয়া,
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ—যা'র দিকে চাও—
এক সুরে বাঁধা মাগো দেখিবারে পাও।

কিন্তু মা চাহিয়া যদি দেখ ভাল ক'রে,
বুঝিবে কি জ্বালা বয় বাঙ্গালীর ঘরে।
হৃদয়েতে বল নাই, মনে কারু শান্তি নাই,
উৎসাহ—উদ্যম তা'র গেছে দূরে স'রে,
স্বাস্থ্য সুখে-সুখী যেন নহে নারী নরে।

কিরূপেতে রবে স্বাস্থ্য?—খাদ্য যে মা নাই,
অমৃতের আস্বাদন আর নাহি পাই।
দুগ্ধ বা অমৃত পিয়ে বাঙ্গালী রহিবে জীয়ে,
সে দুগ্ধ নাহিক দেশে—বল কিবা খাই?
ঘৃত তো ভেজালে পূর্ণ—বল কিবা চাই?

সাত্ত্বিক আহার তাই গিয়াছে উঠিয়া,
অখাদ্য—কুখাদ্য সেবী বাঙ্গালা জুড়িয়া।
চা'য়েতে উদরপূর্ত্তি হোটেলে খাইয়া স্ফূর্ত্তি,
দোকানের রাঁধা মাংস নিতেছে লুফিয়া,
বাঙ্গালীর কথা আর কি কব খুলিয়া!

নিজ কর্ম্মদোষে মরে বাঙ্গালী এখন,
রক্ষা আর নাই তা'র আসন্ন মরণ।
উদরে শক্তি নাই— অকাল বার্দ্ধক্য তাই,
বাঙ্গালী শিশুর মৃত্যু তাই অগণন
কোনোদেশে কোনোজাতি মরেনা এমন!

কোন্ দেশে অজীর্ণেতে এত লোক মরে?
কোন্ দেশে দুর্ব্বলতা প্রতি ঘরে ঘরে?
সোণার এ বঙ্গভূমি, জানমা সকলি তুমি
বিধবা বালিকা কত চক্ষের উপরে—
দেখা নাহি যায় আর,—দে উপায় ক'রে।

যা'দের আনন্দময়ী জননী গো হয়,
আনন্দ তা'দের কাছে কেন নাহি রয়?
এক বর্ষ পরে আজি এলি মা আবার সাজি,
নানা উপচারে পূজি চিতে সাধ হয়,
কিন্তু মা চাহিয়া দেখ্ সব শূন্যময়।

অর্থ নাই—শক্তি নাই—মনও বুঝি নাই,
তা'রি ফলে আজি মোরা এত দুখ পাই।
দে অর্থ আবার আনি, দে শক্তি শক্তির রাণি,
দে বাসনা জাগাইয়ে পদেতে লুটাই,
মরমের অভিলাষ—এইমা, জানাই।

তুমি শক্তি, তুমি মুক্তি, তুমি মোক্ষ—সব,
জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি তোমাতে উদ্ভব।
তুমি সৃষ্টি, তুমি স্থিতি, বায়ু ব্যোম, তুমি ক্ষিতি,
তোমারি যে প্রতিমূর্ত্তি বিশ্বের বিভব,
ব্যাধি হ'য়ে ব্যাধি নাশ'—এতই সম্ভব।

'আয়ুর্ব্বেদ'—যাহা হ'তে বিশ্ব ঝলকিছে,
তা'তেও তোমারি মাগো মহিমা ক্ষরিছে।
জল হ'য়ে ছিলে তুমি, ছিলনা তখন ভূমি—
'কেশব' তখন ইহা করিলা উদ্ধার,
মৎস্যাবতার তাই হইল প্রচার।

দে মা পুনঃ বল চাহি তোমার সদনে,
'মানুষ' করিয়া তোল্ প্রতি জনে জনে।
প্রতিবর্ষে আনি তোমা পূজি শিব মনোরমা,—
অবহিত মতি রাখি ওই শ্রীচরণে,
ধর্ম্ম যেন নাহি ভুলি জনমে-মরণে।

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন।

আমাদের দেশে খাদ্য ও পথ্য।

---:*:---

"আজকাল বাঙ্গালা দেশে নব সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ মত পরিবর্ত্তন হইতেছে। কথায় কথায় ডাক্তার বাবুরা বিলাতী ফুডের ব্যবস্থা করিয়া বসেন। কিন্তু সকলেরই

ভাবিয়া দেখা উচিত যে, আমাদের দেশের উপযোগী ভাবে ঐ সমস্ত খাদ্য প্রস্তুত কি না?

রোগীর পথ্যমধ্যে বঙ্গদেশস্থ পল্লীগ্রাম সমূহে দুগ্ধই অধিক ব্যবহৃত হয় ও চিকিৎসকগণ প্রায়ই ইহা ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। সদ্য দোহন করা টাট্‌কা দুগ্ধ ফুটাইয়া রোগীকে খাওয়াইলে যে উপকার পাওয়া যায়, অন্য কোনরূপ বিলাতী দুগ্ধের দ্বারা সেরূপ উপকারের আশা করিতে পারা যায় না। প্রায়ই মধ্যে মধ্যে অনেকে বাহ্য চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া বিলাতী দুগ্ধের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, কিন্তু ভাবিয়া দেখা উচিত যে, তাহা আমাদের দেশে কিরূপ কার্য্যকরী। আমাদের দেশস্থ খাঁটী দুগ্ধ রাসায়ণিক পরীক্ষা করিলে তাহাতে ৪ প্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়, যথা—কেজিন্, চর্ব্বিময় পদার্থ, ক্ষীরশর্করা এবং জল। আর জমান দুগ্ধ পরীক্ষায় উপরোক্ত দ্রব্য ছাড়া কেন্‌সুগার, ক্ষারময় পদার্থ, ও ফস্‌ফরিক্ এসিড্ অতিরিক্ত বর্ত্তমান থাকিতে দেখা গিয়া থাকে। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, ইহাদের উপাদানগত পার্থক্য কিরূপ? আমাদের দেশের জিনিষই আমাদের পক্ষে প্রকৃত উপকারী। সকলেই দেখিয়াছেন যে, প্রাতঃকালের দোহন করা দুগ্ধ যদি বহুক্ষণ ফেলিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে তাহা ছিটিয়া যায় বা কাটিয়া যায়, কিন্তু এই তিন চারিমাস বা আরও অধিক দিনের দুগ্ধ কি অবিকৃত ভাবে থাকিতে পারে? আরও এককথা, একটিন দুগ্ধ এক দিনে প্রায় খরচ হয় না, সে অবস্থায় তাহা খুলিয়া রাখিলে তাহাতে নানাবিধ জীবাণুর বাসভূমি হইয়া থাকে। অতএব ইহা ব্যবহার করা যে ন্যায়সঙ্গত নহে, তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

যখন আমাদের এলোপ্যাথিক চিকিৎসার পরিবর্ত্তে আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসা কার্য্য সম্পন্ন হইত, তখন এত অধিক পথ্য-বিভ্রাট হইত বলিয়া মনে হয় না। সে সময় আমাদেরই দেশস্থ যবের পালো, সাগুদানা, খৈ, মুগসিদ্ধ, পল্‌তার বড়া, মসূরের যূষ, দুগ্ধ, দধি, ইত্যাদি ব্যবহৃত হইত, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে আজ থিন্‌এরারুট-বিস্কুট, বেঞ্জার্স ফুড, ইত্যাদি নানাবিধ পথ্য আসিয়া দেশ অধিকার করিয়া বসিয়াছে। মুরগীর যূষ খাওয়াইয়া, কেহ কেহ এসেন্স অব্ চিকেন ব্যবহার করিয়া, তাড়াতাড়ি রোগীকে বল প্রদান করিতেছেন। সদাচার বলিয়া হিন্দুর যে একটা জিনিষ ছিল, তা' আজ ম্লেচ্ছাচারে পদদলিত হইতেছে। যখন এসব পথ্য আবিষ্কৃত হয় নাই, তখন কি মৃত্যুসংখ্যা এখনকার অপেক্ষা বেশী ছিল? কখনই না। ইহাতে দোষ কাহার? সকলেই এক বাক্যে উত্তর দিবেন—দোষ আমাদেরই, কেননা আমরাই নূতন সভ্যতানুসারে বিলাসিতার চরম সীমায় উপনীত হইবার বাসনা করিয়া উৎসন্ন যাইতেছি। আমাদের কি ছিলনা,—বা কি নাই, সবই আছে,—গিয়াছে কেবল আমাদের সেই সেকালের বিশ্বাস। এক বিশ্বাসহীন হইয়াই আমাদের এই অবনতি। আমাদেরই দেশের জিনিষ ভালভাবে লেবেল দিয়া উত্তম শিশিতে প্যাক্ হইয়া বিদেশ হইতে ফেরৎ আসিতেছে; তাহাই আমরা সাদরে গ্রহণ করিতেছি। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সকলেরই চক্ষু ফুটিতেছে—"নূতন কিছু করো একটা নূতন কিছু করো"—এ কথাটার পরিবর্ত্তে মধ্যে মধ্যে পুরাণোর আদর দেখা যাইতেছে। আমাদের সেই মসূরের যূষের পরিবর্ত্তে এসেন্স অব্ মসূর, কিসমিসের

ম্র ইত্যাদি পথ্যরূপেও সেই পুরাতন নিম, নিসিন্দা, গুলঞ্চ, কালমেঘ, প্রভৃতি ঔষধরূপে ব্যবহার করায় অনেক উপকার হইয়াছে।

.... অন্য বিলাতী ফুড্ আমাদের দেশস্থ অর্থাৎ যাহা আমাদের শরীরের উপযোগী—সেইরূপ পথ্য ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত। মহর্ষি চরক বলিয়াছেন—"জ্বরাদৌ লঙ্ঘনং পথ্যং জ্বরান্তে লঘু ভোজনং"। একথা মানিয়া চলিতে প্রায় কাহাকেও দেখা যায় না। এখন ইহার পরিবর্ত্তে আমরা নবজ্বরে নানাবিধ পথ্যের বাহুল্য দ্বারা রোগীর অপকারই করিয়া থাকি। জ্বরাবস্থায় প্রায় অতিরিক্ত পথ্যাদি জীর্ণ হয় না, সেই জন্যই আর্য্য ঋষিগণ অত্যন্ত জ্বরের সময় পথ্য প্রয়োগ করিতে নিষেধ করিয়াছেন ও জ্বর কম হইলে লঘুপথ্য ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

.... আমাদের দেশেও যব জন্মিয়া থাকে। যবেরই ইংরাজী নাম বার্লি। এই যবই বেশ্যাই হইয়া বার্লি পাউডার নাম ধারণ পূর্ব্বক এদেশে আসিয়া থাকে, কিন্তু সদ্য প্রস্তুত যব চূর্ণ অপেক্ষা কি তাহার পুষ্টিকারিতা বেশী?—কখনই নয়। আরও আমাদের মাটীতে যে দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাই আমাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

রোগীর তৃষ্ণা পাইলেই অমনি আমরা সোডা-লেমনেড্ ইত্যাদি ব্যবস্থা করিয়া বসি। হঠাৎ বিলাতীজল ব্যবহারে রোগীর পিপাসা নিবারণ করা অপেক্ষা জগদীশ্বরের উৎকৃষ্ট দান ডাবের জল অতি উপযোগিতার সহিত ব্যবহার করা যাইতে পারে। তবে একটা কথা আছে, এ যে সুন্দর বোতলে ভরা লেবেল দেওয়া নয়, কাজেই বাবুদের ভক্তি হয় না।

*　　*　　*

বিলাতী ফুডে যে কি আছে, তাহার প্রকৃত বিবরণ সাধারণে অবগত নহেন। তাহা গ্রীষ্ম প্রধান বঙ্গদেশবাসীর পক্ষে কিরূপ উপকারী, কতদিনের পুরাতন, কতদূর হ'তে তা'র শুভাগমন হ'চ্ছে, এ সবও বিবেচনা ক'রে দেখা উচিত। যে জিনিষের উপাদান নিশ্চিত জানা নাই—তাহা ব্যবস্থা করাও যা, আর বিষ সেবনের ব্যবস্থা করাও তাই। প্রকৃত গুণাদি অবগত হইয়া পথ্যাদি ব্যবস্থাপিত হইলে—তাহা অমৃত তুল্য হইয়া থাকে।"

*　　*　　*　　*

শীর্ষোক্ত কথাগুলি আমার নহে, একজন স্পষ্টভাষী বহুদর্শী ডাক্তারের কথা। শুধু ইহাই নহে, একজন দেশ-বরেণ্য বড় ডাক্তারের সুযোগ্য হস্তে পরিচালিত মাসিক পত্রে—এই সরল সংযত সুন্দর সত্য কথা গুলি সন্দর্ভাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বঙ্গবিশ্রুত-কীর্ত্তি-ডাক্তার কার্ত্তিক চন্দ্র বসু এম্ বি মহাশয় দেশাত্মবোধের মহাশক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া "স্বাস্থ্য সমাচার" নামে যে মাসিক পত্র বাহির করিয়াছেন, সেই মাসিক পত্রে, প্রসিদ্ধ ডাক্তার রাখাল চন্দ্র নাগ মহাশয় ঐ কথাগুলি লিখিয়াছেন। এমন সার-গর্ভ কথা—ইতঃপূর্ব্বে আর আমাদের কর্ণগোচর হয় নাই। রাখাল বাবু যাহা বলিয়াছেন—তাহা দেব নির্ম্মাল্যের মত পবিত্র; তিনি যে ডাক্তার হইয়া দেশীয় পথ্যের আদর বুঝিয়াছেন,—তিনি যে স্বার্থ মোক্ষ জড়পিণ্ড দেশবাসীকে নিজের ঘর চিনাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, জানিনা—আমরা কোন্ ভাষায় তাঁহার এ উদারতার প্রশংসা করিব? ডাক্তার হইয়া কার্ত্তিক বাবুও যে এই প্রবন্ধটী পত্রস্থ করিয়াছেন,—সে জন্য আমরা তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ।

আমরা রাখাল বাবুর "দেশী ও বিদেশী পথ্যের কথা"—নামক সন্দর্ভটীর অধিকাংশই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। রাখাল বাবুর প্রত্যেক কথাই—আমরা ধ্রুব সিদ্ধির মত অভিনন্দিত করিয়া লইতে পারি। বাস্তবিক, যে দেশের ভগবান—কেবল ভোগের জন্যই, এক হইয়াও 'বহু' হইয়াছিলেন,—সে দেশে কি রোগীর জন্য পথ্যের অভাব হইতে পারে! দুঃখের বিষয়—দেশের লোক একথা ভুলিয়া গিয়াছে। নহিলে—ঘরে ঘরে এত অকাল-মৃত্যু-রোগ শোক, অভাব অনটন হইবে কেন?

বর্ত্তমান প্রবন্ধে—আমি আমাদের দেশীয় পথ্য ও খাদ্যের কথা ধারাবাহিক ভাবে লিপি-বদ্ধ করিব। কিছুদিন পূর্ব্বে—মাতৃভাষায় আমার দীক্ষা-গুরু, স্বর্গীয় অক্ষয় চন্দ্র সরকার মহাশয় এই বিষয়ে একখানি পুস্তক লিখিবার জন্য আমাকে অনুমতি করিয়াছিলেন। সংসারের নানা বিড়ম্বনায় পড়িয়া আমি সেই মহাত্মার আদেশ পালন করিতে পারি নাই। আমার পরম বন্ধু—হুগলী জজকোর্টের খ্যাতনামা উকীল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও দেশীয় পথ্য সম্বন্ধে আমাকে কিছু লিখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, সময়াভাবে সে অনুরোধও আমি রক্ষা করি নাই। রাখাল বাবুর যুক্তিময়ী কথায়—আজ আমি একসঙ্গে পরলোকস্থিত গুরুর পরিতর্পণ এবং ইহলোকস্থিত বন্ধুর পুলক বর্দ্ধনে অগ্রসর হইতেছি।

এ সম্বন্ধে আমার অনেক ভ্রমপ্রমাদ পরিদৃষ্ট হইবে, আশা করি—বিশেষজ্ঞগণ তাহার সংশোধন করিবেন। বৃন্দসংহিতা, পাকরাজেশ্বর, ভাব প্রকাশ, পথ্যাপথ্য বিধি প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে—আমি একে একে সুস্থ ব্যক্তির খাদ্য এবং রোগীর পথ্য সঙ্কলন করিব। এ সম্বন্ধে পাঠকগণের কোনও জিজ্ঞাস্য থাকিলে—অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে পত্র লিখিবেন। আমি তাঁহাদের প্রশ্নের যথাশক্তি সদুত্তর দিয়া কৃত কৃতার্থ হইব।

ধান্য।

আমরা বাঙ্গালী,—চাউল আমাদের প্রধান খাদ্য। সকলেই জানেন—"ধান্য" হইতে আমরা সেই চাউল সংগ্রহ করিয়া থাকি। ঋষিগণ 'ধান্যকে' পঞ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা;—১। শালি ধান্য, ২। ব্রীহি ধান্য, ৩। শূক-ধান্য [যব প্রভৃতি] ৪। শিম্বী ধান্য [মুগ, কলায় প্রভৃতি] এবং ৫। ক্ষুদ্র ধান্য। কাঙ্গনী দানা, শ্যামা-বীজ—প্রভৃতি তৃণ জাত ধান্যকে ক্ষুদ্র ধান্য বলা যায়।

এই শালিজাতীয় ধান্য হইতেই উৎকৃষ্ট চাউল প্রস্তুত হইয়া থাকে। শালিধান্য আবার অনেক রকম। তাহাদের নামও অনেক—রক্তশালী, কলম, পাণ্ডুক, শকুনাহৃত, সুগন্ধক কর্দ্দমক, মহাশালি, দূষক, পুষ্পাণ্ডক, পুণ্ডরীক. মহিষমস্তক দীর্ঘশূক, কাঞ্চনক, হায়ন, লোধ্রপুষ্প—ইত্যাদি। এ সকল নাম এখন অভিধানের কুক্ষিগত। এখন চাষারা—বাঁকতুলসী, ঝিঙেশাল, দুধ্‌কলমা, দাদখানি, বাদ্‌শাভোগ, কামিনী, লীলাবতী, রাঁধুনী পাগল—প্রভৃতি নানা সংজ্ঞায় ধান্যের নাম করণ করিয়াছে। এ দেশে এত রকম ধান আছে যে,—তাহাদের নামোল্লেখ করা অসম্ভব। এক কলিকাতার মিউজিয়মেই ৫০০০ রকম চাউলের নমুনা সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

আমাদের ভারতবর্ষ ধান্যের আদি জন্মভূমি। খৃঃ পূঃ ২৮০০ অব্দে চীন দেশে পঞ্চ শস্যের উৎসব হইয়াছিল,—এই পঞ্চ শস্যের মধ্যে

ই সন্ধ প্রধান। ভারতের বৈদিক যাগ যজ্ঞে পঞ্চ শস্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। র তখন ধান্যের জন্য চাষ করা হইত না, ন অকৃষ্ট ভূমিতে আপনা হইতেই এ দেশে ব ধান্য উৎপন্ন হইত। কিন্তু এইরূপ জাত তণ্ডুল ঈষৎ তিক্ত ও কষায়াস্বাদ ত।

এ দেশে কৃষি বিস্তার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্থবও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। বৈদিক ভূমিকর্ষণ করিয়া ধান্য রোপণ প্রথা ন প্রবর্ত্তিত হয়। তখন সেইরূপ ধান্যের ম ছিল—"কৈদার"। ইহার পরবর্ত্তী যুগে কৃষ্টভূমিজাত ধান্য বৃক্ষকে উৎপাটন দিয়া ক্ষেত্রান্তরে পুনর্ব্বপন করার নিয়ম চলিত হইয়াছিল। এইরূপে উৎপন্ন ধান্যের ম—"বাপিত" বা "বাপিত"। বাপিত দের চাউলের তিক্তাস্বাদ নষ্ট হইয়া তাহাতে ধুর রসের আবির্ভাব হয়। অদ্যাপি, এ দেশে ই বাপিত প্রথায়, কৃষকেরা ধান্যের চাষ করিয়া থাকে।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন জাতীয় ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। সে কল কথা সবিস্তারে বলিবার আবশ্যকতা নাই। বঙ্গদেশে, বসন্তকালে, গ্রীষ্মকালে, শরৎকালে—এবং শীতকালে, এই চারি ঋতুতে চারি জাতীয় ধান্য জন্মিয়া থাকে। তাহাদের নাম যথাক্রমে—বোরো, আউস, কার্ত্তিকশাল, এবং আমন। আমন ধান্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ইহার চাউলই সকলের চেয়ে লঘু পাচ্য।

এক রকম ধান্য আছে—আয়ুর্ব্বেদে তাহা "ষষ্টিক" আখ্যায় অভিহিত। "গর্ভস্থা এব যে পাকং যান্তি তে ষষ্টিকা মতা"—এই চাউলের অন্ন অতি অল্প সময়ের মধ্যেই হজম হয়। এই ধান্যেরও অনেক জাতি আছে। তাহাদের নাম=শণপুষ্প, প্রমোদক মুকুন্দক। ইহারা ব্রীহি শ্রেণীর ধান্য। ষাইট্ (৬০) দিনের মধ্যে এই শ্রেণীর ধান্য পরিপক্ক হইয়া থাকে, তাই ইহার চলিত নাম—"ষাইট্"।

যে সকল ধান্য জলাভূমিতে জন্মে, যাহার গাছ নাড়িয়া বসানো হয় না, এবং যে ধান্য বর্ষার শেষে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তাহার চাউল জীর্ণ হয়—বহু বিলম্বে। এ দেশের দীন দরিদ্রেরা এইরূপ চালের অন্ন ভক্ষণ করিয়া, উদর, রক্তহীনতা চর্ম্মরোগ, স্নায়ুর প্রদাহ, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

ধান্যের উপাদান।

উপাদান—	শতকরা
জল	১২.৩
আমিষ জাতীয়	৮.০
স্নেহ জাতীয়	০৩
শালি জাতীয়	৭৯.৪
লবণ জাতীয়	০.৪

চাউল।

(ভাত)

প্রথমেই বলিয়াছি—

•আমাদের সর্ব্বপ্রধান খাদ্যের নাম—"ভাত"। সাধু ভাষায় ভাতের নাম "ভক্ত"। ভক্তের অনেকগুলি পর্য্যায় আছে। যথা—অন্ন, ওদন, অন্ধ, কূর, ভিস্সা, অদ, ও দিদিবি। সকলেই জানেন—চাউলকে জলে সিদ্ধ করিয়া ভাত প্রস্তুত করিতে হয়। যত চাউল, তাহার ৫ গুণ জল দিয়া মৃদু আগুণে সিদ্ধ করিতে হয়। আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণ—এরূপ নিয়মে ভাত রন্ধন করেন না। তাঁহারা ৫ গুণ জল মাপিয়া দেন না। ইহাতে ভাতের গুণ হয়ত ঠিক

হয় না। জল ওজন করিয়া দেওয়াই ভাল। কেননা শাস্ত্রের বিধি—

"সু ধৌতাং স্তণ্ডুলান্ স্ফীতাং স্তোয়ে পঞ্চগুণে পচেৎ।
তন্তক্তঃ প্রস্রুতং চোষ্ণং বিশদং গুণবন্মতং॥"

প্রথমে চাউলকে বেশ করিয়া ধুইতে হইবে; জল পাইয়া চাউল গুলি ফুলিয়া উঠিলে তাহা ৫ গুণ জল দিয়া সিদ্ধ করিবে। চাউলের পরিমাণ যদি এক পোয়া হয়, পাঁচ পোয়া জল দিয়া তাহা সিদ্ধ করিতে হইবে। এক পোয়া চাউলে, তিন পোয়া ভাত হয়।

ভাতের ফেন গালা উচিত কি না?—ভাতের ফেন গালা উচিত। কেন না—"অশ্রুতং শীতং গুর্ব্বরুচ্যং কফপ্রদং।" অর্থাৎ ফেন শুদ্ধ ভাত—শীতবীর্য্য, গুরুপাক, অরুচিকর এবং কফবর্দ্ধক। কাহারও কাহারও বিশ্বাস ভাতের ফেন গালিলে, ফেনের সহিত ভাতের সারাংশ বাহির হইয়া যায়। এ ধারণা ভুল। ভাতকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত উপাদান গুলি প্রাপ্ত হওয়া যায়,—

উপাদান			শতকরা।
আমিষ জাতীয়	...	...	২·৮
শালি জাতীয়	...	...	৫'১·২
লবণ জাতীয়	...	...	০·২৮
লবণ জাতীয়	...	...	৩·২৮
জল	...	...	৩৯·৭২

ভাতের ফেনে (যাহা আমরা ফেলিয়া দিই) আমরা নিম্নলিখিত উপাদান দেখিতে পাই—

আমিষ জাতীয়	...	...	০·৩
শালি জাতীয়	...	...	০·৮
লবণ জাতীয়	...	...	১·৪
জল	...	...	৯৫·৭

ইহাদ্বারা আমরা বেশ বুঝিতে পারি—ভাতের ফেন গালিলে ভাতের লবণ জাতীয় উপাদান অনেকটা কমিয়া যায় বটে, কিন্তু অন্যান্য উপাদান অতি অল্পই নষ্ট হয়।

ভাতের উপাদানের প্রতি লক্ষ্য করিলে আমরা জানিতে পারি—তাহাতে আমিষজাতীয়, স্নেহ জাতীয় এবং লবণ জাতীয় পদার্থ অতি অল্প পরিমাণেই বর্ত্তমান থাকে। এই জন্য যে সকল খাদ্যে পূর্ব্বোক্ত উপাদান গুলি বেশী আছে,—ভাতের সঙ্গে আমরা সেই সকল খাদ্য ভক্ষণ করি। মাছ, মাংস, ঘৃত, দুগ্ধ, ডাল—ভাতের সঙ্গে খাইতে হয়। শাকসব্জী খাইলে,—ভাতের লবণ জাতীয় উপাদানের অল্পতার অনায়াসেই পূরণ হইয়া থাকে। কেননা শাকসব্জীতে লবণ জাতীয় উপাদানের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রমতে—ভাত অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক, তৃপ্তিজনক, শরীরের হিত সম্পাদক; ইহা মলমূত্রের প্রবর্ত্তক, স্নিগ্ধ, বলকারক, বায়ু ও পিত্তনাশক, কিঞ্চিৎ কফকর, এবং লঘু। বিজ্ঞান মতে—ভাত পরিপাক হইতে সাড়ে তিনঘণ্টা সময় লাগে। ইহা সম্পূর্ণরূপে অন্ত্র মধ্যে শোষিত হয়। ইহার সারাংশের সমস্তটুকুই—শোণিতের সহিত মিশিয়া যায়।

কোন্ চাউল ভাল?—নূতন চাউলের চেয়ে পুরাতন চাউলই অধিক পুষ্টিকর। চাউল পুরাতন হইলে, রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। এইজন্য পুরাতন চাউল সহজে পরিপাক করা যায়। কিন্তু অনেক দিনের পুরাতন চাউলও ভাল নহে, তাহা একদিকে যেমন স্বাদহীন, অন্য দিকে তেমনি তাহার পুষ্টিকারিতা [illegible] কমিয়া যায়। [illegible]

চাউলকে পুরাতন বলা চলে। রোগীকে পথ্য দিতে হইলে, ৪।৫ বৎসরের পুরাতন চাউল ব্যবহার করা উচিত।

পুরাতন চাউল—বলকারক, বর্ণ প্রসাদক, ত্রিদোষ নাশক, চক্ষুর পক্ষে হিতকর, মূত্র বর্দ্ধক, স্বরপ্রসাদক, অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টিজনক, এবং পিপাসা, দাহ, বিষদোষ, ব্রণ, শ্বাস, কাস, ও জ্বরাদি নাশক।

নূতন চাউল—অত্যন্ত কফবর্দ্ধক এবং গুরুপাক। নূতন চাউল ভোজনে—গাল ও ... জন্মিতে পারে, অধিকন্তু উদরাময়, অজীর্ণ, ... প্রভৃতি রোগও জন্মিতে পারে। সুতরাং নূতন চাউল না খাওয়াই ভাল।

বর্ষোষিতং সর্ব্বধান্যং গৌরবং পরিমুঞ্চতি।
... বার্ষাষিতং পথ্যং যতো লঘুতরং হিতং॥

আজকাল বাজারে দুই রকম চাউল ... হইয়া থাকে। ১। কলের ছাঁটা, ... ঢেঁকীর ছাঁটা। কলের ছাঁটা চাউল দেখিতে অতি পরিষ্কার—মসৃণ, দানা গুলি ...। কিন্তু কলে ছাঁটা চাউল দেহের পক্ষে ... পুষ্টিকর নহে। কেননা—কলে যেরূপ প্রক্রিয়ায় চাউল ছাঁটা হইয়া থাকে, তাহাতে চাউলের ফস্‌ফরাস-উপাদানযুক্ত স্তর উঠিয়া যায়। অতএব ঢেঁকীতে ছাঁটা চাউল ব্যবহার করাই ভাল।

আবার, ছাঁটা চাউল অপেক্ষা আছাঁটা চাউলের পুষ্টিকারিতা অধিক। ছাঁটা চাউলে ...জাতীয় উপাদান শতকরা ০·৫ ভাগ থাকে, আছাঁটা চাউলে উহা প্রায় ২·৫ ভাগ থাকে। ছাঁটা চাউলে আমিষ জাতীয় উপাদান শতকরা ...১৫ ভাগ, এবং আছাঁটা চাউলে ৭·৬৮ ভাগ থাকে। বিলাতের বড় বড় বৈজ্ঞানিকের ...—ছাঁটিবার সময় চাউলের যে পাতলা আবরণ উঠিয়া যায়—সেই আবরণে "ভাইটামিন্" নামক পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভাইটামিন পুষ্টিকর। অতএব—খুব মসৃণ ছাঁটের চাউল আহার করা উচিত নহে, তবে বিলাসী বাঙ্গালী বাবুরা কি অপরিষ্কার চাউলের অন্ন তৃপ্তির সহিত গ্রহণ করিবেন?

চাউল হইতে জাত খাদ্য।

পায়স—চাউল, ৫ গুণ দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া অল্প ঘন হইলে তাহাকে "ক্ষিরীকা" বলে। ইহার বাঙ্গালা নাম—"পরমান্ন" বা "পায়স"।—গৃহিণীরা মুখপ্রিয় করিবার জন্য—পাককালে এই পায়সের সঙ্গে চিনী বা গুড় মিশ্রিত করেন। ফলে, ইহাতে "পায়স" অত্যন্ত গুরুপাক হইয়া থাকে। মিষ্ট না দিলে—"পায়স" অপেক্ষাকৃত লঘুপাচ্য হয়। মিষ্ট বর্জ্জিত পায়স—অত্যন্ত পুষ্টিকর; যাঁহাদের শুক্রতারল্য রোগ আছে, তাঁহারা চিনী না দিয়া পায়স ভক্ষণ করিলে, উপকার পাইবেন।

"ক্ষীরিকা দুর্জ্জরা হৃদ্যা মধুরা যাতি পুষ্টিদা।
রক্তপিত্ত-হরী রুচ্যা সদ্যঃ শুক্র-বিবর্দ্ধিনী॥"

বৃন্দ। কৃতান্ন বর্গ।

যজ্ঞে ঋষিগণ—পবিত্র ভাবিয়া এই 'ক্ষিরীকা' বা পরমান্ন ভক্ষণ করিতেন। তখন ইহার নাম ছিল 'চরু"।

খিচুড়ী—চাউলও ডাল একত্র মিশাইয়া পাক করিলে যে খাদ্য প্রস্তুত হয়, তাহার নাম "কৃশরা।" চলিত কথায় ইহাকে খিচুড়ী বলে। ইহা প্রস্তুত করিবার নিয়ম—চাল যত, ডালও তত, উভয় পদার্থ জল দিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে। বেশ গলিয়া গেলে, তাহাতে কিছু লবণ, একটু আদার রস এবং অতি সামান্য হিঙ্গুর 'সম্বরা' দিয়া নামাইয়া লইবে।

ইহা অতি পুষ্টিকর খাদ্য। ডালে আমিষ ও স্নেহজাতীয় পদার্থ বেশী আছে—এই দুই পদার্থ চাউলের সহিত মিশ্রিত হওয়ায়—খিচুড়ী বড় পুষ্টিকর হইয়া থাকে। উদরাময় রোগী ব্যতীত অপর সকল রোগীকে ইহা অনায়াসে পথ্য স্বরূপে প্রয়োগ করা যায়। এখনও এদেশে খিচুড়ীর প্রচলন আছে। তবে এখনকার খিচুড়ী আর সেকালের "কৃশরা" এক নহে। এখন খিচুড়ীর সঙ্গে নানাবিধ মস্লা, ঘৃত ও পলাণ্ডু প্রভৃতি মিশিয়া, খিচুড়ীকে একদিকে গুরুপাক, এবং অন্যদিকে বিলাসীর সখের খাদ্যে পরিণত করিয়াছে!

পোলাও—চাউলের সহিত মাংস, মিশ্রিত করিয়া জল দিয়া সিদ্ধ করিতে হয়। উভয় দ্রব্য গলিয়া গেলে, তাহাতে কিছু ধনে চূর্ণ, শুঁঠচূর্ণ, লবণ এবং চাতুর্জাত [এলাচ, লবঙ্গ, তেজপত্র ও দারুচিনী] চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া ঘৃতাঢ্য করিয়া নামাইলে—তাহাকে 'অন্নমাংস' বলে। ইহার আর একটী নাম "পলান্ন"—অপভ্রংশে "পোলাও"। ইহা অত্যন্ত গুরুপাক। ইহার গুণ—বলকারক, শরীরের উপচয়কারক, ধাতুপোষক এবং বাজীকরণে (রতিশক্তি বর্দ্ধনে) অদ্বিতীয়।

অন্নমাংসং পরং বল্যং বৃংহণং ধাতুবর্দ্ধনং।

এখন অন্নমাংস প্রস্তুতে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মুসলমান শাসনকালে—ইহার সঙ্গে বাদাম, পেস্তা, কিস্‌মিস্‌ প্রভৃতি বহু উপকরণ মিশিয়াছে। বলা বাহুল্য পলান্ন—এখন অতিশয় গুরুপাক খাদ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কূরা—চাউলের সহিত তাহার ৪ ভাগের ১ ভাগ মৎস্য, এবং বার্ত্তাকু, বানমূলক, মানকচু, কাঁচকলা প্রভৃতি তরকারি মিশ্রিত করিয়া প্রচুর জল দিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে। সমস্ত দ্রব্য অত্যন্ত গলিয়া গেলে তাহাতে কিঞ্চিৎ লবণ ও গোলমরিচ চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। ইহার নাম "কূরা"। ইহা—বলকারক, রুচিকারক, স্নায়ুর প্রদাহ, প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, বিষম জ্বর এবং ধাতুক্ষয় নাশক। ইহা অনেকটা "পিস্‌পাস্‌" শ্রেণীর খাদ্য।

তাপহরী—প্রথমে কিছু ঘৃতে অল্প হরিদ্রা চূর্ণ ভাজিয়া লইবে। পরে তাহাতে মাষকলায়ের বড়ি এবং সুধৌত চাউল ঈষৎ ভাজিয়া, ঐ উভয় দ্রব্য সিদ্ধ হইতে পারে—এইরূপ পরিমাণে জল দিয়া মৃদু আগুণে সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ হইয়া গেলে তাহাতে যথোপযুক্ত মাত্রায় সৈন্ধব, আদা ও হিং নিক্ষেপ করিয়া নামাইবে। ইহার নাম "তাপহরী।" ইহা অত্যন্ত দাহনাশক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক রুচিকর, শরীরের উপচয় কারক এবং রক্তস্রাব নিবারক। তবে ইহা গুরুপাক।

শালী শক্তু—চাউলকে বেশ করিয়া ধুইবে, পরে শুকাইয়া লইবে; শেষে জাঁতায় ভাঙিয়া চূর্ণ করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। ইহার নাম "শালি শক্তু।" চলিত ভাষায় "সবেদা" এবং ইংরাজী ভাষায় Rice Starch নামে ইহা বিখ্যাত। এই সবেদা দ্বারা পিষ্টক জাতীয় বহু খাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। সে সকল খাদ্য অত্যন্ত গুরুপাক, বিশেষতঃ অজীর্ণগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে তাহা বিষের ন্যায় অপকারী। কিন্তু "সবেদা" হইতে রোগী পথ্যও প্রস্তুত হইতে পারে।

চরক বলেন—

মধুরা লঘবঃ শীতাঃ শক্তবঃ শালি সম্ভবাঃ
গ্রাহিণো রক্তপিত্তঘ্না তৃষ্ণাচ্ছর্দি জ্বরাপহাঃ

অর্থাৎ শালিশক্তু—মধুর [illegible]

এবং রক্তপিত্ত [illegible]

এই মহাযুদ্ধে—আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই মহার্ঘ হইয়াছে, রোগীর ঔষধ-পথ্যের দামও অসম্ভব রূপে চড়িয়াছে। বার্লির মূল্যও তিনগুণ বাড়িয়াছে, দরিদ্র গৃহস্থের বিষম বিপদ। এইরূপ কতকগুলি দরিদ্র রোগীকে আমরা শালিশক্তু ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, ইহার যে উপকারিতা দেখিয়াছিলাম—তাহা বার্লির অপেক্ষা অল্প নহে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—বিলাতী ফুডের পরিবর্ত্তে শালিশক্তু অনায়াসে ব্যবহার করা যায়। ইহাতে খরচও কম পড়ে। শালি শক্তু ১ ভরি, আধ সের জল দিয়া মৃদু জ্বালে সিদ্ধ করিবে,—পরে তাহাতে দুগ্ধ ও মিছরীর গুঁড়া মিশাইয়া রোগীকে খাইতে দিবে। ইহা শিশুদের খাদ্য রূপেও ব্যবহৃত হইতে পারে। ইচ্ছা হইলে দুগ্ধ না দিয়া, লেবুর রস ও অল্প লবণ দিয়া—ইহা রোগীকে দেওয়া যায়। অজীর্ণ ও অতিসার রোগীর পক্ষে ইহা একটী উৎকৃষ্ট পথ্য।

যে সকল স্ত্রীলোকের স্তনে—ভাল দুগ্ধ জন্মে না, অথবা যাহাদের স্তনের দুগ্ধ—শিশুর পোষণের উপযোগী নহে,—শালিশক্তু তাহাদের পক্ষে মহৌষধ। "শালি শক্তু"—এক সপ্তাহ কাল দুগ্ধের সহিত পান করিলে——স্তনে প্রচুর দুগ্ধ বাড়িয়া থাকে। এই সময় প্রসূতিকে একটু বেশী পরিমাণে দুগ্ধ পান করিতে হইবে। ব্যঞ্জনাদি দিয়া ভাত না খাইয়া কেবল দুগ্ধ দিয়া ভাত খাইলে আরও ভাল হয়। শালিশক্তু প্রত্যহ ২ তোলা পর্য্যন্ত ব্যবহার করা চলে। প্রসূতির অবস্থা ও প্রকৃতি বুঝিয়া আধতোলা হইতে আরম্ভ করিবে।

শাল্য পূপ—তণ্ডুল চূর্ণ ২ ভাগ নারিকেল কল্ক ১ ভাগ, লবণ ও মরিচ চূর্ণ—যথোপযুক্ত প্রক্ষেপ দিয়া দুগ্ধ দ্বারা মাখিয়া পিষ্টকাকৃতি করিয়া তপ্ত তাওয়ায় সেঁকিবে। ইহার নাম "শাল্যপূপ"। ইহা গুরুপাক—কিন্তু ক্ষীণশুক্র ও ওজোক্ষয়গ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে একটী উৎকৃষ্ট খাদ্য।

দুগ্ধ কূপিকা।

চাউল চূর্ণ ২ ভাগ, ছানা ১ ভাগ একত্র বেশ করিয়া মাখিবে, পরে তাহাতে গোলাকার কূপিকা প্রস্তুত করিয়া, কূপিকার ভিতর ঘন দুগ্ধের 'পুর' দিয়া,—তাহা ঘৃতে ভাজিবে এবং কর্পূর বাসিত চিনীর রসে ডুবাইয়া রাখিবে। ইহার নাম "দুগ্ধ কূপিকা"—ইহা অত্যন্ত পুষ্টিকারক রুচিজনক, শরীরের উপচয়কারক, শুক্রবর্দ্ধক এবং দৃষ্টিশক্তিপ্রদ। যাঁহারা চক্ষে কম দেখেন,—তাঁহারা ইহা ভক্ষণ করিবেন।

কূর ধুমনী—চাউল চূর্ণ ২ ভাগ, ডাল (মাষ কলায়) ৪ ভাগ, একত্র মিশাইয়া জল দিয়া তরল করিয়া গুলিবে। ঐ তরল দ্রব্যে কিছু মৌরী, মরিচ, যমানী, আদার রস এবং উপযুক্ত পরিমাণে লবণ প্রক্ষেপ দিবে। পরে একখানি লৌহের তাওয়া আগুণে চড়াইয়া, তাহাতে কিছু ঘৃত মাখাইবে. শেষে—পূর্ব্বোক্ত তরল দ্রব্য অল্পে অল্পে ঐ তাওয়ায় ঢালিবে এবং খুন্তীর সাহায্যে রুটীর মত করিয়া তাহা বিস্তৃত করিয়াদিবে। এক পিঠ ভাজা হইলে অপর পিঠ উলটাইয়া ভাজিয়া লইবে। ইহার নাম কূর ধমনী। যাঁহাদের স্মৃতিশক্তি কম, যাঁহাদের [illegible] রোগ আছে,যাঁহারা সর্ব্বদাই শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হন—তাঁহারা ইহা ভক্ষণ করিবেন। এই "কূর ধুমনীই" সম্ভবতঃ সংক্ষিপ্ত হইয়া "[illegible] চিকুনীতে" পরিণত হইয়াছে।

চাউল হইতে আরও নানা রকম [illegible] খাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। [illegible]

তাহা আর লিখিলাম না। যাঁহারা ঐ সকল খাদ্যের বিষয় জানিতে চাহেন, তাঁহারা 'বৃন্দ সংহিতা', 'পাক' রাজেশ্বর' প্রভৃতি গ্রন্থ পড়িয়া দেখিবেন।

যাঁহাদের পরিণামশূল আছে, তাঁহারা কোমল নারিকেলের জলে চাউল পাক করিয়া, ভাত হইলে সেই ভাত খাইবেন।

যাঁহাদের ভাত খাইলেই জ্বর হয়, অথবা যাঁহাদের ভাত সহ্য হয় না, তাঁহারা দুইবার ফেন গালিয়া সেই ভাত খাইবেন। চাউল অৰ্দ্ধ সিদ্ধ হইলে একবার ফেন গালিতে হইবে, তারপর আবার নূতন জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া চাউল খুব গলিয়া গেলে আর একবার ফেন গালিতে হইবে। এই উপায়ে প্রস্তুত করা 'অন্ন' আহার করিলে, তাহা অতি শীঘ্র—এমন কি, একঘণ্টায় হজম হইয়া যায়। রস্' হইবার আর ভয় থাকেনা।

দুই বৎসর পূর্ব্বে আমি একটী রোগী পাইয়াছিলাম, তাহার ভাত সহ্য হইত না, ভাত খাইলেই তাহার জ্বর হইত। এদিকে উপর্য্যুপরি ৪।৫ দিন রুটী খাইলেই তাহার আবার উদরাময় দেখা দিত। বন্ধুবর ডাক্তার ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্—মহাশয় কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া এই রোগী প্রায় ৯ মাস ভুগিয়া—শেষে আমার চিকিৎসাধীন হইয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে দুইবার ফেন গালিয়া সেই ভাত খাইবার উপদেশ দিয়াছিলাম। ইহাতেই তাঁহার আর জ্বর হয় নাই।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে—ভেষজ দ্রব্যের ক্বাথের সহিত অন্নের মণ্ড প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা আছে. পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা ক্রমশঃ তাহা লিপিবদ্ধ করিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ।

পুরাতন পীড়ায় পর্প্পটী প্রয়োগ।

——:*:——

(বৃদ্ধ বৈদ্যের লিখিত)

মকরধ্বজের পরই "পর্প্পটী" একটী উল্লেখ যোগ্য সিদ্ধফল রসৌষধ। পুরাতন পেটের পীড়ায় পর্প্পটীর তুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ বোধ হয় পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। গ্রহণী, অতিসার, প্রবাহিকা [আমাশয় ও রক্তামাশয়] প্রভৃতি প্রাণঘাতী রোগে—"পর্প্পটী' অমৃত বিশেষ; বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত রোগগুলির সহিত যদি রোগীর শরীরে শোথ প্রকাশ পায় তাহা হইলে পর্প্পটীই তাহার একমাত্র ঔষধ। পর্প্পটী প্রয়োগে আমি শত শত শোথযুক্ত আসন্ন মৃত্যু উদরাময় রোগীকে মৃত্যুমুখ হইতে ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ [illegible]

মহাশয়দের কাছে পর্প্পটীর পরিচয় দেওয়া—ধৃষ্টতা মাত্র, তথাপি বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি পর্প্পটীর কথাই আলোচনা করিব।

"পর্প্পটী" অনেক রকম আছে। যথা—"রস পর্প্পটী" "স্বর্ণ পর্প্পটী", "লৌহ পর্প্পটী", "তাম্র পর্প্পটী", "একরধ্বজ পর্প্পটী" ইত্যাদি। কেহ কেহ আবার "বজ্রক্ষার" নামক ঔষধকে সোহাগ করিয়া "ক্ষার পর্প্পটী" ও "শুভ্র পর্প্পটী" নাম দিয়া থাকেন। পর্প্পটীর মধ্যে "বিজয় পর্প্পটী' ও "স্বর্ণ পর্প্পটী'—এই দুইটি কিছু ব্যয় সাধ্য। ইহাদের অভাব "রসপর্প্পটী", "লৌহ পর্প্পটী" এবং পঞ্চামৃত পর্প্পটীর দ্বারাই পূরণ হইতে পারে।

রস পর্প্পটী।

"রস পর্প্পটী" প্রস্তুত করা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। ইহার উপাদান—কেবল পারা ও গন্ধক মাত্র। প্রথমে পারা ও গন্ধককে শোধন করিয়া লইতে হইবে।

গন্ধক শোধন। ৮ ভরি গন্ধক লইয়া একখানি লোহার হাতার উপর রাখ। পূর্ব্বে হাতার ভিতর দিকে একটু গব্যঘৃত মাখাইয়া লইলে ভাল হয়। তা'রপর ঐ হাতা নির্ধূম অগ্নির উত্তাপে চড়াও। তাপ লাগিয়া গন্ধক যেমন গলিতে আরম্ভ করিবে, অমনি একটু একটু করিয়া তাহা, জল ও দুগ্ধ পূর্ণ একটী পাত্রে ঢালিতে থাকিবে। পরে সেই পাত্র হইতে গলিত অথচ জমাট গন্ধক তুলিয়া, বেশ করিয়া জলে ধুইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। ইহাই হইল গন্ধক শোধনের সহজ নিয়ম।

পারা শোধন। পারা ৮ ভরি, ছাড়ানো রসুনের কোয়া ৮ ভরি—একত্রে একখানি পাথরের খলে মাড়। মাড়িতে মাড়িতে যখন সমস্ত রসুন বাটা খুব কালো রঙ হইবে, তখন তাহাতে অল্প পরিমাণে জল দিয়া আবার মাড়িবে। ইহাতে পারা খলের তলায় পড়িবে রসুন বাটা উপরে থাকিবে। এইবার রসুন বাটা ও জল টুকু ধীরে ধীরে ফেলিয়া দিয়া পারা শুদ্ধ খলখানি রৌদ্রে রাখিবে। জল নিঃশেষ হইয়া শুকাইয়া গেলে মোটা কাপড়ে পারা ছাঁকিয়া লইবে। ইহাতে পারা শোধিত হইবে।

পর্প্পটীর প্রস্তুত প্রণালী।—এই রূপ শোধন করা গন্ধক ২।।০ ভরি ও পারা ২।।০ ভরি ওজনে লইয়া নুড়ী দিয়া ধীরে ধীরে লঘু হস্তে মাড়িবে। মাড়িতে মাড়িতে পারা ও গন্ধক একত্রে মিশিয়া খুব কালো হইবে। যখন দেখিবে পারদের কণা আর দেখিতে পাওয়া যায়না, অধিকন্তু খলের তলায় চট্ বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন উহা খল হইতে উঠাইয়া অন্যত্র রাখিবে। এই পারা গন্ধকের মিশ্রণের নাম—"কজ্জলী।" কজ্জলী প্রস্তুত হইলে একখানি লৌহের হাতা, খানিক টাটুকা গোবর, দুই একখানা কচি কলার পাতা, একখানি ছোট খুন্তী [খুন্তী এমন হওয়া চাই—যেন পূর্ব্বোক্ত হাতার মধ্যে ফিরিতে ঘুরিতে পারে] এবং একটু গাওয়া ঘৃত যোগাড় করিয়া লইবে।

তারপর কতকগুলি শুক্‌নো কুলের কাঠ পোড়াইয়া অঙ্গারের স্তূপ প্রস্তুত করিবে। এই অঙ্গার স্তূপের পার্শ্বেই টাট্‌কা গোবর দিয়া একটী ছোট খাটো বেদী গড়িয়া লইবে। বেদীর উপর কচি কলাপাতা বিছাইয়া দিবে। আর একখণ্ড কলারপাতে খানিকটা গোবর পুরিয়া একটী পোঁটলা বাঁধিয়া রাখিবে।

এইবার লোহার হাতায় একটু ঘি মাখিবে, এবং তাহাতে আন্দাজ ২ ভরি কজ্জলী ঢালিয়া

দিবে। পরে কজ্জলীপূর্ণ হাতা খানি—পূর্ব্ব কথিত কুলকাষ্ঠের অঙ্গারস্তূপের মধ্যে বসাইবে। হাতার পার্শ্বের কজ্জলী প্রথমেই গলিতে আরম্ভ হইবে, সেই সময় খুন্তিখানি দিয়া ধীরে ধীরে হাতার মধ্যস্থিত কজ্জলী ঘুঁটিয়া দিবে। সমস্ত কজ্জলী গলিয়া যাইবা মাত্র, সেই যে গোবরের বেদী—যাহার উপর কলাপাতায় আচ্ছাদন দিয়া রাখিয়াছ—তাহারই উপর দ্রব কজ্জলী ঢালিয়া দিবে। অমনি আর একজন সাহায্যকারী কলাপাতা বাঁধা গোবরের পোঁটলাটী দিয়া, বেদীর উপর ঢালা তরল কজ্জলীর উপর চাপ দিবে। এইরূপে যে ঔষধ প্রস্তুত হইবে—তাহারই নাম "রস পর্প্পটী"।

পঞ্চামৃত পর্প্পটী।—৪ ভরি কজ্জলীর সহিত আবার ২ ভরি শোধন করা গন্ধক মিশাইয়া পুনরায় মাড়িবে, পরে তাহাতে জারা লৌহ ১ ভরি, জারা অভ্র ৷৹ ভরি, এবং জারা তামা ।৹ চারি আনা দিয়া উত্তমরূপে মিশাইবে। শেষে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পর্প্পটী পাক করিবে। ইহার নাম পঞ্চামৃত পর্প্পটি।

লৌহ পর্প্পটী।—দুই ভরি কজ্জলীর সহিত ১ ভরি জারা লৌহ মিশাইয়া, পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পর্প্পটী পাক করিলেই—"লৌহ পর্প্পটী" প্রস্তুত হইল।

কোন্ রোগে কোন্ পর্পটী ব্যবহার্য্য।—জীর্ণ ও বিষম জ্বরে, কফজ শোথে, শোথযুক্ত পাণ্ডু রোগে, শোথযুক্ত গ্রহণী, অথবা শোথ রহিত্ গ্রহণী রোগে, পুরাতন প্রবাহিকায় "রস পর্প্পটী প্রয়োগ করিবে।

শোথযুক্ত, জ্বরযুক্ত, পিত্তজ পাণ্ডুরোগে, যকৃৎ বিকার জাত শোথে, শোথযুক্ত বা শোথ রহিত গ্রহণী রোগে, পুরাতন সরক্ত প্রবাহিকায়, সর্ব্ববিধ পুরাতন অতিসারে—পঞ্চামৃত পর্প্পটি অত্যন্ত ফলপ্রদ। ইহা অনেক স্থলেই আমি পরীক্ষা করিয়াছি।

রোগীর দেহে রক্তের শোণিকা অর্থাৎ লালকণা কমিয়া গেলে, রক্তে জলীয় ভাগ বৃদ্ধি পাইয়া শোথ জন্মিলে, লৌহ পর্প্পটী প্রযোগ করিলে চমৎকার ফল পাওয়া যায়। উদরী রোগে লৌহ পর্প্পটী চমৎকার ঔষধ।

সেবনের নিয়ম।—প্রথম দিন প্রাতঃ কালে (বেলা ৯ টার মধ্যে) ১ রতি ওজনের পর্প্পটী লইয়া, ২।৪ ফোঁটা মধু দিয়া কিছুক্ষণ ধীরে ধীরে মাড়িবে, মাড়া হইয়া গেলে তাহাতে ১ ঝিনুক বল্‌কা দুগ্ধ দিয়া বেশ করিয়া গুলিয়া রোগীকে খাইতে দিবে। দ্বিতীয় দিন ২ রতি পর্প্পটী দিবে। এইরূপে এক এক দিন এক এক রতি বাড়াইয়া ১০ দিনে ১০ রতি পর্য্যন্ত বাড়াইবে। এই ১০ দিনেই আরোগ্যের লক্ষণ প্রকাশ পাইবে। তা'রপর আবার প্রতিদিন ১ রতি করিয়া ঔষধের মাত্রা কমাইতে হইবে। ১০ দিনে যাহার রোগ না কমিবে, তাহাকে ১০ রতি মাত্রায় আরও কিছুদিন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। শেষে ১ রতি করিয়া প্রতিদিন মাত্রা কমাইয়া এক রতিতে নামিলে—ঔষধ সেবন বন্ধ করিয়া দিবে।

রোগী যে দিন হইতে পর্প্পটী সেবন আরম্ভ করিবে, সেই দিন হইতে লবণ ও জল খাইবে না। নির্জ্জল দুগ্ধ বল্‌কা গরম করিয়া—সেই দুগ্ধের সহিত পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন ভক্ষণ করিবে। চিনি ও মিছরীর [illegible] খাইতে পারিবে। পিপাসা পাইলে একটু একটু দুগ্ধ পান করিবে। [illegible] দাড়িমের রস, [illegible]

এবং অল্প মাত্রায় শাসশূন্য ডাবের জল—দিবে।

পর্প্প টী সেবনকালে জলপান করিলে যদিও অন্য কোনও বিপদ ঘটিবার আশঙ্কা নাই—তথাপি পর্প্প টী সেবনের সুফল পাওয়া যায় না। সুতরাং জলপান বন্ধ রাখা বড়ই আবশ্যক। শোথ, পাণ্ডু প্রভৃতি রোগে—দেহের রক্ত কমিয়া গেলে, ডাক্তারেরাও লবণ ভক্ষণ নিষেধ করেন। যে সকল রোগে শরীর রক্তহীন হইয়া পড়ে, সেই সকল রোগে লবণের অপকারিতা বহুযুগ পূর্ব্বেই ঋষিরা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পর্প্প টী সেবনের সময়—লবণও বন্ধ রাখা চাই।

পর্প্প টী সেবন ছাড়িয়া দিলেও ২।১ সপ্তাহ—লবণ ও জল বন্ধ রাখা ভাল। ক্রমে ক্রমে—উহা সহাইতে হয়।

নব প্রসূতা নারীর শরীরে যদি শোথ দেখা দেয়, অথবা প্রসূতি যদি সূতিকা-গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হ'ন,—তাহা হইলে বিশেষ বিবেচনা করিয়া পর্প্প টী প্রয়োগ করিবে। পর্প্প টী—শোথ ও সূতিকা-গ্রহণীর শ্রেষ্ঠ ঔষধ বটে, কিন্তু প্রসূতির জরায়ুক্ষেত্র যদি ক্লেদশূন্য না হয়, কিম্বা প্রসবদ্বার দিয়া যদি দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব হইতে থাকে, অথবা প্রসূতির বস্তিদেশে (তলপেটে) ভার বোধ বা বেদনা বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে কখনও পর্প্প টী ব্যবস্থা করিও না।

পর্প্প টী প্রস্তুত করিতে হইলে, টাট্‌কা কজ্জলী ব্যবহার করিবে। পুরাতন (অনেক দিনের প্রস্তুত) কজ্জলীতে পর্প্প টী ভাল হয় না।

গন্ধক শোধন বা পর্প্প টী প্রস্তুতের পূর্ব্বে—পাত্রে ঘৃত মাখাইয়া লইবার উদ্দেশ্য—উহাতে গন্ধক ও কজ্জলী শীঘ্র গলে, আগুনের তাপে লাগিয়া পুড়িয়া যায় না।

পর্প্প টীতে—শিশুর এবং বৃদ্ধের খুব শীঘ্র উপকার হয়, যুবার দেহে পর্প্প টী একটু বিলম্বে শক্তি প্রকাশ করে।

যাহারা অত্যন্ত মাছ মাংস খায় এবং যাহারা মাদক দ্রব্য সেবী, তাহাদের দেহে পর্প্প টী প্রয়োগে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না।

বর্ষাকাল ও শীতকালে—পর্প্প টী প্রয়োগ করিলে, শীঘ্রই উপকার দেখা যায়।

যে রোগী পর্প্প টী সেবন করিবে, তাহাকে—আলোকময় খট্‌খটে শুক্‌নো ঘরে রাখিবে। বেশী স্নান করিতে দিবে না। প্রয়োজন বুঝিলে, গরম জলে, গা' মুছিবার ব্যবস্থা করিবে।

পর্প্প টী সেবনের পর রোগী আধঘণ্টা কাল চুপ করিয়া শুইয়া থাকিবে, নড়িবে চড়িবে না। কাহারও সঙ্গে কথাও কহিবে না। পর্প্প টী সেবনের পর, তাম্বুল চর্ব্বণ করিবে।

আর একটী পর্প্প টী আছে—তাহার নাম—"সর্ব্বেশ্বর পর্প্প টী"। বঙ্গদেশের কবিরাজগণ—ইহা বড় একটা ব্যবহার করেন না। কিন্তু পশ্চিম দেশীয় হিন্দুস্থানী বৈদ্যগণ ইহা সর্ব্বদাই ব্যবহার করেন। এই পর্প্প টী, ঘৃত, মধু বা মাখনের সহিত সেবন করিতে হয়। যক্ষ্মা, পুরাতন জ্বর, হৃদ্রোগ, মেহ, অশ্মরী প্রভৃতি রোগে এই পর্প্প টী বড়ই ফলপ্রদ। ইহার উপাদান—

হিঙ্গুল—১ ভরি,
গন্ধক—১ ভরি,
প্রবাল ভস্ম ।০ আনা,
অভ্র ভস্ম—।০ ,,
লৌহ ভস্ম—।০ ,,
রসাঞ্জন—॥০ ,,

হরিতাল—৵০ „
মনঃ শিলা—৵০ „
তাম্র ভস্ম—৵০ „

এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া, প্রথমে অর্জ্জুন ছালের ক্বাথে, তা'রপর বেড়েলার ক্বাথে, তা'রপর ঘৃতকুমারীর রসে ভাবনা দিবে। পরে পর্প টীর মত পাক করিবে। ইহার মাত্রা—½ রতি হইতে ১ রতি। এই পর্প টী সেবনে গা' বমি বমি করিলে, ঘোল খাইতে দিতে হয়। আমি একটা স্ত্রীলোকের দ্বৌকালীন জ্বর—এই পর্প টি প্রয়োগে ১২ দিনে বন্ধ করিয়াছিলাম। আমার চিকিৎসাধীনে আসিবার প্রায় ১ মাস পূর্ব্বে,—রোগিণী ডাক্তার কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াছিল।

শ্রীসদানন্দ সেন গুপ্ত কবিরাজ।

উষ্ণোদকের উপকারিতা।

—ঃ*ঃ—

পরলোকগত ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন এম ডি—আমার বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—উভয় চিকিৎসাবিজ্ঞানে তাঁহার অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁহার বিজ্ঞান বিষয়ক বহু প্রবন্ধ বাঙ্গালার বহু সাময়িক পত্রের অঙ্গ একদা অলঙ্কৃত করিত।

পল্লীবাসের সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় জলকষ্ট। অনেক সময় পল্লীবাসিগণকে পঙ্কিল জল পান করিয়া প্রাণ ধারণ করিতে হয়। একদিন এই জলকষ্ট-প্রসঙ্গে হেমচন্দ্রের সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা হয়। সেই সময় তিনি উষ্ণজলের উপকারিতা সম্বন্ধে—আমার কাছে তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার কাছে বসিয়া আমি সেই অমূল্য উপদেশের নোট লইয়াছিলাম। পাঠকগণের অবগতির জন্য এই প্রবন্ধে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

হেমচন্দ্র পল্লীগ্রামের লোকগণকে জল গরম করিয়া পান করিতে অনুরোধ করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল—বঙ্গদেশে এই যে বর্ষে বর্ষে এত নরনারী অজীর্ণ-ম্যালেরিয়া ও কলেরায়—মারা পড়ে, ইহার এক মাত্র কারণ—নির্ম্মল জলের অভাব। তিনি বলিতেন—কেবল মাত্র উষ্ণোজল পান করিয়া পল্লীগ্রামের লোকগুলি পূর্ব্বোক্ত মারাত্মক রোগ সমূহের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে।

বাস্তবিক এদেশের অধিকাংশ রোগই জলের দোষে হইয়া থাকে। অতএব জল সম্বন্ধে দু চারিটী কথা সর্ব্ব সাধারণের জানিয়া রাখা উচিত।

জলকে বিশুদ্ধ করিবার সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সুন্দর উপায় জল আগুণে ফুটাইয়া ছাঁকিয়া লওয়া। এরূপ জলে সংক্রামক রোগ জন্মিতে পারে না। আমরা অনেকেই দেখিয়াছি—কলেরা, কয়েক প্রকার জ্বর, কৃমি, উদরাময় প্রভৃতি ব্যাধি দুষিত জল হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং জলকে আগুনে ফুটাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া সেই জল ব্যবহার করিলে উক্ত রোগ গুলির হস্ত হইতে অতি সহজে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

১। খালি পেটে গরম জল পান করিলে অম্লজনিত বুকজ্বালা এবং অম্ল ঢেকুর ওঠা নিবারিত হয়।

২। আহার্য্য পদার্থ জীর্ণ না হইলে, পাকস্থলীতে এক রকম বিষাক্ত পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে। গরম জল পান করিলে সেই বিষাক্ত পদার্থ মলদ্বার দিয়া বাহির হইয়া যায়।

৩। গরম জল পান করিলে বেশ কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

৪। গরম জল পানে আমাশয়ে বা পাকস্থলী হইতে গাঢ় শ্লেষ্মা বিদূরিত হয়,—উদরে শ্লেষ্মা জমিয়া থাকিলে জীর্ণশক্তি কমিয়া যায়। গরম জল পানে এ দোষ থাকেনা।

৫। গরম জল পাকাশয় হইতে যকৃৎ প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া পিত্ত নিঃসরণের সহায়তা করিয়া থাকে।

৬। গরম জল শুষ্ক কাসের মহৌষধ। যাঁহারা শুষ্ক কাসিতে কষ্ট পান, কাসিয়া কাসিয়া পেটে ব্যথা ধরে, অথচ শ্লেষ্মা কিছুই ওঠে না, তাঁহারা যদি রাত্রিকালে শয়ন করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে এক আনা সৈন্ধব লবণ সহ দেড় পোয়া আন্দাজ গরম জল খাইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কফ তরল হইয়া যাইবে, ফলে- কাসির কষ্ট অনেকটা কমিয়া যাইবে।

৭। গরম জল হাঁপানির ব্যায়রামেও বিশেষ উপকারী। শ্বাস কৃচ্ছ্রের সময় লবণ সহ পান করিতে হয়।

৮। গরম জল পানে বাত রোগ আক্রমণের আশঙ্কা দূর হইয়া যায়। যাঁহাদের বাত আছে, তাঁহাদের বাতও ভাল হইয়া যায়।

৯। খালি পেটে আধ সের আন্দাজ গরম জল পান করিলে প্রস্রাব পরিষ্কার হয়। যাঁহাদের প্রস্রাবের পীড়া আছে (অর্থাৎ প্রস্রাব অল্প অল্প হয়, প্রস্রাবের বর্ণ—রক্ত বা পীত এবং যাঁহাদের প্রস্রাব অতিরিক্ত ক্ষারযুক্ত বলিয়া প্রস্রাব কালীন মূত্রদ্বার জ্বালা করিতে থাকে) তাঁহারা গরম জল পান করিবেন।

১০। গরম জল পান করিলে শরীরের মেদ বৃদ্ধি নষ্ট হয়।

১১। গরম জলে কিঞ্চিৎ সর্জ্জিক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, যকৃতের ভিতর পিত্ত সঞ্চয় জাত—পাথুরী জন্মিতে পারে না। সর্জ্জিকার সকল বেণের দোকানেই পাওয়া যায়।

১২। পিত্ত অবরুদ্ধ হইয়া থাকিলে যকৃতে এক রকম শূল হইয়া থাকে,—এই শূল—পূর্ব্বোক্ত বিধানে গরম জল মুহুর্মুহু পানে আরোগ্য হইতে পারে।

১৩। লবণ মিশ্রিত জল ঈষদুষ্ণ অবস্থায় পান করিলে জ্বর, বিসূচিকা, শোণিতস্রাব প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকার করিয়া থাকে। ২ রতি লবণ এক ছটাক জলে মিশাইয়া খাওয়াইতে হয়। এইরূপ ভাবে প্রস্তুত লবণাক্ত উষ্ণ জল পিচকারী দিয়া মলদ্বারে প্রয়োগ করিয়া হেম বাবু ২।৩টী মৃতপ্রায় রোগীকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন।

১৪। নূতন জ্বরের প্রথমাবস্থায় উদরের অভ্যন্তর গাত্র আমরস বা কফ কর্ত্তৃক আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। এইজন্য নূতন জ্বরে পিপাসা হইলে, জল পান করিলে সে জল উদরে শোষিত হয় না। এই জন্য জল পানে পিপাসা থামেনা, পীত জল ও বমন হইয়া যায়। কিন্তু গরম জল পান করিলে, তাহা উদরে শোষিত হয়, পিপাসাও দূর হয়।

১৫। ভোজনের অব্যবহিত পরে জ্বর হইলে, তৎক্ষণাৎ লবণ মিশ্রিত গরম জল পান করিলে ভুক্তদ্রব্য বমি হইয়া উঠিয়া যায়, তাহা আর উদরে থাকিয়া বাষ্পাকারে বিষাক্ত হইতে পারে না।

১৬। লবণ মিশ্রিত গরম জল বমনকারক, আবার বমন নাশক। তবে বমন নিবারণ করিবার জন্য অত্যুষ্ণ গরম জল ব্যবহার করিতে হইবে, অথচ যতটা গরম—রোগী সহ্য করিতে পারে, জল তত গরম চাই এবং সেই জল—মুহুর্মুহু অল্প পরিমাণে পান করাই বিধি।

১৭। গরম জল পানে স্বেদনিঃসরণ-ক্রিয়া বৰ্দ্ধিত হয়।

১৮। মূত্রযন্ত্রের প্রদাহে গরম জল বিশেষ উপকারী।

১৯। গরম জলের ভাপ্‌রা লইলে বাত রোগ এবং শোণিত দুষ্টি আরোগ্য হইয়া থাকে।

২০। গরম জলের বাষ্প—গলার ভিতর প্রবিষ্ট হইলে স্বরভঙ্গ ও বহুবিধ গলরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

২১। নিঃশ্বাস বায়ুর সহিত গরম জলের বাষ্প ফুস্‌ফুসে প্রবিষ্ট হইলে— ফুস্‌ফুসের প্রদাহ কমিয়া যায়।

২২। অভুক্ত ব্যক্তি যদি চার' মত উষ্ণ জল অল্পে অল্পে পান করে—তাহার হজম শক্তি বাড়ে।

২৩। সুস্থাবস্থায় নিয়ম করিয়া প্রত্যহ একপোয়া গরম জল খাইলে—শরীরের দূষিত মল নির্ব্বিঘ্নে নির্গত হইয়া যায়,—কোন রোগ আক্রমণের সহসা আশঙ্কা থাকে না। এই জলের মাত্রা একপোয়া হওয়া উচিত। উষ্ণ জল পানের ২।৩ ঘণ্টা পরে—তবে আহার করিবে।

২৪। ঈষদুষ্ণ জল অৰ্দ্ধ প্রহরে পরিপাক হয়। উষ্ণ জল শীতল করিয়া পান করিলে, তাহা এক প্রহরে জীর্ণ হয়। কিন্তু শীতল জল পরিপাক করিতে দুই প্রহর সময় লাগে।

২৫। কেবল মূৰ্চ্ছা রোগে, রক্তাধিক্যে, দাহ থাকিলেও সুরাপান জনিত রোগে এবং মাথা ঘোরায়—উক্ত জল পান করা বিধেয় নহে।

২৬। গরম জল পানে অভ্যন্তর দেশে স্বেদ দেওয়ার কার্য্য হইয়া থাকে।

২৭। পার্শ্বশূল, অতিসার, বাত, গলগ্রহ, আধ্মান, স্তিমিত কোষ্ঠ প্রভৃতি রোগে শীতল জল একেবারেই বৰ্জ্জন করিয়া গরম জল ব্যবহার করিবে।

২৮। নূতন জ্বর, অরুচি, গুল্ম এবং বিদ্রধি রোগে ও শীতল জলের পরিবর্ত্তে গরম জল ব্যবহার করিবে।

২৯। গরম জলে স্নান দুর্ব্বল দেহে লালসার কার্য্য করিয়া থাকে।

৩০। যাহাদের রোগ ভাল হইয়াছে—অথচ শরীরে বল হয় নাই—তাহারা গরম জলে স্নান করিবে।

গরম জলের গুণ আমাদের আয়ুর্ব্বেদ বেত্তা ঋষিগণ—সত্যযুগে কীর্ত্তন করিয়াছেন। পাঠক-গণের আগ্রহ দেখিলে, ক্রমশঃ তাহা লিপিবদ্ধ করিব।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম, এ।

প্রদর রোগ।

LEUCORRHŒA MENORRHAJIA.

—:*:—

কবিরাজী মত।—বিরুদ্ধ ভোজন. অধ্যশন (অজীর্ণের উপর ভোজন,) অজীর্ণ, মদ্যপান, গর্ভপাত, অতি মৈথুন, অশ্বাদিযানে অতিরিক্ত ভ্রমণ, অধিক পথভ্রমণ, শোক, অভিঘাত, ভারবহন, উপবাসাদির জন্য ধাতুক্ষয়, দিবানিদ্রা—ইত্যাদি কারণে স্ত্রীলোকদিগের চারি প্রকার প্রদর রোগ হইয়া থাকে।

বেদনা এবং অঙ্গমর্দ্দের সহিত অতিশয় স্রাব হইতে থাকিলে, তাহারই নাম প্রদর রোগ। দুর্ব্বলতা,ভ্রম, মূর্চ্ছা, মোহ, তন্দ্রা, প্রলাপ, আক্ষেপ, দাহ, তৃষ্ণা এবং দেহের পাণ্ডুতা—এইগুলি প্রদর রোগের বর্দ্ধিত লক্ষণ।

বাতিক প্রদরে—স্রাবের বর্ণ কতকটা গোলাপী রঙের, কখনও বা মাংস ধৌত জলের মত, ফেনা মিশ্রিত, স্রাব অল্পে অল্পে হয় বলিয়া তলপেট, কটিদেশ এবং উরুদেশে বিদ্ধনবৎ যন্ত্রণা হইয়া থাকে।

পৈত্তিক প্রদরে—স্রাবের বর্ণ কখন পীত, কখনও নীল, কখনওবা কৃষ্ণবর্ণ। যখন স্রাব হইতে থাকে, রোগিণী স্রাবকে উষ্ণ মনে করে, স্রাব প্রবলবেগে হয়—তথাপি যন্ত্রণা থাকে, গা ঝিম্ ঝিম্ করে, গাত্রদাহ খুব বোধ হয়।

শ্লৈষ্মিক প্রদরে—স্রাব পিচ্ছিল, আঁসটে গন্ধ, বর্ণ—কখন পীত, কখনও মাংসধোয়া জলের মত।

সান্নিপাতিক প্রদরে—স্রাব, কখনও মধুর মত, কখনও বা ঘৃত মিশ্রিতের মত, কখনও বা চর্ব্বির মত, কখনওবা হল্‌দে রঙ, অত্যন্ত দুর্গন্ধ। এ প্রদর ভাল হয় না। নিরন্তর অতিরিক্ত স্রাব হইতে থাকিলে, এবং তাহার সঙ্গে জ্বর, গায়ের জ্বালা, পিপাসা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দিলে, রোগী দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে—তাহার শরীরে রক্তাল্পতা ঘটে। এরূপ রোগিণীও প্রায় বাঁচেনা।

আর একপ্রকার প্রদর আছে—তাহার স্রাব—ঠিক্ জলের মত। প্রচুর পরিমাণে স্রাব হয়। রোগিণীর মাথা ঘোরে, ব্রহ্মতালু জ্বালা করে, বুক ধড়্ফড়্ করে,—ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হয় না—বিদাহ জনিত বুক জ্বালা করে। ইহার নাম "জলপ্রদর", চলিত কথায়—"জল-ভাঙ্গা" বলে।

ডাক্তারী মত।—ডাক্তারী মতে প্রদর একটী রোগ নহে—একটী লক্ষণ মাত্র। অনেক রোগে উপসর্গের মত এ লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে। প্রদরের স্রাব বুঝিতে হইলে, প্রথমে স্বাভাবিক স্রাব বুঝিতে হইবে। স্বাভাবিক স্রাব—স্কোয়েমাস ইপিথিলিয়ম হইতে নির্গত হয়, তাহাতে লসিকা মিশ্রিত থাকে। যোনির অভ্যন্তরভাগ স্রাবের পাতলা স্তর দ্বারা আবৃত থাকে। এই স্রাব—অত্যন্ত তরল, স্রাবের পরিমাণ বেশী হইলে, একটু একটু জমিয়া যায়, তাহাতে সুতার মত পদার্থও দেখিতে পাওয়া যায়।

কুমারীর এবং স্বাভাবিক গর্ভাবস্থায়, স্রাবে অধিকাংশ সময়—ভেজাইনা বাসিলাস্ পাওয়া যায়। কথনও বা সামান্য ফঙ্গসও থাকে। ইহা মোনিলিয়া ক্যাণ্ডিডি নামে পরিচিত। কিন্তু রোগজনিত স্রাবে—ইহা একেবারেই দেখিতে পাওয়া যায় না। স্রাবে—ল্যাকটিক্ অ্যাসিড্ থাকে বলিয়াই ভেজাইনা বাসিলাস দেখিতে পাওয়া যায়। অ্যাসিড্ না থাকিলে বাসিলাসেরও অস্তিত্ব থাকে না।

নবজাত কন্যার ও সূতিকাবস্থায় স্রাবে বাসিলাস বর্ত্তমান থাকে না। এই সময়ের স্রাবের প্রতিক্রিয়া—সমক্ষারাম্ল। ইহা থাকিলে ষ্ট্যাফিলোর কোকাস্, ষ্ট্রেপ্টোকো, কাস প্রভৃতি রোগের উৎপাদক জীবাণু পরিবৰ্দ্ধিত হইতে পারে না। লোকিয়া প্রভৃতি স্রাবে,—ভেজাইনা বাসিলাস্ বর্ত্তমান না থাকার জন্য—স্যাপ্রোফাইটস্ ও ষ্টাফিনোকোকাস্ ইত্যাদি পরিবৰ্দ্ধিত হয়।

রোগজনিত স্রাব—তরল, বর্ণ নানারকম, কথনও ঈষৎপীত, কথনও শুভ্র, কথনও পাটল, কথনও সবুজ, কথনও আরক্ত, আবার কথনও পূযের মত। রক্তের ভাগ বেশী থাকিলে—স্রাবের বর্ণ ঘোর লাল হইয়া থাকে।

স্রাব হইবামাত্র তাহা বহির্গত হইলে, কোন গন্ধ থাকে না। কিন্তু স্রাব যদি জরায়ুর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিয়া, পরে বাহির হয়—তাহা দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। এই স্রাব কথনও জলের মত তরল, কথনও ফেনের মত গাঢ়, এবং চটচটে ও হয়। স্রাব মাত্রায় কথনও বেশী, কথনও সামান্য। রোগজ স্রাবে—ষ্টাফিলো কোকাই, গণোকোকাই, ষ্ট্রেপ্টো কোকাই প্রভৃতি জীবাণু দেখিতে পাওয়া যায়। সময় সময় ভেজাইনা বাসিলাস্ ও মোনিলিয়া ও বর্ত্তমান থাকে।

অধিক পুরুষ সংসর্গ, অতিরিক্ত সঙ্গম, অস্বাভাবিক সঙ্গম, পরিষ্কার করিবার জন্য সাবানাদি ক্ষার পদার্থ ব্যবহার, পুনঃ পুনঃ ডুস্ প্রয়োগ—ইত্যাদি কারণে স্বাভাবিক স্রাব—রোগজ স্রাবে পরিণত হইতে পারে।

স্রাব কথনও শুভ্র—সরের মত, খুব অল্প। এত অল্প যে, অনেক নারী ইহাকে রোগের মধ্যেই ধরেন না।

স্রাবে শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে, তাহা চটচটে হয়। এইরূপ স্রাব কথনও আৰ্ত্তব নিঃসরণের পূর্ব্বে, কথনও বা পরেও হয়।

নূতন মেহ ও পুরাতন এণ্ডো মিট্রাইটিস্ থাকিলে—পূয মিশ্রিত পীত বা সবুজ বর্ণের স্রাব হইয়া থাকে।

জননেন্দ্রিয়ের অত্যধিক উত্তেজিত হইলে জলের মত স্রাব হইয়া থাকে। কথন কথন ক্যানসার হইতেও এইরূপ স্রাব হয়।

পূযের পরিমাণ অল্প থাকিলে, শুভ্রস্রাব—শ্বেতপ্রদর নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ক্ষতজন্য, পেশারী অনেক দিন আবদ্ধ থাকিলে ক্যানসার হইলে,—স্রাব অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে।

ক্যানসার, এণ্ডোমিট্রাইটিস্, ফাইব্রোমেটা, পলিপস্, জরায়ুর এণ্ডোথেলিয়োমেটাস্, ক্ষত—ইত্যাদি কারণে যে স্রাব হয়, তাহা কথনও ঈষৎ লাল, কথনও রক্তের মত গাঢ় লাল হইয়া থাকে।

জরায়ু গহ্বরে পলিপসাদি জন্মিলে পাটল বর্ণের স্রাব হয়।

স্রাবের জন্য যোনি হাজিয়া যাইতে পারে, ত্বক্ ফাটিয়া যাইতে পারে, উত্তেজনা উপস্থিত

হইতে পারে. চুলকণার উৎপত্তিও হইতে পারে।

প্রসবের পর প্রদাহ হইলে, গর্ভাবস্থায় শোণিত বহায় রক্তাবেগ হইলে, অস্ত্রোপচারের দোষ ঘটলে, আঘাতাদি লাগিলে, প্রদর লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে। ক্রিমির জন্য—বালিকাদেরও শ্বেতপ্রদর উপস্থিত হইতে পারে।

জরায়ু গ্রীবায় কর্কটোৎপত্তির—প্রথম লক্ষণ—প্রদর। জরায়ুগ্রীবায়—ইপিথি লিওমা হইলেও প্রদর লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। যে কোনও রোগ হউক না কেন—শরীরের পোষণ ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটলেও প্রদর দেখা দেয়, মানসিক উদ্বেগের জন্য ক্ষণস্থায়ী প্রদর হইতে পারে। জরায়ুর সৌত্রিক অর্ব্বুদে—প্রদর হইতে পারে, তাহার স্রাব শ্বেতবর্ণ অথবা রক্তবর্ণ। প্রমেহের জন্য শ্বেত প্রদর জন্মিতে পারে—এই প্রকৃতির স্রাবের সম্পর্শে শুক্রকীট মরিয়া যায়। কাজেই এরূপ নারীর গর্ভ সঞ্চার হয় না।

প্রদর ঔষধ প্রয়োগে, কখনও বা অস্ত্রোপচারের সাহায্যে আরোগ্য হইতে পারে। ডাক্তারী মতে—ডুস্, ট্যাম্পন, সপোজিটরী প্রভৃতি উপায় অবলম্বনে প্রদর রোগ চিকিৎসিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার দ্বারা রোগ স্থায়ীভাবে আরোগ্য হইতে দেখি নাই। ঔষধের মধ্যে লৌহ ও সেঁকো উল্লেখযোগ্য। পুরাতন প্রদরে, Cerevisin ফলপ্রদ। ইহা স্থানিক প্রয়োগে ব্যবহৃত হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থানুযায়ী চিকিৎসায় স্থায়ীফল দেখিতে পাওয়া যায় না। রোগের প্রকৃতি অনুসারে জরায়ু গহ্বর চাঁচিয়া দিতে হয়। কখনও বা কোনও অংশ একেবারে কাটিয়া উচ্ছেদ করিয়া দিতে হয়। জরায়ু গ্রীবার গ্রন্থিসমূহে প্রসারিত হইয়া পড়িলে, কটারী ব্লেড দিয়া গভীর ভাবে দগ্ধ করাই উচিত, কিন্তু একার্য্য অতি কঠিন। ২।৪ জন চিকিৎসক একযোগে মিলিয়া, একার্য্য করিতে হয়। বিশেষজ্ঞ ব্যতীত একার্য্যে অগ্রসর হওয়া উচিত নহে। বলা বাহুল্য অস্ত্রোপচারের পূর্ব্বে—রোগিণীকে সংজ্ঞাহারক ক্লোরফর্ম্মের সাহায্যে অজ্ঞান না করিয়া এরূপ চিকিৎসা চলিতে পারে না।

কবিরাজী মতে প্রদরের অসংখ্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আছে। "অশোক ঘৃত", "অশোকাসব" "পুষ্যানুগচূর্ণ" "লাক্ষাদিচূর্ণ" "চন্দনাদিচূর্ণ" "প্রদরান্তক লৌহ" প্রভৃতি মহৌষধ স্থায়ী আরোগ্য কল্পে বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে।

ইহা ভিন্ন পিচুধারণ, কাথবিশেষ দ্বারা প্রক্ষালন, সত্বই স্রাব নিবারণ করে।

দার্ব্ব্যাদি কাথ, পঞ্চবল্কল কাথ, গুলঞ্চের কাথ, জটালক্কার কাথ—ডুস্ দিয়া প্রয়োগ করিলে ক্যানসার পর্য্যন্ত আরোগ্য হয়।

আমি একজন কবিরাজকে কেবল মাত্র পাচন প্রয়োগে একটী সাংঘাতিক প্রদর রোগিণীকে আরোগ্য করিতে দেখিয়াছি।

সেই পাচনটী নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

দারুহরিদ্রা—

রসাঞ্জন—

বাসকছাল—

মুথা—

চিরাতা—

বেল শুঁঠ—

ভেলার মুঠী—

নীল সুঁদি—

প্রত্যেক ওজন।০ আনা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইতে হয়।*

ডাঃ শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়।
এল্, এম্, এস্।

বিবাহের বয়স।

—ঃ০ঃ—

চিরকাল সর্ব্বদেশেই বিবাহের একটা সময় নিরূপণ করিবার প্রবৃত্তি প্রাগরূক দেখিতে পাই। বিবাহের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সর্ব্বদেশের মতানুযায়ী নহে কিন্তু বিবাহের দৈহিক সম্পর্কটা সকল দেশেই একই ভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

এই দৈহিক সম্পর্কটাই বিবাহকে আয়ুর্ব্বেদের আলোচনার গণ্ডীতে আনিয়া ফেলিয়াছে। এই দৈহিক সম্পর্কের মধ্য দিয়াই বিবাহ—স্বাস্থ্যরক্ষার সহিত সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে।

বিবাহ আদৌ স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযুক্ত কিনা—সে কথা এক্ষেত্রে আলোচ্য নহে। সভ্য সমাজ-মাত্রেরই সৃষ্টি প্রবাহ যখন এই প্রথার আশ্রয়েই সংরক্ষিত হয়, তখন অবশ্য বিবাহকে করণীয় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া এ প্রথার সর্ব্ব অত্যাচার ও ব্যভিচারই যে শিরোধার্য্য করিতে হইবে—তাহা নহে। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বা সামাজিক স্বাস্থ্যের সহিত দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে এ প্রথার সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য।

মানুষের সভ্যতা তাহার যাবতীয় প্রবৃত্তি ও কর্ত্তব্যকে সুসংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া ফেলে। সন্তানোৎপাদন কর্ত্তব্যকে নিয়মবদ্ধ করিবার জন্য সকল সভ্য সমাজেই বিবাহ প্রথার সৃষ্টি।

সন্তানোৎপাদন যদিও সৃষ্টি ধারা রক্ষণের নিমিত্ত অবশ্য কর্ত্তব্য, তথাপি ইহাকে নিয়মবদ্ধ করার এই উদ্দেশ্য যে, সন্তান-জনন ক্রিয়া প্রায়শঃই স্বাস্থ্যহানিকর। তাই এই জনন ক্রিয়াকে এরূপ সংযত ও নিয়মিত করিতে হইবে—যাহাতে স্বাস্থ্য অটুট থাকিতে পারে। আত্মবীর্য্যের ক্ষয়দ্বারা সন্তানের সৃষ্টি হইয়া থাকে। বীর্য্যই আবার শারীরিক বল ও মানসিক মেধাদির কারণ। অতএব বীর্য্যের ক্ষয়ে শরীর ও মনের শক্তির হ্রাস হইয়া পড়ে। তাই এমন সাবধানতার সহিত এই জনন কার্য্যে ব্রতী হওয়া উচিত—যাহাতে শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি সর্ব্বাপেক্ষা কম হয়। এক

---

* এ পাচনটি 'দার্ব্বাদি' নামে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। ইহা 'প্রদরে'র বিখ্যাত পাচন। ইহার মূলের বচন এইরূপ—

দার্ব্বী রসাঞ্জন বৃষাব্দকিরাত বিল্ব—ভল্লাতকৈবর কৃতো মধুনা কষায়ঃ।
পীতো জয়ত্য বলং প্রদরং সশূলং পীতং সিতারুণ বিলোহিত নীল শুক্লম্॥—ভাঃ প্রঃ

কথায় বলিলে সন্তানোৎপাদন ও স্বাস্থ্যরক্ষা—দুইটাই যখন অবশ্য কর্ত্তব্য, তখন এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা বিধেয়—যাহাতে সন্তানোৎপাদন-ক্রিয়া স্বাস্থ্যরক্ষার মধ্য দিয়া সাধিত হইতে পারে।

মনে রাখা উচিত—সন্তানোৎপাদন একটা খুব বড় দায়িত্ব। সেবার প্রবৃত্তি এখানেও প্রবৃদ্ধ রাখা কর্ত্তব্য। এমন সন্তান জগতে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে—যাহার দ্বারা মাতৃভূমির সম্পদ্ বাস্তবিকই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়—জননী জন্মভূমির প্রকৃত সেবা সম্ভবে। নিজের কাম-বাসনার উত্তেজনার ফল স্বরূপ রুগ্ন, নিন্দিতচরিত্র কাপুরুষের সৃষ্টি করিয়া দেশের পাপভার বর্দ্ধিত করিবার অধিকার কাহারও নাই। যিনি স্বদেশের উপর এই অন্যায় সুবিধা গ্রহণ করেন, তিনি মাতৃভূমির অযোগ্য পুত্র ও চিরজীবন কৃতঘ্নতা পাপে লিপ্ত রহেন। অতএব যখন মনোবৃত্তি সমূহের সম্যক্ স্ফুরণ হইয়াছে—আমরা সংকট আত্মস্থ হইতে শিখিয়াছি—বিবাহের উদ্দেশ্য বেশ বুঝিয়াছি—দায়িত্ববোধ বেশ জন্মিয়াছে—তখনই সন্তান জনন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহার আগে নহে। অতএব সোজা কথায় বুঝিতে গেলে—স্বাস্থ্যকে বজায় রাখিয়া সন্তানোৎপাদন কার্য্য যে বয়সে সম্ভবে, সেইটাই পরিণয়ের বয়স।

কিন্তু এখানে একটু ভাল করিয়া বলিবার বিষয় আছে। আমার কথার ভঙ্গিতে কেহ কেহ হয়ত অনুমান করিতেছেন যে—আমার উদ্দেশ্য-অধিক বয়সে বিবাহের সময় নির্দ্ধারণ করা; কারণ বেশী বয়স ভিন্ন মানুষের দায়িত্ব বুদ্ধি ও সংযম শক্তি জন্মেনা। বাস্তবিকই যদি আমার বক্তব্যকে এখানে একটু অস্পষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি, তাই স্পষ্ট করিয়া কথাটা আবার বলিতেছি।

সন্তানোৎপাদন অবশ্যই বয়ঃপ্রাপ্তির পরে কর্ত্তব্য। কিন্তু সন্তানোৎপাদন ও বিবাহ—দুইটা কি একই কথা? অন্ততঃ আমার তাহা মনে হয় না। আমার মনে হয়, বিবাহ যেন একটা বড় বৃত্ত, সন্তানোৎপাদন যেন একটা ক্ষুদ্র বৃত্তাংশ। বিবাহ যদি কখন সন্তানোৎপাদনের সহিত একই অর্থ প্রকাশ করে,—তবে অবশ্য পরিপক্ক বয়সে বিবাহের ঔচিত্য স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু বিবাহের অর্থ যেখানে বিশদ—পুরুষের পক্ষে বিবাহ যেখানে স্ত্রীর আধ্যাত্মিক ও জাগতিক জীবনের সর্ব্ববিধ ভার বহন, স্ত্রীলোকের পক্ষে বিবাহ যে সমাজে যাবজ্জীবন একই স্বামীর অর্চ্চনা, সতীত্বের চরম আদর্শ—যে দেশে সেই একই স্বামীতে অনুরক্তি,-স্ত্রীজাতির ধর্ষণ যে সমাজে মহাপাপ,—এক কথায় যে সমাজে বিবাহ—সন্তানজননকে ভিত্তি করিয়া আধ্যাত্মিকতার সহিত মিশিয়া গিয়াছে, সে সমাজে পুরুষের পক্ষে না হউক—অন্ততঃ স্ত্রী-জাতির পক্ষে বাল্য বিবাহের যে মোটেই দাবী থাকিতে পারিবে না—তাহা কিরূপে বলিব?

আমরা প্রথমে বিবাহ ও সন্তানোৎপাদনকে একই অর্থে ধরিয়া বিবাহের বয়সের আলোচনা করিব, তৎপরে বিবাহকে বিশদ অর্থে বুঝিয়া বিবাহের বয়সের পুনরালোচনা করিয়া দেখিব। সর্ব্বশেষে উভয়ে আলোচনার ফলকেই আধুনিক সমাজের বিবাহের আদর্শের সহিত তুলনা করিয়া একটা সামঞ্জস্যের স্থাপন করিতে চেষ্টা করিব।

ইতর প্রাণিগণ, পৃথিবীর অসভ্যজাতিগণ ও জড়বাদী সভ্যজাতিগণ বিবাহকে সন্তানোৎ-

পাদনের সহিত একই অর্থে ধরিয়া লয়—বিবাহের আধ্যাত্মিকতা ইহাদের নিকট অলীক স্বপ্ন। কিন্তু ইতর প্রাণী ও অসভ্য জাতির সহিত সভ্যজড়বাদী জাতির কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে। ইতর প্রাণীরা সন্তানোৎপাদনের দায়িত্বজ্ঞানমাত্র শূন্য, তাই মাত্র প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হইয়া নৈমিত্তিক বিবাহ করে, এমন কি নিষিদ্ধ ও অবৈধ সঙ্গমের উপভোগ করে,—তাই ইতর প্রাণীর মধ্যে সঙ্গম একেবারে অবাধ,—তাই প্রাচীন অসভ্যজাতির যুগে পৈশাচ-রাক্ষস প্রভৃতি নানারূপ নিন্দিত বিবাহ প্রথার প্রচলন। কিন্তু আধুনিক যুগের সভ্য জড়বাদী এই দায়িত্বটা বিলক্ষণ বোঝে, তাই তাহাদের মধ্যে প্রায়শঃ নিত্য বিবাহের ব্যবস্থা আছে ও সামাজিক বন্ধনের সুশৃঙ্খলার জন্য অনিয়মিত, অবৈধ সঙ্গম নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয়। কিন্তু ইহাদের মধ্যেও বিবাহের আধ্যাত্মিক ভাব অবর্ত্তমান। তাই ইহাদের বিবাহ—সন্তানকে জারজত্বের অপবাদ হইতে বাচাইবার জন্য একটা আইনানুযায়ী চুক্তি (contract), ধর্ম্ম এখানে পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। সুতরাং স্ত্রী সতীত্বের একাগ্রতা এখানে নাই—বিভিন্ন সময়ে ইচ্ছামত স্বামী গ্রহণের নিয়ম এখানে আছে- স্বামীর জীবন কাল পর্য্যন্ত যে নারী বিশ্বস্ত রহেন—তিনিই চরম সতী। বৈধব্যকে শিরোধার্য্য করিয়া পরকালের পানে স্বামী-প্রেমের প্রত্যাশায় চাহিয়া থাকার মাধুর্য্য এ সমাজের নারীর মর্ম্মস্পর্শ করে না। এইরূপ জড়বাদী জাতির অপ্রাপ্ত বয়সে স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভয়েরই বিবাহ হওয়া একান্ত অকর্ত্তব্য —নিতান্ত গর্হিত। কেননা সন্তানোৎপাদনই ইহাদের বিবাহের উদ্দেশ্য—কাজেই অপ্রাপ্ত বয়সে বিবাহ—হয় নিষ্ফল,—না হয় প্রাণহানিকর এবং রুগ্ন সন্তান সৃষ্টির কারণ।

কথাটা আরও স্পষ্ট করিয়া বলি। স্নায়ুমণ্ডলী যাবৎ বলিষ্ঠ ও সুবর্দ্ধিত হয় নাই, মজ্জা অপরিপক্ক রহিয়াছে—তাবৎ শুক্রক্ষয় করা কোনো সভ্যজাতি সম্মত নহে। সুতরাং বিবাহকে যদি আমরা জড়বাদীর মত স্ত্রীগমন ছাড়া আর কিছুই না বুঝি—তবে পরিপক্ক বয়সেই মাত্র বিবাহ করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতে হয়।

কোন্ সময় স্ত্রীগমনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত—তাহা লইয়া বিভিন্ন দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রে বহু তর্ক আছে। সে তর্কের মীমাংসা আমাদের এ প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে। তবে সোজা কথায় বিভিন্ন তর্কগুলি বাছিয়া এই একটী সাধারণ সত্যে উপনীত হওয়া যায় যে—পুরুষের পক্ষে 'পঁচিশের' পর অর্থাৎ যে বয়সটা পর্য্যন্ত শুক্র অপরিপক্ক ও মন চঞ্চল থাকে—সেই বয়সটা উত্তীর্ণ হইলে পর স্ত্রীগমনের উপযুক্ত সময়। স্ত্রীগণ ঋতুমতী হইবার অন্ততঃ দুই বৎসর পরে মাতার কার্য্য করিবার উপযুক্ত হয়। তখন তাহাদের শরীর সুবর্দ্ধিত হয় ও বুদ্ধি—সন্তান পালনের গুরুভার লইবার পক্ষে সমর্থ হয়। তবে একটা কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, সন্তানোৎপাদনের বয়স সঠিক নির্ণয় করা অসম্ভব। স্বাস্থ্যের ভেদাভেদে ঐ বয়স নির্ণীত হওয়া উচিত। নিতান্ত ভগ্নস্বাস্থ্য কোনো উৎকট বা সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে সন্তানোৎপাদনের কার্য্য করা—অতএব জড়বাদীর মতে বিবাহ করা কোনোক্রমেই উচিত নহে। তাহাতে পৃথিবীতে রোগের প্রসার বৃদ্ধি হয় ও অকর্ম্মণ্য জীব-প্রবাহের [illegible] দেওয়া হয়

বস্তুতঃ স্বাস্থ্য ও মন বিশেষ উন্নত থাকিলে, কিঞ্চিৎ কম বয়সেও সন্তানজননের কার্য্য করা চলিতে পারে। মোটের উপর জড়বাদীর চক্ষু দিয়া দেখিতে গেলে, যখন শুক্র ধাতু সুস্থ-সন্তান জননের সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইয়াছে— ও মনের বিশেষ কর্ত্তব্য বুদ্ধি জন্মিয়াছে – তখনই বিবাহের বয়স।

কিন্তু প্রাচীন হিন্দু কখনও বিবাহকে জড়-বাদীর চক্ষু দিয়া দেখে নাই। সে বিবাহকে চিরকালই আধ্যাত্মিকতার সহিত মিলিত করিয়া দেখিয়াছিল। তাহার পক্ষে বিবাহ নর আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল না—মাত্র চুক্তি বা contract বলিয়া বিবেচিত হইত না —সে বুঝিত—বিবাহ একটা অতি বড় ধর্ম্ম—ইহা একটা sacrament – সে বুঝিত—সন্তান জননের সহিত বিবাহ সম্পর্কীভূত বটে, কিন্তু সন্তানজননই ইহার উদ্দেশ্য নহে। প্রেমে মুক্তি—বিবাহের চরম ফল,—এই চরম ফলকে লক্ষ্য করিয়া চলিবার পথে সন্তানোৎপাদন একটা প্রকৃষ্ট উপায়। সন্তান শুদ্ধ যে সৃষ্টি প্রবাহ রক্ষা করে—বংশরক্ষা করে,—নাম রক্ষা করে —তাহা নহে, মাতাপিতার আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধান করে, দাম্পত্য প্রেমকে ঘনীভূত করে। বিবাহের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণতালাভ অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপ প্রাপ্তি অর্থাৎ মুক্তি। পুরুষ উগ্রতার মূর্ত্তি, স্ত্রীজাতি কোমলতার মূর্ত্তি। বিবাহে এই দুই বিভিন্ন মূর্ত্তির – এই উগ্রতার ও এই কোমলতার – মিলন হইয়া থাকে। উভয় শক্তি পরস্পরের মধ্যে গুণের আদান প্রদান করিয়া স্বকীয় অভাব পূরণ করে ও পরকীয় অভাব মোচন করে। স্ত্রীজাতি—পুরুষের নিকট শিখে—স্বাধীনতা, আত্মনির্ভর, মানসিক বল ইত্যাদি। পুরুষ, স্ত্রীজাতির নিকট শিখে—কোমলতা, বাৎসল্য, ধৈর্য্য, দয়া ইত্যাদি। যখন উভয়ে উভয়ের সহিত আদান প্রদান করিয়া গুণের equilibrium প্রাপ্ত হয় বা গুণ বিষয়ে সমশক্তি সম্পন্ন হয়—তখনই তাহারা ঈশ্বরের চিন্তা করিবার অধিকারী হয়, কারণ ঈশ্বরের ধারণা করিতে হইলে মনকে প্রেমে তন্ময় করিতে হইবে। ঈশ্বর প্রাচীন হিন্দুর মতে প্রকৃতি-পুরুষের অপূর্ব্ব সম্মিলনের পরিণাম। দুই বিভিন্ন শক্তির অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য সংস্থাপিত। উগ্রতা, কোমলতার সঙ্গে মিশিয়াছে, ক্রোধের বক্ষে ক্ষমার মণিমালিকা দোদুল্যমান, বীর্য্যের সঙ্গে ধৈর্য্যের গরিমাময় পরিণয় সাধিত হইয়াছে।

এই উজ্জ্বলে মধুরে মিশিবার পথে সন্তান প্রধান সহায়—তাই সে দুই শক্তির মিলনের পরিণাম দাম্পত্য প্রেমকে ঘনীভূত করিয়া দেয়। সন্তান যখন জন্মগ্রহণ করে, সেই সময়ই বিবাহ সার্থক হয়—কিন্তু জড়বাদীর অর্থে নহে। দুইটী বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন প্রাণী প্রথমতঃ কামজ মোহ লইয়া একত্র হয়—তাহাদের মন তখনও পরস্পরের মধ্যে অনেকটা ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া অবস্থান করে—দ্বন্দ্বের তখনও নিরাকরণ হয় না, কিন্তু সন্তান আসে সন্ধির মূর্ত্তিতে—দুই শক্তির অপূর্ব্ব সাম্যবিধান করিয়া—সর্ব্বদ্বন্দ্বের নিরাকরণ করিয়া—বিভিন্ন দুইটা শক্তিকে একত্র গ্রথিত করিয়া। সন্তান তাই দাম্পত্য মিলনের মূর্ত্ত অবস্থা—মহা জয়ের মাল্য তাহার গলে, মুক্তির ঘণ্টা তাহার হাতে বাজিতে থাকে। স্ত্রী ও স্বামী উভয়েই দেখে—তাহাদেরই শক্তি মিলিত হইয়া আবির্ভূত হইয়াছে। তাহারা দেখে—তাহাদের সন্তান তাহাদের কাহারই সঠিক প্রতিমূর্ত্তি নহে, অথচ একই সঙ্গে উভয়েরই অনুরূপ—তাহাদের উভয়ের সাম্য

প্রাপ্ত বিভিন্ন শক্তির প্রতিফলিত ছবি—ঈশ্বরের স্বরূপের আলোক চিত্র। সন্তান-স্নেহ তাই ঈশ্বরের পূজার অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে। স্নেহ, ভক্তির সহিত গিয়া মিশে, মর্ত্ত্যের আনন্দের উপর—ইহকালের সাংসারিক জীবনের উপর—কর্ত্তব্যের উপর—স্বর্গের রশ্মি পরকালের মুক্তির প্রতিবিম্ব আসিয়া পড়িয়া ঝলসিয়া উঠে।

এই প্রাচীন হিন্দুর আদর্শে যদি আমরা বিবাহকে বুঝি—তবে দেখিব—বিবাহের মূল্য অনেক বাড়িয়া গিয়াছে! বিবাহ তখন মানব জীবনের কতিপয় চরম উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্যতম বলিয়া বিবেচিত হইবে। আমরা বুঝিতে পারিব—বিবাহ কেবল দৈহিক সংযোগমূলক নহে—বিবাহের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য মনের মিলন—আত্মায় আত্মায় অন্তহীন মৌন মহাচুম্বন। সন্তানোৎপাদন এই মিলনের একটা হেতু। বিবাহের বয়স তাহা হইলে মাত্র শরীরের পরিণতি দিয়া স্থির হইবে না, মনের উন্নতির কথাও ভাবিতে হইবে। মন যখন বিদ্যাভ্যাসের ফলে প্রেমের স্বরূপ বুঝিয়াছে, তখনই বিবাহের বয়স আসিবে—তাহার আগে নহে। তাই দ্বিজের পক্ষে হিন্দুশাস্ত্র পঞ্চবিংশ বর্ষের পর বিবাহের বয়স ধার্য্য করিতে চাহে। দ্বাদশ বর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া,বারো বৎসর গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিয়া, নানাবিধ শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিয়া দ্বিজের যখন প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও বীর্য্য স্তম্ভিত হইয়াছে, তখনই মাত্র সে প্রেমমুক্তি যজ্ঞে ব্রতী হইতে পারে, তাহার আগে নয়। পুরুষের কথা হইল, এইবার স্ত্রীলোকের কথাটা বলি।—স্ত্রীলোকের পক্ষে বাল্যবিবাহ নিতান্ত সমীচীন বলিয়া মনু প্রমুখ ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ স্থির করিয়াছেন। স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ চঞ্চলপ্রকৃতি ও ভাব প্রবণ,তাই হিন্দু ঋষি বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছিলেন, ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বেই—কামপ্রবৃত্তির উন্মেষ হইতে না হইতে—নবম বর্ষে বালিকাকে সংযতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচর্য্যব্রতপরায়ণ, সুশিক্ষিত প্রাপ্তবয়স্ক যুবকের সহিত বিবাহ দিতে হইবে। জিতেন্দ্রিয় স্বামী, স্ত্রী মাতৃকার্য্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ভার্য্যাভিগমনে বিরত থাকিতেন। সন্তান জনন কার্য্য স্থগিত থাকিলেও বিবাহ নিষ্ফল হইত না। ইতোমধ্যে উপযুক্ত স্বামী, স্ত্রীকে স্বীয় ছন্দানুবর্ত্তিনী করিয়া গড়িয়া তুলিতেন। দৈহিক মিলনের বহুপূর্ব্ব হইতেই আধ্যাত্মিক মানসিক মিলনের ক্রিয়া চলিতে থাকিত। কন্যাকে ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বেই যোগ্যপাত্রে দান করিয়া মাতা পিতা শুদ্ধ যে সামাজিক দায় হইতে মুক্ত হইতেন তাহা নহে—কন্যাকে বাল্যেই স্বামী-হস্তে সুশিক্ষার সুযোগ দেওয়া হইত, অধিকন্তু কন্যা হইতে জাতিনাশের সম্ভাবনা একেবারেই নিরাকৃত হইয়া যাইত।

কিন্তু সে প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার যুগ আজ আর নাই,—হিন্দুর আধ্যাত্মিকতা আজ পাশ্চাত্যের জড়বাদের সঙ্গে মিশিয়া একটা খিচুড়ি করিয়া তুলিয়াছে। আজ ব্রহ্মচর্য্য-জীবনের স্বতন্ত্র শিক্ষার বন্দোবস্ত ভারতের বুক হইতে মুছিয়া গিয়াছে। আজ তাই বিবাহের আদর্শ অনেকটা বদলাইয়া গিয়াছে,—আজ তাই এই জড়ত্ব ও আধ্যাত্মিকতার সামঞ্জস্যকে ভিত্তি করিয়া, নূতন করিয়া আবার বিবাহের বয়স নিরূপণের সময় আসিয়াছে।

আজ সমাজ বিশেষে স্ত্রী স্বাধীনতা,—প্রকাশ্য দরবারে স্ত্রীশিক্ষার যুগ ভারতে বর্ত্তমান। এ সম্প্রদায়ের বিবাহের বয়স নির্দ্ধারণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা বিবাহের বয়স নিরূপণ করিব তাহাদের—যাহারা আজও

হিন্দুর আধ্যাত্মিকতাকে প্রণাম করে—কিন্তু কাল মাহাত্ম্যে জড়বাদের হাত একেবারে এড়াইতে পারে না—যাহারা হিন্দু ছিলাম—হিন্দু রহিব—বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে পারে—আমাদের সেই অতি আদরের হিন্দু সন্তানকে আজ আমরা এইরূপে বিবাহের বয়স নিরূপণ করিতে অনুরোধ করি।

পুরুষ আজ জড়বাদের প্রতাপে বড় উগ্র হইয়া গড়িয়া উঠিতেছে,—স্ত্রীজাতি আগের মতই চঞ্চল থাকিতে পারে, কিন্তু অনেক সমাজেই আজিও স্ত্রীলোক সলজ্জ। তাই স্ত্রীলোকের অপেক্ষা পুরুষের বিবাহের বয়স নিরূপণ করিতেই আজ আমাদের বেশী বিবেচনা করিতে হইবে। অবশ্য অপরিপক্কশরীর বালিকাকে অস্থির মতি উগ্রস্বভাব যুবকের সহিত সঙ্গত হইতে দেওয়া কোনক্রমেই যুক্তিযুক্ত নহে, কিন্তু আমার মনে হয়—তাই বলিয়া আজ আর যুবককে অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত রাখিলে তাহার স্বাস্থ্যরক্ষার আশা বেশী করা যাইতে পারে না। এখনকার যুবকগণ আগেকার মত ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ নহেন, সুতরাং ইন্দ্রিয় সংযমে তাঁহারা অধিকারী নহেন। এ সব কথা এই "আয়ুর্ব্বেদ" পত্রিকায় যথেষ্ট আলোচনা হইয়া থাকে, সুতরাং সে সব কথার পুনরুল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বর্দ্ধিত করার আবশ্যকতা দেখি না। মোটের উপর সমাজ এখন আগেকার অপেক্ষা অনেক বেশী উচ্ছৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে—সেইজন্য এখনকার দিনে যুবকের পক্ষে অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকা বিশেষ নিরাপদ বলিয়া মনে হয় না, তাই আমার মনে হয় কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে এদেশের ছেলেরা যখন বিবাহ কি বুঝিতে পারে—তখনই তাহাকে বিবাহিত করা কর্ত্তব্য। তাহাতে তাহার স্ত্রীর প্রতি একটা দায়িত্বজ্ঞানের উন্মেষ হওয়ার অনেকটা সম্ভাবনা। এই দায়িত্ব বুদ্ধি অনেকটা তাহাকে সর্ব্বনাশের ক্রোড়ে গা ঢালিয়া দিতে বাধা দিবে—একটা শঙ্কা তাহাকে অনেকটা বাঁচাইয়া রাখিবে। কিন্তু তাই বলিয়া অভিভাবকের সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে—মন না হউক, অন্ততঃ শরীরের সম্পূর্ণ পুষ্টিসাধন না হওয়া পর্য্যন্ত স্বামী-স্ত্রীকে কখনও সঙ্গত হইবার সুযোগ দেওয়া উচিত নহে। বিবাহ সাধিত হউক—স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে দেখুক, কিন্তু প্রাপ্ত বয়স না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা যেন শারীরিক সম্মিলন লাভ না করিতে পারে।

শেষ কথা 'আতুরে নিয়মো নাস্তি'।
'সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অৰ্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ'।

যদি এমন অবস্থা হয় যে, যুবক ক্রমেই বিশৃঙ্খল হইয়া চলিয়াছে ও তাহাকে রক্ষা করিবার সর্ব্ব চেষ্টা বিফল হইয়া যাইতেছে, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ অপরিপক্ক বয়সেও উপযুক্ত বালিকার সহিত যুবককে পরিণীত ও সঙ্গত করা একান্ত কর্ত্তব্য। এরূপ স্থলে যুবক নৈতিক অবনতি হইতে অনেক সময় রক্ষা পাইয়া থাকে। একটু বিবেচনা করিলেই এ বিষয়ের যাথার্থ্য অনুমিত হইতে পারে।

স্ত্রীলোকের বিবাহের বয়স সম্বন্ধে প্রাচীন ঋষিগণের বাক্যই আমার মানিয়া চলিতে ইচ্ছা হয়, কারণ অধিকাংশ স্থলেই স্ত্রীজাতির এই জড়বাদের যুগেও পূর্ব্বের যুগের অপেক্ষা বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। জড়ত্বের আবহাওয়াটা পুরুষের উপর দিয়াই বেশী বহিতেছে। স্ত্রীলোকের উপর দিয়াও যদি বহিয়া থাকে—তবে সে সম্প্রদায় বিশেষে।

আমার কথাটা এক কথায় বলিতে গেলে এইরূপ দাঁড়ায়—বিশেষ কারণ ব্যতীত সাধারণতঃ আমাদের আধুনিক হিন্দু সমাজে (কিংবা ভারতের অনেক সমাজেই) স্ত্রীলোকের ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বে ও পুরুষের পরিপক্ক বয়সে বিবাহের সময় নির্দ্ধারণ করা উচিত। অধিকন্তু ভারতের মত উষ্ণপ্রধান দেশে যখন অল্পেই যৌবনকাল আবির্ভূত হয়, তখন বিলাতের আদর্শে আমাদের বিবাহের বয়স স্থির করা অনুচিত। যাহারা পরিপক্ক বয়স ভিন্ন স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতির পক্ষেই বিবাহ হওয়া উচিত নহে মনে করে—তাহাদিগকে, ভারতের মানুষের আয়ুষ্কালের স্বল্পতা ও যৌবনের শীঘ্রোদ্গমনের কথা স্মরণ করাইয়া বিবাহের বয়স নিরূপণ করিতে অনুরোধ করিতে পারি। মন্বাদি আর্য্যঋষিগণ সেই সকল বিষয়ের বিবেচনা করিয়াই বিবাহের বয়স নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, এক কথায় আমাদের পক্ষে তাহাই মানিয়া চলা উচিত।

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ।

ক্ষয়-রোগের বিস্তৃতি নিবারণ।

[রোগীর প্রতি উপদেশ]

—:*:—

আমি যখন প্রথম কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই —সেটা বোধ হয় ১৮৯৯ সাল—তখন এদেশে এত যক্ষ্মারোগের প্রাদুর্ভাব হয় নাই। এখন দেখিতে দেখিতে এ রোগ দেশব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে। রোগের ভীষণত্ব ও পরিণাম দেখিয়া অনেকেরই ধারণা হইয়াছে,—যক্ষ্মা রোগ চিকিৎসকের অসাধ্য ব্যাধি। কিন্তু বাস্তবিক এ ধারণা নিতান্তই ভ্রমাত্মক। যাঁহারা শবব্যবচ্ছেদ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন যে, অন্য শারীরিক যন্ত্রের পীড়া বশতঃ মৃত্যু হইয়াছে—এরূপ শবের ব্যবচ্ছেদ কালীন শতকরা দশজনের ফুস্‌ফুসে যক্ষ্মা-রোগের আরোগ্য চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। সময়ে সময়ে যক্ষ্মারোগ আপনা আপনিই ভাল হইতে পারে—চিকিৎসিত হইলে ত কথাই নাই। আমি কবিরাজী চিকিৎসায় ৪।৫ জন ক্ষয়রোগীকে ভাল হইতে দেখিয়াছি। আয়ুর্ব্বেদে ক্ষয়রোগের অনেক উৎকৃষ্ট ঔষধ আছে। সে সকল কথা বিশেষজ্ঞেরা বলিবেন। আমি কেবল ক্ষয়রোগের বিস্তৃতি নিবারণের জন্য কতকগুলি উপদেশ লিপিবদ্ধ করিব।

১। যেখানে সেখানে থুথু ফেলিবেনা। এমন কি পথে ঘাটে যথায় সর্ব্বদা লোক জনের গতিবিধি, সেখানে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করা একেবারেই নিষিদ্ধ।

২। কাসিতে কাসিতে যে শ্লেষ্মা উঠিবে, কদাচ তাহা গিলিবে না। কারণ সেই শ্লেষ্মা উদরে যাইয়া জীবাণুর অতি-বৃদ্ধি এবং অন্যান্য উপসর্গও ঘটাইতে পারে।

৩। একটী নির্দ্দিষ্ট পাত্রে শ্লেষ্মা ফেলিবে। ঐ পাত্র ধাতু পাত্র হইলে—প্রত্যহ ২ বার, অত্যুষ্ণ জলে ১ ঘণ্টা করিয়া ভিজাইয়া রাখিবে

পরে তাহাতে ক্লোরিনেটেড লাইম ও জল পূর্ণ করিয়া তাহাতেই থুথু ফেলিবে। পাত্র অভাবে কাগজে বা নেকড়ায় থুথু ফেলিয়া উহা তৎক্ষণাৎ দগ্ধ করিয়া ফেলিবে।

৪। যে রুমাল বা গামছা তৎক্ষণাৎ দগ্ধ করিতে পারিবে না, সেরূপ রুমাল বা গামছায় --মুখ এবং গাত্র কখনও মুছিবে না।

৫। ক্ষয়রোগীরা প্রায়ই দেবতা বিশেষের কাছে মানত করিয়া দাড়ী, গোঁফ, চুল ও নখ রাখিয়া থাকে। ইহা বড় সাংঘাতিক। মুখের দাড়ী গোঁফ --একেবারে কামাইয়া ফেলিবে। হাতের নখ---কাটিয়া ফেলিবে। মাথার চুল বাধায়—তাদৃশ আপত্তি নাই।

৬। কোন কিছু আহার করিবার পূর্ব্বে, মুখ, ওষ্ঠ ও হাত---বেশ করিয়া প্রক্ষালন করিবে।

৭। শরীরের কোন স্থানে ক্ষত থাকিলে, তাহা ঢাকিয়া রাখিবে।

৮। গরম দুগ্ধ শীতল করিবার জন্য—ফুঁ দিবে না। ফুঁ দেওয়া দুগ্ধ নিজেও খাইবে না, অপরকেও খাইতে দিবে না।

৯। নিজের পুত্র কন্যাদির মুখ চুম্বন এবং বন্ধুর সহিত করমর্দ্দন করিবে না।

১০। লোকের সম্মুখে কাসির বেগ উপস্থিত হইলে, মুখে চাপা দিয়া কাসিবে।

১১। যতক্ষণ পারিবে—মুক্ত বাতাসে বসিয়া থাকিবে।

১২। কখনও পরিশ্রমজনক ব্যায়াম করিবে না।

১৩। রৌদ্র, বৃষ্টি, শীত, গ্রীষ্ম—সকল সময়েই ঘরের দরজা জানালা খুলিয়া নিদ্রা যাইবে। এজন্য ঠাণ্ডা লাগিবার ভয় করিও না, কেবল গাত্রে একটা আচ্ছাদন দিবে।

১৪। রাত্রে—শীঘ্র শীঘ্র নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিবে, দিবসে আদৌ নিদ্রা যাইবে না।

১৫। কাজ করিতে হইলে বাড়াবাড়ি করিবে না, ধীরে সুস্থে করিবে। মধ্যে মধ্যে বিশ্রামও করিবে।

১৬। চিকিৎসকের উপদেশ ভিন্ন ঔষধ সেবন করিবে না। ঔষধে অনেক সময় উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারই হইয়া থাকে—এ কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও।

১৭। সুরা ঘটিত উত্তেজক পদার্থ সেবন করিও না।

১৮। যে দ্রব্য পরিপাক করিতে বিলম্ব হয়, তাহা খাইবে না।

১৯। নিজের রোগকে অসাধ্য ভাবিয়া আরোগ্যে হতাশ হইওনা। আজ কাল বিজ্ঞান জগতে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, বিজ্ঞানের কৌশলে অনেক ক্ষয়রোগী মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া আসিতেছে। মনে উৎসাহ এবং প্রতিকারে আগ্রহ থাকিলে, তোমার রোগও ভাল হইবে। এই বিশ্বাস কখনও ত্যাগ করিও না। মানুষের দেহে স্বষ্টিকর্ত্তার এমন কৌশল আছে, যে কৌশলে ক্ষয়রোগের আক্রমণ সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ করিতে পারা যায়।

২০। নিজের পীড়া অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে---এরূপ চিন্তা মন হইতে একেবারেই দূর করিবে।

২১। তোমার রোগে—তোমার আত্মীয়-স্বজন যাহাতে আক্রান্ত হইতে না পারে, সে দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিবে।

২২। লালবর্ণের জামা ও বস্ত্র এবং ঐ প্রকারে শীত বস্ত্র কখনও ব্যবহার করিবে না।

২৩। রাগ, দুঃখ, অভিমান ত্যাগ করিবে।

২৪। উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিবে না।

২৫। স্ত্রীলোকের মুখ পর্য্যন্ত দেখিবে না। যে পুস্তকে প্রণয় ঘটিত ব্যাপার বা স্ত্রীলোকের রূপ বর্ণিত হইয়াছে,—সে পুস্তক পর্য্যন্ত পড়িবে না।

২৬। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম প্রসঙ্গে দিন কাটাইবে।

২৭। লঘু ও পুষ্টিকর পথ্য ভোজন করিবে।

২৮। সম্ভব হইলে, প্রত্যহ অন্ততঃ এক ছটাক ছাগলের দুগ্ধ পান করিবে, এবং স্বহস্তে অন্ততঃ একঘণ্টা কাল ছাগলের সাহচর্য্যে থাকিয়া তাহার সেবা করিবে।

২৯। নারিকেল কুরিয়া তাহার দুগ্ধ বাহির করিয়া,সেই দুগ্ধে—তাহার চতুর্গুণ জল মিশাইয়া—একটা কাচ বা প্রস্তর পাত্রে করিয়া রাত্রে শিশিরে রাখিয়া দিবে, একখানি পাতলা কাপড় দিয়া ঐ পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখিবে। প্রাতঃকালে উঠিয়া ঐ পাত্রের উপরিস্থিত স্নেহপদার্থ টুকু খাইবে।

৩০। সহ্য করিবার শক্তি থাকিলে, প্রত্যহ টাট্‌কা দুগ্ধের সহিত কাঁচা ডিম মিশাইয়া খাইবে। প্রথমে একপোয়া দুগ্ধে একটী ডিম, তিনদিন পরে, আধসের দুগ্ধে দুইটী ডিম, আরও ৩দিন পরে—তিন পোয়া দুগ্ধে ৩টী ডিম —এইরূপে পরিপাক শক্তি বুঝিয়া ডিম ও দুগ্ধ বাড়াইবে। ইহাতে দৈহিক গুরুত্ব বৃদ্ধি হইবে।

৩১। উন্মুক্ত বাতাসে দাঁড়াইয়া—প্রত্যহ —২।১ মিনিট করিয়া গভীর শ্বাস গ্রহণ করিবে, ইহাতে ফুস্‌ফুস্ সবল হইবে।

৩২। বিশেষ প্রয়োজন না হইলে জোলাপ লইও না।

ক্ষয়-রোগ বীজাণুর প্রতিষেধক।

—যক্ষ্মা জীবাণু—দেহে প্রবেশ করিলে, তাহা একেবারে ধ্বংস করা অসম্ভব। ঔষধপ্রয়োগে উক্ত জীবাণুর বংশ বৃদ্ধির হ্রাস করা যায় মাত্র। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতে—এই কার্য্যের জন্য যে সব ঔষধ পরিকল্পিত হইয়াছে—ক্রিয়সট তাহার অন্যতম। আমি ক্ষয়রোগে "ক্রিয়সট" বা তদবটিত 'গুইএকল' বহুকাল হইতে ব্যবহার করিয়া আসিতেছি। এই ঔষধ—যক্ষ্মাবীজাণু হ্রাস করিবার জন্য অনেকদিন হইতেই চিকিৎসক সমাজে প্রচলিত আছে।

বৈদ্যমতে—বাসকবৃক্ষ ক্ষয়রোগের একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ। এমন কি, বাসক ব্যবহার করিলে, ক্ষয়রোগীর বিপদের ভয় থাকে না—ইহাই আয়ুর্ব্বেদের সিদ্ধান্ত। যথা—

"ক্ষয়োৎপত্তি বিনাশায় সিংহাস্যং সেব্যতাং সদা।"—একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আমি বহুস্থলে বাসক পাতার রসের সহিত ক্রিয়সট মিশাইয়া রোগীকে সেবন করিতে দিয়া—আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছি।

বাসকপাতার রস ২ ওন্স বা একছটাক, রস অভাবে পাতা সিদ্ধ জল—আধপোয়া লইয়া তাহাতে ২৪ মিনিম ক্রিয়সট মিশ্রিত করিয়া—দিনে রাতে ৪ বারে ইহা খাইতে হইবে। ইহাতে কাসির উপশম হয়, পূয় দোষ ও দুর্গন্ধ দূর হয়, রক্ত ওঠা নিবারণ করে। অধিকন্তু —অন্ত্রশুদ্ধ এবং ক্ষুধাবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বাসক—জ্বর নষ্ট করে—রাত্রিকালের ঘাম বন্ধ করে, অতিসার ভাল করে।

তবে এই দুইটার মিশ্র খাইতে অত্যন্ত বিস্বাদ। একে বাসকের তিক্ত রস, তাহার সঙ্গে ক্রিয়সটের দুর্গন্ধ। পাচাণীর তাহার বলিতে গেলে বলিতে [illegible]

"এবা 'দু'জন' সুজনেরই চুড়ো,
যেমন, আদার রসে গোল মরিচের গুঁড়ো।

ক্রিয়সট জীবাণু নাশক, ইহা নিতান্তই খাইতে না পারিলে ইহার স্থলে—পিপারমেণ্ট তৈলও দেওয়া চলে। কিন্তু বাসককে ত্যাগ করা চলে না। বরং বাসকের দুঃস্বাদ দূর করিবার জন্য বাসকের ক্বাথে চিনী দিয়া পাক করিয়া সিরাপ প্রস্তুত করা উচিত। সামান্য সর্দ্দী কাসি, ব্রঙ্কাইটিস হইতে—অসাধ্য ক্ষয়কাসি পর্য্যন্ত বাসক প্রয়োগে আরোগ্য হইতে পারে। এটী পরীক্ষিত সত্য।

পথ্য।—ক্ষয়রোগী এমন পথ্য গ্রহণ করিবে—যাহাতে ক্ষয়ের পূরণ হইতে পারে। ক্ষয়ের পূরণ করিতে পারিলেই—রোগীর জীবনী শক্তি বৃদ্ধি হইবে, সঙ্গে সঙ্গে জীবাণুর বিষ ক্রিয়াও নষ্ট হইবে। অতএব পথ্যের দিকে সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি রাখা চাই। ক্ষয়রোগীকে যত পারিবে খাওয়াইবে। উপবাস দিতে দিবে না।

প্রত্যহ প্রাতে ১ গ্লাস উষ্ণজল মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিবে। ১১টার সময়—অবস্থা বুঝিয়া রুটী বা অন্নের সঙ্গে—এক পোয়া মাংসের ঝোল বা মসূর ডালের যুষ, টাটকা শাক-সব্জি তরকারি; ৩টার সময় আঙুর পেঁপে প্রভৃতি ফল ও দুগ্ধ; রাত্রে—লুচি, রুটী, মোহনভোগ, শয়ন করিবার সময়—বার্লি মিশ্রিত দুগ্ধ—এক বাটী। অবশ্য প্রবল জ্বর ও অগ্নিমান্দ্য থাকিলে—স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। রোগীর হজমশক্তি থাকিলে, এবং মাংস ভোজনে আপত্তি থাকিলে, ভুট্টার আটার রুটী ও মসূর যুষ—উৎকৃষ্ট পথ্য। মসূর ডালে ফস্‌ফেট ও লৌহ থাকায়; ভুট্টার লৌহ জাতীয় পদার্থ থাকায়—ক্ষয় নিবারণ করে। দুগ্ধ ও মাংস যে ক্ষয় নিবারক—বহুযুগ পূর্ব্বে ঋষিরাও ইহা জানিতেন; যথা—

"ক্ষয়ে মাংস রসঃ পয়ঃ।" আমাশয় বা উদরাময় থাকিলে, প্রথমে শীতল জলে নল দ্বারা আমাশয় ধুইয়া ফেলিবে, পরে দুগ্ধের সহিত ডিমের শ্বেতাংশ মিশাইয়া খাইতে দিবে।

পরিচ্ছদ।—পরিচ্ছদের প্রতিও দৃষ্টি রাখিবে। গাত্রে বেশী কাপড় জড়ানো ভাল নহে। পোষাক খুব ভারি না হয়। যাহাতে হঠাৎ ঠাণ্ডা না লাগে, অথচ ঘাম গায়ে না বসিতে পারে, এইরূপ পোষাক নির্ব্বাচন করিবে। পরিধেয় বস্ত্রাদি—দুইবেলা পরিবর্ত্তন করিলে ভাল হয়। পায়ে সর্ব্বদাই মোজা রাখিবে, ঋতুভেদে পরিচ্ছদ পাৎলা বা মোটা স্থির করিয়া লইবে।

বাসগৃহ। শুষ্ক ও উচ্চভূমিতে স্থিত যে গৃহ—ক্ষয় রোগী সেইগৃহে বাস করিবে। অথচ ঘরের পার্শ্বে গাছ পালা না থাকে। ঘরে রীতিমত রৌদ্র ও বাতাস আসা চাই।

বায়ু পরিবর্ত্তন।—ডাক্তারী মতে চেঞ্জ ক্ষয় রোগীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। চেঞ্জের আবশ্যক—পূতিঘ্ন বায়ু ও সূর্য্যালোক প্রাপ্তির সুবিধা এবং রমণীয় দৃশ্য দর্শনে মনের প্রফুল্লতা সম্পাদন। আমাদের এ দেশের সহর গুলি কল কারখানা, ড্রেণ পাইখানা, বহু লোক জনে পূর্ণ, কৃত্রিম আলোকে উদ্ভাসিত। অধিকন্তু এ সকল সহর মলমূত্র আবর্জ্জনা, ধূম ও কাদাধূলায় ভরা; পল্লীগ্রামগুলিও বন জঙ্গলে খানা ডোবায় পূর্ণ; সুতরাং কি সহর, কি পল্লীগ্রাম—সকল স্থানেরই জলবায়ুই দূষিত হইয়া পড়িয়াছে। বরং পল্লীগ্রামের তত দূষিত নয়, সহরের বাতাস যত দুষ্ট। এইরূপ সহরে

সুস্থ মানুষ বাস করিলেই যক্ষ্মা রোগ হয়। প্রাচীন আর্য্য চিকিৎসকগণ বলিয়া গিয়াছেন—হেতু বিপর্য্যয়ই রোগের উত্তম প্রতিকারের পন্থা। অতএব যে স্থানে থাকিলে মানুষের রোগ জন্মে, রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইলে সে স্থান ছাড়িয়া যাওয়াই সদ্বিবেচনার কার্য্য।

এখন দেখা যাউক—ক্ষয়রোগী বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য কোন্‌স্থানে যাইবে?

যে স্থানের বাতাসে ধূলি প্রভৃতি পার্থিব ময়লা নাই, যে স্থানের বায়ু—মলমূত্র ও বহু লোকের নিশ্বাস দুষ্ট নহে, রোগোৎপাদক জীবাণু কলুষিত করিতে পারে না, অপিচ—যে স্থানে বাতাসে পূর্ণ মাত্রায় অম্লজান আছে, এবং পূতিনাশক "ওজন" আইওডিন্, ক্লোরিন্ প্রভৃতি ভাসমান পদার্থ আছে, এইরূপ স্থানে রোগীর বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য যাওয়া উচিত। যে স্থানে আকাশ পরিষ্কার, প্রায়ই মেঘ, কুজ্ঝটী ও অতিবৃষ্টি নাই, যেস্থল প্রখর রৌদ্রে উজ্জ্বল, এইরূপ স্থান রোগীর বাস যোগ্য।

পার্ব্বত্য স্থান, মরুভূমি, সমুদ্র তীর ও সমুদ্র বক্ষ রোগীর পক্ষে বিশেষ স্বাস্থ্যকর স্থান। এই সকল স্থানের বাতাস—জীবাণুশূন্য, শুষ্ক, ও শীতল রৌদ্র তীক্ষ্ণ। এইরূপ স্থানে থাকিলে, অম্লজান ও ওজনের উত্তেজনায় দেহে শোণিত সঞ্চালনের বৃদ্ধি হয়। ফুসফুসের রক্তাধিক্য প্রশমিত হয়, শ্লেষ্মা কমিয়া যায়, উত্তাপের শান্তি হয়। এই সকল স্থানে থাকিলে শারীর যন্ত্রের শক্তি ও ক্রিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু যাহাদের রোগ অনেকদিন হইয়াছে, যাহাদের প্রকৃতি উগ্র, যাহাদের হৃদপিণ্ডের দোষ জন্মিয়াছে, ল্যারিংসে ঘা হইয়াছে, শরীর অতি জীর্ণ ও দুর্ব্বল, ফুস্‌ফুসে ক্ষত হইয়াছে, ঘন ঘন রক্ত উঠিতেছে তাহাদের পক্ষে পার্ব্বত্যস্থান ভাল নহে। তাহারা মরুপ্রদেশে বাস করিলে উপকার হইতে পারে, কেননা—মরুপ্রবাহিত বায়ু শুষ্ক, অম্লজান ও "ওজন" পূর্ণ—জীবাণু শূন্য।

যে সকল রোগীর প্রকৃতি উগ্র, বায়ুনলীর উত্তেজনায় যাহারা ক্রমাগত কাসিতে থাকে, তাহারা সমুদ্রবক্ষে বাস করিবে। সমুদ্র-বায়ু নাতি শীতোষ্ণ, সমুদ্র তীরের বায়ুও অনেকটা সমুদ্রবক্ষ বায়ুর মত। একমাস সমুদ্র যাত্রায় যে ফল পাওয়া যায়, ৬ মাস স্বাস্থ্য নিবাসে থাকিয়া, বড় ডাক্তারের ব্যবস্থাপিত সহস্র ঔষধ সেবনেও সে ফল পাওয়া যায় না।

সমগ্র শীতকালটা সমুদ্র উপকূলে বাস করিলে, ক্ষয়রোগীর বহু উপকার হইবার সম্ভাবনা।

পার্ব্বত্যস্থানের মধ্যে—দাক্ষিণাত্যের নীলগিরি, কলুর উটকামণ্ড, মধ্য ভারতের আরাবল্লী পর্ব্বতমালা, আবু শিখর, উত্তরে মসুরী মারী—অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। সমুদ্র উপকূলের মধ্যে—পুরী, ওয়ালটেয়ার, লঙ্কাদ্বীপের পূর্ব্বভাগ—খুব ভাল স্থান। মরুদেশের মধ্যে—রাজপুতানা শ্রেষ্ঠ।

কোন্ রোগীর পক্ষে কোন্‌স্থানে যাওয়া উচিত,—চিকিৎসক তাহা স্থির করিয়া দিবেন।

তরুণ যক্ষ্মারোগী—যাহার উভয় ফুসফুস আক্রান্ত হইয়াছে, যাহার রোগ খুব প্রবল, যাহার ক্ষয় দ্রুতগতিতে আরম্ভ হইয়াছে, এবং যে রোগী বন্ধুবান্ধব ছাড়িয়া বিদেশে যাইতে ইচ্ছুক নহে, এরূপ রোগীকে [illegible]

পাঠাইবে না। রোগীকে প্রসন্ন রাখিতে পারিলে, অস্বাস্থ্যকর স্থানেও তাহার রোগের হ্রাস হইতে পারে, আর রোগী যদি ভরসাহীন, অবাধ্য, আবদ্ধস্থানবাসী, মুক্ত বায়ু-বিদ্বেষী, আহার-বিহারের নিয়ম লঙ্ঘনকারী, এবং মানসিক ও কায়িক অত্যাচারী হয়—স্বর্গের মত স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিলেও তাহার অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

এই প্রবন্ধে আমি যে সকল যুক্তির উত্থাপন করিলাম, তাহা আমার নিজেরই যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতার ফল। আমার একান্ত অনুরোধ—কি ডাক্তার, কি কবিরাজ, কি হোমিওপ্যাথ,—যিনি যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসা করিবেন, তিনি যেন তাঁহার রোগীকে ও তাহার শুশ্রূষাকারীকে—এই সকল নিয়ম পালন করিবার জন্য উপদেশ দেন। ইহা ভিন্ন—এ রোগের বিস্তৃতি নিবারণের অন্য উপায় দেখি না। ইহাতে রোগীরও উপকার হইবে,—রোগীর আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুবান্ধব ও দেশবাসীর উপকার হইবে। যাঁহারা যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসা বা সুশ্রূষা করিবেন, তাঁহারা সর্ব্বদাই রুমালে করিয়া ক্রিয়সটের আঘ্রাণ লইবেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ হালদার এল্, এম্, এস্।

হিন্দুর স্বাস্থ্যনীতি।

——:*:——

প্রত্যেক সভ্যরাজ্যে স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ নিবারণ জন্য স্বাস্থ্যবিভাগ সংগঠিত আছে। রোগোৎপত্তির সাধারণ কারণ সমূহ দূর করা এই স্বাস্থ্য বিভাগের কার্য্য। রাজপথ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত করা, পরিত্যক্ত আবর্জ্জনা রাশি সত্বর দূরীকরণ, পানীয় জলের কষ্ট নিবারণ, অসহায় দরিদ্র রোগীদের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন, সংক্রমণ নিবারণ জন্য সংক্রামক রোগগ্রস্ত রোগীদিগকে স্থানান্তরিত করণ প্রভৃতি কার্য্য স্বাস্থ্যবিভাগ দ্বারা সম্পাদিত হয়। স্বাস্থ্য হানিকর কার্য্যানুষ্ঠানে বা স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতিবন্ধকতা আচরণে সকলকে বিরত রাখিবার জন্য আইনাদি বিধিবদ্ধ করাও স্বাস্থ্যবিভাগের কার্য্য।

বর্ত্তমান সভ্যজগতে স্বাস্থ্য বিভাগ দ্বারা সাধারণ স্বাস্থ্য রক্ষা করা হয়। প্রাচীন ভারতে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কি বন্দোবস্ত ছিল, তাহাই আমাদের এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। হিন্দু চিরকালই ধর্ম্মভীরু। যদিও পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে এই ধর্ম্মভীরুতার আংশিক অপনোদন হইয়াছে, তথাপি স্ত্রীলোকদের মধ্যেও যাঁহারা সহর ঘেঁসা নহেন, তাঁহাদের ভিতর এই ধর্ম্মভীরুতার প্রাবল্য এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। বর্ত্তমানকালে আইন আদালতে দলিল, দস্তখত, সাক্ষী, রেজেষ্টারী প্রভৃতি সত্ত্বেও সত্য অসত্য হইয়া যাইতেছে, কিন্তু পূর্ব্বে ধর্ম্মভীরুতার প্রভাবে কেবল মুখের কথায় সত্য রক্ষা হইত। তদ্রূপ ধর্ম্মের দোহাই দিয়া স্বাস্থ্যরক্ষাও অতি সহজে হইত;

হিত হইত। হিন্দুর নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার প্রত্যেকটী স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে বা রাত্রির শেষ যামার্দ্ধ হইতে হিন্দুর প্রাতঃকৃত্য আরম্ভ। এইকালে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণকেই নিদ্রাত্যাগ করতঃ শয্যার উপর উত্তরাস্য বা পূর্ব্বাস্য হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক দীক্ষাগুরুকে ধ্যান ও প্রণাম করিতে হয়—এবং দেবদেবী ও পুণ্যশ্লোক মহাত্মাগণের নামানুকীর্ত্তন করিয়া পরে পৃথিবীকে প্রণাম পূর্ব্বক শয্যাত্যাগ করিতে হয় ইহাই হিন্দু শাস্ত্রের বিধি। এই ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে নিদ্রাত্যাগ স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ হিতকর। পাশ্চাত্য স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্রে early rising বা প্রত্যূষে নিদ্রোত্থান স্বাস্থ্যকর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ আহ্নিক-ক্রিয়া দ্বারা স্বাস্থ্যসাধন যে কেবল শারীর বিজ্ঞান (Physiology) অবলম্বনে সংগঠিত তাহা নহে, ইহাতে Psychology বা মনোবিজ্ঞানও অন্তর্নিহিত আছে। মহাত্মাগণের নাম স্মরণ ও কীর্ত্তন দ্বারা মানবের মনোভাব গঠিত হয়। মনের সহিত শরীরের অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। সুতরাং মানসিক উৎকর্ষও স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য প্রয়োজনীয়।

নিদ্রোত্থানের পর মলমূত্রত্যাগ বিধি। গ্রামে বাসস্থানের দেড়শত হস্ত দূরে ও নগরে তাহার চতুর্গুণ দূরে নৈঋত কোণে মলত্যাগের স্থান নির্ব্বাচন করা শাস্ত্রীয় বিধি। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, আবাস ভূমির বায়ু যাহাতে দূষিত না হয় তাহারই ব্যবস্থা। পল্লীগ্রাম অপেক্ষা নগরের লোক সংখ্যা অধিক, সুতরাং পুরীষ রাশির পরিমাণও অধিক, তজ্জন্য সেকালে গ্রাম্য বাসস্থান অপেক্ষা নাগরিক বাসস্থানের অধিক দূরে মলত্যাগের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইত। নৈঋত কোণ নির্দ্দিষ্ট হইবার কারণ, বোধ হয়—নৈঋত বায়ু প্রায় প্রবাহিত না হয়,—বা যদি প্রবাহিত হয়—তাহাও ক্ষণিক। মলমূত্র ত্যাগকালে মৌনাবলম্বন আবশ্যক, এবং নিষ্ঠীবন ত্যাগ ও শ্বাস গ্রহণ নিষিদ্ধ। মলত্যাগ কালে পরিধেয় বসন কটিদেশের ঊর্দ্ধভাগে স্থাপন করিতে হয়। পাদুকা পরিধান করিয়া, দণ্ডায়মান বা ভ্রাম্যমান অবস্থায় মলমূত্রত্যাগ নিষিদ্ধ। এই সব পদ্ধতি যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় উন্নতির জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। সেকালে কেবল যে মানবজাতির বাসস্থান স্বাস্থ্যজনক রাখিবার জন্য ব্যবস্থা ছিল তাহা নহে, গবাদি গৃহপালিত পশ্বাদির স্বাস্থ্যের প্রতিও লক্ষ্য রাখিবার নিয়ম ছিল। যথা:—

"সদেব গো ব্রাহ্মণ বহ্নিমার্গে ন রাজমার্গে
ন চতুষ্পথে চ।
কুর্য্যাদথোৎসর্গমপীহ গোষ্ঠে পূর্ব্বাং
পরাঞ্চৈব সমাশ্রিতাং গাম্॥"

দেবতা, গো ব্রাহ্মণ ও অগ্নির অভিমুখে রাজপথে, চতুষ্পথে, গোষ্ঠে, অথবা যে স্থানে পূর্ব্বে গো চারণ হইয়াছিল বা পরে হইবে—সেরূপ স্থানে মলত্যাগ নিষিদ্ধ।

মৃত্তিকা দুর্গন্ধ হারক এবং ক্ষারাদি সংশ্লিষ্ট থাকায় ক্লেদাদি অমঙ্গল দূরীভূত করে। তদ্ভিন্ন ইহা Disinfectant বা সংক্রমণ দোষ নাশক। এই জন্য হিন্দুশাস্ত্রে শৌচার্থে ইহা ব্যবহার করিবার নিয়ম। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত স্বাস্থ্যনীতির এতই ঘনিষ্ট সম্বন্ধ যে, যে মৃত্তিকাও আবার বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক তাই শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন,—

"জলমধ্য হইতে, মূষিক গর্ত্ত হইতে, অগ্নি বা অন্যের শৌচাবশিষ্ট হইতে অথবা পুরীষ হইতে শৌচার্থ মৃত্তিকা আহরণ করিবে না।

ইহার পর প্রাতঃস্নানের ব্যবস্থা। কিন্তু তাহাতেও নিয়মাদি বিধিবদ্ধ। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই প্রাতঃস্নানের সময়। প্রাতস্নান ভিন্ন দৈব ও পিতৃক্রিয়ার অধিকার হয় না। সুতরাং ধর্ম্মভীরু হিন্দুর পক্ষে প্রাতঃস্নান অবশ্য কর্ত্তব্য। স্রোতঃজলে স্রোতাভিমুখীন হইয়া ও স্রোতঃহীন জলে সূর্য্যাভিমুখীন হইয়া, নাভিমগ্ন জলে দাড়াইয়া, করদ্বয় দ্বারা মুখ নাসিকা, কর্ণ আচ্ছাদন পূর্ব্বক ডুব দিতে হয়। জলাশয় অপরের হইলে ডুব দিবার পূর্ব্বে উহা হইতে তিনটী বা পাচটী মৃৎপিণ্ড উঠাইয়া তীরে নিক্ষেপ করিয়া "উত্তিষ্ঠোপিষ্ঠ পঙ্ক ত্বং ত্যজ পুণ্যং পবস্তু চ। পাপানি বিলয়ং যান্তি শান্তিং দেহি সদা মম॥"—এই মন্ত্রপাঠ করিতে হয়। ইহাও স্বাস্থ্যবিভাগের কার্য্য। প্রত্যেকে যদি প্রতিদিন স্নান কালে তিনটী বা পাচটী মৃৎপিণ্ড জলাশয় হইতে উঠাইয়া ফেলে, তাহা হইলে জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধর ক্রিয়া অতি সহজেই সম্পাদিত হয়, এক কথায় এইজন্যই ইহার ব্যবস্থা।

আবার স্নান কালে মস্তক, বক্ষঃস্থল প্রভৃতি অঙ্গ মৃত্তিকা দ্বারা মার্জ্জনা করিবারও বিধি আছে, তাহার কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি—মৃত্তিকা দুর্গন্ধহারক, ক্লেদ বিমোচক ও Disinfectant বা সংক্রমণ নিবারণ।

এইরূপ শয়ন, ভোজন প্রভৃতি প্রত্যেক কার্য্যে হিন্দুর যে সব পদ্ধতি আছে, তৎসমুদয়ই স্বাস্থ্যোন্নতিকর। পরিচ্ছন্নতা হিন্দুধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। রাত্রিবাস বা অধৌত বসন পরিধান করিয়া আহ্নিকপূজা ও ভোজনাদি ক্রিয়া হিন্দুর পক্ষে একেবারে নিষিদ্ধ। এমন কি, অধৌত বসনে ও স্নান না করিয়া রন্ধনাদি ক্রিয়া ও পূজাদির আয়োজন করিতে পারা যায় না।

তিথি, বার, মাস ও ঋতুভেদে যে ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য নিষিদ্ধ আছে, তাহাও সংরক্ষণার্থ ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতকের দোহাই দিয়া নিবারিত হইয়াছে। বিরুদ্ধভোজন সম্বন্ধেও তদ্রূপ।

আবার গৃহমধ্যে যাহাতে আবর্জ্জনা রাশি স্তূপিকৃত করিয়া না রাখা হয়—তাহারও বিধি স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য।

আবার infection বা স্পর্শাদি দ্বারা রোগাক্রমণ নিবারণের জন্য ও ব্যবস্থা আছে।

এইরূপে হিন্দুর সৎক্রিয়া পদ্ধতি সমুদায় আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়—শারীরিক বা স্বাস্থ্য সাধন করিবার জন্য প্রত্যেক ক্রিয়া কলাপে ধর্ম্মের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস।

গার্হস্থ মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কা।

—:*:—

চক্ষুরোগে—(১) হরীতকীর শাঁস ঘৃতে ঘসিয়া গরম করিয়া চক্ষের পাতায় প্রলেপ দিলে চক্ষুর ফুলা ভাল হয়। (২) লবঙ্গ—মধুতে ঘসিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলে চক্ষুর ফুলা ভাল হয়। (৩) পাতিলেবুর রস দিয়া পাতিলেবুর শিকড় বাটিয়া চক্ষের নীচে

ও উপরে প্রলেপ দিলে চক্ষু উঠা ভাল হয়। (৪) শ্বেত পুনর্নবার শিকড়—পুরাতন কাঁজির সহিত ঘসিয়া চক্ষে দিলে ছানি ফাল হয়।

কাণ পাকায়।—(১) খানিকটা সরিষার তৈল আগুণে চড়াইয়া একটা শামুক তাহাতে ভাজিয়া ঐ তৈল ছাঁকিয়া কর্ণে দিলে কাণ পাকা রোগ ভাল হইয়া থাকে। (২) শাঁখের গুড়া ও চোণা একত্র মিশাইয়া কিছুক্ষণ কাণের ভিতর রাখিলে কাণপাকা ভাল হয়।

মুখ রোগে—(১) ভেরেণ্ডার আটা এক তোলা, সিকি ভরি সৈন্ধব লবণ—একত্র মিশাইয়া পিতলের পাত্রে গরম করিয়া দন্তপাটির উভয়দিকে কিছুক্ষণ লাগাইয়া ধুইয়া ফেলিলে দাঁতের গোড়ায় নালী হইয়া যদি পুঁজ পড়ে, তাহা হইলে তাহা আরোগ্য হইয়া থাকে। এই ব্যবস্থা দিবসে ২।৩ বার করিবে। ২।৩ দিন এইরূপ করিলেই দন্ত হইতে পুঁজ পড়া নিবারিত হইবে। (২) দাঁতের গোড়া কিম্বা জিহ্বায় ঘা হইলে, গোয়ালিয়ালতার ডাঁটা আনিয়া ডুমা ডুমা করিয়া ঘৃতে ভাজিয়া ঐ ঘৃতেই ডাঁটা গুলি বাটিয়া লইয়া অবলেহ করিবে। ২।৩ দিন এই ব্যবস্থায় চলিলেই ঘা আরোগ্য হইবে।

অরুচিতে। (১) জীরাভাজার গুঁড়া ভোজনের পূর্ব্বে জিহ্বাতে ঘসিয়া ভোজন করিলে আহারে রুচি জন্মিয়া থাকে। (২) শসার পাতা পাতপোড়া করিয়া তৈল ও লবণ মাখিয়া ভোজনের সময় আগে ২।৩ বার খাইবে এবং ভোজনের সময়ও মধ্যে মধ্যে খাইবে। ইহাতে অরুচি ভাল হইবে। (৩) লালিতা-পাতা, পাতপোড়া করিয়া ঐরূপভাবে ভোজনের সময় খাইলেও অরুচি ভাল হয়। (৪) ঘোল দিয়া কুলকুচা করিয়া তাহার পর আহার করিলে আহারে রুচি জন্মিয়া থাকে।

টাকে।—হরিতাল, বহেড়ার শাঁস ও বৃহতীর মূলের গুঁড়া সমভাগে মধু দিয়া মাড়িয়া লেপ দিলে টাক আরোগ্য হয়।

রাতকাণায়। বিশুদ্ধ গাওয়া ঘি খানিকটা গলাইয়া লইয়া সন্ধ্যার পর রোগীর ব্রহ্মতালুতে, চক্ষের উপর হাতের ও পায়ের তালুতে মালিস করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

বিছার কামড়ে।—(১) ছাগলের নাদি জল দিয়া গুলিয়া কিম্বা শুধু ঘসিয়া দিলে যন্ত্রণার নিবৃত্তি হয়। (২) রাঙ্গা শাকের পাতা মুখে চিবাইয়া যেখানে কামড়াইয়াছে—লাগাইয়া দিলে যন্ত্রণার নিবৃত্তি হয়। (৩) গাওয়া ঘি গরম করিয়া লাগাইলেও উপশম হইয়া থাকে।

বোল্‌তা, ভিমরুল ও মৌমাছির কামড়ে।—সৈন্ধব লবণের গুঁড়া মালিশ কর উপশম হইবে।

আঁচিলে।—হলুদ পোড়াইয়া চূণে মিশাইয়া আচিলের উপর মা ইলে উহা নষ্ট হয়।

চুলকণায়। শ্বেতচন্দন ঘসিয়া কিঞ্চিৎ কর্পূরের সহিত মিশাইয়া ২।৩ দিন মাখিলে গায়ের চুলকনা আরোগ্য হয়।

মাথার ঘায়ে।—(১) মুদ্রাশঙ্খ ও তেঁতুলের বীচির শাস সমান ভাগে লইয়া জল দিয়া ঘসিয়া মাথার ঘায়ে লাগাইলে তাহা আরোগ্য হয়। (২) পাকা তেঁতুলের বীচির শাঁস, অল্প লবণের সহিত মিশাইয়া মাথার ঘায়ে দিয়া [illegible] ধুইয়া ফেলিবে।

১।৩ দিন এইরূপ করিলেই মাথার ঘা সারিয়া যাইবে।

পাচড়া ও ঘামাচিতে।—গাওয়া ঘি একছটাক মুদ্রাশঙ্খ আধতোলা, ফটকিরি বার আনা, ভৃঙ্গরাজের পাতার রস একভরি চারি আনা, তুঁতে দুই আনা একত্র মিশাইয়া আগুণে ফুটাইয়া লইয়া পাচড়া এবং ঘামাচিতে লাগাইলে আরোগ্য হইয়া থাকে।

মাথা ব্যথায়।—(১) মুথার রস নাকে দিলে মাথার ব্যথা আরোগ্য হয়।

বসন্তের প্রতিষেধক।—(১) কটি-কারির মূল গোলমরিচের সহিত মিশাইয়া খাইলে বসন্ত রোগ হয় না। (২) পুনর্নবারমূল গোল মরিচের সহিত বাটিয়া খাইলে এক বৎসরের মধ্যে বসন্ত হয় না।

শ্রীসুধাংশুভূষণ সেন গুপ্ত কবিরত্ন।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

—:০:—

চিকিৎসকের অব্যাহতি।—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম,—ঢাকার কবিরাজ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সরকার "রোহিতকারিষ্ট" প্রস্তুতের জন্য আবগারি আইনের আমল হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন। আবগারি কর্তৃপক্ষ ইঁহার মামলা তুলিয়া লইয়াছেন।

মান্দ্রাজে আয়ুর্ব্বেদ।—সংপ্রতি মান্দ্রাজের ব্যবস্থাপক সভায় অনারেবল শ্রীযুক্ত রঙ্গ চারিয়ার আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতি বিধানের জন্য গবর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে সার আলেকজাণ্ডার কারডিস বলেন,—"আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাটা কিছুই নহে উহা হাতুড়ে চিকিৎসকগণের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের একটা উপায় মাত্র। সার আলেকজাণ্ডারের এরূপ মন্তব্যে আমরা শুধু মর্ম্মাহত হই নাই,—বিস্মিতও হইয়াছি। তাঁহারই দেশের- তাঁহারই স্বজাতি—বহুতর লব্ধ প্রতিষ্ঠ ইংরাজ ইতঃপূর্ব্বে এই আয়ুর্ব্বেদের যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের প্রফেসার সার্জ্জন স্যর হ্যাভেলক চার্লস একদিন ছাত্রগণকে উপদেশ চ্ছলে বলিয়াছিলেন,—"আর্য্যচিকিৎসা বিজ্ঞানে যাহা দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, আমি আজ তাহাই তোমাদিগকে পুনর্ব্বার বলিতেছি। চরকে কথিত চিকিৎসার একটু সামান্য অংশমাত্র আমি তোমাদিগকে বলিতেছি।" আমেরিকা—ফিলাডেলফিয়ার ডাক্তার ক্লার্ক, একদা বলিয়াছিলেন, "যদি ব্রিটীশ ফার্ম্মাকোপিয়ার সমস্ত অংশ পরিত্যাগ করিয়া 'চরকে'র চিকিৎসা অবলম্বন করা যায়—তাহা হইলে দেশের লোকের অকাল মৃত্যু অনেক কমিতে পারে।" সার আলেকজাণ্ডার আয়ুর্ব্বেদের কিছুই জানেন না, এ অবস্থায় এরূপ অযথা মন্তব্য তাঁহার মুখ হইতে কেমন করিয়া নির্গত হইল—তাহা আমরা

বুঝিতে পারিতেছি না। কোন শাস্ত্র সম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে হইলে, সেই শাস্ত্র যে রীতিমত অধ্যয়ন করা উচিত—এ কথা কি আর বলিয়া দিতে হইবে?

বঙ্গে বাতুল বৃদ্ধি। সরকারি হিসাবে প্রকাশ,—বাঙ্গালার বাতুলালয় সমূহে বাতুল রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯১৫ হইতে ১৯১৭ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত তিন বৎসরে মোট ১,২৮৩ জন রোগী বাতুলালয় সমূহে প্রবেশ করিয়াছিল এবার তাহাদের সংখ্যা ১,৩৩১ হইয়াছে। যতগুলি কারণে লোকে পাগল হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে—অভাব অনটনও অন্যতম কারণ। এরূপ অবস্থায় বর্ত্তমান সময়ে বাতুলকুলের সংখ্যা বৃদ্ধিতে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণই নাই। দেশের নেতৃবর্গ এ সকল কথা ভাবিতেছেন কি?

নূতন জ্বরে পাবনার কবিরাজ।—নূতন সংক্রামক জ্বরের চিকিৎসা—প্রসঙ্গে পাবনার কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন "বঙ্গবাসী"তে লিখিয়াছেন,—"আয়ুর্ব্বেদ মতে এই জ্বর কাল বিপর্য্যয় জন্য কাল বিপর্য্যয় জ্বর মাত্র; কোন প্রকৃতিতে ইহা বাতজ্বর এবং কোন প্রকৃতিতে ইহা বাতশ্লেষ্মজ্বররূপে আবির্ভূত হইয়া থাকে। এ জ্বরে লক্ষ্মীবিলাস, এবং অগ্নিকুমার রস দিবারাত্রে ২।৩ বার পর্য্যায়ক্রমে পান, আদার রস, পিঁপুল চূর্ণ এবং মধু অনুপানে সেবন করিলে রোগীর বেদনা, শ্লেষ্মা দোষ ও কাসি ইত্যাদি কমিয়া গিয়া রোগী ২।৩ দিনে সুস্থ হইয়া থাকে।—কথাটা আমাদের কিন্তু ভাল লাগিলনা,—হইতে পারে ইহা কাল-বিপর্য্যয় জ্বর, কিন্তু কোন প্রকৃতিতে ইহা বাতজ্বর, আবার কোন প্রকৃতিতে ইহা বাতশ্লেষ্ম—এ কেমন কথা? আমরা ইহাকে বাত জ্বর বলিব না, বায়ুর সহিত শ্লেষ্মা মিশ্রিত থাকায় আমরা ইহাকে বাতশ্লেষ্মজ্বরই বলিব। তাহার পর বঙ্গবাসী'র পত্র লেখকের কথা অনুসারে ইহা যদি বাতজ্বরই হয়, তাহা হইলে লক্ষ্মীবিলাস' এবং 'অগ্নিকুমারে' ইহার কি হইবে? বাতশ্লেষ্ম জ্বর হইলে 'লক্ষ্মীবিলাসে' উপকার হইবার কথা। আমরা গতবারে এই জ্বর প্রসঙ্গে "মকরধ্বজ সেবনের যে ব্যবস্থা দিয়াছিলাম, তাহাই সমীচীন ব্যবস্থা। প্রথম বার এই জ্বরের আক্রমণ কালে কোন ঔষধ দাও—না দাও, আসিয়া যাইবেনা কিন্তু জ্বর অন্তে শ্লেষ্মা এবং দুর্ব্বলতা দূর করিবার জন্য 'মকরধ্বজ' সেবনে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে—এ বিষয় এই বৎসরই আমরা বহুস্থলে পরীক্ষা করিয়াছি। 'মকরধ্বজে'র সহিত 'লক্ষ্মীবিলাস' ব্যবহারে আরও উপকার হইয়া থাকে। যাহা হউক এ জ্বর, শুধু বাতজ্বর নহে, ইহা যে বাতশ্লেষ্ম জ্বর—তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৩য় বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৫—কার্ত্তিক। | ২য় সংখ্যা।

বিজয়া।

—:*:—

পূজা ফুরাইল। বিসর্জ্জনের করুণ রাগিণী—উৎসব, আনন্দ ফুরাইয়াছে জানাইবার জন্য ক্ষীণসুরে বাজিয়া উঠিল। কর্ম্মকুশল বাঙ্গালী কয়দিনের জন্য অবসর পাইয়া যে শান্তি-সুখ উপলব্ধি করিতেছিল, তাহার পরিসমাপ্তি দেখিয়া আবার কর্ম্ম-জুয়ারে গা' ঢালিয়া দিল। আমরাও আমাদের গ্রাহক-অনুগ্রাহক পাঠক ও লেখকদিগকে যথাযোগ্য সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া 'আয়ুর্ব্বেদে'র সেবায় মনোভিনিবেশ করিলাম।

কিন্তু এই আবাহন ও বিসর্জ্জনের ব্যাপারে আমরা কি বুঝিলাম? আশৈশব বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত আমরা সকলেই তো জানি—এ আনন্দ—এ উৎসব ক্ষণিকের জন্য,—ইহা চিরস্থায়ী নয়,—মাত্র তিনটি দিনের জন্য এই উৎসবের স্রোত প্রবাহিত থাকিয়া তিন দিন পরেই ইহা ফুরাইয়া যাইবে,—এত আশা—এত উৎসাহ—এত আকাঙ্খা—এত কামনা—মাত্র তিন দিন পরেই তো অতীতের গর্ভে বিলয় প্রাপ্ত হইবে। তবে বাঙ্গালী এই অস্থায়ী আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য, সারা বৎসর ধরিয়া একটা অভাবনীয় আকাঙ্খা—একটা অনির্ব্বচনীয় উৎসাহ হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকে কেন? যাহা চিরস্থায়ী নহে,—যাহা আসিয়াই ফুরাইয়া যাইবে—যাহা উদয় হইয়াই বুদ্বুদে মিলাইয়া যাইবে—যাহার আরব্ধ মাত্রেই সমাপ্তি হইবে, তাহার জন্য সমগ্র বঙ্গসংসার উন্মত্ত হইয়া উঠে কেন?

কিন্তু 'কেন' যে এই উৎসবে—বাঙ্গালীর প্রাণ উন্মত্ত হইয়া উঠে—তাহা সাধক ভিন্ন অন্যে বুঝিবেনা। সৃষ্টি-স্থিতি লয়—এই ত্রিবিধ ব্যাপার লইয়াই তো শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ। মৃণ্ময়ী মূর্ত্তিতে চিন্ময়ীকে আনিয়া সাধক সেই ত্রিবিধ ব্যাপারেরই রহস্যোদ্ঘাটন করিয়া থাকেন। যে মৃত্তিকা লইয়া মায়ের প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রাণ প্রতিষ্ঠার

ব্যবস্থা করা হয়, সেই মৃত্তিকা—সৃষ্টবস্তুর সর্ব্ব প্রথম। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূত লইয়াই তো সৃষ্টির গঠন। জীব-সৃষ্টিতে ক্ষিতি হইতে উদ্ভবের পর, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমের সাহায্যে তাহার পরিপুষ্টির ব্যবস্থা। বিলয়কালেও ক্ষিতি ভিন্ন অপর সকল গুলির সাহচর্য্যের সঙ্কোচন হইয়া আবার ক্ষিতিতেই তাহার বিলয় সাধন হইয়া থাকে। জগদম্বার মৃণ্ময়ী মূর্ত্তিতেও এই সৃষ্টি ও লয়ের কৌশল সুসংবদ্ধ। ভক্ত সাধক ইহাই উপলব্ধি করেন বলিয়া তাঁহার আকাঙ্খা সারা-বৎসর ধরিয়া জাগিয়া উঠে। সাধকের সেই আকাঙ্খা-জাগরণে বিশ্বসংসার এমন একটা অজানা স্রোতে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে—যাহার ফলে বিশ্ববাসী পূজার অপেক্ষায় উন্মত্ত না হইয়া থাকিতে পারে না।

দুরন্ত দশাননের প্রবল প্রতাপ খর্ব্ব করিবার জন্য শ্রীশ্রীরামচন্দ্র অকালে জগন্মাতার অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। রাবণ-নিধন সেই অর্চ্চনার ফল। দুর্ব্বৃত্ত দমনে বিশ্বসংসার সে দিন ভাবোন্মেষে মত্ত-মধুর হইয়া পড়িয়াছিল। বিসর্জ্জনের পরে শূন্যবেদিকা নিরীক্ষণে সাধকের প্রাণ ফাটিয়া যাইলেও এ দিনে যে প্রণাম, আশীর্ব্বাদ, আলিঙ্গন, সম্ভাষণের ব্যবস্থা—তাহাও দুর্ব্বৃত্ত দমনে ভাবোন্মেষ মত্ততারই ফল সম্ভূত। সুতরাং আজিকার দিনে মাতৃহারা হইলেও সাধক বিশ্ববিজয়ী। মাতৃভক্ত বাঙ্গালী এই জন্যই এ দিনের অপেক্ষায় সারা বৎসর আকুল হইয়া থাকে। এ আকুলতায় যে কত সুখ—তাহা বাঙ্গালী ভিন্ন আর কেহ বুঝিবে না।

শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন।

জল-সংশোধনে তাম্রের অদ্ভুত শক্তি।

——ঃ*ঃ——

"কাঞ্চনে ভক্ষয়েদন্নং দুগ্ধং রজত ভাজনে।,
আয়সে চাপূপং মৎস্যং দধিতক্রে শিলাময়ে॥
রীতি-পাত্রে তিলকল্কং পায়সং শক্তবঃ মধু।
মৃণ্ময়ে শাক-সূপাদীন্ তাম্র পাত্রে জলং
পিবেৎ॥

—পাক-রাঃ

এ দেশের যখন সমৃদ্ধিশালী গৌরবময়ী অবস্থা—তমন এই শ্লোকটী ঋষি রচিত স্বাস্থ্য নীতির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়—সোণার থালে ভাত খাইলে, রৌপ্য পাত্রে দুগ্ধ পান করিলে, লৌহ-পাত্রে পিষ্টক ও মৎস্য ভক্ষণ করিলে, পাথরের বাটীতে দধি ও ঘোল এবং মৃৎপাত্রে শাক সূপাদি আহার করিলে শরীরের যে কি উপকার হয়,—ভোজ্য দ্রব্যের বা পাত্র বিশেষে কিরূপ রাসায়ণিক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, অনেক সময় আমরা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিনা। অনেক সময় মনেও হয়—এ সকল বুঝি প্রাচীন কালের কুসংস্কার! কি[ন্তু] তাম্র-পাত্রে জলপানের বিধি যে খুব ভাল, [সে] কথা আর অস্বীকার করা চলেনা। কেন

এই সভ্যতার স্বর্ণযুগে স্বয়ং সাহেবের মুখে আমরা তাহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শুনিতে পাইতেছি।

আমাদের দেশে—পূর্ব্বে তাম্র-পাত্রের যথেষ্ট আদর ছিল। প্রাচীন ভারতবাসীগণ—তাম্রপাত্রে জল পান করিতেন। বড় বড় তামার কলসীতে পানীয় জল সযত্নে রক্ষিত হইত। তামার কোষাকুশীস্থিত জলে—দেবলোক ও পিতৃলোকের পরিতর্পণ হইত। প্রবীণা গৃহিণীগণ—সন্তানের আরোগ্য বাসনায় জলকুম্ভের মধ্যে দেবতার নামে তাম্রমুদ্রা ডুবাইয়া রাখিতেন। রুগ্ন শিশু সেই জল পান করিত। এ সকল প্রথা এখনও বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়।

এখন সাহেবেরা বলিতেছেন—তাম্র কর্ত্তৃক অপরিষ্কার জল পরিষ্কার হয়। তাম্র পাত্রে জল রাখিলে-জলস্থিত রোগবীজাণু ধ্বংস হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক-পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে—পরিষ্কার তাম্রপাত্রে জল রাখিলে সেই জলস্থিত জীবাণু এবং অপর আনুবীক্ষণিক জীবাণু সহজে নষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। পরিষ্কার তাম্রপাত্রে জল থাকিলে, সেই জলদ্বারা তামার অতি সামান্য অংশ দ্রব হয়। এই দ্রব তাম্রই আনুবীক্ষণিক রোগ বীজাণু নষ্ট করে। শুধু ইহাই নহে। তাম্র জলের দুর্গন্ধ ও বিবর্ণ নষ্ট করে। তাম্র সংস্পর্শে জল স্বাদ-গন্ধ-বর্ণ বিহীন হইয়া থাকে।

স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ম্মচারীগণ বলেন—১০০০০০০ ভাগ জলে, একভাগ সালফেট অফ কপারের দানা দ্রব হইলে—সে জল বীজাণু শূন্য ও সুপেয় হইয়া থাকে। জলের পরিমাণ অনুসারে তন্মধ্যে প্রশস্ত একখণ্ড তাম্রফলক ডুবাইয়া রাখিলেও জলের সমস্ত দোষ দূর হইয়া যায়। এই প্রণালীতে জল পরিষ্কার করা অতি সহজ, যে কোন ব্যক্তি যখন তখন ইহা অনায়াসেই করিতে পারে।

জল মধ্যে যে পরিমাণ জৈবিক পদার্থ বর্ত্তমান থাকে, সেই পরিমাণে তাম্রও জলের সহিত দ্রব হয়। এইটি তাম্রের আশ্চর্য্য শক্তি। দ্রব তাম্র জৈবিক পদার্থের সঙ্গে মিশিয়া অদ্রবনীয় পদার্থ রূপে অধঃপতিত হইয়া থাকে। সুতরাং তাম্রসংযোগে জল ধাতব পদার্থ বিহীন, নির্দ্দোষ ও বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

লেটান গবর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্যবিভাগের জল পরীক্ষক যিনি আনুবীক্ষণিক জীবাণুতত্ত্ববিদ্ বলিয়া বিখ্যাত—সেই ডাক্তার Pitchford জল পরিষ্কার করণে তাম্রের শক্তি ভাল রকম করিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন। ডাক্তার পিচ্-ফোর্ড বলেন—১০০০০০ জলে এক ভাগ সাল-ফেট অফ কপার মিশ্রিত হইলেই জলস্থিত সমস্ত আনুবীক্ষণিক জীবাণু ধ্বংস হইয়া যায়। বীজাণু ধ্বংস করিতে ২৪ ঘণ্টা সময় লাগে, অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টা পরে ঐ জলে আর জীবাণুর অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। যে জল টাইফয়েড্-ব্যাসিলাস্ কর্ত্তৃক দূষিত হইয়াছে, সেই জলের ৭৫০০০ ভাগে ১ ভাগ সালফেট অফ্ কপার মিশ্রিত করিলে, ৩ ঘণ্টা পরে দেখা যাইবে,—ঐ জলে আর টাইফয়েড্ জীবাণু নাই। এক গেলন জলে, ১ গ্রেণ সালফেট অফ্ কপার দেওয়াই নিয়ম। ঐই উপায়ে তিন ঘণ্টার মধ্যে জলস্থিত জীবাণু বিনষ্ট করিতে পারা যায়।

খুব পরিষ্কার মাজাঘষা তাম্র পাত্রে—আনু-বীক্ষণিক জীবাণু কুল ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

পুর্ব্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় জলের দোষে নানাবিধ সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হইত। পরে ডাক্তার ওয়াটকিন্‌স—তথাকার জলে সালফেট অফ্ কপার মিশ্রিত করিবার ব্যবস্থা করায়, জল বিশুদ্ধ হইয়াছে এবং জলজ পীড়ার আশঙ্কাও কমিয়া গিয়াছে।

অতি সামান্য মাত্রায় সাল্‌ফেট অফ্ কপার জলের সহিত দ্রবাবস্থায় থাকিলে, সে জল পান করিলে একটুও অনিষ্ট হয় না। ইহা বৈজ্ঞানিক জগতের একটী পরীক্ষিত সত্য। যে সকল পল্লীগ্রামে—জলের দোষে লোকের নানাবিধ রোগ হইয়া থাকে, সেখানে বক্ষ্যমান প্রণালীতে তাম্র সংস্পর্শে জলকে বিশুদ্ধ করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এত অল্প খরচে আর কোনও উপায়ে জল নির্দ্দোষ হইতে পারে না।

এখন সাহেবেরা তাম্রের এই জল সংশোধক গুণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া তাম্রের অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছেন—সাহেবের কথায় আমরাও তাম্রের প্রভাব বুঝিয়াছি। কিন্তু সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে—আমাদের ঋষিগণ কেমন করিয়া যে তাম্রের এই গুণ জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। এই জন্যই কবি বলিয়াছেন—

ওরে বাছা গৃহে তোর রতনের রাজি।
এ ভিখারী দশা তোর কেন তবে আজি?

হায়রে! তথাপি আমাদের চৈতন্যোদয় হয় না! তাম্র স্বয়ং বিষ হইয়াও, দূষিত জলকে অমৃতে পরিণত করিতে পারে—ঋষিযুগের এই মহাসত্য সাহেবদের অনুগ্রহে আজ আমরা জানিতে পারিয়াছি! আমাদের মত আত্মবিস্মৃত—জাতি জগতে আর আছে কি?

শ্রীলক্ষ্মীকুমার দে, এম্ বি।

শিশুদের যক্ষ্মারোগ।

—:*:—

সহরের এক বড়লোকের বাড়ীতে চিকিৎসা করিতে গিয়াছিলাম। রোগী একটী শিশু, তাহার দেহ একেবারে জীর্ণ শীর্ণ। শিশুটী অনেকদিন হইতে ভুগিতেছিল, বলা বাহুল্য তাহাকে নিরাময় করিবার জন্য ক্রমাগত চিকিৎসক পরিবর্ত্তন চলিতেছিল। বাকী ছিলাম কেবল আমি। আমার পূর্ব্বে অনেক বড় ডাক্তারও দেখিয়াছিলেন। পর্য্যায়ক্রমে কেহ জ্বরের, কেহ যকৃতের কেহ কৃমির, কেহ বা অজীর্ণের চিকিৎসা করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই ছেলেটী সুস্থ হয় নাই।

আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া শিশুকে পরীক্ষা করিলাম। শিশুর অভিভাবক আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইহার রোগ কি?" আমি বলিলাম—"যক্ষ্মা"। বৈঠকখানায় অনেক লোক বসিয়াছিলেন, আমার কথায় তাঁহারা সকলেই যেন বিস্মিত হইলেন। আমার দিকে বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া একটী বাবু জনান্তিকে গৃহস্বামীকে বলিয়া ফেলিলেন—"এত ছোট ছেলের যক্ষ্মা হয়, এই নূতন শুনিলাম। যক্ষ্মা রোগের কারণ—ধাতুক্ষয়। এ ছেলের ত শুক্রই জন্মায় নাই, তবে যক্ষ্মা হইল কেমন করিয়া?"

একথায় উত্তর দিবার তখন আর আমার প্রবৃত্তি হইল না। গৃহস্বামী কিন্তু আমারই উপর শিশুর চিকিৎসার ভার অর্পণ করিলেন। আমিও দ্বিগুণ উৎসাহে—স্বর্গীয় পিতৃদেবের চরণ ও শ্রীভগবানের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া শিশুর চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দিলাম।

৩ মাস পরে শিশুর শরীরে স্বাস্থ্যের চিহ্ন প্রকাশ পাইল। ৮ মাসে সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল। গৃহস্বামী অবশ্যই আমার প্রতি প্রীত হইলেন। যাঁহারা বালকের ক্ষয়রোগের কথায় চমকিত হইয়া, আমাকে উপহাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা একদিন আমাকে ধরিয়া বসিলেন—"কবিরাজ! এইবার সত্য করিয়া বল দেখি,—অত ছোটছেলের কি যক্ষা হইতে পারে? আমাদের বিশ্বাস ছিল—শুক্রক্ষয় না ঘটলে যক্ষা হইতেই পারেনা।" আমি তাঁহাদিগকে যে উত্তর দিয়াছিলাম—বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই লিখিতেছি।

বাস্তবিক অনেকেরই বিশ্বাস আছে—খুব ছোট ছেলের যক্ষ্মারোগ হয়না। ডাক্তারী পুস্তকে শিশু-যক্ষ্মার উল্লেখ আছে। আয়ুর্ব্বেদে ও—শিশুদিগের যক্ষ্মারোগের যৎকিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। কিন্তু যে মতেরই অনুসরণ করা যাউক না, শিশুর যক্ষ্মারোগ হইয়াছে কিনা, তাহা নিরূপণ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। খুব যত্নের সহিত পর্য্যবেক্ষণ না করিলে রোগ ধরা যায় না।

অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, সহরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুগুলির গলায় গ্রন্থির মালা প্রায়ই স্ফীত হইয়া থাকে। এই প্রকৃতির শিশুগণকে ডাক্তারেরা Scrofulous tendency সংযুক্ত নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। যে সকল শিশুর গলদেশে গ্রন্থি স্ফীতি লক্ষিত হয়, তাহারা অতি সহজেই সর্দ্দি ও কাসিতে আক্রান্ত হইয়া থাকে। এই সকল শিশুর সাধারণ স্বাস্থ্যও ভাল নহে, দেহ ক্ষীণ, মন স্ফূর্ত্তিহীন। ইহাদিগের লালনপালনে অভিভাবকগণ যদি ভাল রকম যত্ন না করেন, তাহা হইলে এই সকল শিশু যক্ষ্মারোগে অনায়াসেই আক্রান্ত হইতে হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই শ্রেণীর শিশুদের যক্ষারোগের প্রকৃত চিকিৎসা হয় না। কেননা—ইহাদের রোগ নির্ণয় করা অনেক সময়ই বড় কঠিন হইয়া পড়ে। খুব বিজ্ঞ চিকিৎসকও শিশুদের যক্ষারোগ সহসা ধরিতে পারেন না। ইহার কারণ—যুবক বা কিশোর বয়স্ক মানুষের যক্ষারোগ হইলে, যে যে লক্ষণ প্রকাশ পায়—সে সকল লক্ষণ শিশুর দেহে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না, কখনও বা অস্পট ভাবে লক্ষণগুলি দেখিতে পাওয়া যায় দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতে পারি—"Course breathing এবং Dry rhonchuse ও creaking শব্দ—যদি clavcleএর নিম্নে পাওয়া যায়, কিম্বা সেইস্থানে স্পষ্টতর বোধ হয়, তবে বয়োপ্রাপ্ত ব্যক্তি হইলে, তথায় যক্ষ্মারোগের সূচনা হইয়াছে বলিয়া অনুমান করিতে পারা যায়। কারণ বয়স্ক ব্যক্তিদের ফুসফুসে সাধারণ ভাবে Fubercle পরিব্যাপ্ত না হইয়া স্থানিক ব্যাধিরূপেই যক্ষ্মারোগ হইয়া থাকে। কিন্তু শিশুদের ফুস্‌ফুসে যক্ষ্মা সাধারণ ভাবেই পরিব্যাপ্ত হইয়া দেখা দেয়। শুধু ইহাই নহে —শিশুদের এত সামান্য কারণে এবং এত রকমের কারণে শ্বাস প্রশ্বাসের সূক্ষ্মতম প্রভেদ হইতে থাকে যে, উপযুক্ত স্থানে উল্লিখিত চিহ্ন-গুলি একত্রে অনেক সময় পাওয়া যায় না, আবার পাওয়া গেলেও তাহা যে প্রকৃত যক্ষ্মা-রোগ তাহা স্থিররূপে জানা যায় না।

শিশু প্রকৃতি উত্তেজনাপ্রবণ, উত্তেজনা বশতঃ তাহাদের উভয় পার্শ্বের বক্ষঃ প্রাচীর—ভিন্ন ভিন্ন বেগে পরিচালিত হইতে পারে। সুতরাং একদিকের বক্ষঃপ্রাচীর অন্যদিকের সহিত পৃথক কার্য্য দেখাইলে, জোর করিয়া বলা যায়না যে—তাহার যক্ষাই হইয়াছে।

শিশুদের প্রায়ই রক্তোৎকাস হয় না, অর্থাৎ কাসির সঙ্গে রক্ত ওঠে না।

শিশুরা কাসে খুব কম, এবং থুথু ও ফেলিতে পারে না।

শিশুদের দেহে যক্ষার প্রধান চিহ্ন অতি ঘর্ম্ম ও হেক্‌টিক বোধ—প্রায়ই প্রকাশ পায় না।

শিশুদের যখন যক্ষারোগের সূত্রপাত হয়, তখন তাহার বায়ু নলির প্রদাহ (ব্রঙ্কাইডিস) রূপেই দেখা দেয়। ৩।৪ বার উপর্য্যুপরি—ব্রঙ্কাইডিস্ হইয়া তবে যক্ষারূপে প্রকাশ পায়। ফুস্‌ফুসের প্রদাহ কখনও এত বেশী হয় যে—শিশু তাহাতেই মরিয়া যায়।

ইনফ্লুয়েঞ্জার পূর্ব্বে যেরূপ কাসি হইয়া থাকে, শিশুদের যক্ষার সূত্রপাতে সেইরূপ ধরণের কাসি হইয়া থাকে।

এই সকল কারণে শিশুদের যক্ষারোগ ধরা বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে। ইহার লক্ষণগুলি বিশিষ্টরূপে চিহ্নিতও নহে। তবে ইহা নিশ্চয়—বয়োপ্রাপ্ত ব্যক্তির দেহে যক্ষারোগের যে সমস্ত লক্ষণ দেখা দেয়—শিশু শরীরেও তাহা দেখা দিতে পারে।

Course respiration, Prolonged Exairation, interrupted breathing, এইগুলির উপর নির্ভর করিয়া শিশুদের ক্ষয় রোগ নির্দ্ধারণ করা চলে না।

অনেক সময় শিশুদের কণ্ঠস্বরের বিকৃত বুঝা যায় না।

উভয় Scapula মধ্যস্থলে যদি dulness লক্ষিত হয়, তবে তাহা যক্ষার জন্য হইতে পারে, পরন্ত বর্দ্ধিতায়তন Bronchial গ্রন্থির জন্যও হইতে পারে। তবে এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য কেবল এই টুকু—শেষোক্ত অবস্থায় শ্বাস-প্রশ্বাস শব্দ ও বক্ষঃস্থলের উর্দ্ধাংশে resonance পাওয়া যায়।

শিশুর যক্ষারোগের লক্ষণ এইগুলি—

(ক) ঘন ঘন ফুস্‌ফুসের পীড়া বা ব্রঙ্কাইডিস হওয়া।

(খ) দৈহিক গুরুত্বের হ্রাস।

(গ) বহুকাল ধরিয়া উদরাময়ে ভোগা।

(ঘ) ২৪ ঘণ্টা ঘুষঘুষে জ্বর।

(ঙ) প্রায়ই বমি করা।

(চ) অগ্নিমান্দ্য।

(ছ) অরুচি।

(জ) শৈত্য সেবনে আসক্তি। (ইহা গাত্র দাহেয় জন্যই হইয়া থাকে।)

(ঝ) ল্যারিঙ্কসে ক্ষতোৎপত্তি।

(ঞ) কৃশতা।

(ট) কখনও শুষ্ক কাসি, কখনও আর্দ্র কাসি।

(ঠ) বক্ষ বিকৃতি (বুক বসিয়া যাওয়া বা বাঁকিয়া যাওয়া) শ্বাস প্রশ্বাসের সময় বুকের কোন স্থান ওঠে, কোন স্থান উঠে না।

(ড) স্পর্শ কম্পন। শিশু যখন কথা কহিবে, তখন বুকে হাত দিয়া দেখিলে মনে হইবে—ভিতরে খুব কাঁপিতেছে।

(ঢ) বক্ষ বাদনে—শব্দের বৈভিন্ন্য।

(ণ) ষ্টেথিসকোপ দিয়া শ্রুতি পরীক্ষায়—নানারূপ আগন্তুক শব্দ, রোগ বদ্ধমূল হইলে কখনও কটকট শব্দ, কখনও ভুড়ভুড় শব্দ, কখনও ভড় ভর শব্দ—নানারকম শব্দ।

(ত) উগ্র প্রকৃতি।

(থ) চক্ষুদ্বয়ের অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য।

(দ) মাঝে মাঝে গ্রন্থি স্ফীতি।

(ধ) জিহ্বার মধ্যস্থলে কৃষ্ণবর্ণের ছোব ধরা।

(ন) মৃত্তিকা ভক্ষণে আগ্রহ।

(প) মূত্রদ্বার মাঝে মাঝে উত্তেজিত হওয়া।

(ফ) সর্ব্বদা বিমর্ষ ভাব।

(ব) কেশ পাত।

(ভ) পেট ফাঁপা। ইত্যাদি।

কি কারণে শিশু যক্ষ্মাক্রান্ত হইতে পারে?—

কারণ অনেক গুলি। তন্মধ্যে প্রধান কারণ গুলির উল্লেখ করিতেছি।

১। পিতৃবীর্য্য ও মাতৃ রক্তের দোষ। ২। দুষ্ট দুগ্ধ পান। ৩। অতিরিক্ত মিষ্টান্ন ভোজন। ৪। জনাকীর্ণ সহরে বাস। ৫। বিশুদ্ধ বায়ু ও সূর্য্যালোকের অভাব। ৬। স্যাঁৎসেঁতে স্থানে বাস। ৭। সর্ব্বদা কোণে থাকা। ৮। সর্ব্বদা জামাজোড়া গায়ে থাকা। ৯। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব। ১০। স্নেহ বহুল দ্রব্যের অতি ভোজন। ১১। ভয় দেখানো। ১২। কাঁদানো। ১৩। শরীরে প্রায়ই ক্ষতোৎপত্তি। ১৪। যক্ষ্মা-গ্রস্তা জননীর স্তন্য পান। ১৫। উচ্চ স্থান হইতে পতন।

যে পর্য্যন্ত শিশুর দন্তোদেগামন না হয় - সে পর্য্যন্ত তাহাকে কেবল স্তন্য পান করিতে দেওয়া উচিত।

আমি যে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত শিশুটীর চিকিৎসা করিয়াছিলাম, তাহাকে কেবল "চ্যবনপ্রাশ" খাইতে দিয়াছিলাম। বাস্তবিক চ্যবনপ্রাশ ক্ষয় নিবারণে অদ্বিতীয় মহৌষধ। তবে তাহা চ্যবনপ্রাশ হওয়া চাই। মুদী পসারীর দোকানের দুই তিন টাকা সেরের গাব না হয়।

যখন দেখিবেন—শিশুর প্রায়ই সর্দ্দী কাসি লাগিয়া আছে; মাঝে মাঝে গলায় বীচি হইতেছে, টন্‌সিল্ বৃদ্ধির জন্য -- শুষ্ক কাসি দেখা দিয়াছে, মধ্যে মধ্যে উদরাময় হইতেছে, অথবা কোষ্ঠবদ্ধতা আরম্ভ হইয়াছে, শিশু যেন দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছে,—আর কাল বিলম্ব না করিয়া তাহাকে ছাগ দুগ্ধের সহিত চ্যবনপ্রাশ খাওয়াইবেন। প্রথমে দুই বেলা ২টী বড় মটরের মত মাত্রায় দিবেন। সপ্তাহান্তে মাত্রা বৃদ্ধি করিবেন। তৃতীয় সপ্তাহেই দেখিতে পাইবেন—শিশুর অত্যন্ত ক্ষুধা বৃদ্ধি হইয়াছে, চতুর্থ সপ্তাহে—তাহার দেহের ওজন বাড়িয়াছে। যে শিশুর প্রকাশ্যে কোন রোগ বুঝা যাইতেছে না, অথচ দিন দিন রোগা হইতেছে, চ্যবনপ্রাশ তাহার একমাত্র মহৌষধ।

শ্রীনগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কবিরত্ন। *

* লেখক ভবানীপুরের প্রসিদ্ধ কবিরাজ ৺ভূধর চন্দ্র কবিরত্ন মহাশয়ের মধ্যমাত্মজ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের কার্য্যবিৎ। আমরা সাদরে প্রবন্ধটী পত্রস্থ করিলাম। আং সং।

উপরোধ রক্ষা।

—:*:—

আমি গলিতদন্ত, লোলিতচর্ম্ম, স্খলিত পদ, পলিতকেশ—বৃদ্ধ; এখন কর্ম্মক্ষেত্রে অবসর গ্রহণ করিয়া "শেষ-খেয়ার" প্রতীক্ষায় নদীর কূলে বসিয়া আছি।

আমার অবস্থা—

"পর পারে উত্তরিতে, পা' দিয়েছি তরণীতে"

কিন্তু একি! "পিছু হ'তে আবার আহ্বান!" শ্রীমান্ ব্রজবল্লভ ভায়া এখনও আমায় ছাড়িতে চাহেন না! যখনি দেখা হয়, তখনি বলেন—"দাদা! কিছু লিখুন না।" এ অনুরোধ অবহেলা করিবার সাধ্য তো এ বুড়ার নাই। এ আদেশ যে বৃদ্ধের পক্ষে তরুণী ভার্য্যার আদেশের মত অলঙ্ঘ্য! তবে আমি করি কি? আমাকে যে লিখিতেই হইবে। আমার লেখার প্রধান অন্তরায়—আমি আজীবন কেবল গল্প-গাথা আর কাব্য লিখিয়াই মরিয়াছি; "আয়ুর্ব্বেদ" কবিরাজী কাগজ—ইহাতে "দর্শন" "বিজ্ঞানে"র আলোচনা হয়; ইহাতে কেবল—"হ-য-ব-র-ল ঝ-ঢ়-ধ-ঘ—ঙ—ভূরি ভূরি শাস্ত্র বচনং!!" এখানে ত আমার দন্তস্ফুট চলিবে না। দন্তই বা আমার কোথায়?

কিন্তু একটা কথা আছে—আমার ভাই ডাক্তার, তবু আমি "নার্ভিকা"র বদলে "মকরধ্বজ" খাই; আমার মুখে কাটলেটের চেয়ে শুক্তানি ভাল লাগে। আমি অনেক কবিরাজের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া—তাঁহাদের চিকিৎসা-নৈপুণ্য দু' একস্থলে প্রত্যক্ষও করিয়াছি। আমি কবিরাজী কাগজে লিখিবনা কেন? অতএব জ্ঞানদাসের ভাষায়—আমাকে বলিতে হইতেছে—

লিখিব লিখিব সখি! নিশ্চয়ই লিখিব।

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের কথা। আমার তৎকালের প্রতিবাসী এক ব্রাহ্মণ যুবার একদিন খুব জ্বর হইয়াছিল। প্রথমে জ্বরটাকে আমরা গ্রাহ্যই করি নাই। কিন্তু ৫ দিন পর্য্যন্ত যখন জ্বর ছাড়িল না, তখন একজন ডাক্তারকে ডাকা হইল, ডাক্তারটী নেটিভ ডাক্তার হইলেও বেশ বিজ্ঞ। তিনি রোগীকে বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"নিমোনিয়া হইয়াছে।" শুনিয়াত আমাদের চক্ষুস্থির! ডাক্তার প্রথমে একটু সাহস দিলেন। ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন—সর্দ্দীর লক্ষণ প্রকাশ না পাওয়া পর্য্যন্ত ৪ ঘণ্টা অন্তর ১০ গ্রেণ মাত্রায় Pobase Iodide" ১ আউন্স জলের সহিত সেব্য। সঙ্গে সঙ্গে Spongio pillne দ্বারা বক্ষঃস্থল বন্ধন। ৫।৬ দিন পর্য্যন্ত রোগ সমভাবেই রহিল। ডাক্তার বলিলেন—"এ 'লোবার নিমোনিয়া', ইচ্ছা করিলে আর কাহাকেও ডাকিতে পারেন।" সেইদিন অপরাহ্নে স্থানীয় বড় ডাক্তারকে ডাকা হইল। পটাশ আইডাইডে শ্লেষ্মা তরল হয় নাই শুনিয়া তিনি যেন চমকিয়া উঠিলেন। শেষে প্রেসক্রিপসন্ লিখিলেন—*

ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড্—১৫ গ্রেঃ

স্পিরিট ক্লোরফরম—১৫ মিঃ

* আমার চিরকালের স্বভাব—নোটবুকে প্রেস্‌কৃপসনের নকল লিখিয়া রাখা—লেখক।

টিংচার ডিজিটেলিস্—৫ „

ব্রাণ্ডী———————২ ড্রাঃ

জল ——————————১ ঔন্স

দুই ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে। ইহার সঙ্গে ফ্লানেল জ্যাকেট। পথ্য—দুধসাগু ও সুপ।

রোগ কিন্তু বাড়িতেই চলিল ডাক্তাররা আসিয়া ঘন ঘন ঔষধ পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কোনদিন লাইকার ষ্ট্রিক্‌নিয়া, স্পিরিট ইথারিস্, কোনদিন এল কানাইল্ মিকশ্চার, কোন দিন বা অ্যাসিড মিকশ্চার, কোনদিন বা এফার ভেসেন্‌স্ মিকশ্চার,—এইরূপ নিত্য নূতন পরিবর্ত্তন চলিতে লাগিল।

২৩ দিনের দিন—ডাক্তারদ্বয় বলিলেন—"জীবনের আর আশা নাই। এখন আপনারা অন্য ব্যবস্থা করিতে পারেন।"

বুঝুন এইবার গৃহস্থের কি বিপদ। রোগীর সঙ্কটাপন্ন অবস্থা—ভয়ানক দুর্ব্বল—এইরূপ দুঃসময়ে ডাক্তার জবাব দিলেন!! গ্রামান্তরে আর একজন প্রবীণ ডাক্তার ছিলেন, তিনি ৵ টাকার কম রোগীর গৃহে পায়ের ধূলা দিতেন না। দায়ে পড়িয়া তাঁহাকেই ডাকা হইল। তিনিও বড় আশ্বাস দিলেন না। কেবল বলিলেন—এ নিমোনিয়ার সঙ্গে ম্যালেরিয়ার সংযোগ আছে। প্রেস্কৃপসন লেখা হইল—

Re.

কুইনাইন সাল্‌ফ—২ গ্রেণ,

সাইট্রিক এসিড—১০ গ্রেণ,

সিরপ সিমপ্রেকস—১ ড্রাঃ

জল———————½ ঔন্স।

১ ঘণ্টান্তর সেব্য।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অধিকন্তু রোগীর দেহে আর একটী উপসর্গ দেখা দিল—পেটফাঁপা। ক্রমে রোগীর জ্ঞান পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া আসিল।

তা'রপর সাধারণতঃ যেমন হইয়া থাকে—মরণকালে বৈদ্যকে স্মরণ! পার্শ্বের গ্রামে এক বৈদ্য ছিলেন, লোকটী বেশ সদাচারী, মিতভাষী এবং বিজ্ঞ। তাঁহাকেই ডাকা হইল। কবিরাজ আসিলেন, অনেকক্ষণ ধরিয়া নাড়ী টিপিলেন, পেটটা একবার বাজাইলেন। তা'রপর—আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"ঘোর সান্নিপাতিক বিকার। বাঁচিবার আশা কম। বলেন তো ঔষধ দি। কিন্তু আরোগ্যের জন্য দায়ী হইতে পারিব না।

আমাদের আগ্রহাতিশয্যে কবিরাজ মহাশয় ঔষধ দিলেন—প্রাতঃকালে "কস্তুরী ভৈরব"। বৈকালে—পিপুলচূর্ণ সহ দশমূল পাচন। রাত্রে—"মকরধ্বজ।" আমরা পথ্যের কথাটা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন—"এতদিন কি পথ্য দিতেছিলেন?" উত্তর দিলাম—"দুগ্ধ ও সুপ।" কবিরাজ মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন—"সর্ব্বনাশ! সুপ দিতেছেন? যাহারা সর্ব্বদা মাংস ব্যবহার করে,—সুপ তাহাদের পক্ষে সুপথ্য হইতে পারে। এ শাক-ভাত-খেগো বাঙ্গালী—এর পেটে কি সুপ সহ্য হয়? সুপ খাইয়াই হয়ত পেটফাঁপা দেখা দিয়াছে। কবিরাজ দুগ্ধ পর্য্যন্ত বারণ করিয়া দিলেন। পথ্যের ব্যবস্থা হইল—মসুর ডালের তরল যূষ। তা'ও—দিনে রেতে ৩ বার মাত্র।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই—যে রোগীর শরীরের বলাধানের জন্ত আমরা হিন্দু হইয়াও—প্রত্যহ

দুইটী করিয়া কুক্কুট শাবক সংহার করিতাম, ত্রিসন্ধ্যাকারী ব্রাহ্মণ সন্তানকে—মুর্গীর যুষ খাওয়াইতাম,—এতদিন তাহার পার্শ্বপরিবর্ত্তনেরও শক্তি ছিল না,—কুক্কুটবংশ ধ্বংস করিয়াও তাহার শরীরে যে বলটুকু হয় নাই, কবিরাজের এই নিরামিষ মসুর-ক্বাথে সেই রোগীর দেহে দিন দিন বল বাড়িতে লাগিল। রোগীর পেটফাঁপা কমিল, মলমূত্রের যথারীতি প্রবর্ত্তন হইতে লাগিল। অতি সহজে অল্প কাসিবা মাত্র—পাটল বর্ণের প্রচুর শ্লেষ্মা উঠিতে লাগিল। কবিরাজের হাতে ১১ দিন থাকিবার পর—রোগীর জ্বর ছাড়িয়া গেল, গা' ঠাণ্ডা হইল। আমরা ত ভয়েই অস্থির,—কোলাপ্স নহে ত? কবিরাজকে সংবাদ দেওয়া হইল। তিনি আসিয়া রোগীর হাত দেখিয়া বলিলেন—"আর ভয় নাই, বিকার কাটিয়া গিয়াছে।"

১৭ দিনের দিন রোগী - বালিস ঠেসান দিয়া বসিতে পারিল। ক্ষুধায় তাহার প্রাণ ওষ্ঠাগত —হায়! তথাপি সেই নিষ্ঠুর কবিরাজ—কোন নূতন পথ্যের ব্যবস্থা করিলনা। ৪১ দিন কাটিলে রোগী একটু পলতার ঝোল পাইল। তা'রপর মুগসিদ্ধ, থৈ ও মসুরডাল, অবশেষে ওজন করিয়া একছটাক পরিমাণ পুরাতন চালের অন্ন। ২ মাস পরে রোগী যখন বেশ বেড়াইতে লাগিল, তখন—মাষকলাই সিক্ত তৈল মাখিয়া সর্ব্বৌষধি জলে স্নান। ইহার পূর্ব্বে—আমরা রোগীর গা মুছাইয়া দিবার জন্য অনেকবারই অনুমতি চাহিয়াছিলাম, কবিরাজ তাহা অনুমোদন করেন নাই। স্নানের কথা বলিলেই বলিতেন—"যাবন্ন বলবান্ ভবেৎ।"

এই রোগী—এখন আমার কাছেই কার্য্য করে। এ ঘটনাটী আমার প্রত্যক্ষদৃষ্ট। ইহার পূর্ব্বে—কবিরাজের ছাগবিষ্ঠা সদৃশ বটিকায় যে নিদারুণ নিমোনিয়ার নিবৃত্তি হইতে পারে—আমার সে ধারণাও ছিল না! এরূপ অনেক ঘটনা আমরা নিত্য দেখিতেছি, তবুও কবিরাজের প্রতি আমাদের ডাক্তারের মত শ্রদ্ধা নাই! আমরা কবিরাজ ডাকি কখন? যখন ডাক্তারের ফিঃ গুণিয়া, মিকশ্চারের মূল্য যোগাইয়া গৃহস্থ নিতান্তই দশাহীন হইয়া পড়িয়াছে,—ভুগিয়া ভুগিয়া রোগী যখন জীবনীশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে, তখন আমরা কবিরাজের কাছে উপস্থিত হই, এবং প্রথমেই নিজের দারিদ্র্য জ্ঞাপন করি! আমার মনে হয় —যদি দিন কতকের জন্য কবিরাজ মহাশয়েরা ধর্ম্মঘট করিতে পারেন, তাহা হইলে—এ দেশের অসংখ্য জীর্ণ রোগীকে পটলোৎপাটনের জন্য ঝুড়ির অন্বেষণ করিতে হয়। রোগী ও বৈদ্য উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই—কথাটা একবার ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। আমারও উপরোধ রক্ষা হইয়াছে, এখন 'ইতি'।

শ্রীতারক নাথ বিশ্বাস।

তুলসী।

—:*:—

তুলসী হিন্দুর একটী প্রধান অর্চ্চনার বৃক্ষ। যে হিন্দুর গৃহ-প্রাঙ্গনে যত্ন রক্ষিত তুলসী বৃক্ষ নাই, হিন্দুর চক্ষে সে কখন হিন্দু নহে। বৈষ্ণব গণ বিষ্ণু অপেক্ষা প্রিয়া তুলসীর অধিক সম্মান

করিয়া থাকেন। যিনি প্রত্যহ তুলসী বৃক্ষে জল দান, তুলসী প্রদক্ষিণ, তুলসী তলে প্রণাম না করেন—তিনি কখন বৈষ্ণব নহেন। তুলসী কাহারও নিকট অনাদৃত নহেন। পঞ্চ উপাসক সমানভাবে তুলসীর আদর করিয়া থাকেন।

তুলসী বৃক্ষে বৈদ্যুতিক শক্তি বড়ই প্রবলভাবে নিহিত আছে। ইহার কাষ্ঠের মাল্য ধারণ করিলে মনুষ্য শরীরে বিদ্যুৎ বেগ স্থিরভাবে রক্ষিত হয়, সুতরাং উহাতে অনেক ব্যাধি আরোগ্য হয়,—সহসা শরীরেও কোন ব্যাধি প্রবেশ করিতে পারে না। অন্ততঃ রোগ প্রতিষেধের জন্য আমি সকলকেই তুলসী মাল্য ধারণ করিতে অনুরোধ করি। তুলসী-কাষ্ঠধারী—সাধারণ অপেক্ষা দীর্ঘজীবী ও সৎপথাবলম্বী হয়। যাঁহারা মাল্য ধারণে অনিচ্ছুক, তাঁহারা ইহার কাষ্ঠ কোমরে অথবা বাহুতে বন্ধন করিয়া রাখিতে পারেন।

তুলসীর রস - জ্বর ও সর্দ্দি নাশক। প্রবল সর্দ্দিযুক্ত জ্বরে—তুলসীর রস সহ মকরধ্বজ সেবন করাইয়া আমি অনেক রোগী আরোগ্য করিয়াছি। দুই বেলা খাইতে হয়। কৃষ্ণ তুলসী, শিউলিপাতা ও উচ্ছেপাতার মিলিত রস ১ তোলা সেবন করিয়া মধু ও পিঁপুল চূর্ণ সহযোগে সেবন করিলে কফ জ্বর শীঘ্র বিনষ্ট হয়।

তুলসীর রস শরীরের দূষিত রক্ত শোধন করে। ইহা বাতরক্ত ও গলিত কুষ্ট নাশক। কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তের সুস্থ থাকিতে হইলে তুলসী তাহার একমাত্র অবলম্বন। প্রত্যহ তুলসীর রস দুই বেলা সেবন ও গাত্রে মর্দ্দন করিলে এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া গোমূত্র পান করিলে অনেক স্থলে কুষ্ঠ ব্যাধি যাপ্য হইয়া থাকে। তুলসীর গন্ধও মন্দ নহে, ইহার গুণে কোন রোগ বীজাণু শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না। সপত্র তুলসী শাখা হস্তে ধারণ করিয়া থাকিলে তাহার গাত্রে কদাপি মশক দংশন করিতে পারে না। দেখা গিয়াছে—মশকগণ তুলসী বৃক্ষের ত্রিসীমায় যাইতে পারে না। মশক ম্যালেরিয়াবাহী বলিয়া যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা প্রত্যহ তুলসী ভক্ষণ ও তুলসীর রস অঙ্গে মর্দ্দন করুন, মশক নিকটে যাইবে না।

যাঁহাদের শরীরে নানাবিধ চর্ম্মরোগ আছে, তাঁহারা তুলসী রস ভক্ষণ ও গাত্রে মর্দ্দন করুন। বজ্রাঘাতে হতজ্ঞান রোগীকে সত্বর তুলসীর রস ভক্ষণ করাইলে তৎক্ষণাৎ তাহার দেহে বৈদ্যুতিক ক্রিয়া প্রবাহিত হইয়া তাহার জ্ঞান সঞ্চার করে।

যিনি দুই বেলা তুলসী পত্র ভক্ষণ করেন, তাঁহার শরীর মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় উজ্জল হইতে থাকে। ইহা একটি কম রসায়ন নহে।

বীর্য্যস্তম্ভে তুলসীর শক্তি অসীম। কিয়ৎ পরিমাণ তুলসীর মূল পানের সহিত ভক্ষণ করিলে বীর্য্যস্তম্ভ হয়। আয়ুর্ব্বেদ কি বলিতেছেন শুনুন,—

শূরনং তুলসী মুলং তাম্বুলৈঃ সহ ভক্ষয়েৎ
ন মুঞ্চন্তি নরোবীর্য্যা মে কৈকেন ন সংশয়।

যাহাদের স্বপ্নদোষে মধ্যে মধ্যে শুক্র ক্ষয় হয়, তাহারা সপ্তাহে ২ দিন অল্প মাত্রায় তুলসী মূল সেবন করিবেন, দেহস্থ বিদ্যুৎ সংরক্ষিত হইয়া আর অযথা শুক্র ক্ষয় হইবে না। মনুষ্য দেহে বিদ্যুৎ অবিচলিত রাখিতে তুলসীর মত আর বুঝি কাহারও শক্তি নাই।

তুলসীর মূল বাহুতে বন্ধন করিয়া রাখিলে তাহার বজ্রাঘাতের ভয় থাকে না। অনেক চতুর গৃহস্থ নূতন গৃহ নির্ম্মাণকালে মট্‌কার কাঠে হরিদ্রা রঞ্জিত বস্ত্রে তুলসীর মূল বাঁধিয়া দেন, সে গৃহে কখন বজ্রাঘাতের ভয় থাকে

না। ইহা বজ্র-রোধক দণ্ড অপেক্ষা গুণশালী। শাস্ত্রকার বলেন,—যাহার গৃহে সতেজ তুলসী বৃক্ষ থাকে তথায় কি বজ্রপাত হয়?

রক্তপিত্ত রোগীকে তুলসী ও কামিনী পাতার রস খাওয়াইলে তৎক্ষণাৎ রক্ত-বমন বন্ধ হয়। তুলসী তলের মৃত্তিকা পর্য্যন্ত তুলসীর গুণ প্রাপ্ত হয়, তুলসীতলের কেবল মৃত্তিকা খাইয়া অনেকে যে রোগ মুক্ত হন—ইহাই তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ।

শ্বাস, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগেও তুলসীর রস পান করিলে উপকার হয়। ধ্বজভঙ্গ রোগী ঘৃতের সহিত প্রত্যহ দুইখান তুলসী মুস ভক্ষণ করিলে শরীরে আবার বৈদ্যুতিক ক্রিয়া চলিতে থাকিবে, রোগও আরোগ্য হইবে।

শ্রীবঙ্কুবিহারী সেন গুপ্ত কবিরাজ।

চা পানের অপকারিতা।

বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশে চাএর প্রচলন বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। লোকে অনায়াসে ২টী পয়সা ব্যয় করিয়া চা খাইয়া থাকে। কলিকাতার প্রতি রাজপথে অসংখ্য চাএর দোকান বসিয়াছে এবং প্রতি দোকানেই বহু খরিদ্দারের সমাগম হইয়া থাকে। আমার কোন বন্ধু একদিন হ্যারিসন রোড, কলেজ ষ্ট্রীট, বহুবাজার ষ্ট্রীট ও সার্কুলার রোড, এই চতুঃসীমাবদ্ধ স্থানের চাএর দোকান গণনা করিয়াছিলেন, গণনায় দোকান ১১০ খানি হইয়াছিল। ইহাতেও অনেক দোকান বাদ পড়িয়াছিল। এই সকল দোকানেই ঘরভাড়া, সরঞ্জামী খরচ প্রভৃতি ব্যয় সঙ্কুলান হইয়া বেশ লাভ হইয়া থাকে, নতুবা দোকান উঠিয়া যাইত। এই সমস্ত টাকাই আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত লোক এবং সামান্য ব্যবসায়ী—মুটে, মজুর, ফেরিওয়ালা প্রভৃতি দিয়া থাকে। যাহাদের চা বাগান আছে, তাহারা এবং চাএর বড় বড় ব্যবসায়িগণ প্রথমতঃ বিনা পয়সায় চাএর প্যাকেট বিতরণ করিতেন, তারপর ক্রমে যখন লোকের নেশা ধরিল, তখন বিতরিত চাএর মূল্য সুদসহ আদায় করিয়া লইলেন। শুধু কলিকাতায় নহে, আমাদের দেশের সকল প্রধান সহরেই এইরূপে চাএর বহুল প্রচলন হইয়াছে। আমি যখন বোম্বাই নগরে গিয়াছিলাম, তখন সেখানে অসংখ্য ইরাণী দোকান দেখিয়াছিলাম। ঐ সব দোকানে চা বিক্রয় হইত। সে সময়ে কলিকাতায় চাএর দোকান বসে নাই। বর্ত্তমানে বোম্বাই সহরে চা-বিক্রয় আরও বাড়িয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ বলেন যে, চাএর একটু উপকারিতা আছে. তাহাতে শরীর ঝরঝরে রাখে এবং উৎসাহ জাগাইয়া তোলে। বাস্তবিক পক্ষে যদিবা ঐ গুণ চাএর থাকে, তাহা সাময়িক মাত্র এবং যেমন প্রত্যেক সাময়িক এবং কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদিত উত্তেজনার অবসানে দ্বিগুণ অবসাদ আসে, চাএর প্রভাবটুকু অন্তর্হিত হইলেও শরীরে সেইরূপ অবসাদ আসি

থাকে। এ কারণ একবার চা ধরিলে তাহা ত্যাগ করা বড়ই কষ্টসাধ্য। সমস্ত নেশার জিনিষের সম্বন্ধেই এই কথা প্রযোজ্য।

ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, চায়ে Dyspepsia আনয়ন করে। কিছুদিন নিয়মিত চা সেবন করিলে পাকযন্ত্রের পূর্ব্বের তেজ থাকে না, উক্ত যন্ত্র Gastric juice পাতলা হয় এবং তাহার কার্য্যকরী শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। এ কারণ ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধ, অজীর্ণ প্রভৃতি নানাবিধ ব্যারামের সৃষ্টি হইয়া থাকে। চাএর এই কুফল একদিনে অথবা হঠাৎ উপস্থিত হয় না, এ কারণ লোকে মনে করে, ঐ সব ব্যারাম অন্যান্য কারণে উদ্ভূত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে চা পান যে ঐ সব রোগের এক প্রধান কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

চা সেবনে নিদ্রার ব্যাঘাত হইয়া থাকে এবং ক্রমে ক্রমে নিদ্রার পরিমাণ কমিয়া যায় ও তাহাতে পরিণামে নানাবিধ দুঃসাধ্য ব্যাধি জন্মিয়া থাকে। যদিবা শীতপ্রধান দেশে চাএর কোন উপযোগিতা থাকে, আমাদের দেশের মত গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে চা—বিষের মত ক্রিয়া করিয়া থাকে। বহু লোকে চা পান করিয়া তাহার অনিষ্টকর ফলভোগ করিয়াছেন কিন্তু তাহাতে চাএতে তাহাদের অপ্রবৃত্তি হয় নাই। এইটীই চাপানের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কুফল। পরের অনুকরণে উন্মত্ত হইয়া আমরা যাহা করি, তাহার পরিণাম ফল বিবেচনা করি না। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে?

চা পানের আর একটি অনিষ্টকর ফল আর্থিক ক্ষতি। যে পরিবারের ৪ জন লোক চা পানে অভ্যস্ত, তাহাদের দু'বেলা চা পানে অন্ততঃ ।০ আনা ব্যয় হইয়া থাকে অর্থাৎ মাসে প্রায় ৮৲ টাকা ব্যয় হয়। একটি দরিদ্র অথবা মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে মাসিক ৮৲ টাকা ব্যয় করা সহজ কথা নহে। ফলে তাহাদের অন্যান্য আবশ্যকীয় ব্যয় সঙ্কোচ করিতে হয়। এই ভাবে আমাদের দরিদ্র দেশের কত টাকা যে চাএর জন্য ব্যয় হইয়া থাকে, তাহার পরিমাণ নির্ণয় করা সহজ সাধ্য নহে।

চা পানের এতগুলি কুফল। আমাদের দেশে জন সাধারণের অবগতির জন্য গৃহে গৃহে চা পানের কুফল সম্বন্ধীয় পুস্তক প্রচারিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। এবং আমাদের দেশের লোকের বিশেষ বিবেচনাপুর্ব্বক হিতপথ গ্রহণ করিয়া চা পান একেবারে ত্যাগ করা উচিত।

চা পানের আরও একটি কুফল এই যে, বাড়ীর পুত্র-কন্যাগণ সকলেই চা পানে উৎসাহিত হইয়া থাকে। কোন কোন পিতা মাতা নিজ হাতে স্বীয় পুত্র কন্যাগণকে চা পান করিতে শিখাইয়া থাকেন। পরিণামে এজন্য তাহাদের সকলেরই নানাবিধ কষ্টভোগ করিতে হয়।

এই সব কারণে এই অশীতিপর বৃদ্ধের অনুরোধ—দেশস্থ সকলেই এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিবেন এবং বালক বালিকাগণের ভবিষ্যৎ জীবনপথে কণ্টক রোপণ করিবেন না।

চা পান ত্যাগ করা অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করিয়া সকলেই চাএর বিরোধী হন, এই আমার নিবেদন।

শ্রীশশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা।

—:*:—

(আয়ুর্ব্বেদ সভার ৮ম বার্ষিক ৩য় সাধারণ অধিবেশনে কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়ের সভাপতিত্বে পঠিত)

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার কোন্ সময়ে উৎপত্তি হইল,—কেমন করিয়া—কি জন্য সে চিকিৎসা দেশের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইল,—সে প্রবর্ত্তনায় দেশবাসীর কিরূপ উপকার হইল, —সে সব কথা আমি কিছুই বলিব না। শাস্ত্রকুশল সদ্বৈদ্য পরিবৃত আজিকার এই সভায় সে সব কথা বলার আবশ্যকতাও আমি কিছু মনে করি না,—কেননা, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক মাত্রেই সে সব কথা অবগত আছেন, সুতরাং সে সব কথার উত্থাপনে আয়ুর্ব্বেদের ইতিবৃত্তেরই পুনরাবৃত্তি করা হয় এবং সে পুনরাবৃত্তি সুধী সমাজে বিরক্তিরই কারণ হইয়া থাকে।

আমার আজ বলিবার বিষয়—আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা এখন যে ভাবে দেশের মধ্যে চলিতেছে—ইহাই ঠিক?—না বর্ত্তমান কালের উপযোগী করিয়া লইয়া, অথচ ঋষিপ্রদর্শিত পন্থা হইতে বিচ্যুত না হইয়া, একটু মার্জ্জিত ভাবে ইহার কতকটা পরিবর্ত্তন করা উচিত? সে মিমাংসা করিতে হইলে এ চিকিৎসা আগে কি ভাবে প্রচলিত ছিল, সেই কথার একটু আলোচনা করিতে হয়॥

যে সময় ইংরাজী সভ্যতা আমাদের দেশে প্রবাহিত হয় নাই,—ইংরাজী ছাঁচে—ইংরাজী অনুকরণে—ইংরাজী আব্‌হাওয়ায়—ইংরাজী ঢংএ—ইংরাজী রংয়ে,—এক কথায় ইংরাজের চালচলন —অশনবসন, —কথাবার্ত্তা—ভাব ভঙ্গিমা—ধরণ ধারণ—করণ কারণ—ইংরাজের তাবৎ বিষয়েই হিন্দুসন্তান—তথা বাঙ্গালী সন্তান আদৌ অভ্যস্ত হয় নাই,—শিক্ষার জন্যই বল—আর অর্থোপার্জ্জনের জন্যই বল—যৎকালে শ্যামলশস্যসম্ভারপরিমণ্ডিত,—চ্যুতপণশ-জম্বু-কপিত্থ-বিল্ব-বদরী-বিটপি সুসজ্জিত,—স্বেত —স্বচ্ছ—পুষ্করিণী—দীর্ঘিকা-সম্পদ সম্ভারে সুমণ্ডিত—মুক্ত বায়ু প্রবাহিত—জননী—জন্মভূমি—পল্লীভূমি হইতে পরিবার পোষণের চিন্তায় আকুল হইয়া বাঙ্গালী সন্তানকে সহরের সম্পদ বৃদ্ধি করিতে হয় নাই, সে সময় সর্ব্বাঙ্গ সংসৃত রোগ সকলের—অর্থাৎ জ্বর, অতিসার, উন্মাদ অপস্মার প্রভৃতির প্রশমনোপায়ের জন্যই হউক,—আর দেহ নিবদ্ধ শল্য উদ্ধারের জন্যই হউক, কিম্বা চক্ষু, কর্ণ, মুখ ও নাসিকাদি সংশ্রিত ব্যাধি সকলের প্রতীকারের আবশ্যকই হউক—এই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। এক কথায় শল্য, শালাক্য, কায় চিকিৎসা, ভুতবিদ্যা, কৌমার ভৃত্য, অগদতন্ত্র, রসায়ন তন্ত্র ও বাজীকরণ তন্ত্র —এই অষ্টাঙ্গের চিকিৎসাই সে সময় দেশের মধ্যে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদিগের দ্বারা সম্পন্ন হইত। দ্বিতীয় ধন্বন্তরি সদৃশ ভিষগবর বাভট, —দ্বাপরে পাণ্ডবদিগের চিকিৎসক পদে যখন নিযুক্ত ছিলেন, তখন তাঁহাকে কুরুক্ষেত্রের

মহাসমরে উপস্থিত থাকিয়া যে আহতদিগের দেহ হইতে শল্যোদ্ধার করিতে হইয়াছিল,—ইহা তো সকলেই অবগত আছেন। শুধু কুরুক্ষেত্রের কথা কেন,—পুরাকালে ভারতীয় নরপতিদিগের মধ্যে সম্মুখসমরে বাণযুদ্ধের প্রথা প্রচলিত ছিল। পুরাণাদি গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায়—দেশীয় চিকিৎসকগণ সেই সকল যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতেন এবং আহত যোদ্ধবৃন্দের শরীর হইতে বাণফলকাদি শল্যোদ্ধারণ, রক্তস্রাব নিবারণ, আবশ্যক মত আহত অঙ্গ বিশেষের ছেদন, ক্ষতাদির প্রতীকার—সকল কর্ম্মই নির্ব্বাহ করিতেন।

এখনকার দিনে প্রচার—শরীরে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার প্রথম আবিষ্কার ১৬২৮ খৃঃ অব্দে উইলিয়ম হার্ভি নামধেয় এক সাহেব করিয়াছিলেন, কিন্তু ২৫০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে যখন হার্ভির অস্তিত্ব পৃথিবীবাসীর একেবারেই অবগতি ছিলনা,—সুশ্রুতের আবির্ভাব কাল সেই সময়। ভারতের সেই ফল মূলাশী আর্য্যঋষিই রক্তের গতির প্রথম আবিষ্কর্ত্তা। এ কথার প্রমাণের জন্য শ্লোক সমষ্টি উদ্ধৃত করিবার বোধ হয় প্রয়োজন হইবে না।

গত বর্ষের "আয়ুর্ব্বেদ" পত্রিকার ৮ম ও ৯ম সংখ্যায় প্রসিদ্ধ দার্শনিক প্রবন্ধ লেখক বন্ধুবর কবিরাজ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ 'সার্জ্জন সুশ্রুত' নামে একটি উপাদেয় প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। অনুসন্ধিৎসু চিকিৎসকগণ সেই প্রবন্ধ দুইটি পাঠ করিলে এ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিবেন।

ফল কথা, এখন আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদিগের অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে; তাহাতে একমাত্র কায়চিকিৎসা ভিন্ন অস্ত্র চিকিৎসায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদিগের সেরূপ ব্যুৎপত্তি নাই। আগে এরূপ ছিল না। সেকালে কায়চিকিৎসা শিক্ষার মত শল্য শালক্য প্রভৃতি চিকিৎসাও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদিগকে যথারীতি শিক্ষা করিতে হইত। শল্যতন্ত্রে স্পষ্টই লিখিত আছে, শব ব্যবচ্ছেদ না করিলে কোনপ্রকারেই চিকিৎসা কার্য্য শিক্ষা হয় না এবং যিনি শবব্যবচ্ছেদ না করিয়া চিকিৎসা বৃত্তি অবলম্বন করেন, তিনি যমদূত সদৃশ। কিন্তু কাল বিপর্য্যয়ে এ সকল পদ্ধতি আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক সমাজ হইতে লোপ পাইল,—যবন অধিকারে রাষ্ট্র বিপ্লবে সকল বিষয়ের মত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। ক্রমে অস্ত্র চিকিৎসায় হঠাৎ বিপদ সম্ভাবনা হেতু দণ্ড ভয়ে ও রাজপুরুষদিগের নিকট হইতে উৎসাহ প্রাপ্তির অভাবে অস্ত্র চিকিৎসা আমাদের মধ্য হইতে একেবারে লোপ পাইল, ফলে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ একমাত্র জ্বর, অতিসার, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতির চিকিৎসা ভিন্ন যে আর কিছুই জানেন না—ইহাই হইল দেশের লোকের ধারণা এবং সেই ধারণার ফলে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণও লুপ্ত রত্নের পুনরুদ্ধারের জন্য—অতীত গৌরবকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য—অসম্পূর্ণ চিকিৎসাকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য—আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা, আস্থা—সকলই ত্যাগ করিলেন।

ফলে যতগুলি কারণে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অবনতি ঘটিয়াছে—আমার মনে হয়—আমাদের অস্ত্র চিকিৎসায় অনভিজ্ঞতা তাহার প্রধান কারণ। হোমিওপ্যাথিতে অস্ত্র চিকিৎসার প্রচলন নাই—সেই জন্য এখনকার দিনে হোমিওপ্যাথির উপর দেশের

লোকের আগ্রহ যতটাই বর্দ্ধিত হউক, ইহা কিন্তু অ্যালোপ্যাথিককে উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় নাই, সে উল্লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা হোমিওপ্যাথির কথনও আসিবে বলিয়াও আমি মনে করি না।

অ্যালোপ্যাথি যে বর্ত্তমান কালে সকল চিকিৎসার শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে, ইহার প্রধান কারণ—অস্ত্র চিকিৎসায় অ্যালোপ্যাথির অদ্ভুত ক্ষমতা। মৃতদেহে জীবন প্রদান ভিন্ন পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানে আর সকলই প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। শুধু অস্ত্র চিকিৎসা কেন,—কায় চিকিৎসায়—জ্বর মগ্নে কুইনাইনের আশুকার্য্যকরী ক্ষমতা—সত্য কথা বলিতে গেলে—এখন আমরা যে সকল ঔষধ লইয়া নাড়াচাড়া করি, তাহা অনেক পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। আমাদের 'নাটা'য় জ্বর বন্ধ হয়, ভাঁট পাতার রসে সে কার্য্য সাধিত হয়,—'হরিতালে' কুইনাইনের অনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে,—এসব তো কেবল আমাদের বচন মাত্র, —আমরা কি কেহ সে সকল লইয়া কোনো পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি! 'নাটা'য় সত্য সত্য কুইনাইনের মত জ্বর বন্ধ হয়—একথা আমি নিজে পল্লীগ্রামে থাকিতে, অনেক স্থলে পরীক্ষা করিয়াছি,—কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া সে 'নাটার' ব্যবহার আমি মোটেই করিনা,—আর কেহ করেন কিনা—তাহাও আমি বলিতে পারি না। তবে এটা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি—কুইনাইন বা নাটা প্রয়োগের মত রোগীও কবিরাজদিগের হস্তে এখানে কোনো উন্নত গৃহস্থ একেবারেই দিতে প্রস্তুত নহেন বলিয়াই আমাদের নাটা ব্যবহারের বড় আবশ্যকও হয় না।

কিন্তু দেশের যে এই রুচি পরিবর্ত্তন,—ইহার প্রধান কারণই আমরা চিকিৎসার সকল অঙ্গ শিক্ষা করিনা। প্রাতঃস্মরণীয় 'গঙ্গাধর' অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জ্ঞানগভীর গবেষণা—পাণ্ডিত্যেই স্ফুরিত হইত—এখনকার বিজ্ঞান বিদ চিকিৎসকদিগের মত Experimental, (চিকিৎসার স্বকীয় চিকিৎসার উন্নতির জন্য তিনি বেশী প্রয়াস পরায়ণ ছিলেন কিনা, তাহা আমার ততটা জ্ঞান নাই, কিন্তু এটা আমি নিশ্চয় জানি যে, তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর অনেকে অ্যালোপ্যাথদিগকে মড়াকাটা-চিকিৎসক বলিয়া ঘৃণা করিতেন। সত্য কথা বলিতে গেলে; সেই ঘৃণাকুটিল বদ্ধ ধারণাই আমাদের অধঃপতনের কারণ।

আমরা এখন লম্বা চওড়া সাইনবোর্ড আঁটিয়া, যমক অনুপ্রাসে বিজ্ঞাপনের বাহার করিয়া মটর জুড়ি হাঁকাইয়া চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক আমাদের জীবনের সাফল্য সাধন হইতেছে মনে করিয়া থাকি বটে, কিন্তু যখন একটি জীর্ণ জটিল রোগীর চিকিৎসার জন্য কোন একটি বাড়ীতে উপস্থিত রহিয়াছি, [illegible] যদি সেই পরিবারের কাহারও ফোড়া কাটিবার আবশ্যক হয়, কিম্বা পোয়াতি খালাস বা delivery করাইবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আমাদের সমক্ষেই পাশ্চাত্য চিকিৎসককে আহ্বান করা হইবে—গৃহস্বামী তখন আমাদের ফেলিয়া তাঁহাকে লইয়া শশব্যস্ত হইয়া পড়িবেন,—ইহা কি আমাদের পক্ষে লজ্জার কথা—কলঙ্কের কথা—ঘৃণার কথা—উপহাস্য হইবার কথা নহে। আমাদেরই রত্ন আমাদের বুদ্ধির দোষে আমাদের হস্তচ্যুত হইয়া অন্যের করতলগত

হইয়াছে.- আমরা রত্ন তো হারাইয়াছিই,—তা' ছাড়া সেই রত্ন কুড়াইয়া লইয়া যাঁহারা দেশ রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিতেছি—এটা কি আমাদের পক্ষে বড় গৌরবের কথা?—এই যুগের এই দুর্গতি দেখিয়া মনে হয়—সুশ্রুত, দিবোদাস বাভট! একদা বিশ্ববাসীর কল্যাণ-কামনায় তোমরা যেরূপে সমগ্র ধরণী মাতাইয়া বিশ্ব আলোকিত করিয়া তুলিয়াছিলে, সেইরূপে আর একবার ভারতে অবতীর্ণ হও,—তোমাদের প্রসাদ-লাভে ভারতের সৌভাগ্য আবার ফিরিয়া আসুক।

প্রাণ খুলিয়া সত্য কথা বলিতে গেলে একথা অবিসম্বাদিত সত্য যে, আমরা এখন দুর্ব্বল হইয়াছি। আমাদের সৌভাগ্য বস্তু হস্তগত করিয়া অধুনা যাঁহারা সৌভাগ্যের গর্ব্ব করিবার অধিকারী—আমরা তাঁহা-দিগকেও ছাটিয়া ফেলিব—নিজেরাও পুনরুন্নত হইবার চেষ্টা করিবনা। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক মণ্ডলীর অনেকে হয়ত আমার স্পষ্ট কথায় রাগ করিতে পারেন, কিন্তু সত্যের অপলাপ না করিলে অনেককেই স্বীকার করিতে হইবে যে, অধুনা আমরা চিকিৎসা বৃত্তি অবলম্বন করিলেও প্রকৃত চিকিৎসক হইবার উপযুক্ত নহি। তাহার প্রধান কারণ, —আমাদের মধ্যে অনেকে এখন এক একজন পুরা ব্যবসাদার হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু চিকিৎসা কার্য্যটি যে ব্যবসায়ের অন্তর্গত হইতেই পারে না—তাহা তো আর্য্যঋষিমণ্ডলী পষ্টই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এখন আমরা ঋষি প্রদর্শিত বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি, কিন্তু তাঁহা-দের উপদেশ ভুলিয়া গিয়াছি.—ইহা কি আমাদের পক্ষে গৌরবের কথা?

ব্যবসায় বলিব না তো কি? এখন কলি-কাতার অলিতে গলিতে অসংখ্য ঔষধালয়। অনেকগুলি চিকিৎসালয় নহে—কেবলই ঔষধালয়—কেবল বিজ্ঞাপনের জোরে ঔষধ বিক্রয় করিয়া লাভবান হওয়াই অনেক ঔষধালয়ের উদ্দেশ্য। সুতরাং সে সকল ঔষধা-লয়ে পাওয়া যায় না—এমন ঔষধ নাই, কিন্তু তাহার ভিতরের তথ্য উদ্ঘাটন করিলে সে সকল ঔষধের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে অনেক রহস্য আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে। এখন আপনারাই বলুন, —যে চিকিৎসার এরূপ পন্থা অবলম্বন করা হয়, সে চিকিৎসায় গৌরব নষ্ট হইবে না তো হইবে কাহার! সুশ্রুতের অস্ত্র এখন বৈদ্য ভুলিয়াছে,—নাপিত তাহা গ্রহণ করিয়াছে,—প্রশস্ত স্থান হইতে প্রশস্ত দিনে প্রশস্ত গাছ-গাছড়া সংগ্রহ আগে বৈদ্যগণ যাঁহারা নিজের হাতে করিতেন তাহা এখন বেদে'র হাতে পড়িয়াছে,—মসলা কিনিবার সময় ফর্দ্দ পাঠাইয়া বেণের নিকট যাহা পাওয়া গেল, তাহা আর চিনিবার ক্ষমতা নাই—তাহাই অকৃত্রিম জ্ঞানে বৈদ্য কিনিয়া আনিয়া ঔষধে ব্যবহার করিতেছে.—এ অবস্থায় ব্যবস্থা ঠিক হইলেও ঔষধে আর সেরূপ কার্য্য হইবে কেন? অথচ ঢক্কাধ্বনি করিয়া জানাইব—আমাদের ঔষধ অকৃত্রিম,—আমাদের ঔষধ যথাশাস্ত্র প্রস্তুত—আমাদের ঔষধ ডাকিলে কথা কহিয়া থাকে। এই সকল কারণেই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ আয়ুর্ব্বে-দীয় চিকিৎসা যবনাধিকারে যাহা অধঃপতিত হইল, তাহা আর মাথা তুলিতে পারিল না।

ধাত্বাদি ভস্ম তো অনেক চিকিৎসকই এখন করিতে রাজি নহেন, সে গুলি এখন জুগি এবং বরিশাল জেলার কায়স্থের হাতে। তাহাদের প্রস্তুত এখনকার দিনের টাকায় দুই

ভরি রসসিন্দূরও অনেক সময় ১৬৲ ২৪৲ ৩২৲ ৮০৲ মূল্যে আসল স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ রূপে কাহারও কাহারও আলমারির শোভা অলঙ্কৃত করিয়া থাকে। যে ব্যবসায়ে এতটা অধর্ম্ম — সে ব্যবসায়ের উন্নতি ভগবান সহিবেন কেন? ফলকথা, ইংরাজ রাজত্বে আমরা রাজসাহায্য পাইনা বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ মাথা তুলিতে পারিতেছেনা—ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত হইলেও আমাদের কৃতকার্য্যের ফলেও যে ইহার উন্নতির বিঘ্ন ঘটিতেছে—ইহাও নির্ভেজাল সত্য কথা। ফলে আমাদের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে আমাদিগের পক্ষে আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। আমাদিগকে আবার সেই সত্যনিষ্ঠ—ধর্ম্মপ্রাণ—কর্ম্মকুশল আর্য্য ঋষির যুগ ফিরাইয়া আনিতে হইবে,—আমরা নিজেরা যাহা হইয়াছি, তাহার আর উপায় নাই, —কিন্তু আমাদের সন্তানগণ অষ্টাঙ্গআয়ুর্ব্বেদের সকল অঙ্গই যাহাতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শিখিতে পারে,—তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং শিক্ষালাভের পর তাহারা যাহাতে বিলাসস্রোতে গা ঢালিয়া আমাদের অনুকরণপ্রিয় না হয়, যাহাতে তাহারা নিজেরা সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান পূর্ব্বক ঔষধাদি প্রস্তুত করিতে পারে—তাহার জন্য কঠোর শপথ প্রদানে তাহাদিগকে অঙ্গীকৃত করিতে হইবে। ডাক্তারদিগকে ঘৃণা করিলে চলিবে না, বিলুপ্ত শল্য ও শালাক্য চিকিৎসা তন্ন তন্ন করিয়া ডাক্তারদিগের নিকটই শিক্ষা করিয়া আমাদের প্রধান অভাবগুলি পূর্ণ করিতে হইবে,—মহর্ষি চরকের কথায়

"তদেব যুক্তং ভৈষজ্যং যদা রোগ্যায় কল্পতে।
স চৈব ভিষজাং শ্রেষ্ঠো রোগেভ্যো যঃ প্রমোচয়েৎ।"

এই কথা স্মরণ করিয়া ডাক্তারদিগের সহিত আমাদের সখ্যতা স্থাপন করিতে হইবে,—গোঁড়ামি—ভণ্ডামি—ঘটাপূর্ণ বাক্যের ছটা একেবারে ছাড়িয়া দিতে হইবে, তবেই আমাদের মৃতকল্প আয়ুর্ব্বেদের পুনরুন্নতি সম্ভবপর হইবে,—নতুবা ক্রমশঃ আরও ইহার অধঃপতন ঘটিয়া চিরদিনের জন্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা "যে তিমিরে—সেই তিমিরে"ই থাকিয়া যাইবে,—আমাদের জীবন কোনোরূপে কাটাইয়া যাইলেও আমাদের পুত্রকলত্রগণ এ চিকিৎসা অবলম্বনে যে আর উন্নত হইতে পারিবে না—সে কথা সম্পূর্ণরূপে অবিসম্বাদিত—অতি অপ্রিয় হইলেও খাঁটি সত্য কথা। সমবেত চিকিৎসকমণ্ডলী এ কথা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুধাবন করুন—ইহাই আমার একান্ত অনুরোধ।

আমার আর একটু বলা হইলেই অদ্যকার প্রবন্ধের শেষ করা হয়। সাফল্য-সাধনই চিকিৎসার প্রধান উদ্দেশ্য। শুধু চিকিৎসার উদ্দেশ্য কেন,—সকল কর্ম্মেরই মুখ্য উদ্দেশ্য। আমি যে অ্যালোপাথিক চিকিৎসকদিগের নিকট হইতে বিনয় প্রাপ্ত শস্ত্র চিকিৎসা শিক্ষার কথা বলিয়াছি, চিকিৎসায় সাফল্য লাভ করিতে হইলে, তাহা ভিন্ন আমাদের আদৌ উপায় নাই। গোঁড়া বৈষ্ণবেরা যেমন শক্তিমূর্ত্তি অবলোকনে প্রণাম করা দূরের কথা,—জগজ্জননী—মহামায়া আদ্যাশক্তির প্রসাদ প্রাপ্তিকালে তাঁহারা যেমন 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র কথায় "না করিবে অন্যদেবের প্রসাদ ভক্ষণ"—বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ আমাদের মধ্যে যাঁহারা গোঁড়া কবিরাজ—তাঁহারা 'মড়াকাটা চিকিৎসক'-দিগের নিকট আমাদের শস্ত্রচিকিৎসা-শিক্ষা গ্রহণে কখনই সম্মতি প্রদান করিবেন

না। কিন্তু ইহা ভিন্ন যে আমাদের গত্যন্তরও নাই,—তাহা কি তাঁহাদের মনে করা উচিত নয়? আমরা ডাক্তারদিগের নিকট Practical শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হইব, কিন্তু Practical শিক্ষার জন্য আমরা যাহা অভ্যাস করিব—তাহা আমাদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের তো বহির্ভূত বিষয় নহে। ভগ্নাস্থির সন্ধান, প্রণষ্ট শল্যের উদ্ধার, ব্রণের শোধন, রোপন, উৎসাদন, অবসাদন প্রভৃতি পুরুষচ্ছেত্বা-সুশ্রুত যাহা করিতেন, আধুনিক ডাক্তার মহাশয়েরা তাহাই অবলম্বনে তাঁহাদের শল্যচিকিৎসাশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। সুশ্রুতের নরদেহতত্ত্ব ও জীববিজ্ঞানের নাম তাঁহারা দিয়াছেন—আনাটমি ও ফিজিওলজি! আমাদের কোষে'র নাম তাঁহারা দিয়াছেন—'সেল'। আমাদের 'পললে'র নাম তাঁহারা দিয়াছেন—'প্রটো-প্লাজম।' আমাদের 'অস্থি'র নাম ডাক্তার-দিগের 'বোন।' ডাক্তারি শাস্ত্রে মানব দেহের অস্থিনির্ণয়ে তাঁহারা বলিয়াছেন,—"মানব দেহে দুই শতের অধিক পৃথক পৃথক অস্থি দেখিতে পাওয়া যায়। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র কিন্তু —এই 'দুই শতের অধিক' বলিয়া বাক্য অসম্পূর্ণ রাখেন নাই,—অস্থির সংখ্যা নির্ণয়ে নরকঙ্কালে ২৪৬ খানি অস্থি বিভক্ত বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অস্থির সংখ্যা নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। ডাক্তারি 'প্যারাইটালে'র আমা-দের দেশীয় নাম—'পার্শ্বকপালাস্থি।' ডাক্তারি 'অক্সিপিট্যালে'র আমাদের দেশীয় নাম—'পশ্চাৎকপালাস্থি।' ডাক্তারি 'টেম্পোর্যালে'র আমাদের দেশীয় নাম—শঙ্খাস্থি। ডাক্তারি-এ 'সুপিরিয়ার ম্যাকসিলারি'র আমাদের নাম 'উর্দ্ধ হন্বস্থি।' ডাক্তারি 'সার্ভাইক্যাল ভাইব্রি'র আমাদের নাম—'গ্রীবাবলম্বী কশেরুকা।' ডাক্তারি 'রিব্‌সে'র আমাদের নাম—পশু'কা' বা পঞ্জরাস্থি সকল। ডাক্তারি—এলবো-জয়েণ্টে'র আমাদের নাম কপূ'র বা 'কফোনি সন্ধি।' ডাক্তারি 'রেডিয়াসে'র আমাদের নাম 'কোদণ্ডাস্থি।' ডাক্তারী 'কার্পাসে'র আমা-দের নাম মণিবন্ধস্থ সন্ধি,—ইত্যাদি। তবে আমাদের সুশ্রুতের সহিত ডাক্তারির সংজ্ঞা-নির্ণয়ে এক আধটুক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। যেমন সুশ্রুতের মতে অস্থি পাঁচ প্রকার, আর ডাক্তারি মতে অস্থি চারি প্রকার। কপাল, রুচক, তরুণ, বলয় ও নলক—সুশ্রুতের মতে অস্থি সকল এই পাঁচভাগে বিভক্ত। আর ডাক্তারি মতে—অস্থিনির্ণয়ে—দীর্ঘাস্থি, খর্ব্বাস্থি, প্রশস্তাস্থি এবং বিবিধাকার অস্থি সকল। সুশ্রুত বলেন,—জানু, নিতম্ব, স্কন্ধ, গণ্ড, দন্ত, তালু, শঙ্খ এবং মস্তকে কপাল নামক অস্থি সকল আছে। দন্তগুলিকে রুচক অস্থি বলা যায়। নাসিকা, কর্ণ, গ্রীবা ও চক্ষু কোণে তরুণ অস্থি অবস্থিত। এই তরুণ অস্থি সকলকে ইংরাজীতে কার্টিলেজ অর্থাৎ উপাস্থি বলা হয়।' 'বলয়' নামক অস্থি সকল পাণি, পাদ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, উদর ও বক্ষে দেখা যায়। অবশিষ্ট সকল স্থানে 'নলক' নামক অস্থি সকল অবস্থিত। সুশ্রুতের তরুণ অস্থি অর্থাৎ ডাক্তারি 'কার্টিলেজ'টাকে পরিত্যাগ করিয়া ডাক্তারেরা চারি প্রকার অস্থি নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে বড় আসিয়া যায় না। ফল কথা আমি বলিতে চাহি—ডাক্তার-দিগের নিকট আমাদের অ্যানাটমী ও সার্জ্জারি শিক্ষা করিলেও তাহা আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র বহির্ভূত হইবে না। আধুনিক পাশ্চাত্য-চিকিৎসা-বিজ্ঞান অস্থি সমূহের যে সকল নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, মহর্ষি সুশ্রুতের নামকরণের সহিত

তাহার কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। প্রভেদের মধ্যে যা, কেবল—ডাক্তারদের ভাষা ইংরাজী ও আমাদের ভাষা সংস্কৃত।

হিন্দুশাস্ত্র মতে অধ্যাপনার ভার ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্যই লইবার অধিকারী। অন্য সম্প্রদায়ের নিকট অধ্যয়ন দূরের কথা, ব্রাহ্মণেতর হিন্দুর নিকটও হিন্দুর অধ্যয়নের রীতি কোনো কালে ছিল না। কিন্তু এখন তো সে রীতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার সময় সাহেবদিগের নিকট পর্য্যন্তও আমাদিগকে শিক্ষা লইতে হয়। সেটা হইয়াছে কেন?—না ইংরাজী শিক্ষা প্রদানে সাহেবেরাই অধিক কর্ম্মকুশল। ব্রাহ্মণের নিকট শিক্ষা লাভ করিতে হইত কখন?—যখন ব্রাহ্মণেরা নিজেরা সুশিক্ষিত ছিলেন। ব্রাহ্মণেরা যখন সুশিক্ষিত ছিলেন তখনই তাঁহারা সমাজের সকল কর্তৃত্ব হাতে লইয়া ছাত্রশিক্ষার ভার গ্রহণ করিতেন। কাল বিপর্য্যয়ে ব্রাহ্মণের সে গর্ব্ব এখন খর্ব্ব হইয়াছে। সমাজবন্ধন আঁটিবার ক্ষমতা এখন দেশের ধনাঢ্য মোড়লের। অখাদ্য—কুখাদ্য—অমিত—অহিত—হিন্দুশাস্ত্রের নিষিদ্ধ আহারীয় গ্রহণ ধনাঢ্যের পক্ষে এখনকার দিনে আর অতি গোপনে করিবার বড় প্রয়োজন হয় না,—আপন আলয়ে বাবুর্চি রাখিয়া নিষিদ্ধ মাংস রন্ধন করাইলেও আর সমাজচ্যুত হইবার সম্ভাবনা নাই। যে শক্তি লইয়া ব্রাহ্মণের তেজঃপ্রতিভা ফুটিয়া উঠিত,—সে তেজঃ প্রতিভা যে এখন লুপ্ত হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার শাসন দণ্ড আর লোকে মানিবে কেন? এম-এ পাশ করিয়া পাশ্চাত্য বিদ্যায় সুপণ্ডিত হওয়ার জন্যই বল, আর অতুল ধনের ঐশ্বর্য্য গর্ব্বেই বল—অনেকেই এখন সমাজের মস্তকে পদাঘাত করিতে কুণ্ঠিত নহেন। হিন্দুসমাজ নামে আছে, কিন্তু সত্যের অপলাপ না করিলে ইহা যে এখন খিচুড়িতে পরিণত হইয়াছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

যাক্-যা' বলিতেছিলাম—অধ্যাপনার জন্য ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্য ভিন্ন আর কাহারও অধিকার না থাকিলেও যখন সুশ্রুতের যুগ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তখন আমাদের অনায়ত্ত বিষয় গুলি আয়ত্ত করিতে হইবে—অন্যজাতির নিকট। কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যাইবে না। অস্ত্র চিকিৎসা ডাক্তারদের নিকট আমরা শিক্ষা করিলেও আমরা বেদ বিহিত চিকিৎসাই শিক্ষা লাভ করিব। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—উভয় দেশের পণ্ডিত মণ্ডলীই অথর্ব্ব বেদকে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আদি গ্রন্থ বলিয়াছেন। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে সামবেদেই শারীর বিদ্যা ও শল্য বিদ্যার প্রথম পরিচয় পরিস্ফুট। সেই সকল পণ্ডিতের বিশ্বাস,—বৈদিক যজ্ঞে নিহত পশুর ছেদিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নাম হইতে শারীর বিদ্যার উৎপত্তি। যাহা হউক—অথর্ব্ববেদ হইতেই হউক আর সামবেদ হইতেই হউক—বেদ হইতে যে শারীরবিদ্যার উৎপত্তি হইয়াছে—সে সম্বন্ধে মতভেদ নাই। সুতরাং আমরা অস্ত্র চিকিৎসা শিক্ষা করিলেও বেদ বিহিত চিকিৎসাই শিক্ষা করিব। এখন আমরা জানিনা বলিয়া অন্যের নিকট শিক্ষা করিতে হইবে, কিন্তু সে অপমানের বোঝা আমাদিগকে বেশী দিন বহিতে হইবে না—আমরা জনকয়েক এই বিদ্যার সুশিক্ষিত হইলেই আমরাই আবার ইহার শিক্ষাদানে সমর্থ হইব। আমাদের দ্বারাই ক্রমশঃ সুশ্রুত কালের মত অস্ত্র চিকিৎসার যুগ প্রভূত উন্নত হইয়া পড়িবে।

শেষ কথা—ভেদবুদ্ধি কোনোকালেই সমীচীন নহে, এজন্য ভেদবুদ্ধি কোনো কালে—কোনো বিষয়েই প্রশংসিত হয় নাই। জগতের পুরাবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়-অনিষ্টের মূলোৎপত্তি এই ভেদবুদ্ধির ফলেই সংঘটিত হইয়াছে। সেই জন্য আমার মনে হয়—ডাক্তারেরা মুখে যাহাই বলুন—আমাদের কালমেঘ—আমাদের অশোক—আমাদের অশ্বগন্ধা—আমাদের বাসক—আমাদের গুলঞ্চ—আমাদের পুনর্ণবা—আমাদের কণ্টকারী—আমাদের মকরধ্বজ প্রভৃতি লইয়া তাঁহারা যেমন চিকিৎসায় প্রসিদ্ধি লাভ করিতে চাহেন,—আমরাও সেইরূপ আমাদের যাহা নাই—যে অস্ত্র চিকিৎসা হারাইয়া আজি আমরা চিকিৎসায় সর্ব্বপ্রকারে সাফল্য লাভ করিতে পারিতেছি না,—দেশের মধ্যে যে জন্য আমাদের নিন্দা আছে—অখ্যাতি আছে—অপযশের বোঝা যাহার জন্য আমাদিগকে অম্লান বদনে সহ্য করিতে হয়—পক্ষান্তরে যে অস্ত্র চিকিৎসা হারাইয়া অনেক সময় আমরা নিজেকেই অকর্ম্মণ্য বলিয়া মনে করিয়া থাকি,—সেই চিকিৎসা আমাদের সমাজে আবার যাহাতে প্রচলিত হয়,—সুশ্রুতের যুগের মত সেই চিকিৎসা আবার যাহাতে আমাদের দেশে ফিরিয়া আসে,—ডাক্তারেরা আমাদের ঔষধপ্রয়োগ দেখিয়া যেরূপ বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে মুহ্যমান হইয়া পড়েন, সেইরূপ আমাদিগকে অস্ত্র চিকিৎসায় সুপণ্ডিত দেখিয়া তাঁহারা আরও যাহাতে বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন,—অতীতের উদ্ধার করিয়া,—আমাদের লুপ্ত রত্ন ফিরাইয়া আনিয়া আবার যাহাতে আমরা সুপ্ত ভারত জাগাইয়া তুলিতে পারি—আমাদের জ্ঞানবহুলপাণ্ডিত্য দেখিয়া সমগ্র মেদিনী একদিন যেরূপ আমাদিগকে গুরুপদে অভিষিক্ত করিয়াছিল,—সমগ্র পৃথিবাসী আমাদিগের নিকট দীক্ষা লইবার জন্য অতৃপ্ত আগ্রহ আকাঙ্ক্ষায় যেরূপ একদিন উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, যাহাতে আমরা আবার সেই দিন ফিরাইয়া আনিতে পারি,—সেই অতীত গর্ব্বে আর্য্যসন্তান আবার যাহাতে জাগিয়া উঠিতে পারে,—ধর্ম্ম কর্ম্মের মূর্ত্তহৃদয় মহামহিম মহিমান্বিত বৈদ্যজাতি আবার যাহাতে বৈদ্যনামের সার্থকতা সম্পাদনে সমর্থ হয়—আসুন সমবেত বৈদ্যমণ্ডলী—আমরা তাহারই জন্য কৃতসংকল্প হই। আমাদের এই বয়সে আর শিক্ষালাভের উপায় না থাকিলেও আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকে আমাদের আর্য্য ঋষির অনুমোদিত—বেদ বিহিত সকল প্রকার সুশিক্ষায় সুশিক্ষিত করিয়া আমাদের লুপ্তকীর্ত্তির পুনঃ প্রবর্ত্তনে সচেষ্ট হই। বৈদ্য চিকিৎসক মাত্রের এখন ইহাই প্রধান কর্ত্তব্য এবং আমি এই জন্যই এত কথা বলিলাম।

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন।

বংশ রক্ষায় কর্ত্তব্য অবধারণ।

—:*:—

(প্রাপ্ত)

মহাশয়গণ, শ্রাবণের "আয়ুর্ব্বেদ" সংখ্যায় "কাজের কথা" শীর্ষক প্রবন্ধে "বালক রক্ষা," "ব্যাধির কারণ" "অকাল মৃত্যু" "ছাত্র জীবনে

ব্রহ্মচর্য্য" ও "প্রতীকারের উপায়" পাঠ করিয়া মনে বড়ই শঙ্কা ও চিন্তার উদয় হইল। ভাবিতে ভাবিতে মনে কয়েকটি কথার উদয় হইল ও আপনাদের লিখিতে ইচ্ছা হইল। যদি এই কথা গুলি আপনাদের রোচক হয় ও ইচ্ছা হয় তবে পত্রে প্রকাশিত করিতে পারেন, নতুবা ফেলিয়া দিবেন।

সন্তান—বিশেষ পুত্র সন্তান না হইলে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই মনে কষ্ট হয় এবং যাহাতে উহা লাভ হয় তাহার জন্য অনেকে দেবতা,সাধু প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং একটি সন্তান—বিশেষ পুত্র লাভ হইলে বড়ই আনন্দিত হন। আবার যাঁহাদের এমনই সময়ে পুত্র লাভ হয়, তাঁহারা পুত্র মুখ দেখিয়া আনন্দিত হন আর কন্যা হইলে প্রথমতঃ মনোকষ্ট ভোগ করিয়া পরে মায়াতে মোহিত হইয়া কন্যাতেই প্রীতি লাভ করেন। কিন্তু এই পুত্র বা কন্যা লাভ করা পর্য্যন্তই আগ্রহ। কিসে পুত্র বা কন্যা গুণবান্ বা গুণবতী,—সুস্থ ও সবল হইয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া জগতের মঙ্গল করিবে—সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকেন। কেহ বা জীবিকানির্ব্বাহের জন্য ব্যাপৃত থাকায় সময় না পাইয়া, কেহ বা আলস্যের বশবর্ত্তী হইয়া, আর যাঁহারা অর্থশালী তাঁহারা শিক্ষক ও গৃহশিক্ষকের উপর সম্পূর্ণ ভার দিয়া—বালক-বালিকার সৎশিক্ষা, চরিত্র গঠন ও সুস্থ রাখা বিষয়ের মধ্যে—কিছু তিরস্কার বা প্রহার ছাড়া সম্পূর্ণ উদাসীন থাকেন। পুত্র কন্যারাও পিতা মাতার স্বভাব বা প্রকৃতি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া সেই স্রোতে ভাসিতে থাকে। এইরূপে দেশের অবস্থা ক্রমে বড়ই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে। ফলে দেশের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে আর উপেক্ষা করিবার সময় নাই। সকলেরই এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক হইয়াছে ও বদ্ধপরিকর হইয়া যাহাতে আমাদের বংশাবলী ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে হইতে লোপ না পায়—তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা ও সত্বর প্রতীকারের উপায় করার প্রয়োজন। ছেলেরা যাহাতে উচ্ছৃঙ্খল না হয় তদ্বিষয়ে সত্বর দেখিতে হইবে। রাজনৈতিক আন্দোলনে আমরা যতটুকু সময় কাটাই, তাহা অপেক্ষা যদি অনেক কম সময়ও এই বিষয়ে প্রদান করি, তাহা হইলে দেশের মহৎ উপকার হয়। এখন রাজনৈতিক বিষয়ে চীৎকার করিবার পূর্ব্বে বালক বালিকা রক্ষার উপায় করিবার জন্য আমি দেশবাসীকে অনুরোধ করিতেছি। আমি দেশ বিদেশে হোমরুলের বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু আমার নিজের গৃহে সেই গৃহ শাসনের অভাব। আগে আমরা সুস্থ, সবল ও নীরোগ হইয়া বাঁচিয়া থাকিবার ব্যবস্থা করি, তাহার পর রাজদত্ত অধিকার প্রসারিত করিয়া সুখে থাকিবার চেষ্টা করিব। সকলে একবার চিন্তা করিয়া দেখুন দেখি যে, বালক রক্ষা আমাদের সর্ব্ব প্রধান কার্য্য কিনা! কেবল সন্তান জন্মিলে হইল না। সেই সন্তান সদ্‌গুণান্বিত, শান্ত-শিষ্ট-ধার্ম্মিক-নীরোগ-সবল ও দীর্ঘজীবী কিসে হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত কিনা? এ বিষয়ে পিতা মাতা উভয়েই উদাসীন। পিতা মাতার ব্রহ্মচর্য্য নাই—চিত্ত সংযম নাই—ধর্ম্ম প্রভাব নাই—আহার শুদ্ধি নাই—বলিতে গেলে গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে যে গুণগুলির আবশ্যক, তাহার কিছুই নাই—সন্তানে তাহা বর্ত্তিবে কিরূপে? আহার শুদ্ধি না হইলে চিত্তশুদ্ধি হয় না, চিত্তশুদ্ধি না হইলে ধর্ম্মমার্গে অগ্রসর

হইবার উপায় নাই। ধর্ম্মঅর্থে—যিনি ধরিয়া রাখেন অর্থাৎ ইহকালে সাংসারিক অভাব হইতে মুক্ত করিয়া সুখ সচ্ছন্দে দিন যাপন করেন ও মৃত্যুর পর পথপ্রদর্শক হইয়া সেই রমণীয় দর্শনকে দর্শন করান। ফলে ধর্ম্মহীন আমরাই হইয়াছি,—পুত্রদের দোষ দিলে কি হইবে? কোন মহাপুরুষ বলিয়াছেন "তোমরা সকলেই পুত্র চাও, কিন্তু কেহ শ্রীভগবানের মত পুত্র চাও না। কামজ সন্তানে কি উপকার হইবে। সেইজন্য তোমাদের নিকট ভিক্ষা করি যে, তোমরা শ্রীভগবানের মত পুত্র চাও, মা জগদম্বার মত কন্যা চাও-তবে তোমাদেরও দুঃখ দূর হইবে জগতেরও দুঃখ দূর হইবে। কিন্তু শ্রীভগবানের মত পুত্র-মা জগদম্বার মত কন্যা চাহিতে হইলে সেই রূপ শুচি শুদ্ধভাবে জীবন কাটাইতে হইবে-যেমন দেবকী-বসুদেব, যেমন কৌশল্যা-দশরথ, যেমন মেনকা, হিমালয় কাটাইতেন।" পূজ্যপাদ স্বর্গীয় ভূদেব বাবুও এই কথা তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন যে, প্রত্যেক গৃহস্থ দম্পতি এই রূপ ভাবে শুদ্ধাচারে চিত্ত সংযম লইয়া থাকিবেন যেন শ্রীভগবান তাঁহার গৃহে জন্ম গ্রহণ করিতে পারেন। এখন আমরা যাহা করিয়া ফেলিয়াছি, তাহার উপায় নাই—কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হই ও অন্যকে সাবধান করাই—ইহাই এখন আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য।

উপস্থিত আমাদের কি করা উচিত? প্রথমে যাহাতে আমাদের বালকগণ পুষ্টিকর সাত্ত্বিক আহার পায় তাহা করিতে হইবে। আমরা যাহাদের হাতের রান্না খাই, তাহাদেরই প্রকৃতি আমাদের উপর সূক্ষ্মভাবে ক্রিয়া করে, সেইজন্য রসুইয়া বামুনের হাতে বা হোটেল প্রভৃতিতে খাওয়া যথাসম্ভব ত্যাগ করিয়া নিজ মাতার হস্তের রান্না খাওয়া উচিত। প্রত্যেক মাতা, আপন সন্তানকে যতটুকু পারেন, নিজের হাতে খাওয়াইবেন এবং সেই রান্না যাহাতে এমন শুদ্ধভাবে হয় যে, যিনি যাঁহার আদিষ্ট দেবতা তাঁহাকে বা শ্রীভগবানকে নিবেদন করিয়া দিয়া তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করিতে হইবে। আজকাল পিতামাতা সন্তানকে বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া দেখিতে বড় ভালবাসেন, তাহাতে বিলাসিতা আসিয়া পড়ে। আমার বোধ হয়, যদি বালককে ৫৲ টাকা দামের বুট জুতার পরিবর্ত্তে ১৲ ১৷৷৹ দামের চটি জুতা কিনিয়া দিয়া, যে টাকা বাঁচিবে—তাহাতে বিশুদ্ধ ঘৃত ও দুগ্ধ ও ফল খাওয়ান, তবে সন্তানের মহোপকার করা হয়। বৃথা মাংস, বাসি মাছ একবারে ত্যাগ করান উচিত, দ্বিতীয় উপায় ব্যায়াম,—প্রত্যেক বালককে ডন্, উঠ্‌বস্ করা, আসন করা, ডম্বল দ্বারা বা ছোট হালকা মুগুর দিয়া ব্যায়াম করিতে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। ফুটবল্ প্রভৃতি খেলায় পয়সার অনর্থক খরচও ছেলেদের একটা খেলার নেশা জন্মাইয়া দিয়া খেলা যে শরীরের উপকারের জন্য তাহা ভুলাইয়া দেওয়া হয়। তা' ছাড়া ঐ সব খেলায় যেরূপ পরিশ্রম হয় তাহার উপযুক্ত পুষ্টিকর আহার যোগাইতেও আমরা পারি না। উহাতে খরচ বেশী হয়। যাহাতে খরচ কম হয়—সেইরূপ ব্যায়াম শিক্ষা করানই আবশ্যক। প্রাণায়াম অল্পে অল্পে শিখাইতে পারিলে ভাল হয়। বালক ব্যায়ামে প্রত্যহ বুঝিবে যে, শরীরের উপকার হইতেছে। তৃতীয়—সর্ব্বব্যাধি নিবারণের ঔষধ "রাম" রসায়ণ। সন্ধ্যায় ও শয়নকালে অন্ততঃ বালকগণ, পিতা-মাতা-ভাই-ভগ্নী সকলে মিলিয়া যে পরিবারের

যে ধর্ম্ম বা যে দেবতার উপাসনা করেন, তাহা চিন্তা করা নিতান্ত আবশ্যক। সংসার অজ্ঞানের মূল, জ্ঞান অর্জ্জন মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য। সেই জ্ঞানকে লাভ করিতে হইলে আত্মাকে জানা ও দর্শন করা ও তাহাতে পরমাত্মাকে দর্শন করিবার চেষ্টা করা উচিত। এই সকল করিলে বালকগণ সৎ হইবে, দয়াবান্ হইবে ও যে অক্ষর সেই ভগবানের পরিচায়ক, তাহাতে অশ্লীলতা লিখিয়া নিজের হস্ত দূষিত করিবে না। ইতি—

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, বি, এল উকীল।

ডাক্তারের আত্মকথা।

—:*:—

আমি যখন ডাক্তারী ডিগ্রি লইয়া বাহির হইলাম, তখন হৃদয়ের আশা পর্ব্বতাপেক্ষা উচ্চ—মনের অহঙ্কার সাগর অপেক্ষা বিস্ফারিত এবং গর্ব্ব-তরঙ্গে তাহা নিয়ত আন্দোলিত। মনের আনন্দে আটখানা—সদাই ভাবিতাম যে, আমি যাহা শিখিয়াছি, ইহা অপেক্ষা জগতে আর কোন চিকিৎসাশাস্ত্র বা উপদেশ উৎকৃষ্ট নাই। আর আমি যতদূর বুঝিয়া যেমন তেজের সহিত পাশ করিয়াছি, তাহা অন্যের পক্ষে দুঃসাধ্য। ফলতঃ আমি একটা খুব জাঁহাদার? এরূপ বিশ্বাস একা আমারই মনে যে হইত তাহা নহে। আমি আমার সমপাঠিদিগের সহিত আলাপেও বুঝিতাম যে, অধিকাংশ ব্যক্তিরই আমার ন্যায় ধারণা বদ্ধমূল।

ক্রমে এইভাবে দিন যাইতে লাগিল। একদা আমাদের পল্লীগ্রামের দ্বারকানাথ কবিরাজ মহাশয় আমাকে প্রশ্ন করিলেন। বলিলেন, "ওহে বাপু? তোমরা ত ডাক্তারী পাস করিয়াছ; আচ্ছা সন্নিপাত জ্বরের লক্ষণ কি বলিতে পার?" আমি প্রথমতঃ কতকক্ষণ অবাক হইয়া রহিলাম। পরে বারম্বার উত্তেজনা করায় ধুঁয়াইয়া ধিয়াইয়া আমার প্রাক্‌টিস অব মেডিসিনে টাইফয়েড জ্বরের যে যে লক্ষণ পড়িয়াছিলাম, তাহারই দুই-চারটা যতদূর স্মরণ হইল, বলিলাম। কবিরাজ মহাশয় "হুঁ" এই শব্দ করিয়া ঘৃণা ব্যঞ্জকভাবে এমনই অঙ্গভঙ্গী করিলেন, যাহাতে ডাক্তারী পাস করা ব্যাপার যে অতি তুচ্ছ, এমনকি—কিছুই নহে—এইরূপ ভাব প্রকাশিত হইল। তদ্দর্শনে যদিও আমি নিতান্ত অপ্রতিভ হইলাম বটে, তথাপি অহঙ্কারী আমি—নির্লজ্জ আমি—অর্ব্বাচীন আমি—তাঁহার সহিত অজ্ঞতাপূর্ণ তর্কাদি করিতে ছাড়িলাম না। অবশেষে আমার অনুসন্ধিৎসা বশতঃই হউক, বা যে কারণেই হউক, তাঁহার বিদ্যা পরীক্ষার্থে প্রশ্ন করিলাম যে,—"আপনি সন্নিপাত জ্বরের কি লক্ষণ অবগত আছেন?' তখন তিনি নিতান্ত মদগর্ব্বিত ভাবে এবং বিদ্রূপাত্মক স্বরে নিদানোদ্ধৃত দিব্য পদ্য শ্লোক আবৃত্তি দ্বারা সন্নিপাতের [illegible]

লক্ষণগুলি বলিয়া যেন ডাক্তারী চিকিৎসা প্রণালীকে এবং তাহার অর্ব্বাচীনত্বাকে ও শুধু জটিল গদ্যছন্দযুক্ত ভাষায় চিকিৎশাস্ত্র প্রণয়ন প্রথাকে শত ধিক্কার দিলেন। তচ্ছ্রবনে আমি লজ্জা, ক্ষোভ, দুঃখ এবং অপমান বোধ করিয়া এবং পাসকরা ব্যাপারের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া বাড়ী ফিরিলাম। তৎপর দিবসই মাধব করের কৃত "নিদান" সংগ্রহ করিয়া পড়া আরম্ভ করিলাম। সংস্কৃত শিক্ষা করি নাই বলিয়া নিতান্ত অনুতপ্ত হৃদয়ে বঙ্গানুবাদ পড়িতে লাগিলাম। তৎসঙ্গে কতক কতক সংস্কৃত বচনও মুখস্থ করিয়াছিলাম। উক্ত পুস্তক পাঠ করিতে গিয়া বুঝিলাম যে, আমার পাসের দ্বারা শিক্ষার কিছুই হয় নাই।

অনন্তর বর্ষাকালে যখন দেশমধ্যে জ্বররোগ অত্যন্ত বিক্রমের সহিত প্রাদুর্ভূত হইল, তখন আমিও বিস্তর রোগী পাইতে লাগিলাম। "ফিবার মিকশ্চার ও কুইনিন মিকশ্চার" ঔষধ আর দুধসাগু পথ্য দিয়া চিকিৎসা করিতে থাকিলাম। তাহাতে পিত্তজ্বরগুলি কিছু-দিনের জন্য বন্ধ হইল বটে, কিন্তু শ্লেষ্মার লেশ থাকিলে সে জ্বর আর কিছুতেই যাইতে চাহে না, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে জ্বরের উপরে কাস, বুকের বেদনা, গলা বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ জুটিতে লাগিল। লোকে আর ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া কেহবা কেহবা কবিরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিল। এইখানে প্রকাশ থাকে যে, আমি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। এলোপ্যাথগণ যেমন সকল সময়েই এলোপ্যাথি চিকিৎসা করিয়া, কলেরার সময় হোমিওপ্যাথি ধারণপূর্ব্বক স্বীয় অজ্ঞতার পরিচয় দেন, আমিও তেমনি সকল চিকিৎসা হোমিও-প্যাথিতে করিয়া তৎকালে জ্বর চিকিৎসাটা এ্যালোপ্যাথিতে করিতে যাইয়া অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিতাম।—ফলতঃ উক্তপ্রকার ঘটনা অনেকস্থলেই সংঘটিত হওয়া দেখিয়া মনে মনে বড়ই আত্মত্রুটি অনুভব হইতে লাগিল। ইহা শুধু আমার একার চিকিৎসায় নহে, আমার সমপাঠীগণ এবং অধ্যাপক স্থানীয়গণ প্রায় অধিকাংশই বিজ্বরে কুইনাইন দ্বারা জ্বর চিকিৎসায় ব্রতী হওয়ায়,—দেশ মধ্যে ইহা স্বর্ণাক্ষরে বিজ্ঞাপিত হইয়া পড়িল যে, হোমিও-প্যাথিকে জ্বর চিকিৎসা হয় না। এজন্য যে কলেরা রোগ হোমিওপ্যাথির একচেটিয়া ছিল, একটু জ্বর সংস্রব থাকিলে উহা আর হোমিও-প্যাথির আয়ত্ত নহে মনে করিয়া লোকে এলো-প্যাথির আশ্রয় লইতে আরম্ভ করিল। এইরূপে কয়েকবৎসর কাটিয়া গেল।

এতদ্দেশে জ্বরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান রোগ। তাহার চিকিৎসায় অকৃতকার্য্য—হইলে আর পসার, প্রতিপত্তি কি করিয়া থাকিবে? কাজেই আমি জনসমাজে দিবাভাগের চন্দ্রমাবৎ হীনপ্রভ হইয়া রহিলাম। ক্রমে অন্যান্য স্থানের হোমিওপ্যাথগণের সংবাদ লইয়া জানিলাম যে,—"সব রশুনের একই স্বাদ।" সকল স্থান হইতেই সৌরভ বাহির হইয়াছে যে,—হোমিওপ্যাথিতে জ্বর চিকিৎসা হয় না।" বড়ই আক্ষেপ হইতে লাগিল। ভাবিলাম, জ্বরের এত পুস্তক, এত গবেষনা পূর্ণ লক্ষণ অবধারণ, এত সময়ানুসারে দোষাদি বিচারানুসারে চিকিৎসার ইঙ্গিত, ইহা কি সবই ফাঁকি? না, কখনই তাহা হইতে পারেনা। অবশ্যই এখানে আত্মত্রুটি আছে। এইরূপে বহু চিন্তা করিয়া—বারম্বার জ্বর চিকিৎসা পুস্তক অধ্যয়ন ও বহু পরিশ্রমপূর্ব্বক ঔষধ

নির্ব্বাচন দ্বারা জ্বর চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দেখি যে,—হোমিওপ্যাথির মত জ্বর চিকিৎসার সুন্দর ঔষধ জগতে আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কেননা উপযুক্ত ঔষধের একটি মাত্র মাত্রা সেবনেই অতি তীব্রজ্বর—দশ পনের মিনিট মধ্যে ঘর্ম্ম হইয়া পরিত্যাগ হয় এবং পুনরাগত হয় না। ইহা যদি দশটা স্থলে হয় তবে একশত স্থলে হইবে না কেন? যদি না হয় তবে নিশ্চয়ই ঔষধ নির্ব্বাচনের ত্রুটি আছে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ উক্তরূপে প্রত্যক্ষ সুফল দেখিয়া পরম আনন্দিত হইতে লাগিলাম। তখন "হোমিওপ্যাথিতে জ্বর সারে না" এই ভ্রম বিদূরিত হইল। যেখানে সারেনা সেইখানেই নিজের ত্রুটি বুঝিয়া বিশেষ চেষ্টা পূর্ব্বক ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া দেখিতাম. তৎপরে সহজে আরোগ্যও হইত। কিন্তু শ্লেষ্মা সংযুক্ত জ্বর গুলি উপযুক্ত ঔষধ নির্ব্বাচিত হইলে বেশ ছাড়িত বটে, কিন্তু আবার হইত ও শ্লেষ্মার বৃদ্ধি হইত। ক্রমশঃ ইহার কারণ অনুসন্ধানে ব্রতী রহিলাম। কিছুতেই কিছু ঠিক করিতে না পারায় নিতান্ত ক্ষুণ্ণচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলাম।

আমার সহিত একজন খ্যাতনামা সুবিজ্ঞ কবিরাজ মহাশয়ের বন্ধুতা ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া উঠে। তাহার বিশেষ কারণ আমার আয়ুর্ব্বেদপ্রিয়তা ও নিদানাদি পাঠ। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই চিকিৎসা বিষয়ক আলাপেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। সেই প্রসঙ্গে একদা তাঁহার মুখে শুনিলাম যে,—

বিনাপি ভেষজৈর্ব্যাধিঃ পথ্যাদেব নিবর্ত্ততে
নতু পথ্য বিহীনানাম্ ভেষজানাং শতৈরপি।

অর্থাৎ বিনা ঔষধে শুধু পথ্যেই রোগ নিরাময় হয়। কিন্তু পথ্য বিহীন শত শত ঔষধ প্রয়োগেও কোনো ফল ফলিতে পারে না।

আবার তিনি আর একদিন ডাক্তার দিগের তরুণ জ্বরে দুগ্ধ পথ্যের ব্যবস্থা করা দেখিয়া নিতান্ত বিরক্তভাবে বলিলেন যে—"পথ্যের অব্যবস্থাই ডাক্তারী চিকিৎসার সবিশেষ অনভিজ্ঞতা। যেহেতু ডাক্তারী চিকিৎসায় লোকসকল উক্ত কারণেই চিররুগ্ন হইয়া পড়ে, কারণ বহু পরীক্ষিত ঋষিবাক্যে আছে:—

"জীর্ণজ্বরে কফক্ষীণে ক্ষীরোস্যাদমৃতোপমং।
তদেব তরুণে পীতং বিষবদ্ধন্তি মানবং॥

অর্থাৎ যেখানে শ্লেষ্মা ক্ষয় প্রাপ্ত অথচ জীর্ণ জ্বর (ঘুসঘুসে প্রাচীন জ্বর) হইতেছে; সেইখানে দুগ্ধ পথ্য দিলে উহা অমৃত সম ঔষধ ও পথ্য উভয়েরই কাজ করে। আর উহা (দুগ্ধ) যদি তরুণ জ্বরে দেওয়া হয়, তাহা হইলে বিষের ন্যায় মানবগণকে হনন করিয়া থাকে।

বিজ্ঞ কবিরাজ মহাশয়ের উক্ত বচন প্রমাণ শ্রবণে স্পষ্টই বুঝিলাম যে, তরুণ জ্বরে দুগ্ধ পথ্য দেওয়া আমার অভ্যাস থাকাতেই জ্বর চিকিৎসা ক্ষেত্রে সচরাচর কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। বাস্তবিকই প্রাগুক্ত অকাট্য ঋষি বাক্যাবলম্বনে রোগীকে উপযুক্ত সুপথ্যে রাখিলে বিনা ঔষধেও অত্যল্প কালেই জ্বরাদি পীড়া আরাম হইতে পরে। এইরূপ আলাপ প্রসঙ্গে কবিরাজ মহাশয় বলিলেন যে, তজ্জন্য আয়ুর্ব্বেদ বেত্তাগণ "জ্বরাদৌ লঙ্ঘনং পথ্যং জ্বরান্তে লঘু ভোজনং" বলিয়াছেন, অর্থাৎ জ্বরের প্রথম ভাগে (আমাবস্থায়) অনশন এবং জ্বর পরিত্যাগান্তে—লঘুপথ্য—তাহাও দুগ্ধাদি গুরু ও শ্লেষ্মাবর্দ্ধক পথ্য বর্জ্জিত করিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন। তার পর নবজ্বরের আটাই কা

কোনপ্রকার ঔষধ দিবার বিধিই প্রদান করেন নাই। কেননা রোগীর স্বাভাবিক রোগের আরোগ্য কারী শক্তি (Vismeditetrix matury) ঔষধ কর্ত্তৃক দুর্ব্বল না হয়। অষ্টাহেও যদি স্বভাবে জ্বর আরাম করিতে অক্ষম হয়, তবে মৃদুবীর্য্য ঔষধাদির ব্যবস্থা তাহাও অত্যল্প মাত্রায় দিবসে - জোর দুইবার (এখনকার মত এক বা দু ঘণ্টান্তর নহে) ব্যবহার করাইয়া জ্বর আরাম করিয়া দিতেন। তাহাতে স্বাভাবিক আরোগ্যকারী শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিত বলিয়াই লোকে একবার জ্বর হইতে সারিতে পারিলে আর দশ পনর বৎসরের মধ্যে জ্বরে পড়িত না। অধুনা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায়ও যদি প্রকৃত ঔষধ নির্ব্বাচিত হইয়া উপযুক্ত সময়ে (অর্থাৎ অষ্টাহ জ্বরের ভোগান্তে) প্রযুক্ত হয়, তাহাতে উক্তরূপে সুদীর্ঘকাল নীরোগ থাকিতে দেখা যায় কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, অতি মাত্রায় অসময়ে ও অযথা ঔষধ প্রযুক্ত হওয়ায় লোকের প্রকৃতি এখন এতই দুর্ব্বল হইয়াছে.--স্বাভাবিক আরোগ্যকারী শক্তি এমনি হীন হইয়া পড়িয়াছে যে, কেহই দুইদিন কালও অনশনে থাকিতে সহিষ্ণু নহে, অথবা ক্ষেত্র বিশেষে দুই দিনের তীব্রজ্বর সহ্য করিবার উপযোগী নহে। অনেক স্থলে দুই একদিনের জ্বরেই লীলা সম্বরণ করিতে দেখা যায়। ইহার কারণ চিন্তা করিলে উপলব্ধি হয় যে, অতিরিক্ত ঔষধ অযথা বহুদিন সেবন করিতে করিতে তাহাদিগের স্বাভাবিক আরোগ্যকারী শক্তি এতই নষ্ট হইয়াছে যে, সামান্য জ্বরবেগ মাত্রেই ইন্দ্রিয় সকল অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। অর্থাৎ সে যেন মরিয়াই থাকে, কেবল ঐ জ্বরটুকু উপলক্ষ্য হইলেই জীবন শেষ হয়। তবে শাস্ত্রাদিতে যে অভিন্যাস জ্বর প্রভৃতি হঠাৎ মৃত্যুজনক কতিপয় রোগের কথা উক্ত আছে, সে সংখ্যা নিতান্ত বিরল।

কবিরাজ মহাশয়ের উক্ত বচন প্রমাণে আমার মনোমধ্যে আর একটী চিন্তার উদয় হইল। ভাবিলাম যে পথ্য উপযুক্ত হইলে বিনা ঔষধেই রোগ শান্তি হইতে পারে, সেই জন্য পথ্য ব্যবহার প্রণালী সর্ব্বাগ্রে বিশেষ করিয়া শিক্ষা করার দরকার। তজ্জন্য পথ্য শাস্ত্র অনুসন্ধানে ব্রতী হইয়া ভগ্নমনোরথ হইলাম কারণ কেবল পথ্য বিষয়ের প্রকৃত পুস্তক কবিরাজী এ্যালোপ্যাথী কোন শাস্ত্রেই নাই।* কবিরাজী শাস্ত্রে রোগ হইলে তাহার দেশীয় পথ্যাপথ্য সম্বন্ধীয় যে কয়েক খানি পুস্তক দেখা যায়, তাহাতে অনাগত প্রতিষেধ বিষয়ের কোন উক্তি নাই। তারপর এ্যালোপ্যাথি মতেও বিদেশীয় Beef tea, Beef juce, cheaken broth প্রভৃতি অস্বাভাবিক অযৌক্তিক যে সকল পথ্য অতি সামান্যভাবে লিখিত আছে, তাহাও দেশবাসীর পক্ষে নিতান্তই অনুপযোগী। হোমিওপ্যাথী তাহারই নকল, কুপথ্যের কথাত উল্লেখই নাই।

শ্রীনলিনীনাথ মজুমদার।

* আয়ুর্ব্বেদে পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা খুব ভালরূপই আছে। লেখক আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। আঃ সং।

ওয়ার ফিভার।

—:*:—

ওয়ার ফিভার বা সমর জ্বর আমাদের দেশে আমদানী হইলেও তাহার স্বতন্ত্র নাম আমদানী হয় নাই। সমরে যেমন অধিকাংশ মানুষেরই প্রাণনাশ হওয়া সম্ভাবনা, কিন্তু সমর জ্বরে প্রাণনাশের সম্ভাবনা নাই।* "যাহা হউক এ জ্বরের নাম বিংশ শতাব্দীর জ্বর" নাম দিয়াই আমরা খালাস হইতে পারিতাম, কিন্তু বিংশ শতাব্দীরও যে এখন অনেক দিন বাঁকী আছে। আর কতিপয় বৎসর পরে হয়ত বর্ত্তমান ওয়ার ফিভারকে একটা নব প্রতিষ্ঠিত পরাক্রান্ত জ্বর আসিয়া পরাস্ত করিয়া দিবে। সুতরাং একটা সঠিক একটানা নাম ওয়ার ফিভারের হইতে পারে না। আমরাও ইহাকে তাই বলিয়াই সম্বোধন করিব।

সমর জ্বর কেমন করিয়া আসে, কিরূপে কয়দিন মানুষের দেহে বাসা গাড়িয়া বসে, কি করিয়াই বা উৎপাত করে, তাহা জানা দরকার। এক একবার এক এক সময়, এক একটা ব্যারাম আসিয়া প্রচণ্ড তুফানের মত দেশের মানুষ গুলাকে ছন্নছাড়া করিয়া দেয়। আমাদের স্মরণ আছে—একবার বাঙ্গালাতে কালাজ্বর আসিয়া বিধ্বস্ত করিল, তা'রপর আসিল ডেঙ্গুজ্বর। ডেঙ্গুর পর আসিল—ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়া সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিল। ম্যালেরিয়ায় যত মড়ক—তত আর কিছুতেই হয় নাই। ম্যালেরিয়া যে দিকে পদার্পণ করিয়াছে—তথায় সে বিজয়ী সেনার ন্যায় দেশকে ধ্বংস ও বিধ্বস্ত করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তারপর আসিল—ইনফ্লুয়েঞ্জা। ইহার পর আসিল সর্ব্বজয়ী প্লেগ। ইহাও এক প্রকার জ্বরবিশেষ। প্লেগের জীবনচরিত সকলেরই জানা আছে বলিয়া আর কিছু বলিলাম না।

এই যে সমর জ্বর আমরা দেখিতে পাইতেছি, ইহা অতিরিক্ত সংক্রামক ব্যাধি। ডেঙ্গু জ্বর যেমন সংক্রামক—ইহা ততোধিক। প্রথমতঃ এই জ্বরের আদি বা জন্মস্থান ইয়ুরোপ, অর্থাৎ যেখানে যুদ্ধের প্রভাব—সেইখান হইতেই আসিয়াছে বলিয়া ইহার নাম ওয়ার ফিভার বা সমর জ্বর। যুদ্ধস্থলে কামানের গোলা হইতে দূষিত বাষ্প বাহির হইয়া যুদ্ধস্থানের চতুর্দ্দিকে সর্ব্ব প্রথমে আক্রমণ করিয়াছে। জাহাজে প্রথমতঃ বোম্বাই, পরে কলিকাতা প্রভৃতি স্থান এমন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী পর্য্যন্ত ইহার বিস্তৃতি ঘটিয়াছে। সুতরাং আমিও ইহার জীবন চরিত ও চৌহদ্দি বর্ণনায় সমর্থ হইতেছি।

---

* সমর জ্বরে প্রাণনাশ হইবার সম্ভাবনা যথেষ্টই আছে, এ প্রবন্ধ লেখক যে সময় ইহা লিখিয়া আমাদের নিকট পাঠাইয়াছিলেন, সে সময় এজ্বরে মৃত্যুর কথা বড় শুনা যাইত না, যে সময় কলিকাতায় প্রথম এই জ্বরের আমদানি হয়, এ প্রবন্ধ সেই সময়ের লেখা। কিন্তু তাহার পর এই জ্বর একণে যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ইহার পরিণামে নিউমোনিয়া হওয়ায় ইহা ভীষণ মারাত্মক ব্যাধি বলিয়া স্থিরিকৃত হইয়াছে। বঙ্গদেশে এই ভীষণ মারাত্মক জ্বরে আক্রান্ত হইয়া প্রতিদিন সহস্র সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। শুধু বঙ্গদেশ কেন, ভারতের সর্ব্বত্রই এই জ্বরের ভয়ঙ্কর প্রাদুর্ভাব। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও এই জ্বরের আক্রমণ সংপ্রতি পূর্ণভাবে প্রকটিত। আং সং।

বোধ হয় ইহাতে সাধারণের উপকার হইবে।

সমর জ্বর বা ডেঙ্গুজ্বর সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গালায় আসে কলিকাতায়। কলিকাতার অবস্থা অবর্ণনীয়। সে দুরবস্থার কথা অনেকেই অবগত আছেন। যাঁহারা ভুক্তভোগী তাঁহারা ব্যতীত সংবাদ পত্র পাঠকেরাও বিলক্ষণ অবগত আছেন। এই জ্বরটা একটা অদ্ভুত প্রকৃতির. জ্বরটা আসিবার আগে কিছু অনুভব করা যায় না। হাত, পা, মাথা বেদনা হয়; সর্দ্দিভাব দেখা যায়। তারপরই জ্বর। জ্বরের সঙ্গে সঙ্গেই ভীষণ গা বেদনা। এই বেদনা সংযুক্ত জ্বর তিন দিনই প্রবল থাকে. তারপর কমিতে থাকে। ৪।৫ দিনের বেশী জ্বর ও বেদনার উৎপাত থাকে না। তারপর হয় অতিশয় দুর্ব্বলতা। এই দুর্ব্বলতা অনেক দিন পর্য্যন্ত রোগীকে কাবু করিয়া বসে। জ্বরের প্রথমাবস্থায় বড় বেশী ঘুম হইতে থাকে, জ্বরের প্রাবল্য কমিলে নিদ্রাল্পতা ঘটিতে থাকে এবং ক্রমশঃ দুর্ব্বলতা বাড়িতে থাকে। কফ কাশের উপদ্রবে অনেকের গলা, বুক ও পেটে বেদনা হয় কিন্তু তাহাতে ভয়ের কারণ বুঝিতে হইবে না।

জ্বরটা আসিবার আগে শরীরটাকে খুব হালকা করা প্রয়োজন, যাহাতে সর্দ্দি লাগিতে না পারে সেই আয়োজন করিতে পারিলে জ্বর ও বেদনা হইলেও ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিতে পারে না। জ্বর ও বেদনা হইলেও শরীরটাকে হালকা রাখিতে হইবে। অত্রাবস্থায় লঙ্ঘন—উত্তম ঔষধ। সাগু ও খই ব্যতীত অন্য পথ্য বিধেয় নহে। দুই দিন জ্বরের পর রুটী ব্যবস্থা হয়। জ্বরের উত্তাপ চারি ডিগ্রীর অধিক হইতে দেখা যায় না। কিন্তু শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও বেদনা অত্যধিক প্রকারে আক্রমণ করে। রাত্রে প্রলাপ, মুখ শোষ, হাত, পা জ্বালা, মাথা বেদনা এই জ্বরের অঙ্গ বিশেষ। কিছু দিন হইল "হিতবাদী" পত্রিকায় নুন চা ও ইউসিলেপটাস্ অয়েল ব্যবহারের উল্লেখ কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি লিখিয়াছিলেন কিন্তু অভিজ্ঞতা দ্বারা দেখা গিয়াছে ইউসিলেপটাস্ অয়েল রোগ আক্রমণের পূর্ব্বে ব্যবহার করিলে উপকার হইতে পারে, কিন্তু রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে বিষতুল্য। ইহা ব্যবহার করিলে তদবস্থায় রোগীর মস্তিষ্ক ভয়ানক রকমে উত্তেজিত ও আক্রান্ত হয়। তাহার পর রোগী প্রলাপ বকিতে থাকে। অবত্রাস্থায় রোগীর আত্মীয়গণের চিন্তা করিবার কারণ নাই। দুই দিন পরেই শরীরটা ঝরঝরে, তরতরে হইলেই প্রলাপটা দূর হইবে। তারপর ক্রমশঃ জ্বর ও বেদনা কমিয়া তিন চারি দিন পর্য্যন্ত কাহারো কাহারো পাঁচ ছয় দিন থাকিতেও দেখা যায়। জ্বর ও বেদনা দূরীভূত হইলে রুটী বা খিচুড়ী পথ্য বিধেয়। কফ ও বেদনা কম থাকিলে দুধটাও দেওয়া যাইতে পারে। জ্বর ও বেদনা প্রবল থাকাবস্থায় দুধ কোন প্রকারেই ব্যবস্থা নহে। কফ যখন নাক দিয়া জলের মত পড়িতে থাকে, তখন দুধ বিষতুল্য। কফ যখন গলা দিয়া ঘন হইয়া বাহির হইতে থাকে তখন দুগ্ধ অপথ্য নহে। কিন্তু গরম দুগ্ধই বিধেয়। ইহা কোষ্ঠ পরিষ্কারের সহায়তা করে। কোষ্ঠ বদ্ধ হওয়া একটা উপসর্গ। চারি পাঁচ দিন কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, এরূপবস্থায় জ্বরের পর কোন প্রকার কোষ্ঠ পরিষ্কারের ঔষধ ব্যবস্থা করা উচিত, রীতিমত আহারাদি করিলেও কোষ্ঠ শুদ্ধি ও প্রস্রাব হইয়া থাকে।

এই ব্যারামের আর একটা উপসর্গ এই

যে, রোগীর দাস্ত ও প্রস্রাব এক প্রকার বন্ধ হইয়া যায়। তবে গ্রহণী ও বহুমূত্র রোগীর পক্ষে স্বতন্ত্র কথা। খুব গরম ভাবে থাকিলেই এই ব্যারামের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, অথবা রোগ হইলেও তাহার উৎপাতটা তেমন হয় না। জ্বর আক্রমণের সময় পিপাসা ও দাহ খুব বৃদ্ধি হয়, কোন কোন ব্যক্তি ববফ, সোডা, লেমনেড্ প্রভৃতি শৈত্য ব্যবহার করেন। কিন্তু তাহার মন্দ ফল বড় ভীষণ ভাবে উপস্থিত হয়। এই ব্যাধি মারাত্মক না হইলেও অত্যাচারের নিদর্শন স্বরূপ নিউমোনিয়া প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া মারাত্মক হইয়া পড়ে। এই সব রোগীকেই এই জ্বরে মারা যাইতে দেখা যায়। এই জ্বরের প্রথম ও মধ্য ভাবে সুপক্ক আনারস সুপথ্য কিন্তু অন্ত অম্ল বিষতুল্য, লেবুটাও সুপথ্য বটে।

জ্বর ও বেদনা সারিয়া গেলে অন্ন পথ্য প্রয়োজন। তাহার পর রীতিমত স্নান, আহারাদি করিয়া শরীরটাকে শোধরাইয়া লইতে হইবে। এই সময়ে বলকর ঔষধ ব্যবহার করিলে সহজেই পুনর্ব্বল সংগ্রহ হইতে পারে। যাহাদের পেঁয়াজ খাইতে আপত্তি নাই, তাঁহারা তেলে-ভাজা পেঁয়াজ গরম গরম খাইলে কফ ও বেদনা হইতে উপশম বোধ করিতে পারেন। সর্ব্বো-পরি সাবধান থাকাই ইহাতে ব্রহ্ম ঔষধ।

শ্রীরাজেন্দ্র কুমার মজুমদার।
শাস্ত্রী, বিদ্যাভূষণ।

প্রদর রোগ চিকিৎসা।

(মহিলাদিগের জন্য ছড়ায় লিখিত)

কুশের মূল চালের জলে,
প্রদর সারে বেটে খেলে।

হরিণের রক্ত, মধু, চিনি,
খেলে প্রদর সারে জানি।

অশোক ছাল দুই ভরি,
দুধ নাও আট গুণ করি,
জল নাও দুধের চারি গুণ
পাক ক'রে রাখ দুধ টুকুন।
দিন কতক খাওগে এই ক্বাথ,
প্রদর রোগ হ'বে নিপাত।

যজ্ঞ ডুমুরের রস মধুর সহ
প্রদর হ'লে খেতে কহ।

দুধে বেটে বেড়েলা মূলে
খাও গে প্রদর রোগ হ'লে।

কুলের গুঁড়ো গুড়ের সহ
প্রদর রোগে খেতে দেহ।

গুড় দিয়ে খাও কলার গুঁড়,
প্রদর রোগে উপকার বড়।

দুধ, ঘি আর লাক্ষাচুর,
প্রদর রোগ করে দূর।

———

রোড়া মূলের ছাল, চিনি, মধু
কিম্বা আমলকীর বীচির শাঁস শুধু,
জলে বেটে দাও মধু, চিনি,
প্রদরে খাও উপকার জানি।

———

ধাইফুলের কি আমলার গুঁড়,
মধুর সহিত সেবন কর।
কাকজঙ্ঘা কি কাপাস মূলে
বেটে খাওগে চালের জলে
পাণ্ডু প্রদর হয় গো যাদের
এ দু'টী যোগে উপকার তাদের

———

বাসকমূলের ছাল, দারু হরিদ্রা, মুথা,
রসাঞ্জন, বেলশুঁঠ, ভেলা চিরাতা,
সাড়ে সাতাশ কুঁচ এক একটি নিয়ে—
আধসের জলে চাপিয়ে দিয়ে,
আধপোয়া থাক্‌তে নামিয়ে নাও
মধু দিয়ে এই কাথ খাও।
সব রকম প্রদর এতে সারে,
'দার্ব্বাদি নাম কয় এরে।

———

রক্তচন্দন, বেলশুঁঠ, বাসক, মুথা,
আকন্দমূল, রসাঞ্জন, দারু হরিদ্রা,
চিরাতা,
সিকিভরি এক একটি নিয়ে
আধ সের জলে কাথ করিয়ে,
মধু দিয়ে খাও প্রদর হ'লে,
শিগ্‌গির এতে সুফল ফলে।

———

ভূঁইআমলাচূর, চালের জল
প্রদরে খেলে বড় ফল।

———

দু'তোলা যষ্টীমধু, দু'তোলা চিনি
চা'ল ধোয়া জলে খেলে উপকার
জানি।

শরপুঙ্খ—চালনি জলে বেটে
রক্তস্রাবে খাও-গে বেটে।

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন।

———

গার্হস্থ্য মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কা।*

—:*:—

চষিপোকায়।—হাতের তালুতে কি আঙ্গুলে চষিপোকা হইলে প্রাতে মুখে জল না দিয়া তেলাকুচার পাতা হাতে রগড়াইলে ঐ পাতার সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা বাহির হইয়া রোগ আরোগ্য থাকে।

আঙ্গুল হারায়।—ছোট গোয়ালিয়া লতার পাতার সরু ডগা বাটীয়া প্রলেপ দিলে ৩।৪ দিবসে বা ভাল হয়।

গলায় বিচি আওড়াইলে।—কালজীরা ২ তোলা, রক্তচন্দন ঘসা ২ তোলা,

আফিং ৵০ দুই আনা, মনসা সিজের পাতার রস দিয়া বাটীয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলে উপশম হয়।

আধ্‌কপালে।—যে রগে বেদনা হইবে গামছা পাকাইয়া সে রগ কষিয়া বান্ধিলে উহা তৎক্ষণাৎ আরোগ্য হয়।

নাসায়।—বাসক পাতার রস আধ পোয়া, ভাল মধু আধপোয়া একত্র করিয়া খাওয়াইলে উপকার হয়। ইহা সেবনের পর যদি গা বমি বমি করে—তবে খানিকটা মিছরি খাইতে দিবে।

শিশুর শয্যা মূত্রে।—শনি কিম্বা মঙ্গলবারের ভোরের বেলায় একটা বাঁশের আগা ধরিয়া বালককে বাঁশগাছের মাথায় প্রস্রাব করাইবে, ইহাতে ঐ রোগ ভাল হইবে।

চক্ষু উঠায়।—নারিকেলের ফুল ১টা চোণায় বাটীয়া চক্ষুর চারিদিকে প্রলেপ দিলে উপশম হয়।

স্ত্রীজাতির স্তনে দুগ্ধ বৃদ্ধি।—ভূমি কুষ্মাণ্ডের গুঁড়া আধ তোলা, আতপ চাউলের গুঁড়া আধতোলা খানিকটা দুগ্ধে গুলিয়া ৭ দিন খাইলে স্ত্রীলোকের স্তন্যে দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

চুলকণায়।—গায়ের কোনো স্থানে চুলকণার মত বাহির হইলে কিম্বা চুলকাইয়া দাগড়া দাগড়া হইলে, পুরাণ তেঁতুলের মজ্জা সেই স্থানে মাখাইয়া শুকাইয়া ফেলিবে ২।৩ দিন এইরূপ করিলেই উহা ভাল হইবে।

অম্লশূলে।—ধান্যের গুঁড়া ১ তোলা চা খড়ির গুঁড়া ১ তোলা কাটান'টে শাকের শিকড় ১ তোলা উত্তমরূপে একত্র বাটীয়া গরম রুটীতে মাখাইয়া তাহার পর আবার একটু চা খড়ির গুঁড়া মিশাইয়া প্রাতঃকালে কয়েকদিন খাইলে অম্লজনিত শূল বেদনার উপশম হয়।

ক্রিমি শূলে।—ক্রিমি জনিত শূল হইলে আধপোয়া ছাতিমের মূলের রস আধ ছটাক চুণের জল একত্র মিশাইয়া খাওয়াইলে উপকার হয়

অজীর্ণজনিত পেট ফাঁপা।—জাঙ্গীহরীতকী কাটখোলায় ভাজিয়া, কাল লবণের সহিত মিশাইয়া প্রাতঃকালে ২।৩ দিন খাইলে অজীর্ণ জন্য পেটফাঁপা আরোগ্য হয় জাঙ্গীহরীতকীর পরিমাণ প্রত্যহ একটি এবং লবণের পরিমাণ চারি আনা।

শ্রীসুধাংশুভূষণ সেন গুপ্ত।

---

* আমার পিতামহ স্বর্গীয় ৺ঈশ্বরচন্দ্র সেন গুপ্ত মহাশয় কলিকাতা ইটালির একজন সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন। আমি গার্হস্থ্য মুষ্টিযোগ যাহা লিখিতেছি তাহা তাঁহারই স্বহস্তে লিখিত জীর্ণ খাতা হইতে [illegible] সংগৃহীত।

ধর্ম্মপালনে স্বাস্থ্যরক্ষা।

কতকটা এই বিষয় লইয়াই একটী সুচিন্তিত প্রবন্ধ আশ্বিন মাসের 'আয়ুর্ব্বেদে' বাহির হইয়া গিয়াছে। তথাপি এই একই বিষয়ে আমার আরো একটী প্রবন্ধ লিখিবার কারণ—আমার মনে হয়, আমার পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রদ্ধেয় লেখকের প্রবন্ধটী সুন্দর ও সুসজ্জিত হইয়া থাকিলেও যেন সর্ব্বব্যাপক হইয়া উঠে নাই। সম্ভবতঃ এইরূপ সঙ্কীর্ণভাবে লেখাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। আমি কিন্তু এই বিষয়টা একটু বিশদ্-ভাবে বলিতে চাই। কারণ আমার মনে হয় এইরূপ বিষয় একটু বিশদভাবে বলিবারই আজ সময় আসিয়াছে। অতএব পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকের নিকট বিষয় গ্রহণের নিমিত্ত ঋণী রহিয়া তাহারই উৎকীর্ণ মার্গে অগ্রসর হইব। বিষয়ের মৌলিকতার জন্য যশঃ ও খ্যাতি তাহারই রহিল, বিস্তৃতাবতারণার দোষ ও ক্ষতি আমিই শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম।

বারংবার আমার বলিতে ইচ্ছা হয় যে, 'শরীর মাদ্যং" হিন্দুধর্ম্মচর্য্যার মূল সত্য। এবং এই মূল সত্যের নিদান বলিয়াই আয়ুর্ব্বেদও একটি ধর্ম্মশাস্ত্র. ইহাও একটী বেদ। হিন্দু অতিবড় মনস্তত্ত্ববিদ্ ছিল—সে শরীর মনের প্রগাঢ় সম্বন্ধটা খুবই বুঝিয়াছিল। সে বুঝিয়া-ছিল—ধর্ম্মরাজ্যের মনই নেতা, কিন্তু শরীর যখন মনের পোষক, আবাস, কর্ম্মপথে সহায়, তখন শরীরকে আগে রক্ষা করিতে হইবে। এই মন্ত্রের সঙ্গে অনুষ্ঠান হিন্দুধর্ম্মাচর্য্যায় একই অচ্ছেদ্য সূত্রে চির-কাল গ্রথিত। এই যত সব অনুষ্ঠান তলাইয়া বুঝিলে এগুলিই শরীরো-ন্নতির সহায়। এই উন্নত শরীরই পরে উন্নত মনের স্রষ্টা। প্রত্যক্ষ ভাবে কতকগুলি অনুষ্ঠান শরীরের হানিকর মনে হইতে পারে, কিন্তু ক্ষণিক চিন্তার ফলেই উপলব্ধি হয় যে, এই সাময়িক হানিই পরিণামের স্থায়ী স্বাস্থ্যের কারণ। একাদশীর উপবাস সাময়িক কিঞ্চিৎ ক্লেশ আনয়ন করিলেও পরে কফহীন সুস্থদেহ ও ধারণাশীল মন প্রদান করিয়া পুরস্কৃত করে। বাস্তবিক পক্ষে জগতের সর্ব্ববিধ সফলতাই বুঝি সাময়িক হানি দ্বারা উপার্জ্জিত। ছাত্র জীবনের কঠোর শ্রম পরিণামের চিরসুখী জ্ঞানময় মনের জনক। ব্যায়াম সাময়িক শ্রান্তিদান ও স্বেদস্রাব করাইয়াই পরে বলিষ্ঠ দেহ প্রদান করে। অতএব হিন্দুর কঠোর তপস্যাকে তথাকথিত সুসভ্যজাতির আদর্শানু-সারে—damn your penance বলিয়া উপেক্ষিত করা আদৌ ভব্যতার, অন্ততঃ সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচায়ক নহে।

আদি হিন্দুর সমস্ত জীবন স্থূলতঃ দুইটী প্রয়াসকে বক্ষে ধরিয়াই কৃতার্থ হইয়াছিল। একটী ধর্ম্ম, আর একটী তৎসঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে গ্রথিত স্বাস্থ্যরক্ষার কারণভূত অনুষ্ঠান। একটী মুখ্য উদ্দেশ্য, অন্যটী ঐ মুখ্যটীকে লাভ করিবার জন্য গৌণ হইয়াই বরণীয় হইল। বাস্তবিকই গৌণ অনেক সময় গৌণ হইয়াই যেন মুখ্যকেও ছাপাইয়া উঠে। ইহারই অর্থ বোধ হয় ভগবান অপেক্ষা ভক্ত বড়। [illegible]-

হনুমান—রামকেও বুঝি আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছে। লক্ষণ ও হনুমান না হইলে বুঝি রামায়ণের রামত্ব বজায় থাকিত না। অনুষ্ঠান ও স্বাস্থ্যরক্ষা না থাকিলেও হিন্দু বুঝি ধর্ম্মগুরুর মণিময় রুদ্রাক্ষহার গলদেশে ধারণ করিয়া মানবেতিহাসে 'বর্য্য' বা মহর্ষি আখ্যা লাভ করিতে পারিত না।

স্বাস্থ্যকে অগ্রে রাখিয়া সাধনা করিবার পথে হিন্দু চতুর্ব্বর্ণ ও চতুরাশ্রমের সৃষ্টি করিল। মনে রাখা উচিত যেমন সব জিনিষেরই একটা ভিতর পিঠ বাহির পিঠ, একটা পোষাকী আট পৌরে ভাব আছে, ধর্ম্মেরও তাই। ধর্ম্মও, আট পৌরে ও পোষাকী হিসাবে, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক এই দুই প্রকার। সামাজিক ধর্ম্ম সেইটা—যা রাজ্য রক্ষা করে, দেশকে বাঁচায়, মানব জাতিকে নৈতিক অধঃপতন হইতে মুক্ত করে। আর গভীরতর সূক্ষ্মতর যে আধ্যাত্মিক সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম, তা মানবের মনকে উন্নত করে, তাহাকে গড়িয়া তোলে, বিভিন্নের মধ্যে এক কে বোঝায়, মানবের সসীম জীবাত্মাকে অসীম পরমাত্মার সহিত যুক্ত করে। সকল মানবই কিছু আধ্যাত্মিকতার অধিকারী নহে কারণ সকল মানবই কিছু ভূয়োদর্শন বা সূক্ষ্মানুভবের ক্ষমতা লইয়া জন্মগ্রহণ করেনা। বস্তুতঃ সামাজিক ধর্ম্ম,—শাসনের ধর্ম্ম—রক্ষার ধর্ম্ম না থাকিলে সাধারণ অল্পবুদ্ধি মানবের ধর্ম্ম প্রবৃত্তির প্রদীপ একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়া যাইত।

আমরা ক্রমশঃ এই সামাজিক চাতুর্ব্বর্ণ্য ও আধ্যাত্মিক চাতুরাশ্রম ধর্ম্মপালনের মধ্যে স্বাস্থ্যরক্ষার অনুষ্ঠান গুলির আলোচনা করিব। বলা বাহুল্য বিষয়টী অত্যন্ত বড়, ও স্থান অপ্রচুর বলিয়া বিস্তৃত আলোচনা এ ক্ষেত্রে অসম্ভব। তবে আর কিছু না হউক—সমস্ত বিষয়টীর একটী সম্পূর্ণ অথচ ক্ষুদ্র মানচিত্র অঙ্কিত করিতে প্রয়াসী হইতে আপত্তি কি?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—সামাজিক ধর্ম্ম—শাসনের ধর্ম্ম, দেশ ও সমাজ রক্ষার ধর্ম্ম। এই শাসন ও রক্ষাকল্পে অন্ততঃ চারিটী জিনিস্ চাই—চাই কর্ম্মনেতা, চাই কর্ম্মচারী, চাই সেবক। এই উপদেষ্টাই জ্ঞান গুরু ব্রাহ্মণ, এই কর্ম্মনেতাই ভীমবল যুদ্ধকৌশলী শাসনক্ষম রাজা—ক্ষত্রিয়, এই কর্ম্মচারীই বাণিজ্যকুশল বৈশ্য, এই সেবকই শূদ্র। ব্রাহ্মণ সমাজের মস্তক, তিনি জ্ঞানদান দ্বারা সমাজের মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা করেন। তাঁহারই উপদেশে চালিত হইয়া রাজার বীরত্ব ও ভীমগুণ জ্ঞানের সহিত সংযুক্ত হইয়া স্থৈর্য্য ও কান্ত গুণ লাভ করে ও সুখশাসনের কারণ হয়। ব্রাহ্মণের জ্ঞানলাভ—ধর্ম্ম, জ্ঞানদান তাঁহার অনুষ্ঠান এবং এই অনুষ্ঠানই সমাজের মানসিক স্বাস্থ্য বিধান করে। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম—রাজত্ব শাসন অর্থাৎ যুদ্ধ, দেশরক্ষা বা প্রজাপালন তাহার অনুষ্ঠান। এই দেশ রক্ষার মধ্যেই সামাজিক সর্ব্ববিধ স্বাস্থ্যরক্ষা নিহিত আছে। ক্ষত্রিয়ই তাহা হইলে সাক্ষাৎভাবে স্বাস্থ্যরক্ষা করেন একেবারে কর্ম্মের মধ্য দিয়া। ব্রাহ্মণ করেন একটু পরোক্ষভাবে জ্ঞানের মধ্য দিয়া। এই জ্ঞানই কর্ম্মপথে আত্মপ্রকাশ করে, এই জ্ঞানই কর্ম্মকে বল প্রদান করে। ব্রাহ্মণের স্বাস্থ্যরক্ষায় পরোক্ষ সম্বন্ধ থাকিলেও তিনি ক্ষত্রিয়েরও পূজ্য। কেননা ক্ষত্রিয় নিজেই শাসন নীতির জ্ঞানের জন্য ব্রাহ্মণের নিকট ঋণী। এই কর্ম্মনেতার—এই শাসন কর্ত্তার—এই ক্ষত্রিয়ের কার্য্য সৌকার্য্যার্থ বৈশ্য কর্ম্মচারী [illegible] তিনি যোগান ইন্ধন। এই ইন্ধনের [illegible]

ক্ষত্রিয় উপযুক্ত শাসনকটাহে দেশের মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্য প্রস্তুত করেন। বৈশ্যের শিল্পবাণিজ্য দেশের স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়স্বরূপ খাদ্য ও ধনের সৃষ্টি করে। আর শূদ্র করে একটী ছোট অথচ সবার অপেক্ষা উদার কাজ। সে কর্ম্মক্লান্ত উপরোক্ত তিন জাতির মুখখানি স্নেহাঞ্চলে মুছাইয়া দেয়। সেবার দ্বারা তাহাদের সর্ব্ববিধ ক্লেশের অপনোদন করিয়া পুনরায় তাহাদিগকে কর্ম্মক্ষম করিয়া তোলে। শূদ্রের কাজ কদাপি নিন্দনীয় নহে। তার কাজ মায়ের কাজ, কন্যার কাজ, কনিষ্ঠ ভ্রাতার কাজ। এ কাজের স্মৃতি—কৃতজ্ঞতা জড়িত, অশ্রু ইহার স্বভাব, স্নেহ ইহার প্রাণ, সেবা ইহার ব্রত বা আজন্ম সাধনা।

সমাজকে যদি একটী মানুষ ধরিয়া লই, তবে দেখিব সে কতকগুলি শরীররক্ষক ও ডাক্তার কর্তৃক পরিবৃত। ব্রাহ্মণ তাহার মস্তক ও তৎসঙ্গে তাহার মন রক্ষা করিতেছে, বৈশ্য তার উদরপূর্ত্তি করিয়া তাহার শারীরিক বলের ও তৎসঙ্গে তাহার মানসিক তেজের সৃষ্টি করিতেছে—এই মানসিক তেজের বলেই সে কত গভীর চিন্তা করে, কত সুখদুঃখের সমরে জয়ী হয়, কত শত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া জগৎকে চমৎকৃত করিয়া দেয়। শূদ্র তাহার কর্ম্মক্লান্ত দেহটীকে মাজিয়া ঘষিয়া, স্নান করাইয়া সুস্থ রাখে। আর ক্ষত্রিয় সর্ব্বোপরি তাহার body guardএর মত; শুভাকাঙ্ক্ষী অভিভাবকের মত, তাহার সমস্তটা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। দেখিতেছে সে কি খায়, কি ভাবে, কিরূপ তাহার স্বাস্থ্য, অন্যে তাহাকে আক্রমণ করিতে না পারে। এইরূপ যত্নে লালিত হইয়া সমাজ ক্রমশঃ একটী সুস্থশরীর জ্ঞানী মানুষের আদর্শে গড়িয়া উঠিত।

তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সমাজের স্বাস্থ্য-রক্ষায় নিযুক্ত এই চারিটী বর্ণের এক একটী বিশেষ বিশেষ গুণ বা ধর্ম্ম ছিল ও এক একটী বিশেষ কর্ম্ম বা অনুষ্ঠান তাহাদের সাধন করিতে হইত। এই জন্য চিন্তাশীল বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মণ হইলেন, বাণিজ্যকুশলী বৈশ্য ও সেবাব্রতী শূদ্র হইলেন। ভগবানও এই কথাই গীতায় প্রকাশ করিতেছেন—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"

এইবার চতুরাশ্রমের কথা। ব্রাহ্মণ জ্ঞানগুরু ও চিন্তাশীল, অপর তিনবর্ণ মানসিক বলে তাঁহার অপেক্ষা অনেক ন্যূন? সুতরাং আধ্যাত্মিকতার ধারণায় সম্পূর্ণ অসমর্থ। ব্রাহ্মণ এই আধ্যাত্মিকতাকেই আজীবন বরণ করিয়াছেন—অসীমকে, অনন্তকে, ব্রহ্মকে জানাই তাঁহার জীবনের ব্রত, তাঁহার সার্থকতা। তাই ব্রাহ্মণের আজীবন প্রয়াস, নিজেকে এই ব্রহ্মোপাসনার সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলা। তাই শরীরকে অগ্রে রাখিয়া সাধনার পথে এবার তিনি চতুরাশ্রমের সৃষ্টি করিলেন। প্রথম আশ্রম—ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞানলাভের জন্য শাস্ত্রচর্চ্চা ইহার ধর্ম্ম এবং বীর্য্যরক্ষা ইহার অনুষ্ঠান। এ উপার্জ্জনের আহরণের কাল। এ সময় বীর্য্য ধারণ করিয়া বলের আহরণ করিতে হইবে এবং এই বল ও এই ওজঃ যে সুস্থ ও মেধাবীগণকে সৃষ্টি করিবে, তাহাকে শাস্ত্রাভ্যাসে নিযুক্ত করিতে হইবে। দ্বিতীয় আশ্রম গার্হস্থ্য। এই আশ্রম practical আশ্রম। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কাল্পনিক (theoretical) জ্ঞান এখানে বাস্তবের মাঝে পরীক্ষিত হইবে। উপদেশ এখানে উদাহরণ দেখাইবে। সৃষ্টি প্রবাহরক্ষণের মধ্য দিয়াও কেমন

ব্রহ্মচর্য্য ও স্বাস্থ্যরক্ষা হইতে পারে; স্ত্রী-প্রেম, সন্তান-স্নেহ, ভক্তি প্রীতির দ্বন্দ্বের মধ্যেও কেমনে নির্লিপ্ত শাস্ত্রজ্ঞ মন জ্ঞানের প্রদীপ রাখিয়া সজাগভাবে জনকঋষির মত ভগবদ্ধারণায় অগ্রসর হইতে পারে; প্রেমই কেমনে ধীরে ধীরে মানবকে মুক্তিমার্গে পৌঁছাইয়া দেয় এ সেই শিক্ষার আশ্রম। তৃতীয় আশ্রমে কর্ম্মক্লান্ত কিন্তু কর্ত্তব্যসাধনে আত্ম প্রসাদপ্রাপ্ত মন এবার সংসারের, জনের কাজের অবসানে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া বিজনে ভগবৎস্বরূপ নির্ণয় করিতেছে। বনের নির্ম্মল বাতাস, আসন্ন সমুদ্রসমীর, প্রভাতের অবাধ সহজ খগ-রুতি, সুপ্রস্ফুটিত-কুসুমসুরভি বৃদ্ধের দেহবল ও মনের প্রফুল্লতা অক্ষুণ্ণ রাখিতেছে। বানপ্রস্থাশ্রমী ক্রমশঃ নিজেকে ঈশ্বরের নিকটতর এবং অনুরূপ করিয়া গড়িতেছে। সর্ব্বশেষ আশ্রম কি উদাত্ত! কি গম্ভীর, কি মহিমময়! সর্ব্বত্যাগী যতি, ভগবজ্জ্যোতিঃ লাভ করিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার আজন্ম শরীররক্ষা, মনের উন্নতিসাধন চেষ্টা সফল হইতে বসিয়াছে—সে মুক্তির সোপানে ঈশ্বরের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে নিজেকে জানিয়াছে 'ব্রহ্মোঽহং' এবং ব্রহ্মাকে জানিয়া বলিতেছে—

> ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং,
> ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং।
> ত্বমব্যয় শাশ্বত ধর্ম্মগোপ্তা,
> সনাতনস্ত্বং পুরুষোমতো মে।

ঈশ্বরও যেন প্রসন্ন হইয়া তাহার সফল সাধনাকে পদে স্থান দিয়াছেন। তাহার কর্ম্মানুষ্ঠান, তাহার আজন্ম ভক্তি, তাহার পুত্রকলত্রের প্রতি আসক্তিরহিতভাবে বিজন সাধনা তাহাকে ঈশ্বর প্রাপ্তির, মুক্তির সম্পূর্ণ যোগ্য করিয়াছে।

স্বাস্থ্যে ও ধর্ম্মে এইরূপ সামঞ্জস্য আর কোনো জাতির ভাগ্য সমুজ্জ্বল করে নাই। হিন্দু-সনাতন-ধর্ম্ম জগতে অতুল কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, এত বড় মানসিক অনুশীলন ক্ষণেকের তরে ও স্বাস্থ্যকে এতটা উচ্চাসন না দিলে মানসিক এতটা উন্নতির সম্ভাবনা ও সুযোগ ঘটিত না। কেন না শরীর বলের সাহায্যেই মন কার্য্য করিয়া থাকে।

আমার আসল কথা ত প্রায় বলিয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু তবু বুঝি বেশ হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারি নাই—এমন আশঙ্কা হইতেছে! মনে হয় এত অল্পস্থানে অতবড় বিষয়টা চাপিয়া ঠাসিয়া ভরিতে যাইয়া তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব সম্যক রক্ষা করিতে পারি নাই। কেবল theoryটাই যেন বলা হইয়াছে, কিন্তু উদাহরণ দ্বারা বিষয়টী সরল করিতে পারি নাই। এবার তাই হিন্দুর নিত্য কার্য্যকলাপের মধ্য হইতে কয়েকটী উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া আমার বক্তব্যকে বোধগম্য করিতে চেষ্টা করিব।

ব্রাহ্মণের দিনচর্য্যা একটী অত্যাবশ্যক ধর্ম্ম। ত্রিসন্ধ্যা না করিলে ব্রাহ্মণ মহাপাপপঙ্কে নিমগ্ন হয়। এই আহ্নিক ধর্ম্মের সহিত স্বাস্থ্য-রক্ষা কি সুসংশ্লিষ্ট! ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ ইংরাজী Early rising এর পূর্ণ সমর্থন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রাতঃস্নান নিরাময় দেহ প্রদান করে।

প্রভাতে মধুর ভ্রমরগুঞ্জন শ্রবণ করিতে করিতে সুরভিকুসুম চয়নে যুগপৎ সুস্থদেহ ও প্রফুল্ল মন প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রভাতের নানা বিহগকুজন যখন স্বপোত্থিতা :নিস্তব্ধ ধরণীকে শব্দিত করিয়া তোলে, ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে নদীর বুকের উপর দিয়া সূর্য্যের নিকট আহ্বান প্রেরণ করে, মন কি তখন আনন্দাতিশয্যে নৃত্য

করিয়া উঠে না? একটা সুদূরের প্রেরণা কি ব্রাহ্মণের বুকে আসিয়া মধুরে বাজিতে থাকে না? এই বিজনে প্রকৃতির নগ্নকোলে এমন পাষণ্ড কে আছে যে—ঈশ্বরকে :বারেকের জন্যও স্মরণ না করিয়া থাকিতে পারে? তার-পর তীর্থমূলে বসিয়া বেদগান করিতে করিতে যখন ব্রাহ্মণ দেখে—গরিমময় সূর্য্য সুনীল আকাশের পূর্ব্বভাগে রক্তিমরাগে ভাঙিয়া ফাটিয়া পড়িয়াছে, আর এদিকে পাদমূলে কুলু কুলুস্বরে নদী যেন তারই উদাত্ত সঙ্গীতের সহিত তাল রাখিয়া বাজাইতে বাজাইতে কোন্ অসীমের পানে ছুটিয়া চলিয়াছে, তখন পূজার আর কি বাকী? মন্ত্রোচ্চারণ তখন নিয়মরক্ষা মাত্র। প্রফুল্ল মন, পুলকিত শরীর তখন আপনাআপনি বালরবির গরিমার তলে ঢলিয়া পড়ে, হাতের ফুল পরম পিতার চরণে একটী দিনের একান্ত পূজার নিদর্শনস্বরূপ লাগিয়া থাকিবার জন্য আপনাআপনি খসিয়া পড়িয়া সলিলে ভাসিয়া চলে।

তারপর সন্ধ্যার অনুষ্ঠানগুলি সমস্তই স্বাস্থ্যরক্ষার নিতান্ত অনুকূল। আচমন সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার গুলিকে জলসেচন দ্বারা স্নিগ্ধ ও পবিত্র করিয়া লয়; রাত্রির, মধ্যাহ্নের ও দিবা-বসানের পাপানুশোচনা মনের কলুষনাশ করে, ত্রিমূর্ত্তি গায়ত্রীর আহ্বান আত্মাকে স্থির করিয়া দেয়। এইরূপ ভক্তিভরে একই দিনের মধ্যে তিন তিনবার সন্ধ্যোপাসনায় নিরত হইলে আর কি মন পাপ-প্রবল হইয়া স্বাস্থ্যহানি করিতে পারে?

তারপর হিন্দুর তিথিচর্য্যার সহিত ও স্বাস্থ্যের কি সুন্দর সম্বন্ধ! অমাবস্যা-পূর্ণিমায় যখন রসের, শৈত্যের পূর্ণাবির্ভাব হয়, তখন সংক্ষয়ের জন্য হয় উপবাস দাও, নয় অন্ততঃ নিশিপালন কর। এইরূপ মাসের মধ্যে তিথি-বিশেষে, পর্ব্ববিশেষে, ব্রত নিয়মকে উপলক্ষ্য করিয়া দুই চারিটা দিন উপবাস করিলে বা নিরামিষাহারী হইয়া অর্দ্ধাশনে সংযম অবলম্বন করিয়া থাকিলে বৎসরভোর, জীবন ভোর—সুস্থশরীরে ধর্ম্মাচরণ করিতে পাইবে। অতি লোভ, অমিতাহার, অবৈধাহার স্বাস্থের পক্ষে অহিতকর, তাই মহাপাপের দোহাই দিয়া শাস্ত্র এগুলি বর্জ্জন করিয়াছে। সময়ভেদে আহারের ভেদাভেদ, আচারের বিভিন্নতা অত্যন্ত সমীচীন, তাই শৈত্যকালে শুষ্ক বা উষ্ণদ্রব্য, গ্রীষ্মকালে স্নিগ্ধও শীতলদ্রব্য গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। ভাদ্রমাসের বুড়া লাউ, মাঘমাসের মূলা ভক্ষণ করা কেন শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ, বোধ হয় এবার তাহা সহজবোধ্য। বারবিশেষে মৎস্য, মাংস ও স্ত্রীসম্ভোগ ইত্যাদি এই নীতি-অনুসারেই বর্জ্জনীয়।

স্বাস্থ্যরক্ষার এই সব আচরণ যে প্রায়শঃই মহাপাপের দোহাই দিয়া শাস্ত্রকারগণ নিষেধ করিয়াছেন, তাহার কারণ হিন্দু চির চির-কাল ধর্ম্মভীরু। প্রাণকে সতত মূল্যবান মনে করে না—যত মূল্যবান তার ধর্ম্মকে মনে করে। ধর্ম্মের দুয়ারে চিরকাল সে আত্মবলিদান দিয়া আসিয়াছে। যে কার্য্যেই যখন ধর্ম্মের হানির সম্ভাবনা হইয়াছে সেইখানেই তখন হিন্দু অবনত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই মহাপাপের সম্ভাবনার ইঙ্গিতে হিন্দু এই সমস্ত বিধি-নিষেধকে এতকাল মানিয়া চলিয়াছে। আজ যদি সে বিদ্রোহী হইয়া থাকে, তাহা পর-শিক্ষা, পরধর্ম্মের অনুকরণে। হিন্দু যদি কোন দিন আপনা দেখিতে শিখে, তবে বুঝিবে এ বিধি-নিষেধ মহাপাপের ভয়েই হউক বা কর্ত্তব্যবুদ্ধির অনুরোধেই হউক মানিয়া চলাই

তাহার পক্ষে হিতকর, নতুবা স্বাস্থ্যের সমূহ ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। আজিকার পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের যুগে দুগ্ধের সহিত লবণ ভক্ষণ বা কাংসপাত্রে অন্নভোজন যে মাত্রেও মহাপাপের সঙ্গে সংযুক্ত এ কথা কেহই বিশ্বাস করিতে চাহে না, কিন্তু অমৃততুল্য, দুগ্ধ—লবণপ্রয়োগে যে গুণহীন ও বিষাক্ত হয়, কাংসপাত্রে অন্ন রাখিলে যে নীলবর্ণ বিষাক্ত একপ্রকার লবণের উদ্ভব হয়—একথা আধুনিক বিজ্ঞান নিজেই মানিয়া লইয়াছে। কতকগুলি অনুষ্ঠানের প্রত্যক্ষফল আবার বিজ্ঞানের বিন্দুমাত্র সাহায্য ব্যতিরেকে শুদ্ধ সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন লোকের বুদ্ধিতেই ধরা পড়ে। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব কেন গঙ্গার শুদ্ধ মৃত্তিকা অঙ্গে লেপন করিত—তাহা মৃত্তিকা সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিয়া কুস্তি করিয়া সুস্থ দেহপ্রাপ্ত মানুষকে দেখিলে বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়। হিন্দুর সমস্ত বিধি-নিষেধ আমি জানিও না, আর জানারও বোধ হয় এক্ষেত্রে বিশেষ আবশ্যকতা নাই। তবে যাহা জানি, তাহা দেখিয়া আমার সেই পূর্ব্ব বিশ্বাসই দৃঢ় হইয়াছে যে 'শরীরমাদ্যং' হিন্দুধর্ম্মচর্য্যার মূল সত্য।—হিন্দুর আচার পদ্ধতিকে উপেক্ষার হাসিতে উড়াইয়া দেওয়া কোনোক্রমেই বিবেচনার কাজ নহে। হইতে পারে-(যেমন সর্ব্বত্র হয়) কালক্রমে অনেক অমূলক বিধি-নিষেধ ব্যক্তি বিশেষের কারসাজিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া বিশেষ না জানা পর্য্যন্ত কোনো বিধিরই লঙ্ঘন বা অন্ততঃ উপেক্ষা করা উচিত নহে। কারণ এ কথা সত্য যে সেকালের হিন্দু চরমবিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক বল প্রাপ্ত হইয়াছিল। আজ তার অধঃপতিত বংশধর অজ্ঞতার অন্ধকূপ হইতে তাহার ভাল মন্দ বিচার করিতে প্রায়শঃই অক্ষম। হয়ত তাহার বিচারে আজ যাহা বর্জ্জনীয় বলিয়া ধার্য্য হইবে—হিন্দুর হয়ত তাহাই একটা মহিমাময় আবিষ্কার ছিল। আজ তাই হিন্দুর বংশধরকে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। তাহার উচিত আজ তার অতীত গৌরবকে বিশ্বাস করিয়া চলা—কারণ যজ্ঞের বিশ্বাসই মুক্তির উপায়; আজ তার উচিত—তার অতীত গৌরবকে, পোষণ করা —তার পক্ষপাত করা। তাহা হইলেই আজ তার পূর্ব্ব পুরুষকে উপযুক্ত সম্মান করা হইবে। আমি যাহা বুঝি না, তাহাই যে মিথ্যা অজ্ঞতাসূচকধারণা—আজ যেন হিন্দুর পুত্র বক্ষে আর পোষণ না করে।

শেষ কথা, আমাদের যাহা ছিল তাহা যেন আমরা আশঙ্কায় না ঢাকিয়া জগতের প্রদর্শনীতে যাচাই হইবার জন্য খুলিয়া রাখি। আমার বিশ্বাস, হিন্দুর অতীত আজিও কোনো সভ্য জাতির গরিমার নিকট হীনতার আশঙ্কায় মাথা হেট করিবে না। হিন্দুর এই ধর্ম্মপালনে স্বাস্থ্যরক্ষা পৃথিবীর ধর্ম্মেতিহাসে সুনিশ্চিত একটা নূতনত্ব। এ নূতনত্ব অনুভব করিতে, সমীকরণ করিতে পারে নাই বলিয়াই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতি হিন্দুর অনুষ্ঠানকে useless penance বলিয়া নিন্দা করিতেছে। আজ যখন নূতন করিয়া জাগরণের দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে তখন আমরা দেখাইতে চাই—বুঝাইতে চাই যে হিন্দুকে বাহিরের জাতি তোমরা বোঝ নাই, জান নাই। হিন্দু তোমাদিগকে ঢের দিয়াছে। হিন্দু তোমাকে দিয়াছে—তার বিজ্ঞান, তার চিকিৎসা, তার দর্শন। হিন্দুর ব্রাহ্মণকে তোমরা conservative বলিয়া নিন্দা করিয়া নিরয়গামী হইও না। ... হিন্দুব্রাহ্মণ গীতার সার্ব্বজনীন ধর্ম্মে বিশ্বাসীকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়াছে, যে হিন্দু তারুণ্য [illegible]

ধর্ম্মের দ্বারা বিশ্বমানবকে চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া সামাজিক ধর্ম্মরক্ষার উৎকৃষ্ট পন্থা দেখাইয়া দিয়াছে, যে হিন্দু চতুরাশ্রমের ধর্ম্মে জ্ঞানার্জ্জনের নামে ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়া কেমন করিয়া ব্রহ্মের পরিপূর্ণ অনুভূতি লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ হইতে হয়—তাহা শিখাইয়া দিয়া জগৎবাসীকে চমৎকৃত করিয়াছে,—

"যে দিয়াছে বেদ, যে দেছে পুরাণ অমর
কাব্য কথা
যে নামায়ে আনি' স্বরগের বাণী
হরিয়াছে শোক ব্যথা।"

তাহাকে তোমরা নিন্দা করিও না। তাহাকে তোমরা সকলে স্বীকার কর, তাহাকে বরণ কর, তাহাকে প্রণাম কর, আর তাহারই বংশধরকে তাহার অতীত মহিমোজ্জ্বল আদর্শকে পুনরুদ্ধার করিবার উৎসাহ দিতে দিতে বল—

ব্রাহ্মণদেব ব্রাহ্মণগুরু, পতিতের তুমি প্রাণ,
সম্রাট তুমি ধর্ম্মরাজ্যে, ভারতের তুমি প্রাণ,
* * * * *
নমো নমো নমো ব্রাহ্মণদেব, ধন্য ভারতভূমি
ধন্য আমার জীবন জন্ম তব পদরেণু চুমি।

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এম, এ.

বিবিধ সংবাদ।

— — :*: — —

গোয়ালিয়ার যাত্রা।—সিন্ধিয়ার রাজমাতার চিকিৎসার জন্য 'আয়ুর্ব্বেদে'র অন্যতর সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনী ভূষণ রায় কবিরত্ন এম এ, এম বি গত ২২শে আগষ্ট গোয়ালিয়ার যাত্রা করিয়াছেন। গত বৎসর এমনি সময় তাঁহাকে ইন্দোরের মহারাণীর চিকিৎসার জন্য ইন্দোর যাইতে হইয়াছিল।

আয়ুর্ব্বেদ সভা।—গত ১৬ই আশ্বিন সন্ধ্যা ৭টার সময় কলিকাতা ৩নং কুমার টুলীতে "আয়ুর্ব্বেদ সভার" ৮ম বার্ষিক তৃতীয় সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ সভায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন কর্ত্তৃক রচিত প্রথমে একখানি উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হয়। তাহার পর ঐ সঙ্গীত রচয়িতা কর্ত্তৃকই "আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা" নামক একটী প্রবন্ধ পঠিত হয়। ঐ প্রবন্ধ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ সেন, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি রায় বি,এ, কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরমোহন মজুমদার কাব্যতীর্থ এবং কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র কুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ মহাশয়গণ ঐ প্রবন্ধ অবলম্বনে বক্তৃতা করিয়া উহার সমর্থন করেন। কবিরাজ শ্রীযুক্ত কেদার নাথ কাব্যতীর্থ ও সভাপতি কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়দ্বয়—যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা প্রবন্ধের প্রতিকূল হইয়া-

ছিল। সভাপতি মহাশয় এ সম্বন্ধে অন্য অধিবেশনে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিবেন বলিয়া আমাদিগকে আশান্বিত করিয়াছেন।

সর্ব্বনেশে কৃমিরোগ।—ইংরাজী 'হুক্‌ওয়ার্ম' রোগে অর্থাৎ সর্ব্বনেশে কৃমিরোগে এ দেশের ভীষণ অনিষ্ট করিতেছে বলিয়া বাঙ্গালার গবর্ণর লর্ড রোণাল্ডশে সেনিটারি বোর্ড অর্থাৎ স্বাস্থ্য সংরক্ষিণী সমিতির সভাপতি মিঃ ষ্টিভেন্‌সন্ মুরকে একখানি পত্র লিখিয়া এই ভীষণ ব্যাধির প্রতীকার প্রার্থী হইয়াছেন। আমরা লাট সাহেবকে এজন্য ধন্যবাদ দিতেছি।

মৃত্যু তালিকা।—১৯১৭ সালে ভারতবর্ষে সর্প দংশনে মৃত্যু ২৪০০০, ব্যাঘ্র আক্রমণে ১০০০, চিতাবাঘ দ্বারা ৩৮০, নেকড়ে ও ভালুকের আক্রমণে ২৩০, হস্তী ও তরক্ষুর আক্রমণে ৮০ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

নূতন জ্বর।—নূতন জ্বর বা সমর জ্বরে সমগ্র পৃথিবীর যে কি ভীষণ সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ভারতের সকল স্থানেই এই জ্বরের পূর্ণ প্রভাব প্রকটিত। গত ১২ই অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে এই রোগে কলিকাতায় মৃত্যু সংখ্যা ১২১ জন কিন্তু তাহার পূর্ব্ব সপ্তাহে মরিয়াছিল মাত্র ৪৫ জন। বঙ্গদেশের বাহিরেও এই রোগের আক্রমণে প্রত্যহ সহস্র সহস্র লোক মৃত্যু কবলিত হইতেছে। হাজারিবাগ, রাঁচি, নাগপুর, করাচি, মান্দ্রাজ, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি নগরও এই জ্বরের আক্রমণে বিপর্য্যস্ত হইতে বসিয়াছে। জানি না, কতদিনে দেশ হইতে এই ভীষণপ্রাণহানিকর জ্বরের অবসান হইবে।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৩য় বর্ষ। } বঙ্গাব্দ ১৩২৫—অগ্রহায়ণ। { ৩য় সংখ্যা।

কাজের কথা।

—:*:—

অজীর্ণে বাঙ্গালী।—অজীর্ণে বাঙ্গালা দেশের লোক যত ভুগিয়া থাকে, এমন আর কোন দেশের নহে। আমাদের মনে হয়, বাঙ্গালা দেশে শতকরা ৭৫ জন পুরুষ ও মহিলা অজীর্ণ রোগে কষ্ট পাইয়া থাকেন। আজকাল যে রাজযক্ষ্মা বা থাইসিসে মৃত্যুসংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে, একটু তলাইয়া দেখিলে. এই অজীর্ণ রোগই তাহার কারণ।

* * * *

অজীর্ণের নিদান।—শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন,—অধিক জলপান, বিষম ভোজন অল্প ভোজন, বহু ভোজন ও অসময়ে ভোজন), মলমূত্রাদির বেগধারণ, দিবা নিদ্রা, রাত্রি জাগরণ—এই সকল কারণে অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হয়। ইহার মধ্যে অধিক জলপান এবং রাত্রি জাগরণেই সহর বাসীর অজীর্ণ বর্দ্ধিত হইতেছে। চা এবং সোডা-লেমোনেডের কল্যাণে কলিকাতায় অধিক জলপান অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। আর রাত্রি জাগরণ,—তাহার আয়োজনও নানাপ্রকারে। এ অবস্থায় বাঙ্গালায় অজীর্ণ বৃদ্ধির যথেষ্ট কারণই বর্ত্তমান রহিয়াছে।

* * * *

ছাত্র জীবনে অজীর্ণ-বাহুল্য।—অজীর্ণ বাহুল্যের প্রধান স্থান কলিকাতা এবং অজীর্ণপ্রবণপুরুষদিগের মধ্যে কলিকাতা প্রবাসী মফঃস্বলের ছাত্রগণের সংখ্যাধিক্যই দেখিতে পাওয়া যায়। ছাত্রজীবনে এই অজীর্ণের সঞ্চার মাত্র আরম্ভ হইয়া, কর্ম্মময় জীবনে উহার পূর্ণ প্রভাব যখন প্রকটিত হয়, তখন উহা একেবারে দুরারোগ্য হইয়া পড়ে। এই ছাত্রজীবনে অজীর্ণবাহুল্যের প্রধান কারণ—চা, সোডা, লেমোনেড প্রভৃতি পানীয়ের অত্যধিক ব্যবহার। ইহা ভিন্ন আর একটী কারণে ছাত্রজীবনে অজীর্ণ বাহুল্য ঘটিতেছে—সেটি ব্রহ্মচর্য্যের অভাব। সে

কথা আমরা অনেকবার বলিয়াছি। বাস্তবিক স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে সকল বিষয়েই সংযমী হওয়া একান্ত আবশ্যক! সকল রোগের কারণই সংযমের অভাব।

* * * *

সেকালের বাঙ্গালী।—সেকালের কথা তুলিলে অনেক কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে—বাঙ্গালীর প্রাতঃকৃত্যের কথা, পূজা আহ্নিকের কথা, স্নান-ভোজনের ব্যবস্থা, শিক্ষা বা কর্ম্মকালের সময় নির্দ্দেশ—সকল বিষয়েই যে একটা স্বাস্থ্যরক্ষার শৃঙ্খলা সুসংবদ্ধ ছিল,—বাঙ্গালী এখন তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছে। বিবাহ সেকালে অল্প বয়সেই হইত, কিন্তু তিথি-নক্ষত্র বাছিয়া স্ত্রী-পুরুষের মিলনকাল নির্দ্দিষ্ট ছিল। এখন সে ব্যবস্থা তো একেবারেই অন্তর্হিত। সুকুমারমতি ছাত্রজীবনে সেকালে ধাতুক্ষয়জনিত, পাপসংস্পর্শের কোনো কারণই উপস্থিত হইত না, এখন চৌদ্দ বৎসরের একটি বালকের মুখের প্রতি চাহিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে—তাহার চক্ষুপ্রান্তে কালিমা পড়িয়াছে, গণ্ডস্থলে ব্রণ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, গলার স্বর বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার উপর শিক্ষা-মন্দিরে রাশি রাশি পুস্তক অধ্যয়নের ব্যবস্থা! আমাদের দেশের অবস্থা শোচনীয় হইবে না কেন?

* * * *

আহার ও স্বাস্থ্য।—স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য পবিত্র আহার্য্যের একান্ত প্রয়োজন—একথা আমরা অনেকবার বলিয়াছি। পবিত্র আহারে যে চিত্তশুদ্ধি হয়—স্বাস্থ্যরক্ষা তাহারই ফলসম্ভূত। সেকালের বাঙ্গালী অজীর্ণরোগ গ্রস্ত ছিল না—দৌর্ব্বল্যের নাম তাহারা জানিত না—এখনকার মত এক পোয়া পথ যাইবার জন্য তাহাদিগের যে ট্রাম-অশ্বযান-মোটর গাড়ীর প্রয়োজন হইত না,—পুষ্টিকর আহার্য্যভক্ষণই তাহার প্রধান কারণ। অনেক কারণে দেশ হইতে সে পুষ্টিকর আহারের ব্যবস্থা লোপ পাইয়াছে। ফলে নানাকারণে দেশের যে বড় দুর্দ্দিন ঘটিয়াছে—ইহা খাটি সত্য কথা।

* * * *

দুগ্ধ ও ঘৃত।—দুগ্ধ ও ঘৃত বাঙ্গালীর সর্ব্ব প্রধান আহার্য্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। এখন সে দুইটির প্রচলনই—বাঙ্গালা দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। সে কালের বাঙ্গালী প্রাতঃকালে ধারোষ্ণ দুগ্ধ পান করিয়া বল সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিত, এখন তাহার পরিবর্ত্তে চায়ের প্রচলন হইয়াছে—দুগ্ধপানে বায়ু পিত্ত কফের প্রশমন হয়, সদ্যঃ শুক্র সঞ্চয় হয়, জীবনীশক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আয়ুর্ব্বেদে ইহা সকল প্রাণীর সাত্ম্য, বৃংহণ, বলকারক, মেধাবর্দ্ধক, উৎকৃষ্ট বাজীকরণ, বয়ঃসংস্থাপক, আয়ুষ্য, দেহস্থ পদার্থ সকলের সংশ্লেষকারক ও রসায়ন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালীর এখন দুগ্ধের মত অমৃতে অরুচি। বাঙ্গালী অজীর্ণগ্রস্ত হইয়া ক্ষীণাঙ্গ হইবে না তো হইবে কাহারা?

* * * *

বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ।—প্রকৃতই বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। শিশু জীবন হইতেই পুষ্টিকর দ্রব্যের অভাবে বাঙ্গালীর যে স্বাস্থ্য-হানি ঘটিতেছে, যৌবনে সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাহার আর পুনরুদ্ধার ঘটিতেছে না উন্মার্গগামী বাঙ্গালী যতদিন না আবার পূর্ব্ব স্বভাব প্রাপ্ত হইবে,—[illegible] ক্রিয়াম-পরিহার—[illegible]

...হের সকল বিষয়েই যে পর্য্যন্ত ...ঙ্গালী আবার সেকালের মত চলিতে না ...খিবে, ততদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যরক্ষার ...পায় বিধান কিছুতেই হইবে না। এক ...থায় বাঙ্গালীকে সকল বিষয়েই আবার ...বেক চালে চলিতে হইবে সাবেক ...দ্ধতিতে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার জন্য সংযমী হইতে ...ইবে—কুসুমসুকুমার বাল্যজীবন যাহাতে ...টদংষ্ট না হয়—তাহার প্রতি সর্ব্বাঙ্গে লক্ষ্য ...খিতে হইবে,—তবেই বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যসুখ ...বার ফিরিয়া আসিবে, নতুবা সহস্র সহস্র ঔষধ সেবন কর—তাহাতে কিছুই সুফল লাভ ...টিবে না।

* * * *

ঔষধে আরোগ্য।—ঔষধে রোগ ...রোগ্য হয় না,—রোগ আরোগ্য হয়—...য়মে। ঔষধ—রোগ হইলে উপদ্রব সকলের প্রতীকার করে মাত্র। এখনকার দিনে নানা-...কারণে বাঙ্গালীর শরীর যেরূপ ক্ষয়প্রাপ্ত ...হইতেছে। তাহাতে সেই ক্ষয়ের মূল কারণ ...র না করিয়া ঔষধের দ্বারা উপদ্রব দূর করিয়া ...কতদিন তাহাকে জীবিত রাখা যাইতে ...পারে। অনেক সময় অজীর্ণ এবং ধাতু ...দৌর্ব্বল্যগ্রস্ত অনেক উৎকট রোগী এই জন্যই নানাপ্রকার ঔষধ সেবনেও বিফলমনোরথ হইয়া থাকেন। শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন,—

"ব্যাধেস্তত্ত্বঃ পরিজ্ঞানং বেদনায়শ্চ নিগ্রহ এতদ্বৈদ্যস্য বৈদ্যত্বং ন বৈদ্যঃ প্রভুরায়ু সঃ।"

অর্থাৎ ব্যাধির উপদ্রব দূর করাই বৈদ্যের কার্য্য,—বৈদ্য কখন আয়ুর প্রভু হইতে পারেন না। এ অবস্থায় এখনকার দিনে বাঙ্গালী যে নিজ কৃতকর্ম্মের ফলে আয়ুক্ষয় করিতেছে, বৈদ্য তাহার প্রতীকার করিবেন কি ?

* * * *

কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ।—যাহা হউক আমাদের এখন কর্ত্তব্য নির্দ্দেশের সময় আসি-য়াছে। ব্যাধি উপস্থিত হইলে ব্যাধি প্রশমনে সচেষ্ট হওয়া অপেক্ষা যাহাতে ব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে না হয়, আমাদিগকে এখন তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। সনাতন আয়ু-র্ব্বেদ শাস্ত্রেরও ইহাই উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই স্বাস্থ্যরক্ষাকল্পে সদাচারবিধি প্রবর্ত্তিত। প্রত্যেক বাঙ্গালী-অভিভাবক এ সকল কথা মনে রাখুন,—এ সব কথা মনে রাখিয়া নিজেরা সংযম ব্রত অবলম্বন করুন, তবেই বাঙ্গালীবংশধরগণ সংযম শিক্ষালাভ করিয়া নীরোগ ও দীর্ঘজীবনলাভে সমর্থ হইবে।

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন।

আয়ুর্ব্বেদে—খণ্ডপ্রলয়।*

সে একদিন ছিল—যেদিন সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাস-পুরাণ-শিল্প-বিজ্ঞান-চিকিৎসা-জ্যোতিষ—সকল বিষয়েই ভারতবর্ষ সমুন্নত হইয়া সকল দেশের শীর্ষস্থান অধিকারে গর্ব্ব

* কলিকাতা-আয়ুর্ব্বেদ সভার ৮ম বার্ষিক ৪র্থ সাধারণ অধিবেশনে পঠিত। তারিখ ২৯শে কার্ত্তিক, ১৩২২।

প্রকাশ করিতে পারিত। সে একদিন ছিল—যে দিন ব্যাস-বাল্মিকীর সাহিত্য-রচনায় চমৎকৃত হইয়া বিদ্বদ্‌মণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁহাদের বাক্যসুধা পান করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত। সে একদিন ছিল—যে দিন মনু পরাশর দেশরক্ষার জন্য—দেশ মাতৃকার সন্তান-সন্ততিগণকে উচ্ছৃঙ্খলতার হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সুমধুর শ্লোকগ্রন্থনে যে সব নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, অবশ্য প্রতিপাল্য মনে করিয়া ভারতের তাবৎ অধিবাসীই সে সকল বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিবার জন্য প্রস্তুত হইত। সে এক দিন ছিল—যে দিন ভারতে এখনকার মত শিল্পশিক্ষার জন্য কোনো বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় নাই, অথচ বিশ্বকর্ম্মার মত শিল্পনিপুণ-পুরুষের কীর্ত্তিকলাপ আজিও সমগ্র জগতকে বিমুগ্ধ করিতে সমর্থ হইতেছে। বিজ্ঞানের কিরূপ চর্চ্চা ছিল—ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়-সংবাদেই তাহা সুপ্রকট। আর চিকিৎসা—তাহার উন্নতি ভারতে যেরূপ হইয়াছিল, সহস্র চেষ্টা করিয়াও সেরূপ আর কোনো দেশে কখন হইবে কিনা সন্দেহ।

আমি গত মাসের অধিবেশনে "আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা" শীর্ষক যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম,—এক সময়ে সমুন্নত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা অধুনা যেরূপ অধঃপতিত হইয়াছে, তাহার পুনরুন্নতির পন্থা-নির্দ্দেশ করাই সে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ছিল। যাঁহারা সে প্রবন্ধের পোষকতা করিয়াছিলেন, তাঁহারা আমার উদ্দেশ্য বুঝিয়াছিলেন বলিয়া আমি তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। কিন্তু যাঁহারা তাহার প্রতিকূলে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের উত্তরে আমার কিছু বলিবার আছে,—আমার অদ্যকার আলোচ্য বিষয়েই সে সকল কথার উত্তর দেওয়া হইবে।

প্রথম কথা—'আমাদের ছিল সব'—এ কথার পৌনঃপুনিক আবৃত্তি আশৈশব সকলেই শুনিয়া আসিতেছি, সুতরাং আমাদের 'সকলই ছিল'—ইহা সত্য, কিন্তু 'ছিল' বলিয়া যাহা গিয়াছে—তাহার কি পুনরুদ্ধার করা কর্ত্তব্য নহে? বায়ু পিত্ত-কফের দোহাই দিয়া, আমরা সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া আস্ফালন করিলেই কি আমাদের লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার কীর্ত্তিকলাপ আবার আমরা ফিরাইয়া আনিতে পারিব? জানি,—বায়ুর প্রকৃতি, পিত্তের গতিনির্দ্দেশ এবং কফের স্থিতিস্থাপনে জ্ঞান থাকিলে চিকিৎসায় কৃতিত্ব লাভ করিতে পারা যায়, কিন্তু সেই নাড়ীজ্ঞানে সিদ্ধি লাভ একেবারে যে কাহারও নাই—এরূপ কথা আমি বলিতেছি না,—কিন্তু সকলের আছে কি না—তাহা আমি জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি—সে একদিন ছিল,—যে দিন সাহিত্যদর্শনাদির মত চিকিৎসা বিজ্ঞানও একটা যুগ-প্রলয় উপস্থিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাহারই ফলে সেকালের চিকিৎসকদিগের অনেকে সুস্থব্যক্তির নাড়ী পরীক্ষা করিয়া, ছয় মাস পূর্ব্বে তাহার অন্তিমের কথা বলিয়া দিতেন। খুব বেশী দিনের কথায় কাজ নাই —আমাদের এক পুরুষ পূর্ব্বেও নাড়ীজ্ঞানে সিদ্ধিলাভের পরিচয় আমরা যথেষ্ট পাইয়াছি, কিন্তু সত্য করিয়া বলুন দেখি—এখন [illegible] নাড়ীজ্ঞান কয়জনের আছে? বায়ু-পি[illegible] কফের দোহাই দিয়া মুখে বড়াই করি[illegible] চলিবেনা, মৃত্যু-রোগ-পীড়িতের আয়ু[illegible] কতক্ষণ, পরে [illegible]

কি এখনকার কবিরাজ নামধারী সকল চিকিৎসকই মৃত্যুর পূর্ব্ব দিন পর্য্যন্ত নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন? বায়ু-পিত্ত-কফ-নির্ণয়ে যাঁহার জ্ঞান আছে, তাঁহার নিকটে মৃত্যুকাল নির্দ্দেশ করা অসম্ভব হইবে কেন? সুতরাং অধুনা আমরা অনেকেই যখন তাহা ভুলিয়া গিয়াছি, তখন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানে সকলই আছে বলিয়া আমাদের বৃথা আস্ফালন করা কর্ত্তব্য কি? রন্ধনব্যবসায়ীর মত হীন কর্ম্মে নিরত কোনো ব্রাহ্মণের ঊর্দ্ধতন তৃতীয় কি চতুর্থ পুরুষ চতুর্ব্বেদবিশারদ ছিলেন বলিয়া তাহার আভিজাত্যের গর্ব্ব-প্রকাশ যেমন বাতুলতার পরিচায়ক, অধুনা অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের অবস্থাও যে তদ্রূপ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। ফলে এই অবস্থান্তরে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার পুনরুন্নতির যে বিঘ্ন ঘটিতেছে-তাহার দূরীকরণ নির্দ্দেশই এক কথায় আমার বক্তব্য।

চিকিৎসা যে মতেই করা হউক, শারীর তত্ত্বে জ্ঞান থাকা একান্ত কর্ত্তব্য। যেমন বর্ণ পরিচয়ে জ্ঞান না থাকিলে কোনো পুস্তকই অধ্যয়ন করা চলে না, সেইরূপ শারীর যন্ত্রগুলির অনভিজ্ঞ চিকিৎসক চিকিৎসাকার্য্য সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হন না। তবে শারীরতত্ত্বে অনভিজ্ঞ চিকিৎসকের ঔষধেও রোগ-বিশেষে যে সুফল পাওয়া যায়, তাহার জন্য আশ্চর্য্য হইবার কোনো কারণ নাই, কেননা সেটি পল্লীগ্রামের কোনো কোনো মহিলা যেরূপ দু'চারটি মুষ্টিযোগে কখনো কখনো কোনো কোনো রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন,—সত্য কথা বলিতে গেলে তাহারই অনুরূপ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সুচিকিৎসক মাত্রেই একথা স্বীকার করিবেন। যে, রোগ অনেক সময় বিনা চিকিৎসাতেও আরোগ্য হইয়া থাকে,—হোমিওপ্যাথি তো এইরূপ উদ্দেশ্য লইয়াই প্রচারিত। এরূপ অবস্থায় আমি চিকিৎসার সকল বিষয় শিক্ষালাভ করি নাই—অথচ আমার ঔষধে অনেক রোগ আরোগ্য হইতেছে বলিয়া আমার গর্ব্ব করিবার কিছুই নাই। গর্ব্ব করিবার তো কিছুই নাই, বরং যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি-তাহাতে সম্যক জ্ঞানলাভ করি নাই বলিয়া দুঃখ করিবার আছে। আমার বক্তব্য-এক কথায় সেই দুঃখ প্রকাশ। আমি নিজে ইহার জন্য সন্তপ্ত এবং আমার ন্যায় চিকিৎসকগণও যাহাতে এজন্য সন্তপ্ত হন—ইহার ব্যবস্থাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য।

গত অধিবেশনে কথা উঠিয়াছিল—"শল্য চিকিৎসা আয়ুর্ব্বেদের অঙ্গীভূত হইলেও এখনও সে শিক্ষার সময় আমাদের আসে নাই, —কায়চিকিৎসায় সম্যক সিদ্ধিলাভের পর—অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসর গত হইলে আমাদের সে শিক্ষা লাভের সময় আসিবে।" কিন্তু এ কথার অর্থ ও আমি আদৌ উপলব্ধি করিতে পারি নাই। মহাত্মা সুশ্রুত যখন ধন্বন্তরির অবতার দিবোদাসের নিকট শল্যচিকিৎসা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তখন কি কায়চিকিৎসা শিক্ষা করেন নাই? সুশ্রুত সংহিতায় শারীর বিদ্যা, শারীর তত্ত্ব, নিদান, শল্যতন্ত্র, ধাত্রীবিদ্যা, স্ত্রীরোগ, অস্ত্রবিধি, অগদ, কৌমারভৃত্য, শস্ত্রসাধ্য চিকিৎসা, ইন্দ্রিয়বিজ্ঞান, ব্যাক্রান্তি, ভৈষজ্য বিধান, ভূতবিদ্যা, রসায়ন—চিকিৎসা বিজ্ঞানের সকল বিষয়েরই তো পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণের সূক্ষ্ম হেতুবাদ, উপনিষদের তত্ত্বস্পর্শী—গভীরতা, বিজ্ঞানের বাস্তব রহস্য—সুশ্রুতের প্রত্যেক অধ্যায়ে সুপ্রকট। সুশ্রুত-কি অস্ত্রচিকিৎসা—কি কায়চিকিৎসা—চিকিৎসার

সকল অঙ্গেই সম্যক জ্ঞানলাভ করিয়া তবে চিকিৎসা কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। আমরা আজি সে পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি বলিয়াই আমাদের এত দুর্গতি। সুতরাং সেই দুর্গতি দূর করিতে হইলে,—আমরা যাহা ছিলাম, আবার তাহা হইতে হইলে—আমাদিগকে কায়চিকিৎসার মত শল্য চিকিৎসা একান্তই শিক্ষা করিতে হইবে, আমাদের লুপ্তরত্ন ফিরাইয়া আনিতে হইবে,—আমাদের জ্ঞানগভীরগবেষণা তবেই লোকলোচনে আবার ফুটিয়া উঠিবে,—নতুবা এ চিকিৎসার অবনতি যাহা হইয়াছে, তাহাপেক্ষা আরও দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী।

সেদিন আর একটি কথা উঠিয়াছিল—"যদি আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদিগকে অস্ত্রচিকিৎসা শিক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে যাঁহারা তাহা শিক্ষা করিবেন, তাঁহাদিগকে ধন্বন্তরি সম্প্রদায় ভুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইবে এবং তাঁহাদিগকে কায়চিকিৎসা করিতে দেওয়া হইবে না।" এখনকার দিনের একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক যদি এ কথা না বলিতেন, তাহা হইলে এ সম্বন্ধে আমি কোনো উত্তর দানেই ইচ্ছুক হইতাম না, কিন্তু যিনি একথা বলিয়াছেন, তিনি এখনকারদিনে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদিগের শিরোভূষণ—আমাদের মাথার মণি, সুতরাং এ সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া থাকা চলে না।

সুশ্রুতের গুরু ভগবান ধন্বন্তরি। এইজন্য সুশ্রুত সংহিতাকে ধন্বন্তরি সম্প্রদায়ের গ্রন্থ বলিয়া অনেকে প্রচার করেন। ইঁহাদের মতে চরকসংহিতা আত্রেয় সম্প্রদায়ের গ্রন্থ। কিন্তু পুরাণে আমরা দেখিতে পাই —

তস্য গেহে সমুৎপন্নো দেব ধন্বন্তরি স্তদা।
কাশীরাজো মহারাজঃ সর্ব্বরোগ প্রণাশনঃ।
আয়ুর্ব্বেদং ভরদ্বাজাৎ প্রাপ্যেহসভিষগক্রিতং।
তমষ্টধা পুনর্ব্বসু শিষেভ্যঃ প্রত্যপাদয়ৎ॥

অর্থাৎ কাশীরাজ ধন্বের গৃহে ভগবান ধন্বন্তরি পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভরদ্বাজের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন এবং সেই আয়ুর্ব্বেদকে আটভাগে বিভক্ত করিয়া শিষ্যগণকে শিক্ষা দেন।

এই পৌরাণিক কথা মানিতে হইলে আত্রেয় সম্প্রদায় ও ধন্বন্তরি সম্প্রদায় এক হইয়া যায় না কি? সুতরাং আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ অস্ত্রচিকিৎসা শিক্ষা করিলে সেই চিকিৎসকগণকে কায়চিকিৎসা করিতে দেওয়া হইবে না কেন—ইহা তো আমার মাথায় আসিল না। যদি বলেন, মেডিকেল কলেজ হইতে যাঁহারা উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন—তাঁহারা কেহ কায় চিকিৎসায়, কেহ বা শস্ত্র চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ বা স্পেশালিষ্ট হইয়া থাকেন, কিন্তু তাই বলিয়া কোনো সার্জ্জন যদি ফিজিসয়নের কার্য্য করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাকে যে তাহা করিতে দেওয়া হইবে না, বা তিনি তাহা জানেন না,—এমন কথা তো কখনো শুনি নাই। আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদিগের মধ্যে কেহ শূল রোগের চিকিৎসায় বিখ্যাত, কাহারও বা তৈল-ঘৃতে পাগলের চিকিৎসায় অতি সুন্দর ফল পাওয়া যায়,—কিন্তু তাহা বলিয়া সেই শূলরোগ আরোগ্যকারী বা উন্মাদরোগ নিবারক চিকিৎসক যে অন্য চিকিৎসায় সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন না—এমন কথা কিছু আছে কি? অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের প্রধান অঙ্গ—শল্য চিকিৎসা শিক্ষা লাভ করিয়া যদি কেহ শল্য চিকিৎসায় ফুটিয়া উঠিতে পারেন,—তাহা হইলেও তো আয়ুর্ব্বেদের অতীত গৌরব আবার ফিরিয়া আসিবে,—আয়ুর্ব্বেদীয় [illegible]

সকগণ পূর্ব্ব-কীর্ত্তি ফিরাইয়া আনিয়া এখনকার শারীরতত্ত্ববিদগণের নিকট সগৌরবে আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইবে, শুধু বায়ু-পিত্ত-কফের দোহাই দিয়া তাঁহাদিগকে বসিয়া থাকিতে হইবে না,—সত্য সত্য তাহাদের দ্বারা জগতের আবার হিতসাধন হইবে।

আর একটা কথা—বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে ইংরাজ এখন এদেশী সৈন্য লইতেছেন, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে যাহারা পদাতিক দলে প্রবেশ করিতেছে, তাহারা যদি বলে—আমরা আমাদের দেশীয় প্রথায় সড়্‌কি বল্লমের চালনা করিব কিন্তু অসি চালনা করিব না—তাহা হইলে তাহাদের অবস্থা কিরূপ হয়—তাহা কি আর খুলিয়া বলিতে হইবে? বায়ু-পিত্ত-কফের দোহাই দিয়া আমরা শুধু কায়চিকিৎসা লইয়া থাকিব—আমরা যদি ইহাই বলিয়া বসিয়া থাকি—তাহা হইলে আমাদের অবস্থা কথিত পদাতিক সৈন্যের মত হইবে না কি? যিনি রন্ধন করিতে জানেন, তিনি আহারীয়ের কতক দ্রব্য রন্ধন করিতে পারেন, আর কতক দ্রব্য রন্ধন করিতে পারেন না—তাঁহাকে পাকা রাধুনি বলা যায় না। পুরোহিত, গৃহস্থের প্রয়োজনীয় ষষ্ঠী-মাকাল হইতে দুর্গাপূজা পর্য্যন্ত সমস্ত ক্রিয়া কর্ম্মে অধিকারী না হইলে তাঁহাকে প্রকৃত পুরোহিত বলিতে পারা যায় না। গুরু, পুরোহিত এবং চিকিৎসক একদা হিন্দু সমাজের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকারে যে সমর্থ ছিলেন, তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট সকল কর্ম্মে কুশলতা লাভে সিদ্ধ হওয়াই তাহার একমাত্র কারণ। গুরু, পুরোহিত এবং চিকিৎসকের উন্নতিতেই এক সময় এদেশ উন্নত হইয়াছিল,—এখন এই ত্রিবিধ ব্যবসায়ীরই অধঃপতনে সমাজের অধঃপতন অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক নিজেদের কথা বলিতে গিয়া অপরের কথা তুলিবার প্রয়োজন নাই আমাদের আর্য্যচিকিৎসকদিগের পুনরুন্নতি করিতে হইলে অস্ত্রচিকিৎসায় আবার আমাদিগকে অধিকার লাভ করিতে লইবে,—সুশ্রুতের যুগ আবার ফিরাইয়া আনিতে হইবে,—আমরাই কায়চিকিৎসার জন্য নাড়ী দেখিয়া বায়ু-পিত্ত-কফের নির্ণয় করিব—আমরাই ধাত্রীবিদ্যাশিক্ষা করিয়া প্রসবকাল উপস্থিত হইলে প্রসববাধা দূর করিতে সমর্থ হইব, আমরাই শারীরতত্ত্বে সম্যক অধিকার লাভ করিয়া, প্রয়োজন হইলে ফোড়া কাটিবার জন্য অস্ত্র চালনা করিব—এ সকল ব্যবস্থা যতদিন না হইতেছে—ততদিন পর্য্যন্ত আমরা প্রকৃত চিকিৎসক বলিয়া বড়াই করিতে সক্ষম হইব না—ইহা সুনিশ্চিত—নির্ভাজ সত্য কথা।

কিন্তু কথা হইতেছে—আমরা অস্ত্রচিকিৎসা ভুলিয়া গিয়াছি, এখন তাহা শিখিতে হইলে গুরুকরণ কাহাকে করা হইবে? গত অধিবেশনে আমি ইহার নিরাকরণ করিয়া এখনকার দিনে শারীরতত্ত্বে যাঁহারা অধিকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট ইহা শিক্ষা করা উচিত—এইকথা বলায় কেহ কেহ আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহারা সেরূপ আপত্তি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট আমার নিবেদন,—তাঁহাদের পুত্রকলত্রদিগকে এখন হইতে তাঁহারা ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইতে নিবৃত্ত হউন। কেন না, হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে সকল প্রকার শিক্ষা লাভই ব্রাহ্মণের নিকট করা কর্ত্তব্য। ইংরাজ অধিকারে দেশের সকল বিষয়ের পরিবর্ত্তনের সহিত শিক্ষাগার গুলিতেও কেবল ব্রাহ্মণ অধ্যাপক নিয়োগের ব্যবস্থা অন্তর্হিত হইয়া,

একাকার চলিয়াছে, সুতরাং আমাদের অপত্য-গণ শুদ্র অধ্যাপকের নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করিবে—ইহা আমাদের পক্ষে নিশ্চয়ই নিন্দার—তথা প্রত্যবায়ভাগী হইবার কথা। কিন্তু তাহা যখন আমরা চালাইতে কুণ্ঠিত হইতেছি না,—তখন ব্যবসায়ের পরিচালন কার্য্যে যাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি—তাহা শিখিবার জন্য—এখনকার শল্যতন্ত্রবিদ্গণ পরদেশীয় চিকিৎসা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও তাঁহাদিগের নিকট শিক্ষা করিতে হানি কি? পর দেশীয় চিকিৎসায় ও আর্য্য চিকিৎসায় যে বড় বেশী পার্থক্য নাই - পক্ষান্তরে আর্য্য চিকিৎসা হইতেই যে সমস্ত চিকিৎসার উৎপত্তি হইয়াছে - এ সব কথা গত প্রবন্ধে আমি বিশেষভাবে বুঝাইয়াছি। যাহা হউক অস্ত্র চিকিৎসা-শিক্ষার জন্য আমাদিগকে অভিমান ত্যাগ করিতে হইবে, শল্যতন্ত্রবিদগণের নিকট হইতে লুপ্ত রত্নের উদ্ধার করিতে হইবে, তাহার পরে আমরা নিজেরা শিখিয়া, আচার্য্য হইয়া,আমাদের বংশধরদিগকে ইহার শিক্ষাদানে সমর্থ হইব। আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি করিতে হইলে ইহা ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই।

পুরাকালে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ যে শল্য চিকিৎসায় সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিতেন, সুশ্রুত সংহিতাই তাহার প্রমাণ। চব্বিশ প্রকার স্বস্তিক যন্ত্র, কুড়ি প্রকার নাড়ী যন্ত্র, আটাশ প্রকার শলাকা যন্ত্র, পঁচিশ প্রকার উপযন্ত্রের বিবরণ, ক্রিয়া ও প্রতিকৃতির প্রকটন করিয়া, ছেদন, ভেদন, লেখন বিস্রাবন, ব্যধন, আহরণ, এষণ ও সীবন প্রভৃতি কার্য্যের জন্য মণ্ডলাগ্র, বৃদ্ধিপত্র, করপত্র, প্রভৃতি বিংশতি প্রকার অস্ত্রের বিবরণ ও প্রতিকৃতি প্রকাশ করিয়া, তাহার পর উহার প্রচার কামনায় বৈদ্য-বিচারে তিনি বলিয়া গিয়াছেন,—"শস্ত্রক্রিয়া ও স্নেহাদি ঔষধ প্রয়োগে যাহার অভিজ্ঞতা নাই, সে চিকিৎসার লোভবশতঃ রোগীর প্রাণনাশ করে। অতএব উপযুক্ত চিকিৎসক হইতে গেলে শস্ত্র ও কায়চিকিৎসা—উভয় বিষয়েই পারদর্শী হওয়া কর্ত্তব্য।" আমরা বিশ্বামিত্র-পুত্র-আচার্য্য-সুশ্রুতের সে কথা এখন ভুলিয়া যাইতেছি কেন? সেই অমূল্য উপদেশ ভুলিয়া যাওয়ার জন্যই আয়ুর্ব্বেদে খণ্ড প্রলয় হয় নাই কি? বিদেশীয় চিকিৎসা পূর্ণাঙ্গ নহে,—উহার মতস্থৈর্য্যও অদ্যাপি সম্পূর্ণ হয় নাই,—ঐ চিকিৎসায় আজি যাহা উৎকৃষ্ট, কালি তাহা অপকৃষ্ট বলিয়া প্রচারিত হইতেছে, কিন্তু সনাতন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা তাহা নহে,—ইহার চিকিৎসা-প্রণালী যেভাবে বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার আর পরিবর্ত্তন করিবার কখনো দরকার হয় না, - পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতাও বুঝি কাহারও নাই,--সেইজন্য এই চিকিৎসা পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত, - এ চিকিৎসা-প্রণালী যে ভাবে প্রণীত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ ও অভ্রান্ত বলিয়া আমরা গর্ব্ব করিবার অধিকারী, কিন্তু শল্য চিকিৎসা লুপ্ত হওয়ায় এ চিকিৎসায় যে খণ্ডপ্রলয় ঘটিয়াছে, তাহারই ফলে এ চিকিৎসাব্যবসায়ীগণ এখনকার দিনের শল্যতন্ত্রবিদ্গণের নিকট লজ্জিত। সেইজন্য আমার বক্তব্য—আসুন আমরা ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করি। ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া—দ্বেষ-হিংসা ভুলিয়া গিয়া, নিজেদের মঙ্গলের জন্য—সমাজের কল্যাণের জন্য—বৈদ্য চিকিৎসার কলঙ্ক-কালিকা অপনয়নের জন্য—চিকিৎসার সকল অঙ্গের শিক্ষা সমাপ্তি পূর্ব্বক দেশে আবার চরক-সুশ্রুতের যুগ ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করি। [illegible]

লোলেই—কোনো বিষয়েই কর্ত্তব্য নহে,—বিশেষ জীবন মরণের দায়ীত্বপূর্ণ কার্য্যে—চিকিৎসা বৃত্তিতে তো একেবারেই কর্ত্তব্য নহে. —সুতরাং আসুন, আমরা বিদ্বেষপ্রণোদিত-ভেদবুদ্ধি বিসর্জ্জন সলিলে নিমজ্জিত করিয়া খণ্ড প্রলয় হইতে সনাতন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার পুনরুদ্ধারে যত্নপর হই,—আমরাই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের সকল অঙ্গের শিক্ষায় সুপণ্ডিত হইয়া দেশবরেণ্য চিকিৎসক বলিয়া পরিগণিত হই,—আমাদের দেখিয়া সমগ্র জগত আবার স্তম্ভিত হউক, আমাদের পদ রেণু-সংস্পর্শে কৃতকৃতার্থ হইবার জন্য বিশ্ববাসী আবার ব্যগ্র হইয়া উঠুক। আমার আয়ুর্ব্বেদ! তোমার এক একটি শ্লোকের যশঃসুরভি দিগ্‌দিগন্ত বহন করিয়া বিশ্ব সংসারের সমগ্র প্রাণীর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যত্নপর হউক। আমার আয়ুর্ব্বেদ! তোমার অনুরক্ত সন্তান মণ্ডলীর সুমতি প্রদান কর,—তোমার লুপ্ত রত্নের উদ্ধার করিয়া—তোমার অষ্টাঙ্গ শিক্ষার পরিসমাপ্তি করিয়া—তোমার কৃতি পুত্রগণ তোমারই চরণে যাহাতে অঞ্জলী প্রদান করিতে পারে,—আমার আয়ুর্ব্বেদ! আবার সেই ব্যবস্থা কর! দেশভক্ত বৈদ্যসন্তান আবার জাগিয়া উঠুক,—সে জাগরণে সুরলোক হইতে দেবনির্ম্মাল্য তাহাদের মস্তকে নিক্ষিপ্ত হউক,—কীর্ত্তি-কলাপে তোমার শিষ্যমণ্ডলী অন্যের নিকট অপরাজেয়—অক্ষয়-অমর বলিয়া কথিত হউক—ইহাই তোমার চরণে ঐকান্তিক প্রার্থনা। আমার জীবনে ইহা ভিন্ন আর অন্য কামনা নাই।

শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন।

বালক রক্ষা।

আমাদের সন্তান সন্ততিগণ ক্রমশঃ যেরূপ দুর্ব্বল হীনতেজ, খর্ব্বাকৃতি, রুগ্ন ও মেধাহীন হইয়া আসিতেছে, বোধহয় এরূপ দ্রুত অবনতি এক ভারতবর্ষ—বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশ ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও এরূপ হইতেছে না। এইরূপ অনুপাতে চলিলে আমাদের বংশ যে অচিরে লোপ পাইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহা একবার স্থিরভাবে চিন্তা করিলে আর চিন্তার কূলকিনারা পাওয়া যায় না ও ইহার ভবিষ্যৎ ফল বড়ই ভয়ানক বলিয়া মনে হয়। এখন নিজেদের দেহরক্ষা যেমন প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য, সেইরূপ আমাদের সন্তান সন্ততিগণকে ক্ষয়ের হাত হইতে রক্ষা করাও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। অথচ আমরা এবিষয়ে তত তৎপর না হইয়া বিষয় ভোগে মত্ত হইয়া সংসারের সুখের অন্বেষণে ব্যস্ত ও লালায়িত থাকিয়া এ বিষয়ে এক রকম উদাসীন হইয়া পড়িয়াছি। সংসারের তাড়নায় অবশ্য আমাদের এ চেষ্টার অনেক অন্তরায় রহিয়াছে—কিন্তু যতটুকু করিতে পারি, ততটুকু করি না কেন? যাহা হউক এখন দেখা যাউক এ বিষয়ে আমরা

চেষ্টা করিয়া কতটুকু করিতে পারি। যতটুকু আমাদের করায়ত্ত, ততটুকু অবধারণ করিয়া আমরা যেন কাল বিলম্ব না করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই।

ছেলেদের সৎপথে আনিবার জন্য এখনকার দিনে অনেক সভা সমিতি, অনেক বক্তৃতা, অনেক পত্রিকা প্রকাশ, অনেক উপদেশ দেওয়া হইতেছে, অথচ তাহাতে কাজ হইতেছে না কেন; ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। যাহার মূলে ধর্ম্ম ও সত্য নাই, তাহার প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে না। আমাদের পুত্রকন্যাগণকে উন্নত করিতে হইলে, প্রথমতঃ আমাদিগকে উন্নত হইতে হইবে। আমাদিগকে স্বয়ং ধর্ম্ম ও সত্যকে অবলম্বন করিয়া আত্মসংযম অভ্যাস দ্বারা আমাদের পুত্রকন্যাগণকে শিক্ষা দিতে হইবে। কোন এক সাধুর নিকট—একটি কাশরোগগ্রস্থ ব্যক্তি কোন দূর গ্রাম হইতে আসিয়া কাশরোগের ঔষধ প্রার্থনা করে। সাধু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, এই ব্যক্তি বড় মিষ্টদ্রব্য প্রিয় ও সেইজন্য বেশী পরিমাণে মিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করে। তাহার পর তিনি তাহাকে তাহার পর দিন আসিতে বলিলেন। সে ব্যক্তি অতিকষ্টে দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া তাঁহার নিকট আসিল। সে দিনও তিনি তাহাকে বলিলেন—"কাল আসিও।" সে ব্যক্তি তৃতীয় দিন আসিয়া আবার সেইরূপ উত্তর পাইয়া কিছু বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল, কিন্তু কাশের যন্ত্রণার উপশমের লোভ হেতু ও সাধুর ঔষধের গুণ বহুলোক মুখে শুনিয়া তাঁহার ব্যবস্থা ও ঔষধে দৃঢ় বিশ্বাস হেতু আবার চতুর্থ দিনেও অতি কষ্টে আসিল। তখন সাধু তাঁহাকে বলিলেন—"বাবা যতদিন তোমার কাশ রোগ একবারে ভাল না হয় এবং একবারে ভাল হওয়ার কিছু দিন পর পর্য্যন্তও সর্ব্বপ্রকার মিষ্ট দ্রব্য খাওয়া ত্যাগ করিবে।" সে লোকটি শুনিয়া অবাক্ হইয়া বলিল—"বাবা এই যদি আপনার ব্যবস্থা ও ঔষধ হয়, তাহা হইলে প্রথম দিন বলিয়া দেন নাই কেন?" সাধু বলিলেন—"বাবা, আমার বাক্যের প্রভাব আনিবার জন্য আমাকে এই কয় দিন মিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ ত্যাগ করিতে হইয়াছে এবং যে পর্য্যন্ত না উহা খাওয়ার ইচ্ছা একবারে আমার মন হইতে অপসৃত হইয়াছে—ততদিন তোমাকে উহা ত্যাগের উপদেশ দিই নাই। আমি যখন স্বয়ং মনে মনে উহাকে ত্যাগ করিতে পারিয়াছি, তখন তাহার প্রভাব তোমাতে অর্পণ করিতে পারিব জানিয়া অদ্য তোমাকে বলিলাম। যাও—মিষ্ট দ্রব্য খাওয়া উপস্থিত ত্যাগ কর, তোমার কাশরোগ ভাল হইবে।" সেই ব্যক্তি আনন্দে সাধুর বাক্যের সত্যতার উপর নির্ভর করিয়া মিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ ত্যাগ করিল এবং রোগ হইতে মুক্ত হইল। ইহার দ্বারা আমরা কি শিখিলাম? প্রথম—ভোগে রোগ উপস্থিত হয়। কোন দ্রব্য অপরিমিত ভাবে ভোগ করিলে তাহাতে রোগ হয় এবং সেই ভোগের লালসা ত্যাগ করিতে না পারার জন্য সেই রোগ ভোগ করিতে হয় এবং রোগও ভোগের দ্বারা এবং সুপথ্য গ্রহণ, কুপথ্য ত্যাগ, তিক্ত ঔষধাদি ভক্ষণ ও অন্যান্য অনেক প্রকার সংযমের দ্বারা দূরীভূত হয়। সংসারে বাহিরে সুখ নাই, ভিতরে সুখ। সুখের সময় তাহাতে আসক্ত না হওয়া এবং দুঃখের সময় তাহাতে বিরক্ত না হইয়াই ভিতরের আসল সুখ

পাইবার পথ। দ্বিতীয় শিক্ষা হইতেছে— আদর্শ। যিনি যে বিষয়ে উপদেশ দিবেন, তিনি সেই পথাবলম্বী স্বয়ং হইবেন। তাহা না হইলে সেই উপদেশে কোন ফল হয় না। আমি নস্য ব্যবহার বা তামাক খাওয়া বা চুরুট-সিগারেট-খাওয়ায় অভ্যস্ত—আমার পুত্রের কাছে তাহাই করিতেছি—অথচ পুত্র অল্প বয়সে বিড়ি বা সিগারেট পান করিতেছে দেখিয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিলাম বা মারিলাম, কিন্তু তাহাতে তাহার বিশেষ ফল হইল না। কেননা, ভয়ে হয়ত সে আগেকার মত বিড়ি সিগারেট্ পানকরিল না. কিন্তু সুযোগ পাইলে সে কখনই তাহা হইতে বিরত থাকিবে না, অধিকন্তু তাহা গোপন করিবার জন্য তাহার সঙ্গে আর একটা পাপের সৃষ্টি করিবে অর্থাৎ আমি জিজ্ঞাসা করিলে মিথ্যা কথা বলিয়া তাহা গোপন করিবার চেষ্টা করিবে। আমি তাহাকে যদি হাজার বার শিক্ষা দিয়া বলি— "বাবা নস্য লইলে তাহাতে যে নিকটিন্ বিষ আছে, তাহাতে মস্তিষ্ক—যাহা আমাদের জ্ঞানের আধার অর্থাৎ যাহার দ্বারা আমরা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া অনুভব, স্মরণ, চিন্তন, ধ্যান প্রভৃতি কার্য্য করি, তাহার ক্রিয়া ক্রমশঃ নষ্ট ও হীনবল হইয়া আসিবে,—তাহাতেও সে তাহা হইতে বিরত হইবে না। এইরূপ যদি অল্প বয়সে বিড়ি সিগারেট-পান করিলে বা পানের সহিত দোক্তা খাইলে (যাহা আজকাল স্ত্রীলোক এবং পুরুষদের মধ্যে একটা ভয়ানক বিষ হইলেও অতি আদরের ও উপাদেয় খাদ্য বা পানের মশলা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে) শরীর নষ্ট করে বলিয়া উপদেশ দিই বা ঐ সব ব্যবহার দ্বারা উদরের ও বুকের মধ্যের যন্ত্র সকল কি প্রকার বিকৃত ও ক্রিয়াহীন হয়— চিকিৎসা পুস্তক বা ছবি হইতে দেখাইয়া দিই, অথচ আমি যদি স্বয়ং নস্য লই, তামাক বা সিগারেট ব্যবহার করি ও আমার স্ত্রী পানের সহিত দোক্তা ব্যবহার করেন অথচ আমরা আমাদের পুত্রের নিকট ইহার কারণ দেখাইয়া বলি যে, আমাদের বয়স হইয়াছে— আমাদের অনিষ্ট করিবে না, কিন্তু তাহা হইলেও আমাদের পুত্রগণ উহা হইতে বিরত হইবে না। আজ কাল তামাক কোথাও নস্যরূপে, কোথাও বিড়িরূপে, কোথাও সিগারেট-রূপে, কোথাও দোক্তারূপে, ব্যবহৃত হইয়া শরীরের ও সমাজের কি ভীষণ অনিষ্ট করিতেছে, তাহা চিকিৎসকগণ বেশ বুঝিতে পারেন। আর চিকিৎসগণই বা বুঝিয়া কি করিবেন, অনেক চিকিৎসককে তামাকের ভীষণ অনিষ্ট করিবার কথা বলিতে শুনিয়াছি অথচ তাঁহাকেই পানের সঙ্গে দোক্তা খাইতে দেখিয়াছি। অজ্ঞ লোকেরা এই সকল দেখিয়া উহাতে আরও রত হয়, তাহাতে যাঁহারা উহার অনিষ্ট-কারিতা বুঝিয়াও উহা ত্যাগ করেন না— তাঁহারা প্রকৃতই সমাজের অনিষ্ট করিয়া পাপ পঙ্কে লিপ্ত হন। এ বিষয়ে উপদেশ দিতে হইলে ও কেবল কথায় বা তিরস্কারে চলিবে না, আমাদিগকে উহা একবারে ত্যাগ করিয়া তবে উপদেশ দিলে ফল হইবে। সাধুর বাক্যে লোকে বিশ্বাস করে কেন? কারণ তিনি ত্যাগী, নিজের সুখ-দুঃখের দিকে না দেখিয়া পরের দুঃখের দিকে সাধুগণের দৃষ্টি ও নিজের কষ্ট স্বীকার করিয়াও অন্যের দুঃখ বিমোচন করা তাঁহাদিগের কার্য্য। শুধু সাধুর প্রভাব থাকিলেই হইবে না, সাধুগত প্রাণ ব্যক্তিগণের সেই প্রভাবে বিশ্বাসও থাকা চাই। তবে এই বিশ্বাসের মূলকারণ হইতেছে—সাধুর

নিজের কার্য্যের উদাহরণ বা আদর্শ বা ত্যাগ ধর্ম্মকে সর্ব্বতোভাবে অবলম্বন। ধর্ম্মই আমাদিগকে ধারণ করে,—সেই ধর্ম্মকে অবলম্বন করিতে শাস্ত্র এবং গুরুবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয়, সেইজন্য এ বিষয়ে শাস্ত্র যাহা বলিয়াছেন, তাহা না মানিয়া থাকা চলে না। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—"শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা করেন—অন্যান্য লোকেও তাহাই করিয়া থাকে, তিনি যাহা প্রামাণ্য বলিয়া মানেন অন্য লোকেও তাহারই অনুবর্ত্তন করে।

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরোজনঃ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোক স্তদনুবর্ত্ততে॥

শ্রীভগবানের কার্য্য না থাকিলেও তিনি স্বয়ং দেহ ধারণ করিয়া লোক শিক্ষা দিয়াছেন। তাই আমাদিগকে যখন আমাদের পুত্র কন্যারা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানে বা জানে, তখন আমাদিগকেও সাধুর জীবন বা ব্রতগ্রহণ করিতে হইবে। তাহা না করিয়া আমরা বিলাসে গা ঢালিয়া দিয়াছি, কামনার পূর্ণ আধার হইয়া বসিয়াছি, একটু কষ্ট সহ্য করিতে পারি না, একটু জিতেন্দ্রিয় হইতে পারি না, একটু দয়া দেখাইতে পারি না, একটু ত্যাগ স্বীকার করিতে পারি না, একটু মন খুলিয়া শ্রীভগবানকে ডাকিতে পারি না, এরূপ অবস্থায় আমাদের সন্তান সন্ততিগণকে কি করিয়া ভাল করিতে পারিব? যাহা হউক যাহা হইয়াছে তাহা লইয়া এখন আর বাদানুবাদ বা দোষ দর্শনের সময় নাই,—যিনি যতটুকু পারেন, এরূপ যথার্থ গৃহস্থাশ্রমের উপযুক্ত হইয়া নিজ পরিবারের মধ্যে সাধু বা রাজা বা রক্ষাকর্ত্তা হইয়া ইহার উপায় বিধান করিতে হইবে, এখনকার দিনে ইহাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য এবং ইহা ভিন্ন যে দেশ রক্ষার অন্য উপায় নাই ইহা সুনিশ্চিত,—খাঁটি সত্য কথা।

পূর্ব্বে গুরুগৃহে বাস করিয়া গৃহস্থাশ্রমের উপযুক্ত হইলে অর্থাৎ সংযত দেহ, নির্ম্মল চিত্ত ও ঈশ্বরপরায়ণ হইলে গুরু তাহাকে গৃহস্থাশ্রমের উপযুক্ত মনে করিয়া গৃহস্থাশ্রমে পাঠাইয়া দিতেন এবং তখনই দার পরিগ্রহাদি হইত। এখন সে দিন নাই। বাল্যকালে আমরা সে শিক্ষা পাই নাই, এক্ষণে কিন্তু সময়ের যেরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাতে এই বয়সেও গৃহস্থাশ্রমের উপযুক্ত শিক্ষা না পাইয়া, আমরা ঠেকিয়া যে টুকু শিখিয়াছি, তাহাই বড় মূল্যবান। আসুন তাহাই লইয়া ও শাস্ত্রের উদাহরণ লইয়া আমরা এক্ষণে কার্য্য করি। একজন সাধু আমাকে বলেন "বাবা আমরা ভাতমারা সন্ন্যাসী অনেক আছি, আমাদের দ্বারা বিশেষ কিছু হইতেছেনা, কতক গুলি ভাত দেওয়া সন্ন্যাসী তৈয়ার না করিতে পারিলে সমাজের উন্নতির উপায় নাই"। সাধুর সেই কথায় আমাদিগকে গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া এক্ষণে "ভাত দেওয়া সন্ন্যাসী" হইতে হইবে।

আমাদের প্রধান শত্রু কাম ও ক্রোধ, তন্মধ্যে কামই সর্ব্ব প্রধান, কারণ কাম প্রতিহত হইলেই ক্রোধের উৎপত্তির হেতু হয়। এই কামকে আমাদের সর্ব্বতোভাবে দমন করিতে হইবে। কিন্তু ইহার এমন প্রভাব যে কোন কৌশলে বা বলে ইহাকে পরাস্ত করা যায় না। যেমন শ্রীশ্রীরামচন্দ্র 'ভুতে'র সংহর্ত্তা বলিয়া রাম নাম করিলে ভুত পালায়, তেমনি যিনি কামের সংহর্ত্তা বা সম্মোহয়িতা, তাঁহার নাম লইলে কাম পলায়ন করেন বা পরাস্ত হন। কামের প্রভাব বিষয়ে শ্রীভগবানের ত্রিমূর্ত্তিই উদাহরণ।

ব্রহ্মের অঙ্গ ও প্রকাশ, বেদের বক্তা ব্রহ্মা প্রথমে পঞ্চানন ছিলেন, তিনি কামকে সৃষ্ট করিয়া তাহার ক্ষমতা কিরূপ হইয়াছে—পরীক্ষা করিতে গিয়া নিজের উপরেই পরীক্ষায় দেখিলেন যে, যেমন তাঁহার মনে কামের প্রভাব আসিল—অমনি তিনি নিজ মানস কন্যার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন, হইবামাত্র সেই ভাব তাহার পবিত্র দেহ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার পঞ্চম মস্তকটি উড়িয়া গেল। ইহাতে তিনি লোককে এই শিক্ষা দিলেন যে "বাবা আমার পাঁচটা মাথার একটা উড়িয়া গেল, তাহাতে বড় ক্ষতি হইল না, কিন্তু বাবা, তোমাদের একটা মাথায় যদি কামের প্রভাব আসিতে দাও —তাহা হইলে সেই একটা মস্তক উড়িয়া গেলে তোমার আর কি থাকিবে? অতএব সাবধান হও। শিব যখন ঘোর তপস্যায় নিমগ্ন—তখন দেবতারা নিজকার্য্য উদ্ধার অর্থাৎ তারকাসুর বধের জন্য মহাদেবের ঔরসজাত পুত্রের দ্বারা তাহার বধের জন্য তাঁহাকে উমার সহিত বিবাহ দিবার জন্য কামকে পাঠাইয়া ছিলেন। এখানে কাম-ব্রহ্মার প্রতি স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার করিয়া, নিজ বলের গর্ব্বে ব্রহ্মার শাপের কথা ভুলিয়া যোগীন্দ্র মহাদেবের নিকট স্বীয় প্রভাব কথঞ্চিৎ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন।

"হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্ত ধৈর্য্যঃ তাহার পরেই আত্মসংযম করিয়া জ্ঞানপত্র অর্থাৎ তৃতীয় নেত্র দ্বারা "ভষ্মাবশেষং মদনং চকার"। মহাদেব একটু অসাবধান হওয়াতে যে কিরূপে কাম আক্রমণ করিতে পারে—তাহার উদাহরণ দিয়া—পুনরায় সংযম বায়ু বিক্ষোভিত জ্ঞানাগ্নি দ্বারা কামকে নষ্ট করিয়া তবে বিবাহ করিলেন ইহার দ্বারা মহাদেব জগৎকে এই শিক্ষা দিলেন যে, বিবাহ করিয়া সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে কামকে সম্পূর্ণ রূপে দমন করিতে হইবে। আজকাল বিবাহ কেবল সুখের লালসায় প্রণোদিত। ফলে তাহাতে ইন্দ্রিয় সংযমের সম্পূর্ণ অভাব। শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও কামকে মোহন করিয়া তাহার প্রভাবকে নিরস্ত করিয়া তবে বিবাহ করিয়াছিলেন। স্ত্রী লইয়া আমরা সংসারে কেবল সুখেরই কল্পনা করি। স্ত্রী যে সহ-ধর্ম্মিণী—একথা এখন একেবারেই কাহার কল্পনাতেও আসেনা। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্র পিণ্ড প্রয়োজনঃ। এখন বিবাহ যে পরকালে প্রেতদেহের কষ্টের লাঘবের জন্য—তাহা কেহ ভাবেননা। যতক্ষণ আমাদের এই দেহে দেহী বাস করিতেছেন, ততক্ষণই সেই পুরুষ জীবাত্মা কর্ম্মক্ষম, ততক্ষণ তিনি নিজের সুখ দুঃখ গাইয়া লইতে পারেন, কিন্তু সেই জীবাত্মা বিদেহ হইলে, কর্ম্ম করিতে না পারায় গতিহীন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া প্রেত অবস্থায় দুঃখ ভোগ করেন, সেই জন্য সেই সময়ের পিপাসা নিবারণ—পুত্র দত্ত তর্পণ কালে এবং ক্ষুধা নিবারণ—পুত্র দত্ত পিণ্ড দ্বারা হয় এবং উপনিষদাদি সৎগ্রন্থ পাঠে সেই পরলোকগত আত্মার তৃপ্তিলাভ হয়। পুত্রের ইহাই প্রধান কার্য্য। তা' এখনকার পুত্রের সে শ্রদ্ধা নাই বলিয়া যথার্থ শ্রাদ্ধ হয় না এবং পরলোকে পিতামাতার কোন উপকার হয় না। পশুপক্ষী কোন স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া সন্তান পালন করে না, কিন্তু মনুষ্য লোভ এবং প্রত্যুপকারের বশবর্ত্তী হইয়া পুত্র কামনা ও পালন করে; কিন্তু যদি সেই পুত্র হইতে এই আশাপূরণ না হয়—তবে পুত্রে স্নেহ

কি? আমরা যদি কেবল স্বার্থ ভাবিয়া পুত্র কামনা করি ও পুত্র প্রাপ্ত হই—তাহা হইলেও নিজের হিতের জন্যও যাহাতে সেই পুত্র সৎপুত্র হয় তাহা দেখা কি উচিত নয়?—পুত্র সুস্থ, সবল, নীরোগ, ধার্ম্মিক, দয়াবান্ এবং ঈশ্বরপরায়ণ হইলেই পিতামাতার সুখ ও সমাজের সুখ, নতুবা কেবল দুঃখময়। আজ কাল পুত্রের দ্বারা পিতামাতার কষ্ট বই সুখ হয় না, তাহার কারণ পিতামাতার দোষ। সন্তান রুগ্ন হয়—তাহাও পিতামাতার দোষ। কেননা, পিতামাতা ঐশ্বর্য্য বিলাসের মধ্যে-খালি মগ্ন থাকেন বলিয়া সদ্‌গুণান্বিত পুত্র লাভ এখনকার দিনে আর দেখা যায়না।

মহামনা ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ—দিলীপ রাজা পূজ্য পূজা ব্যতিক্রম করিয়া পাপার্জ্জনে শাপগ্রস্ত বলিয়া পুত্র লাভ করিতে পারিতেছেন না ও বংশলোপ হইয়া যাইতেছে দেখিয়া রাজাকে বনে গোচারণ পূর্ব্বক—ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে স্বাত্বিক গুণের বৃদ্ধির জন্য সুরভি কন্যার সেবা করিতে বলিলেন। সেই ঐশ্বর্য্যের মধ্যে—বিলাসের মধ্যে রাজসিক ও তামসিক ভাবে থাকিয়া—পুত্র হইলে সেই পুত্র অষ্ট-সুরেন্দ্রগুণযুক্ত হইয়া—প্রজাপালক ও প্রজারঞ্জক ও যথার্থ রাজা হইতে পারিবেনা, বলিয়া, বশিষ্ঠ রাজাকে সপত্নিক বনে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিয়া গোচারণের ব্যবস্থা করিলেন। ভাবিয়া দেখা যাক—কোথায় সেই একাধিপত্য রাজ্যেশ্বরের অতুল ঐশ্বর্য্য ও ভোগের মধ্যে দিন কাটাইতেন—আর কোথায় তিনি বন্য লতা প্রতানদ্বারা কেশ বন্ধন করিয়া সামান্য বেশে তূণীর ও ধনু ধারণ করিয়া মুনিহোমধেনু রক্ষা করিতেছেন। সমস্ত দিন গোচারণ করিয়া বন্য ফলমূল খাইয়া সন্ধ্যায় ফিরিয়া সেই গাভীর দুগ্ধ পান পূর্ব্বক সংযতচিত্তে—সাম্রাজ্ঞী সুদক্ষিণার সহিত কুশশয্যায় শয়ন করিয়া রাত্রির শেষ প্রহরে মুনিগণের বেদধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে—শুদ্ধ স্বত্বভাবে শ্রীভগবানকে চিন্তা করিতে করিতে শয্যা হইতে উভয়েই গাত্রোত্থান করিতেন। আর আজকাল কি স্বামী কি স্ত্রী—কাহারও সূর্য্য উদয় না হইলে ঘুম ভাঙ্গেনা। তাহার পর—ঘুম ভাঙ্গার পর শ্রীভগবানের নাম পর্য্যন্ত লওয়া নাই—চা প্রভৃতি উত্তেজক অনিষ্ট কর পানীয়ের চেষ্টা। কোথায় সেই রঘুর মত পুত্র—আর কোথায় এখনকার পিতামাতার চিরব্যাপি কষ্টদায়ক পুত্র।

রাজা দিলীপ এই প্রকারে দীর্ঘকাল আচরণ করার পর, তাঁহার যথার্থ ত্যাগ ধর্ম্ম আসিয়াছে—যথার্থ রক্ষা ধর্ম্ম—ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম আসিয়াছে কিনা—তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য পরীক্ষা হইল, রাজা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। বরের প্রতিশ্রুতি শুনিয়া বর চাহিলেন কি—"বংশস্য কর্ত্তার মনন্তকীর্ত্তিং সুদক্ষিণায়াং তনয়ং যযাচে" এমন পুত্র যিনি অনন্তকীর্ত্তি হইবেন ও বংশের কর্ত্তা হইবেন। তাহার পর সর্ব্ব-সুলক্ষণ—পঞ্চতুঙ্গগ্রহ দ্বারা সুচিতভাগ সম্পদ্ পুত্র রঘুকে লাভ করিলেন। গোসেবা দ্বারা যে আমাদের কত উপকার হয়—তাহা আমরা জানিনা। টাট্‌কা গোমূত্র ও গোময়ের ঘ্রাণে বহুবিধি রোগ নষ্ট হয় এবং উহা দ্বারা রোগের বীজানুধ্বংস হয়। চরকে আছে—যে দীর্ঘজীবী হইতে ইচ্ছা করিলে গোকুল পালের মধ্যে থাকিতে ও আমলকী ভক্ষণ করিতে হয়। এক সন্ন্যাসীর মুখে শুনিয়াছি যে, একজন জমীদারের এক পুত্রের আয়ু কয়েক বৎসর মাত্রছিল—[illegible] কোষ্ঠি বিচার করিয়া

দেখেন। সাধুর আদেশে সেই পুত্রকে বাল্যাবস্থা হইতে গোসেবায় লাগান হয়, তাহাতে সেই পুত্র সুস্থ, সবল ও দীর্ঘায়ু লাভ করে। আমাদের দেশে এক বড়লোকের কোন কঠিন ব্যাধি হয়। রোগের যাতনায় ৺বৈদ্যনাথে হত্যা দেওয়ায় স্বপ্ন হয়—গোসেবা ও গোচিকিৎসা শিক্ষা করিয়া বিনা পয়সায় গোচিকিৎসা করিলে ব্যাধি আরোগ্য হইবে। তিনি তাহাই করিতেছেন এবং নীরোগ হইয়া—সুখে কালযাপন করিতেছেন। আজকালকার দিনে আমাদের প্রধান খাদ্য ঘৃত-দুগ্ধ বেশী মূল্য দিলেও বিশুদ্ধ পাইবার উপায় নাই; কিন্তু গাভী পোষণ ও তাহার যত্ন করিলে উহা পাওয়া যায় এবং তদ্দারা বহু উপকার লাভ হয়; আমরা তাহা করি না বলিয়াই—আমাদের এত দুঃখ। যাক্ এই প্রসঙ্গে কিছু গোসেবার কথা বলা গেল।

যাহা হউক সৎপুত্র লাভ করিতে হইলে প্রত্যেক পিতামাতাকে পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ সাবধান, সতর্ক, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্ম ও ঈশ্বর পরায়ণ হইতে হইবে। তাঁহাদের দৈহিক ও মানসিক অবস্থার উপর সন্তানের দৈহিক ও মানসিক অবস্থা নির্ভর করিতেছে একথাটি সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। সেই জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধে এত কথা বলিতে হইল। বালকের মাতৃগর্ভে সঞ্চার হইবার পূর্ব্ব হইতেই পিতামাতাকে সুস্থ, সবল ও পবিত্র দেহ ও শুদ্ধচিত্ত হইতে হইবে। এই হইল বালকরক্ষার মূলস্বরূপ, এবং এইজন্য এই বিষয়টি এত দীর্ঘ ভাবে বলা হইল। সম্পাদক মহাশয় কৃপা করিলে আবার ইহার পরের কি কি কর্ত্তব্য যথাজ্ঞান বলিবার চেষ্টা করিব। সন্তান গর্ভে আসিবার পূর্ব্ব হইতেই পিতামাতাকে সত্য, ধর্ম্ম ও ঈশ্বরকে অবলম্বন করিতে হইবে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে জিতেন্দ্রিয় হইতে হইবে। তজ্জন্য যথাসাধ্য যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান ও ধারনার সাধনা করিতে হইবে ও সদ্‌গুরুর আদেশানুসারে জপপরায়ণ হইতে হইবে। কাতর ...লন, জগতের দুঃখ ও বিপদের দুঃখ বিমোচকগণকে শ্রীভগবানকে ডাকিতে হইবে। তিনি ...তে রক্ষা বলিয়াছেন যে, যথন অধর্ম্মের অভ্যু... ধর্ম্মের গ্লানি হইবে—তখনই আমি মানবকীল অবতীর্ণ হইয়া অধর্ম্মের বিনাশ ও ধর্ম্মের পরি... করিব। তাঁহার সৃষ্টিরক্ষা—তাঁহাকেই করিতে হইবে ও ধর্ম্মরক্ষা না করিলে সৃষ্টি থাকিবে না। কিন্তু তাঁহাকে ডাকিয়া জানাইতে হইবে যে—"প্রভু তোমার শ্রীমুখের বাণী স্মরণ কর, আর আমাদের দুঃখ সহ্য হয় না,—এস—এস—অবতীর্ণ হও।" পূর্ব্বে ধরাদেবী কান্দিয়া শ্রীভগবানের কাছে গিয়া নিজ দুঃখ জানাইতেন, আমরাও ধরাবাসী সকলে আজ তাঁহাকে জানাই—ভগবান, এস—এস—তোমার সৃষ্টি যায়—আমাদের দুঃখ আর সহ্য হয় না, রক্ষা কর।" দশরথ-কৌশল্যা অপুত্রক হেতু পরশুরামের অত্যাচারের জন্য কান্দিয়া শ্রীভগবানকে পুত্ররূপে ডাকিয়াছিলেন এবং সেই ডাকার সাহায্যার্থে বলী—বশিষ্ঠকে ডাকিয়াছিলেন। তিনিও দশরথকে সম্পূর্ণ সাহায্য করিতে না পারিয়া স্ত্রীপুরুষ ভেদজ্ঞানহীন জিতেন্দ্রিয় মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গকে ডাকিয়া—যজ্ঞ করিয়া—তবে সর্ব্বগুণাধার শ্রীভগবান শ্রীরামকে পুত্ররূপে পাইয়াছিলেন। দেবকী-বসুদেব কংসের অত্যাচারে সকল লোককে কাতর ও বিষণ্ণ দেখিয়া ও নিজে কঠোর কারাগারে লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া একমনে

প্রাণ ভরিয়া শ্রীভগবানকে ডাকিয়াছিলেন। উপর্য্যুপরি ছয়টি পুত্র কংস কর্তৃক হত হওয়ায় পুত্রশোকে কাতর হইয়া শ্রীভগবানকে ডাকিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া-পুত্র লন। তখন তাঁহাদের অবস্থায় কাম ছিল এবং তাঁহাদের আহ্বানে কামনা ছিল বটে, কিন্তু সমাজের মত, শমিত কাম বা জিতকাম, সে কাম কাল শ্রীভগবানের দিকে প্রযুক্ত কাম, সে হয় না তখন ভক্তিতে পরিণত হইয়াছে। সন্তান দের ও এই দুর্দ্দিনে জগতের দুঃখ দূর কেন রিবার জন্য—সর্ব্বপ্রকার অবস্থার সামঞ্জস্য করিবার জন্য সেই কামকে দমন করিয়া শ্রীভগবানকে ডাকিতে হইবে। সেই কামকে দমন করিতে হইলে মায়াকে আগে দমন করিতে হইবে; কারণ কামের মূল মায়া। আবার মায়াকে অতিক্রম করিতে হইলে শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইতে হইবে।

যেমন মৎস্য ধীবরের জাল হইতে রক্ষা পাইতে হইলে ধীবরের পদদ্বয়ের কাছে কাছে থাকিলে তাহার জাল-বিস্তৃতি হইতে রক্ষা পায়, আমরাও সেইরূপ শ্রীভগবানের শ্রীচরণে শরণ লইলে তাঁহার দৈবী স্বত্ব-রজ-তম ত্রিগুণময়ী দৃঢ়া মায়ারজ্জুর বন্ধন হইতে রক্ষা পাইব। তাহা হইতে রক্ষা পাইয়া তাঁহাকে ছাড়িলে কিন্তু চলিবে না, যেমন মা দেবকী অনবরত পুত্র শোকের মধ্যে শ্রীভগবানকে ডাকিয়াছিলেন, তেমনি কাম দমনের প্রধান উপায় মৃত্যুচিন্তা অর্থাৎ আমাকে মরিতে হইবে অন্যের মৃত্যু বিকার হইয়াছে—তাহা ভাবিয়া মনকে কাঁদাইয়া শুদ্ধ করিয়া শ্রীভগবানকে ডাকিতে হইবে তবেই কাম দমন হইবে।—

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা
জহিশত্রু মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্।

আমাদিগকে মহাবাহু অর্থাৎ বলশালী অর্জ্জুনের মত সুধীর বীর হইতে হইবে। শরীরে বল না হইলে কামরিপুকে জয় করা চলিবে না, সেই জন্য সাত্ত্বিক আহার ও ব্যায়াম দ্বারা সুস্থ ও সবল হইতে হইবে। আসন ও প্রাণায়ামের মত শরীরের বায়ু ও মন স্থির করা ভিন্ন আর কোন ব্যায়াম নাই। তাহার পূর্ব্বে কিছু যম নিয়ম ও নাড়ীশুদ্ধি শিক্ষা করিতে হইবে। তাহার পর মনকে ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহিরে যাইতে না দিয়া তাহাকে ফিরাইয়া অনুলোম গতিতে ভিতরে অর্থাৎ নিজের স্থানে আনিয়া তথা হইতে বুদ্ধিতে লইয়া গিয়া, বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আত্মাকে জানিয়া তথায় লয় করিবে অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা মনকে নিশ্চল করিয়া সেই দুর্ণিবার শত্রু কামকে দমন করিতে হইবে। আত্মাকে জানিতে না পারিলে কিছুই হইবে না, তাহার জন্য বল সঞ্চয় আবশ্যক। ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ বীর্য্যধারণ না করিলে উহা হয় না। ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা চিত্তবৃত্তিকে স্থির করিয়া ঈশ্বরে একাগ্র হইতে পারিলে কামকে জয় করিতে পারা যাইবে, নতুবা নয়। ফলে এই ইন্দ্রিয়কে জয় করিতে পারিলে তবে শ্রীভগবানকে ডাকিলে তাঁহাকে বা মা পার্ব্বতীকে কন্যারূপে ডাকিলে তাহাতে যদি তাঁহাদিগকে না পাইতে পারা যায় তাহা হইলেও তত্তুল্য পুত্র বা কন্যা লাভ করিয়া বংশরক্ষা ও অনন্তকীর্ত্তি যুক্ত হইতে। দিলীপরাজা কেন বংশস্তকর্ত্তার-মনন্তকীর্ত্তিম্—তনয় যাচ্ঞা করিয়াছিলেন, এইবার বুঝিতে পারিবেন। ধর্ম্ম না আসিলে শ্রীভগবান আসেন না। শ্রীভগবানের আসার পূর্ব্ব হইতে দেবতাগণের আসা আবশ্যক। আমরা যদি [illegible]

সুতরাং পাবা যাইবে ভাবিয়া যদি দেবতা না হই, —তবে দেবতারা কেন আসিবেন? আর দেবতারা না আসিলে শ্রীভগবানও আসিবেন না। মা জগদম্বাকে ডাকিতে হইলে তবে তিনি "উমযাবনক্ সাক্রন্" আসিবেন। যুধিষ্ঠিররূপে ধর্ম্ম, ভীমসেনরূপে মহাবল পবন, পার্থরূপে ইন্দ্রের গুণসমষ্টি, নকুলসহদেবরূপে চিকিৎসক ও দৈবজ্ঞ এক ইন্দ্রের এই পঞ্চ অংশ ও ভক্তিমূর্ত্তি শচাই যাজ্ঞসেনীরূপে আসিয়া তবে সেই ভগবানকে শ্রীকৃষ্ণরূপে ভক্তিরজ্জুতে বান্ধিয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন। আমাদের ধর্ম্ম, বল, রূপ ও গুণের সমন্বয়,—জ্ঞান ও ভক্তি না আসিলে শ্রীভগবান আসিবেন কেন? যাহা হউক তিনি আর না আসিলে চলিবে না। কংসের আদেশানুসারে নিয়োজিত পূতনা প্রভৃতি রাক্ষসকে বধ তিনিই করিয়াছিলেন, আবার তিনি আসিয়া আমাদের বালকগণকে অকালমৃত্যু ও ব্যাধি প্রভৃতির হাত হইতে রক্ষা করুন।

শ্রীসতীশ চন্দ্র রায় বি, এল, উকীল

যক্ষ্মা রোগ ও তাহার চিকিৎসা।

——:*:——

(লক্ষণ।)

রোগ কঠিন! রোগের চিকিৎসা কঠিন! রোগ হইতে মুক্তি লাভ সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। রোগের এই ভীষণত্ব দেখিয়া সাধারণেরই ধারণা হইয়া গিয়াছে—যক্ষ্মারোগ হইলে মানুষের আর পরিত্রাণ নাই, এ রোগ শিবের অসাধ্য। কিন্তু লোকের মনে এরূপ ভ্রান্তধারণা থাকা ভাল নহে। প্রথম হইতে যত্ন লইতে পারিলে —এ রোগ নিশ্চয় ভাল হয়। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা এই,—প্রথম হইতে রোগটাকে ধরা বড় শক্ত কথা। কেননা আদি অবস্থায় রোগীর দেহে রোগের প্রধান লক্ষণগুলি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। রোগী হয়ত চিকিৎসককে তাহার অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য বা দৌর্ব্বল্যের কথা মাত্র জানায়, কেহবা দুই একবার শুষ্ক কাসির অস্তিত্ব স্বীকার করে। চিকিৎসক অজীর্ণের লক্ষণ বুঝিয়া হজমশক্তি বাড়াইবার ঔষধ দেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই হয়ত তাহার দেহে যক্ষ্মারোগের বহু উপসর্গ আবির্ভূত হইয়া থাকে। তখন তাহার বক্ষঃপ্রদেশ পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসক দেখেন —রোগ অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে! এতদিন যক্ষ্মা রোগকে অজীর্ণ মনে করিয়া তিনি বৃথা চিকিৎসা করিয়াছেন!

যাহাতে আদি অবস্থায় যক্ষ্মারোগ ধরিতে পারা যায়, এ প্রবন্ধে আমি তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

যক্ষ্মা রোগের প্রধান লক্ষণ চারিটী; যথা,—

১। কাসি,

২। শরীর কৃশ হওয়া,

৩। রক্ত ওঠা,

৪র্থ। জ্বর।

কাসি।—প্রথমাবস্থায় কাসি অতি সামান্য থাকে। কখনও বা প্রাতে কখনও বা রাত্রে একটু কষ্ট দেয় মাত্র। দিনে কাসি

প্রায়ই থাকে না। কফ প্রায়ই নির্গত হয় না, যদি হয়—তবে চট্‌চটে ও হরিদ্রাভ। কিন্তু যেদিন আবহাওয়া ঠাণ্ডা থাকে, সেদিন কাসি কিছু ঘন ঘন হইয়া থাকে। অণুবীক্ষণে পরীক্ষা করিলে, কফে বিশেষ কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না।

শরীর কৃশ হওয়া।— অনেক রোগেই শরীর কৃশ হইয়া থাকে, অজীর্ণে প্রায়ই শরীর কৃশ হয়। কিন্তু যক্ষ্মারোগে শরীর উত্তরোত্তর কৃশ হইয়া পড়ে। অন্যরোগে এমন দৈনন্দিন কৃশতা পরিলক্ষিত হয় না।

রক্ত ওঠা।—আদি অবস্থায় প্রায়ই রক্ত ওঠেনা। রোগ যখন বদ্ধমূল হইয়াছে—ফুস্‌ফুস্ গলিতে আরম্ভ হইয়াছে—সেই সময় ইহা দেখা দেয়। তবে কাহারো কাহারো প্রথমেই রক্ত উঠিতে থাকে। যে রক্ত বাহির হয়, তাহার পরিমাণ অল্প। ফুস্‌ফুস্ পরীক্ষা করিলে কেবল Moiscrales, পাওয়া যায়—রক্ত নির্গমনের স্থান ঠিক করিতে পারা যায় না। এই রক্ত—সূক্ষ্মশিরা হইতে বাহির হইয়া থাকে। সুতরাং অধিক বা মারাত্মক হইবার আশঙ্কা নাই।

জ্বর।—প্রায়ই থাকে। কখনও নাও থাকে। পূর্ব্বোক্ত তিনটি লক্ষণের সহিত যদি এই জ্বর বর্ত্তমান থাকে, তবে রোগকে যক্ষ্মা বলিয়া অনায়াসেই ধরিতে পারা যায়। প্রথমে এই জ্বর সামান্য ভাবেই দেখা দেয়। বৈকালে একটু হয়, রাত্রে ছাড়িয়া যায়। সকালে কিছুই থাকে না। এরূপ জ্বরকে বিশ্বাস করা উচিত নহে, তখনি সন্দেহ করা উচিত।

এইরূপে ধীরে ধীরে—এই মহারোগের সূত্রপাত হয়। তাহার পর ব্যাধি যেমন প্রবল হইতে থাকে, লক্ষণগুলিও তত স্পষ্টতর হইতে থাকে। এই জন্য চিকিৎসকগণ—এই রোগকে তিনস্তরে বিভক্ত করিয়াছেন।

প্রথম স্তর—টিউবার্‌কুল অধিষ্ঠান।
দ্বিতীয় স্তর—Consolidation.
তৃতীয় স্তর—ফুসফুসাংশ কোমল ও গলিত হওন।

প্রথম স্তর।—টিউবার্ক্ল ফুস্‌ফুসের একাংশ আক্রমণ করে। ইহা ভিতরের ব্যাপার। বাহিরের লক্ষণ—বক্ষঃস্থলের সম্মুখ ভাগ কিছু চেপ্টা বলিয়া বোধ হইবে। অঙ্গুলী দ্বারা আঘাত করিলে শব্দ অপেক্ষাকৃত কম মনে হইবে। রোগীর নিশ্বাস মৃদু এবং প্রশ্বাস অধিকক্ষণ স্থায়ী (Prolonged) হইবে।

দ্বিতীয় স্তরে।—ফুসফুসের আক্রান্ত স্থান ঘন হইয়া আসে—ইহা প্রায় ফুস্‌ফুসের (apex) শীর্ষদেশে ক্লাভিকেলের নীচে হইয়া থাকে। বাহির হইলে দেখা যায়—নিশ্বাস লইবার সময় রোগীর বক্ষঃস্থল সমান ভাবে স্ফীত হইতেছে না, একদিক চেপ্টা হইতেছে। রোগী স্থানীয় বেদনা অনুভব করিতেছে। অঙ্গুলী দ্বারা আঘাত করিলে dulness অর্থাৎ স্পষ্ট কম আওয়াজ পাওয়া যায়। যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিলে নিশ্বাসের শব্দ রুক্ষণ ও ফুৎকারবৎ (belowing) বোধ হয়, এবং রোগী শব্দ করিলে তাহা সুস্পষ্ট অনুভূত হয়। ২।১টী র‍্যাল্‌স্ পাওয়া যায়, কখনওবা ফুস্‌ফুস্ বেষ্টক অর্থাৎ প্লুরায় ঘর্ষণ অনুভূতি হয়।

তৃতীয় স্তরে।—ফুস্‌ফুস্ নরম ও গলিত হয়, তাহাতে কোটর (cavity) উৎপন্ন হয়। ইহা তরল হইয়া কাসির সঙ্গে নির্গত হইয়া থাকে। এই অবস্থার প্রধান লক্ষণ (ক) নিশ্বাস ফেলিবার সময় কট্‌কট্ শব্দ (cruck sing sound) পাওয়া যায়। চট্ চটে শ্লেষ্মার মধ্য দিয়া বায়ুর গতি হয় বলিয়াই

ঐরূপ শব্দ উত্থিত হইয়া থাকে। (খ) মন্নেষ্ট র‍্যাল। (গ) কষ্টদায়ক কাসি। (ঘ) উত্তরোত্তর শরীর শীর্ণ হয়। (ঙ) উদরাময় দেখা দেয়। (চ) অঙ্গুলীর দ্বারা বক্ষে আঘাত করিলে crucked pol চিনা মাটীর পেয়ালার মত শব্দ হইতে থাকে।

প্রথম স্তরে।—শ্লেষ্মার সহিত টিউবার কুল্ বেসিলাস্ (ক্ষয় বীজাণু) প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, কদাচিৎ পাওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয় স্তরে সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে।

ব্রঙ্কোনিমোনিয়ার সহিত যক্ষ্মারোগের ভুল হইতে পারে। কেবল প্রভেদ এই—ব্রঙ্কো নিমোনিয়া প্রায় ফুস্ফুসের এপেক্সে হয় না। কিন্তু যদি gumma হয়, তবে ধরা বড় শক্ত। গামা হইলে—নিশ্বাস-প্রশ্বাসের বিকৃত শব্দ থাকে না। অধিকন্তু বেদনা থাকে না, র‍্যালস্ থাকে না, কাসি থাকে না, জ্বরও থাকে না। রোগী কৃশ হইয়াও পড়ে না। কিন্তু তথাপি গামা নির্ণয় করা বড় কঠিন।

চিকিৎসা।

পরিপাক শক্তির দিকে দৃষ্টি রাখিবে।

যক্ষ্মারোগের চিকিৎসা দীর্ঘকাল ধরিয়া করিতে হয়। এই দীর্ঘকাল শব্দে—অন্ততঃ ২।৩ বৎসর বুঝিতে হইবে। রোগীর অবস্থা যখন প্রথম স্তরে থাকে, তখন হইতে সাবধানে থাকিয়া চিকিৎসিত হইলে রোগ নিশ্চয়ই ভাল হয়। দ্বিতীয় স্তরের অবস্থাতেও—যত্ন লইতে পারিলে রোগী ভাল হইতে পারে। কিন্তু রোগ তৃতীয়স্তরে পৌঁছিলে আর আরোগ্যের আশা থাকে না।

রোগীকে অত্যধিক শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম হইতে নিবৃত্ত হইতে হইবে। মন হইতে দুশ্চিন্তা ও বিষণ্নতা দূর করিতে হইবে। বাটীর বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু সেবন ও অঙ্গ চালনা একান্ত প্রয়োজন। আহার—সহজ পাচ্য, যেন গুরুতর না হয়। শরীর আবৃত থাকিবে, তবে ফ্লানেল ব্যবহার করা এদেশে সহ্য হয় না, ইহার দ্বারা বহুস্থলে কুফল ফলিতে দেখা যায়।

চিকিৎসককে সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিতে হইবে—রোগীর পরিপাক শক্তি যেন অব্যাহত থাকে। নতুবা ঔষধ প্রয়োগ বৃথা। কেননা, কড্ লিভার অয়েল বা মল্ট্ এক্সট্রাক্ট প্রভৃতি পুষ্টিকর ঔষধ—পরিপাক শক্তি না থাকিলে, দেওয়া চলে না।

জ্বর।

যক্ষ্মায় জ্বর থাকেই। এই জ্বর দুইটী কারণে হইয়া থাকে। (ক) ব্যাধি ক্রমে ক্রমে ফুস্ফুসের অধিক স্থান আক্রমণ করে। (খ) ফুস্ফুসের আক্রান্ত ভাগ নরম ও গলিত হওয়ায় তাহা রক্তের সহিত সঞ্চরণ করে।

যখন রোগের প্রবল (Acute) অবস্থা—তখন জ্বর অবিচ্ছেদে অর্থাৎ রেমিটেণ্ট ভাবে থাকে, প্রাতঃকালে জ্বরবেগ কিছু কম, অপরাহ্নে পুনর্বৃদ্ধি। রোগের প্রকোপ অল্প হইলে জ্বরও সবিচ্ছেদ হইয়া থাকে; সকালে ছাড়ে, অপরাহ্নে কিছু বাড়ে। এই উভয় অবস্থার চিকিৎসাও স্বতন্ত্র।

ঘর্ম্ম।

রাত্রে ঘর্ম্ম—এ রোগের একটী উল্লেখ যোগ্য উপসর্গ। ইহাতে রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। রাত্রে শয়নকালে রোগীকে কিছু খাইতে দিলে, ঘাম কম হয়, রোগীও তত দুর্ব্বল হয় না। অন্য কিছু না খাওয়াইয়া একটু মুরুয়া খাওয়ান সব চেয়ে ভাল। ইহাতে

প্রবৃত্তি না হইলে—টাট্‌কা দুগ্ধ পান করা উচিত।

রক্ত উঠা।

যক্ষ্মারোগে সকল রোগীর রক্ত ওঠেনা, তবে অনেকেরই ওঠে। এইটী বড় আশঙ্কাজনক উপসর্গ। ইহাতে রোগীর আত্মীয়-স্বজন যেমন উদ্বিগ্ন হ'ন, রোগীও তেমনি ভীত হইয়া পড়ে। আত্মীয়গণ চিকিৎসককে—রক্ত বন্ধ করিবার জন্য ব্যগ্র ভাবে অনুরোধ করেন। চিকিৎসকও উহা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাড়াতাড়ি রক্ত বন্ধ করা ভাল নহে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ইহা ভূয়ো ভূয়ো করিয়া নিষেধ করা হইয়াছে। ডাক্তারী-বিজ্ঞানেও বলে—প্রথমেই রক্ত বন্ধ করিবার জন্য ব্যস্ত হওয়ার আবশ্যক নাই। যদি রোগের প্রারম্ভেই রক্ত উঠিতে থাকে, তাহা বন্ধ করা যুক্তিযুক্ত নহে। বরং কতকটা রক্ত উঠিয়া গেলে, রক্তাধিক্য বশতঃ স্থানীয় যে congestion ও tension হয়,—তাহা দূর হয় এবং অপকারের পরিবর্ত্তে রোগীর যথেষ্ট উপকার হইয়া থাকে। ইহা স্বাভাবিক (natural) ক্রিয়া মাত্র। আমরা ব্লিষ্টার বসাইয়া, কবিরাজ মহাশয়েরা জোঁক লাগাইয়া—যে কাজ করি ও করেন, রক্ত ওঠার জন্য সে কাজ আপনাআপনিই হইয়া যায়। অনেক স্থলেই দেখিয়াছি—রক্ত ওঠার পর কিছুদিন রোগ আর বাড়ে না। কিন্তু যদি রক্ত ওঠার পরিমাণ বড় বেশী হয়,—সে রক্ত সত্বর বন্ধ করিতে হইবে। নতুবা রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, হয়ত বা তাহার হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। রোগের প্রবল অবস্থায় রক্ত উঠিলে—তাহা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। এরূপ অবস্থা হইলে বুঝিতে হইবে—রোগীর ফুস্‌ফুসে কোটর (cavity) হইয়াছে এবং বৃহৎ artery গুলি হইতে রক্ত নির্গত হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

ডাঃ শ্রীনগেন্দ্র কুমার দে (ক্যাম্বেল হস্‌পিট্যালের ভূতপূর্ব্ব হাউস্‌ সার্জ্জন।)

শিশুর খাদ্য-বিচার।

——:*:——

প্রথম পক্ষের পত্নীর মৃত্যুর পর দুইটী অপোগণ্ড শিশুকে পালন করিবার জন্য আমাকে শিশুর খাদ্যের বিচার করিতে হইয়াছিল। সেই সময় যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছিলাম, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারই উল্লেখ করিব। যাঁহারা আমার মত অবস্থায় পড়িয়া—শিশু পালনে বিব্রত, এ প্রবন্ধে হয় ত তাঁহাদের কিছু উপকার হইতে পারে।

"শিশু" বলিতে, জন্মাবধি ৬মাস বয়সের—ছেলেই আমি বুঝি। এ হেন শিশুর শারীরিক উত্তাপ রক্ষা করিতে হইলে কিরূপে খাদ্যাদি প্রস্তুত করিতে হইবে—এ রহস্য সকলেরই

জানা উচিত। কবিরাজ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় "আমাদের দেশের খাদ্য ও পথ্য" সম্বন্ধে— একটী উপাদেয় প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়া ছেন। আমার ভরসা হয় না, তিনি এ প্রবন্ধটী শেষ করিতে পারিবেন। অনেক কাগজেই তাঁহাকে জ্ঞাতব্য তথ্য পূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতে দেখিয়াছি, কিন্তু কোনটাই শেষ করিতে দেখি নাই। এ কথার একমাত্র প্রমাণ— এই 'আয়ুর্ব্বেদে' প্রকাশিত "জর" নামক প্রবন্ধ। এমন অত্যুৎকৃষ্ট প্রবন্ধটী—অসীম শক্তিধর ভাই আমার শেষ করিতে পারিলেন না। ইহা "আয়ুর্ব্বেদের" পাঠক বর্গের দুর্ভাগ্য। "আয়ুর্ব্বেদে' এমন সুন্দর প্রবন্ধ এ পর্য্যন্ত একটাও বাহির হয় নাই, বোধ হয় হইবেও না। "আমাদের দেশের খাদ্য" প্রবন্ধও শেষ হইবে না। এ বিষয়ে আমি ভবিষ্যৎ বাণী করিতে পারি।

যাহাহউক, "আমাদের দেশে খাদ্য ও পথ্য" প্রবন্ধে প্রথমেই শিশু খাদ্যের বিচার করা উচিত ছিল। ব্রজবল্লভ তাহা করেন নাই। সেই জন্যই প্রবন্ধটী "অঙ্গহীন" হইয়া পড়িয়াছে। শিশুর—শিশু অবস্থাতে দৈহিক উত্তাপ রক্ষা করা—অত্যন্ত আবশ্যক। কিন্তু কাজটা বড় শক্ত। আমি সেই কথাটাই বুঝাইব।

Caloric value ইংরাজী কথায় বাঙ্গালা প্রতিশব্দ—"তাপ বৰ্দ্ধ বা শক্তি।" এক Kilogrumme (=২ পাউণ্ড ¼ উন্স প্রায় এক সের) জলের ১ ডিগ্রী (সেন্টিগ্রেড) উত্তাপ বৃদ্ধি করিতে যে উষ্ণতার আবশ্যক হয়, তাহাকেই ১ caloric বা ১ভাগ তাপবৰ্দ্ধক শক্তি বলে। ১গ্রাম চর্ব্বি হইতে ৯·৩ ভাগ তাপ বৰ্দ্ধক শক্তি পাওয়া যায়। 1 grammo =154 gruirs, ১ গ্রাম carboly drate (তেজবৰ্দ্ধক শ্বেতসার) ও ১ গ্রাম Proteid (মাংস বৰ্দ্ধক) উভয় হইতেই ৪·১ তাপ বৰ্দ্ধক শক্তি পাওয়া যায়। যে জননী স্বাস্থ্যবতী, তাঁহার ১০০ গ্রাম স্তন দুগ্ধ হইতে ৬১ ভাগ; এবং ভগ্নস্বাস্থ্য মাতার দুগ্ধ হইতে ৩৬ ভাগ তাপবৰ্দ্ধক শক্তি পাওয়া গিয়া থাকে। আবার স্থূলাঙ্গী বিলাসিনীর স্তন দুগ্ধে ১০০ গ্রামে ৩০ ভাগ তাপবৰ্দ্ধক শক্তি পাওয়া যায়। ইহাই সাধারণ হিসাব। এক্ষণে মানবী, ছাগী, গাভী ও গৰ্দ্দভীর দুগ্ধ তুলনা করিয়া দেখা যাউক।

	বাজার দুগ্ধ	১০০ গ্রামে তাপবৰ্দ্ধক শক্তির অনুপাত	প্রটেড অংশ	শর্করা অংশ	বসার অংশ
মানবী	সুস্থা মাতার	৬১ —	১ —	৭ —	— ৪
	দুর্ব্বল মাতার	৩৬ —	২·৫ —	৪ —	— ২
	বিলাসিনীর	৯০ —	৩·৫ —	৭·৫ —	— ৫
	গাভীর—	৬৮ —	৩·৩ —	৪·৫ —	— ৩·৮৮
	ছাগীর—	৮০ —	৪ —	৫ —	— ৪·৮
	গৰ্দ্দভীর—	৫০ —	২ —	৬ —	— ১·৬

উল্লিখিত তালিকাটী দেখিলেই পাঠক মহাশয় বুঝিতে পারিবেন; গর্দ্দভীর দুগ্ধে বসার ভাগ অত্যন্ত কম, সুতরাং ঐ দুগ্ধ শিশুর খাদ্যের সম্পূর্ণ উপযোগী। কিন্তু যদি ঐ দুগ্ধের ১০০ গ্রামে ২ চা চামচ পূর্ণ মাখন সংযোগ করা যায়, তবে উহার তাপবর্দ্ধক শক্তি ৫৯ ভাগে দাঁড়ায়। তখন ঐ দুগ্ধ—সুস্থা জননীর স্তন্য দুগ্ধের সমান হইয়া থকে।

মাতৃহীন শিশুকে ফিডিং বোতলের সাহায্যে পালন করিয়া দেখিয়াছি ১০০ cubic centimetre (৩½ আউন্স খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে) ৪০ ভাগ তাপবর্দ্ধক শক্তি না থাকিলে চলে না। এই হিসাবে মাসে মাসে কি পরিমাণ খাদ্যাংশ দেওয়া কর্ত্তব্য তাহারও একটা তালিকা দিতেছি—

কোন মাসে	প্রোটিড গ্রাম	বসা গ্রাম	শর্করা গ্রাম	১০০ গ্রাম করা তাপ বর্দ্ধক শক্তি	নাইট্রেজেন ও নন নাইট্রোজেন উভয়ের অনুপাত
১ম	২·৩	৪·৫	৬·৬	৫০	১:৫
২য়	৩·১	৩·৬	৮·৩	৩০	১:৩৭
৩য়	২·৮	৩·৩	৯·৯	৩৩	১:৪৭
৪র্থ	৪·২	৪·৮	১১·৮	৪৪	১:৪
৭ম	৩·০	৫·৩	৭·৭	৩৩	১:৪·৩

এই দ্বিতীয় তালিকাটী বোধ হয় সাধারণের বোধগম্য হইবে না। সেইজন্য নিম্নে একটা মোটামুটি হিসাব দিলাম ;—

কত বয়সে	কতবার খাওয়াইবে	প্রতিবারে কতখানি যাইবে (গ্র্যাম্)	(ঔন্স)	২৪ ঘণ্টায় খাদ্যে কতভাগ তাপবর্দ্ধক শক্তি
১ম সপ্তাহ	১০	৩০	১	১৮০
১ মাস	৯	৪৫	১½	২৪০
২য় "	৮	৮৫	৩	৪০০
৪র্থ "	৭	১২০	৪	৫০০
৬ষ্ঠ "	৬	১৭০	৬	৬০০

আমি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি গোদুগ্ধের চেয়ে স্তনদুগ্ধে শিশু অধিক পোষণ হইয়া থাকে। প্রোটিডের ক

ধরা যাক্। গাভী দুগ্ধে প্রতিপালিত শিশু শরীরের মধ্যে বেশী নাইট্রোজেন গ্রহণ করিতে পারে না। পারে না—অতিরিক্ত প্রোটিড্ ভোজনের জন্য। অতিরিক্ত মাত্রায় প্রোটিড্ ভোজনে উদরাময়, পেট্ কামড়ানি, এবং অন্ত্রে বায়ুর প্রকোপ উপস্থিত হইয়া থাকে। মাতৃ দুগ্ধ পানের দেড় ঘণ্টা পরে যে শিশুর পাকস্থলী শূন্য দেখা গিয়াছে, সেই শিশুরই পাকস্থলীতে ২।০ ঘণ্টা পরেও গোদুগ্ধ পাওয়া গিয়াছে। মাতৃস্তন্যপায়ী বালকের মলে রিএক্সন (acid) অম্ল এবং গোদুগ্ধ পালিত বালকের বিষ্ঠায় রিআকসান ক্ষার (alkaline) থাকিবার কথা। কিন্তু গোদুগ্ধ পালিত বহু শিশুর বিষ্ঠা পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে—তাহা ক্ষার না হইয়া অম্ল হইয়াছে। অর্থাৎ সে সকল শিশুর উদরে—গোদুগ্ধ সম্পূর্ণ পরিপাক হয় নাই।

এইবার সর্কিয়া ষ্টার্চ্চের কথা ধরি। শতকরা ৭ ভাগের বেশী ষ্টার্চ্চ শিশুখাদ্যে থাকা ভাল নহে। থাকিলে বালক মোটা হইয়া পড়ে এবং অচিরেই rickes গ্রস্ত হয়। তাহার উদরাময়ও দেখা দেয়—মল অম্লযুক্ত, বর্ণ হরিৎ। fat এর অংশ বেশী হইলে উদরাময় অবশ্যম্ভাবী। এইরূপ উদরাময়ের শিশুর মল কখনও কখনও সাবান গোলার মত, কখনও চর্ব্বী মিশ্রিতের ন্যায় হইয়া থাকে।

অনেক শিশুই সচরাচর গোদুগ্ধ পান করিয়া থাকে—বিশেষতঃ যে সকল শিশু উপযুক্ত মাত্রায় মাতৃস্তন্য পায় না। অনেকে বলেন—এইরূপ শিশুকে গোদুগ্ধ ৫০০ হইতে ৭০০ গ্রাম পর্য্যন্ত দেওয়া চলে। কিন্তু তাহাতে সম্যক তাপ রক্ষা হয় বটে, তথাপি তাহাতে এত বেশী প্রোটিড্ এবং এত কম দুগ্ধ শর্করা আছে যে, শিশুর পক্ষে তাহা ঠিক্ উপযোগী নহে।

এইজন্য অনেকে গোদুগ্ধকে কৃত্রিম উপায়ে স্তন দুগ্ধের মত করিবার উপদেশ দেন। কেন না, তাহা হইলে গোদুগ্ধ মাতৃস্তন্যের মত লঘুপাচ্য হইতে পারে। ইহা দুই উপায়ে হইতে পারে, (ক) গোদুগ্ধের নবনী উঠাইয়া লইয়া, এবং casein ফিলটার করিয়া তাহাতে দুগ্ধ শর্করা মিশান। (খ) নবনী ৫ ঔন্স, চূণের জল ১ ঔন্স, জল ১৪ ঔন্স, দুগ্ধশর্করা ১ ঔন্স। একত্রে মিশান। ইহাতে কৃত্রিম স্তনদুগ্ধ প্রস্তুত হয়।

সদ্যজাত, পীড়িত, দুর্ব্বল, এবং উদরাময় গ্রস্ত শিশুকে whey হোয়ে বা ছানার জল খাওয়ান খুব ভাল। হোয়ে খাওয়াইলে বার্লি খাওয়াইবার প্রয়োজন হয় না। আমি নিজের শিশুকে খাওয়াইবার জন্য—১ পাঁইট wheyতে ২—৪ গ্রেণ বাই কর্ব্বনেট অফ্ সোডা এবং ৩ ড্রাম দুগ্ধ শর্করা মিশাইয়া দেখিয়াছি—ইহাতে ঐ খাদ্যের ৪০ ভাগ তাপবর্দ্ধক শক্তি জন্মিয়াছে।

জলমিশ্রিত দুগ্ধ। ১ ভাগ দুগ্ধে ১ ভাগ জল মিশাইলে তাহার তাপরক্ষণ শক্তি ৩৪ ভাগে দাঁড়ায়।

শিশুর পরিপাক শক্তি স্বভাবতঃই কম। এইজন্য উদরাময়গ্রস্ত বা দুর্ব্বল শিশুকে খাওয়াইবার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা—Predigested milk ব্যবস্থা করেন। আমি এইরূপ দুগ্ধের নাম দিয়াছি—কৃতজীর্ণ দুগ্ধ। নিম্নলিখিত নিয়মে এই কৃতজীর্ণ দুগ্ধ প্রস্তুত হয়—

(১) দুগ্ধ—২ ঔন্স, জল ২ ঔন্স, নবনীত ½ ঔন্স, ফেরার চাইল্ডের মিল্ক পাউডার—১ চামচ। একত্র মিশাইয়া এই মিশ্রিত পদার্থ ১১৪ ফাঃ পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া, ৫।৬ মিনিট

রাখিয়া, শিশুকে খাওয়াইতে হয়। ইহার তাপ রক্ষণ শক্তি ৭৭ ভাগ।

(২) দুগ্ধ ১ পাঁইট, লইকর প্যান ক্রিয়েটিস ১ ড্রাম, সোডি বাই কার্ব ২০ গ্রেণ। প্রথমে দুগ্ধকে ৪ চামচ চূণের জল মিশাইয়া ১৬০ ফাঃ পর্য্যন্ত উত্তাপ দাও, পরে প্যান ক্রিয়াটিস্ সোডা তাহাতে মিশাইয়া সাধারণ উত্তাপে ৩ ঘণ্টা রাখ। এইরূপে এই দুগ্ধ—শিশু খাদ্যের উপযোগী হইবে। কিন্তু যখনই খাওয়াইবে, গরম করিয়া লইবে।

(৩) ২ ঔন্স টাট্‌কা কাঁচা দুগ্ধ একটী শিশির মধ্যে পূরিয়া, তাহাতে ফেরার চাইল্ডের মিল্ক পাউডার ১ ড্রাম দিয়া, শিশিটী ২০ মিনিট গরম জলে রাখ। পরে এই দুগ্ধ শিশুকে খাওয়াও। খাওয়াইবার পূর্ব্বে নিজে চাখিয়া দেখিবে, তিক্তাস্বাদ হইয়াছে কি না? যদি তিক্ত হইয়া থাকে, তবে তৎক্ষণাৎ ঐ শিশিটী বরফ জলপূর্ণ পাত্রে ডুবাইবে। ইহাতে তিক্ততা দূর হয়। Fair child's Peptonising powder এ প্যান্‌ক্রিয়েসন, সোডি বাই কার্ব, এবং মিল্ক সুগার আছে।

বিলাতে এবং এদেশে আজকাল কন্‌ডেন্স মিল্ক বা জমান দুগ্ধ শিশুখাদ্য রূপে ব্যবহার হইতেছে। এদেশের শিশুর পক্ষে জমান দুগ্ধ উপযোগী নহে। কারণ জমান দুগ্ধে—নবনীর ভাগ কম, এবং শর্করার ভাগ বড় বেশী। জমান দুগ্ধ খাইলে কোন কোন শিশু হৃষ্টপুষ্ট হয় বটে, কিন্তু সে পুষ্টতা অন্তঃসার শূন্য। বিলাতে জমাট দুগ্ধসেবী শিশুরা পূর্ব্বেই rickets গ্রস্ত হয়, আমাদের দেশের শিশুরা পেট রোগা হয়। বিশেষতঃ জমানদুগ্ধ বিক্রয়কারীরা ১ ভাগ দুগ্ধে ৭ ভাগ জল মিশাইতে বলেন—ইহা সমীচীন বোধ হয় না। অন্ততঃ ২৪ ভাগ জল মিশাইলে এবং তাহাতে কিঞ্চিৎ নবনীত সংযোগ করিতে পারিলে—উপরে উত্তাপ রক্ষণ শক্তি ৫৩ ভাগে দাড়ায়।

দাঁত উঠিবার পূর্ব্বে শিশুকে শ্বেতসারময় খাদ্য দেওয়া উচিত নহে। তবে যদি নিতান্তই দিতে হয়, তাহা হইলে কোন ঔষধ পদার্থ দ্বারা ঐ শ্বেতসারকে সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ করিয়া দিতে হইবে।

কতকগুলি দুগ্ধবহুল শিশুখাদ্য।—

অ্যানেনকরিজ ফুড্। নং ১। ৪ মাসের শিশুকে খাওয়ান চলে। তাহার অধিক বয়স হইলে এই খাদ্যের ২নং ব্যবহার্য্য। এই ফুড প্রস্তুতকারীদের মতে—এই খাদ্যে ৬৮ ভাগ তাপবর্দ্ধক শক্তি আছে, কিন্তু যদি এই ফুড পূর্ণ ১ টেবিল চামচ না লইয়া, ½ চামচ লইয়া ৩ ঔন্স জল ও ২ চামচ নবনী মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে ইহাতে ৬০ ভাগ তাপরক্ষণ শক্তি জন্মে এবং ইহা মাতৃস্তন্যের অনেকটা সমকক্ষ হইতে পারে। ২ নং এই খাদ্যের তাপরক্ষণ শক্তি—৮৬ ভাগ।

হর্লিকস্ মলটেড্ মিল্ক। তাপরক্ষণ শক্তি ৪২ ভাগ। যদি ইহাতে ১ টেবিল চামচে নবনী মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে তাপরক্ষণ শক্তি ৬০ ভাগ জন্মে।

মেলিন্স ফুড। ৩ মাসের কম বয়সের শিশুর খাদ্যে ৪৫ ভাগ এবং তদূর্দ্ধ বয়সের খাদ্যে ৭০ ভাগ তাপরক্ষণ শক্তি আছে।

বেঞ্জার্স ফুড। তাপরক্ষণ শক্তি ৫৬ ভাগ। ½ কাঁচা নবনী মিশাইলে তাপরক্ষণ শক্তি ৬৫ ভাগ হয়।

শিশুদের বড় বড় বিলাতী খাদ্যের কথা লিখিলাম। দুঃখের বিষয়—আমাদের দেশের একটা খাদ্যেরও নাম করিতে পারিলাম না। এদেশে ত বড় বড় বৈজ্ঞানিক আছেন, ডাক্তার

আছেন, কবিরাজ আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কি একটা শিশুখাদ্য আবিষ্কার করিতে পারেন না? বিলাতী খাদ্য যে সকল সময় আমাদের শিশুদের উপযোগী হয় না, — একথা সর্ব্ববাদী সম্মত। অথচ এমন সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা দেশে শিশুর জন্য একটা খাদ্য প্রস্তুত হইল না। ইহার মত লজ্জাকর ব্যাপার আর আছে কি?

শ্রীসতীশ চন্দ্র রায় এম্ এ,

মানব জন্মের কথা।

——:*:——

অনন্তর গর্ভের জীবনোপায়ের নিয়ম কথিত হইয়াছে।

গর্ভিণী স্ত্রীর বাহিনী নাড়ী, গর্ভস্থ সন্তানের নাভি নাড়ীর সহিত সংঘর্ষ থাকে বলিয়া নিয়ত গর্ভিণীর আহারাদির দ্বারা গর্ভস্থ সন্তান বর্দ্ধিত হয়। মাতার নিশ্বাস, উচ্ছ্বাস, সঞ্চালন ও নিদ্রা প্রভৃতি অনুসারে গর্ভস্থ সন্তান নিঃশ্বাস উচ্ছ্বাস, সঞ্চালন ও নিদ্রা প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ গর্ভিণীর নিশ্বাসাদি যখন যে ক্রিয়া করে, সন্তানও গর্ভে থাকিয়া তৎতৎকালে সেই সেই ক্রিয়া প্রাপ্ত হয়।

গর্ভস্থ সন্তানের নাভিমণ্ডল তেজের আবাস ভূমি, তদ্বারা বায়ুচালিত হয়, এই নিমিত্ত গর্ভস্থ শিশুর দেহ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, এবং উক্ত বায়ু—উষ্মার সহযোগে শরীরের উর্দ্ধ তির্য্যক ও অধোভাগে এবং স্রোতাদির যে যে স্থানে প্রসারিত হয়—গর্ভস্থ সন্তানের সেই সেই স্থান বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

উক্ত প্রকারের নাভি হইতে দৈহিক আবর্তীয় স্রোত (Avarta and artary) সমূহ প্রস্তুত আরম্ভ হওয়া প্রযুক্ত নাভি হইতেই মানব দেহে রক্তসঞ্চালন কার্য্য যাবজ্জীবন চলিয়া থাকে। এই নিমিত্তই নাভিকে দেহস্থ যাবতীয় শিরা ও ধমনীর মূল স্থান বলা হইয়াছে।

মানবগণের দৃষ্টি (নেত্রমণি) ও রোমকূপ কখনই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। উহারা নিশ্চিত একভাবেই থাকে—ইহাই ভগবান ধন্বন্তরির অভিমত।

মনুষ্যের শরীর ক্ষীণতর হইলেও নখ ও চুল এতদুভয় বস্তু প্রাকৃতিক স্বভাব প্রযুক্ত সর্ব্বদা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। মন ও দেহ চেতনার আশ্রয়। কেশ, রোম, নখাগ্র অন্তরস্থ মল ও দ্রব্যগুণ ইহারা অচেতন।*

গর্ভস্থ সন্তানের পুরীষ ও মূত্র উৎসর্গ না হওয়ার কারণ এই যে, বায়ুর অল্পতা এবং পাকাশয়গত বস্তুর অত্যল্পযোগ হেতু উহা হইতে পারে না। অতঃপর গর্ভস্থ সন্তানের মুখ জরায়ু কর্ত্তৃক আবৃত এবং কণ্ঠদেশ কফ পূর্ণ থাকে—এজন্য বায়ুর পথ প্রতিরোধ হেতু গর্ভস্থ শিশু রোদনাদি করিতে পারে না।

---

* আধুনিক পাশ্চাত্য মতাবলম্বী বৈজ্ঞানিক ডাক্তার বসু যে সমুদয় পদার্থেরই জীবন থাকা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা মৃতদেহেরও জীবন থাকার ন্যায় স্বতন্ত্র ভাবাপন্ন। —লেখক।

গর্ভধারণের দিবস হইতে গর্ভিণী হৃষ্টচিত্ত, শোভন অলঙ্কার সমূহে ভূষিতা ও সদাচারী হইয়া শুক্লবস্ত্র পরিধান করতঃ গুরু এবং ব্রাহ্মণগণের পূজানিরত থাকিবেন এবং প্রত্যহ সুমধুর রসযুক্ত স্নিগ্ধ, হৃদয়গ্রাহী, তরল, লঘু, ও অগ্নিদীপ্তিকারক আহার্য্যসামগ্রী ভোজন তৎপর হইবেন। তৎকালে ব্যায়াম, উপবাস মৈথুন, অতিশয় সন্তর্পণ ক্রিয়া, রাত্রি জাগরণ শোক, অশ্বাদিযানারোহণ, রক্তমোক্ষণ, মল ও মূত্রাদির বেগধারণ এবং বিপর্য্যস্ত ভাবে অবস্থান এই সমুদয় গর্ভিণী স্ত্রীগণ পরিত্যাগ করিবেন। কারণ দোষ কিম্বা অভিঘাতজনিত যে যে অংশ গর্ভিণীর শরীরে পীড়িত হয়, গর্ভস্থ শিশুরও সেই সেই অংশ পীড়িত হইয়া থাকে।

মলিনবেশবিশিষ্টা,—বিকটাকৃতিযুক্তা কিম্বা অঙ্গহীনা, এবম্ভূতা কোন স্ত্রীকে গর্ভবতী নারী কদাচ স্পর্শ করিবেন না। এবং দুর্গন্ধ গ্রহণ কিম্বা অপ্রিয় ভোজন প্রভৃতি সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবেন। কলহ বা পরনিন্দাদি ও গৃহের বহির্দ্দেশে গমনাগমন বা জনশূন্য গৃহাদিতে গমন এবং ক্রোধ প্রভৃতি কার্য্য গর্ভিণীগণ মনোযোগ সহকারে পরিত্যাগ করিবেন। গর্ভিণী স্ত্রী উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিবেন না,—কেননা তদ্বারা গর্ভ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা এবং অত্যন্ত তৈল মর্দ্দন বা অধিক উদ্বর্ত্তন অর্থাৎ গাত্রমার্জ্জন বা ঘর্ষণ কদাচ করিবেন না। কঠিন শয্যাতে কিম্বা অত্যন্ত উচ্চ স্থানে শয়ন বা অবস্থান করিবেন না; গর্ভিণী অতি যত্ন সহকারে উক্ত নিয়ম সকল প্রতিপালন করিবেন। তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই নিরোগ দীর্ঘায়ু, বুদ্ধিমান, বলিষ্ট, সুন্দর এবং মেধাবী সুসন্তান লাভ করিতে পারিবেন।

সূতিকা গৃহ কিরূপ করা উচিত ?

—দৈর্ঘে আট হাত প্রস্থে চারিহাত এবং পূর্ব্বদ্বার বা উত্তর দ্বার বিশিষ্ট করিয়া সূতিকা গৃহ নির্ম্মাণ করিবে। এতদ্দেশে নিতান্ত সেঁতসেঁতে স্থানে অতি ক্ষুদ্রায়তন একটিমাত্র ক্ষুদ্রতম দ্বার বিশিষ্ট যে সূতিকা গৃহনির্ম্মাণের প্রথা দৃষ্ট হয়, তাহা অতীব অনিষ্টকর। কারণ তদ্রূপ ক্ষুদ্র গৃহে বায়ু সঞ্চালিত হইতে না পারায় মেঝেটি সমধিক আর্দ্র অবস্থা যুক্ত হয় বলিয়া প্রসূতি ও নবজাত শিশুর অনেক প্রকার রোগ সৃষ্টি হইতে পারে, অনেক সময় এতাদৃশ অবস্থায় সূতিকা গৃহেই শিশুদিগের ধনুষ্টঙ্কার, ব্রঙ্কাইটিস এবং নিউমোনিয়া প্রভৃতি শ্লেষ্মাঘটিত রোগ উপস্থিত হইতে দেখা যায়।

এক্ষণে আসন্ন প্রসবা স্ত্রীর লক্ষণ বলা হইতেছে। যখন গর্ভবতীর কুক্ষিদেশ শিথিল ও হৃদয়ের বন্ধন বিমুক্ত হয় এবং নিতম্বের সম্মুখভাগে বেদনা উপস্থিত হয়, মুহুর্মুহু কটি ও পৃষ্ঠদেশে তীব্রতর বেদনা হয়, মলমূত্রের বেগ উপস্থিত হয়, তখনি তাহাকে আসন্ন প্রসবা বলিয়া বুঝিতে হইবে। ইহা বুঝিতে পারিলেই গর্ভিণীর গাত্রে তৈল মর্দ্দন করাইয়া উষ্ণ জলদ্বারা স্নান করাইতে হয়। এই সময় সুশিক্ষিতা প্রসবকারিণী অভিজ্ঞ ধাত্রী ও চারিজন পরিচারিকার আবশ্যক। ঐ চারিজন পরিচারিকার মধ্যে এক জন গর্ভিণীর প্রসব দ্বারের চারিদিকে তৈল মর্দ্দন করিয়া মিষ্টবাক্যে আশ্বাস প্রদান করিবে। এই সময় যখন ভগবানের প্রাকৃতিক বিধানানুসারে মলমূত্র বেগের ন্যায় আপনা আপনি প্রসবের বেগ উপস্থিত হইবে, তখন সেই পরিচারিকা সুমিষ্ট কথায় গর্ভিণীকে বলিবে "হে সৌভাগ্যবতী, এক্ষণে কুন্থন কর।" অনন্তর তদ্রূপ প্রাকৃতিক বেগ প্রাপ্তা গর্ভিণী যথাযথ কুন্থন করিতে থাকিবে। কিন্তু অকালিক

বেগ না আসিলে অথবা বেগ আসিয়া নিবৃত্ত হইয়া গেলে কদাচ কুন্থন করিবে না। প্রথমতঃ অল্প অল্প—তৎপরে যেমন বেগ আসে তাদৃশ অধিক বলের সহিত কুন্থন করিতে থাকিবে। সন্তান-যোনির দ্বারদেশ প্রাপ্ত হইলে যে পর্য্যন্ত জরায়ু হইতে শিশু ভূমিষ্ঠ না হইবে, তাবৎকাল স্বকীয় শক্তি অনুসারে গাঢ়তর কুন্থন করিতে থাকিবে।

ফলতঃ স্বাভাবিক বেদনার সহিত বেগ উপস্থিত না হইলে কদাচ কুন্থন করিবে না। ধাত্রী যদি ভ্রম বশতঃ গর্ভিণীকে অকালে কুন্থন করিতে অনুরোধ করে, তাহা কখনই প্রতিপালনীয় হইবে না। প্রসব বেদনা ঠিক না হইতে কুন্থন করিলে, শিশু মূক, বধির, কুব্জ, শ্বাশ, কাশ রোগযুক্ত এবং শিথিল দেহ যুক্ত হয়। তজ্জন্য কুন্থন বিষয়ে সদুপদেশ সমূহ যত্নসহকারে প্রতি পালনীয়।

অনন্তর বালকের জন্ম হইলে বালক এবং গর্ভিণীকে যথোপযুক্ত বিধানে সুস্থ করিয়া যথা বিধি স্ত্রীআচার এবং কুলাচার যাহা যাহা পূর্ব্ব কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তৎসমুদয় নিয়ম প্রতিপালন করিবে।

উক্ত প্রকার কার্য্য সকল অবগত থাকা গৃহস্থ মাত্রেরই নিতান্ত কর্ত্তব্য। অধুনা তাহা অজ্ঞাত থাকার জন্যই অনেক গর্ভিণীকে বিপন্না হইয়া ডাক্তার প্রভৃতির আশ্রয় লইতে বাধ্য হইতে হয়।

ডাঃ শ্রীনলিনীনাথ মজুমদার।

বনৌষধি।

—:*:—

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা বনৌষধির বিষয়ে আলোচনা করিব। আমাদিগের সাংসারিক ব্যয় মধ্যে ডাক্তার বৈদ্যের খরচ একটা প্রধান খরচের মধ্যে ধর্ত্তাব্য।

নিতাই আমাদিগের গৃহে রোগ বর্ত্তমান, বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই রোগ ক্লিষ্ট। একটু অসুস্থ হইলেই চিকিৎসকের আশ্রয় ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কিন্তু আমাদিগের গৃহ প্রাঙ্গনে, বাড়ীর বাগানে—নানাস্থানে যে অযত্নে রক্ষিত কত শত প্রকার রোগনাশক ঔষধি বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার গুণ গ্রহণ করিতে আমরা অবসর পাই না, চেষ্টাও করি না, আমাদিগের প্রবৃত্তিও হয় না।

পরন্তু প্রকৃতি দেবী—বিনামূল্যে যে সমস্ত বনৌষধি আমাদিগের জন্য সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন—আমাদিগের অজ্ঞানতা নিবন্ধন সেই সমস্ত ঔষধি রূপান্তরিত ভাবে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় ক্রয় করিয়া গৌরব বোধ করিতেছি। উদাহরণ স্থলে দেখাইব—যে বাসক পত্র নানা স্থানে এমন কি বাড়ীর চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, যাহার স্বরস পান করিলে সামান্য কাসি হইতে দুঃসাধ্য ক্ষয়কাসিও আরোগ্য হইতে পারে—যাহা সংগ্রহ করিতে একটী পয়সা মাত্র ব্যয় নাই, যাহার টাট্‌কা রস বিশেষ ফলপ্রদ,—সেই বাসক রস ভিন্ন দেশ হইতে ভিন্ন নামে রূপান্তরিত হইয়া পর্য্যুসিত ভাবে একখানি

চক্‌চকে লেবেল আঁটা শিশিতে সুসজ্জিত হইয়া আমাদিগের হস্তগত হইতেছে! আর আমরা হাসিমুখে তাহাই গ্রহণ করিতেছি।

যাহা হউক আমরা এই বনৌষধি প্রবন্ধে ক্রমান্বয়ে বহুবিধ বনৌষধির রোগ নিবারণ শক্তি প্রকাশ করিব, পল্লীবাসী গৃহস্থ পরিবার বর্গের ইহা দ্বারা যে বিশেষ উপকার সাধিত হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ যাহার দৃষ্টান্ত দেখাইলাম তাহারই শক্তি বর্ণনা করিব।

বাসক।—সামান্য কাসি, ক্ষয়কাসি শ্বাসকাসি ও রক্তপিত্ত রোগে বাসক একটী মহৌষধি, আয়ুর্ব্বেদে বাসক সম্বন্ধে উল্লেখ আছে—

যথা—

"বাসায়াং বিদ্যমানায়াং,
আশায়াং জীবিতস্য চ
রক্ত-পিত্তী ক্ষয়ী কাসী
কিমর্থ মবসীদতি?"

বাসক বিদ্যমান থাকিতে রক্তপিত্ত, ক্ষয় কাসি রোগাক্রান্ত ব্যক্তি কেন অবসাদ প্রাপ্ত হয়?

উক্ত শ্লোকে বাসকের যেরূপ শক্তি উল্লেখ করা হইল, তাহাতে বাসক যে উক্ত ব্যাধি সমূহের একটী মহৌষধ তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বাসক পৃথক রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং পাচন, কল্প, অরিষ্ট, অবলেহ প্রভৃতি রূপেও ব্যবহার্য্য। যাহারা পুরাতন কাসি, হাঁপ কাসি ও ক্ষয়কাসিতে কষ্ট পাইয়া থাকেন, তাঁহারা প্রত্যহ প্রাতে অর্দ্ধ ছটাক বাসকের টাট্‌কা রস—রসের অর্দ্ধ পরিমাণ বিশুদ্ধ মধু ও কিঞ্চিত ইক্ষুচিনী সংমিশ্রণে সেবন করিলে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইবেন, ইহা অন্ততঃ রীতিমত একমাস পর্য্যন্ত সেবন করিতে হইবে।

বাসকের পত্র, পুষ্প, ফল, মূল ও শাখা সমস্তই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাসক পুষ্পের মধু কাসি রোগে বিশেষ উপকারী,—বাসক বনে—কোন কোন সময়—এই মধুচক্র দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ মধু চক্রের আয়তন ক্ষুদ্র, এই হেতু মধুও অল্প প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বাসক যে কেবল রক্ত পিত্ত ও ক্ষয়কাসির মহৌষধ তাহা নহে—

পিত্ত শ্লেষ্মা জ্বরে বাসক।—বাসক পত্রের অর্দ্ধ ছটাক পরিমিত স্বরস শর্করা ও মধু সংযোগে সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর উপশম হইয়া থাকে।

জীর্ণ জ্বরে বাসক।—বাসক ক্বাথে যথারীতি ঘৃত পক্ক করিয়া তাহা পান করিলে বহুকালের জীর্ণজ্বর প্রশমিত হয়।

কুষ্ঠে বাসক।—কচি বাসক পত্র গো মূত্রে পেষণ করিয়া কুষ্ঠে লেপন করিলে কুষ্ঠ রোগ নিরাময় হইয়া থাকে।

বিচর্চ্চিকায় বাসক।—বিচর্চ্চিকা রোগে বাসক পত্র বেষ্টন করিয়া বন্ধন করিলে সপ্ত দিবসের মধ্যে উহা আরোগ্য হইয়া থাকে।

সুখ প্রসবে বাসক।—বাসকমূল কটিদেশে সূত্রদ্বারা বন্ধন করিয়া দিলে এবং ঐ পত্র পেষণ করিয়া বস্তি ও যোনিতে প্রলেপ দিলে অনতিবিলম্বে সুপ্রসব হইয়া থাকে।

অর্শ-রোগে বাসক।—কফজ অর্শের বলিতে বাসক পত্র কুচি কুচি করিয়া তাহা পোটুলী বদ্ধকরতঃ কাষ্ঠ-অগ্নি-সন্তাপে উত্তপ্ত করিয়া স্বেদ প্রদান করিলে অর্শের উপশম হইয়া থাকে।

বসন্ত রোগে বাসক।—বাসকের স্বরস মধুর সংযোগে কফ প্রধান বসন্ত রোগে পান করাইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

শ্বাস রোগে বাসক।—বাসকের শাখা পত্র শুষ্ক করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রূপে কাটিয়া লইবে, এবং হরীতকী সমভাগ গ্রহণ করত কলিকাতে সাজিয়া কাষ্ঠের অগ্নিদ্বারা শুষ্ক হুঁকায় তামাকের ন্যায় টানিয়া ধূম অধঃকরণ করিলে শ্বাস কাসে বিশেষ উপকার দর্শে।

কবিরাজ শ্রীহরি প্রসন্ন রায় কবিরত্ন।

শিশু চিকিৎসা।

—:*:—

উদরাময়।

শিশুদের উদরাময় অর্থাৎ অতিসার হইলে, প্রথমেই দুগ্ধ বন্ধ করা উচিত। কেননা অতিসারে দুগ্ধ পান করিলে বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে। দুগ্ধের সহিত বিষাক্ত পদার্থ পরিচালিত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। পরিপাক প্রণালীতে দুগ্ধে রোগের বীজাণু পরিপুষ্ট হয়, বংশ বৃদ্ধিও করে।

পীড়ার প্রথমাবস্থায় পাকস্থলীতে দুগ্ধ পরিপাক হয়না। এ সময় যাহাতে পরিপাক প্রণালী পরিষ্কার হইয়া যায়, এরূপ উপায় করা উচিত।

শুধু দুগ্ধ কেন, রোগের তরুণ অবস্থায়—সমস্ত খাদ্যই বন্ধ করিয়া দিয়া কেবল সিদ্ধকরা জল কিম্বা বার্লিওয়াটার খাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপ পথ্যের উপর ২।১ দিন নির্ভর করা চাই।

অনেক স্থলে দেখা যায়—এইরূপ পথ্যের উপর শিশুর পিতামাতা বা অভিভাবকগণ বড় আস্থা স্থাপন করেন না। তাঁহারা ভাবেন—ছেলে কেবলমাত্র একটু জল বা জলবার্লি খাইয়া কেমন করিয়া বাচিবে? তাই তাঁহারা শিশুকে অন্য কোন রকম পথ্য দেওয়া চলে কিনা, বারম্বার তাহা চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করেন। পিতামাতার আগ্রহাতিশয্যে—চিকিৎসকও হয়ত শিশুকে অন্যরূপ পথ্য দিতে বাধ্য হন। ইহা কিন্তু অত্যন্ত অন্যায়। এ অবস্থায় চিকিৎসকের কর্ত্তব্য—তাহার অভিভাবককে বুঝানো, শিশুর এখন অন্য খাদ্য পরিপাক করিবার শক্তি নাই, তাহার পরিপাক প্রণালীতে অন্য পথ্য আদৌ শোষিত হইবে না। এই সময় শিশুর অভিভাবকগণকে শিশুর মল দেখাইয়া দিয়া বলা উচিত—এখন দুগ্ধাদি পান করিতে দিলে—তাহা হজম হইবে না, পীত দুগ্ধ সমস্তই অন্ত্র হইতে বাহির হইয়া যাইবে।

তরল ভেদ হইতে থাকিলে, পিপাসা অত্যন্ত প্রবল হয়। এরূপ অবস্থায় শিশুকে বারম্বার জলপান করিতে দেওয়া উচিত। তবে একেবারে অধিক মাত্রায় জল না দিয়া এক ঘণ্টা, আধঘণ্টা, কিম্বা ১৫ মিনিট অন্তর, আধ তোলা পরিমাণে জল পান করিতে দিতে হয়। জল বেশী দিলে—শিশু বমি করিতে পারে।

অনেক ডাক্তার সমস্ত দিনে এক পোয়া জলের সহিত ১ ড্রাম ব্রাণ্ডী মিশাইয়া পান করাইতে বলেন।

কোন শিশুর চব্বিশ ঘণ্টার পর, কাহারও বা ৪৮ ঘণ্টার পর, পরিপাক-প্রণালী পুনরায় পরিশোধণ শক্তি লাভ করে। অন্ত্রমণ্ডলও অনেকটা পরিষ্কার হইয়া যায়। এই সময়—একপোয়া বার্লিওয়াটারের সঙ্গে আধ আউন্স ডিমের অণ্ডলান মিশাইয়া শিশুকে খাওয়ান যাইতে পারে। দেশীয় প্রথানুসারে—চিঁড়া ধোয়া জলের সহিত অণ্ডলান মিশ্রিত করিয়া তাহাও খাওয়ান চলে. এই পথ্য দিবসে ২ ঘণ্টা অন্তর এবং রাত্রে ৪ ঘণ্টান্তর অল্প অল্প দিতে হইবে। এই ভাবের পথ্য দু'এক দিন দিয়া যখন দেখিবে—অতিসারের লক্ষণ তিরোহিত হইয়াছে বা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন অন্য পথ্য দিতে পার।

অতিসারের লক্ষণ সম্পূর্ণ তিরোহিত হইলে, প্রথমে ছানার জল, পরে প্রেপ্টোনাইজ করিয়া, তাহার পর চূণের জল মিশাইয়া গোদুগ্ধ সহ পান করিতে দিবে। এইরূপ নিয়মে পথ্যের ব্যবস্থা করিতে পারিলে,—বিনা ঔষধেও রোগ সারিতে পারে।

ঔষধের মধ্যে এমন ঔষধ প্রথমে ব্যবস্থা করিবে—যাহাতে অল্প সময়ের মধ্যে দূষিত পদার্থ নির্গত হইয়া অন্ত্র পরিষ্কার হইয়া যায়। এরণ্ড তৈলের এই গুণ যথেষ্ট আছে। কিন্তু বমনোদ্বেগ বেশী থাকিলে, এরণ্ড তৈলের পরিবর্ত্তে পারদ ঘটিত ঔষধ দেওয়া ভাল। তরুণ লক্ষণ অন্তর্হিত হইলে অর্থাৎ ঘন ঘন মলত্যাগের প্রবৃত্তি প্রশমিত হইলে—অবসাদক ঔষধ দেওয়া উচিত।

আক্ষেপ।

আক্ষেপ কিছু বেশীক্ষণ স্থায়ী হইলে, শিশুকে প্রথমেই গরম জলে নিমজ্জিত করিবে; অথবা একসের গরম জলে একতোলা সর্ষপ চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া এই জলে গামছা ভিজাইয়া তাহার দ্বারা শিশুর অঙ্গ আবৃত করিবে। এই ভাবে ১০।১৫ মিনিট রাখিতে হইবে।

ইহাতেও যদি আক্ষেপ নিবারিত না হয়, কিম্বা ক্ষণস্থায়ীভাবে নিবারিত হইয়া পুনরায় আরম্ভ হয়, তাহা হইলে—অবসাদক ঔষধের প্রয়োজন। শিশুর প্রকৃতি ও রোগের অবস্থা বুঝিয়া—এইরূপ ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হয়। ডাক্তারী মতে—কোরোফরম ক্লোরাল হাইড্রেট—এমন কি মর্ফিয়া পর্য্যন্ত আক্ষেপ নিবারণের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। *

দন্তোদ্গম।

দন্তোদ্গম সময়ে শিশুদের নানাবিধ রোগ হইবার সম্ভাবনা। যাহাতে এ সময় শিশুর কোন অসুখ না হইতে পারে—প্রথম হইতে তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। খাদ্যের দিকে দৃষ্টি না রাখিলে—অতিসার, উদরের যন্ত্রণা ও আধ্মান প্রভৃতি দেখা দিতে পারে। এই পীড়ায় এরণ্ড তৈল ও রিয়াই (রেউচিনী) উৎকৃষ্ট ঔষধ। †

---

* কুমারিয়া লতা বাটিয়া কপালে প্রলেপ দিলে তৎক্ষনাৎ আক্ষেপ নিবারিত হয়। আয়ুর্ব্বেদে আক্ষেপ নিবারক বহুযোগ উল্লিখিত হইয়াছে। পৃথক প্রবন্ধে আমরা তাহা লিখিব।—আং সং

† ছুছুন্দরী শুষ্ক দশনং শুদোষ্টং বিবোষ্টি। কণ্ঠস্থ বসনে নিবদ্ধ।
দন্তোত্তরাং বালকং রুজং জ্বরঞ্চ ঐকাহিকং হন্তি কুচ ভার নম্রে।
ছুঁচার দাঁত এবং ঠোঁট রৌদ্রে শুকাইয়া কাপড়ের পুঁটুলিতে বাঁধিয়া শিশুর গলায় পরাইয়া দিলে, দন্তোদ্গম কালীন সকল ব্যাধি নষ্ট হয়। আং সং।

পেটের বেদনা খুব বেশী হইলে অল্প মাত্রায় আফিং প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু অনেকেই বিশেষতঃ কবিরাজ মহাশয়েরা —আফিং দিতে আপত্তি করিতে পারেন। তবে আফিং দিতে হইলে খুব সাবধান হইয়া দিতে হইবে। যেন মাত্রা বেশী না হইয়া পড়ে। পুনঃ পুনঃ আফিং দেওয়াও উচিত নহে। এক ফোঁটা আফিমের আরক (টিঞ্চার ওপিয়াই) দিলে যথেষ্ট। তন্দ্রাভাব দূর না হওয়া পর্য্যন্ত আর দ্বিতীয়বার আফিং দিবেনা। আফিং খাইলে শিশুর চক্ষু যেন জড়াইয়া আসে, নিদ্রাকালীন ভাব উপস্থিত হয়, ইহাকেই তন্দ্রাভাব বলে। তন্দ্রাভাব—অর্থাৎ ঝিমানো। যতক্ষণ এই ঝিমানো, বা নেশার ভাব দূর না হয়, ততক্ষণ দ্বিতীয় মাত্রা আফিং প্রয়োগ করিতে নাই, এটুকু স্মরণ রাখিবে। শিশু অনিদ্রাগ্রস্ত এবং অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়িলে—ডাক্তারী মতে "ব্রোমাইড" প্রয়োগ করিতে হয়।

দন্তোদ্ভব কালের পেটের অসুখ সহসা বন্ধ করিবে না; এ সময় পেটের অসুখ হওয়া বরং ভাল, তাহাতে আর আক্ষেপের (রস তড়কা) ভয় থাকেনা। যে সকল শিশুর দাঁত উঠিবার সময় পেটের অসুখ না হয়, তাহাদের রসতড়কা হইতে পারে। অতএব দাঁত উঠিবার সময় মল যাহাতে পরিষ্কার থাকে—তাহার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে করা চাই।

দাঁত উঠিবার সময়—ছেলেরা যা' তা' মুখে দেয়। ইহাতে অনেক রোগের বীজাণু তাহাদের দেহে প্রবিষ্ট হইতে পারে। শিশু বেশী মৃত্তিকা মুখে দিলে—ঐ মৃত্তিকা উদরস্থ হইয়া রক্তের ক্রিয়া নষ্ট করিয়া দেয়, মাটির সঙ্গে ক্রিমি বীজাণুও উদর গহ্বরে আশ্রয় লাভ করে।

এ সময় দাঁতের মাড়ী শোণিত পূর্ণ ও বেদনাযুক্ত হয়। সোহাগার খৈ মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া দন্তমাড়িতে প্রলেপ দিলে-বেদনার হ্রাস হইয়া থাকে। আমেরিকায় এক দন্ত চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকায়—একজন বড় ডাক্তার লিখিয়াছেন —"দন্তোদ্গম সময়ে দাঁতের মাড়ি কাটিয়া দিলে অনেক ছেলে মৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ পায়। দন্তোদ্গমকালীন বেদনা হইতে আক্ষেপের উৎপত্তি প্রায়ই হইয়া থাকে।" এ যুক্তি কিন্তু সমীচিন বলিয়া মনে হয় না। শিশুর আক্ষেপ হয়—পরিপাক প্রণালীর দোষে। মস্তিষ্কাবরক ঝিল্লীর প্রদাহের জন্য টিউবার কিউলোসিসের জন্য, নিমোনিয়া হইবার প্রারম্ভে শিশুর শরীরে আক্ষেপের লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে। দাঁতের মাড়ী কাটিয়া দিলে—আক্ষেপ নিবারিত হয় না। তবে শোণিত স্রাব হওয়ায় স্থানিক বেদনা কমিয়া যায় বটে।

কেবল একটু রক্তস্রাব হইতে পারে—এইরূপ ভাবে দাঁতের মাড়ি কাটিয়া দিলে মন্দ হয় না। গভীরভাবে কর্ত্তন করা একেবারেই অনুচিত। মাড়ি শোণিত পূর্ণ বোধ না হইলে অথবা শিশু বেদনার কোন লক্ষণ প্রকাশ না করিলে, কখনই দাঁতের মাড়ি চিরিয়া দিবেনা।

আমাদের দেশের প্রাচীনা গৃহিনীগণ—শিশুর দন্তোদ্গমের বিলম্ব দেখিলে—ধান্যের দ্বারা মাড়ি সামান্য বিদ্ধ করিয়া দিতেন। ইহাতে রক্তস্রাব হইয়া শিশু সুস্থতা লাভ করিত। মাড়ি শোণিত পূর্ণ হইয়া—তাহাকে আর কষ্ট দিতে পারিত না।

স্তন্যের দোষ।

মাতৃস্তন্যের দোষে শিশুর অনেক রোগ হইতে পারে। তাহার মধ্যে পরিপোষণের

ব্যাঘাত—সর্ব্ব প্রধান। কোন কোন প্রসূতির স্তনের দুগ্ধে এমন কোন রাসায়নিক বিশেষত্ব থাকে যে, সে স্তন্য পান করিলে শিশুর হজম হয় না। অথচ এইরূপ স্তন্যের মেদের অংশ অল্প থাকায়—শিশু দিন দিন শীর্ণ হইয়া পড়ে. কিন্তু সেরূপ শীর্ণ শিশুকে পরীক্ষা করিলে, বিশেষ রোগ ধরিতেও পারা যায় না। শিশু সর্ব্বদা কাঁদে, নিয়ত অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে,বাহে ভাল হয় না। যাহা হয় তাহাও অত্যন্ত কঠিন। বিলাতে এইরূপ মেদবর্জ্জিতস্তন্যে ক্রিম মিশ্রিত করিয়া শিশুকে খাওয়াইবার প্রথা আছে। আমাদের দেশের শিশুকে এরূপ অবস্থায় বার্লিসহ ছাগদুগ্ধ বা গোদুগ্ধ * খাওয়ান ভাল। ইহা মাত্র দুইবার খাওয়াইতে হইবে। বাকী সময় মাতার স্তন্যপান করিবে।

প্রসূতি-স্তন্যে দুগ্ধ শর্করার অল্পতা হইলে, সে স্তন্য পানেও শিশু শীর্ণ হইয়া পড়ে। এরূপ শিশুকে একটু করিয়া চিনী খাওয়ান উচিত।

কোন কোন প্রসূতির স্তন্য পান করিলে শিশুর পেটের কামড়ানি ও ভেদ হইয়া থাকে। শিশুর মলে ছানার অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ প্রসূতিকে ক্ষার ঔষধ খাইতে দিলে, তাহার স্তন্য সংশোধিত হয়। ডাক্তারী মতে এরূপ প্রসূতিকে—সোডিবাইকার্ব্ব এবং সোডা এবং সোডা সাইট্রাস খাওয়ানর ব্যবস্থা আছে। কবিরাজী মতে - শঙ্খ ভস্ম ও মৌরীচূর্ণ খাইলে প্রসূতির স্তন দুগ্ধ বিশুদ্ধ হয়।

নিদ্রিতাবস্থায় ভয়ানক স্বপ্নদর্শন।

অতি অল্প সংখ্যক বালকেরই এ রোগ হইয়া থাকে। ইহার ঔষধ—অবসাদক। যথা এণ্টপাইরিন,—প্রভৃতি। বৈদ্য মতে তেলা কুচার পাতার রস চিনী সহ পান করাইলে বেশ সুফল পাওয়া যায়।

শয্যামূত্র।

পেটে কৃমি থাকিলে প্রায়ই এ লক্ষণ উপস্থিত হয়। বেলেডোনা ও আফিং ইহার ঔষধ। উভয় ঔষধ অল্পমাত্রায় আরম্ভ করা উচিত। তেলাকুচার পাতার রস, চাউল ভাজার গুঁড়া, জটামাংসীর ক্বাথ প্রভৃতি প্রয়োগে--এ রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

সিঃ হসপিট্যাল হইতে অবসর প্রাপ্ত
ডাঃ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র গুপ্ত।

পঞ্চকর্ম্ম।

—:*:—

ডাক্তার-কবিরাজ সংবাদ।

ডাক্তার। আসুন কবিরাজ মহাশয়, ভাল আছেন ত?

কবিরাজ। এক রকম মন্দ নয়, আপনার খবর কি?

ডাক্তার। শারীরিক ভালই বটে, কিন্তু বাজার বড় মন্দা। রোগীপত্তর খুব কম।

ক। র'ক্ষে করুন মশায়, বার মাস সমান টানে লোকে যদি রোগ ভোগ করে, তা,

* এরূপ অবস্থায় গব্য দুগ্ধে শালপানি মিশাইয়া চিনি সহ সিদ্ধ করিয়া শিশুকে খাইতে দিলেও বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।—আঃ সং।

হলে শেষে যে একেবারেই রোগী পাবেন না।

ডাঃ। তা তো বল্‌ছেন, কিন্তু মনে ক'রে দেখুন দেখি খরচাটা কি। বাড়ী ভাড়া, লোক জন-সহিস কোচমানের মাইনে, ঘোঁড়ার খোরাক, ইলেকট্রিক আলো, পাখার বিল—এগুলো ত মাস গেলেই গুণতে হবে। আপনারাও তো ক্রমে খরচা বাড়িয়ে তুলেছেন।

ক। মহাজনঃ যেন গতঃ স পন্থা—আপনারা হ'লেন মহাজন,—যে পথে আপনারা চ'লেন, আমরাও সেই পথে চলিছি।

ডাঃ। পূর্ব্বে আপনাদের তো এ রকম চাল ছিল না?

ক। কিছুমাত্র না। আয়ুর্ব্বেদের স্রষ্টা যাঁরা—তাঁ'রা গাছের বাকল প'রতেন। তার পর তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে যারা জীবের স্বাস্থ্যবিধান এবং প্রাণরক্ষা রূপ মহাব্রত অবলম্বন ক'রতেন, তাঁ'রা মোটা চাদর কাপড় আর চটী জুতো হ'লেই সন্তুষ্ট থাকতেন। এখনও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের যেমন দেখচেন—আগেকার কবিরাজেরা ঠিক সেই রকম একেবারে বিলাসিতা বর্জ্জিত ছিলেন। তাছাড়া শাস্ত্রচর্চ্চায় ও চিন্তায় তাঁরা এত নিমগ্ন থাকতেন যে, বিষয়বুদ্ধি তাঁদের কিছুমাত্র ছিল না—টাকা, মোহরের প্রভেদ জানতেন না।

ডাঃ। বলেন কি!

ক। বলি সত্য কথা। এই কিছু দিন পূর্ব্বের ঘটনা শুনুন। দর্প নারায়ণ ব'লে এক জন কবিরাজ ছিলেন, তিনি এক সময়ে মহিষাদলের রাজবাড়ীতে চিকিৎসার জন্য আহূত হন। যা'বার সময় কবিরাজ মহাশয়ের স্ত্রী ব'লে দেন যে, তিনি যেন হলদে টাকা চান। কবিরাজ মহাশয়ের সুচিকিৎসায় রোগী আরোগ্য লাভ করিলে বিদায়ের সময় তিনি রাজার নিকট হলদে টাকা চাহিলেন, রাজাও দাওয়ানকে যথেষ্ট মোহর পুরস্কার দিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু দাওয়ান দেখিলেন যে, কবিরাজ নিতান্ত বোকা। তিনি টাকায় হলুদ মাখাইয়া কবিরাজ মহাশয়কে দিলেন। রাজকীয় প্রহরী এবং কর্ম্মচারী সঙ্গে কবিরাজ মহাশয় বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং গৃহিণীকে টাকা দিয়া মহা আনন্দে বলিলেন,—'এই দেখ গৃহিণী, হলদে টাকা এনেছি।' গৃহিণী দেখিয়া ভাবিলেন যে, উহা কখনই রাজার কার্য্য নহে। কোন দুষ্টবুদ্ধি কর্ম্মচারী এরূপ করিয়াছে, তিনি সমাগত কর্ম্মচারী এবং প্রহরীদিগকে রাজার নিকটে একখানি পত্র লইয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তাহারা—ইহা উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর কার্য্য এবং রাজার নিকট পত্র লইয়া গেলে তাহাদের চাকরী থাকিবে না—এইরূপ ভাবিয়া পত্র লইয়া যাইতে অস্বীকৃত হইল। কেবল এক-জন পালকী-বেহারা কবিরাজ মহাশয়ের গুণে মুগ্ধ হইয়া বলিল, আমি খাটিয়া খাই, চাকরী যায়—অন্যত্র চাকরী করিব, আমি পত্র লইয়া যাইব। যাহা হউক তাহারই হস্তে পত্র দেওয়া হইল। পত্রে লেখা ছিল যে, মহারাজ, এরূপ লোককে আপনার ঠকান ভাল হয় নাই। রাজা পত্র পাইয়া তৎক্ষণাৎ সেই দুষ্ট কর্ম্ম-চারীকে পদচ্যুত করিলেন এবং যথেষ্ট মোহর কবিরাজ মহাশয়ের নিকট পাঠাইলেন।

ডাঃ। একি গল্প না সত্য কবিরাজ মশায়?

ক। এখন গল্প ব'লেই মনে হয়, কিন্তু সত্য সেকালের কবিরাজদের বিষয় বুদ্ধি মোটেই ছিলনা। টাকা সম্বন্ধে আর একটা ঘটনার কথা বলি শুনুন। একবার জনৈক

কবিরাজ কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ীতে চিকিৎসার জন্য আহূত হন। রোগী আরোগ্য লাভ করিলে, রাজা কবিরাজ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কি চান? কবিরাজ মহাশয় পূর্ব্বে হাতী দেখেন নাই, এখানে হাতী দেখিয়া খুব আনন্দ হইয়াছিল, তিনি রাজাকে একটা হাতী দেখাইয়া বলিলেন—আমি এইটে নেব। রাজা হাতী পুরস্কার দিয়া কবিরাজ মহাশয়কে বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। কবিরাজ গৃহিণী ব্যস্তসমস্ত ভাবে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি এনেছ? কবিরাজ সানন্দে হাতী দেখাইয়া বলিলেন, আমি এইটে চেয়ে এনেছি। তখন গৃহিণী কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন,—আঃ আমার কপাল! কবিরাজ মহাশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন—কেন, কি হল? কবিরাজ-গৃহিণী বলিলেন, দাড়াও দেখাচ্ছি। এই বলিয়া প্রচুর ধান ও চাউল হাতীকে খাইতে দিলেন। গজরাজও মহা আনন্দে সেই ধান্য ও চাউলের স্তূপ উদরসাৎ করিল। গজরাজের আহার দেখিয়া কবিরাজ মহাশয় অবাক। তখনি ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে পত্র লিখিলেন যে, আপনি আমার সঙ্গে প্রতারণা করিয়াছেন। আমাকে একটা রাক্ষস দিয়াছেন। রাজা কবিরাজ মহাশয়ের শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য এবং বিষয়বুদ্ধির হীনতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া হস্তীর পরিবর্ত্তে প্রচুর অর্থ দিয়া পাঠাইলেন।

ডাঃ। আশ্চর্য্য ব্যাপার, যা'রা এত বিষয়-বুদ্ধিহীন,—তা'রা পণ্ডিত হ'য়ে কি করে?

ক। কিছুই আশ্চর্য্য নয়। পাশ্চাত্য দেশের গালিলিও, সক্রোটীস প্রভৃতিও এইরূপ ছিলেন। নিউটন এত চিন্তামগ্ন থাকিতেন যে, আহার ক'রতে ভুলে যেতেন। প্রকৃত পাণ্ডিত্যের সঙ্গে বিলাসিতা ও অর্থচিন্তার বিরুদ্ধ সম্বন্ধ। কবিরাজগণ যত বিলাসী ও অর্থপ্রিয় হ'তে লাগলেন, ততই তাঁদের পাণ্ডিত্য ক'মে আসতে লাগল্। ফলে আয়ুর্ব্বেদের ক্রমশঃ অবনতি ঘ'টলো। এখন এমন হয়েছে যে—একটা ফোড়া কাটতে হ'লে—কি পিচকারি দিয়ে বাহ্যে করা'তে হ'লে আপনাদের দ্বারস্থ হতে হয়।

ডাঃ। পিচকারী দিয়ে বাহ্যে করান আগে ছিল নাকি?

ক। (হাসিয়া) এখন তাই মনে হয় বটে, কিন্তু পিচকারী দিয়ে বাহ্যে করাবার যে সুন্দর নিয়ম আয়ুর্ব্বেদে ছিল, আপনাদের শাস্ত্রে তার সিকির সিকিও নেই।

ডাঃ। বলেন কি?

ক। বলি ঠিক। কেবল বাহ্যে করাবার জন্য পিচকারী দেওয়া নয়, পিচকারী দিয়ে অনেক রোগের চিকিৎসাও হ'ত।

ডাঃ। অবাক কল্লেন আপনি! রেক্ট্যাল ফিডিং (Rectal feeding) কবিরাজীতে ছিল নাকি?

ক। ছিল বৈ কি। এক বস্তিকেই শাস্ত্রে অর্দ্ধেক চিকিৎসা—মতান্তরে সম্পূর্ণ চিকিৎসা বলা হ'য়েছে।

ডাঃ। বস্তিটা কি?

ক। মলদ্বারে পিচকারী দিয়ে ঔষধ প্রয়োগ করার নাম বস্তিপ্রয়োগ। আর মূত্রদ্বার পথে ঔষধ প্রয়োগ করার নাম উত্তর বস্তি।

ডাঃ। আপনি আমার কৌতূহলী ক'রে তুল্লেন দেখছি। তা' যখন ক'রে তুলেছেন,—তখন সব শোনাতে হবে আপনাকে।

ক। তাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু ত' হ'লে পঞ্চকর্ম্ম সবই শুনতে হয়।

ডাঃ। হাঁ হাঁ পঞ্চকর্ম্ম ব'লে একটা প্রবন্ধ প্রথম বছরের আয়ুর্ব্বেদে বেরিয়ে ছিল বটে। কিন্তু তা'তে কেবল স্বেদের কথাই লেখা ছিল।

ক। স্বেদ—পঞ্চ কর্ম্মের মধ্যে নয়, ওটাকে প্রাককর্ম্ম বলে। পঞ্চকর্ম্মের পূর্ব্বে প্রথমে স্নেহ পান করিয়ে স্বেদ দিতে হয় তা'রপর পঞ্চ কর্ম্ম ক'রতে হয়।

ডাঃ। স্নেহ পান কি?

ক। স্থাবর ও জঙ্গম ভেদে স্নেহ দুই প্রকার। আবার ঘৃত, তৈল, বসা ও মজ্জা-ভেদে স্নেহ চারি প্রকার। স্থাবরস্নেহের মধ্যে তিল তৈল ও জঙ্গম স্নেহের মধ্যে ঘৃতই প্রধান। পঞ্চকর্ম্ম ক'রবার পূর্ব্বে প্রথমে রোগীকে স্নেহ পান ক'রাতে হয়।

ডাঃ। আচ্ছা স্নেহ পানের নিয়ম কি?

ক। নিয়ম নানারূপ আছে, ক্রমশঃ ব'লছি। পূর্ব্বে যে চা'র প্রকার স্নেহের কথা ব'লেছি, তার মধ্যে পিত্তপ্রধান ব্যক্তির পক্ষে ঘৃত, বাত প্রধান ব্যক্তির পক্ষে সৈন্ধব লবণ সংযুক্ত ঘৃত এবং কফ প্রধান ব্যক্তির পক্ষে শুঁঠ পিপ্পল, মরিচ ও যবক্ষার চূর্ণ সংযুক্ত ঘৃত প্রশস্ত। আর বুদ্ধি স্মৃতি ও মেধা প্রার্থী ব্যক্তিগণের পক্ষে ঘৃতই প্রশস্ত। গ্রন্থি (এই রোগে শরীরে গোলাকার গাঁইটের মত হয়) রোগ ও নালী ঘা রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি, ক্রিমিরোগী, শ্লেষ্মরোগী, মেদোরোগী, বায়ুরোগী, এবং ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তি দিগের শরীরের লঘুতা ও দৃঢ়তার জন্য তৈল প্রয়োগ ক'রতে হয়। প্রবল বায়ু, রৌদ্র পথ পর্য্যটন, ভারবহন, স্ত্রী সংসর্গ ও ব্যায়াম বশতঃ ক্ষীণ ধাতু ব্যক্তিগণের পক্ষে এবং রুক্ষ ক্লেশ সহ, অত্যগ্নি বিশিষ্ট এবং বায়ু কর্ত্তৃক রুদ্ধ স্রোত ব্যক্তিগণের পক্ষে বসা ও মজ্জা হিতকর। সন্ধি, অস্থি, মর্ম্মপ্রকোষ্ঠে বেদনা থাকিলে এবং দগ্ধ আহত, ভ্রষ্টযোনি, কর্ণ ও মস্তকে যন্ত্রণাযুক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষের একমাত্র বসা (চর্ব্বি) হিতকর।

ডাঃ। স্নেহ কি সকলকেই পান করান যেতে পারে?

ক। না, তা' যায় না। এক নিয়ম কি সকলের পক্ষে খাটে? যাহাদের স্বেদ দিতে হবে—বা যা'দের শরীর বমন বিরেচনের দ্বারা শোধন ক'রতে হ'বে—তা'দের পক্ষে, মদ্য, স্ত্রী ও ব্যায়ামাসক্ত ব্যক্তির পক্ষে, চিন্তাশীল, বৃদ্ধ, বালক, দুর্ব্বল কৃশ, রুক্ষ, অল্পরক্ত, অল্প শুক্র, বায়ু পীড়িত, পুরাতন অভিষ্যন্দ নামক নেত্র রোগ, তিমির নামক নেত্ররোগ, দুঃসাধ্য রোগ গ্রস্ত এবং জাগরণশীল ব্যক্তির পক্ষে স্নেহ পান হিতকর। আর মন্দাগ্নি বিশিষ্ট, তীক্ষ্ণাগ্নি বিশিষ্ট, অতি স্থূল, অতি দুর্ব্বল, তৃষ্ণা ও মদ্য দ্বারা পীড়িত এবং উরুস্তম্ভ, অতিসার, গলরোগ বিষরোগ, উদররোগ, মূর্চ্ছা, বমি, অরুচি, শ্লেষ্মা রোগ গ্রস্ত ব্যক্তিগণ স্নেহ প্রয়োগের অযোগ্য। যে সকল স্ত্রী অকালে প্রসূতা হয়, তাহারাও স্নেহ পানের অযোগ্য।

ডাঃ। স্নেহ পান সম্বন্ধে আর কি নিয়ম আছে?

ক। নিয়ম অনেক আছে, তবে মোটা-মুটি এই। আর ঘৃত পানের পর উষ্ণ জল, তৈল পানের পর যূষ এবং বসা ও মজ্জা পানের পর মণ্ড পান করিতে দিবার বিধি আছে, কিন্তু সকল প্রকার স্নেহ পান ক'রে গরম জল খাওয়া চলে, তবে রোগভেদে ভেলার তেল, চাল মুগরার তেল পান ক'রে ঠাণ্ডা জল খেতে হয়।

ডাঃ। ভেলার তেল খেতে হয় নাকি ?

ক। সে রোগ ভেদে,—পঞ্চ কর্ম্মের প্রাক্ কর্ম্মে নয়। সে কথা পরে ব'লব। স্নেহ পান সম্বন্ধে আর দুই একটা কথা আছে—প্রথমে বলি। স্নেহ পান ক'রে দুটি উপসর্গ ঘ'টতে পারে,—এক পিপাসা, দ্বিতীয় স্নেহ জীর্ণ না হওয়া। স্নেহ পান ক'রে পিপাসা হ'লে গরম জল পান ক'রতে দিতে হয়। তাতে যদি পিপাসার শান্তি না হয়, তা' হলে প্রচুর পরিমাণে গরম জল পান করিয়ে বমি করা'তে হয়। এতে স্নেহ পদার্থ নিঃসারিত হ'য়ে পিপাসার শান্তি হয়। যদি স্নেহপদার্থ জীর্ণ না হ'য়ে থাকে, তা' হলেও গরম জল পান করিয়ে বমি করা'তে হয়। পরে কোষ্ঠ লঘু হ'লে পুনরায় স্নেহ পান করা'তে হয়। স্নেহ জীর্ণ হ'য়েছে কিনা—সন্দেহ হ'লে গরম জল পান করা উচিত। এতে স্নেহ জীর্ণ হয় এবং উদ্গার বিশুদ্ধ ও অন্নে রুচি হ'য়ে থাকে।

ডাঃ। এইবার ভেলার তেল পান করা ব্যাপারটা কি বলুন।

ক। পূর্ব্বেই ব'লেছি, যে স্নেহপানের কথা বলেছি সেটা প্রাক্ কর্ম্মের জন্য। এ ছাড়া নানা রোগে স্নেহপান করার বিধি আছে। সুশ্রুত ব'লেছেন—বহুরোগ স্নেহসাধ্য। পান, অনুবাসন, শিরোবস্তি (মাথার উপর চামড়ার ঠুলি রাখিয়া তাহা তৈলপূর্ণ করা) মস্তিষ্ক তর্পণ, উত্তর বস্তি, নস্য, কর্ণ পুরণ, অভ্যঙ্গ ও ভোজন কার্য্যে স্নেহ প্রয়োগ করিতে হয়। বাহুল্য ভয়ে কেবল কয়েকটীর নাম মাত্র বলা যাইতেছে। যথা, বিরেচক স্নেহ, বমনকারক স্নেহ, শিরো বিরেচক স্নেহ, দুষ্ট ব্রণনাশক স্নেহ, মহাব্যাধি বিনাশক স্নেহ, মূত্ররোধনাশক স্নেহ, শর্করা ও অশ্মরী (পাথরী) নাশক স্নেহ, প্রমেহনাশক স্নেহ, পিত্ত সংসৃষ্ট বায়ুনাশক স্নেহ, ক্ষতস্থান কৃষ্ণবর্ণ কারক স্নেহ, ক্ষতস্থান পাণ্ডুবর্ণকারক স্নেহ, দদ্রু কিটিম নাশক স্নেহ, ইত্যাদি। কুষ্ঠ রোগে চাল মুগবা এবং ভেলার তেল পান করিবার বিধি আছে। ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের সহিত স্নেহ পাক করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়।

ডাঃ। তাই ত ব্যাপার ত বড় সোজা নয় !

ক। ব্যাপার আরও অনেক আছে, ক্রমশঃ শুনুন। এইত গেল স্নেহ পান। স্নেহ পানের পরেই স্বেদ দিতে হয়।

ডাঃ। আচ্ছা কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগে যে স্নেহ পানের কথা ব'ল্লেন, তা'দের কি পরে স্বেদ, বমন, বিরেচন নিষিদ্ধ।

ক। না নিষিদ্ধ কেন? স্নেহপান, স্বেদ, বমন, বিরেচন প্রভৃতি দ্বারা সংশোধন অনেক রোগে ক'রতে হয়। কিন্তু বিস্তারিত ভাবে সে সব কথা ব'লতে গেলে সমগ্র আয়ুর্ব্বেদই ব'লতে হয়। সেইজন্য আমি সাধারণ ভাবে পঞ্চকর্ম্মের কথা ব'লছি।

ডাঃ। সাধারণ ভাবে কি ?

ক। এই মনে করুন—সুস্থ শরীরে প্রথমে পঞ্চ কর্ম্ম ক'রে তারপর, রসায়ন—বাজীকরণ ঔষধ সেবন ক'রতে হয়। তবে এভাবে বলতে গেলেও অনেক রোগের কথা আপনি এসে পড়বে। কেন না, যা'দের বমন-বিরেচন করা'তে হয়—সে কথাত বল'তে হবে।

ডাঃ। আচ্ছা, স্নেহপানের কথা ত শুনলাম। স্নেহ পানের পর স্বেদ। তা' স্বেদের কথা প্রথম বছরের আয়ুর্ব্বেদে প'ড়েছিলাম। এই গেল আপনার প্রাক্ কর্ম্ম, এখন পঞ্চকর্ম্মের কথা বলুন।

ক। স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগের পর প্রথমেই বমন করা'তে হয়। যে দিন বমন করা'তে হবে, তা'র পূর্ব্বদিন রোগীকে মৎস্য, মাংস, তিল প্রভৃতি কফের উৎক্লেশকর পথ্য ভোজন করিতে দিবে।

ডাঃ। তা'র মানে কি?

ক। তার মানে এই যে, ঐরূপ না ক'রলে বমন কষ্টকর হ'য়ে পড়ে।

ডাঃ। আচ্ছা তার পর?

ক। তা'রপর দিন রোগীকে জানুতুল্য উচ্চ আসনে বসিয়ে প্রাতঃকালে বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ ক'রতে হয়। আবার রোগভেদে বমনকারক ঔষধেরও ভেদ আছে।

ডাঃ। সে কি রকম?

ক। ব'লতে গেলে পুঁথি বেড়ে যাবে, যা' হোক বলি শুনুন, কিন্তু তা বলবার আগে একটা কথা মনে প'ড়ে গেল। একবার আমার এক জন ডাক্তার কবিরাজ বন্ধু ব'লেছিলেন, ওহে জোলাপের একটা কিছুই ঠিক পাই না, এক জনকে যে মাত্রায় দিই—তার কিছুই হয় না সেই মাত্রায় অন্য লোককে দিলে বেশ কোষ্ঠ শুদ্ধি হয়, আবার অপর একজনের সেই মাত্রায় অতিরিক্ত দাস্ত হয়।

ডাঃ। আপনি কি উত্তর করলেন?

ক। আমি বললাম, দেখ হে সেটা জোলাপের দোষ নয়, এক রকম জোলাপ যদি সকল রোগে আর সকলের শরীরে সমানভাবে কাজ করতো, তা হ'লে আত্রেয় ঋষি কষ্ট স্বীকার ক'রে ছয় শত জোলাপের উল্লেখ করতেন না।

ডাঃ।—বলেন কি ছয় শত রকম জোলাপ!

ক।—সেটাও কেবল দিগদর্শন মাত্র। চিকিৎসক ইচ্ছা ক'রলে আরও ছয়শত কোন্ না কল্পনা ক'রে নিতে পারেন।

ডাঃ।—আপনার সংসর্গে আয়ুর্ব্বেদের উপর আমার ভক্তি বেড়ে উঠছে। আগে আমি আয়ুর্ব্বেদকে অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখতাম।

ক।—অনেকেরই তাই হয়। ভিতরে কি আছে না দেখে ঘৃণা করাটা অনেকেরই স্বভাব। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ আলোচনা ক'রলে বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই আয়ুর্ব্বেদকে শ্রদ্ধা না ক'রে থাকতে পারবেন না। অনেক অনেক মার্কিন, জার্ম্মান ইংরাজ এবং ফরাসী পণ্ডিত শতমুখে আয়ুর্ব্বেদের সুখ্যাতি ক'রেছেন।

ডাঃ। কিন্তু একটা কথা বলি কবিরাজ মশায়, কিছু মনে ক'রবেন না। আয়ুর্ব্বেদের উপর ভক্তি যতই বেড়ে যাচ্ছে, আপনাদের উপর ততই অশ্রদ্ধা হচ্ছে। কি জিনিসটাকে আপনারা কি ক'রে তুলেছেন।

ক। আপনি যদি কাণ দুটো ম'লে দিয়ে দু'গালে দু'টো চড় মেরে এ কথা ব'লতেন, তা হ'লেও রাগ বা দুঃখ হতো না। ত্রুটি কেবল শুধু আমাদের একলার নয়, আমরা পুরুষানুক্রমে দোষী। একথা যখন মনে করি, তখন আপনা আপনি গালে-মুখে চড়াতে ইচ্ছা হয়।

ডাঃ। যাক এখন আপনি রোগভেদে বমনকারক ঔষধ প্রয়োগের কথা বলুন।

ক। ব'লছি, আর একটু ব'লে নিই, দাঁড়ান। আমাদের দোষত স্বীকার করলাম! কিন্তু দেখুন, আপনাদের মধ্যে অনেকে আয়ুর্ব্বেদ না জেনে বা জেনেও ইচ্ছাপূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকেও অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। আপনিও তা'র একজন ছিলেন।

ডাঃ। আমাদের অনেকের এই দোষ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছি। কিন্তু অনেকে আয়ুর্ব্বেদে শাস্ত্রকে খুব ভক্তির চক্ষে দেখেন— একথাও মানতে হ'বে।

ক। নিশ্চয়, আর এর জন্যে তাঁদের কাছে যে আমরা কতদূর কৃতজ্ঞ—তা' ব'লে বোঝাবার নয়।

ডাঃ। থাক সে কথা, আপনি এখন যা' ব'লছিলেন, বলুন।

ক। হাঁ বলছি। ঘোষার ফল ও পুষ্প জ্বর, শ্বাস, হিক্কারোগে, তিত্‌লাউ কাস, শ্বাস, কফজ বমি, পিপাসা, কফজরোগ ও মূর্চ্ছারোগে, ঘোসার পুষ্প, ফল ও পল্লব বিষদুষ্টি, গুল্ম, উদর, কাস, বাতশ্লেষ্মজ রোগ, কণ্ঠগত ও মুখগত, কফদুষ্টি, কফজনিত রোগ এবং কষ্টসাধ্য ও বহুদিনস্থায়ী রোগে, কুড়্চি হৃদ্রোগ বাতরক্ত ও বিসর্প রোগে, শ্বেত পুষ্প কুষ্ঠ, পাণ্ডু, প্লীহা, শোথ, গুল্ম ও সংযোগ বিষজাত রোগে এবং মদন ফল অধিকাংশ রোগে বমন কার্য্যের জন্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে। আমি আপনাকে নিতান্ত সংক্ষেপে বলিলাম, বমনকারক বহুবিধ দ্রব্য আছে এবং প্রত্যেকের প্রয়োগ-কল্পনাও নানাপ্রকারে করা যাইতে পারে। এক তিতলাউয়ের ৪৫টী যোগ কল্পনা করা হইয়াছে; তন্মধ্যে আটটী দুগ্ধ সহ; সুরাখণ্ড সহ ১টী, দধিমণ্ড সহ একটী, তক্র সহ একটী, যাহাতে আঘ্রান লইলে দাস্ত হয়—এরূপ অবস্থার রোগে একটী মাংস যোগে একটী, তৈল যোগে একটী, বর্দ্ধমান (ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করা) ও আসব যোগে ছয়টী, ঘৃত সহ একটী, যষ্টিমধু প্রভৃতির ক্বাথ সহ নয়টী, বস্তি ক্রিয়ার জন্য আটটী, লেহযোগে পাঁচটী, মন্থ (জলে গোলা ছাতু) যোগে একটী ও মাংস রস যোগে একটী প্রয়োগ করিবার কল্পনা করা হইয়াছে। প্রত্যেক বমন কারক দ্রব্যেরই এইরূপ বিবিধ কল্পনা করা হইয়াছে।

ডাঃ।—এযে বিরাট ব্যাপার দেখছি! ইচ্ছে হ'চ্চে যে, আয়ুর্ব্বেদ আগাগোড়া পড়ে ফেলি।

(ক্রমশঃ)

বিবিধ সংবাদ।

—:*:—

কাশী আয়ুর্ব্বেদ সম্মিলনী।—গত ১০ই কার্ত্তিক ৺কাশীধামে 'বাঙ্গালীটোলা' স্কুল গৃহে "কাশী আয়ুর্ব্বেদ সম্মিলনী"র ২য় বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের জ্ঞানানন্দ স্বামী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারই আদেশে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র নায়ক মহাশয় সভাপতির আসনে উপবেশন করেন। "আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা" শীর্ষক সংস্কৃত প্রবন্ধ এবং "ভারতবর্ষে আয়ুর্ব্বেদ চর্চ্চা" নামক বাঙ্গালা প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। আমরা ইহার বার্ষিক কার্য্য বিবরণী পাঠ করিয়া দেখিলাম—লুপ্ত প্রায় শল্য ও রসায়ন শাস্ত্রের পুনরুদ্ধার ও উন্নতি সাধন করাও সম্মিলনীর উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য সে সাধু, সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী।—কলিকাতা এবং মফঃস্বলের অনেক স্থানেও ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর আকার ধারণ করিয়াছে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী এ জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয়পূর্ব্বক প্রকৃতিপুঞ্জকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু মফঃস্বলের অনেক স্থলে আদৌ চিকিৎ-

সক মিলিতেছেনা। কলিকাতার স্কুল কলেজ গুলি শারদীয়া পূজার অবকাশের পর দু'বার বন্ধ হইয়াছে। আমাদের অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ও এই উপলক্ষে ১৫ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত খোলা হয় নাই।

কলিকাতায় মড়ক।—কলিকাতায় ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে কিরূপ লোকক্ষয় হইতেছে এক সপ্তাহের হিসাব হইতে তাহা উপলব্ধি হইবে। নবেম্বর মাসে ১১ই ৭৬, ১২ই ৭০, ১৩ই ৬১, ১৪ই ৬২, ১৫ই ৫৯, ১৬ই ৫৯, ১৭ই ৫১ জন এই মহামারীর প্রকোপে ইহলীলা সাঙ্গ করিয়াছে।

সিন্ধিয়ার রাজমাতা।—আমাদের পাঠকবর্গ শুনিয়া সুখী হইবেন,—সিন্ধিয়ার রাজমাতা উত্তরোত্তর আরোগ্য লাভ করিতেছেন, কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ এম বি অতি শীঘ্রই স্বদেশে প্রত্যাগত হইবেন।

আয়ুর্ব্বেদ সভা।—গত ২৯শে কার্ত্তিক কুমারটুলী গঙ্গাপ্রসাদভবনে কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ সভার ৮ম বার্ষিক ৪র্থ সাধারণ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কবিরাজ শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন "বৈদ্যক চিকিৎসার উন্নতি সাধন" এবং কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন "আয়ুর্ব্বেদে—খণ্ডপ্রলয়" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। ২য় প্রবন্ধটি পাঠ করিবার পূর্ব্বে স্থায়ী সভাপতি মহাশয় ঐ প্রবন্ধ পাঠের সময় পর্য্যন্ত কবিরাজ শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে সভাপতির পদে বরণ করেন। ২য় প্রবন্ধটি শল্য চিকিৎসার অভাবে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের অংশ অর্থাৎ খণ্ড সকল যে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে—তাহাই অবলম্বনে লিখিত, সেই সঙ্গে ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনের পঠিত প্রবন্ধের সমালোচনা সম্বন্ধেও যে সকল কথা বলা আবশ্যক, তাহারও উল্লেখ করিয়া লিখিত হইয়াছিল। "বৈদ্যক চিকিৎসার উন্নতি সাধন" প্রবন্ধেও শল্য চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি রায় B.A. কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ এবং কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরমোহন মজুমদার মহাশয়গণ এই উপলক্ষ্যে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা বড়ই যুক্তিপূর্ণ। কবিরাজ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী সাংখ্য-ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়ও এ সম্বন্ধে অনেক সারগর্ভ কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি "আয়ুর্ব্বেদে খণ্ড প্রলয়" নামকরণের জন্য যে সকল কথা—বলিয়াছিলেন এবং ঐ প্রবন্ধে কলিকাতার কোন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের কথার উত্তর দেওয়া হইয়াছে বলিয়া 'ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিতে দেওয়া উচিত ছিলনা'—প্রভৃতি যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তাহার জন্য আমরা বাস্তবিকই আশ্চর্য্য হইয়াছি। ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধে ঐ প্রবন্ধের নামকরণ "আয়ুর্ব্বেদে খণ্ডপ্রলয়" হওয়া যুক্তি বিরুদ্ধ হইলেও 'খণ্ড' শব্দের অর্থ 'অংশ' করিলে নামকরণ কখনই অসঙ্গত হয় নাই। তাহার পর কবিরাজ শরচ্চন্দ্র কি বলিতে চাহেন যে, এ সভার প্রত্যেক সভ্যই কলিকাতার শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগুলি যাহা বলিবেন, তাহাই অবনত শিরে মানিয়া চলিবেন! যদি ইহাই সভার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে কোনো আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই ঐ সভায় সভ্য নাম লিখাইতে রাজি হইবেন না। শরচ্চন্দ্র অসাধারণ পণ্ডিত, কিন্তু ওরূপ অসঙ্গত কথা বলিয়া তিনি বাস্তবিকই আমাদের মনে একটা আতঙ্ক সঞ্চারের সম্ভাবনা করিয়া দিয়াছেন।

আয়ুর্ব্বেদ সভার উদ্দেশ্য।—এই সভার উদ্দেশ্যের প্রথমেই লিখিত আছে—'বিবিধ উপায়ে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র-প্রসার, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক ও চিকিৎসা প্রণালীর উন্নতি সাধন এবং সর্ব্বত্র নানারূপে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার গৌরব ঘোষণা এই সভার উদ্দেশ্য।" ইহার পর এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় নির্দ্ধারণে লিখিত আছে '(খ) উদ্দেশ্যের অনুকূল বিষয় সমূহের আলোচনা।' এ অবস্থায় 'আয়ুর্ব্বেদে খণ্ডপ্রলয়" শীর্ষক প্রবন্ধ উদ্দেশ্যের প্রতিকূলে নহে—ইহা শরচ্চন্দ্রের মনে করা উচিত, কেননা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের প্রসার যখন ইহার উদ্দেশ্য, তখন সেই উদ্দেশ্যের অনুকূলে যিনি এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন,—তাঁহাকে উহা পাঠ করিতে দেওয়া উচিত ছিলনা—এ কথা বলায় সত্য সত্যই প্রবন্ধ পাঠকের মর্য্যাদার হানি করা হইয়াছে কিনা এবং তাহার ফলে এখন হইতে যাঁহারা কলিকাতার শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদিগের মতের বিরুদ্ধে কথা বলিতে পারিবেন না,—তাঁহাদের আর এ সভায় প্রবন্ধ পাঠ করা উচিত কিনা—সে সম্বন্ধে ভাবিবার বিষয়।

প্রবন্ধ প্রেরণের কথা।—কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনে যে 'আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা কবিরাজীর গোঁড়ামি প্রবন্ধ হয় নাই। ইহার পর তিনি যখন আবার প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য সম্পাদক ও সভাপতি মহাশয়কে লিখিয়া পাঠাইলেন, তখন সভাপতি মহাশয়ের নিকট হইতে উত্তর আসিল,—তিনি বর্ত্তমান অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করিবেন, কিন্তু সম্পাদক মহাশয় লিখিয়া পাঠাইলেন—তাঁহাকে প্রবন্ধ পাঠের ৩।৪ দিন পূর্ব্বে প্রবন্ধ তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। কবিরাজ সত্যচরণ ইহার উত্তর দিলেন, তিনি এরূপ সর্ত্তে প্রস্তুত নহেন। সে পত্রের আর উত্তর আসিল না। ছাপান কার্ডে তাঁহার প্রবন্ধ পঠিত হইবে বলিয়া পরদিনই উত্তর আসিল। যথাসময়ে প্রবন্ধও পাঠ করা হইল। ঐ প্রবন্ধে ১ম দিনের পঠিত প্রবন্ধ সম্বন্ধে সমালোচনার যে উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে—কবিরাজ সত্যচরণ পত্র লিখিবার সময় সে স[illegible] কথা জানাইয়াছিলেন। এ অবস্থায় ত[illegible] তাঁহারা আপত্তি করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাও করা উচিত নহে এবং সেই জন্যই তাঁহারা আপত্তি করেন নাই বলিয়া আমরা মনে করি। আর নিয়মাবলীতে যদিও 'প্রবন্ধ পাঠ করিবার পূর্ব্বে তাহা বা বিশেষ আলোচনার সূচনা পাঠানর কথা যায়, নিয়ম বদ্ধ আছে, কিন্তু তাহার সহিত কোনো আত্ম-মর্য্যাদা-জ্ঞানব্যক্তিই একমত হইবেন না। অচিরে ঐ নিয়মটি তালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়া উচিত।

সভাপতির মন্তব্য।—স্থায়ী সভাপতি মহাশয় সে দিন সভাপতি বদল করিয়া বক্তার আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা যেরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ, সেইরূপ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তিনি যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহার সার মর্ম্ম—তিনি শল্য চিকিৎসার বিরোধী কোনোকালেই নহেন, বরং শল্য চিকিৎসা শিক্ষা না করিলে, কাহারও সুচিকিৎসক হইবার অধিকার থাকেনা, তবে কায় চিকিৎসার যে সকল গলদ চলিতেছে, আগে সেই সকল দূর করা কর্ত্তব্য। প্রবন্ধপাঠক প্রথমদিনের প্রবন্ধে কায় চিকিৎসার যে সকল গলদের কথা বলিয়াছিলেন,—কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় সে সম্বন্ধে বলেন, "আমি এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিতে পারি, কিন্তু এখানে আয়ুর্ব্বেদব্যবসায়ী ভিন্ন অনেক বিষয়ী লোকও রহিয়াছেন, তাই

"ভয়ে ভয়ে বলি—কি বলিব আর,
তা'না হ'লে শুনাতাম বীণার ঝঙ্কার।"

ফলে আমরা কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়ের মত সুপণ্ডিত ব্যক্তি যে শল্য চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার জন্য এ প্রবন্ধ পাঠ সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিতেছি। ঐ প্রবন্ধ বর্ত্তমান সংখ্যায় স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৩য় বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৫—পৌষ। | ৪র্থ সংখ্যা

কাজের কথা।

——:*:— —

স্বাস্থ্যরক্ষা।—স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে না পারিলে ধর্ম্ম বল, অর্থ বল, কাম বল, আর মোক্ষের কথাই বল—কিছুই লাভ করিবার উপায় নাই। আর্য্যঋষিগণ এই জন্যই সর্ব্বাগ্রে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অবহিত থাকে—নীরোগ ও সুস্থ দেহে যাহাতে দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারা যায়—আমাদের দৈনন্দিন কর্ত্তব্যের ভিতর দিয়াই তাহার বিধি সকল প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। সে সকল বিধি এখন আমরা আর মানিয়া চলিনা। ফলে অধিকাংশ বাঙ্গালীই যে এক্ষণে এত রোগজীর্ণ—তাহার প্রধান কারণই তাহাই।

*　　*　　*

সেকালের বাঙ্গালী।—সেকালের বাঙ্গালী এখনকার মত বিলাসিতার ধার সেটেই ধারিত না। বিলাসি হইবার উপায়ও তখনকার দিনে বুঝি বাঙ্গালীর এতটা ছিল না। তাহার কারণ—সেকালের অধিকাংশ বাঙ্গালীই আশৈশব মরণ পর্য্যন্ত পল্লী-জননীর ক্রোড় ছাড়িয়া সহরের সম্পদ উপলব্ধি করিবার সুযোগ পায় নাই। চাকরি তখনকার দিনে অধিকাংশ বাঙ্গালীকেই করিতে হইত না, ফলে অধিকাংশ—বাঙ্গালী সন্তান সেকালে ক্ষেতের ধান, বাগানের তরকারী, পুকুরের মাছ এবং গোয়ালভরা গাভীর দুগ্ধে উদরপূর্ত্তি করিয়া নিরুদ্বেগ চিত্তে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে সমর্থ হইতেন।

*　　*　　*

একালের কথা।—একালের বাঙ্গালীর সে সকল ব্যবস্থা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। ক্ষেতের ধান, বাগানের তরকারী, পুকুরের মাছ এবং গোয়ালভরা গাভীর ব্যবস্থা করিতে একালেও যাঁহারা সমর্থ, সহর বাসের স্পৃহা বলবতী হওয়া তাঁহারাও সে সকল বিসর্জ্জন দিয়াছেন। ফলে এখনকার

দিনে 'চাকরি'ই হইয়াছে অনেকের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপায়। কিন্তু সত্য কথা কহিতে গেলে—সে চাকরিলব্ধঅর্থে সহরে থাকিয়া সেকালের মত স্বচ্ছলভাবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা অনেকের পক্ষেই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালীর, স্বাস্থ্য হানির ইহাও একটা কারণ।

* * *

দৈনন্দিন কর্ম্ম।—সেকালের বাঙ্গালী যখন চাকরী করিতে জানিতনা,—তখন তাঁহাদের দৈনন্দিন কর্ম্ম যে ভাবে নির্ব্বাহিত হইত, এখন তাহারও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সে অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ, সর্ব্বাঙ্গ তৈলাক্ত করিয়া সে প্রাতঃস্নান, সে পূজা আহ্নিকে চিত্তশুদ্ধির ব্যবস্থা, শাস্ত্র-পুরাণাদির আলোচনায় সেকালের মত বৈকালিক সময় ক্ষেপণ, সন্ধ্যার পর মজলিস্ বসাইয়া কিছুক্ষণ গীতবাদ্যে আনন্দ উপভোগের ব্যবস্থা—একালে সমস্তই তিরোহিত হইয়াছে। সে সকল করিবার সময়ও এখন কাহারও নাই, সে প্রবৃত্তিও এখন লোপ পাইয়াছে। বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহানি হইবে না তো হইবে কাহার?

* * *

বিলাসিতায় স্বাস্থ্যহানি।—সে সকল ব্যবস্থা তো বাঙ্গালীর নিকট হইতে লোপ পাইয়াছেই—তা' ছাড়া বাঙ্গালী এখন সর্ব্ব প্রকারেই ঘোর বিলাসি হইয়া পড়িয়াছে। আগেকার বাঙ্গালী দশক্রোশ পথ চলিতেও কষ্ট বোধ করিতেন না, এখনকার বাঙ্গালীর এক পোয়া পথ চলিবারও ক্ষমতা নাই। যাঁহারা সহরে থাকেন, তাঁহাদের অর্দ্ধপোয়া যাইতে হইলেও ট্রামের দরকার। আগেকার মত সে তৈল মর্দ্দনের ব্যবস্থাও এখন অনেকের নিকটই যেন ঘৃণাজনক হইয়া পড়িয়াছে। সাবান এখন 'বাবু' দের তৈলের স্থান অধিকার করিয়াছে। সেকালের 'কেওরা' 'আতরে' এখন আর কাহারও মন উঠে না, নানারূপ বিলাতী 'সেণ্টে' তাহার স্থান পূর্ণ হইয়াছে। তামাকের ব্যবহারটা একেবারে উঠিয়া না যাইলেও 'সিগারেটের' চলন—তামাক অপেক্ষা দশগুণ—দশগুণ বলিলেও বোধ হয় কম হয়—বিশগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। আর চা, সোডা—লেমোনেডের কথা তো আমরা অনেকবারই বলিয়াছি। ফলে বাঙ্গালা পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অর্থের মুখ অধিক দেখিলেও সাবেক পদ্ধতি ছাড়িয়া বাঙ্গালী এখন যে সকল পদ্ধতিতে চলিতে শিখিয়াছে, তাহাই তাহার স্বাস্থ্যহানির কারণ।

* * *

মহিলাদিগের কথা।—শুধু পুরুষদিগের কথা নহে—বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালী-মহিলাগণেরও স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে। অনেক স্থলে তাহারও প্রধান কারণ—তাঁহাদিগের শারীরিক পরিশ্রমের অভাব। অনেক 'বাবু'ই এখন অর্দ্ধাঙ্গিনীদিগকে বিবি' করিয়া তুলিতে চাহেন। ফলে অনেক সংসারেই এখন উড়িয়া বা বাঁকুড়া-মেদিনীপুরের 'বামুনঠাকুর' ঢুকিয়াছে। ঝি-চাকরেরও অভাব নাই। কাজেই সেকালের মত মহিলাদিগকে ভোরে উঠিয়া ছড়া ঝাঁট দিয়া, আঙ্গিনা পরিষ্কার করিয়া, থালা-বাসন মাজিয়া আর রন্ধনাদির কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয় না। কাজেই 'বাবু' দিগের মত বাঙ্গালী 'বিবিরাও' এখন শারীরিক পরিশ্রম একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন। বাবুরা চাকরির জন্য—মানসিক শ্রম করেন, আর 'বিবিরা' নাটক—নবেল

পাঠে তাঁহাদের সে শ্রমের অংশভাগিনী হইয়া থাকেন। কাজেই বাঙ্গালী এখনকার দিনে এত হিষ্টিরিয়ারোগাক্রান্ত। আজকাল প্রসব করাইবার জন্যও এত যে ধাত্রীবিশারদ চিকিৎসকের প্রয়োজন হয়—তাহার কারণও ইহাই। বাঙ্গালী এ সকল কবে বুঝিবে?

* * *

দেশের ভবিষ্যৎ।—ফলে দেশের অবস্থা ক্রমেই যেরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে তাহাতে বাঙ্গালী মাত্রেরই আর নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে। নানারূপ রোগ-তাড়নে বাঙ্গালী পুরুষ ও মহিলাদিগের দেহ যেরূপ ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে বাঙ্গালী মাত্রেরই আত্মরক্ষার জন্য চিন্তাশীল হওয়া কর্ত্তব্য। শারীরিক শ্রম না করিলে স্বাস্থ্য-রক্ষা যে একেবারেই অসম্ভব, বিলাসি—বাঙ্গালী-গণ এ কথা বুঝিতে চেষ্টা করুন। বুঝিয়া সংসার পরিচালনার প্রত্যেক বিষয়েই পর মুখাপেক্ষী না হইয়া, নিজেরা কর্ম্মঠ হইতে চেষ্টা করুন এবং সঙ্গে সঙ্গে পুরমহিলাদিগকেও কর্ম্মনিরতা করিতে প্রয়াসপরায়ণ হউন,—তবেই আবার বাঙ্গালী পুরুষ ও মহিলাগণের স্বাস্থ্যোন্নতি সম্ভবপর হইবে, নতুবা দেশের ভবিষ্যৎ যে ক্রমেই তমসাচ্ছন্ন হইয়া উঠিবে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন।

আয়ুর্ব্বেদের প্রভাব।

বৈদ্য চিকিৎসার-সাফল্য।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব।)

আমাদের তখন পূর্ণ যৌবন। মনে পূর্ণ [illegible], প্রাণে পূর্ণ শান্তি, সংসারে পূর্ণ সুখ। [illegible] মাথায় খেয়াল চাপিল—একখানি মাসিক [illegible] বাহির করিতে হইবে। রাধাজীবন তখন [illegible] কবিতা লিখিতে শিখিয়াছে; আচার্য্য [illegible]চন্দ্র—সেই কবিতা "সাধারণীতে" ও "নবজীবনে" ছাপিতেছেন! স্বভাবকবি [illegible] সাহিত্যিক সমাজে তাহার একটু আদর [illegible] বাড়িয়াছে! কাজেই আমরা তাহাকে [illegible] কাগজে লিখিবার জন্য ধরিলাম। সে [illegible] কতকগুলি লেখকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করাইয়া দিল। আমরা দ্বিগুণ উৎসাহে—মাতৃভাষার সেবা আরম্ভ করিয়া দিলাম।

বন্ধুবর * * * বাবু তখন ছোট গল্প লেখেন। যৌবনে বিপত্নীক হইয়া তাঁহার হৃদয় সঞ্চিত প্রেম গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে-ছিল। সেই প্রেম তাঁহার গল্পগুলিকে বেশ রসাল ও মধুর করিয়া তুলিত। তাঁহাকে দিয়া আমাদের কাগজে গল্প লিখাইতে হইবে। এই শুভ কামনায় অনুপ্রাণিত হইয়া, রাধা-জীবন, আমি ও অম্বিকাদাদা বন্ধুবরের

বাসায় উপস্থিত হইলাম। কিন্তু তাঁহার ভৃত্যের মুখে শুনিলাম—বন্ধুবর অনেকদিন হইতেই শয্যাগত। তাঁহার নীচে নামিবার শক্তি নাই। আমরা সংবাদ দিয়া উপরে উঠিলাম। দেখিলাম—একটী ক্ষুদ্র কক্ষে—এক মলিন শয্যার উপর বন্ধু শুইয়া আছেন। তাঁহার হস্ত ও পদদ্বয়ের গ্রন্থিতে ফ্লানেল জড়ান। বন্ধু অতিকষ্টে আমাদের বসিতে বলিলেন। আমরা যে উদ্দেশে গিয়াছিলাম, তাহা ভুলিয়া গিয়া, বন্ধুর রোগের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম।

বন্ধু কোন কথা গোপন করিলেননা। অকালে পত্নী-বিয়োগ, পত্নীর প্রতি অগাধ ভালবাসার খাতিরে পুনর্বিবাহের অস্বীকার; তাহার পর সঙ্গদোষে পদস্খলন, সর্ব্বশেষে চরিত্রহীনতার প্রতিফল এই নিদারুণ সন্ধিবাত রোগে—উত্থান শক্তি রহিত। দুঃখের কথা, রোগের কথা, প্রাণের ব্যথা, বলিতে বলিতে বন্ধুর চক্ষু দু'টী সজল হইয়া উঠিল।

এই সময় একজন ডাক্তার সেইগৃহে প্রবেশ করিলেন। শুনিলাম—দুই মাস ধরিয়া ইনিই বন্ধুর চিকিৎসা করিতেছেন। দুঃখের বিষয় এমন সুচিকিৎসকের হাতে পড়িয়াও বাতের যন্ত্রণা একদিনের জন্যও কমে নাই। ডাক্তার বাবু প্রেস্কৃপসন লিখিয়া দিয়া যথারীতি ভিজিট লইয়া চলিয়া গেলেন।

বন্ধুর কাতরতা দেখিয়া তাঁহাকে আর একজন ডাক্তারকে ডাকিবার উপদেশ দিলাম। চীৎপুর রোডের উপর একজন বড় ডাক্তার ছিলেন, তাঁহারই নাম করিলাম। বন্ধু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন—"উঁহাকেও দেখান হইয়াছে। ডাক্তারী চিকিৎসার হদ্দমুদ্দ করিয়াছি। কেবল সামর্থ্যে কুলাইবেনা বলিয়া সাহেব ডাক্তার ডাকি নাই। বড় বড় বিলাতী পেটেণ্ট ঔষধ ও মালিশ পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়াছি। কোন কোন ঔষধে সাময়িক উপকারও পাইয়াছি, রোগ কিন্তু সারে নাই। বেদনা, যন্ত্রণা, জ্বর,—এই সাত-মাস সমভাবেই রহিয়াছে।" এই বলিয়া বন্ধু তাঁহার মাকে ডাকিয়া একটী ছোট বাক্স আনিতে বলিলেন ঐ বাক্স উদ্ঘাটিত হইলে আমরা দেখিলাম—উহা প্রেস্কৃপসনে পূর্ণ!!

বন্ধুকে যে সকল ডাক্তার চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহারা প্রত্যেকেই জনসমাজে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা গাউট ও সন্ধিবাতের বড় বড় ঔষধ—কার্ব্বনেট অফ গোয়েকাল, পটাসিয়ম থাইওডাইড, নক্সভমিকা, কম্পাউণ্ড হাইপো-সিকো ফস্‌ফেট, আর্সেনিক, আয়রণ,—সমস্তই প্রয়োগ করিয়াছিলেন, কিছুতেই কিছু হয় নাই।

ডাক্তারের প্রেস্কৃপসন দেখিয়া, আমরা প্রযুজ্য ঔষধের নাম গুলি জানিতে পারিলাম। মনে মনে বুঝিলাম—এ বাত ভাল হইবার নহে। শুধু ঔষধ সেবন কেন, লোকের পরামর্শেই বন্ধু নাকি দিনকতক আফিম্ এবং মেডিসিন্ ডোজে মদ্য অভ্যাস করিয়াছিলেন, তাহাতেও যন্ত্রণার হ্রাস হয় নাই। শেষে যে ডাক্তার চিকিৎসা করিতেছিলেন, তিনিই বন্ধুকে বদভ্যাস হইতে মুক্ত করিয়াছেন শেষোক্ত ডাক্তারের ব্যবস্থা মত—বন্ধু দুইমাস ধরিয়া সালসা সেবন করিতেছেন, কিন্তু ভাগ্য দোষে,—বাঁধাসাল্‌সাও ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

রাধাজীবন আগাগোড়া সব কথা শুনিতে ছিল এবং বন্ধুর রুগ্ন শরীরের পানে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল। সে সহসা বলিয়া উঠিল

"একবার কবিরাজ দেখাইলে হয় না?" বন্ধুর বৃদ্ধা মাতা—এ কথায় সর্ব্বপ্রথম সায় দিলেন। আমরাও ভাবিলাম—মন্দ কি? একটু রকম ফের হইবে এ বাঙ্গালীর বিদ্‌ঘুটে বাত—বাঙ্গালা ঔষধেরই দরকার।

সে'দিনের মত আমরা বিদায় লইলাম। পথে পরামর্শ হইল—রাধাজীবন নিজে কবিরাজ লইয়া আসিবে। আমি ও অম্বিকা, বন্ধুর বাটীতে অপেক্ষা করিব। সময়—অপরাহ্ণ।

পরদিন আমাদের যাইতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল। কিন্তু আমরা গিয়া দেখিলাম—রাধাজীবন তাহার কথা রক্ষা করিয়াছে। সে কবিরাজ মহাশয়কে লইয়া আসিয়াছে। কবিরাজ মহাশয়কে দেখিয়া আমাদের বড়ই ভক্তি হইল। দীপ্ত গৌরবর্ণ—সুন্দর চেহারা। যেন ঋষিযুগের মানুষ। আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিলাম।

কবিরাজ মহাশয় রোগীকে ক্রমাগত প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। সে যেন মহা-অপরাধীর প্রতি উকীলের জেরা! এই সুযোগে রাধাজীবন বলিল—"ইনিই এখন কলিকাতার বড় কবিরাজ; আমার পিতার পরম বন্ধু; নাম লোকনাথ মল্লিক, পাতিলপাড়ায় নিবাস; এক্ষণে ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তীর লেনে বাড়ী করিয়াছেন।"

কবিরাজ মহাশয় উঠিলেন; রোগীর অবস্থা দেখিয়া, রাধাজীবনের মুখে রোগীর দারিদ্র্যের পরিচয় পাইয়া ভিজিটও লইলেন না। পরদিন ঔষধ আনিবার উপদেশ দিয়া কবিরাজ গাড়ীতে চড়িলেন।

যথাসময়ে ঔষধ আসিল। রোগী লবণ-জল বন্ধ করিয়া ঔষধ সেবন আরম্ভ করিল। এবং ৪ দিন অন্তর রেড়ির তৈল ও গোমূত্র একত্র মিশাইয়া পান করিতে লাগিল। ঔষধ—একখণ্ড শালপত্রে মোড়া ছিল। তাহার বর্ণ—ঘোর কাল, হিংএর উগ্রগন্ধ। শুনিলাম—ঔষধটীর নাম "রসোন পিণ্ড।" কিন্তু আশ্চর্য্য তাহার শক্তি—১২ দিনের পর বন্ধুর সন্ধির অমন বেদনা যেন মন্ত্রবলে উড়িয়া গেল। একমাসের মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন। সামান্য "রসোন পিণ্ড" তাঁহাকে নব জীবন দান করিল। বন্ধু অনুতাপ করিতে লাগিলেন—হায়! নিজের ঘরে এমন সহজলভ্য মহৌষধ থাকিতে—বৃথা চিকিৎসায় কত টাকাই তিনি নষ্ট করিয়াছেন।

এ ঘটনা—আমার কল্পনাপ্রসূত আখ্যায়িকা নহে। ইহা প্রত্যক্ষদৃষ্ট, বাস্তব ঘটনা। অম্বিকা মরিয়াছে, রাধাজীবনও কালস্রোতে ভাসিয়াছে, বন্ধুবর এখনও জীবিত থাকিয়া মাতৃভাষার সেবা করিতেছেন। আর কবিরাজী চিকিৎসার এই অপূর্ব্ব সাফল্যের একমাত্র সাক্ষী হইয়া, এখনও আমি আমার সত্তা অনুভব করিতেছি।

রসুনপিণ্ডী খাইয়া বন্ধু আমার নবজীবন,—নব যৌবন লাভ করিয়াছেন; আবার তাঁহার বিবাহ হইয়াছে, তিনটী পুত্র ও একটী কন্যা—নূতন বধূর ক্রোড়শোভা করিয়াছে। সর্ব্বকণিষ্ঠ পুত্রটী গতবারে ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

শ্রীতারকনাথ বিশ্বাস।

অস্ত্রোপচার।

অবতরণিকা।

—:*:—

আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থী ছাত্রগণকে অস্ত্র চিকিৎসা শিখাইবার উদ্যোগ এ পর্য্যন্ত কেহ করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। তাই যে দিন আমার অনুজতুল্য শ্রীমান্ ব্রজবল্লভ রায়ের মুখে কলিকাতায় 'আয়ুর্ব্বেদ কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে শুনিলাম, সে দিন আমার মনে বড়ই আনন্দ হইয়াছিল। আমি অনেক দিন হইতে হাসপাতালে কার্য্য করিয়াছি,—আমাকে অনেক রোগীর অঙ্গে অস্ত্রোপচার করিতে হইয়াছে। এখন চাকুরী ছাড়িয়া বাড়ীতে বসিয়া আছি। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের চর্চ্চা করিতেছি। আমিত 'কম্‌লী' ছাড়িয়াছি, কিন্তু "কমলী" তো আমাকে ছাড়ে না। এখনও কোথাও অস্ত্র চিকিৎসা করিতে হইলে—লোকে আমাকে ডাকিতে আসে। বৃদ্ধবয়সেও আমার কপালে অবসর-সুখ নাই!

সেদিন একটী ক্যান্‌সার রোগীর চিকিৎসার জন্য হুগলীর এক ভদ্রলোকের বাটীতে আহুত হই। সেখানে বৈদ্যশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ব্রজবল্লভ ভায়ার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। সেই সময় ব্রজবল্লভ ভায়া আমাকে বলেন—"দাদা! আমাদের আয়ুর্ব্বেদ কলেজের মাসিক পত্র "আয়ুর্ব্বেদে" আপনাকে অস্ত্রোপচার সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিতে হইবে।" ভায়ার কাছে প্রতিশ্রুত হইলাম—'লিখিব।' আজ সেই প্রতিশ্রুতি পালন করিতে বসিয়াছি। আমার মত লোকের অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধে যদি আয়ুর্ব্বেদপাঠার্থী কোন ছাত্রের কিছু উপকার হয়, আমার লেখনি সার্থক হইবে।

সংজ্ঞাহারক ঔষধ এবং তাহার প্রয়োগের পরবর্ত্তী ফল।

ভগবান সুশ্রুতের সময়ে এবং তাহার পরবর্ত্তীকালে—এদেশের বৈদ্য-সমাজে অস্ত্র চিকিৎসার প্রচলন ছিল। সে কালের বৈদ্যগণ যে সকল যন্ত্র ও শস্ত্র ব্যবহার করিতেন, এখনকার উন্নত শল্যতন্ত্রেও সে সকল অস্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তবে এখনকার অস্ত্র-শস্ত্রে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অনেক নূতন অস্ত্রও বাহির হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই —সেকালের ঋষি-বৈদ্যগণ যে যে রোগে অস্ত্র চিকিৎসা করিতেন, একালের বড় বড় সার্জ্জনেরাও প্রায় সেই সেই রোগে অস্ত্র চিকিৎসা করিয়া থাকেন।

আয়ুর্ব্বেদের "শল্য তন্ত্র" পাঠে জানা যায় —সেকালের বৈদ্যগণ পূর্ব্বে—রোগীর শরীরে অস্ত্র প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে রোগীকে উপযুক্ত ভাবে প্রস্তুত করিয়া লইতেন। পরে অস্ত্র প্রয়োগের অব্যবহিত পূর্ব্বে—"সংজ্ঞাহারিণী" ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া রোগীর চৈতন্য লোপ করিতেন। এই শ্রেণীর ঔষধের নাম ছিল "সম্মোহিনী।" শেষে অস্ত্র চিকিৎসা হইয়া গেলে—"সঞ্জীবনী" ঔষধ প্রয়োগ করে —অস্ত্রোপচারের পর রোগীর দেহ গ্লানির

হইত, কোনও আগন্তুক উপসর্গ উপস্থিত হইতে পারিতনা। 'ভোজ প্রবন্ধ' প্রভৃতি গ্রন্থে—এই সকল বিবরণ জানা যায়। যাঁহারা জানিতে চাহেন, পড়িয়া দেখিবেন। আমি বেশী কথা বলিব না। আমি কেবল বলিতে চাই—এখনকার আয়ুর্ব্বেদপাঠার্থীগণ যদি অস্ত্র চিকিৎসা শিখিতে চাহেন, তবে তাঁহারা সে কালের সেই "সম্মোহনী" ও "সঞ্জীবনী" বুঝিবার চেষ্টা করুন। উহা যে কিরূপ ঔষধ ছিল আমার মত লোকে তাহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিবে না। কিন্তু কবিরাজগণ এতদ্বিষয়ের অনুসন্ধান করিলে, দেশের একটী মহা অভাব দূরীভূত হইতে পারে।

ক্লোরোফরম।

এখনকার ডাক্তারী "সম্মোহনীর" নাম "ক্লোরোফরম্"। বড় বড় অস্ত্র চিকিৎসার ব্যাপারে—আমরা ক্লোরোফরমের সাহায্যে রোগীকে অজ্ঞান করিয়া থাকি। কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়—"ক্লোরোফরম" প্রয়োগ—নিরাপদ নহে। অনেক ক্ষেত্রে ইহার দ্বারা রোগীর দেহে মন্দ লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। এমন কি ক্লোরোফরম-প্রয়োগের দূরবর্ত্তী ফলে—অনেক রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। তাই বলিতেছিলাম—কবিরাজ মহাশয়গণ যদি প্রাচীন কালের "সম্মোহনী" ও "সঞ্জীবনী" ঔষধের তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিতে পারেন, বড়ই ভাল হয়।

বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল রোগীর দেহে ক্লোরোফরম প্রয়োগ করিলে, বিপদের সম্ভাবনা অধিক। অথচ যেখানে দেখা যায়, ক্লোরোফরম-প্রয়োগ ভিন্ন গত্যন্তর নাই, সেখানে রোগীকে পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়—অনেক সময় এমন রোগীও পাওয়া যায়—তৎক্ষণাৎ তাহার দেহে অস্ত্রোপচারের আবশ্যক। এরূপ রোগীকে আগে থেকে প্রস্তুত করা অসম্ভব নহে কি? এমন অবস্থায় অর্থাৎ রোগীকে প্রস্তুত করিয়া লইবার সময় না পাইলে—ক্লোরোফরমের গৌণ ফলে—রোগীর বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

আগে থেকে রোগীকে প্রস্তুত না করিয়া লইলে, ক্লোরোফরম-প্রয়োগে রোগীর বড়ই যন্ত্রণা হইয়া থাকে। ক্লোরোফরমের যন্ত্রণা, অস্ত্র প্রয়োগের যন্ত্রণা উভয়ে একত্র হইয়া রোগীকে কাতর ও বিপন্ন করিয়া তোলে। আমি স্বয়ং দেখিয়াছি—যে স্থলে অধিক সময়ব্যাপী ক্লোরোফরমের প্রয়োগ আবশ্যক হইয়াছে, সেই স্থলেই রোগীর বিপদ ঘটিয়াছে। ক্লোরোফরম প্রয়োগে রোগীর দেহে কি কি মন্দ লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে, একে একে তাহা দেখাইতেছি।

(ক) বমন।

বমন।—ক্লোরোফরমের প্রয়োগ করিয়া অস্ত্রোপচার করিলে, সংজ্ঞালাভের পূর্ব্বে রোগীর বমন উপস্থিত হয়। এই বমনে শ্লেষ্মা ও পিত্ত মিশ্রিত থাকে। কিছুক্ষণ পরে কাহারও কাহারও বমি আপনা আপনি বন্ধ হয়, কাহারও বমি ৭।৮ দিন পর্য্যন্ত থাকে। এমনও দেখিয়াছি—অনবরত বমি করিয়া রোগী বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, অধিকন্তু পুষ্টিকর পথ্য পরিপাক না পাওয়ায় রোগী ক্রমে জীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

যাঁহারা ক্লোরোফরমের সাহায্যে রোগীকে অজ্ঞান করিবেন, তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত—রোগী সংজ্ঞালাভ করার পর যেন উঠিয়া না বসে, এমন কি শয্যা বা বস্ত্র পরি-

বর্ত্তনের সময় তাহার শরীরে যেন ঝাঁকানী না লাগে। রোগী সুস্থিরভাবে চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিলে—বমনোদ্বেগ নিবারিত হইতে পারে।

১৫ বৎসর পূর্ব্বে আমি যে সাহেব ডাক্তারের সাহায্যকারী ছিলাম—তিনি সংজ্ঞাহরণের জন্য 'ইথর' প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু ইথরের বাষ্প পাকস্থালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর পথে বহির্গত হওয়ায় তথায় উত্তেজনা উপস্থিত হয়, এইজন্য বেশী বমি হইয়া থাকে। আবার ক্লোরোফরম পাকস্থলী পথে না যাইলেও,—ইহার দ্বারা প্রবল বমন হইতে পারে। ফলে আমার মনে হয়—স্নায়ুকেন্দ্রের উপর সংজ্ঞাহারক ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশ—এই বমনোদ্বেগের একমাত্র কারণ। তবে 'ইথর বা' ক্লোরফরম যাহাই প্রয়োগ করা হউক না কেন, মুখের লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহার কিয়দংশ যে পেটের ভিতর গিয়া বমনোদ্বেগ উপস্থিত করে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? পাকস্থালীর প্রদাহ না হইলে বমি হয় না, এই জন্যই বোধ হয় প্রবীনাচার্য্যগণ অস্ত্রোপচারের অব্যবহিত পূর্ব্বে রোগীকে পঞ্চপল্লবের কল্ক, উশীর-কষায় বা গুড়ূচীর কাথ পান করাইতেন। আমরা একালের ডাক্তার—আমরা রোগীর পাকস্থালীস্থিত উত্তেজক পদার্থ তরল করিবার জন্য—ক্লোরোফরম করিবার পূর্ব্বে রোগীকে একগ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াই। ইহাতে রোগীর কতকটা উপকার হয়।

অস্ত্রোপচারের ফলে পাকস্থালীতে রক্ত প্রবিষ্ট হইলেও, সেই রক্তের উত্তেজনায় রোগীর বমন হইতে পারে। কিন্তু রোগী বয়স্ক হইলে, বমন খুব কম হয়। কথনওবা ইউরিয়ার জন্য রোগীর শরীর বিষাক্ত হইয়া বমন উপস্থিত করে।

ক্লোরোফরম-প্রয়োগ করিয়া রোগীকে দক্ষিণপার্শ্বে শয়ন করাইলে, তাহার পাকস্থালীস্থিত পদার্থ অতি সহজে ডিউডিনমে প্রবেশ করে. কাজেই আর উত্তেজনা উপস্থিত হইতে পারে না, বমিও বন্ধ হইয়া যায়। রোগীকে সম্পূর্ণ চিৎ করিয়া না শোয়াইয়া অৰ্দ্ধশায়িতাবস্থায় রাখিলেও বমন বন্ধ হইতে পারে। দুগ্ধাদি তরল পদার্থ পান করিবামাত্র যদি রোগীর বমনোদ্বেগ উপস্থিত হয়, তবে তাহা না দেওয়াই উত্তম।

যে রোগীর বমন আরম্ভ হইয়াছে, অথচ সম্পূর্ণ জ্ঞান হয় নাই, তাহাকে শয্যায় শয়ন করাইবে এবং তাহার মাথা একপার্শ্বে এমন ভাবে নীচু করিয়া রাখিবে, যেন বান্ত পদার্থ—মুখ হইতে আপনা আপনি বাহির হইয়া যায়। মুখ উঁচু করিয়া রাখিলে, যদি বমন হয়, তবে বান্ত পদার্থ দ্বারা শ্বাসরুদ্ধ হইয়া রোগীর তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটে। আমি ২।৩টী রোগীকে এইরূপে মরিতে দেখিয়াছি।

বৈদ্যশাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে—অস্ত্রোপচারের পূর্ব্বে—পঞ্চকর্ম্ম দ্বারা শরীরকে সংশোধন করিয়া লওয়া। ইহার তুল্য নিরাপদ ও উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা আর হইতে পারেনা। এমন অস্ত্রোপচার আছে—যাহাতে রোগীর বমি হইলেই বিপদের সম্ভাবনা। ডাক্তারী মতে এইরূপ অস্ত্রোপচারের পরে, রোগীর পাকস্থালী গরম জলের ডুস্ দিয়া ধুইয়া দিতে হয়, কিন্তু পঞ্চকর্ম্ম দ্বারা সংশুদ্ধ দেহে এইরূপ ডুস্ দিবার প্রয়োজনই হয় না।

সংজ্ঞানাশক ঔষধের প্রভাব কমিয়া আসিলে অর্থাৎ রোগীর [illegible] ফিরিয়া আসিলে

যদি বমন হয় তবে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া গুলি করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

(ক) এক গেলাস গরম জল পান।

(খ) ২টী বড়এলাচ বাটিয়া একপোয়া জলে গুলিয়া পান।

(গ) ভাজা মুগ ৫ ভরি, /২ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধসের থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথ ঈষদুষ্ণ থাকিতে থাকিতে পান।

(ঘ) কমলালেবুর শুষ্ক খোসা অর্দ্ধ তোলা, আধসের গরম জলে আধঘণ্টা ভিজাইয়া ছাঁকিয়া সেই জল পান।

(ঙ) ২৫ গ্রেন বাইকার্ব্বনেটঅফ পটাশ একপোয়া গরম জলে গুলিয়া পান।

(চ) ৩ মিনিম টিংচার আইওডিন এক পোয়া ঠাণ্ডা জলের সহিত পান।

(ছ) গাঢ় করিয়া কাফী ১ পেয়ালা পান।

(জ) শ্যাম্পেন নামক মদ্য পান।

(ঝ) ২ গ্রেন অ্যাসিটি-নিলিড—আধ ঘণ্টান্তর সেবন—এইরূপ ৪ বার।

(ঞ) মধুর সহিত ৵০ আনা পরিমাণ হরীতকী চূর্ণ লেহন।

(ট) পূর্ব্বদিন প্রস্তুত করা গুলঞ্চের ক্বাথ পান।

(ঠ) আতপ চালের চেলুনী সহ শ্বেত চন্দনের কল্ক পান।

(ড) আমলকীর রস ২ তোলা মাত্রায় পান।

পূর্ব্বোক্ত যোগ গুলি মৎ কর্ত্তৃক বহুবার পরীক্ষিত হইয়াছে। ডাক্তারী পুস্তকে বমন নিবারক আরও কতিপয় ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

১। ডাইলুট হাইড্রোসিয়ানিক এসিড্ অল্প মাত্রায় পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ।

২। মুখ পথে বা অধস্ত্বারিক প্রণালীতে মর্ফিয়া প্রয়োগ।

৩। রোগী স্নায়বিক ধাতু প্রকৃতির হইলে পটাশ ব্রোমাইড প্রয়োগ। ব্রোমাইড্ দুই উপায়ে দেওয়া যায়, মলদ্বারে মুখ পথে। ২০ গ্রেণ ব্রোমাইড্ ২ উন্স জলে গুলিয়া পিচকারীর সাহায্যে মলদ্বারে প্রয়োগ করিতে হয়। ১০ গ্রেণ ব্রোমাইড্ জিহ্বার তলায় রাখিয়া দিতে হয়।

সাহেব ডাক্তারের মধ্যে ২।১ জনকে এই বমন নিবারণের জন্য—রোগীর পেটে (পাকস্থালী প্রদেশে গরম জলে সিক্ত ফ্লানেলের পুনঃ পুনঃ ফোমেণ্টেসন্ প্রয়োগ করিতে দেখিয়াছি।

অত্যুগ্র পিপারমেণ্ট ৫ হইতে ১০ ফোঁটা মাত্রায় কিঞ্চিৎ চিনীর সহিত মিশাইয়া রোগীকে চুষিয়া খাইতে দিলেও বমি নিবারিত হইতে পারে। অম্লজানবাষ্প পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিলেও প্রবল বমি থামিতে পারে।

অনেক দিন ধরিয়া রোগীর বমি হইতে থাকিলে, বমনের বেগে পেশীতে আঘাত লাগে, রোগী তাহাতে বক্ষঃস্থলে বেদনা বোধ করে। এই বেদনা অতি কষ্টপ্রদ। অনেক সময় মনে হয়—বুঝিবা রোগীর প্লুরিসি হইয়াছে।

(খ) ফুসফুসের পীড়া।

ক্লোরোফরম বা ইথর প্রয়োগে—রোগী ফুস্ফুস্ আক্রান্ত হইতে পারে। ক্লোরোফরমের চেয়ে ইথরেই ইহার অধিক সম্ভাবনা। ফুস্ফুস্ আক্রান্ত হইলে ব্রঙ্কাইটিস্ দেখা দেয়। রোগী মন্দ প্রকৃতির হইলে সেই ব্রঙ্কাইটিস্ ক্রমে নিমোনিয়ার আকার ধরিয়া তাহার জীবিতকাল সংক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। এই

নিমোনিয়াকে ইংরাজীতে—"পোষ্ট অপারেটিভ নিমোনিয়া বলে।"

বস্তি ও উদর গহ্বরে অস্ত্রোপচারের পর—এইরূপ নিমোনিয়া হইতে পারে। ক্লোরোফরম করিয়া অস্ত্রোপচার অন্তে, রোগীর দেহে ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলেও—ইহা হইতে পারে। অতএব যাহাতে ফুস্‌ফুসের ইনফার্কসন না হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবে। নিমোনিয়া হইলে নিমোনিয়ার চিকিৎসা করিবে। বৈদ্যমতে—বাসক, কণ্টকারি, যষ্টিমধু, কুড়, কটফল, পিপুল, কাঁকড়াশৃঙ্গ ও বামনহাটীর পাচন—নিমোনিয়ায় উৎকৃষ্ট ঔষধ।

(গ) মূত্র যন্ত্রের রোগ।

ক্লোরোফরম প্রয়োগের পর অস্ত্রোপচার শেষে—রোগীর মূত্রযন্ত্র আক্রান্ত হইতে পারে। প্রথমে ইহা এলবুমিনুরিয়ার আকারে দেখা দেয়। অস্ত্রোপচারের পর রোগী ক্ষণ কালের জন্য চেতনা লাভ করিয়া আবার অজ্ঞান হইয়া পড়ে। আর তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসেনা। এই অবস্থায় মৃত্যু ঘটে। লোকে মনে করে—অস্ত্রোপচারের ফলেই বুঝি রোগী মরিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা নহে। এই অজ্ঞানতার নাম—"ইউরিমিক কোমা।" এইরূপ অবস্থায় মৃতরোগীর শবচ্ছেদ করিয়া মূত্রযন্ত্রের পীড়া দেখা গিয়াছে। এ রোগের ফলপ্রদ ঔষধ অদ্যাবধি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে আবিষ্কৃত হয় নাই। কবিরাজী বিজ্ঞানে ইহার ঔষধ আছে কিনা, আমি জানি না।

অতএব ক্লোরোফরম প্রভৃতি প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে—রোগীর মূত্র পরীক্ষা করা উচিত।

অস্ত্রোপচারের পর অবসন্নতা বা সংজ্ঞাহীনতা অধিকক্ষণ স্থায়ী দেখিলে, ঘর্ম্মকারক ঔষধ ব্যবস্থেয়। শিরা মধ্যে লবণ দ্রব্য প্রয়োগও ভাল। কোমল রবারের নলের সাহায্যে—রোগীর মলদ্বারে—ঈষদুষ্ণ জলের লবণ দ্রব ১ পাঁইট মাত্রার ধীরে ধীরে প্রয়োগ করিতে হয়। প্রথম বারে ফল না পাইলে ৩ ঘণ্টা পরে আবার দিতে হয়। ইহাতে প্রস্রাব পরিষ্কার হইতে পারে।

(ঘ) পাণ্ডু।

ক্লোরোফরমের পর অনেক সময় রোগীর জণ্ডিস্ (কামলা-পাণ্ডু) রোগ দেখা দিতে পারে। ইহার কবিরাজী ঔষধ—নবায়স লৌহ, ফল ত্রিকাদি পাচন" বা দারু—হরিদ্রার ক্বাথ।

(ঙ) উন্মত্ততা।

রোগীর পূর্ব্বে কখনও উন্মাদ রোগ হইয়া থাকিলে, ক্লোরোফরম—প্রয়োগে আবার তাহা দেখা দিতে পারে। অত্যন্ত বায়ু প্রকৃতির লোকেরও উন্মত্ততা আসিতে পারে। ইহার চিকিৎসা—আশ্বাস ও স্নিগ্ধ তৈল।

(ঙ) অচৈতন্যতা।

বহুমূত্ররোগীর শরীরে ক্লোরোফরম প্রয়োগ করিলে, তাহার ডাইবিটিক কোমা" হইতে পারে। এ রোগ অসাধ্য। তবে অস্ত্রোপচারের পূর্ব্বে উপযুক্ত পথ্যের ব্যবস্থা করিলে উপকার হইতে পারে।

(চ) পক্ষাঘাত।

ক্লোরোফরম-প্রয়োগের পর রোগীর পক্ষাঘাত হইতে পারে। রক্তাধিক্যজনিত আক্ষেপের ফলেই ইহা দেখা দেয়। চিকিৎসা—সাধারণ পক্ষাঘাতের।

(ছ) রক্ত বমন।

ক্লোরোফমের পর অন্ত্রে অস্ত্রোপচার করিলে ২।১ জনের রক্ত বমন হইয়া থাকে। এ [illegible]

কিন্তু বিরল। ছাগদুগ্ধ ও যজ্ঞডুমুরের রস পান—ইহার প্রতিষেধক।

(জ) রক্তোৎকাস।

রোগীর যদি ফুস্‌ফুসের ক্ষয়রোগ থাকে, তবে ক্লোরোফরমের পর—কাসির সহিত রক্ত উঠিতে পারে। বাসকপাতার রস, মধু ও লাক্ষাচূর্ণ—একসঙ্গে চাটিয়া খেলে ইহা নিবারিত হইয়া থাকে।

(ঝ) হিক্কা।

ক্লোরোফরমের পর রোগীর হিক্কাও উপস্থিত হইতে পারে। এ হিক্কা সহজে বন্ধ হয় না। জিহ্বা টানিয়া ধরিলে বন্ধ হইতে পারে। বৈদ্যমতের হিক্কানাশক মুষ্টিযোগ গুলি পরীক্ষা করিলে উপকারের সম্ভাবনা। যেমন স্তনদুগ্ধে রক্ত চন্দন ঘষিয়া সেবন।

ক্লোরোফরম বা ইথর প্রয়োগ করিলে কত রকম বিপদ ঘটিতে পারে, আমি তাহার কয়েকটী দেখাইলাম। অথচ অস্ত্রোপচারের পূর্ব্বে এই শ্রেণীর সংজ্ঞাহারক ঔষধ ব্যবহার করাও চাই। সেই জন্য আমার অনুরোধ—প্রাচীন শল্যতন্ত্রে যে "সম্মোহনী" ঔষধের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কবিরাজ মহাশয়েরা তাহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিলে তাঁহাদের শল্যতন্ত্র আবার বাঁচিয়া ওঠে।

ক্লোরোফরমজনিত উপসর্গ গুলির যখনই আমি চিকিৎসা করিয়াছি, তখনই কবিরাজী মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করিয়াছি, অনেক ক্ষেত্রে সুফলও পাইয়াছি। তাই আমার জানিতে ইচ্ছা হয়—"সম্মোহনী ঔষধটী কি? হায় ঋষি! তোমরা ত অপূর্ব্ব প্রতিভা বলে, সংজ্ঞাহারিণী "সম্মোহনীর" আবিষ্কার করিয়া গিয়াছিলে, আমরা তাহার নামও ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা তোমাদের এমনি কৃতজ্ঞ সন্তান!

সে'দিন এক ইংরাজী নবিশের বাঙ্গালা প্রবন্ধে পড়িতেছিলাম—শল্যতন্ত্রের "সম্মোহনী" ঔষধ আর কিছুই নহে—"গঞ্জিকা"। বিলাতী শিক্ষার স্পর্দ্ধা লইয়া ঋষিপ্রতিভার অপূর্ব্ব সমালোচনা! কোথায় তুমি মহর্ষি সুশ্রুত! আর একবার—এই দেশাত্মবোধের মাঝে ফিরিয়া এস,—আমাদের মত পিতৃ পরিচয় বিস্মৃত অজ্ঞকে একবার "সম্মোহনী" ও "সঞ্জীবনীর" স্বরূপ চিনাইয়া দাও, শল্যতন্ত্রের সম্মান রক্ষা কর।

আয়ুর্ব্বেদের প্রত্নতত্ত্ব লইয়া বিচার করিতে পারেন,—শ্রীমান্ ব্রজবল্লভ ভায়া। কিন্তু তিনি পেটের দায়ে বিব্রত,—স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিবার তাঁহার সময় কৈ? বাঙ্গালার সর্ব্বত্র—সাইন বোর্ডে—বৃহদক্ষরে নাম লেখা অনেক কবিরাজ দেখিতে পাই, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কি এই "সম্মোহিনী"র স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারেন না? তাঁহাদের আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার ফল কি কেবল—'সস্তায় চ্যবনপ্রাশ' বিক্রয় করা?

(ক্রমশঃ)

ডাঃ শ্রীসত্যজীবন ভট্টাচার্য্য।
(অবসর প্রাপ্ত—অ্যাসিষ্টেণ্ট সার্জ্জন)

বর্ত্তমান জনপদবিধ্বংসী রোগের কারণ ও নিরাকরণ-উপায়।

—:*:—

কি সঙ্কট সময় আসিয়াছে; মৃত্যু নিজ করাল ছায়া বিস্তার করিয়া হুহুঙ্কারে অসংখ্য নরনারী, বালক-বালিকা, শিশু বৃদ্ধকে কাল-কবলিত করিতেছে। সকলেই শঙ্কিত। শোকের নিদারুণ ধ্বনি দেশ প্লাবিত করিতেছে। এই সময় অনেক স্থানে চিকিৎসক নাই, ঔষধ নাই, পথ্য নাই, এমন কি অনেক স্থানে রোগীর দেহে শীত নিবারণের সামান্য বস্ত্র নাই। দেশের ধনী,—বিলাসী—বড় লোকদের বলি, একবার পল্লীগ্রামে গিয়া দেখিয়া আসুন, যে, কি ভীষণ অবস্থা। বিশাল বিস্তীর্ণ মাঠ—সব জ্বলিয়া পুড়িয়া গিয়াছে। যেখানে দশহাজার মন ধান্য হইত, সেখানে দশ মন ধান্য নাই। গত বৎসরের যৎসামান্য যাহা ছিল, তাহা ফুরাইয়া আসিতেছে. তাহার পর উপায় কি হইবে ভাবিয়া পল্লীবাসী কূল-কিনারা পাইতেছেনা। দেহে জীর্ণ বস্ত্র শতছিদ্রে শীতের প্রকোপ আরও বাড়াইয়া দিতেছে। যেমন তুষানলে দগ্ধ হইলে বহুবিলম্বে বহুকষ্টে প্রাণবায়ু বহির্গত হয়, তদ্রূপ তাহাদের মৃত্যু ভয়ানক কষ্টে হইবার উপক্রম হইয়াছে। এই সকল পল্লীবাসিগণ তাহাদের কঠোর পরিশ্রম দ্বারা শস্য উৎপন্ন করিয়া সহরের লোককে খাওয়াইতেছে। শস্য কিছু সহরে হয়না; সবই পল্লীগ্রাম হইতে আইসে। কিন্তু এক-দিকে এই ভীষণ হৃদয়বিদারক দৃশ্য, অন্যদিকে সহরে যথাপূর্ব্ব বিলাস স্রোত! সেই বেশ-ভূষা—সেই বিন্যাস—সেই চুরুট চা পান—সেই মোটর গাড়ি—সেই চিত্তবিনোদনের জন্য নৃত্য গীতাদি শ্রবণ-দর্শন,—সেই সকল বিলাসের কিছু কি কমিয়াছে? এ কি আমাদের কর্ত্তব্য জ্ঞান? সহরের বিলাসী বাবুরা ভাবেন না কি যে, তাঁহারা পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত পুণ্য ফল ভোগ করিতেছেন যেমন কামনাপূর্ণ ব্যক্তি ইষ্টজনক কার্য্যের দ্বারা স্বর্গভোগ করেন এবং "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং জায়ন্তে",—যেমন সঞ্চিত অর্থ ব্যয়কারী ব্যক্তি সঞ্চয় ত্যাগ করিয়া দু'হাতে ব্যয় করিয়া আবার ভিখারী হয়—সেইরূপ তাঁহারা কি ভাবেন না যে, তাঁহারাও ক্ষীণপুণ্য হইলে এবং আর পুণ্য সঞ্চয় না করিলে ঐরূপ দারিদ্র্যের দুর্দ্দশায় পতিত হইবেন। যদি তাঁহাদের এই ভাবনায় চৈতন্য হয় তবে তাঁহারা আবার সুখভোগের অর্থাৎ যাহাকে দুঃখমিশ্রিত সংসার সুখ বলে, শ্রুতি যাহাকে "প্রেয়" বলেন, তাহার জন্য পুণ্য অর্জ্জন করিতে থাকুন। দয়াময় জগদী-শ্বরের দয়াগুণকে অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরে দারিদ্র্যমূর্ত্তির সেবায় নিযুক্ত হইয়া অন্নবস্ত্র-ঔষধ পথ্য ও চিকিৎসকের সাহায্য দানে আপন দিগকেও ব্যাধির করাল আক্রমণের আশ[illegible] হইতে রক্ষা করুন। পল্লীগ্রামে যেমন লো[illegible] কষ্টের দারুণ ব্যথায় মরিতেছে, সহরের লোক সেইরূপ ভীষণ ভীষণ রোগের আক্রমণে অস[illegible] যন্ত্রণা ভোগ করি[illegible]

যাহারা বাঁচিয়া আছেন, তাঁহারা কেহ শোক করিতেছেন, কেহ আত্মীয়-স্বজন বা নিজের ঐ ভীষণ ব্যাধি হইতে পারে সেই আশঙ্কায় নানাবিধ উপায় অবলম্বন ও ঔষধাদি সেবন করিতেছেন। দেশে ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি নানাবিধ ভীষণ ব্যাধি লোক সকলকে অকালে অকস্মাৎ গ্রাস করিতেছিল, কিন্তু বিধাতা ঐ সকল ভীষণ ব্যাধি দ্বারা লোক সংহার কার্য্য পর্য্যাপ্ত না ভাবিয়া ভীষণ যুদ্ধ লাগাইয়াছিলেন এবং সেই ভীষণ লোমহর্ষণ কর যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতেই এই নূতন ব্যাধি—যাহাকে একপ্রকার প্লেগ বলা যাইতে পারে এবং যাহাকে আজকাল লোকে "ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা" বা কফজ্বর বলিতেছেন, তাহার সৃষ্টি করিয়া সংহার কর্ত্তা শিব জগতের শিব অর্থাৎ মঙ্গলময় কার্য্য করিতেছেন।

কেহ বলিবেন যে, শিব মহা অমঙ্গলময় দুঃখ শোকদায়ক সংহার কার্য্য করিয়া কিরূপে মঙ্গলময় হইলেন? সন্তান দুষ্ট প্রকৃতি হইলে নানাপ্রকার অশান্তিকর কার্য্য করিলে, পারিবারিক শান্তিরক্ষা ও বালকের স্বভাব সংশোধন দ্বারা পিতামাতা তাহার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য কারুণ্যত্যাগ করিয়া তাড়ন-পীড়ন করেন। কৃষক যেমন প্রয়োজনীয় গাছকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আগাছা উন্মূলন করিয়া ফেলিয়া দেয়, সেইরূপ সেই দয়াময় জগদীশ্বর তাঁহার সৃষ্টি-প্রবাহ ও প্রাকৃতিক নিয়মরক্ষার নিমিত্ত সৃষ্টি ও স্থিতিকার্য্যে নিরত থাকিয়াও বিপথগামী ও তাঁহার সৃষ্টির ও প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতিকূলগামীকে নষ্ট করিয়া শিবরূপেতে লয়কার্য্য করিয়া জগতের মঙ্গল করিতেছেন। যাহারা তাঁহার সৃষ্টির অনুকূলে কার্য্য করিতেছে—তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্‌ ধাতুর সাকল্য দ্বারা যত্নবান্ কৃষকের ন্যায় শিবরূপে আগাছা নিড়াইতেছেন। এখন এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে যাহাতে আমরা আগাছা না হইয়া—দুষ্কৃতিবান্ না হইয়া, ধর্ম্মপরায়ণ ও ভগবদ্‌ভক্ত হইয়া, দয়া দাক্ষিণ্য-ক্ষমা শৌচ-সত্য প্রভৃতি দৈবীসম্পদ সকল গ্রহণ ও অভ্যাস করিয়া তাহার 'কাজের গাছে' পরিণত হইতে পারি, তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য। রাজা যেমন অপরাধীর দণ্ডবিধান করিয়া অপরাধীর চরিত্র-সংশোধন ও অন্যের অপরাধ করায় দণ্ডের ভয় সঞ্চার করিয়া দণ্ডনীতি দ্বারা নিজ রাজ্যের সুশাসন করেন, সেইরূপ সেই রাজরাজেশ্বর ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডরাজ্যের রক্ষা ও সুশাসন জন্য দণ্ডনীতি অবলম্বন পূর্ব্বক রোগ-শোক-মৃত্যু প্রভৃতি কঠোর ব্যবস্থা দ্বারা কঠোর পাপীর শুদ্ধি ও অল্পপাপীর মনে ভয়-সঞ্চার দ্বারা শুদ্ধিকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। এমন অবস্থায় তাঁহাকে একলা এইরূপ ভাবে শুদ্ধি কার্য্য করিতে না দিয়া, আমরা সকলে যদি শুদ্ধচিত্ত হইতে পারি, তাহা হইলে তাঁহাকে সাহায্য করা রূপ মহদ্ধর্ম্ম ও আত্মরক্ষা—উভয় কার্য্যই সম্পাদন করা হয়। দেশের যে অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে ধনী, বিলাসি, দরিদ্র প্রভৃতি কেহই নিরুদ্বেগ ও নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না। ইহার উপায় কি—যদি সকলে চিন্তা করেন, তবে নিশ্চয়ই উপায় উদ্ভাবন করিয়া সকলে সুখে,—সুস্থশরীরে সেই শান্তিময় শ্রীহরিকে সদা সর্ব্বদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী হৃদয়পদ্মে চিন্তা করিতে করিতে—তাঁহারই যত প্রিয়কার্য্য সমস্ত সম্পাদন করিতে করিতে, ইহকালে ভোগ ও পরকালে সেই পরম রমণীয় দর্শনকে দর্শন করিবার অধিকারী হইয়া পূর্ণ আয়ুকাল ভোগ করিয়া, মৃত্যুরূপী

শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার সেই মৃত্যু দ্বার দিয়া তাঁহাকে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার অমৃত মূর্ত্তিকে প্রাপ্ত হইয়া, নরজন্ম সার্থক করিতে পারেন। এখন দেখা যাউক, এই উপায় উদ্ভাবন করিতে গিয়া কি করা উচিত? ভাবিয়া দেখিলে জ্ঞান হইবে যে, এই সকল কষ্টের মূল কারণ কি? উপস্থিত এই জগদ্বিধ্বংসী মহামারীর মূল কি? সকল শাস্ত্র এবং আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র রোগের পর পর কারণ অন্বেষণ করিতে করিতে সর্ব্বনিম্নমূলে দেখিলেন "তস্যাপি মূলমধর্ম্ম" সকল ব্যাধির মূল অধর্ম্ম। কোথাও আমাদিগকে নিজের অধর্ম্ম ফল ভোগ করিতে হইতেছে ও এইটাই বেশীর ভাগ, কোথাও আমরা যাহার সঙ্গে থাকি বা যাহাদের সঙ্গে একদেশে থাকিয়া সেই দেশোৎপন্ন সুখ ভোগ করি, তাহাদের পাপ-রাশি দ্বারা কলুষিত হইয়া নানাপ্রকার ব্যাধির হাতে পড়ি। আজকালকার বিজ্ঞানবিদেরা বলেন. নানাপ্রকার রোগের বীজাণু অতি সূক্ষ্মভাবে সকলের অলক্ষিতে বায়ুমণ্ডলে ভাসমান আছে। কোথাও এই বীজাণু বেশী পরিমাণে আছে, কোথাও অল্প পরিমাণে আছে, কোথাও নাই। কোন ব্যক্তির রোগ-প্রবণতা এত বেশী যে, কোন ব্যক্তির কোন ব্যাধির বীজাণু নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা বা খাদ্য-পানীয় দ্রব্য দ্বারা বা ক্ষতাদি দ্বারা রক্তে সংযোগ দ্বারা বা রোগক্লিষ্ট ব্যক্তির সংস্পর্শ দ্বারা সেই রোগাক্রান্ত হইতে হয়। কেহবা এই সকল কারণ বিদ্যমান্ থাকা স্বত্বেও রোগাক্রান্ত হননা। রোগের কারণ—রোগের বীজাণুই কেবল যে বায়ুমণ্ডলে ভাসমান আছে—তাহা নহে, উহা জলে এবং মৃত্তিকাতেও বিদ্যমান আছে। যক্ষ্মা-বসন্ত প্রভৃতি রোগের বীজাণু. বায়ুমণ্ডলে ভাসমান্, ম্যালেরিয়া কলেরা প্রভৃতি রোগের বীজাণু জলে মিশ্রিত থাকে এবং প্লেগ ইত্যাদি রোগের বীজাণু পৃথিবীতে মৃত্তিকার অনুস্যূত। মহামুনি ত্রিকালদর্শী মহর্ষি বেদব্যাস মার্কণ্ডেয় পুরাণে লিখিয়াছেন, "মনুষ্যের পাপ প্রথমে বায়ুকে, পরে জলকে ও অবশেষে পৃথিবীকে দূষিত করিয়া নানাপ্রকার ব্যাধি—এমন কি মহামারী পর্য্যন্ত উৎপন্ন করে।" আজকাল দেশে যজ্ঞ একরকম উঠিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে প্রত্যেক ব্রাহ্মণের গৃহে প্রত্যহ গব্যঘৃত দ্বারা যজ্ঞ হইত। এখন বিশুদ্ধ গব্যঘৃত সংগ্রহ করিবার চেষ্টা না করিয়া ব্রাহ্মণেরা বলেন যে, "একটু গব্যঘৃত খাইতে পাইনা, তা' হোম কি প্রকারে করিব?" অহোরাত্র গায়ত্রী জপ না করিলে, তিনদিন সন্ধ্যাবন্দনা না করিলে এবং দ্বাদশ দিন হোম না করিলে ব্রাহ্মণ চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়। একথা আধুনিক ব্রাহ্মণগণ একবারে ভুলিয়া গিয়া, অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়া, নানা কুসঙ্গে মিশিয়া ভারতীয় মনুষ্য সমাজের শীর্ষস্থানে থাকিয়া—সমস্ত সমাজকে দূষিত করিতেছেন। মস্তকে যে প্রকার দূষিত জল ঢালা যায়, সেই দূষিত জল ঊর্দ্ধ অঙ্গ ধৌত করিয়া তত্রত্য মলা গ্রহণ করিয়া আরও দূষিত হইয়া অধঃ শরীরকে বিশেষভাবে দূষিত করে। আমাদের আজ সেই দশা হইয়াছে! সমাজের নেতা ও শীর্ষ স্থানীয় ব্রাহ্মণ অধঃপতিত হওয়ায় ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ত্যাগ করায় অন্যান্য বর্ণও পতিত হওয়ায় পাপের স্রোতও অব্যাহত গতিতে চলিতেছে। পূর্ব্বে সমাজের নেতা ব্রাহ্মণ অরণ্যবাসী হইয়াও গাভীপালন করিতেন ও গাভীদুগ্ধ পান ও ঘৃত-ভোজন ও ঘৃতাহুতি দ্বারা হোম করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীভগবানের ধ্যানে নিরত থাকিয়া স্বাধ্যায় প্রভৃতি দ্বারা ও নিজ [illegible]

বেদধ্বনি নিনাদিত করিয়া, নিজেরা সুস্থ শরীরে থাকিতেন ও বায়ু, জল ও পৃথিবীতে পবিত্র রাখিয়া জগতের মঙ্গল বিধান করিতেন। এখনো আমরা যতটুকু বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত খাইতে পাই, তাহাতে যদি হোম করি, তাহা হইলে সেই হোমের ঘৃতাহুতির সুগন্ধে মনকে আমোদিত ও প্রফুল্ল করিয়া বহুগুণ ফল প্রদান করিতে পারে। ইহাতে যে কেবল আমাদের উপকারেরই সম্ভাবনা, তাহা নহে, সেই হোমদ্বারা দেবতারা তৃপ্ত হন, গৃহ পবিত্র ও বায়ু বিশুদ্ধ হয় ও যত দূর সেই হোম-ধূম বিস্তৃত হয়—ততদূর প্রতিবেশীদেরও কল্যাণ করে এবং সমস্ত রোগের বীজাণু নষ্ট করিয়া ফেলে। দেশ হইতে সেই মহান্ হিতকর হোমকার্য্য উঠিয়া গিয়াছে, সেই বেদধ্বনি উঠিয়া গিয়াছে, সেই পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ উঠিয়া গিয়াছে, তাহার উপর মনুষ্যের নানাপ্রকার পাপ বাড়িতেছে, তাই দেশে এই মহামারী। আমাদের চেষ্টা নাই, কাজেই নানাপ্রকার ওজর ও আপত্তি দ্বারা আমরা এখনকার দিনে হোম অসম্ভব বলিয়া প্রকাশ করি। কিন্তু চেষ্টা করিলে এখনও অধিকাংশ গৃহস্থ গাভী পালন করিতে পারেন এবং টাট্‌কা গোময়ে ও গোমূত্রের গন্ধে গৃহকে পবিত্র রাখিতে পারেন ও গব্যদুগ্ধ-পান দ্বারা নিজ ও পরিবারবর্গের সকলের বল ও স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন ও গব্য ঘৃত দ্বারা হোম করিয়া নিজের ও জগতের অকল্যাণ নিবারণ করিতে পারেন। যাঁহারা মন, ইন্দ্রিয় এবং আত্মাকে সংযত পূর্ব্বক যোগের প্রকৃত পন্থা অবলম্বন করেন, স্বর্গ মর্ত্ত পাতালে তাঁহাদের অপ্রাপ্য বা অগম্য কিছুই থাকে না। সামান্য পিপীলিকা সর্ব্বদা উদ্যোগী বলিয়া গমন করিতে করিতে সহস্র ক্রোশ পথ যাইতে পারে, কিন্তু বেগগামী পক্ষিরাজ গরুড় অনুপযুক্ত হইলে এক পা' ও যাইতে সমর্থ হয় না। মার্কণ্ডের পুরাণে আছে—

নাগ্নাবহরণঞ্চৈব ক্রতুভাবশ্চ লক্ষ্যতে।
ন বাপ্যায়ণ মস্মাকং বিনা হোমেন জায়তে॥
বয়মাপ্যায়িতা মর্ত্ত্য যজ্ঞ-ভাগৈ র্যথোচিতম্।
বৃষ্ট্যা তাননু গৃহ্নীমো মর্ত্ত্যান্ শস্যাদি সিদ্ধয়ে॥
নিষ্পাদিতা স্বৌষধীষু মর্ত্ত্যা যজ্ঞে র্যজন্তি নঃ।
তেষাং বয়ং প্রযচ্ছাম কামান্ যজ্ঞাদি পূজিতাঃ॥
অধোহি-বর্ষাম বয়ং মর্ত্ত্যাশ্চোর্দ্ধ প্রবর্ষিণঃ।
তোয় বর্ষেণ হি বয়ং হবির্বর্ষেণ মানবাঃ॥
যে নাস্মাকং প্রযচ্ছন্তি নিত্য নৈমিত্তিকীঃ ক্রিয়াঃ॥
ক্রতুভাগং দুরাত্মানঃ স্বয়ঞ্চাশ্নন্তি লোলুপাঃ॥
বিনাশায় বয়ং তেষাং তোয় সূর্য্যাগ্নি মারুতান্।
ক্ষিতিঞ্চ সন্দূষয়ামঃ পাপানামপকারিণাম॥
দুষ্ট তোয়াদ ভোগেন তেষাং দুষ্কৃত কর্ম্মিণাম।
উপসর্গাঃ প্রবর্ত্তন্তে মরণায় সুদারুণাঃ॥

অর্থাৎ অগ্নিচরণ হইতেছেনা, যজ্ঞ সকলের অভাব লক্ষিত হইতেছে। হোম ভিন্ন আমাদেরও অন্য উপায় নাই। মর্ত্ত্যগণ যথোচিত যজ্ঞভাগে আমাদিগকে আপ্যায়িত করে, আমরাও শস্যাদি সিদ্ধির নিমিত্ত বৃষ্টিদ্বারা তাহাদিগকে অনুগ্রহ করি। ওষধি সকল নিষ্পাদিত হইলেই মর্ত্ত্যগণ তদ্দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করে, আমরা ও যজ্ঞাদি দ্বারা পূজিত হইয়া তাহাদিগের অভিলষিত বিষয় সকল সম্পাদন করিয়া থাকি। আমরা অধোদিকে বৃষ্টিদ্বারা বর্ষণ করি, মর্ত্ত্যগণ উর্দ্ধদিকে ঘৃতধারা বর্ষণ করে, যে দুরাত্মারা নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সকল আমাদিগের উদ্দেশে অর্পণ করে না এবং লোলুপ হইয়া যজ্ঞভাগ সকল স্বয়ং ভোজন করে, আমরা সেই অপকারী পাপাত্মাদিগের বিনাশের জন্য জল, অগ্নি, সূর্য্য, বায়ু ও পৃথিবীকে দূষিত করি। দুষ্ট জলাদি উপভোগ

দ্বারা সেই দুষ্কর্ম্মাদিগের বিনাশসূচক দারুণ উপসর্গ সকল প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

এক হোম দ্বারা কত উদ্দেশ্য সাধিত হয়। সেই হোমের সাধনভূত হোমধেনু রক্ষা না করিলে আমাদের আর উপায় নাই। ঘৃতাহুতির সদ্‌গন্ধে ব্যাধি বিনিষ্ট হয়, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। গব্য ঘৃতের গুণ আয়ুর্ব্বেদে লিখিত আছে :—

গব্যং ঘৃতং বিশেষেণ চক্ষুষ্যং বৃষ্যমগ্নিকৃৎ।
স্বাদু পাকরসং শীতং বাতপিত্ত কফাপহম্॥
মেধা লাবণ্য কান্ত্যোজ স্তেজো বৃদ্ধিকরং পরম্।
অলক্ষ্মী পাপরক্ষোঘ্নং বয়সঃ স্থাপকং গুরু॥
বল্যং পবিত্র মায়ুষ্যং সুমঙ্গল্যং রসায়নম্।
সুগন্ধং রোচনং চারু সর্ব্বাজ্যেষু গুণাধিকম্॥

গব্যঘৃত চক্ষুর অত্যন্ত হিতকর, শুভজনক, অগ্নিবর্দ্ধক, মধুর রস, মধুর বিপাক, শীতবীর্য্য, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, কফাপহারক, মেধাজনক, লাবণ্যবর্দ্ধক, কান্তিপ্রদ, ওজোধাতুবর্দ্ধক, অত্যন্ত তেজস্কর অলক্ষ্মী বিনাশক, পাপহারক রক্ষোঘ্ন, বয়ঃস্থাপক, গুরু, বলকর, পবিত্র, আয়ুস্কর, মঙ্গলজনক, রসায়ন, সুগন্ধি, রুচিকারক এবং মনোজ্ঞ। ইহা ছাড়া অন্য ঘৃতের ন্যায় বুদ্ধিজনক স্বর বর্দ্ধক, স্মৃতিকারক রক্ষোঘ্ন উদাবর্ত্ত, জ্বর উন্মাদ, শূল, আনাহ, ব্রণ, ক্ষয়, বীসর্প ও রক্তদোষনাশক। একদ্রব্যে এত গুণ বোধ হয় পৃথিবীর আর কোন জিনিষে নাই। কিন্তু যদি ইহাতে চর্ব্বি ইত্যাদি অপবিত্র দ্রব্য বা অন্য স্নেহপদার্থ সংমিশ্রিত হয়, তবে বিষক্ষয় না করিয়া বিষেরই কার্য্য করে। ঘৃতের ও তৈলের একটী বিশেষ গুণ এই যে, উহা যে দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত থাকে—তাহার বীর্য্য ও প্রভাব গ্রহণ করিয়া তাহার প্রভাব সূক্ষ্ম ও বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করে। এই জন্য কবিরাজী ঘৃত ও তৈল যে যে দ্রব্যে পাক করা হয়, তাহা তাহার সহিত সংমিশ্রিত না থাকিলেও তাহার গুণ গ্রহণ করিয়া তাহার ক্রিয়া দেহে প্রকাশ করে।

হোমের বিষয় শ্রীভগবান্ শ্রীগীতায় শ্রীমুখে বলিয়াছেন :—

"সহ যজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্ট কামধুক্॥
দেবান ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ।
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞ ভাবিতাঃ।
তৈ র্দত্তান প্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ॥
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্ব কিল্বিষৈঃ
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥
অন্নাদ ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্ন সম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞ কর্ম্ম সমুদ্ভবঃ॥

* * *

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥"

এই যজ্ঞ আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। আমাদের ঋষিরা বলিয়াছেন, শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশ এত অধঃপতিত হইয়াছে যে, তাহা কেহ মনে স্থান দিবেন না। তবে যদি কোন বড় ডাক্তার—বিশেষ পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন, তবে তখনই লোক তাহা মানিয়া চলিবে। আজকাল এই ইনফ্লুয়েঞ্জা বা মহামারী প্রতিষেধের জন্য ইউকিপটাস তৈল, থাইমল তৈল ও মেনথল সর্ব্বদা রুমালে ঘ্রাণ লইবার ব্যবস্থা হইয়াছে, কেন না উঁহাদের অণুপরমাণু নাসারন্ধ্রে ও কণ্ঠপ্রদেশে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকিলে উক্ত রোগের বীজাণু শ্বাস দ্বারা বা আহার দ্বারা [illegible] হইয়া যাইবে। [illegible]

ঘৃত—বিশেষ গব্যঘৃত বিষদোষনাশক ও অত্যন্ত তেজস্কর হইয়া পবিত্র মন্ত্রযোগে অগ্নিমুখে দেবোদ্দেশে প্রদত্ত হইয়া, অতিশয় বীর্য্যবান্ হইয়া, পাপনষ্ট পূর্ব্বক রোগের বীজাণু সকলের সমূলে বিনষ্ট করিবে তাহাতে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে কি? আর যেমন প্রত্যহ আহার্য্য সংগ্রহের জন্য চেষ্টা আবশ্যক, তেমনি যাঁহারা আমাদের আহার্য্য জোগাইতেছেন, তাহার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁহাদের আহার্য্য এই আহুতি না দেওয়া কি আমাদের চৌরের মত কার্য্য—মহাপাপের কার্য্য নয়? এই পাপ ছাড়া জগতে আরও কত মহা মহা পাপ হইতেছে; মিথ্যা প্রবঞ্চনা, চুরি, জাল, জুয়া-চুরি, দস্যুতা হিংসা, পশুবলবৃদ্ধি বা জিহ্বার তৃপ্তিসাধন জন্য অসংখ্য প্রাণীর নির্দ্দয়ভাবে সংহার, ইন্দ্রিয়-সেবার জন্য—ভোগ বিলাসের জন্য দুর্ব্বলকে পীড়ন, পরস্ত্রীগমন, মনে মনে অন্য স্ত্রীকে মাতা না ভাবিয়া ভোগের বস্তু জ্ঞান করিয়া কামভাবের বিস্তার দ্বারা জগদম্বার স্বমূর্ত্তির অবমাননা ইত্যাদি কত পাপের কথা বলিব! এই রাশি রাশি পাপ এক দিকে, আর অন্যদিকে ধর্ম্মচর্চ্চা নাই, কাজেই বসুন্ধরা ভীষণ পাপভারে পীড়িতা! পূর্ব্বকালে এইরূপ বসুন্ধরা পাপ অত্যাচারাদি প্রপীড়িতা হইলে ভগবান বিষ্ণুর নিকট গমন করিতেন, অর্থাৎ জগতের সকল লোক প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে ডাকিত ও ইহা বলিয়া গাহিত যে "ধরমের গ্লানি আসিবে আপনি শ্রীমুখেতে বলেছিলে, আজ অকূলে আকুল, ডাকে জীব কুল, ও কোলে নাওহে তুলে" এখন আর সকলে মিলিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছেনা, তাই তিনিও আসিতেছেন না; কিন্তু বসুধার ভার হরণের জন্য কতকগুলি ভীষণ ব্যাধি সৃষ্টি করিয়া সংহার কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার স্তব-স্তুতি-প্রণাম ইত্যাদি যে সকল ঋষিবাক্যে সংস্কৃত ছন্দে বদ্ধ আছে, তাহা পাঠ করিলে কেবল যে চিত্তশুদ্ধি হয়, হৃদয়ে আনন্দধারা প্রবাহিত হয়—তাহা নয়, সেই পবিত্র শব্দের কীর্ত্তনে, তাঁহার হরি হরাদি নাম উচ্চারণে শব্দব্রহ্মের সাহায্যে পরব্রহ্মকে পাইবার চেষ্টায় বায়ু, জল, পৃথিবী পবিত্র হয় এবং সমস্ত রোগের বীজাণু নষ্ট হয়। আমাদের দেশে গৃহস্থের গৃহে প্রাতে ও সন্ধ্যায় দেবোদ্দেশে ধূপদীপ দান ও শঙ্খধ্বনির ব্যবস্থা ছিল, তাহা প্রায় লোপ পাইল! কিন্তু যেমন একজন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ বলিলেন, শঙ্খের ধ্বনিতে রোগের বীজাণু নষ্ট হয়, ধূপের গন্ধে বায়ু শুদ্ধ হয়, অমনি অনেকে ধূপ দেওয়া ও শঙ্খধ্বনির ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু সেই শঙ্খ-চক্র গদাপদ্মধারী শ্রীহরির পবিত্র নাম পরিবারের সকলে মিলিয়া প্রাণ ভরিয়া উচ্চারণ করিবার ব্যবস্থা কই করিলেন! শ্রীহরি পূজায় পয়সা খরচ নাই। তিনিই শ্রীমুখে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন :—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতং মশ্নামি প্রযতাত্মন॥

তাহার পর—

যৎকরোষি যদশ্নাসি যর্জ্জুহোমি দদামি যৎ।
যত্তপশ্যাসি কৌন্তেয় তৎকুরুস্ব মদর্পণম॥

যা কিছু করি, তাঁহারই কার্য্য করি এবং তাহা তাঁহাকে অর্পণ করি—এই তো তাঁহার পূজা। প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল, সায়ংকাল হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত যাহা করি—তাহাতে তাঁহার পূজা হউক। এই ভাবনায় কাজ করিলে পাপ আসিতে পারে না। তাহার পর শ্রীভগবান যে ফুল, ফল, পাতা, জল দ্বারা তাঁহার পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার

পূজা ও হয় এবং স্বাস্থ্যও ভাল থাকে ও বায়ু প্রভৃতি পবিত্রযুক্ত হয়। একে দেবতারা আমাদের পাপের জন্য বায়ু, অগ্নি, জল পৃথিবী, সূর্য্য (সূর্য্যের কিরণ) অপবিত্র পূর্ব্বক আমাদের রোগের ও সংহারের ব্যবস্থা করিতেছেন, আমরাও অন্ধ হইয়া, নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করিয়া এই সকলকে দূষিত করিতেছি। যে অগ্নিতে নানাপ্রকারসুগন্ধি—সুমিষ্ট পবিত্র দ্রব্য দেবোদ্দেশে পূতঃ হইয়া মহাসৌরভ বিস্তার পূর্ব্বক অগ্নির, সূর্য্যকিরণের বায়ুর দোষ ও রোগের বীজাণু সকল নষ্ট করিত, এখন সেই অগ্নি 'মোটর' চালান তৈলের দুর্গন্ধ-বিস্তারে, অ্যাসিটিলিন্ কোলগ্যাস্ প্রভৃতির দুর্গন্ধময় পদার্থের দহনদ্বারা বায়ুকে দুর্গন্ধময় ও বিষাক্ত করিতেছেন। যে ব্রাহ্মণগণ শ্রীভগবানের বিভূতি বেশী থাকার জন্য অগ্নিকে জড় পদার্থ না ভাবিয়া ভগবানের বিশেষ সত্ত্বায় সত্ত্বান্বিত ভাবিয়া দেবভাবে পূজা করিতেন, সেই নমস্য অগ্নি আজকাল বিড়ি, চুরুট, সিগারেটের হোমকারী সম্পাদন করিয়া পানা বশিষ্ট বিড়ি ইত্যাদির সহিত সবুট পদদলিত হইতেছেন! একদিন কোন বিখ্যাত উকীল বাবুর বাসায় প্রবেশ করিবার পথের ধারে দেখিলাম যে, রক্তপুঁয মিশ্রিত তুলা অগ্নি দ্বারা অর্দ্ধদগ্ধ হইয়া পড়িয়া আছে। ভাবিলাম ও মনে মনে কান্দিলাম যে, হে অগ্নিদেব! কোথায় তোমার দেবভাবে ঘৃতাহুতি দান, আর কোথায় তোমার অমেধ্য হরণ। যাহা ভূগর্ভে প্রোথিত হইলে বায়ু দূষিত করিতে পারেনা তাহাই অবাধে অগ্নিসংযোগে বায়ুতে বিস্তৃতি লাভ পূর্ব্বক আমাদের ইহকাল ও পরকালের অনিষ্ট সম্পাদন করিতেছে। এই ত অগ্নির দুর্দ্দশা। সূর্য্য স্বয়ং পবিত্র, কিন্তু আমরা মলাদি সূর্য্যকিরণ সংস্পর্শ দ্বারা দূষিত করিতেছি। পূর্ব্বে মাঠে মল-মূত্র ত্যাগের ব্যবস্থা ছিল এবং তাহার পর তাহার উপর পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মৃত্তিকা চাপা দেওয়ার পদ্ধতি ছিল,—যাহাতে সূর্য্যকিরণ সংস্পর্শে ইহা বায়ুমধ্যে সঞ্চালিত না হয়। আজকাল কিন্তু সে প্রথা পল্লী গ্রামে লোপ পাইয়াছে ও সহরের ময়লাগুলিও সহরের বাহিরে ট্রেঞ্চিং গ্রাউণ্ডে কোথাও অর্দ্ধ প্রোথিত কোথাও প্রোথিত না করিয়াই ফেলা হইতেছে, কোথাও বা নদীজলে ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে। আমি একবার শ্রীবৃন্দাবনে কেশীঘাটে যমুনায় স্নান করিবার সময় জলে বাঙ্গালার চিরপ্রচলিত মতে কুলকুচা করিয়াছিলাম। তাহা দেখিয়া একটি ব্রজবাসী আমার উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "এ বাঙ্গালি! তম্ যমুনা মাইপর কুলকুচা কর দিয়া।" হরিদ্বারেও এইরূপ। সেখানে পাণ্ডারা গঙ্গায় দন্তধাবন করিতে দেন না। 'ঘটি'তে করিয়া জল তুলিয়া লইয়া দূরে মুখ ধুইতে হয়। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের কি ঘোর কুৎসিৎ প্রথা! লিখিতে লজ্জা ও ঘৃণা বোধ হয়, পল্লীগ্রামে বঙ্গললনারা যে পুষ্করিণীর জল লইয়া রন্ধন পূর্ব্বক প্রিয় পুত্র ও স্বামী প্রভৃতিকে ভোজন করান, তাহারই জলে মূত্রত্যাগ ও শৌচাদি করেন, ছেলের মলমূত্রসিক্ত বস্ত্র প্রক্ষালনও করেন। অল্প চেষ্টায় এই জঘন্য ও ভয়ানক স্বাস্থ্যহানিকর প্রথা উঠিয়া যাইতে পারে, কিন্তু কেহই এদিকে দৃষ্টিপাত করেন না। জলকে নারায়ণ ব[illegible] হইয়াছে। জলে ভগবানের বিভূতি খুব বে[illegible] বলিয়া ব্রাহ্মণের সন্ধ্যায় জলের [illegible] ভগবানের আরাধনার ব্যবস্থা। [illegible] হইয়া তাঁহারই উপাসনা— [illegible]

ব্যবস্থা। পুকুরের জলে পুরুষেও কাপড় গামছা কাচা, কুলকুচা করা, মুখ ধোয়া থুঁথু ফেলা প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা জলকে নানা প্রকারে দূষিত করিয়া সেই জলপানের ফলে স্বল্পমাত্রায় বিষপানে আত্মহত্যার ন্যায় নিজের প্রাণকে অকালে কালকবলে প্রেরণ করিতেছেন। সহরে কলের জল বলিয়া ততটা দূষিত হয় না। কিন্তু যে নল দিয়া জল অনবরত আসে, তাহা শুদ্ধিকর বায়ু বা সূর্য্যকিরণের মুখ দেখেনা ও নলের মধ্যে যে ময়লা জমে, জল আসিবার সময় তাহাও ধৌত হইয়া আসে। তাহার পর নদ নদীর কথা। নদ নদীতে তো আজকাল ময়লাবহারের কার্য্য পূর্ণমাত্রায় চলিয়াছে। যে পতিতপাবনী সুরধনী বিষ্ণু পাদোদ্ভবা বলিয়া বিখ্যাত যাঁহার এক বিন্দু জল মৃত্যুকালে মুখে পড়িলে মানব মুক্ত হয় ইহাই শাস্ত্র বাক্য—যাঁহার পবিত্র বায়ু অঙ্গে স্পৃষ্ট হইলে জীবিত অবস্থায় নিষ্পাপ অর্থাৎ স্বাস্থ্যোন্নতি ও অন্তে স্বর্গভোগের হেতু হয় এবং যাঁহার তীরে দেহ ত্যাগ করিয়া কত কোটী কোটী সাধু, সুধী, জ্ঞানী প্রভৃতি এবং উপস্থিত নিজ কার্য্যের দ্বারা মহাত্মা ৺গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কষ্টকর মর্ত্তাধাম ত্যাগ করিয়া অমর ধামে চলিয়া গিয়াছেন, সেই সুরধনীর আজ কি অবস্থা ভাবিয়া দেখুন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, গঙ্গাজলে সমস্ত রোগের বীজাণু নষ্ট হয়, কিন্তু যদি আমরা উহাতে রাশিরাশি ময়লা নিক্ষেপে উহাকে অপবিত্র করি তাহা হইলে আমরা যে অনিষ্টের পথ প্রশস্ত করিব, সে বিষয়ে আর কথা কি? পবিত্র কাশীধামেও সহরের নর্দ্দামার ময়লা গঙ্গায় আনিয়া ফেলা হইতেছে। ইহাতে কি কাশী মাহাত্ম্য খর্ব্ব করা হইতেছে না। আজ কাশীধামে এই মহামারী কি ভয়ানক সংহার কার্য্য অবলম্বন করিয়া আমাদিগের চক্ষু ফুটাইবার চেষ্টা করিতেছে। এতেও যদি দেশের লোকের ও স্বাস্থ্যবিভাগের লোকের চৈতন্য না হয়, তবে কি দেশ শ্মশানে পরিণত হইলে তবে চক্ষু ফুটিবে? যা' হবার হইয়াছে এখনও যদি আমরা সাবধান ও যত্নপর হই. তবে আমাদের বংশ থাকিবে, নতুবা যেরূপ মহামারী আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে যদি উহা শীঘ্র না কমে, তবে যে কি ভীষণ অবস্থা ঘটিবে, তাহা ভাবিবার বিষয় নয় কি? জল কিরূপে দূষিত হইয়া ব্যাধি সৃষ্টি করিতেছে তাহা বলা হইল। ঈশ্বরের কেহ প্রিয় কেহ অপ্রিয় নাই। তাঁহার নিকট সকলেই সমান, তবে যেমন অগ্নির নিকট গেলে শৈত্য নিবারণ ও আলোক পাওয়া যায়, তেমনি ঈশ্বরের উপাসনা, আরাধনা পূজা প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার প্রিয় হওয়া যায় ও ইহকালে সাংসারিক সুখভোগ করিয়া অন্তে তাঁহাকেই পাওয়া যায়। আমরা না ইহকালের উপায় করিতেছি, না পরকালের ব্যবস্থা করিতেছি। আলস্যে বিলাসে, ব্যসনে, পর নিন্দায় পরচর্চ্চায় খেলায়, মত্ততায় ঐশ্বর্য্যে উন্মত্ত হইয়া আমরা অতল জলে ডুবিতে যাইতেছি। ভক্তের এই গানটি বড়ই ভাবোন্মেষক।

"হরি বলরে ভাই—নাম বিনে আর ভব পারের
বন্ধু নাই,
হরিনামের মতন কি আছে রতন, করনা যতন
কেন ভাই।
অলসে বিলাসে নিশি না সুখে—বিষয় লালসে
মজিলি সুখে,
বরষে বরষে পলকে পলকে সময় বহিয়া যায়,
(ও নাম) যদি এখনও না বলবি—তবে কি আর
করবি—ঘাটে বসে কাঁদবি ভাই।

কি ছার অসার আমোদে মেতে, সুপথ ছাড়িলি,
ধাইলি কুপথে,
কুসঙ্গে মজিলি ডুবিয়া মরিতে—কুসঙ্গে লইলি ঠাঁই,
যখন সাতারে পড়বি,, পাব না পাইবি, হাবু ডুবু
খাইবি ভাই।
না বুঝে না সুঝে যা হয় তা করলি, এখনো ফিরিলে
পাইবে সকলি,
এখনও ডাকিলে শুনিবে কাণ্ডারী—ধরিয়া তুলিবে
নায়।
(ও তুই) আর কত হবি তল, হরিবল হরিবল,
পারের সম্বল কর ভাই।
যত পতিতে তারিতে করুণা করিয়ে মর্ত্ত্যে ভাবিয়ে
হরিনাম আনিয়ে দিয়েছে ঢালিয়ে জগত ভরিয়ে
গৌর আর নিতাই।
তোরা আয় সব ছুটিয়ে, নিয়ে যা লুটিয়ে, এমন
দিন কি পাবি ভাই।"

সমস্ত বর্ণ ও আশ্রম সমূহের সাধারণতঃ যাহা কর্ত্তব্য, তাহা এই ভগবদুপাসনার সঙ্গে সঙ্গেই অবলম্বন করিতে হইবে। তাহা আটটি—

সত্যং শৌচমহিংসা চ অনসূয়া তথা ক্ষমা।
আনৃশংস্যমকার্পণ্যং সন্তোষ স্তাষ্টমে গুণাঃ॥

পত্র পুষ্প পূজার ব্যবস্থার সঙ্গে স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা চিকিৎসা শাস্ত্র দেখাইতেছেন। তুলসী পত্র যে কত রোগ ও রোগের বীজাণুনাশক, তাহা "আয়ুর্ব্বেদে" পূর্ব্বেই বাহির হইয়াছে। বিল্ব-পত্রের রস পান করিলে বহুবিধ রোগ নষ্ট হয়। যে জিনিসের গুণাধিক্য বেশী, সেই জিনিসেই ভগবান বিশেষভাবে আছেন। তুলসী বৃক্ষে নারায়ণের অধিষ্ঠান, বিল্ববৃক্ষে মা জগদম্বা ও শিবের অধিষ্ঠান। পদ্ম যেমন শোভাবিশিষ্ট, তেমনিই সুগন্ধিযুক্ত। জবার শোভা মা জগ-দম্বার এবং মহেশ ও নারায়ণের পদতলের ন্যায়। অপরাজিতার শোভা মা কালী ও শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়। এই সব পুষ্পপত্র দ্বারা পূজায় মন আনন্দিত, ভগবচ্চরণে ধ্যান ঘনীভূত এবং চিত্তশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যরক্ষা হয়। ইহাও আমরা ছাড়িয়াছি। ডাক্তারেরা বলেন যে, তুলসীর গুণ থাইমলে আছে। অথচ আমরা পয়সা দিয়া থাইমলের ঘ্রাণ লইতেছি, কিন্তু বিনাপয়সায় নারায়ণপাদপদ্মে অর্পিত—রক্ত-চন্দনচর্চ্চিত তুলসীপত্র ভক্ষণ করিতেছিনা। রক্ত বা শ্বেতচন্দনচর্চ্চিত বিল্বদল মহাদেব ও মা জগদম্বার পাদপদ্মে অর্পণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিতে-ছিনা। ইহা অপেক্ষা আমাদের দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে? যে বিল্ববৃক্ষ সম্বন্ধে শাস্ত্রে আছে "দর্শনং বিল্ববৃক্ষস্য স্পর্শনং পাপনাশনং" সেই বিল্ববৃক্ষ কর্ত্তন করিতেও আমরা কুণ্ঠিত নহি!

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধি মবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥

ফলে আমরা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া, স্বেচ্ছাচারের বশবর্ত্তী হইয়া তত্ত্বজ্ঞান, শান্তি ও মুক্তিলাভের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইতেছি, ইহাই আমাদের পক্ষে অনিষ্টের প্রধান কারণ।

মৃত্তিকার দোষ নিবারণের প্রতীকার—গোময় লেপন। এখন আমাদের 'কোটা ভিটা' হওয়ার ফলেও তাহাও লুপ্ত হইতে বসিয়াছে! এখন আমাদের ঘরগুলি পয়সা খরচ করিয়া ফেনাইল দিয়া ধোয়ান হয় ও তাহার দুর্গন্ধ ভোগ করা হয়, অথচ টাট্‌কা গোবর যাহা বিনা পয়সায় লভ্য—তাহার সদ্গন্ধ 'বাবুদে'র ভাল লাগে না।

আমরা আমাদের ঋষিবাক্য না শুনিয়া গোবরকে অবহেলা করিয়াছি। সাহেব ডাক্তার কিন্তু গোবর সম্বন্ধে কি বলিতেছেন, শুনুন "প্লেগরোগ বিস্তারের সময় গৃহপ্রাঙ্গণ [illegible]

হয় এবং সেই গৃহে আসিবার পুর্ব্বে শুষ্ক গোময়, শুষ্ক নিমপত্র ও গন্ধক একত্র জ্বালাইবে।"

Burn Cowdung and Neem leaves and Sulphur in it.

Sd. W. C. Ross Major, I. M. S.
Sanitary commissioner B+O.

গোমূত্রের গুণ অনেক—ইহা তীক্ষ. প্লীহা, উদর, শ্বাস, কাস, শোথ, মলবদ্ধতা, শূল, গুল্মরোগ, আনাহ, কামলা ও পাণ্ডুরোগনাশক। ইহা অগ্নি দীপ্তিকারক, মেধাজনক, কৃমি ও কুষ্ঠরোগ নাশক। গোমূত্র কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল নষ্ট হয়। গোময় ১ ভাগ গোমূত্র ২ ভাগ, গোমূত্রের চারিগুণ ঘৃত, ঘৃতের আটগুণ দুগ্ধ এবং দুগ্ধের আটগুণ দধি গ্রহণ করিবে। এই সকল মিলাইয়া যে পঞ্চগব্য হয়, তাহা মন্ত্র দ্বারা শোধিত করিয়া নারায়ণের এবং শিবশিবা প্রভৃতির স্নানে দেওয়া হয়, দধি, দুগ্ধ ঘৃত, চিনি মধু এই পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান ও পানীয় দেওয়া হয়। চন্দনমিশ্রিত জলে স্নান করান হয়। ঐ জল, গঙ্গাজল বা কূপ বা নদীর জল তাম্রনির্ম্মিত কোষায় থাকিয়া পবিত্র হইয়া—শক্তিযুক্ত হইয়া দেবতার পাদ্যঅর্ঘ্য স্নান প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়। সেই স্নানজল পূজার পাত্রে সংগৃহীত হয় এবং তাহার সহিত সচন্দনতুলসীপত্র, সচন্দন বিল্বপত্র, সচন্দনজবা পুষ্প (যাহার সিক্তজল স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই উপকারক) এবং অন্যান্য সুগন্ধি পুষ্প মধুদ্বারা সংমিশ্রিত হইয়া কি অপার্থিব অমৃত উৎপাদন করে, তাহা আধুনিক সভ্য জগতের 'বাবুরা' জানিতে পারেন না। এই স্নানজল বা ভগবানের চরণ ধৌত জলকে ঋষিরা কত রোগের বীজাণুনাশক ও কত উপকারক বলিয়া—অকাল মৃত্যুহারক বলিয়া এই মন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন,—

অকাল মৃত্যু হরণং সর্ব্ব ব্যাধি বিনাশনম্।
বিষ্ণু পাদোদকং পিত্বা শিরসা ধারয়াম্যহম্॥

এখন ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া ইহার উপসংহার করা যাউক। আমি এক সাধুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "বাবা আপনি যে স্থানে আছেন ওখানে ত প্লেগের প্রকোপ খুব, আপনি নিশঙ্কে কি প্রকারে সেখানে থাকেন?" তাহাতে স্বামীপূজ্যপাদ শ্রীযোগানন্দ সরস্বতী লেখেন যে, "ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া পরমাত্মার ধ্যানে নিযুক্ত থাকায় কোন ভয় বা আশঙ্কা হয় না।"

রোগীর সংসর্গে রোগ হয়। কিন্তু যাঁহারা রোগীর সুশ্রূষা বা চিকিৎসা করেন, তাঁহারা মনে একটা সাত্ত্বিক বল লইয়া কার্য্য করেন বলিয়া সংক্রামক রোগ সকল তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। একটা গোরুর কাছে ভয়ে ভয়ে গেলে সে সিং নাড়া দেয়, কিন্তু সাহস করিয়া গেলে সে কিছুই করেনা, অথচ উভয় অবস্থায় যে যায়, তাহার বাহ্যিক আকার একই প্রকার। মনের গতির জন্য এই দুই প্রকার ভাব হয়। রোগও বোধ হয় মনের বল ও শরীরের বল দেখিয়া আক্রমণ করে। বীর্য্যধারণই প্রধান ব্রহ্মচর্য্য। বীর্য্যধারণ না হইলে মস্তিষ্ক বলবান হয় না। বুদ্ধিতেজস্কর না হইলে ভগবান বুদ্ধিযোগ দিয়া তাহাতে আত্মযোগে অবস্থিত হইয়া দীপ্তিশালী জ্ঞানালোক দ্বারা আমাদের মোহান্ধকার নষ্ট করেন না। পূর্ব্বেও এই বাঙ্গালা দেশ ছিল, কিন্তু এখানে এত ম্যালেরিয়া ছিল না, তাহার কারণ তখন দেশের লোক বায়ু প্রভৃতি পবিত্র রাখিবার চেষ্টা করিত এবং ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক সর্ব্বদা ঈশ্বরের চিন্তায় নিরত থাকিত। তখন সকল গ্রামেই হরিনাম হইত। এখন

তাহার বদলে পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, দাবা, তাস, পাশা প্রভৃতি স্থান পাইয়াছে। তামাকটা কোনরূপে না কোনরূপে আমাদের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক আমাদের ভীষণ অনিষ্ট করিতেছে। ইহাতে আমরা হীনবল হইয়া নানারোগের আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতেছি। এখন এই ভীষণ মহামারীর হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে, তামাক—কি কোন প্রকার মাদক দ্রব্য ত্যাগ করিতে হইবে। বাজারের খাবার ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাবে গৃহপ্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন, জলখাবারাদি শ্রীভগবানকে নিবেদন পূর্ব্বক সেই প্রসাদ গ্রহণ করিতে হইবে। দেবপূজা করিতে হইবে, হোম করিতে হইবে এবং উপরে যে যে বিষয়ের আলোচনা করা হইল—তাহার ত্যাজ্য বিষয় ত্যাগ ও গ্রাহ্য বিষয় গ্রহণ করিতে হইবে। হরীতকী প্রত্যহ একটু করিয়া খাওয়া উচিত। শ্রীভগবানকে নিবেদন করিবার সময় অন্নে ও পানীয় জলে তুলসী পত্র দেওয়া উচিত। বিষ্ণুপাদোদক পান ও প্রত্যহ পূজা করা এবং বিল্বপত্র ভক্ষণ করা উচিত। প্রাতে পূজার পর বিল্বপত্র এবং জলপানের সময় পূজা পূর্ব্বক তুলসী পত্র দিয়া সেইজল পান করা ও সেই তুলসী পত্র চর্ব্বণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করা উচিত। যে গৃহে হোম হইবে—তথায় দ্বাররুদ্ধ করিয়া পরিবারের সকলে কিয়ৎকাল হোম-কালীন অবস্থান করা, হোমের তিলক ধারণ করা ও চরণোদক পান করা উচিত, কারণ হরি সকল দেবতাকেই বুঝায়। আর

হরি র্হরতি পাপানি দুষ্ট চিত্তৈরপি স্মৃতঃ।
অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্ট দহত্যেব হি পাবকঃ॥

হরিং হরীতকীঞ্চৈব গায়ত্রীঞ্চ জাহ্নবী জলং।
অন্তর্ম্মলবিনাশায় স্মরেৎ খাদেৎ জপেৎ পীবেদ্বং।

সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মচর্য্য আবশ্যক। বীর্য্যধারণে রোগের বীজাণু শরীরে প্রবেশ করিতে দেয় না। পরম পূজ্যপাদ ৺কৈলাসপতি গোস্বামী স্বামীজি বলিয়াছিলেন,—“বাবা বাঙ্গালা-দেশের মত দেশ নাই,—যদি প্রত্যেক ব্রাহ্মণে ত্রিসন্ধ্যা করে, শিবপূজা, বিষ্ণুপূজা, গুরুপূজা ও ইষ্টপূজা করে, কিম্বা সকলে না পারিলেও প্রত্যেক গ্রামে কেহ কেহ নিত্য হোম করে, তবে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধি কোথায় পলাইয়া যায়।” এই সব করার সঙ্গে কিছু ঔষধ ব্যবহারে আত্মরক্ষাকে বড়ই দৃঢ় করে। আমি নিজে ও পরিবারে সকলে ম্যালেরিয়া মিশ্রিত ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হই, শ্রীভগবানের কৃপায় সকলে ডাক্তারি ঔষধ সেবন করিয়া ভাল হই, কিন্তু দুর্ব্বলতা ও অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি কিছুতেই যায় না। ভাবিয়া চিন্তিয়া নিম্নলিখিত পাচনটি সেবন করিয়া সকলেই বিশেষ উপকার পাই। ইহা প্রতিষেধকরূপেও ব্যবহৃত হইলে উপকার বই অপকার করিবে না।

নিমছাল, চিরাতা, ক্ষেতপাঁপড়া, গুলঞ্চ, বাসক, কণ্টকারি, হরীতকী ও আমলা প্রত্যেক ।০ চারি আনা, জল অর্দ্ধসের, পাকশেষ অর্দ্ধ-পোয়া, ঈষদুষ্ণ অবস্থায় প্রাতে সেব্য।

এখন যেরূপ মহামারী হইতেছে, এইরূপ গৃহে গৃহে পূজাদি হোম ও সন্ধ্যায় হরিনাম সংকীর্ত্তন হওয়া অত্যাবশ্যক। নগর-সংকীর্ত্তন আরও ভাল।

শরীরঞ্চ নবচ্ছিদ্রং ব্যাধিগ্রস্তং কলেবরম্।
ঔষধং জাহ্নবী-তোয়ং বৈদ্যোনারায়ণোহরিঃ

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় (চট্টোপাধ্যায়) বি, এল।

পৌষ-পার্ব্বণ।

—— ঃ*ঃ ——

শীতের জড়তা ঠেলি'— এ উল্লাস কোথা পেলি—
অয়ি! বিষাদিনী—বঙ্গ জননী আমার
কিসের এ আয়োজন? পূজা আজি কা'র?
চির অভিশপ্ত দেশে, সাক্ষাৎ কমলা এসে—
সহসা কি খুলে দিল "লক্ষ্মীর ভাণ্ডার?"
কোথা' গেল—ক্ষীণ কণ্ঠে দীন-হাহাকার?

বল কোন্ মহোৎসবে, মাতিয়াছে আজ সবে,
ঘরে ঘরে কেন হেরি আনন্দ তুফান?
কি প্রাসাদ—কি কুটীর, সকলই সমান।
গৃহিণীরা ভোরে উঠে, এনেছে চাউল কুটে,
কোন্ মহাব্রত আজ হ'বে উদ্‌যাপন?
অতীতের স্মৃতি এ যে! প্রেমের তর্পণ!

গৃহ-কোণে বঙ্গ বধূ বুকে স্নেহ, মুখে মধু,
"নবান্নে"—নূতন শস্য, দেবতারে দিয়া,
রেখেছিল শেষ ভাগ যতনে তুলিয়া।
বাহান্ন সপ্তাহ তরে, কতই আগ্রহ ভরে,
সে সম্বলে "রত্ন ঝাঁপি" ভরিয়া যতনে,
"বাউনী" বাঁধিল বালা খড়ের বন্ধনে।*

তিন দিন গৃহ ছাড়ি' যেওনা কাহারো বাড়ী"
মমতায় সুমধুর—বধূর শপথ,—
বাঙ্গালীর কি সৌভাগ্য দেখ্‌রে জগৎ।

* বাহান্ন (৫২) সপ্তাহে বর্ষ গণনা করিয়া, সম্বৎসরের জন্য পুরাকালের গৃহিণীগণ শস্য সঞ্চয় করিয়া গোলায় বাঁধিয়া রাখিতেন। ইহার নাম ছিল "বাহান্নী", তাহাই অপভ্রংশে "বাউনী বাঁধা" নাম পাইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্য পড়িলে পাঠক ইহা সবিস্তারে জানিতে পারিবেন।—লেখক।

পতি-পুত্র-পরিজনে— তুষিতে প্রফুল্ল মনে
অন্তঃপুরে—অবতীর্ণা "অন্নপূর্ণেশ্বরী"—
রাঁধিয়াছে কত খাদ্য বঙ্গের সুন্দরী।

মধুর "মোচার ঘণ্ট" সুধারসে সিক্ত কণ্ঠ,
কোমল 'পালমশাকে' মটরের বড়ী;
রসাল ক'রেছে তা'রে—মিশাল চিঙ্গড়ী।

বিবিধ মসলা যুক্ত— মূলার "মোহন শুক্ত"
ঘন অরহর ডালে—'জীরার ফোড়ন্'।
'কপি' সহ 'কই মাছ'—বিশ্বে অতুলন।

'তিল-পিটুলীর' বড়া ছাঁকা তেলে ভাজা কড়া,
'আমড়ার' "গুড়াম্বল" সুস্বাদু সরস।
ভেট্‌কী মাছের ঝোলে কে না হয় বশ;

ঘৃতে ভাজা তপ্ত লুচী, সদ্য অরুচির রুচি,
আস্কে, চুষী, পাটী-সাপ্টা, পাঁপর, কচুরি,
নূতন "ন'লেন" গুড়ে" মণ্ডার মাধুরী।

রসে মোলায়েম মিঠা, গোলাপী গোকুল পিঠা,
মুগের মগধ লাড়ু, কৃষ্ণ তিলে ছাঁই,
পান্তুয়া, নিখুঁতি, বোঁদে, মালপো মিঠাই।

পায়স—কামিনী চেলে, দেবরাজ খান পেলে,
পূর্ণিমার পূর্ণ শশী—সে 'সরুচিকুলী,'
দেশী মেওয়া, পূর দেওয়া, নানাবিধ 'পুলি'।

হা নিষ্ঠুর! হা নির্ব্বোধ! মাতৃ ধনে তুচ্ছ বোধ?
কেন সে' অখাদ্য খাও, কোন্ অনুরাগে?
এর কাছে, 'কাটলেট' কোর্ম্মা কোথা লাগে?

আর কত দিন ওরে! থাকিবি এ মোহ ঘোরে?
জননী-পীযুষ কিরে, অযত্নের ধন?
এত কি লেগেছে ভাল গোহাড় চর্ব্বণ?

শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ।

ডাক্তারের ডায়েরী।

—:*:—

দিল্লীর প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাত্মা ৺হেমচন্দ্র সেনের নাম কোন্ বাঙ্গালী না শুনিয়াছেন? তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্য, আতিথেয়তা, তাঁহার সমদর্শিতা অদ্যাপি প্রবাদের মত পশ্চিমভারতে ঘোষিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার রোগীগণ তাঁহাকে ধন্বন্তরির অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। দিল্লী প্রবাসী কোনও বাঙ্গালীর কাছেই তিনি ভিজিট লইতেন না। তীর্থ-যাত্রী ভদ্রলোকগণের আদর অভ্যর্থনার জন্য—তাঁহার প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকার দ্বার সর্ব্বদাই মুক্ত থাকিত।

চিকিৎসা কার্য্যে—তাঁহার অনন্য সাধারণ খ্যাত যশ ছিল। তাঁহার অভিমত—নব্য ডাক্তারগণ গুরু উপদেশের মত শিরোধার্য্য করিয়া লইতেন; হেমবাবু তাঁহার বহু অভিমত ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করিতেন। সেই পুরাতন ডায়েরীতে আমাদের মত লোকের অনেক জিনিষ শিখিবার আছে। "আয়ুর্ব্বেদে" ক্রমশঃ তাহা প্রকাশিত হইবে।

[—সঙ্কলয়িতা।]

উত্তেজনার কার্য্যে ব্রাণ্ডী প্রয়োগ করা ভ্রম।

"সাধারণ লোকে ব্রাণ্ডীকে উত্তেজক বলিয়াই জানে। তাহাতে তত দোষ ধরি না। কিন্তু অনেক ডাক্তারও যে ব্রাণ্ডীকে উত্তেজক পদার্থ মনে করেন না, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। আমি দেখিয়াছি, বেশ নামজাদা ডাক্তার—প্রসূতা নারীকে, অজীর্ণ ও উদরাময় রোগীকে, —পুনঃ পুনঃ জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিকে—পোর্ট, সেরী, ব্রাণ্ডী ও ভাইব্রোণা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য ব্যবহারের পরামর্শ দিয়া থাকেন। কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির অভিমত—প্লেগাদি মহামারীর প্রকোপ কালে সামান্য সর্দ্দিতে, সহর হইতে পল্লীগ্রামে গমনের সময়ে—পোর্ট, সেরী, ব্রাণ্ডী ও ভাইব্রোণা ব্যবহার করা খুব ভাল। কিন্তু এই ধারণাটী তাঁহাদের মারাত্মক ভ্রম। কেননা ব্রাণ্ডী ক্ষণিক উত্তেজক হইলেও উহা একটী অবসাদক পদার্থ। যেখানে উত্তেজনার আবশ্যক, সেখানে ব্রাণ্ডী প্রয়োগ করা অত্যন্ত অনিষ্টকর।

ব্রাণ্ডী পান করিলে, শরীর উষ্ণবোধ এবং দেহে বলাধান বোধ হয় বটে, কিন্তু তাহা ক্ষণ-স্থায়ী। ব্রাণ্ডীপানের পরবর্ত্তী অবসাদ অতি ভয়ঙ্কর। অতএব যেখানে হৃদ্‌পিণ্ডের শক্তি নাশের সম্ভাবনা—সেখানে কখনও ব্রাণ্ডী প্রয়োগ করিবেনা। ইহাতে কুফল ফলিতে পারে। ব্রাণ্ডীপানের অল্পক্ষণের পর—ত্বাচিক রক্তাধিক্য হইয়া থাকে, ফলে—হৃদপিণ্ডের রক্ত চাপের হ্রাস হয়, এবং শরীর ঠাণ্ডা হইয়া যাইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়া পড়ে। ব্রাণ্ডী বা ব্রাণ্ডীজাতীয় ঔষধ—হৃদপিণ্ডকে কখনই সতেজ অবস্থায় আনিতে পারে না।

বিসূচিকা রোগে—রোগীর হিমাঙ্গ অবস্থা উপস্থিত হইলে, অনেক চিকিৎসক ব্রাণ্ডীর ব্যবস্থা করেন, যাহারা এই ব্যবস্থা করিয়া

থাকেন, আমার বিশ্বাস—তাঁহারা প্রকৃত ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে না পারিয়া গত্যন্তর বিহীন হইয়াই এরূপ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। বিসূ-চিকা রোগে—ব্রাণ্ডী কখনও ঔষধরূপে প্রয়োগ করা উচিত নহে।”

ঋতু স্নান।

“আমাদের দেশে—ঋতুর চতুর্থ দিবসে স্ত্রীলোকদিগের স্নানের ব্যবস্থা আছে। স্মৃতি শাস্ত্রেও এ মত সমর্থিত হইয়াছে। কিন্তু অনেক রমণীর ঋতু চারিদিনের ও অধিক কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইতে দেখা যায়। এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণ—পূর্ণঋতুর অবস্থায়—আর্ত্তব থাকিতে থাকিতে, চতুর্থ দিবসে—শুচি হইবার লোভে স্নান করিয়া, নিজের অমঙ্গল নিজেই ডাকিয়া আনেন। এই সকল নারীর প্রায়ই বাধক বেদনা জন্মিয়া থাকে। “ঋতুর চতুর্থ দিবসে স্নান করিবে” শাস্ত্রের এইরূপ উপদেশ, কিন্তু এই চতুর্থ দিবসের অর্থ অনেক নারীই বুঝেন না। তৃতীয় দিবসের মধ্যে যাঁহাদের আর্ত্তব সম্যক স্রাব হইয়া যায়, তাঁহারা ৪র্থ দিবসে স্নান করিবেন। যাঁহাদের ঋতু ৪র্থ দিবসেরও অধিক দিন থাকে,—তাঁহারা ৪র্থ দিবসে স্নান করিলে—কখনই শুচি হইতে পারেন না। ঋতুকালে স্নান—জরায়ু রোগের নিদান। অতএব ঋতু থাকিলে—চতুর্থ দিনে কখনই স্নান করিতে দিবে না।”

মানসিক শ্রমের পর কায়িক শ্রম।

“কতকগুলি লোকের বিশ্বাস অত্যধিক মানসিক শ্রমের পর কায়িক পরিশ্রম করা উচিত। আমাদের দেশের ছাত্রগণ, তাই অধিক পাঠের পর কিয়ৎকালের জন্য অঙ্গ-চালনা বা ব্যায়াম করিয়া থাকেন। একজন বৈজ্ঞানিককেও বলিতে শুনিয়াছি—এইরূপ ব্যায়ামের দ্বারা, রক্তাধিক্য সমস্ত শরীরে পরি-ব্যাপ্ত হইয়া মস্তিষ্ককে শীতল রাখে। বৈজ্ঞানিক বলেন—তখন শরীরের যে অংশ কোন কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে, তখন সেই কর্ম্মশীলযন্ত্র বিশেষেই রক্তাধিক্য হইয়া থাকে। কিন্তু যে পরিমাণে সেই যন্ত্রবিশেষ কর্ম্মে রত থাকে, সেই পরিমাণে তজ্জনিত শরীরক্ষয়ও হইতে থাকে। সুতরাং মস্তিষ্ক পরিচালনায় যেমন শরীর ক্ষয় হয়, ব্যায়ামেতেও তদ্রূপ শরীর ক্ষয় হয়, অতএব একটী যন্ত্রের ক্ষয়পূরণের জন্য অপর যন্ত্রকে ব্যবহার করা চলে না। তবে একথা নিশ্চয়, গুরুতর মানসিক পরিশ্রমের পর ব্যায়াম করিলে, শরীর কিছু স্বচ্ছন্দ বোধ হয়।

যাঁহারা গুরুতর মানসিক পরিশ্রম করিবেন, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ পাঠাদি মানসিক শ্রমে ও নিযুক্ত হইবেন না। উভয় ব্যাপারই শরীরের অনিষ্ট কর।”

জ্বরের কোন্ অবস্থায় কুইনাইন দিতে হয়?

”কি ডাক্তার, কি গৃহস্থ, উভয়েরই ধারণা—বিজ্বর অবস্থায় অথবা জ্বর নামিবার মুখে কুইনাইন্ প্রয়োগ করা উচিত। আমি কিন্তু এরূপ মতের পক্ষপাতী নহি। জ্বরের কম্পনাবস্থা কাটিয়া গেলেই, কুইনাইন দেওয়া চলে। বিজ্বর অবস্থায় কিম্বা জ্বর নামিবার মুখে কুইনাইন্ দিয়া যে ফল পাওয়া যায়, জ্বরের অতি প্রবল অবস্থায় কুইনাইন দিলে—তা'র চেয়ে অনেক সুফল পাওয়া যায়। ইহা আমার পরীক্ষিত সত্য। আমি ২০ বৎসর ধরিয়া এইভাবে কুইনাইন্ ব্যবহার করিয়া আসি-তেছি। যদি ম্যালেরিয়া জ্বর জীবাণুঘটিত বলিয়া স্বীকার করিতে চাও, [illegible]

কাটিয়া গেলেই—প্রবল জ্বরে নির্ভয়ে কুইনাইন প্রয়োগ করিও। কিন্তু জ্বর ম্যালেরিয়া না হইলে, কুইনাইন দেওয়া ভাল নহে।"

জ্বরের পিপাসা।

"পিপাসা—জ্বরের একটী যন্ত্রণাপ্রদ প্রধান উপসর্গ। পিপাসা নিবারণের জন্য রোগীকে জলপান করিতে দিতে হয়। কবিরাজ মহাশয়েরা জ্বরগ্রস্ত রোগীকে কাঁচা জল পান করিতে দেন না,—তাঁহারা সিদ্ধ করা জল শীতল করিয়া পান করিতে বলেন। এ ব্যবস্থা মন্দ নহে। আমি দুই চারিজন বিজ্ঞ ডাক্তারকে শীতল জল পানের বিরোধী হইতে দেখিয়াছি। তাঁহারা রোগীর পিপাসার জন্য—উষ্ণ জলের ব্যবস্থা দেন। এখানে উষ্ণ জল অর্থে luke warm অর্থাৎ করোষ্ণ (কুসুম কুসুম) বুঝিতে হইবে। আমি এই উষ্ণজল পানের অত্যন্ত বিরোধী, উষ্ণজল পানে রোগীর পিপাসা দূর হয় না, বরং বাড়ে; অধিকন্তু বমনোদ্বেগ উপস্থিত হয়। উষ্ণজল বিস্বাদ,—তাহা পানে রোগীর প্রবৃত্তি বা রুচিও হয় না। একজন বহুদর্শী কবিরাজকে আমি আমার অভিমত জানাইয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন—গরম জলে রোগীর বমি হইতে পারে বটে, কিন্তু সেই বমিতে অনেক উপকার হইয়া থাকে। বমির সঙ্গে সঙ্গে পাকাশয় ধৌত হইয়া যাওয়ায়—রোগী শান্তি বোধ করে।" আমি কিন্তু আমার রোগীগণকে ঠাণ্ডা জল পান করিতে দিয়া থাকি। অনেকে শ্লেষ্ম-জ্বরে ঠাণ্ডা জল দিতে সাহস করেন না, ভয়—পাছে বুকে সর্দ্দী বসে। ইহা, অবশ্যই ভ্রান্তবিশ্বাস। নিমোনিয়া, প্লুরিসি, ব্রঙ্কাইটিস্ প্রভৃতি রোগেও—ঠাণ্ডা জল পান করিতে দেওয়া যায়। কেননা—জল পানে বুকে সর্দ্দী বসিতেই পারে না। বিশেষতঃ এ সকল রোগ জীবাণু-জাত। জ্বরাবস্থায়—শরীর ক্ষয় জনিত ক্লেদাদি দেহমধ্যে সঞ্চিত হইয়া থাকে। ঠাণ্ডা জল পানে সেই সকল ক্লেদ দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। মূত্র-গ্রন্থির কর্ম্মভার লাঘব করিবার জন্য রোগীকে প্রচুর পরিমাণে মুহু-র্মুহুঃ শীতল জল পান করিতে দিবে। শীতল জল পানের আর একটী উপকার—দেহের উত্তাপ কমিয়া যায়।

তথাপি যদি রোগীকে শীতল জল দিতে সাহস না কর, তবে—চায়ের মত অত্যুষ্ণ জল পান করিতে দিও। তাহাতে বরং উপকার পাইবে। কদাচ ঈষৎ উষ্ণ জল পান করিতে দিও না।"

নূতন জ্বরে দুগ্ধ পথ্য অনিষ্ট কর।—

"ডাক্তারেরা নূতন জ্বরে দুগ্ধ পান করিতে দেন; কবিরাজী মতে নূতন জ্বরে দুগ্ধ পান—বিষপানের তুল্য, আমি ডাক্তার হইয়াও, এই কবিরাজী মতটীকে শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছি। বাস্তবিক বহুস্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি—নূতন জ্বরে দুগ্ধ প্রদান করিলে, রোগীর দেহে কফের সঞ্চার হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যে অবস্থায় রোগীকে উপবাস দেওয়ার ব্যবস্থা—সে অবস্থায় দুগ্ধের মত গুরুপাক খাদ্য কখনই দেওয়া উচিত নহে। অল্পদিন জ্বরে ভুগিতে না ভুগিতে আজকাল যে অনেক রোগীর পেটে প্লীহা-যকৃতের আবির্ভাব হইয়া থাকে, নব জ্বরে দুগ্ধপান তাহার একটী কারণ।"

কড্‌লিভারের চেয়ে চ্যবনপ্রাশ ভাল।

"ফুসফুসের ক্ষয়-সূচনায় কড্‌লিভার অয়েল একটী ফলপ্রদ ঔষধ। ঘুষঘুষে জ্বর, তাহার সঙ্গে খুক্ খুক্ কাসি—এরূপ অবস্থায় আমরা কডলিভার বা কডলিভার মিশ্রিত ঔষধের

ব্যবস্থা দিয়া থাকি। কিন্তু কড্‌লিভার যে ক্ষয় নিবারণে সর্ব্বত্র সক্ষম—একথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। অনেক ক্ষয়রোগীর কড্‌লিভার সহ্য হয় না। খাইতে খাইতে উদরাময় দেখা দেয়, যকৃতের ক্রিয়া হ্রাস হইয়া পড়ে, আহারে অরুচি উপস্থিত হয়। রোগীর এরূপ অবস্থা দেখিলে, ডাক্তার কড্‌লিভার বন্ধ করিবার পরামর্শ দেন, তা'রপর পেটের অসুখ সারিলে, আবার কড্‌লিভার খাইতে বলেন। আবার খাইতে খাইতে পেটের অসুখ দেখা দেয়, আবার বন্ধ রাখিবার হুকুম হয়। এইরূপে অনেক রোগীকে মাঝে মাঝে বন্ধ রাখিতে হয়। আমি এরূপ চিকিৎসার পক্ষপাতী নহি। আমার বিশ্বাস—কড্‌লিভারের পরিবর্ত্তে কবিরাজী "চ্যবনপ্রাশ" ক্ষয়-রোগীকে খাইতে দেওয়া ভাল। চ্যবনপ্রাশ ক্ষয় নিবারক ও উৎকৃষ্ট রসায়ন। আমি নিজে অনেক রোগীকে চ্যবনপ্রাশ ব্যবহারে উপকৃত হইতে দেখিয়াছি। "চ্যবনপ্রাশে"—উদরাময়ের আশঙ্কা প্রায়ই নাই। অধিকন্তু—উহা সুস্বাদযুক্ত, সুরভি, মুখপ্রিয় এবং ফলপ্রদ। তবে চ্যবনপ্রাশ বিশুদ্ধ ও টাটকা হওয়া চাই। দুঃখের বিষয়—এমন একটা ক্ষয়নিবারক মহৌষধ, দিন দিন তাহাতে কৃত্রিমতার আবির্ভাব হইতেছে। ব্যবসায়ের খাতিরে—অনেকেই চ্যবনপ্রাশ ঘেঁটিয়া বড় লোক হইতে চাহিতেছে। অনেক রোগী আবার বিজ্ঞাপনের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া, সামান্য সর্দ্দী কাসীতে পর্য্যন্ত চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার করিয়া থাকেন। যে জিনিষে চাহিদা যত বেশী, সে সে জিনিসের নকলও তত বেশী। অতএব চ্যবনপ্রাশ সেবন করিতে হইলে সুপণ্ডিত বৈদ্যের শরণাগত হওয়াই উচিত।"

নূতন ক্ষত—আরংজেব সোর।

"দিল্লীতে—শুধু দিল্লী কেন—জয়পুরেও দেখিয়াছি—লোকের শরীরে একরকম ক্ষত উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ক্ষতকে স্থানীয় অধি-বাসীগণ "আরংজেব-সোর" বলেন। এই ক্ষত অতি ভয়ানক। ইহাতে পূয-রক্ত বা স্রাব বড় একটা থাকেনা। টক্‌টকে লাল ঘা—ভিতরে অগ্নিদাহের মত অত্যন্ত জ্বালা। ঘা একবার হইলে শুকাইতে চাহেনা, ক্রমাগত বাড়িতে থাকে। আমি এই "আরংজেব সোরের" অনেক চিকিৎসা করিয়াছি। ডাক্তারি মতে নানারকম লোসন্-মলম প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়াছি—কিন্তু কিছুতেই ঘা ভাল করিতে পারি নাই। অথচ আমি একজন প্রসার-প্রতিপত্তিবান্ ডাক্তার বলিয়া অনেক রোগীই এই ঘার চিকিৎসার জন্য আমার কাছে আসিত। কলিকাতায় অবস্থানকালীন একদা বন্ধুবর ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন এম ডিব সঙ্গে এই ক্ষতরোগের সম্বন্ধে আলোচনা করি। বন্ধুবর—চিরদিন "আয়ুর্ব্বেদের' গোঁড়া। তিনি আমাকে একটা কবিরাজী মলম প্রস্তুত করিতে শিখাইয়া দেন। সেই মলমে আমি অনেকগুলি রোগীর "আরংজেব সোর" ভাল করিয়াছি। এই মলম লাগাইবা মাত্র ঘায়ের জ্বালা কমিয়া যায়, ৭।৮ দিনে ঘা শুকায়। মলমটী এই—

গব্য ঘৃত—১ ছটাক,

মোম—১ ছটাক।

একত্রে মৃদু অগ্নিতে মাটীর পাত্রে গলাইতে হয়। উভয় পদার্থ গলিয়া গেলে—পাত্রটী অগ্নি তাপ হইতে নামাইয়া তাহাতে, নিম্নলিখিত দ্রব্যের গুঁড়া দিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া মিশাইতে হয়।

অনন্ত মূল চূর্ণ - -৵৹।
পল্‌তা চূর্ণ——৵৹।
ডালকরমচার বীজ চূর্ণ—/৹।
নিমপাতা চূর্ণ——৵৹।
নিসিন্দা পাতাচূর্ণ—৵৹।
হাফরমালীর পাতা চূর্ণ—৵৹।
ছোট গোয়ালের পাতা চূর্ণ—৵৹।
পাকা আকন্দ পাতা চূর্ণ - ৵৹।

এই মলমে নালী ঘা, এবং সর্ব্বপ্রকার দূষিত ঘা—সমস্তই ভাল হয়।

এই ঘা প্রথমে নাকি সম্রাট আরংজেবের অঙ্গে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাই ইহার নাম "আরংজেবসোর।"

শ্রীজগবন্ধু গুপ্ত এল, এম, এস।

ইন্দ্রিয়ের শক্তি হ্রাস।

বিগত আশ্বিন মাসে, আমার এক হিন্দুস্থানী প্রতিবেশীর চক্ষুরোগ হইয়াছিল। আমি তাহাকে লইয়া বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ চিকিৎসক, বন্ধুবর—ডাক্তার যতীন্দ্র নাথ মৈত্রের শরণাগত হইয়াছিলাম।

ডাক্তার মৈত্র সে দিন বড়ই ব্যস্ত। দুই শতেরও অধিক রোগী সে'দিন তাঁহার আতুরাশ্রমে উপস্থিত। মুহূর্ত্তের জন্য এ অভাগা-আগন্তুকের দিকে একটু স্বাগত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, ডাক্তার মৈত্র তাঁহার এক ভৃত্যের দ্বারা এক বাক্স 'সিগারেট' ও এক ডিবা তাম্বুল পাঠাইয়া দিলেন; আমি বিজলী-চালিত-পাখায়—অপ্সরার অঞ্চল বাতাসে স্নিগ্ধ হইয়া—সেগুলির সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলাম।

"গরুড়স্তম্ভের" পার্শ্বদেশ হইতে মহাপ্রভুর জগন্নাথ দেখার মত—আমি কেবল ডাক্তারের দিকে চাহিয়াছিলাম। কমকবেষ্টনী পদ্মরাগ মণির মত, অসংখ্য রোগী ও রোগিনী পরিবৃত হইয়া, আজ তাঁহাকে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। মহাপ্রকৃতির মাঝে ভবিষ্য সৃষ্টির ক্রমবিকাশের ন্যায়, তাঁহার দুইজন সাহায্যকারী এক একটী রোগীকে—তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিতেছিল। ডাক্তারের শান্ত-সৌম্য-সুন্দর মুখখানি—অনন্ত চিন্তানুগামিতায়, কৌৎস ঋষির কৌষেয়বাসের মত আরক্তিম হইয়া উঠিতেছিল। অসংখ্য রোগী পরীক্ষা করিতে করিতে, এমন পেশী-পুষ্ট কর্ম্ম-কুশল হাত দু'খানি, যেন বিপুল অবসাদে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল। ক্ষুণ্ণ দৃষ্টি বহু নর নারীর আর্ত্তকাহিনী শুনিতে শুনিতে কক্ষ মধ্যস্থ পবনও বুঝি ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল! আমি ভাবিতেছিলাম—সৃষ্টিরহস্য উদ্ঘাটনের জন্য, ভগবান যেমন "একোঽহং বহুস্যামঃ" বলিয়া প্রকৃতির বুকে বহুমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন; নশ্বর মানব নয়নের কুহেলী ভেদ করিতে ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ কেন এক হইয়া অনেক হউন না! হায় তখন ত আমার

মনে হয় নাই—বিজ্ঞানের পরিপূর্ণতার প্রতিষ্ঠা করিবার নিমিত্ত, ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ আজ কর্ম্মরূপী বহিস্ফুরণ!

আমাদের পাড়ায় একজন দশকর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। লক্ষ্মীপূজার দিন—যখন তাঁহাকে বহু যজমানের যাজনা করিতে হইত, অতি সংক্ষেপে দেব-সেবা সারিবার জন্য তিনি কম করিয়া মন্ত্র পাঠ করিতেন। এইরূপে এক ঘণ্টার মধ্যে তিনি পঞ্চাশ ঘরের পূজা শেষ করিয়া ফেলিতেন। সেই পুরোহিতের কথা সহসা আমার স্মৃতিপথে উদিত হইল। ডাক্তার মৈত্রকে লক্ষ্য করিয়া আমি বলিয়া ফেলিলাম—"পুরোহিতের হাতে যেদিন কাজ বেশী থাকে, সে'দিন তিনি কম করিয়া মন্ত্র পড়িয়া থাকেন।" রহস্যভূষণাভাষায় ডাক্তার মৈত্র উত্তর দিলেন—"মন্ত্র কম বলিলে দেবতা সন্তুষ্ট হইবেন কেন?" বুঝিলাম—রোগ পরীক্ষায় এমন অসীম ধৈর্য্য ও অপূর্ব্ব অধ্যবসায় না থাকিলে ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ এত বিরাট ও মহান্ হইতেন না।

ডাক্তারের পরীক্ষা গৃহে, সমাগত অসংখ্য রোগীর মধ্যে অনেকগুলি রমণীও ছিলেন। কেহ বৃদ্ধা, কেহ প্রৌঢ়া, কেহ তরুণী, কেহ কিশোরী। আরও দেখিলাম—ওষ্ঠে ও গণ্ডে গোলাপের লালিমা মাখা দুই চারিটী বালিকা! হায়! ইহারা সকলেই চক্ষুরোগাক্রান্ত!! পরিচয় পাইলাম—ইহাদের মধ্যে অনেকে সহর বাসিনী, অনেকে সুদূর পল্লীগ্রামের কুললক্ষ্মী।

এই সকল রোগীকে ডাক্তার মৈত্র অতি যত্নে ও অতি আগ্রহে পরীক্ষা করিলেন। মধ্যগগনস্পর্শী মার্ত্তণ্ডদেব ক্রমে পশ্চিম দিকে ঈষৎ ঢলিয়া পড়িলেন। আমাদের মধ্যে একটু বিশ্রম্ভালাপ আরম্ভ হইল। এমন সময় একটী ভদ্রলোক সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে দুইটী সুকুমার শিশু। একটীর বয়স ৭ বৎসর, ২য়টি এখনও পঞ্চমবর্ষ অতিক্রম করে নাই। বালকদ্বয়ের পিতা বলিলেন—ছেলে দুটী রাত্রে কিছুই দেখিতে পায় না। ডাক্তার মৈত্র অর্দ্ধ ঘটিকা ব্যাপী পরীক্ষার পর, বালকদ্বয় সম্বন্ধে তদীয় অভিমত প্রকাশ করিলেন—ইহারা উভয়েই রাতকাণা। ইহাদের নেত্র মণ্ডলের কতকগুলি স্নায়ুবিতান শুকাইয়া গিয়াছে। চিকিৎসায় কোন ফল হইবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না।"

এইবার আমার ধারণা হইল—মানুষের দর্শনেন্দ্রিয়ের শক্তি দিন দিন হ্রাস হইয়া আসিতেছে!!

আমরা যখন "ছাত্রবৃত্তি"শ্রেণীর ছাত্র, তখন বাঙ্গালার প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বেতালপঞ্চবিংশতি" আমাদের পাঠ্য পুস্তক ছিল। পুস্তক খানি হিন্দী "বেতাল পঁচিশী" হইতে ভাষান্তরিত। এখন আর ইহা বিদ্যালয়ে পঠিত হয় না। বই খানি এখন বোধ হয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারে স্থান লাভ করিয়া প্রত্নতত্ত্বের সামিল হইয়া পড়িয়াছে! দুঃখের কথা নহে কি? এখনকার ছাত্রেরা বইখানি পড়ুন আর নাই পড়ুন—ইহার গল্পগুলি অনেকেই শুনিয়াছেন। এই সকল গল্পের মধ্যে "ভোজন বিলাসী" ও "শয্যা বিলাসীর" গল্প সর্ব্বজন বিদিত। তথাপি এ স্থলে সেই গল্পটীর ভাবার্থ আমি লিপিবদ্ধ করিতেছি—

"ধর্ম্মপুরে গোবিন্দ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র "ভোজন বিলাসী"—অর্থাৎ খাদ্য দ্রব্যে কোন দ্রব্যের দোষ থাকিলে, অসাধারণ [illegible]

সে তাহা ধরিতে পারিত। কনিষ্ঠ পুত্র—"শয্যা বিলাসী"। শয্যায় কোনও দুর্লক্ষ্য বিঘ্ন ঘটিলে—তাহার আর নিদ্রা হইত না। উভয় ব্রাহ্মণ সন্তানের এইরূপ বিস্ময়জনক ক্ষমতার কথা শুনিয়া, সে দেশের রাজা—একদা দুই ভ্রাতাকে পরীক্ষা করিবার মনস্থ করিলেন। উভয়ে রাজ-প্রাসাদে নিমন্ত্রিত হইল।

"ভোজন বিলাসী"—তাহার জন্য রাজা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাচককে নানাবিধ সুখাদ্য প্রস্তুত করিবার আদেশ দিলেন। "ভোজন-বিলাসী" যথা সময়ে আহার স্থানে উপস্থিত হইল। পাচক সযত্নে প্রস্তুত—চর্ব্ব, চুষ্য, লেহ্য, পেয়—চতুর্ব্বিধ খাদ্য সম্ভার ব্রাহ্মণের সম্মুখে সজ্জিত করিল। কিন্তু "ভোজন বিলাসী" আসনে উপবেশন করিয়াই তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িল। অমন দেব-ভোগ্য ভোজ্য বস্তু আহার করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

ক্ষণকাল পরে রাজা আসিয়া "ভোজন বিলাসীকে" জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন, তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করিয়াছ ত?" ব্রাহ্মণ বিষণ্ণবদনে উত্তর দিল—"না মহারাজ! আমার আহারই হয় নাই, তৃপ্তি ত দূরের কথা!" রাজা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন, আহার হয় নাই কেন?" ভোজন বিলাসী বলিল—"মহারাজ সকল খাদ্যের শ্রেষ্ঠ খাদ্য অন্ন, আপনার পাচক যে অন্ন পাককরিয়াছে, সে অন্নে আমি শবদাহের পূতিগন্ধ অনুভব করিয়াছি। কাজেই আমার খাওয়া হয় নাই।"

ব্রাহ্মণকে উন্মাদ মনে করিয়া, রাজা, প্রথমে হাসিয়া ফেলিলেন। কিন্তু সবিশেষ অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন—যে তণ্ডুলে অন্ন পাক করা হইয়াছিল, সে তণ্ডুল শ্মশান সন্নিহিত কোন ক্ষেত্র জাত ধান্য হইতে উৎপন্ন। বিস্ময়-বিমুগ্ধ-নৃপতি তখন সেই "ভোজন বিলাসীর" যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পর্য্যাপ্ত পুরস্কারে প্রীত হইয়া ব্রাহ্মণ স্বগৃহে প্রস্থান করিল।

এদিকে রাজ প্রসাদের এক মর্ম্মর খচিত কক্ষে পুষ্পিত যৌবনা সুন্দরী বৃন্দেরসেবা-নিপুণ-করপরিচালনায় "শয্যা-বিলাসীর" জন্য দুগ্ধ ফেণনিভ সুকোমল শয্যা রচিত হইল। ব্রাহ্মণ সেই শয্যায় নিশা যাপনের অনুমতি পাইল।

পরদিন অতি প্রত্যূষে রাজা সেই শয়ন কক্ষে উপস্থিত। দেখিলেন—"শয্যা বিলাসী" কক্ষতলে বসিয়া রহিয়াছে! তাহার জাগরণারুণ নেত্র ও কেশপাণ্ডুর মুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া, রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন ব্রাহ্মণ! তোমার ভাল ঘুম হইয়াছে ত?" জড়িত কণ্ঠে "শয্যা বিলাসী উত্তর দিল—"না মহারাজ! আমার আদৌ ঘুম হয় নাই। আপনার এই শয্যার সপ্তম তলে একগাছা চুল আছে, সেই জন্য এই শয্যায় শয়ন করিবামাত্র আমার পৃষ্ঠদেশে ভয়ানক বেদনা হইয়াছে। সারারাত্রি আমি ঘুমাইতে পারি নাই।" শয্যা বিলাসীর কথায় রাজা চমকিত, বিত্রস্ত ও বিচলিত হইয়া উঠিলেন। কিঙ্করীগণ ছুটিয়া আসিল, একে একে শয্যাতল পরীক্ষা করিতে লাগিল। রাজা দেখিয়া অবাক হইলেন—সেই শিরীষপুষ্পপেলব অমল ধবল সুখ শয্যার ঠিক সপ্তম তলে—নারী শিরঃচ্যুত একগাছি কেশ পড়িয়া রহিয়াছে! এই একগাছি কেশের জন্যই—অমন সুন্দর সুখশয্যাও "শয্যা বিলাসীর" পক্ষে বিঘ্নকণ্টকিত হইয়াছে!

বলা বাহুল্য "শয্যা বিলাসীর" ত্বগিন্দ্রিয়ের এইরূপ অপূর্ব্ব তীক্ষ্ণতার প্রমাণ পাইয়া, রাজা তাহার উপর অত্যন্ত প্রীত হইলেন।

গল্পটীতে—একজনের ঘ্রাণ শক্তি এবং অপরের স্পর্শশক্তির যেরূপ আতিশয্য বর্ণিত হইয়াছে, বিংশ শতাব্দির সভ্যযুগে তাহা কখনই বিশ্বাস যোগ্য নহে। আমাদের পণ্ডিত মহাশয়—যখন এ গল্পটী আমাদের পড়াইয়া শুনাইয়াছিলেন, আমরা বালক হইলেও—আমাদের মনে হইয়াছিল—"শ্মশান-সন্নিহিত ক্ষেত্রজাত ধান্যের তণ্ডুলের অন্নে" শবদেহের দুর্গন্ধ অনুভব করা, আর সাতখানা গদীর তলায় একগাছা ক্ষুদ্র চুল থাকায় সারারাত্রি ঘুম না হওয়া—দুই অসম্ভব! মানুষের ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও ত্বগিন্দ্রিয়—এতদূর তীক্ষ্ণশক্তিসম্পন্ন হইতেই পারে না। আমাদের কথা ছাড়িয়া দিই,—কোন্ সুদূর অতীতের ধর্ম্মপুরের নরপাল, তিনিও তো প্রথমে একথা বিশ্বাস করেন নাই। তখনও তাঁহার মুখে হাসি আসিয়াছিল, এখনও আমাদের মুখেও হাসি আসে।

কিন্তু চিন্তার কথা এই—ধর্ম্মপুরের রাজা "ভোজন বিলাসী" ও "শয্যাবিলাসীর" কথা প্রথমে বিশ্বাস করেন নাই; শেষে যখন উভয় ভ্রাতার নির্দ্দেশ, নানা অনুসন্ধানে বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল,—তখন তো রাজা এ ঘটনা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন! তবে আমরা ইহা বিশ্বাস করি না কেন? ইহার কারণ,—মানবেন্দ্রিয়ের এরূপ তীক্ষ্ণতার উদাহরণ আমাদের মধ্যে আমরা কখনও দেখি নাই। কাজেই গল্পের "ভোজন বিলাসী" ও "শয্যা-বিলাসীকে" আমাদের পাগল বলিয়াই মনে হয়।

ঠিক্ স্মরণ হয় না—বোধ হয় ১৩০৮ কি ১৩০৯ সালে, আচার্য্য অক্ষয় চন্দ্রের কলিকাতার বাসায়, বঙ্কিম মণ্ডলের অন্যতম জ্যোতিষ্ক স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় একদিন বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। সেই সময় কথাপ্রসঙ্গে চন্দ্রনাথ বাবু "বেতালপঞ্চবিংশতির" কথা উত্থাপন করেন। "ভোজন বিলাসী" ও "শয্যা বিলাসীর" কথায় আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র বলেন—"এ গল্পে অবিশ্বাস করিবার কিছুই নাই। যে যুগে "বেতাল পঁচিশী"র গল্প রচিত হইয়াছিল, সে যুগের মানুষের ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা যে আমাদের চেয়ে অনেক বেশী ছিল, তাহা অস্বীকার করা চলে না। গল্পের কল্পনাকাণ্ডে, মানুষের প্রকৃত অবস্থার আভাস ইঙ্গিতও থাকিতে পারে। কল্পনা যতই উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল হউক না কেন,—বাস্তব ঘটনাই তাহার ভিত্তি। আমাদের চেয়ে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের ইন্দ্রিয়র যে তীক্ষ্ণতা অধিক ছিল, ইহা নিশ্চিত।

চন্দ্রনাথ বাবু, অনেক তর্ক-বিতর্কের পর আচার্য্য অক্ষয় চন্দ্রের মত সমর্থন করিয়াছিলেন। "বেতালে বহু রহস্য' নামক উপাদেয় প্রবন্ধে তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সভ্যতার প্রসাদেই হউক আর জল বায়ুর বিকৃতি বশেই হউক,—আমাদের ইন্দ্রিয়ের শক্তি যে ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইয়া যাইতেছে—যুক্তিপূর্ণ কথায়, চন্দ্রনাথ বাবু উক্ত প্রবন্ধে তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন—অসভ্যাবস্থায় মানুষের কোন কোন ইন্দ্রিয়ের অসাধারণ তীক্ষ্ণতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। মধ্য এশিয়ার তাতারদিগের দর্শন শক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, তাহারা বহুদূরস্থিত পদার্থ দেখিতে পায়। কতকগুলি জাতির ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা এত অধিক, তাহারা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা যোজনান্তরস্থিত জলাশয়ের অস্তিত্ব বুঝিতে পারে। এসম্বন্ধে উৎসুক ব্যক্তি "বেতালে" বহু রহস্য পড়িয়া দেখিবেন।

বেতাল পঞ্চ বিংশতির আর একটী গল্প ত্বগিন্দ্রিয়ের ও [illegible]

বর্ণিত হইয়াছে। এক রাজার তিন মহিষী ছিল। রাজার নাম "ধর্ম্মধ্বজ"। একদা বসন্তকালে তিন মহিষীকে লইয়া তিনি উপবন বিহারে যাত্রা করিয়াছিলেন। সেখানে, জ্যেষ্ঠা মহিষীকে রাজা একটী ফুটন্ত ফুল প্রেমোপহার দিয়াছিলেন, সেই ফুলটী করচ্যুত হইয়া রাজ্ঞীর বামপদে পতিত হওয়ায় সে কোমল চরণ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। চন্দ্রের অমৃতকিরণস্পর্শে দ্বিতীয়া মহিষীর গাত্রের স্থানে স্থানে অগ্নিদগ্ধের মত ফোস্কা উঠিয়াছিল। বহুদূরস্থিত গৃহস্থের গৃহ হইতে আগত উদুখলের ক্ষীণ শব্দ শুনিয়া কনিষ্ঠা রাজ্ঞী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন। এ ঘটনাও চন্দ্রনাথ বাবু অবিশ্বাস করিতে পারেন নাই। স্নায়ুর অবস্থা বিশেষে এরূপ ঘটিতে পারে। চন্দ্রনাথ বাবুর কোন বন্ধু—সেতারের সুমধুর ঝঙ্কারে—শিরঃপীড়ায় সংজ্ঞাশূন্য হইতেন। অযোধ্যার মৃত নবাব ওয়াজেদ্‌আলিশাহ অপরাহ্নে জলযোগের সময় ৪ খানি ছানার জিলিপি ও ৪টী ক্ষীরের পান্তুয়া ভক্ষণ করিতেন। তদীয় আদেশানুসারে জিলিপি ভাজা হইয়া গেলে, সেই ঘৃত পরিবর্ত্তন করিয়া আবার নূতন ঘৃতে পান্তুয়া ভাজা হইত। নবাবের এক নূতন কর্ম্মচারী—ঘৃতের এইরূপ অনর্থক অপচয় নিবারণ করিবার জন্য, জিলিপি ভাজার পর সেই ঘৃতেই পান্তুয়া ভাজিবার হুকুম দেন। যে দিন এইরূপ করা হয়, সেদিন নবাব সাহেব একটী পান্তুয়ার কিয়দংশ মুখে দিয়াই দুর্গন্ধবশতঃ তাহা খাইতে পারেন নাই। নাটোরের মহারাজার মুখে শুনিয়াছি—তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ রাজা আনন্দ নাথ রায়, প্রত্যহ তুলা ধুনাইয়া সেই তুলা নূতন খোলে পূরিয়া—তাহার উপর শয়ন করিতেন। বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে, একবার তাঁহাকে কলিকাতায় আসিয়া, রাজা রাধাকান্ত দেবের ভবনে বাস করিতে হয়। তাঁহার দর্জ্জি তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল। প্রত্যহ নূতন করিয়া তুলা ধুনিয়া নূতন খোলে পূরিয়া গদী প্রস্তুত হইতেছে দেখিয়া, রাজা রাধাকান্ত দেব গোপনে দর্জ্জিকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করেন। কাজেই নাটোরেশ্বরকে সে'দিন পূর্ব্বদিনের প্রস্তুত গদীতে শয়ন করিতে হইয়াছিল। সমস্ত নিশি ঘোর অশান্তি ও অনিদ্রায় অতিবাহিত করিয়া পরদিন প্রভাতে আনন্দনাথ তাঁহার দর্জ্জিকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছিলেন। শেষে রাধাকান্ত দেবের কাছে সকল রহস্য অবগত হইয়া দর্জ্জির অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছিলেন।

বেতাল পঞ্চবিংশতির গল্পে বর্ণিত ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা ও কোমলতার কথা যখন আমাদের কাছে উপহাসযোগ্য হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে—আমাদের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা ও কোমলতা নিতান্তই হ্রাস হইয়া গিয়াছে। এই হ্রাসের পরিমাণ কিরূপ—তাহা নির্ণয় করা এক্ষণে বড়ই কঠিন ব্যাপার। আমাদের নিজের ইন্দ্রিয়ের শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি আমরা কতক বুঝিতে পারি, কিন্তু পরের বেলা তাহা পারি না। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের ইন্দ্রিয় শক্তি কতদূর প্রবল ছিল, তাহা আমরা জানি না। বেদে-পুরাণে কাব্য-দর্শনে সে শক্তির যে টুকু স্বপ্ন ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়—তাহাতেই আমরা বুঝিতে পারি;—তাঁহাদের ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা, শরীরের স্বাস্থ্য, মনের বল, মস্তিষ্কের প্রতিভা, জীবনের স্পন্দন,—আমাদের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। এখন তাহার তুলনা করা চলে না। মহাত্মা চন্দ্রনাথ বসু বলিয়াছেন—"আমাদের ইন্দ্রিয়ের [illegible] কমিয়াছে এবং [illegible]

আমাদের [বাঙ্গালী জাতির] প্রকৃত বিপদ্ ও বিষম ভয় ভাবনার কারণ উপস্থিত হইয়াছে।”

একথা পাকা বৈজ্ঞানিকের—পাকা বহুদর্শীর কথা! বাস্তবিক আমাদের ইন্দ্রিয় শক্তির দিন দিন অধঃপতন ঘটিতেছে। আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা যে কিরূপ দ্রুতবেগে নষ্ট হইয়া আসিতেছে আমি তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ডাক্তার মৈত্রের বাটীতে আমি এত চক্ষুরোগগ্রস্ত নরনারী এবং বালক বালিকা দেখিয়াছি, যে, সাহস করিয়া বলিতে পারি—পূর্ব্বে এদেশে এত লোকের চক্ষুরোগ হইত না। প্রাচীনভারতে চস্মার প্রচলন ছিল না, সংস্কৃত ভাষায় চস্মার প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না। প্রবীন সাহিত্যিক দাদা দীননাথ ধরের মুখে শুনিয়াছি—তাঁহার বাল্যকালে তিনি কদাচিৎ কোন বৃদ্ধকে চস্মা ব্যবহার করিতে দেখিয়াছেন। একথা অশীতি বর্ষের পূর্ব্বের কথা। আমার বাল্যকালে আমিও অধিক লোককে চস্মা ব্যবহার করিতে দেখি নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম প্রভাবের সময়—বিজ্ঞতা ও গাম্ভীর্য্যের ব্যঞ্জনাস্থলে—অনেকে চস্মার আদর আরম্ভ করেন। কিন্তু এখন যেহাটে, মাঠে, পথে, ঘাটে—যুবক যুবতীদের চ'ক্ষে কনক বেষ্টনে নানাবর্ণের কাচখণ্ড দেখিতে পাই, ইহা দর্শনেন্দ্রিয়ের বিকার বা দৌর্ব্বল্যের জন্যই। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে—বৃদ্ধদের চ'খে চসমা দেখিয়াছি,—যুবক-যুবতী বা বালক-বালিকারা আবার যে চস্মা পরিতে পারে—তখন ইহা কল্পনাও করি নাই। এখন দশ বছরের বালকেও চস্মা পরিয়া স্কুলে যাইতে দেখিতেছি। যে সকল ছাত্র অদ্যাপি চস্মা গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকের দৃষ্টিশক্তি ক্ষুন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ইহার প্রমাণ—১৩০৬ সালে মহীশূর প্রদেশের এক উচ্চ রাজকর্ম্মচারী, শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া এদেশে আসিয়া ‘হিন্দু’ ‘হেয়ার’ প্রভৃতি অনেকগুলি স্কুলের ছাত্রের নেত্র পরীক্ষা করিয়াছিলেন। সে পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে—এদেশের ছাত্রগণের মধ্যে শতকরা ৬৬ জন চক্ষু রোগগ্রস্ত! আমাদের দৃষ্টিশক্তি হ্রাসের ইহা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নহে কি?

এখন আমাদের মধ্যে কেহ দূরে দেখিতে পান না, কেহ নিকটে দেখিতে পান না, কেহ নিকটে-দূরে—কোথাও দেখিতে পান না।

একজন প্রবীন বৈজ্ঞানিক আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন, “পূর্ব্বে চিকিৎসককে সংযতহইয়া রোগীর আপাদ মস্তক ধীরভাবে নিরীক্ষণ করিয়া, তাহার দেহের আভ্যন্তরিক অবস্থা বুঝিবার চেষ্টা করিতে যেরূপ দেখিয়াছি, এখন আর প্রায় সেরূপ দেখিনা। সে অন্তর্ভেদিনী দৃষ্টি, বোধ হয় এখন কমিয়া গিয়াছে। যান্ত্রিক পরীক্ষার প্রচলনে চক্ষুঃ স্থূলতা প্রাপ্ত হইতেছে। আমার মনে বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মিতেছে যে, রোগ নির্ণয়ে ও রোগের চিকিৎসায় ইন্দ্রিয়ের পরিবর্ত্তে যন্ত্রের ব্যবহার যত বাড়িতেছে ইন্দ্রিয় সকল তত স্থূল, ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে। ইহাতে মানুষের মঙ্গল কি অমঙ্গল, যথার্থই ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে।”

[সাহিত্য সংহিতা তৃতীয় খণ্ড
১১শ ও ১২শ সংখ্যা, ৬১৪ পৃঃ]

বাস্তবিক—জগতে যত যন্ত্রের ব্যবহার বাড়িতেছে, ততই মানুষের ইন্দ্রিয়ের শক্তি, তীক্ষ্ণতা কার্য্যকারিতা এবং অন্তর্দৃষ্টি কমিয়া যাইতেছে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস— ডাক্তারের চেয়ে বৈদ্যগণ ভাল [illegible] নাড়ী

দেখিতে পারেন। এ বিশ্বাস অমূলক নহে। বৈদ্যশাস্ত্রে উত্তাপ মাপিবার মাপকাটী নাই। কাজেই বৈদ্যগণকে ভাল করিয়া "নাড়ী-জ্ঞানী" হইতে হয়। ডাক্তার ষ্টেথিস্কোপ বসাইয়া হৃদ্‌পিণ্ড ও ফুপ্‌ফুসের অবস্থা যেরূপ অনুমান করিয়া থাকেন, কেবলমাত্র নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বৈদ্য তাহা বুঝিতে পারেন। বৈদ্যমতে ভিন্ন ভিন্ন রোগে নাড়ীর গতি বিভিন্ন হইয়া থাকে। নাড়ীর সর্পগতি, ভেকগতি, জলৌকা গতি, পারাবতগতি,—ডাক্তারগণ হয়ত বিশ্বাসই করিবেন না। যন্ত্রের পরীক্ষায় ত এ সব জানা যায় না। দুঃখের বিষয় স্পর্শেন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা কমিয়া যাওয়ায় আজকাল অনেক বৈদ্যই নাড়ী পরীক্ষায় কৃতিত্ব হারাইতেছেন।

আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা যে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে—তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের শক্তিও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তবে ইহা বুঝিবার সুযোগ পাওয়া যায় না। কর্ণের বহির্দেশ দেখিয়া, কে বধির কে কম শুনে, তাহা জানা যায় না। আমি কিন্তু কতকগুলি ধনী সন্তানকে 'ইয়ার ট্রম্পেট' ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। য়ুরোপে এই যন্ত্রের বহুল প্রচলন আছে। আমাদের দেশে উহার ব্যবহার এখনও বিরল হইলেও আমাদের শ্রবণ শক্তির যে স্বল্পতা ঘটিয়াছে—তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

আমাদের রসনেন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতাও নষ্ট হইতে বসিয়াছে। অনেকেরই জিহ্বার অবস্থা ভাল নয়। কেহ কেহ অন্নব্যঞ্জনে অধিক লবণ ব্যবহার করেন, কেহ খর ঝাল না হইলে তরকারীর আস্বাদ পান না। একটু সামান্য অম্লরস লেহনে কাহারও জিহ্বায় জাড়ি উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্বাস্থ্যের প্রতিকূল জানিয়াও আমরা অধিক মসলা সংযোগে পাচিত ব্যঞ্জন ভিন্ন রুচি পূর্ব্বক আহার করিতে পারি না। অনেক দ্বিজাতির গৃহেও এখন নিষিদ্ধ মাংস, পলাণ্ডু রস, সাদরে ব্যবহৃত হইতেছে।

আমার বেশ মনে পড়ে—বাল্যকালে লুচির নিমন্ত্রণে—লুচি ও চিনি ভিন্ন আর কিছু উপকরণ বড় একটা দেখিতে পাইতাম না। শূদ্রের বাটীতে ব্রাহ্মণ বা নবশাখ কেহই তরকারী খাইতেন না। সামান্য শর্করা সংযোগে—অনেকেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লুচি উদরস্থ করিতেন। বড়লোকের বাড়ী হইলে, একটু দধির আয়োজন হইত, তাহাও ভোজনের শেষভাগে পাতে পড়িত। এখনকার ভোজে—লুচির সঙ্গে, শাক, ভাজা, তরকারী, ডাল, চাট্‌নী প্রভৃতির আয়োজন করিতে হয়। ক্রমশঃ দেখিতেছি—চাট্‌নীর সমাবেশ দ্রুততর বৃদ্ধি পাইতেছে। এখন কর্ম্মকর্ত্তাকে নিমন্ত্রিতের জন্য নানাবিধ চাট্‌নী প্রস্তুত করিতে হয়। জয়পুরাধিপতির ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী স্বর্গীয় সংসার চন্দ্র সেন মহাশয়ের কন্যার বিবাহ ভোজে—আমি ১১ রকম চাট্‌নী ও ৫ রকম সরবতের সমাবেশ দেখিয়াছি। মিষ্টান্নের ভিতরে এখন—খাজা, গজা, দরবেশ, জিলিপি, বঁদে, পান্তুয়া, রসগোল্লা সন্দেশ প্রভৃতি শোভন সুন্দর বেশে স্থান লাভ করিয়াছে। অম্ল দধি এখন আর ভাল লাগেনা, তাই তাহা শর্করা সংযোগে "চিনিপাতা দধিতে" দাঁড়াইয়াছে। শুধু ইহাই নহে—রসনেন্দ্রিয়ের স্বাদশক্তির তীক্ষ্ণতার হ্রাস হওয়ায়—এখনকার ভোজে—পাপর, কচুরী, নিমকী, ডালমুট ভাজার সঙ্গে সঙ্গে—নানাবিধ ফল মূলেরও আয়োজন করিতে হইতেছে। এত উদ্যোগ—এত আয়োজন রহিলে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভোক্তার

মুখ বদলান হয় কি ? আগেকার ভোক্তারা আহারে বসিয়া মুখ বদলাইবার আবশ্যকতা দেখিতেন না। আচার্য্য অক্ষয় চন্দ্রের মুখে শুনিয়াছি পূজার মহাষ্টমীর দিন তাঁহার পিতৃদেব রায় গঙ্গাচরণ সরকার—কতকগুলি ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতেন। ঐ সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে দুই চারিজনের রসনার শক্তি এতদূর তীক্ষ্ণ ছিল যে, তাঁহারা চল্লিশ টাকা মণের ও বিয়াল্লিশ টাকা মণের সন্দেশে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকিত, তাহাও ধরিতে পারিতেন। আমাদের জিহ্বায় আর পূর্ব্বের মত আস্বাদানুভব হয় না। আমাদের ক্ষুধা, পরিপাক শক্তি দিন দিন কমিতেছে। আমাদের দেশে আর "একমনে রঘু" "আধমনে কৈলাস" জন্ম গ্রহণ করে না। নব্যসম্প্রদায় অধিক আহারকে অসভ্যতার চিহ্ন বলেন। আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র পূর্ণ আহারের পর—২৫টা গোলাপভোগ আম খাইতে পারিতেন। ভায়া অজয় চন্দ্র অক্ষয় চন্দ্রের পুত্র সে রসে বঞ্চিত। এখন নিমন্ত্রণ খাইতে বসিয়া—আহার্য্যের উপকরণ কোনটা ছুইতে হয়, কোনটা শুকিতে হয় কোনটা বা একটু মুখে দিতে হয়। অম্লরোগের তাড়নায় —মিষ্টান্নভক্ষণ এখন বিভীষিকাবৎ হইয়া উঠিয়াছে। বড়দুঃখেই বঙ্গের বরেণ্য ব্রাহ্মণ ভূদেব মুখোপাধ্যায় "সামাজিক প্রবন্ধে" লিখিয়াছিলেন—

"ভারতবাসীর খাদ্য-পরিমাণ ন্যূন হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্ব্বে লোকে যত খাইতে পারিত এখন তত খাইতে পারেনা;—সকল লোকের এইরূপ বিশ্বাস। এখনকার দুই তিন পুরুষ পূর্ব্বে যে সকল ভোজ দেশে হইত, যাঁহারা তাহার দুই. একটির হিসাব দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন যে. পূর্ব্বে লোক-খাওয়াইতে যত দ্রব্যের আহরণ করিতে হইত, এখন সেই পরিমাণ লোক-খাওয়াইতে তত দ্রব্যের আয়োজন করিতে হয়না। প্রসিদ্ধ দেব-সেবা গুলির পূর্ব্বকালের যেরূপ বরাদ্দ ছিল, দেখিলেও অনুমিত হইতে পারে যে. এখন পূর্ব্বের অপেক্ষা অল্পপরিমাণ দ্রব্যে অতিথিদিগের ভোজন নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।"

২৫৪ পৃষ্ঠা।

আহারের অল্পতায় যে মানুষের শরীরস্থ পেশী, অস্থি, শোণিতাদি উপাদানের বিকৃতি ও অপকর্ষ ঘটিতেছে—ইহাতে সন্দেহ নাই। সারপদার্থের অপচয় ঘটিলে জীবনীশক্তিও কমিয়া যায়। ইন্দ্রিয়ের অবনতিতে সমস্ত শরীরেরই অবনতি বুঝায়। আমাদের যখন ইন্দ্রিয়েরই অবনতি হইয়াছে, তখন যথার্থই আমরা বিপন্ন। আমাদের পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শক্তি দিন দিন ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ায়,—ইন্দ্রিয়েশ্বর মনের শক্তিও নষ্ট হইতে বসিয়াছে। আমাদের যুবাদের মধ্যেও আর সে সাহস, স্ফূর্ত্তি, তেজঃ দেখিতে পাই না। এই ইন্দ্রিয়ের অবনতিতেই আমাদের এত দুর্দ্দশা। আমাদের সাহিত্যে সৌন্দর্য্য নাই, সমাজে ঐক্য নাই, বাণিজ্যে উদ্যম নাই,—আমরা জগতের কাছে করুণার পাত্র।

প্রাণের জ্বালায় আমি তো অনেক "হাবড় হাটী" বকিলাম, এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য কি ? আমরা যে নৈহাটী হইতে ভাটপাড়া পর্য্যন্ত হাঁটিয়া যাইতে পারিনা, দশহাত দূরের বস্তু দেখিতে পাইনা, দুইমুঠা ভাত ও একহাতা ডাল খাইয়া পরিপাক করিতে পারি না,—এ অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য কি? এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর—পূর্ণ জীবনীশক্তি লাভ। পূর্ণ

জীবনীশক্তি না পাইলে, পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ অসম্ভব। তুমি যত সভা সমিতি কর, ক্রিকেট্ ফুটবল খেল, শিল্প প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা কর, সভ্যতার ধুরন্ধরী হও মনেপ্রাণে হিন্দু হইতে না পারিলে, তোমার মত বাঙ্গালীর আর মঙ্গল নাই। জীবনীশক্তি পুনর্লাভের জন্য তোমাকে "আয়ুর্ব্বেদের" শরণাগত হইতে হইবে। আতিশয্য ও অসঙ্গত হইলেও—"বেতাল পঞ্চবিংশতির" গল্পে একেবারে অবিশ্বাস করিও না। তোমার ইন্দ্রিয়ের শক্তি দিন দিন হ্রাস হইয়া পড়িতেছে, সে দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিও। ঐ শুন,—তোমাদেরই মধ্যে একজন সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত, পরিণত বয়সে দেশবাসীকে সম্বোধন করিয়া কি বলিতেছেন,—

"আমরা যে সাংঘাতিক অবস্থায় উপনীত হইয়াছি, তাহা নানা কারণে ঘটিয়াছে। আমরা ম্যালেরিয়া বিষে জর্জ্জরিত। তৃষ্ণায় আমরা জল পান না করিয়া বিষপান করি। দুগ্ধ, ঘৃত, মৎস্য প্রভৃতি আমাদের সমস্ত পুষ্টিকর খাদ্যের শোচনীয় অভাব ঘটিয়াছে। আমরা পর্য্যাপ্ত পেট ভরিয়া খাইতে পাই না। ভোগবিলাসিতায় আমরা বিহ্বল, ব্যতিব্যস্ত। চিন্তা-দুর্ভাবনায় আমরা অভিভূত; আমাদের স্বাস্থ্যনাশক মাদক দ্রব্যের ব্যবহার বাড়িয়া গিয়াছে। আমরা স্ত্রীপুরুষ—মুটেমজুর—শিশু সকলে চা-চুরুটে মজিয়া উঠিতেছি। শুনিয়াছি বেশী চা পান করিলে স্নায়ু দুর্ব্বল হয়, বড় বেশী পান করিলে পক্ষাঘাতে আক্রান্তও হইতে হয়। স্বচক্ষে দেখিয়াছি অনেক চাপায়ীর লিখিতে হাত কাঁপে, লেখা টেড়া বাঁকা হইয়া যায়। সন্তান উৎপাদন প্রভৃতি অতি গুরুতর কার্য্যে আমরা শাস্ত্রের সমস্ত সুনিয়ম ভঙ্গ করিতেছি। এইরূপ নানাকারণ ঘটিতেছে। সেই সকল কারণ, যতদূর সম্ভব নিরূপণ করিতে হইবে। আমরা জীবন-মরণের সমস্যায় আসিয়া পড়িয়াছি। এ সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য সমস্যায় হাত দিলে, এ সমস্যার সমাধান হইতে পারিবে না; আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইতে পারে। ভরসার মধ্যে এই—আমরা বড় পবিত্র ঘরের সন্তান। আমাদের পিতৃপুরুষেরা বিশ্বনাথকে লইয়াই বিভোর হইয়া থাকিতেন। বিলাসে-বৈভবে তাঁহাদের মনঃ ছিল না, পুণ্যে ও পবিত্রতায় তাঁহারা পৃথিবীর আদর্শস্থানীয় হইয়াছিলেন। তাঁহারা এখন আবার পৃথিবীর আদর্শস্থানীয় হইতেছেন। আজিকার ইউরোপ ও আমেরিকা, তাঁহাদের জ্ঞানালোক লাভ করিবার জন্য লালায়িত। ইহাতে বুঝিতে হয়, তাঁহাদের পুণ্যফল ফুরায় নাই। আমরা পতিত, কিন্তু তাঁহাদেরই পুত্র। পিতার পুণ্যফলে পুত্রের প্রথম ও অবিসংবাদী অধিকার। তাই মনে বড় আশা যে, বিশ্বনাথের নিকট ভক্তিভরে অবনত শিরে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিলে তিনি সেই পুণ্যশ্লোক পিতৃপুরুষ দিগের প্রতিষ্ঠিত পুরী রক্ষা করিবেন।"

বঙ্কিমযুগের ঋষির এই পবিত্র ঋক্ মন্ত্র—বাঙ্গালী ও বাঙ্গালাকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করুক। উপসংহারে ইহাই আমার কামনা।

শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ।

বিবিধ সংবাদ।

—:*:—

নিখিল ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদ সভা।—আগামী জানুয়ারি মাসের শেষভাগে নিখিল ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদ সভা দিল্লীতে হইবে স্থির হইয়াছে। সে সময় সেখানে এক প্রদর্শনীও বসিবে। প্রদর্শনীর জন্য ঔষধাদি ও সম্মেলনের জন্য প্রবন্ধাদি আগামী ২০শে জানুয়ারির মধ্যে পাঠাইবার সময় কর্ত্তৃপক্ষগণ নির্ণয় করিয়াছেন।

বৈদ্যের পরলোক প্রাপ্তি।—আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম—কলিকাতা প্রবাসী কবিরাজ ক্ষীরোদচন্দ্র সেন মহাশয় গত ১৮ই অগ্রহায়ণ ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৫৪ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার নিবাস ফরিদপুর-কোটালিপাড়ায়।

স্ত্রীজাতির মৃত্যু।—১৯১৭ সালের স্বাস্থ্য কর্ম্মচারী মহাশয়ের রিপোর্টে প্রকাশ—কলিকাতা সহরে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতির মৃত্যুসংখ্যা শতকরা ৪০ জন অধিক। অন্তঃপুর মহিলাদিগের অবরোধ প্রথাই এই মৃত্যুবৃদ্ধির কারণ বলিয়া স্বাস্থ্য কর্ম্মচারী মহাশয় তাঁহার মন্তব্যে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু এ কথার সমর্থন করিতে পারিনা,—হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে অবরোধ প্রথা বরাবরই আছে; কিন্তু আগেকার মহিলারা পুরুষ অপেক্ষা বেশী মরিতেন না কেন? সহযোগী "সঞ্জীবনী" এ সম্বন্ধে বাল্যবিবাহের দোষ দিয়াছেন, আমরা তাহারও সমর্থন করিতে প্রস্তুত নহি. কারণ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বাল্য বিবাহও আজ নূতন করিয়া প্রবর্ত্তিত হয় নাই। আমাদের বিশ্বাস,—আমরা এখন বিলাস জুয়ারে গা ঢালিয়া—দিয়া বাবুগিরির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া নিজেরা তো অকর্ম্মণ্য হইতেছিই, সঙ্গে সঙ্গে পুরমহিলাদিগকেও শারীরিক শ্রমের হাত হইতে অব্যাহত রাখিয়া মূর্ত্তিমতী বিলাসিনী করিয়া তুলিতেছি। ফলে সেই বিলাস-বাসনার আস্বাদন পাইয়া আমাদিগের মত পুরমহিলারাও যে হিন্দুর ব্রহ্মচর্য্য ভুলিয়াছে—পুরুষ অপেক্ষা রমণীজাতির মৃত্যুর আধিক্য তাহারই ফলসম্ভূত।

ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী।—ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর প্রকোপটা কলিকাতায় কিছু কম পড়িয়াছে। এখন গড়ে প্রাত্যহিক মৃত্যু-সংখ্যা ৫০ জনেরও কম। স্থানে স্থানে এখনো কিন্তু ইহার পূর্ণ প্রকোপ রহিয়াছে।

হুকপোকা নিবারণ কমিটী।—এই পোকার নিবারণ কল্পে একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। রাজসাহী সার্কেলের ডেপুটি সেনিটারি কমিশনর মহাশয় এই কমিটির স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন।

কলিকাতায় দুগ্ধসরবরাহ।

কলিকাতার অধিবাসীদিগকে খাঁটি দুগ্ধ সরবরাহের ব্যবস্থার জন্য কলিকাতা করপোরেসন একটি কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। ঐ কমিটীতে প্রস্তাব হইয়াছে—কলিকাতার অধিবাসীদিগকে বিশুদ্ধ দুগ্ধ সরবরাহ করিতে হইলে [illegible]

নিসিপ্যালিটীক গোষ্ঠ স্থাপন করিতে হইবে। কলিকাতা-মিউনিসিপ্যালিটী যদি এরূপ ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে সত্য সত্যই সহরবাসীর বিশেষ উপকারের প্রত্যাশা করা যায়।

সুচিকিৎসকের পরলোক।—গত ৪ঠা পৌষ বৈকালে বেলগেছিয়া মেডিকেল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার আর, জি, কর মহাশয়ের দেহান্তর ঘটিয়াছে। বেলগেছিয়ার মেডিকেল স্কুল স্থাপনে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার যে সহজপন্থা বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহার জন্য ইনি ভারতে চিরস্মরণীয় থাকিবেন। কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ প্রায় চারিশত চিকিৎসক ও ছাত্র শ্মশানঘাট পর্য্যন্ত তাঁহার শবদেহের অনুগমন করিয়াছিলেন। আমরা এরূপ কৃতী বাঙ্গালী দেশহিতৈষীর মৃত্যুতে যথেষ্ট ব্যথা অনুভব করিতেছি। ভগবান তাঁহার বিয়োগবিধুর স্বজনের চিত্তে শান্তি দান করুন।

বিগত ১৩ই পৌষ বেলা ১২ ঘটিকার সময় গোয়ালিয়ারের শ্রীশ্রীমন্মহারাজ বাহাদুর "অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়" পরিদর্শন করিয়াছেন। বিদ্যালয়ের অধ্যাপনাসৌকর্য্যার্থ সংগৃহীত বিবিধ দ্রব্যসম্ভার, মহারাজা বিশেষ অনুসন্ধিৎসু ভাবে দর্শন করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি মহারাজ বাহাদুরকে যে অভিনন্দন পত্র দ্বারা অভিনন্দিত করিয়াছিলেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

স্বস্তি বিবিধবিরুদাবলীবিরাজমানমানোন্নতমহারাজবর্য্য

শ্রীল-শ্রীযুক্ত-লেফ্‌টেনেণ্ট জেনারেল্‌ হিজ্‌ হাইনেস্‌

মহারাজা সার মাধব রাও সিন্ধিয়া আলিজা বাহাদুর

জি-সি-এস্‌-আই, জি-সি-ভি-ও, জি-বি-ই,এ-ডি-সি,

ডি-সি-এল্‌, এল্‌-এল্‌-ডি মহোদয়ানাম্‌

নিখিলভারতীয়াষ্টাঙ্গায়ুর্ব্বেদবিদ্যালয়ে স্বাগতপ্রশস্তিঃ।

মহারাজ!

লোকে গঙ্গাপ্রসাদোদয়ইতি বিদিতঃ শক্তিমান্‌ শান্তমূর্ত্তি
র্জ্ঞানজ্যোৎস্নাবিকাশক্ষপিত-জনমনোমোহ-গাঢ়ান্ধকারঃ।
রাজেন্দ্রানন্দদায়ী প্রমথগণবৃতো ভূতিমানাশুতোষঃ
শশ্বদ্ভব্যং বিধত্তাং শরণগতসুহৃদ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়াত্মা ॥

এহ্যেহি ভূপতিলকোজ্জ্বলপুণ্যকীর্ত্তি-
জ্যোৎস্নাবলীধবলিতাখিলভারতেন্দো!
বিদ্যালয়ে নিখিলভারতবৈদ্যবিদ্যা-
সঞ্জীবনায় বিহিতে জয় জীব শশ্বৎ ॥

মহারাজা জীজা জয়তি জননী তে জনকজা
পিতা জয়্জীরাবোঽভবদমিতেজা রঘুপতিঃ।

তয়োঃ সাক্ষাদাত্মা ত্বমসি বরবীরঃ কুশমদঃ
কৃপাপারাবারো ভুবি বিজয়সে ভারতমণে! ॥
ত্বং সিন্ধিয়াকুলমহোদধিপূর্ণচন্দ্র-
স্ত্বং ভারতীয়বরভূপগণাগ্রগণ্যঃ।
ত্বঃ সর্ব্বদাঽভ্যুদয়কৃৎ কৃপয়া প্রজানাং
ত্বং মাধবোভবসি মাধবরাব-মূর্ত্ত্যা ॥

ভূপাল স্বাগতং তে ভবতু বিজয়িনোদৃপ্তসামন্তমৌলি-
ভ্রাজদ্বৈদূর্য্যহীরদ্যুতিচয়বিলসৎপাদপীঠামলাঙ্ঘ্রে।
রাজন্তী কল্পকোটীঃ সুরতরুজয়িনী ত্বৎকৃপাকল্পবল্লী
নন্বায়ুর্ব্বেদবিদ্যাপুনরুদয়ফলায়োজ্জিহীতে সমন্তাৎ ॥
যাসীৎ কল্পলতেব ভারতমহীসর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদা
যস্যাঃ সংশ্রয়ণাচ্চিকিৎসককুলং জাতং জগন্মণ্ডনম্।
সৌখ্যারোগ্যসুধাবিধানকুশলা যা সর্ব্ববিদ্যাগ্রণী
র্যস্যা লব্ধজনির্ব্বিরাজতি পরা ভৈষজ্য বিদ্যান্যতঃ।
সাদ্যায়ুর্ব্বেদবিদ্যাপচয়মুপগতা ভূমিপোৎসাহহীনা
দৌর্ভাগ্যাদস্মদীয়াৎ প্রতিদিশমপরৈর্ধিক্কৃতা ত্যক্তলজ্জৈঃ।
নূনং তদ্ভাগ্যসম্পৎ পুনরুদয়মিতা যন্নরেন্দ্রাগ্রয়ায়িন্!
আয়ুর্ব্বেদাঙ্গবিদ্যার্জ্জনভবনমিদং ভূষয়ন্নাগতোঽসি ॥

প্রতীচ্যভৈষজ্যবিদামবজ্ঞয়া।
বিমানিতা ভারতবৈদ্যবিদ্যা।
কৃপাকটাক্ষৈস্তব চেদিয়ং স্যা-
দুজ্জীবিতা তেন বয়ং কৃতার্থাঃ ॥

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৩য় বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৫—মাঘ। | ৫ম সংখ্যা

কাজের কথা।

——:*:——

চিত্তসংযম।—চিত্তসংযমই যোগশাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। 'পাতঞ্জল-দর্শনের" প্রথমেই লিখিত হইয়াছে—'যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ' অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির নিরোধের নামই যোগ। এই চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিতে শিখিলেই সকল বিষয়ে দমন করিবার যে শক্তি উপস্থিত হয় এবং তাহার ফলে মানুষ যে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়—সকল শাস্ত্রের মূলতঃ উপদেশ ইহাই।

* * * *

ব্রহ্মচর্য্য।—ব্রহ্মচর্য্যপালন করিতে হইলে এই চিত্তসংযমের শিক্ষা করা সর্ব্বাগ্রে দরকার। বাল্যে এ শিক্ষাটা অবশ্য আপনা হইতে আসে না; এজন্য সে কালে যে গুরুগৃহে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, তাহারই ফলে এ ব্যবস্থা অতি সহজেই সম্পন্ন হইত। এখনকার ছাত্রমণ্ডলীর পক্ষে যেরূপ যথেচ্ছাচারী হইবার ব্যবস্থা অপ্রতিহত, সেকালে তাহা হইবার উপায় ছিল না। সে কালের বালকমণ্ডলীর অভিভাবকগণ হাতেখড়ির পরই তাহার সকল শিক্ষার ভার গুরুর হাতে অর্পণ পূর্ব্বক বালকদিগকে গুর্ব্বাবাসেই অবস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। ছাত্র যত বড় অবস্থাপন্ন ঘরেরই হউক না কেন, গুরু তাহার প্রতি দৃকপাত না করিয়া, তাহার ভবিষ্যৎ জীবন যাহাতে উন্নত হইতে পারে—তাহারই প্রয়াসে তাহাকে শ্রমশীল করিয়া তুলিতেন। সেই শ্রমশীলতাই তাহাকে ভবিষ্যৎ সুখের সকল সম্পদ দানে সমর্থ হইত। এখনকার আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ সকল কিন্তু এখন গল্প বা উপকথায় পরিণত হইয়াছে।

* * * *

সে কালের শিক্ষা।—গুর্ব্বাবাসে সেকালের শিক্ষার ব্যবস্থাটা বড় সহজ ছিল না,—ছাত্রগণকে কেবল অধ্যয়নে নিরত করিয়াই সে কালের গুরু বা অধ্যাপকগণ কর্ত্তব্য পালন হইল বলিয়া মনে করিতেন না,—

গোপালন্,—গোচারণ পর্য্যন্ত সেকালের ছাত্রদিগকে গুর্ব্বাবাসে অবস্থিতির সময় করিতে হইত,—ভিক্ষালব্ধ অন্নে গুরুগৃহে অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইত,—তাহার উপর সে ভিক্ষালব্ধ অন্নের যথেচ্ছ ব্যবহার করিবার শক্তি পর্য্যন্ত তাহাদের থাকিত না, গুরু সেই অন্ন হইতে তাহাদিগের উদরপূর্ত্তির জন্য যথোপযুক্ত অন্ন প্রদান করিতেন, তবে তাহারা আহার করিতে পাইত। ফলে গুরুগৃহে অবস্থানের সময় এই সকল রীতির প্রবর্ত্তনে চিত্তসংযমের উপায় বাল্যকাল হইতে সহজেই হইয়া যাইত। এখনকার ছাত্রগণ এ সকল কথা ধারণায় আনিতে পারেন কি ?

* * * *

দম, দয়া ও দান।—দম, দয়া ও দান—এই তিনটিই সর্ব্বপ্রকার সুখলাভের উপায়। প্রত্যেক ইচ্ছাকে দমন করিতে পারিলে, সর্ব্ব জীবে দয়া করিতে শিখিলে এবং অবস্থানুরূপ দানে অভ্যস্ত হইলে তাহার তো আর কিছুই করিবার প্রয়োজন হয় না। দান বলিলে যে কেবল অর্থদানই বুঝায়—এরূপ নহে,—কায়িক ও মানসিক শক্তির বিনিময়েও অন্যের শুভ ব্যবস্থা করিতে পারিলে তাহাও উৎকৃষ্ট দানের মধ্যে গণ্য। এখনকার দিনে অনেক ব্রাহ্মণের প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা হইয়াছে,—অর্থের মুখও ব্রাহ্মণজাতির ভিতর এখনকার দিনে অনেকে দেখিয়া থাকেন, কিন্তু সেকালে ব্রাহ্মণেরা অর্থের মুখ বড় একটা দেখিতে পাইতেন না,—পর্ণকুটীরই সেকালের ব্রাহ্মণদিগের শীতবাত আতপের কষ্ট অপনয়ন করিত—কিন্তু এই দানের ব্যবস্থা ব্রাহ্মণেরই মুখনিঃসৃত। ফলে সেকালের ব্রাহ্মণজাতি আশীর্ব্বচনে, অন্যান্য জাতিকে যে অমূল্য সম্পদ দান করিতেন, তাহার নিকট ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বও হারি মানিত। ফলে 'দম' 'দয়া' ও দানে সে চিত্তশুদ্ধি হয়—শারীরিক স্বাস্থ্যলাভের ব্যবস্থা তাহার সহিত সুসংবদ্ধ। প্রত্যেক ইচ্ছাকে দমন করিতে পারিলেই জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায়। জিতেন্দ্রিয় হওয়ার অন্যতম নামব্রহ্মচর্য্য পালন এবং ব্রহ্মচর্য্যপালনের শিক্ষা করিলেই স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অন্য শিক্ষার প্রয়োজন করে না।

* * * * *

বিন্দুরক্ষা।—শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন—"মরণং বিন্দুপাতেন।" অর্থাৎ বীর্য্যক্ষয়ই মরণের কারণ। ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ব্যক্তি এই জন্য বীর্য্যরক্ষার প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবে। সেকালে ইহারই জন্য পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে পুরুষজাতির—স্ত্রীজাতির সহিত মিলনের ব্যবস্থা ছিলনা। তাহার পর পরিণত বয়সেও যে স্ত্রী-পুরুষের মিলনের ব্যবস্থা হইত; তাহার মধ্যেও তিথি-নক্ষত্র-পর্ব্বদিন—এ সকল বাছিবার ব্যবস্থা হইত। এখন সে পদ্ধতি একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীর রোগপ্রবণতা তাহারই ফলসম্ভূত। কিন্তু দেশের আবহাওয়া পরিবর্ত্তনের ফলে দেশবাসীর যেরূপ রুচি বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তাহাতে আবার সে কালের বিধি-ব্যবস্থা বাঙ্গালা দেশে পুনঃ প্রবর্ত্তিত হওয়াও কঠিন ব্যাপার।

* * * *

দেশরক্ষার উপায়।—দেশরক্ষার উপায় করিতে হইলে আগে দেশের বালকদিগকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাঙ্গালী বালকই-বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা। সেই জন্য বালকরক্ষার চিন্তায় সর্ব্বাগ্রে মনোযোগ প্রদান প্রত্যেক অভিভাবকের করণীয় বিষয়। শুধু তাহাদিগকে বিদ্যামন্দিরে প্রেরণ

করিয়া,—রাশি রাশি পাঠ্য পুস্তক কিনিয়া দিয়া—সময়ের অধিকাংশকাল সেই সকল পাঠ্য পুস্তকে তাহারা যাহাতে অভিনিবিষ্ট হইতে পারে—তাহার ব্যবস্থা করিলে চলিবে না—তাহাদের কুসুম কোমল-দেহ যাহাতে অকালে কীটদংষ্ট না হইয়া শরীর ক্ষয়ের কারণ না করিয়া তুলে—সর্ব্বাগ্রে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমরা ইহার পুর্ব্বে আরও একবার বলিয়াছিলাম—গণ্ডস্থলে ব্রণপ্রকাশ, গলার স্বর বিকৃত হওয়া, চক্ষুপ্রান্তে কালিমা চিহ্ন প্রকাশ—পাপ পরিব্যাপ্তির প্রকট নিদর্শন। বালকরক্ষার চেষ্টা করিতে হইলে, প্রত্যেক অভিভাবককে ইহার প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখিতে হইবে,—বালকগণের নিকট যখনই ঐ সকল চিহ্ন প্রকাশ পাইবে, তখনই তাহাদিগকে অধঃপতনের পথ হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তাড়নায় অবশ্য ইহার প্রতীকার হইবে না—তাড়নায় বরং কুফল ফলিবারই অধিক সম্ভাবনা। বালকগণ কদর্য্য অভ্যাস নিরত হইতেছে বুঝিতে পারিলে, অভিভাবকগণ তাহাদিগকে যদি নিজের সঙ্গে অধিকাংশ সময় রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা হইলেই ইহার কতকটা প্রতীকারের আশা করা যায়, নতুবা ইহার উপায় বিধান একেবারেই অসম্ভব।

* * * *

আর একটি উপায়।—যে সকল বালক বিশেষ উন্মার্গগামী হইয়া পড়িতেছে বুঝা যাইবে, তাহাদের রক্ষাকল্পে তাহাদিগকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করাও কতকটা মন্দ ব্যবস্থা নহে। দীর্ঘকাল চিকিৎসা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া, ধাতুক্ষয় এবং স্বপ্নবিকারগ্রস্ত বহুসংখ্যক ছাত্ররোগীর আমরা চিকিৎসা করিয়াছি। উল্লিখিত দুইটী রোগই অস্বাভাবিক উপায়ে শুক্রক্ষয়ের ফলসম্ভূত। আমাদের এ সম্বন্ধে যতটা অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহাতে এই অস্বাভাবিক উপায়ে শুক্রক্ষয় হইতে বালক রক্ষার প্রধান উপায়ই বিবাহবন্ধনের ব্যবস্থা। বাল্যজীবনে শুক্রক্ষয় আদৌ ভাল নহে, কিন্তু উহা অস্বাভাবিক বা অনৈসর্গিক উপায় অপেক্ষা নৈসর্গিক উপায়ে অনেকটা ভাল। সেই জন্য যে সকল বালক একেবারেই অধঃপতনের চরমপন্থাবলম্বী হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের জন্য বিবাহের ব্যবস্থা করিলে তাহারা কদর্য্য অভ্যাস হইতে প্রতি নিবৃত্ত হইতে পাবে।

* * * *

অস্বাভাবিক শুক্রক্ষয়ের পরিণাম।
অস্বাভাবিক শুক্রক্ষয়ের পরিণাম বড় সহজ নহে—ধাতু এবং স্বপ্নবিকার ভিন্ন দারুণ অজীর্ণ রোগও ইহার ফলসম্ভূত। এই অভ্যাসে দীর্ঘকাল অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে, মস্তিষ্কের বিকার পর্য্যন্ত ঘটিয়া মানুষকে উন্মাদ করিয়াও তুলিতে পারে। তাহার পর, বিবাহ হইলেও ইঁহাদের বীর্য্য এরূপ তরল হইয়া যায় যে, তাহার ফলে অনেকেরই সন্তান উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হওয়ায় পুত্রমুখ দেখিবার উপায় থাকে না। কখন বা ঐরূপ বীর্য্যে পুত্র উৎপাদনের ক্ষমতা জন্মিলেও যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে দুর্ব্বল ও অল্পায়ু হইয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশের রোগপ্রবণতা এবং অকাল মৃত্যুর আধিক্যের ইহাও একটা প্রধান কারণ। প্রত্যেক অভিভাবক এ সকল কথা বিশেষভাবে গ্রহণ করুন এবং তাহার ফলে বালক রক্ষার জন্য সর্ব্বতোভাবে যত্নশীল হউন—ইহাই আমাদের একান্ত অনুরোধ।

* * * *

কলিকাতার ছাত্রাবাস।— মফঃস্বলের অনেক অভিভাবকই কলিকাতার ছাত্রাবাস গুলিতে বালকদিগকে রাখিবার ব্যবস্থা পূর্ব্বক বিদ্যাশিক্ষার বন্দোবস্ত করেন। আমাদের মনে হয়, এ ব্যবস্থাটাও সমীচীন নহে। নানা প্রকার বিলাস সম্ভারে সুসজ্জিত কলিকাতা সহরে আত্মরক্ষা করা অনেক সময় জ্ঞানগর্ব্ব-পরিণত বয়স্ক পুরুষেরও পক্ষেও অসম্ভব হইয়া পড়ে—তা' চঞ্চলমতি বালকদিগের নিকট তো দূরের কথা। আমরা ছাত্রাবাসে অবস্থিত সকল বালকের কথা বলিতেছিনা, কিন্তু অনেক বালকই যে এইরূপ অভিভাবক শূন্য অবস্থিতির ফলে যথেচ্ছাচারী ও বিপথগামী হইয়া থাকে, তাহা খাঁটী সত্য কথা। অনেক ছাত্রাবাসেই দেখিতে পাওয়া যায়, তৈল মর্দ্দনের ব্যবস্থা সেখান হইতে উঠিয়া গিয়াছে, সাবান তাহার স্থান পূর্ণ করিয়াছে—শুষ্ক ধোঁদলের খোলা দিয়া তাহারা গাত্রমার্জ্জন করিতে শিখিয়াছে, পরিচ্ছদ পারিপাট্যেও তাঁহাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি। ফলে এই বিলাসবাসনায় চিত্তপ্রবৃত্তি সহজেই সুখান্বেষণের প্রয়াস পরায়ণ হয়। আমাদের মনে হয়, মফঃস্বল অপেক্ষা কলিকাতা প্রবাসী ছাত্র-মণ্ডলীর অধিক অধঃপতন এইরূপেই ঘটিয়া থাকে।

* * * *

নাটক, নবেল ও থিয়েটার।— নাটক, নবেল পাঠ এবং থিয়েটার দেখার প্রবৃত্তিও এই বিলাসিতা হইতে জাগিয়া উঠে। সেবা নিপুণ 'আয়েসা'র সুশ্রুষায় চরমসুখ উপলব্ধি করিয়া' কুমার জগৎ সিংহে'র মত সেইরূপ রোগ শয্যায় সুশ্রুষা প্রাপ্তির জন্য কাহারও বাসনা জাগিয়া উঠে, কেহ 'কুন্দনন্দিনী'র মাতার আসন্নকালে 'নগেন্দ্রনাথের' মত সাহায্য নিরত হইবার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠেন, কেহ 'গোবিন্দলালের' মত 'বারুণী পুষ্করিণী' হইতে জলমগ্না 'রোহিণীকে' উদ্ধার করিবার কল্পনা আনিয়া কৃতার্থমনা হইয়া থাকেন, কেহবা 'কণ্টকে গঠিল বিধি মৃণাল অধমে, শুনিয়া 'হেমচন্দ্র' হইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। 'প্রতাপ' হইবার সাধ অনেকেরই নাই, কিন্তু 'দেবেন্দ্রনাথের' মত 'হরিদাসী বৈষ্ণবী' হইবার শক্তি অনেকেরই আছে। ফলে নাটক-নবেল পাঠ বা থিয়েটার দেখায় ছাত্রজীবন যে বাস্তবিকই কলুষিত হইয়া থাকে—ইহা সুনিশ্চয়।

* * * *

স্ত্রী-প্রসঙ্গ।—এক কথায় কোনোরূপ স্ত্রী-প্রসঙ্গই ছাত্রজীবনে কর্ত্তব্য নহে। স্ত্রী-প্রসঙ্গের মত পাপের পথ প্রশস্ত করিবার ব্যবস্থা আর কিছুতেই নাই। এইজন্য নাটক-নবেল পাঠ বা থিয়েটার দেখার প্রবৃত্তি হইতে ছাত্রদিগকে রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। অনেকে স্বধর্ম্মভ্রষ্টও হইতেছে ইহারই ফলে। ছাত্রাবাসগুলি তুলিয়া দেওয়া হউক—এ কথা তো বলিলে চলিবে না—তবে ছাত্রাবাস গুলির কর্ত্তৃপক্ষগণ যদি এ সম্বন্ধে কঠোর দৃষ্টি রাখিবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে বোধ হয় ইহার অনেকটা প্রতীকার হইতে পারে। কিন্তু তাহার একটা উপায় করিবার জন্য আমাদের দেশের লোক মাথা ঘামাইবেন কি ?

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন।

সমরজ্বর বা নবইনফ্লুয়েঞ্জা।

গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"কালহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ" আমিই লোকক্ষয়কারী মহাকাল।" যখন অন্যায় ও অবিচার, ব্যভিচার ও অনাচার, হিংসা ও দ্বেষ সমাজের শিরোভূষণ হয়;—যখন, বিলাসিতা ও অলসতা, অখাদ্য ও কুখাদ্য মানবের শ্রেয় ও প্রেয় বস্তু হয়, তখনই কালরূপী ভগবান মানবকে উদ্বুদ্ধ করিবার নিমিত্ত দুর্ভিক্ষ ও মড়করূপে জনপদ ধ্বংস করিতে থাকেন। পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিলেই ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

শরীর ও মন—আধার ও আধেয়;—উভয়ের সম্পর্ক অতীব নিকট, তাই একের কষ্টে অন্যের কষ্ট, একের পাপে দু'য়ের শাস্তি—একের রোগে উভয়েরই রোগ।

প্লেগ পলাইয়াছে, কলেরা হারি মানিয়াছে, ম্যালেরিয়া মানবের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া মৃত্যুসংখ্যা কমাইয়াছে। কিন্তু মানবের বিধিলিপি,—বিলাসিতা, অলসতা, অন্যায় ও অনিয়মের শাস্তি—মৃত্যু—তাই লোকক্ষয়কারী মহাকাল সমর-জ্বর বা নব ইনফ্লুয়েঞ্জা-রূপে মানবজাতির মধ্যে দেখা দিয়াছেন। এবার মহাকালের পূর্ণাবতার—বসন্ত, কলেরা, প্লেগ ও ম্যালেরিয়ার ন্যায় একদেশব্যাপী অংশাবতার নহে,—সম্পূর্ণ ও সম্পন্ন অবতার;—তাই এই সমরজ্বর বা নবইনফ্লুয়েঞ্জারূপী মহামড়ক এক সময়ে পৃথিবীর সমগ্রদেশে, সমগ্রজাতির মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমগ্র দেশ ও জাতিকে ধ্বংসের পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে; বিংশ শতাব্দির 'মহাকুরুক্ষেত্রে' যাহা করিতে পারে নাই, বুঝিবা সমরজ্বর বা নবইনফ্লুয়েঞ্জা তাহাই সম্পূর্ণ ও সম্পন্ন করিয়া দেয়! আফরিকার বন্যজাতি হইতে আরম্ভ করিয়া ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ সমূহের সুসভ্য জাতি অবধি—কেহই এই ভীষণব্যাধির করালকবল হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছেননা। কত বৈজ্ঞানিক কত গবেষনা করিতেছেন, কত বড়বড় দেশের কত মহামহামনীষি এই ভীষণ মড়কের অবাধগতি প্রতিরোধ করিবার জন্য কত চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু ইহার অবাধ—অপ্রতিহতগতির প্রতিরোধ হওয়া দূরে থাকুক, দিন দিন বৃদ্ধির দিকেই অগ্রসর হইতেছে। বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন, আগামী বৎসরে এই রোগের মৃত্যুর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।

পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রভূত পণ্ডিত, কালনা মেডিক্যাল মিশনের প্রখ্যাত নামা চিকিৎসক সুহৃদ্বর ডাক্তার ভি, ই, এ্যাম্বেট ও রেভারেণ্ড ডাক্তার ই, মিউর, এম্, ডি, মহোদয় দ্বয়ের মুখে যতদূর অবগত হইয়াছি, তাহাতে ডাক্তারীমতে এই নব মড়কের বিশেষ কোন প্রতিষেধক বা প্রতিরোধক ঔষধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে বিশেষ চেষ্টা, গবেষনা ও লেখালেখি চলিতেছে। Dr. Miur এখানকার হাঁসপাতালে ইনফ্লুয়েঞ্জা-নিউমোনিয়া রোগীর কফ হইতে

vaccine প্রস্তুত করিয়া Injection দিতেছেন। তাহাতে তিনি আশা করেন, ভাল ফল হইতে পারে। বৈদেশিক জগতে এই নব রোগের চিকিৎসা লইয়া মহা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে; নানারূপ পরীক্ষা চলিতেছে, বহু সাময়িক ও মাসিক পত্রিকাদিতে গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইতেছে; —কিন্তু আমরা—সহস্র-বর্ষ-পূর্ব্বের-ঘৃতসেবনগর্ব্বী আমরা,—আমরা কি করিতেছি? ধন্বন্তরি-শার্ঙ্গধরের বংশধর আমরা—চরক, সুশ্রুত, অগ্নিবেশ, হারীতের-শিষ্য প্রশিষ্য আমরা;—আমরা কি করিতেছি? ঋষিযুগে, নবমড়ক—নবব্যাধির সৃষ্টি হইলে, হিমাচলের কেন্দ্রমূলে ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিগণের সভা হইয়া তাহার প্রতিষেধক ও প্রতিরোধক ঔষধ সকল আবিষ্কৃত হইয়া, জন সমাজের মঙ্গলের জন্য প্রচারিত হইত। ঋষিযুগের আয়ুর্ব্বেদ এখন শবে পরিণত হইয়াছে,—সেই গলিত শবের উপর বসিয়া আরাধনা করিয়া সিদ্ধ হইবে বলিয়া, হে নবযুগের কর্ম্ম-সাধকগণ, তোমরা যে উদ্বুদ্ধ হইয়াছ;—তোমরা কি করিতেছ?

কোন্ অতীতে স্বর্ণময়যুগে—কোন্ জ্ঞান্ ও গরিমায় প্রদীপ্তমঙ্গলমধ্যাহ্নে ত্রিকালদর্শী মহামহর্ষি চরক দূর ভবিষ্যতে নব নব রোগ ও রোগসঙ্করের সৃষ্টি স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া, জ্ঞানগবেষণার স্বর্ণার্গল উন্মুক্ত করিয়া বলিয়া গিয়াছেন;—

"নাস্তি রোগো বিনা দোষৈ যস্মাৎ তস্মাদ্বিচক্ষণঃ।
অনুক্তমপি দোষাণাং লিঙ্গৈর্ব্যাধিমুপাচরেৎ॥"

বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিন ছাড়া দোষ নাই;—দোষ ছাড়া রোগ নাই, অতএব দোষ বা রোগ অনুক্ত (সঙ্কর, আগন্তুজ বা নূতন) হইলেও, স্বধর্ম্ম ও বৈধর্ম্ম, দোষ ও দূষ্য বিচার ও গবেষণা করিয়া চিকিৎসা করিবে। কোন্ সুদূর অতীতে অতিদূর ভবিষ্যতের কুহেলিকা-বরণ ছিন্ন করিয়া নব নব রোগের চিকিৎসা প্রণালীর এত-জ্ঞান-গবেষণামূলকযুক্তি—এমন সহজ সরল ভাষায় ব্যক্ত করিতে এক আয়ুর্ব্বেদ ছাড়া জগতের অন্য কোন চিকিৎসা শাস্ত্রে ব্যক্ত হইয়াছে কিনা জানিনা! এই যে নূতন নূতন রোগ সমূহের সৃষ্টি হইতেছে, ইহাতে কি মহামহর্ষি চরকের জ্ঞানগবেষণার ইঙ্গিত মানিয়া চিকিৎসা করিয়া দেখিতেছি কি? *

"আয়ুর্ব্বেদ" পত্রিকা বর্ত্তমান বঙ্গীয় চিকিৎসক মণ্ডলীর মুখপত্র; নব্য আয়ুর্ব্বেদের প্রাণ, ভারতগৌরব বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিকিৎসাতত্ত্ববিদ চিকিৎসক মণ্ডলীদ্বারা সম্পাদিত ও পরিচালিত। আমি আশা করিয়াছিলাম,—আমাদের নব জাগরণের মঙ্গল পাঁতি "আয়ুর্ব্বেদে" এই নূতনরোগ বিষয়ে অনেক সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও চিকিৎসা প্রণালী দেখিতে পাইব, কিন্তু শ্রাবণ হইতে অগ্রহায়ণ সংখ্যা অবধি আমার আশা পূর্ণ হইল না। আমরা মফস্বলবাসী চিকিৎসক; আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অমার্জ্জিত—পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র অপরিসর, তাই সহরের যাঁহারা চিকিৎসক, যাঁহাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অগাধ ও অপরিমেয়—

* আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদিগের সকলেই যে ইনফ্লুয়েঞ্জার সময় নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন, তাহা লেখককে কে বলিল? অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকই ইহার প্রতিকার কল্পে চেষ্টা করিতেছেন এবং সে সকল কথা সময় সময় কোনো কোনো সংবাদ পত্রেও বাহির হইতেছে। আমাদের অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে 'চরক' হইতে সংগ্রহ করিয়া "জ্বরের চা" নামক এক প্রকার ঔষধ আবিষ্কার করা হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা বহু সংখ্যক রোগীই আরোগ্য লাভ করিয়াছে।—আঃ সঃ।

যাহাদের গৌরবে আয়ুর্ব্বেদের গৌরব, তাঁহাদের প্রত্যক্ষজ্ঞানলব্ধজ্ঞান উপদেশ—বিশেষতঃ নূতন কোন রোগের অভ্যুত্থান হইলে তাহা আমাদের অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়। বিন্দুর সমষ্টি সিন্ধু; বিরাট আয়ুর্ব্বেদ সঙ্ঘের তুলনায় যদিও আমরা বিন্দু, তথাপি আমাদের সমষ্টি না থাকিলে আয়ুর্ব্বেদ সঙ্ঘের অস্তিত্ব বড় একটা থাকে না—আমরা সিদ্ধকাম না হইলে আয়ুর্ব্বেদের সম্মান থাকে না; সহরের ২।৪ জন চিকিৎসক—ব্যক্তিত্ব হিসাবে যিনি যত বড় পণ্ডিত হউন না কেন, আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধার করিতে হইলে—আয়ুর্ব্বেদের লুপ্ত গৌরবের দিন ফিরাইয়া আনিতে হইলে, সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ পন্থী চিকিৎসকগণকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লব্ধ উপদেশ দ্বারা পরিমার্জ্জিত ও উন্নত করিয়া লইতে হইবে, তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদের লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার অতি সহজ হইবে। সহরের শ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ তাঁহাদের দরিদ্র পল্লী চিকিৎসক ভ্রাতাদের উন্নতি সাধনে কতদূর কৃপাবান্—তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আয়ুর্ব্বেদ পত্রিকার পৃষ্ঠা অন্বেষণ করিলেই পাওয়া যাইবে!

যাহা হউক যাঁহারা শ্রেষ্ঠ—যাঁহারা নবরোগ সম্বন্ধে উপযুক্ত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসামূলক প্রবন্ধ লিখিবার অধিকারী, তাঁহারা যখন এ সম্বন্ধে কিছুই লিখিলেন না; তখন ভুক্তভোগী আমি—আমার দরিদ্র ভ্রাতাদিগের অসুবিধা স্মরণ করিয়া বিগত কয়েক মাসে সমরজ্বর বা নবইনফ্লুয়েঞ্জা চিকিৎসায় যে সামান্য অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাই প্রবন্ধকারে লিপিবদ্ধ করিতেছি। সুধী পাঠক যদি আমার কোন ভ্রম বা বিচ্যুতি ঘটে, দেখাইয়া বাধিত করিবেন।

ইনফ্লুয়েঞ্জার ইতিহাস।—ষোড়ষ-শতাব্দিতে প্রথম এই ব্যাধি লোকলোচন গোচরীভূত হয়, তৎপরে, ১৮৩০—৩৩, ১৮৩৬—৩৭, ১৮৪৭- ৪৮, ১৮৮৯—৯০, এবং ১৯০৯ সালে এই পাঁচবার ইহার আক্রমণ ও সংক্রামকতা দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৮৯ সালে যে আক্রমণ হইয়াছিল—তাহাতে আক্রমণের বেশ একটা বিধিবদ্ধ তালিকা দেখা যায়; ১৮৮৯ সালের মে মাসে বোখারাতে প্রথম আক্রমণ আরম্ভ হইয়া, সেপ্‌টেম্বর মাসে মস্কো, অক্টোবর মাসে সেণ্টাপিটাসবর্গ (Petrogard) ও ককেস্‌স্, নভেম্বরের মধ্যভাগে বার্লিন, ডিসেম্বরের মধ্যভাগে লণ্ডন এবং শেষভাগে নিউইয়র্কে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ প্রকাশ পায়; একবৎসরের মধ্যেই ইহা পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ সমাধা করে।

রোগের কারণ—পাশ্চাত্য মতে pfeiffers bacillus এই রোগের বীজাণু। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগীর মুখ ও নাসিকা নিঃসৃত শ্লেষ্মায় ঐ বীজাণু দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ মুখগহ্বর ও নাসারন্ধ্র দ্বারা রোগ-বীজাণু মানবশরীরে প্রবেশ করে। ইনফ্লুয়েঞ্জা বীজাণু কেমন করিয়া কি থেকে জন্ম গ্রহণ করে এবং তাহার প্রকৃত কারণ কি; তাহার পুরা মিমাংসা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এখনও করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তবে তাঁহারা এবং সাধারণ চিকিৎসকগণ—সকলেই অনুমান করেন—অতিরিক্ত ঠাণ্ডা লাগান, ভেজাল খাদ্য ভোজন, সাধ্যাতিরিক্ত পরিশ্রম করা, আহার বিহারে ও পরিচ্ছদের অমিত আচরণ প্রভৃতি এই রোগ আক্রমণের প্রধান ও প্রথম কারণ।

গতি বিস্তার ও পরিণতি।—সাধারণতঃ এক একটি স্থানে ইহার প্রকোপ বা অবস্থিতি কাল ৬ হইতে ৮ সপ্তাহ। বিশ হইতে চল্লিশ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ ইহার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকেন। বৃদ্ধ বয়সে এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইলে রক্ষা পাইবার বিশেষ কোন আশা থাকে না। যাঁহারা স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, গলক্ষত, হাঁপানি, সর্দ্দি, হৃদ্রোগ প্রভৃতি ব্যাধিপীড়িত, তাঁহাদের শরীরে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা-বীজাণু অতি সহজে অল্প ঠাণ্ডা লাগিলেই প্রবেশ করিয়া স্বীয় প্রভাব বিস্তারের অবসর ও সুযোগ পায়। বাটিতে একজন আক্রান্ত হইলেই বাটির অন্যান্য সকলেই আক্রান্ত হইতেছে দেখা যায়। প্লেগ, বসন্ত অপেক্ষাও ইহা সংক্রামক ও জনপদ ব্যাপক,—ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা-রোগী-সংস্পর্শে সুস্থ ব্যক্তির শরীরে এ বিষ সহজেই সংক্রামিত হইতে পারে। একবার এইরোগে আক্রান্ত হইলে পুনরায় এই রোগ আক্রমণের খুব বেশী সম্ভাবনা থাকে এবং এই রোগে পুনরাক্রান্ত হইলে প্রায়ই নিউমোনিয়া হইয়া মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। ১৮৮৯ সালে যে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ হইয়াছিল, তাহাতে জর্ম্মন সৈন্যদের মধ্যে ৫৫২৬৩ জন আক্রান্ত হয়, তন্মধ্যে ৬০ জনের মৃত্যু হয়, জর্ম্মণের সাধারণ অধিবাসীদিগের মধ্যে ২২৯৭২ জন আক্রান্ত হন, তন্মধ্যে ১৩৩ জনের মৃত্যু হয়; অর্থাৎ সৈনিকদের মধ্যে হাজারকরার ১টির কিছু বেশী এবং সাধারণ অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা ১টির কিছু কম লোকের মৃত্যু হয়। পরন্তু এই যে মৃত্যু গুলি হইয়াছিল—তাহার অর্দ্ধেকের উপর মৃত্যু ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা-নিউমোনিয়া জনিত। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা নিউমোনিয়া ভীষণ মারাত্মকব্যাধি; বিশেষতঃ বর্ত্তমান বর্ষে যাহা দেখা যাইতেছে, তাহাতে ইনইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা-নিউমোনিয়ার কোন প্রতিকারই হইতেছে না। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার প্রথম যে আক্রমণ এবার দেখা গিয়াছিল, তাহাতে নিউমোনিয়া হইতে বড় দেখা যায় নাই বা নিউমোনিয়া হইলেও তাহার ২।১টি রক্ষা পাইয়াছিল, কিন্তু অধুনা যাহা হইতেছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণের পরই তৃতীয় বা চতুর্থ দিবসে নিউমোনিয়া হইয়া পঞ্চম বা অষ্টম দিবসে মৃত্যু হইতেছে। শুনিতেছি স্থানীয় হাঁসপাতালে ১৫০টি ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা-নিউমোনিয়া চিকিৎসিত হইয়াছিল, বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা সত্বেও তন্মধ্যে প্রায় সকল গুলিরই মৃত্যু হইয়াছে। এবারকার ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার গতি ও পরিণতির নির্দ্দেশ বড়ই কঠিন। পূর্ব্বে সর্দ্দি জ্বরই ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার প্রধান ও প্রথম লক্ষণ ছিল, এখন নানারূপ লক্ষণ প্রকাশ ও বিভিন্ন পরিণতি দেখা যাইতেছে;—কেহ উন্মাদ হইতেছে, কেহ প্রাণে মরিতেছে, অল্প সংখ্যক ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা-নিউমোনিয়ার আক্রান্ত ব্যক্তি অতি কষ্টে বাঁচিয়া উঠিতেছে। কাহারও বা ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার পরিণামে যক্ষ্মা হইতেছে।

রোগের লক্ষণ ও নির্ব্বাচন।—সাধারণতঃ নাসিকা হইতেই এই রোগের আক্রমণ আরম্ভ হয়, নাকে সর্দ্দি দেখা যায়, মাথা ধরে, ক্ষুধামান্দ্য ঘটে, সর্ব্বাঙ্গে—বিশেষতঃ কোমড়ে অত্যন্ত বেদনা হয়, চক্ষু অল্প লাল, জিহ্বা শ্বেতবর্ণ ও চটচটে হয়, তিন বা চারি দিন প্রবল জ্বর থাকিয়া তৎপরে জ্বর ছাড়িয়া যায়, তবে দুর্ব্বলতা অনেক দিন যাবৎ ভোগ করিতে হয়, কাহারও বা ইনফ্লুয়েঞ্জা অন্তে টনসিল (আলজীব) বড় হইয়া

ভয়ানক উৎকাসী হয় বা কর্ণে অসহ্য যন্ত্রণা হয়, ইহাই—ইনফ্লুয়েঞ্জা জরের প্রধান লক্ষণ কিন্তু এবার অনেক বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে, লক্ষণের কোন স্থিরতা দেখা যাইতেছে না। কাহারও প্রত্যহ ছাড়িয়া ছাড়িয়া জর আসিতে আসিতে তৃতীয় বা চতুর্থ দিনে প্রবল গাত্রদাহ বা পিপাসা প্রকাশ পাওয়া নিউমোনিয়া বা টায়ফডের লক্ষণ দেখা দিতেছে,—কাহারও বা অসহ্য মাথার যাতনা, চক্ষু রক্তবর্ণ, প্রবল জ্বর সত্বে ভাবণ ঘর্ম, কোমড়, গলা ও বুকে ব্যথা—অথচ নাসিকায় শ্লেষ্মা বা সর্দ্দির লেশমাত্র নাই, সহসা ৪।৫ দিনের দিন বুকে শ্লেষ্মা ও শ্বাস কষ্ট প্রকাশ পাইয়াই মৃত্যু হইতেছে। কেহ বা সামান্য সর্দ্দি জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছে, কাজকর্ম্ম করিতেছে বা গল্প করিতেছে—সহসা উন্মাদের ন্যায় প্রলাপ বকিতে বা নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। এই সকল দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, এই জ্বর নূতন ধরণের। পূর্ব্বে যাহাকে ইনফ্লুয়েঞ্জা বলিতাম—তাহা নহে। ইহা ইনফ্লুয়েঞ্জা সংস্পৃষ্ট নূতন প্রকারের রোগশঙ্কর;—তাই ইহার নব ইনফ্লুয়েঞ্জা নামকরণ করিলাম।

নব ইনফ্লুয়েঞ্জার সাধারণতঃ তিনটী শ্রেণী-বিভাগ চলে;—ইহার প্রকোপ ও প্রাধান্য কেন্দ্রও তিনটী যথা;—মস্তিষ্ক, ফুসফুস্ ও বৃহদন্ত্র। নব ইনফ্লুয়েঞ্জা আক্রমণ করিলেই এই তিনটী স্থানের কিছু না কিছু ব্যতিক্রম হইবে। ইহা মস্তিষ্ক আক্রমণ করিলে বাতশ্লৈষ্মিক উন্মাদের সমস্ত লক্ষণ প্রকটিত হয় এবং দারুণ কোষ্ঠকাঠিন্য হয়াতে থাকে;—ফুসফুস আক্রান্ত হইলে নিউমোনিয়া প্রকাশ পায়, কফ আদৌ নিঃসৃত হয় না, নাড়ীর গতি প্রতি মিনিটে ১০০—১১২ এবং শ্বাস প্রশ্বাস ৩৫০—৭২ হইয়া থাকে; বৃহদন্ত্র আক্রান্ত হইলে বিসূচিকা জরাতিসার বা টায়ফয়েডের লক্ষণ সকল প্রকাশিত হয়, প্রচুর তরল দাস্ত বা উদরধ্মান, জরের অনিয়মিত হ্রাসবৃদ্ধি, পেটজ্বালা এবং দক্ষিণ তলপেট টিপিলে কঁক্ কঁক্ শব্দ ও নানারূপ উপদ্রব বুঝিতে পারা যায়।

নব-ইনফ্লুয়েঞ্জায় মস্তিষ্ক বা বৃহদন্ত্র আক্রান্ত হইলে, আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধে শীঘ্রই রোগী আরোগ্য করিতে পারা যায়; কিন্তু ফুসফুস্ আক্রান্ত হইলে সকল প্রকার চিকিৎসাতেই খুব কম রোগীই রক্ষা পায়। এবার প্রায় শতাধিক ইনফ্লুয়েঞ্জা-নিমোনিয়া রোগী আমার চিকিৎসাধীনে আসিয়াছিল, তন্মধ্যে অধিকাংশই ১।২ দিন চিকিৎসাধীনে থাকিয়াই জীবন্ত-বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল বা আসন্নকালে আসিয়াছিল, কেবল মাত্র আটটি ইনফ্লুয়েঞ্জা-নিউমোনিয়া রোগীকে আমি চিকিৎসা করিবার সুযোগ ও অবসর পাইয়াছিলাম, তন্মধ্যে শ্রীভগবানের কৃপায়—আয়ুর্ব্বেদের মহিমায় তিনটীর জীবনরক্ষা হইয়াছে।

বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে এই "নব-ইনফ্লুয়েঞ্জা' বাতশ্লেষ্ম প্রধান মধ্যপিত্ত সান্নিপাতিক লক্ষণাক্রান্ত জ্বর বলিয়া অনুমান হয়,—অন্ততঃ আমি তাহাই নির্ব্বাচন করিয়া চিকিৎসা করিতেছি—এবং চিকিৎসার ফল অ্যালোপ্যাথ চিকিৎসকদের তুলনায় যে মন্দ হইতেছে, তাহা আমার মনে হয় না, সাধারণের অনুমান বরং কিছু ফল ভালই হইতেছে।

চিকিৎসা।—প্রথমাবস্থায় প্রবল জ্বর, মিনিটে নাড়ীগতি ১০৮—১২, শ্বাস প্রশ্বাস ২৫—৩০, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, মাথা ভার, কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলে প্রথমতঃ দশমূল ক্বাথে অর্দ্ধ

ছটাক এড়ণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া খাওয়াইয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার করাইয়া, বাতগজাঙ্কুশ, স্বল্পলক্ষ্মী বিলাস ও বেতাল রস—আদার রস ও সৈন্ধব লবণ, পানেররস এবং আদার রস মধু অনুপানে পর্য্যায়ক্রমে, তিন ঘণ্টা অন্তর সেব্য। অত্যন্ত দাহ এবং জল পিপাসা ও ঘর্ম্ম নির্গম থাকিলে অল্প প্রবাল ভস্ম মিশাইয়া যথেষ্ট পমিমাণে ইষদুষ্ণ জল খাইতে দিলে, পিপাসা, দাহ ও ঘর্ম্মের শান্তি হয়। প্রথমাবস্থায় এই নিয়মে চিকিৎসা করিলে এবং জ্বর বন্ধ হইবার পর কিছুদিন নিয়মিত রূপে ১ রতি মকরধ্বজ এবং ১ রতি স্বল্পলক্ষ্মী বিলাস ও কর্পূর ১ রতি একত্রে মিশ্রিত করিয়া ১ মাত্রা প্রত্যহ বৈকালে আদার রস ও মধুসহ সেবন করিলে এবং প্রাতে আদা ও মিছরি সিদ্ধ করিয়া তৎসহ অল্প লেবুর রস মিশাইয়া চাএর ন্যায় গরম গরম পান করিলে পুনরাক্রমনের বা যে কোন প্রকার বিপদের আশঙ্কা থাকে না। ইনফ্লুয়েঞ্জার পর উৎকাসিতে সোহাগার খৈ মধুসহ গলার ভিতর লাগাইলে বা চন্দ্রামৃত চুষিয়া খাইলে অল্প সময়েই আরোগ্য হইয়া যায়। শৃঙ্গারাভ্র আদা ও পান সহ চিবাইয়া খাইলেও বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়। ইনফ্লুয়েঞ্জা দ্বারা মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইলে প্রত্যহ বা ১ দিন অন্তর দশমূল ক্বাথ ও এড়ণ্ডতৈল দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার বিধেয় এবং নারদীয় লক্ষ্মীবিলাস পানের রস মধুসহ,—চতুর্ম্মুখ রস—ব্রাহ্মীশাকের রস ও মধুসহ এবং সারস্বত চূর্ণ—উষ্ণ জল সহ সেবন এবং মহাদশমূল তৈল নস্য ও শিরকরোটিতে মর্দ্দন করিলে অচিরে রোগী আরোগ্য লাভ করে। ইনফ্লুয়েঞ্জা-নিউমেনিয়াতে কোষ্ঠ পরিষ্কারের প্রতি এবং ফুসফুসের ক্রিয়াকলাপের প্রতি সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে পূর্ব্বোক্তরূপ এড়ণ্ডতৈল দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার করাইয়া, মহালক্ষ্মীবিলাস রস, কস্তুরীভৈরব (বৃহৎ) ও শৃঙ্গাদিচূর্ণ—কর্পূরচূর্ণ, আদার রস ও মধু, রুদ্রাক্ষ ঘষা ও মধু এবং গরম জল অনুপানে পর্য্যায়ক্রমে ৩ ঘণ্টা অন্তর সেব্য। শ্বাসকষ্ট এবং কফ আদৌ নিঃসৃত না হইলে অর্দ্ধ বা এক ঘণ্টা অন্তর শৃঙ্গাদিচূর্ণ—বামুন হাটির উষ্ণ ক্বাথ এবং ২ রতি সোহাগার খৈ অনুপানে সেব্য। হার্টফেলের সম্ভাবনা দেখিলে মকরধ্বজ ২ রতি, কর্পূর ২ রতি, মৃগনাভি ১ রতি, ধুস্তুরবীজচূর্ণ ১ রতি, মিশাইয়া লইয়া অবস্থা বিশেষ ২।৩ বার পানের রস বা তুলসীপত্র রস সহ সেবন করাইলে বেশ ফল পাওয়া যায়। বক্ষস্থলে বেদনাদি নিবারণের জন্য মহাদশমূলতৈল বা মহাকনকতৈল মালিশে অসাধারণ ফল পাওয়া যায়। ইনফ্লুয়েঞ্জা-নিউমোনিয়াতে কর্পূর অসাধারণ ফলপ্রদ মহৌষধ; অনেক সুবিজ্ঞ এ্যালোপাথ চিকিৎসক ইহাতে কর্পূরের তৈল Hypodermic Injection দিয়া থাকেন। নিউমোনিয়া অবস্থায় কাসে বৃহৎশৃঙ্গারাভ্র আদা ও পানসহ চিবাইয়া খাইলেও, কাসের শান্তি হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা-নিউমোনিয়াতে আমি যে ঔষধগুলি ব্যবস্থা করিলাম, ইহা যদি রোগের প্রারম্ভ হইতে উৎকৃষ্ট পথ্যের সহিত প্রযুক্ত হয় এবং চিকিৎসক ধীরভাবে ঔষধগুলি ব্যবহার করিতে পারেন, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস, অনেক ইনফ্লুয়েঞ্জা-নিউমোনিয়া রোগীর প্রাণ রক্ষা হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা দ্বারা বৃহদন্ত্র আক্রান্ত হইলে মুথার রস অনুপানে অমৃতার্ণবরস, সিদ্ধপ্রাণেশ্বর ও আনন্দভৈরব —যমানীভাজার গুঁড়া ও মধুসহ এবং সম্রাগ্নিমুখচূর্ণ উষ্ণজল সহ বিবেচনা পূর্ব্বক নিয়মিত সেবন করাইতে পারিলে অচিরে রোগী আরোগ্য হইতে পারে।

পথ্যাদি সম্বন্ধে অনেকে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে জলীয় পথ্য দিতে নিষেধ করেন, তবে, দুগ্ধ প্রচুর পরিমাণে দিতে বলেন, কিন্তু আমাদের মতে দুগ্ধ আদৌ দেওয়া উচিত নহে, মুগ বা মসুরের যূষ, পানফল বা শঠীর পালো উৎকৃষ্ট পথ্য। দুগ্ধ যদি একান্তই দিতে হয়—তাহা হইলে শুঁঠ ও পিপুঁলের কল্কসাধিত দুগ্ধ দেওয়া কর্ত্তব্য। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় পথ্যের কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম বলা সুকঠিন; চিকিৎসক রোগীর অবস্থানুসারে লঘু ও বলকারক পথ্য ব্যবস্থা করিবেন।

* * *

আয়ুর্ব্বেদ অনন্ত ঔষধরত্নের আধার—অগাধ অতল-স্পর্শ-অমৃত সিন্ধু,। ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ যে কোন প্রকারের ব্যাধি বা মড়ক হইয়াছে—হইতেছে ও হইবে, তাহার সম্পূর্ণ-সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন-চিকিৎসা এক আয়ুর্ব্বেদেই আছে। প্রাণপণ যত্ন ও চেষ্টা করিয়া রত্ন চিনিয়া লইতে পারিলেই হইল। আয়ুর্ব্বেদ আমাদের শুধু ব্যবসায় নহে—আয়ুর্ব্বেদ আমাদের জন্মজন্মান্তরের সাধনা—আমাদের জাতি ও ধর্ম্মের গৌরব—আমাদের ইহকালের সর্ব্বস্ব ও পরকালের মোক্ষ, যদি আমাদের সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতিতে সেই গৌরবের হ্রাস হয়, তাহা হইলে সেই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাদের সমস্ত জীবনেও হইবে না।

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত
(মল্লিক) কবিরত্ন।

পঞ্চকর্ম্ম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

——:*:——

ক। ভালইতো। তা'তে আপনার চিকিৎসা কার্য্যে অতি বিজ্ঞতা বাড়বে বই কম্‌বে না।

ডাঃ।—কিন্তু দীর্ঘকাল সময় লাগে যে।

ক।—আপনার মত বুদ্ধিমান ব্যক্তির বেশীদিন লাগবে না। তা' ছাড়া আমি সহায়তা করবো। আর একটু কষ্ট স্বীকার ক'রে পড়লে আপনার উপকার যথেষ্ট হবে।

ডাঃ।—আচ্ছা দেখি কি হয়। এখন আপনি বমন সম্বন্ধে সব কথা বলুন।

ক। বমনের চেষ্টা উপস্থিত হ'লে রোগী আপন হাতের দুটী আঙ্গুল কিম্বা উৎপলের নল কণ্ঠ বিবরে প্রবিষ্ট করিয়ে বমি করবে।

ডাঃ।—তা'র মানে কি?

ক!—বমন বেগকে উত্তেজিত করা আর কি! গলায় আঙ্গুল দিয়ে বমি করার কথা শোনেননি কি?

ডাঃ। হাঁ ঠিক্ কথা। শুনিছি বৈকি।

ক।—বার বার বমনের বেগ ভা'ল নয়। মধ্যমরূপ বমন হলে প্রথমে কফ, পরে পিত্ত ও পরে বায়ু নিঃসারিত হয় এবং হৃদয়, পার্শ্ব, মস্তক ও ইন্দ্রিয় বিশুদ্ধ এবং শরীর লঘু হয়।

ডাঃ।—আর অধিক বমন হ'লে কি হয়?

ক। অধিক বমন হ'লে পিপাসা, মোহ, মূর্চ্ছা, বায়ুর প্রকোপ, নিদ্রা ও বলের হানি হয়।

ডাঃ।—এরূপ অবস্থায় কর্ত্তব্য কি ?

ক। তা, হ'লে রোগীকে ঘৃত মাখাইয়া শীতল জলে অবগাহন করাতে হয়, আর চিনি মধু ও ছাতু জলে গুলে খাওয়াতে হয়।

ডাঃ। আর যদি বমন ভালরূপ না হয় ?

ক। বমন ভালরূপ না হোলে রোগীর কোষ্ঠ, কণ্ঠ, হৃদয় ও ইন্দ্রিয়ের অবিশুদ্ধি এবং শরীরের গুরুতা—এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এরূপ ঘটলে পুনরায় বমন করা'তে হয়।

ডাঃ। আচ্ছা বমনের পর কিরূপে পথ্য দিবার নিয়ম ?

ক। সম্যক বমন হ'লে সেই দিন সন্ধ্যাকালে বা পরদিন প্রাতঃকালে সুখোষ্ণ জলে স্নান করিয়ে পুরাতন শালি তণ্ডুলের ঈষদুষ্ণ মণ্ড পান করা'তে হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অন্নকালেও মণ্ড পথ্য। চতুর্থ ভোজনকালে ঐরূপ চাউলের বিলেপী—স্নেহ ও লবণ না দিয়ে অথবা অল্প লবণ ও স্নেহ দিয়ে পান করা'তে হয় এবং গরম জল অনুপান দিতে হয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অন্নকালেও এইরূপ নিয়ম। সপ্তম অন্নকালে শালি তণ্ডুলের অন্ন অল্প সৈন্ধব—স্নেহ ও মুগের যূষের সঙ্গে পথ্য দিতে হয়, গরম জল অনুপান করাতে হয়। অষ্টম অন্ন ভোজন কালেও এইরূপ নিয়ম দশম একাদশ ও দ্বাদশ অন্নকালে লাব, গৌর তিতির প্রভৃতি কোন পক্ষীর মাংস রস উপযুক্ত স্নেহ ও লবণ সংযোগে অন্নের সঙ্গে ভোজন করা'তে হয় এবং উষ্ণ জল অনুপান করা'তে হয়। এই রকম ভাবে সাত দিন থেকে —পরে স্বাভাবিক ভোজন করা নিয়ম।

ডাঃ। আর সব বুঝলাম, কিন্তু বারটা অন্নকালের কথা বল্লেন, তা'হলে ত সাতদিনের বেশী হ'ল। আর অনুপান মানে তো ওষুদের সঙ্গে যা' খায়।

ক। অন্নকাল মানে—যে ব্যক্তি যে সময়ে খায়। তা'লোকেত একবার খায় না, প্রধানতঃ দু'বার খায়। কাজেই সাত দিনে চৌদ্দটা অন্নকাল পাওয়া যায়। আর আহারের পরে বা ওষুধ খাবার পরে যাহা পান করা যায় —তাকে অনুপান বলে। অনু মানে পশ্চাতে—আর পান মানে পান করা। কিন্তু ওষুদের সঙ্গে যা'খাওয়া হয়, সেটাকেও অনুপান কথা চলিত হয়ে গেছে।

ডাঃ। আচ্ছা সকল লোককেই কি বমন করান যেতে পারে ?

ক। কোন এক প্রকার ক্রিয়া সকল লোকের প্রতি প্রয়োগ করা যেতে পারে না। ক্ষতগ্রস্ত, ক্ষীণ; অতি স্থূল, অতি কৃশ, বালক, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল পরিশ্রান্ত, ক্ষুধিত, কর্ম্মভারবহন বা পথশ্রমে কাতর, উপবাসী, মৈথুন, অধ্যয়ন, ব্যায়াম ও চিন্তাকারী, কৃশ, গর্ভিণী, সুকুমার, মলবদ্ধ দ্বারা পীড়িত এবং উরুস্তম্ভ, অতিসার, গলরোগ উদররোগ, মূর্চ্ছা, বমি, অরুচি, শ্লেষ্মারোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ স্নেহ প্রয়োগের অযোগ্য। যে সকল স্ত্রী অকালে প্রসূত হয়, তাহারাও স্নেহ পানের অযোগ্য।

ডাঃ। স্নেহ পানের আর কি নিয়ম আছে বলুন ?

ক। বর্ষাকালে তৈল, শরৎকালে ঘৃত এবং বৈশাখ মাসে বসা ও মজ্জা হিতকর। বাতপিত্তাধিক ব্যক্তির উষ্ণকালে, রাত্রিতে এবং শ্লেষ্মাধিক ব্যক্তির শীতকালে মেঘ রহিত দিবাভে স্নেহ পান করা উচিত।

ডাঃ। স্নেহের পরিমাণ কিরূপ ?

ক। অগ্নি প্রবল হইলে আট তোলা, মধ্যবান হইলে ছয় তোলা, আর হীনবল হইলে চার তোলা মাত্রায় সেবন করিতে হয়।

ডাঃ। স্নেহ কি একদিন প্রয়োগ করিলেই হয়?

ক। না। মৃদুকোষ্ঠ ব্যক্তিকে তিন দিন, মধ্যকোষ্ঠ ব্যক্তিকে চার দিন এবং ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তিকে সাত দিন স্নেহ পান করাইলে শরীর স্নিগ্ধ হয়। ইহার পর আর পান করান উচিত নহে। কারণ তাহা হইলে উহা অভ্যস্ত হইয়া পড়ে।

ডাঃ। স্নেহ প্রয়োগ ঠিকমত হয়েছে কিনা—তা' জানবার উপায় কি?

ক। বায়ুর অনুলোম (অধোগমন), অগ্নির দীপ্তি, মল স্নিগ্ধ ও অকঠিন হওয়া, স্নেহ পানে অনিচ্ছা এবং শরীরের গ্লানি—এই লক্ষণ গুলি প্রকাশ পাইলে বুঝিতে হইবে যে, শরীর সম্যক্ স্নিগ্ধ হয়েছে। আর রুক্ষতা (স্নেহের অল্পতা) ঘটলে বায়ুর উর্দ্ধগতি হয়, অগ্নি মন্দ হয় এবং মল রুক্ষ ও কঠিন হয়। আবার বেশী স্নিগ্ধ হলে শরীরের পাণ্ডুবর্ণতা, তরল মলভেদ এবং নাক-মুখ দিয়া জল পড়া—উপসর্গ ঘটে।

ডাঃ। এ সকল ঘটলে কি করতে হয়?

ক। স্নেহপ্রয়োগ ঠিক হ'লেত কথাই নেই। কম হ'লে তা'কে আবার স্নেহ পান করাতে হয়। আর বেশী হলে কাঙ্গনী ধানের চাল, যবের ছাতু, তিল প্রভৃতি খাওয়াতে হয়।

ডাঃ। আচ্ছা আপনারা তো এত শাস্ত্রজ্ঞ কিন্তু পূর্ব্বে আপনাদের তো এ রকম চাল ছিল না?

ক। কিছুমাত্র না। আয়ুর্ব্বেদের স্রষ্টা যাঁ'রা—তাঁ'রা গাছের বাকল প'রতেন। তার পর তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে যাঁরা জীবের স্বাস্থ্যবিধান এবং প্রাণরক্ষারূপ মহাব্রত অবলম্বন ক'রতেন, তাঁ'রা মোটা চাদর-কাপড় আর চটী জুতো হ'লেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। এখনও ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের যেমন দেখচেন—আগেকার কবিরাজেরা ঠিক সেই রকম একেবারে বিলাসিতা বর্জ্জিত ছিলেন। তা' ছাড়া শাস্ত্রচর্চ্চায় ও চিন্তায় তাঁরা এত নিমগ্ন থাকতেন যে, বিষয় বুদ্ধি তাঁদের কিছুমাত্র ছিল না টাকা, মোহরের প্রভেদ জানতেন না।

ডাঃ। বলেন কি!

ক। বলি সত্য কথা। এই কিছু দিন পূর্ব্বের ঘটনা শুনুন। 'দর্প নারায়ণ' ব'লে এক জন কবিরাজ ছিলেন, তিনি এক সময়ে মহিষাদলের রাজবাড়ীতে চিকিৎসার জন্য আহূত হ'ন। যা'বার সময় কবিরাজ মহাশয়ের স্ত্রী ব'লে দেন যে তিনি যেন হলদে টাকা চান। কবিরাজ মহাশয়ের সুচিকিৎসায় রোগী আরোগ্য লাভ করিলে, বিদায়ের সময় সময় তিনি রাজার নিকট হলদে টাকা চাহিলেন রাজাও দাওয়ানকে যথেষ্ট মোহর পুরস্কার দিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু দাওয়ান দেখিলেন যে, কবিরাজ নিতান্ত বোকা। তিনি টাকায় হলুদ মাখাইয়া কবিরাজ মহাশয়কে দিলেন। রাজকীয় প্রহরী এবং কর্ম্মচারী সঙ্গে কবিরাজ মহাশয় বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং গৃহিণীকে টাকা দিয়া মহা আনন্দে বলিলেন,—'এই দেখ গৃহিণী, হলদে টাকা এনেছি।' গৃহিণী দেখিয়া ভাবিলেন যে, উহা কখনই রাজার কার্য্য নহে। কোন দুষ্টবুদ্ধিকর্ম্মচারী এরূপ করিয়াছে। তিনি সমাগত কর্ম্মচারী ও প্রহরীদিগকে রাজার নিকটে একখানি পত্র লইয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু

তাহারা—ইহা উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর কার্য্য এবং রাজার নিকট পত্র লইয়া গেলে তাহাদের চাকরী থাকিবে না—এইরূপ ভাবিয়া পত্র লইয়া যাইতে অস্বীকৃত হইল। কেবল এক-জন পালকীবেহারা কবিরাজ মহাশয়ের গুণে মুগ্ধ হইয়া বলিল, আমি খাটিয়া খাই, চাকরী যায়—অন্যত্র চাকরী করিব. আমি পত্র লইয়া যাইব। যাহা হউক তাহারই হস্তে পত্র দেওয়া হইল। পত্রে লেখা ছিল যে, মহারাজ, এরূপ লোককে আপনার ঠকান ভাল হয় নাই। রাজা পত্র পাইয়া তৎক্ষণাৎ সেই দুষ্ট কর্ম্ম-চারীকে পদচ্যুত করিলেন এবং যথেষ্ট মোহর কবিরাজ মহাশয়ের নিকট পাঠাইলেন।

ডাঃ। একি গল্প না সত্য কবিরাজ মশায়?

ক। এখন গল্প ব'লেই মনে হয়, কিন্তু সত্য সে কালের কবিরাজদের বিষয়বুদ্ধি মোটেই ছিলনা। টাকা সম্বন্ধে আর একটা ঘটনার কথা বলি শুনুন। একবার জনৈক কবিরাজ কৃষ্ণনগরের রাজ-বাড়ীতে চিকিৎসার জন্য আহূত হন। রোগী আরোগ্য লাভ করিলে, রাজা কবিরাজ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কি চান? কবিরাজ মহাশয় পূর্ব্বে হাতী দেখেন নাই. এখানে হাতী দেখিয়া খুব আনন্দ হইয়া ছিল, তিনি রাজাকে একটা হাতী দেখাইয়া বলিলেন—আমি এইটে নেব। রাজা—হাতী পুরস্কার দিয়া কবিরাজ মহাশয়কে বাড়ী পাঠা-ইয়া দিলেন। কবিরাজ-গৃহিণী ব্যস্তসমস্ত ভাবে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি এনেছ? কবিরাজ সানন্দে হাতী দেখাইয়া বলিলেন, আমি এইটে চেয়ে এনেছি। তখন গৃহিণী কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, আঃ আমার কপাল! কবিরাজ মহাশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন—কেন, কি হল? কবিরাজ-গৃহিণী বলিলেন, দাঁড়াও দেখাচ্ছি। এই বলিয়া প্রচুর ধান ও চাউল হাতীকে খাইতে দিলেন। গজরাজও মহা আনন্দে সেই ধান্য ও চাউলের স্তূপ উদরসাৎ করিল। গজ-রাজের আহার দেখিয়া কবিরাজ মহাশয় অবাক। তখনি ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে পত্র লিখিলেন যে, আপনি আমার সঙ্গে প্রতারণা করিয়াছেন। আমাকে একটা রাক্ষস দিয়া-ছেন। রাজা কবিরাজ মহাশয়ের শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য এবং বিষয়-বুদ্ধির হীনতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া হস্তীর পরিবর্ত্তে প্রচুর অর্থ দিয়া পাঠাইলেন।

ডাঃ। বাস্তবিক সেকালের কবিরাজগণ বিষয়বুদ্ধি হীনই ছিলেন বটে! যাক সে কথা, বমন করার পর কি রকম নিয়ম পালন করতে হয়, সে কথা বলুন।

ক। বমন করার পর উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা, অধিক ভোজন, নিশ্চিন্ত হইয়া উপবেশন, অত্যন্ত ভ্রমণ, ক্রোধ, শোক, হিম, রৌদ্র, শিশির, অতিরিক্ত বায়ুসেবন, অতিবিক্ত যানারোহণ, স্ত্রীসহবাস, রাত্রিজাগরণ, দিবা নিদ্রা, বিরুদ্ধ ভোজন, অজীর্ণকর দ্রব্য ভক্ষণ, অহিতকর দ্রব্য ভোজন, অকালে ভোজন বিষমভোজন, মলমূত্রের বেগধারণ বা বেগ উপস্থিত না হইলে বলপূর্ব্বক বেগদান প্রভৃতি পরিত্যাগ করা উচিত। ইহা ভিন্ন বমন করার পর রোগীর হস্ত, পদ, মুখ ধৌত করাইয়া তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিবে এবং দৈহিক দোষ প্রশমক কোন প্রকার ধূম পান করাইয়া পুনরায় হস্ত পদাদি ধৌত করাইবে এবং বায়ু প্রবাহ শূন্য গৃহে অবস্থান করাইবে।

ডাঃ। ধূমপান বুঝি, তামাক, সিগারেট, বিড়ি?

ক। না, এ ধূমপান তামাক, সিগারেট, বিড়ি নয়। পঞ্চকর্ম্ম বলার সঙ্গে সঙ্গে পরে ধূমপানের কথা ব'লতে হবে।

ডাঃ। আচ্ছা স্নেহ পানের পর কি রকম নিয়মে থাকা উচিৎ সে কথাত বল্‌লেননা।

কঃ। উষ্ণ জলে স্নান, পান ও শৌচাদি কার্য্য করিতে হয়। দিবানিদ্রা, মৈথুন, মল-মূত্র, উদ্গার ও অধোবায়ুর বেগ ধারণ; ব্যায়াম, উচ্চৈঃস্বরে কথা কহা, ক্রোধ, শোক, হিম ও আতপ সেবন পরিত্যাগ করা উচিত এবং বায়ু প্রবাহ হীন স্থানে থাকা কর্ত্তব্য।

ডাঃ। আচ্ছা বমনত হ'ল—পঞ্চকর্ম্মের প্রথম কর্ম্ম। তার পর কি ক'রতে হ'বে বলুন।

ক। বমনের পর বিরেচন প্রয়োগ ক'রতে হয়। বমন করার পর পুনরায় রোগীকে পূর্ব্ববৎ নিয়মে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ ক'রতে হবে। তা'র পর বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ ক'রতে হয়। ঔষধের সঙ্গে যা খাওয়া হয়, সে'টাকেও অনুপান কথিত হয়ে থাকে?

ডাঃ। তাতো হ'ল কিন্তু যে রকম বল্লেন তাতে ত কাউকে বমন করানই চলেনা দেখছি।

ক। কেন চ'লবে না? এতেই কি সব শেষ হ'ল? পীনস, কুষ্ঠ, নবজ্বর, রাজযক্ষ্মা, কাস; শ্বাস, গলগ্রহ (গলা নাড়িতে না পারা), গলগণ্ড, মেহ, অগ্নিমান্দ্য অজীর্ণ; বিসূচিকা, অলসক (বিসূচিকা ভেদ) অধোগ রক্তপিত্ত; মুখ দিয়া শ্লেষ্মা উঠা, অর্শঃ, গা বমি বমি করা, অরুচি, অপরিপাক, অপচী, অপস্মার, উন্মাদ, অতিসার, শোথ পাণ্ডুরোগ, মুখে ক্ষত হওয়া, দুষ্টস্তন্য জনিত রোগ, শ্লেষ্মজনিতরোগ, বিষপান, বিষধর সর্প কর্তৃক দংশন প্রভৃতি রোগে বমন করান হিতকর। শাস্ত্রে বলে যে ক্ষেতের আলি ভাঙ্গা গেলে যেমন ধান্যাদি শুষ্ক ও নষ্ট হয়, বমন দ্বারাই এই সকল রোগও সেইরূপ নষ্ট হইয়া থাকে।

ডাঃ। আচ্ছা বমনের পর স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করার কথা যা, বল্‌ছিলেন, সেটা আবার কি?

ক। পঞ্চকর্ম্ম দ্বারা শরীর শোধিত হয়, শোধিত অর্থে দোষ রহিত, আমরা ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, জ্ঞানে অজ্ঞানে শরীরের অনিষ্টকর অনেক রূপ ক্রিয়া করি, ফলে শরীরের নানা স্থানে দোষ সঞ্চিত হয়ে থাকে। সেই দোষ বা অনিষ্টকর পদার্থকে শরীর হ'তে নিঃসৃত করাই শোধন। এখন দেখুন শরীর থেকে দোষ নিঃসৃত করার পথ প্রধানতঃ দুইটী—মুখ এবং মলদ্বার। আমাশয়ে যে দোষ সঞ্চিত হয়, সে সমস্ত বমন দ্বারা মুখ দিয়ে নির্গত হ'য়ে যায়, আর পক্কাশয়ে যে সমস্ত দোষ সঞ্চিত হয়, সে সমস্ত বিরেচন দ্বারা মলদ্বার দিয়ে নির্গত হ'য়ে যায়।

ডাঃ। আচ্ছা তা, যদি হয়, তবে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগের স্বার্থকথা কি?

ক। বলছি সে কথা। ছেলেবেলা কখন আম চুরি করে খেয়েছেন কি?

ডাঃ। চুরি ক'রে খাওয়া জানি না; তবে আম খেয়েছি আর চুষিকাঠীর মত চুষেছি।

ক। তাতো চুষেছেন, কিন্তু তাতে কি চুরি ক'রে খাওয়া হয়নি? শুনুন বলছি, আমের পেছন দিকে অর্থাৎ বোঁটার বিপরীত দিকে একটা ফুটো করতে হয়, আর সেই খানে মুখ দিয়ে চুষে চুষে খেতে হয় এটা জানেন তো?

ডাঃ। তাতে কি হল?

ক। হ'ল এই যে—সেখানে কেবল মুখ দিয়ে চুষলেই আমের রস টুকু পাওয়া যায় না। চোষবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আমটা টিপে টিপে সেই ছিদ্রের দিকে আমের রস সঞ্চালন ক'র নিয়ে খেতে হয়। স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ ঠিক সেই টেপার কাজ করে। দোষ কেবল আমাশয়ে ও পক্কাশয়ে থাকেনা—তার নিকটবর্ত্তী অনেক স্থানেও থাকে। স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগের ফলে সেই সমস্ত দোষ আমাশয়ে ও পক্কাশয়ে এসে জন্মে এবং তখন বমন বা বিরেচন প্রয়োগ ক'রলে অতি সহজেই বা'র হ'য়ে যায়।

ডাঃ। তা'ত হল, কিন্তু দু'বার করে স্নেহ স্বেদ প্রয়োগ করা কেন?

ক। এত সোজা কথা। প্রথমবার স্নেহ স্বেদ প্রয়োগ ক'রলে দোষ সকল আমাশয়ে এসে সঞ্চিত হয়। আর বমন দ্বারা সেই সকল দোষ নির্গত হ'য়ে যায় ব'লে শরীরের উর্দ্ধভাগ বিশুদ্ধ হয়। তা'র পরে স্নেহ স্বেদ প্রয়োগ ক'রলে দোষ সকল পক্কাশয়ে এসে জমে, আর বিরেচন দ্বারা সেই দোষ নির্গত ক'রলে অধঃশরীর বিশুদ্ধ হয়।

ডাঃ। সঙ্গত কথা বটে। এখন বিরেচনের বিষয় বলুন।

ক। পূর্ব্বেই ব'লেছি যে, বিরেচন নানা প্রকার আছে। সংক্ষেপে তা'দের প্রয়োগের ক্ষেত্র ব'লছি। জ্বর, হৃদ্রোগ, বাতরক্ত ও উদাবর্ত্তরোগে এবং বালক, বৃদ্ধ; ক্ষতরোগ গ্রস্ত, ক্ষীণ ও সুকুমার ব্যক্তিদিগের পক্ষে সোঁদাল; পাণ্ডুরোগ, উদর, গুল্ম, কুষ্ঠ, দূষিতবিষ, শোষ, মধুমেহ, উন্মাদ, অপস্মার প্রভৃতি রোগে মনসা সীজের আটা, গুল্ম, হৃদ্রোগ, কুষ্ঠ, শোথ, উদর এবং শ্লেষ্মপ্রধান রোগে এবং পাণ্ডু, ক্রিমি, কুষ্ঠ, ভগন্দর প্রভৃতি রোগে দন্তী দ্বারা বিরেচন হিতকর। এতদ্ভিন্ন তেউড়ী, লোধ প্রভৃতি বিবিধ রোগ বিরেচনের জন্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

ডাঃ। এখন বিরেচন প্রয়োগের নিয়ম বলুন?

ক। পূর্ব্বেই ব'লেছি যে বমনের পর পুনরায় স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ ক'রে বিরেচন করা'তে হয়। বালক, বৃদ্ধ, পরিশ্রান্ত ভীত নবজ্বরী, মন্দাগ্নিযুক্ত ব্যক্তি, অধোগরক্তপিত্ত রোগী, মলদ্বারে ক্ষতযুক্ত ব্যক্তি অতিসার রোগী, যাহাদের শরীরে শল্য বিদ্ধ আছে এরূপ ব্যক্তি, ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তি গর্ভিণী তৃষ্ণার্ত্ত এবং অজীর্ণগ্রস্ত ব্যক্তিকে বিরেচন প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

ডাঃ। তবে কিরূপ ব্যক্তিকে বিরেচন প্রয়োগ করা যায়?

ক। কুষ্ঠ, জ্বর, মেহ, উর্দ্ধগ রক্তপিত্ত, ভগন্দর, উদর, অর্শ, ব্রধ্ন, প্লীহা, গুল্ম, অর্ব্বুদ, বিসূচিকা, অলসক, মূত্রাঘাত, ক্রিমিকোষ্ঠ, বিসর্প, পাণ্ডুরোগ, শিরঃশূলঃ, পার্শ্বশূল, উদাবর্ত্ত, নেত্রদাহ, মুখদাহ, হৃদ্রোগ, নেত্ররোগ, নাসারোগ, মুখরোগ, কর্ণরোগ, মলদ্বারের পাক, লিঙ্গের পাক, হলীমক (পাণ্ডু রোগ বিশেষ) শ্বাশ, কাস, কামলা, অপচী, অপস্মার উন্মাদ, বাতরক্ত, যোনিদোষ, শুক্রদোষ এবং পিত্তজ রোগে বিরেচন হিতকর।

ডাঃ। আচ্ছা যে রোগ বমনের অযোগ্য—তাহাকে কি বিরেচন করান যায়?

ক। পঞ্চকর্ম্মের সাধারণ সূত্র এই যে, প্রথমে স্নেহ, পরে স্বেদ, পরে বমন প্রয়োগ ক'রে তবে বিরেচন প্রয়োগ ক'রতে হয়, পরে

গ্রহণী দোষ উৎপন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু সাধারণ সূত্র এরূপে হ'লেও ভিন্ন ভিন্ন রোগের চিকিৎসায় কখন বমন, কখন বিরেচন, কখন উভয়ই প্রয়োগ করতে হয়, আবার দুর্ব্বল রোগীকে ঔষধের কোনই প্রয়োগ করা উচিৎ নয়। ঊর্দ্ধগরক্তপিত্তে বমন নিষেধ, কিন্তু বিরেচন প্রয়োগ করা যায়। অধোগ রক্তপিত্তে বিরেচন নিষেধ, কিন্তু বমন প্রয়োগ করা যায়।

ডাঃ। আচ্ছা বমন বিরেচনের পূর্ব্বে কি স্নেহও স্বেদ প্রয়োগ করা সর্ব্বত্রই আবশ্যক ?

ক। বলবান রোগী এবং সুস্থ ব্যক্তির দেহ শোধন ক'রতে হ'লে স্নেহ স্বেদ প্রয়োগ ক'রে যথারীতি পঞ্চকর্ম্ম কর'তে হয়। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন রোগেরই চিকিৎসার অনেক সময় সেটা শুধু আবশ্যক নয়, পরন্তু অপকারী. নবজ্বরে বমন করা'বার বিধি আছে, কিন্তু নবজ্বরে স্নেহপান নিষিদ্ধ। আবার সন্নিপাত জ্বরে স্বেদ দিবার বিধি আছে, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও স্নেহ দান নিষিদ্ধ।

ডাঃ। এ বড় জটিল ব্যাপার দেখছি ?

ক। বিষম জটিল। একটা উদাহরণ দিয়ে বল'ছি শুনুন। বিষয়টা আরও জটিল ব'লে বোধ হবে। ভগবন আত্রেয়ের নিকট অগ্নিবেশ যখন শিক্ষা করেন, তখন বমন বিরেচন সম্বন্ধে উপদেশ দেবার সঙ্গে আত্রেয় ব'ললেন, বমন বিরেচন কার্য্যে রোগীর বিপদ উপস্থিত হ'লে তার প্রতিকারের জন্যও অনেক দ্রব্যের আবশ্যক, বিপদ সহসা উপস্থিত হ'লে ক্রয়াশয় নিকটে থাকিলেও তখনি তখনি আবশ্যক দ্রব্যের আয়োজন করা সম্ভবপর নহে, এই জন্য রোগীর যে সকল দ্রব্য আবশ্যক—সেগুলি পূর্ব্বেই সংগ্রহ ক'রে রাখা উচিত।

আত্রেয়ের কথা শুনে অগ্নিবেশ বললেন, ভগবান, জ্ঞানবান ব্যক্তির প্রথম হতেই এরূপ প্রতিবিধান করা উচিত—যাতে ঔষধ প্রয়োগে নিশ্চিত সিদ্ধিলাভ হয়, অর্থাৎ কোনরূপ বিপত্তি না ঘটে। ঔষধ সম্যক রূপে প্রয়োগ কার্য্য সিদ্ধির এবং অসম্যক প্রয়োগ বিপত্তির কারণ, যদি এরূপ হয় যে সিদ্ধি ও বিপত্তি সম্বন্ধে কোনরূপ নিয়ম নাই অর্থাৎ জ্ঞান পূর্ব্বক ঔষধ প্রয়োগ ক'রলে ক্ষেত্র বিশেষে কার্য্য সিদ্ধি হয়, আবার কাহারও পক্ষে বিপত্তি ঘটে, তা'হলে জ্ঞান এবং অজ্ঞান দুই সমান ব'লতে হ'বে।

ডাঃ। বাঃ অগ্নিবেশ তো বড় জবর কথা বলেছেন !

ক। আত্রেয় আরও জবর কথা বলেছেন। তিনি উত্তর ক'রলেন, অগ্নিবেশ, আমরা অথবা আমাদের মত ব্যক্তিরাই এরূপ ভাবে ঔষধ প্রয়োগ ক'রতে সমর্থ হই, আমাদের ঔষধের দ্বারা নিশ্চয় রোগ নিবারণ হয় কোনরূপ বিপত্তি ঘটে না। এরূপ প্রয়োগ সম্বন্ধে যথাযথ উপদেশ দিতেও কেবল আমাদেরই সামর্থ্য আছে। কিন্তু এমন লোক কেহ নাই যে, আমাদের মত উপদেশ দিতে এবং সেই উপদেশের মর্ম্ম সম্যক অবধারণ ক'রতে সমর্থ। আমার উপদেশের মর্ম্ম গ্রহণ ক'রে তদনুরূপ কার্য্য ক'রতে পারে—এমন লোকও কেহ নাই। দোষ (বায়ু, পিত্ত, কফ), ঔষধ দেশ, বল, শরীর আহার, সাত্ম সত্ব, প্রকৃতি এবং বয়স প্রভৃতির এত অবস্থান্তর এবং সেই সকল অবস্থান্তর (ভিন্নতা) এত সূক্ষ্ম যে, ইহাদের বিষয় সম্যক ভাবে চিন্তা করিতে বিশাল ও বিপুল বুদ্ধি সম্পন্ন * ব্যক্তিরও বুদ্ধি আকুল হইয়া পড়ে, অল্প বুদ্ধিরত কথাই নাই।

ডাঃ। অতি সত্য কথা। কিন্তু আত্রেয়ের কি তেজোগর্ব্ব উক্তি—আমি বা আমার মত ব্যক্তি কি পারে, আর কেউ পারে না।

ক। তাঁরা ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষ ছিলেন, তাঁরাই শুধু এরূপ কথা উচ্চারণ ক'রতে সাহস ক'রতে পারেন। সংহিতাকার অগ্নিবেশকে পর্য্যন্ত বিপত্তির প্রতিকারের উপায় শিখতে হ'য়েছিল।

ডাঃ। তা আপনি যখন বিরেচনের কথা ব'লেছেন, তখন বিপত্তির প্রতিকারের কথাও বলতে হবে।

ক। দেখুন—সত্য কথা না ব'ললে ও বাঁচিনে, এ আপনাকে যা' বলছি সেটা পাখীর রাধাকৃষ্ণ বলাব মত, কথার মানে না বুঝে বলা। যখন বিরেচন আমরা সম্যকরূপে প্রয়োগও ক'রতে পারিনে, আর তার বিপত্তির প্রতিকার কত্তে জানিনে। তবে শাস্ত্রে যা লেখা আছে—তাই বলছি।

(ক্রমশঃ)

স্বাস্থ্যরক্ষায় কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী।

—:+:—

আশ্বিনের "আয়ুর্ব্বেদে" "হিন্দুর স্বাস্থ্য নীতি" শীর্ষক এক প্রবন্ধ বাহির হয়। পরে কার্ত্তিকের পত্রিকায় উক্ত প্রবন্ধের অসম্পূর্ণতা পূরণোদ্দেশে পরবর্ত্তী প্রবন্ধ লেখক যে প্রবন্ধ লেখেন, তাহাতে শরীর রক্ষার জন্য স্বাস্থ্যের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম প্রবন্ধটী বাস্তবিক মূলত্যগ করিয়া কেবল আখ্যায়িকা মাত্র হইয়াছিল। এস্থলে দ্বিতীয় প্রবন্ধলেখকই প্রকৃত প্রশংসনীয়। যাহা হউক এক্ষণে বর্ত্তমান স্বাস্থ্য-নীতি সম্বন্ধে কলিকাতা মিউনিসিপালিটি উপলক্ষ্য করিয়া দুই এক কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

প্রথমতঃ দেখা যাউক, কলিকাতার ন্যায় মহানগরীর স্বাস্থ্যরক্ষার কি ব্যবস্থা আছে। এক্ষণে অবশ্য পল্লীগ্রাম সমূহেও যথাসম্ভব একটু একটু করিয়া সহরের পদ্ধতিই অনুবর্ত্তিত হইতে দেখা যাইতেছে, সুতরাং সহরের কথা বলিলেই অনেকটা মফঃস্বলের কথাও আসিয়া পড়িবে। কলিকাতা মহানগরীর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য মিউনিসিপালিটির সৃষ্টি। প্রজাবর্গের প্রতিনিধি স্বরূপ নির্ব্বাচিত কমিশনরগণ দ্বারা মিউনিসিপালিটী পরিচালিত। রাস্তা প্রস্তুত করণ, উহা মেরামত ও পরিষ্কার রাখা, রাত্রিকালে রাস্তায় আলোক প্রদান, বাটীর ও পথের জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত, পুরীষ রাশি ও আবর্জ্জনাদির স্থানান্তরের দূরীকরণ, পানীয় জল সরবরাহ, খাদ্য ও পানীয়ের অবিশুদ্ধতা নিবারণ, মহামারী ও সংক্রামক রোগসমূহের প্রতিকার সাধন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য মিউনিসিপালিটি দ্বারা সমাধা হয়। এই সকল কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মিউনিসিপালিটি দ্বারা প্রজার নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট হারে কর

সংগ্রহ করা হয়। ফলকথা মিউনিসিপালিটী প্রজাবর্গের ও প্রজাদের নির্ব্বাচিত কমিশনরগণ কর্তৃক গঠিত ও পরিচালিত।

বাটী নির্ম্মাণ সম্বন্ধে মিউনিসিপালিটীর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব আছে, অর্থাৎ মিউনিসিপালিটীর অনুমোদন ভিন্ন কাহারও বাটী নির্ম্মাণ করিবার ক্ষমতা নাই। যাহাতে গৃহমধ্যে আলোক প্রবেশের ও বায়ুসঞ্চালনের উপায় থাকে, সে সম্বন্ধে কতকগুলি আইন বিধিবদ্ধও আছে। কলিকাতার ন্যায় স্থানে যেখানে জমির মূল্যের অত্যন্ত মহার্ঘতা বশতঃ অনেককেই অতি সংকীর্ণ স্থান মধ্যে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে হয়, সেরূপ স্থলে স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিকে আইন বিধিবদ্ধ করিতে হয়, এজন্য কলিকাতা মিউনিসিপালিটী বাস্তবিকই ধন্যবাদার্হ। আইনের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইলে মিউসিপাল কর্ম্মচারিগণের গৃহনির্ম্মাণের অনুমতি দিবার কোন ক্ষমতা নাই। কিন্তু কখনও কখনও এরূপও হয় যে, আইন বজায় রাখিয়া গৃহনির্ম্মাণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে, তবে আইনের সামান্য ব্যতিক্রম হইলেও স্বাস্থ্যের বিশেষ হানি হয় না। এইজন্য কোন কোন স্থলে বাটী নির্ম্মাণকারক দরখাস্ত করিলে, চেয়ারম্যান, হেল্‌থ অফিসর ও কমিশনরগণ মন্ত্রণাসভায় আন্দোলন করিয়া, যদি স্বাস্থ্যহানিকর হইবে না মনে করেন, তাহা হইলে বাটী নির্ম্মাণের অনুমতি দিয়া থাকেন। বন্দোবস্ত বাস্তবিকই খুব ভাল। তবে এরূপ অনুমতি লাভ কমিশনরের কৃপাদৃষ্টি ভিন্ন ঘটে না। যাঁহারা কমিশনরের প্রিয়পাত্র, তাঁহাদের অদৃষ্টে এরূপ সৌভাগ্য লাভ সহজেই ঘটে। যে সকল কমিশনর অপক্ষপাতী ও করদাতাগণের প্রকৃত শুভানুধ্যায়ী কেবল তাঁহাদের ওয়ার্ডে সকলে সমভাবে এই সুবিচার লাভে অধিকারী হন। যাহা হউক এ দোষ মিউনিসিপালিটীর নহে, উহা করদাতৃগণের কমিশনর নির্ব্বাচনের দোষ। বঙ্গদেশের গৃহনির্ম্মাণের যে প্রাচীন ব্যবস্থা ছিল, তাহা খুব ভাল হইলেও কলিকাতার ন্যায় বহুজনাকীর্ণ মহানগরীর প্রতি প্রয়োজ্য নহে, এবং সে পদ্ধতি অবলম্বন করিলে অনেকের পক্ষেই বাসগৃহ নির্ম্মাণ দুরূহ হইয়া পড়ে। এস্থলে মিউনিসিপালিটীর অবলম্বিত ব্যবস্থাই ভাল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু পল্লীগ্রামে যেখানে জমির মূল্য সুলভ, সেরূপ স্থলে প্রাচীন পদ্ধতিই ভাল, যথা,—"পূবে হাঁস। পশ্চিমে বাঁশ। উত্তর বেড়ে। দক্ষিণ ছেড়ে। ঘর কর রে ভেড়ের ভেড়ে॥" ইহার অর্থ এই যে, বাসভবনের পূর্ব্বদিকে জানালা থাকা আবশ্যক; কারণ নবোদিত তরুণ তপনের নাতিতীক্ষ্ণ রশ্মিরাজি গৃহমধ্যে স্বতঃপ্রবিষ্ট হইয়া এবং কোন কোন অগম্যস্থানেও জলাশয় হইতে প্রতিবিম্বিত কিরণমালা প্রবেশ করিয়া গৃহের ও গৃহাভ্যন্তরস্থ বায়ুরাশির আর্দ্রতা নিবারণ ও রোগের বীজাণু ধ্বংস করিতে সক্ষম হয়। পশ্চিমে বাঁশঝাড় বা উচ্চ বৃক্ষরাজি থাকা আবশ্যক; তাহা হইলে অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের অসহ্য ও অস্বাস্থ্যকর কিরণরাশি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। উত্তর দিক বেষ্টন বা প্রাচীর রুদ্ধ করিবার কারণ এই যে, উত্তর বায়ুর গতি রোধ হইয়া শৈত্য নিবারিত হইবে। যাহাতে দক্ষিণ মলয়ানিল অবাধে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে—তজ্জন্য দক্ষিণ দিক খোলা থাকা আবশ্যক। যেখানে জমির স্বচ্ছলতা আছে, সেখানে

এ প্রণালীতে গৃহনির্ম্মাণ বেশ স্বাস্থ্যকর বটে।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর জন্য কলিকাতায় রাস্তা পরিষ্কারের বেশ সুবন্দোবস্ত আছে। কিন্তু পল্লীগ্রামে—যেখানে মিউনিসিপালিটীর সৃষ্টি হয় নাই—তথাকার রাস্তা পরিষ্কার ব্যাপারটা গ্রামবাসিদের উপর নির্ভর করে। তবে জমির সচ্ছলতা প্রযুক্ত অনেক গ্রামের আবর্জ্জনা রাশি রাস্তায় ফেলিতে দেখা যায় না। মধ্যে যে সকল পতিত জমি থাকে বা গৃহস্বামীর নিজের যে পতিত জমি থাকে, তাহাতেই পল্লীগ্রামের আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করা হয়—এরং ঐ আবর্জ্জনা রাশি ক্রমে মৃত্তিকায় পরিণত হয়। ঐ সকল পতিত জমি প্রায় বাসগৃহ হইতে দূরেই অবস্থিত, সুতরাং উহা দ্বারা গ্রাম অস্বাস্থ্যকর হয় না। কিন্তু যে সকল গ্রামের লোকসংখ্যা অধিক এবং বাস ভবনের অনতিদূরেই আবর্জ্জনা রাশি পচিতে থাকে, তথায় উহা পীড়া উৎপাদনের কারণ হইয়া থাকে। কলিকাতা মিউনিসিপালিটি রাস্তা পরিষ্কারের জন্য দু'বেলা রাস্তায় ঝাড়ু দেওয়া, দুবেলা জল সেচন করা, দুবেলা আবর্জ্জনা রাশি গাড়ী করিয়া স্থানান্তরিত করা প্রভৃতি দ্বারা কলিকাতাবাসীর স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করেন। ইহাতে অর্থও প্রচুর ব্যয়িত করা হয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর একটু সুবন্দোবস্ত হইলে ভাল হয় বলিয়া আমরা মনে করি। নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইলে আবর্জ্জনা রাস্তায় ফেলিতে দেওয়া হয় না বা স্থানে স্থানে লৌহ নির্ম্মিত যে আধার থাকে তন্মধ্যে ফেলিবার যে ব্যবস্থা আছে, তাহার একটু পরিবর্ত্তন হইলে ভাল হয়। কারণ অনেক গৃহস্থের সর্ব্বদা আবর্জ্জনা রাশি পথস্থিত লৌহাধারে নিক্ষেপ করিবার সুবিধা হয় না। যাঁহাদের গৃহকার্য্যের জন্য ঠিকা লোক নিযুক্ত থাকে; সে লোক দিনান্তে একবার আসিয়া গৃহ প্রাঙ্গন পরিষ্কার করে ও আবর্জ্জনা রাশি নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিক্ষেপ করে। কিন্তু সমস্ত দিবারাত্রি ঐ সব আবর্জ্জনারাশি গৃহমধ্যেই পচিতে থাকে। কারণ অবরোধস্থ স্ত্রীলোকেরা রাস্তায় যাইয়া আধার মধ্যে আবর্জ্জনা ফেলিয়া আসিতে পারে না। আবর্জ্জনা রাশি পচিয়া দূষিত হইতে থাকে। যে সকল বাটীর সন্নিকটে আবর্জ্জনার আধার থাকে—তাহাদের আবর্জ্জনা ফেলিবার সুবিধা হয় বটে; কিন্তু একস্থানে প্রচুর আবর্জ্জনা রাশি থাকায় অত্যন্ত দুর্গন্ধ ভোগ করিতে হয়। ধাঙ্গড়ের সংখ্যা যদি বাড়াইয়া দেওয়া হয়, এবং সমস্ত দিন আবর্জ্জনা রাস্তায় পড়িবামাত্র যদি উঠাইয়া লইবার বন্দোবস্ত করা হয়, তাহা হইলে ইহার প্রতীকার হইতে পারে। শুনিয়াছি চীনদেশের কোন কোন সহরে নাকি এইরূপ বন্দোবস্ত আছে। মেথর সমস্ত দিন ঝাড়ু হাতে রাস্তায় উপস্থিত থাকে, আবর্জ্জনা পড়িবামাত্র তৎক্ষণাৎ স্থানান্তরিত করা হয়।

এইবার রাস্তা মেরামত সম্বন্ধেও কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। মিউনিসিপালিটীর অনুগ্রহে কলিকাতার রাস্তা সর্ব্বদাই মেরামত হইতেছে। বড় রাস্তা ও ফুটপাথ সমূহে পাথর দেওয়াতে বড়ই সুন্দর হইয়াছে। এমন কি অনেক গরীব লোক গ্রীষ্মকালে রাত্রে ফুটপাথে শয়ন করিয়া থাকে। কিন্তু বর্ষার সময় পাথরের উপর বড় পা পিছলাইয়া যায় বলিয়া তাহারও প্রতিকার সাধন হইয়াছে; অর্থাৎ পাথরের উপরিভাগ যাহাতে মসৃণ না হয়—সেরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গলির

রাস্তায় ইট বিছাইয়া পাকা করিয়া দেওয়া হইতেছে। কিন্তু অনেক রাস্তার উচ্চতা এত বর্দ্ধিত করা হইয়াছে যে, অনেক বাটীর প্রাঙ্গন বা গৃহতল যাহা পূর্ব্বে রাস্তা হইতে উচ্চ ছিল, তাহা এক্ষণে রাস্তা অপেক্ষা নিম্ন হইয়াছে। ইহা দ্বারা নিম্নতলের গৃহগুলির আদ্রতা বর্দ্ধিত হইয়া অস্বাস্থ্যাকর হইয়াছে। এ বিষয়টীর প্রতি মিউনিসিপালিটীর লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। কোন কোন স্থলে মিউনিসিপালিটীর স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে নোটিশ দিয়া গৃহস্বামীকে নিজ খরচায় গৃহ প্রাঙ্গন উচ্চ করান হইতেছে। কিন্তু নীচু হইলে না দিলে আর এরূপ নোটিশ দিবার প্রয়োজন হয় না। কোন কোন স্থলে উঠান উঁচু করিতে গিয়া শয়ন ঘরের মেজের সহিত প্রায় সমতল হইয়া পড়িতেছে। ইহাতে ঘরের আর্দ্রতা বৃদ্ধি পাইতেছে। যাহাতে রাস্তা উঁচু না হইয়া সমভাবে থাকে, সে বিষয় মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষগণের একটু কৃপাদৃষ্টি থাকিলে ভাল হয়। যে সকল রাস্তা অনেক উঁচু হইয়াছে, যদি সেগুলিকে নামাইয়া দেওয়া সম্ভব হয়, তাহারও চেষ্টা করা উচিত।

কলিকাতায় অধিকাংশ বাটীই সঙ্কীর্ণ স্থানে নির্ম্মিত। তথায় অবিরুদ্ধ বায়ু সেবনের উপায় নাই। সে কারণ মুক্ত বায়ু সেবনার্থ কলিকাতা মিউনিসিপালিটী স্থানে স্থানে স্কোয়ার বা সরকারি বাগান নির্ম্মাণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। কলিকাতার ন্যায় অন্যান্য বড় বড় সহরেও এইরূপ স্কোয়ার ও পার্ক নির্ম্মিত হইয়াছে ও হইতেছে। এ বন্দোবস্ত যে খুব ভাল তাহার কোন সন্দেহ নাই। কলিকাতায় আবার অবরোধবাসিনীদের বায়ু সেবনার্থ পার্ক হইবার বন্দোবস্ত হইতেছে। এ সব সম্বন্ধে কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর কার্য্যকলাপ সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। ইহাতে আমাদের প্রতিবাদ বা নূতন প্রস্তাব করিবার কিছুই নাই।

খাদ্য ও পানীয়ের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে কলিকাতার মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষগণের বিশেষ যত্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে তাঁহারা বেশ কৃতকার্য্যও হইতেছেন। বাজারে পচা মৎস্য বা মাংস, দুর্গন্ধ ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাদি বিক্রয় করিতে দেওয়া হয় না। বিক্রয় করিতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ ফেলিয়া দেওয়া হয় ও বিক্রেতাকে দণ্ডভোগ করিতে হয়। পানীয় জলের বিশুদ্ধতাই কলিকাতার স্বাস্থ্যোন্নতির প্রথম সোপান। শুনা যায়, কলিকাতায় যখন প্রথম কলের জলের সৃষ্টি হয়, তখন তিন দিন নিমতলা শবদাহ ঘাটে শবদাহ হয় নাই, অর্থাৎ কলিকাতায় ৩ দিন লোক মরে নাই। সে সময় মহাত্মা হগ্ সাহেব চেয়ারম্যান ও ডাক্তার টনিয়ার হেলথ্ অফিসার ছিলেন। কলিকাতার স্বাস্থ্যান্নতির সম্বন্ধে ইঁহারা সর্ব্বাগ্রে ধন্যবাদার্হ। এই ডাক্তার টনিয়ার সাহেব হোমিওপ্যাথ ছিলেন। ইঁহার পর কোন হেলথ্ অফিসরের আমলে মৃত্যুসংখ্যা একদিনের জন্যও একেবারে শূন্য হইতে দেখা যায় নাই। যে কলের জল কলিকাতার স্বাস্থ্যোন্নতির মুখ্য কারণ, বর্ত্তমানে সেই জল সরবরাহ করা সম্বন্ধে দুই এককথা বলিবার আছে। কলিকাতা মিউনিসিপালিটী দ্বারা এক্ষণে দুই প্রকার জল সরবরাহ করা হয়। পান, স্নান এবং গৃহকর্ম্মের জন্য পরিস্কৃত জল, এবং পায়খানা পরিষ্কারের জন্য অপরিস্কৃত জল মাপিয়া দেওয়া হয়, তাহার অতিরিক্ত খরচ হইলে স্বতন্ত্র দাম দিতে হয়। সে কারণ যাঁহাদের বিশুদ্ধ জলের খরচ অধিক, তাঁহারা তৎপরিবর্ত্তে অপরিস্কৃত

জল ব্যবহার করেন। ইহা রোগোৎপত্তির একটী কারণ। এই জল খরচের পরিমাণ স্থির করিবার জন্য মিউনিসিপালিটীর খরচায় গৃহদ্বারে একটা মিটার বা পরিমাপক যন্ত্র স্থাপিত আছে। উহা পরিদর্শনের জন্য অনেক ইন্স্পেক্টর ও কুলি নিযুক্ত আছে, এবং মেরামতের জন্যও মিস্ত্রী আছে। এই সকল খরচা কমাইয়া যাহাতে বিশুদ্ধ জল অবাধে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, সে বন্দোবস্ত করিলে মন্দ হয় না। কিন্তু তাহা বলিয়া জলের অপব্যয় করিতে দেওয়াও যুক্তি সঙ্গত নহে। তবে অন্য উপায়ে জলের অপব্যয় নিবারণ করা যাইতে পারে। দিবারাত্র যদি কলে জল থাকে, তাহা হইলে কতক পরিমাণে অপব্যয় নিবারণ হইতে পারে। কলিকাতায় হিন্দুর সংখ্যা। অধিক। খাদ্য, পানীয়ের পবিত্রতা সম্বন্ধে হিন্দুকে অনেক কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয়। দিবারাত্র জল না থাকার জন্য জল চৌবাচ্ছায় ও অন্যান্য আধারে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হয়। ফলে সামান্য কারণে এই জল হিন্দুর অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে। হয় ত বায়সাদি দ্বারা চৌবাচ্ছার জলে কোন অস্পৃশ্য দ্রব্য আসিয়া পড়িল, হয় ত ইন্দুরাদি দ্বারা কোন উচ্ছিষ্ট বা অস্পৃশ্য দ্রব্য জলের জালা বা কলসীর গাত্রে সংলগ্ন হইল। সেইজন্য হিন্দুকে পূর্ব্ব সংগৃহীত জল পরিত্যাগ করিয়া আবার নূতন করিয়া জল সংগ্রহ করিতে হয়। কিন্তু দিবারাত্র কলে জল থাকিলে জল সংগ্রহ করিয়া রাখিবার আবশ্যক হয় না। ফলে নানা কারণে কলিকাতায় জলের অপব্যয় হইয়া থাকে। এখন কলের মুখ যেরূপ আছে, তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া রেল ষ্টেসনের কলের ন্যায় বা রাস্তার কলের ন্যায় মুখ প্রচলন করিলে অনেক সময় অপব্যয় নিবারণ করা যাইতে পারে অর্থাৎ ধরিয়া থাকিলে জল পড়িবে এবং ছাড়িয়া দিলেই জল বন্ধ হইবে—এরূপ করিলে জল যাহার যত আবশ্যক—অবাধে ব্যবহার করিতে পারিবেন, এবং জলের অপব্যয়ও নিবারিত হইবে।

আমরা আশা করি, কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি আমাদের কথাগুলি বিবেচনা করিবেন।

ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস।

ওলাউঠার প্রতিষেধক।

——:*:——

("নীহার" হইতে উদ্ধৃত)

ওলাউঠা ব্যাধি সম্বন্ধে কয়েকটী সাধারণ নিয়ম আছে, যাহা ব্যক্তিগত ভাবে পালন করিলে ঐ ব্যারামের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে। দেশের জনকয়েক শিক্ষিত লোক ছাড়া পল্লীবাসী অসংখ্য জনসাধারণে এ বিষয়ে সম্পূর্ণই অনভিজ্ঞ। বর্ত্তমান ওলা-

উঠার প্রাদুর্ভাব কালে জনসাধারণের হিতার্থে নিম্নে কয়েকটী নিয়ম লিখা হইল।

(১) কলেরা ব্যারাম প্রায়ই শীতকালে দেখা যায়। দরিদ্র লোককে যাহাদের শীতবস্ত্রের অভাব তাহাদের বেশীর ভাগ লোককে এই ব্যাধিতে মরিতে দেখা যায়। শরীরে—বিশেষতঃ পেটে যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে, সেদিকে সকলের বিশেষ দৃষ্টী রাখা উচিত। সামান্য পেটের অসুখ হইলেও স্নান করা একেবারে নিষিদ্ধ। সাধারণ লোকের বিশ্বাস আছে—স্নান করিলেই পেট ঠাণ্ডা হইবে, উহা সম্পূর্ণ ভুল। পেটের অসুখ হইলে স্নান করা কোন রকমে উচিত নহে।

(২) প্রায়ই দেখা যায়,—কলেরা দূষিত জল ও দুগ্ধ পান করিলে হয়। এ সময় প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত—পানীয় জল উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া তাহা পরিষ্কার নেকড়ার দ্বারা ছাঁকিয়া ঠাণ্ডা করিয়া পান করা। জল সিদ্ধ করিলে উহার সমস্ত দোষ নষ্ট হয়। কাঁচা দুগ্ধও কখন পান করা উচিত নয়। আমি জানি—একজন বড় সাহেব কাঁচা দুগ্ধ পান করিয়া কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। এখন খাঁটী দুগ্ধ পাইবার উপায় নাই। দুগ্ধ বিক্রেতারা অনেক সময় দূষিত খাল বিলের জল মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধকে বিষাক্ত করে।

(৩) কলেরা রোগের বিষ রোগীর ভেদ ও বমির সহিত নিঃসৃত হয়। অতএব রোগীর মল-মূত্র ও বমি আদি যাহাতে পানীয় জলে না পড়িতে পারে এবং উহার উপর মাছি না বসে, সে বিষয়ে সকলের বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। মাটীর গামলা অথবা সরাতে রোগীর মলমূত্রও বমি ধরিয়া তাহার উপর তৎক্ষণাৎ মাটী অথবা বালি দিয়া ঢাকা দিলেই মাছি বসিতে পারে না এবং তাহার পর পাত্র সহিত রোগীর মল—মাটির নীচে পুঁতিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। নচেৎ অগ্নিতে পোড়াইয়া ফেলা বিধেয়। রোগীর মল কখনও যেখানে সেখানে ছড়াইয়া ফেলা উচিত নয়। কলেরা একটী অতি সংক্রামক ব্যাধি, রোগীর ভেদ বমির উপর যদি মাছি বসিতে পায়, তবে উহারা ঐ পীড়ার বিষ লইয়া খাদ্যদ্রব্যের উপর বসিলে তাহাও বিষাক্ত করিয়া দেয় এবং সেই খাদ্য দ্রব্য খাইয়া লোকে কলেরা ব্যারামে আক্রান্ত হইতে পারে। এই জন্য খাদ্যদ্রব্য সমূহ এমন ভাবে ঢাকিয়া রাখা আবশ্যক, যাহাতে উহার উপর মাছি আদৌ বসিতে না পারে।

বাজারে অনেক খাবারের দোকান আছে, কিন্তু সমস্ত দোকানের খাবারগুলি রাস্তার ধূলায় ও মাটীতে ঢাকা থাকে। এইরূপ খাবার খাইলে লোকের অনিষ্ট ছাড়া উপকার হইতে পারে না।

কলি চুণ একটী বিষ প্রতিষেধক। কলেরা রোগীর মলে ইহা দিলে বিষ নষ্ট হয়। ইহা ছাড়া পারমাঙ্গানেটঅব পটাশ দ্বারাও জলের দোষ নষ্ট করা যায়। ইহা একটা সাধারণ কুয়াতে অৰ্দ্ধ আউন্স পরিমাণে মিশ্রিত করিলেই যথেষ্ট হয়, অথবা ক্লোরোজেন ১ আউন্স দিলেই জলের দোষ নষ্ট হয়। ফেনাইলও একটী উত্তম বিষপ্রতিষেধক। বাড়ীতে কলেরা হইলে ঘরের দেওয়াল ও মেজেয় ফেনাইল জলে মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে ঘর পরিষ্কার করা দরকার এবং ঘরের মেজেতে ঘুঁটিয়ার আগুন করিয়া দিলে সমস্ত দোষ নষ্ট হয়। ইহা ব্যতীত গন্ধক জ্বালাইলেও দূষিত হাওয়া পরিশোধিত হয়।

(৪) কলেরা রোগীর কাপড় কখনও পুকুর অথবা অন্য কোন জলাশয়ে ধোওয়া উচিত নহে। উহা হইতেই ব্যারাম চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। রোগীর কাপড়-হাঁড়ি অথবা টিনের ভিতর রাখিয়া উত্তমরূপ সিদ্ধ করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লওয়া উচিত। জলে ফিনাইল অথবা চূণ মিশাইয়া লওয়া বিধেয়।

(৫) কলেরার কীটাণু দেখিতে কমার ন্যায়। সেই জন্য ইহার নাম হইয়াছে, কমা ব্যাসিলাস্। কলেরার বিষ অম্লে নষ্ট হয়। কলেরার সময় লেবু (পাতি, কাগজি, কমলা) খাওয়া ভাল এবং ঔষধ Sulphuric Acid Dilute ১০ ফোঁটা করিয়া আহারের পর দুইবার খাওয়া ভাল।

শ্রীরমণীমোহন মুখোপাধ্যায়
এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন।

পিত্তশূল বা Gallstone.

—:*:—

[ডাক্তার গ্লাইকোকোলেট বলেন,—সোডার চেয়ে কবিরাজী কুলেখাড়া—এ রোগের অব্যর্থ ঔষধ]

আজকাল আর একটা রোগ বেশ ব্যাপক ভাবেই এ দেশে দেখা দিয়াছে। রোগটীর নাম—"গলষ্টোন" [Gallstone.] শাস্ত্রীয় নাম—'পিত্তশূল"। পূর্ব্বে এ রোগ কদাচ কাহারও হইত, এখন কিন্তু অনেককেই এ রোগে আক্রান্ত হইতে দেখিতেছি। গত বৎসর—আমি গলষ্টোন রোগাক্রান্ত ১৭টী রোগীর চিকিৎসা করিয়াছি। সুতরাং এ সম্বন্ধে আলোচনা—আমার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা নহে। কবিরাজ মহাশয়গণ—এই ভীষণ যন্ত্রণাপ্রদ রোগের পরিচয় বিলক্ষণই জানেন, কেননা তাঁহাদের শাস্ত্রে ইহার লক্ষণ ও চিকিৎসা বেশ নিপুণ ভাবেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাঁহাদের কাছে এ রোগের পরিচয় দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি কেবল নূতন শিক্ষার্থী ছাত্রদিগকে এতৎ সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—গলষ্টোনের বাঙ্গালা নাম "পিত্তশূল"। "পৈত্তিক শূল" পিত্ত প্রধান শূল। আর "পিত্ত, শূল ও পৈত্তিক শূল" এক নহে। "পিত্তশূল" পিত্তকোষের শূল। পাঠকগণ নামের এই পার্থক্যটুকু মনে রাখিবেন। আমার প্রিয়সুহৃদ্ আয়ুর্ব্বেদে অসাধারণ অভিজ্ঞ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায়—"বৈদ্যাঞ্জন" নামক একখানি চিকিৎসা গ্রন্থের অনুবাদে এ রোগের নাম লিখিয়াছেন, "পিত্তশিলা", নামটী খুব সঙ্গত। কেননা এ রোগে পিত্তকোষে শিলা অর্থাৎ পাথুরী জন্মে।

রোগটী এমন জটিল লক্ষণাক্রান্ত যে, প্রথমে ধরা বড় শক্ত। অনেক রোগের লক্ষণের সহিত ইহার ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং পদে পদে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা।

নিদান। এ রোগের নিদান অর্থাৎ আদি কারণ—

অতিশয় পরিশ্রম, অশ্বাদি যানে ভ্রমণ, অতি মৈথুন, রাত্রি জাগরণ, অপরিমিত শীতল

জল পান, রুক্ষ দ্রব্য ভক্ষণ, পূর্ব্বের আহার জীর্ণ না হইতে পুনর্ভোজন, পিষ্টকাদি এবং অধিক ঘৃত মসলাযুক্ত দ্রব্য আহার, চিন্তা, দিবানিদ্রা, আলস্য, ক্ষীর মৎস্যাদি সংযোগ বিরুদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ, মাদক সেবন, মাংসাশক্তি, অজীর্ণতা, মল মূত্রাদির বেগধারণ, শোক, উদ্বেগ, অতিহাস্য, অতি ভাষণ, ইত্যাদি কারণে শরীরে বায়ু কুপিত হয়, পিত্ত নিঃসরণের ব্যাঘাত জন্মে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের ইহাই অভিমত। এই কারণগুলি—আমাদের দেশে, আমাদের সমাজে, দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, তাই গলষ্টোনও ব্যাপক ভাবে দেখা দিতেছে।

পূর্ব্বরূপ। যকৃতের নিকটে [Right Hypo chon drium] অল্প অল্প ভার বোধ, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্ল-বিপাক, এবং শারীরিক দৌর্ব্বল্য—এইগুলি এ রোগের "পূর্ব্বরূপ" রূপে প্রকাশ পায়। পরে শূলের যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। এই যন্ত্রণা দেখা দিলেই আসল রোগ ধরা পড়ে।

ইহার সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ—মাঝে মাঝে যকৃতের নিকট অত্যন্ত বেদনানুভব। এই বেদনা নবম পঞ্জরাস্থির কার্টিলেজ হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ অস্থির লাইনে দক্ষিণ Scapuler প্রদেশে যায়, কখনও আরও উর্দ্ধে দক্ষিণ স্কন্ধের দিকে, কখনও বা বাম স্কন্ধের দিকে, আবার কখনও বা নিম্নদিকে নাভি দেশ পর্য্যন্ত—গমন করিয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে বমি হয়। ইহাতে পিত্ত নিঃসরণ নালীর গাত্র প্রসারিত (Relaxed) হওয়ায়, পাথুরী Duodenum এ চলিয়া আসে। পুনঃ পুনঃ যন্ত্রণার জন্য রোগী কাতর হইয়া পড়ে। এমন কি—হিমাঙ্গ (Collupse) হইয়া মারা যাইতে পারে।

প্রবল আক্রমণ। রোগের প্রবল আক্রমণে রোগী যন্ত্রণায় ছটফট করিতে থাকে তাহার আর্ত্তনাদে দর্শকের নেত্র সজল হইয়া উঠে। রোগী দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে থাকে, পীড়িত স্থান পুনঃ পুনঃ টিপিতে থাকে; তাহার শরীরে ম্যালেরিয়া রোগীর মত কম্পন উপস্থিত হয়। জ্বরও দেখা দেয়—জ্বরের উত্তাপ বিলাতী মাপ কাটিতে মাপিলে, ১০২।১০৩ কখনও ১০৪ পর্য্যন্ত উঠে। কাহারও কাহারও অতি ঘর্ম্মস্রাব হয়, পেট ফাঁপে, প্রস্রাব বন্ধ বা মূত্রকৃচ্ছ উপস্থিত হয়।

যদি পাথুরীর আকার অতি বৃহৎ হয়, এবং উহা বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইয়া, পিত্তকোষ ও অন্ত্রের গাত্র ক্ষত বিক্ষত করিয়া, একেবারে অন্ত্রের মধ্যে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে ভুক্তদ্রব্যের গমনাগমনের পথ পর্য্যন্ত রুদ্ধ হইয়া যায়। সেই সময় অন্ত্রাবরোধের লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পায়। খুব প্রবল ভাবে জ্বরও দেখা দেয়। এরূপ অবস্থায় রোগীর জীবন সংশয় হইয়া পড়ে।

উপসর্গ। পিত্তকোষে পাথুরী জন্মিলে তাহার উপসর্গরূপে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দেখা দেয়।

১। শূল বেদনা। ইহার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই শূলের ডাক্তারী নাম Gullstone Colic. পিত্ত কোষের চতুর্দ্দিকস্থ টিস্যুর সহিত সংযোগ হইলে এই যন্ত্রণা খুব বেশী হইয়া থাকে।

২। বমন। কখন কখন ক্রমাগত বমন হইতে থাকে, কখনও ১৫ মিনিট অন্তর, কখনও বা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর। বমনে ভুক্তদ্রব্য উঠিয়া যায়, তাহার সহিত পিত্ত মিশ্রিত থাকে।

৩। পাণ্ডুতা। ইহার ডাক্তারী নাম জণ্ডিস্। যখন যকৃতের পিত্ত নিঃসরণ প্রণালী (common cluch) রুদ্ধ হয়, তখনই ইহা প্রকাশ পায়। রোগীর দেহ পীতবর্ণ—রক্ত-শূন্য মনে হয়। কিন্তু crall bladder কিম্বা oyatic 'cluct বা পিত্ত কোষ প্রণালীতে পাথুরী থাকিলে—প্রায়ই জণ্ডিস্ হয় না।

৪। অম্ল বিপাক। বুক, পেট, গলা—অম্লে জ্বালা করে, ওষ্ঠ, মুখ অম্লাস্বাদ যুক্ত হয়।

৫। অরুচি। কোন জিনিষ খাইতে ভাল লাগে না। ৬। জ্বর। জ্বরের কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এই জ্বর—ঠিক্ urithral fever এর মত।

৭। বস্তি দেশের স্ফীততা। তলপেট ফাঁপা। ৮। কোষ্ঠ বদ্ধতা। ৯। মূত্রকৃচ্ছ্র অতি সরু ধারে মূত্র বাহির হয়, কখনও ফোঁটা ফোঁটা। মূত্রের বর্ণ কখনও জলের মত স্বচ্ছ, কখনও পীত, কখনও গোমেদ মণির মত, কখনও আবিল, কখনও রক্ত মিশ্রিত। মূত্রের গন্ধ —ছাগ গন্ধী।

১০। অবসাদ। ১১। তৃষ্ণা। ১২। মূর্চ্ছা। রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে, হস্ত পদাদির আক্ষেপ উপস্থিত হয়। ১৩। দাহ। ১৪। শিরোরোগ—মাথাধরা, মাথার রোগ। ১৫। শোথ। এ লক্ষণ—মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বেই দেখা দেয়।

১৬। অজীর্ণ। কেবল:মাত্র অজীর্ণতার জন্য—গলষ্টোন রোগ জন্মিতে পারে।

এমন অনেকগুলি রোগ আছে—যাহাদের সহিত গলষ্টোন রোগের অনেক বিষয়ের ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্যই গলষ্টোনের স্বরূপ নির্ণয় করিতে বড় বড় চিকিৎসককেও হারি মানিতে হয়। চলনশীল Right Kidney, Solid or cystic tumour of Kidney, ক্যানসার পাইলোরস্, ক্যানসার লিভার, দক্ষিণ সুপ্রারীণেল ক্যাপস্থুনের টিউমার ওসেণ্টামেয় অর্ব্বুদ, যকৃতের Hydatid, প্রভৃতি অনেকগুলি রোগে—গলষ্টোন বলিয়া ভ্রম হয়। আবার গলষ্টোনের যন্ত্রণা যেরূপ,—নিম্নলিখিত রোগগুলিতে ঠিক সেই ভাবের যন্ত্রণা হইতে পারে। যথা—Intestinal colic, Renal colic. পাকস্থলীর Pyloric endoy স্থূলতা ও বেদনা, Lead colic, duolenal ulcer. লিভারের congestion. —প্রভৃতি।

পরীক্ষা। পিত্তকোষের বিবৃদ্ধি ও তাহার ভিতর গলষ্টোন আছে কিনা? ইহা পরীক্ষা করিতে হইলে রোগীকে জানুর উপর হাতের ভর দিয়া সম্মুখ দিকে ঝাঁকিয়া বসিতে বলিবে। চিকিৎসক রোগীর পিছনে বসিবেন এবং নিজের হস্ত সমতল ভাবে রোগীর পেটের উপর পিত্তকোষের কাছে লম্বা করিয়া রাখিবেন, পরে রোগীকে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে বলিবেন। প্রতি প্রশ্বাসের সহিত রোগীর পেট কুঞ্চিত হইলে, চিকিৎসক নিজের হাতখানি রোগীর পেটের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া তাহা ঘুরাইয়া রৈখিক ভাবে (Hori Zontally) যকৃতের নিম্নতলে আনিবেন ইহার দ্বারা পিত্তকোষের বিবৃদ্ধি ও পাথুরীর অস্তিত্ব—অনেকটা বুঝিতে পারা যায়।

গলষ্টোন সম্বন্ধে চিকিৎসককে আর একটী বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। এ রোগ পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোকদেরই বেশী হয়। আবার যে সকল স্ত্রীলোকের ৩০ বৎসরের বেশী বয়স হইয়াছে, তাহারাই এ রোগে আক্রান্ত হই

থাকেন। যাঁহারা সন্তান প্রসব করিয়াছেন, তাহারা আবার অধিকতর আক্রান্ত হইয়া থাকেন। পুনঃ পুনঃ সন্তান প্রসব করায় ডায়াফ্রাম দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; যে সকল রমণী দিনরাত জামাজোড়া সেমিজ-সাঁয়া আঁটীয়া—জুজুবুড়ী সাজিয়া থাকেন, ডায়াফ্রামিক শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে তাঁহাদের অল্পই সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। কাজেই পিত্তকোষে পিণ্ড জমিয়া যায়—জোরের সহিত বাহির হইয়া অন্ত্রমধ্যে প্রবেশ করে না। এই পিণ্ডই প্রস্তরাকারে প্রকাশ পায়। এ রোগ বৃদ্ধাদের মধ্যে আরও বেশী। বঙ্গ রমণীর চেয়ে কর্সেট আঁটা বিবিদের পিত্তকোষে প্রায়ই পাথুরীর উৎপত্তি হইয়া থাকে।

চিকিৎসা। ডাক্তারী মতে—অস্ত্র চিকিৎসাই ইহার মুখ্য চিকিৎসা। কিন্তু অনেক সময়ই ইহা বিপজ্জনক। রোগীর বল না থাকিলে, বয়সটা বেশী হইলে,—তাহাকে ক্লোরফর্ম করা চলে না, অস্ত্রপ্রয়োগ করাও চলে না। বিশেষতঃ—যে স্থলে নিশ্চয় রূপে রোগ ধরা শক্ত, সে স্থলে অস্ত্র চিকিৎসা যুক্তি সঙ্গত হইতেই পারে না।

একবার একজন বড় ডাক্তারকে এজন্য অপ্রতিভ হইতে দেখিয়াছি! আমি তাঁহার সহায্যকারী ছিলাম। রোগিণী—বড় লোকের বাড়ীর বধূ, বয়স ৩৫।৩৬, সন্তানাদি হয় নাই। ২ বৎসর রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, রোগিণী বড় ডাক্তারটীর চিকিৎসাধীন হ'ন। তাঁহার গলষ্টোনের বেদনার মত বেদনা ধরিত, ঐ সময় কম্প উপস্থিত হইত, গা বমি বমি করিত, মাথা ঘুরিত, ফিট্ ও হইত। অস্ত্র প্রয়োগে গলষ্টোন বাহির করিতে গিয়া দেখা গেল—রোগ ঠিক্ ধরা যায় নাই। তাঁহার রোগ গলষ্টোন নহে,—Congestion of the ovary. আর একটী রোগিণীর গলষ্টোনের চিকিৎসা করিতে গিয়া পেট চিরিয়া দেখা গেল—ইরিটায়ে টিউমার হইয়াছে!

আরও ২।৩টী রোগী ও রোগিণীর গলষ্টোনের চিকিৎসা করিতে গিয়া শক্ত মলের চাপ, কাহারও ক্ষুদ্রান্ত্রের বায়ুপূর্ণতা, কাহারও বা Membrunous Enlcritis.—দেখা গিয়াছে!

ডাক্তারী মতে। সেডিয়ম গ্লাইকোকোলেট এবং মাঝে মাঝে অলিভ অয়েল প্রয়োগ করিলে গলষ্টোনের যন্ত্রণা কমিয়া যায়। ৫ গ্রেণ গ্লাইকোকোলেট অফ্ সোডা—কিঞ্চিৎ ম্যাগ্নেসিয়ার সহিত মিশাইয়া, প্রত্যহ ২।৩ বার সেব্য, আবশ্যক মত বিরেচক ঔষধের প্রয়োগ। কিন্তু এ ব্যবস্থায় আশানুরূপ ফল দেখি নাই। তবে একথা সত্য—ডাক্তারী মতে গ্লাইকোকোলেট, ও অলিভ অয়েল—গলষ্টোনের একমাত্র ফলপ্রদ ঔষধ। বিশেষতঃ গ্লাইকোকোলেট পিত্তনিঃসরণের বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে।

এ স্থলে গলষ্টোনের একটী অব্যর্থ ঔষধের উল্লেখ করিব। ঔষধটী—কবিরাজী ঔষধ। গলষ্টোনের এমন ঔষধ এ পর্য্যন্ত আমার আর দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এই ঔষধটীর আবিষ্কার সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে।—

কর্ম্মক্ষেত্র হইতে মাঝে মাঝে দেশের বাড়ীতে যাইতাম। সেখানে—একজন নগণ্য পাড়াগেঁয়ে হাতুড়িয়া—কবিরাজী চিকিৎসা করিতেন। দেশে গেলে তাঁহারই চণ্ডীমণ্ডপ আমার বসিবার আড্ডা হইত। এই ব্যক্তির কাছে—অনেক দরিদ্র এবং নীচ জাতীয় রোগী প্রায়ই চিকিৎসার জন্য আসিত। ইনি স্বয়ং

নাপিত জাতীয় ছিলেন। পল্লীগ্রামের নিম্ন-শ্রেণীর রোগী অধিকাংশেরই পেটজোড়া প্লীহা যকৃৎ, ঘুস ঘুসে জ্বর, পায়ে শোথ, পেটের পীড়া। আমাদের গ্রামের আসে পাশে প্রায় ১৫।২০ খানা গ্রামের লোকের বিশ্বাস ছিল—এই নাপিত-কবিরাজ প্লীহা-যকৃতের সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি।

আশ্চর্য্যের বিষয়—ইহার হাতে অনেকে আরোগ্যও হইত। প্রায়ই দেখিতাম—এই নরসুন্দরবর তাঁহার রোগীগণকে এক রকম ক্ষার পদার্থ সেবন করিতে দিতেন। অনেক অনুসন্ধানের পর—তাঁহারই এক পুত্রের মুখে শুনিলাম—ঐ ক্ষার—কুলেখাড়া নামক গাছ হইতে প্রস্তুত।

আমিও জানিতাম—কুলেখাড়া যকৃতের [illegible]। একদিন নাপিতটীর কাছে [illegible] প্রস্তুতের কৌশলটা শিখিয়া লইলাম। তাহার পর হইতে—স্বহস্তে ক্ষার প্রস্তুত করিয়া বিকৃত ও বিবৃদ্ধ যকৃৎ রোগীর উপর ইহা প্রয়োগ করিতে লাগিলাম। অল্প দিনের মধ্যেই আমি কুলেখাড়ার অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় পাইলাম।

কুলেখাড়া—মাঠে, জলা জমির ধারে, পুষ্করিণীর পাড়ে প্রচুর জন্মে। গাছ—লম্বা, পাতাও লম্বা, পাতার কোণে—তীক্ষ্ণ কাঁটা থাকে, ফুল নীল বর্ণের। চাষা ভুষা সবাই চিনে। এই কুলেখাড়ার গাছ—তুলিয়া আনিয়া ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুকাইতে হয়। পরে ঐ শুষ্ক গাছগুলিকে একটী মাটীর হাঁড়িতে পূরিয়া,—হাঁড়ির মুখে সরা ঢাকা এবং উভয়ের জোড়ের স্থানে কাদার প্রলেপ দিয়া,—উনানে বসাইয়া ১ ঘণ্টা জাল দিতে হয়। ইহাতে কুলেখাড়ার গাছ পুড়িয়া অঙ্গারে পরিণত হইলে, সেই অঙ্গার-গুলি ওজন করিয়া, ৮ গুণ জলে গুলিয়া, মোটা কাপড়ে ছাঁকিয়া (বৈদ্য মতে ২১ বার ছাঁকিলে ভাল হয়, আমি ৪।৫ বার মাত্র ছাঁকিয়া লই) সেই পরিশ্রুত জল লৌহ কটাহে রাখিয়া আবার জাল দিতে হয়। জল মরিয়া গেলে বেশ দানাদার একরকম ক্ষার পদার্থ কটাহের গাত্রে লাগিয়া থাকে। ইহাই কুলেখাড়ার ক্ষার। এই ক্ষার ৬ গ্রেণ হইতে ১২ গ্রেণ মাত্রায় প্রত্যহ ২ বার (আহারের পর) খাইলে, গলষ্টোনের যন্ত্রণা এবং পিত্ত-কোষের বিবৃদ্ধি নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। আমি বহুস্থলে এই ক্ষারের কার্য্যকারীশক্তি পরীক্ষা করিয়াছি। কাজটা একটু 'ভজকট' —কিন্তু যিনি ইহার গুণ বুঝিতে পারিবেন—তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে—অল্প ব্যয়ে একটী অমোঘ মহৌষধ পাইয়াছি।

কুলেখাড়ার ক্ষার সেবন করিলে, যকৃৎ-কোষে উত্তেজনা উপস্থিত হয়; তাহাতে ক্ষয় জনিত সঞ্চিত পদার্থ বহির্গত হইয়া যায়—কেননা এই ক্ষার উদরস্থ হইবামাত্র পিত্ত নিঃসরণ অধিক হইয়া থাকে। সুতরাং যকৃতে বিলিরুবিন সঞ্চিত থাকিতে পারে না। যে রোগীর দেহ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে, চক্ষু, মূত্র প্রভৃতি পীতবর্ণ ধারণ করিয়াছে, সে রোগী ১০।১৫ দিন এই ক্ষার ব্যবহার করিলে—তাহার দেহের ও ত্বকের বর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কুলেখাড়ার ক্ষার—গলষ্টোনের একটী মহৌষধ। কিছুদিন ইহা নিয়মিত ব্যবহার করিলে আর বেদনা ধরিবার ভয় থাকে না। এই ঔষধের কোন বিপক্রিয়া নাই। বরং ইহাতে স্বাভাবিক রূপে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া থাকে।

এই ক্ষার সেবনে প্রথম দুই একদিন কোন কোন রোগীর গা' বমি বমি করে, এ ভাব ৫।৬ দিন পরেই তিরোহিত হয়।

গলষ্টোনের যন্ত্রণায়, পিত্তকোষের বিবৃদ্ধিতে এবং ম্যালেরিয়া জ্বরে—যকৃতের ক্রিয়া ভাল না থাকায় রোগীর শরীরে পাণ্ডুতা দেখা দিলে ও বর্ণ মলিন হইলে, এই ক্ষার প্রয়োগ করিবে। যে কোনও রোগে—শরীরে পাণ্ডুতা দেখা দিলে—এ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহার অত্যাশ্চর্য্য শক্তিতে—কয়েক সপ্তাহের মধ্যে—গলষ্টোন বা পিত্তশিলা গলিয়া যায়। অস্ত্র প্রয়োগের আর আবশ্যক থাকে না।

যখন গলষ্টোন রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে, অথচ ইহার ফলপ্রদ কোন ঔষধই দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন—আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, চিকিৎসকগণ—ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

তবে—এই ঔষধ ব্যবহারের সময়—রোগীর পথ্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। রোগীকে এমন পথ্য দিবে—যেন তাহার যকৃত একটু বিশ্রাম করিবার অবকাশ পায়, অথচ শরীর পোষণের ব্যাঘাত না ঘটে। দৈনিক ৬ ড্রাম নাইট্রোজেন হইলেই দেহ রক্ষা হয়। পোষণ কার্য্যে প্রোটইড্ খাদ্য যথেষ্ট আবশ্যক বটে, কিন্তু উহার জন্য যকৃৎ এবং কিড্নীর কার্য্য অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। কার্ব্বোহাইড্রেট্ পরিপাক করিতে যকৃৎকে বেশী খাটিতে হয় না। মাংস, মাখন, উদ্ভিজ্জ তৈল, অধিক ব্যবহার করা উচিত নহে। উদ্ভিজ্জ পথ্যই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। তাহার সঙ্গে অল্প পরিমাণে ফলমূলও দেওয়া চলে। যথেষ্ট পরিমাণে জলপান—পিত্ত নিঃসরণের সাহায্য করে।

ডাঃ শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়
এল, এম্, এস,

গার্হস্থ্য মুষ্টিযোগ ও টোটকা।

—:*:—

বৃশ্চিক দংশনে।—(১) খানিকটা গাওয়া ঘি আগুনে গরম করিয়া একটু সৈন্ধব লবণ মিশাইয়া দিলে যন্ত্রণার উপশম হয়। (২) ছাগলের নাদি জলে গুলিয়া ঘসিয়া দিলে যন্ত্রণার উপশম হয়। (৩) রাঙা শাকের পাতা মুখে চিবাইয়া লাগাইলে যন্ত্রণার উপশম হয়।

বোলতা, মোমাছি ও ভীমরুলের কামড়ে।—সৈন্ধব লবণের গুঁড়া ঘসিলে যন্ত্রণার শান্তি হয়।

চুলকণায়।—(১) শ্বেত চন্দন ঘসিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ কর্পূর মিশাইয়া ২।৩ দিন মাখিলে চুলকণা আরোগ্য হয়। (২) চাল মুগরার ফল ও হরিদ্রা সমান ভাগে বাটিয়া গায়ে মাখিলে চুলকণা ভাল হয়।

দন্ত শূলে।—খদির ১ তোলা, চূর্ণ চারি আনা, তুঁতে চারি আনা, গুঁড়া করিয়া এক পোয়া জলে গুলিয়া গরম করিবে, পরে সেইজল দ্বারা কুলকুচা করিবে। ইহাতে সদ্যঃ দন্তশূল আরোগ্য হইবে।

মাকড়সার গরলে।—কুড়চির ছাল ১ মাষা, গোলমরিচ চারিটা—একত্র লইয়া বাসিজল দিয়া বাটিয়া ১ সপ্তাহ সেবন করিবে এবং কুড়চির ছাল—বাসি হুঁকার জল দিয়া বাটীয়া ১ সপ্তাহ গায়ে মাখিবে,—ইহাতে গরল ভাল হইবে।

পাঁকুইয়ের ঔষধ।—মেদিগাছের পাতা বাটীয়া প্রলেপ দিলে পাঁকুই আরোগ্য হয়।

খোস পাঁচড়ার ঔষধ।—বেগুণের পাতা ভস্ম করিয়া, তাহার অর্দ্ধেক পাথরের চূণ লইয়া, নারিকেলের তেলে মিশাইয়া, নিম পাতার জলে ক্ষতস্থান ধুইয়া ৩।৪ দিন লাগাইলে খোস পাঁচড়া আরোগ্য হয়।

কাণপাকায়।—সরিষার তৈল এক পোয়া, নিমপাতা, মিঠাবিষ, হিং ও সমুদ্র ফেণা প্রত্যেক ১।০, গোমূত্র /১ সের একত্র পাক করিয়া ছাঁকিয়া লাগাইলে কাণপাকা আরোগ্য হয়।

উপদংশে।—মোম ১ তোলা, নারিকেল তৈল অর্দ্ধ ছটাক—একত্রে আগুণে গলাইবে, শীতল হইলে মুদ্রাশঙ্খ ও কজ্জলী ১ তোলা হিসাবে মিশাইয়া দিবসে ২।৩ বার প্রলেপ দিলে উপদংশের ক্ষত আরোগ্য হয়।

শ্রীসুধাংশু ভূষণ সেন গুপ্ত কবিরত্ন।

বনৌষধি।

অদ্য আমরা দুইটি বনৌষধির কথা বলিব। গুলঞ্চ ও নিম। প্রথমে গুলঞ্চের কথা বলি।

গুলঞ্চ (গুড়ূচী)—গুলঞ্চ সর্ব্বত্রই সহজ প্রাপ্য, পল্লীগ্রামে ইহা প্রচুর দৃষ্ট হইয়া থাকে। গুড়ূচী দ্বিবিধ, সাধারণ গুড়ূচী ও পদ্ম গুড়ূচী। নিম্ববৃক্ষ আশ্রয় করিয়া যে গুড়ূচীর উৎপন্ন হইয়া থাকে, ঔষধার্থে উহাই শ্রেষ্ঠ। কোন প্রকার অম্লবৃক্ষ যথা তেঁতুল, আম্র প্রভৃতি বৃক্ষাশ্রিত গুড়ূচী ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় না। নিম্ব বৃক্ষাশ্রিত গুড়ূচীর অভাবে অম্ল বৃক্ষ ব্যতীত অন্যান্য বৃক্ষাশ্রিত গুড়ূচীও ব্যবহৃত হয়।

পদ্ম গুড়ূচীর গাত্রে অতি অল্প উন্নত কণ্টক উদ্ভূত হইয়া থাকে। উভয়বিধ গুড়ূচীই ঔষধার্থে ব্যবহারযোগ্য।

গুড়ূচী অধিকাংশ স্থলে কাথ্য দ্রব্যে ব্যবহৃত হয়। গুড়ূচী হইতে এক প্রকার সার বহির্গত করা যায়, তাহাকে গুড়ূচীর চিনী বা "পালো বলে। উহা চা খড়ির ন্যায় শ্বেতবর্ণ চূর্ণ, তাহাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গুড়ূচীর পালো প্রস্তুতের প্রণালী উল্লেখ করা যাইতেছে। কাঁচা গুড়ূচীলতার উপরিস্থিত পাতলা খোসা ছাড়াইয়া লইবে, তৎপর উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া হামানদিস্তা বা

ঢেঁকীতে কুট্টিত করিয়া একটী মৃত্তিকা পাত্রে (হাড়ী বা গামলায়) জল পূর্ণ করিয়া তাহাতে কুট্টিত গুড়ূচী ভিজাইয়া এক দিবস রাখিয়া দিবে। পর দিবস উক্ত গুড়ূচী গুলি উত্তম রূপে জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া সিটী গুলি পরিত্যাগ করিয়া পাত্রস্থ জল স্থিরভাবে রাখিয়া দিবে। ঐ জলের নিম্নে যে পদার্থ দৃষ্ট হইবে তাহাই গুড়ূচীর পালো। কিন্তু উহা পরিস্কৃত করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ জল দ্বারা ধৌত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ চূর্ণ করিয়া লইলে তবে ঔষধার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গুড়ূচীর পালো পিত্ত প্রশমক। রক্তপিত্ত রোগে মধুর সহিত সেবন করিলে সুফল ফলিয়া থাকে। গুড়ূচীর স্বরস, কল্ক, কাথ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

রসায়নে গুড়ূচী।—যাঁহারা রসায়ন কামী, তাঁহারা প্রত্যহ প্রাতে গুড়ূচীর স্বরস ১ তোলা পরিমাণে সেবন করিবেন।

বিষম জ্বরে গুড়ূচী।—বিষমজ্বরে বা ম্যালেরিয়া জ্বরে গুড়ূচী একটী প্রধান ঔষধ। যাঁহারা নিত্য ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়া কঙ্কালসার হইতেছেন, তাঁহারা প্রত্যহ প্রাতে গুড়ূচীর কাথ পান করিলে ম্যালেরিয়ার কবল হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন। ইহা কুইনাইনের তুল্য ফলদায়ক।

কামলায়।—(ন্যাবা) গুড়ূচী। কামলা রোগ (যাহাকে ন্যাবা বলিয়াও কথিত হইয়া থাকে) প্রত্যহ প্রাতে গুড়ূচীর শীত কষায় মধু সহযোগে পান করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

বাতরক্তে গুড়ূচী।—গুড়ূচীর রস দুগ্ধ সহ তৈল পাকের বিধানানুসারে তিল তৈলে পাক করিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিলে বাত রক্তের উপশম হয়। পিত্তপ্রধান বাতরক্তে গুড়ূচীর কাথ পান করিলে বিশেষ ফল দৃষ্ট হইয়া থাকে।

স্তন্য দুগ্ধ শোধনে গুড়ূচী।—প্রসূতির স্তন্য দুগ্ধ বিকৃতি প্রাপ্ত হইলে ঐ স্তন্য পানে স্তন্যপায়ী সন্তান রোগগ্রস্ত হয়। এরূপ অবস্থায় প্রসূতিকে সপ্তাহকাল গুড়ূচী ও ছাতিম ছালের কাথে কিঞ্চিৎ শুঁঠ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া ঐ কাথ পান করাইলে স্তন্য দুগ্ধ বিশোধিত হইয়া থাকে।

বাত জ্বরে গুড়ূচী।—গুড়ূচীর কাথ সেবনে বায়ু প্রধান জ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে।

প্রমেহ রোগে গুড়ূচী। পিত্ত প্রধান মেহ রোগী গুড়ূচীর কাথ শীতল করিয়া কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে পিত্ত প্রধান মেহ নিরাময় হয়।

আমবাতে গুড়ূচী।—আমবাতগ্রস্ত রোগী গুড়ূচী পেষণ করিয়া (১ তোলা) কিঞ্চিৎ শুণ্ঠী চূর্ণ সহ সেবন করিলে উপকার প্রাপ্ত হইবেন।

শ্লীপদে (গোদে) গুড়ূচী।—তিল তৈল বা সর্ষপ তৈল সহযোগে গুড়ূচীর কাথ পান করিলে গোদ প্রশমিত হয়!

কুষ্ঠে গুড়ূচী।—গুড়ূচীর স্বরস প্রত্যহ প্রাতে পান করিয়া, কিঞ্চিৎ পরে গব্য ঘৃত অথবা মুগের যূষের সহিত অন্ন ভোজন করিলে গলিত কুষ্ঠ আরোগ্য হয়।

হৃদ্‌রোগে গুড়ূচী।—হৃদয়স্থিত বায়ুতে বুক "ধড়ফড়" করিলে গুড়ূচী পেষণ করিয়া কিঞ্চিৎ মরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া গরম জলের সহিত পান করিলে, উহা উপশমিত হইয়াথাকে।

ক্রিমিরোগে গুড়ূচী।—ক্রিমিরোগে গুড়ূচীর ক্বাথ কিঞ্চিৎ মধুসহযোগে পান করিলে ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ ক্রিমি বিনষ্ট হয়। ডাক্তারি মতে যে স্থলে কলম্বা ব্যবহৃত হয়, আয়ুর্ব্বেদ মতে তৎস্থলে গুড়ূচীর ব্যবহার হইয়া থাকে। গুড়ূচী শোণিত শোষক, পিত্ত প্রশমক, বয়ঃসংস্থাপক। শীতজ্বর, শুক্রক্ষয় কৃত দুর্ব্বলতা, মূত্রকৃচ্ছ্রে গুড়ূচী বিশেষ উপকারী।

মেহ বা গণোরিয়ায় গুড়ূচী।—পাষাণ ভেদীর (পাথর কুচির) রস ও গুড়ূচীর রস সমাংশে মিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া প্রাতে পান করিলে সপূয মেহ বা গণোরিয়া প্রশমিত হয়। ইহা মূত্রকৃচ্ছ্রেও বিশেষ ফলদায়ক।

গুড়ূচী বলকারক, জ্বরনিবারক এবং মূত্র সরলকর, ইহা বিশেষ রূপে পরীক্ষিত হইয়াছে।

নিম্ব।

নিম্ব বৃক্ষ তিন প্রকার। নিম্ব, মহানিম্ব কৈডর্য্য। মহানিম্বকে ঘোড়ানিম্বও বলিয়া থাকে। আমরা এই প্রবন্ধে আপাততঃ নিম্বের গুণ বর্ণনা করিব। ত্রিবিধ নিম্বের আকৃতি পার্থক্য রহিয়াছে।

কুষ্ঠে নিম্ব।—কুষ্টগ্রস্ত রোগীর নিম্ব মহৌষধ। নিম্ব তরুতলে বাস, নিম্বপত্রে ব্যজন, নিম্বপত্র ভক্ষণ - কুষ্টের ক্ষত স্থানে নিম্ব পত্রের প্রলেপ বিশেষ উপকারী। কুষ্ঠ রোগীর স্নান ও পানারজল নিম্ব পত্র দ্বারা সংস্কৃত করিয়া ব্যবহার করিবে। যে কুষ্ঠরোগীর ক্ষতে পোকা জন্মিয়াছে, তাহাকে নিম্বপত্র দ্বারা জল উত্তপ্ত করিয়া ক্ষত ধৌত করাইবে। শয়নকালে কাঁচা নিম্ব পত্র শয্যায় বিছাইয়া তদুপরি শয়ন করাইবে। কুষ্ঠরোগীর বাসগৃহের চতুর্দ্দিকে নিম্ব বৃক্ষ থাকিলে—উহার শীতল বায়ুতে রোগের উপশম হইয়া থাকে। কুষ্ঠরোগীর পক্ষে নিম্ব তৈল মহোপকারী।

পদ্মিণী কণ্টক রোগে নিম্ব।—ইহা এক প্রকার চর্ম্মরোগ বিশেষ। গাত্রে স্থানে স্থানে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণ্টকবৎ খস্‌খসে দাগ দৃষ্ট হয়। ঐ রোগে নিমছাল ১ তোলা, সোণালু পত্র ১ তোলা, জল অৰ্দ্ধসের, শেষ এক ছটাক দ্বারা প্রত্যহ ঐ স্থান ধৌত করিবে।

বাতরক্ত রোগে নিম্ব।—নিম্বপত্র ও তিক্তপটোল লতা—পূর্ব্বোক্ত ক্বাথ প্রস্তুতের নিয়মানুসারে প্রস্তুত করিয়া, কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে।

সুরামেহ রোগে।—নিম্বছালের ক্বাথ বিশেষ উপকারী।

দাহ জ্বরে নিম্ব।—জ্বরের প্রদাহ হইলে নিম্বছালের ক্বাথ পান করাইবে। নিম্বপত্র দ্বারা ব্যজন ও নিম্বপত্র শয্যা বিছাইয়া তদুপরি শয়ন করিবে।

কফজ তৃষ্ণায় নিম্ব।—কফপ্রধান জ্বরে তৃষ্ণাধিক্য হইলে নিম্ব ফুলের উষ্ণ ক্বাথ পান করাইবে। ইহাতে বমন হইয়া তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইবে।

ব্রণক্ষতে নিম্ব।—নিম্বপত্র দ্বারা জল সিদ্ধ করিয়া ক্ষত ধৌত করিলে ক্ষত স্থান পরিষ্কৃত হয়। নিম্বপত্র গব্য ঘৃতে ভাজিয়া শিলায় পেষন করিয়া মলম প্রস্তুত করিবে, ঐ মলম যে কোন প্রকারের ক্ষত হউক তাহাতে প্রয়োগ করিলে অত্যল্প কাল মধ্যে ক্ষত পূরণ ও শুষ্ক হইয়া থাকে।

বিষনাশনে নিম্ব।—কোন প্রকার স্থাবর বিষাক্রান্ত হইলে নিম্ব ক্বাথ [illegible]

করিয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে তৎক্ষণাৎ বমনের দ্বারা বিষদোষ নষ্ট হইয়া থাকে।

কেশের অকালপক্কতায় নিম্ব। ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক মাত্র দুগ্ধান্নভোজী হইয়া এক মাস কাল নিম্ব তৈল কেশে মর্দ্দন ও নিম্ব তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে কেশের অকালপক্কতা দূর হয়। খালিত্য (টাক) রোগেও নিম্ব তৈল বিশেষ উপকারী।

শীতপিত্ত, বিস্ফোটক, কোঠ, কণ্ডু, ক্ষতরোগে নিম্ব।—শরীরে নানা স্থানে চুলকাইয়া অত্যল্প সময় মধ্যে যে চক্রবৎ লালবর্ণ দাগ ও সে স্থান স্ফীত হইয়া উঠে ও সময়ান্তরে উহার কিছুই থাকে না, —তাহাকে শীতপিত্ত বলে। ঐ রোগে এবং বিস্ফোটকাদি উল্লিখিত রোগ সমূহে শুষ্ক নিম্বপত্রচূর্ণ গব্যঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া, অথবা কাঁচা নিম্ব পত্র ও শুষ্ক আমলকী সমাংশে জলের দ্বারা পেষণ করিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিলে উল্লিখিত ব্যাধি নিরাময় হইয়া থাকে, ইহা পিত্তাধিক্যের পক্ষে মহোপকারী।

কামলা রোগে নিম্ব।—নিমছালের বা নিম্বপত্রের রস ২।৪ ফোঁটা মধু সহযোগে প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে কামলা রোগ নিরাময় হয়।

হৃদ্‌রোগে নিম্ব।—কফজ হৃদ্‌রোগে বচ ও নিম্ব ছালের ক্বাথ পান করিলে বমন দ্বারা হৃদ্‌রোগ উপশমিত হইয়া থাকে।

নেত্ররোগে নিম্ব।—নিম্বপত্র ও কিঞ্চিৎ শুঁঠ, (আদা শুষ্ক) সামান্য জলের সহিত পেষণ করিবে, তৎপর উহাতে কিঞ্চিৎ সৈন্ধব চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ঈষদুষ্ণ করতঃ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চক্ষের উপর ও নিম্ন পাতায় প্রলেপ দিবে, (সতর্ক থাকিতে হইবে যেন চক্ষুর ভিতর ঔষধ প্রবেশ না করে, অসাবধানতাবশতঃ কিঞ্চিৎ প্রবিষ্ট হইলেও কোন ক্ষতির কারণ নাই) দিবসে ২।৩ বার এইরূপ প্রলেপ দিলে চক্ষুর কণ্ডু (চুলকান) স্ফীতি ও বেদনা নিবারিত হয়। কাঁচা নিম্ব পত্রের রস কিঞ্চিৎ কাঁচা হরিদ্রার রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া চক্ষুর অভ্যন্তরে ৩।৪ ফোঁটা প্রদান করিলে, চক্ষুর পিচুটী নষ্ট হয়, এবং চক্ষুর দীপ্তি উজ্জ্বল হয়।

শিশুর জ্বরে নিম্ব।—মধু ও গব্য ঘৃতের সহিত কাঁচা নিম্বপত্র নির্ধূম অগ্নিতে (কাঠকয়লায়) দগ্ধ করিয়া ঐ ধূম শিশুর গাত্রে লাগাইলে জ্বর নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

ক্রিমিরোগে নিম্ব।—ক্রিমিরোগে, প্রত্যহ প্রাতে নিম্বপত্র রস ২।৩ ফোঁটা মধু সহ যোগে সেবন করাইলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

রক্তপিত্তে নিম্ব।—রক্তপিত্ত রোগী নিম্বপত্রের ঝোল সেবন করিবে।

শ্রীহরিপ্রসন্ন রায়, কবিরত্ন।

আয়ুর্ব্বেদ সভায় পঠিত প্রবন্ধ সম্বন্ধে একখানি পত্র।

আয়ুর্ব্বেদ সভা'য় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা" ও আয়ুর্ব্বেদে—খণ্ডপ্রলয়"—শীর্ষক যে প্রবন্ধ দুইটী পঠিত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে বাঙ্গালা সাহিত্যে সুপরিচিত, প্রথিতনামা লেখক

শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ প্রবন্ধ দুইটীর লেখককে যে পত্র প্রেরণ করিয়া ছিলেন, তাহা পাঠকগণের অবগতির জন্য এইস্থলে উদ্ধৃত হইল। চণ্ডীবাবু আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ী না হউন, কিন্তু তিনি যে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতি কল্পে পত্র খানি লিখিয়াছেন, সে জন্য তাঁহাকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

চণ্ডীবাবুর লিখিত বিষয় এই—"আয়ুর্ব্বেদ" পত্রিকায় তোমার দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলাম। তুমি একজন আয়ুর্ব্বেদ-ব্যবসায়ী হইয়াও আয়ুর্ব্বেদের ত্রুটি বিষয়ে যে ভাবে আলোচনা করিয়াছ, তাহাতে তোমার উদার মতের সমর্থন না করিয়া থাকা যায়না এবং সাধারণের বিশেষতঃ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের নিকট তুমি যথার্থই ধন্যবাদের পাত্র একথা অস্বীকার করা যায়না। আমি যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, তোমার উদ্দেশ্য প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদকে বর্ত্তমান কালোপযোগী করিয়া প্রচার করা; অবশ্য তাহা পুরাতনকে পরিত্যাগ করিয়া নহে, বরং পুরাতনের পুনরুদ্ধার ও পুনঃ প্রচলন দ্বারা। কেননা আমাদের পুরাতনই বিদেশীয়দিগের নূতনের ভিত্তি। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের পুরাতনের স্মৃতি ব্যতীত অন্য চিহ্ন কিছুই নাই। চিরকাল সেই গৌরব-স্মৃতি বুকে করিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিলে জগতের সম্মুখে গৌরব লাভ তো হইবেই না, অধিকন্তু হাস্যাস্পদ হইতে হইবেই। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকবৃন্দের পশ্চাতে সময় সময় ধিক্কারের যে করতালি প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহা কি অযৌক্তিক? আমার তো বোধ হয় না।

"কেবল কায়চিকিৎসার জন্যও কায়তত্ত্বজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন, ইহাই তো আমার বিশ্বাস। তুমিও সেই কথাই বলিয়াছ, তবে তোমার প্রবন্ধের বিরুদ্ধ-সমালোচনা কেন হইয়াছে, তাহা তো বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের আর্য্য আয়ুর্ব্বেদকে জগত সমক্ষে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রকারেই তাহাকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিতে হইবে। কেবল মুখের কথায় লোক ভুলিবেনা, কাজে দেখাইতে হইবে। পূর্ব্বে যে সকল ব্যাধিতে লোকে মৃত্যুমুখে পতিত হইত, আজকাল অস্ত্রোপচার দ্বারা সেই সকল ব্যাধি কেন সত্বর ও সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হইতেছে? এ সকল বিষয় নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়াও কি পুরাতনের বাঁধা বুলি আওড়াইয়া লোক ভুলাইবার চেষ্টা করিতে হইবে এবং "মড়াকাটা" চিকিৎসকগণের নিন্দা করিয়া ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে হইবে?

"আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অবনতি মুসলমান রাজাদিগের যত্নে ও কাল মাহাত্ম্যে যাহা হইবার তাহা তো হইয়াছেই, তদ্ব্যতীত স্বার্থপর ব্যবসায়ীদিগের কার্য্যদোষেও ইহার যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। যখন দেশে ম্যালেরিয়া—মহামারীরূপে প্রবেশ লাভ করিল এবং নিত্য শত সহস্র লোককে শমন সদনে প্রেরণ করিয়া, জনপূর্ণ গ্রামগুলিকে শ্মশানে পরিণত করিতে উদ্যত হইল, তখন কবিরাজ মহাশয়গণ চিকিৎসায় সাফল্য লাভ দূরের কথা, কেবল চুপ করিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং এরূপ মহামারী দৈবের পীড়ন বলিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য অর্থাৎ চিকিৎসকের কর্ত্তব্য এইখানেই পরিসমাপ্ত হইল। কিন্তু তখন এই নিদারুণ ব্যাধির সম্মুখে "কুইনাইন" লইয়া পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রাভিজ্ঞ ডাক্তারগণ দণ্ডায়মান হইলেন এবং এই কালব্যাধির গতিরো

করিতেও কৃতকার্য্য হইলেন। দেশের সাধারণ লোক কবিরাজগণকে ফেলিয়া ডাক্তারগণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আমার বোধ হয়, এই সময় হইতেই দেশীয় আয়ুর্ব্বেদ দূরে পড়িয়া রহিল; উচ্চস্থান ও সম্মানজনক আসন অধিকার করিল—বিদেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্র ও তদনুবর্ত্তী ডাক্তারগণ। তখন,—বলিতে লজ্জাও করে—দুঃখও হয়—কিন্তু এটা খুব সত্য কথা.—আয়ুর্ব্বেদ বিশারদগণ বিদেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের ও সেই শাস্ত্রব্যবসায়ী ডাক্তারগণের এবং ম্যালেরিয়ানাশককুইনাইনের কুৎসা রটনা করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে লাগিলেন! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কুইনাইনের ম্যালেরিয়া দমনের অদ্ভুত শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া আপনারাও কুইনাইনের বটিকা—নাম পরিবর্ত্তন করিয়া বিক্রয় করিতে লাগিলেন! ইহাতে তাঁহাদের অর্থাগম হইতে লাগিল বটে, কিন্তু ফল কি হইল? পাশ্চাত্য চিকিৎসা প্রণালী এদেশে প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিল, কুইনাইন কবিরাজী ব্যবসায়ের অন্তরায় হইয়া উঠিল। বাস্তবিক প্রকৃত কথা বলিতে গেলে বলা যায় যে, এই সমস্ত হিংসাপরায়ণ স্বার্থ সর্ব্বস্ব কবিরাজকুলের কল্যাণেই হিন্দুর গৌরবের আয়ুর্ব্বেদ,—জগতের আদি চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ—অজ্ঞতার গাঢ় অন্ধকারে গা' ঢাকা দিল। তাহাকে বাহির করিয়া বিশ্বের বাজারে প্রচার করিবার জন্য কেহ যত্নও করিলেন না।

"তুমি আয়ুর্ব্বেদের ত্রুটি পরিলক্ষিত করিয়া এই সমস্ত কবিরাজগণকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য লেখনী চালনা করায় উঁহারা তোমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তোতাপাখীর মত শিক্ষকের বুলির আবৃত্তি করিয়া আপনাকে ধন্যজ্ঞান করিতেছেন, তাঁহারা যত বড় বিজ্ঞ বিচক্ষণই হউন, নিজের শিরে নিজে অস্ত্রাঘাত করিতেছেন বলিয়াই বোধ হয়। এইরূপ লোক যখন পাশ্চাত্য চিকিৎসাপ্রণালীর, পাশ্চাত্য চিকিৎসকবৃন্দের নিন্দা করিতে থাকেন, তখন বাস্তবিকই হাস্য সংবরণ করা কঠিন হইয়া উঠে! কেননা যিনি যে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তিনি সেই বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিয়া পাণ্ডিত্য প্রচার করিবার অধিকারী নহেন। তাঁহাদিগের এই অনধিকার চর্চ্চাই তাঁহাদিগের স্বরূপ প্রকট করিয়া থাকে।

এখনকারদিনে আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি করিতে হইলে, তাহার একাঙ্গ লইয়া আন্দোলন করিলে চলিবে কেন? অষ্টাঙ্গেরই আন্দোলন চাই। যদি সক্ষম হও তবে আয়ুর্ব্বেদ লইয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হও, নচেৎ ও ব্যবসায়—পরিত্যাগ কর। অষ্টাঙ্গের একাঙ্গ, (তাহারও বোধ হয় সম্পূর্ণ নহে) অধ্যয়ন করিয়া অষ্টাঙ্গের পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইবার আকাঙ্খা কেন? ইহারইনাম "ভাবের ঘরে চুরি!" বিশেষতঃ কায়চিকিৎসা বলিতে গেলেই ত শল্যাদি অন্যান্য অঙ্গ তাহারই অন্তর্ভুত হইয়া পড়ে। শল্য শালক্যাদিতে পারদর্শী না হইলে কিরূপে কায়চিকিৎসায় দক্ষ হওয়া যাইবে? সুতরাং অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা না করিলে তাঁহাকে প্রকৃত পক্ষে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক বলিব কেন?

"যে কুইনাইনের নিন্দায় কবিরাজ মহাশয়গণ চতুর্ম্মুখ, সেই কুইনাইন জিনিসটা কি? উহা কি আয়ুর্ব্বেদবহির্ভূত কোন পদার্থ? আমার তো বোধ হয় না। গুলঞ্চের পালো, নাটার বীজ যে শ্রেণীর ঔষধ, কুইনাইনও তাহাই, উহা তো বৃক্ষ বিশেষের পালো মাত্র! তবে নামটা

বিদেশী বটে! এই কি তার অপরাধ! অতি মাত্রায় কুইনাইন দ্বারা কুফল ফলিতে পারে বলিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সুফল ফলিবেনা কেন? কবিরাজগণের সেঁকো অতি মাত্রায় কুফল প্রদান করে বলিয়া, তাঁহারা কি উপযুক্ত মাত্রায় তাহার ব্যবহার করা পরিত্যাগ করিয়াছেন? তবে কেবল কুইনাইনকেই এত ঘৃণার চক্ষে দেখা কেন? এ কেবল অজ্ঞের কাছে প্রতিপত্তি লাভের প্রয়াস মাত্র।

"আর একটা সত্য কথা অনেকের অপ্রিয় হইলেও তোমাকে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না; কারণ তুমি আজ প্রকৃতপক্ষে গোঁড়ামি পরিত্যাগ করিয়া সত্যের আলোচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছ। আমার বিশ্বাস, আয়ুর্ব্বেদের অবনতির আরও একটা খুব গুরুতর কারণ আছে। পূর্ব্বে বিজ্ঞ ও বহুজ্ঞ ধন্বন্তরিকল্প চিকিৎসকগণ নিজ নিজ বাস ভূমিতে চিকিৎসাব্যবসায় অবলম্বন করিয়া রাজা মহারাজা হইতে নিতান্ত দীনহীন ভিক্ষুকেরও চিকিৎসা করিতেন এবং এইরূপ দরিদ্রের উপকার করাতেই জীবনের সার্থকতা জ্ঞান করিতেন। বহু লোকের জন্য বহু ব্যয় করিয়া যে সমস্ত মূল্যবান ঔষধ প্রস্তুত হইত, কবিরাজ মহাশয়ের কৃপায় দীনদরিদ্র জনসাধারণে সেই সকল মূল্যবান ঔষধের দ্বারা উপকৃত হইত। তখন তাঁহারা গরীবের জন্য তিন পয়সার ঔষধের মূল্য তিন টাকা ধার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হইতেন এবং এরূপ করাকে অধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিতেন। গরীবের জন্য তাঁহাদিগের ঔষধ বিতরণের কথা মনে হইলে মনে হয় যে, তখনকার এক এক জন "কবিরাজ বাড়ী"ই ছিল আজকালকার "দাতব্য চিকিৎসালয়!" আধুনিক প্রত্যেক কবিরাজ মহাশয় যদি তাঁহাদিগের পিতামহ-প্রপিতামহ প্রভৃতির কীর্ত্তিকাহিনী মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করেন, তাহা হইলে আমাকে আর এজন্য পৃথক প্রমাণ উপস্থিত করিতে হইবে না। কিন্তু এখন কি আর তেমনটি আছে? বিলাস বিহীন ধর্ম্মপরায়ণ যে সকল কবিরাজ মোটা ভাত মোটা কাপড়ে সন্তুষ্ট থাকিয়া পিতৃপিতামহের বাসভূমিতে সন্ধ্যা দিতেন এবং প্রতিবাসী দীন দরিদ্রের জীবনদানে অনন্ত পুণ্য অর্জ্জন করিতেন, এখন তাঁহাদেরই বংশধরগণ মুখে পাশ্চাত্যচিকিৎসাপ্রণালীর অখ্যাতি রটনায় অভ্যস্ত হইয়াও পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে মুগ্ধ হইয়া, বিলাসের স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া, জন্মভূমি পল্লীর মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক নানারূপে কৃতার্থ হইতেছেন। তাঁহার বাল্য সহচরের পরিবারবর্গ ম্যালেরিয়ায় কষ্ট পাইতেছে,—নিত্য নানাবিধ রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে,—যমের সহোদর পাড়াগেঁয়ে হাতুড়ে-ডাক্তার কবিরাজের উপর নির্ভর করিয়া অদৃষ্টবাদী পল্লীবাসী তিল তিল করিয়া মৃত্যু-পথে অগ্রসর হইতেছে, আর তিনি নগরমাঝে সুদীর্ঘ সাইনবোর্ড টাঙ্গাইয়া,—মোটর জুড়ি হাঁকাইয়া—প্রভূত অর্থোপার্জ্জনে নিজেকে কৃতার্থমনা অনুভব করিতেছেন! তাঁহারই দীন প্রতিবাসী যে অসময়ে এক বিন্দু ঔষধের অভাবে শমন সদনে গমণ করিতেছে, ইহা তাঁহার চিন্তারও অবসর নাই, কিন্তু তিনি ব্যবসায়ের খাতিরে—অর্থের উদ্দেশ্যে আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি জন্য খেয়াল দেখিতেছেন! বলিতে বুক ফাটিয়া যায়—আধুনিক কবিরাজগণ অর্থের লোভে পল্লী ছাড়িয়াছেন, দেশ ভুলিয়াছেন, আত্মীয় স্বজনের মায়া বিসর্জ্জন দিয়াছেন, বিলাসে ডুবিয়াছেন; কিন্তু যাঁহারা তাঁহাদের

পরিত্যক্ত পল্লীবাসীর রোগের সময় ঔষধ দিয়া চিকিৎসাকার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, দেশরক্ষায় নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা মড়াকাটা ডাক্তার বলিয়া নিন্দিত হইতেছেন! বিজ্ঞতার বাহাদুরী লইয়া মরিতে ইচ্ছা হয়। দেশেরলোক আজ-কাল কবিরাজমহাশয়দের 'সর্ব্বজ্বরহরলোহ যে কি পদার্থ তাহা জানেনা, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের এক পয়সার চারি গ্রেন কুইনাইনের ট্যাবলেট খুব চিনিয়াছে। কবিরাজ মহাশয়গণ কুইনাইনের যতই নিন্দা করুন, লোকে তাঁহাদের কথা শুনিবে কেন? তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে, এদেশেরই চিরপ্রবাদ "কেবল কথায় চিঁড়ে ভেজে না।"

"দুঃখের সহিত আরও একটী কথা বলিতে হয়,—আজকালকার কবিরাজ মহাশয়গণ পল্লী-গ্রামের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করায় আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎ-সার পাচন প্রভৃতিতে ব্যবহার্য্য বৃক্ষাদির পুঁথি গত পরিচয় তাঁহারা অবগত থাকিলেও, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গাছগাছড়ার সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় আছে বলিয়া বোধ হয় না। "অনন্তমূলের" সহিত "সূক্ষ্মফলা"র পার্থক্য নির্ণয় করা বোধ হয় অনেকেরই সাধ্যাতীত।

"আমার কথাগুলা অপ্রিয়; কিন্তু সত্য। হয় তো কিছু রূঢ়ও হইয়া থাকিবে। কি করিব ভাই, তোমার প্রকৃত কথার প্রতিধ্বনি স্বরূপেই এই অপ্রিয় কথার অবতারণা করিতে হইল।"

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সর্ব্বনেশে ক্রিমি বা হুকপোকার প্রতিকার।

—:*:—

(বঙ্গেশ্বর লর্ড রোণাল্ডশের বক্তৃতা)

সর্ব্বনেশে ক্রিমি বা হুকপোকার প্রতিকার কল্পে গত ২৮শে নভেম্বর সায়ংকালে কলিকাতা লাটপ্রাসাদে সেনেটারি বোর্ডের এক বিশেষ সভা বসিয়াছিল। সভার উদ্বোধনে বঙ্গেশ্বর লর্ড রোণাল্ডশে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম্ম আমরা নিম্নে তুলিয়া দিতেছি।

হুকপোকায় রোগী এদেশে বিস্তর। সাধারণে উহার প্রকৃতি অবগত নহে, এমন কি, অনেকে এই রোগোৎপাদক কীটের নামই অবগত নহে, সেইজন্য এই বিষয়টি সাধারণকে জানাইয়া দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য।

হুকপোকা একরূপ পরগাছা, উহার দৈর্ঘ্য প্রায় আধ ইঞ্চি। মানুষের অন্ত্রের মধ্যে উহাদের বাস। অজীর্ণ এবং রক্তহীনতা—এই দুইটি রোগ ইহারা উৎপাদন করিয়া থাকে। এই পীড়ায় আক্রান্ত হইলে লোকের কাজকর্ম্মে উৎসাহ থাকেনা এবং অলস হইতে হয়।

মানুষের অন্ত্রে অবস্থান কালে হুকপোকা বহুসংখ্যক ডিম্ব প্রসব করে, ঐ ডিম্ব সকল মলের সহিত শরীর হইতে বাহির হইয়া আসে এবং উত্তাপ ও আর্দ্রতা সহযোগে উহারা অতি

বিবিধ প্রসঙ্গ।

—:০:—

ধূমপান নিবারণ আইন।—সংপ্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদিগের জন্য ধূমপান নিবারণ আইন পাশ হইয়া গিয়াছে। ১৬ বৎসরের কম বয়সের কোনো বালক ধূমপান করিতেছে দেখিলেই এই আইনের বলে পুলিশ বা ক্ষমতা প্রাপ্ত স্কুলের শিক্ষক ও জনহিতৈষী প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারীরা বালকদিগকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন। এই অপরাধে অপরাধী বালকদিগকে প্রথমবার সতর্ক করিয়া দেওয়া হইবে এবং ৫৲ ১০৲ টাকা, উর্দ্ধ সংখ্যা ২৫৲ অর্থদণ্ড হইতে পারে। আমরা এ আইন পাশে সুখী হইয়াছি।

মেডিকেল কন্‌ফারেন্সে আয়ুর্ব্বেদ। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, দিল্লীতে যে মেডিকেল কনফারেন্স বসিয়াছিল, তাহাতে কথা হইয়াছে "ভারতের কোনো কোনো মেডিকেল কলেজে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া ভারত গবর্ণমেন্ট এদেশী চিকিৎসা বিদ্যাশিক্ষার সুবিধা করিয়া দিন।" সভাপতি মহাশয় তাঁ'হার অভিভাষণেও একথার সমর্থন করিয়া বলেন—"আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা অবিলম্বেই করিয়া ফেলা উচিত। আমাদের পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে দেশী চিকিৎসাপদ্ধতি সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় সন্নিবিষ্ট করিলেই সহজে ইহা সাধিত হইতে পারে। ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্য স্বতন্ত্র অধ্যাপক নিয়োগ করা উচিত। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিক্রমে এদেশী ঔষধ সমূহ সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য এক ফার্ম্মাকোপিয়াসমিতি প্রতিষ্ঠিত হউক এবং সেই সমিতি ব্রিটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ার মত একখানি ইণ্ডিয়ান ফার্ম্মাকোপিয়া সঙ্কলন করুন।"

ভেজাল ঘৃত বিক্রয়ে দণ্ড।—ভেজাল ঘৃত বিক্রয় করিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ৩০।১১।১৮ তারিখে দণ্ডিত হইয়াছে —(১) চম্পরান ঃ—২০ এবং ২১নং বড়তলা ষ্ট্রীট, জরিমানা—১৪০৲ টাকা (২) রামলাল, ২৯নং বাঁশতলা ষ্ট্রীট, জরিমানা ১২৫৲ টাকা। (৩) শিউপ্রসাদ রাম ও তাহার দোকানের চাকর সখিচাঁদরাম, জরিমানা—যথাক্রমে ৩০০৲ ও ১০০৲ টাকা। (৪) গোপাতলাল ৮১ নং মল্লিক ষ্ট্রীট, জরিমানা ২০০৲ টাকা।

বিজ্ঞ চিকিৎসক।—ডাক্তার কার্ত্তিক চন্দ্র দাস জনৈক বহুদর্শী হোমিওপ্যাথিক্‌ চিকিৎসক। বহুদিন হইতে ইনি আমাদের পরিচিত। অনেকবার আমরা ইঁহার চিকিৎসায় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। কয়েক বৎসর ধরিয়া ইনি চিকিৎসাকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি আবার সাধারণের অনুরোধে চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ইনি হোমিওপ্যাথ হইলেও আয়ুর্ব্বেদের পক্ষপাতী। ইনি আয়ুর্ব্বেদ ও হোমিওপাথির সম্মিলনে মাইক্রোপ্যাথি নামক নূতন চিকিৎসার উদ্ভাবন করিয়াছেন এবং ইহা দ্বারা পুরাতন জটিল রোগসমূহ আরোগ্য করিতেছেন।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৩য় বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৫—ফাল্গুন। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার বর্ত্তমান অবস্থা ও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতির উপায়।

(নিখিল ভারতবর্ষীয় দশম বৈদ্য সম্মেলনে দিল্লী নগরীতে হিন্দী ভাষায় পঠিত।) *

——:০:——

বহ্নি ভস্মাচ্ছাদিত হইয়া থাকিলেও তাহার দাহিকাশক্তি নষ্ট হয় না। সুগন্ধি পুষ্পস্তবক ছিন্ন ভিন্ন দলিত এবং পর্য্যুসিত হইয়া কক্ষ প্রান্তের একতম দেশে রক্ষিত হইলেও তাহার সুরভিসম্ভার কক্ষমধ্যে অবস্থিত ব্যক্তিগণের তৃপ্তি সম্পাদনে সমর্থ হয়। বহুল আয়াস লভ্য রত্নশ্রেষ্ঠ পদ্মরাগ নিশীথকালের ঘোর তমসাচ্ছন্ন স্থানে রক্ষিত হইলেও দিব্য জ্যোতিঃ বিকীরণ পূর্ব্বক সে স্থানকে আলোকময় করিয়া তুলে।

এখনকার দিনে আমাদের সনাতন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অবস্থাও সেইরূপ। শুভক্ষণে জগৎস্রষ্টা হিরণ্যগর্ভ ইহার আবিষ্কার করিয়া দক্ষ, অশ্বিনীকুমার দ্বয়, ইন্দ্র এবং ত্রিকালদর্শী আর্য্যঋষিগণের ভিতর ইহার শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থায় পুণ্যভূমি ভারতজননীকে এক অপূর্ব্ব সম্পদের অধিকারিণী করিয়াছিলেন। সমগ্র বিশ্ববাসী সে সম্পদ দর্শনে শুধু যে বিমুগ্ধ হইয়াছিল, তাহা নহে;—সে সম্পদের কৃপা-প্রসাদ পাইবার জন্যও সে সময় সমগ্র বিশ্ব উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আরবীয়গণ, গ্রীসবাসীগণ এবং গ্রীসদেশ হইতে সমগ্র বিশ্ববাসী এইরূপে ইহার কিয়ৎপরিমাণে প্রসাদ লাভ করিয়া একদা যে কৃতার্থমনা হইয়াছিল,—তাহারই ফলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আজি সমুন্নত হইয়া প্রকাণ্ড মহীখণ্ড মাঝে

* হিন্দী অনুবাদের সময় পঠিত প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবে বলিয়া মূল বাঙ্গালা হইতে কতক কতক স্থান বাদ দেওয়া হইয়াছিল।

শারীর তত্ত্বের চরমোৎকর্ষ সাধনে সমর্থ হইতেছে। আর আয়ুর্ব্বেদ!—ব্রহ্মার কমণ্ডলু নিঃসৃত দিব্যৌষধি সকলের সমন্বয়ে সুসংবদ্ধ বেদ-বেদাঙ্গ-তন্ত্র-উপনিষদের সার সঙ্কলন—সমগ্র বিশ্বচিকিৎসার মূল গ্রন্থ—পুণ্য—পবিত্র জীব চিকিৎসার পরিসমাপ্ত গ্রন্থ—আমাদের আয়ুর্ব্বেদ! রাষ্ট্রবিপ্লবে—রুচিবিপর্য্যয়ে-শিক্ষার ব্যতিক্রমে—নানাকারণে ছিন্ন ভিন্ন ও বিপর্য্যস্ত হইয়া—ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায়—দলিত এবং পর্য্যুসিত পুষ্পস্তবকের ন্যায় ও নিশীথকালের তমসাচ্ছন্ন কক্ষে পদ্মরাগ মণির ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

সত্য কথা—আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা যদি সম্পূর্ণ ও অভ্রান্ত না হইত—চিকিৎসা বিজ্ঞানের সর্ব্বাঙ্গ বিষয়ের চিন্তা করিয়া যদি ইহা আবিষ্কৃত না হইত—ইহার প্রচারিত ঔষধ সকলের কার্য্যকারী শক্তি যদি মন্ত্রশক্তির মত ফলপ্রদ না হইত—তাহা হইলে এ চিকিৎসা—জীবকুশলেচ্ছু আর্য্যঋষিগণের জ্ঞানগভীর গবেষণা সম্ভূত সনাতন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা যে কোন্‌কালে কোন্ অতীত গগনের বিস্মৃতির কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া ইহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলয় প্রাপ্ত হইত, তাহার আর সন্দেহ মাত্র নাই। যাহা খাঁটি—যাহা সত্য—যাহা অভ্রান্ত—যাহা সংশয় রহিত—প্রকৃতই তুমুল সংগ্রামের তাণ্ডব নৃত্যেও তাহার অস্তিত্ব নষ্ট হয় না। ইন্দুনিভ কাঞ্চন পাবক শিখায় বর্ণহীন হইলেও তাহা খাঁটি বলিয়াই প্রমাণিত হইয়া থাকে। প্রাবৃটের ঘনঘটাচ্ছন্ন গগনে কিয়ৎকালের জন্য হিমাংশুকিরণ লোক লোচনের অন্তরালে অবস্থিত থাকিলেও মেঘ মুক্ত নির্ম্মল আকাশে আবার তাহার মনোমদ অংশুরাশি সন্দর্শনে সমগ্র বিশ্ব আলোকিত হইয়া থাকে। রোগে ভোগ আছে, সে ভোগে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যশালিনী ষোড়শী সুন্দরীর স্বভাবসুলভ চমৎকারিণী দৃশ্যশোভা নষ্ট হইয়া অস্থি কঙ্কাল সর্ব্বস্ব হইলেও সে রোগ ভোগের অন্তে আবার তাহার সম্পদ সম্ভার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সর্ব্বস্থান জুড়িয়া পূর্ব্বভাব আনিয়া থাকে। বিশ্বজগতে বিশ্ব নিয়ন্তার নিয়মই এইরূপ। ইহার প্রতিবাদ করিবার কিছুই নাই।

তাই বলিতেছিলাম,—আমাদের আয়ুর্ব্বেদ—হিন্দু রাজত্বের অবসানে—মোগল-পাঠানের সৌভাগ্য লক্ষ্মী ভারত গগনে সমুদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইউনানি বা হাকিমি চিকিৎসা রাজ সাহায্য লাভে পরিপুষ্ট হইয়া তাহার শক্তি সামর্থ্য প্রচার করিবার সুযোগ ও সুবিধা পাওয়ায়,—সমগ্র বিশ্ব সংসার বিজয়ী জগতের সর্ব্বপ্রধান চিকিৎসা গ্রন্থ আয়ুর্ব্বেদ তাৎকালিক ভারত সম্রাটের প্রকৃতি পুঞ্জের নিকট একেবারে অনাদৃত না হউক, ক্রমশঃ উপেক্ষিত হইতে লাগিল। সেই উপেক্ষাই হইল—আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার সর্ব্বনাশের সূচনা। ক্রমে মোগলের বিজয় লক্ষ্মী যখন সুসভ্য ইংরাজ রাজের করতলগত হইয়া ভারত বাসীর সংসার পরিচালনার অশেষ সুখসমৃদ্ধি তাহাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিল,—সেই সময় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অঙ্গ বিশেষ—ইউনানি বা হাকিমি চিকিৎসাও লুপ্ত প্রায় হইল এবং অ্যালোপাথিক চিকিৎসার প্রচার হওয়ায় ভারতবাসীর রোগ চিকিৎসার এক অভিনব ঐন্দ্রজালিক দ্বার উন্মুক্ত হইয়া উঠিল। সনাতন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অভ্যন্তর প্রদেশে যে সকল অমূল্য রত্নরাজি নিহিত আছে, ভারতবাসী তাহা আর যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করি-

বার চেষ্টা করিল না,—এখনকারদিনের পাশ্চাত্য বিদ্যায় সুপণ্ডিত, মার্জ্জিতবুদ্ধি সুসভ্য সন্তান যেরূপ গলিতদন্ত - পলিতকেশ বর্ষীয়ান—বর্ষীয়সী-জনকজ-ননার পরিচর্য্যায় কর্ত্তব্যপালন অপেক্ষা হাবভাবশালিনী নবোঢ়া পত্নীর প্রীত্যুৎপাদনে আত্মতৃপ্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, বিকৃত বুদ্ধি ভারত সন্তানও সেইরূপ আয়ুর্ব্বেদের অসাধারণ শক্তি-সম্পন্ন পাচন মুষ্টিযোগ, চূর্ণ-বটিকা মোদক-অবলেহ, তৈল ঘৃত —সকলই বিসর্জ্জন দিয়া পিল্ মিক্‌শ্চার, লোশন-অয়েণ্টমেণ্ট, এবস্ট্রাক্ট-লিকুইয়েডের দৃশ্যশোভা ও সহজ সুলভ ব্যবহার প্রণালী নিরীক্ষণে বিমূঢ়—বিমুগ্ধ হইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিল।

ঠিক এমনই সময়ে ম্যালেরিয়ার তাণ্ডব নৃত্যে বঙ্গ জননী বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ১৮০৪ খৃঃ অব্দে—যে সময় অ্যালোপাথিক চিকিৎসা দেশের মধ্যে অল্পে অল্পে আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইতেছে—ঠিক সেই সময়ে বাঙ্গালার মুর্শিদাবাদ ও কাশিমবাজারে এই রোগের প্রথম প্রাদুর্ভাব আরম্ভ হইল। কিন্তু তখনও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার পাচন-মুষ্টিযোগ বা চূর্ণ-বটিকাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া এই রোগ নিবারণের জন্য অ্যালোপাথিক চিকিৎসার শরণাপন্ন হইবার প্রবৃত্তি দেশের সকল লোকের জাগিয়া উঠে নাই। ম্যালেরিয়ার নাম নূতন হইলেও ইহা আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে বিষম জ্বর ভিন্ন অন্য কিছুই নহে—সুতরাং বাঙ্গালার মুর্শিদাবাদ ও কাশিমবাজারের ম্যালেরিয়া-নিবারণে যাঁহাদের মনে তখনও অ্যালোপাথিক চিকিৎসার অনুরাগ-বাসনা জাগিয়া উঠে নাই, তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকেরই শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু বিধাতার নির্ব্বন্ধে ইহার ২০ বৎসর পরে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাজা সীতারাম রায় প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালার যশোহর জেলার মহম্মদপুর গ্রামে ইহা প্রকট মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক যখন গ্রামখানি বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল,—মহম্মদপুরের পঞ্চ সহস্র অধিবাসী যখন ঐ দারুণ ম্যালেরিয়ার ভীষণ আক্রমণে কালকবলিত হইয়া ম্যালেরিয়ার প্রবল প্রতাপের কথা সমগ্র দেশবাসীকে উপলব্ধি করাইয়া দিল, তাহার পর মহম্মদপুর ধ্বংস করিয়া যশোহর, নদীয়া, ২৪ পরগণা—এক কথায় বাঙ্গালার সকল স্থানেই যখন এই প্রচণ্ড মূর্ত্তি কালানল ছড়াইয়া পড়িল, তখনই সত্য সত্য অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা—কুইনাইনের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্যে সমগ্র বাঙ্গালায়—ক্রমে সমগ্র ভারতে একাধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইল। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার যতগুলি কারণে অবনতি ঘটিয়াছে, আমাদের মনে হয় বাঙ্গালার ম্যালেরিয়া তাহার একটি কারণ। এই ম্যালেরিয়া না হইলে আমাদের দেশে কুইনাইনের মহিমা বড় একটা প্রচারিত হইত না। কুইনাইন অপেক্ষা 'নাটা'য় বেশী ফল হয় কিনা, হরিতালঘটিত ঔষধ প্রয়োগে ম্যালেরিয়াবিষ নষ্ট হয় কি না, কুইনাইনের সহিত প্রতিযোগিতায় আয়ুর্ব্বেদীয় কোনো ঔষধ দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ কিনা—সে সব বিষয়ের আলোচনা আমি এক্ষেত্রে করিতেছিনা,—আমি আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস আলোচনায় যতটুকু দরকার—তাহাই বলিয়া' যাইতেছি মাত্র।

যাক্ তা'রপর। তা'র পর আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অবনতি ঘটিল কি কারণে সে কথাটা এইবার একটু বিশদ করিয়া বলিব। মোগল-পাঠানের অভ্যুদয়ে—যৎকালে ইউ

নানির প্রচলন আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা হীনপ্রভ হইতে আরম্ভ হইল, —সেই সময় পুরুষপরম্পরায়—আয়ুর্ব্বেদের সেবা ভিন্ন যাঁহাদের গত্যন্তর ছিল না, তাঁহারাও অবস্থা বুঝিয়া কর্ম্মান্তরে মনোভিনিবেশ করিলেন। ইংরাজের অভ্যুদয়ে সে মনোভিনিবেশটা আর একটু বেশী করিয়া হইল। তাহার ফল এইরূপ ফলিল যে, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের চর্চ্চা ভিন্ন যে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা সম্পূর্ণ হয় না—পক্ষান্তরে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের শল্য-শালাক্য প্রভৃতি তন্ত্র সকলের শিক্ষালাভ তো দূরের কথা,—কায়চিকিৎসারও সকল তথ্যের শিক্ষা না করিয়া, নিতান্ত উদরান্নের—সংস্থানের জন্য অনেকে এই ব্যবসায়ে ব্রতী হইয়া, শুধু অর্থোপার্জ্জনের পথই সুপরিষ্কৃত করিতে সচেষ্ট হইলেন। রাজ আইনে আমাদের শল্য চিকিৎসার এই সময় এক ভীষণ অন্তরায় ঘটিল বটে, কিন্তু যদি তখন আমাদের সনাতন শল্য চিকিৎসার পবিত্র সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আমাদের মনে প্রগাঢ় বাসনা জাগিয়া উঠিত,—নরসুন্দরপুঙ্গবের হস্তে অস্ত্র চিকিৎসার ভার অর্পণ পূর্ব্বক যদি আমরা নিশ্চিন্ত না হইতাম, ভারতে নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট শস্ত্রবিশারদ চিকিৎসকদিগের কার্য্যকলাপ সন্দর্শনে যদি আমরা চমৎকৃত হইয়া, শুধু তাঁহাদের পারদর্শীতার প্রশংসা না করিতাম, তাহা হইলে বোধ হয় রাজ আইনে ভারতবাসীর শস্ত্র চিকিৎসার যে একটা বিষম অন্তরায় ঘটিয়াছিল, সকলের মিলিত চেষ্টার ফলে সেই অন্তরায়ের অন্তরায় সংঘটন ভারতবাসীর নিকট বড় কঠিন হইত না,—অস্ত্র চিকিৎসার অভাবে আমাদের আয়ুর্ব্বেদের অঙ্গহানি হইতেছে—এ কথা যদি আমরা প্রাণ খুলিয়া সুসভ্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট বিজ্ঞাপন করিতাম, মহর্ষি সুশ্রুত প্রণীত যন্ত্র ও উপযন্ত্রের বিবরণ, ক্রিয়া ও প্রতিকৃতির প্রকটন করিয়া, তদ্বিরচিত তাবৎ চিকিৎসা প্রণালী যদি আমরা তখন ন্যায়নিষ্ঠ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট নিবেদন পূর্ব্বক তাহা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক সমাজে অপ্রতিহত রাখিবার জন্য তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিতাম, এক কথায় অস্ত্র চিকিৎসাই যে আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্বপ্রধান চিকিৎসা—এ কথা যদি আমরা ভারতীয় তাবৎ বৈদ্য সম্মেলনে তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতাম, তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস, ইংরাজের তুলাদণ্ডে কখনই আমাদিগকে অস্ত্রহীন হইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইত না। আমরা তখন সে চেষ্টা করি নাই।

ধর্ম্মার্থৌ কীর্ত্তিমর্থাংশ সতাংগ্রহণমুত্তমম্
প্রাপ্নুয়াৎ স্বর্গবাসঞ্চ হিতমারভ্য কর্ম্মণা।

এ কথা তখন আমরা ভুলিয়া গিয়াছি।

"তথা বিবাতি কেবলে শরীরজ্ঞানে শরীরাভিনিবৃত্তি জ্ঞানে প্রকৃতিবিকারজ্ঞানে চ নিঃসংশয়ঃ সুখসাধ্য কৃচ্ছ্রসাধ্য যাপ্য প্রত্যাখ্যেয়ানাঞ্চ রোগাণাং সমুত্থান পূর্ব্বরূপ লিঙ্গ বেদনোপশয় বিশেষ বিজ্ঞানে ব্যাপগত সন্দেহাঃ" প্রভৃতি শ্লোকের অর্থ তখন আর আমাদের ধারণায় আসিতে পারে না।

"কপিলা কোটীদানাদ্ধি যৎফলং পরিকীর্ত্তিতম্ ফলং তৎ কোটীগুণিতমেকাতুরা চিকিৎসয়া।

একথাও তখন বৈদ্য ভুলিয়াছে।

ফলে তখন দেশের দুর্দ্দিনে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ—শল্য চিকিৎসা রক্ষা করিবার লোক আর কেহই রহিল না। তা' ছাড়া বৈদ্যচিকিৎসকগণই শারীরতত্ত্ববিদ্ চিকিৎসকদিগকে 'মড়াকাটা চিকিৎসক' বলিয়া

ঘৃণা করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালার মধুসূদন গুপ্ত যখন প্রথম মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নের জন্য প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন ইংরাজজাতি তোপের বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহার সম্মান রাখিয়াছিলেন, কিন্তু শবব্যবচ্ছেদের ফলে সমাজ তাঁহাকে পতিত করিতেও চেষ্টার ত্রুটী করে নাই। ভারতীয় সমাজের তখন তো এইরূপ অবস্থা!

ফলে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অবনতির একটি প্রধান কারণ অস্ত্র চিকিৎসার অঙ্গহানি। Practical জ্ঞান অর্জ্জনে সে শস্ত্র চিকিৎসা-শিক্ষার প্রবৃত্তি তো কাহারও নাই-ই, সুশ্রুত পাঠেও বিষয়গুলি বুঝিবার প্রবৃত্তি বৈদ্যের মধ্যে লোপ পাইয়াছে। যে শরীর লইয়া আমরা চিকিৎসার জন্য প্রবৃত্ত হইতেছি, সেই শারীরযন্ত্রের প্রত্যেক বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া অনুশীলন করা কর্ত্তব্য নহে কি? আমরা বড় বড় গ্রন্থ পাঠের জন্য প্রবৃত্তিপরায়ণ হইতেছি, কিন্তু আমাদের বর্ণপরিচয়েই জ্ঞান জন্মে নাই! অবস্থাটা কিরূপ ভাবুন দেখি! আমরা এ স্থলে বায়ু-পিত্ত-কফের দোহাই দিয়া কথাটা চাপা দিবার চেষ্টা করিয়া থাকি, কিন্তু সেই বায়ু-পিত্ত-কফে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে তো শারীরস্থানের শিক্ষালাভ সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। ফলে সে শিক্ষার অভাবেই আমাদের আর্য্য চিকিৎসার অবনতি ঘটিয়াছে—ইহা নির্ভেজাল সত্য কথা, এ কথার প্রতিকূলে বলিবার কিছুই নাই।

আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি করিতে হইলে ধাত্রী বিদ্যাতেও আমাদিগকে পারদর্শী হইতে হইবে। এক কথায় শল্য, শালাক্য, কায় চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্য, অগদ তন্ত্র, রসায়নতন্ত্র, বাজীকরণ তন্ত্র—আয়ুর্ব্বেদের সকল অঙ্গ গুলিই আমাদিগকে তন্ন তন্ন করিয়া আয়ত্ত করিতে হইবে। ইহার জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় বিষয়ের সংমিশ্রণে ভারতের সকল স্থানেই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। দ্বেষ হিংসা ভুলিয়া এক মনে এক প্রাণে সেই সকল বিদ্যাপীঠের সাধনায় সকলকে প্রাণপণ করিতে হইবে, কায়চিকিৎসার যে সকল গলদ—যথা 'মকরধ্বজের' পরিবর্ত্তে 'রস সিন্দূরের' প্রচলন, সস্তার প্রলোভন দেখাইয়া বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশের পরিবর্ত্তে আমলকীর পিণ্ড প্রদান, সহস্রপুটিত লৌহ অভ্রের পরিবর্ত্তে এলামাটির গুঁড়া মিশ্রিত লৌহ অভ্র বাজার হইতে কিনিয়া ঔষধে ব্যবহার—এ সকল বৈদ্য চিকিৎসার ভিতর হইতে একেবারে পরিহার করিতে হইবে। আমরা যদি এই সকল বিষয়ে মনোযোগী হইতে পারি, তবেই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার পুনরুন্নতি সম্ভবপর হইবে, নতুবা ইহার অধঃপতন আরও যে অবশ্যম্ভাবী, সে পক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

আয়ুর্ব্বেদ অনন্ত রত্নের আধার। বেদব্যাস মহাভারত-প্রসঙ্গে যেরূপ বলিয়াছেন,—যাহা মহাভারতে নাই, তাহা পৃথিবীর কোনো ইতিহাসেই নাই, আমরাও সেইরূপ দম্ভ করিয়া বলিতে পারি,—যাহা আয়ুর্ব্বেদে নাই, তাহা পৃথিবীর কোনো চিকিৎসা পুস্তকেই দৃষ্টিগোচর হইবেনা। তুমি আমি এ কথা বুঝিতেছি না, কিন্তু অ্যালোপাথিক চিকিৎসক সমাজ এ কথা বিলক্ষণই বুঝিয়া থাকেন। তোমাদের রত্নাবলী হইতে মকরধ্বজ, মৃগনাভি, অশোক, গুলঞ্চ, কালমেঘ, অশ্বগন্ধা তাই তাঁহারা বাছিয়া লইয়া আদর করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন। এই দিল্লীতেই গত ডিসেম্বর মাসে যে মেডিকেল কনফারেন্স হইয়াছিল, তাহাতে তাহার সভা-

পতি ডাক্তার নীলরতন সরকার তাঁহার বক্তৃতার একস্থলে বলিয়াছেন—"দেশীয় ভৈষজ্য ও চিকিৎসা প্রণালীর অনুসন্ধানের জন্য বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক। ভারতের মেডিকেল কলেজ গুলিতে আয়ুর্ব্বেদীয় অধ্যাপক নিয়োগের চেষ্টা করা' আবশ্যক এবং ব্রিটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ার মত ইণ্ডিয়ান ফার্ম্মাকোপিয়া প্রস্তুত করা আবশ্যক!"

আসল কথা, তোমাদের মহামহিম মহিমান্বিত বিশাল আয়ুর্ব্বেদ সমগ্র চিকিৎসার মূল ভিত্তি সে তো পুরাতন কথা,—উপস্থিত অন্য চিকিৎসাবলম্বীগণ তোমাদের রত্নরাজি যে নূতনভাবে গ্রহণ করিতে মনস্থ কারতেছেন, ইহাতে তোমাদের গৌরব বাড়িবে কি কমিবে—তাহা ভাবিবার বিষয়। তোমাদের অস্ত্র চিকিৎসা তো এমনই করিয়াই বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে! শুধু বিলয় প্রাপ্ত নহে—উহাব অবস্থা এক্ষণে এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, তোমাদেব পূর্ব্ববর্ত্তী চিকিৎসকগণ যে অস্ত্রবিশারদ ছিলেন. এ কথা তোমরাই এখন আর বিশ্বাস করিতে প্রওত নহ। ডাক্তারি চিকিৎসায় তোমাদেব অন্যান্য ঔষধাদি যদি গ্রহণ করার ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে উহার অবস্থাও যে অস্ত্র চিকিৎসার মত দাঁড়াইবে না. তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু তোমরা যদি নিজেরা আয়ুর্ব্বেদের প্রকৃত চর্চ্চা পরিহার না কর, শল্য-শালাক্য প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদের অষ্টাঙ্গের শিক্ষায় সত্য সত্য তোমরা যদি সুপণ্ডিত হইতে পার, প্রত্যেক দ্রব্য সন্দর্শন মাত্র যদি তাহার নাম ও গুণব্যাখ্যায় তোমাদিগকে ইতস্ততঃ করিতে না হয়, তাহা হইলে তোমাদের রত্ন অন্য চিকিৎসকগণ যতই গ্রহণ করিতে চেষ্টা করুন,—তোমরাই যে তাহার প্রকৃত অধিকারী—সে পরিচয় আর জগতে কাহারও নিকট নূতন করিয়া দিতে হইবে না। মাইকেল 'মেঘনাদ বধে' নূতন ছন্দো বিন্যাস বাঙ্গালায় আবিষ্কার করিলেও উহা যে ইংরাজীর ছাঁচে ঢালা—তাহার জন্য আর কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক হয়না। তোমরা তোমাদের নিজের দ্রব্য রক্ষা করিতে পারিলে. অন্যে তোমাদের অনুকরণ করিলেও মাইকেলের 'মেঘনাদবধের' অবস্থা যে প্রাপ্ত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

তোমরা নিজের ঘরের দিকে তাকাইয়া নিজের জিনিস রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা কর, ভারতের নানাস্থানে বিদ্যাপীঠের সৃষ্টি করিয়া চরক সুশ্রুতের যুগ ফিরাইয়া আনিবার সংকল্পে কায় চিকিৎসার মত শল্য চিকিৎসার পুনরুদ্ধারে বদ্ধপরিকর হও, ডাক্তারেরা যেমন তোমাদের ঔষধ গ্রহণে তাঁহাদের চিকিৎসার অঙ্গ পুষ্ট করিবার জন্য উদগ্রীব—তোমরাও সেইরূপ তোমাদের লুপ্তপ্রায় বিষয়গুলি তাঁহাদের নিকট হইতে গ্রহণপূর্ব্বক তোমাদের পূর্ব্ব চিকিৎসার গৌরব ফিরাইয়া আনিয়া, সেই ঋষিকল্প আর্য্য চিকিৎসার যুগের পুনঃ প্রবর্ত্তনে সচেষ্ট হও—ইহাই আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, ইহা ভিন্ন আর আমাদের বলিবার কিছুই নাই।

শেষ কথা—এতদিন যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এখনও বৈদ্য সন্তান জাগরিত হও। চক্ষুরুন্মিলিত করিয়া চাহিয়া দেখ—নিখিল বেদের সারাংশ সঙ্কলনে তোমাদের যে আয়ুর্ব্বেদ রচিত, ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-চতুর্ব্বর্গ সম্পদলাভের একমাত্র উপায় যে আয়ুর্ব্বেদের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় জলন্ত অক্ষরে ফুটিয়া উঠিতেছে, শুধু চিকিৎসার কথা নহে—দর্শন এবং বিজ্ঞানের পূর্ণপ্রতিভা যে আয়ুর্ব্বেদের প্রত্যেক অক্ষরে প্রকটিত—

তোমাদের শিক্ষার অভাবে তাহা আজি ছন্ন ছাড়া হইবার উপক্রম হইয়াছে। তোমাদের অযত্ন দেখিয়া—তোমাদের বিবেকবুদ্ধির অভাব বুঝিয়া—এক কথায় তোমাদিগকে অসার ও অকর্ম্মণ্য উপলব্ধি করিয়া—তোমাদের অমূল্য রত্ন অন্যে লুণ্ঠন করিবার জন্য চেষ্টাশীল। এ সময় আর তোমাদের অপদার্থের মত নিশ্চিন্ত থাকা কোনোক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। মিসর দেশের 'মামি'র অর্থাৎ বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া ঔষধবিশেষ রক্ষিত মৃতদেহের কথা শুনিয়াছ কি? আয়ুর্ব্বেদের উৎকৃষ্ট ভেষজ গুলি বিজাতীয় চিকিৎসকের করতলগত হইলে আমাদিগকেও যে ক্রমে মিসরবাসীর অবস্থায় পড়িতে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। তাই বলি, বৈদ্য সন্তান, আর নিশ্চিন্ত থাকিও না, উঠ,—জাগ। জাগিয়া আবার প্রাচীন কালের শিক্ষালাভের জন্য সচেষ্ট হও, —অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের যথারীতি শিক্ষালাভ করিয়া,—শুধু গ্রন্থ অধ্যয়ন নহে - হাতে কলমে সে শিক্ষায় সাফল্য লাভ করিয়া—সকল বিষয়ে পারদর্শী হইয়া, চিকিৎসার সকল অঙ্গের জ্ঞান-গর্ব্বে তুমি গর্ব্বান্বিত হইয়া উঠ, তোমার জাগরণে বিশ্বসংসার জাগরিত হউক,—দিগ্বধূগণ মুখরিত হইয়া তোমার জয়কীর্ত্তন করুক,—তুমি অন্যের নিকট অপরাজেয়—অক্ষয়—অমর হইয়া ঋষিপ্রদর্শিত-পন্থায় সমগ্র বিশ্ববাসীর পূজা পাইতে চেষ্টা কর—আয়ুর্ব্বেদের পুনরুন্নতির জন্য ইহাই প্রত্যেক বৈদ্যসন্তানের নিকট আমাদের ঐকান্তিক অনুরোধ। ফল কথা, দেশের "বড় দুর্দ্দিন—এ দুর্দ্দিনে আত্মরক্ষা করিতে হইলে আর আমাদের অচেতন প্রায় থাকিলে চলিবে না,—উঠিতে হইবে—জাগিতে হইবে—নিদ্রার অবসাদ একেবারে পরিহার করিতে হইবে। তাই আবার বলি - বৈদ্য সন্তান, আর ঘুমাইও-না—ঘুমের নেশা কাটাইয়া ফেল—উঠ - জাগো —জাগো—জাগো।

আর একটা কথা। এই কথাটা বলিয়াই আমাদের বক্তব্যের পরিসমাপ্তি করিব। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের পুনরুন্নতির জন্য স্থানে স্থানে যে বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠা কথার কথা বলিয়াছি, —সে কথাটায় প্রত্যেক আয়ুর্ব্বেদীয়চিকিৎসককে বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে—এ প্রস্তাবটী উপেক্ষার বিষয় নহে—উপেক্ষার হাস্যে আস্য বিকাশ পূর্ব্বক ইহা উড়াইয়া দিলে আর্য্য চিকিৎসার যে কিছুতেই পুনরুন্নতি ঘটিবে না—ইহা খাঁটি সত্য কথা। আর্য্য চিকিৎসার অবনতির যতগুলি কারণ দেখাইয়াছি, তা' ছাড়া আর একটি কারণ সকলে জানেন কিনা জানিনা—সেইজন্য সে কথাটাও এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি। মহামান্য ইংরাজ রাজের কৃপায় যে সময় মেডিকেল কলেজের স্থাপনা হইল, সেই সময় মধুসূদন গুপ্তের দেখাদেখি অনেকে ডাক্তারি শিক্ষার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িলেন। ইহার ফলে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের ব্যবসায় পরিচালনায় বিঘ্ন তো ঘটিলই, তা' ছাড়া এই সময় আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থগুলির সমালোচনা ও অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ পর্য্যন্ত হইয়া গেল। এই সমালোচনা ও অনুবাদকারীদিগের মধ্যে কোনো একজন ডাক্তার তাঁহার প্রণীত হিন্দু মেটেরিয়া মেডিকার ভূমিকায় প্রকাশ করিলেন—"আয়ুর্ব্বেদ অবৈজ্ঞানিক, ইহার ভিতর প্রত্যক্ষ ও পরিদর্শনযোগ্য কিছুই নাই।" সনাতন আয়ুর্ব্বেদের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য এই সময় অনেকেই চেষ্টা করিতেছিলেন, এমনই সময়

ঐ ডাক্তার মহাশয়ের এই উক্তি তাহার বিলক্ষণ পোষকতা করিল—দেশ ব্যাপিয়া রাষ্ট্র হইল—"আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা ভ্রমাত্মক, ঐ চিকিৎসকগণ চিকিৎসা কার্য্যে একান্তই অনুপযোগী—উহারা হাতুড়ে বা কোয়াক" কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ কিরূপ বিজ্ঞানসম্মতচিকিৎসা,—ডাক্তারদিগের মত অ্যানাটমী পড়িয়া, ফিজিওলজি শিখিয়া, সার্জ্জারিতে সুপণ্ডিত হইয়া এ চিকিৎসকগণ চিকিৎসা কার্য্যে, ব্রতী হইতেন কিনা—তাহা সুবিখ্যাত ডাক্তার ওয়াইজ প্রভৃতি অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন। ডাক্তার ওয়াইজ তাঁহার প্রণীত হিন্দু সিষ্টেম অব্ মেডিসিন নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, "রীতিমত শবচ্ছেদ করিয়া আয়ুর্ব্বেদের শারীর স্থান লিখিত হইয়াছে।" কিন্তু আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদিগের ভাগ্য বিপর্য্যয়ে দেশবাসীর রুচি এতই পরিবর্ত্তিত যে, সে কথা শুনিবার আর প্রয়োজনই নাই। একজন ডাক্তারের কথায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ যে হাতুড়ে বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, তাঁহাদের চিকিৎসা গ্রন্থ তাহারই ফলে quackery ভিন্ন আর কিছুই নহে।

বাস্তবিক আমাদের ছিল সব, কিন্তু এখন যে লুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং 'ছিল' বা আমাদের গ্রন্থ মধ্যে আছে এ কথা বলিয়া আর নির্ব্বাক থাকিলে চলিবে না, সেই অভাব পরিপূরণের জন্য ভারতের নানাস্থানে আমাদিগকে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার বৈজ্ঞানিক সত্যতা উদ্‌ঘাটন করিয়া বিদ্যাপীঠের সৃষ্টি একান্তই করিতে হইবে। কলিকাতার অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ইহার প্রথম পথ প্রদর্শন করিয়াছে। যথারীতি অ্যানাটমী ও সার্জ্জারির শিক্ষা দিয়া—আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সকলকে সংক্ষেপ ও সহজ বোধ্য ভাবে প্রণয়ন পূর্ব্বক ছাত্রশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া এই বিদ্যালয়ে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার বন্দোবস্ত হইয়াছে। মাধবকরের নিদানে যে সকল কথার উল্লেখ নাই, অথচ যে সকল বিষয়ের অনুল্লেখ থাকিলে নিদান শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না—তাহা বিস্তর শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া রোগ বিনিশ্চয় নামক গ্রন্থ প্রণয়ন পূর্ব্বক এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে রোগনিদান বুঝান হইতেছে। কুমারতন্ত্র, বিষতন্ত্র, শল্য তন্ত্র, শালাক্য তন্ত্র, দ্রব্যগুণ শিক্ষার পুস্তক এই বিদ্যালয় হইতে যেরূপ ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমানকালে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার পন্থা সুগম করিবে বলিয়া মনে হয়। তবে বাঙ্গালায় একটি কবিতা আছে—

"চাঁদেও কলঙ্ক আছে মৃণালে কণ্টক"

সেইজন্য এ বিদ্যালয়ের বিধি-ব্যবস্থা যেরূপ অনুষ্ঠান লইয়া গঠিত, তাহা হয় তো দোষশূন্য না হইতে পারে। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদের পুনরুন্নতির জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার সমন্বয় যে একান্তই আবশ্যক—সে পক্ষে যদি সন্দেহ না থাকে—তাহা হইলে কলিকাতার অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় কর্ত্তৃক সে উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হইবে, তাহা সুনিশ্চিত। যাহা হউক আমাদের মনে হয় আয়ুর্ব্বেদের পুনরুন্নতির জন্য ভারতের সকল স্থানেই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। কলিকাতার অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের যদি কোনো ভ্রম প্রমাদ ঘটিয়া থাকে—প্রত্যেক বৈদ্য সন্তানের তাহা দেখাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ফলে আমাদের কথা হইতেছে—হে মহামহিম মহিমান্বিত—সর্ব্বজনবরেণ্য বৈদ্য চিকিৎসকগণ—সনাতন আয়ুর্ব্বেদকে রক্ষা করিবার জন্য—বৈরী সম্প্রদায়ের অলীক রচনা—আয়ুর্ব্বেদীয়

চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্মত নহে—এই মিথ্যা অপবাদ সমগ্র বিশ্ববাসীকে বুঝাইবার জন্য, জীব-কুশলা-কাঙ্ক্ষী ফলমূলাশী সর্ব্বত্যাগী আর্য্যঋষি মণ্ডলীর বৈজ্ঞানিক মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য,—ভেদা-ভেদ ভুলিয়া,—দ্বেষ-হিংসা ত্যাগ করিয়া,— স্বার্থ-পরার্থ বিসর্জ্জন-সলিলে নিমজ্জিত করিয়া—যাহার যতটুকু শক্তি আছে—যাহার যতটুকু ক্ষমতা আছে—যাহার যতটুকু সামর্থ্য আছে—বৈদ্য চিকিৎসার পুনরুন্নতির বিরাট—বিশাল-যজ্ঞকুণ্ডে তাহার আহুতি সম্পাদনে বৈদ্য নামের মহিমা রক্ষায় ধন্যমনা হইয়া – জাতীয়-গৌরব রক্ষায় কৃতকৃতার্থ হও। তোমরা যে পুণ্যপূত কর্ম্ম রাশি লইয়া লোকহিতার্থ জন্মগ্রহণে একদিন বিশ্ববরেণ্য হইয়াছিলে,—ব্রহ্মার ছিন্নশিরঃ সংযোজনে তোমাদেরই পুণ্যকীর্ত্তি পূর্ব্বপুরুষ একদিন যে যজ্ঞাংশ গ্রহণের অধিকারী হইয়া-ছিলেন তোমাদের চিকিৎসা গ্রন্থের প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক সত্যতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া, সমগ্র বিশ্ব যে তোমাদের গর্ব্বে হিংসা-প্রবণতায় তোমাদিগকে খর্ব্ব করিবার অধিকারী—এই খাঁটি সত্য কথা আর না বুঝিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে কিছুতেই চলিবেনা, সেইজন্য অনুরোধ করিতেছি—তোমাদের অধঃপতিত অবস্থা সন্দর্শনে ব্যাকুল হইয়া তোমাদের নিকট করযোড়ে নিবেদন করিতেছি,—সমাজের গৌরবস্থল—দেশের আশা ভরসা—সোদর প্রতিম বৈদ্যব্যবসায়ীগণ,—আর নিশ্চিন্ত থাকিও না,—উঠ,—নিদ্রার ঘোর পরিত্যাগ কর,—জাগো, জাগো জাগো। দেশের বড় দুর্দ্দিন—তাহা মনে কর,—তোমরা কি ছিলে আর কি হইয়াছ—তাহা মনে কর,—যাহা ছিলে—তাহা ফিরাইয়া আনিবার জন্য আবার বদ্ধপরিকর হও—সময়ে তোমাদের সুদিন আবার নিশ্চয়ই আসিবে—সময়ে তোমরা আবার নিশ্চয়ই যাহা ছিলে, তাহা হইবে। তাই আবার বলিতেছি—জাগো, জাগো, জাগো।

শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন।

রোগ নিবারণ কিসে হয় ?

—:০:—

জগদ্ব্যাপী মহাসমরের প্রচণ্ড দাবানল নির্ব্বাপিত হইতে না হইতেই "ইনফ্লুয়েঞ্জা" নামক মহামারী ভীষণভাবে সংহার কার্য্য সাধন করিতেছে। এই ভয়ঙ্কর ব্যাধি ছাড়া অন্যান্য ব্যাধিও এই সংহার কার্য্যে সহায়তা করিতেছে। পূর্ব্বে সংগ্রামে নিযুক্ত সকল জাতিই চেষ্টা করিতেছিলেন যে, কিসে সেই ভয়ঙ্কর লোকক্ষয়-কারী সমরানল নির্ব্বাপিত হইয়া জগতে শান্তি স্থাপিত হয়। সেই চেষ্টায় যেমন আমেরিকা আসিয়া যোগ দিলেন, তেমনি সকলেরই চেষ্টা ফলবতী হইয়া মহাযুদ্ধে লোকক্ষয়কর ব্যাপার বন্ধ হইল। যুদ্ধে লোকক্ষয় বন্ধ হইল, কিন্তু রোগে লোকক্ষয় বন্ধ হইল কি ? যেমন যুদ্ধের ভীষণ সমস্যা লোকলোচনে নৃত্য করিতেছিল, তেমনি

ব্যাধির আরও ভীষণতর অথবা সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণতম সমস্যা মধ্যে মধ্যে আশার আশা দিয়া ঘোরান্ধকারে বিদ্যুচ্ছটার ন্যায় অন্ধকারকে আরও ঘনীভূত করিতেছে। আবার সকল দেশের লোক বদ্ধপরিকর হইয়া স্বাস্থ্যসমিতি গঠন প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা মহামারীর দাবদাহ নিবারণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু ভারত শুধুই নিশ্চেষ্ট। যুদ্ধের সময় আমাদের সম্রাটকে সাহায্য করিতে হইবে বলিয়া ভারতের অতুলনীয় রাজভক্তি যুদ্ধ সাহায্যে জাগাইয়া ছিল। এখন সেই যুদ্ধ যেমনি বন্ধ হইয়াছে, ভারত তেমনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ঘুমাইলে আর চলিতেছে না। মৃত্যু গভীর হুঙ্কারে আমাদিগকে তাহার তাণ্ডবলীলা দেখাইতেছে। ইহাতেও যদি আমরা প্রতিকারের কোন উদ্যোগ না করি, তাহা হইলে পরিতাপের বিষয় নহে কি? দেশে চিকিৎসকের অভাব—বিশেষ সুচিকিৎসকের। যিনি নির্লোভ হইয়া নিজের ভরণপোষণের আয়োজন ও পরোপকার উভয় কার্য্যই করিতে পারেন এরূপ চিকিৎসক ত অত্যন্তই বিরল। ইহার পূর্ব্ব প্রবন্ধে এই মহামারীর কারণ ও নিরাকরণের উপায় আমার যৎসামান্য জ্ঞানমতে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং তাহার সমূলে উৎপাটনের ব্যবস্থা—যাহা শ্রীভগবান্ হৃদ্দেশে থাকিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন, তাহাই বর্ণনা করিতে গিয়া যদি কিছু ভ্রমপ্রমাদের কথা লিখিয়া থাকি, তাহা হইলে তাহা তাঁহার প্রদর্শিত পন্থা ভাল করিয়া না দেখিয়া লেখনী চালনার ভ্রম মাত্র,—উহা পন্থার ভ্রম নয়। কিন্তু যাহাতে লোকে সুস্থভাবে থাকিয়া জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হয়, কই এবিষয়ে নিস্বার্থ-ভাবে কে চেষ্টা করিতেছেন? যিনি দরিদ্র, তিনি তাঁহার দারিদ্র্য কষ্টে কাতর হইয়া দিন-পাত করিতেছেন। যিনি মধ্যবিত্ত লোক—তিনি কোথাও কৃষিকার্য্য—কোথাও বাণিজ্য—কোথাও দাস্যবৃত্তি প্রভৃতির দ্বারা এই খাদ্য দ্রব্যাদির দুর্ম্মূল্যের দিনে কোনরূপে পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন সংস্থান করিয়া আর অন্য কার্য্যের সময় পাইতেছেন না। আর যাঁহারা ধনী—তাঁহারা অলসে, বিলাসে, খেলায়, নৃত্যগীতে, ব্যসনে এবং কেহ কেহ কতই কুরুচিপূর্ণ কার্য্যে তাঁহাদের অগাধ ধন নিশ্চিন্ত মনে ব্যয় করিতে-ছেন। কেহ কাহাকেও বাধা দিতে নাই। কোথাও চালক নাই, সকলেই স্বাধীনভাবে যথেচ্ছ চলিতেছেন। যিনি চিকিৎসক তাঁহার দ্বারাই এই দুর্দ্দিনে বেশী উপকারের সম্ভাবনা। কিন্তু তিনিও যথাসম্ভব অর্থসংগ্রহ দ্বারা নিজেকে ধনী করিবার জন্য "চরক" "সুশ্রুত" প্রভৃতি গ্রন্থ কথিত চিকিৎসকের গুণকে উপেক্ষা করিয়া মনুষ্য জীবনের বহুমূল্য সময় অনর্থ ব্যয় করিতেছেন। অন্যান্য ব্যবসায়ীদের ত কথাই নাই। কিসে অন্যকে বঞ্চনা করিয়া নিজে প্রভূত ধনের অধিকারী হইব—অন্যান্য ব্যবসায়ীদিগের শুধু তাহারই চেষ্টা! পূর্ব্বে লোকে এইরূপ ধন-লালসায় ব্যাকুল হইয়া কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইত না। বিষয়-বাসনা-বিষ লোককে এত জর্জ্জরিত করিতে পারে নাই। রামায়ণে মহামুনি বাল্মিকী অযোধ্যাবাসীর বর্ণনকালে অযোধ্যা-বাসীর দুইটি গুণকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া-ছিলেন—প্রথম কেহ কাহারও অপেক্ষা বেশী ধনী হইত না—সকলেই সমভাবে ধনী ছিল এবং ইহাতেই তাহারা সুখী ছিল; দ্বিতীয়—তাহারা কার্য্যক্ষেত্রে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ তৎক্ষণাৎ করিতে পারিত। আমাদের এই দুইটিরই অভাব। সমাজের নেতা ব্রাহ্মণ অত্যন্ত লোভী,

"অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ" বলিয়া ব্রাহ্মণ নষ্ট হওয়ায় অন্যান্য জাতিও নষ্ট হইয়াছে। ফলে পাশ্চাত্যানুকরণ আমাদের কেবল দোষভাগেরই হইয়াছে, গুণভাগের হয় নাই। তাহাদের মত আমরা ঈশ্বরকে ভুলিয়াছি, ধর্ম্মকে ভুলিয়াছি এবং সব ছাড়িয়া এক সংসারকে চিনিয়াছি। কিন্তু তাহাদের মত কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, বিপদে কর্ত্তব্যাবধারণ ও তন্মুখে চেষ্টা, একতা, পরোপকার, দয়া প্রভৃতি কোন সদ্‌গুণের অনুকরণ করি না।

যিনি ব্যবহারজীবী, তিনি তাঁহার উচ্চশিক্ষা ও পরিমার্জ্জিত বুদ্ধি দ্বারা কি করিয়া বেশী অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারেন, কি করিয়া অন্যকে বঞ্চনা করিয়া নিজে ধনবান্ হইতে পারেন, তাহার চেষ্টায় নিরত। যিনি বাণিজ্য করিতেছেন—তিনি তাঁহার ঘৃতাদি পণ্যদ্রব্যে লোকের প্রাণহানিকর বিষাক্ত দ্রব্যাদি লোকের অজ্ঞাতসারে ও অলক্ষিতে মিশ্রিত করিয়া ধনী হইবার চেষ্টায় দ্বিধা বোধ করিতেছেন না। চিকিৎসক মহোদয়গণও যিনি বিশেষ ও উচ্চশিক্ষা পাইয়াছেন, তিনিও অর্থের দাস হইয়া কত অনর্থ সাধন করিতেছেন। বিনা দর্শনীতে চিকিৎসার বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া নিজের কৃতিত্বের ঢাক বাজাইয়া, কত প্রকারে নানাবিধ বিজ্ঞাপনের জাল বিস্তার করিয়া রোগকাতর-জ্ঞানশূন্য রোগীকে—কুরঙ্গকে বংশীবাদন দ্বারা লুব্ধ করার ন্যায় নিজের জালে ফেলিয়া অবাধে ঐশ্বর্য্যবান্ হইতেছেন। চিকিৎসকের মোটর গাড়ী, কলিকাতার প্রশস্ত রাজপথের উপর বৃহদট্টালিকা প্রভৃতি বহুব্যয়সাধ্য ব্যাপারের আয়োজন না হইলে তাহার ১৬৲ টাকা ৩২৲ টাকা বা তদূর্দ্ধ দর্শনীর উপায় হয় না। কিন্তু আমাদের এই দরিদ্র ভারতে কতদিন এইরূপ চলিবে! চিকিৎসকগণও যদি এই ভীষণভাবে অর্থ সংগ্রহে তৎপর হন, তবে তাঁহারা চিকিৎসা দ্বারা পরোপকার কি প্রকারে করিবেন? এখনকার দিনে পরোপকারের কথা বলিলে লোকে গাত্রে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবে।

চিকিৎসকের এখন প্রথম দৃষ্টি অর্থে। সেই অর্থোপার্জ্জনের পথ প্রসার করিতে যদি রোগীকে কষ্ট পাইতে হয়, রোগ বেশী দিন ভোগ করিতে হয় ও রোগীর জন্য গৃহস্বামীকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়, তবে চিকিৎসকের কর্ত্তব্য কি হইল? ফলকথা এখনকার অনেক চিকিৎসকই যে অর্থশোষণে তৎপর—একথা বলিলে অন্যায় হইবে না। পূর্ব্বেকার চিকিৎসকগণ কিরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাহার একটী উদাহরণ দিতেছি। ৺গয়ানাথ কবিরাজ আমাদের দেশে মুর্শিদাবাদ জেলায় কান্দী মহকুমার অন্তর্গত পারুলিয়া গ্রামে একজন বিখ্যাত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার গুরু স্বর্গীয় গঙ্গাধরের ন্যায় তাঁহার পাচন চিকিৎসাটাই বেশী ছিল। কাজেই চিকিৎসায় কম খরচ পড়িত ও বহুলোকে তাঁহার দ্বারা চিকিৎসিত হইতে পারিত। আমার পিতা ৺বরদাপ্রসাদ রায়কে তিনি তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে জীর্ণ জ্বরের চিকিৎসা করেন। জীর্ণজ্বরের সহিত শোথ-প্লীহা প্রভৃতি উপসর্গও জুটিয়াছিল। তাঁহার চিকিৎসার ভার গ্রহণের পূর্ব্বে কবিরাজ মহাশয় বলিয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি ছয় মাস কাল বাঁচিবেন, যদি তাহার বেশী বাঁচেন, তবে আরোগ্যের সম্ভব। চতুর্থ মাসে রোগ প্রায় চৌদ্দ আনা উপশম হইয়া আসে। কিন্তু একদিন আবার জ্বর বৃদ্ধি হইয়া ক্রমশঃ পূর্ব্ব লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইল এবং তাঁহাকে ছয় মাসের মধ্যে কালগ্রাসে পতিত করিল। এইরূপ কঠিন রোগের চিকিৎসায় ২ প্রকার

পাচন, ১টি অবলেহ, ১টি বড়ি ও পঞ্চামৃত লৌহ ব্যবহার করিতে হইত। কিন্তু তাহাতে মাসিক ৬৲ টাকাব বেশী ব্যয় পড়িত না। তাঁহাব যে মাসে মৃত্যু হয়, তাহার পূর্ব্বের ১ মাসের ঔষধের দাম বাকী ছিল। আমি উহা আন্দাজ করিয়া ৪৲ টাকা পিতৃদেবের মৃত্যুব পর দিতে গেলে তিনি লইলেন না। যখন আমি বলিলাম,—"তবে আমার পিতৃদেব কি প্রকারে আপনাব ঋণমুক্ত হইবেন"? তখন তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন,—"উহা কাহাকেও দান করিয়া দেন, আমি মৃত ব্যক্তির ঔষধের দাম লই না।" সেই চিকিৎসক আর এখনকাব চিকিৎসক! এখনকাব চিকিৎসক রোগীর বাড়ী গিয়া দেখিলেন তাহার আগমনের পূর্ব্বেই রোগী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার আত্মীয় স্বজন কাঁদিতেছে, সেই সময় কিন্তু তিনি তাঁহার দর্শনীর টাকাটা আদায় না করিয়া যাইবেন না। ৺গয়ানাথ কবিরাজ মহাশয় বড়লোকেরা পাল্কী পাঠাইলে পাল্কীতে রোগী দেখিতে যাইতেন। পল্লীগ্রামে রাস্তা ভাল না থাকায় ঘোড়ার গাড়ী যাতায়াত করিতে পারে না। তিনি জুড়ি গাড়ীও রাখেন নাই। নিকটে চিকিৎসা করিতে হইলে পদব্রজেই ঔষধের ব্যাগটি হাতে লইয়া যাইতেন। দূরে হইলে 'ডুলি' করিয়া যাইতেন, যদি কেহ বলিত আপনি পাল্কী করিয়া যান না কেন?—তাহাতে বলিতেন —"আমার রোগীর বেশী পয়সা খরচ হইবে, পাল্কী ভাড়া তো রোগীর নিকট হইতেই আদায় হয়। যদি আমি পাল্কীতে যাতায়াত করি, তাহা হইলে অনেক গরীব আমায় ডাকিতে পারিবে না।" চিকিৎসক সমাজের সেই এক দিন, আর আজকালকার মোটর গাড়ী চড়া জুড়ি গাড়ী চড়া, দীর্ঘদর্শনী গ্রহণ করা চিকিৎসক সমাজের এই এক দিন! এ সকল খরচ ছাড়া মহা আড়ম্বরযুক্ত বিজ্ঞাপন দেওয়ার বিশেষ খরচ আছে, তাহাও কিন্তু ঔষধের মূল্য বৃদ্ধি দ্বারা রোগীর উপরেই পড়ে। তা'ছাড়া বৃহদট্টালিকার ব্যয় ভার। অবশ্যই চিকিৎসকেব জীবিকা নির্ব্বাহের কার্য্যে অর্থ আবশ্যক, কিন্তু ঐ সকল নিয়ম অবলম্বনে ও কঠোর হইয়া অর্থ সংগ্রহকেই মুখ্য উদ্দেশ্য এবং চিকিৎসা দ্বারা রোগীব যন্ত্রণা উপশমকে গৌণ উদ্দেশ্য কবিলে কি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র কথিত চিকিৎসকের গুণ রক্ষিত হয়? প্রাতঃস্মরণীয় ৺গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয় একবার একটী বিদ্যার্থীর শিরঃশূল একটী মুষ্টিযোগ দ্বারা আবোগ্য কবেন, তজ্জন্য তাঁহাকে কয়েক আনা পয়সা মাত্র খরচ করিতে হয়। এক ধনীর ঐ পীড়া হওয়ায় সেই কয় পয়সাব ঔষধেই সেই রোগ আরাম করিয়া তাঁহার নিকট ৫০০৲ টাকা লন। এখনকার কবিরাজ মহাশয়েরা আমাদের দেশের বিলাস-ব্যসন-তৎপব পরোপকার-পরাঙ্মুখ, ঈশ্বরের দরিদ্র মূর্ত্তির সেবা-বিমুখ ও গর্ব্বী ধনীর নিকট হইতে অজস্র অর্থ গ্রহণ করুন, তাহাতে ক্ষতি নাই, বরং ভালই কিন্তু সেই অর্থ নিজ ভোগ-বিলাসে ব্যয় না করিয়া, দরিদ্রকে অকাতরে চিকিৎসা ও ঔষধাদি দান করুন। ৺গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়কে এক ব্যক্তি বলিলেন—"মহাশয় এই কয় পয়সার ঔষধে আপনি ধনীর নিকট অত টাকা কে[ন] লইলেন?" তাহাতে তিনি বলিলেন—"বাব[া] আজকাল ধনীরা চিকিৎসককে কোন প্রকা[রে] সাহায্য করেন না, যদি উহার নিকট অত টা[কা] না লইব— তবে জয়মঙ্গলরস, বসন্তকুসুমাকর র[স] স্বর্ণ পর্পটি প্রভৃতি বহুমূল্য ঔষধাদি দ্বারা কোথ[াও] বিনামূল্যে, কোথাও স্বল্পমূল্যে গরীবের ও ম[ধ্য]বিত্ত লোকের কি প্রকারে চিকিৎসা করি[ব]

সূর্য্য সহস্র সহস্র কর বিস্তার পূর্ব্বক পৃথিবী হইতে জলরূপ কর গ্রহণ করিয়া বর্ষা-কালে লোকের হিতসাধন জন্য নিজে আকাশে কিছু না রাখিয়া সমস্তই অর্পণ করেন "পরোপকারায় সতাং জীবনম"—এই কথা মনে করিয়া সূর্য্যদেবকে সমস্ত আরোগ্যের নিদান জানিয়া, তাঁহাকে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি ধারণা করিয়া, তাঁহার উদাহরণ গ্রহণ পূর্ব্বক চিকিৎসকগণ চিকিৎসাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন। তাহার ফলে ভারতের বহু দুঃখ মোচন করিতে পারিয়া ইহকালে ও পরকালে উভয় লোকেই সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করিতে সক্ষম হইবেন।

আমার ভ্রাতা ৺শরৎ চন্দ্র রায়—স্বর্গীয় হেমচন্দ্র সেন এম, এ, এম,ডি, মহাশয়ের একটী উপযুক্ত ছাত্র ছিলেন। তিনি গরীবদের বিনা-পয়সায় ঔষধ ত দিতেনই, তা' ছাড়া বিনা মূল্যে ভাল সাগু বার্লি প্রভৃতি পথ্যের দ্রব্য দিতেন। শীতকালে একটী প্রসূতির চিকিৎসায় নিজের স্বাস্থ্যকে উপেক্ষা করিয়া দিবারাত্রি পরিশ্রম করায় নিজে নিউমোনিয়াগ্রস্ত হইয়া অকালে ৩৬ বৎসর বয়সে স্বর্গধামে গমন করেন। তাঁহার পরোপকার বৃত্তি মৃত্যুর পরও কিরূপে তাঁহাকে চালিত করিয়াছিল—তাহা নিম্নের সত্য ঘটনায় প্রকাশ পাইবে।

আমাদের পুরোহিত শ্রীযুক্ত হৃষিকেশ ভট্টাচার্য্য, ইনি আপনাদের আয়ুর্ব্বেদের এক-জন গ্রাহক। একদিন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রবল জ্বর হয়। তখন রাত্রি ৯টা, ছেলেটি জ্বরের যাতনায় ছটফট করিতে থাকে। পিতা পুত্রের অবস্থায় কাতর হইয়া চিকিৎসক ডাকিতে পাঠান। তাঁহাকে পাওয়া গেল না। তখন তিনি বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া মনে মনে কাতর ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন—"আজ যদি শরৎ ডাক্তার থাকিত, তবে আমার ছেলেটার এই প্রবল ব্যাধিতে এইরূপ বিষম সঙ্কটে পড়িতে হইত না।" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি বসিয়া দেয়ালে হেলান দিয়া একটু তন্দ্রাবেশে পড়িলেন এবং সেই সময় দেখিতে পাইলেন যে, ৺শরৎ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন,—"ভট্টাচার্য্য মহাশয়, আমাকে কেন ডাকিলেন? আমার আসিতে বড়ই কষ্ট হইল, দেখুন আমি আর এসংসারে নাই—তা' আপনারা জানেন, তবুও আমাকে ডাকিলেন কেন? আর দেখুন, এখন আমি চিকিৎসা করি না, আমার কাছে ঔষধাদিও নাই যে আপনার ছেলেকে দিব। আচ্ছা যখন আসিয়াছি—তখন এক কাজ করুন—এই গৃহের কোণে একটা শিশি আছে, উহাতে এক-শিশি জল পূরুন ও উহার কতকটা তিনবার আপনার ছেলেকে খাওয়াইয়া দেন, জ্বর সারিয়া যাইবে।" বলিয়া সেই মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় জাগিয়া উঠিয়া তাঁহার স্ত্রীকে সব কথা বলিলেন এবং একটী শিশিও ঘরের কোণে দেখিলেন। উহা জল পূর্ণ করিয়া সেই জল প্রথমবার দিবা মাত্র ছেলেটির ছটফটানি কমিয়া গেল। আর দুইবার দেওয়ার পর সে ঘুমাইয়া গেল। প্রাতে চিকিৎসক আসিয়া নাড়ীতে জ্বর নাই দেখি-লেন। তাহার পর সে দিন আর জ্বর আসিল না, তৃতীয় দিনে অন্নপথ্য দেওয়া হইল। এখন এই ঘটনাটি কি ভাবে হইল, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিরা চিন্তা করিয়া দেখুন। যখন আমরা এই সংসার হইতে চলিয়া যাইব, তখন আমাদের সঙ্গে কিছুই যাইবে না। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম যাইবে—পাপ পুণ্য যাইবে। আমরা যখন সকলেই সুখ ইচ্ছা করি, তখন পরকালের সুখ ইচ্ছা

কেন করি না! বৃথা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, এই সংসারকে সার জানিয়া, কেবল অর্থ সংগ্রহ-তৎপর হইয়া অধর্ম্মকে অবলম্বন করি ও ধর্ম্মকে ত্যাগ করি। ধর্ম্ম যে আমাদের পর-কালের পথপ্রদর্শক ও সুখের আবাস স্থল-নির্ণয়কারী, —সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। শাস্ত্রে কথিত আছে।

ধনানি ভূমৌ পশবশ্চ গোষ্ঠে
নারী গৃহদ্বারে জনাঃ শ্মশানে।
দেহশ্চিতায়াং পরলোকমার্গে
ধর্ম্মানুগো গচ্ছতি জীব একঃ॥

ধন এই পৃথিবীতে পড়িয়া রহিবে। অশ্ব-গজ-গো—তাহা তাহাদের স্থানে রহিবে। প্রাণ প্রিয়া পত্নী গৃহদ্বার পর্য্যন্ত যাইবেন। এই যে এত সাধের দেহ তাহাও চিতায় দগ্ধ হইবে, সঙ্গে কিছুই যাইবে না। এক ধর্ম্ম জীবের পরলোক মার্গে অগ্রে অগ্রে যাইবে।

রোগের আদি কারণ অধর্ম্ম। সেই রোগের যিনি চিকিৎসা করিবেন—তিনি যদি ধর্ম্মকে অবলম্বন না করেন, তবে কোন্ বলে তিনি রোগীর রোগ অপনয়ন করিবেন?

এই তো গেল চিকিৎসকের কর্ত্তব্য। এখন যাঁহারা চিকিৎসিত হইতেছেন বা যাঁহাদের চিকিৎসিত হইবার আবশ্যক আছে, তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি? রোগ সকল প্রাদুর্ভূত হইলে মানবদিগের তপস্যা, উপবাস, অধ্যয়ন, ব্রত ও আয়ুর বিঘ্ন উপস্থিত হয়। এই রোগ যাহাতে দেহে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহাই প্রথমে চেষ্টা করা উচিত। এ সম্বন্ধে পৌষমাসের প্রবন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। সেই সকল নিয়ম পালন করিলে রোগাক্রমণের আশঙ্কা খুব কম থাকে। রাজ নিয়মের ব্যবস্থা (আইন) অমান্য করিলে, উহার অজ্ঞানতা, অপরাধীর দণ্ড বিধান নিবারণ করিতে পারে না—Ignorance of Law is no excuse. সেইরূপ প্রাকৃতিক নিয়মের উল্লঙ্ঘন করিলে রোগ অনিবার্য্য। তবে অল্প অল্প অনিয়মে রোগ হয় না। "প্রাপ্তে কালে গদো যথা—" অনিয়ম করিতে করিতে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় ও রোগ আক্রমণ করিয়া আয়ু হ্রাস করিয়া ফেলে। সেই জন্য আমাদের সকলকে প্রাকৃতিক নিয়মে চলা উচিত ও কিসে রোগ হয়, কি করিলে রোগের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়—স্বাস্থ্যরক্ষার এসব নিয়মগুলি জানা চাই। রোগ হইলে তাহার চিকিৎসা করা অপেক্ষা রোগ হইতে না দেওয়াই শ্রেয়ঃ। পূর্ব্বে-কার লোকেরা নিয়মে থাকিতেন মিতাহার করিতেন পূর্ব্বের আহার সম্পূর্ণ জীর্ণ না হইলে পুনরায় আহার করিতেন না। অধিকাংশই একাহার করিতেন, ব্রহ্মচর্য্য পালন অর্থাৎ বীর্য্য ধারণ করিতেন, একাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা প্রভৃতিতে উপবাস করিয়া পাকস্থালীকে বিশ্রাম দিতেন। অমেধ্য অখাদ্য আহার, যাহার তাহার হাতে আহার—এ সব করিতেন না, দেব সেবা, ব্রাহ্মণে ও গুরুজনে ভক্তি, সাত্ত্বিক ভোজন ও সর্ব্বদা ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া নীরোগে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া ইহকালের ও পরকালের উভয় কালের সুখ ভোগ করি-তেন। চিকিৎসককে সম্মান করিতেন। এখন তাহার বিপরীত হইয়াছে। তাই জরা ব্যাধি প্রভৃতি আসিয়া অকালে লোককে কাল গ্রাসে পাতিত করিতেছে। এখন এ বিষয়ে কর্ত্তব্য কি? আগে সামান্য সামান্য রোগ বাড়ীর গৃহিণীরা নিজেরা জানিত-মুষ্টিযোগ দ্বারা আরাম করিতেন। এমন কি, কখনও কখনও চিকিৎসক না পাওয়া গেলে, তাঁহারা

কঠিন কঠিন রোগও আরাম করিতেন। কিন্তু এখন ছেলের সামান্য মাথা ধরিলেই ছেলের মা ডাক্তার ডাকিলেন, তিনি আসিয়া কতকগুলা উগ্রবীর্য্য ঔষধ ব্যবহার করাইয়া শরীরকে আরও খারাপ করিয়া দিলেন। উপবাস তো এখন উঠিয়াই গিয়াছে। "জ্বরাদৌ লঙ্ঘনং পথ্যম্"—একথা বলিলে লোকে হাসে। আমরা একটু কষ্ট সহ্য করিতে পারি না। এখনকার দিনে নবজ্বরে অবাধে দুগ্ধ পান করার ফলে আতিসারিক বিকার অর্থাৎ টাইফএডকে আহ্বান করা হয় মাত্র। একবার আমার কোন বন্ধুর ছেলে কাসিতে বড় কষ্ট পাইতেছিলেন, তাঁহাকে বলিলাম বাসক গাছের ছাল—মূলের ছাল ও পাতা—(বাসকে ত্রিবাসক বলে) জলে সিদ্ধ করিয়া ছেলেটিকে খাওয়ান, তাহাতে তিনি বলিলেন,—"কে অত হাঙ্গাম করে? একটা সিরাপ অব বাসক কিনিয়া লইয়া খাওয়াই।' তিনি অবাধে ৫০ আনা পয়সা খরচ করিলেন, কিন্তু তাহা অপেক্ষা অধিক উপকারী টাট্‌কা বাসকের কাথ তৈয়ার করাইয়া খাওয়াইলেন না। আর এক বন্ধু উহা ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া সকলকে বলিলেন,—এখন আমার বাসক গাছে পাতা গজাইতে পায় না। আমার বাসক গাছটি দেখিলে মনে হয়—যেন পরোপকারার্থে সে জীর্ণশীর্ণ হইয়া ক্রমশঃ প্রাণ হারাইতে বসিয়াছে। বাসক গাছটি এখন প্রমাণ করিতেছে যে—

বাসায়াং বিদ্যমানায়াং আশায়াং জীবিতস্য চ।
রক্তপিত্তী ক্ষয়ী কাসী কিমর্থ মবসীদতি॥

ফলকথা, সকলকেই মোটামুটি রোগের চিকিৎসা জানিতে হইবে। গাছ গাছড়া কতকগুলি চিনিতে হইবে। নিজের ঘরের পাশে, আঙ্গিনায় বা বাগানে কতকগুলি অত্যাবশ্যক ভেষজ বৃক্ষলতাদি লাগাইতে হইবে। রোগ নিবারণের জন্য রসায়ন ব্যবহার করিতে হয়, ঋতু হরীতকী তন্মধ্যে সুলভ ও প্রশস্ত রসায়ন জানিয়া যাঁহারা রোগ প্রবণ, তাঁহারা উহা ব্যবহার করিতে যত্নবান হইবেন। কি পরিমাণে উহার ব্যবহার করিতে হয়। সম্পাদক মহাশয় এইখানে ফুট নোটে তাহার প্রকাশ করিলে বড় ভাল হয়। * ঋতুহরীতকী যে ঋতুতে যে দ্রব্যের সহিত সেব্য নিম্নের শ্লোকে কথিত হইয়াছে—

সিন্ধূত্থ-শর্করা-শুণ্ঠী-কণা মধু গুড়ৈঃ ক্রমাৎ।
বর্ষাদিস্বভয়া সেব্যা রসায়নগুণৈষিণা॥

বাড়ীর নিকট নিম্ব, বেল, তুলসী, কণ্টকারী, বাসক, গুলঞ্চ, অশ্বগন্ধা, ক্ষেতপাঁপড়া, দূর্ব্বা, কালমেঘ, আমরুল, আমলকী প্রভৃতি যেন রোপণ করিয়া রাখা হয়। নিম্বের অশেষ গুণ। আমার যে গোয়ালা গাভী দোহন করে, সে বৃদ্ধ হইয়াছে—কিন্তু তাহার পিতার শরীর দেখিলে তাহাকে যুবা বলিয়া মনে হইবে। তাহার পিতা বলে—তাহার কখন জ্বর হয় না। একদিন তাহার গামছার একটু কোন অংশে সবুজবর্ণ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ওরূপ কেন?" তাহাতে সে বলিল "চৈত্রমাসের প্রথম পনর দিন নিমপাতার রস খাই বলিয়া, ঐ রস নিঙড়াইতে এরূপ হইয়াছে। বেশী পাই না বলিয়া পোয়াটাক ধারোষ্ণ গব্য দুগ্ধ ইহার

* ঋতু হরীতকী সেবনাকাঙ্ক্ষিগণ প্রথমে দুই আনা হইতে আরম্ভ করিয়া ১ সপ্তাহ সেবনের পর প্রতিদিন এক আনা হিসাবে বাড়াইয়া অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত ব্যবহার করিবেন। আঃ সং।

পর পান করি, তাহার ফলে আমি সমস্ত বৎসর বেশ ভাল থাকি।" এক সর্পবিষচিকিৎসক আমাকে বলেন যে, প্রত্যহ কিছু কিছু নিম্ব পাতা খাইয়া যখন গায়ে নিমের গন্ধ হইবে, তখন আর সর্পবিষ দেহে বিষক্রিয়া অত্যল্পই করিবে, তাহাতে প্রাণহানি হইবে না।

দেশের কবিরাজগণ সকলে মিলিয়া চরকোক্ত ভাবে এক বিরাট সভা করিয়া স্থির করুন যে, কি উপায়ে বর্ত্তমান রোগ সকলের হাত হইতে ভারতবাসী রক্ষা পায়। তাহা তাঁহারা প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রে প্রকাশ করুন। "আয়ুর্ব্বেদের" মত মাসিক পত্রিকা আরও প্রকাশিত হউক, মূল্য যথা সম্ভব কম করা হউক এবং তাহাতে যে বিষয় যিনি ভাল জানেন তাহা লিখুন। সকল গৃহস্থই "আয়ুর্ব্বেদ" বা অন্য কোন ভাল সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা মাসিক চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকা গ্রহণ করুন ও পরিবারের সকলে উহা পড়ুন ও তদনুযায়ী কার্য্য করুন। শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন মহাশয় যে প্রণালীতে সরল পদ্যে নানারোগের সরল চিকিৎসা প্রণালী "আয়ুর্ব্বেদে" প্রকাশ করিতেছেন, ঐরূপ অন্যান্য কবিরাজেরাও করুন এবং উহা বালকবালিকাদের কণ্ঠস্থ করান। বড়ই দুঃখের বিষয় যে "আয়ুর্ব্বেদ" কাগজে সকলে লেখেন না বা তাহার বিস্তারের চেষ্টা করেন না।

শ্রীসতীশ চন্দ্র রায়। (চট্টোপাধ্যায়) বি, এল্।

বাঙ্গালীর ভগ্নস্বাস্থ্য।

—:০:—

দেখা যাইতেছে, দিন দিন বাঙ্গালী, জীবন সংগ্রামে অধিকাংশ জাতি হইতেই অধঃপতিত হইয়া যাইতেছে। স্বাস্থ্যের বিষয়েও একথা সমীচীন হইয়া পড়িয়াছে। 'আয়ুর্ব্বেদ' যখন স্বাস্থ্যালোচনার পত্র, তখন আমরা ইহাতে বাঙ্গালীর এই স্বাস্থ্যের অধঃপতনের বিষয়ই আলোচনা করিব।

যে জাতি একদিন মহারথ মহাবীরগণকে বক্ষে স্থান দিয়া ধন্য হইয়াছিল; কুরুক্ষেত্র সমরেতিহাস যে জাতির বীরত্বের চরম নিদর্শন; সে জাতি আজ কত নিম্নে ভাবিলে দুঃখে ম্রিয়মান হইতে হয়। আগেকার বাঙ্গালী-বীরগণের সহিত তুলনা করিলে আধুনিক শীর্ণকায়, অস্থিচর্ম্মসার, সার্দ্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত বাঙ্গালীকে দেখিয়া যুগপৎ হাস্য ও বিষাদের উদ্রেক হয়। বৈষম্যধারণা হাস্যের সৃষ্টি করে এবং অধঃপতনের স্মৃতি-অশ্রু টানিয়া আনে।

বাঙ্গালীর এ অধঃপতন কেন হইল? আমার বিশ্বাস, পর-নির্ভরতা ইহার প্রধানতম কারণ। যে জাতি দুইশত বৎসরেরও অধিক কাল পরমুখাপেক্ষী, তাহার জাতীয় প্রাণ যে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া যাইবে। ইহা খুব স্বাভাবিক। আত্মরক্ষার শক্তি তাহার কোথায়? একবার বাঙ্গালী জাতির দিকে চাহিয়া দেখুন দেখি? ঐ দেখুন—কেরাণীকুল ২০৲ টাকা মাহিনার জন্য রেলে, কয়লা দিবার

মত করিয়া তাড়াতাড়ি ৮টা বাজিতে না বাজিতে আহার কোন রকমে সারিয়া অর্দ্ধাশনে ময়লা কোট গায়ে, ছেঁড়া জুতা পায়ে অফিসের পানে ছুটিতেছে। তাহাদের পঞ্জরগুলি গণনা করা অনায়াস সাধ্য, অকালে পক্বকেশ তাহাদের মস্তক বিভূষিত করে, তাহাদের যাবতীয় শক্তি কলম চালাইতেই ব্যয়িত হইয়া যায়।

আজিকাল আমরা খুব চাকরি ভক্ত বটে, তথাপি ভাবিতে গেলে চাকরি একটি নিকৃষ্ট কাজ। তাই সুপরিচিত সংস্কৃত শ্লোকে ভিক্ষার অগ্রে ইহার স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু তথাপি মোটা মোটা চাকরিগুলি বাঙ্গালীর নহে। বিলাত প্রত্যাগত বা বিলাত সম্ভূত মহা পুরুষগণই তাহা উপভোগ করেন। বাঙ্গালীর সর্ব্বোচ্চ আশা—হয় একটা ডেপুটী বা মুন্সেফ হওয়া নয় বড় জোর একটা হাইকোর্টের জজ্ হওয়া। হায়, হায়, যে নিজের ঘরে বন্দী, নিজের অন্ন পরের হাতে খায়—তা'র কি মনের তেজ, দেহের বল থাকিতে পারে! তা'র কেননা শীর্ণ দেহ, উৎসাহহীন মন, দমিত আশা—জীবনের প্রধান উপকরণ হইবে? সে কেননা পরের সেই Indrader এর এক বিন্দু কৃপা পাইলে নিজেকে ধন্য মনে করিবে?

এই পরনির্ভরতা বাস্তবিকই বাঙ্গালীর মজ্জা একেবারে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। আমি ক্রমশঃ দেখাইতেছি যে, যত সব অনর্থ, যত কিছু শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা—তৎসমুদয়ই এই পরনির্ভরতার পরিণাম। হায়, হায়, বাঙ্গালী কেন পরমুখাপেক্ষী হইল?

তা'র পর, বাঙ্গালীর রাজা বিভিন্ন জাতীয়ও বিভিন্ন দেশীয় হওয়ায় বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের কম ক্ষতি হয় নাই। সে সর্ব্বদা রাজার জাতির সহিত নিজেকে তফাৎ করিয়া দেখে, খাটো করিয়া দেখিতে শিখে। এই খাটো করিয়া দেখা, এই আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস, তাহার উন্নতির পথে অনতিক্রমণীয় বাধার সৃষ্টি করে। সে বুঝে, সে দেখে,—আমি ধরাধামে নগণ্য, ছোট, রাজার জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট। রাজার জাতির কাছে নমিত হওয়ায় রাজার জাতিরই ক্ষমতার প্রাবল্য স্বীকৃত হয় এবং নিজে ভগ্ন স্বাস্থ্যকে বরণ করিয়া বাঙ্গালী হীনতাকে আশ্রয় করে।

আধুনিক বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যভঙ্গের আরম্ভ বাল্যকাল হইতে। আগের দিনে যখন বাঙ্গালীর সব ছিল—হিন্দুর গৌরব ছিল, ব্রাহ্মণের তপোবল ছিল, সেই দিনে বালককে কি সুন্দরভাবে শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত ছিল! গুরুগৃহে প্রথমতঃই চরিত্র শিক্ষা, ব্রহ্মচর্য্য পালন, পরে বিদ্যোপার্জ্জন। ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষাটা বাল্যকালের একটা প্রকৃষ্ট শিক্ষা ছিল। কারণ বীর্য্যই উন্নত মনের স্রষ্টা। সুতরাং বীর্য্যকে কিরূপে রক্ষা করা যাইতে পারে তাহার, উপায় আগেই জানা আবশ্যক। কিন্তু যখন হইতে বাঙ্গলী পরমুখাপেক্ষী হইল; পরের ধর্ম্ম, পরের আদর্শ ভয়াবহ হইয়া যখন বাঙ্গালীর ঘাড়ে চাপিয়া বসিল, তখন হইতে তাহার সব লোপ পাইতে থাকিল, ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত একেবারে ভারতের বুক হইতে মুছিয়া গিয়াছে। তৎপরিবর্ত্তে পাশ্চাত্য আচার-ব্যবহার, পাশ্চাত্যের অনুকরণে স্ত্রী-জাতির সহিত আধ মিশ্রণ,—বিলাতি courtship, বাঙ্গালীর মজ্জাগত হইতেছে। ফলে বাল্যকাল হইতে বাঙ্গালীর ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। বীর্য্য ক্ষয়ে অপরিণত বয়স্ক বালক যৌবনের প্রারম্ভেই শীর্ণ শরীর-বৃদ্ধ হইয়া গড়িয়া উঠিতেছে, মৃত্যুর আহ্বান

যেন সর্ব্বদা তাহাদের শিয়রে জাগিয়া আছে। যে জাতি ব্রহ্মচর্য্যে শীর্ষস্থানীয় ছিল, অধুনা সেই জাতির মত ব্রহ্মচর্য্যহীন জাতি পৃথিবীর আর কোথায়ও নাই। কি তীব্র, কি কঠোর, কি নিষ্ঠুর, কি মারাত্মক পরিবর্ত্তন! আজকালকার বালকগণ কিরূপ অল্প-বয়সে উচ্ছৃঙ্খল, তাহা এই "আয়ুর্ব্বেদ" পত্রের "কাজের কথা" যাহারা নিয়মিতরূপে পাঠ করেন, তাঁহাদিগের নিকট আর তাহার উল্লেখ করিতে হইবে না। বাস্তবিকই বালক-জগত আজ বীর্য্যক্ষয়ে ম্রিয়মাণ। বাল্যকালের এই বীর্য্যক্ষয় যে কিরূপ সর্ব্বনাশকর তাহা বলিয়া বুঝাইবার জো নাই। বাল্যকালেই যখন পরিপক্ক বয়সের সূচনা হয়--বালকই যখন পরে প্রবীণ মানব হইয়া গড়িয়া উঠে—যখন the child is father of the man তখন বালককে বড় সাবধান হইয়া পালন করা উচিত। কারণ তা'র উচ্ছৃঙ্খল জীবন, হীনবল ও দুর্ব্বল-মন মানব-সমাজের সৃষ্টি করে, এবং তার সংযত সাধনা—ধাম্মিক, দীর্ঘকায় ও সবল মনস্বীগণের দ্বারা ভূপৃষ্ঠ পূর্ণ করিয়া দেয়। মিল্টনের বাণী সার্থক The child shows the man as morning shows the day.

অতএব বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যোন্নতির বিধান করিতে হইলে প্রথমেই বালকের ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে। তাহাদের শারীরিক উন্নতির জন্য পুষ্টিকর খাদ্য ও উপযুক্ত ব্যায়ামের সুবিধা করিয়া দিতে হইবে। বালক যদি সুস্থকায় ও সবল হইয়া গড়িয়া উঠে, তবে বাঙ্গালীর পূর্ব্বদিন আবার ফিরিয়া আসিবে। আমরা দেখিব বিস্তৃত রাজপথে শিখসৈন্যের মত প্রশস্ত ললাট, সমুচ্চবক্ষ, আজানুলম্বিতবাহু, মানসিক তেজ ও শারীরিক ওজঃ লাবণ্যে ভাস্বর—অসংখ্য বাঙ্গালী আদি স্বাধীন যুগের সুহাস্যে হাসিয়া উঠিবে।

বাঙ্গালীর ক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্যের একটী উল্লেখযোগ্য কারণ এই যে, স্বাস্থ্যরক্ষা যে একটী অত্যাবশ্যক ধর্ম্ম—এ কথা সে পরিপূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়াছে। অথচ তাহারই পূর্ব্ব পুরুষ একদিন সেই বিজ্ঞান সম্মত বাণী উচ্চারণ করিয়াছিল-- "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং।" আজ সে কাণা কড়িকেই বড় করিয়া ধরিয়াছে। শক্তিকে যে উপেক্ষা করে, শক্তিমানকে সে একটা অনাবশ্যক সৃষ্টি, একটা অন্যায় উপদ্রব, একটা 'গুণ্ডা' বলিয়া বিবেচনা করে, শক্তির কাজ, সাহসের কাজকে সে অভদ্রোচিত হঠকারিতা বলিয়া উপহাস করে। আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এমন অনেকে আছেন যাহারা শীর্ণকায়, শক্তিমাত্রহীন, তাঁহাদের প্রধান প্রয়াস এই প্রমাণ করা যে—শক্তিশালী মাত্রেই নির্ব্বোধ ও তাঁহাদের ন্যায় শীর্ণকায় না হইলে বুদ্ধিমান হইবার উপায় নাই। একি ভীষণ কুসংস্কারের কথা! ভাবিলেও যে আতঙ্ক উপস্থিত হয়! হায় বাঙ্গালী! আজ শরীরকে, বলকে এত খাট' করিয়াছ?

পরাধীন বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহানির অন্যতম কারণ—কেরাণীগিরি ও চাকরির উপর তাহার একান্ত ভক্তি। সে বাণিজ্য করিবে না বা মূলধনের অভাবে করিতে পারে না। ভদ্রতার হানির জন্য সে চাষ আবাদে মন দিবে না, কিন্তু ১৫।২০ টাকার জন্য জাতি নির্ব্বিশেষে ভুলিয়া যাহার তাহার পদলেহন করিতে পারিবে। অসময়ে খাওয়া, ব্যায়ামের অভাব, স্বল্প আয়ে সাংসারিক খরচ নির্ব্বাহ করার দারুণ চিন্তা, কন্যাদায়, ঋণশোধের চেষ্টা [illegible] শরীর ও [illegible]

মনকে একেবারে নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে।

বাঙ্গালী বড় কদর্য্য খায়। প্রথমতঃ তা'র রোজগার অল্প, তদুপরি একজনের ঘাড়ে ভর করিয়া দশজনে থাকে। এক পয়সায় অক্রূর সংবাদ শোনা হয় না। অর্দ্ধাশনে বা অল্প খাদ্যে পনের আনা বাঙ্গালী কষ্ট পায়। বাঙ্গালীকে স্বাবলম্বন শিখিতে হইবে। প্রত্যেককে নিজে নিজে উপার্জ্জন করিতে শিখিতে হইবে। তাহা হইলে আয় বেশী হওয়ায় সকলে পুষ্টিকর সুখাদ্য দ্রব্য ভক্ষণে মনোযোগী হইতে পারিবে ও সুন্দর স্বাস্থ্য লাভ করিবে।

আর একটা সর্ব্বনাশ করিতেছে—খাদ্যাদির কৃত্রিমতার—'ভেজালে'। আধুনিক যুগের সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে যেন 'ভেজাল' আগমন করিয়াছে। কোন জিনিষই বিশুদ্ধ পাইবার উপায় নাই। ঘৃতে, 'ভেজাল,' তৈলে 'ভেজাল' দুগ্ধে 'ভেজাল। মানুষ বাচিবে কি খাইয়া? বাঙ্গালী পেটের দায়ে অল্প পয়সায় ঐ সব অপবিশুদ্ধ জিনিষ ক্রয় করিয়া মনে করে—পুষ্টিকর খাদ্য লইতেছি, কিন্তু কি বিষ তাহারা শরীরে গ্রহণ করিতেছে, তাহা বারেকের তরেও উপলব্ধি করে না। ঘৃতের ভেজালের যে লজ্জাকর জনক কাহিনী শুনিয়াছি, তাহা লিখিয়া লেখনী কলঙ্কিত করিব না। বাঙ্গালী এইরূপ নিয়ত কত বিষ ও অভক্ষ্য গ্রহণ করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ফলে নানারূপ আধি-ব্যাধি বাঙ্গালীকে বেড়িয়া ধরিতেছে। পয়সা কম,—কিন্তু উৎকৃষ্ট খাদ্য গ্রহণের ইচ্ছা বলবতী, কাজেই কৃত্রিম জিনিষ ক্রয় ভিন্ন উপায় নাই। ব্যবসায়ীরাও কেরাণী বাবুদের ইচ্ছা পূরণার্থে ঘৃতে নারিকেল তৈল বা সাপের চর্ব্বি মিশ্রিত করেন দুগ্ধে বারো আনা জল শুধু তাহাই নহে, তাহাতে এরারুট ও চিনি মিশ্রিত করিয়া সুমিষ্ট করিয়া লয়।

তদুপরি রাজার জাতির অনুকরণে যে আমাদের স্বাস্থ্যের কম ক্ষতি হইতেছে তাহা নহে। পাশ্চাত্য অনুকরণে চায়ের অপকারিতা আজি কালিকার দিনে বুঝিবার প্রধান বিষয় হইয়াছে। বাঙ্গালীর পক্ষে হ্যাট্-কোট পরিধান বিশেষ স্বাস্থ্যহানিকর। এমন কি, পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে ফুটবল খেলা আমাদের দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য। কিন্তু আমাদিগকে যে অনুকরণ করিতেই হইবে, সুতরাং ছেলেদের সে খেলা না শিখাইয়া উপায় নাই।

এইত যতদূর মনে পড়িল বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের বিবরণ প্রদান করিলাম। খুঁজিয়া দেখিলে এমন শত সহস্র বিষয় বাহির করা যায়। যাহা হউক অধুনা এই বিষম সমস্যার যুগে বাঙ্গালী কেমন করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে পারে সে বিষয় যৎকিঞ্চিৎ বলা যাউক।

বাঙ্গালী আত্ম প্রাণকে স্বাধীন করিতে শিখুক। শরীর অন্যের পরাধীন হইতে পারে, কিন্তু মনের উপর অন্য কাহারও অধিকার নাই। মন স্বাধীন হইলে মনের প্রফুল্লতায় তাহার স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার হওয়ার খুবই সম্ভাবনা। বাঙ্গালী স্বাবলম্বন শিক্ষা করুক। প্রত্যেকেই নিজের পায়ে নিজে দণ্ডায়মান হউক। এক জনের ঘাড়ে ভর করিয়া যেন দশজন থাকিতে চেষ্টা না করে। তাহা হইলে উপার্জ্জন বেশী হইবে ও স্বচ্ছলতা বাড়িবে। আমাদের উদ্দেশ্য হউক—আমরা আয় বুঝিয়া যত কমই হউক খাঁটি জিনিষ ব্যবহার করিব। অল্প পয়সায় বেশী বা মূল্যবান জিনিষ আশা করিলে তাহা প্রায়ই

অসার ও অপরিশুদ্ধ হয়। লোভের জন্য, সাময়িক রসনা তৃপ্তির জন্য, আমরা যেন স্থায়ী-ধন স্বাস্থ্যকে না হারাই।

বাঙ্গালীর চাকরির প্রতি পরম ভক্তি ত্যাগ করিতে হইবে। গোলামীকে ছাড়িয়া আত্ম নির্ভরতাকে বরণ করিতে হইবে। স্বাধীন মনঃপ্রবৃত্তি যে শরীরের স্বাস্থ্যবিধান করে ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। বাঙ্গালী আজি হইতে নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া উপার্জ্জন করিতে শিখুক। কুড়ি টাকার জন্য একটী গাধার মত ভারবাহী না হইয়া, স্বাধীন মন লইয়া বানিজ্য করুক কৃষিকর্ম্ম করুক। মূলধন কম? সবাই কি ধনী হইবে? বিনা ধনেও ব্যবসা করা চলে।

লোক দলে দলে বড় বড় ব্যবসায়ীর স্থানে apprentice ভাবে কাজ করুক, তাহাদের নিকট বিশ্বাসী হউক। তৎপরে সেই ব্যবসায়ীই মহাজন হইয়া তাহাকে ধার দিবে, তাহার ব্যবসায়ের সুবিধা করিয়া দিবে। চাই বিশ্বাস, চাই সত্য, চাই ধর্ম্ম, সত্যের জয় ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী।

বঙ্গদেশের কৃষিক্ষেত্র গুলি সমস্তই অজ্ঞ-অশিক্ষিতের দ্বারা কর্ষিত হয়। ঐ সব ক্ষেত্র যদি বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে শিক্ষিত লোকের উপদেশে ও তত্ত্ব বিধানে কর্ষিত হয়, তবে ক্ষেত্রে কত বেশী ফসল হয়? ছোট লোকও মজুরি খাটিয়া পয়সা পায়। শিক্ষিত বাঙ্গালীও কেরানীগিরি না করিয়া প্রভুত আয় করিতে পারে। প্রত্যেকের জমী না থাকিতে পারে, কিন্তু জমী সংগ্রহ করিতে সকলেই পারে। বাণিজ্যে বাস্তবিকই লক্ষ্মী বসতি করেন—ফলে যে বাণিজ্য করে, সে তো লাভবান হয়ই অধিকন্তু অপরেও কায়ক্লেশে যা' উপার্জ্জন করে, তাহাতে তাহারা লাভবান হয়। এইরূপ ভাবে আত্ম নির্ভর করিয়া উপার্জ্জন করিতে শিখিলে, মন পবিত্র থাকে, স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে।

শেষ কথা আমাদের আদর্শ থাকিবে অনুকরণ নহে—কিন্তু সমীকরণ। পরের জিনিষ আমরা গ্রহণ করিতে পারি এবং চিরকাল করিব কিন্তু নিজস্বকে ত্যাগ করিয়া নহে! আমার ধর্ম্ম, আমার জাতীয়তা, আমার আদর্শ-চিরকালই আমার থাকিবে। অনুকরণের দ্বারে তাহাদিগকে বলি দিব না। পরের কাছ হইতে যাহা আহরণ করিব, তাহাতে ঐ জাতীয়তা, ঐ আমার ধর্ম্ম, ঐ আমার আদর্শ পুষ্টিলাভ করিবে। যদি ইহা করিতে পারি, তবে দেখিব আবার নবীনতর স্বাস্থ্য-সুষমা বাঙ্গালীর অঙ্গে অঙ্গে ক্ষরিয়া পড়িতেছে। আবার দেখিব বাঙ্গালী মনের স্বাধীনতার আনন্দে শিহরিত হইয়া উঠিতেছে,—আর বাঙ্গালী ভিক্ষুক নহে, আর বাঙ্গালী অনুকরণশীল নহে; আর বাঙ্গালী পরাধীন নহে। জগতের অন্যান্য জাতির মত জাতীয় মহাসভা-স্থলে সেও তার আপন উচ্চাসন বাছিয়া লইবে। সেও উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কহিবে—"ওগো আমি ছোট নহি। এককালে আমি কত বড় ছিলাম। আমার বিজ্ঞান, আমার চিকিৎসা শাস্ত্র, আমার জ্যোতিষ কত জাতিকে অজ্ঞতার অন্ধকূপ হইতে উদ্ধার করিয়াছিল, কত জাতি আমারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আজি ধরাধামে ধন্য ও বরণীয় হইয়াছে। আমি আবার অতীত সংস্কারকে মস্তকে করিয়া তোমাদেরই মাঝে আসন বাছিয়া লইবার জন্য আসিয়াছি। আমার অতীত গৌরবের ধারণা করিয়া, তোমরা আমাকে ঘৃণা করিতে পার না।

তোমরা আজ আমাকে স্বীকার কর, বরণ কর। তাহা হইলেই আজ তোমাদের পক্ষ হইতে আমাকে চরম কৃতজ্ঞতা দেখান হইবে।”

সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম,এ।

পঞ্চকর্ম্ম।

—:o:—

ক। বমন, বিরেচন, স্বেদ আর স্নেহ সম্বন্ধে আর একটু ব’লছি। উদ্ধভাগ দিয়ে দোষহরণ করার নাম বমন এবং অধোভাগ দিয়ে দোষ হরণ করার নাম বিরেচন। রেচন অর্থাৎ দোষ নিঃসরণ করে ব’লে উভয়কেই আবার বিরেচন বলা যায়। সুতরাং যেখানে অধোভাগ দিয়ে দোষ হরণ করায় অপকার ঘটে, সেখানে উর্দ্ধ ভাগ দিয়ে এবং যেখানে অধোভাগ দিয়ে দোষহরণ করায় বিপত্তি ঘটে, সেখানে উদ্ধভাগ দিয়ে দোষহরণ করা যেতে পারে। আর শাস্ত্রে বলে যে, যেমন স্নেহাক্ত পাত্রে মধু রা’খলে যেমন মধু পাত্রে সংলগ্ন হয় না এবং পাত্র থেকে সমস্ত মধু অনায়াসে ফেলে দেওয়া যায়, সেইরূপ স্নেহাক্ত শরীরে বমন-বিরেচন প্রয়োগ ক’রলে, সমস্ত দোষকে অনায়াসে বাহির ক’রে দেয়। আর স্বেদত নানা কারণে আপনারাও দিয়ে থাকেন। নিমোনিয়ায় শুষ্ক শ্লেষ্মা বক্ষে আবদ্ধ হ’লে, তরল হ’য়ে যা’তে সহজে উঠে যায়—সে জন্যে স্বেদ দেওয়া হয়। পঞ্চকর্ম্মের পূর্ব্বে স্বেদ দিলেও তেমনি দোষ সকল উৎক্লিষ্ট অর্থাৎ বহির্গমনোন্মুখ হ’য়ে আমাশয়ে বা পক্কাশয়ে সঞ্চিত হয়।

ডাঃ। এখন বেশ বুঝতে পা’রলাম। এখন বিরেচনের পরে কি ক’রতে হয় বলুন?

ক। বিরেচনের পর যতদিন না পূর্ব্বের মত বল ও বর্ণ লাভ না হয় এবং মন ও শরীর সুস্থ এবং অন্নসুজীর্ণ না হয়—ততদিন বল, শরীর প্রকৃতি, বয়স, সাত্ম্য, দেশ কাল প্রভৃতি বিচার ক’রে, বমন করার পর যেরূপ নিয়মে আহার দেবার কথা বলা হ’য়েছে, সেইরূপ আহার দিতে হয়। তা’রপর বল বর্ণাদি হ’লে মাথা ধোওয়া, গাত্রে সদ্গন্ধ মাখা এবং উত্তম বস্ত্রাদি ধারণ করিয়ে জ্ঞাতি বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক’রতে দেবে এবং ইচ্ছামত আহার বিহারাদি ক’রতে ব’লবে।

ডাঃ। কেন তার পূর্ব্বে কি জ্ঞাতি বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা নিষেধ নাকি?

ক। রাজা রাজতুল্য লোককে পঞ্চকর্ম্ম প্রয়োগ ক’রতে হ’লে উপযুক্ত গৃহ নির্ম্মাণ ক’রে, তা’র ভিতরে সমস্ত উপকরণ রেখে তবে পঞ্চকর্ম্ম ক’রতে হয়। চিকিৎসা শেষ হ’লে তবে রোগীকে ঘরের বাহির করে।

ডাঃ। কৈ সে কথা ত আগে বলেন নি।

ক। ব’লেও লাভ নেই, শুনেও লাভ নেই। আর রাজ রাজড়া ছাড়া সে রকম কেউ ক’রতে পারে না।

ডাঃ। তবে কি দরিদ্রের পক্ষে পঞ্চকর্ম্ম বিহিত নয়?

ক। অনেকটা সেই রকমই বটে। তবে শাস্ত্রকার ব'লেছেন যে, দরিদ্রের পক্ষে পূর্ব্ব কথিত দ্রব্য সকল সংগ্রহ করা সুকঠিন। অতএব দরিদ্রের ব্যাধি হ'লে তা'কে একরকম ক'রে বিরেচন প্রয়োগ করবে। কেন না, সকল মনুষ্যের সমস্ত উপকরণ থাকে না, আবার দরিদ্রের দারুণ রোগ হ'য়ে থাকে। অতএব দরিদ্রের রোগ উপস্থিত হ'লে যে রকম ঔষধ সে সংগ্রহ ক'রতে পারে, আর যেরূপ অশন বসন জোটে, তা'র সাহায্যেই চিকিৎসা ক'রতে হ'বে।

ডাঃ। দরিদ্রের প্রতি সবাই বিমুখ দেখছি। এখন বড়লোক মশাইদের জন্যে কি রকম কি ক'রতে হয় বলুন শুনি।

ক। শুনুন তবে' প্রথমেই একটা উপযুক্ত গৃহ নিম্মাণ ক'রতে হ'বে। গৃহটী দৃঢ় ও বায়ুরহিত হ'বে, কেবল এক্‌স্থানে বায়ু চলাচলের পথ থাকবে। গৃহে বিচরণ ক'রতে যেন কোন কষ্ট না হয়। গৃহের পার্শ্বে যেন অন্য উচ্চ গৃহ বা পর্ব্বতাদি না থাকে। গৃহের মধ্যে যেন ধূম, রৌদ্র, ধূলা প্রবেশ করতে না পারে এবং গৃহটী যেন অনিষ্টকর শব্দ, স্পর্শ রূপ, রস ও গন্ধের অগম্য হয়। তা'র পর গৃহের মধ্যে চিকিৎসার জন্য আবশ্যক মত যে সকল বিবিধ দ্রব্য রা'খবার উপদেশ আছে, সংক্ষেপে ব'লছি। সকল কার্য্যে সুনিপুণ এবং কিছুতেই বিরক্ত না হয় এরূপ শুশ্রূষাকারী, গীতবাদ্য ও মনোহর কথা নিপুণ পারিষদ, বিবিধ মনোহর পক্ষী, জীবিতবৎসা নীরোগ গাভী, জল পূর্ণ টব, হাঁড়ি, কলসী প্রভৃতি, তা'রপর রোগীর চিকিৎসার জন্য বিবিধদ্রব্য, পথ্যের জন্য বিবিধ দ্রব্য, শয়ন উপবেশনের শয্যাদি সমস্তই আবশ্যক। এই সকল দ্রব্য সংগ্রহ ক'রে সেই ঘরের মধ্যে থেকে চিকিৎসা কর'তে হয়।

ডাঃ। এ যে আমাদের হাসপাতাল ছাড়িয়ে উঠল দেখছি। হাসপাতালে বাজারের দুধ মাংস ব্যবহার করা হয়, কিন্তু এযে একেবারে দুগ্ধের জন্য গাভী আর মাংসের জন্য পশুপক্ষী সঙ্গে রাখার ব্যবস্থা দেখছি।

ক। ব্যবস্থা কি ভাল নয় বলেন?

ডাঃ। না ভাল খুবই, তবে বড় কঠিন ব্যাপার।

ক। কঠিন ব'লেইত রাজা রাজাদের জন্যে এই রকম বন্দোবস্ত করার কথা বলা হ'য়েছে।

ডাঃ। যাক্ সে কথা। এখন বিরেচনের কম বেশী বা সমান হওয়ার বিষয় বলুন।

ক। দশবার দাস্ত হ'লে জঘন্য, বিশবার দাস্ত হ'লে মধ্যম এবং ত্রিশবার দাস্ত হ'লে প্রধান শুদ্ধি বলা যায়। পরিমাণ অনুসারেও উত্তম এবং অধম বিরেচন বুঝা যায়। তিন সের চব্বিশ তোলা পরিমাণে দাস্ত হ'লে জঘন্য। চার সের চার তোলা হ'লে মধ্যম এবং পাঁচসের আট চল্লিশ তোলা হলে প্রধান শুদ্ধি বলা যায়।

ডাঃ। এযে মারাত্মক শোষণ কবিরাজ মশায়। একেবারে রোগ রোগী—দুই আরাম।

ক। এখন তাই হ'য়েছে, কিন্তু আগে যা' বলেছি, সেই পরিমাণ দাস্তই করান হ'ত। সে সময়ে সে ওষুধয়টা আটতোলা মাত্রায় প্রয়োগ করা যেত; এখন তার মাত্রা—দুই তোলা; কাজেই আগে যা' জঘন্য বিরেচন ছিল, এখন তা'কেই প্রধান বিরেচন ব'লতে হ'বে!

ডাঃ। তা' হ'লে সঙ্গত হয় বটে, এখন সম্যক ও অল্পাধিক বিরেচনের লক্ষণ কি বলুন।

ক। সম্যক বিরেচন হ'লে স্রোতঃ সমূহের বিশুদ্ধি, ইন্দ্রিয় সকলের প্রসন্নতা, শরীরের লঘুত্ব ও বলাধান, অগ্নির দীপ্তি, রোগের নিবৃত্তি, এবং মল, পিত্ত, কফ ও বায়ুর ক্রমশঃ বহির্নিসরণ এই—সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অতিরিক্ত বিরেচন হ'লে যথা রক্তপিত্ত, কফজনিত ও বায়ুজনিত বিবিধ রোগের উৎপত্তি, স্পর্শশক্তির অভাব, গা ভাঙ্গা, ক্লান্তি, কম্প, নিদ্রাহীনতা, দুর্ব্বলতা, চক্ষে অন্ধকার দেখা, উন্মাদ, হিক্কা প্রভৃতি উপসর্গ ঘটে।

অসম্যক বিরেচন হ'লে শ্লেষ্মা, পিত্ত ও বায়ুর প্রকোপ, ঘর্ম্ম নির্গম, অগ্নিমান্দ্য, শরীরের গুরুতা, তন্দ্রা, বমি, অরুচি ও বায়ুর প্রতিলোমতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অসম্যক বিরেচন হ'লে, যে দিন বিরেচন প্রয়োগ করা হয়—সে দিন দিবাভাগে যবাগু পান ক'রতে দিবে না। অল্প ক্ষুধা বোধ হ'লে দিবসান্তে আহার করিতে দিবে। কারণ অগ্নির অল্প উদ্রেকে অতি লঘুপাক দ্রব্য আহার করিতে দিলেও অল্প অগ্নিতে তৃণ ও শুষ্ক গোময়াদি দিলে যেমন ক্রমে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সেইরূপ অন্তরাগ্নিও ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে দিবসে বিরেচন ঔষধ পান করা যায়, সেই দিবস যদি সম্যক বিরেচন না হয়, তাহা হইলে সেইদিন আহার করিয়া পর দিন বিরেচন করাইবে।

ডাঃ। অতিরিক্ত বিরেচন হ'লে কি ক'রতে হয়।

ক। অতিরিক্ত বিরেচন হ'লে পিত্তনাশক ক্রিয়া অর্থাৎ শৈত্যাদি প্রয়োগ হিতকর। বিরেচন দ্বারা ক্ষীণ দেহ ব্যক্তির পক্ষে মাংস রস, ঘৃত, দুগ্ধ এবং মনোজ্ঞ বলকারক দ্রব্য সুপথ্য। বিরেচনের অতিযোগবশতঃ শোণিত নির্গত হ'তে থাকলে, মৃগ, মহিষ বা ছাগলের সদ্যো নিঃসৃত রক্ত পান ক'রতে দেবে। ঐ সকল জীবের রক্ত কুশমূলের কল্কের সঙ্গে মিশ্রিত ক'রে বস্তি প্রয়োগ করাও চলে।

ডাঃ। আচ্ছা বিরেচন সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদে আর কি উপদেশ আছে বলুন?

ক। উপদেশ অনেক, সব ব'লতে গেলে একখানা বৃহৎ গ্রন্থ হ'য়ে প'ড়ে। সেই জন্যে বাদসাদ দিয়ে স্থূলভাবে ব'লছি শুনুন।

ডাঃ। বিরেচন ঔষধ সেবন ক'রে মলের বেগ উপস্থিত হ'লে যদি সে বেগ ধারণ করা যায়, তা'হ'লে দোষ কুপিত হয়ে হৃদয়ে গিয়ে উৎকট হৃদ্রোগ এবং হিক্কা শ্বাস, পার্শ্ববেদনা, দীনতা, লালাস্রাব ও দৃষ্টিবিভ্রম প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন করে। রোগী সংজ্ঞাহীন হ'য়ে জিহ্বা দংশন এবং দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে। এরূপ অবস্থা ঘ'টলে চিকিৎসক বিভ্রান্ত না হ'য়ে তৎক্ষণাৎ সেই রোগীকে বমন করা'বেন। পিত্তজ মূর্চ্ছার লক্ষণ প্রকাশ পেলে মধুর রসযুক্ত ঔষধ দ্বারা আর কফজ মূর্চ্ছার লক্ষণ প্রকাশ পেলে কটুরসযুক্ত ঔষধ দ্বারা বমন করা'তে হয়। তা'রপর দোষনাশক পাচন প্রয়োগ ক'রে ক্রমশঃ অগ্নির বল ও শারীরিক বল বৃদ্ধির চেষ্টা ক'রতে হয়।

ডাঃ। পিত্তজ মূর্চ্ছা আর কফজ মূর্চ্ছা কিরূপ লক্ষণ দ্বারা বুঝা যায়।

ক। এইজন্যেই তো ব'লছিলাম যে, সমস্ত কথা ব'লতে গেলে সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ ব'লতে হয়।

ক। পিত্ত প্রধান ব্যক্তিকে বা পিত্তজ রোগে কষায় ও মধুর দ্রব্য দ্বারা, কটু

দ্রব্য দ্বারা এবং বায়ুতে স্নিগ্ধ উষ্ণ ও স্নেহ দ্রব্য দ্বারা বিরেচন করা'তে হয়। বিরেচন না হ'লে উষ্ণ জল পান এবং হাত গরম ক'রে উদরে স্বেদ দেওয়া কর্ত্তব্য।

দুর্ব্বল ব্যক্তি, যাহাদের পূর্ব্বে শোধন করা হ'য়েছে এরূপ ব্যক্তি, অল্প দোষযুক্ত ব্যক্তি, কৃশ এবং যাহাদের কোষ্ঠ কঠিন নাই, তাদের মৃদু বিরেচন প্রয়োগ করা উচিত। রুক্ষ বায়ু প্রধান, ক্রূর কোষ্ঠ, ব্যায়ামসেবী এবং দীপ্তাগ্নি ব্যক্তিকে বিরেচন প্রয়োগ ক'রলে দাস্ত না হ'য়ে ঔষধ জীর্ণ হয়ে যায়। সেই জন্য এইরূপ ব্যক্তিকে বিরেচন করাতে হ'লে প্রথমে বস্তি ক্রিয়া ক'রে পরে স্নেহ সংযুক্ত বিরেচন প্রয়োগ ক'রাতে হয়। এতদ্ভিন্ন অস্নিগ্ধ ব্যক্তিকে স্নিগ্ধ ও স্নিগ্ধ ব্যক্তিকে রুক্ষ এবং যে সকল ব্যক্তি স্নেহ পানে অভ্যস্ত তাহাকে রুক্ষ ক'রে স্নিগ্ধ বিরেচন প্রয়োগ ক'রতে হয়।

ডাঃ। এই খানেইত গোলমাল হচ্ছে কবিরাজ মহাশয়। বমনের পর স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ ক'রে তবে বিরেচন প্রয়োগ ক'রবার কথা বলা হ'য়েছে। এখন আবার অস্নিগ্ধ, রুক্ষ, স্নেহ সাত্ম্য প্রভৃতির কথা বলা হচ্চে। সুতরাং বিরোধ ঘটছে যে।

ক। কেন বিরোধ ঘটবে, পূর্ব্বেত বলেছি যে, অনেক রোগে পঞ্চকর্ম্ম না করে, এক, দুই বা তিন প্রকার কর্ম্ম করবার আবশ্যক হয়। আবার এ সকল ক্ষেত্রে প্রায় কর্ম্ম ও অর্থাৎ স্নেহ স্বেদ প্রয়োগ করবার আবশ্যক হয় না, সুতরাং বিরোধ ঘটলো কি করে?

ডাঃ। হাঁ বুঝেছি এইবার। এখন বিরেচন সম্বন্ধে আর কি জানবার আছে বলুন।

ক। মোটামুটি সবই এক রকম বলেছি। তবে বিরেচন ঔষধ প্রয়োগের সম্বন্ধে যে একটু বিশেষত্ব আছে, তার দুই একটা উদাহরণ দিচ্ছি। এই মনে করুন, রোগীকে একগাছা আক খেতে দিলে কিম্বা মৃদুকোষ্ঠ ব্যক্তি গলায় ফুলের মালা শুকলে তার বিরেচন হবে।

ডাঃ। সে কি রকম?

ক। এক গাছা আক দু' খণ্ড করে তার অভ্যন্তর ভাগে তেউড়ী মূলের কল্ক বাটা মাখাতে হয়। আর সেই দুই খণ্ড আক একত্র ক'রে দড়ি দিয়ে বেঁধে কুশ দিয়ে জড়িয়ে তার উপর মাটির লেপ দিতে হবে। তারপর পুট পাকে অর্থাৎ ঘুটের আগুনে পুড়িয়ে ঠাণ্ডা হলে রোগীকে খেতে দিতে হয়। এতে পিত্তজ রোগ পীড়িত ব্যক্তির সহজে দাস্ত হয়।

ডাঃ। বাঃ এত বেশ মজার ওষুদ খাওয়ান। শুনেছি হাকিমেরা রোগীর ইচ্ছায় মিষ্টি ঝাল এবং সুস্বাদু করে ওষুদ খেতে দেয়। সেটা বোধ হয় আয়ুর্ব্বেদের এইরূপ ঔষধ প্রয়োগের অনুকরণে হ'য়ে থাকবে।

ক। খুব সম্ভব তাই। কেননা আয়ুর্ব্বেদ থেকেই মুসলমানী চিকিৎসা শাস্ত্রের উৎপত্তি। যাক সে কথা, এখন মালার কথা বলি শুনুন। তেউড়ী, সোঁদাল, দন্তী, শঙ্খিনী ও সপ্তলা—এই সকলের চূর্ণ সমান ভাগে নিয়ে রাত্রিতে গো-মূত্রে ভিজাইয়া রাখিবে এবং দিবসে সূর্য্যতাপে উদ্ধার করিবে। এই নিয়মে শত ভাবনা দিতে হবে। আর মনসার আঠাও এই রকম নিয়মে সাত দিন ভাবনা দিতে হবে। তার পর সুগন্ধ ফুলের মালাতে এই সমস্ত ওষুদ মাখাবে। শরীর বস্ত্র দ্বারা আবৃত ক'রে এই মালার আঘ্রাণ নিলে মৃদুকোষ্ঠ ব্যক্তির সুখে বিরেচন হয়।

ডাঃ। চমৎকার ঔষধ প্রয়োগ বটে। আরও কি রকম প্রয়োগের নিয়ম আছে বলুন। শুনতে কৌতূহল হচ্ছে।

ক। রোগী যা'তে বিনা কষ্টে ওষুদ খেতে পারে, তা'র জন্যে নানাপ্রকার কল্পনা আছে। দুগ্ধের সঙ্গে, মাংসের সঙ্গে, শুষ্ক মৎস্য ও শুষ্ক মাংসের সঙ্গে, সববতের সঙ্গে, সুরার সঙ্গে, আসবের সঙ্গে, অরিষ্টের সঙ্গে, আরও অনেক দ্রব্যের সঙ্গে প্রয়োগ করার নিয়ম আছে।

ডাঃ। আচ্ছা বমনকারক ওষুদের কি এ রকম প্রয়োগ নাই?

ক। আছে বৈকি। বিরেচন ঔষধের কল্পনাও যত রকম, বমনকারক ঔষধের কল্পনাও প্রায় তত রকম। বমনকারক ঔষধ ফুলের মালায় মাখিবে, সেই মালা শুঁকিয়েও বমন করা'বার নিয়ম আছে।

ডাঃ। ঔষধ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ অদ্বিতীয় দেখ্‌ছি।

ক। এইটুকু শুনেই সে কথা ব'লবেন না। বমন ও বিরেচনকারক ঔষধ সকলের কথা ব'লে পরে শাস্ত্রকার বলেছেন ঃ—

"এই যে ছয় শত ঔষধের কথা বলা হইল, ইহা কেবল দিক্‌দর্শন মাত্র। চিকিৎসক স্বীয় বুদ্ধি বলে এইরূপ সহস্র বা কোটী যোগ কল্পনা করিয়া লইবেন। দ্রব্যের কল্পনা বহুবিধ বলিয়া যোগ সকলের সংখ্যার সীমা নাই।

ডাঃ। তা' মশা'য়েরা নূতন কল্পনা করা দূরে থাকুক, যে ছয় শত প্রকার কল্পনা শাস্ত্রকারেরা ক'রে গেছেন, সে গুলিও বোধ হয় ভুলে গেছেন।

ক। হাঁ সে কৃতিত্ব টুকু আমাদের ঘ'টেছে বৈকি?

ডাঃ। বড়ই দুঃখের বিষয় কবিরাজ ম'শায়। তা' যাক, এখন বিরেচন সম্বন্ধে যদি আর কিছু জ্ঞাতব্য থাকে ত বলুন।

ক। পূর্ব্বে বমন বিরেচনের হীনযোগ, সম্যক যোগ ও অতি যোগের কথা ব'লেছি। তা' ছাড়া তীক্ষ্ণ, মধ্য ও মৃদু ভেদে বমন-বিরেচন তিন প্রকার। যে বমন, বিরেচন বা নিরূহ দ্রব্য প্রদত্ত হ'লে সত্বর তাহার ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হয়, যাহা অত্যন্ত গ্লানিকর নহে, যাহা গুহ্যদেশ ও হৃদয়ে বেদনা জন্মায় না এবং যাহা অন্নাশয় থেকে সমস্ত দোষকে নিস্কাশিত করে, সেই হ'ল তীক্ষ্ণ।

যে সকল ঔষধ জল, অগ্নি ও কীট দ্বারা দূষিত নয়, উপযুক্ত স্থান থেকে উপযুক্ত কালে গৃহীত, তুল্যবীর্য্য ঔষধ দ্বারা ভাবিত এবং অপেক্ষা কৃত অধিক মাত্রায় প্রযুক্ত—সেই ঔষধ স্নিগ্ধ ব্যক্তিকে প্রয়োগ ক'রলে তীক্ষ্ণত্ব প্রাপ্ত হয়।

যে সকল ঔষধ ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীন গুণ বিশিষ্ট এবং পূর্ব্বাপেক্ষা হীন মাত্রায় প্রযুক্ত, সেই সকল ঔষধ স্নিগ্ধগুণ ব্যক্তিকে প্রয়োগ ক'রলে মধ্যতা প্রাপ্ত হয়। আর যে ঔষধ মন্দবীর্য্য, অতুল্য বীর্য্য ঔষধ দ্বারা ভাবিত, অল্পমাত্রায় প্রযুক্ত, সেই ঔষধ রুক্ষ ব্যক্তিকে প্রয়োগ করলে মৃদুতা প্রাপ্ত হয়।

মধ্য ও মৃদুবীর্য্য ঔষধ বলবান ব্যক্তিদের সমস্ত দোষ হরণ ক'রতে পারে না ব'লে, তা'দের সম্যক্ শোধন হয় না। এই জন্য বলবান ব্যক্তিদের তীক্ষ্ণ এবং মধ্যবান ও হীনবান ব্যক্তিদের মধ্য ও মৃদু ঔষধ প্রয়োগ ক'রতে হয়।

আবার যে সকল রোগে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়—তাহা তীক্ষ্ণ ব্যাধি, যাহাতে মধ্যম লক্ষণ প্রকাশ পায়—তাহা মধ্যব্যাধি, আর যাহাতে অল্প লক্ষণ প্রকাশ পায়—তাহা মৃদু ব্যাধি। ব্যাধির বল বুঝিয়া তীক্ষ্ণব্যাধিতে তীক্ষ্ণ ঔষধ, মধ্যম ব্যাধিতে মধ্যম ঔষধ

এবং মৃদু ব্যাধিতে মৃদু ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত।

ডাঃ। ঔষধ সংগ্রহের উপযুক্ত দেশ সকল যাহা এর আগে ব'লছিলেন, সেটা আবার কি?

ক। যে ঋতুতে যে ঔষধির যে অঙ্গ (যেমন ফল পুষ্প, আটা) সম্যক বীর্য্যশালী হয়, সেই ঋতুতে তাহা সংগ্রহ ক'রতে হয়। আবার বল্মীক, ক্ষার, মৃত্তিকা প্রভৃতি স্থানে যে সকল ঔষধ জন্মায়—সেগুলি পূর্ণবীর্য্য হয় না ব'লে, সেই সকল ঔষধি গ্রাহ্য নয়।

ডাঃ। বুঝেছি, তা'র পর বলুন।

ক। বমন বা বিরেচন জন্য প্রদত্ত ঔষধ যদি দোষ সকলকে বহির্গত না ক'রে পরিপাক প্রাপ্ত হয়, তা' হলে বিজ্ঞ চিকিৎসক পুনরায় ঐ ঔষধ সেবন করা'বেন।

যে ব্যক্তি দীপ্তাগ্নি, বহু দোষযুক্ত ও দৃঢ়, স্নেহ গুণ বিশিষ্ট তাহাদের দুঃশোধ্য। ইহা-দিগকে পূর্ব্ব দিন দোষের উৎক্লিষ্টকারক দ্রব্যাদি ভোজন করাইবার পর দিন পুনরায় ঔষধ পান করাইবে। যাহারা দুর্ব্বল ও বহু দোষযুক্ত এবং যাহাদের দোষের পরিপাক হইয়া বিরেচন হয়, তাহাদের ভোজ্য ও রসাদির সহিত ঔষধ সেবন করাইতে হয়?

দুর্ব্বল ও অল্প দোষান্বিত রোগীকে এবং যাহাকে পূর্ব্বে সংশোধন ঔষধ সেবন করান হ'য়েছে—এরূপ ব্যক্তিকে মৃদু ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। কেননা মৃদু ঔষধ বারংবার প্রয়োগ ক'রলেও কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা থাকে না, কিন্তু অতি তীক্ষ্ণ ঔষধ সহসা প্রয়োগ করা উচিত নয়। কারণ তাহাতে শীঘ্র প্রাণ সংশয় হ'য়ে উঠতে পারে।

দোষের বিবদ্ধতা হেতু বমন বা বিরেচন ঔষধ দ্বারা যদি বিলম্বে অল্প দোষ নির্গত হয়—তবে গরম জল পান করান উচিত। ইহাতে আধ্মান (পেট ফাঁপা), পিপাসা, বমি ও দোষের বিবদ্ধতা নষ্ট হয়।

বমন বা বিরেচন ঔষধ যদি দোষ দ্বারা বদ্ধ হয়ে উর্দ্ধ বা অধঃ কোন দিক দিয়ে নির্গত না হয়, এবং উদ্গার ও উদরে শূলবৎ বেদনা হয়—তা' হ'লে স্বেদ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

বিরেচন ঔষধ সেবন ক'রে যদি সম্যক বিরেচন হওয়ার পরেও সেই বিরেচন ঔষধের গন্ধযুক্ত উদ্গার উঠতে থাকে তাহা হ'লে রোগীকে বমন ক'রাবে, তা' না হ'লে অতিরিক্ত বিরেচন হ'বে। আর ঔষধ জীর্ণ হওয়ার পর যদি অতিরিক্ত বিরেচন হয়, তা' হ'লে বিরেচন বন্ধ ক'রবার জন্য শীতল জল পান ক'রা'বে।

ঔষধ কদাচিৎ শ্লেষ্মা দ্বারা রুদ্ধ হইয়া বক্ষঃস্থলে অবস্থিতি করিতে পারে। পরে শ্লেষ্মার ক্ষয় হলে সন্ধ্যাকালে বা রাত্রে আপনা হ'তেই নির্গত হয়। বিরেচন ঔষধ যথাযথ ভাবে প্রয়োগের পর যদি লালাস্রাব, গা বমি বমি বিষ্টম্ভ, পেটভার হয়ে থাকা ও রোমাঞ্চ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ বীর্য্য কটু রসাদি ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত।

সুস্নিগ্ধ ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তির বিরেচন ঔষধ সেবন ক'রে যদি বিরেচন না হয়, তা' হ'লে লঙ্ঘন ব্যবস্থা করা উচিত। ইহাতে স্নেহ জনিত শ্লেষ্মার বিবদ্ধতা নষ্ট হয়।

রুক্ষভোজী, নিয়ত পরিশ্রমী ও দীপ্তাগ্নি শক্তিদের সঞ্চিতদোষ সকল—শ্রমজনক কর্ম্ম বায়ু, আতপ ও অগ্নির দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। উহাদিগের বিরুদ্ধ ভোজন, অধ্যশন (পূর্ব্বাহার অজীর্ণ সত্বে ভোজন) ও অজীর্ণ জনিত দোষ সকলও পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম, বায়ু প্রভৃতি দ্বারা ক্ষয়

প্রাপ্ত হয়। এই সকল ব্যক্তিকে স্নিগ্ধ করিয়া কুপিত বায়ু হইতে রক্ষা করা উচিত। কারণ রুক্ষ ভোজন, পরিশ্রম প্রভৃতি কারণে ইহাদিগের বায়ু কুপিত হইয়া থাকে। ইহাদের কোন বিশেষ ব্যাধি না হইলে বিরেচন করাইবে না।

ডাঃ। বিরেচন সম্বন্ধে সমস্ত বলা হ'য়েচে?

ক। মোটামুটি প্রায় সবই বলা হ'য়েচে। কেবল শিরোবিরেচন বাঁকী রহিল। সেটা নস্য প্রসঙ্গে বলা যা'বে।

ডাঃ। তা' এই যদি আপনার মোটামুটি হয়, তা' হ'লে বিস্তারিত না জানি কি ব্যাপার!

ক। ব'লেছি ত সে বিস্তারিত ব'লতে গেলে একখানা প্রকাণ্ড গ্রন্থ হ'য়ে পড়ে। প্রথমতঃ সে সকল কথা আরও ভাল ক'রে বোঝাবার জন্যে অনেক কথা বলা আবশ্যক। যেমন দাস্ত না হ'লে স্বেদ দেবে। এ কথাটা ভাল ক'রে বোঝাতে হ'লে কি স্বেদ দেবে, কোথায় দেবে, কতক্ষণ দেবে—এ সব কথা ব'লতে হয়। আর বমন বিরেচনের নানা প্রকার যোগ, নানা প্রকার স্নেহের কল্পনা, স্নেহ পাকের নিয়ম, ঔষধ সংগ্রহ বিধি, আরও কত বিষয় ব'লবার আবশ্যক হয়। কাজেই যা' ব'ললাম - তা' মোটামুটি বৈ কি।

ডাঃ। আচ্ছা বিরেচন তো বলা হ'ল, এখন বস্তির কথা বলুন।

ক। আপনি কি এক দিনেই সব শিখ্‌তে চান?

ডাঃ। তা'তে ক্ষতি কি?

ক। না, ক্ষতি কিছু নাই, তবে লোকে ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞ হয়। আর আপনি কি একদিনেই হবেন?

(জনৈক ব্যক্তির প্রবেশ।)

আগন্তুক। এই যে কবিরাজ ম'শায়! আমি আপনার বাসায় খুঁজে এখানে আসছি।

ক। ব্যাপার কি?

আগন্তুক। আমার ছোট ভাই জোলাপের ওষুধ খেয়েছিল। তা' দাস্ত হয়নি, ভয়ানক যন্ত্রণা হ'চ্চে। তা' আপনি চলুন, ডাক্তার বাবুকেও যেতে হবে।

ক। (ডাক্তারের প্রতি) চলুন, আপনার পিচকারী দেবার সরঞ্জাম সঙ্গে নিন।

ডাঃ। যা' আলোচনা করা হচ্ছিল, সেটা দু'জনে একত্রে প্রত্যক্ষ ক'রবার বেশ সুযোগ ঘটেছে।

আগন্তুক। আজ্ঞে আপনাদের পক্ষে সুযোগ বটে, কিন্তু আমার পক্ষে বিষম গোলযোগ। এখন আসুন।

(ক্রমশঃ)

ওয়ার ফিভার।

—:০:—

বিগত কার্ত্তিক মাসের "আয়ুর্ব্বেদ" পত্রে "ওয়ার ফিভার" নামক প্রবন্ধ লিখিয়া তৎসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য যৎকিঞ্চিৎ লিখিয়াছি, সুতরাং ইহাকে উহার দ্বিতীয় প্রবন্ধও বলা যায়। দেখা যাইতেছে, বর্ত্তমানে ওয়ার ফিভারের ছায়া, কায়া, সবই পরিবর্ত্তিত হইয়া একবারে ইহা

সংহার মূর্ত্তিধারণ করিয়াছে। একটা বিষম প্রবল ঝড়ের মত দেশের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে। প্রথমে যখন ওয়ার ফিভার আমাদের দেশে আসিয়াছিল, তখন আমাদের বড় বেশী শত্রুতা করিত না, অধুনা জ্বরটা একবারে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে, আর রুদ্র মূর্ত্তিতে আমাদের উপর লাফাইয়া পড়িতেছে। জ্বরের প্রকারটা আগেকার অপেক্ষা বহু প্রকারে বিভিন্ন এবং বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার উপায় সামান্যই দেখা যায়।

প্রথমে যেমন করিয়া জ্বর আসিত, এখনও তেমন করিয়াই আসে, তবে মূর্ত্তিটা মারাত্মক। আগেও কফ, কাস, গা বেদনাটাকে সঙ্গে লইয়া আসিত, এখনও তা'রাই তা'দের সহায়, বডি গার্ড; অধিকন্তু নিউমোনিয়া নামক উগ্র সিপাহী রোগীর দেহে আসিয়া উপস্থিত হয়। নিউমোনিয়া হইলে রোগী প্রায় বাঁচান যায় না। যাহাদের নিউমোনিয়া প্রথমে হয় নাই, সামান্য কারণেই তাহাদের নিউমোনিয়া হইবার সর্ব্বদাই সম্ভাবনা থাকে। তাহা হইলে রোগীকে বাচানর বড় সম্ভাবনা থাকে না। নিউমোনিয়া আক্রান্ত রোগীকে এই সময় কোন চিকিৎসক ভাল করিতে পারিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় নাই। রোগীর বিলক্ষণ কফ থাকে এবং তাহা দুর্গন্ধময়। কোন্ প্রকার চিকিৎসা যে এ সম্বন্ধে কার্য্যকারী, তাহাও এখনও সঠিক নির্ণীত হয় নাই। আমি যে সকল রোগী দেখিয়াছি, তাহাদিগকে ঔষধ দিলে সাময়িক উপদ্রবগুলি কমিয়া থাকে, কিন্তু ব্যারামের শেষ করিতে কেহই সমর্থ নহেন। সব রোগীই যে মরিয়া যায় এমন নহে শতকরা অর্দ্ধেক ভাল হইয়াও থাকে। যে সকল রোগী, সাবধানে থাকে—তাহাদেরই অধিকাংশ ভাল হয়, আর যাহারা অসাবধান, শরীরে ঠাণ্ডা লাগায়, ভাত বা ঠাণ্ডা দ্রব্য খায় বা পান করে তাহাদের অবস্থাই গুরুতর হইয়া পড়ে। "সাবধানের মার নাই"—কথাটা এখানে অনেকটা খাটে। যাহাদের প্রথম অবস্থায়ই নিউমোনিয়া লইয়া জ্বরটা আসে, তাহাদের রক্ষার উপায় প্রায় দেখা যায় না।

জ্বর যখন হয়—তখন হইতেই সাবধানতা অবলম্বন দরকার। ঠাণ্ডা জল ও অন্ন পথ্য বর্জ্জন করিতে হইবে, ঠাণ্ডা বাতাস যাহাতে লাগিতে না পায় তাহার উপায় করিতে হইবে। যাহাদের জ্বর হয় নাই তাহাদের সকলকেও জল ফুটাইয়া পরে ঠাণ্ডা করিয়া পান করা উচিত। জল ফুটাইয়া লইলে জলে সংক্রামিত হইবার রোগ-বীজাণুগুলি নষ্ট হইয়া যায়। তাহাতে ভাল মানুষের রোগ হইবার আশঙ্কা অতি কম থাকে। আর প্রতিদিন গৃহে ধুপ ও গন্ধক পোড়ান উচিত, তাহাতে দূষিত বাষ্প পরিষ্কার হইয়া রোগের বীজাণু নষ্ট করিয়া দেয়। ওয়ার ফিভার যেখানে আরম্ভ হয়, তথাকার প্রত্যেক গৃহস্থ পরিবারেই এই রোগ হইবার আশঙ্কা থাকে, সুতরাং সকলেরই সতর্ক থাকা বিধেয়।

প্রথমতঃ ওয়ার ফিভারকে আমরা বড় ভয় করিতাম না, কারণ তখন মৃত্যুসংখ্যা প্রায়ই হইত না, কেবল ভোগই ছিল, এখন তা'র অন্যরূপ অবস্থা দেখিয়া দেশের লোক নিতান্ত আশঙ্কিত হইয়াছে। আমাদের দেশের পল্লী গ্রামের লোক সমূহ বড় দরিদ্র, তা'দের রোগীগুলি মাটীতে বিছানা করিয়া শুইয়া থাকে, ঘরে রীতিমত বেড়া নাই; তা' দিয়া হিম আসে ও ঠাণ্ডা লাগে। ওয়ার ফিভারের চিকিৎসকগণ বর্ত্তমান নাম দিয়াছেন ইনফ্লুয়েঞ্জা, যে নামই

হউক, নামে কিছু আসিয়া যায় না। মারাত্মক অবস্থাটা এখনই খুবই। এই রোগে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎগণ প্রায়ই স্বর্ণ সিন্দুর বা মকরধ্বজের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। সাময়িক উপদ্রব সমূহ তাহাতে সময় সময় অনেকটা কমিয়া থাকে।* ইহার যতটা সংক্রামক অবস্থা, ততটা প্রবল পরাক্রান্ত ওলাউঠারও নাই। সেই জন্যই ইহাতে সর্ব্বদা বেশী সতর্ক থাকা সকলেরই কর্ত্তব্য। যাহাদের জ্বর হয় নাই, তাঁহারাও ঠাণ্ডা লাগাইবেনা। এই জ্বরের জন্য দেশের মৃত্যুসংখ্যা বড় বাড়িয়া গিয়াছে, তাহা কলিকাতার মৃত্যুর হার দেখিলেই অনুমান করা যাইতে পারে।

অচিকিৎসায় বা বিনা শুশ্রূষায় বহু রোগী মারা পড়িতেছে। রীতিমত শুশ্রূষা পথ্য ও ঔষধ পড়িলে অনেকেই রক্ষা পাইতে পারেন। কাসের উপদ্রবে বাসক পাতার রস জাল দিয়া মিশ্রির সঙ্গে খাইলে অনেক উপকার হয়। তাহার সঙ্গে আদা, গোলমরিচ, কাবাবচিনী প্রভৃতি দিলে ভাল হয়। এই জ্বরে মাথা গরম ও মাথা বেদনা হয়। সেইজন্য সেই সকল উপদ্রবের প্রতি চিকিৎসকের দৃষ্টি রাখা বিশেষ আবশ্যক। বুকটাকে গরম রাখিতে পারিলে নিউমোনিয়া আক্রমণ হইতে প্রায়ই রোগীকে রক্ষা করা যাইতে পারে। এই জ্বরে প্রায়ই দেখা যায়, কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, এমন কি ৩।৪ দিনেও একবার কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না। তজ্জন্য কোষ্ঠ পরিষ্কারের ঔষধ দিয়া শরীরটাকে হাল্‌কা করা কর্ত্তব্য; কিন্তু সাবধান, যেন তীক্ষ্ণবীর্য্য জোলাপের ঔষধ দেওয়া না হয়। এখন শীতকাল, ঠাণ্ডার সময়, সুতরাং যে ঘরে রোগী থাকিবে সে ঘর গরম রাখিবার জন্য ঘরে আগুণ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। রোগীর অবস্থা বুঝিয়া হাতে পায়ে সেঁক দেওয়াও কর্ত্তব্য। অবস্থা বুঝিয়া বলকারক পথ্য দেওয়াও উচিত। জ্বর নির্দ্দোষ সারিয়া গেলে কয়দিন পর অবস্থার উপর লক্ষ্য রাখিয়া অন্ন পথ্য দেওয়া ব্যবস্থা হইতে পারে। পূর্ব্ব বাঙ্গালায় অনেক স্থানেই টিনের ঘর, শীতকালে টিনের ঘর বড় ঠাণ্ডা, সুতরাং সে গৃহে রোগীকে না রাখিলেই ভাল হয়। বাধ্য হ'য়ে ঐরূপ গৃহে রাখিতে হইলে ঘরটাকে গরম রাখিতে হইবে। এই জ্বরে ঔষধ অপেক্ষা শুশ্রূষাই অধিকতর কার্য্যকারী হয়। এখন এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, ঘরে ঘরেই রোগী, কে কা'র শুশ্রূষা করে? সুতরাং ইহারই মধ্যে যাহা করিয়া উঠিতে পারা যায়—তাহার প্রতিই লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

এই জ্বর সমগ্র দেশে অধিকার বিস্তার করিয়া ফেলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে যমের নিকট হইতে যেন পাশ লইয়া আসিয়াছে, যা'কে ধরিবে—তা'কে আর ছাড়িবে না—এইরূপই অবস্থা। যে গ্রামে বা পাড়ায় এই জ্বর আসিয়াছে, সেখানকার সমস্ত লোককেই সাবধান হইতে হইবে। নতুবা আর রক্ষা নাই।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ।

---

* মকরধ্বজে শুধু সাময়িক উপদ্রব নহে,—উহার প্রয়োগে ঐ ব্যাধির বিলক্ষণ উপকারই হইয়া থাকে। আঃ সং।

সমর জ্বরের প্রতিষেধক আদা।

——:০:——

আদার, সংস্কৃত নাম আর্দ্রক; বাঙ্গালা নাম আদা, সংস্কৃতের অপভ্রংশ। ডাক্তারী নাম Gingiber Officinale. ইংরেজীতে Ginger এবং হিন্দিতে আদরক্ বলে। আদা উদ্ভিদ বিশেষ; ইহার কন্দের নাম আদা। ইহা বাঙ্গালাদেশে প্রচুর উৎপন্ন হয়। রৌদ্র ও গাছের ছায়া—উভয় স্থানেই ইহার আবাদ চলে। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে জমী উত্তমরূপে খুঁড়িয়া দেড় হাত অন্তর শ্রেণী কাটিবে এবং প্রতি শ্রেণীতে আধহাত অন্তর আদা পুঁতিয়া দিবে। বেশ এক পস্‌লা বৃষ্টির পর জমীতে আদা বসাইবে। গোড়ায় যাহাতে জল না দাঁড়ায়—সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। ছাই ও খোল আদার পক্ষে উত্তম সার। দোঁয়াশ মাটিই আদার উত্তম জমি। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে আদার গোড়া হইতে কতক আদা ভাঙ্গিয়া লওয়া চলে এবং পরে মাটী চাপা দিলে গাছের কোন ক্ষতি হয় না। মাঘ মাসে পাতা শুকাইয়া গেলে সকল আদা মাটী হইতে উঠাইবে। আদা ইয়ুরোপে প্রচুর পরিমানে রপ্তানী হইয়া থাকে।

পরিপুষ্টক আর্দ্রককন্দ উত্তমরূপে ধৌত করিয়া ঝুড়িতে রাখিয়া কৃষকেরা ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া ছাল তুলিয়া ফেলে। ইহা রৌদ্রে ক্রমশঃ শুষ্ক করিয়া লইলেই শুঁঠ প্রস্তুত হয়। উত্তম শুঁঠ দেখিতে শুভ্রবর্ণ এবং বহু দিন অবিকৃত থাকে। পাটনাতে বিস্তর আদা জন্মে এবং বঙ্গে পাটনাইশুঁঠই সাধারণতঃ বাজারে বিক্রীত হয়।

মাত্রা সরস অর্দ্ধ তোলা হইতে ২ তোলা; চূর্ণ /০ আনা হইতে ।০ আনা ঔষধার্থে ব্যবহার করিতে হয়।

এই বৎসর (১৩২৫ সন) কলিকাতা ও অন্যান্য সহরে, এমন কি গ্রামে-ঘরেও এক-প্রকার বহুব্যাপক নাশক সংক্রামক সর্দ্দি-জ্বর দেখা যায়। সাধারণতঃ এই জ্বর "সমর জ্বর" বলিয়া কথিত। ভারতবর্ষে প্রথমতঃ বোম্বে প্রদেশেই এই রোগ দেখা দেয়। রোগের প্রথম অবস্থায় প্রবল সর্দ্দিজ্বরের মত নাক ও গলা শ্লেষ্মা পূর্ণ হয়, অত্যন্ত মাথা ধরে, ক্ষুধা মাত্রও থাকে না, শরীর ম্যাজম্যাজে ও দুর্ব্বল বোধ হয়। রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় জ্বর দেখা দেয়, মূত্র রক্তবর্ণ হয়, শেষে বুকে সর্দ্দি বসিয়া স্থল বিশেষে ঘোরতর সান্নিপাতিক জ্বরের ন্যায় বিবিধ উপসর্গ উপস্থিত করে। এ রোগ কলিকাতায় সংক্রামক রূপে দেখা দিলে তথায় আমরা যে বাটীতে ছিলাম, ঐ বাটীর সকলেই এই রোগে আক্রান্ত হন এবং ৩।৪ দিন ভুগিয়া সকলে আরোগ্য লাভ করেন। কিন্তু কলিকাতার অন্যান্য স্থলে এই ব্যাধি এত সহজে আরোগ্য হয় নাই। এই রোগে মৃত্যু সংখ্যা ভীতিপ্রদ।

এই রোগের গৌণ কারণ যাহা হউক, মুখ্যতঃ কোন আগন্তুক বিষ গলা ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি এবং পাকস্থালী আক্রমণ করিয়া বায়ু, পিত্ত এবং কফকে দূষিত করে। কফের দিকেই বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে।

এই আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই যদি আকণ্ঠ আদার রসের কুলি দিবসে ৩।৪ বার এবং আদার রস ও মধু দিবসে ৩ বার এবং তুলসী পাতার রস মধু সন্ধ্যার পর ১ বার সেবন করা যায়, তাহা হইলে ব্যাধি নিশ্চয়ই প্রবল হইতে পারে না এবং ক্রমে ক্রমে আরোগ্য হইয়া যায়। জিঞ্জারেড ব্যবহার করাও মন্দ নহে, ইহাতে আদা আছে। গুরুতর আক্রমণেও এইরূপ চলিতে হইবে। আমি এ পর্য্যন্ত ৭৬ জন রোগীকে এই ব্যাধি হইতে আরোগ্য করিয়াছি। ইহাতে কাহারও কোন দুষ্ট উপসর্গ দেখা দেয় নাই। সকলকেই ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাইতেছি। আদা খাদ্যরূপে আমরা নিত্য ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহা ব্যবহারে কাহারও কোন ভয়ের কারণ নাই। আদার রসের কুলি লওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গলা বুক ও নাক হইতে সর্দ্দি কাটিতে থাকে, বেদনার লাঘব হয় এবং সমর জ্বরের যাতনাও অনেকটা নিবৃত্ত হইয়া যায়, ক্রমে ক্ষুধা দেখা যায় ও রোগ আরোগ্য হয়। গ্রামঘরে সমর জ্বর দেখা দিলেই আহারের পূর্ব্বে আদা ও সৈন্ধব-লবণ সেব্য। এইরূপে চলিয়া সমর জ্বরে আক্রান্ত হইতে আমরা কাহাকেও দেখি নাই। আদা ও তুলসী সমর জ্বরের প্রতিষেধক ও উত্তম ঔষধ। যতদূর পরীক্ষা করা হইয়াছে, তাহাতে এই সত্যই প্রতিপাদিত হয়।

আদা সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের বিস্তৃত অভিপ্রায় নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

চক্রদত্ত মতে (১) আদার রসে সৈন্ধব লবণ ও ত্রিকটুচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া আকণ্ঠ মুখে ধারণ করিবে এবং কিছুক্ষণ রাখিয়া ফেলিয়া দিবে, পুনঃ পুনঃ থুঁথু ফেলিবে। ইহাতে সন্নিপাত জ্বরে বুকের, গলার ও কণ্ঠের কফ বাহির হইয়া লঘুতা জন্মে। (জ্বর, চিঃ) (২) অতিসার রোগীর নাভির চতুর্দ্দিকে পিষ্ট-আমলকীর আলবাল প্রস্তুত করিয়া মধ্যস্থল আদার রসে পূর্ণ করিবে; ইহা অতিসার রোগীর পক্ষে অতিশয় হিতকর। (অতিসার চিঃ) (৩) শুঁঠ কল্কের সহিত গব্যঘৃত পাক করিয়া গ্রহণী রোগে সেব্য; ইহা বায়ুর অনুলোমক (গ্রহণী চিঃ) (৪) ক্ষুধা বৃদ্ধির জন্য মধ্যাহ্নে আহারের পূর্ব্বে আদা ও সৈন্ধব লবণ সেব্য। (অগ্নিমান্দ্য চিঃ) (৫) নূতন সর্দ্দি ও শ্বাসকাশে আদার রস ও মধু সেব্য। (কাস চিঃ) (৬) আমবাত রোগী কাঁজির সহিত শুঁঠ চূর্ণ পান করিবে। (আমবাত চিঃ) (৭) হৃদরোগ ও কাস আদির পক্ষে শুঁঠের ক্বাথ গরম গরম পান হিতকর। (হৃদরোগ চিঃ) (৮) তীব্র শিরোবেদনায় গব্যদুগ্ধের সহি শুঁঠ-চূর্ণ নস্য লইবে। (শিররোগ চিঃ)।

শাঙ্গর্ধর মতে (১) শুঁঠচূর্ণে গব্যঘৃত মাখাইয়া এড়ণ্ডপত্র বেষ্টন পূর্ব্বক মাটীর প্রলেপ দিয়া মৃদু অগ্নিতে পুটপাক করিবে। এই চূর্ণ প্রাতঃকালে চিনির সহিত সেবনে আমাতিসারের বেদনা দূর হয়। (দ্বিঃ খঃ ১ অঃ) (২) শুঁঠচূর্ণ এড়ণ্ডমূলের রসে সিক্ত করিয়া পিণ্ডাকার করতঃ এড়ণ্ডপত্র দ্বারা আবৃত ও মাটীর প্রলেপ দিয়া পুটপাক করিবে। ইহার রস মধুসহ পান করিলে আমবাত প্রশমিত হয়। (দ্বিঃ খঃ ১অঃ)।

ভাবপ্রকাশ মতে (১) পীতপুষ্পবেড়েলা মূলের ছাল ও শুঁঠ সমভাগে লইয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। ২।৩ দিন এই ক্বাথ পান করিলে শীতকম্প-দাহযুক্ত বিষম-জ্বর নষ্ট হয়। (মঃ খঃ ২ভা) (৪) সার্জ্জিকাক্ষার ও

আদা সমভাগে গুল্মরোগে সেব্য। (মঃ খঃ ৩ভাঃ)

চরক মতে (১) আদার রস ও দুগ্ধ সমভাগে উদর রোগে সেব্য। (চিঃ ১৮ অঃ) (২) গরম জলের সহিত শুঁঠচূর্ণ পান করিলে আম বিনষ্ট হয়।' (চিঃ ১৯ অঃ) (৩) পুরাণ গুড় ও আদা তুল্যভাগে ক্রমে মাত্রা বৃদ্ধি করতঃ ১ মাস সেবন করিবে, এই সময়ে দুগ্ধের সহিত অন্ন পথ্য ব্যবস্থেয়। শোথরোগে ও শ্বাসের পক্ষে এই ঔষধ হিতকর। (চিঃ ১৭ অঃ) (৪) ক্ষতক্ষীণ রোগী শুঁঠচূর্ণ সেবন করিবে। ঔষধ সেবনকালে অন্ন ত্যাগ করিয়া শুধু দুগ্ধ পান বলারোগ্যপ্রদ। (চিঃ ১৬ অঃ) (৫) বালা ও শুঁঠ সমভাগে ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া অতিসারে সেব্য। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক ও অতিসারহর।

দ্রব্যগুণ হিসাবে আদা—ভেদক, গুরু, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিকারক, কটু, বিপাকে মধুর, রুক্ষবাত ও কফনাশক। শুঁঠে যে সমস্ত গুণ, প্রায় সমস্তই আদাতে আছে। শুঁঠের গুণ যথা—রুচিকারক, পাচক, কটু, লঘু, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, পাকে মধুর, কফ, বায়ু ও বিবন্ধ (মলাদির রোধ) নাশক, বলকারক এবং স্বরবদ্ধক। আগ্নেয় গুণ হেতু শুঁঠ আভ্যন্তরীণ জলীয়াংশ শোষণ করতঃ মল পদার্থ সংগ্রহ করে এই হেতু শুঁঠ গ্রাহী।

'ঢাকা প্রকাশে'—

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায় কবিভূষণ।

মকরধ্বজের অনুপান বিধি।

——:০:——

সর্ব্বজন শুন শুন, মকরধ্বজের গুণ,
যে রোগেতে যাহা অনুপান।
আদা মধু সর্দ্দি জ্বরে, তুলসীর পত্র পরে,
স্বল্পকাসি সারে দিলে পান॥
দাহ, পিপাসা কারণ, রোগী ব্যস্ত সর্ব্বক্ষণ,
—সে সময় পটোল বেদানা।
মধু আর বেলপাতা, আশ্চর্য্য এর ক্ষমতা,
শান্তি পায় জ্বর ও বেদনা॥
মৌরী ও শ্বেত চন্দন, ইহাতে সারে বমন,
শশা বীজ, কুল আঁটি শাঁসে।
চাউল ধৌত জলে, অজীর্ণে সুফল ফলে,
জাম ছালে অতিসার নাশে॥
হইলে হে নাড়ীক্ষয়, দেখে সবে পায় ভয়,
সে সময় কর্পূরের জল।
আর দিলে আদা তা'তে, মঙ্গলময় কৃপাতে,
অত্যাশ্চর্য্য জানিবেক ফল॥
ভস্ম ময়ূরের পুচ্ছ—হিক্কাকে করয়ে তুচ্ছ,
পুনঃ পুনঃ ইহা ব্যবহারে।
শিথিল হইলে গাত্র, মৃগনাভি একমাত্র,
ঘোর সান্নিপাতিক বিকারে॥
কদলী মূলের রস করিলে সেবন।
হিক্কা ভয় দূর হয় শুন সর্ব্ব জন॥
মকরধ্বজের সহ কচিতাল জল,
মিশা'য়ে সেবিলে হয় হিক্কা রোগে ফল॥

ভিজান মুড়ির জল পরম সহায়।
থোড়ের রস ও চিনি হরে হিক্কা রোগ ভয়॥
গুলঞ্চ সিউলি পাতা, মধু ও পলতা লতা,
পুরাতন জ্বর নিবারক।
যদি কা'র থাকে কাসি, তাহাকে কহি প্রকাশি
—উপকারী পিঁপুল বাসক॥
থাকিলে উদরাময়, না করিহ কোন ভয়,
আল্‌কুশী সহ ভদ্র মূল;
অথবা বিট লবণ, যমানী সহ সেবন,—
করিলে হে যায় আমশূল॥
শ্বেত পুনর্ণবা রস, শোথ রোগী এর বশ,
হ'য়ে থাক পাবে পরিত্রাণ।
পটোল আর বেদানা, ইহাদের গুণপণা,
শীঘ্র সারে উদর আধ্মান॥
ধাইফুল, মোচরস রক্ত আমাশয়।
পরমোপকারী ইহা জানিবে নিশ্চয়॥
চিকি সুপারির রস আমরুলি রসে।
আমাশয় যায় দূরে দু' তিন দিবসে॥
রক্তনাইলের ফুল মৌরী ও চন্দন।
রক্ত আমাশয় এতে হয় নিবারণ॥
কুড়চি ও জায়ফল, রক্তআমে ফল,
বনমূলা পাতা আয়াপান।
মুথা ও কাঁচড়া দাম, ব্যবহারে অবিরাম,
রক্তরোধে ইহাই বিধান॥
হইলে রক্তাতিসার, মুথা ও দাড়িম পাতার,—
রস সহ করিবে সেবন।
আর অতি উপকারী, তণ্ডুল ধৌত বারি,
শুন শুন ওহে বিচক্ষণ॥
বেলপোড়া ইক্ষু চিনি, ইহাতে সারে গ্রহণী,
কিম্বা আমলকী ভিজা জলে।
মুথা, কর্পূর, খদির, এই অনুপানে ধীর,
ভীষণ গ্রহণী যায় চ'লে॥
আমলকী পদ্মমূল, যষ্টিমধু ধাইফুল,
ইহা শীঘ্র তৃষ্ণা নিবারক।
যজ্ঞ ডুমুরের রস, দ্রাক্ষা ও অম্লবেতস,
মুখ শুষ্ক—পিপাসা নাশক॥
মলকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, প্রমেহ, ভীষণ বাত,
মকরধ্বজেতে উপকার।
প্রমেহেতে পুঁজ পড়া, যজ্ঞ ডুমুরের গুঁড়া,
ব্যবহারে হয় প্রতিকার॥
গদ ও ইসবগুল প্রমেহ করে নির্ম্মূল,
কাঁচা হলুদ ও আমলকী।
কাকুড় বীজের শাঁস, মূত্রকৃচ্ছ্র করে নাশ,
মৃদু বিরেচনে হরীতকী॥
কাবাব চিনির গুঁড়া শ্রেষ্ঠ স্বপ্নভঙ্গে।
সেবিলে শয়ন কালে মধু দিয়ে সঙ্গে॥
যৌবনে প্রধান রোগ শুক্রের তারল্য।
তালমূলী রসে যায় ইহার প্রাবল্য॥
রক্তপিত্ত, উরঃক্ষত, ভীতিপ্রদ কাসে,
সতত কাতর রোগী পড়ি মহা ত্রাসে,
আলতা ভিজান জল মধু দিয়া তা'তে।
ফটকিরি গুঁড়া সহ সেবিবেক প্রাতে॥
যজ্ঞডুমুরের রস এক তোলা ল'বে।
মধু দিবে অর্দ্ধ তোলা সেবিবেক সবে॥
কামিনী ফুলের পাতা লবে রস করি।
সেবিবে মকরধ্বজ বিষ্ণুনামস্মরি॥
বাসক পাতার রসে সারে রক্ত পিত্ত।
ভগবান পাদ পদ্মে রেখো রোগীচিত্ত॥

শ্রীতারিণীচরণ কবিভূষণ ভট্টাচার্য্য।

রক্ত মোক্ষণ।

—:০:—

Blood Letting.

রক্ত মোক্ষণ দুই প্রকার। (১) সার্ব্বাঙ্গিক (genarel) এবং (২) স্থানিক (Local)।

সার্ব্বাঙ্গিক রক্তমোক্ষণ দুই প্রকারে সম্পন্ন হইতে পারে,—(১) শিরচ্ছেদন (venesection) ও (২) কোন ধমনীচ্ছেদন (Artteristomy)। প্রথমোক্ত প্রণালী ডাক্তারী মতে সচরাচর অবলম্বিত হইয়া থাকে। যতটুকু রক্ত মোক্ষণ করিতে হইবে, রোগীর বয়স, অবস্থা ও রোগের প্রকোপ অনুসারে তাহা স্থির করা আবশ্যক। এরূপ অবস্থায় নাড়ীর অবস্থা আমাদের প্রধান নিদর্শন। নাড়ী যতক্ষণ কঠিন থাকে, ততক্ষণ রক্ত মোক্ষণ করা যাইতে পারে এবং তাহা কোমল হওয়া মাত্র নিবৃত্ত হওয়া উচিত। নতুবা শোণিত ক্ষয়ে মূর্চ্ছা হইবার সম্ভাবনা।

স্থানিক (Local) রক্ত মোক্ষণ ও দুই প্রকার (১) জোঁক বসান (Leeching) এবং (২) যন্ত্র দ্বারা রক্ত চোষণ (cupping)।

১। জোঁক বসান। প্রথমতঃ একটি পাত্রে একসের পরিমাণ জল রাখিয়া তাহাতে অর্দ্ধ তোলা হরিদ্রা চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। পরে তাহাতে জলৌকা নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ করিলে উহা স্বয়ং লালা ত্যাগ করিতে থাকিবে। সেই লালাহীন জলৌকা রক্ত-মোক্ষণ কার্য্যে প্রশস্ত। যে স্থানে জোঁক বসাইতে হইবে, সেই স্থান ধৌত করিয়া মুছিয়া ফেলিবে। এবং শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা জলৌকা ধরিয়া ঐ স্থানে লাগাইয়া দিবে। সহজে না ধরিলে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ, মাখন বা রক্ত ঐ স্থানে লাগাইয়া দিবে। চিত্র জলৌকা সচরাচর এক হইতে দুই ড্রাম এবং দেশীয় জলৌকা এক হইতে তিন ড্রাম রক্ত শোষণ করে। প্রায়ই ১৫ - ২০ মিনিটের মধ্যে জলৌকা পড়িয়া যায়। যদি শীঘ্র ছাড়াইবার প্রয়োজন হয়, তবে একটু তামাকের জল না লুণের জল দিলেই খুলিয়া পড়িবে। হুঁকার কটু জল অথবা চূণের জল দিলেও খুলিতে পারে। জোঁক কোন মতেই টানিয়া খুলিবে না। ইহার পর যদি আরও রক্ত মোক্ষণ করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে উক্ত দষ্ট স্থানে উষ্ণ জলের সেঁক দিবে এবং চোষণাদি করিবে। যদি জোঁক ধরার স্থান হইতে রক্ত পড়িতে আরম্ভ হয়, তবে কিঞ্চিৎ তুলা ঐ স্থানে টিপিয়া ধরিলেই রক্ত বন্ধ হইয়া যায়। তাহাতেও রক্ত বন্ধ না হইলে অথবা অত্যন্ত রক্তস্রাব হইলে ফট্‌কিরী চূর্ণ কিম্বা তাহার গাঢ় দ্রব লাগাইলে সহজেই রক্ত বন্ধ হইয়া যায়। ডাক্তারী মতে acid tanic, nitrit of silver অথবা Tr. Steel প্রয়োগে সহজেই রক্ত বন্ধ হয়। মলদ্বারে, গলমধ্যে ও জরায়ু, গ্রীবা প্রভৃতি স্থানে রক্ত মোক্ষণের আবশ্যক হইলে উপযুক্ত যন্ত্র দ্বারা অতি সাবধানে জলৌকা প্রয়োগ করিতে হয়; কেননা, সামান্য কারণে ঐ সকল গহ্বরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে। এরূপ হইলে লবণ জল কিম্বা হুঁকার [illegible]

প্রয়োজন মত পান করিতে দিবে অথবা পিচ্‌-কারী দ্বারা অন্তঃক্ষেপ করিবে।

২। যন্ত্র দ্বারা রক্ত চোষণ (cupping) দুই প্রকার; (১) আর্দ্র (moist) ও (২) শুষ্ক (dry)। moist cupping ডাক্তারী মতে নিম্নোক্ত উপায়ে সম্পন্ন হইয়া থাকে। স্কারিফিকেটর নামক যন্ত্র দ্বারা প্রদাহ স্থান কর্ত্তন করিবে। এবং একটি কাঁচের বাটির অভ্যন্তর প্রদেশে তুলি দ্বারা স্পিরিট (Spirit) লাগাইয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিবে। অগ্নি প্রজ্বলিত হইবা মাত্র কর্ত্তিত স্থানে তাহা বসাইবে। ইহাতে বাটির অভ্যন্তর বায়ুশূন্য হইয়া যায় এবং তদ্দ্বারা উক্ত স্থানের ত্বক আকৃষ্ট ও স্ফীত হইয়া উঠে; সঙ্গে সঙ্গে রক্ত নিঃসৃত হইয়া যায়।

Dry cupping অস্ত্র দ্বারা অথবা অন্যরূপে চর্ম্ম না চিরিয়া ঐরূপে বাটি বসাইবে। ইহাতে শোণিত নিঃসৃত না হইলেও বাটির নিম্নস্থ ত্বকের অভ্যন্তরে সঞ্চিত হয়; তাহাতে আভ্যন্তরীণ রক্তাধিক্য কমিয়া যায়।

আময়িক প্রয়োগ;—বলিষ্ঠ ও যুবকদিগের ফুস্‌ফুস্‌ ও মস্তিষ্কাবরক ঝিল্লি, হৃৎপিণ্ডাবরক স্বরযন্ত্র ও মূত্রগ্রন্থির প্রদাহ এবং সন্ন্যাস, গাউট, স্থানিক চর্ম্ম প্রদাহ প্রভৃতি অবস্থায় সার্ব্বাঙ্গিক ও স্থানিক রক্ত মোক্ষণ আবশ্যক।

কোন কারণে শরীর হইতে রক্ত নিঃসৃত হইলে অল্পাধিক পরিমাণে সর্ব্বশরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে; কিন্তু কোন প্রদাহিত স্থান হইতে শোণিত নির্গত হইলে তথাকার প্রদাহ কমিয়া আসে। প্রাচীন চিকিৎসকগণ প্রায়ই রক্তমোক্ষণ ব্যবস্থা করিতেন। সুশ্রুতে রক্ত মোক্ষণ প্রণালী অতি সুন্দর রূপে বিবৃত হইয়াছে। তথাপি কালের কুটিল চক্রে আজকাল এই প্রথা প্রায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। অদ্যাপি আমাদের ময়মনসিংহ জেলার স্থানে স্থানে নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে ইহার প্রভাব পূর্ণ মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। তাহারা বাঁশের চোঙ শিঙ্গা, বিল্ব প্রভৃতির সাহায্যে আশ্চর্য্য উপায়ে রক্তমোক্ষণ করিয়া থাকে। তন্মধ্যে বিল্ব দ্বারা রক্তমোক্ষণ প্রণালীই সহজ ও সুফল প্রদ। আমি অনেক স্থলে ইহার অসীম উপকারিতা উপলব্ধি করিয়াছি। সাধারণের অবগতির জন্য সহজ উপায়টিই এখানে লিপি-বদ্ধ করিলাম।

একটি ছোট সুগোল অথচ সুপক্ক বিল্ব—কপিত্থক হইলেই ভাল হয় সংগ্রহ করিয়া তাহার মুখ সামান্য পরিমাণে কাটিয়া ফেলিতে হইবে এবং সেই কর্ত্তিত বিল্বকে জলে উত্তম রূপে সিদ্ধ করিয়া লইতে হইবে। এইরূপ ভাবে বিল্বের মধ্যস্থিত পদার্থ গলিয়া গেলে উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। পরিষ্কৃত বিল্বটি রৌদ্রোত্তাপে শুষ্ক করিয়া এক খণ্ড ফ্লানেল অথবা অন্য কোন গরম কাপড় দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক আলমারীতে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে—যেন তাহাতে ঠাণ্ডা বাতাস না লাগে।

কাকিলা মৎস্যের ঠোঁট দ্বারা প্রদাহিত স্থান পাচিয়া লইতে হইবে। পরে উক্ত বিল্বের অভ্যন্তর ভাগে স্পিরিট লাগাইয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিবে। অগ্নি প্রজ্বলিত হইবা-মাত্র উহা প্রদাহিত স্থানে জোরে বসাইয়া দিবে হইবে, স্পিরিট না পাইলে কেরোসিন দ্বারায় বিল্বের অভ্যন্তর প্রলিপ্ত করিলেও চলে। তবে স্পিরিট দিতে পারিলেই ভাল হয়। ইহাতে বিল্বের অভ্যন্তর ভাগ বায়ুশূন্য হইয়া ত্বক্‌কে আকৃষ্ট করিয়া দূষিত রক্ত নির্গত করিয়া

ফেলে। যে পর্য্যন্ত দূষিত রক্তে বিম্বের অভ্যন্তর পূর্ণ না হয়, সে পর্য্যন্ত বিম্ব পতিত হয় না। পরে পরিমাণ মত রক্ত নির্গত হইয়া গেলেই বিম্ব আপনাপনিই খসিয়া পড়িয়া যায়। তবে প্রদাহ বেশী হইলে কদাচিৎ ২।১ দিন পরেও পুনরায় উপরোক্ত নিয়মে রক্ত চোষণ করিতে হয়।

শ্রীযোগেন্দ্র কিশোর লোহ।

বসন্তে মুষ্টিযোগ।

—:o:—

বসন্তে রস প্রয়োগ। শোধিত গন্ধক দুই ভাগ ও শোধিত রস এক ভাগ লইয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া, তাহা যথোপযুক্ত মাত্রায় পানের রস সহ সেবন করাইলে, বসন্তের প্রতীকার হইয়া থাকে।

বসন্তে দাহ নিবারণ। বসন্ত রোগ নিবন্ধন শরীরে দাহ উপস্থিত হইলে, বাসি জলের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে, দাহের শান্তি হইবে। অধিকন্তু এই মধু মিশ্রিত জল পান দ্বারা বসন্ত রোগেরও উপশম হইয়া থাকে।

কায় শোধন। চালিতার ছাল দ্বারা শীতকষায় প্রস্তুত করিয়া লইয়া ঐ জল দ্বারা শরীর ধৌত করিলে বসন্তের ক্লেশ বিদূরিত হইবে। পাচন প্রস্তুতের নিয়মে পূর্ব্ব দিন কষায় প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া পরদিনে উহা ব্যবহার করাইতে হয়। এইরূপ কাথকেই আয়ুর্ব্বেদে শীতকষায় বলা হইয়াছে। এ স্থলে ধৌত করিবার জন্য ষড়ঙ্গপানীয় বিধানেই শীত কষায় প্রস্তুত করা বিহিত।

ধূপ। বচ, বাঁশের নেলি, যব, বাসক মূলের ছাল, কার্পাস বীজ ব্রাহ্মী শাক, তুলসীপাতা, আপাং বীজ, লঙ্কা ও ঘৃত সংযোগে ধূপ প্রদান করিলে, সকল প্রকার বসন্ত ও অন্যবিধ ব্রণ রোগেরও উপশম হইয়া থাকে। কাহারও কাহারও মতে এ স্থলে ধূম দ্রব্যের সহিত বিষ প্রদান করাও কর্ত্তব্য, কিন্তু বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বলেন, বসন্ত রোগের কোন অবস্থাতেই কোন প্রকারে বিষের সম্পর্ক রাখা, জীবনের পক্ষে হিতজনক নহে।

কষায় (পাচন) নিম্বাদি। নিমছাল, ক্ষেতপাপড়া, আকনাদি, কটকি, পলতা, বাসকমূলের ছাল, দুরালভা, আমলা, বেণার মূল, রক্তচন্দন, ও শ্বেতচন্দন;—এই দ্রব্যগুলি যথোপযুক্ত মাত্রায় সমভাগে লইয়া কাথ প্রস্তুত করিয়া, উহাতে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইলে, জ্বর ও বিসর্পযুক্ত ত্রিদোষজাত বসন্ত রোগেরও শান্তি হইয়া থাকে। বসন্তের গুটি বসিয়া গেলে, এই পাচন ব্যবহারে তাহা পুনরায় বাহিরে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই পাচনটি সকল প্রকার বসন্তের বিশেষ ফলপ্রদ।

পটোলাদি। পলতা, গুলঞ্চ, মুতা, বাসক, ধনে, দুরালভা, চিরাতা, নিমছাল, কটকি ও ক্ষেতপাপড়া—এই সকলের মিলিত কাথে, কিঞ্চিৎ

অথবা কি পক্ক, সকল প্রকার বসন্তেরই উপশম হইয়া থাকে ; অধিকন্তু জ্বর ও-বিস্ফোট প্রভৃতি এই কষায় সেবনে নিবারিত হয়।

শীঘ্র পাকাইবার উপায়। টাবালেবুর কেশর, কাঁজি দ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিলে শীঘ্রই বসন্তের গুটিকাগুলি পাকিয়া উঠে এবং দাহ নিবারিত হয়।

পাদদাহ নিবারণ। পাদদ্বয়ে উৎপন্ন বসন্তগুলি অত্য স্তদাহ জন্মাইয়া থাকে, চেলেনি জলদ্বারা বারংবার পা ধুইলে সেই দাহ নিবারিত হয়।

পক্কাবস্থায় ব্যবস্থা। বসন্তের পক্কাবস্থায় বায়ুর অতিশয় প্রকোপ হইয়া থাকে, এইজন্য বসন্তের এই অবস্থাতে বিশোষণ অর্থাৎ কর্ষণ ক্রিয়া করা কোন মতেই বসন্তরোগ পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে শুভজনক নহে, প্রত্যুত এইরূপ অবস্থাতে সংরক্ষণ অর্থাৎ পুষ্টিকারক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করাই আতুরের জীবন কামনায় সুচিকিৎসকের কর্ত্তব্য।

পক্ক অবস্থাতে—গুলঞ্চ, যষ্টিমধু; কিসমিস, ইক্ষু-মূল, ও দাড়িম্ব ছালের ক্বাথে উপযুক্তরূপ ইক্ষু গুড় প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইলে শীঘ্র বসন্তের স্ফোটকগুলি পাকিয়া উঠে এবং বায়ুরও শান্তি হইয়া থাকে।

মাংসরস প্রয়োগ। বসন্তের পক্কাবস্থাতে কর্ষণক্রিয়ানিবন্ধন বায়ুর প্রকোপ হইয়া পড়িলে, সেই আতুরের শূল, আধ্মান (পেট ফাঁপা) ও কম্প প্রভৃতি বাতজাত উপদ্রব-গুলি জন্মিয়া থাকে। এই অবস্থাতে চাতক ও তিত্তির প্রভৃতি পাখীর মাংসরস অল্প মাত্রায় সৈন্ধব সহযোগে প্রদান করা কর্ত্তব্য।

অরুচি। বসন্তরোগে অরুচি হইলে অম্ল দাড়িমের রসের সহিত যূষ পান করা উচিত। খয়ের এবং পীতশাল দ্বারা সাধিত শীতল ক্বাথ পানেও অরুচি বিদূরিত হয়।

শৌচ। খয়েরকাষ্ঠ ও চালিতা ছালের দ্বারা যড়ঙ্গপানীয় বিধানে অর্দ্ধেক জল শুষ্ক করিয়া প্রস্তুত ক্বাথ, বসন্তরোগে শৌচ ক্রিয়ায় ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

মুখ ও কণ্ঠরোগে। জাতীপত্র, মঞ্জিষ্ঠা, দারুহরিদ্রা, সুপারি, শমীকাঠ, আমলা ও যষ্টিমধু দ্বারা ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া, শীতল অবস্থায় তাহার সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া, মুখ ও কণ্ঠরোগে গণ্ডূষ ধারণ করিতে হইবে।

চক্ষুরোগে। গুলঞ্চ ও যষ্টিমধু জলের সহিত বাটিয়া লইয়া বস্ত্র দ্বারা পুটুলি বাঁধিতে হইবে। ঐ পুঁটুলি ঈষৎ নিপীড়িত করিয়া চক্ষুতে সেঁক দেওয়া কর্ত্তব্য।

যষ্টিমধু, হরীতকী আমলা, বহেড়া, সূচমুখী, দারুহরিদ্রা নীলোৎপল (সুঁদি) বেণারমূল, লোধ ও মঞ্জিষ্ঠা—এই সকল দ্রব্য মিলিত ভাবে অথবা পৃথক ভাবে (এক একটির) যথাযথ গ্রহণ করিয়া প্রলেপ বা ক্বাথ দ্বারা অভিষেক করিলে নয়নগত বসন্তের উপশম হয় এবং ফোড়া গলিয়া চক্ষুর অনিষ্ট ঘটিবার কোন আশঙ্কা থাকে না।

পুঁয হইলে তাহার প্রতিকার। বসন্তের স্ফোটকে পুঁয হইলে বট, অশ্বত্থ, পাঁকুড় যজ্ঞডুমুর ও বকুলের ছাল চূর্ণ তাহাতে ব্যবহার করা বিধেয়। ঘুঁটের ছাই অথবা শুষ্ক গোবর চূর্ণ ও পূর্ব্বোক্তরূপে ক্লেদ নিবারণের জন্য প্রয়োগ করা বিহিত।

ক্রিমি নিবারণ। বসন্তের স্ফোটকে ক্রিমি উৎপন্ন হইবার আশঙ্কা নিবারণের জন্য সরল, অগুরু ও গুগ্‌গুলু প্রভৃতি

দ্বারা বেশ ধূম প্রদান করা কর্ত্তব্য। কারণ এইরূপ ধূমের দ্বারা আতুরের বেদনা ও দাহের শান্তি হয় এবং পুঁষ নির্গত হইয়া স্ফোটকগুলিও বিশুদ্ধ হয়; সুতরাং শীঘ্রই পীড়া আরোগ্য হইয়া থাকে।

কণ্ঠশুদ্ধি। এই রোগে কণ্ঠে শ্লেষ্মার প্রকোপ দৃষ্ট হইলে, পিপুল ও হরীতকী চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিতে দিবে। কণ্ঠশুদ্ধির জন্য অষ্টাঙ্গবলেহ অথবা আদার কবল করাও বিহিত।

স্নেহ প্রয়োগ। বসন্তরোগে পান, অভ্যঞ্জন ও ভোজ্য দ্রব্যের সহিত পঞ্চতিক্ত ঘৃত ব্যবহার করা ব্যবস্থা। ব্রণরোগের জন্য যে সকল প্রয়োগ বিহিত হইয়াছে, ইহাতে সে সকলও বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবহার করা আবশ্যক। কিন্তু বসন্তরোগে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তৈল ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে হইবে, প্রাচীন ও প্রবীন বিচক্ষণ আয়ুর্ব্বেদ আচার্য্যগণ সকলেই একবাক্যে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। যথা,—

'পঞ্চতিক্তং প্রযুঞ্জীত পানাভ্যঞ্জনভোজনৈঃ।
কুর্য্যাদ্ব্রণবিধানঞ্চ তৈলাদীন্ বর্জ্জয়েচ্চিরম্॥

অধিকন্তু,—

'বাতং স্বেদং শ্রমং তৈলং গুর্ব্বন্নং ক্রোধমাতপম্।
কট্বম্লং বেগরোধঞ্চ মসূরিগদবাংস্ত্যজেৎ॥"

মসূরি পীড়াক্রান্ত ব্যক্তি (বাহিরের) বাত বর্জ্জন করিবে; কোনরূপ স্বেদ (অগ্নির উত্তাপ) ও আতপ (রৌদ্র) গ্রহণ করিবে না; তৈল ব্যবহার করিবে না; গুরুপাক, কটু (ঝাল) বা অম্ল দ্রব্য আহার করিবে না; ক্রোধের বশীভূত হইবে না এবং মল ও মূত্রাদির বেগ ধারণ করিবে না।

রক্তমোক্ষণ। বসন্তরোগে রক্তের বিকৃতি পরিলক্ষিত হইলে অবস্থা বিশেষে রক্তমোক্ষণ করাও বিহিত।

গাত্রের দুর্গন্ধ নিবারণ। হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বেণারমূল শিরীষপুষ্প, মুতা, লোধ, শ্বেতচন্দন ও নাগকেশর;—উপযুক্ত মাত্রায় লইয়া বাটিয়া শরীরে মাখিলে বসন্তের দুর্গন্ধ নিবারিত হয়। এই প্রয়োগটির দ্বারা বিস্ফোট, বিসর্প, কুষ্ঠ ও গাত্র দৌর্গন্ধ প্রভৃতিও নিবারিত হইয়া থাকে।

পথ্য ও অপথ্য।

ভাবপ্রকাশ বলেন,—

'মসূরিকাসু ভুঞ্জীত শালীন্ মুদ্গমসূরিকান্।
রসং মধুরমেবাশ্নাৎ সৈন্ধবং চাল্পমাত্রকম্॥

বসন্তরোগে হৈমন্তিক ধান্যের অন্ন, মুগ ও মসূর ডাইল, মধুর রস বিশিষ্ট দ্রব্য সমূহ এবং উপযুক্ত পরিমাণে সৈন্ধব লবণ সেবন করিবে।

অধিকন্তু বাত, পিত্ত ও কফের সংস্রব অতিশয় বিচক্ষণতার সহিত লক্ষ্য করিয়া নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলিও পথ্য স্বরূপে ব্যবহৃত হইলে, বসন্ত রোগের উপশম হইয়া থাকে।

পুরাতন যেটে ধান, আমনধান ও যব; ছোলা, মুগ ও মসূর ডাইল, প্রতুদ জাতীয় অর্থাৎ পায়রা, ঘুঘু, চড়াই, জলকুক্কুট ও ডাহুক প্রভৃতির মাংস, করল্লা কাকরোল কাচকলা সজিনা ও পটোল তরকারি, কিসমিস ও ডালিম এবং এতদ্ভিন্ন মেধাবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক অন্ন ও পানীয় অন্যান্য দ্রব্য সমূহ, কুল ও মাংসরস, বসন্তরোগে সুপথ্য।

সংক্ষেপে বসন্তরোগের প্রতীকারকারক কতিপয় মুষ্টিযোগ এই প্রবন্ধে প্রকটিত করার জন্য যত্ন করা গিয়াছে। ইহা দ্বারা মানবের জীবন রক্ষা হইলেই সেই প্রযত্নের সার্থকতা হইবে। "হিতবাদী"তে—

শ্রীমথুরানাথ মজুমদার কবিরাজ।
কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

—:০:—

নিখিল ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদ সম্মেলন। গত ২৬শে হইতে ২৯শে জানুয়ারি পর্য্যন্ত দিল্লী নগরীতে নিখিল ভারতবর্ষীয় দশম আয়ুর্ব্বেদ সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। সভাপতি হইয়াছিলেন—৺কাশীধামের প্রবীণ কবিরাজ শ্রীযুক্ত উমাচরণ কবিরত্ন শাস্ত্রী। হাকিম আজমন খাঁ সাহেব অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত খাপার্দ্দি ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য প্রভৃতি বহুসংখ্যক আয়ুর্ব্বেদানুরাগী ব্যক্তি সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ২৯শে জানুয়ারি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য তাঁহার বক্তৃতার একস্থলে বলেন যে, তিনি কলিকাতার তাঁহার এক বন্ধুর নিকট হইতে আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে এক লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই টাকায় তিনি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গ স্বরূপে একটি আয়ুর্ব্বেদীয় কলেজ ও একটি আয়ুর্ব্বেদীয় গাছ গাছড়ার উদ্যান প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা করিয়াছেন। আমাদের অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে এই সম্মেলনে একটি প্রবন্ধ ও কয়েকটি দ্রব্য প্রদর্শনের জন্য দেওয়া হইয়াছিল। আগামী বৎসর এই সম্মেলন ইন্দোরে হইবে স্থির হইয়াছে।

মারওয়ারি হাসপাতাল।—শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী বিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলিকাতা আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে সংপ্রতি একটি মারওয়ারি দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হইয়াছে। ইহার কার্য্যপ্রণালী ভাল ভাবে চলিতেছে দেখিলে আমরা সুখী হইব।

কলিকাতার স্বাস্থ্য।—কলিকাতায় ইনফ্লুয়েঞ্জা হ্রাস পাইলেও এখনও একেবারে তিরোহিত হয় নাই। হাম-বসন্ত এবং কলেরাও আরম্ভ হইয়াছে। এ সময় সহরবাসীর বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন কর্ত্তব্য।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের দাতব্য বিভাগ।—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের দাতব্য ঔষধালয়ে এবার ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগী বহু সংখ্যক আরোগ্য লাভ করিয়াছে। 'জ্বরের চা' নামক এক প্রকার নূতন ঔষধ আবিষ্কারের ফলে এ রোগের চিকিৎসায় সাফল্য লাভ হইয়াছে। ইহা গরম জলে কিছুক্ষণ রাখিয়া সেবন করিতে হয় এবং ইহার কার্য্যকারী শক্তি সদ্যঃই বুঝা যায়।

ইনফ্লুয়েঞ্জায় বৈদ্যুতিক চিকিৎসা।—জোয়ারসন নামক একজন সুইডেন্ দেশীয় ডাক্তার তীব্র বৈদ্যুতিক তাপ সহযোগে স্পেন দেশীয় ইনফ্লুয়েঞ্জা পীড়িত বহু সংখ্যক ব্যক্তিকে আরোগ্য করিয়াছেন। এই তাপ প্রয়োগে প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্মোদগম হয় এবং তাহাতেই না কি এ রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। এ চিকিৎসার বিস্তৃত বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই, আমরা উহা জানিবার জন্য উৎসুক থাকিলাম।

ম্যালেরিয়ার ঔষধ।—লাহোরের সিবিল মিলিটারি গেজেটে প্রকাশ—ইটালির জনৈক ডাক্তার ম্যালেরিয়ার এক নূতন ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। এ ঔষধে এক সপ্তাহেই না কি ম্যালেরিয়া জ্বর সম্পূর্ণরূপে

আরোগ্য হয়। ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত বাঙ্গালা দেশে ইহার পরীক্ষা করিলে হয় না ?

দোক্তায় মৃত্যু।—মেদিনীপুর-হিতৈষীতে প্রকাশ—"কাঁথি মহকুমার বাহিরী গ্রামের এক ব্যক্তি কয়েক দিন হইল কাঁথি হইতে গৃহে প্রত্যাগমন কালে পথিমধ্যে পানের দোকান হইতে পান ক্রয় করিয়া ভক্ষণ করে। পানে দোক্তা দেওয়া ছিল। লোকটী পান খাইয়া কিছু পথ চলিয়া যাওয়ার পর তাহার মাথা এবং শরীর হইতে খুব ঘর্ম্ম নির্গত হইতে থাকে। সে তখন কাঁপিতে থাকে। সে পথিপার্শ্বে পড়িয়া যায় এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে থাকে, ইহার অল্পক্ষণ পরেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে।" দোকানের চাবি খিলি পান এক পয়সায় কিনিয়া যাঁহারা চর্ব্বণসুখ উপলব্ধি করিয়া থাকেন, এ ঘটনায় তাঁহারা কিছু শিখিবেন কি ?

ইন্‌ফুলেঞ্জায় তামা।—২৪ পরগণা-গোবরডাঙ্গা হইতে কবিরাজ শ্রীযুক্ত আশুতোষ ধন্বন্তরি পত্রান্তরে লিখিয়াছেন, "ডাক্তার সাল-জার, ওয়াটসন, হকিন্স প্রভৃতি পাশ্চাত্য ডাক্তারগণ পরীক্ষা দ্বারা জানিয়াছেন যে তামার ব্যবহার দ্বারা কলেরা, ক্ষয়কাশ, অর্শ, পুরাতন উদরাময়, অতিসার মৃগী প্রভৃতি রোগ ভাল হয়! হোমিওপ্যাথি ও এলোপ্যাথি কুপ্রম এই তামা হইতে প্রস্তুত। আয়ুর্ব্বেদে শোধিত তামার ব্যবহার খুব আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ দেখিয়াছেন যে, যাহারা তামার খনিতে কাজ করে, তাহারা অনেক রোগের হাত হইতে রক্ষা পায়। বর্ত্তমান ইন্‌ফুলুয়েঞ্জা রোগ যেখানে সংক্রামক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেখানে সকলকে তামার তাগা পরাইয়া সুফল পাওয়া গিয়াছে।"

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৩য় বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৫—চৈত্র। | ৭ম সংখ্যা।

আমাদের দেশের খাদ্য ও পথ্য।

—:০:—

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

ধান্য-জাত খাদ্য।

বিগত অগ্রহায়ণ মাসের "আয়ুর্ব্বেদ" পত্রে—"শিশুর খাদ্যবিচার" ইতি নামধেয় একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। নিবন্ধের মুখবন্ধে এ অধমের প্রতি একটু কটাক্ষ করা হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র রায় এম্ এ মহোদয়—বঙ্গসাহিত্যের অকৃত্রিম সুহৃদ্, সুতরাং তাঁহার কথা আমার শিরোধার্য্য। তাঁহার আক্ষেপ—আমি অনেক কাগজেই অনেক প্রবন্ধ লিখি, কিন্তু কোনটাই শেষ করিতে পারিনা! অবশ্যই ইহা আমার দোষ, এ কথা ত অস্বীকার করা চলেনা। তিনি আমার অগ্রজতুল্য—ভক্তিভাজন, তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিবার শক্তি ত আমার নাই। আমার আত্মপক্ষসমর্থনের কেবল একটী মাত্র কৈফিয়ৎ আছে—আমি সারস্বত মন্দিরের পূজারি নহি, স্বেচ্ছাসেবক মাত্র; স্বেচ্ছা সেবার দোষ—তাহার উপর বারমাস নির্ভর করা যায় না। আমার দুর্ভাগ্য—এমন সহজ সত্যটুকুও সতীশ বাবু ভুলিয়া গিয়াছেন!

কখনও স্বনামে পরিচয় দিয়া, কখনও বা ছদ্মনামের অন্তরালে থাকিয়া আমি ত আশৈশব মাতৃভাষার সেবা করিয়া আসিতেছি, কিন্তু এই "নভেলী" যুগে, নভেল ছাড়া কাজের কথা ত বিকাইতে দেখিলাম না! মর্ম্মব্যথার সহৃদয় শ্রোতাও পাইলাম না! যে দেশে আচার্য্য অক্ষয় চন্দ্রের স্বাস্থ্যনীতি অনধিকারীর ধিক্কার-বাণে ক্ষত বিক্ষত হইতে পারে, সে দেশে আমার মত নগণ্য ব্যক্তির রচনাকে কেহ কি অভিনন্দিত করিতে পারে? বন্ধু বর্গের অনুরোধে অযোগ্য হইয়াও, কদাচিৎ সাদা কাগজে একটু কালীর আঁচড় দিয়া ফেলিয়াছি,—তাহা আমার প্রয়াসের পূর্ব্বাভাষ, তাহাকে পরিণতির পূর্ণ সৌষ্ঠব দিতে আমার

সাহসে কুলায় নাই। আমার বিশ্বাস, বাঙ্গালীর অতীত বিস্মৃতিময়, বর্ত্তমান অগ্নিজ্বালাময়, ভবিষ্যৎ অন্ধ তমসাচ্ছন্ন! তাই নিজের জাতির সব ভুলিয়া যে পাপাচরণ করিয়াছি, তাহারই প্রায়শ্চিত্ত করিতে—"পুরাতন"কে কখন কখন "নবরাগ" দিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু আমার চেষ্টার আগুন্তই নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। চিতা চুল্লীর অঙ্গার ঘাঁটিয়া হাত কাল করিয়াছি, তথাপি সে "বিষ্ণুপঞ্জর" খুঁজিয়া পাই নাই। কেবল মনে হইয়াছে—এই সাহিত্যসেবাই আমার ভাগ্য-গগনের নষ্ট চন্দ্র, স্বর্গোদ্যানের নিষিদ্ধফল; এই জন্যই আমার উদ্যমের শেষভাগ শিথিল হইয়া পড়িয়াছে।

বাঙ্গালী যদি কাজের কথা শুনিত, গুণের আদর করিত, তাহা হইলে কবিরাজ সত্য চরণের "ভৈষজ্য মণিমাণিকার" এতদিনে ৫টী সংস্করণ হইত। বিরজাচরণের "বনৌষধি দর্পণে" বহু সংসার প্রতিবিম্বিত হইত! বঙ্কুবিহারীর "জীবন চিত্র" গৃহে গৃহে বিরাজ করিত।

আমি সতীশ বাবুকে আশ্বাস দিতেছি—"জ্বর" নামক প্রবন্ধটী পরিবর্ত্তিত হইয়া মদ্রচিত "আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাসের" অঙ্গীভূত হইয়াছে। "আমাদের দেশের খাদ্য ও পথ্য" গ্রন্থাকারে পাঠকবর্গের সঙ্গে পুনঃ সম্ভাষণের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। অতঃপর আর কোন প্রবন্ধই "ক্রমশঃ"—ভাবে এ অকিঞ্চনের নাম স্বাক্ষরের বিশেষত্ব লইয়া মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইবে না।

চিপিটক বা চিঁড়া।

ধান্য হইতেই ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। বোধ হয় বৌদ্ধ যুগেই ইহার প্রথম আবিষ্কার। বৈষ্ণবেরা ইহার বহুল প্রচলন করেন। ধান্যকে জলে ভিজাইতে হয়, তাহার পর খোলায় ভাজিতে ভাজিতে স্ফুটিত হইলে, ঢেঁকিতে ফেলিয়া ধীরে ধীরে 'পাড়' দিতে হয়। ঢেঁকির মুষলে—লৌহের বেষ্টনী থাকিলে চলিবে না। বঙ্গদেশে সূত্রধর জাতীয়া স্ত্রীলোকগণ—চিঁড়া প্রস্তুত করে।

চিঁড়া অত্যন্ত গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, বায়ুনাশক, শ্লেষ্মাবর্দ্ধক। অতিসার ও প্রবাহিকা রোগে—চিঁড়ার মণ্ড প্রয়োগ করিলে, বিরেচকের কার্য্য করে অর্থাৎ মল নিঃসরণ হয়। এইজন্য সাধারণের ধারণা—চিঁড়া ধারক, ইহাতে পেট আঁটিয়া যায়। চিঁড়া কিন্তু ধারক নহে। শরৎকালে চিঁড়া ও নারিকেল ভক্ষণ করিলে, পিত্ত নিঃসরণের সাহায্য হইয়া থাকে, পিত্তজ বিষাক্ততার আশঙ্কা থাকে না।

চিঁড়া দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া, শর্করা সংযোগে পায়স প্রস্তুত করিতে হয়। এই পায়স—অত্যন্ত শুক্রবৃদ্ধিকারক, কামোদ্দীপক এবং বলকর। ইহা ক্রূরকোষ্ঠে - জোলাপের কার্য্য করিতে পারে।

যদি উদরাময়পীড়িতব্যক্তিকে চিঁড়ার মণ্ড ব্যবস্থা কর,—তাহার রোগ বাড়িতে পারে। তবে—চিঁড়াকে ভাতের মত সিদ্ধ করিয়া, মাড় গালিয়া ফেলিয়া খাইতে দিলে, তাহা অপেক্ষাকৃত লঘুপাচ্য হয়।

চিঁড়াকে ঘৃত সংযোগে ভাজিয়া কিঞ্চিৎ মরিচচূর্ণ ও লবণ সংযোগে ভক্ষণ করিলে, বহুমূত্র রোগীর উপকার হয়। নবপ্রসূতা নারীকেও চিঁড়া ভাজা খাইতে দেওয়া উচিত। ইহাতে জরায়ুর দোষ নষ্ট হয়। ভাজা চিঁড়া কফনাশক, সর্দ্দী, কাসি ও গাত্র বেদনায় উত্তম ফলপ্রদ। অধিকন্তু ইহা পিপাসা নিবারণ

করে, মুখ-গহ্বরের লালা নিঃসরণের সাহায্য করে, স্বাদগ্রহণের শক্তি বাড়াইয়া—অরুচি দূর করে।

খণ্ড চিপিটক।—আধপোয়া চিঁড়াকে শুষ্ক খোলায়, মৃদু উত্তাপে, বেশ করিয়া ভাজিবে। যখন চিঁড়ার বর্ণ বাদামের মত হইবে, তখন ঐ চিঁড়াকে হামানদিস্তায় ফেলিয়া গুঁড়া করিয়া লইবে। আধপোয়া চিনীতে ৵।০ সের জল দিয়া আগুনে চড়াইবে। রস একটু চট্‌চটে হইলে তাহাতে চিঁড়াচূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া নাড়িতে থাকিবে। ঘন হইলে নামাইয়া তাহাতে ৪ রতি এলাচ চূর্ণ, ৪ রতি মরিচ চূর্ণ এবং ১ রতি কর্পূর নিক্ষেপ করিবে। ইহা অতি উপাদেয় খাদ্য। অত্যন্ত শুক্রবৃদ্ধিকর মাংসবৰ্দ্ধক, ইন্দ্রিয়তর্পক। ক্ষয়রোগীর পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী।

চিঁড়া সাধারণতঃ গুরুপাক—তাই ইহার নাম "পৃথুক"। চরকের সূত্র স্থানে—ভাজা চিঁড়া অল্প পরিমাণে ভক্ষণ করিবার উপদেশ পাওয়া যায়।

ভৃষ্ট তণ্ডুল বা মুড়ি।

ইক্‌মিক্‌কুকারের আবিষ্কার কর্ত্তা অসাধারণ পণ্ডিত, প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার ৺ইন্দুমাধব মল্লিক—বিলাতী বিষকুটের চেয়ে বাঙ্গালার মুড়ির প্রশংসা করিতেন। বাস্তবিক মুড়ি গৃহস্থের একটী সহজলভ্য সুলভ খাদ্য।

স্থূল ধান্যকে উত্তমরূপে ঝাড়িয়া ও বাছিয়া লইয়া, অতি পরিষ্কার জলে ৩।৪ দিন ভিজাইয়া রাখিবে। পরে ধান্যগুলিকে প্রয়োজনমত জল দিয়া সিদ্ধ করিবে। এই সিদ্ধ ধান পরিষ্কার জলে একরাত্রি আবার ভিজাইয়া রাখিবে। পর দিন আবার তাহাকে সিদ্ধ করিবে। হাঁড়ি হইতে বাষ্প উত্থিত হইলে ধানগুলি নামাইয়া লইবে। এই ধান্যের নাম "দোভাবা" ধান। দোভাবা ধানকে রৌদ্রে শুকাইবে—যেন বেশী শুকাইয়া 'কট্‌কটে' না হয়। মধ্যম রূপ শুষ্ক হইলে, সেই ধান্য হইতে চাউল প্রস্তুত করিবে। ইহার নাম "মুড়ির চাল"। মুড়ির চাল রসযুক্ত থাকায় —বেশী দিন ঘরে রাখা উচিত নহে। যে ধান্য হইতে মুড়ির চাউল প্রস্তুত করিবে, সে ধান্য যেন নূতন না হয়। পুরাতন ধান্যই মুড়ির চাউল প্রস্তুত করিবার পক্ষে প্রশস্ত।

এইবার "মুড়ির চাউল" হইতে মুড়ি প্রস্তুত কর। মুড়ি ভাজিবার ৫।৭ ঘণ্টা পূর্ব্বে [১০।১২ ঘণ্টা পূর্ব্বে হইলেও ক্ষতি নাই] চাউল গুলি একবার বেশ করিয়া ধুইয়া লইবে এবং তাহাতে কিছু লবণ মাখাইয়া রাখিয়া দিবে। যদি চাউল গুলি বেশী শুকাইয়া গিয়াছে মনে হয়, তবে তাহাতে আর একটু জল মাখাইয়া লইবে। এই লবণাক্ত আর্দ্র চাউল—একখানা মাটীর খোলায়, মৃদুতাপে কাষ্ঠের তাড়ু দিয়া বেশ করিয়া নাড়িতে থাকিবে। যখন দেখিবে—চা'লগুলি নীরস হইয়াছে—দু' একটী চা'ল ফুটিতেও আরম্ভ করিয়াছে— তখন আগুন হইতে চা'ল গুলি নামাইয়া রাখিবে। এইবার বালুকাপূর্ণ উত্তপ্ত খোলায়—কুঁচির সাহায্যে অল্পে অল্পে চাউল গুলিকে ভাজিয়া লইবে। তাহা হইলেই মুড়ি প্রস্তুত হইল। মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমান জেলায় উৎকৃষ্ট মুড়ি প্রস্তুত হয়। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের হাউর ষ্টেশনে – আমি খুব বড় মুড়ি দেখিয়াছি। অমন মুড়ি বাঙ্গালার আর কোন অঞ্চলে জন্মায় না।

মুড়ি—অত্যন্ত লঘুপাক। মুড়ি ভিজাইয়া বা শুষ্ক মুড়ি উত্তমরূপে চিবাইয়া খাইতে হয়। চিবাইবার সময় মুখগহ্বরে প্রচুর লালাস্রাব হইতে থাকে। ইহাতেই মুড়ি অতি সহজে জীর্ণ হইয়া যায়। নারিকেল সংযোগে শুষ্ক মুড়ি চিবাইয়া খাইলে অম্লবিপাকের শান্তি হইয়া থাকে। মুড়ি খাওয়ার পর জল কিম্বা অপর কোন তরল পদার্থ পান করা উচিত নহে, জল কিম্বা দুগ্ধ পানের আবশ্যকতা হইলে, অন্ততঃ ১ ঘণ্টা পরে পান করা উচিত। মুড়িতে তৈল কিম্বা ঘৃত মাখিলে—তাহা গুরুপাক হইয়া থাকে। এরূপ মুড়ি প্রবলাগ্নির পক্ষেই ব্যবহার্য্য।

মুড়ির উপাদান—

আমিষ জাতীয়	৫·৯
শালি-জাতীয়	৮২·৪
লবণ জাতীয়	১·৩
স্নেহ „	০·১
জল	১০·১

মুড়িতে লবণ থাকায়—উহা শোথরোগী এবং রক্তহীন ব্যক্তির খাওয়া উচিত নহে। যাহাদের বৃক্কের দোষ আছে (অর্থাৎ কিড্‌নির দৌর্ব্বল্য) তাহাদের পক্ষেও মুড়ি ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

মুড়ি বা চাউল ভাজা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মৃদুতাপে অল্প ঘৃতে ভাজিবে। ভাজা হইলে, তাহাতে কিছু সূক্ষ্ম চিনী এবং অল্প পরিমাণে মৎস্যণ্ডীর (মিছরী) চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। বেশ করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া লইয়া গরম থাকিতে থাকিতে লাড়ু পাকাইবে, এই লাড়ু খুব মুখপ্রিয়। হৃদ্‌পিণ্ডের দৌর্ব্বল্যে ইহা একটী সুপথ্য। লাড়ু পাকাইবার সময় কিছু মরিচ চূর্ণ, জীরা ভাজার চূর্ণ এবং অল্প পরিমাণে ভাজা কৃষ্ণ তিল মিশাইয়া লইলে ইহা আরও রুচিকর হইয়া থাকে।

মুড়ি ভিজান' জল—হিক্কা ও বমি নিবারণে ব্যবহৃত হয়।

লাজ বা খৈ।

স্বর্ণ বর্ণ খর্ব্বাকৃতি "কণকচূর্ণ" নামক ধান্য হইতে সাধারণতঃ খৈ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ধান্যকে বালুকাপূর্ণ উত্তপ্ত খোলায় কুঁচির সাহায্যে ক্ষিপ্রহস্তে ভাজিয়া লইলেই খৈ হইয়া থাকে। খৈ এর তুল্য লঘু খাদ্য আর দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেক রোগেই খৈ পথ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। খৈ অনেকগুলি ঔষধের উপাদান স্বরূপেও গৃহীত হইয়াছে।

খৈ এর গুণ। অত্যন্ত লঘু, অগ্নি বৃদ্ধি কর, পাচক, মল ও মূত্র প্রবর্ত্তক, রুক্ষ, শীতল, মধুর রস, বমি, অতিসার, অজীর্ণ, কফজ ও পিত্তজব্যাধিনাশক, রক্তদুষ্টি, রক্তাল্পতা, রক্তপিত্ত, মেহ, দাহ ও পিপাসা নাশক। খৈ শরীরের মেদ কমাইয়া দেয়। বল বৃদ্ধি করে।

লাজমণ্ড। টাটকা ভাজা খৈ বেশ করিয়া বাছিয়া লইয়া,—গরম জলে আধ ঘণ্টা ভিজাইবে। পরে সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ডে ছাঁকিয়া মণ্ড প্রস্তুত করিবে। খৈকে জলে সিদ্ধ করিয়াও মাড় বাহির করা যায়। ইহা সমধিক গুণসম্পন্ন। পাকস্থালীর পীড়ায় (গ্রহণী অতিসার প্রভৃতি) জ্বরে, পিত্তজ ও কফজ রোগে, অতিঘর্ম্মে, হিমাঙ্গে, সান্নিপাতিক বিকারে এই লাজমণ্ড বা খৈ এর মাড়—উৎকৃষ্ট পথ্য। সাগু-বার্লির চেয়ে খৈএর মণ্ড লঘু। অনেক শিক্ষিত ডাক্তারও—বিদেশী ফুডের পরিবর্ত্তে খৈ-মণ্ড ব্যবহা[illegible]

করিবার উপদেশ দেন। খৈএর উপকারিতায় মুগ্ধ হইয়াই হিন্দুরা সকল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে —খৈকে সাদরে স্থান দিয়াছিলেন। প্রাচীন বৈদ্যগণ রোগীকে অন্ন পথ্য দিবার পূর্ব্বে—মুগের যূষ মাখিয়া খৈ খাইতে দিতেন।

খৈ হইতে নানাবিধ সুখাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। ধনেখালির "খৈচুর" কাঁচরাপাড়ার "চাঁপা" জয়নগরের মোয়া; কৈচারের "মুকুন্দ মোয়া"—এক সময় রাজ রাজেশ্বরের রসনাকেও রসসিক্ত করিয়া তুলিত। এখন দেশের লোকের রুচি ফিরিয়াছে—পথে পথে ফিরি করিয়া ফিরিলেও কেহ মোয়া কিনিতে চায় না!

খৈ ২ ভরি, গোলাপ জলে ভিজাইয়া লেবুর রস ও চিনীসহ খাইতে দিলে. অজস্র উত্থিত হিক্কারও নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

মুগের যূষে—খৈ এবং চিনী প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তজ জ্বর প্রশমিত হয়।

গরম দুগ্ধ খৈ, মিছরীর গুঁড়া একত্রে রাত্রিকালে ভক্ষণ করিলে, বায়ুর অনুলোম হইয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

খৈচূর্ণ মধুর সহিত চাটিয়া খাইলে হাঁপানীর টান কমে, হিক্কা নিবারিত হয় ও বমনোদ্বেগ দূর হয়।*

শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ।

পঞ্চকর্ম্ম।

(ডাক্তার-কবিরাজ সংবাদ)

—:০:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

ডাঃ। সে দিনকার সে রোগীর আর কোন সংবাদ পেয়েছিলেন?

ক। হাঁ, পেয়েছিলাম বৈকি? সে দিন বমি করা'তেই সে সুস্থ হ'য়েছিল আর কোন উপসর্গ ঘটেনি।

ডাঃ। লোকটা আর বোধ হয় যা'র—তা'র কথা শুনে কোন জোলাপের ওষুদ খাবে না।

ক। কথা তাই বটে। তবে লোকের মন বলা যায় না। আবাব কেউ হয়ত পরামর্শ দেবে, সে থাকতে পা'রবে না। আর এই রকম অযাচিতপরামর্শদাতারা হাতে স্বর্গ তুলে দেন। বলেন যে,—এই ওষুদ খেলেই একেবারে নিরাময়! লোকে স্বল্পবুদ্ধি, সহজেই তাই ক'রে বসে. পরিণামে যে বিপদ ঘ'টতে পারে- তা' বোঝে না।

---

* "আমাদের দেশের খাদ্য ও পথ্য" সাময়িক পত্রে শতাধিক প্রবন্ধেও নিঃশেষ হইবার নহে। অতএব এ প্রবন্ধের এই স্থানেই উপসংহার করা হইল। "আমাদের দেশের খাদ্য ও পথ্য"—শীঘ্রই পুস্তাকাকারে প্রকাশিত হইবে। লেখক।

ডাঃ। এই সব পরামর্শদাতার পরামর্শে অনেক সময় লোকের বিষম অনিষ্ট হয়।

ক। তা'ত নিশ্চয়ই হয়? কিন্তু অনেক পেটেণ্ট ওষুদ আর অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ শিক্ষিত ডাক্তারের চিকিৎসায়ও অনেক রোগীর অনিষ্ট হয়। পূর্ব্বে মনুষ্য বা পশুর মিথ্যা-চিকিৎসা ক'রলে দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল।

ডাঃ। এখনও সে আইন আছে।

ক। আছে বটে, কিন্তু সে মিথ্যা চিকিৎসায় নয়, সদ্যোমারাত্মকচিকিৎসায়। একজন পাশ করা ডাক্তার যদি দুই তিন মাস মিথ্যা চিকিৎসা ক'রে কোন রোগীর মৃত্যুর কারণ হন, তা' হলে তাঁকে দণ্ডিত করা যায় না। সদ্যোমারাত্মক চিকিৎসায়ও প্রায় সেই রকম। তবে যাঁরা পাশ না দিয়ে চিকিৎসা করেন, তাঁ'রা সদ্যোমারাত্মক চিকিৎসা করলে দণ্ডিত হ'তে পারেন। কিন্তু যে অবস্থার লোকের মধ্যে তা'রা চিকিৎসা করে, তা'র কয় জনই বা সেটা বুঝতে পারে? আর কয় জনই বা দণ্ডিত করবার জন্য চেষ্টা করে?

ডাঃ। যাক, সে কথা। এখন বস্তি প্রয়োগের কথা বলুন।

ক। কেন হাতে রোগীপত্র নেই নাকি?

ডাঃ। জরুরী রোগী বড় নেই। একটা ছিল মাত্র।

ক। তবে নিশ্চিন্ত হয়ে শুনুন। বস্তি তিন প্রকার। প্রথম অনুবাসন অর্থাৎ স্নেহ দ্বারা বস্তি প্রয়োগ, দ্বিতীয় নিরূহ বা আস্থাপন-কষায়াদি দ্বারা বস্তিপ্রয়োগ, তৃতীয় উত্তর বস্তি অর্থাৎ লিঙ্গ বা যোনি মধ্যে বস্তি প্রয়োগ।

ডাঃ। আচ্ছা প্রথমে বলুন—যা'দের বস্তি দিতে হয়, আর যা'দের দিতে নেই।

ক। আস্থাপনের অযোগ্য ব্যক্তি, যথা অজীর্ণ রোগী—অতি স্নিগ্ধ, স্নেহপীত উৎক্লিষ্ট দোষ, যানাক্লান্ত, অতি দুর্ব্বল, ক্ষুধা তৃষ্ণা ও শ্রম পীড়িত, অতি কৃশ, যাহারা আহার বা জলপান করিয়াছে, যাহাদের বমন বা বিবেচন করান হইয়াছে, ক্রুদ্ধ, ভীত, মত্ত, মূর্চ্ছিত, যাহাদের প্রায়ই বমন হয়, এবং যাহারা মুখ দিয়া থুঁথু উঠা, শ্বাস, কাস, বদ্ধোদর, ছিদ্রোদর, আধ্মান, অলসক, বিসূচিকা, অতিসার, মধুমেহ বা কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত। যে সকল স্ত্রীলোক আমগর্ভ প্রসব করে তাহাদেরও আস্থাপন কার্য্যের অনুপযুক্ত জানিবে।

ডাঃ। থামুন মশা'য়। বমন-বিরেচনের পরে ত বস্তিকর্ম্ম ক'রতে হয়, তবে বমন-বিরেচনের পরে বস্তিকর্ম্ম নিষেধ করা হ'ল কেন? আর বদ্ধোদর ছিদ্রোদর, এ সব কি?

ক। বমন-বিরেচন করা'বার কিছুদিন পরে বস্তি প্রয়োগ ক'রতে হয়? এখানে বমন-বিরেচনের পর সঙ্গেই সঙ্গেই বস্তিকর্ম্ম নিষেধ করা হ'য়েছে। আর ঐ যে উদর রোগের কথা বল্লেন, রোগ বিনিশ্চয়ে উদর রোগের মধ্যে তা'দের পরিচয় পা'বেন।

ডাঃ। এখন কা'দের আস্থাপন ক'রতে হয়—বলুন।

ক। সর্ব্বাঙ্গ বাত (অর্থাৎ যাদের সর্ব্বাঙ্গে বায়ুর প্রকোপ) একাঙ্গবাত, কুক্ষিরোগ, বায়ু, মল, মূত্র ও শুক্রের বিবদ্ধতা, বল, বর্ণ, মাংস ও শুক্রক্ষয়জনিত রোগ, উদরাধ্মান, অঙ্গের অসাড়তা, ক্রিমিকোষ্ঠ, উদাবর্ত্তই, বেগধারণজনিত রোগ, অঙ্গের স্তব্ধতা, অতিসার, প্লীহা, গুল্ম, হৃদ্রোগ, ভগন্দর, উন্মাদ, জ্বর, ব্রধ্নরোগী, শিরশূল, কর্ণশূল, হৃদয়, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও কটীদেশের গ্রহ (আড়ষ্ট

হওয়া বা ধরিয়া যাওয়া) কম্পন, আক্ষেপ, শরীরের অত্যন্ত গুরুত্ব, বা লঘুত্ব, রজঃক্ষয়, রজঃহীনতা, বিষমাগ্নি, হিক্কা—জানু, জঙ্ঘা, উরু, গুল্ম পায়ের গাঁট, পার্ষ্ণি (গোড়ালি) প্রদেশ (পায়ের পাতা) যোনিকচ্ছ, অঙ্গুলি, স্তনদেশ, দন্ত, নখ, পর্ব্ব ও অস্থিসমূহে শূলবং বেদনা, শোথ; স্তব্ধতা, অন্ত্রকূজন (পেট ডাকা) পরিকর্ত্তিকা (উদরের মলদ্বারে কর্ত্তনবৎ পীড়া) উদরে অল্প অল্প শব্দ, এই সকল রোগে, বিশেষতঃ নানা প্রকার বাতব্যাধিতে (Nervous deases) আস্থাপন বস্তি প্রধানতম চিকিৎসা। বৃহৎ বৃক্ষের মূলচ্ছেদ করিলে তাহা যেমন একেবারে নষ্ট হইয়া যায়, আস্থাপন প্রয়োগ দ্বারা বায়ুর প্রধান স্থান পক্কাশয় স্থিত বায়ু প্রশমিত হয় বলিয়া অন্যান্য স্থলগত বায়ুরও সেইরূপ প্রশমন হয়।

ডা। এখন অনুবাসনের যোগ্যও অযোগ্য ব্যক্তির নির্দ্দেশ করুন।

ক। যা'রা আস্থাপনের অযোগ্য, তা'রা অনুবাসনেরও অযোগ্য, বিশেষতঃ নবজ্বর, পাণ্ডুরোগ, কামলা, প্রমেহ, অর্শঃ, প্রতিশ্যায় অরুচি, অগ্নিমান্দ্য দৌর্ব্বল্য, প্লীহা, কফোদর, উরুস্তম্ভ, পিত্ত ও কফজনিত অভিষ্যন্দ (চোখ উঠা) শ্লীপদ, গলগণ্ড. অরুচী (আব বিশেষ) ও ক্রিমিকোষ্ঠ এই সকল ব্যক্তি এবং যাহারা ভোজন করে নাই, যাহাদের কোষ্ঠ গুরু যাহারা বিষ বা শরবিষ পান করিয়াছে, তাহাদিগকে অনুবাসন প্রয়োগ করিবেনা।

ডা। এখন যা'দের অনুবাসন দেওয়া উচিত—বলুন।

ক। যাহাদের আস্থাপন প্রয়োগ করা যায়, তা'দের অনুবাসনও প্রয়োগ করা যায়। বিশেষতঃ রুক্ষ, তীক্ষ্ণাগ্নি ও বাতার্ত্তরোগিগণের পক্ষে অনুবাসন প্রধানতঃ চিকিৎসা। মূলে জলসেক ক'রলে যেমন বৃক্ষের নূতন পল্লব উৎপন্ন হয়, সেইরূপ অনুবাসন দ্বারা রোগনাশ হওয়ায় নূতন ধাতু সকল উৎপন্ন হোয়ে থাকে।

ডা। অনুবাসন প্রয়োগের নিয়ম বলুন।

ক। ব'লছি, কিন্তু দেখুন—যে সকল রোগে যে যে কর্ম্ম করা প্রশস্ত বলা হ'য়েছে, তাও অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিতে হয়। এই মনে করুন—অতিসার রোগে আস্থাপন প্রয়োগ ক'রবার কথা বলা হোয়েছে, কিন্তু অতিসার হ'লেই আস্থাপন দিতে হয় না। অতিসারের পুরাতন, অবস্থাতেই আস্থাপন হিতকর।

ডাঃ। তবেইত গোলমালে ফেললেন। কোন্ রোগের কোন্ অবস্থায় কোন্ কর্ম্ম করতে হ'বে, তা' না জা'নলে পঞ্চকর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ কি ক'রে হবে।

ক। এত জ্ঞান লাভ নয়, যত কর্ম্ম আয়ুর্ব্বেদে আছে, সেগুলি এই প্রকার, এই রূপে প্রয়োগ ক'রতে হয়, তা'রি একটা মোটা মুটি ধারণা হওয়া মাত্র।

ডা। তবে রোগের অবস্থাভেদে প্রয়োগ শিখব কি করে?

ক। সে সম্বন্ধে আমরাই বিশেষ কিছু বুঝিনে। তা' আপনাকে শে'খাব কি করে! তবে রোগভেদে কোন্ রোগের কিরূপ অবস্থায় কিরূপ চিকিৎসা করা উচিৎ, সে বিষয় ক্রমশঃ আমরা আয়ুর্ব্বেদে আলোচনা ক'রব, তাইতে দেখতে পাবেন।

ডাঃ। আচ্ছা রোগনাশ ব্যতীত বস্তি দ্বারা আর কি, কি উপকার হয়?

ক। বস্তি প্রয়োগের ফলে ক্ষীণশুক্র ব্যক্তির বাজীকরণ হয়, কৃশ ব্যক্তি পুষ্টি হয়, স্থূল দেহ কৃশ হয়, দৃষ্টি প্রসন্ন হয়, বলী পলিত নষ্ট হয়, যৌবন দীর্ঘস্থায়ী হয়, শরীর পুষ্ট হয়, বর্ণ উজ্জ্বল হয় বল বৃদ্ধি হয়, এবং পরমায়ু বৃদ্ধি হয়।

ডাঃ। 'বলী পলিত নষ্ট হয়—মানে কি? বৃদ্ধ ব্যক্তিরও কি বলী পলিত নষ্ট হ'য়ে আবার যৌবন ফিরে আসে?

ক। তাও কি কখন হ'তে পারে মশায়! আর আপনি নিতান্ত অমনোযোগী বা প্রতিভাহীন ছাত্র ব'লে এ প্রশ্ন উত্থাপন করলেন? কেননা যখন পূর্ব্বে বলা হ'য়েছে যে, বৃদ্ধ ব্যক্তিকে বস্তিপ্রয়োগ করা নিষেধ, তখনই ত এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হ'য়ে গেছে।

ডাঃ। সত্যই অধ্যাপক মহাশয়, এটা এই অযোগ্য ছাত্রের বিশেষ ত্রুটী। এক্ষণে ত্রুটি মার্জ্জনা ক'রে বস্তি প্রয়োগ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করুন।

ক। বৎস্য, এক্ষণে বস্তিপ্রয়োগ সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। বিরেচনের সাতদিন পরে রোগী সবল হইলে অনুবাসন প্রয়োগ করিতে হয়। প্রথমে রোগার শরীরে তৈল মর্দ্দন করিয়া উষ্ণ জল দ্বারা স্নিগ্ধ করিবে। পরে ভোজন করাইয়া অল্পক্ষণ পরে পাদচারণা করিতে বলিবে। অনন্তর মলমূত্র ত্যাগ করাইয়া স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিবে।

বলা হইয়াছে—সেই সকল দোষ পরিহারের জন্য শীত ও বসন্ত কালে দিবাভাগে এবং গ্রীষ্ম, প্রাবৃট ও শরৎ কালে—দিনান্তে স্নেহ বস্তি প্রয়োগ করিবে। বায়ুর আধিক্য থাকিলে যে কোন সময়ে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তীব্র রোগে যে রোগীর আহার জীর্ণ হইয়াছে, তাহাকে ভোজন করাইয়া অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। অভুক্ত* ব্যক্তিকে কদাচ স্নেহ বস্তি প্রয়োগ করিবে না। কারণ তাহাতে কোষ্ঠশুদ্ধ ও শূন্য থাকে বলিয়া স্নেহ ঊর্দ্ধে গমন করে। অতএব ভোজনের পরেই স্নেহবস্তি প্রয়োগ করা উচিত। ভুক্ত দ্রব্য বিদগ্ধ হইলে সেই অবস্থায় যদ্যপি স্নেহ বস্তি প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে জ্বর হইয়া থাকে। অত্যন্ত স্নিগ্ধ দ্রব্য ভোজন করাইয়া স্নেহ বস্তি প্রয়োগ করিবে না। কারণ তাহাতে দুই প্রকারে স্নেহ প্রয়োগ করা হয় বলিয়া মত্ততা ও মূর্চ্ছা হইয়া থাকে। আবার রুক্ষ অন্ন ভোজন করাইয়া স্নেহ বস্তি প্রয়োগ করিলে বল ও বর্ণ উৎপন্ন হয় না। সুতরাং অল্প পরিমাণে স্নেহ সংযুক্ত দ্রব্য আহার করাইয়া অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। অথবা রোগের অবস্থা বিবেচনায় কফ, পিত্ত ও বায়ুরোগীকে যথাক্রমে রুক্ষ মুগের যূষ দুগ্ধ বা মাংস রস পান করাইয়া অনুবাসন প্রয়োগ করিবে।

ডাঃ। আচ্ছা পূর্ব্বে বলা হয়েছে যে, ভুক্তব্যক্তিকে বস্তি প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ। আবার এখন বলা হচ্চে যে, আহার না করিয়ে বস্তি প্রয়োগ করবে না। এ যে বিষম মত দ্বৈধ ঘ'টল দে'খচি।

ক। মতদ্বৈধ কিছু ঘটেনি, একটু ব'লবার এবং বোঝবার এদিক ওদিক। অনুবাসন প্রয়োগ ক'রতে হ'লে রোগী যে পরিমাণ আহার ক'রতে অভ্যস্ত, তা'র সিকি পরিমাণ কম খাদ্য আহার করা'তে হয় আর, নিরূহ প্রয়োগ ক'রতে হ'লে আহার না করিয়ে পূর্ব্ব অন্ন জীর্ণ হ'লে প্রয়োগ করা উচিত।

ডাঃ। এবার বু'ঝতে পেরেছি।

ক। শুধু এইটুকু বুঝলে হ'বে না আরও একটু বুঝে রাখুন। অনেক সময় নিষিদ্ধ স্থলেও বস্তি প্রয়োগ করা আবশ্যক হ'য়ে পড়ে। যেমন বমিতে, হৃদ্‌রোগে এবং গুল্ম রোগে বমন, এবং কুষ্ঠাদি রোগে বস্তি কর্ম্ম নিষিদ্ধ হলেও আবশ্যক স্থলে প্রয়োগ কর'তে বাধ্য হ'তে হয়। এইজন্য যোগ্যাযোগ্য নির্দ্দেশের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা চলে না। কারণ দেশ কাল এবং বলের প্রতি লক্ষ্য রেখে নিষিদ্ধ কার্য্যও সময়ে ক'রতে হয়।

ডাঃ। এ বিষম ব্যাপার দেখছি, মাথা গুলিয়ে যায়।

ক। চিকিৎসাই বিষম ব্যাপার বৈকি। বিধাতার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম অশেষ কৌশলময় নরনারীদের চিকিৎসা করা কি সোজা কথা। পূর্ব্বেত ব'লেছি যে মহর্ষি আত্রেয় বলেছেন যে, এসব ব্যাপারে বিশাল বিপুল বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির চিত্তও আকুল হয়, তা' আমাদের মত অল্পবুদ্ধি লোকের মাথা গুলিয়ে যা'বে তা'তে আর সন্দেহ কি।

ডাঃ আচ্ছা আমরা এখন যে রকম যন্ত্র দিয়ে পিচকারী দিই, আয়ুর্ব্বেদের বস্তি কি সেই রকম ছিল।

ক। না, সে রকম ছিল না। আগে বস্তিনির্ম্মাণ ক'রবার কথাই বলি শুনুন। বস্তি (Bladder) দিয়েই বস্তি নির্ম্মাণ করার নিয়ম ছিল। পূর্ণবয়স্ক অথচ বৃদ্ধ নয়—এরূপ গো, মহিষ, শূকর, ছাগ বা মেষের বস্তিই এ জন্য ব্যবহৃত হ'ত। এই বস্তি কোমল, অত্যন্ত দীর্ঘ নয়, অত্যন্ত স্থূলও নয়, দৃঢ় এবং উপযুক্ত পরিমাণ দ্রব্য ধরে—এরূপ হওয়া উচিত। বস্তির অভাব হ'লে পাতলা চর্ম্ম, বা পুরু বস্ত্র দিয়ে প্রস্তুত কর'তে হয়।

এই ত গেল বস্তি। তা'রপর বস্তির একটা নেত্র বা নল চাই। রোগীর বয়স এক বৎসর হ'লে নলের পরিমাণ চার আঙ্গুল, এক বৎসর থেকে আট বৎসর পর্য্যন্ত আট আঙ্গুল, এবং আট থেকে ষোল বৎসর পর্য্যন্ত দশ আঙ্গুল দীর্ঘ হওয়া উচিত। নলের বেধও বয়স ভেদে ক্রমশঃ কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমা অঙ্গুলির মত হ'বে। আর উহার পরিনাণ বয়স ভেদে ক্রমশঃ দেড় আঙ্গুল, দুই আঙ্গুল ও আড়াই আঙ্গুল হ'বে। নলের যে মুখ মলদ্বারে প্রবিষ্ট করাতে হ'বে, তা'র পরিমাণ বয়স ভেদে যথাক্রমে কাক, এবং ময়ূরের পালকের নলের মত হবে। আর নলের ভিতরের ছিদ্র ক্রমশঃ মুগ, মাষকলায় বা মটর কলায়ের মত হবে। পঁচিশ বৎসরের অধিকবয়স হ'লে নলের পরিমাণ চার আঙ্গুল দীর্ঘ, মূলের বেধ অঙ্গুলির মধ্যভাগের ন্যায়, অগ্রের বেধ কনিষ্ঠাঙ্গুলির মধ্যভাগের ন্যায়, প্রবেশ মুখ শকুনের পালকের নলের মত, ভিজা মটরের ন্যায় ছিদ্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক। নলের নিম্নে বস্তি বন্ধনের জন্য দুইটী কর্ণিকা (কোণ) রাখিতে হইবে। এই স্থলে জানা উচিত যে, অঙ্গুলি পরিমাণ অর্থে রোগীর অঙ্গুলির পরিমাণ।

স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম, লৌহ, পিতল, হস্তিদন্ত, গো মহিষাদির শৃঙ্গ, স্ফটিক বা সারকাঠ—এই সকল পদার্থ দ্বারা নল প্রস্তুত করিতে হয়। এইরূপ নলের অভাবে শর, বাঁশ বা অস্থি দ্বারা নল নির্ম্মাণ করা উচিত। নল মসৃণ, দৃঢ়, গোপুচ্ছের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট অর্থাৎ গোড়ার দিক মোটা, মুখের দিক সরু, সরল ও অতীক্ষ্ণাগ্র (যাহার অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ নয়) হওয়া উচিত। পূর্ব্বোক্ত বস্তির সহিত এই নলের মূলদেশ উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা বাঁধিয়া তদ্দ্বারা বস্তি প্রয়োগ করিতে হয়। (ক্রমশঃ)

যক্ষ্মারোগ ও তাহার চিকিৎসা।

——:০:——

(অগ্রহায়ণ ৩য় সংখ্যার পর)

পূর্ব্বে যক্ষ্মরোগ সম্বন্ধে মোটামুটি অনেক কথা বলিয়াছি। আরও অনেক বলিবার আছে। জর্ম্মণ দেশের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার ককের প্রসাদে আমরা জানিতে পারিয়াছি, এ রোগের ঐ জীবাণুর নাম—"বেসিলাস্ টিউবার কুলোসিস্।" ইহারা সর্ব্বব্যাপী অর্থাৎ জলে, স্থলে শূন্যে, বাতাসে, জীবের খাদ্যে—বিচরণ করিয়া থাকে। এই ভয়ানক জীবাণু প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদেরদেহে প্রবেশ করিতেছে, কিন্তু সকল সময় সকল অবস্থায় ইহারা আমাদের অনিষ্ট করিতে সক্ষম হয় না। করুণাময় ঈশ্বর মানবদেহে এমন একটী মহাশক্তি দিয়াছেন, যে শক্তির প্রভাবে দুষ্টজীবাণু শরীরে প্রবেশ করিয়া সহসা অত্যহিত ঘটাইতে পারে না। সে মহা-শক্তির নাম "ফ্যাগোসাইট"। 'ফ্যাগোসাইট' অণু বিশেষ,—শরীরমধ্যেই তাহার বাস। বাহির হইতে দুষ্টজীবাণু শরীরে প্রবেশ করিলে এই "ফ্যাগোসাইট"ই জীবাণুগুলিকে খাইয়া ফেলে। আর্য্য ঋষিগণের অভিমত—মানুষের জীবনী শক্তি যতক্ষণ প্রবল থাকে, শারীর ধাতু সাম্য অবস্থায় থাকে, ততক্ষণ দুষ্টজীবাণু শরীরের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। জীবনী শক্তি হ্রাস হইলে ধাতুর বিকৃতি ঘটিলে, [শরীর রক্ষক "ফ্যাগোসাইটস্" সংখ্যায় হীন হইলে] জীবাণু শরীরকে আক্রমণ করিয়া থাকে। অনেক সময় জীবাণু পিতৃবীর্য্য ও মাতৃরক্তের সহিত ও প্রবেশ করিতে পারে। এ সকল কথা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে নিপুণ ভাবেই আলোচিত হইয়াছে।

কি কি কারণে ধাতু বৈলক্ষণ্য ঘটে? কারণ অনেক গুলি। যথা,—জনাকীর্ণ স্থানে বাস, বিশুদ্ধ বায়ু ও সূর্য্যালোকের অভাব, জলময় স্যাঁতানে স্থানে বাস, রুগ্ন পিতা মাতার ঔরসে জন্ম, আবদ্ধ স্থানে উৎকট আসনে বসিয়া কায করা, অতি মৈথুন, অতি ভোজন, অতি অল্পাহার, চিন্তা প্রভৃতি কারণে ধাতুর বিকার ঘটিয়া থাকে। ধাতুর বিকার ঘটিলে, রোগবীজাণু দেহে প্রবেশ করিয়া দেহকে নাশ করে।

যক্ষ্মাজীবাণু শরীরের নানাযন্ত্রে প্রবেশ করিয়া থাকে। আক্রান্ত যন্ত্রে প্রথমে স্থানে স্থানে গুটি প্রকাশ পায়। কালে সেগুলি হয় গলিয়া যায়,—ছোট বড় কোষে পরিণত হয়, কিম্বা শক্ত হইয়া শুকাইয়া যায়। কোষমধ্যে পুয ও রক্তস্রাবের সহিত মিশ্রিত থাকে, ছোট বড় শিরা বাহির হইয়া পড়ে। সময়ে সময়ে শিরাগুলি ফুলিয়া রক্ত থনিতে পরিণত হয় এবং ফাটিয়া যায়। কাসির সহিত দুষিত স্রাব—ফুসফুসের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হয়, কখনও মুখে থাকিয়া অন্ত্রে প্রবেশ করে। কখনও বা রস ও রক্তের সহিত সঞ্চালিত হইয়া সমস্ত দেহে ছড়াইয়া পড়ে।

যক্ষ্মার লক্ষণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এস্থলে অতি সংক্ষেপে আর একবার উল্লেখ করিতেছি।

জ্বর। অল্পাধিক, কখন সবিরাম কখনও বা স্বল্পবিরাম।

ঘর্ম্ম। অত্যন্ত, বিশেষতঃ ভোর রাত্রে বেশী।

কৃশতা। শরীরের গুরুত্ব দিন দিন কমিয়া যায়। সকল ধাতুই ক্ষীণ হইয়া পড়ে।

কাসি। হয় শুষ্ক না হয় আর্দ্র। রোগের আরম্ভে শুষ্ক কাসি, ফুস্‌ফুসে ক্ষত হইলে আর্দ্র কাসি। কাসি প্রথমে কিছুই ওঠে না, পরে খুব উঠিতে থাকে।

আণুবীক্ষণিক পরীক্ষায়—জীবাণু এবং ফুস্‌ফুসের তন্তু প্রভৃতি অণু দেখিতে পাওয়া যায়।

রক্তোৎকাস। কখনও রক্তের ছিটা কাসির সঙ্গে থাকে, কখনও ভলকে-ভলকে রক্ত উঠে।

বক্ষ পরীক্ষা। বক্ষের বিকৃতি ঘটে। যথাঃ—বুক বাঁকিয়া যায়, বসিয়া যায়। শ্বাস প্রশ্বাসের সময় বক্ষস্ফীতির ব্যাঘাত হয়; অর্থাৎ কোন স্থান ওঠে, কোন স্থান ওঠে না। রোগীর কথা কহিবার সময় বুকের উপর হাত রাখিলে স্পর্শকম্পনের আধিক্য! বাজাইলে শব্দের স্তৈমিত্য। যন্ত্রদ্বারা শুনিলে—নানারূপ অস্বাভাবিক শব্দজ্ঞান প্রথম অবস্থায়—যখন গুটি উঠিতেছে—তখন নিশ্বাস বায়ু শব্দ কখনও ক্ষীণতম,—প্রায় শোনা যায় না; কখনও কর্কশ, কখনও তরঙ্গায়িত; যখন ফুস্‌ফুস সংবৃত ও কঠিন হইতে আরম্ভ হয়—তখন নল শব্দ শোনা যায়। যখন গলিতে আরম্ভ হয়—তখন কট্‌কট্ এবং ভুড় ভুঁড় শব্দ, যখন ক্ষত কোষে পরিণত হয়, তখন ভড় ভড় শব্দ এবং অন্যান্য নানাবিধ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়।

আনুসঙ্গিক রোগ। যক্ষ্মার সঙ্গে প্রায়ই ফুস্‌ফুস্ নানা প্রকার পীড়িত হইয়া থাকে। যথা ফুস্‌ফুস্ নালী প্রদাহ, বায়ু কোষ প্রদাহ, বায়ু কোষের স্ফীততা, বায়ু নল-স্ফীতি, প্লুরাদাহ—তরুণ ও জীর্ণ। বায়ু বক্ষ; পূয়-বায়ু বক্ষ। গলিত ফুস্‌ফুস্, কণ্ঠকোষ প্রদাহ, পাক যন্ত্রে গুটীক্ষত, তজ্জনিত উদরাময়, অগ্নিমান্দ্য ইত্যাদি, রক্তমণ্ডলী, স্নায়ুমণ্ডলী, যকৃতাদিযন্ত্রও পীড়াগ্রস্ত হইয়া থাকে।

যক্ষ্মা-রোগ ভাল হয় কি না?

ইহাই আজকালকার গুরুতর প্রশ্ন। অধিকাংশ লোকের ধারণা—যক্ষ্মা রোগ ভাল হয় না। এরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক। যক্ষ্মারোগ সাংঘাতিক বটে, কিন্তু সকল যক্ষ্মাই অসাধ্য নহে। বরং কোন কোন অবস্থায় নিশ্চয়ই ভাল হয়।

যদি উৎপত্তিসময়ে রোগ ধরা পড়ে, রীতিমত চিকিৎসা অবলম্বিত হয়, রোগী চিকিৎসকের মতাবলম্বী হইয়া চলিতে পারে, তবে যক্ষ্মারোগ অনেক স্থানেই আরোগ্য হয়। আবার কোন কোন স্থলে—রোগের শান্তি না হইলেও তাহার গতিরোধ করা যাইতে পারে। কিন্তু জীবাণুদোষ সংঘটন হইবার সময় যদি রোগ ধরিতে পারা যায়, তাহা হইলে রোগমুক্তির আশা করা যায়।

সেই জন্যই যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধে—যত অধিক আলোচনা করা যায়, ততই ভাল। শীত প্রধান ইউরোপ ও আমেরিকায় যক্ষ্মারোগের প্রভাব—আমাদের দেশের চেয়ে বেশী। কেননা সেখানে ঘোরজীবন-সংগ্রাম চলিতেছে। উপার্জ্জনের জন্য, সভ্যতার অনুরোধে, সেখানকার লোক—প্রাকৃতিক নিয়ম পদে পদে লঙ্ঘন করিতেছে, আর্য্য ঋষিগণ

বলিয়াছেন—"বেগরোধ, ক্ষয়, অতি সাহস, এবং বিষমাশন" এই চারিটী যক্ষ্মা রোগের কারণ। বাস্তবিক এ গুলি পাকা লোকের পাকাকথা। এই কারণগুলি প্রত্যেক ভারতবাসীর জানা উচিত। এজন্য কবিরাজ মহাশয়গণ রীতিমত চেষ্টা করুন।

যক্ষারোগের প্রথম কারণটি সচরাচর ঘটিয়া থাকে—বেগ অর্থাৎ মল মূত্রাদি ত্যাগের ইচ্ছা। সে ইচ্ছার পূরণ না করিলে প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়। সভ্যতার মত্ততায় জীবন সংগ্রামের তাড়নায়, মানুষ সময়ে মলমূত্র ত্যাগ করিতে পারেনা। সময়ে খাইতে পায় না, কখনও অল্পভোজনে তাহাকে দিন কাটাইতে হয়, কখনও অতি-ভোজনে পাকযন্ত্র ভারগ্রস্ত হইয়া পড়ে। ইউরোপে মাতা ছেলেকে স্তন্য দেন না, কৃত্রিম খাদ্যে শিশু পালিত হইয়া থাকে। এদেশেও অনেক গৃহে কৃত্রিম খাদ্যের প্রচলন রীতিমত আরম্ভ হইয়াছে। ভাবিবার কথা বটে।

পল্লীগ্রামের চেয়ে সহরে যক্ষারোগের প্রভাব অনেক বেশী। ইউরোপেও তাই, এদেশেও তাই। সহরের লোক ছোট একটি অন্ধকূপে গোষ্ঠীশুদ্ধ বাস করে। বাতাস ও সূর্য্যালোক না পাইলে যক্ষারোগ হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? পল্লীগ্রামে এ অসুবিধা নাই। তথাপি পল্লীগ্রামে যে যক্ষারোগ হইতেছে, ইহা অনেকটা সহরের আমদানি।

অতি সাহস—ক্ষয়রোগের একটি কারণ বলিয়া ঋষিগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাস্তবিক অতি সাহসে মানুষের তেজঃক্ষয় হইয়া থাকে।

যক্ষ্মা জীবাণুর হস্ত হইতে মুক্তি লাভের উপায়।

একটী জীবাণু হইতে অত্যল্প কালে কোটী কোটী জীবাণু জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং এই জীবাণুর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে বিশেষ সাধনা করিতে হয়। প্রথমেই চেষ্টা করিতে হইবে—যাহাতে জীবাণু আমাদের শরীরে প্রবেশ করিয়া স্থানলাভ করিতে না পারে। অর্থাৎ যাহাতে শারীর ধাতুর সমতা-রক্ষা হয়, শরীর রক্ষক ফ্যাগসাইট অও দলে ভারি থাকে, সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—ফ্যাগসাইট দলের সহিত জীবাণুর ঘোরতর সংগ্রাম চলে। যাহার বল বেশী, শেষে তাহারই জয় হয়। ফ্যাগ-সাইটের দলপুষ্টির প্রধান উপায়—স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম গুলি মানিয়া চলা। নিয়মিত আহার বিহারে, নিয়মিত শারীরিক ও মানসিক শ্রমে, আলোক-বাতাস উপভোগে,—জীবনী-শক্তি বা ফ্যাগসাইট দলের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

আর্য্য ঋষিগণ—যে দিনচর্য্যা ও ঋতুচর্য্যার নিয়মগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা পালন করিতে পারিলে, শুধু যক্ষ্মা রোগ কেন, কোন রোগই শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। আমার ইচ্ছা—কোন যোগ্যতম ব্যক্তি ঋষিনির্দ্দিষ্ট দিনচর্য্যা ও ঋতুচর্য্যার বিধি-ব্যবস্থা বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইবার জন্য—এই আয়ুর্ব্বেদ পত্রেই একটু বিস্তৃত আলোচনা করেন। দিনচর্য্যা ও ঋতু-চর্য্যার নিয়ম বর্ত্তমান কালে পালন করা খুব কঠিন হইলেও, তাহার মধ্যে অনেকগুলি নিয়ম যে মানিয়া লইতে পারা যায়—তাহা আর অস্বীকার করা চলে না। অন্ততঃ লোকের তাহা জানিয়া রাখাও ভাল।

চিকিৎসকের চেষ্টায় জীবাণু ধ্বংস করা অসম্ভব। তাহাদিগকে পুড়াইয়া কিম্বা বিষ খাওয়াইয়া মারিবার চেষ্টা করিলে—আগে রোগীকে পুড়াইতে কিম্বা বিষ খাওয়াইতে হইবে। ইহার চলিত ব্যঙ্গ পূর্ণ নাম—"এক সঙ্গে রোগ রুগী দুই আরাম!!"

কিন্তু যদি শারীরধাতুর উন্নতি করিতে পারা যায়, তাহা হইলে জীবাণুর ধ্বংস অনিবার্য্য। দিনচর্য্যা ও ঋতুচর্য্যার নিয়ম পালন করিলে শারীর ধাতুর উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

ডাঃ শ্রীনগেন্দ্রকুমার দে।

(ক্যাম্বেল হস্‌পিটালের ভূতপূর্ব্ব হাউস সার্জ্জন)

অস্ত্রোপচার।

মুখ নাসিকা ও গলকোষ।

উপসর্গ। ১। পচন সংক্রমন। ২। পচন জনিত নিউমোনিয়া। ৩। ডিপ্‌থিরিয়ার জন্য গলকোষের পচনদোষ। ৪। ত্বক্ কণ্ডু। ৫। কর্ণাভ্যন্তরের তরুণ প্রদাহ। ইত্যাদি।

নাসিকার এডিনইড্ অস্ত্রের সাহায্যে উচ্ছেদ করিলে পূর্ব্বোক্ত উপসর্গগুলি দেখা দিতে পারে। অনেক স্থলে উহা মারাত্মকও হইতে পারে।

এডিনইড্ উচ্ছেদের জন্য অস্ত্রোপচার অতি সহজ। কিন্তু যাহাতে উপসর্গগুলি উপস্থিত হইতে না পারে—সেজন্য সাবধান হইবে। অস্ত্রোপচারের পূর্ব্বে দেখিবে—রোগীর গলার অবস্থা ভাল আছে কি না? মুখ-গহ্বরে কোন ক্ষতযুক্ত বা দূষিত দন্ত থাকিলে, অস্ত্রোপচারের পূর্ব্বে—তাহা উৎপাটন করিবে। পরে ২১ দিন পর্য্যন্ত পচন নিবারক স্প্রে প্রয়োগ করিবে। অস্ত্রোপচারের পূর্ব্বে ইহাও সন্ধান লইবে—রোগী সে সময়ে ডিপ্‌থিরিয়া বা অন্য কোন দূষিত জ্বরের সংস্রবে আসিয়াছিল কি না? অথবা রোগীর বাসস্থানের কাছে কাহারও ঐরূপ রোগ হইয়াছে কি না?

এডিনইড্ কাটার পর রোগীকে পূর্ণ একদিন ও এক রাত্রি শয্যায় শুইয়া থাকিতে বলিবে। নাক মুখ পরিষ্কার করিবার জন্য—প্রত্যেকবার পরিষ্কার ন্যাক্‌ড়া ব্যবহার করিবে। অস্ত্রোপচারের পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে—রোগীর মুখ হইতে বমনের সঙ্গে রক্ত বাহির হইতে পারে। ইহাতে ভয় করিও না। রোগীকে এমন স্থানে শয়ন করাইবে—তাহার শরীরে বায়ু প্রবাহ না লাগে, অথচ দরজা-জানালা খোলা থাকিবে—যেন বায়ু চলাচলের কোন ব্যাঘাত না হয়।

অস্ত্রোপচারের ২ ঘণ্টা পরে—যবাগু, মোহন ভোগ, মুগের যুষ প্রভৃতি লঘুদ্রব্য

রোগীকে খাইতে দিবে। পর দিবস পচন নিবারক ঔষধের স্প্রে প্রয়োগ করিবে।

ডাক্তারী পচন নিবারক।

(১) সোডা সাল্‌ফ্‌ অর্দ্ধ ড্রাম। হাইড্রাজ আইওডাইড রুর্ব্বাই ২ গ্রেণ। সোডি আইওডাইড্‌ ২ গ্রেন। পরিশ্রুত জল ১ পাইণ্ট।

(২) সোডা সালফ্‌ ১ ড্রাম, স্যানিটাস্‌ ১ ড্রাম, একোয়া ডিষ্টিল ১ পাইণ্ট।

(৫) সোডা সালফ ২ ড্রাম, সোডাবাইকার্ব্ব ১০ গ্রেণ, গ্লিসিরিনাই কার্ব্বলিক এসিড ৪০ মিনিম, একোয়া ডিষ্টিল ১ পাইণ্ট।

(৪) লিষ্টিরিণ ৩ ড্রাম, একোয়া ডিষ্টিল ½ পাইণ্ট।

কবিরাজী মতে পচন নিবারক।

(১) হরীতকী, বহেড়া, আমলা, প্রত্যেকটী ১ ভরি ওজনে লইয়া একসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধসের থাকিতে নামাইয়া, ছাঁকিয়া লইবে।

(২) সর্জ্জিকাক্ষার ও যবক্ষার প্রত্যেক৵৹ আনা, জল ⁄॥৹ সের।

(৩) জাতাপত্র, নীলঝাঁটী পত্র, প্রত্যেক ১ তোলা, ⁄১ সের জলে সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া থাকিতে নামাইবে।

(৪) জাতীপত্র, ময়নাফল, বৈঁচিফল, কট্‌কী প্রত্যেক আধ ভরি, একসের জলে সিদ্ধ করিয়া একপোয়া অবশেষ।

(৫) লোধছাল, খদির কাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টীমধু প্রত্যেক আধতোলা, জল পূর্ব্ববৎ।

(৬) নিমপত্র, নিসিন্দা পত্র, পলতা, গুলঞ্চ। পূর্ব্ববৎ।

(৭) বিড়ঙ্গ, নিমুকাপত্র, দন্তীপত্র, দারু হরিদ্রা। ওজন ও জল পূর্ব্ববৎ।

(৮) নিমছাল, বাসকছাল, কন্টিকারি, পলতা, গুলঞ্চ। প্রত্যেক ওজন ॥৹ তোলা। জল পূর্ব্ববৎ।

(৯) নিমুকা, দ্রাক্ষা, জাতীপত্র, খদির। পূর্ব্ববৎ।

(১০) বাবলা, গুয়েবাবলা, যষ্টীমধু, অনন্ত মূল লাক্ষা, বকুলছাল, বাবুই তুলসী। প্রত্যেক ওজন।৹, জল পূর্ব্ববৎ।

(১১) যোয়ান, লতাকস্তুরী, অগুরু, অনন্ত মূল, জায়ফল, কাকলা—প্রত্যেক ওজন।৹, জল পূর্ব্ববৎ।

ইহাদের মধ্যে যে কোনও একটী ক্বাথ ঈষতুষ্ণ অবস্থায় স্প্রে প্রয়োগ করিবে।

স্প্রের অভাবে পূর্ব্বোক্ত ক্বাথ গরগরা বা গারগল রূপে ব্যবহার করা যায়। ইহাতে মুখমধ্যস্থিত সঞ্চিত রক্ত ও ক্লেদাদি বাহির হইয়া যায়। বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভিন্ন গারগল—শিশুর পক্ষে—সুবিধাজনক নহে। সুতরাং স্প্রে প্রয়োগই ঠিক। ৭ দিন উপর্য্যপরি স্প্রে বা গারগল দেওয়া উচিত। ইহাতে পচন দোষের আশঙ্কা তিরোহিত হইতে পারে।

নাসিকার পশ্চাৎ অংশে পিচকারী দেওয়ার প্রয়োজন হইলে, খুব জোরে পিচকারী দিবে না। পিচকারীর ভিতরের তরল পদার্থ যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে বাহির হইতে পারে, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিবে। নাসিকায় এমন পিচকারী প্রয়োগ করিবে,—যাহার মধ্যে ৫ ঔন্স তরল পদার্থ ধরিতে পারে। অথচ পিচকারীর নলের মুখে রবারের সরু নল লাগানো থাকে। নাসা গহ্বরের অস্ত্রোপচারের পর, নাসিকায় ও গলায় ক্রিয়েসটআইওডিন এবং কার্ব্বলিক এসিডের বাষ্পগ্রহণ করিলে বেশ উপকার হয়। শ্বেতচন্দন ও যোয়ান সিদ্ধ করিয়া সেই

জলের বাষ্প গ্রহণ বিশেষ ফলপ্রদ। অস্ত্রোপচারের পর রোগীকে সামান্য জোলাপ দেওয়া উচিত। ডাক্তারেরা লাবণিক বিরেচক ব্যবস্থা করেন। বৈদ্যমতেও এমন বিরেচক দিবে—যাহাতে লবণ থাকে। রোগীকে—অস্ত্রোপচার সামান্য হইলেও অন্ততঃ ২।৩ দিন গৃহমধ্যে বিশ্রাম করিবার উপদেশ দিবে।

নাসাগহ্বর অবরুদ্ধ থাকিলে ছোট ছেলে মেয়েরা মুখপথে নিশ্বাস গ্রহণ করে। অস্ত্রোপচারের পর অবরোধ দূরীভূত হইলেও, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি ফুলিয়া উঠিয়া ৫।৭ দিন পর্য্যন্ত নাসাগহ্বর পূর্ব্ববৎ অবরুদ্ধ থাকে। এই ৬।৭ দিন অতীত হইয়া গেলে ছেলেদের নাক দিয়া নিশ্বাস ফেলিতে অভ্যাস করাইবে। মুখপথ হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া নাক দিয়া নিশ্বাস ফেলিতে বলিবে।

এডিনইড জন্য নাসা গহ্বর অবরুদ্ধ থাকায় বালক বালিকারা অনুনাসিক স্বরে কথা কহিয়া থাকে। অস্ত্রচিকিৎসার পরও কিছুদিন এ অভ্যাস থাকিয়া যায়। দীর্ঘকাল ধরিয়া বিশুদ্ধ ভাবে কথা কহাইবার চেষ্টা করিলে তবে এ দোষ সারিয়া যায়।

নাসিকার পশ্চাদংশে পচনদুষ্ট এবং দুর্গন্ধ যুক্ত প্রশ্বাসবায়ুসহ জ্বর অর্থাৎ দৈহিক উত্তাপ বর্দ্ধিত হইলে, নেসাল ডুস দিয়া প্রত্যহ ৩।৪ বার নেজো ফেরিংক্স ধুইয়া দিতে হয়। গরম জলে সোডা মিশ্রিত করিয়া সেই জলের ডুস দেওয়া উচিত। ডুস দিবার সময় রোগীকে মুখপথে নিশ্বাস গ্রহণ করিতে বলিবে। ডুস অতি ধীরে ধীরে দিবে। যেন এক নাসিকা দিয়া জল প্রবেশ করিয়া অপর নাসিকা দিয়া বাহির হইতে পারে।

মন্দলক্ষণ উপস্থিত হইলে ডাক্তারেরা জোলাপ দিয়া থাকেন, কুইনাইন ও আয়রণ খাইতে দেন।

মধ্য কর্ণের প্রদাহের লক্ষণ উপস্থিত হইলে সেই কর্ণের পশ্চাদংশে জোঁক বসানো ভাল। অথবা ব্লিষ্টার দেওয়া ভাল। কখন কখন উষ্ণ স্বেদ দিলেও উপকার হয়। এই সময় নাসিকার পশ্চাদংশে ইরিগেশন করা প্রয়োজন। পুঁয হইয়াছে দেখিলে, সাধারণ কাণপাকার চিকিৎসা করিবে।

ডিপথিরিয়া প্রভৃতি উপসর্গ অত্যন্ত মারাত্মক, ইহার চিকিৎসা করিয়া ফললাভের আশা কম। যাহাতে এরূপ মারাত্মক উপসর্গ উপস্থিত হইতে না পারে, সে জন্য বিশেষ চেষ্টা করা উচিত।

এডিনইড উচ্ছেদ করার পর ইনফ্লুয়েঞ্জা হওয়ার সম্ভাবনা। বাটীতে কিম্বা পাড়ায় ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ হইয়াছে দেখিলে,—অস্ত্রোপচার না করাই সৎপরামর্শ।

এডিনইড উচ্ছেদের পর রোগীর দেহে আর একটী উপসর্গ দেখা দিতে পারে। তাহা—গাত্রের ত্বকে কণ্ডু নির্গমন। অস্ত্রোপচারের দ্বিতীয় কি তৃতীয় দিবসে ইহা বাহির হয়। ৩।৪ দিন থাকিয়া আপনাআপনি মিলাইয়া যায়। টনসিল উচ্ছেদের পরও ইহা ঘটিতে পারে।

অস্ত্রোপচারের পর ৪র্থ বা ৫ম দিনে পলিজার ব্যাগদ্বারা ইউষ্টেকিয়ান নলে বায়ুর পিচকারী দেওয়া খুব ভাল। ইহা ৩।৪ দিন প্রয়োগ করিতে হয়। রোগীর বধিরতার লক্ষণ দেখিলে ১৫।১৬ দিন পর্য্যন্ত বায়ুর পিচকারী প্রয়োগ করিবে।

টনসিল উচ্ছেদ করিলে—এডিনইড উচ্ছেদের সমস্ত উপসর্গই উপস্থিত হইতে

পারে। প্রভেদের মধ্যে এই;—এডিনইড উচ্ছেদে মধ্যকর্ণের প্রদাহ জন্মিতে পারে। টন্‌সিল উচ্ছেদে ইহার সম্ভাবনা নাই। টনসিল উচ্ছেদের পর—পূর্ব্বোক্ত পচন নিবারক ঔষধের স্প্রে গলার মধ্যে প্রত্যহ ৩।৪ বার প্রয়োগ করিবে। টনসিল উচ্ছেদ করিলে গলায় যথেষ্ট বেদনা হয়—কাজেই রোগী গারগল বা কবল করিতে পারে না। ফলি কিউলারটন্ সিলাইটিস জনিত গলায় অত্যন্ত বেদনা বোধ করিলে রোগীকে—পটাস ক্লোরেট্ ৫ গ্রেণ, একোয়া মিন্থপিপ ১ উন্স; অথবা নিসিন্দাপত্রের কাথে গোলমরিচ ঘষিয়া, প্রত্যহ ৩বার সেবন করিতে দিবে।

কচি নারিকেলের কড়কচি বাবলাছাল, চামেলীর পত্র এবং পেয়ারা পাতা সিদ্ধ করিয়া তাহাতে একটু ফটকিরি মিশাইয়া সেই জলে রোগীকে মুখ ধুইতে বলিবে। কিম্বা পটাস ক্লোরেট ৭ গ্রেণ, টিঞ্চর ফেরি পরে ক্লো ১০ মিনিম, গ্লিসারিং ১ ড্রাম, একোয়া মিন্থ পিপ ১ ঔন্স—একত্রে মিশাইয়া তদ্বারা মুখ ধুইবার পরামর্শ দিবে।

এডিন্‌ইড্ ও টনসিল যুক্ত রোগীর স্বাস্থ্য আদৌ ভাল হয় না। সুতরাং অস্ত্রোপচারের পর—রোগীর স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য—"চ্যবন-প্রাশ" খাইতে দিবে। সক্ষম হইলে, রোগীকে কিছুদিন বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য—ওয়াল-টিয়ার, পুরী প্রভৃতি স্থানে যাইবার পরামর্শ দিবে।

দন্তোৎপাটনের পর ২।১ দিন পর্য্যন্ত রোগীকে পচননিবারক ঔষধের মুখধৌতি প্রদান করিবে। নিম্নে ডাক্তারী ও কবিরাজী মতের ২।৪টী মুখধৌতির নির্দ্দেশ করিতেছি;

ডাক্তারী মতে—

(১) জল ১ পাইণ্ট, ফেবেট অফ সোডা ১ ড্রাম।

(২) আর্ণিকা সলিউসন্।

(৩) হাইড্রোজেন্ পার অক্সাইড্।

(৪) গ্লাইকো থাইমলিন।

ইহারা মুখ গহ্বর পরিষ্কার ও বেদনা নিবারণ করিয়া থাকে।

কবিরাজী মতে—[পচন নিরারক মুখ ধৌতি]

(১) বট, অশ্বথ, পাকুড়, যজ্ঞডুম্বর, ইহাদের ছাল জলে সিদ্ধ করিয়া তাহার কাথ দিয়া মুখ ধুইবে।

(২) বচ, চৈ, সর্জ্জিকাক্ষার, আকনাদি, লাক্ষা—ইহাদের চূর্ণ গরম জলে নিক্ষেপ করিয়া সেই জলে মুখ ধুইবে।

(৩) পল্‌তা নিমছাল ও ত্রিফলার কাথ দিয়া মুখ ধুইবে।

(৪) বেয়াকুড়, ভুঁইকদম, ভেরেণ্ডা ও কন্টিকারী সিদ্ধ জলে সরিষার তৈল নিক্ষেপ করিয়া—ইহার দ্বারা মুখ হইবে।

(৫) গরম জলে আকন্দর আটা ও ছাতিম গাছের আটা প্রক্ষেপ দিয়া সেইজলে মুখ ধুইবে।

(৬) মুথা, যষ্টিমধু, নিসিন্দা পাতা, খদিরকাষ্ঠ, বেণার মূল, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, বিড়ঙ্গ—ইহাদের কাথ দিয়া মুখ ধৌত করিবে।

কাহারও দাঁত তুলিয়া দিলে, আমি তাহাকে নিম্নলিখিত মুখধৌতির ব্যবস্থা করিয়া থাকি।

Re.

এলকোহল	১০০ ভাগ
টিংচার রেটানী	৪০ ভাগ

এসিড্ বেঞ্জোইক্	...	৮ ভাগ।
গ্লাকারিণ	...	৪ ভাগ।
ওলিয়াই মিস্থাপিপ	...	½ ভাগ।
ওলিয়াই সিনামোমাই	...	½ ভাগ।

একত্র মিশাইয়া রাখিবে। ইহার পঞ্চাশ ফোঁটা লইয়া আধ পাইণ্ট জলে মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা মুখ ধুইতে হইবে।

জিহ্বাদির অস্ত্রোপচার।

উপসর্গ। বিগলন। শোণিত স্রাব। পচন জন্য ফুসফুস প্রদাহ। গলকোষের সেলুলাইটিস।

এই শ্রেণীর অস্ত্রোপচারে—খুব সতর্ক হইলেও—সামান্য পরিমাণ পচন দোষ সংস্পৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা পরিহার করা অসাধ্য। জিহ্বায় অস্ত্রোপচার করিবার পূর্ব্বে দেখিবে—রোগীর কোন দন্তে ক্ষত বা অপর কোন দোষ আছে কিনা? থাকিলে, প্রথমেই সেই দন্তটীকে দূরীভূত করা কর্ত্তব্য। পরে, ২।৪ দিন পচন নিবারক ঔষধ দিয়া মুখ ধৌত করিয়া অস্ত্রোপচার করিবে।

জিহ্বায় অস্ত্রোপচার করার পর রোগীকে দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করাইয়া দিলে, স্রাব বাহির হইয়া যায়, মুখ গহ্বরে সঞ্চিত থাকে না।

এই অবস্থায় উষ্ণ বোরাসিক দ্রব বা তদ্রূপ অন্য কোন দ্রব দ্বারা মুখের মধ্যে ইরিগেসন করিলে,—সমস্ত স্রাবই ধৌত হইয়া যায়। ইরিগেটারের নল কাচের হওয়া চাই। অতি অল্প সঞ্চাপে ইরিগেসন প্রয়োগ করিতে হয়। ইরিগেটারের অভাবে পিচকারীর দ্বারাও কাজ চলিতে পারে।

রোগীকে তাকিয়া হেলান দিয়া অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় রাখিলে ফুসফুসে রক্তাধিক্য হইতে পারে না। জিহ্বা কর্ত্তন করার পর তাহার যে অবশিষ্টাংশ থাকে, তাহা পশ্চাতে সরিয়া যাইয়া শ্বাসরোধ উপস্থিত করিতে পারে না। কাসি উপস্থিত ও হইতে পারে না।

জিহ্বায় অস্ত্রোপচারের পর, রোগীকে পথ্য দিবার সময়, একটী বাটীতে ৩।৪ ইঞ্চি দীর্ঘ রবারের নল সংলগ্ন করিবে, এবং বাটিতে দুগ্ধাদি তরল খাদ্য পূর্ণ করিয়া, নলটী গলার অভ্যন্তরে দিয়া বাটী অল্প উচ্চ করিয়া ধরিবে। ইহাতে খাইবার সুবিধা হইবে।

শ্রীসত্যজীবন ভট্টাচার্য্য।

(অবসর প্রাপ্ত—এসিষ্টেণ্ট সার্জ্জন)

ওলাউঠা হইতে আত্মরক্ষার উপায়।

—:•:—

ওলাউঠা অতি সাংঘাতিক পীড়া। ইহা যেখানে সংক্রামমূর্ত্তিতে দেখা দেয়, তথাকার অধিবাসীগণের এক ভীষণ আতঙ্ক উপস্থিত হয়। দেখিতে দেখিতে একের পর একে আক্রমণ করিতে থাকে, চিকিৎসার অভাবে—অসাবধানতায় শত শত লোক অকালে প্রাণ

বিসর্জ্জন করে। অনেক স্থলে মৃত্যুর সময় আত্মীয়স্বজনও কেহ উপস্থিত হননা। এমন কি, সেবা-শুশ্রূষাদির জন্যও লোকের একান্ত অভাব হইয়া উঠে। যদিও নিকটে ২।৪ জন চিকিৎসক থাকেন, তাঁহারাও ভয়ে জড়সড় হইয়া চিকিৎসা করিতে অস্বীকৃত হন। যাহাতে চিকিৎসা বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও নিজ পরিবারের মধ্যে চিকিৎসা করিয়া এ ঘোর বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্য নিম্নে উহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, প্রতিষেধক ও মোটা-মুটি চিকিৎসা প্রদত্ত হইল।

ওলাউঠাদি চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথিক যেরূপ খ্যাতিলাভ করিয়াছে তাহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন। এমন কি, অনেকে স্পষ্টই বলিয়া থাকেন যে হোমিওপ্যাথিক ওলাউঠা ও রক্তামাশয় ইত্যাদিতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য করিয়া থাকে। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে যখন ওলাউঠা বহুব্যাপকরূপে প্রকাশ পায়, তখন সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ম্যাক্‌লগ্‌লিন নিরপেক্ষভাবে বলিয়া গিয়াছেন যে, "যদিও আমার শিক্ষা-দীক্ষা সমস্তই এলোপ্যাথিক মতে, তথাপি আমি যদি ওলাউঠা দ্বারা আক্রান্ত হই, আমার চিকিৎসার ভার এলোপ্যাথের হাতে না দিয়া হোমিওপ্যাথের হাতেই দিব।

ইতিহাস—১৮১৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে যশোহর জেলার অন্তঃপাতী নলডাঙ্গা নামক গ্রামে একটী মেলা উপলক্ষে বহুলোকের সমাগম হওয়াতে হঠাৎ এই পীড়ার উৎপত্তি হয়। তৎপরে ক্রমে ক্রমে প্রায় সমগ্র ভূমণ্ডলে ইহা বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কেবল মাত্র অষ্ট্রেলিয়া ও আন্দামানদ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি কয়েকটী স্থান ইহার ভীষণ আক্রমণ হইতে এ পর্য্যন্ত রক্ষা পাইয়াছে।

ওলাউঠা অর্থে ভেদ বমন বুঝায়। (ওলা—নামা অর্থাৎ ভেদ, উঠা—বমন) ওলাউঠা এক প্রকার জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত হয়। এই জীবাণু দেখিতে নখচিহ্নবৎ অর্থাৎ (,) কমার ন্যায়। এই জন্য এই জীবাণুকে Comma bacillus বলে। ইহার দৈর্ঘ্য ১/২৫০০০ ইঞ্চ ও বিস্তার ১/১২৫০০ ইঞ্চি। ওলাউঠা রোগীর ভেদ ও বমনে এই জীবাণু বর্ত্তমান থাকে।

প্রতিষেধক—ইংরাজীতে একটী প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে যে Prevention is better than cure অর্থাৎ রোগ হইলে চিকিৎসা করা অপেক্ষা রোগ জন্মিতে না দেওয়াই উচিত। এজন্য কতকগুলি নিয়ম পালন করিলে ইহার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। সেই নিয়মগুলি নিম্নে লিখিত হইল :—

১। ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব কালে মনে সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি রাখা আবশ্যক। পীড়ার চিন্তা আদৌ মনোমধ্যে স্থান দিবে না। সর্ব্বদা সৎকার্য্যে লিপ্ত থাকিবে। এজন্য দেশ প্রচলিত হরি সংকীর্ত্তনাদি এত সুফলদায়ক হয়।

২। অধিকক্ষণ খালিপেটে থাকা উচিত নয়। নিয়মিত সময়ে লঘু ও পরিমিত আহার করা উচিত। দিবানিদ্রা ও রাত্রি জাগরণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অপক্ক ফলমূল, অম্ল বা পচা দ্রব্য (বিশেষতঃ পচা মাছ মাংস) ভোজন, মাদক দ্রব্য ও দূষিত বায়ু সেবন বর্জ্জনীয়।

৩। পানীয় জল ও দুগ্ধাদি ফুটাইয়া ব্যবহার করা উচিত, কারণ জল ও দুগ্ধাদির

দ্বারা এই রোগ বিশেষভাবে সংক্রামিত হয়। আহারীয় দ্রব্যে মাছি আদি বসিতে না পারে —এরূপভাবে ঢাকাইয়া রাখা উচিত।

৪। রাত্রি ১টার পর হইতে প্রাতে নিয়মিত সময়ে মলত্যাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তৃষ্ণায় কাতর হইলেও কখন জলপান করিবে না।

৫। একটী পয়সা বা তাম্রখণ্ড কোমরে ঝুলাইয়া রাখা কর্ত্তব্য। এজন্য তামখনিতে যাহারা খননের কার্য্য করে, তাহাদের প্রায় কলেরা হয় না।

৬। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হেরিং বলেন, পরিধানের জুতা ও মোজার অভ্যন্তরে অতি সূক্ষ্ম গন্ধক চূর্ণ ছড়াইয়া সেই জুতা ও মোজা ব্যবহার করিলে কলেরা প্রায় আক্রমণ করিতে পারে না।

৭। সংক্রামিত স্থানে কাহারও বাটীতে জলপান ও তাম্বুল গ্রহণ সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ।

৮। কলেরা রোগীর ভেদ ও বমন যেখানে সেখানে না ফেলিয়া বাড়ীর সামানার বাহিরে অগ্নিতে দগ্ধ করা উচিত। যেখানে ভেদ বমি করিবে, তৎক্ষণাৎ তাহা পরিষ্কার করিয়া ফেনাইল ছড়া দিবে। সমস্ত গৃহ গন্ধকের ধূমে বিশোধিত করিবে।

৯। স্পীট ক্যাম্ফার বা সাধারণ কর্পূরের ঘ্রাণ প্রত্যহ মধ্যে মধ্যে লওয়া উচিত।

১০। সংক্রামিত স্থানে সুস্থ ব্যক্তিরা প্রতিদিন প্রাতঃকালে ভিরেট্রোম এল্বাম ৬ষ্ঠ শক্তির বা কিউপ্রাম ৩০ শক্তির ১ ফোঁটা মাত্রায় ১ কাচ্চা জলের সহিত সেবন করিলে ওলাউঠা আক্রমণ করিতে পারে না।

চিকিৎসা :–

ওলাউঠা রোগের ৪টী অবস্থা।

১। আক্রমণাবস্থা;

২। পূর্ণবিকাশাবস্থা।

৩। পতনাবস্থা।

৪। প্রতিক্রিয়াবস্থা।

আক্রমণাবস্থায় চিকিৎসা :—

প্রথম ভেদ হওয়ামাত্রেই রুবিনীর স্প্রীট ক্যাম্ফর সেবন করা আবশ্যক। যতক্ষণ পর্য্যন্ত রোগীর দাস্তে মল থাকে ও বমন পিপাসার উদ্রেক না হয়, ততক্ষণ ইহা ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেক দাস্তের পর ১ মাত্রা করিয়া, এইরূপে ২।৩ মাত্রা ঔষধ সেবনের পর যদি কোনও উপকার না হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত ওষধগুলি লক্ষণানুসারে দিবে।

উক্ত ক্যাম্ফার বালকদিগের জন্য ২।৩ ফোঁটা মাত্রায় ও পূর্ণবয়স্কের জন্য ৫ হইতে ১০ ফোঁটা মাত্রায় চিনি কিম্বা বাতাসার সহিত সেব্য। ইহা কখনও জলের সহিত ব্যবহার করিবেনা। ক্যাম্ফার ঔষধটী হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সহিত রাখিবে না। তাহা হইলে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সমস্ত গুণ নষ্ট হইয়া যায়।

ক্যাম্ফারে কোনও উপকার না হইলে একোনাইট ১X ক্রম দিবে। তরল ভেদ, মৃত্যুভয়, অস্থিরতা, পিপাসা, পেটবেদনা ইত্যাদিতে ইহা ব্যবস্থেয়। চতুর্দ্দিকে কলেরায় মৃত্যু হইতে দেখিয়া ভয় জনিত দাস্ত হইলে একোনাইট তাহার প্রধান ঔষধ। বমনের প্রধান ঔষধ ইপিকাক; বমন হইয়া গেলেও বমনেচ্ছার নিবৃত্তি না হওয়া লক্ষণে ইহা উত্তম ঔষধ। কিন্তু বমন হইলেই বমনেচ্ছার নিবৃত্তি লক্ষণে এণ্টিম টার্ট ৬।

পূর্ণবিকাশাবস্থার চিকিৎসা।

চাউলধোয়া জলের ন্যায় ভেদ, অত্যন্ত বমন, কপালে ঠাণ্ডা ঘাম, নাড়ী ক্ষীণ ও

অস্থিরতা ইত্যাদি লক্ষণে ভিরেট্রাম্ এল্‌বাম ১২ উপযোগী। ভেদ ও বমনের পরিমাণ কম, দুর্নিবার পিপাসা, নাড়ী লুপ্তপ্রায়, অতিশয় অবসন্নতা, বমনের পর পাকাশয়ে অত্যন্ত জ্বালা, মূত্রাবরোধ, ঘন ঘন কষ্টকর শ্বাস প্রশ্বাস ইত্যাদি লক্ষণে আর্সেনিক ৩০ ক্রম ব্যবস্থেয়। ভিরেট্রাম ও আর্সেনিকের পিপাসার পার্থক্য এই যে, ভিরেট্রামের রোগী একেবারে বেশী পরিমাণ জলপান করে ও আর্সেনিকের রোগী অতি অল্প অল্প বহুবার জলপান করে। ওলাউঠায় হস্ত ও পদদ্বয়ে অধিক মাত্রায় খিলধরা লক্ষণে কিউপ্রাম ৬ মহৌষধ। কিউপ্রামে খিলধরার কোনও উপকার না হইলে সীকেলী কর ৬ দিবে। পিত্তযুক্ত তরল ভেদ, অম্ল গন্ধ বিশিষ্ট বমন, পরে পিত্ত বমন, বমনের পর জ্বালা, শেষ রাত্রিতে পীড়ার আক্রমণ প্রভৃতিতে আইরিস ভার্স ৩X ব্যবস্থেয়। পাকস্থলীতে অতিশয় যন্ত্রণা, জলপান করি... উঠিয়া পড়া, সহসা পিঁচকারীর ন্যায় বেগে তরল মলস্রাব ইত্যাদি লক্ষণে ক্রোটন টিগ ৬। উদরের মধ্যে গড়গড় কল্‌কল্ শব্দ, প্রথমে বমন, পরে ভেদ, হস্তপদের আক্ষেপ, সার্ব্বাঙ্গীন শীতলতা, মলধোয়া জলের পরিবর্ত্তে আঠা আঠা শ্বেতবর্ণের তরল ভেদ ইত্যাদিতে জ্যাট্রোফা ৬ উপযোগী। ওলাউঠা রোগীর রক্তদাস্ত হইলে ইপিকাক ৩X ব্যবস্থেয়। রক্তভেদের সহিত শ্লেষ্মা থাকিলে মার্কিউরিয়াস কর ৬ প্রযুজ্য। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রস্রাব না হইলে ক্যান্থারিস ৬ দিবে। উহাতে উপকার না হইলে টেরিবিন্থিনা ৬ সেবন বিধি। মস্তকের রক্তাধিক্য জন্য প্রলাপ হইলে বেলেডোনা ৩০ ব্যবস্থেয়।

পতন অবস্থার চিকিৎসা।

হিমাঙ্গ অবস্থায় কার্ব্বভেজ ৩০ বিশেষ উপকারী ঔষধ। ভেদ বমন বন্ধ হইয়া উদর স্ফীত, কপালে ও গলায় বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম, অতিশয় শ্বাসকষ্ট, অত্যন্ত গাত্রদাহ, নাড়ী বিলুপ্ত, সর্ব্বশরীর নীলবর্ণ ও বরফের ন্যায় শীতল লক্ষণে ইহা বিশেষ উপযোগী। পতনাবস্থায় এসিড হাইড্রো সায়েনিক ৬ একটী মহৌষধ। মৃতবৎ দেহ, শীতল ঘর্ম্ম, ধীরে ধীরে শ্বাস প্রশ্বাস, নাড়ী লোপ, অচেতনাবস্থা ও গোঙ্গানি প্রভৃতি লক্ষণে ইহা উৎকৃষ্ট কার্য্য করে। পতনাবস্থায় এসিড হাইড্রোসায়েনিকের দ্বারা কার্য্য না হইলে কোব্রা বা ন্যাজা ৬ দিবে। বারম্বার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম, উদরস্ফীত, সর্ব্ব শরীর নীলবর্ণ ও বরফবৎ ঠাণ্ডা ইত্যাদি লক্ষণে ইহা ব্যবহার্য্য। ইহা পতনাবস্থার শেষ ঔষধ।

প্রতিক্রিয়াবস্থার চিকিৎসা।

এই অবস্থায় রোগী ক্রমশঃ আরোগ্যের দিকে যাইতে থাকে। এই অবস্থায় ঔষধ সেবন বন্ধ রাখা উচিত, কিম্বা লক্ষণানুসারে উপরোক্ত ঔষধ সমূহ দীর্ঘ সময় অন্তর অল্প মাত্রায় সেবন করান আবশ্যক।

মাত্রা—রোগের প্রবলতার সময় ১০।১৫ মিনিট অন্তর ঔষধ ১ ফোঁটা মাত্রায় ও বালকের জন্য অর্দ্ধ ফোঁটা মাত্রায়, শিশুদিগের জন্য সিকি ফোঁটা মাত্রায় সেবন আবশ্যক। ক্রমে দীর্ঘ সময় অন্তর ঔষধ সেবন করিবে।

পথ্য।

রোগের বর্দ্ধিত অবস্থায় ঠাণ্ডা জলই একমাত্র পথ্য। প্রতিক্রিয়া অবস্থা আরম্ভ হইলে রোগীকে খুব পাতলা জল-এরারুট অল্প লবণসহ দিবে। ওলাউঠার ভেদ বমন হইলে রক্তের

জলীয়ভাগ ও লবণাংশ বহির্গত হইয়া যায়, সুতরাং রক্ত গাঢ় হইয়া আসে। এজন্য জলসহ লবণ মিশাইয়া দিলে, উক্ত জল ও লবণাংশ রক্তমধ্যে সহজেই সঞ্চারিত হইয়া শারীরিক যন্ত্রাদিতে বল আনয়ন করে ও রক্ত গাঢ় করিয়া হৃৎপিণ্ডকে সহসা নিস্তেজ করিতে পারে না। কলেরায় এজন্য Saline Injection এত সুফলদায়ক হয়। *

ডাক্তার শ্রীমহাদেব মণ্ডল।

পিত্তজ-বিষাক্ততা।

—:o:—

আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ ঋষিগণ—পিত্তের শক্তি, কার্য্য, প্রভাব ও অবস্থানাদির আলোচনা করিয়া, তাহার স্বরূপ যেরূপ নিপুণ ভাবে নির্ণয় করিয়াছেন, সেরূপ আর কোনও বিজ্ঞানে দেখিতে পাওয়া যায় না। পাঠক! আয়ুর্ব্বেদের পঞ্চবিধ পিত্তের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা একবার ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিবেন; দেখিবেন—ভারতের ঋষি ভিন্ন পিত্ত-রহস্যের মীমাংসা করা অন্যের অসাধ্য। আয়ুর্ব্বেদের পিত্তরহস্য যিনি বুঝিতে পারিবেন, জগতের জীব-বিজ্ঞান সম্পূর্ণ ভাবেই তাঁহার করায়ত্ত হইবে। পিত্তরহস্য সংক্ষেপে আলোচিত হইবার নহে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি সে চেষ্টাও করিব না। আমি কেবল নব্য তন্ত্রের "পিত্তজ বিষাক্ততা" বুঝিবার প্রয়াস পাইব।

পিত্ত- বিষধর্ম্মাক্রান্ত। পিত্তের মধ্যে নানা পদার্থের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। সে গুলি পিত্তের উপাদান। এই সকল উপাদানের মধ্যে কোনটির পরিমাণ কতটুকু? তাহার বিষক্রিয়াই বা কিরূপ, তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা—আধুনিক বিজ্ঞানের অতি অল্প। কিন্তু চিকিৎসকের তাহা জানা উচিত। পিত্তজ বিষাক্ততার সাধারণ নাম—"কোলিমিয়া"। পিত্তের বিষাক্ত পদার্থের মধ্যে যেটী প্রধান—তাহার বিলাতী সংজ্ঞা—Bilirubin. এই বিলিরুবিণের জন্যই পিত্তজ বিষাক্ততার অধিকাংশ লক্ষণ জীবদেহে প্রকাশ পায়।

বিলিরুবিণের রাসায়নিক উপাদানের পরিমাণ—$C_{32}. H_{30} N_4 O_6$.

ইহা অম্লের অনুরূপ পটাশিয়ম শ্রেণীর ধাতব পদার্থের সহিত সম্মিলিত হইয়া অনেক রকম মিশ্র পদার্থ উৎপাদন করে। পিত্তস্থলীর ভিতরকার পিত্তের মধ্যে শতকরা ৫ ভাগ এই বিলিরুবিণ বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু শোষ যা হইতে নির্গত পিত্তে শতকরা ০·১ অংশ মাত্র বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কত পরিমাণ বিলিরুবিণ উৎপন্ন হয়, অদ্যাপি তাহা সঠিক রূপে স্থির করা যায় নাই।

* আজকাল কলেরা রোগে অনেকেরই হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস বলিয়া এপ্রবন্ধ পত্রস্থ করিলাম। আয়ুর্ব্বেদেও কিন্তু ওলাউঠা বা কলেরার অতি উৎকৃষ্ট চিকিৎসা আছে। আমরা সে চিকিৎসা-প্রণালী ইহার পর প্রকাশ করিব। আঃ সং।

কেবল এইটুকু জানা যায়—সুস্থব্যক্তির শরীরে ৫·৩ গ্রামের অধিক বিলিরুবিণ জন্মায় না। রক্তের বর্ণজ পদার্থ অবস্থাবিশেষে বিশ্লেষিত হইয়াই বিলিরুবিণের উৎপত্তি অনুমিত হইয়া থাকে। কিন্তু কিরূপ রাসায়নিক পরিবর্ত্তনে যে ইহার উৎপত্তি হয়, এখনও তাহার কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই।

অন্ত্রের মধ্যে, রোগ-জীবাণু কর্ত্তৃক "হাইড্রোজেন" হইতে "হাইড্রোবিলিরুবিণ" উৎপন্ন হয় এবং ইহাই ষ্টারকো বিলিনে পরিবর্ত্তিত হইয়া মলের সহিত বাহির হইয়া যায়। এই হাইড্রোবিলিরুবিণের কিয়দংশ অন্ত্র মধ্যে শোষিত হইয়া, পুনঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া "উরুবিলিণ" রূপে মূত্রসহ নির্গত হইয়া থাকে। বিলিরুবিণ হইতে "উরুবিলিনের" উৎপত্তি ইহাই বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত।

জীব দেহের গুরুত্বের সের প্রতি ৬০০০ পিত্ত পিচকারি দ্বারা প্রয়োগ করিলে [বিধান মধ্যে]—আক্ষেপ উপস্থিত হওয়ায় মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। কিন্তু সেই পিত্তকে যদি জান্তব অঙ্গারের ভিতর দিয়া চালিত করিয়া তাহার বর্ণক পদার্থ দূরীভূত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই পিত্তের বিষক্রিয়া দুই তৃতীয়াংশ হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

বিষধর্ম্মাক্রান্ত বিলিরুবিণ যদি দেহের মধ্যে অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইতে থাকে এবং তাহা মল-মূত্রাদির সহিত নির্গত হইতে না পারে, তাহা হইলে সমগ্র শরীর বিষাক্ত হইয়া উঠে, পৈশিক উত্তেজনার আধিক্য হয়। এই অবস্থার নামই—Nervousness অর্থাৎ স্নায়বীক দুর্ব্বলতা।

বকৃতের দোষ – বিলিরুবিণ পিত্তের সহিত বাহির হইয়া অন্ত্রের মধ্যে না গিয়া, তথা হইতেই শোষিত হয়। পিত্তবহা সূক্ষ্ম নলের আবদ্ধতা, যকৃতের ক্ষয় (সঙ্কোচন—সিরোসিস) এবং কোষের দোষেই—ইহা হইয়া থাকে। ত্বকের বর্ণ পিত্তের বর্ণে রঞ্জিত দেখিলে এই অবস্থাই ধরিয়া লইতে হইবে। পিত্তজ বিষাক্ততা ধরিবার সহজ উপায় রোগীর রক্ত পরীক্ষা করা। কিন্তু আর্য্য ঋষিগণ—তাহার আবশ্যকতা মনে করিতেন না। তাঁহারা রোগীর দেহের অন্যান্য লক্ষণ দেখিয়াই তাহা নিঃসন্দেহ বুঝিতে পারিতেন। নিম্নে পিত্তজ বিষাক্ততার সাধারণ লক্ষণ লিপিবদ্ধ হইল।

স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা, অবসন্নতা, অমনস্কম, (কোন কার্য্যেই মন নিবিষ্ট হয় না) স্নায়বীয় উত্তেজনা খিটখিটে স্বভাব, মানসিক বিকার, অজীর্ণ (খাদ্যদ্রব্য পরিপাক হয়না।) আহারান্তে পেটভার বোধ হয়, ইহার ১ কি ২ ঘণ্টা পরে পিপাসা বোধ, অম্লোদ্গার, আহারের পরই পাকস্থালীতে বেদনা বোধ, (এই বেদনা কয়েক মুহূর্ত্ত পরে নিবৃত্তি হয়, ৩।৪ ঘণ্টা পরে আবার দেখা দেয়) আহার্য্য বস্তু যেন পাকস্থালী হইতে গলদেশে উঠিতেছে এইরূপ অনুমান; বিবমিষা (গা বমি বমি) কখনও বা বমন; কোষ্ঠবদ্ধতা, মধ্যে মধ্যে অতিসার, মল অম্লাক্ত, বাহির হইবার সময় গুহ্যদ্বার জ্বালা করে, মলে যথেষ্ট পরিমাণে পিত্ত মিশ্রিত থাকে, শ্লেষ্মাও শোণিত ও মিশ্রিত থাকিতে পারে। কখন কখন—বমি ও অতিসার এক সঙ্গে উপস্থিত হয়। নাড়ী—কখনও স্বাভাবিক, কখনও দুর্ব্বল, মৃদু, উত্তেজিত, এবং বিষম গতি বিশিষ্ট। মুখের লালা অম্লাক্ত, মুখে তিক্ত স্বাদ, প্রশ্বাস বায়ু দুর্গন্ধযুক্ত, দৈহিক উত্তাপের হ্রাস বৃদ্ধি—স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীত (অর্থাৎ পূর্ব্বাহ্নে ৭টার সময় সর্ব্বাপেক্ষা উত্তাপ

বেশী হয় অপরাহ্ণে উত্তাপ সর্ব্বাপেক্ষা কম) রোগী মনে করে তাহার বুঝি জ্বর হইয়াছে। কখনও নাসিকা হইতে কখনও বা মুখ হইতে শোণিতস্রাব। বৃদ্ধ হইলে চক্ষু হইতে কখন কখন রক্তস্রাব হইতে দেখা যায়। স্ত্রীলোক হইলে অধিক আর্ত্তবস্রাবও দেখা যায়।

ত্বক অপরিষ্কার, পীতাভ, (ঈষৎ লঘু হরিদ্রা বর্ণের আভাযুক্ত) হস্তের পশ্চাতে ও পদের পৃষ্ঠে—এই বর্ণপরিবর্ত্তন সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু পর্ব্বাস্থির সংযোগ স্থলের ত্বকে ঐরূপ বর্ণ পরিবর্ত্তন নাও দেখা যাইতে পারে। উভয় সন্ধির মধ্যবর্ত্তী স্থলেই বর্ণপরিবর্ত্তন অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট দেখা যায়। হাতের তেলো, পায়ের তলা, নখমণ্ডলের স্থানে স্থানে এবং শরীরের অন্যান্য স্থানেও বিন্দু বিন্দু দাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

রোগের প্রবলাবস্থায় সমস্ত শরীরের ত্বকই বিবর্ণ হইয়া যায়, স্থানে স্থানে গাঢ়বর্ণের দাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

মানসিক বিকারের নানা লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই সকল লক্ষণের দিকে চিকিৎসক কে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে হইবে। কেননা, অনেক সময় ম্যালাঙ্কোলিয়ার লক্ষণও দেখিতে পাওয়া যায়। রোগী বিমর্ষভাবে বসিয়া বা শুইয়া থাকে, সামান্য ত্রুটীতে অত্যন্ত রাগিয়া ওঠে। অনিশ্চিত বিষয়ের আশঙ্কা করে। মৃত্যুকামনা করে। তবে আত্মহত্যা করে না। নানারকম শব্দ শুনিতে পায়। দুশ্চিন্তা, অনিদ্রা, শরীরক্ষয়, শিরঃশূল প্রভৃতি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বা উন্মাদ হইয়া যায়।

দেহ পরীক্ষা করিলে দেখা যায়—যকৃত সামান্য একটু হ্রাস, প্লীহা সামান্য একটু বড়, কিন্তু সকল রোগীর ইহা হয় না।

পিত্তজ-বিষাক্ততারোগগ্রস্ত ব্যক্তির পূর্ব্ব ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে জানা যায়—পূর্ব্বে অজীর্ণ (ডিসপেপসিয়া) ছিল, কোষ্ঠ পরিষ্কার হইত না। এই কোষ্ঠবদ্ধতায় রোগী বহুদিন ধরিয়া কষ্ট পাইয়াছে, এই কোষ্ঠবদ্ধতার জন্যই শরীর বিষাক্ত হইয়াছে।

পাকস্থালীর মধ্যে জৈবিক অম্লের উৎপত্তি, তজ্জন্য যকৃতের ক্রিয়ার বৈষম্য, সূক্ষ্ম পিত্তবহা আক্রান্ত হওয়ায়—পিত্ত যথেষ্ট পরিমাণে বহির্গত হইতে পারে না,—লসিকার মধ্যে থাকিয়া যায়, পাকস্থালীর উৎসেচন ক্রিয়ায় ফলে যকৃতের সঙ্কোচন (সিরোসিস) হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, পিত্তনলীর প্রদাহ ইহা হইতেও হইতে পারে।

এইরোগে অ্যালোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করা খুব কঠিন। ডাক্তারেরা অল্প মাত্রায় পারদ ঘটিত ঔষধ এবং গ্লাইকোকোনেট সোডিয়ম প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ আর্টিফিসাল সিরমের পিচকারীর ব্যবস্থা করেন। কেহবা ক্ষারাক্ত ঔষধ এবং সোডিয়ম স্যালিসিনেট প্রয়োগের উপদেশ দেন।

আমি অনেক রোগীকে কবিরাজী মতে চিকিৎসিত হইতে দেখিয়াছি। গুলঞ্চ এ রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। আমি বেঙ্গলের গুলঞ্চ লিকুইড প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছি। ২ তোলা গুলঞ্চ—আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া—৪ ঔন্স শিশিতে পুরিয়া ৪ দাগ—৩ ঘণ্টান্তর করিয়া খাইতে দিয়াছি। ইহাতেও বেশ উপকার পাইয়াছি। রোগের প্রথমাবস্থায়—গুলঞ্চ প্রয়োগ করিতে পারিলে, রোগ নিশ্চয়ই ভাল হইবে। অথচ গুলঞ্চ সর্ব্বজন পরিচিত, সহজ প্রাপ্য, সুলভ মহৌষধ। কলত্রিকাদিপাচনও পিত্তজ বিষাক্ততার একটী ফলপ্রদ ঔষধ। হরীতকী,

বহেড়া, আমলা গুলঞ্চ, বাসক, কট্‌কী, চিরাতা ও নিমছাল—এই ৮টী জিনিষ প্রত্যেকটী ।০ আনা ওজনে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া, ৪ ঔন্স শিশিতে পুরিয়া ৩ ঘণ্টান্তর সেবন করিলে—পিত্তজ বিষাক্ততার বিশেষ উপকার হয়। এই পাচনটী যকৃতের উত্তেজক। ইহাতে ত্বকের বিবর্ণত্বের হ্রাস হইয়া থাকে। ত্বকের বিবর্ণত্ব হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে বুঝিতে হইবে—পীড়ার লক্ষণও হ্রাস হইয়াছে। শুনিয়াছি—মণ্ডুর ভস্ম নাকি এ রোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ; কিন্তু আমি পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাই নাই।

ডাঃ শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়
এল, এম, এস।

বনৌষধি।

—:০:—

আদ্রক-আদা, হিঃ আদরক।—বঙ্গদেশে আদার যথেষ্ট চাষ হইয়া থাকে। কোন কোন গৃহস্থ-বাড়ীতেও ইহা যত্নে রক্ষিত হয়। হিন্দী ভাষায় আদাকে 'অদরক বলে।

আদা কাঁচা ও শুষ্ক দুই রকমে ব্যবহৃত হয়। শুষ্ক আদাকে শুঁঠ বা শুণ্ঠী বলে। কাঁচা ও শুষ্ক আদার পৃথক পৃথক গুণ দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশ হইতে বহু পরিমাণে আদা ইউরোপে রপ্তানি হইয়া থাকে। ইহা হইতেই "টিঞ্চার জিঞ্জার' ও "সিরাপ জিঞ্জার' প্রস্তুত হয়।

আদ্রকের গুণ।—কাঁচা আদা অগ্নি বৃদ্ধিকারক, কফনাশক, বিরেচক, মুখরোচক। আদার স্বরস ঔষধের সহ পানার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৈদ্যকমতে কাঁচা আদা অপেক্ষা শুঁঠের ব্যবহার অধিক দৃষ্ট হয়।

ভোজনের অব্যবহিত পূর্ব্বে কাঁচা আদা কিঞ্চিৎ লবণের সহিত সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি ও মুখে রুচি হইয়া থাকে।

সন্নিপাত জ্বরে আদা।—আদার রসে কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ ও ত্রিকটু চূর্ণ (শুঁঠ, পিপুল মরিচ) মিশ্রিত করিয়া আকণ্ঠ মুখে ধারণ করিয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া ফেলিয়া দিবে, এই প্রকার পুনঃ পুনঃ করিলে বক্ষের, গলার ও কণ্ঠের শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া শরীরের লঘুতা জন্মিবে। ইহা স্বরভঙ্গেও বিশেষ উপকারী।

অতিসারে আদা।—অত্যন্ত প্রবল অতিসারে যাহার মল কোনপ্রকারেই রোধ করা যাইতেছে না, তাহার নাভীর চতুঃপার্শ্বে শুষ্ক আমলকী বাটিয়া আলিবদ্ধ করিবে, তৎপরে ঐ আমলকী বেষ্টিত স্থানে (নাভি মূলে) কাঁচা আদার স্বরস পরিপূর্ণ করিয়া ২।৩ ঘণ্টা রাখিবে। ইহা অতিসার রোগে একটী শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোগ, ইহাতে প্রবল অতিসারের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

গ্রহণী রোগে শুঁঠ।—শুণ্ঠী (আদা শুঁঠ) কল্কের সহিত গব্যঘৃতে পাক করিয়া [illegible]

[চা]রি আনা কিম্বা ছয় আনা মাত্রায় সেবন [ক]রিলে গ্রহণী উপশমিত হয়। ইহা বায়ুর [অ]নুলোমক।

রক্তস্রাবে আদা।—মূত্রমার্গ হইতে [র]ক্তস্রাব হইলে শুঁঠ ২ তোলা, জল দেড় পোয়া [গ]বাদুগ্ধ অর্দ্ধপোয়া—একত্রে জ্বাল দিয়া দুগ্ধ [শে]ষ রাখিয়া ঐ দুগ্ধ পান করিবে, ইহাতে রক্ত[স্র]াব বন্ধ হইবে।

অতিসারে শুঁঠ।—শুঁঠ ১ তোলা, [ব]লা ১ তোলা, জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া, [এ]ই ক্বাথ পান করিলে অতিসারের নিবৃত্তি হয়। [ই]হা অতিশয় অগ্নিবর্দ্ধক।

ক্ষত স্থানে শুঁঠ।—ক্ষতক্ষীণ রোগী [প্র]ত্যহ শুঁঠ চূর্ণ।০ চারি আনা পরিমাণ জলের [সহ]িত সেবন করিবে, ঔষধ সেবনকাল পর্য্যন্ত [অ]ন্ন পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র দুগ্ধ পান [কর]িবে। ইহাতে ব্যাধির উপশম হইবে। [এ]ক পক্ষ কাল এইরূপ নিয়মে সেবন করিবে।

উদরী রোগে আদা।—উদরী রোগে [প্র]ত্যহ প্রাতে আদার রস ১ তোলা ও দুগ্ধ ১ [তো]লা একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। [(২]) দশগুণ আদার রসের সহিত তিল তৈল [পা]ক করিয়া সেই তৈল সেবন ও অঙ্গে [প্রল]েপ করিবে। ইহাতে উদরী রোগের [উ]পশম হইবে।

আমদোষে শুঁঠ।—গরম জলের সহিত [প্র]ত্যহ চারি আনা পরিমাণ শুণ্ঠী চূর্ণ সেবন [ক]রিলে আম পরিপাক হয়, ইহা বিশেষ অগ্নি[ব]র্দ্ধক।

আমাতিসারে উদর বেদনায় শুঁঠ।—শুণ্ঠী চূর্ণ কিঞ্চিৎ গব্য ঘৃত সহ মিশ্রিত করিয়া [এ]রণ্ডপত্রে বেষ্টন করিয়া পরে মৃত্তিকার [প্র]লেপ দিয়া একটী মোষ প্রস্তুত করিবে। ঐ মোষ ঘুঁটিবার অগ্নিতে মৃদুপাক করিবে, পাকশেষে শীতল হইলে অভ্যন্তরস্থ ঔষধের চূর্ণ দুই আনা পরিমাণ প্রত্যহ প্রাতঃকালে চিনির সহিত সামান্য জলসহ সেবন করিলে উদরের আমজনিত বেদনার উপশম হয়।

কর্ণশূলে আদা।—তিল তৈল ও আদার রসে কিঞ্চিৎ মধু ও সৈন্ধব মিশ্রিত পূর্ব্বক ঈষৎ উত্তপ্ত করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণের আভ্যন্তরিণ বেদনার নিবৃত্তি হয়।

কাসে আদা।—খুসখুসে কাসিতে কাঁচা আদা খোসা ছাড়াইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিবে, পরে উহাতে কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ মাখাইয়া একটী শলাকা দ্বারা আদার টুকরাগুলিকে বিদ্ধ করিয়া তৈলের প্রদীপের শিখায় সেঁকিয়া লইয়া ২।১ টুকরা করিয়া চিবাইয়া সেবন করিবে, ইহা সর্দ্দি কাসির পক্ষে বিশেষ উপকারী।

গুল্মরোগে আদা।— সর্জিকাক্ষার (বেনের দোকানে পাওয়া যায়) ও আদা সমভাগে লইয়া, বাটীয়া ৪ রতি প্রমাণ বড়ী করিয়া জলের সহিত সেবন করিলে রক্তজ গুল্ম উপশমিত হয়।

শীতপিত্তে আদা।—রক্ত এবং পিত্ত উত্তপ্ত হইয়া শীতপিত্তরোগ জন্মে, ইহাতে সর্ব্বাঙ্গে অথবা দেহের স্থানে স্থানে চাকা চাকা মণ্ডলাকৃতি বোলতার দংশনের ন্যায় দৃষ্ট হয়। কিঞ্চিৎ পুরাতন ইক্ষু গুড়ের সহিত আদার রস সেবন করিলে ইহা উপশমিত হইয়া থাকে।

বিষম জ্বরে শুণ্ঠী।—শ্বেত বেড়েলার মূলের ছাল ও শুণ্ঠী সমভাবে গ্রহণ করিয়া উহার ক্বাথ করিবে। (১ তোলা বেড়েলা, ১ তোলা শুঁঠ, জল।৹ সের, শেষ ।৴৴ পোয়া।)

প্রত্যহ প্রাতে এই ক্বাথ পান করিলে শীতকম্প দাহযুক্ত বিষম জ্বর উপশমিত হয়।

হিক্কায় শুঁঠ।—ছাগী দুগ্ধ দ্বারা ক্ষীর পাকানুযায়ী শুণ্ঠীর ক্বাথ হিক্কা নাশক।

শিরোরোগে শুণ্ঠী।—শুণ্ঠি চূর্ণ গব্য দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া নস্যগ্রহণ করিলে শিরোরোগের উপশম হয়।

শূলরোগে শুণ্ঠী।—শূলরোগে ৴০ আনা শুঁঠ, ৵০ আনা বিট লবণ, একত্রে মিশ্রিত করিয়া গরম জলের সহিত সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ বেদনার উপশম হয়।

শুঁঠ-বায়ুনাশক, বেদনা নিবারক, ইহা গলরোগ নাশক, শ্লেষ্মা প্রশমক, অগ্নিমান্দ্য বিসূচিকা, উদরাময়, পেট ফাঁপা, শোথ প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকারী।

বাতজনিত বেদনা স্থানে।—শুণ্ঠীচূর্ণ, তার্পিণ তৈল ও কর্পূর মিশ্রিত করিয়া মালিশ করিলে বেদনার নিবৃত্তি হইয়া থাকে, উহাতে কিঞ্চিৎ সজিনার ছালের রস ও ধুস্তুর পাতার রস মিশ্রিত করিয়া লইলে উৎকৃষ্ট বাতের মালিশ হয়।

শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন।

ডাক্তারের ডায়েরি।

[স্বর্গীয় মহাত্মা ডাক্তার হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখিত]

(১৯০৬)

—:o:—

কার্ব্বলিক অ্যাসিডের কুফল।

অনেক ডাক্তারের বিশ্বাস—কার্ব্বলিক অ্যাসিডের স্থানিক প্রয়োগে ক্ষত আরোগ্য হইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত, কার্ব্বলিক অ্যাসিডে ঘা পচিতে পারে। এরূপ দেখা গিয়াছে—শতকরা দুই অংশ শক্তির কার্ব্বলিক দ্রব দিয়া কোন রোগীর আঘাত প্রাপ্ত অঙ্গুলি আবৃত রাখা হইয়াছিল! পরদিন ঐ অঙ্গুলিতে গ্যান্‌গ্রিন হইয়াছিল। কোনও যুবকের আঙ্গুলে বেদনা হওয়ায়—কার্ব্বলিক লোসন (মৃদু প্রকৃতির) প্রয়োগ করা হয়। ৫।৬ দিন পরে ঐ আঙ্গুলে গ্যান্‌গ্রিন্ হইয়া অস্থি পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। বালক বালিকার শরীরে অল্প পরিমাণে কার্ব্বলিক প্রয়োগ করিলেও স্থানিক পচন আরম্ভ হইতে পারে। কার্ব্বলিক অ্যাসিড প্রয়োগ করিলে পীড়িত স্থান পীতাভ পাটল বর্ণ ধারণ করে; ক্রমে ঐ স্থানের বর্ণ কাল হইয়া যায়। আক্রান্ত স্থানের স্পর্শজ্ঞান লোপ পায়, কোমল হয়। শেষে পচিতে আরম্ভ করে। মাংস বিগলিত হইয়া পৃথক হয়। অতএব ডাক্তার ভায়ারা এবং সাধারণ গৃহস্থেরা—কার্ব্বলিক অ্যাসিড প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে সতর্ক হইবেন।

আফিং পরিত্যাগের ঔষধ।

যদি কোন ব্যক্তি আফিম সেবনের বদ-ভ্যাস হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য ডাক্তারের

শরণাগত হন, ডাক্তার তাঁহাকে "হায়সিন হাইড্রোব্রোমেড" ব্যবস্থা করিবেন। ইহা প্রয়োগ করিয়া আমি দিল্লীর কয়েকজন আফিংখোর ভদ্রলোককে আফিম ছাড়াইয়া দিয়াছি।

আফিম পরিত্যাগেচ্ছু ব্যক্তিকে ডাক্তার এমন স্থানে রাখিবেন, যেন সর্ব্বদাই তাহাকে দেখা চলে। এমন একটী ঘর চাই, যে ঘরে কোনও দ্রব্যাদি থাকিবে না, অথচ ঘরটি অন্ধকার হইবে। হায়সিন সেবনে রোগীর শরীরে উন্মত্ততার লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে। চক্ষে আলোক লাগিলে উত্তেজনা আসিতে পারে। রোগীর কাছে একজন বিশ্বাসী—শুশ্রূষাকারীকে রাখিতে হইবে।

হায়সিন প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে আফিংখোরের হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস এবং মূত্রযন্ত্র ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে হয়। ঐ সমস্ত যন্ত্রের কোনও পীড়া থাকিলে, প্রথমে তাহারই চিকিৎসা করিবে।

যে দিন হায়সিন ব্যবহার করাইবে, তাহার পূর্ব্বদিনে—রোগীকে উষ্ণজলে স্নান করিতে বলিবে —গায়ে যেন ময়লা না থাকে। তা'রপর স্ট্রিকনিন সালফেট দুই ঘণ্টা অন্তর ৩ বার সেবন করাইবে। রাত্রে ক্যালমেল, পডফিলিন এবং ইপিকাক সেবন করাইয়া ভোরের সময় লবণ ঘটিত জোলাপ দিবে।

ইহাতে হৃৎপিণ্ড সবল হইবে, যকৃতের ক্রিয়া ভাল হইবে, শরীরস্থ সঞ্চিত দূষিত পদার্থ বাহির হইয়া যাইবে। গা' বমি, পেটবেদনা, পেটের পীড়া প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দিবে না।

অভিজ্ঞ এবং সাহসী চিকিৎসক ভিন্ন—হায়সিন প্রয়োগ বড়ই শক্ত ব্যাপার। রোগীর অবস্থা বুঝিয়া ১ গ্রেণ মাত্রায় হায়সিন প্রয়োগ করিতে হয়। প্রত্যেক ঘণ্টায় ঔষধ সেবন করান আবশ্যক। হায়সিনের ক্রিয়া রোগীর দেহে প্রকাশ পাইবা মাত্র বন্ধ রাখিবে। যখন দেখিবে—নাড়ীর গতি মৃদু (প্রতি মিনিটে ১৫ বার) হইয়াছে, মুখমণ্ডল উজ্জ্বলভাব ধারণ করিয়াছে, কনীনিকা প্রসারিত এবং জিহ্বা শুষ্ক হইয়াছে, রোগী সামান্য প্রলাপ বকিতেছে, অথবা কল্পিত বস্তু দর্শন করিয়া উন্মাদের মত তাহা ধরিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে—তখনই বুঝিবে হায়সিনের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। এই সকল লক্ষণ যাহাতে ৩০।৪০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকে, সেজন্য অতি অল্প মাত্রায় হায়সিন প্রয়োগ করিবে। ইহার পরই রোগী প্রকৃতিস্থ হইবে, অথচ আবার হায়সিন খাইতে চাহিবে। কিন্তু আর দিবে না। ইহার ২।১ দিন পরেই রোগীর অত্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক হইবে। আফিমের অভ্যাস দূর হইবে, শরীরে উৎসাহ ও বল ফিরিয়া আসিবে।

রোগীর প্রলাপ ও অজ্ঞানাবস্থা দেখিয়া ভয় করিও না। রোগী যে পর্য্যন্ত না সম্পূর্ণ নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে, সে পর্য্যন্ত অর্দ্ধ ঘণ্টা হায়সিন প্রয়োগ করিবে।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংজ্ঞাহারক।

অস্ত্র চিকিৎসার পূর্ব্বে রোগীকে সংজ্ঞাহারক ঔষধ প্রয়োগ করা হয়। আমার বিশ্বাস—সংজ্ঞাহারক ঔষধের মধ্যে ইথিল ক্লোরাইড খুব ভাল। ইহাতে অল্প সময়ের মধ্যে কাজ হয়। রোগীকে পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত করিয়া লইবার সময় না পাইলে ইথিল ক্লোরাইড সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংজ্ঞাহারক। ইহাতে ৫।৬ মিনিটের মধ্যে রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে। পুনরায় তাহার জ্ঞান হইতে ১০

মিনিটের অধিক সময় লাগেনা। ক্লোরফরম ও ইথরের পরিবর্ত্তে—ইথিন ক্লোরাইডের বহুল প্রচলন আবশ্যক।

চাউল জলে অম্ল নিবারণ।

অশিক্ষিত লোকদের মধ্যেও দেখিয়াছি—অম্ল বা অজীর্ণ হইলে তাহারা আস্ত চাউল জল দিয়া গিলিয়া খায়। কেহ কেহ ক্ষুধা বৃদ্ধির জন্যও এরূপ করিয়া থাকে।

এ নিয়মটী খুব ভাল। যাঁহাদের অজীর্ণ রোগ আছে, ক্ষুধা ভাল হয় না তাঁহারা প্রত্যহ আহারের ১ ঘণ্টা পূর্ব্বে—৫।৭টী আস্ত চাউল (না চিবাইয়া) জল দিয়া গিলিয়া খাইবেন। ইহাতে Stomachএর (আমাশয়) অজীর্ণ জনিত যাবতীয় পদার্থ অতি শীঘ্র পক্বাশয়ে নির্গত হইয়া যায়। আস্ত কাঁচা চা'ল—অজীর্ণ রোগীর পেটে হজম হয় না ইহা সত্য, কিন্তু ঐ চা'ল পক্বাশয় ও আমাশয়কে উত্তেজিত করিয়া থাকে, তাহার ফলে রোগীর পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া থাকে।

এস্পাইরিণের বিষক্রিয়া।

স্যালিসিলেট অফ সোডার মন্দ ফল দেখিয়া উহার পরিবর্ত্তে আজকাল এস্পাইরিণ প্রয়োগ করা হইতেছে। কিন্তু এস্পাইরিণও নির্দ্দোষ নহে—ইহারও বিষক্রিয়া আছে। ধাতু ও প্রকৃতি বুঝিয়া সেই বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। এমন কি ১০ গ্রেণ মাত্রায় ২।৩ বার এস্পাইরিণ ব্যবহার করিয়া অনেকের দেহে বিষক্রিয়া উৎপন্ন হইতে দেখিয়াছি।

কাহারও হৃদপিণ্ড, কাহারও পেশী কাহারও বা মস্তিষ্কের স্পর্শবোধক সমস্ত স্নায়ু আক্রান্ত হইয়া বিষক্রিয়া উপস্থিত হয়। বিষক্রিয়ার লক্ষণও সর্ব্বত্র এক নহে। কাহারও কর্ণে প্রদাহ হয়, কাহারও মুখ ফোলে, কাহারও প্রস্রাব সবুজ বর্ণ হয়। কাহারও বা শ্বাসকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয়। কেহ বা দৌর্ব্বল্যে অবসন্ন হইয়া পড়ে। কাহারওবা অনেক বার অধিক মাত্রায় প্রস্রাব হইতে থাকে।

অতএব এস্পাইরিণ অধিক মাত্রায় হঠাৎ প্রয়োগ করিওনা। অল্প মাত্রায় দিবে। মাত্রা ৫ গ্রেণের বেশী না হয়।

বহুমূত্র রোগে—বঙ্গ প্রয়োগ।

রাং নামক ধাতুকে কবিরাজী শাস্ত্রে 'বঙ্গ' বলে। রাঙের মধ্যে পদ্ম রাং উৎকৃষ্ট। ইহা ভস্ম করিয়া লইতে হয়। ভস্ম করা রাং বহুমূত্র রোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। আমি উরানিয়ম প্রয়োগে তিনটী বহুমূত্র রোগীর চিকিৎসা করি। বিশেষ কোন ফল পাই নাই, উরানিয়ম নাইট্রেট—অতি সাবধানে আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিতে হয়। আমি এই তিনটী রোগীকে আহারের পর ১ গ্রেণ উরানিয়ম যথেষ্ট পরিমাণ জলসহ মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিতাম, প্রত্যহই ইহাদের প্রস্রাব পরীক্ষা করিতাম। প্রস্রাবে অণ্ড লাল প্রচণ্ড হইলে তৎক্ষণাৎ ঔষধ বন্ধ করিতাম। উরানিয়মের দোষ—ইহাতে অণ্ড লাল বাড়ায়। কোষ্ঠবদ্ধতাও উপস্থিত করে।

অবশেষে—ইহাদিগকে বঙ্গভস্ম খাইতে দিই। ইহাতে বেশ সুফল ফলিয়াছিল। প্রত্যেক রোগীর খুব উপকার হইয়াছিল।

"বঙ্গ"—রোগীর দৈহিক গুরুত্ব বৃদ্ধি করে। ঔষধের মাত্রা ক্রমে ক্রমে বাড়াইলে, ঐ গুরুত্ব বহুদিন স্থায়ী হয়। "বঙ্গ" প্রস্রাবের শর্করা কমাইয়া দেয়। রোগীর উৎসাহ ও বল বৃদ্ধি করে। স্নায়বিক বেদনা নিবারণে ক্রমো

"বঙ্গ" যক্ষ্মারোগীরও ক্ষয় নিবারণ করে,—দৈহিক গুরুত্ব বাড়াইয়া দেয়। কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে—হিন্দুরা এই অপূর্ব্ব ঔষধের আবিষ্কার করিয়া ছিলেন!! বঙ্গের অপূর্ব্ব শক্তি দেখিয়া ঋষিগণের চরণে কোটি কোটি প্রণাম করিতে ইচ্ছা হয়।

বঙ্গের গুণ পরীক্ষা করিয়া আমি নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি ;—

বঙ্গ—ক্ষত শুষ্ক করে, রক্ত রোধ করে, অণ্ডলাল সংযত করে, প্রস্রাবের চিনী কমায়, দৈহিক গুরুত্ব বাড়ায়, কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখে, ক্ষয় নিবারণ করে।

মুখের দুর্গন্ধ দূর করিবার জন্য দেশী ও বিলাতী মুষ্টিযোগ।

কুড় নামক বণিক দ্রব্যের গুঁড়া, জামের আঁটির গুঁড়া, তেজপাতার গুঁড়া ও পাপ্‌ড়ি খয়ের একত্র মিশাইয়া দাঁত মাজিবে।

স্যাকারিণ ১৫ গ্রেণ, সোডাবাইকার্ব্ব ১৫ গ্রেণ, অ্যাসিড স্যালিসিনিক ৩০ গ্রেণ, এলকোহল ৩ উন্স। একত্র মিশাইয়া শিশির মধ্যে রাখিবে। ইহার কয়েক ফোঁটা ১ গ্লাস জলে দিয়া, সেই জলে কুলকুচা করিবে।

রোগ নির্ণয়ের ভ্রম।

আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রে আর একটী বিভ্রাট সম্প্রতি উপস্থিত হইয়াছে। সন্ধিস্থলে বেদনা হইলেই অনেক ডাক্তার তাহাকে "রিউমেটিজম্" নামে অভিহিত করেন। সঙ্গে সঙ্গে "রিউমেটিজমের" অমোঘ ঔষধ স্যালিসিলেট অফ সোডা ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ডাক্তার যদি একটু ধীরভাবে রোগটী পরীক্ষা করিতেন, তাহা হইলে হয় ত সে বেদনা অন্য পীড়া বলিয়া বুঝিতে পারিতেন। মাঝে থেকে রোগীকে মিছামিছি স্যালিসিলেট খাইয়া অনর্থক কষ্ট পাইতে হইত না। দুঃখের বিষয় ডাক্তার তাহা করিলেন না, তিনি সন্ধির বেদনা মাত্রকেই 'রিউমেটিজম্' স্থির করিয়াছেন। কাজেই রোগীকে স্যালিসিলেটের ব্যবস্থা দিয়াছেন। ফলে স্যালিসিলেট খাইয়া রোগীর পরিপাকক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিল। কিডনীর কার্য্য বাড়িল, ক্ষুধা কমিল, পোষণ ক্রিয়ার বিঘ্ন হইতে লাগিল, জীবনীশক্তিও আংশিক নষ্ট হইয়া গেল।

অবশ্য অল্প মাত্রায় স্যালিসিলেট প্রয়োগ করিলে এতদূর মন্দ ফল হয় না। কিন্তু ডাক্তার যখন দেখেন—ঔষধ প্রয়োগে ফল হইতেছে না, তখন তিনি অধিক মাত্রায় ইহা প্রয়োগ করেন। ঠিক রোগ ধরা পড়ে নাই—ইহা তাঁহার মনেই হয় না।

আমার চ'খের সম্মুখে আমি এইরূপ ৫।৬টী রোগী দেখিয়াছি,—যাহাদের সন্ধিস্থলের বেদনা "রিউমেটিজম" আখ্যা পাইয়াছে। ডাক্তার রাশি রাশি স্যালিসিলেট খাওয়াইতেছেন, অথচ রোগীর বেদনার তিলমাত্র উপশম হইতেছে না। শেষে রোগী ডাক্তারের উপর হতশ্রদ্ধ হইয়া কবিরাজের হাতে পড়িতেছে। ভালও হইতেছে। ডাক্তারের পক্ষে অবশ্যই ইহা লজ্জার কথা!

ষ্ট্রাফিলোকোকাস, গণোকোকাস টিউবারকেল বাসিলাস এবং অন্যান্য বহুবিধ রোগের বীজাণু কর্ত্তৃক সন্ধিস্থলে বেদনা হইতে পারে। এই সকল জীবাণুর উপর স্যালিসিলেটের কোনো প্রভাব নাই। সুতরাং স্যালিসিলেট প্রয়োগে পূর্ব্বোক্ত রোগ গুলিতে কোন উপকারের আশা করা যায় না। বরং অধিক মাত্রায় স্যালিসিলেট সেবনে রোগীর সমূহ অপকার হইয়া থাকে।

সম্প্রতি আমি একটী রোগী পাইয়াছিলাম। সম্ভ্রান্ত মুসলমান যুবক। তাঁহার সন্ধিতে বেদনা হওয়ায় উপর্য্যুপরি ৩ জন ডাক্তারের চিকিৎসাধীন ছিলেন। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম—তাঁহার বেদনা "নিউমোকোকাস্" জন্য। সন্ধিতে পূয হইয়াছে। ফুস্ফুস্ পরীক্ষায় প্রদাহের লক্ষণও পাওয়া গেল। সন্ধির আবরক ঝিল্লীতে স্রাব সঞ্চিত হওয়ায় প্রদাহ এবং স্ফীততা দেখা দিয়াছিল। পচন দোষের লক্ষণও বর্ত্তমান ছিল। জ্বর কমিত, বাড়িত। এস্পিরেট করিয়া যে পূয পাইলাম তাহার বর্ণ পীতাভ সবুজ, গন্ধহীন, সূত্রবৎ পদার্থ মিশ্রিত। ইহাতে নিউমোকোকাউ বর্ত্তমান ছিল।

পূয বাহির করিয়া দিয়া লক্ষণানুযায়ী ঔষধাদি দিয়া—আমি তাঁহাকে অনেকটা সুস্থ করি। এখন তিনি সালসা খাইতেছেন। এক-জন বৃদ্ধ হাকিম চিকিৎসা করিতেছেন।

ডাঃ শ্রীজগবন্ধু গুপ্ত।
এল্ এম্ এস্।

ব্রহ্মচর্য্যে বালকসমাজ।

—:০:—

বালক স্বাস্থ্য বিষয়ে 'আয়ুর্ব্বেদে' ত অনেক প্রবন্ধই বাহির হইয়া গেল ও সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে আরও হইবে। কিন্তু 'কাজের কথা', ঔষধের কথা, বালক রক্ষার উপায়ের কথা এখনও ভালো করিয়া বলা হইল না ত! যথা বাহান্ন—তথা তিপ্পান্ন! এতই যখন লেখা হইয়াছে, তখন আমি আরও কতকটা এ বিষয় লিখিতে চাহি, 'কাজের কথা' হইবে কি না বলিতে পারি না, তবে ঔষধের কথাও যে হইবে না—এমন নহে।

সত্য সত্যই আধুনিক ভারতীয় বালক-সমাজের কথা খুব করিয়া ভাবিবার বিষয়। যে অঙ্কুরই ভবিষ্যতে ফলফুলসমন্বিত মহা-মহীরুহে পরিণত হয়, সে অঙ্কুর বড় যত্নে রক্ষিত হওয়া উচিত। যে বালক ভবিষ্যতের মানুষের খস্ড়া, তাহাকে সাবধানে রক্ষা না করিলে পরিণামের সমস্ত জাতিটা উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য উৎসন্ন যাইবার সম্ভাবনা। আমরা যে আজ এত হীন, ঘৃণা, দলিত, ক্লিষ্ট-ক্ষিপ্ত,—তাহার কারণ, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের বালকরক্ষার প্রতি ঔদাসীন্য ও আমাদের এখনকার ঔদাসীন্য ভবিষ্যতে একটী বীর্য্যহীন খর্ব্বকায় অজ্ঞ জাতির সূচনা করিতেছে। এ বক্তৃতার ভাষা নহে—এ কবিত্ব নহে; এ অতি বাস্তব—অতি সত্য কথা। ইহা আমাদের বিশ্বাস করিতেই হইবে। কেন করিতে হইবে বলিতেছি।

আপনারা একবার সেই ধূমায়মান অতি অতীত হিন্দুযুগের মাঝে প্রবেশ করুন। সত্য বটে—সে মহিমোজ্জ্বল যুগের আজ বিশেষ কিছুই নাই—আছে বুঝি অতীত মহিমার ক্ষীণ ক্ষীণস্মৃতিগুলি—না, না, তাও বুঝি বিলুপ্ত প্রায়। কিন্তু তা'র যতটুকুই আছে—তত টুকুই বড় পবিত্র, বড় আশাব্যঞ্জক বড় [illegible]।

—এত সত্য যে তাহা শুদ্ধ ভারতবাসী কেন সমগ্র মানবজাতির আদর্শ হইবার যোগ্য। আমরা সেই গুরুগম্ভীর-ঋষিযুগ হইতে বালক শিক্ষার ক্ষীয়মান আদর্শটীকে বাছিয়া লইতেছি।

ঐ দেখুন, ঋষিকুল নদীর তীরে তীরে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া আছেন। তাঁহাদের জীবনের সাধনা, সমগ্র ইচ্ছা শিক্ষার কার্য্যে—বালক শিক্ষা দ্বারা মনুষ্য গঠনের কার্য্যে-উৎসর্গীত। ঐ অসংখ্য কোমলমতি বালক সেই কুলপতির কর্ত্তৃত্বাধীনে সমবেত। কুলপতির আহার-নিদ্রা নাই তাঁহার দিবারাত্র চেষ্টা—বালকগুলি কিসে মানুষ হইয়া গড়িয়া উঠিবে--তাহার নিয়ত লক্ষ্য—বালকের শরীর ও মন যুগপৎ উন্নত হইতেছে কিনা। তখনকার আদর্শ ছিল—বালককে চরিত্রবান হইতেই হইবে; শারীরিক বলশালী হইতেই হইবে, মনস্বী হইতেই হইবে। বালক এই আদর্শকে পোষণ করিয়া গুরুগৃহের বহু বর্ষের সাধনার পর মানুষ হইয়া আসিয়া গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করিত এবং বিবাহিত ও সংসারী হইয়া ধর্ম্ম ও অর্থ উপার্জ্জনে মনোযোগী হইত। এই আশ্রমকে বলা হইত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম—এই আচরণকে বলা হইত ব্রহ্মচর্য্য। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতির মধ্যে এ চর্য্যা সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া ইহার ঐরূপ অর্থগত নামকরণ হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে অর্থের উপলক্ষণা দ্বারা পরিবর্ত্তনের ফলে যে কোন জাতির বাল্যের অধ্যয়ন, শরীর রক্ষা, চরিত্র গঠন প্রভৃতি সংযত-শিক্ষাকে ব্রহ্মচর্য্য বলা হইত। কিন্তু আধুনিক যুগে এ অর্থের আরো পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখন ব্রহ্মচর্য্য বলিলে আবালবৃদ্ধবণিতার পক্ষে মাত্র বীর্য্যরক্ষা বুঝায়। এইরূপ অর্থ-পরিবর্ত্তনের দুইটী কারণ—একটী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের আধুনিক সভ্যতায় সমূলে বিলুপ্তি; আর একটী হিন্দুর ক্রমশঃ ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির অভাব ও শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্ত্তন। ব্রহ্মচর্য্যকে আগে বড় ভক্তির চক্ষে দেখা হইত, তাই ইহার শিক্ষার জন্য চতুরাশ্রমের একটী আশ্রম নির্দ্দিষ্ট ছিল - ইহাকে ধর্ম্মের গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়া, বালকজীবনের বিবিধ শিক্ষার সহিত একীভূত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি সে শ্রদ্ধা—সে গৌরব আজিকার জগতের আদর্শ নহে। বীর্য্যধারণশিক্ষা এখন শ্লীলতার বহির্ভূত বিষয়। স্কুল কলেজের শিক্ষা হইতে তাই ব্রহ্মচর্য্যকে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে। তাই বিবাহিত জীবনে পুত্রকন্যার পিতা হইয়াও আধুনিক স্কুলকলেজে অধ্যয়ন সম্ভবপর হইয়াছে।

কিন্তু শ্লীলতার এ আদর্শ ত আমাদিগকে মুগ্ধ করে না। দর্শন-বিজ্ঞান হইতে আরম্ভ করিয়া গাড়ীচালান শিক্ষা দিবার জন্য পর্য্যন্ত আধুনিক যুগে বিদ্যালয় স্থাপিত রহিয়াছে, কিন্তু এত বড় একটা শক্ত কার্য্য—বীর্য্যরক্ষা তাহা অশ্লীল বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। এ শিক্ষার কোন স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত দূরে থাকুক, আংশিক বন্দোবস্ত ও নাই। শিক্ষা ভিন্ন যদি গাড়ীখানা চালান মানুষের পক্ষে অসম্ভব হয়, তবে কোমলমতি, অজ্ঞ বালকের পক্ষে এত বড় একটা বিরাট যন্ত্র - একটা ধাঁধা - যে এই মনুষ্য শরীর—তাহাকে চালান কত বেশী অসম্ভব। তাহার অকৃতকার্য্যতা যে কত স্বাভাবিক। বালক সমাজ যে আজ বীর্য্য ক্ষয়ে ম্রীয়মাণ—আমি বলি, সেজন্য বালকের বিন্দুমাত্র দোষ নাই। সে দোষ তাহাকে যে আদর্শটী আমরা দিয়াছি তাহার, সে দোষ

তাহার শিক্ষা-প্রণালীর, সে দোষ সর্ব্বৈব আধুনিক প্রবীণ মনুষ্য সমাজের সভ্যতার। বালককে কেন আমরা অমন স্বাধীনতার কোলে ছাড়িয়া দিই? কেন তাহাকে সাহেব সাজাইয়া তৃপ্ত হই? কেন তাহাকে উগ্র—অখাদ্য ও কুখাদ্য খাইতে দিই? কেন তাহাকে প্রতিপদে লক্ষ্য করি না। সে না বুঝিয়া যদি কোন কুকার্য্য করিয়া ফেলে, তবে অশ্লীলতার ভয়ে চক্ষু চাপিয়া না থাকিয়া, কেন উপদেশ দ্বারা তাহার সর্ব্বনাশ বুঝাইয়া দিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিনা? আজ আমরা সত্যসত্যই বড় এক নিষ্ঠুর সভ্যতাকে বরণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। জীবনমরণের যাহা বিষয়ীভূত—অশ্লীল বলিয়া তাহাকে উপেক্ষা করিয়া, আমরা বালককে—তথা মনুষ্যসমাজকে বিপন্ন, শ্রীহীন, ক্ষীণদেহ করিয়া দিতেছি।

আধুনিক বালক সমাজকে দেখিয়া চক্ষু ফাটিয়া জল আসে না কি? তাহার শীর্ণদেহ, বিকশিত দশন, প্রকটিত কণ্ঠা, নয়ন নিম্নে নীলিমা, তাহার যক্ষ্মা, তাহার অকালবার্দ্ধক্য প্রভৃতি দেখিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ কত অন্ধকারময় উপলব্ধি হইয়া বুক শুকাইয়া আসে না কি? চীৎকার করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয় না কি, যে আধুনিক সভ্যতার আদর্শ আমাদের পক্ষে বড় উত্তপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার গরিমা, ইহার শৃঙ্খলা, ইহার শিক্ষা তপোবন-বাসী ফলমূলাহারী সন্ন্যাসী হিন্দুর পুত্রের পক্ষে চলিবেনা।

বাস্তবিকই বালকশিক্ষার কেতন উড়াইয়া পথে-ঘাটে বক্তৃতা দিবার, পত্রে পুস্তকে লিখিবার দিন বহিয়া গিয়াছে। আমাদের বালক আজ আসন্ন মৃত্যুর কোলে ঝাঁপ দিতে উপক্রম করিয়াছে। আর বিলম্ব না করিয়া আমাদেরও ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, তাহাদিগকে আগুলিয়া রক্ষা করিতে হইবে। উপদেশের দিন কাটিয়া গিয়াছে। বালক শিক্ষার অভাবে যে অধঃপতনে গা ঢালিয়া দিয়াছে, তাহাকে শাসাইয়া আজ আর তা'র প্রতিকারের সম্ভাবনা নাই। বাস্তবিকই এ বিষয়ে তিরস্কার করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তিরস্কার করিতে হয় আমাদের নিজেদিগকে, আমাদের অজ্ঞতাকে, আমাদেরই অর্জ্জিত শিক্ষাপ্রণালী-কে, আর সর্ব্বোপরি যে নিখিল ভারতে পরনির্ভরতারূপ নিদারুণ অনর্থকে আনিয়াছে—সেই চিরকালের অচেনা কিন্তু সর্ব্বকাজের নেতা আমাদের অদৃষ্টকে।

যাহা আমাদের পক্ষে অতি গুরুতর. জীবন রক্ষার নিদান-তাহাকে লজ্জার আবরণে ঢাকিয়া রাখিলে আর আমাদের সৌভাগ্যের সম্ভাবনা নাই। তাই বালকরক্ষা বিষয়ে আজ সকলেই প্রকাশ্যভাবে কাজ করিতে থাকুন। ভাবিয়া দেখুন, পরের আদর্শ গ্রহণ, পরপদলেহন, পরের খাদ্যে তৃপ্তি—এসব যদি শীলতা ও সভ্যতা হয়—তবে নিজের আদর্শকে পোষণ করা,—পুনরুদযাপিত করা, আমার অতীত গৌরবকে ফিরাইয়া আনা, আমার শুভকে ইচ্ছা করিয়া আমার জাতিকে বর্দ্ধিত করা—নিশ্চয়ই অশ্লীলতা নহে, পরন্তু সূর্য্যাপেক্ষাও ভাস্বর, গাঙ্গোদক অপেক্ষাও পবিত্র, স্বর্গ অপেক্ষাও ঈপ্সিত।

এত দিনত পরের আদর্শকে বুকে-মাথায় করিয়া রাখিলে, কিন্তু লাভ কি হইল? টাকায় একমন চাউল ছিল, এখন পাঁচ সের বিক্রীত হইতেছে, হস্তীর মত বলীয়ান ছিলে, আজ দশ সের ভার উত্তোলন করিতে বা দশমাইল পথ হাঁটিতে পার না, ধর্ম্মের দধীচি ছিলে, আজ

অখাদ্যে কুখাদ্যে তোমার তৃপ্তি, সুজলাসুফলা, গিরিনদী-সমন্বিতা-ভারতভূমি স্বাস্থ্য জগতের মধ্যে আদর্শ স্থানীয় ছিল, আজ ম্যালেরিয়া, কলেরা, প্লেগ-বসন্তের গুঁতায় লক্ষ প্রাণ ধ্বংস হইতেছে, তুমি গৃহে অন্নাভাবে কাঁদিয়া মরিতেছ, তোমারই ধন দেশান্তরের সমৃদ্ধি সম্পাদন করিতেছে। যাহাদের আদর্শ লইয়া তুমি স্বগৃহে বীর্য্যক্ষয়ে অলস শক্তিহীন, তাহারাই বলিষ্ঠ দেহের ও মানসিক তেজের স্পর্দ্ধায় তোমার সম্মুখ দিয়া বিচরণ করিতেছে। যাহার আদর্শ তাহারই পক্ষে ভাল—অন্যের তাহা খাটে না। একটা বড় সভ্যতা একটা দুর্ব্বল জাতির পক্ষে মারাত্মক হইয়া পড়ে। সভ্যতার পেষণে কত জাতি যে বিলুপ্ত হইয়াছে—ইতিহাসে তাহার নিদর্শনের ইয়ত্তা নাই। ভারতবাসী আজ পূর্ব্বাপেক্ষা ঢের দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। আধুনিক সভ্যতা তাহার পক্ষে বড় উত্তপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, সে কিছুতেই ইহাকে হজম করিতে পারিতেছেনা। তাই ভারতের আবাল-বৃদ্ধ বনিতার অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িতেছে। ভারতবাসীর এখন কর্ত্তব্য—এ সভ্যতার গ্রাস হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়ান ও নিতান্ত প্রয়োজন ভিন্ন ইহার আস্বাদনে বিরত থাকা। নিজেকে সে বঞ্চিত করুক—নিজস্বকে গ্রহণ করিতে যাইয়া যদি সে মরে—সে মরণও লোভনীয় ও বরেণ্য হইবে।

ভারতবাসি! আরো কি নবযুগ, নব আদর্শ, নব সভ্যতাকে বুকে করিয়া মরিবে? একবার জাগো। দেখো তোমার নিজস্ব কত উজ্জ্বল, কত মহার্ঘ, কত বরণীয়। নিজেকে নিজে চেন, নিজেকে নিজে প্রস্তুত কর, গড়িয়া তোল। বালক তোমার পুত্র, তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, তোমার বৃদ্ধত্বের যষ্টি, তোমার জাতির ভবিষ্যৎ আশা, তোমার গৌরবের অঙ্কুর। তাহাকে তুমি সুশিক্ষা দেও, তাহাকে তুমি রক্ষা কর। তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিলে চলিবে না। তা'র কি দোষ? সে ত বালকই বটে, সে যে অজ্ঞ, সে যে দুর্ব্বল, সে যে চঞ্চল। তাহার ভ্রম যে অবশ্যম্ভাবী। তাহাকে যদি জ্ঞানী, বীর, বলীয়ান, সুচরিত্র করিতে না পার, সে দোষ যে তোমারই। এ দোষের ভুল তুমি ত ভোগ করিবেই—এমন কি ভবিষ্যতের শত অনুশোচনা, অবিরল অশ্রুধারা—এ দোষকে প্রক্ষালিত করিয়া লইতে পারিবে না।

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ।

গর্ভিণীরোগ-চিকিৎসা।

(মহিলাদিগের জন্য ছড়ায় লিখিত)

—:০:—

শ্বেতচন্দন, মদন ফল,
গুলকা, চিনি, চা'লের জল,
বেশ ক'রে বেটে—ছেঁকে দিয়ে—

গর্ভিণীকে দাও খাওয়াইয়ে।
প্রথম মাসের বেদনা হ'লে
এ মুষ্টিযোগে সুফল ফলে।

নীলোৎপল, পাণিফল, কেশুর নিয়ে,
চা'লের জলে নাও বাটিয়ে,
দ্বিতীয় মাসের ব্যথা হ'লে
শাস্ত্রে এ যোগ খেতে বলে।

আমলকী, কাঁকলা ক্ষীরকাঁকলা
গরম জলে বেটে—খাও দু'বেলা,
তৃতীয় মাসের ব্যথা যা'র
এ যোগে নিবারণ হয় তা'র।
ঔষধ জীর্ণ হ'বে যখন,
শালি তণ্ডুলের অন্ন খেও তখন।

কুড়, শালুক, পদ্ম, নীলোৎপলে
বেটে নাও চিনির জলে,
তৃতীয় মাসে ব্যথা বড়—
দুধে মিশিয়ে পান কর।

নীলোৎপল, শালুক, কণ্টকারী
আর দুধ সহ বাট' গোক্ষুরী,
কিম্বা - গোক্ষুর, বালা, কণ্টকারী,
নীলোৎপল তা'য় মিশাল করি'
দুধে বেটে পান কর,
চতুর্থ মাসে যা'র ব্যথা বড়;

ক্ষীরকাঁকোলী, নীলোৎপল—
সমান ক'রে বাট' কেবল,
দুধ, ঘি আর মধু দিয়ে
পাঁচ মাসের ব্যথায় দাও খাওয়াইয়ে।
কিম্বা—নীলোৎপল, কাঁকলা সমান নিয়ে—

শীতল জলে নাও বাটিয়ে—
দুধে মিশিয়ে পান কর,
পাঁচ মাসে যা'র ব্যথা বড়।

———

টাবালেবুর বীজ নীলোৎপল,
প্রিয়ঙ্গু, চন্দন—সমান সকল
দুধে বেটে কর পান—
ছ'মাসে গর্ভিণী যদি ব্যথা পান

———

পিয়ালবীজ, কিস্‌মিস্, খইয়ের চূড়
ছ'মাসের ব্যথা করে দূর।

———

পদ্মমূল আর শতমূলী
দুধে বেটে খাওগে খালি,
সাত মাসের ব্যথা দূর হ'বে,
গর্ভ স্থির ভাব হ'য়ে রবে।

———

কদবেলের মূল, খই, চিনি
আর শুপারির মূল আনি,
জলে বেটে সেবন কর,
সাত মাসের ব্যথায় উপকার বড়।

———

ধনে বেটে চা'লের জলে
আট মাসের ব্যথায় খাও—শাস্ত্রে বলে।
কিম্বা—পলাশ পাতা বেটে নিয়ে
আট মাসের ব্যথায় খাও চুমুক দিয়ে।

———

এরণ্ডমূল আর কাঁকলা বেটে
ন'মাসের ব্যথায় খাওগে চেটে।

———

পলাশবীজ, কাঁকলা, ঝাঁটিমূল
কাঁজি সহ খাও—ন'মাসে যদি ব্যথার শূল

———

নীলোৎপল, যষ্টিমধু, মুগ আর চিনি
দশ মাসের ব্যথায় খাও—উপকার জানি।

———

পদ্মকাষ্ঠ, নীলোৎপল, যষ্টিমধু,
আর মৃণাল বাট' জলে শুধু।
কিম্বা—বরাহক্রান্তামূল, ক্ষীরকাঁকোলী
আর নীলোৎপল, কুড় জলে গুলি'।
বেটে নিয়ে সেবন কর—
এগার মাসে যা'র ব্যথা বড়।

———

ভুঁইকুমড়া, কাঁকোলি, ক্ষীরকাঁকোলি
চিনি সহ বাট'—জলে গুলি'।
প্রথম মাসে রক্তস্রাব হয় যা'র
এই যোগ জেন ব্যবস্থা তা'র।

———

আমরুল, মঞ্জিষ্ঠা, শতমূলী,
কৃষ্ণতিল বাট—দুধে গুলি।
রক্তস্রাব যা'র দ্বিতীয় মাসে—
খেতে ব্যবস্থা দাও তাহার পাশে।

———

পরগাছা, ক্ষীরকাঁকোলি, নীলোৎপল,
অনন্তমূল বাট'—দুধে কেবল,
তৃতীয় মাসে রক্ত স্রাব হ'লে—
এ যোগ খেলে সুফল ফলে।

———

শ্যামালতা, রাস্না, বামুনহাটী
অনন্তমূল, যষ্টিমধু—দুধে বাটি'।—
চতুর্থ মাসে রক্তস্রাব যা'র
এ যোগ সেবন ব্যবস্থা তা'র।

———

বটাদি গাছের ছাল,—শুঙ্গ পারি'
গাম্ভারিফল, বৃহতী, কণ্টকারী,
আর মৃণাল নাও সকল সমান,

দুধে বেটে করাও পান,
পাঁচ মাসে রক্ত স্রাব হয়,
এ যোগে যায়—শাস্ত্রে কয়।

চাকুলে, বেড়েলা, যষ্টিমধু,
আর সজিনা, গোক্ষুর শুধু,
দুধে বেটে কর সেবন,
ছ' মাসে রক্তস্রাব হয় নিবারণ।

মৃণাল, পাণিফল, কেশুর চিনি,
কিস্‌মিস্, যষ্টিমধু আনি'
দুধে বেটে সেবন কর,
সাত মাসে রক্তস্রাব হ'লে বড়।

বেল, কদবেল, আক, বৃহতী,
সবার মূল আর কণ্টকারি, নতি,
সমান ভাগে দুধের সহ—
আট মাসের স্রাবে খেতে কহ।

শ্যামালতা, অনন্ত মূল, ক্ষীরকাঁকোলী
আর যষ্টিমধু—দুধে গুলি'
ন'মাসের স্রাবে খেতে দাও,
হাতে হাতে ফল দেখতে চাও।

আট গুণ দুধ, শুঁঠ দু'ভরি—
জল নাও দুধের আট গুণ করি,
দুধ যতটা—ততটা শেষ,
দশ মাসের শূল এতে বিশেষ।

শুঁঠ, দেবদারু যষ্টিমধু,
সব গুলিতে দু' তোলা শুধু,
দুধ ষোল তোলা—আট গুণ জল,
ষোল তোলা র'লে খাও কেবল,

দশম মাসে গর্ভ শূল যা'র
এতে উপকার সদ্যঃ তা'র।

ভেরেণ্ডা, গোক্ষুর, কুশ, কেশে,
মূল কেটে নাও—সবার ঘেঁসে,
এক একটি নাও আধ আধ ভরি,
দুধ—সব গুলির আট গুণ করি,
তা'র আট গুণ জল—দুগ্ধ শেষ,—
চিনি সহ খেলে গর্ভশূল বিশেষ।

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

—:০:—

স্বাস্থ্য-শিক্ষা।—অনারেবল মিঃ আই-রুণ গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্ম্মে প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে "এ দেশের সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত ও খাস সরকারী স্কুলকলেজ সমূহে ছাত্রগণকে স্বাস্থ্য বিষয়ের শিক্ষা দানের জন্য বজেটে ব্যবস্থা করা হউক।" বাঙ্গালার শিক্ষাধ্যক্ষ মহাশয় ইহার উত্তরে বলিয়াছেন,—"স্বাস্থ্যবিষয়ক পাঠ্যপুস্তক প্রায় সকল স্কুলেই পড়ান হইয়া থাকে। ফল কথা আপনি যাহা চাহিতেছেন, গবর্ণমেণ্ট তাহার ব্যবস্থা পূর্ব্বেই করিয়া রাখিয়াছেন।" আমরা বলি,—শুধু স্বাস্থ্যবিষয়ক পুস্তক পাঠে স্বভাবতঃ তরলমতি ছাত্রদিগের যতটা উপকারের সম্ভাবনা,—বাঙ্গালী বালকদিগের উপযোগী হাতেকলমে শিক্ষা দিলে তাহাপেক্ষা বেশী উপকারের আশা করা যায়। চিত্তসংযম ও ব্রহ্মচর্য্যপালনই যে স্বাস্থ্যরক্ষার মূল মন্ত্র—সুকুমারমতি শিশুজীবনে ইহা উপলব্ধি করাইবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সেরূপ ধরণের গ্রন্থ পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিলে এবং উপযুক্ত শিক্ষকের বক্তৃতায় সে সকল কথা বুঝাইবার বন্দোবস্ত করিলে, বাঙ্গালী শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা কতকাংশে সিদ্ধ হইতে পারে।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা কনফারেন্স।—ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার কারণ নির্ণয় ও উহার প্রতিষেধকল্পে আগামী মার্চ্চ মাসে ফ্রান্সের রাজধানী পারিসে এক বৈঠক বসিবে। ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে স্বাস্থ্যবিভাগের কমিশনার মেজর নরমান হোয়াইট সম্ভবতঃ ঐ বৈঠকে উপস্থিত থাকিবেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ও ইউনানী প্রদর্শনী।—গত ২০শে ফেব্রুয়ারী করাচী নগরে আয়ুর্ব্বেদীয় ও ইউনানী প্রদর্শনী খুলিয়াছে। সহস্রাধিক নাগরিক ঐ উদ্বোধনসভায় উপস্থিত

হইয়াছিলেন। দেশের লোকের দেশীয় চিকিৎসার প্রচার কল্পে যত মতিগতি বাড়িবে, ততই দেশের মঙ্গলের সম্ভাবনা।

চিকিৎসকের অভাব।—বাঙ্গালার লোক সংখ্যার তুলনায় এখনো চল্লিশ হাজার সুচিকিৎসকের প্রয়োজন। চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার জন্য বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে মাত্র ২টী সরকারি কলেজ ও ২টী স্কুল আছে। মহামান্য বঙ্গেশ্বর লর্ড রোণাল্ডশে বাহাদুর বর্দ্ধমানে আর ১টী মেডিকেল স্কুল স্থাপনায় চিকিৎসকের সংখ্যাবৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন। সহযোগী হিতবাদী বলিতেছেন, "শুধু বর্দ্ধমানে নহে, বাঙ্গালার প্রত্যেক জেলাতেই চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার স্কুল ও কলেজের প্রতিষ্ঠা কর্ত্তব্য।" সহযোগীর পরামর্শ যে সাধু, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা বলি, কলিকাতায় আমাদের অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় যে উদ্দেশ্য লইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বাঙ্গালার কুবের সম্প্রদায় তাহাকে আদর্শ করিয়া বাঙ্গালার প্রধান প্রধান স্থানে সেইরূপ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় প্রকৃত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগঠন করিতে চেষ্টা করুন না। বাঙ্গালার অর্থশালীগণ উদ্যোগী হউন এবং গবর্ণমেণ্টকে সাহায্যকারী করিতে চেষ্টা করুন, ইহাতে সুচিকিৎসকের সংখ্যাও বাড়িবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আয়ুর্ব্বেদও আবার মাথা তুলিতে পারিবে। সহযোগী আমাদের এ প্রস্তাব সম্বন্ধে কি বলেন?

শ্রমশিল্প-বিদ্যালয়।—কাশীমবাজারের মহারাজা বাহাদুরের ব্যয়ে বাঙ্গালায় একটী শ্রম শিল্প বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কলিকাতায় এ বিষয়ের একটী কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্যও কলিকাতা-করপোরেসনে আলোচনা চলিতেছে। আলোচ্য বিষয় কার্য্যে পরিণত হইলে অনেক বাঙ্গালী—স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জনের ব্যবস্থা তো করিতে পারিবেই, তা' ছাড়া ইহার ফলে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যোন্নতি হইবে বলিয়াও আমাদের মনে হয়।

ইনফ্লুয়েঞ্জায় মৃত্যু।—সার্ শঙ্কর নেয়ার বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন,—প্রায় ৫০ লক্ষ ভারতবাসী ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। সাধারণতঃ নিউমোনিয়া রোগে ভারতবাসী অধিক আক্রান্ত হয় বলিয়া ভারতবাসীর ইনফ্লুয়েঞ্জায় এত মৃত্যু হইবার কারণও তিনি ঐ প্রসঙ্গে ব্যবস্থাপক সভায় জানাইয়াছেন। ফলে এ সব আলোচনা যত হয়—ততই মঙ্গল। কিন্তু যাহাতে দেশবাসী ইহা হইতে রক্ষা পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা কি?

মাদক নিবারণ।—আমেরিকা নিজ দেশে মদ্যের আমদানি রহিত করিয়াছেন। বিলাতেও মদ্যপানসম্বন্ধে কঠোর বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ভারতবাসীর—বিশেষ বঙ্গবাসীর মাদকপ্রিয়তা কিন্তু ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। বাঙ্গালী এইজন্যই তো এত রোগজীর্ণ।

দীর্ঘজীবন লাভের উপায়।—'সঞ্জীবনী' লিখিয়াছেন—"১৮৩৮ হইতে ১৮৫৪ সাল পর্য্যন্ত মানুষের গড় আয়ু ৪০ বছর ধরা হইত। ১৯০৮ হইতে ১৯১৮ সালে ৫১ বৎসর ধরা হইতেছে।

সার নিউম্যান মানুষের এই অল্প আয়ুতে সন্তুষ্ট নহেন। তিনি বলেন ৫০।৬০ বছর বয়সেই মানুষ মরিবে কেন? মানুষ স্বভাবতঃই ১০০ বছর বা তাহারও বেশী কেন বাঁচিবে না?

বৈজ্ঞানিকেরা সকলে একমত হইয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, মানুষ যদি তাহার শরীর হইতে ক্ষয়কারী জিনিষ ও রোগের কারণ বাহির করিয়া ফেলিতে পারে, তাহা হইলে সে ১০০ বছর কেন—পূর্ণ দৈহিক ও মানসিক শক্তি লইয়া ৫ শত এমন কি ১০০০ বছর পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারে।

শিরা প্রশিরা ও গ্রন্থিগুলির মধ্যে চুণ জাতীয় জিনিষ জমিয়া মানুষকে বৃদ্ধ করিয়া দেয়। ক্রমে দেহ কর্ম্মের অনুপযুক্ত হয়। পরিণামে মৃত্যু ঘটে। এই ক্ষয়কারী জিনিষ দেহ হইতে বাহির করিয়া দিতে পারিলে বিজ্ঞানমতে দীর্ঘজীবন লাভে কোন বাধা থাকিবে না।

দধি, ঘোল এবং আপেলফলের মধ্যে এমন জিনিষ আছে, যাহাতে দেহের জমাট চুণ গলাইয়া বাহির করিয়া দিতে পারে। এইরূপ কথিত হয় যে, আদিম জনক জননী যে জীবনতরু ফল ভক্ষণ করিয়াছিলেন, ঐ বৃক্ষ আপেল গাছ। বৌদ্ধ ও হিন্দু সাধুরা এই ফল খাইয়াই দীর্ঘজীবী হন।"

এখনকার বাঙ্গালীরা এ সকল বোঝেনা বলিয়াই তো বাঙ্গালীর এত দুঃখ।

মাড়োয়ারী হাসপাতাল।—মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের চেষ্টা ও অর্থব্যয়ে কলিকাতা সহরে শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী মারওয়ারী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কথা আমরা পূর্ব্ব সংখ্যায় উল্লেখ করিয়াছি। হাসপাতালের জন্য ৪ লক্ষ ৪০ হাজার ২১৮৲ টাকা চাঁদা পাওয়া গিয়াছে শুনিলাম। এরূপ সদনুষ্ঠানের জন্য মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের দানস্পৃহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। ঐ হাসপাতালের কার্য্য পরিচালনার জন্য যে দুইজন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসককে লওয়া হইয়াছে, তাঁহারা উভয়েই সুচিকিৎসক। হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক নিযুক্ত হইয়াছেন—লাহোর মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরমোহন মজুমদার কাব্যতীর্থ ও ২য় চিকিৎসক হইয়াছেন স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন মহাশয়ের সুযোগ্য ছাত্র শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সেন গুপ্ত। আমরা এই হাসপাতালের ক্রমোন্নতি দেখিলে সুখী হইব।

মাদকতা নিবারণী বক্তৃতা।—গত ২৬শে ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহের সূর্য্যকান্ত টাউনহলে স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মাদক দ্রব্য ব্যবহারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালার স্থানে স্থানে এরূপ বক্তৃতায় দেশের উপকারের সম্ভাবনা।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৩য় বর্ষ। } বঙ্গাব্দ ১৩২৬—বৈশাখ। { ৮ম সংখ্যা।

নববর্ষ।

—:০:—

আবার গাহিব গান, আবার তুলিব তান,—
তব শুভ আগমনে ওগো নববর্ষ,
আবার আমার মুখে ফুটিয়াছে হর্ষ।

হৃদয়ে নাহিক বল, চক্ষু দু'টি ছল ছল,
রোগে জীর্ণ তনু খানি—বদন মলিন,
তবু প্রদানিছ সুখ, বরষ নবীন!

অতীত চলিয়া গেছে, কিন্তু বড় ব্যথা দেছে,
—কোটী কোটী বিশ্ববাসী করিয়াছে গ্রাস,—
স্মরণে এখনো যেন উঠিতেছে ত্রাস।

তোমারে পাইয়া তাই, সব যেন ভুলে যাই,
—তাই আজি ভাবিতেছি তব আগমনে—
শান্তি বুঝি উঠিবে গো এ বিশ্ব-ভবনে।

অন্তরের দাগা গুলি বল গো কেমনে ভুলি?
তুমিই বা কি করিবে—কে বলিতে পারে?
তবু আশা—তুমি বুঝি রাখিবে ধরারে।

নিবেদন আজি তাই, শান্তি টুকু যা'তে পাই—
হে নূতন, কর তুমি তা'রি আয়োজন,
বিশ্বের ফুটায়ে দাও নূতন নয়ন।

ধরমে করিয়া ভর বিশ্ববাসী নিরন্তর
কর্ম্মগতপ্রাণ হোক—এই অভিলাষ,
হে নূতন, তুমি কি গো পূরাইবে আশ?

হিন্দুর হিন্দুত্ব রাখি' পাপের মূরতি আঁকি'—
যদি তুমি দেখাইতে পারগো আবার,
নির্ব্ব্যাধি—দীর্ঘায়ু লাভ হইবে সবার।

পাপে তাপ—তাপে রোগ, আধিব্যাধি তা'রি ভোগ
—এই কথা বিশ্ববাসী বুঝিবে যখন
চির শান্তি বিশ্বমাঝে বহিবে তখন।

শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন।

বালক রক্ষা।

——:০:——

সকল লোকই সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তির জন্য ইচ্ছা করিয়া থাকে। দুঃখ কেহ চায় না, সকলেই সুখ চায়, সকলেই আনন্দে থাকিতে চায়। তবে দুঃখ আসে কেন? দুঃখের কারণ পাপ, আর সুখের কারণ পুণ্য। পাপকে দুঃখের কারণ জানিয়াও লোকে পাপ হইতে বিরত হয় না। জগতের সকল উন্নতির মূলে লোকের দুঃখ-নিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তির ইচ্ছা নিহিত আছে। এই উন্নতি বাস্তবিক সাংসারিক উন্নতি নয়। সাধারণতঃ লোকে সাংসারিক উন্নতিকেই উন্নতি বলে, কিন্তু তাহা অসার ও ক্ষণবিধ্বংসী। মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া আমাদের সুরত্ব লাভ করিতে হইবে। সুর হইতে পারিলে তবে আমরা সেই বিষ্ণুর পরমপদ দর্শন করিতে পাইব। সেই বিষ্ণুর পরমপদ দর্শনে পরমানন্দ প্রাপ্তি হইবে এবং সদা সেই দর্শন ও আনন্দ হইতে মোক্ষানন্দ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। সেই পরমপদ বা পরমধামকে প্রাপ্ত হইলে আর জন্মমরণ প্রবাহোৎক্ষিপ্ত সংসার-সাগরে ভাসিয়া অসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। যেমন মনুষ্য-দেহ সর্ব্ব দুঃখের মূল, তেমনি আবার এই দেহ

দ্বারা আমরা মুক্তি ও পরমানন্দ লাভ করিতে সমর্থ হই। সেই জন্য এই দেইটা সুস্থ ও সবল রাখিতে হইবে। শরীর নারোগ ও সবল না হইলে সেই আত্মাকে জানিবার উপায় নাই। শ্রুতি বলেন "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। এই বল—শারীরবল ও মানসবল—উভয়বিধ। শরীরে বল না থাকিলে আমরা সংসারে কত প্রকারে লাঞ্ছিত হই তাহা সকলে জানেন, সেইজন্য সে সব কথার এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।—এই সংসারের জাবন সংগ্রামে যেমন শরীরের বলের আবশ্যক, তেমনি মানসিক বলের আবশ্যক। আবার এই দুইপ্রকার বল পরস্পর পরস্পরের সাপেক্ষ। শরীরে বল থাকিলে মনে বল হয়; মনের বল হইলে শরীরে বল হয়। প্রথম কার্য্য আমাদের শরীরকে নীরোগ রাখা তাহার পর শারীরিক ও মানসিক বল সংগ্রহ করা। আজকাল আমাদের ভারতবাসীর যে অবনতি হইয়াছে ও আরও তীব্র গতিতে যে অবনতি হইতেছে, তাহাতে ভারতের ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকারময়। অনেক মহাপুরুষ, সাধু ও স্বার্থত্যাগী ব্যক্তি আমাদের উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কিছুই হইতেছে না। সমাজের সেই যথেচ্ছাচারিতা, সেই বিলাস-ব্যসন, সেই ঈশ্বরপরাঙ্মুখতা, সেই ধর্ম্মকে ছাড়িয়া অধর্ম্মকে অবলম্বন, সেই দয়াধর্ম্ম ত্যাগ,—আর কত বলিব?—মানুষের দেবত্ব লাভের চেষ্টা ত নাই-ই, তাহার উপর যেটুকু মনুষ্যত্ব লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি—সেটুকুও হারাইতে বসিয়াছি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলধারা নানাস্থান হইতে আসিয়া মিলিত হইয়া বা বৃহৎ নদীতে মিলিত হইয়া তাহার জলের স্রোতঃ বৃদ্ধি পূর্ব্বক যখন প্রবল বেগ ধারণ করে, তখন সে বেগের গতি ফিরান অসম্ভব। আমাদের সমাজের অবস্থা তাহাই ঘটিয়াছে। অধঃপতনের মূলকারণসকল সমাজের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে ও যেরূপ অলর্কবিষ বর্ত্তমান আছে কিনা বুঝা যায় না—কিন্তু যখন প্রসর্পিত হইয়া প্রকাশ পায়, তখন আর সে বিষ হইতে আত্মরক্ষার উপায় থাকে না। আমাদেরও তাহাই ঘটায় সাধু মহাত্মাদের সকল উদ্যম ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। এখন এই প্রবল স্রোতের প্রতিচেষ্টা বিফল দেখিয়া নিরস্ত হইলে আরও সর্ব্বনাশ। আর সময় নষ্ট করিলে আরও ভীষণ বিপদ। সেইজন্য সকলেই জাগরিত হউন। সকলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলধারার দিকে দৃষ্টি করিয়া তাহার পবিত্রতা রক্ষণে যত্নবান হউন। আমাদের বালকেরা যাহাতে এখনও আত্মরক্ষার উপায় করিতে পারে—আমাদিগকে সে চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা বালকদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য যেরূপ চেষ্টা করিয়া থাকি, তাহাদের রক্ষা সম্বন্ধে সেরূপ কিছুই করিতেছি না। আমাদের বালকেরা যে প্রকার অবনতির মুখে চলিতেছে, তাহাতে কিন্তু আর রক্ষা না করিলে কোনো উপায় নাই। এসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন মহাশয় বিশেষ চেষ্টিত ও আয়ুর্ব্বেদে এসম্বন্ধে বিশেষ তীব্রভাবে সমালোচনা করিয়া—আমাদের সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু সকল চেষ্টা বিফল হইতেছে বলিয়া মনে হয়। আমাদের প্রগাঢ় নিদ্রা ভাঙ্গাইতে কেহই সক্ষম হইতেছেন না। এখন এই নিদ্রা ভাঙ্গার উপায় কবিরঞ্জন মহাশয় একটা কিছু স্থির করিয়া সে বিষয়ে লিখুন। সমাজের এই প্রকার উপেক্ষা ভাব দেখিয়া কিছু লিখিতে গেলে হতাশের ঘোরান্ধকার দৃষ্টি

শক্তিলোপ করে, কলম ধরিতে গেলে হাতে বল আসে না, কিন্তু কবিরঞ্জন মহাশয়ও ছাড়িবার লোক নন। আয়ুর্ব্বেদে লিখিবার জন্য তাঁহার বড়ই ইচ্ছা। সেই জন্য আবার নিরাশার কিছু স্থির করিয়া তাঁহার অতিপ্রিয় বিষয় বালক রক্ষা সম্বন্ধে এই প্রবন্ধ লেখা হইল। বালকদের রক্ষা করিলে তবে আমাদের বংশরক্ষা হইবে, আর্য্যজাতি ভারতবর্ষে থাকিবে, আর্য্যধর্ম্ম ও ব্রহ্মবিদ্যা ভারত হইতে লোপ পাইবে না। নতুবা কি যে হইবে তাহা ভাবিয়া আর কূলকিনারা পাওয়া যায় না। যাঁহাদিগকে, বালকদের রক্ষা করিতে অনুরোধ করা যাইবে, তাঁহারাই এইরূপভাবে শিক্ষিত যে, তাঁহারা তাঁহাদের শিক্ষা বা উদাহরণ দ্বারা যে কিছু করিতে পারিবেন, তাহার আশা আদৌ করা যায় না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—মনুষ্যমাত্রের চেষ্টা সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ লাভ। এই লাভ কেবল নিজের হইলেই হইল না। পরিবারের সকলেই যাহাতে এই লাভে লাভবান্ হন—তাহার চেষ্টা করা সমানভাবে কর্ত্তব্য। কারণ হয়ত আমি নিজেকে কোন প্রকারে সুখী করিলাম, নিজে সুস্থ ও রোগহীন হইলাম কিন্তু যদি আমার পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, ভগ্নী প্রভৃতি কেহ দুঃখ পায় বা রোগগ্রস্ত হয়, তবে আমার শান্তি কোথায়? তাঁহাদের রোগ-কষ্ট প্রভৃতি আমাকেও কাতর করিয়া ফেলিবে। আমরা সংসারে বড়ই স্বার্থপর। নিস্বার্থভাবে চলেন—এমন লোক খুবই বিরল।

"আত্মানং সততং রক্ষেৎ" আমরা তাহাও করি না। সামান্য সুখের লালসায় আমরা আত্মাকে চিনিতে, জানিতে চেষ্টা না করিয়া যথার্থরূপে আত্মহন্তা হই। আমাদের যথার্থ মঙ্গল কিসে হয়—তাহা আমরা একবারও ভাবি না। মানিয়া লইলাম যে, আমরা নিজের উন্নতি যাহাকে বলে—তাহার চেষ্টা করি, নিজ সুখের ইচ্ছা করি। কিন্তু কেবল তাহা করিলেইত হইল না। পশু পক্ষীরও জ্ঞান আছে, তাহারাও মানুষের মত সন্তানাদি পালন করে। কিন্তু এবিষয়ে তাহারা মনুষ্য অপেক্ষা উচ্চতর। কেন না, তাহারা লোভ বা প্রত্যুপকারের আশায় সন্তান পালন করে না, মানুষ তাই করে। এ বিষয়ে পশুপক্ষী অপেক্ষা মনুষ্যকে নিম্নস্তরে দেখিয়া মেধস্ মুনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন,—

"জ্ঞানিনো মনুজা সত্যং কিন্তু তে নহি কেবলম্।
যতো হি জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে পশুপক্ষি মৃগাদয়ঃ॥
জ্ঞানঞ্চ তন্মনুষ্যানাং যৎ তেষাং মৃগপক্ষিণাম্।
মনুষ্যানাঞ্চ যৎ তেষাং তুল্যমন্যৎ তথোভয়োঃ॥
জ্ঞানেঽপি সতিপশ্যৈতাম্ পতগঞ্ছাবচঞ্চুষু।
কণ মোক্ষাদৃতাম্ মোহাৎ পীড্যমানানপি ক্ষুধা॥
মানুষা মনুজব্যাঘ্র সাভিলাষাঃ সুতান্ প্রতি।
লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নন্বেতে কিং ন পশ্যসি॥

তোমরা আপনাকে যে ভাবে জ্ঞানী বলিয়া মনে করিতেছ, সেইভাবে জ্ঞানী অর্থাৎ বিষয়-রাজ্যের জ্ঞানসম্পন্ন মনুষ্যমাত্রই হইয়া থাকে। একথা সত্য—কেবল মনুষ্য কেন—পশু, পক্ষী, মৃগ, প্রভৃতিরাও বিষয়ের উপলব্ধি করিয়া থাকে, সুতরাং তাহাদিগকেও জ্ঞানী বলা যায়। এই-রূপে মনুষ্যের যেরূপ জ্ঞান আছে, পশু পক্ষী-দেরও সেই জ্ঞান আছে, আবার পশুপক্ষীদের যে জ্ঞান আছে, মনুষ্যদেরও সেই জ্ঞান আছে অর্থাৎ আহার বিহারাদি বাহ্য বিষয়ে মানুষ ও পশুপক্ষী সকলেই একপ্রকার জ্ঞানবিশিষ্ট। তথাপি ঐ দেখ—জ্ঞানসত্ত্বেও পক্ষীরা নিজে ক্ষুধায় পীড়িত হইয়াও মোহবশতঃ [illegible]

কারে তণ্ডুলাদির কণা সমস্ত শাবকদিগের চঞ্চুতে প্রদান করিতেছে। হে মনুজব্যাঘ্র! তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না—মনুষ্যগণ চরমকালে প্রত্যুপকারলুব্ধ হইয়া পুত্রাদির প্রতি স্নেহযুক্ত হইয়া থাকে।"

যে কারণেই হউক, ফল কথা, আমরা আত্মৈষণা ও পুত্রৈষণা দ্বারা সংসারসুখ অন্বেষণ করি। আত্মাকে ভাল বাসি বলিয়া আত্মার সুখ পুত্রাদি দ্বারা হইবে ইহাই ভাবি, কিন্তু আমরা আজকাল সংসারে যেরূপ আচরণ করিতেছি—তাহাতে আমরা আত্মাকেও যথার্থ ভালবাসিনা, পুত্রাদিকেও যথার্থ ভাল বাসিনা, বিষয়-সুখের লালসায় উদ্ভ্রান্ত হইয়া কেবল গরলভক্ষণ করিয়া আত্মহা হইতেছি ও সেই সঙ্গে সঙ্গে পুত্রহাও হইতেছি—এবিষয় ওরিয়েণ্টাল্ সেমিনারিতে পারিতোষিক বিতরণ কালে হাই-কোর্টের মহামান্য জজ্ ঋষিতুল্য সার জন উড্রফ্ যাহা বলিয়াছেন,—যাহা ৬ই মার্চ্চ তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সকলেরই পাঠ্য। তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, যে পিতা পুত্রকে যথার্থ উন্নতি বিষয়ক শিক্ষা দিবেন, তিনিই আধুনিক শিক্ষায় বিকৃতমনা, সে অবস্থায় তিনি পুত্রের শিক্ষা কি প্রকারে প্রদান করিবেন? এ সম্বন্ধে তিনি আরও বলিয়াছেন যে, মুসলমানেরা এ বিষয়ে অনেক ভাল, কারণ তাঁহারা তাঁহাদের সন্তানদিগকে বাল্যকালে তাঁহাদের ভাষা, নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা দেন, অন্য ভারতবাসীরা সেইরূপ দেননা। বিশেষ বাঙ্গালীদের এবিষয়ে উদাসীনতাটা খুবই বেশী। আমি এবিষয়ে পূর্ব্বেই বলিয়াছি গরীবেরা অন্নচিন্তায় ব্যাকুল, মধ্যবিত্তেরা আপিসের চাকরী—ব্যবসায় প্রভৃতিতে বিপন্ন, আর বড়লোকেরা কি করিয়া ধনের অপব্যয় করিয়া বিলাসে-ব্যসনে সময় কাটাইবে—তাহারই চিন্তায় বিশেষরূপে নিমগ্ন। এ অবস্থায় আমাদের দেশে বালকদের শিক্ষা দিবার লোকের সময় কই? আমাদের রোগপ্রবণতার যে আমরাই একমাত্র কারণ, তাহা কি ইহাদ্বারা উপলব্ধি হয় না? সম্প্রতি গিড়িডিতে মদীয় বাটীতে এক মহাপুরুষ পদধূলি দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। আমি যে কয়টী প্রবন্ধ আয়ুর্ব্বেদে লিখিয়াছি, তাহা তিনি পাঠ করিয়া বলিলেন,—যদি কেহ ইহার একটী প্রবন্ধও পাঠ করিয়া তদনুযায়ী চেষ্টাশীল হয়, তবে দেশের বহু উন্নতি হয়, কেহ শোনেনা আর লিখিয়া কি করিবেন! আমি তাই হতাশ হইয়া চুপ করিয়াছিলাম, কিন্তু শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন মহাশয় বৈশাখের সংখ্যায় একটী জ্ঞানগভীর গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার স্বদেশপ্রীতি ও বালকরক্ষার পুনঃ পুনঃ উদ্যমে উৎসাহান্বিত হইয়া আবার এই হতাশ মনে কিছু লিখিলাম, কিন্তু এবারকার প্রবন্ধ সেরূপ মনের জোরের সহিত লিখিত পারিলাম না; তাই মনে হইতেছে যে, এবার আয়ুর্ব্বেদের পাঠকগণ আমার প্রবন্ধ পড়ায় সময় নষ্ট করা মনে করিবেন। কি করি—সেই হৃদ্বিহারী পরমাত্মা যাহাতে নিযুক্ত করিলেন, তাঁহাকে ধ্যান করিয়া তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম। আসুন ভারতবাসী ভাইবন্ধুগণ, আমরা নববর্ষের নবীন উৎসাহে আমাদের অধঃপতিত নষ্টপ্রায় বংশরক্ষা করিতে চেষ্টিত হই,—বালকদের রক্ষাবিধান করি ও যাহাতে ব্রীর্য্যধারণ অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যপালন দ্বারা আমাদের বালকেরা দুর্ব্বল অবস্থা মুক্ত হইয়া দেহে বল

পায়, মনে শান্তি পায়, সর্ব্বদা পবিত্র চিত্ত হইয়া সুস্থ থাকে—তাহারই উপায় অন্বেষণে বিশেষ ভাবে চেষ্টিত হই। আমি প্রথমেই বলিয়াছি—সকলেই সুখ অন্বেষণে ব্যস্ত, এক্ষণ দেখা যাউক কিসে এই সুখ উপস্থিত হইতে পারে? ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণে সুখ নাই। সুখের লালসা ঐ পথেই চালায় বটে কিন্তু তাহা দুঃখের মূল। "সংসারের সুখ যত, নিশার স্বপন মত, যতক্ষণ উপভোগ, ততক্ষণ থাকে সুখ, দিনান্তে আঁধার মত পরিণামে ঘটে দুঃখ।"—কবির সহিত এবিষয়ে আমি একমত হইতে পারিলাম না। কারণ তিনি "যতক্ষণ উপভোগ, ততক্ষণ থাকে সুখ"—এই কথা বলিয়াছেন। কিন্তু এইটা সুখ নয়। চেতনাকে অভিভূত করিবার ঔষধ-ঘ্রাণ দ্বারা রোগীকে অজ্ঞান করিয়া অস্ত্রোপচার করিলে সে কষ্টবোধ করিতে পারে না, কিছু আরাম প্রথম অবস্থায় বোধ করে, আমাদের সংসারের সুখ সেই প্রকার, দুঃখকে বিস্মৃতি করাইয়া দুঃখ মিশ্রিত সুখকে অর্থাৎ দুঃখকে সংসার হইতে ভুলাইবার মোহময়ী মদিরা পানের উন্মত্ততাকে সাংসারিক সুখ বলা যায়। দেহ হইতে আত্মাকে বিভিন্ন করিয়া, সেই আত্মদর্শনে আত্মার স্বরূপ অবস্থানে যে আনন্দ—তাহাই যথার্থ সুখ। এখন সেই সুখ লাভের জন্য জ্ঞান ও ভক্তিদ্বারা আত্মদর্শন' আবশ্যক। সেই পরমাত্মাই সুখসাগর ও তিনিই"সত্যং জ্ঞানমনন্তম্।" সেই সত্যস্বরূপকে লাভ করা ও বারম্বার জন্ম মৃত্যু প্রবাহ হইতে রক্ষা পাওয়াই মোক্ষানন্দ বা মুক্তি ও ইহাই লাভ করা মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য। শ্রীভগবানেরও ইহারই জন্য আমাদের নরদেহ প্রদান, বিশেষ যাঁহারা ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা এ বিষয়ে শ্রীভগবানের বিশেষ প্রিয় হইয়া, তাঁহার শক্তির অধিকতর অধিকার লাভ পূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ফল কথা, সেই দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়া যদি তাহার সদব্যবহার না করিলাম, তবে আমরা নিজেরা আত্মঘাতী হইলাম ও সেই বিশ্বস্বামীর নিকট অকৃতজ্ঞ হইয়া ঘোর নরকে স্থান পাইবার সরণী পরিষ্কার করিলাম। আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিলাম না—সে সুখ বা আনন্দ সেই ব্রহ্মে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদানন্দং ব্রহ্ম কেবলম্।"

সংসারে আমাদের আত্মা পুরুষরূপে প্রকৃতিতে অবস্থান করিয়া, অন্তঃকরণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, যেমন রক্তপুষ্প সমীপে স্ফটিক রক্তবর্ণ দেখায়,—বাস্তবিক তাহার রঞ্জনা নাই-সেইরূপ আত্মা আপনাকে সুখী বা দুঃখী মনে করেন। বাস্তবিক তাঁহার সুখ বা দুঃখ নাই। আমরা কি প্রকারে সেই সুখ-দুঃখের অতীত হইয়া যথার্থ সুখলাভে সমর্থ হই—তাহাই আমাদের চেষ্টা করা উচিত ও আমাদের সন্তানেরাও যাহাতে সেই সুখ পায়—তাহাতে আমাদের যত্নবান হওয়া উচিত। এই প্রকৃতি হইতে তিনটী গুণ উৎপন্ন হইয়াছে, সত্ত্ব, রজ ও তমঃ। এই তমোগুণ আমাদিগকে নীচমার্গে লইয়া যায়। রজগুণ মধ্যাবস্থায় রাখে ও সত্ত্ব গুণ উন্নতি-পথে লইয়া যায়। নিদ্রা, আলস্য প্রমাদ প্রভৃতি তমোগুণ হইতে হয়। তৃষ্ণা, অনুরাগ—আজ ইহা পাইলাম—কাল আর একটি পাইব—এইরূপ উত্তরোত্তর বৰ্দ্ধমান ও বিষয়-বাসনা রজগুণের কার্য্য। সত্ত্বগুণের দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হয় এবং উহা সুখের কারণ হইয়া সমস্ত দুঃখের নিহন্তা মোক্ষকে লাভ করাইয়া দেয়। এই বিষয়ে "জ্ঞান যথার্থ সুখেরই প্রাপ্তির হেতু [illegible] [illegible]।

ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা, আরোগ্য, অনালস্যাদি সাত্ত্বিক ভাব। সেইজন্য প্রথমেই এই সত্ত্বগুণকে পাইতে হইলে যাহাতে আমাদের আহার ও আমাদের বালকের আহার সত্ত্বগুণাকর্ষী হয়—তাহাই করা উচিত। আহার শুদ্ধি দ্বারা সংসারে সবই লাভ হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন,—

আহার শুদ্ধৌ তু সত্ত্বশুদ্ধিঃ স্বত্বশুদ্ধৌ
ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলভ্যে সর্ব্বগ্রন্থীনাং
বিপ্র মোক্ষা—ইত্যাদি—

আহার শুদ্ধি অর্থাৎ শুদ্ধদ্রব্য পান-ভোজনাদি দ্বারা চিত্ত প্রসন্ন অর্থাৎ নির্ম্মল হইয়া সেই শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ আত্মাকে জানিবার উপযুক্ত হয়। এই চিত্তশুদ্ধির দ্বারা স্মৃতিলাভ হয়। স্মৃতিলাভ হইলে আমি কে?—কোথা হইতে আসিয়াছি? —কোথায় যাইব?—ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান হইয়া আমি যে সেই অখণ্ড ব্রহ্মের অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও মায়োপাধিক যুক্ত হইয়া ঘটাকাশের ন্যায় মহাকাশের অনন্তস্বরূপ জীবাত্মা রূপে বিরাজ করিতেছি—এইটা স্মরণ হয়। আমরা সংসারে অতিশয় মিশিয়া গিয়া তমঃ ও রজগুণে বদ্ধ হইয়া আত্মাস্বরূপকে বিস্মৃত হইয়াছি। এই বিস্মৃতি অপনোদন করিয়া আত্মার স্বরূপকে স্মরণ করাইবার জন্য চিত্তশুদ্ধি আবশ্যক, মহামনা অর্জ্জুন কত সংশয়ে পড়িয়া কত কার্য্যকে অকার্য্য ও অকার্য্যকে কার্য্য মনে করিয়া নিজ ক্ষত্রিয়োচিত ধর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক পরধর্ম্ম সুখাবহ বলিয়া গ্রহণ করিতে গিয়াছিলেন। শ্রীভগবান যখন তাঁহাকে কত বুঝাইলেন, তখন তাহাতেও অর্জ্জুন বুঝিতে পারিতেছিলেন না। তাহার পর ভগবান যখন পরমাত্মার স্বরূপ নিজ বিশ্বরূপ দর্শন করাইলেন, তখন অর্জ্জুন সেই বিরাটরূপ দর্শন করিতে সক্ষম না হইয়া বলিলেন—"তে নৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে।" তাহার পর শ্রীভগবান্ ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু মহাত্মা আবার সৌম্যবপু হইয়া মানুষরূপে অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। আবার অর্জ্জুন অবহিত, চিত্তে ভক্তি সহকারে শুনিতে লাগিলেন। দশ অধ্যায় গীতা শোনাইয়া নিজের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াও শ্রীভগবান যখন অর্জ্জুনের ন্যায় জিতেন্দ্রিয় ও ভক্তহৃদয়ে নিজের স্বরূপ ধারণা করাইতে পারিলেন না, তখন বিশ্বরূপ দেখাইয়া, অর্জ্জুনকে সম্পূর্ণভাবে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়া, তাঁহার চিত্তশুদ্ধির ব্যবস্থায় আবার তদ্গতচিত্ত অর্জ্জুনকে আরও ছয় অধ্যায় গীতা শ্রবণ করাইলেন। অর্জ্জুন শুদ্ধচিত্ত ছিলেন, জিতেন্দ্রিয় ছিলেন, ভক্ত ছিলেন, এইজন্য শ্রীভগবানের উপদেশে জ্ঞান লাভ করিয়া আত্মার স্বরূপ অবগত হইয়া আপনাকে স্মরণ করিয়া শ্রীভগবান্‌কে বলিবেন

নষ্টোমোহঃস্মৃতির্লব্ধাত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত ;
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥

এইখানে আত্মতত্ত্ব উদয় হওয়ায় অর্জ্জুনের স্মৃতি লাভ হইল। শ্রীভগবান্ ইতিপূর্ব্বে অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন যে, আমার ও তোমার বহুজন্ম গত হইয়াছে, অর্থাৎ আমি অজ হইয়াও নিজ মায়ায় ধর্ম্মরক্ষার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, আমার সে সব মনে আছে- তোমার সে সব মনে নাই; কারণ জন্মজরাব্যাধি ও মৃত্যু—এই সকল ভুলাইয়া দেয়। কিন্তু যদি কেহ চিত্ত শুদ্ধি দ্বারা মোহমুক্ত হয়, তবে সে ভোলে না। আমি ভুলি নাই, তুমি ভুলিয়াছ। শ্রীভগবানের কৃপায় আজ অর্জ্জুনের সেই স্মৃতি লাভ হইল। সেই স্মৃতি লাভের পূর্ব্বেই মোহ নষ্ট হইয়াছিল, এখন তাঁহার হৃদয় গ্রন্থি সকল ছিন্ন হইয়া গেল,

সেইজন্য তিনি গতসন্দেহ হইলেন এবং শ্রীভগবানের আদেশ পালনে তৎপর হইলেন, অর্থাৎ জ্ঞানদ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার অনুকূল কার্য্য করিতে লাগিলেন। আমরা পূর্ব্বজন্মে কি ছিলাম তাহা জানি না, তাহা জানিলে বিষয়ে এত আসক্তি আসিতনা। আমাদের মন এত চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত হইতনা। এই স্মৃতি লাভের প্রধান উপায় শুদ্ধমন। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত—এই চারিটীতে মনের নানা অবস্থার সমষ্টি অন্তঃকরণ রূপে বর্ত্তমান। এই শুদ্ধি লাভ করিতে হইলে প্রথম আহারশুদ্ধি আবশ্যক। অতএব দেখুন—যাঁহারা বলেন, আহারের মধ্যে ধর্ম্মের সংস্রব কি? তাঁহাদের সেটা ভ্রান্তি পূর্ণ কথা নহে কি? ধর্ম্ম আর কিছুই নয়—যাহা দ্বারা আমরা ধৃত হই অর্থাৎ যে সৎকর্ম্মের দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া বারংবার জনম মরণ স্বরূপ সংসারে পুনঃ পুনঃ পতিত না হই—তাহাই ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম দেহের ও মনের;—দুইএরই পবিত্রতার আধার। আমাদের আর শুদ্ধ হইবার সময় নাই—এ আপত্তি করিয়া চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না। যেমন করিয়া হউক চিত্তশুদ্ধি আনয়নের চেষ্টা করিতে হইবে। আমার গিড়িডি বাটীতে এক সাধু পুরুষ আমাকে আসন শিক্ষা দিবার সময় আমার কষ্ট দেখিয়া বলেন "বুড়ো হাড়ে আর কি হইবে"?—তখন মনে বড় দুঃখ হইল যে জন্মটা বৃথা গেল। তাই আমার বড় ছেলেকে তাহা শিখাইবার জন্য প্রবৃত্ত করাইলাম, তাহার খুব শীঘ্র শীঘ্র সমস্ত সাধনা সম্পন্ন হইতে লাগিল, আমি পারিলামনা। তাই সকলকে বলিতেছি, আমাদের যাহা হইবার হইয়াছে—এখন আমাদের ছেলেদের বাল্যকাল হইতে তৈয়ার করিতে চেষ্টা করুন। তাহারা তৈয়ার হইলে আমাদের অনেক ভরসা আছে। তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হউক যে, ধর্ম্মের প্রথম সোপান সংযম শিক্ষা ও তন্মধ্যে প্রধান শুদ্ধ আহার। শুদ্ধ আহার বলিতে যে আমরা যাহা খাই বা পান করি তাহা নয়। ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা ভিতরে যাহা গ্রহণ করি তাহাই আহার। এই আহার যাহাতে শুদ্ধ হয়, বালকদিগকে তাহাই শিক্ষা দিতে হইবে। চক্ষুদ্বারা এমন রূপ গ্রহণ করিতে বালককে শিক্ষা দিতে হইবে—যাহাতে তাহার মনে কোন প্রকার কুভাব না আসে। সেই রূপ গ্রহণে শুদ্ধ পবিত্রতা ছাড়া যেন আর বালকের মনে অন্য কিছু না আসে। কর্ণ এমন প্রেমমাখা হরিনাম শ্রবণ করিবে—যেন হৃদয় ভক্তি ও প্রেমে গদ্‌গদ্‌ হইয়া আনন্দের ফোয়ারা ছুটাইতে থাকে। কর্ণ যেন কোন প্রকার কুভাব উত্তেজক শব্দ, সঙ্গীত বা স্ত্রীলোকের সঙ্গীত শ্রবণ না করে। চক্ষু তাহাদের নর্ত্তন দর্শন না করে। এই চক্ষু-কর্ণ দ্বারা কলিকাতা বা অন্য সহরে থিয়েটারাদি দর্শন করিয়া স্ত্রীলোকের হাবভাব পূর্ণ সঙ্গীত শ্রবণ বা তাহাদের নর্ত্তন দর্শন দ্বারা কত পবিত্র হৃদয় সুকুমারমতি বালকগণ নরকের ঘোরান্ধকারে পতিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা করা যায়না। স্পর্শ কেবল বিল্বপত্র তুলসীদল, বানলিঙ্গ, শালগ্রাম শিলা, সা[illegible] মহাত্মার শ্রীচরণ, পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনে[illegible] শ্রীচরণ স্পর্শ ও অন্যান্য পবিত্র বস্তু স্পর্শ ছা[illegible] অন্য কিছু স্পর্শ না করে। নাসিকা যেন পবি[illegible] বস্তু ঘ্রাণ ছাড়া অন্য ঘ্রাণ না লয়। জিহ[illegible] যেন পবিত্র বস্তু ছাড়া অন্য বস্তুর রস গ্র[illegible] না করে। সর্ব্বোপরি জিহ্বা যেন [illegible] শ্রীভগবানের পবিত্র নামোচ্চারণ [illegible]

সে সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকে এবং পৌলস্ত্যের ন্যায় বলেন :—

হে জিহ্বে রস-সারজ্ঞে সর্ব্বদা মধুর প্রিয়ে।
নারায়ণাখ্যাং পীযূষ্ পিব জিহ্বে নিরন্তরম্॥

হে জিহ্বে! তুমি নানারস মধ্যে যাহা সার রস তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা কর এবং সর্ব্বদা মধুর রস ভালবাস কিন্তু এরসে আনন্দ নাই। সেই আনন্দের আধার শ্রীনারায়ণের নামামৃত সর্ব্বদা পান কর। বালককে বাল্য-কাল হইতে জিহ্বার সংযম শিক্ষা দিতে হইবে। বালক যেন অসার সুখের লালসায় সর্ব্বদা—কুখাদ্য দ্বারা রসনার তৃপ্তি সাধন না করে। আহার শরীর ও মনের ধর্ম্মরক্ষার জন্য—দেহ রক্ষার জন্য;—জিহ্বার তৃপ্তির জন্য নয়। আহারের সঙ্গে ধর্ম্মের খুব সম্বন্ধ, একথা সকল-কেই বিলক্ষণ মনে রাখিতে হইবে। ধর্ম্ম বলিতে সাধারণতঃ এই বুঝায়,—

ক্ষমাশৌচং দমঃ সত্যং দানমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
অহিংসা গুরু শুশ্রূষা তথানুশরণং দয়া॥
আর্জ্জবং লোভ শূন্যত্বং দেব ব্রাহ্মণ পূজনম্
অনভ্যসূয়াচ তথা ধর্ম্ম সামান্য উচ্যতে॥

বাল্যকাল হইতে বালককে ইহা অভ্যাস না করাইলে বয়স হইলে উহার কেবল পুঁথিগত বিদ্যা হইয়া থাকিবে। বালককে ক্ষমা শিক্ষা দিতে হইবে, বাহ্য এবং অন্তর শৌচ শিক্ষা দিতে হইবে, সত্যকে অবলম্বন করা আবশ্যক ইহার শিক্ষা বিশেষ করিয়া দিতে হইবে। সর্ব্বদা সত্যবাক্য বলিতে অভ্যাস করাইতে হইবে। বাক্ সংযত করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। অনর্থক বাক্য বলিলে তাহার জন্য শাস্ত্রে বিষ্ণু স্মরণের ব্যবস্থা আছে—বালককে ইহা অভ্যাস করাইলে মধ্যে মধ্যে বিষ্ণু স্মরণ দ্বারা বাক্য সংযত হইবে ও সত্য বাক্য ভিন্ন অন্য বাক্য বলিতে তাহার মতি হইবেনা। বাক্যই ব্রহ্ম, সেই জন্য বাক্যরূপী ব্রহ্মকে কখনও মিথ্যা বিষয়ে লিপ্ত করা হইবে না শাস্ত্রে আছে "বাচং পবিত্রং পরমম্, বাচোঽমৃতং বিষং বাচঃ"। বাক্যই অমৃত বাক্যই বিষ, বাক্যই পরম পবিত্র। স্বয়ং ব্রহ্ম—শব্দব্রহ্মবেদ রূপে সৃষ্টির আদিতে প্রকাশ হন। সেইজন্য বাক্য প্রয়োগ বিষয়ে বালককে বিশেষ সংযত হইতে শিক্ষা দিতে হইবে। কল্পনা প্রসূত অসত্যঘটনাবলম্বিত নাটক-নভেল বালককে আদৌ পড়িতে বা শুনিতে দিবেন না। জীবন বেশী দিনের জন্য নয়—সর্ব্বদা মৃত্যুর সন্নিকট হইতেছে—এই ভাবিয়া ধর্ম্ম অবলম্বনে বাসনকে দূরে ফেলিতে বালককে শিক্ষা দিতে হইবে। মহা-মান্য হাইকোর্টের জজ স্যার জন উড্রফ সাহেব ওরিএন্টালসেমিনারিতে যাহা বলিয়াছেন, সেইমত আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষের মহিমা ও গৌরব বালককে দেখাইয়া দিতে হইবে ও ঋষিগণের প্রদর্শিত পথে বালকগণকে চালিত করিতে হইবে। ঋষিরা এই কথা বলিয়াছেন বা কোন পণ্ডিত এই কথা বলিয়াছেন বলিলে কেহ তাহাতে অনাস্থা স্থাপন করিবেন না; সেই জন্য এই ঘোর কলিকালের বিকার নাশের জন্য শ্রীভগবান্ উড্রফ্ সাহেব, অলকট্ সাহেব, মাতা এনিবেসাণ্টকে ঋষি রূপে, গার্গী রূপে আমাদের নিকট তাঁহার বার্ত্তা প্রচার করিতে নিয়োগ করিয়াছেন। স্যার্ জন উড্রফ্ সাহেব বলিয়াছেন, "যদি ভারতের উন্নতি চাও তবে বালকদিগকে তোমাদের পূর্ব্ব-পুরুষের গৌরব সকল দেখাইয়া দাও। পাশ্চাত্য গুরুর নিকট মন্ত্র লইলে সভ্যতা শিক্ষা

হইবেনা”। যে সভ্যতা জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছিল এবং যাহা এখনও করিতেছে—সেই সভ্যতা বনবাসী ফলমূলাহারী সিদ্ধার্থ ঋষিগণ আমাদের হিতের জন্য শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতিতে নিবেধ করিয়া গিয়াছেন, আমরা আজ তাহা ভুলিয়া গিয়া অশেষ দুঃখ সাগরে ভাসিতেছি। এখন যাহাতে আমাদের বালকদিগকে আমাদের মত দুঃখ সাগরে না ভাসিতে হয়, তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। আহার ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে পর প্রবন্ধে বালক রক্ষা বিষয়ে লিখিত হইবে।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় (চট্টোপাধ্যায়) বি, এল,

পঞ্চকর্ম্ম।

(ডাক্তার-কবিরাজ সংবাদ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

—:০:—

ডা। আচ্ছা বয়সভেদে ঔষধ প্রয়োগ করবার মাত্রার তারতম্য কিরূপ ?

ক। আস্থাপন দ্রব্য পূর্ব্বে ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত যেমন নলাদির বিভাগ করা—সেই অনুসারে ক্রমশঃ রোগীর দুই চার এবং আট অঙ্গুলি পরিমাণ। তা'রপর রোগীর বয়স উত্তরোত্তর যত বেশী হবে, নল ও বস্তির পরিমাণ সেইরূপ বাড়া'তে হ'বে। পঁচিশ বৎসরের অধিক বয়স হ'লে নলাদির পরিণাম যেরূপ হবে—তা' বলা হ'য়েছে। ঔষধের পরিমাণ রোগীর অঞ্জলির বার অঞ্জলি হবে। কিন্তু সত্তর বৎসরের উর্দ্ধে নলের পরিমাণ এবং আস্থাপন দ্রব্যের পরিমাণ ষোড়শ বৎসর বয়স্কের ন্যায় হ'বে।

ডা। এই আবার আপনি সব গোলমাল ক'রে দিলেন! এই বললেন যে—বৃদ্ধকে বস্তি প্রয়োগ করা যখন নিষেধ, তখন বৃদ্ধের বলী পলিত নষ্ট হবে কিনা এ প্রশ্নই উঠতে পারে না। আবার কখন বৃদ্ধকে বস্তি দেবার কথা বলছেন!

ক। ধৈর্য্য ধারণ করুন। বাক্যার্থের কদন্বয় করবেন না—সমন্বয় করুন। তা'হ'লেই উপদেশ বোধগম্য হবে।

ক। এর সমন্বয় আমার মাথায় কিছু আসছে না।

ক। ভবদীয় মস্তিষ্কে কিঞ্চিৎ গোময়ের আধিক্য হ'য়েছে। ভাল, আমিই সমন্বয় ক'রে দিচ্ছি। প্রথম বলা হয়েছে যে, বৃদ্ধকে বস্তি দিতে নাই। তা'রপর বলা হ'য়েছে যে, বস্তি প্রয়োগ দ্বারা বলিপলিত নষ্ট হয়। সুতরাং এতদ্বারা বুঝা যায় যে, এ বলীপলিত বৃদ্ধের নয়—অকাল বলীপলিত। কেমন সঙ্গত কথা ত!

ডা। হাঁ সঙ্গত।

ক। এত গেল সাধারণ কথা, তা'রপর বিশেষ কথা বলা হ'য়েছে যে, আস্থাপক [illegible]

নিষিদ্ধ স্থলেও বস্তি প্রয়োগ ক'রতে হয়। বৃদ্ধ নিষিদ্ধ স্থল, সুতরাং আবশ্যক হ'লে বৃদ্ধকেও বস্তি দেওয়া যেতে পারে—এ কথা আসেত?

ডা। হাঁ আসে।

ক। এখন বৃদ্ধকে পূর্ব্বমাত্রায় বস্তি দিয়ে পাছে তা'র অনিষ্ট করা হয় এবং পাছে বৃদ্ধের উপযুক্ত নল এবং ঔষধের পরিমাণ সম্বন্ধে চিকিৎসকের ভ্রম হয় - সেই জন্য এরূপ নির্দ্দেশ করা হ'য়েছে। এখন সমন্বয় হলো কি?

ডা। হলো বটে, কিন্তু বড় হাঙ্গামা। আমাদের শাস্ত্রে সকল বিষয় খোলসা ক'রে এক যায়গায় লেখা থাকে। তা'তে বুঝাবার খুব সুবিধে হয়। আমার বিবেচনায় এটী আয়ুর্ব্বেদের একটী প্রধান দোষ।

ক। আপনার চক্ষে যা প্রধান দোষ ব'লে বোধ হ'চ্চে—আমার চক্ষে সেটী মহৎ-গুণ ব'লে বোধ হয়।

ডা। কি সে?

ক। নয় কি সে? দেখুন আপনারা যখন পরীক্ষা দেন, তখন কোথা থেকে একটু হাড় কি কোন যন্ত্রের একটু অতি সূক্ষ্ম অংশ এনে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। কেন বলুন দেখি—নর-কঙ্কালের ভিতর সেই হাতটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেই হয়।

ডাঃ। তা হ'লে আর তা'র পড়ানর পরিচয় কি হল? যথাস্থানে থাকলেত অনায়াসেই বোঝা যায়।

ক। এখন পথে আসুন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যে এই সকল একটু অস্পষ্ট ভাবে বলা আছে—সেটা বুদ্ধির উন্মেষ, এবং অজ্ঞানের পরিচয় সম্বন্ধে সাহায্য করে। বৃদ্ধকে বস্তি দিবে না—অথচ বলিপলিত নষ্ট করে—ইহার সমাধান করতে গেলে, শিক্ষার্থীকে একটু চিন্তা কর'তে হয়, আর চিন্তার ফলে তার বুদ্ধির উন্মেষ ঘটে। অধ্যাপক যদি দেখেন যে, ছাত্র এই সকল বিষয় সমন্বয় ক'রতে পারছে, তখন তা'কে চিকিৎসক হবার যোগ্য বলে বিবেচনা করেন। আর যদি দেখেন যে, এই সকল রহস্য ভেদ ক'রবার ক্ষমতা আদৌ নেই, তখন তাহাকে বলেন যে বৎস্য, চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা করা অপেক্ষা হলচালনা শিক্ষা করাই তোমার পক্ষে শ্রেয়স্কর।

ডা। না, বাক্যে আপনারা অদ্বিতীয় বটে!

ক। আপনাদের শাস্ত্রে তো বলে যে, শরীরের একদিকের হ্রাস বৃদ্ধির অন্যদিক দিয়ে পূরণ বা হ্রাস ঘটে। তা' আমরা কার্য্যে যত অপটু হই না কেন,—বাক্যে তো পটুতার বৃদ্ধি হচ্চে।

ডা। তা' এখন বাক্য থাক, কি ক'রে অনুবাসন প্রয়োগ ক'রতে হয় বলুন।

ক। প্রশস্ত এবং উপাধানহীন শয্যায় রোগীকে বাম পার্শ্বে (বাঁ কাতে) শয়ন করা'তে হয়। রোগী দক্ষিণ উরু সঙ্কুচিতভাবে ও বাম উরু প্রসারিতভাবে রা'খবে এবং কথা বলবে না।

এদিকে চিকিৎসক বস্তি ঔষধ পূর্ণ করবেন। ঔষধ পূর্ণ ক'রবার সময় বস্তি যেন দীর্ঘ বা সঙ্কুচিত না হয়; ঔষধে বুদ্বুদ না জন্মে এবং বস্তিতে যেন বায়ু না থাকে। বস্তির এক দিকে নল বাঁধা থাকে আর একদিকে খোলা থাকে। সেই খোলা মুখ দিয়ে ঔষধ পূর্ণ ক'রে সেই মুখে দুই তিনটী বেষ্টনী দিয়ে বাঁধতে হয়। তা'রপর দক্ষিণ হস্ত চিৎ ক'রে তদ্বারা বস্তিটী ধ'রতে হ'বে, আর বাম হস্তের প্রদেশিনী ও মধ্যাঙ্গুলী দ্বারা নলটী ধ'রে নলের মুখ

অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা চেপে রেখে পরে ঘৃতাক্ত গুহ্য দ্বারের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দেবে। ঠিক পিঠের শিরডাঁড়ার সঙ্গে সোজা ভাবে বস্তির কাণ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়ে বাম হাতে বস্তিটা ধ'রে দক্ষিণ হস্তের চাপ দিয়ে বস্তি প্রয়োগ ক'রবে। একবার চাপ দিয়েই প্রয়োগ করা এবং খুব দ্রুতভাবে বা খুব আস্তে চাপ দেওয়া উচিত নয়। বস্তিতে স্নেহের কিছু শেষ থাকা উচিত।

অনন্তর এক শত বাক্য বলিতে যতক্ষণ সময় লাগে—ততক্ষণ রোগীকে চিৎ হইয়া শয়ন করিতে বলিবে। কারণ সর্ব্বগাত্র প্রসারিত হইলে স্নেহবীর্য্য প্রসারিত হইতে পারে। পরে রোগী হাত পা আকুঞ্চিত ও প্রসারিত ক'রবে। ইহার পর রোগীর হস্ত পদতলে তিনবার আঘাত করিবে এবং শয্যা হইতে তিনবার নিতম্বদেশ ঈষৎ উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিবে। ইহাতে স্নেহ উর্দ্ধ ভাগে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। ইহার পর বিস্তৃত শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে এবং হিতকর দ্রব্য সেবন করিবে।

ডাঃ। আচ্ছা অনুবাসনের যে মাত্রা বলা হয়েছে, তাই কি সকলের পক্ষে প্রযুজ্য? সবল দুর্ব্বল বিচার নেই?

ক। আছে বৈকি। চিকিৎসা সম্বন্ধে যে কোন বিষয় নানাদিক দিয়ে দেখতে হয় একদিক দিয়ে দেখ্‌লে হয় না। অনুবাসনের মাত্রা ত্রিবিধ, যথা শ্রেষ্ঠা, মধ্যমা এবং কনিষ্ঠা। শ্রেষ্ঠা মাত্রা ৪৮ তোলা, শ্রেষ্ঠ বলবান ব্যক্তির প্রতি প্রয়োজ্য। মধ্যমা মাত্রা ২৪ তোলা মধ্য বল ব্যক্তির প্রতি প্রযোজ্য। আর কনিষ্ঠা মাত্রা ১২ তোলা অল্প বয়স ব্যক্তির প্রতি প্রযুজ্য।

ডাঃ। আচ্ছা বস্তি কি একদিন একবার মাত্র প্রয়োগ ক'রলেই হয়।

ক। একবারত নয়ই, কতবার সেটা ক্রমশঃ শুন্‌তে পারেন। শ্রেষ্ঠ বলবান ব্যক্তিকে যে ৪৮ তোলা স্নেহ প্রয়োগ ক'রবার কথা বলা হ'য়েছে—সেটা একদিনে নয়। প্রথম দিন ১৬ তোলা, তা'রপর একদিন বাদ দিয়ে ২০ তোলা, তা'রপর একদিন বিশ্রাম ক'রে ২৪ তোলা, এইরূপে একদিন অন্তর ৪ তোলা ক'রে বাড়িয়ে নয় দিন স্নেহ প্রয়োগ ক'রলে ৪৮ তোলা পর্য্যন্ত প্রয়োগ করা হয়। মধ্যবল ব্যক্তিকে স্নেহ প্রয়োগ ক'রতে হ'লে প্রথম দিনে আট তোলা, তা'রপর একদিন অন্তর ২ তোলা ক'রে বাড়িয়ে নয় দিন প্রয়োগ ক'রলে ২৪ তোলা হয়। আর অল্পবলব্যক্তিকে প্রথম দিনে ৪ তোলা স্নেহ প্রয়োগ ক'রে একদিন অন্তর একতোলা বৃদ্ধি ক'রে, নয় দিন স্নেহ প্রয়োগ ক'রলে ১২ তোলা প্রয়োগ করা হয়।

ডাঃ। আচ্ছা স্নেহ—কোষ্ঠে থাকে কতক্ষণ?

ক। এ সম্বন্ধে এইবার যে সমস্ত কথা ব'লছি তা'তেই বুঝতে পা'রবেন যে স্নেহ কতক্ষণ থাকে।

প্রযুক্ত স্নেহ কার্য্যকারী না হ'য়ে শীঘ্র নির্গত হ'য়ে প'ড়লে সত্বর পুনরায় স্নেহ প্রয়োগ ক'রতে হয়। যাহার স্নেহ তিন প্রহর কাল শরীরের মধ্যে থেকে বায়ু ও বিষ্ঠার সহিত বিনাক্লেশে নির্গত হয়, তাহার সম্যের অনুবাসন হ'য়েছে বুঝ'তে হবে। অহোরাত্রের পরে স্নেহ নির্গত হলেও দোষের হয়না, বরং বস্তির গুণই প্রকাশ করে। বস্তিযাগে প্রবি[illegible] স্নেহ বায়ু কর্ত্তৃক আবৃত হয়ে রুক্ষতা বশত যদি সম্পূর্ণরূপে নির্গত না হয়, তা' হ[illegible] উহা বাহির [illegible] ক'রবার চেষ্টা [illegible]

নয়। কারণ উহা দ্বারা কোনরূপ অনিষ্ট হয় না। দিবা রাত্রির মধ্যে স্নেহ নির্গত না হ'লে যদি কোন উপদ্রব উপস্থিত হয় তা হ'লে শোধনবস্তি প্রয়োগ করে তা' নিঃসারিত করতে হয়। কিন্তু স্নেহ নির্গত না হলেও কদাচ স্নেহ বস্তি প্রয়োগ করবে না।

স্নেহবস্তি বা নিরূহ বস্তি একবারে অধিক পরিমাণে অভ্যাস করা কদাচ উচিত নয়। কারণ স্নেহবস্তি নিয়ত অধিক মাত্রায় প্রয়োগ ক'রলে অগ্নিমান্দ্য ও দোষের উৎক্লেশ হয়। আবার নিরূহবস্তি অধিক পরিমাণে নিয়ত অভ্যাস ক'রলে বায়ু বর্দ্ধিত হয়। এই জন্য ক্রমান্তরে স্নেহবস্তির পর নিরূহ বস্তি এবং নিরূহ বস্তির পর স্নেহ প্রয়োগ করা উচিত। ইহাতে পিত্ত বা কফের উৎক্লেশ কিম্বা বায়ু বৃদ্ধির ভয় থাকে না।

রুক্ষ দেহ ও অত্যন্ত বায়ুপ্রধান ব্যক্তিকে প্রতিদিন স্নেহ বস্তি প্রয়োগ করা যায়। অপর ব্যক্তিকে অগ্নিমান্দ্যের ভয়ে প্রতি তৃতীয় দিবসে অর্থাৎ একদিন অন্তর স্নেহবস্তি প্রয়োগ করা উচিত। আবার রুক্ষদেহ ব্যক্তিকে সকল সময়েই অল্প পরিমাণে স্নেহ বস্তি এবং স্নিগ্ধ ব্যক্তিকে সকল সময়েই অল্প মাত্রায় নিরূহবস্তি প্রয়োগ করা যায়।

কেবল বায়ুদ্বারাপীড়িত ব্যক্তিকেই স্নেহ বস্তি প্রয়োগ করা যায়। নচেৎ বমন বিরেচন দ্বারা দেহ শোধন না করিয়া স্নেহ বস্তি প্রয়োগ করা উচিত নয়। কারণ অবিশুদ্ধ অবস্থায় স্নেহবস্তি প্রয়োগ ক'রলে তাহার কোন গুণই শরীরে প্রকাশ পায় না, পরন্তু উক্ত স্নেহ মলের সহিত মিশ্রিত হ'য়ে শরীরের দুর্ব্বলতা আধ্মান, শূল, শ্বাস ও পকাশয়ের গুরুতা উৎপন্ন করে। এরূপ অবস্থায় নিরূহ এবং তীক্ষ্ণ ঔষধ দ্বারা সিদ্ধ তীক্ষ্ণবস্তি প্রয়োগ করা উচিত।

ডাঃ। আচ্ছা শোধন বস্তি, তীক্ষ্ণ বস্তি—এসব আবার কি ?

ক। শ্রেষ্ঠা মাত্রায় বস্তি প্রয়োগ করা যায়—তাকে তীক্ষ্ণ বস্তি বলে। আর গুণ ভেদে বস্তির নানা নাম হয়। যেমন শোধন, (যেমন বিরেচন কারক) দ্রব্যসহ সিদ্ধ শোধন বস্তি, লেখন (দোষ চাঁচিয়া ফেলা) বস্তি; বৃংহণ (পুষ্টিকারক) বস্তি, বাজীকরণ বস্তি। পিচ্ছিল (অতিসারাদিতে প্রয়োজ্য) বস্তি, সংগ্রাহী মল বোধক) বস্তি, উৎক্লেশনবস্তি, দোষ হর বস্তি, দোষের প্রশমনকারক বস্তি, মাধুতৈলিক (মধু ও তৈল প্রধান) বস্তি, যুক্ত রথ নামক মাধুতৈলিক বস্তি, সিদ্ধবস্তি, মুস্তাদি বস্তি প্রভৃতি।

ডাঃ। বিরাট ব্যাপার দেখছি !

ক। এতেই বিরাট ব্যাপার দেখছেন, শাস্ত্রে আরও যে কত প্রকার তৈল প্রভৃতির বস্তি দেবার উপদেশ আছে, শুন'লে অবাক হবেন। বাহুল্য ভয়ে সে সকলের উল্লেখ ক'রলাম না। বন্ধ্যানারীকে যে বলা তৈলের বস্তি প্রয়োগ ক'রতে হয়, সেই তৈল এক শতবার পাক করা হয় ব'লে "শতপাকী বলা তৈল" বলে।

ডাঃ। আচ্ছা, বস্তি কতগুলি দেওয়া যেতে পারে ?

ক। প্রয়োগের পরিমাণ ভেদে বস্তি তিন প্রকার, যথা কর্ম্মবস্তি, কালবস্তি ও যোগ বস্তি। প্রথমে একটী অনুবাসন বস্তি প্রয়োগ করিয়া পরে পর্য্যায় ক্রমে অর্থাৎ একটীর পর অপরটী এইরূপ ভাবে বারশ

নিরূহ বস্তি এবং দ্বাদশটি স্নেহ বস্তি প্রয়োগ করিবে। পরে পাঁচটী স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিবে, এইরূপে ত্রিশটী বস্তি প্রয়োগ করিলে তাহাকে কর্ম্ম বস্তি বলে। আর প্রথমে একটী স্নেহবস্তি দিয়া পরে একটী নিরূহবস্তি—এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে দ্বাদশটি বস্তি দিবে। পরে তিনটী স্নেহবস্তি দিবে। এইরূপে উপর্য্যুপরি পনরটি বস্তি প্রয়োগ করিলে তাহাকে কাল বস্তি বলে। আবার প্রথমে একটী স্নেহ বস্তি পরে একটী স্নেহ ও একটী নিরূহবস্তি—এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে সাতটী বস্তি দিয়া শেষে একটী স্নেহ বস্তি দিতে হয়, তাকে যোগবস্তি বলে। রোগ ও রোগীর অবস্থা বুঝে এই তিনরকম বস্তির যে কোন একটী প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ডাঃ। আচ্ছা পূর্ব্বে যে সংশোধন, বৃংহণ প্রভৃতি বস্তির কথা ব'লেছেন তাদের কি ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রয়োগের নিয়ম আছে।

ক। আছে বৈকি। ভিন্ন ভিন্ন রোগে ভিন্ন ভিন্ন বস্তি প্রয়োগ ক'রতে হয়। সংক্ষেপে দু' একটা উদাহরণ দিচ্ছি। কুষ্ঠ, মেহ প্রভৃতি রোগে শোধনীয় বস্তি প্রয়োগ করা উচিত; বৃংহনীয়বস্তি প্রয়োগ ক'রতে নাই। মেদস্বী ব্যক্তিদের বৃংহণীয়বস্তি প্রয়োগ ক'রতে নেই, লেখন বস্তি প্রয়োগ করতে হয়। ক্ষতক্ষীণ, শোষ রোগী, অত্যন্ত দুর্ব্বল প্রভৃতি রোগীকে শোধনীয় বস্তি প্রয়োগ ক'রতে নাই; অবস্থা-ভেদে বৃংহণ বস্তি প্রয়োগ ক'রতে হয়।

ডাঃ। আচ্ছা বস্তি সম্বন্ধে আর কি জানবার আছে বলুন।

ক। বস্তিদ্রব্য অতি শীতল হইলে শরীরকে স্তব্ধ করে। অত্যুষ্ণ হইলে দাহ ও মূর্চ্ছা জন্মায়। অতিস্নিগ্ধ বস্তি দ্বারা শরীরের জড়তা, রুক্ষ বস্তিতে বায়ুর প্রকোপ, পাতলা, মাত্রাহীন ও অল্প লবণযুক্ত বস্তি দ্বারা অযোগ এবং মাত্রাধিক বস্তি দ্বারা অতিযোগ হয়। অল্প ও গাঢ় বস্তি বিলম্বে প্রত্যাগত হয়। অতি লবণ মিশ্রিত বস্তি দ্বারা দাহ ও অতিসার জন্মায়। সুতরাং বস্তি দ্রব্য ঐ সকল দোষ রহিত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

বস্তি অর্দ্ধেক পরিমাণ প্রদত্ত হইলে যদি মল ও অধোবায়ুর বেগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে বস্তির মল বাহির করিয়া লইবে এবং মল ও বায়ু নির্গত হইলে পুনরায় অবশিষ্ট বস্তি প্রয়োগ করিবে।

ডাঃ। আর কি নিয়ম আছে বলুন?

ক। পূর্ব্বে সাধারণ নিয়ম বলা হয়েছে যে বস্তি শীতল হ'লে অনিষ্টকর হয়। কিন্তু বিশেষ নিয়ম এই যে, উষ্ণাভিভূত ব্যক্তিকে শীতল এবং শীতাভিভূত ব্যক্তিকে সুখোষ্ণ বস্তি দিতে হবে। আবার শীতাভিভূত ব্যক্তিকে উষ্ণবীর্য্য দ্রব্যের সঙ্গে, আর উষ্ণাভিভূত ব্যক্তিকে শীতবীর্য্যদ্রব্য দিয়ে বস্তি দিতে হ'বে।

ডাঃ। দুই রকম যখন বলা হ'ল, তখন শীতল বস্তি অনিষ্টকর বলার তাৎপর্য্য কি?

ক। এইত আপনি হাঙ্গামায় ফেললেন। সাধে কি ব'লেছি যে, সব কথা জানতে হ'লে সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ জা'নতে হয়। আচ্ছা বলছি, শুনুন। বায়ু সাধারণতঃ শীতগুণ বিশিষ্ট আর বায়ু নাশের জন্যেই বস্তি দেওয়া হয়। সুতরাং শীতগুণের বিপরীত উষ্ণই বায়ু নাশের জন্য প্রযোজ্য। এই কারণে সাধারণতঃ উষ্ণবস্তি প্রয়োগ ক'রতে বলা হ'য়েছে। কিন্তু দেখুন পাথর যেমন স্বভাবতঃ শীতল হলেও উষ্ণ সংযোগে উষ্ণ এবং শীত সংযোগে

শীতল হ'য়ে পড়ে, তেমনি বায়ুও উষ্ণ সংযোগে উষ্ণ এবং শীত সংযোগে শীতল হয়ে পড়ে। গ্রীষ্মের বায়ু এবং শীতের বায়ু ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কাজেই মনে করুন, বায়ু নাশের জন্য সাধারণতঃ উষ্ণবস্তি প্রয়োগ হ'লেও পিত্ত সংসর্গে বায়ু যখন উষ্ণগুণ বিশিষ্ট হয় তখন শীতল এবং শ্লেষ্মা সংযোগে যখন অধিকতর শীতগুণ বিশিষ্ট, হয় তখন অপেক্ষাকৃত উষ্ণ বস্তি প্রয়োগের আবশ্যকতা ঘটে। যেমন শীতের শীতল বায়ু হ'তে অব্যাহতি পা'বার জন্যে আমরা গরম কাপড় পরি, অগ্নি সেবন করি। আর গ্রীষ্মের উষ্ণ বায়ু থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য আমরা শীতল ব্যজন, শীতল অনুলেপন ব্যবহার করি।

ডাঃ। অনেক লোকের ধারণা যে, ঠাণ্ডা ক'রলে বায়ু নাশ হয়।

ক। সেটা ভুল ধারণা। উষ্ণ এবং স্নিগ্ধ ক্রিয়ার দ্বারা বায়ুর উপশম হয়, আর শীতল ও রুক্ষ ক্রিয়া দ্বারা বায়ু বর্দ্ধিত হয়।

(ক্রমশঃ)

স্বাস্থ্যরক্ষায় হিন্দুধর্ম্মের বিধি-নিষেধ।

—:০:—

স্বাস্থ্যরক্ষায় হিন্দু-ধর্ম্মের বিধি নিষেধ অনেক রহিয়াছে। অনেককাল পর্য্যন্ত তা মা'নিয়া আমরা ধর্ম্ম-রক্ষা ও স্বাস্থ্য-রক্ষা করিয়াছি, দেশে যখন পাশ্চাত্য-সভ্যতার ঢেউ প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিল তখন আমরা ধর্ম্ম বিদ্রোহী হইলাম, স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্য পালনে হীন ও অনাস্থাসম্পন্ন হইলাম, ইহা শুধু আমাদের শিক্ষার দোষ—অনুকরণের পরিণপন্থি। পাশ্চাত্যশিক্ষা-সভ্যতা আমাদের দেশে প্রবল ঝড়ের মত বহিতে লাগিল, আমরাও সেই বাতাসের ঢেউ সহিতে না পারিয়া কাতর হইয়া পড়িলাম। ত্রিসন্ধ্যাপূতঃ, স্বাস্থ্যের প্রতিমূর্ত্তি ব্রাহ্মণের মুখ দিয়া যখন শাস্ত্রাদেশ বাহির হইয়াছিল—তখন স্বাস্থ্যরক্ষায় না হউক—ধর্ম্মরক্ষার ভয়ে তাহা পালন করিয়া আসিতেছিলাম। যখন আমরা ধর্ম্মশাস্ত্রকে অবিশ্বাস করিতে শিখিলাম, তখন আমরা তাহার বিধিনিষেধকেও অগ্রাহ্য করিতে লাগিলাম। আমাদের শাস্ত্রকারগণ যে সকল বিধিনিষেধ ধর্ম্মের ভয় দেখাইয়া ব্রাহ্মণের মুখ দিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, সে সকল আমরা ধর্ম্মভয়ে ভীত হইয়া বেদ বাক্যের মত পালন করিতে লাগিলাম, হিন্দু সব করিতে পারে কিন্তু ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারেনা, কিন্তু এখন আমরা ধর্ম্ম হীন। শাস্ত্রাদেশ ত দূরের কথা,—তদীয় বিধি নিষেধও আমাদের এখন গ্রহণ যোগ্য নহে। আমরা চাই সুখ, আমরা চাই বিলাসিতা। আপাতমধুর সুখকে আমরা আলিঙ্গন করিয়া ধর্ম্ম তো হারাইতে বসিয়াছি-ই, স্বাস্থ্যেরও হানি করিতেছি।

হিন্দুর ধর্ম্ম প্রাতরুত্থান, প্রাতঃস্নান। প্রভাতের স্নান—সূর্য্যরশ্মি লাগিবার আগে জল নির্ম্মল ও স্বাস্থ্যোপযোগী থাকে বলিয়া তাহাতে অবগাহন করিলেও দেহ মনের পাপ দূরীভূত

হয়। স্বর্গীয় অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ দেহ ও মনকে আনন্দিত করিয়া তোলে। তারপর পুষ্প চয়ন, পুষ্পের সুগন্ধ—নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া, মনকে আনন্দ ও সুখ প্রদান করে, ভ্রমর গুঞ্জন শ্রবণ-বিবরে প্রবিষ্ট হইয়া মনকে নবভাবে মাতাইয়া তোলে। ভ্রমরবধূ যেন আকুলি-বিকুলি করিয়া গুঞ্জরিয়া থাকে। তা'র পর আহ্নিক, এই সময় ভগবানের আরাধনা কত আনন্দদায়ক—তা' যাঁ'রা ইহার সেবক—তাঁরাই বুঝিতে পারিয়াছেন। সাত্বিক আহার হৃদয় মনের তৃপ্তি সাধন করিয়া দেহকে সম্পূর্ণ নিরাময় করিয়া তোলে। তাই সে কালের হিন্দু নিরোগী ও দীর্ঘায়ু ছিলেন। নানা পাপে লিপ্ত থাকিয়া আমরা এখন আর তাঁহাদের ন্যায় নিরোগ দেহ, সুস্থ মন ও দীর্ঘায়ু লাভ করিতে সমর্থ হইনা। সায়াহ্নে আমাদের হিন্দুর সন্ধ্যাবন্দনা ও রজনীযোগে সাত্বিক আহার আয়ুরক্ষার অনুকূল ছিল। এগুলি আমরা এখন আর রক্ষা করিনা। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাপ্ত আমরা কুশিক্ষাগ্রস্ত হইয়া মনে করি—ইহা আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের অসভ্যতার লক্ষণ। এককালে এমন দিন ছিল, আমরা এইরূপ হিন্দুকে দেখিয়া উপহাস করিয়াছি। এখন অনেক কারণে সে বাতাস কতকটা ফিরিয়াছে; মঙ্গলের লক্ষণ।

অধুনা প্রতারণা ও পাপ আমাদের হৃদয় দখল করিয়া বসিয়াছে, তাহার জন্য আমাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে। গ্রহ বিপাকে আগেকার কোনটাই আমাদের এখন আর ভাল লাগিতেছেনা। ধন্বন্তরি সদৃশ ঋষি গণের ঔষধে আমাদের বিশ্বাস নাই, আয়ুর্ব্বেদে আস্থা নাই আমাদের দেশের উপযোগী, আমাদের দেহে যা' সহনীয়—আমরা তা' গ্রহণ করিতে নারাজ। উষ্ণ প্রধান আমাদের দেশ, শীত প্রধান দেশের উগ্রবীর্য্য ঔষধ পথ্য আমাদের সহিবে কেন? তাহাতে সুফলের অপেক্ষা কুফলই অধিক হইয়া থাকে। চ্যবন ঋষি কৃত চ্যবনপ্রাশকে ছাড়িয়া আমরা নিত্য কড্‌লিভার ব্যবহার করি। সুস্বাদ চ্যবনপ্রাশের পরিবর্ত্তে বিস্বাদ কড্‌লিভারকে আমরা কেন পছন্দ করি, তা' আমরাই বুঝি না। এইত একটা উদাহরণ দিলাম, আর কত রহিয়াছে, সব কথা পরিষ্কার করিয়া বলা ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মাসিক পত্রে লিপি বদ্ধ করা চলে না।

পূর্ব্বে হিন্দুর প্রাতঃকৃত্যের কথা উল্লেখ করিয়াছি, অধুনা যাঁহারা ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করেন, তাঁহারা সেই শুভ মুহূর্ত্তেই চায়ের আয়োজনে ব্যস্ত হন। কাক যখন ডাকে কা,—বাবুরা তখন ডাকেন চা! একটু বিস্কুট, এক পেয়ালা চা উদরস্থ করা চাই, তা' না হইলে ত সভ্যতাই হইলনা। বিদেশের আমদানাকরা শিক্ষা লাভ করিয়াই বা লাভ হইল কি? আগে দেশে চা ছিলনা, কেমন করিয়া চা আমাদের উপর একাধিপত্য বিস্তার করিল, তা' অনেকেই অবগত আছেন। বিলাতি ব্যবসায়ীরা বিনামূল্যে চা খাওয়াইয়া আমাদিগকে নেশার বশে কাবু করিয়া—তাঁহাদের ব্যবসায় বিস্তার করিয়া ফেলিয়াছেন। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে কি কেহ কলিকাতায় এতগুলি চায়ের দোকান দেখিয়াছেন? তা'রপর অলিতে-গলিতে চা ফেরি করিয়া আমাদের দ্বারে উপস্থিত হইতেছে, আমরা তা' না খাইয়া যাই কোথা? আমি একবার পশ্চিমে যাইতেছিলাম,—মোগলসরাই ষ্টেসনে গাড়ি অনেকক্ষণ দাঁড়ায়, ফেরিওয়ালা চা

দিতেছে, —"ব্রাহ্মণ চা" বলিয়া যখন হাঁকিল— তখন বড় শীত বলিয়া তা'কে ডাকিলাম, এক পেয়ালা চা খাইয়া দাম দিতে চাহিলাম, সে কহিল, "আমরা লিপটন সাহেবের চাকর বিনা দামে চা খাওয়াই।" আমি ভাবিলাম ব্যবসায়ী বটে! আমি যে কামরায় ছিলাম সেই কামরায় আরো দুইজন কলিকাতার সৌখিন বাবু ছিলেন—তাঁহারা বলিলেন "ছিঃ আপনি হিন্দুর চা খাইলেন কেন? হিন্দুরা কি চা তৈয়ার করিতে পারে? মুসলমানের চা খান, বেশ আরাম পাইবেন।" আমি তো ইঁহাদের বিকৃত শিক্ষা বুঝিয়া অবাক হইলাম। যাহা হউক আমাদের আর একটা মহৎ দোষ হইয়াছে—হিন্দুর সব তাতেই অগ্রাহ্য করা। হিন্দুর অস্পৃশ্য জাতি না রাঁধিলে আমাদের ভাল লাগেনা, তাহারা ছুঁইয়া না দিলে আমাদের রসনায় সেটা যেন তৃপ্তিকর বলিয়াই উপলব্ধি হয় না। হিন্দু ভিন্ন অন্যান্য জাতির পক্কাহারে এবং চায়ের মত উগ্রবীর্য্য দ্রব্য পানে আমাদের উদরের পীড়া হইবার কথা, ফলে হইতেছেও তাহাই। চায়ের অপকারিতা যথেষ্ট, চা-খোরদের ডিস্‌পেপসিয়া নামক রোগটি যেন একচেটিয়া। চা পানে সাময়িক একটা স্ফূর্ত্তি হইতে পারে, কিন্তু অবসাদ হয় তার দ্বিগুণ। আমার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা রেঙ্গুন চিফকোর্টের উকীল, তাঁহার বিবাহের জন্য আমাদের সমাজ ছাড়িয়া আমার কোন আত্মীয় কলিকাতা অঞ্চলে মেয়ে দেখিতে-ছিলেন, একটী মেয়ে ঠিক করিয়া পত্র লিখিলেন, কলিকাতায় গিয়া মেয়ে দেখিলাম। সে মেয়ে যেন একটী থিয়েটারের অভিনেত্রী বেশে আমার নিকট হাজির হইল। অবস্থা দেখিয়াই ত আমি অবাক্। পরে জানিলাম, মেয়ে প্রাতে উঠিয়া চা-বিস্কুট খায়? সন্ধ্যায় বিকালে আবার চা চাই। সাবান এসেন্সেরত কথাই নাই। যাহা হউক সে মেয়েকে আর আমাদের গৃহে আনা হইল না। আমাদের কোন পুরুষেই—কি মেয়ে কি পুরুষের জন্য চায়ের ব্যবস্থা নাই, কেবল দেশের অবস্থা বুঝিয়া অভ্যাগতদের জন্য গৃহে চায়ের আয়োজন আছে মাত্র। যাহাহউক হিন্দুর প্রাতঃকৃত্যাদির পরিবর্ত্তে ঐ সময় এই সকল বিজাতীয় পান ভোজনের ব্যবস্থা আমাদের গৃহে এরূপভাবে প্রবেশ করিয়াছে যে, ইহা আমাদের অন্তঃপুর পর্য্যন্ত দখল করিয়া ফেলিয়াছে—ইহাই ভয়ের কথা। আমাদের দেশে অনেকেই স্বীয় পুত্র কন্যাকে স্বহস্তে এই বিষ প্রদান করিয়া থাকেন, ইহা আরো আশঙ্কার কথা। পূর্ব্বে যে অবিবাহিতা মেয়ের কথা বলিলাম, তাহার পিতা মাতাই তাহাকে এই কুঅভ্যাসগ্রস্ত করিয়াছেন শুনিলাম।

শাস্ত্রকারেরা কতকগুলি তিথি বিশেষে কোন কোন বস্তু গ্রহণ ও ভক্ষণের ব্যবস্থা দেন নাই—উহার সহিত স্বাস্থ্যের অতি নিকট সম্বন্ধ। অমাবস্যায় স্ত্রী, তৈল, মৎস্য, মাংস-সম্ভোগ-নিষেধ-ব্যবস্থা আছে। আবার কোন তিথিতে তাল, কোনটীতে অলাবু ও কোনটীতে বার্ত্তাকু ইত্যাদি রূপে তিথি বিশেষে, দ্রব্য বিশেষের ভক্ষণ নিষিদ্ধ; এখানেও শাস্ত্র-কারেরা ধর্ম্মহানি, বংশহানি প্রভৃতির ভয় দেখাইয়াছেন। ফলকথা, যে সকল নিষিদ্ধা-দেশ হইয়াছে তাহার সহিত স্বাস্থ্যের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নিহিত, তাহা আধুনিক বিজ্ঞানবিশারদেরাও অস্বীকার করিতে পারেন না। একাদশীতে উপবাস ও পক্ষান্তে নিদ্রি পালন ব্যবস্থা আছে। একাদশী যাঁহারা

পালন করেন—আর একাদশী যাঁহারা পালেন করেন না-তাঁহারা উভয় পক্ষ হইতেই এই সকল উক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারেন। একাদশী জোয়ারের দিন, সে দিন উপবাস দিলে দেহটা খুব ঝরঝরে খরখরে হয়, সে দিন উপবাস দিলে বাতাদি রোগের বিশেষ উপকার দর্শে। সেই জন্য দেখা যায়, আমাদের বিধবাগণ প্রায় সকলেই নীরোগ। আবার পক্ষান্তদিনেও জোয়ারের দিন। অমাবস্যা, পূর্ণিমায় নিশিপালন অর্থাৎ রাত্রিতে উপবাসদিলে বা অন্নাহার রহিত করিলে শরীরটা বেশ হাল্কা হয়। তাহাতেও বাতাদি রোগের উপকার দর্শে। বর্ত্তমান-কালে পাশ্চাত্য শিক্ষিত ডাক্তারেরাও পক্ষান্তে রোগীকে অন্নাহার দেননা, একাদশীতেও তাঁহারা তদ্রূপ ব্যবস্থা করেন। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া ঐ সকল নিষেধ করা হইয়াছে, তাহার কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি—হিন্দু, ধর্ম্মকে ছাড়িতে পারেনা, আর সব পারে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে সকল ব্যবস্থা শাস্ত্রকারগণ বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে স্বাস্থ্যোন্নতির উপায় বিজড়িত এই কথা আমাদের সকলেরই মনে করা উচিত। আমরা যেরূপ অল্পায়ু ও স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়িতেছি, তাহাতে আর ইহা উপেক্ষা করিলে চলিবে না। শাস্ত্রবিধান লঙ্ঘন করিয়াই আমরা মরিতে বসিয়াছি—ইহা আমা-দিগকে বিশেষরূপে মনে করিতে হইবে, নতুবা আমাদের আর আত্মরক্ষার কোনো উপায়ই নাই।

কোন ইংরেজের মুখ দিয়া কথা বাহির না হইলে আমরা তাহা মানিতে চাই না। ইংরেজ যাহা বলেন, তাহা আমাদের ঋষি প্রণীত বেদ বাক্য অপেক্ষাও অধিকতর গ্রহণ করিয়া থাকি। পথ্যাদি সম্বন্ধেও আমাদের এক্ষণে সেইরূপ ব্যবস্থা হইতেছে। রোগীর পথ্য দেশভেদে আমাদের রোগ ও দেহের উপযোগী হওয়া প্রয়োজন, আমরা আমাদের আয়ুর্ব্বেদ প্রচলিত পথ্যাদিতে তেমন আস্থা—বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারিতেছিনা, ইহাও আমাদের দুর্লক্ষণ। তাহা না হইলে খই ও চিঁড়ার মণ্ড, মসুরের যূষ প্রভৃতি অনেকদিন পূর্ব্বে আমাদের বাস্তুভিটা হইতে নির্ব্বাসিত হইত না। এখন তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে—বিলাতি নানাবিধ কুপথ্য। তবে সংপ্রতি মসুরের যূষের আদর হইতে দেখিতেছি, কারণ আমেরিকার ডাক্তারগণ বা মেডিকেল বোর্ড বলিয়াছেন, যে মসুরের দালে মাংসের তুল্য উপাদান রহিয়াছে। আমাদের শাস্ত্রকারেরা তাহা পূর্ব্বেই জানি-তেন। তাই তাঁহারা রবিবার ও অমাবস্যায় মৎস্য, মাংসের নিষেধের সঙ্গে মসুরের দাইলেরও নিষেধব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। কেমন করিয়া বলিব—আমাদের শাস্ত্রকারগণ কিছু বুঝিতেন না, অথবা তাঁহারা অবৈজ্ঞানিক ছিলেন?

ফলকথা; স্বাস্থ্যরক্ষা করিয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে ঋষি প্রণীত শাস্ত্রা-দেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইবে। তাহা হইলে আর আমাদিগকে নিত্য ডাক্তারের দাওয়াইখানায় দৌড়া দৌড়ি করিতে হইবেনা, —আজ ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, কাল শিরঃপীড়া, পরদিন জ্বর—এ সকল নিত্য অসুখে ভুগিতে হইবে না। শাস্ত্রাদেশ না মানিয়া আমরা এই সকল আধিব্যাধির বাঁধা নিমন্ত্রণ আনিয়া ফেলিয়াছি ছেলে জন্মিতেই সামান্য অসুখে ডাক্তা[illegible] ঔষধে তা'র পেটে চড়া পড়িয়া যা[illegible] আমাদের প্রাচীনাদের টোটকা টাটকী মুষ্টি[illegible]

ঘর হইতে বিদায় হইয়াছে, আমাদের সূতিকা ঘরে শিশুর ক্রন্দনেও ডাক্তারের ডাক পড়ে! আর বাকী রহিল কি? যদি নিজেকে নীরোগ, দীর্ঘজীবী ও পুত্র পৌত্রাদিকে সুস্থদেহ দেখিতে চাও—তবে আর বিলম্ব করিওনা, শাস্ত্রাদেশকে আলিঙ্গন কর, কৃতাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হউক।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মজুমদার।

দর্শনেন্দ্রিয়-বিবরণ।*

—:০:—

দর্শনেন্দ্রিয়ের আলোচনা করিতে হইলে তৎপূর্ব্বে আমাদিগকে জ্ঞানের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে হয়। কারণ দর্শনেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেরই কারণ বা দ্বার স্বরূপ। কোন পদার্থ শরীরের বাহিরে অথবা ভিতরে সংস্পৃষ্ট হইলে তথাকার স্রোতের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে, এবং সেই পরিবর্ত্তিত অবস্থা মস্তিষ্কে উপনীত হইলে, মনকে যে সংজ্ঞা প্রদান করে, তাহাকেই আমরা জ্ঞান বলিয়া থাকি।

আমাদের এই দেহের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গই চৈতন্যময়। চৈতন্যময় হইলেও ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন চৈতন্য স্রোতের দ্বারা মস্তকে নীত হইলে আমরা মনের দ্বারা তাহার উপলব্ধি করিয়া থাকি।

যদিও আমাদিগের ধমনী অথবা স্রোত বস্তুর সকল ধর্ম্মকে বহন করিতে পারে না, তথাপি তাহারা যে পদার্থের বিশেষ বা ভেদক ধর্ম্ম বহন করিতেছে, একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

বাহিরের পদার্থ ব্যতীত আভ্যন্তরিক কোন কারণে ধমনীর অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইলে, সেই পরিবর্ত্তিত অবস্থা মস্তকে উপনীত হইলে চৈতন্যের উদয় হইতে পারে। যেমন বাহিরে গন্ধদ্রব্য ব্যতীত সময়ে সময়ে নাসারন্ধ্রে গন্ধদ্রব্যের আঘ্রাণ পাওয়া যায়; শ্লৈষ্মিক রোগে অনেক সময় ইহা প্রত্যক্ষ করা যায়। বাহিরের কোন উত্তেজনা ব্যতিরেকেও চক্ষুদ্বারা আলোক ও অন্ধকার দৃষ্ট হইয়া থাকে, অপস্মার রোগে ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি।

চৈতন্য নানা প্রকার; তন্মধ্যে অসুস্থতা, দৌর্ব্বল্য, গ্লানি বা অবসন্নতা প্রভৃতি চৈতন্য

---

* আয়ুর্ব্বেদ সভার সাধারণ অধিবেশনে এই প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। প্রবন্ধের সমালোচনার জন্য আর একটী সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। আলোচনার সুবিধার জন্য ১০।১২ জন সভ্যের নিকট প্রবন্ধের প্রতিলিপি পাঠান হইয়াছিল। কতকগুলি সভ্য প্রবন্ধের বহুস্থলে আয়ুর্ব্বেদোক্ত প্রমাণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। অধিবেশনান্তরে স্থির হয় যে প্রবন্ধ লেখক অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার সিদ্ধান্তের প্রমাণ উল্লেখ পূর্ব্বক একটী পৃথক্ প্রবন্ধ লিখুন। আশাকরি প্রবন্ধ লেখক সভার অনুরোধ মত কার্য্য করিবেন, এবং করিলে সেই প্রবন্ধ সাদরে আমরা মুদ্রিত করিব। আঃ সং।

শরীরের কোন্ স্থান হইতে উৎপন্ন হইতেছে তাহা বলা যায় না। কিন্তু উহারা যে শরীরস্থ দোষ বা রসরক্তাদি ধাতুর বিকৃতি বা অস্বাভাবিক অবস্থা হইতেই উৎপন্ন হইতেছে তাহা বলা যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন ক্ষুধা বোধ, ইহাকে আমাশয়িক চৈতন্য, শিরা ধমনীর ক্রিয়া লোপ, ইহাদিগকে শিরা ধমনীর চৈতন্য, গুরুত্ব লঘুত্ব বোধ, ইহাকে, পেশীর চৈতন্য বলা যায়।

আবার সাধারণ উত্তেজনার দ্বারাই হউক, বা বিশিষ্ট উত্তেজক দ্রব্য দ্বারাই হউক, কোন বিশিষ্ট স্থান উত্তেজিত হইয়া যে চৈতন্য উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান কহে, এবং তৎ স্থানকে তাহাদের স্ব স্ব ইন্দ্রিয় কহে। ইন্দ্রিয় পাঁচটী—চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক।

৩। উত্তেজক কারণ দেহ মধ্যেই থাকুক অথবা বাহির হইতেই দেহে সংস্পৃষ্ট হউক তাহা ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান উৎপাদন করে। যেমন চক্ষুতে বাতাদিদোষ দূষিত হইলে নানা প্রকার আলোক এবং অন্ধকার দৃষ্ট হয়, ঘ্রাণ দূষিত হইলে বিবিধ গন্ধ এবং কর্ণে নানা প্রকার শব্দ এবং জিহ্বায় বিবিধ আস্বাদ এবং ত্বক দূষিত হইলে শীত উষ্ণ বেদনা প্রভৃতি নানা প্রকার স্পর্শ অনুভূত হয়।

উপরে যে জ্ঞানের বিষয় আলোচনা করা হইল, অনেক সময় তাহা ভ্রম পূর্ণও হইতে পারে, যেমন এক গাছি দড়ি দেখিয়া অনেক সময় সর্প ভ্রম হইতে পারে। বিস্তৃত ময়দানে স্থাণু দেখিয়া ভূত ভ্রমে অচেতন হইতে পারে। এইরূপ দৈহিক কোন কারণ জনিত চৈতন্য ও বাহ্য কারণ সম্ভূত বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। যেমন চক্ষু পিত্তদূষিত হইলে বাহির হইতে আলোক পড়িতেছে বলিয়া ভ্রম হয়। কর্ণ দূষিত হইলে শব্দ বাহির হইতে আসিতেছে অথবা কিয়দ্দূরে ঢাক ঢোল বাজাইতেছে বলিয়া বোধ হয়।

আবার দেখা যায় যে, এই সকল ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান বিষয়ে, ইন্দ্রিয়ের উপর মন প্রভুত্ব করিয়া থাকে। কারণ দেখা যায় যে, এই সকল বহিরিন্দ্রিয়ের সহিত মনঃ সংযোগ থাকিলে তবে জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে। মনঃ সংযোগ না থাকিলে কোন জ্ঞানই জন্মিতে পারে না, যেমন কোন ব্যক্তি তাহার বন্ধুর সহিত কথা বলিতে বলিতে যদি তাহার মন অন্য কোন একটা গুরুতর বিষয়ে আক্রান্ত হয় তবে সে তাহার বন্ধুর কোন কথাই বুঝিতে পারে না, কারণ তাহার মন শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত নহে। ঘোর নিদ্রার অবস্থায় মন ক্লান্ত হইয়া বিষয় গ্রহণ হইতে নিবৃত্ত হইলে, অথবা রাগান্ধ হইলে, তখন কোন জ্ঞানই মনোমধ্যে উদিত হয় না। আবার তীব্র মনঃসংযোগে মানব ঐক্যতান বাদনের বিবিধ যন্ত্রের স্বর তান ও তাল স্বতন্ত্র করিয়া অনুভব করিতে সক্ষম হয়।

উপরোক্ত জ্ঞানের আলোচনা দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি যে, জ্ঞানোৎপত্তি স্থান যেখানেই হউক না কেন, সেই জ্ঞানের উপলব্ধি মস্তকেই হয়। জ্ঞান সাধারণতঃ অসংখ্য প্রকার হইলেও তাহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ ও মানস প্রত্যক্ষ। শরীরের ভিতর হইতেই হউক বা বাহির হইতেই হউক, যাহা কোন বহিরিন্দ্রিয়কে স্পর্শ করিবে—তাহাই ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান; এবং যাহা কোন বহিরিন্দ্রিয়কে স্পর্শ করিবে না, কেবল মাত্র মনকে স্পর্শ করিবে, তাহাই মানস জ্ঞান। এই জ্ঞান আবার যথার্থ ও অযথার্থ ভেদে দ্বিবিধ। যথার্থ জ্ঞান অর্থাৎ প্রমাজ্ঞান এবং অযথার্থ জ্ঞান অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান। মানস বোধেই

ভ্রম জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তি কালে মন অন্য কোন বিষয়ে অভ্যস্ত থাকিলে হঠাৎ তাহা উপস্থিত হইয়া ভ্রম জ্ঞান উৎপাদন করে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় প্রথমে চৈতন্য গ্রহণ করে, তৎপর স্ব স্ব স্বেতঃ দ্বারা তাহার উপলব্ধি হইয়া থাকে। যাহাহউক এক্ষণে দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয় আলোচনা করা যাউক।

যাহাদের চক্ষু আছে, তাহারা দেখিতে পায়, যাহাদের চক্ষু নাই তাহারা দেখিতে পায় না। অন্ধকারে চক্ষু খুলিয়া রাখিলেও যে ফল, আলোকে চক্ষু বন্ধ করিয়া রাখিলেও সেই ফল। ইহা দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি যে, চক্ষু দ্বারা আমরা দেখিতে পাই এবং আলোকের সাহায্যেই ঐ সকল বস্তু আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে; সুতরাং আলোক এবং চক্ষু সম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যক। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, ইন্দ্রিয়গণ স্বজাতীয় দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়াই স্বস্ব বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকে। যেমন সন্দেশটী মুখে প্রক্ষিপ্ত হইলেই রসনেন্দ্রিয় দ্বারা উহার মধুরতা অনুভূত হয় না, কিন্তু কণ্ঠগত শ্লেষ্মা দ্বারা অভিব্যক্ত হইলেই উহার স্বাদ অনুভূত হয়। সেইরূপ দর্শনেন্দ্রিয় রূপ দ্বারা উত্তেজিত হইলেই বিষয় গ্রহণে সমর্থ হয়। আলোকের ধর্ম্ম এই যে, তাহারা কোন পদার্থ হইতে নিঃসৃত হইয়া সরল রেখা অভিমুখে গমন করে। জল অথবা তৎতুল্য কোন দ্রব পদার্থ অথবা উজ্জ্বল ঘন কাচ বা তৎতুল্য কোন পদার্থের ভিতর দিয়া ঐ আলোক সরল রেখাভিমুখে অতি সহজে প্রবেশ করিতে পারে। চক্ষুর সম্মুখাংশ জলের ন্যায় স্বচ্ছ এবং দ্রব পদার্থে পূর্ণ থাকে; সুতরাং চক্ষুর ভিতরে ঐ আলোক অনায়াসে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়; এবং ইহার দ্বারা দৃষ্টি উত্তেজিত হইয়াই বিষয় গ্রহণে সমর্থ হয়। রূপ এবং দর্শনেন্দ্রিয় উভয়ই পঞ্চমহাভূতাত্মক হইলেও চক্ষুতে তেজো ধাতুর আধিক্য আছে বলিয়া আলোক দ্বারা দর্শনেন্দ্রিয় উত্তেজিত হইতে পারে।

চক্ষুর আকার গোল, কয়েকখানি অস্থি নির্ম্মিত কোটরে অবস্থিত, ইহার বেধ নিজ অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণের দুই অঙ্গুল। এবং দৈর্ঘ ও প্রস্থ সার্দ্ধ দ্ব্যঙ্গুল। ইহার উপরি ভাগের গঠন অনেকটা গোস্তনের ন্যায় ইহা কয়েকখানি মাংস পেশী দ্বারা আবদ্ধ থাকে এবং ইচ্ছামত ঘুরাইতে ফিরাইতে পারা যায়। নয়ন গোলক কতক গুলি আবরণ. মাংসপেশী, কাচ সদৃশ পদার্থ ও উজ্জ্বল তেজোময় আলোচক পিত্তদ্বারা নির্ম্মিত,। ইহার চতুর্দ্দিক জলময়, কিন্তু মধ্য প্রদেশটী তেজোময় পিত্ত দ্বারা নির্ম্মিত হওয়ায় চক্ষুর সমস্ত অভ্যন্তর প্রদেশই দেখিতে বেশ উজ্জ্বল হয়। ঐ উজ্জ্বলতা জলের দ্বারা নষ্ট হয় না। উহা হইতে সর্ব্বদাই একটী জ্যোতিঃ বহির্গত হইতেছে এবং তাহার ক্ষয় হয় না, বাহিরের আলোকের সংস্পর্শে উহা আরও উদ্দীপিত হয়। ইহার অক্ষয়ী জ্যোতিঃ অনেকটা খদ্যোতের আলোকের ন্যায়। এই জ্যোতির্ম্ময় পদার্থটী উষ্ণ, সুতরাং চক্ষু শীত সাত্ম্য অর্থাৎ শৈত্য দ্বারা উহা নিরাপদ থাকে এবং উষ্ণস্পর্শে উহা উত্তেজিত হয়, এমন কি এতদূর উত্তেজিত হইতে পারে যে, তদ্বারা তাহার আশ্রয় স্থান সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইতে পারে। বিদেহাধিপের মতে শৃঙ্গাটক সিরা চক্ষুর পশ্চাৎ দেশ ভেদ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক দৃষ্টিমণ্ডল নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রত্যেক পার্শ্বের সিরা তাহাদের নিজ চক্ষুর ভিতর প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে এক পার্শ্বের কতকগুলি স্রোতঃ অপর

পার্শ্বে গমন করে, এজন্য প্রত্যেক চক্ষে দুই সিরাই দেখিতে পাওয়া যায়। চক্ষুর বহির্দ্দেশ দেখিতে শুভ্র, কিন্তু উহার সম্মুখাংশ উজ্জ্বল ও দেখিতে অতিশয় সুন্দর, এইস্থান দিয়াই চক্ষুর ভিতর আলোক প্রবেশ করে।

চক্ষুতে মণ্ডল পাঁচটী, তন্মধ্যে পক্ষ্মমণ্ডল ও বর্ত্মমণ্ডল পরিত্যাগ করিলে নেত্র গোলকে তিনটী মাত্র মণ্ডল দেখা যায়। এইস্থলে শুদ্ধ সেই তিনটী মণ্ডলের এবং নেত্রগোলকের সম্মুখ হইতে পশ্চাৎভাগ পর্য্যন্ত যে চারিটী পটল বা স্তর আছে, তাহারই বিবরণ করা যাইতেছে। মণ্ডল—ইহা সিরা স্নায়ু ব্যাপ্ত জরায়ু বিশেষ, সাধারণতঃ ভাষায় ইহাকে আমরা পর্দ্দা বলিয়া থাকি। এই পর্দ্দাগুলি শৃঙ্গাটক সিরার সম্মুখ প্রদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া সমস্ত নেত্রগোলককে মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিয়া আছে এই জন্যই ইহাদের নাম মণ্ডল রাখা হইয়াছে। নেত্রগোলকে মণ্ডল ৩টা,—শ্বেতমণ্ডল কৃষ্ণমণ্ডল দৃষ্টিমণ্ডল। এই মণ্ডলগুলি উপর্য্যুপরি ব্যবস্থিত অর্থাৎ প্রথম শ্বেত মণ্ডল তাহার মধ্যে কৃষ্ণমণ্ডল এবং তন্মধ্যে দৃষ্টিমণ্ডল। সর্ব্ববহিস্থিত মণ্ডলের নাম শ্বেত মণ্ডল।

শ্বেতমণ্ডল—ইহা অতি কঠিন ও ঘন সূত্রে নির্ম্মিত। ইহা চক্ষু মণ্ডলের প্রায় পাঁচভাগের ৪ ভাগ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সম্মুখস্থ অপর পঞ্চমাংশ অত্যন্ত উজ্জ্বল ও নির্ম্মল। এই সম্মুখস্থ গোস্তনাকার অংশের নাম গোস্তন। এই সর্ব্ববহিস্থ স্তরের ত্বকগুলি রসবাহিনী ধমনীদ্বারা নির্ম্মিত; রক্তবাহিনী ধমনীও ইহাতে প্রবেশ করে একথা কেহ কেন বলেন। এবং ইহাতে যে দ্রব পদার্থ রহিয়াছে, তাহা স্বচ্ছ রস, এই রসের স্বাদ ঈষৎ লবণাক্ত এই রস স্বচ্ছ বলিয়াই গোস্তনটী ওরূপ সুন্দর দেখায়। যদিও এই স্বচ্ছরসের সহিত শোণিত মিশ্রিত নহে, তথাপি উহাকে কখন কখন রক্তবর্ণ হইতে দেখা যায়।

কৃষ্ণমণ্ডল—এই আবরণটী কৃষ্ণ বর্ণ পদার্থে পরিপূর্ণ, ইহা শোণিতে রই অংশ, অত্যন্ত আগ্নেয়, কারণ দেখা যায় যে, ইহা দ্বারা সমগ্র দৃষ্টিমণ্ডল উত্তপ্ত থাকে। কৃষ্ণ বর্ণের পদার্থ গুলি শোণিতের অংশ হইলেও উহাতে প্রচুর পরিমাণে বায়ু থাকায় তৎ সংযোগে উহার বর্ণও কাল হইয়াছে। এই আবরণটী শ্বেতমণ্ডলে মূলদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া উৰ্দ্ধে শ্বেত মণ্ডল ও বাহ্য পটল এই উভয়ের সংযোগ স্থলে উপস্থিত হইয়াছে। এবং ইহারই একটী অংশ আরও অগ্রসর হইয়া মাংস পটলকে সর্ব্বতোভাবে উৰ্দ্ধে ও নিম্নে ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ইহা দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধিত হয় যে, যে সকল তীক্ষ্ণরশ্মি অতি-মাত্রায় অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নয়নাধিষ্ঠানকে অভিভূত করে, তাহাদিগকে শোষন করে।

মাংসপটল—ইহা গোলাকার কুঞ্চনশীল পেশী বিশেষ। ইহার মধ্যস্থলে গোলাকার একটি ছিদ্র দৃষ্ট হয়, ইহার নাম দৈব ছিদ্র। মাংস পটল মেদঃ পটলের সম্মুখ গাত্রে সংলগ্ন হইয়া অবস্থিতি করে। ইহার বাহ্য ধার গোস্তন শ্বেতমণ্ডল ও কৃষ্ণমণ্ডলের আবরণদিগের সন্ধিস্থলে। ইহাতে কতকগুলি পিত্ত শোণিত বাহী এবং মেদো বাহী স্রোত এবং কণ্ডরা দৃষ্ট হয়। ইহার ভিতর দিয়া আলোক প্রবেশ করিতে পারে না। কারণ ইহারই সম্মুখ ও পশ্চাৎভাগে কৃষ্ণবর্ণের একটী পর্দ্দা সংলগ্ন রহিয়াছে। বাহিরের অতিরিক্ত আলোক গোস্তনের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র তাহার কতকাংশ এই কৃষ্ণবর্ণের পদার্থ শোষন

করিয়া লয়। সুতরাং পরিমিত আলোকই দৈব ছিদ্র দ্বারা প্রবেশ করিয়া থাকে। এবং ইহা আলোকরশ্মিকে বিপথে গমন করিতে দেয় না। এই পটলটী নিম্নভাগে দূষিত হইলে সমীপস্থ বস্তু এবং উর্দ্ধভাগে দূষিত হইলে দূরস্থ বস্তু দৃষ্টিগোচর হয় না। অর্থাৎ দূরদর্শন বা নিকটদর্শন পক্ষে মাংস পটলই কারণ। এই মাংসপেশী কুঞ্চিত হইলেই দৃষ্টিমণ্ডল কুঞ্চিত হয় এবং ইহার প্রসারনেই দৃষ্টিমণ্ডল প্রসারিত হয়। নানা-কারণে দৃষ্টিমণ্ডল কুঞ্চিত ও প্রসারিত হয়।

দৃষ্টিমণ্ডল—ইহা মেদোবাহি স্রোতঃ দ্বারা নির্ম্মিত। শৃঙ্গাটকসিরা চক্ষুর পশ্চাদ্দেশ ভেদ করিয়া অভ্যন্তরে বিস্তৃত হইয়া দৃষ্টিমণ্ডল এই সংজ্ঞা লাভ করে। ইহাতে মশক, মক্ষিকা, মণ্ডলাকার, পতাকা সদৃশ, নক্ষত্র সদৃশ, জালকের ন্যায় নানাপ্রকার দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা নেত্রগোলকের সমস্ত অভ্যন্তরপ্রদেশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। দেখা যায় যে, দৃষ্টিমণ্ডল কৃষ্ণমণ্ডলের ক্রোড় দেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া শুক্ল মণ্ডল ও কৃষ্ণ মণ্ডলের সন্ধি স্থলে মিলিত রহিয়াছে। এবং তথা হইতে মাংস পটলের নিম্নদেশে উপস্থিত হইয়া দৈবছিদ্র পর্য্যন্ত আসিয়াছে। এই অংশটীর নাম মেদঃ পটল। মেদঃ পটল মাংস পটলেরই নিম্নগাত্রে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। এখান হইতে দৃষ্টিমণ্ডলের, সমস্ত নিম্নপ্রদেশই মেদোময়। কালকাস্থি, ইহাই দর্শনেন্দ্রিয়াধিষ্ঠান। যদিও সমস্ত নেত্রগোলককেই দর্শনেন্দ্রিয়াধিষ্ঠান বলা যাইতে পারে, তথাপি পূর্ব্বোক্ত অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এই পটলই প্রধান বলিয়া ইহাকে দর্শনেন্দ্রিয়াধিষ্ঠান বলা যায়। কালকাস্থি একটী মেদঃ পূর্ণ কূপের উপরিভাগে অবস্থিত। ইহা ক্ষুদ্র এবং কিঞ্চিৎ ঘন সূত্রাকার অস্থি পদার্থ হইতে নির্ম্মিত। ইহার পরিমাণ মাংসপটলের এক সপ্তমাংস। ইহার সমস্ত উপরিভাগ একখানি গাঢ় নীলবর্ণ পর্দ্দা দ্বারা আবৃত। এই অস্থিখণ্ডের মধ্যভাগ কিঞ্চিৎ চাপা হইতে পারে। ইহা হইতে অগ্নি শিখার ন্যায় একটী আলোক রশ্মি নির্গত হয়, তদ্দ্বারা নেত্রগোলকের সমস্ত অভ্যন্তর ভাগ অত্যন্ত উজ্বল হয়। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অঙ্গুলি দ্বারা নেত্র পল্লবের উপরিভাগ টিপিলে উহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি। অন্ধকারে পশুদিগের প্রশস্তচক্ষে অথবা বিড়ালের চক্ষে ইহা সুস্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হয়। এই দর্শনেন্দ্রিয়াধিষ্ঠানে কোনরূপ আলোক পড়িবা-মাত্র ইহা প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। এবং সেই সময় তারকা কুঞ্চিত হয়। উপরোক্ত মাংস পটলের কৃষ্ণবর্ণ পর্দ্দাখানা নিম্নদিকে ক্রমে ক্রমে আরও ভিতরের দিকে প্রবেশ করিয়া কালকাস্থিতে উপস্থিত হইয়াছে। ইহার কৃষ্ণবর্ণ পদার্থের সারভাগ, যাহা মাংস পটলের নিম্নভাগের স্রোতের মধ্যে প্রস্তুত হয় তাহাই কালকাস্থিতে প্রবেশ করিয়া তারকা নামে অভিহিত হয়। এই উজ্বল তার-কাই বস্তুর সমস্ত রূপ গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার ধর্ম্ম শৃঙ্গাটক শিরাদ্বারা মস্তকে প্রেরণ করে। এই কালকাস্থির গাঢ় নীলবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ আগ্নেয়, সুতরাং অত্যন্ত উষ্ণ। এই নীল বর্ণ পদার্থ ব্যতীত নয়ন গোলকে যে নানাবিধ রস দেখিতে পাওয়া যায়, যদ্বারা নেত্র বুদবুদের সমস্ত অভ্যন্তর প্রদেশ পূর্ণ রহিয়াছে, তাহারা সকলেই শ্লেষ্মধর্ম্মা অর্থাৎ শীতল। বহ্নি

এইরূপ না হইত তবে কালকাস্থিগত ঐ পিত্ত নয়ন গোলককে দগ্ধ করিয়া ফেলিত—এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। রূপের আলোচন অর্থাৎ গ্রহণ করে বলিয়া ইহার নাম আলোচক পিত্ত, এই আলোচক পিত্ত যদি একবার নির্ব্বিবাদে রূপ গ্রহণ করিতে পারে, তাহা হইলেই সম্যক্ জ্ঞান লাভ করা যায়, অর্থাৎ দর্শনশক্তি ইহাতেই পূর্ণরূপে বিদ্যমান।

বস্তুর রূপ গোস্তনের ভিতর দিয়া কাল কাস্থি এবং তথা হইতে কাল কাস্থির ভিতর দিয়া শৃঙ্গাটক শিরার অগ্রভাগ এবং শৃঙ্গাটক শিরাদ্বারা ঐ রূপের বহন কার্য্যে পথিমধ্যে কোনরূপ বাধা প্রাপ্ত হয় না। দেখা যায় যে পরিষ্কার জল উজ্জ্বলকাচ অথবা তত্তুল্য পদার্থের ভিতর দিয়া আলোক প্রবেশ করিলে যতক্ষণ না উহা বাধা প্রাপ্ত হইবে, ততক্ষণ উহা প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিবেনা। যেমন বাধা প্রাপ্ত হইবে—অমনি উহা ঘুরিয়া দাঁড়াইবে, ইহার নাম প্রতিবিম্ব। প্রতি অর্থাৎ বিপরীত ভাবাপন্ন, বিম্ব অর্থাৎ প্রতিকৃতি, তাহাই প্রতিবিম্ব। চক্ষুতে আলোক প্রবেশ করিলে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে অথবা পরে কোন স্থানে উহা বাধা প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং প্রতিবিম্ব গ্রহণের কোন কারণ দেখা যায় না। অতএব আমরা যে সকল দ্রব্য প্রত্যক্ষ করি, তাহা বিপরীত ভাবে দর্শন করি না। স্বাভাবিক অবস্থাই দর্শন করিয়া থাকি।

পূর্ব্বে যে মাংস পটলের উপরিভাগে একখানি পর্দ্দা বা জরায়ুর কথা বলা হইয়াছে, যাহার উপরিভাগ কৃষ্ণবর্ণ, উহার নাম কৃষ্ণ ত্বক। ঐ কৃষ্ণত্বক মাংস পটলের গাত্রে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। উহাতে দুই প্রকার স্রোতঃ দেখা যায়—শ্লেষ্মবাহি ও পিত্তবাহি। তন্মধ্যে কোন কারণে পিতবাহি স্রোতঃ উত্তেজিত হইলে চক্ষুর তারকা কুঞ্চিত হয়, এবং শ্লেষ্মবাহি স্রোতে শ্লৈষ্মিক অংশ বৃদ্ধি পাইলে চক্ষু প্রশস্ত হয়।

এস্থলে একটী প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রত্যেক চক্ষুর ভিতরে একটী বস্তুর স্বতন্ত্র রূপ প্রবেশ করায় আমরা একটী বস্তুকে দুইটী কেন দেখি না। উত্তর এই যে, শৃঙ্গাটক শিরা একটি, দুইটী অথবা তিনটীকিম্বা সহস্রটী চক্ষু দ্বারায় একই রূপ প্রবেশ করিলেও শৃঙ্গাটক শিরা একই রূপ দ্বারা অভিন্নরূপে ভাবিত হওয়ায় একই ধর্ম্মকে বহন করে। সুতরাং একটী বস্তুর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপ দুইটী চক্ষুদ্বারা প্রবেশ করিলেও আমরা একটী বস্তুর দুইটী রূপ দেখি না। ইন্দ্রিয়বাহী ধমনীগণ যদিও পদার্থের রূপ বহন করিয়া মস্তিষ্ক মধ্যে লইয়া যায় না, কিন্তু রূপের দ্বারা তাহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে পারে, এবং সেই পরিবর্ত্তিত অবস্থা অভিন্ন রূপ হওয়ায় দুইটী চক্ষু দ্বারা অভিন্ন রূপ দ্রব্য প্রত্যক্ষ হয়।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা আমরা এই বুঝিলাম যে, পদার্থ হইতে আলোকরশ্মি নিঃসৃত হইয়া নির্ম্মল গোস্তনের ভিতর দিয়া দৈবছিদ্র দ্বারা কালকাস্থিতে উপস্থিত হয়। এবং সেই মুহূর্ত্তেই কাল কাস্থির ভিতর দিয়া সরল রেখাভিমুখে আরও অগ্রসর হইয়া একেবারে শৃঙ্গাটক শিরার মুখে উপস্থিত হইয়া তত্তৎ পদার্থের বিশেষ ধর্ম্মকে মস্তকে প্রেরণ করে। সুতরাং প্রকৃত দর্শন জ্ঞান মস্তকেই হইয়া থাকে। পদার্থ হইতে আলোকরশ্মি নিঃসৃত হইয়া শৃঙ্গাটক শিরার সহিত মিলিত হওয়ায়

উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইল তদ্দ্বারা শৃঙ্গাটক শিরা ভাবিত হইতে পারে, সুতরাং আমরা বস্তুর প্রকৃত রূপই দর্শন করিয়া থাকি, প্রতিবিম্ব নহে।

শ্রীহরমোহন মজুমদার কাব্যতীর্থ,
কবিভূষণ।

স্বাস্থ্যতত্ত্বে বৈধব্য ধর্ম্ম।

ভগবানের বিশাল বিরাট অবনীমণ্ডলে ভারতবর্ষের "বৈধব্য ধর্ম্ম" স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অদ্বিতীয়। এমন গবেষণাপূর্ণ উচ্চ বৈজ্ঞানিক সুব্যবস্থা অন্য কোন দেশে কোন জাতির মধ্যে নাই। কিন্তু কালমাহাত্ম্যে আধুনিক কি পুরুষ—কি স্ত্রীলোক-প্রায় সকলেই এ হেন সুপ্রতিষ্ঠিত সাধুপ্রথার বিরুদ্ধে নানা প্রকার ভ্রুকুটিভঙ্গী ও নিন্দাবাদ এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিতে মুক্তকণ্ঠ! নব্যশিক্ষিত পুরুষ গণের মধ্যে অধিকাংশই বৈধব্যধর্ম্মকে নিতান্ত কষ্টকর এবং অবিচারজনিত কুপ্রথা বলিয়া ঘৃণা করতঃ তাঁহাদের উদার দয়ার-দ্বার উদ্ঘাটনে ব্যস্ত হন। সেজন্য সনাতন যতি ধর্ম্মাবলম্বিনী বিধবাদিগের বিবাহ দিতেও বদ্ধপরিকর! আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে রমণী সমাজও ইহার স্বাস্থ্যজনকতা ও ধার্ম্মিকতা এবং পরম পবিত্রতা বুঝিতে না শিখিয়া নানা প্রকার বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। ফলতঃ বৈধব্য যেন মহা পাপের ফল এবং বৈধব্য ধর্ম্ম যেন নিতান্ত ঘৃণিত কুকার্য্য ও কষ্টদায়ক;—কারণ প্রত্যহ মার্জ্জিত বগুনায় রান্না করিয়া এক সন্ধ্যামাত্র স্বপাক আহার, ঘৃত সৈন্ধবযুক্তভোজনে জীবনধারণ, মৎস্য, মাংস ও পর্য্যুষিত দ্রব্য তিন বার আহার করিতে না পারা, একাদশী প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার পর্ব্বে উপবাস করিতে বাধ্য থাকা, বেশভূষা পরিত্যাগে সন্ন্যাসিনী সাজিয়া জীবন যাপন, কামেন্দ্রিয়ের চরিতার্থে বঞ্চিত থাকা,—ইত্যাদি আচরণ নিতান্ত দুঃখজনক।—ইহার পরিবর্ত্তে উচ্ছিষ্ট মৃৎপাত্রে রান্না করিয়া বা পর্য্যুসিত রাখিয়া তিন চারিবার প্রেতাহার, পলাণ্ডু, পাঙ্গালবণাদি জাতিদুষ্ট কদাহার, মৎস্য, মাংস প্রভৃতি কদর্য্য বস্তু এবং পূতিগন্ধযুক্ত ইত্যাদি রাক্ষসাহার, অনুপবাস, অধৌতপদ উড়িয়া প্রভৃতি যাহার তাহার আশ্রয়দুষ্ট আহার্য্য গ্রহণ, আর সর্ব্বদা আভরণ মণ্ডিতা ও ল্যাভেণ্ডার আপ্লুতা এবং তাম্বুলরঞ্জিতা বিলাসিনী সাজিয়া কামপূর্ণ অন্তঃকরণে জীবন যাপনই পরম সুখ-কর এবং ইহাই যেন জগতের সার সর্ব্বস্ব মঙ্গল-জনক। এতাদৃশ ধারণাতেই যতিধর্ম্মের গ্লানিকর ব্যবহার দেশের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে।

আধুনিক পুরুষ এবং সধবা সম্প্রদায়ের প্রাগুক্তরূপ ভ্রান্তধারণা বদ্ধমূল থাকায় সরলা বিধবা রমণীগণের স্ব স্ব জীবনের প্রতি নিতান্ত ঘৃণা ও বিরক্তি এবং কদাচিৎ কোথাও বা সধবার আচরণে গোপন প্রবৃত্তি উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা ঘটিতে পারে। তা' ছাড়া যতিধর্ম্ম যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং তদ্দ্বারা যে স্বীয় স্বামী এমন কি ভগবানকে পর্য্যন্ত লাভ করিবার বিশেষ সম্ভাবনা, তাহা না বুঝিয়া নিতান্ত নিরুৎসাহ-পূর্ণ চিত্তে স্বীয়কর্ত্তব্যে অনাস্থা উপস্থিত হওয়া বড়ই দুঃখের কথা। এই কারণে বৈধব্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

হিন্দুশাস্ত্রের সহমরণের সুব্যবস্থা থাকিলেও সংসারের সর্ব্ব ধর্ম্ম রক্ষার [illegible] আদর্শ

সমুজ্জ্বল রাখিবার জন্য, বিধবার ব্রহ্মচর্য্যকে উচ্চতর আসন প্রদান করা হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যকেই যতিধর্ম্ম বলে। এই ধর্ম্মে স্মরণ-কীর্ত্তন প্রভৃতি অষ্টবিধ মৈথুনাভাব ব্রত স্থির রাখিবার নিমিত্ত এবং স্বাস্থ্যকে অক্ষুন্ন রাখিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত থাকিবার জন্য ও দীর্ঘজীবন লাভের উদ্দেশ্যে যে সকল আচার ব্যবহার, ব্রত উপবাসাদি করিবার বিধি হিন্দুশাস্ত্রকারগণ ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন, তদ্দারা শাস্ত্রের সদুদ্দেশ্য সুন্দররূপেই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সহমৃতা রমণীর অপেক্ষা প্রকৃত ব্রহ্মচারিণীর আসন উচ্চতর, যেহেতু সহ-মৃতার ধর্ম্ম সকাম আর ব্রহ্মচারিণীর ধর্ম্ম নিষ্কাম। স্বামীবিয়োগে মরণোদ্যতা সতীর দেহ ও মনের যে অবস্থা ঘটিবার কথা, প্রকৃত ব্রহ্মচারিণীর মনেরও ঠিক সেই অবস্থাই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ইহার এতদূর ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা যে, সন্তান সন্ততি ও গুরুজনের মুখ চাহিয়া তাহাদের কষ্ট এবং সাংসারিক বিশৃঙ্খলতার চিন্তায় পাষাণে বুক বাঁধিয়াও তাহাদের উপ-কারে বিধবাগণ জীবনোৎসর্গ করেন।

হিন্দু বিধবার স্বামী বিয়োগ জনিত শোক যাহা সাগর অপেক্ষা গভীর এবং হিমাদ্রি অপেক্ষা গুরুতর এবং গগনাপেক্ষা বিস্তৃত—তাহাই উপশমের কৌশল স্বরূপে হিন্দু সমাজ যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে হিন্দু বিধবার স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা বিশেষরূপে জড়িত। এবং তাহারই ফলে পরিবারবর্গের রোগপরি-চর্য্যায় তাঁহাদিগের আহার নিদ্রা পরিত্যাগ, দিবারাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম, সকলই সম্ভবপর হইয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয়া ও নিষ্কামী হিন্দু বিধবা ভিন্ন সধবা রমণী বা পুরুষের শক্তি, অধ্যবসায় এবং উৎসাহ সমান ভাবে জন্মিতে পারে না? ফল কথা ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ বিধবাদিগের ধর্ম্ম পালনে যে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই চমৎকার। ইহা সমাজের কল্যাণকর এবং সহ-মরণাপেক্ষা অধিকতর উপকারী।

মানব সহস্র সহস্র জন্ম সাধনা করিয়া নিষ্কামধর্ম্ম লাভ করিতে পারে কিনা সন্দেহ। সনাতন বৈধব্য ধর্ম্ম নিবৃত্তিমূলক, ইহা প্রবৃত্তি মূলক নহে এই ধর্ম্ম পালনে যথার্থ স্বর্গীয় সুখ শান্তি ও সুন্দর স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘজীবন লাভ হয় এই ধর্ম্ম পালনে যে তৃপ্তি, তাহা আনন্দ বা ভোগ বিলাসের জন্য নহে, সংযমের জন্য। এ স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, এই নিবৃত্তি মার্গ বা সংযমের পথ কেবল মোক্ষ প্রাপ্তির হেতুভূত। আগে হিন্দুসমাজে প্রথম শিক্ষারম্ভ ভিত্তি হইতেই ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন দ্বারা মনুষ্যত্বের সংস্থাপন করা হইত, তপস্যা ও যোগাভ্যাস প্রভৃতি মানব জন্মের প্রকৃত কর্ম্ম সকল স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের জন্যই ব্যবস্থা ছিল। সংযম, কঠোরতার সহিত ইন্দ্রিয় নিগ্রহের ব্যবস্থা, উহা সধবা, বিধবা, স্ত্রী, পুরুষ সকলের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। আধুনিক অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি হিন্দুশাস্ত্র ও সমাজবন্ধনকে ছিন্ন করিতে প্রয়াসী। কিন্তু তাঁহাদের বোঝা উচিত যে, আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র স্বাস্থ্য লইয়াই লিখিত। এ ধর্ম্মের অপলাপ করা—অনভিজ্ঞতা ও বিবেক-বিহীনতার পূর্ণপরিচয় প্রদান মাত্র।

যুগধর্ম্মে, বিজাতীয় অনুকরণ প্রভা[illegible] হিন্দু সমাজে বিলাস বাসনা ও ভোগ কামন[illegible] রাহুর-করাল গ্রাসে নির্ম্মল ব্রহ্মচর্য্যময় বৈধ[illegible] ধর্ম্ম রূপ [illegible] হওয়াতেই হিন্দু জ্যোতি[illegible] লালসার [illegible] ডুবিয়াছে। [illegible] অবক্ষয়কারী [illegible]

প্রকার দুরারোগ্য রোগ, শোক, তাপ, জ্বালায় হিন্দু জীবন অশান্তিময়, দেহ রোগের আধার, পরমায়ু ক্ষয় এবং অকাল মৃত্যু সংঘটিত হইতেছে। কি যে বিষম দুর্ব্বুদ্ধি ও কি মূঢ়তা এবং অপরিণামদর্শিতায় হিন্দু সমাজ আচ্ছন্ন হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলেও বিভ্রান্ত হইতে হয়। দগ্ধোন্মুখ গৃহে সুশীতল জল সেচনের পরিবর্ত্তে কুম্ভপূর্ণ ঘৃত ঢালিবার ব্যবস্থা চলিতেছে।

বর্ত্তমান হিন্দুজাতি প্রায় সহস্র বৎসরের কুসংসর্গে অনেকেই পশুবৎ ইন্দ্রিয় পরায়ণ, উচ্ছৃঙ্খল এবং—অধঃপতিত। কাজেই ব্রহ্মচর্য্যের সম্মান বুঝিবার শক্তি হারাইয়াছে। সেই ভীষণ পাপের ফলেই দেশব্যাপী রোগ, শোক, অকাল মৃত্যু ও দুঃখ দৈন্য প্রভৃতি নানাবিধ সহনীয় ক্লেশের এতাদৃশ প্রাদুর্ভাব।

যে দেশে একদিন শিবাণী, সাবিত্রী, সীতা এবং দময়ন্তী প্রভৃতি বহু সতী, আর লক্ষ্মণ, ভীষ্ম, অর্জ্জুন এবং জরৎকারু প্রভৃতি ব্রহ্মচারিগণ জন্মলাভ করিয়াছিলেন, আজকাল সেই দেশের ব্রহ্মচর্য্যের বিষয় মাসিক পত্রিকায় আলোচনা করিয়া স্মরণ করাইয়া দিতে হয়—ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি আছে?

বর্ত্তমান কালের পুরুষোচিত স্ত্রী শিক্ষায় স্বর্গীয় ভাব বিনাশ করিতেছে। পুরুষ বর্গের কুশিক্ষার ফলে রমণীগণের আত্ম সুখাকাঙ্ক্ষাজনিত স্বার্থপরতায় বাঙ্গালী সমাজকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে। নাটক নভেলের পোকা এবং বিলাস ভোগের কৃমি হইয়া আধুনিক অধিকাংশ রমণীগণ সন্তানপালন বা স্বামীসেবা কিম্বা রোগী পরিচর্য্যা, অতিথি সেবা প্রভৃতি সৎকার্য্যের অবসর পান না। প্রাচীন কালে গৃহিণীগণ—রোগ প্রতিকার বিষয়ে কত সহজ ও সুন্দর মুষ্টিযোগ বা অন্যান্য উপায় পরিজ্ঞাত ছিলেন, কত দ্রব্যগুণ জানিতেন যাহাতে গৃহাঙ্গনস্থিত গুল্মলতা দ্বারায়ই ডাক্তার খরচা বাঁচিয়া যাইত, এখন তাহার পরিবর্ত্তে রমণীগণ—নাটক, নভেল, ইতিহাস, ভূগোল পড়া, আর দেশ বিদেশে প্রত্যহ পত্র লিখিয়া পোষ্টাফিস খরচার দায়ে কর্ত্তাকে বিপন্ন করিতে অভ্যস্ত! তাহাতে না হয় ইহকালের কাজ, না হয় পরকালের কাজ। পূর্ব্বে দেখিয়াছি—কোন বাড়ীতে কোন বৃহৎ ব্যাপার হইলেও গ্রাম্য স্ত্রীলোকেই রন্ধনপরিবেশনাদি সম্পন্ন করিতেন, গৃহে ত কথাই নাই। এখন স্ত্রীলোকের রন্ধন অভ্যাস নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অজ্ঞাত কুলশীল অপবিত্র মলিন পাচক এখন পাকের ও পরিবেশনের কর্ত্তা। সেই কদর্য্য অন্নগ্রহণে দেহ ক্ষীণ ও রুগ্ন এবং স্ফূর্ত্তিহীন হইতেছে। বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষার এমনি কুফল প্রসব করিয়াছে। আর গৃহে গৃহে রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ পাঠের ব্যবস্থা এককালেই নাই। সে সব স্থান এখন ইংরাজী ছাঁচেঢালা নাটক-নভেল অধিকার করিয়াছে।

তাই বলি হে হিন্দু সন্তানগণ! এখনও যদি অশেষ অকল্যাণের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করতঃ স্বাস্থ্য ও সুখসম্পন্ন হইতে চাও, নিজে বাঁচিতে ও দেশকে বাঁচাইতে চাও, তবে আবার সেই সনাতন পথে প্রত্যাবর্ত্তন কর! কুপথের অনেক দূর চলিয়া গিয়াছ, এখনও স্ব স্ব পুত্র কন্যাগণকে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দাও, প্রকৃত ব্রহ্মচারিণী—সতী। রমণীদিগকে আবার সেই সতী ধর্ম্মের শিক্ষা প্রদান কর। দেবার্চ্চনা, গুরুজন সেবা, রোগী শুশ্রূষা, দীনে

দয়া, অন্নহীনকে অন্ন এবং বস্ত্র হীনকে বস্ত্র দান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় প্রদান প্রভৃতি সৎ শিক্ষা দিতে সচেষ্ট হও। বৈধব্য ধর্ম্মচারিণীর ন্যায় আদর্শ শিক্ষয়িত্রী জগতে আর কোন স্থানেই মিলিবে না। অপবিত্র মনকে পবিত্র করিবার, চিত্তশুদ্ধি করিবার অব্যর্থ মহৌষধ যে ব্রহ্মচর্য্য পালন—ইহা প্রত্যেককে বুঝাইয়া দাও। পুরুষকার, তেজ, বীর্য্য ও লাবণ্য—ব্রহ্মচর্য্য হইতেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এরূপ বংশধর না জন্মিলে হিন্দুস্থানের কল্যাণ সাধন সংঘটিত হইতে পারিবে না। যদি মঙ্গল কামনা কর, তবে এখনো পথে এস।

শ্রীনলিনী নাথ মজুমদার।

—————

——:০:——

সেকাল ও একাল।

শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন মহাশয় কিছুতেই আমাকে ছাড়িতেছেন না। আমি তাঁহাকে শতবার নিবেদন করিয়াছি যে, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে আমি একেবারে অনভিজ্ঞ; সাধারণ জ্ঞানও আমার নিতান্তই তুচ্ছ—যাহা বলিবার তাহা পূর্ব্বেই বলিয়া ফেলিয়াছি, এখন যদি কিছু বলিতে হয়, তাহা হয় পুনরাবৃত্তি, না হয় কথিত বিষয়ের উদাহরণ। সাধারণতঃ মানুষ দুই একটী কথাই বলিতে আসে—সেই দুই একটী কথাকে বেষ্টন করিয়াই তাহার মৌলিকতা লতাইয়া উঠে। তা'রপরও যদি সে কিছু বলে—তবে তাহা ঐ মৌলিকতাকে পরিপোষণ করিবার জন্য নিদর্শন প্রদান মাত্র। কিন্তু কবিরঞ্জন মহাশয় তথাপি আমাকে দিয়া পত্রিকার পত্রাঙ্ক পূরণ করিতে চাহেন। তিনি নিজে বিজ্ঞ,—অভিজ্ঞ সম্পাদক, কিন্তু অজ্ঞের দুঃখ বোঝেন না।

"চির সুখী জন, ভ্রমে কি কখন,
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?"

তাঁহার মত মহীয়ানের এ আগ্রহে আমার মনে একটু আনন্দ সঞ্চার হয়। আমার মনে হয়—আমার জ্ঞান যতই তুচ্ছ হউক,—বলিবার শক্তি যতই কম হউক,—আমার বক্তব্য, আমার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই মহৎ। এ মহত্বের গৌরব আমার নহে,—এ গৌরব তাঁ'র,—যিনি আমার মধ্য দিয়া তাঁহার অভাব অভিযোগ ভারতবাসীকে পাঠাইতেছেন—এ গৌরব সেই ভারতমাতার। ভারতমাতা তাঁহার সন্তান মণ্ডলীকে কাঁদিয়া বলিতেছেন,—"দেখরে দীন, দেখরে পতিত, দেখরে শীর্ণম্লান; দেখ তোর উৎপত্তি, তোর অতীত—কত সমুজ্জল। এ অতীতকে পুনরুদ্দ্বাপিতকর। তোর দৈন্য, আমার দুঃখ—ভয়ে পলায়ন করিবে। ওরে আমার আদর্শ আমার যত হিতকর, পরের আদর্শ কি তার শতাংশের একাংশও হইতে পারে? আমার অতীত ত হীন ছিল না? তবে কেন আধুনিকতা তাহাকে মুছিয়া ফেলিতে চায়? ভস্মাচ্ছন্ন রাখে?" মূর্খই নূতন তুচ্ছকে মাথায় তুলিয়া লইয়া পুরাতন সনাতনকে ভুলিয়া যায়? নূতন চিরকালই

প্রখর, চঞ্চল ও সম্মুখবর্ত্তী। অজ্ঞমানব স্বভাবতঃ ভাবপ্রবণ, কাজেই সে এই চঞ্চলতা—এই প্রখরতাকেই আশ্রয় করে, এই সম্মুখবর্ত্তীকেই বরণ করে। কিন্তু জ্ঞানী—পুরাতনকেই ভালবাসে, কারণ পুরাতন প্রায়শঃই সাম্য, গম্ভীর ও পরীক্ষিত বলিয়া বিশুদ্ধ,—অসত্যের চাঞ্চল্য তা'তে নাই, সত্যের স্থিরতা ও বিনয় তাহাকে মৌন করিয়া পশ্চাদনুবর্ত্তী করিয়া রাখিয়াছে। সময়ে সময়ে পুরাতনকে পরিবর্ত্তন করিতে হইতে পারে, কিন্তু এ পরিবর্ত্তন বিশেষ বিবেচনা সাপেক্ষ হওয়া বিধেয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনুকরণ ও চাঞ্চল্যের যুগে ভাবিবার অবসর নাই,—শুদ্ধ চলিবার, ধাইবার—মাতিবার উৎসাহ আছে।

বলবীর্য্যের জন্মভূমি এই ভারতবর্ষ আজি যে রুগ্ন, শীর্ণ, খর্ব্ব—তাহার মধ্যেও এই আধুনিকতা, এই অনুকরণের ঘৃণ্য প্রবৃত্তি। জীবন-যাপন একটা মহাসংগ্রাম। এখানে বলীয়ানের জয়, মৌলিকতা ও প্রতিভার স্বায়ত্ত শাসন। দুঃখিত, ম্লান অশক্তের এখানে স্থান নাই। মৌলিকতা এখানে রাজত্ব করে, অনুকরণ ভিক্ষা করিয়া মরে। এ জগতে চিরকালই দানের সম্মান, গ্রহণের নহে। এক সময়ে ভারতমাতা সমস্ত পৃথিবীকে তাঁ'র জ্ঞানশস্য দান করিয়াছিলেন; তাই সে সময়ে সম্মানে তিনি জগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু আজ আর তিনি কিছু দিতে পারেন না;—গ্রহণ করিয়াই তিনি তৃপ্ত; তাই তিনি আজ আহত, দলিত। আজও যদি কেহ এনিবেসান্তের মত ভারতভূমিকে পূজা করেন, তবে তাঁহার অশেষ মাতৃভক্তি বলিতে হইবে। সর্ব্বস্বত্যাগের পরও যাঁর মাতৃভক্তি অটুট থাকে, তিনি নিশ্চয়ই পশ্বাদি ইতর প্রাণী-সাধারণ শ্রেণীভুক্ত নহেন, তিনি অতিমানুষ।

আমাদের অতীতের জন্য এ ক্রন্দন কত যথার্থ তাহা একদিন আমাদের কি ছিল—আর আজ আমাদের কি নাই—ভাবিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারি। মাননীয় সম্পাদকের একান্ত ইচ্ছায় আজ আমি এই চিত্রটিই অঙ্কিত করিব। বাস্তবিক চিত্রের শক্তি অশেষ। এ কিছু বলে না, অথচ সুষ্ঠুরূপে সবটা বুঝাইয়া দেয়। শ্রেষ্ঠ কবিতার মত এ একেবারেই গিয়া মর্ম্মে আঘাত করিয়া, আমাদের সমস্ত বৃত্তিগুলিকে বহির্ম্মুখী করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামাইয়া আনিতে চায়। উপদেশ অপেক্ষা যে উদাহরণ শ্রেয়ঃ—চিত্রই তাহার একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আমাদের সেকালে একটু মোটা, সোজা অথচ স্থায়ী জিনিসের বেশী আদর ছিল, কিন্তু একালে আমরা আদর করিতে শিখিয়াছি—উজ্জ্বল অথচ ক্ষণভঙ্গুরকে,—মিহি অথচ অস্থায়ীকে। এই চাকচিক্যের প্রতি সম্মান আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। আগে এককালীন কিছু বেশী ব্যয়ে অনেক দিনের সুযোগ হইত, এখন বহুবারের স্বল্পব্যয়ে নিত্য নূতন জিনিসের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। আগে সোনা-রূপা-পিত্তলকাঁসার জিনিসের দাম অবশ্য কিছু বেশী ছিল, কিন্তু এগুলি স্থায়ী হইত—অনেকদিন। আজকালের কাঁচের বাসন, ঝিনুকের বোতাম কম দামে পাওয়া যায়, কিন্তু নষ্ট হয় খুব সহজে। কাজেই মাসে মাসেই নূতনের ব্যবস্থা করিতে হয়। মূলতঃ ব্যয়টা অস্থায়ী সামগ্রীতেই বেশী লাগে। খাদ্য জগতেও ঐ কথা খাটে। আগে খাইতাম—মূল্যবান ও পুষ্টিকর ঘৃত, দুগ্ধ, চর্ব্য, চোষ্য,

লেহ্য, পেয়, এখন খাই দুই পয়সার গরম চা, এক পয়সার আঠার'ভাজা। ফলে যত রকম বাজে ও নকল মাল, যত রকম জাল জুয়াচুরি ও শঠতার আবির্ভাব হইয়াছে। বিদেশী—আমাদের উপর আমাদের এই আপাতমনোরমের প্রতি অনুরক্তির সুবিধা লইতেছে; কৃত্রিম ঘৃত, কুক্কুর, গাধা, শূকরের দুগ্ধ, গিল্টী করা চক্‌চকে গহনা, হাওয়ায় ছিঁড়ে—এমন ফুর্‌ফুরে পোষাক অল্পদামে সরবরাহ করিয়া আমাদিগকে রুগ্ন ও দুস্থ ও নিজেদিগকে ধন্য ও ধনী করিতেছে। বরিশালের গীতি কবি মুকুন্দ দাসের গান সার্থক :—

'খেতে ভাত সোনার থালে,
now satisfied steelএর থালে,
তোমার মত মূর্খ কি আর দ্বিতীয়টি মিলে ?'

আমাদের আদি মোটা ও স্থায়ী জিনিস অনাদরের তাপে শুকাইয়া গিয়াছে। তাই এই মহাসমরের দুর্ম্মূল্যের দিনে আমরা অনেকে যখন আমাদের সেই নিজস্বকে খুঁজিয়াছিলাম—তখন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তা'র জীর্ণ কঙ্কাল ব্যতীত আর কিছুই পাই নাই। বাণিজ্যের এই গ্লানি আমাদের অর্থ কমাইয়া দিয়াছে। বিদেশীয় চাকচিক্যের প্রতি এই সমাদর, এই কামনা আমাদের ঐ ক্ষয়িত অর্থ বিদেশে পাঠাইতেছে। এই অশুদ্ধ ও অসারে তৃপ্তি আমাদিগকে বাবু সাজাইতেছে বটে, কিন্তু আমাদের বস্তু আর কিছুই রাখিতেছে না। কাজেই আমরা ক্ষীণকায়, দুর্ব্বল ও নানারোগের আকর হইয়া পড়িয়াছি।

মঙ্গল চাহিতে হইলে আমাদের এই স্বকীয় বাণিজ্যকে আবার ফিরাইয়া আনিতে হইবে, নিজ বিশুদ্ধ খাদ্যের আবার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। ঘরের জিনিস ঘরে পাইয়া স্বাধীনতার একটা অপূর্ব্ব আনন্দে ভারতবাসীর মানসিক দৈন্য নিরাকৃত হইয়া যাইবে। পবিত্র আহার বিহারে শারীরিক স্বাস্থ্য আবার ফুটিয়া উঠিবে। আর চিরকালই বা আমাদের মোটা জিনিসে তৃপ্ত থাকিতে হইবে কেন? সর্ব্ববিষয়েই জগতে ক্রমোন্নতি ত আছেই। চেষ্টার ফলে আমাদের ঘরেই সুন্দর অথচ বিশুদ্ধ, চিক্কণ অথচ স্থায়ী, পুষ্টিকর অথচ সুখাদ্য জিনিস আমরা পাইতে পারিব। এ গেল সাধারণ জীবনের কথা।

এই অনুকরণ-প্রবৃত্তির ফলে আমাদের নৈতিক আদর্শও যথেষ্ট বদলাইয়া গিয়াছে। অনুকরণের একটা বিষম দোষ এই যে, এ নিজেকেও নষ্ট করে, পরকেও খর্ব্ব করে। এ আপন গৌরবকে ত হারাইয়া ফেলেই, পরন্তু যে আদর্শের পশ্চাৎ ধাবিত হয়—তাহাকেও 'খাস্ত' করিয়া ঘরে আনে। আমাদের নৈতিক আদর্শেও আমরা বিলাতি নীতিকে প্রবর্ত্তিত করিতে চাই, কিন্তু যাহার প্রবর্ত্তন করি—তাহা কিছুই নহে—বিলাতিও নয়, স্বদেশীও নয়। পূর্ব্বপুরুষ ভিক্ষুকমাত্রকে ভিক্ষা দিতেন। বিলাতি আদর্শ ডাকিয়া করিল—"সমর্থকে ভিক্ষা দিবে না; কারণ উহা indiscriminate charity" ফলে আমরা একেবারেই ভিক্ষা দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছি। বাড়ীর দুয়ারে যোগ্য বা অযোগ্য—যে কোন প্রকারের প্রার্থী আসিলেই দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়া, আমরা যেন পরম নৈতিক আনন্দ উপভোগ করি। কাজেই কত প্রকৃত গরীব অর্থাভাবে অনশনে মরিতেছে, কত দুঃস্থ-রুগ্ন রোগে ঔষধ পাইতেছে না। আবার আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা টাকার যে কোন লোককে [illegible]

ঘৃণা করিতেন। আমরা পাশ্চাত্য horserace, lottery প্রভৃতিতে টীকেট কিনিয়া বড় সুখী হই। এদিকে প্রতিবাসী দুঃখী অনাহারে শুকাইয়া মরে, ওদিকে আমাদেরই অর্থে এক ধনকুবেরের অর্থাধার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পাশ্চাত্যেরা দুইই বজায় রাখে; horserace এর যেমন টিকেট কিনে; orphanage এও তেমনই সাহায্য করে। আমরা অনুকরণ করিতে যাইয়া কোন দিকই বজায় রাখিতে পারি না। তাই আমি বরাবর বলিয়া আসিতেছি,—যা'র আদর্শ তা'র ভাল—কেননা তা'র সমাজে, তার দেশে ঐ আদর্শ বেশ খাপ খায়; কিন্তু বিভিন্ন সমাজে, সে আদর্শ সর্ব্বনাশের সূচনা করে।

এবার ধর্ম্মজীবনের কথা বলিয়া আজিকার মত বিদায় লইব। এখানেও অনুকরণের আব্ হাওয়া বহিয়া সব পর্য্যুসিত করিয়া দিয়াছে। অধুনা এমন অনেক ভারতবাসী আছে—যাহারা চার্চ্চেও যায় না, কৃষ্ণ আল্লাও ভজে না। তাহাদের পক্ষে ধর্ম্ম একেবারে নির্ব্বাসিত। ধর্ম্মজ্ঞান যাহাদের নাই—তাহারা না করিতে পারে—এমন কাজই নাই। এরা না মানে—জড়বাদীর মত ভৌতিক বা প্রাকৃতিক শাসন, না মানে ধর্ম্মের শাসন। যথা, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যও প্রাতরুত্থান করে না, বা সন্ধ্যাবন্দনাদির জন্যও না। সুতরাং প্রাতরুত্থানের মঙ্গল তাহারা উপভোগ করিতে পারে না। খাদ্যাখাদ্য বিষয়েও তাহাদের সহানুভূতি সার্ব্বজনীন। তাহারা দুনিয়ার সব খায়। সর্ব্বজাতির আদর্শ হইতে তাহারা আহারীয় সংগ্রহ করে। মুসলমান কুক্কুট খায়, কিন্তু শূকর বর্জ্জন করে। আবার সম্প্রদায় বিশেষ শূকর ভক্ষণ করিয়া তৃপ্ত রহে। তাহারা কিন্তু কুক্কুটও খায়, শূকরকেও অব্যাহতি দেয় না। দেশভেদে যে খাদ্যাখাদ্যের ও আচার ব্যবহারের বিভিন্নতা হওয়া উচিত; এটা তাহারা বোঝেনা ও মানেনা। কিন্তু ফল যা' দাঁড়ায়—তা' নিতান্ত শুভকর নহে। মানুষ দোষ ক্ষমা করিতে জানে, কিন্তু প্রকৃতি কাহাকেও ক্ষমা করে না। নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য ভিক্ষুক হইতে আরম্ভ করিয়া রাজাকে পর্য্যন্ত ব্যাধিভোগ করিতে হয়।

শেষকথা, একদিন যে আদর্শকে পোষণ করিয়া ভারতবাসী বরেণ্য হইয়াছিল, মনে করিতে হইবে—সেই আদর্শই ভারতের পক্ষে হিতকর। সেই আদর্শকেই সর্ব্বান্তঃকরণে পুষ্ট করা আমাদের কর্ত্তব্য। অন্যে দেশকাল পাত্রভেদে যে ভিন্ন আদর্শকে বরণ করিয়া উন্নত হইয়াছে, তাহার অনুকরণ করিয়া আমাদের উন্নতির সম্ভাবনা নাই – কারণ তাহা আমাদের নিজস্ব নহে। নিজস্বকে বড় করিবার জন্যই মানুষ জন্মে—এ সর্ব্বধর্ম্মের কথা। অতএব সকলের নিজস্বকেই আশ্রয় করা উচিত। ইহা স্বার্থ নহে; পরন্তু ইহাই পরার্থপরতার নিদান। উপলখণ্ড যেমন আগে নিজের শরীরেই বালুকা জড়াইতে জড়াইতে শেষে এক বিরাট চড়ার সৃষ্টি করে, মানুষও সেইরূপ নিজস্বকে বড় করিতে করিতে সমগ্র জগৎকে আলিঙ্গন করে। self realisation সর্ব্বশ্রেষ্ঠধর্ম্ম। charity begins at home—বিশ্বপ্রেমের জন্ম—গৃহকোণেই হইয়া থাকে।

নিজস্বকে বড় করিতে থাকিলে আমরা দেখিব—আর আমরা দলিত ক্ষুণ্ণ নহি, স্বাস্থ্য-গৌরবে, আয়ুর প্রসারে আয়ুর্ব্বেদের মুখ আবার উজ্জ্বল হইয়া জগতে আবার এক নূতন যুগের প্রতিষ্ঠা করিয়া তুলিয়াছে।

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ,

চরকোক্ত পঞ্চকর্ম্ম সাধন।

—:০:—

দুর্ব্বল, শোধিত কিংবা অঙ্গদোষ যা'র।
মৃদু ঔষধ দিবে কোষ্ঠ অজ্ঞাত যাহার॥
অল্পৌষধ বারে বারে পীড়াকর নয়।
অতি তীক্ষ্ণ প্রয়োগিলে জীবন সংশয়॥
দুর্ব্বলীর বহু দোষে দিলে বিরেচন।
অল্প অল্প বহুবারে করিবে অর্পণ॥
ঔষধ মৃদুতা হেতু দোষ বিনিঃসৃত।
না হইলে প্রাণহানি হইবে নিশ্চিত॥
ঊর্দ্ধে কফাবৃত হ'য়ে অধোগামী হলে।
লঙ্ঘন করিবে, তাহা নাশিয়া কবলে॥
পূর্ব্বাপেক্ষা কফ ক্ষীণ হইলে তৎপরে।
বমন প্রয়োগ পুনঃ বৈদ্যগণ করে॥
বহু দোষ অল্পে অল্পে বিলম্বে স্রাবিত।
হ'লে বিরেচনে, উষ্ণ জল পানে হিত॥
তাহাতে আধ্মান, তৃষ্ণা, বিবদ্ধ অপর।
বমি বিদূরিত হ'বে জানিবে সত্বর॥
শোধন ঔষধ যদি দোষে রুদ্ধ রয়।
ঊর্দ্ধ কিবা অধোদিকে নিঃসৃত না হয়,
উদ্গার বা অঙ্গশূল হয় যদি তায়।
স্বেদ প্রয়োগের বিধি জানিও তথায়॥
ঔষধের সঙ্গে যদি উদ্গার সহিত।
বাহিরায় বিরেচন হ'লেও বিহিত॥
তবে সে ঔষধ বমি করিয়া ফেলিবে।
নহে অতি বিরেচন তাহাতে হইবে॥
অতিশয় বিরেচন তাতে যদি হয়।
শীতল প্রক্রিয়া করি নিবে শুভ চয়॥
কখন ঔষধ বক্ষে কফে রুদ্ধ করে।
কফ ক্ষীণ হ'লে রাত্রে সন্ধ্যায় বা পরে॥
রুক্ষ অনাহারে জীর্ণ, ঔষধ হইলে।
অজীর্ণে বিষ্টব্ধ বাতে ঊর্দ্ধগত হলে॥
পুনর্ব্বার সে ঔষধ স্নেহ ও লবণ।
সংযোগে প্রয়োগ করে শ্রেষ্ঠ বৈদ্যগণ॥
তৃষ্ণা, মোহ, ভ্রম, মূর্চ্ছা জীর্ণৌষধে হয়।
পিত্তঘ্ন, শীতল স্বাদে ঔষধ দিতে হয়॥
সে সব ঔষধ যদি কফাবৃত রয়।
বিষ্টম্ভ, লালাহৃল্লাস লোমহর্ষ হয়॥
তাহাতে তীক্ষ্ণোষ্ণ কটু কফ বিনাশক।
ঔষধ প্রয়োগ পুনঃ করিবে ভিষক॥
সুস্নিগ্ধ ও ক্রূর কোষ্ঠে লঙ্ঘনাদি দিবে।
স্নেহ জাত শ্লেষ্মা, তার বিবদ্ধ নাশিবে॥
রুক্ষ, বহু কফ, ক্রূর কোষ্ঠ দীপ্তানল।
বিরেচন জীর্ণ করে ব্যায়ামী সকল॥
বস্তি দিয়া পরে এতে দিলে বিরেচন।
দোষ হরি শীঘ্র তাহা হয় নিঃসরণ॥
রুক্ষ ভোজী পরিশ্রমী দীপ্তাগ্নির দোষ।
পরিশ্রম বাতাতপ অনলে নির্দ্দোষ॥
বিরুদ্ধ অজীর্ণাহার অধ্যশন কৃত।
পীড়া হলে ঐ উপায়ে হয় প্রশমিত॥
উহাদের স্নেহ বিধি বায়ু রক্ষা তরে।
বিরেচন নাহি দিবে বিনা রোগান্তরে॥
অতি স্নিগ্ধে নাহি দিবে স্নেহ বিরেচন॥
স্নেহোৎক্লিষ্ট দেহে দিবে রুক্ষ বিরেচন॥
ইহা জ্ঞাত হ'য়ে জ্ঞানী দেশ কাল আর।
পরিমাণ অনুসারে করিয়া বিচার॥
বিরেচন যোগ্য জনে দিলে বিরেচন।
অপরাধী নাহি হয় সে জন কখন॥
সু.প্রয়োগে সুধাসম ভ্রমে বিষবৎ।
কালে যত্ন করি পান করিবে তাবৎ।
মৃদুকোষ্ঠে [illegible] দিনে সপ্তাহ [illegible]।
স্নেহপান করি [illegible]

সপ্তাহের পরে তারে স্বেদ দিতে হয়।
স্নেহসাত্ম্য সপ্তাহান্তে হইবে নিশ্চয়॥
স্নেহ বায়ুনাশ আর দেহ মৃদু করে।
মলের বিবদ্ধ নাশ হয় তার পরে॥
স্নেহ প্রয়োগের পরে স্বেদ দিলে তায়।
সূক্ষ্ম স্রোতে লীন দোষ দ্রব হয়ে যায়॥

শ্রীরাসবিহারী রায় কবিকঙ্কণ।

আয়ুর্ব্বেদে ওলাউঠা।

(চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ)

—:*:—

অনেকে বলেন, ম্যালেরিয়ার মত ওলাউঠা রোগও আমাদের দেশে নূতন। ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে এ রোগ আমাদের দেশে ছিল না, ভারত ইংরাজাধিকৃত হওয়ার পর ম্যালেরিয়া এবং ওলাউঠা আমাদের দেশে নূতন প্রবেশ করিয়াছে এবং এই জন্যই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এই দুইটি রোগের কোনো প্রকার চিকিৎসা নাই।

যাহারা এ কথা বলেন, তাঁহাদের কথা যে ভ্রমপূর্ণ—তাহা আমরা গত বর্ষের "আয়ুর্ব্বেদে" ম্যালেরিয়া বিষয়িণী কয়েকটি প্রবন্ধে বিশেষ ভাবে প্রমাণ করিয়াছি। ম্যালেরিয়া নাম আমাদের দেশে—নূতন হইলেও উহা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বিষমজ্বরের অন্তর্গত—এবং সেই জন্য অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় কুইনাইনের সাহায্যে ইহা যাপ্য ভাব অবলম্বন করিলেও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় ইহা সম্পূর্ণ আরোগ্যের ক্ষমতা আছে। ম্যালেরিয়ায় যাঁহারা নাটা এবং হরিতাল ঘটিত ঔষধের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারাই আমাদের এ কথায় যাথার্থ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন। আমরা সে সব কথার আলোচনা—গত বৎসর যথেষ্ট করিয়াছি; সময়ান্তরে আরও করিব।

আমাদের অদ্যকার আলোচ্য বিষয়ে—ওলাউঠা বা বিসূচিকা চিকিৎসা—আয়ুর্ব্বেদে কিরূপ ফলপ্রদ তাহাই দেখাইব। ওলাউঠার ইংরাজী নাম কলেরা। আয়ুর্ব্বেদে ইহাকে বিসূচিকা বলে। বিসূচিকারই বাঙ্গালা নামকরণ হইয়াছে—ওলাউঠা।

আয়ুর্ব্বেদ বলেন—সাধারণতঃ অজীর্ণ হইতে বিসূচিকার উৎপত্তি এবং এই পীড়ায় অজীর্ণ বশতঃ বায়ু অতিকুপিত হইয়া গাত্র সকলকে অন্যান্য বেদনা অপেক্ষা সূচীবেধবৎ বেদনায় অধিকতর অস্থির করে বলিয়া বৈদ্যেরা ইহাকে বিসূচী নামে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। যথা—

"সূচীভিরিব গাত্রাণি তুদন্ সন্তিষ্ঠ তেহনিলঃ।
যস্যাজীর্ণেন সা বৈদ্যৈ বিসূচীতি নিগদ্যতে॥"

যাহারা পরিমিতাহারী—তাহাদিগকে এই রোগ আক্রমণ করিতে পারেনা। আহার বিষয়ে অমিতাচারী, অজিতেন্দ্রিয় ও যাহারা অশনলোলুপ—তাহারাই এই পীড়ায় সাধারণতঃ আক্রান্ত হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর

পল্লীগ্রামে যখন ওলাউঠা আরম্ভ হয়—তখন ইতর জাতীয়ের মধ্যেই এই জন্য এই রোগের প্রথম আক্রমণ হইতে দেখা যায় এবং ভয়ে বা অন্য কারণে ক্রমে ভদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে এই রোগ সংক্রামিত হইলেও সংখ্যায় ইতর জাতীয়গণই অত্যধিক পরিমাণে এই রোগে কালকবলিত হইয়া থাকে।

ইতর সম্প্রদায়ের মধ্যে এই রোগে মৃত্যুর আধিক্যের একটি বিশেষ কারণ,—সংখ্যায় তাহারাই তো এই রোগে অধিক পরিমাণে আক্রান্ত হয়ই, তা' ছাড়া রোগাক্রমণে উপযুক্ত চিকিৎসা এবং সুশ্রূষাও তাহাদিগের ভাগ্যে বড় একটা ঘটে না—কিন্তু যদি সুশ্রূষা এবং উপযুক্ত চিকিৎসায় তাহাদিগকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করা যায়—তাহা হইলে এই রোগের মৃত্যুর পরিমাণ বোধ হয় অনেক হ্রাস পাইতে পারে।

হোমিওপ্যাথিতে এই রোগের চিকিৎসায় সাধারণের প্রগাঢ় বিশ্বাস। আজকাল ইন্‌জেক্‌সনের প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে, সেইজন্য অনেকে অ্যালোপাথিক চিকিৎসকেরও শরণাপন্ন হন, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদে ইহার যে সকল উৎকৃষ্ট ঔষধ ও ব্যবস্থা রহিয়াছে, সাধারণতঃ অনেকেই তাহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন, সেইজন্য অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের ভাগ্যেই এ রোগের চিকিৎসা করা—বড় একটা ঘটিয়া উঠে না।

আমি যখন রাণাঘাটে ছিলাম—তখন পল্লীর মধ্যে কয়েকটি রোগীকে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় আরোগ্য করিয়াছিলাম। সেই বিবরণ গুলি নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত—সকল বিষয়েই নদীয়া জেলার রাণাঘাট প্রধান আসন পাইবার উপযুক্ত। রাণাঘাট-মিউনিসিপ্যালিটি রাণাঘাটবাসীর স্বাস্থ্যরক্ষাকল্পে আটত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া পাকা ড্রেণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু ড্রেণ নির্ম্মাণের পর ঐ সকল রোগগুলি রাণাঘাটে যেন আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে।

যাউক সে কথা। সে বৎসর রাণাঘাটে খুবই কলেরার প্রাদুর্ভাব। আমি একদিন দ্বিপ্রহরবেলায় রোগী দেখিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলে, প্রতিবাসী একজন ভদ্রলোক আমায় ডাকিতে আসিলেন। বলিলেন,—"তাঁহার বাটীতে একজনের কলেরা হইয়াছে, আমাকে যাইতে হইবে।" রাণাঘাটে অ্যালোপাথিক চিকিৎসকের অভাব নাই, হোমিওপ্যাথও ২।৩ জন রহিয়াছেন—সাধারণতঃ কলেরা রোগে রাণাঘাটে হোমিওপ্যাথিরই যথেষ্ট আদর—এ অবস্থায় আমার ডাক পড়িল বলিয়া আমি একটু আশ্চর্য্য হইলাম। যাহা হউক বলিলাম—"আপনি অগ্রগামী হউন, আমি অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া যাইতেছি।"

ভদ্রলোক চলিয়া গেলেন। আমিও অতিশীঘ্র স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলাম।

রোগী—স্ত্রীলোক—যুবতী। প্রাতঃকাল হইতে রোগ—প্রকাশ পাইয়াছে, একটু ভাল করিয়া জানিলাম—ভোর রাত্রিতে নহে—প্রাতঃকালেই রোগের সূচনা। ভোর রাত্রের কথাটা ভাল করিয়া জানিবার কারণ,—আমার মত কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিকিৎসকের বিশ্বাস—ভোর রাত্রিতে কলেরা আরম্ভ হইলে স্বয়ং মহাদেবও তাহাকে ফিরাইতে পারেননা।

যাহা হউক, গিয়া দেখিলাম—রোগিণী

দাস্ত প্রাতঃকাল হইতে ১৫ বার হইয়াছে, দাস্ত পাতলা—আঁসধোয়া জলের মত। বমিও কয়েকবার হইয়াছে। পিপাসা যথেষ্ট, তল-পেটে শূলবদ্‌ বেদনা, হাতে পায়ে খালি ধরা, গাত্রদাহ, মধ্যে মধ্যে কম্প, বক্ষোবেদনা—কোনো উপদ্রবেরই বড় একটা বাকী নাই। তবে মূর্চ্ছা বা ভ্রমের চিহ্ন দেখিলাম না।

আয়ুর্ব্বেদে বিসূচিকা রোগের নিদানে উল্লিখিত হইয়াছে—

"মূর্চ্ছাতিসারৌ বমথুঃ পিপাসা
শূলো ভ্রমোদ্বেষ্টন জৃম্ভদাহাঃ।
বৈবর্ণ কম্পৌ হৃদয়ে রুজশ্চ
ভর্বান্ত তস্যাং শিরসশ্চ ভেদঃ॥"

এ লক্ষণ গুলির সহিত মিলাইলে রোগিণীর প্রায় সকল লক্ষণগুলিই যুগপৎ উপস্থিত হইয়াছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আর কাহাকেও ডাকা হইয়াছিল।"

শুনিলাম—না, রোগিণীর অম্লের পীড়া আছে, মধ্যে মধ্যে দম্‌কা দাস্ত হয়—সেইজন্য প্রথমতঃ অম্ল বলিয়াই উপেক্ষা করা হইয়াছিল।

রোগিণীর অম্লের পীড়া ছিল শুনিয়া আমার কিন্তু ইঁহার রোগনির্ণয়ের একটু সুবিধা হইল। অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে যদিও ইহাকে কলেরা ভিন্ন এখন অন্য কিছুই বলা যায় না, কিন্তু ইহার মূলকারণ বুঝিলাম অম্ল। সেই জন্য তাঁহাকে বিসূচিকা অধিকারের কোনো ঔষধের ব্যবস্থা না করিয়া গ্রহণী অধিকারোক্ত "চিত্রকাদিগুড়ি"র ১বটি শুদ্ধ শীতল জল সহ প্রয়োগ করিলাম। এই ঔষধটি গ্রহণী অধিকারোক্ত হইলেও আমি অম্লপিত্ত ও অজীর্ণ অবস্থায় খুব বেশী ব্যবহার করিয়া থাকি এবং সকল স্থলেই বিশেষ ফল পাই। কলেরার পূর্ণ প্রকট অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিবার কারণ,—এই কলেরাক্রান্তা রোগিণীর অম্লপিত্ত ছিল এ পরিচয় পূর্ব্বেই পাইয়াছি—সুতরাং বর্ত্তমানে ইহা কলেরা হইলেও ইহার মূল কারণ অম্লপিত্ত। সেইজন্য

"রোগমাদৌ পরীক্ষেত তদনন্তর মৌষধম"

—এই ঋষিবাক্য যদি মানিতে হয় তাহা হইলে আমি যে ঔষধ ব্যবহারে অম্লপিত্তে যথেষ্ট ফল পাইয়া থাকি—সেই অম্লপিত্তই যদি ইহার মূল রোগ হয়, তাহা হইলে বিসূচিকা অধিকারের অহিফেন ঘটিত ঔষধ ব্যবহারে উপকার না হইয়া বরং উগ্রবীর্য্য ঔষধে কুফলই ফলিবে, এ ঔষধ স্নিগ্ধবীর্য্য, পাচক ও আমদোষনাশক, সুতরাং ইহাতেই ফল হইবে।

যাহা হউক ঔষধের ১ মাত্রা প্রয়োগেই ঔষধের গুণ প্রকাশ পাইল। এক ঘণ্টার মধ্যে আমি আর কোনো ঔষধ দিলামনা, কিন্তু এই এক ঘণ্টার মধ্যে রোগিণীর দাস্ত আর আঁসধোয়া জলের মত হইল না, ১ বার মাত্র দাস্ত হইল—কিন্তু তাহাতে মলের সঞ্চার হইয়াছে দেখা গেল। বমিও আর হইলনা, কিন্তু বমনোদ্বেগ রহিল, তাহা নিবারণের জন্য বড় এলাইচভিজানজল—পিপাসার সময় দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, এক ঘণ্টার মধ্যে বমনোদ্বেগ কমিলনা দেখিয়া—ধনে, মৌরি ও কর্পূর তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া সেই জল দিবার ব্যবস্থা করিলাম।

এক ঘণ্টা পরে এক মাত্রা বজ্রক্ষারের ব্যবস্থা করিলাম। আর ১ বার দাস্ত হইল, তাহাতেও সামান্য মল বুঝা গেল। আর একটি চিত্রকাদি গুড়ি এই সময় ব্যবস্থা করিলাম। ইহা ভিন্ন নাভির চতুর্দ্দিকে 'বায়ফল'

বাটিয়া প্রলেপ দেওয়ার ব্যবস্থা করিলাম। ফলে দাস্ত ও বমন বা বমনেচ্ছা দুই-ই বন্ধ হইল। আমি ভগবানকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিলাম।

ঐ রোগীকে আর বড় বেশী ঔষধ দিতে হয় নাই,—ঐ চিত্রকাদিগুড়ি এবং এক আধ মাত্রা বজ্রক্ষারেরই ব্যবস্থায় ৩ দিন রাখিয়া ছিলাম—তাহাতেই রোগিণী নিরাময় হইয়া উঠিয়া ছিলেন। ২ দিনের পর রোগিণীর আর যখন কোনো উপসর্গ থাকিল না, তখন পথ্য দিলাম—জলবার্লি এবং চারি দিনের পর পথ্য দিলাম—গন্ধ ভাদুল্যার ঝোল ও ভাত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন।

আবার।

—:*:—

(১)

কোকিল-কূজিত কুঞ্জে আবার
ফুটেছে সুষমা রাশি;
নবীন পুলক পরশি' মলয়
ফুটায় ফুলের হাসি।
নব চেতনার স্পন্দন ভরা
বিশ্বের চারি ধার;
নবীন আলোকে ভূলোক দ্যুলোক
পুলকেতে একাকার।
চৌদিকে নব জাগরণে জাগে,
স্বাস্থ্যের নব বল;
সৌম্য শান্ত শোভা-সজ্জিত
বঙ্গের সমতল।

(২)

স্মরণ অতীত যুগের এমনি
প্রভাতী আলোকে জাগি';
ভারতের ঋষি প্রচারিলা জ্ঞান—
বিশ্ব হিতের লাগি'।
ত্রিতাপ-তপ্ত মানবের তরে
জ্ঞানের ত্রিধারা ঢালি';
দাঁড়াইলা আসি ব্রাহ্মণ ল'য়ে,
বিজ্ঞান বেদ ডালি।
অবাক হইয়া চাহিয়া দেখিলা
বিশ্বের যত জন,
সম্ভ্রমে নত মস্তকে সবে
বন্দিলা সে চরণ।

(৩)

বিশ্বের গুরু নিঃস্ব হইয়া
শিষ্যকে দিলা দান;
বরিয়া লইলা দৈন্য আপনি;
অহো কি মহান প্রাণ!
ত্যাগের মন্ত্রে লইলা দীক্ষা,
বর্জ্জিয়া ভোগ-আশা;
রম্য হর্ম্ম তুচ্ছ করিয়া
বনেতে বাঁধিলা বাসা।
বিতরিতে জ্ঞান, গোত্রের মাঝে
যজ্ঞের আয়োজন;
পরিচয়ে হই ধন্য আজিও,
স্মরিয়া সে তপোবন!

(৪)

লুপ্ত হ'য়েছে ত্যাগের মন্ত্র,
ভোগে ভরা ধরাধাম ;
সুপ্ত কর্ম্মী, গুপ্ত পন্থা,
স্মৃতি মাঝে শুধু নাম।
আবার এ নব প্রভা-প্রদীপ্ত
প্রভাতী আকাশে আজি ;
ধ্বনিয়া উঠুক সে মহামন্ত্র—
শঙ্খ উঠুক বাজি'।
কর্ম্ম ক্ষেত্রে কর্ম্মী আবার
আসুক সকলে ফিরে ;
জাগুক আবার ভারত জননী
জ্ঞানের মুকুট শিরে।

(৫)

আবার ভারত-সন্তান সব
এ নব আলোকে জাগি' ;
শিখিতে কর্ম্ম-কৌশল, হও
নূতনের অনুরাগী।
পুরাতন সহ মিলাও নূতন,—
মণি কাঞ্চন যোগ ;
হইবে ধন্য, ঘুচিবে দৈন্য,
দূরে যা'বে রোগ শোক।
আয়ুর্ব্বেদের বিজয় বাদ্য
এ নব প্রভাতে আজি ;
বিশ্বের মাঝে গুরু গম্ভীরে
আবার উঠুক বাজি'।
ব্যাধি মর্দ্দিত শরীরে আবার
করিতে স্বাস্থ্য দান ;
আবার অমৃত কুণ্ডের ধারা,
হউক প্রবহমান্।
আবার বঙ্গ পল্লীর মাঝে,
দীনের কুটির দ্বারে ;
বহন করিয়া স্বাস্থ্য তত্ত্ব,
বিতরণ কর তা'রে।
আবার দীনের পীড়িত অঙ্গে,
বুলাও স্নেহের কর ;
করহ ধন্য জন্ম জীবন,
হে ঋষি বংশধর।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

—:০:—

আবগারি আয়।—বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের অর্থ সচিব সার হেনরি হুইলার বলিয়াছেন, "আবগারি আয় অতিক্রুত বর্দ্ধিত হইয়া আমাদের অর্থাগমের প্রধান উপায় ও নির্ভর স্থল হইতেছে। এবার আমাদের আবগারি আয় ৯ লক্ষ বর্দ্ধিত হইয়া ১ কোটী ৮৪ লক্ষ হইবে। হুগলি, হাওড়া, ২৪ পরগণায়, দেশী মদের কাটতি বৰ্দ্ধিত হওয়ায় আমাদের আয় বৃদ্ধি হইয়াছে।" কিন্তু এই আয় বৃদ্ধিতে দেশ বাসীর যে সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে—ইহাই বিশেষজ্ঞ দিগের চিন্তা করিবার বিষয়। এ দেশের লোকে হাড়ভাঙ্গা খাটিয়াও

উদরান্নের সংস্থান করিতে পারে না, কিন্তু মদ্যপানে এত অধিক অর্থ বঙ্গবাসী প্রদান করিতেছে। লজ্জার কথা বটে। ক্লেশ ও দারিদ্র্য এই মদ্য পানের ফল। স্বাস্থ্যহানি তাহারই জ্বলন্ত প্রতিমূর্ত্তি।

শিশু মৃত্যু।—কলিকাতা এবং ভারতবর্ষের বড় বড় সহরে যত শিশু জন্ম গ্রহণ করে, তাহার অর্দ্ধেকগুলি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। হিসাবে বঙ্গদেশ সম্বন্ধে এইরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বাঙ্গালায় ৩টি জন্মিলে এক বৎসরের মধ্যে উহার ১টী মরিয়া যাইবে। বিলাতে শিশুমৃত্যু নিবারণের জন্য প্রত্যেক নগরে শিশু চিকিৎসার স্বতন্ত্র হাসপাতাল আছে ইহা ভিন্ন নানাবিধ উপায়ে সেখানে শিশুমৃত্যু, রোধের চেষ্টা চলিতেছে। ভারতবর্ষ কিন্তু এ সম্বন্ধে একেবারেই নিদ্রিত।

যক্ষ্মারোগ।—বাঙ্গালায় যক্ষ্মারোগীর সংখ্যাও দ্রুত বর্দ্ধিত হইতেছে। স্বাস্থ্য বিভাগের রিপোর্টে প্রকাশ—বাঙ্গালার কোনো কোনো স্থানে মৃত ব্যক্তির দশমাংশ ব্যক্তি এই যক্ষ্মারোগে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। এক্ষণে খুব সম্ভব ৪ লক্ষ লোক এই ভীষণ ব্যাধিতে আক্রান্ত। কিন্তু বক্তৃতাবীর উদ্যোগী বাঙ্গালীগণ এ সম্বন্ধে প্রতীকারের ভাবনা ভাবিতেছেন কি?

যক্ষ্মার কারণ।—স্বাস্থ্যকমিশনর ডাক্তার বেণ্টলী বলিয়াছেন,—"এ দেশের মিঠাইয়ের দোকানগুলিতে সর্ব্বদাই মাছি ভন্ ভন্ করিয়া থাকে। মাছিগুলি পচা ও দুর্গন্ধময় স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহাদের সর্ব্বাঙ্গই রোগবীজাণুপূর্ণ। এই এই সকল মাছি খাদ্যদ্রব্যের উপর রোগের বীজাণু নিক্ষেপ করে। এক বাটী দুধের উপর ইহার একটি মাছি বসিয়াও মিনিটে ঐ দুধের মধ্যে দুই সহস্র রোগ বীজাণু এবং অর্দ্ধ ঘণ্টা বসিয়া ৩ লক্ষ ৫০ হাজার বীজাণু নিক্ষেপ করিয়া যায়। মাছির দ্বারা কলেরা টায়ফয়েড প্রভৃতি রোগবীজাণু তো ব্যাপ্ত হয়ই, যক্ষ্মারোগের প্রাবল্যও মাছি দ্বারা হইয়া থাকে। দোকানের খাবারগুলি যাহাতে অনাবৃত না থাকে, তাহার জন্য কর্তৃপক্ষের কঠোর নজর থাকিলেই কিন্তু ইহার প্রতীকার হইতে পারে।

যক্ষ্মায় আমাদের মত।—ডাক্তার বেণ্টলী বাঙ্গালা দেশে যক্ষ্মারোগের বৃদ্ধির জন্য যে কারণ দর্শাইয়াছেন, তাহা যে অমূলক তাহা আমরা বলিতেছিনা, কিন্তু ইহাপেক্ষাও ভীষণ কারণ—বাঙ্গালার দারিদ্র্য। বাঙ্গালী পুষ্টিকর খাদ্য পায়না—অথচ তাহাকে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতে হয়। বাঙ্গালী যে পরিমাণ উপার্জ্জন করে, বাঙ্গালীর পরিবার বর্গের ব্যয় তাহার দ্বারা সংকুলান হয় না, কাজেই তাহাকে যক্ষ্মা বা ক্ষয়ের প্রধান কারণ দুশ্চিন্তা বিষে অনেক সময়ই জর্জ্জরিত থাকিতে হয়। ইহা ভিন্ন এখনকার দিনে বাঙ্গালী কন্যাদায়ে এতই বিব্রত যে, কিরূপ পাত্রে কত বয়সের পার্থক্য রাখিয়া কন্যাকে পাত্রস্থ করা উচিত—বাঙ্গালীর এখন আর সে চিন্তার অবকাশই নাই—তাহার ফলে বাঙ্গালী স্ত্রী-পুরুষের মিলনে এখন অনেকস্থলে অসামঞ্জস্য দোষ ঘটিতেছে। ফলে ব্রহ্মচর্য্য হীন বাঙ্গালীর স্ত্রীপুরুষের মিলনে বয়োবিচারও নাই, বিধি-নিষেধ-নিয়ম-পদ্ধতি—সকলই বঙ্গীয় সমাজ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালায় যক্ষ্মা বৃদ্ধির ইহা একটি প্রধান কারণ।

ব্যবস্থাপকসভায় পল্লীচিন্তা।—বাবু ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর প্রশ্নোত্তরে

গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে মিঃ ওমেলি জানাইয়াছেন,—"পল্লীগ্রামে স্বাস্থ্য গঠনের চেষ্টা করা হইতেছে।" আমরা এ সংবাদে সুখী হইলাম।

আয়ুর্ব্বেদের নিন্দা।—ডাক্তার লেফ্‌টনাণ্ট কর্ণেল সাদার ল্যাণ্ড—ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেটে "আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা" প্রণালীর নিন্দা করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার কথা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-প্রণালীর মূলে অন্ধ কুসংস্কার নিহিত। আমরা বলি—এই নিন্দাকারী ডাক্তার সাদার ল্যাণ্ড আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা যে কিরূপ বিজ্ঞানসম্মতভাবে রচিত—তাহার কিছুই বোঝেন না। যদি তিনি কোনো আয়ুর্ব্বেদীয় অধ্যাপককে গুরুপদে বরণ করিয়া চরক এবং সুশ্রুতের সমস্ত পৃষ্ঠা গুলি অধ্যয়ন করিতে পারেন, তবেই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার মূলে অন্ধ কুসংস্কার নিহিত কি ইহা সকল চিকিৎসা শাস্ত্রের মূলগ্রন্থ—তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতে পারেন। সার পারডিলি উকিস্, মার্কিন যুক্ত রাজ্যের ফিলাডেলফিয়ার ডাক্তার ক্লার্ক প্রভৃতি মহাত্মাগণ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা তাহা বিলক্ষণই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে ডাক্তার পারডিলিউকিস্ বলিয়াছিলেন "যত অধিক দিন আমি ভারতবর্ষে থাকিতেছি—এ দেশের সহিত আমার পরিচয় যত বর্দ্ধিত হইতেছে, এ দেশের বৈদ্য এবং হাকিমদের চিকিৎসার মূল্য আমি তত অধিক বুঝিতে সক্ষম হইতেছি।" ডাক্তার ক্লার্কও এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"যদি চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে আধুনিক সমস্ত ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্যের নাম তুলিয়া দিয়া চরকের প্রণালীমতে চিকিৎসা করা হয়, তাহা হইলে চিকিৎসকের কার্য্য কমিবে এবং পৃথিবী হইতে পুরাতন ব্যাধি পীড়িতের সংখ্যা অনেক হ্রাস পাইতে পারিবে।" ডাক্তার সাদারল্যাণ্ড কি এ সকল অভিমতও পড়িয়া দেখেন নাই? যে চিকিৎসা সহস্র সহস্র বৎসর হইতে ভারতে চলিয়া আসিতেছে, নানা প্রকার ঘাত প্রতিঘাতেও যে চিকিৎসাপ্রণালী লোপ পায় নাই—যে চিকিৎসা শাস্ত্র—হইতে মকরধ্বজ প্রভৃতি ঔষধ লইয়া অন্য চিকিৎসকেরা কৃতিত্ব দেখাইতেও রাজি—সে চিকিৎসা সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে ইহার সকল তথ্য অবগত হওয়া উচিত নহে কি?

ঔষধের চাষ।—যুদ্ধের সময় ইউরোপ হইতে ঔষধ আমদানি করার সুবিধা না হওয়ায় ভারতের নানা স্থানে ভেষজ উৎপন্নের ব্যবস্থা করা হয়। সে চেষ্টার ফলে বেলেডোনা, ইপেকাকোহানা পডোফিলাম, নক্সভমিকার চাষ চলিতেছে। ভারতবাসীর এ সম্বন্ধে আরও বিশেষ চেষ্টাশীল হওয়া কর্ত্তব্য।

সহরের স্বাস্থ্য।—কলিকাতার স্বাস্থ্য ক্রমশঃই শোচনীয় হইতেছে। ওলাউঠা, বসন্ত প্লেগ ও ইনফ্লুয়েঞ্জায় কলিকাতাবাসীগণ তো ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেনই, তাহার উপর প্লেগও আমদানি হইতেছে। সহরবাসীর এ সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন কর্ত্তব্য।

মাদকতা নিবারণ।—কাঠিবার নগর রাজ্যের মহারাজা বাহাদুর তাঁহার জন্ম দিন উপলক্ষে তাঁহার রাজ্য হইতে সমস্ত মদের দোকান তুলিয়া দিবেন। ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলিতে এ ব্যবস্থা হয় না?

সমালোচনা।

বৈদ্যজাতির স্বরূপ নির্ণয়।—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র মোহন সেন গুপ্ত প্রণীত ও ৯ নং শ্যামাচরণ দের ষ্ট্রীট—কলিকাতা হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।৵০ আনা। এই পুস্তকে বৈদ্যজাতি অম্বষ্ঠ এবং অম্বষ্ঠ জাতির উৎপত্তি, অম্বষ্ঠ শব্দের উৎপত্তি এবং অম্বষ্ঠদিগের বৃত্তি, অনুলোম জন্ম, বৈধবিবাহ বিধি, বিবাহ প্রণালী, কর্ত্তা ও ভার্য্যার একত্ব, অনুলোম বিবাহে দ্বিজভার্য্যা পত্নীপদবাচ্য, জন্ম বিষয়ে ক্ষেত্র অপেক্ষা বীজের প্রাধান্য, বৈদ্যের জন্ম গৌরব, বৈদ্য ব্রাহ্মণ বর্ণ, বৈদ্যের কর্ম্মাধিকার অপসদ বৈদ্য, বৈদ্য শব্দের অর্থ এবং বৈদ্যের শ্রেষ্ঠত্ব, মূর্দ্ধাভিষিক্ত জাতিও বৈদ্যনামে অভিহিত, বৈদ্যের পূজ্য, আয়ুর্ব্বেদ ও অথর্ব্ব বেদের প্রামাণিকতা, আয়ুর্ব্বেদ ও চিকিৎসাবৃত্তির শ্রেষ্ঠত্ব, কু বৈদ্য পংক্তি দূষক ও পূজ্য নহে, সদ্বৈদ্য পংক্তি পাবন—এই সকল বিষয়ের আলোচনা শাস্ত্র প্রমাণ সহ অতি সুন্দররূপে মীমাংসিত হইয়াছে। ঐ সকল প্রমাণ দেখাইতে গিয়া গ্রন্থকার প্রত্যেক শ্লোকার্থের পরই যে সকল বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, সেগুলি গ্রন্থকারের জ্ঞান গভীর গবেষণা সম্ভূত। যে সকল যুক্তি অবলম্বনে তাঁহার বক্তব্য লিখিত, তাহা পড়িয়া আমরা বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। এখনকার দিনে সংসার তাড়নে ব্যতিব্যস্ত হইয়া দেশের চিন্তা—সমাজের চিন্তা—স্বজাতির চিন্তা করিবার অবসর বড় একটা কাহারও নাই, সে প্রবৃত্তিও বুঝি সাধারণের মধ্য হইতে লোপ পাইয়াছে। একাকারের প্রাদুর্ভাব ইহারই ফলসম্ভূত এবং সেই একাকারের প্রবল বাত্যায় আমাদের দেশ হইতে যে ধর্ম্মভাব নষ্ট হইতে বসিয়াছে, বাঙ্গালার রোগপ্রবণতা তাহারই কারণ। এই বাত্যাবিক্ষুব্ধ বঙ্গ জননীর দুর্নীতিপরায়ণ সন্তানদিগকে রক্ষা করিতে হইলে দেশের ধর্ম্মভাব ফিরাইয়া আনিবার জন্য আবার আমাদিগকে সমাজের চিন্তা করিয়া সামাজিক রজ্জু সুদৃঢ় করিবার প্রয়োজন। উদরান্নের সংস্থানের জন্য বর্ত্তমান হাহাকারের যুগে যাঁহারা সে চিন্তা করিবার অবসর পান, তাঁহারা সত্য সত্যই দেশের আদর্শ পুরুষ। জ্ঞানেন্দ্র বাবু সেই জন্য আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহার রচনা প্রণালী অতি সুন্দর, তাঁহার ভাষার কৃতিত্ব সুষ্ঠু গৌরবে সমুজ্জ্বল। গ্রন্থখানির ছাপা ও কাগজ অতি উৎকৃষ্ট। কিন্তু এই প্রসঙ্গে অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যজাতি সম্বন্ধে আমাদের একটা কথা বলিবার আছে। "অম্বষ্ঠ=অম্ব (পিতা)+স্থ (যিনি থাকেন)। অর্থাৎ যিনি রোগ সময়ে পিতার ন্যায় প্রীতি পূর্ব্বক অবস্থান করেন,"—এই অর্থে যে 'অম্বষ্ঠ' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, এখনকার অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যগণ সে কথা তো আদৌ উপলব্ধি করেন না! তাহা হইলে বৈদ্যজাতির অনেকে চিকিৎসা বৃত্তি ভুলিয়া চাকরিগত প্রাণ হইবেন কেন? এই গ্রন্থের গ্রন্থকার যদি স্বতন্ত্র পুস্তকে এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বৈদ্যজাতির মতিগতি ফিরাইবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে সে পুস্তক বৈদ্যজাতির আরও উপযোগী হইবে। আলোচ্য গ্রন্থখানি "বৈদ্যজাতির স্বরূপ নির্ণয়" আখ্যায় অভিহিত হইলেও আমাদের মনে হয়, ইহা শুধু বৈদ্যজাতির নহে—সকল জাতির ব্যক্তিগণেরই উপকারে লাগিবে। যাঁহারা সমাজ রহস্য জানিবার প্রয়াসী, আমরা তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থখানি পাঠ করিতে পরামর্শ দিতে পারি।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৩য় বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৬—জ্যৈষ্ঠ। | ৯ম সংখ্যা।

কাজের কথা।

—:*:—

বাঙ্গালীর রোগপ্রবণতা।— বাঙ্গালী অর্থ অর্থ করিয়া যেরূপ ব্যতিব্যস্ত,—স্বাস্থ্যের কথা তো বাঙ্গালী সেরূপ চিন্তা করেনা। পরিবার-প্রতিপালনের জন্যই বল—আর আত্মতৃপ্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের জন্যই বল,—সমগ্র বাঙ্গালীকে গড়ে এখন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দশ ঘণ্টা এই অর্থের চিন্তায় বিব্রত থাকিতে হয়। স্বাস্থ্যরক্ষা কল্পে আগে আমাদের দেশে যে সকল বিধি-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল—সে সকল বিধিব্যবস্থা প্রতিপালন করা বাঙ্গালী এখন একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। তাহার উপর এই দশ ঘণ্টা কাল অর্থাগমের গুরু চিন্তায় বাঙ্গালীর দেহ যে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, বাঙ্গালীর রোগ প্রবণতার সমস্ত কারণ গুলির মধ্যে তাহা অন্যতম।

*　　*　　*

স্বাস্থ্যরক্ষায় দিনচর্য্যা।—আগেকার বাঙ্গালী অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিত, বাঙ্গালীর শয্যাবিলাসিনীগণ তাহারও অনেক পূর্ব্বে শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহস্থালীর কর্ম্মে মনোনিবেশ করিতেন। বাঙ্গালী-পুরুষ শয্যা ত্যাগের পর হস্তমুখাদি প্রক্ষালনান্তর প্রাতঃস্নান করিতেন, বাঙ্গালীর মত গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে সে প্রাতঃস্নানের ফলে তাহার দেহে বায়ু কুপিত হইতে পারিত না। প্রাতঃস্নানের পর পূজা আহ্নিক সমাপন করিয়া, সেকালের গৃহস্থ-সংসারে যে জলযোগের ব্যবস্থা ছিল, তাহার মধ্যে আদার কুচি ও ছোলা ভিজাও সংরক্ষিত হইত। ফলে সেরূপ ব্যবস্থায় সেকালের কাহারও পিত্তও কুপিত হইতে পারিত না,—শ্লেষ্মাও দমনে থাকিত। এক কথায় প্রাতঃস্নান, পূজা আহ্নিক এবং প্রাভাতিক জলযোগের ব্যবস্থায়—স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বায়ুপিত্ত কফ—ত্রিধাতুরই যে সাম্যতার প্রয়োজন, তাহা সকলেরই সম্যক প্রকারে সিদ্ধ হইত। তাহার পর, কর্ম্মকালের ব্যবস্থাও সেকালে

নির্দ্দিষ্ট ছিল—প্রাতর্সায়াহ্নে। অর্থাগমের জন্য সেই কর্ম্মকালেও সেকালের বাঙ্গালীকে ৬ ঘণ্টার অধিক বিব্রত থাকিতে হইতনা। ফলে সেকালের লোকে সকল কর্ম্মের মধ্যে "শরীরমাদ্যং"—এ কথাটি অগ্রে মনে রাখিত। আধিব্যাধিতে সেকালের বাঙ্গালী এই জন্যই এত ব্যতিব্যস্ত হইত না।

* * * *

আহারে স্বাস্থ্য বিধি।—স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে আহারের নিয়ম প্রতিপালন একান্ত প্রয়োজন—এখনকার বাঙ্গালী এ কথা একেবারেই মনে করে না। আগে আমাদের দেশে সাত্বিক আহারের ব্যবস্থা ছিল। সেকালে আমাদের দেশের লোকে এমনই পবিত্র দ্রব্য আহার করিত যে, আহার করিবার সময় তাবৎ দ্রব্যই দেবতার উদ্দেশে নিবেদন না করিয়া ভক্ষণ করিত না। এখন বাঙ্গালীর আহারের ব্যবস্থা যেরূপ, তাহাতে আহারীয় দ্রব্য সকল আর দেবোদ্দেশে নিবেদন করা সম্ভব নহে। আহারীয় দ্রব্য সকলের মধ্যে গব্য দুগ্ধজাত দ্রব্য গুলি শরীরপুষ্টির যেরূপ সহায়তা করে, এমন আর কোনো দ্রব্য নহে। বাঙ্গালী-সংসারে সেই জন্যই সেকালে দুগ্ধজাত দ্রব্য মিশ্রণে আহার—উৎকৃষ্ট আহার বলিয়া পরিগণিত হইত। দুগ্ধজাত দ্রব্য অনায়াস লভ্য হইবে বলিয়াই আমাদের দেশে গাভী মাতৃপদ বাচ্য। সেকালে ছেলেমেয়ের সম্বন্ধে কন্যার পিতা—পাত্রের সংসারে 'গোয়াল ভরা গাই'—আছে কি না—এই জন্যই অনুসন্ধান করিতেন। ফলে আমাদের দেশে সেকালে যে গব্যজাতদ্রব্য আহারে শরীর পুষ্টির ব্যবস্থা ছিল, যে কারণেই হউক, দেশ হইতে এখন তাহা লোপ পাইয়াছে। তৎপরিবর্ত্তে শীত প্রধান দেশবাসীদিগের অনুকরণে বাঙ্গালীর এখন আহার-বিধি চলিয়াছে। ফলে ক্রমাগত উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য ভক্ষণে বাঙ্গালীর ধাতু সকল বিকৃতি প্রাপ্ত হইতেছে। এখনকার বাঙ্গালী—নানারূপ রোগে ভুগিতেছেও সেই জন্য।

* * * *

বঙ্গে সংক্রামক ব্যাধি।—

সংক্রামক ব্যাধির প্রাবল্যের কারণ, অধুনা দেশের জল বায়ু দূষিত হইয়াছে—এ কথা স্বীকার করিলেও—বাঙ্গালী নিজকর্ম্মকৃত পাপে যে সেই সংক্রামক ব্যাধি কর্ত্তৃক অধিক আক্রান্ত হইতেছে—একথাও অস্বীকার করিবার যো নাই। আহার বিহারের নিয়ম উল্লঙ্ঘনেই যে সকল প্রকার রোগে আক্রান্ত হইতে হয়—একথা চিকিৎসাশাস্ত্র যাঁহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন,—তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন। সনাতন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বিসূচিকা রোগের পরিচয় আমরা পাই; মসূরী বা বসন্ত রোগের পরিচয়ও আয়ুর্ব্বেদে রহিয়াছে, সুতরাং এ সকল রোগ যে আমাদের দেশে আগে হইত—একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি, কিন্তু এত প্রবলভাবে—সময়ে অসময়ে, যখন তখন, যাহার তাহার যে হইত না—ইহা নির্ভাজ সত্য কথা। শাস্ত্রবিধিসম্মত আহার বিহারের উল্লঙ্ঘনের ফলেই অধুনা এ রোগ কিন্তু বাঙ্গালায় চিরব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে। এ সকল কথা চিন্তাশীল বাঙ্গালীগণ ভাবিতেছেন কি? আমাদের হোমরুলের চিন্তা—বাঙ্গালাকে স্বাধীন করিবার চিন্তা অপেক্ষা এ চিন্তা যে সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

* * * *

সংক্রামক রোগ নিবারণে প্রতি-

ষেধক বিধি।—সংক্রামক রোগাক্রমণ হইতে বঙ্গবাসীদিগকে রক্ষা করিতে হইলে সকল প্রকার প্রতিষেধক বিধি অবলম্বনের পূর্ব্বে বঙ্গবাসীকে আবার প্রাচীন পদ্ধতি প্রতিপালনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রাচীন পদ্ধতি অবলম্বনই বঙ্গবাসীর পক্ষে সকল প্রকার সংক্রামক রোগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার উপায়—এ কথা বঙ্গবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে হইবে। আমরা ইহার পূর্ব্বে অনেকবার বলিয়াছি—বাঙ্গালী অপরিণত বয়স হইতেই ইন্দ্রিয় পরিচালনার অপব্যবহারে স্বাস্থ্যক্ষয়ে অভ্যস্ত। তাহার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃপায় রাশি রাশি গ্রন্থ অধ্যয়নের ফলেও যৌবন বিকাশোন্মুখের পূর্ব্বেই বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের অপচয় ঘটিতেছে। এক কথায় বাঙ্গালী যখন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছে—তখন বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য সম্যক প্রকারে কর্ম্মক্ষম নহে,—কিন্তু উদারান্নের সংস্থানের জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম না করিলেও উপায় নাই। তাহার উপর শিক্ষার দোষে বালককাল হইতে বাঙ্গালী ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচারে স্পৃহাশূন্য। বাঙ্গালী সংক্রামক ব্যাধিতে ভুগিবেনা তো ভুগিবে কাহারা? সংপ্রতি কয়েকমাস হইতে কলিকাতায় কলেরা ও বসন্তের পূর্ণ প্রভাব। এই দারুণ গ্রীষ্মের দিনে প্রাতঃকাল হইতে, মধ্যাহ্ন—সায়াহ্ন—রাত্রির প্রথম যাম পর্য্যন্ত চায়ের দোকানগুলির বিক্রয়াধিক্য নিরীক্ষণ করিয়াছেন কি? বাঙ্গালীর রোগ হইবে না তো হইবে কাহার? সকল প্রকার সংক্রামক রোগেই তো বাঙ্গালী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আক্রান্ত হয়,—আমাদের মনে হয়,—ঔষধে ইহার প্রতিষেধক ব্যবস্থা হইবে না—বাঙ্গালী যদি আবার সাবেক পদ্ধতি অবলম্বনে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়,—তবে তাহাই বাঙ্গালীর সংক্রামক রোগের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় হইবে।

* * *

রোগের কারণ।—উদরান্নের সংস্থান করিবার জন্য আমাদিগকে জননী জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। সে ক্ষেতের ধান, বাগানের তরকারী,—পুকুরের মাছ,—গোয়াল ভরা গাভীর দুগ্ধ এখন আর আমাদের সহজলভ্য নহে। সে সাবেক পদ্ধতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এজন্য সংসার পোষণের জন্য আমাদের কর্ম্মকালের নির্দ্দিষ্ট সময় —মধ্যাহ্নকাল পরিশ্রমে অতিবাহিত করিতেই হইবে, কিন্তু ইহারই মধ্যে যতটা সম্ভব—স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আমরা সচেষ্ট হই না কেন? প্রাভাতিক স্নান—দেবোদ্দেশে পূজা অর্চ্চনা—উষ্ণ দ্রব্য চায়ের পরিবর্ত্তে আদা, ছোলা ভিজা, মিছরির পানার ব্যবস্থা আমরা তো সহরে থাকিয়াও সহজে করিতে পারি। তৈল মর্দ্দনে এবং স্নানাহার সমাপনে যে পরিমাণ সময় দেওয়া কর্ত্তব্য—তাহার ব্যবস্থা না করিয়া, দশ পনের মিনিটের মধ্যেই ঐ সমস্ত কার্য্য আমরা সমাধা করিয়া কর্ম্মালয় উদ্দেশে ধাবিত হই কেন? আমাদের এই সকল কর্ম্মকৃত ফলেই আমাদের মধ্যে সকলপ্রকার রোগই সংক্রামক ভাবে প্রবেশ করিতেছে। অন্যান্য রোগ সম্বন্ধে জল বায়ুর দোহাই দিয়া কাটাইলেও, বাঙ্গালার যক্ষ্মাবৃদ্ধি যে ইহারই ফল সম্ভূত, সে পক্ষে আদৌ সন্দেহ নাই। বাঙ্গালীর দেহ নানারূপে ক্ষয়প্রাপ্ত—তাহার পর এরূপ অত্যাচারে ক্ষয় বা যক্ষ্মারোগ যে একান্তই অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে।

শিশু মৃত্যু।—বাঙ্গালীশিশুও মরিতেছে পৃথিবীর সকল দেশের শিশু অপেক্ষা অধিক। ইহার প্রধানতঃ দুইটি কারণ আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি। ১ম দুর্ব্বল পিতামাতার শুক্র-শোণিতের ফলে উৎপত্তি—২য় তাহাদিগের রক্ষাকল্পে তাহাদিগকে যেরূপ ভাবে প্রতিপালন করা আবশ্যক, আমরা তাহা করিতে পারি না। আমাদের অনুরাগের অভাবে এবং আরও কতকগুলি কারণে শরীর রক্ষার এবং আয়ুবর্দ্ধনের সর্ব্ব প্রধান দ্রব্য গোদুগ্ধ তো একরূপ দুষ্প্রাপ্য হইয়াই পড়িয়াছে, এজন্য উপযুক্ত পরিমাণে গোদুগ্ধ পানের ব্যবস্থা অনেক শিশুর জন্য করা হয় না, অনুকরণ স্পৃহায় দুগ্ধের পরিবর্ত্তে নানাপ্রকার বিলাতী ফুডে অনেক স্থলে শিশু রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ইহা একেবারেই সমীচীন নহে। তাহার পর ভূমিষ্ঠ কালের পর আগে যে প্রচুর তৈল মাখাইয়া মার্ত্তণ্ড কিরণে শিশু দেহ উত্তপ্ত পূর্ব্বক শ্লেষ্মা প্রশমনের ব্যবস্থা ছিল—এখন অনেক ক্ষেত্রে তাহা লোপ পাইয়াছে। পুরুষ জাতির মত দেশের মহিলাগণও বিকৃত শিক্ষায় সাবেক পদ্ধতি ভুলিয়াছেন, তাহারই ফলে নানারূপ বেশবিন্যাসে সর্ব্বদা শিশু দেহ আবৃত করিয়া রাখিলেই যেন শিশুদিগকে রক্ষা করিবার প্রধান উপায় করা হইল—ইহাই এখনকার মা-লক্ষ্মীগণ মনে করেন। ইহা ভিন্ন সামান্য সামান্য রোগে শিশুদিগকে এখন টোট্‌কা টাটকী ছাড়িয়া বড় বড় চিকিৎসকের শরণ গ্রহণে যে ঔষধের ব্যবস্থা করা হয়—ইহাও শিশুরক্ষার প্রধান অন্তরায়। সেকালে শিশুদিগের যে সামান্য জ্বর হইত তাহার অভিধান ছিল—'বালসা'। সে বালসার সামান্য মধু, তুলসীর রস,—বড় জোর একটু ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম—এ সকল দেওয়ার যে রীতি ছিল,—এখন সে ব্যবস্থা দেশ হইতে বিলুপ্ত। ফলে শিশু প্রতিপালন যেরূপ ভাবে করা উচিত—আমরা এখন তাহা করিতে জানি না বলিয়াই বাঙ্গালী-শিশুর মৃত্যু সংখ্যা বাড়িয়া উঠিয়াছে।

* * *

শিশু মৃত্যুর সহিত শিশু জননীর স্বাস্থ্য।—বঙ্গদেশ হইতে শিশু-মৃত্যুর হ্রাস করিতে হইলে বঙ্গমহিলাদিগেরও স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রাচীন পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া দেশের মহিলাগণও ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িতেছেন। তাহার উপর কলিকাতার মত স্থানে আয়ের তুলনায় স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী বাটী ভাড়া লইয়া অনেকেরই পক্ষে বাস করা সম্ভবপর নহে, সেই জন্যই অনেককে আলোক রৌদ্র-বায়ু বিহীন সামান্য বাড়ী ভাড়া লইয়া বাসের ব্যবস্থা করিতে হয়। পুরুষেরা কর্ম্মসূত্রে নানাস্থানে গমনাগমন করেন—সে জন্য সেরূপ বাটীতে অবস্থিতির ফলে তাঁহাদের স্বাস্থ্যের বিশেষ অন্তরায় না ঘটিলেও ইহার জন্য যে মহিলাদিগের স্বাস্থ্যের অপচয় ঘটিতেছে - তাহা সুনিশ্চিত। ফলকথা আমরা বলিতে চাহি—শিশু মৃত্যুর সহিত শিশু জননীর ভগ্নস্বাস্থ্য সুসংবদ্ধ।

* * *

বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ।—যেরূপ আব্‌ হাওয়া চলিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ বড়ই অন্ধকারময়। প্রতি বৎসর অসংখ্য অসংখ্য শিশু অকালে কাল কবলিত হইতেছে, অসংখ্য অসংখ্য যুবা-প্রৌঢ় ইহলীলা সম্বরণ করিতেছে, —নানারূপ রোগের সংহার মূর্ত্তি বঙ্গ জননীকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। [illegible]

—কাহারও নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে, উপেক্ষার হাস্যে আস্য বিকাশ পূর্ব্বক এই মৃত্যুর আধিক্য ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া আর আমাদিগের পক্ষে উড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে কেন? আয়ুর্ব্বেদ তো স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—

"বর্ত্ত্যাধারস্নেহযোগাদ্ যথা দীপস্য সংস্থিতিঃ।
বিক্রিয়াপিচ দৃষ্টৈবমকালে প্রাণ সংক্ষয়ঃ॥"

অর্থাৎ তৈলাধার বা প্রদীপে তৈল এবং বর্ত্তিকা সংস্থিত থাকিলেও বায়ু তাড়নে তাহা যখন নির্ব্বাপিত হইতে পারে, সেইরূপ আয়ু থাকিতে অকালে প্রাণহানিও অসম্ভব নহে। আমরা নানারূপ অনিয়মে সেই অকালে প্রাণহানির কারণ করিয়া তুলিতেছি। অতঃপর আমাদের আত্মরক্ষার জন্য আবার সংযম শিক্ষা ও শাস্ত্রবিধি পালন একান্তই আবশ্যক। এই বাত্যা-বিক্ষুদ্ধ বঙ্গে ইহা ভিন্ন যে গত্যন্তর নাই—ইহা বঙ্গবাসী মাত্রেই চিন্তা করুন—ইহাই আমাদের বিশিষ্ট অনুরোধ।

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন।

বালক রক্ষা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

——:০:——

বাল্যকাল হইতে বালককে আমি কে—এই জ্ঞান পাইবার জন্য শিক্ষা দিতে বিশেষ চেষ্টিত হইতে হইবে। সুখ দুঃখ কি? এবং দুঃখ দূর হইয়া বিমল সুখ অর্থাৎ আনন্দ লাভ কিসে হয়—সে বিষয়ে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করাইতে হইবে। বাল্যকাল হইতে বালক কেবল দুঃখময় সংসারে ও সংসারের বিষয়ে মনকে আকৃষ্ট করিয়া আধুনিক শিক্ষার কৃপায় সর্ব্বদা সুখান্বেষী হইয়া আপাতমধুর—পরিণামে বিষবৎ বিষয় উপভোগকে সুখ বলিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক অল্পকালমাত্র দুঃখময়—রোগ শোকময় জীবন যাপন করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। এইরূপে অযথা বিষয়ভোগের স্পৃহায় শরীরকে রোগ সঙ্কুল করিয়া অকাল মৃত্যু দ্বারা আত্মঘাতীর মহাপাতকে পতিত হয়। উহাদিগকে এই বিষয় হইতে রক্ষা করিতে হইলে, এই ধারণা করাইতে হইবে যে, যাহাকে 'আমি' বলি—তাহা এই দেহের মধ্যে দেহী,—যন্ত্রের মধ্যে যন্ত্রী, গৃহের মধ্যে অখণ্ড মহাকাশের খণ্ড স্বরূপ আকাশ এবং সেই অখণ্ড পরমাত্মার খণ্ড স্বরূপ প্রতীয়মান আত্মা। আত্মা এই দেহের মধ্যে দ্রষ্টারূপে আছেন। আমরা মনে করি—ইনি সুখ দুঃখ অনুভব করিতেছেন, কিন্তু বুদ্ধি বৃত্তির সহিত যতক্ষণ মিলিত থাকেন, ততক্ষণ এইরূপ মনে হয়। বুদ্ধি বৃত্তির সহিত হইতে ভিন্ন দেখিলে তাঁহার স্বরূপ দেখা যায়, তখন আর তাঁহার সুখ দুঃখ থাকে না, নিজ নিত্যানন্দে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কেবল আনন্দময় হইয়া যায়।

এখন এ বিষয়ে আমাদিগকে নিজে বিশেষ জ্ঞানী হইয়া বালককে অভ্যাস দ্বারা জ্ঞানী করিতে প্রয়াস পাইতে হইবে। আত্মাকে জানিতে পারিলে লোকে আর বৃথা বিষয় সুখের চেষ্টায় ধাবিত হইয়া নিজ আয়ুকে ক্ষয় ও রোগ

পূর্ণ জীবন অতিবাহিত করিতে পারেনা। এই সংসারে মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া আমাদের কর্ত্তব্য এই যে, যাহাতে পূর্ণ জীবিত কাল কাহারও মতে ১২০ বৎসর, কাহারও মতে ১০০ বৎসর নীরোগ অবস্থায় জীবিত থাকিয়া কর্ম্ম দ্বারা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মক্ষয় পূর্ব্বক যথার্থ জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করিয়া সেই "সত্যমনন্তং জ্ঞানম্'কে লাভ করিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া সেই পরম ধামে যাইতে পারি – যেথান হইতে আর ফিরিয়া আসিয়া বারম্বার যাতায়াত ও গর্ভ যন্ত্রণা ভোগ ও মৃত্যু যন্ত্রণাভোগ ও সংসারে থাকিয়া দুঃখ ভোগ করিতে না হয়। আমরা যে কিরূপ ভাবে যাতায়াত করিতেছি—তাহা শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,-"যাবজ্জননং যাবন্মরণং যাবজ্জননী জঠরে শয়নং" ইত্যাদি। কিন্তু এই দুঃখ প্রবাহ অতিক্রম করিয়া বাল্যকাল হইতে এইরূপ ভাবে চলিতে হইবে ও সাধনা করিতে হইবে যে, মৃত্যুকালে সেই পরব্রহ্মকে ধ্যান করিতে করিতে, তাঁহার ব্যঞ্জক পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে, সুষুম্না মার্গ দিয়া প্রাণ বায়ুকে ভ্রূমধ্যে লইয়া গিয়া যেরূপ ব্যবস্থা শ্রী গীতায় ও কঠোপ-নিষদে আছে – সেইরূপে প্রাণত্যাগ করিতে পারিলে আমরা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইব,—আর এ সংসারে আসিতে হইবে না, সেই ধামে যাইব—যেথান হইতে আর ফিরিতে হয় না "যদ্‌গত্বান নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।" তাঁহাকে না জানিতে পারিলে আমরা এই ভয়াবহ মৃত্যুর হাত হইতে এড়াইতে পারিব না। "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়" তাঁহাকে জানিলেই আমরা মৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি পাইব,—এই উপায় ছাড়া এই কঠোর দুঃখদায়ক সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার অন্য কোন উপায় নাই। সমস্ত জীবন সাধনা করিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। আমরা সব বিষয়ে সতর্ক হই—কিন্তু মৃত্যুকে যে এত ভয় করি—তাহার জন্য ত কোন প্রকার সতর্ক হই না। বাল্যকাল হইতে কেহ এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই বলিয়া জীবনের এক-মাত্র উদ্দেশ্য আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। আমরা ত বিস্মৃত হইয়া "সখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা মারে" বলিয়া অসময়ে চিৎকার করিতেছি। এখন বয়স হইয়াছে "স্বগাত্রান্যপি ভারায়" হইয়াছে। নিজের দেহটা ভার স্বরূপ হইয়াছে, ঈশ্বরকে ভজন করিবার—সাধনা করিবার আর ক্ষমতা নাই। এখন কেবল অনুতাপ আসিয়াছে যে, "জীবনটা বৃথা গেল, কিছুই করিলাম না।" শুধু এ জীবন কেন, কত জীবন যে আমাদের এইরূপ বৃথায় গিয়াছে – তাহার ইয়ত্তা নাই। মায়ের আহ্বান বাণী আমাদের কাণে আসিতেছে না। অনাহুত ধ্বনির কথা শুনিতে পাইবার চেষ্টা দূরে থাকুক উহার কথা বলিলে, লোকে বলে যে, পাগলে উন্মত্ত অবস্থায় এইরূপ শোনে। তাই আমি সেই সকল বিজ্ঞান বেত্তাদের বলি "যে অনাহুত ধ্বনি শুনিয়া আমি পাগল, না,—না শুনিয়া তুমি পাগল—একবার ভাবিয়া দেখ দেখি"! ভক্ত শিরোমণি স্বর্গীয় বিদ্যার্ণব মহাশয়ের কথাটি এখানে মনে পড়ে—

"সৃষ্টিচক্রে পরতঃ পর উন্নত এই জীবকুলে।
ডাকেন মা প্রসারি' বাহু
—নেবেন ব'লে কোলে তুলে।
মায়া মোহন মহাচ্ছন্ন জীব
নিদ্রিত তাঁকে ভুলে।
আপন স্বপন [illegible]
[illegible]

আমরা এই দুর্লভ মনুষ্য জীবন বৃথায় কাটাইতেছি। বাল্যকাল হইতে আরম্ভ না করিলে এ পথের পরিচয় হয় না, এখানে চলা যায়না ও গন্তব্য স্থান পাওয়া যায় না। তাই বড় দুঃখে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

বালস্তাবৎ ক্রীড়াশক্তঃ—
তরুণ স্তাবৎ তরুণী রক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তা মগ্নঃ
পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ॥

পাঠক বলিবেন, এ কি—"বালক রক্ষা" বিষয় লিখিতে কি লেখা হইতেছে? আমার সানুনয় করযোড়ে নিবেদন এই যে, অনেক কথা বলা হইয়াছে—অনেক বক্তৃতা করা হইয়াছে অনেক প্রবন্ধ লেখা হইয়াছে—কিন্তু বালকের মতিগতি আমাদের যাহা প্রতিভাত হইতেছে, তাহাতে এখন সকলের দৃষ্টি সেই পরম করুণাধার শ্রীভগবানে আকৃষ্ট না করিতে পারিলে, এই সংসারের বিষয় বিষপান হইতে নিবারণ করিয়া অকাল বার্দ্ধক্য ও মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে পারা যাইবেনা। আমাদের জীবনটা বৃথা গেল দেখিয়া, আমাদের প্রিয় পুত্রগণ যাহাতে সেরূপ না হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। "ধর্ম্ম রক্ষিত রক্ষতি" আমাদিগকেই আমাদের বালকদিগকে ধর্ম্ম রক্ষা না করিলে আর কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না।—সেই জন্য ধর্ম্মকে আগে রক্ষা করিতে হইবে এবং উহা হইতে অর্থ, কাম ও মোক্ষ পুরম্পরা আসিতে থাকিবে। মহাত্মা পুণ্যশ্লোক রামদাস কাঠেরা বাবা দ্বাদশ বৎসর বয়ক্রম কালে ভিক্ষার্থ এক গৃহস্থের দ্বারে উপস্থিত হন। গৃহস্বামী বলেন,—"এত অল্প বয়সে গৃহত্যাগী কেন?" তাহাতে তিনি উত্তর দেন,—"বাবা সেখানে যাইতে বহুদূর পথ অতিক্রম করিতে হয়, এখন হইতে আরম্ভ না করিলে কি শেষ পর্য্যন্ত পৌছিতে পারিব"? ফলকথা আমাদিগকে বাল্য হইতে ধর্ম্মপথের অন্বেষণ করিতে হইবে।

মৃত্যু সকলেরই ভয়ের জিনিষ এবং অবশ্যম্ভাবী। মানুষ অনেক কল্পিত ভয়ের জন্য কাতর হইয়া তাহা হইতে আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করে, কিন্তু যাহা স্থির নিশ্চয়—সেই মৃত্যুর জন্য কেহ প্রস্তুত হয় না, তাহার হাত হইতে রক্ষা পাইবার কোন উপায় করে না। উপায় অবশ্য শক্ত বটে, তাই বলিয়া কি ছাড়িয়া দিতে হইবে? আমরা মৃত্যুকে কেহ ভয় করি? মৃত্যুর দ্বার দিয়া আবার আমাদিগকে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে, আবার সংসারের অনলে দগ্ধ হইতে হইবে, মরিতে হইবে।

পুনরপি জননং পুনরপি মরনং
পুনরপি জননী জঠরে—শয়নম্।
ইহ সংসারে খলুদুস্তারে কৃপয়াঽপারে
শয়নম্ পাহিমুরারে।

গোবিন্দকে—মুরারিকে ডাকার মত ডাকিয়া তাঁহার মত না হইতে পারিলে এই দুস্তর সংসারে মৃত্যু মুখ হইতে অব্যাহতির উপায় নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে জীবের বড়ই কষ্ট হয়। পৈত্তিক উষ্মা অষ্ট মর্ম্মস্থানকে যখন দগ্ধ করিতে থাকে, যখন প্রাণবায়ু ও অপানবায়ু, সমানবায়ুর অধীনে না থাকিয়া পরস্পর স্বাধীন হইয়া—দেহ ত্যাগের চেষ্টা করে, যখন নাভিশ্বাস হয়, তখন জীবের বড়ই কষ্ট হয়। যাঁহারা কাহারও মৃত্যু শয্যার পার্শ্বে বসিয়াছেন, তাঁহারাই এই যন্ত্রণা দেখিয়াছেন। কিন্তু তাহা দেখিয়া তাঁহারও এইরূপ হইবে ভাবিয়া সেই যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কোন চেষ্টা

করিয়াছেন কি? তাহার পর মৃত্যু আসিলে যখন আত্মা দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যান, তখন বায়ু যেমন কুসুমাদি হইতে দগ্ধ বিশিষ্ট অতি সূক্ষ্ম অণু সকল গ্রহণ করিয়া গমন করে, সেইরূপ পূর্ব্ব শরীর হইতে আত্মা এই সকল প্রভৃতিতে অবস্থিত মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে গ্রহণ পূর্ব্বক গমন করে।

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎ ক্রমেতীশ্বরঃ।
গৃহী ত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধা নিরাশয়াৎ॥

এই মৃত্যুর পর জীব স্থূল দেহ ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়গণ ও মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারের সহিত ও পঞ্চতন্মাত্রের সহিত বাসনা দেহ ধারণ করিয়া প্রেতলোকে (ভুবলোকে) বাসকরে।

আমাদের এই দেহে তিনটী দেহ আছে। প্রত্যেক দেহই যত্নের জিনিষ, কোনটীকে তাচ্ছিল্য করিবার উপায় নাই। এই তিনটি দেহ, সূক্ষ্মদেহ ও কারণ দেহ। এই তিনটি দেহ ছয়টি কোষের মধ্যে আছে। যথাঃ—এই স্থূল দেহ—অন্নময় কোষের মধ্যে। ইহা ক্ষিতি, অপ্, তেজ্, মরুৎ, ব্যোম পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতাত্মাতে দেহে বর্ত্তমান থা.ক। ইহা আহারের দ্বারা ধার্য্য বলিয়া ইহার নাম অন্নময় কোষ।

সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ দেহ—প্রাণময় কোষ—পঞ্চবায়ু, দশ ইন্দ্রিয়ের তন্মাত্র, পঞ্চ প্রাণ বা বায়ুর প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান; পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা জিহ্বা ত্বক্। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় - বাক্ প্যাণি, পাদ পায়ু ও উপস্থ। মন, বুদ্ধি কামাদি ইন্দ্রিয় ও পঞ্চবায়ু প্রাণ সংজ্ঞক হইয়াই বসু। কেননা তাঁহারাই পুরুষাদি সমস্ত প্রাণিগণকে বাস করান (রক্ষা করেন)। কারণদেহ মধ্যে প্রাণ সমূহ বর্ত্তমান থাকিলেই এই সমস্ত জগৎ বর্ত্তমান থাকে, নচেৎ নহে। যে হেতু নিজেরাও বাস করেন এবং অন্যকেও বাস করান, এই জন্য ইঁহারা বসু নামে অভিহিত। এই সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহ যাহার মধ্যে বাসনা ও ভাবনা দেহ আছে—তাহা প্রাণময়, মনোময়,জ্ঞানময় কোষে বিজ্ঞানময় অবস্থিত। তাহার পর কারণদেহ আনন্দময় কোষে বিরাজমান। কেহ কেহ ষট্ কোষ বলেন, কেহ কেহ বিজ্ঞানময় কোষকে এক করিয়া জ্ঞানময় নাম দিয়া পঞ্চ কোষ বলেন। এই পঞ্চ কোষ মধ্যে (যঃ কাশতে শোভতে) যিনি শোভা পান তিনিই কাশী এবং তাঁহাতেই সেই ভাগবতী তনু প্রকৃতি পুরুষ বিশ্বনাথঅন্নপূর্ণা যুগল হইয়া এক দেহে বিরাজমান, আর মা গঙ্গা সেই অন্নপূর্ণা যুক্ত বিশ্বস্বামীর চরণ ধৌত করিয়া বিরাজিত। এখানকার মা গঙ্গা—গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী সহিত যুক্ত ত্রিবেণী হইতে আসিয়া স্বয়ম্ভু লিঙ্গকে বেষ্টিত করিয়া আছেন। আমাদের দেহেও তদ্রূপ "ইড়া, ভগবতী—গঙ্গা, পিঙ্গলা—যমুনা নদী।

ইড়াপিঙ্গলয়োর্মধ্যে সুষুম্নাচ সরস্বতী।
ত্রিবেণী সঙ্গমো যত্র তীর্থরাজ স উচ্যতে।
তত্র স্নান প্রকুর্ব্বীত পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

এই হইল আসল কাশী।" পঞ্চ ক্রোশ ঘুরিয়া কাশী প্রদক্ষিণ করায় কোন ফল নাই—যতক্ষণ না মনকে এই পঞ্চকোষী করিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া পাঁচটি কোষ হইতে আনিয়া স্বয়ম্ভু লিঙ্গ বেষ্টিত কুণ্ডলিনী শক্তিতে না লাগান যায় এবং তথা হইতে সকলকে একত্র করিয়া সহাস্রার নিয়ে দ্বাদশদল পদ্মোপরি বিরাজ মান সশক্তি গুরুপাদ [illegible] সেই পরমাত্মায় লীন করিতে না পারা [illegible] মনের [illegible]

মিশ্রিত সুখভোগ বা যাতায়াত, জনম মরণ জননী জঠরে শয়ন আর সংসার শয্যা কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হওয়া। মনকে সেই পরব্রহ্মে পরব্যোমে লয় করিতে পারিলেই সংসার নিবৃত্তি বা মুক্তি বা মোক্ষ বা পরমানন্দলাভ বা সেই পরমধাম প্রাপ্তি হওয়া যায়,—যেথান হইতে আর ফিরিতে হয় না, যেখানে গিয়া আমরা অমৃতের পুত্র হইবা অমৃতত্ব লাভ করি এবং সেই দেশে বাস করি—সেখানকার রক্ষা শ্রীভগবান্ নিজে শ্রীমুখে গীতায় বলিয়াছেন।

ন তদ্ ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্ক ন পাবকঃ
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।

আবার শ্রুতি কঠোপনিষদে বলিয়ছেন—

ন তত্র সূর্য্যো ভবতি, ন চন্দ্র তারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নি।
তমেব ভান্ত মনুভাতি সর্ব্বং—
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥

এখানে সেই আনন্দময় স্থান যেখানে নিরানন্দের লেশ নাই। সেই প্রকৃতি পুরুষ পার্ব্বতী পরমেশ্বর সগুণ হইতে নির্গুণ ব্রহ্মরূপে তথায় বিশেষ প্রকাশমান হইয়াছেন। যদিও তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বস্ব বিরাট মহান ব্যাপক, তথাপি তিনি শরীরের জন্য সেই ব্রহ্মলোকে বা পর ব্যোমে অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় ভাবে বিরাজমান।

পূর্ব্বে স্থূল দেহের ও সূক্ষ্মদেহের কথা বলা হইয়াছে, বাকী কারণ দেহ, ইহা আনন্দময় কোষে। আত্মা ইহার পরেও ভিন্ন। আনন্দ ময় কোষ ক্ষণিক, আর আমি (আত্মা) সর্ব্বদা স্থিত বলিয়া নিত্য। এই জন্য এই আনন্দময় কোষ আমি নহি আমারও নহে। ইহা কারণ রূপ দেহ। আমি ইহার জ্ঞাতা। ইহা আত্মা হইতে ভিন্ন। এই পঞ্চ কোষ অনুভব গ্রাহ্য। এই পঞ্চ কোষকে অনুভব রূপ যে চৈতন্য তিনি পঞ্চ কোষ হইতে ভিন্ন আত্মা। তিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ, তাঁহার জন্ম মৃত্যু, সুখ দুঃখ, শোক আনন্দ কিছুই নাই। তবে তিনি দ্রষ্টা বলিয়া বুদ্ধিবৃত্তিকে যুক্ত থাকিয়া সুখী দুঃখী মনে করেন।

আত্মা স্বলিঙ্গস্ত মনঃ পরিগৃহ্য মহামতে।
তৎকৃতান সংজুষনং কামান সংসারে বর্ত্ততেঽবশঃ॥
বিশুদ্ধ স্ফটিকো যদ্বদ্রক্ত পুষ্প সমীপতঃ।
তদ্বর্ণ যুতো ভাতি বস্তুতো নাস্তি রঞ্জনা।
বুদ্ধিন্দ্রিয়াদি সামীপ্যাদাত্মনোঽপি তথাগতি॥
মনো বুদ্ধিরহঙ্কারো জীবন্য সহকারিণঃ।
স্বকর্ম্ম বশতস্তাত ফল ভোক্তার এবতে।
পঞ্চভূতাত্মকো দেহমুক্তো জীবো যতঃ স্বয়ম্।

ভগবতী গীতা

দেহ পঞ্চ ভূতময়। কিন্তু তন্মধ্যে জীব স্বয়ং মুক্ত অর্থাৎ দেহ হইতে নির্লিপ্ত।

আত্মা প্রথমতঃ নিজ লিঙ্গ স্বরূপ মনকে গ্রহণ করে, পরে অস্বতন্ত্র ভাবে তৎকৃত কামনা উপভোগ সহযোগে পুনঃ পুনঃ সংসারে পরিভ্রমণ করে। বিশুদ্ধ স্ফটিক যেরূপ রক্তবর্ণ পুষ্প সমীপে থাকিলে সেই বর্ণযুক্ত বোধ হয় কিন্তু বাস্তবিক উহা উহার বর্ণ নয়, তদ্রূপ আত্মা বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির সামীপ্যহেতু সুখী ও দুঃখীরূপে প্রতীয়মান হয়।

উক্ত স্থূল দেহের নাশকে আমরা মৃত্যু বলিয়া থাকি। আয়ুঃ শেষ হইয়া আসিলেই মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়। এই স্থূল দেহ বা অন্নময় কোষ [illegible]তে আত্মা বিচ্যুত হইলে মৃত্যুদ্বার দিয়া সূক্ষ্ম শরীর অর্থাৎ বাসনাদেহ ও ভাবনা দেহ লইয়া ক্ষণকালের জন্য অজ্ঞান হইয়া পড়ি। এই অজ্ঞানের পরই যখন জ্ঞান হয়—তখন আমরা দেখি একটা নূতন 'লোকে' আসিয়াছি। তাহাকে 'ভুবঃ' লোক বলে।

ইহার নিম্নস্থলে প্রেত বা কাম লোক। মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রায়ই অধিকাংশ লোকের মনে বহু কামনা থাকে, সেই সকল কামনা তৃপ্তি না হওয়ায় মানবকে দারুণ যাতনা সকল ভোগ করিতে হয়। তখন ভোগের চেষ্টার জন্য এই অন্নময় কোষ অর্থাৎ পঞ্চভূতাত্মক দেহ থাকে না, কিন্তু কামনাগুলি থাকিয়া যায়, তাহার পরিতৃপ্তি না হওয়ায় এই প্রেতলোকে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। তাহার পর যখন পাপক্ষয় হয়, যখন প্রেতলোকে কিছুকাল যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে কামনা সকল ক্ষীণ হইয়া আইসে, তখন কামনা দেহের কতকগুলি অণু কমিয়া যায়। এই ভোগকাল সমান নয়, কামনার তীব্রতা অনুসারে ইহার দীর্ঘতা নির্ভর করে। সাধারণতঃ ইহাকে এক বৎসর ধরিয়া পুত্রগণকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক শুদ্ধ ভাবে শ্রদ্ধার সহিত মৃত্যুর পর প্রেতত্ব প্রাপ্ত পিতা মাতার জন্য তর্পণ জল অর্পণ ও মাসিক শ্রাদ্ধ ও পিণ্ড দান, ব্রাহ্মণ ভোজন আবশ্যক। এই প্রেত অবস্থায় সেই জীব নিজের দুঃখ মোচন করিতে সমর্থ হয় না। তাহাকে কামনার দাবানলে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হয়। পিপাসায় কাতর হইলে জল নাই। ক্ষুধায় কাতর হইলে আহার নাই। শীতে কাতর হইলে বস্ত্র নাই। প্রেত লোকের এই সকল যন্ত্রণা লাঘব করাইবার জন্য ও অপেক্ষাকৃত সুখকর স্থান পিতৃলোকে গমনের জন্য ত্রিকালজ্ঞ আর্য্য ঋষিগণ যথার্থ ব্রাহ্মণের অভাবে এই কলিকালে শালগ্রাম শিলার সম্মু[illegible]কুশময় ব্রাহ্মণের অধিষ্ঠান করাইয়া তাহাতে বিষ্ণুর আরাধনা ও মন্ত্রাদি দ্বারা শুদ্ধভাবে প্রস্তুত অন্নে ভক্তিভাবে প্রদত্ত পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শীতোষ্ণাদির যাতনা নিবারণের জন্য ছত্র, পাদুকা, বস্ত্র, মশারি, খাট প্রভৃতি শ্রদ্ধার সহিত সৎপাত্রে দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু

কি ঘোর কলিকাল আগত! এই পরম লোকহিতকর শ্রাদ্ধাদি ক্রমশঃ লোপ পাইয়া আসিতেছে। লোক দেখানি করিয়া আদ্য শ্রাদ্ধ ও সপিণ্ডকরণ পর্য্যন্ত হয়, তাহার পর আর একোদ্দিষ্ট সপিণ্ডণ হয় না। ইহার সম্বন্ধে বিশ্বাস ক্রমশঃ লোপ পাইয়া উঠিয়াছে—বিশেষ আধুনিক শিক্ষা একবারে আমাদিগকে শ্রদ্ধাহীন করাইয়াছে! অন্যান্য যুগের মত পূর্ণ আয়ুভোগ কচিৎ ঘটে। প্রায়ই অকাল মৃত্যু। পূর্ব্বে লোকের মৃত্যু বার্দ্ধক্যে জরাগ্রস্থের পর হইত, তাহাতে তত মৃত্যু যন্ত্রণা হইত না। লোকে প্রস্তুত হইয়া ঈশ্বরকে চিন্তা করিতে করিতে মরিতে পারিত এখন আর তাহা হয় না। অকালে হঠাৎ মৃত্যুর লক্ষণ আবির্ভাবের পূর্ব্বেই অধিকাংশ লোকের মৃত্যু হয়, সেই জন্য মৃত্যুর পূর্ব্বে অসহ্য যন্ত্রণা ও প্রেত দেহে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। আমরা আরামে থাকিবার জন্য ভাল ঘর দ্বার তৈয়ার করাই, গাড়ি ঘোড়ার ব্যবস্থা করি, সুন্দর সুকোমল শয্যার ব্যবস্থা করি, ভাল পরিচ্ছদ প্রভৃতির ব্যবস্থা করি, কিন্তু যে অর্থ কেবল অভাব মাত্র মোচনের জন্য, যাহা শাস্ত্রে কেবল ভরণ পোষণ মাত্র আবশ্যক মত উপার্জ্জন করিয়া সঞ্চয়ের নিষেধ করিয়াছেন, সেই অর্থের অগাধ সঞ্চয় ব্যপদেশে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়া যায়, বাকীটুকু অলসে বিলাসে, আমোদে প্রমোদে ও নিদ্রায় কাটিয়া যায়, কিন্তু আমরা এই ভীষণ মৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার কোনই উপায় করি না। কারণ বাল্যকাল হইতে এ বিষয়ে কেহ শিক্ষা দেয় নাই। আমরা যদি এখন আমাদের বালকগণকে বাল্যকাল হইতে এই সকল বিষয় না জানাইয়া ও না শিখাইয়া রাখি, তবে কখন হঠাৎ মরিয়া

হইব,—ইহ সংসারে ত কত কষ্টই পাইলাম। প্রেতলোকের কষ্ট নিবারণের জন্য যে পুত্র কামনা, সেই পুত্রত কই আমার কষ্ট নিবারণ করিতে পারিবে না। তর্পণ জল দিলে, পিণ্ডদান করিলে, যে পরলোকে প্রেত দেহের তৃপ্তি হয়, এই বিশ্বাস আমাদের মধ্যে দৃঢ়ভাবে কয়জনের আছে যে, আমাদের নিকট হইতে আমাদের বালকগণ সে শিক্ষা পাইতে পারিবে? পিতৃ পুরুষকে শ্রাদ্ধকালে যাহা দেওয়া হয়, তাহা শুদ্ধ ও শুচিভাবে পবিত্র অন্তঃকরণে দিতে হইবে। মন্ত্র সকল শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে হইবে ও মন্ত্রার্থ বুঝিয়া, ভাবে-শ্রদ্ধাতে গদ্ গদ্ হইয়া উহা পিতৃপুরুষকে অর্পণ করিতে হইবে। বাল্যকাল হইতে বালককে এই পরলোকতত্ত্ব উপদেশ দিয়া তাহাদের মনে এ বিষয়ে দৃঢ় ধারণা জন্মাইতে হইবে। এইরূপে তাহাদের হৃদয়ে শ্রদ্ধার বৃদ্ধি হইবে। মন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে হইবে। মন্ত্রের দ্বারা অনেক অলৌকিক ব্যাপার সম্পাদিত হয়। কেবল যে উপাসনাদির দ্বারা প্রেত দেহের দুঃখের লাঘব হয়—তাহা নহে, তর্পণ জল প্রদান ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্য ও পিণ্ডদান দ্বারা পরলোকগত জীবের আহার পিপাসা প্রভৃতির কষ্টের নিবারণ হয়, ঋষিগণ দিব্য দৃষ্টিতে এই সকল দেখিয়া পরের মঙ্গল কামনায় শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থায় ঈশ্বরোপাসনার সহিত মন্ত্র প্রয়োগ দ্বারা শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের বিধি প্রদান পূর্ব্বক উহা আরও ফলদায়ক করিয়াছেন। প্রেতদেহ বিমোচনের জন্য তাহারা আত্ম শ্রাদ্ধাদির এবং ভাবনা দেহ বিমোচনের জন্য সপিণ্ডকরণাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। মানবের প্রেতলোকে যে সমস্ত কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহা স্মরণ থাকে না বটে—কিন্তু ইহার দ্বারা পরমকারুণিক পিতা পরমেশ্বর জীবের শুদ্ধি ক্রিয়ার বিশেষ সাহায্য করিতেছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই কষ্ট ভোগের দ্বারা চিত্তে বড়ই অনুতাপ আইসে এবং তদ্দারা কামনাদেহের অণুপরমাণু অনেক ক্ষয় হইয়া যায়। তাহার দ্বারা জীব পিতৃ লোকে উন্নত হয়। সেখানে কতক সুখ ভোগ কতক দুঃখভোগ দ্বারা বাসনা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আইসে, তখন তাহার দ্বিতীয় মৃত্যু হয়, তাহার পর ভাবনা দেহ লইয়া স্বর্গে গমন করে। সেখানে সুখ কিন্তু একঘেয়ে; প্রথম প্রথম ভাল লাগিলেও তাহার পর আর ভাল লাগে না। এইরূপে কিছুকাল কাটিলে তাহার ভাবনা দেহটিও বিচ্যুত হয়, তখন তাহার তৃতীয়বার মৃত্যু হয়। তাহার পর যাহারা বেশী পুণ্যবান হয়, তাহারা আরও উচ্চ স্বর্গে গমন পূর্ব্বক অতুল আনন্দ উপভোগ করে। অতঃপর পূর্ব্ব সঞ্চিত বাসনানুসারে আবার একটী নূতন দেহ ধারণ পূর্ব্বক কর্ম্মফল ভোগের জন্য পৃথিবীতে নিজ কর্ম্মের উপযুক্ত পিতার ঔরসে ও মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। কি প্রকারে এই পৃথিবীতে জন্ম হয় তাহা শাস্ত্রে যেরূপ আছে তাহা সংক্ষেপে বর্ণী হইতেছে।

স্বকর্ম্মবশতো জীবো নীহারকণযা যুতঃ।
পতিতো ধরণী পৃষ্ঠে ব্রীহিমধ্যগতো ভবেৎ॥
স্থিত্বা তত্র চিরং ভুক্ত্বা ভুজ্যতে পুরুষৈ স্ততঃ।
ততঃ প্রবিষ্টং তদ্‌ভুজ্যং পুংসোদেহে প্রজায়তে॥
রেতস্তেন স জীবোঽপি ভবেদ্দেহগতস্তদা॥

ভগবতী গীতা।

জীব স্বর্গলোক হইতে নিজ কর্ম্মফলানুসারে আগত হইয়া কিছুকাল আকাশ মার্গে ভাসমান থাকে। মৃত্যুর পর প্রেতত্ব অবস্থা হইতে এই অবস্থায় আসিতে কাহার কত সময় লাগে—তাহার স্থিরতা নাই। নিজ কর্ম্ম

ফলানুসারে কাহারও বহুকাল লাগে, কাহারও অপেক্ষাকৃত অল্পকাল লাগে। এইরূপে আকাশ-মার্গে ভাসমান্ থাকিতে থাকিতে জীব নীহার কণাযুক্ত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইয়া কোন ব্রীহি যবধান্যাদির মধ্যগত হয়। সেই ব্রীহি পুষ্ট ও পরিপক্ক হইয়া রৌদ্রে শুষ্ক. উদুখলে নিষ্পিষ্ট, অগ্নিতাপে পক্ক হওয়া কালীন জীব তন্মধ্যে নিদ্রায় ন্যায় অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকায় তদ্বারা কোন যন্ত্রণা ভোগ করিতে পারে না। পুরুষের দেহে কিছুকাল থাকিয়া স্ত্রীলোকের গর্ভে নীত হইয়া সেইখানেই মাতৃভুক্তানুসারে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। গর্ভে কি প্রকারে জীব দেহাকারে পরিণত ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহা গর্ভোপনিষদে বর্ণিত আছে :—

"ঋতুকালে সম্প্রয়োগাদেক রাত্রোষিতং কললং ভবতি, সপ্তরাত্রোষিতং বুদ্‌বুদং, অর্দ্ধ-মাসাভ্যন্তরে পিণ্ডং মাসাভ্যন্তরে কঠিনং, মাস-দ্বয়েন শিরঃ, মাসত্রয়েণ পাদপ্রদেশঃ, চতুর্থে গুল্‌ফ জঠর কটিপ্রদেশাঃ, পঞ্চমে পৃষ্ঠবংশঃ, ষষ্ঠে মুখ নাসিকাক্ষি শ্রোত্রাণি, সপ্তমে জীবনেন সংযুক্তঃ, অষ্টমে সর্ব্বলক্ষণ সম্পূর্ণঃ পিতুরেতো হতিরেকাৎ পুরুষঃ মাতুরেতোঽতি রেকাৎ স্ত্রী, উভয়োর্বীজ তুল্যত্বান্ন পুংসকং ব্যাকুলিত মন সোঽন্ধাঃ খঞ্জাঃ কুব্জা বামনা ভবন্তি। অন্যোন্য বায়ু পরিপীড়িত শুক্রদ্বৈবিধাদ্ দ্বিধা তনুঃ স্যাদ্ যুগ্মাঃ প্রজায়ন্তে। পঞ্চাত্মকঃ সমর্থঃ পঞ্চাত্মিকা-চেতসা বুদ্ধির্গন্ধরসাদি জ্ঞানাক্ষরাক্ষরমোঙ্কারং চিন্তয়তীতি তদেকাক্ষরং জ্ঞাত্বাষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ ষোড়শ বিকারাঃ শরীরে তস্যৈব দেহিনঃ (এই দেহে প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব (বুদ্ধি) অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র এই অষ্ট প্রকৃতি এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চস্থূলভূত এবং মন—এই ষোড়শ পদার্থ বিদ্যমান আছে।

অথ মাত্রাশিত পীত নাড়ী সূত্রগতেন প্রাণ—আপ্যায়তে।

অথ নবমে মাসি সর্ব্ব লক্ষণ জ্ঞান সম্পূর্ণো-ভবতি, পূর্ব্ব জাতিং স্মরতি, শুভাশুভঞ্চ কর্ম্ম-বিন্দতি॥

যে নাড়ী গর্ভস্থ শিশুর নাভি হইতে মাতার হৃদয় পর্য্যন্ত যুক্ত আছে, তাহা দ্বারা মাতার ভুক্ত ও পীত দ্রব্যের রস গ্রহণ করিয়া গর্ভস্থ সন্তানের প্রাণ আপ্যায়িত হয়। অনন্তর নবম মাসে গর্ভস্থ সন্তান সর্ব্বলক্ষণ ও সর্ব্ব জ্ঞান সম্পন্ন হইয়া পূর্ব্ব জন্ম স্মরণ করে এবং তাহার শুভাশুভ কর্ম্মের জ্ঞান জন্মে!

পূর্ব্বে যোনিসহস্রাণি দৃষ্ট্বাচৈব ততোময়া আহারা বিবিধা ভুক্তাঃ পীতাঃ নানাবিধাঃ স্তনাঃ। জাতশ্চৈব মৃতশ্চৈব জন্মচৈব পুনঃ পুনঃ। যন্ময়া পরিজনস্যার্থে কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্। একাকী তেন দহ্যেঽহং গতাস্তে ফলভোগিনঃ। অহো দুঃখ দধৌ মগ্নো ন পশ্যামি প্রতিক্রিয়াম্। যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেঽহং তং প্রপদ্যে মহেশ্বরম্। অশুভ ক্ষয় কর্ত্তারং ফলমুক্তি প্রদায়কম্। যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেঽহং তং প্রপদ্যে নারায়ণম্। অশুভক্ষয় কর্ত্তারং ফলমুক্তি প্রদায়কং। যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেঽহং তং সাংখ্যং যোগমভ্যসে। অশুভ ক্ষয় কর্ত্তারং ফলমুক্তি প্রদায়কমং। যদি যোন্যাঃ প্রমুঞ্চামি ধ্যায়ে ব্রহ্ম সনাতনম্।

নবম মাসে শিশু এই প্রকার চিন্তা করিতে থাকে যে, আমি পূর্ব্বে সহস্র সহস্র জন্ম দর্শন করিয়াছি। তাহার পর মাতৃগর্ভ হইতে নির্গত হইয়া বিবিধ ভোগ্যবস্তু আহার ও নানাপ্রকার স্তনপান করিয়াছি। কতবার জন্মিয়াছি, কত বার মরিয়াছি, আমার জন্ম, আমার মৃত্যু, [illegible]

প্রকার পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু ভোগ করিয়াছি। পরিজন প্রতিপালনের জন্য কতই শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়াছি। কিন্তু সেই সকল কর্ম্মের নিমিত্ত আমাকে একাকী দগ্ধ হইতে হইতেছে, তাহারা তো তাহার ফলভোগ করিতেছে না! অহো! এই দুঃখ সাগরে মগ্ন হইয়া উদ্ধারের কোন উপায় দেখিতেছি না। যদি একবার এই গর্ভ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইতে পারি, তবে অশুভ ক্ষয়কারী মুক্তি ফলপ্রদায়ক সেই মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইব। যদি একবার এই গর্ভবাস হইতে মুক্ত হইতে পারি—তবে সেই অশুভ ক্ষয়কারী মুক্তি ফলদাতা নারায়ণের চরণে শরণ লইব। যদি একবার এই যোনি হইতে নির্গত হইতে পারি, তবে অশুভ বিনাশক সাংখ্য জ্ঞান এবং যোগের অভ্যাস করিব। যদি একবার যোনি হইতে মুক্ত হইতে পারি—তবে সর্ব্বদা সেই ব্রহ্মসনাতনকে ধ্যান করিব।

অথ যোনিদ্বারং সম্প্রাপ্তো যন্ত্রেণাপীড্যমাপে মহতা দুঃখেন জাতমাত্রস্তু বৈষ্ণবেন বায়ুনা সংস্পৃষ্ট স্তদান স্মরতি জন্মমরণানিচ কর্ম্ম শুভাশুভং বিন্দতি। গর্ভোপনিষৎ।

এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে গর্ভস্থ শিশু গর্ভদ্বারে আসিয়া—অস্থি যন্ত্র দ্বারা অতিশয় পীড়িত হইয়া, ঘোরতর দুঃখ প্রাপ্তির পর নরক হইতে নির্গত নারকীর ন্যায় গর্ভ হইতে নির্গচ্ছ হইয়া জন্মলাভ করে। সেই সময় বৈষ্ণবী মায়া দ্বারা মুগ্ধ হইয়া জন্মমরণাদি বিস্মরণ হইয়া যায় এবং শুভাশুভ কর্ম্মও আর জানিতে পারে না।

আমরা এই বৈষ্ণবী মায়া দ্বারা মুগ্ধ হইয়া সমস্ত বিস্মরণ হই বলিয়া আবার আমরা সংসারী জীবরূপ সংসার-প্রবাহে যাতায়াত করিতে থাকি। যে ব্যক্তি সেই শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হন, মায়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয় এবং আহার শুদ্ধিদ্বারা চিত্তশুদ্ধি আসিলে স্মৃতি পুনরায় উদয় হইলে যে যন্ত্রণার সংস্কার মাত্র থাকায় মৃত্যুর পর আবার সেই দুঃখে পড়িতে হইবে বলিয়া ভয়ঙ্কর বিভীষিকা আইসে —সেই সংস্কারের স্থানে পূর্ণ স্মৃতি লাভ পূর্ব্বক সংসার যাতায়াতের যন্ত্রণা—মনোমধ্যে উদিত হওয়ায় তাহার নিষ্কৃতির উপায় অনুসন্ধানে লিপ্ত হইয়া সেই ভয়েরও ভয়—অনন্তেরও অন্ত সেই অনন্তদেবের শরণাপন্ন হই। তাঁহার শরণাপন্ন হইলে মায়াও সরিয়া যায়। এই মায়ার হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া বড়ই কঠিন। যে ব্যক্তি সেই মায়া যাঁহা হইতে উদ্ভূত ও মায়া যাঁহার আশ্রয়—সেই শ্রীভগবানের শরণ লন, তিনিই সেই মায়ার হাত হইতে উদ্ধার পান, অন্যে পায় না।

দেবী হেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে॥

আমরা স্বয়ং জানিনা যে কি প্রকারে আমাদের সংসারে গতাগতি হইতেছে, তাই আমরা সতর্ক হইতে পারি না। সর্ব্বদা বিষয় লিপ্ত হইয়া সেই পরমধনকে ভুলিয়া যাই। আমাদের বালকেরাও আমাদের অনুকরণে ঈশ্বর বিমুখ হইয়া পড়িতেছে এবং সাধারণ বিদ্যা শিক্ষার সহিত ব্রহ্মবিদ্যা, পরলোকতত্ত্ব প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া যাইতেছেনা বলিয়া তাহারা এত শীঘ্র অধঃপাতের দিকে অগ্রসর হইতেছে। সংসার জ্বালা-যন্ত্রণার দিকে—শোক দুঃখের দিকে মনকে লইয়া গিয়া মনকে কাতর করিয়া তুলিতেছে, যখন সংসারে বিষয় সুখ নাই, কেবল দুঃখময় দেখাইতে পারিব, তখন প্রকৃত সুখ কোথায়—মন তাহার সন্ধান করিতে স্বতঃই প্রবৃত্ত হইবে। সেই সময় যদি ভগবানের

মনকে উপদেশ দেওয়া যায়, মনকে বুঝাইয়া দেওয়া যায় যে, সেই পতিতপাবন অধম-তারণ দীনবন্ধু দয়াময় হরি ভিন্ন আমাদের আর গতি নাই—তখনই মন সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তির পর পরমানন্দ লাভের নিমিত্ত সেই সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবানকে প্রেম ভক্তিপূর্ণ নয়নে দেখিবে। এই সাধন—সংসারে শ্রেষ্ঠ এবং সার সাধন। এই সাধন জন্য শরীর ও মন—কষ্টের হেতু হইলেও আবার দুঃখ নিবৃত্তির চেষ্টারও একমাত্র উপায়। এখন এই শরীর ও মন যাহাতে বালকের সুস্থ পবিত্র ও কর্ম্মক্ষম হয়—তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় (চট্টোপাধ্যায়) বি, এল।

পঞ্চকর্ম্ম।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—:০:—

ডাঃ। আচ্ছা বস্তি প্রয়োগের পর পথ্যাদির নিয়ম কি ?

ক। স্নেহবস্তি প্রয়োগের পর স্নেহ—শরীর থেকে নির্গত হ'য়ে গেলে, যদি পূর্ব্বেই অন্ন জীর্ণ হ'য়ে থাকে, তা'হ'লে সায়ংকালে লঘু অন্ন আহার ক'রাতে হয়। পরদিন প্রাতঃকালে ধনে ও শুঁঠের সঙ্গে সিদ্ধ করা গরম জল পান করান উচিত। উহাতে অগ্নির দীপ্তি ও আহারে রুচি হয়। বস্তি প্রয়োগের পর অতিভোজন, নিরন্তর একস্থানে থাকা, অধিক কথা বলা, যানে ভ্রমণ, দিবানিদ্রা, মৈথুন, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ, শীত ক্রিয়া, আতপসেবন, শোক ক্রোধ প্রকাশ, অকালভোজন এবং অহিতকর দ্রব্য-ভোজন পরিত্যাগ করা উচিত।

ডাঃ। এইবার নিরূহ প্রয়োগের বিষয় বলুন।

ক। স্নেহ বস্তি ও নিরূহ প্রয়োগের নিয়ম একই, তবে পূর্ব্বেই বলেছি যে, ভুক্ত অন্ন জীর্ণ হ'লে তবে নিরূহ প্রয়োগ ক'রতে হয়, ভুক্ত ব্যক্তিকে নিরূহ দিতে নেই। নিরূহ প্রয়োগের পর ত্রিশ মাত্রা উচ্চারণ ক'রতে যতক্ষণ সময় লাগে,—ততক্ষণ অপেক্ষা ক'রে রোগীকে উঠতে বলবে। নিরূহ প্রয়োগের পর উবু হয়ে ব'সতে হয় অর্থাৎ উপবেশন করতে হয়। নিরূহ এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই প্রত্যাগত হয়ে থাকে।

ডাঃ। বস্তি প্রয়োগ ক'রবার সময় কি রকম ভাবে প্রয়োগ ক'রতে হয়, আর খারাপ ভাবে প্রয়োগ ক'রলে কি দোষ হয়—সে সব কথা কিছু বলা হয় নি ?

ক। হয়েছে বৈকি? দোষ অনেক হয়, আর বস্তিব্যাপৎ [illegible]

কথা শুনতে পাবেন। এখন দুই একটা কথা ব'লছি। বস্তির নল সোজাভাবে প্রবেশ করা'তে হয়। কেননা তির্য্যকভাবে প্রবেশ করা'লে ঔষধের ধারা ভিতরে প্রবেশ করেনা। বস্তির নল চঞ্চল হ'লে গুহ্যদেশে ক্ষত হয়। বস্তিপুট আস্তে আসতে টিপলে বস্তির ঔষধ আশয় পর্য্যন্ত পঁহুছায় না। অত্যন্ত বল পূর্ব্বক টিপলে বস্তির ঔষধ কণ্ঠ পর্য্যন্ত যায়। এইজন্য বস্তির নল সরল ও স্থির ভাবে রাখবে এবং বস্তি খুব বেশী জোরেও নয় অথচ কম জোরেও নয়—এরূপ ভাবে টিপবে।

ডাঃ। স্নেহ বস্তি আর নিরূহ বস্তি প্রয়োগের পর পথ্যের নিয়ম কি এক রকম?

ক। তা' কি করে হ'বে? স্নেহবস্তি আহার করিয়ে, আর নিরূহ বস্তি আহার জীর্ণ হ'লে প্রয়োগ ক'রতে হয়। সুতরাং স্নেহ বস্তি প্রয়োগের পর স্নান ও ভোজন ক'রতে হয়। পিত্ত, কফ ও বায়ুজনিত রোগে যথাক্রমে দুগ্ধ, মুগের যূষ ও মাংসরসের সঙ্গে আহার দেবে। অথবা সমস্ত রোগেই জাঙ্গল মাংস রসের সঙ্গে পথ্য দেওয়া যেতে পারে। রোগীর দোষ ও অগ্নিবল অনুসারে নিত্য যে পরিমাণ খাওয়া অভ্যাস—তা'র সিকি' অর্দ্ধেক বা তিন ভাগ পরিমাণ খাদ্য দিতে হয়।

ডাঃ। আচ্ছা নিরূহ ঔষধ যদি শরীর থেকে না বেরিয়ে না আসে, তা' হ'লে কি অনিষ্ট হয়?

ক। হাঁ, খুব অনিষ্ট হয়। নিরূহ দ্রব্য অধিককাল শরীরের মধ্যে বদ্ধ থা'কলে গ্লানি, জ্বর—এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত হ'তে পারে। সেই জন্য নিরূহদ্রব্য অধিকক্ষণ শরীরের মধ্যে থা'কলে ক্ষার, গোমূত্র এবং অম্ল সংযুক্ত তীক্ষ্ণ নিরূহ প্রয়োগ ক'রে সংশোধন ক'রবে।

ডাঃ। সংশোধন করবেন কি? কতকটা পেটের মধ্যে র'য়েছে, আবার কতকটা পেটে ঢুকিয়ে দেবেন?

ক। হাঁ ঢুকিয়ে দেবেন—আগেকার দেওয়া নিরূহ শুদ্ধ বার ক'রবার জন্যে। যেমন বেনো জল ঢুকে সাবেক জল বা'র ক'রে নিয়ে যায়, সেই রকম, কিম্বা যেমন কানে জল দিয়ে জল বের করার নিয়ম আছে—সেই রকম।

ডাঃ। আচ্ছা নিরূহ প্রয়োগ ভাল কি মন্দ হ'ল—বোঝবার লক্ষণ কি?

ক। নিরূহ সম্যক রূপে প্রয়োগ করা হ'লে শরীর বেশ লঘু হয়, আর মল, পিত্ত, কফ ও বায়ু ক্রমান্তরে নির্গত হ'য়ে থাকে। নিরূহের অতি প্রয়োগ হইলে, অতিরিক্ত বিরেচন হ'লে যে সব লক্ষণ প্রকাশ পায় সেইরূপ ঘটে। আর অসম্যক প্রয়োগ হ'লে বেগ অল্প হয়, মল ও বায়ু কম নির্গত হয় এবং মূত্ররোধ, অরুচি ও শরীরের জড়তা জন্মায়।

ডাঃ। নিরূহের মাত্রা সম্বন্ধে কি স্বতন্ত্র নিয়ম আছে, না স্নেহবস্তির মত মাত্রা দিতে হয়?

ক। না, স্বতন্ত্র নিয়ম আছে। পিত্ত প্রধান রোগে কষায়ের মাত্রা পাঁচ ভাগ, স্নেহ এক ভাগ। পিত্ত প্রকৃতিস্থ থাকলেও এই রকম মাত্রা। বায়ুপ্রধান রোগে কষায়ের মাত্রা আট ভাগ, আর স্নেহ এক ভাগ। এক বৎসর বয়স্ক শিশুর নিরূহের মাত্রা আট তোলা। দ্বিতীয় বৎসর থেকে দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিবৎসর আট তোলা মাত্রা বৃদ্ধি ক'রতে হয়, অর্থাৎ দ্বিতীয় বৎসর ১৬ তোলা, তৃতীয় বৎসর

২৪ তোলা, চতুর্থ বৎসর ৩২ তোলা এইরূপ। দ্বাদশ বৎসর থেকে অষ্টাদশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর ১৬ তোলা ক'রে মাত্রা বৃদ্ধি ক'রতে হয়। আঠার বৎসর থেকে সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত এই নিয়মেই নিরূহ প্রয়োগ ক'রতে হয়। সত্তর বৎসরের পর যোল বৎসর বয়সে যেরূপ মাত্রা আছে—সেই রকম মাত্রায় দিতে হয়। শিশু ও বৃদ্ধদিগের নিরূহের মাত্রা দুইপল এবং নিরূহ দ্রব্য মৃদুবীর্য্য হওয়া উচিত।

ডাঃ। এ রকম মাত্রায় নিরূহ দিলে বোধ হয় এক নিরূহেই রোগীর দফা শেষ হয়। কেননা আঠার বৎসর বয়সে চার সের বত্রিশ তোলা নিরূহ দিতে হবে। তা'রপর শিশুদের নিরূহের মাত্রা একবার বলা হল যে প্রথম বৎসর ৮ তোলা তা'রপর প্রতি বৎসর আট তোলা বাড়া'তে হবে। তা'রপর বলা হল যে শিশুদের মাত্রা ষোল তোলা! এতে বুঝব কি?

ক। বুঝবেন সবই, কিন্তু ক্রমশঃ। শাস্ত্রে বলে যে "শনৈঃ পর্ব্বত লঙ্ঘনম" অর্থাৎ ধীরে ধীরে পর্ব্বত লঙ্ঘন করতে হয়। তা' আপনি কি আয়ুর্ব্বেদের পঞ্চকর্ম্মরূপ এই মহাপর্ব্বত একেবারেই লঙ্ঘন ক'রতে চান? সবুর করুন—সবুরে মেওয়া ফলে। আপনার আপত্তি আমি খণ্ডন ক'রছি। আপনার প্রথম কথা এই যে, মাত্রা বড় বেশী। পূর্ব্বে ঔষধাদির মাত্রা যেরূপ ছিল, এখনকার লোকে যে সেরূপ মাত্রা সহ্য করতে পারে না—সে কথা পূর্ব্বে বলেছি। থাবার ওষুদ সম্বন্ধে যেরূপ নিয়ম, বস্তি প্রয়োগের ঔষধেরও সেইরূপ নিয়ম। আরও একটা কথা,—দেখুন, শাস্ত্রকার বলেছেন যে, সত্তর বৎসর বয়সের পর ষোল বৎসর বয়সের মত মাত্রা প্রয়োগ ক'রতে হ'বে। কিন্তু এখন সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত কম লোকেই বাঁচে। আগে লোকের একশত বা একশত কুড়িবৎসর পরমায়ু ছিল, আর সেই হিসাবে সত্তর বৎসরের পর লোকে প্রকৃত বৃদ্ধ হতো। বেশী দিনের কথা নহে—খনার বচনেও "নর গজা বিশে শয়" অর্থাৎ নর ও গজ একশত কুড়ি বৎসর বাঁচে, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এখন লোকে যখন সত্তর বৎসরের বেশী বাঁচে না, তখন ৫০ বা ৬০ বৎসর বয়সের আগে বৃদ্ধ হয় এরূপ মীমাংসা করা উচিত। আর তা' ব'লে সত্তর বৎসর বয়সে যে পরিমাণ বস্তি দ্রব্য প্রয়োগ ক'রবার নিয়ম, এখন পঞ্চাশ বৎসরেই সেই রকম প্রয়োগ ক'রতে হ'বে,—তাও কম মাত্রায়, কেননা এখনকার লোক অল্পপ্রাণ। তারপর আপনার দ্বিতীয় কথা—শিশুদের মাত্রা সম্বন্ধে। এখন দেখুন শিশুকাল কত দিন? সকল শিশু সম্যক বলশালী হয় না, সকল শিশুর দেহ সমান ভাবে পরিবর্দ্ধিত হয় না? এ সব বিষয় বিচার ক'রতে হ'লে অনেক পার্থক্য দেখতে পাবেন। কোনমতে দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শৈশব অবস্থা, তাই যদি হয়, তা'হ'লে দুই বৎসরের শিশুকে যে পরিমাণ ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, নয় বৎসরের শিশুকে কি সেই প্রমাণ ঔষধ প্রয়োগ করা সঙ্গত? কাজেই শিশুদের একটা সাধারণ মাত্রা নির্দ্দিষ্ট ক'রে তা'রপর বলা হয়েছে যে, শিশুর বয়স অগ্নিবল, দেহের, পরিমাণ প্রভৃতি লক্ষ্য করে মাত্রার হ্রাস বৃদ্ধি ক'রতে হ'বে।

ডাঃ। আচ্ছা আপনি পূর্ব্বে বলেছিলেন যে, আয়ুর্ব্বেদে রেক্‌টাল ফিডিং (Rectal feeding) আছে। সে কি এই বস্তি না আর কিছু?

ক। না আর কিছু নয়, এই বস্তিই বটে।

ডাঃ। তা বস্তিটী রেকফিডিং হ'ল কি করে?

ক। রেকট্যাল ফিডিং মানে মলদ্বার দিয়ে খাওয়ান বা পুষ্টিকর পদার্থ মলদ্বার দিয়ে শরীরে প্রবেশ করান। পূর্ব্বে ব'লেছি যে, বৃংহণ বস্তি আছে। বৃংহণ মানে পুষ্টিজনক। যে বস্তি প্রয়োগে শরীরের পুষ্টি হয়, সে বস্তি কি মলদ্বার দিয়ে খাওয়ান নয়? একটা বস্তি দ্বারা প্রযুজ্য ঔষধের নমুনা দেখুন। ছাগমাংস ৬।০ সওয়া ছয় সের, আট গুণ জলে সিদ্ধ ক'রে চতুর্থ ভাগ থাকতে নামাবে। তার পর এক পোয়া তৈল ও এক পোয়া ঘৃত দিয়ে সাঁতলে নেবে। এই মাংসরস, দধি ও দাড়িমের রসের দ্বারা অম্লীকৃত এবং সৈন্ধব লবণ ও মদন ফলের কল্ক মিশ্রিত করে তদ্দ্বারা বস্তি প্রয়োগ করবে। এই বস্তি বল, বর্ণ, মাংস ও শুক্রবর্দ্ধক, অগ্নিদীপক এবং আন্ধ্য ও শিরোরোগ নাশক। এখন বিবেচনা করে দেখুন, এই বস্তির উদ্দেশ্য মলদ্বার দিয়ে পুষ্টিকর দ্রব্য শরীরে প্রবেশ করান নহে কি?

ডাঃ। প্রকারান্তরে এটা রেকট্যাল ফিডিং বটে, কিন্তু আমরা যে রকম স্থলে রেকট্যাল ফিডিং করি, সে রকম নয়। এই মনে করুন, হিক্কা রোগে রোগীকে মুখ দিয়ে খাওয়ানো যাচ্ছেনা, তাকে মলদ্বার দিয়ে খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। এ সে রকম নয়।

ক। না, সেরকম নয়। তবে সে রকম না তোলেও মলদ্বার দিয়ে যে পুষ্টিকর পদার্থ প্রবেশ করান যেতে পারে, এবং আয়ুর্ব্বেদ কারগণের যে সে সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল এর দ্বারা তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়? আর তাই যদি ছিল— তা' হ'লে যে সকল রোগীকে মুখ দিয়ে খাওয়ান যায় না, অথচ আহারাভাবে মারা যাচ্ছে, তাদের যে মল দ্বার দিয়ে খাওয়ান হ'ত না এমন কথা বলা যায় না; তবে এসম্বন্ধে কোন বিশিষ্ট প্রমাণ এখন দিতে পারছিনে।

ডাঃ। কথাটা বলেছেন মন্দ নয়। তবে যখন বিশিষ্ট প্রমাণ নেই, তখন জোর ক'রে কিছু বলা চলে না। এখন বস্তি সম্বন্ধে যদি সব কথা বলা হয়ে থাকে, তা' হ'লে তা'র পর কি করতে হয় বলুন।

ক। বস্তি সম্বন্ধে আরও অনেক কথা আছে। তবে আর পুঁথি বাড়িয়ে কাজ নেই। কিন্তু বস্তির পর কি ক'রতে হয় তা' বল'বার আগে উত্তর বস্তির কথা বলে নেই।

ডাঃ। হাঁ তাই বলুন ওটা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।

ক। পুরুষকে উত্তর বস্তি দিতে হ'লে রোগীর আঙ্গুলের চৌদ্দ আঙ্গুল পরিমাণ নল প্রস্তুত ক'রতে হয়, মালতী ফুলের বোঁটার আগার মত সূক্ষ্ম এক একটি সর্ষপ নির্গত হ'তে পারে এরূপ ছিদ্র বিশিষ্ট হবে। কেহ কেহ বলেন যে, লিঙ্গের সমান পরিমাণ নল প্রস্তুত ক'রতে হ'বে। নল স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্ম্মিত এবং মসৃণ হওয়া আবশ্যক। বস্তি দ্বারা প্রযুজ্য স্নেহ পদার্থের পরিমাণ আট তোলা। কিন্তু আট তোলা পূর্ণ মাত্রা, পঁচিশ বৎসর অপেক্ষা কম বয়স হ'লে বিবেচনাপূর্ব্বক মাত্রা কম ক'রতে হ'বে।

উত্তর বস্তি প্রয়োগ ক'রতে হ'লে রোগীকে প্রথমতঃ স্নেহ স্বেদ প্রদান করে ঘৃত ও দুগ্ধ সংযোগে যথা শক্তি যবাগু পান করাবে। পরে রোগীকে জানু তুল্য উচ্চ সমান আসনে বসিয়ে বস্তি ও মস্তকের তালুদেশ উষ্ণ তৈল দ্বারা অভ্যঙ্গ করাবে। অনন্তর শলাকা দ্বারা

লিঙ্গের ছিদ্র অন্বেষণ ক'রে পরে ঘৃত্যাভ্যক্ত বস্তি নল ছয় অঙ্গুলি পরিমাণ প্রবিষ্ট করাবে এবং বস্তি প্রয়োগ করে নলটী ধীরে ধীরে বার ক'রে নেবে।

বস্তি দ্বারা প্রযুক্ত স্নেহ প্রত্যাগত হোলে অপরাহ্ন কালে দুগ্ধ, মুগের যূষ, বা মাংসের যূষ আহার করতে দেবে। এই রূপ নিয়মে তিন চার বার বস্তি প্রয়োগ ক'রতে হয়। তবে উপর্য্যুপরি না দিয়ে স্নেহ বস্তির ন্যায় এক দিন অন্তর দিতে হয়।

ডাঃ। স্ত্রীলোকদেরও কি এই নিয়মে উত্তর বস্তি প্রয়োগ করতে হয়?

ক। স্ত্রীলোকদের অপত্য পথে চার অঙ্গুলি এবং মূত্রপথে দুই অঙ্গুলি বস্তি নল প্রয়োগ করতে হয়। বালিকাদের মূত্রপথে এক অঙ্গুলি পরিমাণ। স্নেহ পদার্থের মাত্রা রোগীর হাতের এক অঞ্জলি পরিমাণ। স্ত্রীলোকদের উত্তর বস্তি প্রয়োগ ক'রতে হ'লে উত্তান (চিৎ) ভাবে শুইয়ে জানুদেশ উর্দ্ধদিকে রেখে বস্তি প্রয়োগ করতে হয়। গর্ভাশয় শোধনের জন্য স্নেহ পদার্থের মাত্রা দুই অঞ্জলি। উত্তর বস্তি প্রয়োগ করলে যদি স্নেহপদার্থ নির্গত না হয়, 'তা' হ'লে পুনর্ব্বার শোধনীয় ঔষধ সংযুক্ত বস্তি প্রয়োগ করবে, কিম্বা শোধনদ্রব্য সংযুক্ত বস্তি মলদ্বারে প্রয়োগ করবে। ইহাতে মলের বেগ উপস্থিত হ'লে স্নেহ নির্গত হতে পারে। অথবা বস্তি মার্গে এষণী নামক যন্ত্র প্রয়োগ করবে। কিম্বা মুষ্টি দ্বারা নাভির অধোভাগে পীড়ন ক'রবে। কিম্বা সোঁদাল পাতা, নিসিন্দার রস, গোমূত্র ও সৈন্ধব লবণ সংযোগে বয়স ভেদে মুগ, এলাচ, জীরা, সর্ষপের ন্যায় বেধ বিশিষ্ট বস্তু প্রস্তুত করে প্রয়োগ করবে। অপত্যমার্গে চার অঙ্গুলি বস্তি প্রয়োগ করতে হয়।

বস্তিদেশে দাহ জন্মালে, যষ্টিমধুর শীতল কাথে মধু ও চিনি মিশ্রিত করে অথবা ক্ষীরী বৃক্ষের (যে সকল বৃক্ষের আটা আছে) বটাদি কাথ শীতল দুগ্ধ সহ মিশ্রিত করে, তদ্দ্বারা বস্তি প্রয়োগ করবে।

ডাঃ। উত্তর বস্তি কোন্ কোন্ রোগে প্রয়োগ করা হয়?

ক। আর্ত্তব দূষিত হ'লে কিম্বা অসময়ে আর্ত্তব দর্শন বা আর্ত্তব নাশ হলে, মূত্রাঘাত, মূত্রদোষ, যোনি রোগ, অপরা (ফুল) না পড়া, শুক্র নির্গমন, শর্করা, পাথরী, বস্তি, কুঁচকি বা লিঙ্গে শূলবদ্ বেদনা এবং মেহ ব্যতীত বস্তি জাত অন্যান্য ঘোরতর রোগ সকল উত্তর বস্তি দ্বারা প্রশমিত হয়। এই উত্তর বস্তির সম্যক প্রয়োগের লক্ষণ; ব্যাপৎ এবং তাহার চিকিৎসা স্নেহ বস্তির ন্যায়।

ডাঃ। এইবার কি ব্যাপদের কথা বলবেন নাকি?

ক। না আগে পঞ্চকর্ম্ম শেষ হোক তারপর ব্যাপদের কথা বলব।

ডাঃ। এইবার কোন্ কর্ম্ম?

ক। এইবার নস্য। বমন-বিরেচন অনু-বাসন ও নিরূহ প্রয়োগ ক'রে শরীর শুদ্ধ হ'লে পর রোগীর মস্তকে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ ক'রবে। তা'রপর রোগের বল বিবেচনা ক'রে একবার, দুইবার বা তিনবার নস্য প্রয়োগ ক'রে শিরো বিরেচন ক'রবে। শিরোবিরেচন সম্যক্‌রূপে প্রযুক্ত হ'লে হৃদয়, মস্তক ও ইন্দ্রিয় সকল লঘু হয় এবং স্রোতসকল বিশুদ্ধ হয়। আর মস্তক অতি বিরেচিত হ'লে মস্তক, চক্ষু, শঙ্খদেশে ও কর্ণে বিবিধ পীড়া, সূচীবেধবৎ বেদনা এবং চক্ষুতে অন্ধকার দেখা এই সকল

লক্ষণ প্রকাশ পায়। এইরূপ ঘ'টলে রোগীকে স্নেহ পান করিয়ে মৃদু তর্পণ প্রয়োগ করবে।

ডাঃ। আচ্ছা নস্যমাত্রকেই কি শিরো-বিরেচন বলে ?

ক। না, নস্যের কথা এইবার বলছি, যা ব'ললাম—এটা হ'ল বস্তি প্রয়োগের পর শিরোবিরেচনের নিয়ম।

নস্য কর্ম্ম, পাঁচ প্রকার, যথা, প্রতিমর্ষ, অবপীড়, নস্য, প্রধমন ও শিরোবিরেচন। তন্মধ্যে স্নেহ দ্রব্য নাসাপুটের দ্বারা উর্দ্ধে আকর্ষণ ক'রে গলদেশ দিয়ে বহির্গত ক'রলে তা'কে প্রতিমর্ষ নস্য বলে। প্রতিমর্ষ নস্য দুই অঙ্গুলীতে লইয়া সকল ঋতুতেই দিবারাত্রি সকল সময়ই নাসাপুটে প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু উদ্ধশ্বাসে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নয়। ইহা দ্বারা সুস্থ ব্যক্তিদিগের দন্ত, শিরঃ, কপালাদি দৃঢ় হয়। প্রাতঃকালে, সন্ধ্যাকালে, আহারান্তে এবং নিদ্রা, পর্য্যটন, পরিশ্রম, মৈথুন, মস্তকে তৈলাদি মর্দ্দন, গণ্ডূষ ধারণ, মূত্রত্যাগ, অঞ্জন ধারণ; দাতন করা এবং হাসি অন্তে দুই বিন্দু পরিমাণ প্রতিমর্ষ নস্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। অবপীড়নস্য দুই রকম, শোষণ ও স্তম্ভন। কোনো বস্তু অবপীড়ন ক'রে (টিপে) তা'থেকে রস নিয়ে যে নস্য লওয়া যায়, তা'কে অবপীড় নস্য বলে।

নস্য—স্নেহ শূন্য মস্তককে স্নিগ্ধ ক'রবার জন্য এবং গ্রীবা, স্কন্ধ ও বক্ষঃস্থলের বলাধানের জন্য নাসিকা দ্বারা যে স্নেহ প্রয়োগ করা যায়, তার নাম নস্য। এই নস্যের মাত্রা ত্রিবিধ, প্রথম মাত্রা আট বিন্দু, দ্বিতীয় মাত্রা ৩২ বিন্দু এবং তৃতীয় মাত্রা ৬৪ বিন্দু। বলানুসারে ভিন্ন মাত্রায় প্রয়োগ ক'রতে হয়। বায়ু ও কফে তৈল, কেবল বায়ুতে চর্ব্বি, পিত্তে ঘৃত এবং বাতপিত্তে মজ্জার দ্বারা নস্য প্রয়োগ হিতকর।

ছয় অঙ্গুল পরিমিত দুই মুখ বিশিষ্ট নলের মধ্যে ঔষধ রেখে এক মুখে ফুঁদিয়ে মুখ দ্বারা নাসিকার মধ্যে ঔষধ প্রয়োগ করাকে প্রশমন নস্য বলে। প্রশমন নস্য সুক্ষ্মতা বশতঃ স্রোতঃ সমূহে প্রবেশ ক'রে বহু দোষের নিঃসরণ করে। আর শিরোবিরেচক দ্রব্য দ্বারা অথবা শিরো-বিরেচক দ্রব্য সাধিত স্নেহ দ্বারা যে নস্য প্রয়োগ করা যায়, তাকে শিরোবিরেচন বলে। আবার এই পাঁচ প্রকার নস্যকে স্নেহ এবং শিরোবিরেচন এই দুইভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। তন্মধ্যে নস্যের ভাগ প্রতিমর্ষ আর শিরোবিরেচনের অবপীড় ও প্রশমন।

নস্য যে জন্য প্রয়োগ করিতে বলা হইয়াছে, সেই সকল কার্য্য এবং দৃষ্টি প্রসন্ন করিবার জন্য মস্তক বায়ু কর্ত্তৃক অভিভূত হইলে, দন্ত কেশ ও শ্মশ্রু পতিত হইতে থাকিলে কর্ণশূল ও ক্ষেড় রোগে, তিমির নামক চক্ষুঃ রোগে, স্বরভেদ; নাসারোগ, মুখ শোষ আমরাচ্ছন্না নামক বাতব্যাধি, অকাল বলিপলিত দরুণ বাতপৈত্তিক রোগ, মুখরোগ এবং অন্যান্য বিবিধ রোগে বাত পিত্ত নাশক দ্রব্যসহ স্নেহ পাক করিয়া নস্য প্রয়োগ করিবে।

আর তালু কণ্ঠ ও মস্তক শ্লেষ্মা দ্বারা ব্যাপ্ত হ'লে, অরুচি, মাথাভার, মাথা কামড়ানী পীনস (নাসা রোগ বিশেষ), আধকপালে, ক্রিমি, প্রতিশ্যায় (নাকমুখ দিয়া জলস্রাব), মৃগী, ঊর্দ্ধগত রোগে শিরোবিরেচন নস্য প্রয়োগ করতে হয়।

ডাঃ। আচ্ছা নস্য কি সকলকেই প্রয়োগ ক'রতে পারা যায়।

ক। আহারের পর, উপবাসের পর, তরুণ প্রতিশ্যায় রোগী; গর্ভবতী স্ত্রী, [illegible]

ব্যক্তি স্নেহ পান ক'রেছে, যে ব্যক্তি জল, মদ্য বা দ্রবদ্রব্য পান করেছে, অজীর্ণ রোগী যা'কে বস্তি প্রয়োগ করা হ'য়েছে, ক্রুদ্ধ, সংযোগ বিষাক্রান্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, শোকাতুর, পরিশ্রান্ত, বালক, বৃদ্ধ, যে ব্যক্তি মল মূত্রের বেগ ধারণ ক'রেছে যে ব্যক্তি মস্তক ধৌত করেছে—এই সকল ব্যক্তিকে কদাচ নস্য প্রয়োগ ক'রবে না। আর অকালে মেঘোদয় হ'লে নস্য ও ধূম প্রয়োগ উভয়ই নিষিদ্ধ।

ডাঃ। এই বল্লেন বস্তি কার্য্যের পর নস্য প্রয়োগ ক'রতে হয়, আবার বলছেন, যে, বস্তি দেওয়া হ'লে নস্য প্রয়োগ করবে না। আর যদি কেউ এক ঢোক জল কি দুধ খায়, তা'কে নস্য দিলেই বা কি দোষ হয়।

ক। বস্তিকার্য্যের পরেই নস্য দিতে হয়। কিন্তু এখানে বোঝাচ্ছে যে, যে দিন বস্তি দেওয়া হবে, সেইদিন নস্য প্রয়োগ করবে না। বস্তি প্রয়োগের রোগী সবল হ'লে নস্য প্রয়োগ ক'রতে হয়। আর এক ঢোক জল খাওয়া যে বল্লেন, ওটা এক তণ্ডুল ন্যায় অগ্রাহ্য। অর্থাৎ একটী তণ্ডুল খেলে যেমন সে আহার ক'রেছে এ কথা বলা যায় না সেইরূপ একটু আধটু জল খেলে, সে জল খেয়েছে ও কথা বলা যায় না।

ডাঃ। আয়ুর্ব্বেদ প'ড়তে হ'লে দর্শনশাস্ত্র জানার দরকার দেখছি। এখন কি নিয়মে নস্য প্রয়োগ ক'রতে হয় বলুন।

ক। মলমূত্র পরিত্যাগ এবং মুখধৌতাদি ক'রে মস্তকে স্নেহ-মালিষ ক'রে ও সেঁক দিয়ে রোগীকে বায়ু প্রবাহহীন স্থলে শয়ন করাতে হ'বে। তার পর কণ্ঠার উর্দ্ধদেশে পুনরায় সেঁক দিয়ে পা কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে এবং মাথা কিছু নীচু ক'রে রাখতে হবে। তারপর গরম জলের বাষ্প দ্বারা নস্য উত্তপ্ত ক'রে এক নাসাপুট রুদ্ধ রেখে অন্য নাসা পুটে নল বা তুলি দ্বারা নস্য প্রয়োগ ক'রবে। পরে সেই নাসাপুট রুদ্ধ করে অন্য নাসায় প্রয়োগ ক'রবে। তার পর রোগীর পদতল, স্কন্ধ, হস্ত ও কর্ণ মর্দ্দন ক'রবে। রোগী নাক দিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে নস্য টেনে মুখ দিয়ে বার ক'রে ফেলবে। যতক্ষণ সমস্ত ঔষধ বেরিয়া না যায়, ততক্ষণ এইরূপ ক'রতে হ'বে। এইরূপ ভাবে দুই তিনবার নস্য প্রয়োগ ক'রতে হয়।

নস্য অসম্যক প্রয়োগের ফলে যদি রোগী মূর্চ্ছা যায়, তা'হলে মস্তক বাদ দিয়ে শরীরে শীতল জল সেচন করবে।

ডাঃ। নস্য কি নিত্য প্রয়োগ করতে হয়? আর কতদিনই বা প্রয়োগ করা উচিত?

ক। স্নৈহিক নস্য প্রতি তৃতীয় দিবসে অর্থাৎ একদিন অন্তর প্রয়োগ ক'রতে হয়। এইরূপে সাত দিন পর্য্যন্ত প্রয়োগ করা যেতে পারে। আবার শিরোবিরেচনও একদিন অন্তর প্রয়োগ ক'রতে হয়। একদিন স্নেহ নস্য তা'র পর দিন শিরোবিরেচন নস্য এইরূপ ভাবে প্রয়োগ ক'রতে হয়। আবার অবস্থা ভেদে দুদিন অন্তরও প্রয়োগ ক'রতে হয়।

ডাঃ। আচ্ছা পূর্ব্বে বলা হয়েছে যে, এইরূপ ব্যক্তিকে স্নৈহিক নস্য এবং এইরূপ ব্যক্তিকে শিরোবিরেচন প্রয়োগ করবে, কিন্তু এখন বল্‌ছেন যে, দুই রূপ ক'রতে হবে।

ক। সেটা অবস্থার উপর নির্ভর করে। আবশ্যক না হ'লে দু'রকম দেবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আবশ্যক হ'লে দুরকমও দেওয়া যায়। এই মনে করুন, মস্তক অতি স্নিগ্ধ হলে বিরেচন নস্য প্রয়োগ ক'রতে হয়। আবার শিরোবিরেচনে [illegible]

স্নৈহিক নস্য প্রয়োগ ক'রতে হয়।

ডাঃ। আচ্ছা নস্য প্রয়োগের পর কি করতে হয় বলুন ?

ক। নস্য প্রয়োগের পর রোগীর মস্তকে পুনরায় স্বেদ প্রদান ক'রতে হয়। তারপর নস্য স্নেহ বা'র ক'রে ফেলবার জন্যে রোগী বার বার শ্লেষ্মার সহিত স্নেহ আকর্ষণ ক'রে নাক ঝেড়ে ফেলবে। শিরোবিরেচনের পর মস্তক শূন্য হয়ে যায়। রোগী এই অবস্থায় যে দোষ প্রকোপক খাদ্য আহার করে, যাহা সেই দোষ কুপিত হয়ে মস্তক আশ্রয় ক'রে বহু রোগ উৎপন্ন ক'রতে পারে। এই জন্য শিরো বিরেচনের পর সুপথ্য সেবন করা কর্ত্তব্য। শিরোবিরেচন প্রয়োগ করবার সময় স্নেহ যেন চক্ষুতে না পড়ে, এরূপ ভাবে প্রয়োগ ক'রতে হয়,আর চক্ষু বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করা ভাল।

ডাঃ। আচ্ছা নস্যের অযোগ অতিযোগ হ'লে কি হয় ?

ক। সম্যক যোগ হ'লে মস্তকের লঘুতা, সুনিদ্রা, সুখ জাগরণ ; রোগের উপশম, ইন্দ্রিয় সমূহের বিশুদ্ধি এবং মনের সুখ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। মস্তক অতিস্নিগ্ধ হ'লে মস্তকের গুরুতা ও ইন্দ্রিয়ের বিভ্রম এই সকল উপসর্গ ঘটে। আর অসম্যক যোগ হ'লে ইন্দ্রিয়গণের বিগুণতা, রুক্ষতা ও রোগের অপশম হয়। মস্তক অতিস্নিগ্ধ হ'লে রুক্ষ ক্রিয়া ক'রতে হয়, আর অসম্যক প্রয়োগ হ'লে পুনর্ব্বার আবশ্যক মত নস্য প্রয়োগ ক'রতে হয়।

ডাঃ। এইবার ধূম পানের বিষয় বলুন।

ক। ধূম পাঁচ প্রকার, যথা প্রায়োগিক, স্নৈহিক, বৈরেচনিক, কাসহর ও বামন। মতান্তরে প্রায়োগিক, স্নৈহিক ও বৈরেচনিক ভেদে ধূম তিন প্রকার বলা হয়েছে। এই মতে কাসহর ধূম প্রায়োগিকের এবং বামনধূম বৈরেচনিকের অন্তর্ভুক্ত।

প্রায়োগিক ধূম নিত্য ব্যবহার্য্য। এই ধূমপানের প্রথা পূর্ব্বে যে প্রচলিত ছিল, সেটা কাদম্বরী প্রভৃতি গ্রন্থপাঠ ক'রলে জানা যায়। এলাচ, গন্ধতৃণ, দারুচিনি, বালা, ধূনা, অগুরু, কুঙ্কুম প্রভৃতি দ্রব্য উত্তমরূপে বেটে একটী বার অঙ্গুলি প্রমাণ শরকাণ্ড আট অঙ্গুলি রেশমী কাপড় জড়িয়ে তার ওপর লেপ দেবে। লেপ যবের ন্যায় মধ্যে স্থূল এবং অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ মোটা হওয়া উচিত। লেপ শুষ্ক হলে শরকাণ্ড বারকরে নিয়ে সেই বর্ত্তির ধূম পান করাকে প্রায়োগিক বলে। আর বহেড়ার মজ্জা, মোম ধূনা প্রভৃতি দ্রব্যের সহিত ঘৃতাতি স্নেহ মিশ্রিত ক'রে বর্ত্তি প্রস্তুত ক'রলে তাকে স্নেহস ধূম বলে। আপাং, সজিনা বীজ, পিঁপুল প্রভৃতি শিরোবিরেচক দ্রব্যের দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত ক'রে ধূমপান ক'রলে তাকে বৈরেচন ধূম বলা যায়। বৃহতী, কণ্টকারী, হিং, কাকড়াশৃঙ্গী প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করে ধূমপান করলে তাকে কাসঘ্ন ধূম বলে। আর পশুর খুর, শিং, কাঁকড়ার খোলা, শুষ্ক মাংস প্রভৃতির দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত ক'রলে তাকে বামন অর্থাৎ বমনকারক ধূম বলে।

ডাঃ। ধূমপান ক'রতে হয় কি করে ?

ক। পাইপ চাই, তবে পাইপটি একটু দীর্ঘ। প্রায়োগিক ধূমপানের নল দেড় হাত, স্নৈহিক ধূমপানের নল বত্রিশ আঙ্গুল,বৈরেচনিক ধূমপানের নল ষোল আঙ্গুল এবং বামন ধূম পানের নল দশ আঙ্গুল হওয়া উচিত। স্বর্ণ, রৌপ্য তাম্র প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য দিয়ে ধূমের নল প্রস্তুত করবার কথা বলা হয়েছে

ধূমপানের নলও সেই সমস্ত দ্রব্য দিয়ে প্রস্তুত ক'রতে হয়। নলের অগ্রভাগে একটী কুলের আঁটি যেতে পারে, এমন ছিদ্রযুক্ত হবে, আর গোড়ার দিকে অঙ্গুষ্ঠ প্রবেশ যোগ্য ছিদ্র থাকবে। নলটী ঋজু অথচ ত্রিভঙ্গ হবে।

ডাঃ। ঋজু অথচ ত্রিভঙ্গ কি ?

ক। ঋজু কিনা সোজা—আর ত্রিভঙ্গ কি না—তিন জায়গায় বাঁকা, যেমন ত্রিভঙ্গ মুরারি, অর্থাৎ নলের গঠন শ্রীকৃষ্ণের মত হবে।

ডাঃ। হেঁয়ালি ছাড়ুন মশায়, ঋজু অথচ ত্রিভঙ্গ কি—সেটা স্পষ্ট করে বলুন।

ক। স্পষ্ট করে বলতে পারছিনে বলেই এই হেয়ালী ধরেছি। যদি অপর লোক হ'ত তা'হলে যা হয় ক'রে বুঝিয়ে দিতাম। কিন্তু সত্য কথা ব'লতে হ'লে নিজেই যখন বুঝিনে তখন বোঝাব কি। অবশ্য আমি এই সত্য কথা বললাম ব'লে অনেক লম্বসাটপটাবৃত কবিরাজ আমাকে গালি দেবেন এবং তাঁহাদের মতে এই সহজবোধ্য কথাটা আমি বুঝতে পারিনি ব'লে আমায় লম্বকর্ণ ব'লে উপাধিও দিতে পারেন। আজকালকার দিনে এই রকমই ঘটেছে। যে যত মূর্খ, তার তত আস্ফালন বেশী। এই ফরফরায়মান সফরী-দের জ্বালায় অস্থির হ'তে হয়েছে। আপনার কাছে একটা সত্য কথা ব'লে যতই গালা-গালি খাই না কে'ন, কিন্তু একটা আত্ম প্রসাদ জন্মেছে।

কথাটা একটু স্পষ্ট করে আপনাকে বলছি, মূলে আছে "ঋজু ত্রিকোষ ফলিতং" অর্থাৎ নলটা তামাক খাবার পাইপে যেমন কোষ থাকে, সেই রকম তিনটে কোষ থাকবে। কিন্তু সবটা ঋজু যদি হয়, তবে তিনটে কোষ থাকার সার্থকতা কি ? ধূমতো কোষে প্রবেশ না করে বরাবর সোজা চলে যাবে।

ডাঃ। যাক মোটামুটি এক রকম বোঝা গেল, এখন ধূমপান করবার নিয়ম কি বলুন।

ক। রোগী প্রসন্নচিত্ত এবং সাবধান হয়ে নীচু দিকে দৃষ্টি সম্বদ্ধ রেখে স্বচ্ছন্দভাবে উপবেশন ক'রে ধূমপান করবে। স্নেহাক্ত বর্ত্তির অগ্রভাগে আগুন ধরিয়ে নলের ছিদ্রের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়ে ধূমপান করতে হয়। প্রথম মুখ দিয়ে ধূমপান করে পরে নাক দিয়া পান ক'রতে হয়। মুখ দিয়ে এবং নাক দিয়ে ধূমপান করে যথাক্রমে মুখ ও নাক দিয়েই ধূম পরিত্যাগ করা উচিত। মুখ দিয়ে ধূম-পান করে কদাচ নাক দিয়ে পরিত্যাগ করা উচিত নয়। কারণ তাতে দৃষ্টিশক্তির হানি হয়ে থাকে। প্রায়োগিক ধূম নাসিকা দ্বারা, স্নেহস ধূম মুখ ও নাসিকা দ্বারা বৈরেচন ধূম নাসিকা এবং কাসঘ্ন ও বামনীয় ধূম মুখ দিয়ে পান করাই বিধি। আবার বক্ষ ও কণ্ঠগত রোগে মুখ দ্বারা এবং মস্তক, নাসিকা ও চক্ষুগত রোগে নাসিকা দ্বারা ধূমপান করা উচিত। প্রায়োগিক ধূমপানের বস্তি থেকে শরকাণ্ড ঘুচলে রৌদ্র ও বায়ু প্রবাহ হীন স্থানে শুষ্ক করতে হয়। তারপর আগুন ধরিয়ে নলে বসিয়ে ধূমপান করতে হয়। স্নেহস এবং বৈরেচন ধূমপানের এইরূপ নিয়ম। আর কাসঘ্ন ও বামনীয় ধূম পান করতে হলে একখানি শরায় কাঠ কয়লার নির্ধূম আগুন রেখে তাইতে বর্ত্তি দিতে হবে। সেই শরার ওপর আর এক ছিদ্রযুক্ত শরা ঢাকা দিয়ে সেই ছিদ্রমুখে নল সংলগ্ন করে ধূমপান করতে হবে। যতদিন শরীর নির্দোষ না হয়, তত দিন ধূমপান করা উচিত।

ডাঃ। ধূম কি [illegible]

না নির্দ্দিষ্ট সময় আছে।

ক। সময় নির্দ্দিষ্ট আছে বৈকি। মূত্র ত্যাগ, মলত্যাগ, হাঁচি শোষ, এবং মৈথুনের পরে স্নেহ ধূম, স্বেদ, বমন ও দিবানিদ্রার পর বিরেচন ধূম দন্ত প্রক্ষালন নস্য গ্রহণ, স্নান, ভোজন ও শস্ত্রকার্য্যের পর প্রায়োগিক ধূম পান করা উচিত।

ডাঃ। আচ্ছা স্নানের পর বিরেচন ধূম আবার প্রায়োগিক ধূম দুই পান করবার কথা বলা হল কেন?

ক। স্নানের পর দুই রকমই পান করা যেতে পারে।

ডাঃ। অন্য সময়ে ধূমপান করলে কি দোষ হয়?

ক। অকালে ধূমপান করলে ভ্রম, মূর্চ্ছা শিরোরোগ এবং কর্ণ ও জিহ্বা প্রভৃতির অনিষ্ট হয়ে থাকে।

ডাঃ। ধূম কি সকলেই পান করতে পারে।

ক। না, শোক পরিশ্রম, ভয়, ক্রোধ, উষ্ণতা, বিষ, রক্তপিত্ত, মদরোগ, মূর্চ্ছা, দাহ, পিপাসা, পাণ্ডুরোগ, তালুশোষ, বমি, মস্তকে আঘাত, উদ্গার, উপবাস, তিমির (চক্ষু রোগ বিশেষ) মেহ, উদরাধ্মান ও উর্দ্ধগতবাত রোগাক্রান্ত এবং বালক বৃদ্ধ দুর্ব্বল, যাহাদের বিরেচন প্রয়োগ করা হইয়াছে, যে ব্যক্তি রাত্রি জাগরণ করিয়াছে, গর্ভিণী রুক্ষ ক্ষীণ, যাহার বক্ষস্থলে ক্ষত হইয়াছে, যে ব্যক্তি মধু ঘৃত দধি দুগ্ধ মৎস্য মদ্য ও যবাগু প্রচুর পরিমাণে পান করিয়াছে এবং যে ব্যক্তি অল্প কফ বিশিষ্ট তাহাদের পক্ষে ধূম পান নিষিদ্ধ।

(ক্রমশঃ)

বাঙ্গালার যক্ষ্মা।

বঙ্গদেশে যক্ষ্মা রোগ যেরূপ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা আবশ্যক। যক্ষ্মার অপর নাম ক্ষয় রোগ। রোগ মাত্রেই ক্ষয় কিন্তু যক্ষ্মায় অতি শীঘ্র দেহের ক্ষয় করিয়া থাকে বলিয়া ইহার সাধারণ নাম ক্ষয়।—যে শ্রেণীর যক্ষ্মা অতি মারাত্মক, উহার নাম রাজযক্ষ্মা, রাজযক্ষ্মা হইলে মানুষ হাজারদিন অর্থাৎ মোটের উপর তিন বৎসরের অধিক বাঁচেনা। রাজযক্ষ্মা ও সাধারণ যক্ষ্মায় তফাৎ অনেক, রাজযক্ষ্মার ক্ষয়কারী শক্তি যত অধিক, তেমন অপর যক্ষ্মার নহে। উহা অত্যধিক পরিমাণে সংক্রামক,

তাই মানুষ মাত্রেই উহাকে ভয় করিয়া থাকে। রক্ত বমন ও জ্বর ইহার প্রধান ও সাধারণ লক্ষণ, তবে রক্ত বমন হইলেই যে ক্ষয় হইবে এমন কোন কথাই বলা যায়না বাঙ্গালী অন্ন চিন্তায় জর্জ্জরীত, প্রফুল্ল চিত্ততা বাঙ্গালীর নাই. তাই যক্ষা বাঙ্গালায় এত বিস্তৃতি হইয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বদা কদর্য্য স্থানে বাস, কদর্য্যাহার প্রভৃতি দ্বারাই যক্ষা রোগের উৎপত্তি হয়। কখন কখন ম্যালেরিয়া জ্বর হইতে যক্ষার উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। কাস সংযুক্ত অল্প অল্প জ্বরই যক্ষার মূল চিনিবার উপায়। যাহারা অত্যধিক মৈথুনাশক্ত তাহাদেরই যক্ষারোগ হওয়ার সম্ভাবনা সমধিক। যক্ষা রোগীর দিবা নিদ্রা বর্জ্জনীয়। নিত্য মুক্তবায়ু সেবন ও সহ্য মত প্রাতঃভ্রমণ ও সান্ধ্যবায়ু সেবন কর্ত্তব্য। রাত্রে আবদ্ধ গৃহে না থাকিয়া জানালা খুলিয়া সুবাতাস সেবনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাহারা উন্মুক্ত স্থানে থাকিয়া মুক্তবায়ু সর্ব্বদা সেবন করে, তাহাদের দিকে যক্ষা আর ঘেঁসিতে পারে না।

অনেক সময় দেখা যায়, কোন উপদ্রব না থাকিলেও যক্ষারোগী ক্রমে শীর্ণ হইতে থাকে। যক্ষারোগ কতিপয় বৎসরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ঋষি প্রণীত নিয়মাদি রক্ষা না করিয়া আমরা হীনবল হইতেছি, তাহার উপর উদরান্নের সংস্থানের জন্য আমাদের প্রাণান্ত পরিশ্রম ও যথোপযুক্ত আহারের অভাব বাঙ্গালার যক্ষারোগ বৃদ্ধির প্রধান কারণ। যক্ষা সংক্রামক ব্যাধি বলিয়া লোকে ইহাকে বড় ভয় করে।

যক্ষা রোগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে মৈথুন সম্বন্ধে সতর্কতাবলম্বন বা তাহাকে বর্জ্জন করা একান্ত আবশ্যক। যাহারা এবিষয়ে অসতর্ক, তাহারাই মৃত্যুকে অকালে ডাকিয়া আনে। বালকগণের ও অতি বৃদ্ধের প্রায় এই রোগ হইতে দেখা যায় না। যক্ষারোগীদিগের কাম বাসনার উদ্রেক অত্যধিক হইয়া থাকে। এবং সেই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সুযোগ সে সর্ব্বদাই খুঁজিতে থাকে। কেবল তাহাই নহে, অন্যান্য কুপথ্য গ্রহণের জন্যও সে অতি মাত্রায় ব্যগ্র হইয়া পড়ে। এই সকল বিষয়ে কেহ হিতোপদেশ দিলে সে তাহার কথা অগ্রাহ্য করিতে ব্যস্ত হয়।

যক্ষা রোগীর অন্যান্য নিয়ম প্রতিপালনের মত দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ বর্জ্জনীয়। কুপথ্যত্যাগ করিয়া অতিজনতায় বা এক স্থলে বহু লোক একত্রে শয়ন করিবে না। বহু জন নিঃশ্বাসে গৃহের শুদ্ধ বায়ুও দূষিত হইয়া পড়ে। প্রত্যহ কোষ্ঠশুদ্ধির ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজন। সর্ব্বদা মনকে প্রফুল্ল রাখিতে হইবে। স্ত্রী বা মৈথুন বিষয়ে সর্ব্ব প্রকার চিন্তা হইতে দূরে থাকিবে। কলহ ও ক্রোধ বর্জ্জন করিবে। শোক দ্বারা চিত্ত চাঞ্চল্য জন্মাইবেনা, অতি আহার বা অনাহার করিবে না। সর্ব্বদা সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া দ্বিতল ও ত্রিতলে যাতায়াত সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে। শীত বা রৌদ্র লাগাইবেনা; দূষিত মৎস্য মাংস ভোজন ও অতি মসলা সংযুক্ত দুষ্পাচ্য ব্যঞ্জনাহার এবং অধিক লঙ্কা পেঁয়াজ রসুন ভক্ষন বর্জ্জন করিতে হইবে, গরম জল ঠাণ্ডা করিয়া পান করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা এই রোগের একটা প্রতিষেধক ব্যবস্থা, ভাজা পোড়া দ্রব্যাহার নিষিদ্ধ। ২৫ হইতে ৫০ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিগণেরই এই রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা বেশী। ৩০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত রোগীই অনেক দেখা [illegible]

বর্ষাকালে এই রোগ বেশী হইয়া থাকে। যাহাদের পুরাতন রোগ তাহারাও বর্ষাকালে বেশী ভুগিয়া থাকে। বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে ইহার যাপ্যাবস্থা। শীতকালেও ইহার আক্রমণ কিছু কম। প্রাতরুত্থান দেহকে রোগ মুক্ত-করে, যক্ষ্মারোগে প্রাতরুত্থান অবশ্য কর্ত্তব্য, প্রাত র্ভ্রমণও উত্তম ব্যবস্থা, প্রাতে ও সন্ধ্যায় মুক্ত বায়ু সেবন বড় সুপথ্য, হিমালয় প্রদেশে ধরণহর নামক স্থানে গভরমেণ্ট যক্ষ্মারোগীর বাস স্থান নির্দ্দেশ করিয়া সেখানে একটী যক্ষ্মা আশ্রম করিয়াছেন, আর সংপ্রতি কলিকাতা মেডিকেল কলেজেও গভরমেণ্ট একটী যক্ষ্মা চিকিৎসালয় নির্ম্মান করিয়াছেন, উহা অতি উচ্চ, অতি উচ্চস্থানে বিশুদ্ধ বাতাস পাওয়া যায়, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিয়া রোগী প্রফুল্ল চিত্ত হয়। কলিকাতায় কলের ধূম চিমণী দিয়া উপরে উঠিয়া যায় সত্য, কিন্তু সে ধূম উপরের দিকে বেশী উঠিতে না পারিয়া কিছু বিশুদ্ধ হইয়া নীচেই নামিয়া আসে। মন্দের ভাল বলিতে হইবে। অগ্ন্যুত্তাপ, ধূমসেবা- যক্ষ্মারোগীর পক্ষে অতি নিষিদ্ধ। পল্লীতে পল্লীতে যক্ষ্মারোগী দৃষ্ট হয়, সুতরাং যাহারা যক্ষ্মারোগী দেখিবেন, তাঁহারা যেন যক্ষ্মারোগীকে উপযুক্ত উপদেশ দিয়া তাহাঁর আয়ুর্বৃদ্ধির সহায়তা করেন। এবং যাহাতে সেই স্থানে আর যক্ষ্মারোগ বৃদ্ধি হইতে না পারে, তাহারও উপায় করেন।

বংশানুক্রমে যক্ষ্মারোগ সংক্রমিত হইতে দেখা যায়, তাই অনেকে যক্ষ্মারোগীর পুত্র কন্যার সহিত নিজ পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে ইতস্ততঃ করিয়া থাকেন। যাহারা যক্ষ্মারোগীর শুশ্রূষা করে, তাহারাও এই রোগাক্রান্ত হইতে পারে। যক্ষ্মারোগীর পুত্রকন্যাগণকেও সাধারণতঃ দুর্ব্বল হইতে দেখা যায়। যক্ষ্মারোগীর শ্বাস প্রশ্বাসে যক্ষ্মার বীজাণু বিচরণ করে, অধিকন্তু যক্ষ্মারোগীর শুক্র শোণিতেও যক্ষ্মার বীজাণু দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল যে পুরুষেরই যক্ষ্মা হয় এমন নয়, স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও বহুতর যক্ষ্মারোগী দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহাদের জরায়ু দূষিত ও যাহারা প্রদরাদি রোগে পীড়িত, তাহারা অতি সহজেই যক্ষ্মারোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে পারে। তাহাদের স্তন্য দুগ্ধ পান করিয়া তাহাদের শিশুগণও যক্ষ্মারোগ গ্রস্ত হইতে পারে। তবে বাল্যকালে উহাদের রোগ প্রকাশ পায় না, উপযুক্ত বয়স হইলে প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং কিছুকাল তাহা যাপ্য হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে যক্ষ্মারোগ চিকিৎসার অনেক প্রকার প্রণালী আছে। পুরাকালে আমাদের দেশে এখনকার মত যক্ষ্মার প্রাদুর্ভাব না থাকিলেও দূরদর্শী ঋষিগণ এই রোগের সর্ব্বপ্রকারে আলোচনা করিয়াছিলেন। অধুনা ইউরোপীয় ডাক্তারগণ যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধে নানাপ্রকার আলোচনা করিতেছেন। তাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে যে সকল বিষয় লক্ষ্য করিতেছেন, তাহার আলোচনা ভালই হইতেছে। শীত-প্রধান দেশেও যক্ষ্মারোগ যথেষ্ট পরিমাণে হইয়া থাকে। তবে মরুময় প্রদেশে যক্ষ্মা-রোগ দুই রকম হইয়া থাকে। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেছি—একদা আমি রোগাক্রান্ত হইয়া চিকিৎসারজন্য কলিকাতা যাইতেছিলাম, আমার মুখ দিয়া অধিক লালা পড়িত, আমি আমার পুত্রকে লইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিয়াছি, দুইদিন গাড়ীতে থাকিয়া কলিকাতায় পৌছিব, মধ্যম শ্রেণী ও তৃতীয় শ্রেণীতে আমার

অপর সঙ্গী লোক রহিয়াছে। কোন এক জংসনে গাড়ী বদল হইল—রাত্রি তখন দশটা। এই সময় একদল মাড়োয়ারি ধনী সেই গাড়ীতে উঠিলেন, তাঁহারা কলিকাতার যাত্রী, তাঁহারা গাড়ীতে উঠিয়া কহিলেন 'বাবু তোমরা ক্যা হুয়া।" আমি বলিলাম 'জরবি হ্যায়, লহুবি গিড়তা।' তাঁহারা সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—ক্যা বাবু, যখ হ্যায়।' আমি কহিলাম 'হাঁ যখ হ্যায়।' তাহারা 'বাপরে যখ্।' বলিয়া অন্য কোন গাড়ীতে চলিয়া গেলেন! আমার গাড়ীতে একজন রাজভ্রাতা ও একটী তাঁহার একজন উচ্চ সহকারী ছিলেন, তাঁহারা উভয়েই আমার পূর্ব্ব পরিচিত। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন 'কেন আপনার যক্ষ্মা হইয়াছে বলিলেন?' আমি বলিলাম 'এই দেখুননা, ইহারা এ গাড়ীতে উঠিলে কথাবার্ত্তা কহিয়া রাত্রি ভোর করিয়া দিত, আমিতো পীড়িতই, আপনারা পর্য্যন্ত ঘুমাইতে পারিতেন না।' রাজপুতানা প্রভৃতি মরুময় প্রদেশে যক্ষ্মারোগ নাই বলিলেই হয়, তাই ইহারা যক্ষ্মারোগকে যত ভয় করে, তত আর কোন রোগকে ভয় করে না। যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধে সতর্ক থাকা সকলেরই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যক্ষ্মারোগকে বঙ্গদেশ হইতে তাড়াইতে না পারিলে বাঙ্গালীর আর রক্ষা নাই, সেই জন্য দেশের চিন্তাশীল বাঙ্গালীগণ এই রোগের হস্ত হইতে যাহাতে বাঙ্গালা দেশ রক্ষা পাইতে পারে—তাহার জন্য চেষ্টাশীল হউন, ইহাই আমার বক্তব্য।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী, বিদ্যাভূষণ।
এম্‌, আর, এ, এস।

আয়ুর্ব্বেদে ওলাউঠা।

[চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ।]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

চিত্রকাদি গুড়িটি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে লিখিত থাকিলেও আমি সাধারণের সুবিধার জন্য উহার ফর্দ্দটি এইস্থানে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

চিতামূল, পিপুলমূল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পঞ্চলবণ, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, হিং, বনযমানী ও চৈ—এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া গোঁড়া লেবুর রসে বাটিয়া দুই আনা পরিমিত গুড়িকা প্রস্তুত করিতে হয়। অম্লজনিত অতিসারে—ইহা অব্যর্থ ঔষধ।

আর একটি রোগীর পরিচয় দিই। সেটি পুরুষ, বয়স ৩০। সেটির জন্য যখন আমার ডাক পড়ে, তখন তাহার অবস্থা আরও সাঙ্ঘাতিক। নাড়ী দেখিলাম—নাড়ীর অবস্থা খুবই খারাপ, হাতে পায়ে খাল ধরাটা খুবই বেশী। খুব অবস্থাপন্ন ঘরের রোগী হইলে—বোধ হয় রাগারাটি গুরু ডাক্তার কবিরাজগণকে একত্র করার ব্যবস্থা হইত, কিন্তু [illegible] মধ্যবিত্ত গৃহস্থ [illegible]

স্বভাবের,—আর বোধ হয় আমার উপর একটু বিশ্বাসও ছিল—সেইজন্য আমারই হস্তে—একমাত্র পুত্রের জীবন-মরণের দায়ীত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন।

পরিচয় লইয়া জানিলাম—আহারাদির এমন কোনো বিশেষ গোলযোগ ঘটে নাই—যাহার জন্য তাঁহার এই ব্যাধি উপস্থিত হইতে পারে। তখন স্থির করিলাম—সংক্রামক স্থানে অবস্থিতিই ইহার কারণ।

ইঁহার রোগও প্রাতঃকালে আরম্ভ হয়—এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ভীষণ অবস্থা হইয়া উঠিয়াছে।

রাণাঘাটে থাকিতে ঔষধ তৈয়ার করাটা আমার একটা বিশেষ অভ্যাস ছিল। প্রয়োজন থাক আর নাই থাক—সকল অধিকারেরই নানাবিধ ঔষধ নিত্য তৈয়ার হইত। এক্ষেত্রে চিত্রকাদি গুড়ি'তে কিছু হইবে না—বুঝিলাম, সেইজন্য এ রোগীকে "বিসূচিকারি রসের" ব্যবস্থা করিলাম—হাতে পায়ে খাল নিবারণের জন্য আগুণের স্বেদ দিয়া মালিশ করার উপদেশও দিলাম। বমন নিবারণের জন্য পূর্ব্ব কথিত রোগিণীকে যেরূপ ধনে, মৌরি, কর্পূর ও বড়এলাচ ভিজান জলের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, ইঁহার জন্যও সেই ব্যবস্থা করিলাম। নাভির চারিদিকে সেই—যায়ফলের প্রলেপ—সকল ব্যবস্থাই রাখিলাম, কিন্তু কিছুই উপকার দর্শিলা না, রোগের প্রকোপ উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। আমি বড়ই বিপন্ন হইলাম। ভাবিলাম—এরূপ রোগী লইয়া দুর্ণাম কেনা অপেক্ষা অন্য চিকিৎসককে ডাকিতে পরামর্শ দিই। রোগীর পিতার এক আত্মীয়ের নিকট মনের কথা আভাস ইঙ্গিতে প্রকাশও করিলাম। রোগীর পিতা আত্মীয়ের মুখে সে কথা শুনিলেন, কিন্তু তিনি বলিলেন,—আমার পুত্রের অবস্থা যাহা হয় হউক—আমি অন্য কাহাকেও ডাকিব না—উঁহারই উপর আমার সম্পূর্ণ নির্ভর—যাহা হয় উঁহারই হাতে হইবে।

রোগীর পিতার যখন এতটা আগ্রহ—তখন আমি অন্য চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া প্রাণান্ত পরিশ্রমে রোগীর চিকিৎসা করিতে লাগিলাম।

যখন দেখিলাম দাস্ত কিছুতেই কমিতেছে না, তখন অহিফেনঘটিত "কর্পূর বটী"—কর্পূর ভিজান জলের সহ ১ ঘণ্টা অন্তর ২টি প্রয়োগ করিলাম এবং প্রসাব করাইবার জন্য 'হিমসাগর' বা 'পাথর কুচির' পাতা ও 'সোরা' একত্রে বাটিয়া তলপেটে প্রলেপ দেওয়ার ব্যবস্থা করিলাম। সেবনের জন্য 'কর্পূর বটী' ভিন্ন হিমসাগরের পাতার রস সহ বজ্রক্ষার ৩ রতি ও মকরধ্বজ ১রতি—একত্র মিশাইয়া তাহাও সেবন করার ব্যবস্থা করিলাম। এরূপ ব্যবস্থায় দেখিলাম—ক্রমশঃ উপকার হইতে লাগিল, সেইজন্য ইহার পরিবর্ত্তন না করিয়া ইহাই চালাইতে লাগিলাম। ক্রমশঃ রোগী আরোগ্য হইল, আমার ভাগ্যে যশ ছিল, আমি অর্থের সহিত কিঞ্চিৎ যশোলাভও করিলাম।

শোধিত হিঙ্গুল (হিঙ্গুল পাতি লেবুর রসে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ৩দিন ৩ রাত্রি ভিজাইয়া রাখিলেই শোধিত হয়) শোধিত অহিফেন (অহিফেন দুগ্ধে ভিজাইয়া শোধন করিতে হয়) মুতা, ইন্দ্রযব (কুড়চির ফলকে ইন্দ্রযব বলে, ইহা বেণের দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়) জায়ফল, সোহাগার খই ও কর্পূর—এই সকল দ্রব্য সমানভাগে লইয়া জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিলেই কর্পূর বটী প্রস্তুত হয়। বিসূচিকা

ভিন্ন প্রবল অতিসার ও গ্রহণী রোগেও ইহা প্রয়োগ করিতে পারা যায়।

জায়ফল, জৈত্রী, খোসাশুদ্ধ ছোট এলাইচ, খোসাশুদ্ধ বড় এলাইচ, জীরা, মরিচ, যমানী, মৌরি ও রাঁধুনি—প্রত্যেক দ্রব্য আধ তোলা পরিমাণে লইয়া ১৵০ সিদ্ধির গুঁড়া উহার সহিত মিশ্রিত করিতে হয়। তাহার পর আফিঙ ভিজান জলে বাটিয়া কুলের আঁটির ন্যায় বটীকা করিলেই "বিসূচিকারি রস" প্রস্তুত হইল। আতপ চাউল ভিজান জল, জীরা ভাজার গুঁড়া ও মধু কিম্বা জীরা ভিজান জল ও মধু দিয়া বিসূচিকায় ইহা প্রয়োগ করিতে হয়।

আমি আরও কতকগুলি বিসূচিকার চিকিৎসা করিয়াছিলাম, সমস্ত পরিচয় এ প্রবন্ধে লিখিতে গেলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়ে, সেইজন্য সে সব পরিচয় পরে দিব। তবে আমার বিশ্বাস, যদি প্রথম হইতেই বিসূচিকার রোগী পাওয়া যায়—তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় ইহার বিশেষ ফল দর্শিতে পারে—কিন্তু রোগের নিদান বুঝিয়া ও বিশেষ যত্ন লইয়া চিকিৎসা করা চাই। শুধু চিকিৎসকের ব্যবস্থায় ঔষধ প্রয়োগ করিলে চলিবেনা, বাড়ীর লোককেও সেবা সুশ্রূষার জন্য বিশেষ যত্ন লইতে হইবে।

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন।

প্রতিকার।

চপলা টুক্‌টুকে অধরে বিজলী খেলিয়া কমলিনীর নিকট সরিয়া বসিল। চপলা কমলিনীর সই। সে অনেক দিন শ্বশুর বাড়ী কাটাইয়াএই সে দিন বাপের বাড়ী আসিয়াছে। কমলিনী শ্যাম সুন্দরের স্ত্রী। শ্যাম সুন্দরের বাড়ী—চপলাদের বাড়ীর অতি নিকটে, তাই চপলা ও কমলিনীর মধ্যে ভালবাসাটা বেশ গাঢ় হইয়া গিয়াছে। বাড়ী আসিয়া চপলা —সইকে দেখিতে আসিয়াছে। কমলিনীর মন আজ তত ভাল নয়, তাই মুখখানি যেন মেঘে ঢাকা। হৃদয়ের যাতনা—মুখমণ্ডল যেমন প্রকাশ করে, আমাদের কৃত্রিম ভাষা তেমন পারে না। কমলিনীর মুখ আজ বিষাদ কালীমায় মাখা দেখিয়া চপলা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে, কমলের বিরহ উপস্থিত। চপলার পক্ষে এরূপ সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক, কারণ চপলা যুবতী—রং-তামাসা, হাসি-ঠাট্টা ও আমোদ আহ্লাদেই যুবতীগণ অধিক সময় অতিবাহিত করে। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে ইহা তাহাদের পক্ষে নিন্দনীয় নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে চপলার সিদ্ধান্ত খাটিল না। কমলিনী বিরহ-বিধুরা নহে।

কমল। সই, ভগবান যা'কে সুখী করেন —সে সকল অবস্থাতেই সুখী—তা'র দুঃখের আঁচড়টী পর্য্যন্ত লাগে না। সই, তুমি বেশ আছ,—বেশ [illegible]

কাটিয়ে দিচ্ছ। যাই হোক সই, তোমাদের দেখেই আমরা সুখী। আমাদের কপালে ত বিধাতা সুখ লেখেন নি! বুঝি এ জীবন এমনি দুঃখেই কাটিয়ে দিতে হ'বে! জীবনের প্রভাতেই যখন এমন আঁধার হ'ল, তখন সারা জীবনই বুঝি আঁধারে কাটাতে হবে! বুঝ্‌লে বোন, আমার বিষ বদন কেন?

চপলা। সই, তুমি যে এমন কবি হ'য়ে উঠেছ, তাতো আমি জানিনে! খুব লম্বা চওড়া তো ব'লে গেলে আমি যে ওর কিছুই বুঝতে পারলাম না। কবির সঙ্গে থেকে বুঝি কবি হ'য়েছ? তা, -আমাকেও তোমার চালা কর না। তবে আর কিছু বুঝতে পারি, না পারি, তো এই টুকু বুঝলাম যে, আমার কমলকলির ভেতর কি একটা পোকা ঢুকেছে, আর সেই পোকাই তা'র এমন দশা ক'রেছে। সত্যি আমার মনটা কেমন ক'রছে--কি হ'য়েছে—ব'লবনা?

কমল। আর ভাই!

কমল একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল। বোধ হইল,—যেন কত নীরব-বেদনা বুকখানাকে পোড়াইয়া ছাই করিয়া, একটা উত্তপ্ত বাষ্প হইয়া বাহির হইয়া গেল। কমল উদাস নয়নে আকাশের দিকে চাহিল। কমলের এইভাব দেখিয়া চপলার প্রাণ উড়িয়া গেল। সে বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িল। সই-এর এ ভাব সে কখনো দেখে নাই। এমন হাসি ভরা, ঢলঢল বিকসিত পদ্ম সদৃশ মুখ—আজ শুকাইয়া ম্লান হইয়া গিয়াছে। সখীর মর্ম্ম যাতনা আপনি হৃদয়ে অনুভব করিয়া চপলা কাঁদিয়া ফেলিল। কমলের নীরব শোকের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল—সে সইকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কিছুক্ষণ কাঁদিল। ইহাতে তাহার হৃদয় যেন একটু শান্ত হইল। শোকের অংশ ভাগী যদি পাওয়া যায়- যদি কেহ ব্যথার ব্যথী থাকে, তাহা হইলে তাহাতে শোকের কিছু লাঘব হয়। কমলেরও তাই হইল।

কিছুক্ষণ পরে কমল বলিল—"চপল, আমার কপাল বড়ই মন্দ, প্রভাত হ'তে না হ'তে সন্ধ্যা এল। প্রাণের কত সাধ, কত আহ্লাদ - সব যেন বন্যার জলে ভেসে গেল। চপল, ভেবেছিলাম,এ শোক তাপময় সংসারকে নন্দন কানন ক'রে তু'লব—আমার স্বপ্ন দিয়ে গড়া রাজ্য যে ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে গেল! আমি কত আশায় বুক ভরিয়ে রেখেছিলাম—আমার বুক ভেঙ্গে গেল, আশাও চ'লে গেল। চপল, এ আমি কি করলাম --আমি কি কর্ব্বো? এ যাতনা কার কাছে ব'লবো?—যিনি যাতনা দিচ্ছেন—তিনিই কেবল জানেন, আর ত কেউ জানে না—আর ত কেউ শুনে না। চপল, যদি বুকখানা দেখা'বার হ'ত, দেখা'তাম যে, এই নীরব বেদনায় আমার বুক খানাকে কত পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিচ্ছে! কি হ'য়েছে জান, ওঁর খুব শক্ত অসুখ ক'রেছে। সবাই ত যক্ষ্মা ব'লচে। ডাক্তার ব'লচেন (pthysis) থাইসিস্। পয়সাও ত খুব খরচ করা হ'চ্ছে, কিছুতেই কিছু হ'চ্ছে না। কিছু দিন যায়—আবার হঠাৎ এক ঝলক রক্ত ওঠে। কাল আবার রক্ত উঠেছে—থানা, থানা রক্ত। কি করি চপল, আমার প্রাণ যে উড়ে যাচ্ছে! ভগবান কি আমার ওপর এতই নির্দ্দয় হ'বেন—আমার দিকে কি একটুও মুখ তুলে চাইবেন না?

চপলা। ভাই, ভগবান দয়া না ক'র্‌লে কি আমরা একদণ্ড বাঁচতাম? তাঁর অসীম দয়া। তাঁর দয়ায় সকল প্রাণীই বেঁচে আছে।

তাঁর যদি দয়া হয় তো তোমার স্বামীর অসুখ সেরে যা'বে। তুমি কায়মনোবাক্যে তাঁকে ডাক, তাঁর দয়া হ'বে, তোমার চোখের জল মুছে যা'বে। তোমার মত নিরীহ প্রাণীকে কষ্ট দিয়ে তাঁ'র কি লাভ ?

কমল। তাই বল ভাই,—তাই বল। যেমন ক'রে ডাকৃতে বল—তেমনি কোরে ডাকৃবো। শয়নে, স্বপনে সকল সময়েই ত তাঁকে ডাকৃছি। এর জন্য যদি আমার প্রাণ দিতে হয়— তাতেও ত আমি কুণ্ঠিত নই !

চপলা। দেখ ভাই, আমার একটা কথা শুনবে ?

কমলা। তা শুনবো না কেন সই, আমার যা'তে উপকার হবে—আমি তাই করবো ?

চপলা। দেখ, অনেক শক্ত ব্যারাম কবিরাজী চিকিৎসায় সারে। আমি একটী ঠিক এই রকম ঘটনা জানি। আমার শ্বশুর বাড়ীর কাছে বোসোদের একটা ছেলের ঠিক এই রকমই হ'য়েছিল। ডাক্তার দেখানর অভাব হয়নি। তা'রা খুব বড়লোক, পয়সাটা জল বৃষ্টির মত খরচ ক'রেছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'লনা। তাঁ'র বৌয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হ'য়েছিল। সে রোজ আমাদের বাড়ী আসত; স্বামীর অসুখের কথা তুলে কতই যে কাঁদত— তা' আর কি ব'লব। তা'র চোকের জল শুকোতনা। আর বৌটার স্বামীগতপ্রাণ। তা'র স্বামীও তা'কে খুব ভালবাসত। যখন ডাক্তার কিছু ক'রতে পারল না, তখন সকলেই কবিরাজ দেখাতে ব'লল। বেশ নামজাদা একজন কবিরাজকে আনা হ'ল, তিনি দেখতে লাগলেন। তিনি পর পর ভিন্ন ভিন্ন ওষুধ দিতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁ'র শরীর সবল হ'তে লাগল এবং রক্ত বমিও দিন দিন ক'মে আসতে লাগল। এমনি ক'রে ৩।৪ মাস ওষুধ খাওয়ার পর রক্ত বমি বন্ধ হ'য়ে গেল। তারপরও একবছর নাগাদ ওষুধ খেয়েছিল। এখন শুনতে পাই—তা'র অসুখ একেবারে সেরে গিয়েছে। এখন কেমন সুশ্রী, সবল, সুস্থ দেহ হয়েছে। তার জন্য—দুইটা মুষ্টিযোগ যা' দেওয়া হ'য়েছিল—আমি তা' লিখে নিয়েছি। তোমাকে কাল সে কাগজ খানা এনে দেবো। ভাই, বেলা গেল, এখন উঠলাম, কাল নিয়ে আস্‌বো।

কমল। এস ভাই, তবে। কবিরাজ দেখানর বন্দোবস্ত ক'রব।

পর দিন কমল শ্বাশুড়ীকে কবিরাজ আনিতে শ্বশুরকে বলিতে বলিলেন। শ্বশুর সেই দিন হইতে খুব ভাল একজন বৃদ্ধ কবিরাজ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কবিরাজীমতে চিকিৎসা চলিতে লাগিল।

চপলা যে দুইটা মুষ্টিযোগ লিখিয়া রাখিয়াছিল, তাহা আনিয়া দিল। তাহা এই—(১) ননীর সহিত মধু ও চিনি একত্র মিশাইয়া রোগীকে খাইতে দেওয়া,—অথবা দুধ, ঘি ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করান, ইহাতে শরীর পুষ্ট হয়। (২) পায়রা, হরিণ, ছাগ বা বানর—ইহাদের মাংস ভাজিয়া চূর্ণ করিয়া ছাগলের দুধের সহিত খাইলে ক্ষয় রোগ ভাল হয়।

কবিরাজ, আয়ুর্ব্বেদ মতে 'অশ্বগন্ধাদি' 'ত্রয়োদশাঙ্গম,' এবং আর কয়েকটা ব্যবস্থা পর পর প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। শ্যামসুন্দরের অবস্থা উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। দেখা গেল—অন্যান্য মুষ্টিযোগের সহিত চপলার উক্ত দুইটী মুষ্টিযোগ তিনি [illegible] ব্যবহার করিয়া [illegible]

সেবন করিয়া শ্যামসুন্দর নষ্ট স্বাস্থ্য পুনপ্রাপ্ত হইলেন। কমলিনীর হাসি ফুটিল,—কমল আবার বিকসিত হইল।

* * * *

কিসে শ্যামসুন্দর নবজীবন লাভ করিল —কবিরাজী ঔষধে—কি কমলিনার একাগ্র ভগবৎ আরাধনায়—তাহা পাঠকগণ বিচার করিবেন। তবে আমাদের ঋষিকৃত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র এখনো মরে নাই। যদি বল এখন কবিরাজী ঔষধে আর তেমন কাজ হয় না,—সে দোষ ঔষধের নয়, সে দোষ কবিরাজের এবং কতক আমাদেরও। কবিরাজ মহাশয়েরা সকল সময়ে উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করেন না। মধু অভাবে গুড় দেন। ইহা হয় তাঁহারা গাছ গাছড়া চিনেন না, বেদিয়া যাহা আনিয়া দেয়—তাহার উপর নির্ভর করেন, নয় উপযুক্ত পয়সা পান না বলিয়া মধু অভাবে গুড় দেন। সেই জন্যই ঔষধ কার্য্যকরী হয় না। ইহাতে তাঁহাদের অপযশ ত আছেই, অধিকন্তু লোকের মনে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের উপর একটা অবিশ্বাস জন্মাইয়া দেয়। ইহার এক প্রতিকার আছে, যদি অস্মদ্দেশীয় ধনী ও রাজা মহারাজগণ কবিরাজ রাখিয়া স্বব্যয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতে যথাযথ ভেষজ সংগ্রহ পূর্ব্বক এবং নিয়মিত প্রক্রিয়ায় ঔষধ প্রস্তুত করান, তাহা হইলে আমার বোধ হয়, সেই ঔষধ মৃত ব্যক্তিকে প্রাণ দান করিতে পারে। পুজ্যপাদ ঋষিগণ জগতের হিতের জন্য অকাতর পরিশ্রম করিয়া যে সকল ঔষধাদি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন তাহা কি উর্ব্বর মস্তিষ্কের লক্ষ্যহীন প্রলাপ!

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র পাল বি, এ,।

আয়ুর্ব্বেদের স্বপক্ষে একটী সত্য।

—:*:—

যাহার আদর্শ যাহা, তাহা যে তাহার পক্ষে ভাল—এই মহাসত্যের একটী প্রকৃষ্ট নিদর্শন আজ পাঠকদিগের নিকট উপস্থিত করিতেছি। এই নিদর্শনটী সম্ভবতঃ পাঠকবর্গের কিঞ্চিৎ মনোযোগ আকর্ষণ করিবে—কেননা এটী লোকপরম্পরাগত কোন কিম্বদন্তী নহে বা কোন আয়ুর্ব্বেদভক্তের অনুরাগ-প্রসূত কল্পনাও নহে, এটী এই ক্ষুদ্র লেখকের নিজ জীবনে প্রমাণিত একটী বাস্তব ঘটনা।

এবারের সমরজ্বর বা ইনফ্লুয়েঞ্জার কথা কাহারও অবিদিত নাই। আমি গত পূজার ছুটীতে বাড়ী যাইয়া ইংরাজী নবেম্বর মাসের মাঝামাঝি দ্বিতীয় বারের ভয়াবহ ও মারাত্মক ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হই। আক্রান্ত হইয়াই এ জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলাম। কারণ ইতিপূর্ব্বে আমাদের গ্রামে যে কয়েকটী ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই কালকবলিত হইয়াছিল। অধিকন্তু আমাদের গ্রামে অনেকগুলি হাতুড়ে ডাক্তার বৈদ্যের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা থাকিলেও সুচিকিৎসক সম্বন্ধে একরূপ নিঃস্ব বলিলেই হয়। শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ রায় [illegible]

দেশ প্রসিদ্ধ অনেক শাস্ত্রাভিজ্ঞ ধর্ম্মপ্রাণ যে কবিরাজ ছিলেন, তিনিও আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ রোগে, শোকে, জরাজীর্ণ হইয়া কয়েক বৎসর যাবৎ ৺কাশী বাসী হইয়াছেন। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কামারা ডাক্তার এখনও এতবেশী হয় নাই যে, আজকালকার বি, এ, এম এর মত তাহারা গ্রামে গ্রামে ভিড় করিয়া বসিবে। জেলাগুলি চিকিৎসক বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সমৃদ্ধিশালী হইলেও গ্রাম গুলি প্রায়শঃই 'সহস্রমারী'দের হস্তে সমর্পিত আছে। এই সমস্ত যমস্বরূপদের তীব্র ঔষধাস্ত্র সকল সহ্য করিয়া প্রাণ রক্ষা পাওয়া নিতান্ত ঈশ্বরের অনুগ্রেহের উপর নির্ভর করে। সত্য বলিতে কি, আমি নিজেই একেবারে স্বদেশে manufactured অথচ দস্তরমত বিলাতি ডাক্তারগণকে একটু ভীতি মিশ্রিত সম্মানের চক্ষেই দেখিয়া থাকি। ইঁহারা ঔষধ বা যন্ত্রের ব্যবহার না জানিলেও প্রয়োগ করিতে ছাড়েন না! কাজেই সহজ ও সুন্দরভাবে চিকিৎসার যে ফলটুকু তাহাও ইঁহারা দেখাইতে পারেন না। ইঁহাদের চিকিৎসায় সুসাধ্য রোগও অনেক সময় দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। অনেক রোগী যে ঔষধের বলেই শীঘ্র শীঘ্র মুক্তিমার্গে উপস্থিত হয়—একথা ও একেবারে অমূলক নহে।

সৌভাগ্যক্রমে চিকিৎসার এই দুর্দ্দিনেও আমাদের গ্রামে অন্ততঃ একটী বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কামারা ডাক্তার ছিলেন। তাঁহাকেই আমার চিকিৎসার জন্য আহ্বান করা হইল। ইনি আমার বাল্যবন্ধু। অল্পবয়স্ক হইলেও ডাক্তারী চিকিৎসা ব্যাপারে ইতিমধ্যেই ইনি কিঞ্চিৎ যশস্বী হইয়াছিলেন। আমাদের আশে পাশের প্রায় দশবারোটী গ্রাম সাধারণতঃ ইঁহার চিকিৎসাতেই সন্তুষ্ট থাকে। আমার অসুখ দেখিয়া ইনি যেন কিঞ্চিৎ চিন্তান্বিত হইলেন ও প্রাণপণে আমার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সকলেই জানেন, এবারকার ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা—ডাক্তারী ঔষধকে দস্তরমত পরাজিত করিয়াছে। এই কলিকাতায় এত মহাবিজ্ঞ ডাক্তারগণের চিকিৎসাধীনে থাকিয়াও ক্বচিৎ দুই একটী রোগী কোনগতিকে প্রাণে রক্ষা পাইয়াছে। এমতাবস্থায় আমার বন্ধু যে চিকিৎসায় বিশেষ ফলোদয় করিতে পারেন নাই, তাহাতে তাঁহাকে দোষী করিবার কিছুই নাই। তিনি তাঁহার শাস্ত্রমত তিক্ততীব্র ঔষধাবলী—সমস্তই আমাকে ব্যবস্থা করিলেন। এমন কি, জ্বর নিবারণের শেষ চিকিৎসা এক তরফা কুইনাইন ইন্‌জেক্‌সন পর্য্যন্ত আমার উপর দিয়া হইয়া গেল। কিন্তু ডাক্তারী চিকিৎসার বলপ্রয়োগের মূলে বোধ হয় একটা ভুল রহিয়া গিয়াছে। এ চিকিৎসা যদি বুঝিত যে রোগও তত দুর্ব্বল নহে, যে জুলুমের বাধ্য হইবে, তাহা হইলে বোধ হয় এ চিকিৎসায় অনেক সময় অধিকতর ফলোদয় হইত। যাহা হউক বন্ধুবরের শত চেষ্টা বিফল হইল। ইন্‌জেক্‌সনের পরে জ্বরটা যেন ক্ষেপিয়া গিয়া অধিকতর আক্রোশের সহিত আমার ঘাড়ে চাপিয়া বসিল এবং রোগ নিউমনিয়ার দিকে যাইতে না পারিলেও দ্রুতবেগে টাইফয়েডে আসিয়া পৌঁছিল।—সেই কালো কালো গোবর গোলার মত পিত্তযুক্ত অজস্র মল নিঃসরণ, কখনও দস্তরমত রক্তভেদ অথবা অতিদাহযুক্ত বিষমজ্বর, মস্তক বিকৃতি, জিহ্বা, হস্তাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কম্পন মোটের উপর নিদানোক্ত ইত্যাদি যাবতীয় লক্ষণগুলি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

আর কি গেছি। বাড়ীর কথা দূরে থাকুক, গ্রামস্থ সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া আক্ষেপ করিতে লাগিল। বন্ধুবর ডাক্তার আরও কিছু দিন চিকিৎসা করিয়া নিতান্ত গর্ব্বিতভাবে বাবাকে বলিলেন,—"মহাশয়, আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, রোগী আমার বিশেষ বন্ধু, ইহার প্রাণরক্ষার জন্য আমিও নিতান্ত ব্যস্ত। অতএব আপনি একবার জেলার ভাল একজন ডাক্তার দেখান। তাঁহার মতানুযায়ী আমি চিকিৎসা করিতে চাহি। একাকী চিকিৎসা করিতে আর আমার সাহস নাই।' বাবা তাহাই করিলেন। বরিশাল হইতে উপাধি প্রাপ্ত একজন ডাক্তার আহূত হইয়া আসিলেন ও সনাতন প্রথানুসারে একখানি প্রেসক্রিপসন লিখিয়া বন্ধুবরকে সাময়িক পরামর্শ দিয়া কতক রজতখণ্ড আদায় করিয়া চলিয়া গেলেন।

নূতন প্রকারে আবার কয়েক দিন চিকিৎসা চলিল, কিন্তু ফল অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মতই হইল। বন্ধুবর ডাক্তার এবার ভারী চিন্তিত হইয়া বলিলেন—"আমার বিদ্যা বুদ্ধি শেষ হইয়াছে। বরিশালের ডাক্তারের পরামর্শও কার্য্যকারী হইল না। এখন সকলে পরামর্শ করিয়া কি করিবেন দেখুন।,' বাবার মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি বলিলেন -"শেষ চেষ্টা একবার করিব, বরিশাল একবার লইয়া যাইব, তারপর অদৃষ্টে যা' আছে—হইবে।" প্রথমতঃ এই প্রস্তাবে কেহ কেহ আপত্তি করিয়া কহিল, —'রোগী বত্রিশ দিন পর্য্যন্ত ভুগিয়া এত দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে যে, ইহাকে এখন বিশেষ নাড়াচাড়া করা উচিত নহে।' কিন্তু পরে বাবার নিতান্ত অস্থিরতা দেখিয়া সকলে বরিশাল যাওয়ার মত দিল।

বরিশাল যাওয়ার সব ঠিক ঠাক—নৌকা প্রস্তুত, সঙ্গে দুইজন স্ত্রীলোক যাইবেন, আর যাইবেন আমার বাবা নিজে ও আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। এমন সময়ে দৈব আশীর্ব্বাদের মত নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে একজন ভাল কবিরাজ কার্য্যগতিকে আমাদের গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই শুনিলেন আমার অত্যন্ত ব্যারাম। চিকিৎসক সুলভ কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি আমাকে তখনি দেখিতে আসিলেন। প্রায় আধঘণ্টা ধরিয়া নাকি আমার নাড়ী, জিহ্বা, চক্ষু, উদর ইত্যাদি পরীক্ষা করিলেন। আমার তখন সম্যক জ্ঞান ছিল না, কাজেই এ সময়ের কথা আমি যেরূপ শুনিয়াছি—বলিতেছি। দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুখখানি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—'রোগীকে আমি কিছুতেই বরিশাল লইয়া যাইতে দিব না। কুইনাইনের অপব্যবহারের ফলেই এই সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে। আবার কুইনাইনের জল উদরস্থ হইলে রোগীর বাঁচা অসম্ভব হইবে।" বাবাকে বলিলেন—'ভয় নাই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, রোগী আরোগ্য না হইলে আমি দায়ী। তিন দিন মধ্যে ফল দেখাইব।' বাবা কাঁদিয়া বলিলেন—'আমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়াছে, আপনারা যা' ভাল মনে করেন—আমি তাতেই রাজী।' কবিরাজ মহাশয় বলিলেন—'আবাল্য এ গ্রামের নুন খাইয়াছি। এ রোগীর প্রাণপণ চিকিৎসা করা আমার একান্ত কর্ত্তব্যজ্ঞানে করিব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

কবিরাজ মহাশয় গ্রাম্য বৈদ্যকে কয়েকটী ঔষধ দিতে বলিয়া বরিশাল চলিয়া গেলেন। তারপর দিন চিকিৎসা আরম্ভ হইল। কি

চমৎকার তাঁর চিকিৎসা, কিরূপ বিবেচনা-পূর্ব্বক তাঁর পথ্যাপথ্য নির্ণয়,আর সর্ব্বোপরি কি গভীর তাঁর স্নেহ, কি মধুর তাঁর যত্ন,—ভাবিলে চক্ষে জল আসে। শুদ্ধ কবিরাজ হিসাবে নয়, একটী মহাপুরুষ হিসাবেও তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতে ইচ্ছা হয়। এ মানবপ্রীতি যে ঋষিতুল্য ধর্ম্মপ্রাণ চিকিৎসকাচার্য্যের নিকট হইতে তিনি পাইয়াছেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

বাস্তবিকই তিন দিনে আমার রোগের অত্যদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইল, মল অনেকটা গাঢ় হইয়া আসিল, জ্বর থার্ম্মোমিটারে অনেক কম উঠিতে লাগিল,মাথা খুব পরিষ্কার হইয়া গেল। আমি সজ্ঞানে যখন প্রথম চক্ষু মেলিয়া চাহিলাম, কবিরাজ মহাশয়ের দেবোপম সাদা শুভমূর্ত্তি দেখিয়া যেন অনেকটা উপশম বোধ করিলাম। সকলের আশার আনন্দে মুখ প্রফুল্ল হইল, সাফল্য সম্ভাবনায় কবিরাজ মহাশয় বিনয় নম্র হইয়া রহিলেন।

রোগ ক্রমশঃই আরোগ্যের পানে ছুটিল। এই অত্যাগী জ্বর ক্রমে ক্রমে কমিতে কমিতে ৪৫ দিনের দিন একেবারে ছাড়িয়া গেল। সকলে হাততালি দিয়া কবিরাজ মহাশয়ের প্রশংসা করিতে লাগিল। আনন্দাতিশয্যে আমার ডাক্তার বন্ধু নিজেই বলিলেন—"কবিরাজ মহাশয় আপনিই ধন্য। আপনি আজ আমাদের বেশ করিয়া দেখাইলেন যে, ভারতের নিজস্ব চিকিৎসা আয়ুর্ব্বেদই ভারত বাসীর পক্ষে ব্রহ্মাস্ত্র। বিলাতি চিকিৎসা বিলাতের পক্ষে যতই মঙ্গলজনক হউক না কেন, তাহাতে অস্ত্র শস্ত্র ব্যাণ্ডেজ ষ্টেথিসস্কোপের যতই প্রাবল্য থাকুক না কেন, আয়ুর্ব্বেদীয় বটী পাচন মুষ্টিযোগই ভারতীয় লোকের পক্ষে একান্ত উপযুক্ত।"

আমি এ যাত্রা কবিরাজ মহাশয়ের কৃপায় নীরোগ হইলাম। ৫৬ দিনে অন্নপথ্য করিলাম। সবল সুস্থ হইয়া ৭৯ দিনের দিন কলিকাতা 'ল' কলেজের থার্ডইয়ার ক্লাশে নবজীবনে পুনরায় উপস্থিত হইতে পারিলাম।

আমার রোগ আরোগ্যের জন্য যে সকল ঔষধের ব্যবস্থা হইয়াছিল, আমি কবিরাজ মহাশয়ের নিকট হইতে তাহা জানিয়া লইয়াছিলাম। নিম্নে সেই ঔষধ কয়টির কথা লিখিতেছি :—

জ্বরের জন্য—বিশ্বেশ্বর রস, বৃহৎ জ্বরকস্তূরি ভৈরব। মহামৃত্যুঞ্জয় ও মুষ্টিযোগ ইত্যাদি।

পেটফাঁপা ও হজমের জন্য—সূর্য্যকান্ত রস, শঙ্করযোগ ও মুষ্টিযোগ ইত্যাদি।

মস্তিষ্কের জন্য--মহালক্ষ্মীবিলাস, মহা নারদীয় লক্ষ্মীবিলাস ও মুষ্টিযোগ ইত্যাদি।

আর কি বলিব ? এবার অসুখে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে,আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা আর্য্য ঋষিগণের ভারতবাসীর উপর চরম আশীর্ব্বাদ! আজ অনাদরে, অবজ্ঞায় এ চিকিৎসা বিলুপ্ত প্রায়, কিন্তু সুদূর অতীতে এই শাস্ত্র হইতেই ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের জন্ম হইয়াছিল। এই অবসানের শেষ মুহূর্ত্তেও এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিদর্শন আয়ুর্ব্বেদের অসীম শক্তিরই পরিচয় দিয়া থাকে। এ শাস্ত্রকে অবমাননা করিলে আমাদের চলিবে না। আয়ুর্ব্বেদকে পরিপোষণ করিতে পারিলে তবে ভারতবাসী আবার স্বাস্থ্যসুষমা লাভ করিতে পারিবে, নতুবা বিলাতি শত শত পেটেণ্ট টনিক তাহাকে চিররোগের কবল হইতে কিছুতেই অব্যাহতি দিতে পারিবে না। বিদেশীয় চিকিৎসার আধিপত্য বিস্তারে দেশ ক্রমশঃ ক্ষীণ শীর্ণ হইয়া উঠিবে।

নিরপেক্ষ বিচারে আয়ুর্ব্বেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে বোধ হয় এই সত্য নিদর্শনটী যথেষ্ট হইবে।

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ।

চরকোক্ত পঞ্চকর্ম্ম সাধন।

—:০:—

বমনের যোগ্যজনে পূর্ব্বাহ্নে ভিষক।
খাবা'বে আনুপমাংস গ্রাম্য ও ঔদক॥
মাংসরস দুগ্ধ আর করাইয়ে পান।
কফের উৎক্লেশ হ'তে ক'র তারে ত্রাণ॥
বিরেচক যোগ্যজনে স্নিগ্ধ করাইবে।
যূষ ও জাঙ্গলমাংসে কফ কমাইবে॥
গ্রাম্যমাংসে কফাধিক্য তাহাতে বমন।
মন্দ কফে সহজেই হয় বিরেচন॥
কফাল্পে বমনৌষধি অধোদিগে ধায়।
কফাধিক্যে বিরেচক তথা উর্দ্ধে যায়॥
স্নিগ্ধ করি যথাবিধি করা'বে বমন।
পরে পেয়াদির ক্রম করিবে পালন॥
বিরেচনে যথাবৎ স্নিগ্ধ করি পরে।
স্বিন্ন করি যোগ্যতম রেচন আচরে॥
পেয়া ও বিলেপীকৃত অকৃত অথবা।
যূস, মাংসরস ক্রমে সেবনার্থে দিবা॥
প্রধান, মধ্যম আর অধম শোধন।
তিন, দুই, একবার করিলে সেবন॥
অনুমাত্র অগ্নি যথা তৃণ ও গোময়।
ক্রমে দহি, মহাস্থির সর্ব্বসহ হয়॥
ক্রমে শুদ্ধ ব্যক্তিদের অন্তরাগ্নি তথা।
পেয়াদি দহিয়া স্থির হইবে সর্ব্বথা॥
নিকৃষ্ট, অধম আর উৎকৃষ্ট লক্ষণ।
চারি, ছয়, আটবার হইলে বমন॥
দশ, বিশ, ত্রিশবার বিরেচন হ'লে।
নিকৃষ্ট, অধম, শ্রেষ্ঠ বেগ তারে বলে॥
অর্দ্ধপ্রস্থ, পৌনেএক, একপ্রস্থ আর।
বমনের দ্রবমান ক্রমশঃ তাহার॥
দুই, তিন, চারিপ্রস্থ নৃপে বিরেচন।
নিকৃষ্ট, অধম, আর শ্রেষ্ঠের লক্ষণ॥
পিত্ত দরশন নাহি হয় যতক্ষণ।
বমন করান বিধি তাকে ততক্ষণ॥
কফ দরশন নাহি যতক্ষণ হয়।
ততক্ষণ বিরেচন উচিত সময়॥
আদি দুই তিনবার মল নিঃসরণ।
বিরেচন সংখ্যামধ্যে না হয় গণন॥
পানীয় ঔষধ বেগে যতক্ষণ রয়।
বমন নিকৃষ্ট সংখ্যা মধ্যে তাহা নয়॥
ক্রমে কফ পিত্ত বায়ু হইলে নির্গত।
সম্যক বমন তার হয় রীতিমত॥
হৃদি, পার্শ্ব, শির আর ইন্দ্রিয়নিচয়।
স্রোতের বিশুদ্ধি, দেহ লঘুতাতে হয়॥
দেহে স্ফোট, কণ্ডু, কোঠে আদি সমুদয়।
গাত্রগুরু, অবিশুদ্ধি ইন্দ্রিয় হৃদয়॥
অতিশয় বমনেতে তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, মোহ।
বায়ুকুপ্ত, নিদ্রাহীন, বলনাশে দেহ॥

বিরেচন পরীক্ষা।

বিরেচন হয় যদি সম্যক প্রকার।
ইন্দ্রিয় প্রসাদ হয়, স্রোতশুদ্ধি আর॥
দেহ লঘু, বলোদয়, অগ্নির উদ্রেক।
নিরাময় বোধ হয় এবং শান্তিবহ॥

বিষ্ঠা, পিত্ত, কফ, বায়ু ক্রমে নিঃসরণ।
হয়ে থাকে এইরূপ তাহার লক্ষণ ॥
ভালভাবে বিরেচন যদি নাহি হয়।
শ্লেষ্মা, পিত্ত, বায়ুতাতে কুপ্ত হয়ে রয় ॥
অগ্নিমান্দ্য; দেহগুরু, তন্দ্রা, প্রতিশ্যায়।
বমন, অরুচি, বায়ু-বিলোমন তায় ॥
অতিশয় বিরেচন কা'রো যদি হয়।
কফ, রক্ত, পিত্ত আর সুপ্ততা ও ক্ষয়,
অঙ্গমর্দ্দ, ক্লান্তি আর কম্পন রহিবে।
নিদ্রা, বলহানি, হিক্কা, উন্মাদ হইবে ॥
সম্যক বমন আর বিরেচন পরে।
নবম দিবসে ভাত ঘৃত পান ক'রে।
অথবা অনুবাসন গ্রহণ করিয়া,
তিন দিন পরে দেহে তৈল মাখাইয়া ॥
পাতি' বুভুক্ষিত কালে তাহাকে তখন।
করাবে ভিষকগণ নিরূহ গ্রহণ ॥

বমনের অযোগ্যপাত্র।

ক্ষতক্ষীণ, অতি স্থূল, কৃশ শিশুগণ,
বৃদ্ধ, শ্রান্ত, পিপাসিত, দুর্ব্বল যে জন।
ক্ষুধিত ও শ্রমক্লান্ত, উপবাসরত।
অধ্যয়ন-চিন্তা আর ব্যায়াম নিরত ॥
ক্ষাম, গর্ভবতী, কোষ্ঠ সংবৃত যাহার,
উর্দ্ধ রক্তপিত্তরোগগ্রস্থ, সুকুমার,
বমি সাধ্য, উর্দ্ধবাতগ্রস্থ, আস্থাপিত,
হৃদ্‌রোগ উদাবর্ত্তগ্রস্থানুবাসিত,
মূত্রাঘাত-প্লীহা-গুল্ম-অষ্ঠীলা-উদর,
তিমির ও শির-শঙ্খরোগী, ভগ্নস্বর,
কর্ণরোগী, অক্ষি-পার্শ্বশূলরোগীগণ।
ইহারা অযোগ্য হয় করাতে বমন ॥

অযোগ্যের হেতু।

ঔরঃক্ষতে ক্ষতবৃদ্ধি বমনেতে হয়।
রক্তের উদ্গম তাতে হয় অতিশয় ॥
ক্ষীণ, অতি স্থূল-কৃশ-বাল বৃদ্ধ আর।
দুর্ব্বলে বমনাসহ প্রাণে হানি তার ॥
শ্রান্ত, পিপাসিত আর ক্ষুধাতুরজনে।
বমন নিসিদ্ধ হয় এসব কারণে ॥
শ্রম ভারাক্রান্ত আর যে করে ভ্রমণ,
উপবাস, রতিক্রিয়া আর অধ্যয়ন,
ক্ষাম, চিন্তারত আর ব্যায়ামী যাহারা,
রুক্ষ হেতু বাতরক্তে প্রকুপিত তারা।
কণ্ঠনালী আদি স্থান ছিন্ন হয়ে যায়,
উরঃক্ষত হতে পারে অরোগ্য তাহায় ॥
গর্ভিণীর গর্ভস্রাব, গর্ভব্যাপতাদি,
সুদারুণ রোগ হয় তেঁই ত্যাজ্য বিধি ॥
সুকুমার হৃদয়ের বিকর্ষণ তরে।
উর্দ্ধ অধোমার্গে রক্ত বিনিসৃত করে ॥
দুর্ব্বম্য, সংবৃত্তকোষ্ঠ করিলে কুন্থন।
আমাশয়ে সমুৎক্লিষ্ট দোষ সে কারণ ॥
বীসর্প, স্তম্ভ ও জাড্য, চিত্তের বিকার,
মরণ পর্য্যন্ত করে কি কহিব আর ॥
উর্দ্ধগত রক্তপিত্ত উৎক্ষেপে উদান।
প্রাণ নাশ করে রক্ত হয়ে বলবান ॥
প্রশক্ত বমি ও উর্দ্ধবাত আস্থাপিত।
অনুবাসিতে উর্দ্ধবায়ু হয় প্রধাবিত ॥
হৃদ্রোগে হৃদয়-ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।
উদাবর্ত্তে রোগ বৃদ্ধি প্রাণ নাশে তায় ॥
মূত্রাঘাত, প্লীহা, গুল্ম, অষ্ঠীলা, উদর,
স্বরভঙ্গে শূলে হয় তাতে তীব্রতর ॥
তিমিরে তিমির বৃদ্ধি শিরঃশূল আর,
শঙ্খ-কর্ণ-অক্ষি শূলে বৃদ্ধি [illegible] ।
যে সব ব্যক্তির পক্ষে নিসিদ্ধ বমন।
তার—বিষ-গর [illegible], বিরুদ্ধ ভোজন,
কিম্বা আম [illegible] রোগ [illegible]।
আশুকরী [illegible]

বমনের যোগ্যপাত্র।

পীনস ও কুষ্ঠ আর নবজ্বর, কাস,
রাজযক্ষ্মা, গলগ্রহ, গণ্ডমালা, শ্বাস,
শ্লীপদ, মন্দাগ্নি, মেহ. বিরুদ্ধ ভোজন,
বিসূচিকা, অলসক, অজীর্ণ অশন,
বিষ গরপান, দুষ্টদগ্ধ-বিদ্ধমার,
অধোগত রক্তপিত্ত, প্রসেক, অপর
অরুচি, হৃল্লাসারুচি, অর্শ, অপস্মার ;
অবিপাক, শোথ পাণ্ডু উন্মাদাতিসার,
মুখপাক, ধাত্রীরোগ, শ্লেষ্ম রোগ নানা।
বমনের যোগ্য এরা থাকে যেন জানা॥
ক্ষেত্র আলি ভাঙ্গি যথা শস্য করে নাশ।
বমি তথা দোষ হরি করে রোগ নাশ॥

শ্রীরাসবিহারি রায় কবিকঙ্কন।

মসূরিকা বা বসন্ত।

প্লেগ, কলেরা ও ইনফ্লুয়েঞ্জার মত মসূরিকা বা বসন্ত রোগও ভারতবাসীকে ধ্বংস করিতে বসিয়াছে। সরকারি মৃত্যুর হার পর্য্যবেক্ষণ করিলে, গত কয়েক বৎসর হইতে বসন্ত রোগে মৃত্যুর সংখ্যাও বড় কম হইবেনা ; এবং এই রোগে মৃত্যুর সংখ্যা প্রতি বৎসরই যে বাড়িতেছে তাহাও ঐ তালিকা দৃষ্টে জানিতে পারা যায়, সুতরাং এ রোগের হাত হইতে ভারতবাসী যাহাতে অনেকটা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়, প্রত্যেক চিকিৎসকেরই সে সম্বন্ধে চিন্তাশীল হওয়া কর্ত্তব্য।

বসন্তরোগ দেশে যে আগে হইত না. তাহা নহে কিন্তু প্রায়শই এরূপ মারাত্মক মূর্ত্তি ধারণ করিত না। চৈত্র মাসে—গরম ফুটিলে—এমনই সময় দেশের অল্প সংখ্যক ব্যক্তি এই রোগে আক্রান্ত হইত,কিন্তু সে আক্রমণ যেরূপ ভাবে হইত তাহাতে তাহাকে জলবসন্ত বা পাণিবসন্ত আখ্যা ভিন্ন আর কিছুই বলা হইত না এবং সামান্ত কয়েক দিন কিছু কষ্ট পাওয়ার পর সে বসন্ত বিনা চিকিৎসাতে আপনিই সারিয়া যাইত। মেথী ভিজান জল, কুড় ও বাবুইতুলসী সিদ্ধ, থোড়ের জল—এই সকল ব্যবস্থা সেরূপ অবস্থায় কদাচিৎ করা হইত। ফল কথা বসন্ত হইলে সেকালে আমাদের দেশবাসী আদৌ চিন্তিত হইতনা ; সামান্য ব্রণ বা স্ফোটকের মত আপনা আপনি সারিয়া যাইবে বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিত।

কিন্তু এখন এ রোগের মৃত্যু সংখ্যা দেখিয়া লোকের মনে একটা বিষম বিভীষিকার সঞ্চার হইয়াছে, লোকক্ষয়ও যথেষ্ট হইতেছে, এ অবস্থায় এ রোগের নিদান, প্রতিষেধক বিধি ও চিকিৎসার কথা আয়ুর্ব্বেদবেত্তাগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত আমাদের অভিজ্ঞতা মিশাইয়া এই প্রবন্ধে তাহা লিপিবদ্ধ হইবে।

শাস্ত্রপাঠে আমরা অবগত হই,—কটু, অম্ল, লবণ ও ক্ষার [illegible], বিরুদ্ধ ভোজন, অজীর্ণ সত্ত্বে ভোজন, দুষ্ট অন্ন, শিম্বী ও শাকাদি আহার, সদোষবায়ু সেবন ও সদোষ জলপান এবং দেশের প্রতি [illegible]

দিগের কুদৃষ্টি—এই সকল কারণে বাতাদি দোষ কুপিত ও দুষ্ট রক্তের সহিত সঙ্গত হইয়া মসূরিকা বা বসন্ত রোগ উৎপন্ন করে। এই রোগে মসুর কলায়ের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট পীড়কা সকল উৎপাদন করে বলিয়া এই রোগের নাম মসূরিকা। তাহারই বাঙ্গালা হইয়াছে বসন্ত। বাতাদি দোষ বলিলে, বায়ু পিত্ত কফ বুঝায়, কিন্তু কফ ও বায়ু অপেক্ষা এই রোগে আমরা পিত্তেরই অধিক প্রকোপ হইয়া থাকে দেখিতে পাই। আমরা এখনকার দিনে শাস্ত্র মানিনা, ধর্ম্ম মানিনা, স্বাস্থ্যের সহিত আমাদের ধর্ম্মের যে অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ এবং দিন চর্য্যা, ঋতু চর্য্যা—ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিষয়ে শাস্ত্রের বিধি ব্যবস্থা পালন যে আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতির মূল এ সকল কথা আমরা কিছুই মানিতে চাহিনা, আমাদের নানারূপ রোগপ্রবণতা তাহার ফলই সম্ভূত। বসন্ত রোগ লইয়াই আমরা সে কথাটা একটু ভাল করিয়া বুঝাইতে চাই।

বসন্ত রোগের সূচনা হয় ফাল্গুনের শেষে এবং চৈত্র মাসে ইহার পূর্ণ প্রকোপ প্রকট হইয়া থাকে। আমাদের দেশে ফাল্গুন ও চৈত্র এই দুই মাস বসন্তকাল। শাস্ত্র পাঠে আমরা দেখিতে পাই—"শীত ঋতুতে সঞ্চিত কফ বসন্তকালে সূর্য্য কিরণে দ্রবীভূত হইয়া অগ্নিনাশ ও বিবিধ রোগ উৎপাদন করে অতএব, তৎকালে কফ নাশক ক্রিয়া সকলের অনুষ্ঠান করিবে। তীক্ষ্ণ বমন তিক্তক্তে নস্য, লঘু ও রুক্ষ ভোজন, ব্যায়াম, গাত্রমার্জ্জন ও পরস্পর পাদাঘাত ক্রিয়া দ্বারা প্রবৃদ্ধ কফকে জয় করিবে। স্নান, কর্পূর, চন্দন, অগুরু ও কুঙ্কুম, পুরাতন যব, গোধূম এবং শূলপক্ক জাঙ্গল মাংস ভোজন করিবে।

* * মলয় মারুত হিল্লোলে সুশীতল, চতুর্দ্দিকে জলপ্রণালী পরিবেষ্টিত, মণি-বেদি বিরাজিত, কোকিল কাকলী মুখরিত, বিবিধ পুষ্প বৃক্ষ শোভিত, সৌগন্ধময় উপবনে অবস্থিতি করিয়া নানারূপ মনোহর বাক্যালাপে মধ্যাহ্নকাল অতিবাহিত করিবে" ইত্যাদি। কিন্তু আমরা কি এখনকার দিনে এই সকল ব্যবস্থা করিবার উপায় করিতে পারি?—পারিনা। কেন পারিনা—তাহার কারণ সংসার তাড়নে নিষ্পেষিত কর্ম্মগতপ্রাণ ভারতবাসীর কোকিল কুজিত উপবনে মধ্যাহ্ন উপভোগের আদৌ অবসর নাই; প্রচণ্ড রৌদ্রে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে সে সময় তাহাকে প্রভুর মনোরঞ্জনে অর্থাগমের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কাজেই সে ব্যবস্থা ইচ্ছা সত্ত্বেও অসম্ভব। কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ঋতু চর্য্যার সকল ব্যবস্থা তো আমরা করিতে পারি;—তাহার প্রবৃত্তি যে আমাদের তিরোহিত হইয়াছে। অজীর্ণ এবং ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় দেশের লোক জর্জ্জরীত, যখন রোগ পীড়নে একান্ত ক্লিষ্ট হইতে হয়—তখনই অনেকে চিকিৎসকের শরণ গ্রহণ করেন। কিন্তু দিনচর্য্যা—ঋতুচর্য্যা—শাস্ত্রবিধি যদি দেশের লোক পালন করিত, তাহা হইলে ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার নামও দেশ হইতে লোপ পাইত এবং চিকিৎসকের শরণ গ্রহণও করিতে হইত না। শাস্ত্র বলিতেছেন, 'বসন্ত কালে তীক্ষ্ণ বমন, তীক্ষ্ণনস্য ব্যবহারে শরীর শোধন করিয়া লইবে।'—শাস্ত্রকার শুধু উপদেশ প্রদানেই ক্ষান্ত হন নাই, সে জন্য বমন কার্য্যে মদন ফল, নস্যকার্য্যে কটফলা চিনাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু এখন যেই বমন বা নস্যের কথা বলিবে [illegible] কম্পিত করিবেন, কিন্তু [illegible]

আধিব্যাধি কম হইত, তখন দেশের সকল লোকই ঐ সকল কথা বুঝিত এবং পালন করিত। এখন দেশের রুচি পরিবর্ত্তন হইয়াছে, আমরা ব্যাধি প্রবণ হইবনা কেন ?

আমাদের আহারের ব্যবস্থা বারমাস এক ঘেয়ে। যাঁহারা মেসে, বোর্ডিংয়ে, হোটেলে থাকিয়া প্রাত্যহিক আহারের ব্যবস্থা করেন, তাহাদের তো কথাই নাই, অন্যান্য ব্যক্তিদিগের মধ্যেও শাস্ত্রাদেশ মানিয়া আহারের ব্যবস্থা নাই। সকল সংসারেই বারমাস এক ঘেয়ে আহার চলিয়াছে। কটু, অম্ল, লবণ ও ক্ষার ভোজনে মসূরিকা বা বসন্ত রোগ উৎপন্ন হয়, সেই জন্য বসন্ত রোগের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য বসন্তকালে ইহার পরিহার করা কর্ত্তব্য, কিন্তু দেশের লোক এ সকল কথা বুঝেন কি? ক্ষীর-মৎস্যাদি সংযোগ বিরুদ্ধ ভোজন—এ তো আমরা সকল সময়ই করিয়া থাকি। আমাদের আধিব্যাধির প্রবলতা এবং আলোচ্য বিষয় বসন্ত রোগ এই জন্য দেশে ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে। যাহাহউক আমরা এসকল কথা ছাড়িয়া দিয়া আগামী বারে এই রোগের অন্যান্য কথারই আলোচনা করিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযামিনী ভূষণ রায় কবিরত্ন, এম এ, এম বি।

বিবিধ প্রসঙ্গ

যশোহর জিলাবোর্ডে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয়।—গত ২৯শে মার্চ্চ যশোহর জিলা বোর্ডে আলোচনা হইয়াছে যে. যশোহর জিলাবোর্ড হইতে যশোহরে একটি আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হউক। ইহার জন্য বোর্ডের পক্ষ হইতে চেয়ারম্যান মহাশয় গবর্ণমেণ্টকে একথা জানাইয়াছেন। আমরা এ সংবাদে পরম সুখী হইয়াছি এবং ভরসা করি, গবর্ণমেণ্ট যশোহর জেলা বোর্ডের এই সাধু প্রস্তাব নিশ্চয়ই গ্রহণ করিবেন। সরকারি সাহায্য পাওয়ায় বর্ত্তমান সময়ে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা সর্ব্বজন সমাদৃত হইলেও সনাতন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা খাঁটি ও অভ্রান্ত বলিয়া এখনো পর্য্যন্ত লুপ্ত হইতে পারে নাই। পাশ্চাত্য দেশে অনেক সুবিজ্ঞ ও বহুদর্শী চিকিৎসক ইহার চিকিৎসাপ্রণালীর যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে যেখানে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা হারি মানিয়াছে—সেখানে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে—এরূপ ঘটনা পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগের অনেকেই দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এত দিন যদি অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার মত আয়ুর্ব্বেদের পৃষ্ঠপোষক হইতেন, তাহা হইলে আজি অনেক বৈদ্যসন্তান পুরুষপরম্পরার ব্যবসায় —বৈদ্যবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইত না এবং এখনো "ভারতবর্ষে ৪০ চল্লিশ হাজার চিকিৎসকের আবশ্যক বলিয়া চিকিৎসক প্রস্তুতের জন্তও গবর্ণমেণ্টকে চিন্তা করিতে হইত না। আমাদের মনে হয় সেরূপ ব্যবস্থা থাকিলে ভারতবর্ষ বোধ হয় নানারূপ রোগ পীড়নে আদি এত বিব্রত

ধিকাও দেখিত না। যশোহর জিলা বোর্ডের এই সাধু প্রস্তাব শুনিয়া সেইজন্য আমরা যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করিয়াছি। দেশের লোকের মতিগতি পরিবর্ত্তিত হউক, মহামান্য গবর্ণমেণ্টবাহাদুর লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদের পুনরুন্নতির জন্য সাহায্য করুন—ইহাই আমাদিগের ঐকান্তিক কামনা।

দেশবাসীর আত্মরক্ষার উপায়। —দেশের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে,—আধি ব্যাধিতে বঙ্গভূমি—তথা সমগ্র ভারতভূমি যেরূপ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে.—তাহার সহিত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্টভাবে নিহিত। আমাদের দেশ উষ্ণপ্রধান, সেইজন্য আমাদের দেশে শীতপ্রধান দেশের উগ্রবীর্য্য চিকিৎসার ব্যবস্থা—কখনই সমীচীন নহে। তা' ছাড়া বাতব্যাধি, পরিণাম শূল, অম্লপিত্ত, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য.কুষ্ঠ, বাতরক্ত প্রভৃতি এমন অনেকগুলি রোগ আছে, যে গুলির চিকিৎসায় অনেক বিজ্ঞ অ্যালোপ্যাথও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা করাইবার পরামর্শ দিয়া থাকেন। সরকারী সাহায্য পাইয়া পাশ্চাত্য চিকিৎসা যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিলেও কতকগুলি রোগ আরোগ্যের বিশেষ শক্তির জন্য আয়ুর্ব্বেদের গর্ব্ব এখনো খর্ব্ব হয় নাই। ফলকথা, আমরা যদি সনাতন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাকে পুনরুন্নত করিতে পারি. গবর্ণমেণ্ট যদি এই চিকিৎসাকে সাহায্য করেন—তাহা হইলে দেশের লোকের মতিগতিও ফিরিবে এবং তাহার ফলে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ ইহার উন্নতির জন্য আরও চেষ্টাশীল হইয়া দেশ রক্ষায় মনোভিনিবেশ করিতে সমর্থ হইবেন।

পরলোক।—রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর, এম্, এ, পি, আর, এচ, বিদ্যাসাগর মহাশয় গত ২৬শে চৈত্র, ৯ই এপ্রিল বুধবার সন্ধ্যা ৭টায় পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি সংস্কৃত সাহিত্যে প্রগাঢ় পণ্ডিত ও ইংরাজী বিদ্যায় রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ উপাধিধারী ছিলেন। কর্ম্মময় জীবনে ইনি বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অনুবাদকের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিকাতা সাহিত্যশাখার একজন বিশিষ্ট সভ্যরূপেও ইনি বহুকাল কার্য্য করিয়াছিলেন। কলিকাতা সাহিত্য-সভার ইনি প্রাণস্বরূপ ছিলেন। আমরা ইঁহার বিয়োগে যথেষ্ট ব্যথা অনুভব করিয়াছি। ভগবান ইঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রাণে শান্তিবারি সেচন করুন।

প্রাদেশিক ভাষায় চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা।—বাবু সুরেন্দ্র নাথ রায়ের প্রশ্নোত্তরে মিঃ ডোনাল্ড জানাইয়াছেন, যে, প্রাদেশিক ভাষায় চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা দানের প্রশ্ন গবর্ণমেণ্ট চিন্তাই করেন নাই এবং ঐ জন্য কোনো বিদ্যালয় স্থাপন অথবা স্থানীয় বিদ্যালয় গুলিতে বাঙ্গালা শাখা খুলিয়া দেওয়ার কথা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন নাই।" কিন্তু এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট চিন্তা করেন—ইহা আমাদিগের বিশেষ.অনুরোধ। যে দেশে এখনও ৪০ হাজার চিকিৎসকের প্রয়োজন, সে দেশে প্রাদেশিক ভাষায় চিকিৎসা শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে অনেক ইংরাজী ভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তিই চিকিৎসা শিক্ষার জন্য অগ্রসর হইতে পারে। দেশের অনেকে ইংরাজীতে সুপটু নহে বলিয়াই তো ইচ্ছাসত্ত্বেও অনেকে এ বৃত্তি অবলম্বনের সুযোগ পাইতেছেন না। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এ সকল কথা চিন্তা করিলে [illegible] [illegible] হইবে।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৩য় বর্ষ। } বঙ্গাব্দ ১৩২৬—আষাঢ়। { ১০ম সংখ্যা।

দেশের কথা।

—:*:—

বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার যুগে ইংরাজী শিক্ষালব্ধ জ্ঞানার্জ্জনে আমরা এখন এক এক-জন মহা মহা কর্ম্মবীর বলিয়া পরিগণিত হইয়াছি—ইহা সত্য হইলেও সেই সঙ্গে আমাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছে কি অবনতি হইয়াছে—সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা করি-বার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

ইংরাজী শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া এখনকার দিনে আমরা যে পরিমাণে অর্থের মুখ দেখিতে পাইতেছি, এ পরিমাণ অর্থ বঙ্গবাসী—তথা সমগ্র ভারতবাসী কখনো উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হন নাই। অধুনা B.A. M.A. পাশ করিয়াও অনেকের ইপ্সীত বাসনা অতৃপ্ত থাকে সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও এখনকার B.A. M.A. ন্যূনকল্পে যে পরিমাণ অর্থ উপার্জ্জন করেন, সেকালে বহু চেষ্টা করিয়াও প্রায়শঃ সেরূপ অর্থ কেহ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইতেন না; সুতরাং বর্ত্তমান যুগে বিদেশীয় শিক্ষার চরম সাধনা করিতে পারিলে, দেশের লোকের অর্থোপার্জ্জনের পন্থা আর কণ্টকাবৃত থাকেনা,—একরূপে তাহার জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের ব্যবস্থা হইতে পারে।

কিন্তু সে অর্থ উপার্জ্জনের ফলে আমরা করিতেছি কি? যাঁহারা খুব বেশী টাকা রোজগার করেন—তাঁহাদের কথা বাদ দিয়া, যাঁহারা কেরাণী বৃত্তি করিয়া হাড়ভাঙ্গা পরি-শ্রমের ফলে মোটামুটি উপার্জ্জন করেন—তাঁহাদের অবস্থায় কতটা শান্তি থাকিতে পারে, তাহা আমি বলিতে পারি না, কিন্তু বহুকাল চিকিৎসা ব্যবসায়ের ফলে এ কথাটি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা তাঁহারা আদৌ করিতে পারেননা। তাহার কারণ, এখনকার দিনে আমরা নগদ অর্থের মুখ যেমন যথেষ্ট দেখিয়াছি, তেমনি সকল বিষয়েই অধুনা আমরা অকাতরে ব্যয়শীল হইয়া পড়িয়াছি। অর্থ উপার্জ্জন করিয়া যেরূপভাবে উহার ব্যব-

হার করিতে হয়, এখনকার দিনে আমরা সে জ্ঞান আদৌ অর্জ্জন করিতে শিখি নাই। এক কথায় এখনকার দিনে আমরা অর্থ আনিতে জানি, কিন্তু উহার ব্যবহার করিতে জানি না। তা' যদি জানিতাম, তাহা হইলে আজি কলিকাতা—শুধু কলিকাতা নহে, বাঙ্গালা দেশের সমস্ত সহরে—শুধু সহরে কেন—পল্লী-গ্রামে পর্য্যন্ত বিড়ি-সিগারেটের বিক্রয়াধিক্য দেখিতে হইতনা, দোকান খুলিয়া পতিতা রমণীকুলকে রাজপথগুলিতে পয়সায় চারি খিলি পান বিক্রয় করিতে দেখিতে হইতনা, সোডা-লেমনেড-সরবতের দোকানের ভিড়ে বঙ্গবাসীকে বিপর্য্যস্ত হইতে হইতনা! আর আসাম-দারজিলিং ও জলপাইগুড়ির উদ্যানজাত চায়ের কল্যাণেও প্রত্যেক সহরে পয়সা পেয়ালা চা বিক্রয়ে অনেককে জীবিকা নির্ব্বাহের সংস্থান করিতে হইত না।

বাঙ্গালী কি অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করে? কখনই করেনা। তা' যদি করিত—তাহা হইলে বর্ত্তমান বৎসরে কলিকাতার বাজারে আজি দশটাকা শ'য়ের আম কিনিবার জন্য আপণ গুলিতে প্রাতর্ম্মধ্যাহ্ন-সায়াহ্ন—সকল সময়েই প্রবল জনতা দৃষ্টিগোচর হইত না—সেমিজ-জ্যাকেট-বডির দোকান গুলিতেও এত ভিড়ের ব্যবস্থা হইত না।

তাই বলিতেছিলাম—বাঙ্গালী ইংরাজী পড়িয়া—ইংরাজী শিখিয়া—ইংরাজী সভ্যতাকে আদর্শ করিয়া, দেশের নিকট—দশের নিকট—সমাজের নিকট—আত্মপরিজনের নিকট জ্ঞান-গর্ব্ব-সুখ অনুভব করিতে পারিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার বুদ্ধি-বিপর্য্যয়ের ফলে প্রকৃত সুখলাভের পথ সে যে একেবারে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে—ইহা অবিসংবাদিত সত্য, এ কথার প্রতিকূলে কিছুই বলিবার নাই।

রাজা আমাদের ইংরাজ, সুতরাং এখন আর শুধু আমাদের দেশের ভাষা শিক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবেনা, আমাদিগকে ইংরাজী পড়িতে হইবে, কিন্তু তাই বলিয়া আমরা ইংরাজের অনুকরণ করিব কেন? ইংরাজ তো আমাদের মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দেন নাই যে, তোমরা তাঁহাদের অনুকরণ কর। তাঁহারা তো সে কথা বলিয়া দেন নাইই, বরং তোমাদের জাতীয় শিক্ষার বিস্তার কামনায় সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য সংস্কৃতকলেজ খুলিয়া, টোলে বৃত্তি দিয়া, তোমাদের বাঙ্গালা বিদ্যালয়গুলিতে সাহায্য করিয়া, তোমাদের নিজস্ব বজায় রাখিবার ব্যবস্থা যথেষ্ট করিয়াছেন। তোমরা সে সকল নিজে গ্রহণ করিবেনা। নিজেরা বিকৃত বুদ্ধিকে প্রণোদিত হইয়া যদি অশুভ উৎপাদনের ব্যবস্থা কর, তাহা হইলে তাহার ফল যে তোমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে—ইহা ধ্রুব সত্য এবং ইহারই জন্য বাঙ্গালীর মনে সুখ নাই, শান্তি নাই, স্বাস্থ্যসম্পদে বাঙ্গালী আজি আর সে কালের মত গরীয়ানও নহে।

প্রকৃত কথা, আমাদের দেশ—জ্ঞানের দেশ,—ইহা ভোগের দেশ নহে। এ দেশের লোকের কোনো কালে অর্থ ছিল না, কিন্তু তাহার এমনই সামর্থ্য ছিল যে, সে সামর্থ্যে একদা সমগ্র বিশ্ববাসী চমৎকৃত হইয়াছিল তাহার কারণ, স্কুলকলেজের বিদ্যা এখন যেমন অর্থকরী বিদ্যা হইয়াছে, এ দেশে সেরূপ ব্যবস্থার কাহারও প্রয়োজন ছিলনা। ইহার প্রধান কারণ, সেকালে উদরান্নের ব্যবস্থার জন্য কাহাকেও বড় একটা ভাবিতে হইত না

সকলেরই দু' দশ বিঘা চাষের জমী ছিল—সেই জমীতে ধান্য এবং অন্যান্য ফসলাদি যাহা উৎপন্ন হইত, তদ্বারা প্রায় সকল সংসারেরই অন্নের সংস্থান হইত, সকলেরই গৃহ-সান্নিধ্যে অল্পবিস্তর পরিমাণের বাগান ছিল,—সে বাগানে যে পরিমাণ তরিতরকারি উৎপন্ন হইত, তদ্বারা আহারকালে দৈনন্দিন ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা হইত। পল্লীবাসী মাত্রেরই এক একটা ছোট বড়—যেরূপ ধরণেরই হউক না কেন, দীর্ঘিকা-পুষ্করিণী থাকিত, তাহার জন্য মৎস্য কাহাকেও কিনিতে হইত না। আর গাভীপালন—এটা সেকালে যে প্রত্যেক বাঙ্গালার করণীয় বিষয় ছিল, তাহার উল্লেখ না করিলেও চলিতে পারে। ফলে সেকালের বাঙ্গালী প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ বা অমৃত পানে দীর্ঘায়ু ও বয়ঃসংস্থাপনের ব্যবস্থায় সক্ষম হইত। ফলে সেকালে অধিকাংশ বাঙ্গালীকেই জীবিকার্জ্জনের ভাবনা বিশেষ ভাবিতে হইত না। সেইজন্য সেকালে বাঙ্গালী যে বিদ্যাশিক্ষা করিত—তাহা জ্ঞানার্জ্জন উদ্দেশেই করিতে পারিত। এখন তো তাহা নাই। এখন বাঙ্গালী কৃষিকর্ম্ম ভুলিয়াছে, কারণ সে আর চাষা হইতে রাজি নহে, পিতৃপিতামহের বাস্তভিটা পল্লীভূমির মায়া পরিত্যাগ করিয়াছে—কারণ বহুকাল সহরের সর্ব্ববিধ সুখ উপলব্ধি করিয়া সে আর নানা অসুবিধার মধ্যে ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট হইতে ইচ্ছুক নহে। চোরের উপর রাগ করিয়া মাটীতে ভাত খাওয়ার মত, এখন বাঙ্গালীর অবস্থা হইয়াছে,—পল্লীগ্রামের ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য তাহার চেষ্টা নাই,—পল্লীগুলি ম্যালেরিয়ার আকর ভূমি, সুতরাং সে স্থানে আর থাকা হইবে না, ইহাই হইয়াছে বাঙ্গালীর অবস্থা। এ অবস্থায় বাঙ্গালীর দুরবস্থা হইবে না তো হইবে কাহার?

ইংরাজী শিখিয়া চাকরিজীবি অধিকাংশ বাবুর দলই এখন সহরে বাস করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু সহর বাসের ফলে টাকায় চারি সের দুগ্ধ কিনিয়া স্বাস্থ্যসুখ লাভ করিবার ক্ষমতা অনেকেরই নাই। অন্যান্য খাদ্যও বাঙ্গালী যথেষ্ট পরিমাণে খাইতে পায় না। তাহার উপর আয়ের অবস্থায় বাসস্থানের ব্যবস্থাও বিবেচনা করিয়া করিতে হয়,—কাজেই অনেকের ভাগ্যেই আলোক-রৌদ্রহীন বাড়ীতে অবস্থিতি করা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। শিশু-মৃত্যুর আধিক্য—বাঙ্গালীর অকাল বার্দ্ধক্যের বিস্তৃতি—বাঙ্গালীর যক্ষ্মারোগবৃদ্ধি—ইহারই ফলসম্ভূত।

যক্ষ্মায় বাঙ্গলা দেশ তো সমগ্র বিশ্বকে ছাড়াইয়া ফেলিয়াছে,—আর কলিকাতা হইতেছে—বাঙ্গালার সকল স্থান অপেক্ষা যক্ষ্মাগ্রস্ত রোগীর প্রধান তীর্থ। বাঙ্গালী হোমরুল হোমরুল করিয়া চীৎকার করিতেছে, কিন্তু বাঙ্গালীর পক্ষে সে চিন্তার পূর্ব্বে এই সকল বিষয়ের চিন্তা করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য নহে কি?

ধর্ম্মের সহিত স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ অতি নিকট বলিয়াই সে কালের বাঙ্গালী অতি ধর্ম্মভীরু ছিলেন এবং সেই ধর্ম্মরক্ষার জন্যই সেকালের বাঙ্গালী নীরোগ ও সুস্থদেহে দীর্ঘায়ুলাভ করিতে সক্ষম হইতেন।

এখনকার বাঙ্গালী সে সাবেক পদ্ধতি একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং সে ধর্ম্মপালনও নাই—সে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কাহারও যত্নও নাই। সেকালের বাঙ্গালী বুঝিত—শরীরমাদ্যং। একালের

বাঙ্গালী জানে—অর্থং সর্ব্বস্বং। শুধু অর্থ সর্ব্বস্ব নহে—বাঙ্গালী এখন যথেষ্ট অনুকরণ প্রিয় হইয়াছে—বাঙ্গালীর বিলাস-বাসনা তাহার সহিত বিজড়িত। সেই বিলাসিতা হইতে বাঙ্গালী তৈলমর্দ্দন ভুলিয়াছে, তাহার স্থলে সাবান মর্দ্দন আরম্ভ করিয়াছে। বাঙ্গালী-ধূম-পায়ী হুঁকা-গড়গড়ার সাহায্যে তামাক পরিত্যাগ করিয়া বিড়ি-সিগারেটের সহজ সুলভ ধূম গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছে। কোন স্থানে যাইতে হইলে বাঙ্গালীর আর এক পোয়া পথ হাঁটিবার ক্ষমতা নাই—ট্রাম অশ্বযান-মোটর ভিন্ন বাঙ্গালী আর চলিতে পারিবে না—এত অত্যাচারেও যদি বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য অটুট থাকে —তাহা হইলে তো আর বিশ্বনিয়ন্তার কোনো নিয়মই প্রতিপালন করিবার আবশ্যক হয় না। শুধু পুরুষদিগের কথা নহে -আমাদের রমণী দিগকেও গৃহস্থালীর কর্ম্ম সকল হইতে বিরত রাখিয়া আমরা তাঁহাদিগকেও এমনই অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিতেছি যে, সেই অকর্ম্মণ্যতার ফলে তাঁহাদিগের স্বাস্থ্যের ও অপচয় ঘটিতেছে। দাস দাসীর নিয়োগ করিও না—পুরলক্ষ্মীদিগকে অনবরত খাটাইয়া-খাটাইয়া মারিয়া ফেল—এরূপ কথা অবশ্য আমরা বলিতেছিনা, কিন্তু বাঁকুড়া-মেদিনী-পুরের বামুন রাখিয়া, তাহাদের দ্বারা রন্ধনের ব্যবস্থা করিয়া, দেশের নারীদিগকে যে শুধু শয্যাবিলাসিনী করা উত্তম ব্যবস্থা নহে—এ কথা সহস্র বার বলিব।

আমাদের অন্নপূর্ণার দেশে অন্নপূর্ণার অংশ সম্ভূতা রমণীদিগকে অন্নবিতরণে ক্লিষ্টা হইতে দেখিলে সমাজের রুচিপরিবর্ত্তনে ব্যথিত হইতে হয় বলিয়াই ইহার উল্লেখ করিলাম। ফল কথা, দেশের বড় দুর্দ্দিন। এ দুর্দ্দিনে আত্মরক্ষা করা বাঙ্গালীর পক্ষে যেরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে ইহার ভবিষ্যৎ যে বিশেষ অন্ধকারময়, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাই বলিতেছিলাম—ইংরাজী পড়, আপত্তি নাই—শুধু আপত্তি নাই-ই বা বলি কেন,—ইংরাজী তোমাকে পড়িতেই হইবে—কিন্তু প্রত্যেক বাঙ্গালীর নিকট করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছি—অনুকরণে মজিয়া যাইও না, পিতৃ পিতামহের আদেশ ভুলিও না—অনুকরণ স্রোতে হিন্দুর দীক্ষা ভাসাইয়া দিয়া বিজাতীয় বন্যার প্রাবল্যে ভাসমান হইও না। তাহাতে হইবে কি?—না—তাহাতে দু'য়ের বা'র হইবে। না পারিবে অনুকরণে আসল টুকু আনিতে, না পারিবে হিন্দুত্ব বজায় রাখিতে। ফলে একটা খিচুড়ির মিশ্রণে তুমি সহজেই স্বাস্থ্য হানি করিয়া বসিবে।

হিন্দুত্ব বজায়ের সহিত যে আমাদের স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ বিজড়িত—সে কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি; সুতরাং যাহাতে স্বাস্থ্য বজায় থাকে, নীরোগ হইতে পার, দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পার, বৎসরের মধ্যে নয় মাস কাল চিকিৎসকের শরণ গ্রহণ করিতে না হয়—তোমার বীর্য্যোৎপন্ন সন্তান সন্ততি যাহাতে তোমারই দোষে অকালে কাল কবলিত না হয়—কায়মনোপ্রাণে হিন্দুত্ব বজায় রাখিয়া তাহারই ব্যবস্থা কর—ইহাই আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন।

পঞ্চকৰ্ম্ম।

—:*:—

[ডাক্তার-কবিরাজ সংবাদ।]

(পূৰ্ব্বানুবৃত্তি)

ডাঃ। এখন ধূম পানের দ্বারা কি উপকার হয় বলুন।

ক। স্নেহন ধূম বায়ু নাস করে, বিরেচন ধূম কফকে উৎক্লিষ্ট ক'রে নির্গত করে। প্রায়োগিক ধূম স্নেহন ও বিরেচন এই উভয় ধূমের কার্য্যকারী। ধূমপান করিলে ইন্দ্রিয়, স্বর ও চিত্ত প্রসন্ন হয়, কেশ, দন্ত ও শ্মশ্রু দৃঢ় হয় এবং মুখ সুগন্ধ ও পরিস্কৃত হইয়া থাকে। ইহা সুস্থাবস্থায় ধূম পানের গুণ। ইহা ভিন্ন কাস, শ্বাস, অরুচি, মুখের উপলেপ (যেন কিছু লেপা রহিয়াছে বোধ), স্বরভেদ, মুখ হইতে লালাদি স্রাব, বমি, তন্দ্রা, হনুস্তম্ভ, (চোয়াল ধরা), মন্যাস্তম্ভ, পীনস, শিরোরোগ, কর্ণশূল, চক্ষু শূল এবং বায়ু ও কফজনিত মুখরোগ জন্মিতে পারে না ও জন্মিয়া থাকিলে প্রশমিত হয়।

ডাঃ। ধূম পান বেশী হ'লে কি দোষ হয়?

ক। অতিরিক্ত ধূমপান ক'রলে রোগের শান্তি হয় না এবং তালু ও গলদেশের শুষ্কতা, দাহ, তৃষ্ণা, মূৰ্চ্ছা, ভ্রম (ঘুরণী) মত্ততা, কর্ণরোগ, চক্ষুরোগ, দৃষ্টির হীনতা, নাসারোগ ও দৌর্ব্বল্য জন্মিয়া থাকে।

ডাঃ। আচ্ছা ধূম কতক্ষণ পান ক'রতে হ'বে, তা'র কিছু নিয়ম আছে।

ক। আছে বৈকি। প্রায়োগিক ধূম মুখ ও নাসিকা দ্বারা পর্য্যায়ক্রমে তিন তিন বার বা চার চার বার পান ক'রতে হয়। যতক্ষণ চক্ষু দিয়ে অশ্রু নির্গত না হয়—ততক্ষণ স্নৈহিক ধূমপান করতে হয়। এটা হ'ল সকলের পক্ষে; দুর্ব্বল ব্যক্তি এর চেয়ে কম পান করবে। বিরেচন ধূম ৩।৪ বার অথবা যতক্ষণ শ্লেষ্মা নির্গত না হয়—ততক্ষণ পান করা নিয়ম। কাসহরধূম আহারের পর তিন চার বার পান ক'রতে হয়। আর খোসা শূন্য তিলের যবাগূ আকণ্ঠ পান ক'রে কফণীয় ধূমপান ক'রতে হয়। যতক্ষণ বমন হ'য়ে পিত্ত নির্গত না হয়—ততক্ষণ পান করা উচিত।

ডাঃ। এই ত গেল আপনার চতুর্থ কৰ্ম্ম। পঞ্চম কৰ্ম্ম কি?

ক। পঞ্চম কৰ্ম্ম করান—গণ্ডূষ ধারণ। আর তা' ছাড়া আশ্চোতন তর্পণ, পুটপাক ব'লে কিছু কৰ্ম্ম আছে।

ডাঃ। আচ্ছা আপনি সংক্ষেপে সব গুলোর কথাই বলুন। কৰ্ম্মের বংশ একেবারে নির্ব্বংশ করা যাক।

ক। আজতো সেটা আমি আরম্ভই করেছি, আপনার বলবার অপেক্ষা রাখিনি। এখন সব গুলোর কথাই সংক্ষেপে বলি শুনুন। কবল চার প্রকার, যথা, স্নেহী, প্রসাদী,

শোধন ও রোপণ। বায়ু জন্য রোগে স্নিগ্ধ ও উষ্ণ গুণযুক্ত কবল, পিত্ত জন্য রোগে মধুর ও শীত গুণযুক্ত কবল, কফ জনিত রোগে কটু, অম্ল, লবণ, রুক্ষ ও উষ্ণ কবল প্রযুজ্য। ইহাকে শোধন বলে। আর বাতজ রোগে ও পিত্তজ রোগে যে দুই প্রকার কবল প্রয়োগ ক'রবার কথা বলা হ'য়েছে, তা'দের যথাক্রমে স্নেহী ও প্রসাদী বলে। এতদ্ভিন্ন মুখব্রণে কষায় স্বাদু ও তিক্ত দ্রব্যের যে কবল প্রয়োগ করার নিয়ম আছে, তা'কে রোপণ বলে।

ডাঃ। আচ্ছা কবল কি দিয়ে দিতে হয় ?

ক। রোগ ভেদে সেই সেই দ্রব্যনাশক ঔষধের সঙ্গে সিদ্ধ ক'রে ক্বাথ প্রস্তুত ক'রতে হয়। তারপর বায়ু রোগে ঘৃতাদি স্নেহ, পিত্ত-রোগে কিসমিসের ক্বাথ, চিনি প্রভৃতি মধুর দ্রব্য, আর কফরোগে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ প্রভৃতি দ্রব্যের চূর্ণ মিশিয়ে কবল প্রয়োগ ক'রতে হয়। মুখের ক্ষতে ক্ষতনাশক দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত ক'রে প্রয়োগ ক'রতে হয়।

ডাঃ। আচ্ছাকবল আর গণ্ডূষে প্রভেদ কি ?

ক। ওরা দুই ভাই—কবল ছোট আর গণ্ডূষ বড়। যে পরিমাণ দ্রব্য মুখে নিয়ে মুখের মধ্যে অনায়াসে সঞ্চালন ক'রতে পারা যায়, সেই পরিমাণ নিলে তা'কে কবল বলা যায়। কবল শব্দের অপভ্রংশ কুল্লি আর কুলকুচো। আর যে পরিমাণ দ্রব্য মুখে নিলে মুখ মধ্যে সঞ্চালন করা যায় না, মুখটা বুঁজে চুপটী ক'রে ব'সে থাকতে হয়, সেই পরিমাণ নিলে তাকে গণ্ডূষ বলে।

ডাঃ। পূর্ব্বে ঋষিরা গণ্ডূষে সমুদ্র পর্য্যন্ত পান ক'রে ফেলতেন। তা' হলে তাঁদের শ্রীমুখে গহ্বরের পরিমাণ কম ছিল না।

ক। সে ব্যাখ্যা পৌরাণিকেরা ক'রবেন। তবে আয়ুর্ব্বেদের মতে যদি ব'লতে হয়—তা' হলে অগস্ত্য লবণ রসযুক্ত, সুতরাং শোধন গণ্ডূষ ধারণ করেছিলেন ব'লে তাঁর কফরোগ আর পঙ্ক মুনি মধুর রাঙ্গাজলের গণ্ডূষ ধারণ ক'রেছিলেন ব'লে তাঁর পিত্ত রোগ ছিল।

ডাঃ। ঠিক বলেছেন, কোনো বিলিতী এন্টিকোয়েরিয়েনকে (Antiquarian) লিখলে তাঁরা এটা আহ্লাদ সহকারে গ্রহণ করবেন।

ক। তা করুন আপনি এখন শ্রবণ করুন। অনন্যমনা হয়ে এবং শরীর উন্নত ভাবে রেখে অর্থাৎ সোজা হ'য়ে ব'সে কবল ও গণ্ডূষ ধারণ করতে হয়। যে পর্য্যন্ত দোষ গালের মধ্যে না আসে এবং নাসাস্রোত ও চক্ষু জলপ্লুত না হয়—ততক্ষণ কবল ও গণ্ডূষ ধারণ ক'রতে হয়। তা'রপর মধু ঘৃতাদির কবল ধারণ করতে হয়। কবল প্রয়োগ করবার পূর্ব্বে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বচ, সর্ষপ ও হরীতকী বেটে তৈল, গোমূত্র বা মধুর সঙ্গে লবণ সংযোগে মিশ্রিত ও উষ্ণ ক'রে রোগীর গলায়, গালে ও ললাটে মাখিয়ে স্বেদ দিতে হয়।

ডাঃ। কবল গণ্ডূষেরও অযোগ অতি যোগ আছে নাকি ?

ক। আছে বৈকি ? কবলের হীনযোগ হ'লে মুখের জড়তা, কফের উৎক্লেশ এবং রস-জ্ঞানের হানি হয়। অতিযোগ হ'লে মুখে ক্ষত, মুখের শুষ্কতা, তৃষ্ণা, অরুচি ও ক্লান্তি জন্মায়। আর সম্যক প্রয়োগ হ'লে ব্যাধির উপশম, মনের সন্তোষ, মুখের নির্ম্মলতা ও লঘুতা এবং ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা ঘটে।

ডাঃ। আচ্ছা কবল গণ্ডূষ কোন্ কোন্ রোগে প্রয়োগ করা যায় ?

ক। নানা প্রকার মুখরোগ, নাসারোগ, কণ্ঠরোগ; দন্তরোগ প্রভৃতিতে কবল প্রয়োগ করা যায়। শ্লেষ্মপ্রকৃতি ব্যক্তির পক্ষে বসন্তকালে কফ প্রশমনের জন্য কবল হিত কর। নিত্য তৈলের গণ্ডূষ ধারণ ক'রলে অকাল বলী পলিত হয় না, কেশ দন্ত প্রভৃতি ভাল থাকে, ইন্দ্রিয় সকল প্রসন্ন হয়, ও দৃষ্টি অব্যাহত থাকে।

ডাঃ। এইবার অঞ্জন, না কি ব'লবেন—ব'লেছিলেন ?

ক। হাঁ ব'লছি। তা'র আগে কবলের একটী বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পরিচয় দিই—এঁর নাম প্রতিসারণ। কবলের জন্য যে সব ওষুদ প্রয়োগ ক'রতে হয়, সেই সব ওষুদ সেই সেই ক্ষেত্রে চূর্ণ ক'রে বা বেটে প্রয়োগ করাকে প্রতিসারণ বলে। এর দোষ গুণ—সব কবলের ন্যায় এবং কবল প্রয়োগ দ্বারা যে সকল রোগ নষ্ট হয়, প্রতিসারণ দ্বারা সেই সকল রোগও নষ্ট হয়।

ডাঃ। এইবার অঞ্জনের কথা বলুন ?

ক। অঞ্জন সুস্থ শরীরে ব্যবহার ক'রলে চক্ষু ভাল থাকে। পূর্ব্বে অঞ্জন ব্যবহার ক'রবার রীতি ছিল। কজ্জলপূরিত লোচন স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি ক'রতো ব'লে শোনা যায়। এখন এই হিতকর প্রথাটা প্রায় লোপ পেয়েছে। কেবল শিশুদের জন্য ইহা এখন অনেক স্থলেই দেওয়া হয়। তবে সভ্যতার খাতিরে তাও বুঝি আর থাকে না।

ডাঃ। হাঁ হালি হিসাবে শিক্ষিত অনেক লোকের বাড়ী থেকে ছেলেদের কাজল পরাও উঠে গিয়েছে।

ক। তা' উঠবে বৈকি। নইলে চোখের চিকিৎসকেরা এখন মোটর হাঁকাবেন কি করে! চশমার দোকান চ'লবে কি করে, আর চশমা চোখে দিয়ে সভ্যতার উৎকর্ষের পরিচয়ইবা দেওয়া হবে কি করে ?

ডাঃ। আপনি কি বলতে চান যে, কেবল কাজল না পরাবার জন্যই এত চোখের দোষ আর চশমার ছড়াছড়ি ?

ক। কেবল যে সেই জন্যে—তা' বলছি না; তবে কাজল পরার প্রথা লোপ পাওয়ায় চোখের রোগের এবং চশমা ব্যবহারের যে অনেকটা বাহুল্য ঘটেছে—সেটা বোধ হয় সত্য। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও অনেক স্থলে অঞ্জন (সুরমা) ব্যবহারের চলিত আছে, আর যারা অঞ্জন ব্যবহার ক'রে—তাদের মধ্যে চোখের রোগ এবং চশমার ব্যবহার খুব কম।

ডাঃ। সেটা কেবল আপনার অনুমান তো ?

ক। কেবল অনুমান নয়, একটু সন্ধান নিয়েও দেখিছি। এখন একটা কথা এই যে, কাজল পরা উঠে গেল কেন? সভ্যতার খাতিরে কি? কিন্তু কাজল পরা অসভ্যতার পরিচায়ক হোক আর যাই হোক, কাজল পরলে চক্ষু ভাল থাকে এবং সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি হয়। কোন কজ্জলপূরিতলোচনা-সুন্দরীকে দেখবার সৌভাগ্য আমার ঘটেনি, কিন্তু শিশুদের কাজল দিলে বড় সুন্দর দেখায় দেখেছি।

ডাঃ। সে বিষয়ে আমিও আপনার সঙ্গে এক মত। এখন অঞ্জন প্রয়োগের কথা বলুন।

ক। কফ বিরেচন এবং শিরোবিরেচন দ্বারা রোগীকে বিশুদ্ধ ক'রলেও যদি চক্ষুতে ও চক্ষুর নিকটে দোষ থাকে এবং শোথ বেদনা, বস্ত্ত, পৈচ্ছিল্য, ফরফর করা, অশ্রু নির্গম, রক্তিমাবর্ণ ও ঘনদূষিকা (পিচুটি) নির্গম প্রভৃতি ঘটে, তাহা হইলে চক্ষুতে অঞ্জন

প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। অঞ্জন তিন প্রকার, যথা লেখন অর্থাৎ দোষ উঠাইয়া ফেলে; রোপণ অর্থাৎ যাহা ক্ষত শুষ্ক করে এবং দৃষ্টি-প্রসাদন-অর্থাৎ যাহা দৃষ্টি শক্তিকে নির্ম্মল করে। কষায়, অম্ল, লবণ ও কটু দ্রব্য দ্বারা লেখাঞ্জন, তিক্ত দ্রব্য দ্বারা রোপণাঞ্জন এবং স্বাদু ও শীতল দ্রব্য দ্বারা দৃষ্টি-প্রসাদন অঞ্জন প্রস্তুত হ'য়ে থাকে।

ডাঃ। অঙ্গন কি হাতে ক'রে দিতে হয়?

ক। না, শলায় ক'রে দিতে হয়। শলা দশ আঙ্গুল মধ্যভাগে সূক্ষ্ম এবং শলাকার মুখ কুন্দ, জাতি বা মল্লিকা ফুলের কুঁড়ির মত হওয়া উচিত। লেখনকার্য্যের জন্য তামার শলাকা, রোপণ কার্য্যে কৃষ্ণবর্ণ লৌহের শলাকা এবং দৃষ্টিপ্রসাদনের জন্য স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্ম্মিত শলাকা কিম্বা অঙ্গুলি দ্বারা অঞ্জন প্রয়োগ ক'রতে হয়।

ডাঃ। অঞ্জনপ্রয়োগ ক'রবার নিয়ম কি?

ক। চক্ষু উন্মীলিত না ক'রে শলাকা দ্বারা চক্ষুতে এবং পরে চক্ষুর পাতার ভিতরে অঞ্জন প্রয়োগ ক'রতে হয়। কিছুক্ষণ পরে ব্যাধি দোষ এবং ঋতুর উপযোগী জলের দ্বারা চক্ষু ধৌত ক'রতে হয়। তা'র পর বাম চক্ষের উপরের পাতা ঊর্দ্ধে আকর্ষণ ক'রে নির্ম্মল বস্ত্র—বেষ্টিত অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা বাম চক্ষু এবং বাম অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ চক্ষু মার্জ্জন করে পরিষ্কৃত ক'রতে হয়।

ডাঃ। অঞ্জন প্রয়োগ ক'রবার নিষেধ কিছু আছে?

ক। ক্রমশঃ ব'লছি। অঞ্জন প্রয়োগ ক'রলেও যদি কণ্ডূ ও জড়তা ভাল না হয়, তা' হলে তীক্ষ্ণ অঞ্জন ও ধূম প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তীক্ষ্ণ অঞ্জন প্রয়োগের ফলে চক্ষুতে জ্বালা উপস্থিত হ'লে শীঘ্র শীতল অঞ্জন প্রয়োগ ক'রতে হ'বে। প্রাতঃকালে, অপরাহ্নে, মেঘাগমে এবং সূর্য্যের উত্তাপ প্রবল হ'লে অঞ্জন ব্যবহার করা উচিত। যাহাকে বমন করান হইয়াছে, যাহাকে বিরেচন করান হইয়াছে, যাহার মল মূত্র দিয়া বেগ উপস্থিত হইয়াছে, আহারের পরে, ক্রুদ্ধ, ভীত ও পিপাসিত ব্যক্তিকে, সূক্ষ্ম বা উজ্জ্বল বস্তু দর্শনের পরে, শিরোবেদনায়, শোষে; রাত্রি জাগরণের পরে, মাথা ধুইবার পরে, ধূম বা মদ্যপানের পরে, অজীর্ণে, রৌদ্র সেবনের পরে, দিবা নিদ্রার পরে, পিপাসিত ব্যক্তিকে এবং সূর্য্য প্রকাশ না পাইলে অঞ্জন প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ।

ডাঃ। আচ্ছা অঞ্জনের আগে আর একটা কি ব'লেছিলেন?—অচেতন—না কি?

ক। ঠিক অচেতন নয়, তবে কাছাকাছি বটে, আশ্চ্যোতন। যাকে আপনারা আই ড্রপ (Eye-drop) বলেন। বাম হস্ত দ্বারা চক্ষু উন্মীলিত ক'রে তুলার বর্ত্তি দ্বারা দুই আঙ্গুল অন্তর থেকে চক্ষুর কনীনিকার উপর দশ বা বার ফোঁটা ওষুদ প্রয়োগ করতে হয়। তা'রপর কোমল বস্ত্র দ্বারা চক্ষু মার্জ্জনা ক'রে অপর একখানি কোমল বস্ত্র উষ্ণ জলে ভিজিয়ে চক্ষুতে মৃদু স্বেদ দিতে হয়। বায়ু ও কফ-প্রধান চক্ষু রোগেই এই প্রণালী প্রশস্ত।

ডাঃ। আশ্চ্যোতনে কি উপকার হয়?

ক। ইহা দ্বারা চক্ষুর বেদনা, চুলকানি করকর্ করা, জলপড়া, জ্বালা ও লাল হওয়া ভাল হয়। রক্ত ও পিত্তজনিত শীতল এবং বায়ু ও কফরোগে উষ্ণ আশ্চ্যোতন প্রয়োগ ক'রলে—চক্ষু বেদনা, রক্তবর্ণতা এবং অবিরত জলস্রাব হ'য়ে দৃষ্টি শক্তি নষ্ট হয়। [illegible]

শীতল আশ্চ্যোতন প্রয়োগ ক'রলে চক্ষুতে সূচীবেধবৎ যাতনা. স্তব্ধতা ও নানাপ্রকার যন্ত্রণা হয়। আশ্চ্যোতন অধিক মাত্রায় প্রয়োগ ক'রলে চক্ষু ফরফর করা, চক্ষু কষ্টে উন্মীলন করিতে পারা, এবং চক্ষুর পাতায় রক্তবর্ণতা উপসর্গ ঘটে। আশ্চ্যোতন অল্প পরিমাণে ব্যবহার ক'রলে রোগ বৃদ্ধি পায়। আর অপরিস্কৃত আশ্চ্যোতন ব্যবহার ক'রলে চক্ষুতে শোথ হয়।

ডাঃ। এ যে সর্ব্বনেশে চিকিৎসা কবিরাজ মশায়! যা'তে চক্ষু নষ্ট হ'য়ে যায়—এমন চিকিৎসা না করাই ত ভাল।

ক। চক্ষুর হিত করবার জন্যই চিকিৎসা করা, নষ্ট ক'রবার জন্যে নয়। ভাল কর্ম্মের অযথা প্রয়োগ হইলে চক্ষু নষ্ট হইয়া যেতে পারে—এই কথা বলা হ'য়েছে। তা' এটা যে শুধু আশ্চোতনেই হয়—তা' নয়, ঔষধ, শস্ত্র, বমন, বিরেচন, বস্তি প্রভৃতি সব গুলিরই অযথা প্রয়োগে রোগীর মহান অনিষ্ট হতে পারে!

ডাঃ। তা সত্য বটে। এখন আর যা' অবশিষ্ট আছে—সেটা ব'লে ফেলুন।

ক। প্রাতঃকাল বা সন্ধ্যাকালে তর্পণ প্রয়োগ করা উচিত। যব ও মাষকলায় বাটা দিয়ে চক্ষুর কোণের বাহিরে দুই আঙ্গুল উচ্চ সমান আল প্রস্তুত করতে হয়। তারপর দোষানুসারে দোষনাশক ঔষধ নিয়ে চক্ষুর পাতা পর্য্যন্ত পূরণ করতে হয়। কিন্তু রাতকাণা, বায়ুরোগ, তিমির ও কৃচ্ছ্রনামক চক্ষুরোগ প্রভৃতিতে ঘৃতের পরিবর্ত্তে ঔষধ সিদ্ধ বসা প্রয়োগ হিতকর্ম্ম।

ডাঃ। তারপর কি করতে হয়?

ক। চক্ষু ঘন ঘন বন্ধ ক'রতে হয়, আর খুলতে হয়। চক্ষুর পাতার রোগে এক শত লঘু অক্ষর উচ্চারণ কাল পর্য্যন্ত, চক্ষুর সন্ধিগত রোগে তিন শত মাত্রা (লঘু অক্ষর), শুক্ল মণ্ডল (শ্বেতবর্ণ অংশ) গত রোগে পাঁচ শত মাত্রা; কৃষ্ণমণ্ডল গত রোগে সাত শত মাত্রা, দৃষ্টিমণ্ডল গত রোগে অষ্ট শত মাত্রা, অধিমন্থ নামক চক্ষুরোগে দশশত মাত্রা, বায়ুতে দশ শত মাত্রা, পিত্তে ছয় শত মাত্রা, কফে ও সুস্থ ব্যক্তির দৃষ্টি প্রসাদন জন্য পাঁচ শত মাত্রা কাল তর্পণ রাখতে হয়; পরে অপাঙ্গের নীচে একটী ছিদ্র ক'রে স্নেহ বা'র করে দিতে হয়। ইহার পর রোগীকে ধূম পান করান উচিত আর আকাশ ও দীপ্তিশীল পদার্থ দেখতে দিতে হয়?

ডাঃ। এতে উপকার কি হয়?

ক। বায়ুজনিত রোগে প্রত্যহ, পিত্ত জনিত রোগে একদিন অন্তর, কফজনিত রোগে এবং সুস্থ শরীরে দুইদিন অন্তর চক্ষুর তৃপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত তর্পণ ব্যবহার করলে দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধিত হয়, চক্ষু নির্ম্মল হয় এবং চক্ষু সুস্থ হয়।

ডাঃ; এরও কি অযোগ অতিযোগ আছে?

ক। আছে বৈ কি। হীন তর্পণ হ'লে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণের বিপরীত লক্ষণ প্রকাশ পায়. আর অতি তৃপ্তি হ'লে চুলকানি, পিচ্ছিল, স্রাব প্রভৃতি শ্লেষ্মজ রোগ প্রকাশ পায়।

ডাঃ। আর বাঁকি রইল কি।

ক। এইবার পুটপাকের কথা ব'ললেই শেষ হয়। বাতজনিত চক্ষুরোগে স্নেহন, বাত শ্লেষ্মরোগে লেখন, আর চক্ষুর দৌর্ব্বল্য, বায়ু পিত্ত ও রক্তজনিত চক্ষুরোগে এবং সুস্থ শরীরে প্রসাদন পুটপাক প্রয়োগ ক'রতে হয়। স্নেহন পুটপাক এরণ্ড পত্র বেষ্টিত ও মৃত্তিকা লিপ্ত

ক'রে ধব কাঠের কয়লার আগুনে, লেখন পুটপাক বট পত্রে বেষ্টিত ও মৃত্তিকা লিপ্ত ক'রে ধন্বন কাঠের কয়লার আগুনে এবং প্রসাদন পদ্মপত্রে বেষ্টন ও মৃত্তিকা লিপ্ত করে ঘুঁটের আগুনে পাক করতে হয়। লেপ রক্তবর্ণ হ'লে অগ্নি থেকে উদ্ধৃত ক'রে শীতল হ'লে তা'রপর তর্পণের মত প্রয়োগ করতে হয়। লেখন পুটপাক শত মাত্রা কাল স্নেহন পুটপাক দুই শত মাত্রা কাল এবং প্রসাদন পুটপাক সাত শত মাত্রা কাল ধারণ ক'রতে হয়। লেখন ও স্নেহন পুটপাক ঈষদুষ্ণ অবস্থায় প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। পুট-পাকের উপকারিতা এবং অযোগ অতিযোগ তর্পণের ন্যায়।

স্নেহন ও লেখন পুটপাক প্রয়োগের পর ধূম পান করা উচিত। যতদিন পর্য্যন্ত তর্পণ ও পুটপাক প্রয়োগ করা যায়, তার দ্বিগুণ সময় পর্য্যন্ত হিতকর পথ্য সেবন করা উচিত। যাদের নস্য প্রয়োগ ক'রতে নেই, তাদের তর্পণ এবং পুটপাক প্রয়োগও ক'রতে নেই।

মসূরিকা বা বসন্ত।

—:*:—

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর।)

আয়ুর্ব্বেদে বাত, পিত্ত, কফ, রক্ত ও সন্নি-পাত ভেদে পাঁচ প্রকার বসন্তের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। রস, রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা, অস্থি ও শুক্রাশ্রয় পূর্ব্বক বায়ু পিত্ত ও কফ কর্ত্তৃক বসন্ত রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে রসকে আশ্রয় করিয়া যে বসন্ত উৎপন্ন হয়, চলিত কথায় তাহারই নাম পানিবসন্ত বা জলবসন্ত। রক্তগত মসূরিকা কৃষ্ণবর্ণ ও পাতলা চর্ম্মবিশিষ্ট। ইহা শীঘ্র শীঘ্র পাকিয়া উঠে এবং বিদীর্ণ হইলে ইহা হইতে রক্তস্রাব হয়। রক্ত যদি অধিক পরিমাণে দূষিত না হয়, তাহা হইলে এ বসন্তও সুখসাধ্য। মাংসগত মসূরিকা কঠিন, স্নিগ্ধ ও পুরুচর্ম্ম বিশিষ্ট; ইহা পাকিতে বিলম্ব হয়। ইহাতে গাত্রশূল, তৃষ্ণা, কণ্ডু, জ্বর ও চিত্তচাঞ্চল্য বিদ্যমান থাকে। এই ভাবের বসন্তরোগ কষ্ট সাধ্য। মেদোগত মসূরিকা মণ্ডলাকার, কোমল, কিঞ্চিৎ উন্নত, ঘোর জ্বরোৎপাদক, স্থূল, চিক্কণ ও বেদনাযুক্ত। ইহাতে মনো বিভ্রম, চিত্তচাঞ্চল্য ও সন্তাপ—এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়। ইহা সম্পূর্ণরূপে অসাধ্য ব্যাধি। দৈবাৎ এইরূপ ভাবের বসন্ত হইতে কেহ অব্যাহতি লাভ করিয়া থাকে। অস্থি ও মজ্জাগত মসূরিকা ক্ষুদ্রাকৃতি, গাত্র সমবর্ণ, রুক্ষ, চিপিটক সদৃশ চেপটা ও কিঞ্চিৎ উন্নত। এইরূপ বসন্তে মোহ, বেদনা ও অরতি হয়। এইরূপ বসন্তে মর্ম্মস্থল সকল ছিন্ন হওয়ায় সর্ব্বাঙ্গে ভ্রমর দংশনের ন্যায় যন্ত্রণা হইয়া থাকে। এরূপ বসন্ত আশু প্রাণনাশক। শুক্র-গত মসূরিকা চিক্কণ, সূক্ষ্ম ও অত্যন্ত বেদনা যুক্ত। ইহাতে চিত্তের অস্থিরতা, মূর্চ্ছা, দাহ, মত্ততা, আর্দ্র বস্ত্র আচ্ছাদনের ন্যায় অনুভূতি—

এই সকল উপদ্রব ঘটিয়া থাকে। ইহাও আশু প্রাণনাশক।

ত্রিদোষজাত বসন্তও অসাধ্য ব্যাধি। ইহাদের কতকগুলি প্রবালের ন্যায় লোহিতবর্ণ, কতকগুলি জাম ফল তুল্য চিক্কণ, কৃষ্ণ, কতকগুলি লোহিতবর্ণ সদৃশ রুক্ষ ও কৃষ্ণ, কতকগুলি তমাল ফলের তুল্য বর্ণ বিশিষ্ট হয়।

বায়ুর আধিক্য যুক্ত বসন্তে পীড়কা সকল শ্যাববর্ণ বা অরুণ বর্ণ, রুক্ষ, তীব্র বেদনাযুক্ত ও কঠিন হয় এবং এরূপ বসন্ত বিলম্বে পাকিয়া থাকে। এরূপ বসন্ত হইলে—সন্ধি, অস্থি ও পর্ব্বস্থানে বিদারণবৎ বেদনা, কাস, কম্প, অনবস্থিত চিত্তত্ব ও ক্লম, তালু, ওষ্ঠ জিহ্বার শোষ, তৃষ্ণা এবং অরুচি উপসর্গ হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক বসন্তের পীড়কা সকল শ্বেতবর্ণ, চিক্কণ, অতিশয় স্থূল ও কণ্ডু বিশিষ্ট, ইহাতেও অল্প বেদনানুভূতি হয়। ইহা দীর্ঘকালে পাকে। কফস্রাব, স্তৈমিত্য, শিরোবেদনা, গাত্র গৌরব, বমনিষা, অরুচি, নিদ্রা, তন্দ্রা ও আলস্য—এইগুলি ইহার উপসর্গ।

ইহা ভিন্ন চর্ম্মদল নামক একপ্রকার বসন্ত আছে, তাহাতে কণ্ঠরোধ, অরুচি, স্তম্ভিত-গাত্র, প্রলাপ ও অরতি উপস্থিত হয়। ইহা দুশ্চিকিৎস্য।

প্রায় সকলপ্রকার বসন্তের কথাই আমরা মোটামুটি ভাবে উল্লেখ করিলাম। এইবার ইহার চিকিৎসা ও প্রতিষেধক বিধি বলিব।

প্রতিষেধক বিধি।

১। তেলাকুচার পাতা, মাধবীলতার পাতা, অশোক পাতা, পাঁকুড়পাতা ও বেতস পাতা—এই সকল দ্রব্যের এক একটী ৮/১০ ওজনে লইয়া, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া, একরাত্রি পর্য্যুসিত অর্থাৎ বাসি করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে সেব্য। ইহাতে বসন্ত রোগ উৎপন্ন হইতে পারে না। ইহা চৈত্রমাসে পান করিতে হয়।

২। হরীতকীর আঁটি বা স্ত্রী-শৃগালের অস্থি পুরুষের দক্ষিণ হস্তে ও স্ত্রীলোকের বাম হস্তে ধারণ করিলে বসন্তের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

৩। রুদ্রাক্ষ হস্তে ধারণ করিলে বসন্ত-ভয় নিবারিত হইয়া থাকে।

৪। ডাবের জলে আতপ চাউলের অন্ন প্রস্তুত করিয়া এক সপ্তাহ ভোজন করিলে বসন্তের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

৫। কণ্টকারীর শিকড় চারি আনা, ২১টি গোলমরিচের সহিত বাসি জল দিয়া বাটিয়া, বৎসরে ১ দিন মাত্র সেবন করিলে বসন্তের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

৬। চৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে শুক্রবর্ণ কলসোপরি রক্তবস্ত্র নির্ম্মিত পতাকাযুক্ত সিজ বৃক্ষের শাখা স্থাপন করিলে বসন্তের ভয় বিদূরিত হয়।

৭। উচ্ছের বীচি বসন্তের প্রতিষেধক। নিম্ব ভোজনও প্রতিষেধক হইয়া থাকে, এজন্য চৈত্রমাসে এ দুইটী দ্রব্য বিশেষভাবে ব্যবহার করা উচিত।

৮। মৎস্য, মাংস, উষ্ণবীর্য্য ও গুরুপাক দ্রব্য—এ সময় যত কম ব্যবহার করা যায়, বসন্তের আক্রমণ হইতে ততই আত্মরক্ষার সম্ভাবনা।

প্রথমাবস্থায় চিকিৎসা।

১। কুমারিয়া পাতা ২ তোলা, জল আধ

সের শেষ আব পোয়া। দুই আনা পরিমিত হিং প্রক্ষেপ দিয়া ইহা আক্রমণের প্রথমাবস্থায় পান করিলে উপকার দর্শে।

২। শেয়ালকাঁটার মূল বাসি জল দ্বারা বাটীয়া পান করিলেও বসন্তের প্রতীকার হয়।

৩। হলুদের পাতা ও তেঁতুলপাতা চারি আনা হিসাবে এক একটি লইয়া শীতল জলের সহিত বাটিয়া সেবন করাইলে বসন্তের প্রথম আক্রমণে উপকার হয়।

৪। সুপারির মূল, নাটাকরঞ্জের মূল, গোক্ষুর মূল অথবা অনন্তমূল - এক একটি দ্রব্য এক আনা পরিমিত লইয়া জলের সহিত বাটিয়া সেবন করাইবে।

৫। বাতজ মসূরিকায় দশমূল, বাসক, দারুহরিদ্রা, বেণার মূল, দুরালভা, গুলঞ্চ, ধনে ও মুতা—এই কয়টি দ্রব্যের কাথ উপকারক।

৬। মঞ্জিষ্ঠা, বট, পাঁকুড়, শিরীষ ও যজ্ঞডুম্বুরের ছাল—এইগুলি একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

৭। শোধিত গন্ধক দুই ভাগ ও শোধিত রস একভাগ—লইয়া কজ্জলী করিবে। যথোপযুক্ত মাত্রায় ইহা পানের রস সহ সেবন করিলে বসন্তের প্রতীকার হয়।

৮। টাবা লেবুর কেশর কাঁজি দ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিলে শীঘ্র বসন্ত পাকিয়া উঠে।

৯। পাদদ্বয়ের তলায় বসন্ত পীড়কা প্রকাশ পাইলে চাউল ধোয়া জল সহ বারম্বার ধৌত করিলে দাহ প্রশমিত হয়।

১০। শরীরের অন্যস্থানে দাহ নিবারণের জন্য বাসি জলের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে।

পক্কাবস্থায় ব্যবস্থা।

১। বসন্তের পক্কাবস্থায়—গুলঞ্চ, যষ্টি মধু, কিসমিস, ইক্ষুমূল ও দাড়িম ছালের কাথে উপযুক্ত রূপ ইক্ষু গুড় প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

২। দ্রাক্ষা, গাম্ভারী, খর্জ্জুর, পলতা, নিমছাল; থৈ, আমলকী, দুরালভা ইহাদের কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তজ মসূরিকা বিনষ্ট হয়।

৩। বাসক, মুতা, চিরাতা, ত্রিফলা, ইন্দ্রযব, দুরালভা, পলতা ও নিমছাল—ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কফজ মসূরিকা বিনষ্ট হয়।

৪। শিরীষ, যজ্ঞডুম্বুরের ছাল, এবং খদির ও নিমের পাতা প্রলেপ দিলে কফজ ও পিত্তজ মসূরিকা বিনষ্ট হয়।

৫। নিমছাল, ক্ষেৎপাপড়া, আকনাদি, পটোল পত্র, কটকী, বাসক, দুরালভা, আমলকী, বেণার মূল, শ্বেতচন্দন ও রক্তচন্দন—ইহাদের কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে জ্বর ও বিসর্পজনিত এবং ত্রিদোষজাত মসূরিকা বিনষ্ট হয়। যে সকল মসূরিকা বহির্গত হইয়া অন্তর্লীন হয়—তাহাও ইহাতে বহির্গত হইয়া থাকে।

৬। গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, রাস্না, স্বল্পপঞ্চমূল, রক্তচন্দন, গাম্ভারী ফল, বেড়েলা মূল ও বৈচি মূল ইহাদের কাথ পান করিলে বাতজন্য পক্কাবস্থায় মসূরিকার উপকার দর্শিয়া থাকে।

৭। পিত্তজ মসূরিকা পাকিতে আরম্ভ করিলে, পটোল মূলের কাথ ও ইক্ষুমূলের স্বরস প্রয়োগ করিবে।

৮। দুরালভা, ক্ষেৎপাপড়া, চিরাতা ও

কটকী—ইহাদের কাথ পৈত্তিক কিম্বা শ্লৈষ্মিক মসূরিকায় পান করিবে।

৯। বাসক, মুতা, চিরাতা, ত্রিফলা, ইন্দ্রযব, দুরালভা, পলতা ও নিম্ব—ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কফজ মসূরিকা বিনষ্ট হয়।

১০। খদির কাষ্ঠ, ছাতিমছাল, মুতা, বাসক, সোঁদালপাতা, দেবদারু ও কৈবর্ত্ত মুস্তক—এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া শ্লেষ্মজ মসূরিকায় প্রলেপের ব্যবস্থা করিলে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে।

১১। গুলঞ্চ, বাসক, পলতা, মুতা, ছাতিম ছাল, খদির কাষ্ঠ, কৃষ্ণবেত্র, নিম্বপত্র, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা—ইহাদের কাথ সেবনে বসন্ত ও তৎসংক্রান্ত জ্বরের শান্তি হইয়া থাকে।

১২। গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, রাস্না, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, রক্তচন্দন, গাম্ভারীফল, বেড়েলামূল, বৈঁচিমূল—ইহাদের কাথ বাতপ্রধান বসন্ত রোগের পক্বাবস্থায় বিশেষ উপকারক।

বসন্তের দাহ নিবৃত্তির উপায়।

১। পটোলমূল ও রক্ত কাঁটানটের কাথে হরিদ্রা ও আমলকী চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। ইহা সকল প্রকার বসন্তের দাহ অবস্থাতেই প্রযুজ্য।

২। পটোল মূল, রক্তকাঁটানটেরমূল, আমলকী ও খদির কাষ্ঠ—ইহাদের সুশীতল কাথে বসন্ত রোগের দাহ প্রশমিত হয়।

৩। বাসি জলের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে মধু মিশাইয়া সেবনে বসন্ত রোগের দাহ নিবৃত্তি হয়।

চক্ষুতে বসন্ত হইলে—

১। গুলঞ্চ ও যষ্টিমধু—জলের সহিত বাটিয়া লইয়া বস্ত্র দ্বারা পুঁটলি বাঁধিতে হইবে। ঐ পুঁটলি ঈষৎ নিপীড়িত করিয়া চক্ষুতে সেঁক দেওয়া কর্ত্তব্য।

২। যষ্টিমধু, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও সুঁচমুখী, দারুহরিদ্রা, নীলোৎপল (সুঁদি), বেণার মূল, লোধ ও মঞ্জিষ্ঠা—এই সকল দ্রব্য মিলিতভাবে অথবা পৃথকভাবে যথাযথ গ্রহণ করিয়া প্রলেপ বা কাথ দ্বারা অভিষেক করিলে নেত্রগত বসন্তের উপশম হয়। ইহাতে স্ফোটক গলিয়া চক্ষুর অনিষ্ট ঘটিবার শঙ্কা থাকে না।

বসন্তের অরুচি নিবারণে—

বসন্তে অরুচি হইলে অম্ল দাড়িমের রসের সহিত মুগের যূষ পান করিলে মুখের রুচি হইয়া থাকে। খদির ও পীতশাল দ্বারা সাধিত শীতল কাথ পান করিলেও অরুচি বিদূরিত হয়।

পূঁয প্রতীকারের উপায়—

১। বট, অশ্বথ, পাঁকুড়, যজ্ঞডুম্বুর ও বকুলের ছাল একত্রে মিশাইয়া বসন্তের উপর লাগাইয়া দিলে বসন্তের পূঁয নিঃসারিত হইয়া থাকে।

২। ঘুঁটের ছাই অথবা শুষ্ক গোবর চূর্ণ পূর্ব্বোক্তরূপে ছড়াইয়া দিলেও পূঁয নিঃসারিত হয়।

ক্রিমি নিবারণের জন্য।

১। বসন্তের গুটীকা গুলিতে ক্রিমি না হয়—এই জন্য সরলকাষ্ঠ, ধুনা, দেবদারু, চন্দন, অগুরু ও গুগ্‌গুলু প্রভৃতির ধূম প্রদান করিবে।

২। ত্রিফলার ক্বাথে গুগ্‌গুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলেও ক্রিমির আশঙ্কা থাকে না।

৩। খদিরকাষ্ঠ, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, নিমছাল, পলতা, গুলঞ্চ ও বাসক—ইহাদের ক্বাথ—গুগ্‌গুলু সহ সেবনে বসন্তে ক্রিমি জন্মিবার সম্ভাবনা থাকেনা। অধিকন্তু ইহা দ্বারা বসন্ত রোগের সর্ব্ববিধ উপদ্রব তিরোহিত হইয়া থাকে। ইহা বসন্তরোগের উৎকৃষ্ট পাচন।

কণ্ঠ শুদ্ধির ব্যবস্থা।

বসন্ত রোগে কণ্ঠে শ্লেষ্মার প্রকোপ দৃষ্ট হইলে পিঁপুল ও হরীতকী চূর্ণ—মধুর সহিত লেহন করিতে দিবে। "অষ্টাঙ্গ অবলেহ" ব্যবহারেও এরূপ অবস্থায় ফল দর্শিয়া থাকে। কুষ্ঠরোগোক্ত "পঞ্চতিক্ত ঘৃত" এ অবস্থায় ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

গাত্রের দুর্গন্ধ দূর করিবার উপায়।

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বেণারমূল, শিরীষ পুষ্প, মুতা, লোধ, শ্বেতচন্দন ও নাগকেশর—এই সকল দ্রব্য উপযুক্ত মাত্রায় লইয়া বাটিয়া মাখিলে গাত্র হইতে বসন্তের দুর্গন্ধ বিদূরিত হয়।

দুষ্ট বসন্তে।

দুষ্ট বসন্তে জলৌকা অর্থাৎ জোঁক বসাইয়া রক্ত মোক্ষণের ব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

ঔষধ প্রয়োগের কথা।

বসন্ত নিবারণের জন্য যে সকল ব্যবস্থা বলা হইল—উপযুক্ত ভাবে প্রয়োগ করিতে পারিলে ঐ সকল ব্যবস্থাতেই মসূরিকা বা বসন্ত রোগ আরোগ্য হইতে পারে। এ সকল ব্যবস্থা ভিন্ন ঔষধের ব্যবস্থা বড় একটা ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয় না। তবে যদি ঔষধের আবশ্যক হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রীয় নিম্নলিখিত ঔষধ কয়টিতে বসন্তে উপকার হইতে পারে।

উষণাদি চূর্ণ।

মরিচ, পিঁপুল, কুড়, গজপিপুল, মুতা, যষ্টিমধু, মূর্ব্বা, বামনহাটি, মোচরস, বংশলোচন, যবক্ষার, আতইচ, বাসক ছাল, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ। এই চূর্ণ ঔষধ ১ মাষা মাত্রায় প্রাতে ১ বার ও বৈকালে ১ বার জলের সহিত সেব্য।

দুর্লভো রস।

শ্বেতবেড়েলা, পীতবেড়েলা, পিঁপুল, আমলকী, রুদ্রাক্ষ, ঘৃত ও মধু—এই সকল দ্রব্যের সহিত রসসিন্দুর মর্দ্দন করিয়া ১ রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে বসন্ত প্রশমিত হয়। শাস্ত্রকার বলেন—

"পাপঃ রোগান্তকো যোগঃ পৃথিব্যামেব দুর্লভঃ।"

অর্থাৎ এরূপ পাপরোগান্তক যোগ পৃথিবীতে দুর্লভ।

ইন্দুকলা বটী।

শিলাজতু, লৌহ ও স্বর্ণ—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ। বাবুই তুলসী রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক ১ রতি বটী করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে। ইহা সেবনে সকল প্রকার বসন্ত আরোগ্য হয়।

পথ্যাপথ্য।

প্রথমতঃ উপবাস, বমন, বিরেচন ও সংশোধনক্রিয়া এই রোগে কর্ত্তব্য। মসূরি পক্ক হইলে মুগের যূষ, জাঙ্গল মাংসের যূষ, বেলেকা

শাক, ব্যবস্থা করিবে। ভাবপ্রকাশ বলেন,—

মসূরিকাসু ভুঞ্জীত শালীন্‌-
মুদ্গ মসূরিকান্‌।
রসং মধুর মেবাল্পং সৈন্ধবং-
চাল্প মাত্রকম্‌।

অর্থাৎ হৈমন্তিক ধান্যের অন্ন, মুগ ও মসূর দাল, মধুর রস বিশিষ্ট দ্রব্যসকল এবং অল্প মাত্রায় সৈন্ধব লবণ—মসূরিকায় পথ্য স্বরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

পুরাতন ষষ্টিকধান্য ও শালিধান্য, ছোলা, মুগ, মসূর, যব, পায়রা, চড়াই, ডাক, বক, চকোর, জলকুক্কুট ও ডাহুক প্রভৃতির মাংস, কাকরোল, কাঁচা কলা, পটোল, সজিনা প্রভৃতির তরকারী উপকারী। দাড়িম এই রোগে পরম পুষ্টিকর। মাষকলায়ের ঝোল ও ইহাতে ব্যবস্থা করিলে উপকার দর্শিয়া থাকে।

অপথ্য।

মৈথুন, স্বেদক্রিয়া, গুরুদ্রব্য ভোজন, পরিশ্রম, দূষিত জল বায়ুর ব্যবহার, শিম, আলু, শাক ও লবণের ব্যবহার, অম্ল দ্রব্য-ভোজন—এই রোগে অহিতকর।

মলমূত্রাদির বেগ ধারণ বসন্ত রোগীর একান্ত পরিত্যাজ্য।

বসন্তের গুটিকাগুলি শুষ্ক হইয়া আসিলে নিম্ব পত্র ও কাঁচা হরিদ্রা একত্র পিষিয়া লইয়া শরীরে লেপন করিবে।

পরিবার বর্গের মধ্যে কাহারও বসন্ত হইলে গৃহস্বামীর কর্ত্তব্য।

১। পরিবার বর্গের মধ্যে কাহারও বসন্ত রোগ হইলে সেই বাটীর সকলেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবেন।

২। জপ, হোম, পূজা, শান্তি-সস্ত্যয়ন ও শীতলা স্তোত্রাদি পাঠের ব্যবস্থা বসন্তাক্রান্ত রোগীর বাটীতে হওয়া কর্ত্তব্য।

৩। বসন্ত রোগীর পরিধেয় বস্ত্র দুই বেলা বদলাইয়া দেওয়া হইবে, এবং সংক্রমণ নিবারণের জন্য সে বস্ত্র দীর্ঘিকা, পুষ্করিণী প্রভৃতিতে ধৌত না করিয়া বাটীতে প্রত্যহ সাবান দ্বারা ধৌতের ব্যবস্থা করিবে।

৪। চিকিৎসক ও পরিচর্য্যাশীল ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেহ সে গৃহে অধিকক্ষণ অবস্থিতি করিবে না, বিশেষতঃ রাত্রিবাস একান্তই পরিহার করিবে।

৫। পিতা, মাতা, স্বামী বা অন্য পূজনীয় সম্পর্কের মধ্যে কাহারও বসন্ত হইলে—পুত্র, ভ্রাতা, পত্নী প্রভৃতি সকলেই বসন্ত রোগীর উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিবে না।

৬। যে গৃহে আলোকের সুব্যবস্থা আছে, বসন্ত রোগীকে এইরূপ গৃহে অবস্থিতির ব্যবস্থা করিয়া দিবে।

৭। বসন্ত রোগ জনিত জ্বর হইলে রোগী যাহাতে আদৌ জলস্পর্শ না করে—তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে।

৮। নির্ব্বাত স্থানে অবস্থিতি এই রোগ আরোগ্যের সহায়তা করিয়া থাকে;

৯। সিদ্ধির চূর্ণ মালিশ এই রোগে হিতকর।

১০। খদির কাষ্ঠ ও চালিতা গাছের ছালের দ্বারা ষড়ঙ্গ পানীয় বিধানে অর্দ্ধেক শুষ্ক করিয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে এবং বসন্ত রোগীর শৌচের জন্য সেই জল ব্যবস্থা করিবে।

১১। এখন যেরূপ দিন-সময় পড়িয়াছে, তাহাতে বসন্ত রোগ উৎপন্ন হওয়া মাত্র সুচিকিৎসকের শরণ গ্রহণ কর্ত্তব্য। উপেক্ষা

করিয়া বিনা চিকিৎসায় রাখা কখনই কর্ত্তব্য নহে।

যে বাটীতে বসন্ত হইবে, সে বাটীতে মৎস্য আনা একেবারে বন্ধ করিবে। বসন্তের প্রাদুর্ভাবের সময় মৎস্য ও বাজারের দুগ্ধ ব্যবহার করা একেবারেই কর্ত্তব্য নহে। আমাদের যতটা অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহাতে এই মৎস্য ও দুগ্ধ হইতেই বসন্তের সংক্রমণ হইয়া থাকে।

শ্রীযামিনী ভূষণ রায় কবিরত্ন
এম, এ, এম বি।

হুক্ ওয়ার্ম বা বক্রাস্য ক্রিমি।

হুক্ ওয়ার্ম বা বক্রমুখ ক্রিমিকুল মানবজাতির ভীষণ শত্রু। এই কীটের উপদ্রবে ভারতের বহু সহস্র নরনারী আক্রান্ত হইতেছেন। বাঙ্গালার মাননীয় গবর্ণর বাহাদুর প্রোক্ত রোগের আক্রমণ হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য যত্ন করিতেছেন। তাঁহার যত্ন ও চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে স্নাধীয়সী, তাঁহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু দেশের লোকসংখ্যার অনুপাতে তথাবিধ যত্নের ফলভোগ সর্ব্বদা সকলের পক্ষে সুলভ নহে; যাহাতে দেশীয় ঔষধাদির প্রয়োগেও কথিত পীড়ার প্রতীকার হইতে পারে—তজ্জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

(২) খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যখন এই রোগের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে; তখন আর ইহাকে নিতান্ত অভিনবও বলা যাইতে পারে না; তবে ভারতবর্ষে ইহার প্রাদুর্ভাব নূতন কিনা—সে কথা স্বতন্ত্র। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে "হুক্ ওয়ার্ম" বা তজ্জাতীয় কোন ক্রিমির উল্লেখ আছে কিনা—প্রথমতঃ ইহা দ্রষ্টব্য। পাশ্চাত্য বৈদ্যমণ্ডলীর মতে এই রোগ নূতন। দেশের জল বায়ু প্রভৃতির স্বভাবের ব্যতিক্রম ঘটিলে নূতন রোগের লক্ষণেরও তারতম্য হইতে পারে। পাশ্চাত্য স্বাধীনজাতির বিজ্ঞান চর্চ্চার ফলে তাঁহারা নানাবিধ বিস্ময়কর বিষয়ের আবিষ্কার করিয়া জগৎকে মুগ্ধ করিতেছেন, পক্ষান্তরে ভারতের প্রাচীন চিকিৎসাবিজ্ঞানোপজীবিগণ এক্ষেত্রে যে একেবারে নীরব থাকিবেন, তাহাও সমীচীন নহে; তবে যতদূর সম্ভব নূতন প্রাদুর্ভূত রোগ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির সাহায্য ব্যতীত ও যাহা শাস্ত্রে লিখিত আছে—তাহারই আলোচনা—দেশীয় বৈদ্যগণের প্রথম কর্ত্তব্য। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে রক্তজ ক্রিমির আকৃতি প্রকৃতি, উৎপত্তি ও স্থিতি বিষয়ে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, আলোচ্য হুক্ওয়ার্ম নামক ক্রিমির সহিত তাহার অনেক ঐক্য হয়।

বৈদ্যকশাস্ত্রে বহুবিধ ক্রিমির উল্লেখ আছে; তন্মধ্যে কতকগুলি তাম্রবর্ণ, কোন কোন ক্রিমি শ্বেতাভ, কতক নিতান্ত হ্রস্ব, নবোদ্ভূত ধান্যাঙ্কুর সদৃশ, আবার কোন কোন ক্রিমি এতদূর সূক্ষ্ম যে চর্ম্মচক্ষুর সাহায্যে তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না; [illegible]

হুক্ওয়াম নামক ক্রিমিকে আয়ুর্ব্বেদোক্ত রক্তজ ক্রিমির সম শ্রেণীর জীব বলিলে বোধ হয় দোষ হইবে না।

ক্রিমি প্রধানতঃ দ্বিবিধ ;—বাহ্য ক্রিমি ও আভ্যন্তর ক্রিমি। বাহ্য ক্রিমি শরীরের উপরিস্থিত চর্ম্মে সংলগ্ন ধূলি প্রভৃতি পদার্থে উৎপন্ন হয়—ইহাদিগকে সাধারণতঃ উকুন্ বলে। আভ্যন্তর ক্রিমি অন্ত্রনাড়ীতে, মলে, রসে, কফে এবং রক্তবাহি শিরায় জন্মে এবং তথায় অবস্থান করে। ইহাদিগকে কিঞ্চুলক বা কেঁচে ক্রিমি (Tape warm) বলে। এতদতিরিক্ত আরও অনেক কথা লিখিত আছে, প্রসঙ্গতঃ অল্প মাত্র উদ্‌ধৃত হইল।

হুক ওয়ার্ম "চর্ম্মদ্বারা শরীরে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ তাহারা রক্তবহা শিরায় পৌঁছায় * * * রক্ত ও রস ইত্যাদিতে পরিপুষ্ট ও সেইস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে" এই প্রকৃতির সহিত প্রাচীন ভারতের বৈদ্যগণের প্রত্যক্ষীকৃত ক্রিমি লক্ষণের সাদৃশ সম্যক্ পরিলক্ষিত হয়—যথা, "রক্তবাহি শিরাস্থান রক্তজা জন্তবোঽণবঃ"। রক্তজ ক্রিমি অতিশয় ক্ষুদ্র, তাহারা রক্তবাহি শিরায় বাস করে। শাস্ত্র বলেন ; সৌক্ষ্ম্যাৎ কেচিদ্দর্শনাঃ। কোন কোন ক্রিমি এত সূক্ষ্ম যে, দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহে। বর্ত্তমান কালে অনুবীক্ষণের সাহায্যে যে রক্তজ সূক্ষ্মতম ক্রিমি দৃষ্ট হয়, লোক লোচনের অবিষয়ীভূত সেই সকল ক্রিমি বা সূক্ষ্মতম পদার্থ পুরাকালের ঋষিগণ যোগবলে সম্যক্ অবগত ছিলেন। প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছিল কিনা, তাহা নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে না। সুতরাং "সৌক্ষ্ম্যাৎ কেচিদ্দর্শনাঃ" এই বাক্যের দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, রক্তজ ক্রিমিসকল প্রাচীন ভারতীয় মণীষিগণের অপরিজ্ঞাত ছিল না।

ক্রিমির সাধারণ লক্ষণ ;—মানব-শরীরে ক্রিমি উৎপন্ন হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণ হয়—

জ্বরো বিবর্ণতাশূলং হৃদরোগঃ সদনং ভ্রমঃ
ভক্তদ্বেষোঽতিসারশ্চ সঞ্জাত ক্রিমিলক্ষণম্॥

জ্বর, শরীরের বিবর্ণতা, শূল, হৃদরোগ (হৃদয়ে যন্ত্রণা বিশেষ, স্পন্দনাধিক্য ইত্যাদি) অপ্রসন্নতা ভ্রান্তি, অন্নে অরুচি এবং অতিসার হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদে রক্তজ ক্রিমির যে সকল লক্ষণ ও চিকিৎসা কথিত হইয়াছে, হুকওয়ার্ম নামক ক্রিমির লক্ষণের সহিত তাহার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। যথা ;—রক্তজ ক্রিমি সকল রক্তবাহি শিরায় অবস্থান করে, ইহারা অতিশয় সূক্ষ্ম, পাদবিহীন কতগুলি বৃত্ত, কতক তাম্রবর্ণ। আকার ও ক্রিয়াদি ভেদে ইহারা আবার ছয়প্রকার। তাহাদের নাম ;—কেশাদ, রোমবিধ্বংস, রোমোদ্দীপ, উড়ুম্বর সৌরস ও মাতৃসংজ্ঞক। ইহাদের সকল প্রকার ক্রিমিই যে হুকের ন্যায় বক্রমুখ, তাহা অনুবীক্ষণের সাহায্য ভিন্ন (বর্ত্তমান কালে) নিশ্চয় করিবার উপায় নাই। এখন দেশীয় মতে এই রোগের ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

রক্তজ ক্রিমি সকল এতই ভীষণ যে, তাহারা সকলেই কুষ্ঠরোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

ভারতের অধিকাংশ লোক নিরন্ন ও নিতান্ত দরিদ্র,—সুতরাং তাহারা উত্তম বসন ও আহারীয় দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারেনা ; কাজেই তাহারা অপবিত্র আহারীয় ও মলিন বস্ত্রাদির ব্যবহারে নানাবিধ দুরারোগ্য রোগের দ্বারা সহজেই আক্রান্ত হয়। তবে

কেবল দারিদ্র্যই ভারতবাসীর রোগের কারণ নহে, অনেক সময়ে আলস্যবশতঃও অনেক ব্যক্তি স্বাস্থ্যের অনুকূল নিয়ম প্রতিপালন করে না, তজ্জন্যও তাঁহারা নিজ শরীরকে ব্যাধিমন্দির রূপে পরিণত করেন।

প্রোক্ত ক্রিমির অন্যান্য লক্ষণ সাধারণ ক্রিমি লক্ষণের ন্যায়, অতএব তাহার বিস্তৃতির আবশ্যক নাই। ইতঃপূর্ব্বে "আয়ুর্ব্বেদ" পত্রের ১১ সংখ্যায় হুকওয়ার্ম ক্রিমির প্রতীকার কল্পে যে সকল বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা অবশ্য পালনীয়। রক্তজ ক্রিমির দেশীয় ঔষধ ;—বিড়াঙ্গাদিঘৃত, ক্রিমিমুদ্গর ও ক্রিমি কুঠারাস্তক প্রভৃতি। আরও কয়েকটী যোগ কথিত হইতেছে ;—(১) পলাশবীজ, যমানী, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব, ইহা প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করতঃ একত্র মিশ্রিত করিবে, উহা ৵০ মাত্রায় সকালে ও ৵০ আনা রাত্রি কালে সেব্য, অনুপান আনারসের পাতার রস, অভাবে জল। (২) ডালিমের শিকড়, ইন্দ্রযব, খোরমানীমানী ও বিড়ঙ্গ চূর্ণ সম পরিমাণ। ইহা হইতে ৵০ মাত্রায় পূর্ব্ব অনুপানে বা পালদে মাদারের পাতার রস অনুপানে সেব্য। (৩) শুদ্ধ কুচিলাচূর্ণ, হরিদ্রা সোমরাজী, নিমপাতা ও বিড়ঙ্গ চূর্ণ প্রত্যেক সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ⁄০ বা ⁄১০ আনা মাত্রায় পূর্ব্ববৎ পানের রস সহ সেব্য। (৪) কেবুক, বিড়ঙ্গ, নিসিন্দা, আপাঙ, বামনহাটী ও থানকুনী চূর্ণ ইহা পূর্ব্ববৎ সমভাগে লইয়া চূর্ণ করতঃ ৵০ মাত্রায় সেব্য। ইহার অনুপান পালিধা মাদারের পাতার রস, মধু, অভাবে জল। 'ভাঁটের' সুকোমল পত্র ৵০ জলে বাটিয়া ২ রতি বিটলবণ সহ প্রাতঃকালে ও রাত্রিতে শয়নকালে জলসহ সেব্য। রোগের অবস্থা এবং রোগীর বয়ঃক্রম প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া ঔষধের মাত্রার হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে। কথিত ঔষধের পরিমাণ পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে প্রযোজ্য। বালকদিগকে অল্প মাত্রায় ঔষধ দিতে হইবে। যেস্থলে সুচিকিৎসকের অভাব, তথায় প্রোক্ত ঔষধের কোন একটী ব্যবহার করা উচিত।

শ্রীসারদাচরণ সেন কবিরত্ন।

মদাত্যয়।

—:*:—

অন্যান্য চিকিৎসার ন্যায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় মদ্যপান বিধি সমধিক প্রচলিত না থাকিলেও মদ্যপান বিরল বা একেবারে নিষিদ্ধ নহে। গুণগ্রাহি-মহাত্মাগণ গুণেরই আদর করিতেন, ভক্ষ্য অভক্ষ্য বা পাপ পুণ্য লইয়া সমাজকে বিচলিত করিতেন না, সেই জন্য আর্য্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায়ও কতকগুলি ঘৃণার্হ দ্রব্য সতত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অদ্য সে বিষয়ের মীমাংসার কোন প্রয়োজন নাই, তবে বলিতে হইবে মদ্যপান [illegible]

বিরুদ্ধ হইলেও আয়ুর্ব্বেদ মতে নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যে সমুদায় রীতিতে মদ্য পান উল্লিখিত হইয়াছে, আধুনিক মদ্যপায়িদিগের পক্ষে ঐ রীতি অক্ষুণ্ণ রাখা অতীব দুরূহ ব্যাপার। এমন সুখের বিনিময়ে ঘোর দুঃখ ভোগ মদ্যপায়ীর স্বতঃসিদ্ধ। যাঁহার হৃদয়ে বল আছে, চিত্তে সংযমনী শক্তি আছে, তিনিই যেন সুখের আশায় মদ্যপান করেন। নচেৎ নির্ধন ধনবান, রোগী নীরোগ, ইতর ভদ্র— কাহারও পক্ষে মদ্যপান সঙ্গত নহে, পরন্তু সর্ব্বতোভাবেই নিষিদ্ধ। এখন ধর্ম্মের জন্য মদ্যপান নাই যোগসিদ্ধির জন্য মদ্যপান নাই, ঔষধার্থ মদ্যপান নাই, আছে বিলাসিনীর কালকূট পূর্ণ কটাক্ষরূপ কন্দর্পশরজর্জ্জরীত যুবকের যন্ত্রণা নিবারণার্থ। তন্ত্রযুক্তি প্রভাবে ভারতবর্ষে মদ্যপান প্রথা বহুকাল হইতে গুপ্ত ভাবে চলিতেছিল, কিন্তু এখনকারদিনে ভারতে আর সে গুপ্তভাব নাই, প্রকাশ্যেই উহার সংঘটন হইতেছে, পক্ষান্তরে যাহাদিগকে আমরা শ্রেষ্ঠ, মহাপ্রভাবশালী, ধনবান ও বিদ্বান বলিয়া মনে করি, তাহাদেরও অধিকাংশই ঐ ভয়ঙ্কর দোষে দূষিত। অনুকরণ প্রিয় ভারতবাসী আবার উহাদের অনুকরণ করিতে যাইয়া মজিতে বসিয়াছে। সুরারাক্ষসীর করাল দশন বিকাশ কে না দেখিয়াছে? সর্ব্বসংহারিণী সুরার অসীম শক্তিতে কত শত অমরাবতী বিনিন্দিত সুরম্যহর্ম্ম্য মরুভূমির ন্যায় ধূ ধূ করিতেছে! সুরা সাহায্যে কত শত বলিষ্ঠ যুবক—শীর্ণ, বিশীর্ণ কঙ্কালসার কলেবরে কাল কবলে কবলিত হইতেছে। মনুষ্য সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া গোহত্যা, নরহত্যা, স্ত্রীহত্যা প্রভৃতি কোন্ নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে? বাস্তবিক দেখিতে গেলে, ধর্ম্মশাসনের ন্যায় সমাজশাসনের ন্যায়, পারিবারিক শাসনের ন্যায় ইহা বন্ধ করিবার শাসন সুদৃঢ় নহে। পুরাকালে ভারতবর্ষে মদ্যপান প্রথা ছিল বটে, কিন্তু তাহা বিলাস বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য নহে। যাহা হউক, অনেকে মনে করেন, ঈদৃশ অনিষ্টজনক মদ্যপান কিরূপে সার্ব্বজনীন আয়ুর্ব্বেদে বিধি বিহিত হইল? আবার অনেক সময় আয়ুর্ব্বেদের দোহাই দিয়া অনেকে সুরা পিপাসার শান্তিও করিয়া থাকেন। আজ আমরা সেই জন্য কিরূপ সুরাপান আয়ুর্ব্বেদানুমোদিত ও সুরার দোষগুণ কি, তাহাই সাধারণের অবগতির জন্য আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

প্রেত্য চেহ চ যচ্ছ্রেয়ঃ শ্রেয়ো মোক্ষশ্চ যৎপরম।
মনঃ সমাধৌ তৎ সর্ব্বমায়ত্তং সর্ব্ব দেহিনাম॥

মনুষ্যদিগের ইহকাল ও পরকাল যাহা শ্রেয়ঃ, মঙ্গল ও মোক্ষ উহা সম্পূর্ণভাবে চিত্তেরএকাগ্রতার আয়ত্ত অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা ব্যতীত ইহ ও পরকালে শ্রেয়ঃ মোক্ষ, বা মঙ্গললাভ করা যায় না। মদ্যপানে চিত্তের সংক্ষোভ উপস্থিত হয়, সুতরাং ইহ ও পরকালে মদ্যপায়ীরা কখনই শ্রেয়ঃ বা মোক্ষলাভে সমর্থ হয় না।

মদ্যেন মনসশ্চাস্য সংক্ষোভঃ ক্রিয়তে মহান্।
মহা মারুতবেগেন তটস্থস্যেব শাখিনঃ॥

প্রবল বায়ুবেগে নদীতটস্থ বৃক্ষ যেরূপ আন্দোলিত হয়, সেইরূপ মদ্যপানে মনের যৎপরোনাস্তি সংক্ষোভ উপস্থিত হয়। মদ্যপানে মনের স্থিরতা সম্পাদন অতীব দুরূহ ব্যাপার।

মদ্যপ্রসঙ্গ মজ্ঞাত্বা মহাদোষং মহাগদম্।
সুখমিত্যধি গচ্ছন্তি রসে মোহ পরপিতাঃ॥

রজঃ ও তমো গুণাভিভূত ব্যক্তিগণ মদ্যপানের রোগোৎপাদক মহাদোষ না জানিয়া সুখের আশায় মদ্যাসক্ত হইয়া পড়েন ও চিরকাল

মদ্যপান দুর্নিবার অপকার ভোগ করিতে থাকেন।

মদ্যোপহত বিজ্ঞানা বিযুক্তা সাত্ত্বিকৈর্গুণৈঃ।
শ্রেয়োভির্বিপ্রযুজ্যন্তে মদান্ধাঃ মদলালসাঃ॥
মদ্যে মোহো ভয়ং শোকঃ ক্রোধো মৃত্যুশ্চ সংশ্রিতাঃ।
সোন্মাদ মদ মূর্চ্ছাদ্যাঃ সাপস্মারাপ তানকাঃ॥
যত্রৈকঃ স্মৃতিবিভ্রংশ স্তত্র সর্ব্বমসাধুবৎ।
ইত্যেবং মদ্য দোষজ্ঞা মদ্যং গর্হন্তি যত্নতঃ॥

মনুষ্যগণ মদ্যপান করিয়া অজ্ঞানরূপ তমসাচ্ছন্ন হইয়া পরে স্বাভাবিক সাত্ত্বিকগুণ সমুদায় হীন হয়, সুতরাং মদলালস মদান্ধ ব্যক্তিকে সত্বর মঙ্গল সমূহ হইতে বিমুক্ত হইয়া পড়িতে হয়। মদ্য হইতে মোহ, ভয়, শোক, ক্রোধ, উন্মাদ, মণ্ডল মূর্চ্ছা, অপস্মার ও অপতানক প্রভৃতি রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। মদ্য হইতে মৃত্যু পর্য্যন্তও সংঘটিত হইয়া থাকে। পরন্তু যাহা হইতে একমাত্র স্মৃতিভ্রংশ উপস্থিত হয়, এমন কোন অমঙ্গল নাই—যাহা তাহা হইতে সংঘটিত হইতে পারে না। মদ্য দোষজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপে সর্ব্বদা মদ্যের নিন্দা করিয়া থাকেন।

যে বিষস্য গুণাঃ প্রোক্তা স্তেঽপি মদ্যে প্রতিষ্ঠিতাঃ।

বিষের যে সমুদায় গুণ আছে অর্থাৎ বিষে যে সমুদায় অনিষ্টকারিণী শক্তি আছে, মদ্যেরও তাদৃশী শক্তি।

সত্যমেতে মহাদোষা মদস্যোক্তা ন সংশয়ঃ।
অহিতস্যাপি মাত্রস্থ পীতস্য বিধি বর্জ্জনম॥
কিন্তু মদ্যং স্বভাবেন যথৈবান্নং তথা স্মৃতম।
অযুক্তি যুক্তং রোগায় যুক্তিযুক্তং যথামৃতম॥
প্রাণাঃ প্রাণভৃতামন্নং তদযুক্ত্যা হিনস্ত্যসূন্।
বিষং প্রাণহরং তচ্চ যুক্তিযুক্তং রসায়নম॥

পূর্ব্বে মদ্যের যে সমুদয় দোষ উল্লিখিত হইল, মদ্যপান বিধি অতিক্রম করিলে বাস্তবিকই ঐ সমুদায় দোষ ঘটিয়া থাকে, কিন্তু বিধি বিহিত মদ্যপানে অপকার না ঘটিয়া উপকারই ঘটিয়া থাকে। উহা ক্রমশঃ প্রদর্শন করা যাইতেছে। মদ্য স্বভাবতঃ অন্ন সদৃশ হিতকর দ্রব্য। অবৈধভাবে সেবিত হইলে নানাবিধ রোগের কারণ হয় বটে, কিন্তু বিধি অনুসারে পীতমদ্য অমৃত সদৃশ হিতকর বস্তু। যে অন্ন প্রাণিগণের প্রাণস্বরূপ তাহাও অযথারূপে সেবিত হইয়া প্রাণনাশক হয় এবং স্বভাবতঃ প্রাণনাশক গুণসম্পন্ন বিষও যক্তি অনুসারে সেবিত হইয়া রসায়ন সদৃশ উপকার করে। মদ্যও তদ্রূপ। যুক্তিপূর্ব্বক মদ্যপান করিলে হর্ষ, বল, পুষ্টি, আরোগ্য ও পৌরষ জন্মে। যে মদ্যপানে মত্ততা জন্মে, দুঃখ না হইয়া সুখ হয়, ঐ মদ্য রুচিকারক, পাচকাগ্নির উদ্দীপক, হৃদয়ের সন্তোষ জনক, বলকারক, ভয় শোক এবং শ্রমনাশক, নিদ্রাজনক এবং বাকপটুতা জনক এবং অতিনিদ্র ব্যক্তির প্রবোধক, মল মূত্রের বিবদ্ধনাশক, আঘাত প্রাপ্তি এবং বন্ধনাদি যন্ত্রণা নিবর্ত্তক। ইহা ভিন্ন মদ্য অনেক রোগের নিবর্ত্তক, রতিবর্দ্ধক, মনঃসংযোগকারক-প্রীতি বর্দ্ধক এবং অতিবৃদ্ধ ব্যক্তির উৎসাহ ও আনন্দ জনক।

বহু দুঃখ কৃতাত্মাস্য শোকেনোপ হতস্য চ।
বিশ্রামো জীবলোকস্য মদ্যং যুক্ত্যা নিষেবিতং

বহুবিধ দুঃখ ও শোকাভিভূত ব্যক্তির যুক্তি পূর্ব্বক নিষেবিত মদ্যই একরূপ বিশ্রাম স্থ অর্থাৎ ক্লেশ নিবারক।

অনুপান বয়োব্যাধি বল কাল ত্রিকানি ষট্।
ত্রীণ দোষাঃ ত্রিবিধং সত্ত্বং জ্ঞাত্বা মদ্যং পিবে[illegible]

ত্রিবিধঅন্ন, ত্রিবিধ পান, ত্রিবিধ বয়ঃক্রম, ত্রিবিধ ব্যাধি, ত্রিবিধ কাল, ত্রিবিধ বল, ত্রিবিধ দোষ ও ত্রিবিধ সত্ত্ব এই সকলের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া মদ্যপান করা কর্ত্তব্য।

তেষাং ত্রিকাণামষ্ঠানাং যোজনা যুক্তিরুচ্যতে।
যথাযুক্ত্যা পিবেন মদ্যং মদ্য দোষৈর্নযুজ্যতে॥

উল্লিখিত ত্রিবিধ অন্নাদির সম্যক যোজনার নাম যুক্তি, ঐ যুক্তি অনুসারে মদ্যপান করিলে কোন দোষই ঘটে না।

অপানে সাত্ত্বিকান বুদ্ধা তথা রাজস তামসান।
জহ্যাৎ সহায়ান যৈঃ পীত্বা সহ দোষানুপাশ্নুতে॥

মদ্যপান স্থলে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস বিবেচনা করিয়া মদ্যপান করা উচিত, যাহাদের সহিত মদ্যপান করিলে দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা, তাদৃশ ব্যক্তির সহিত কখনই মদ্যপান করা বিধেয় নহে। আজকাল এই সঙ্গদোষ বিবেচনা না করার জন্যই অনেক লোককে বিষম বিপদে পতিত হইতে হয়। যে সমুদায় ব্যক্তি সুশীল, মিষ্টভাষী, সুমুখ, সজ্জন, গীত বাদ্যাদিকলাকুশল বিশদবাক, বিষয়াদিতে অত্যাশক্তি রহিত, পরস্পর বশীভূত ও সৌহার্দ্দ যুক্ত, যাহারা সুমধুর হাস্য ও প্রীতিজনক বাক্য দ্বারা পান ভূমির উৎসব পূর্ণ করে, এবং যাহারা পরস্পর দর্শনে সুখবোধ করে, তাহাদিগের সহিত মদ্যপান করিলে মদ্যপায়ী আনন্দ উপভোগ করিতে পারে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও মদ্যপানের কতিপয় ক্রম লিখিত হইল,-অধিক লেখা আবশ্যক মনে করিনা, কারণ আমাদের মতে মদ্যপান বিশেষ গর্হিত কার্য্য এবং ইহার ফলে স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া থাকে।

মদ্যের পরিমাণ ও তীব্রতা ভেদে চারি প্রকার মত্ততা উপস্থিত হয়। অতঃপর যথাক্রমে ঐ সকলের লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

বুদ্ধিস্মৃতি প্রীতিকরঃ সুখশ্চ পানান্ন নিদ্রা রতি বর্দ্ধনশ্চ।
সংপাঠ গীতস্বরবর্দ্ধনশ্চ প্রোক্তোতি রম্যঃ প্রথমোমদো হি॥

প্রথম মদ বুদ্ধি প্রকাশক, স্মরণ শক্তিবর্দ্ধক, প্রীতিজনক, সুখোৎপাদক এবং পান ভোজন, রতিশক্তি ও কণ্ঠস্বর সংবর্দ্ধক, এইরূপ মদাবস্থা অতীব সুখকর। যাহাদের মদ্যপান নিতান্ত প্রয়োজন, তাঁহারা যেন এইরূপ ভাবে মদ্যপান করেন; অর্থাৎ উল্লিখিত লক্ষণ সমুদায় হইতে অতিরিক্ত কোন লক্ষণ উপস্থিত না হয়। বাস্তবিক পক্ষে কেহই মদ্যপানে স্থির থাকিতে পারে না, আকাঙ্ক্ষার অপরিতৃপ্তিই ইহার মূল কারণ অর্থাৎ প্রথম মদ্যপানের পর সকলেই মনে করেন আরও একটু পান করিলে ইহা অপেক্ষা অধিকতর সুখোদয় হইবে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার বিপরীত হইয়া পড়ে।

অব্যক্ত বুদ্ধি স্মৃতি বাগ্বিকচেষ্টঃ সোন্মত্তললাকৃতি রূপ্রশান্তঃ।
আলস্য নিদ্রাভিহতো মুহুশ্চ মধ্যেন মত্তঃ পুরুষো মদেন॥

দ্বিতীয় মদমত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি, স্মরণশক্তি ও বাক্য সম্যক ব্যক্ত নহে অর্থাৎ জড়তাযুক্ত, চেষ্টার বিকৃতি আকৃতি ও কার্য্য উন্মত্তের ন্যায় এবং মুহুর্মুহু আলস্য ও নিদ্রার আবির্ভাব—এইরূপ লক্ষণ উপস্থিত হয়। ঈদৃশ অবস্থা উপস্থিত হইলেই মদ্যপান হইতে বিরত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য, নচেৎ অতীব দুরবস্থাগ্রস্ত হইতে হয়, ইহার নাম দ্বিতীয় মদ।

গচ্ছেদগম্যা ন্ন গুরূংশ্চ মন্যেৎ খাদেদভক্ষ্যাণি চ নষ্ট সংজ্ঞঃ॥

ক্রিয়াচ্চ গুহ্যানি হৃদি স্থিতানি মদে তৃতীয়ে
পুরুষোঽস্বতন্ত্রঃ।

মদ্যপানে দ্বিতীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও যাহারা নিবৃত্ত হয়না, আরও অধিক পান করিতে থাকে, ঐ সমুদায় ব্যক্তির নিন্দনীয় তৃতীয় অবস্থা উপস্থিত হয়। তৃতীয় অবস্থা উপস্থিত হইলে মনুষ্য অগম্য নারীতে গমন করিতে প্রবৃত্ত হয়, গুরুজনের অবমাননা করে, এবং হৃদয়স্থ গুহ্য বিষয় প্রকাশ করে ও অভক্ষ্য ভক্ষণ করে। এতদবস্থ ব্যক্তি জ্ঞানশূন্য ও আপনার অনায়ত্ত হইয়া পড়ে।

চতুর্থে তু মদে মূঢ়ো ভগ্নদার্ব্বিব নিষ্ক্রিয়ঃ।
কার্য্যাকার্য্য বিভাগজ্ঞো মৃতাদপ্য পরো মৃতঃ॥
কোমদং তাদৃশং গচ্ছেদুন্মাদমিব চাপরম্।
বহুদোষমিবা মূঢ়ঃ কান্তারং স্ববশঃ কৃতী॥

অতঃপর চতুর্থ মদাবস্থায় মনুষ্য সর্ব্বতোভাবে জ্ঞানশূন্য, ভগ্ন কাষ্ঠের ন্যায় নিষ্ক্রিয় ও কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য বিকারশূন্য হইয়া পড়ে। চতুর্থ মদবস্থ ব্যক্তি অবিকল মৃতবৎ পড়িয়া থাকে। অমূঢ় অর্থাৎ বিকার শক্তি সম্পন্ন আত্মবান কোন কৃতী ব্যক্তি বহু দোষোৎপাদক বিবিধ হিংস্রজন্তুসংকুল দুর্গম পথের ন্যায় চতুর্থ মদবস্থায় উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করেন না। মদ্যপানে প্রবৃত্ত হইলে প্রায়শঃই সকলকে যুক্তিচ্যুত হইয়া পড়িতে হয় এবং অবশেষে নানাবিধ বিপদে পতিত হইতে হয়। তুলনা করিতে গেলে মদ্যপানে উপকার অপেক্ষা অপকারই অধিক। সুতরাং কাহারও পক্ষে মদ্যপান যুক্তি ও শাস্ত্র সম্মত নহে।

নির্ভক্তমেকান্তত এব মদ্যং নিষেব্য মাণং
মনুজেন নিত্যং।
আপাদয়েৎ কষ্টতমান্ বিকারানাপাদয়ে
চ্চাপি শরীর ভেদম্॥

নিত্য অধিক পরিমাণে অন্নাদি উপকরণ হীন মদ্য-পান করিলে, নানাবিধ কৃচ্ছ্রসাধ্য কষ্ট-দায়ক রোগ জন্মে ও পরিশেষে তদ্দ্বারা মৃত্যু পর্য্যন্ত সংঘটিত হইয়া থাকে।

ক্রুদ্ধেন ভীতেন পিপাসিতেন শোকাভিতপ্তেন
বুভুক্ষিতেন॥
ব্যায়াম ভারাধ্ব পরিক্ষতেন, বেগাবরোধাভি-
হতেন চাপি॥
অত্যম্ভ ভক্ষাবততোদরেণ সজীর্ণ ভুক্তেন
তথাবলেন॥
উষ্ণাভিতপ্তেন চ সেব্য মানং করোতি মদ্যং
বিবিধান্ বিকারান্॥

ক্রোধ, ভয়, পিপাসা, শোক ও ক্ষুধার সময়, ব্যায়াম, ভার বহন বা পথ পর্য্যটন ক্লান্ত অবস্থায়, মলমূত্রাদির উপস্থিত বেগরোধ করিয়া, অন্ন ভোজন বা জল পান দ্বারা উদরের পূর্ণাবস্থায় এবং উষ্ণাবস্থায় অর্থাৎ পরিশ্রমাদির দ্বারা শরীর উষ্ণতা হইলে মদ্য-পান করিবে না, উহাতে পানাত্যয়াদি কঠিন রোগ উৎপন্ন হয়।

পানাত্যয়ং পরমদং পানাজীর্ণমথাপি বা
পান বিভ্রমমুগ্রঞ্চ যকৃৎ রোগং করোতি তৎ॥
তৎ অবধি পীত মদ্য মিত্যর্থঃ।

শাস্ত্রীয় বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া মদ্যপান করিলে, পানাত্যয়, পরমদ, পানাজীর্ণ, পান বিভ্রম ও দারুণ যকৃৎ রোগ উৎপন্ন হয়। পানাত্যয় ও মদাত্যয় এই দুইটী শব্দ একার্থ বাচক, সুতরাং মদাত্যয়াধিকার নাম প্রদত্ত হইয়াছে।

হিক্কাশ্বাস শিরঃ কম্প পার্শ্ব শূল প্রজাগরৈঃ।
বিদ্যাদ্ বহু প্রলাপস্য বাতপ্রায়ং মদাত্যয়ম্॥

বাতিক মদাত্যয় রোগে হিক্কা, শ্বাস, শিরঃ কম্পন, পার্শ্ববেদনা, নিদ্রানাশ ও প্রলাপ বাহুল্য—এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয়।

তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর স্বেদ-মোহাতিসার বিভ্রমৈঃ।
বিস্তাদ্ধরিতবর্ণস্য পিত্তপ্রায়ং মদাত্যয়ম্॥

পৈত্তিক মদাত্যয় রোগে তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, ঘর্ম্মনির্গম্, মূর্চ্ছা, অতিসার, ভ্রম ও দেহের হরিত বর্ণতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

ছর্দ্দ্যরোচক হৃল্লাস তন্দ্রা স্তৈমিত্য গৌরবৈঃ।
বিস্তাচ্ছিত পরিতস্তু কফপ্রায়ং মদাত্যয়ম্॥

শ্লৈষ্মিক মদাত্যয়ে বমি, অরুচি, বমনবেগ, তন্দ্রা, গাত্রে আর্দ্রবস্ত্রাবৃতবৎ বোধ,—দেহের গুরুতা ও অতিশয় শীত এই সমুদায় লক্ষণ প্রকাশ পায়।

উল্লিখিত বাতিকাদি ত্রিবিধ মদাত্যয়ের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে সান্নিপাতিক মদাত্যয় জানিতে হইবে। পরমদ প্রভৃতিতে মদ্যাত্যয় লক্ষণের অতিরিক্ত কতকগুলি লক্ষণ লক্ষিত হয়। পরমদ নামক রোগে শ্লেষ্মপ্রাচুর্য্য, নাসাস্রাব, দেহভার, মুখবৈরস্য, মলমূত্র রোধ, তন্দ্রা, অরুচি, তৃষ্ণা, শিরোবেদনা ও সন্ধি সমুদয়ে ভঙ্গবৎ বেদনা প্রভৃতি শ্লেষ্ম লক্ষণ সমুদয় দেখিতে পাওয়া যায়।

পীতমদ্য জীর্ণ না হইয়া পানাজীর্ণ রোগ জন্মায়। ইহাতে অতি ক্লেশকর উদরাধ্মান, বমন, অথবা মদ্যগন্ধযুক্ত উদ্গার ও গাত্রদাহ প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়।

পান বিভ্রমাখ্য রোগে সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ বক্ষস্থলে সূচিবেধবৎ বেদনা, কফস্রাব, কণ্ঠ হইতে ধূম নির্গমবৎবোধ, মূর্চ্ছা, বমি, শিরঃপীড়া, দাহ এবং গৌড়ী (ধেনো) কাদম্বরী (তাড়ি) প্রভৃতি মদ্যে বিদ্বেষ উপস্থিত হয়।

মদ্যানাং সততাভ্যাসাৎ তীব্র মদ্য নিষেবনাৎ।
নিরন্নাদপি পানাচ্চ যকৃদ্রগো ভবন্তি হি॥
যকৃদ্রোধিকারে তান্ সলক্ষণ চিকিৎসিতান্।

বিবিধ মদ্যের নিরন্তর পান, তীব্র মদ্যপান ও খাদ্য রহিত মদ্যপান প্রভৃতি কারণে যকৃৎ রোগ উৎপন্ন হয়। যকৃতে যে সমস্ত লক্ষণ হইয়া থাকে, ঐ সমুদায় এবং তাহার চিকিৎসা প্লীহা যকৃদধিকারে ক্রমশঃ প্রকাশ করা হইবে।

শ্রীহরিপদ মজুমদার কাব্যতীর্থ কবিভূষণ।

জ্বররোগে পথ্য ও চিকিৎসা।

সাধারণের ধারণা যে রোগে যাহা খাওয়া হিতকর, সেই রোগে তাহাই পথ্য। হিতকর খাদ্য ত পথ্য বটেই, কিন্তু যে রোগে যাহা কিছু হিতকর; সেই রোগে তাহাই পথ্য। যেমন নবজ্বরে উপবাস পথ্য।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে জ্বরের প্রথমেই উপবাস দিতে বলা হইয়াছে। কেবল বলা নয়, জ্বরের প্রথমে লঙ্ঘন অমৃতের ন্যায় বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কেন? শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন,—আমাশয়স্থ আম

(অপক্ক আহার রস) সংযুক্ত দোষ সকল (বায়ু, পিত্ত, কফ) অগ্নিকে নষ্ট করিয়া এবং মার্গ (ঘর্ম্মাদি স্রোতঃ) সকলকে রুদ্ধ করিয়া জ্বর উৎপাদন করে বলিয়া জ্বরের প্রথমে লঙ্ঘন দেওয়া উচিত।

সুস্থ শরীরে শারীরিক স্রোতঃ সকল প্রকৃতিস্থ থাকে এবং অগ্নি প্রবল থাকায় ক্ষুধা হয়। কিন্তু জ্বর হইলে অগ্নি নষ্ট হওয়ায় ক্ষুধা হয় না এবং ক্ষুধা না হইলে আহার দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।—ইহা একটা সাধারণ যুক্তি।

জ্বর একরূপ নহে, অতি সামান্য জ্বর হইতে সন্ন্যোমারাত্মক প্রবল জ্বর পর্য্যন্ত সমস্ত জ্বরেরই সাধারণ সংজ্ঞা জ্বর। জ্বর যত মৃদু হয়, শরীরের এবং শারীরিক যন্ত্রাদির ততই অল্প বিকৃতি ঘটে, আর জ্বর যত প্রবল হয়, শরীরের ও শারীরিক যন্ত্রাদির ততইঅধিক বিকৃতি ঘটে। সেই জন্য মৃদু জ্বরে অল্প এবং প্রবল জ্বরে অধিক উপবাস দেওয়া আবশ্যক।

জ্বরের প্রাবল্যের তারতম্য অনুসারে যেমন অল্প বা অধিক উপবাস দেওয়ার বিধি আছে, সেইরূপ যে সকল জ্বরে লঙ্ঘন দিলে অনিষ্টের সম্ভাবনা, সেই সকল জ্বরে লঙ্ঘন নিষেধ করা হইয়াছে। যথা :—

"বায়ু জনিত জ্বর, ক্ষয়জনিত জ্বর, মানস দোষ জনিত জ্বর (যেমন কাম বা ক্রোধ জনিত জ্বর) এবং পূর্ব্বে দ্বিব্রণীয়াধ্যায়ে যাহাদিগকে উপবাসের অযোগ্য বলা হইয়াছে, তাহাদিগকে লঙ্ঘন দিবে না।"

দ্বিব্রণীয়াধ্যায়ে বলা হইয়াছে :—

"ঊর্দ্ধ বায়ু (হিক্কাদি), তৃষ্ণা, ক্ষুধা, মুখ শোষ এবং শ্রম (বিনা পরিশ্রমে শ্রান্তি বোধ—মতান্তরে ভ্রম) পীড়িত রোগীকে এবং গর্ভিণী, বৃদ্ধ, বালক, দুর্ব্বল ও ভীরু ব্যক্তিদিগকে উপবাস করাইবে না।

এই সকল ক্ষেত্রে উপবাস দিলে অনিষ্ট হয় বলিয়া শাস্ত্রকার এই সাধারণ সূত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রে জ্বরের প্রাবল্য, বহু দোষের সহিত সঞ্চিত অগ্নির নাশ, বমনোদ্বেগ প্রভৃতি থাকিলে যুক্তি পূর্ব্বক অল্প অল্প উপবাস দেওয়া আবশ্যক ও হিতকর —ইহা আমরা কার্য্যক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যথা সময়ে সে সম্বন্ধে বলা যাইবে।

পাঠকগণ ইহা মনে রাখিবেন যে, শাস্ত্রকারগণ চিকিৎসা সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, রোগীর অবস্থা ভেদে যুক্তি পূর্ব্বক সে সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিতে হয়। কেননা, জগতে একরূপ আকৃতি বিশিষ্ট দুইটী লোক যেমন দেখা যায় না, সেইরূপ ঠিক এক প্রকার লক্ষণ বিশিষ্ট দুইটী লোক দেখা যায় না।

আয়ুর্ব্বেদে জ্বরের প্রথম সাত দিন তরুণ জ্বর বলা হয়। চরকে কথিত হইয়াছে :—যথা

"প্রজ্জ্বলিত অগ্নি ইন্ধন যুক্ত হইলেও যদি বায়ু কর্ত্তৃক বহিঃ প্রেরিত হয়, তাহা হইলে যেমন স্থালী (হাড়ি) স্থিত অন্ন পাক করিতে পারে না, সেইরূপ দোষ সকল অগ্নি স্থান হইতে উষ্মাকে বহির্ভাগে নিক্ষিপ্ত করে বলিয়া জ্বররোগী অন্ন আহার করিলে অগ্নি তাহা পাক করিতে পারে না বা কষ্টে লঘু অন্ন পাক করিতে পারে। এইজন্য বল রক্ষার্থ লঙ্ঘনাদি আবশ্যক। প্রথমে লঙ্ঘন পরে পেয়া ইত্যাদি হিতকর, এক সপ্তাহে সর্ব্ব ধাতু গত মল (কুপিত বায়ু পিত্ত কফ) পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কিন্তু এই সাধারণ জ্বরের উপর নির্ভর

করিয়া সকল ক্ষেত্রে উপবাস দেওয়া চলে না। উপবাস পাছে অল্প বা অধিক হয় সেই জন্য শাস্ত্রে নিম্নলিখিত উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

"যাবৎ কাল পর্য্যন্ত দোষ স্থির ভাবে অবস্থিত থাকায় শরীরের বদ্ধবৎ বোধ হয় তাবৎকাল উপবাস দিবে। পরে লঘু পথ্য দিবে।

আম বা তরুণ জ্বরের লক্ষণ—লালা নিঃসরণ, বমনভাব, হৃদয়ের ভারবোধ, অরুচি, তন্দ্রা, আলস্য, খাদ্য অবিপাক, মুখের বিরসতা, শরীরের গুরুতা, ক্ষুধার নাশ, প্রচুর মূত্র নিঃসরণ এবং জ্বরের স্তব্ধতা ও প্রাবল্য এই গুলি আমজ্বরের লক্ষণ। এই সকল লক্ষণ প্রকাশ থাকা পর্য্যন্ত উপবাস দেওয়া কর্ত্তব্য।

দোষপাকের লক্ষণ—জ্বরের মৃদুতা, শরীরের লঘুতা ও মল নিঃসরণ—এইগুলি দোষ পাকের লক্ষণ। এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগীকে লঘু পথ্য দেওয়া যাইতে পারে।

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই শাস্ত্রকার নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। সম্যক উপবাস দেওয়া হইলে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়—তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা, অধোবায়ু, মূত্র ও মল নির্গম, শরীরের লঘুতা, হৃদয়ে উদ্গার, কণ্ঠের ও মুখের বিশুদ্ধতা, তন্দ্রা ও ক্লান্তির নাশ, ঘর্ম্ম নিঃসরণ আহারে রুচি, ক্ষুধা ও পিপাসার উদয় এবং মন প্রসন্ন (গ্লানি রহিত) হইলে সম্যক উপবাস দেওয়া হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

জ্বরে উপবাস দিলে কি ফল হয়, সে সম্বন্ধে শাস্ত্রকার বলিয়াছেন যে, অনবস্থিত (যাহা স্ব স্থানে এবং উপযুক্ত পরিমাণে নাই) দোষ এবং অগ্নি বিশিষ্ট জ্বর রোগী উপবাস করিলে তাহার দোষ পরিপাক পায়, অগ্নি দীপ্ত হয়, জ্বর নষ্ট হয়, শরীর লঘু হয় এবং অন্নে আকাঙ্ক্ষা ও রুচি হয়।

নবজ্বরে উপবাস অমৃতের ন্যায় হিতকর বলায় উপরোক্ত উপদেশাদি সত্বেও পাছে রোগীকে অধিক উপবাস করান হয়—সেই আশঙ্কা করিয়া শাস্ত্রকার বলিয়াছেন :—

"লঙ্ঘন প্রাণের (বলের) বিরোধী বলিয়া অর্থাৎ লঙ্ঘন দ্বারা বলহানি ঘটে বলিয়া রোগীকে অতিরিক্ত লঙ্ঘন করাইবে না। কারণ যে আরোগ্যের জন্য চিকিৎসা করা যায়—বলই সেই আরোগ্যের অধিষ্ঠান অর্থাৎ বলকে আশ্রয় করিয়া আরোগ্য লাভ ঘটে।

অতিরিক্ত উপবাস দিলে রোগীর বলহানি হয় এবং বিবিধ উপসর্গ ঘটে। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, অতিরিক্ত লঙ্ঘনের ফলে পর্ব্বসমূহে ভঙ্গবৎ বেদনা, শরীর বেদনা, কাস, মুখের শুষ্কতা, ক্ষুধার নাশ, অরুচি, তৃষ্ণা, চক্ষু ও কর্ণের দুর্ব্বলতা, মনের ভ্রান্তি, প্রবল ঊর্দ্ধগত (হিক্কা, শ্বাস, কর্ণে শব্দ), হওয়া হাই উঠা, মোহ, এবং দেহ, অগ্নি ও বলের হানি ঘটিয়া থাকে। । এইজন্য জ্বর রোগীকে কদাচ অতিরিক্ত উপবাস দিবে না।

নবজ্বরে উপবাস সম্বন্ধে এই সকল সুন্দর উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সন্নিপাত জ্বরে উপবাস সম্বন্ধে একটু বিশেষত্ব আছে। টাইফায়েড জ্বর, নিউমানিয়া প্রভৃতি—সন্নিপাত জ্বরের অন্তর্ভুক্ত। সন্নিপাতজ্বরে চিত্তের বিকৃতি ঘটিলে তাহা জ্বরবিকার নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

সন্নিপাত জ্বরে তিন দিন, পাঁচ দিন, দশ দিন বা যতদিন রোগী আরোগ্য-পথে অগ্রসর না হয়, ততদিন লঙ্ঘন দিবার উপদেশ

দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে অতিরিক্ত উপবাসের বিষম অনিষ্টকারিতার বিষয় বলার পর এইরূপ দীর্ঘ উপবাসের ব্যবস্থা করায় শিক্ষার্থির মন সন্দেহাকুলিত হইতে পারে। তজ্জন্য শাস্ত্রকার বলিয়াছেন :—

লঙ্ঘনে যে এইরূপ সহিষ্ণুতা অর্থাৎ এত দীর্ঘকাল লঙ্ঘন সহ্য করিতে পারা —তাহা কেবল দোষের অর্থাৎ কুপিত বায়ু, পিত্ত, কফের শক্তি বশতঃ ঘটিয়া থাকে দোষের ক্ষয় হইলে কখনই লঙ্ঘনাদি (লঙ্ঘন ও স্বেদাদি) সহ্য করিতে পারে না।

আমরা বহুস্থলে এই শাস্ত্রবাক্যের সম্পূর্ণ সার্থকতা দেখিয়াছি। সন্নিপাতজ্বরে উপবাস দিলে রোগী সত্বর আরোগ্য লাভ করে। বালকেরাও সন্নিপাত জ্বরে যথেষ্ট উপবাস সহ্য করিতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রথম হইতে আহার দিলে তাহা রোগীর মৃত্যু বা দীর্ঘকাল রোগভোগের কারণ স্বরূপ হইয়া থাকে। সুখের বিষয় এই, পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণও ক্রমশঃ এই তথ্য বুঝিতে পারিতেছেনা। প্রসিদ্ধ চিকিৎসক অস্‌লার সাহেব তাঁহার প্রণীত চিকিৎসা গ্রন্থে টাইফায়েড নামক সন্নিপাত জ্বরের পথ্য প্রয়োগ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, কেহ কেহ এই রোগে একেবারে খাদ্য দিতে নিষেধ করেন।

পূর্ব্বে নবজ্বরে সম্যক লঙ্ঘনের যে সকল লক্ষণ লিখিত হইয়াছে এবং যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে পথ্য দিবার উপযুক্ত কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সেই লক্ষণ বিচার করিয়া সন্নিপাতজ্বরেও পথ্য প্রয়োগ করিতে হয়।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, নবজ্বরে এক্ষণে এত অধিক উপবাস সহ্য হয় না। অনেক স্থলেই ইহা সত্য। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে, দুর্ব্বল রোগীর পক্ষে উপবাস নিষিদ্ধ। এক্ষণে অধিকাংশ লোকেই দুর্ব্বল। সুতরাং এখনকার দুর্ব্বল লোকদিগকে বিশেষ বিবেচনা করিয়া উপবাসের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত অতিরিক্ত উপবাসের কোন একটী উপসর্গ ঘটিলেই লঘু পথ্য প্রয়োগ করা উচিত। রোগী বলবান হইলে সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত উপবাস দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সন্নিপাত জ্বরে দোষের শক্তি বশতঃ লঙ্ঘন সহ্য হয় বলিয়া যথোপযুক্ত লঙ্ঘন হেতু কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।

নবজ্বরে পিপাসা হইলে জল সংস্কৃত করিয়া পান করিতে দেওয়া উচিত।

চরকে লিখিত হইয়াছে—জ্বর আমাশয়কে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। আমাশয় জাত রোগে বিরেচন, বমন, উপবাস ও সংশমন হিতকর। উষ্ণ জল ঐ সকলের সাধক এবং পাচক বলিয়া জ্বরে হিতকর। ইহা দ্বারা বায়ুর অনুলোম হয়, অগ্নি প্রবাহ হয়, উষ্ণ জল শীঘ্র পরিপাক পায়, শ্লেষ্মাকে শুষ্ক করে এবং পান করিলে তৃষ্ণা প্রশমিত করে।

সুশ্রুতে কথিত হইয়াছে যে,—উষ্ণ জল অগ্ন্যুদ্দীপক, সংহত কফেরচ্ছেদকারক, বায়ু ও পিত্তের অনুলোমক, এবং তৃষ্ণানাশক, এই জন্য বায়ুজনিত শ্লেষ্মাজনিত বা বাতশ্লেষ্মাজনিত জ্বরে হিতকর। অপিচ উষ্ণ জল পান করিলে দোষ সকলের অল্পতা ঘটে এবং স্রোতোপথ সকল বিশুদ্ধ হয়।

শীতল জল উষ্ণ জলের বিপরীত গুণ বিশিষ্ট বলিয়া শীতল জল পান করিলে জ্বর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

পিত্ত জ্বর, মদ্যপানজনিত জ্বর এবং

বিষজ জ্বরে তিক্ত দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ করিয়া সেই জল শীতল হইলে পান করিতে দিবে। এই প্রকারে সিদ্ধ করা জল এবং উষ্ণ জল অগ্ন্যুদ্দীপক, পাচক, জ্বরনাশক, স্রোতঃ শোধক, বলকর রুচি জনক এবং ঘর্ম্মজনক।

ষড়ঙ্গ পানীয়—মুতা, ক্ষেত পাঁপড়া, বেণার মূল, রক্তচন্দন, বালা ও শুঁঠ প্রত্যেকে পাঁচ আনা দুই রতি—মোট দুই তোলা লইয়া ধুইয়া থেতো করিবে। পরে চারি সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া দুই সের থাকিতে নামাইয়া লইবে; এই জল শীতল করিয়া পান করিতে দিলে পিপাসা ও জ্বর নষ্ট হইয়া থাকে। মতান্তরে শুঠী স্থলে পদ্মকাষ্ঠ লইবার বিধি আছে।

বাতপিত্ত জ্বরে ষড়ঙ্গপানীয় অথবা উষ্ণ জল শীতল করিয়া এবং বাতশ্লেষ্মজ্বরে ও ত্রিদোষজ জ্বরে উষ্ণ জল পান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে,—

সন্নিপাত জ্বরে রোগী প্রলাপ বকিতে থাকিলেও পুষ্টিকর খাদ্য দিবে না এবং দাহ ও তৃষ্ণায় অভিভূত হইলেও শীতল জল পান করিতে দিবে না।

জ্বরে উষ্ণ জল প্রচুর পরিমাণে দেওয়া যাইতে পারে। জল সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধেক থাকিতে নামাইয়া, সেই জল সহ্যমত উষ্ণ থাকিতে থাকিতে পান করিতে দেওয়া উচিত।

লঙ্ঘন এবং জল পানের বিষয় বলা হইল। এক্ষণে কিরূপ নিয়মে পথ্য দিতে হয়, তাহা বলা যাইতেছে. শাস্ত্রকার মণ্ড, পেয়া ও বিলেপী,—জ্বররোগে পথ্যের জন্য দিতে বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—

মণ্ড, পেয়া, ও বিলেপী লঘু বলিয়া এবং ঔষধ সহ সংস্কৃত হওয়ায় অগ্ন্যুদ্দীপক এবং বায়ু, মূত্র, পুরীষ ও দোষের অনুলোমক হইয়া থাকে, তরল ও উষ্ণ বলিয়া ঘর্ম্ম উৎপাদন করে, তরল বলিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে, আহার বলিয়া বল জন্মায়, সাহস বলিয়া শরীরের লঘুতা সম্পাদন করে, জ্বরে হিতকর বলিয়া জ্বর নষ্ট করে,—এইজন্য মদ্যপান জনিত জ্বর ব্যতীত অন্য জ্বরে যবাগূ পথ্য দিবে। (ক্রমশঃ)

শ্রী ———বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

* ওলাউঠা চিকিৎসা।

——:০:——

ওলাউঠা কাহাকে বলে? ইহার প্রকৃতি প্রত্যয়গত অর্থই বা কি? এবং কোন্ ভাষা হইতেই বা এই শব্দ গৃহীত হইয়াছে? ইত্যাদি বিষয় আমরা কিছুই অবগত নহি। আয়ুর্ব্বেদীয় কোনো গ্রন্থে এই শব্দের প্রয়োগ দৃষ্টিগোচর হয় না। এই সকল আলোচনা করিয়া অনেকেই বলিয়া থাকেন, "ওলাউঠা আয়ুর্ব্বেদ বহির্ভূত এক প্রকার নূতন রোগ। পাশ্চাত্য দেশের সমুন্নত স্থান হইতে এই রোগ ভারতে আসিয়াছে, এই জন্যই ইহার চিকিৎসা বিধান আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং কবিরাজ দ্বারা এই পীড়ার চিকিৎসা হওয়া

* ওলা—ভেদ, উঠা—বমন।

সর্ব্বথা অসম্ভব।" কিন্তু সাধারণতঃ এ রোগের যে সকল লক্ষণ আমরা দেখিতে পাই, তাহাতে ইহাকে আমরা নূতন রোগ বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। এই রোগে আক্রান্ত হইলে প্রথমতঃ রোগীর অত্যন্ত মলভেদ এবং সঙ্গে সঙ্গে মুহুর্মুহুঃ বমন হইতে আরম্ভ হয়। তাহার পর স্বরভঙ্গ, হিক্কা, মূত্ররোধ, ঘর্ম্ম নিঃসরণ, উদ্বেষ্টন, অর্থাৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের খালি ধরা প্রভৃতি লক্ষণ জুটিয়া রোগীকে সাতিশয় যন্ত্রণা দিতে থাকে। সমস্ত শরীর বিশেষতঃ মুখমণ্ডল ও দন্তসমূহ নীলবর্ণ হয়। কাহারও কাহারও বক্ষোদেশের তীব্র বেদনা ও শিরঃশূল উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা চক্ষুঃ রক্তবর্ণ ও কোটরগত হইতেও দেখা যায়। এবম্বিধ লক্ষণাক্রান্ত অন্য কোন রোগ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে কিনা,—এক্ষণে আমাদের ইহাই আলোচ্য। সনাতনশাস্ত্রে ওলাউঠা শব্দের প্রয়োগ না থাকুক, কিন্তু তাহার লক্ষণের ন্যায় লক্ষণ বিশিষ্ট অপর কোন রোগের উল্লেখ থাকিলে তাহা অগ্রাহ্য করিব কেন? যদি শাস্ত্রবর্ণিত সেই রোগের চিকিৎসা দ্বারা ওলাউঠা রোগেরও সর্ব্বতোভাবে প্রতীকার ঘটাইতে পারা যায়, তাহাতেই বা শিথিলচেষ্ট হইব কেন?

আয়ুঃ শাস্ত্রে বিসূচিকা রোগের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিসূচিকা রোগের নিদান ও লক্ষণের বিষয় অনুশীলন করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন—আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ যাহাকে বিসূচিকা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই বর্ত্তমান কালে ওলাউঠা নাম ধারণ করিয়াছেন! ফলতঃ ইহা কোন নূতন রোগ নহে, কেবল নামটিই নূতন। নিদান সংগ্রহ কর্ত্তা ধীমান্ মাধবকর বলিয়াছেন:—

(১) যে পীড়ায় অজীর্ণ বশতঃ বায়ু অতি কুপিত হইয়া গাত্র সকলকে অত্যন্ত বেদনা অপেক্ষা সূচীবেধবৎ বেদনায় অধিকতর অস্থির করিয়া তুলে, বৈদ্যগণ তাহাকে বিসূচিকা বলিয়া থাকেন। (২) এই রোগে মূর্চ্ছা, অতিসার, বমন, পিপাসা, শূলবৎ বেদনা, হস্ত পদে খালি ধরা, জৃম্ভা (হাই); গাত্রদাহ, বিবর্ণতা, কম্প, বক্ষোবেদনা, ও শিরঃশূল উপস্থিত হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান ওলাউঠা রোগে এতদ্ব্যতীত নূতন কোন লক্ষণ প্রায়শঃ পরিলক্ষিত হয় না। তবে দেখা যাইতেছে যে, আজকাল লোকে যাহাকে ওলাউঠা বলিয়া ঘোষণা করিতেছে, আয়ুর্ব্বেদ, শাস্ত্রে সেই রোগই বিসূচিকা বলিয়া বর্ণিত। এক্ষণে দেখা যাউক, কি কি কারণে কেমন করিয়া এই বিসূচিকা রোগ জীবদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদে শারীর স্থান এবং অন্নবিপাক ক্রিয়াপদ্ধতি অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিলে সুস্পষ্টরূপে জানা যায় যে, একমাত্র অজীর্ণ রোগই অধিকাংশ রোগের প্রসূতি। (৩) যাহারা লোভপরায়ণ, ঔদরিক, পশুবুদ্ধি ও হিতাহিত বোধশূন্য হইয়া অপরিমিত আহার করে, তাহারাই নানারোগের মূল স্বরূপ অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত হয়।

---

(১) সূচীভিরিব গাত্রাণি তুদন সন্তিষ্ঠতেহ নিলঃ। যস্যা জীর্ণেন সা বৈদ্যৈর্বিসূচিতি নিগদ্যতে॥

(২) মূর্চ্ছাতিসারো বমথুঃ পিপাসা শূলো ভ্রমোদ্বেষ্টন জৃম্ভ দাহাঃ। বৈবর্ণ্যকম্পৌ হৃদয়ে রুজশ্চ ভবন্তি তস্যাং শিরসশ্চ ভেদঃ॥

(৩) অনাত্মবন্তঃ পশুবদ্ভুঞ্জতে যেহ প্রমাণতঃ। রোগানীকস্য তে মূলমজীর্ণং প্রাপ্নুবন্তি হি॥

(১) এই অজীর্ণ রোগ তিন প্রকার :—

(ক) অর্থাৎ আমাজীর্ণ, (খ) বিষ্টব্ধাজীর্ণ (গ) বিদগ্ধাজীর্ণ। এবং ইহাদের—হইতেই বিসূচিকা, বিলম্বিকা, অলসিকা রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। (২) শাস্ত্রদর্শী পরিমিতাহারী ব্যক্তিগণের এই রোগ হয় না। ভক্ষ্যাভক্ষ্য সম্বন্ধে যাহাদের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, যাহারা আত্মসংযমে সম্পূর্ণ অক্ষম এবং পেটক, তাহারাই এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। ইহা হইতে উপলব্ধি হইতেছে যে, একমাত্র অজীর্ণই এই রোগের নিদান। অগ্নিমান্দ্য হইতে অজীর্ণ এবং অজীর্ণ হইতে সকল রোগের উৎপত্তি হয়। তাই আমরা প্রথমতঃ অগ্নিমান্দ্য বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। অগ্নি কাহাকে বলে? সকলে সর্ব্বদা যে অগ্নি প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, যাহার সহায়তায় জ্বালাণীকাষ্ঠ সংযোগে লোকে অন্ন প্রস্তুত করিয়া আহার করে, যাহার কণিকামাত্র সংস্পর্শে সরস নীরস সর্ব্ববিধ বস্তুই ভস্মীভূত হইয়া যায়, ইহাও কি ঠিক সেই প্রকার পদার্থ? অত্যুচ্চ সূর্য্য মণ্ডল হইতে রসাতল পর্য্যন্ত সমস্তই একজাতীয় অগ্নি বিরাজমান। কাষ্ঠে কাষ্ঠে পরস্পর সংঘর্ষণ করিলে যে অগ্নির উদ্গম হয়, সেই অগ্নি পরিশেষে দেহের, গেহের—সর্ব্ববিধ কার্য্যের সংসাধক হইয়া থাকে। প্রচ্ছন্ন নিগূঢ় বহ্নিতে তাড়না ব্যতীত কখনও উহা উৎক্ষিপ্ত হয় না। কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় জীবদেহও অগ্নিময়। কাষ্ঠ নিষ্ক্রিয়ভাবে পড়িয়া থাকে, সুতরাং তাড়না না করিলে উদ্গম হয় না। জীবদেহ তদ্রূপ নয়। দেহ মধ্যে নিমিষে নিমিষে প্রবলবেগে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। তাহাতে রসরক্তাদির অবিরত সঞ্চালন ঘটিতেছে। শারীরিক যন্ত্রগুলিও নিষ্ক্রিয়ভাবে পড়িয়া থাকে না। যান্ত্রিক বিষম তাড়না বশতঃ কাষ্ঠখণ্ড অপেক্ষা শরীরের উত্তাপ অনেক বেশী। এই দেহগত বহ্নি পাছে দাবানলের ন্যায় প্রচণ্ড হইয়া পরে, শরীরকে সম্পূর্ণরূপে রসশূন্য করিয়া ফেলে, মাংসাদির পূর্ণ পরিপাক সংসাধন করিয়া শরীরকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে, তাই ভয়ে ভয়ে মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু পানাহারের ব্যবস্থা করিতে হয়।

আয়ুর্ব্বেদগুরু ভগবান পুনর্ব্বসু এবং ভদ্রকাপ্য প্রভৃতি ঋষি কহিয়াছেন :—"পিত্তই শরীরের অগ্নি" পিত্তকে সমভাবে রাখিতে পারিলেই শরীর সুস্থ থাকে। যে পিত্ত তীক্ষ্ণ, দ্রব্য, দুর্গন্ধ, নীল ও পীতবর্ণ যাহা উষ্ণ এবং যাহা কটুরস বিশিষ্ট, তাহাই স্বাভাবিক। পিত্তে অম্লরস জন্মিলে তাহা দূষিত হইয়া থাকে। কার্য্যভেদে পিত্ত পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত :—পাচক, রঞ্জক, সাধক, আলোচক, ভাজক।

পাচকপিত্ত অগ্ন্যাশয়ে অবস্থিতি করিয়া ভুক্তবস্তুর পরিপাক সাধন করে, এবং মল মূত্রাদির নিঃসরণ করিয়া দেয়। অধিকন্তু ইহা দ্বারা অপরাপর পিত্তের বল বৃদ্ধি হয়। রঞ্জকপিত্ত যকৃৎ ও প্লীহায় অবস্থান করে, এবং ভুক্ত পদার্থের প্রথম পরিপাক হইবার পর—যে রস জন্মে, তাহাকে রসে পরিণিত করে। সাধকপিত্ত হৃদয়ে অবস্থিত। ইহা

(১) অজীর্ণমামং বিষ্টব্ধং বিদগ্ধঞ্চ যদীরিতম্। বিসূচ্যলসকৌ তস্মাত্তত্রৈচাপি বিলম্বিকা।

(২) ন তাং পরিমিতাহারা লভন্তে বিদিতাগমাঃ। মূঢ়াস্তামজিতাত্মানো লভন্তে২শন লোলুপাঃ।

হইতে বুদ্ধি, স্মৃতি, এবং মেধার উৎপত্তি হয়। আলোচকপিত্ত নেত্রদ্বয়ে অবস্থান করে, ইহা হইতে দর্শন ক্রিয়ার সংসাধন হয়। ভ্রাজক পিত্ত গাত্রচর্ম্মে অবস্থিত। ইহা অভ্যঙ্গ দ্রব্যের পরিপাচক এবং শরীরের অগ্নিবর্দ্ধক। পাচগাগ্নি চতুর্ব্বিধ অবস্থায় জঠরে অবস্থান করিয়া থাকে—যথা—মন্দ, তীক্ষ্ণ বিষম এবং সম। শরীরে কফাধিক্য হইলে মন্দাগ্নি উপস্থিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে যাহা কিছু আহার করা যায়, তাহা সুচারুরূপে পরিপাক হয়না। ইহাতে মাথাকন্‌কনানি, উদ্গারবাহুল্য, উদরস্ফীতি. উদরের গুরুত্ব. মলরোধ, এবং মূত্রাধিক্য প্রকাশ পায়। সামান্য সর্দ্দিতেও এই সকল লক্ষণ উপলক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু জঠরে কফ সঞ্চিত হইলেই এই অবস্থা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা এক প্রকার অজীর্ণ। জঠরে পিত্তের আধিক্য হইলে তীক্ষ্ণাগ্নি জন্মে। তীক্ষ্ণাগ্নিবিশিষ্ট লোক যখন যাহা কিছু আহার করে, তখনই তাহা শীঘ্র পরিপাক হইয়া যায়, আবার ক্ষুধার উদ্রেক হয়। ইহাতে শরীরের শোষ আরম্ভ হইলে পীড়া সাংঘাতিক মূর্ত্তি ধারণ করে। বায়ুর আধিক্য বশতঃ বিষমাগ্নির উৎপত্তি হয়। ইহাতে ভুক্ত পদার্থের কখনওবা শীঘ্র এবং কখনও বা বিলম্বে পরিপাক হইয়া থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা সমাগ্নি শরীরের পক্ষে শ্রেষ্ঠ এবং স্বাস্থ্যসম্পাদক। সমাগ্নির রক্ষণচেষ্টাই সকলের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এতদ্ভিন্ন অগ্নির তিন প্রকার অবস্থাই অজীর্ণ রোগ বলিয়া সমাখ্যাত। অগ্নিমান্দ্য বা অজীর্ণ রোগে কফদোষ থাকিলে তাহাকে আমাজীর্ণ, পিত্তদোষ থাকিলে তাহাকে বিদগ্ধাজীর্ণ এবং বায়ুর সংশ্রব থাকিলে তাহাকে বিষ্টব্ধাজীর্ণ কহে। প্রতিদিন যাহা কিছু আহার করা যায়, সেই সমস্ত ভুক্ত রসে অংশ বিশেষ জীর্ণ না হইয়া রসাবস্থায় অবস্থিত থাকে, তাহাই সময়ান্তরে অজীর্ণ রোগ রূপে পরিণত হয়, শাস্ত্রে ইহার নাম রসশেষাজীর্ণ। উল্লিখিত সকল প্রকার অজীর্ণ রোগ হইতে দেশ-বিধ্বংশকর প্রাণনাশক, বিসূচিকা বা ওলাউঠা রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্য শারীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ ওলাউঠা রোগের বীজস্বরূপ স্বতন্ত্র কোন বিষের কথা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মতে জলবায়ু দূষিত হইয়া এই রোগের বীজ জন্মাইয়া থাকে। পরে সে রোগবীজ জীব দেহে প্রবেশ লাভ করিয়া, সদ্যোমারাত্মক সাংঘাতিক ওলাউঠা রোগের সৃষ্টি করে। এই সকল কথা সারবত্তা আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ স্বীকার করেননা। বাহ্য পদার্থ দূষিত হইয়া রোগের বীজস্বরূপ কোন বিষের উৎপত্তি হইতে পারে, তাঁহাদিগের মতে ইহা অসম্ভব। অযুক্ত আহার-বিহারদ্বারা আপনা হইতেই দেহমধ্যে নানাবিধ বিষের উদ্ভব হয়। আচার্য্যগণ বলেন, তন্মধ্যগত অন্যতম বিষ হইতেই এই সাংঘাতিক রোগের উৎপত্তি। জলবায়ু প্রাণীদিগের সাধারণ সম্পত্তি। প্রাণীমাত্রেই এই দুইটী বস্তু সর্ব্বদা সমান ভাবে ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাদিগের অভাবে বা বিশ্বপ্রসবিনী ক্রিয়ার দোষে জগতের অস্তিত্ব ও অসম্ভব। বায়ু সঞ্চরণশীল। ব্যক্তি বিশেষের কদাচারের দোষে অথবা নৈসর্গিক দোষে যদি কোন স্থানের বায়ু দূষিত হয়, তবে তাহা অচিরে সমস্তদেশে অভিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং জীবমাত্রেই তাহা ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারে না।

জল সম্বন্ধেও নিয়ম ঠিক ঐ প্রকারই। উক্ত কারণে কোন স্থানের জল বিষাক্ত হইলে তাহা অচিরে বহু স্থানে সঞ্চালিত হয়। তবে স্থানের দূরত্বানুসারে বিষাক্ত অংশ কম হইতে পারে। যদি প্রকৃত প্রস্তাবে সাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারোপযোগী জলবায়ু দূষিত হইয়া ওলাউঠা রোগের উৎপাদন করিত, তাহা হইলে ঐ রোগে কীট পতঙ্গ হইতে মানব পর্য্যন্ত প্রত্যেক প্রাণীকে তুল্যভাবে আক্রান্ত হইতে হইত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা হয়না। এইজন্য আমরা দেহমধ্যে স্বয়মুৎপাদিত বিষের কথা স্বীকার করিয়া থাকি। কিন্তু ইহা সত্যসত্যই সংক্রামক কিনা,—তাহাই একবার আমরা আলোচনা করিব। যে সকল রোগ এক শরীর হইতে অন্য শরীরে প্রবেশ করে তাহাকে সংক্রামক রোগ বলে। এই সংক্রামক রোগ বহু শ্রেণীতে বিভক্ত। কতকগুলি রোগ আছে, তাহারা নিত্য সংক্রামক। আবার এমন কতকগুলি রোগ আছে যে, তাহারা কাল প্রভাবে কখনও কখনও সংক্রামক হয়।

নানা কারণে সংক্রামক রোগের বীজ উৎপন্ন হইরা থাকে। মিথ্যা আহার বিহার দ্বারা আপনা হইতে দেহাভ্যন্তরে এই বীজের উৎপত্তি ঘটে। পরে এক শরীর হইতে অন্য শরীরে সঞ্চালিত হয়। ব্যক্তি বিশেষের কদাচারিতায় কখনও কখনও প্রথনতঃ স্থানীয় জল দূষিত হইয়া পড়ে। পরে বায়ু কর্ত্তৃক সেই দোষ বহু স্থানে সঞ্চারিত হইতে থাকে। সাধারণের নিত্যব্যবহার্য্য জলবায়ু এইরূপে দূষিত হইলে প্রাণী মাত্রকেই ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইতে হয়, সময় সময় ক্রুর গ্রহের কুটিল দৃষ্টিপাতে পার্থিব জলবায়ুও দূষিত হয়। যে কারণেই হউক জলবায়ু দূষিত হইয়া সংক্রামক পীড়ার উৎপত্তি হইলে তাহা ভীষণ আকার ধারণ করে। এতদ্বারা মহাদেশ মহাশ্মশানে পরিণত হওয়া অসম্ভব নয়! বর্ত্তমান ওলাউঠা বা বিসূচিকা রোগ এ প্রকার সংক্রামক নহে। ইহা বসন্ত রোগের ন্যায় এক শরীর হইতে অন্য শরীরে যে প্রবিষ্ট হয়, একথা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। তবে ওলাউঠা রোগীর যে মল মূত্রাদি পরিত্যাগ করে, তাহার কোন অংশ যদি কীট, পতঙ্গ, মক্ষিকা প্রভৃতি দ্বারা খাদ্যদ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হয়, অথবা জলের সহিত উদরস্থ হয়, তাহা হইলে এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হওয়া অসম্ভব নহে। ইহা বসন্ত রোগের ন্যায় সংক্রামক পীড়া নহে কিম্বা কুষ্ঠ অর্শ, যক্ষ্মা, ঔপসর্গিক মেহ এবং উপদংশ প্রভৃতির ন্যায়ও ইহাকে সংক্রামক রোগ বলিয়া আমরা গণনা করি না। উক্ত রোগাদি দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির দূষিত শুক্র হইতে জাতসন্তানের শরীরেও ঐ সকল পীড়া জন্মিয়া থাকে। কিন্তু ওলাউঠা রোগ এইরূপ ভাবে কাহাকেও —আক্রমণ করিতে দেখা যায় না। উন্মাদ গ্রস্তা জননীর সন্তানকেও উন্মাদ প্রভৃতি প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইতে হয়। ইহা বহুক্ষেত্রে প্রত্যক্ষীকৃত। ওলাউঠা পীড়ায় সেইরূপ সংক্রামকতা নাই, তবে এই পীড়া কালপ্রভাবে কখন কখনো কখনো সংক্রামক হয়, কখনো কখনো হয়ও না। এক্ষণে আমরা প্রণিধান করিয়া দেখিব—কোন্ সময় এই পীড়া সংক্রামক হইয়া দাঁড়ায় এবং কোন সময়ই বা সংক্রামক হয় না।

সর্ব্বদাই দেখা যায়,—যে সকল ব্যক্তি ওলাউঠা রোগীর নিকট অবস্থান করিয়া অহরহঃ তাহার সেবা শুশ্রূষা করে,—নিজ

হস্তে মল মুত্রাদি পরিষ্কার করিয়া দেয়, একটী বারও রোগীর কাছছাড়া হয় না, তাহাদিগকে কখন এই রোগে আক্রান্ত হইতে হয় না। যাহারা ভয়ে ভয়ে অতি বড় সাবধানে থাকে, রোগীর পরিচর্য্যা করা দূরে থাকুক, যে বাড়ীতে রোগী বাস করে, তাহার ত্রিসীমানাতেও পদার্পণ করে না, তাহারাই এই পীড়াতে আক্রান্ত হইয়া অকালে কালকবলিত হয়। তবেই দেখা যাইতেছে—এই পীড়া সকল অবস্থায় সংক্রামক হইয়া দাঁড়ায় না।

অজীর্ণ হইতে যে এই কাল ব্যাধির সমুৎপত্তি—ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। যদি কোন ওলাউঠা রোগীকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, তুমি দুই তিন দিনের মধ্যে কোন অজীর্ণকর দ্রব্য আহার করিয়াছ কিনা, তখন সে মুক্ত কণ্ঠে বলিয়া ফেলিবে --আমি ৫।৭ দিনের মধ্যে কোন অপথ্য দ্রব্য ভোজন করি নাই। কিন্তু সমস্ত বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, রোগীর কথার সত্যতা বাস্তবিক কর্পূরের ন্যায় উড়িয়া যায়। সুতরাং রোগীর বা তাহার আত্মীয় স্বজনের নিকট কোন কথা শুনিয়া রোগের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করা এক প্রকার দুরূহ ব্যাপার। ওলাউঠা রোগ গ্রামের মধ্যে যখন প্রথম প্রবেশ করে, তখন দুই চারি জন স্বেচ্ছাচারী ঔদরিক লোকই ইহা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। তাহার পর ক্রমশঃ মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে এই পীড়া প্রবল বেগে সকলকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। এইরূপে পীড়ার আক্রমণ অত্যন্ত প্রবল হইলে যখন চতুর্দ্দিক হইতে ক্রন্দনের রোল কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়, পক্ষীকুল থাকিয়া থাকিয়া এক একবার মর্ম্মভেদী কলরব করিয়া উঠে, শৃগাল কুক্কুরগণ বিকট শব্দে সভয়ে আর্ত্তনাদ করিতে থাকে,--প্রাণসম নৈরাশ্যেরভাবী আতঙ্কে সকলে শিহরিয়া উঠে, তখন আর সদাচারী, কদাচারী, মিতাহারী, অমিতাহারী—এই রোগের বিভীষিকার ভীতি সম্বন্ধে কাহারও কিছুমাত্র প্রভেদ থাকেনা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদীননাথ শাস্ত্রী, কবিরত্ন।

শরীর ও স্বাস্থ্য।

——:০:——

কোন কার্য্যের ফলাফল বিচার করিতে যাইলে সর্ব্বপ্রথমে কারণের অনুসন্ধান করিতে হয়। কারণ ব্যতীত কার্য্য হয়না—আবার কার্য্য করিলেই তাহার ফল অবশ্যম্ভাবী। জগৎপ্রপঞ্চ কারণ সম্ভূত। উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়—কার্য্যকারণের অবস্থান্তর। শৃঙ্খলবদ্ধ কার্য্যপরম্পরা অবলোকন করিলে বোধ হয় জগতের পশ্চাতে—নিয়ম অনন্ত কারণরূপে প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞানের কথায় নৈসর্গিক নিয়মই ভগবানের নিয়ম।* তবে ভগবান কি? তাহা আমার বিবেচ্য বিষয় নয়। দার্শনিক পণ্ডিতগণ তাঁহাকে বিভিন্ন আখ্যায় ভূষিত করিয়া গবেষণা পূর্ণ জটিল দর্শন লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি যাহাই হউন, বাস্তব জগতে আমরা দেখিতে পাই যে, এক অতি ক্ষুদ্র অণু-পরমাণু হইতে আরম্ভ

করিয়া সমস্ত উদ্ভিদ জগৎ—সমস্ত প্রাণিজগৎ ও সমস্ত আলোক জগৎ একই নিয়মের অধীন। উত্থান, অবস্থান ও পতন সর্ব্বব্যাপী নিয়মের অবস্থার পরিবর্ত্তন। বিশ্ব যখন নিয়মে পরিচালিত, তখন বিশ্বের অন্তর্গত যাবতীয় পদার্থ সেই একই নিয়মাধীন। সেই নিয়মে ফুল ফুটিতেছে,—সেই নিয়মে নদী ছুটিতেছে—সেই নিয়মে পাখী উড়িতেছে,—সেই নিয়মে পশু বিচরণ করিতেছে.—সেই নিয়মে তুমি হাসিতেছ, আমি কাঁদিতেছি, আবার তুমি কাঁদিতেছ, আমি হাসিতেছি;—সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, নিয়মই আমাদের নিয়ন্তা।

স্বাস্থ্য কি?—স্বাস্থ্য, এই নিয়ম প্রতিপালন, আর এই নিয়মের ব্যতিক্রমই অস্বাস্থ্য। জগতে এত হাহাকার—এত হা-হুতাশ কেন? এই নিয়মের অবহেলার জন্য। প্রাণিজগতের মধ্যে মানব জাতিই প্রধান অত্যাচারী। মানবই সকল নৈসর্গিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া অনৈসর্গিক অত্যাচারে—আপনাকে পীড়িত করিয়া ফেলে এবং রোগ শোকে জর্জ্জরীত হইয়া মৃত্যুর পথ সুগম করিয়া লয়। আমরা মরিবার জন্যই জন্মিয়া থাকি, তাই বলিয়া কি ভগবানের নিকট হইতে যে সর্ত্ত লইয়া মর্ত্তে আসিয়াছি, তাহা আয়ত্ত করিবার আগেই আমরা মরিব? আমরা জানি যে, জন্মিলে মৃত্যু আছেই, তাই মৃত্যুকে সর্ব্বদা নিকটস্থ জানিয়া ভগবানের নিয়ম প্রতিপালন পূর্ব্বক আপন আপন কার্য্যে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য।

আমরা যে এখানে আসিয়াছি, তাহার উদ্দেশ্য আছে। আমরা দেখিতে পাই—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সেই এক উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইতেছে। ক্রমবিকাশ হইতে পূর্ণবিকাশে উন্নতিই মানব জীবনের উদ্দেশ্য। এই জীবন সংগ্রামে (Struggle for existence) প্রকৃত বীরের মত বীরসাজে সজ্জিত হইয়া নীরোগ ও বলিষ্ঠ দেহ লইয়া যে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইবে, সেই জয়ী হইবে। তাই ইংরাজ কবি বলিয়াছেন:—

> In the bevouac of life
> Be not dumb driven cattle
> Be a hero in the strife."

বাস্তবিক এই জীবন সংগ্রামে জয়ী হইতে গেলে আমাদের স্বাস্থ্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। বধিরের শ্রবণেচ্ছা যেমন বৃথা, মূকের বাক্য স্ফূর্ত্তির চেষ্টা যেমন যন্ত্রণাদায়ক, অন্ধের দর্শনেচ্ছা যেমন নিস্ফল, স্বাস্থ্যহীনের সকল আশাই তেমনি নিস্ফল হয়,—ভবিষ্যৎ জীবন তেমনি তাহার মর্ম্মভেদী শোকান্ধকারে আবৃত থাকে। এই আঁধারময় জীবন লইয়া সে কি করিবে? স্বাস্থ্য ব্যতিরেকে তাহার কোন উদ্দেশ্যই তো সিদ্ধ হইবে না। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্।" সুস্থ শরীর ব্যতীত ধর্ম্ম ও অর্থ কিছুই আয়ত্ত হয় না। বেদান্ত মতে জগৎ মিথ্যা, মায়াময় স্বপ্ন, সুতরাং জগৎ হইতে সৃষ্ট যে এই শরীর—ইহাও মিথ্যা ও স্বপ্ন মাত্র; ভগবান গীতায় বলিয়াছেন:—

> "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি
> নরোঽপরাণি।
> তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি
> নবানি দেহী॥"

যাহা হউক যদিও এই দেহ কিছুই নয়, তথাপি ইহাই কিন্তু সব। এই দেহই দেবতার মন্দির (temple of God),—ইহারই ভিতর আত্মা বাস করেন। এই নশ্বর শরীরের সাহায্যেই আমরা ভগবানের উপাসনা করিতে পারি। মানবজন্ম কেবল

আহার নিদ্রা ও মৈথুনের জন্য নয়, ইহার উচ্চ লক্ষ্য আছে (the goal of life);—আত্ম-জ্ঞান মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। আত্ম-জ্ঞানেই পূর্ণ বিকাশ। শরীর ব্যতীত ইহা অসম্ভব। আবার নাম মাত্র শরীর থাকিলে চলিবে না—শরীর কর্ম্মক্ষম হওয়া চাই, শরীর সুস্থ ও সবল হওয়া চাই। এখন দেখা যাইতেছে যে, এই দেহ—ইহা মিথ্যা হইলেও ইহার যতখানি সত্যতা আছে, তাহা আমা-দিগকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে হইবে; স্বাস্থ্য আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

আমরা দেখিতে পাই—পশুরা আমাদের অপেক্ষা বলবান ও পূর্ণস্বাস্থ্য। তাহার কারণ, তাহারা স্বাভাবিক নিয়ম লঙ্ঘন করে না—প্রকৃতির মঙ্গলজনক নিয়ম তাহারা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করে, কাজেই তাহাদের মধ্যে ডাক্তার বা বৈদ্যের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু গৃহপালিত পশু বন্য পশু অপেক্ষা ক্ষীণ ও দুর্ব্বল। গৃহপালিত পশু—স্বাভাবিক নিয়ম ভঙ্গ করে, তাই তাহারাও অত্যাচারী মানবের ন্যায় স্বাস্থ্যহীন। সুতরাং তাহাদেরও জন্য ডাক্তার (Veterinary surgeon) হইয়াছে। যাহার যেমন স্বভাব, সে অপরকেও সেই ছাঁচে ঢালিতে চায়। গৃহ পালিত পশুদিগকে আমরা আমাদের মতই করিয়া তুলিতে চাই, তাই তাহাদের দশাও আমাদের মতই হইয়াছে।

এ স্বাভাবিক নিয়ম প্রতিপালনের ব্যবস্থা আমাদের দেশে সুন্দরভাবেই ছিল এবং তাহা প্রতিপালিতও হইত। ভবিষ্যতে স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আমাদের বহুপ্রকার নিয়ম পালন করিতে হইত। সেই সকল নিয়ম পালন করিয়া যে দ্বিতীয় আশ্রমে উপনীত হইত, সে জীবনে কখনো দুঃখ পাইত না,—বিদ্যা বুদ্ধি শৌর্য্যে ও বীর্য্যে মণ্ডিত হইয়া সুন্দর স্বাস্থ্য ভোগ করিত। তুমি মেধাবী, বুদ্ধিমান হইতে পার, কিন্তু তোমার যদি স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া থাকে, তবে তুমি মেধা ও বুদ্ধি লইয়া কি করিবে? তোমার জীবন বৃথা—জীবন তোমার পক্ষে ভার বহন বলিয়া বোধ হইবে। তোমার সুখ-শান্তি, আমোদ প্রমোদ দূরে,—বহুদূরে পলায়ন করিবে,—তুমি নিয়ত মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিবে, তুমি জীবন্মৃত্যু (life-in-death) হইয়া থাকিবে। সে কষ্টের সে যন্ত্রণার—সে মর্ম্মান্তিক বেদনার তুলনা—হয় না। স্বাস্থ্যহীন জীবন চিন্তা করিলে চোকে অন্ধকার দেখিতে হয়—মাথা ঘুরিয়া যায়। এমনও শুনিতে পাওয়া যায় যে, স্বাস্থ্য ভঙ্গের জন্য বিষম অন্তর্দাহে কেহ কেহ আত্ম-ঘাতীও হইয়াছে। কিন্তু ইহার মত পাপ বোধ হয় জগতে আর দ্বিতীয় নাই।

যখন ভাবি যে, এই স্বাস্থ্য ও শরীর রক্ষার জন্য আমাদের শাস্ত্রকারগণ কতই পরিশ্রম করিয়াছেন, তখন আশ্চর্য্য হইয়া যাই। তাঁহারা কি স্বদেশ প্রেমিক। তাঁহারা স্বদেশ ও স্বজাতির বংশধরদিগের রক্ষার জন্য কত ধর্ম্মশাস্ত্র, কত যোগ শাস্ত্র,-আয়ুর্ব্বেদ ও কামশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। বাস্তবিক দেখিতে গেলে আমাদের সকল শাস্ত্রেই শরীর রক্ষা ও শরীর পালন সম্বন্ধে লিখিত। আমার বোধ হয় শারীর বিজ্ঞান (hygiene) সম্বন্ধে ভারতবর্ষ সর্ব্ব প্রধান ও মৌলিক। আমরা এখন অত্যাচারী ও প্রবঞ্চক হইয়াছি, ঋষি কথিত শরীরপালনের নিয়ম অনুসরণ করি না। সে সকল নিয়ম পালন করিতে গেলে আধুনিক সভ্যজগতের পারিপার্শ্বিক কতকগুলি অত্যাবশ্যক—খাঁটি কথায় বলিতে গেলে—[illegible]

পায়। অবশ্য দেশ-কাল-পাত্র ভেদে ফল ভেদ হয়; এখন যেমন কাল উপস্থিত, আচার ব্যবহারও সেইরূপই হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য—ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া অনেকে চীৎকার করেন বটে, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য বলিলে যাহা বুঝায়, সে রকম ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ প্রাচীন কালের মত ব্রহ্মচর্য্য এখন পালন করা বড়ই কঠিন। ব্রহ্মচর্য্যের প্রধান অর্থ বীর্য্যধারণ। বীর্য্যধারণই শারীরিক উন্নতির প্রধান সহায়। এই উদ্ধরেতঃ হইতে গেলে আমাদিগকে ব্রহ্মচর্য্যের সকল নিয়মই পালন করিতে হয়। এখন আর সে রকম গুরুর আশ্রম নাই; আপন আপন গৃহকেই ব্রহ্মচারীর আশ্রম করিয়া লইতে হইবে। পঞ্চম বর্ষীয় বালককে ব্রহ্মচারীর ব্রতে দীক্ষিত করিতে হইলে গৃহে গুরুর আবশ্যক। আমাদের কিন্তু তেমন গুরুর অভাব। গৃহে মাতা পিতরাই গুরুর কাজ করা উচিত। কিন্তু যাঁহারা গুরু হইবেন, তাঁহারা ব্রহ্মচারী নহেন, সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয় পরায়ণ, সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা কাজ হইবার আশা বড়ই কম। সবল, স্বাস্থ্যসম্পন্ন সন্তান পাইতে ইচ্ছা করিলে মাতা-পিতারও সবল ও সুস্বকায় হওয়া উচিত। "পুত্রার্থে ক্রিয়তেভার্য্যা' এই কথা মনে করিয়া স্ত্রী সহবাস করিতে হইবে—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য পবিত্র বিবাহবন্ধন নহে। পিতা-মাতা বা অভিভাবকগণ নিজে নিজে সংযমী হইলে পুত্রকন্যাদিগকেও সংযমী করিতে পারেন। যেমন বৃক্ষ তেমনি তার ফল হইবে। সংযম ব্যতীত স্বাস্থ্যবান হওয়া বড়ই কঠিন। সংযমই স্বাস্থ্যের ভিত্তি- (control over one's senses is the basis of perfect health)।

শিশু স্বাস্থ্য জননীদের উপর নির্ভর করে। তাঁহারা যদি একটু বিলাসিতা বর্জ্জন করিয়া সন্তানগনকে প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে প্রতিপালন করেন, তাহা হইলে শিশু হৃষ্ট পুষ্ট হয় ও পরে বেশ স্বাস্থ্যবান পুরুষ হইয়া উঠে। এই সময়ে যেমন অভ্যাস করান যাইবে, সারাজীবন সেই অভ্যাস থাকিয়া যাইবে। পূর্ব্বে জননীরা নবজাত শিশুকে সর্ষপ তৈলাক্ত করিয়া রৌদ্রে রাখিয়া দিতেন, এখন তাহার পরিবর্ত্তে তাহাকে জামা প্রভৃতি পরাইয়া দেওয়া হয়—পাছে শিশু রৌদ্রে তাপে কাল, হইয়া যায় বা বাতাসে তাহার ঠাণ্ডা লাগে। ইহাদের কার্য্যকলাপ দেখিলে বোধ হয়, পূর্ব্বে যেন রৌদ্র ও জল বায়ু ছিল না। এইরূপে প্রকৃতির ক্রোড় হইতে কাড়িয়া লইয়া জননীরা শিশুদিগকে স্বাস্থ্যহীন করিয়া রাখেন। এই শিশুই কালে মানুষ হইবে। এই রুগ্ন সন্তানগণ ও তাহাদের বংশধরগণ কতদিন জীবিত থাকিবে—তাহা জনক জননীরা একবার ভাবিয়া দেখুন।

তারপর আহার। অধুনা যেরূপ খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন রাখা বড় দুরূহ ব্যাপার। খাঁটি দ্রব্য পাওয়া ভার হইয়াছে। সকল দ্রব্যই ভেজাল মিশ্রিত। স্বাস্থ্যান্বেষীকে বড়ই সতর্ক থাকিতে হইবে।

স্বাস্থ্যসম্বন্ধে এত কথা বলা যাইতে পারে যে, এক মাসের আয়ুর্ব্বেদ একটা প্রবন্ধেই পূর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু তাহা করিলে তো চলিবে না তাই প্রধান প্রধান কারণ উপরে দেখাইয়া আমি প্রবন্ধ আজিকার মত এইখানেই করিলাম।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র প্রামা।

পঞ্চকর্ম্ম সাধন।

—:০:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

অশোধিতে পীতৌষধ জীর্ণ হ'লে পরে।
পুনঃ পান বিধি নহে, অতিযোগ করে॥
কোষ্ঠের গুরুতা, বল. লঘুতা বুঝিয়া।
অযোগে মৃদু বা তীক্ষ্ণ দিবে বিচারিয়া॥
বমি কৃচ্ছ্রে, না বুঝিয়া বমি বিরেচন।
দিলে ক্রমে প্রাণ হানি হয় সেকারণ॥
অস্নিগ্ধ, অস্বিন্ন আর রুক্ষ যেই হয়।
পুরাণ ঔষধে তার দোষোৎক্লিষ্ট রয়॥
হরণ করিতে তাহা না পারি, তখন।
নিম্নোক্ত বিবিধ রোগ করে উৎপাদন॥
বিভ্রংশ প্রবল হিক্কা, আঁধার দর্শন
কণ্ডূঃ গুরুঃ অবসাদ, নিশ্চয় তখন॥
সিদ্ধি সিন্ন হইলে'ও অল্প মাত্রা তরে।
কিম্বা দীপ্তাগ্নিতা হেতু ঔষধ জীর্ণ করে॥
অথবা শীতোভারে আমস্তব্ধ হয়।
দোষোৎক্লিষ্ট করে তবে ঔষধ নিচয়॥
নিঃসাধিত কবিতে না পারিয়া তখন।
উল্লিখিত রোগ সব করে উৎপাদন॥
ঐরূপ অযোগ হ'লে বৈদ্য বুদ্ধিমান।
নিম্নোক্ত চিকিৎসা তরে করিবে বিধান॥
লবণ মিশ্রিত তৈলে অভ্যঙ্গ করিবে।
প্রস্তর-সঙ্কর স্বেদে স্বিন্ন করি নিবে॥
পূর্ব্বোষধ খাদ্য জীর্ণ হইবার পর।
গোমূত্রে নিরূহ দিতে হইবে তৎপর॥
ধন্বা মাংস-রস সহ করায়ে আহার।
অনুবাসন বস্তি তারে দিবে পুনর্ব্বার॥

তৈল মাত্রা-অনুযায়ী মদন, পিপুল,
দেবদারু কল্ক ক্বাথে পাকিবে নির্ভুল,
অনন্তর বাতহর তৈলে স্নিগ্ধ করে।
সুতীক্ষ্ণ ঔষধ দান করিবে তাহারে॥
ক্ষুধার্থ ও মৃদু কোষ্ঠে তীক্ষ্ণ বিরেচন।
বিষ্ঠা. পিত্ত, কফ আগে করিবে হরণ॥
ধাতু দ্রবীভূতকারি নিস্রবে তৎপরে।
তাহাতে উহার বল স্বর ক্ষয় করে॥
দাহ, কণ্ঠশোষ আর ক্লান্তি, তৃষ্ণা হয়।
তাকে মিষ্টৌষধে বমি করাবে নিশ্চয়॥
বমনের অতিযোগে দিবে বিরেচন।
বিরেচন-অতিযোগে মৃদুল বমন॥
পরে পরিষেক আদি শীতাবগাহন।
করায়ে ভিষক তারে করিবে স্তম্ভন॥
অন্নপানৌষধ যাহা মধুর কষায়।
শীতল ও রক্তপিত্ত অতিসার যায়॥
দাহ জ্বর যাহা হ'তে হয় নিবারণ।
তাহাই এরূপ স্থানে হইবে স্তম্ভন॥
রসাঞ্জন, বেণামূল. লোহিত চন্দন।
পেষি, ছাগরক্ত চিনি করিয়া মিলন॥
গুলিয়া করিলে পান লাজ চূর্ণ সহ।
বিরেচনে অতিযোগ নাশে নিঃসন্দেহ॥
বটাদি বৃক্ষের বৃন্ত শেয়ার সহিত,
সিদ্ধ করি শীতলিয়া মধুর সহিত,
কিম্বা মলসংগ্রাহক ঔষধের সহ।
দুগ্ধ সিদ্ধ করি [illegible]

বিরেচনে অতিযোগ হইলে তখন।
জাঙ্গল রসের সহ করিবে ভোজন॥
অতিসারে পিচ্ছাবস্তি করিবে প্রদান।
দুগ্ধ ঘৃতে স্নিগ্ধ স্বাদু অনুবাসন দান॥
বমনের অতিযোগে-মুখে, আমাশয়ে।
সুশীতল জল দিবে তার ক্রমান্বয়ে॥
নিম্বুক ফলের রসে লাজ শক্তু আদি!
ঘৃত মধু চিনি যোগে পান করা বিধি॥
সোদ্গার বমি ও মূর্চ্ছা হ'লে মধুসহ।
ধনে, মুতা, যষ্টিমধু, রসাঞ্জন দেহ॥
বমি হেতু জিহ্বা অন্ত প্রবিষ্ট হইলে।
হিতকর, স্নিগ্ধ অম্ল নোনা রস দিলে॥
হৃদগ্রাহী যূষপান, দুগ্ধ-মাংস রসে।
কবল প্রয়োগ তারে করিবেক শেষে॥
বমি বেগে জিহ্বা যদি বহির্গত হয়।
পিষ্ট তিল কিস্‌মিস্ কল্ক লেপে তয়॥
বাগ্ লুপ্ত, বাগ্ রোধ হইলে তাহার।
স্নেহ স্বেদ, মাংস সিদ্ধ যবাগূ আহার॥
বমিত, বা বিরেচিত মন্দাগ্নি লক্ষিত।
অগ্নি বল বৃদ্ধি তরে পেয়াদি বিহিত॥
বহু দোষ, রুক্ষ আর হীনাগ্নি যে জন।
কিম্বা উদাবর্ত্ত রোগে অল্প বিরেচন॥
দোষোৎক্লিষ্ট করি তাতে মার্গ রোধ করে।
অত্যন্ত আধ্মান হয় নাভির উপরে॥
পৃষ্ঠ পার্শ্ব শিরঃশূল, বিষ্ঠা মূত্র আর।
বায়ুর বিবন্ধ হয় তাহাতে আবার॥
অভ্যঙ্গ, স্বেদ ও বর্ত্তি তাহাতে বিহিত।
নিরূহ, অনুবাসন, উদাবর্ত্তোচিত॥
স্নিগ্ধ, গুরুকোষ্ঠ কিম্বা আমদোষে যেই,
শোধন ঔষধ সেবে বলবৎ, সেই।
কিম্বা ক্ষীণ, মৃদু কোষ্ঠ, ক্লান্ত, অল্প বলে—
ঐরূপ ঔষধ পান করে যে সকলে,
তার সাম দোষ আশু পায়ু স্থানে যায়।
তীব্র শূল পিচ্ছারক্তে বেদনা জন্মায়॥
তাহাতে লঙ্ঘন আর পাচন তৎপরে.
রুক্ষোষ্ণ লঘু ভোজনে অতিহিত করে॥
আর ক্ষীণ ব্যক্তিদের ঐ বিঘ্ন হ'লে।
বৃংহনীয়, জীবনীয় ঔষধ সে স্থলে॥
আমাজীর্ণ হেতু যদি বিবন্ধ জন্মায়।
ক্ষারাম্ল লঘু ভোজন প্রশস্ত তাহায়॥
বাতাধিক্য হ'লে পুষ্প কাসী মিশ্রিত।
লবণ-দাড়িম-ক্ষার ঘৃতে হয় হিত॥
বাতাধিক্যে পান কিম্বা করিবে ভোজন।
দধ্যম্লে দাড়িমত্বক করিয়া মিশ্রন॥
দেবদারু তিলকল্ক অথবা তেমন।
উষ্ণ জল সহ পানে হয় প্রশমণ॥
অশ্বথ, যজ্ঞডুমুর, কদম্ব, পাকুড়,
দুগ্ধ সিদ্ধ করি পানে হয় তাহা দূর॥
কষায় মধুর দ্রব্যে, পিচ্ছাবস্তি কিবা,
যষ্টিমধু সিদ্ধ স্নেহ বস্তি তাকে দিবা॥
বহুদোষে দিলে পরে অল্প বিরেচন।
দোষোৎকৃষ্ট করিকরে অল্প নিঃস্রাবন॥
তাতে কণ্ডু, শোথ কুষ্ঠ গুরুতা উদয়।
অগ্নিনাশ উৎক্লেশ স্তৈমিত্য জন্মায়॥
অরুচি, পাণ্ডুতা, শোষ পরিস্রাব হবে।
ত্রিদোষ শমনৌষধে প্রশমিত রবে॥
তাতে যদি নহে শান্তি করাবে বমন।
তদন্তে করিয়া স্নিগ্ধ তীক্ষ্ণ বিরেচন॥
রোগী শুদ্ধ হ'লে পরে চূর্ণ ও আসব।
অরিষ্ট সংস্কৃত যূষ, প্রদানিবে সব॥
ঔষধ সেবিয়া বেগ করিলে ধারণ।
ত্রিদোষ প্রকোপি, করে হৃদয়ে গমন
ঘোরতর হৃদগ্রহ তাহাতে জন্মায়।
হিক্কা, শ্বাস, পার্শ্বশূল, দৈন্য হয় তায়.
দৃষ্টির বিভ্রম, নাসা, দশন দংশন।
দন্ত কিড়মিড়ি তার করে উৎপাদন॥

তাহাতে জীবক নাহি বিচলিত হবে।
রোগীকে তখন শীঘ্র বমন করাবে॥
সিপত্ত্যাপাধিক্য হলে মূর্চ্ছা ঔষধ মধুর।
কফাধিক্যে কটুযোগে করে তাহা দূর॥
তাহাতেও দোষ যদি না হয় নিঃশেষ।
পাচক ঔষধে তবে নাশিবেক শেষ॥
ক্ষুধা বলক্রমে তার করিয়া বর্দ্ধন।
চিকিৎসক করিবেক কার্য্য সমাপন॥
বায়ু যদি করে তার হৃদয় পীড়ন।
স্নিগ্ধায় লবণৌষধে হবে তা শমন॥
পীতৌষধে বমিবেগ করিলে ধারণ।
কুপিত কফেতে বায়ু রোধিয়া তখন।
অঙ্গগ্রহ, স্তব্ধ আর বেপথু জন্মায়॥
নিস্তোদোবেষ্টন অতি মূর্চ্ছা হয় তায়॥
এইরূপ হলে হয় বিবিধ প্রকার।
বাত হর ক্রিয়া স্নেহ স্বেদ ব্যবহার॥
লঘুভোজী মৃদুকোষ্ঠে তীক্ষ্ণ বিরেচন।
দোষ হরি মস্থিকরে শোণিত হরণ॥
অন্নে মিশাইয়া তাহা কাক বা কুক্কুরে,
খাওয়াইবে শুদ্ধাশুদ্ধ পরীক্ষার তরে॥
বিশুদ্ধ জানিবে যদি করে তা ভক্ষণ;
অভক্ষণে পিত্ত রক্ত বুঝিবে তখন॥
কিম্বা শুক্ল বস্ত্রে মাখি লবে শুকাইয়া।
দেখিবে তৎপর তাহা জলে প্রক্ষালিয়া॥
বিবর্ণ হইলে তাহা পিত্ত রক্ত হবে।
বিশুদ্ধ হইলে রক্ত বসনে না রবে॥
অতিযোগে তৃষ্ণা মূর্চ্ছা মত্ততাদি হলে।
আমরণ পিত্তহর ক্রিয়া সেই স্থলে॥
মৃগ, গো, মহিষ কিম্বা ছাগল শোণিত
পীড়িতাবস্থায় তাহা করিয়া নিঃসৃত,
অতিশয় রক্তক্ষয়ে করিলে তা পান।
জীবন লভিবে তাহা জীবাতি সন্ধান॥
কুশ মূল কল্কে তাহা করিয়া মর্দ্দিত।
বস্তি প্রয়োগেতে আর হয়ে থাকে হিত॥
গাম্ভারী, অনন্তমূল, দুর্ব্বা, বীরা, কুল,
কল্কে জলযুক্ত দুগ্ধ চতুর্গুণ তুল,
পাক করি তাতে ঘৃত রসাঞ্জন যোগে,
শীতলাবস্থায় বস্তি ইহাতে প্রয়োগে।
সুশীতল পিচ্ছাবস্থি অথবা প্রয়োগী।
অনুবাসন ঘৃত মণ্ডে দিবে সেই রোগী॥
অতিশয় বিরেচনে গুদভ্রংশ হলে।
কষায় বসাবে স্তব্ধী বটাদি বল্কলে॥
অতি স্নিগ্ধে সেবে যদি স্নেহ বিরেচন।
দোষে তাহা বদ্ধ করে মৃদুতা কারণ॥
স্বস্থান হইতে চ্যুত হইয়া তখন।
স্তব্ধ হয়ে থাকে কিন্তু নহে নিঃসরন॥
ইহাতে বাত বিবন্ধ, গুদস্তম্ভ শূল,
অল্প অল্প সরে মল, না হয় নির্ম্মূল॥
এইরূপে স্থলে তীক্ষ্ণ বস্তি, বিরেচন।
অথবা প্রশস্ত হয় লঙ্ঘন পাচন।
রুক্ষ অল্পবলে দিলে রুক্ষ বিরেচন।
ঘোর উপদ্রব করে কুপিত পবন।
স্তব্ধ শূল সর্ব্বদেহে হয় ঘোরতর।
ইহাতে স্নেহ স্বেদাদি দিবে বাত হর।
স্নিগ্ধ গুরু কোষ্ঠে দিলে মৃদু বিরেচন।
কফোৎক্লিষ্ট পিত্তবাত রুধিয়া তখন,
তন্দ্রা ও গৌরব, ক্লান্তি দৌর্ব্বল্য জন্মায়।
অঙ্গ অবসাদ হবে নিশ্চয় তাহায়॥
পীতৌষধ শীঘ্র ফেলি করাবে বমন।
পরে দিবে ক্রমান্বয়ে লঙ্ঘন পাচন।
স্নিগ্ধ ও গুরু কোষ্ঠতা দূর করি পরে।
তীক্ষ্ণ বিরেচন দিবে স্নেহ যোগ করে।

শ্রীরামবিহারী রায় কবিকঙ্কণ।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

—:০:—

ইংলণ্ডে কবিরাজী।—শ্রীযুক্ত এস্, মিত্র বিলাতের বোরণ্‌মাউথ নগরে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় কঠিন কঠিন রোগ আরোগ্য করিতেছেন জানিয়া আমরা সুখী হইলাম। কামানের ভীষণ শব্দে সর্ব্ব শরীর কম্পনের ফলে স্নায়ুমণ্ডলীতে বিকার উপস্থিত হইয়াছে—এমন কতকগুলি যোদ্ধাকে তিনি আরোগ্য করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। রক্তদুষ্টি ও পারদ বিকৃতির কয়েকটি রোগীকেও তিনি নিরাময় করিয়াছেন।

মান্দ্রাজে কুষ্ঠাশ্রম।—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গবর্ণর বাহাদুর সেখানকার কুষ্ঠরোগীদিগের আশ্রম নির্ম্মাণ ও সেবার ব্যবস্থা করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন জানিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইলাম। এই কার্য্যের সাফল্যের জন্য ৩০ হাজার টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইবে। রামনাদের রাজা বাহাদুরের উপর এই চাঁদা সংগ্রহের ভার অর্পিত হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে এরূপ একটা ব্যবস্থা হয় না?

বিদ্বৎসভার বিদ্যালয়।—সহযোগী "ধন্বন্তরি" পত্রে প্রকাশ,—বিদ্বৎসভা হইতে এরূপ একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে, যে বিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা অধিক থাকিবে অথচ বিশ্ব বিদ্যালয়ের matriculation পরীক্ষাদানোপযোগী ইংরাজী ভাষা শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হইবে। এরূপ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য—বৈদ্য ছাত্রগণ সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শী হইলে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার পথ তাঁহাদিগের পক্ষে সুগম হইবে। আমরা এই চেষ্টার সাফল্য কামনা করি।

আয়ুর্ব্বেদ কলেজ সম্বন্ধে "নায়ক"।—আয়ুর্ব্বেদ কলেজ সম্বন্ধে গত ২৯শে জ্যৈষ্ঠের 'নায়ক' লিখিয়াছেন,—"কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদীয় কলেজটির ৪র্থ বর্ষ আরম্ভ হইতেছে। এই কলেজের বাঙ্গালা বিভাগে চারি বৎসরে ও সংস্কৃত বিভাগে পাঁচ বৎসরে শিক্ষা সমাপ্ত হয়, সুতরাং আর এক বৎসর পরেই বাঙ্গালা বিভাগের ছাত্রগণ উত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করিবেন। এই কলেজে শল্য-শালাক্য প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষা দান করা হয়, সেইজন্য উত্তীর্ণ ছাত্রগণ ডাক্তারী ও কবিরাজী—উভয় চিকিৎসাতেই কৃতিত্ব দেখাইয়া দেশে সুচিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়। কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনী ভূষণ এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা হইলেও এই কলেজ এক্ষণে রেজেষ্টারিভুক্ত সাধারণের সম্পত্তি। ভারতের নানা প্রদেশের ছাত্রও এখানে অধ্যয়নের জন্য আসিতেছে। এই কলেজের কল্যাণে সুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদের যুগ আবার ফিরিবে আশা করা যায়।"

কুষ্ঠরোগে চালমুগ্‌রা।—কয়েক মাস পূর্ব্বে কলিকাতা চৌরঙ্গী অঞ্চলে 'ইয়ংমেন্স ক্রিশ্চান অ্যাসোসিয়েসন'' সভার প্রাসাদে কুষ্ঠরোগীগণের প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এক সভা বসিয়াছিল। ঐ সভায় বঙ্গেশ্বর লর্ড রোণাল্ডশে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ বঙ্গেশ্বরের বক্তৃতা হয়। তাহার পর স্যার লিওনার্ড রজার্স এ সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন, তাহার এক স্থলে তিনি বলেন, যে,—চাউল মুগরার তৈল হইতে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় একপ্রকার ঔষধ বাহির করিয়া তিনি কয়েকজন কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য করিয়াছেন। এই ঔষধ প্রস্তুত ব্যাপারে রায় চুনিলাল বসু বাহাদুর প্রমুখ কয়েকজন রসায়নবিদের কৃতিত্বের কথাও তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদবেত্তাগণ কিন্তু এই চালমুগরার কুষ্ঠ নাশক গুণ বহুপূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। 'চাল মুগরা'র অন্যতম নামই এইজন্য "কুষ্ঠ বৈরী"। ইহার নামের পর্য্যায় ও গুণ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এইরূপ আছে,—

"কুষ্ঠ বৈরী শৈলরোহী মহাগদ মহীরুহঃ ॥
বৈবস্বতদ্রুমঃ সস্বাদ্‌ বলকৃচ্চ রসায়নঃ ॥
পামা বিচর্চ্চিকা কণ্ডু সিধ্মোদর্দ্দ বিপাদিকাঃ।
হস্ত্যামবাতং বাতাস্রং কুষ্ঠানি চ বিশেষতঃ ॥
অস্য ফলস্য বীজং তত্তৈলঞ্চ, গ্রহণীয়ম। বীজস্য মাত্রা ৬ রক্তিকাঃ, তৈলস্য ৪ বিন্দবঃ।

অর্থাৎ "চালমুগরা'র পর্য্যায় এইগুলি—কুষ্ঠবৈরী, মহাগদ, মহীরুহ ও বৈবস্বতদ্রুম। ইহা বলকর ও রসায়ন। পামা, বিচর্চ্চিকা, কণ্ডু, সিধ্ম, উদর্দ্দ বিপাদিকা, আমবাত, বাতরক্ত ও কুষ্ঠরোগে, প্রয়োজ্য। ইহার ফলের বীজ ও উহার তৈল ব্যবহার্য্য। বীজের মাত্রা ৬ রতি, তৈলের ৪ বিন্দু।

সর্পাঘাতে মুরসী—"জঙ্গীপুর সংবাদে" প্রকাশ,—"জঙ্গীপুরে উকীল থানার একজন কেরাণী সর্পদংশনে আক্রান্ত হন। একজন কাজী তাঁহার ক্ষত স্থানের নিকট ক্ষুর দিয়া চিরিয়া মুরগী লাগাইতে আরম্ভ করেন। ইহাতেই ঐ কেরাণী আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।" এরূপ চিকিৎসা কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের বহির্ভূত বিষয় নহে।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের নূতন ব্যবস্থা।—সংপ্রতি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের যে নূতন ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে বোর্ড অব ট্রাষ্টির প্রেসিডেন্ট হইয়াছেন,—অনারেবল সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী এম, এ, ডি এল এবং কলেজ কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট হইয়াছেন—মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম, এ, এল. এম, এস। পাঠকগণ এ সংবাদে নিশ্চয়ই সুখী হইবেন।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য।—আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক সমাজে শল্য-শলাকা প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের প্রায় সকল অঙ্গেরই লোপ পাইয়া এখনকার দিনে কেবলমাত্র কায় চিকিৎসাই চলিয়া আসিতেছে। উহারই জন্য কিন্তু বর্ত্তমান যুগে আয়ুর্ব্বেদ মাথা তুলিতে পারিতেছে না। সেইজন্য লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদের যুগ আবার ফিরাইয়া আনিবার জন্য জগতের আদি চিকিৎসা আয়ুর্ব্বেদের অতীত গৌরব আবার পুনরুদ্ধার করিবার জন্য—ফলমূলাদি আর্য্য ঋষিদিগের জ্ঞান গভীর গবেষণা যে সমস্ত বিশ্ববাসীকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করিবার জন্য এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। শরীর লইয়া চিকিৎসা করিতে হইলে আগেই শারীর তত্ত্বে জ্ঞানার্জ্জন কর্ত্তব্য। সেই জন্য আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থগুলি ভিন্ন অ্যানাটমী, সার্জ্জারী, ফিজিওলজির শিক্ষায় ছাত্রদিগকে চিকিৎসা বিষয়ক সম্পূর্ণ জ্ঞান সম্পন্ন করাই ইহার উদ্দেশ্য

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৩য় বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৬—শ্রাবণ। | ১১শ সংখ্যা।

কাজের কথা।

—:*:—

বাঙ্গালীর ব্যাধি।—আমরা অনেক বারই বলিয়াছি সকল প্রকার আধিব্যাধিতে বাঙ্গালী যত ভুগিয়া থাকে, এমন আর কোনো দেশের লোককে ভুগিতে দেখা যায়না। বাঙ্গালীর অকালবার্দ্ধক্য এবং অকালমৃত্যুর হারও এইজন্য পৃথিবীর সকল দেশের অপেক্ষা অধিক! ইহার প্রধান কারণ—বাঙ্গালীর মত সংযমবিহীন জাতি পৃথিবীর আর কোনো দেশে নাই। সুসভ্য ইংরাজজাতি—যে জাতির রীতি নীতির অনুকরণের সকলটুকু গ্রহণ করিবার জন্য আমরা সর্ব্বদা লালায়িত হইয়া থাকি, সেই জাতির পঞ্চম বর্ষীয় শিশুটি পর্য্যন্ত একটা নিয়মের বন্ধনে চলিয়া থাকে। বাঙ্গালীর সেইটিরই অভাব। ইংরাজজাতির মধ্যে দরিদ্রই হউন, মহৎই হউন, সকলের পক্ষেই সকল বিষয়েরই যে নির্দ্দিষ্ট সময় আছে, তাহা কেহ উল্লঙ্ঘন করেনা। ইংরাজ ঠিক সময়ে আহার করিয়া থাকে, ঠিক সময়ে কর্ম্ম করিয়া থাকে; ঠিক সময়ে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিয়া থাকে। বাঙ্গালীর অনেক সময় এই তিনটীর মধ্যে কোনোটিরই নিয়ম ঠিক থাকে না। সকল চিকিৎসা শাস্ত্রেই আহার-বিহারের নিয়ম উলঙ্ঘন সকলপ্রকার রোগ-উৎপত্তির কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ফলে এখনকার নিয়মবিহীন বাঙ্গালীজাতি তাহারই ফলভোগ করিতেছে।

* * *

নিয়ম লঙ্ঘনের হেতু।—নিয়ম লঙ্ঘনের প্রধান হেতু এখনকার বাঙ্গালী যে পরিমাণ অর্থ উপার্জ্জন করে, তাহাতে তাহার সংকুলান হওয়া শক্ত, কাজেই তাহাকে পরিশ্রমের মাত্রা বাড়াইতে হয়। বি-এ, এম-এ পাশ করিয়া—অগাধ বিদ্যা অর্জ্জন পূর্ব্বক অনেকে যেরূপ চাকরি করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার কলিকাতার মত ব্যয়বহুল স্থানে অবস্থিতিপূর্ব্বক সংসার প্রতিপালন করা সম্ভব

পর নহে, সেই জন্য তাঁহাকে ছাত্র পড়াইয়া বা অন্য কিছু করিয়া প্রাতে অপরাহ্নে—এখন কি রাত্রিতে পর্য্যন্ত অর্থ উপার্জ্জনের পন্থা পরিষ্কৃত করিতে হয়, ফলে এরূপ পরিশ্রমে স্বাস্থ্যের অপচয় স্বভাবতঃই ঘটিয়া থাকে। দরিদ্রতার নিষ্পীড়নে অর্থ অর্থ করিয়া যাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়—তাহাদিগের ভাগ্যে পুষ্টিকর আহার্য্যলাভ যে অসম্ভব—তাহা আর বলিতে হইবে না। এই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম ও পুষ্টিকর আহারের অভাব—বাঙ্গালী জাতির স্বাস্থ্যহানির একটা বিশেষ কারণ।

* * *

বাঙ্গালী-ধনীর স্বাস্থ্যহানি।—তাহার পর দেশের মধ্যে যাহারা বড় লোক—যাঁহাদিগকে পরিশ্রম করিয়া খাইতে হয় না—তাহাদের মধ্যে অনেকের যে অকাল বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইতে দেখা যায়—তাহার কারণও সংযমের অভাব। প্রভূত সম্পদের অধিকারী করিয়া দুশ্চিন্তার হাত হইতে ভগবান তাঁহাদিগকে অব্যাহতি দিলে কি হইবে,—স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে সকল নিয়ম পালনের আবশ্যক, অনেক সময়ই তাঁহারা তাহার বিঘ্ন ঘটাইয়া থাকেন। পুষ্টিকর আহার—তাঁহাদের ভাগ্যে যথেষ্ট জুটিয়া থাকে—কিন্তু যেরূপ পরিশ্রম করিলে সেই আহার্য্য পরিপাক প্রাপ্ত হয়—দেশের ধনকুবেরদিগের অনেকেরই তাহার প্রতি লক্ষ্য নাই। ইংরাজ জাতি—যাহাদিগের অনুকরণ-স্রোতে আজি বঙ্গজননী মগ্নপ্রায়া হইয়া পড়িয়াছেন—কায়িক পরিশ্রম যে স্বাস্থ্যোন্নতির মূল, সে কথাটা তাঁহারা ভালরূপই বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের বাঙ্গালী-গরীবের সংসার প্রতিপালনের জন্য কায়িক পরিশ্রমের অবসর নাই—আর বাঙ্গালী কুবেরদিগের আলস্য পরতন্ত্রতার জন্য তাহার সুযোগ নাই। ইহার উপর বিলাস-বাসনা পরিতৃপ্তির ফলেও অনেকে স্বাস্থ্যের অপচয় ঘটাইয়া থাকেন। ফলে আলস্য পরতন্ত্রতা এবং বিলাসবাসনা পরিতৃপ্তির ফলই বাঙ্গালী ধনীর স্বাস্থ্যহানির কারণ।

* * *

আগেকার বাঙ্গালী।—আগেকার বাঙ্গালী তো এরূপ ছিল না, সেইজন্য আগেকার বাঙ্গালীরা এত রোগেও ভুগিতনা। ধনী দরিদ্রের সৃষ্টি যে দেশে শুধু এখনই হইয়াছে,—আগে ছিল না, তাহা নহে, সেকালেও দরিদ্রকে খাটিয়া খাইতে হইত—কিন্তু এরূপ ভাবে নহে। তাহার কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি—এখন সংসার প্রতিপালনের জন্য অর্থের প্রয়োজন এত বেশী হইয়াছে যে, সমস্ত দিন প্রাণান্ত পরিশ্রম না করিলে উপায় নাই। আর বড়লোকদিগের কথা—সেকালে আমাদের দেশে একালের মত এরূপ ব্যসনবাত্যা উপস্থিত হয় নাই সুতরাং সেকালে দেশের বড়লোকদিগের মতিগতিও বিলাস-বাসনায় প্রবাহিত হইত না। সেকালে ধনী দরিদ্র সকলেই প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিতেন—সে শয্যাত্যাগের পর এখনকার মত চায়ের বাটি তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করা হইত না, শয্যাত্যাগের পর হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করা হইলে, সকলেই আয়ুর্ব্বেদিকের তৈলের অভ্যঙ্গ করিয়া স্নানের ব্যবস্থা করিতেন। গ্রীষ্মপ্রধান বাঙ্গালা দেশে সে প্রাতঃস্নানে দেহ স্নিগ্ধের জন্য অমৃত সেবনের ফল ফলিত। তাহার পর পূজা অর্চ্চনা শেষ করিয়া যে জলযোগের ব্যবস্থা হইত, তাহাতে স্নিগ্ধ—অথচ পুষ্টিকর দ্রব্যের ব্যবস্থা হইত। যাহার অন্য জলযোগ ঘটিত না, সেও এক বাটি ধারোষ্ণ দুগ্ধ পান করিত।

এখন সে দুগ্ধ পান তো দুগ্ধ প্রাপ্তির অভাবে একেবারেই অসম্ভব। ফলে বাঙ্গালীর এই পরিবর্ত্তন স্রোতঃই বাঙ্গালীকে স্বাস্থ্যহীন করিয়া তুলিয়াছে।

* * *

বাঙ্গালী মহিলা।—বাঙ্গালীমহিলারা ও সেকালে যেরূপ পরিশ্রম করিতেন, এখন তাহারও ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। যে সংসারের অবস্থা উন্নত, সে সংসারের মহিলাদিগকে নাটক নবেল পাঠ এবং সীবন-বনন কার্য্য ভিন্ন গৃহস্থলীর কোনো পরিশ্রমের কার্য্যই করিতে হয় না—পাচকে অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতেছে, পুরুষদিগের মত মহিলাদিগকেও থালা ভরিয়া সাজাইয়া দিতেছে,—দাসদাসীতে গৃহস্থলীর অন্যান্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছে.—আর মা লক্ষ্মীগণ আরাম-কেদারায় অধিষ্ঠান পূর্ব্বক স্বাস্থ্যোন্নতির বিঘ্ন ঘটাইতেছেন। ফলে এই গৃহস্থলীর কর্ম্ম হইতে বিরত থাকিয়া পাকস্থলীর ক্রিয়ার যে ব্যতিক্রমের কারণ করিতেছেন—তাহারই ফল হইতেছে—কলিকাতায় বাঙ্গালী পুরুষ অপেক্ষা বাঙ্গালী মহিলার যক্ষ্মারোগ বৃদ্ধির কারণ। বাঙ্গালীর সমৃদ্ধি সম্পন্ন গৃহে বঙ্গমহিলার যক্ষ্মা রোগের প্রাবল্য এই কারণে, আর বাঙ্গালী-দরিদ্রের মধ্যে যক্ষ্মারোগে বঙ্গ মহিলা কাল কবলিত হইতেছেন—আলোক রৌদ্র-বায়ু হীন বাড়ীতে বাস করিয়া এবং তাঁহাদিগকে গৃহস্থলীর কর্ম্ম নির্ব্বাহে যে পরিমাণ পরিশ্রম করিতে হয়—তাহার উপযুক্ত আহার্য্য না পাইয়া। অনেক পুরুষের আয় সামান্য, কিন্তু সেই সামান্য আয়েও তাঁহারা সপরিবারে কলিকাতা বাসের জন্য যে সামান্য বাড়ীতে বাস করেন, তাহা অস্বাস্থ্যের লীলাভূমি। ফলে নানা কারণে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে সকল চিন্তা ফেলিয়া আগে এ সকল বিষয়ের চিন্তায় মনোনিবেশকরা কর্ত্তব্য।

* * *

চিন্তার সমাধান।—এ চিন্তার সমাধান করিবার উপায় কিন্তু এখনো যথেষ্ট আছে, তবে তাহার জন্য বাঙ্গালী পুরুষ যে মার্গ অনুসরণ করিয়াছেন; তাহা হইতে তাঁহাকে অন্য সরণী অবলম্বন করিতে হইবে, প্রবৃত্তিকে একটু দমন করিয়া রুচি পরিবর্ত্তনে অভ্যস্ত হইতে হইবে,—বাঙ্গালীকে অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিতে হইবে। কার্য্যোপলক্ষে যাঁহাদিগকে কলিকাতায় থাকিতে হয়, তাঁহাদিগকে আয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পুত্রকলত্রের জন্য আবার পিতৃপিতামহের ভিটায় শঙ্খধ্বনি পূর্ব্বক সন্ধ্যা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাঙ্গালী পুরুষকে তো খাটিতেই হইবে, তাঁহার পক্ষে তো আয়ের পরিমাণ সামান্য হইলেও সহরে বাস না করিয়া উপায় নাই, তা' ছাড়া একাকী থাকিলে সে নিজের বাসোপযোগী একটি মাত্র উৎকৃষ্ট ঘর ভাড়া লইয়াও বাস করিলে পারিবে। কিন্তু তাহা না করিয়া আপাতমধুর-সুখকামনায় সগোষ্টি একত্র থাকিয়া মরিবার ব্যবস্থা করিয়া লাভ কি!

* * *

কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ।—তাই বলিতেছি, দরিদ্র বঙ্গবাসী ভ্রাতৃবৃন্দ, এখনও সাবধান হও;—উপেক্ষার হাস্যে আস্য বিকাশপূর্ব্বক আর উড়াইয়া দিলে চলিবেনা—দেশের কথা স্মরণ পূর্ব্বক বিদেশ-বাসের স্পৃহা পরিত্যাগ কর, জননী জন্মভূমি দর্শনের সঙ্কল্প করিয়া পরিবার বর্গের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যত্নবান হও। পল্লীগ্রামে

ম্যালেরিয়া, কিন্তু ম্যালেরিয়া কি কলিকাতায় নাই? গত অক্টোবর হইতে জানুয়ারি পর্য্যন্ত সরকারী রিপোর্টে সে কথা সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে; তা' ছাড়া গত বৎসর কলিকাতায় ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা মহামারীটা কিরূপ হইয়াছিল, সে কথাটাও স্মরণ করিও। পল্লীজননী ম্যালেরিয়ার আকর ভূমি—এ কথা সত্য, কিন্তু সেই ম্যালেরিয়ার নিবারণকল্পে দীর্ঘিকা পুষ্করিণীগুলির সংস্কারের জন্য প্রয়াস করিলে, বনজঙ্গলগুলি পরিষ্কারের ব্যবস্থা করিলে—পল্লীরক্ষার উপায় করা যাইতে পারে। ইহাতে তো স্বাস্থ্যরক্ষারও উপায় হয়ই,—তা' ছাড়া কিঞ্চিৎ সংস্থানেরও ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এসব কথা বাঙ্গালীর আর ভাল লাগিবে কি? রুচি-পরিবর্ত্তনে বাঙ্গালী যে এখন হাবুডুবু খাইতেছে!

শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন।

আয়ুর্ব্বেদের কথা।

—:০:—

আয়ুর্ব্বেদ বলিলে আমরা কি বুঝি? ঋষি বা ঋষিকল্প মহাত্মাগণের জ্ঞানগবেষণার ফল নানাবিধ হিন্দু-চিকিৎসা গ্রন্থকেই আমরা আয়ুর্ব্বেদ সংজ্ঞাপ্রদান করি এবং তদুক্ত চিকিৎসাপদ্ধতিতেই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা নামে অভিহিত করিয়া থাকি। আয়ুর্ব্বেদের এ অর্থ একদিন সার্থক ছিল,—যেদিন এই ভারতীয় আর্য্য-আয়ুর্ব্বেদ ব্যতীত অন্যত্র এ বিদ্যার অস্তিত্বই ছিলনা। এখন কিন্তু আর সে দিন নাই, এখন নানা দেশে, নানা ভাষায় আমাদেরই এই ভারতীয় হিন্দু-চিকিৎসা-প্রণালী অবলম্বন করিয়া চিকিৎসাশাস্ত্র রচিত হইয়াছে। সুতরাং এখন আয়ুর্ব্বেদ বলিলে কেবল হিন্দু চিকিৎসাপদ্ধতিকে বুঝিলে আয়ুর্ব্বেদের অর্থ সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ করা হয়। যাহাতে আয়ুস্তত্ত্বের জ্ঞান জন্মে—তাহাই আয়ুর্ব্বেদ,—তা' সে ভারতবর্ষের চিন্তাপ্রসূতই হউক—অথবা দেশান্তরের জ্ঞানানুমোদিতই হউক! কিম্বা দেবভাষায় লিখিতই হউক বা দেশান্তরের মানবীয় ভাষাতেই বিরচিত হউক! যাহাতে দেখিব—শারীরতত্ত্বের আলোচনা আছে, ভৈষজ্যতত্ত্বের মীমাংসা আছে, রোগ ও আরোগ্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তাহাকেই আয়ুর্ব্বেদ বলিয়া বুঝিব এবং তাহাকেই আয়ুর্ব্বেদ বলিয়া মানিব; তা' সে স্বদেশীই হউক বা বিদেশীই হউক!

সকল দেশের আয়ুস্তত্ত্ববিদ্যাই আয়ুর্ব্বেদ নামে পরিচিত হইলেও, অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে যেমন হিন্দুধর্ম্মের কিছু বিশিষ্টতা আছে, হিন্দু আয়ুর্ব্বেদেরও তেমনই কিছু বিশিষ্টতা পরি[illegible] লক্ষিত হয়, এবং এইরূপ বিশিষ্টতার জন্যই, হিন্দু ধর্ম্মের মতই যে [illegible]

করিয়াও, নিজে অপরের নিকট উপেক্ষিত ও নিন্দিত হইয়া বর্ত্তমান আছে। ভারতবর্ষের সন্তান হিন্দুবংশধরগণও কেহ কেহ বিজাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রাচীন ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ ব্রহ্মবিদ্যাপূর্ণ ধর্ম্মের মতই এই আয়ুর্ব্বেদকে নির্ব্বাসন প্রদান করিতে কুণ্ঠিত নহেন। আবার কেহ কেহ ইহাকে এত ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরেন যে, সাধারণের দৃষ্টি-শক্তি তত ঊর্দ্ধে পঁহুছিতেই পারেনা!

যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদকে এইরূপ ঊর্দ্ধে তুলিয়া অতুল গৌরব অর্জ্জনের প্রয়াসী, তাঁহারা ইহাকে একেবারেই অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া প্রচার করেন। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, "অনন্তজ্ঞানসম্পন্ন আর্য্যঋষিগণের সাধনার ফল এই আয়ুর্ব্বেদ সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে সর্ব্ব-জনের প্রতিই সমানভাবে প্রযুজ্য। যে ইহাকে পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করে, সে বাতুল ও মূর্খ। এই আর্য্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান আয়ুর্ব্বেদ তাহার জ্ঞান-ভাণ্ডার উন্মুক্ত রাখিয়াছে—পরকে দান করিবার জন্য,—পরের নিকট হইতে গ্রহণ করিবার জন্য নয়। কারণ ইহার যাহা আছে, তদ্ব্যতীত অপরের এমন আর কিছুই নাই—যাহা গ্রহণ করা যাইতে পারে। এ শাস্ত্র অনন্ত কালের জন্য পূর্ণ!"

আর একদল লোক আছেন, যাঁহারা আর্য্য আয়ুর্ব্বেদকে লোকচক্ষুর অন্তরালে অতি ঊর্দ্ধে সংস্থাপিত না করিয়া, মানব সমাজের মধ্যেই সংস্থাপনপূর্ব্বক যুগোপযোগী পরিবর্ত্তন-পরিবর্দ্ধনাদি করিয়া মানবের ব্যবহারোপযোগী করিতে চাহেন। ইঁহারা বলেন, এমন কোন ব্যবহারিক বিজ্ঞান নাই, যাহা যুগে যুগে অপরিবর্ত্তনীয়। এমন যে সনাতন ধর্ম্ম, ইহার বিধিব্যবস্থাকে যুগোপযোগী পরিবর্ত্তন করিয়া লইবার জন্যই ভগবানকে অবতীর্ণ হইতে হয়। সুদূর অতীতের বৈদিক যুগ হইতে এই সে দিনের চৈতন্য যুগ পর্য্যন্ত ধর্ম্মের কত পরিবর্ত্তনই হইয়া গিয়াছে! তাহাতে সনাতন ধর্ম্মের গৌরব কি কিছু কমিয়াছে? তেমনই এই আর্য্য আয়ুর্ব্বেদকে যদি সময়োপ-যোগী করিয়া লইবার চেষ্টা করা যায়, তাহাতে আয়ুর্ব্বেদের গৌরব কমিবেনা ত বটেই; বরং তাহার গৌরব বৃদ্ধিই হইবে। ঋষিপ্রোক্ত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ঔষধাদির যেরূপ মাত্রা লিখিত হইয়াছে, আজকাল ক্ষীণবীর্য্য মানবমণ্ডলীর জন্য কি তদনুসারে মাত্রা লিখিত হইতে পারে? হইলে হয়ত অনেক ক্ষেত্রে হিতে বিপরীত ফলের আশঙ্কা আছে। সুতরাং এরূপ স্থলে পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক মাত্রেই ইচ্ছানুসারে এইরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন, কিন্তু অন্য কোনরূপ পরিবর্ত্তনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেই, আয়ুর্ব্বেদকে চির অপরি-বর্ত্তনীয় বলিয়া প্রচার করিতে যত্ন করেন। পুরাতন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণও "ফিরঙ্গ রোগ" আয়ুর্ব্বেদে গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই; কিন্তু সেই ঋষিপ্রতিম আচার্য্যগণের তুলনায় যাঁহারা নিতান্তই নগণ্য, তাঁহারাও এক্ষণে অন্যদেশের কোন বিষয় গ্রহণ করিতে নিতান্তই নারাজ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গোপনে গ্রহণ করিলেও প্রকাশ্যে তাহা স্বীকার করিতে চাহেন না! এ আত্মবঞ্চনা আর কত-দিন চলিবে জানি না এবং এই আত্মবঞ্চনার দ্বারা আয়ুর্ব্বেদকে কতদূর গৌরবান্বিত করা যাইবে তাহাও বুঝিনা!

আমাদের চিকিৎসাপদ্ধতি—আমাদের গৌরবের আয়ুর্ব্বেদ—বিদেশীয় চিকিৎসাপদ্ধতির

অভ্যুদয়ে এবং আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকবৃন্দের অমনোযোগে কিছুদিনের জন্য নিতান্তই হীন-প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। সৌভাগ্যের বিষয় আবার তাহার গৌরব জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইবার শুভ সুযোগ উপস্থিত হইতেছে বলিয়াই বোধ হয়। জানি না ভগবান ভারতবাসীর জন্য ভারতবর্ষে কবে সে শুভদিন আনয়ন করিবেন।

ভারতবর্ষের গৌরব আর্য্যআয়ুর্ব্বেদকে আবার আর্য্যভূমি ভারতবর্ষে প্রচার করিতে হইলে. এক্ষণে প্রচলিত বৈদেশিক চিকিৎসা পদ্ধতির সহিত প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। কেবল মৌখিক প্রতিযোগিতা বা বিবিধ প্রকার বাক্‌বিন্যাসের দ্বারা আয়ুর্ব্বেদের প্রচার হইবে না,—হইতে পারে না। আয়ুর্ব্বেদের লুপ্ত গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, প্রতিযোগীতায় অপরকে পরাজিত করিতে হইবে, কর্ম্মের সাফল্য দেখাইতে হইবে। বৈদেশীক চিকিৎসা পদ্ধতি এক্ষণে দেশের গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহাকে স্থানচ্যুত করা কেবল মৌখিক উপদেশের দ্বারা হইতে পারে না, এ কথা সকল সময়েই স্মরণ রাখিতে হইবে। অস্ত্র চিকিৎসায় আমাদের আয়ুর্ব্বেদ বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে, ইহা তো আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই! শুনিয়াছি আর্য্য আয়ুর্ব্বেদে এই অস্ত্রচিকিৎসার বিধি ব্যবস্থা ভালরূপই ছিল; কিন্তু এক্ষণে তাহার পঠন পাঠন, শিক্ষা দীক্ষা, সব বিলুপ্ত হইয়াছে। কর্ম্ম—কর্ম্মক্ষেত্র হইতে লোপ পাইয়াছে, আছে কেবল অতীতের স্মৃতি। কিন্তু সেই পুরাতন স্মৃতি কি এই কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিযোগীতায় আয়ুর্ব্বেদের পূর্ব্ব গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে? আমাদের তো তাহা বোধ হয় না। শারীর বিজ্ঞানে এবং অস্ত্রোপচারে এলোপ্যাথিক চিকিৎসাপদ্ধতি আর্য্য আয়ুর্ব্বেদের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এ ক্ষেত্রে কেবল সুশ্রুতের শ্লোক আবৃত্তি করিলে প্রতিযোগিতায় পরাজয় অনিবার্য্য। হইতেছেও তাই। দিন দিন আয়ুর্ব্বেদকে পশ্চাতে ফেলিয়া বৈদেশিক শল্যতন্ত্র অদ্ভুত ক্রিয়া প্রদর্শন পূর্ব্বক সগৌরবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। আর ভৈষজ্য বিজ্ঞানে বা ঔষধ প্রকরণে হোমিওপ্যাথিক প্রণালী আর্য্য আয়ুর্ব্বেদকে পশ্চাতে ফেলিয়া ক্রমেই অগ্রসর হইতেছে। তাহার গতি দেখিয়া বোধ হয় যে, সুদূর ভবিষ্যতে আর্য্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা পদ্ধতি ও এলোপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি উভয় প্রণালীকেই পশ্চাতে ফেলিয়া হোমিওপ্যাথি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবে। আমাদের এই আয়ুর্ব্বেদকে তাহার সহিত প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে তাহার মতই সর্ব্বপ্রকারে সুলভ হইতে হইবে। বিবিধপ্রকার পাচনেরআয়োজন করণ এবং তিনবার ঔষধ সেবনের জন্য ছয় প্রকার চূর্ণ ও নয় প্রকার স্বরসের সংগ্রহ করা বিশেষ আয়াস সাধ্য কার্য্য, দেশের লোক এরূপ আয়াস স্বীকার করিতে পারিত—যখন ইহার অপেক্ষা আর কোন সহজ সাধ্য উপায় ছিলনা, কিন্তু এখন অন্যান্য চিকিৎসা প্রণালী বিশেষতঃ হোমিওপ্যাথির সহজপন্থা পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন? এই আয়োজনের হিসাবেও হোমিওপ্যাথির ঝঞ্ঝাট কম, সুতরাং সুলভ, আর মূল্যের তো কথাই নাই। এত সুলভে ঔষধ দেওয়া যাইতে পারে—ইহা বোধ হয় কল্পনাতেও আনা যায় না। কিন্তু উপকারিতার এ প্রণালী অন্যের অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে, বরং অনেক স্থলে অধিক বলিয়াই বোধ হয়। আর্য্য

আয়ুর্ব্বেদের এই হোমিওপ্যাথির সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে হইলে ঔষধ সেবনের আয়োজন কমাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, এবং প্রচার করিতে হইলে হোমিওপ্যাথিক-চিকিৎসা পুস্তকের মত সরল ভাষায় রোগের লক্ষণ অনুযায়ী ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহা দেখিয়া সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও বিপদের সময় আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে পারে। আমি যতদূর জানি, মনে হয় যেন আয়ুর্ব্বেদের সকল পুস্তকই পুরাতন প্রণালী ক্রমে লিখিত হইয়া থাকে। এক স্বর্গীয় কবিরাজ রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদের আয়ুর্ব্বেদ সোপান কিছু নূতনভাবে লেখা ছিল বটে, কিন্তু তাহাও হোমিওপ্যাথির মত লক্ষণ অনুযায়ী নহে। আর্য্য আয়ুর্ব্বেদের দ্বারা দেশকে নিরাময় করিতে হইলে, যাহাদের লইয়া দেশ সেই চির দরিদ্র পল্লীবাসী কৃষককুলের পর্ণ কুটিরে ঔষধ পঁহুছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যখন কাল-কলেরার কবলে পতিত হইয়া পল্লীগুলি ধ্বংস হইতে থাকে—যখন ম্যালেরিয়ার জঠরাগ্নিতে পল্লীবাসী দগ্ধ হইতে থাকে, তখন পল্লীগুলিকে রক্ষা করিয়া পল্লীবাসী পীড়িতগণকে উদ্ধার করিবার জন্য মহামতি ধন্বন্তরির নাম স্মরণপূর্ব্বক সেই নিরন্ন ব্যাধিবিমর্দ্দিতজনগণের কুটির দ্বারে ঔষধ পথ্য লইয়া উপস্থিত হইতে হইবে, তাহাদিগকে বাঁচাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহাদিগের রোগ-প্রতীকারের আয়োজন করিতে হইবে। তবে আবার এই ভারতবর্ষে আর্য্য আয়ুর্ব্বেদের গৌরবমহিমা বাড়িয়া উঠিবে। নতুবা নগরে আড়ম্বরপূর্ণ ঔষধালয় স্থাপন করিয়া ধনবানের খেয়ালপূর্ণকরতঃ আপনার পকেটপূর্ণ করিলেই আর্য্য আয়ুর্ব্বেদের প্রচার ও গৌরববর্দ্ধন হইবে না। বরং এই উপায়ে চিকিৎসকের সম্পদ সম্ভার বাড়িয়া উঠিলেও আর্য্য আয়ুর্ব্বেদকে ডুবাইয়া দেওয়া হইবে।

এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে—হিন্দুর দেশে, আমরা হিন্দু চিকিৎসা পদ্ধতিরই পক্ষপাতী, তাই আজ বিজ্ঞ ও বহুজ্ঞ কবিরাজ মণ্ডলীর নিকট এই প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইয়াছি। ভরসা করি, তাঁহারা তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার পীড়িতের সহায়, বিপন্নের উদ্ধার কর্ত্তা ও দরিদ্রের বন্ধু রূপে আর্য্য আয়ুর্ব্বেদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন। কেবল অর্থের আকাঙ্ক্ষা ও বিলাসিতার উপকরণ সংগ্রহের কামনা লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলে, বাসনা পূর্ণ হইতে পারে; কিন্তু আর্য্য আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি হইবে বলিয়া বোধ করি না এবং দেশের কিছু উপকার হইবে বলিয়াও বিবেচনা করি না।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

জ্বররোগে পথ্য ও চিকিৎসা।

—:*:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

মণ্ড, পেয়া ও বিলেপীর সাধারণ নাম যবাগূ। যে ব্যক্তি যে পরিমাণ চাউলের অন্ন আহারে অভ্যস্ত, তাহার সিকি পরিমাণ চাউল গুঁড়া করিয়া লইয়া যবাগূ প্রস্তুত

করিতে হয়। উক্ত চাউলের চতুর্দ্দশ গুণ জলের সহিত মণ্ড ছয়গুণ জলের সহিত পেয়া এবং চারগুণ জলের সহিত বিলেপী পাক করিতে হয়। মণ্ডে সিটা থাকে না, পেয়ায় অল্প সিটা থাকে এবং বিলেপীতে প্রচুর সিটা ও অল্প তরল অংশ থাকে।

আজকাল জ্বরে যে সাগু, বার্লি সিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয় তাহাও যবাগূ। কেবল উপাদানের প্রভেদ মাত্র।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে জ্বরের প্রথম সাত দিন তরুণাবস্থা। এই তরুণাবস্থায় উপবাস দিবার বিধি আছে। কিন্তু উহা অবস্থা ভেদে। সন্নিপাত জ্বরে যখন তিন রাত্রি বা পাঁচ রাত্রি উপবাস দিবার কথা বলা হইয়াছে, তখন উক্ত ব্যবস্থার পরে পথ্য দেওয়া যাইতে পারে ইহা বুঝা যাইতেছে। ঋষি-বলিয়াছেন,—

লঙ্ঘন, স্বেদ, যবাগূ এবং তিক্ত রস—এই সমস্ত তরুণ জ্বরে অপক্ব দোষের পাচক।

এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে তরুণ জ্বরেও যবাগূ হিতকর। সুতরাং তরুণ জ্বরের কাল শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া সম্যক উপবাসের লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই যবাগূ পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। জ্বরের আম বা তরুণাবস্থার বিচার প্রধানতঃ ঔষধ প্রয়োগ সম্বন্ধে। সে কথা পরে বলা যাইবে।

শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন,—

অনুবাদ—জ্বরের প্রথমে লঙ্ঘণ, জ্বরের মধ্যাবস্থায়, পাচন, জ্বরের শেষ অবস্থায় ঔষধ এবং জ্বর মুক্তির পর বিরেচন পথ্য।

অপিচঃ—

জ্বরের প্রথম সাতদিন তরুণ জ্বর, আট হইতে বারদিন পর্য্যন্ত মধ্য জ্বর এবং বার দিনের পর পুরাণ জ্বর বলিয়া কথিত।

এই উভয় যুক্তি দ্বারা জ্বরের প্রথম সাত দিন লঙ্ঘন ঋষিদিগের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে জ্বরের তরুণাবস্থায় যবাগূ প্রয়োগ শাস্ত্র সম্মত।

নবজ্বরে একমাত্র যবাগূই পথ্য। দালের যুস প্রভৃতি মধ্য জ্বরে পথ্য দিতে হয়। কেননা তরুণ জ্বরে বৈদাল আমিষ প্রভৃতি নিষেধ করা হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখানেও বলিতেছি যে সাতদিন কাল সাধারণতঃ জ্বরের তরুণ অবস্থা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেও যদি এই কালের মধ্যে নিরাম জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে দালের যুষ প্রভৃতি পথ্য দেওয়া যাইতে পারে।

যবাগূ, জ্বরে এবম্বিধ হিতকর হইলেও মদাত্যয়ে নিত্য মদ্য পায়ীর জ্বরে, গ্রীষ্ম-কালীন জ্বরে, পিত্ত ও কফ প্রধান জ্বরে এবং ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তে যবাগূ নিষিদ্ধ। এই সকল ক্ষেত্রে প্রথমে তর্পণ প্রয়োগ করিতে হয়। খৈ চূর্ণ জ্বর নাশক ফলের রস বা কাথ এবং মধু ও চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া পথ্য দেওয়াকে তর্পণ বলে। খর্জ্জুর, কিসমিস, দাড়িম, পিয়ারা ও ফলসা প্রভৃতি জ্বর নাশক ফলের দ্বারা পেয়া প্রস্তুত করিতে হয়। কিসমিসের দ্বারা পেয়া প্রস্তুত করিতে হইলে এক ছটাক কিসমিস দুইসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ সের থাকিতে নামাইবে এবং কাথ ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে খৈ চূর্ণ চার তোলা, চিনি বা মিছরীর গুঁড়া এক তোলা এবং মধু এক তোলা মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়। এইরূপে অন্যান্য ফলের কাথের সহিত এবং দাড়িমের রসের সহিত তর্পণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, জ্বর, উপবাস

এবং লঙ্ঘন বায়ু জনিত জ্বরে নিষিদ্ধ। এই সকল ক্ষেত্রে দীপ্তাগ্নিরোগীকে মাংসযূষের সহিত অন্ন পথ্য দেওয়া হিতকর। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ঔষধ সহ সিদ্ধ যবাগূ হিতকর। এইরূপে ঔষধ সহ সিদ্ধ যবাগূ প্রয়োগে যে মহান্ উপকার হইয়া থাকে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। জগতের আর কোন চিকিৎসা শাস্ত্রে এরূপ সুন্দর পথ্য প্রয়োগের প্রণালী দেখা যায় না, দুঃখের বিষয় এই সকল পথ্য অস্বাদু বলিয়া পরম হিতকর হইলেও এক্ষণে পরিত্যক্ত হইয়াছে। আর কখন ঐরূপ পথ্যের প্রচলন হইবে কিনা তাহাও সন্দেহ। আমরা আয়ুর্ব্বেদানভিজ্ঞ পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য কয়েকটা এইরূপ পথ্যের বিষয় উল্লেখ করিতেছি।

(১) পিঁপুল এবং শুঁঠ সহ খৈয়ের মণ্ড সহজেই পরিপাক হয় বলিয়া ক্ষুধা থাকিলে অগ্ন্যাগ্নি বিশিষ্ট রোগীকেও দেওয়া যাইতে পারে। ইহা জ্বর নাশক।

২। মস্তক, পার্শ্বদেশ ও বস্তিতে বেদনা থাকিলে—গোক্ষুর ও কণ্টকারীর সহিত সিদ্ধ রক্তশালি তণ্ডুলের পেয়া হিতকর।

(৩) কোষ্ঠবদ্ধতা ও কোষ্ঠে বেদনা থাকিলেও কিসমিস, পিপুলমূল চৈ, চিতামূল এবং শুঁঠ সহ সিদ্ধ পেয়া হিতকর।

(৪) স্বল্প পঞ্চমূল অর্থাৎ শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ইহাদিগের সহিত সিদ্ধ পেয়া বাতপিত্ত জ্বর নাশক।

(৫) মহৎ পঞ্চমূল অর্থাৎ বেলছাল, গাম্ভারী ছাল, শোণা ছাল, পারুল ছাল ও গণিয়ারী ছাল—ইহাদিগের সহিত সিদ্ধ পেয়া বাতশ্লেষ্ম জ্বর নাশক।

(৬) স্বল্প পঞ্চমূল ও মহৎ পঞ্চমূল সহ সিদ্ধ পেয়া ত্রিদোষজ জ্বর নাশক।

(৭) ধনে ও পিঁপুলের সহিত সিদ্ধ পেয়া পিত্ত শ্লেষ্ম জ্বর নাশক।

এই সকল দ্রব্যের সহিত মাংসের যূষ বা দালের যূষও পাক করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। এইরূপ বহুবিধ যোগের বিষয় আয়ুর্ব্বেদে লিখিত আছে। অনাবশ্যক বিবেচনায় উদ্ধৃত করা হইল না। যবাগূ পাকের নিয়ম দুই প্রকার, যথা ক্বাথসাধ্য ও কল্কসাধ্য। ক্বাথসাধ্য যবাগূ প্রস্তুত করিতে হইলে ষড়ঙ্গ পাণীয়ের নিয়মে দুই তোলা ঔষধ চার সের জলে সিদ্ধ করিয়া দুই সের থাকিতে নামাইয়া লইবে এবং সেই ক্বাথের সহিত মণ্ডাদি পাক করিয়া লইবে।

কল্ক সাধ্য যবাগূ প্রস্তুত করিতে হইলে ঔষধ এক তোলা বা আধ তোলা পেষণ করিয়া বা চূর্ণ করিয়া আবশ্যক মত চাউল চূর্ণ এবং চাউল চূর্ণের চতুর্থ গুণ), ছয় গুণ (পেয়া) বা চারিগুণ (বিলেপী) জল সহ একত্র সিদ্ধ করিবে। পরে মণ্ড পেয়াদির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া লইবে।

ঔষধ দ্রব্য তিন প্রকার, যথা তীক্ষ্ণবীর্য্য (যেমন শুঁঠপিঁপুল প্রভৃতি), মধ্যবীর্য্য (যেমন বেলছাল, শোনা ছাল প্রভৃতি) এবং মৃদুবীর্য্য (যেমন আমলকী প্রভৃতি)। শাস্ত্রে তীক্ষ্ণ দ্রব্য দুই তোলা, মধ্যবীর্য্য দ্রব্য চার তোলা এবং মৃদুবীর্য্য দ্রব্য আট তোলা লইবার নিয়ম আছে। ইহা কল্কসাধ্য যবাগূ সম্বন্ধে, ক্বাথ সাধ্য যবাগূতে ঔষধ আট তোলা হইতে বত্রিশ তোলা লইবার নিয়ম দেখা যায়। কিন্তু এখনকার অল্পপ্রাণ লোকের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত ক্বাথসাধ্য যবাগূর পরিমাণ অনুসারে

দ্রব্য লইয়া ক্বাথ সাধ্য যবাগূ প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। আর কল্কসাধ্য যবাগূর নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের চতুর্থাংশ পরিমাণ ঔষধ লইয়া কল্কসাধ্য যবাগূ প্রস্তুত করা উচিত।

কেবল জ্বর বলিয়া নহে আয়ুর্ব্বেদে প্রায় সকল রোগেই এইরূপ ঔষধ সিদ্ধ যবাগূ প্রয়োগের বিধি আছে এবং এই সকল যবাগূ সেই সকল রোগে মহোপকারী। কিন্তু এইরূপ পথ্য প্রয়োগের একটী দোষ যে অরুচি জন্মায়। "বৃন্দ"—ঔষধের মাত্রা কম ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। তরুণ জ্বরে যে একমাত্র যবাগূই প্রযোজ্য এবং দালের যূষ প্রভৃতি মধ্য জ্বরে পথ্য তাহা চরকে বিশেষরূপে প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—

"যতদিন জ্বর মৃদুভাবাপন্ন না হয় অথবা ছয় দিন পর্য্যন্ত—বিচক্ষণ ব্যক্তি মণ্ড পেয়াদি পথ্য দিবেন। সমিধের দ্বারা যে অগ্নি দীপ্ত হয়, মণ্ডাদি সেবন দ্বারা জঠরাগ্নিও সেইরূপ দীপ্ত হইয়া থাকে।……অনন্তর সাত্ম্য (অর্থাৎ যে ব্যক্তি যেরূপ খাদ্য আহার করিতে অভ্যস্ত এবং যাহা তাহার পক্ষে হিতকর, এবং অগ্নি বলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তর্পণ জীর্ণ হইলে পাতলা মুগের যূষ বা জাঙ্গলরসের সহিত পথ্য দিবে।

মুগ, মসূর, ছোলা, কুলথ কলায় ও মুগের যূষ নবজ্বররোগীর পক্ষে হিতকর, বেগুন, সজিনার ডাঁটা, উচ্ছে, বেতের ডগা, পটোল, কাঁকরোল, পলতা, কচি মূলা, তিক্ত শাক, নটে শাক এবং গুজেরা শাক মধ্য জ্বরে পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। ফলের মধ্যে দাড়িম, কিসমিস ও বৈঁচি এবং পূর্ব্ব কথিত খেজুর, ফলসা ফল প্রভৃতি সুপথ্য।

মধ্য জ্বরে অন্ন (ভাত) পথ্য নহে। চরকে মধ্য জ্বরে যূষাদি প্রয়োগের সঙ্গে বলা হইয়াছে যে, পুরাতন শালি ও ষষ্টিক তণ্ডুলের যবাগূ জ্বর নাশক বলিয়া জ্বরিতব্যক্তিকে প্রয়োগ করিবে। কিন্তু তরুণ জ্বরে যে অতি লঘু মণ্ড প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে; মধ্য জ্বরে তাহা না দিয়া পেয়া ও বিলেপী ক্রমশঃ দেওয়া উচিত।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সাত্ম্য ও অগ্নি বল লক্ষ্য করিয়া মধ্য জ্বরে পথ্য দিবে। শাস্ত্রে যে সকল দ্রব্য (দালের যূষ, শাক প্রভৃতি) পথ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা এতদ্দেশীয়গণের পক্ষে সাত্ম্য হইলে মাংসভোজী য়ুরোপীয় জাতির পক্ষে সাত্ম্য নহে। সুতরাং একজন জ্বরিত য়ুরোপীয়কে পথ্য দিতে হইলে মাংসের যূষ দেওয়া উচিত।

পূর্ব্বে যে সকল রোগীকে যবাগূ প্রয়োগ নিষেধ করিয়া তর্পণ পথ্য দিবার কথা বলা হইয়াছে, ঐ সকল রোগীকে দাড়িমাদির রস দ্বারা মিশ্রিত জাঙ্গল মাংসের যূষ দিবার বিধি আছে।

সুশ্রুতের মতে মন্দাগ্নি বিশিষ্ট রোগীকে পুরাতন মদ্য এবং যবান্ন (যবকৃত খাদ্য) আহার করিতে দেওয়া হিতকর।

পুরাণ জ্বরে অর্থাৎ জ্বর উৎপন্ন হইবার দ্বাদশ দিন পরে লাব, গৌর তিতির কৃষ্ণবর্ণ হরিণ; চিত্র হরিণ ও চতুঃশৃঙ্গ বিশিষ্ট হরিণের মাংসের যূষ পথ্য দিবে। সারস, কুক্কুট ও তিত্তিরের মাংস গুরু ও উষ্ণ বলিয়া কোন কোন চিকিৎসক ঐ সকল জ্বর রোগীকে প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করেন না। কিন্তু লঙ্ঘনের জন্য অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে কাল ও মাত্রা বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে।

মাংস বায়ুনাশক, বলবর্দ্ধক এবং পুষ্টিকর বলিয়া পুরাণ জ্বরে মাংসের যূষ বিশেষ হিতকর। মধ্য জ্বরে যে সকল পথ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাও পুরাণ জ্বরে প্রয়োজ্য, তদ্ব্যতীত গোদুগ্ধ, ছাগদুগ্ধ এবং অবস্থা বিবেচনায় ঘৃত পুরাণ জ্বরে পথ্য দিবার উপদেশ আছে।

পুরাণ জ্বরে অন্ন (ভাত) পথ্য কি না? এক্ষণে দেখা যায় যে, কি আয়ুর্ব্বেদীয়---কি ভিন্ন, সমগ্র দেশের চিকিৎসক রোগী সম্পূর্ণ জ্বর মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত অন্ন প্রয়োগ করেন না। বরং জ্বর ত্যাগের পর দুই এক দিন রুটী প্রভৃতি পথ্য দিয়া পরে অন্ন আহার করিতে দেন। শাস্ত্রেও পুরাণ জ্বরে অন্য পথ্য দিবার কোন উপদেশ নাই। অথচ পুরাণ জ্বরে চরকে ঘৃত পান করিবার উপদেশ আছে। যথা :—

"কষায়, বমন, লঙ্ঘন, এবং লঘুভোজন দ্বারা যে, রুক্ষ রোগীর জ্বর প্রশমিত না হয়, চিকিৎসক তাহাকে ঘৃত প্রয়োগ করিবেন।

কিন্তু এক্ষণে এইরূপ ঘৃত প্রয়োগের প্রথা নাই। ইহার কারণ কি? প্রধাণতঃ ইহার দুইটী কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ পূর্ব্বে লোকে ঘৃতসাত্ম্য ছিল এবং নিত্য প্রচুর ঘৃত সেবন করিত বলিয়া উহার প্রয়োগ সহ্য হইত। কিন্তু এক্ষণে লোকে ঘৃত সাত্ম্য হইলেও নিত্য যথেষ্ট সেবন করিতে পায় না এবং ঘৃত প্রয়োগ সহ্য করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ জাঙ্গল দেশে শরীর যেরূপ শীঘ্র রুক্ষ হয় এবং কফের দোষ নষ্ট হয় বঙ্গের ন্যায় আনূপ দেশে তাহা হয় না। আর এইরূপ না ঘটিলে ঘৃত প্রয়োগ করাও সঙ্গত নহে। এ সম্বন্ধে চরক বলিয়াছেন :—

দশদিন অতীত হইলেও রোগীর শরীরে যদি সম্যক লঙ্ঘনের লক্ষণ সকল প্রকাশ না পায় এবং কফের প্রাবল্য থাকে, তাহা হইলে ঘৃত পান না করিয়া দোষনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করিবে।

জীর্ণ জ্বর ও বিষম জ্বরের অবস্থা বুঝিয়া পূর্ব্ব কথিত পথ্য সকল প্রয়োগ করিতে হয়। জ্বর প্রবল হইলে নবজ্বরের নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য। জ্বর প্রবল হইলেই অগ্নিবল ক্ষীণ হয় এবং শারীরিক যন্ত্র সকলের ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। জীর্ণ জ্বরে পথ্য প্রয়োগ সম্বন্ধে চরক বলিয়াছেন :—

"দেহস্থ ধাতু সকলের (রসরক্তাদি) দৌর্ব্বল্য বশতঃ জীর্ণ জ্বর হইয়া থাকে। সুতরাং জীর্ণ জ্বরগ্রস্ত রোগীকে পুষ্টিকর আহার দিবে। অবশ্য এখানে পুষ্টিকর আহার অর্থে পোলাও কালিয়া নহে, মাংসের যূষ, দালের যূষ, দুগ্ধ প্রভৃতি। জীর্ণ ও বিষম জ্বরে জ্বর প্রবল না হইলে অথবা কফের প্রকোপ না থাকিলে অন্নভোজী পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। এ স্থলে জানা উচিত যে, জীর্ণ জ্বর ও বিষম জ্বরে বিবিধ উপসর্গ ঘটিয়া থাকে? সেই সকল উপসর্গের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পথ্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।"

জ্বরে রোগীকে অধিক উপবাস দিয়া তাহার বলক্ষয় করা উচিত নহে-সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত বলিয়াই শাস্ত্রকার নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই; পুনরায় বলিয়াছেন :—

"জ্বরিত ব্যক্তির অরুচি হইলেও হিতকর খাদ্য সেবন করা উচিত। কেননা, যথা সময়ে আহার না করিলে রোগী ক্ষীণ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

জ্বররোগী গুরুদ্রব্য অভিষ্যন্দী দ্রব্য এবং অকালে ভোজন করিবে না। অহিতকর দ্রব্য ভোজন করিলে তাহা আয়ু ও সুখপ্রদ হয় না।

অহিতকর দ্রব্য যখন এইরূপ নিষেধ করা হইয়াছে, তখন অহিতকর দ্রব্য প্রয়োগ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? কিন্তু দারুণ অরুচির জন্য রোগী যদি সুপথ্য সেবন করিতে না পারিয়া ক্ষীণ হইতে থাকে এবং সামান্য কুপথ্য সহিত যদি কিঞ্চিৎ সুপথ্য আহার করিতে পারে—এরূপ সামান্য কুপথ্য দেওয়া সঙ্গত বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

জ্বরিত ও জ্বর মুক্ত ব্যক্তির পক্ষে অপরাহ্ণে ভোজন করা প্রশস্ত। কেননা সেই সময়ে শ্লেষ্মার ক্ষয় হওয়ায় অগ্নিপ্রবল হইয়া থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি যে সময়ে আহারে অভ্যস্ত, সেই সময়েই তাহার ক্ষুধা বোধ হয় এবং সেই সময় অতীত হইলে ক্ষুধা নষ্ট হইয়া থাকে। সেই জন্য ভোজনকালে ক্ষুধার উদ্রেক হইলে সেই সময়েই আহার দেওয়া কর্ত্তব্য।

নিত্য একপ্রকার খাদ্য আহার করায় এবং খাদ্য স্বাদ নহে বলিয়া যদি পথ্যের প্রতি বিরাগ জন্মে, তাহা হইলে যাহাতে রোগীর রুচি জন্মে এরূপ ভাবে পথ্য প্রস্তুত করিবে।

জ্বরে পথ্য সম্বন্ধে পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের সহিত আয়ুর্ব্বেদের একটী বিষম মতভেদ আছে। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ নবজ্বরে যথেষ্ট দুগ্ধও পথ্য দিয়া থাকেন। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ বলেন—

জীর্ণ জ্বরে বলক্ষীণ হইলে দুগ্ধ অমৃতের ন্যায় হিতকর। কিন্তু উহা তরুণ জ্বরে প্রযুক্ত হইলে মনুষ্যকে বিষের ন্যায় বিনষ্ট করিয়া থাকে।

দুগ্ধ মধুর, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল ও শ্লেষ্মাবর্দ্ধক বলিয়া নবজ্বরে দুগ্ধ প্রশস্ত নহে। দুগ্ধ নবজ্বরে প্রযুক্ত হইলে শরীরের অধিকতর গুরুতা জন্মায়, স্বেদবাহী স্রোতঃ সকলকে রুদ্ধ করে, অগ্নি দুর্ব্বল থাকায় সুচারুরূপে পরিপাক প্রাপ্ত না হওয়ায় আরও আমদোষের বৃদ্ধি করে। এইজন্য বিবিধ রোগে সুপথ্য এবং মনুষ্যের জীবন স্বরূপ হইলেও দুগ্ধ নবজ্বরে অপথ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

নবজ্বরে দুগ্ধ প্রয়োগের অপকারিতা আমরা বহুস্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। একটী মাত্র রোগীর বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে।

রোগীর বয়স ২৫।২৬ বৎসর। আসিয়া বলিল যে, জ্বর হইয়াছে, ৪।৫ দিন হইল, জ্বর ছাড়ে না। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এল, এম, এস, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং বিলাত হইতে ডাক্তারী উপাধি লইয়া প্রত্যাগত হইয়া অল্প বয়স্ক ডাক্তার দেখিতেছে। অন্য পথ্য না দিয়া প্রত্যহ দেড় সের, দুই সের দুগ্ধ পথ্য দেওয়া হইতেছে। দুগ্ধ একেবারে বন্ধ করিয়া এবং জলসাগু ও জল বার্লি খাইতে বলিয়া ঔষধ দিলাম। রোগী তিন দিন পরে আসিয়া বলিল যে, ঔষধ খাই নাই, জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে।

এ ক্ষেত্রে দুগ্ধই যে জ্বর আটকাইয়া রাখিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাঁহারা নবজ্বরে দুগ্ধ প্রয়োগের পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে আমরা এ বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। দুইটী তুল্য জ্বরবেগবিশিষ্ট রোগীর একটীকে দুগ্ধ এবং একটীকে অপর খাদ্য দিয়া দেখিলে সহজেই পরীক্ষা করা যাইতে পারে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যিনি এইরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, তিনি কখনই আর নবজ্বরে দুগ্ধ প্রয়োগ করিবেন না।

(ক্রমশঃ)

শ্রী—[illegible]

মেদ বৃদ্ধি।

—:০:—

অনেক কৃশকায় ব্যক্তির মোটা হইবার সাধ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের শরীরে কোন ব্যাধি নাই, বলও যথেষ্ট আছে, শরীর বেশ শ্রমক্ষম, কিন্তু গঠনের কৃশতা বশতঃ তাঁহারা দুঃখিত। তাঁহাদের অভিপ্রায় যে, দেহখানি বেশ নাদুস-নুদুস হইবে, গণেশের মত ভুঁড়িটী হইবে। এমন কি মোটা হইবার জন্য তাঁহারা ঔষধ খাইতে এবং মেদোৎপাদক পথ্য গ্রহণেও ত্রুটি করেন না। এইরূপ করিতে গিয়া কাহারও কাহারও এত মেদাধিক্য হইয়া পড়ে যে, জীবনের আশঙ্কায় আবার মেদ কমাইবার জন্য চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কেহ কেহ স্বভাবতঃই মোটা, ক্রমে এত মোটা হন যে, একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন। এমন কি নিজের শরীর বহনেও অক্ষম হইয়া পড়েন। মেদবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রক্তের তারল্য কমিয়া যায় ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। সুতরাং রক্ত সঞ্চালনক্রিয়া মৃদু হইয়া আসে। এমন কি হৃৎপিণ্ড মেদোময় হইয়া হঠাৎ উহার ক্রিয়া বন্ধ প্রযুক্ত আকস্মিক মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। ফুসফুসে মেদাধিক্য হইয়া শ্বাসরোধেও মৃত্যু হইতে পারে। সুতরাং মোটা হওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে অহিতকর বই হিতকর নহে। শুধু স্বাস্থ্যহানিকর নহে, একেবারে প্রাণসংশয়কর। কিন্তু যাঁহারা দুর্ব্বল, (কোন রোগ বশতঃই হউক বা ধাতুগত কারণেই হউক) তাঁহারা বললাভের জন্য বলবর্দ্ধক ঔষধ সেবন করিতে পারেন। বলবর্দ্ধন ও মেদোৎপাদন দুইটী পৃথক জিনিষ। কৃশব্যক্তিও যথেষ্ট বলশালী হইতে পারেন এবং মোটা লোকও যৎপরোনাস্তি দুর্ব্বল হইতে পারেন। তবে দৌর্ব্বল্য বশতঃ যদি শরীর কৃশ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে বলবর্দ্ধক ঔষধ সেবন ও পুষ্টিকর পথ্য গ্রহণে বলসঞ্চার হইলেই ক্রমশঃ কৃশতা নষ্ট হইয়া পূর্ব্ব গঠন লাভ হয়। কিন্তু তাহা বলিয়া মেদবৃদ্ধির চেষ্টা করা যুক্তি সঙ্গত নহে। অনেক সময় আহারাদির দোষে স্বভাবতঃই মেদাধিক্য ঘটিয়া থাকে। মেদবৃদ্ধি সখের জিনিষ নহে, ইহাও পীড়া বিশেষ। ইংরাজিতে এই পীড়াকে ওবেসিটি (obesity) বলে।

এই পীড়া সকল বয়সেই হয়। কিন্তু শৈশবাবস্থায় এবং চল্লিশ বৎসরের অধিক বয়সে ইহার আধিক্য দেখা যায়। এবং পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদের মধ্যেই ইহা অধিক হইতে দেখা যায়। সাধারণতঃ ঋতু বন্ধের সময় অর্থাৎ ৪০।৪৫ বৎসর বয়সে হইতে দেখা যায়।

এই রোগ নির্ণয়ের জন্য লক্ষণাবলী বর্ণনার আবশ্যক করে না। রোগীকে দেখিবামাত্রেই ইহার উপলব্ধি লইতে পারে। ইহার প্রথম চিহ্ন শরীরের আয়তন বৃদ্ধি। সেই সঙ্গে অঙ্গ সঞ্চালন ধীর ও আয়াস-সাধ্য হয়। পদক্ষেপে মন্থরগতি হয়। ক্রমে হৃৎপিণ্ডের ও শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়াব্যত্যয় ঘটে এবং শ্বাসকষ্টের লক্ষণ প্রকাশ পায়। হৃৎপিণ্ডের আয়তন বৃদ্ধি

হইতে আরম্ভ হয়। অবশেষে উহার মধ্যে মেদসঞ্চয় হইয়া হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে, ধমনী সমূহের কাঠিন্য বৃদ্ধি হয়। মূত্র গ্রন্থির পীড়া কিম্বা বহুমূত্রও হইতে দেখা যায়, ঘর্ম্ম অতিরিক্ত হয়। অল্প পরিশ্রমেই শ্বাসকৃচ্ছ্রতা ও হৃৎকম্প হয়।

এই রোগোৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে, ইহা কৌলিক, অর্থাৎ পূর্ব্ব পুরুষের মধ্যে কাহারও এই পীড়া থাকিলে তাঁহার সন্তান সন্ততিদের মধ্যে পুরুষানুক্রমে এই পীড়া হইতে দেখা যায় ; এই মত কতদূর ভিত্তি মূলক বলিতে পারি না। তবে কোন কোন স্থলে নির্দ্দিষ্ট বংশের মধ্যে পুরুষানুক্রমে কয়েক জনের এই পীড়া হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহার কারণ কুলগত কি না, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং অনুসন্ধান দ্বারা এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, যে, বংশের এক জনের যে উত্তেজক কারণে (exciting cause) রোগোৎপত্তি হইয়াছিল, তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে অপর আক্রান্ত ব্যক্তিদের ও সেই কারণ বর্ত্তমান। কারণ নিবারণ করিলে তাঁহারাও এই রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিতেন। এরূপ স্থলে ইহাকে ঠিক কুলগত বলা যায় না। এ রোগের প্রধান কারণ অতিভোজন ও শ্রমহীনতা। গঠনের স্থূলতা কতকটা কুলগত বটে। এই স্থূলতা মেদবৃদ্ধি জনিতও হইতে পারে, অথবা মাংসবৃদ্ধি জনিতও হইতে পারে। আহার ও শ্রমের প্রতি একটু লক্ষ্য রাখিলে মেদসঞ্চয় (fatty in filtration) না হইয়া মাংসবৃদ্ধি (muscular development) হইতে পারে।

এই রোগ সকল সময়েই যে আরোগ্য সাধ্য তাহা নহে, বরং অধিকাংশ স্থলেই দুরারোগ্য দেখা যায়। একবার মেদবৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইলে, উহার বর্দ্ধনশীলতা কমান বড়ই দুরূহ। তবে আহারাদির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া অতিবর্দ্ধন কিয়ৎপরিমাণে দমন করা যাইতে পারে। যাঁহাদের বংশে এই রোগ বর্ত্তমান, তাঁহারা প্রথম হইতে প্রতি-ষেধক উপায়াবলী অবলম্বন করিয়া ইহার আক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন।

এই রোগের চিকিৎসা করিতে হইলে, নিম্নলিখিত ৪টী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

(১ম) আহার হ্রাস, বিশেষতঃ মেদোৎ-পাদক খাদ্য না খাওয়া।

(২য়) মাংসপেশীর ক্রিয়া বৃদ্ধি।

(৩য়) রক্তকণিকার বর্দ্ধন সাধন।

(৪র্থ) দেহাভ্যন্তরে অধিক পরিমাণে অম্লজান উৎপাদন।

এই চারিটীর প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পরিলে প্রায়ই এ রোগ আরোগ্য হয়। কিন্তু এ গুলি কার্য্যে পরিণত করা দুষ্কর হয় বলিয়া এ রোগ দুরারোগ্য বলিয়া বর্ণিত হয়।

আহার কমাইতে হইলে বিশেষ সতর্কতার সহিত কমান আবশ্যক। যাহাতে রোগী দুর্ব্বল ও রক্তহীন না হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। যদি রক্তহীনতা হয় অথচ মেদ না কমে, তাহা হইলে অত্যন্ত ভয়ের কারণ। আহার এরূপ ভাবে কমাইতে হইবে—যাহাতে শরীরের বল ও গুরুত্ব না কমে অথচ মেদ বৃদ্ধি হইতে না পারে। উপবাস দ্বারা রোগ আরোগ্যের চেষ্টা করিবে না, তাহাতে আরও কুফল ফলিবার সম্ভাবনা। আহারের পরিমাণ না কমাইয়া তাহার [illegible]

ও এ কার্য্য সফল হইতে পারে। যথা ঘৃত, ছানা, মিষ্টান্ন প্রভৃতি মেদোৎপাদক খাদ্য ত্যাগ করিলে ক্রমশঃ স্থূলতা কমান যাইতে পারে। সর্ব্বপ্রকারের হরিদ্বর্ণ তরকারী ও অম্ল ফল বিশেষ উপযোগী। চাউল ও ময়দা অল্প পরিমাণে খাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ঘৃত ও চিনি সংযুক্ত করিবেন না। কঠিন খাদ্যের পরিমাণ যত কমাইতে পারা যায় ও পানীয়ের বৃদ্ধি করাযায়, ততই ভাল।

কেবল আহারের ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। মেদোৎপাদক খাদ্য না খাইলে মেদ জন্মিতে পারে না বটে, কিন্তু সঞ্চিত মেদের অপচয় হওয়া আবশ্যক। তজ্জন্য মাংসপেশীর ক্রিয়া বৃদ্ধি অর্থাৎ কায়িক পরিশ্রম নিতান্ত প্রয়োজন। তাহা বলিয়া অতিরিক্ত বা সাধ্যাতীত পরিশ্রম করা উচিত নহে। কায়িক শ্রম বা ব্যায়াম প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিয়মিতরূপে করিতে হইবে। প্রথমে অতি সহজভাবে ব্যায়াম আরম্ভ করিতে হইবে। ক্রমে অল্প অল্প করিয়া উহার পরিমাণ বাড়াইতে হইবে। যাহারা অতিরিক্ত মোটা—তাহাদের হৃৎপিণ্ড ও মেদসঞ্চয় বশতঃ উহার যান্ত্রিক ক্রিয়া বড়ই দুর্ব্বল। সুতরাং একেবারে অতিরিক্ত শ্রম আরম্ভ করিলে হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া আকস্মিক মৃত্যু হইতে পারে। সেইজন্য ধীরে ধীরে অল্প অল্প করিয়া ব্যায়াম সহ্য করান আবশ্যক। বেড়ান, নৌকা চালান, কাঠ কাটা, পাহাড়ে উঠা, বাইসিকাল চড়া প্রভৃতি ব্যায়াম মন্দ নহে।

রক্ত কণিকার বর্দ্ধনসাধনের জন্য তদুপযুক্ত ঔষধাদি সেবন করা আবশ্যক। সাধারণতঃ লৌহ ঘটিত ঔষধ বিশেষ উপযোগী বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করেন। এ বিষয় চিকিৎসকের নিজের বিবেচ্য।

দেহাভ্যন্তরে অম্লজান বৃদ্ধির জন্য বিশুদ্ধ বায়ু সেবন আবশ্যক। অনাবৃত স্থানে বিচরণ বা সামান্য ব্যায়াম মন্দ নহে। গৃহ মধ্যে ব্যায়াম করিলে কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই। ব্যায়াম অনাবৃত স্থানে করা আবশ্যক। শ্বাস যন্ত্রের ব্যায়াম অর্থাৎ দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ বিশেষ উপযোগী। হিন্দুর প্রাণায়াম পদ্ধতি ইহার সুন্দর আদর্শ। যাহারা ইহাতে অনভ্যস্ত তাঁহারা বিশেষ সতর্কতার সহিত এ ব্যায়াম অভ্যাস করিবেন।

এই সকল উপায়াবলম্বনে মেদসঞ্চয় কমাইতে পারা যায়। অতএব যাঁহারা দুর্ব্বল বা অসুস্থ নহেন, অথচ কৃশ, তাঁহারা যেন কৃশতার জন্য ক্ষোভ না করেন।

ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস।

পঞ্চকর্ম্ম ব্যাপদ্।

—:০:—

[ডাক্তার কবিরাজ সংবাদ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ক। আচ্ছা পঞ্চকর্ম্মের বিষয় যা' শুনলেন, তা'তে আপনার কি মনে হয়?

ডাঃ। সে কথা আমি এখন বলছিনে, ব্যাপদের কথা গুলি আগে শুনে লব।

ক। আচ্ছা তা' হলে ব্যাপদের কথা শুনুন। প্রথমে বমন ও বিরেচনের কথা বলছি। বমন বিরেচনের অন্যান্য ব্যাপদ একই রকম, কেবল বমনের গতি ঊর্দ্ধ দিকে আর বিরেচনের গতি অধোদিকে এই—ব্যাপদের মাত্র প্রভেদ। সুশ্রুত গ্রন্থে পনর রকম ব্যাপদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ডাঃ। অন্য গ্রন্থে কম বেশী আছে নাকি ?

ক। কম-বেশী প্রকৃত পক্ষে নাই, কেবল বলবার রীতিগত প্রভেদ বলে মনে হয়। পূর্ব্বে বলেছি যে সুশ্রুতের ধূমপানের বিধি পাঁচ রকম আর চরক তিন রকম ব'লে উল্লেখ আছে। কিন্তু সুশ্রুতের যে দু'রকম বেশী—সে দুটোর চরকের তিন প্রকার ধূমপানের অন্তবিভাগ মাত্র। কাজেই কম বেশী হলেও ফলে এক।

ডাঃ। বুঝতে পেরেছি আপনি ব'লে যান।

ক। প্রথমে বমনকারক ঔষধ যদি অধোদিকে যায় এবং বিরেচন ঔষধ অধোগামী না হ'য়ে যদি ঊর্দ্ধগামী হয়—তা হলে কি করা উচিত তাই বলছি। অত্যন্ত ক্ষুধিত, অতি তীক্ষ্ণ অগ্নি বিশিষ্ট, মৃদু কোষ্ঠ বা দুর্ব্বল ব্যক্তি বমন কারক ঔষধ সেবন ক'রলে যদি অধোদিকে গমন করে, এরূপ অবস্থায় বাঞ্ছিত ফলপ্রাপ্তির জন্য রোগীকে প্রথমে স্নেহ প্রয়োগ ক'রে পরে তীব্রতর বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ ক'রে বমি করাবে। আবার যদি উৎক্লিষ্ট শ্লেষ্মার আধিক্য বশতঃ আমাশয় অশোধিত থাকে, কিম্বা ভুক্তান্ন পরিপাক প্রাপ্ত হ'তে বাকী থাকে, তা'হলে বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ করলে পরে অধোগতি না হয়ে ঊর্দ্ধ গতি হবে থাকে। অপ্রিয় বিরেচক অধিক মাত্রায় সেবন করলেও এই দোষ ঘটে। এরূপ ক্ষেত্রে অবিশুদ্ধ আমাশয়যুক্ত এবং অধিক শ্লেষ্মযুক্ত রোগীকে বমন করিয়ে তীক্ষ্ণতর বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করে বিরেচন করাবে। অপ্রিয় বিরেচক ঔষধ অধিক পরিমাণে সেবন করার জন্য এরূপ ঘটলে পুনরায় মুখপ্রিয় বিরেচক অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করবে। কিন্তু দ্বিতীয় বার যদি এইরূপ ঘটে, তা হলে আবার তৃতীয় বার বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করবে। মধু, ঘৃত এবং পাতলা আকের গুড় একত্রে লেহন করিয়ে বিরেচন করাবে।

অল্প মাত্র ঔষধ দোষের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যদি দেহের ঊর্দ্ধভাগে বা অধোভাগে থাকে এবং দোষকে স্থানচ্যুত ক'রতে না পারে, তা হলে পিপাসা, পার্শ্বদেশে শূলাদি, বমি, মূর্চ্ছা, সন্ধি স্থলে ভঙ্গবৎ বেদনা, গা বমি বমি করা, শরীরের গ্লানি এবং ঔষধের গন্ধযুক্ত ঢেকুর উঠা এই সকল উপদ্রব উৎপন্ন হয়। এরূপ অবস্থায় রোগীকে উষ্ণ জল পান করিয়ে বমন করাবে।

ক্রূর কোষ্ঠ ব্যক্তির, অত্যন্ত তীক্ষ্ণাগ্নি বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে অল্পগুণ বিশিষ্ট ঔষধ অন্নের ন্যায় পরিপাক প্রাপ্ত হয়। ইহাতে বর্দ্ধিত দোষ যথাকালে নির্গত হয় না এবং তজ্জন্য ব্যাধির বৃদ্ধি ও বলহানি হয়ে থাকে এরূপ অবস্থায় প্রচুর এবং তীক্ষ্ণ ঔষধ সেবন বা বিরেচক প্রয়োগ করবে।

স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ না করে অল্প গুণ ঔষধ প্রয়োগ করলে অল্পমাত্র দোষ নষ্ট হয়। বমন কারক দ্রব্য [illegible] প্রয়োগ করলে দোষের শেষ থাকে [illegible]

বমন, ত্রাস, হৃদয়ের অশুদ্ধি এবং ব্যাধির বৃদ্ধি ঘটে। এরূপ অবস্থায় অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণ বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ ক'রে বমন ক'রাবে। আর বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ ক'রে দোষের শেষ থাকলে মলদ্বারের শূলুনি, পেটফোলা, মাথা ভার, অধোবায়ুর অনির্গম এবং ব্যাধির বৃদ্ধি হয়। এরূপ অবস্থায় রোগীকে স্নেহ স্বেদ প্রয়োগ ক'রে, অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণ বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ ক'রে বিরেচন করা'বে। এটা হ'ল হীন দোষের কারণ ব্যাপদ। এইবার বাতশূল-ব্যাপদের কথা বলছি।

স্নেহ স্বেদ প্রয়োগ না ক'রে রুক্ষ ঔষধ প্রয়োগ ক'রলে অথবা মৈথুনরত ব্যক্তিকে রুক্ষ ঔষধ প্রয়োগ ক'রলে বায়ু কুপিত হয় এবং সেই কুপিত বায়ু পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, কটী, ঘাড়ের শিরা ও হৃদয়ে শূলবদ্ বেদনা, মূর্চ্ছা, ভ্রম, ও সংজ্ঞানাশ উৎপন্ন ক'রে। এরূপ স্থলে রোগীকে স্নেহ দ্বারা অভ্যঙ্গ করে ধান্য-স্বেদ দিয়ে যষ্টিমধু সহ পাক করা শীতল তৈলের অনুবাসন প্রয়োগ করা উচিত।

ডাঃ। বমন বিরেচন উভয়ের বাতশূল ব্যাপদের কি এই একরূপ লক্ষণ এবং চিকিৎসা?

ক। হাঁ, যেখানে অন্যরূপ উল্লেখ না থাকে, সেখানে এক রকমই বুঝতে হ'বে, কেননা প্রথমেই বলা হ'য়েছে যে, উভয়ের ব্যাপদ উর্দ্ধগতি অধোগতি ভিন্ন সমস্তই এক প্রকার।

এইবার আরোগ্যের কথা বলিতেছি। স্নেহ স্বেদ প্রয়োগ না ক'রে অল্প বা অল্প গুণ বিশিষ্ট ঔষধ প্রয়োগ ক'রলে তাহা উর্দ্ধ বা অধোদিক দিয়ে নিঃসৃত হয় না এবং দোষ সকলকে উৎক্লিষ্ট ক'রে ও তাহার সঙ্গে মিলিত হ'য়ে বলক্ষয় করে। ইহাতে পেটবেদনা তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা ও দাহ উপসর্গ ঘটে। এরূপ অবস্থায় লবণ মিশ্রিত মদন ফলের ক্বাথ দ্বারা বমন করা'বে এবং তীক্ষ্ণতর কর্পূর প্রয়োগ ক'রে বিরেচন করাবে। আবার যে ব্যক্তির সহজে বমন হয় না, যে ব্যক্তির বমনকারক ঔষধ সেবন করলে অল্প বমন হয় এবং সেই ঔষধ দোষ সকলকে উৎক্লিষ্ট ক'রে শরীরে কণ্ডু, শোথ, কুষ্ঠ, বেদনা উৎপন্ন করে, এরূপ স্থলে অবশিষ্ট দোষ তীক্ষ্ণ-ঔষধ প্রয়োগ না ক'রে বিরেচন প্রয়োগ ক'রলে অল্প বিরেচন হয় এবং নাভির অধোভাগে উদরের পূর্ণতা ও স্তব্ধতা, বোধ হয় এবং মণ্ডলাকার চিহ্নের উৎপত্তি হয়। এইরূপ অবস্থায় আস্ফালন প্রয়োগ করে পুনরায় স্নেহস্বেদ এবং বিরেচন করাবে, তাহার পর তীক্ষ্ণ ঔষধ প্রয়োগ করে বিরেচন করাবে। দোষ উপযুক্তরূপে নিঃসৃত না হলে এবং সংশোধন ঔষধ দুষ্ঠ ভাবে কোষ্ঠে থাকলে বিরেচনের উত্তেজনার জন্য ঔষধ—জল পান করাবে এবং হাত গরম করে পার্শ্বদেশে ও উদরে স্বেদ দিবে। এরূপ করলে দোষ নির্গত হয়। বহু দোষযুক্ত ব্যক্তির অল্প বিরেচন প্রয়োগে শরীরে মণ্ডলাকার চিহ্নের উৎপত্তি হয়। এরূপ অবস্থায় আস্থাপন প্রয়োগ ক'রে পুনরায় স্নেহপান এবং তীক্ষ্ণ ঔষধ প্রয়োগ ক'রে বিরেচন করাতে দোষ উপযুক্ত রূপে নিঃসৃত না হলে এবং সংশোধন ঔষধ দুষ্ট ভাবে কোষ্ঠে থাকলে বিরেচনের উত্তেজনার জন্য উষ্ণজল পান ক'রাবে এবং হাত গরম ক'রে পার্শ্বদেশে ও উদরে স্বেদ দিবে। এরূপ ক'রলে দোষ নির্গত হয়। বহু দোষযুক্ত

ব্যক্তির অল্প বিরেচন হ'য়ে যদি ঔষধ জীর্ণ হয়ে যায়, তা'হলে দিবসের শেষভাগে রোগীর বলের প্রতি লক্ষ্য রেখে পুনরায় ঔষধ প্রয়োগ ক'রবে। ইহাতেও যদি দোষের নিবৃত্তি না হয়, তা'হলে দশ দিন পরে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ ক'রে পুনরায় বিরেচন ক'রাবে। রোগী দুর্ব্বল ও যাহার সহজে বিরেচন হয় না - সেরূপ স্থলে আস্থাপন প্রয়োগ ক'রে, পুনরায় স্নেহপান করিয়ে বিরেচন ক'রাবে।

এইবার অতিযোগের বিষয় ব'লছি, অতিশয় স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগের 'পর অথবা অত্যন্ত মৃদুকোষ্ঠ ব্যক্তিকে অধিক মাত্রায় বা তীক্ষ্ণ ঔষধ প্রয়োগ ক'রলে অতিযোগ হয়, বমনের অতিযোগ ঘটে, অত্যন্ত পিত্ত নিঃসরণ, বল ক্ষয় এবং অত্যন্ত বায়ুর প্রকোপ হয়। এরূপ অবস্থায় শরীরে ঘৃত মর্দ্দন ক'রে শীতল জলে অবগাহন করাবে এবং শর্করা ও চিনি মিশ্রিত হিতকর লেহ পথ্য দিবে। বিরেচনের অতিযোগ হ'লে অত্যন্ত কফনিঃস্থত হয় ও শেষে রক্ত ভেদ হয়, বলের হানি ঘটে এবং বায়ু অত্যন্ত কুপিত হয়। এরূপ অবস্থায় রোগীকে অত্যন্ত শীতল জলে অবগাহন করাবে বা রোগীর শরীরে শীতল জল সেচন করবে এবং শীতল চেলুনি জল মধু মিশ্রিত ক'রে পান করিয়ে বমন করাবে। অনন্তর পিচ্ছাবস্তি প্রয়োগ করে দুগ্ধ ঘৃত দ্বারা অনুবাসন প্রয়োগ করবে। চেলুনি জল সহ প্রিয়ঙ্গু প্রভৃতি ঔষধ পান ক'রতে দেবে এবং দুগ্ধ বা মাংস রস পথ্য দেবে।

ডাক্তার। আচ্ছা অতিযোগে কি সমস্ত গুলোই ক'রতে হবে। যদি শীতল জল সেবন করলে আর বমন করালে অতিযোগের লক্ষণ দূর হয়, তা'হলেও কি অনুবাসন পিচ্ছাবস্তি প্রভৃতি প্রয়োগ করতে হবে?

কবিরাজ। না, তা হ'বে কেন। রোগ থাকলেই ওষুদ দিতে হয়. রোগ না থাকলে ওষুদ দেবার আবশ্যক কি, তবে ততক্ষণ ক্রমশঃ ঐ সকল ক্রিয়া ক'রতে হ'বে।

ডাঃ। ভাল আর একথা কথা,—পূর্ব্বে বলা হয়েছে যে, বিরেচনের সাত দিন পরে বস্তিক্রিয়া করতে হয়, এ স্থলেও কি তাই করতে হবে? আর যোগবস্তি যেরূপ আটটী প্রয়োগ করবার নিয়ম, সেইরূপ করতে হবে?

ক। তাও কি কখন হয়? রোগী অতিরিক্ত বিরেচনের ফলে মারা যেতে বসেছে সে স্থলে কি অপেক্ষা করা চলে? আর এরূপ অবস্থায় দুর্ব্বল রোগীর পক্ষে—দুই একটী বস্তি—তাও কম মাত্রায় প্রয়োগ করতে হয়। নইলে রোগী সহ্য ক'রতে পারবে কেন? পিচ্ছাবস্তি দিলে যদি উপসর্গ নষ্ট হয়, তবে দুটী দেবার আবশ্যক নেই।

ডাঃ। আচ্ছা বুঝেছি, এইবার অন্য কথা বলুন।

ক। বমনের অতিযোগ হেতু যদি থুঁথুর সঙ্গে রক্ত উঠে বা রক্ত বমি হয়, জিহ্বা নির্গত হয়ে পড়ে বা ভিতরে প্রবেশ করে, চক্ষু বহির্গত হয়, চোয়াল ধরে যায়, পিপাসা, হিক্কা, জ্বর ও সংজ্ঞানাশ হয়, তবে জীবদান ব্যাপদ বলে। এই অবস্থায় রোগীকে ছাগলের রক্ত, রক্ত চন্দন, বেণার মূল, রসাঞ্জন ও খৈ—চিনি ও জলে গুলে পান ক'রাতে হয়। আর রক্তপিত্তের বিধান অনুসারে চিকিৎসা করতে হয়। দুগ্ধ ও জাঙ্গল মাংসের রস পথ্য দিতে হয়।

জিহ্বা অত্যন্ত নির্গত হয়ে প'ড়লে—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও সৈন্ধব লবণের চূর্ণ দ্বারা ঘর্ষণ করে কিম্বা তিল ও কিসমিস বাটা মাখিয়ে মর্দ্দন ক'রে ভিতরে প্রবিষ্ট করিয়ে দেবে। আর জিহ্বা ভিতরে প্রবিষ্ট হয়ে গেলে তাহার সম্মুখে লোভজনক অম্লদ্রব্য আস্বাদান করাবে। ইহাতে জিহ্বা লালাস্রাব হেতু মৃদু হয়ে স্বস্থানে অবস্থিত হয়। চক্ষু বহির্গত হয়ে পড়লে ঘৃত মাখিয়ে শীতল ক'রে যথাস্থানে প্রবিষ্ট করাবে। চোয়াল ধরে গেলে বাতশ্লেষ্মানাশক নস্য এবং স্বেদ প্রয়োগ করবে। তৃষ্ণা প্রভৃতি উপদ্রবে তৃষ্ণাদি প্রশমক প্রক্রিয়া করবে। রোগী সংজ্ঞাহীন হলে বাঁশী, বীণা ও সঙ্গীত ধ্বনি শ্রবণ করাবে।

ডাঃ। এটা কি রকম হল কবিরাজ মশায়? রোগী অজ্ঞান হলে গান শোনে কে?

ক। বিশেষ অন্যায় কিছু হয় নি। এতো আর সন্ন্যাস রোগের অচৈতন্য হওয়া নয়, যে উত্তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা দগ্ধ করবার বিধান থাকবে। এতে অতিরিক্ত বমন হ'য়ে রোগী এবং রোগীর ইন্দ্রিয় শক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়ে। এরূপ স্থলে সঙ্গীতাদির ধ্বনি দ্বারা চেতনার উদ্বোধন হয়। এই মনে করুন—ঘুমের সময়েও মানুষের জ্ঞান থাকে, গীতবাদ্যধ্বনি দ্বারা কি নিদ্রিতের চেতনার উদ্বোধন হয় না?

ডাঃ। কারও কারও অল্পে হয়, কারও কারও ঢাক বাজা'তে হয়।

ক। এও সেই রকম। এ স্থলে অল্পে হয় ব'লে বীণাবেণুর ধ্বনিতেই চলে, আবার বিশেষ অচৈতন্য হলে শাস্ত্রে ঢাক বাজাবারও উপদেশ আছে।

ডাঃ। তাইত অচৈতন্য হওয়ার যেমন নানা রকম আছে, তার জন্য প্রক্রিয়াও নানা রকম দেখছি। বেশ স্পষ্ট ধারণা করতে পারছিনে, কিন্তু মনে হয়—এর ভিতর অবশ্যই কিছু সত্য আছে।

ক। সত্য না থাকলে ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষেরা কি কতকগুলো প্রলাপ ব'কে গিয়াছেন মনে করেন?

ডাঃ। তা মনে ক'রলে কি আর এত যত্ন করে শুনতাম?

ক। ভগবান অপনার মঙ্গল করুন, শুনে বড় সুখী হলাম। কিন্তু আজ কাল অনেকেই নিজে যা বোঝেন না—সেটা কিছুই নয় ব'লে মনে করেন। আমাদের এই ক্ষুদ্র বুদ্ধি নিয়ে অনন্তরহস্যজগতের কতটুকু রহস্য আমরা বুঝতে পারি? প্রকৃতি সম্বন্ধীয় বা রোগ সম্বন্ধীয় একটা তুচ্ছ বিষয় মীমাংসা করবার জন্যেও কত সুধী ব্যক্তি জীবন পাত করেও জানতে পারেন নি। আর আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি নিয়ে এক মুহূর্ত্তে সকল বিষয়ের মীমাংসা করে ফেলি—ইহাই আশ্চর্য্য।

ডাঃ। খুব সত্য কথা। এখন আপনি তারপর বিরেচনের অতিযোগের কথা বলুন। ভাল একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—আপনি পূর্ব্বেও—ত অযোগ অতিযোগের কথা বলেছিলেন। সেও ত শাস্ত্রের কথা, তবে শাস্ত্রে আবার পৃথক ভাবে অযোগ অতিযোগের কথা বলা হয়েছে কেন?

ক। সেটা হ'ল সামান্য অযোগ অতিযোগ, আর এটা হচ্ছে বিপত্তি জনক অযোগ অতিযোগ। তবে ব্যাপদের দু' একটা কথাও পূর্ব্বে বলা গেছে, সমগ্র ব্যাপদ আপনাকে শোনান ঘটেনি।

ডাঃ। আচ্ছা বলুন এখন।

ক। বিরেচনের অতিযোগ হ'লে ময়ূর পুচ্ছের ন্যায় চাকচিক্য শালী জলবৎ ভেদ হয়. পরে মাংসধোয়া জলের ন্যায় ভেদ হয়, পরে জীবশোণিত নির্গত হয়, মলদ্বার নির্গত হয়ে পড়ে, কম্প এবং বমনের অতিযোগের কথিত উপদ্রব সকল উপস্থিত হয়। এরূপ অবস্থায় রক্তপিত্ত এবং রক্তাতিসারের বিধান অনুসারে চিকিৎসা ক'রতে হয়। মলদ্বার নির্গত হ'য়ে পড়লে তা'তে ঘৃতাদি স্নেহ পদার্থ মাখিয়ে স্বেদ দিয়ে ভিতরে প্রবিষ্ট কর'বে অথবা ক্ষুদ্র রোগের চিকিৎসায় গুদভ্রংশের (হারিশ) যেরূপ চিকিৎসার কথা বলা হ'য়েছে সেইরূপ চিকিৎসা করবে। কম্প হ'লে বাতব্যাধিতে কম্পের যেরূপ চিকিৎসার কথা বলা হ'য়েছে, সেই রূপ চিকিৎসা করবে।

ডাঃ। এই যে সব অমুক রোগের মত চিকিৎসা ক'রবে ব'লে বরাত দেওয়া হয়েছে, এগুলো কি সুবিধা জনক ?

ক। সুবিধা জনক বৈকি! নইলে এক প্রকার চিকিৎসার কথা অনেক জায়গায় ব'লতে হয়, আর তা'তে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি ছাড়া কোন লাভ নাই।

ডাঃ। কিন্তু চিকিৎসকের পক্ষে সুবিধা হয়।

ক। চিকিৎসকের পক্ষে সুবিধা হয়—এ কথাও বলা যায় না। কারণ সময়ে দরকার হলেও যদি সর্ব্বদা পুঁথি খুলে চিকিৎসা ক'রতে হয়, তবে তাঁকে চিকিৎসক নামে অভিহিত করা যায় না। চিকিৎসা শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নয়।

ডাঃ। আচ্ছা আপনি তারপর বলুন।

ক। জিহ্বা নির্গত হয়ে পড়লে পূর্ব্বে যেমন বলা হয়েছে সেইরূপ চিকিৎসা করতে হয়। জীবশোণিত অতিরিক্ত পরিমাণে নির্গত হয়ে থাকলে গাম্ভারী ফল, কুল, দুর্ব্বা ও বেণার মূল,—এই সকল দ্রব্যের সঙ্গে দুগ্ধ পাক ক'রে শীতল হ'লে তার সঙ্গে ঘৃত ও স্রোতাঞ্জন, (সুরমা বিশেষ) মিশিয়ে আস্থাপন প্রয়োগ করবে। ন্যগ্রোধাদিগণের (বট প্রভৃতি কতক গুলি বৃক্ষে'র ছালের) কাথ, দুগ্ধ; ইক্ষুরস, ঘৃত ও রক্ত (ছাগাদির) একত্র মিশ্রিত ক'রে বস্তি প্রয়োগ করবে। মুখ দিয়ে রক্ত নির্গত হ'লে রক্তপিত্ত ও রক্তাতিসারের ন্যায় চিকিৎসা ক'রবে।

মলদ্বার দিয়ে যে রক্ত নির্গত হয়, সেটা জীব রক্ত কি রক্তপিত্তের রক্ত তাহা পরীক্ষার জন্য সেই রক্ত তুলা বা বস্ত্রে ঘৃত রাখিয়ে উষ্ণ জলে ধৌত ক'রলে যদি দাগ উঠে না যায় তবে জীবশোণিত ব'লে জানবে। আর সেই রক্ত অন্ন বা ছাতুতে মাখিয়ে কুকুরকে খেতে দিলে, যদি খায়, তবে জীবশোণিত ব'লে জানবে। অন্যথায় অর্থাৎ যদি বস্ত্রের দাগ উঠে যায় এবং কুকুরে না খায় তবে রক্তপিত্তের রক্ত বলে জানবে।

ডাঃ। জীব শোণিতটা কি ?

ক। শরীরের যে বিশুদ্ধ রক্ত তাই জীব শোণিত, আর পিত্তদূষিত রক্তকেই এখানে রক্তপিত্তের রক্ত বলা হয়েছে। পিত্ত দূষিত রক্ত তিক্তাস্বাদ ব'লে কুকুরে খায় না। আর বিশুদ্ধ রক্ত তিক্ত নয় বলে খেয়ে থাকে।

ডা। আমাদের মতে আর্টারীর রক্ত বিশুদ্ধ এবং ভেনের রক্ত দূষিত। তা হলে কি এখানে আর্টেরিয়েল ব্লড আর ভেনস ব্লডের কথা বলা হইয়াছে।

ক। তা কি করে বলবো। আর্টারির আর ভেনের রক্তের কথা জানি বটে, কিন্তু

এটা ঠিক তাই কি না বলতে পারিনে। তবে জীবরক্ত নামে বিশুদ্ধ রক্ত আর অন্যটী পিত্ত দূষিত রক্ত এটা বোঝা যায়।

ডা। আচ্ছা আমি একবার পরীক্ষা ক'রে দেখবো। আপনি তার পর বলুন।

ক। এতক্ষণ অতিযোগের কথা বলা হয়েছে, এইবার আধ্মান-ব্যাপদের কথা ব'লব।

বহু দোষযুক্ত, রুক্ষ বা বায়ুকোষ্ঠ (যাহার উদরে কুপিত বায়ু থাকে) ব্যক্তির ভুক্তান্ন অবশিষ্ট থাকলে অর্থাৎ সম্পূর্ণ জীর্ণ না হলে যদি অনুষ্ণ এবং অস্নিগ্ধ ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, তা হলে উদরাধ্মান, বায়ু মূত্র ও পুরীষের অপ্রবৃত্তি (নির্গত না হওয়া) আমাশয় স্ফীত হওয়া পার্শ্বদেশে ভঙ্গবৎ বেদনা, মলদ্বার ও বস্তিতে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, অন্নে অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পেলে আধ্মানব্যাপদ্ বলা যায়। এরূপ অবস্থায় স্বেদ দিয়ে আনাহ রোগে যে মলভেদক বর্ত্তির কথা বলা হ'য়েছে, সেই বর্ত্তি প্রয়োগ করবে, যা'তে অগ্নি বৃদ্ধি হয় এরূপ ক্রিয়া ক'রবে এবং প্রয়োগ ক'রবে।

ক্ষীণ দেহ, মৃদু কোষ্ঠ, রুক্ষ বা মন্দাগ্নি বিশিষ্ট বা রুক্ষ ব্যক্তিকে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, অত্যন্ত লবণ রসাত্মক কিম্বা অত্যন্ত রুক্ষ ঔষধ প্রয়োগ ক'রলে—বায়ু, পিত্ত, দূষিত হয়ে পরিকর্ত্তিকা ব্যাপদ উপস্থিত করে। ইহাতে মলদ্বার, নাভি, লিঙ্গ, বস্তি ও মস্তকে কাটার মত যন্ত্রণা হয়, বায়ু স্তব্ধ হ'য়ে থাকে, এবং আহারে অরুচি হয়। এরূপ অবস্থায় যষ্টি মধু ও কৃষ্ণতিল বাটা এবং মধু ও ঘৃত সংযুক্ত করে পিচ্ছাবস্তি প্রয়োগ ক'রবে।

ডা। পিচ্ছাবস্তিটে কি একটু মোটা মুটি বলুন না?

ক। শিমূলের বোঁটা, শিমূল ফুল, বট; যজ্ঞ ডুমুর ও অশ্বথের কুঁড়ি প্রভৃতি দ্রব্যদ্বারা যে পিচ্ছিল গুণ বিশিষ্ট বস্তি প্রয়োগের ঔষধ প্রস্তুত হয় তাকে পিচ্ছাবস্তি বলে। পিচ্ছা বস্তি প্রয়োগের পর রোগীর শরীরে শীতল জল সেচন করবে, ঘৃতমণ্ড ও দুগ্ধের সহিত অন্ন সেবন করবে এবং যষ্টিমধু সিদ্ধ তৈল দ্বারা অনুবাসন প্রয়োগ করবে।

ডা। ঘৃতমণ্ড কি? অন্নমণ্ডের মত জলের সঙ্গে ঘৃত পাক ক'রে প্রস্তুত করতে হয় নাকি?

ক। ঘৃতের উপরের তরল অংশকে ঘৃতমণ্ড বলে। মণ্ড শব্দে সারে-মাতে যে সব জিনিষ থাকে তা'র মাতকে বোঝায়।

ডা। বুঝেছি। এইবার পরিস্রাব ব্যাপদের কথা বলুন।

ক। ক্রূরকোষ্ঠ বা বহুদোষযুক্ত ব্যক্তিকে মৃদু ঔষধ প্রয়োগ ক'রলে দোষ সকলকে উৎক্লিষ্ট (বহির্গমনোন্মুখ) করে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নির্গত করতে পারে না। সেই সকল দোষ পরিস্রাব জন্মায় অর্থাৎ ক্রমাগত অল্প অল্প ক'রে নির্গত হ'তে থাকে এবং দুর্ব্বলতা, উদরের স্তব্ধতা, অরুচি, ও অঙ্গের অবসন্নতা জন্মায়। বেদনার সহিত পিত্ত ও শ্লেষ্মা অল্প অল্প ক'রে নির্গত হ'তে থাকে। ইহাকেই পরিস্রাব ব্যাপদ বলে। এরূপ ঘ'টলে আস্থাপন প্রয়োগ ক'রবে। তা'তে দোষের উপশম হ'লে রোগীকে পুনরায় স্নেহ প্রয়োগ ক'রে সংশোধন ক'রবে।

রোগীকে অত্যন্ত রুক্ষ বা স্নিগ্ধ ক'রে ঔষধ প্রয়োগ ক'রলে, বেগ উপস্থিত না হ'লে বল পূর্ব্বক বেগ দিলে কিংবা বেগ উপস্থিত হ'লে সে বেগ ধারণ ক'রলে প্রবাহিকা ব্যাপদ

উৎপন্ন হয়। এতে দাহ ও শূলবৎ যন্ত্রণার সঙ্গে বায়ু সংযুক্ত পিচ্ছিল শ্বেতবর্ণ, অথবা কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ যুক্ত কফ নির্গত হ'তে থাকে এবং মলত্যাগ কালে রোগীকে অত্যন্ত প্রবাহন ক'রতে (কোঁথাতে) হয়। এই রোগের চিকিৎসা পরিস্রাব ব্যাপদের ন্যায়।

ডা। প্রবাহিকা মানে যাকে চলতি কথায় আমাশয় বলে এবং আমরা ডিসেণ্ট্রী (Dysentry) বলি—তাইত?

ক। হাঁ তাই বই কি?

ডা। তা'হ'লে বাংলা করে বলুন যে, জোলাপ দিলে কথন কথন আমাশয় হ'তে পারে, আর তার চিকিৎসা এই রকম।

ক। বাংলা করে বলিনি, তবে কি সংস্কৃত ক'রে বলিছি নাকি? তবে আমাশা না ব'লে প্রবাহিকা বলেছি। তা' আমাশয় রোগ নয় একটা যন্ত্র, যাকে আপনারা ষ্টমাক ব'লে থাকেন।

ডা। আচ্ছা তা' হ'ক এখন তার পর কি বলুন।

ক। তারপর হৃদয়োপসরণ। অজ্ঞতা বশতঃ বমন বা বিরেচনের বেগ ধারণ ক'রলে দোষ সকল হৃদয়ে উপসরণ অর্থাৎ গমন করে। প্রধান মর্ম্ম হৃদয় সন্তপ্ত হলে অত্যন্ত বেদনা হয়, রোগী দাঁত কিড়মিড় করে, চক্ষু উর্দ্ধগত হয় জিহ্বা দংশন করে, অবসন্ন হয়, এবং অচৈতন্য হ'য়ে পড়ে। এরূপ অবস্থায় রোগীকে স্নেহাভ্যঙ্গ করে ও ধান্য স্বেদ দিয়ে যষ্টিমধুর সহিত সিদ্ধ তৈলের অনুবাসন দিতে হয় এবং তীক্ষ্ণ শিরোবিরেচন প্রয়োগ করতে হয়।

(ক্রমশঃ)

শিশুর খাদ্য।

—:০:—

মাতৃদুগ্ধ শিশুর সম্পূর্ণ পোষণের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। একশত ভাগ মাতৃ দুগ্ধে মোটামুটী বলিতে গেলে ৮৯ ভাগ জল, ৪ ভাগ নাইট্রোজেন ঘটিত বস্তু, ৩ ভাগ স্নেহ, ৩ ভাগ চিনি এবং এক ভাগের ¼ অংশ ধাতব বস্তু আছে।

বয়োবৃদ্ধিসহকারে শিশুর খাদ্যের আবশ্যকীয় উপাদানেরও মহৎ পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। প্রাপ্তবয়স্কের শরীরের ওজনের অনুপাতে যত স্নেহ ও শ্বেতসার জাতীয় পদার্থের আবশ্যক একটী দশমাসের শিশুর পক্ষে তাহার শরীরের ওজনের অনুপাতে ঐ দুই জাতীয় পদার্থের তদপেক্ষা তিনগুণ অধিক আবশ্যকতা দৃষ্ট হয়। প্রাপ্ত-বয়স্কের আকৃতির সহিত শিশুর আকৃতি তুলনায় শিশুর পক্ষে যে পরিমাণ খাদ্যের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হয়, বস্তুতঃ তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ খাদ্য শিশুর জন্য আবশ্যক। শিশুর পরিবর্দ্ধন অতিদ্রুত নির্ব্বাহ হইতে থাকে—শরীরের অস্থি, মাংসাদি ধাতু গঠিত হইতে থাকে এবং শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত নির্ব্বাহ হয়, সুতরাং খাদ্যাধিক্যের আবশ্যকতা হয়।

বয়োবৃদ্ধির সহিত এই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে, অতএব ভিন্নরূপ খাদ্যের আবশ্যক হয়। শিশুর মত একজন যুবা কদাপি কেবল দুগ্ধ মাত্র পান করিয়া থাকিতে পারে না। কেবল দুগ্ধ মাত্র পান করিয়া বাঁচিতে হইলে একজন যুবককে ৪ সেরেরও অধিক দুগ্ধ পান করিতে হয়; কিন্তু ইহাতে আহারে স্নেহের ভাগ অত্যধিক হইয়া পড়ে। প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের শরীর ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। শরীরোপাদনের এই ক্ষয় পূরণ ও শরীর-গঠন এবং শরীরের উত্তাপ রক্ষা এই দ্বিবিধ কার্য্য যে আহারের দ্বারা নির্ব্বাহ হয় তাহাই শরীর রক্ষার উপযোগী আহার। প্রোটিড় জাতীয় পদার্থ, জল এবং বিবিধ ধাতব পদার্থের দ্বারা প্রথম প্রকারের কার্য্য এবং নাইট্রোজেন্ ঘটিত এবং নাইট্রোজেন বর্জ্জিত খাদ্যের দ্বারা দ্বিতীয় প্রকারের কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। যে খাদ্যে এই সকল অত্যাবশ্যক পদার্থের কোন একটী নাই, কিছুকাল যদি সেইরূপ আহার কোন প্রাণী গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার শরীর এতদূর ভগ্ন হইয়া পড়িবে যে, পরে তাহাকে গুণকারী আহার প্রদান করিয়াও তাহার প্রাণরক্ষা করা কঠিন হইয়া থাকে। শিশুর পক্ষেও এইরূপ—যদি কোন শিশুকে ভেজাল দুধ দেওয়া হয়, কিম্বা দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত এমন কোন খাদ্য আহার করিতে দেওয়া যায়, যাহাতে শিশুর শরীর রক্ষার জন্য যে বস্তুর প্রয়োজন তাহা হয় অতি-মাত্রায় নচেৎ অতি অল্প মাত্রায় আছে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই শিশুর স্বাস্থ্য-হানি হইবে।

সমস্ত-প্রাণি-দুগ্ধেই শিশুর শরীর রক্ষার আবশ্যক উপাদান বিদ্যমান থাকিলেও ঐ সকল উপাদানের পরিমাণের অবশ্যই পার্থক্য আছে। ইহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, মনুষ্য, গো, মহিষ, ছাগ, প্রভৃতি প্রত্যেক প্রাণীর শাবকেরা সকলেই দুগ্ধ পান করিলেও প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন উপাদান সমন্বিত বস্তু ভোজন করিতেছে। অতএব ইহা প্রমাণ করিতে কিছুমাত্র বিবাদ করিতে হয় না যে, নরশিশুর পক্ষে গো বা ছাগ দুগ্ধ কদাচই—যথার্থ উপযোগী খাদ্য নহে। গো দুগ্ধের সহিত নারীদুগ্ধের তুলনা করিলে দেখা যায় নারীদুগ্ধ অপেক্ষা গোদুগ্ধে জল কম কিন্তু কঠিন বস্তু (Solids) অত্যধিক মাত্রায় আছে—স্নেহ, লবণ পদার্থ ও নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ গোদুগ্ধে অধিক, কিন্তু শর্করা অল্প।

গোদুগ্ধ কিরূপে নারীদুগ্ধের সদৃশ হয়?—গোদুগ্ধে জল মিশাইলে উহার এলবুমেন ও লবণ ঘটিত পদার্থ নারীদুগ্ধের তুল্য হয় বটে কিন্তু শর্করার পরিমাণ আরও কমিয়া যায় এবং মেদের ভাগও অল্পতর হইয়া থাকে। অতএব যদি গোদুগ্ধে জল মিশাইয়া তাহাকে নারীদুগ্ধের সদৃশীকরণের প্রণালীই আমরা অবলম্বন করি, তাহা হইলে উহাতে শর্করা ও স্নেহ মিশ্রিত করিলেই আমাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হইতে পারে। কত পরিমাণ শর্করা ও স্নেহ মিলাইতে হইবে এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণ বহু তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন। কিন্তু পরে আমরা যে তালিকা দিব তদনুসারে কার্য্য করিলেই গোদুগ্ধ কার্য্যোপযোগিতায় নারী দুগ্ধের সদৃশ হইবে।

কিন্তু আরও কতকগুলি বিষয়ে সমতা উৎপাদন করিতে না পারিলে গো দুগ্ধ ঠিক নারীদুগ্ধের তুল্য হইবে না। কোন্ কোন্ বিষয়ে সমতা সম্পাদন আবশ্যক? প্রথমতঃ নারীদুগ্ধের প্রতিক্রিয়া ক্ষারধর্ম্মী (Alkaline) কিন্তু গো-দুগ্ধ অম্লধর্ম্মী (Acid)। নারীদুগ্ধ

জীবাণু বর্জ্জিত, গোদুগ্ধ জীবাণু পূর্ণ ; গোদুগ্ধ শিশুর পাকস্থালীতে গিয়া দুর্জ্জর মোটা মোটা জমাট পদার্থে পরিণত হয়, পক্ষান্তরে নারীদুগ্ধ সহজে জীর্ণ হইবার উপযুক্ত দধিবৎ পদার্থে পরিণত হুইয়া থাকে।

এক্ষণে বুঝিতে পারাগেল যে গোরুর দুধকে নারী দুগ্ধের তুল্য গুণান্বিত করিতে হইলে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে—

(১) পাৎলা করিতে হইবে।

(২) শর্করা এবং স্নেহ যোগ করিতে হ ইবে।

(৩) বড় বড় জমাট বাঁধা পদার্থে যাহাতে পরিণত হইতে না পারে এতদর্থে কোন পদার্থের সংযোগ করিতে হইবে।

(৪) ক্ষার গুণান্বিত করিতে হইবে।

(৫) জীবাণু বর্জ্জিত করিতে হইবে।

"চার" চামচের ৪ চামচ গোদুগ্ধ লইয়া তাহাতে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি মিশাইলে উপরি-লিখিত মত সংস্কার সাধিত হইবে—

দুগ্ধ	...	চার চামচের ৪ চামচ
জল	...	,, ,, ৭ ,,
চুণের জল	...	,, ,, ১ ,,
সোডা সাইট্রেট্		২ গ্রেণ অর্থাৎ ১ রতি
দুগ্ধজাতশর্করা		১০ গ্রেণ অর্থাৎ ৫ রতি
"ক্রীম" (cream)		১০ বিন্দু।

উপরি লিখিত কোন্ বস্তুর দ্বারা কি উদ্দেশ্য সাধিত হয় জানা উচিত। চুণের জল যোগ করায় ১, ৩, ৪, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় বটে—কিন্তু ইহাতে মলবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা বা দীর্ঘকাল ব্যবহার করিতে করিতে অতিসার জন্মিতে পারে। এই দোষ দূরীকরণার্থ পাৎলা বার্লির জল, অনেকে চুণের জলের পরিবর্ত্তে পছন্দ করেন। বার্লির জলে ১, ৩, উদ্দেশ্য সাধিত হয়। সোডা সাইট্রেট্ যোগ করিলে দুগ্ধের ক্ষারত্ব সাধিত হইয়া থাকে। "ক্রীম" (cream) কর্ত্তৃক অতিরিক্ত স্নেহ সংযোজিত হইয়া থাকে।

"ক্রীম" (cream) বাজার হইতে ভাল ক্রীম্ সংগ্রহ করা দুষ্কর, অতএব বাড়ীতে প্রস্তুত করাই ভাল। সাধারণতঃ লোকে ক্রীমকে দুগ্ধ হইতে পৃথক্ বস্তু বলিয়া জানে, কিন্তু বস্তুতঃ "ক্রীম" অধিকতর স্নেহ সমন্বিত দুগ্ধ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভাল দুগ্ধ হইতেই ভাল "ক্রীম" পাওয়া যায়। ভাল দুগ্ধ হইতে "ক্রীম" উঠাইবার পূর্ব্বে—যত অধিকক্ষণ সেই দুগ্ধকে স্থিরভাবে রাখা হয়, ক্রীম ততই অধিক পাওয়া যায়। উত্তম দুগ্ধ ১২ ঘণ্টা রাখিয়া ক্রীম উঠাইলে সেই ক্রীমে শতকরা ১৬ ভাগ স্নেহ থাকে। দুগ্ধ যত অল্পক্ষণ রাখিয়া ক্রীম উঠান হইবে—তাহাতে ততই অল্প মাত্রায় ক্রীম পাওয়া যাইবে। শিশুর জন্য যে ক্রীম উপযোগী তাহাতে শত করা ১০।১২ ভাগ স্নেহ থাকিলেই যথেষ্ট। দুগ্ধ হইতে ক্রীম পাইবার সহজ উপায়—

এক পাইট দুধ ধরে এমন একটী গোল লম্বা টীনের পাত্র প্রস্তুত করাইবে, ইহার তলদেশ সমতল না হইয়া কিছু গড়ানে ভাবের হইবে। একটী ঢাকনি আর নীচের দিকে পাশে একটী ছোট নল থাকিবে। এই পাত্রের ভিতর দিকে সমান চারিভাগে বিভক্ত করিয়া ৪টি চিহ্ন থাকিবে। ছোট নলটীর মুখে হইতে দুই ইঞ্চ লম্বা একটী রবারের নল থাকিবে, রবারের নলের মুখ একটী "সেফ্ টিপিন্" দিয়া বন্ধ থাকিবে।

বিশুদ্ধ দুগ্ধ ছাঁকিয়া ঐ টিনের পাত্রে রাখিয়া ঢাক্‌নী বন্ধ করিয়া পাত্রটীকে শীতল [illegible]

বা গ্রীষ্মকালে বরফের বাক্সের ভিতর রাখিয়া ৫ ঘণ্টাকাল অপেক্ষা করিবে। পরে রবারের নলের মুখ খুলিয়া দিলে দুধ বাহির হইতে থাকিবে। টীনের পাত্রে পূর্ব্বে যে সমভাগে চারিটী চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, দুগ্ধ নির্গত হইতে হইতে যখন তিনটী চিহ্ন অতিক্রম করিয়া চতুর্থ চিহ্নে উপর আসিবে অর্থাৎ যখন দুগ্ধের ¼ অংশ পাত্রে থাকিবে, তখন আর দুধ বাহির হইতে দিবে না—নল বন্ধ করিবে। এই ¼ অংশ যাহা থাকিবে তাহা সমস্তই ক্রীম। এই ক্রীম শিশুর পানীয় দুগ্ধে মিশাইবার জন্য রাখিয়া দিবে। ইহাতে শত করা ১০ ভাগ স্নেহ আছে।

বার্লির জল প্রস্তুত প্রণালী—চার চামচের দুই চামচ পার্ল বার্লি লইয়া পরিষ্কার এনামেলের বা পিতলের পাত্রে রাখিয়া কিছু জল দিয়া জোর জালে আন্দাজ ৫ মিনিট কাল ফুটাইয়া জল ফেলিয়া দিয়া আবার এক পাঁইট অর্থাৎ ৩০ তোলা পরিস্রুত জল উহাতে ঢালিয়া ধীরে ধীরে ফুটাইবে ২০ তোলা আন্দাজ জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং মস্‌লিনের মত পাৎলা একখণ্ড কাপড় ফুটন্ত জলে ভিজাইয়া নিঙ্‌ড়াইয়া লইয়া ঐ কাপড় দ্বারা ছাঁকিবে।

বার্লির জল প্রস্তুতের অন্য প্রণালী—চার চামচের দুই চামচ যব লইয়া কুটিয়া একটী পাত্রে রাখিয়া এক পাঁইট ফুটন্ত জল উহাতে ঢালিয়া নাড়িতে থাক, পরে আগুণের নিকটে এই পাত্রটী এক ঘণ্টা রাখিয়া মধ্যে মধ্যে নাড়িতে হইবে—পরে মস্‌লিনের মত পাৎলা কাপড়ে ছাঁকিয়া লইয়া এক চিম্‌টা লবণ মিশাইয়া লইবে। বার্লির জল প্রতিদিন নূতন প্রস্তুত করিতে হইবে। বাসি বার্লির জল কদাচ শিশুকে পান করিতে দিবে না—গ্রীষ্মকালে প্রয়োজন হইলে দৈনিক দুইবার ও বার্লির জল প্রস্তুত করিবে।

চুলের জল (Limewater) ডাক্তারী ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়, তাহাই ব্যবহার করিতে হইবে।

এক্ষণে আমরা নারী দুগ্ধের সহিত অন্যান্য গৃহপালিত প্রাণীর দুগ্ধের তুলনা করিব।

উপাদান		নারীদুগ্ধ		গোদুগ্ধ		গর্দ্দভদুগ্ধ		ছাগদুগ্ধ	
প্রোটিড্	কেজিন্	০·৬	২·০	৩·২৫	৪·০	১·০	১·৮	৩·০	৩·৭
	ল্যাক্‌টো এল্‌বুমিন্ ...	১·৪		০·৭৫		০·৮		০·৭	
স্নেহ		৩·০		৩·৫		১·০		৪·২	
শর্করা		৭·০		৪·০		৫·৫		১·০	
ধাতব পদার্থ		০·২		০·৭		০·৪		০·৫	

সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস যে গর্দ্দভের দুগ্ধ গুণে প্রায় নারী দুগ্ধের তুল্য বস্তুতঃ ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি। গর্দ্দভীর দুগ্ধে অধিক পরি-[illegible]

কম আছে। শর্করা এবং লবণ অধিক মাত্রায় বিদ্যমান। গর্দ্দভীর দুগ্ধ সহজে পরিপাক পায় বলিয়া সে সকল শিশু গো দুগ্ধ পরিপাক করিতে পারে না তাহাদের পক্ষে গর্দ্দভীর দুগ্ধ বিশেষ উপযোগী। কিন্তু দোষ এই যে, ইহাতে অধিক মাত্রায় লবণ থাকায় অনেক সময় শিশুর উদরাময় হইয়া থাকে। ইহার বিরেচন শক্তি আছে বলিয়া যে সকল শিশুর যকৃৎ দোষ ও কোষ্ঠ বদ্ধতা আছে তাহাদের পক্ষে উপকারী; কিন্তু সুস্থ শিশুর পক্ষে এত বিরেচন শক্তি যুক্ত দুগ্ধ তাদৃশ ব্যবস্থেয় নহে। আরও দোষ এই যে, যদি সুস্থ শিশুকে গর্দ্দভীর দুগ্ধ পান করান হয় তাহা হইলে মাখম এবং এলবুমিন্ ঘটিত অভাব পূরণ জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায় দুগ্ধ পান করাইতে হইবে কিন্তু মাত্রাধিক্যের জন্য আবার লবণ, শর্করার পরিমাণ অত্যধিক হইয়া পড়িবে। অতএব বুঝিতে পারা গেল যে গর্দ্দভের দুগ্ধ সুস্থ শিশুর পক্ষে উপযুক্ত খাদ্য নহে। গর্দ্দভীর দুগ্ধে ক্রীম সংযুক্ত করিলে উহার অনেক দোষ দূরীভূত হইতে পারে বটে কিন্তু এদেশে ভাল ক্রীম সংগ্রহ করা তত সহজ ব্যাপার নহে। নারী দুগ্ধের সহিত তুলনায় গর্দ্দভীর দুগ্ধের দোষ গুণ বিচার করা হইল। এক্ষণে গো দুগ্ধ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, যদিও গো দুগ্ধে প্রোটিড এবং লবণ অধিক মাত্রায় আছে তথাপি উহা অনেকটা নারী দুগ্ধের তুল্য। ছাগ দুগ্ধ সম্বন্ধে কথা এই যে, উহাতে ছানা এবং লবণের ভাগ অধিক থাকিলেও, যে সকল শিশুর পরিপাক শক্তি বলবতী তাহাদের প্রতিপালনের জন্য ছাগ দুগ্ধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য প্রাণীর আহারের উপর তাহার দুগ্ধের গুণাগুণ নির্ভর করে। এমন কি আমরা সকলেই জানি যে, মাতা কোন বিরেচক ঔষধ সেবন করিলে তাহার দুগ্ধেও বিরেচন গুণ সঞ্চারিত হইয়া শিশুর অন্ত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই জন্য আয়ুর্ব্বেদে অতি শিশুকে ঔষধ পান করানর পরিবর্ত্তে তাহার মাতা বা স্তন্যদাত্রীকে ঔষধ পান করানর উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ছাগ বহুভুক্ প্রাণী অতএব ইহাকে যথেচ্ছ বিচরণ পূর্ব্বক যাহা তাহা ভোজন করিতে না দিয়া, যদি বাঁধিয়া রাখিয়া নির্দ্দিষ্ট ভোজ্য দান করা যায়, তাহা হইলে ছাগলের দুগ্ধের দুর্জ্জরতা (যাহা হজম করা শক্ত) সম্বন্ধে যে ধারণা আছে তাহা অমূলক বলিয়া প্রতীত হইবে।

বিশুদ্ধ গোদুগ্ধ অতি ঈষৎ অম্লরস হইয়া থাকে—এই অম্লত্ব জিহ্বায় অনুভব করা যায় না—কিন্তু যদি এক খণ্ড নীলবর্ণ 'লিটমাস্' কাগজ লইয়া দুগ্ধে ডুবান যায় তাহা হইলে ঐ নীলবর্ণ কাগজ খণ্ড গোলাপী রঙ ধারণ করিবে। যদি লাল হয় তাহা হইলে দুগ্ধে অম্লত্ব অধিক পরিমাণে আছে বুঝিতে হইবে। দুগ্ধ অতিরিক্ত অম্লরসান্বিত হইলে বুঝিতে হইবে যে উহা পচিতে আরম্ভ করিয়াছে; অতএব এরূপ দুগ্ধ পরিহার করা উচিত। যদি গোদুগ্ধে চা খড়ির গুঁড়া মিশান থাকে তাহা হইলে উহা "লিট্‌মাস" কাগজের বর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না। যদি রুগ্ণ গোরুর দুধ হয় তাহা হইলে উহাতে দুগ্ধের স্বাভাবিক অম্লত্বও থাকিবে না—উহা একবারে ক্ষারধর্ম্মী (Alkaline) হইবে। আবার নারী দুগ্ধ ও ক্ষারধর্ম্মী হয় সুতরাং ইহাও—"লিট্‌মাস" কাগজের বর্ণ লাল করিতে পারে না। এই সকল কারণে শিশুর [illegible] পূর্ব লিখিত পরিমাণ [illegible]

সেবন করান ভাল। ইহাতে যে অম্লত্ব দূর হয় তাহা লিট্‌মাস্' কাগজের দ্বারা পরীক্ষা করিলেই প্রতীত হইবে।

দুধ কাটিয়া যায় কেন?—গ্রীষ্মকালে জ্বাল দিতে বিলম্ব হইলে ঋতু স্বভাবজ উত্তাপের জন্য কিম্বা দুগ্ধের পাত্রে বাসি টক্ দুধ থাকিলে দুধ কাটিয়া যায়—ছানা বাঁধে ইহা আমরা সকলেই দেখিয়াছি। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় দুধ বেশ আছে—কিন্তু জ্বাল দিতে আরম্ভ করিলেই কাটিয়া গিয়া ছানা বাঁধে। ইহা দেখিয়া আমরা তখন বিস্মিত হই বটে—কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বিস্ময়ের কোনই কারণ নাই। ঐ দুধ ইতঃপূর্ব্বেই গাজিতে আরম্ভ করিয়াছিল তবে যতটুকু 'লাক্‌টিক এসিড', সঞ্চিত হইলে বিনা অগ্নির উত্তাপে, অগ্নির উত্তাপ প্রদানানন্তর যাহা ঘটিল তাহা উৎপাদন করিতে পারিত, ততটুকু সঞ্চয় হয় নাই; সুতরাং দুগ্ধ অগ্নিতে চাপাইবামাত্র প্রচুর উত্তাপ পাইয়াই বিকৃত হইয়া যায়। অতএব বুঝিতে হইবে ঐ দুগ্ধ হয়ত কোন পচা দুগ্ধ দূষিত পাত্রে ছিল কিম্বা জ্বাল দিতে বিলম্ব হওয়ায় কালধর্ম্মে উহার উদ্রেক (fermentation) আরম্ভ হইয়াছিল। এইরূপ কাটিয়া যাওয়া দুগ্ধ শিশুকে পান করান নিষেধ। শিশুকে লইয়া অল্প দূরস্থিত স্থানে যাইতে হইলে নিম্নলিখিত প্রণালীতে দুধ লইয়া গেলে বিকৃত হইবে না। দুধকে ফুটাইয়া উহাতে কিছু চিনি মিলাইয়া কিছু গরম থাকিতে থাকিতে অতি উত্তমরূপ পরিষ্কৃত কোন বোতলে পূর্ণ করিয়া (যেন কিছুও ফাঁক না থাকে) তৎক্ষণাৎ ছিপিবন্ধ করিয়া গালা দিয়া মোহর করিয়া দিবে। যদি অতি দূর দেশে যাইতে হয় তাহা হইলে বিলাতী ঘন টীনের দুগ্ধ তৎকালে কাজে লাগিতে পারে। শিশুর বয়স যদি এক মাসের অল্প হয় তাহা হইলে চার চামচের এক চামচ বিলাতী ঘন দুগ্ধে ১২ চামচ অথবা বড় চামচের তিন চামচ জল মিশাইয়া এবং অপেক্ষাকৃত বড় শিশুর জন্য চার চামচের ১ চামচ দুগ্ধে ৮ চামচ বা বড় চামচের ২ চামচ জল মিশাইয়া পান করাইতে হয়।

নানা প্রকারে দুগ্ধে জীবাণুর সম্পর্ক ঘটিতে পারে সুতরাং পানের পূর্ব্বে দুগ্ধ যাহাতে জীবাণু সম্পর্কবর্জ্জিত হয় তাহা অবশ্যকরণীয়। পানের পূর্ব্বে দুগ্ধ জ্বাল দিয়া পান করিলেই ঐ দোষ দূর করা যাইতে পারে, কিন্তু কাঁচা দুগ্ধ শিশুর পক্ষে যেমন পোষক জ্বাল দেওয়া দুধ ঠিক সেইরূপ পোষকগুণ বিশিষ্ট নহে। জ্বাল দেওয়া দুধের জীবাণু নষ্ট হয় বটে কিন্তু কাঁচা দুধ অপেক্ষা ইহার উপকারিতা কিঞ্চিৎ অল্প। কিন্তু জীবাণুনাশে উহা ভীষণ ব্যাধি এবং এমন কি মৃত্যুর হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করে বলিয়া এই অল্প গুণ-হীনতা আমরা চিরদিন উপেক্ষা করিব। জ্বাল না দিয়া দুধকে জীবাণুদোষ বর্জ্জিত করিবার জন্য এক প্রকার বিলাতী কল পাওয়া যায়। ইহার নাম "soxhlet's steriliser" মূল্য ২৬ টাকা। এই কলে দুধকে ঠিক ফুটান হয় না অথচ দুধ কিঞ্চিৎ উষ্ণ হয় মাত্র। ফুটাইলে দুধের যে স্বাদ হয়, এই কলে উষ্ণ করিলে তাহাও হয় না, কিম্বা ফুটাইলে অত্যন্ত উত্তাপ সংযোগে দুধের যে অহিতকর পরিবর্ত্তন জন্মায় তাহাও হইতে পারে না। এই কলে কৃত্রিম উপায়ে যে উদ্দেশ্য সাধিত হয় ধারোষ্ণ দুগ্ধে স্বভাবতঃই সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে। দোহন মাত্র দুগ্ধের যে উষ্ণতা থাকে সেই উষ্ণতা বিশিষ্ট দুগ্ধকে ধারোষ্ণ দুগ্ধ বলে। ধারোষ্ণ

দুগ্ধের উষ্ণতা আছে কিন্তু এই উষ্ণতা অগ্নি-সংযোগ-কৃত নহে বলিয়া ইহাতে পুষ্টিকারিতা গুণের অল্পতা নাই এবং উষ্ণ বলিয় জীবাণু-দোষ-বর্জ্জিত। আয়ুর্ব্বেদে কাঁচা দুধের বহু অপকারিতার যথেষ্ট উল্লেখ এবং জ্বাল দেওয়া দুধের উপকারিতা, অপকারিতা দুইয়েরই উল্লেখ আছে—কিন্তু ধারোষ্ণ-দুগ্ধের নানা গুণের উল্লেখ পূর্ব্বক উহাকে লঘু অর্থাৎ সহজ পাচ্য অগ্নিবর্দ্ধনকারী এবং সুধাসম বলা হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদে দুগ্ধে জীবাণুর প্রসঙ্গ না থাকিলেও কাঁচা দুধ, জ্বাল দেওয়া দুধ এবং ধারোষ্ণ দুধের যে গুণ বলা হইয়াছে তাহাতে সিদ্ধান্তের এমন অপূর্ব্ব একতা রহিয়াছে যে তত্ত্বানুসন্ধিৎসু বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না।

কোন বয়সের শিশুকে কত পরিমাণ দুগ্ধ পান করান উচিত ?—

কোন বৈদেশিক গ্রন্থকারের মতে প্রসবের প্রথম এক বা দুই সপ্তাহকাল, [illegible] ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মাতৃস্তন হইতে তিন ছটাক হইতে একপোয়া দুগ্ধ পাইয়া থাকে। পরে দুগ্ধ স্রাব বর্দ্ধিত হইয়া দৈনিক তিন পোয়া পর্য্যন্ত হয়। পরীক্ষকগণ, শিশুকে মাতৃদুগ্ধ পানের পূর্ব্বে ও পরে ওজন করিয়া এবং অন্যান্য পরীক্ষা দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছেন যে একটী তিনি মাসের সুস্থ শিশু প্রতিবারে প্রায় তিন ছটাক দুগ্ধ পান করে। দৈনিক এইরূপ পাঁচবার স্তন্য পান করান উচিত ধরিয়া লইলে শিশুর দৈনিক পানীয় দুগ্ধের পরিমাণ তিন পোয়া হইতে এক সেরের কিঞ্চিৎ অধিক হয়। যে সকল ছেলেকে ঢোকা দুধ খাওয়ান হয়, এই হিসাব হইতে, তাহাদিগকে কত দুধ খাইতে দেওয়া উচিত তাহার একটা পরিমাণ জানিতে পারা যায়। বহু বৈদেশিক অনুসন্ধান-কারিগণ এ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন এস্থলে তাহাই লিখিত হইতেছে। জন্ম হইতে ২।৩ দিন পর্য্যন্ত আধ ছটাক করিয়া দৈনিক দশবার দুগ্ধপান করাইবে। ১৫ দিন পর্য্যন্ত প্রায় দৈনিক আধসের। একমাস পর্য্যন্ত দৈনিক নয় ছটাক। দ্বিতীয় মাসে দৈনিক একসের ৮ বারে। তৃতীয় মাসে—দিনে ৩ ঘণ্টা অন্তর ৭ বার এবং রাত্রিতে ২ বার, মোট দুগ্ধের পরিমাণ.—একসের এক ছটাক হইতে এক সের পাঁচ ছটাক পর্য্যন্ত। অতঃপর বয়োবৃদ্ধি সহকারে প্রতিবারে এক পোয়া করিয়া প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত ৫ বার এবং রাত্রিতে আর একবার মোট দুগ্ধের পরিমাণ এক সের ১ পোয়া হইতে দেড় সের পর্য্যন্ত।

গর্ভাবস্থায় স্তন দুগ্ধের পরিবর্ত্তন।

আয়ুর্ব্বেদকারগণ বলিয়াছেন গর্ভধারণ করিলে নারীগণের দুগ্ধ আর সন্তানের পক্ষে হিতকর হয় না। গর্ভাধানের পর কোন্ মাসে স্তন দুগ্ধের কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে এক্ষণে তাহাই বলিতেছি—গর্ভাবস্থার প্রথম মাসে দুগ্ধের জলীয় ভাগ ও শর্করার অংশ হ্রাস পায়, দুগ্ধের কঠিন পদার্থ (solids) চতুর্থ মাস পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। স্নেহ ভাগ ৬ মাস পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। লবণের ভাগ প্রথমে কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইলেও পরে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। এই সকল বিবেচনা করিয়া গর্ভিনীর স্তনপানের ঔচিত্য বিবেচনা করিবে।

দুগ্ধের শর্করা।—শর্করা, চিনি বলিলে আমরা যাহা বুঝি দুগ্ধের শর্করা সেই পদার্থ নহে। দুগ্ধশর্করা গুণে দ্রাক্ষাশর্করার তুল্য। দ্রাক্ষাশর্করাকে ইংরেজিতে Grape Sugar

বলে। ভক্ষিত দ্রাক্ষাশর্করা আমাশয়ে উপস্থিত হইলে যেরূপ পরিণাম প্রাপ্ত হয়, দুগ্ধ শর্করা ঠিক তদ্রূপ পরিণতি লাভ করিয়া থাকে।

বিলাতী গাঢ় দুগ্ধ—বিলাতী গাঢ় দুগ্ধ দুই প্রকার শর্করাযুক্ত ও শর্করা বিহীন। ইহার মধ্যে শর্করা বিহীনই শিশুর পক্ষে প্রশস্ত। যদি শর্করাহীন বিলাতী গাঢ় দুগ্ধে তিনভাগ জল মিশান যায় তাহা হইলে উহা গো দুগ্ধের প্রায় তুল্য হয়—গো দুগ্ধকে মাতৃ দুগ্ধের সদৃশীকরণের উপায় পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে।

দুগ্ধ ভিন্ন অন্যান্য খাদ্য।

শিশুর প্রধান ও প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট খাদ্য—দুগ্ধ সম্বন্ধে বলা হইল। এক্ষণে অন্যান্য খাদ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব। অন্যান্য খাদ্য অর্থে খৈ, মুড়ি, রুটী, এরারুট, সাবু, বিস্কুট প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। এই সমস্ত খাদ্য সম্বন্ধে আমরা কুমারতন্ত্রের ২৮।২৯ পৃষ্ঠায়, পূর্ব্বে সঙ্ক্ষেপে বলিয়াছি। এক্ষণে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিব। প্রথমেই বলিতেছি এই সকল খাদ্য শিশুর দাঁত উঠিবার পূর্ব্বে খাইতে দেওয়া হইবে না। এই সকল খাদ্যের প্রধান উপাদান শ্বেতসার দুগ্ধে বিদ্যমান নাই এবং এই সকল খাদ্য পরিপাক করিবার জন্য পরিপাকের ইন্দ্রিয় সকলের যেরূপ শক্তি ও যোগ্যতা আবশ্যক শিশুর তাহা নাই। বড় শিশুর পক্ষে এ সকল খাদ্যের পোষক গুণ আছে বটে কিন্তু যে শিশুর দাঁত বাহির হয় নাই তাহাদের পক্ষে উহারা যে অনুপযুক্ত ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত।

গরিব লোকেরা ছেলেদের দুধের পয়সা যোগাইতে না পারায় অতি শিশুকাল হইতে ঐরূপ কোন দ্রব্য শিশুকে খাওয়ায় বটে কিন্তু ঐ সকল খাদ্য শিশু কেবল গলাধঃকরণ করে মাত্র পরিপাক করিতে পারে না—সুতরাং একরূপ অনাহারে থাকে। ইহার ফলে তাহাদের শরীর ক্ষয় হয়, চর্ম্ম লোল হইয়া যায়। যাহারা অপেক্ষাকৃত বলবান্ থাকে তাহারাও ক্রমে ক্ষীণ হইয়া যায়—শেষে অস্থি পর্য্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, অবশেষে উদরাময় বা অন্য কোন ক্ষয় রোগ আসিয়া তাহাদিগকে ধরাধাম হইতে বিদায় দেয়।

অপত্য-হিতৈষী সমস্ত পিতা মাতার এই সার সত্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, দন্তাবির্ভাবের পূর্ব্বে দুগ্ধ ভিন্ন শিশুকে অন্য কোনও খাদ্য কদাচ দেওয়া উচিত নহে। যদি অজ্ঞতাবশাৎ তাড়াতাড়ি শিশুকে এই সকল খাদ্য আহার করিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে প্রকৃতি এ অজ্ঞতা কদাচ মাফ্ করিবেন না। পিতা মাতাকে ইহার ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। দাঁত বাহির হইবার পূর্ব্বে দিলেত ঘোরতর অনিষ্ট পাতের আশঙ্কা ধ্রুব; কিন্তু দাঁত বাহির হইলেও হঠাৎ বা অধিক পরিমাণে এই সকল খাদ্য সেবন করাইলে নিশ্চিতই শিশু পীড়িত হইবে। ঋতু-দর্শন মাত্রই যেমন স্ত্রীলোকের গর্ভধারণ যোগ্যতা জন্মে না—কিছুকাল পরে সেই যোগ্যতা আসে, শিশুর পক্ষেও সেইরূপ দাঁত বাহির হইবামাত্রই তাহার দুগ্ধ ভিন্ন অন্য খাদ্য পরিপাকের শক্তি জন্মে না। কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে ক্রমশঃ অন্য খাদ্য অল্প অল্প খাওয়াইতে হয়। এবং দুগ্ধ প্রচুর দিতে হয় তবে ঐ সকল নবাভ্যস্ত খাদ্য শিশুর পরিপাক করিবার শক্তি জন্মে; একবৎসর বয়সের পূর্ব্বে কোন শিশুকে শ্বেতসারযুক্ত কোন খাদ্য খাইতে দিবে না। আমরা এস্থলে আয়ুর্ব্বেদকারের সার সত্য স্বরূপ উপদেশটী আর একবার স্মরণ করিতে বলি। আয়ুর্ব্বেদে কথিত হইয়াছে—

"অথৈনং জাতদশনং ক্রমশোঽপনয়েৎ স্তনাৎ।
চরান্নিষেবমানো হ্যয়ংবালো নাতুর্য্য মশ্নুতে॥"

নিষেধের হেতু কি ?—দাঁতবাহির হইবার পূর্ব্বে দুগ্ধ ভিন্ন অন্য খাদ্য নিষেধের কারণ? এ সময়ে শিশুর অন্ত্র পূর্ণ দীর্ঘত্ব প্রাপ্ত না হইয়া হ্রস্ব থাকে। লালাগ্রন্থি হইতে প্রথম কয়েকমাস লালাস্রাব হয় না। তিন মাসে পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে শ্বেতসারের উপর Pancreatic fluid কোন শক্তিই প্রকাশ পায় না। তণ্ডুল পাক করিবার পক্ষে অগ্নি যেরূপ আবশ্যক দুগ্ধ ভিন্ন অন্য খাদ্য পরিপাকের পক্ষে ঐ সকল রসের তাদৃশই প্রয়োজনীয়তা স্থিরীকৃত হইয়াছে। অতএব কৃত্রিম খাদ্য অসময়ে সেবন করাইলে উহা শল্য স্বরূপ উদরে অবস্থিতি বলিয়া বিষক্রিয়া করে দ্বিতীয়তঃ শিশুকে বস্তুতঃ অনাহারে রাখে।

শিশুর প্যাটেণ্ট খাদ্য।

আজকাল বাজারে বিদেশ হইতে আমদানী এমন কতকগুলি শিশুর খাদ্য বিক্রীত হয়, যেগুলি দুগ্ধ ও নহে,—রুটী, বিস্কুট, এরারুটও নহে সুতরাং এগুলিকে দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী খাদ্য বলা যাইতে পারে। এইরূপ কথিত হইয়াছে যে, এই সকল ফুড্ রুটী এরারুটের জাতীয় হইলেও প্রস্তুতপ্রণালীর কৌশলে রুটী এরারুট জাতীয় খাদ্যের বিরুদ্ধে যে সকল দোষ আরোপ করা হইয়াছে তাহাদের কোনটীই এই সকল ফুডে নাই। যাহা হউক আমরা এই সকল ফুড্‌কে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া উহাদের স্বরূপ নির্ণয় করিব।

প্রথম শ্রেণীর খাদ্য—শুষ্কীকৃত দুগ্ধ এবং তৎসহ আংশিক বা সর্ব্বতোভাবে অঙ্কুরিত, শুষ্কীকৃত, ভর্জ্জিত ও চূর্ণীকৃত ব্রীহিদ্বি-দলাদি (malted cereals) মিশ্রিত থাকে।

২য় শ্রেণীর খাদ্যের মধ্যে কতক-গুলিতে সর্ব্বতোভাবে অঙ্কুরিত শুষ্কীকৃত ভর্জ্জিত ও চূর্ণীকৃত ব্রীহিদ্বিদলাদি থাকে। শ্বেতসার থাকে না। সর্ব্বথাদ্রবনীয় (souble) কার্ব্বহাইড্রেট জাতীয় বস্তু এবং কিঞ্চিৎ প্রটিড্ থাকে। মেলিন্স ফুড এই জাতীয় খাদ্য। অন্য-গুলিতে আংশিক অঙ্কুরিত, শুষ্কীকৃত, ভর্জ্জিত ও চূর্ণীকৃত ব্রীহি-দ্বিদলাদি এবং শ্বেতসার বেশ থাকে; কিন্তু এই সকল খাদ্য যেরূপে প্রস্তুত করিয়া শিশুকে খাওয়াইতে হয় সেই প্রস্তুত প্রণালীর গুণে এই শ্বেতসার—পিচ্ছিল, গুণ-বিহীন ও শর্করায় পরিণত হয় বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

৩য় শ্রেণীর খাদ্যে কেবল অঙ্কুরিত, শুষ্কীকৃত, ভর্জ্জিত ও চূর্ণীকৃত ব্রীহিদ্বিদলাদি যথাবৎ বিদ্যমান থাকে—কোনরূপ গুণান্তরিত করা হয় না।

এক্ষণে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এই ত্রিবিধ শ্রেণীর খাদ্য ব্যবহৃত হইবার উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে তাহাই কথিত হইতেছে।

প্রথম শ্রেণীর খাদ্য কেবল সেই ক্ষেত্রেই দেওয়া যায় যেখানে শিশু দুগ্ধের ছানার ভাগ পরিপাক করিতে না পারে। কারণ এই জাতীয় খাদ্য হইতে অতি সূক্ষ্ম ভাগে দুগ্ধের ছানার ভাগ নিষ্কাশিত হইয়াছে। কিন্তু এই জাতীয় খাদ্য কদাচ ২।১ সপ্তাহের অধিক সেবন করাইবে না। অতঃপর শিশুকে আবার মাতৃদুগ্ধ সহ্য করাইবার চেষ্টা পাইতে হইবে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদ্যে শ্বেতসার নাই; সুতরাং ইহা শিশুর তিনমাস বয়স হইতে অতি অল্প মাত্রায় দুগ্ধের সহকারী খাদ্যরূপে যেমন কমাইতে পারা যায় [illegible]

প্রয়োজন হইলে ক্রমশঃ মাত্রাবর্দ্ধিত করা যাইতে পারে। ইহারা পুষ্টিকর খাদ্য এবং যেমন বার্লির জল দুগ্ধের ছানার ভাগ পরিপাকের সাহায্য করে ইহারাও সেইরূপ করিয়া থাকে।

তৃতীয় শ্রেণীর খাদ্য অন্ততঃ এক বৎসর বয়সের পূর্ব্বে শিশুকে সেবন করিতে দেওয়া যায় না। বরং একবৎসরের উপর ৩।৪ মাস পর্য্যন্ত না দিলে আরও ভাল।

এই অধ্যায়ের শেষে আমরা কতকগুলি বিলাতী খাদ্যের উপাদান সম্বন্ধে আলোচনা করিব। দুঃখের বিষয় এই সকল বিলাতী খাদ্যের বহু বিচিত্র আড়ম্বর পূর্ণ বিজ্ঞাপন দেখিয়া সাধারণের বিশ্বাস হয় যে এই সকল খাদ্য বস্তুতঃই "শিশুর খাদ্য" কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতেছি যে বস্তুতঃ তাহা নহে। এই সকল বিলাতী খাদ্য সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিলাম তাহাতে আশা করি জনসাধারণ এবং পাঠকবর্গ ঐ সকল বিলাতী খাদ্যের যথার্থ স্বরূপ কি তাহা অবধারণা করিতে এবং যথাযোগ্য ভাবে ব্যবহার করিতে পারিবেন। আমরা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি এবং বলিতেছি যে, এই সমস্ত খাদ্য যদৃচ্ছভাবে যখন তখন ব্যবহারের কুফল স্মরণ রাখিতে হইবে এবং এই কথাটা বেশ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে যে, দুগ্ধভিন্ন অন্য কঠিন খাদ্য পরিপাকের যোগ্যতা না জন্মিলে ঐ সকল খাদ্য কদাচ শিশুকে দেওয়া যাইতে পারে না।

জল—শিশুর এই অত্যাবশ্যক পথ্য সম্বন্ধে সকলেরই কিছু জানিয়া থাকা ভাল। প্রাপ্ত বয়স্কের অপেক্ষা শিশুর জলের প্রয়োজন কম নহে, বরং তাহাদের আকারের তুলনায় অধিক। শিশুকে একবারে জলপান হইতে বঞ্চিত করা নিতান্ত নিষ্ঠুরতা ও তাহার স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। অবশ্য অতিরিক্ত জলপান করিতে দেওয়া কদাচই হিতকর নহে, কিন্তু পরিমিত জল পান হইতে বঞ্চিত করিলে তাহার পোষণের বিঘ্ন ঘটিবে এবং তাহার শরীরের মল—ত্বক্, বৃক্ক, ফুস্‌ফুস্ এবং অন্ত্র দ্বারা যথোচিত ভাবে নির্গত হইতে পারিবে না। কিন্তু শিশুকে জলপানে প্রশ্রয় দিলে সে হয়ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল প্রার্থনা করিতে পারে। এস্থলে তাহাকে বরং কিছু সতর্ককতার সহিত জলপান করিতে দিবে। আচ্ছা শিশু যদি কিছু অতিরিক্ত জলই পান করে তাহাতে তাহার কি ক্ষতি হইতে পারে? ক্ষতি অতি সামান্য;—কিন্তু জল পান করিতে দেওয়া সম্বন্ধে কড়াকড়ি করিলে যে দোষ হয়, তাহা ইহা অপেক্ষা অধিক ক্ষতি করিতে পারে। সৌভাগ্য বশতঃ জল পানের পিপাসা চরিতার্থ করিবার প্রবৃত্তি এতই দুর্দ্দমনীয় যে তাহাতে আমাদের পছন্দমত ব্যবস্থা চালান দুষ্কর। অবস্থা বিশেষ কিছুকালের জন্য ছেলেদের জলপান প্রবৃত্তি রোধ করা আবশ্যক হয়। আহার করিতে বসিয়াই ছেলেরা যাহাতে অধিক জলপান না করে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত। ভোজনের প্রারম্ভেই অধিক মাত্রায় জলপান করিলে আমাশয়ের উষ্ণতা হ্রাস পাইয়া সুপরিপাকের ব্যাঘাত জন্মায়। ভোজনের কিছু পরে আমাশয় কার্য্যব্যস্ত থাকিয়া উষ্ণতা লাভ করে সুতরাং তখন জলপান করিলে কোনই ক্ষতি হইতে পারে না। ভুক্ত বস্তুকে ক্লিন্ন ও জীর্ণ করিবার জন্য আমাশয়ে এক প্রকার শ্লেষ্মা আছে। ইহার নাম ক্লেদক শ্লেষ্মা (gastric juice)। অনেকের ধারণা আহারের সময় জলপান

করিলে জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া ঐ ক্লেদক শ্লেষ্মা দ্রবীভূত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে এই ভয়ে তাঁহারা জলপান সম্বন্ধে এতাধিক সতর্কতা অবলম্বন করেন। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা ভ্রম। আহার কালে জলপান করিলে ক্লেদক শ্লেষ্মাকে দ্রবীভূত করা হয় না; বরং পান করা জল শোষিত হইয়া ক্লেদক শ্লেষ্মা স্রাবের পক্ষে সহায়তা করে।

বিশুদ্ধ পানীয় জলের প্রয়োজনীয়তা—শিশুর পক্ষে পানীয় জলের প্রয়োজনীয়তা দেখান হইল বটে কিন্তু এই জল বিশুদ্ধ না হইলে হিতে বিপরীত ঘটে। দূষিত জল স্বাস্থ্যের পক্ষে কত অনিষ্টকারী ও কত উৎকট রোগের জনক তাহা সংক্ষেপে কেমন করিয়া বুঝাইব? আমাদের দেহের অধিকাংশই জল—প্রধানতঃ জলের দোষেই অজীর্ণ শূল, পাথরী প্রভৃতি উৎকট রোগ জন্মে। অশুদ্ধ জল পান করিয়াই যে দেশে কলেরা, রক্ত আমাশয়, মারাত্মক সন্নিপাতজ্বর প্রাদুর্ভূত ও বিস্তৃত হইয়া জনপদ ধ্বংস করিতেছে এ বিষয় নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। যে জল বিশুদ্ধ না হইলে এত অনিষ্টোৎপত্তি ঘটে পরিতাপের বিষয় আমাদের দেশে সেই জলের দোষ চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। ভারতবর্ষ গ্রীষ্ম-প্রধান দেশ—আমরা শুচিস্বভাব জাতি; সুতরাং এদেশে যে বিশুদ্ধ জলের প্রয়োজনীয়তা অন্য দেশ অপেক্ষা অনেক অধিক একথা সহজেই বুঝায়। যত-সমাজ-হিত কর অনুষ্ঠান আছে তন্মধ্যে বিশুদ্ধ জল পাইবার সুব্যবস্থাকে যদি শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয় তাহা হইলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। প্রাচীন সমাজ-হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ এই সত্যের উপলব্ধি করিয়া দিঘী সরোবরাদি প্রতিষ্ঠার পুণ্য করত্ব ঘোষণা পূর্ব্বক জনসাধারণকে তৎপ্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তাহার ফলে এ দেশে সুদীর্ঘ, প্রসারিত, অতিগভীর, সুস্বাদু জলপূর্ণ দিঘী পুষ্করিণীর অভাব ছিল না। এখন অভিনব শিক্ষার প্রভাবে এবং অন্যান্য নানা কারণে লোকের হৃদয় হইতে অনেক সুকুমার দেশহিতকরপ্রবৃত্তি অন্তর্হিত বা ক্ষীণ হইয়াছে। লোকে এখন পুণ্যজনক কর্ম্ম বলিয়া আর দিঘী পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করে না, অথচ স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে একান্ত আবশ্যক বলিয়াও বিশুদ্ধ জল যাহাতে সহজে সংগ্রহ করিতে পারা যায় তাহারও কোন ব্যবস্থা করিতেছে না। যাহা সহস্র সহস্র নরনারীর স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত আবশ্যক তাহাকে পুণ্যকর্ম্ম বলিয়াই হউক বা লোকহিতকর বলিয়াই হউক অবশ্যই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। আমাদের পূর্ব্ব সংস্কার গিয়াছে অথচ নূতন কিছু তৎস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই—সমাজের এই অবস্থা বড়ই পরিতাপ জনক ও অনিষ্টকর। দেশের লোকে বর্ষাকালে জলপ্লাবনে পরিত্রাহি চীৎকার করে এবং গ্রীষ্মকালে পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া একঘটী জলের জন্য হাহাকার করে। বিশুদ্ধ দুগ্ধের অভাবে শিশুকুল রুগ্ণ হইয়া জাতির যে সর্ব্বনাশ করিতেছে তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিশুদ্ধ জলের অভাবে দেশে নানা সাংঘাতিক ব্যাধির অবাধ প্রসার হওয়ায় কিরূপ অনিষ্ট সঙ্ঘটিত হইতেছে তাহাও সংক্ষেপে বলিলাম। ইহা ত বিলাপ মাত্র, এখন কাজের কথা বলি।

জল সংশোধনের উপায়—বঙ্গের অধিকাংশ পল্লীর পুকুরের জলই দীর্ঘকাল সংস্কারের অভাবে এবং [illegible]

উদ্ভবে অধিকতর দূষিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার উপর আবার যে পুষ্করিণীতে জল পান করা হয়—তাহাতেই শৌচ, প্রস্রাব; বস্ত্র-প্রক্ষালনাদি এবং কার্য্যই নির্ব্বাহ করা হয়। যখন পুষ্করিণী সুগভীর ছিল বলিয়া জল বিশুদ্ধ থাকিত—তখন এই উভয় কার্য্য একটী পুষ্করিণীতে নির্ব্বাহ করায় যত ক্ষতি হইত, এখন পঙ্কে পুষ্করিণী পূর্ণ—সুতরাং জলও মলিন হওয়ায় ক্ষতির ভাগ অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছে। অতএব যেখানে বহতা নদী আছে—সেখানে অন্ততঃ পানার্থে নদীর জল ব্যবহার করা উচিত। মন্দ হইলেও স্রোতের জল তত মন্দ হইতে পারে না, ডোবা-ডাবাবির জল কি মাঠের জমা জল পানার্থ কদাচ ব্যবহার করিবে না। জল ফুটাইয়া লইলে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ হয়। ইহা অপেক্ষা জল শোধনের সহজ উপায় আর নাই। ফিল্টার আজকাল অনেক রকম বাহির হইয়াছে বটে, কিন্তু এ সকল ফিল্টারকে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। ফিল্টারে জলশোধন করা অনেক স্থলেই মনকে প্রবোধ দেওয়া মাত্র। বর্ষাকালে অনেক নদীর জল ঘোলা হয়। এক কলসী ঘোলা জলে চার চামচের আধ চামচ ফটকিরির গুঁড়া ঢালিয়া বেশ করিয়া গুলিয়া সমস্ত রাত্রি রাখিলে জলের যত ময়লা তলায় পড়িয়া যাইবে। তখন আস্তে আস্তে উপরের জল গড়াইয়া লইয়া ফুটাইয়া নিঃসন্দেহে ব্যবহার করা যায়। তাম্রের জলশোধিনী শক্তি আছে—তুঁতেতে তামা আছে—এক জালা জলে ১ রতি তুঁতে দিলে জল বিশুদ্ধ এবং জীবাণু বর্জ্জিত হয়। তাম্রময় জলপাত্র ব্যবহার করা ভাল।—আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ—"তাম্রপাত্রে জলং পিবেৎ।"

(ক্রমশঃ)

কুমারতন্ত্র-রচয়িতা।

বায়ু।

—:০:—

আয়ুকে জানিতে চাহিয়াই আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি। এই আয়ু আবার বায়ুকে আশ্রয় করিয়াই আপন অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে। বায়ুকে 'জীবন' বলিয়া অভিহিত করা তাই সার্থক। আয়ুর্ব্বেদের মূলীভূত বায়ুতত্ত্বের আজ যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

প্রয়োজনীয়তা—পৃথিবীর চারি পার্শ্বে এক বিশাল বায়ুমণ্ডল আছে। এই মণ্ডলস্থ বায়ুকে সেবন করিয়াই পৃথিবীস্থ যাবতীয় প্রাণী জীবিত থাকে। হৃৎপিণ্ডের শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারাই জীবন সূচিত হয়। বায়ু সাহায্যেই এই শ্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিয়া পরিচালিত হয়। খাদ্যাভাবে বরং আমরা কিছুদিন বাঁচিতে পারি, কিন্তু বায়ু ভিন্ন কয়েক মুহূর্ত্তেই আমাদের জীবনলীলা সাঙ্গ হয়। এই বায়ু যত বেশী বিশুদ্ধ, তত বেশী দীর্ঘ জীবনের পক্ষে উপযোগী। বায়ুকে শরীর-মধ্যে স্থিরতা দান করিতে পারিলেও দীর্ঘ জীবন লাভ হইতে পারে।

প্রাচীন মনস্বী হিন্দু এই বায়ুর উপকারিতাকে যথাযথ ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন, তাই

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র বিশুদ্ধ বায়ুর গুণকীর্ত্তনে মুখরিত, তাই হিন্দু যোগীর প্রাণায়াম-হঠযোগে বায়ু-স্তম্ভন করিয়া দীর্ঘজীবন লাভের বিজ্ঞান-সম্মত ব্যবস্থা।

ক্ষয়কাস, ওলাউঠা হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্নিমান্দ্য অজীর্ণ প্রভৃতি যাবতীয় কঠিন রোগই মূলতঃ বায়ুর অপ্রচুর ব্যবহার বা অবিশুদ্ধ বায়ু সেবন দ্বারা সূচিত হয়। বায়ু যে জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক, তাহার একটী পঠিত প্রমাণ দিতেছি। এক বিখ্যাত ইউরোপীয় চিকিৎসক এক সুবৃহৎ কাঁচপাত্রে একটী জীবিত পক্ষীকে আবদ্ধ করিয়া air-pump (এয়ার পাম্প) দ্বারা পাত্রস্থ যাবতীয় বায়ু বাহির করিয়া লন। মুহূর্ত্ত মধ্যে পক্ষীটী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, তৎক্ষণাৎ পাত্রের মুখ খুলিয়া দেওয়া হইল, পর্য্যাপ্ত-বায়ু সেবনে পক্ষীটী অচিরাৎ সজীব হইয়া উঠিল।

বিশুদ্ধ বায়ুর উপাদান—বিশুদ্ধ বায়ু যখন জীবনের পক্ষে এত প্রয়োজনীয়, তখন ইহা কি কি উপাদানে গঠিত তাহা জানিতে অনেকের কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, প্রতি সহস্র ঘন ফুট স্বাভাবিক নির্ম্মল বায়ুতে ৭১০·০ ঘনফুট নাইট্রোজেন, ২০৯·৬ ঘনফুট অক্সিজেন, ·৪ ঘনফুট কার্ব্বন ডায়কসাইড ও অবশিষ্টাংশ ওজোন জলীয়বাষ্প, এ্যামোনিয়া ইত্যাদি অল্পাধিক পরিমাণে বর্ত্তমানে আছে। এই সমস্ত উপাদানগুলির মধ্যে অক্সিজেনই প্রাণধারণের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। এই অক্সিজেন দ্বারাই জীব-শোণিতের নির্ম্মলতা সম্পাদিত হয়। এই নির্ম্মল শোণিতই সুগঠিত সুস্থ দেহ ও উৎসাহশীল মন প্রদান করিয়া মানবকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে। পার্ব্বত্য প্রদেশের ও সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী বায়ুতে এই অক্সিজেন অধিক পরিমাণে থাকে বলিয়াই, তৎ তৎ স্থানের মানুষ অধিকতর নীরোগ দেহ ও কর্ম্মী। এইজন্য বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ এ দেশীয় রোগীকে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য দার্জ্জিলিং বা পুরী যাইতে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। বাস্তবিকই বিশুদ্ধ বায়ুই অনেক রোগের একমাত্র ঔষধ। কোন ঔষধেই যে রোগ আরোগ্য হয় নাই, শুদ্ধ বিশুদ্ধ বায়ু সেবনে তাহা অনেক সময় আরোগ্য হইয়াছে। ঔষধ ভিন্ন নির্ম্মল বায়ু সেবন দ্বারা রোগারোগ্যের নিদর্শন যত বহুল, নির্ম্মল বায়ু ভিন্ন শুদ্ধ ঔষধে রোগারোগ্যের নিদর্শন ততোধিক বিরল।

এখন কথা উঠিতে পাবে যে, বায়ুর মধ্যে অক্সিজেনই যদি সমধিক আবশ্যক, তবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শুধু অক্সিজেনের শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিলে অধিকতর সবল সুস্থ দেহ ও আয়ুষ্মান্ হওয়া যায় কিনা? বাস্তবিকই বিধাতার বুদ্ধির উপর মানুষ কোনদিনই বাহাদুরি দেখাইতে পারে না। যেটি আমাদের ঠিক উপযোগী, বিধাতা ঠিক সেইটিই দিয়াছেন, তা'র উপর তুলি বুলাইতে গেলেই ঠকিতে হয়। বিধাতার জলের উপর কারসাজি করিতে যাইয়া মানুষ কলের জল তৈয়ার করিল, কোষ্ঠবদ্ধতা (Constipation) অমনি আসিয়া হাজির হইল। ইলেকট্রিক আলোর বাহাদুরিতে নিত্য কত লোক মারা পড়ে, কত বালক বার বৎসরে চসমাধারী হয় তাহার ইয়ত্তা নাই।

Heber, Wilson, Notter, Firth, প্রভৃতি অনেক বিজ্ঞ রাসায়নিক চিকিৎসক বলেন যে, বায়ুতে যদি কেবলই অক্সিজেন থাকিত—তবে প্রাণিজগৎ অত্যন্ত চঞ্চল ও

ধর্ম্মপরায়ণ হইলেও নিতান্ত অল্পায়ু হইত। অক্সিজেনপূর্ণ একটী পাত্রের মধ্যে একটী জলন্ত অঙ্গার ধরিলে এ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি হয়, অঙ্গার খণ্ড, ক্ষণকাল অতীব দীপ্তিমান্ হইয়াই নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। অক্সিজেনসহ নাইট্রোজেন ও কার্ব্বণিক এ্যাসিড গ্যাস্ মিশ্রিত থাকায় জীবের পক্ষে বায়ু অধিকতর সহনীয় ও হিতকর হইয়াছে। অধিকন্তু যে উদ্ভিজ্জ-জগৎ অধিকাংশ জীবের আহারীয়ের সংস্থান করে, কার্ব্বণিক এ্যাসিড গ্যাস্ সেই উদ্ভিজ্জ জগতের পোষণ কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করে। উদ্ভিদগণ দিবাভাগে সূর্য্যকিরণ ও স্বীয় সবুজবর্ণ বিশিষ্ট ক্লোরোফিল নামক পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়া-সাহায্যে বায়ুস্থিত কার্ব্বণিক গ্যাস হইতে কার্ব্বণ গ্রহণ করিয়া বৰ্দ্ধিত হয় এবং অক্সিজেন ত্যাগ করিয়া বায়ু-মণ্ডলকে পরিস্কৃত ও অধিকতর হিতকারী করে। নাইট্রোজেন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশেষ কার্য্যকারী না হইলেও বায়ুকে পরোক্ষভাবে অধিকতর উপভোগ্য করিয়া আমাদের জীবন ধারণের সহায়তা করে। অতএব দেখা যাইতেছে—বায়ু প্রস্তুতকরণে বিধাতা কম কৌশলের পরিচয় দেন নাই। বায়ুতে এই বিভিন্ন উপাদানের মিশ্রণে তিনি জীব-জগৎ ও উদ্ভিজ্জ জগতের যুগপৎ পরিবর্দ্ধনের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। কি সুন্দর সামঞ্জস্য! যে কার্ব্বণিক গ্যাস মানুষ প্রশ্বাসের সঙ্গে ত্যাগ করে—তাহাই বিভক্ত করিয়া উদ্ভিদ কার্ব্বণ গ্রহণ করে ও জীবজগতের শ্বাস-গ্রহণোপযোগী জীবনের পরম হিতকর অক্সিজেন দান করে। ঐ কার্ব্বণ ডায়কসাইড আবার অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত থাকিয়া বায়ুকে জীবের সহনীয় ও অধিকতর উপভোগ্য করিয়া তুলে।

বিশুদ্ধ বায়ু—অতএব দেখা যাইতেছে, স্বাভাবিক বিশুদ্ধ বায়ুই জীবের পক্ষে প্রকৃত হিতকর। কৃত্রিম উপায়ে মানুষ বায়ু প্রস্তুত করিতে পারে, কিন্তু তাহা যে কলের জল ও বৈদ্যুতিক আলোর মতই মানুষের সর্ব্বনাশ করিবে না—তাহা বলা যাইতে পারে না। যাহা হউক বায়ু এখনও এত সুলভ আছে যে, কৃত্রিমতা অবলম্বনের আদৌ আবশ্যকতা নাই। তবে এ কথাও সত্য যে, স্বাভাবিক বিশুদ্ধ বায়ু জীবের পক্ষে হিতকারী হইলেও সর্ব্বত্র বিশুদ্ধ বায়ু সুলভ নহে। প্রকৃতি চিরকালই নগ্না। তাই নানা কারণে স্বাভাবিক বায়ু দূষিত হইতে পারে, কিন্তু কিঞ্চিৎ সতর্ক ও চেষ্টাশীল হইলে আমরা এই দূষিত বায়ুকে সুসংশোধিত করিয়া লইতে পারি। বিশুদ্ধ বায়ু যখন দীর্ঘ জীবনের নিদান ও অবিশুদ্ধ বায়ু আয়ুর্হানিকর ও নানারোগের আকর, তখন বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের ব্যবস্থা চিকিৎসার প্রথম ও সর্ব্বোচ্চ সোপান হওয়া উচিত। আমি বিশুদ্ধ বায়ু-প্রাপ্তি সম্বন্ধে কয়েকটী উপদেশ দিয়াই অদ্যকার প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

বায়ু বিশুদ্ধ করিবার উপায়—

১। আবদ্ধ বায়ু শীঘ্রই দূষিত হইয়া পড়ে। অতএব বাড়ী এমন খোলা ও চতুর্দ্দিকে প্রাঙ্গন বিশিষ্ট হওয়া উচিত, যাহাতে সর্ব্বদা বায়ু কর্তৃক বিধৌত হইতে পারে। ঘরগুলি এমন জানালাবহুল হওয়া বিধেয় যে, বায়ু এক জানালা দিয়া আসিয়া অনায়াসে অপর জানালা দিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে।

২। পর্য্যুসিত ও গলিত পচনশীল জিনিস কিছুতেই বাসস্থানের চতুর্দ্দিকে না জমিতে পারে তাহা দেখিতে হইবে। কারণ যত সব

রোগবীজাণু সাধারণত পচা জিনিসের মধ্যেই বৰ্দ্ধিত হয়। বাতাস এই বীজাণুগুলিকে উড়াইয়া লইয়া গিয়া রোগের সংক্রামকতার বৃদ্ধি করে।

৩। রান্নাঘর যতদূর সম্ভব শয়ন গৃহের দূরবর্ত্তী হওয়া প্রয়োজনীয়। রান্নাঘরেও যাহাতে ধূম জমিতে না পারে—এরূপ বন্দোবস্ত করা উচিত। বিলাতে রান্নাঘরের ধূমের অবাধ নিষ্কাসনের জন্য চিমনি রাখার প্রথা অত্যন্ত সমীচীন বলিয়া মনে হয়। মনে রাখিতে হইবে—রন্ধন-কাষ্ঠ বা কয়লা কার্ব্বণ পদার্থ। অক্সিজেন সাহায্যে দাহন-কার্য্য সম্পন্ন হয়। দাহনকালে কার্ব্বণ অক্সিজেনে মিশিয়া কার্ব্বণ ডায়কসাইড নামক গ্যাস্ প্রস্তুত হয়। এই কার্ব্বণ ডায়কসাইড্ শ্বাস গ্রহণের পক্ষে নিতান্ত অহিতকর। অতএব ঐ গ্যাস যাহাতে অবাধে বাহির হইয়া সুবৃহৎ প্রাঙ্গণের প্রচুর বায়ুতে মিশিতে পারে—তাহা করা উচিত। এই জন্যই কলকারখানা যত দূর সম্ভব গ্রাম বা নগরের বাহিরে পরিচালিত হওয়া উচিত। একান্ত অসম্ভব হইলে ঐ ধূম যাহাতে কোনও জলাশয়ের জলের সহিত মিশিয়া যাইতে পারে—এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৪। একগৃহে অধিক লোক শয়ন করা নিতান্ত অন্যায়। আমরা প্রশ্বাসকালে কার্ব্বণ ডায়কসাইড ত্যাগ করি। শ্বাস গ্রহণের পক্ষে অহিতকর এই গ্যাস গৃহস্থ বায়ুকে নিতান্ত দূষিত করে। তারপর রাত্রিতে দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া শয়ন করার যে অভ্যাস তাহাও অত্যন্ত গর্হিত। প্রশ্বাসে যে কার্ব্বণিক এ্যাসিড গ্যাস বহির্গত হয়, তাহা গৃহে আবদ্ধ থাকিলে কিছুতেই বহির্গত হইতে পারে না। সুতরাং অনেক সময় প্রাণনাশও সম্ভবপর হইয়া থাকে। 'ব্লাকহোল ট্রাজিডি' যে কার্ব্বণিক এ্যাসিড গ্যাসেরই কীর্ত্তি সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই।

মোটের উপর বায়ুর অনাবদ্ধতা বায়ুকে বিশুদ্ধ রাখিবার শ্রেষ্ঠ উপায়। সর্ব্ব প্রযত্নে যাহাতে বাসস্থানের চতুর্দ্দিকে বায়ুর চলাচল অবাধ থাকে—তাহা করিতে হইবে। তাহার পর মাঝে মাঝে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বা নদী ও সমুদ্রের উপকূলে বেড়াইতে যাইতে পারিলে প্রায়শঃই রোগাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না।

দূষিত বায়ুকে বিশুদ্ধ করিবার উপায়—এ তো গেল বিশুদ্ধ বায়ুকে ঘরে আনিবার কথা। কিন্তু বায়ু যখন ঋতুদোষে বা মহামারীর সংক্রামকতায় পূর্ব্বেই দূষিত হইয়া গিয়াছে,—তখন কি উপায় অবলম্বন করা উচিত? এই দূষিত বায়ুকে গ্রহণ করিতে থাকিলে রোগকবলিত হওয়া একরূপ নিশ্চিত। অতএব তখন যাহাতে এই দূষিত বায়ুকে বিশুদ্ধ করা যাইতে পারে—তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। দূষিত বায়ুকে বিশুদ্ধ করার জন্য নিম্নলিখিত পন্থাগুলি অবলম্বন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

১। আবদ্ধতা হেতু বায়ু দূষিত হইলে প্রথমতঃই বায়ু চলাচলের সুবন্দোবস্ত করা উচিত। বাড়ীর চারিদিকে ঘন সন্নিবিষ্ট বৃক্ষ থাকিলে তাহা যথাসম্ভব কাটিয়া ফেলা উচিত। দক্ষিণ দিক হইতেই ভাল বায়ু অধিকাংশ সময়ে আসিয়া থাকে; অতএব বাড়ীর দক্ষিণ দিক একেবারে খোলা রাখাই বিধেয়।

২। অনেক সময়ে বাড়ীর নিকটে পচা পানা পুকুর, অবিরত পচনশীল নালানর্দ্দমা থাকে। এইজন্য বায়ু দূষিত হইয়া রোগের

সৃষ্টি করে। এই সমস্ত পুকুর নালা-নর্দ্দামাদি পরিষ্কৃত রাখা বায়ুবিশুদ্ধির প্রধান উপায়।

এই সমস্ত সাধারণ কারণ ভিন্ন বিশেষ বিশেষ কারণে বায়ু দূষিত হইলে অন্য কতকগুলি উপায় অবলম্বন করিতে হয়।

৩। যখন মহামারী প্রভৃতি কারণে সর্ব্বত্রই বায়ু দূষিত হইয়া পড়িয়াছে—তখন বায়ুর অবাধ চলাচল রোধ করাই বরং অনেক ক্ষেত্রে সমীচীন। নতুবা বায়ু প্রবাহ দ্বারা অতি সহজে রোগ সংক্রামিত হয়।

৪। সংক্রামক ব্যাধি প্রসারের সময়ে বায়ুর অবাধ গমনাগমনের জন্য বিশেষ চিন্তিত না হইয়া, নিজ বাসস্থানস্থ বায়ুকে যাহাতে বিশুদ্ধ করা যাইতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

৫। বাড়ীর উঠানে সুবৃহৎ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করা উচিত। ইহাতে বায়ুর লঘুতা সম্পাদিত হওয়ায়, নিম্নস্তরের দূষিত বায়ু ঊর্দ্ধে উঠিয়া গিয়া মহাবায়ু-সমুদ্রে মিশিয়া বিশুদ্ধ হয়, অধিকন্তু প্রজ্বলিত অগ্নিতে অনেক বীজাণু ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

৬। অঙ্গার বা কয়লা—বায়ুশোধনের পক্ষে এক সুলভ উপায়। শুষ্ক পরিষ্কৃত কয়লা গৃহ মধ্যে চারি পাচ হাত ঊর্দ্ধে কোন সচ্ছিদ্র পাত্রে রাখিলে গৃহ মধ্যস্থ বায়ু অতি বিশুদ্ধ হয়। অঙ্গারের মধ্যে অসংখ্য ছিদ্র আছে। অঙ্গার এক রাসায়নিক শক্তি বলে বায়ুর দূষিত অংশ নিজ ছিদ্র মধ্যে টানিয়া লয়। সপ্তাহান্তে একবার করিয়া ধুইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইলে একই কয়লা বহুদিন ব্যবহার করা যাইতে পারে।

৭। 'ওজোন' নামক এক রাসায়নিক পদার্থ বায়ু বিশুদ্ধ করিতে বিশেষ উপযোগী। দুই ভাগ পটাসিয়াম্ পারম্যাঙ্গানেট ও তিন ভাগ গন্ধক-দ্রাবক একত্র মিশ্রিত করিলে এই 'ওজোন' উৎপন্ন হয়।

৮। গন্ধকের বাষ্প বীজাণু নষ্ট করিতে ধন্বন্তরি। ধূপ ধূনার ধূমেও বায়ু শোধিত হয়। হিন্দুর পূজায় ধূপধূনা প্রজ্বলিত করা কত বিজ্ঞান-সম্মত—তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে।

৯। গোময় ও মৃত্তিকা দুর্গন্ধ ও পচন নিবারণে একান্ত সমর্থ। পাশ্চাত্যবিজ্ঞানবিদেরাও মৃত্তিকার দুর্গন্ধ-নাশিকা শক্তি স্বীকার করিয়াছেন। পচনশীল দ্রব্যের উপর মৃত্তিকা ছড়াইয়া দিলে তাহার দুর্গন্ধ নষ্ট হয় ও তাহাতে আর রোগ-বীজাণু আশ্রয় লইয়া সঞ্চিত হইতে পারে না। গোময়ের প্রলেপে গৃহস্থিত-রোগ-বীজাণু মরিয়া যায়। আজিও বর্ত্তমান হিন্দু-ভবনের গোবর ছড়া দেওয়া বা ঘরের মেঝেয় নিত্য নিত্য গোবর লেপন নিতান্ত নিরর্থক নহে। গোমূত্রও বায়ু সংশোধন করিয়া থাকে।

১০। কার্ব্বলিক য়্যাসিড ত্রিশ গুণ জলে মিশাইয়া গৃহমধ্যে ছড়াইয়া দিলে সকল দুর্গন্ধ দূর হয়, জৈবিক পদার্থের পচন শক্তি বিনষ্ট হয় ও উদ্ভিদ্-বীজাণু প্রভৃতি জন্মিতে পারে না। ফিনাইল জলে মিশাইয়া ছড়াইয়া দিলেও একই ফললাভ হয়।

আজি আর কিছু বলিব না। যতটা বলিলাম, তাহাতে বায়ু যে সত্য সত্যই জীবন এ কথা উপলব্ধি করাইতে চেষ্টা করিয়াছি। নির্ম্মল বায়ুর অভাবেই যে আজি বাঙ্গালী এত জরাজীর্ণ একটু চিন্তা করিলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। বঙ্গদেশের প্রায় রোগই মূলতঃ বায়ুর অসম্মান করার বিষময় ফল। আশা

করি, বাঙ্গালী এবার চোখ খুলিয়া দেখিবে। আমি বিশুদ্ধ-বায়ু-প্রাপ্তির যে যে পন্থা গুলি আজি উপস্থিত করিয়াছি, সে গুলি চূড়ান্ত না হইলেও পর্য্যাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই।

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।

বাঙ্গালার লোকক্ষয়।

সেনিটারী কমিশনার ডাক্তার বেণ্টলী মিউনিসিপাল এলাকা ব্যতীত বাঙ্গালার জেলা সমূহে গত এপ্রিল মাসে কত লোকের জন্ম ও মৃত্যু হইয়াছে, তাহার তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। সে ভীষণ তালিকার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

জেলা	জন্ম	মৃত্যু	কলেরা	বসন্ত	জ্বর
বর্দ্ধমান	৩৪০৪	৭৪৭৩	১২৭২	৪৭	৫৩৬৯
বীরভূম	২৩২৫	৪৪৭৪	৮৬৯	৫১	৩২৫৩
বাঁকুড়া	৩৫৩৫	৪২৩৫	৩৩৪	৬৪	৩১১৩
মেদিনীপুর	৬৫০৯	১০৫৪৯	১৫২৮	১৪৪	৭৬৪৪
হুগলী ও শ্রীরামপুর	১৭২৭	৩০৭৫	৩৪৬	৯৩	২১৮১
হাওড়া	১৭৯২	২১৯৫	৩৭৫	১৪৬	১০০১
২৪ পরগণা	৩৮৭৯	৪৪২২	১২৯০	৭০	২৪৫৭
নদীয়া	৩৮৯৬	৭৮৩৪	১৯২৩	৮৩	৫২৮৮
মুর্শিদাবাদ	৩৮২৬	৬৩০২	১৬৭২	২৮	৪০৪১
যশোহর	৩৭৩৯	৪৮২৩	৯৮১	২৮	৩৪৩৩
খুলনা	২৮৯৭	৩৩৩৩	৫৩৩	২	২০৩২
রাজসাহী	৪৫৩১	৫৭১৮	৭৩৬	৬৪	৪৫৩৩
দিনাজপুর	৫৭৫১	৫৭২৩	১৪৪	১০৫৬	৪০৬৮
জলপাইগুড়ি	২৪৫৫	৪১৪০	৯৯৭	১৪৪	২৬৯১
দারজিলিং	৬৪২	১১৬৫	১৬৯	৪৩	৭৬৯
রঙ্গপুর	৭০২১	৮৩৯৯	৯১৮	১২৩৭	৬১৫১
বগুড়া	২৫৮৩	২৩৬০	৩৫০	১৬৫	১৬০৮
পাবনা	৩৪৪৮	৬৫৭১	১৬২২	৬০০	৪১৩৭
মালদহ	২৭৫২	৩১৯৩	৭১২	৯৬	২১৭০
ঢাকা	৭৫৩৮	৮০৬৪	১৪৬৯	১৮[illegible]	[illegible]

ময়মনসিংহ	১০৯৪০	১০৮৬৮	১৮০৫	৩৩৮	৭৫৩৯
ফরিদপুর	৫২৬১	৬৬৯২	১৩৮৮	৭৬	৪২৩৪
বাখরগঞ্জ	৭০১০	৮০৭৩	১২৬৭	২৪	৪৭৮৪
চট্টগ্রাম	৩৮২৪	৪৯৭৭	১২৯৫	১৬	৩৪৮২
নোয়াখালী	৩৩৩৪	৩৬৭৮	৫২৯	৬২,	২৫৮০
ত্রিপুরা	৫৬৫৯	৬১৬৫	১০৬০	৩৩৭	৩৫৭৮
সমস্ত বাঙ্গালা	১,১০,৫২	১,৪৪৫০১	২৫৮৬৫	৫১৯৬	৯৭০১৫

গত এপ্রিল মাসে সমস্ত বঙ্গদেশে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু সংখ্যা ৩৪ হাজার বেশী হইয়াছে। কেবল দিনাজপুর, বগুড়া ও ময়মনসিংহে জন্ম সংখ্যা কিঞ্চিৎ কম, আর সর্ব্বত্রই বেশী। কলেরা, বসন্ত ও ম্যালেরিয়া নিবার্য্য ব্যাধি। চেষ্টা করিলেই উহা নিবারণ করা যাইতে পারে কিন্তু দরিদ্রতা, অজ্ঞানতা ও শিথিলতার জন্য ঐ ৩ ব্যাধিতে একমাসে ১,২৮,০৭৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

বাঙ্গালার যে সকল সহরে ১০ হাজার ও ততোধিক লোকের বাস, সেই সকল সহরে এপ্রিল মাসে ৩৭১০ জনের জন্ম ও ৯৬৫৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

রাজপুরুষদের মুখ চাহিয়া আর থাকা উচিত নয়। গ্রামগুলি স্বাস্থ্যকর করা, পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, দরিদ্রতা দূরের উপায় করা আমাদেরই কাজ। যদি আমরা বাঁচিয়া থাকিতে চাই, তবে আত্মশক্তির উপর নির্ভর করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

"সঞ্জীবনী"—২২শে শ্রাবণ ১৩২৬।

—:*:—

বিবিধ প্রসঙ্গ।

—:০:—

বসন্ত চিকিৎসায় পুরস্কার।—বসন্তের দেশীয় চিকিৎসকদিগের মধ্যে এই বৎসর যাঁহারা ময়মনসিংহে সন্তোষজনক ভাবে বসন্ত রোগীর সেবা করিবেন, তাঁহাদের পুরস্কারের জন্য গবর্ণমেণ্ট দুই হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এ ব্যবস্থায় বসন্তচিকিৎসকগণ উৎসাহ পাইবেন, সন্দেহ নাই।

আয়ুর্ব্বেদের নিন্দা সম্বন্ধে সঞ্জীবনী।—ডাক্তার লেপটেনাণ্ট কর্ণেল সাদারল্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেটে যে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাপ্রণালীর নিন্দা করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে সহযোগিনী সঞ্জীবনী প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন,—

"যে চিকিৎসা প্রণালীর বয়স সহস্র সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, যাহার সার্থকতায় এত কাল কেহ সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই, এই বার লেপ্টনাণ্ট কর্ণেল সাদার ল্যাণ্ড প্রকাশ্যে উহার নিন্দা প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই চিকিৎসা প্রণালী কিরূপ সুযুক্তি ও ন্যায়ের ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান, তাহা তিনি কি করিয়া বুঝিবেন? সংকীর্ণ দলাদলীর ভাব হইতে কোন একটি বিষয় আলোচনা করিলে উহার

সত্য মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করা যায় না। তিনি তাঁহার পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যার বৈজ্ঞানিকতার অভিমান লইয়া আয়ুর্ব্বেদের প্রতি বঙ্কিম কটাক্ষপাত করিয়াছেন। কবিরাজদের রোগনির্ণয়পদ্ধতি তাঁহার আক্রমণের প্রধান বিষয়। অন্ধের হাতী দেখার মত লেপ্টেনাণ্ট কর্ণের সাদার ল্যাণ্ডের আয়ুর্ব্বেদের বোধ জন্মিয়াছে। এমন বোধ হয় তো আরও কাহারও কাহারও থাকিতে পারে, কিন্তু ইনি আপনার অদ্ভুত বোধ কাগজে ব্যক্ত করিয়া অতি অনিষ্ঠ সাধনের চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া আমরা উহার প্রতিবাদ না করিয়া পারি না।

আমরা লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেলকে ইহাই স্মরণ করাইতেছি যে, এই চিকিৎসা প্রণালী রাজানুকূল্য ব্যতিরেকে কেবল স্বকীয় শ্রেষ্ঠতার জন্যই সহস্র সহস্র বর্ষ সগৌরবে জীবিত রহিয়াছে।"

চিকিৎসকের পরলোক।—রাজা রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীটের সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ করুণা কুমার গুপ্ত মহাশয় কিছুদিন হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। ক্ষত চিকিৎসায় ইঁহার যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ছিল। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে ইনি যথেষ্ট চেষ্টাবান্ ছিলেন। উপরোক্ত বিদ্যালয় সংলগ্ন দাতব্য চিকিৎসালয়ের শল্যবিভাগের ঔষধাবলী ইঁহারই ব্যবস্থায় নির্ণীত হইত। ইঁহার বিয়োগে বিদ্যালয়ের যথেষ্ট ক্ষতি হইল। ইঁহার বিয়োগবার্ত্তা প্রচারমাত্র বিদ্যালয় এক দিনের জন্য বন্ধ করা হইয়াছিল। আমরা ইঁহার অভাবে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। ভগবান ইঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রাণে শান্তিবারি প্রদান করুন।

রসায়নবিদ বাঙ্গালী বালক।—জব্বলপুর সহরের মিঃ পি, সি, দত্ত নামক জনৈক ব্যারিষ্টারের পুত্র মিঃ ই, দত্ত নামক একটি সতের বৎসর বয়সের বালক রসায়ন শাস্ত্রে নানাপ্রকার উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়া বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণকে স্তম্ভিত করিয়া তুলিয়াছেন। কয়লার খনিতে এক প্রকার বাষ্প জন্মে, সে দেখাইয়াছে যে, উহা অন্য স্থানেও জন্মান যাইতে পারে। এই বাষ্প ভিন্ন গন্ধক প্রস্তুত করার প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিয়াও ঐ বালক সরকার হইতে পেটেণ্ট প্রাপ্ত হইয়াছে। সোডা, কার্ব্বনেট, অ্যালুমিনা পটাশ প্রভৃতি আরও কতকগুলি দ্রব্যও ঐ বালক আবিষ্কার করিয়াছে। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা গৌরবের কথা সন্দেহ নাই।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের নূতন ব্যবস্থা।—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের ছাত্র সংখ্যা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে। এই শ্রাবণে এই কলেজ ৪র্থ বৎসরে পদার্পণ করিল। নূতন সেসনে অনেকগুলি graduate ও under graduate কৃতবিদ্য ছাত্র ভর্ত্তি হইয়াছে। এই সকল ছাত্রের ভবিষ্যৎ উপায়ের জন্য কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ স্থির করিয়াছেন যে, চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১ম ও দ্বিতীয় ছাত্রকে ভারতীয় রাজন্যবর্গের চিকিৎসকরূপে অথবা সরকারি চিকিৎসালয় সমূহের চিকিৎসকের কার্য্যে উপযুক্ত বেতন নির্দ্ধারণে নিযুক্ত করিয়া দিবেন। যাঁহারা চিকিৎসা বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে চাকরী করিবার প্রয়াসী, তাঁহাদিগের পক্ষে ইহা অপূর্ব্ব সুযোগ সন্দেহ নাই।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৩য় বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৬—ভাদ্র। | ১২শ সংখ্যা।

"অশ্বিনী কুমার"।

—:*:—

আদিম যুগের প্রাচীন গাথা বিঘোষিল বেদ সমস্বরে।
যাঁ'দের মহিমা যাঁ'দের গরিমা উথলে আজিও ভুবন ভ'রে॥
ত্রিদিবে যাঁ'দের অতুল প্রভায়, ছাইল অপার যশের রাশি।
শান্ত করিল করুণা ধারায় মুগ্ধ এখনও জগত বাসী॥
ধন্য ধরণী পুণ্য কাহিনী গাহিয়া আপনি আপন হারা।
অমর শ্রেষ্ঠ গুণ গরিষ্ঠ অশ্বিনী সুত সুষমা ভরা॥

জনক যাঁ'দের কশ্যপ সুত ত্রিলোক পূজ্য দেবতা সূর্য্য।
বিশ্বকর্ম্মা-তনয়া- সংজ্ঞা-জননী, জামাতা অমৃতাচার্য্য॥
উত্তর কুরু বর্ষে উদিল যুগল কুমার মধুর দৃশ্য।
বিরাট তীর্থে পুণ্য আলোক উজলি' ছাপিল সারাটি বিশ্ব॥
ধন্য ধরণী পুণ্য কাহিনী গাহিয়া আপনি আপন হারা।
অমর শ্রেষ্ঠ গুণ গরিষ্ঠ অশ্বিনী সুত সুষমা ভরা॥

দক্ষ-সকাশে শিক্ষা লভিলে শিষ্য হইল অমর ইন্দ্র।
অশেষ প্রতিভা প্রকাশি' রচিলে স্বনামে অশ্বিনীকুমার তন্ত্র॥
ভৈরব-ক্রোধ-ছিন্নশীর্ষ যুক্ত করিলে ব্রহ্মাদেবে।
যজ্ঞ অংশ লভিলে সমরে অলংকৃত করি' দেবতা সবে॥

ধন্য ধরণী পুণ্য কাহিনী গাহিয়া আপনি আপন হারা।
অমর শ্রেষ্ঠ গুণ গরিষ্ঠ অশ্বিনী সুত সুষমা ভরা॥

ভুজস্তম্ভ ব্যাধি বিমুক্ত তোমারি প্রভাবে দেবতা ইন্দ্র।
ভগের নেত্র, তপনে দন্ত দানিলে; যক্ষ্মা মুক্ত চন্দ্র॥
'সুকন্যার' ধর্ম্ম রক্ষা করিলে স্থবির চ্যবনে যৌবন দানি।
ব্রহ্মবাদিনী, ঘোষার কুষ্ঠ নীরোগি' মুছা'লে কুমারী বাণী॥
ধন্য ধরণী পুণ্য কাহিনী গাহিয়া আপনি আপন হারা।
অমর শ্রেষ্ঠ গুণ গরিষ্ঠ অশ্বিনী সুত সুষমা ভরা॥

ইন্দ্র ছেদিত শীর্ষ যোজিলে দধীচি মুনির পুনর্ব্বার।
অরি কর হ'তে রাজা বিমদের পত্নী করিলে সমুদ্ধার॥
তুগ্র পুত্র ভুজ্যুর স্তবে বিশাল জলধি করিলে পার।
ঋজ্রাশ্বেরে নয়নে পশিলে নাশিলে অসীম অন্ধকার॥
ধন্য ধরণী পুণ্য কাহিনী গাহিয়া আপনি আপন হারা।
অমর শ্রেষ্ঠ গুণ গরিষ্ঠ অশ্বিনী সুত সুষমা ভরা॥

খেল নৃপতির জায়া বিশবলা স্তুতিতে লভিল করুণা তব।
সমর ক্ষেত্রে ছিন্ন চরণে লৌহ জঙ্ঘা ঘটিল নব॥
বিজ্ঞানালোক বিকাশি নবীন রাখিলে নিখিল বিমল কীর্ত্তি।
অমর ইন্দ্র বন্দিল পদ নীরোগ মানব স্মরিয়া মূর্ত্তি॥
ধন্য ধরণী পুণ্য কাহিনী গাহিয়া আপনি আপন হারা।
অমর শ্রেষ্ঠ গুণ গরিষ্ঠ অশ্বিনী সুত সুষমা ভরা।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর সামাধ্যায়ী ব্যাকরণতীর্থ, বিদ্যাবিনোদ
এইচ্, এল্, এম্, এস্।

প্রাচীন ভারতে কীটাণু তত্ত্ব।

—:০:—

জার্ম্মাণীতে কীটাণুতত্ত্বের আবিষ্ক্রিয়া হইয়া সমস্ত ইউরোপে ব্যাপ্ত হইয়াছে। এই কীটাণু-তত্ত্ব আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে ও সাহিত্যবিজ্ঞানে নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছে। পূর্ব্বে যক্ষ্মা প্রভৃতি কয়েকটী সংক্রামক পীড়ার হেতু বলিয়া কীটাণুকে ধরা হইত

এইক্ষণে আর তাহা নাই, কীটাণুর ন্যায় তাহার তত্ত্বও বাড়িতে বাড়িতে সমস্ত রোগেরই বিভিন্ন নিদান বিভিন্ন প্রকারের কীটাণু বলিয়া সাব্যস্ত করিতেছে। পণ্ডিতগণ আবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন.—কতকগুলি কীটাণু শরীরের অপকারী, কতকগুলি কীটাণু উপকারী। দধিতে এই উপকারী কীটাণু পাওয়া যায়— এইজন্য দধিভোজীরা দীর্ঘায়ুঃ হইয়া থাকে। আমাদিগের চিকিৎসাবিজ্ঞানে দধিকে দীর্ঘায়ুর কারণ বলিয়াছে কিনা জানি না, তবে অনাদি কাল হইতে আমাদিগের দেশে যে দধির ব্যবহার ছিল, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, এইদেশ হইতেই যে অল্পদিন পূর্ব্বে ভিন্নদেশে দধির আমদানি হইয়াছে তাহাও বলিতে পারি। ইউরোপীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানে যাঁহারা দক্ষতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মুখে নিয়ত যেমন দধির প্রশংসা শুনা যায়, তাঁহারা যেমন সকল রোগেই রোগীকে, দধি পথ্য দিবার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন আমাদের কবিরাজ মহাশয়দিগের মুখে সেরূপ প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায় না এবং সেরূপ ব্যবস্থাও দিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। যখন যাহার হুজুগ উঠে, তাহা লইয়া তৎক্ষণাৎ ইউরোপ যেমন নাচিয়া উঠে, আমাদের বৈদ্যদিগের আজও ততটা হয় নাই, তাঁহারা গড্ডলিকা প্রবাহের একান্ত বিরোধী। ব্যাকরণে পর্য্যন্ত আছে —"স্থূলং করণং দধি"। দধি যে উপকারী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, তবে সকল সময়ে সকল অবস্থাতে সকল রোগে দধি যে উপকারী —যাঁহারা দধির আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন, তাঁহারা অন্ততঃ তাহা স্বীকার করিবেন না। এইরূপ সমস্ত রোগেরই কারণ কীটাণু - এ কথাও সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে না।

দধির মতন কীটাণুতত্ত্বেরও সর্ব্বপ্রথমে ইউরোপে আবিষ্কার হয় নাই। ভারতেই কীটাণু তত্ত্বের প্রথম আবিষ্কার, এবিষয়ে সংস্কৃত কাব্য, নাটক, পুরাণ, তন্ত্র হইতে ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখাইতে পারি। পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্ব প্রথম ধর্ম্মগ্রন্থ—বেদে পর্য্যন্ত এই কীটাণুতত্ত্বের উল্লেখ আছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও তদ্‌ভাবে ভাবিত ; তাঁহাদিগের ভারতীয় ছাত্রগণ বেদের মন্ত্রভাগ প্রথমে রচিত, তাহার অনেক পরে ব্রাহ্মণভাগ রচিত, মন্ত্রভাগের মধ্যে আবার ঋক্‌সংহিতার রচনা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন— এই স্বকপোলকল্পিত অভিনব মতের পক্ষপাতী। আমরা কিন্তু সেই মতের কোন ভিত্তি বেদে পাই না। আমরা সকল বেদকেই নিত্য অনাদিকালসিদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস করি। এ প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহাদিগের মতসিদ্ধ ঋক্‌সংহিতা হইতেই এই কীটাণুতত্ত্বের প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটী মন্ত্রের আজ নিম্নে উল্লেখ করিতেছি, পাঠক পাঠিকারা দেখিবেন, ইউরোপ আমাদিগকে আজ পর্য্যন্তও কোন নূতন কথা শুনাইতে পারিতেছেন না। আমরা ঋক্ সংহিতার সেই মন্ত্রগুলির উল্লেখ না করিয়া বা তাহার সায়ন ভাষ্যের উল্লেখ না করিয়া মিঃ রমেশ চন্দ্র দত্ত যে সেই মন্ত্রগুলির অনুবাদ করিয়াছেন, নিম্নে তাহাই উদ্ধৃত করিলাম। তাহাতেই নবীনদল অধিক সন্তুষ্ট হইবেন।

১। "অল্পবিষ প্রাণী, মহাবিষ প্রাণী, জলচর, অল্পবিষ প্রাণী দুই প্রকার (জলচর ও স্থলচর), দাহকর প্রাণী, এবং অদৃশ্যরূপ প্রাণী, আমাকে (বিষ দ্বারা) সম্পূর্ণরূপে লিপ্ত করিয়াছে।

২। যে ঔষধ আসিতেছে তাহা অদৃশ্য

রূপ (বিষধর) প্রাণীকে নাশ করে ও প্রত্যাবর্ত্তনকালে তাহাকে নাশ করে। বিনষ্ট হইবার সময় নাশ করে এবং পিষ্ট হইবার সময় পেষণ করে।

৩। শর, কুশর, দর্ভ, সৈর্যা, মুঞ্জ, বীরণ প্রভৃতি (ঘাসে) অদৃষ্টরূপে অবস্থিত (বিষধরগণ) সকলে মিলিত হইয়া আমাকে লিপ্ত করিতেছে।

৪। যখন ধেনুগণ গোষ্ঠে উপবেশন করিয়া আছে, যখন মৃগগণ নিজ নিজ স্থানে বিশ্রাম করিতেছে, যখন মনুষ্যের চৈতন্য অপগত হইয়াছে তখন অদৃশ্যরূপ (বিষধর) আমাকে লিপ্ত করিয়াছে।

৫। তস্করের ন্যায় এই সকলকে রাত্রিকালে দেখা যায়। উহারা নিজে অদৃশ্য হইলেও সমস্ত জগৎ দর্শন করে। অতএব মনুষ্যগণ! সাবধান হও।

৬। স্বর্গ পিতা, পৃথিবী মাতা, সোম ভ্রাতা, অদিতি ভগিনী। অদৃষ্ট সর্ব্বদর্শীগণ! তোমরা নিজ নিজ স্থানে অবস্থিতি কর এবং যথা সুখে গমন কর।

৭। যাহারা স্কন্দবিশিষ্ট, যাহারা অঙ্গবিশিষ্ট, যাহারা শুচিবিশিষ্ট, যাহারা অত্যন্ত বিষযুক্ত, অদৃষ্টগণ! তোমাদিগের এখানে কি আছে? তোমরা সকলে মিলিয়া আমাদিগের নিকট হইতে চলিয়া যাও।

৮। পূর্ব্বদিকে সূর্য্যদেব উদিত হইতেছেন। তিনি সমস্ত বিশ্ব দর্শন করেন এবং অদৃষ্টদিগকে বিনাশ করেন। তিনি সমস্ত অদৃষ্টদিগকে ও যাতুধানীদিগকে বিনাশ করেন।

৯। সূর্য্য প্রচুর পরিমাণে সমস্ত বিষ নাশ করতঃ উদয় হইতেছেন, সর্ব্বদর্শী অদৃশ্যদিগের বিনাশক, আদিত্য জীবলোকের মঙ্গলের জন্য উদিত হইতেছেন।

১০। শৌণ্ডিক গৃহে চর্ম্মময় সুরাপাত্রের ন্যায়, আমি সূর্য্যমণ্ডলে বিষ নিক্ষেপ করিতেছি। পূজনীয় সূর্য্যদেব যেমন প্রাণত্যাগ করেন না, সেইরূপ আমরাও প্রাণত্যাগ করিব না। সূর্য্যদেব অশ্বদ্বারা চালিত হইয়া দূরস্থিত বিষকে অপনয়ন করেন। হে বিষ! মধুবিদ্যা তোমাকে অমৃতে পরিণত করে।

১১। ক্ষুদ্র শকুন্তিকা পক্ষী তোমার বিষ খাইয়া ফেলিয়াছিল, সে যেমন প্রাণত্যাগ করে নাই, আমরাও প্রাণত্যাগ করিব না। সূর্য্যদেব অশ্বদ্বারা চালিত হইয়া দূরস্থিত বিষকে অপনয়ন করেন। হে বিষ! মধু বিদ্যা তোমাকে অমৃতে পরিণত করে।

(ঋক্‌বেদ সংহিতা—২য় অষ্টক, ৫ অধ্যায়, ১ মণ্ডল, ১৯১ সূক্ত)

সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠ সমস্ত দেবতার হিতকারী সর্ব্বরোগনাশক ভিষক (যাঁহার স্মরণ করিলেও সমস্ত রোগের নাশ হয়) বাগ্মীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম রুদ্র আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপদেশ দিউন। হে রুদ্র! সেই সমস্ত সর্পব্যাঘ্রাদিকে বিনাশ করিয়া ও অধরাচি (অধোধোগমনশীলা অর্থাৎ চক্ষুর বাহিরে অবস্থিত) যাতুধানীদিগকে (রাক্ষসীদিগকে) বিনাশ করিয়া আমাদিগের নিকট হইতে দূর করিয়া দেও। (শুক্লযজুর্ব্বেদ—মধ্যেন্দিত শাখা ১৭ অঃ ৫ কণ্ডিকা)" (১)

বেদ সংহিতা হইতে যে কয়েকটী মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শিত হইল, তাহা দ্বারাতেই প্রাচীন ভারতে যে কীটাণুতত্ত্ব পরিজ্ঞাত ছিল

(১) এই সূক্তটির বাঙ্গালা ব্যাখ্যা কেহ করেন নাই, যজুর্ব্বেদে মহীধরকৃত ভাষ্যানুসারে এই বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল।

তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। তন্ত্র, স্মৃতি, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদিতে ইহা অপেক্ষা আরও স্পষ্টতর প্রমাণ আছে, তাহা আর এবার উদ্ধৃত করা গেল না। আবশ্যক হইলে পাঠক পাঠিকার জিজ্ঞাসুভাব বুঝিতে পারিলে, বারান্তরে প্রকাশিত হইবে। এই যে শাস্ত্রকারগণ কুষ্ঠ, যক্ষ্মী রোগী প্রভৃতির সহিত "আলাপাৎ গাত্র সংস্পর্শাৎ নিঃশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ" প্রভৃতি বচন দ্বারা সংসর্গ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তাহাদ্বারাতেও ত বুঝা যায় যে; তাঁহাদিগের কীটাণুতত্ত্ব অবিদিত ছিল না। কাহারও মৃত্যু হইলে কিয়দ্দিবসের জন্য (অশৌচ কাল পর্য্যন্ত) যে সেই গৃহ হইতে কেহ দান গ্রহণ করে না, সেই গৃহে কেহ আহার করে না—এমন কি ভিক্ষা পর্য্যন্ত গ্রহণ করা ও বিতরণ করা বন্ধ শবদাহী ও শববাহীর ভিন্নজলাশয়ে স্নান করিয়া গৃহে প্রবেশের বহির্ভাগে দাঁড়াইয়া হাতে, পায়ে, মুখে এবং বক্ষঃস্থলে নিম্বপত্র সংযুক্ত ও অগ্নি স্পর্শ করিবার পদ্ধতি আছে, উত্তপ্ত লৌহ ও উত্তপ্ত শিলাবস্তু হাতে, পায়ে, বুকে ও মুখে স্পর্শ করিবার পদ্ধতি আছে, ইহার মূলেতেও আমরা কীটাণুতত্ত্বের আভাস পাই।

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন।

পঞ্চকর্ম্ম ব্যাপদ্।

——:০:——

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর।)

ডা। এইবার বিবন্ধের কথা বলুন।

ক। দোষ ঊর্দ্ধ বা অধোমার্গ দিয়ে নিঃসৃত হ'তে থাকলে যদি রোগী শীতল গৃহে অবস্থান, শীতল জল পান বা শীতল বায়ু সেবন করে অথবা শীতল দ্রব্য শরীরে পরিষেক করে তা' হলে দোষ সকল স্রোতঃ সমূহে দুর্ব্বল এবং ঘনীভূতভাবে থেকে বায়ু, মূত্র ও পুরীষকে রোধ করে,—বিবন্ধ ব্যাপৎ উৎপন্ন করে। ইহাতে পেটে গুড় গুড় শব্দ, দাহ, জ্বর এবং তীব্র বেদনা হয়ে থাকে। এরূপ স্থলে রোগীকে সত্বর বমন করিয়ে অবস্থা বিবেচনায় চিকিৎসা করবে। দোষ সকল শরীরের অধোভাগে থাকলে সৈন্ধব লবণ; কাঁজি ও গোমূত্র মিশ্রিত ক'রে বিরেচন প্রয়োগ করবে। দোষ অনুসারে আস্থাপন ও অনুবাসন প্রয়োগ করবে। আর দোষ ও উভয় মার্গের উপদ্রব লক্ষ্য করে দুগ্ধ, যুষ বা মাংস রস পথ্য দেবে।

ডা। এই বিবন্ধ ব্যাপদে অধোদিকের কথা বলা হ'ল, কিন্তু ঊর্দ্ধদিকের কথা বলা হল না!

ক। বলা হ'য়েছে বৈ কি।

ডা। কৈ কখন বলা হ'ল?

ক। ম'শায় যদি এতেও না বুঝতে পেরে

থাকেন, তবে শাস্ত্রকার নাচার! প্রথমে বলা হ'য়েছে বমন বিরেচনের ব্যাপদ্ একই। তার পর বলা হ'ল—বিবদ্ধ ব্যাপদে বমন করিয়ে উপযুক্ত চিকিৎসা করাবে। তারপর অধোভাগের দোষের চিকিৎসা বলা হ'ল। সুতরাং প্রথমটা যে উর্দ্ধভাগের চিকিৎসা সেটা কি বুঝতে বাঁকী রইল! এতটুকু বিবেচনা শক্তি না থাকলে তার চিকিৎসা করাই বিড়ম্বনা।

ডা। এ দীনহীনের অত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি নেই, বিশেষ আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে সব কথা স্পষ্ট করে বলা আছে।

ক। এও তো অস্পষ্ট কিছু নয়, বুদ্ধি থাকলে বেশ স্পষ্ট।

ডা। কিন্তু চিকিৎসার কথা আরও স্পষ্ট ক'রে বলা উচিত।

ক। আরও স্পষ্ট, সে কি রকম? বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বোধোদয়ের মত? আমরা ইতঃস্তত যে সকল দ্রব্য দেখিতে পাই তাহাদিগকে পদার্থ বলে, পদার্থ তিন প্রকার। চেতন—"

ডা। মাপ করুন মশায়। এখন বস্তি ব্যাপদের কথা বলুন।

ক। ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন। কেননা বমন বিরেচন সম্বন্ধে আর দুই একটী কথা বলবার আছে। আপনি হুঁসিয়ার নন ব'লে এ আপত্তি উত্থাপন করেন নি। কিন্তু দেখুন বমন বিরেচন ব্যাপৎ এক সঙ্গে বলা হয়েছে—অথচ নাম বলা হয়েছে পরিকর্ত্তিকা বা গুদপরিকর্ত্তিকা, পরিস্রাব এবং প্রবাহিকা। তা' বমন ব্যাপদে দেহের উর্দ্ধ ভাগে প্রবাহিকা প্রভৃতি কি ক'রে হ'বে।

ডা। তাও তো বটে, এখন এর সমস্যা কি বলুন।

ক। এজন্যে ভীত হবেন না, অবহিত চিত্তে শ্রবণ করুন। বিরেচনে যাহাকে পরিকর্ত্তিকা বা গুদপরিকর্ত্তিকা বলে, বমনের সেইরূপ ব্যাপৎ হ'লে তা'কে কণ্ঠক্ষণম (কণ্ঠদেশ ফুঁড়ে ফেলার মত যন্ত্রণা) বলা যায়। শরীরের অধোভাগে যাহার নাম পরিস্রাব, উর্দ্ধভাগে তাহার নাম শ্লেষ্ম প্রকোপ (শ্লেষ্মা নির্গত হওয়া)। অধোভাগে যাহার নাম প্রবাহিকা, শরীরের উর্দ্ধভাগে তাহার নাম শুষ্কোদ্গার।

ডা। এখন আপনার বমন বিরেচন ব্যাপদ শেষ হ'ল তো! এইবার বস্তি ব্যাপদের কথা বলুন।

ক। শেষ যে ঠিক হ'ল তা' নয়। কেননা ভালরূপে বোঝাতে গেলে এর চেয়ে আরও ভাল ক'রে ব'লতে হয় এবং আরও অনেক কথা ব'লতে হয়। সে রকম ভাবে কেন বলিনি সে কথা পরে বলব। এখন ধৈর্য্য ধারণ করে বস্তি ব্যাপদ্ শ্রবণ করুন। কারণ বস্তি ব্যাপদ্ শাস্ত্রে ছেষট্টি (৬৬) প্রকার ব'লে কথিত হয়েছে। তা' ছাড়া স্নেহ প্রত্যাবর্ত্তন না করবার গুটি ছয়েক কারণ আছে।

ডা। আঃ সর্ব্বনাশ!

ক। ভীত হবেন না। ভীত হ'বেন না, ম'শায় অবহিত চিত্তে শ্রবণ করুন। শাস্ত্রে বলে যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হ'লে অর্দ্ধেক পরিত্যাগ করতে হয়। তা আপনি যখন সর্ব্বনাশ বলছেন, তখন অর্দ্ধেক পরিত্যাগ করে বলব।

ডা। সে কি রকম হবে? ছেষট্টি ব্যাপদের মধ্যে তেত্রিশটের বিষয় বলবেন।

ক। না ছেষট্টিটের বিষয়ই বলব তবে সংক্ষেপে অর্থাৎ অর্দ্ধেক পরিত্যাগ ক'রে।

ডা। আচ্ছা তবে তাই বলুন।

ক। প্রথমে বস্তি ব্যাপদগুলির ভেদ ও নাম বলছি। চলিত, বিবর্ত্তিত, পার্শ্বাবপীড়িত, উৎক্ষিপ্ত, অবসন্ন ও তির্য্যকক্ষিপ্ত এই কয়টী বস্তি নাম বসাইবার দোষ। অতি স্থূল, কর্কশ, অবনত, অনু (ক্ষুদ্রাকার), ভিন্ন (বিদারিত) সন্নিকৃষ্ট কর্ণিক, বিপ্রকৃষ্টকর্ণিক, সূক্ষ্ম (সূক্ষ্ম মুখ), অতিচ্ছিদ্র, অতি দীর্ঘ, ও অতি হ্রস্ব এই কয়টা বস্তির নলের দোষ। বহুলতা, অল্পতা, সচ্ছিদ্রতা, প্রস্তীর্ণতা, ও দুর্ব্বলতা এই পাঁচটী বস্তির দোষ। অতি পীড়িততা, শিথিল পীড়িততা, ভূয়োভূয়ঃ অবপীড়ন, ও কালাতিক্রম এই চারিটী পীড়নের (বস্তি টিপিয়া ঔষধ প্রয়োগের) দোষ। আমতা, হীনতা, অতিমাত্রতা, অতিশীততা, অত্যুষ্ণতা, অতি তীক্ষ্ণতা, অতি মৃদুতা, অতি স্নিগ্ধতা, অতি রুক্ষতা, অতিসান্দ্রতা ও অতি দ্রবতা এই এগারটী ঔষধ দ্রব্যের দোষ। অথবা শীর্ষতা (মস্তক নত করিয়া শয়ন), উচ্ছীর্ষতা (মস্তক উন্নত করিয়া শয়ন), ন্যুব্জতা, উত্তানতা, সঙ্কুচিত দেহতা, স্থিততা ও দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন এই সাত প্রকার শয়ন দোষ। চিকিৎসকের অনভিজ্ঞতা বশতঃ এই চুয়াল্লিশ প্রকার বস্তি ব্যাপদ ঘটিয়া থাকে। রোগীর নিমিত্ত যে পঞ্চদশ প্রকার ব্যাপদ্ ঘটিয়া থাকে তাহা পরে বলা যাইবে। নেত্র ও বস্তি এই উভয়ের অযোগ, আধ্মান, পরিবর্ত্তিকা, পরিস্রাব, প্রবাহিকা, হৃদয়োপকরণ, অঙ্গোপ্রগ্রহ, অতিযোগ ও জীবাদান এই নয় প্রকার উপসর্গও চিকিৎসকের অনভিজ্ঞতা বশতঃ ঘটিয়া থাকে। সংক্ষেপে এই সাতষট্টি প্রকার ব্যাপদের বিষয় কথিত হইল।

ডা। সর্ব্বনাশ এই সংক্ষেপে! তবে বিস্তার কি ?

ক। আপনি বিজ্ঞ চিকিৎসক হ'য়ে এই কথাটা বল্লেন শুনে আশ্চর্য্য হচ্ছি। বিস্তার শাস্ত্রে নেই, চিকিৎসকের স্থির ক'রে নিতে হবে। সংসারে দু'টী মানুষের মুখ যেমন এক রকম দেখা যায় না, তেমনি রোগই থাকুক আর ঔষধ প্রয়োগই বলুন—দু'টী রোগীকে এক রকম দেখা যায় না,—বা দু' জায়গায় ঔষধ প্রয়োগ ক'রে একরকম দেখা যায় না। সুতরাং শাস্ত্রে যে সাতষট্টি প্রকার বস্তি ব্যাপদের কথা দিগ্‌দর্শন স্বরূপ উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তা' ছাড়া যে আরও কত রকম ব্যাপৎ ঘ'ট্‌তে পারে তার ইয়ত্তা নেই। সেইজন্যে শাস্ত্রে এরূপ বলা হয়েছে।

ডা। তা' যা' বলেছেন ঠিক। কেবল শাস্ত্রের—অবশ্য আমি আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রের কথা বলছি—উপদেশ শুনে চিকিৎসা করা চলে না। অবস্থা ভেদে নিজের বুদ্ধি বৃত্তির উপর নির্ভর ক'র্‌তে হয়। এটা আবার আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে যতটুকু দরকার, আপনাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে তার চেয়ে বেশী দেখছি।

ক। সে জন্যে আমরা শাস্ত্রকারদের নিকট কৃতজ্ঞ এবং তাঁরা আমাদের উপর এতটা বিশ্বাস স্থাপন ক'রেছেন ব'লে আপনাদের গৌরবান্বিত বোধ করি। কিন্তু বলতে দুঃখ ও লজ্জায় মরমে মরতে হয়, এখন ঠিক তার উলটো হয়েছে। এখন বংশের মধ্যে যে প্রতিভাহীন, সেই কবিরাজী শেখে, আর যারা প্রতিভাশালী, তারা অন্যান্য অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা ক'রে থাকে।

ডাঃ। হাঁ, চিকিৎসা বিদ্যাটা এমনই সোজা বটে! যাক্ সে জন্যে আর দুঃখ ক'রে কি হবে? আপনি তা'রপর কি বলুন।

ক। পূর্ব্বে সাতষট্টি রকম দোষের কথা ব’লেছি, তার মধ্যে স্নেহ প্রত্যাগত অর্থাৎ বস্তি প্রয়োগ করলে ঔষধ ফিরে না আসবার আটটী কারণ আছে। (১) গতাদি ত্রিদোষ দ্বারা অভিভূত হওয়া (২) ভুক্তদ্রব্য দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়া, (৩) মলের সহিত মিশ্রিত হওয়া (৪) দেহমধ্যে অধিক দূর প্রবিষ্ট হওয়া, (৫) স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ না করা ও অনুষ্ণ ও অল্প আহারকারী ব্যক্তিকে স্বেদ না দেওয়া।

বস্তির নল চলিত বা বিবর্ত্তিত হ’লে গুহ্য দেশে ক্ষত ও বেদনা হয়। ইহাতে খাদ্যাখাদ্যের ন্যায় মধু ঘৃতাদি প্রয়োগ ক’রতে হয়। নল অত্যুৎক্ষিপ্ত (উচ্চদিকে প্রযুক্ত) এবং অবসন্ন (অধোদিকে প্রযুক্ত) হ’লে মলদ্বারে বেদনা হয়। ইহাতে পিত্তনাশকচিকিৎসা এবং স্নেহ পদার্থ সেচন করা উচিত। তির্য্যক্ ভাবে কিম্বা পার্শ্বভাগে নেত্রনল প্রযুক্ত হ’লে মুখ আবৃত থাকায় ঔষধ সম্যকরূপে প্রবেশ করিতে পারে না। নল অত্যন্ত স্থূল কর্কশ বা অবনত হ’লে গুহ্যদেশে ক্ষত ও বেদনা হয় এবং পুর্ব্বোক্ত ক্ষতের ন্যায় চিকিৎসা ক’রতে হয়।

নলের কর্ণিকা বর্ত্তির মুখের খুব নিকটে হলে, নল ভগ্ন হলে অথবা অত্যন্ত ক্ষুদ্র হ’লে বস্তির ঔষধ বাহির হইয়া পড়ে। নলের কর্ণিকা বৃহৎ এবং নিকটবর্ত্তী হলে মলদ্বার আহত হইয়া রক্তপাত হয়। এরূপ স্থলে পিত্তনাশক ক্রিয়া এবং পিচ্ছা বস্তি হিতকর। নল হ্রস্ব বা বা নলের ছিদ্র সরু হ’লে বস্তি প্রয়োগ ক’রতে হয়, ঔষধ দ্রব্য ফিরিয়া আইসে এবং বস্তি বিঘ্যাত হেতুতে রোগ উৎপন্ন হয়। নল দীর্ঘ এবং খর ও বৃহৎ ছিদ্র বিশিষ্ট হলে অত্যন্ত অবপীড়ন বশতঃ যন্ত্রণা হয়।

বস্তি বিস্তীর্ণ এবং স্থূল হ’লে যেরূপ দোষ হয় সেইরূপ হয়; বস্তি ছোট হলে অল্প ঔষধ ধরে বলে গুণকারী হয় না। বস্তি উত্তমরূপে বাঁধা না হ’লে বা সামান্য ছিদ্রযুক্ত হ’লে, নল ভিন্ন হ’লে যেরূপ দোষ ঘটে—সেইরূপ হয়।

বস্তি অত্যন্ত বল পুর্ব্বক পীড়ন ক’রলে ঔষধ আমাশয়ে গমন করে এবং বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইয়া নাক মুখ দিয়া নির্গত হয়। এরূপ ঘটিলে সত্বর গলদেশে পীড়ন, চুল ধরিয়া চালনা করা, তীক্ষ্ণ বিরেচন, তীক্ষ্ণ শিরোবিরেচন, শীতল দ্রব্যের পরিসেক করা কর্ত্তব্য। বস্তি আস্তে আস্তে টিপলে ঔষধ পক্বাশয়ে যায় না এবং কোন ফলপ্রদ হয় না। বস্তি বার বার পীড়ন ক’রলে অভ্যন্তরস্থ বায়ু কুপিত হ’য়ে আধ্মান এবং অত্যন্ত যন্ত্রণা উৎপন্ন করে। ইহাতে উপযুক্ত বস্তি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কাল অতিক্রম করে অর্থাৎ দীর্ঘ কাল ধ’রে বস্তি প্রয়োগ ক’রলে অত্যন্ত বেদনা হয় এবং রোগ বাড়িয়া যায়। ইহাতে পুনরায় ব্যাধিনাশক বস্তি প্রয়োগ করা উচিত।

আম অথাৎ অপক্ক দ্রব্য দ্বারা বস্তি প্রয়োগ ক’রলে মলদ্বারের শোথ এবং উপলেপ হয়। ইহাতে সংশোধন বস্তি ও বিরেচন হিতকর। ঔষধের মাত্রা কম হ’লে কোন বস্তিই কার্য্যকরী হয় না এবং মাত্রা অধিক হ’লে আনাহ (মল মূত্রের বদ্ধতা এবং অতিসার জন্মে। ঔষধ অত্যন্ত মৃদু বা শীতল হ’লে বায়ুর বিবন্ধ ও আধ্মান হয়। এই সকল অবস্থায় বিপরীত ক্রিয়া দ্বারা চিকিৎসা করিবে। অত্যন্ত স্নিগ্ধ বস্তি জড়তাকারক এবং অত্যন্ত রুক্ষ এবং অতি রুক্ষ স্নিগ্ধ বস্তি প্রয়োগ ক’রে প্রতীকার করতে হয়।

রোগীর মস্তক অবনত রেখে বস্তিপ্রয়োগ

ক’রলে বস্তি অতি পীড়ন করার ন্যায় দোষ হয়। মস্তক উন্নত রেখে বস্তি প্রয়োগ করলেও দোষ ঘটে। ইহাতে স্বেদ প্রয়োগ ক’রে উত্তর বস্তি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। রোগী ন্যুব্জভাবে থেকে বস্তি গ্রহণ ক’রলে ঔষধ পক্বাশয়ে না গিয়া অন্যদিকে যায়, তাহাতে হৃদয় ও মলদ্বারের বেদনা এবং কোষ্ঠে বায়ু কুপিত হয়। রোগী চিৎ হয়ে বস্তি লইলে পথ আবৃত থাকায় বস্তি ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না এবং অভ্যন্তরস্থিত বায়ু কুপিত হয়।

দেহ বা উরুদেশ সঙ্কুচিত থাকা অবস্থায় বস্তি প্রয়োগ করলে বায়ু কর্ত্তৃক প্রতিহত হইয়া বস্তি প্রত্যাগত হইয়া থাকে। রোগী উপবিষ্ট থাকা অবস্থায় বস্তি প্রয়োগ করিলে উহা সত্বর প্রত্যাগত হয় এবং আশয় সকল অর্পিত না হওয়ায় কোনই ফল হয় না। দক্ষিণ ভাগে শুইয়া বস্তি গ্রহণ করিলে তাহা পক্বাশয়ে প্রবেশ করে না। ন্যুব্জাদি অবস্থায় বস্তি প্রয়োগ করিলে বায়ু কুপিত হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় যথাবিধি চিকিৎসা করিবে।

স্বেদে বস্তির ঔষধ অনুষ্ণ ও অল্প হ’লে. তাহাতে বিষ্টম্ভ আধ্মান ও শূল উৎপন্ন করে। ইহাকে অযোগ ব্যাপদকর। এরূপ অবস্থায় তীক্ষ্ণ বস্তি ও তীক্ষ্ণ বিরেচক প্রয়োগ করা হিতকর। ভুক্ত অন্ন পরিপাক না হ’লে, আহারের পরে, দোষ থাকা সত্বে যদি অল্প উষ্ণ ও প্রচুর ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, অথবা অনুষ্ণ অতি লবণ সংযুক্ত প্রচুর স্নেহ প্রয়োগ করা যায়, কিম্বা যদি উদরে বহু মল থাকা অবস্থায় বস্তি প্রয়োগ করা যায়, তা হলে আধ্মান, হৃদয়, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠে শূলবদ্‌ বেদনা উৎপন্ন হয়, এরূপ অবস্থায় তীক্ষ্ণ বস্তি এবং অনুবাসন হিতকর। অতি তীক্ষ্ণ, উষ্ণ লবণযুক্ত বা রুক্ষ বস্তি প্রয়োগ ক’রলে বায়ু ও পিত্ত কুপিত হয়ে পরিকর্ত্তিকা রোগ উৎপন্ন করে এবং নাভি, বস্তি ও মলদ্বারে ছেদন করার ন্যায় যন্ত্রণা হয়। এরূপ অবস্থায় পিচ্ছা বস্তি প্রয়োগ করা হিতকর। তীক্ষ্ণ বস্তি বহুবিধ রোগ উৎপন্ন করে এবং ইহাতে অঙ্গের অবসাদ, পিত্ত নির্গমন ও মল দ্বারে দাহ হয়। এরূপ অবস্থায় পিচ্ছা বস্তি এবং দুগ্ধ ও ঘৃতের বস্তি হিতকর। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, নিরূহ ও অনুবাসন প্রয়োগ করলে প্রবাহিকা উৎপন্ন হয় এবং দাহ ও শূল সহিত মল ও রক্ত নিঃসরণ হয়। এরূপ অবস্থায় পিচ্ছা বস্তি দুগ্ধের সহিত পথ্যে ভোজন করা, এবং মধুর দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ ঘৃত বা তৈলের অনুবাসন হিতকর। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বা নিরূহ অনুবাসন প্রয়োগ ক’রলে হৃদয়োপসরণ ব্যাপদ্‌ ঘটে এবং অঙ্গের পীড়া, মত্ততা, শরীরের গুরুতা, এবং মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপদ্রব ঘটে, ইহাতে সর্ব্বদোষ নাশক শোষণ বস্তি প্রয়োগ করা উচিত। রুক্ষ বায়ুযুক্ত এবং অপ্রশস্ত ভাবে শায়িত ব্যক্তিকে রুক্ষ, মৃদু এবং অল্প ঔষধ প্রয়োগ কর’লে অঙ্গের অবসন্নতা, শরীরের স্তব্ধতা, হাঁই উঠা, বেষ্টনবৎ পীড়া, কম্প ও সন্ধি ও স্কন্ধে ভেদবৎ যন্ত্রণা হ’য়ে থাকে। এরূপ অবস্থায় স্বেদ অভ্যঙ্গ ও বস্তি ক্রিয়া হিতকর।

অত্যন্ত উষ্ণ, তীক্ষ্ণ ও বহু পরিমিত বস্তি অতি স্বেদিত বা অল্পদোষ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে প্রয়োগ ক’রলে বস্তির অতিযোগ হয়। এরূপ অবস্থায় বিরেচনের অতিযোগের ন্যায় চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য এবং শীতল পিচ্ছাবস্তি প্রয়োগ হিতকর। অতিযোগের ফলে জীবরক্ত নির্গত হ’লে বিরেচনোক্ত জীবাদানব্যাপদের ন্যায়

চিকিৎসা করবে এবং রক্ত মিশ্রিত পিচ্ছা বস্তি প্রয়োগ ক'রবে।

ডা। এই কি আপনার ব্যাপদ বলা শেষ হল ?

ক। মোটামুটি সব বলা হ'য়েছে। কেবল যে পনর রকম ব্যাপদের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনুন।

অত্যন্ত ক্রোধ হ'লে পিত্ত কুপিত হয়ে পিত্ততা রোগ উৎপন্ন করে। অতিরিক্ত পরিশ্রম ও শোক বশতঃ পিত্ত কুপিত হ'য়ে মত্ততা মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপদ্রব উৎপন্ন করে। মৈথুন সেবন ক'রলে আক্ষেপক, পক্ষাঘাত, অঙ্গবেদনা, গুহ্যদেশে শোথ, কাস ও রক্তমিশ্রিত শুক্রস্রাব উপসর্গ ঘটে। দিবসে নিদ্রা গেলে প্লীহা, প্রতিশ্যায়, পাণ্ডুরোগ, জ্বর, মোহ, অবসাদ, অপরিপাক প্রভৃতি উপদ্রব ঘটে। তমোগুণ বৃদ্ধি হ'লে নিদ্রা অধিক হয়। উচ্চৈঃস্বরে কথা বলায় বায়ু কুপিত হ'য়ে মস্তকে বেদনা, দেহের জড়তা, ঘ্রাণশক্তির হ্রাস, বধিরতা, মূকতা, চোয়ালের শিথিলতা, অধিমন্থ নামক চক্ষুরোগ, অর্দ্দিত রোগ, নেত্রস্তম্ভ, তৃষ্ণা, শ্বাস, কাস, নিদ্রানাশ, দন্ত চালন প্রভৃতি রোগ জন্মায়, যানে ভ্রমণ ক'রলে বমি, মূর্চ্ছা, ভ্রম, অঙ্গবেদনা ইন্দ্রিয়বিভ্রম ও ক্লান্তি জন্মায়। অধিক সময় উপবিষ্ট থাকলে বা স্নান ক'রলে কটিদেশে বেদনা হয়। অতিরিক্ত সংক্রমণ (পাইচারি করলে) বায়ু কুপিত হয়ে জঙ্ঘায় বেদনা জন্মায়, অথবা শকথির শুষ্কতা, শোথ ও পাদ হর্ষ উৎপন্ন করে। শীতল দ্রব্য সম্ভোগ বা শীতল জলে পানাদি ক'রলে বায়ু বর্দ্ধিত হয়ে অঙ্গ বেদনা, বিষ্টম্ভ, শূল, আধ্মান ও কম্প জন্মায়। বায়ু ও আতপ সেবন ক'রলে শরীরের বিবর্ণতা ও জ্বর হয়। বিরুদ্ধ ভোজন বা পূর্ব্বাহার জীর্ণ না হ'তে ভোজন ক'রলে ঘোর ব্যাধি বা মৃত্যু হয়। অসাত্ম্য দ্রব্য ভোজন ক'রলে বল ও বর্ণের হানি হয়। সেইজন্য বস্তি প্রয়োগের পর এই সমস্ত কার্য্য নিষিদ্ধ।

ডা। এইবার সব বলা হয়েছে ত ?

ক। সব আর ব'লেছি কৈ, মোটামুটি বলেছি। বমন, বিরেচন ও বস্তি প্রয়োগ সম্বন্ধে, প্রয়োগের পর আহারাদি সম্বন্ধে শাস্ত্রে অনেক নিয়ম আছে। তা'রপর যোগ অর্থাৎ ওষুদ সম্বন্ধে ত কিছুই বলা হয়নি। ধূম নস্যাদির বিষয়ও সংক্ষেপে ব'লেছি। ব্যাপারটা কিরূপ ছিল, সে সম্বন্ধে আপনার যা'তে মোটামুটি একটা ধারণা হয় এই উদ্দেশ্য। সূক্ষ্মভাবে পঞ্চকর্ম্মের বিষয় বল'তে হ'লে একখানা প্রকাণ্ড গ্রন্থ হ'য়ে পড়ে। এখন পঞ্চকর্ম্ম সম্বন্ধে আপনার মন্তব্য কি বলুন।

ডা। পঞ্চকর্ম্ম যে একটা খুব ভাল জিনিষ ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর বিরাট ব্যাপার। সমস্ত পঞ্চকর্ম্ম যদি একজনের শরীরে করা যায়, তা হলে শরীর নূতন হ'য়ে যায়। এর পর কুটী প্রবেশ ক'রে রসায়ন সেবন করলে সে লোক যে দীর্ঘজীবি হবে, নীরোগ হবে, মেধাবী হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্যাপারটা এখন চিত্রিত দীপের ন্যায় হয়ে পড়েছে। আলো নেই—অন্ধকার।

ক। সে কথা ত আপনাকে পূর্ব্বেই ব'লেছি। আমাদের যা ছিল তার কিছুই নেই। আছে কেবল বৃথা অভিমান। পঞ্চকর্ম্মের আবার যদি কখন পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়, তা'হ'লে আয়ুর্ব্বেদের নিকট অন্যান্য চিকিৎসা শাস্ত্র নিতান্ত হীন হয়ে পড়বে।

পঞ্চকর্ম্ম সমাপ্ত।

জ্বররোগে পথ্য ও চিকিৎসা।

——:০:——

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর।)

যাহাতে কালে আহারে রুচি হয় সেইজন্য অল্পকালে রোগীকে দন্তধাবন করাইবে। রোগীর মুখে যেরূপ রস থাকে—তাহার বিপরীত রস যুক্ত দ্রব্য দ্বারা অথবা রোগীর প্রিয় বস্তুর দ্বারা দন্তধাবন করাইতে হয়। অথবা বৃক্ষ শাখার অগ্রভাগ (দাঁতন) দ্বারা দন্ত ধাবন করিয়া বার বার মুখ ধৌত করিবে। ইহাতে মুখের বিরসতা নষ্ট হয়, অন্ন পানে আকাঙ্ক্ষা হয় এবং খাদ্যদ্রব্যের রসের আস্বাদন পাওয়া যায়।

এক্ষণে জ্বরের চিকিৎসার বিষয় বলা হইতেছে। কিন্তু জ্বরের বিস্তারিত চিকিৎসা এবং ঔষধের উল্লেখ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কেবল জ্বর চিকিৎসার মূল সূত্রগুলির আলোচনা করা যাইবে।

জ্বর ও আমাশয়ে বহু দোষের অবস্থান হেতু বমন থাকিলে প্রথমেই বমন করান কর্ত্তব্য। কিন্তু বমন সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। চরকে কথিত হইয়াছে যে "আমাশয় রোগ কফ প্রধান ও বহির্গমনোম্মুখের বমনেচ্ছা দ্বারা ইহা অনুমান করা যায়। দোষ সকল থাকিলে বমনের উপযুক্ত ব্যক্তিকে যুক্তি পূর্ব্বক বমন করাইবে। কিন্তু দোষসকল বহির্গমনোম্মুখ না হইলে যদ্যপি রোগীকে বমন করান যায়—তাহা হইলে হৃদ্রোগ, শ্বাস, আনাহ, (মল মূত্রের বদ্ধতা) মোহ প্রভৃতি উপসর্গ ঘটিয়া থাকে। বাগ্‌ভট বলেন সন্তর্পণ (অতিরিক্ত আহার জনিত) জ্বরে এবং আহার করিবার পর জ্বর হইলে বমন করান হিতকর। কিন্তু সর্ব্বত্রই দেখিতে হইবে যে, রোগী বমনের যোগ্য কি না।

তিমির নামক চক্ষুঃরোগগ্রস্ত, গুল্ম, পাণ্ডু বা উদর রোগগ্রস্ত স্থূলব্যক্তি, ক্ষত, ক্ষীণ, অতিকৃশ, অতিবৃদ্ধ, অর্শ, অর্দ্দিত বা আক্ষেপক রোগযুক্ত রুক্ষ ব্যক্তি, প্রমেহ রোগী, তরুণগর্ভা, উর্দ্ধগ রক্তপিত্তরোগগ্রস্ত ব্যক্তি, ক্রিমিকোষ্ঠ ব্যক্তি এবং অত্যন্ত মল বদ্ধতাযুক্ত ব্যক্তি বমনের অযোগ্য। কিন্তু ইহারা যদি অতিরিক্ত কফ পীড়িত হয় তাহা হইলে যষ্টিমধুর ক্বাথ পান করাইয়া বমন করান যাইতে পারে।

সাধারণতঃ নবজ্বরে বিরেচন নিষিদ্ধ হলেও অবস্থা বিবেচনায় বিরেচন করাইবার নিয়ম আছে। চরকে কোষ্ঠবদ্ধতা ও কোষ্ঠে যন্ত্রণা থাকিলে পেয়ার সহিত কিসমিস, পিঁপুল, শুঠ প্রভৃতি সারক দ্রব্য পাক করিয়া দেওয়ার নিয়ম আছে। ইহাতে কোষ্ঠ শুদ্ধি হইয়া থাকে। সুশ্রুতে কথিত হইয়াছে :—

"কোষ্ঠগত পক্কমল স্রোতে বিবদ্ধ থাকিলে যাহার অল্পকাল জ্বর হইয়াছে তাহাকেও বিরেচন প্রদান করিবে। কারণ পক্কমল নিঃসরিত না হইয়া শরীরে থাকিলে মহান্ অনিষ্ট করিতে পারে, বিষম জ্বর জন্মাইতে পারে এবং বল ক্ষয় করে। বিরেচন ব্যতীত

সুশ্রুতে বস্তি প্রয়োগ করিয়া নিঃসরিত করিবারও উপদেশ আছে।

সুশ্রুতের মতে দোষ নিঃসরণ জন্য প্রথমে বমন, পরে আস্থাপন, পরে বিরেচন, পরে শিরোবিরেচন অর্থাৎ মস্তক হইতে দোষ নিঃসরণ নস্য দিবার বিধি আছে। শ্লেষ্ম জ্বর গ্রস্ত বলবান রোগীকে বমন, পিত্তজ্বরে বিরেচন এবং মল মূত্রের বিবদ্ধতাযুক্ত বাতিক জ্বরে নিরূহ প্রশস্ত। মস্তকের গুরুতা ও যন্ত্রণা থাকিলে শিরোবিরেচন হিতকর।

দুর্ব্বল জ্বর রোগীর উদরাধ্মান, পেটফোলা এবং উদরে যন্ত্রণা থাকিলে, দেবদারু, বচ, কুড়, শুলফা, হিং ও সৈন্ধব বাটিয়া উদরে প্রলেপ দিবে এবং ঐ সকল দ্রব্যের বস্তি প্রস্তুত করিয়া মলদ্বারে প্রয়োগ করিবে।

নবজ্বরে এই সকল ক্রম অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা করিতে হয়। পথ্য প্রয়োগের বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

পূর্ব্বে আমজ্বরের লক্ষণ বলা হইয়াছে। সেই সকল লক্ষণ বলার পর শাস্ত্রকার বলিয়াছেন :—

"আমজ্বরে ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে। কারণ আমদোষ থাকিতে ঔষধ প্রয়োগ করিলে জ্বর প্রবলতর হইয়া থাকে।

অপিচ—

তরুণ জ্বরে—কষায় প্রয়োগ করিলে দোষ সকল পরিপাক প্রাপ্ত না হইয়া স্তম্ভিত হয় এবং সেই স্তম্ভিত দোষ বিষম জ্বর উৎপন্ন করে।

এই সকল বচনের উপর নির্ভর করিয়া অনেকে বলেন যে, আয়ুর্ব্বেদে রোগ জন্মিবামাত্র ঔষধ দেওয়া হয় না। আজকাল সাতদিন অপেক্ষা করিয়া ঔষধ দেওয়া চলে না। ইতি মধ্যে অনেক রোগীরই মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা— ইত্যাদি। এই বিষয়ের সত্যতা নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ আয়ুর্ব্বেদ মতে নবজ্বরে ঔষধ দেওয়া হয় না—একথা ঠিক নহে। কারণ তরুণ জ্বরে মুখ্য ঔষধ দেওয়া নিষিদ্ধ হইলেও "ষড়ঙ্গ পানীয়" এবং পেয়াদির সহিত সিদ্ধ করিয়া ঔষধ দিবার বিধি আছে। ঐ সকল ঔষধ ও পথ্য জ্বরনাশক, দোষপাচক, সারক, ঘর্ম্ম নিঃসরক প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট। সুতরাং সে জ্বরে ঔষধ দিবার নিয়ম নাই, ইহা প্রকৃত নহে। সুশ্রুত বলিয়াছেন :—

"কেহ কেহ বলেন যে সাত রাত্রি দিনের পর ঔষধ দেওয়া উচিত। কেহ কেহ বলেন যে দশ দিনের পর ঔষধ প্রয়োগ কর্ত্তব্য। জ্বর অল্প কালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও ঔষধ দেওয়া যায়। দোষের পরিপাক পাইলে যে রোগীর অল্পকাল জ্বর হইয়াছে—তাহাকেও ঔষধ দেওয়া যায়।"

এই ত গেল বৈদিক ঔষধের কথা। তারপর বিবিধ ধাতু, উপধাতু, পারদ ও অমৃত ঘটিত তান্ত্রিক ঔষধ নবজ্বরে প্রয়োগ করার বিধি আছে। ডাক্তারেরা প্রথম অবস্থায় যেরূপ জ্বরবিচ্ছেদকারক ঔষধ দেন, আয়ুর্ব্বেদের ষড়ঙ্গ পানীয়, পেয়াসহ সিদ্ধ ঔষধ এবং তান্ত্রিক ঔষধ গুলিও সেইরূপ। ডাক্তারী শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ জ্বরবিচ্ছেদকারক একোনাইট—তন্ত্রোক্ত হিঙ্গুলেশ্বর, মৃত্যুঞ্জয় রস, জয়াবটী, জয়ন্তী বটী, স্বচ্ছন্দ ভৈরব প্রভৃতি। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদ মতে নবজ্বরে ঔষধ প্রয়োগ করিবার নিয়ম নাই একথা বলা যায় না।

"ষড়ঙ্গ পানীয়" জ্বরের প্রথম হইতেই দেওয়া যায় বটে কিন্তু পেয়ার সহিত সিদ্ধ ঔষধ লঙ্ঘনের পর দিতে [illegible]

দিনের পরে ঐ সকল ঔষধ দেওয়া যায়। সাত দিন ঔষধ দিবার নিয়ম নাই—একথা না বলিয়া বরং ২।৩ দিন বলিলে কতকটা সঙ্গত হইতে পারে। কারণ তান্ত্রিক ঔষধ সকলও বিপদের আশঙ্কা না বুঝিলে কোন চিকিৎসকই ২।৩ দিন পরে নহিলে প্রয়োগ করেন না। "কেবল যড়ঙ্গ পানায়" জ্বরের প্রথম হইতে দিয়া থাকেন।

এক্ষণে কথা হইতেছে এই যে,—দুই দিন অপেক্ষা করিয়া ঔষধ প্রয়োগের নিয়ম আছে—ইহা হিতকর কি অহিত কর? অনেক সময় ২।৩ দিন না দেখিলে রোগের স্বরূপই নির্ণয় হয় না। বসন্ত রোগের প্রারম্ভে ২।৩ দিন প্রবল জ্বর হয়। সেরূপ ক্ষেত্রে ২।৩ দিন অপেক্ষা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ না করিলে রোগীর বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—

রোগমাদৌ পরীক্ষেত ততোঽনন্তরমৌষধম্।
ততঃ কর্ম্ম ভিষক পশ্চাৎ জ্ঞান পূর্ব্বং
সমাচরেৎ॥

অর্থাৎ—প্রথমে রোগ পরীক্ষা করিবে, পরে ঔষধ নির্ব্বাচন করিবে, পরে বিবেচনা পূর্ব্বক চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবে।

দুই তিন দিন রোগের গতি, বল এবং অগ্নিবল, রোগীর অবস্থা প্রভৃতি দেখিয়া রোগ নির্ণয় করিয়া ঔষধ দেওয়াই যে উৎকৃষ্ট চিকিৎসা—তাহা বিজ্ঞব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। রোগ—বুঝি আর নাই বুঝি, রোগী দেখিয়াই কতকগুলা ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সময় রোগীর অনিষ্ট করিয়া থাকি।

কেহ বলিতে পারেন যে, এই ২।৩ দিনেই হয়ত রোগীর মৃত্যু হইতে পারে। যদি সেই-রূপ ঘটিবার সম্ভাবনা হয়, যদি দুই এক দিনেই রোগীর নাড়ী ছাড়িয়া যাইতেছে দেখি, তাহা হইলে কি আমরা সাত দিন অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিব? না কোন চিকিৎসা শাস্ত্র এরূপ উপদেশ দিতে পারে? নাড়ী ছাড়িতে দেখিলে আমরা তখনই মৃগনাভি-মকরধ্বজ প্রয়োগ করিতে বাধ্য। নবজ্বর হইবার সঙ্গে সঙ্গেই নাড়ী ছাড়ে না বলিয়া শাস্ত্রে এইরূপ উপদেশ হইয়াছে।

অপর কেহ বলিতে পারেন যে, ২।৩ দিন অপেক্ষা করিয়া ঔষধ দেওয়ার ফলে হয়ত রোগ মারাত্মক হইয়া উঠিতে পারে। ২।৩ দিন অপেক্ষা করিয়া ঔষধ দেওয়া যে ভাল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমাদের বিশ্বাস যে, ২।৩ দিন অপেক্ষা করিয়া ঔষধ দিলে যতগুলি রোগ মারাত্মক হইতে পারে, ২।৩ দিন অপেক্ষা না করিয়া ঔষধ দিলে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী রোগ মারাত্মক হইয়া উঠে। অপিচ প্রথম হইতেই যে সকল রোগের কঠিন উপসর্গ উপস্থিত হয়—আয়ুর্ব্বেদের সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতিকারের উপায় বলা হইয়াছে। যেমন সন্নিপাত জ্বর। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে:—

লঙ্ঘণং বালুকাস্বেদো নস্যং নিষ্ঠীবনন্তথা।
অবলেহো অঞ্জনায় অযোগ্যাং ত্রিদোষজে॥

অনুবাদ:—সন্নিপাত জ্বরের প্রথমেই লঙ্ঘন, বালুকা, স্বেদ, নস্য নিষ্ঠীবন, অবলেহ এবং অঞ্জন প্রয়োগ করিবে।

নিষ্ঠীবন:—শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ ও সৈন্ধ লবণ আদার রসে আপ্লুত করিয়া মুখে ধারণ করিবে এবং পুনঃ পুনঃ নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবে। ইহাতে হৃদয়, মন্যা (ঘাড়) পার্শ্ব, মস্তক ও পায়দেশের শুষ্ক শ্লেষ্মা আকৃষ্ট হইয়া উঠিয়া

যায়. শরীর লঘু হয়. এবং পর্ব্ব সমূহে ভঙ্গবৎ বেদনা, গাত্র বেদনা, মূর্চ্ছা, কাস, গলদেশের রোগ, মুখ ও চক্ষুর গুরুতা, জড়তা, ও বমন ভাব নষ্ট হয়। দোষের বলাবল বুঝিয়া দুই তিন বা চারি বার নিষ্ঠীবন প্রয়োগ করিতে হয়। ইহা সন্নিপাত জ্বরে উৎকৃষ্ট ঔষধ।

নস্য—(১) সৈন্ধবলবণ, সচললবণ ও বিট লবণ, আদার রস ও ছোলঙ্গ লেবুর রসে আপ্লুত এবং উষ্ণ করিয়া নস্য প্রয়োগ করিবে। ইহাতে সংহতশ্লেষ্মা ভিন্ন হইয়া উঠিয়া যায় এবং মস্তক, হৃদয়, কণ্ঠ, মুখ, ও পার্শ্বদেশের যন্ত্রণা নষ্ট হয়।

(২) মৌলের সার, সৈন্ধবলবণ, বচ, মরিচ ও পিঁপুল বাটিয়া উষ্ণ জলে মিশ্রিত করিয়া নস্য প্রয়োগ করিলে অচৈতন্য রোগী সংজ্ঞা লাভ করে।

(৩) সৈন্ধবলবণ, সজিনাবীজ, সর্ষপ ও কুড় বাটিয়া ছাগমূত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া নস্য দিলে তন্দ্রা নিবারিত হয়।

অঞ্জন—শিরীষ বীজ, পিঁপুল, মরিচ, সৈন্ধব লবণ, রসোন, মনঃশিলা ও বচ—গোমূত্র সহ বাটিয়া অঞ্জন দিলে রোগী চৈতন্য লাভ করে।

অবলেহ—কটফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, মরিচ, পিঁপুল, শুঁঠ, দুরালভা ও সা জীরা ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মধুর সহিত অবলেহ করিতে দিবে। কিন্তু স্বেদাদি প্রয়োগ রূপ উষ্ণ ক্রিয়া করা হইলে মধুর পরিবর্ত্তে আদার রস সহ অবলেহ প্রস্তুত করিতে হয়। কারণ মধু উষ্ণের বিরোধী। এই অবলেহ অষ্টাঙ্গাবলেহ নামে প্রসিদ্ধ। ইহার প্রয়োগে সুদারুণ সন্নিপাত, হিক্কা, শ্বাস ও কণ্ঠরোগ নিবৃত্তি পায়।

উপরোক্ত যোগ সকল দ্বারা সন্নিপাতের প্রবল উপসর্গ সকল, যথা ফুসফুস কণ্ঠাদির শ্লেষ্মপূর্ণতা, সংজ্ঞা নাশ, তন্দ্রা, মূর্চ্ছা প্রভৃতি নষ্ট হয়।

স্বেদ—সন্নিপাতে মনুষ্যের দেহ জলময় হয় বলিয়া অগ্নিক্রিয়া ব্যতিরেকে তাহার শান্তি হয় না। এইজন্য সন্নিপাত জ্বরে মুহুর্মুহু স্বেদ দেওয়া আবশ্যক। সন্নিপাতজ্বরে সবিষ এবং নির্ব্বিষ নানাপ্রকার ঔষধ আছে বটে, কিন্তু অগ্নির তাপ ব্যতিরেকে তাহারা প্রায়ই স্ব স্ব বীর্য্য প্রকাশ করিতে পারে না।

সন্নিপাতের অন্যান্য উপসর্গগুলির চিকিৎসা সম্বন্ধে শাস্ত্রে সুন্দর উপদেশ আছে। বাহুল্য ভয়ে সে সকলের বিষয় লিখিত হইল না। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে :—

মৃত্যুনা সহ যোদ্ধব্যং সন্নিপাত চিকিৎসতা।

অর্থাৎ সন্নিপাত জ্বরের চিকিৎসায় মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিতে হয়।

অনেকের বিশ্বাস যে, সন্নিপাতজ্বরে আয়ুর্ব্বেদে কেবল উষ্ণ প্রয়োগেরই বিধি আছে, শৈত্য প্রয়োগের বিধি নাই। কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। উষ্ণ জ্বরে শৈত্য প্রয়োগ এবং শীত জ্বরে উষ্ণ প্রয়োগের বিধি আছে। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে; আয়ুর্ব্বেদ সূক্ষ্ম বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের জন্য। কিন্তু আমরা স্থূলবুদ্ধি বলিয়া একেবারে "হাতে হেতেড়ে।" বুঝাইয়া না দিলে বুঝিতে পারি না।

শাস্ত্রে যে তন্ত্রযুক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে বাক্যযোজনা এবং অর্থযোজনার সহায়তা করিয়া থাকে বলা হইয়াছে যে, শরীর জলময় হইলে অগ্নিক্রিয়া ব্যতীত তাহার শান্তি হয় না। এই বাক্যের বিপর্য্যয়ে বুঝা যাইতেছে যে, শরীর অগ্নিময় হইলে শৈত্য বা জল ব্যতীত তাহার শান্তি হয় না। [illegible]

পিত্তপ্রধান বা দাহ জ্বরে অথবা যে জ্বরে রোগীর শরীরে উত্তাপের অধিক্য হয়, সেই সকল জ্বরে শৈত্য ক্রিয়া করিবার স্পষ্ট উপদেশ আছে।

নবজ্বর ও সন্নিপাত জ্বরে বমন বিরেচন, লঙ্ঘন, মণ্ডাদি প্রয়োগ, পানার্থ জল প্রয়োগ প্রভৃতি বিষয় বলা হইয়াছে। এক্ষণে জ্বরে অন্যান্য যে সকল সদুপদেশ আছে, সংক্ষেপে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

দাহ ও তৃষ্ণা উপসর্গযুক্ত বাতপিত্তপ্রধান জ্বরের নিরাম অবস্থায় দোষসকল বদ্ধই হউক বা স্থানচ্যুতই হউক, ঔষধসহ সিদ্ধ দুগ্ধ প্রয়োগ করিয়া জ্বর নাশ করিবে। ইহাই সুশ্রুতের আদেশ।

পূর্ব্ব কথিত ক্রিয়া সকলের দ্বারা জ্বর নষ্ট না হইলে এবং বল মাংস ক্ষীণ না হইলে বিরেচন প্রয়োগ করিয়া জ্বর প্রশমন করিবে। কিন্তু জ্বররোগী ক্ষীণ হইয়া পড়িলে তাহার পক্ষে বমন বা বিরেচন হিতকর নহে। এরূপ অবস্থায় ঔষধসহ সিদ্ধ দুগ্ধ পান করাইয়া অথবা নিরূহ (Enema) প্রয়োগ করিয়া মল নিঃসারিত করিবে।

শীতল, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, রুক্ষ প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা যাহার জ্বর প্রশমিত না হয়, তাহার জ্বর রক্তাশ্রয়ী বলিয়া জানিবে, এই অবস্থায় রক্ত মোক্ষণ দ্বারা জ্বরের শান্তি হয়।

নবজ্বরে দিবানিদ্রা, স্নান, তৈলাদি মর্দ্দন, গুরুপাক অন্ন, স্ত্রী সংবাস ক্রোধ, শরীরে বাতাস লাগান, পরিশ্রম এবং কষায়রস পরিত্যাগ করিবে। ইহা সাধারণ নিয়ম। কিন্তু সময়ে কুপথ্যও সুপথ্য হইয়া থাকে। মনে করুন কোন জ্বর রোগীর উপর্য্যুপরি ৩।৪ দিন আদৌ নিদ্রা না হইবার পর চতুর্থ বা পঞ্চম দিবসে যদি দিবাভাগে নিদ্রাকর্ষণ হয়, তাহা হইলে দিবানিদ্রা নিষেধ করা চলে না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে জীর্ণজ্বরে বলকর ও পুষ্টিকর পথ্য প্রয়োগ করিবে। পুরাতন জ্বরে কফ্ ও পিত্তের ক্ষীণতা ঘটিলে এবং অগ্নি প্রবল থাকিলে রুক্ষ ও বদ্ধপুরীষ ব্যক্তিকে অনুবাসন প্রয়োগ করিবে।

মস্তকের যন্ত্রণা ও গুরুতা এবং ইন্দ্রিয় সকলের বিবদ্ধতা থাকিলে শিরোবিরেচন নস্য-বিশেষ প্রদান করিবে। ইহাতে অরুচিও নষ্ট হয়।

সর্ব্ব প্রকার জীর্ণ জ্বর দুগ্ধ দ্বারা প্রশমিত হয়। অতএব উপযুক্ত ঔষধসহ সিদ্ধ দুগ্ধ উষ্ণ বা শীতল অবস্থায় পান করিতে দিবে।

জীর্ণজ্বরে শীত এবং উষ্ণ বিভাগ করিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক উষ্ণ বা শীতল অভ্যঙ্গ, প্রলেপ বা স্নেহযুক্ত অবগাহন ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে বহির্ম্মার্গতগত জ্বর শীঘ্র প্রশমিত হয় এবং অঙ্গসুখ বল ও বর্ণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

যে সকল জীর্ণজ্বররোগীর চর্ম্মমাত্র অবশিষ্ট থাকে ধূপ ও অঞ্জন প্রয়োগ দ্বারা সেই সকল জ্বরের শান্তি হয়।

বাত প্রধান বিষম জ্বর ঔষধ সহ সিদ্ধ ঘৃতপান, বস্তি প্রয়োগ ও উষ্ণ অন্ন পান দ্বারা প্রশমিত হয়। পিত্ত প্রধান বিষম জ্বরে বিরেচন ঔষধসহ সিদ্ধ দুগ্ধ ও ঘৃত পান, এবং তিক্ত ও শীত বীর্য্য দ্রব্য দ্বারা প্রশমিত হয়। কফ প্রধান বিষম জ্বরে বমন, পাচন রুক্ষ অন্নপান, লঙ্ঘন এবং উষ্ণ বীর্য্য দ্রব্য প্রয়োগে প্রশমিত হয়।

উন্মাদ প্রভৃতি মানসিক রোগে যে সকল ধূম, ধূপ নস্য ও অঞ্জন প্রয়োগ করিবার বিধি

আছে, বিষম জ্বরেও সেই সকল প্রয়োজ্য। দুই একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। ব্যাঘ্রের বসা তিল এবং হিঙ্গু সম ভাগে লইয়া সৈন্ধব লবণ সহ মিশ্রিত করিয়া নস্য লইলে অথবা পুরাতন ঘৃত, সিংহের চর্ব্বি ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া নস্য লইলে বিষম জ্বর নষ্ট হয়। সৈন্ধব, পিপুলের দানা, ও মনঃশিলা তিল তৈলসহ বাটিয়া অঞ্জন দিলে বিষম জ্বর নষ্ট হয়। গুগগুলু, নিমপাতা, বচ, কুড়, হরীতকী শ্বেত সর্ষপ, যব ও ঘৃত একত্র করিয়া ধূপ দিলে বিষমজ্বর নষ্ট হয়। অভিঘাত জ্বর অর্থাৎ পতন আঘাত প্রাপ্তি জনিত জ্বরে ঘৃত পান ও ঘৃত মর্দ্দন, আহত স্থান হইতে রক্ত মোক্ষণ এবং রুচিকর ও হিতকর মাংস বসা সেবন দ্বারা প্রশমিত হয়। অতিরিক্ত মদ্য পান বশতঃ মদ্যসাত্ম্য ব্যক্তির জ্বর হইলে উপযুক্ত মাত্রায় মদ্য এবং সাত্ম্য রস সেবনে প্রশমিত হয়। ক্ষত ও ব্রণরোগ গ্রস্ত ব্যক্তির জ্বর—ক্ষত ও ব্রণরোগের চিকিৎসার দ্বারা ভাল হয়।

জ্বর রসস্থ হইলে বমন ও উপবাস, রক্তস্থ হইলে সেক, প্রলেপ ও দোষনাশক ঔষধ, মাংস মেদস্থিত হইলে বিরেচন ও উপবাস এবং অস্থি ও মজ্জাগত হইলে নিরূহ ও অনুবাসন প্রয়োগ করিবে।

কাম, শোক ও ভয় জনিত জ্বর আশ্বাস বাক্য, প্রার্থিত বস্তু লাভ, বায়ুর প্রশমন এবং হর্ষোৎপাদন দ্বারা প্রশমিত হয়। ক্রোধ জনিত জ্বর প্রার্থিত ও মনোজ্ঞ বস্তু, পিত্তনাশক চিকিৎসা এবং প্রিয় বাক্য দ্বারা প্রয়োগে এবং ক্রোধ জনিত জ্বরে এবং কাম ও ক্রোধ উৎপন্ন করিলে ভয় ও শোক জনিত জ্বর প্রশমিত হয়।

মনের একটী বেগ যে অপর একটী বেগের দ্বারা আশ্চর্য্য রূপ নিবৃত্ত হয় এ সম্বন্ধে বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ একটী ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। বিষ্ণুপুরের জনৈক রাজা একটী অত্যন্ত উচ্চ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন। স্তম্ভ নির্ম্মাণ প্রায় শেষ হইয়াছে—এমন সময়ে রাজা তাহা দেখিবার ইচ্ছায় রাজমিস্ত্রীরা যে বাঁশের সিঁড়ি দিয়া উঠিত—সেই সিঁড়ি দিয়া স্তম্ভের উপরে উঠেন। স্তম্ভের উপর হইতে নিম্নে দৃষ্টিপাত করিয়া রাজা ভয়ে এত অভিভূত হইয়া পড়েন যে, কোনক্রমেই নামিতে পারেন না। অমাত্য বর্গ এবং অন্যান্য লোকের মতে আশ্বাস বাক্যেও রাজার ভয় দূর হইল না। রাজাকে নামাইবার অন্য কোন উপায়ও দেখা গেল না। তখন একজন রাজমিস্ত্রী বলিল, আমি রাজাকে নামাইতেছি, কিন্তু আপনারা আমাকে রক্ষা করিবেন। এইরূপ বলিয়া রাজমিস্ত্রী স্তম্ভের উপরে উঠিয়া বলিল, মহারাজ। আমি যেমন করিয়া নামি, আপনিও তেমনি করিয়া নামুন। রাজা বলিলেন,—না, আমি নামিতে পারিব না। তখন রাজমিস্ত্রী বলিল—উঠেছিলেন কেন? এই কথা শুনিয়া রাজার ভয়ানক ক্রোধ হইল। তিনি পলায়নপর রাজমিস্ত্রীর পশ্চাদানুসরণ করিয়া নীচে নামিতে লাগিলেন। এক্ষেত্রে ক্রোধ উৎপাদন দ্বারা ভয়ের উপশম করা হইয়াছিল।

জ্বরের বেগ কাল অর্থাৎ অমুক সময়ে আমার জ্বর আসিবে—এইরূপ চিন্তা করিয়া যাহার জ্বর হয়, বিবিধ ইষ্ট বস্তু এবং বিচিত্র বিষয় দ্বারা তাহার স্মৃতি নষ্ট করিবে অর্থাৎ যে যাঁহাতে জ্বর আসার কথা না ভাবে এরূপে ভুলাইয়া রাখিবে।

জ্বরযুক্ত বা জ্বর মুক্ত ব্যক্তির [illegible] খাইলে [illegible]

অন্নপান, স্ত্রীসংসর্গ অভিচেষ্টা, স্নান ও অতিরিক্ত ভোজন পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ করিলে জ্বরের উপশম হয় এবং জ্বরের পুনরাগমন হয় না। জ্বর প্রশমিত হইলেও যদি অরুচি, শরীরের অবসন্নতা, শরীর ও মনের বিবর্ণতা থাকে, তাহা হইলে জ্বর পুনরাগমনের ভয়ে শোধন ক্রিয়া—যেমন বিরেচনাদি করিবে। জ্বর দ্বারা কৃশ ব্যক্তিকে সহসা যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য দিবে না, কেননা অগ্নি দূষিত হইয়া পুনরায় জ্বর হইতে পারে।

জ্বরমুক্ত ব্যক্তি যতদিন বলবান না হয়—ততদিন ব্যায়াম, মৈথুন, স্নান ও ভ্রমণ নিষিদ্ধ। কেননা বলবান না হইয়া ঐ সকল সেবন করিলে জ্বর পুনরাগমন করে। যে জ্বরিত ব্যক্তি বহুকাল জ্বরভোগ করিয়া ক্লিষ্ট, দুর্ব্বল ও দীন চিত্ত হয় সে ব্যক্তির পুনরায় জ্বর হইলে অল্পকাল মধ্যেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। অথবা বিনষ্ট না হইলেও কৃশতা, শোষ, গ্লানি, পাণ্ডুতা অরুচি, উৎকোট (গাত্রে চাকা চাকা দাগ) পিড়কা, অগ্নিদৌর্ব্বল্য প্রভৃতি উপসর্গ ঘটে।

পুনরাগত জ্বরে অভ্যঙ্গ, উদ্বর্ত্তন, স্নান, ধূপ, অঞ্জন এবং পঞ্চতিক্ত ঘৃত পান প্রশস্ত। গুরু অভিষ্যন্দী ও অসাত্ম্যভোজন হেতু জ্বর পুনরাবর্ত্তন করিলে নবজ্বরের ন্যায় লঙ্ঘন ও উষ্ণ উপচার প্রভৃতির দ্বারা চিকিৎসা করিবে। কিত ধাতুর অর্থ রোগাপনয়ন এবং এই ধাতু হইতে চিকিৎসা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং যদ্দ্বারা রোগোপনয়ন হয়—তাহাকে চিকিৎসা বলে। এইজন্য পথ্যও চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু আমরা পাঠকগণের বোধসৌকর্য্যার্থ পথ্য ও চিকিৎসা পৃথক বলিয়াছি।

আবার "পথি" হইতে পথ্য শব্দের উৎপত্তি। পথি—হিতম অর্থাৎ রোগীর পক্ষে যাহা কিছু হিতকর তাহাই পথ্য শব্দ বাচ্য।

সমাপ্ত।

শ্রী—বন্দ্যোপাধ্যায়।

ওলাউঠা চিকিৎসা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তখন সকলেরই মুখমণ্ডল শুষ্ক, কণ্ঠ নীরস হইয়া উঠে,—অতি বড় সাহসীরও বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে থাকে। সেরূপ ক্ষেত্রে ফুস্ফুস্ সঞ্চারিত হইয়া যদি তাহার এক অংশ অপর অংশের উপর উঠিয়া পড়ে, তাহা হইলে কাহারো আর জীবনের আশা থাকে না। দুই একবার ভেদ বমি হইতে না হইতেই জীবনের লীলা শেষ হইয়া যায়। একমাত্র ভয় হইতেই এরূপ ঘটনার উপস্থিতি ঘটে। ফলতঃ ভয় হইতে যে কোন রোগের উদ্ভব হউক না কেন, তাহা প্রায়শঃ দুঃসাধ্য বা অসাধ্য হইয়া থাকে।

আবার সময় সময় এরূপও দেখা যায় যে, গ্রামের মধ্যে ওলাউঠা রোগের অত্যন্ত প্রকোপ,

হইলে যদি কোন ব্যক্তির কণ্ঠ শুষ্ক, ওষ্ঠ নীরস এবং মুখমণ্ডল ঈষৎ নীলবর্ণযুক্ত হয়, তবে তাহাকে আর অধিক কাল ইহজগতে বাস ত হয় না, অথচ সেই হতভাগ্য তখনো পর্য্যন্তও জানে না, অথবা তাহার আত্মীয় স্বজনেও বুঝিতে পারে না যে, মুহূর্ত্ত মধ্যেই তাহাকে কীদৃশ অবস্থায় পতিত হইতে হইবে। এরূপ অবস্থায় দুই একবার ভেদ বমি হইতে না হইতে দুই তিন ঘণ্টার মধ্যেই রোগীর সংসারের খেলার অবসান ঘটে। ওলাউঠার ঘোরতর আক্রমণকালে যখন পল্লীমধ্যে হুলস্থুল ব্যাপার আরম্ভ হইতে থাকে, তখন বায়ুর আধিক্য, মনের চাঞ্চল্য এবং ফুস্‌ফুস্ বা হৃৎপিণ্ডের বিকৃতি বশতঃ প্রথমেই বমন আরম্ভ হয়। হয় তো সেই বমি হইতেই রোগীর আকস্মিক জীবনান্ত হইয়া থাকে। তাহার আর ভেদ হইবার অবসরের প্রতীক্ষা করিতে হয় না।

অজ্ঞানতা বশতঃ অনেকে অনেক সময় কাহারও অতিরিক্ত দাস্ত হইতে দেখিলে অমনি অহিফেন্ বা অহিফেন সংযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বসেন। ইহা নিতান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ। অহিফেনের পরিবর্ত্তে যদি কর্পূর সম্পর্কিত ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না। অহিফেনে যে অনিষ্টের উৎপত্তি হয়, তাহার সংশোধনের কোন উপায়ই আর থাকে না। আমরা নিদানতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে পাই যে, বর্ত্তমান ওলাউঠা বা বিসূচিকা রোগের যে সকল লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে; অতিসার রোগেও তাহার অধিকাংশ রোগের লক্ষণ প্রকাশ হইয়া থাকে। কোনটি অতিসার, কোনটী বিসূচিকা রোগের প্রথম আক্রমণ—ইহা নির্ণয় করা একটু কঠিন ব্যাপার। চিকিৎসকদিগকেও এই রোগ নিরূপণ কালে অনেক সময়ে ভ্রমে পতিত হইতে হয়।

অহিফেন—মূত্রশোষক এবং ইহা দ্বারা মূত্র যন্ত্রও সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। অতিসার রোগে অতিরিক্ত মল নিঃসরণ এবং শরীরস্থ জলীয়াংশের শোষণ হয় বলিয়াই মূত্ররোধ হয়। কিন্তু মূত্রযন্ত্র কখনও বিকার প্রাপ্ত হয় না। এই পীড়ার প্রথমাবস্থায় অহিফেন প্রয়োগ করিলে দ্রব্যপ্রভাবে মূত্রযন্ত্রের আংশিক বিকৃতি বা অধিক পরিমাণে মূত্রশোষণ ঘটিলেও ঔষধ দ্বারা তাহা আনয়ন করা বড় কঠিন হয় না। কিন্তু বিসূচিকা রোগের ব্যাধিপ্রভাবেই মূত্র যন্ত্রের সঙ্কোচন এবং মূত্রের ক্ষয় হইতে আরম্ভ হয়। ইহার পর অহিফেন প্রয়োগ করিলে মূত্রসঙ্কোচনের এবং মূত্রক্ষয়ের সহায়তাই হইতে থাকে, সুতরাং সে দোষ সংশোধন করিবার আর কোন উপায়ই হইতে পারে না। এ অবস্থায় মূত্ররোধ বা মূত্রক্ষয় বশতঃ রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। কিন্তু অতিসার বা বিসূচিকা—যে রোগই হউক না কেন, প্রথমাবস্থায় যদি কর্পূর বা কর্পূর সংযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে এরূপ দুর্ঘটনা কখনই সংঘটিত হইতে পারে না। অর্থাৎ মূত্ররোধ হইয়া কাহারও মৃত্যু হয় না। তাই বলিতেছি—বর্ত্তমান ওলাউঠা রোগের প্রথমাবস্থায় কিছুতেই অহিফেন প্রয়োগ করা উচিত নহে। তবে রোগের মধ্যমাবস্থায় অথবা প্রয়োজন হইলে শেষাবস্থায় অহিফেন সংযুক্ত ঔষধ বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অহিফেনের সহিত অন্যান্য দ্রব্য সংযুক্ত হইলে, অহিফেন যে রূপান্তর বা গুণান্তর প্রাপ্ত হয়—ইহা সর্ব্বথা সকলেরই স্বীকার্য্য।

একদোষোৎপন্ন উপদ্রব যেমন অনায়াসেই প্রতিকৃত হইতে পারে, বহু দোষোৎপন্ন উপদ্রব সেইরূপ অনায়াস সাধ্য নহে, এমন কি তাহা অসাধ্যরূপে পরিণত হইতে পারে।

২য়—চিকিৎসা প্রকরণ।

"ঔষধিনা হন্যতে হস্তী হরিণেন কদাপি ন।
জম্বুকাঃ পরিভূয়ন্তে শ্বভিরুগ্রৈ স্বর্জ্জৈ ন হি॥"

পল্লীমধ্যে বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে সকলেরই কটিদেশে অলাবুত্বক্ (লাউয়ের খোলা) ধারণ এবং তাহার ধূমগ্রহণ করা উচিত। সর্ব্বদা কর্পূর-আঘ্রাণ এবং কর্পূর-সেবন এ রোগোৎপত্তি নিবারণের একটী প্রশস্ত কল্প। প্রথমে পেট কাঁপিয়া তরল দাস্ত হইতে থাকিলে, অগ্নিমান্দ্য ও অতিসারাদি রোগে কোনো কোনো ঔষধ বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিতে হয়—অনুপান আদার রস ও চার, পাঁচ রতি সৈন্ধব লবণ। এরূপ ক্ষেত্রে কর্পূরবাসিত জলের সহিত "মুস্তাদ্য বটী" অথবা চিনির সহিত 'কর্পূরাসব' সেবন করাইয়াও ফল পাওয়া যায়। নিম্নে ঔষধ দুইটীর প্রস্তুতপ্রণালী লিখিত হইল। নানা কবিরাজী গ্রন্থে এক নামের অনেক ঔষধ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং কোনো ঔষধ বলিয়া কোনোরূপ ঔষধ সেবন করিলে তাহার কোনরূপ ফল পাওয়া যায় তাহা কে বলিতে পারে?

১। মুস্তাদ্যবটী—

১। অব্দাৎ পলদ্বয়ং কুষ্ঠং কণা কর্পূর হিঙ্গুতঃ।
পলং পলং গৃহীত্বা তু মর্দ্দয়িত্বা বটীং চরেৎ॥
চতুর্গুঞ্জামিতাং খাদেৎ কর্পূরাম্বুসুবাসিতাম্।
অতীসারমজীর্ণঞ্চ বিসূচীং ঘোর রূপিণীং
অরোচকং বহ্নি মান্দ্য গ্রহণীমপি দারুণাম্
কাসং পঞ্চবিধং চৈব নাশয়েদ বিকল্পতঃ।

২। তুলাং প্রসন্নাং পরিগৃহ্য শুদ্ধাং,
পলাষ্টকং চোড়ুপতেঃ ক্ষিপেচ্চ।
এলা চ মুস্তা ঘনশৃঙ্গবেরে
যমানিকা বেল্লজ মত্র সর্ব্বং॥

মুতা ১৬ তোলা পিঁপুল, কর্পূর, শোধিত-হিঙ্গু প্রত্যেকে ৮ তোলা। প্রথম তিনটী ঔষধ উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া লইতে হইবে। শোধিত হিঙ্গু, ছাঁকিয়া লইবার প্রয়োজন নাই। খলে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া লইলেই চলিতে পারে। পরে চারিটী দ্রব্যই জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া চারি রতি মাত্রায় বটী প্রস্তুত করিতে হইবে—অনুপান কর্পূরোদক। এই ঔষধ সেবন করিলে বিসূচিকা, অতিসার প্রভৃতি রোগের শান্তি হয়।

২। কর্পূরাসব ;—

পলপ্রমাণং পিহিতে চ ভাণ্ডে মর্গেং নিদধ্যাদ্ ভিষগত্র যত্নাৎ। বিসূচিকায়াঃ পরমৌষধং তন্নিহন্তি চান্যান্ বিবিধান বিকারান্॥

(৩) কবিরাজী ওজন ৬৪ তোলায় সের গণনা করিতে হইবে। এবং ৫ রতিতে আনা ধরিতে হইবে।

মৃতসঞ্জীবনী অথবা অন্য কোন প্রকার পরিষ্কৃত সুরা ১২॥ সের, কর্পূর ১৷৹ সের, ছোট এলাচ, মুতা, শুঁঠ যমানী, মরিচ—প্রত্যেক ৮ তোলা—মাত্রায় অর্দ্ধ কুট্টিত করিয়া লইতে হইবে। আর সমস্তগুলি দ্রব্য একত্র করিয়া ১ মাস কাল আবৃত ভাণ্ডে রাখিতে হইবে। ঔষধগুলি উত্তররূপে ছাঁকিয়া লইবে। ইহা বিসূচিকা রোগের মহৌষধ। ইহা দ্বারা অপরাপর নানাপ্রকার পীড়ারও প্রতিকার হইয়া থাকে। মাত্রা ১ মাষা। ওলাউঠা রোগের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত এই ঔষধ সেবন করিলে কোনও অপকার হয় না। গ্রামের মধ্যে ওলাউঠা রোগের প্রবল আক্রমণ

লক্ষিত হইলে, অতিসার অথবা সাধারণ অজীর্ণ বলিয়া কাহারও তাহা উপেক্ষা করা উচিত নহে। সকলেরই বেশ মনে রাখা উচিত যে, সাধারণ অজীর্ণ বা অতিসার রোগে তিন, চার বার ভেদ হইলেও কাহারও কাহারও দন্ত বা সমস্ত মুখমণ্ডল শ্যামবর্ণ বা নীলবর্ণ হয় না। পুনঃপুনঃ অতিরিক্ত ভেদ হইতে হইতে রোগ যখন অতিশয় সাংঘাতিক আকার ধারণ করে, তখন দন্ত এবং মুখমণ্ডলের বর্ণ পূর্ব্বোক্ত রূপ বিকৃতি প্রাপ্ত হইতে পারে।

সত্য সত্যই ওলাউঠা বা বিসূচিকা রোগে আক্রমণ করিলে দুই একবার, ভেদ বমি হইয়া অমনি মুখশ্রীর সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হয়। অর্থাৎ মুখমণ্ডল ও দন্ত—শ্যামবর্ণ বা ঈষৎ নীল-বর্ণ হয়। দন্ত একেবারে নীরস হইয়া যায়। শরীরও অতি শীঘ্র অবসন্ন হইয়া পড়ে। বিসূচিকা বিষ সমস্ত শরীরে অভিব্যাপ্ত হইলে যখন মর্ম্মগ্রন্থি সমূহ একেবারে শিথিল হইয়া পড়ে, শরীর হইতে শ্লেষ্মা তরল হইয়া মলা-কারে নির্গত হয় এবং সময় সময় রোগীর চৈতন্য বিলুপ্ত হইয়া যায়, যখন ঘোরতর মোহ আসিয়া উপস্থিত হয়, মধ্যে মধ্যে নেত্র ঊর্দ্ধগামী হইয়া উঠে, তখন নাড়ীস্পন্দন সম্পূর্ণ উপলব্ধি হয় না। কিন্তু বিশেষরূপ প্রণি-ধান করিয়া দেখিলে, অনেক বিলম্বে থাকিয়া থাকিয়া এক একবার সূক্ষ্মতন্তুর ন্যায় নাড়ীর স্পন্দন অনুভূত হয়।* এইরূপ অবস্থায় নিম্নলিখিত ঔষধগুলি প্রয়োগ করিলে সবিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে।

একখানি কটরা মধ্যে টুকরা টুকরা হরিণ শৃঙ্গ সংস্থাপন করিয়া আর একখানি কটরা দ্বারা আচ্ছাদন করিবে, পরে কর্দ্দমলিপ্ত বস্ত্র দ্বারা তাহা উত্তমরূপ বন্ধন ও কর্দ্দম লেপন করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। তাহার পর ৬০।৭০ খানা বনঘুঁটে দ্বারা পূর্ণ হয়—একহস্ত পরিমান গভীর গোলাকার গর্ত্ত করিবে। সেই গর্ত্ত এক তৃতীয়াংশ বনঘুঁটে দিয়া পূর্ণ করিয়া তাহার মধ্যে উল্লিখিত কর্দ্দমলিপ্ত কটরা স্থাপন করিবে। গর্ত্তের অবশিষ্টাংশ আরো বনঘুঁটে দ্বারা পূর্ণ করিবে। পরিশেষে উপরিভাগে অগ্নি প্রদান করিয়া মুষাবদ্ধ হরিণ-শৃঙ্গ ভস্ম করিবে। ইহাকে সাধারণ পুট কহে। সাধারণ পুটে বনঘুঁটের বিশেষ কোন পরিমাণ নাই। ২০।২৫ খানা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রয়োজন মত ১০০ খানা পর্য্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন আরো অনেক প্রকার পুট আছে। যথাস্থানে তাহার বিষয় বর্ণনা করা যাইবে। সকল প্রকার পুটের কার্য্য রাত্রিতে সম্পাদন করা উচিত। পরদিন প্রাতঃকালে পুটস্থিত অগ্নি সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত হইয়া মুষাবদ্ধ ঔষধ যখন শীতল হইবে, তখন তাহা বাহির করিয়া লইবে এবং উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া কাচকুপীর মধ্যে রাখিয়া দিবে। এই ঔষধ একরতি, অর্দ্ধ তোলা আপাঙমূলের রসের সহিত সেবনীয়। বালক, বৃদ্ধ ও গর্ভিনী সকলেই নির্ভয়ে সেবন করিতে পারে। ইহা দ্বারা ফুস্‌ফুস্ ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ঠিক থাকে, সুতরাং ব্যাধি শীঘ্র শীঘ্র সাংঘাতিক হইতে পারে না। সর্ব্ববিধ অজীর্ণ বা অম্লাজীর্ণ ইহা দ্বারা প্রশমিত হইয়া থাকে।

অর্দ্ধযব পরিমিত হরিতালভস্ম পূর্ব্ববৎ আপাঙমূলের রসের সহিত সেবন করিলে কখনও নাড়ী স্পন্দন বিলুপ্ত হয় না। এবং সপ্ত ধাতুর ক্ষয়নিবন্ধন উদ্বেষ্টন প্রভৃতি

* বিসূচ্যাং নৈব দৃশ্যতে নৈব স্থানং বিমুঞ্চতি।

যে সকল গুরুতর উপসর্গ গুলি উপস্থিত হইয়া থাকে—তাহাও হইতে পারে না। এক্ষণে হরিতাল ভস্মের প্রস্তুতপ্রণালী লিখিত হইতেছে। বংশপত্র হরিতাল খণ্ড খণ্ড করিয়া সপ্তাহ কাল চূণের জলে ভিজাইয়া রাখিলে অথবা পোট্‌লী বদ্ধ হরিতাল মৃৎভাণ্ডে দোলাযন্ত্রে ঝুলাইয়া দুই প্রহর কাল চূণের জলে পাক করিলে ইহার শোধন হয়। শোধনের পর কোন মৃৎভাণ্ডের তিন চতুর্থাংশ অশ্বথ বৃক্ষের শুষ্ক ছাল দ্বারা পূর্ণ করিয়া তদুপরি শোধিত বংশ পত্র হরিতাল স্থাপন করিবে। পরে তাহার উপর আরো অশ্বথ ছাল রাখিয়া সেই ভাণ্ড পূর্ণ করিবে। দুই সের পরিমিত ছালে পাঁচ তোলা পরিমাণ হরিতাল প্রদান করিবে। এই অনুপাতে অশ্বথ ত্বক্ ও হরিতাল দেওয়ার নিয়ম, কিন্তু হরিতাল আড়াই তোলার কম দেওয়া উচিত নহে। ভাণ্ড পূর্ণ হইলে ভাণ্ডের মুখ সরার সন্মুখে উত্তমরূপ অবরুদ্ধ করিয়া দুই প্রহর কাল তীব্র অগ্নিতে পাক করিবে। দুই প্রহর অন্তে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে যখন ভাণ্ড শীতল হইবে, তখন ভাণ্ডমধ্যস্থিত ভস্ম গুলি হইতে হরিতাল উঠাইয়া লইবে। ইহাই হরিতাল ভস্ম। এই হরিতাল ভস্ম ঈষৎ হরিদ্রা বর্ণ। ওলাউঠা রোগে এই হরিতাল ভস্মের প্রয়োগ করিবার বিধান আছে। অন্যান্য বৈকারিক অবস্থাতেও ইহা প্রয়োগ করা যায়।

* বিসর্পণ চূর্ণ।

ফট্‌কিরি ১, বংশপত্র হরিতাল ৩, স্বর্ণ।০ উপরি লিখিত তিনখানি দ্রব্য দ্বারা এই ঔষধ প্রস্তুত করিতে হয়। ফট্‌কিরি শোধন করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। পূর্ব্বে যে হরিতাল শোধনের প্রকরণ বলা হইয়াছে, ঠিক সেই নিয়মানুসারে বংশপত্র হরিতাল শোধন করিয়া লইবে। এই ঔষধে জারিত হরিতালের প্রয়োগ নিষিদ্ধ। স্বর্ণ, বিধিপূর্ব্বক শোধন করিয়া ভস্ম করিয়া লইবে। প্রথমতঃ একখানি কটরা মধ্যে কিঞ্চিৎ জারিত অভ্র স্থাপন করিবে। ইহার পূর্ব্বেই প্রাগুক্ত ফট্‌কিরি এবং বংশপত্র হরিতাল উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া, আলতার জলে সাতবার ভিজাইয়া সাতবার রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া একটী গোলক প্রস্তুত করিবে।

এই গোলক উল্লিখিত মৃত্তিকাভাণ্ডস্থিত লৌহ ও অভ্রের উপরিভাগে স্থাপন করিবে। তাহার পর আবার কিঞ্চিৎ লৌহ ও অভ্র দ্বারা ঐ গোলক বেশ করিয়া ঢাকিয়া আর একখানি কটরা দ্বারা সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত এবং কর্দ্দমলিপ্ত রজ্জু দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন ও দুই অঙ্গুলি পুরু কর্দ্দম লেপন করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। ইহাকে বজ্রমূষা কহে। এই মূষাবদ্ধ ঔষধ গোলক, স্বর্ণ সিন্দূর ও মকরধ্বজ পাকের নিয়মানুসারে বালুকা যন্ত্রে আট প্রহর পাক করিবে। পাকান্তে মূষা যখন শীতল হইবে, তখন তাহা উদ্ধৃত করিয়া সেই মৃত্তিকা নির্ম্মিত ভাণ্ড সংলগ্ন পীতবর্ণ যে ঔষধ পাওয়া যাইবে, তাহাই গ্রহণ করিবে। অথবা পূর্ব্বোক্ত লৌহ, অভ্র, এবং ঔষধ গোলক ঠিক পূর্ব্বোক্ত নিয়মে কোন কর্দ্দমলিপ্ত দৃঢ় কাচকূপীর মধ্যে সংস্থাপন করিয়া খড়িমাটী দিয়া কাচকূপীর

* স্ফটিকারি সমংগ্রাহ্যং হরিতালং এয়োমতা। অলক্তক দ্রবৈর্ভাব্যং গোলকং কারয়েৎ ভিষক্
মৃৎপাত্রো পরি লৌহে স্থাপয়েৎ গিরিজা মলম্। কৃত্বা চ বজ্রমূষায়াং সংস্থাপ্য দৃঢ় খর্পরে॥
যামাষ্টং বালুকা যন্ত্রে চাপি তীব্রাগ্নিনা পচেৎ। স্বাঙ্গং শীতঞ্চ বিজ্ঞেয়ং গৃহীত্বা তোলকাষ্টকম্।
শানমাত্রং স্বর্ণ দত্বা চিকিৎস্যোক প্রয়োজয়েৎ। খদমাত্রং যবার্দ্ধংবা অনুপানং বিধানতঃ॥

মুখ আল্‌গা ভাবে আটকাইয়া গজপুটে এক রাত্রি পাক করিলেও কাচকূপীর ঊর্দ্ধভাগে এক প্রকার পীতবর্ণ চটী পাওয়া যায়, তাহাও গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই পীতবর্ণ ঔষধ একতোলা এবং জারিত স্বর্ণ সিকি তোলা একত্র মিশ্রিত করিলেই বিসর্পণ চুর্ণ প্রস্তুত হয়। বোতলের নিম্নদেশে অথবা কটরা দুইটির মধ্যভাগে অসংলগ্ন ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ কঠিন যে পদার্থ পাওয়া যায়, তাহা ২।১ রতি মাত্রায় উপযুক্ত অনুপান সহ প্রয়োগ করিলে বাতরক্ত ও কুষ্ঠরোগে বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। সর্ব্ববিধ বৈকারিক ক্ষেত্রে এই ঔষধ ১ রতি ও কস্তুরী ১ রতি অনুপান বিচার করিয়া প্রয়োগ করিতে পারিলে বিস্ময়জনক ফল দেখিতে পাওয়া যায়।

ওলাউঠা রোগে প্রথমতঃ পাত্‌লা মল অধিক পরিমাণে নির্গত হয়। তাহার পর স্বচ্ছ জল, কুমড়া পচা জল অথবা জলের সহিত কুমড়া বাটার ন্যায় এক প্রকার ভেদ হইতে থাকে। যখন মর্ম্ম গ্রন্থি হইতে শ্লেষ্মা স্খলিত হইয়া মলাকারে নির্গত হইতে থাকে, তখনই কুমড়া বাটার ন্যায় পদার্থ পতিত হয়। কাহারও বা পূর্ব্ব হইতে বমন আরম্ভ হয়, কাহারও বা অনেক বিলম্বে বমনোদ্রেক হয়। যাহার যত শীঘ্র বমন আরম্ভ হয়, তাহার তত শীঘ্রই ধাতু বসিয়া যায়। পাড়াও নিতান্ত সাংঘাতিক আকার ধরিয়া থাকে। কিন্তু বিলম্বে বমনোদ্রেক হইলে চিকিৎসার সময় পাওয়া যায়। দাস্ত, বমি, অঙ্গ বিশেষে খাইল ধরা, ঘর্ম্ম এবং শিরঃশূল প্রভৃতি যে প্রকার লক্ষণই উপস্থিত হউক না, তজ্জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা না করিয়া প্রথমতঃ ওলাউঠার দোষ শান্তির জন্য চেষ্টা করিবে। মল নিঃসরণ থাকিতে থাকিতে অর্থাৎ উৎবেষ্টন, ঘর্ম্ম, স্বরভঙ্গ, শিরঃশূল প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে এবং মণিবন্ধে নাড়ী স্পন্দন বিদ্যমান থাকিতে যদি বিসর্পণ চুর্ণ সেবন করান যায়, তাহা হইলে কিছুতেই ধাতু বসিয়া যায় না। এবং উল্লিখিত উপদ্রব গুলি দ্বারাও রোগীকে কখনও আক্রান্ত হইতে হয় না। ঐ সকল উপদ্রব গুলির মধ্যে যদিও ২।১টি আসিয়া আক্রমণ করে, তাহাও অনায়াসে নিবারিত হইয়া থাকে। ফল কথা পূর্ব্বোক্ত অবস্থায় বিসর্পণ চুর্ণ একবার উদরে প্রবেশ করাইতে পারিলে রোগীর কিছুতেই মৃত্যু হইবে না-- ইহা ধ্রুব সত্য কথা। চারি আনা ওজনে আপাঙ শিকড়ের ছাল উত্তমরূপে ধুইয়া শিলে পেষণ করিবে; তাহার পর অর্দ্ধযব পরিমিত বিসর্পণ চুর্ণ তৎসঙ্গে মিশাইয়া শীতল জল সহ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবনের পরক্ষণেই প্রস্ফুটিত ধুতুরা ফুলের মধ্যে যে পাঁচটি শিস থাকে, তাহা লইয়া আড়াইটা মরিচের সহিত শীতল জলে বাটিয়া খাইতে দিবে। এক বৎসরের শিশুদিগের পক্ষে অর্দ্ধখণ্ড মরিচ ও একটি শিস্, তিন বৎসরের বালকের পক্ষে একটি মরিচ ও দুইটি শিস্, সাত বৎসরের বালকের সম্বন্ধে দেড়টা মরিচ ও তিনটা শিস, দশ বৎসর বালকের পক্ষে একটা মরিচ ও চারিটা শিস, এবং পূর্ণ বয়স্ক যুবক দিগের জন্য আড়াইটা মরিচ এবং পাঁচটি শিস ব্যবস্থেয়। ইহাই ওলাউঠা রোগের প্রথম চিকিৎসা। এই বিসর্পণ চুর্ণ একবারের বেশী কাহাকেও সেবন করাইতে দেওয়া যায় না। এই ঔষধের পরমাণু সমূহ কণ্ঠনালী হইতে আরম্ভ করিয়া আমাশয় পর্য্যন্ত প্রত্যেক স্থানেরই মাংস, পেশী ও

ঝিল্লী মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অসীম পরাক্রম প্রকাশ করিতে থাকে। মুহুর্মুহু বমি হইতে থাকিলেও এই ঔষধ উঠিয়া পড়ে না। দ্রব্য শক্তি বা ঔষধের প্রভাব বশতঃ এইরূপ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ধুতরা ফুলের শিস ও মরিচের দ্বারা যে অনুপানের কল্পনা করা হইয়াছে, বমনের সহিত তাহা উঠিয়া পড়া অসম্ভব নহে। সেরূপ ক্ষেত্রে অর্থাৎ যদি বমনের সহিত পূর্ব্বোক্ত ধুতুরা শিস ও মরিচ উঠিয়াই পড়ে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তেলাপোকার একটু বিষ্ঠা জলে গুলিয়া খাইতে দিবে। তাহার পরেই আবার ধুতুরার শিস ও মরিচ পূর্ব্ববৎ সেবন করাইতে দিবে। এবারেও যদি ধুতুরার শিস ও মরিচ উঠিয়া যায়, তাহা হইলে পুনর্ব্বার তেলাপোকার বিষ্ঠা শীতল জলের সহিত সেবন করাইয়া ধুতুরার শিস ও মরিচ সেবন করাইবে। এইরূপ প্রণালীতে ধুতুরা শিস ও মরিচ একবার উদরের মধ্যে স্থায়িত্ব লাভ করিলে আর কোন ভয়ের কারণ থাকিতে পারে না। পরে যখন যে কোন উপদ্রব আসিয়া জুটুক না কেন, তাহা নিবারণ করিতে আর কোনো বেগ পাইতে হইবে না। যে পর্য্যন্ত ধুতুরা শিস্ ও মরিচ স্থিতিশীল হইয়া না বসে, সে পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে তেলাপোকার বিষ্ঠা সেবন করাইয়া ধুতুরা শিস্ ও মরিচ উদরস্থ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেই হইবে।

তেলাপোকার বিষ্ঠা অতিশয় বমন নিবারক। ইহার অদ্ভুত পরাক্রম পরিদর্শন করিলে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। সুস্থ শরীরে এই তেলাপোকার বিষ্ঠা গলাধঃকৃত হইলে অত্যন্ত বমন হইতে থাকে। কিন্তু বমন রোগে ইহা প্রযুক্ত হইলে বমন বেগ সর্ব্বথা দূরীকৃত হয়। ইহা বহুক্ষেত্রে বহুবার পরীক্ষিত। পূর্ব্বে যে হরিণশৃঙ্গ ভস্ম ও হরিতাল ভস্মের কথা বলা হইয়াছে, যথাবিধি তাহা সেবন করাইবার পরও এই ধুতুরাফুলের কেশর ও মরিচ সেবন করাইতে দেওয়া যায়, তাহাতে বিসর্পণ চূর্ণের ন্যায় ফল দেখিতে পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কখনও হরিতাল ভস্ম ও বিসর্পণ চূর্ণ সেবন করান উচিত নহে। গর্ভাবস্থায় পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে হরিণ শৃঙ্গ ভস্ম সেবন করাইয়া পরে ধুতুরা ফুলের শিস্ ও মরিচ সেবন করাইলে গর্ভস্রাব বা অন্য কোন আশঙ্কা ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না।

শ্রীদীননাথ কবিরত্ন, শাস্ত্রী।

শিশুর খাদ্য।

(কতকগুলি বিলাতী ফুড সম্বন্ধে আলোচনা।)

শিশুর ব্যবহারের জন্য বিদেশী ফুড্ বাজারে এত আছে যে লোকে কোন্‌টী রাখিয়া কোন্‌টী ব্যবহার করিবে ঠিক্ করিতে পারে না। অতএব কতকগুলি অতি পরিচিত বিলাতী ফুড্ সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিব। পূর্ব্বে বিলাতী ফুড্‌গুলিকে আমরা তিন

শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি এবং প্রত্যেক শ্রেণীর উপাদান কি স্থূলতঃ তাহাও বলিয়াছি, কোন্ শিশুর পক্ষে ব্যবহৃত হইতে পারে তাহাও বলা হইয়াছে। এক্ষণে তিনটী শ্রেণীর প্রত্যেকের কতকগুলি সুপরিচিত' বিলাতী খাদ্যের নাম এবং উপাদানের পরিমাণ এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও প্রস্তুত প্রণালী বলিব।

প্রথম শ্রেণীর ফুডের মধ্যে হর্লিক্স মল্‌টেড্ মিল্ক এবং মিলোফুডের নাম করা যাইতে পারে।

হর্লিক্স মল্‌টেড্ মিল্ক (Horlick's Molted Milk)—উপাদান বিশ্লেষণ—জল শতকরা ৩·৭, প্রটিড্ ১৩·৮, স্নেহ ৯·০, কার্ব্বহাইড্রেট্ ৭০·৮, ধাতবপদার্থ ২·৭০। শুষ্কীকৃত দুগ্ধ (শতকরা ৫০) গোধূমচূর্ণ (শতকরা ২৬¾), বার্লিমল্ট (শতকরা ২৩) এবং বাইকার্ব্বনেট্ অফ্ সোডার (শতকরা ¼) মিশ্রণে প্রস্তুত। মিশ্রণ কালে অপরিবর্ত্তিত শ্বেতসার (Unaltered Starch) থাকে না। ৪ ঔন্স অর্থাৎ আধপোয়া জলে চার চামচের তিন চামচ মিশাইয়া তিনমাসের শিশুর জন্য ব্যবস্থা।

মিলো ফুড্ (Milo food)—উপাদান বিশ্লেষণ—জল ১·৫৬, প্রটিড্ ১১·০৩, স্নেহ ৩·৯২, কার্ব্বহাইড্রেট্ ৮১·৩৮, ধাতব পদার্থ ২·১১। শুষ্কীকৃত সুইস দেশীয় দুগ্ধ, ভাজা গোধূমচূর্ণ এবং ইক্ষু শর্করা (শতকরা ৩০)। শতকরা ৬২ ভাগ দ্রবনীয় এবং ১৯ ভাগ অদ্রবনীয় কার্ব্বহাইড্রেট্ আছে। কেবল জল সংযোগে প্রস্তুত করিতে হয়।

মন্তব্য—এই দুইটী ভিন্ন কার্ণরিক্স সলিউবেল ফুড্ (Carnrick's soluble food) এবং এলেন্‌বেরি (Allenbury) প্রভৃতি আরও কয়েকটী ফুড্ এই শ্রেণীভুক্ত। এই শ্রেণীর খাদ্যকে স্থূলতঃ শুষ্কীকৃত দুগ্ধ বলা যায়। ইহারা মাতৃদুগ্ধের প্রতিনিধি স্বরূপ কল্পিত হয়। ইহাদের দোষ এই—দীর্ঘকাল শিশুর ইহাই আহার স্বরূপ হইলে যদি কয়েক মাসের পর ইহার সহিত কোন তাজা ফলের রস মিশ্রিত না করা যায়, তাহা হইলে শিশুর রক্ত বিকৃতি (Scurvy) জন্মে। অধিকন্তু স্নেহের ভাগও অল্প থাকে। এ সকল দোষ ভিন্ন এক প্রধান দোষ, ইহাদের মূল্য এত বেশী যে, তাজা দুধের দাম তাহার তুলনায় অনেক অল্প।

দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদ্যের মধ্যে ক বর্গে মেলিন্স ফুড্ (Mellin's food) এবং খ বর্গে বেঞ্জার্স ফুডের (Benger's food) নাম করা যাইতে পারে।

মেলিন্স ফুড্ (Mellin's food)—উপাদান বিশ্লেষণ—জল শতকরা ৬·৩, প্রটিড্ ৭·৯, স্নেহ অতি সূক্ষ্মাংশ, কার্ব্বহাইড্রেট্ ৮২·০, ধাতব পদার্থ ৩·৮। ইহা সর্ব্বতোভাবে মল্ট্ যুক্ত। ইহার সমস্ত কার্ব্বহাইড্রেট্ দ্রবণীয় অবস্থায় স্থিত। ইহাকে শুষ্কীকৃত মল্টের সার বলা (Malt extract) যায়। এক পাঁইট জল এবং এক পাঁইটের ¼ র্থাংশ দুগ্ধের সহিত বড় চামচের এক চামচ মিশাইয়া তিন মাসের কম বয়স্ক শিশুর জন্য ব্যবস্থা।

বেঞ্জার্স ফুড্—(Benger's food)—উপাদান বিশ্লেষণ—জল শতকরা ৮·৩, প্রটিড্ ১০·২, স্নেহ ১·২, কার্ব্বহাইড্রেট্ ৭৯·৫ ধাতব পদার্থ ৩·৮। গোধূমচূর্ণ এবং Pancreatic extract অর্থাৎ জীবশরীরে পরিপাককারী রসস্রাবী Pancreas নামে যে আশয় আছে, তাহার নির্য্যাসের মিশ্রণে প্রস্তুত। উপরিউক্ত প্রস্তুত প্রণালী অনুসারে প্রস্তুত করিয়ে [illegible]

না হউক অধিকাংশ শ্বেতসার দ্রবনায় অবস্থায় পরিণত হয়। প্রস্তুত প্রণালীর গুণে খাদ্যের প্রটিড্ ভাগের এবং প্রস্তুতার্থ ব্যবহৃত দুগ্ধের আংশিক পরিপাক হইয়া যায়। প্রস্তুত প্রণালী—বড় চামচের এক চামচ খাদ্য এবং বড় চারি চামচ শীতল গোদুগ্ধ মিশাইয়া তাহাতে আধ পাইট ফুটন্ত জল মিশাইয়া কোন উষ্ণ স্থানে ১৫ মিনিট কাল রাখিবে' পরে সামান্য ফুটাইয়া লইবে।

মন্তব্য—Cheltine Maltose food, Hovis Baby's food, Savary and Moor's food, Comb's Malted food, Worth's Perfect food এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই শ্রেণীর খাদ্যে প্রায় শ্বেতসার আছে—ছয় মাসের পূর্ব্বে শিশু শ্বেতসার পরিপাক করিতে পারে না—এই অসুবিধা দূরীকরণার্থ এই শ্রেণীর খাদ্যে দ্রব্যান্তর সংযোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যাহার ফলে প্রস্তুত কালে খাদ্যগত শ্বেতসার Dextrineও Sugarএ পরিণত হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। যদি এই শ্রেণীর ফুড্ ব্যবহার করিতে হয় তাহা হইলে একথা বেশ স্মরণ রাখা উচিত যে এই সকল ফুড্ কেবল দুগ্ধের সহকারীরূপে সেব্য হইতে পারে, কদাচ একাকী ব্যবহৃত হইতে পারে না। প্রয়োজন হইলে কোন্‌টী ব্যবহার করা উচিত এই প্রশ্নের যদি আমাকে উত্তর দিতে হয় তাহা হইলে আমি এই বলিব, যে, প্রস্তুত কর্ত্তা যেখানে শ্বেতসারের শর্করায় পরিণত হইবার প্রকৃষ্ট এবং নিশ্চিত উপায় আবিষ্কারে সমর্থ বলিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে সেই খাদ্যই ব্যবস্থা করা উচিত। মেলিন্স ফুড্ ব্যবহার করা যায় কিন্তু ইহাতে স্নেহের ভাগ এত অল্প আছে যে শিশুকে যদি প্রধানতঃ ইহাই ভোজন করাইয়া রাখা যায় তাহা হইলে তাহার পথ্য মেদঃসঞ্চারের পক্ষে যে হানিকর হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। মেলিন্স ফুডের প্রচারকগণ উহাদের খাদ্যে পালিত বহু স্থূল শিশুর চিত্র আমাদের সম্মুখে ধারণ করিলেও আমরা এই সত্যের অন্যথা করিতে পারিব না।

তৃতীয় শ্রেণীর খাদ্যের মধ্যে রবিন্‌সন্স বার্লির নাম উল্লেখযোগ্য। উপাদান বিশ্লেষ—জল শতকরা ১০·১, প্রটিড্ ৫·১, স্নেহ ০·৯, কার্ব্বহাইড্রেট ৮২·০, ধাতব পদার্থ ১·৯। ইহা পার্ল বার্লির সূক্ষ্ম চূর্ণ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

মন্তব্য Ridges food, Neaves food, Frame food diet, Bananina ompus food, Falona, Scotts oat flour প্রভৃতি এই শ্রেণীর খাদ্য। এই শ্রেণীর খাদ্যগুলির আবিষ্কর্ত্তারা স্পষ্টই বলিয়াছেন ইহাতে মণ্টের সম্পর্কও নাই—এগুলি সম্পূর্ণ শ্বেতসারমূলক খাদ্য। যে সকল শিশু শ্বেতসার পরিপাক করিতে পারে তাহাদের পক্ষে এই শ্রেণীর খাদ্যের অধিকাংশই হানিজনক না হইলেও ভাজা গমের ময়দা কিম্বা ভাজা কলায়ের ছাতু অপেক্ষা এই সকল খাদ্যের কোন বিশেষ উপযোগিতা নাই। যে শিশুর বয়স অন্ততঃ ৬মাস পূর্ণ হয় নাই তাহার পক্ষে এসকল খাদ্য পথ্য নহে—সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

এতদ্দেশীয় চিকিৎসকগণ যাঁহারা উপরিলিখিত খাদ্যের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন তাঁহারা অবশ্যই উহাদের গুণদোষ লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। আমি উপসংহারে এই বলিতে পারি যে ভারতীয় সুস্থ শিশুগণের পক্ষে এই সকল খাদ্যের কিছুই আবশ্যকতা নাই। পীড়িত শিশুর ঔষধ মূলক পথ্য স্বরূপ যদি কোন সময় এ সকল খাদ্য ব্যবস্থা করিবার

প্রয়োজন হয় তাহা হইলে কোন্‌টী ভাল বিবেচনার সুবিধার জন্য যৎকিঞ্চিত কথিত হইল।

মাতৃস্তন্য-অন্নপরিবর্ত্তন-অন্যদুগ্ধে পালন-কৃত্রিম-আহার।

শিশু কতদিন মাতৃস্তন্য বা ধাত্রীস্তন্য পান করিবে? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিব যদি প্রসূতির স্তন্য প্রচুর ও স্বাস্থ্য অব্যাহত থাকে তাহা হইলে শিশু এক বৎসর পর্য্যন্ত মাতৃস্তন্য পান করিবে। বৎসরের পর স্তন্য প্রচুর এবং প্রসূতির স্বাস্থ্য উত্তম থাকিলেও আর শিশুকে স্তন্য পান করিতে দেওয়া উচিত নহে। বৎসরাধিককাল স্তন্য পান করাইলে শিশু এবং প্রসূতি উভয়েরই স্বাস্থ্য হানি হইবে।

বৎসরাধিককাল স্তন্য পান করাইলে প্রসূতির ক্ষুধা কমিয়া যায়, পরিপাকের দুর্ব্বলতা ঘটে, মানসিক অবসাদ, শিরঃপীড়া ও মাংসক্ষয়, স্পষ্ট লক্ষণ রূপে প্রকাশ পায়। এতদ্ভিন্ন, কাণেশব্দ, মূর্চ্ছা, বুকধড়ফড় করা, বুকে বেদনা দেখা দিলে কদাচ উপেক্ষা করা উচিত নহে। বৎসরাধিক কাল স্তন্য পানে শিশু-শরীরে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহাও অবগত হওয়া উচিত। দীর্ঘকাল স্তন্য পানে শিশুর শরীর পাণ্ডুবর্ণ ও গাত্রত্বক্ শ্লথ হয়। ভিতরের বল (Stamina) এমন কমিয়া যায় যে পরে আহারাদির অতি সুব্যবস্থা করিয়াও তাহা সহজে পুনরানয়ন করা কঠিন হইয়া পড়ে। আমাশয় বড় হইয়া যায়, ঘিনঘিনে হয়—নাকিসুরে অব্যক্ত বেদনা প্রকাশ করে—ইহারা প্রায়ই অস্থিবিকৃতি (Rickets) বা ক্ষয়রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে। অতএব বুঝিতে পারা গেল, মাতৃস্তন্য শিশুর পক্ষে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য বিশেষ হিতকর হইলেও কালক্রমে উহাই আবার বিষম অনর্থের কারণ হইয়া থাকে।

অন্নপরিবর্ত্তন।

দ্বাদশ মাসের পর শিশুর মাতার স্তন্য প্রচুর থাকিলেও উভয়ের হিতার্থে শিশুকে স্তন্য-ত্যাগ করাইয়া অন্য আহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্তন্য-ত্যাগ হঠাৎ একদিনে করাইবে না। ঠিক্ দ্বাদশ মাসেই স্তন্য-ত্যাগ করাইতেই হইবে এরূপ নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না—যদি এই সময় দাঁত উঠিবার জন্য শিশুর পেটের পীড়া, জ্বর হইতে থাকে তাহা হইলে স্তন্য-ত্যাগ স্থগিত রাখিতে হইবে। পরে সুস্থ হইলে আস্তে আস্তে অন্য খাদ্য অভ্যাস করাইতে হইবে। প্রথমে মাতা রাত্রিতে স্তন্য-দান বন্ধ করিবেন। তারপর কিয়দ্দিন দিবসে দুইবার মাত্র স্তন্য দান করিবেন। মাতৃস্তন্যের পরিমাণ কম হইলেই ক্ষুধার তাড়নায় শিশু অন্য আহারের প্রতি আগ্রহ দেখাইবে। এই অন্য আহার কি? তাহা আমরা কৃত্রিম আহার বর্ণনা কালে বলিব।

অতঃপর আমরা মাতৃ স্তন্যে পালিত এবং অন্য প্রকার খাদ্যে পালিত শিশুর স্বাস্থ্যের ও পোষণের তুলনা করিয়া দেখিব।

যে সকল শিশু মাতার অনিচ্ছা, দুর্ঘটনা পীড়া বা মৃত্যু হেতু জন্ম হইতেই তাহার প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট-খাদ্য স্তন্য হইতে বঞ্চিত হয়, তাহারা প্রায়ই অতি দুঃখে কিয়ৎকাল জীবিত থাকিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইয়া থাকে। এই সকল দুর্ভাগ্য শিশুগণের শরীরে মেদঃ না

থাকায় হাত পা সরু সরু হয়, রক্তে লোহিতবর্ণ কণিকা না থাকায় কিছুমাত্র কান্তি, শ্রী লক্ষিত হয় না। মুখে শিশুজনোচিত কোমলতার পরিবর্ত্তে বার্দ্ধক্য-সুলভ লোল চর্ম্মতা আবির্ভূত হয়, তাহাদের কণ্ঠস্বর নিরবচ্ছিন্ন বিলাপ ধ্বনি বলিয়া মনে হয়, অধিক কি এই সকল শিশুকে যেন মূর্ত্তিমান্ দুঃখ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু প্রকৃতি এই সকল শিশুর জন্য যে খাদ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, ইহাদিগকে সময় থাকিতে যদি তাহা সেবন করিতে দেওয়া যায় তাহা হইলে দেখিবে,—তাহাদের মুখে আর ক্রন্দন নাই, তৎপরিবর্ত্তে সন্তোষের স্পষ্ট চিহ্ন বিরাজমান রহিয়াছে, ক্রমশঃ শিশুজনোচিত কমনীয়তা আবার ফিরিয়া আসিবে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পুষ্ট ও বর্ণ উজ্জ্বল হইবে। অবশেষে বালোচিত হাস্য আনন্দের কোলাহলে তোমার গৃহ পরিপূর্ণ হইবে, অধিক কি কিছুদিন পূর্ব্বে যাহাদিগের দুঃখ দেখিলে অশ্রু সম্বরণ কষ্ট সাধ্য হইত এখন তাহাদিগকে আনন্দের পরিপূর্ণ মূর্ত্তি স্বর্গ-ভ্রষ্ট দেব-শিশু বলিয়া মনে হইবে। কেহ কেহ হয়ত আপত্তি করিয়া বলিলেন মাতৃস্তন্যে বঞ্চিত সমস্ত শিশুরই যে এইরূপ দুর্দ্দশা হয় ইহা কদাচ স্বীকার করা যায় না; কারণ আমরা দেখিয়াছি সযত্নে প্রতিপালিত মাতৃহীন বা দৈবদুর্ঘটনায় মাতৃস্তন্যে বঞ্চিত অনেক শিশু বেশ সুস্থ থাকিয়া পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়াছে। আমরা সামান্য ভাবে এই সকল বিষয় আলোচনা করিলাম এক্ষণে প্রত্যক্ষ ঘটনার সাক্ষ্য লইব। কোন্ ভাবে প্রতিপালিত হইলে শিশুর স্বাস্থ্য কিরূপ হয়, বৈদেশিক চিকিৎসক-গণ অনুসন্ধান করিয়া যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন আমরা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

আহারের প্রণালী।	প্রতিশত-শিশুতে যেরূপ ফল দেখা গিয়াছে।
১। কেবল মাতৃস্তন্য ৯মাস বা তদধিককাল।	৬৩ জন সুপরিবর্দ্ধিত। ২৩ জন মধ্যমরূপ বর্দ্ধিত। ১৪ জন নিকৃষ্ট ভাবে বর্দ্ধিত।
২। মাতৃস্তন্য তাদৃশ প্রচুর নহে; অতএব পরবর্ত্তী কালে স্তন্যের সহকারী ভাবে অন্য খাদ্যের আবশ্যকতা ছিল।	৫৭½ জন সুপরিবর্দ্ধিত। ২৫½ জন মধ্যমরূপ। ১৬ জন নিকৃষ্ট ভাবে।
৩। স্তন্য নিতান্ত অল্প; অতএব জন্ম হইতেই অন্যান্য খাদ্যের আবশ্যকতা ছিল।	২৭ জন সুপরিবর্দ্ধিত। ২৬ জন মধ্যমরূপ। ৪৬ জন নিকৃষ্ট রূপ।
৩। স্তনদুগ্ধে একবারে বঞ্চিত সুতরাং জন্ম হইতেই হাতে-পালা।	১৬ জন সুপরিবর্দ্ধিত। ২৬ জন মধ্যমরূপ। ৬৪ জন নিকৃষ্টরূপ।

উপরি উদ্ধৃত বিবরণের ১ দফার সহিত ৪র্থ দফার তুলনা করিলে দেখা যায় যে প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট খাদ্যে অর্থাৎ মাতৃস্তন্যে পালিত ১০০ জন শিশুর মধ্যে ৬৩ জন সুপুষ্ট ও সুপরিবর্দ্ধিত

হয় কিন্তু হাতে পালা (Handfed) শিশুর শতকরা ১৬ জন মাত্র সুপুষ্ট হইয়া থাকে।

যে সকল শিশু হাতে-পালা এবং যাহাদিগকে নিয়ম পূর্ব্বক আহার দেওয়া হয় না, তাহারা অতি ধীরে মৃত্যু মুখে অগ্রসর হয়। যদি জন্ম হইতেই ঐরূপ আহারের অনিয়ম হয় তাহা হইলে শিশু প্রায় ২।৩ মাসের অধিক কাল জীবিত থাকে না। পক্ষান্তরে যদি কিছুকাল স্তন্য পান করাইয়া পরে হাতেপালা হয়, তাহা হইলে তাহার রোগের আক্রমণ হইতে আত্ম রক্ষার শক্তি অপেক্ষাকৃত অধিকতর দেখা যায়। মাতৃস্তন্যে বঞ্চিত হইয়া নূতন খাদ্যে জীবন ধারণ করিতে বাধ্য হইলে যদি ও প্রথম প্রথম কিছুকাল তাহাকে পাণ্ডুবর্ণ বিমর্ষ এবং শিথিলাঙ্গ দেখা যায় তথাপি তাহার দেহ ও শক্তির উপর নূতন পথ্যের প্রভাব কিঞ্চিৎ লক্ষিত হইয়া থাকে। এইরূপ স্থলে প্রায়ই শিশুর অস্থি সমূহ কোমল ও বক্র হওয়ায় সে অসমর্থ ও বিকলাঙ্গ হইয়া পড়ে।

গ্রীষ্ম প্রধান দেশে শিশুর এই রোগ কিন্তু অপেক্ষাকৃত অনেক কম দেখা যায়। শিশুর রীতিমত পোষণ না হইলে এবং বাসস্থলীতে আলোক ও বায়ুর সম্যক্ সুব্যবস্থা না থাকিলে প্রায়ই শিশু রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে। দেড় হইতে দুই বৎসরের মধ্যেই প্রায় এই রোগ দেখা দেয়। ইহার বিশেষ লক্ষণ রাত্রিতে ছটফট করা, মাথায় ও ঘাড়ে অতিরিক্ত ঘর্ম্ম, অতিসার, বিলম্বে দাঁত উঠা, শিশুকে তুলিলে সে অত্যন্ত কষ্ট পায়, পেশী সমস্ত শিথিল, বিবর্ণ এবং শোথযুক্তের মত, ক্রমে অস্থি নরম হয় এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিকৃতি জন্মায়।

কারণ—দীর্ঘকাল স্তন্যপান, কেবল নানাপ্রকার ফুড বা গাঢ় দুগ্ধের (Condenced Milk) দ্বারা পালন, বিবিধ দুঃখের আগার স্বরূপ এই রোগের কারণ।

চিকিৎসা—স্বাস্থ্যরক্ষার ও পথ্যের নিয়মানুবর্ত্তন করিবে এবং ছাগলাদ্য ঘৃত তুল্য খাদ্যৌষধ সেবন করিতে দিবে।

মাতৃদুগ্ধে পালিত শিশুর অপেক্ষা 'হাতে-পালা' শিশুগণের মধ্যে মৃত্যু সংখ্যা যে অধিকতর ইহা প্রমাণ করিবার জন্য আমরা আর অধিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া পাঠাকর ধৈর্য্য পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করি না। বৈদেশিক ডাক্তার মেরিম্যান সযত্নকৃত বহু অনুসন্ধান করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, যে সকল শিশু 'হাতেপালা' হয় তাহাদের ৮ জনের মধ্যে ৭ জন বিবিধ ব্যধিতে পীড়িত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। বিলাতের অনেক শিশু হাঁসপাতালের বিবরণ পাঠ করিলেও এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। আমাদের এই বিশাল দেশে শিশুর মৃত্যু-সংখ্যার কোনই হিসাব নাই—কোন কোন বড় সহরের কিঞ্চিৎ আছে মাত্র। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে কলিকাতায় শিশুমৃত্যু পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই পরিবৃদ্ধির কারণ—জননীর স্বাস্থ্যহানি, স্তনদুগ্ধের অল্পতা, অনেক স্থলে জননীর স্তন্যদানে অপ্রবৃত্তি, বিশুদ্ধ গোদুগ্ধের দুর্লভতা, বিবিধ বিদেশীয় ফুড এবং গাঢ়দুগ্ধের (Condenced Milk) প্রচার ও ব্যবহার।

যে মাতৃদুগ্ধের অভাবে শিশুর এতাদৃশ ভীষণ অবস্থা আপতিত হয় কোন্ মাতা ইচ্ছা-পূর্ব্বক বা সামান্য কারণে স্বীয় সন্তানকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিবেন? স্তন্যদানে সন্তানের অনন্ত হিত সাধিত হইলেও [illegible] [illegible] উহাতে যে [illegible]

একথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি (কুমারতন্ত্রের ২১ পৃঃ দেখ)। স্তন্যদানে মাতার স্বাস্থ্যের বিশেষ ক্ষতি না হইলে যত দূর পারা যায় ততটুকু মাতৃদুগ্ধ হইতেও সন্তানকে বঞ্চিত করিবে না "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ" এই মহাবাক্য তুল্য, যে যৎসামান্য স্তনদুগ্ধ মাতা সন্তানকে দান করিবেন তাহাতেই শিশু অনেক বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইবে।

হাতে-পালা শিশুর খাদ্য।

মাতা শিশুকে স্তন্যদানে অসমর্থা হইলে ধাত্রী নিযুক্ত করা উচিত। কিরূপ ধাত্রীর দুগ্ধ-পান শিশুর পক্ষে হিতকর তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি (কুমারতন্ত্র প্রথম অধ্যায়)। যদি ধাত্রী সংগ্রহ না হয় তাহা হইলে অবশ্যই শিশুকে হাতেপালা ভিন্ন উপায় নাই। শিশুর মাতার যেমন অবস্থাই হউক না কেন দুগ্ধদানে সম্পূর্ণ অসমর্থতা ক্কচিৎ ঘটিয়া থাকে। শিশুকে স্বীয় দুগ্ধপান করান মাতার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই অবশ্য-কর্ত্তব্যতা যিনি যতটুকু নির্ব্বাহ করিতে পারেন তাহাতেই শিশুর প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে। যদি মাতার অবস্থা এতাদৃশ মন্দই হয় তথাপি তিনি অবস্থা ভাল না হওয়া পর্য্যন্ত দিনে ২ বার করিয়া যদি স্তন্যদান করেন তাহা হইলে বাকিটুকুর জন্য কৃত্রিম খাদ্যের উপর নির্ভর করা যাইতে পারে। যতই সামান্য হউক স্তনদুগ্ধ পানের সহিত যদি কৃত্রিম খাদ্য প্রদান করা যায় তাহা হইলে কেবল কৃত্রিম খাদ্যের উপর নির্ভর করা অপেক্ষা অনেক ভাল ফল পাওয়া যায়।

শিশুকে হাতেপালা বড় কঠিন ব্যাপার। এই কার্য্য যথাবৎ নির্ব্বাহ করিতে হইলে শিশুর পরিচারিকার এত অধিক যত্ন এবং শিশুর পরিপাক শক্তি ও আহারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে এত সূক্ষ্ম বিবেচনার আবশ্যক হয় যে সাধারণ পরিচারিকার দ্বারা তাহা সম্যক্‌নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন; সুতরাং সাধারণতঃ হাতেপালার ফল প্রায়ই সন্তোষজনক হইতে দেখা যায় না। পক্ষান্তরে বিজ্ঞানশাস্ত্রের উপদেশ ও অভিজ্ঞতা যদি একান্তভাবে প্রতিপালিত হয় তাহা হইলে হাতেপালা শিশু তেমনিই সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান্ হইতে পারে।

গোদুগ্ধ—যদি শিশুকে হাতে পালিতে হয় তাহা হইলে পিতামাতাকে বুঝাইবার জন্য আমরা বারম্বার এই কথা বলিতেছি যে শিশুর জন্ম হইতে দন্ত না উঠা পর্য্যন্ত প্রায় বৎসরাধিক কাল পৃথিবীতে দুগ্ধ, কেবল দুগ্ধ ভিন্ন এমন কোন হিতকর খাদ্য নাই, যাহা আহার করিয়া শিশু সুস্থ শরীরে বাঁচিতে পারে। পূর্ব্বে আমরা দেখাইয়াছি যে অন্যান্য তরল বস্তু এবং দুগ্ধজাত শর্করার যোগে গোদুগ্ধকে প্রায় নারীদুগ্ধের সদৃশ করা যায়—কিছু ক্রীম—(ইহা শিশুগণ বেশ সহজে পরিপাক করিতে পারে) যোগ করিলেত কথাই নাই। গো-দুগ্ধের কি কি দোষ খণ্ডনের জন্য উহাতে চুণের জল, বার্লির জল যোগ করিতে হয় তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। শ্বেতসার মূলক খাদ্য দাঁত উঠার পূর্ব্বে শিশু পরিপাক করিতে পারে না, অথচ শিশুর দুগ্ধে বার্লির জল মিশাইতে বলা হইতেছে কেন? উত্তরে বক্তব্য এই বার্লিতে অতি অল্প পরিমাণ শ্বেতসার আছে, যাহা সামান্য পরিমাণ আছে তাহাও আবার অতি সূক্ষ্ম কণার আকারে থাকে; সুতরাং ইহার ব্যবহারে আপত্তি থাকা উচিত নহে। বার্লি, কেবল বার্লি ভিন্ন আর এমন কোন ব্রীহি-বিদলাদি-মূলক খাদ্য (Farinicious articles) নাই

যাহার দ্বারা বার্লির কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। গোরুর দুগ্ধের অম্লতা দোষ দূরীকরণার্থ এক পাইট দুগ্ধে বড় চার চামচের দুই চামচ চুণের জল মিশ্রিত করিলেই যথেষ্ট। মোট কথা চুণের জলের মাত্রা অধিক না হয়, অবশ্য শিশুর উদরাময় থাকিলে উহার মাত্রা বেশী হইলেও দোষ নাই।

সদ্যোজাত শিশুর পক্ষে—বড় চামচের এক চামচ গোদুগ্ধে পরিস্রুত গরম জল বড় তিন চামচ এবং চার চামচের একচামচু চুণের জল মিশাইয়া কিম্বা গরম জলের পরিবর্ত্তে বার্লির জল মিশাইয়া পান করাইবে। ইহাতে কিঞ্চিৎ দুগ্ধজাত-শর্করা কিম্বা ইক্ষু-শর্করা মিশাইলে আর কোন ত্রুটি থাকিবে না। Brown sugar মিশাইবে না। ইহা মিশাইলে দুগ্ধ পরিপাক কালে উদ্রিক্ত হইয়া বিদাহপাক (acidity) হইবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি স্তনদুগ্ধ যদি অপ্রচুর হয় এবং তজ্জন্য আহারাভাবে যদি শিশুর মাংসক্ষয় হইতে থাকে তাহা হইলে অন্য খাদ্য দানের আবশ্যকতা স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। এক্ষণে আমরা দেখিব শিশুকে কতক্ষণ অন্তর কতটুকু সংস্কৃত (diluted) দুগ্ধপান করিতে দিব এবং শিশুর পক্ষে সমস্ত দিনে কতটুকু দুগ্ধের প্রয়োজন।

প্রত্যেক হাতেপালা শিশুকে অন্য খাদ্য সেবন করাইবার পূর্ব্বে সর্ব্বাগ্রে গোদুগ্ধ সেবন করাইবে অর্থাৎ হাতেপালা শিশুর গোদুগ্ধই প্রথম খাদ্য হওয়া উচিত। যদি বিশুদ্ধ গো-দুগ্ধের অভাব হয় তাহা হইলে ছাগদুগ্ধ দিতে হইবে। মাতৃদুগ্ধের সদৃশ করিবার জন্য ছাগ-দুগ্ধের সংস্কার কিরূপ হইবে শিশুর হিতার্থিগণ এই বিষয় চিন্তা করিবেন। তাঁহাদের সুবিধার জন্য আমি একটী বিবরণী লিখিতেছি।

বয়স	তরল বস্তু মিশ্রণ	২৪ ঘণ্টার মধ্য যত বার খাও-য়াইতে হইবে	প্রতিবারের পরিমাণ	২৪ ঘণ্টার জন্য যতটুকু সংস্কৃত দুগ্ধ আবশ্যক	যতটুকু দুগ্ধ-জাত শর্করা যোগ করা আবশ্যক	যতটুকু ক্রীম যোগ করা আবশ্যক
২-৭ দিন	১ ভাগে ৩ ভাগ	১০	আধ ছটাক	পাঁচ ছটাক	½ চার চামচ	½চার চামচ
১ মাস	১ ভাগে ২ ভাগ	১০	এক ছটাক	আড়াই পোয়া	½চার চামচ	½চার চামচ
২ মাস	১ ভাগে ১½ ভাগ	৯	দেড় ছটাক	চৌদ্দ ছটাক	১চারচ ামচ	¾চার চামচ
৩ মাস	১ ভাগে ১ ভাগ	৮	আধ পোয়া	এক সের	১¼চার চামচ	¾চার চামচ
৪-৫ মাস	১ ভাগে ½ ভাগ	৭	আড়াইছটাক	একসের দেড় ছটাক	১½চার চামচ	২চার চামচ
৬-৭ মাস	১ ভাগে ¼ ভাগ	৬	সাড়ে তিন ছটাক	একসের পাঁচ ছটাক	[illegible]চার চামচ	ঐ
৮-৯ মাস	অমিশ্রিত	৬	ঐ	ঐ	২চার চামচ	ঐ

'ক্রীম' কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যদি ক্রীম না পাওয়া যায় দুধের সর বাটিয়া প্রস্তুত করা গব্যঘৃত দৈনিক ১০-২০ বিন্দু দিবে। দুধের ছানার ভাগ পরিপাক না হইয়া যদি শিশুকে কষ্ট দেয় তাহা হইলে ভিন্ন সম্প্রদায়ের চিকিৎসকেরা বলেন এস্থলে প্রতি আধ ছটাক দুগ্ধের সহিত অর্দ্ধরতি 'সোডিয়ম্ সাইট্রেট্' মিশাইয়া দিলে দুধের ছানা সহজে পরিপাক পাইবে।

পূর্ব্বলিখিত প্রণালী যত্নসহকারে অবলম্বিত হইলেও যদি শিশুর পোষণ ও পরিবর্দ্ধন না হয়, যদি দুগ্ধ সম্যক্ সহ্য পাইতেছে না বলিয়া বুঝা যায় তাহা হইলে কি কর্ত্তব্য? আমার বোধ হয় কিছুদিনের জন্য অস্থায়ীভাবে কোন গাঢ় বিলাতী দুধ খাওয়ান ভাল। পশ্চাৎ লিখিত প্রণালীতে গাঢ় বিলাতী দুধকে তরল করিয়া স্নেহের 'অল্পতা পরিপূরণার্থ ক্রীম যোগ করিয়া পান করাইবে। গাঢ় বিলাতী দুধের মধ্যে নেসেলের যে গাঢ় দুগ্ধ মধুরীকৃত নহে তাহাই ভাল। ইহা যদি না পাওয়া যায় মধুরীকৃতই ব্যবহার করা যাইতে পারে।

বিলাতী গাঢ় দুগ্ধের সংস্কার।—১ ভাগ গাঢ় বিলাতী দুগ্ধে ১৫ কি ২০ ভাগ জল মিশাইয়া উহার দেড় ছটাকে চার চামচের একচামচ ক্রীম মিশাইবে। এইরূপ সংস্কৃত গাঢ় দুগ্ধ একমাস, প্রয়োজন হইলে ৬ মাস পর্য্যন্ত ব্যবহার করাইবে। ইহাতে অনেক ক্ষেত্রে সুফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে দীর্ঘকাল গাঢ় দুগ্ধ সেবন করাইলে শিশুর রক্তবিকার (Scurvy) বা তাহার অস্থি কোমল ও বক্র হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। এই দোষের সংশোধন জন্য লেবুর রস মিশাইতে হয়।

হাতেপালা শিশুর আহার সম্বন্ধে যাহা কথিত হইল যত্নপূর্ব্বক দৃঢ়তার সহিত প্রতিপালিত হইলে, শিশু প্রায় দন্তোদ্গম কাল পর্য্যন্ত কোন প্রকারে কাটাইয়া দিতে পারে। কিন্তু এস্থলে একটী কথা স্মরণ রাখা উচিত, যে খাদ্যে শিশুকে হাতেপালা আরম্ভ করিবে তাহার ফল বিশেষ করিয়া বুঝিয়া তবে তাহা বর্জ্জন বা অনুবর্ত্তন করিবে। অন্ততঃ একপক্ষকাল না দেখিয়া কোন খাদ্য বর্জ্জন করিবে না।

ছাগদুগ্ধ—ছাগদুগ্ধে প্রটিড্ এবং স্নেহ অধিক আছে। যদি বিশুদ্ধ গোদুগ্ধ সহজে সংগ্রহ করিতে না পারা যায়, এবং শিশুর পরিপাক শক্তি বলবতী থাকে তবে ছাগদুগ্ধ ব্যবহারে কোন বাধা নাই। ছাগদুগ্ধে ছানার ভাগ অতি সূক্ষ্মভাবে থাকে বলিয়া গোদুগ্ধ অপেক্ষা সহজে পরিপাক পাইয়া থাকে। গোদুগ্ধ যে প্রকার সংস্কৃত করিবার কথা বলা হইয়াছে ছাগদুগ্ধও সেইরূপে সংস্কৃত করিলে ছাগদুগ্ধের যে একপ্রকার বিশ্রী গন্ধ আছে তাহা অনুভূত হইবে না। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, যেখানে গোদুগ্ধের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সন্দেহ হইবেসেস্থলে অন্যান্য খাদ্য প্রদান করিবার পূর্ব্বে ছাগদুগ্ধ ব্যবহার করিয়া দেখিবে। যদি কোন স্থলে নিতান্ত পক্ষে কোন ফুড ব্যবহার করাই আবশ্যক হয় তাহা হইলে আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব যে বিজ্ঞাপনদাতারা যাহাই বলুন না কেন নারীদুগ্ধ বা গোদুগ্ধ ভিন্ন পৃথিবীতে এমন কোন খাদ্য অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই যাহা দীর্ঘকাল নিরাপদে মাতৃদুগ্ধ বা গোদুগ্ধের প্রতিনিধিস্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে। গোদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া মেলিন্স ফুডের কোনটী ব্যবহার করিলে হয়ত

কিছুদিন অস্থায়ীভাবে উহা মাতৃদুগ্ধ বা গোদুগ্ধের প্রতিনিধিস্বরূপ বিবেচিত হইতে পারে কিন্তু উহাদের ব্যবহারে যে বিপদের সম্ভাবনা তাহাত পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

৯ মাস বা একবৎসর পর্য্যন্ত উপরি লিখিত প্রকারে আহার দিয়া ততঃপর একবৎসর কাল অর্থাৎ শিশুর দুই বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছোট মাগুর মাছ সিদ্ধ ঈষৎ লবণাক্ত করিয়া দিনে একবার দিবে। অন্য খাদ্যের প্রতি শিশুর আগ্রহ এবং তাহা পরিপাকের শক্তি থাকিলে আলু সিদ্ধ, পোরের ভাত, সন্দেশ অতি অল্প খবান যাইতে পারে। এখন পর্য্যন্ত কিন্তু গোদুগ্ধ প্রচুর দিতে হইবে—এ সকল সহকারী মাত্র। তিন হইতে ৪ চারি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশু পোরের ভাত, রুটীর ছিল্কা, কাঁচা পেঁপের তরকারী, কচি বেগুণ সিদ্ধ, যে কালের যে ফল হিতকর হইবে তাহা খাইতে দিবে। ক্রমে এই সকল খাদ্য অধিক পরিমাণে দিয়া দুগ্ধের প্রাধান্য হ্রাস করাইতে হইবে।

শিশুকে প্রথম হইতে উত্তমরূপ চর্ব্বণ করিয়া ভোজন করিতে অভ্যস্ত করিবে। ঘন ঘন খাওয়ার অভ্যাস ভাল নহে। একবার খাইয়া ভুক্তবস্তু সম্যক্ পরিপাক পাইবার পূর্ব্বে পুনরায় ভোজন করিলে কখনই কেহ স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারে না।

শিশুকে লবণ, তিক্ত বস্তু খাওয়ান অভ্যাস করাইবে। এদেশের লোকের মত কোনও জাতি ইচ্ছা করিয়া তিক্তবস্তু ভোজন করে না—কিন্তু ভারত গ্রীষ্ম প্রধান দেশ, তিক্তের প্রতি আমাদের স্বভাবতঃ একটা স্পৃহা আছে। আমাদের দেশে অনেক তিক্ত শাকসবজিও পাওয়া যায়, সেইগুলির কোনটী প্রত্যহ ঋতু অনুসারে নির্ব্বাচন করিয়া ভোজন করিলে বহুহিত সাধিত হয়। এই উদ্দেশে আমাদের দেশে আলুই ব্যবহৃত হইত। মিষ্ট বস্তু শর্করাদি ভোজনে শিশুর স্বাভাবিক লোভ থাকে সুতরাং ইহাকে প্রশ্রয় না দিয়া সংযত করিবার জন্যই সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

কুমারতন্ত্র রচয়িতা।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও ধন্বন্তরি।

গত আষাঢ় মাসের "ধন্বন্তরি" পত্রে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় সম্বন্ধে একটি মন্তব্য পূর্ণ সন্দর্ভ প্রকাশিত হইয়াছে। ধন্বন্তরি সম্পাদক মহাশয় এই বিদ্যালয়ের কল্যাণ কামনায় চিন্তাশীল হইয়াছেন দেখিয়া আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ, কিন্তু তাঁহার ঐ সন্দর্ভে কয়েকটি ভুল কথা বাহির হওয়ায় তাহার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইতেছি। তিনি ঐ প্রবন্ধের এক স্থলে বলিয়াছেন—"(১) সাধারণতঃ যে সকল আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক চিকিৎসা কৌশলে দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, প্রতিষ্ঠাকা [illegible] তাঁহাদের [illegible] সহানুভূতি [illegible] প্রয়াস পান নাই। [illegible]

যে যে অঙ্গে যিনি পারদর্শী, অধ্যাপনায় তাঁহাদের সহায়তা লাভের আশা অতি অল্প।" চিকিৎসাকুশল ও দেশবাসীর নিকট সুপ্রতিষ্ঠিত চিকিৎসকমণ্ডলীর সহানুভূতি লাভের প্রয়াস যে ইহার প্রতিষ্ঠাতৃগণ করেন নাই—একথা ধন্বন্তরি-সম্পাদক মহাশয় কাহার নিকট শুনিয়াছেন বলিতে পারি না,—কিন্তু উহার মূলে যে আদৌ সত্যতা নাই—এ কথা আমরা জোর করিয়াই বলিব। 'অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতৃগণ এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর দেশের চিকিৎসাকুশল ও সুপ্রতিষ্ঠিত কবিরাজ মহাশয়গণের নিকট সাহায্য প্রার্থী বহুসময়ে তো হইয়াছেনই, তা' ছাড়া কি কলিকাতায় কি মফঃস্বলে যাঁহারা সুপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া এখনো পরিগণিত হন নাই (অবশ্য চিকিৎসাকুশল নহেন—এ কথা আমরা বলিতে পারি না—কারণ সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলেও অনেকে যে চিকিৎসাকুশল হইয়া থাকেন, ইহা অভ্রান্ত সত্য) তাঁহাদের নিকটও ইহার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়া, স্বতঃপরতঃ চেষ্টা করিয়া, তাঁহাদিগকে বিদ্যালয়ে লইয়া গিয়া, যাঁহার যেরূপ শক্তি—তিনি সেইরূপে ইহার সাহায্যকারী হউন—এরূপ অনুরোধ—প্রতিষ্ঠাতৃগণ অনেক সময়ই করিয়াছেন ও করিয়া থাকেন।

ধন্বন্তরি-সম্পাদক মহাশয় যদি অনুগ্রহ করিয়া একদিন অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে শুভাগমন পূর্ব্বক ইহার পরিদর্শকমণ্ডলীর পুস্তক গুলি পর্য্যবেক্ষণ করেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, দেশের ছোট বড় সকল শ্রেণীর চিকিৎসক,—শুধু চিকিৎসক নহেন—অন্য সম্প্রদায়ের বহু লোককেও উদ্দেশ্য বুঝাইবার জন্য এবং সাহায্য লাভের জন্য বিদ্যালয়ে আনা হইয়াছে এবং এখনো তাহার জন্য বিধিমত চেষ্টা হইতেছে। সুতরাং বৈদ্যজাতির মুখপত্র ধন্বন্তরিতে ওরূপ ভ্রমপ্রমাদ পূর্ণ সংবাদ প্রকাশ হওয়ায় আমরা বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি।

এই বিদ্যালয়ে বেতন লইয়া ছাত্র শিক্ষা দেওয়া হয়—এজন্য ধন্বন্তরি সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন—"ইহা জনসাধারণের মন আকৃষ্ট করিবার পরিপন্থী হইবে।" টাঙ্গাইল আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের প্রসঙ্গে কিছুকাল পূর্ব্বে যখন ধন্বন্তরিতে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের প্রতি এইরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল—তখনই আমরা আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। জানি, অর্থ লইয়া আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দেওয়ার রীতি কোনোকালে ছিল না, স্বীকার করি—এখনো কলিকাতার কয়েকজন খ্যাতনামা চিকিৎসকের নিকট কতকগুলি ছাত্র অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষা পায় কিনা জানি না—কিন্তু স্থান পাইয়া থাকে, তবে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে যেরূপ প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহাতে শুধু মামুলী শাস্ত্রীয় শ্লোক মুখস্থ করাইলেই চলিবার উপায় নাই—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষাদানের জন্য এখানে শিক্ষা ব্যপদেশেই যে বহুল অর্থ ব্যয় করিতে হয়। শল্য চিকিৎসার জন্য তো অর্থব্যয় স্বতঃসিদ্ধ কথা, তা' ছাড়া দ্রব্যগুণের শিক্ষা পর্য্যন্তও এই বিদ্যালয়ে শুধু শ্লোক মুখস্থ করাইলেই চলিতে পারে না—দ্রব্যগুণ শিক্ষা দানের সময়েও প্রত্যেক দ্রব্যটি ছাত্রদিগের সমক্ষে উপস্থিত করিবার জন্যও বহু অর্থ ব্যয় করিতে হয়। বিদ্যালয় সংলগ্ন দাতব্য ঔষধালয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় ও শল্য চিকিৎসার বিভাগ দুইটিও ছাত্রশিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত। এ সকল ব্যাপারে যে পরিমাণে ব্যয় করিতে হয়, তাহাতে কিছু কিছু

বেতন গ্রহণের ব্যবস্থা না করিলে উপায় কি? মেডিকেল কলেজের শিক্ষাপদ্ধতির অনুকরণেই এই বিদ্যালয়ে অ্যানাটমী, সার্জ্জারি, ফিজিও-লজির শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। মেডিকেল কলেজে শুধু ডাক্তারি শিক্ষা প্রদত্ত হয়, কিন্তু অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের সম্পূর্ণ শিক্ষা প্রদান করা হয়, অর্থাৎ ডাক্তারি ও কবিরাজীর সমন্বয়ে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হয়। জানি, বৈদ্য জাতির পক্ষে প্রথম প্রথম বেতন দিয়া চিকিৎসা শিক্ষার জন্য অনেকেই অগ্রসর হইবেন না, কিন্তু বহু অর্থ ব্যয় করিয়া অভিভাবকগণ যদি মেডিকেল কলেজে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে পারেন,—তাহা হইলে সামান্য বেতন ও কলিকাতায় অবস্থিতির ব্যবস্থা করিয়া এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করাইতে রাজি হইবেননা কেন? তবে ধন্বন্তরি-সম্পাদক মহাশয়ের ইহাও জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য, আমরা বেতন গ্রহণের ব্যবস্থা করিলেও বহুসংখ্যক অবৈতনিক ছাত্রও এখানে অধ্যয়ন করিয়া থাকে। এবার অবৈতনিকের আবেদন এত বেশী পাওয়া গিয়াছে যে, বিদ্যালয়ের পরিচালক বর্গকে তজ্জন্য চিন্তিত হইতে হইয়াছে।

"ধন্বন্তরি"র ৩য় মন্তব্য "বিদ্যালয়ের সংশ্রবে একটি ছাত্রাবাস থাকা একান্ত প্রয়োজন, আমাদের ধারণা এ পর্য্যন্ত তাহার ব্যবস্থা হয় নাই, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা সঙ্গত ছিল বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।"

ধন্বন্তরি সম্পাদকের মত একজন সকল বিষয়ের তথ্যান্বেষী সম্পাদক এরূপ ভুল ধারণা কেন যে করিলেন, তাহা আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিনা। কারণ বিদ্যালয় সংলগ্ন ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা বিদ্যালয়ের ২য় বর্ষ পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই করা হইয়াছিল। ৪১ নং মোহন বাগান লেনে সে ছাত্রাবাস বহুকাল অবস্থিত থাকার পর কলেজের সিলোনি ছাত্রেরা নানা অসুবিধার জন্য ঐ বাটী হইতে গত পূজার পর কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে উঠিয়া যায়, সেই সঙ্গে সঙ্গে কিছুদিনের জন্য কলেজ সংলগ্ন ছাত্রাবাসও লোপ পায়। কিন্তু তাহার পর ২৭।১এ বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীটে একখানি ত্রিতল বাটী, উচ্চ ভাড়ায় এবং বহুদিনের জন্য বন্দোবস্ত করিয়া উৎকৃষ্ট ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এবার ১ম বার্ষিক শ্রেণীতে অনেকগুলি কৃতবিদ্য ছাত্র ভর্ত্তি হইয়াছে এবং তাহারা ঐ ছাত্রাবাসেই অবস্থিতি করিতেছে।

ধন্বন্তরি সম্পাদক মহাশয়ের ৪র্থ মন্তব্যের উত্তরে আমরা জানাইতেছি যে, এই বিদ্যালয়ে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষাদানের কথা তিনি যাহা বলিয়াছেন—তাহা অতি যুক্তি পূর্ণ। সৌভাগ্য ক্রমে এই বিদ্যালয়ে ভারতের নানাস্থান হইতে নানা শ্রেণীর ছাত্র ভর্ত্তি হইতেছে—এ অবস্থায় ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে সকল শ্রেণীর ছাত্রগণেরই যে অধ্যয়ন-সৌকর্য্য হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিদ্যালয়ের পরিচালকবর্গ সে কথা বিলক্ষণই বুঝিয়াছেন এবং তাহারই ফলে ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাদানের জন্য ২টি "স্পেশাল ক্লাশ"ও খোলা হইয়াছে। ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ ছাত্রগণকে ইংরাজীতে অভিজ্ঞ করিয়া লইলে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দিবার বিশেষ সুবিধা হইবে আশা করা যায়।

আর একটি বিষম ভুলের সংবাদ ধন্বন্তরিতে বাহির হইয়াছে। ধন্বন্তরি সম্পাদক কলিকাতার কয়েক জন খ্যাতনামা কবিরাজের নাম করিয়া

বলিয়াছেন,—তাঁহাদিগের নিকট যতগুলি শিক্ষার্থী আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র শিক্ষা করিতেছেন, গত চারি বৎসরে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে সে পরিমাণ ছাত্র শিক্ষালাভ করিতেছে বলিয়া তাঁহার মনে হয় না। কিন্তু ইহার উত্তরে ধন্বন্তরি সম্পাদকের নিকট আমরা নিবেদন করিতেছি—গত চারি বৎসরের সমগ্র ছাত্রের হিসাবে প্রয়োজন নাই, বর্ত্তমান বর্ষে এক প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতেই যতগুলি ছাত্র ভর্ত্তি হইয়াছে,—তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিলেই তাঁহার অনুমান অমূলক বলিয়া প্রতীত হইবে।

উপসংহারে বক্তব্য—ভুল ভ্রান্তি সকলেরই আছে। এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতৃগণ যেরূপ ভাবে এই বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা যে ভ্রমপ্রমাদ পরিশূন্য নহে—একথা কখনই বলা যায় না। তাঁহাদের ব্যবস্থায় দোষ থাকিতে পারে, তাঁহাদের বন্দোবস্তে ত্রুটী থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিয়া, ধন্বন্তরি সম্পাদকের মত প্রবীণ, বিচক্ষণ, [illegible] সেবক, স্বজাতিবৎসল ও সহৃদয় ব্যক্তি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে সর্ব্বান্তঃকরণে সাহায্য করুন—ইহাই আমাদিগের আন্তরিক কামনা।

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন।

(সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়)

বিবিধ প্রসঙ্গ।

সিন্ধিয়ার রাজমাতা।—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক মহামান্য শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা সিন্ধিয়ার (গোয়ালিয়ারের) মাতৃদেবী গত ২৩শে ভাদ্র প্রত্যুষে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার বিয়োগে আমরা বিশেষ ব্যথিত হইয়াছি। এই উপলক্ষে ২৬শে ভাদ্র অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় বন্ধ দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

চিকিৎসকের পরলোক।—গত ১৯শে ভাদ্র রাত্রি প্রায় ২টার সময় সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় হৃদ্রোগে লোকান্তরিত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৫৪ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা বিশেষ কষ্ট অনুভব করিয়াছি। তিনি বৈদ্য ব্যবসায়ের স্বনামধন্য কৃতী পুরুষ ছিলেন। ভগবান তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রাণে শান্তিবারি সেচন করুন।

চিকিৎসকের অভাব।—বাঙ্গালা দেশে রোগ বৃদ্ধির তুলনায় চিকিৎসকের সংখ্যা যে যথেষ্ট বর্দ্ধিত হওয়া উচিত—একথা বঙ্গেশ্বর লর্ড রোণাল্ডসে বাহাদুরের মুখে আমরা অনেক সময় শুনিয়া আশ্বস্ত হইতেছি। ইহার জন্য ঢাকা সহরের মত বর্দ্ধমানেও মেডিকেল স্কুল স্থাপনার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু শুধু বর্দ্ধমানে উহা স্থাপন করিলেই যে চিকিৎসকের অভাব

পূর্ণ হইবে না—ইহা সুনিশ্চিত,—বাঙ্গালা দেশে চিকিৎসকের অভাব পূরণ করিতে হইলে, শুধু বর্দ্ধমানে নহে বাঙ্গালা দেশের তাবৎ প্রধান প্রধান স্থানেই ঐরূপ স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং আগে যেমন ক্যাম্পবেল স্কুলে বাঙ্গালা ভাষায় ডাক্তারি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল, তাহার পুনঃ প্রচলনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সংপ্রতি বঙ্গেশ্বর ঢাকার মেডিকেল স্কুলে এই প্রসঙ্গ লইয়া যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি জানাইয়াছেন—"নানা কারণে বাঙ্গালা ভাষায় ডাক্তারি শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব।" আমরা কিন্তু তাঁহার এই প্রস্তাবে একমত হইতে পারিলাম না। আমাদের বিশ্বাস, আধিব্যাধির লীলানিকেতন বাঙ্গালাদেশে চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইলে, বাঙ্গালীর মাতৃভাষায় উহার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিলে অনেক ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও ইহা শিক্ষা করিয়া দেশের উপকারে সমর্থ হইবে।

শ্রীমতী বেসান্ত ও দেশীয় চিকিৎসা।—১৯১৭ খৃঃ অব্দের কলিকাতা কংগ্রেসে শ্রীমতী বেসান্ত দেশীয় চিকিৎসার উন্নতিকল্পে অনেকগুলি সারগর্ভ কথা বলিয়াছিলেন। তিনি যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম্ম এইরূপ,—"যখন ডাক্তারি চিকিৎসার প্রচলনে দেশের অভাব পূর্ণ হইতেছে না, এবং বহু শতাব্দীর পরীক্ষিত প্রাচীন কবিরাজি ও হাকিমী চিকিৎসায় অদ্যাপিও সুফল পাওয়া যাইতেছে, তখন সরকার হইতে এ চিকিৎসার সহানুভূতি প্রদর্শন না করায় একদেশদর্শিতার কার্য্য করা হইতেছে। ডাক্তারি চিকিৎসায় অস্ত্র চিকিৎসা বিশেষ ফলপ্রদ, কিন্তু কবিরাজী ও হাকিমি চিকিৎসার ঔষধ প্রকরণ ডাক্তারি অপেক্ষা কোনো অংশে নিকৃষ্ট নহে। অনাদৃত ও উপেক্ষিত হইয়াও এ চিকিৎসা এখনও সম্যকরূপে জীবিত আছে, দেশের অনেকের এখনও এ চিকিৎসার প্রতি শ্রদ্ধা আছে।" শ্রীমতী এনি বেসান্ত—দেশের অনেকেই যে এ চিকিৎসার প্রতি শ্রদ্ধা সম্পন্ন বলিয়াছেন,—অনেক ক্ষেত্রে তাহা না হইয়া যে উপায় নাই, কারণ এমন অনেকগুলি রোগ আছে, যাহা ডাক্তারির অস্ত্র চিকিৎসার মত কবিরাজীতে 'একচেটিয়া' বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ফলকথা গবর্ণমেণ্ট হইতে এতদিন আয়ুর্ব্বেদ ও ইউনানিকে সাহায্য লাভে বঞ্চিত করিয়া রাখিলেও এখনও এ দুইটি মৃতকল্প প্রাচীন চিকিৎসাকে পুনর্জ্জীবিত করিবার ব্যবস্থা করা যাউক—ইহার জন্য আমরা কর্ত্তৃপক্ষগণের সকরুণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

প্লেগে মৃত্যু।—প্লেগ রোগে এ পর্য্যন্ত এক কোটী ভারতবাসী কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদ

আর্য্যচিকিৎসাবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক মাসিকপত্র ও সমালোচক।

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এল, এম, এস,
কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ, এম, বি,
কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ,
কবিরাজ শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র কবিরত্ন
মহাশয়গণের তত্ত্বাবধানে

কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

৪র্থ বর্ষ
(সন ১৩২৬ আশ্বিন হইতে ১৩২৭ ভাদ্র পর্য্যন্ত)

কলিকাতা
২৯নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট
অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে
কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
২০১নং গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে
প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুলসহ ৩৸০

চতুর্থ বর্ষের প্রবন্ধ সূচী

(বর্ণমালানুসারে)

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৪র্থ বর্ষ।	বঙ্গাব্দ ১৩২৬—আশ্বিন।	১ম সংখ্যা।

মঙ্গলাচরণ।

—:*:—

(শ্রীইন্দুভূষণ সেন গুপ্ত)

দ্যুলোক হইতে ভূলোকে চিকিৎসা প্রথম শিক্ষা যাঁ'র,
দীক্ষা যাঁহারি পীড়িতের তরে নাশিতে রোগের ভার।
ব্যাধি-প্রপীড়িত সমগ্র বিশ্ব দেখিয়া ব্যথিত প্রাণে,
শিক্ষা যাঁহারি আয়ুর্ব্বেদ ইন্দ্র-সন্নিধানে,—
তাঁহার চরণে [illegible] স্মরণ লইতেছি নববর্ষে,
এস ভরদ্বাজ! কর আশীর্ব্বাদ, বিশ্ব মাতুক হর্ষে।

এস আত্রেয়, এস [illegible] রক্ষিতে নিখিলবাসী,
এস অগ্নিবেশ, ভেল, জতুকর্ণ—লইয়া আশীষ রাশি।
এস পরাশর, এস গো হারীত, এস ঋষি ক্ষারপাণি,
অনন্তদেব, এসগো আবার লইয়া "চরক" খানি।
এস ধন্বন্তরি—দিবোদাস রূপে লইয়া সহস্র শিষ্য,
বিশ্ব মাঝারে ফুটিয়া উঠুক আবার মধুর দৃশ্য।

"অষ্টাঙ্গ হৃদয় সংহিতা" লইয়া সৌম্য মূরতি ধ'রি,
এস গো 'বাভট' তোমার চরণে কোটী নমস্কার করি'।

এস গো সুশ্রুত—শারীর বিদ্যা প্রথম প্রচার যাঁ'র,
তোমার চরণে গললগ্নী হ'য়ে প্রণিপাত বারবার।
প্রাচীন কাহিনী নূতন করিয়া শুনাইব নববর্ষে,
(ওগো) কর আশীর্ব্বাদ সকলে মিলিয়া—বিশ্ব মাতুক হর্ষে।

আমাদের কথা।

(কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন)

দিনের পর দিন যাইল, মাসের পর মাস কাটিল, এমনই করিয়া আবার একটি বৎসর উত্তীর্ণ হইল। আমাদের বড় আশার—বড় আকাঙ্ক্ষার—বড় সাধের—বড় আদরের "আয়ুর্ব্বেদে"রও এমনই করিয়া আর একটি বৎসর কাটিয়া গেল,—"আয়ুর্ব্বেদ" তৃতীয় বর্ষ অতিক্রম করিয়া চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করিল।

আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি কামনায় আয়ুর্ব্বেদীয় মাসিক পত্র ইতঃপূর্ব্বে কয়েকখানি বাহির হইয়াছিল বটে; কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহার প্রায় সকল গুলিই অকালে কালকবলিত হইয়াছে। "চিকিৎসাসম্মিলনী"র অস্তিত্ব নাই,—"সমীরণ" বন্ধ হইয়া গিয়াছে, "আয়ুর্ব্বেদ পত্রিকা" বিলুপ্ত, বৈদ্যসঞ্জীবনী" ও জীবন হারা। কিন্তু ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে, ২টি কারণ স্বভাবতঃই উপলব্ধি হয়। ১ম—দেশবাসী চিকিৎসক মণ্ডলী চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্রের নিকট যে ধরণের সন্দর্ভাদির প্রত্যাশা করিয়া থাকেন, এ মাসিক পত্রগুলি হয় সেভাবে পরিচালিত হয় নাই; না হয় বৈদ্যক চিকিৎসার উন্নতি কামনায় জ্ঞান গভীরগবেষণা সম্ভূত প্রবন্ধাদির প্রচার কল্পে বৈদ্যজাতি আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ প্রদানে অনভ্যস্ত। আমাদের অনুমানের দুইটি কারণই আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করি। বিশেষতঃ শেষোক্ত কারণটি যে "আয়ুর্ব্বেদে"র অদৃষ্টেও খাটিতেছেনা, তাহা নহে, আমরা সেটুকু উপলব্ধি করিয়াই আয়ুর্ব্বেদের নীরস কথাগুলিকে সরস করিয়া বলিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। বৈদ্য চিকিৎসক ভিন্ন অনেক ডাক্তার, ব্যবহারজীবী এবং দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তি এইজন্যই "আয়ুর্ব্বেদের" গ্রাহক থাকিয়া ইহা যথারীতি পাঠ করিয়া থাকেন। গত তিন বৎসর কাল "আয়ুর্ব্বেদ" এই ভাবেই পরিচালিত হইয়াছে।

বাস্তবিক আয়ুর্ব্বেদীয় প্রসঙ্গ করিতে হইলে শুধু যে চিকিৎসার কথাই বলিতে হইবে, ব্যাধির নিদান বলিতে হইবে, রোগ-প্রশমনের উপায় বিধিই বলিতে হইবে,—ব্যাধি প্রপীড়িত আর্ত্তগণের কিরূপ ঔষধে—কিরূপ নিয়মে—

কিরূপ পথে চলা উচিত—এই সকল কথারই আলোচনা করিতে হইবে এবং তাহা করিলেই এ সম্বন্ধে সকল কথা বলা হইবে, এমন ধারণা ঠিক নহে,—আয়ুর্ব্বেদের কথা সাধারণকে বুঝাইতে হইলে, রোগ প্রতীকারের উপায়-বিধির মত যাহাতে লোকে ব্যাধি প্রপীড়িত না হয়, ঋষি প্রদর্শিত নিয়ম সকল পালন করিয়া—অবহিত চিত্তে শাস্ত্রোপদেশ রক্ষা করিয়া—সদাচার ও সদ্বৃত্তিপরায়ণ হইয়া যাহাতে দেশবাসী আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া থাকে, এক কথায় রোগাক্রমণের প্রতিষেধক বিধি সকলই সর্ব্বাগে আলোচনা করিতে হইবে। আয়ুর্ব্বেদের সেবা করিতে গিয়া আমরা সেই বিষয়টির উপরই সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্য রাখিয়া থাকি।

দেশের অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় হইয়াছে, অধুনা বঙ্গজননীর অধিকাংশ সন্তানই রোগের যন্ত্রণায় কিরূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, নিত্য নূতন নূতন রোগাসুরের তাণ্ডব লীলায় বঙ্গজননী কিরূপ ভীতা কম্পিতা—সে কথা তো আর কাহাকেও নূতন করিয়া বুঝাইতে হইবে না। ম্যালেরিয়ায় বাঙ্গালা শ্মশান হইয়াছে, ওলা-দেবীর কৃপায় প্রতি বৎসর বঙ্গমাতার অসংখ্য অসংখ্য সন্তান অকালে কালকবলিত হইতেছে, —ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা, বাঙ্গালায় সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে—ইহার জন্য তো প্রতীকারের চিন্তা করিতেই হইবে, কিন্তু সেই সঙ্গে সেই সকল রোগের আক্রমণ হইতে বাঙ্গালী যাহাতে অব্যাহত থাকিতে পারে, তাহার চেষ্টা যে সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। ঘরে আগুন লাগিলে জল ঢালিয়া রক্ষা করিবার চেষ্টা করা অপেক্ষা আগুন লাগিবার পূর্ব্বে সাবধানতা অবলম্বন কর্ত্তব্য নহে কি? আমরা সে কথাটা আগে ভাবি নাই, সেই জন্যই তো আজি বাঙ্গালার এই অবস্থা।

আসল কথা দেশের এই দুর্দ্দিনে আধি-ব্যাধির লীলা নিকেতন বঙ্গমাতার সন্তানদিগকে আত্মরক্ষার উপায় করিতে হইলে সংসার পরিচালনা বিষয়ে আবার তাহাদিগকে সাবেক পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে, সাবেক সরণীর অনুসরণ ভিন্ন তাহার যে আর গত্যন্তর নাই—এ কথাটি তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে বুঝিতে হইবে। —গত তিন বৎসরে—আমরা সেই উদ্দেশ্য লইয়াই আয়ুর্ব্বেদ পরিচালন করিয়াছি—এবং এখনও তাহাই করিব। আমাদের পুরাতন পাঠকগণ আমাদের সঙ্কল্প অবগত আছেন,—নূতন পাঠকদিগকে আমাদের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বলিবার জন্য আমাদের সেই পুরাতন কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়া—আয়ুর্ব্বেদের আবিষ্কার কর্ত্তা দেবতাদিগকে ও ও প্রচার কর্ত্তা আর্য্য ঋষিমণ্ডলীকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া, আবার কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলাম, দেবতা ও ঋষিমণ্ডলী আমাদিগের সহায় হউন—ইহাই গুরুজনের নিকট আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি।

বঙ্গে দুর্গোৎসব।

(কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন)

আবার মহাপূজার সাড়া পড়িল। জগজ্জননী আনন্দময়ীর আগমনের বার্ত্তা বঙ্গবাসীকে জানাইবার জন্য ললিত-বিভাসের আলাপে আবার নহবতের বাদ্য বাজিয়া উঠিল। মায়ের শ্রীচরণ-সরোজে স্থান পাইবে বলিয়া রক্তজবা গর্ব্বভরে আবার ফুটিয়া উঠিল। কুমুদ-কহ্লারও রক্তজবার মত কৃতকৃতার্থ হইবার বদ্ধ সংস্কারে মধুর হাস্যে আস্য বিকাশ করিতে লাগিল।

মা আসিতেছেন—এ হেন মধুর দিনে বাঙ্গালীর আর আনন্দ রাখিবার স্থান নাই। চিরকর্ম্মক্লান্ত-বাঙ্গালী কয়দিনের জন্য বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিবে,—প্রিয়জন সন্দর্শনে বহুদিনের অদর্শন জনিত কত আবেগ উচ্ছ্বাস—কত মর্ম্মব্যথা—কত পুরাতন কাহিনী প্রকাশ করিয়া, কত মধুর আনন্দ—কত অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি অনুভব করিবে, পতি, পত্নীর সহিত, পিতা, পুত্রের সহিত, ভ্রাতা, ভগ্নীর সহিত, সখা, সুহৃদের সহিত, মিত্র, বান্ধবের সহিত, প্রবাসী, স্বদেশীর সহিত মিলিত হইবে,—কত কথা—কত কাহিনী—কত গল্প—কত পরামর্শ—কত আকাঙ্ক্ষা—কত কামনা—পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদানে পরস্পরে পরম সুখ—চরম স্ফূর্ত্তি—প্রাণভরা তৃপ্তি উপলব্ধি করিবে। কত হাসি ছুটিবে, কত আবেগ উঠিবে, কত উচ্ছ্বাস বহিবে। মা এই রঙ্গ দেখাইবার জন্যই বর্ষে বর্ষে বঙ্গে আগমন করিয়া থাকেন। এবারও আসিতেছেন। তাই তাঁহার আগমনের সাড়া পাইয়া বঙ্গবাসী আবার জাগিয়া উঠিয়াছে।

বঙ্গবাসী জাগিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু অন্যান্য বর্ষের মত এবার যে আর হর্ষভরে মাতিয়া উঠিতেছে না। সে আনন্দের আবেগ, সে সুখের স্ফূর্ত্তি, সে প্রাণভরা তৃপ্তি—এবার যে দৈন্য-দারিদ্র্যে তাহার নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। বাঙ্গালী উদরপূর্ত্তির উপযুক্ত অশন পাইতেছে না,—লজ্জা রক্ষার মত তথা ভদ্রতা রক্ষার উপযোগী বসন পাইতেছে না,—অশন-বসনের সকল সামগ্রীই সম্মুখে রহিয়াছে,—কিন্তু দুর্ম্মূল্যতা নিবন্ধন ক্রয় করিয়া সাধ পূর্ণ করিবার সক্ষমতা নাই,—তাহার উপর ম্যালেরিয়া কলেরা ইনফ্লুয়েঞ্জার তাণ্ডব নৃত্যে বাঙ্গালী গত বৎসর যেরূপ চক্ষে অন্ধকার দেখিয়াছে, তাহাতে জগজ্জননী আনন্দময়ীর আগমনের সাড়া পাইয়া জাগিয়া উঠিলেও প্রাণ খুলিয়া এবার যে আর বাঙ্গালী আনন্দে মাতিতে পারিতেছে না।

রোগের জ্বালা—শোকের জ্বালা, তাহার উপর সর্ব্বাপেক্ষা পেটের জ্বালা যে বড় জ্বালা। দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসীর করাল বদন ব্যাদানে সমগ্র বঙ্গ যে এবার ধ্বংসোন্মুখ হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য তণ্ডুল হইতে সমস্ত দ্রব্যই যে দুর্ম্মূল্য। বাঙ্গালী পেটের ভাত—পরনের কাপড় সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। পূজার আনন্দে বাঙ্গালী মাতিবে কি করিয়া! সেইজন্য আনন্দময়ীর আগমনে এবার অনেকেই আনন্দের পরিবর্ত্তে নিরানন্দ উপভোগ করি-

তেছে। বালসুলভ-চাপল্যের আকাঙ্ক্ষা—ধনী-দরিদ্র বিচার করিতে পারে না, অবস্থা-হীন দুর্ভিক্ষপীড়িত বাঙ্গালীর সন্তান-সন্ততি মহামায়ায় পূজার সময় নূতন বেশ বিন্যাসের আকাঙ্ক্ষায় যে সারা বৎসর উৎফুল্ল হইয়া রহিয়াছে এবার দরিদ্র বাঙ্গালী-জনকের পক্ষে তাহাদের সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার সামর্থ্য নাই। কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে সংসার-সমুদ্রে নানা-ঝঞ্ঝাবাতের মধ্য দিয়াও কতক কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় এবং কতক ঋণ করিয়াও যাঁহারা কন্যাদায় হইতে মুক্ত হইয়াছেন ঘটাপূর্ণ তত্ত্বের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে তাঁহাদের সন্ততিগণ তাঁহাদের কোপপ্রবণা শ্বশ্রু ঠাকুরাণীর কোপ নয়নে পতিতা হইবেন, কিন্তু অবস্থার ব্যবস্থায় তাঁহাদিগকে তাহা হইতে রক্ষা করিবার উপায় নাই। জমীদারের খাজনা, উত্তমর্ণের ঋণের সুদ, বিপণীর মহাজন-দিগের প্রাপ্য—মহাপূজার সাড়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলই পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা বঙ্গের চিরন্তন রীতি। কিন্তু এবার এই দুর্ব্বৎসরে বাঙ্গালী জীবন দারিদ্র্যের মধ্য দিয়া সে ব্যবস্থা করিবে কি করিয়া! কাজেই মায়ের আগমনে বাঙ্গালী এবার সত্য সত্যই আকুল হইয়া পড়িয়াছে।

যে সকল ভক্ত সাধক সারা বৎসর প্রাণান্ত পরিশ্রম পূর্ব্বক সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াও অতি কষ্টে বর্ষে বর্ষে জনজ্জননীকে জীর্ণ আট-চালায় আনিয়া কৃত কৃতার্থ হইয়া থাকেন, যাঁহাদের কল্যাণে কত পল্লীবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা আদ্যাশক্তির স্বরূপ দর্শনে অপার আনন্দ অনুভব করিতে পারেন,—তাঁহাদিগের মধ্যে এবার অনেকেরই পুণ্য আটচালার শূণ্য বেদিকা পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে মাত্র। ফলে বিশ্ব-মাতার আরাধনা করিতে না পারিয়া,—জবা বিল্বদলে জগন্মাতার পূজা করিতে না পারিয়া,—পরমামৃত—বিশ্ব জননীর চরণামৃত ভক্তিভরে পান করিতে না পারিয়া, এবার যে কত ভক্তের প্রাণ আঘাত প্রাপ্ত হইতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

কত নবোঢ়া পত্নী—পতি সন্দর্শন কামনায় আশাপথ চাহিয়াছিল, অনেকের সে আশা এবার অপূর্ণই থাকিল, দারুণ অর্থ কষ্টে নব বিবাহিত স্বামী এবার যুবতী বনিতার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারিলেন না, শুধু প্রীতিপূর্ণ পত্র লিখিয়াই নিষ্কৃতি পাইলেন। কত পতিগত প্রাণা পত্নী—স্বামী সন্দর্শন জনিত অপার সুখ উপভোগে ধন্যমনা হইলেন বটে, কিন্তু পূজা উপলক্ষ্যে তাঁহাদিগের প্রার্থিত দ্রব্য সম্ভার প্রাপ্তির অভাবে যথেষ্ট ক্ষুণ্ণমনাও হইলেন। কত যুবতী অল্পদিন পূর্ব্বে তাঁহার এক সমবয়স্কা প্রতিবেশিনীর সহিত "সখিত্ব" সম্পর্কে কুটুম্বিতা পাতাইয়াছিলেন, যাঁহার সহিত সে সম্পর্ক পাতান হইয়াছিল, তিনি জানিতেন, সখীর স্বামী দূর প্রবাসের একজন গণ্যমান্য চাকরে পুরুষ,—বঙ্গে মায়ের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবান উপ-ঢৌকন পাইয়া তিনি কিছু লাভবতী হইবেন, কিন্তু তাঁহার সে কামনা এবার অপূর্ণই থাকিল, সখীর স্বামী এবার ব্যয় বাহুল্যে এরূপ ক্লিষ্ট যে, পত্নীর মনস্তুষ্টি করিতে তাঁহার নূতন উপকুটম্বিনীর জন্য একখানি বস্ত্র পর্য্যন্তও আনিতে পারেন নাই।

ফলে এবার দেশের বড়ই দুর্দ্দিন। আনন্দ-ময়ীর আগমনে বাঙ্গালী এবার প্রতিকার্য্যে—প্রতি বিষয়েই নিরানন্দ উপলব্ধি করিতেছে। বাঙ্গালীর মনে সুখ নাই, হৃদয়ে বল নাই, প্রাণে স্ফূর্ত্তি নাই, চিত্তে শান্তি নাই,—অশান্ত

হৃদয়ে বঙ্গ জননীর অনেক সন্তানই এবার আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছে। "সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা শস্য শ্যামলা"—বঙ্গ জননীর সন্তানগণ এবার অন্নাভাবে যে ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন, এই নিরানন্দের কারণই তাহাই।

কিন্তু মা বিশ্বরূপিণী! তোমার আগমনে বিশ্ববাসীর দুঃখ কষ্ট—দৈন্য-দারিদ্র্য—সবই যে অপনোদিত হইবার কথা মা! তুমি যে মা অন্নপূর্ণা! দুর্গতি দূর করিবার জন্যই 'দুর্গা'—নাম ধরিয়াছ। দেশের এই ভীষণ দুর্গতি দূর করিয়া, অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে বাঙ্গালায় আগমন করিয়া, তোমার অকৃতি সন্তানগণের সকল কষ্ট—সর্ব্ব প্রধান অন্নকষ্ট অপনয়ন কর না মা! অথবা রঙ্গময়ী—তুমি রঙ্গ দেখিতেছ,—তোমার সন্তানগণ তোমাকে ভুলিয়া, তোমার শাস্ত্রাদেশ ভুলিয়া,—অখাদ্য-কুখাদ্য—অমিত-অহিত দ্রব্যসকল ভক্ষণ করিয়া—আর্য্য সন্তান অনেক বিষয়েই অনার্য্যের মত আচরণ অবলম্বনে এতদিন যে পাপ পণ্য অর্জ্জন করিয়াছে, তাহারই ফলভোগের জন্য—আজি তাহার এই ভীষণ অবস্থা, সেইজন্য ভীষণ অবস্থা সন্দর্শন করিয়াও তুমি তাহার প্রতিকারকল্পে চেষ্টাবতী না হইয়া রঙ্গ দেখিতেছ। কিন্তু সকরুণ হৃদয়া দয়াবতী জননী আমার! আর যে তোমার রঙ্গ দেখিবার সময় নাই, বাঙ্গালা যে ছারখারে যাইবার উপক্রম হইয়া পড়িল,—আর রঙ্গ দেখিলে চলিবে না,—রোগ হইয়াছে—ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে—ঔষধই রোগের প্রতীকারের উপায়। জননী আমার! রঙ্গ ছাড়িয়া, রোগ বুঝিয়া, বাঙ্গালীকে ইহা তাহার কৃতকর্ম্মের ফল উপলব্ধি করাইয়া—তাহার প্রাণে অনুশোচনার বীজমন্ত্র প্রয়োগ কর—অনুতাপে প্রত্যেক বাঙ্গালীর হৃদয় জর্জ্জরিত হউক—সেকালের সদাচার-নিরত শুদ্ধস্বত্ব বাঙ্গালীর মত এ কালের বাঙ্গালী আবার পূর্ব্ব অভ্যাসে অভ্যস্ত হউক.—স্বধর্ম্ম ত্যাগী—স্বকর্ম্ম ত্যাগী বাঙ্গালী সন্তান আবার সনাতন ধর্ম্মে—স্বজাতির কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট হউক—বাঙ্গালা হইতে দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসী হুঙ্কার ছাড়িয়া পলায়ন করিবে,—বাঙ্গালার দুঃখ-দারিদ্র্য অপনোদিত হইবে,—অধুনা অস্থিকঙ্কাল সর্ব্বস্ব-দৈন্য-কষ্টের আকর স্থূল বঙ্গভূমি—আবার সোনার বাঙ্গালা নাম ধারণ করিয়া—মাতৃ পূজায় আত্মতৃপ্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে বিমলানন্দ লাভে সমর্থ হইবে।

আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস।

—:০:—

(মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন, সরস্বতী এম-এ, এল, এম-এস)

আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস আলোচনা করিতে হইলে আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত কালকে চারিটী ভাগে বিভক্ত কর যাইতে পারে। প্রথমতঃ—দৈবকাল; দ্বিতীয়

—আর্ষকাল বা সংহিতা কাল ; তৃতীয়তঃ—সংগ্রহ কাল, চতুর্থতঃ—অবনতি কাল। বর্ত্তমান সময়কে আয়ুর্ব্বেদের পুনরভ্যুদয়ের আরম্ভকালও বলা যাইতে পারে।

দৈবকাল—প্রথমে ভগবান্ ব্রহ্মা নিখিল জীবের আরোগ্যপ্রদ শাশ্বত আয়ুর্ব্বেদ স্মরণ করিয়া লক্ষশ্লোকময়ী "ব্রহ্ম সংহিতা" রচনা করেন। ব্রহ্মা হইতে প্রজাপতি দক্ষ, দক্ষ হইতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অশ্বিনীকুমারদ্বয় হইতে দেবরাজ ইন্দ্র আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। ইহার ফলে "ব্রহ্ম সংহিতা"র পরে "প্রজাপতি সংহিতা" "অশ্বি সংহিতা" ও "বলভিৎ সংহিতা" বা "ঐন্দ্র সংহিতা" রচিত হইয়াছিল।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মা ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদ দেখিয়া আয়ুর্ব্বেদ নামক পঞ্চম বেদ সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মা হইতে সূর্য্য আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া "সূর্য্যসংহিতা নামক আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ রচনা করেন। সূর্য্যের বহু শিষ্য আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ভগবান ধন্বন্তরি "চিকিৎসা-তত্ত্ব বিজ্ঞান," দিবোদাস * "চিকিৎসা দর্শন," কাশীরাজ "চিকিৎসা কৌমুদী," অশ্বিনীকুমারদ্বয় "চিকিৎসাসার তন্ত্র ও ভ্রমঘ্ন," নকুল "বৈদ্যক সর্ব্বস্ব", সহদেব "ব্যাধিসিন্ধু বিমর্দ্দন." যমরাজ "জ্ঞানার্ণব" চ্যবন ঋষি "জীবদান," জনক "বৈদ্য-সন্দেহ ভঞ্জন," চন্দ্রসুত "সর্ব্বসার," জাবাল "তন্ত্রসার," জাজলি "বেদাঙ্গ সার," পৈল "নিদান," করথ "সর্ব্ব-ধরতন্ত্র" ও অগস্ত্য "দ্বৈধনির্ণয় তন্ত্র" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের মত আয়ুর্ব্বেদের প্রচলিত মত হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন।

আর্যকাল—(১) কথিত আছে ভগবান্ ধন্বন্তরি ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া কাশিরাজ দিবোদাস রূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং ঔপধেনব; বৈতরণ, ঔরভ্র, পৌষ্কলাবত, করবীর্য্য, গোপুররক্ষিত, সুশ্রুত প্রভৃতি ঋষিদিগকে শল্যতন্ত্রপ্রধান আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন। দিবোদাসের শিষ্য এবং এবং অনুশিষ্যগণ শল্যতন্ত্র প্রধান বিবিধ আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ স্ব স্ব নামে রচনা করিয়া গিয়াছেন। যে সকল চিকিৎসক ধন্বন্তরির মতানুসারে চিকিৎসা করিতেন এবং করেন, তাঁহারা ধন্বন্তরি সম্প্রদায় নামে খ্যাত।

(২) কায়তন্ত্রপ্রধান চিকিৎসা ব্রহ্মর্ষি ভরদ্বাজ কর্ত্তৃক প্রচারিত হয়। কোন সময়ে প্রাণীদিগের রোগ যন্ত্রণা দর্শনে. ব্যথিত হইয়া করুণহৃদয় ঋষিগণ তাহার প্রতিকারের উপায় চিন্তার জন্য হিমাচলের সানুদেশে সমবেত হইয়াছিলেন। সেই মহাসম্মেলনে তাঁহারা চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ ইন্দ্রের শরণ গ্রহণ করাই ইহার একমাত্র উপায়। অনন্তর সকলের সম্মতি ক্রমে ভরদ্বাজ ঋষি ইন্দ্রের নিকট গিয়া আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। ভরদ্বাজ ঋষি আত্রেয়কে এবং আত্রেয় অগ্নিবেশ, ভেল, জতুকর্ণ, পরাশর, হারীত এবং ক্ষারপাণি নামক ছয়জন শিষ্যকে কায়চিকিৎসা প্রধান আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন। আত্রেয় ঋষির এই ছয় জন শিষ্য স্ব স্ব নামে সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। ভরদ্বাজ ও আত্রেয় ঋষির

* দিবোদাস ও ধন্বন্তরি সুশ্রুত মতে একই ব্যক্তি। পুরাণের মত স্বতন্ত্র।

মতানুসারী চিকিৎসকগণ ভরদ্বাজ সম্প্রদায় বা আত্রেয় সম্প্রদায় নামে খ্যাত।

বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য দেশেও এইরূপ দুইটী সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা কায়চিকিৎসক সম্প্রদায় (School of Physicians—স্কুল অফ ফিজিসিয়ানস্) এবং শল্য চিকিৎসক সম্প্রদায় (School of Surgeons) স্কুল অফ সর্জ্জনস্) নামে অভিহিত।

কিন্তু প্রথমে এইরূপ দুইটী সম্প্রদায় গঠিত হইলেও কালক্রমে আয়ুর্ব্বেদের অষ্টাঙ্গের পৃথক ভাবেই পঠন পাঠন প্রচলিত হইয়াছিল। এক্ষণে পাশ্চাত্য দেশে চিকিৎসা শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশের যেমন বিশেষজ্ঞ (Specialist) আছেন, পূর্ব্বে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের ভিন্ন ভিন্ন অংশেরও সেইরূপ বিশেষজ্ঞ হইয়াছিলেন। সংহিতা ও সংগ্রহকারদিগের পরিচয় প্রসঙ্গে পাঠক তাঁহাদের বিষয় বিস্তৃতভাবে অবগত হইতে পারিবেন্।

এই দুই সম্প্রদায়ের অতিরিক্ত আর একটী সম্প্রায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং সেই সম্প্রদায়ের চিকিৎসকগণ রসবৈদ্যসম্প্রদায় নামে অভিহিত। চরক সুশ্রুতাদি গ্রন্থে বিবিধ খনিজ দ্রব্যের অল্পবিস্তর উল্লেখ থাকিলেও ব্যবহার নিতান্ত কম দেখা যায়। তান্ত্রিক চিকিৎসায় পারদ এবং বিবিধ ধাতু উপধাতু যথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কথিত আছে যে, তন্ত্রের বক্তা মহাদেব। আদিম, নিত্যনাথ, চন্দ্রসেন, সোমদেব, গোবিন্দ, নাগার্জ্জুন প্রভৃতি রসশাস্ত্রাচার্য্যগণ পারদের পরম রোগনাশকতা শক্তি দেখিয়া বিবিধ রসতন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ইতিহাস আলোচনা করিলে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বৌদ্ধযুগেই রসতন্ত্রের বিশেষ উন্নতি ও প্রচলন ঘটিয়াছিল।

এক্ষণে আমরা আর্যযুগের সংহিতা গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিব। এই সকল সংহিতা অধুনা প্রায় পাওয়া যায় না। কিন্তু টীকাকারদিগের উদ্ধৃত পাঠ দ্বারা প্রমাণিত হয় * যে, এই সকল গ্রন্থ টীকাকারদিগের সময়ে —কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বেও—বর্ত্তমান ছিল। সম্ভবতঃ ভারতব্যাপী অন্বেষণ হইলে এখনও অনেক গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইতে পারে। যে সকল বিলুপ্ত প্রায় গ্রন্থের সংবাদ আমরা টীকাকারদিগের মুখে পাইয়া থাকি, তাহাদের মধ্যে কয়েক খানির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। কায়চিকিৎসা তন্ত্র—

(WORKS ON THE PRACTICE OF MEDICINE)

১। **অগ্নিবেশ সংহিতা।** মহর্ষি আত্রেয়ের শ্রেষ্ঠ শিষ্য অগ্নিবেশ এই সংহিতার প্রণেতা। ইহা আত্রেয় সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এক্ষণে যে গ্রন্থ চরক সংহিতা নামে পরিচিত, তাহাই অগ্নিবেশ সংহিতা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। চরক উহার প্রতিসংস্কর্ত্তা। কিন্তু বিজয়রক্ষিত, শ্রীকণ্ঠ প্রভৃতি টীকাকারগণ অগ্নিবেশের যে সকল বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তন্মধ্যে অনেকগুলি বর্ত্তমান কালে চরক সংহিতায় পাওয়া যায় না। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, চরক সংহিতা অগ্নিবেশ সংহিতা নহে অথবা প্রতিসংস্কৃত হইয়া অগ্নিবে সংহিতার এত রূপান্তর ঘটিয়াছে যে, মূ

* এই সকল পাঠ মদীয় "প্রত্যক্ষশারীর' নামক সংস্কৃত গ্রন্থের ভূমিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে।

গ্রন্থের সহিত অনেক স্থলে পাঠের সামঞ্জস্য নাই। মূল অগ্নিবেশ সংহিতা চরক ঋষির আবির্ভাবের পূর্ব্বেই জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছিল; সেইজন্যই তখন তাহার প্রতিসংস্কার আবশ্যক হয়।

কেহ কেহ বলেন যে, অঞ্জন নিদান নামক গ্রন্থ অগ্নিবেশের রচিত। কিন্তু চক্রপাণি, বিজয়রক্ষিত, শ্রীকণ্ঠ দত্ত প্রভৃতি কোন টীকাকারই অঞ্জননিদাম হইতে পাঠ উদ্ধৃত করেন নাই এবং উহার ভাষাও ঠিক প্রচীন সংস্কৃতের ন্যায় নহে। এইজন্য উহা অর্ব্বাচীন কালে রচিত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু অগ্নিবেশ প্রণীত না হইলেও অঞ্জন নিদানে এরূপ সংক্ষেপে এবং সুন্দররূপে রোগের নিদান লিখিত হইয়াছে, যে, অল্পমতি ব্যক্তিগণের পক্ষে উহা বিশেষ উপযোগী গ্রন্থ।

২। ভেল-সংহিতা। ইহা আত্রেয় সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় সংহিতা। বিজয়রক্ষিত, শিবদাস প্রভৃতি টীকাকার ভেল-সংহিতা হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই গ্রন্থ এখনও তাঞ্জোর নগরীর রাজকীয় গ্রন্থাগারে খণ্ডিতাকারে বর্ত্তমান আছে। প্রথমে উহার প্রতিলিপি ও পরে মূলগ্রন্থ দর্শনের সৌভাগ্য প্রবন্ধ লেখকের ঘটিয়াছিল। উক্ত গ্রন্থাগারের গ্রন্থসূচীকার বার্ণেল নামক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে বাগভট প্রধানতঃ ভেল সংহিতা অবলম্বন করিয়াই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই মতের সার্থকতা বুঝা কঠিন।

কেহ কেহ বলেন যে, ভেলসিংহিতা এবং ভালুকি-সংহিতা একই গ্রন্থ। কিন্তু সেম্মত সমীচীন নহে। ডল্লনাচার্য্য সুশ্রুতের টীকায় "ভেল-ভালুকি" উভয়েরই উল্লেখ করিয়াছেন। ভালুকি-সংহিতা শল্যতন্ত্র প্রধান গ্রন্থ। শল্যতন্ত্র প্রধান গ্রন্থের পরিচয় প্রসঙ্গে উহার বিবরণ দ্রষ্টব্য।

৩ জতুকর্ণ-সংহিতা—আত্রেয় সম্প্রদায়ের আদৃত এই গ্রন্থ এক্ষণে নিতান্ত দুর্লভ। চক্রপাণি, বিজয় রক্ষিত, শ্রীকণ্ঠ, শিবদাস প্রভৃতি টীকাকারগণ স্ব স্ব টীকায় জতুকর্ণ-সংহিতা হইতে অনেক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৪—৫। পরাশর সংহিতা ও ক্ষারপাণি-সংহিতা।

কেবল বিজয়রক্ষিত ও শ্রীকণ্ঠ দত্ত নহে—পরন্তু শিবদাসও এই গ্রন্থদ্বয় হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এতদ্বারা বুঝা যায় যে. শিদবাসের সময়েও উক্ত গ্রন্থদ্বয় সুলভ ছিল।

৬। হারীত-সংহিতা—চক্রপাণি, বিজয় রক্ষিত, শ্রীকণ্ঠদত্ত এবং শিবদাসের সময়েও এই গ্রন্থ সুলভ ছিল, কিন্তু এক্ষণে দুর্লভ। হারীত-সংহিতা বলিয়া অধুনা যে মুদ্রিত গ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহা মূল হারীত-সংহিতা নহে। কারণ পূর্ব্বোক্ত টীকাকারগণ স্ব স্ব টীকায় হারীতসংহিতা হইতে যে সকল পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তন্মধ্যে অধিকাংশ পাঠই মুদ্রিত হারীত-সংহিতায় পাওয়া যায় না, অধিকন্তু মুদ্রিত গ্রন্থ বহুস্থলেই লিপিকর প্রমাদে পূর্ণ।

৭ খরনাদ—সংহিতা। বিজয়রক্ষিত হেমাদ্রি, অরুণদত্ত প্রভৃতি টীকাকরগণ খরনাদ সংহিতা হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। হেমাদ্রি খারনাদি নাম দিয়া যে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহা খরনাদের অথবা খরনাদের পুত্রের বা অপর কাহার, তাহা নির্ণয় করা যায় না।

৮ বিশ্বামিত্র-সংহিতা। ইহা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। চরক ও সুশ্রুতের টীকায় চক্রপাণি বিশ্বামিত্র-সংহিতার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। শিবদাসকৃত চক্রদত্তের টীকাতেও বিশ্বামিত্র সংহিতার বচন দেখা যায়।

৯ অত্রি-সংহিতা। কাহারও মতে অত্রিসংহিতা অতি প্রাচীন, কাহারও মতে আধুনিক। প্রাচীনদিগের টীকায় অত্রিসংহিতা হইতে উদ্ধৃত পাঠ দেখা যায় না বলিয়া উহার প্রাচীনত্বে সন্দেহ হয়। পঞ্চনদে অত্রিসংহিতা নামে বৃহৎ পুস্তক আছে, এইরূপ শুনা যায়।

১০—১১ কপিল তন্ত্র ও গৌতম তন্ত্র *—এই উভয় সংহিতার পাঠ সুশ্রুতের টীকায় ও নিদানের টীকায় উদ্ধৃত দেখা যায়।

২। শল্যতন্ত্র।

(WORKS ON SURGERY.)

১২—১৩ ঔপধেনবতন্ত্র ও ঔরভ্র-তন্ত্র। এই তন্ত্র দুইখানির কেবল নাম মাত্র দেখা যায়। উক্ত তন্ত্রদ্বয় হইতে উদ্ধৃত প্রমাণ নিতান্ত বিরল। ডল্লন সুশ্রুতের ব্যাখ্যায় ঔপধেনব মত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন মাত্র। উহাদের সত্তা কেবল সুশ্রুতোক্ত পাঠ দ্বারাই অনুমিত হয়।

১৪ সৌশ্রুত তন্ত্র বা বৃদ্ধ সুশ্রুত। বৃদ্ধ সুশ্রুত বর্ত্তমান সুশ্রুত সংহিতার মূলীভূত। কেহ কেহ উভ সুশ্রুতকে অভিন্ন বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা যুক্তি যুক্ত নহে। কারণ বৃদ্ধ সুশ্রুত হইতেউদ্ধৃত হইতে কোন কোন পাঠ প্রচলিত সুশ্রুত সংহিতায় দেখা যায় না। টীকাকার শিবদাসও বৃদ্ধ সুশ্রুত হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, যে, শিবদাসের সময়েও বৃদ্ধ সুশ্রুত সুলভ ছিল।

১৫। পৌষ্কলাবত তন্ত্র। চক্রপাণি সুশ্রুতের টীকায় পৌষ্কলাবত তন্ত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

১৬। বৈতরণ তন্ত্র। ডল্লন ও চক্রপাণি স্ব স্ব টীকায় বৈতরণ তন্ত্র হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। শস্ত্রচিকিৎসা সম্বন্ধে সুশ্রুতে অনুক্ত বহু বিষয়ের পাঠ টীকাকারেরা এই গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়া অনুমান হয়, যে, সুশ্রুত অপেক্ষা উক্ত তন্ত্র বৃহত্তর ছিল।

১৭। ভোজতন্ত্র বা ভোজসংহিতা। টীকাকারগণ ভোজতন্ত্র হইতে অনেক নূতন বিষয়ের প্রচুর পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেজন্য অনুমান হয়, যে, ভোজতন্ত্র সুবৃহৎ গ্রন্থ ছিল। ডল্লন সুশ্রুতের টীকায় মহর্ষি ভোজ সুশ্রুতাদির সতীর্থ ছিলেন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেইজন্য ভোজতন্ত্র ধারেশ্বর ভোজরাজের রচিত নহে বলিয়াই প্রতীতি হয়। ভোজরাজের রচিত রাজমার্ত্তণ্ডাদি যে সকল সংগ্রহ গ্রন্থ আছে, সেগুলি ভোজসংহিতার অনেক পরবর্ত্তি-কালে রচিত। ভোজরাজ অপেক্ষা ভোজমুনি বহু প্রাচীন, তজ্জন্য কেহ কেহ ইহাকে বৃদ্ধ ভোজও বলিয়া থাকেন।

১৮। করবীর্য্যতন্ত্র। টীকাকারগণ এই তন্ত্র হইতে কদাচিৎ পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই জন্য টীকাকারদিগের সময়ে করবীর্য্যতন্ত্র বহু প্রসিদ্ধ ছিল না বলিয়া প্রতীত হয়।

১৯। গোপুররক্ষিত তন্ত্র। এই তন্ত্র আছে শুনা যায় মাত্র, তদুদ্ধৃত পাঠ প্রায়

---

* ঋষি প্রণীত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সমূহ তন্ত্র এবং সংহিতা উভয় নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। তন্ত্রশাস্ত্র নামে যাহা প্রসিদ্ধ তাহা স্বতন্ত্র।

কোথায়ও দেখা যায় না। কেহ কেহ বলেন—গোপুর ও রক্ষিত দুই জন ব্যক্তি এবং দুই জনের রচিত দুই খানি তন্ত্র ছিল।

২০। ভালুকি তন্ত্র। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ভেলসংহিতা হইতে ভালুকিতন্ত্র স্বতন্ত্র। ডল্লন, বিজয় রক্ষিত ও শ্রীকণ্ঠ ভালুকি তন্ত্র হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। চক্রপাণির উদ্ধৃত যন্ত্রশস্ত্রাদির লক্ষণ সমন্বিত অনেক বচন দেখিয়া বোধ হয় যে, এই তন্ত্র শল্যতন্ত্রের একখানি প্রধান গ্রন্থ।

৩। শালাক্যতন্ত্র।

(WORKS ON DISEASES OF EYE, EAR, NOSE, THROAT &c.)

২১। বিদেহতন্ত্র। বিদেহাধিপতি নির্ম্মিত এই তন্ত্র শালাকীদিগের প্রধান গ্রন্থ। ইহা বর্ত্তমান সুশ্রুত গ্রন্থের শালাক্য তন্ত্রাংশের মূলভূত—একথা সুশ্রুতেই আছে। ডল্লন, বিজয়রক্ষিত, শ্রীকণ্ঠ প্রভৃতি টীকাকার এই তন্ত্র হইতে যথেষ্ট পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। বিজয় রক্ষিত জ্বর, অরোচক এবং পাণ্ডু প্রভৃতি রোগেও বিদেহতন্ত্র হইতে কোন কোন পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয় শালাক্যতন্ত্র প্রধান হইলেও এই গ্রন্থ সুশ্রুতাদি গ্রন্থের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন ছিল।

কেহ কেহ বলেন যে, নিমি এবং বিদেহাধিপতি একই ব্যক্তি। কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। কারণ ডল্লন ও শ্রীকণ্ঠদত্ত স্ব স্ব টীকায় নিমি ও বিদেহ উভয়েরই পাঠ একই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিয়াছেন। চরকে "জনকো বৈদেহঃ" পাঠ থাকায় বুঝা যায় যে, পুণ্যশ্লোক ভগবান্ জনক রাজর্ষি এই তন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

২২। নিমিতন্ত্র। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই তন্ত্র বিদেহ তন্ত্র হইতে পৃথক্। শ্রীকণ্ঠ এই তন্ত্র হইতে পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সময়েও বিদেহতন্ত্র সুলভ ছিল।

২৩। কাঙ্কায়ন তন্ত্র। চরকে এবং ডল্লনের টীকায় কাঙ্কায়নের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এই তন্ত্রোদ্ধৃত প্রমাণ অদ্যাপি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

২৪—২৫। গার্গ্যতন্ত্র ও গালবতন্ত্র। ডল্লনের টীকায় শালাক্যতন্ত্র প্রসঙ্গে গার্গ্য ও গালবতন্ত্রের উল্লেখ আছে মাত্র। উক্ত তন্ত্রদ্বয় হইতে উদ্ধৃত কোন পাঠের পরিচয় আমরা পাই নাই।

২৬। সাত্যকি তন্ত্র। ইহা প্রাচীন শালাক্যতন্ত্র। ডল্লন এবং শ্রীকণ্ঠদত্ত এই তন্ত্র হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

২৭। শৌনক তন্ত্র। ডল্লন ও চক্রপাণি শৌনক তন্ত্র হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। চরক এবং সুশ্রুতেও শৌনক মতের উল্লেখ আছে। কিন্তু গর্ভের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গনিষ্পত্তি বিষয়ে চরকোদ্ধৃত শৌনক মতের সহিত সুশ্রুতোদ্ধৃত শৌনক মতের স্পষ্ট বিরোধ দেখিয়া অনুমান হয়, যে, চরকোক্ত শৌনক সুশ্রুতোক্ত শৌনক হইতে বিভিন্ন। সম্ভবতঃ এই বিরোধ পরিহারের জন্য চরক মদ্রশৌনক অর্থাৎ মদ্রদেশীয় শৌনক এই পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। ডল্লনের টীকায়ও মদ্র-শৌনকের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। ডল্লন এবং চক্রপাণির উদ্ধৃত পাঠ হইতে জানা যায় যে, শৌনকতন্ত্র কেবল শালাক্যতন্ত্র মাত্র ছিল না, পরন্তু শারীর ও ভেষজ কল্পনাদির বর্ণনাও ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল।

কেহ কেহ বলেন যে, অথর্ব্ব বেদের শৌনক-সংহিতাকার শৌনকই শৌনকতন্ত্র প্রণেতা। কিন্তু আথর্ব্ব-সংহিতাকার অতি প্রাচীন, শৌনকতন্ত্রকার তদপেক্ষা নবীন। পূর্ব্বে এক নামের অনেক আচার্য্য, তন্ত্রকার ছিলেন; কেবল নামের সাদৃশ্য দেখিয়া পরস্পরের অভেদ নির্দ্দেশ করা সঙ্গত নহে।

২৮। করালতন্ত্র। এই তন্ত্রকার করালকে ডল্লন করালভট্ট আখ্যা দিয়াছেন। ইনি ঋষি ছিলেন কি না স্পষ্ট বুঝা যায় না, কারণ কোন ঋষিরই ভট্ট পদবী দৃষ্ট হয় না। তথাপি ডল্লন-শ্রীকণ্ঠাদির নির্দ্দেশ দ্বারা জানা যায় যে, এই তন্ত্রকারও বহু প্রাচীন কালের।

২৯। চক্ষুষ্যতন্ত্র। কেহ কেহ ইহাকে "চক্ষুষ্যেণ তন্ত্র" সংজ্ঞাও দিয়া থাকেন। শ্রীকণ্ঠদত্তের টীকায় এই গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়।

৩০। কৃষ্ণাত্রেয় তন্ত্র। কেহ কেহ বলেন, এই তন্ত্র পুনর্ব্বসু আত্রেয় নির্ম্মিত। কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে। শ্রীকণ্ঠ, শিবদাস প্রভৃতি টীকাকারগণের উদ্ধৃত পাঠ হইতে জানা যায় যে, শালাক্যতন্ত্রকার কৃষ্ণাত্রেয় কায়তন্ত্রকার আত্রেয় হইতে পৃথক্ ব্যক্তি।

৪। ভূতবিদ্যাতন্ত্র।

(WORKS ON MENTAL DISEASES.)

আয়ুর্ব্বেদের ভূতবিদ্যা নামক অঙ্গ পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ থাকিলেও এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে। ভূতবিদ্যা তন্ত্রের গ্রন্থ পাওয়া দূরে থাকুক, তন্ত্রের নাম পর্য্যন্ত টীকাকারেরাও উদ্ধৃত করেন নাই।

বর্ত্তমানে আয়ুর্ব্বেদে ভূতবিদ্যার বীজস্বরূপ নিম্নলিখিত কয়টী প্রসঙ্গ দেখা যায়। যথা—

(১) সুশ্রুতে অমানুষ প্রতিষেধাধ্যায় (উত্তরতন্ত্র, ৬ অঃ)।

(২) চরকে উন্মাদ চিকিৎসাধ্যায় (চিঃ স্থা, ৯ অঃ)।

(৩) বাগ্‌ভটে ভূতবিজ্ঞানীয় ও ভূতপ্রতিষেধ অধ্যায় (উত্তর, ৪।৫ অঃ)।

সুশ্রুত ও বাগ্‌ভটে ভূতবিদ্যা পৃথক্‌ভাবে লিখিত হইলেও চরকে উহা উন্মাদাধিকারের অন্তর্ভুক্ত। সহস্র বর্ষের পূর্ব্বতন ব্যাখ্যাকারগণও ভূতবিদ্যাতন্ত্রের কোন প্রমাণ উদ্ধৃত করেন নাই। সেইজন্য অনুমান করা যায় যে, ভূতবিদ্যা বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই লোপ পাইয়াছে ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অগ্নিপুরাণ ও গরুড় পুরাণাদিতে যথেষ্ট ভূতবিদ্যা প্রসঙ্গ থাকায় মনে হয় যে, পৌরাণিক যুগেও ভূতবিদ্যা বিলুপ্ত হয় নাই।

চরক যে ভূতাবেশকে শুধু উন্মাদ রোগের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন তাহা নহে, বাতোন্মাদ চিকিৎসা এবং ভূতাবেশ চিকিৎসা প্রায় একই প্রকার বলিয়াছেন। আমাদের ধারণা, অতি প্রাচীনকালে মানস রোগাধিকারই ভূতবিদ্যা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। মানুষ উন্মাদাদি রোগে ভূতাবিষ্টের ন্যায় নানা প্রকার বিকৃত অমানুষিক আচরণ করে, অথচ অনেক স্থলেই উপযুক্ত ঔষধ তৈলাদি ব্যবহারে আরোগ্য হয়, ইহা অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। দেবগ্রহাদি সম্বন্ধে সুশ্রুত স্পষ্টই বলিয়াছেন যে "ন তে মনুষ্যৈঃ সহ সংবিশন্তি"—তাহারা মানুষের সহিত থাকে না মানুষের স্কন্ধে চাপে না।

কিন্তু মানুষের স্কন্ধে ভূত চাপার এবং বলিহোমাদির কথাও বর্ত্তমান সময়ের অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে দেখা যায়। এইজন্য মনে হয়, শাস্ত্রের অবনতির সহিত অনেক কুসংস্কার এই ভূতবিদ্যায় প্রবেশ করিয়াছে। এই ধারণার জন্য আমরা ভূত-বিদ্যাকে মানস রোগাধিকারের অন্তর্ভুক্ত বলিতে ইচ্ছুক।

৫। কৌমারভৃত্য তন্ত্র।

(WORKS ON DISEASES OF CHILDREN).

৩১।৩২।৩৩। **জীবক তন্ত্র, পার্ব্বতকতন্ত্র ও বন্ধক তন্ত্র।**—কৌমারভৃত্য তন্ত্রেরও বহু গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি নিম্নে লিখিত হইল।

সুশ্রুতের উত্তর তন্ত্রের ব্যাখ্যায় ডল্লন জীবক, পার্ব্বতক ও বন্ধক নামক কৌমারভৃত্য তন্ত্রকারদিগের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহাদের গ্রন্থ পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ ছিল এইরূপ অনুমান করা যায়।

জীবক প্রভৃতি তন্ত্রকার বৌদ্ধাচার্য্য ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তন্মধ্যে জীবক নামক বৌদ্ধভিষক্ জীবক "কোমারভচ্চ" (কৌমারভৃত্য?) সংজ্ঞায় বৌদ্ধ ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। ইনি ভিক্ষু আত্রেয়ের শিষ্য এবং ভগবান বুদ্ধদেবের ও বৌদ্ধ রাজা বিম্বিসারের চিকিৎসক ছিলেন।

বৌদ্ধ ভিক্ষু আত্রেয়ই চরকোক্ত ভিক্ষু আত্রেয়—কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন। কিন্তু চরকে বশিষ্ট, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, আত্রেয় প্রভৃতি ঋষির সহিত ভিক্ষু আত্রেয় হিমালয় সানুতে মিলিত হইয়াছিলেন—এইরূপ লিখিত আছে। ঐ সকল ঋষি বৌদ্ধযুগের অনেক পূর্ব্বকালীন। সুতরাং চরকোক্ত ভিক্ষু আত্রেয় এবং বৌদ্ধ ভিক্ষু আত্রেয় এক ব্যক্তি হওয়া সম্ভবপর নহে।

চক্রপাণি সুশ্রুতের ভানুমতী টীকায় কৌমারভৃত্য তন্ত্র হইতে যে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা কাহার রচিত নির্ণয় করা যায় না।

৩৪। **হিরণ্যাক্ষ তন্ত্র।** শ্রীকণ্ঠ দত্তের উদ্ধৃত পাঠ দেখিয়া ইহা কুমারতন্ত্র প্রধান ছিল বলিয়াই মনে হয়।

সুশ্রুতের "উত্তর তন্ত্রে দ্বাদশটী অধ্যায়ে কৌমারভৃত্যতন্ত্র প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। সেইজন্য বোধ হয় যে, আয়ুর্ব্বেদের এই অঙ্গ পূর্ব্বকালে সুমহৎ ছিল, এক্ষণে নষ্টপ্রায় হইয়াছে।

এই স্থানে বলা আবশ্যক যে গর্ভিণীচর্য্যাদি বিষয় কৌমারভৃত্য তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নহে। উহা প্রাচীন বৈদ্যকে শারীরের অন্তর্ভুক্ত এবং মূঢ়গর্ভ (Difficult labour) চিকিৎসা শল্যতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং প্রসূতিতন্ত্র (Midwifery) কৌমারভৃত্য তন্ত্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। কিন্তু সুশ্রুতে যৌনিব্যাপৎ-প্রতিষেধ অধ্যায়ের শেষে "ইতি সুশ্রুতাচার্য্য বিরচিতে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উত্তর তন্ত্রে কৌমারভৃত্যং সমাপ্তম্"—এইরূপ পাঠ আছে। সেই জন্য বোধ হয়, প্রাচীনকালে স্ত্রীরোগ কৌমারভৃত্য তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৬। অগদতন্ত্র।

(WORKS ON TOXICOLOGY).

যাবতীয় স্থাবর ও জঙ্গম বিষের পরিজ্ঞান

এবং চিকিৎসা অগদ তন্ত্র নামে খ্যাত, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এক্ষণে অগদ তন্ত্র এবং তদ্বিষয়ক প্রাচীন সংহিতাগুলি বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে। কেবল সুশ্রুতের কল্পস্থানে এবং চরকের চিকিৎসা স্থানে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে অগদতন্ত্রমূলক প্রসঙ্গ আছে। আমরা অগদতন্ত্র বিষয়ক নিম্নলিখিত কয়েক খানি সংহিতার পরিচয় পাইয়াছি।

৩৫। কাশ্যপ সংহিতা। মহাভারতে কথিত হইয়াছে যে, কাশ্যপ নামক ঋষি মহারাজ পরীক্ষিতের চিকিৎসার জন্য আসিতে ছিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে তক্ষক কর্ত্তৃক নিবারিত হয়েন। ডল্লন, চক্রপাণি এবং শ্রীকণ্ঠ কাশ্যপতন্ত্র হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কেহ কেহ কাশ্যপতন্ত্রকে কায়চিকিৎসা প্রধান, অপরে শল্যতন্ত্র প্রধান বলিয়া থাকেন। কিন্তু মহাভারতের কথিত সংবাদ, টীকাকার দিগের বিষচিকিৎসা সম্বন্ধীয় পাঠোদ্ধার এবং বৃদ্ধ বৈদ্যগণের প্রসিদ্ধি হেতু আমরা কাশ্যপ সংহিতাকে অগদতন্ত্র প্রধান বলিয়াই স্থির করিয়াছি।

৩৬। অলম্বায়ন সংহিতা। শ্রীকণ্ঠদত্ত বিষনিদানের টীকায় অলম্বায়ন সংহিতা হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৩৭। উশনঃ সংহিতা। উশনঃ কৃত এই সংহিতা অগদতন্ত্রমূলক বলিয়া বৃদ্ধ বৈদ্যদিগের নিকট পরিচয় পাওয়া যায়। উশনার পথ অনুসরণ করিয়া কৌটিল্য স্বকৃত অর্থশাস্ত্রে বিষাদির প্রতীকার এবং আশুমৃতের পরীক্ষা * সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন, তদ্দ্বারা এই সংহিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

৩৮। সনক সংহিতা (বা শৌনক-সংহিতা)। এই অগদতন্ত্রমূলক প্রাচীন গ্রন্থ পূর্ব্বে যবনগণ কর্ত্তৃক স্বভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। ইহা জার্ম্মান পণ্ডিত মূলার কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ডাক্তার প্রফুল্ল চন্দ্র রায় কৃত রসশাস্ত্রের ইতিহাসের (Dr. P. C. Roy's History of Hindu Chemistry; Vol. I. (Introduction) cx II.) ভূমিকা পাঠ করিলে ইহার প্রমাণ পাইবেন।

৩৯। লাট্যায়ন সংহিতা। ডল্লন স্বীয় টীকায়লা ট্যায়ন সংহিতা হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৭। রসায়ন তন্ত্র।—

(WORKS ON METHODS OF GAINING HEALTH AND LONGEVITY).

জরাব্যাধি বিনাশের জন্য ঔষধ প্রয়োগ আয়ুর্ব্বেদের রসায়ন তন্ত্র ব্যতীত অন্য কোথাও দেখা যায় না। আয়ুর্ব্বেদের আর্ষযুগে এবং বৌদ্ধযুগে এই তন্ত্রের বিশেষ উন্নতি ঘটিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে, ঋষিগণ রসায়নের জন্য প্রায় বনৌষধি প্রয়োগেরই উপদেশ দিয়াছেন, লৌহাদি প্রয়োগের উল্লেখ দেখা যায় না। সুতরাং রসতন্ত্র আয়ুর্ব্বেদ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু এই মত সমীচীন নহে। রসায়ন অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের একটী প্রধান অঙ্গ। সুশ্রুতে

---

* আশুমৃতক পরীক্ষার ইংরাজী নাম Post Mortem Examination, অধুনা যাহা Medical Jurisprudence বলিয়া খ্যাত, তাহা বোধ হয় পূর্ব্বে ব্যবহারায়ুর্ব্বেদ নামে পরিচিত ছিল। এই সকল বিষয় উশনঃ সংহিতার অন্তর্ভুক্ত। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে "কণ্টক শোধন" প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

লৌহ, শিলাজতু, মাক্ষিক প্রভৃতির এবং চরকে পারদ লৌহাদি ধাতুর প্রয়োগ দেখা যায়। তবে আর্য্যযুগে লৌহাদির কিছু কিছু প্রয়োগ থাকিলেও বৌদ্ধযুগের প্রারম্ভে পারদাদি খনিজ পদার্থ বহুলরূপে ঔষধার্থে এবং রসায়নের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল। উহা "রসশাস্ত্র" নামে পৃথক্ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ রসশাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ হইতে পৃথক্ নহে। আর্ষ ও অনার্ষ ভেদে রসায়ন তন্ত্র দুই প্রকার বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। আমরা আর্ষ রসায়ন তন্ত্রের নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির পরিচয় পাইয়াছি।

৪০। **পাতঞ্জল তন্ত্র।** টীকাকারগণ এই তন্ত্র হইতে বহু পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। চক্রপাণি এই তন্ত্র হইতে লৌহপ্রয়োগবিধি স্বকীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৪১।৪২।৪৩। **ব্যাড়ি তন্ত্র, বশিষ্ঠতন্ত্র ও মাণ্ডব্যতন্ত্র।** এই তিন খানি অতি প্রাচীন তন্ত্র রসতান্ত্রিকদিগের আশ্রয়ভূত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। রসরত্নসমুচ্চয়ে লিখিত রসাচার্য্যগণের সূচীর মধ্যে ব্যাড়ি ও মাণ্ডব্যের পরিচয় পাওয়া যায়। নাগার্জ্জুনকৃত রসরত্নাকরে বশিষ্ঠ ও মাণ্ডব্যের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

৪৪। **নাগার্জ্জুন তন্ত্র।** কেহ কেহ বলেন যে, এই তন্ত্র নাগার্জ্জুন নামক মুনির রচিত, অপরে বলেন ইহা সিদ্ধ নাগার্জ্জুন নামক বৌদ্ধাচার্য্যের রচিত। চক্রপাণিকৃত সংগ্রহ গ্রন্থে নাগার্জ্জুন মুনির এবং পাটলিপুত্রের স্তম্ভে আচার্য্য নাগার্জ্জুনের উল্লেখ আছে। পাটলিপুত্র বৌদ্ধগণের বিহারক্ষেত্র ছিল বলিয়া শেষোক্ত নাগার্জ্জুনকে বৌদ্ধাচার্য্য বলিয়াই মনে হয়। নাগার্জ্জুন নামধারী অনেক আয়ুর্ব্বেদবিদ্ ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কক্ষপুট তন্ত্র এবং আরোগ্যমঞ্জরী নামক গ্রন্থদ্বয়ও নাগার্জ্জুনের রচিত। বিজয় রক্ষিত নিদানের টীকায় আরোগ্যমঞ্জরী হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৮। বাজীকরণ তন্ত্র—

(WORKS ON SEXUAL INVIGORATION.)

বাজীকরণ তন্ত্রের প্রাচীন সংহিতাসমূহের বিশেষ পরিচয় এক্ষণে পাওয়া যায় না। প্রাচীন টীকাকারগণ এতদ্বিষয়ক কোন সংহিতা হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করেন নাই বলিয়া মনে হয় যে, সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই বাজীকরণ তন্ত্রের আর্ষসংহিতাগুলি লোপ পাইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও বাজীকরণ তন্ত্র দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে "ঔপনিষদিক" অধিকারে নানাবিধ বাজীকরণ যোগের উল্লেখ আছে। উক্ত গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায়, যে মহাদেবের অনুচর নন্দী সহস্র অধ্যায়যুক্ত কামসূত্রের বর্ণনা করিয়াছিলেন। উদ্দালকের পুত্র শ্বেতকেতু উহাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া পাঁচশত অধ্যায়ে বিভক্ত করেন। অনন্তর বভ্রুর পুত্র পাঞ্চাল উহাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া সাত ভাগে বিভক্ত করেন। পরে দত্তক, চারায়ণ, সুবর্ণনাভ, ঘোটকমুখ, গোনর্দ্দ, গোণিকাপুত্র এবং কুচুমার এই সাতজন সাতটী বিভাগ পৃথক্‌রূপে প্রচার করেন। এতদ্দ্বারা অনুমান হয় যে, পূর্ব্বে কামসূত্রকার ঋষিদিগের প্রণীত ঔপনিষদিক

নামক বিভাগ আয়ুর্ব্বেদে বাজীকরণ তন্ত্র নামে পৃথক্‌রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল।

৪৫। **কুচুমার তন্ত্র।** বাজীকরণ বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে ইহা একখানি প্রধান গ্রন্থ। বাৎস্যায়নের কামসূত্র পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এই প্রচীন বাজীকরণ তন্ত্র এককালে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। উদ্দালকের পুত্র শ্বেতকেতু এবং বভ্রুর পুত্র পাঞ্চালের প্রণীত অতি বৃহৎ কামশাস্ত্রের ঔপনিষদিক অধিকারদ্বয়ও দুইটী পুরাতন বাজীকবণ তন্ত্র ছিল।

কেহ কেহ বলেন যে, মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ও চাণক্য বা আচার্য্য কৌটিল্যই বাৎস্যায়ন, অপরে ইঁহাকে মুনি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যে মতই গ্রহণ করা যাউক বাৎসায়ন দুই সহস্র বৎসর অপেক্ষাও প্রাচীনকালের। সুতরাং বাৎস্যায়ন কথিত ঔদ্দালকি, বাভ্রব্য এবং কুচুমার কৃত তন্ত্র যে আরও প্রাচীন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

(ক্রমশঃ)

রজঃস্বলানারীর স্বাস্থ্য।

—:০:—

(ডাঃ শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র দাস।)

আমাদের কাছে আদর কিসের? স্বদেশের না বিদেশের? একটু বিবেচনা পূর্ব্বক আলোচনা করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, বিদেশরই আদর। আমরা বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত। সুতরাং আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি সবই বৈদেশিক। আবার ব্যবহারও ক্রমশঃ বৈদেশিক হইয়া যাইতেছে। এ কথায় হয়ত আপনারা বলিবেন, সে কি, আজকাল অনেকেরই স্বদেশানুরাগ দেখিতে পাওয়া যায়! এ কথার উত্তরে বলিতেছি যে, এই স্বদেশানুরাগও বৈদেশিক। অনেকেই হাসিবেন; বলিবেন এ যে সোণার পাথর বাটী।

আমাদের রত্নগর্ভা ভারতে সবই ছিল—সবই আছে। আর্য্য ধর্ম্ম ও আর্য্যশাস্ত্রে সবই আছে, কেবল আমরাই অন্ধ। আমরা অধুনা একটু একটু যাহা দেখিতে পাইতেছি, তাহাও বিদেশীর চক্ষে। দু' পাতা ইংরাজি পড়িয়া যে সকল তত্ত্ব আমরা—ভ্রমাত্মক, গোঁড়ামি বা ভণ্ডামি বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছি, সেই সকল তত্ত্বের কোনটী যদি কোন ইয়ুরোপীয় বা আমেরিকান সাহেব অভ্রান্ত ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া সপ্রমাণ করেন, তখন আমরা যাহা ভ্রমাত্মক বলিয়া ত্যাগ করিয়াছিলাম, তাহাই আবার আদরে গ্রহণ করিব ও স্বদেশ গৌরবে মাতিয়া বুক ফাজাইব। আমাদের ঘরের জিনিষেরও আদর বিদেশীর চক্ষে। তাই বলিতেছি যে, এরূপ স্বদেশানুরাগকে কি বৈদেশিক বলা যায় না! আমাদের কোন প্রাচীন বর্ব্বর রীতি যদি বিদেশীর মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে আমরাও উহাকে [illegible]

বলিয়া মনে করি, নচেৎ উহা ভ্রমসঙ্কুল ও বর্ব্বরতা পূর্ণ বলিয়া পরিত্যজ্য। সুতরাং এক্ষণে স্ত্রীস্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে একটী সামান্য কথার উল্লেখ করিব—উহাতে বিদেশীর মতানুসরণই করিব।

বোধ হয় অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, আজকাল স্ত্রীলোকদের মধ্যে রজঃকৃচ্ছ্র, স্বল্পরজঃ বা অতিরজঃ প্রভৃতি ঋতুবিপর্য্যয়ের প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়।—ইহার প্রধান কারণ—আমাদের চির প্রচলিত প্রাচীন রীতির উল্লঙ্ঘন। হিন্দু প্রথানুযায়ী রজঃস্বলা নারী অশুচি ও অস্পৃশ্যা। এই অশুচি অবস্থায় তাঁহার স্পর্শিত খাদ্যাদি তো দূরের কথা, তৎকালে তৈজসাদি পর্য্যন্ত তাঁহাদের স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। সে সময় তাঁহাদের স্পর্শিত বস্ত্রাদি অপরের—অপরিধেয়; তাহাদের স্পর্শিত জল অব্যবহার্য্য। এই সময় রজঃস্বলা নারীকে একান্ত নিভৃত কক্ষে বাস করিতে হয় এবং যাবতীয় গৃহকার্য্য হইতে বিরত থাকিতে হয়। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদিগকে আহারীয় নিয়মও পালন করিতে হয়। ফলমূলাদি সাত্ত্বিক আহার, দুগ্ধ, অন্ন এবং কোন কোন উদ্ভিজ্জ সিদ্ধ রজঃস্বলা স্ত্রীর আহার্য্য। অন্যান্য খাদ্য অর্থাৎ উগ্র ও দুষ্পাচ্য খাদ্য ভক্ষণ অসঙ্গত। রজঃস্বলা নারীর পক্ষে পুরুষের মুখদর্শন পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ। এ নিয়ম কেবল আদ্য ঋতুর সময় অনেকে পালন করেন বটে, কিন্তু তাহার পর এ সমুদয় একেবারেই উপেক্ষিত হয়। ইউরোপ ও আমেরিকার বর্ত্তমান চিকিৎসকগণ বলেন যে রজঃস্বলা স্ত্রীর পূর্ণ বিরাম গ্রহণ আবশ্যক, এমন কি পুস্তকাদি পাঠও নিষিদ্ধ। লঘুপাক ও অনুত্তেজক খাদ্য তাঁহার পক্ষে উপযোগী। ঘৃত তৈল ভর্জ্জিত বা মসল্লা সংযুক্ত উগ্র খাদ্যাদি ভোজন তাহাদের পক্ষে একান্তই নিষিদ্ধ। শীতল বায়ু সেবন, জলে ভিজা, মানসিক উত্তেজনা প্রভৃতি পরিবর্জ্জনীয়। তাঁহারা আরও বলেন যে, এরূপ করিলে কেবল যে ঋতুরোগ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়—তাহা নহে; গর্ভিণীর সুখপ্রসব হয়। এমন কি প্রসব বেদনা আদৌ অনুভূত হয় না। হিন্দুর পদ্ধতি অনুসারে রজঃস্বলা রমণীকে অশুচি মনে করিয়া পূর্ণ বিরাম দেওয়া হইত। এই সকল নিয়ম আজকালকার শিক্ষিত সভ্য সমাজ হইতে প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে, কেবল কোন কোন অশিক্ষিত ধর্ম্মভীরুদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, শিক্ষিত দলের মধ্যে সময়ে সময়ে ঋতুকালেও স্ত্রী-পুং মিলনের কথাও শুনিতে পাওয়া যায়,—কিন্তু ইহা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই অস্বাস্থ্যকর। এই জন্যই বোধ হয় সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকারেরা ঋতুকালে একেবারে পুরুষের মুখদর্শন পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে নিষেধ করিয়াছেন। আবার ইহাও পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগের কথা যে, রোগ আরোগ্য অপেক্ষা প্রতিষেধক ভাল। তাই বলি, একবার প্রাচীন প্রথা অবলম্বন করিয়া দেখুন। তাহা হইলে আর ঘরে ঘরে Aletris cordial এলেট্রিস্ কর্ডিয়ালের শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না।

আবার ডাক্তার প্লিনি বলেন যে, রজঃস্বলা নারীর হস্ত কিছুক্ষণ সুরামধ্যে নিমজ্জিত রাখিয়া পরে ঐ সুরা পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, উহা অম্লত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। আবার ঐ নারীর দ্বারা অন্য সময়ে পরীক্ষা করায় সুরার কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। সুতরাং সুরা বা দুগ্ধে যদি এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে, অন্যান্য খাদ্য ও পানীয়ে যে পরিবর্ত্তন

ঘটিবে—তাহার আর বৈচিত্র্য কি। কার্পেন্টার তাঁহার ফিজিওলজি বা শারীরতত্ত্ব গ্রন্থে একটী রমণীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, তাঁহার স্বামী পারদ ভক্ষণ করিয়াছিলেন, স্বামীর সহিত এক শয্যায় নিদ্রা যাইবার পর, স্ত্রীরও 'মুখ' আসিয়াছিল অর্থাৎ প্রচুর লালা নিঃসরিত হইয়াছিল। যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে রজঃস্বলা নারীর সহিত একত্র বাসও যে অস্বাস্থ্যকর তাহার আর সন্দেহ কি?

শিশুপালন।

—:০:—

[উপক্রমণিকাংশ]

(শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বি-এ, সরস্বতী)

মানবের ঘরে একটি শিশুর জন্ম কত আনন্দ, উল্লাস এবং আশার বারতা আনিয়া দেয়। নবজাত শিশুটি যখন অফুটন্ত গোলাপের মত মাতার কোল আলো করিয়া শুইয়া থাকে, তখন, তেমনি আত্মীয়স্বজনের প্রাণে যেমন আনন্দ হয় সেই মুহূর্ত্তেই শিশুর ভবিষ্যৎ চিন্তায়ও তাঁহাদের চিত্ত আন্দোলিত হইতে থাকে। শিশুর ভাবী গৌরবপূর্ণ জীবনের চিত্র কল্পনা চক্ষে দেখিয়া পিতামাতার বক্ষ কত আশার আনন্দে এবং উৎসাহে ফুলিয়া উঠে। শিশুর স্বর্গীয় সুষমা-মণ্ডিত মুখখানি দেখিয়া তাঁহাদের অন্তর কি অপার্থিব স্নেহ ও আনন্দের তরঙ্গে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। আবার শিশু যখন মাতার চক্ষের দিকে চাহিয়া মধুর হাসি ছড়ায়, মধুর আধ আধ ভাষায় শব্দ উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করে, তখন হৃদয়ের প্রেম ও আনন্দ শতগুণ বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পিতামাতা তাঁহাদের দায়িত্ব ভারের গুরুত্ব ক্রমশঃই উপলব্ধি করেন। বিধাতা যে নির্ম্মল শুভ্র পবিত্র ফুলটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষা করা—তাহাকে ফুলেরই মত সুন্দর করিয়া গড়িয়া তোলা,—তাহাকে মনুষ্যত্বের গৌরবে গৌরবান্বিত করা, একমাত্র তাঁহাদেরই উপর নির্ভর করে। বিধাতার বাগানের এই শুভ্র ফুলটি যদি ধরণীর ধূলায় কলঙ্কিত হয়, তবে তাহার জন্য পিতামাতাই সম্পূর্ণ রূপে দায়ী। শিশুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক পিতামাতার চিত্তেই এইরূপ গুরুতর চিন্তার আলোড়িত হয়। শিশুর শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের ভার বিধাতা তাঁহাদেরই হস্তে রাখিয়াছেন।

শিশুর মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্পূর্ণরূপে শারীরিক উন্নতির উপরই নির্ভর করে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে শিশুর শারীরিক উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখা প্রত্যেক পিতামাতারই কর্ত্তব্য। কারণ শিশু সুস্থ, সবল হইয়া

বাঁচিয়া উঠিলে তবে তাহার মানসিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের ভাবনা ভাবিবার সময় আসে। অজ্ঞানতা বশতঃ উপযুক্ত যত্নের অভাবে অঙ্কুরেই জীবন নষ্ট হইলে, সকল আশাই বিফল হইয়া যায়। সুতরাং শিশু জন্মিবার পূর্ব্ব হইতেই তাহার মাতাকে কত নিয়মে থাকিতে হয় এবং জন্মগ্রহণের পর শিশুকে কত বুদ্ধি বিবেচনার সহিত লালন পালন করিতে হয়—তাহা প্রত্যেক রমণীর জানা অবশ্য কর্ত্তব্য। সন্তান জন্মগ্রহণ করিবামাত্র তাহারই ক্ষুদ্র জীবনটির সহিত মাতার সকল সুখ-দুঃখ—আশা-নিরাশা অটুট বন্ধনে জড়িত হইয়া যায়। শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম না জানায় অকালে কত গৃহ শূন্য হইয়া যায়, কত নারীর জীবন হাহাকারময় হয়—তাহার সংখ্যা করা যায় না।

বহুস্থলে শুধু একটু জ্ঞানের অভাবে এই ভীষণ দৃশ্য আমাদিগকে দেখিতে হয়। নারীদিগের এ সকল বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান থাকিলে আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা বহুল পরিমাণে হ্রাস হইত, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে নারীগণের মূর্খতা বশতঃ কত শিশু অকালে জীবন বিসর্জ্জন করে। সুতরাং প্রত্যেক নারীর জ্ঞান লাভ করা উচিত। আমাদের দেশের অনেক লোক নারীর শিক্ষা লাভ সম্বন্ধে এই বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করেন, যে, তাহারা ত আর চাকরী করিবে না, যে অধিক লেখাপড়া শিক্ষার প্রয়োজন! লেখাপড়া যে শুধু চাকরীর জন্যই প্রয়োজন তাহা নহে। নারীদিগকে যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবন রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালন করিতে হয়—তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে সমুচিত জ্ঞান লাভের একান্তই প্রয়োজন। সামান্য চিঠিপত্র লিখিতে এবং ধোপার ও বাজার হিসাব রাখিতে যতটুকু জ্ঞানের আবশ্যক, এই গুরুতর দায়ীত্ব ভার উপযুক্তরূপে নির্ব্বাহ করিতে হইলে তদপেক্ষা অনেক অধিক উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন হয়।

একে আমাদের দেশের নারীদিগের জ্ঞানাভাব, তদুপরি বাল্যবিবাহ বশতঃ নারীগণ এত অল্প বয়সে শিশুর জননী হন যে তখন তাহাদিগের নিজেদের ভার লইতেই তাঁহারা অক্ষম। একটি ক্ষুদ্র শিশুর জীবনের ভার লওয়া তাহাদের সাধ্যাতীত। তাহাকে উপযুক্ত রূপে লালন পালন করিতে হইলে যে গভীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন—তাহা তাঁহাদের মোটেই থাকে না।

কেবল সন্তানকে জন্ম দিলেই জননীর কাজ সম্পন্ন হয় না,—তাহাকে সুস্থ, সবল, কর্ম্মঠ, বীর্য্যশালী মানুষ করিয়া গঠন করাই জননীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। নারী যতদিন না সেই উচ্চ জ্ঞান লাভ করেন, শিশু পালনের গুরুতর দায়ীত্বের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে সক্ষম না হন, ততদিন তাঁহাদিগকে শিশুর জননী পদ লাভের অধিকার প্রদান করা ঘোরতর নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ। জ্ঞানহীনা নারীদিগকে অল্প বয়সে বিবাহ দিয়া ঘরে ঘরে আমরা যে কি সর্ব্বনাশের বীজ রোপণ করিতেছি, তাহা যদি উপলব্ধি করিতে পারিতাম, তবে বহু পূর্ব্ব হইতে এ কুপ্রথার সমূলে উচ্ছেদ সাধনে প্রবৃত্ত হইতাম। তাহা হইলে আজ দেশের মুখশ্রীও ফিরিয়া যাইত। স্বাস্থ্যসম্পন্ন সুদৃঢ় মাংসপেশীবিশিষ্ট, উৎসাহী, তেজস্বী, জিতেন্দ্রিয়-কর্ম্মী সন্তান দেশকে প্রদান করিবার সময় আসিয়াছে। সমগ্র দেশ দুর্ব্বল, রুগ্ন;

ক্ষীণজীবী, শ্রীহীন, উৎসাহহীন, ভীরু অমানুষে ভরিয়া গিয়াছে !

পরিণত বয়সে কোনো কারণ বশতঃ, অসময়ে অপুষ্ট সন্তান জন্মগ্রহণ করিলেও তাহার বাঁচিবার সম্ভাবনা যত অধিক, অপরিণত বয়সের সন্তানের তেমন নহে। পরিণত বয়স্কা শিক্ষিতা নারী অসময়ে প্রসূত, অপুষ্ট সন্তানকে বাঁচাইবার জন্য যত নিয়ম প্রণালী অবলম্বন করিতে পারেন, সর্ব্ব প্রকার শিক্ষাবর্জ্জিতা একটি জ্ঞানহীনা অল্পবয়স্কা বালিকার পক্ষে তাহা অসম্ভব। সুস্থ, বলশালী সন্তান গড়িয়া তোলা বর্ত্তমান সময়ে নানা কারণে এক কঠিন সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। দেশের নারীজাতির মধ্যে যদি জ্ঞানের প্রচার থাকিত, তবে এই সমস্যা বহু পরিমাণে মীমাংসিত হইতে পারিত। সুতরাং এদিক দিয়া দেখিতে গেলেও স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সমগ্র দেশে স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার হইলে, দেশের শিশু মৃত্যুর হার অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইবে। এমন অনেক পীড়ায় আমাদের দেশের শিশুদের মৃত্যু হয়—যাহা শিক্ষিতা জননী হইলে অনেক স্থলেই নিবারণ করিতে সক্ষম হন।

কলিকাতা সহরে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা অতি ভয়ানক। কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর স্বাস্থ্য-বিভাগের রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে, কলিকাতায় এক বৎসরের নিম্ন বয়স্ক প্রতি চারিটি শিশুর মধ্যে একটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দশ বার, বৎসর পূর্ব্বে ইহা অপেক্ষাও অবস্থা শোচনীয় ছিল। তখন প্রতি চারিজনের মধ্যে দুইজনেরই মৃত্যু হইত। কলিকাতার বিভিন্ন ওয়ার্ডের শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা তুলনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, যে সকল ওয়ার্ডে ঘন বসতি এবং গৃহগুলি অপরিষ্কার আবর্জ্জনাপূর্ণ, আলো বাতাসশূন্য সেই সকল ওয়ার্ডেই শিশু মৃত্যুর সংখ্যা অধিক।

১৯১৪—১৯১৫ সনে জোড়াবাগান বড় বাজার এবং কলিঙ্গাতে প্রতি হাজারে ৪৪০ জন, কুমারটুলী, কড়টোলা, সুকিয়া ষ্ট্রীট, পদ্মপুকুরে ২৪০ জন শিশুর মৃত্যু হইয়াছে কিন্তু ভবানীপুরে প্রতি হাজারে ১৯৪ জন শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। ১৯১৮ সনের রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে, জোড়াবাগানে হাজার করা ৫৮১, বড় বাজারে ৪৭৬, বহুবাজারে ৪০৮, কলিঙ্গায় ৩৬৬, খিদিরপুরে ৩৫১, মুচি-পাড়ায় ৩৪৫ ও ফেনিক বাজারে ৩২৫ জন শিশু মারা গিয়াছে। পৃথিবীর সুসভ্য দেশ সমূহে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। আর আমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশে শিশু মৃত্যু ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছে। জোড়াবাগান, বড় বাজার প্রভৃতি স্থানেই মৃত্যু সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই সকল স্থানে ঘন বসতি, গৃহগুলি অত্যন্ত অপরিষ্কার এবং অস্বাস্থ্যকর। বাড়ী গুলি সব ছোট ছোট অসংখ্য কুঠরীতে বিভক্ত। প্রত্যেক কুঠরীতে এক এক পরিবারে বাস করে। অধিকাংশ কুঠরীই সম্পূর্ণরূপে আলো ও বাতাস বর্জ্জিত। সহরের এই অংশে বহু সংখ্যক মূর্খ, কুসংস্কার-প্রিয় এবং অত্যন্ত রক্ষণশীল লোক সকল বাস করে। ইহাদিগের চির পুরাতন রীতি-নীতি এবং আচার ব্যবহারে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে ইহারা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠে। ইহাদের গৃহে কোন প্রকার সংস্কার সাধন করা দুঃসাধ্য। ভবানীপুরের বাসগৃহগুলি খোলা জায়গায় অবস্থিত, তেমন ঘন বসতি নাই, সেই কারণে শিশুমৃত্যুর সংখ্যাও [illegible]

১৯১৪—১৯১৫ সনে যত শিশু জন্মগ্রহণ

করে, তাহার তিন ভাগের একভাগ জন্মিবার প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই মৃত্যুর প্রধান কারণ—অপুষ্ট অবস্থায়, অসময়ে জন্ম এবং ধনুষ্টঙ্কার। শেষোক্ত কারণে মৃত্যু সচরাচর অজ্ঞানতাবশতঃ এবং মূর্খ ধাত্রীদিগের জন্যই ঘটিয়া থাকে। প্রথমোক্ত দুইটি কারণে মৃত্যু—লোকের আর্থিক এবং সামাজিক কারণে ঘটে। দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস, বাল্য বিবাহ এবং অবরোধ প্রথাই প্রধানতঃ এই সকল মৃত্যুর কারণ। এই কারণগুলির এক একটিই এত গুরুতর যে, বাহির হইতে তাহার সংস্কার সাধন করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। শিক্ষা প্রচারই এই সকল গুরুতর কারণ দূরীভূত করিবার একমাত্র উপায়। জনসাধারণ এবং নারীগণের মধ্যে শিক্ষা প্রচারিত হইলে উপরোক্ত কারণগুলি তাঁহারা নিজেরাই সংশোধন করিতে পারিবেন।

প্রথম সপ্তাহ কাটিয়া গেলে মৃত্যু সংখ্যা বহু পরিমাণে হ্রাস হইয়া যায়। প্রথম সপ্তাহে যত মৃত্যু হয়, প্রথম মাসের শেষে মৃত্যু সংখ্যা তাহার অর্দ্ধেক হয়। প্রথম মাসে ধনুষ্টঙ্কারেই অধিকাংশ শিশুর মৃত্যু হয়, তা'রপর ব্রঙ্কাইটিস। শিশুদের শারীরিক যন্ত্রাদি এত কোমল থাকে যে, হঠাৎ শীতাতপের পরিবর্ত্তন তাহারা সহ্য করিতে পারে না। দরিদ্রতাবশতঃ আমাদের দেশের লোকেরা উপযুক্ত বস্ত্রদ্বারা শিশুকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে অসমর্থ। এই কারণে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া শিশুদের ব্রঙ্কাইটিস এবং নিউমোনিয়া হয়।

নিম্নলিখিত তালিকা দেখিলে ১৯১৪-১৫ শিশুগণের কোন্ পীড়ায় কত সনে হারে মৃত্যু হইয়াছে তাহা উপলব্ধি হইবে।

কারণ	শতকরা
১। বসন্ত, হাম, জ্বর, ম্যালেরিয়া	[illegible]
২। পেটের অসুখ, এণ্টেরাইটিস, কলেরা, আমাশয়	শতকরা ৮·১
৩। অসময়ে জন্ম, অপুষ্ট অবস্থায় জন্ম (Debility at Birth), ক্ষয়রোগ (Marasmus)	শতকরা ৩১·৮
৪। ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া	শতকরা ৩·২
৫। ধনুষ্টঙ্কার (Tetanus) neonatorum, তড়কা	১·৭
৬। লিভার, অন্যান্য কারণ	৬·২

এই তালিকা হইতে দেখা যায় যে শতকরা ৮০টি শিশুর মৃত্যু তিনটি প্রধান কারণে ঘটিয়াছে। যেমন অকালে এবং দুর্ব্বল অবস্থায় জন্ম, ব্রঙ্কাইটিস ও নিউমোনিয়া এবং ধনুষ্টঙ্কার ও তড়কা।

আমাদের দেশের নারীজাতি যদি শিক্ষা লাভ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা বর্ত্তমান জ্ঞান বিজ্ঞান আলোকিত যুগের এমন অনেক নিয়ম প্রণালী ও উপায় সকল অবগত থাকিতেন, যদ্দ্বারা তাঁহারা দুর্ব্বল, অকালে প্রসূত শিশুদিগের অধিকাংশকেই রক্ষা করিতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু জননীগণ মূর্খ বলিয়া এ সকল

ক্ষীদ্রম প্রণালীর কিছুই জানেন না, সুতরাং কত শিশু শুধু মাতার অজ্ঞতা বশতঃ প্রাণত্যাগ করে।! আমাদের গ্রীষ্মাধিক্য দেশে উপযুক্ত যত্ন লইলে, ব্রঙ্কাইটিস ও নিউমোনিয়ার জন্য শিশুদিগের মৃত্যু সংখ্যা সহজেই হ্রাস করা যাইতে পারে। মাতা শিক্ষিতা হইলে ধনুষ্টঙ্কারে শিশুদিগের মৃত্যু সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করিতে পারেন। এই সুসভ্য যুগে আমাদের দেশে মূর্খ ধাইদিগের হস্তে শিশুর জন্মকালের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া ধনুষ্টঙ্কারে তাহার মৃত্যু ঘটান আর চলিতে দেওয়া উচিত নহে। মূর্খ ধাইদিগের পক্ষে এই কার্য্যের ভার লওয়া আইন বিরুদ্ধ বলিয়া দণ্ডনীয় হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে মাতার জ্ঞান থাকিলে তিনি ধাত্রীদিগকে নানা বিষয়ে সতর্ক করিতে এবং উপদেশ দিতে পারেন। নারীজাতি শিক্ষালাভ করিলে, শারীর তত্ত্ব, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞান সম্মত শিশুপালন প্রণালী অবগত হইয়া সুস্থ, সবল, বুদ্ধিমান, তেজস্বী সন্তান গঠন করিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর উন্নত দেশ সমূহে শিশুশিক্ষা প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। ইহাতে আশ্চর্য্য ফল দেখা যাইতেছে। অতি অল্প বয়সেই বালক বালিকাগণের বুদ্ধিবৃত্তি আশ্চর্য্যরূপে বিকশিত হইতেছে এবং তাহারা নানা ভাষায় এবং অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতেছে। কিন্তু আমাদের দেশের বিদ্যালয় সমূহে এখনো সেই মান্ধাতার আমলে "অ, আ- ক, খ" এবং A B C মুখস্ত করাইয়া পাঠশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। আমাদের নারীগণ যদি শিক্ষিতা হইতেন, তবে কোমল মতি সন্তানদিগকে অল্প বয়সেই বিদ্যালয়ের কঠোর ও একঘেঁয়ে শিক্ষার মধ্যে ফেলিয়া না দিয়া, নিজেরাই বর্ত্তমান চিত্তাকর্ষক ও উন্নত প্রণালীতে তাহাদিগকে সুন্দর রূপে শিক্ষা দিতে পারিতেন। মাতার নিকট যে শিক্ষা শিশু কোমল বয়সে পায়, তাহা যেমন তাহার মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া যায়, তেমন আর কিছুতেই হয় না। সুতরাং মাতার হস্তে যেমন স্বাস্থ্যরক্ষা নির্ভর করে, তেমনি তাহার মানসিক আধ্যাত্মিক উৎকর্ষও তাঁহার হস্তে ন্যস্ত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, নারীজাতির মধ্যে শিক্ষা প্রচারই দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির প্রধান উপায়।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি কলিকাতার অন্তঃপুর পরিদর্শন করিবার জন্য একজন স্বাস্থ্য পরিদর্শিকা নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি তাঁহার কার্য্য বিবরণীতে প্রকাশ করিয়াছেন যে,—"যতই দেশে শিক্ষার প্রচার হইতেছে, নারীদিগকে স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষা দিবার প্রয়োজন ততই উপলব্ধি হইতেছে। মূর্খ এবং অর্দ্ধ শিক্ষিতাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও শিক্ষিতাদিগের মধ্যেও স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানাভাব দেখা যায়। আমি এক বৎসরের মধ্যে ৩৬৬৬টি বাড়ী পরিদর্শন করিয়াছি। ইহাতে ৬৭৪০টি পৃথক্ পরিবারকে বাস করিতে দেখিয়াছি। ৬৭৪০ জন স্ত্রীলোকের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া সন্তান পালন সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছি। ৫৪৫টি নবজাত শিশু দেখিয়া যথাযথ সাহায্য এবং তাহাদিগকে পালন করা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছি। শিশুর জন্মগ্রহণের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই যদি উপযুক্ত যত্ন লওয়া হয়, তবে বিপদ অনেকটা কাটিয়া যায়। ২৪০টি বিনা টিকা দেওয়া শিশু দেখিয়া তখনই কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট করিয়া দিয়াছি, গৃহের নানাপ্রকার অস্বাস্থ্যকর অবস্থা দেখিয়া তাহা দূর করিবার

জন্য হেল্থ্ অফিসারকে জানাইয়াছি। কলিকাতার মত বৃহৎ সহরে আমার মত আরো অনেক পরিদর্শিকা নিযুক্ত হইলে, তবে কিছু কাজের আশা করা যাইতে পারে।” ইনি শিক্ষিতা ধাইদিগকে লইয়া ক্লাস করিয়া তাহাদিগকে ধাত্রী বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছেন এবং প্রত্যেককে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি প্রদান করিয়াছেন। সমস্ত সহরের জন্য এইরূপ পরিদর্শিকা নিযুক্ত হইলে প্রকৃতই দেশের কল্যাণ সাধিত হইবে।

শিশুপালন, শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম এবং খাদ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা জনিতই এত অমূল্য জীবনের অপচয় হয়। তাহা নিবারণ করিতে হইলে প্রত্যেক নারীরই শিক্ষা লাভ করা এবং এই গুরুতর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকা কর্ত্তব্য। আমাদের নারীগণ যাহাতে শিশুপালনের এবং স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ প্রণালী, শিশুর খাদ্য সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য নিয়ম অবগত হইয়া শিশুপালনে সাহায্য লাভ করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধটি লিখিত হইল।

পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করিলে—উপযুক্ত বস্ত্র পরাইলে এবং খাদ্য ও পানীয় সম্বন্ধে স্বাস্থ্যকর নিয়ম পালন করিলে, মোটামুটি শিশুকে সুস্থ রাখা যায়। সাধারণ ভাবে শিশুদিগের অসুস্থতার কারণ জানা থাকিলে জননীরা সেই সব বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন পূর্ব্বক তাহাদিগকে সুস্থ রাখিতে চেষ্টা করিতে পারেন। পুষ্টিকর খাদ্য, স্বাস্থ্যকর নিয়ম ও শারীরতত্ত্ব জানা থাকিলে জননীগণ দুর্ব্বল এবং রুগ্ন শিশুকেও সুস্থ, সবল ও তেজস্বী সন্তানে পরিণত করিতে সক্ষম হন। কিন্তু এ সব বিষয়ে অজ্ঞ থাকিলে নানা প্রকার ঝঞ্ঝাট ও যাতনা ভোগ করিতে হয়, এমন কি শিশুর প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইতে পারে।

আমাদের দেশের প্রাচীনাগণ বহুদর্শিতার ফলে শিশুপালন বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন সাধারণতঃ শিশুদিগের যে সকল পীড়া হয়, তাহার সুন্দর মুষ্টিযোগ তাঁহাদের জানা ছিল। তদ্দ্বারা তাঁহারা অধিকাংশ স্থলেই শিশুদিগের রোগ আরাম করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে সেই সব প্রাচীন মহিলাদিগের অধিকাংশই ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের কন্যা ও বধূগণের সে অভিজ্ঞতা নাই এবং অনেক মুষ্টিযোগ ও তাঁহাদের সহিত লুপ্ত হইয়াছে। বঙ্গদেশ হইতে নানা কারণে একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা উঠিয়া যাওয়ায় বর্ত্তমান সময়ে নারীদিগকে অধিকাংশ স্থলে একাকী সংসার করিতে হয়। সুতরাং বয়োবৃদ্ধা অভিভাবিকা সঙ্গে না থাকায় নিজেদেরই শিশু পালনের সমস্ত ভার লইতে হয়। সুতরাং মূর্খ হইয়া থাকিলে শিশুপালন লইয়া অত্যন্ত বিপদের মধ্যে পড়িতে হয়। কিন্তু শিক্ষা থাকিলে এ সম্বন্ধে সকল বিষয়ই জানা থাকে এবং একাকী হইলেও সুচারুরূপে বর্ত্তমান সময়ের বিজ্ঞানসম্মত উন্নত প্রণালীতে শিশু পালন করিতে সমর্থ হন।

শিশু পালনের বিষয় বুঝাইতে হইলে সর্ব্ব প্রথমে শিশুর খাদ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা উচিত বিবেচনায় আমরা আগামীবারে উহারই আলোচনা করিব।

(ক্রমশঃ)

আয়ুর্ব্বেদে ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগ।

—:০:—

পূর্ব্বে ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগ দ্বারা বহু রোগের চিকিৎসা হইত। এক্ষণে আয়ুর্ব্বেদোক্ত ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগ লুপ্তপ্রায়। অর্শ প্রভৃতি রোগে সম্প্রদায় বিশেষকে ক্ষার প্রয়োগ করিতে দেখা যায় মাত্র। ক্ষারের আভ্যন্তরিক প্রয়োগ কিছু কিছু আছে বটে, কিন্তু তাহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ। আমরা এই প্রবন্ধে পাঠকগণের অবগতির জন্য ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগ বিষয়ের আলোচনা করিব।

ক্ষার, অগ্নি, জলৌকা প্রভৃতি শাস্ত্রে অনুশস্ত্র নামে আখ্যাত। ইহারা হীনশস্ত্র বা শস্ত্রের ন্যায় কার্য্যকারী বলিয়া ইহাদিগকে অনুশস্ত্র বলা যায়। শস্ত্র এবং অনুশস্ত্রের মধ্যে ক্ষারই প্রধানতম। কারণ ইহা দ্বারা ছেদন (কাটিয়া ফেলা—যেমন অর্শের বলি ক্ষারযুক্ত সূত্রের দ্বারা বাঁধিয়া রাখিলে কাটিয়া যায়) ভেদন (যেমন ফোড়ায় ক্ষার লাগাইলে বিদীর্ণ হয়) লেখন (চাঁচিয়া ফেলা,—যেমন ক্ষত প্রভৃতির দূষিত অংশ পরিষ্কার করা) এই ত্রিবিধ কার্য্যই হইয়া থাকে। কিন্তু অগ্নি বা জলৌকা দ্বারা ছেদন কার্য্য হয় না। আবার ইহা ত্রিদোষ নাশক এবং বিশেষ বিশেষ কার্য্যে (যেমন পিত্তজ অর্শ নাশক জন্য) উপযোগী।

দূষিত ত্বক মাংসাদি ক্ষরণ অর্থাৎ পাতন অর্থাৎ নাশ করে বলিয়া ইহাকে ক্ষার বলা যায়। ক্ষার—বিবিধ ঔষধ সংযোগে ত্রিদোষনাশক এবং শ্বেতবর্ণ বলিয়া সৌম্য অর্থাৎ শীতল গুণ বিশিষ্ট। কিন্তু ক্ষার শীতল গুণ বিশিষ্ট হইলেও উহাতে দহন (দগ্ধ করা) পচন (পাকাইয়া ফেলা) দারণ (বিদীর্ণ করা) শক্তি থাকা অবিরুদ্ধ। ক্ষার—প্রচুর আগ্নেয় ঔষধ সংযুক্ত হওয়ায় কটু, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, পাচন, বিলয়ন (মিলাইয়া দেওয়া—যেমন বাত-কফ প্রধান শোথ ক্ষার সেবনে মিলাইয়া যায়) শোধন (ক্ষতাদি বিশুদ্ধ করে), স্তম্ভন (রক্তপাত বন্ধ করে) লেখন গুণ বিশিষ্ট এবং ক্রিমি, আম, কুষ্ঠ, বিষ, মেদ প্রভৃতি ও অতিসেবিত হইলে পুরুষত্ব নষ্ট করে।

প্রতিসারণীয় (লাগাইবার) এবং পানীয় (খাইবার) ভেদে ক্ষার দুই প্রকার। কুষ্ঠ, কিটিম, (কুষ্ঠ বিশেষ), দদ্রু, বিলাস (অরুণ বর্ণ ধবল রোগ), মণ্ডল নামক কুষ্ঠ, ভগন্দর, দূষিত ক্ষত, নালীঘা, আঁচিল, তিল, ছুলী, মেচেতা, আঁচিলভেদ, বাহ্য বিদ্রধি (বড় ফোড়া) বাহ্য ক্রিমি (উকুন), বাহ্যবিষ (বিষাক্ত ক্ষত প্রভৃতি) অর্শ এবং উপজিহ্বা, অধিজিহ্বা, উপকুশ, দন্ত বৈদর্ভ এবং তিনপ্রকার রোহিণী—এই সকল রোগে প্রতিসারনীয় ক্ষার প্রয়োজ্য।

পানীয় ক্ষার কৃত্রিম বিষ বা দূষীবিষ, গুল্ম, উদর, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অরুচি, আনাহ, শর্করা (সূক্ষ্ম পাথরী) পাথরী, অভ্যন্তর বিদ্রধি, ক্রিমি ও বিষ এবং অর্শ রোগে প্রয়োজ্য। রক্তপিত্ত, জ্বর, পিত্ত, প্রকৃতি, বালক, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, ভ্রমরোগগ্রস্ত, মদরোগগ্রস্ত, মূর্চ্ছা রোগগ্রস্ত, তিমির নামক চক্ষুরোগগ্রস্ত এবং এইরূপ অন্যান্য ব্যক্তিকে পানীয় ক্ষার প্রয়োগ করিবে না।

প্রতিসারনীয় ক্ষার প্রস্তুত করিতে হয়। বিবিধ রোগ প্রসঙ্গে পানীয় ক্ষারের

বিষয় উল্লিখিত হইবে বলিয়া এ স্থানে বলা হইল না।

প্রতিসারণীয় ক্ষার প্রস্তুত করিতে হইলে, শরৎকালে প্রশস্ত দিনে পর্ব্বতের সানুদেশে-জাত, মধ্যবয়স্ক, বৃহদাকার এবং দাবাগ্নি বিষের দ্বারা অদূষিত ঘণ্টাপারুল গাছকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিবে। অনন্তর বায়ুশূন্য স্থানে রাখিয়া, উহার সহিত সুধা-শর্করা (চুণ প্রস্তুত করিবার পাথর) মিশ্রিত করিয়া তিলের ডাঁটার দ্বারা দগ্ধ করিবে। অনন্তর অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে ঘণ্টাপারুলের ভস্ম এবং পাষাণ ভস্ম পৃথক পৃথক গ্রহণ করিবে।

অনন্তর কুড়চি, পলাশ, অশ্বকর্ণ (লতাশাক), পালতে মাদার (মতান্তরে দেবদারু) বহেড়া, সোঁদাল, ডহরকরঞ্জ, বাসক, কদলী, পটিয়া, লোধ, আকন্দ, মনসাসীজ, আপাং, পারুল, রক্তচিতা, নাটাকরঞ্জ, ইন্দ্র বৃক্ষ (কুড়চি ভেদ) অনন্তমূল, হাপরমালি, করবী, ছাতিম, গণিয়ারী, কুঁচ এবং চারি প্রকার ঘোষা (বৃহৎ ফলা, অল্প ফলা, পীতপুষ্প ও শ্বেত পুষ্প) ইহাদিগের ফল, মূল, পত্র ও শাখা পূর্ব্বোক্ত রূপে অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া ক্ষার গ্রহণ করিবে।

পরে ঘণ্টাপারুলের ভস্ম দুই ভাগ এবং কুড়চি প্রভৃতির ভস্ম একভাগ করিয়া—সমুদায়ে বত্রিশ সের লইবে এবং ১৯২ সের জল বা গোমূত্রে গুলিয়া বস্ত্র দ্বারা একুশবার ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর সিটে বাদ দিয়া ক্ষারজল বৃহৎ কটাহে রাখিয়া অগ্নিতে পাক করিবে এবং হাতা দিয়া ধীরে ধীরে নাড়িতে থাকিবে। পাক করিতে করিতে যখন বেশ নির্ম্মল, রক্তবর্ণ, তীক্ষ্ণ এবং পিচ্ছিল হইবে, তখন নামাইয়া বৃহৎ বস্ত্রখণ্ডে ছাঁকিয়া পুনরায় শিটে বাদ দিবে। অনন্তর দেড় সের ক্ষারজল পৃথক রাখিয়া, অবশিষ্ট অংশ পুনরায় পাক করিবে এবং নাটা, পূর্ব্বোক্ত পাথর ভস্ম, ঝিনুক এবং শঙ্খনাভি প্রত্যেকে এক সের—মোট চার সের; লৌহ পাত্রে উত্তপ্ত করিয়া অগ্নিবর্ণ হইলে নামাইয়া স্বতন্ত্র রক্ষিত দেড় সের জলে ভিজাইয়া ও বাটিয়া উহাতে নিক্ষেপ করিবে। সাবধানতার সহিত নাড়িতে নাড়িতে যখন এমন হইবে যে, অত্যন্ত ঘন বা তরল নহে—তখন নামাইয়া একটি লৌহ-কলসের মধ্যে রাখিবে এবং মুখ বন্ধ করিয়া নির্জ্জন স্থানে রক্ষা করিবে।

তীক্ষ্ণ বীর্য্য, মধ্য বীর্য্য এবং মৃদুবীর্য্য ভেদে ক্ষার তিন প্রকার। উপরে যে ক্ষার প্রস্তুতের কথা বলা হইল—উহা মধ্যবীর্য্য ক্ষার। উক্ত ক্ষারে যদ্যপি নাটা প্রভৃতি দ্রব্য চতুষ্টয় না দেওয়া হয়, তবে তাহাকে মৃদুবীর্য্য ক্ষার বলে। আবার উক্ত ক্ষারে যদি দন্তী, দ্রবন্তী (দন্তীভেদ), রক্ত চিতা, গণিয়ারী, নাটা-করঞ্জের পত্র, তালমূলী, বিটলবণ, সাচি-ক্ষার, স্বর্ণক্ষীরী (সোনামুখী, মতান্তরে কঙ্কুষ্ঠ নামক মৃত্তিকা) হিং, বচ, ও মিঠা বিষ—এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ চারি তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পাক করা হয়, তবে তাহাকে তীক্ষ্ণ ক্ষার বলে।

ক্ষার দীর্ঘকাল প্রস্তুত থাকার জন্য অথবা হীনবীর্য্য ঔষধ দ্বারা প্রস্তুত হওয়ার জন্য বীর্য্য হীন হইলে পূর্ব্বোক্ত ক্ষার জলের সহিত পুনরায় পাক করিয়া লইলে বীর্য্যবান হয়।

অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বা মৃদু নয়—অত্যন্ত শুক্লবর্ণ নয়—শ্লক্ষ্ণ অর্থাৎ করকরে নয়, পিচ্ছিল, অভি-ষ্যন্দী নয় অর্থাৎ প্রয়োগ করিলে ছড়াইয়া পড়ে

না, অত্যন্ত তরল বা ঘন নয় এবং শীঘ্রকার্য্যকারী—এই আটটী গুণ বিশিষ্ট ক্ষারই উত্তম। অত্যন্ত মৃদু, অত্যন্ত শ্বেতবর্ণ, অত্যন্ত উষ্ণ, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, অত্যন্ত পিচ্ছিল, অত্যন্ত প্রসর্পণকারী (ছড়াইয়া পড়ে) অত্যন্ত গাঢ় সুসম্পূর্ণরূপ পাক করা নয় এবং হীনদ্রবতা অর্থাৎ কথিত দ্রব্য সমস্ত না দেওয়া—এই নয়টী ক্ষারের দোষ।

ক্ষার প্রয়োগ করিতে হইলে—রোগীকে বায়ু ও আতপ শূন্য প্রশস্ত স্থানে উপবেশন করাইয়া ব্যাধিস্থান উত্তমরূপে লক্ষ্য করিয়া, পিত্তদুষ্ট হইলে সেই স্থান ঘর্ষণ করিয়া, বাতদুষ্ট হইলে কঠিন অসাড় চর্ম্মের অল্প ছাল তুলিয়া এবং কফদুষ্ট ও শোথযুক্ত স্থানে অল্প অল্প চিরিয়া, শলাকা দ্বারা ক্ষার প্রয়োগ করিবে। অনন্তর একশত লঘু অক্ষর উচ্চারণ করিতে যতক্ষণ সময় লাগে—ততক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ক্ষার তুলিয়া ফেলিবে। ক্ষার প্রয়োগের পর পীড়িত স্থান কৃষ্ণবর্ণ হইলে—সম্যকরূপে দগ্ধ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

ক্ষারদগ্ধ স্থানে জ্বালা উপস্থিত হইলে—ঘৃত, মধু এবং কাঁজি প্রভৃতি অম্লদ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে জ্বালা নষ্ট হয়।

ক্ষার দগ্ধ স্থানের ক্ষত পূরণ করিবার জন্য তিল ও যষ্টিমধু—তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য অম্লরসে বাটিয়া ঘৃত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। ইহাতে শীঘ্রই ক্ষতস্থান পুরিয়া উঠে।

এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, ক্ষারের তেজ তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য, সুতরাং অগ্নিগুণ বিশিষ্ট কাঞ্জিকাদি দ্বারা কি করিয়া যন্ত্রণা প্রশমিত হইতে পারে? কিন্তু ক্ষারে অম্লরস ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত রসই আছে। আবার তন্মধ্যে কটু ও লবণ রসই প্রচুর রূপে বর্ত্তমান। এইজন্য অম্লরসের সহিত সংযুক্ত সেই তীক্ষ্ণ লবণ রস—তীক্ষ্ণ ভাব পরিত্যাগ করিয়া মৃদুতা প্রাপ্ত হয় এবং সেই হেতু ক্ষার জনিত জ্বালারও হ্রাস হয়।

ব্যাধি স্থান ক্ষার দ্বারা সম্যক রূপে দগ্ধ হইলে—রোগের উপশম, ব্যাধি স্থানের লঘুতা এবং দগ্ধ স্থান হইতে স্রাব নির্গম বোধ হয়। যদি সম্যক দগ্ধ না হইয়া কম দগ্ধ হয়, তাহা হইলে ব্যাধি স্থানে বেদনা, কণ্ডু ও জড়তা হয় এবং রোগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আর অতিরিক্ত দগ্ধ হইলে জ্বালা, রক্তবর্ণতা, পাকিয়া যাওয়া, অঙ্গবেদনা, গ্লানি, পিপাসা, মূর্চ্ছা—এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

দুর্ব্বল, বালক, বৃদ্ধ, ভীরু, সর্ব্বাঙ্গ শোথ বিশিষ্ট রোগী, উদর রোগী, রক্তপিত্ত রোগী, গর্ভিণী নারী, ঋতুমতী স্ত্রী, জ্বররোগী, প্রমেহ রোগী, উরঃক্ষত বশতঃ ক্ষীণ রোগী, তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছাপীড়িত ব্যক্তি, ক্ষীণশুক্রব্যক্তি, যে সকল রোগীর অণ্ড বা যে সকল স্ত্রীলোকের গর্ভাশয় ঊর্দ্ধদিকে উৎক্ষিপ্ত বা নিম্নদিকে স্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, ইহাদিগের পক্ষে উভয়বিধ ক্ষার প্রয়োগ নিষিদ্ধ। মর্ম্ম, শিরা, স্নায়ু, সন্ধি সকল, তরুণাস্থি (cartilage) সিবন (সেলাই) করার মত, ধমনী (Nerve) গলদেশ, নাভি, লিঙ্গ নালস্রোতঃ, অল্প মাংস বিশিষ্ট স্থান, এবং বর্ত্মগত চক্ষুরোগ ভিন্ন ক্ষার প্রয়োগ নিষিদ্ধ। পূর্ব্বে যে সকল ক্ষারসাধ্য ব্যাধির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সকল ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির শরীরে শোথ থাকিলে, অস্থি শূল থাকিলে, অন্নপানে দ্বেষ থাকিলে এবং হৃদয় ও সন্ধি স্থানের পীড়া থাকিলে, ক্ষার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে।

অল্প বুদ্ধি ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইলে, ক্ষার

বিষ, অগ্নি, শস্ত্র এবং বজ্রের ন্যায় প্রাণনাশক হইয়া থাকে, আর বুদ্ধিমান ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইলে সত্বরেই ঘোরতর রোগ সকল বিনষ্ট করে।

অগ্নিকর্ম্ম বিধি।

গুণে ক্ষার শ্রেষ্ঠ হইলেও, কার্য্যতঃ ক্ষার হইতে অগ্নি শ্রেষ্ঠ। কারণ অগ্নিকর্ম্ম দ্বারা রোগ প্রশমিত হইলে আর তাহাদের পুনরুৎপত্তি হয় না এবং যে সকল রোগ ঔষধ, শস্ত্র ও ক্ষার প্রয়োগ দ্বারা নিবারিত হয় না, তাহারা অগ্নিকর্ম্ম দ্বারা প্রশমিত হইয়া থাকে।

অগ্নি কর্ম্মের জন্য নিম্নলিখিত দ্রব্যসকল প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, পিপ্পুল, ছাগবিষ্ঠা, গরুর দাঁত, শর, শলাকা, জাম্ববৌষ্ঠ (জামের ন্যায় মুখাগ্র বিশিষ্ট কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত বর্ত্তি), লৌহ, তাম্র, রৌপ্য, মধু, গুড় ও স্বেদ দ্রব্যাদি (ঘৃত তৈলাদি) তন্মধ্যে পিপুল, ছাগলনাদী, গোদন্ত, শর ও শলাকা চর্ম্মাশ্রিত রোগে, জাম্ববৌষ্ঠ ও লৌহ তাম্রাদি মাংসগত রোগে এবং মধু ও স্নেহ পদার্থ শিরাগত, স্নায়ুগত, সন্ধিগত ও অস্থিগত রোগে অগ্নি কর্ম্মের জন্য প্রয়োগ করিতে হয়।

শরৎ ও গ্রীষ্মকাল ব্যতীত অন্য সকল ঋতুতেই অগ্নিকর্ম্ম করা যাইতে পারে। কিন্তু শরৎ এবং গ্রীষ্মকালে যদি অগ্নিসাধ্য ব্যাধি প্রাণ নাশক হইয়া উঠে, তাহা হইলে উক্ত কালের বিপরীত বিধান। অর্থাৎ শীতল আচ্ছাদন, ভোজন, প্রলেপ অবলম্বন করিয়া উক্ত দুই ঋতুতেই অগ্নি কর্ম্ম করিতে পারা যায়। সকল রোগে এবং সকল ঋতুতেই পিচ্ছিল (দধি প্রভৃতি যুক্ত) অন্ন ভোজন করাইয়া অগ্নি কার্য্য করিবে। কিন্তু মূঢ়গর্ভ (Difficult labour), পাথরী, ভগন্দর, অর্শ ও মুখরোগে রোগীকে ভোজন না করাইয়া অগ্নিকর্ম্ম করা কর্ত্তব্য।

কেহ কেহ বলেন যে, ত্বক্ দগ্ধ ও মাংস দগ্ধ ভেদে অগ্নিকর্ম্ম দুই প্রকার। কিন্তু ধন্বন্তরির মতে শিরা, স্নায়ু, সন্ধি এবং অস্থিতেও অগ্নিকর্ম্ম করা নিষিদ্ধ নহে।

অগ্নিকর্ম্ম দ্বারা ত্বক্ দগ্ধ হইলে শব্দ, দুর্গন্ধ ও চর্ম্মের সঙ্কোচ হয়। মাংস দগ্ধ হইলে কপোত বর্ণতা (মলিন শ্বেতবর্ণ) অল্প ফোলা এবং শুষ্ক ও সঙ্কুচিত ক্ষত হয়। শিরা ও স্নায়ু দগ্ধ হইলে কৃষ্ণবর্ণ ও উন্নত ক্ষত হয় এবং রক্তাদির স্রাব বন্ধ হয়। সন্ধি এবং অস্থি দগ্ধ হইলে রুক্ষ, অরুণ বর্ণ, এবং কর্কশ ও স্থির (ব্যাপ্তিশীল নহে) ক্ষত হয়।

শিরোরোগ ও অধিমন্থ নামক চক্ষুরোগে ভ্রূ, কপাল ও শঙ্খ দেশে, বর্ত্ম অর্থাৎ চক্ষুর পাতার রোগে দৃষ্টি স্থান আর্দ্র আলতা দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া বর্ত্ম দেশের রোমকূপ দগ্ধ করিতে হয়। ত্বক্, মাংস, শিরা ও স্নায়ুতে বায়ু প্রকোপ বশতঃ অত্যন্ত বেদনা হইলে, উন্নত ও অসাড় কঠিন মাংসে, ব্রণে, গ্রন্থি, অর্শ, অর্ব্বুদ, ভগন্দর, অপচী, গোদ, আঁচিল তিল, অন্ত্রবৃদ্ধি (Harnia), সন্ধিস্থান ও শিরোচ্ছিন্ন হইলে, নালী ঘা প্রভৃতি রোগে এবং অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলে অগ্নিকর্ম্ম করিতে হয়। রোগের স্থানভেদে অগ্নিকর্ম্ম চার প্রকার। যথা, বলয়, বিন্দু, বিলেখন ও প্রতিসারণ। আক, গলগণ্ড প্রভৃতি দৃঢ়মূল রোগে বালার ন্যায় আকারে দগ্ধ করাকে বলয়, তিল, আঁচিল প্রভৃতি রোগে বিন্দুর আকারে দগ্ধ করাকে বিন্দু, তির্য্যক, সরল

ও বক্রাদিভেদে নানা আকারে দগ্ধ করাকে বিলেখন এবং উত্তপ্ত লৌহ শলাকাদি দ্বারা ঘর্ষণ করাকে প্রতিসারণ বলে। অগ্নিকর্ম্ম এই চারি প্রকার বলা হইল। রোগের সংস্থান অর্থাৎ আয়তনাদি, মর্ম্মস্থান (পরিহারের জন্য) রোগীর বলাবল, ব্যাধি (বাতকফ জনিত ব্যাধিতে অগ্নিকর্ম্ম কর্ত্তব্য এবং রক্তপিত্তে নিষিদ্ধ), ইহা ভিন্ন ঋতুর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অগ্নিকর্ম্ম করিতে হয়।

অগ্নিদ্বারা সম্যক্ দগ্ধ হইলে মধু ও ঘৃত সেই স্থানে মর্দ্দন বা লেপন করিবে।

পিত্ত প্রকৃতি, অন্তঃ শোণিত (যাহাদের শরীরের অভ্যন্তরে কোন স্থানে রক্তস্রাব হয়), ভিন্ন কোষ্ঠ (যাহাদের কোষ্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছে, যাহাদের শরীরে শল্য বিদ্ধ আছে, দুর্ব্বল, বালক, বৃদ্ধ, ভীরু, অনেক ক্ষতযুক্ত এবং পাণ্ডু রোগী, মেহ রোগী, রক্তপিত্ত রোগী তৃষ্ণার্ত্ত প্রভৃতি যাহাদিগকে স্বেদের অযোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে অগ্নি কর্ম্ম নিষিদ্ধ।

এক্ষণে চিকিৎসক কর্ত্তৃক দগ্ধ করা ব্যতীত অন্য প্রকারে অর্থাৎ প্রমাদ বশতঃ দগ্ধের লক্ষণ বলা যাইতেছে। অগ্নি—ঘৃত তৈলাদি স্নেহ দ্রব্য এবং কাষ্ঠাদি রুক্ষ দ্রব্য আশ্রয় করিয়া দগ্ধ করিয়া থাকে। অগ্নিদ্বারা উত্তপ্ত ঘৃত তৈলাদি স্নেহ পদার্থ সহজে সূক্ষ্ম শিরা মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে বলিয়া ত্বক্ মাংসাদিকে আশু দগ্ধ করিয়া ফেলে। এই জন্য স্নেহ পদার্থ দ্বারা দগ্ধ হইলে অত্যন্ত অধিক যন্ত্রণা হইয়া থাকে।

চিকিৎসকের দোষে বা প্রমাদ বশতঃ চারিপ্রকার অগ্নিদগ্ধের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—পুষ্ট, দুর্দ্দগ্ধ, সম্যক্ দগ্ধ ও অতি দগ্ধ। দগ্ধ স্থান বিবর্ণ, (পাণ্ডুবর্ণ), অত্যন্ত দাহযুক্ত হইলে এবং স্ফোট (ফোসকা) উৎপন্ন না হইলে তাহাকে পুষ্ট দগ্ধ বলা যায়। দগ্ধ স্থানে স্ফোট উৎপন্ন হইলে, চোষ (চূষণ বৎ পীড়া, দাহ, রক্তবর্ণতা, বেদনা ও পাক বিশিষ্ট হইলে এবং দীর্ঘকালে ভাল হইলে তাহাকে দুর্দ্দগ্ধ বলে। দগ্ধস্থান অগভীর ভাবে দগ্ধ, পাকা তালের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট, অত্যন্ত উন্নত বা অবনতরূপ দোষ বর্জ্জিত এবং পূর্ব্বে ত্বক্ মাংসাদি দগ্ধের যেরূপ লক্ষণ বলা হইয়াছে সেইরূপ লক্ষণ যুক্ত হইলে সম্যক্ দগ্ধ বলা যায়। আর দগ্ধ স্থানের মাংস ঝুলিয়া পড়িলে, গাত্র বিশ্লিষ্ট হইলে অর্থাৎ ফাটিয়া গেলে, সিরা, স্নায়ু, সন্ধি, অস্থি নষ্ট হইলে, জ্বর, দাহ, পিপাসা, মূর্চ্ছা ঘটিলে তাহাকে অতিদগ্ধ বলে। ইহাতে ক্ষত স্থান বিলম্বে পূর্ণ হয় এবং ভাল হইলেও বিবর্ণ থাকে।

প্রাণিদিগের রক্ত অগ্নি সংযোগে অত্যন্ত কুপিত হইয়া এবং অগ্নি ও কুপিত রক্তের জন্য পিত্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কারণ অগ্নি ও পিত্ত রস, ও বীর্য্যে তুল্য। উভয়ের প্রকোপ বশতঃ তীব্র বেদনা হয়, বিদাহ জন্মায়, শীঘ্র স্ফোট উৎপন্ন হয় এবং জ্বর ও তৃষ্ণা জন্মিয়া থাকে।

এক্ষণে, অগ্নিদগ্ধের চিকিৎসার বিষয় কথিত হইতেছে, উষ্ণ দগ্ধে অগ্নিতাপ (স্বেদ), উষ্ণ প্রলেপাদি এবং উষ্ণ অন্ন পান প্রয়োগ করিবে। কারণ শরীরে অধিক পরিমাণে স্বেদ দিলে রক্ত স্বিন্ন হয় বলিয়া জমাট বাঁধিতে পায় না। কিন্তু জল শীতল বলিয়া জল প্রয়োগ করিলে রক্ত জমাট হইয়া যায় এবং তজ্জন্য রুদ্ধমার্গ বায়ু, শূল, শোথ ইত্যাদি উপদ্রব উপস্থিত করে। সেইজন্য প্লুষ্ট দগ্ধ স্থানে উষ্ণ

ক্রিয়া করাই হিতকর। দগ্ধ স্থানে শীত ক্রিয়া করিলে তাহা কখনই সুখকর হয় না।

দুর্দ্দগ্ধে দাহ গভীর হইলে স্বিন্ন (স্বেদ প্রাপ্ত) রক্তের উষ্ণতা দূর করিবার জন্য ক্রিয়া এবং অগভীর হইলে যাহাতে জমাট বাঁধিয়া না যায় তজ্জন্য উষ্ণ ক্রিয়া করিবে। পরে ঘৃত লেপন এবং শীতল দ্রব্য সেবন করিবে।

সম্যক্ দগ্ধে বংশলোচন, পাঁকুড় ছাল, রক্ত চন্দন, গেরীমাটী ও গুলঞ্চ সমান ভাগে লইয়া পেষণ ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া দগ্ধ স্থানে প্রলেপ দিবে। ইহাতে পিত্ত জনিত দাহাদি নিবারিত হয়। গো, অশ্ব প্রভৃতি গ্রাম্য, বরাহ, মহিষ প্রভৃতি আনূপ এবং কচ্ছপাদি ঔদক মাংস বাটিয়া দগ্ধ স্থানে প্রলেপ দিলে বায়ুজনিত যন্ত্রণার উপশম হয়। অপিচ, পিত্তজ বিদ্রধি রোগে যেরূপ চিকিৎসার কথা বলা হইয়াছে, সম্যক দগ্ধে সেইরূপ চিকিৎসা করিবে।

অতিদগ্ধে যেসকল মাংস ঝুলিয়া পড়িয়াছে—সেইগুলি ফেলিয়া দিয়া শীতল ক্রিয়া করিবে। পরে সেই স্থানে শালি তণ্ডুলের চূর্ণ ছড়াইয়া দিবে। ক্ষতস্থান গুলঞ্চের পাতা বা পদ্ম প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদের পাতা দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। অপিচ, পিত্ত বিসর্পে যেরূপ চিকিৎসার কথা বলা হইয়াছে, অতিদগ্ধেও সেইরূপ চিকিৎসা করিবে।

মোম, যষ্টিমধু, লোধ, ধুনা, মাঞ্জিষ্ঠা, রক্ত চন্দন এবং সূচীমুখী—সমান ভাগে বাটিয়া তাহার সহিত ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত সর্ব্বপ্রকার দগ্ধ ক্ষতের উত্তম ঔষধ।

সর্ব্বপ্রকার স্নেহ দগ্ধ জনিত ক্ষত অর্থাৎ উত্তপ্ত ঘৃত তৈলাদি দ্বারা ক্ষতস্থানে রুক্ষ ক্রিয়া করিবে। অর্থাৎ স্নেহ ব্যতীত রুক্ষ চূর্ণ, প্রলেপ পভৃতি প্রয়োগ করিবে।

কণ্ঠনাসিকাদি স্থানে অগ্নি কর্ম্ম করিবার সময় ধূম লাগিয়া রোগীর কতকগুলি উপদ্রব জন্মিতে পারে। ইহাকে ধূমোপাহত বলে। অগ্নি কর্ম্ম ব্যতীতও ধূম লাগিয়া পীড়া উপস্থিত হইলে তাহাকেও ধূমোপহত বলা যায়। শ্বাস হিক্কা, আধ্মান (পেট ফোলা), কাস, চক্ষুর দাহ ও রক্তবর্ণতা, নিঃশ্বাসের সহিত ধূম নির্গম, ধূম ব্যতীত অন্য দ্রব্যের ঘ্রাণ না পাওয়া, সমস্ত খাদ্যে ধূমের আস্বাদ (ধোঁয়াটে) পাওয়া, শ্রবণ শক্তির লোপ, তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, অবসন্নতা ও মূর্চ্ছা—ধূমোপহত ব্যক্তির এই সমস্ত উপদ্রব ঘটিয়া থাকে।

ধূমোপহত ব্যক্তিকে ঘৃত ও ইক্ষুরস, অথবা কিসমিসের ক্বাথ পান করাইয়া বমন করাইবে। এইরূপ বমন দ্বারা আমাশয়াদি বিশুদ্ধ হইলে ধূমগন্ধ নষ্ট হয় এবং শরীরের অবসন্নতা, হাঁচি জ্বর, দাহ, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, আধ্মান, শ্বাস, কাস প্রভৃতি প্রশমিত হয়। মধুর, অম্ল, কটু ও লবণ দ্রব্যের কবল ধারণ (কুল কুচা) করিলে ধূমোপহত ব্যক্তির মন প্রসন্ন হয় এবং ইন্দ্রিয় সকল সম্যক্ প্রকারে রসাদি গ্রহণ করিতে পারে। উপযুক্তরূপ শিরো-বিরেচন নস্য প্রয়োগ করিলে ধূমোপহত ব্যক্তিকে অবিদাহী (যাহা খাইলে গলা বুক জ্বালা করে না), লঘু এবং স্নেহযুক্ত আহার প্রদান করিবে।

অতিতেজ অর্থাৎ বজ্রাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইলে প্রায়ই কোন ঔষধে প্রতিকারের আশা থাকে না, দগ্ধ ব্যক্তির মৃত্যু হয়। কিন্তু যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলে ঘৃতাদি স্নেহ পদার্থ তাহার সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিবে এবং স্নেহ দ্রব্য পরিষেক ও স্নেহযুক্ত প্রলেপ প্রয়োগ করিবে।

প্রসঙ্গ ক্রমে উষ্ণ বাতাদি দগ্ধের চিকিৎসা

কথিত হইতেছে। উষ্ণ বায়ু বা রৌদ্র কর্ত্তৃক দগ্ধ হইলে, শীতল দ্রব্য পরিষেক, শীতল প্রলেপ এবং শীতল অন্নপান প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করিবে। শীত (হিম তুষার) কর্ত্তৃক দগ্ধ হইলে (হিম দগ্ধে দাহ সাদৃশ্য থাকে বলিয়া লোকে তুষার দগ্ধ বলে) অথবা জল সংযুক্ত কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে উষ্ণ এবং স্নিগ্ধ ক্রিয়া করিবে।

বালক রক্ষা।

(প্রাণায়ামের আবশ্যকতা ও উপকারিতা)।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় (চট্টোপাধ্যায়) বি-এল।

মনুষ্যজীবন লাভ করিয়া জীবিত কালে ভুক্তি ও অন্তে মুক্তি লাভ করিতে পারিলেই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা হইল। সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ লাভ করিতে সকলেই চায়। কিন্তু ইহার জন্য শ্রেয়ের অনুসরণ না করিয়া, আপাতঃ বিষোপম পরিণামে অমৃতোপম সাত্ত্বিক সুখের চেষ্টা,—না করিয়া বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগে সুখের চেষ্টা, রাজসিক সুখ--যাহা অগ্রে অমৃতোপম পরিণামে বিষোপম এবং তামসিক সুখ যাহা অগ্রে এবং পশ্চাতে উভয় অবস্থায় কষ্ট দায়ক তাহাই লাভ করিতে চেষ্টা করে। জন্মিলে মরিতে হইবে এবং মরিলে জন্মিতে হইবে ইহা অবশ্যম্ভাবী এবং এই জন্মমৃত্যু প্রবাহ বড়ই কষ্টকর ব্যাপার। এই কষ্ট কিরূপ ভয়ানক তাহা দেখাইবার জন্য গত বর্ষের আয়ুর্ব্বেদে আমরা কিরূপে সংসারে যাতায়াত করি—তাহাই বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। ইহাতে মুখ্য উদ্দেশ্য হইতে বিচলিত মনে করিয়া পাঠক মহোদয়গণ লেখকের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইতে পারেন, কিন্তু জানিয়া শুনিয়াই লেখককে পাঠকের বিরক্তির কারণ হইতে হইয়াছে। যদি মৃত্যু কিরূপ যন্ত্রণাদায়ক, জন্ম কিরূপ যন্ত্রণাদায়ক এবং জন্ম মৃত্যুর অন্তরাল কিরূপ কষ্টকর দেখান না যায়, এবং বালককে তদ্বিষয়ে শিক্ষা না দেওয়া যায়, তাহা হইলে বাল্যকাল হইতে বালক ও বালকের অভিভাবকগণ শ্রেয়োলাভের চেষ্টায় সাত্ত্বিক সুখ লাভের জন্য তৎপর হইবেন না। কোন বিষয়ে সতর্ক করিতে হইলে তাহার বিচার করিয়া তাহার মন্দাংশ না দেখাইলে সে বিষয় হইতে কেহ বিরত হয় না। এই দেহ ও মন আমাদের সংসারের কারণ, আবার এই দেহ ও মন মুক্তির কারণ—

দেহ মূলো মনস্তাপো দেহ সংসার তারণম্।
দেহঃ কর্ম্ম সমুৎপন্নঃ কর্ম্ম চ দ্বিবিধং মতম্॥

দেহ হইতে মনস্তাপ জন্মে, দেহ জীবকে সংসারে বদ্ধ করে, সেই দেহ কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন এবং কর্ম্ম পাপপুণ্যানুসারে দ্বিবিধ।

দুঃখস্য কারণং দেহঃ পঞ্চভূতাত্মক শিবে।
ততস্তদ্বিরহে দেহী ন দুঃখৈঃ পরিভূয়তে,

সোঽহং সঞ্জায়তে মাতঃ কথং দেহো মহেশ্বরি।

হিমালয় কহিলেন হে শিবে! পঞ্চভূতাত্মক দেহই দুঃখের হেতু। সুতরাং দেহ অভাবে দেহীর কখনও দুঃখ বোধ সম্ভবেনা, কিন্তু হে মহেশ্বরি! আমার প্রতি যদি অনুগ্রহ থাকে, তবে বিস্তারিতরূপে বলুন, সেই দেহ কিরূপে উৎপন্ন হয়?

(ভগবতী গীতা।)

আবার চরক কি বলেন শুনুন।

জীবন্ হি পুরুষস্ত্বিষ্টং কর্ম্মণঃ ফলমশ্নুতে (৭)

(ষষ্ঠ অধ্যায় নিদানস্থানম্)

কারণ পুরুষ বাঁচিয়া থাকিলেই কর্ম্মের ইষ্ট ফল ভোগ করিতে পারেন। পুনশ্চ—

সর্ব্বমন্যং পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ

তদভাবে হি ভাবানাং সর্ব্বভাবঃ শরীরিণামিতি।

অন্য সমস্ত ফেলিয়া অগ্রে শরীর রক্ষা করিবে। কারণ তদভাবে শরীরীদিগের সর্ব্বভাবেরই অভাব হয়। এই দুই ভাবকে প্রথমতঃ বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। মুক্তি শাস্ত্র ভগবতী গীতা কি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকে লঙ্ঘন করিতেছে? তাহা নয়। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রও মুক্তি শাস্ত্র। শরীর রাখিয়া, শরীর ও মন দ্বারা মুক্তি অর্জ্জন করাই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। শরীর ও মন সর্ব্ব সাধনের মূল! সেই জন্যই বলে "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্।" শরীর ভাল থাকিলে মন ভাল থাকে ও মন ভাল থাকিলে শরীর ভাল থাকে। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ থাকিলেও যদি শোকাদি কোন কারণে মন খারাপ থাকে, তাহা হইলে অগ্নিমান্দ্যাদি রোগ আনিয়া শরীরকে রুগ্ন করে। আবার যদি মন বেশ ভাল থাকে, তখন যদি উৎকট শিরঃ পীড়াদি হয়, তখন মনও খারাপ হইয়া পড়ে, আমরা যাহাতে বেশ সুস্থ ও সবল থাকিয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারি, তাহাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কারণ দীর্ঘকাল জীবিত না থাকিলে ভোগার্জ্জন দ্বারা মুক্তি মার্গের অনুসন্ধান করিয়া তাহার সাধন ও সিদ্ধি অসম্ভব। অল্প সময়ের মধ্যে মৃত্যু ও জন্ম লইতে হইলে কেবল যাতায়াতেই সময় কাটিয়া যায়, সংসারে থাকিয়া জ্ঞানার্জ্জনের আর সময় পাওয়া যায় না। আমার একবার খুব কঠিন পীড়া হইয়াছিল। যখন প্রবল জ্বর সেই সময় অদ্ধ জ্ঞান আছে—এমন অবস্থায় মনে হইল, আমি পৃথিবীর একপার্শ্বে আসিয়া একটা জ্যোৎস্না আলোকিত স্থান দূর হইতে দেখিতেছি। সেই স্থানে যাইতে আমার মনে বড়ই আনন্দের সঞ্চার হইতেছে ও মনে হইতেছে যে মরিয়া উচ্চ স্থানে যাইব। কিন্তু একটা বড় দুঃখ সেই সময় মনে উপস্থিত হইল যে, বাল্যকাল হইতে চেষ্টা করিয়া আমি কে, কোথায় যাইব, কোথা হইতে আসিয়াছি ও সেই শ্রীভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় লওয়া ভিন্ন সংসারে জন্মমরণ কষ্টের বিরাম নাই তাহা জানিতে পারিয়াছি, কিন্তু তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় লইবার পূর্ব্বেই চলিলাম; এই জ্ঞানটুকু লইয়া আবার যখন আসিয়া জন্মিব, তখন হারাইব। এই দুঃখে বড়ই কাতর হইয়া পড়িলাম। জগদীশ্বরের বড়ই কৃপা যে, তিনি আমার দুঃখের কথা শুনিয়া তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় লইবার আর একটা সময় দিলেন, কিন্তু কই সে বিষয় তো কিছুই করিতে পারিতেছি না। বাল্যকাল হইতে বালককে জানাইয়া দিতে হইবে যে, সংসারের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। এটা একটা খেলার যায়গা। দিন কয়েকের জন্য এই সংসার বিদেশে আসিয়াছি আবার নিজ

দেশে চলিয়া যাইব। কিন্তু এই শরীর ও মন—যাহা আমার কষ্টের হেতু, তাহা যাহাতে আর গ্রহণ করিতে না হয়—তাহার জন্য সেই শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিবার উপায় করিয়া যাই—যাহাতে সেই স্বদেশে গেলে যেন তাঁহার শ্রীচরণে স্থান পাইয়া—আর এই সংসার বিদেশে আসিতে হয় না। আমরা যে এই জ্ঞানটুকু মৃত্যু ও জন্মদ্বার দিয়া আসিতে আসিতে ভুলিয়া যাই—তাহা আমাদের সাধনার অভাবে। আমাদের স্মৃতি আমরা অনেক প্রকারে হারাই। প্রথমতঃ আহার শুদ্ধি। "আহার শুদ্ধৌতু" সত্ত্বশুদ্ধি—"সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতির্লম্ভে সর্ব্ব-গ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ" এই স্মৃতির প্রধান সহায় শুদ্ধ আহার। আহার মানে যে খাদ্য—দ্রব্য তাহা নয়। আমরা বাহিরের যে কোন জিনিষ ভিতরে লইয়া যাই তাহাই আহার। কতক শরীরের আহার,—যেমন অন্নাদি ভোজন, দুগ্ধাদি পান। আবার চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা, ত্বক্‌, এই সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা ভিতরের বিষয় গ্রহণ,—ইহা মনের আহার। যাহাতে এই উভয় বিধ শরীরের ও মনের আহার শুদ্ধ হয় তদ্বিষয়ে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া বালকদের বাল্যকাল হইতে শুদ্ধতা ও শৌচ রক্ষা করিতে বিশেষ যত্নপর হইতে হইবে। আমাদের শরীর রক্ষার জন্য যাহা বাহির হইতে শরীরের মধ্যে গ্রহণ করা যায়—তাহাই আহার। বায়ুভুক্‌ বলিয়া একটা কথা আছে। বায়ুই আমাদের সর্ব্ব প্রধান জীবন রক্ষার হেতু। বায়ু ব্যতীত আমরা বেশী ক্ষণ বাঁচিতে পারি না। আবার শুদ্ধ বায়ু না হইলে বাঁচিবার উপায় নাই। এই বায়ুই আমাদের প্রাণ। পঞ্চবায়ুই আমাদের প্রাণ। এই পঞ্চ বায়ু আবার উনপঞ্চাশ প্রকার বলিয়া কথিত আছে। বায়ু একই,—কেবল ক্রিয়ার ভেদে নানা নাম যুক্ত। পঞ্চ অন্তর্বায়ু—প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান। আমরা যাহাকে প্রাণময় কোষ বলিয়া থাকি তাহা এই এই পঞ্চপ্রাণ বা পঞ্চবায়ু ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়। বাক্য, পাণি, পাদ, উপস্থ ও পায়ু। প্রাণ বায়ুর স্থান হৃদয়। ইহা প্রতি দিবারাত্রিতে ২১৬০০ বার শ্বাস প্রশ্বাস রূপ কার্য্য করিতেছে ইহাকে অজপ্যা জপ করা বলে। ইহারই উপর আমাদের জীবন বা আয়ু। ইহারই গতি ইত্যাদি স্থির করিতে পারিলেই আমরা দীর্ঘায়ু হইতে পারি। অবশ্য অন্যান্য বায়ুও এ বিষয়ে সহায়ক, কিন্তু এই প্রাণ বায়ুর উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিলে উহা অন্যান্য বায়ুকে নিজ স্থানে রাখিয়া কার্য্য করায় ও আমাদিগকে দীর্ঘায়ু করায়। প্রাণ ও অপান বায়ুর গতি নিয়মিত করাকে প্রাণায়াম বলে। প্রাণ বায়ু উর্দ্ধ গমনশীল। অপান বায়ুর স্থান নাভির নিম্নে—গুহ্য দেশ পর্য্যন্ত। ইহা অধোগমনশীল ও ইহার দ্বারা মল মূত্র ত্যাগ হয়। সমান বায়ুর স্থান নাভিদেশ। আমরা যাহা কিছু আহার করি—সেই আহারের পরিপক রস নির্গত করিয়া নানাপ্রকার নাড়ী দ্বারা সর্ব্ব শরীরে লইয়া যাওয়া ইহার কার্য্য। আহার্য্য বস্তু পরিপাক করিয়া তাহা হইতে রস, রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস মজ্জা শুক্র প্রভৃতি প্রস্তুত করায়; ইহাই বায়ুর কার্য্য। সকলকে সমান ভাবে রাখিয়া শরীরের কার্য্য সম্পন্ন করে ও প্রাণ ও অপান বায়ুকে নিজ নিজ স্থানে রাখিয়া নিজে মধ্যে থাকিয়া মৃত্যুর সময় যখন প্রাণ ও অপান পরস্পর মিলিত হইতে চেষ্টা করে, সেই সময় সরিয়া যায়, প্রক্রিয়াহীন হয়, কিন্তু অন্যান্য

সময় প্রাণ ও অপানকে নিজ নিজ স্থানে রাখিয়া নিজে মধ্যে থাকে এই জন্য ইহার নাম সমান। উদান বায়ুর স্থান কণ্ঠ। আমরা যাহা কিছু পান করি বা ভক্ষণ করি—তাহাকে বিভাগ করিয়া দেওয়াই ইহার কার্য্য। ব্যান বায়ুর স্থান সর্ব্বাঙ্গ। সর্ব্বাঙ্গের সন্ধিস্থানের কার্য্য সর্ব্বনাড়ী—গমনশীল—সর্ব্ব শরীর স্থায়ী —এই বায়ুর কার্য্য। ক্ষয় ও পূরণ এই বায়ুর ক্রিয়া। এই পঞ্চ অন্ত বায়ু ও পঞ্চবহি বায়ু দ্বারা আমাদের শরীরের যতকিছু কার্য্য হইতেছে। ইহারা নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়। এই বায়ুর ক্রিয়া শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে—যথা,—প্রাণস্য বহির্গমনম্ অপানস্যাধোগমনং ব্যানস্য ব্যবসমাকুঞ্চর প্রসারণাদীনি সমানস্যাশিত পীতাদীনাং সমুন্নয়নম্ উদানস্যোর্দ্ধ নয়নম্।

উদ্গারে নাগ আখ্যাতঃ কূর্ম্ম উন্মীলনে স্মৃতঃ।
কৃকর ক্ষুৎকারো জ্ঞেয় দেবদত্তো বিজৃম্ভনে।
ন জহাতি মৃতঞ্চাপি সর্ব্বব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ॥

শ্রীধর গীতা।

বায়ু পঞ্চভূতের এক ভূত। কিন্তু ইহার সহিত অন্য চারি ভূত মিলিত আছে, তাহাদের গুণ এই প্রকার। যথা—বায়ুর মধ্যে যে আকাশ আছে তাহার গুণ প্রসারণ,—বায়ুর নিজগুণ ধাবন, তেজের গুণ বমন, জলের গুণ চারণ, পৃথিবীর গুণ আকুঞ্চন।

এই পঞ্চ বায়ুকেই প্রাণ বলা যায়।

এখন দেখা যাইতেছে যে বায়ুকে স্থির ও নিয়মিত করিতে পারিলেই আমরা সুস্থ, সবল ও দীর্ঘজীবি হইতে পারি। মন আমাদের বড়ই চঞ্চল। বিশেষ বালকদের মন বড়ই চঞ্চল। এই চঞ্চল মনকে যতই স্থির করিতে পারা যায়, ততই শান্তি আসে ও দুঃখের লাঘব হইয়া সুখ আসে। চঞ্চল মন যখন স্থির হয়, তখন তাহা বুদ্ধিবৃত্তি রূপে পরিণমিত হয়। যেমন তরঙ্গায়িত জলে চন্দ্রাদির প্রতিবিম্ব ঠিক দেখা যায় না, বহু খণ্ড বলিয়া ভ্রম হয়, সেইরূপ আমরা এই চঞ্চল মনে সকল আনন্দের আধার জ্ঞান স্বরূপ সেই ভগবানকে তাঁহার ছায়ারূপে দেখিতে পাইয়া চঞ্চল মনে কোন কাজ হয় না। মনকে স্থির করিয়া একাগ্র করিতে পারিলেই ইহা দ্বারা কার্য্য এমন কি অসাধ্য সাধনও হইয়া থাকে। যেমন সূর্য্যের কিরণ যখন সাধারণ ভাবে থাকে, তখন তাহার উত্তাপ কাহাকেও দগ্ধ করিতে পারে না। এমন কি সেই বিচ্ছিন্ন সূর্য্য কিরণ সমূহে উত্তাপ আছে বলিয়া বিশেষ বোধ হয় না। কিন্তু যদি কৌশল ক্রমে সেই বিচ্ছিন্ন কিরণ সমূহকে একমুখী করিতে পারা যায়, তবে তাহার কি প্রচণ্ড দাহিকা শক্তি উপস্থিত হয় দেখিতে পাওয়া যাইবে। একখণ্ড কাচ যাহার উভয় পৃষ্ঠই মধ্যস্থল ক্রম উচ্চ, তাহার যদি সূর্য্যের দিকে একখণ্ড কাগজ বা অন্য পদার্থ আনা যায়, তবে উহা উপরে ও নীচে লইয়া যাইতে যাইতে একটী এমন স্থানে আসিবে—যাহা ঐ কাচখণ্ডে পতিত কতকগুলি কিরণ এক পুঞ্জীকৃত করিয়াছে, সেইখানেই আসিবামাত্রই ঐ কাগজ খণ্ডটী পুড়িয়া যাইবে। যদি কতকগুলি কিরণ সমষ্টির এই শক্তি হয়, তবে আরও বেশী কিরণ সমষ্টির যে প্রচণ্ড দাহিকা শক্তি—তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। সেইরূপ আমাদের বিক্ষিপ্ত মনকে যতই পুঞ্জীকৃত করিতে পারিব, ততই তাহার শক্তি বৰ্দ্ধিত হইবে। অন্যান্য মনোবৃত্তি রুদ্ধ হইয়া বুদ্ধি বৃত্তিটী পুঞ্জীকৃত হইলে, তাহার অন্যান্য মুখ রুদ্ধ হইয়া গিয়া একটী মাত্র মুখ

নির্ব্বিকার পরমাত্মাত্মা সত্ত্বভূত গুণেন্দ্রিয়ৈঃ।
চৈতন্যে কারণং নিত্যো দ্রষ্টা পশ্যতি হি ক্রিয়াঃ॥
বায়ুঃ পিত্তং কফশ্চোক্তঃ শারীরো দোষসংগ্রহঃ।
মানসঃ পুনরুদ্দিষ্টো রজশ্চ তম এব চ॥
প্রশাম্যত্যৌষধৈঃ পূর্ব্বো দৈবযুক্তি ব্যপাশ্রয়ৈঃ।
মানসো জ্ঞান বিজ্ঞান ধৈর্য্য স্মৃতি সমাধিভিঃ॥

চরক সংহিতা।

শরীর ও মন ব্যাধিগণের আধার, আর কাল, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ার্থের যথাযোগ আরোগ্যের কারণ। পরমাত্মা নির্ব্বিকার এবং ইহার চৈতন্য সম্বন্ধে মন, ভূতগণ ও ইন্দ্রিয় সকল কারণ স্বরূপ। পরমাত্মা নিত্য, দ্রষ্টা এবং সাক্ষীস্বরূপ। বায়ু, পিত্ত ও কফ শরীরের দোষ এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ মনের দোষ। যাহা বিকারপ্রাপ্ত হইলে রোগ হয়, তাহাকে দোষ বলে। শারীরিক দোষ—দৈব যুক্তির দ্বারা শান্ত হয়, আর মনের দোষ—জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধৈর্য্য, স্মৃতি ও সমাধি দ্বারা শান্ত হয়।

বায়ু পিত্ত ও কফের সাম্যাবস্থায় শরীর নীরোগ থাকে ও এক দুই বা তিনের বৃদ্ধিতে ব্যাধি উৎপন্ন হয়। মনের মধ্যেও তিনগুণ খেলা করিতেছে, যখন ত্রিগুণের বাহিরে আসা যায়, তখনই পরমানন্দ লাভ হয়, আর যখন তমঃ গুণের মধ্যে থাকা যায়- তখন মোহ দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া নিদ্রা, প্রমাদ, আলস্যের অন্ধকার দ্বারা জ্ঞানকে আবৃত রাখা হয়, আর তমকে দমন করিয়া—রজঃকে আশ্রয় করিলে, সর্ব্বদা উৎসাহ লাভ—এ কার্য্য হইতে অন্য কার্য্য করে, আমরা সংসারে খুব বাহাদুরি করি—ইত্যাদি চেষ্টা হয়, ইহারও জ্ঞান আবৃত থাকে, কিন্তু সত্ত্ব নির্ম্মল ও প্রকাশক বলিয়া জ্ঞানকে প্রকাশ করেনা এবং যখন জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিকার হয়—তখন সত্ত্ব সরিয়া যান এবং তখন মনে লয় হইয়া গুণাতীত বা মুক্ত অবস্থা আইসে। শরীরের সহিত মনের খুব সম্বন্ধ। ইন্দ্রিয়গণ উভয়কে সাহায্য করে। শরীরকে ও মনকে ভাল দেখিতে হইলে, ইন্দ্রিয়গণকে বিপথে যাইতে না দিয়া সুপথে সবল রাখিতে পারিলেই উন্নতির পথে অগ্রগামী হওয়া যায়। কফ শরীরকে আশ্রয় করিয়া অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, পিত্তের ও বায়ুর ক্রিয়া বৃদ্ধি করিয়া জীবন নাশ করে। মৃত্যুকালে কফেরই এই কার্য্য। তমঃগুণ সেইরূপ মনকে প্রবিষ্ট অর্থাৎ সংসারে সুখী করাইয়া, পুনঃ পুনঃ যাতায়াতের কষ্টের কারণ হয়, এমন কি, মৃত্যুকালে তমঃ গুণকে মন অবলম্বন করিলে, পশ্বাদি—বৃক্ষাদি নীচ যোনীও প্রাপ্ত হয়। রজঃ গুণকে অবলম্বন করিয়া মরিলে এই সংসারেই থাকিতে হয়, আর সত্ত্ব গুণকে অবলম্বন করিয়া মরিলে স্বর্গাদি সুখকর লোক ভোগ হয়। মনের সত্ত্বগুণে স্থিতি কালই সুখের কাল। পিত্ত দ্বারা নানাপ্রকার কার্য্য হয়; ইহা রজোগুণের ন্যায়। আর বায়ু শরীরে সাম্যাবস্থায় থাকিলেই সুখ, এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে রোগ হয় বটে—কিন্তু বায়ু সুপথে চালিত হইলে শরীরকে ও মনকে সুস্থ রাখে ও দীর্ঘজীবনের সহায়তা করে। প্রথমে কফকে, পরে পিত্তকে শান্ত করিয়া আমাদের বায়ু লইয়া ক্রিয়াদি করিলেই সর্ব্ব রোগ নষ্ট ও দীর্ঘজীবন লাভ ও মৃত্যুকালে এই বায়ুকেই সুষুম্না মার্গ দিয়া লইয়া গিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র প্রাণব্যাপী এই বায়ুকে বহির্গত করিতে পারিলেই ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। এই বায়ুই আমাদের প্রাণ বা পঞ্চপ্রাণরূপে শরীরে নানা কার্য্য করিতেছে। এই বায়ু আমাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস রূপে জীবনকে রক্ষা করিতেছে, এই বায়ু যাহাতে নির্ম্মল ও পবিত্র হয় এবং আমরা

সর্ব্বদা দুর্গন্ধ বিহীন নির্ম্মল ও পবিত্র বায়ু শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করিতে পারি—তাহার চেষ্টা করি ও বালকগণকে সেইরূপ ভাবে শিক্ষা দিয়া তদ্ভাবে রাখি। পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে যে, আমরা দিবারাত্রে ২১৬০০ বায়ু শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করি। ২৪ ঘণ্টায় ১ দিন, ৬০ মিনিটে

$$\frac{২১৬০০}{২৪ \times ৬০} = ১৫$$

একঘণ্টা—অর্থাৎ প্রতি মিনিটে আমরা ১৫ বার শ্বাস প্রশ্বাস্ গ্রহণ ও ত্যাগ করি। প্রকৃতির আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, জীব একই সময়ে যত কম শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে সে—তত দীর্ঘজীবী হয়, আর যাহারা বেশী ত্যাগ ও গ্রহণ করে তাহারা অল্পায়ু হয়। কেবল যে কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে শ্বাস সংখ্যা কম হইলে প্রাণী দীর্ঘজীবি হয় তাহা নয়, উহা আবার অল্পায়ত অর্থাৎ হ্রাস হওয়া আবশ্যক। শ্বাস দীর্ঘ হইলে আয়ু কম হয়। পূর্ব্বে যে ২১৬০০ শ্বাসের কথা বলা হইয়াছে, ইহা অল্পায়ু কলির জীবের। পূর্ব্বে লোক দীর্ঘজীবি ছিল, সেই জন্য তাঁহাদের শ্বাস সংখ্যা প্রতি মিনিটে—১১।১২ ছিল, এখন আয়ু অল্প হইয়া পড়ায় উহা ১৫।১৬ হইয়া পড়িয়াছে। আমরা দেখিতে পাই—কুকুর, ছাগল প্রভৃতি প্রাণী খুব ঘন ঘন ও দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে ও খুব অল্পায়ু হয়। সর্প, ব্যাং, কচ্ছপ খুব কম ও অল্পায়ত শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ করে, সেই জন্য তাহারা সব জীব অপেক্ষা দীর্ঘজীবি হয়। পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্ত বাগীশ এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই অবলম্বন করিয়া লিখিতেছি ও তাঁহার লিখিত তালিকাটি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি যে, কোন জীব শ্বাস সংখ্যায় ও শ্বাস-আয়তনের অল্পতা হেতু কি প্রকার দীর্ঘজীবি হয়।

প্রাণী	প্রতি মিনিটের প্রায়িক শ্বাস সংখ্যা	প্রায়িক পরমায়ু বৎসর
শশ	৩৮।৩৯	৮
কপোত	৩৬।৩৭	৮।৯
বানর	৩১।৩২	২০।২১
কুক্কুর	২৮।২৯	১৩।১৪
ছাগল	২৩।২৪	১২।১৩
বিড়াল	২৪।২৫	১২।১৩
ঘোড়া	১৮।১৯	৪৮।৫০
মনুষ্য	১২।১৩	১০০
হস্তী	১১।১২	১০০
সর্প	৭।৮	১২০।১২২
কচ্ছপ	৪।৫	১৫০।৫৫

যাহাদের প্রতি মিনিটে শ্বাস সংখ্যা যত বেশী হয়, তাহাদের রক্ত সঞ্চালন ও ফুসফুসের ক্রিয়া তত বেশী হয় এবং শরীর বলবান, সুদৃঢ় ও বৃহৎ হইলেও আয়ু কম হইয়া পড়ে। ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে, আমরা যতই শ্বাস সংখ্যা প্রতি মিনিটে কম ও অল্পায়ত করিতে পারিব ততই দীর্ঘজীবি হইব ও তদ্বিপরীতে অল্পায়ু হইব। আমাদের শ্বাস সংখ্যা যে প্রতি মিনিটে বেশী হয়—কেবল—বেশী হয় তাহা নয়—উহা আরও দীর্ঘ হইয়া আমাদের আয়ু হ্রাস করে। সেই জন্য বালকদের বেশী দৌড়াদৌড়ি খেলা করিতে দেওয়া উচিত নয়। ফুটবল প্রভৃতি খেলা আমাদের দেশে আমাদের বালকের সর্ব্বনাশ করিতেছে—তাহা এই বায়ু তত্ত্বেই পর্য্যালোচনায় জানা যাইতেছে। ইংলণ্ডের ন্যায় শীত প্রধান দেশের উহা উপযোগী ও উহা সেখানকার মত মাংস খাদক সাহেবদের উপকারী বলিয়া উহা আমাদের দেশের

শাক-চচ্চড়ি-ভাত খাওয়া ও গ্রীষ্ম প্রধানদেশে বাস করা ও ক্রমশঃ হীনবীর্য্য বালকের পক্ষে কি উপযুক্ত হইবে? কলির ভীম শ্রীযুক্ত রামমূর্ত্তি বলেন যে, যে ব্যায়াম দ্বারা বেশী শ্বাস ক্ষয় হয়—তাহা শরীরকে বলবান করিলেও তাহা আয়ুকে হ্রাস করে। আমাদের দেশে যে ভাবে বালকেরা ফুটবল-ক্রিকেট প্রভৃতি দৌড়াদৌড়ি খেলা করে – তিনি তাহা আমাদের সম্পূর্ণ হানিকর বলেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, আমাদের দেশের পালোয়ানেরা যাহারা কেবল ব্যায়াম দ্বারা ও আহার দ্বারা শরীরকে বলবান করিয়াছে—শ্বাস রক্ষা বিষয় কিছুই চেষ্টা করা নাই—তাহারা ৩০।৩২ বৎসরের বেশী জীবিত থাকে নাই। ফুটবল অপেক্ষা ডন, বৈঠক, বার-একসারসাইজ, মুগুরভাঁজা, ডম্বল ভাঁজা, সেণ্ডোর মতে ব্যায়াম করা—অনেক ভাল, কিন্তু যাহাতে শ্বাস রোধ করিয়া ব্যায়াম করিতে হয় ও শ্বাস দীর্ঘ ও ঘন না হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রফেসার রামমূর্ত্তি বক্ষের উপর হস্তী দণ্ডায়মান করাইবার পূর্ব্বে একটী বক্তৃতা করেন, তাহাতে বলেন যে, উহা পশু বলের দ্বারা সাধিত হয়। উহাতে পবনের বলের আবশ্যক। আমাদের দেশে বলবানের আদর্শ ভীম ও হনুমান। উভয়কেই পবন পুত্র বলা হয়। তাঁহারা পবনকে আশ্রয় করিয়া তাহার দ্বারা সংসারে বড় হস্তীর বল ধারণ করিতেন। তিনি আরও বলিলেন যে, উহা বায়ু ধারণ ও চিত্ত বৃত্তি নিরোধ দ্বারা সমাহিত হয়। হস্তী বক্ষে চড়াইবার পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলাম। তিনি যখন সমভাবে একটা অপ্রশস্ত গদীর উপর শুইলেন, তখন স্থিরভাবে সর্ব্ব শরীর রাখিলেন, কেবল দুই পা নাড়িতে লাগিলেন। তখন তাঁহার বক্ষ ক্রমশঃ স্ফীত হইয়া উঠিল। তাহার পর যখন পায়ের নাড়া স্থির হইল, অমনি তাঁহার লোক তাহা দেখিয়া তাড়াতাড়ি তক্তাটা একটা গোদি দিয়া বুকের উপর দিল এবং সতর্ক ভাবে হস্তীকে বুকের উপর তক্তার উপর দিয়া চলিয়া যাইতে দিল। হস্তী যাইবার সময় যখন তক্তায় চারি পা দিল, তখন উহা বক্ষের উপর সমতল হইল, তৎক্ষণাৎ নামিয়া গেল। হস্তী নামিয়া যাইবামাত্রই তাহার অনুচরগণ তাঁহাকে যেন জোর করিয়া হাত যাহা বুকের উপর স্থাপিত ছিল খুলিয়া সরাইয়া দিল এবং উঁহাকে যেন ক্ষণিক অজ্ঞান অবস্থা হইতে উঠাইল। যেন তিনি ক্ষণিক সংজ্ঞাহীন ছিলেন এইরূপ বোধ হইল আমাদের বলের স্থান বক্ষ ও বায়ুই বল। বায়ুই আয়ু, বায়ুই জীবন বায়ুই সব। বায়ু স্থির হইলে মন স্থির হয়। চঞ্চল মন স্থির হইলে একাগ্র হইতে পারা যায় এবং একাগ্র মনের দ্বারা বুদ্ধিকে স্থির করিয়া সংসারে সকল বস্তুই লাভ করিতে পারা যায়। সকলেরই মূলে বায়ু। এই বায়ুকে সংযত করাই ভক্তি ও মুক্তির প্রধান উপায় ও উহা কেবল প্রাণায়াম দ্বারা হইতে পারে। প্রাণায়াম দ্বারা দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ কম হয় উহা ক্রমশঃ অল্পায়ত হয় এবং চিত্তকে স্থির করে। এই বায়ুই দুই নামে ইড়া পিঙ্গলায় চলিতেছে। কখন কোন নাড়ীতে চলিতেছে—ইহার জ্ঞান থাকা আবশ্যক কারণ কোন সময় কোন কার্য্য করিলে উপকার হইবে, কোন সময় অনিষ্ট হইবে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। যখন ইড়াতে বায়ু বহে তখন ভোজন করিলে উহা জীর্ণ হয় না, কিন্তু পিঙ্গলা বহন কালে ভোজন করিলে জীর্ণ হয়। প্রশ্বাসের বায়ু কি পরিমাণে বাহিরে আসে

তাহা জানা আবশ্যক। উহা যত বেশী পরিমাণ বাহিরে আইসে ততই আমাদের শরীরের ক্ষয় সম্পাদন করে। শরীরকে সুস্থ রাখিতে হইলে কেবল যে যাহাতে শরীরের উৎকর্ষতা লাভ হয়—এমন খাদ্যাদি ভোজন করিলে চলিবে না। উহার সর্ব্বপ্রকার ক্ষয় যথাসম্ভব নিবারণ করিতে হইবে। শুক্রক্ষয়ে শরীর যে শীঘ্রই পতনোন্মুখ হয়—তাহা কে না জানে? কিন্তু কই তাহা হইতে কে নিবারিত হয়? লোকে জানে যে, শুক্র ক্ষয়ে দেহ নাশ হয়, কিন্তু তাহা হইতে বিরত হয় না। এই জন্যই অর্জ্জুন শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

"অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥"

হে বৃষ্ণিকুল পাপ করিতে ইচ্ছা না করিলেও লোকে কাহা কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া যেন বলপূর্ব্বক নিয়োজিত হইয়াই পাপ আচরণ করে?

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেন মিহ বৈরিণম্॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, ইহা রজোগুণ জাত দুষ্পূরণীয় ও অত্যুগ্র কাম। সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি দ্বারা রজোগুণের ক্ষয় হইলে কাম জন্মে না এবং কোন কারণে বাধা পাইলে ক্রোধ রূপে পরিণত হয়। কাম মুক্তি মার্গের প্রধান শত্রু জানিও। তাহার পরে শ্রীভগবান্ কিরূপে কামকে দমন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সেই উপদেশ মত চলিতে পারিলে কাম দমিত হয় ও পাপাচরণ নিবৃত্ত হয়। প্রাণায়াম কামদনের প্রধান মুদ্গর।

শুক্র সর্ব্বধাতু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহার ক্ষয়ে যে শরীরে ভীষণ ক্ষয় হয় তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। ইহা সকল সময়ে ক্ষয় করিবার সুযোগ ও সময় হয় না, যখন হয় তখন ভীষণ ভাবে হয়। কিন্তু বায়ু অসংযমতায় যে ক্ষয় হইতেছে—তাহা অহরহঃ হইতেছে। আমরা কেহই ক্ষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখি না। কোন বিষয় বিচার করিয়া তাহার ভিতরে কি আছে না দেখিয়া সকলে যাহা ভাল বলে তাহাই বলি। আমি একদিন উকীল মহলে বলিলাম যে, আধুনিক হকি, ফুটবল প্রভৃতি খেলা আমাদের ছেলেদের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। অমনি সকলেই আমাকে ঠাট্টা করিলেন ও বলিলেন "ছেলেদের স্বাস্থ্য না খেলিলে কিসে ভাল হইবে? আমি নিজ পক্ষ সমর্থন জন্য দুই একটা কথা বলিতে চাহিলাম, কিন্তু উপহাসের অট্টহাসে আমাকে মৌন থাকিতে হইল। একে ছেলেদের মন সর্ব্বদা চঞ্চল, তাহার উপর বালস্তাবৎ ক্রীড়াশক্ত স্তরুণস্তাবৎ তরুণীলগ্নঃ। বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ পরমেব্রহ্মপি কোঽপিনলগ্নঃ সেই খেলায় বালকদিগকে উত্তেজিত করিলে তাহাদের মন সংযত করার ব্যবস্থায় একবারে জলাঞ্জলি দেয়। একদা একটী উকীলের দুইটি পুত্রের হৃদরোগ হইয়া পীড়া কঠিন হইয়া পড়িল। ডাক্তার দেখান হইল, কিছু ফল হইল বটে, কিন্তু বিপদের আশঙ্কা সম্পূর্ণ থাকিল। আজকাল ডাক্তারেরাও ভাল হার্টটনিক বলিয়া মকরধ্বজ ব্যবহার করেন, সেই মতে বহুবিজ্ঞ ডাক্তার শ্রীশবাবু অর্জ্জুনছালের রস দিয়া মকরধ্বজ ব্যবহারের ব্যবস্থা করিলেন। ডাক্তারি ঔষধ ও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কিছুদিন পরে বেশ উপকার বোধ হইল। বালক দুইটি এখন

নবাপন, তবে বেশীদিন সুচিকিৎসার সুনিয়মে ও সুপথ্যে না থাকিলে এ রোগ আরাম হইবে না। রোগের প্রবলাবস্থায় মানকরের বিখ্যাত কবিরাজ শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ গুপ্ত মহাশয়কে বালকদ্বয়কে দেখান হইলে তিনি বলিলেন যে, অতিরিক্ত দৌড়াদৌড়ি ও হকি খেলাই উহার কারণ। অত্যন্ত পরিশ্রমের পর বালকদ্বয় পিপাসায় থাকিতে না পারিয়া শীতল জল পান করিয়া এই কঠিন হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। কবিরাজ মহাশয়ের ঐ কথা শুনিয়া উক্ত উকীল বাবু আমাকে তৎপর দিন বলিলেন যে, "আপনি ঠিক বলিয়াছিলেন, বালকদের ফুটবল, হকি প্রভৃতি খেলা বড়ই অনিষ্টকর। কবিরাজ মহাশয় আমার ছেলেদের দেখিতে আসিয়া প্রথমে জিজ্ঞাসা করেন, ছেলেরা হকি কি ফুটবল খেলে কি না? বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি কি করিয়া জানিলেন যে, আমার ছেলেরা হকি ফুটবল খেলে। অতঃপর আর ছেলেদের ঐরূপ খেলিতে দিব না। আশা করি আমার উকীল বাবুর ন্যায় বালকদের অন্যান্য অভিভাবকদের চৈতন্য হইবে। তাঁহারা নিম্নলিখিত শ্লোক কয়টি পড়িয়া ভাবিবেন।

দেহাদ্বিনির্গতোবায়ুঃ স্বভাবাদ্দ্বাদশাঙ্গুলিঃ।
গায়নে ষোড়শাঙ্গুল্যো ভোজনে বিংশতি স্তথা॥
চতুর্বিংশাঙ্গুলিঃ পান্থে নিদ্রায়াং ত্রিংশদঙ্গুলিঃ।
মৈথুনে ষট্‌ত্রিংশদুক্তং ব্যায়ামেচ ততোধিকম্॥
স্বভাবেঽস্য গতেমূলে পরমায়ুঃ প্রবর্দ্ধতে চাস্তরোদগতে।
আয়ুঃক্ষয়োঽধিকে প্রোক্তো মারুতে চান্তরোদগতি॥

পবন বিজয়স্বরোদয়॥

প্রাণবায়ু দেহ হইতে বহির্গত হইয়া প্রশ্বাসে ১২ অঙ্গুলি বাহিরে যাওয়াই স্বাভাবিক, গান গাহিবার সময় ১৬ অঙ্গুলি, ভোজনের সময় ২০ অঙ্গুলি, দৌড়াইয়া গেলে বা বেশী পথ চলিলে ২৪ অঙ্গুলি, নিদ্রাকালে ৩০ অঙ্গুলি, মৈথুনে (ইহাতে অষ্ট প্রকার মৈথুন ধরা যাইতে পারে) ৩৬ অঙ্গুলি, এবং ব্যায়ামকালে তদপেক্ষাও অধিক পরিমাণে প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। যে ব্যক্তি যত স্বাভাবিক অর্থাৎ ১২ অঙ্গুলি বহির্গতি ঠিক রাখিতে পারেন, তিনিই পরমায়ু বৃদ্ধি করিতে পারেন। আর যদি প্রাণবায়ুর বহির্গতি অর্থাৎ প্রশ্বাস দীর্ঘ হয়, তবে উহা যতই দীর্ঘ হইবে ততই আমাদের প্রাণনাশ শীঘ্র হইবে। এই জন্য প্রশ্বাসের প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যদি কোন কারণে উহা অস্বাভাবিক অর্থাৎ দ্বাদশাঙ্গুলির বেশী হয়, তবে প্রাণায়াম ক্রিয়া দ্বারা ঐ দ্বাদশাঙ্গুলিকেও শ্বাস ও প্রশ্বাসের মাত্রা কমাইয়া দিয়া সেই ক্ষয় পূরণ করিতে হইবে। আমাদের পালোয়ান হওয়ার আবশ্যক নাই যে, ব্যায়াম দ্বারা শরীরকে ক্ষয় করিয়া শরীরকে দৃঢ় করিতে হইবে। প্রাণায়াম ক্রিয়া দ্বারা শরীর অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ হইবে, শরীরের ক্ষয়কে নিবৃত্তি করিবে, মনের চাঞ্চল্য দূর করিয়া মনকে একাগ্র করিবে, বুদ্ধি বৃত্তিকে সতেজ তীক্ষ্ণ ও একাগ্র ও শুদ্ধ করিবে, শরীরকে নীরোগ রাখিবে, কামকে দমন করিবে, আমাদিগকে দীর্ঘজীবি করিবে, শরীরে শীঘ্র কোনো রোগ থাকিতে দিবে না,—যদি আসে শীঘ্র দূর করিয়া দিবে এবং ইহকালে আনন্দ দান করিয়া পরকালে সেই পরম রমণীয়কে দর্শন বা তাহার সহিত মিলিত করিবে। (ক্রমশঃ)

মুষ্টিযোগ ও টোটকা।

—-:০:--—

(কবিরাজ শ্রীসুধাংশু ভূষণ সেনগুপ্ত।)

পুরাতনজ্বর।—(১) নিমপাতা, উচ্ছেপাতা, কালতুলসীর পাতা ও গোল মরিচ—সমস্ত দ্রব্য সমান ভাগে বাটিয়া ছোলার মত বটিকা করিবে। প্রাতঃকালে ইহার একটি করিয়া বটিকা চোনার সহিত সেবনের ব্যবস্থা করিলে কয়েকদিন মধ্যে বিষম জ্বর প্রশমিত হয়। (২) গোলমরিচ, নাটার শাঁস ও গুলঞ্চ—প্রত্যেক দ্রব্য ১ তোলা ও চিতামূল চূর্ণ ৩ তোলা, একত্র মিশাইয়া দুই আনা বা চারি আনা মাত্রায় প্রাতঃকালে সেবন করিলে বিষম জ্বর বিনষ্ট হয়। (৩) চিরতা, গুলঞ্চ ও পিপুল—প্রত্যেক দ্রব্য চূর্ণ করিয়া, সমান ভাগে মিশাইয়া লইবে। প্রাতঃকালে ইহা দুই আনা হইতে চারি আনা পর্য্যন্ত মাত্রায় বিষম জ্বরে সেবন করিলে উপকার দর্শিয়া থাকে। (৪ ক্ষেৎপাপড়ার রস ১ তোলা ও শিউলির পাতার রস ১ তোলা—গরম করিয়া মধুর সহিত সেবনে বিষম জ্বর নষ্ট হইয়া থাকে। (৫) আদার রস, গুলঞ্চের রস, সিউলিপাতার রস, ক্ষেৎপাপড়ার রস—প্রত্যেকটি অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় লইয়া গরম করিয়া, প্রাতে ও বৈকালে ১ বার করিয়া সেবন করিলে পুরাতন জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে। (৬) গুলঞ্চ, ক্ষেৎপাপড়া, বেলপাতা ও শিউলিপাতা—প্রত্যেক দ্রব্যের পরিমাণ ১ তোলা। সমস্ত দ্রব্য একত্র কুটিয়া আগুনে গরম করিয়া যে রস বাহির হইবে, তাহা মধুর সহিত মিশাইয়া সেবনে জীর্ণ জ্বর নষ্ট হইয়া থাকে। (৭) আপাংয়ের রস অথবা অপরাজিতার রসের নস্য লইলে পুরাতন জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে। (৮) কণ্টকারী তেউড়ী, কেশুরিয়া, ক্ষেৎপাপড়া ও মুথা—প্রত্যেক দ্রব্য ।৵১০ আনা ওজনে লইয়া, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া, সেই কাথে কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া কয়েকদিন পান করিলে, পুরাতন জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে।

রক্তাতীসারে। (১) আম, জাম ও আমলকীর পাতার রস প্রত্যেকটি ।৵১০ ওজনে লইয়া কিঞ্চিৎ মধু বা চিনির সহিত মিশাইয়া কয়েকদিন সেবনে রক্তাতীসার প্রশমিত হয়। (২) কুড়চির ছাল, দাড়িম ফলের খোসা, মুথা, বেলশুঁঠ ও ধাইফুল—প্রত্যেক দ্রব্য ।৵১০ ওজনে লইয়া, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া, সেই কাথ সেবনে রক্তাতীসার প্রশমিত হয়। (৩) জায়ফলের গুঁড়া, লবঙ্গের গুঁড়া, জীরাভাজার গুঁড়া ও সোহাগার খই—ইহাদের চূর্ণ সমানভাগে মিশাইয়া, প্রাতঃকালে চারি আনা পরিমিত এই ঔষধে অল্প মধু দিয়া সেবন করিলে প্রবল আমাতীসার আরোগ্য হইয়া থাকে। (৪) কেবল মাত্র কুড়চির ছাল ২ তোলা, জল আধসের, শেষ ৵০ পোয়া—এই কাথে একটু মধু মিশাইয়া কয়েকদিন পান করিলেও প্রবল আমাতীসার আরোগ্য হইয়া থাকে।

অতীসারে। (১) জায়ফল বাটিয়া নাভিতে প্রলেপ দিলে অতি প্রবল অতীসারও আরোগ্য

হইয়া থাকে। (২) বেলশুঁঠ ও আমের আঁটির শাঁস—সমান ভাগে গুঁড়া করিয়া মিশাইয়া অল্প চিনির সহিত সেবনে অতীসার প্রশমিত হইয়া থাকে। (৩) বাবলা গাছের কচি পাতার রস ১ তোলা করিয়া কয়েকদিন সেবনে অতীসার আরোগ্য হইয়া থাকে। (৪) কর্পূর, সাজিমাটী ও গোলমরিচ—প্রত্যেকটি অর্দ্ধ আনা, এই দ্রব্য কয়টি শীতল জল সহ বাটিয়া সেবন করিলে অতীসার রোগীর শূল বেদনা আরোগ্য হইয়া থাকে।

আমাশয় রোগে। (১) পেয়ারার কচি পাতার রস চারি আনা পরিমাণে দিবসে ১ বার করিয়া সেবনে আমাশয় রোগ নিবারিত হয়। (২) গন্ধভাদুল্যার রস ২ তোলা অল্প মধুর সহিত পান করিলে আমাশয় রোগ প্রশমিত হয়। (৩) আমরুল পাতার রস অর্দ্ধছটাক প্রাতে এবং বৈকালে পান করিলে আমাশয় রোগ প্রশমিত হয়। (৪) কুক্‌সিম পাতার রস অর্দ্ধ ছটাক একটু চিনির সহিত সেবনে আমাশয় রোগ সদ্যঃ আরোগ্য হইয়া থাকে। (৫) কচি বনমূলা পাতার রস অর্দ্ধ ছটাক করিয়া কয়েকদিন চিনির সহিত প্রাতঃকালে পান করিলেও আমাশয় রোগ প্রশমিত হয়।

রক্তামাশয় রোগে। (১) বাবলা গাছের কচি কুঁড়ি।০ আনা—চিনির সহিত বাটিয়া প্রাতে ও বৈকালে একবার করিয়া সেবন করিলে রক্তামাশয়রোগে বিশেষ ফল দর্শিয়া থাকে। (২) আমরুলের শিকড় চারি আনা—গোল মরিচ আড়াইটা, জীরা আড়াইটা—একত্র বাসি জলের সহিত বাটিয়া ৩।৪ দিন সেবন করিলে রক্তামাশয় রোগ প্রশমিত হয়। (৩) দূর্ব্বার রস ১ তোলা করিয়া কয়েকদিন সেবন করিলে রক্তামাশয় রোগ প্রশমিত হয়। (৪) কচি দাড়িমের পাতার রস ১ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত কয়েকদিন সেবন করিলে রক্তামাশয় রোগ প্রশমিত হয়।

গ্রহণী রোগে। (১) পাকা কয়েদ বেলের পাতা মিছরির সহিত মিশাইয়া সমস্তদিনে ২।৩ বার সেবনে গ্রহণী রোগ বিনষ্ট হয়। (২) শ্বেত চন্দন ও কর্পূর—একত্র পিষিয়া লইয়া নাভিমূলে প্রলেপ দিলে গ্রহণী রোগে উপকার দর্শিয়া থাকে। (৩) মুথা ও লবঙ্গ প্রত্যেক দ্রব্য।০ আনা লইয়া উত্তমরূপে পিষিয়া লইবে। তাহার পর উহা অগ্নি সন্তাপে গরম করিয়া মধুর সহিত সেবন করিলে গ্রহণী রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

অর্শ রোগে। (১) হরীতকীর গুঁড়া ৷৷০ তোলা ও চিনি ৷৷০ তোলা জলের সহিত শয়নকালে সেবনে অর্শরোগ নিবারিত হয়। (২) মাখন ও মিছরি প্রত্যেক দ্রব্য ২ তোলা, নাগেশ্বর ফুলের রেণু ৷৷০ তোলা একত্র মিশাইয়া কয়েকদিন সেবনে অর্শ উপশমিত হয়। (৩) উচ্ছে পাতার রস মধুর সহিত প্রাতঃকালে সেবনে অর্শ রোগের শান্তি হইয়া থাকে। (৪) বনআদা ও আদা সমান ভাগে বাটিয়া সেবনে অর্শরোগের শান্তি হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

শিশু চিকিৎসায় সহজ ব্যবস্থা।

(কবিরাজ শ্রীযামিনী ভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ, এম বি)

শ্বাসের কষ্টে।—শ্বাসের কষ্ট নিবারণ করিবার জন্য আমড়া পোড়াইয়া তাহার খোসার পরেই যে সার পদার্থ থাকে, তাহা ও পুরাতন ঘৃত একত্র মিশাইয়া বক্ষঃস্থলে মালিশ করিলে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। শিশুদিগের বুকে সর্দ্দি বসিলে ইহার প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। সমস্ত দিনে ৩ বার মালিশ করিতে হইবে। শুষ্ক শ্লেষ্মা সরল করিবার পক্ষে ইহা অমোঘ ঔষধ।

ঘুংরিতে।—শিশুদিগের বুকে সর্দ্দি বসিয়া বিশেষ কষ্টদায়ক হইয়া উঠিলে, আদার রস ও মধু—সমান ভাগে লইয়া অগ্নি সন্তাপে আদার রস শুকাইয়া, শুধু মধু মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিবে। ইহা সমস্ত দিনে ২।৩ বার অল্প অল্প করিয়া সেবন করাইলে প্রবল ঘুংরি রোগে মন্ত্রশক্তির মত ফল পাওয়া যায়। শিশুদিগের ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া বা ব্রণকাইটিসে—যেখানে অনেক ঔষধ ব্যর্থ হইয়া থাকে, সেখানেও এই ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ ফল দর্শিয়া থাকে।

সর্দ্দিতে।—শিশুর সর্দ্দিতে খাঁটি সরিষার তৈল গরম করিয়া দুই পায়ের তলায় রাত্রিতে উত্তমরূপে মালিশ করিলে উপকার দর্শিয়া থাকে। পিঁপুলের গুঁড়া ও মধু, তুলসীর রস ও মধু, আদার রস ও মধু—এইরূপ অবস্থায় বিশেষ উপকারী।

ক্রিমিতে।—পালিধামাদারের পাতার রসে অল্প মধু বা চিনি মিশাইয়া প্রাতঃকালে একবার করিয়া সেবনের ব্যবস্থা করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। রসের পরিমাণ ১ বৎসরের শিশুর পক্ষে ১ ঝিনুকের এক অষ্টমাংশ;—ঐ হিসাবে মাত্রা বাড়াইয়া ১০।১২ বৎসরের বালককে এক ঝিনুক পর্য্যন্ত সেবন করান চলে। ১ বৎসরের কম বয়স্ক শিশুর পক্ষে বিড়ঙ্গ চূর্ণ ও মধু উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। মাত্রা ১ বৎসর পর্য্যন্ত এক রতি বা দুই গ্রেণের এক চতুর্থাংশ। ক্রিমির সহিত পেটের দোষ থাকিলে টাট্‌কা কালমেঘের রস ও মধু ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। এক্সট্রাক্ট কালমেঘ অপেক্ষা কাঁচা কালমেঘে সদ্যঃ উপকার দর্শে। কালমেঘের বড়ি করিয়া সেবন করাইলেও কাঁচা কালমেঘের মত ফল পাওয়া যায়।

অতীসারে।—সোহাগার খই শিশুর অতীসার নিবারণের মহৌষধ। বাজার হইতে সোহাগা কিনিয়া আগুনে পোড়াইয়া লইলেই খই প্রস্তুত হইবে। ১ বৎসরের কম বয়স্ক শিশুকে এই খই অর্দ্ধ রতি একটু চিনি কিম্বা মধুর সহিত মিশাইয়া প্রাতে একবার করিয়া সেবন করাইতে হয়। অতীসার দোষ অধিক থাকিলে প্রাতে ও বৈকালে ২ বার করিয়াও সেবন করান চলে। ১ বৎসরের পর ৩ বৎসর বয়স্ক শিশুকে ইহা ১ রতি মাত্রায় প্রয়োগ করিতে হয়। তাহার পর বয়স বিবেচনায় মাত্রা নির্ণয় করিতে হইবে।

কোষ্ঠবদ্ধতায়।—যষ্টিমধুর গুঁড়া গরম দুগ্ধের সহিত সেবন করাইলে শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতায়

উপকার দর্শে। ১ বৎসর বয়স্ক শিশুর জন্য ১ বতি, ঐ হিসাবে মাত্রা বাড়াইতে হয়।

অজীর্ণে :—শিশুর অজীর্ণ দোষ নিবারণের জন্য এক মাত্র চূণের জলই মহৌষধ। অজীর্ণ নিবন্ধন শিশুর যখন দুধ তোলা রোগ উপস্থিত হয়, তখন ইহা প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। শিশুর দুধ তোলা রোগে এ ব্যবস্থায় ফল পাওয়া না যাইলে, আম্রকেশী, খই ও সৈন্ধব লবণ ইহাদের চূর্ণ সমান ভাগে লইয়া মধুর সহিত মিশাইয়া অল্প অল্প লেহন করাইলে উপকার দর্শিয়া থাকে।

চক্ষু উঠা রোগে।—সেওড়ার আটায় কাজল পাতিয়া চক্ষুতে সেই কাজলের অঞ্জন দিলে উহা আরোগ্য হইয়া থাকে।

তড়কায়। শিশুর তড়কায় চেতনা সম্পাদনের জন্য একখানি হরিদ্রা আগুনে উত্তপ্ত করিয়া কপালে অল্প তাপ দিলে চেতনা সম্পাদিত হয়। যদি ইহাতে চৈতন্য সঞ্চার না হয়, তাহা হইলে নিশাদল ও চূণ একত্র মিশাইয়া শিশুর নাসিকার নিকট ধরিলে চৈতন্য সঞ্চারিত হয়। শিশুর তড়কা অনেক কারণে উপস্থিত হয়। জ্বর বেশী হওয়ার জন্য তড়কা হইলে, চোখে মুখে ও মাথায় ঠাণ্ডা জলের ছাট দিবে। দুর্ব্বলতার জন্য তড়কা হইলে কিছু বেশী পরিমাণে রাইসরিষার গুঁড়া গরম জলের সহিত মিশাইয়া, ঐ জলে একটি পাত্র পূর্ণ করিয়া, তাহাতে হাঁটু পর্য্যন্ত শিশুর পা ডুবাইয়া রাখিবে। এইভাবে কিয়ৎকাল রাখার পর ময়দা ও রাই সরিষার গুঁড়া একত্র জলে মিশাইয়া লইয়া—শিশুর দুই পায়ের ডিমে উহার পটি বসাইয়া দিবে এবং হাতে, পায়ে ও বগলে আগুনের সেঁক দিবে, হাতে, পায়ে ও বুকে শুঁঠের গুঁড়া মালিশ করিবে। ক্রিমি জন্য তড়কায় গরম জল পূর্ণ একটি পাত্রে শিশুর গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখা উপকারী। এরূপ করিয়া আধ হাত উচ্চ স্থান হইতে মস্তকে শীতল জল ঢালিতে হয়। এইরূপ ব্যবস্থায় শিশু যখন সুস্থ হইবে, তখন দুগ্ধের সহিত এরণ্ড তৈল সেবন করাইয়া—দাস্ত করান উপকারী। সকল প্রকার তড়কাতেই দাস্ত পরিষ্কারের প্রতি লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

ধনুষ্টঙ্কারে।—তড়কা নিবারণের জন্য যে সকল উপায় বিধি বলা হইল, সেই সকল উপায় বিধি অবলম্বনে ধনুষ্টঙ্কারেও ফল পাওয়া যায়। ইহার পর মাতৃস্তনা পান করিতে দেওয়া উচিত। যে পর্য্যন্ত স্তন্যপানের শক্তি না জন্মায়, সে পর্য্যন্ত স্তনদুগ্ধ গালিয়া লইয়া ঝিনুকে পূর্ণ করিয়া পান করান কর্ত্তব্য। এই অবস্থায় উদরে শীতল জল সেচন এবং তার্পিন তৈল ও এরণ্ড তৈল একত্র মিশাইয়া উদরে মালিশ করিলে ফল পাওয়া যায়।

মুখের ঘায়ে। -সোহাগার খই—মধুর সহিত মিশাইয়া মুখে লাগাইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ভেড়ার দুগ্ধ লাগান এই অবস্থায় উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা।

কাণপাকায়।—শিশুর কাণ পাকিয়া পুঁয নির্গত হইতে থাকিলে গরম জল কিম্বা কাঁচা দুগ্ধ ও জলসহ পিচ কারির সাহায্যে কর্ণ ধৌত করিয়া তাহার পর উত্তমরূপে উহা মুছাইয়া দিয়া ২।৩ ফোঁটা আতর কর্ণ মধ্যে ঢালিয়া দিলে উহা আরোগ্য হইয়া থাকে। ফট্‌কিরির জলের ফুট দিলে কিম্বা আলতা গরম করিয়া তাহার ফুট দিলেও কাণপাকা রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

পান দোষ।

—:*:—

(শ্রীযোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।)

যে সকল কারণে আমাদের দেশের স্বাস্থ্য ও আর্থিক অবস্থা ক্রমশই মন্দ হইতেছে, অধিকাংশ লোকের অল্পাধিক পরিমাণে মদ্য-পানে অভ্যস্ততা তৎসমুদয়ের অন্যতম। কত কাল যাবত যে এ দেশ সুরাকুহকিনীর কুহক জালে সমাচ্ছন্ন, বিশেষজ্ঞগণই তাহা বলিতে পারেন। যাহার মায়ায় ভুলিয়া শতসহস্র লোক অহরহঃ অজস্র অর্থ অনায়াসে অপব্যয় করিতেছে,—নানারোগে আক্রান্ত হইয়া অশেষ ক্লেশভোগ করিতেছে, ধর্ম্ম কর্ম্মে অনাসক্ত হইতেছে, সেই সুরা-মায়ারূপীর মায়া পাশ যথাসম্ভব সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট না হইলে দেশোন্নতির আশা কিছুতেই করা যাইতে পারেনা।

মানবমাত্রেই কোন না কোন ধর্ম্মাবলম্বী এবং প্রায় সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই মদ্যপান মহাপাপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মনুসংহিতায় লিখিত হইয়াছে।—

"ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বাঙ্গনাগমঃ।
মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃসহ॥"

মনুসংহিতা ১১শ অঃ ৫৫ শ্লোক।

"ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য, গুরুপত্নী-গমন এবং তাদৃশ দোষীদের সহিত সংসর্গ এই পাঁচটি মহাপাতক বলিয়া কথিত হইয়াছে।'

ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতির ন্যায় সুরা-পানও মহাপাপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, শিক্ষিত অশিক্ষিত শতসহস্র হিন্দু জানিয়া শুনিয়া সেই মহাপাপ বহুকাল যাবৎ করিয়া আসিতেছেন।

ধর্ম্মপুস্তকে মদ্যপানের বিধি না থাকিলেও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীগণের মধ্যেও অনেকেই অনেক দিন হইতে সুধাভ্রমে সুরা-বিষ গলাধঃ-করণ করিয়া আসিতেছে। যাহারা ধর্ম্মমত মানে না, মদ্যপানরূপ ঘৃণাকর্ম্ম করিতে ভ্রমেও যাহারা বিরত হয় না, উচ্চ-শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভব, ধনবান হইলেও তাহারা কিছুতেই সজ্জনের শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারে না। যাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতে পশ্চাৎপদ হয় না, কিছুতেই তাহারা প্রকৃত সুখের অধিকারী হইয়া সময় যাপন করিতে পারে না।—কখনও তাহাদের—মন, ভয়, সংশয় ও বিষাদশূন্য হয় না।

সজ্জন মাত্রেই সুরাপানের অপক্ষপাতী। কিন্তু কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, চিকিৎসক গণ রোগবিশেষে ও অবস্থাভেদে পরিমিত মাত্রায় সুরাপানের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। এ কথা সত্য হইলেও ইহা অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে, কেহ কোন একটি অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইলে, উহা পরিত্যাগ করা তাহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠে। কারণ সকলেই অভ্যাসের দাস। যদি কেহ পরিমিত মাত্রায় পানাভ্যস্ত হয়, তবে সে কস্মিনকালেও উহা ত্যাগ করিতে পারে না। বরঞ্চ ঐ অভ্যাস দিন দিন বৃদ্ধিই পাইতে থাকে। যাঁহারা পানাসক্ত নহেন, এমন কি সুরা স্পর্শও করেন না এবং যাঁহারা ব্যবস্থামত পরিমিত ভাবে উহা পানে অভ্যস্ত হন, তাঁহাদের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক পার্থক্য ইহাই লক্ষিত

হয় যে, প্রথোমোক্ত ব্যক্তিগণ চিরকাল স্বাস্থ্য সুখ উপভোগ করেন এবং শেষোক্ত লোকেরা ক্রমে পরিমিত হইতে অপরিমিত মাত্রায় পানাভ্যস্ত হইয়া স্বাস্থ্য, সম্মান, অর্থ ইত্যাদি নষ্ট করিয়া থাকেন.। ইহা বুঝিয়াই অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ সকলকেই পানাসক্ত হইতে নিষেধ করিয়াছেন। চরক সংহিতায় লিখিত হইয়াছে :—

'নিবৃত্তঃ সর্ব্বমদোভ্যো নরো যঃ স্যাজ্জিতেন্দ্রিয়ঃ।
শারীরৈর্ম্মানসৈ ধীমান বিকারৈর্ণ সংযুজ্যতে।'

চরক সংহিতা।

"যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার মদ্য হইতে নিবৃত্ত থাকেন এবং জিতেন্দ্রিয়, তিনি কখন শারীরিক বা মানসিক রোগগ্রস্ত হন না।"

সুরাপানের ন্যায় সুরাদান ও গ্রহণও অন্যায়। কারণ উহা দান করিলে গ্রহীতাকে এবং গ্রহণ করিলে নিজেকে কিংবা অপরকে পানে প্রলোভিত করা হয়। ইহার ফলে সকলকেই রোগ যাতনা ভোগ করিতে হয়।

শীতপ্রধান দেশের লোকগণ মদ্যপানে বিশেষভাবে অভ্যস্ত বটে, কিন্তু সেই দেশের প্রসিদ্ধ চিকিৎসকবৃন্দ ইহার ঘোর অনিষ্টকারিতা স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। চিকিৎসকপ্রবর শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস এম, বি, মহাশয় তাঁহার 'স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে' বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তারগণের যে সকল যুক্তিপূর্ণ মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা হইতে দুই চারিটা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।—

'সুরা মানুষকে প্রথমতঃ বালকরূপে এবং অবশেষে পশুরূপে পরিণত করে।'

'পরিমিত মদ্যপান পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্য না করিয়া বরং বিঘ্ন জন্মায়।'

'কোন মানুষ বলিতে পারে না কখন সে সীমা অতিক্রম করে। সে আপনাকে পরিমিত পায়ী মনে করিতে পারে, অথচ যে পরিমাণ তাহার দেহ সহ্য করিতে পারে, তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক প্রতিদিন পান করিতেছে এবং তাহার দরুণ দেহের কোন অংশ ধীরে ধীরে রোগগ্রস্ত হইতেছে। পরিমিত পায়ীর আপাততঃ বিপদ না হইতে পারে, কিন্তু বিপদের সম্পূর্ণ আশঙ্কা রহিয়াছে। (স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ৮৫ পৃঃ)।

আমাদের দেশের বর্ত্তমান সময়ে অনেক অভিজ্ঞ ডাক্তার-কবিরাজই মদ্য বিষবৎ বলিয়া মত প্রকার করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া দেশ বিদেশের নীতি শাস্ত্রজ্ঞগণও ইহার অনিষ্টকারিতা বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বাবু জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কৃত 'হরিদাসী' উপন্যাস, এদেশে আরও অনেক লেখকের, ও Mr. Hal Cane, Mrs. Henry Wood প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখক-লেখিকার উপন্যাস ও Mr. Todd প্রভৃতির গ্রন্থ পাঠ করিলে মদ্যপানের অনিষ্টকারিতা সুন্দররূপে অবগত হওয়া যায়।

দেশ বিদেশের সজ্জনমাত্রেই সুরাপানের বিষময় ফল প্রকৃষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত অধিকাংশ লোক জানিয়া শুনিয়াও কেন যে সেই সুরা অমৃতভ্রমে পান করিয়া প্রকৃত সুখে বঞ্চিত হইয়া থাকে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা মৎসদৃশ ক্ষুদ্রবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তির সাধ্যাতীত।

এই দুর্দ্দিনেও মদ্যপায়ীর সংখ্যা কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। গত ১৯১৮ সালে একমাত্র কলিকাতা সহরে যে পরিমাণ মদ্য বিক্রীত হইয়াছে, তাহার মাসিক হিসাব সংবাদ পত্র

হইতে উদ্ধৃত হইল;—জানুয়ারী—১ লক্ষ ৯ হাজার ৪০ সের; ফেব্রুয়ারি—১ লক্ষ ১২ হাজার ১৩০ সের, মার্চ—১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৩৩৫ সের, এপ্রিল—৮৮ হাজার ৪২৫ সের, মে—১ লক্ষ ৮ হাজার ৮১৫ সের; জুন—১ লক্ষ ১৬ হাজার ৭৮০ সের; জুলাই—১ লক্ষ ১২ হাজার ২৫ সের; আগষ্ট—১ লক্ষ ১৩ হাজার ৫২৫ সের; সেপ্টেম্বর—১ লক্ষ ২৮ হাজার ৬৩৫ সের; অক্টোবর—১ লক্ষ ৪৯ হাজার ৮৩৫ সের; নবেম্বর—১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৫৫৫ সের; ডিসেম্বর—১ লক্ষ ৪২ হাজার ৩৬৫ সের। এই হিসাব পাঠ করিয়া অন্যান্য স্থানের বিক্রীত মদের পরিমাণ এবং দেশের কত লোক কু অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়া কত অর্থ অপব্যয় করিয়া থাকে, তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। এই দারুণ দুর্ভিক্ষের দিনেও যদি লোকের চৈতন্যোদয় না হয়, তবে আর কখন হইবে?

আমেরিকার প্রায় সকল অঞ্চল সুরা-রাক্ষসীর করাল কবল হইতে চিরমুক্ত হইয়াছে। ইহার ফলে সে সকল স্থানের গরীব অধিবাসীরা (যাহারা পূর্ব্বে মদ্যপানে মত্ত থাকিত) অল্পদিনের মধ্যেই বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে। সাধু নিহাল সিং লিখিয়াছেন। 'Wharever alcohol has been banished in America, proverty and dependance upon charity has been reduced homes shows signs of affluence, the deposits in banks especially saving banks have risen and facilities for education have increased.' (Modern Review, May 1919).

আমেরিকাবাসী যদি বিষবৎ মদ্য পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়, তবে আমাদের দেশের লোকেরা তাহা পারিবেনা কেন? সমাজের নেতাদের মধ্যে অনেকেই অনেক কারণে অকারণে সামাজিক শাসনে শাসিত করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা কি মদ্যপায়ীকে ধর্ম্ম ও নীতি বিরুদ্ধাচরণকারীকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিয়া সমাজের কল্যাণসাধন করিতে পারেন না? পানদোষ প্রভৃতির বিলোপ সাধন করিতে না করিলে যে সমাজের উন্নতি কিছুতেই হইতে পারে না, তাহা কি ভ্রমেও চিন্তা করেন না? পানদোষ নিবারণে যদি তাঁহারা বিশেষ যত্নবান না হন, তবে তাঁহাদের সমাজপতি বলিয়া গর্ব্বানুভব করা বৃথা। পানদোষদুষ্ট লোকদিগকে সামাজিক শাসনে শাসিত করিয়া সমাজের উন্নতি সাধন করা তাঁহাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ যাহা অদেয়, অপেয় অগ্রাহ্য বলিয়াছেন, দেশ বিদেশের অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও নীতিপরায়ণ লোকগণ যাহার অপকারিতা বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যাহা পানে ধর্ম্ম, অর্থ, স্বাস্থ্য সকলই লুপ্ত হয় আমেরিকার অধিকাংশ অধিবাসী কর্ত্তৃক যাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহা—এই সুরা যাহাতে দেশ হইতে চিরকালের নিমিত্ত বর্জ্জিত হয় তাহা করা, দেশকল্যাণকামী সকলেরই প্রধান কর্ত্তব্য।

সুরা-কুহকিনীর কুহকজাল সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করিয়া দেশের কল্যাণ সাধন করিতে হইলে, দেশ হিতৈষীবৃন্দের এবিষয়ে সংবাদ পত্রে দুই এক পংক্তি লিখিলে কিম্বা অবসর সময়ে সভা সমিতিতে যৎকামাত্র বক্তৃতা প্রদান করিলে চলিবে না। খোস মেজাজি সাহিত্যে উপাসকগণ একাল ও সেকালের কবিদের সমালোচনায়, ভাষা-সংস্কারকগণ বানান সম্বন্ধে

প্রভৃতি বিষয়ে এবং দেশনায়কবৃন্দ স্বায়ত্ব শাসনের দাবীরূপে আন্দোলনে সময় যাপন করিলে মদ্যপগণের পানাভ্যাস অপনীত হইবে না, দেশবাসী রোগ, দৈন্যাদির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। ইহা নিবারণার্থ তাঁহারা সবিশেষ যত্নবান হন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

—:*:—

মহীশূরে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা।—মহীশূরে আয়ুর্ব্বেদ কলেজের উন্নতি ও সংস্কার কল্পে মহীশূর গবর্ণমেণ্ট ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহারা ঐ কলেজের আয়তন বৃদ্ধির জন্য ৭০ হাজার টাকা এবং প্রাথমিক খরচে জন্য ১২ হাজার ১ শত টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এ ব্যবস্থায় আমরা সুখী হইয়াছি।

নূতন চিকিৎসা প্রণালী।—"ত্রিপুরা হিতৈষীতে" প্রকাশ, মেদিনীপুর জজকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়—এ্যালোপাথিক ডাক্তার ছিলেন। সম্প্রতি তিনি এ্যালাপাথিক চিকিৎসা প্রণালী পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন প্রণালীতে রোগ চিকিৎসা করিতেছেন। তিনি কোন ঔষধের ব্যবস্থা করেন না। তিনি মানসিক ক্রিয়া দ্বারা রোগীর মনে এক প্রকার শক্তি সঞ্চার করেন। তিনি এই চিকিৎসা প্রণালীর সাহায্যে—ত্রিপুরা, দিল্লী, আগ্রার অনেক রোগীকে রোগমুক্ত করিয়াছেন। যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এ সংবাদে কিছু আশ্চর্য্য হইবেন না।

রোগ ও দুর্ভিক্ষ।—ভারতে যেমন দুর্ভিক্ষ বাড়িয়াছে, সকল প্রকার রোগও তেমনি সমগ্র ভারত জুড়িয়া বসিয়াছে। ফলতঃ খাদ্য দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতা নিবন্ধন ভারতবাসী যথোপযুক্ত আহার্য্য না পাওয়াই ভারতবাসীর রোগ বৃদ্ধির কারণ বলিয়া আমরা মনে করি। সহযোগী "হিন্দুস্থান" গত ২৯শে শ্রাবণের সংখ্যায় "কি ছিল, কি হইয়াছে!" শীর্ষক প্রবন্ধে একশত বৎসর পূর্ব্বে, ৬৬ বৎসর পূর্ব্বে এবং ৩০।৩২ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য কিরূপ ছিল, নজীরসহ যাহা প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, একশত বৎসর পূর্ব্বে বালাম চাউলের মোন ১৷৵০ ছিল, উত্তম গব্য ঘৃত ২০৲ ছিল, মাঝারি গব্য ঘৃত ১৬৲ টাকায় বিক্রীত হইত, ভয়েসা ঘৃতের মোন ছিল ১৬৲। ৬৬ বৎসর পূর্ব্বে চাউলের মোন ছিল ১।০, কলাইয়ের মোন ছিল ৷৷০ আনা, ৩০।৩২ বৎসর পূর্ব্বে চাউলের মূল্য ছিল টাকায় অর্দ্ধ মোন, খাঁটি সরিষার তৈলের মূল্য ছিল চারি আনা সের। গব্য ঘৃত তখনও টাকায় পাঁচ পোয়া দরে এবং খাঁটি দুগ্ধ টাকায় ষোল সের দরে বিক্রীত হইত। এখন লোকে আগের অপেক্ষা অর্থ উপার্জ্জন অনেক বেশী করিতেছে বটে, কিন্তু দুর্ম্মূল্যতা নিবন্ধন পর্য্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। আমাদের দেশের রোগ বৃদ্ধির সকল কারণ গুলির মধ্যে ইহাই যে সর্ব্বপ্রধান—ইহা নিশ্চিত রূপে বলা যাইতে পারে।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

১ম বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৬—কার্ত্তিক। | ২য় সংখ্যা।

বঙ্গে বিজয়া।

—:০:—

(শ্রীইন্দুভূষণ সেন গুপ্ত)

থেমে গেল কোলাহল, শান্ত পল্লীগুলি,
নগরী মুখরী পুনঃ তুলি' শত বুলি।
কর্ম্মগত জীব পুনঃ করমে মগন,
বিশ্ববাসী পুনঃ যেন আগেরি মতন।
ক্ষীণ কণ্ঠে আলাপন তাই 'সাহানার'—
জানাইছে দিন ওগো আজি বিজয়ার।

(কিন্তু) কে বির্জিত—কে বিজেতা? বঙ্গে তা' তো নাই,
কিসের আনন্দ তবে আজি মোরা পাই?
'রামের' বিজয়োৎসব 'রাবণ' নিধনে,—
মোদের বিজয়োৎসব 'রোগে'র পীড়নে!
লেলিহান লোল জিহ্বা বিস্তারি' রসনা—
গ্রাসিতেছে 'ম্যালেরিয়া' বিকট বদনা।

'ইনফ্লুয়েঞ্জা' ভয়ঙ্করী নাশিতেছে বঙ্গ,
'কলেরা বসন্ত' আসি' করিতেছে রঙ্গ!

কত শিশু অকালেতে ছাড়িছে ধরণী,
'যক্ষ্মা'য় মরিছে কত যুবতী ঘরণী।
বঙ্গবাসী মরে যত—এমন মরণ,
কোনো দেশে কোনো কালে হয়না কখন।

রোগের বিষম জ্বালা দৈত্য অবতংস,
কেবা আগুয়ান বল করিবারে ধ্বংস ?
তবে কেন বিজয়ার বাজিবে বাজনা ?
বিজয়া নাহিক বঙ্গে—কেবল বেদনা!
বিজয়া উৎসবে মত্ত হইব তখন,
রোগাসুর দেশ হ'তে যাইবে যখন।

কাজের কথা।

বাঙ্গালায় ব্যাধি—সোনার বাঙ্গালা শ্মশান হইতে বসিয়াছে। পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়ায় অসংখ্য লোক মরিতেছে, সহরে যক্ষ্মায় যথেষ্ট লোকক্ষয় ঘটিতেছে। ইহা ছাড়া প্লেগ, কলেরা, বসন্ত, প্রভৃতি সাময়িক ব্যাধিতে লোকক্ষয় তো আছেই! তাহার উপর গত বৎসর ইনফ্লুয়েঞ্জা-নিউমোনিয়া নামক দুরন্ত ব্যাধি করাল-বদনব্যাদানে যেরূপ অগণিত লোকক্ষয় করিয়াছে, তাহাতে উহার পুনরাক্রমণ ঘটিলে সত্য সত্যই বাঙ্গালা দেশ যে শ্মশান সদৃশ হইয়া পড়িবে, ইহা সুনিশ্চিত। ফল কথা বঙ্গভূমি যেরূপ ব্যাধিপ্রবণ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে আমাদের সকল চিন্তা অপেক্ষা সর্ব্বাগ্রে আত্মরক্ষার চিন্তা করা প্রধান কর্ত্তব্য। দেশ রক্ষার অধিনায়ক—সরকারী স্বাস্থ্য কর্ম্মচারিগণ অবশ্য এজন্য বিশেষ চিন্তা করিতেছেন, কিন্তু শুধু তাঁহাদের চিন্তায় নির্ভর করিলে চলিবে না,—প্রত্যেক দেশবাসীকেই ইহার প্রতীকারকল্পে সচেষ্ট হইতে হইবে।

* * * *

উপায় চিন্তন—প্রতীকারকল্পে সচেষ্ট হইতে হইলে বাঙ্গালীকে সর্ব্ব প্রথম সংযমব্রত শিক্ষা করিতে হইবে। সেই সংযম ব্রত শিক্ষার অভাবেই তো বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে, ইহা নির্ভেজাল সত্য কথা। বাঙ্গালীর ছেলেকে হাতে খড়ি দেওয়ানর পর হইতে তাহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিভূষণে ভূষিত করিবার জন্য বাঙ্গালীজনক যেরূপ চেষ্টাশীল হইয়া থাকেন, তাহাকে সংযমব্রত শিক্ষা দিবার জন্য সেরূপ চেষ্টা করিয়া থাকেন কি? স্কুল কলেজেও যেরূপ শিক্ষা দিবার

ব্যবস্থা, তাহাতে সেখানেও সেরূপ কোনো শিক্ষা দানের বন্দোবস্ত নাই! কাজেই বাঙ্গালী সংযমী হইবে কেমন করিয়া! বাঙ্গালী বিদ্যো-পার্জ্জন করে—অর্থ উপার্জ্জনের জন্য,—জ্ঞানার্জ্জনের কামনায় বা সংযমী হইবার আকাঙ্ক্ষায় বাঙ্গালী বিদ্যা শিক্ষা করে না,—কাজেই স্বাস্থ্য রক্ষার মূল যে ধর্ম্মপ্রবণতা—বাঙ্গালী তাহা মানিতে পারে না, বাঙ্গালীর রোগবাহুল্যের কারণই ইহাই।

* * *

অনুকরণে অনিষ্ট—বাঙ্গালী-বালক প্রাথমিক শিক্ষাকাল হইতে কোনো ধর্ম্মমূলক শিক্ষা প্রাপ্তির সুযোগ তো প্রাপ্ত হয়ই না, তা' ছাড়া অনুকরণে অনিষ্ট উৎপাদন করিবার শিক্ষাটি বাঙ্গালী-বালক নানা প্রকারে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বাঙ্গালী পিতা প্রাতে স্নানাহ্নিক করিবার পূর্ব্বেই গরম গরম চায়ের পেয়ালা লইয়া নিস্তেজ দেহখানিকে ক্ষণেকের জন্য সবল করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন, বাঙ্গালী-শিশুও তাহার প্রসাদলাভে বঞ্চিত হয় না। চায়ের মত উগ্র দ্রব্য ব্যবহারে ইংলণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে উপকার হইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালা দেশ যে গ্রীষ্মের উর্ব্বর ভূমি,—এদেশের লোকের পক্ষে চায়ের মত উগ্র দ্রব্য ব্যবহারে পাকস্থালীর ক্রিয়ার ব্যত্যয় স্বভাবতঃই হইবার কথা। বাঙ্গালী-পিতা বহুকালজাত মৌতাতে এতই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে, জানিয়া শুনিয়াও তাহার পক্ষে আর এ নেশার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই—বাঙ্গালী-শিশুও কিন্তু সে কথা শুনিল না,—তাহাকে সে কথা কেহ বুঝাইলও না,—ফলে সাহেবদের অনুকরণে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে চায়ের মত দ্রব্য প্রবেশ করিয়া বাঙ্গালীর যে কি সর্ব্বনাশই করিতেছে তাহা বুঝাইতে গেলে একখানি প্রকাণ্ড পুঁথি হইয়া পড়ে!

* * *

আহারে স্বাস্থ্যপালন—আহারের সহিত স্বাস্থ্যরক্ষার সম্বন্ধ যে সুসংবদ্ধ, সে কথা আমরা অনেক বারই বলিয়াছি। বাঙ্গালী যখন সে কথা মানিত, তখন বঙ্গভূমি রোগের আকরভূমি হয় নাই। আর্য্যশাস্ত্রে যে স্বস্থবৃত্তির ব্যবস্থা ছিল, বাঙ্গালী আগে তাহার প্রত্যেক বিষয় পালন করিত। প্রাভাতিক স্নান পূজা আহ্নিকের ব্যবস্থায় যে স্বতঃই স্বাস্থ্যরক্ষা হইয়া থাকে, এ কথা কি এখনকার বাঙ্গালী মানিতে চাহেন? আগেকার বাঙ্গালী কিন্তু স্নানাহ্নিকে দেহ ও চিত্তশুদ্ধি না করিয়া কোনো দ্রব্য আহার করিতেন না। প্রাভাতিক স্নান ও পূজা আহ্নিক সমাপনের পর বাঙ্গালীর যে জলযোগের ব্যবস্থা ছিল, তাহার মধ্যে প্রধান দ্রব্য থাকিত—আদা ও ছোলা ভিজা,—এ কথা আমরা অনেকবারই বলিয়াছি। ফলে আদায় ক্ষুধা বৃদ্ধির কার্য্য করিত, পাকস্থালীর ক্রিয়া সুপরিষ্কৃত হইত; আর ছোলাভিজা ভক্ষণে পিত্ত প্রশমনের কার্য্য করিত। তাহার পর মাধ্যাহ্নিক আহারেও বাঙ্গালী যে সকল দ্রব্য আহার করিত, তাহার মধ্যে দুগ্ধ ঘৃতাদি পুষ্টিকর খাদ্যসকলের ব্যবস্থা থাকিত। এখন সে দুগ্ধ ঘৃতাদি একরূপ দুষ্প্রাপ্যই হইয়া পড়িয়াছে অনেকের ঐ দুইটি দ্রব্য খাইবার প্রবৃত্তিও নষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গালী এখন সূর্য্যোদয় হইতে না হইতেই শয্যা ত্যাগের পূর্ব্বেই চায়ের জন্য ব্যতিব্যস্ত, মাধ্যাহ্নিক আহারের সময় দুগ্ধ ঘৃতের পরিবর্ত্তে কতকগুলি অসার দ্রব্য ভক্ষণে অভ্যস্ত! তাহার উপর বাঙ্গালী ধর্ম্ম শিক্ষা বর্জ্জিত,

কাজেই চিত্তসংযমেও তাহার শিক্ষা নাই, সকল দেশের অপেক্ষা বাঙ্গালী অধিক রোগ-প্রবণ হইবে না তো হইবে কাহারা? সকল দেশের লোকের অপেক্ষা বাঙ্গালীর মৃত্যুও তো এই জন্য অধিক।

* * *

ব্রহ্মচর্য্য পালন—ইহার উপর বাঙ্গালীর ব্রহ্মচর্য্যপালনের শিক্ষা একেবারেই নাই। চিত্ত সংযমের শিক্ষা বাঙ্গালী প্রাপ্ত হয় নাই, কাজেই ব্রহ্মচর্য্যপালনের শিক্ষা সে পাইবে কোথা হইতে? ফলে ব্রহ্মচর্য্যপালনের শিক্ষা না থাকায় "মরণং বিন্দুপাতেন"—এ কথা বাঙ্গালী এখন আর মানিতে চাহে না। পূর্ব্বে বাল্যজীবনে তো ব্রহ্মচর্য্যপালনের ব্যবস্থা বিশেষ ভাবেই পালন করা হইত, তা'ছাড়া পরিণত বয়সেও তিথি-নক্ষত্র দেখিয়া, পর্ব্বদিন বাছিয়া তবে স্ত্রী-পুংমিলনের ব্যবস্থা হইত। এখন সে ব্যবস্থা একেবারেই তিরোহিত হইয়াছে। বাঙ্গালী যে ফুসফুসের পীড়ায় সকল পীড়া অপেক্ষা অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে, ইহার একমাত্র কারণই সংযমের অভাব। একে পুষ্টিকর আহার্য্য বাঙ্গালী আহার করিতে পায় না, তাহার উপর শুক্রক্ষয় জনিত অসংযমী বাঙ্গালীর পাকস্থালীর ক্রিয়া সহজেই বিকৃত হইয়া উঠিতেছে। সেই পাকস্থালীর ক্রিয়ার বিকৃতির ফলেই বাঙ্গালীর হৃদপিণ্ড দুর্ব্বল হইয়া বাঙ্গালীর দেহ নানা রোগের আকার-ভূমি হইয়া পড়িতেছে। বাঙ্গালী যতদিন এ সকল কথা না বুঝিবে, ততদিন যে বাঙ্গালীর মঙ্গল নাই—ইহা সুনিশ্চিত।

* * *

বাঙ্গালী রমণী—বাঙ্গালী-রমণীদিগের স্বাস্থ্যও নানা কারণে ভগ্নপ্রবণা হইয়া উঠিতেছে। বাঙ্গালী-পুরুষের চিত্তসংযমের শিক্ষা নাই, কুসুম কোমল প্রাণা মহিলা জাতি সে শিক্ষা পাইবে কোথা হইতে? তাহার উপর এখনকার বাঙ্গালী-পুরুষ নিজেদের বাবুয়ানীর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে গিয়া তাঁহাদের অঙ্কলক্ষ্মীদিগকেও এক একটি আদর্শ বিলাসিনী গড়িয়া তুলিতেছেন! তাহারই ফলে বাঙ্গালী-মহিলাগণ একেবারে শ্রম-বিমুখা হইয়া পড়িতেছেন। পূর্ব্বেকার বাঙ্গালী-রমণীগণ শ্রমবিমুখা ছিলেন না, তাঁহারা অতি প্রত্যূষে শয্যা পরিত্যাগের পরেই গৃহস্থলীর কর্ম্ম সকলে মনোভিনিবেশ করিতেন। সেই গৃহস্থলীর কর্ম্ম সম্পাদনেই তাঁহাদের পরিশ্রমের কার্য্য সম্পন্ন হইত। এখনকার অধিকাংশ বাঙ্গালী-রমণীকেই গৃহস্থলীর কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হয় না,—দাস-দাসীতে সে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া থাকে। তাহার উপর নাটক নবেলের মত আদিরস ঘটিত পুস্তকগুলি পাঠে চিত্ত সংযমের প্রবৃত্তি তাঁহাদের একেবারেই তিরোহিত হইয়া থাকে। ফলে আলস্য-পরতন্ত্রতাই এখনকার অধিকাংশ বাঙ্গালী-রমণীর যে স্বাস্থ্যহানির কারণ—ইহা অবিসংবাদিত—সত্য কথা। কিন্তু বাঙ্গালী-পুরুষ এ সকল কথা না বুঝিলে বাঙ্গালী রমণীকে রক্ষা করিবার উপায় কিছুতেই হইবে না।

আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস।

—:০:—

(মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন সরস্বতী এম এ, এল, এম্, এস্)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(ক) অগস্ত্য সংহিতা—মহর্ষি অগস্ত্য ইহার প্রণেতা বলিয়া কথিত। বঙ্গসেন বলেন, এই গ্রন্থ অবলম্বনে তিনি তাঁহার সংগ্রহ রচনা করিয়াছেন। দক্ষিণাপথে আয়ুর্ব্বেদ প্রচার প্রসঙ্গেও অগস্ত্য সংহিতার বিষয় লিখিত হইবে।

(খ) কৌপালিক তন্ত্র—ইহা কৌপালিকের রচিত শল্যতন্ত্র প্রধান গ্রন্থ।

অশ্ব, গজ ও গো-চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক প্রাচীন সংহিতা ছিল। তন্মধ্যে তিন খানির পরিচয় লিখিত হইতেছে।

(১) শালিহোত্র সংহিতা। ইহা অশ্ব চিকিৎসার গ্রন্থ এবং এক্ষণে দুর্লভ হইলেও সুপ্রসিদ্ধ ছিল। পূর্ব্বে আরবেরা এই গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া "শালাটোর" নাম দিয়াছিল। এই সংহিতা অবলম্বনে লিখিত নকুলকৃত এবং জয়দত্তসূরিকৃত "অশ্ববৈদ্যক" এক্ষণে এসিয়াটিক সোসাইটী কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

(২) পালকাপ্য সংহিতা। ইহা হস্তি চিকিৎসা বিষয়ক সুমহান গ্রন্থ। ইহা পুণ্যপত্তনের আনন্দাশ্রমের অধ্যক্ষ কর্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে। ভগবান পালকাপ্য মুনি অঙ্গাধিপ রোমপাদ নৃপতিকে এই শাস্ত্রের উপদেশ দিয়াছিলেন।

(৩) গোতম সংহিতা—ইহা গো-চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ ছিল। এক্ষণে দুর্লভ হইয়াছে।

বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ—বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে মূল গ্রন্থ এখন কিছুই পাওয়া যায় না। শাঙ্গর্ধর কৃত সংগ্রহের "উপবন বিনোদ" নামক অংশ বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ বিষয়ক। তদ্ব্যতীত অগ্নিপুরাণ, বৃহৎ সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে বৃক্ষায়ুর্ব্বেদের অতি অসম্পূর্ণ অংশ দেখিতে পাওয়া যায়।

দক্ষিণাপথে আয়ুর্ব্বেদ প্রচার—আর্য্যগণের বিহার ক্ষেত্র আর্য্যাবর্ত্তে আয়ুর্ব্বেদের এইরূপ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণাপথেও আর্য্যগণ কর্ত্তৃক আয়ুর্ব্বেদ প্রচারিত হইয়াছিল। আমাদের অনুমান হয়, ভরদ্বাজ ঋষি ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া মর্ত্ত্যে প্রচার করিবার পর আত্রেয় আর্য্যাবর্ত্তে এবং অগস্ত্য দক্ষিণাপথে আয়ুর্ব্বেদ প্রচার করেন। মতান্তরে অগস্ত্য ধন্বন্তরির শিষ্য বলিয়াও প্রসিদ্ধি আছে। অগস্ত্যপ্রণীত অগস্ত্য সংহিতা এবং তদানুসারী 'অগস্ত্যসম্প্রদায়' নামক চিকিৎসকগণ এক সময়ে দক্ষিণাপথে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক আচার্য্য কোন মতে ১৮ জন, কোন মতে ২২ জন এবং কোন মতে ৪৪ জন। ইঁহারা সংস্কৃত এবং দ্রাবিড় ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে অনেক গ্রন্থ দক্ষিণ ভারতে এখনও পাওয়া যায়। পরে গ্রন্থ পরিচয় প্রসঙ্গে উহাদের বিষয় লিখিত হইবে।

মহর্ষি অগস্ত্য কতকাল পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা এ পর্য্যন্ত কোন ঐতিহাসিক নির্ণয় করিতে পারেন নাই। কেহ

কেহ ইঁহাকে রামায়ণে কথিত অগস্ত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন*।

এই আর্ষযুগ বা সংহিতা যুগকে আয়ুর্ব্বেদের মধ্যাহ্নকাল বলা যাইতে পারে। এই সময়ে অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন অন্যান্য দেশ ভারতীয় জ্ঞান-জ্যোতিতে আলোকিত হইয়া উঠিতেছিল। এই সময়েই আর্য্যাবর্ত্ত বহিষ্কৃত অনেক ব্রাত্য ক্ষত্রিয় নানা দেশে গিয়া ভারতীয় জ্ঞানালোক চ্ছটা উন্মেষিত করিয়াছিলেন—বিষ্ণুপুরাণাদিতে এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়।

সংগ্রহকাল—কালক্রমে আর্য্যজ্যোতিঃ ক্ষীণ হইতে আর্ষজ্ঞানাধিকারী নবাভ্যুদিত বৌদ্ধাচার্য্যগণ নূতন ধর্ম্মপ্রচারের সঙ্গে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মহাদেশের নানা দূরদূরান্তর প্রদেশে ভারতীয় জ্ঞান সম্পদ বিতরণ করেন। এইরূপে আরবদেশ, মিশ্রদেশ (ইজিপ্ট), গ্রীস, রোম, চীন, যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশ ক্রমে ভারতীয় জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। গ্রীস দেশীয় পণ্ডিতগণ যে য়ুরোপের গুরুস্থানীয় তাহা পাশ্চাত্যগণ এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সেই গ্রীসদেশীয় পণ্ডিতগণ যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা পরম্পরাক্রমে ভারতের শিষ্য—ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। কি পরিতাপের বিষয় যে য়ুরোপের গুরুর গুরু সেই ভারতবর্ষ আজ ভাগ্যবিপর্য্যয়ে নানা বিষয়ে য়ুরোপের নিকট জ্ঞান ভিক্ষা করিতেছে! কিন্তু আমরা পরে ইহাও দেখাইব যে, আয়ুর্ব্বেদের অনেক তত্ত্ব আজও পাশ্চাত্যগণের অবিদিত ও শিক্ষণীয়।

আরবদেশীয়গণ যে ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট হইতে জ্ঞানলাভ করিয়াছিল, "অলবরুণ প্রণীত আরবদেশীয় ইতিহাসে তাহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। খ্রীষ্টিয় অষ্টম শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ সম্রাট "হরুণ-উল-রসিদের" রাজত্বকালে 'শরক' (চরক), 'সস্রদ' (সুশ্রুত), 'নেদান' (নিদান) এবং অগদতন্ত্র ও কোমারভৃত্যাদি বিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থ আরব ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। 'মঙ্খ' নামক জনৈক ভারতীয় চিকিৎসক উক্ত যবন সম্রাটকে কঠিন রোগ হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহার সভায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। আয়ুর্ব্বেদের অনুগ্রহেই সৌশ্রুত মতানুযায়ী বাত-পিত্ত-কফ-শোণিত বর্ণনা, সিরাবেধ প্রণালী, সিরাবেধের বহুল প্রচার, মরিচ, যষ্টিমধু, লাক্ষা, গুগ্‌গুল্ প্রভৃতি ভারতীয় ঔষধের বহুশঃ প্রয়োগ এখনও যাবনিক বা য়ুনানী চিকিৎসা শাস্ত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

চীনদেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রেও আয়ুর্ব্বেদের বীজ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। 'ইৎসিঙ্গ' নামক চীনদেশীয় পরিব্রাজক বলেন, আয়ুর্ব্বেদের বাত-পিত্ত-কফ-শোণিত বর্ণনা চীনদেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে দেখা যায়, ভারতীয় বহু ভেষজও চীনদেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে গৃহীত হইয়াছে।

এইরূপে আয়ুর্ব্বেদের বহুল প্রচার হইবার পরে, সংগ্রহকালে কিরূপে আয়ুর্ব্বেদের অবনতি ঘটিয়াছিল এক্ষণে আমরা সংক্ষেপে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এই প্রসঙ্গে প্রতিসংস্কর্ত্তা, সংগ্রহকার ও টীকাকারদিগের নাম মাত্র উল্লেখ করিয়া পরে উঁহাদিগের বিস্তৃত পরিচয় লিখিত হইবে।

* দক্ষিণাপথে আয়ুর্ব্বেদ প্রচার সম্বন্ধে মান্দ্রাজ নিবাসী আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য মহোদয় বৈদ্যরত্ন পণ্ডিত ডিঃ গোপালচার্লু মহাশয়ের নিকট হইতে এই বিষয়ে অনেকসংবাদ পাইয়াছি, সেজন্য তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ রহিলাম।

কালক্রমে দুর্দ্দৈববশে চিরন্তন বৈদিক আচার গৌরব হীয়মান হইলে ভারতপ্রভাকর বৌদ্ধ দুর্দ্দিনাচ্ছন্ন হইয়া ক্ষীণজ্যোতিঃ হইয়াছিল। সেই সময়ে অকালবজ্রনির্ঘাতের ন্যায় জ্ঞানাজ্জনবিঘ্নভূত শক, হূণ এবং যবনাদি জাতির উৎপাত আরম্ভ হয়। খ্রীষ্ট জন্মের ৩২৭ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীসদেশীয় সম্রাট "অলিকসন্দর" ভারত আক্রমণ করেন। এই আক্রমণের ফলে দেশে মহা বিপ্লব উপস্থিত হয়। দুর্ভিক্ষ এবং গৃহ দাহবশতঃ অসংখ্য প্রজা ও বহু গ্রন্থ নষ্ট হইয়া যায়। "অলিকসন্দর" স্বদেশে প্রত্যাগমন কালে "সেলুকস্" নামক গ্রীকবীরকে বিজিত দেশ শাসন করিবার জন্য রাখিয়া যান। সেলুকস্ ভারত হইতে বিবিধ গ্রন্থ, বিশেষতঃ বহু চিকিৎসাগ্রন্থ স্বদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি ও তাঁহার প্রভু অলিকসন্দর উভয়েই ভারতীয় চিকিৎসানৈপুণ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সেলুকস্ মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনকালে "মিগস্থিনিস' নামক গ্রীকচিকিৎসককে ভারতীয় বিদ্যাশিক্ষার জন্য চন্দ্রগুপ্তের সভায় রাখিয়া যান। ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, গ্রীকগণ ভারত হইতে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত এবং তৎপুত্র বিন্দুসারের মৃত্যুর পরে তদানীং ক্রূরপ্রকৃতি অশোক বহু রাজপুত্র এবং রাজবংশীয়দিগকে বিনষ্ট করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন (২৬৪ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ) অশোকের রাজ্যপ্রাপ্তি কাল হইতে তিনবৎসর পর্য্যন্ত ভীষণ অন্তর্বিপ্লব ঘটিয়াছিল এবং তাহাতে লক্ষ লক্ষ প্রজা বিনষ্ট হইয়াছিল। এই সময়ে শত শত অমূল্য গ্রন্থও নষ্ট হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। অনন্তর উপগুপ্ত নামক বৌদ্ধাচার্য্য কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া অশোক পরম ধর্ম্মিষ্ঠ হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি চীন গ্রীসাদি বহু দূরদেশে বৌদ্ধ শ্রমণগণকে প্রেরণ করিয়া সেই সকল দেশে ধর্ম্ম ও জ্ঞানালোক বিতরণ করেন। চিকিৎসা বৌদ্ধগণের একটী প্রধান ধর্ম্মানুষ্ঠান। অতএব সে সময়ে আয়ুর্ব্বেদ কিঞ্চিৎ হীনপ্রভ হইলেও উহা যে পরহিতব্রত শ্রমণগণ কর্ত্তৃক যবনাদি দেশে বহুলভাবে প্রচারিত হইয়াছিল সে বিষয় সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে এই সময়ে রাজাজ্ঞায় শবব্যবচ্ছেদাদি নিষিদ্ধ হওয়ায় শারীরশাস্ত্রেরও বিশেষ অবনতি ঘটিয়াছিল।

অনন্তর মৌর্য্যবংশ হীন পরাক্রম হইলে (১৮৬ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে) 'পার্থি' নামক গ্রীক জাতি এবং শক নামক বর্ব্বর জাতি পুনঃ পুনঃ ভারত আক্রমণ করিয়া সিন্ধু নদ হইতে সাকেতপুর পর্য্যন্ত দেশে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল। এই সময়ে 'মিলিন্দ' নামক জনৈক গ্রীক পঞ্চনদ প্রদেশ জয় করিয়াছিল। মগধ দেশে সুঙ্গবংশীয় পুষ্পমিত্র মৌর্য্যবংশীয় বৃহদ্রথকে বিনাশ করিয়া তাঁহার রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিল। নিরন্তর এইরূপ যুদ্ধবিগ্রহ হওয়ায় সে সময়ে সমস্ত আর্য্য শাস্ত্রের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে আয়ুর্ব্বেদেরও যথেষ্ট অবনতি ঘটিয়াছিল।

পুষ্পমিত্র রাজা হইবার পরে কিছু দিনের জন্য দেশব্যাপী বিপ্লব কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়াছিল। এই সময়ে ভগবান পতঞ্জলি বিশীর্ণপ্রায় অগ্নিবেশ সংহিতার প্রতিসংস্কার করিয়াছিলেন। আমরা পরে দেখাইব যে এই পতঞ্জলিই চরক নামে বিখ্যাত। বৌদ্ধাচার্য্য নাগার্জ্জুনও এই সময়ে সুশ্রুত সংহিতার প্রতিসংস্কার করিয়াছিলেন। এই সকল ঘটনা প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

শকজাতি কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হইয়া ভারতীয় রাজগণ হীনবল হইলে কুশাণবংশীয় কনিষ্ক নামক মহা প্রতাপ শকনরপতি হিমাচল হইতে বিন্ধ্যগিরি পর্য্যন্ত ভারতের সমস্ত উত্তর পশ্চিমার্দ্ধ জয় করেন। ইহার পর তিন শত বৎসর দেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই সময়েই চরকসংহিতার অঙ্গহানি ঘটিয়াছিল এবং কাশ্মীর দেশীয় দৃঢ়বলাচার্য্য তাহার পূরণ করেন।

ইহার পর পঙ্গপালের ন্যায় বহু সংখ্যক হূণ ও শক সৈন্য ভারত আক্রমণ করিয়া বিষম বিপ্লব উপস্থিত করে। ইহার কিছুকাল পরে খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৫৭ অব্দে মালবাধিপতি বিক্রমাদিত্য শকদিগকে জয় করিয়া উজ্জয়িনী হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপিত করেন। এই সময় হইতে প্রায় পঞ্চ শত বর্ষকাল দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

রাজা বিক্রমাদিত্য এবং তদ্বংশীয় নরপতি দিগের শাসন কালে বিপ্লব-বিশীর্ণ ভারতীয় জ্ঞান পুনরায় কথঞ্চিৎ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। এই সময়ে কালিদাস প্রমুখ কবিগণ ও আর্য্যভট্ট প্রমুখ জ্যোতির্ব্বিদগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহার পরে পঞ্চশত বৎসরের মধ্যে বাগ্‌ভটাচার্য্য, বৃন্দ ও মাধব নামক আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের সংগ্রহকারগণ এবং জৈয়ট, গয়দাস, ভাস্কর ব্রহ্মদেব প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গদেশে চরকসুশ্রুতের টীকাকার ও সংগ্রহকার চক্রপাণি এই সময়ের মধ্যে (খ্রীষ্টাব্দ ১০৪০—১০৫০) প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং চক্রপাণি ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যার পুনরভ্যুদয় কালের শেষ সময়ের আচার্য্য। মালবের নানাশাস্ত্রবিদ ভোজ নামক প্রসিদ্ধ রাজা ১০০৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রণীত 'রাজমার্ত্তণ্ড' প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ এবং 'পাতঞ্জলবৃত্তি' নামক দার্শনিক গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ।

ইহার পর ভারতের দুর্ভাগ্য বশতঃ মুসলমানদিগের ঘোর আক্রমণ প্রবাহ চলিতে থাকে। পূর্ব্বে মহম্মদ বিন কাশিম ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধুদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা স্থায়ী বা অধিক ক্ষতিকর হয় নাই। একাদশ শতাব্দীতে বহু সহস্র সৈন্য লইয়া মহম্মদ গজনী ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তাহার ফলে সোমনাথ পত্তনাদি স্থানের অমূল্য সম্পদ লুণ্ঠিত, তীর্থস্থান সমূহের দেবমূর্ত্তি বিচূর্ণিত ও সহস্র সহস্র প্রজার প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছিল। গজনীর সৈন্যগণ এই সময়ে প্রতিদিন শত শত গৃহ ও সেই সঙ্গে বহু প্রাচীন সংহিতাদি ভস্মীভূত করিয়াছিল। লোকে ধন-প্রাণধর্ম্ম রক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া জ্ঞানার্জ্জনের চেষ্টা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। মহম্মদ গজনী লুণ্ঠন কার্য্য শেষ করিয়া দেশে ফিরিবার অল্পদিন পরেই স্বদেশদ্রোহী জয়চন্দ্র কর্ত্তৃক আহূত হইয়া মহম্মদ ঘোরী ভারত আক্রমণ করেন। ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষত্রকুলসূর্য্য দেহলীপতি মহারাজ পৃথ্বীরাজ মহম্মদ ঘোরী কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন। ইহার পর দশ বৎসরের মধ্যে প্রায় সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত মুসলমানদিগের করায়ত্ত হয়। পরবর্ত্তী কালে আলতামাস্ এবং আলাউদ্দীন্ মালব ও দাক্ষিণাপথের কিয়দংশ আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন।

মুসলমানদিগের আক্রমণ স্থান হইতে দূরে থাকায় বঙ্গদেশ এই সময়ে বিশেষ বিপর্য্যস্ত হয় নাই। খ্রীষ্টীয় সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে নিদানসংগ্রহকার মাধব কর এবং [illegible]

শতাব্দীতে চক্রপাণি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশে দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমান বিপ্লব আরম্ভ হইলেও টীকাকার বিজয় রক্ষিত ও শ্রীকণ্ঠ আয়ুর্ব্বেদের ক্ষীণ জ্যোতিঃ আবার উদ্দীপিত করিয়াছিলেন। ইহাদিগের সময়েও অনেক প্রাচীন গ্রন্থ পাওয়া যাইত। ইহার পরে বঙ্গদেশও মুসলমানগণ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ বিজিত ও বিধ্বস্ত হইয়াছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চেঙ্গিস্ খাঁ নামক মোগল ভারত আক্রমণ করিয়া হিমাচল হইতে মধ্যদেশ পর্য্যন্ত লুণ্ঠন এবং বহু প্রজার প্রাণবিনাশ করিয়াছিল। চেঙ্গিস্ খাঁ প্রতিনিবৃত্ত হইলেও পুনঃ পুনঃ সমাগত মোগলদিগের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল। ইতিমধ্যে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তৈমুরলঙ্গ নামক মোগল ভারত আক্রমণ করিয়াছিল। তৈমুরলঙ্গ দুই মাস ব্যাপিয়া ভারতবর্ষের ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন এবং অসংখ্য প্রজার গৃহদাহ ও প্রাণ বিনাশ করিয়াছিল।

এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে মহাবিক্রান্ত বীরবুক্ক বা বুক্ক নামক রাজা বিজয়নগর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় সভাসদ্ সায়ণাচার্য্য ও মাধবাচার্য্য দ্বারা বেদের উদ্ধার ও ভাষ্য প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। শার্ঙ্গধর নামক আয়ুর্ব্বেদীয় সংহিতাকার এই সময়ে (১৪২০ সম্বতে) আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে মোগল নরপতি বাবর পাঠানদিগকে জয় করিয়া রাজ্য অধিকার করেন। ইহার কতিপয় বৎসর পরে বাবরের পুত্র হুমায়ুনের দিগ্বিজয় উপলক্ষে দেশে বিষম বিপ্লব ঘটিয়াছিল। অনন্তর হুমায়ুন শেরসা নামক পাঠানরাজ কর্ত্তৃক পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। এই সময় হইতে ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত মোগল ও পাঠান জাতির মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ চলিয়াছিল। তাহার ফলে ভারতের ধন, প্রাণ ও বিদ্যার যথেষ্ট হানি হইয়াছিল।

ষোড়শ বর্ষ পরে হুমায়ুন পুনরায় যুদ্ধ করিয়া রাজ্য লাভ করেন। তাঁহার পুত্র আকবর শাহ স্বীয় বাহুবলে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রথমে বহু প্রজা ও দেশ ধ্বংস হইলেও শেষে দেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। আকবর শাহ ভারতীয় শাস্ত্র ও পণ্ডিতগণের সমাদর করিতেন। এই সময়ে ষোড়শ শতাব্দীর শেষে বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে প্রসিদ্ধ সংগ্রহকার ভাবমিশ্র কান্যকুব্জে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

আকবরের পৌত্র ঔরঙ্গজেব রাজ্য লাভ করিবার পর দেশে বিষম বিপ্লব ঘটিয়াছিল। হিন্দুদ্বেষী ঔরঙ্গজেব শত শত দেব মন্দির চূর্ণ করিয়া সহস্র সহস্র গ্রন্থ দগ্ধ করিয়া এবং অসংখ্য স্বধর্ম্মনিষ্ঠ প্রজার প্রাণবধ করিয়া ভারতের বিষম অনিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন। সুতরাং নষ্টপ্রায় ভারতীয় বিদ্যা ইতিপূর্ব্বে কথঞ্চিৎ উজ্জীবিত হইলেও এই সময়ে পুনরায় শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। আয়ুর্ব্বেদও এই সময় হইতে যবন চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া কোন রূপে জীবন ধারণ করিয়াছিল।

ইহার পর ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে নাদির সাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। পরে আমেদ সা আবদালী কর্ত্তৃক ভারতভূমি উপর্য্যুপরি চারিবার আক্রান্ত হয়। এই সকল আক্রমণের ফলেও অসংখ্য প্রজার প্রাণ নষ্ট হয় এবং বহুজনপদ শ্মশানে পরিণত ও বহু ধনরত্ন ও গ্রন্থরত্ন অপহৃত ও বিনষ্ট হইয়াছিল।

আর্যযুগের পরবর্ত্তী সময় হইতে ভাবমিশ্রের সময় পর্য্যন্ত কালকে সংগ্রহকাল বলা যাইতে পারে। ইহা আয়ুর্ব্বেদের অথবা ভারতের সমস্ত বিদ্যার অপরাহ্ন কাল। এই সময়েও বহু প্রাচীন সংহিতা অল্পাধিক খণ্ডিত আকারে পাওয়া যাইত এবং সেই সকল গ্রন্থের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অঙ্গ পুনর্যোজনা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল।

অবনতি কাল—সংগ্রহকালে আয়ুর্ব্বেদের অনেক অবনতি ঘটিলেও প্রতিসংস্কারক, সংগ্রহকারক এবং টীকারদিগের চেষ্টা বশতঃ সম্পূর্ণ অবনতি ঘটে নাই। অপিচ টীকাকারদিগের সময়েও বহু প্রাচীন সংহিতা সুলভ ছিল, সে কথা বলা হইয়াছে। এই জন্য সংগ্রহকালের পরবর্ত্তী কালকেই আমরা অবনতিকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি।

অবনতিকালে প্রাচীন সংহিতা সকল দুর্লভ হইয়া পড়ে এবং যে সকল সংগ্রহ অবশিষ্ট থাকে সেগুলি বহু ভ্রম প্রমাদের আকর হইয়া উঠে। অপিচ, সংস্কৃত ভাষার পঠন পাঠন হ্রাস পাওয়ায় আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চিকিৎসকের সংখ্যাও কম হইতে থাকে। সমাজ ও রাষ্ট্রবিপ্লব বশতঃ লোকে স্ববৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহার ফলে যে সকল চিকিৎসাগ্রন্থ পূর্ব্ব পুরুষগণের পরম আদরের ধন ছিল, তাঁহাদের সন্তান সন্ততির নিকট সেই সকল গ্রন্থ আবর্জ্জনার মধ্যে পরিগণিত হয়। এইরূপ অনাদরেও কত গ্রন্থ রত্ন যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

ক্রমে অনুচিত ধর্ম্মাভিমান বশতঃ চিকিৎসকগণ রোগীর মলমূত্র-পূয়-রক্তাদিকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করেন এবং তাহার ফলে বস্তিক্রিয়া লোপ পায়, শস্ত্রচিকিৎসা ক্ষৌরকারদিগের বৃত্তি বলিয়া পরিগণিত হয় ও প্রসূতিবিদ্যা নীচ জাতীয়া স্ত্রীলোকের হস্তে সমর্পিত হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বৌদ্ধযুগ হইতেই রাজাজ্ঞায় শবব্যবচ্ছেদ প্রথা রহিত হইয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বশতঃই হউক অথবা পরবর্ত্তী কালে নিরন্তর যুদ্ধ বিগ্রহ হেতু দেশে মহান্ বিপ্লব ঘটিবার কালেই হউক, ভারতীয় রাজগণ বা জনসাধারণ শব ব্যবচ্ছেদ প্রথা পুনঃ প্রচলিত করিবার জন্য চেষ্টা করেন নাই। বিজেতা মুসলমান রাজগণেরও এ বিষয়ে কোন উৎসাহ ছিল না। ফলে শবব্যবচ্ছেদ একেবারে বিলুপ্ত হয় এবং আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক শারীর তত্ত্বে নিতান্ত অনভিজ্ঞ হইয়া পড়েন। এইরূপে শারীর জ্ঞান বর্জ্জিত চিকিৎসকের সংখ্যার আধিক্য বশতঃ আয়ুর্ব্বেদের যথেষ্ট অবনতি ঘটে।

পূর্ব্বে হিন্দু এবং বৌদ্ধ রাজগণের সময়ে দেশে দেশে আরোগ্যশালা (Hospital) প্রতিষ্ঠিত ছিল বৌদ্ধযুগের পরবর্ত্তী সময়ে মুসলমান বিপ্লবের কালে সেই সকল আরোগ্যশালা ক্রমে ক্রমে উঠিয়া যায়। চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার্থীর পক্ষে আরোগ্যশালায় কর্ম্মাভ্যাস ব্যতীত চিকিৎসাবিদ্যায় সম্যক পারদর্শিতা জন্মে না। কোন চিকিৎসকবিশেষের নিকট থাকিয়া কর্ম্মাভ্যাস করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু তাঁহাতে সেই চিকিৎসকের আয়ত্ত বিদ্যা ব্যতীত, আয়ুর্ব্বেদের সকল বিষয়ের জ্ঞানলাভ করা যায় না। এই কারণেও ইদানীং আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের জ্ঞান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সংগ্রহকালেই বাহ্লিক

চিকিৎসায় প্রাধান্য ঘটে। আয়ুর্ব্বেদের অবনতিকালে মুসলমান রাজার আদরাতিশয়ে যাবনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের অত্যন্ত প্রসার ঘটে এবং আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রচলন অত্যন্ত কমিয়া যায়। এমন কি স্বাধীন নৃপতিবৃন্দ আয়ুর্ব্বেদের পরিবর্ত্তে রাজকীয় য়ুনানী চিকিৎসা শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে থাকেন। সেই জন্য উত্তর ভারতে এখনও য়ুনানী চিকিৎসা বহুসমাদৃত।

এইরূপে ক্রমে গ্রন্থ লোপ, ভিন্ন ভিন্ন অংশের অপ্রচার, পঞ্চকর্ম্মাদির বিলোপ, সংস্কৃত ভাষা আলোচনার ন্যূনতা প্রভৃতি নানা কারণে আয়ুর্ব্বেদ অবনতির চরম সীমায় উপনীত হয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বর্ত্তমান সময়কে আয়ুর্ব্বেদের পুনরভ্যুদয়ের সূচনাকালও বলা যাইতে পারে। বহুকালব্যাপী বিপ্লবের পরে দেশে আবার শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। নষ্টপ্রায় ভারতীয় বিদ্যার এবং বিপ্লবপীড়িত প্রজার উদ্ধারের জন্যই যেন বিধাতা কৃপা করিয়া উদারহৃদয় ইংরাজ জাতিকে এদেশে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের শাসন গুণে এক্ষণে প্রজার ধন-মান-প্রাণ নিরাপদ এবং জ্ঞান অর্জ্জনের পথ বিঘ্নশূন্য। এখন ভারতীয় প্রাচীন বিদ্যা ও কীর্ত্তির রক্ষার্থে ও উন্নতি কল্পে ব্রিটিশরাজ মুক্ত হস্তে সাহায্য করিতেছেন। বিষম দুর্দ্দিনের পর ভারতে আবার সুদিন ফিরিয়া আসিয়াছে। বহুদিনের পর ভারতের নানা স্থানে আয়ুর্ব্বেদের একটা নূতন জাগরণ দেখা যাইতেছে।

গ্রন্থকার ও গ্রন্থপরিচয়।

পূর্ব্বে অনেকগুলি গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের কথা প্রসঙ্গক্রমে বলা হইয়াছে। এক্ষণে বিশিষ্ট গ্রন্থকারদিগের এবং গ্রন্থ সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখিত হইতেছে। পাঠকগণের সুবিধার জন্য প্রথমে বর্ত্তমান সময়ে প্রসিদ্ধ প্রধান প্রধান প্রাচীন গ্রন্থকারগণের পরিচয় —(ক) প্রতিসংস্কারক (খ) সংগ্রহকারক ও (গ) টীকাকার—এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া লিখিত হইবে। (সংহিতাকারগণের পরিচয় পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে।) পরে গ্রন্থ পরিচয় —(ক) সংহিতাগ্রন্থ (খ) সংগ্রহ গ্রন্থ, (গ) রস গ্রন্থ, (ঘ) নিঘণ্ট গ্রন্থ ও (ঙ) বিবিধ সংগ্রহ—এই পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া প্রদত্ত হইবে। অপ্রধান গ্রন্থকারদিগের পরিচয় গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে লিখিত হইবে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, মূল সংহিতার পরে আর কোন নূতন গ্রন্থ রচিত হয় নাই। কেহ প্রাচীন সংহিতার প্রতিসংস্কার করিয়াছেন, কেহ বিবিধ গ্রন্থ হইতে সঞ্চয়ন করিয়া বিবিধ সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, কেহ টীকা করিয়াছেন। অতএব গ্রন্থ ও গ্রন্থকার শব্দ এস্থলে গৌণ ভাবেই প্রযুক্ত হইল বুঝিতে হইবে। সুতরাং গ্রন্থকার পরিচয় প্রসঙ্গে প্রতিসংস্কর্ত্তা প্রভৃতির এবং গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে প্রতিসংস্কৃত ও সংগ্রহ গ্রন্থাদির পরিচয় লিখিত হইতেছে। তবে বৌদ্ধযুগে অনেক নূতন রসগ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

গ্রন্থকার পরিচয়।

(ক) প্রতিসংস্কারকগণ।

চরক—ইনি অগ্নিবেশতন্ত্রের প্রতিসংস্কারক। প্রতিসংস্কৃত অগ্নিবেশ-সংহিতার বা চরক-সংহিতার যে মূল-অগ্নিবেশসংহিতার সহিত অনেক পার্থক্য বা অসামঞ্জস্য আছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই চরক কে—সে সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে।

পাণিনির "কঠচরকাল্লুক"—এই সূত্র দেখিয়া কেহ কেহ বলেন যে চরক পাণিনির পূর্ব্বতন। কিন্তু এই মত বিচারসহ নহে। কারণ, পাণিনির কথিত কঠ ও চরক যজুর্ব্বেদের শাখা বিশেষের প্রবক্তা দুইজন ঋষি। সেই চরক শুধু প্রতিসংস্কর্ত্তা চরকের কেন,—আত্রেয় অগ্নিবেশাদিরও অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী।

কেহ কেহ বলেন যে, চরক কাশ্মীর দেশীয় কনিষ্ক রাজার চিকিৎসক ছিলেন। এই মতের মূল ত্রিপিটকাখ্য বৌদ্ধ গ্রন্থ। কিন্তু এই চরকই যে বর্ত্তমান চরক সংহিতার লেখক তাহা বোধ হয় না; কেননা তাহা হইলে কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিনী নামক ইতিহাসে কনিষ্ক প্রসংঙ্গে প্রতিসংস্কর্ত্তা চরকসংহিতা উল্লিখিত হইত।

আমাদের মতে ভগবান্ পতঞ্জলিই চরকসংহিতার প্রতিসংস্কর্ত্তা চরক মুনি। বিজ্ঞানভিক্ষু, ভোজরাজ, নাগেশভট্ট, রামভদ্র দীক্ষিত ভাবমিশ্র প্রভৃতি লেখকগণের গ্রন্থলিখিত বচন দ্বারাও এইরূপই প্রমাণ পাওয়া যায় *। পতঞ্জলি কেবল অগ্নিবেশ সংহিতার প্রতিসংস্কর্ত্তা নহেন, রসশাস্ত্র সম্বন্ধেও তাঁহার কথিত অনেক উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, শেষাবতার পতঞ্জলি মনুষ্যের মনের দোষ দূর করিবার জন্য পাতঞ্জল দর্শন, বাক্যের দোষ নিবারণার্থ বৈয়াকরণ মহাভাষ্য এবং শরীরের দোষ নিবারণের জন্য চরকসংহিতা প্রভৃতি বৈদ্যকগ্রন্থ লিখিয়াছেন। এই পতঞ্জলি যে দুই সহস্র বৎসর বা আরও কিছু পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—ঐতিহাসিকগণ অখণ্ডনীয় যুক্তি দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

দৃঢ়বল—কালে চরকপ্রতিসংস্কৃত অগ্নিবেশ সংহিতার বা চরক-সংহিতার অঙ্গহানি ঘটিলে দৃঢ়বল তাহার পুনঃ প্রতিসংস্কার করেন। দৃঢ়বল কাশ্মীরে কিংবা পাঞ্জাবে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন—এই সম্বন্ধে উভয় প্রকার মতই প্রচলিত আছে। প্রথমটা ডাক্তার হর্ণলির মত ও দ্বিতীয়টী সাধারণ মত। দৃঢ়বল-সংস্কৃত চরকের অনেক পাঠ বাগ্‌ভট স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় যে, দৃঢ়বল বাগ্‌ভটের পূর্ব্বে এবং পতঞ্জলির পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান চরকসংহিতার কোন্ কোন্ অংশ ঠিক চরকের লেখা সে সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। বাগ্‌ভটের পরবর্ত্তী কোন কোন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিও চরক-সংহিতায় পাঠ যোজনা করিয়াছেন, এরূপ মতও কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবন্ধ বাহুল্য ভয়ে আমরা এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা করিলাম না।

নাগার্জ্জুন—লভ্যমান সুশ্রুতসংহিতার প্রতিসংস্কর্ত্তা কে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। ডল্লন সুশ্রুতের টীকায় নাগার্জ্জুনকেই সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার লেখার ভাবে † বোধ হয়, নাগার্জ্জুন ভিন্ন অপর প্রতিসংস্কর্ত্তারও পূর্ব্বে প্রসিদ্ধি ছিল। নাগার্জ্জুনকে সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিলেও এই নাগার্জ্জুন কে, তাহা স্থির করা দুরূহ। প্রাচীন ইতিহাসে নাগার্জ্জুন নামে প্রসিদ্ধ অনেক ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। লোহশাস্ত্রপ্রবক্তা রসতন্ত্রাচার্য্য এক

* এই প্রসঙ্গে যে সকল লেখা হইয়াছে, তাহার প্রমাণাদি "প্রত্যক্ষশারীর" গ্রন্থের ভূমিকায় দ্রষ্টব্য। প্রবন্ধ বাহুল্যভয়ে কোন স্থলেই সেসকল প্রমাণ উদ্ধৃত করা হয় নাই। অনুসন্ধিৎসু পাঠক প্রয়োজন হইলে সেই সকল প্রমাণ দেখিয়া আমাদের মতের বিচার করিবেন।

† "প্রতিসংস্কর্ত্তাপীহ নাগার্জ্জুন এব"—ডল্লন কৃত সুশ্রুত টিকা।

জন নাগার্জ্জুন ছিলেন। ইনি কক্ষপুটতন্ত্র ও রসরত্নাকর * প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা এবং সিদ্ধ নাগার্জ্জুন নামে প্রসিদ্ধ।

নেপাল রাজ্যের প্রান্তভাগে তাঁহার আশ্রম ছিল, এইরূপ জনশ্রুতি আছে। এই নাগার্জ্জুন সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা হইলে, পারদের জরা-ব্যাধিনাশকতা গুণ বোধ হয় সুশ্রুতে উল্লিখিত হইত। কিন্তু সেরূপ কোন উল্লেখ নাই বলিয়া সিদ্ধ নাগার্জ্জুন সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা—একথা দৃঢতার সহিত বলা যায় না।

নাগার্জ্জুন নামক বৌদ্ধ নরপতি সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা বলিয়া কোনরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। মাধ্যমিক সূত্রাদিকার নাগার্জ্জুন নামক অপর বৌদ্ধাচার্য্যকে সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা বলিবার হেতুও কোন বৌদ্ধগ্রন্থে পাওয়া যায় না। সুতরাং বৌদ্ধ নাগার্জ্জুন যে সুশ্রুতের প্রতি-সংস্কর্ত্তা ইহা প্রতিপন্ন করা কঠিন। তবে সুশ্রুতের মধ্যে "সুভূতি গৌতমের" উল্লেখ প্রভৃতি দুই একটী এমন কথা আছে যাহাতে সুশ্রুতের প্রতিসংস্কার যে বৌদ্ধযুগে হইয়াছিল, একথা বলা অসঙ্গত হয় না।

বৌদ্ধাচার্য্য নাগার্জ্জুনকে সুশ্রুতের প্রতি-সংস্কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিলে ঐ প্রতিসংস্কার দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল বলিতে হইবে; কারণ, নাগার্জ্জুন নামক প্রধান বৌদ্ধাচার্য্য দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—ইহাই সর্ব্ববাদিসম্মত। পক্ষান্তরে চরকোক্ত ক্ষয়জকাস প্রভৃতির পাঠ সুশ্রুত-সংহিতায় উদ্ধৃত হইয়াছে দেখিয়া বুঝা যায় যে সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা চরকের পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

(খ) সংগ্রহকার।

বাগ্‌ভট—ইনি প্রথমে অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহ বা 'বৃদ্ধ বাগভট' এবং পরে অষ্টাঙ্গহৃদয় বা 'বাগ্‌ভট' রচনা করিয়াছিলেন। ইৎসিং নামক চীনদেশীয় পরিব্রাজক তাঁহার রচিত গ্রন্থে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদসংগ্রহকার নবীন আচার্য্য বলিয়া বাগভটকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইৎসিং খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারত পরিভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। সুতরাং বোধ হয় বাগভট ঐ সময়ের কিছু পূর্ব্বে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বাগভট সিন্ধু (Sind) দেশের অধিবাসী বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন।

কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন যে, অষ্টাঙ্গসংগ্রহকার বাগভট এবং অষ্টাঙ্গহৃদয়কার বাগভট পৃথক ব্যক্তি। কিন্তু এই মত নিতান্ত ভিত্তিহীন; কারণ উভয় গ্রন্থের ভাষা একরূপ, কুত্রাপি মতভেদ নাই এবং উভয় গ্রন্থকার ও গ্রন্থকারের পিতার নাম, পর্য্যন্ত এক। সংগ্রহগ্রন্থের মধ্যে বাগভটের ন্যায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আর নাই।

রসরত্নসমুচ্চয়কার বাগ্‌ভট সংগ্রহকার বাগভট হইতে পৃথক ব্যক্তি এবং বহু পরবর্ত্তী। কারণ বিস্তৃত অষ্টাঙ্গসংগ্রহে রসতন্ত্রোক্ত বিষয়ের নামগন্ধও নাই। এতদ্ব্যতীত সোমদেব গোবিন্দ প্রভৃতি পরবর্ত্তী কালের গ্রন্থকারদিগের বচন রসরত্নসমুচ্চয়ে উদ্ধৃত হইয়াছে।

মাধব কর—মাধবনিদান নামে প্রসিদ্ধ 'রুগ্বিনিশ্চয়' গ্রন্থের রচয়িতা মাধবকর বঙ্গ-দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থে রাশি রাশি বাগভটের বচন উদ্ধৃত

* রসরত্নাকর নামে দুইখানি রসগ্রন্থ আছে—একখানি নাগার্জ্জুন কৃত ও অপরখানি নিত্যনাথ কৃত। রসগ্রন্থ প্রসঙ্গ দেখ।

করায় বুঝা যায় যে, মাধবকর বাগভটের পরবর্ত্তী। আবার বৃন্দ ও চক্রপাণি স্ব স্ব গ্রন্থে মাধবের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন ও তাঁহার লিখিত ক্রম অনুসারে চিকিৎসা লিখিয়াছেন; সুতরাং মাধব, বৃন্দ ও চক্রপাণির পূর্ব্ববর্ত্তী। অষ্টম শতাব্দীতে বোগদাদের প্রসিদ্ধ সম্রাট 'হরুণ-উল-রসীদের' রাজত্বকালে মাধবনিদান পারস্য ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল—ইহা ঐতিহাসিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন। এই সকল কারণে অনুমান হয় যে, মাধবকর সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। নিদান ব্যতীত মাধবকর "রত্নমালা" নামক দ্রব্যগুণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ডল্লনের কথিত সুশ্রুতে টিপ্পনীকার 'শ্রীমাধব' মাধবকর হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি; কারণ শ্রীমাধব কুত্রাপি মাধবকর নামে অভিহিত হয়েন নাই।

বেদভাষ্যকার মাধবাচার্য্য নিদানকার মাধবকর হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। কারণ তিনিও কুত্রাপি মাধবকর বলিয়া উল্লিখিত হয়েন নাই। অপিচ, মাধবাচার্য্য মাধবকরের প্রায় পাঁচশত বৎসর পরে দক্ষিণাপথে বিজয়নগর রাজ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন—ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ।

সোঢ়ল—ইনি গদনিগ্রহ ও সোঢ়ল-নিঘণ্ট নামক গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা। সোঢ়লকৃত গদনিগ্রহ সম্পূর্ণাঙ্গ বৃহৎ গ্রন্থ। এই গ্রন্থ আয়ুর্ব্বেদমার্ত্তণ্ড পণ্ডিত যাদবজী ত্রিকমজী আচার্য্য কর্ত্তৃক বম্বে হইতে "আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থমালার" মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। সোঢ়ল-নিঘণ্ট নামক গ্রন্থের ভূমিকা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সোঢ়ল গুর্জ্জর দেশবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি ভেল, হারীত, কৃষ্ণাত্রেয়, অগ্নিবেশ, বৈদেহ প্রভৃতির অনেক পাঠ স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। মাধবনিদানের সহিত ইঁহার গ্রন্থের অনেক পাঠের সাদৃশ্য আছে। সম্ভবতঃ ইনি মাধবকরের কিছু পূর্ব্বে বা পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বাগ্‌ভট হইতে অনেক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়া ইনি যে বাগ্‌ভটের পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বৃন্দ—সিদ্ধযোগ নামক সংগ্রহকার বৃন্দ, মাধবের পরে এবং চক্রপাণির পূর্ব্বে—সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় নবম বা দশম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বৃন্দকৃত সংগ্রহ অবলম্বন করিয়াই চক্রপাণি স্বীয় গ্রন্থ রচনা করেন।

চক্রপাণি—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে চক্রপাণি ডল্লনের সমকালীন বা সমীপ কালীন। ইঁহার পিতা গৌড়াধিপ নয়পালদেবের চিকিৎসক ছিলেন। চক্রপাণি চরক ও সুশ্রুতের টীকা, "চক্রদত্ত" নামে প্রসিদ্ধ চিকিৎসাসংগ্রহ এবং দ্রব্যগুণ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকগণ স্থির করিয়াছেন যে,নয়পালদেব খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অতএব চক্রপাণির সময় একাদশ শতাব্দী বলিয়া স্থির করা যায়।

শার্ঙ্গধর—ইনি শার্ঙ্গধর পদ্ধতি, শার্ঙ্গধর সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা, কবি ও আয়ুর্ব্বেদের সংগ্রহকার। শার্ঙ্গধরপদ্ধতির প্রস্তাবনায় জানা যায় যে, ইনি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

বঙ্গসেন—ইঁহার রচিত চিকিৎসাসার-সংগ্রহ নামক গ্রন্থ "বঙ্গসেন" নামেই পরিচিত। বঙ্গসেন বলিয়াছেন, লুপ্তপ্রায় অগস্ত্যসংহিতার প্রতিসংস্কার করিয়া তিনি "বঙ্গসেন নামক এই গ্রন্থ প্রচার করিলেন। বঙ্গসেন শার্ঙ্গধরের পরে এবং ভাবমিশ্রের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়া

ছিলেন। ইঁহার বঙ্গদেশীয় গ্রন্থকার বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। নাম দেখিয়াও সেইরূপ অনুমান হয়।

ভাবমিশ্র—ভাবমিশ্র স্বকৃত সংগ্রহে শার্ঙ্গধর ও বঙ্গসেনের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভাবপ্রকাশে ফিরঙ্গ রোগের এবং অনেক যাবনিক দ্রব্যের উল্লেখ আছে। ফিরঙ্গ রোগ প্রথমে পোর্টুগিজদিগের দ্বারা ভারতীয় পণ্যাঙ্গনাগণের মধ্যে সংক্রমিত হইয়াছিল। পোর্টুগিজগণ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে ভারতবর্ষে আগমন করে। এই হেতু অনুমান হয় যে, ভাবমিশ্র ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে কান্যকুব্জ দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

(গ) টীকাকারগণ।

ডল্লন—সুশ্রুতের প্রসিদ্ধ টীকাকার ডল্লনাচার্য্য আপনাকে সহনপালদেব নামক রাজার বল্লভ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। "পাল দেব" নামযুক্ত নরপতিগণ খ্রীষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে মগধ, গৌড় ও অন্যান্য দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ডল্লন ও চক্রপাণি উভয়ের মধ্যে কেহই কাহারও নাম করেন নাই—এজন্য উভয়েই প্রায় সমান সময়ের বলিয়া মনে হয়। এই সকল কারণে অনুমান হয় যে, ডল্লন খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষে বা একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

চক্রপাণি—চিকিৎসাসংগ্রহকার চক্রপাণি সুশ্রুতের "ভানুমতী" এবং চরকের "আয়ুর্ব্বেদ দীপিকা" টীকা রচনা করিয়াছিলেন। ইহাঁর বিষয় সংগ্রহকার প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে।

অরুণদত্ত—বাগ্‌ভট প্রণীত অষ্টাঙ্গহৃদয়ের টীকাকার অরুণদত্ত সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে আবির্ভূত ছিলেন।

বিজয় রক্ষিত ও শ্রীকণ্ঠ দত্ত—মাধবনিদানের প্রসিদ্ধ টীকাকার বিজয়রক্ষিত ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। "আতঙ্কদর্পণ" নামক নিদানটীকাকারও এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিজয়রক্ষিত গুণাকর প্রণীত "যোগরত্নমালা" হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় যে, তিনি গুণাকরের পরবর্ত্তী। গুণাকর ত্রয়োদশ শতাব্দীর আরম্ভে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীকণ্ঠদত্ত বিজয়রক্ষিতের শিষ্য। তিনি গুরুর আদেশে প্রমেহনিদান হইতে মাধবনিদানের অবশিষ্টাংশের টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

শিবদাস—চরকসংহিতা ও চক্রদত্তের টীকাকার শিবদাস গৌড়রাজের চিকিৎসকের পুত্র। ইনি সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

চরকের অন্যান্য টীকাকার—ঈশান দেব, হরিচন্দ্র, বাপ্যচন্দ্র, বকুল, ভামদত্ত, ঈশ্বর সেন, নরদত্ত, জিনদাস, জৈয়ট বা জেজ্জড় ও গুণাকর প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহাদের টীকা এখন দুর্ল্লভ।

মুর্শিদাবাদের সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজমুকুটমণি গঙ্গাধর ও চরকের "জল্পকল্পতরু" টীকা এবং কয়েক খানি মুদ্রিত ও অমুদ্রিত বৈদ্যকগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

সুশ্রুতের অন্যান্য টীকাকার—জৈয়ট বা জেজ্জড, কার্ত্তিক, গোস্বামী, গদাধর ও গয়ী বা গয়দাস প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত ভাস্কর সুশ্রুতের পঞ্জিকা এবং মাধব, ব্রহ্মদেব ও

সোম টিপ্পনী রচনা করিয়াছিলেন, এরূপ প্রমাণও পাওয়া যায়।

বাগ্‌ভটের অন্যান্য টীকাকার—অরুণ দত্ত ব্যতীত চন্দ্রনন্দন ও হেমাদ্রি অষ্টাঙ্গহৃদয়ের টীকাকার বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। ইন্দু প্রণীত অষ্টাঙ্গসংগ্রহের টীকা সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে ও বোম্বাই প্রদেশে মুদ্রিত হইতেছে। হেমাদ্রিকৃত টীকার কিয়দংশ প্রবন্ধ লেখকের নিকট বর্ত্তমান।

(ক্রমশঃ।)

দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা।

—:*:—

ঝাড় হইতে বাঁশ কাটিয়া আনিয়া কুটীর রচনা করিলে কিছুদিনের মধ্যেই সেই বাঁশ ঘুণের কবলে ঝাঁঝ্‌রা হইয়া পড়ে। আর যদি সেই বাঁশ জলে ভিজাইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া দ্বন্দ্ব সহিষ্ণু করা যায়, তবে সেটি বহু দিন স্থায়ী হয়। ঘুণ তাহার মধ্যে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। যে চাষার ছেলে মাঠের মাঝে আকাশের বারিধারা ও সূর্য্যদেবের প্রচণ্ড কিরণ মালা বরণ করিয়া আপনাকে গড়িয়া তোলে, ঘুণের মত রোগ-বীজাণুও তাহাকে সহজে আয়ত্ত করিতে পারে না, জরাও কোন নির্দ্দিষ্ট বয়সে তাহার দেহ-যষ্টিকে আক্রমণ করে না, এজন্য যুবা বয়সে অকাল বৃদ্ধ অথবা পরিণত বয়সে শিং ভাঙ্গিয়া বাছুরের দলে মিশিবার মত লোক অনেক দেখা যায়। রোগ ও জরার প্রবল প্রতাপ খর্ব্ব করিতে হইলে আমাদিগকে দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু হইতে হইবে। দুইটি বিপরীত ধর্ম্ম বিশিষ্ট প্রাকৃতিক ব্যাপারে আমরা কষ্ট পাইয়া থাকি। একটি তাপ, অপরটি শৈত্য। এই দু'টি ক্রমে ক্রমে সহাইতে পারিলে মানুষ দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু হইতে পারে। পূর্ব্বে এই বাঙ্গালা দেশে নবজাত শিশুকে তৈল মাখাইয়া রৌদ্রে দেওয়ার প্রথা ছিল। উহার উদ্দেশ্য মানব শিশুটীকে ক্রমে ক্রমে দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু করা। আমরা উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া অনেক ভাল প্রথা ত্যাগ করিতেছি, আবার অনেক মন্দ প্রথা ক্রমে ক্রমে আমদানী করিতেছি। বিচার বুদ্ধিতে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া তবে সামাজিক প্রথা বদলাইতে কিম্বা নূতন কিছু প্রবর্ত্তন করিতে অগ্রসর হওয়া উচিত।

একদা কোন সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ কলিকাতার কোন ধনী ভূস্বামীর বাড়ীতে তাঁহার পুত্র ও জামাতার জ্বররোগের চিকিৎসায় ব্রতী হন। দুই জনের জ্বরই একদিনে বিচ্ছেদ হয়। জ্বর বিচ্ছেদের পরদিন জমিদারের পুত্রটীকে সুজির রুটি ও কচি পাঁঠার ঝোল এবং জামাতাটিকে খৈ ও বেগুণ পোড়ার ব্যবস্থা করেন। তা'র পরদিন কবিরাজ মহাশয় আসিয়া শোনেন,—জামাতা বাবাজী তাঁহার এরূপ ব্যবস্থা-বৈষম্যে [illegible]

হইয়াছেন। তিনি আর হাত দেখাইবেন না। ইহা শুনিয়া কবিরাজ মহাশয় জামাতার কাছে গিয়া স্নেহগর্ভস্বরে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিতে লাগিলেন, বাবাজী, রাগ করিও না শোন; তুমি, আমি, (কর্ম্মচারীদের লক্ষ্য করিয়া) এঁরা সব ভাত, ডাল, মাছের ঝোল, শুক্তো, ডালনা, একটু দুধ খাইয়াই পুরুষানুক্রমে মানুষ। আমাদের পক্ষে জ্বরান্তে লঘু ভোজন, খৈ আর বেগুণ পোড়াই ঠিক। আর উনি পুরুষানুক্রমে বড় মানুষের রক্ত বহন করিয়া আসিতেছেন; পোলোয়া, কালিয়া, কোরমা, ক্ষীর, ছানা প্রভৃতি খাইয়া মানুষ। উঁহার পক্ষে সুজির রুটী ও কচি পাঁঠার ঝোলই লঘু পথ্য। ধাতু বৈষম্য ত আর বিনা কারণে হয় না। শুনিয়া বাবাজীবন অধোবদনে রহিলেন, আর সকলে হাসিয়া উঠিলেন। সূক্ষ্ম দৃষ্টির প্রভাবে উল্লিখিত কবিরাজ মহাশয় অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য করিতে পারিতেন। এই সূক্ষ্ম দৃষ্টি সকলের নাই, এজন্য চিকিৎসকে চিকিৎসকে এত প্রভেদ। এই সূক্ষ্ম দৃষ্টির অভাবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা একান্ত রক্ষণশীল এবং বিলাত প্রত্যাগতেরা একান্ত অনুকরণশীল হইয়া পড়িয়াছেন। অনেক দেশীয় ও বিদেশীয় আচার ও অনাচার উদ্দেশ্যশূন্য হইয়া প্রথা ও 'ফেশান' রূপে সমাজের মধ্যে চলিতেছে।

আমাদের মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই ৭০ বৎসর বয়সে অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া শূন্য পদে নামাবলী মাত্র গাত্রে গঙ্গাস্নান করিতে যান এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই বাড়ীতে প্রত্যাগত হইয়া বিষয় কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। আর তাঁহার যুবক পুত্র বাতায়ন পথে সূর্য্য কিরণ প্রবেশ করিলে শয্যাত্যাগ করেন, তৎপর চা খাইয়া গরম কাপড়ের কোট, পোষাকে আপাদ মস্তক মণ্ডিত করিয়া প্রাতর্ভ্রমণে বহির্গত হন।

বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায়ের সর্দ্দি কিম্বা অন্য অসুখ দেখাই যায় না, কিন্তু তাঁহার পুত্র মুখার্জ্জি সাহেবের সর্দ্দি ত লাগিয়াই আছে, তা' ছাড়া মধ্যে মধ্যে কঠিন রোগে ভুগিয়া থাকেন। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ ছাড়িয়া আমরা শুধু এই বাঙ্গালা দেশের জল বায়ুর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ভান জিনিটা প্রকৃতির চোখে বড় ভয়ানক। ভানে সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। আমি নির্ধন, ধনীর ভানে চলিলে পথের কাঙ্গাল হইতে আমার বিলম্ব হইবে না। শীত নাই যেখানে, সেখানে শীত প্রধান দেশের সাজে চলিলে প্রকৃতির বিচারে স্বাস্থ্যের কাঙ্গাল হইতে বিলম্ব হয় না। এই বাঙ্গালার অধিকাংশ স্থলে ৩।৪ মাস একটু শীত বাড়ে, বাকী ৮।৯ মাস গ্রীষ্ম। এই গ্রীষ্ম প্রধান দেশে শীত প্রধান দেশের অনুকরণে সাজ পোষাক কি আহারাদি কিম্বা ভেজষাদি গ্রহণ করিলে ফল বিষময় হইবেই। চিন্তাশক্তির অভাবে শিক্ষিত অশিক্ষিত অধিকাংশই গড্ডলিকা স্রোতে চলিয়া থাকেন। মাথার চুল কাটার ব্যাপারটি লক্ষ্য করিলে দেশের বিচার শক্তির বহর বুঝিতে পারা যায়। মাথায় মর্ম্মস্থানের চুল কাটিয়া ছাঁটিয়া শূন্য প্রায় করা হয়, অথচ যাহারা টুপি ব্যবহার করেন না, তাঁহাদের এই স্থানটি কেশদামে উত্তমরূপ ঢাকিয়া রাখা কর্ত্তব্য। হ্যাট ধারীদের সুবিধার অনুকরণে চুল কাটানই টুপীহীন জাতির ফ্যাশান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রতিভাশূন্য অনুকরণশীল জাতির পক্ষে বিশ্বমাঝে জাতিরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর নহে।

(ক্রমশঃ)

শিশু পালন।

—:*:—

[শিশুর খাদ্য]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বি-এ, সরস্বতী।]

শিশুকে কি নিয়মে খাওয়াইতে হইবে তাহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে শিশুর জন্মকালীন অবস্থা এবং প্রথম কয়েকমাসে তাহার দেহের গঠন ও বৃদ্ধির বিষয় আলোচনা করা যা'ক।

পরিপূর্ণ সময়ে জন্মগ্রহণ করিলে একটি সুস্থ শিশুর ওজন প্রায় ৩½ সের থাকে। ১৮ ইঞ্চি লম্বা হয়। প্রথম ৩।৪ দিনের মধ্যে শিশুর ওজন প্রায় একপোয়া কমিয়া যায়। তারপর উপযুক্ত খাদ্য পাইতে থাকিলে হাড়, মাংস, স্নায়ু এবং দেহের অন্যান্য যন্ত্রাদির গঠনের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর ওজনও বৃদ্ধি হয়। এইরূপে বাড়িতে থাকিলে একবৎসরের পর শিশুর ওজন ৯ সের হইতে ১১ সের পর্য্যন্ত হয়। এই সময়ের মধ্যে শিশুর ওজন দ্বিগুণ অথবা তিনগুণ বৃদ্ধি হয়। জীবনের আর কোনো সময়ে মানব দেহ এত শীঘ্র বাড়েনা। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এই সময় শিশুর উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের কত প্রয়োজন। দেহ বৃদ্ধি এবং গঠনের জন্য খাদ্য কি অসীম কাজ করে, আমরা ইহা হইতে তাহার ধারণা করিতে পারি। খাদ্য দ্রব্য শিশুকে জড় পিণ্ড হইতে একটী জীবন্ত শিশুতে পরিণত করে। সুতরাং শিশুর জন্য এমন খাদ্য নির্ব্বাচন করিবে—যাহা দেহের পুষ্টিসাধন করে এবং সহজে হজম হয়। এই সময়ে হাড়, মস্তিষ্ক, মাংসপেশী, ফুসফুস এবং অন্যান্য যন্ত্র এত শীঘ্র বাড়িতে থাকে যে, প্রত্যেকের সবল গঠন এবং বৃদ্ধির জন্য বহু পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন। এই সময়ে কেবল ঘুম এবং আহার গ্রহণ করা ব্যতীত শিশুর দৈহিক কিংবা মানসিক কোন কার্য্যই হয় না। মাতৃদুগ্ধই শিশুর স্নায়ু, মাংস হাড়, চর্ব্বি প্রভৃতি গঠন এবং বৃদ্ধি করিবার একমাত্র উপাদান। মাতৃদুগ্ধই তাহার দৈহিক সমস্ত যন্ত্র গঠন এবং বর্দ্ধনের একমাত্র সহায়। সুস্থ, সবল দেহ গঠন করিতে শিশুর পক্ষে মাতৃদুগ্ধই একমাত্র খাদ্য। মাতৃদুগ্ধে শিশুর দেহ গঠনের সমস্ত উপাদানই আছে। স্বাস্থ্যবতী মাতার দুগ্ধই শিশুর প্রাণ। ইহাতেই শিশুর যেমন দৈহিক সমস্ত যন্ত্র গঠিত হয়, মস্তিষ্ক পুষ্টি লাভ করে, তেমনি মানসিক উৎকর্ষও সাধিত হয়। ধর্ম্মপ্রাণা, তেজস্বিনী, বুদ্ধিমতী রমণী আপনার ধর্ম্ম, তেজ, মেধার অঙ্কুর বক্ষের দুগ্ধ ধারা দ্বারাই সন্তানের মনের মধ্যে উপ্ত করিয়া দেন। মাতা মহীয়সী গরীয়সী হইলে সন্তানও মহৎ এবং গরীয়ান হইবেই। কারণ সে যে মাতৃদুগ্ধ পানের সঙ্গে সঙ্গে মহত্বের বীজ লাভ করিয়াছে। তাহার ফল ত বৃথায় যাইবার নয়। মাতার অন্তরে তেজ, স্বদেশ প্রেম, সাধুতা থাকিলে সন্তানও বীর, স্বদেশ

প্রেমিক ও সাধু হইবেই। মাতা সুশিক্ষিতা হইলে সন্তানও মেধাবী হইবে। ইহাই ভগবানের রাজ্যের সাধারণ নিয়ম। দুই এক স্থলে ইহার ব্যতিক্রম দেখা গেলে তাহা অন্য কোনো কারণে হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। বিফলতার দুই একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়া তাহাই যে সাধারণ নিয়ম এরূপ সিদ্ধান্ত করা নির্ব্বোধের কাজ। আমাদের দেশের শিক্ষিত পুরুষগণ এইরূপ দুই একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়াই কুটতর্ক জালে নারীর শিক্ষার পথে কাটা দিতে সর্ব্বদাই উন্মুখ। মাতৃদুগ্ধই শিশুর ভবিষ্যৎ সমস্ত উন্নতির একমাত্র ভিত্তি। মাতা সাধু, মহৎ, উন্নতভাবে পূর্ণ হইয়া শিশুকে দুগ্ধপান করাইবেন। আপনার অন্তরের সমস্ত মহৎ চিন্তা একত্র করিয়া একাগ্রমনে ভগবানকে স্মরণ করিয়া একনিষ্ঠ হইয়া শিশুর মুখে আপনার বক্ষের অমৃত ধারা ঢালিয়া দিবেন। চিত্ত যেন তখন চঞ্চল না থাকে, মন যেন পার্থিব নানা বিষয়ে ঘুরিয়া না বেড়ায়। চিত্ত যেন কোন প্রকার বিক্ষোভের আন্দোলনে আন্দোলিত না হয়।' চিত্ত যেন শান্ত প্রফুল্ল এবং সংযত থাকে। চিত্ত যখন দুঃখে, ক্রোধে, ক্ষোভে অশান্ত থাকিবে, তখন শিশুকে কখনও দুগ্ধ পান করাইবেন না। তাহা হইলে ঐ সব দোষ শিশুর মধ্যে সংক্রামিত হইবে। মাতা শিশুকে যতবার দুগ্ধপান করাইবেন, ততবারই শান্ত সমাহিতচিত্তে তাহা করিবেন। কিন্তু এইরূপ সংযমের সহিত শিশুকে দুগ্ধদান করিতে গেলে নারীর সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা' চাই, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হওয়া দরকার। নতুবা এইরূপে উন্নতভাবে পূর্ণ হইয়া শিশুকে দুগ্ধদানের মর্ম্মই তাঁহাদের বোধগম্য হইবে না। আমরা অনেক সময় দেখিয়াছি, মাতা শিশুকে বক্ষে লইয়া দুগ্ধ দান করিতেছেন, এমন সময় হয় ত আর একটি শিশু আসিয়া কোন কারণে তাঁহাকে বিরক্ত করিল, আর তিনি ক্রোধ ভরে তাহাকে এক চপেটাঘাত করিলেন। এই যে মনের বিকৃতি ঘটিল, তাহা বক্ষের দুগ্ধ ধারার সহিত সন্তানের প্রাণে গিয়া মুদ্রিত হইয়া গেল। এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। প্রাণে যখন শোক কিংবা দুঃখ উপস্থিত হয়, তখন সন্তানকে কখনো স্তন্যদান করা কর্ত্তব্য নহে।

যে সকল মেরুদণ্ড বিহীন, ভণ্ডাচারী, অমানুষে দেশ ভরিয়া গিয়াছে তাহা হইতে দেশকে উদ্ধার করিতে হইলে দেশের নারীজাতি যাহাতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভ করিতে পারেন, তাহার সমস্ত পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। নারীকে সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা দিতে হইবে, আত্মার স্বাধীনতা প্রদান করিতে হইবে, সর্ব্ব-বিষয়ে নারী যতদূর জ্ঞানলাভ করিতে পারেন, যতদূর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারেন সে দিকে সাধ্যমত চেষ্টা করিতে হইবে। তবেই সাধু, বীর, ধর্ম্মপ্রাণ সন্তানের আগমন হইবে। জনক যাজ্ঞবল্ক, গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী, রাজা রামমোহন ও বিদ্যা-সাগরের আগমন বর্ত্তমান অবনতির যুগে এদেশে বড়ই প্রয়োজন হইয়াছে। নারীকে এমন শিক্ষা দিতে হইবে যে, তাঁহারা এই সব যাহা পুরুষ এবং মনস্বিনী নারীর উপযুক্ত জননী হইয়া তাহাদিগকে অমনি করিয়া গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইবেন। নারী তাঁহার বক্ষের অমৃতধারা পান করাইবার সঙ্গে সঙ্গে,

মহত্বের বীজ সন্তানের প্রাণে অঙ্কুরিত করিয়া দিবেন। কবি তাই বলিয়াছেন :—

স্তনদুগ্ধ যবে পিয়াও জননী,
বীর গর্ব্বে তার নাচুক ধমনী।

যে শিশু শৈশবে মাতৃদুগ্ধ পান করিতে পায় না, তাহার মত দুর্ভাগা এবং যে রমণীর বক্ষে উহার অভাব হয় তাহার মত দুর্ভাগিনী আর নাই। মাতৃদুগ্ধের অভাবে কত শিশু বিকলাঙ্গ চির রুগ্ন, দুর্ব্বল, বুদ্ধিহীন হইয়া সমাজের হেয় হইয়া থাকে। স্বাস্থ্যবতী মাতার দুগ্ধই শিশুর প্রাণ, সুতরাং তাহা হইতে শিশুকে বঞ্চিত করা কখনো কর্ত্তব্য নহে। তবে নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণ ঘটিলে শিশুকে মাতার দুগ্ধ ব্যতীত কৃত্রিম দুগ্ধ (গরু, ছাগল, গাধার দুগ্ধ) দিতে হইবে।

(১) মাতৃদুগ্ধের অল্পতা হইলে অর্থাৎ শিশুর ক্ষুন্নিবৃত্তির পক্ষে তাহা যথেষ্ট না হইলে শিশুকে কৃত্রিম দুগ্ধ প্রদান করিতে হইবে। এ সব স্থলে শিশু পরিপূর্ণ আগ্রহের সহিত স্তন মুখে লয়, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে না পারিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকে। শিশুকে এরূপ করিতে দেখিলে বুঝিতে হইবে যে, মাতার দুগ্ধে তাহার ক্ষুধা যাইতেছে না, আরো খাদ্যের প্রয়োজন। কিছুদিন এইরূপে যাইতে দিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, শিশু ক্রমশঃ মিট্‌মিটে, বিবর্ণ এবং রোগা হইয়া যাইতেছে। পুষ্টি এবং খাদ্যের অভাবে এইরূপ হয়। এরূপ অবস্থায় তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। নতুবা শিশুর গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং এমন স্থলে মাতার দুগ্ধ ব্যতীত মাতৃদুগ্ধের সমগুণ বিশিষ্ট খাদ্য দিতে হইবে। মাতার দুধ অল্প বলিয়া শিশুকে তাহা দেওয়া বন্ধ করিবে না। যতটুকু মাতৃদুগ্ধ শিশু পান করে তাহাই তাহার পক্ষে অমৃতসম হয়।

(২) মাতার দুগ্ধের বিকৃতি ঘটিলে কিংবা দুগ্ধে অম্ল দোষ অথবা অন্য কোন কারণে দুগ্ধের গুণ নষ্ট হইলে, তাহা শিশুকে পান করিতে দেওয়া উচিত নহে। এরূপ দুধ পান করিলে শিশুর পুষ্টি না হইয়া ঘোরতর অনিষ্ট হয়। এরূপ দুগ্ধ পানের ফলে শিশুর মাংসপেশী শিথিল এবং নরম হইয়া যায় এবং পেটের অসুখ, কোষ্ঠ কাঠিন্য রোগে শিশু অসুস্থ হয়। মাতার দুগ্ধ ঠিক অবস্থায় আছে কি না—এ বিষয়ে সন্দেহ হইলে তাহা চিকিৎসকের দ্বারা পরীক্ষা করান উচিত।

(৩) মাতা ক্ষয়, যক্ষ্মা, ফুসফুসের অসুখে আক্রান্ত হইলে কিংবা এই ভীষণ অসুখ পিতামাতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়া থাকিলে, তাঁহার দুগ্ধ শিশুকে কখনো দিবে না। এইরূপ অবস্থায় অধিকাংশ স্থলেই দেখা গিয়াছে যে, মাতৃ দুগ্ধের দ্বারা শিশুর দেহে এই রোগের বীজ রোপিত হইয়াছে।

(৪) মাতা অন্য কোন অসুখে কিংবা রুগ্ন, দুর্ব্বল দেহ বশতঃ কোন প্রকার ঔষধ সেবন করিতে থাকিলে, তাঁহার দুধ শিশুকে দিবে না। কারণ এইরূপ অবস্থায় মাতার দুগ্ধের গুণ নষ্ট হয়, সুতরাং শিশুর পক্ষে তাহা একেবারে অনুপযোগী।

(৫) যেখানে মাতার সামাজিক অবস্থা এরূপ যে, অধিকাংশ সময়েই তাঁহাকে গৃহের বাহিরে থাকিতে হয়, অর্থাৎ কায়িক শ্রম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে হয়, সুতরাং শিশুকে নিয়মিত দুগ্ধপান করিতে

পারেন না, সে সব স্থলেও মাতার দুগ্ধের গুণ ঠিক থাকে না। সুতরাং এরূপ অবস্থায় শিশুর মাতৃস্তন্য পান করা কর্ত্তব্য নহে।

(৬) মাতার মৃত্যু হইলে কিংবা মাতৃস্তনে কোন পীড়া হইলে শিশুর কৃত্রিম খাদ্য ব্যতীত আর উপায় থাকে না।

উপরোক্ত কারণগুলি বশতঃ শিশু মাতৃদুগ্ধ পান করিতে না পাইলে অনেক স্থলে স্তনদুগ্ধ দিবার জন্য ধাত্রী নিযুক্ত করা হয়। এই প্রথা ঘোরতর আপত্তি জনক। ইহাতে শিশুর শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক গুরুতর অনিষ্ট সাধিত হইবার সম্ভাবনা। সাধারণতঃ যে শ্রেণী হইতে এই সকল ধাত্রী নিযুক্ত হয়, তাহাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের কোন সুযোগ হয় না। তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকিলেও মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাহারা বড় হীন। তাহাদের প্রবৃত্তি, মানসিক ভাব এবং নৈতিক আদর্শ ও অত্যন্ত নিকৃষ্ট প্রকৃতির। আবার বংশপরম্পরা গত তাহাদের হৃদয়ে এমন কোন নীচ ভাব নৈতিক হীনতা, বা বুদ্ধি হীনতা বদ্ধমূল থাকিতে পারে--যাহা উচ্চবংশের ধর্ম্মপরায়ণ পিতামাতার সন্তানের মধ্যে সংক্রামিত হইলে তাহার ঘোরতর অনিষ্ট হইবে। সুতরাং যে শিশু এইরূপ ধাত্রীর দুগ্ধে বর্দ্ধিত হয়, তাহার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক হীনতা প্রাপ্ত হইবারই সম্ভাবনা অধিক। অবশ্য কৃত্রিম দুগ্ধ পান করান অপেক্ষা উচ্চবংশ সম্ভূতা, সুশিক্ষিতা, ধর্ম্ম-পরায়ণা স্বাস্থ্যসম্পন্না ধাত্রীর স্তন্যপান করানই শ্রেয়ঃ। কিন্তু এরূপ ধাত্রী পাওয়া কঠিন, একরূপ অসম্ভব বলিলেই হয়। শিশুর আত্মীয়ার মধ্যে কেহ ধাত্রীর উপযুক্ত থাকিলে তাঁহার দুগ্ধ পান করানই সর্ব্বাংশে উত্তম। তাহা না হইলে হীন বংশের, হীন আদর্শে বর্দ্ধিতা ধাত্রীর দুগ্ধ অপেক্ষা গরু, ছাগল, গাধার দুগ্ধে শিশুকে পালন করা উচিত। বর্ত্তমান সময়ে বিলাতি যে সকল কৃত্রিম দুগ্ধ আমাদের বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে, তাহার উপর শিশুকে বর্দ্ধিত করা ঘোর নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ। কেবল এই সকল দুগ্ধের উপর শিশুকে পালন করিলে শিশুর মাংসপেশী নরম-থলথলে হয়, হাড় দৃঢ় হয় না, কোন কোন স্থলে হাড় এমন নরম হয়, যে, পা বাঁকিয়া যায়। মস্তিষ্কের যথেষ্ট পুষ্টি হয় না। সুতরাং শিশু বুদ্ধিহীন হয়। মাতার যতটুকু দুগ্ধ থাকে—ততটুকু পান করান কর্ত্তব্য, তাহাই শিশুর পক্ষে জীবন। মাতার দুগ্ধ শিশুর ক্ষুন্নিবৃত্তির পক্ষে কম হইলে গরু, ছাগল এবং গাধার দুগ্ধে তাহা পূরণ করিতে হইবে। প্রত্যূষে কিংবা রাত্রিতে এই সকল দুগ্ধ পাওয়া না গেলে, দুই একবারের জন্য শিশুকে বিলাতি কৃত্রিম দুগ্ধ দেওয়া যাইতে পারে।

মাতার দুগ্ধে শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ জল আছে। এতদ্ব্যতীত আরো কয়েকটি জিনিষ আছে। যথা—প্রোটিড, স্নেহজাতীয় পদার্থ, শর্করা এবং লবণ। এই দ্রব্যগুলি নিম্নলিখিত হারে মাতার দুগ্ধে দেখিতে পাওয়া যায়।

জল	শতকরা	৮৭·২৪	হইতে	৯০·৫৮
কার্ব্বোহাইডেটস (ল্যাক্টোজ)	,,	৩·১৫	,,	৬·০৯
ফ্যাট বা শর্করা (মাখম)	,,	২·৬৭	,,	৪·৩৩
প্রোটিড (ছানা)	,,	২·৯১	,,	৩·৯২
লবণ	,,	·১৪	,,	·২৮

মাতৃদুগ্ধে প্রোটিড নামক যে পদার্থ আছে, তাহা দ্বারা দেহের অঙ্গগুলি গঠিত হয়। দুধ নষ্ট হইয়া গেলে তাহাতে যে ছানার মত পদার্থ ভাসিতে দেখা যায়—তাহাই প্রোটিড। মানবের আহার্য্যের মধ্যে প্রোটিড না থাকিলে জীবন রক্ষা হয় না। যে সকল উপাদান দ্বারা দেহের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গগুলি বৰ্দ্ধিত ও পুষ্ট হয়, প্রোটিড—রক্তে সেই সকল উপাদান দান করে। শিশুর খাদ্যে প্রোটিডের অভাব হইলে শীঘ্রই তাহার কুফল দেখিতে পাওয়া যায়। প্রোটিডশূন্য খাদ্য খাইলে শিশুর দৈহিক গঠন এবং বৃদ্ধি বাধা প্রাপ্ত হয়, দেহ দুর্ব্বল এবং বিবর্ণ হয়, মাংস থলথলে হয় এবং পীড়া রোধ করিবার ক্ষমতা থাকে না।

মস্তিষ্ক, স্নায়ু এবং দেহের অন্যান্য অংশ গঠন করিবার উপাদান, দুগ্ধের মাখন (ফ্যাট) রক্তের মধ্যে প্রদান করে। দেহের মধ্যে কতক ফ্যাটের রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হয় এবং তাহা দেহের তাপ উৎপাদন করে। ফ্যাট দেহকে গরম রাখে।

আমরা যে শর্করার সহিত সাধারণতঃ পরিচিত, মাতৃ দুগ্ধের শর্করার সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকিলেও উহা একই জিনিস নহে। দেহের তাপ রক্ষা করা এবং মাখন (ফ্যাট) তৈয়ারী করা এই শর্করার কাজ। ইহার রাসায়নিক নাম কার্ব্বোহাইড্রেটস।

দুগ্ধে যে লবণ আছে, তাহা দেহের হাড় গঠন করে। দেহের অন্যান্য যন্ত্র গঠন করিতে এবং রক্ষা করিতে যে নানাপ্রকার লবণাক্ত পদার্থের প্রয়োজন হয়, তাহা এই লবণ—রক্তের মধ্যে দান করে। দুগ্ধের সমস্ত জল, প্রোটিড, ফ্যাট (মাখন) এবং শর্করা ফুটাইয়া নিঃশেষ করিলে পর একপ্রকার ছাইয়ের ন্যায় দ্রব্য পতিত থাকিতে দেখা যায়, তাহাই দুগ্ধের লবণ। দুগ্ধ পান করিয়া হজম হইয়া যাইবার পর দুগ্ধের প্রোটিড, ফ্যাট (মাখন) শর্করা এবং লবণ—দুগ্ধের জল দ্বারাই রক্তের মধ্যে নীত হয়। তারপর দেহ গঠনের কার্য্য চলিতে থাকে।

শিশুকে কোন কৃত্রিম দুগ্ধে পালন করিতে হইলে মাতার দুগ্ধে যে পরিমাণে উপরোক্ত পদার্থগুলি আছে, শিশুর খাদ্যেও সেই পরিমাণে উহা থাকা প্রয়োজন। তাহা না হইলে একটি পদার্থের অভাবে কিংবা অল্পতায় শিশু রীতিমত খাদ্য গ্রহণ করিলেও তাহার দেহ পুষ্ট হয় না, অধিকন্তু ক্রমশঃই শীর্ণ হইয়া যায়। মাতার দুগ্ধের পর গাভীর দুগ্ধই শিশুর পক্ষে উৎকৃষ্ট খাদ্য। ছাগল এবং গাধার দুগ্ধের গুণও মাতৃ দুগ্ধের প্রায় সম গুণ বিশিষ্ট। গাধার দুগ্ধ শিশুকে ৩।৪ মাস বয়স পর্য্যন্ত খাওয়ান যাইতে পারে। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার যেরূপ পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন হয়, গাধার দুগ্ধে যেরূপ পুষ্টিকর পদার্থ নাই, কারণ মাতৃদুগ্ধ অপেক্ষা গাধার দুগ্ধে মাখনের অংশ অনেক কম। মাতৃ দুগ্ধে শতকরা তিনভাগ মাখন আছে, কিন্তু গাধার দুগ্ধে শতকরা একভাগের কিছু বেশী মাখন আছে। সুতরাং গাধার দুগ্ধ শিশুকে বেশী দিন খাওয়ান চলে না। সাধারণতঃ গাধাদিগকে এত অপরিষ্কার স্থানে ও অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় রাখা হয় এবং জঘন্য খাদ্য খাইতে দেওয়া হয় যে, ইহাদের দুধ শিশুকে খাওয়াইলে পীড়ায় আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে। অধিকন্তু গাধার দুগ্ধ মহার্ঘ এবং সচরাচর বেশী পাওয়া যায় না। ছাগলের দুগ্ধে আবার মাতৃ দুগ্ধ অপেক্ষা মাখনের অংশ বেশী। এই কারণে প্রথম কয়েকমাস শিশুকে এই দুগ্ধ

দেওয়া যাইতে পারে না। শিশুর হজম শক্তির পক্ষে ছাগলের দুগ্ধ ভারী। ৮।৯ মাস হইলে শিশুকে ছাগলের দুগ্ধ দেওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে সহরে খাঁটি গাভীর দুগ্ধ দুষ্প্রাপ্য। সহরের বাটীতে স্থানাভাব বশতঃ গাভী রাখাও অতিশয় কঠিন। এই কারণে ছাগল পুষিলে শিশুকে তবু খাঁটি দুগ্ধ দেওয়া যায়। বাটীতে ছাগল পুষিয়া তাহাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থায় রাখিয়া উত্তম খাদ্য আহার করাইলে তাহার যে দুগ্ধ হয়, তাহা শিশুর পক্ষে উপকারী ও পুষ্টিকর। সকল প্রাণীর দুগ্ধে একই পদার্থ সমূহ বিদ্যমান আছে। তবে তাহাদের পরিমাণে কম-বেশী আছে। মাতৃ দুগ্ধ, গাভী, ছাগল এবং গাধার দুগ্ধে কোন্ পদার্থ কি পরিমাণে আছে, তাহা নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

(১০০ শত ভাগে)	জল।	ছানা।	মাখন।	শর্করা	লবণ।
মাতৃদুগ্ধ—	৮৮'৯০	৩'৪২	৩'৩৩	৪'৫৫	০'২১
গাধা—	৮৯'০১	৩ ৫৭	১'৮৫	৪'৫০	০'৫৫
গাভী—	৮৭'০৫	৪ ২১	৩'৮২	৩'৬৭	০'৭১
ছাগল—	৮৬'৮৫	৩ ৭৯	৪'৩৪	৩'৭৮	০'৬৫
মহিষ—	৮৪ ১০	৪'০০	৭'১০	৪'০০	০'৮০

মাতৃদুগ্ধে যে পরিমাণ ছানা আছে, গাভীর দুগ্ধে তাহার পরিমাণ অধিক এবং শর্করার পরিমাণ কম। এই কারণে গাভীর দুগ্ধে জল এবং শর্করা মিশাইয়া শিশুকে পান করাইলে তাহা অনেকটা মাতৃদুগ্ধের সমান হয়। ২।১ মাসের শিশুর দুগ্ধে যতটা জল মিশান দরকার, শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার পরিমাণ কমাইয়া দিতে হইবে। শিশুর দাঁত উঠিবার পূর্ব্বে কোন প্রকার (Starchy) কঠিন শস্য বা শ্বেতসার খাদ্য দেওয়া উচিত নহে। দাঁত উঠিলে শিশুকে শস্যজাত শ্বেতসার খাদ্য দেওয়া যাইতে পারে। দাঁত উঠিবার পূর্ব্বে শিশুকে এ্যারারুট, রুটি, সাগু, ময়দা, আলু প্রভৃতি শ্বেতসার দেওয়া একেবারে নিষিদ্ধ। তখন এইরূপ খাদ্য খাইলে শিশুর অত্যন্ত অনিষ্ট হয়। শিশু এরূপ খাদ্য তখন হজম করিতে পারে না। সময় সময় চারি মাসেও দাঁত উঠে, কিন্তু সাধারণতঃ ছয় মাস হইলেই শিশুর দাঁত উঠিতে আরম্ভ হয়। সুতরাং ছয় মাসের পূর্ব্বে কোন প্রকার শ্বেতসার বিশিষ্ট খাদ্য কখনো দিবেনা। ছয় মাসের পর উহা অল্প পরিমাণে দেওয়া যায়। কিন্তু দুই বৎসরের পূর্ব্বে খাদ্য ভাল করিয়া হজম করিবার শক্তি জন্মে না। শিশুদের জন্য যে সকল বিলাতি কৃত্রিম দুগ্ধ বাজারে পাওয়া যায়, তাহা বিশেষ সাবধানতার সহিত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। কারণ এইরূপ কোন কোন দুগ্ধের ভিতর ময়দা প্রভৃতি শ্বেতসার জাতীয়

জিনিস আছে। আহারের সময় জিহ্বা হইতে যে লালারস নির্গত হয়, তাহাই শস্য জাতীয় খাদ্য হজম করে। সাধারণতঃ চারি মাসের পূর্ব্বে শিশুর জিহ্বা হইতে লালা নির্গত হয় না। এই কারণে চারিমাসের পূর্ব্বে শিশুকে "starchy খাদ্য দিলে শিশু তাহা হজম করিতে পারে না।

বেশী পরিমাণে খাইলেই যে শিশুর দেহ পুষ্টিলাভ করে এরূপ বিবেচনা করা নির্ব্বুদ্ধিতা। যতটুকু খাদ্য শিশু সহজে হজম করিতে পারে, তাহাই তাহার দেহের পুষ্টিসাধন করে। খুব খাইলেই যে শিশুর দেহ সবল ও স্বাস্থ্যবান হইবে এমন কোন কথা নাই। পুষ্টিকর, সহজে হজম হয়—এরূপ খাদ্য শিশুকে দিতে হইবে। শিশু খুব খাইতেছে—অথচ শরীর শীর্ণ, দুর্ব্বলই রহিয়াছে—এরূপ হইলে বুঝিতে হইবে যে, শিশু যাহা আহার করিতেছে তাহা জীর্ণ করিতে পারিতেছে না। যে শিশু মাতৃদুগ্ধ পায় না তাহাকে কৃত্রিম খাদ্য দিতে হয়। এইরূপ শিশুর সর্ব্বাঙ্গের পুষ্টি সাধনের পক্ষে নিম্নলিখিত প্রকারের খাদ্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

(১) যে খাদ্যে মাতৃদুগ্ধের সম পরিমাণ উপাদান সমূহ আছে।

(২) এই উপাদানগুলি মাতৃদুগ্ধে যে পরিমাণে আছে ঠিক সেই পরিমাণ থাকিবে।

(৩) যে খাদ্য শিশু সহজে হজম করিতে পারে।

(৪) খাদ্য টাট্‌কা হইবে। তাহাতে কোনো ময়লা যেন না থাকে এবং বিস্বাদ যুক্ত না হয়।

(৫) শিশুকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যতটা খাদ্য দিবে তাহার পুষ্টিকারিতা গুণ যেন দশ ছটাক হইতে ত্রিশ ছটাক মাতৃদুগ্ধের তুল্য হয়।

উপরোক্ত কয়েকটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যদি শিশুকে কৃত্রিম খাদ্য দেওয়া হয়, তবে তাহাতেই শিশুর দেহের পুষ্টিসাধন হইবে। একবৎসরের নিম্নবয়স্ক যে সকল শিশুর মৃত্যু হয়, তাহার চারিভাগের তিন ভাগ শিশুই কৃত্রিম খাদ্য আহার করে। অনুপযুক্ত, অপুষ্টিকর খাদ্যই এই মৃত্যুর কারণ।

শিশু চিকিৎসায় সহজ ব্যবস্থা।

—:•:—

(কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ, এম-বি,)

বুকে সর্দ্দি বসিলে।—(১) ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম—মধুর সহিত মিশাইয়া সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হয়। ময়ূর পুচ্ছ ভস্ম করিতে হইলে একখানি হাতায় কতকগুলি ময়ূরপুচ্ছ রাখিয়া একটি ছোট বাটি দ্বারা উহা চাপা দিয়া কিয়ৎক্ষণ অগ্নি সন্তাপে রাখিলেই উহা ভস্ম হইয়া থাকে। এক বৎসরের শিশুর জন্য এই ময়ূর পুচ্ছ ভস্মের পরিমাণ ১ রতি। এই হিসাবে মাত্রা ঠিক করিয়া লইতে হয়। অবস্থা-বিবেচনায় ইহা প্রাতে ও বৈকালে ২ বার করিয়াও সেবন করান চলে। ইহার সহিত ১ রতি পিপুলের গুঁড়া মিশাইয়া সেবন করাইলে আরও সুফল দর্শিয়া থাকে। (২) আদার রস ও পুরাতন ঘৃত একত্র মিশাইয়া বুকে ও গলায় মালিশ করিলে বিশেষ উপকার হয়। (৩) পিপুল দুই আনা, ভূঁইআমলকী দুই আনা, [illegible]

মধু, মিছরি, বড় এলাইচ ও হরীতকী—ইহাদের প্রত্যেকটী চারি আনা, সমস্ত দ্রব্য অগ্নি উত্তাপে দেড় পোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া এক ঝিনুক অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া দুই তিন বারে সেবন করাইলে শিশুর সর্দ্দি-কাশীতে বিশেষ ফল দর্শিয়া থাকে।

এঁড়ে লাগায়।—(১) দুগ্ধের সহিত চূণের জল সেবন করাইলে এঁড়ে লাগা বা পারিগর্ভিক জনিত অগ্নিমান্দ্য আরোগ্য হইয়া থাকে। (৩) ছাতিমফুল, মরিচ ও গোরোচনা প্রত্যেকটী ১ রতি মাত্রায় লইয়া জলসহ শিলায় পিষিয়া কয়েক দিন সেবন করাইলে এঁড়ে লাগা বা পারিগর্ভিক রোগের উপশম হয়।

জ্বরে।—(১) তুলসীর রস ও মধু শিশুর জ্বর নিবারক। (২) আতইচের গুঁড়া মধুর সহিত মিশাইয়া সেবন করাইলে শিশুর সাধারণ জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে। আতইচ বেণের দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়। আতইচের গুঁড়ার মাত্রা ১ বৎসরের শিশুর পক্ষে অর্দ্ধ রতি প্রাতে ও অর্দ্ধ রতি বৈকালে। জ্বরের সহিত কাশী ও বমির উপদ্রব থাকিলে ও এইরূপ ব্যবস্থায় উপকার হইয়া থাকে। (৩) মুতা, হরীতকী (আঁটীবাদ), নতি, যষ্ঠীমধু নিমছাল—প্রত্যেক দ্রব্য সাড়ে আট কুঁচ ওজনে লইয়া আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া শিশুর সাধারণ জ্বরে এক ঝিনুক মাত্র খাওয়াইবে, বাকী কাথ ফেলিয়া দিবে। এরূপ ব্যবস্থায় শিশুর সাধারণ জ্বরে সুফল দর্শিয়া থাকে। (৪) নতি, নিমছাল, হরীতকী (আঁটীবাদ), বহেড়া (আঁটীবাদ), হরিদ্রা আমলকী (আঁটিবাদ)—প্রত্যেক দ্রব্য বত্রিশ কুঁচ ওজনে লইয়া আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া সমস্ত কাথ ফেলিয়া দিয়া মাত্র একঝিনুক বালককে কয়েকদিন সেবন করাইলে বালকের সাধারণ জ্বরে উপকার হইয়া থাকে। ৩ এবং ৪নং যোগ দুইটী অন্ততঃ ৩ বৎসর বয়স্ক শিশু ভিন্ন সেবন করান ঠিক নহে।

বমন রোগে।—(১) কণ্টকারী ও বৃহতী ফলের রস সমান ভাগে সিকি ঝিনুক মাত্র লইয়া সেবন করাইলে শিশুর বমন প্রশমিত হয়। স্তন-দুগ্ধ পান মাত্র যে সব শিশু বমন করিয়া থাকে—তাহাদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। (২) আম্রকেশী, সৈন্ধব লবণ ও খই চূর্ণ একত্র মিশাইয়া সেবন করাইলে শিশুর বমন রোগে উপকার হইয়া থাকে। প্রত্যেক দ্রব্যের মাত্রা ১ বৎসরের শিশুর জন্য ১ রতি। (৩) পিঁপুলের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া ও কাশীর চিনি প্রত্যেক দ্রব্য অর্দ্ধ রতি করিয়া লইয়া মধুর সহিত মিশাইয়া লেবুর রস সহ সেবন করাইলে শিশুর বমন রোগের উপশম হইয়া থাকে। শিশুর হিক্কা রোগেও এ যোগটীতে উপকার হয়।

মূত্র রোধে।—পিঁপুল, মরিচ, ছোট এলাইচের গুঁড়া, চিনি, সৈন্ধব লবণ—সমান ভাগে লইয়া মধুর সহিত মিশাইয়া অবলেহ করাইলে শিশুর মূত্ররোধে উপকার দর্শিয়া থাকে।

মুখ পাকিলে।—অশ্বত্থ গাছের ছাল ও পত্র—উত্তমরূপে বাটিয়া মধুর সহিত মিশাইয়া মুখে প্রলেপ দিলে শিশুর মুখপাকিলে উপকার হইয়া থাকে। এই প্রলেপ দিবার সময় সাবধানে ইহার প্রয়োগ করিবে, যেন চক্ষে না লাগে।

দন্তোদ্ভেদজ রোগে।—শিশুর দাঁত উঠিবার সময় জ্বর, অজীর্ণ প্রভৃতি নানা-

প্রকার পীড়া হইয়া থাকে। বিশেষ কোনো ঔষধ এই অবস্থায় প্রয়োগ করা ঠিক নহে, কারণ দাঁত উঠিলে ঐ সকল রোগ আপনা আপনিই সারিয়া যায়। এই সময় আমলকীর রস দাঁতের মাড়িতে ঘসিতে থাকিলে শীঘ্র শীঘ্র দাঁত উঠিয়া থাকে। ধাইফুল ও পিঁপুলের গুঁড়া একত্র মিশাইয়া দাঁতের মাড়িতে ঘসিলেও শীঘ্র শীঘ্র দাঁত উঠিয়া থাকে। যদি এ সকল ব্যবস্থা করিলেও দাঁত উঠিতে বিলম্ব হয় এবং তজ্জন্য বিশেষ কষ্ট বোধ হয়, তাহা হইলে সুযোগ্য চিকিৎসকের সাহায্যে ঐ স্থান চিরিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

দূষিত স্তন্যপান জনিত-রোগে। —দূষিত স্তন্যপানে শিশুর নানাপ্রকার পীড়া হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় শিশুর পেট ফাঁপা উপদ্রব ঘটিলে এক ছটাক দুগ্ধের সহিত ১ তোলা ধনে বা মৌরী ভিজান জল মিশ্রিত করিয়া পান করানর ব্যবস্থা করিবে। গব্য দুগ্ধের সহিত সমপরিমিত চুণের জলও এইরূপ অবস্থায় উপকারী। ধাত্রীর স্তন দূষিত হইলে সেই স্তন্যদুগ্ধ শিশুকে কখন পান করিতে দিবে না, ছাগ দুগ্ধ কিম্বা জল ও মিছরি মিশ্রিত গব্য দুগ্ধ পান করান এই অবস্থায় ফলপ্রদ।

ভেদ বমিতে।—(১) কুল, আমরুল, কাকমাচী ও কয়েদবেল এই সকল দ্রব্যের পাতা পিষিয়া লইয়া মাথায় প্রলেপ দিলে শিশুর ভেদ বমি নিবারিত হয়। (২) বেলশুঁঠ ও আমের আটির শাঁসের কাথের সহিত খইয়ের গুঁড়া ও চিনি মিশাইয়া সেবন করাইলে শিশুর ভেদ বমি নিবারিত হয়।

অতিসারে।—আমড়া ছাল, আম ছাল ও জাম ছালের গুঁড়া সমান ভাগে মিশাইয়া চিনি বা মধুর সহিত সেবন করাইলে শিশুর অতীসার আরোগ্য হইয়া থাকে। (২) ধাইফুলের গুঁড়া কিম্বা বেলশুঁঠের গুঁড়া—চিনি কিম্বা মধুর সহিত মিশাইয়া সেবন করাইলে শিশুর অতীসার আরোগ্য হইয়া থাকে। ১ বৎসরের শিশুর জন্য ঐ ২টি দ্রব্যের প্রত্যেকটির মাত্রা ১ রতি। (৩) ছাগ দুগ্ধ ও জামছালের রস কিম্বা জাম গাছের পাতায় সিদ্ধ করা ছাগ দুগ্ধ শিশুর অতীসার নাশক। (৪) বেলশুঁঠ, ইন্দ্রযব (কুড়চির ফল), বালা, মোচরস ও মুথা—প্রত্যেক দ্রব্য ।৵১০ আনা, ছাগ দুগ্ধ এক পোয়া ও জল একসের—একত্র সিদ্ধ করিয়া জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া শিশুকে ২।৩ বারে উহা পান করাইলে শিশুর অতীসার প্রশমিত হয়।

আমাশয়ে।—(১) সাদা জীরার গুঁড়া ও সাদা ধুনার গুঁড়া সমান ভাগে মিশাইয়া চিনি বা মধুর সহিত সেবন করাইলে শিশুর প্রবাহিকা বা আমাশয় রোগ প্রশমিত হয়। মাত্রা—১ বৎসরের শিশুর জন্য প্রত্যেক দ্রব্যের মাত্রা অর্দ্ধ রতি। (২) খইয়ের গুঁড়া, যষ্টীমধুর গুঁড়া, চিনি ও মধু—সমান ভাগে লইয়া সেবন করাইলে শিশুর প্রবাহিকা বা আমাশয় আরোগ্য হয়। মাত্রা পূর্ব্ববৎ।

সফল চিকিৎসা।

—:*:—

(বাতাজীর্ণে লাল চতুর্ম্মুখ।)

অজীর্ণ রোগে সাধারণতঃ কবিরাজী চিকিৎসায় ভাস্কর লবণ, মহাশঙ্খ বটী, হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণ, বজ্রক্ষার প্রভৃতি ঔষধই ব্যবহার করা হয়, অনেক সময় সে সকল ঔষধে সুফলও হইয়া থাকে, কিন্তু অনেক সময় ঐ সকলের ব্যবস্থায় রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয় না। ইহার কারণ অন্য কিছুই নহে, রোগের মূলতত্ত্ব অবগত না হইয়া ঔষধ প্রয়োগ। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র ত এইজন্যই বলিয়া গিয়াছেন,—

"রোগমাদৌ পরীক্ষেত ততোঽনন্তর মৌষধম্।
ততঃ কর্ম্ম ভিষক পশ্চাজ্‌ জ্ঞান পূর্ব্বং সমাচরেৎ॥

অর্থাৎ অগ্রে রোগ পরীক্ষা করিয়া তাহার পর ভিষক জ্ঞানপূর্ব্বক যথা বিহিত ব্যবস্থা করিবেন।

অনেক সময় কিন্তু রোগের মূলতত্ত্ব অবগত না হইয়া ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, এইজন্যই চিকিৎসক সুফল প্রদর্শনে 'সমর্থ হন না, কিন্তু যদি রোগের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিয়া যথাশাস্ত্র ঔষধ প্রয়োগ করা যায়—তাহা হইলে তদ্দারা যে শুভফল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, ইহা সুনিশ্চিত।

আমি রাণাঘাটে থাকিতে একটি দুতকর অজীর্ণ রোগীর চিকিৎসায় "লাল চতুর্ম্মুখ" সেবন করাইয়া অতি আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহার কথাই আজি বলিব।

রোগীর নিবাস রাণাঘাটেই, রোগী কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের বি-এ, উপাধিধারী এবং কলিকাতা পোষ্ট অফিসের একজন কর্মচারী। নাম শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র বসু। বয়স ৩৫-৩৬ বৎসর। পূর্ব্বে ইনি যথেষ্ট ব্যায়াম করিতেন, তখন তাঁহার শারীরিক গঠন খুব দৃঢ় ছিল। ডাকঘরের চাকরি লইয়া পদোন্নতি কামনায় ইনি প্রাণান্ত পরিশ্রম পূর্ব্বক অনিয়মিত পরিশ্রম করিতেন। অনিয়মিত পরিশ্রম করিতেন—অথচ উপযুক্ত আহার ছিল না, ফলে তিনি কিছুকাল কর্ম্ম করার পরেই দারুণ অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত হইলেন। অজীর্ণ বায়ু জনিত। সর্ব্বদাই পেট ফাঁপিত, কোষ্ঠ শুদ্ধি হইত না, আহার করিতে পারিতেন না, শিরঃপীড়া বোধ হইত, বুক ধড়ফড় করিত, রাত্রে ভালরূপ নিদ্রা হইত না, স্বপ্ন ভঙ্গ হইত, কোনো কার্য্যে উৎসাহ ছিল না, ক্রমে কার্য্য করিবার সামর্থ্য একেবারে নষ্ট হইল, যাহা খাইতেন, তাহাই অজীর্ণ হইতে লাগিল, ক্রমে অর্শ আসিয়াও উপস্থিত হইল।

রোগীর কর্ম্মস্থান কলিকাতায়, বিশেষতঃ তিনি বিশ্ব বিদ্যালয়ের বি এ, উপাধিধারী—শিক্ষিত ব্যক্তি, কাজেই তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রথমতঃ কলিকাতার বড় বড় ডাক্তার দিগের হাতেই পড়িল। কয়েকজন অ্যালোপাথ দেখিলেন, কয়েকজন হোমিওপ্যাথ দেখিলেন, শেষে কলিকাতার কয়েকজন প্রথিতনামা কবিরাজও তাঁহার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিলেন। ফলে কিছুতেই রোগের উপশম হইল না। অনেকে Change যাওয়া বা হাওয়া পরিবর্ত্তনের পরামর্শ দিলেন, তিনি

সেই পরামর্শ শিরোধার্য্য করিয়া "কৈলোয়ারে" পর্য্যন্ত কয়েকমাস কাটাইয়া আসিলেন।

কৈলোয়ারে গিয়া তাঁহার রোগের শান্তি ত হইলই না, বরং রোগ আরও ভীষণ ভাব ধারণ করিল, তিনি অস্থিকঙ্কাল সর্ব্বস্ব হইলেন। সত্য কথা বলিতে কি, তখন একরূপ তাঁহার হাড় কয়খানি মাত্রই অবশিষ্ট। এরূপ অবস্থায় তাঁহার আত্মীয়গণ আর তাঁহাকে কৈলোয়ারে রাখা অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া তাঁহার আবাস ভূমি রাণাঘাটে লইয়া আসিলেন। কিন্তু
"যাবৎ কণ্ঠগতাঃ প্রাণা যাবন্নাস্তি নিরিন্দ্রিয়ঃ
তাবচ্চিকিৎসা কর্ত্তব্যা কালস্য কুটিলাগতিঃ।"

এজন্য রাণাঘাটে মৃতকল্প অবস্থায় তাঁহাকে লইয়া আসা হইলেও রাণাঘাটের কয়েকজন প্রসিদ্ধ অ্যালোপাথ চিকিৎসকের দ্বারা তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু সকল চিকিৎসকই এক বাক্যে বলিলেন,—এ রোগীর জীবনের আশা নাই, চিকিৎসা করান বৃথা।

এই সময় রোগীর মাতুল গবর্ণমেণ্টের পেন্সন প্রাপ্ত বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত হরিমোহন ঘোষ মহাশয় রোগীকে আমার নিকট লইয়া আসিলেন। দুইজন দুই দিকে ধরিয়াছে, রোগী অতি কষ্টে হাঁটিয়া আসিতেছে—এইরূপ ভাবে রোগী আমার চিকিৎসালয়ে আগমন করিলেন। আমার সহিত তখন তাঁহার পরিচয় ছিল না, আমি রোগীর অবস্থা দেখিয়া বলিলাম— "ইঁহাকে কষ্ট দিয়া কেন লইয়া আসিলেন? আমাকে লইয়া গেলেই তো ভাল হইত।" রোগীর মাতুল বলিলেন,—"ইঁহার আর কোনো চিকিৎসায় বিশ্বাস নাই, সেইজন্য আর অধিক অর্থ ব্যয়ে ইচ্ছুক নহেন। আমি একরূপ আপনাকে শেষ দেখান দেখাইব বলিয়া জোর করিয়াই লইয়া আসিয়াছি।"

আমি স্থির ভাবে তাঁহার সমস্ত অবস্থা শ্রবণ করিলাম। নাড়ী পরীক্ষা করিলাম—নাড়ী বাতপ্রবণ এবং অতিশয় দুর্ব্বল। রোগীই আমাকে তাঁহার রোগের আদ্যোপান্ত অবস্থা বুঝাইয়া দিলেন। রোগ-পরিচয়ে তিনি এত ভাল করিয়া বুঝাইলেন যে, আমি তাহার পূর্ব্বে কোনো রোগীর নিকট সেরূপ পরিষ্কার ভাবে রোগের অবস্থা বিবৃতি করিতে দেখি নাই। রোগী যারপরনাই দুর্ব্বল, সেই দুর্ব্বলতা নিবন্ধন তখন তাঁহার কথা কহিতেও যেন কষ্ট হইতেছিল। তিনি খুব কষ্ট করিয়াই তাঁহার রোগের সকল কথা আমাকে বুঝাইতে লাগিলেন। এই রোগের অবস্থা বিবৃতি করিতে তাঁহার প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল।

সমস্ত অবস্থা বুঝাইয়া তিনি আমাকে বলিলেন, "দেখুন, আমার আর চিকিৎসা করানর ধৈর্য্য নাই, আপনি ত রাণাঘাটে পড়িয়া আছেন, কলিকাতার বড় বড় অ্যালোপাথ, হোমিওপ্যাথ এবং কবিরাজের আমি শরণাপন্ন হইয়াছিলাম, কেহই কিছু করিতে পারেন নাই, রাণাঘাটেরও যে কয়জন বড় ডাক্তার আছেন—সকলকেই দেখাইয়াছি।—এক কথায় আমার মত গৃহস্থের পক্ষে যতদূর সাধ্য চিকিৎসা করান যাইতে পারে, তাহা আমি করিয়াছি। এখন সকলেই জবাব দিয়াছেন। আমি এখন মরিবার জন্যই প্রস্তুত হইয়াছি। মামার নিতান্ত অনুরোধে আপনার নিকট আসিয়াছি মাত্র, কিন্তু আমি বেশী দিন আপনার চিকিৎসায় অপেক্ষা করিতে পারিব না, যদি এক সপ্তাহের মধ্যে কোনোরূপ উপকার প্রাপ্ত না হই, তাহা হইলে এক সপ্তাহেই আপনার দ্বারা চিকিৎসা [illegible]

সাধ আমার মিটিয়া যাইবে। আপনি এই সকল বিবেচনা করিয়া যদি এরূপ কোনো ঔষধ থাকে—যাহাতে মন্ত্রশক্তির মত কার্য্য করিতে পারে,—তবে তাহাই আমাকে প্রদান করুন। নতুবা কোনো ঔষধ দিবেন না।”

কোনো রোগী আমার নিকট এরূপ কথা ইতিপূর্ব্বে বলে নাই, কোনো চিকিৎসকের নিকট আর কোনো রোগীও এরূপ কথা বলিয়াছে কি না তাহাও আমি জানিনা। ফলে রোগীর মুখে এরূপ কথা শুনিলে সাধারণতঃ সে রোগীর চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্তিই হয় না। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রও সেরূপ রোগীর চিকিৎসা করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদ সে সম্বন্ধে তো বলিয়াছেন,—

বৈরী বৈদ্যবিদগ্ধশ্চ শ্রদ্ধাহীনশ্চ শঙ্কিতঃ।
ভিষজার্ম্বধেয়াশ্চ নোপক্রম্যা ভিষগ বিধাঃ॥

অর্থাৎ শত্রুতা ভাব সম্পন্ন বৈদ্যধূর্ত্ত, বিশ্বাসহীন, শঙ্কিত, চিকিৎসকের অবাধ্য ও চিকিৎসক কল্প—এই সকল ব্যক্তির চিকিৎসা করিবেনা।

কিন্তু আমি ভাবিয়া দেখিলাম,—রোগে ইঁহাকে এইরূপ চিকিৎসায় বিশ্বাসহীন করিয়াছে, নতুবা ইনি যেরূপভাবে আত্মরোগ বিবৃতি করিয়াছেন, তাহাতে চিকিৎসা শাস্ত্রের উপদেশানুযায়ী ইনিই ত সর্ব্বপ্রথম চিকিৎসার উপযুক্ত পাত্র। কারণ চিকিৎসা শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

“নিজ প্রকৃতি বর্ণভ্যাং যুক্তঃ সত্তেন চক্ষুষা
চিকিৎস্যো ভিষজা রোগী বৈদ্য ভক্তো জিতে-
ন্দ্রিয়ঃ॥

উপরোক্ত শ্লোকের মধ্যে আমাদের লিখিত রোগীর সমস্ত গুণ না থাকিলেও নিজ রোগ বিবরণ ইনি যেরূপ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে ইনিই তো চিকিৎসা শাস্ত্রের উপদেশানুযায়ী সর্ব্ব প্রথম চিকিৎসার যোগ্য।

যাহা হউক আমি তাঁহার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিলাম। ঔষধের ব্যবস্থা করিলাম—অজীর্ণের বাঁধাধরা নিয়মে নহে,—একটু রকমারি করিয়া তাঁহার ব্যবস্থা করিলাম। তাঁহাকে প্রথম সপ্তাহে যে কয়টি ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, তাহা নিম্নে লিখিতেছি।

প্রাতে—লাল চতুর্ম্মুখ।

রস সিন্দুর, লৌহ ও অভ্র—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ এবং স্বর্ণ ভস্ম এক চতুর্থাংশ। ঘৃত কুমারীর রসে মাড়িয়া, এরণ্ড পত্র দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক ধান্যরাশির মধ্যে ৩ দিন রাখিয়া ২ রতি বটী—যাহা বাতব্যাধি অধিকারে লিখিত আছে—সেই ঔষধের ব্যবস্থা করিলাম। অনুপান দিলাম—বায়ু রোগ শান্তির বাঁধা নিয়মে ত্রিফলা ভিজান জল ও মধু।

দিবসে আহারান্তে

ভাস্কর লবণ—

ইহার মাত্রা দিলাম এক আনা মাত্র। অনুপানের ব্যবস্থা করিলাম—টাট্‌কা ঘোল।

সন্ধ্যায়—বজ্রক্ষার।

মাত্রা এক আনা। অনুপান—মৌরী ভিজান জল।

আমার নিকট আসিবার পূর্ব্বে জীর্ণ হইত না বলিয়া রোগী একেবারে ভাত খাওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন। আমি বলিলাম—“তাহা হইবে না, একবেলা ভাত ও একবেলা সাগু খাইবেন। ভাত কিন্তু যাহা খাইবেন, তাহাতে উদরপূর্ত্তি সম্যকরূপে করিতে পারিবেননা, অর্দ্ধেক হিসাবে খাইবেন। প্রাতে এবং বৈকালে পাকা পেঁপে কিছু খাওয়ার বন্দোবস্ত করিবেন। দিবসে যে ভাত খাইবেন, তাহা যেন বেলা ১১টার পর না হয় এবং ১১টার পূর্ব্বেও না হয়, অর্থাৎ

ঠিক একই সময়ে আহারকাল ঠিক রাখিবেন। খুব প্রত্যূষে সামর্থ্য মত একটু একটু হাঁটিয়া মুক্ত বায়ু সেবন করিবেন। বৈকালেও ঐরূপ যতটুকু সহ্য করিতে পারেন, করিবেন। দিবসে একেবারেই শয়ন করা চলিবে না, রাত্রিতে ৯টার পর কিন্তু নিদ্রা না আসিলেও শয্যা গ্রহণ করিতে হইবে। ভাতের সঙ্গে বেশী ব্যঞ্জন খাইতে পাইবেননা, জীবিত মৎস্যের ঝোল এবং ভাত। মৎস্যের ঝোল যাহা রন্ধন করা হইবে—তাহাতে লঙ্কা মরিচের ঝাল একেবারে দেওয়া হইবে না।"

রোগীকে যেরূপ বলিয়াছিলাম, ঠিক সেই ভাবে তিনি এক সপ্তাহ আমার ব্যবস্থায় থাকিলেন, এরূপ চমৎকার ফল হইল যে, তাহাতে আমি তো আশ্চর্য্য হইলামই, রাণাঘাটের যে বড় বড় ডাক্তারেরা তাঁহাকে চিকিৎসার অসাধ্য বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারাও এক সপ্তাহ পরে তাঁহাকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। রাণাঘাটের ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ গুপ্ত এল, এম, এস মহাশয় আমার দ্বারা তাঁহার চিকিৎসা হইবার পূর্ব্বে তাঁহার ওজন লইয়াছিলেন, এই সময় আবার ওজন লইয়া দেখিলেন—ওজনে তিনি একসের বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

রোগীরও স্ফূর্ত্তি হইল। দ্বিতীয় সপ্তাহে রোগী অতি আহ্লাদের সহিত আমার নিকট আগমন করিয়া সকল কথা বলিলেন।

দ্বিতীয় সপ্তাহেও আমি তাঁহার প্রথম সপ্তাহের ব্যবস্থাই বজায় রাখিলাম। তাহার পর তৃতীয় ও চতুর্থ সপ্তাহ। ব্যবস্থার আর পরিবর্ত্তন করিলাম না, একই ব্যবস্থা চালাইতে লাগিলাম। কয়েক সপ্তাহের পর রোগীর উদরাময় দেখা দিল; আমি এই সময় [illegible] ঔষধটি বদলাইয়া দিয়া তাহার স্থলে "চিত্রকাদি গুড়ি"র এক একটি গুড়িকা শীতল জলের সহিত সেবনের ব্যবস্থা করিলাম। এই চিত্রকাদি গুড়ির ব্যবস্থার সময় রোগী বলিলেন, "মহাশয় ঐ ঔষধটি দিবেন না, উহা আমি কলিকাতায় * * কবিরাজ মহাশয়ের নিকট অনেক খাইয়াছি, কিন্তু কোনো ফল পাই নাই। ঐ ঔষধে আমার ভক্তি নাই।" আমি বলিলাম—"তখন উপযুক্ত কাল হয় নাই বলিয়া আপনি তখন ফল পান নাই, এখন ইহা ব্যবহার করিলে ফল পাইবেন।"

ফলে এইরূপ ভাবে তাঁহার চিকিৎসা চলিতে লাগিল। দিন দিনই তাঁহার বিশেষ উপকার হইতে লাগিল। রাণাঘাটের অধিবাসিগণ তাঁহাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে লাগিলেন।

আহারের ব্যবস্থাও আমি ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ এক বেলা ভাত ও এক বেলা গরম গরম খোলা হইতে গব্য ঘৃতে ভাজা টাটকা লুচি খাওয়ার ব্যবস্থা দিলাম, রোগীর এই সময় ক্ষুধা খুব, যাহা খান তাহাই অতি শীঘ্র জীর্ণ হইতে লাগিল। এই সময় তিনি একদিন বলিলেন, 'কবিরাজ মহাশয়, বহুকাল সন্দেশ খাই নাই, উহা খাইতে ইচ্ছা করিতেছে, একটি খাইব কি?' আমি খাইবার ব্যবস্থা দিলাম, কিন্তু রোগীর এতই সংযম শিক্ষা যে, আমি ব্যবস্থা দেওয়ার এক সপ্তাহ পরে তবে তিনি উহার একটি মাত্র খাইয়াছিলেন তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি।

শারীরিক বল বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে প্রাতর্ভ্রমণের ব্যবস্থা খুব বেশী করিয়া দিলাম। ক্রমশঃ তিনি প্রাতে এক ক্রোশ ও বৈকালে এক ক্রোশ রাস্তা রাণাঘাটে [illegible] অধিবাসীদের [illegible] করিতে লাগিলেন [illegible]

এইরূপ ভাবে ৬ মাস কাল তাঁহার চিকিৎসা করা হয়। শেষে তাঁহাকে স্নায়ু সকল সতেজ করিবার জন্য একবার করিয়া 'স্বর্ণবঙ্গ' সেবনের ব্যবস্থা দিয়াছিলাম। নিত্য দাস্ত পরিষ্কার রাখিবার জন্য কখন কখন 'প্রাণদা গুড়িকা' সেবন করিতে দিতাম। এই প্রাণদা গুড়িকা শুঁঠের পরিবর্ত্তে হরীতকী দিয়া প্রস্তুত। বায়ু শান্তির জন্য কখন কখন বিষ্ণু তৈল মর্দ্দনের ব্যবস্থা করিতাম। যাহা হউক ৬ মাস পরে তিনি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিলেন কিন্তু তখনি কার্য্যে join না করিয়া আরও কিছু দিন পরে কার্য্য ভার গ্রহণ করিলেন।

রোগের হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হইলেও তিনি কিন্তু চতুর্ম্মুখের ব্যবস্থা পরিত্যাগ করেন নাই। সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হওয়ার পরেও কিছুকাল পর্য্যন্ত তিনি ১ বার করিয়া লাল চতুর্ম্মুখ সেবন করিতেন। আমিও বুঝিয়াছিলাম অন্যান্য যে সকল ঔষধেরই ব্যবস্থা করিনা কেন,—একমাত্র 'লাল চতুর্ম্মুখেই এরূপ শুভফল প্রদান করিয়াছে, রোগীও বুঝিয়া ছিলেন,—ঐ ঔষধই তাঁহাকে আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। এখন রোগী এরূপ হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়াছেন যে, কখন যে তাঁহার ঐরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল—এক্ষণে তাঁহাকে দেখিয়া আর তাহা বুঝিবার উপায় নাই। এখন তিনি কলিকাতা পোষ্ট অফিস সমূহের জেনারাল করস্পণ্ডেণ্ট বিভাগের হেড ক্লার্কের কার্য্য করিতেছেন। কলিকাতায় সকল পোষ্টাপিসের কর্ম্মচারিগণই তাঁহার সে সময়ের অবস্থা অবগত আছেন।

কবিরাজী ঔষধের শাস্ত্রীয় শ্লোক দেখিয়া অনেকে কবিরাজী ঔষধে 'গরু হারাইলে গরু পাওয়া যায়' বলিয়া যে পরিহাস করিয়া থাকেন, বাস্তবিক পক্ষে তাহা ঠিক নহে। ফল-মূলাশী আর্য্য ঋষিগণ জ্ঞান গভীর গবেষণা দ্বারা যে সকল ঔষধ আবিষ্কার করিয়া ফলশ্রুতি উপলক্ষে সেই সকল ঔষধ নানাবিধ রোগ নিবারক বলিয়া যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য কথা। রোগ বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে পারিলে কবিরাজীর প্রত্যেক ঔষধটিই নানাবিধ রোগ আরোগ্যে সমর্থ। আমি যে লিখিত রোগীটির জন্য চতুর্ম্মুখের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম,—তাহার কারণ, ঐ রোগীটির রোগ তখন যে আকারই ধারণ করুক, উহার মূল কারণ বায়ুর বৈষম্য। চতুর্ম্মুখে যে সকল উপাদান আছে, তাহার মধ্যে লৌহ—তিক্ত, সারক, শীতল, কষায়, মধুর, গুরু, রুক্ষ, বয়ঃস্থাপক, চক্ষুষ্য, লেখন, বায়ুবর্দ্ধক, কফ-পিত্তনাশক ও বিষঘ্ন।

অভ্র—কষায়, মধুর, শীত বীর্য্য, আয়ুষ্কর, ধাতুবর্দ্ধক, ত্রিদোষ প্রশমক, ক্রিমিনাশক ও বিষঘ্ন।

স্বর্ণ—কষায়, তিক্ত, মধুর, গুরু, লেখন, হৃদ্য, রসায়ন, বলকারক, চক্ষুষ্য, কান্তিপ্রদায়ক বিষঘ্ন ও পবিত্র।

রস সিন্দুর—ক্রিমিনাশক, কুষ্ঠঘ্ন, স্বাস্থ্যপ্রদ, দৃষ্টির বলবর্দ্ধক, সারক, অকাল মৃত্যু নিবারক, বীর্য্যবান, জরঘ্ন, বৃষ্য, পাণ্ডুরোগ প্রশমক এবং উপযুক্ত কাথাদির সহিত সেবনে সর্ব্বব্যাধি নাশক।

ঐ দ্রব্য গুলির মিশ্রণে তাহার পর ঘৃত কুমারীর রস সহ মর্দ্দনে ও ধান্যের রাশির মধ্যে তিনদিন স্থাপনে উহার যে শক্তি

সঞ্চারিত হয়, সে সম্বন্ধে শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

এতদ্রসায়নং বরং ত্রিফলামধুযোজিতম্।
তদ্ যথাগ্নি বলং খাদেদ্ বলীপলিত নাশনম্॥
ক্ষয়মেকাদশবিধং পাণ্ডুরোগং প্রমেহকম্।
কাসং শূলঞ্চ মন্দাগ্নিং হিক্কাঞ্চৈবাম্লপিত্তকম্॥
ব্রণান্ সর্ব্বানাঢ্য বাতং বিসর্পং বিদ্রধিং তথা।
অপস্মারং মহোন্মাদং সর্ব্বার্শাংসি ত্বগাময়ান্॥
ক্রমেণ শীলিতং হন্তি বৃক্ষমিন্দ্রাশনি যথা।
পৌষ্টিকং বল্যমায়ুষ্যং স্ত্রীণাং প্রসব কারণম্॥

অর্থাৎ ত্রিফলা ও মধু রসহিত এই ঔষধ সেবনে ইহা উৎকৃষ্ট রসায়নের কার্য্য করিয়া থাকে। ইহা সেবনে বলীপলিত নষ্ট হয়, একাদশ প্রকার ক্ষয়জ ব্যাধি প্রশমিত হয়, পাণ্ডুরোগ, প্রমেহরোগ, কাস, শূল, মন্দাগ্নি, হিক্কা, অম্লপিত্ত, ব্রণ, সর্ব্বপ্রকার বাত, বিসর্প, বিদ্রধি অপস্মার, উন্মাদ ও অর্শ রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

আমি অনেক রোগেই যেখানে রোগের মূল কারণ বায়ুর বিকৃতি বিবেচনা করিয়া থাকি, সেই স্থানেই চতুর্ম্মুখের ব্যবহারে এরূপ অদ্ভুত ফল পাইয়া থাকি যে, অনেক সময় অনেক ঔষধে সেরূপ সুফল দেখিতে পাইনা।

ওলাউঠা চিকিৎসা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

—:০:—

(কবিরাজ শ্রীদীননাথ শাস্ত্রী কবিরত্ন)

১। কালান্তক রস।*

স্বর্ণ ১ হরিতাল ১ হিঙ্গুল ১ লৌহ ১
বঙ্গ ১ সোহাগা ১ জীরা ১ বিষ ১
দারমুষ ১ অহিফেন ১

এই দশখানি দ্রব্য প্রত্যেক সমান ভাগ ওজন করিয়া লইবে। ইহার মধ্যে স্বর্ণ ও লৌহ এবং বঙ্গ এই তিনখানি দ্রব্য শোধন ও মারণ প্রক্রিয়ার দ্বারা বিধি পূর্ব্বক ভস্ম করিয়া এই ঔষধে প্রযুজ্য। হরিতাল শব্দে বংশপত্রী হরিতালই গ্রহণীয়। হরিতাল ভস্ম করিয়া লইলেও হয়, অথবা জলে শোধন করিয়া লইলেও চলিতে পারে। অবশিষ্ট দ্রব্যগুলি যথাবিধি শোধন করিয়া লইতে হইবে। সকল প্রকার শোধন ও মারণ প্রক্রিয়ার বিবরণ আমরা ইহার পর বিশেষরূপে বর্ণন করিব।

প্রথমতঃ শোধিত হিঙ্গুল, হরিতাল, দার-

---

* সুবর্ণং তালকং রক্তং তীক্ষ্ণ বঙ্গং সটঙ্গনং।
এতৎ সর্ব্বং সমং গ্রাহ্য সূক্ষ্ম চূর্ণানি কারয়েৎ।
কেশরাজ রসেনাপি অজা ক্ষীরেণ মর্দ্দয়েৎ।
সর্ব্ব ব্যাধি হরশ্চৈব ব্যাধি-বারণ-কেশরী।
জ্বরমষ্ট বিধং হন্তি নানা দোষোদ্ভবং তথা।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শ্বয়ং গুল্মং বিনাশয়েৎ।
রসো কালান্তকোনাম পূলিনা পরিনির্ম্মিতং।
জীরকঞ্চামৃতং দারু ফণি ফেণং তথৈব চ।
হিঙ্গুলী বরশৈর্ত্তাভ্যাং ভৃঙ্গরাজ রসৈঃ পুনঃ।
গুঞ্জার্দ্ধং বটিকাং কুর্য্যাৎ দাপয়েৎ [illegible] [illegible]।
সংগ্রহ গ্রহণীং হন্তি চিরকালানু বর্ত্তিনীম্।
অতীসারং নিবর্ত্ত্যাশু শোথং শূলং [illegible]।
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং বজ্রবৎ [illegible]।
ঔষধস্য প্রসাদেন অকালে মরণং [illegible]।

মৃত্র, জীরা এবং বিস—প্রত্যেক দ্রব্য পৃথক পৃথক ভাবে সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া রাখিবে। এমন ভাবে চূর্ণ করা চাই, যাহাতে কিছুমাত্র কুচি না থাকে। সোহাগা খোলায় ভাজিয়া খই করিয়া লইবে। গাঢ় পরিস্কার বস্ত্রে ছাঁকিয়া ঔষধে প্রয়োগ করিবে। ঔষধের প্রত্যেকটী উপকরণ সংগ্রহ হইলে, তারপর একটা পরিমাণ স্থির করিবে। সিকি তোলা, অর্দ্ধ তোলা, এক তোলা অথবা যাঁহার যেরূপ সুবিধা ও প্রয়োজন সেইরূপ মাত্রায় প্রত্যেকটা দ্রব্য ওজন করিয়া একত্র মর্দ্দন করিবে। তবে কথা এই—সকলগুলি দ্রব্যই ভাগে সমান হওয়া চাই। এইরূপে সমস্তগুলি উপকরণ মর্দ্দিত ও মিশ্রিত হইলে কৃষ্ণবর্ণ বার্ত্তাকী অর্থাৎ কালো রঙ্গের বেগুণের রস বাহির করিয়া তদ্দ্বারা ঐ মিশ্রিত ঔষধ কিছুকাল মর্দ্দন করিবে; এবং প্রখর রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। রাত্রিতে শিশিরসিক্ত করিবে। এইরূপে দিবাভাগে তরল পদার্থ মর্দ্দন ও শুষ্কীকরণ এবং রাত্রিকালে শিশির সেচন করানকে ঔষধের ভাবনা দেওয়া কহে। প্রতিদিন এক একটী করিয়া ভাবনা দেওয়া বিধান। কৃষ্ণবর্ণ বার্ত্তাকীর স্বরসে সাতদিন সাতবার ভাবনা দেওয়া হইলে তাহার পর আবার *ভৃঙ্গরাজ পত্রের স্বরসে ঐরূপ সাতদিনে সাতবার ভাবনা দিবে। পরিশেষে কেশরাজ অর্থাৎ কেশুরের স্বরসে ঐ প্রকার সাতটী ভাবনা দিতে হইবে। এই তিন দ্রব্যের স্বরসে ভাবনা সম্পন্ন হইলে শেষ দিন উপযুক্ত পরিমাণ ছাগ দুগ্ধের সহিত অর্দ্ধ প্রহর পর্য্যন্ত মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধ রত্তি মাত্রায় এক একটী বটি প্রস্তুত করিবে। তাহার পর বটিগুলি প্রখর রৌদ্রে শুকাইয়া কাচকূপী মধ্যে রাখিয়া দিবে। ইহাকে কালান্তক রস কহে। এই কালান্তক রস বিবিধ রোগে প্রযুজ্য। তৎ সমুদয় উল্লেখ করিবার এখানে কোনও প্রয়োজন নাই। ওলাউঠা রোগের যে অবস্থায় যে নিয়মে ইহা প্রয়োগ করিতে হয়—এস্থলে তাহাই লিখিত হইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত বিসর্পণ চূর্ণদ্বারা নাড়ীস্পন্দন অবিকৃত থাকে এবং শরীরস্থ সপ্ত ধাতুক্ষয় নিবারিত হয়। এই কালান্তক রসের অচিন্তনীয় প্রভাবে যাবতীয় বৈকারিক লক্ষণ, অতিরিক্ত মল নিঃসরণ ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইতে থাকে। পূর্ব্বে অহিফেনের প্রয়োগ সর্ব্বথা নিষিদ্ধ হইয়াছে। তাহা রোগের প্রথমাবস্থাতেই বুঝিতে হইবে। মধ্য বা পরিণত অবস্থায় অহিফেন প্রয়োগ দূষণীয় নহে। এই ঔষধে অহিফেণের প্রয়োগ-বিধান লিখিত হইয়াছে। অন্যান্য উপকরণের সহিত সংযুক্ত হওয়ায় অহিফেন এমনভাবে গুণান্তর প্রাপ্ত হয় যে, তদ্দ্বারা মূত্রযন্ত্রের ক্রিয়ারোধ হইতে পারে না। অহিফেনের নৈসর্গিক শক্তির বলে যদিও মূত্রযন্ত্রের আংশিক ক্রিয়ারোধ হয় সত্য, তথাপি তাহা সাংঘাতিক আকার ধারণ করিয়া সহসা প্রাণনাশের কারণ হয় না। ঔষধের প্রয়োগে অল্লায়াসেই যন্ত্রণা উপশমিত হইয়া থাকে। অবিরত অতিরিক্ত মল নিঃসরণ হইতে থাকিলে অচিরেই ধাতু ক্ষয় ঘটে। সুতরাং রোগীর প্রাণ বিয়োগ হইতে বড় বিলম্ব থাকে না। এই অবস্থায় এই ঔষধ বিশেষ রূপে প্রয়োগ করিতে হয়। ঔষধের প্রয়োগে মল নিঃসরণ রোধ হইয়া আইসে এবং শারীরিক যন্ত্রগুলি অবিকৃত ভাবে অবস্থিতি

* ভীমরাজ।

করে। অধিকন্তু মূত্রের রোধ জন্য এরূপ অবস্থায় কাহাকেও মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয় না। এই কালান্তক রসের অনির্ব্বচনীয় ফলোপধারিণী শক্তি সর্ব্বতোভাবে বহু ক্ষেত্রে বহু বার পরীক্ষিত হইয়াছে। অনেকে ইহাকে ওলাউঠা রোগের অব্যর্থ মহৌষধ বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন। চিকিৎসা বিশেষের দ্বারা রোগীর প্রথমাবস্থা অতীত হইয়া যদি দ্বিতীয় অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয় অর্থাৎ নাড়ী-স্পন্দনের একেবারে বিলুপ্তি ঘটে—নানাবিধ বৈকারিক লক্ষণ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়ে, এবং যাবতীয় ইন্দ্রিয় ক্রমে শক্তিহীন নিষ্ক্রিয় ভাব ধারণ করে—দেখিতে দেখিতে রোগী চৈতন্য হারা হয়—তখন এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে আশানুযায়ী ফল পাওয়া যায় না। প্রথমাবস্থায় পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে বিসর্পণ চূর্ণ অনুপান সহ রোগীকে সেবন করাইয়া শেষে যদি এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে কাহাকেও কালকবলে পতিত হইতে হয় না। প্রতি দাস্তের পর এই ঔষধের প্রয়োগ চলিতে পারে। দুই তিনবার ঔষধ সেবন করিলেই যদি মল পীতবর্ণ হইতেছে দেখা যায়, তাহা হইলে আর অধিক সেবন করান উচিত নহে। সাধারণতঃ প্রয়োজনানুসারে দাস্ত বন্ধের জন্য দিনের মধ্যে একবার অথবা দিবারাত্রির মধ্যে দুইবার এই ঔষধ সেবন করান উচিত। মলের পীতবর্ণতা লক্ষিত হইলেই বুঝিতে হইবে—রোগীর জীবন রক্ষা পাইল। তখন আর মূত্র নিঃসরণের জন্য বিশেষ কোনও চেষ্টা করিতে হয় না। অল্পায়াসেই অথবা আপনা হইতেই মূত্র নির্গত হইতে থাকে। মূত্রাশয়ে মূত্র সঞ্চিত না থাকিলে চারি প্রহর বা আট প্রহরে পরেও কাহারও কাহারও মূত্র নিঃসরণ হইয়া থাকে। মূত্র নিঃসরণের কথা পরে যথাস্থানে আমরা বিবৃত করিব। এক্ষণে কালান্তক রসের সহপান ও অনুপানের বিষয়ই উল্লিখিতব্য। যাহার সহিত ঔষধ মাড়িয়া পান করিতে দেওয়া হয়—তাহাকে সহপান এবং ঔষধ সেবনের পর যাহা পান করিতে দেওয়া হয়—তাহাকে অনুপান বলে।

রোগীর উদরে যদি বেদনা থাকে, তাহা হইলে আপাঙ্গমূলের রস অৰ্দ্ধ তোলা অথবা ক্ষেত্র বিশেষে এক তোলা সহ একটী মাত্র কালান্তক রস উত্তমরূপে মাড়িয়া সেবন করিতে দিবে। এইরূপ যতবার প্রয়োজন হয়—ততবার সেবন করাইবে।

কিঞ্চিৎ জল মিশাইয়া উক্ত মূল কুটিয়া লইবে। এবং পরিষ্কার বস্ত্রে ছাঁকিয়া রস গ্রহণ করিবে। এই রসের সহিতই ঔষধ সেব্য। উদরে বেদনা না থাকিলে কালো জামের কচি কচি পাতা অথবা কচি কচি বট পাতা পাথরে কুটিয়া রস বাহির করিবে। সেই রসের অৰ্দ্ধ বা এক তোলার সহিত এই কালান্তক রস সেবন করিতে দিবে। ইহাতে দাস্ত ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া আসে। নাভিমূলে বেদনা থাকিলে অথবা আমের সঞ্চার বুঝিলে পাথর কুচি পাতার রসের সহিত এই ঔষধ সেবনীয়। ইহাতে মূত্র নিঃসরণেরও সহায়তা হইয়া থাকে।

বিকার নাশের জন্য ঝাঁপিটেপারির রসের সহিত এই ঔষধ প্রযুজ্য। ইহা অগ্নিবৰ্দ্ধক। উল্লিখিত রসগুলি কিঞ্চিৎ গরম করিয়া লইলেই ভাল হয়। অথবা দগ্ধ লৌহ ঐ রস মধ্যে নিষিক্ত করিলেও চলিতে পারে।

এতাবৎ যে সমস্ত ঔষধের প্রয়োগ-বিধান কথিত হইল,—তৎসমুদায় উল্লিখিত সহপান

ও অনুপানের সহিত নিয়মিত রূপে সেবন করাইলে যখন রোগীর চক্ষু চঞ্চল ও রক্তবর্ণ হইয়া উঠে, এবং থাকিয়া থাকিয়া চক্ষুর তারা উদ্ধপক্ষা হইতে থাকে, তখন সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকুক আর নাই থাকুক—নির্ভয়ে রোগীর মস্তকে শীতল জলের পটী দিবে এবং মুহুর্মুহু মাথায় শীতল জল সেচনের ব্যবস্থা করিবে। এইরূপ অবস্থায় মস্তকে শীতল জল সেচন না করিলেই বরং অপকার হইবার সম্ভাবনা। মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা না থাকিলে নাড়ী অবিলম্বে চঞ্চলা হইয়া উঠে এবং চক্ষু দেখিতে দেখিতে লাল হইয়া পড়ে,—এমন কি, অবশেষে ঘোরতর মোহ আসিয়া উপস্থিত হয়। ওলাউঠা রোগের ঠিক এইরূপ চিকিৎসাপদ্ধতি প্রচলিত কোনও আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই চিকিৎসা-প্রকরণের অধিকাংশ ঔষধই "আদিত্য সংহিতা" নামক বিলুপ্তপ্রায় গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের বহুদর্শিতাজনিত জ্ঞানলব্ধ ক্রিয়া-পদ্ধতিও যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইতেছে। অধুনা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রোক্ত কতিপয় দৃষ্টফল মহৌষধ উল্লিখিত হইতেছে। এই সকল ঔষধ রোগের সাংঘাতিক অবস্থায় প্রযুজ্য। এতদ্বারা সকলেরই যে নিশ্চয়রূপে জীবন রক্ষা হইবে, তাহা অবশ্যই স্থির সিদ্ধান্ত নহে। যখন রোগীর দর্শন শক্তি, শ্রবণ শক্তি এবং বাক্‌শক্তি ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে, রোগীর কিছুমাত্র সংজ্ঞা থাকে না,—নাড়ী একেবারে বসিয়া যায়, তখন আর কোনরূপ বিচার না করিয়া শীঘ্র-শীঘ্র "বিসূচী বিধ্বংসী রস" অথবা "বৃহৎ সূচিকা ভরণ রস" প্রয়োগ করিবে। এক বৎসরের শিশুদিগকে অর্দ্ধ বটী, তদুর্দ্ধ বয়সের বালক দিগকে এক বটী এবং বলবান যুবক দিগকে একত্র দুই বটী করিয়া সেবন করাইবার বিধি। ঝাঁপিটেপারীর মূলের রস সহ বটী সেবন করিতে দিয়া পরে কিঞ্চিৎ ডাবের জল সেবন করান কর্ত্তব্য। অথবা কেবল ডাবের জল সহও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। উল্লিখিত দুইটী ঔষধই এক-বিধ সহপান ও অনুপানের সহিত প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এই দুইটী ঔষধই তিন বারের বেশী কাহাকেও সেবন করাইতে হয় না। ঔষধ সেবনান্তে চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ এবং নাড়ী স্পন্দনবতী হইয়া উঠিলে নির্ভয়ে রোগীর মস্তকে শীতল-জল-সেচন ও তক্রাদি সেবন করাইবে। ক্রমে ক্রমে বৈকারিক লক্ষণ বিদূরিত হইলে যথেষ্ট শীতল জলে স্নান এবং শরীরের অবস্থা অনুসারে ক্ষুধানুযায়ী পথ্য প্রদান করিবে। কিন্তু ডাবের জল, ইক্ষু রস, দাড়িম্ব রস, দধি, কাঞ্জি, এই সকল দ্রব্য দিতেই হইবে। ঔষধ সেবনের পর যদি নাড়ীতে স্পন্দন এবং চক্ষুতে রক্তবর্ণতা না আইসে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে এই ঔষধে কোন উপকার হইল না। তাদৃশী অবস্থায় শীতল ক্রিয়াদিও করিবার কোন প্রয়োজন নাই। এক্ষণে "বিসূচী বিধ্বংস রস" ও "বৃহৎ সূচিকাভরণ রস" কি কি উপকরণে, কিরূপ প্রণালীতে প্রস্তুত করিতে হয়—তাহাই লিখিত হইতে হইতেছে।

বিসূচী বিধ্বংস রস।*

* টঙ্কনং মাক্ষিকং শুণ্ঠী পারদং গন্ধকং বিষং।
মর্দ্দয়েৎ জম্বীর দ্রাবৈ বটী কার্য্যা প্রযত্নতঃ।
বিসূচীং নাশয়ত্যাশু দধ্যন্নং পথ্যমাচরেৎ।
গরলং সমভাগেন সর্ব্বেষাং হিঙ্গুলং সমং॥
শ্বেত সর্ষপ তুল্যাচ মৃত সঞ্জীবনী তথা॥
ত্রিদোষমমতীসারং সর্ব্বোপদ্রব সংযুতম্॥
ইতি রসেন্দ্র কৌমুদী।

সোহাগার খই ১ ভাগ।
স্বর্ণ মাক্ষিক (শোধিত ও জারিত) ১ ভাগ।
শুঁঠ ... ১ ভাগ
{ পারদ / গন্ধক (শোধিত ও কজ্জলীকৃত) ২ ,,
কাষ্ট বিষ (শোধিত) ... ১ ,,
কৃষ্ণসর্প বিষ (শোধিত) ... ১ ,,
হিঙ্গুল (শোধিত) ... ১ ,,

এই আটখানি দ্রব্য উপরের লিখিত মত ওজন করিয়া লইবে। পরে কিঞ্চিৎ গোঁড়া লেবুর রসে কাষ্টবিষ ভিজাইয়া রাখিবে। বিষগুলি যখন কোমল হইয়া আসিবে—তখন তাহা শিলায় উত্তমরূপে পেষণ করিবে এবং ইহাতে সর্পবিষও মিশাইয়া লইবে। পূর্ব্বোক্ত শোধিত হিঙ্গুলখানি ওজন করিয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করতঃ যাহা রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে—সেই চূর্ণীকৃত হিঙ্গুল এই বিষ মিশ্রণে মিশ্রিত করিয়া এমন ভাবে মর্দ্দন করিবে—যেন তাহা সর্ব্বতোভাবে মিশিয়া যায়। তদন্তর কজ্জলী, শুঁঠ, স্বর্ণমাক্ষিক এবং সোহাগার খই ইহাতে মিশাইয়া রৌদ্রে শুকাইবে এবং রাত্রিতে শিশিরসিক্ত করিবে। এইরূপে সাতদিনে সাতবার জামীরের রসে ভাবনা দিয়া সর্ষপ পরিমিত এক একটী বটী প্রস্তুত করিবে। খুব সতর্কতার সহিত এই ঔষধ প্রস্তুত করা উচিত। নখ-মধ্যগত অথবা লোমকূপ প্রবিষ্ট হইয়া এই ঔষধ শরীরে বিশেষ যন্ত্রণা প্রদান করিতে পারে।

সূচিকা ভরণ রস।*

কাষ্ঠ বিষ (শোধিত) ... ১ ভাগ
সর্প বিষ (শোধিত) ... ১ ,,
দারুমুজ (শোধিত) ... ১ ,,
হিঙ্গুল (শোধিত) ... ১ ,,

এই চারিখানি দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া উপরি লিখিত ভাগে ওজন করিয়া এমন ভাবে একত্র মর্দ্দন করিবে যে, প্রত্যেকটী দ্রব্যই যেন সুন্দররূপে মিশিয়া যায়। তারপর পঞ্চ পিত্তের প্রত্যেকটী দ্বারা এক এক দিন এক এক বার ভাবনা দিয়া সর্ষপ প্রমাণ এক একটী বটী প্রস্তুত করিবে।—রোহিত মৎস্য, মহিষ, ময়ূর, ছাগ ও বরাহের পিত্তকে পঞ্চপিত্ত কহে। পূর্ব্বেই এই সকল পিত্ত সংগ্রহ করিয়া পরিশিষ্টাধ্যায়ে লিখিত বিধি অনুসারে শোধন ও শুদ্ধিকরণ করিয়া রাখিবে, পরে প্রয়োজন মত ইহার কিয়দংশ জলে গুলিয়া তদ্বারা ভাবনা প্রদান করিবে। ইহার অনুপান "বিসূচী বিধ্বংস রসে"র ন্যায়ই জানিবে। ইহাও দুই তিন বারের অধিক কাহাকেও সেবন করিতে দেওয়া হয় না। ঔষধ সেবন করাইয়া নাড়ীর স্পন্দন অনুভূত হইলে, রোগীর গাত্রে তিল তৈলাদি মর্দ্দন ও অপরাপর শীতল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে। ঔষধের অমোঘ প্রভাবে মৃত প্রায় ব্যক্তিও উজ্জীবিত হইয়া উঠে। যদি ঔষধ গলাধঃকরণ করিবার ক্ষমতা না থাকে, ক্ষুর দিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে ক্ষত করিলে যদি রক্তের কণিকা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই ক্ষত স্থানে সর্ষপ প্রমাণ (অর্থাৎ সূচিকার অগ্রভাগে যে

* অমৃতং গরলং দারু সর্ব্বতুল্যঞ্চ হিঙ্গুলং।
বটিকা সূচিকাগ্রেণ সন্নিপাত কুলান্তকৃৎ।
সহস্রশো দৃষ্ট ফলেয়ং বটিকা॥
পঞ্চ পিত্তেন সংমর্দ্দ্য সর্ষপোমাং বটীং চরেৎ॥
তিলঞ্চ তিলতৈলঞ্চ ভোজনঞ্চ দধি [illegible]॥

পরিমাণ ঔষধ সংলগ্ন থাকে) 'সূচিকা ভরণ' অথবা ব্রহ্মরন্ধ্র রস মর্দ্দন করিতে থাকিবে। ইহা দ্বারা শরীরে উষ্ণতা এবং নাড়ীতে স্পন্দন উপলব্ধি হইলে শীতল ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। নতুবা জীবনের আশা বৃথা। নিম্নে বৃহৎ সূচিকা ভরণের বিষয় লেখা যাইতেছে। যাহার শক্তি এতদপেক্ষা বহু গুণেই গরীয়সী।

বৃহৎ সূচিকা ভরণ রস।*

পারদ গন্ধক } (শোধিত ও কজ্জলীকৃত)	...	২ ভাগ
সিসা (শোধিত ও জারিত)	...	১ ,,
অভ্র (শোধিত ও জারিত)	...	১ ,,
কাষ্ঠ বিষ (শোধিত)	...	১ ,,
কৃষ্ণ সর্প বিষ (শোধিত)	...	১ ,,

পূর্ব্বোক্ত ছয়খানি দ্রব্য যথাযথরূপে গ্রহণ করিয়া উত্তমরূপে মিশাইয়া লইবে। পরে রোহিত মৎস্য, মহিষ, ময়ূর ও ছাগলের পিত্তে চারিদিনে চার বার ভাবনা দিবে। বরাহ পিত্তে ইহার ভাবনা দিবার নিয়ম নাই। চারিপ্রকার পিত্তের ভাবনা দিয়া ক্ষুদ্র সর্ষপের ন্যায় এক একটী বটী প্রস্তুত করিবে। কেবল নারিকেল জলের সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহা দ্বারা ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত; বিসূচিকা, ও অতিসার প্রভৃতি রোগ উপসংহিত হয়। যখন রোগীর অবস্থা নিতান্ত মন্দ হইয়া আইসে এবং বাঁচিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না, তখন এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। এই ঔষধ সেবন করাইবার পর, রোগীর গাত্রে তিল তৈল ও চন্দনাদি লেপন প্রভৃতি শীতল ক্রিয়া এবং নারিকেলজল পান ও দধি প্রভৃতি ভোজন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

ব্রহ্মরন্ধ্র রস। †

পারদ গন্ধক } (শোধিত ও কজ্জলীকৃত)	..	২ ভাগ
অভ্র (জারিত)	...	১ ,,
হরিতাল (শোধিত)	...	১ ,,
হিঙ্গুল (শোধিত)	...	১ ,,
মরিচ	...	১ ,,
সোহাগার খই	...	১ ,,
সৈন্ধব লবণ	..	১ ,,
বিষ (শোধিত)	...	৮ ,,

এই নয়খানি দ্রব্য উপরে লিখিত ভাগে একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। যখন ঔষধগুলি সর্ব্বতোভাবে মিশিয়া যাইবে তখন শোধিত মহিষী পিত্তের জলে আবার অবিরত মর্দ্দন করিতে থাকিবে। ঔষধের দ্রব্য সমষ্টি পরিমাণ যত হইবে, তাহার চতুর্থাংশ মহিষী পিত্ত কিঞ্চিৎ জলে গুলিয়া লওয়াই শাস্ত্রের বিধান। ঔষধগুলি ভিজিতে পারে, জলের পরিমাণ এইরূপ হইলেই চলিবে। কথিত

---

* রস গন্ধক নাগাভ্রং বিষং স্থাবর জঙ্গমম্।
সূচিকা ভরণো নাম ভৈরবেণ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
ত্রয়োদশ সন্নিপাতে বিসূচ্যামতীসারকে।
পয়ঃ পেটী শতং দদ্যাৎ ভোজনং দধি শক্তকম্।
রোগিণো যৎ প্রিয়ং ত্রব্যং তস্মৈ তচ্চ প্রদাপয়েৎ॥
মাৎস্য-মাহিষ-মায়ূর-চ্ছাগ পিত্তৈ বিভাবয়েৎ ॥
দাতব্যঃ সূচিকাগ্রেণ পয়ঃ পেটী জলেন চ ॥
ত্রিদোষজে তথা কাসে দাপয়েৎ কুশলো ভিষক্ ॥
তথা সুভঞ্জিতং স্নানং লেপনং তিল চন্দনৈঃ ॥

রসেন্দ্র কৌমুদী।

† রসাভ্রং গন্ধকং তালং হিঙ্গুলং মরিচন্তু তথা।
সপ্ত পাদ সমোপেত মহিষী পিত্ত মর্দ্দিতং।
ব্রহ্মরন্ধ্র প্রয়োক্তব্যং সন্ন্যাস জ্বরে সঙ্গমো॥
সহস্র কলসৈঃ স্নানং লেপনং চন্দনাদিভিঃ।
টঙ্কনং সৈন্ধবোপেতং সর্ব্বাংশ সমৃতং তথা॥
ইক্ষু মূলাং রসং ভোজ্যং তক্র ভক্তং যথেপ্সিতাং॥
(রসেন্দ্র কৌমুদী)

পিত্ত দ্বারা ঔষধগুলি সুন্দররূপে মর্দ্দিত হইলে রৌদ্রে শুকাইয়া চূর্ণাবস্থাতেই রাখা যাইতে পারে। অথবা বটী প্রস্তুত করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া রাখিলে চলে। আমাদিগের বিবেচনায় বটী প্রস্তুত করিয়া রাখিলেই ভাল হয়। তাহা হইলে ঔষধস্থিত পিত্তগুলির বীর্য্য অধিক দিন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ও অবিকৃত অবস্থায় থাকিতে পারে।

যখন যাবতীয় ইন্দ্রিয়শক্তি বিলুপ্ত হইয়া যায়, ঔষধ সেবন করিবার কিছু মাত্র ক্ষমতা থাকে না, তখন ব্রহ্মরন্ধ্র ক্ষত করিয়া সেই ক্ষত স্থানে এই ঔষধ লাগাইয়া দিতে হয়। ঔষধ লাগাইবার পর মৃদু হস্তে মর্দ্দন করা উচিত। যদি রক্তের সহিত ঔষধ সংলগ্ন হইতে পারে তবেই উপকার হইবার সম্ভাবনা। এত দ্বারা রক্তের সঞ্চালন ক্রিয়া সূচিত হইলে এবং শরীর গরম হইয়া উঠিলে রোগীকে শীতল জলে স্নান করাইবে ও মস্তকে শীতল জলের ধারা দিবে। শরীরে চন্দনাদি লেপন, ইক্ষু রস, মুগের যূষ ও তক্রাদির যথেষ্ট পানের ব্যবস্থা করিবে। ঔষধ প্রয়োগে শরীর গরম না হইলে জীবনের আশা করা যায় না।

ওলাউঠা রোগের মূত্র নিঃসরণ ও পীত-বর্ণ-মল নির্গমণ হইতে থাকিলে কখনও কখনও কোনও কোনও রোগীর ঘোরতর বৈকারিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ পানের রস অথবা দোষানুযায়ী অন্য কোনও অনুপানের সহিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি ও কর্পূর—প্রত্যেকটি দুই এক রতি মাত্রায় দুই তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিলে প্রভূত উপকার দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাতে বৈকারিক লক্ষণ শীঘ্রই দূরীভূত হয়।

উপযুক্ত অনুপানের সহিত "বৃহৎ কস্তূরী ভৈরব" সেবন করিতে দিলেও এরূপ অবস্থায় সবিশেষ সুফল দেখা যায়। এস্থলে মকরধ্বজ ও বৃহৎ কস্তূরী ভৈরব প্রস্তুতের নিয়মাবলী উল্লেখ করিবার আবশ্যকতা দেখি না। এই দুই ঔষধের প্রস্তুতের বিশদ প্রণালী আয়ুর্ব্বেদীয় প্রচলিত সকল গ্রন্থেই বর্ণিত আছে। এক্ষণে উপসর্গ-চিকিৎসার বিষয় সংক্ষেপে কিছু বলা নিতান্তই প্রয়োজন।

ওলাউঠা রোগের পরিণামে সকল রোগীরই চক্ষুঃ কোটরগত হইয়া থাকে। তেলাপোকার বিষ্ঠা জলের সহিত মাড়িয়া চক্ষুর পাতায় প্রলেপ দিলে এই উপসর্গের সবিশেষ উপকার হয়।

নিরামিষ খাদ্য।

—:*:—

(শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র পাল)

নিরামিষ আহার অর্থাৎ উদ্ভিদ হইতে সংগৃহীত আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে কার্ব্বো-হাইড্রেট্‌স্ (carbo-hydrate) প্রধান, কিন্তু প্রাণিজাত খাদ্যের মধ্যে প্রোটিড এবং চর্ব্বিই প্রধান। কার্ব্বোহাইড্রেট উদ্ভিজ্জ দ্রব্যের মধ্যে চিনি ও শ্বেতসারের আকারে অবস্থান করে। নিরামিষ খাদ্য যে একেবারে প্রোটিড হীন তাহা নহে,—দাল প্রভৃতিতে উক্ত পদার্থ

অধিক মাত্রায় বিদ্যমান কিন্তু বাদাম, নারিকেল প্রভৃতিতে চর্ব্বিই অধিক পরিমাণে থাকে।

উদ্ভিজ্জ আহারের ভিতর পুষ্টিকর পদার্থ যথা, প্রোটিড, চর্ব্বি ও কার্ব্বোহাই ড্রেট।

অল্প সোডিয়ম ক্লোরাইড (sodium cloride) মিশ্রিত জলে উদ্ভিদ প্রোটিড (vegetable-protied) সহজেই দ্রব হইয়া যায়। উদ্ভিদ প্রোটিড বা প্রাণী প্রোটিড সিদ্ধ করিলে দুষ্পরিপাচ্য হয়। ইহা হইতে বেশ উপলব্ধি হয় যে, মাংস বেশী সিদ্ধ করিলে দুষ্পাচ্য হয়, কারণ তাহাতে প্রোটিড অধিক মাত্রায় বর্ত্তমান; আর উদ্ভিদ সিদ্ধ করিলে সুপাচ্য হয় কারণ তাহাতে কার্ব্বো হাইড্রেট অংশ অধিক।

আমরা দেখিতে পাই যে, শস্যের বীজ সর্ব্বত্র অধিক পরিমাণে প্রচলিত। রাসায়নিক বিশ্লেষণ (chemical analysis) দ্বারা আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, রবিশস্যের বীজে অনেক প্রকার খনিজ পদার্থ বিদ্যমান থাকে, যথা ফস্‌ফেট অব ক্যালসিয়ম্ (phosphates of calcium) ম্যাগনেসিয়ম (magnesium) পটাস (potash) লৌহ (iron) এবং সিলিকা (silica) প্রধান প্রধান রবিশস্যের ভিতর কোন্ কোন্ খনিজ পদার্থের কত পরিমাণ নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল।

নাম	চর্ব্বি	কার্ব্বো হাইড্রেট	প্রোটিড	খনিজ পদার্থ	জল
গম	২'১৮	৭০'৯২	১২'২৪	২'২৪	১১'৮৩
যব চূর্ণ	৭'৩	৬৯'৪	১৪'২	১'৯	৭'২
বার্লি	২'২	৭৩'৩	১০'০	২'৬	১১'৯
চাউল	০'৮	৭৮'৮	৬'৮৬	১'৩২	১১'৫
ভুট্টা	৫'৪	৭০'৯	৯'৭	১'৫	১২'৫

অন্য সকল রবিশস্যের তুলনায় ভুট্টাতে চর্ব্বীভাগ বেশী এবং লবণ ভাগ কম। চাউল শ্বেতসারে পূর্ণ কিন্তু তাহাতে যবক্ষার জনিত কোন দ্রব্য, চর্ব্বি এবং খনিজ পদার্থ অতি অল্প পরিমাণে বিদ্যমান। যবচূর্ণ, চর্ব্বি ও প্রোটিড পরিপূর্ণ এবং সকল রবিশস্যের মধ্যে ইহাই খুব পুষ্টিকর।

গম পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচলিত। গম হইতে আমরা তিন প্রকার জিনিস প্রাপ্ত হই। ময়দা তরল পদার্থ হইতে প্রস্তুত হয়, সূক্ষ্ম পদার্থের অপেক্ষাকৃত মোটা আবরণ হইতে আটা তৈয়ার হয়, আর অপেক্ষাকৃত মোটা তৃতীয় আবরণ হইতে সুজি প্রস্তুত হয়, ইহা অতিশয় পুষ্টিকর।

বঙ্গদেশে চাউল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং ইহা আমাদের প্রধান খাদ্য। বহু

প্রকারের চাউল এখানে জন্মিয়া থাকে। আমাদের এখানে যে সকল চাউল পাওয়া যায় তাহাকে আমরা "দেশী" চাউল বলিয়া থাকি এবং তাহা 'বর্ম্মা চাউল' হইতে ভিন্ন। ব্রহ্মদেশের চাউল ভাল হয় না, তাহা একেবারে কলে প্রস্তুত হইয়া বাহির হয়,সুতরাং তাহাদের দুইটী আবরণ বাহির হইয়া যায়। তাই দেশী চাউল অপেক্ষা বর্ম্মা চাউল কিছু আকারে ছোট। সিদ্ধ চাউলে বীজকোষ বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু বর্ম্মা চাউলে তাহা থাকেনা, সেইজন্য বর্ম্মা চাউল প্রোটীড ও খনিজ পদার্থ বিশেষ ফসফরাস শূন্য।

সমস্ত বীজ খাদ্যের মধ্যে তণ্ডুলে প্রোটীড (protied), চর্ব্বি (fat) ও খনিজ পদার্থ অতি অল্প মাত্রায় থাকে। তণ্ডুলে অধিক মাত্রায় শ্বেতসার (starch) থাকে বলিয়া ইহা বিরস। ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যবক্ষার জনিত দ্রব্য যথা দাল, মাছ, ঘৃত, প্রভৃতি ব্যবহার করিতে হয়। তণ্ডুল পুরাতন হওয়া আবশ্যক, নূতন চাউলে পেটের পীড়া হয় এবং ইহা দুষ্পাচ্য।

যব খুব পুষ্টিকর ও খনিজ পদার্থে পরিপূর্ণ। ইহাতে যবক্ষার জনিত পদার্থ ডিমের শ্বেতাংশের আকারে বর্ত্তমান।

নিরামিষ খাদ্যের মধ্যে দাল যবক্ষারবহুল পদার্থ। দাল প্রোটিডবহুল বলিয়া ইহা শ্বেতসার বহুল দ্রব্যের সহিত অর্থাৎ চাউলের সহিত খাইতে হয়। দালে পটাস লবণ (salt of potash) চূণ ও গন্ধক থাকে। দালের উপাদান :—

নাম	প্রোটিড	কার্ব্বোহাই	চর্ব্বি	জল	খনিজ পদার্থ
মটর	২১০	৬১'৪	১'৮	১৩ ০	২'৬০
কলাই	২২'৫৮	৫৮'০২	১'১০	১০'৮৭	৩ ৬১
মুগ	২৩'৬২	৫৩'৪৫	১ ৬৯	১০'৮৭	৩'৫৭
ছোলা	১৯'৯৪	৫১'১৩	৪'৩১	১০'০৭	৩'৭২
অরহর	২১'৬৭	৫৪'২৭	৩'৩৩	১০'০৮	৫'৫০
মসুর	২৫'৪৭	৫৫ ০৩	৩'০০	১০'২৩	৩'৩৩

আলু অধুনা সর্ব্বত্র প্রচলিত। আলু আমাদের খাদ্যের প্রধান উপকরণ, আলু ব্যতীত আমাদের একদণ্ড চলে না। আলু না থাকিলে আমরা ব্যঞ্জন কিরূপে পাইতাম তাহা বলা যায় না, কারণ অন্যি তরকারী বড়ই দুর্ম্মূল্য হইয়াছে। [illegible]

থাকে, তজ্জন্য ইহা কতকগুলি রোগীর পক্ষে উপকারী। যবক্ষার জনিত দ্রব্যের সহিত আলু ব্যবহারে শরীর বেশ সুস্থ ও সবল থাকে। ইহাতে নাইট্রেড অব পটাস থাকে। নূতন আলু অপেক্ষা পুরাতন আলু আশু পাচ্য।

কাঁচা শাকসব্‌জিতে শতকরা ৯০ ভাগ জল ও যবক্ষার ১ হইতে ৪ পর্য্যন্ত থাকে। চর্ব্বি ইহাতে বড়ই কম, সুতরাং ঘি বা তৈল পক্ক করিয়া ইহা খাইতে হয়।

কার্ব্বোহাইড্রেট বহুমূত্র রোগে অপকারী, উপরিউক্ত দ্রব্য গুলিতে উক্ত পদার্থ খুব অল্প পরিমাণে আছে, সুতরাং বহুমূত্র রোগীর পক্ষে উপকারী। ফুলকপি সব চেয়ে সুপাচ্য এবং অম্লরোগীর পক্ষে উপকারী। শসা দুষ্পাচ্য, বেল বড় উপকারী। পেটের ব্যারামে বেলের সরবৎ ও বেলের মোরব্বা খুব উপকারী, ইহাতে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

শরীর পুষ্টিসাধনে আঙ্গুর অতি উপকারী,

নাম	প্রোটীড্	চর্ব্বি	জল	কার্ব্বোহাই	খনিজ-পদার্থ
বাঁধাকফি	১.৮	০.৪	৮৯.৬	৬.৯	১.৩
ফুলকফি	২.২	০.৪	৯০.৭	৫.৯	০.৮
শসা	০.৮	০.২	৯৫.৪	৩.১	০.৫
বেগুন	০.৮৯	০.৯৪	৯৩.৯৮	৩.৪৮	০০.২৬
কলা	১.৩	০.৬	৭৫.৩	২২.০	০.৮
বিলাতী কুমড়া	০.৯০	১.০	৯৩.৪০	৩.৯৬	০.৭

আঙ্গুরের রসে চিনি, বাইট্রেট্ অব পটাস্ (bitrate of potash) টার ট্রেট অব লাইম (titrate of lime) ম্যালিক য়্যাসিড (malic acid) এবং জল থাকে, বৃদ্ধের পক্ষে আঙ্গুর খুব উপকারী। শুষ্ক আঙ্গুরকে কিসমিস বলে, তাহা আঙ্গুর অপেক্ষা দুষ্পাচ্য।

আম অতিশয় পুষ্টিকর ফল। উদরের খারাপ অবস্থায় খাইলে কঠিন উদরাময় রোগ জন্মায়।

নারিকেল, বাদাম প্রভৃতি ফলে কার্ব্বোহাইড্রেট অংশ অতিশয় কম আছে, বহুমূত্র রোগীর পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। ইহারা খুব পুষ্টিকর ফল, কিন্তু সহজে পরিপাক প্রাপ্ত হয় না।

মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কা।

—:০:—

(কবিরাজ শ্রীসুধাংশুভূষণ সেন গুপ্ত)।

কোষ্ঠবদ্ধতায়।—(১) ঘন দুগ্ধের সহিত ২ তোলা পরিমিত ছানা মিশাইয়া খাইলে ১ বার উত্তমরূপে কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া থাকে। (২) এক তোলা মৌরী বাটা এক গ্লাস মিছরির সরবতের সহিত পান করিলে কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া থাকে। (৩) হরীতকীর গুঁড়া, আমলকীর গুঁড়া, সোনামুখীর গুঁড়া ও সৈন্ধব লবণ—এই কয়েটি দ্রব্য ৵১০ সাড়ে তিন আনা ওজনে লইয়া গরম জলের সহিত রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে সেবন করিলে প্রাতে উত্তমরূপ কোষ্ঠ শুদ্ধি হইয়া থাকে। (৪) হরীতকীর গুঁড়া চারি আনা, মৌরীর গুঁড়া চারি আনা, সোণামুখীর গুঁড়া চারি আনা, গোলাপ ফুলের দলের গুঁড়া চারি আনা একত্র মিশাইয়া লইয়া তাহার চারি ভাগের এক ভাগ এবং মিছরির গুঁড়া ১ ভাগ শীতল জলের সহিত রাত্রিতে শয়নকালে সেবন করিলে প্রাতঃকালে তিনবার ভেদ হইয়া থাকে। (৫) সোণামুখী ॥০ তোলা, রেউ চিনি ॥০ তোলা, জাঙ্গী হরীতকী ॥০ তোলা ও সোঁদাল ফলের আটা আধ তোলা—আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া উহার অর্দ্ধেক ফেলিয়া দিয়া বাকী অর্দ্ধেকটি কিঞ্চিৎ চিনি মিশাইয়া পান করিলে জোলাপের কার্য্য করিয়া থাকে।

শিরঃপীড়ায়।—(১) অপরাজিতা ফুলের পাতার রসের নস্ত লইলে শিরঃপীড়ার উপশম হয়। (২) আকন্দের আটায় ঘুঁটের ছাই মিশাইয়া কাদার মত করিয়া শুকাইয়া নস্ত লইলে অনেক গুলি হাঁচি হইয়া শ্লেষ্মা নির্গত হয় এবং শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। (৩) নিশাদল—কলি চুণের সহিত মিশাইয়া তাহার ঘ্রাণ লইলে শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। (৪) কর্পূর—শ্বেতচন্দনের সহিত ঘসিয়া লইয়া কপালে প্রলেপ দিলে শিরঃপীড়ার উপশম হয়। (৫) কুলের পাতার উল্টা পিঠে কলিচুণ মাখাইয়া রগে বসাইলে শিরঃপীড়ার উপশম হয়। (৬) কদম্বের নূতন পাতা মাথায় মর্দ্দন করিলে শিরঃশূল প্রশমিত হয়।

দন্তরোগে।—(১) আকন্দের আটা ও সৈন্ধব লবণ সমান ভাগে মিশাইয়া শুকাইয়া লইয়া তদ্দ্বারা দন্ত মার্জ্জনা করিলে দন্তশূল প্রশমিত হয়। (২) পাঁপড়ি খদির ১ ভাগ, তুঁতে পোড়া ১ ভাগ, কাঁচা শুপারির শাঁস পোড়ান ১ ভাগ, হরীতকীর গুঁড়া ১ ভাগ, বহেড়ার গুঁড়া ১ ভাগ, ও আমলকীর গুঁড়া ১ ভাগ—এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশাইয়া দন্ত মার্জ্জনা করিলে দন্ত রোগ প্রশমিত হয়। (৩) পাঁপড়ি খদির এবং তাহার সিকি পরিমাণ কর্পূর মিশাইয়া জল দিয়া কাদার মত করিয়া তদ্দ্বারা দন্ত মাজিলে দন্তশূল ও দন্ত বেদনা প্রশমিত হয়। (৪) নাগেশ্বরের মূল ১ ভাগ ও আদা ১ ভাগ একত্র মিশাইয়া দন্ত ধাবন করিলে দন্তরোগ প্রশমিত হয়। (৫) জাতী ফুলের পাতা ১ ভাগ, পুনর্ণবা ১ ভাগ, গজ পিপুল ১ ভাগ, জেরেণ্ডার শিকড় ১ ভাগ,

কুড় ১ ভাগ, শতমূলী ১ ভাগ—সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ একত্র করিয়া মুখে ধারণ করিলে দন্ত রোগ আরোগ্য হয় এবং দন্ত বজ্রের মত শক্ত হয়। (৬) বটের কুঁড়ি চিবাইয়া দাঁতের গোড়ায় বেদনার স্থানে রাখিলে বেদনা প্রশমিত হয় এবং নড়া দাঁত শক্ত হইয়া থাকে। (৭) সিউলীর মূল বাটিয়া দন্তে লাগাইলে দন্তশূল নিবারিত হয়।

পোড়াঘায়ে।—জ্বালা দীপ শিলে ঘসিয়া ঐ মাটি দিয়া প্রলেপ দিলে অতি শীঘ্র পোড়া ঘা আরোগ্য হয়।

অগ্নিমান্দ্যে।—(১) আহারের পূর্ব্বে আদার কুচি সৈন্ধব লবণের সহিত মিশাইয়া নিত্য সেবনে অগ্নিমান্দ্য প্রশমিত হয়। (২) প্রাতঃকালে শুঁঠের গুঁড়া এক আনা হইতে দুই আনা পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎ গবাঘৃতের সহিত মিশাইয়া লেহন করিয়া একটু গরম জল পান করিলে অগ্নিমান্দ্য প্রশমিত হয়। (৩) যদি প্রাতঃকালে অজীর্ণ বোধ হয় তাহা হইলে হরীতকীর গুঁড়া, শুঁঠের গুঁড়া ও সৈন্ধব লবণের গুঁড়া প্রত্যেক দ্রব্য এক আনা পরিমাণে লইয়া শীতল জলের সহিত প্রত্যূষে সেবন করিলে অজীর্ণ প্রশমিত হইবে।

অজীর্ণে।—ঘৃত খাইয়া যদি অজীর্ণ হয়, তাহা হইলে লেবুর রস খাইলে উহা প্রশমিত হয়। কাঁঠাল খাইলে যদি অজীর্ণ হয়, তাহা হইলে কলা খাইলে উহা আরোগ্য হয়। কলা খাইয়া যদি অজীর্ণ হয়, তাহা হইলে ঘৃত খাইলে আরোগ্য হয়। নারিকেল এবং তাল শাঁস খাইয়া যদি অজীর্ণ হয়, তাহা হইলে চাউল ভক্ষণে আরোগ্য হয়। আম্র খাইয়া অজীর্ণ হইলে দুগ্ধ পানে প্রশমিত হয়। ময়দা খাইয়া যদি অজীর্ণ হয়, তাহা হইলে শসা ভক্ষণে আরোগ্য হয়। খেজুর এবং কয়েদবেল খাইয়া অজীর্ণ হইলে নিম্ববীজ খাইলে প্রশমিত হয়। তণ্ডুল খাইয়া অজীর্ণে গরম জল পান হিতকর। মটর খাইয়া অজীর্ণ হইলে হরীতকী সেবনে প্রশমিত হয়। লবণ ভক্ষণে অজীর্ণ হইলে চাউলধোয়া জল হিতকর। জল পান করিয়া অজীর্ণ হইলে মধু সেবনে উপকার হয়। পিষ্টক আহারে অজীর্ণ হইলে গরম জল পান করিবে। জাম খাইয়া অজীর্ণ হইলে শুঁঠ সেবনে প্রশমিত হইবে। মালপুয়া এবং বড়া ভক্ষণে অজীর্ণ হইলে যমানি সেবন হিতকর। বেগুন এবং মূলা ভক্ষণে অজীর্ণ রোগে বৃহতীর কাথ পান করিলে প্রশমিত হয়। শাক খাইয়া অজীর্ণ হইলে সরিষা বাটা সেবনে আরোগ্য হয়। ওল খাইয়া অজীর্ণ হইলে গুড় ভক্ষণে ভাল হয়। তরকারী খাইয়া অজীর্ণ নাশের জন্য তিলের গাছ পোড়াইয়া উহা জলের সহিত মিশাইয়া সেবনে আরোগ্য হয়। দুগ্ধ পানে অজীর্ণে কুঙ্কুম, চিঁড়া ভক্ষণে অজীর্ণ নিবারণে পিপুলের গুঁড়া ও কুঙ্কুম এবং ষষ্টিক তণ্ডুল পরিপাকের জন্য দধিমস্তু প্রশস্ত। খিচুড়ি—সৈন্ধব লবণে, মাংস—লেবুতে এবং মুগের যূষে পায়স পরিপাক করে।

বিষ চিকিৎসা।

—:০:—

(কবিরাজ শ্রীঅতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিভূষণ)

সর্প দংশনে।—সর্প দংশন করিবামাত্র দষ্টস্থানের চারি অঙ্গুলী উপরে দৃঢ় রজ্জু দ্বারা বাঁধিয়া ফেলিবে। তাহার পর দংশিত স্থান চিরিয়া একটি ছোট গেলাসের মধ্যে স্পিরিট জ্বালিয়া ক্ষত মুখে সেই গেলাসটি চাপিয়া ধরিয়া রক্ত নির্গমন করিতে চেষ্টা করিবে এবং তাহার পর এক খণ্ড লৌহ অগ্নি সন্তাপে রক্তবর্ণ করিয়া ক্ষত স্থান দগ্ধ করিবে। দংশিত স্থান যদি বাঁধিবার উপায় না থাকে, তাহা হইলেও চিরিয়া দিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থায় রক্তমোক্ষণের চেষ্টা করিবে এবং উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা দগ্ধ করিবে। যদি বিষ সর্ব্ব দেহে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে ভুঁতের জল বা অন্য বমন কারক ঔষধ সেবনে বমন করাইতে চেষ্টা করিবে।

ঔষধের কথা।—(১) ৮।১০টি গোল-মরিচের সহিত হুড়হুড়ের মূল জলে পিষিয়া সেবন করান হিতকর। (২) অপরাজিতা ও হাপরমালীর কাথ পান করান সর্পবিষে উপকারক। (৩) মঞ্জিষ্ঠা, মধু, যষ্টিমধু, জীবক, ঋষভক, চিনি, গাম্ভারী ও বটের শুঙ্গার কাথ পান করান সর্পবিষে প্রশস্ত ব্যবস্থা। (৪) মরিচ, পিঁপুল, শুঁঠ, আতইচ, কুড়, ঝুল, রেণুকা, সিউলি ছোপ ও কটকী—এই সকল দ্রব্যের সমষ্টির পরিমাণ ২ তোলা, জল ৵৷৷০ আধ সের, শেষ আধ পোয়া,—এই কাথে কিঞ্চিৎ মধু মিশাইয়া সর্প বিষাক্রান্ত ব্যক্তিকে পান করানর ব্যবস্থা করা বাঞ্ছিত পারে। (৫) হাতীশুঁড়ার মূল ও ভুঁই চাপার মূল সেবনে সর্পবিষ বিনষ্ট হয়।

নস্য প্রয়োগ।—(১) ঈশলাঙ্গলার মূল জলে পিষিয়া লইয়া নস্য প্রয়োগ সর্প বিষাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে ব্যবস্থেয়। (২) বিষাক্রান্ত ব্যক্তির নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা ও কণ্ঠনালীর রোধ হইলে বার্ত্তাকু, হোলঙ্গ লেবু এবং কট্‌কী পেষণ করিয়া নস্য প্রয়োগের ব্যবস্থা করিবে।

বৃশ্চিক দংশনে।—দংশিত স্থানে তার্পিণ তৈলের মালিশ উত্তমরূপে করিতে থাকিবে এবং তালপাতার আগুন করিয়া বারম্বার সেঁক দিবে। গাওয়া ঘি ও সৈন্ধব লবণ একত্র মিশাইয়া গরম করিয়া দংশিত স্থানে মাখাইয়া দিলে বিষ নষ্ট হয়। গোময় গরম করিয়া প্রলেপ দিলেও উপকার দর্শিয়া থাকে। কাল কচুর আটা মর্দ্দন করিলে এ অবস্থায় বিশেষ উপকার দর্শে। চুণ গরম করিয়া দিলেও বৃশ্চিক-বিষে উপকার হয়। চিটে গুড়ের প্রলেপও বৃশ্চিক বিষ প্রশমনে উপকারক।

মূষিক বিষে।—সর্প বিষাক্রান্ত ব্যক্তির মত প্রথমতঃ রক্তমোক্ষণ করান আবশ্যক। তাহার পর ঝুল, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা ও সৈন্ধব লবণ সমানভাগে লইয়া একত্র মিশাইয়া গরম করিয়া প্রলেপ দেওয়া হিতকর। আকন্দের মূল পিষিয়া প্রলেপ দিলেও উপকার হইয়া থাকে। দারুচিনি ও শুঁঠের গুঁড়া প্রত্যেক দ্রব্য ।০ আনা মাত্রায় লইয়া গরম জলের সহিত সেবন করানও এ অবস্থায় [illegible]

মাকড়সার বিষে।—(১) অপরাজিতা অর্জ্জুন ছাল, কুড়, শেলু অশ্বত্থ, বট, পাকুড়, যজ্ঞডুমুর ও বেতস ছাল—সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল আধ সের, শেষ আধ পোয়া,—এই ক্বাথ পান করাইলে মাকড়সার বিষ নষ্ট হয়। (২) রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, বেণা মূল পাকল, নিসিন্দা, স্বর্ণক্ষীরি, সিউলিছোপ শিরীষ, বালা ও অনন্ত মূল—এই সমস্ত দ্রব্য সমানভাগ এবং কুড় ৩ ভাগ—একত্র শেলু বৃক্ষের রসের সহিত পিষিয়া প্রলেপ দিলে মাকড়সার বিষ নষ্ট হইয়া থাকে।

শৃগাল ও কুকুরের বিষে।—শৃগাল বা কুকুরে দংশন করিবামাত্র দংশিত স্থান চিরিয়া রক্ত নির্গমনের ব্যবস্থা করিবে এবং উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা সেই স্থান দগ্ধ করিবে এবং তৎক্ষণাৎ ধুতুরার মূল ১ রতি অথবা কুঁচিলার মূল ১ রতি ও খানিকটা গব্য ঘৃত পানের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। সীজের আটায় শিরীষ বীজ ঘসিয়া দংশিত স্থানে প্রলেপ দিলে এ অবস্থায় উপকার দর্শিয়া থাকে। সীজের আটায় শিরীষ বীজ ঘসিয়া তাহার মধ্যে ভেড়ার লোম পূরিয়া সেবন করানও এ অবস্থায় হিতকর।

শোষক কার্পাস।

(The Absorbent Cotton)

[অভিনব প্রণালীতে হস্ত দ্বারা প্রস্তুত করিয়া নিখিল ভারতবর্ষীয় দশম বৈদ্য সম্মেলন-প্রদর্শনী উপলক্ষে দিল্লীতে প্রদর্শিত]

—:*:—

(শ্রীপ্রমথ নাথ দত্ত গুপ্ত)

চিকিৎসা শাস্ত্রে 'কার্প্পাস' এবং তজ্জাত বস্ত্রাদির অনেকস্থলে ব্যবহার দেখিতে পাই। মহাত্মা ধন্বন্তরি সুশ্রুতোক্ত অগ্রোপহরণীয় অধ্যায়ে অষ্টপ্রকার অস্ত্র ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তৎকার্য্যোপযোগী যন্ত্রাদি সহ পিচু (তুলা) প্লোত সূত্র ও পট্ট ইত্যাদির সংগ্রহ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ছিন্ননাসা, ছিন্ন ওষ্ঠাদি যাবতীয় শল্য চিকিৎসায়ও কার্পাসের ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। এই কার্পাস কিরূপ এবং কি প্রকারে ব্যবহৃত হইত, তাহা শাস্ত্রীয় ব্যবহার বিধিগুলির আলোচনা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

অস্ত্র ক্রিয়ার পশ্চাতে, ক্ষতের আর্দ্রতা পরিশোষণজন্য, কষায়াদি বস্ত্র ও বিকেশিকা প্রস্তুতার্থ প্রতিসারণীয়—ক্ষারকর্ম্মে ক্ষরিত রক্ত পূযাদি শোষণ করণার্থ এবং ব্রণ বন্ধনে যাহাতে বন্ধন শিথিল বা সঙ্কুচিত না হয়—অথচ তাহার কোমলতা বিদ্যমান থাকে, বনমক্ষিকা মশা তৃণ, প্রস্তর খণ্ড, ধূলি এবং শীত, বাত, আতপ প্রভৃতি উপদ্রব দ্বারা ক্ষতস্থান কোন প্রকারে দূষিত না হইতে পারে—অপিচ অস্থি চূর্ণিত, মথিত, ভগ্ন বা অতি-পাতিতাবস্থায় শিরা, স্নায়ু প্রভৃতি ছিন্ন হইলে তাহাদিগকে স্বস্থানে স্থিতকরণার্থ

শল্যতন্ত্রোক্ত কার্পাসের ব্যবহার বহুপ্রকারেই দেখিতে পাই।

উপরি লিখিত কার্পাসের শাস্ত্রীয় প্রয়োগ দৃষ্টে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে, ঐ কার্পাস বিশেষ উপাদানে শোষকগুণ বিশিষ্ট রূপে প্রস্তুত। স্বাভাবিক কার্পাসে যে পরিমাণে শোষক শক্তি বিদ্যমান আছে—তাহাতে ক্ষতাদির বন্ধন পক্ষে উহা সম্যক উপযোগী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। যেহেতু উপযুক্তভাবে শোষণ গুণ যুক্ত না হইলে উহা কদাপি লেপাদি ঔষধ ক্ষতাদ্র্তা ও রক্ত পূয়াদির শোষণ কার্য্য করিতে অথবা কোমল হইতে পারে না।

অতএব শোষণ গুণযুক্ত শোষক কার্পাসই শল্য চিকিৎসার একটী প্রধান উপাদান। ইহা দ্বারা ধাত্রী চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় ও ব্রণাদির প্রতিকারার্থ যাবতীয় বর্ত্তি, পিচু, বিকেশিয়া, ছুকূল, ও ব্রণবন্ধনী বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয় এবং তৎ সমস্তই শোষণ গুণ যুক্ত ও উত্তম আবরক হইয়া থাকে।

ব্রণ হইতে রক্তপূয়াদি আকর্ষণ করিয়া, অভ্যন্তরে পূয়োদপাদক বীজাণু প্রসারের হ্রাস করা এবং বহির্দ্দেশ হইতে শীত, বাত, আতপ, বীজাণু ও ধূলি ইত্যাদি আগন্তুক উপদ্রব হইতে রক্ষা করাই ইহার প্রধান কার্য্য। এই জন্য ইহা প্রদাহে অগ্নি কর্ম্মে, ক্ষারকর্ম্মে,বিসর্পে অন্যান্য ক্ষতাদি স্থানে, বীজাণুশূন্য এবং বীজাণু নাশক কষায় সিক্ত করিয়া আবরণার্থ ব্যবহৃত হয়। ইহা ব্যতীত অপস্তম্ভ, ফুসফুসাদি যন্ত্রের প্রদাহে, উরঃক্ষতে, শীত, বাত, এবং আতপ হইতে রক্ষাকরণার্থ বক্ষ ও পৃষ্ঠ প্রভৃতি পীড়িত স্থান ইহার দ্বারা আবৃত করিয়া রাখা হয়।

অধুনা প্রক্রিয়ার দ্বারা ইহাকে দ্রব করিয়া তদ্বারা ছেদ্য, ভেদ্য, লেখ্য, এষ্য, আহার্য্য ও সিব্য ক্রিয়োৎপন্ন ক্ষত উত্তমরূপে আচ্ছাদন করা যাইতেছে।

এই শোষণ গুণযুক্ত কার্পাস প্রাকৃতিক কি বৈকৃতিক তাহা আমরা সামান্য পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি। বৃক্ষজাত বীজ রহিত কার্পাস জলে নিমজ্জিত করিলে দেখিতে পাই,কার্পাস খণ্ড জলে ভাসিতেথাকে জল শোষণ করে না। অতএব ইহার দ্বারা প্রতীয়মান হয়, স্বভাব জাত কার্পাসে শোষণ শক্তি উপযুক্ত ভাবে বর্ত্তমান নাই। কিন্তু অভিনব প্রণালীতে প্রস্তুত 'শোষক কার্পাস, জলে স্থাপন করিবামাত্র দেখা যায় যে, তন্মুহূর্ত্তে জল কার্পাসের প্রত্যেক স্তরে স্তরে এবং উর্দ্ধস্থিত সূক্ষ্ম তন্তু পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়া অতি সত্বরই উহাকে নিমজ্জিত করিয়া ফেলে।

এই কারণে প্রমাণ হয় যে,—আর্য্য চিকিৎসা শাস্ত্রবিদ্ মহাত্মারা শল্য চিকিৎসায় যে কার্পাসাদি ব্যবহার করিতেন, তাহা শোষণ গুণ বিশিষ্ট ও যে বস্ত্র ব্যবহার করিতেন তাহাও উক্ত কার্পাস দ্বারা প্রস্তুত হইত এবং কার্পাসকে শোষকরূপে পরিণত করিবার প্রক্রিয়া তাঁহাদের বিশেষ ভাবে জ্ঞাত* ছিল, অথচ সেই তত্ত্ব আজ আমাদের নিকটে অজ্ঞাত।

'আমরা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে

* এই প্রবন্ধের লেখক অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। দ্বিতীয় [illegible] প্রদর্শনীতে যে, শোষক কার্পাস প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা এই ছাত্রেরই উদ্ভাবনী শক্তির পরিচায়ক। এই "শোষক কার্পাস" অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের [illegible] চিকিৎসালয়ের রোগীদিগকে [illegible] বিশেষ ফল পাওয়া যাইতেছে। [illegible]

অধ্যয়ন করিয়া পদার্থ বিশ্লেষণ শাস্ত্রে (chemistry) সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, কার্পাসে স্নেহযুক্ত এমন একটী পদার্থ বিদ্যমান আছে—যাহার দ্বারা কার্পাসে জল শোষিত হইতে পারে না, কিন্তু প্রক্রিয়ার দ্বারা সেই তৈলাক্ত পদার্থকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে পারিলে কার্পাস শোষকগুণবিশিষ্ট এবং কোমল ও শস্ত্র ক্রিয়াদির সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়া থাকে।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

—:০:—

মহিলাদিগের মৃত্যু।—কলিকাতায় মহিলাদিগের মৃত্যু সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। সরকারি রিপোর্টে প্রকাশ—গত বৎসর কলিকাতায় পুরুষদিগের মৃত্যু সংখ্যা হাজার করা ৩১·৬ এবং মহিলাদিগের মৃত্যু সংখ্যা হাজার করা ৪৪। ইহার মধ্যে বসন্ত রোগে পুরুষ মরিয়াছে—হাজার করা ৫৪, মহিলা মরিয়াছে ৭৪; হামে পুরুষ ১১, মহিলা ২৪; ইনফ্লুয়েঞ্জায় পুরুষ ৪·৩, মহিলা ৫; ম্যালেরিয়ার পুরুষ ৯৭, মহিলা ১·৯; আমাশয়ে পুরুষ ২·৫, মহিলা ৪·৯; যক্ষ্মারোগে পুরুষ ১·৬, মহিলা ২·৯; ফুসফুস্ রোগে পুরুষ ৭·৭, মহিলা ৯ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এই হিসাব দৃষ্টে বুঝা যায় মহিলাদিগের মধ্যে যক্ষ্মা ও ফুসফুসের পীড়াই প্রবল ভাব ধারণ করায় গত বৎসর অধিক সংখ্যক মহিলা কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। কলিকাতার স্বাস্থ্যরক্ষক মহাশয় ইহার যে কয়টি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে আলোক-রৌদ্রহীন-ঘরগুলিতে অন্তঃপুরচারিণীদিগের অবস্থিতির কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতি সঙ্গত। আমরা অনেক বারই বলিয়াছি—অনেক প্রবাসী চাকুরে পুরুষের আয়ের পরিমাণ অল্প হইলেও পুত্র কলত্র লইয়া কলিকাতা বাসের সাধ মিটাইতে গিয়া সামান্য কদর্য্য বাড়ীতে বাস করিয়া থাকেন। ফলে কর্ম্মসূত্রে তাঁহাদিগকে অনেক সময় বাহিরে থাকিতে হয়, কিন্তু তাঁহাদের পুরস্ত্রীগণের জন্য আলোক-রৌদ্র উপভোগের ব্যবস্থা করিবার উপায় নাই। বাঙ্গালী মহিলার স্বাস্থ্য এইরূপেই ক্ষয়িত হইতেছে। অল্প আয়ের বাঙ্গালী পুরুষ এসব কথা যে বুঝেন না—ইহাই তো দুঃখ।

শিশু মৃত্যুর হিসাব।— মহিলাদিগের মত কলিকাতায় শিশুর মৃত্যুর সংখ্যাও ভীষণ বর্দ্ধিত হইতেছে। গত বৎসর কলিকাতায় যত শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহার এক তৃতীয়াংশ শিশু এক বৎসর উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই ইহলীলা সংবরণ করিয়াছে। গত বৎসর কলিকাতায় মোট ৫০৯৬টি শিশুর মৃত্যু ঘটিয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে জন্মের এক সপ্তাহের মধ্যে ১৭৯১টি মৃত্যুর কবলে পতিত হইয়াছে। গত বৎসর যতগুলি শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল তাহার তিনভাগের ১ ভাগ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে, কয়েক দিনের মধ্যে বা ১ [illegible] করিয়াছে। এই [illegible]

মৃত শিশুর মোট সংখ্যা ১৭৯১, ইহাদিগের মধ্যে ৫৯৫টি শিশু অপূর্ণাবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, ৭৬৯টি শিশু দুর্ব্বল অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, ৩৯৫টি শিশুর ধাত্রীর দোষে ধনুষ্কারে মৃত্যুর কারণ ঘটিয়াছিল।

শিশু মৃত্যুর হিসাবের বিশ্লেষণ।

শিশুমৃত্যুর হিসাবের বিশ্লেষণে আমরা আরও জানিতে পারি যে, জন্মের ৭ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে কলিকাতায় ৮৩২টি শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। এক কথায় কলিকাতায় যত শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে, তাহার অর্দ্ধাংশ এক মাসের মধ্যেই কাল কবলিত হইয়া থাকে। ৭ দিনের মধ্যে যত শিশুর মৃত্যু হয় তাহার শতকরা ২৫ ভাগ এবং ৭ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে যত শিশুর মৃত্যু হয়, তাহার শতকরা ৫০ ভাগ ধনুষ্টঙ্কারে মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। গত বৎসর যত শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ৩৮৫টি শিশুর মৃত্যু হইয়াছে দ্বিতীয় মাসে। এই ৩৮৫টির মধ্যে ২৬৫টির ব্রঙ্কাইটিসে মৃত্যু হইয়াছে। গত বৎসর জন্মগ্রহণের পর ২৬৫টি শিশু তৃতীয় মাসে ব্রঙ্কাইটিসে এবং ৩ হইতে ৬ মাস বয়সের মধ্যে ২১২টি শিশু ঐ রোগে মারা গিয়াছে। এই হিসাবে ব্রঙ্কাইটিস্ রোগে শিশুর মাসিক মৃত্যু সংখ্যা ১১৬। গত বৎসর ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ৬ হইতে ১২ মাসের প্রতি মাসে গড়পড়তা ২০১টি শিশু কাল কবলিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে ব্রঙ্কাইটিসে মৃত্যু ঘটিয়াছে প্রতি মাসে ৯০টি। গত বৎসর ৯৮৭টি শিশু মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল।

শিশু মৃত্যুর কারণ।—কলকথা

শিশুমৃত্যুর অবস্থা ক্রমশঃ যেরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাতে ইহার উপায় চিন্তন অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। যে কারণে কলিকাতায় মহিলা মৃত্যু বাড়িয়া উঠিয়াছে, শিশু মৃত্যুর কারণও তাহার সহিত বিজড়িত। বাঙ্গালীকে উদরান্নের সংস্থানের জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিতে হয়,—তাহার অনুপাতে বাঙ্গালী পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, বাঙ্গালী-মহিলার অবস্থা আরও শোচনীয়, একে [illegible] হীন কক্ষমধ্যে দিবারাত্রি অবস্থিতি, তাহার উপর চিরন্তন রীত্যনুসার বাঙ্গালী পুরুষকে যথাসাধ্য আহার করাইয়া ভুক্তাবশেষ ভোজনে আত্মতৃপ্তি অনুভূতির ফলে অনেক মহিলাই উপযুক্ত ভোজনের দিকে লক্ষ্য রাখেন না। ফলে বাঙ্গালী-পুরুষও যেরূপ দুর্ব্বল ও ভগ্ন স্বাস্থ্য হইয়া পড়িতেছেন, বাঙ্গালী মহিলা তাহা পেক্ষাও স্বাস্থ্যহানির কারণ করিয়া তুলিতেছেন। কাজেই দুর্ব্বল পিতামাতার শুক্র-শোণিতের সংমিলনে যে সকল সন্তান সন্ততি জন্মগ্রহণ করেন, তাহারা যে এরূপ ভাবে অকালে কাল কবলিত হইবে—তাহাতে আর বিচিত্র কি?

শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা।—সহযোগী

"হিন্দুস্থান" হইতে শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য আমরা নিম্নলিখিত খোকা খুকীদের কথা উদ্ধৃত করিলাম।

১। শিশুর ঠোঁটে ঠোঁট রাখিয়া কখনো চুমো খাইবেন না—বা আর কাহাকেও খাইতে দিবেন না।

২। বাজার হইতে কিনিয়া আনা কৃত্রিম স্তনবৃন্ত শিশুদের মুখে দিয়া কখনো তাহাদিগকে ভুলাইয়া রাখিবেন না। শিশুদের বাড় ইহাতে কমিয়া যায়; গঠনও খারাপ হইবার ভয় আছে।

৩। কি দিনে, কি রাতে, একেবারে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া ঠিক নিয়ম করিয়া শিশুদিগকে দুধ খাওয়াইয়া দিবেন।

৪। প্রতিবারের আহারের পরেই বোরিক অ্যাসিড দিয়া শিশুদের মুখ ধুইয়া দেওয়া দরকার।

৪। দোল দিয়া শিশুকে ঘুম পাড়াইবেন না।

৬। শিশুর পিছনে এক হাত না রাখিয়া কখনো তাহাকে কোলে করিবেন না।

৭। যতক্ষণ পারেন,—শিশুকে খোলা আকাশে [illegible] রাখিবেন। খোলা বাতাসে শিশুর [illegible]

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৪র্থ বর্ষ।	বঙ্গাব্দ ১৩২৬—অগ্রহায়ণ।	৩য় সংখ্যা।

সুশ্রুত।

—:*:—

(শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায় ব্যাকরণতীর্থ-বিদ্যাবিনোদ।)

(১)

নিখিল ভুবন আবৃত যখন নিবিড় মোহের তমসা স্পর্শে।
তখন উজল জ্ঞানের আলোক ছাইল সারাটা ভারতবর্ষে॥
তাহার মাঝারে সুশ্রুত দেব! দানিলে বিশাল ভিষকতন্ত্র।
প্রতিভা প্রকাশি' অন্তেবাসীরে বিতরি শতেক শল্য যন্ত্র॥
তোমার মহিমা তোমার গরিমা গাহিল সকলে পুজিল মূর্ত্তি।
জলধির তীরে শিখরীর শিরে ছুটিল অশেষ বিমল কীর্ত্তি॥

(২)

জনক তোমার অতি তেজস্বী তপোধন মুনি বিশ্বামিত্র।
কৈশোরে তব জ্ঞানের আলোকে-উজলিল হৃদে সে শালিহোত্র।
জনক আদেশে জ্ঞানের প্রয়াসে বারাণসী ধামে পুণ্যক্ষেত্রে।
বরিলে নৃমণি দেব দিবোদাসে আচার্য্য পদে সুদেব পুত্রে॥
তোমার মহিমা তোমার গরিমা গাহিল সকলে পুজিল মূর্ত্তি।
জলধির তীরে শিখরীর শিরে ছুটিল অশেষ বিমল কীর্ত্তি॥

(৩)

বিতরিল গুরু শতেক শিষ্যে সমান বিদ্যা সমান জ্ঞান।
উচ্চে উঠিলে সবার মাঝারে গুণ গৌরবে লভিলে মান॥

ব্রহ্মা রচিত আয়ুর শাস্ত্র তোমাতে লভিল সমুৎকর্ষ।
রচিলে স্বনামে গ্রন্থরত্ন শিষ্য সমাজে ফুটা'লে হর্ষ॥
তোমার মহিমা তোমার গরিমা গাহিল সকলে পূজিল মূর্ত্তি।
জলধির তীরে শিখরীর শিরে ছুটিল অশেষ বিমল কীর্ত্তি॥

(৪)

শবচ্ছেদি দিলে শারীরের জ্ঞান শিখা'লে সকলে যন্ত্র শস্ত্র।
এষণ সীবন লেখনাহরণ ছেদন ভেদন বেধন অস্ত্র॥
তিব্বতে তব ঘোষিল কীর্ত্তি মিশরে উঠিল যশের মন্ত্র।
আরব ঘোষিল অতুল মহিমা তবানুসরণে রচিল তন্ত্র॥
তোমার মহিমা তোমার গরিমা গাহিল সকলে পূজিল মূর্ত্তি।
জলধির তীরে শিখরীর শিরে ছুটিল অশেষ বিমল কীর্ত্তি॥

কাজের কথা।

—:০:—

বাঙ্গালীর কথা।—এখনকার দিনে বাঙ্গালীর পরমায়ু গড়পরতা পঞ্চাশ। ত্রিশ বৎসরের পরই বাঙ্গালীর শক্তি-সামর্থ্য হ্রাস পাইতে আরম্ভ হয় এবং চল্লিশ বৎসরের পর অনেক বাঙ্গালীরই অধিকাংশ ইন্দ্রিয় পূর্ণভাবে কার্য্য করিতে পারে না। বাঙ্গালীর মধ্যে যেরূপ উপচক্ষুর বিস্তৃতি লক্ষিত হয়, তাহাতে যৌবনের সীমা অতিক্রম করিতে না করিতে অনেক বাঙ্গালীরই যে চক্ষু নামক ইন্দ্রিয়ের দোষ ঘটিয়া থাকে—ইহা তো স্বীকার করিতেই হইবে। সেই চক্ষুর দোষ ঘটার প্রধান কারণ বাঙ্গালীর শরীর ক্ষয়। চক্ষুর দোষ ঘটিলেই বুঝিতে হইবে যে, যে কোনো কারণেই হউক অল্পদৃষ্টি-বাঙ্গালীর শারীরিক ক্ষয় ঘটিতেছে। বাল্যে বা যৌবনে যাহাদিগের উপচক্ষু ধারণ করিবার কারণ ঘটে, আমাদের মনে হয়, নিয়ত পুস্তকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরগুলির প্রতি চক্ষুর দৃষ্টি সুসংবদ্ধ থাকাই তাহার প্রধান কারণ। বাঙ্গালী বালক মূর্খ হউক—তাহার অধ্যয়ন করিয়া কাজ নাই—এ কথা অবশ্য আমরা বলিতেছিনা, কিন্তু ইদানিন্তন কালের অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষার জন্য দিবারাত্রি রাশি রাশি গ্রন্থ অধ্যয়নের ব্যবস্থায় সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান কার্য্যকরী ইন্দ্রিয় চক্ষুর দোষ জন্মাইবার কারণ উপস্থিত করাও সমীচীন কিনা—তাহাই চিন্তার বিষয়।

* * * *

উপচক্ষু বিস্তৃতির হেতু।—শিক্ষার ব্যবস্থা ভিন্ন আর একটি কারণে বাঙ্গালী বালক ও যুবক সমাজে উপচক্ষু

বিস্তৃতির আবশ্যক হইয়া পড়িতেছে—সে টি ব্রহ্মচর্য্যের অভাব। যতগুলি কারণে চক্ষুর দোষ ঘটিয়া থাকে, তাহার মধ্যে অতিমৈথুন—চক্ষুর দোষ উৎপন্ন করিবার একটি প্রধান কারণ। ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার অভাবে বাঙ্গালী-বালক ও যুবকদিগের মধ্যে ইহার গতি কিন্তু রোধ করিবার উপায় নাই। তাহার উপর যেরূপমৈথুনে চিরদিনের জন্য অন্তঃসারশূন্য হইতে হয়, সেই অস্বাভাবিক মৈথুনের ব্যবস্থাই উঁহাদিগের মধ্যে অপ্রতিহত। ইহার ফলে বাঙ্গালী বালকের চক্ষুর দোষ তো ঘটিতেছেই, তদ্ভিন্ন স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের ভীষণ পীড়নে কর্ম্মময় জীবনে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই বাঙ্গালীকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিতেছে।

*　　*　　*　　*

ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে সর্ব্বনাশ।—সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রগুলিতে যত বিজ্ঞাপন বাহির হয়, তাহার চারিভাগের তিন ভাগ ধাতু ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল নিবারণের ঔষধে পূর্ণ। বাঙ্গালীর শোচনীয় অবস্থা ঐ সকল বিজ্ঞাপনের অবস্থা দেখিয়াই উপলব্ধি করা যাইতে পারে। রোগের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা বুঝিয়া দেশে যে ঐ শ্রেণীর ঔষধের আবিষ্কর্ত্তারাও বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা তো বলাই বাহুল্য। ফলে এখনকার দিনে বাঙ্গালী-বালকের নিকট যে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার ব্যবস্থা নাই, তাহার প্রতীকার কি? সে কালের শিক্ষাকাল গুরুগৃহে অতিবাহিত করায় ব্যবস্থা তো অধুনা লুপ্ত হইয়াছে,—যেরূপ শিক্ষার স্রোত এখন বাঙ্গালায় প্রবাহিত, তাহারই মধ্যে কর্ত্তৃপক্ষগণ কি ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দানের কোনো একটা ব্যবস্থা করিতে পারেন না? ইহার বন্দোবস্ত কিরূপভাবে হইতে পারে—শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তারা সে বিষয়ের চিন্তা করিবেন, তবে আমাদের মনে হয়,—স্বাস্থ্য পালনের শিক্ষাদানের জন্য সাহিত্য-গণিতের মত যদি একটু কড়াকড়ির ব্যবস্থা করা হয় এবং স্বাস্থ্যপালনের সেই সকল পুস্তকে ব্রহ্মচর্য্য পালনের বিধি সকল লিপিবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে কতকটা শুভ ফল ফলিতে পারে।

*　　*　　*　　*

অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য।—এখনকার বাঙ্গালী বালককে যে একেবারেই চিত্ত সংযমের শিক্ষা দেওয়া হয় না—ইহা অতি সত্য কথা। বাঙ্গালী-বালকের অধ্যয়ন ব্যাপারে তাহার পিতামাতা যেরূপ কঠোর দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন, তাহাকে সংযমী করিবার জন্য যদি তাহার কতকটা দৃষ্টিও নিক্ষেপ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আজি বঙ্গজননীর অনেক কৃতীপুরুষকে অকালে কাল কবলিত হইতে হইত না। অজীর্ণ এবং অগ্নিমান্দ্যেও এখনকার দিনে পনের আনা বাঙ্গালী ভুগিয়া থাকেন। অধিক জলপান, বিষম ভোজন (অল্প ভোজন, বহু ভোজন বা অসময়ে ভোজন), মলমূত্রাদির বেগধারণ ও রাত্রি জাগরণ—সাধারণতঃ এই কয়টি কারণে অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হয়—ইহাই শাস্ত্রবাক্য। বাঙ্গালার পল্লীগুলি অপেক্ষা সহর গুলিতেই অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যের প্রাদুর্ভাব অধিক, আবার বাঙ্গালার সকল সহর অপেক্ষা সর্ব্বপ্রধান সহর কলিকাতাতেই ইহার বিস্তৃতি অত্যধিক। আমাদের মনে হয়, বাঙ্গালার পল্লীগুলিতে চা-সোডা-লেমোনেড-সরবতের দোকান নাই,—ফিরিওয়ালা "চাই বরফ" বলিয়া সেখানে সর্ব্বদা হাকিয়া যায় না, কুলপী বরফ সেখানে প্রকাশ্যে পথে বিক্রয়ের ব্যবস্থা নাই; তাহারই ফলে

পল্লীমাতার সন্তানগণ নাগরিকগণের মত এত অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যপ্রবণ হইয়া ভগ্নস্বাস্থ্য হইতে পারেন না। সহরে বাঙ্গালী পিতা নিজেই এইরূপ অধিক জলপানে অজীর্ণগ্রস্থ হইবার কারণ করিয়া থাকেন, এরূপ অবস্থায় বাঙ্গালী-বালককে সে বিষয়ে চিত্ত সংযম করিবার শিক্ষা কে প্রদান করিবে? ফলে বাঙ্গালী প্রতি নিয়ত রোগের তাড়নায় ক্রমেই যে মুহ্যমান হইয়া পড়িতেছে, সে সম্বন্ধে কবি রামপ্রসাদের কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়:—

"কারো দোষ নয় গো মা,
আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।"

* * *

বাঙ্গালীর পরমায়ু।—অনেক বাঙ্গালীই যে এখন পঞ্চাশ বৎসরের অধিক বাঁচেনা এবং পঁয়তাল্লিশ বৎসর অতিক্রম করার পর হইতেই তাহার যে জীবনের আশঙ্কা প্রতি মুহূর্ত্তেই হইয়া থাকে—ইহা পৃথিবীর সকল জাতির লোকেই একরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন। বিলাত ও আমেরিকার জীবন-বীমা কোম্পানী গুলি তাঁহাদের ব্যবসায়ের প্রসার কল্পে বাঙ্গালী জাতির বীমা গ্রহণ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স্ক বাঙ্গালী যদি মৃত্যুর পর টাকা প্রদানের সর্ত্তে বীমা করিবার জন্য আবেদন করে, তাহা হইলে তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না, সেরূপ বয়সে দশ কি ঊর্দ্ধ সংখ্যা পনের বৎসর পরে জীবদ্দশায় টাকা গ্রহণের সর্ত্তে অধিক চাঁদা দিয়া বীমা করিতে হয়। আর পঞ্চাশ বৎসর বয়সের পর বীমা গ্রহণের আবেদন করিলে তাহা তো গ্রহণ করার ব্যবস্থাই নাই। ফলে বাঙ্গালী জাতির পরমায়ু এখনকার দিনে পঁচ-পরতা যে পঞ্চাশ,—ইহা পৃথিবীর সকল দেশের লোকেই একরূপ স্থির করিয়া লইয়াছেন।

* * *

সেকালের বাঙ্গালী।— সেকালের বাঙ্গালী আশী-নব্বই-পঁচানব্বই বৎসর পর্য্যন্ত তো বাঁচিতই—একশত এবং তদূর্দ্ধ বয়সেও বাঁচিয়া থাকার লোকও আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সমাজের নিয়মে বার্দ্ধক্যে পদার্পণ করিলেও পত্নী বিয়োগে বাঙ্গালীর নূতন করিয়া দার পরিগ্রহে বাধা নাই। অনেক অশীতিপর স্থবিরকেও সেই নীতির মর্য্যাদা পালন করিতে দেখা যায় এবং দারান্তর গ্রহণের ফলে তাঁহাদিগকে প্রজাবৃদ্ধি করিতেও দেখা গিয়াছে। ইহার কারণ সেকালের বাঙ্গালী যেরূপ অধিক দিন জীবিত থাকিবার ক্ষমতা লাভ করিতেন, সেইরূপ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা স্বাস্থ্যসুখে বঞ্চিত হইতেন না। বাল্যে ব্রহ্মচর্য্য পালন—তথা স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালনই তাহার এক মাত্র কারণ। অজীর্ণ অগ্নিমান্দ্যের নাম সে কালে বাঙ্গালী একেবারে জানিত না। এখনকার সৌখিন-বাঙ্গালী আহার করিতে পারে না—ভোজ-নিমন্ত্রণে আহূত বাঙ্গালীর মধ্যে যিনি যত অল্পাহারী—তিনি তত ধন্যমনা বলিয়া মনে মনে গর্ব্ব-সুখ অনুভব করিয়া থাকেন, আগেকার বাঙ্গালী তো সেরূপ ছিল না। আগেকার বাঙ্গালীকে মাধ্যাহ্নিক আহারের সময় যে অন্ন প্রদান করা হইত, তাহার পরিচয়ে বলিতে গেলে বলিতে হয়—ঐ অন্নদ্রব্য মার্জ্জার বা বিড়ালে ডিঙ্গাইতে পারিত না। সেকালের আহারপটু বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা নিন্দার কথা ছিলনা, বাঙ্গালীর আহারপটুতা সে কালের একটা গৌরবের বিষয়ই ছিল। [illegible]

যিনি যত বেশী আহার করিতে পারিতেন, তিনি তত বেশী প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিতেন। বাঙ্গালীর 'মুন্‌কে রঘু'—এই আহারপটুতার ফলে আজিও স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। ফলে সেকালের বাঙ্গালী বাল্যে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিত, যৌবনে স্বভাবতঃ শরীর ক্ষয়ের কারণ ঘটিলেও তাহার পূরণ কামনায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার করিত,—স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ-ব্যবস্থাও সর্ব্বপ্রকারে মানিয়া চলিত। সেকালের বাঙ্গালীর নীরোগ, দীর্ঘায়ু ও স্বাস্থ্যবান থাকিবার তাহাই একমাত্র কারণ।

* * *

এ কালের বাঙ্গালী।—এ কালের বাঙ্গালী ব্রহ্মচর্য্য শিখে নাই, সদাচার করিতে অভ্যস্ত হয় নাই, সদ্বৃত্তি সে পাইবে কোথা হইতে? যে সকল আহার্য্যে শরীরের পুষ্টি ও মনের তুষ্টি সম্পাদিত হইয়া থাকে সেই দুগ্ধ ঘৃত তো দেশে একরূপ দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে, তা'ছাড়া সে সকল দ্রব্য আহারের জন্যও বাঙ্গালী এখন আর উদ্‌গ্রীব নহে। বাঙ্গালীর বল সঞ্চয় হইবে কোথা হইতে? বলসঞ্চয় ভিন্ন দীর্ঘজীবন লাভ তো একেবারেই অসম্ভব। এখনকার অধিকাংশ বাঙ্গালীর ভাগ্যে যে সকল আহার্য্য জুটিয়া থাকে, তাঁহার মধ্যে না থাকে দুগ্ধ, না থাকে ঘৃত, না থাকে যথেষ্ট পরিমাণে মৎস্য! ছাত্রজীবনে অনেক বাঙ্গালী কেই মেসে বা বোর্ডিংয়ে থাকিতে হয়, ইহাদিগের ভাগ্যে বিশেষ পুষ্টিকর আহার্য্য লাভ সম্ভবপর নহে, যে সকল অল্প বেতনের চাকুরে বাঙ্গালী সপরিবারে সহরে অবস্থিতি করেন, তাঁহাদিগের ভাগ্যেও ঐ একই ব্যবস্থা। গরীব বা মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর আহার তো এইরূপ, দেশের অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণও এখনকার দিনে প্রচুর আহার করিতে পারেন না। তাহার প্রধান কারণ তাঁহারা অতিশয় শ্রমবিমুখ। পরিশ্রম না করিলে তো ক্ষুধাকালে যথেষ্টরূপে ভোজ্য দ্রব্য গ্রহণ করিবার শক্তি জন্মিতে পারে না। ফলে দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া যথেষ্টভাবে উদরপূর্ত্তির অভাবে অজীর্ণ রোগগ্রস্থ হইয়া স্বাস্থ্যক্ষয়ের কারণ করিয়া তুলিতেছেন, আর দেশের ধনবানেরা আলস্য-পরতন্ত্রতার ফলে বয়সোচিত আহারের অভাবে ঐ রোগের কারণ ঘটাইতেছেন।

* * *

পরিণাম।—ফলে নানাকারণে বাঙ্গালীর অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইতেছে, তাহাতে ইহার পরিণাম যে কি হইবে—তাহা ভাবিবার বিষয়। বাঙ্গালীর বুদ্ধি আছে, কিন্তু বল নাই, বল না থাকিলে সে বুদ্ধির স্ফূরণ হওয়া কখন সম্ভবপর নহে।' বাঙ্গালীর প্রাণ আছে, কিন্তু উৎসাহ নাই, উৎসাহ না থাকিলে সে শুষ্ক প্রাণ লইয়া কোনো বিরাট ব্যাপারে একাগ্রতার অভিনিবেশের আশা করা যায় না। বাঙ্গালীর হৃদয় আছে, কিন্তু তাহা অশান্তিপূর্ণ, অশান্তিপূর্ণ হৃদয়ের চেষ্টা কখনো সফলকাম হইতে পারে না। বলবুদ্ধি, প্রাণের উৎসাহ এবং হৃদয়ের শান্তি—এই কয়টি জিনিসের অভাবে মানুষের মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়। বাঙ্গালীর এখন সেই মনুষ্যত্ব নষ্টের উপক্রম ঘটিয়াছে। ইহারেই ফলে বঙ্গজননী আর "প্রতাপাদিত্যের" মত সন্তানপ্রসূ নহেন, "আশানন্দ-বৈদ্যনাথ-বিশ্বনাথের" মত প্রথিত নামা সন্তানকে আর বঙ্গজননীর অঙ্কে ধারণ করিতে হয় না। স্বাস্থ্যহীনতার ভীষণ ফলে সে 'রামপ্রসাদের' মত সাধক, 'কীর্ত্তিবাস' 'কাশীরাম' 'ভারত' 'চণ্ডী-

দাসের' মত কবিত্ব লইয়াও বাঙ্গালা দেশে কেহ জন্ম গ্রহণ করে না, 'টেকচাঁদ' 'বঙ্কিম' 'দীনবন্ধুর' স্থানও পূরণ করিবার শক্তি এইজন্য বাঙ্গালা হইতে তিরোহিত হইয়াছে।

* * *

ব্যবস্থার কথা।—আর্য্য ঋষিগণ পুনঃ পুনঃ মাথার দিব্য দিয়া আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন—"স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল।" এখনকার দিনের অর্থসর্ব্বস্ব বাঙ্গালী সে কথা বোঝেনা বলিয়াই তো আজি তাহার এই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। ফলে নষ্টস্বাস্থ্য প্রায় বাঙ্গালার পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করিতে হইলে তাহাকে সেকালের মত আবার সাবেক রীতি নীতি মানিয়া চলিতে হইবে। বাল্যে গুরুগৃহে অবস্থিতির ব্যবস্থা না হইলেও ছাত্রগণ বাল্য-জীবনেই যাহাতে ব্রহ্মচর্য্য-পালনের শিক্ষা প্রাপ্ত হয়—তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ধনবানদিগকে শ্রমবিমুখ হইলে চলিবে না,—শারীরিক শ্রমের জন্য তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সচেষ্ট হইতে হইবে। সাধারণ অল্প বেতনের চাকুরেগণ জননী জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে যে সহরে অবস্থিতি করেন, সে সংকল্প পরিহার করিতে হইবে। চাকরির নেশা পরিত্যাগ করিয়া যদি পল্লীজননীর প্রান্তর ভূমিতে কৃষিকর্ম্মের ব্যবস্থায় জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা হইলে তো কোনো কথাই নাই, তাহা না হইলেও সপরিবারে কর্ম্মস্থানে থাকিয়া সকলেই অর্দ্ধাশনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার সুলভ ব্যবস্থা করিয়া থাকিলে আর চলিবে না। সকল খাদ্য অপেক্ষা দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতি পুষ্টিকর আহার্য্যের ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে। দরিদ্র বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহানির সর্ব্বপ্রধান কারণ দুশ্চিন্তা। দরিদ্র-বাঙ্গালী যদি অবস্থা মত ব্যবস্থা করে, তাহা হইলে এই দুশ্চিন্তা-রাক্ষসী বাঙ্গালীর নিকট হইতে অতিদূরে পলায়ন করিবে, ফলে বাঙ্গালী আবার সেকালের মত নীরোগ ও সুস্থ দেহে দীর্ঘজীবন লাভে সমর্থ হইবে।

* * *

দুশ্চিন্তার কারণ।—বাঙ্গালীর দুশ্চিন্তার প্রধান কারণ—বাঙ্গালীর সর্ব্ব বিষয়ে অভাব, সেই অভাবটা যেন বাঙ্গালীর নিকট ক্রমশঃই বাড়িয়া উঠিতেছে। বাঙ্গালী পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, কারণ চাউলের মূল্য দশ টাকা, বাঙ্গালী শীত-গ্রীষ্মের উপযোগী বসন পরিতে পায় না, কারণ সাধারণ কাপড় একজোড়ার মূল্য অন্ততঃ পাঁচ টাকা। ইহার উপর দরিদ্র বাঙ্গালীর উপর মা-ষষ্ঠীর কৃপা পূর্ণ মাত্রায়। কাজেই বাঙ্গালী প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া সারাদিনে যে অর্থ উপার্জ্জন করে, তদ্দ্বারা নিজের এবং পরিবারবর্গের সুখস্বচ্ছন্দে অশন বসনের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নহে, কাজেই দুর্ব্বল মস্তিকে তাহাকে দুশ্চিন্তা-রাক্ষসীকে আলিঙ্গন না করিয়া থাকা চলে না। ইহার উপর সমাজের কঠোর ব্যবস্থায় কন্যাদায়ে সকল বাঙ্গালীই জর্জ্জরীত। একে উদরান্ন সংস্থানের চিন্তা, তাহার উপর কন্যাদায়ের ভয়ঙ্করী চিন্তা! বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য হানি হইবে না—তথা বাঙ্গালীর অকাল মৃত্যু ঘটিবেনা তো ঘটিবে কাহার? হায়! অর্থ উপার্জ্জনের অসচ্ছলতার এই দারুণ দুর্দ্দিনে বাঙ্গালী-পিতা সঙ্গতিহীন-পুত্রের বিবাহ সংঘটনের পূর্ব্বে যদি এই কথা চিন্তা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পুত্রের ভবিষ্যৎ তো এরূপ ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইত না। কিন্তু কোনো বাঙ্গালীই এ কথা বুঝেন না, সেই জন্যই তো বাঙ্গালার এই অবস্থা।

আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস।

——ঃ০ঃ——

গ্রন্থ পরিচয়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন সরস্বতী এম্,এ,এল্, এম্ এস্)

চরক সংহিতা—এই কায়চিকিৎসা প্রধান প্রামাণিক সংহিতা সমস্ত কায়চিকিৎসা তন্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মহর্ষি আত্রেয় ইহার বক্তা এবং অগ্নিবেশ শ্রোতা। অগ্নিবেশ ইহা গ্রন্থাকারে প্রচার করেন বলিয়া এই গ্রন্থ অগ্নিবেশ সংহিতা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। আত্রেয় অগ্নিবেশ, ভেল, জতুকর্ণ, পরাশর, ক্ষারপাণি ও হারীত—এই ছয় জন শিষ্যকে আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে সমান ভাবে উপদেশ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বুদ্ধির উৎকর্ষ বশতঃ অগ্নিবেশ প্রথমেই গ্রন্থ রচনা করেন এবং সেই গ্রন্থই শ্রেষ্ঠ হয়।

কালে মূল অগ্নিবেশ-সংহিতার অঙ্গহানি ঘটিলে চরক ঋষি উহার প্রতিসংস্কার করেন। এই জন্য উহা চরকসংহিতা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে চরক-সংহিতার অঙ্গহানি ঘটিলে দৃঢ়বল তাহার পূরণ করেন। কল্পস্থান, সিদ্ধিস্থান এবং চিকিৎসাস্থানের শেষ সপ্তদশ অধ্যায় দৃঢ়বল কর্ত্তৃক লিখিত বলিয়া চরকে উক্ত হইয়াছে। চক্রপাণি রচিত "আয়ুর্ব্বেদ দীপিকা" নাম্নী চরকটীকার ত্রিস্থানাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। সমগ্র টীকা বোম্বাই প্রদেশে মুদ্রিত হইতেছে। বঙ্গভূমি-ভূষণ ৺গঙ্গাধর কবিরাজ রচিত "জল্পকল্পতরু" নাম্নী সমগ্র টীকা মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে উহাও সুলভ নহে।

ভেল বা ভেড় সংহিতা—এই কায়চিকিৎসা প্রধান চিকিৎসাগ্রন্থ আত্রেয়ের অন্যতম শিষ্য ভেল কর্ত্তৃক রচিত। ভেল সংহিতা পূর্ব্বে দক্ষিণাপথে সুপ্রচলিত ছিল। এক্ষণে উহা তাঞ্জোরের রাজকীয় পুস্তকালয়ে খণ্ডিতাকারে বর্ত্তমান আছে।

হারীত সংহিতা—এই কায়চিকিৎসা-প্রধান গ্রন্থ আত্রেয়শিষ্য হারীত কর্ত্তৃক রচিত। বর্ত্তমানে হারীত-সংহিতা নামে যাহা প্রচলিত, তাহা মূল হারীতসংহিতা নহে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বর্ত্তমান হারীতসংহিতার রচনা দেখিয়া বোধ হয়, উহাতে কোন অজ্ঞাত-নামা অল্পবিদ্য ব্যক্তির রচনা যথেষ্ট পরিমাণে মিশ্রিত আছে।

সুশ্রুত সংহিতা—এই শল্যতন্ত্র-প্রধান গ্রন্থ, বর্ত্তমানে যে সকল শল্যতন্ত্রপ্রধান গ্রন্থ পাওয়া যায় তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই গ্রন্থের বিষয় কাশীরাজ দিবোদাস রূপে অবতীর্ণ ধন্বন্তরি কর্ত্তৃক শিষ্য সুশ্রুতাদিকে উপদিষ্ট হইয়াছিল। সুশ্রুত ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন বলিয়া ইহা সুশ্রুত-সংহিতা নামে খ্যাত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে সুশ্রুতের অঙ্গহানি ঘটিলে নাগার্জ্জুন নামক বৌদ্ধাচার্য্য উহার প্রতিসংস্কার করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

সুশ্রুত-সংহিতা—সূত্রস্থান, নিদানস্থান, শারীরস্থান, চিকিৎসাস্থান, কল্পস্থান এবং উত্তরতন্ত্র—এই ছয় ভাগে বিভক্ত। নিদানস্থানে প্রধানতঃ শস্ত্রসাধ্য (Surgical) ব্যাধি সমূহের নিদান এবং চিকিৎসা স্থানে ঐ সকল

রোগের চিকিৎসার বিষয় লিখিত হইয়াছে। কল্পস্থান ও উত্তরতন্ত্রে অন্যান্য সাতটী তন্ত্রের বিষয়ীভূত রোগ সমূহের নিদান ও চিকিৎসাদি বর্ণিত হইয়াছে। স্বস্থবৃত্ত (Hygiene) এবং পঞ্চকর্ম্ম বিষয়ক উপদেশও উত্তরতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। উত্তরতন্ত্রে বিদেহ প্রভৃতি গ্রন্থকারের মত, এমন কি চরকের পাঠ পর্য্যন্ত উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এইজন্য এই অংশ অপরের রচিত বলিয়া বোধ হয়। কারণ মূলসংহিতা হইলে বোধ হয় এরূপে বিদেহ প্রভৃতির মত ও পাঠ উদ্ধৃত হইত না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অধুনা যাহা সুশ্রুতসংহিতা নামে প্রসিদ্ধ, তাহা মূল সুশ্রুতসংহিতা নহে। উহা নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত সুশ্রুত। এই পার্থক্য বুঝাইবার জন্য টীকাকারগণ মূল সুশ্রুত হইতে উদ্ধৃত বচন "বৃদ্ধ সুশ্রুতের" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সুশ্রুতের ডল্লন কৃত "নিবন্ধ সংগ্রহ" নাম্নী সমগ্র টীকা এবং চক্রপাণি কৃত "ভানুমতী" টীকার সূত্রস্থানাংশ মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে দুর্লভ এরূপ অন্যান্য মূল সংহিতার বিষয় পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

(খ) সংগ্রহ গ্রন্থ।

সংগ্রহগ্রন্থ বলিতে আয়ুর্ব্বেদের সমগ্র অংশের সংগ্রহ এবং আংশিক সংগ্রহ উভয়ই বুঝায়। কিন্তু আমরা এই পর্য্যায়ে কেবল সম্পূর্ণ সংগ্রহেরই পরিচয় প্রদান করিব। আংশিক সংগ্রহগ্রন্থের নামাদি "বিবিধ সংগ্রহ" তালিকার মধ্যে লিখিত হইবে।

অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ বা বাগ্‌ভট—ইহা বাগ্‌ভট কৃত উৎকৃষ্ট এবং সুবৃহৎ সংগ্রহগ্রন্থ। অষ্টাঙ্গসংগ্রহ সূত্রস্থান, শারীরস্থান, নিদানস্থান, চিকিৎসা স্থান, কল্পস্থান ও উত্তর স্থান—এই ছয় ভাগে বিভক্ত। আয়ুর্ব্বেদের আটটী তন্ত্রোক্ত চিকিৎসার সকল বিষয়ই ইহাদের অন্তর্ভুক্ত। গ্রন্থের ভাষা সরল এবং গদ্যপদ্যময়। এই গ্রন্থ এক্ষণে বঙ্গে প্রদেশে মুদ্রিত হইয়াছে।

অষ্টাঙ্গহৃদয় বা বাগ্‌ভট—অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ রচনার পরে বাগ্‌ভট ইহা রচনা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া বাগ্‌ভট এই নাতিসংক্ষেপবিস্তর গ্রন্থ স্মরণধারণসুখকর পদ্যে রচনা করেন। কিন্তু অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ অপেক্ষা অষ্টাঙ্গ হৃদয়ের ভাষা কঠিন। দক্ষিণাপথে ও উত্তরপশ্চিম ভারতে এই গ্রন্থেরই অধ্যয়ন অধ্যাপনা অধিক প্রচলিত। অষ্টাঙ্গহৃদয়কে সংহিতাও বলা হইয়া থাকে।

শার্ঙ্গধর সংগ্রহ—ইহা শার্ঙ্গধর কর্ত্তৃক রচিত নাতিবিস্তৃত সংগ্রহ গ্রন্থ। ইহার রচনা অতি প্রাঞ্জল, বিষয় বিভাগ রমণীয় ও বিশিষ্ট প্রকার। শার্ঙ্গধর প্রণীত শার্ঙ্গধর পদ্ধতি নামক সাহিত্য সংগ্রহ ও বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ (উপবন বিনোদ) মুদ্রিত হইয়াছে। শার্ঙ্গধর সংগ্রহেরও প্রচার উত্তরপশ্চিম ভারতে অধিকতর দেখা যায়। শার্ঙ্গধরের সময় পূর্ব্বে নিরূপিত হইয়াছে।

গদনিগ্রহ—এই বৃহৎ গ্রন্থ সোঢল কর্ত্তৃক রচিত। ইহাতে প্রথমে প্রয়োগ খণ্ডে ঔষধাদি প্রস্তুত সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় পরিভাষা ও ঔষধ সংগ্রহ লিখিয়া পরে কায়তন্ত্র, শল্যতন্ত্র প্রভৃতি আটটী তন্ত্রের উপদেশ স্বতন্ত্র ভাবে লিখিত হইয়াছে। গদনিগ্রহে অনেক প্রাচীন সংহিতার বচনও উদ্ধৃত হইয়াছে। মাধব

নিদানের অনেক পাঠের সহিত এই গ্রন্থের পাঠের সাদৃশ্য আছে কিন্তু মাধবনিদানই প্রথম নিদানসংগ্রহ বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই জন্য গদ-নিগ্রহ—মাধবনিদানের কিছু পরে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায়।

বঙ্গসেন বা চিকিৎসাসংগ্রহ—এই বৃহৎ গ্রন্থ বঙ্গসেন কর্ত্তৃক রচিত. এবং বঙ্গসেন নামেই সুপ্রসিদ্ধ। অগস্ত্যসংহিতা অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে—গ্রন্থসমাপ্তিতে গ্রন্থকার নিজেই এইরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থের ভাষা বা বিভাগ-প্রণালী সংহিতা গ্রন্থের অনুরূপ নহে। সুতরাং অগস্ত্যসংহিতার অনেক উপদেশ ইহাতে থাকিলেও, এই গ্রন্থ অগস্ত্যসংহিতা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়াই বোধ হয়। বঙ্গসেনের অন্যান্য পরিচয় পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

যোগরত্নাকর—ইহা কোন অজ্ঞাত-নামা সুবিজ্ঞ বৈদ্য রচিত বৃহৎ সংগ্রহগ্রন্থ। দাক্ষিণাপথে এই গ্রন্থ সুপ্রচলিত এবং বিশেষ-রূপে আদৃত। এই গ্রন্থে লিখিত জারণ-মারণ পদ্ধতি ও ঔষধাবলী অতি উত্তম, এজন্য ইহা সর্ব্বত্র সমাদৃত হইবার যোগ্য সন্দেহ নাই।

ভাবপ্রকাশ—ভাবমিশ্র রচিত বৃহৎ সংগ্রহগ্রন্থ। এই গ্রন্থ য়ুরোপীয়দিগের ভারত বর্ষে আগমনের পরে রচিত বলিয়া ফিরঙ্গ (Syphilis) রোগের নিদান ও চিকিৎসাদি ইহাতে লিখিত হইয়াছে। অহিফেন, তোপ চিনি প্রভৃতি কতকগুলি ঔষধের প্রয়োগ—সংহিতা এবং প্রাচীন সংগ্রহগ্রন্থে নাই, কিন্তু ভাবপ্রকাশে আছে। য়ুনানী চিকিৎসা শাস্ত্রেরও দুই একটী ঔষধ ভাবপ্রকাশে দেখা যায়। ভাবমিশ্রের পরিচয়াদি পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

(গ) রসগ্রন্থ।

রসরত্নাকর—(১) নাগার্জ্জুন রচিত অমুদ্রিত গ্রন্থ। এই নাগার্জ্জুন যে সুশ্রুত-প্রতিসংস্কর্ত্তা নাগার্জ্জুন হইতে ভিন্ন ব্যক্তি—তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

রসরত্নাকর—(২) নিত্যনাথ সিদ্ধ বিরচিত পঞ্চখণ্ডাত্মক সুবৃহৎ রসগ্রন্থ। পঞ্চ খণ্ড যথা,—রসখণ্ড, রসেন্দ্রখণ্ড, বাদখণ্ড, রসায়নখণ্ড এবং মন্ত্রখণ্ড। তন্মধ্যে রসখণ্ড ও রসেন্দ্র খণ্ড কলিকাতায় এবং রসায়নখণ্ড সহ উক্ত দুই খণ্ড বোম্বাই নগরে আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থমালায় * মুদ্রিত হইয়াছে। রসরত্নাকর প্রণেতা নিত্যনাথ সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

রসরত্নসমুচ্চয়—বাগ্‌ভট্ট প্রণীত প্রসিদ্ধ ও উৎকৃষ্ট রসগ্রন্থ। এক্ষণে বোম্বাই ও কলিকাতা উভয় স্থানেই মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের রসতন্ত্র বিষয়ক প্রায় সকল বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে। এই বাগ্‌ভট যে অষ্টাঙ্গ-হৃদয়কার বাগ্‌ভট হইতে ভিন্ন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশ—শ্রীমাধব কৃত রসতন্ত্র সম্বন্ধীয় প্রাচীন গ্রন্থ। শ্রীমাধব—মাধবকর এবং সায়ণ মাধব হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি। শ্রীমাধব রসতন্ত্রকার আদিনাথ, নিত্য-নাথ প্রভৃতি যোগী চিকিৎসকদিগের পরবর্ত্তী,

* বর্ত্তমান সময়ে দুর্লভ অনেক রসগ্রন্থ ও সংগ্রহগ্রন্থ সম্প্রতি আয়ুর্ব্বেদমার্ত্তণ্ড পণ্ডিত যাদবজী ত্রিকমজী আচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া বম্বে নগরে আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইতেছে। এজন্য বৈদ্যমাত্রেই ইহার নিকট কৃতজ্ঞ।

কিন্তু অন্যান্য রসতন্ত্র-সংগ্রহকারদিগের পূর্ব্ব-বর্ত্তী। আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশে রসের এবং অন্যান্য খনিজ ভেষজের সংস্কার, শোধন ও জারণাদি অতি বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

রসেন্দ্রচূড়ামণি—সোমদেবকৃত প্রাচীন গ্রন্থ। ইহার পরিভাষা প্রকরণ অতি প্রামাণিক বলিয়া রসরত্নসমুচ্চয়কার বাগ্‌ভট নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই গ্রন্থ এখনও মুদ্রিত হয় নাই, সংগৃহীত হইয়াছে। সম্ভবতঃ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থমালায় শীঘ্রই মুদ্রিত হইবে।

রসহৃদয়তন্ত্র—শঙ্করাচার্য্যের ভিক্ষু গোবিন্দ ভাগবত পাদাচার্য্য বিরচিত। এই উৎকৃষ্ট রসগ্রন্থ এক্ষণে বম্বে আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ-মালার চতুর্ভুজ প্রণীত টীকাসহ মুদ্রিত হইয়াছে। রসসংস্কারাদি বিষয় এই গ্রন্থে সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে।

রসার্ণবতন্ত্র—লেখকের নাম অজ্ঞাত। প্রাচীন রসগ্রন্থ।

রসেন্দ্র কল্পদ্রুম—নীলকণ্ঠ ভট্টের পুত্র শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্ট বিরচিত রসগ্রন্থ। অমুদ্রিত।

রসেন্দ্র চিন্তামণি—এই সুবৃহৎ ও প্রামাণিক প্রাচীন রসগ্রন্থ কলিকাতায় মুদ্রিত হইয়াছে।

রসেন্দ্রসার সংগ্রহ—গোপালকৃষ্ণ প্রণীত এই সংক্ষিপ্ত রসগ্রন্থ বঙ্গদেশে বিশেষ আদৃত। অন্য দেশে ইহার প্রচার নাই। ইহাতে ধাত্বাদির জারণ-মারণ বিষয় সংক্ষিপ্ত-ভাবে কিন্তু ঔষধাবলী সবিস্তর বর্ণিত আছে।

রসপ্রকাশ সুধাকর—ইহা যশোধর নামক গৌড় দেশবাসী ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত নাতি বৃহৎ রস-গ্রন্থ। ইহাতে অষ্টাদশবিধ রসসংস্কার ও রসবন্ধ এবং সর্ব্বধাতু জারণ মারণ ব্যতীত হেম রৌপ্যাদি-করণ বিধিও বর্ণিত আছে।

রসফলক—রুদ্রযামলের অন্তর্গত। এই প্রসঙ্গে ধাত্বাদির শোধনজারণাদি সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে।

রসকৌমুদী—ভিষক্ মাধব প্রণীত। ইহাতে রসঘটিত বিবিধ ঔষধ নানা গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই মাধব—নিদানকার মাধবের পরবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়।

রস চন্দ্রিকা—নীলাম্বর কৃত সংক্ষিপ্ত রসগ্রন্থ।

রস চিন্তামণি—অনন্তদেব সূরি বিরচিত রসগ্রন্থ। বম্বে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

রস নক্ষত্র মালিকা—মথন সিংহ বিরচিত রসগ্রন্থ।

রস পদ্ধতি—শ্রীবিন্দু পণ্ডিত বিরচিত রসগ্রন্থ।

রস মঞ্জরী—শালিনাথ কৃত রসতন্ত্র-প্রধান গ্রন্থ। বম্বে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

রস প্রদীপ—উত্তম রসগ্রন্থ। ভাব-মিশ্র এই গ্রন্থ হইতে অনেক ঔষধ স্বীয় সংগ্রহে নিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা এখনও মুদ্রিত হয় নাই।

রসযোগ মুক্তাবলী—নরহরিভট্ট কৃত রসগ্রন্থ। অমুদ্রিত।

রসরত্নমালা—নিত্যনাথকৃত রসগ্রন্থ। অমুদ্রিত।

রসরাজ মহোদধি—রসতন্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ। বম্বে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

রস রাজলক্ষ্মী—বিষ্ণুদেব বিরচিত রসগ্রন্থ।

রসরাজ সুন্দর—রসতন্ত্র বিষয়ক অর্ব্বাচীন গ্রন্থ। বম্বে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

রস সঙ্কেত কলিকা—চামুণ্ড কায়স্থ বিরচিত ক্ষুদ্র রসগ্রন্থ। আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থমালায় মুদ্রিত।

রসসার—গোবিন্দাচার্য্য বিরচিত রসগ্রন্থ। এই গ্রন্থে ধাতুপাদ (Alchemy) বিশেষ রূপে লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার গোবিন্দাচার্য্য গুর্জ্জর দেশবাসী এবং শঙ্করাচার্য্যের গুরু গোবিন্দাচার্য্য হইতে ভিন্ন ব্যক্তি।

রস সারামৃত—রামসেন কৃত রসতন্ত্র বিষয়ক আধুনিক গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

স্বর্ণ তন্ত্র—অন্য ধাতু হইতে কিরূপে স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে হয় তদ্বিষয়ক গ্রন্থ। লেখকের নাম অজ্ঞাত।

কাকচণ্ডীশ্বরী মত তন্ত্র—রসতন্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ। কাকচণ্ডীশ্বরী ও ভৈরবের কথোপকথনচ্ছলে লিখিত। গ্রন্থকারের নাম জানা যায় না।

বৈদ্য বৃন্দ—নারায়ণ কৃত রস গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

বৈদ্যামৃত—নারায়ণ কৃত রসগ্রন্থ। অমুদ্রিত।

(ঘ) নিঘণ্টু গ্রন্থ।

নিঘণ্টুর অন্য নাম দ্রব্যগুণ। সংহিতা সমূহে দ্রব্যগুণ সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখিত বলিয়া বিস্তৃত নিঘণ্টু চিকিৎসকের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নিঘণ্টুর পরিচয় নিম্নে লিখিত হইতেছে।

ধন্বন্তরি নিঘণ্টু—কাশিরাজ ধন্বন্তরি ইহার বক্তা। তাঁহার কোন্ শিষ্য ইহা সংগ্রহ করিয়া প্রচার করেন তাহা জানা যায় না। সংগ্রহকার এই নিঘণ্টুকে দ্রব্যাবলি নামে অভিহিত করিয়াছেন।

মদনবিনোদ বা মদনপাল নিঘণ্টু—কচ্ছদেশের রাজা মদনপাল এই নিঘণ্টুর রচয়িতা। মদনপাল নিজ গ্রন্থে ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক নিঘণ্টুর কথা বলিয়াছেন। কিন্তু সেই সকল নিঘণ্টু এখন পাওয়া যায় না। মদনপালনিঘণ্টু মধ্যমাকারের উত্তম নিঘণ্টু গ্রন্থ।

রাজ নিঘণ্টু—এই উৎকৃষ্ট নিঘণ্টু নরহরি পণ্ডিত প্রণীত। নরহরি আপনাকে কাশ্মীর দেশীয় বলিয়াছেন আর কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্র ভাষায় দ্রব্যের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয়, তিনি গ্রন্থরচনা কালে কর্ণাট বা মহারাষ্ট্র দেশের অধিবাসী ছিলেন। ইনি ধন্বন্তরি-নিঘণ্টু, মদনপাল নিঘণ্টু, হলায়ুধ নিঘণ্টু, বিশ্বপ্রকাশ নিঘণ্টু, অমরকোষ এবং শেষরাজনিঘণ্টু প্রভৃতি হইতে গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন—এইরূপ বলিয়াছেন। অতএব ইনি উক্ত গ্রন্থকারের পরবর্ত্তী, কিন্তু চক্রপাণির পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়।

দ্রব্যগুণ সংগ্রহ—চক্রপাণি এই সংক্ষিপ্ত নিঘণ্টুর প্রণেতা। ইহাতে কয়েকটী মাত্র পথ্য ও ভেষজদ্রব্যের গুণ লিখিত হইয়াছে।

রাজবল্লভ নিঘণ্টু—এই নিঘণ্টু রাজবল্লভ বৈদ্যের রচিত। ইহাতে অনেক প্রয়োজনীয় ঔষধের গুণ লিখিত হয় নাই।

সোঢ়ল নিঘণ্টু—সোঢ়ল কৃত বিস্তৃত নিঘণ্টু-গ্রন্থ। বম্বে নগরে আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থমালার মধ্যে মুদ্রিত হইতেছে। সোঢ়লকৃত গদনিগ্রহের বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

রত্নমালা—মাধব প্রণীত সংক্ষিপ্ত নিঘণ্টু গ্রন্থ।

এই সকল নিঘণ্টু ব্যতীত চন্দ্রনন্দনকৃত গণনিঘণ্টু, বোপদেব কৃত হৃদয়প্রদীপ, মুদ্গলকৃত দ্রব্যরত্নাকরনিঘণ্টু, কেয়দেব কৃত কেয়দেব রত্নাকর নিঘণ্টু, কেশব কৃত সিদ্ধমন্ত্র প্রভৃতি বহু নিঘণ্টু গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। অর্ব্বাচীনকালে বহু দেশীয় এবং অনেক ভারতীয় য়ুরোপীয় চিকিৎসক ভারতীয় ভেষজ দ্রব্যের গুণনির্ণায়ক বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)।

কবিরাজীর কৃতকার্য্যতা।

—:০:—

পক্ষাঘাতে—গুড়ূচ্যাদি তৈল।

(ডাক্তার শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসু, এল, এম, এস)

মেডিকেল কলেজ হইতে ডাক্তারি পাস করিয়া কর্ম্মময় জীবনে বহু কাল হইতে আমি ডাক্তারী চিকিৎসাই করিয়া আসিতেছি। সত্য কথা বলিতে হইলে, এই ব্যবসায় অবলম্বন করার পর হইতে কবিরাজী চিকিৎসার উপর আমার ততটা আস্থা ছিল না। অনেক সময় ভাবিতাম, এখনকার কবিরাজেরা শারীরবিদ্যা শিক্ষা করেন না, এজন্য শারীরস্থানের কোনো খবরই তাঁহারা অবগত নহেন, একমাত্র নাড়ী দেখিয়াই তাঁহাদের কৃতিত্ব। তাঁহারা বলেন, "বায়ু, পিত্ত, কফের বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে পারিলেই চিকিৎসা ক্ষেত্রে জয়ী হইতে পারা যায়।" আমি ডাক্তার, বায়ু-পিত্ত-কফের খবর রাখি না, কাজেই বক্ষঃস্থল পরীক্ষা না করিয়া, জ্বরে টেম্পারেচারের গতি না বুঝিয়া, কেবল বায়ু-পিত্ত-কফের দোহাই দিয়া কিরূপে চিকিৎসা ক্ষেত্রে জয় অর্জ্জন করিতে পারা যায়—তাহা আমি ধারণা করিতে পারিতাম না। অনেক কবিরাজকে অনেক সময় হাতুড়ে বা quake জ্ঞানে এজন্য বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষেও দেখিতে পারিতাম না।

সংপ্রতি একটি বিশেষ ঘটনায় আমার সে বদ্ধ ধারণা যেরূপে অপনোদিত হইয়াছে, তাহারা পরিচয় দিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

আমার জ্যেষ্ঠসহোদর রায়সাহেব শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ই, বি, রেলের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে তাঁহাকে সিলংয়ে কর্ম্মভার লইয়া গমন করিতে হইল। পূর্ব্ব হইতে একটু বিশেষ অসুখে ভুগিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য সে সময় তত ভাল ছিল না। যাহা হউক সিলংয়ে গমন করিবার কিছুকাল পরেই টেলিগ্রাম পাইলাম, তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। আমি সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র তাঁহার কর্ম্মস্থানে গমন করিবার এবং ৬ মাসের জন্য ছুটীর ব্যবস্থা করাইবার

চিকিৎসার্থ তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিলাম।

কলিকাতায় আনয়নের পর আমার আত্মীয়বন্ধুদিগের অনেকে পরামর্শ দিলেন—"এ সকল রোগে কবিরাজী চিকিৎসাই বিশেষ ফলপ্রদ, অতএব তাঁহার চিকিৎসার ভার কোনো উপযুক্ত কবিরাজের হস্তে অর্পণ করা হউক।" আমি কিন্তু সে কথা মানিতে পারিলাম না,—বহুকাল হইতে হাসপাতালের চাকরির কল্যাণে নানাপ্রকারের অসংখ্য রোগীকে আরোগ্য করিয়া আমার এমনই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, ডাক্তারী অপেক্ষা কবিরাজী চিকিৎসা কখনই আশু ফলপ্রদ হইতে পারে না। ফলে দাদার চিকিৎসা অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকের হস্তেই ন্যস্ত করা হইবে সাব্যস্থ হইল এবং শ্রীযুক্ত আর, এল, দত্ত মহাশয়কে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহারই হস্তে তাঁহার চিকিৎসার ভার দেওয়া হইল।

দাদার তখন রোগের অবস্থা শুধু পক্ষাঘাত নহে, তাহার সহিত জ্বরও হইতেছিল। একেবারে উত্থান শক্তি রহিত, তাহার উপর বড় দুর্ব্বল।

দত্ত সাহেব কিন্তু তাঁহার রোগ পরীক্ষা করিয়া যে ব্যবস্থা করিলেন, তাহা আধা-কবিরাজী আধা-ডাক্তারী। কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য একটি সেবনের ঔষধ দিলেন,—সেটি অ্যালোপ্যাথিক সম্মত এবং মালিশের জন্য ব্যবস্থা করিলেন—কবিরাজী সম্মত "গুড়ূচ্যাদি তৈল।" আমি এরূপ অদ্ভুত ব্যবস্থা দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম, কিন্তু এ ব্যবস্থা তো যে সে লোকের নহে, এখনকারদিনের এক-জন প্রাচীন ও বহুদর্শী অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক স্বয়ং দত্ত সাহেবের,—এ ব্যবস্থা উল্টাইবার সাধ্য আমার নাই। ফলে দত্ত সাহেবের ব্যবস্থা শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ কলেজের বিশেষ সংসৃষ্ট আমাদের একজন বন্ধু কবিরাজকে ডাকিয়া পাঠাইলাম।

কবিরাজ আগমন করিলেন, আমি তাঁহাকে সমস্ত অবস্থা বিবৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "গুড়ূচ্যাদি তৈল আছে?" তিনি বলিলেন,—"আছে।" আমি আপাততঃ এক পোয়া তৈল পাঠাইয়া দিতে বলিলাম, তিনি উহা পাঠাইয়া দিলেন।

সত্য কথা বলিতে কি—চারি পাঁচ দিন ঐ তৈল ব্যবহার করানর পরই দাদার জ্বর বন্ধ হইয়া গেল, পক্ষাঘাতের অসহ্য কষ্টও যেন অতি অল্প মাত্রায় কমিয়া আসিতে লাগিল বলিয়া উপলব্ধি হইল। আবার দত্ত সাহেবকে ডাকিয়া পাঠাইলাম, তিনিও রোগীর অবস্থা সন্দর্শনে প্রীত হইলেন।

ঐ ব্যবস্থাই চলিতে লাগিল। উপকারও প্রতিদিনই প্রকাশ পাইতে লাগিল, এমনই করিয়া ঠিক এক মাসে দাদা নিরাময় হইলেন।

ব্যাপার দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম। কবিরাজীর উপর আমার যে অশ্রদ্ধার ভাব ছিল এই সময় হইতে তাহা বিদূরিত হইল। আমি এখন আর কোনো চিকিৎসারই বিপক্ষ নহি।

ইহার কিছুকাল পরে কবিরাজী পুস্তকে "গুড়ূচ্যাদি তৈলে"র প্রস্তুত প্রণালী ও গুণ-পরিচয় দেখিতে ইচ্ছা হইল। উহার গুণ-পরিচয়ে অবগত হইলাম, বাতরক্ত, উদাবর্ত্ত, অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ, হনুস্তম্ভ, প্রমেহ, কামলা, পাণ্ডুতা, বিস্ফোট, বিসর্প, নাড়ীব্রণ, ভগন্দর, বিচর্চিকা, পাদকণ্ডু, পাদদাহ প্রভৃতি ব্যাধিতে এই তৈল বিশেষ কার্য্যকারী। এই

তৈল ব্যবহারে বলীপলিত নষ্ট হয় এবং বল বৃদ্ধি ও বর্ণের ঔজ্জ্বল্য সম্পাদিত হয়। মহর্ষি আত্রেয় এই তৈলের আবিষ্কর্ত্তা।

এই তৈলের গুণ-ব্যাখ্যায় শাস্ত্রকার যে সকল রোগ নিবারণের কথা বলিয়া গিয়াছেন, দাদার রোগ তো সে ধরণের হয় নাই। দাদার রোগ হইয়াছিল পক্ষাঘাত, কিন্তু গুড়ূচ্যাদি তৈলের গুণ-পরিচয়ে জানিতে পারা যায়, ইহাতে সাধারণতঃ বাতরক্ত নষ্ট করিবার শক্তিই সঞ্চারিত। তবে "হনুস্তম্ভ" নামক বাতব্যাধিও ইহাতে আরোগ্য হইয়া থাকে শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পক্ষাঘাত বলিলে তো শুধু হনুস্তম্ভই বুঝায় না। এজন্য ইহার প্রভাবে এত বড় একটা রোগ কেমন করিয়া সারিয়া গেল, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না।

একজন বিজ্ঞ কবিরাজকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন,—"বায়ু—পিত্তযুক্ত হইয়া পক্ষাঘাত রোগ উৎপাদন করে,—এরূপ অবস্থায় গুলঞ্চে যে পিত্তনাশিনী শক্তি যথেষ্ট রূপে বর্ত্তমান, তাহা হইতে তো শুভ ফলেরই আশা করা যায়। তাহার উপর তৈল মাত্রেই বাতনাশক, বিশেষতঃ তিল তৈলের বাতনাশকতা শক্তি অধিক। দুষ্ট বায়ু দেহের অর্দ্ধেক ভাগকে আক্রমণ ও তন্মাগস্থ শিরা ও স্নায়ু সকলকে বিশোষণ করিয়া সন্ধিবন্ধ বিশ্লেষ পূর্ব্বক বাম বা দক্ষিণ একতর পক্ষকে বিনষ্ট করে, সুতরাং সেই পক্ষ অকর্ম্মণ্য ও বিচেতন প্রায় হইয়া থাকে। এই ব্যাধিরই নাম তো একাঙ্গ রোগ বা পক্ষাঘাত। এরূপ অবস্থায় তৈলে সাধারণতঃ বায়ু নষ্ট করিবার শক্তি যথেষ্ট বর্ত্তমান, তাহার উপর গুড়ূচির সংমিশ্রণে দুষ্ট বায়ু ও কুপিত পিত্ত উহাতে প্রশমিত হইয়াই পক্ষাঘাত রোগ আরোগ্যের শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল। ফলে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, গুড়ূচ্যাদি তৈল আয়ুর্ব্বেদে বাতরক্ত অধিকারোক্ত তৈল বলিয়া উল্লিখিত হইলেও অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে পারিলে উহাতে অনেক রোগই আরোগ্য হইয়া থাকে।"

আমি জ্ঞানবৃদ্ধ-কবিরাজ মহাশয়ের এই যুক্তি শ্রবণে আশ্চর্য্য হইলাম এবং ত্রিকালদর্শী আর্য্যঋষিদিগের জ্ঞান-গভীর-গবেষণার ফল সম্ভূত এই সকল মহৌষধ আবিষ্কারের জন্য তাঁহাদিগের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলাম।

চ্যবন প্রাশের পুরাবৃত্ত।

এখনকার বিজ্ঞাপন মাহাত্ম্যে এবং সুলভ মূল্যের কৃপায় যে "চ্যবন প্রাশ" ভারতবাসী মাত্রেরই পরিচিত, আমাদের পাঠকগণকে [illegible] তাহার একটু পুরাবৃত্তের পরিচয় প্রদান করিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা। [illegible]

পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। 'সুকন্যা' নাম্নী তাঁহার এক সুন্দরী কন্যা ছিল। সেকালে রাজকুমারীদিগের বিবাহ একটু বেশী বয়সেই হইত, সেইজন্য ষোড়শ বৎসর অতিক্রম করিলে তখনও সুকন্যার অনূঢ়াকাল উত্তীর্ণ হয় নাই।

রাজা শর্য্যাতি অনূঢ়া ষোড়শী কন্যাকে সঙ্গে লইয়া একদা মৃগয়ায় গমন করিয়াছিলেন। এক নিবিড় অরণ্যানীর মধ্যে রাজা যখন মৃগয়ায় ব্যস্ত, সেই সময় সুকন্যা দেখিলেন, বনবিটপির একতম দেশে একটি বল্মীকাচ্ছাদিত স্থানের মধ্যে দুইটি তিমির পটলাবৃত নেত্র তারা শোভা পাইতেছে। রাজকুমারী এই অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য সন্দর্শনে কৌতূহলপরবশা হইয়া ঐ নেত্র তারা দুইটির মধ্যে একটি কাষ্ঠ শলাকা প্রবেশ করাইয়া দিলেন।

মহামুনি 'চ্যবন' যোগ সমাহিত হইয়া বহুকাল অতিক্রম করায় এরূপ মগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, বল্মীক কর্ত্তৃক তাঁহার সমস্ত দেহ সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল এবং কেবল চক্ষু দুইটি মাত্র বহিঃপ্রদেশে প্রকাশ পাইতেছিল। সুকন্যা তাহাতেই শলাকা বিদ্ধ করিলেন, ফলে "চ্যবনে"র ধ্যান ভগ্ন হইল এবং উগ্রতপা ঋষি সুকন্যাকে অভিসম্পাত প্রদানে উদ্যত হইলেন। রাজা এই ঘটনা অবগত হইয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে ঋষির ক্রোধ শান্তির জন্য যথেষ্ট প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু কিছুতেই ঋষির ক্রোধ প্রশমিত হইল না।

সেকালে কন্যাদান একটি প্রধান দান বলিয়া পরিগণিত ছিল। এখনকার মত সেকালে কন্যাদানকালে পণ-পীড়নে কাহাকেও ঋণগ্রস্থ হইয়া চিন্তাসর্ব্বস্ব হইতে হইত না। কন্যাদান প্রাপ্তি ঘটিলে গৃহীতা ধন্যমনা হইত।

রাজা শর্য্যাতি ঋষি-ক্রোধ-প্রশমনের যখন কোন ব্যবস্থাই করিতে পারিলেন না, তখন সুকন্যাকে চ্যবনের হাতে সম্প্রদান করিয়া তাঁহার কোপানল হইতে কন্যাকে নিরাপদ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। রাজা দান করিলেন, চ্যবন গ্রহণ করিলেন। আকাশের চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্র মণ্ডলী সাক্ষী হইলেন, পবন উল্লসিত হইয়া সে বারতা সমগ্র রাজ্যে জানাইয়া দিল, পুলকে বিহগকুল কাকলীর তানে দিগন্তে ছুটাইয়া মঙ্গলধ্বনি করিতে লাগিল। এমনই ভাবে অশীতিপর বৃদ্ধ চ্যবনের গলায় এক ষোড়শী অলোকসামান্যা সুন্দরী রাজকন্যা বরমাল্য প্রদান করিলেন। রাজা কন্যাকে বনে রাখিয়া নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

রাজকন্যা বৃদ্ধ স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চ্যবন ঋষি হইয়াও আবার গার্হস্থ ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। এমনই করিয়া উভয়ের দিন কাটিতে লাগিল, সুকন্যা অলোকসামান্যা সুন্দরী ছিলেন। পূর্ণ যৌবনে সে সৌন্দর্য্য আরও ফুটিয়া উঠিল। স্বর্গ-বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় সেই রূপরাশি সন্দর্শনে সুকন্যার সৌন্দর্য্য সুধা পানের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন।

একদা তাঁহারা সুকন্যাকে একাকী পাইয়া মর্ম্মকথা প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। অসহায়া দুর্ব্বলা রমণী সেই কুপ্রসঙ্গ উত্থাপনে শিহরিয়া উঠিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহাদিগের সামর্থ্য প্রকাশের প্রয়াস পাইলেন, সুকন্যা ভীতি কম্পিতা হইয়া পিতৃসম্বোধনে তাঁহাদের চরণে শরণ গ্রহণ করিলেন। ফলে সুকন্যার স্তব স্তুতিতে স্বর্গবৈদ্যদ্বয়ের হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল। তাঁহারা চিত্তসংযমে সমর্থ

হইলেন এবং সুকন্যাকে মাতৃ সম্বোধনে অভয় দান পূর্ব্বক 'বর' গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিলেন।

সুকন্যা জানিতেন, পতিই তাঁহার জীবনের সর্ব্বস্ব, সুতরাং পতির জীবন স্বাস্থ্যবান দেখিলেই তিনি সর্ব্ব সুখী হইবেন। তাই স্বর্গ-বৈদ্যদ্বয়কে বিনীতভাবে জানাইলেন, তাঁহারা দয়া করিয়া তাঁহার স্বামী অশীতি বর্ষ বয়স্ক ঋষি চ্যবনকে নব যৌবন প্রদানের ব্যবস্থা করুন। সুকন্যা ইহা ভিন্ন অন্য বর কামনা করেন না।

অশ্বিনীকুমারদ্বয় বলিলেন, তাহাই হইবে, এই বলিয়া "আমলকী রসায়ন" প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিলেন। ঐ ঔষধ প্রস্তুত করিয়া সুকন্যাকে নিকটস্থ একটি পুষ্করিণীতে স্নান করিতে বলিয়া শুদ্ধিভাবে সেই "আমলকী রসায়ন" চ্যবনকে সেবন করাইতে অনুজ্ঞা করিলেন। সেই ব্যবস্থায় অশীতি বৎসর বয়স্ক মুনিপুঙ্গব চ্যবন নব যৌবনের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। সেই সময় হইতে এই "আমলকী রসায়নে"র নাম করণ হইল "চ্যবনপ্রাশ" এবং সেই চ্যবন প্রাশই দুর্ব্বল ইন্দ্রিয় সবল করিতে, নিস্তেজ ইন্দ্রিয় কার্য্যক্ষম করিতে, শরীরের সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নষ্ট করিয়া পুষ্টি লাভ করিতে অদ্ভুত ক্ষমতা সম্পন্ন মহৌষধ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে।

'চ্যবন প্রাশে'র পুরাবৃত্ত বলা হইল। এই বার এই চ্যবনপ্রাশের ফলাফল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছি।

শাস্ত্রকারগণ এই ঔষধের ফলশ্রুতি উপলক্ষে ইহাকে প্রথমেই 'রসায়ন' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তাহার পর নানারূপ গুণের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অন্যান্য গুণের বিষয় না বলিয়া কেবল মাত্র ইহাকে শ্রেষ্ঠ রসায়ন বলিলেও ইহাকে নানাবিধ গুণ সম্পন্ন মহৌষধ স্বীকার করা যাইতে পারে। কারণ শাস্ত্রবেত্তারাই বলিয়া গিয়াছেন, রসায়ন ঔষধ সেবন করিলে—

"দীর্ঘমায়ু স্মৃতিং মেধামারোগ্যং তরুণং বয়ঃ।
দেহেন্দ্রিয় বলং কান্তি নর বিন্দেদ্রসায়নাৎ॥"

অর্থাৎ রসায়ন ঔষধ সেবন করিলে দীর্ঘ আয়ু লাভ হয়, স্মৃতি ও মেধাশক্তি বর্দ্ধিত হয়, আরোগ্য তাহার নিত্য সহচর হয়, তাহাকে তরুণ বয়স্ক পুরুষ বলিয়া অনুমিত হয় এবং তাহার দেহ, ইন্দ্রিয়, বল এবং কান্তি যথেষ্ট রূপে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় 'চ্যবন প্রাশ' সেবনে মানব যে স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘজীবি হইতে পারে তাহা সুনিশ্চয়।

কিন্তু আমরা অনেকের মুখেই শুনিয়াছি, তিনি বহুকাল এই শাস্ত্রীয় 'চ্যবন প্রাশ'কে মহৌষধ জ্ঞানে সেবন করিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয় কোনো ফলই প্রাপ্ত হন নাই। ইহার কারণ আর কিছুই নহে,—সেই স্বর্গ বৈদ্য অশ্বিনী কুমার দ্বয়ের কল্পিত "চ্যবন প্রাশ" সস্তার প্রলোভনে অধুনা বিকৃত আকার ধারণ করিয়াছে। এখনকার দিনে বিজ্ঞাপনের বাজারে চারি টাকা, তিন টাকা—এমন কি আড়াই টাকা মূল্যেও ইহা বিক্রীত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। যাঁহারা চ্যবন প্রাশ" সেবনে কোনো ফল নাই বলিয়া দুঃখ করিয়া থাকেন, বলা বাহুল্য তাঁহারা ঐ শ্রেণীর সস্তার "চ্যবন প্রাশের"ই খরিদদার। সস্তার দুরবস্থার প্রসিদ্ধি চিরদিনই চলিয়া যাইতেছে। স্বর্গ বৈদ্যের আবিষ্কৃত "চ্যবন প্রাশ"ও সেইজন্য আজি ব্যর্থগুণসম্পন্ন।

আমরা এই প্রসঙ্গে "চ্যবন প্রাশে"র

উপাদানগুলির উল্লেখ করিয়া পশ্চাৎ সেই সমস্ত উপাদানে সযত্নে প্রস্তুত "চ্যবন প্রাশ" অতি সস্তায় কেমন করিয়া বিক্রয় করা সম্ভব —সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

বেল ছাল, গনিয়ারি ছাল, শোনা ছাল, গাম্ভারী ছাল, পারুল ছাল, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, মুগাণী, মাষাণী, পিপুল, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ভূঁই আমলা কিসমিস, জীবন্তী, কুড়, অগুরু, হরীতকী, গুলঞ্চ, ঋদ্ধি, জীবক, ঋষভক, শঠী, মুথা, পুনর্ণবা, মেদ, ছোট এলাইচ, রক্ত চন্দন, নীলোৎপল, ভূমি কুষ্মাণ্ড, বাসকের মূল, কাকোলী, কাকনাসা—এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকটি ১ পল অর্থাৎ ৮ তোলা করিয়া লইবে। সমুদয় দ্রব্য একমণ চব্বিশসের জলে সিদ্ধ হইবে। আমলকী ৫০০ শত লইবে। ঔষধের রস জলের সহিত উত্তম-রূপে মিশিয়া গেলে আমলকীগুলি তুলিয়া আটি ফেলিয়া দিবে। পরে সেই আমলকী দ্বাদশ পল পরিমিত ঘৃত ও তিল তৈলে ভাজিয়া সেই পাত্রে পূর্ব্বোক্ত বেল ছাল প্রভৃতির কাথ একত্র করিয়া ছয়সের মিছরির সহিত পাক করিবে। ঘন হইলে নামাইয়া শীতল করিয়া তাহাতে ৬ পল মধু, চারি পল বংশ লোচন, পিঁপুলের গুঁড়া ২ পল এবং দারু-চিনি, ছোট এলাইচ, তেজপাতা ও নাগকেশর —ইহাদিগের গুঁড়া এক পল করিয়া নিক্ষেপ করিবে।

যাঁহারা সস্তায় 'চ্যবন প্রাশ' বিক্রয় করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের যুক্তি এই ঔষধ প্রস্তুতে সামান্য ব্যয় হইয়া থাকে। তাঁহারা সেই হিসাবে প্রত্যেক দ্রব্যের মূল্যের খতিয়ানও দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু শাস্ত্রকার ঔষধ প্রস্তুত বিষয়ে দ্রব্যের উপাদান সংগ্রহে বলিয়া গিয়াছেন,—

প্রশস্ত দেশ সম্ভূতং প্রশস্তেহনি চোদ্ধৃতম্।
অল্পমাত্রং মহাবীর্য্যং গন্ধবর্ণ রসান্বিতম্॥
ঔদ্ভিজ্জং পরিশুদ্ধং শুদ্ধং ধাত্বাদিকং তথা।
সমীক্ষ্য কালে দত্তঞ্চ ভেষজং পরমং মতম্॥

অর্থাৎ প্রশস্ত দেশে উৎপন্ন, প্রশস্ত দিবসে উদ্ধৃত অল্প পরিমিত, মহাবীর্য্য সম্পন্ন এবং গন্ধবর্ণ ও রস বিশিষ্ট অর্থাৎ কীটাদি কর্ত্তৃক অক্ষুণ্ণ উদ্ভিজ্জ এবং শোধিত ধাতুপ্রভৃতি যথা সময়ে প্রয়োগ করিলে তাহাকে উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা যায়।

এ অবস্থায় প্রশস্ত দেশ হইতে প্রশস্ত ভেষজ দ্রব্য সকল সংগ্রহ করিয়া যদি বিশুদ্ধ চ্যবন প্রাশ প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে কেমন করিয়া অতি সস্তায় ইহা বিক্রয় করা যাইতে পারে—তাহা প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বুঝিতে সমর্থ হইবেন। যাঁহারা মাটীর দামে ইহা বিক্রয় করিবার জন্য বিজ্ঞাপন-সাহায্যে ঢক্কা নিনাদে কর্ণ পটাহ ঝালাপালা করিয়া তুলিতেছেন,—প্রশস্ত দিনে প্রশস্ত স্থান হইতে উপাদান সকল সংগ্রহ করিবার জন্য তো তাঁহাদের প্রয়োজন হয় না, 'চ্যবন প্রাশ' সেবনের উপযুক্ত কাল কিনা, তাহাও তাঁহাদিগের বিচার করিবার বড় দরকার হয় না, বিক্রয় করিয়া অর্থাগমের ব্যবস্থা করিলেই তাঁহাদের সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইল!

ইহার উপর "চ্যবন প্রাশে'র প্রধান উপা-দান সকল সময়ে সুলভ নহে। কার্ত্তিকের প্রারম্ভ হইতে বৈশাখের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত আমলকী পাওয়া যায়। এ অবস্থায় যাঁহারা অতি সস্তায় 'চ্যবন প্রাশ' বিক্রয় করিয়া থাকেন এবং বার মাস সমান ভাবে প্রচুর পরিমাণে

বিক্রয় করিয়াও যাঁহারা খরিদদার ফেরান না, তাঁহারা যে অনেক সময় শুষ্ক আমলকীর গুঁড়ার সাহায্যেও ঐ ঔষধ প্রস্তুত করিতে পারেন না—তাহাই বা কেমন করিয়া বলা যাইবে! একে চ্যবনপ্রাশের কয়েকটি দ্রব্য বহু আয়াস করিয়াও অধুনা কোনো চিকিৎসকই সংগ্রহ করিতে পারেন না, তাহার উপরও যদি ইহাকে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করা হয়, তাহা হইলে সে চ্যবন প্রাশ সুফল প্রদ হইবে কোথা হইতে?

চ্যবন প্রাশে ঘৃত ও তিল তৈল প্রয়োগ করিতে হয়। ঘৃত শব্দে গব্য ঘৃত বুঝিতে হইবে, কিন্তু সেই গব্যঘৃত এখনকার দিনে কিরূপ দুর্মূল্য হইয়াছে, তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। তিল তৈলের দরও আগের মত সুলভ নহে। এ অবস্থায় যাঁহারা কেবল ঔষধ বিক্রেতা নামে অভিহিত নহেন, যাঁহারা প্রকৃত পক্ষে চিকিৎসা করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে সস্তার চ্যবন প্রাশ বিক্রেতাদিগের অপেক্ষা অনেক বেশী মূল্যে ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন, তাহাই কি ঠিক নহে? চ্যবন প্রাশে'র গুণ ও বীর্য্য একবৎসর পরেই নষ্ট হইয়া থাকে। যাঁহারা প্রকৃত চিকিৎসা ব্যবসায়ী, তাঁহারা একবৎসর উত্তীর্ণ হইলেই বীর্য্যহীন 'চ্যবন প্রাশ' ফেলিয়া দিয়া থাকেন। এজন্যও ইঁহা অল্প মূল্যে বিক্রীত হওয়া কখনই সম্ভব পর নহেন।

বিলাতী "কড্‌লিভার অয়েল" অপেক্ষা আর্য্য চিকিৎসার গৌরবের ঔষধ 'চ্যবন প্রাশ' যে অধিক কার্য্যকারী—এ কথা এখনকার দিনে অনেক বড় বড় ডাক্তারেরাও স্বীকার করিতেছেন, কিন্তু সস্তার আড়ম্বরে সেই প্রত্যক্ষ ফল প্রদ ঔষধের গুণ অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হইতেছে দেখিয়াই এত কথা বলিলাম।

রস বিজ্ঞান।

ভূমিকা।

(ভারতে তান্ত্রিক যুগ, পারদের আবিষ্কার)

—:০:—

(কবিরাজ শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ)

সে অনেক দিনের কথা।

মহা ভারতের মহাযুদ্ধ তখন শেষ হইয়া গিয়াছে; "নারী পর্ব্বের" অশ্রু ধারায় সিক্ত হইয়া, বীর বৃন্দের চিতাচুল্লী—দীপান্বিতার আলোক মালার মত, নিঃশব্দে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছে!

বিপন্নের আর্ত্তস্বর শুনিয়া, ক্ষত্রিয় বীর আর অগ্রসর হয় না! আর্য্য-সমাজ বিশৃঙ্খল। বর্ণ-দৃপ্তা বীর-ধাত্রী ভারত ভূমি—বহু শতাব্দি ধরিয়া মৃতবৎ নিশ্চেষ্ট। বর্ণের গুরু ব্রাহ্মণের মোহময়ী বিস্মৃতি। যজ্ঞক্ষেত্র—যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত। ছিন্নকণ্ঠ অসহায় পশুর [illegible]

আর্ত্তনাদে, ভূলোক দ্যুলোক গোলক পর্য্যন্ত বিচলিত। হিংসাময়ী ধরণীর রক্তসিক্ত ধূলিকণার উপর পরম পূজ্য বুদ্ধদেবের আবির্ভাব। জাতি বিচারের তিরোধান।

তাহার পর, মানবের ক্ষুদ্র অহমিকা দেবত্বে পরিপুষ্ট করিয়া, "এসিয়ার আলোক"—সাধক সিদ্ধার্থের মহা নির্ব্বাণ। সমাজ আবার উচ্ছৃঙ্খল! বোধিসত্ত্ব--তাঁহার মহাসাধনার শীলধর্ম্ম হইতে "ঈশ্বরকে" নিরাকৃত করিয়াছিলেন,—প্রেম-প্রতিমা রমণীকে মুক্তি-পথের অন্তরায় ভাবিয়াছিলেন;—এইবার সেই সুদারুণ কঠোরতার ভীষণ প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। বেদ-পন্থার চির বিরোধী—উদার ধর্ম্ম "সঙ্ঘ" ধীরে ধীরে বিকৃত হইয়া পড়িল। রাজা নারীর হস্তে রাজ্য ভার অর্পণ করিয়া মন্থর পদ ক্ষেপে অন্তঃপুরে আশ্রয় লইলেন। স্বয়ং রাজ্যেশ্বরী, অলক্ত রাগ-রঞ্জিত বাম চরণের পেলবস্পর্শে—রক্তাশোক বীথির প্রাণ সঞ্চার করিয়া, "প্রমোদ বনে" পুষ্প শয্যা বিছাইয়া, অম্বর বিজয়ীকে স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে বাঁধিয়া ফেলিলেন। ঘরে ঘরে "মদনোৎসবে" কুসুমায়ুধের পূজা চলিতে লাগিল। বার-বনিতা বধূর' সম্মান পাইয়া মুখে অবগুণ্ঠন টানিয়া, শুদ্ধান্তের শোভা বর্দ্ধণ করিল। বারুণী ও তরুণীর সেবার—সংযমী শ্রমণ উন্মত্ত হইয়া উঠিল।

এইরূপে, উদ্দাম-ইন্দ্রিয়ের মরুময়ী বুভুক্ষায়—দেশ যখন মরীচিকার নিষ্ঠুর ছলনায় বিড়ম্বিত, তখন আবার নূতন অঙ্কের পুনরভিনয় আরম্ভ হইল। কুমারিল, অলর্ক, শঙ্কর, যামুন,—নভোনীলিমার মাঝে ভাস্বর শুকতারার মত একে একে ফুটিয়া উঠিলেন! মহত্ত্বের মহাশ্মশানে, মহেশ্বরের আশীরুত্তোলিত কল্যাণকর হইতে, দিগন্ত ব্যাপী জড়ের অঙ্গে প্রাণ স্পন্দন করিয়া পড়িল! নূতনত্বের পুলক-ব্যাকুলতা বক্ষে লইয়া, হোম হবি সুরভি ব্রাহ্মণ্য—শ্লথ-তন্দ্রায় জাগিয়া উঠিয়া বজ্রকণ্ঠে ওঙ্কার উচ্চারণ করিলেন! বহু বৌদ্ধচিহ্ন অঙ্গে ধারণ করিয়া, কামিনী কাঞ্চন কাদম্বরীর বিজয় ঘোষণার জন্য—জিঘাংসাময়ী তান্ত্রিকতা—অহিংসার শান্ত তপোবনে আপনার আসন পাতিয়া লইল।

বিজেতা ব্রাহ্মণ্য ক্ষমাশীল ছিলেন না। প্রলয়ানুষ্ঠানের মধ্যে—তিনি মঠ ভাঙ্গিলেন, চৈত্য ভস্মীভূত করিলেন; বুদ্ধ ও গোপার সন্ন্যাস-মূর্ত্তি—"শিব দুর্গায়" রূপান্তরিত হইল। "মার" এর সহোদর গোষ্ঠী—প্রেত পিশাচের আকার ধারণ করিল। পঞ্চ 'ম' কারের প্রবল তাড়নায়—সত্যভ্রষ্ট "সংঘ" নির্ব্বাণের পথ দেখিল! বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপদেশ—"যদি প্রকৃতির হাত এড়াইতে চাও—তবে রমণী পরিত্যাগ কর"। তন্ত্র বলিলেন—"জীবনের দুইটী কেন্দ্র--একটী পুরুষ, অপরটী প্রকৃতি, একটী উদাসীন—অন্যটী প্রবর্ত্তক। পুরুষ চিদাধার—স্ত্রী বিশ্ব প্রকৃতি; অতএব রমণীকে জননীত্বে পরিণত কর; তোমার প্রাকৃতিক পিপাসা মিটিয়া যাইবে।" নির্ব্বাণের দার্শনিকতা ও জড়োপসনার চেয়ে এ যুক্তি—অনেকেরই ভোগাবিল জীবনে সার্থক বলিয়া মনে হইল। নাগভট্ট প্রমুখ প্রবুদ্ধাচার্য্যের দল—কিছুদিন ধরিয়া যুদ্ধ করিলেন, অবশেষে—উদয়ন রামানুজের জ্বলন্ত প্রতিভার প্রভায় হৃত সর্ব্বস্ব ও পরাজিত হইয়া লজ্জা-কুণ্ঠিত মুখে গোপন অপরাধের তপ্তশ্বাস ফেলিলেন। রক্ষকের অভাবে—বীচি-বিক্ষোভ-চঞ্চল সিন্ধুগর্ভে—প্রাণহীন, বায়ু হীন, আলোক হীন, অতলে, ক্ষীণপুণ্য-বৌদ্ধ দর্শন চিরদিনের জন্য সমাহিত হইল।

এইবার তান্ত্রিক মঠে জড়াত্মিক বিজ্ঞানের পূর্ণ অনুসন্ধান চলিল। রসায়ন-তন্ত্রের প্রথম আবিষ্কারে—"রুদ্র যামলের এক একটী অধ্যায় হিরণ্ময় হইয়া উঠিল। কল-মুখরা কেদার বাহিনী তটে—রক্তাম্বর পরিহিত ভস্ম-ধূসর তান্ত্রিক, তিমির কুটিলা রজনীর গাঢ় অন্ধকারে—প্রকৃতির আরাধনায় আত্ম-নিয়োগ করিলেন। স্তব্ধ ধ্যানের আসন্ সম্মুখে—জলন্ত কুণ্ডে "বজ্র মুদ্রা" স্থাপিত হইল। অপরাঙ্মুখ অনুসন্ধানে তান্ত্রিক নারী রহস্যের মর্ম্ম বুঝিলেন। পুরুষ অনুপ্রাণয়িতা, নারী—বশবর্ত্তিনী শক্তি, পুরুষ সন্ন্যাস—নারী সৃজন কারিণী;—পিতৃ অংশে পুরুষ কেবল জীবনের উন্মেষক, নারী কিন্তু সে জীবনের সঞ্চারিকা, জীব নারী হইতে জন্মগ্রহণ করে, নারী লইয়া সংসারী হয়, নারী সংসর্গে—মৃত্যু কালিমায় মাটিতে মিশিয়া যায়। পুরুষ ও নারী—এই উভয় কেন্দ্রের দৈনন্দিন কার্য্য—শারীরিক ধাতু সর্ব্বদাই ক্ষয় ও পরিবর্ত্তন শীল। সেই ধাতু ক্ষয় নিবারণের অমোঘ উপায়—স্বর্ণাদি ধাতুর রহস্য নির্ণয়। নৈশ সাধনার ফলে তান্ত্রিক সপ্তধাতুর বীর্য্য পরীক্ষা করিলেন। ভারতে রস-চিকিৎসা প্রবর্ত্তিত হইল। বিজ্ঞানের ভীম-কান্ত প্রভাব, স্ফুরমান বিদ্যুৎ তরঙ্গের মত নরলোকের লোমহর্ষ উৎপাদন করিল। "সুবর্ণকারের বায়োকেমিকেল রেমিডি" ভূমিষ্ঠ হইবার বহুযুগ পূর্ব্বে—ভারতে স্বর্ণাদি ধাতুর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আরম্ভ হইল। বিজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান এক হইয়া গেল। পারদের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি-পানে, সাধন-দুর্ল্লভ দিব্য দৃষ্টিতে চাহিয়া, নতজানু তান্ত্রিক বিশ্ব দেবতাকে প্রণাম করিবেন;—

"ধরা পোইগ্নি মরুদ্ব্যোম মহেশেন্দ্বর্ক মূর্ত্তয়ে।
সর্ব্ব ভূতান্তরস্থায় পারদায় নমো নমঃ॥"

পারদ ও তন্ত্রের ইহাই অতি-সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। তন্ত্র পারদকে জগৎস্রষ্টার স্বর্ণ সিংহাসনে বসাইয়াছেন—ইহার পূর্ব্বে পারদকে এত বড় করিয়া আর কোন জীবন্ত বিজ্ঞান ভাবিতে পার নাই। তন্ত্রের মহোজ্জ্বল মহিমায়—রমণী বা প্রকৃতির ভিতর দিয়া, আজ আমরা "রস-বিজ্ঞান" বুঝিবার চেষ্টা করিব।

"পারদ"—বর্ত্তমান আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসার সর্ব্ব-প্রধান উপকরণ। সংস্কৃত অভিধানে ইহার অনেকগুলি পর্য্যায় আছে। তন্মধ্যে—সূত 'চপল" "রস" "হরবীর্য্য"—এই নামগুলিই রস-গ্রন্থে সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাস্তবিক "হরবীর্য্য', পারদের সার্থক সংজ্ঞা। যিনি পারদ-রহস্য বুঝিতে পারেন, সৃষ্টি ও বিনাশের প্রহেলিকা কখনও তাঁহার কাছে দুর্ব্বোধ্য হইতে পারে না।

একদিকে দ্যুতি রাত বিস্তৃতি, অন্য দিকে নৃতি তমিস্রা সংহৃতি—ইহাই পারদের ক্রিয়া। তাই পারদ "হরবীর্য্য";—হর তমোগুণ, সংহার মূর্ত্তি—বৈশ্লেষিক পাক (Destrudtive metabolism)—অতএব পারদ এক রকম মরণেরই শুক্র কীটাণু। পারদের অবৈধ প্রয়োগে বা আময়িক শক্তির (Puthogenetic property) প্রভাবে—জীব দেহস্থ ধাতু উপাদান ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে হর—আদি পুরুষ, জগৎ-পিতা; মূল প্রকৃতির স্বামী। পারদ তাঁহার বীর্য্য—সুতরাং জীবনের উন্মেষক, জীবনী শক্তির নিতান্ত সাধ্য।

পার্ব্বতী—মূল প্রকৃতি—শারীর ক্ষেত্রে বৃংহনী শক্তি (Consbtuctive metabolism) পিতৃ অংশে প্রাণ, মাতৃ অংশে দেহ। পিতৃ অংশ বৈশ্লেষিক, মাতৃ অংশ সংশ্লেষিক; পিতৃ অংশ প্রলয়কারী, মাতৃ অংশ [illegible]

—"হরিতালের" নাম পার্ব্বতীর তেজ। অবৈধ পারদ যখন শরীর ধ্বংস করে, হরিতালে তাহা পুনর্গঠিত হইতে পারে। পারদ মৃত্যু শুক্র—ধ্বংসকারী,—একথা যদি সত্য হয়, তবে আবার সেই পারদকে জীবনের বা জৈবী-শক্তির প্রধান সহায় বল কেন? তন্ত্রই এ রহস্যের মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। তন্ত্র বলিয়াছেন,—জীবন, মরণের সহায়; মরণ জীবনের সৃষ্টি কর্ত্তা। 'দুইটী সীমান্ত মরণের ব্যবধানের নাম "জীবন"। এই ব্যবধান লইয়াই মনুষ্য জন্ম। "জীবনের" আর একটী অর্থ চিন্তন; 'জীবন' —অনুভূতি রূপে অনাস্বাদিত বিষয়ের আস্বাদনে প্রমত্ত, তাই 'জীবন' এক হইতে বহুতে বিসর্পিত হইবার ইচ্ছা করে। আপনাকে নিত্য নূতন ভাবে সৃষ্টি করিয়া, সেই সৃষ্টির নবীনতায় আত্মাকে বিলাইয়া দিবার চেষ্টা 'জীবনের প্রথম কার্য্য।" পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভূয়োদর্শন লাভ করিতে করিতে "জীবনের" বেগ-মন্থর হইয়া পড়ে। যিনি তত্ত্বদর্শী—তিনি অনায়াসেই বুঝেন ব্যষ্টির জীবন জাতিতে পরিণত হইয়া থাকে। যে জাতি 'জীবন' কি জানেনা, সে জাতি সর্ব্বদাই জরা-মরণ ভয়ে ভীত ও চকিত। অতএব তন্ত্রের উপদেশ—জীবনকে অক্ষুণ্ণ ও অনর্পচিত রাখিতে হইবে। এ সকল কথা—রস বিজ্ঞানের অদ্ভুত আবিষ্কার "মকরধ্বজের ব্যাখ্যায় পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিব। আমরা : আয়ুর্ব্বেদের উপাসক—"আয়ুর্ব্বেদ" আমাদের "জীবন মরণের "বর্ণ পরিচয়"। ইহার প্রণেতা—সর্ব্ব জীবের প্রণম্য স্বয়ং—ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যা-সাগর। আয়ুর্ব্বেদের এক অপরিহার্য্য অঙ্গ—"তন্ত্র।" যিনি প্রকৃত "বৈদ্য" তিনি মনে জানে "তান্ত্রিক" না হইয়া থাকিতে পারেন না। বৈদ্য, বিধাতার মতই সৃষ্টি-কুশলী। বৈদ্যের কর্ম্মক্ষেত্র—এক বিরাট পুরুষকারের দৃশ্য! পারদের আময়িক প্রয়োগ কালে, কথা গুলা কাজে লাগিবে বলিয়াই, প্রবন্ধের অবতরণিকায় ইহা বলিয়া রাখিলাম। উপেক্ষিত অবমানিত অতীতকে আমি যে রাজাধিরাজের মণি মুকুটে সাজাইতে যাইতেছি—হইতে পারে ইহা আমার ধৃষ্টতা। কিন্তু কেহ যেন মনে না করেন—চতুর ভক্তের মত, "হাটের কলায়" নৈবেদ্যের কল্পনা না করিয়া, আমি কেবল বৈকুণ্ঠনাথকেই তুষ্ট করিতে অগ্রসর! আমি ক্ষুদ্র, সুতরাং আজ আমি যে বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত, তাহার উপলব্ধি করিবার পক্ষে—আমার এই ক্ষুদ্রতাই মহৎ অন্তরায়। যে ঋষি পারদের গুণ প্রথমেই পরিকল্পনা করিয়া ছিলেন—তাঁহার পবিত্র পদ ধূলি আমার কর্ত্তব্য-পথের অমূল্য পাথেয় হউক। তিনি আশীর্ব্বাদ করুন—পারদ তত্ত্ব প্রকাশ করিতে বসিয়া—মুহূর্ত্তের প্রমাদে আমি যেন পুরাতনের ও পবিত্রের অবমাননা না করি।

এইবার দেখা যাউক, এদেশে ঔষধ-রূপে পারদের প্রয়োগ কোন্ সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে? আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র তদীয় হিন্দু রসায়নে এ সম্বন্ধে রীতিমত আলোচনা করিয়াছেন। আমি তাহার অজীর্ণোদ্গার করিয়া—এ দীন প্রবন্ধকে ভারাক্রান্ত করিব না। আমি কেবল নিজের কথাই বলিব।

বর্ত্তমানে, "সুশ্রুত সংহিতা"—আয়ুর্ব্বেদের অন্যতম প্রতিনিধি। এই সুশ্রুত সংহিতার দুই চারি স্থলে পারদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু পারদ যে সর্ব্ব

ব্যাধি নিবারক মহৌষধ—সুশ্রুতের যুগে ইহা প্রচারিত হয় নাই।

সুশ্রুতের পর বাগভটের যুগ। বাগভটের সময়েও পারদ ঔষধের প্রধান উপকরণরূপে—গৃহীত হয় নাই। অষ্টাঙ্গ হৃদয় নামক গ্রন্থে পারদ অর্থে রস শব্দের ব্যবহার থাকিলেও, একটী ভিন্ন রসের কোন রাসায়নিক প্রকরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। অষ্টাঙ্গ হৃদয়—বৌদ্ধ যুগের সংহিতা। বৌদ্ধ বৈদ্যগণ—রস অর্থে রক্তের পূর্ব্বভাব বুঝিতেন। "রসক্রিয়া" তখন ঘনীভূত উদ্ভিদ রসকেই বুঝাইত।

বৌদ্ধ যুগের পর পৌরাণিক যুগ। পৌরাণিক যুগের ইতিহাস—বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া ভারতে বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। বেদের "পরমাত্মা" বৌদ্ধের হাতে পড়িয়া "আদিবুদ্ধ" হন। "প্রজাপতি সৃষ্টির উপাখ্যানগুলিও বৌদ্ধদের অপার মহিমায়—"বুদ্ধ" "ধর্ম্ম" ও "সঙ্ঘ" এই ত্রিমূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হয়। পুরাণকারগণ ইহার প্রতিশোধ লইতে ভুলেন নাই। বৌদ্ধ জাতকের—ত্রিমূর্ত্তি, সৃষ্টি কর্ত্তা, পালন কর্ত্তা এবং সংহার কর্ত্তা সাজিয়া—পুরাণে "ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর" নামে বিখ্যাত হইয়া উঠেন। এই রাসায়নিক সংযোগ পাছে নূতন বলিয়া জনাদরের পরিবর্ত্তে অনাদর লাভ করে,—সেই জন্য শাস্ত্রকার—নূতন গ্রন্থকে "পুরাণ" আখ্যা প্রদান করেন। "পুরাণ"—পুরাতন শব্দেরই অপভ্রংশ। এহেন পুরাণের যুগেও পারদের ভাগ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটে নাই। "অগ্নি পুরাণে" বা "গরুড় পুরাণে" —যে সকল চিকিৎসা-পদ্ধতি আছে, তাহাতে পারদের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না।

সংগ্রহকার গণের মধ্যে—চক্রপাণি দত্ত একজন অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। মানব দেহের মায়াপুরীতে প্রবেশ করিয়া,—অমৃতের সন্ধানে একদা তিনি অমৃতময় হইয়াছিলেন। মহাত্মা চক্রপাণিই প্রথম পারদ ব্যবহার করেন। এ কথা প্রত্নতাত্ত্বিকের কথা। চক্রপাণির পিতা "নারায়ণ" গৌড়াধিপতি নয়নপাল দেবের "মহানস রক্ষী" ছিলেন। সুতরাং ১০৫০ খৃষ্টাব্দকে—তাহার প্রাদুর্ভাব কাল বলিয়া ধরা যায়। অবশ্য ইহা অনুমানেরই কথা। অনুমানে—ভ্রান্তি থাকাও বিচিত্র নহে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা—বিচিত্র এই—অনেক ঐতিহাসিক পারদের প্রয়োগ দেখিয়াই তন্ত্রের বয়স ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন, ইঁহাদের মতে—যখন নাগার্জ্জুন প্রতিসংস্কৃত সুশ্রুত সংহিতায় রস প্রয়োগের আড়ম্বর নাই, বৌদ্ধ বাগভটের গ্রন্থেও পারদের ছড়াছড়ি নাই;—তখন বৌদ্ধ যুগের বৈদ্যগণ পারদ প্রয়োগের কৌশল জানিতেন না। পারদের ব্যবহার কেবল তন্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব নিঃসন্দেহে বলা যায়—চক্রপাণি দত্তের পরেই এদেশে তন্ত্রের সৃষ্টি।

এ গুরু গম্ভীর গবেষণাময়ী বিলাতী যুক্তি কিন্তু ঘাত-সহ নহে। আমরা—চক্রপাণির পূর্ব্ববর্ত্তী বৃন্দ সংহিতায় পারদের উল্লেখ দেখিয়াছি। আমাদের বিশ্বাস বৌদ্ধযুগের বহু পূর্ব্বে—ভারতে তান্ত্রিকতা বর্ত্তমান ছিল। অথর্ব্বের উপচারই একদিন তান্ত্রিকতার জন্মদান করিয়া ছিল। অথর্ব্ব বেদকে পরন্তন ঋষিরা বড় একটা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন না। কাজেই অথর্ব্ববেদের সহোদর তন্ত্রকেও তাঁহারা কখনও সম্মান করিতেন না। তান্ত্রিকতার প্রতিবেশ প্রভাবেই ব্রাহ্মণ্যের অধঃপতন ঘটাইয়াছিল। তখন

ও তন্ত্র এবং তন্ত্রোক্ত মন্ত্র—একেবারে শক্তিহীন হইয়া পড়ে নাই। বৌদ্ধধর্ম্মকে হৃতসর্ব্বস্ব হতগৌরব করিয়া বিজয়ী তন্ত্র সগৌরবে দণ্ডায়মান হইলে, বৌদ্ধ দার্শনিকগণ সে আততায়িতা ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহারা তন্ত্র ও তান্ত্রিক ঔষধকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। জগতে—অ-সাম্প্রদায়িক ভাবে কয়জন সত্যের আদর করিতে পারে? খৃষ্টান যাজক গ্রীক দর্শন' ও গ্রীক বিজ্ঞানকে পদদলিত করিয়াছিলেন। মহামনস্বী গ্যালিলিওকেও নিদারুণ নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল। ইতিহাস ইহার জীবন্ত-সাক্ষী। আসল ঈশ্বরকে লইয়া কখনও বিরোধ উপস্থিত হয় না; বিবাদ কেবল তোমার "ঈশা মূষা" আর আমার "দুর্গা" "হরি" লইয়া! নাগার্জ্জুন, বাগভট, প্রভৃতি বৈদ্যগণ—বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন। চক্রপাণিও বৌদ্ধ-পালিত চিকিৎসক। পাছে—তান্ত্রিক ঔষধ বলিলে বৌদ্ধ প্রভু বিরক্ত হন, বৌদ্ধ মতাবলম্বী রোগিগণ—ঔষধের প্রতি শ্রদ্ধা হারায়, বোধ হয় সেই ভয়েই যেন চরক-চতুরানন চতুর চক্রপাণি—"রস পর্প্পটী—আমারই প্রস্তুত বলিয়া জনসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন! নতুবা, সাধ্যমত—বৌদ্ধ বৈদ্যগণ তান্ত্রিক ঔষধকে স্ব রচিত গ্রন্থে স্থানদান করিতে সম্মত হন নাই! চক্রপাণি—রস বিজ্ঞানের উজ্জ্বল রত্ন—রসপর্প্পটীকে স্বগ্রন্থের অধ্যায় ভুক্ত করিয়াছেন,—অথচ এমন ভাব দেখাইয়াছেন—উহা যেন তান্ত্রিক যোগ নহে, যেন তাঁহারই মৌলিক উদ্ভাবনায়, স্বাধীন চিন্তায়, আর দুর্ল্লভ সাধনায়—মহৌষধ রূপে উহা পরিকল্পিত হইয়াছে! "সুশ্রুত"—প্রতিসংস্কার কর্ত্তা নাগার্জ্জুন, অষ্টাঙ্গ হৃদয়-সঙ্কলয়িতা বাগভট যে কাজ করিতে ইতঃস্তত: করিয়াছেন, দায়ে পড়িয়া চক্রপাণিকে সেই কার্য্যে হাত দিতে হইয়াছে! তাই "রস পর্প্পটী প্রস্তুত করিয়া, লোকলজ্জায় খাতিরে তাঁহাকে বলিতে হইয়াছে—

"রস পর্প্পটিকা খ্যাতা নিবদ্ধা চক্রপাণি না।"

বৈদিক যুগে "মধু বিদ্যা" নামে স্বতন্ত্র বিদ্যার অস্তিত্ব ছিল। দধীচি ঋষি দেবরাজের নিকট এই মহতী বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই মধু বিদ্যাই অনেক 'হাত ফের" হইয়া, বৃহদারণ্যকে 'মধু-ব্রাহ্মণ:' নামে পরিচিত হইয়াছিল। মদ ধাতু হইতে যে "মধু" শব্দের উৎপত্তি, সে মধু আর "মদন" একই। রসজ্ঞ পাঠক পাঁচকড়ি দাদার "মদন তত্ব" শীর্ষক দিব্যোজ্জ্বল উপাদেয় প্রবন্ধে ইহার সুন্দর মীমাংসা দেখিতে পাইবেন। বেশী কথা বলিবার আমার সময় ও শক্তি নাই। আমি কেবল ঋগ্বেদের সেই মন্ত্রসূক্তটী উদ্ধৃত করিব -

"কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ
প্রথমং যদাসীৎ।

ইহার অর্থ—জীবের পূর্ব্ব কল্প কৃত কর্ম্ম থাকায় ভগবানের মনে সৃষ্টির কামনা জাগ্রত হইয়াছিল। সৃষ্টি ও সংহারের পরম্পরা অনন্ত; কল্পান্তরের কর্ম্ম-শৃঙ্খলাও অনন্ত। অতএব ভগবানে কাম বা মদন চির বিরাজমান। সংহার কার্য্য সম্পূর্ণ হইলেই, স্রষ্টার মনে সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি কামনাও জাগিয়া উঠে। তখন ভোগের জন্য ভগবান এক হইয়াও বহু হন। ভগবানের সৃষ্ট জীব আমরা—আমরাও শক্তি গ্রহণের কালে, বিবাহের সময়—"কামঃ কামায়াদাৎ। কামেন ত্বাং প্রতি গৃহ্নামি কামৈতত্তে।" বলিয়া ভাবী পত্নীকে আমন্ত্রণ করিয়া থাকি।

বিজ্ঞান বলেন—পূর্ণের ধর্ম্ম অংশেও বর্ত্তমান থাকে। পরমাত্মা যেমন এক হইয়াও বহু হইতে চাহেন, জীবাত্মাও তেমনি বহুতে বিস্তৃত হইবার ইচ্ছা করে। এই "একোঽহং বহুস্যাম:" কামনা—তান্ত্রিকতার সূতিকা গৃহ। "মদন" সৃষ্টিকর্ত্তার নিত্য সহচর। জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ, সুতরাং মদন যেমন পরমাত্মার নিত্য সঙ্গী, তেমনি জীবাত্মারও নিত্য সঙ্গী। তন্ত্র অতি সংক্ষেপে ইহার আভাষ দিয়াছেন। তন্ত্রের মতে শিব ও জীব এক। শিবের "মদন" সৃষ্টির বিকাশে ও বিস্তারে পরিস্ফুট; জীবের "মদন" দেহ বদ্ধ রিরংসায় পর্য্যবসিত। কিন্তু উভয়েরই উদ্দেশ্য এক—বহুতে পরিণতি, অংশে অংশে বিস্তৃতি।

এই বহুতে পরিণতির জন্য যে আনন্দের আদান প্রদান—তাহার নাম "যৌবন।" তন্ত্র বুঝিয়াছিলেন—যৌবনের অরুণ রাগে লোহিতাভ হইয়া পুরুষ প্রকৃতি বিকাশের হিল্লোলে মৃদু মৃদু কাঁপিতেছেন! সে কম্পনে মিলনের আকাঙ্ক্ষা স্ফুরিত হইতেছে। ইহার পরই উভয়ের "একী করণ"—অর্দ্ধনারীশ্বরের চিত্র—তাহার তত্ত্বময় রূপক। পৃথিবীতে, স্থাবর জঙ্গম, স্থূল সূক্ষ্ম, জড়, শক্তি যাহা কিছুর অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়—সমস্ত পদার্থই এক হইতে বহু হইতে চাহে। "মদন" এই আত্ম বিসর্পণের নেতা, সেই মদনের যে অধিনায়ক—তাহারই নাম "যৌবন"। সৃষ্টির সনাতন ধারা রক্ষা করিতে হইলে—"যৌবনকে" অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। "যৌবন"—আত্ম বিকাশের একমাত্র অবলম্বন। বহু হইবার যে সাধ—তাহার নাম "রস"। তাই আর্য্য ঋষি 'তত্ত্বমসি" বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই স্বীকার করিয়াছেন—"রসো বৈ স:"; তিনি "রস" স্বরূপ। "রস" ভিন্ন বহুতে পরিণতি ঘটে না! "রস" নহিলে 'দুই' 'এক' হইতে পারে না; 'রস' ছাড়া আমার আমিত্বকে বহু বিসর্পিত করিবার দ্বিতীয় উপায় নাই। "রসের" আধার—"যৌবন"। "রসের" ইংরাজী প্রতি শব্দ স্থির করিবার মত প্রতিভা আমার নাই। তবে আমার অনুমান—"Emotions" কথাটার "রস" বুঝাইলেও বুঝাইতে পারে। যাহার দ্বারা আমার 'আমিত্বের' বিসর্পণ ও সংহরণ সম্ভব পর হয়—তাহাই "রস"। এই "রসেরই" এক একটী তরঙ্গ—রতি, আসক্তি অনুভূতি। রসের আধার "যৌবন," যৌবনের বেদী—"রূপ।" জগতে সকলেই চায়—তৃপ্তি; এই তৃপ্তির পথের যাহা অন্তরায়, তাহার নাম "দুঃখ"; এ দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের যে বিরাট প্রয়াস—তাহাই জীবের "সাধনা"। তান্ত্রিক সাধক নৈশ "সাধনায়" আত্ম নিয়োগ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন সৃষ্টি ধারা বজায় রাখিতে গেলে—স্বাস্থ্য সামর্থ্যে সমুজ্জ্বল শরীর চাই; তেমন শরীর না হইলে "যৌবন" স্থির থাকিতে পারে না,—"রস"ও পরিস্ফুট হয় না। যে ইচ্ছায় "মদনের" উদ্ভব, সেই ইচ্ছায় "রসের"ও বিকাশ; তান্ত্রিক তাই অনন্ত দুঃখের উপশান্তি কামনায়—তৃষাক্লাম কণ্ঠে "রসের সাগরে" ডুব দিলেন। আত্মার মোদিনী ও রঞ্জিনী বৃত্তিকে "রস" সিক্ত করিয়া লইলেন। শেষে—পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য, বাসনা ব্যাপ্ত যৌবন এবং আনন্দময় দীর্ঘ জীবন লাভ করিবার জন্য, ধরণীর অন্ধ-তামস গর্ভ হইতে রুদ্রমূর্ত্তি "রসের" আবিষ্কার করিয়া, তান্ত্রিক নিজে ধন্য হইলেন, আমাদিগকেও কৃতার্থ করিলেন। বলা বাহুল্য এই রস [illegible]

বুঝিবার নিমিত্ত তান্ত্রিককে "বিলাস" ছাড়িয়া "বিকাশ"কে আশ্রয় করিতে হইয়াছিল!

মানুষকে কোন তত্ত্ব শিখাইতে হইলে, ভগবানকেও মানুষ সাজিতে হয়, মানব-ভাষায় কথা কহিতে হয়! যে দেশ দশ দশ বার ভগবানের পদরেণু স্পর্শে পবিত্র হইয়াছে—সে দেশের লোক ভিন্ন—অন্য দেশের লোক আমার এই কথা গুলিকে হাস্যাস্পদ বাচালতা মনে করিতে পারেন। কেননা তন্ত্রের কথা আমাদের চেয়ে কেহই বোধ হয় ভাল বুঝিবে না। ভারতের বিজ্ঞান ছাড়া—পারদের এই বিরাট বিশেষ তত্ত্ব পৃথিবীর অন্য কোন সভ্য জাতির বিজ্ঞানে আছে কিনা জানি না। তন্ত্র—শিব বাক্য। ইহার অন্য সংজ্ঞা—"আগম"। তন্ত্র শিবই লিখুন বা যাঁহারাই লিখুন—তাঁহারা যে আমাদের চেয়ে জ্ঞানে গরিষ্ঠ, প্রতিভায় অতি মানুষ, অধ্যবসায়ে অক্লান্ত কর্ম্মী—কর্ম্ম বীর ছিলেন – ইহা আমাকে বলিতেই হইবে। আমরা মানুষ, আমাদের জীবন অনন্তে "মুহূর্ত্ত" মাত্র। এই মুহূর্ত্ত পরিমিত কাল—যে ভাগ্যবান—দেবতার সঙ্গে, দেবতার কার্য্যে, দেবতার কৃপায় যাপন করিতে পারেন; যিনি ধরণীর চক্ষে জন্ম হারাইয়া, সত্যের চক্ষে অমর হইতে পারেন, তিনিই "রসশালায়" প্রবেশ করিবার উপযুক্ত পাত্র। অন্যের সে অধিকার নাই। অতএব দূর হইতেই "তস্মৈ রসায় নমঃ" বলিয়া আমরা পারদের মহিমা বুঝিবার চেষ্টা করিব।

"রসের" নাম "পারদ" হইল কেন? তন্ত্র ছাড়া অন্য কোথাও এ প্রশ্নের উত্তর মিলিবে না। যে ধাতু মানুষকে জন্মমৃত্যুর পরপারে লইয়া যায়—"পারদ"ই তাহার সার্থক সংজ্ঞা। পারদ সেবনে মানুষ জীবন্মুক্ত হইতে পারে—তাই পারদের একটী বিশেষণ—"সূত"। পারদের মহিমা কীর্ত্তন করিবার জন্য—"রসেশ্বর দর্শন" সর্ব্ব দর্শন সংগ্রহের অঙ্গীভূত হইয়াছিল। সেই রসেশ্বর দর্শনের সূচনা এইরূপ—

ঊর্দ্ধে মুক্ত উদার বিপুল নীলিমা, নিম্নে শ্যামল তৃণ প্রান্তর; সম্মুখে—আবেগ চঞ্চলা কলনাদিনী নির্ঝরিণী, পশ্চাতে লতার শ্যাম বেষ্টনে—গগনস্পর্শি নমেরু তরু; মধ্যে—মায়ালোক মধুর শৈল শিখর। চারিদিকে অসীম মৌনতা। তন্দ্রা-মগ্ন নিশীথে—বিল্ব কুঞ্জের মর্ম্মর বেদীতে—মহাযোগী মহাদেব। তাঁহার বামে—সাধনার সহচরী মহামায়া। পার্ব্বতী পশুপতিকে প্রশ্ন করিলেন—"প্রভো! কি উপায়ে মানুষ খেচরী গতি লাভ করিতে পারে?" শঙ্কর সহাস্য মুখে উত্তর দিলেন—"রসের প্রয়োগে।" পাঠক! দেবতার কথা দেবতার ভাষাতেই শুনুন;—

"যথা লোহে তথা দেহে কর্ত্তব্যঃ সূতকঃ সতা।
সমানং কুরুতে দেবি! প্রত্যয়ং দেহ লোহয়োঃ।
পূর্ব্বং লোহে পরীক্ষেত পশ্চাদ্দেহে প্রয়োজয়েৎ।"

লোকনাথ লোকধাত্রীকে বুঝাইয়া দিলেন—"প্রথমে ধাতুর উপর, পরে দেহের উপর—পারদের প্রভাব পরীক্ষা করা উচিত। পারদ ব্যবহারে জীব জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে।"

বরাহ মিহিরের সময়েও—ব্যাধি বিনাশের জন্য—"মাক্ষিক ধাতু মধু পারদ চূর্ণ" সেবনের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। তান্ত্রিকগণ পারদের নিন্দা সহিতে পারিতেন না। তান্ত্রিকের প্রাণের কথা—

পতিতো দরদে দেশে গৌরবাদ্বহ্নি বক্ত্রতঃ।
সরসো ভূতলে লীন স্তদ্দেশ নিবাসিনঃ।
যশ্চ নিন্দতি সূতেন্দ্রং শম্ভোস্তেজঃ পরাৎপরং।
স পতেন্নরকে ঘোরে যাবৎ কল্প বিকল্পনা॥

রস রত্ন সমুচ্চয়। ১ম অঃ।

হরবীর্য্য পারদ বহ্নি দেবতার মুখ হইতে দরদ দেশে পতিত হইয়াছিল; এ হেন সুতেন্দ্রকে যে অধম নিন্দা করে, সে দেব নিন্দা রূপ মহাপাপে কলুষিত হইয়া কল্পান্তর কাল-নরকে বাস করে। বাস্তবিক পারদের উপকারিতা দেখিলে "পারদকে" দেবতা বলিয়া পূজা করিতে ইচ্ছা হয়। "পারদ"—ভাব প্রধান ভারতবর্ষের চিরন্তনী সম্পত্তি। মনীষা ও প্রতিভার সমন্বয় সাধনে—পারদ এই জম্বু দ্বীপের ভূগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছিল। পারদের গুণ, বীর্য্য, বিপাক ও প্রভাব—য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক মান-দণ্ডে পরিমাপ করা যায় না। পারদ প্রকৃতির পরম ও চরম প্রসাদ। মানবের দেহ-ধাতু সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল, স্বতঃই ক্ষয়-প্রবণ। কেবল মাত্র—পারদের সাম্য-সামগ্রী দিয়াই বৈদ্য সে ক্ষতির পূরণ করিতে পারেন। পারদের প্রকৃত প্রয়োগ করিতে পারিলে, পৃথিবী হইতে অকাল মৃত্যু অকাল বার্দ্ধক্য, অস্বাভাবিক রোগ শোক,—বিলুপ্ত হইয়া যায়। সত্য-মিথ্যার সমুদ্র-মন্থনে, —পারদের উত্থান; হিন্দু একদিন এই পারদের অমৃত আস্বাদ উপভোগ করিয়াছিল। এখনও হিন্দুর নির্জ্জীব-বিজ্ঞানের শাস্ত্র ক্রোড়ে —শিবকণ্ঠের মৃত্যু নীলিমার মত পারদের কল্যাণকর চিহ্ন বর্ত্তমান। বৈদ্যগণ—এখনও পারদের সাহায্যে—অসাধ্য-ব্যাধি জয় করিয়া থাকেন। পারদের প্রভাবেই এখনও জীর্ণ-জটিল রোগে—বৈদ্য চিকিৎসার মত সফল চিকিৎসা দেখিতে পাওয়া যায় না। এখনও পারদ হিন্দুর স্মৃতি সর্ব্বস্ব অতীতের স্মারক,—বর্ত্তমানের গর্ব্ব তৃপ্তির উপাদান, ভবিষ্যতের স্বর্ণ মণ্ডিত বিজয় বস্তু। প্রকৃত সাধকের অনুশীলনের অভাবে—আলোক বিহীন স্থানের উদ্ভিদের মত, পারদের মহিয়সী শক্তি—এখন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে! তন্ত্রের "ভৈরবী চক্র" কামনায় কলুষিত হইয়াছে! বৈদ্য-সমাজে আর অনুসন্ধানতৎপরতা দেখিতে পাই না! রসানুভাবকতার জ্বলন্ত মূষা—ইন্ধনের অভাবে নিভিয়া গিয়াছে! তান্ত্রিকের বংশধর নিরপেক্ষ সত্যনিষ্ঠা ভুলিয়াছে। এ পাপাচারের প্রায়শ্চিত্তও এইবার আরম্ভ হইয়াছে! হাটে মাঠে ঘাটে বাটে—মুদীর দোকানে, পশারীর টাটে—শঠতার জয়চিহ্ন সস্তায় "চ্যবন প্রাশ" বিক্রয় হইতেছে! বৈদ্যের "বত্রিশ সিংহাসনে" বসিয়া—"ভোজের" মত নগণ্য ব্যক্তিও সুধার দোহাই দিয়া, জঘন্য বিষ প্রয়োগে অগণ্য নরনারীকে প্রতারণা করিতেছে! "মকরধ্বজের" নামে—পারা গন্ধক ও মনছালের সংযোগ—নিরীহ লোককে ব্যাপন্ন করিয়া তুলিয়াছে! আজ যে "তামাক ওয়ালা"—কাল সে "কবিরাজ" সাজিতেছে! "পাচনের" পবিত্র উপাধি লইয়া হাতুড়ের হাতধোয়া জল—দেশব্যাপী ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক হইয়াছে! নিজের জাতিকে ইন্দ্রিয় লালসার অন্ধ উন্মাদনায়—আকুল করিবার জন্য—"পানের দোকানে" দুই পয়সায় 'মদনানন্দ মোদকের' নমুনা বিকাইতেছে।

অতীতের প্রসঙ্গ ও অমর্য্যাদায় ক্ষুণ্ণ হইয়া প্রাণের আবেগে অনেক কথাই বলিয়া ফেলিলাম! আমি "আয়ুর্ব্বেদের" একজন লেখক, কিন্তু বহুদিন ধরিয়া আমার কোন নিবন্ধ আয়ুর্ব্বেদের পদপ্রান্তে স্থান পায় নাই। এজন্য অনেকেই আমার কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছেন। কেহ কেহ আমার রচনা অতিরিক্ত সদয়-দৃষ্টিতে দেখিয়া,—আমি আর লিখিনা কেন? —পত্র লিখিয়া জানিতেও চাহিয়াছেন। এক-

দিন আমি কাহাকেও পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই। কেবল—আমার দুঃখের সহৃদয় শ্রোতা—সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়কে আমার মর্ম্ম বেদনা কথঞ্চিৎ নিবেদন করিয়াছি। আয়ুর্ব্বেদের কথা আমার "কৃষ্ণ কথা," কিন্তু সে কথা কাহাকে শুনাইব? আমি যে—"ধুঁয়ার ছলনা ক'রে কাঁদি"—কে ইহা বুঝিবে? বেদ তীর্থে ভ্রমণ করিয়া আমি যে কেবল শ্মশান ভস্মে সোণার কমণ্ডলু ভাবিয়াছি। তবে আর লিখিব কি? আয়ুর্ব্বেদের মণ্ডপে—আজ মহামহোপাধ্যায় গণনাথ প্রবেশ করিয়াছেন; আজ আমার আনন্দের সীমা নাই। তাই অযোগ্য হইয়াও—আজ আবার শব্দ ব্রহ্ম উচ্চারণে সাহসী হইয়াছি। আমার আকুল কণ্ঠের একাগ্র প্রার্থনা—এতদিন মহাশূন্যে বিলীন হইয়াছে। তথাপি আবার জিজ্ঞাসা করিতেছি—হে বৈদ্যরত্ন গণনাথ! হে কবিরাজ-কুল ভূষণ যামিনী ভূষণ! বলিতে পার—তোমরা থাকিতে, এখনও ৩৫ খানি সংহিতা থাকিতে, বাঙ্গালীর "গুড় খেগো মিষ্ট মুখ"—কুইনাইনে এমন 'তিত' হইয়া গেল কেন? যে দেশের মাটীতে এখনও পল্‌তা ক্ষেৎপাপড়া প্রমুখ শত তিক্ত জন্ম গ্রহণ করিতেছে, সে দেশে কে কুইনাইনের "কল্পতরু" রোপণ করিল? "আয়ুর্ব্বেদকে" পরিণতির পূর্ণ সৌষ্ঠব প্রদান করিবার জন্য দেশে কি আর একজনও "বৈদ্য" দেখিতে পাইব না? যে দেশে হারীত, অগ্নিবেশ, চরক, সুশ্রুতের সত্ত্বা বিরাজ করিত সে দেশে কি আর দ্বিতীয় "গঙ্গাধর" জন্মগ্রহণ করিবে না? কৈ সে "নরনারায়ণ"—যিনি প্রলয়পয়োধি জলে—"আয়ুর্ব্বেদকে—" পৃষ্ঠে বহন করিতেন?

সভ্যতার জীবন্ত কেন্দ্র কলিকাতা সহরে—আজকাল "কবিরাজের" অভাব নাই। কিন্তু তাঁহাদের অনেকেরই গুরু নাই, সতীর্থ নাই! যিনি "আয়ুর্ব্বেদ" শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক তিনি "ব্রহ্ম"—তাঁহার একটী বিশেষণ "স্বয়ম্ভু"; এই সকল "কবিরাজ"ও স্বয়ম্ভু (অর্থাৎ আপনা হইতে জন্মিয়াছেন—বাংলা ভাষায় যাহাকে ভুই ফোঁড়" বলে)—ইহাই কি বৈদ্য বিজ্ঞানের বিবর্ত্তণ-বাদ? মোহপ্রাপ্ত মাতৃদেহ ইহারা যে শ্মশানে টানিয়া আনিয়াছে;—ভদ্রাসনের কড়ী বরগা চেলাইয়া চিতা সাজাইয়াছে,—তাহাতে মাতৃদেহ তুলিয়া দিয়া, বিলাতী দেশলাই ধরাইয়া আগুণ জ্বালিতেছে; সে আগুণে মৃত্যুগন্ধি ধূম ও রক্তনাগিণী শিখা উঠিতেছে! ক্রব্যাদ-বহ্নির প্রেতালোক দেখিয়া, যমাষ্টকের সান্নিপাতিক সন্তাপে উন্মত্ত হইয়া, দেশের লোক কঙ্কালের করতালি বাজাইয়া—চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতেছে। পার যদি—ইহার প্রতিকার কর। অমঙ্গলের চিতাচুল্লী হইতে মাতৃমূর্ত্তি নামাইয়া লও। তাঁহাকে গঙ্গাজলে স্নান করাইয়া—কালী-ধূম মুছাইয়া 'অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের" মর্ম্ম বেদিকায় বসাও। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ—নিপুণ বৈদ্য-হস্তের হরি চন্দনে লিপ্ত কর। জীবন্ত আয়ুর্ব্বেদের জীবনীর স্নেহে—সে দাহস্ফোট শীতল হউক।

তন্ত্রের মহিমা ও পারদের কথা বলিতে গিয়া—অনেক বাজে কথাই বলিলাম। আমার ভগ্ন কণ্ঠের কর্কশ কাকু—অনেকের পক্ষেই বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছে। অতএব এই খানেই—আজ এই "ঢাকের বাদ্যি" বন্ধ করিলাম।

শিশুপালন।

(পরিপাক ক্রিয়া।)

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

—:*:—

[শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বি-এ সরস্বতী।]

খাদ্যের কার্য্য কি কি ?

খাদ্য (১) আমাদের দেহের পুষ্টি সাধন করে; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলশালী এবং গঠন করিবার পক্ষে খাদ্যই প্রধান উপায়। দেহের বৃদ্ধির পক্ষে খাদ্য প্রধান উপাদান। (২) সমগ্র জীবন ভরিয়া ক্রমাগত আমাদের দেহ যে ক্ষয় হইতেছে খাদ্য তাহা পূরণ করে। (৩) দেহে উত্তাপ এবং শক্তিসঞ্চার করিতে যে সকল উপাদানের প্রয়োজন হয়—খাদ্য তাহা প্রদান করে।

এই কাজগুলি করিতে গেলে খাদ্যকে রক্তের সহিত মিশিয়া যাইতে হয়। কিরূপে খাদ্য—রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়, এখানে সংক্ষেপে তাহা লিখিত হইল। শিশু যে খাদ্য গ্রহণ করে, এমন কি যে মাতৃদুগ্ধ পান করে তাহা কিরূপে রক্তে পরিণত হয় এবং তাহা দ্বারা শিশুর হাড়, মাংস, স্নায়ু প্রভৃতিইবা কিরূপে গঠিত হয় তাহা জানিবার জন্য প্রত্যেক জননীই উৎসুক হইতে পারেন।

আহার্য্য দ্রব্য কতকগুলি প্রক্রিয়ার দ্বারা পরিপাক হইয়া এমন সব দ্রবণীয় পদার্থে পরিণত হয় যে, তাহা সহজেই রক্তের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে।

শিশু শুধু দুগ্ধ পান করে বলিয়া তাহার পরিপাক প্রণালী সহজ ও সরল এবং পরিপাক যন্ত্রও অত্যন্ত কোমল থাকে। এই কারণে শিশুর খাদ্যের কোনরূপ গোলমাল হইলে সহজেই পরিপাক যন্ত্র বিকল হইয়া পড়ে এবং নানারূপ অসুখ হয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আহার্য্য দ্রব্যের জটিলতা যেমন বৃদ্ধি পায়, পরিপাক যন্ত্রও তেমনি দৃঢ় হইতে থাকে এবং পরিপাক করিবার ক্ষমতাও বাড়ে।

আহার্য্য দ্রব্য মুখে যাইবামাত্র আমরা তাহা জিহ্বা এবং দাঁত দিয়া চর্ব্বণ করি। তারপর আমাদের আহার্য্যে যে শ্বেতসার পদার্থ আছে—(প্রধানতঃ, ভাত, আলু, শাকসব্জী প্রভৃতিতেই বেশী পরিমাণে শ্বেতসার পদার্থ থাকে)—তাহা লালা রস দ্বারা maltose নামক একপ্রকার দ্রবণীয় পদার্থে (শর্করায়) পরিণত হয়।* শ্বেতসার পদার্থ জলে মিশ্রিত করা যায় না,

* আমাদের মুখের ভিতর প্রধানতঃ তিন জোড়া লালাগ্রন্থি আছে, তাহা হইতেই লালারস নিঃসৃত হয়। এক জোড়া গ্রন্থি কাণের ঠিক নীচে এবং সম্মুখে অবস্থিতি করিতেছে, আর দুই জোড়া মুখের ভিতরে রহিয়াছে। প্রত্যেক লালাগ্রন্থি হইতে একটি ছোট নল বাহির হইয়া মুখের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এই নল দিয়া লালারস প্রবাহিত হইয়া মুখের মধ্যে আসে। এতদ্ব্যতীত আমাদের মুখের মধ্যে আরো ছোট ছোট লালা গ্রন্থি আছে। লালা রস alkaline। ইহাতে জল খনিজ পদার্থ, মেদময় পদার্থ এবং মুখের ত্বক হইতে নিঃসৃত আরো কয়েক প্রকার পদার্থ আছে। ইহাতে দেহের অন্যান্য সমস্ত রস হইতে পৃথক একটি বিশেষ পদার্থ আছে, তাহার নাম Istyalin। লালা রসের ইহাই প্রধান উপকরণ এই Istyalinই শ্বেতসার পদার্থকে শর্করায় পরিণত করে। শিশুদের ছয় মাস বয়সের পূর্ব্বে তাহাদের লালারসে এই পদার্থ উপযুক্ত ভাবে বিদ্যমান থাকেনা বলিয়া তাহারা শ্বেতসার বিশিষ্টখাদ্য শর্করায় পরিণত করিতে অর্থাৎ জীর্ণ করিতে পারে না।

সুতরাং রক্তের সহিত কিরূপে মিশিবে? কিন্তু লালারস দ্বারা ইহা যে দ্রবণীয় শর্করা পদার্থে পরিণত হয় তাহা সহজেই রক্তের সহিত মিশিয়া যায়। শিশুদিগের দাঁত উঠিবার পূর্ব্বে যে লালারস নির্গত হয় তাহাতে শ্বেতসার পদার্থ জীর্ণ করিয়া শর্করায় পরিণত করিবার ক্ষমতা জন্মে না। মাতার দুগ্ধে শ্বেতসার কিংবা তদনুরূপ কোনো পদার্থ বিদ্যমান নাই।

আহার্য্য দ্রব্য মুখে চর্ব্বিত এবং তাহার শ্বেতসার পদার্থ লালারস দ্বারা শর্করায় পরিণত হইবার পর তাহা গলনালী দিয়া পাকস্থলীতে প্রবেশ করে।

পাকস্থলীর ভিতরের গতি একপ্রকার সূক্ষ্ম ত্বক দ্বারা আবৃত। এই ত্বক হইতে রক্ত হইতে জাত এক প্রকার রস নিঃসৃত হয়, তাহার নাম পাচক রস। খাদ্য দ্রব্য পাকস্থলীতে প্রবেশ করিলে পর ইহার পেশী নির্ম্মিত গাত্র খাদ্য দ্রব্যকে ক্রমাগত আলোড়ন করিতে থাকে। সুতরাং পাকস্থলীর ত্বক হইতে নিঃসৃত পাচক রসের সহিত খাদ্য দ্রব্য একবারে মিশ্রিত হইয়া যায়। (ক) মুখের লালারস আমাদের খাদ্যদ্রব্যের শ্বেতসারকে শর্করায় পরিণত করিয়া রক্তে মিশিবার উপযোগী করে। এই সমুদয় পদার্থ পাচক রস দ্বারা Proteid matters পেপটোন নামক এক দ্রবণীয় পদার্থে পরিণত হইয়া রক্তে মিশিবার উপযোগী হয়। শিশুর দুগ্ধপানের পর তাহা এই পাকস্থলীতে আসিয়া অম্লাদি বিশিষ্ট পাচকরসের সহিত মিশিয়া দুগ্ধের ছানার অংশ পৃথক হইয়া পড়ে। এই ছানাই দুগ্ধের nitrogenous পদার্থ। পাচকরস তখন এই ছানাকে জীর্ণ করে। মাতৃদুগ্ধের ছানা খুব ছোট ছোট হয়, সুতরাং পাচক রস তাহা সহজেই হজম করিয়া দেয় কিন্তু গরু ও ছাগলের দুধের ছানা ভারি এবং গাঢ় হয়, এই জন্য হজম হইতে দেরী হয়। গাধার দুধ অনেকটা মাতৃদুগ্ধের ন্যায়, সুতরাং হজমও শীঘ্র হয়। খাদ্যের ছানার অংশ পাকস্থলীর পাচক রস দ্বারা পেপটোন নামক দ্রবণীয় পদার্থে পরিবর্ত্তিত হইয়া পাকস্থলীর গাত্রে যে অসংখ্য সূক্ষ্মরক্তবহা নালী Blood vessels আছে তাহাতে চলিয়া যায়। খাদ্যের অবশিষ্ট যে সব অংশ (যেমন মেদময় পদার্থ, শেতসার পদার্থ) পাকস্থলীতে দ্রবণীয় পদার্থে পরিবর্ত্তিত হয় না, তাহা পাকস্থলী হইতে বাহির হইয়া ক্ষুদ্র অন্ত্রে প্রবেশ করে। এইস্থলে যকৃৎ হইতে পিত্তরস এবং ক্লোমগ্রন্থি হইতে ক্লোমরস (Pancreatic Juice) 'আসিয়া' খাদ্যের উপর কার্য্য করে। যকৃৎ হইতে পিত্তরস এবং ক্লোমগ্রন্থি হইতে (Pancreas) ক্লোমরস আসিবার Jotyalin যেমন লালারসের প্রধান উপকরণ, Joepsin তেমনি পাচক রসের প্রধান উপকরণ। পাচক রস মেদময় পদার্থ এবং শ্বেতসার পদার্থ জীর্ণ করিতে পারে না। ক্লোমরস ইহাদিগকে জীর্ণ করে। পাচক রস nitrogenous খাদ্যকে জীর্ণ করে। মাংসের albumen, ডিমের খাদ্য অংশ, দুগ্ধের ছানা (casim) ময়দার gluten প্রভৃতি পাকস্থলীতে পাচক রস জীর্ণ করিবার জন্য ক্ষুদ্র অন্ত্রের সহিত দুইটি নালিযুক্ত পাকস্থলীতে পাচক রসের কার্য্যের পরও খাদ্যের যে সব উপাদান অপরিবর্ত্তিত

(ক) পাচক রসের গুণ acid। ইহাতে জল খনিজ পদার্থ free hydrocitric acid এবং pepsin আছে।

অবস্থায় ক্ষুদ্র অন্ত্রে প্রবেশ করিয়াছে, ক্লোম-রস সেই উপাদান সমূহকে দ্রবণীয় পদার্থে পরিণত করে। ক্লোমরসের কার্য্য শক্তি অনেক। ক্লোমরস দুগ্ধকে দধির আকারে পরিণত করে, পাচক রসের ন্যায় খাদ্যের nitrogenous অংশকে Peptone নামক পদার্থে দ্রব করে, খাদ্যের শ্বেতসার পদার্থের যাহা লালারস এবং পাচক রস দ্বারা দ্রবীভূত হয় না, তাহাকে শর্করায় পরিণত করে এবং খাদ্যের মাখনের অংশকে অতি সূক্ষ্ম ভাগে বিভক্ত করে। যকৃৎ হইতে যে পিত্তরস ক্ষুদ্র অন্ত্রে প্রবাহিত হয় তাহা সাধারণতঃ পরিপাক কার্য্যে ক্লোমরসকে সাহায্য করে। পিত্তরসেরগুণ alkaline ইহার রঙ সবুজ। ইহাতে জল খনিজ পাদার্থ, রঙ করিবার জিনিস, bile acids, chotesterin এবং মেদ আছে। বয়স্কেরা যে খাদ্য আহার করে—তাহার যে অংশ মুখের লালারস এবং পাকস্থলীর পাচক রস দ্বারা দ্রবীভূত হয় না তাহা এইরূপে ক্ষুদ্র অন্ত্রে ক্লোমরস দ্বারা দ্রবীভূত হইয়া রক্তে মিশিবার উপযোগী হয়। খাদ্য এইরূপে লালারস, পাচক রস, পিত্তরস এবং ক্লোমরস দ্বারা দ্রবীভূত হইয়া দুগ্ধের ন্যায় এক প্রকার তরল পদার্থে পরিণত হইয়া রক্তে মিশিয়া যায়। এই পদার্থকে Chyle বলে। যে গুণে ক্লোমরস শ্বেতসার পদার্থকে শর্করায় পরিণত করিয়া রক্তে মিশিবার উপযোগী করে, শিশুর ক্লোমরসে সে গুণ জন্মের প্রথম কয়েক মাসে বিদ্যমান থাকে না। এই কারণে শিশুকে শ্বেতসার বিশিষ্ট খাদ্য দিলে তাহা তাহার মুখেও দ্রবীভূত হয় না এবং অন্ত্রের মধ্যেও জীর্ণ হয় না; শিশু নানারূপ পীড়ায় আক্রান্ত হয়।

আমাদের খাদ্যদ্রব্য নানাপ্রকার রসের দ্বারা দ্রবীভূত হইয়া যে তরল আকার ধারণ করে তাহা পাকস্থলী এবং অন্ত্রের গাত্রাবৃত ত্বকে যে সূক্ষ্ম রক্তবহা নালী সকল আছে, তাহাতেই প্রধানতঃ প্রবেশ করে। খাদ্য গ্রহণের পর আমাদের পাকস্থলী অন্ত্রে প্রবাহিত রক্ত খাদ্যের সার অংশের দ্বারা উপরোক্ত ভাবে পুষ্ট হইয়া পাকস্থলী ও অন্ত্র হইতে বাহির হইয়া একটি শিরা দিয়া যকৃতে প্রবেশ করে। যে দ্বার দিয়া পাকস্থলী ও অন্ত্র হইতে পরিপুষ্ট রক্ত যকৃতে প্রবেশ করে তাহাকে ইংরাজিতে Portal Vein বলে। এই রক্ত যকৃতে প্রবেশ করিলে পর যকৃত তাহাকে পরিবর্ত্তিত করে অর্থাৎ রক্তের যে উপাদান-বর্জ্জন করিবার তাহা বর্জ্জন করিয়া দিয়া সার অংশ গ্রহণ করে। এই পরিত্যক্ত জিনিসটি পিত্ত। ইহা যকৃৎ হইতে বাহির হইয়া পিত্ত-কোষে গিয়া সঞ্চিত হয়। এইরূপে রক্ত যকৃৎ কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত হইয়া দেহের রক্ত স্রোতের সহিত মিশিবার উপযুক্ত হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, খাদ্যের মাখনের অংশ ক্লোমরস দ্বারা অতি সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত হয়। ক্ষুদ্র অন্ত্রের ভিতরের গাত্রে যেমন বহুসূক্ষ্ম বহা নালী সকল আছে, তেমনি ইহা একপ্রকার সূক্ষ্ম শুঁয়া দ্বারা আবৃত। ইহাকে ইংরাজীতে 'ভিলি' (Villi) বলে। প্রত্যেক ভিলাসের ভিতর বহু সূক্ষ্ম রক্তবহা নালী আছে এবং ২।১টি করিয়া এক প্রকারের নালী আছে, তাহাকে ল্যাকটিয়্যালস্ (lacteals) বলে। খাদ্যের মেদময় পদার্থ সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত হইলে পর ক্ষুদ্র অন্ত্রের গাত্রের ভিতর দিয়া চোয়াইয়া ভিলির অভ্যন্তরস্থ ল্যাকটিয়ালে প্রবেশ করে। ক্রমশঃ এই ল্যাকটিয়ালগুলি ক্ষুদ্র হইতে

থাকে এবং আমাদের বুকের পশ্চাদ্দিক দিয়া যে একটি লম্বা নালী গিয়াছে তাহার মধ্যে এই ল্যাকটিয়ালগুলি তাহাদের অভ্যন্তরস্থ খাদ্যের মেদময় পদার্থ চালিয়া দেয়। এই নালীকে বক্ষঃনালী thoracicduct বলে। এই নালী গলার বাম দিকের বৃহৎ শিরার সহিত সংযুক্ত হইয়া আছে। খাদ্যের মেদময় পদার্থ thoracic duct দিয়া এই বৃহৎ শিরার মধ্যে প্রবেশ করে এবং তথা হইতে রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, খাদ্যের অধিকাংশ উপাদান দ্রবীভূত হইয়া সাধারণতঃ পাকস্থলী এবং অন্ত্রের ত্বকে স্থিত রক্তবহা নালীতে প্রবেশ করে এবং খাদ্যের মেদময় পদার্থ উপরোক্ত ল্যাকটিয়াল্ দিয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। উপরোক্ত প্রণালী হইতে আমরা দেখিতে পাইলাম যে, খাদ্যদ্রব্য জীর্ণ করিবার জন্য চারিটি রসের আবশ্যক হয়।

(১) লালা রস (২) পাচক রস, (৩) পিত্ত রস এবং (৪) ক্লোম রস।

খাদ্য দ্রব্য মুখে যাইবা মাত্র লালারস খাদ্যের শ্বেতসার পদার্থের উপর কার্য্য করে এবং ইহাকে শর্করায় পরিণত করে। খাদ্য দ্রব্য এইরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। তথায় প্রবেশ করিবামাত্র পাচক রস ঐ খাদ্যের উপর কার্য্য করে। তখন খাদ্যের নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন ঘটে। (১) লালারস দ্বারা খাদ্যের শ্বেতসার উপাদানের কতক অংশ শর্করায় পরিণত হইয়াছে। (২) মাংসের ন্যায় পদার্থের কিয়দংশ পাচক রস দ্বারা দ্রবীভূত হইয়াছে। এই দু'টি পদার্থ এবং যে পানীয় গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা পাকস্থলীর রক্তবহা নালী চুষিয়া লইয়াছে।

তারপর (১) শ্বেতসার এবং উদ্ভিদ্ পদার্থ পাকস্থলীর দ্বার দিয়া বাহির হইয়া অন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে। (২) মাংসের ন্যায় পদার্থের অবশিষ্টাংশ নরম এবং টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া অন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে। (৩) খাদ্যের মেদময় পদার্থ সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত হইয়া তৈলের গুলির আকারে অন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে।

পাকস্থলীর পাচকরস দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া খাদ্যের যে অংশ অন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে—তাহা টক। এই টক খাদ্যাংশ অন্ত্রে প্রবেশ করিবামাত্র পিত্ত রস এবং ক্লোম রস ইহার সহিত মিশ্রিত হয়। এই দু'টি রসের গুণ, লালারসের ন্যায়, টকের বিপরীত। সুতরাং তাহারা—বিশেষতঃ পিত্তরস পাচক রসের টক গুণ নষ্ট করে। পিত্ত রসের প্রধান গুণই এই যে, ইহা পাচকরসের টক গুণ নষ্ট করে। পিত্ত রস পাচক রসের টক গুণ নষ্ট করিলে পর তবে ক্লোম রস খাদ্যের উপর কার্য্য করিতে পারে, সামান্য টক থাকিলেও ক্লোমরস কার্য্য করিতে পারে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ক্লোমরস খাদ্যের সমস্ত উপাদানই জীর্ণ করে। লালারস, পাচক রস এবং পিত্তরস খাদ্যের উপর কার্য্য করিয়া যে সকল উপাদান জীর্ণ করিতে পারে না, ক্লোমরস তাহা সবই জীর্ণ করে। এই তিন রসের ক্রিয়া শেষ হইবার পরও খাদ্যের যে শ্বেতসার পদার্থ অবশিষ্ট থাকে, ক্লোমরস তাহাকে জীর্ণ করিয়া শর্করায় পরিণত করে, যে মাংসময় উপাদান অবশিষ্ট থাকে—তাহা দ্রবীভূত করে এবং পিত্তরসের সাহায্যে মেদময় পদার্থকে সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত করে। আমাদের আহার্য্য দ্রব্য যখন সমস্ত ক্ষুদ্র অন্ত্রের মধ্য দিয়া চলিতে থাকে, তখন ক্লোমরস ধীরে ধীরে কার্য্য করিতে

থাকে। ক্লোমরস দ্বারা জীর্ণ হইবার পর খাদ্যের উপাদান গুলিকে ভিলি (villi) চুষিয়া লয়। শর্করা ও মাংসের রসকে রক্ত বহা নালী এবং মেদময় উপাদানকে ল্যাকটিয়াল্‌স্‌ চুষিয়া লয়। জীর্ণ করা খাদ্যের অধিকাংশই ক্ষুদ্র অন্ত্রের ভিলি চুষিয়া লয়।

এইরূপে খাদ্য জীর্ণ হইয়া বৃহদন্ত্রে প্রবেশ করে এবং তথা হইতে খাদ্যের অসার অংশ মল রূপে বহির্গত হইয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

আয়ুর্ব্বেদে রক্ত মোক্ষণ।

—:০:—

রক্ত মোক্ষণ দ্বারা অনেক রোগের প্রতিকার হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদে রক্তমোক্ষণ সম্বন্ধে বিস্তারিত উপদেশ আছে। আমরা এই প্রবন্ধে সাধারণের অবগতির জন্য রক্ত মোক্ষণের বিষয় আলোচনা করিব। রক্ত মোক্ষণ এক সময়ে ডাক্তারী চিকিৎসায় বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল। ক্রমে উহা উঠিয়া যায়। এদেশে রক্ত মোক্ষণের জন্য জলৌকা, শৃঙ্গ, অলাবু এবং শস্ত্র প্রভৃতির প্রয়োগ করা হইত। ক্রমশঃ প্রত্যেকের বিষয় বলা যাইতেছে।

রাজা, ধনী, বালক, বৃদ্ধ, ভীরু, দুর্ব্বল, স্ত্রী ও সুকুমার ব্যক্তির রক্ত মোক্ষণ করিতে হইলে জলৌকার প্রয়োগই অত্যুৎকৃষ্ট উপায়। জলৌকা, অলাবু এবং শৃঙ্গ এই ত্রিবিধ পদার্থ দ্বারা রক্তমোক্ষণের মধ্যে জলৌকা প্রয়োগই প্রধানতম।

অপিচ, বাতদুষ্টরক্ত—শৃঙ্গ দ্বারা, পিত্ত দুষ্ট রক্ত—জলৌকা দ্বারা এবং কফ দুষ্ট রক্ত অলাবু দ্বারা মোক্ষণ করা যায়। কারণ শৃঙ্গ স্নিগ্ধ বলিয়া বায়ুতে হিতকর, জলৌকা শীতল বলিয়া পিত্তে হিতকর এবং অলাবু রুক্ষ বলিয়া কফে হিতকর। আবার ত্রিদোষ দূষিত রক্ত মোক্ষণের জন্য উক্ত ত্রিবিধ দ্রব্যই প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

শৃঙ্গ দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করিতে হইলে, যে স্থান হইতে রক্ত মোক্ষণ করিতে হইবে—সেই স্থান অল্প অল্প চিরিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্র সংযোগে শৃঙ্গের স্থূল মুখ তথায় এমন ভাবে বসাইবে যেন বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে। পরে ছিদ্রের অন্য মুখে মুখ দিয়া জোরে চুষিয়া রক্ত মোক্ষণ করিবে।

অলাবু দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করিতে হইলে পীড়িত স্থান অল্প অল্প চিরিয়া মধ্য স্থলে প্রজ্বলিত দীপবর্ত্তি সংযুক্ত অলাবু যন্ত্র তথায় স্থাপিত করিবে। ইহাতে রক্ত মোক্ষণ হইয়া থাকে।

জলৌকা প্রয়োগ :—জল ইহাদিগের আয়ু, এজন্য ইহাদিগকে জলৌকা বলে। আবার জল ইহাদিগের ওকা অর্থাৎ বাক্য স্থান এই জন্য ইহাদিগকে জলায়ুকা বলে। জলৌকা দ্বাদশ প্রকার। তন্মধ্যে ছয় প্রকার নির্ব্বিষ এবং ছয় প্রকার সবিষ।

কৃষ্ণা, কর্ব্বুরা, আলগর্দ্দা, ইন্দ্রায়ুধা, সামুদ্রিকা ও গোচন্দনা এই ছয় প্রকার

জলৌকা সবিষ। অঞ্জন চূর্ণের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ এবং স্থূল মস্তক বিশিষ্ট জলৌকাকে কৃষ্ণা বলে। বাইন মাছের ন্যায় আয়ত এবং উদরের কোথাও উন্নত ও কোথাও ছিন্নবৎ—রূপ জলৌকাকে কার্ব্বুরা বলে। কুঞ্চিত অঙ্গ লোমযুক্ত বিস্তৃত পার্শ্ব বিশিষ্ট ও কৃষ্ণ মুখ জলৌকাকে অলগর্দ্দা বলে। ইন্দ্র-ধনুর ন্যায় ঊর্দ্ধ রেখা দ্বারা চিত্রিত জলৌকাকে ইন্দ্রায়ুধ বলে। ঈষৎ কৃষ্ণ পীত বর্ণ বিচিত্র পুষ্পের আকৃতির ন্যায় চিত্র বিচিত্র অঙ্গ জলৌকাকে সামুদ্রিকা বলে। যে সকল জলৌকার অধোভাগে বাড়ের কোষের ন্যায়, দুই ভাগে বিভক্ত এবং মুখ সূক্ষ্ম তাহাদিগকে গোচন্দনা বলে।

সবিষ জলৌকা দংশন করিলে দষ্ট স্থানে অত্যন্ত শোথ ও চুলকণা, হয় এবং মূর্চ্ছা জ্বর, দাহ, বমি, মত্ততা ও অবসন্নতা—এই সকল উপদ্রব ঘটে। ইন্দ্রায়ুধ নামক জলৌকায় দংশন করিলে দষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হয়। সবিষ জলৌকায় দংশন করিলে বিষ চিকিৎসায় যে সকল ঔষধের উল্লেখ আছে, সেই ঔষধ পান, লেপন ও নস্যাদি কার্য্যে প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করিতে হয়।

কপিলা, পিঙ্গলা, শঙ্কু মুখী, মুষিকা, পুণ্ডরীক মুখী ও সাররিকা এই ছয় প্রকার জলৌকা নির্ব্বিষ। ইহাদের মধ্যে যে সকল জলৌকার দুই পার্শ্ব মনঃশিলার ন্যায় বর্ণে রঞ্জিত এবং পৃষ্ঠদেশ স্নিগ্ধ মুগের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট তাহাদিগের নাম কপিলা। যাহারা অল্প রক্তবর্ণ বিশিষ্ট, গোলাকার, পিঙ্গল বর্ণ এবং শীঘ্র গামিনী তাহাদের নাম পিঙ্গলা। যাহারা যকৃতের ন্যায় নীল-লোহিত বর্ণ বিশিষ্ট, শীঘ্র রক্তপায়ী, এবং দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণ মুখ বিশিষ্ট তাহাদিগকে শঙ্কু মুখী বলে। যাহারা ইন্দুরের ন্যায় আকৃতি ও বর্ণ বিশিষ্ট এবং দুর্গন্ধ যুক্ত তাহাদিগকে মুষিকা বলে। যাহারা মুগের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট এবং রক্ত পদ্মের ন্যায় মুখ যুক্ত তাহাদের নাম পুণ্ডরীক মুখী। আর যে সকল জলৌকা স্নিগ্ধ, পদ্ম পত্রের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট এবং দশ অঙ্গুলি প্রমাণ দীর্ঘ, তাহাদিগের নাম সাররিকা। এই সাররিকা জলৌকা হস্তী, অশ্বাদি পশুদিগের চিকিৎসা কার্য্যে ব্যবহার করিতে হয়। মনুষ্যদিগের চিকিৎসা কার্য্যে কদাচ এই জলৌকা প্রয়োগ করা উচিত নহে।

যবন বা তুরক দেশ, পাণ্ড্য (কাম্বোজের দক্ষিণ এবং পুরাতন দিল্লীর পশ্চিমে অবস্থিত) দেশ, সহ্য নর্ম্মদা নদীর তীরবর্ত্তী সহ্য নামক পার্ব্বত্য দেশ এবং মথুরা দেশে দীর্ঘকায়, হৃষ্ট পুষ্ট ও অধিক রক্তপায়ী জলৌকা যথেষ্ট পাওয়া যায়। সবিষ মৎস্য, কীট, ভেক, মূত্র ও পুরীষ দ্বারা পূতি ভাবাপন্ন কলুষিত জলে সবিষ জলৌকা উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর পদ্ম উৎপল, কুমুদ, শৈবাল প্রভৃতি দ্বারা আচ্ছন্ন নির্ম্মল জলে নির্ব্বিষ জলৌকা উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিশেষতঃ নির্ব্বিষ জলৌকা সকল ক্ষেত্রে ও সুগন্ধি জলে বিচরণ করে, বিষাক্ত দ্রব্য আহার করে না এবং পঙ্কে বিচরণ করে না।

শরৎকালে কাঁচা চামড়া বা সদ্যাহত জন্তুর অঙ্গাবয়ব দ্বারা জলৌকা ধরিতে হয়। তৎপরে একটী বৃহৎ নূতন ঘটে সরোবর বা দীঘির জল এবং পঙ্ক রাখিয়া তাহা ছাড়িয়া দিতে হয়। উহাদের আহারের জন্য শুষ্ক মাংস, শৈবাল এবং পদ্ম ও উৎপলাদির কন্দ চূর্ণ করিয়া দিতে হয় এবং থাকিবার জন্য তৃণ জলজ পত্র দিতে হয়। দুই তিন দিন অন্তর জল বদলাইয়া দিতে হয় এবং নূতন করিয়া খাদ্য দিতে হয়। সাত দিন অন্তর অন্য ঘটে স্থাপন করিতে হয়।

যে সকল জলৌকার দেহের মধ্যভাগ স্থূল যাহারা ক্লিষ্ট; অত্যন্ত দীর্ঘ ধীরে ধীরে গমন করে, পীড়িত স্থানে সহজে সংলগ্ন হয় না, অল্প রক্ত পান করে এবং যাহারা সবিষ এই জলৌকা রক্ত মোক্ষণ কার্য্যে প্রশস্ত নহে।

ব্যাধি—জলৌকা প্রয়োগ-সাধ্য হইলে রোগীকে শয়ন করাইয়া বা উপবেশন করাইয়া ব্যাধি স্থানে ক্ষত না থাকিলে শুষ্ক মৃত্তিকা ও গোময় চূর্ণ দ্বারা ঘর্ষণ করিবে। ক্ষত থাকিলে জলৌকা সহজেই সেই স্থান গ্রহণ করে বলিয়া ঐরূপ ঘর্ষণ করিবার আবশ্যক হয় না। অনন্তর পাত্র হইতে জলৌকা ধরিয়া তাহার গাত্রে সর্ষপ ও হরিদ্রা বাটা লেপন করিবে। এবং গ্রহণ করার জন্য ক্লান্তিনাশ হেতু মুহূর্ত্তকাল জল পূর্ণ পাত্রের মধ্যে রাখিয়া দিবে। পরে সূক্ষ্ম, শুক্ল এবং আর্দ্র তুলা বা বস্ত্র খণ্ড দ্বারা মুখ ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া ব্যাধি স্থানে সংলগ্ন করিবে। যদ্যপি জলৌকা রুগ্ন স্থান গ্রহণ না করে, তাহা হইলে একবিন্দু দুগ্ধ বা রক্ত সেই স্থানে প্রদান করিবে অথবা সেই স্থানে একটু ক্ষত করিয়া দিবে। ইহাতেও যদি জলৌকা রুগ্নস্থান গ্রহণ না করে, তাহা হইলে সেই জলৌকা পরিত্যাগ করিয়া অন্য জলৌকা গ্রহণ করিবে।

জলৌকা অশ্বের খুরের ন্যায় মুখ নীচু ও স্কন্ধ উন্নত করিলে বুঝিতে হইবে যে, ব্যাধি স্থান গ্রহণ করিয়াছে। জলৌকা ব্যাধি স্থান গ্রহণ করিলে উহার শরীর আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে এবং তদুপরি জলসেচন করিবে। ইহাতে জলৌকা গাত্র শীতল হয় বলিয়া শীঘ্র শীঘ্র রক্তপান করে।

জলৌকা সংলগ্ন স্থানে বেদনা ও কণ্ডু হইলে বুঝিতে হইবে যে, জলৌকা বিশুদ্ধ রক্ত পান করিতেছে। তখন তাহাকে অপসারিত করিবে। যদ্যপি জলৌকা সহজে পীড়িত স্থান ত্যাগ না করে, তাহা হইলে তাহার মুখে একটু সৈন্ধব লবণ চূর্ণ দিবে। ইহাতে জলৌকা নিশ্চয়ই ব্যাধি স্থান পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

জলৌকা রক্তপান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পতিত হইলে, উহার গাত্রে চাউলের গুঁড়া মাখাইয়া এবং মুখ লবণ ও তৈল দ্বারা লিপ্ত করিবে। অনন্তর বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা পুচ্ছ দেশ ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা ধীরে ধীরে মুখ পর্য্যন্ত মর্দ্দিত করিয়া বমন করাইবে। জলৌকা সম্যক প্রকারে মোক্ষণ করিলে যদি উহাকে জলের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সে আহারের চেষ্টায় ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে থাকে। কিন্তু জলে ফেলিলেও যদি জলৌকা অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং ইতস্ততঃ সঞ্চরণ না করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাহার সম্যক প্রকার কার্য্য করা হয় নাই। এরূপ অবস্থায় পুনরায় মোক্ষণ করান কর্ত্তব্য। কেননা সম্যক্ প্রকারে মোক্ষণ করান না হইলে উহাদের ইন্দ্র মদ নামক দুঃসাধ্য ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সম্যক্ প্রকারে মোক্ষণ করান হইলে জলৌকাকে পূর্ব্ববৎ নিয়মে যথাস্থানে রাখিয়া উপযুক্ত খাদ্যাদি দিয়া পালন করিবে।

জলৌকা প্রয়োগ হেতু সম্যক্ যোগ ব্যতীত রক্তস্রাবের হীন, মিথ্যা এবং অতিযোগ হইতে পারে। সম্যক্ যোগ হইলে ক্ষত স্থানে শত ধৌত ঘৃত মর্দ্দন বা শত ধৌত ঘৃতযুক্ত তুলা বা বস্ত্রখণ্ড সংলগ্ন করিবে। হীন-যোগ হইলে রক্তস্রাবের জন্য ক্ষতস্থান মধু দ্বারা ঘর্ষণ করিবে। অতিযোগ হইলে শীতল জল সেচন করিবে অথবা শীতল [illegible] বস্ত্রখণ্ড

দ্বারা বন্ধন করিবে। মিথ্যাযোগ হইলে মধুর দ্রব্য পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

জলৌকা দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করাইতে হইলে রোগীর বল, শরীরের আয়তন, দোষের বল, দোষের প্রমাণ প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় রক্তমোক্ষণ করান কর্ত্তব্য। ব্যাধি স্থান অল্প হইলে অল্প রক্ত এবং বৃহৎ হইলে অধিক রক্ত মোক্ষণ করান কর্ত্তব্য।

শাস্ত্রে কি পরিমাণ রক্তমোক্ষণ করান উচিত সে সম্বন্ধে উপদেশ আছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সেরূপ মাত্রার রক্তস্রাব করান যায় না বলিয়া পরিমাণ লিখিত হইল না।

শস্ত্র দ্বারা রক্ত মোক্ষণ।

ত্রিদোষজ ব্যতীত পঞ্চবিধ বিদ্রধি (বড়-ফোড়া), কুষ্ঠ, বেদনাযুক্ত বাতব্যাধি (Nervous disease), শরীরের একদেশ আশ্রিত শোথ, কর্ণপালি বাতরোগ সকল, গোদ, বিবাক্ত রক্ত, আব্, বিসর্প, বাতজ গ্রন্থি, পিত্তজ গ্রন্থি, কফজ গ্রন্থি, বাতজ উপদংশ, পিত্তজ উপদংশ, কফজ উপদংশ, স্তনরোগ সমূহে বিদারিকা, ক্রিমি দন্তক, দন্তবেষ্ট; উপকুশ, শীতাদ, পিত্তজ ওষ্ঠ ব্যাধি, রক্তজ ওষ্ঠ ব্যাধি, কফজ ওষ্ঠ ব্যাধি এবং অধিকাংশ ক্ষুদ্র রোগে রক্ত মোক্ষণ কার্য্য প্রশস্ত। ক্ষীণ ব্যক্তির শোথ হইলে এবং পাণ্ডু, অর্শ, উদর শোষ রোগী ও গর্ভিণী স্ত্রীর শোথ হইলে রক্ত মোক্ষণ নিষিদ্ধ।

বায়ু দূষিত রক্ত ফেণাযুক্ত ঈষৎ রক্তবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, রুক্ষ, পাতলা, শীঘ্র প্রসরণ শীল হয় এবং সহজে জমিয়া যায় না। পিত্ত দূষিত রক্ত নীলবর্ণ, পীতবর্ণ, হরিত বর্ণ, শ্যাম-বর্ণ (হরিত কৃষ্ণ মিশ্রিত বর্ণ) কাচা মাংসের ন্যায় গন্ধযুক্ত, পিপীলিকা ও মক্ষিকাদির অনভিলষিত (অর্থাৎ মক্ষিকাদি পিত্ত দূষিত রক্ত খায় না) সহজে জমিয়া যায় না। কফ দূষিত রক্ত গেরিমাটী মিশ্রিত জলের ন্যায় পাণ্ডু লোহিত মিশ্রিত বর্ণ, স্নিগ্ধ, শীতল, ঘন, পিচ্ছিল, মাংস পেশীর ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট হয় এবং বিলম্বে স্রাব হইয়া থাকে। ত্রিদোষ কর্ত্তৃক দূষিত রক্ত ভিন্ন ভিন্ন দোষ দূষিত রক্তের লক্ষণ যুক্ত কাঁজির ন্যায় আভা বিশিষ্ট এবং দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। দ্বিদোষ দ্বারা দূষিত হইলে দুই দোষের লক্ষণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। রক্তদোষজনক কারণে দূষিত রক্ত—পিত্ত দুষ্ট রক্তের লক্ষণ যুক্ত এবং কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে।

যে রক্ত ইন্দ্রগোপ নামক কীটের ন্যায় উজ্জ্বল রক্তবর্ণ বিশিষ্ট, অতি তরল বা অত্যন্ত ঘন নহে, এবং আলতা, কুঁচ প্রভৃতির ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট—সেই রক্ত বিশুদ্ধ বলিয়া জানিবে।

অস্ত্র দ্বারা দুই প্রকারে রক্তমোক্ষণ করান যাইতে পারে। অসময়ে শস্ত্র প্রয়োগ করিলে, কিম্বা চিকিৎসকের দোষে ভাল রূপ অস্ত্র প্রযুক্ত না হইলে, অথবা অত্যন্ত শীতাধিক্য কিম্বা বাতাধিক্য কালে শস্ত্র প্রয়োগ করিলে, ভোজনের পূর্ব্বে বা অব্যবহিত পরেই শস্ত্র প্রয়োগ করিলে এবং রক্ত গাঢ় হইলে রক্তস্রাব হয় না অথবা স্রাব হইলেও অল্প মাত্রায় হইয়া থাকে।

যাহারা মদ্যপান বা বিষ পান করিয়াছে, যাহারা মূর্চ্ছাগ্রস্ত, যাহাদের বায়ু, মূত্র ও ও পুরীষের অবরোধ ঘটিয়াছে এবং যাহারা নিদ্রাভিভূত বা ভীত,—শস্ত্রপ্রয়োগে তাহাদের রক্তস্রাব হয় না।

এই সকল কারণে রক্তস্রাব না হইলে, সেই দুষ্ট শোণিত শরীরে থাকিয়া কণ্ডু, শোথ,

দাহ, পাক ও বেদনা জন্মায়; অনভিজ্ঞ চিকিৎসক কর্ত্তৃক, অত্যন্ত উষ্ণ কালে, ঘর্ম্মাক্ত অবস্থায়, অতিরিক্ত স্বেদ দেওয়ার পরে রক্ত মোক্ষনার্থ শস্ত্রপাত করিলে অথবা অতিরিক্ত বিদ্ধ হইলে অত্যধিক রক্তস্রাব হইয়া থাকে। অতএব নাতিশীতোষ্ণকালে. রোগীকে অধিক স্বেদ না দিয়া অথবা সূর্য্য বা অগ্নিতাপে অধিক তাপিত না করিয়া প্রথমে তিলের যবাগূ পান করাইয়া পরে রক্তমোক্ষণ করিবে।

অতিরিক্ত মাত্রায় রক্তস্রাব হইলে শিরঃ শূল, অন্ধতা, অধিমন্থ নামক চক্ষুরোগ, তিমির রোগ, ধাতুক্ষয়, আক্ষেপক, পক্ষাঘাত, একাঙ্গ রোগ, তৃষ্ণা দাহ, হিক্কা, শ্বাসকাস ও পাণ্ডু রোগ জন্মিতে পারে—এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে।

রক্তস্রাব হইতে হইতে যখন দেখিবে যে, রক্তবর্ণ বিশুদ্ধ রক্তস্রাব হইতেছে অথবা রক্তস্রাব আপনা হইতে বন্ধ হইয়াছে, কিম্বা দেহের লঘুতা, বেদনার উপশম, রোগের হ্রাস এবং চিত্তের প্রফুল্লতা জন্মিয়াছে, তখন সম্যক রক্তস্রাব হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। রক্তমোক্ষণশীল ব্যক্তিদিগের কুষ্ঠনীলিকাদি ত্বকদোষ, গ্রন্থি রোগ, শোথ এবং রক্তদোষ জনিত ব্যাধি সকল উৎপন্ন হইতে পারে না।

যগুপি রক্তস্রাব না হয়—তাহা হইলে,এলাচ, কর্পূর, কুড়, তগরপাদুকা, আকনাদী, দেবদারু, বিড়ঙ্গ, চিতা, শুঠ, পিপুল, মরিচ, গৃহধূম (ঝুল,) হরিদ্রা, আকন্দের আটা ও ডহর করঞ্জের ফল এই সকল দ্রব্যের মধ্যে যে গুলি পাওয়া যায়—তিনটী চারটী বা সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করিয়া তিলতৈল ও সৈন্ধব, লবণ সহ মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থানে ঘর্ষণ করিবে। ইহাতে রক্তস্রাব হইয়া থাকে।

অতিরিক্ত মাত্রায় রক্তস্রাব হইতে থাকিলে, লোধ, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু, রক্তচন্দন, গেরিমাটী, ধুনা, রসাঞ্জন, শিমূল, ফুল, শঙ্খ, ঝিনুক, মাষ কলায়, যব ও গোধুম—এই সমস্ত দ্রব্য সমান ভাগে চূর্ণ করিয়া অঙ্গুলিদ্বারা ধীরে ধীরে ক্ষতস্থানে লাগাইয়া দিবে। অথবা শাল, সর্জ্জ (শাল ভেদ), অর্জ্জুন, অরিমেদ (গুয়েবাবলা), কাকড়াশৃঙ্গী ও ধামন বৃক্ষের ছাল চূর্ণ করিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইবে। কিম্বা কার্পাসান্বিত বস্ত্র দগ্ধ করিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইবে অথবা সমুদ্রফেন ও (লাক্ষা) চূর্ণ করিয়া প্রয়োগ করিবে। পাট বা কার্পাসবস্ত্র দ্বারা ক্ষতস্থানে দৃঢ় রূপে বন্ধন করিলেও রক্তস্রাব নিবারিত হয়। ক্ষতস্থানে শীতল বস্ত্রাদি দ্বারা আচ্ছাদিত করিলে, রোগীকে শীতল দ্রব্য ভোজন করিতে দিলে, শীতল গৃহে রাখিলে ক্ষতস্থানে শীতল দ্রব্য পরিষেক করিলে বা শীতল দ্রব্য প্রলেপ দিলে,ক্ষার বা অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিলে রক্তস্রাব নিবৃত্ত হইয়া থাকে। শিরা পূর্ব্বে যেস্থানে বিদ্ধ করা হইয়াছিল তাহার নিম্নে সেই শিরা বিদ্ধ করিলেও রক্তস্রাব নিবারিত হয়। অপিচ, রোগীকে কাকোল্যাদি মধুর গণোক্ত দ্রব্যের কাথে ইক্ষু চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। কৃষ্ণসার মৃগ, হরিণ, মেষ, শশক, মহিষ, বরাহ প্রভৃতির রক্তপান করিতে দিবে। দুগ্ধ, ঘৃত, সংস্কৃত মুগের যূষ ও মাংস রস সহ সুস্নিগ্ধ অন্ন আহার করিতে দিবে। রোগীর অন্য কোন উপসর্গ ঘটিলে নিম্নলিখিত নিয়মে দোষানুসারে তাহার চিকিৎসা করিবে।

অত্যধিক মাত্রায় রক্তস্রাব হইলে ধাতুক্ষয় বশতঃ অগ্নিমান্দ্য হয় এবং বায়ু অত্যন্ত কুপিত হইয়া থাকে। সুতরাং এরূপ অবস্থায় রোগীকে

নাতি শীতল, লঘু স্নিগ্ধ ও রক্তবর্দ্ধক পথ্য, এবং অম্ল যুক্ত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

রক্তস্রাব নিবারণ করিবার উপায় চারি প্রকার। যথা, সন্ধান, স্কন্দন, দহন ও পাচন। তন্মধ্যে কষায় দ্রব্য দ্বারা ক্ষতস্থানের সন্ধান বা সঙ্কোচন, শীতল ক্রিয়া দ্বারা রক্তের স্কন্দন, কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্র ভস্ম প্রয়োগ দ্বারা পাচন এবং দাহ বা দহন দ্বারা শিরা সঙ্কোচন ক্রিয়া করিতে হয়। শীতল ক্রিয়া দ্বারা রক্ত ঘনীভূত হইয়া রক্তস্রাব বন্ধ না হইলে সন্ধান ক্রিয়া করিবে। সন্ধান ক্রিয়া দ্বারা রক্তস্রাব বন্ধ না হইলে পাচন ক্রিয়া করিবে। এই তিন প্রকার ক্রিয়ার দ্বারা রক্তস্রাব বন্ধ না হইলে দহন ক্রিয়া করিবে। এই রূপে রক্তের দোষ নিঃশেষিত রূপে দূর হইয়া রক্তস্রাব বন্ধ হইলে ব্যাধি পুনর্ব্বার উৎপন্ন বা বর্দ্ধিত হইতে পারে না। দোষ থাকিতে রক্তস্রাব বন্ধ হইলে পুনরায় আর রক্তস্রাব না করিয়া সংশমন অর্থাৎ দোষনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া অবশিষ্ট দোষের প্রতিকার করিবে। কারণ রক্তই শরীরের মূল ও রক্ত দ্বারাই শরীর রক্ষিত হইয়া থাকে। সেইজন্য রক্তকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করা উচিত। রক্তকেই জীবন বলিয়া জানিবে।

রক্তস্রাবের পর শীতল পরিষেকাদির জন্য বায়ু কুপিত হইলে ক্ষতস্থানে শোথ ও সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা হয়। এরূপ অবস্থায় ঈষদুষ্ণ ঘৃত ক্ষতস্থানে সেচন করিলে প্রতিকার হইয়া থাকে।

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান।

—:০:—

(ডাঃ শ্রীনলিনী নাথ মজুমদার এইচ, এল, এম, এস)

যে সকল সদুপায়ে দেহ মনকে পরিচালন করিলে শরীর ও মন সুস্থ থাকিয়া সুখশান্তিময় স্বভাবে সুদীর্ঘ জীবন লাভ করা যায়—সেই সকল সদুপায়কেই স্বাস্থ্যবিজ্ঞান কহে। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রথম এবং প্রধান উপায় ব্রহ্মচর্য্য।

ব্রহ্মচর্য্য শব্দের অর্থ কি? এই শব্দটির বিশ্লেষণে দুইটি বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, একটি সচ্চিদানন্দময় আত্মা অর্থাৎ ব্রহ্ম; অপরটির 'চর' ধাতু অর্থাৎ গমন। সুতরাং যেরূপ কর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্মসন্নিধানে গমন করা যায়—তাহার নাম ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা আত্মদর্শন বা ব্রহ্মদর্শন ঘটে বলিয়াই আত্মদর্শনে অমরত্ব লাভ, পক্ষান্তরে আত্মদর্শনেই মৃত্যু হওয়া বেদশাস্ত্র সম্মত মহাবাক্য *। তাহা হইলে চৌরাশী লক্ষ যোনী পরিভ্রমণান্তর সুদুর্লভ যে মানবজন্ম, যাহা কেবল ব্রহ্মদর্শন জন্যই অবধারিত

---

* বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বা ইতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়॥ [illegible] পুরুষ সূক্ত।

বেদার্থ প্রতিপাদ্য আদিত্যবর্ণ গুণাতীত পুরুষকে অবগত হইলে মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারা যায়। তদ্ভিন্ন মৃত্যু নিবারণের অন্য কোন উপায়ই থাকিতে পারে না।" সুতরাং সেই আত্মদর্শন অভাবে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

হইয়াছে, তাহার সেই প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনকল্পে মানবজাতি মাত্রেরই ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালনের প্রকৃত পন্থাই শ্রবণমননাদি অষ্ট প্রকার মৈথুন পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুক্রধারণ। এইজন্য শাস্ত্র বলেন—

"মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ॥"

যে পুরুষ যে পরিমাণে শুক্রধারণ করে, তাহার জীবন সেই পরিমাণে দীর্ঘ ও সুখ সেই রূপ হয়, আর যে পুরুষ যে পরিমাণে বিন্দুপাত করে তাহার মৃত্যু সেই পরিমাণে অকালে এবং দুঃখজনকভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

শুক্রধারণ অর্থে যে কেবল পুরুষ জাতিরই কর্ত্তব্য তাহা নহে। উহা স্ত্রীজাতিরও অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ স্ত্রীজাতিও শুক্র ধারণ রূপ ব্রহ্মচর্য্য পরায়ণ না হইলে উৎকৃষ্ট আর্ত্তবলাভে সমর্থা হন না বলিয়া সুসন্তান লাভ করিতে বা দীর্ঘায়ু ও বীর্য্যবতী হইতে পারেন না। কেহ কেহ বলেন যে, স্ত্রীজাতির শুক্র হয় না। ইহা নিতান্তই ভ্রান্তিমূলক বাক্য। এজন্য সুশ্রুত বলেন,—

"এবং মাসেন রসঃ শুক্রীভবতি স্ত্রীণাঞ্চার্ত্তবমিতি। স্ত্রীণাঞ্চেতি চকারাৎ স্ত্রীণামপি শুক্রং ভবতি॥"

একমাসে রস পরিপাকান্তে পুরুষের শুক্র রূপে এবং স্ত্রীদিগের শুক্র আর্ত্তবরূপে পরিণত হয়। "স্ত্রীণাঞ্চ" এই "চ" কার দ্বারা স্ত্রীদিগের শুক্র সমুচ্চিত করা যায়। ইহার প্রমাণও সুশ্রুতেই উক্ত হইয়াছে; যথা, স্ত্রীলোকেরও পুরুষ সংসর্গে শুক্রস্রাবিত হয়; কিন্তু সেই শুক্র গর্ভোৎপত্তির কোনই সহায়তা করে না। ঐ শুক্র শুদ্ধগর্ভের কারণ হয় না। তবে বিকৃত গর্ভের কারণ হইতে পারে।

শুক্র শব্দে শুক্ল বলিলে কোন দোষ দেখা যায় না। কেন না শুক্র বাস্তবিকই নির্ম্মল নির্ম্মল বস্তু মাত্রেই শুক্ল। আবার 'র' কার ও 'ল' কারে সমানতা থাকা হেতুও বুঝিবার সুবিধার জন্য শুক্র বলা যায়। ঋষিগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, স্বকীয় অগ্নিদ্বারা পরিপাকে রস হইতে মজ্জা পর্য্যন্ত ছয়টি ধাতুতেই মল উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, কিন্তু স্বর্ণ যেমন সহস্রবার দগ্ধ করিলে সুনির্ম্মল হয়, তদ্রূপ রস বারম্বার পরিপক হওয়া প্রযুক্ত নির্ম্মল অবস্থায় শুক্রত্ব প্রাপ্ত হয়। সেই শুক্র আবার পরিপাক হইয়া তাহার সার অংশ স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে স্থূলাংশ শুক্রে পরিণত থাকে আর স্নেহময় সূক্ষ্মাংশ ওজো ধাতু রূপে পরিণত হয়। এই ওজো ধাতু সমস্ত শরীরেই অবস্থিতি করে। ইহা স্নিগ্ধ, শীতল স্থির, শ্বেতবর্ণ এবং শরীরের বল ও পুষ্টি কারক। মহামতি সুশ্রুত বলিয়াছেন যে, রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত সপ্ত ধাতুর যে পরম তেজোভাগ তাহাকেই ওজ কহে। সেই ওজো ধাতুই বল নামে অভিহিত হয়। এস্থলে অভিপ্রায় এই যে, যে রস হইতে ওজ উৎপন্ন হয়, সেই রস ক্রমান্বয়ে সমস্ত ধাতুর স্থান প্রাপ্ত হইতে হইতে অবশেষে ওজো ধাতুতে পর্য্যাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব রস যখন যে ধাতুতে উপনীত হয়, তখন উহা সে ধাতুরই তুল্য বলিয়া গৃহীত হয়, সুতরাং ওজো ধাতু যে সমস্ত ধাতুরই স্নেহভাগ, তাহাতে সন্দেহ নাই। দুগ্ধের মধ্যে যেমন ঘৃত থাকে, ওজো ধাতুতে সেইরূপ বল অবস্থিতি করে। অতএব ওজোধাতুই বল নামে অভিহিত। ওজো ধাতু দশপ্রকার গুণ বিশিষ্ট, যথা,—গুরু, শীতল, কোমল, স্নিগ্ধ, ঘন, মধুর রস, স্থির, নির্ম্মল, পিচ্ছিল ও শ্লক্ষ্ণ। দেহে শুক্র রক্ষিত হইলেই ওজো ধাতু

বর্দ্ধিত হয়। ওজো ধাতু বর্দ্ধিত হইলেই দেহের তুষ্টি, পুষ্টি ও বলবীর্য্য লাভ হইয়া দীর্ঘজীবি হওয়া যায়, এবং জীবিত কাল পর্য্যন্ত উৎসাহ, দেহের শোভা, কমনীয় কান্তি, ধীরতা, লাবণ্য ও সৌকুমার্য্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভুক্ত দ্রব্যের রস সমূহ পুনঃ পুনঃ পরিপক্কতা লাভ করিতে করিতে একমাস কালে পুরুষের শুক্র এবং স্ত্রীজাতির আর্ত্তব ও শুক্র রূপে পরিণত হয়। চরকে উক্ত আছে যে, ওজোধাতু অষ্টবিন্দু প্রমাণ, সুতরাং অনুমান হয় যে, উহা বড়জোর বত্রিশ বিন্দু শুক্রের সূক্ষ্মাংশই হইবে। এদিকে একবার স্ত্রীসম্ভোগে যে শুক্র নির্গত হয়, তাহা নিশ্চয়ই বত্রিশ বিন্দু অপেক্ষা নিতান্ত কম নহে। তবে দেখা যায় যে, খাদ্যাদির রস পরিপাকে এক মাসের পরিশ্রমে যে শুক্র টুকু প্রস্তুত হয়, অতি বৎ সামান্য ক্ষণ সুখের লালসায় অমন ব্রহ্মবস্তুকে অনায়াসে অপব্যয় করা অপেক্ষা মূর্খতা আর কি হইতে পারে? সুতরাং কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক—সকলেরই বিশেষ সাবধানতার সহিত শুক্র ধারণ করা অতীব কর্ত্তব্য। কামিনীগণের প্রতি আসক্তিতে বিরক্তি উৎপাদন জন্য দত্তাত্রেয় প্রভৃতি ঋষিগণ অবধূত গীতাদি শাস্ত্রে অনেক ঘৃণাজনক বাক্যের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে মাতৃস্বরূপা মহিলাগণের মনে আঘাত লাগিবার কথা, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে, পুরুষ-দেহই যখন প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়ের সংমিশ্রণে প্রস্তুত, তখন প্রকৃতি পরিত্যাগের উপায় কি? আমরা একথা বুঝিতে পারি যে—

নৈব স্ত্রীন পুমানেষ ন চৈবায়ং ন পুংসকঃ।
যদ্ যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স লক্ষ্যতে।

৫ অঃ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

অতএব হি যোগীন্দ্রঃ স্ত্রীপুং ভেদং ন মন্যতে।
সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং ব্রহ্মন্ পশ্যতি নারদঃ॥

১ অঃ প্রকৃতিখণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

সুতরাং স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কোনরূপ ভেদ করিয়া কাহারো প্রতি ঘৃণিতোক্তি সমীচীন বোধ করি না।

কিন্তু এই ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ শুক্রধারণ ব্যাপার কার্য্যতঃ অত্যন্ত কঠিন। এজন্য ইহার অনুষ্ঠানকল্পে যে যে নিয়মাধীন থাকার অভ্যাস করার নিতান্ত প্রয়োজন, তাহার বিবৃত্তিকল্পে আমরা চরক গ্রন্থের শারীর স্থানের ৫ম অধ্যায় এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা—(১১ শ্লোক) "পুরুষ অহংকারাদি দোষে ভ্রাম্যমান থাকে বলিয়া প্রবৃত্তি অতিক্রম করিতে পারে না। প্রবৃত্তিই পাপের মূল। নিবৃত্তিই অপবর্গ, ইহাই শান্তি, অক্ষয়, ব্রহ্ম এবং মোক্ষ। এক্ষণে মুমুক্ষুর উপযোগী উপায় সকল ব্যাখ্যা করিব। লোকদোষদর্শী মুমুক্ষু ব্যক্তি আচার্য্যের নিকট গমন পূর্ব্বক উপদেশ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। অগ্নিসেবা ধর্ম্মশাস্ত্রানুসরণ, ধর্ম্মশাস্ত্রার্থবোধ, ধর্ম্মশাস্ত্ররূপস্তম্ভে আশ্রয় করণ, ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকরণ, সাধুদিগের উপাসন, অসাধু পরিবর্জ্জন, দুর্জ্জনের সহিত অসঙ্গতি, সত্য, সর্ব্বভূতহিতকর বচন, অপরুষ বচন, অনতিকালে পরীক্ষাপূর্ব্বক বচন, সর্ব্বপ্রাণীতে আত্মবৎ দর্শন, স্ত্রীদিগের অস্মরণ, * স্ত্রীদিগের অসঙ্কলন, স্ত্রীদিগের অপ্রার্থনা, স্ত্রীদিগের অনভিভাষণ, স্ত্রীদিগের সহিত সর্ব্বসম্বন্ধ ত্যাগ প্রচ্ছাদনার্থ কৌপীন, (গৃহস্তের পক্ষে অত্যল্প

* আকাশাদি পঞ্চভূত এবং চৈতন্ত এই ছয় ধাতুর সমবায়কেই যখন পুরুষ কহে আবার পৃথক চেতনা ধাতুরও পুরুষ সংজ্ঞা হয়, মন ও দশেন্দ্রিয় প্রভৃতি অষ্ট প্রকার প্রকৃতির চতুর্ব্বিংশতি [illegible] যখন পুরুষের [illegible]

মূল্যের সামান্য বস্ত্র) গৈরিক বসন, কন্থা সীবন হেতু সূচী ও বস্ত্র খণ্ড, শৌচাধান হেতু জল-কুণ্ডিকা, দণ্ড ধারণ ভিক্ষাচর্য্যার্থ পাত্র, (এ গুলি সম্ভবতঃ সন্ন্যাসাশ্রমের ব্যবস্থা, কিন্তু গৃহাশ্রমপক্ষে ইহার মধ্যে নিবৃত্তি মার্গীয় সম্ভবপর উপায় সকল গ্রহণীয় ।) প্রাণ ধারণার্থ বন্য ফলমূলাদি যথাপ্রাপ্তি আহার, শ্রমাপ-নয়নার্থ শীর্ণ শুষ্কপত্র তৃণের আস্তরণ ও উপাধান, ধ্যান হেতু যোগপট, বনে বৃক্ষাদিতলে বাস, তন্দ্রা, নিদ্রা ও আলস্যাদি বিসর্জ্জন, কর্ম্মত্যাগ, বিষয়ে রাগ-দ্বেষ না রাখা, নিদ্রা, স্থিতি, গতি, দৃষ্টি, আহার, বিহার ও অঙ্গ চেষ্টা দির আরম্ভে স্মরণপূর্ব্বক প্রবৃত্ত হওয়া, সৎকার স্তুতি, নিন্দা ও অপমানে ঔদাসীন্য, শ্রম, শীত, উষ্ণ, বাত বর্ষা সুখ ও দুঃখের সহিষ্ণুতা ; শোক, দৈন্য, দ্বেষ, মদ, মান, লোভ, রাগ ঈর্ষ্যা ভয় ও ক্রোধাদি দ্বারা বিচলিত না হওয়া, অহঙ্কার প্রভৃতিকে উপদ্রব জ্ঞান করা, বাহ্যজগতের সহিত পুরুষের সমানতা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করা, মোক্ষার্থ কার্য্যকালের অতিক্রম না করা, যোগারম্ভে সর্ব্বদা অনির্ব্বেদ, সত্বোৎসাহ ও অপবর্গের উদ্দেশ্যে সর্ব্বদা ধী, ধৃতি ও স্মৃতির বলাধান, ইন্দ্রিয়বর্গের শাসন, চিত্তে চিত্তস্থাপন, আত্মাতে আত্ম স্থাপন, ধাতুভেদে শরীরাবয়বের অবধারণ, সমস্ত কারণবৎ দ্রব্যকেই দুঃখময়, অনাত্মীয়, অনিত্য এইরূপ বোধ করা, সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তিকেই দুঃখবোধ এবং সর্ব্ব প্রকার সন্ন্যাসেই সুখবোধ করিয়া অভিনিবেশ, অপবর্গের অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্তির বাধা ঘটিয়া থাকে। এইরূপে নিবৃত্তি মার্গের উপায় সকল ব্যাখ্যা করা হইল॥ (২৩ শারীর স্থান ৫ম অঃ, চরক ।)

এই সকল সুখকর শুদ্ধির উপায় দ্বারা সত্ব বিশুদ্ধ হইয়া তৈলবস্ত্রাদিকরণ যোগে মার্জ্জিত দর্পণের ন্যায় নির্ম্মল হয় এবং গ্রহ, মেঘ, ধূলি ও নীহার দ্বারা আচ্ছাদিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় শোভা পায়। দীপাশয়ের (লণ্ঠনের) দ্বার বদ্ধ করিয়া দিলে তন্মধ্যে নির্ম্মল শিখাবিশিষ্ট দীপ যেমন স্থিরভাবে জ্বলিতে থাকে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণ সংযত হইলে আত্মাতে শুদ্ধ সত্ব স্থির ভাবে প্রকাশ পায়। (২৪ ঐ) শুদ্ধ সত্ব হইতে যে শুদ্ধ সত্যবুদ্ধি উৎপন্ন হয়, যাহার বলে অতিবল মহামোহময় তমঃ ভেদ করা যায়, যদ্দ্বারা নিস্পৃহ ব্যক্তি সর্ব্বভাবের স্বভাব অবগত হইয়া থাকেন, যদ্দ্বারা যোগসাধন করা যায়, যদ্দ্বারা সাংখ্য (সংখ্যাতত্ত্ববিৎ) হওয়া যায়, যাহা প্রাপ্ত হইলে অহংকার থাকে না এবং সুখ দুঃখের কারণ অবগতি হয় ; যাহা থাকিলে অন্য কোন অবলম্বন আর আবশ্যক হয় না ; যাহা থাকিলে সর্ব্বত্যাগ করা যায় ; যাহা থাকিলে নিত্য, অজর, শান্ত ও অক্ষয় স্বরূপ পরব্রহ্মে গমন করা যায়, সেই শুদ্ধ সত্ব-বুদ্ধিই বিদ্যা ; সিদ্ধি, মতি, মেধা, প্রজ্ঞা ও জ্ঞানস্বরূপ। (২৫ ঐ) যিনি বাহ্যজগতের ষড়্ধাতুময় আত্মা এবং ষড়্ধাতুময় আত্মাকে বাহ্যজগৎ দেখিতে পান, সেই ব্রহ্মজ্ঞ ও লোকজ্ঞ মহাত্মার জ্ঞান-মূলা শান্তি কখনই বিনষ্ট হইতে

(৬ শ্লোক শারীর ১ম অঃ) তখন এই হিসাবে স্ত্রীপুরুষ ভেদ নাই। সুতরাং স্ত্রীঅস্মরণ পুরুষের এবং পুরুষ অস্মরণ স্ত্রীদিগের সমান কর্ত্তব্য। কিন্তু পুরুষ[illegible] উভয়ের মাখামাখিভাবে বাস অনিবার্য্য। কেবল সংযম অভ্যাসেই পরস্পর অনাসক্ত থাকিতে [illegible] লেঃ।

পারে না। তিনি সর্ব্বদা জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় সমুদয় ভূতকেই সমান ভাবে দেখিয়া থাকেন, তিনি পরিণামে ব্রহ্মভূত হন এবং পুনর্জ্জন্মের কারণ সকল তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। (২৬ ঐ)

প্রাগুক্ত চরক শাস্ত্রোক্ত উপায়গুলি গৃহী ও সন্ন্যাসী উভয় আশ্রমী ব্যক্তির জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, উহার মধ্য হইতে সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য-গুলি বাদ দিয়া লইলেই গৃহীর কর্ত্তব্য সহজে অবধারিত হইতে পারে। ফলতঃ শুক্রধারণ করিয়া উর্দ্ধরেতা হইতে না পারিলে এবং সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তিমার্গ ত্যাগ অভ্যাস করিতে পরাঙ্মুখ হইলে কখনই মানব আত্মোন্নতি বা বলবীর্য্য লাভ করিয়া দীর্ঘায়ু ও স্বাস্থ্যবান হইতে পারে না। যে কোন কারণে শুক্র নষ্ট হইলেই আত্মক্ষয় হয়, এজন্য স্ত্রীসংসর্গ পুরুষের সর্ব্বদা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

যদি সঙ্গ করত্যেব বিন্দুস্তস্য বিনশ্যতি।
আত্মক্ষয়ো বিন্দুহীনাদসামর্থঞ্চ জায়তে॥
দত্তাত্রেয়।

যদি স্ত্রীসঙ্গ করে তবে বিন্দু নাশ হয়। বিন্দু নষ্ট হইলে আত্মক্ষয় ও সামর্থ্যহীন হইয়া থাকে।

বীর্য্যই ব্রহ্মতেজ বলিয়া বিখ্যাত। বির্য্যের অভাব হইলে মনুষ্যগণের তেজঃ বীর্য্য, সৌন্দর্য্য, শারীরিক বল, ইন্দ্রিয়গণের স্ফূর্ত্তি, স্মরণশক্তি, ধারণাশক্তি প্রভৃতি সমস্ত মনুষ্যত্বই নষ্ট হইয়া দেহটি জ্বর বাত, যক্ষ্মা, প্রমেহ, শ্বাস, রক্তাল্পতা শক্তিহীনতা প্রভৃতি অশেষ রোগের আকর-ভূমি হয়, তজ্জন্যই দেশে অধুনা রোগ সকলের সৃষ্টি হইয়া লোককে চিররুগ্ন এবং অকাল মরণের দিকে অগ্রসর করিতেছে ফলকথা—কি স্ত্রী আর কি পুরুষ—সকলেরই সযত্নে শুক্ররক্ষা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান সময়ে দেশের অধিকাংশ লোকই যেরূপ ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে এ সকল কথা প্রত্যেকেরই ভাবিবার বিষয়।

ওলাউঠা চিকিৎসা।

—:০:—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

(হিক্কা)

(কবিরাজ শ্রীদীননাথ শাস্ত্রী কবিরত্ন।)

হিক্কা একটী প্রধান উপসর্গ। ইহা শীঘ্রই জীবনকে হিংসা করে, অথবা কণ্ঠ হইতে পুনঃ পুনঃ হিক্ শব্দ উত্থিত হয়। এই জন্যই ইহাকে হিক্কা বলিয়া থাকে। সুতরাং হিক্কা নিবারণের জন্য সর্ব্বতোভাবে যত্ন করা উচিত। পূর্ব্বে যে সমস্ত জঙ্গম বিষযুক্ত ঔষধ উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ঔষধ গুলিই সদ্যঃ শ্লেষ্ম প্রশমক এবং সাতিশয় বায়ুবর্দ্ধক। যে প্রকার তাপ দ্বারা সরস বস্ত্র হইতে প্রথমতঃ রস নির্গত হইয়া পরিশেষে [illegible]

সেই রস ক্রমশঃ বিশুষ্ক হইতে থাকে, সেই প্রকার ব্যাধি প্রভাবে, দেহমধ্যে আপনা হইতেই একপ্রকার তীক্ষ্ণ বিষ উৎপাদিত হইয়া প্রথমতঃ শরীরের শ্লেষ্মা বা স্নেহাংশকে তরল করিয়া স্রোতোবাহী পথগুলিকে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলে। পরিণামে সেই বিষ দ্বারাই যখন শরীরস্থ বায়ু সমধিক প্রবল হইয়া উঠে, কিন্তু তরলীকৃত শ্লেষ্মা বা স্নেহাংশকে সহসা সঞ্চালিত করিয়া দিতে পারে না এবং আপনিও শরীর মধ্যে সর্ব্বথা সঞ্চরণশীল হয় না, তখনই হিক্কা বা উর্দ্ধশ্বাস আসিয়া জোটে। দেখিতে দেখিতে অনতি বিলম্বেই শরীর মধ্যে বায়ুর সর্ব্বথা গতিরোধ হইয়া যায়। সুতরাং রোগীও নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়ে; জীবনান্ত হইবার বড় বেশী বিলম্ব থাকে না। এই সময়ে বিহিত বিধানে রোগীর অবস্থা প্রণিধান করিয়া যদি জঙ্গম বিষ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে শীঘ্রই শরীরস্থ প্রাণ নাশক বিষের তেজ হীন-বল হইয়া পড়ে এবং তরলীকৃত শ্লেষ্মা বা স্নেহাংশও ক্রমশঃ বিশুষ্ক ও সঞ্চালিত হইতে থাকে। তৎকালে বাহ্য-বিষ-প্রভাবে দৈহিক বায়ু শক্তিমান্ ও প্রবল হইয়া উঠে। সুতরাং বাতাধিক্য বশতঃ নাড়ীর গতিতে ক্রমশঃ চাঞ্চল্য অনুভূত হইতে থাকে। নাড়ীর স্পন্দনে চঞ্চলতা উপলব্ধি করিলেই বুঝিতে হইবে যে, দৈহিক বিষের তেজ কমিয়া আসিতেছে। তখন শীতল ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করিয়া বায়ুর সংযত রাখিবার চেষ্টা করা উচিত। জঙ্গম বিষ প্রয়োগ করিবার পর যদি নাড়ী ধীরে ধীরে চঞ্চল না হইয়া অকস্মাৎ প্রবল হইয়া উঠে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, অনুপযুক্ত সময়ে বাহ্য বিষ প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রযুক্ত-বিষের অভাব সীমাতিক্রমিত হওয়ায় মুহূর্ত্ত মধ্যেই শরীরস্থ বিষ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং ঐ প্রযুক্ত বিষের দ্বারাই রোগীর জীবনী শক্তি ক্ষীণ, হীন ও নির্ব্বাণ প্রায় হইয়া আসিতেছে। বিষ-প্রয়োগের পূর্ব্বেই সবিশেষ ধীরভাবে আলোচনা করিয়া রোগীর মুমূর্ষু অবস্থায় জঙ্গম বিষ প্রয়োগ করা আবশ্যক। উপযুক্ত সময়ে জঙ্গম বিষ প্রয়োগ করিলে যদি সেই বিষের ক্রিয়া ফলিতে আরম্ভ হয়, তাহা হইলে উপদ্রব নিবারণের জন্য আর দ্বিতীয় ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হয় না। প্রযুক্ত জঙ্গমের দ্বারা জীবন বিনাশের মূলীভূত দৈহিক বিষ বিনষ্ট হইয়া গেলে সেই প্রযুক্ত বিষের পোষকতায় অর্থাৎ শীতল ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করিলে আপনা হইতে সকল প্রকার উপদ্রব তিরোহিত হইয়া যায়। এস্থলে হিক্কা প্রভৃতির উপদ্রব প্রশমক যতগুলি ঔষধ উল্লিখিত হইতেছে, তৎ সমুদয় জঙ্গম বিষ প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বেই প্রয়োক্তব্য। হিক্কা নিবারণের জন্য নির্ধূম অঙ্গারাগ্নিতে মাষকলাই, হিঙ্গুল অথবা গোলমরিচ দগ্ধ করিয়া রোগীর নাসারন্ধ্রে সেই ধোঁয়া প্রদান করিতে হইবে। হিঙ্গুল ও গোলমরিচ গব্য ঘৃতে পেষণ করিয়া একখানি সাদা কাগজে চুরুটের মত শূন্যগর্ভ নল প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহার একদিকে আগুণ জ্বালাইয়া অন্য দিক্ নাকের কাছে ধরিলে হিক্কা নিবারণ হয়। রজনীগন্ধা ফুলের একতোলা রসে ৫।৬ রতি সোরা গুলিয়া পান করিতে দিলেও তৎক্ষণাৎ হিক্কা থামিয়া যায়। মুড়ি ভিজানো জলের সহিত সাদা চন্দন ঘসিয়া ৩০।৪০ ফোঁটা স্তনদুগ্ধের সহিত উহা গুলিয়া পান করাইলে পনর মিনিটের মধ্যে হিক্কা-বেগ উপশমিত হয়। নাভির উপরে কাঁসার বাটী রাখিয়া তাহার মধ্যে ঠাণ্ডা জল ঢালিতে থাকিলে [illegible]

হিক্কার তিরোধান ঘটে। কস্তূরী ২।৩ মাত্রায় লইয়া মধুর সহিত মাড়িয়া ডালিমের অথবা বেদানার রস মিশ্রিত করিয়া ২।৩ বার খাইতে দিলে আশাতীত ফল দেখিতে পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে আমানিও একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা বাহ্য এবং আভ্যন্তর উভয় প্রকারেই প্রয়োগ করা যায়। বাহ্য প্রয়োগের প্রণালী বস্ত্রখণ্ড আমানিতে সিক্ত করিয়া শিরোদেশে পটী দেওয়ার নিয়ম। বস্ত্রখণ্ড সর্ব্বদাই যেন সুসিক্ত থাকে। অভ্যন্তর প্রয়োগের মাত্রা ২।৩ তোলা। আমরুলের রস—গব্য ঘৃতে মিশাইয়া হরিণের চর্ম্মে জল মাখাইয়া—নির্ধূম মৃদু অঙ্গারাগ্নিতে কণ্ঠে, পার্শ্বে, নাভিদেশে স্বেদ প্রদান করিলে হিক্কা বিলীন হইয়া যায়।

(বমি)।

হিক্কার ন্যায় বমিও একটী প্রধান উপদ্রব। ইহাদ্বারা শীঘ্রই শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং ধাতু বসিয়া যায়। ইহা স্বরভঙ্গেরও অন্যতম কারণ। অতিরিক্ত দ্রব পদার্থ পান, অতি স্নিগ্ধ ভোজন, অসাত্ম্য আহার, অধিক লবণ ভক্ষণ, অকালে ভোজন, অপরিমিত ভোজন, অসাত্ম্য ভোজন, দ্রুত ভোজন এবং শ্রম-ভয়-উদ্বেগ-অজীর্ণ-ক্রিমিদোষ, গর্ভাবস্থা ও অপরাপর নানাবিধ বীভৎস কারণ বশতঃ বাতাদি দোষ-ত্রয় শীঘ্র উৎক্ষিপ্ত ও বেগে ধাবিত হইয়া মুখকে পীড়িত ও আচ্ছাদিত এবং অঙ্গে ভঙ্গবৎ পীড়া উৎপাদন করিয়া নির্গত হয়। ইহাকেই (ছর্দ্দি) বমি কহে। বমি হইবার পূর্ব্বে সকলেরই হৃল্লাস, উদ্গার, মুখ হইতে লবণাক্ত পাতলা জলস্রাব এবং পানাহারে নিরতিশয় বিদ্বেষ উপস্থিত থাকে। সাদা জীরা, দুর্ব্বার শিকর, আতপ চাউল, যষ্টিমধু ও কুল বিচির শাঁস—ঠাণ্ডা জলে অথবা বরফ জলে রগড়াইয়া, ছাঁকিয়া লইয়া, একটু একটু করিয়া পান করিতে দিলে বমির উদ্বেগ থামিয়া যায়। স্তনদুগ্ধে শ্বেতচন্দন ঘষিয়া খাওয়াইলেও যথেষ্ট উপকার হয়। বরফের ছোট ছোট টুকরা মুখে রাখিতে দিলেও বমির বেগের উপশম ঘটে।

শ্বেতসর্ষে, বচ এবং লোধ বাটিয়া নাভির নীচে যকৃৎস্থানে প্রলেপ দিলে বমন বেগ বন্ধ হয়। আল্তা, বাবলা ছাল, আম্লা, মউরী, ছোলা, মিশ্রি একসঙ্গে ভিজাইয়া বেশ করিয়া রগড়াইয়া তাহাতে ২।৪ ফোঁটা লেবুর রস মিশাইয়া ২।৩ চামচ করিয়া পান করিতে দিলে পিপাসা ও বমন বেগ উভয়েরই শান্তি হয়।

শূল।

ওলাউঠা রোগে পেটে, তলপেটে এবং নাভিদেশে অত্যন্ত বেদনা হইয়া থাকে। প্রথমত তত্তৎ স্থানে চাপ ধরিয়া সেই চাপ অবিরত সঞ্চালিত হইতে আরম্ভ হয়। তখন বোধ হয়—যেন কেহ এক যোগে সহস্র সহস্র সূচাগ্র মুহুর্মুহুঃ ঐ সকল স্থান পীড়ন করিতেছে এবং বক্ষ, পার্শ্ব, বস্তি প্রভৃতি স্থান যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। ইহা বিষম যন্ত্রণাপ্রদ। শরীরস্থ শ্লেষ্মা স্খলিত হইয়া মলাশয়ে যাইবার সময় এবং ক্রিমিদোষ জন্য এইরূপ বেদনার উপস্থিতি ঘটে। ইহাকে শূল কহে। পূর্ব্ব কথিত বিসর্পণ চূর্ণ ~~[illegible]~~ যথাবিধি সেবন করাইতে পারিলে কাহাকেও এই রোগে বড় বেশী আক্রান্ত হইতে হয় না। পূর্ব্ব সঞ্চিত দোষের প্রকোপ জন্য যদিও কখনও কখনও এই বেদনার সূচনা ঘটে, তাহা হইলেও তাহার উপশমের জন্য বিশেষ কোনও

চেষ্টা করিতে হয় না। প্রায়শঃ আপনা-হইতেই ইহা তিরোহিত হইয়া যায়। ঈদৃশ বেদনা দূর করিবার জন্য অর্দ্ধ তোলা শ্বেত অপামার্গের মূলের রস (আপাঙ্গ) সহ স্বস্ব পরিমিত হরিতাল ভস্ম বা বিশোধিত, শঙ্খবিষ সেবন করিতে দিবে। ২।৩ বার সেবন করাইলেই বেদনা নিবারিত হয়। শোধিত কুঁচিলা ২ রতি এবং কমলাগুঁড়ি ১ আনা—একত্র পেষণ করিয়া এক ছটাক চূণের জলে ভিজাইয়া রাখিবে। কিছুকাল পরে সেই জল ছাঁকিয়া মধ্যে মধ্যে সেবন করাইলে ক্রিমিদোষজনিত বেদনার শান্তি হয়। কচি মূলার রসের সহিত উক্ত ঔষধ সেবন করিতে দিলেও বেদনা দূরীভূত হয়। শুঁঠ, শ্বেত সর্ষপ, সজিনাছাল বাটিয়া প্রলেপ দিলেও এক্ষেত্রে বিশেষ ফল দেখিতে পাওয়া যায়। তারপিন তৈল মর্দ্দনেও উপকার হইয়া থাকে।

ঘর্ম্ম ও তৃষ্ণা।

রস রক্তাদি সপ্ত ধাতু একমাত্র ভুক্ত দ্রব্যের সারাংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ সপ্ত ধাতু যথাক্রমে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হয়। তাহার মধ্যে অসার ভাগকে মল এবং সার ভাগকে শরীর পোষক উপাদান কহে। মেদের যে অসার ভাগ, তাহাকে মেদ-মল অথবা ঘর্ম্ম কহে। ইহা রোমকূপ দ্বারাই নির্গত হইয়া পাকে। সাধারণতঃ শরীরস্থ যে ~~জলীয়াংশ~~ জলীয়াংশ রোম-কূপদ্বারা নির্গত হয়, আমরা তাহাকেই ঘর্ম্ম বলিয়া থাকি। ওলাউঠা রোগে মলদ্বার দিয়াও ঐ সকল জলীয়াংশ নির্গত হয়। কিন্তু তাহা ঘর্ম্ম বলিয়া কথিত হয় না। যে কোন প্রকারেই হউক না কেন, শরীর হইতে জল নিঃসরণ হইতে থাকিলেই প্রথমতঃ অত্যন্ত পিপাসা হয়, শেষে অঙ্গ সমূহ ক্রমশঃ শীতল ও শিথিল হইতে থাকে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে, শ্রম বা বলক্ষয়াদি—বাত প্রকোপ হেতু দ্বারা অথবা কটু, অম্ল, ক্রোধ ও উপবাসাদি—পিত্তবর্দ্ধক কারণ বশতঃ স্বস্থান সঞ্চিত কুপিত পিত্ত, বায়ুর সহায়তায় ঊর্দ্ধপ্রসৃত তালু ও ক্লোম (পিপাসাস্থান) স্থানে গমন করিয়া তৃষ্ণা উৎপাদন করে। জলবাহী স্রোতঃ সমূহ বাতাদি দোষ কর্ত্তৃক দূষিত হইলে পিপাসা জন্মিয়া থাকে। যাহা হউক ঘর্ম্ম ও পিপাসা—এই দুইটি উপদ্রব বড়ই ভয়াবহ। ইহাদিগের দ্বারা শীঘ্রই মোহ উপস্থিত হইয়া জীবনান্ত হইতে পারে। এ অবস্থায় কখনও জল পান করিতে নিষেধ করা উচিত নহে। যদিও অতিরিক্ত মাত্রায় জল পান করিলে প্রকৃত পক্ষে পীড়ার কোন উপকার না হইয়া অপকারই ঘটে স্বীকার করি, কিন্তু তাহা হইলেও আশু জীবন রক্ষার জন্য মধ্যে মধ্যে কর্পূর বাসিত পরিস্কৃত শীতল জল অথবা বরফ জল দেওয়া সঙ্গত। সেই সঙ্গে হেতু প্রষেধক ঔষধও প্রয়োগ করাও কর্ত্তব্য। যাদৃশী শক্তি প্রভাবে শরীর হইতে যে জাতীয় বস্তু নিঃসৃত হইতে আরম্ভ হয়, তাদৃশী শক্তি বিশিষ্ট অন্য জাতীয় বস্তু প্রয়োগ না করিলে কখনও সেই নিঃসরণ-ক্রিয়ার রোধ হইতে পারে না।

সুপক্ক নীরস সুপারি সূক্ষ্মরূপে চূর্ণ করিয়া অর্দ্ধ রতি মাত্রায় লইয়া কিঞ্চিৎ শীতল জলের সহিত সেবন করাইলে, ঘর্ম্ম, তৃষ্ণা এবং মোহ প্রভৃতি দূরীভূত হয়। অথবা "ষড়ঙ্গ পানীয়ে"র বিধানানুসারে সুপারির কাথ প্রস্তুত করিয়া মধ্যে মধ্যে সেবন করিতে দিলেও [illegible]

দেখিতে পাওয়া যায়। তাম্রবর্ণ অর্থাৎ কচি কচি আমের পাতা ও কাল জামের পাতার ক্বাথ সেবন করিতে দিলেও পিপাসা উপশমিত হয়। সুস্থ শরীরে অধিক মাত্রায় সুপারি ভক্ষণ করিলে যে তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম, শরীরে অস্থিরতা, বুকে পেটে খালি ধরা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়, ইহা সর্ব্বজন বিদিত, কিন্তু যাহাতে যে রোগের উৎপত্তি বেশ প্রণিধান পূর্ব্বক সমীচীনতার সহিত প্রয়োগ করিতে পারিলে সেই সেই দ্রব্যে সেই সেই রোগের তিরোধান ঘটে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, ওলা-উঠা রোগ সংক্রামক হইলে অনেকে একটি গোটা সুপারি হাতে বাঁধিয়া দিয়া থাকেন, সুতরাং ইহা দ্বারাও সুপারিতে বিসূচিকা দমনের শক্তি অনুধ্যানযোগ্য। অনেক দ্রব্যই বাহ্য এবং অভ্যন্তর প্রয়োগে যুগপৎ বিস্ময়াবহ সুফলের উৎপাদন করিয়া থাকে।

প্রাচীন চিকিৎসকের টোটকা ও মুষ্টিযোগ। *

(শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র লাহিড়ী)

মৃতবৎসার মাদুলী।— অপামার্গের শিকড় তাবিজে ভরিয়া শনি অথবা মঙ্গলবারে শুদ্ধ হইয়া ধারণ করিলে মৃতবৎসাদোষ দূর হয়।

রক্ত আমাশয়ে।—বুনো পুঁইপাতা ৪-৫টী গব্য ঘৃতে ভাজিয়া খাইলে যে প্রকার রক্ত আমাশয়ই হউক না কেন—নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে।

শ্বাসে।—আফুলা দ্রোণপুষ্পের (গলঘসিয়া), শিকড় ১০টা, মরিচ ২১টা প্রাতঃস্নান করতঃ যথাশক্তি গরম জলসহ উক্ত ঔষধ খাইতে হইবে এবং তৎপর গরম কাপড় দ্বারা শরীর আচ্ছাদন করতঃ ৩ ঘণ্টা কাল বসিয়া থাকিতে হইবে। এইরূপ প্রক্রিয়া ক্রমান্বয়ে ৭ দিন করিলে প্রবল শ্বাস দূর হয়।

উপদংশে।—শ্বেত করবির মূল ঘসা

---

* বরেন্দ্রভূমিতে স্বর্গীয় ধন্বন্তরিকল্প কবিরাজ ৺জয়রাম লাহিড়ী মহাশয়ের নাম সর্ব্বজন বিদিত। তাঁহার চিকিৎসার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যদিবার লোক এখনও অনেকেই জীবিত আছেন। কীর্ত্তিমান্ কুশলী কবিরাজ অনেকেই ছিলেন, এখনও অনেকেই আছেন। স্বর্গীয় মহাত্মা কবিরাজ লাহিড়ী মহাশয়ের বৈশিষ্ট প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ লইয়া লোকে যাহাকে বলে "শুধু হাতে বাঘ মারা", যাঁহার অনন্য সাধারণ কার্য্য প্রণালী ঠিক তদ্রূপই ছিল। চিকিৎসার্থ যেথানেই আহূত হইতেন না কেন, তাঁহার প্রযোজ্য ঔষধের কুত্রাপি অভাব হইত না। তাই আজ আমরা তাঁহার অমোঘ মুষ্টিযোগ ও ঔষধাবলী ধারাবাহিক রূপে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বারান্তরে স্বর্গীয় কবিরাজ মহাশয়ের বিচিত্রতাপূর্ণ শিক্ষাপ্রদ অলোকসামান্য জীবন-আখ্যায়িকা লিখিতেও প্রয়াসী হইব। ইনি শুধু প্রাতঃস্মরণীয় কবিরাজ ছিলেন না, যোগের মূর্ত্তিমান অবতার বলিয়াও অনেকের ধারণা ইঁহার উপর অতি অধিক মাত্রায় ছিল।—লেখক।

১ তোলা রক্তচন্দন ঘসা ১ তোলা, একত্র মিশাইয়া ৩টী বটীকা প্রস্তুত করিতে হইবে। ঐ বটিকা ১টী করিয়া প্রত্যহ প্রাতে নিম্বপত্র ও গুলঞ্চের রস সহ সেব্য।

নাসা ও রক্তপিত্তে।—ছাগদুগ্ধ ।/০ পোয়া, (একপোয়া) রক্তচন্দন ঘসা, মধু, গব্য-ঘৃত ও চিনি প্রত্যেক ১ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া যজ্ঞডুমুরের রস সহ সেব্য।

স্বপ্নদোষে।—আফিং ৴০ আনা (এক আনা) রসসিন্দুর ।০ আনা (চারি আনা) শীতল জল সহ উক্ত ঔষধ মর্দ্দন করিয়া একটি সর্ষপ অপেক্ষা সামান্য মাত্র একটু বড় করিয়া বটি প্রস্তুত করিতে হইবে, ঐ বটী রাত্রে গরম দুগ্ধ ২ তোলা সহ সেব্য।

প্রমেহে।—কচি শিমুল মূলের ছাল ।/০ পোয়া, কলমী সোরা ৴০ ছটাক, চন্দনের বীজ ১ তোলা শ্বেতচন্দন ঘসা ২ তোলা একত্র মর্দ্দন করিয়া ৫ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। কচি শিমুল মূলের রস ২ তোলা মধু ও কাবাব চিনির চূর্ণ সহ প্রাতে ও বৈকালে এক এক বটিকা সেব্য।

ঘায়ে।—ঘায়ে—তিল তৈল ।/০ পোয়া, বিশুদ্ধ মোম ৴০ ছটাক কুচিলা অৰ্দ্ধ তোলা, নিমপাতা বাটা ১ তোলা, শ্বেতধুনা অৰ্দ্ধ তোলা একত্রে মিশাইয়া একটি মৃতপাত্রে রাখিতে হইবে। এই ঔষধ যে প্রকার ক্ষত হউক না কেন, মন্ত্রের ন্যায় কার্য্যকরী হইবে।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

—:*:—

দান।—গয়ার গোস্বামী রামধন পুরী মহাশয় কিছুদিন হইল অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যা-লয় পরিদর্শনে প্রীতিলাভ করিয়া ইহার উন্নতি কল্পে ৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন, এ জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

ইনফ্লুয়েঞ্জার সংবাদ।—ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ বাঙ্গালা দেশে ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। যুক্ত-প্রদেশেও ইনফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণ খুব কম দাঁড়াইয়াছে। করাচী ও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কোনো কোনো স্থানে ইহার আক্রমণের গতি কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কলিকাতার মৃত্যু-হিসাব।—কলিকাতার মৃত্যু সংখ্যা গত বৎসর যেরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, ১৯০৭ সালের পর হইতে আর সেরূপ দেখা যায় নাই। গত বৎসর কলিকাতা সহরে মোট মৃত্যুসংখ্যা ৩১,৩৭১। এই মৃত্যুর হারের হাজার করা হিসাব ৩৫,০। উহার পূর্ব্ব বৎসর অর্থাৎ ১৯১৭ সালে কলিকাতার লোক মরিয়াছিল মোট ২১,৩৬০ জন এবং ঐ মৃত্যুর হারের হাজার করা হিসাব হইয়াছিল ২৩৮। এই হিসাবে বুঝা যায় ১৯১৭ সাল অপেক্ষা ১৯১৮ সালে [illegible]

মোট মৃত্যু সংখ্যা দশ হাজার এবং হাজার করা ১১'২ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ক্রমশঃ কলিকাতার স্বাস্থ্যোন্নতি কিরূপ ঘটিতেছে, তাহা এই মৃত্যুর হিসাব হইতেই উপলব্ধি হইতে পারে!

দিল্লীর হাকিম।—কয়েকদিন হইল দিল্লীর স্বনামখ্যাত হাকিম হাজিমুল্ক আজমল খান এবং সুলতান সিং রায় বাহাদুর এবং ডাক্তার বি, কে, মিত্র অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় পরিদর্শনে প্রীতিলাভ করিয়া প্রত্যেকে ১০০৲ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। হাকিম সাহেব এবং সুলতান সিং রায় বাহাদুর দিল্লীর আয়ুর্ব্বেদ কলেজের জন্য চাঁদা তুলিতে ব্রহ্মদেশে গিয়াছিলেন এবং সেখানে আড়াই লক্ষ টাকা তুলিয়া ফিরিবার সময় কলিকাতার পথে এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়াছিলেন। দিল্লীর এই আয়ুর্ব্বেদ কলেজ হাকিম বাহাদুরেরই প্রভূত চেষ্টার ফলপ্রসূত। লর্ড হার্ডিংঞ্জের যত্নে একলক্ষ টাকা পাইয়া হাকিম বাহাদুর এই কলেজের উন্নতিকল্পে বদ্ধ পরিকর হন। ব্রহ্মদেশের লোকে দিল্লীর আয়ুর্ব্বেদ কলেজের কল্যাণ-কামনায় চাঁদা দিয়া অবশ্যই ধন্যবাদার্হ কিন্তু কলিকাতার আয়ুর্ব্বেদ কলেজটির উন্নতির জন্য বঙ্গদেশের অধিবাসীগণ কি করিতেছেন?

সদনুষ্ঠান।—গত ১৩ই ও ১৪ই ডিসেম্বর জেলা দাতব্য সমিতি হইতে জোড়াসাঁকো রাজবাটীতে তের শত দরিদ্র ও পীড়িত লোককে বস্ত্রদান করা হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে শীতবস্ত্র বিতরণের জন্য বাবু কুমারকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় তিন শত টাকা সমিতির হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন।

চিকিৎসালয়ে দান।—মেদিনীপুরের 'নীহারে' প্রকাশ—কাঁথির প্রবীন উকীল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার মহাশয় সেখানকার দাতব্য চিকিৎসালয়ের মহিলা বিভাগের উন্নতি কল্পে শতকরা ৩৲ টাকা সুদের ৩০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ প্রদান করিয়াছেন ইহার পূর্ব্বে ঐ উকীল মহাশয় ঐ উদ্দেশ্যে ৪০০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন।

শিশুমৃত্যু।—বিহার ও উড়িষ্যায় যত শিশু জন্মে, উহার তৃতীয়াংশ জন্মের অল্পকাল মধ্যেই মরিয়া থাকে। সমগ্র বঙ্গদেশে শিশু মৃত্যুর মরণের হিসাব হাজার করা ১৮৫ এবং সমগ্র ভারতে উহার হাজার করা হিসাব ২০৬। বিহার ও উড়িষ্যার হাজার করা হিসাব ১০৮। ইংলণ্ডে হাজার করা ৯১ জন শিশুর মৃত্যু হইয়া থাকে। সুতরাং আমাদের দেশে শিশু মৃত্যুর অবস্থা কিরূপ শোচনীয় তাহা সহজেই অনুমেয়।

সমালোচনা।

রোগ নির্ণয় সংগ্রহঃ। প্রথমঃ ভাগঃ। কবিরাজ শ্রীভুবনেশ্বর গুপ্ত কবিরঞ্জন প্রণীতঃ প্রকাশিতশ্চ। ৬৪নং সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতায় গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়। মূল্য ১৲ টাকা। রোগ নির্ণয় সম্বন্ধে এই গ্রন্থখানি অভিনব ভাবে লিখিত হইয়াছে। এক একটি

প্রধান লক্ষণ কতকগুলি রোগে দেখা যায়, তাহার তালিকা লিপিবদ্ধ করিয়া রোগ নির্ণয় প্রণালীর সূচনা ভালই করা হইয়াছে, কিন্তু যথার্থ রোগনির্ণয় ইহা দ্বারা হইবে কিনা বুঝা গেল না, তবে গ্রন্থকারের উদ্যম প্রশংসনীয়। ২য় ভাগে রোগনির্ণয়-প্রণালী প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হইবে না।

দ্রব্যগুণ দর্পণম্। প্রথম ভাগঃ। কবিরাজ শ্রীভুবনেশ্বর গুপ্ত কবিরঞ্জনেন প্রণীতঃ প্রকাশিতঞ্চ। মূল্য ১॥০ টাকা। দ্রব্যগুণ শিক্ষার ইহা একখানি উৎকৃষ্ট প্রাথমিক গ্রন্থ। দ্রব্যগুণে জ্ঞান না থাকিলে সুচিকিৎসক হওয়া যায় না। চিকিৎসা বিষয়ের প্রথম শিক্ষার্থিগণ যদি এই পুস্তকখানি আয়ত্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে চিকিৎসার কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহারা উপকৃত হইবেন। তবে ২য় ভাগ প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত ইহাও অসম্পূর্ণ গ্রন্থ।

সন্ধি বোধম্। বাঁকুড়ান্তর্বর্ত্তি বিষ্ণুপুর বাস্তব বৈদ্য শ্রীভোলানাথ দাশ শর্ম্মণা প্রণীতং প্রকাশিতঞ্চ। মূল্য ॥০ আনা গ্রন্থকার ব্যাকরণের সন্ধিগুলিকে কবিতা করিয়া লিখিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সে প্রয়াস সফল হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারিলাম না। ব্যাকরণের মত নীরস জিনিষকে সরস কবিতায় অনুবাদ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কেবল রাঘব ভট্টাচার্য্যের এই চেষ্টা সফল হইয়াছিল। তিনি পদ্যে শিশুদিগকে ব্যাকরণের সূত্রগুলি অতি সরল ভাষায় বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার একটি সূত্র এইরূপ—

"ঋকার রকার ষকার পরে ন কার যদি
থাকে।
কচ্ করি তার কাটি মাথা—কোন বাপে তায়
রাখে।"

এই শ্লোকটির অনুকরণে আলোচ্য গ্রন্থের গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—

ঋকার রকার ষকারের পর ন কার থাকে যদি,
মাত্রাটি তার কেটে ফেলে মাথাটা তুলে দি।

রাঘব ভট্টাচার্য্যের—এরূপ অনুকরণ তো এ গ্রন্থে যথেষ্ট আছেই, তা' ছাড়া যেখানে গ্রন্থকারের নিজস্ব সূত্র রচিত হইয়াছে—সেই স্থানেই সেই সূত্র গুলি দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে। ইঁহার নিজস্ব একটি কবিতারও নমুনা দেওয়া গেল,—

অক্ষ শব্দ থাকলে' পরে জানালা বুঝালে,
গোএরও অব হয়,—না হয় প্রাগ্যঙ্গ হোলে।

তবে এই গ্রন্থ মধ্যে যে স্তোত্রাবলী লিখিত হইয়াছে, সে গুলি উৎকৃষ্ট। স্তোত্রগুলি যেরূপ সুমধুর ছন্দে লিখিত, সেইরূপ সদ্ভাব প্রবণ।

গান। দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস। শ্রীবিহারি লাল সরকার কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ॥০ আনা। আদ্যাশক্তি জগন্মাতার আগমনী ও বিজয়া প্রসঙ্গে এই গান বিরচিত, ইহা ভিন্ন শ্রীশ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীশ্রীশ্যামার উদ্দেশেও কয়েকটি গান রচিত হইয়াছে। এই গান গুলির রচয়িতা বিহারি বাবু এখনকার দিনের একজন শ্রেষ্ঠ সম্পাদক। ভাষার ছটায় এবং ভাবের সম্পদে "বঙ্গবাসী"র এত যে গৌরব—তাহা এখন বিহারিবাবুরই প্রসাদে। "গান" সেই বিহারি বাবুর পরিপক্ক হস্তের অঙ্কিতকীর্ত্তি। শুধু ভাব ও ভাষার কথা নহে, এই গান গুলিতে বিহারি বাবুর অন্তর্নিহিত আবেগ ধারা যেন আকুল হইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃত পক্ষে এই গান গুলির প্রত্যেক কথাটিই যেন ভক্ত সাধকের প্রাণের উচ্ছ্বাস। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এই গান গুলি গীত হউক, কুকর্ম্ম-নিরত বাঙ্গালী সন্তান আবার মায়ের নামে জাগিয়া উঠুক, বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে আগমনী ও বিজয়ার গানে সে কালের ধর্ম্মভাব আবার ফিরিয়া আসুক—ইহাই আমরা কামনা করিতেছি।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৪র্থ বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৬—পৌষ। | ৪র্থ সংখ্যা।

পল্লী-স্বাস্থ্য।*

——:০:——

এমন একদিন ছিল—যে দিন বাঙ্গালার পল্লীগুলিতে কিছুরই অভাব ছিল না, দেহ ধারণের সকল সামগ্রীই বাঙ্গালার পল্লীগুলিতে প্রকৃতি দেবী সযত্নে সাজাইয়া রাখিতেন। নদী বহুলা বলিয়া পল্লীভূমির যে প্রসিদ্ধি ছিল, তাহা হইতে পল্লীবাসীর বিশুদ্ধ জলের অভাব হইত না। দেহধারণের জন্য জল, বায়ু ও আলোক—যে তিনটি দ্রব্যের একান্ত আবশ্যক, বাঙ্গালার সকল পল্লীবাসীই সে তিনটি দ্রব্য বিশুদ্ধভাবে প্রাপ্ত হইত। এখন বাঙ্গালার অনেক নদী হাজিয়া মজিয়া গিয়াছে, পুষ্করিণী-দীর্ঘিকা সকল বহুকালাবধি সংস্কারের-অভাবে পঙ্কিল হইয়াছে, কাজেই অনেক পল্লীতেই এখন জলকষ্ট হইয়াছে। আর বায়ু ও আলোক :—নিদাঘ সন্তপ্ত-পল্লী-কৃষকের অঙ্গে শাল তমাল পত্রের মর্ম্মর বায়ু এখনও প্রবাহিত হয় বটে, কিন্তু পল্লীভূমির চতুঃপার্শ্বস্থ নালা ডোবা বিস্তৃতির ফলে সে বায়ুও যেন এখন কতকটা বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃতিরাণী পল্লীমাতার উদ্দেশে এখনও মার্ত্তণ্ড ময়ুখ এবং হিমাংশু কিরণ বিকীরণ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু অবিশুদ্ধ জল বায়ুর নিকট সে কিরণ সম্ভার বিশেষ কার্য্য করিতে পারে না। পল্লী গ্রামে এইজন্যই রোগের জ্বালা এবং তাহা হইতেই বাঙ্গালার পল্লীগুলি শ্মশান হইতে বসিয়াছে।

কিন্তু এমনটা হইল কেন? কাহার অভিসম্পাতে পল্লীভূমির এরূপ দুর্গতি হইল? ইহার উত্তর দিতে হইলে পল্লীবাসীকেই ইহার কারণ বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করিব। যে জল—দেহ ধারণের প্রধান জিনিষ,—সে জলের দুর্গতি পল্লীবাসী নিজ হইতেই উপস্থিত করিয়াছে।

* কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ সভার ৯ম বার্ষিক ৩য় সাধারণ অধিবেশনে পঠিত।

স্বীকার করিলাম,—বাঙ্গালার অনেকগুলি নদীর দুর্গতি নানা কারণে হইয়াছে এবং পল্লীভূমির স্থানে স্থানের বায়ু ও তজ্জন্য অবিশুদ্ধ হইয়াছে, - কিন্তু সে সেকালের দীর্ঘিকা-পুষ্করিণীগুলির পঙ্কোদ্ধারের জন্য একালের পল্লীবাসিগণ কি কোনোরূপ চেষ্টাশীল হইয়াছেন? জল দেহ ধারণের প্রধান সামগ্রী বলিয়া জলের অন্য নাম জীবন। এই জন্যই আমাদের দেশে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা। সে ব্যবস্থার পালনের জন্য নূতন নূতন জলাশয়ের প্রতিষ্ঠা তো দূরের কথা, পূর্ব্বপুরুষ দিগের প্রতিষ্ঠিত দীর্ঘিকা-পুষ্করিণীর সংস্কারের জন্যও এখন কয়জন চেষ্টাশীল? আগে পল্লী-জননীর কৃতী সন্তানগণ স্বকীয় শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বাগ্রে জন্মভূমির শ্রীবৃদ্ধির জন্য মনোভিনিবেশ করিতেন। তখনকার দিনে গ্রামে একজন শ্রীমান পুরুষ জন্মগ্রহণ করিলে, সে গ্রামখানি শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিত। তখনকার দিনে অনেক গ্রামেই দোল হইত, দুর্গোৎসব হইত, রথ হইত, রাস হইত—এক কথায় বাঙ্গালার হিন্দুর পল্লীগুলিতে বারমাসে তের পার্ব্বণ হইত। অনেকগুলি সমৃদ্ধি সম্পন্ন পল্লীতে বর্ষে বর্ষে বারইয়ারি পূজাও হইত। ইহার ফলে ধর্ম্ম কর্ম্ম অন্য যাহা হয় হউক,—তা' ছাড়া প্রতিমা বাহির করিবার জন্য গ্রামের রাস্তাঘাট গুলি পরিষ্কার করা হইত, ফলে প্রতি বর্ষেই ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, গ্রামের বন-জঙ্গলগুলি কাটিয়া ফেলা হইত। ধর্ম্ম কর্ম্মের কথা ছাড়িয়া দিলেও—স্বাস্থ্যরক্ষার দিক দিয়াও ইহাতে যে পল্লীগুলির বিশেষ উপকার হইত—তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

ম্যালেরিয়ার তাড়নে পল্লীমাতার সুসন্তানগণ অধুনা বিদেশবাসী। কিন্তু সেই ম্যালেরিয়া বাঙ্গালার পল্লীগুলিতে কিরূপভাবে প্রবেশ করিবার সুযোগ পাইল—সে কথাটি একটু ভাবিয়া দেখুন দেখি! ম্যালেরিয়া কবে আমাদের দেশে প্রবেশ করিয়াছে তাহার সঠিক ইতিবৃত্ত নাই, কিন্তু ১৮০৪ খৃঃ অব্দে মুর্শিদাবাদ ও কাশিমবাজারের কয়েকজন ব্যক্তি এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল, তাহার একটু পরিচয় পাওয়া যায়। এই ১৮০৪ খৃঃ অব্দ ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভকাল। জাতীয় বৃত্তি নিরত-বাঙ্গালার চাকরি করিবার স্পৃহা এই সময় অল্পে অল্পে জাগিয়া উঠিতেছিল এবং তাহারই ফলে দেশ মাতৃকার সুসন্তানগণ জননী জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক সপরিবারে কর্ম্মস্থলে আবাস স্থান নির্ণয়ের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। তখনও বাঙ্গালার জলকষ্ট সম্পূর্ণরূপে হয় নাই, কিন্তু অনেক পল্লীভূমিই জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া আসিতেছিল, তবে তখনও সে সকলের পরিণতি খুব বেশী রূপ হয় নাই বলিয়া সে আক্রমণের গতিও অধিক হইতে পারে নাই। কিন্তু ইহার বিশ বৎসর পরে রাজা সীতারাম রায় প্রতিষ্ঠিত মহম্মদপুর ধ্বংস করিয়া এই দুরন্ত ব্যাধি যখন চিত্রানদীর উভয় পার্শ্ব দিয়া গ্রামের পর গ্রাম, জনপদের পর জনপদ উচ্ছেদ করিতে লাগিল, যখন নলডাঙ্গার মত গ্রাম, গদাখালির মত বাণিজ্য বহুল বন্দর,—তা'রপর নদীয়ার কাঁচড়াপাড়া, চাকদহ, বীরনগর প্রভৃতি গ্রামগুলি বিধ্বস্ত করিয়া তুলিল,—তখন পল্লীবাসিগণেরও সে কালের চালচলন অনেক বদলাইয়া আসিয়াছে। তখন অনেক পল্লীরই জলাশয়গুলি হাজিয়া মজিয়া উঠিয়াছে, অনেকের নাট মন্দির ও চণ্ডীমণ্ডপে অশ্বত্থ বটের শিকড় গজাইয়াছে, অনেক পতিত

প্রাসাদের গ্রথিত ইষ্টক ভেদ করিয়া কতক গুলি বিটপ শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে। অনেক পল্লীবাসীই স্বজাতির মায়া পরিত্যাগ করিয়া,—আত্মীয় . স্বজনের প্রীতি-সখ্যতা বিসর্জ্জন দিয়া,—দরিদ্র প্রতিবাসীর আগ্রহ আকাঙ্খা ভুলিয়া গিয়া,—পল্লীমাতার অঙ্ক ছাড়িয়া সহরবাসী হইয়া পড়িয়াছেন। ফলে অনেক পল্লীতেই জলকষ্ট হইল, পূতিগন্ধময় স্বল্পতোয়া পঙ্কিল ডোবার মধ্যে ম্যালেরিয়ার সজাব জীবাণুবাহীদল পুষ্টি পাইতে লাগিল, জঙ্গলাকীর্ণ স্থানগুলি তাহাদের বিহারভূমি হইল, ফলে যাহারা পল্লীজননীর অঙ্ক পরিত্যাগ করিল না, তাহারা ঐ সকল মশকাক্রমণে সহজেই ম্যালেরিয়ার কালকবলে পতিত হইতে লাগিল,—এমনই করিয়া বাঙ্গালার পল্লীগুলি ধ্বংস হইতে বসিল।

পল্লীগুলি ধ্বংস হইতে বসিল,—কিন্তু পল্লীর কৃতীপুরুষগণ সহরে আবাসস্থান নির্ণয় করিয়াই বা কি সুখ পাইলেন? সহরে আসিয়া সহর প্রবাসিগণ কলের জল পাইলেন, গ্যাস বিদ্যুতের আলোক পাইলেন, সাধ মিটাইবার, সখ পূরণ করিবার—সভ্য হইবার সকল উপকরণই পাইলেন, কিন্তু সহরের জনসঙ্ঘে সহরের বাষ্প রাশি বদ্ধ হইয়া পড়িল, একটির পর আর একটি সৌধ, তাহার পার্শ্বে আর একটি সৌধ, সেই ধবল শুভ্র সৌধপ্রান্তে আবার সৌধ,—পার্শ্বে সৌধ, পশ্চাতে সৌধ, সম্মুখে সৌধ,—কাজেই সহরের সেই সৌধ শিখর ভেদ করিয়া মার্ত্তণ্ড দেব আর ময়ূখমালা বিস্তারে সমর্থ হইলেননা,—পূর্ণিমার চন্দ্র দূরে—অতি দূরে—অন্তরালে থাকিয়াই হাস্যরাশি বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন,—বায়ু বদ্ধ—আলোকের অভাব—কাজেই সহরের সহজ সুলভ কলের জলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ পীড়িত পল্লী পরিত্যক্ত সহর প্রবাসীর স্বাস্থ্যসুখ উপলব্ধির সুযোগ ঘটিলনা, ফলে চিত্রগুপ্তের দপ্তরে সহরের মৃত্যু সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়াই উঠিল,—কলেরা-রাক্ষসী তাণ্ডবলীলা করিতে লাগিল,—ক্রমে প্লেগ ছুটিল,—ফুস ফুসের পীড়া বৃদ্ধি পাইল,—মিউনিসিপ্যালিটির কৃপায় সহর প্রবাসীর সুখ সমৃদ্ধির ব্যবস্থা যত উত্তমরূপেই করা হউক, সহরপ্রবাসী কিন্তু রোগের হাত হইতে অব্যাহতি পাইল না, কাজেই ম্যালেরিয়ার ভয়ে পল্লী ছাড়িলেও পল্লী ভূমির চাকরিগত প্রাণ কর্ম্মঠ পুরুষগণ সহরে আসিয়াও সুখী হইতে পারিল না।

সুখী হইতে পারিবে কিসে? সুখী হইতে হইলে সকল বিষয় অপেক্ষা সর্ব্বাগ্রে স্বাস্থ্য সুখ অন্বেষণ করিতে হইবে। স্বাস্থ্য সুখ অন্বেষণ করিতে হইলে যে সকল পুষ্টিকর আহার্য্যের প্রয়োজন, পল্লীবাসীকে যে সে সকল বিসর্জ্জন দিয়া আসিতে হইয়াছে! দুগ্ধের মত বলবর্দ্ধক ও পুষ্টিকর দ্রব্য আর কিছুই নাই, সেইজন্য পল্লীবাসীর ঘরে ঘরে গাভীপালনের যে ব্যবস্থা ছিল, সহরে আসিয়া নানা কারণে সে ব্যবস্থা রহিত করিতে হইল। দুগ্ধ ঘৃত বিসর্জ্জন দিয়া, অখাদ্য—কুখাদ্য—অমিত—অহিত সহরপ্রবাসী পল্লী পরিত্যক্ত পুরুষগণ স্বচ্ছন্দ মনে ক্রমশঃ উদরস্থ করিতে অভ্যস্ত হইলেন। শরীর শুদ্ধির জন্য—সাধারণতঃ বায়ু ও পিত্ত প্রধান বাঙ্গালীর ঐ দুইটি ধাতুর সাম্যভাব রক্ষার জন্য পল্লী পরিত্যাগের পূর্ব্বে যে প্রাতঃস্নানের প্রথা ছিল, সহরে আসার পর হইতে সে প্রথা লুপ্ত হইল। তাহার পর—পূজা আহ্নিকে চিত্তশুদ্ধির পর, আদা, ছোলাভিজা, গুড়, চিনি,—মুড়ি—

নারিকেল—যাঁহার যাহা জুটিত তিনি তাহাই খাইয়া মধ্যাহ্ন ভোজনের যে প্রতীক্ষা করিতেন, তাহারও পরিবর্ত্তন হইল,—এক কথায় আহার বিহার—বেশ-বিন্যাস—চাল-চলন—সকল বিষয়েই বাঙ্গালী-পল্লীবাসীর সহরে আসিয়া সকলই নূতন হইল। ফলে বাঙ্গালীর ধাতুতে এ পরিবর্ত্তন সহ্য হইল না, সেইজন্য ম্যালেরিয়ার আকরভূমি-পল্লী পরিত্যাগেও বাঙ্গালী স্বাস্থ্য সুখ উপভোগ করিতে পারিল না।

বর্ত্তমান সময়ে সকল দ্রব্যই যেরূপ দুর্ম্মূল্য—তদুপরি কলিকাতার বাড়ী ভাড়ার হার যেরূপ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে অনেক স্বল্প আয়ের বাঙ্গালী শ্রমজীবির কলিকাতা বাসের স্পৃহাও যেরূপ বলবতী হইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালীর নিকট স্বাস্থ্য সুখের আশা যে চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়া—থাকিবে, এ কথাও জোর করিয়া বলা যাইতে পারে। কারণ আমরা বরাবরই বলিতেছি,—আলোক, রৌদ্র এবং বায়ুই মনুষ্যের স্বাস্থ্য সুখের প্রধান উপকরণ। স্বল্প আয়ের উপর নির্ভর করিয়া কলিকাতায় প্রাসাদ লইয়া বাস করা চলেনা, কাজেই অধিকাংশ পল্লীবাসী যেরূপ বাড়ীতে বাস করিয়া থাকেন, আলোক-রৌদ্র-বায়ু তাহাদের ত্রিসীমানায় প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। কাজেই একে দুগ্ধ ঘৃতের মত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, তাহার উপর কদর্য্য স্থানে বাসের জন্য বাঙ্গালীর পরমায়ু যে ক্রমশঃই স্বল্প হইয়া আসিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি !

সেই জন্য আমাদের মনে হয়, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ গণের পতিত ভিটা গুলির দ্বার উন্মুক্ত করিয়া—সেই সকল ভিটায় সান্ধ্য প্রদীপ জ্বালিয়া—পল্লীর সৌম্য-স্নিগ্ধ, শান্ত অঙ্কে আবার স্থান লাভের ব্যবস্থা করিলে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য-সুখ বুঝি আবার ফিরিয়া আসিতে পারে। পল্লী-ভূমি ম্যালেরিয়া পীড়িতা, কিন্তু, দেশ মাতৃকাকে সে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য কি কোন ব্যবস্থা হইতে পারে না? আমরা সকল বিষয়ের সুব্যবস্থার জন্য গবর্ণমেণ্টের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকি, কিন্তু অত পরনির্ভরতা কেন? আমরা নিজেদের কি সামর্থ্য অনুযায়ী কিছুই করিতে পারিনা! গবর্ণমেণ্ট—পল্লীবাসীর সুখ-সুবিধার ব্যবস্থার জন্য—আমরা না বলিলেও চেষ্টা করিয়া থাকেন, ম্যালেরিয়া পীড়িত পল্লী সন্তান দিগকে রক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের যথেষ্ট প্রয়াস আছে। কিন্তু সেই প্রয়াসের সহিত আমাদের প্রয়াস যদি একত্র হয়,—তাহা হইলে পল্লী হইতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপও অনেক কমিতে পারে এবং সেই সঙ্গে সহরের লোক সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় সহরের রোগবাহুল্যও হ্রাস পাইতে পারে।

ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হইতে পল্লীরক্ষা করিতে হইলে, পল্লীবাসী মাত্রেরই স্ব স্ব বসত বাটীর পার্শ্বস্থ বন জঙ্গল গুলি কাটাইতে হইবে, নালা ডোবা গুলি বুজাইয়া ফেলিতে হইবে এবং গ্রামের মধ্যে এমন একটী জলাশয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে—যে জলাশয়ের জল পানার্থ ভিন্ন অন্য কার্য্যে ব্যবহৃত না হয়। যে গ্রামে জলাশয় গুলি হাজিয়া মজিয়া আসিয়াছে, সে গ্রামের সমস্ত লোক একত্র হইয়া সাধ্যমত সামর্থ্য—মত চাঁদা তুলিয়া—সেই চাঁদার উদ্বৃত্ত অর্থ স্থানীয় ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের হস্তে অর্পণ পূর্ব্বক তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণে সেই গ্রামের জলসংস্থানের ব্যবস্থা করিবে। আমাদের মনে হয়, প্রত্যেক গ্রামের মিলিত চেষ্টায়

প্রত্যেক পল্লীবাসী যদি ঐ কয়টির ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা হইলে পল্লী হইতে ম্যালেরিয়া-রাক্ষসীর তিরোধান অসম্ভব হয় না।

পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়া ও কলেরা—দুইটি প্রবল ব্যাধিরই প্রকোপ দেখা যায় বর্ষার অন্তে। এই বর্ষার অন্তে অনেক পল্লীর একমাত্র জলাশয়েই আমরা জানি—পাট পচান হইয়া থাকে। ফলে এই দূষিত জল পান করিয়া অনেক পল্লীর অধিবাসীই ঐ দুইটি রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে, পল্লীরক্ষার জন্য প্রত্যেক পল্লীর অধিবাসীকে ইহার উপর কঠোর দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং গ্রাম হইতে ইহার ব্যবস্থা করিতে না পারিলে, মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রার্থনা করিয়া ইহার প্রতীকারের ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইবে।

কিন্তু শুধু বচনে কার্য্য হইবে না, পল্লীর কৃতী পুরুষগণ—যাঁহারা সহরে থাকিয়া সহরের সম্পদ বৃদ্ধি করিতেছেন, তাঁহাদিগকে পল্লী-ভিটায় ফিরিয়া গিয়া এই সকল কার্য্যের জন্য অগ্রণী হইতে হইবে—তবে বচন—কার্য্যে পরিণত হইবে।

অবশ্য সহর ছাড়িয়া—সহরের অর্থাগমের পথ চিরদিনের মত রুদ্ধ করিয়া—একেবারে পল্লী ভূমিতে অবস্থিতির ব্যবস্থা করুন—এরূপ কথা আমি বলিতেছিনা। আমার বক্তব্য—পল্লীর কৃতী সন্তানগণ একেবারে স্বদেশ পরিত্যাগ না করিয়া বৎসরের মধ্যে ২।৩ বারও গ্রামে ফিরিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করুন, যে সময় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ পল্লী হইতে হ্রাস পাইয়া থাকে, সেই সময় কয়েক মাসের জন্যও পুত্র কলত্রদিগকে বাস্তুভিটায় সন্ধ্যা দানের জন্য ব্যবস্থা করিয়া দিন,—এরূপ করিতে পারিলেই অধঃপতিত পল্লী শ্রী আবার ফিরিয়া আসিবে, পল্লীর দুর্গতি নিবারণের জন্য আপনা হইতেই প্রাণ কাঁদিয়া উঠিবে, রোগে শোকে জর্জ্জরিত হইয়াও যাহারা বাস্তুভিটার মায়া বিসর্জ্জন দিতে পারে নাই—তাহাদের মহদুপকার সাধন করা হইবে এবং সেই সঙ্গে তাহাদের অমোঘ আশীর্ব্বাদে দেবনির্ম্মাল্য লাভ করিয়া প্রভূত যশঃ অর্জ্জনের পথও পরিষ্কার করা হইবে।

আমার আজি আর বেশী কিছু বলিবার নাই। সমবেত সভ্যমণ্ডলীর অনেকেই আজি লক্ষ্মীর বর পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, অনেকে সহরে আবাস স্থান নির্দ্দেশ করিয়া লইয়াছেন,—কিন্তু লোক সমাজে বাসস্থানের পরিচয় দিতে হইলে—সকলেই পৈত্রিক পল্লী-ভূমিরই নামোল্লেখে গর্ব্ব সুখ অনুভব করিয়া থাকেন,—কিন্তু সেই গৌরবের স্থল জন্মভূমি যে আজি সর্ব্ব প্রকারে দীন ভাবাপন্ন,—সেই পল্লীজননীর আমাদের যে সকল ভ্রাতৃবৃন্দ এখনও, পল্লী, রক্ষা করিতেছে,—তাহাদের রোগজীর্ণ শরীর, কঙ্কালসার আকৃতি কোটরা-গত চক্ষু—পল্লী ভূমির স্বাস্থ্য-দৈন্যের জলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে,—যে পল্লীভূমির সন্তান দিগের একদা মনে সুখ ছিল, হৃদয়ে বল ছিল, কার্য্যে উৎসাহ ছিল,—যে পল্লী-প্রান্তে একদিন সেকরার দোকান, কামারের কারখানা, ছুতারের কারুকার্য্যের আলয়—তাঁতীর বস্ত্র বয়নের কক্ষ—সকলই নির্দ্দিষ্ট ছিল,—যে পল্লীপ্রান্তরে একদিন গোচারণের মাঠ ছিল, সহজ সুলভ শ্যামল শস্প প্রান্তরে গোকুল আকুল হইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা করিতে পারিত—তাহার ফলে এখনকার মত গাভীর দল জীর্ণ শীর্ণ হইত না, হৃষ্টপুষ্ট বৃষ মিথুন এবং পয়স্বিনী গাভীর দল সাক্ষাৎ শরীরী ভগবতী বলিয়া পরিকীর্ত্তিতা হইত,

যে পল্লীবাসীর ঘরে ঘরে গোলা ভরা ধান্য থাকিত, মরাই ভরা শস্য থাকিত, ক্ষেত্র ভরা ফসল থাকিত, যে পল্লীভূমির ঘরে ঘরে একদিন বার মাসে তের পার্ব্বণ হইত, দোল হইত, দুর্গোৎসব হইত, কালীপূজা হইত, জগদ্ধাত্রী পূজা হইত, পৌষ পার্ব্বণ হইত, রথের ঘটা হইত,—সকলই হইত, মহিলা কুলের কলহাস্য ও অলঙ্কার সিঞ্জন যে পল্লী পুষ্করিণীর সোপান তলে একদা মধুর স্বরে ধ্বনিত হইত, উচ্চ নীচ সম্বন্ধ ভুলিয়া—নাপিত খুড়া ধোপা মামা, তাঁতি কাকা প্রভৃতি সম্বন্ধে একদিন যে পল্লীমাতার সন্তানগণের মধ্যে আত্মীয়তা ও সহানুভূতির পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যাইত, কালীসর্দ্দার, ভুলু কাহার প্রভৃতি খেলোয়াড় ও লাঠিয়ালের দলের বিচিত্র ব্যায়ামে যে পল্লীবাসী একদিন অপার আনন্দ অনুভব করিত,—পল্লিপরিত্যক্ত সমবেত সভ্যমণ্ডলি! সেই জননী জন্মভূমি পল্লার প্রাচীন ও বর্ত্তমান অবস্থা একবার চিন্তা করুন! চিন্তা করুন—আমরা সহরে আসিয়া সুখী হইয়াছি,—কিন্তু তখনও বড় কম সুখী ছিলাম না। সে "আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু" আমরা পল্লী ছাড়িয়াই যে বিসর্জ্জন দিয়াছি, ইহা সুনিশ্চয়। সেইজন্য আবার বলিতেছি—পল্লীর ম্যালেরিয়া দূর করিবার জন্য পল্লার প্রত্যেক কৃতী সন্তানই বদ্ধপরিকর হউন,—সারাজীবন সহরের কুহকে ভুলিয়া না থাকিয়া, মধ্যে মধ্যে নিজ নিজ পল্লীভিটায় শঙ্খধ্বনির ব্যবস্থা করুন—সহরের স্বোপার্জ্জিত ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার নাম দেশ হইতে উঠিয়া যাইবে,—অক্ষত স্বাস্থ্যে বাঙ্গালীর বলোদীপ্ত প্রতিভা আবার ফুটিয়া উঠিবে।

আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস।

—:০:—

বিবিধ সংগ্রহ।

(অকারাদি বর্ণক্রমে)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন সরস্বতী, এম-এ, এল, এম, এস)

অজীর্ণ মঞ্জরী—কোন্ দ্রব্য সেবন জনিত অজীর্ণ কোন্ দ্রব্য সেবনে প্রশমিত হয়, এই গ্রন্থে তাহা উত্তমরূপে লিখিত হইয়াছে। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

অঞ্জননিদান—অগ্নিবেশ প্রণীত সংক্ষিপ্ত নিদান সংগ্রহ। জয়কৃষ্ণ মিশ্র অঞ্জন নিদানের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। অঞ্জন নিদান চরকবক্তা অগ্নিবেশ কর্ত্তৃক প্রণীত নহে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

অনুপান দর্পণ—এই গ্রন্থে ধাতু

ঘটিত ঔষধ সমূহের প্রস্তুত প্রণালী এবং রোগ-ভেদে ঔষধের অনুপান সমূহ লিখিত হইয়াছে। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

অনুপানমঞ্জরী— অনুপান-দর্পণের সদৃশ আধুনিক গ্রন্থ। কাশীতে মুদ্রিত।

অনুভূত যোগাবলী—এই গ্রন্থে উত্তম উত্তম পরীক্ষিত যোগ সকলের বিষয় লিখিত হইয়াছে।

অভিনব চিন্তামণি—চক্রপাণি দত্ত কৃত চিকিৎসাসংগ্রহ। অমুদ্রিত।

অর্ক প্রকাশ—রাবণ-কৃত। ইহাতে অর্ক (আরক) প্রস্তুতের নিয়ম এবং রোগ ভেদে প্রয়োগের নিয়ম লিখিত হইয়াছে। রাবণকৃত বলিয়া উল্লেখ থাকিলেও ইহা বৌদ্ধ-যুগের পরবর্ত্তিকালে রচিত।

আতঙ্ক দর্পণ—বাচস্পতি কৃত মাধব নিদানের টীকা, গ্রন্থবিশেষ নহে। কেহ কেহ ভ্রমক্রমে ইহাকে সংগ্রহ বলিয়াছেন, এইজন্য এখানে উল্লিখিত হইল *। বম্বে নগরে মুদ্রিত।

আদিশাস্ত্র—ইহাতে স্ত্রীপুরুষের লক্ষণ, কিরূপ স্ত্রীপুরুষের বিবাহ হওয়া উচিত এবং বিবিধ রোগের চিকিৎসার বিষয় লিখিত হইয়াছে। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

আনন্দ কন্দ—এই গ্রন্থ রসানন্দ কন্দ নামেও প্রসিদ্ধ। মন্থানভৈরব ইহার রচয়িতা। (দ.)

আয়ুর্ব্বেদ-সুধানিধি—সায়নাচার্য্যের অনুরোধে একাম্রনাথ অবধান সরস্বতীর পুত্র শৈলনাথ কর্ত্তৃক রচিত সংগ্রহ গ্রন্থ।

আয়ুর্ব্বেদ সুষেণ সংহিতা—ইহাতে সামান্য ওষধিবর্গ, ধান্যবর্গ, জলবর্গ ইত্যাদির দোষগুণ লিখিত হইয়াছে। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

আয়ুর্ব্বেদ সূত্র—ব্যাকরণের যেমন এক একটী সূত্র থাকে, এই গ্রন্থ সেইরূপ সূত্রাত্মক; সূত্র যথা "আমং হি সর্ব্বরোগাণাং" "অনামপালনং কার্য্যং" ইত্যাদি। আয়ুর্ব্বেদ-সূত্রের অগস্ত্য বিরচিত টীকা আছে শুনা যায় এবং নিত্যানন্দ নাথ বিরচিত প্রশ্নপঞ্চকের টীকা পাওয়া যায়। মূল গ্রন্থের সপ্তদশ প্রশ্নাত্মক অংশ বিদ্যমান। (দ)

আয়ুর্ব্বেদাগমন—ইহা আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস। ব্রহ্মা হইতে গ্রন্থকার পর্য্যন্ত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থকারগণের নাম ইহাতে লিখিত হইয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণ গ্রন্থ দুর্ল্লভ।

আরোগ্য চিন্তামণি—চিকিৎসা সংগ্রহ। গ্রন্থকারের নাম অজ্ঞাত।

ইন্দ্রকোষ—প্রভাকরপুত্র ভট্ট রামচন্দ্র গৌড়ের রাজা ইন্দ্রসিংহের আদেশ অনুসারে নানা বৈদ্যক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই কোষ রচনা করিয়াছিলেন। ইহার অন্য নাম "রাজেন্দ্র কোষ"।

উপবন বিনোদ—শার্ঙ্গধর-সংগ্রহের বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ বিষয়াত্মক অংশ। বর্ত্তমান গ্রন্থ-কার কর্ত্তৃক বহু পূর্ব্বে স্বতন্ত্র ভাবে অনুবাদসহ মুদ্রিত হইয়াছিল। কি নিয়মে বৃক্ষ রোপণ

* টীকা গ্রন্থ অসংখ্য—তাহাদের উল্লেখ বিশেষ কারণ না থাকিলে করা হইবে না।

(দ) 'দ' চিহ্নিত গ্রন্থগুলি দক্ষিণাপথে প্রসিদ্ধ বুঝিতে হইবে।

করিতে হয়, কি উপায়ে বৃক্ষ সকল বৃহৎ এবং প্রচুর ফল ধারণ করে, কোন্ বৃক্ষে কিরূপ সার দিতে হয়, কি করিয়া বৃক্ষবাটিকা নির্ম্মাণ করিতে হয়, এই গ্রন্থে সেই সকল বিষয় ও কূপার্থ ভূমি পরীক্ষা, বৃক্ষচিকিৎসা প্রভৃতি লিখিত আছে।

ওষধি কল্প—এই গ্রন্থে বিবিধ দ্রব্যের গুণ, কেশরঞ্জন বিধি ও ধাতু জারণমারণের বিধি লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের নাম জানা যায় না।

কল্প পঞ্চক প্রয়োগ—এই গ্রন্থে চোপচিনি কল্প, রুদ্রবন্তী কল্প, রাগদমনী কল্প, শিবলিঙ্গী কল্প এবং পলাশ কল্প—এই কয়টী বিষয় লিখিত হইয়াছে। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

কল্যাণ কারক—শ্রীমদ্ জিন মগধ ভাষায় এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। পরে রাষ্ট্রকূট বংশজ মহারাজ নৃপতুঙ্গ মহীবল্লভের চিকিৎসক উগ্রাদিত্যাচার্য্য উহা সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করেন। উগ্রাদিত্যাচার্য্য খৃষ্টীয় ৮১৪ বৎসরে নৃপতুঙ্গের সভাসদ্ ছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। (দ)

কাম কুতূহল—ইহাতে ধাতুক্ষীণতাদির প্রশমক উত্তম বাজীকরণ ঔষধ সকল লিখিত আছে। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

কামরত্ন—নিত্যনাথ কৃত বাজীকরণ-সংগ্রহ। বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

কার্ম্মণম্—এই গ্রন্থে ওষধি সমূহের পুষ্প, ফল, মূল, ত্বক্ ও পত্র এই পঞ্চাঙ্গের গুণ বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের নাম জানা যায় না। কিন্তু গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থে বহুল পরিমাণে আন্ধ্রদেশীয় ভেষজের গুণ লিপিবদ্ধ করায় তিনি আন্ধ্রদেশবাসী ছিলেন বলিয়া বলিয়া বোধ হয়। (দ)

কালজ্ঞান—শম্ভুনাথ কর্ত্তৃক রচিত। এই গ্রন্থে মৃত্যুবোধক লক্ষণ, রোগের লক্ষণ এবং চিকিৎসা সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে।

কুট মুদ্গর—এই গ্রন্থে অজীর্ণ রোগের চিকিৎসা ও পথ্য লিখিত হইয়াছে। বোম্বাই নগরে মুদ্রিত।

ক্ষেমকুতূহল— কৃষ্ণশর্ম্মবিরচিত চিকিৎসা সংগ্রহ। অমুদ্রিত।

গূঢ়বোধক—হেরম্ব সেন কৃত। এই গ্রন্থে কতকগুলি রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা আছে। অমুদ্রিত।

গৌরী কাঞ্চলিকা তন্ত্র—ইহা তান্ত্রিক চিকিৎসা-সংগ্রহ। বোম্বাই নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

চক্রদত্ত—চরক ও সুশ্রুতের টীকাকার চক্রপাণিদত্ত কৃত নানাস্থানে মুদ্রিত চিকিৎসা-সংগ্রহ। চক্রদত্ত নামেই সুপরিচিত এই উৎকৃষ্ট সংগ্রহ সর্ব্বত্রই—বিশেষতঃ বঙ্গদেশে বিশেষ আদৃত হইয়া থাকে। ইহা চিকিৎসাসার-সংগ্রহ নামেও প্রসিদ্ধ। এই সংগ্রহের অনেক অংশ বৃন্দ কৃত সিদ্ধযোগ হইতে গৃহীত। চক্রপাণির সময়াদি পূর্ব্বে নিরূপিত হইয়াছে।

চর্য্যাচন্দ্রোদয়—ইহাতে অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিবার প্রণালী লিখিত হইয়াছে। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

চারুচর্য্যা—ভোজরাজ কৃত। স্বস্থবৃত্ত বিষয়ক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ।

চিকিৎসা কলিকা—ত্রিসটাচার্য্য কৃত চিকিৎসাগ্রন্থ। বিজয়রক্ষিত নিদান টীকায়

ত্রিমল্লাচার্য্যের রচনা উদ্ধৃত করায় জানা যায় যে, ইনি একজন প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য ছিলেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। চিকিৎসাকলিকা মুদ্রিত হয় নাই।

চিকিৎসা-কল্পলতিকা— ইহাও ত্রিমল্লাচার্য্য প্রণীত বৃহত্তর চিকিৎসা গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

চিকিৎসাঞ্জন—ইহাতে জ্বর, শ্বাস, কুষ্ঠ, ভগন্দর প্রভৃতি অনেকগুলি কঠিন রোগের চিকিৎসার বিষয় লিখিত হইয়াছে। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

চিকিৎসা দীপিকা—হরানন্দ কৃত। হস্তলিখিত পুঁথি ঢাকায় আছে।

চিকিৎসামৃত—গণেশ কৃত। অমুদ্রিত।

চিকিৎসা রত্ন—জগন্নাথ দত্ত কৃত। হস্তলিখিত পুঁথি ঢাকায় আছে।

চিকিৎসা-রত্নাভরণ—সদানন্দ দাধীচ প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসা-গ্রন্থ।

চিকিৎসা সার—হরিভারতী কৃত। অমুদ্রিত।

চিন্তামণি—বল্লভেন্দ্র এই গ্রন্থের রচয়িতা, ইনি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই গ্রন্থে নাড়ী ও মূত্রাদি পরীক্ষা দ্বারা রোগনির্ণয় এবং রোগ সমূহের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসা বিস্তৃত ভাবে লিখিত হইয়াছে। কর্ম্মবিপাক-জাত রোগ সকল এবং তাহাদের শান্তির উপায়ও বর্ণিত হইয়াছে। চরকাদি গ্রন্থ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বিষয়নির্ণয়, সন্নিপাত-জ্বরাদির ভেদ, সাধ্যাসাধ্য অবস্থা প্রভৃতি এবং রসতন্ত্র সম্বন্ধীয় বিবিধ বিষয় লিখিত হইয়াছে। (দ)

জ্বরতিমির নাশক— সর্ব্বপ্রকার জ্বরঘ্ন ঔষধ সংগ্রহ। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

জ্বরনির্ণয়—নারায়ণ কৃত। অমুদ্রিত।

ত্রিশতী—রাওল শার্ঙ্গধর কৃত জ্বর-চিকিৎসা সংগ্রহ। এই শার্ঙ্গধর সংহিতা-প্রণেতা—শার্ঙ্গধর হইতে ভিন্ন ব্যক্তি।

ধারাকল্প—জল ও ক্বাথাদি পরিষেক দ্বারা চিকিৎসাপদ্ধতি মূলক গ্রন্থ। হাইড্রোপ্যাথি (Hydropathy) নামক চিকিৎসায় যেমন জল প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করা হয়, এই গ্রন্থেও সেইরূপ জল এবং ক্বাথের প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসার উপদেশ আছে।

নপুংসকামৃতার্ণব—এই গ্রন্থে নপুংসক-দিগের জন্য নানাপ্রকার তৈল, ঘৃত, লেপ, বাজীকরণ ঔষধ প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

নাড়ীজ্ঞান তরঙ্গিনী—নাড়ীজ্ঞান বিষয়ক সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

নাড়ীজ্ঞান দীধিতি—নাড়ীজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ। মুদ্রিত।

নাড়ীদর্পণ—নাড়ীজ্ঞান বিষয়ক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ।

নাড়ী পরীক্ষা—রাবণ কৃত উত্তম সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। বম্বে নগরে নির্ণয়সাগর প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছে।

নাড়ী পরীক্ষাদি চিকিৎসা কথন—সঞ্জীবেশ্বর শর্ম্মার পুত্র রত্নপাণি শর্ম্মার রচিত নাড়ীজ্ঞান ও তন্মূলক চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

নাড়ীপ্রকাশ—বঙ্গদেশীয় শঙ্কর সেন কৃত নাড়ীজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ। মুদ্রিত।

নাড়ীবিজ্ঞান—কণাদ কৃত। এই কণাদ-বৈশেষিক দর্শনকার কণাদ বলিয়া অনেকের ধারণা, কিন্তু ইহা সম্ভব নহে। মহর্ষি কণাদ চরকের (সম্ভবতঃ অগ্নিবেশেরও) পূর্ব্ববর্ত্তী, কেননা চরকে বৈশেষিকদর্শনের পদার্থবাদ গৃহীত হইয়াছে। কণাদ কৃত নাড়ীবিজ্ঞান চরকের সময়ে প্রসিদ্ধ থাকিলে চরকের ন্যায় সর্ব্বার্থসংগ্রাহক মহাগ্রন্থে নাড়ীবিজ্ঞানের উল্লেখ থাকিত *। তাহা যখন নাই এবং রচনাও যখন আধুনিক রচনার মত, তখন নাড়ীবিজ্ঞান মহর্ষি কণাদকৃত—একথা স্বীকার করা যায় না।

নাবনীতক—ইহা অজ্ঞাতনামা কোন বৌদ্ধ ভিক্ষু কৃত সিদ্ধযোগ-সংগ্রহ। কর্ণেল বাউয়ার কর্ত্তৃক চীনদেশে মৃত্তিকা স্তূপের মধ্যে আবিষ্কৃত।

নামসাগর—কেন্দ্রদেব কৃত চিকিৎসা গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

নিদান প্রদীপ—ইহা নাগনাথ বিরচিত রোগ-পরিচায়ক গ্রন্থ। (দ)

নৃসিংহোদয়—বীরসিংহ কৃত চিকিৎসা গ্রন্থ।

পথ্যাপথ্য—কেবলপ্রসাদ মিশ্র সংগৃহীত। ইহাতে রোগ ভেদে পথ্যাপথ্যের বিষয় লিখিত আছে। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

পথ্যাপথ্য-বিনিশ্চয়—বিশ্বনাথ সেন রচিত পথ্যাদি সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। এই বিশ্বনাথ উড়িষ্যার মহারাজা প্রতাপরুদ্র গজপতির চিকিৎসক ছিলেন।

পথ্যাপথ্য বিবোধক—কেয়দেব কৃত নিঘণ্ট গ্রন্থ। (যা)।

পরহিত সংহিতা—শ্রীনাথ পণ্ডিত বিরচিত এই গ্রন্থে কৌমারভৃত্য তন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া আয়ুর্ব্বেদের শল্যশালাক্যাদি আটটী তন্ত্র—হেতু, লক্ষণ ও চিকিৎসা সহ সুবিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছে। (দ)

পাক প্রদীপ—খাদ্যপাক বিষয়ক মুদ্রিত গ্রন্থ।

পাকরত্নাকর—খাদ্যপাক বিষয়ক মুদ্রিত গ্রন্থ।

পূজ্যপাদীয়—আচার্য্য পূজ্যপাদ এই সংগ্রহ গ্রন্থের রচয়িতা। পার্শ্ব পণ্ডিতের লিখিত পূজ্যপাদ চরিত হইতে জানা যায় যে, তিনি ৪৭০ খৃষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। (দ)

প্রয়োগ চিন্তামণি—রামমাণিক্য সেন রচিত চিকিৎসা গ্রন্থ।

প্রয়োগ-পারিজাত—অসংখ্য প্রয়োগ-

* বৈদিক গ্রন্থে নাড়ীজ্ঞান বা নাড়ীপরীক্ষা সম্বন্ধে কোন বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায় না। এইজন্য বৈদিকযুগে নাড়ীপরিচয় বিদ্যা ছিল না বলিয়াই অনুমান করা যায়। তান্ত্রিকযুগে নাড়ী লইয়া বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল। কিন্তু নাড়ীপরীক্ষার নাড়ী অর্থে ধমনী (Artery) বুঝিতে হয়—যোগশাস্ত্রের নাড়ী (Nerve) স্বতন্ত্র। সম্ভবতঃ বৈদ্যকের নাড়ী-পরিচয় বিদ্যা তান্ত্রিকযুগের শেষভাগে প্রচারিত হইয়াছিল। আমরা ভবিষ্যতে নাড়ীপরিচয় বিদ্যার প্রাদুর্ভাব কাল নির্ণয় করিতে চেষ্টা পাইব। লেখক।

† (যা) এইরূপ চিহ্নিত গ্রন্থগুলি বম্বে আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থমালার সম্পাদক পণ্ডিত যাদবজী ত্রিকমজী কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে, অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই।

সমন্বিত প্রাচীন ও প্রামাণিক চিকিৎসা গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

বসবরাজীয়—আন্ধ্রদেশের শৈব ব্রাহ্মণ-কুলে জাত বসবরাজ এই গ্রন্থের রচয়িতা। এই গ্রন্থে নাড়ী ও মূত্রাদি পরীক্ষাদ্বারা রোগ নির্ণয়, জ্বর কাসাদি রোগের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসা এবং অনুভবসিদ্ধ উৎকৃষ্ট যোগ সকলের বিষয় লিখিত হইয়াছে। রেউচিনি, অহিফেন প্রভৃতি ভাবপ্রকাশ পরিগৃহীত ঔষধের উল্লেখও এই গ্রন্থে দেখা যায়। (দ)

বাণীকরী—বাণীকরী রচিত। ইহাতে রোগ সমূহের পৃথক্ করণ (Diagnosis) সম্বন্ধে উপদেশ আছে। অমুদ্রিত।

বালচিকিৎসা পটল—অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার কর্ত্তৃক রচিত শিশুচিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

বালতন্ত্র—মহীধরের পুত্র কল্যাণ বৈদ্য কর্ত্তৃক রচিত শিশু-চিকিৎসা গ্রন্থ। বম্বেনগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

বালবোধ—বামাচার্য্য কৃত সরল চিকিৎসাগ্রন্থ। অমুদ্রিত।

বিশ্বকোষ—মহেশ্বর রচিত বৈদ্যক অভিধান। মুদ্রিত হয় নাই।

বিষোদ্ধার—অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারের লিখিত বিষ চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

বীরসিংহাবলোকন—বীরসিংহ রচিত চিকিৎসা-সংগ্রহ। বম্বে নগরে মুদ্রিত।

বৈদ্যক রহস্য—বংশীধরের পুত্র বিদ্যা-পতি এই গ্রন্থের রচয়িতা। গ্রন্থকার গৌড়বর্য্য স্থানতি (?) রায়ের অনুমতি অনুসারে ১৭৩৮ সংবতে গ্রন্থ রচনা শেষ করিয়াছিলেন। গ্রন্থে জ্বর প্রভৃতি রোগ সমূহের চিকিৎসার বিষয় লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে ফিরঙ্গ রোগের উল্লেখ থাকায় জানা যায় যে, বিদ্যাপতির সময়ে ফিরঙ্গ রোগ দেশে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল।

বৈদ্য কল্পদ্রুম—শুকদেব সংগৃহীত চিকিৎসাগ্রন্থ। বম্বে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

বৈদ্যকসংগ্রহ—গ্রন্থকারের নাম মহেন্দ্র —এই মাত্র পরিচয় পাওয়া যায়। নানা প্রকার চূর্ণ, ক্বাথ, তৈল, ঘৃত এবং পারদঘটিত ঔষধ সমূহের প্রয়োগ-বিধি লিখিত আছে। গ্রন্থে আত্রেয়, চরক, শ্রীবৎস, অমৃতমালা রসার্ণব, রসরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থকার ও গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়।

বৈদ্যজীবন—দিবাকরসুত লোলিম্বরাজ রচিত। ইহাতে কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যশাস্ত্র বিষয়ক উপদেশ- দম্পতির কথোপকথনচ্ছলে আদিরসাত্মক পদ্যে লিখিত হইয়াছে।

বৈদ্যবল্লভ—হিতরুচির পুত্র হস্তিরুচি এই জ্বর চিকিৎসা গ্রন্থের রচয়িতা। এই গ্রন্থ বম্বে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

বৈদ্যবিনোদ—শঙ্কর সেন বিরচিত চিকিৎসাগ্রন্থ। অমুদ্রিত।

বৈদ্যবিলাস—রাঘব কৃত। অমুদ্রিত।

বৈদ্যমন-উৎসব—বম্বে নগরে মুদ্রিত যোগ-সংগ্রহ।

বৈদ্য মনোরমা—কেরল দেশবাসী শ্রীকালিদাস বৈদ্য রচিত সংগ্রহগ্রন্থ।

বৈদ্যরত্ন—বম্বে নগরে মুদ্রিত চিকিৎসা-গ্রন্থ। গোস্বামী শিবানন্দ ভট্ট এই চিকিৎসা গ্রন্থের রচয়িতা।

বৈদ্য সঞ্জীবনী—বম্বে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

বৈদ্য সর্ব্বস্ব—অমুদ্রিত চিকিৎসা সংগ্রহ।

বৈদ্য সংক্ষিপ্তসার—সোমনাথ মহাপাত্র কৃত। অমুদ্রিত।

বৈদ্য সংগ্রহ—গোপাল দাস কৃত। অমুদ্রিত।

বৈদ্যামৃত—বৈদ্য শ্রীমাণিক্য ভট্টের পুত্র ভিষক্ মোরেশ্বর রচিত। ইঁহার বাসস্থান মহম্মদ নগরে ছিল। ১৫০৫ সংবৎসরে গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল—গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে। চারিটী অলঙ্কার বা অধ্যায়ে সংক্ষেপে রোগ সমূহের চিকিৎসা লিখিত হইয়াছে।

বৈদ্যামৃত লহরী—মথুরানাথ শুক্ল কৃত জ্বর চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ।

ভাস্করোদয়—৺গঙ্গাধর কবিরাজ বিরচিত সংক্ষিপ্ত রোগ-বিজ্ঞান বিষয়ক বিচার গ্রন্থ। মুদ্রিত হইয়াছে।

ভীমবিনোদ—দামোদর কৃত সংগ্রহ গ্রন্থ। ইহা চিকিৎসা ও উত্তর—এই দুই খণ্ডে বিভক্ত। সকল রোগের নিদান ও ও চিকিৎসা এবং জ্যোতিঃশাস্ত্র সম্মত কর্ম্মবিপাক ও রোগ সমূহের উৎপত্তির কারণ ইহাতে লিখিত হইয়াছে। রসঘটিত এবং উদ্ভিজ্জঘটিত উভয়বিধ ঔষধেরই প্রয়োগবিধি গ্রন্থে লিখিত আছে।

ভৈষজ্য রত্নাবলী—গোবিন্দ দাশ কৃত প্রসিদ্ধ চিকিৎসা সংগ্রহ। বঙ্গদেশে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে ইহা অত্যন্ত সমাদৃত।

ভৈষজ্য সারামৃত সংহিতা—উপেন্দ্র মিশ্র প্রণীত রসচিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। (যা)

ভোজন কুতূহল—রঘুনাথ কৃত খাদ্য পাক বিষয়ক গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

মধুমতী—ইহা নরসিংহ কবিরাজ রচিত দ্রব্যগুণ ও চিকিৎসা সংগ্রহ। নরসিংহ দ্রাবিড়-নিবাসী নীলকান্ত ভট্টের পুত্র এবং রামকৃষ্ণ ভট্টের শিষ্য ছিলেন। গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই। প্রবন্ধ লেখকের নিকট অতি প্রাচীন পুঁথি বর্ত্তমান।

মনোরমা—অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার লিখিত জ্বরচিকিৎসা গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

মাধবনিদান—বঙ্গের বৈদ্য শিরোমণি মাধবকর সংগৃহীত এই "রুগ্বিনিশ্চয়" নামক গ্রন্থ নিদান বা মাধবনিদান নামে প্রসিদ্ধ। মাধবনিদান সমস্ত নিদানের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থ ভারতের সকল দেশেই সমাদৃত। ইহার উপর বিজয় রক্ষিত প্রণীত "ব্যাখ্যা মধুকোষ" এবং বাচস্পতি কৃত "আতঙ্ক দর্পণ" নামক টীকাগ্রন্থদ্বয় পাওয়া যায়। মাধবকরের আবির্ভাবের সময় পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

মাধব সংহিতা—গ্রন্থ মধ্যে "মাধব বিরচিত" এই পরিচয় ব্যতীত গ্রন্থকারের আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। এই মাধব এবং মাধবকর যে একই ব্যক্তি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। গ্রন্থে প্রথমে রোগের লক্ষণ এবং পরে চিকিৎসাবিধি লিখিত হইয়াছে। রোগের লক্ষণ মাধবনিদানের ঠিক অনুরূপ—কচিৎ রোগের লক্ষণ কিছু অধিক আছে মাত্র। মাধবনিদানের ক্রম অনুসারে জ্বর হইতে বিষনিদান পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছে, পরে রসায়ন, বাজীকরণ, পঞ্চকর্ম্ম ও পরিভাষা লিখিত হইয়াছে।

মূত্র পরীক্ষা—অজ্ঞাতনামা লেখক রচিত মূত্র পরীক্ষা দ্বারা রোগনির্ণয় বিষয়ক গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

মোমহন বিলাস—[illegible]

মোমহন প্রণীত চিকিৎসা গ্রন্থ। মোমহন পিরোজখাঁর পুত্র মহমুদ সাহের রাজত্বকালে বর্ত্তমান ছিলেন এবং ১৪৬৭ শকাব্দে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া স্বগ্রন্থে পরিচয় দিয়াছেন। এই গ্রন্থে চরক, সুশ্রুত, অত্রি, বাগ্‌ভট, উড্ডীশ, পুক্কুহতজাল, সদ্‌যোগিনী মত, বৃন্দ, বঙ্গ, রসার্ণব, চক্র, অশ্বিনীকুমার সংহিতা, নাগার্জ্জুন, রসযোগ মুক্তাবলী, তত্ত্বকণিকা, রাজমার্ত্তণ্ড, আগমরত্নাবলী, যোগমালা, যোগরত্নাবলী, রসরত্নাকর, যোগনিধান ও ক্রিয়াকালগুণোত্তর প্রভৃতি গ্রন্থকার ও গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়।

যোগচন্দ্রিকা—লক্ষ্মণাচার্য্যপ্রণীত বৃহৎ চিকিৎসা গ্রন্থ।

যোগচিন্তামণি—শ্রীচন্দ্রকীর্ত্তির শিষ্য হর্ষকীর্ত্তি সূরি নামক জৈন পণ্ডিত বিরচিত প্রাচীন চিকিৎসা গ্রন্থ। গ্রন্থ মধ্যে আত্রেয়, চরক, বাগ্‌ভট, সুশ্রুত, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, হারীত ভৃগু, ভেল, বৃন্দ, মাধব কর প্রভৃতির গ্রন্থের উল্লেখ দেখা যায়।

যোগতরঙ্গিণী—দক্ষিণাপথ নিবাসী বৈদ্য ত্রিমল্ল ভট্ট রচিত। গ্রন্থকারের পিতার নাম বল্লভ, পিতামহের নাম শিঙ্গন ভট্ট এবং পুত্রের নাম শঙ্করভট্ট। এই শঙ্করভট্ট রসপ্রদীপ নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ত্রিমল্লভট্ট এই গ্রন্থ ব্যতীত শতশ্লোকী, বৃহদ্ যোগতরঙ্গিনী, দ্রব্যগুণমাণিক্যমালা ও বৈদ্যচন্দ্রোদয় নামক বৈদ্যক গ্রন্থ এবং অলঙ্কার মঞ্জরী নামক অলঙ্কার গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। গ্রন্থ মধ্যে অশ্বিনীকুমার সংহিতা, চরকাচার্য্য, চর্পটী, আরোগ্যদর্পণ, কৃষ্ণাত্রেয়, কলিকা, গোরক্ষনাথ, চিন্তামণি, চক্রদত্ত, চিকিৎসা কলিকা, চিকিৎসাদীপ, ত্রিশটাচার্য্য, নারায়ণ, প্রয়োগপারিজাত, বৃহদাত্রেয়, বৃদ্ধহারীত, বৌদ্ধমত, বৌদ্ধসর্ব্বস্ব, ভদ্র শৌনক, ভালুকি তন্ত্র, ভৈরব তন্ত্র মদনপাল, মতিকুমার, যোগরত্নাবলী, যোগশত, যোগপ্রদীপ, রসরত্নপ্রদীপ, রুদ্রচন্দ্র, রত্নপ্রদীপ, রসেন্দ্র চিন্তামণি, রুগ্‌বিনিশ্চয়, রসরত্ন, রসপ্রদীপ, রাজমার্ত্তণ্ড, রসরত্নাবলী, বৈদ্যালঙ্কার, বৃন্দ, বীরসিংহাবলোকন, বসন্তরাজ, বৈদ্যাদর্শ, বাগ্‌ভট, শার্ঙ্গধর, সারসংগ্রহ ও সুশ্রুত এই সকল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়। গ্রন্থে ১৭টী তরঙ্গ বা অধ্যায়ে আয়ুর্ব্বেদের সমস্ত বিষয় লিখিত হইয়াছে। (দ)

যোগদীপিকা—চিকিৎসা-সংগ্রহ। রণকেশরী প্রণীত।

যোগরত্নাবলী—শ্রীকণ্ঠ বিরচিতচিকিৎসা-সংগ্রহ। অমুদ্রিত।

যোগশতক—শ্রীকণ্ঠ দাস কৃত জরা-ব্যাধিনাশক শতসংখ্যক যোগ সংগ্রহ। মুদ্রিত হয় নাই।

যোগসমুচ্চয়—দাশগণপতি প্রণীত চিকিৎসা গ্রন্থ।

যোগ সংগ্রহ—গ্রন্থকার অজ্ঞাত। উত্তম উত্তম প্রয়োগ সমূহের সংগ্রহাত্মক গ্রন্থ।

যোগ সুধানিধি - জগদীশের পুত্র বন্দি মিশ্র প্রণীত চিকিৎসা গ্রন্থ। গ্রন্থের ষোড়শ প্রকরণের মধ্যে একটী প্রকরণ মাত্র পাওয়া যায়। এই প্রকরণ পাঠে বুঝা যায় যে, মনুষ্য-চিকিৎসা শেষ করিয়া স্ত্রী পশুর চিকিৎসা লিখিত হইতেছে। স্ত্রী-পশুদিগের বিবিধ রোগের চিকিৎসার বিষয় এই প্রকরণে লিখিত হইয়াছে।

রসদীপিকা—আনন্দানুভব কৃত। রস চিকিৎসা বিষয়ক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। (যো)

রসমুক্তাবলী—রস শোধন মারণ ও

চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। গ্রন্থকর্ত্তার নাম অজ্ঞাত। (যা)

রসরত্নদীপিকা—রামরাজ প্রণীত সংক্ষিপ্ত রসচিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। (যা)

রসরাজ শঙ্কর—রস চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। রামকৃষ্ণ প্রণীত। (যা)

রসাবতার—(১) গ্রন্থকর্ত্তা অজ্ঞাত। রস চিকিৎসা বিষয়ক বিপুল গ্রন্থ। (যা)

রসাবতার—(২) মাণিক্যচন্দ্র জৈন প্রণীত রসচিকিৎসা বিষয়ক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। (যা) *

রাজমার্ত্তণ্ড—ভোজরাজ কৃত উত্তম প্রয়োগ সংগ্রহ। এই গ্রন্থ বম্বে "আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থমালায়" মুদ্রিত হইয়াছে।

শতশ্লোকী—বোপদেব কৃত শতশ্লোক-ময় ঔষধ সংগ্রহ। বম্বে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

শরীর নিশ্চয়াধিকার—রামদাস কৃত। গর্ভাবস্থায় রমণীগণের পক্ষে যেরূপ নিয়ম পালন হিতকর এই গ্রন্থে তদ্বিষয়ক উপদেশ আছে। অমুদ্রিত।

শালিহোত্রসার সমুচ্চয়—কহ্লন প্রণীত অশ্ব চিকিৎসা গ্রন্থ।

শ্রীকণ্ঠ নিদান—এই গ্রন্থ জীবরক্ষামৃত নামেও প্রসিদ্ধ। ইহাতে প্রথমে নাড়ী প্রভৃতি অষ্ট স্থান পরীক্ষা দ্বারা রোগ নির্ণয়ের উপদেশ দিয়া পরে প্রত্যেক রোগের নিদান লক্ষণাদির বিষয় বলা হইয়াছে। সন্নিপাতাদি কতকগুলি রোগের বিজ্ঞানোপায় এই গ্রন্থে মাধবনিদান অপেক্ষা বিস্তৃত ভাবে বলা হইয়াছে এবং মাধবনিদান অপেক্ষা অধিকতর সংখ্যক রোগের বিষয় লিখিত হইয়াছে। (য)

লক্ষণামৃত—কেরল দেশে প্রসিদ্ধ সংক্ষিপ্ত বিষ চিকিৎসা-গ্রন্থ। সুন্দর ভট্টপাদ প্রণীত।

সন্নিপাত মঞ্জরী—ভবদেব কৃত সন্নিপাত চিকিৎসাসংগ্রহ। অমুদ্রিত।

সদ্বৈদ্যভাবাবলী—জগন্নাথ গুপ্ত কৃত সংগ্রহ গ্রন্থ।

সংজ্ঞা সমুচ্চয়—চতুর্ভুজের পুত্র শিবদত্ত মিশ্র প্রণীত। গ্রন্থে দ্বাদশটি প্রকরণ আছে। যথা—১। দোষ, ধাতু, মর্ম্ম প্রভৃতি। ২। রোগ সমূহের হেতু প্রভৃতি। ৩। দ্রব্য সমূহের গুণ ও বীর্য্যাদি। ৪। লঙ্ঘন প্রভৃতি। ৫। ত্রিফলাদি পারিভাষিক সংজ্ঞা। ৬। দ্রব-দ্রব্য বিনির্দ্দেশ। ৭। কৃতান্নবর্গ। ৮। অহিত দ্রব্য। ৯। স্বরসাদি সংজ্ঞা। ১০। পরিমাণ নির্দ্দেশ। ১১। স্নেহ, স্বেদ, ধূম, গণ্ডূষ, কবল, মুখলেপ, মূর্দ্ধলেপ, নেত্রাঞ্জন, পুটপাক প্রভৃতি। ১২। মিশ্রসংজ্ঞা প্রকরণ। ইহা উত্তম সংগ্রহ গ্রন্থ কিন্তু অমুদ্রিত।

সাধ্যরোগরত্নাবলী—শ্যামলাল কৃত চিকিৎসা সংগ্রহ। অমুদ্রিত।

সিদ্ধভেষজ মণিমালা—জয়পুর-বাসী ভট্ট শ্রীকৃষ্ণরাম প্রণীত উত্তম আধুনিক গ্রন্থ।

সিদ্ধান্ত মঞ্জরী—বোপদেব কৃত চিকিৎসা সংগ্রহ। অমুদ্রিত।

স্ত্রীচিকিৎসা—বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ।

স্ত্রীবিলাস—দেবেশ্বর উপাধ্যায় প্রণীত স্ত্রী-চিকিৎসা বিষয়ক নাতিবৃহৎ গ্রন্থ।

* "যা" চিহ্নিত রসগ্রন্থগুলির বিবরণ পরে জানিতে পারায় রসগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া বিবিধ সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করা হইল।

হংসরাজ নিদান—হংসরাজ কৃত নিদানসংগ্রহ। এই গ্রন্থ পশ্চিমাঞ্চলের স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে। বম্বে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

হিতোপদেশ (১)—শ্রীকান্ত দাশ কৃত চিকিৎসা সংগ্রহ। ইহাতে শিশু, স্ত্রী ও বিষ চিকিৎসার বিষয় বিশেষ ভাবে লিখিত হইয়াছে। অমুদ্রিত।

হিতোপদেশ (২)—শ্রীকণ্ঠ শিবাচার্য্য প্রণীত চিকিৎসা গ্রন্থ। অমুদ্রিত। (দ)

দক্ষিণাপথের আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণ।

দক্ষিণাপথে আয়ুর্ব্বেদ প্রচারের বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তে সংস্কৃত ভাষার বহুল প্রচলন বশতঃ আয়ুর্ব্বেদের পঠন পাঠন সংস্কৃত ভাষাতেই অধিক প্রচলিত ছিল, কিন্তু দক্ষিণাপথে সংস্কৃত ভাষার ন্যায় দ্রাবিড় আন্ধ্র প্রভৃতি ভাষারও সমধিক উন্নতি হওয়ায় বহু আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ ঐ সকল ভাষাতেই রচিত হইয়াছিল। যাঁহারা দক্ষিণাপথে সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা "বড়-সম্প্রদায়" এবং যাঁহারা দ্রাবিড়াদি ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাঁহারা "তেন্ সম্প্রদায়" নামে প্রসিদ্ধ। আন্ধ্র দ্রাবিড় প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত ও রচিত কোন কোন গ্রন্থ দুই সহস্র বৎসর বা তদূর্দ্ধ কালের প্রাচীন। অবশ্য দক্ষিণাপথে সংস্কৃত ভাষাতে যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, অনেক স্থলে সেই সকল গ্রন্থ যে ভাষাগ্রন্থগুলির মূলীভূত—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু অনেক মৌলিক ভাষাগ্রন্থও বর্ত্তমান। আমরা দক্ষিণাপথের যে সকল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের পরিচয় পাইয়াছি, তাহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থের পরিচয় বিবিধ সংগ্রহের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছি। সাধারণ ভাবে তদ্দেশীয় গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

গ্রন্থকার।

পুলস্ত্য	জেবিমুস্থ
তেরষ্যর	পের্ব্বাংতোম্বুমুস্থ
প্যুহমুনি	তেব্বাটুমুস্থ
ভোগর	আলত্তূরুনম্বি
পুলিপ্পাণি	উগ্রাদিত্যাচার্য্য
বৈথরিমুস্থ	মঙ্গরাজ
শিরট্টনমুস্থ	অভিনব চন্দ্র
তিরুবান্ কুরু	পূজ্যপাদ
হস্তচারি	বসবরাজ
বিশাল	বিজ্ঞানেশ্বর
বিভণ্ডক	গঙ্গাধর
বৈদর্ভনর	মন্থান ভৈরব
বাগ্বলি	মঙ্গব্বগিরি সূরী
মৃগশর্ম্ম	শ্রীনাথ পণ্ডিত
সুরেন্দ্র	ত্রিমল্ল ভট্ট
দেবেন্দ্র মুনি	শ্রীকণ্ঠ পণ্ডিত
নংজরাজ	শ্রীকণ্ঠ শিব পণ্ডিত
নৃসিংহভট্ট	নাগনাথ
বল্লভেন্দ্র	

গ্রন্থ।

কায়ণম্	উমামহেশ্বর সংবাদ
অভিধান রত্নমালা	চিন্তামণি
দ্রব্যগুণ রত্নাবলি	বসবরাজীয়
দ্রব্যগুণ কল্পবল্লী	হিতোপদেশ
আয়ুর্ব্বেদ মহোদধি	যোগরত্নাবলি
পদার্থ চন্দ্রিকা	যোগতরঙ্গিনী

দ্রব্যগুণ চতুঃশ্লোকী বৃহৎ যোগতরঙ্গিণী
শ্রীকণ্ঠ নিদান পরহিত সংহিতা
নিদান প্রদীপ রস প্রদীপিকা (আং)*
নাড়ীজ্ঞান বিনির্ণয় শিবতত্ত্ব রত্নাকর
ষড়বিধ নাড়ী তন্ত্র আনন্দ কন্দ
নাড়ী নক্ষত্র মালা রুগ্-হৃদয়
নাড়ী জ্ঞান রুগ-বিলাস
ভেষজ সর্ব্বস্ব রুগ্ হৃদয় সার
ধন্বন্তরি বিলাস আয়ুর্ব্বেদ সূত্র
যোগ শতক ভেষজ-কল্প (আং)
সন্নিপাত চন্দ্রিকা নবনাথ সিদ্ধ দীপিকা (আং)
রাজমৃগাঙ্ক আন্ধ্র বৈদ্য চিন্তামণি (আং)
প্রশ্নোত্তর রত্নমালা শতশ্লোকী (আং)
ধন্বন্তরি সারনিধি আয়ুর্ব্বেদার্থ সংগ্রহ (আং)
বীরভট্টীয় ধন্বন্তরি বিজয় (আং)
গদ সঞ্জীবনী ভিষগ্‌রাঞ্জন (আং)
বৃষরাজীয় (আং) খগেন্দ্রমণি দর্পণ (আং)
দূতাধ্যায় (আং) সাহিত্য বৈদ্যবিদ্যা জলনিধি
মদন কামরত্ন (আং) ভিষগ্বর তিলক
বালগ্রহ চিকিৎসা কবিজনৈক মিত্র
সর্ব্বরোগ চিকিৎসা রত্ন পূজ্য পাদীয়
চিকিৎসা নুল (?) কল্যাণকারক
বাগ্‌ভট চিন্তামণি সহস্র যোগ
বৈদ্যসার সংগ্রহ হরমেখলা
চিকিৎসা সার আরোগ্য কল্পদ্রুম

আন্ধ্র, দ্রাবিড় প্রভৃতি ভাষায় লিখিত আরও কতকগুলি মুদ্রিত ও অমুদ্রিত চিকিৎসা গ্রন্থের তালিকা নিম্নে লিখিত হইল। এই সকল গ্রন্থের নাম পর্য্যন্ত দ্রাবিড় ভাষায় রচিত।

অগস্ত্যার গেরূন্দিরট্ট সরকুবৈপ্প
অগস্ত্যার ভস্মমুরৈ রামদেবন পেরিনূল
অগস্ত্যার আয়ুর্ব্বেদ ভাষ্যম্ গোরক্কর বৈদ্যং
অগস্ত্যার নাড়িমূল মৎস্যমুনি এন্নুর
অগস্ত্যার আয়িরত্তনেনূর কন্নবুবার তিরট্টু
অগস্ত্যার তোলকাপ্যং তেরষাম্ করাশীল মুন্নুর
অগস্ত্যার পরিপূর্ণং
পুলিপ্পাণি ঐনূর অগস্তর্ পিলনৈত্মিন্
ভোগর এন্নূর্ শিবজালং
উহ্মমুনি আয়িরং মন্মুখ জালং
রোমঋষি ঐনূরূ কোংকণর্ নিদানং

সিংহলে আয়ুর্ব্বেদ প্রচার—

দক্ষিণাপথ হইতে সিংহলদ্বীপে আয়ুর্ব্বেদ প্রচারিত হইয়াছিল। আনন্দকন্দ নামক গ্রন্থপ্রণেতা মন্থনভৈরব সিদ্ধ সিংহলদ্বীপের একজন প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য ছিলেন। সারার্থসংগ্রহ, ভেষজমঞ্জুষা, সারসংক্ষেপক, ভেষজকল্প, যোগশতক সারস্বত নিঘণ্ট, সিদ্ধৌষধ নিঘণ্ট এবং যোগরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থ সিংহলে এখনও প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে যোগরত্নাকর ছয় শত বৎসরের ও অধিক কাল পূর্ব্বে ময়ূরপাদ ভিক্ষু নামক বৌদ্ধাচার্য্য কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছিল।*

আমরা বৈদ্যক গ্রন্থের বিবরণ যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা এস্থলে লিখিত হইল। বর্ত্তমান কালের গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের পরিচয় বাহুল্য ভয়ে লিখিত হইল না। লিখিত গ্রন্থ সকল ব্যতীত ভারতবর্ষের নানা স্থানে যে বহু গ্রন্থরত্ন অপ্রকাশিত অবস্থায় রহিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ পর্য্যন্ত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থের উদ্ধার কল্পে সমগ্র ভারতব্যাপী যথোচিত

* "আং" চিহ্নিত পুস্তকগুলি আন্ধ্র ভাষায় রচিত।

* দক্ষিণাপথ ও সিংহলে আয়ুর্ব্বেদ প্রচার সম্বন্ধীয় অধিকাংশ বিষয় মান্দ্রাজের [illegible] বৈদ্যরত্ন গোপালাচার্য্যু মহাশয়ের সাহায্যে সংগৃহীত হইয়াছে।

প্রবর্ত্ত হয় নাই। যাহাতে দেশের সমস্ত চিকিৎসক ও পণ্ডিতগণের যত্নে ভারতব্যাপী বিশিষ্ট প্রযত্ন হয় তাহার আয়োজন সম্প্রতি হইতেছে। এইরূপ চেষ্টার ফলে আয়ুর্ব্বেদের যে বিশেষ অঙ্গপুষ্টি হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশস্থ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক "নিখিল 'ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদ সম্মেলন'' নামে যে মহাসভা স্থাপিত হইয়াছে, প্রতিবৎসর ভারতবর্ষের কোন একটী নগরে সেই মহাসভার অধিবেশন হইয়া থাকে। সেই অধিবেশনের সহিত যে প্রদর্শনী খোলা হয়, তাহাতে প্রতি বৎসর বহু নূতন গ্রন্থ দেখান হয়। সম্মেলনের স্থায়িসমিতি দ্বারা প্রচারিত বিবরণীতে সেই সকল গ্রন্থের পরিচয় লিখিত হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদে রক্তমোক্ষণ।

—:*:—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(কবিরাজ শ্রী..............বন্দ্যোপাধ্যায়।)

অসম্পূর্ণ ধাতু বলিয়া বালকদিগের, ক্ষীণ ধাতু বলিয়া স্ত্রীলোকদিগের, বায়ুরোগ উৎপন্ন হইবার আশঙ্কায় ও উরঃক্ষত বশতঃ ক্ষীণ ব্যক্তিদিগের, তমোবহুল প্রকৃতি বলিয়া রক্ত দর্শনে মূর্চ্ছা জন্মাইবার আশঙ্কায় ভীরুব্যক্তিদিগের, অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইয়া মৃত্যু ঘটিবার আশঙ্কায় পরিশ্রান্ত ব্যক্তিদিগের, বায়ু প্রকুপিত হইবার ভয়ে স্ত্রীসহবাস হেতু কৃশ ব্যক্তিদিগের, অতিরিক্ত মূর্চ্ছা হইবার ভয়ে মদ্যপায়ী ব্যক্তিদিগের, বায়ু প্রকুপিত হইবার ভয়ে পথভ্রমণ হেতু কৃশ ব্যক্তিদিগের, অধিক বায়ু কুপিত হইবার ভয়ে যাহাদের বমনকরান হইয়াছে তাহাদের ও যাহাদের বিরেচন করান হইয়াছে তাহাদের, বায়ু প্রকোপের ভয়ে আস্থাপিত (যাহাদের আস্থাপন দেওয়া হইয়াছে) ও জাগরণশীল ব্যক্তিদিগের, মন্দ অগ্নি অধিকতর মন্দ হইবার ভয়ে অনুবাসিত (যাহাদের স্নেহবস্তি প্রয়োগ করা হইয়াছে) ব্যক্তিদিগের, প্রধান ধাতুক্ষয় হইয়া প্রাণনষ্ট হইবার ভয়ে অলসপ্রাণ ব্যক্তিদিগের, ক্ষীণধাতু বলিয়া দেহ নাশের ভয়ে ক্ষীণ ও গর্ভিণীদিগের, কাস, শ্বাস ও শোষ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের, ধাতু-পুষ্ট হয় না বলিয়া রক্তক্ষয় বশতঃ প্রাণনাশের ভয়ে তাহাদিগের, প্রলাপাদি জন্মিবার ভয়ে জীর্ণ জ্বর রোগীর, অত্যধিক বায়ুপ্রকোপের ভয়ে আক্ষেপক রোগীর, পক্ষাঘাত রোগীর ও উপবাসীদিগের এবং প্রাণনাশের আশঙ্কায় মূর্চ্ছিত ও পিপাসিত ব্যক্তিদিগের শিরা বিদ্ধ করা উচিত নহে। বিদ্ধ করিলে যে সকল উপদ্রবের আশঙ্কায় বিদ্ধ করা উচিত নহে বলা হইয়াছে, সেই সকল উপদ্রব ঘটিয়া থাকে।

শিরা অবেধ্য হইলে, অথবা যে শিরা বিদ্ধ করিবার যোগ্য তাহা দেখা না যাইলে, দেখা গেলেও যদি যন্ত্র দ্বারা বন্ধন করা না যায়, বন্ধন করিলেও যদি শিরা উন্নত না হয়, তাহা হইলেও শিরা বিদ্ধ করা উচিত নহে।

পূর্ব্বে যে সমস্ত ব্যাধিতে রক্তমোক্ষণ করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে—সেই সমস্ত ব্যাধিতে এবং যে সকল ব্যাধির বিষয় পূর্ব্বে কথিত হয় নাই অর্থাৎ অপক্ব ব্রণ প্রভৃতি ব্যাধিতে স্নেহ স্বেদাদি প্রয়োগ করিয়া শিরা বিদ্ধ করিবে।

কিন্তু যাহাদের শিরা বিদ্ধ করা নিষিদ্ধ, তাহাদের বিষ জনিত উপসর্গে অর্থাৎ সর্পাদি কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে এবং বিদ্রধি প্রভৃতি অন্য উপায়ে অসাধ্য ব্যাধিতে প্রাণনাশের আশঙ্কা ঘটিলে শিরা বিদ্ধ করা যাইতে পারে।

রোগীকে স্নেহ পান দ্বারা স্নিগ্ধ এবং স্বেদ প্রয়োগ দ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া রক্তের উৎক্লেদ জন্মাইবার জন্য তরল খাদ্য বা যবাগূ পান করাইবে। অনন্তর যথাকালে (অর্থাৎ যে ঋতুতে এবং যেরূপ সময়ে শিরা বিদ্ধ করা হিতকর) রোগীকে উপবেশন করাইয়া, বস্ত্র, পাট, চর্ম্ম, গাছের ছাল, লতা দ্বারা যে শিরা বিদ্ধ করিতে হইবে সেই শিরা 'মস্তকে অত্যন্ত গাঢ় না হয়—এরূপ ভাবে এবং হস্ত পদে অত্যন্ত শিথিল না হয়—এরূপভাবে বন্ধ করিয়া উপযুক্ত শস্ত্র দ্বারা শিরা বিদ্ধ করিবে।

অত্যন্ত শীতের সময়, অত্যন্ত গরমের সময়, প্রবল বায়ু বহিতে থাকিলে ও মেঘাচ্ছন্ন দিনে শিরা বিদ্ধ করা উচিত নহে। রোগ না থাকিলে কদাচ শিরা বিদ্ধ করা উচিত নহে।

যে রোগীর শিরা বিদ্ধ করিতে হইবে, তাহাকে সূর্য্যের দিকে মুখ রাখিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ-পর্য্যন্ত এক হস্ত প্রমাণ উচ্চ আসনে উপবেশন করাইবে। অনন্তর পদদ্বয় কুঞ্চিত করিয়া জানুসন্ধিদ্বয়ের উপরে দুই হস্তের দুই কনুই রাখিতে হইবে এবং দুই হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ঘাড়ের পিছন দিকে সংলগ্ন করিবে। বন্ধন রজ্জুর অর্থাৎ যে রজ্জু দ্বারা শিরা বন্ধন করা হয়—তাহার দুই মুখ গ্রীবাস্থিত মুষ্টিদ্বয়ের উপর দিয়া পশ্চাৎভাগ হইতে অন্য ব্যক্তি উত্তান বামহস্ত দ্বারা ধরিয়া রাখিবে এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বেধ্য শিরা উত্থাপিত করিবে। এই সময় রোগী মুখ বায়ুপূর্ণ করিয়া থাকিবে এবং যাহাতে সম্যক রক্তস্রাব হয় তজ্জন্য পশ্চাৎভাগস্থিত ব্যক্তি রজ্জু ধরিয়া টানিবে ও রোগীর পৃষ্ঠদেশ মর্দ্দন করিবে। মুখ ব্যতীত মস্তকের শিরা বিদ্ধ করিবার প্রণালী এইরূপ।

পায়ের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে—যে পায়ের শিরা বিদ্ধ করিতে হইবে—সেই পা সমতল স্থানে স্থিরভাবে রাখিতে হইবে এবং অন্য পা খানি ঈষৎ সঙ্কুচিত ও উচ্চ করিয়া রাখিবে। অনন্তর বেধ্য পা খানির হাটুর নীচে রজ্জু দ্বারা বেষ্টন করিয়া দুই হস্ত দ্বারা পায়ের গুলফদেশ পীড়ন করিবে এবং বিদ্ধ করিবার স্থান হইতে চারি অঙ্গুলি উপরে বস্ত্র বন্ধনাদি দ্বারা বন্ধন করিয়া পদের শিরা বিদ্ধ করিবে। হস্তের উপরিভাগে শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে, চারি অঙ্গুলির মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ রাখিয়া হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিবে এবং সুখকর ভাবে উপবেশন করাইয়া বিদ্ধ করিবার ন্যায় যন্ত্রিত অর্থাৎ বদ্ধ করিয়া হস্তের শিরা বিদ্ধ করিবে।

গৃধ্রসী (Sciatica) রোগে জানু সঙ্কুচিত করিয়া শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। শ্রোণি (পাছা) পৃষ্ঠ ও স্কন্ধ দেশের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে পৃষ্ঠ দেশ উন্নত ও বিস্তৃত করিয়া এবং মস্তক নীচু করিয়া রাখিতে হয়। উদর ও বক্ষঃস্থলের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে বক্ষঃস্থল বিস্তারিত, মস্তক উন্নত এবং শরীর প্রসারিত রাখিতে হয়। পার্শ্বদ্বয়ের শিরা

বিদ্ধ করিতে হইলে দুই হস্ত দ্বারা শরীর জড়াইয়া ধরিতে হয়। লিঙ্গের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে লিঙ্গ অবনত করিয়া রাখিতে হয়, জিহ্বার অধোভাগের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে জিহ্বার অগ্রভাগ উন্নত করিয়া উপরের দন্তপাটিতে ঠেকাইয়া রাখিতে হয়। তালু এবং দন্তমূলের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে মুখ খুব হাঁ করিয়া রাখিতে হয়। এইরূপে রোগ বিশেষে এবং স্থান বিশেষে যুক্তিপূর্ব্বক যাহাতে বেধ্য শিরা উন্নত হইয়া উঠে—এরূপ ভাবে অবস্থান করাইয়া বা যন্ত্র দ্বারা বন্ধন করিয়া শিরা বিদ্ধ করিবে।

মাংসল স্থানে শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে এক যব প্রমাণ শস্ত্র প্রবিষ্ট করাইবে। অন্যান্য স্থানে অর্দ্ধযব প্রমাণ বা ব্রীহিমুখ শস্ত্র দ্বারা এক ব্রীহি অর্থাৎ ধান্য পরিমাণ বিদ্ধ করিবে। অস্থির উপর কুঠারিকা নামক শস্ত্র দ্বারা অর্দ্ধ যব পরিমাণ বিদ্ধ করিতে হয়।

বর্ষাকালে মেঘ শূন্য দিবসে, গ্রীষ্মকালে শীতল সময়ে * এবং শীতকালে মধ্যাহ্নে অস্ত্র প্রয়োগ করা উচিত।

সম্যক প্রকারে শস্ত্র প্রয়োগ করা হইলে রক্ত মুহূর্ত্তকাল (৪৮ মিনিট) ধারাকারে স্রাব হইয়া বন্ধ হইয়া যায়। কুসুম ফুল পীড়ন করিলে প্রথমে যেমন পীতবর্ণ স্রাব হয় সেই রূপ শিরা বিদ্ধ করিলে প্রথমে দুষ্ট রক্ত নির্গত হইয়া থাকে। মূর্চ্ছিত, ভীত, পরিশ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির শিরা বিদ্ধ করিলেও রক্তস্রাব হয় না। আবার রোগীকে যন্ত্রিত করিলেও যে সকল শিরা উন্নত হয় না, সেই সকল শিরা বিদ্ধ করিলেও রক্ত স্রাব হয় না।

বহুদোষ বিশিষ্ট ক্ষীণ ব্যক্তির এবং মূর্চ্ছা পীড়িত অক্ষীণ ব্যক্তির শিরা বিদ্ধ করিলে যদি রক্ত স্রাব না হয় এবং রক্তমোক্ষণ করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া থাকে, তাহা হইলে অপরাহ্নে পর দিবসে বা তৃতীয় দিবসে পুনর্ব্বার শিরা বিদ্ধ করা উচিত।

ক্ষীণ ব্যক্তির শরীর হইতে সমস্ত দূষিত রক্ত নির্গত করিবে না। কারণ অতিরিক্ত রক্ত মোক্ষণ করাইলে বিপত্তি ঘটিতে পারে। অবশিষ্ট দোষ—দোষ নাশক ঔষধ দ্বারা প্রশমন করা উচিত। বলবান্, বহু দোষ যুক্ত এবং বয়ঃপ্রাপ্ত (বালক বা বৃদ্ধ নহে) ব্যক্তির শরীর হইতে ১০৮ তোলা রক্তস্রাব করান যাইতে পারে।

পাদ-দাহ, পাদহর্ষ, অববাহুক, বিসর্প, বাতরক্ত, বাত-কণ্টক, বিচর্চ্চিকা ও পাদদারী প্রভৃতি রোগে ক্ষিপ্র মর্ম্মের (অঙ্গুষ্ঠ ও তৎপার্শ্বস্থ অঙ্গুলির মধ্যে অর্দ্ধাঙ্গুল প্রমাণ মর্ম্মস্থলে) দুই অঙ্গুলি উপরে ব্রীহিমুখ অস্ত্র দ্বারা শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। শ্লীপদ রোগে ক্ষিপ্র মর্ম্মের চারি অঙ্গুলি উপরে বিদ্ধ উচিত। ক্রোষ্টুকশীর্ষ, খঞ্জ ও পঙ্গু রোগে—গুলফ দেশের চারি অঙ্গুলি উপরে জঙ্ঘা দেশের শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। অপচী রোগে ইন্দ্রবস্তি নামক মর্ম্মের (জঙ্ঘার মধ্যে পশ্চাৎ দিকে পায়ের গোড়ালি হইতে তের অঙ্গুলি উপরে ইন্দ্রবস্তি মর্ম্ম) দুই অঙ্গুলি নিম্নে শিরা বিদ্ধ করা কর্ত্তব্য। গৃধ্রসী রোগে জানু সন্ধির চারি আঙ্গুল উপরে বা নীচে শিরা বিদ্ধ করিবে। গলগণ্ড রোগে উরু দেশের মূল ভাগের শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। এই পর্য্যন্ত এক সকথির (সমস্ত

* 'গ্রীষ্মকালেতু শীতলে" এই পাঠের ডল্লন টীকা 'তৃতীয় প্রহারানন্তরম্' এই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কিন্তু গ্রীষ্মকালে তৃতীয় প্রহরের পর শীতল কাল নয়। বিশেষতঃ পুনরায় বিদ্ধ করিতে হইলে অপরাহ্নে বিদ্ধ করিতে বলা হইয়াছে। সুতরাং গ্রীষ্মকালে প্রাতে বিদ্ধ করা উচিত বলিয়া মনে হয়।—লেখক।

পায়ের) শিরা বিদ্ধ করিবার যেরূপ নিয়ম বলা হইল—অপর সকথির এবং বাহুর শিরাও এইরূপ নিয়মে বিদ্ধ করিবে।

বিশেষতঃ প্লীহাবৃদ্ধি রোগে বাম বাহুর কূর্পর সন্ধির কনুয়ের অভ্যন্তরস্থ শিরা বা কনিষ্ঠা ও অনামিকার মধ্যস্থিত শিরা বিদ্ধ করিবে এবং যকৃৎবৃদ্ধি রোগে ও দক্ষিণ বাহুর ঐরূপ স্থলের শিরা বিদ্ধ করিবে। কাস ও শ্বাস রোগেও এইরূপ নিয়মে বিদ্ধ করা উচিত। বিশ্বচী রোগে গৃধ্রসীর ন্যায় অর্থাৎ কনুয়ের চারি অঙ্গুলি উপরে বা নিম্নে শিরা বিদ্ধ করিবে। শূলযুক্ত প্রবাহিকা রোগে কটীদেশের দুই অঙ্গুলির মধ্যস্থ স্থানের শিরা বিদ্ধ করা উচিত। পরিকর্ত্তিকা (কর্ত্তনবৎ পীড়া) ও উপদংশ, শূকদোষ ও শুক্রজ রোগে লিঙ্গমধ্যস্থ শিরা বিদ্ধ করিবে। মূত্রবৃদ্ধি রোগে কোষের পার্শ্বস্থ শিরা বিদ্ধ করিবে। জলোদরে নাভির অধোভাগে সেবনীর চারি অঙ্গুলি বামদিকে শিরা বিদ্ধ করিবে। অন্তর্বিদ্রধি ও পার্শ্ব শূল রোগ বাম পার্শ্বে হইলে—বাম পার্শ্বের বগল ও স্তনের মধ্যবর্ত্তী স্থলে এবং দক্ষিণ পার্শ্বে হইলে দক্ষিণ পার্শ্বের ঐরূপ স্থলের শিরা বিদ্ধ করিবে। কেহ কেহ বলেন যে, বাহু শোষ এবং অববাহুক রোগে স্কন্ধের মধ্যবিত্ত শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। তৃতীয়ক জ্বরে ত্রিক সন্ধির (গ্রীবা ও মধ্য শরীরের সন্ধি) অংশ নামক মর্ম্মদ্বয় বাদ দিয়া তৎসমীপবর্ত্তী শিরা বিদ্ধ করা উচিত। চাতুর্থক জ্বরে স্কন্ধসন্ধির অধোভাগে বাম বা দক্ষিণ পার্শ্বের শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। অপস্মার রোগে হনু সন্ধির (চোয়ালের সন্ধি) মধ্য গত শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। উন্মাদ এবং অপস্মার রোগে বক্ষঃস্থল, ললাট এবং অপাঙ্গ দেশের সন্ধিস্থলে শিরা বিদ্ধ করিবে। জিহ্বা রোগে ও দন্ত রোগে জিহ্বার অধোভাগস্থ এবং তালু রোগে তালুগত শিরা বিদ্ধ করা উচিত। কর্ণ-শূলে ও কর্ণ রোগে কর্ণদ্বয়ের উপরিভাগে চারিদিকে বিদ্ধ করা যাইতে পারে। নাসারোগে এবং ঘ্রাণশক্তি নষ্ট হইলে—নাসাগ্রে শিরা বিদ্ধ করা উচিত। তিমির নামক চক্ষুরোগে, চক্ষুর পাক শিরোরোগে, অধিমন্থ প্রভৃতি রোগে নাসিকার সমীপস্থ ললাট স্থিত এবং অপাঙ্গদেশে ভ্রূপুচ্ছ মধ্যবর্ত্তী শিরা বিদ্ধ করিতে হয়।

শিরা বিদ্ধ করিবার দোষ বিংশতি প্রকার, যথা—দুর্ব্বিদ্ধ, অতিবিদ্ধ, কুঞ্চিত, পিচ্চিত, কুট্টিত, অপ্রস্রুত, অত্যুদীর্ণ, অন্তে অভিহিত, পরিশুষ্ক, কূর্ণিত, বাপিত, অনুত্থিত, বিদ্ধ, শস্ত্রহত, তির্য্যগবিদ্ধ, অপবিদ্ধ, অব্যাধ্য, বিদ্রুত, ধেণুকা, পুনপুনঃ বিদ্ধ এবং শিরা, স্নায়ু, অস্থি, সন্ধি ও মর্ম্মস্থানে বিদ্ধ। প্রত্যেকের লক্ষণ পৃথক ভাবে বলা যাইতেছে।

সূক্ষ্ম অস্ত্রদ্বারা বিদ্ধ করিলে যদ্যপি রক্ত সম্যক প্রকারে স্রুত না হয় এবং বেদনা ও শোথ জন্মে তবে তাহাকে দুর্ব্বিদ্ধ বলা যায়। উপযুক্ত প্রমাণের অতিরিক্ত বিদ্ধ করিলে যদি শোণিত দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে অথবা অধিক পরিমাণে শোণিত স্রাব হয়, তবে তাহাকে অতিবিদ্ধ বলে। কুঞ্চিত অর্থাৎ বিদ্ধ স্থান কুটিলীভূত হইলেও এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়। ধারহীন (ভোঁতা) অস্ত্রদ্বারা বিদ্ধ করিলে যদি বিদ্ধস্থান মথিত হইয়া ফুলিয়া উঠে তবে তাহাকে পিচ্চিত বলা যায়। শস্ত্র যদি সম্যক্ প্রমাণ অভ্যন্তরে প্রবেশ না করে এবং ভজ্জন্য পুনঃ পুনঃ বিদ্ধ করা যায় তাহা হইলে কুট্টিত বলা যায়। শীত, ভয় এবং মূর্চ্ছার [illegible]

হয়, তবে অপ্রক্রুত বলা যায়। তীক্ষ্ণ ও বৃহৎ মুখ বিশিষ্ট শস্ত্র দ্বারা অধিক পরিমাণে বিদ্ধ করিলে তাহাকে অতিদীর্ণ বলে। অল্প রক্তস্রাব হইলে অন্তে অভিহত বলা যায়। অল্প রক্ত বিশিষ্ট শক্তির বিদ্ধ স্থান বায়ু পূর্ণ হইলে তাহাকে পরিশুষ্ক বলে। উপযুক্ত প্রমাণের চতুর্থাংশ মাত্র বিদ্ধ হইয়া অল্প রক্তস্রাব হইলে তাহাকে কুণিত বলে। কম্পবান ব্যক্তির অনুপযুক্ত স্থানে বন্ধন হেতু শোণিত স্রাব না হইলে তাহাকে ব্যাপিত বলে। বেধ্য শিরা উত্থিত হইলে যদি বিদ্ধ করা যায় তাহা হইলে রক্তস্রাব হয় না। ইহাকে অনুত্থিত বলে। শিরা ছিন্ন হইয়া যদি অতিরিক্ত রক্তস্রাব হয় এবং গমন ও গ্রহণাদি ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে, তবে তাহাকে শস্ত্রহত বলে। তির্য্যকভাবে শস্ত্র প্রয়োগ করায় যদি সম্যকরূপ বিদ্ধ না হয় তবে তাহাকে তির্য্যক্‌বিদ্ধা বলে। হীন শাস্ত্র প্রয়োগ হেতু অধিক ক্ষত হইলে অপবিদ্ধ বলা যায়। শস্ত্র প্রয়োগের অযোগ্য স্থানে বা অযোগ্য ব্যক্তিকে শস্ত্র প্রয়োগ করিলে তাহাকে অব্যাধ্যা বলে। অব্যবস্থিত (তাড়াতাড়ি বা কম্পিত হস্তে) ভাবে বিদ্ধ করিলে তাহাকে বিদ্রুত বলে। উপর্য্যুপরি শস্ত্র প্রয়োগ করিলে মুহুর্মুহু শোণিত স্রাব হইতে থাকে, ইহাকে ধেনুকা বলা যায়। সূক্ষ্ম শস্ত্র দ্বারা এক স্থানে বহুবার বিদ্ধ করা হইলে পুনঃ পুনঃ বিদ্ধ বলে। স্নায়ু, অস্থি, শিরা, সন্ধি ও মর্ম্মস্থান বিদ্ধ হইলে অত্যন্ত বেদনা, শোষ, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। এইজন্য অত্যন্ত সাবধানতার সহিত শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। কেননা অজ্ঞানতা বশতঃ শিরা বেধের দোষ ঘটিলে নানাপ্রকার বিপত্তি ঘটিতে পারে।

শিরা বিদ্ধ করিলে যত শীঘ্র ব্যাধি প্রশমিত হয়, স্নেহ প্রয়োগাদি এবং লেপনাদি ক্রিয়া দ্বারা তত শীঘ্র প্রশমিত হয় না। কার চিকিৎসা মধ্যে যে বস্তি ক্রিয়াকে অর্দ্ধেক চিকিৎসা বলা হইয়াছে, শল্য তন্ত্রে সেইরূপ শিরাবেধকে অর্দ্ধেক চিকিৎসা বলা হইয়াছে।

স্নিগ্ধ, স্বিন্ন, বান্ত, বিরিক্ত, আস্থাপিত, অনুবাসিত ও শিরা বিদ্ধ ব্যক্তিগণ শরীর সবল না হওয়া পর্য্যন্ত ক্রোধ, পরিশ্রম, মৈথুন, দিবানিদ্রা, অতিরিক্ত কথা বলা, ব্যায়াম, যানে ভ্রমণ, অধিক ক্ষণ দাঁড়াইয়া বা বসিয়া থাকা, ভ্রমণ, শীত, বায়ু ও রৌদ্র সেবন, বিরুদ্ধ, অসাত্ম্য ও অজীর্ণকর দ্রব্য ভোজন পরিত্যাগ করিবে। কেহ কেহ কেহ বলেন। এক মাস কাল এইরূপ নিয়ম পালন করা উচিত ;

স্বাস্থ্য বিজ্ঞান।

প্রাতরুত্থান।

——:০:——

(ডাঃ শ্রীনলিনীনাথ মজুমদার এইচ এল, এস, এস)।

স্বাস্থ্য কামী ব্যক্তি অতি প্রত্যুষে শয্যা-ত্যাগ করিবে। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তই গাত্রোত্থানের উপযুক্ত কাল। সূর্য্যোদয়ের দেড় ঘণ্টা বা অর্দ্ধ প্রহর কালের মধ্যে দুইটি মুহূর্ত্ত আছে, তাহার প্রথম মুহূর্ত্তের নাম ব্রাহ্ম, দ্বিতীয় মুহূর্ত্তের নাম রৌদ্র। এতদ্দেশে গ্রীষ্মকালে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে ভোর ৪ ঘটীকায়, বর্ষা-কালে আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ৪ ঘটীকা ৪৫ মিনিটে বা ৪। সোয়া চারিটায়, ভাদ্র আশ্বিন মাসে ৪॥ টায়, কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ পৌষে পাঁচ-টায়, পৌষ মাঘ মাসে ৫ ঘটিকায় এবং ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে ৫। সোয়া পাঁচ ঘটিকার সময় শয্যাত্যাগ করা সকল সুস্থ ব্যক্তিরই নিতান্ত প্রয়োজন। তবে অসুস্থ ব্যক্তির কথা স্বতন্ত্র। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তের এই সুন্দর সময় শাস্ত্রে "মধুময় সময়" বলে। এ সময় মধুর বায়ু প্রবাহিত হয়, সাগর ও নদীগণ মধু ক্ষরণ করে, বৃক্ষলতা-গণ মধুর ভাব ধারণ করে, এমন কি পার্থিব ধুলিকণা পর্য্যন্ত মধুবৎ হইয়া থাকে। এ স্থলে মধু শব্দের অর্থ কল্যাণকর বা স্বাস্থ্যপ্রদ। ফলতঃ প্রত্যুষে গাত্রোত্থান যে সর্ব্বথা কর্ত্তব্য সে বিষয়ে প্রাচীন শাস্ত্রে বহু উপদেশ উক্ত আছে। শাস্ত্রকারগণ সে কালের বর্ণন অতি সুন্দরভাবে করিয়াছেন।—

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও প্রাতরুত্থানের উপ-কারিতা বিশিষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়াই প্রাতঃ-কালীন ভ্রমণ বা (morning walk) ব্যবস্থা করেন। এসম্বন্ধে তাঁহারা এরূপ একটি পদ্য ও ইংরাজী ভাষায় রচনা করিয়াছেন যে,—

"The early bed and early rise
Makes the man healthy wealthy
and wise."

অর্থাৎ

সকালে শয়ন আর প্রত্যুষে উত্থান—
বৃদ্ধি করে মানবের স্বাস্থ্য, ধন, জ্ঞান।

কিন্তু তন্মধ্যে হিন্দুশাস্ত্র প্রাতঃকালীন ভ্রমণের পূর্ব্বে অর্থাৎ জাগ্রত হইবামাত্রেই সর্ব্বপ্রথমে পরম কারুণিক পরমেশ্বরের এবং দেবতা ও সাধুগণের নাম স্মরণ এবং শ্রীগুরুদেবকে স্মরণ পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া গত রাত্রের কৃতাপরাধ সমূহের মার্জ্জনা এবং অদ্যকার শুভদিন প্রার্থনা করিয়া লইয়া শয্যাত্যাগের ব্যবস্থা দিয়াছেন। সেরূপ আচরণ করিলে মঙ্গলময় পরম পিতার করুণায় সমস্ত দিন মঙ্গল ভাবে নিরাপদে কাটিয়া যায়। পাশ্চাত্য শাস্ত্রে সেরূপ কোন ব্যবস্থা নাই বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রের যুক্তি উপেক্ষা করা উচিত নহে। হিন্দুর যাবতীয় কার্য্যেই ভগবানের নাম স্মরণ করিবার ব্যবস্থা আছে। অতঃপর শয্যাত্যাগকালে "জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তি,জানাম্য ধর্ম্মং নচমে নিবৃত্তিঃ। ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি॥" গীতোক্ত এই সার শ্লোকটি পাঠ করতঃ "প্রিয় দত্তায়ৈ ভুবে নমঃ" এই মন্ত্রো-চ্চারণ পূর্ব্বক পৃথিবীকে নমস্কার করিয়া

প্রথমতঃ দক্ষিণপদ ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া গাত্রোত্থান করিবে।

বিষ্ঠামূত্রোৎসর্গ।

উত্থিত হইয়া চক্ষু ও মুখে জল দিয়া মুখ প্রক্ষালনান্তে বস্ত্র দ্বারা মস্তক আচ্ছাদন পূর্ব্বক মল মূত্র বিহীন শুচি স্থানে অবস্থিতির স্থান হইতে নৈঋত কোনে বান বিক্ষেপ যোগ্য স্থানের বাহিরে অর্থাৎ সার্দ্ধ শত হস্তের বাহ্যদেশে যত্নে ষ্টীবন ও উচ্ছ্বাস বর্জ্জিত মৌনী এবং সমাহিত চিত্তে উভয় পাটির দন্তে দন্তে দৃঢ় লগ্নভাবে আবদ্ধ করতঃ মল মূত্র ত্যাগ করিবে। সেস্থানে অধিককাল অবস্থান করিবে না এবং বাক্যোচ্চারণ করিবে না। দিবাভাগে উত্তর মুখে ও রাত্রিতে দক্ষিণ মুখ হইয়া মল মূত্র ত্যাগ করিবে না। রুগ্ন ব্যক্তি ভিন্ন অপর কেহই সন্ধ্যাকালে মলাদি ত্যাগ করিবে না।

উক্তরূপ ব্যবস্থায় আধুনিক পায়খানায় মল মূত্র ত্যাগের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইতেছে। কারণ তাহাতে উক্ত কোন নিয়মই স্থির রাখিবার উপায় নাই। প্রাতঃকালে পুষ্পাদির মনোরম সুগন্ধের পরিবর্ত্তে পায়খানার দুর্গন্ধ গ্রহণ যে নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু এমনি কালমাহাত্ম্য যে, আজ কাল বিশেষতঃ সহরবাসিগণের পক্ষে সেই বিষময় অস্বাস্থ্যকর দুর্গন্ধ প্রত্যহ—এমনকি দৈনিক দুই তিন বারও গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হইতেছে। ইহাতে স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে কিরূপে, এই নিমিত্তই সহরাপেক্ষা পল্লীবাসী এ পক্ষে স্বাস্থ্যকর।

বিষ্ঠামূত্র ত্যাগকালে দ্বিজাতি গৃহী যজ্ঞোপবীতকে পৃষ্ঠদেশে কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হারবৎ কণ্ঠ লম্বিত, অথবা মস্তক অবগুণ্ঠন পূর্ব্বক দক্ষিণ কর্ণে ধারণ করিবেন। তবে যদি প্রাণ বিনাশের আশঙ্কা থাকে কিম্বা কোন কারণে ভীতির সঞ্চার হয়, তবে দ্বিজ সর্ব্বদা ছায়াতে কি অন্ধকারে দিবাতে কি রাত্রিতে নিজের সুবিধামত যে কোন মুখে উপবিষ্ট হইয়া মল মূত্র ত্যাগ করিবে। সূর্য্য, জল, গো ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে সম্মুখবর্ত্তী করিয়া এবং পথে, ভস্মে, গোষ্ঠে, হালকর্ষিত ভূমিতে, জলে, শ্মশানে, ইষ্টকস্তূপে, পর্ব্বতে, জীর্ণ দেবায়তনে বল্মীক প্রাণী বিশিষ্ট গর্ত্তে, গমন করিতে করিতে, দণ্ডায়মানাবস্থায়, নদীতীরে, পর্ব্বত মস্তকে এবং বায়ু অগ্নি ও ব্রাহ্মণ এবং জল, সূর্য্য ইহা দিগকে দর্শন করিতে করিতে কদাচ বিষ্ঠামূত্র ত্যাগ করিবে না। এতাদৃশ অহিতাচার করিলে সে ব্যক্তি চির রুগ্ন ও অল্পায়ু হইয়া থাকে। আহার বিহার এবং মূত্র পুরীষোৎসর্গ সর্ব্বদা অতি গোপনীয় স্থানে করিতে হইবে। এরূপ সদাচরণ করিলে মানব শ্রীযুক্ত হয় নচেৎ শ্রীহীনতা অবশ্যম্ভাবী। পাদুকা পায়ে দিয়া মল মূত্র ত্যাগ করিবে না। (এখন অনেকেই এরূপ করেন) জলপাত্র হস্তে করিয়া মল মূত্র ত্যাগ করিলে পাত্রস্থিত জল মূত্র তুল্য হয়। অতএব উহা দূরে নিক্ষেপ করিবে।

শৌচ।

স্বাস্থ্যকামী ও ধর্ম্মবিদ ব্যক্তি অধঃ শৌচে দক্ষিণ হস্ত ব্যবহার করিবে না। পক্ষান্তরে বাম হস্ত দ্বারা নাভির উর্দ্ধ স্থানে শোধন করিবে না। সুস্থাবস্থায় উক্তরূপ আচরণ এবং প্রত্যেকবার মল বা মূত্র ত্যাগান্তে পদ ধৌত করিবে। পীড়াগ্রস্থ ব্যক্তি ইহার ব্যতিক্রম করিতে পারিবেন।

মল ত্যাগান্তে সুন্দর পবিত্র স্থানে বাগ্‌যত হইয়া উদ্ধৃত জল এবং মৃত্তিকা সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রথমে মৃত্তিকা বাম হস্তে লেপন করতঃ মর্দ্দন করিবে, পরে যাবৎ মৃত্তিকা সম্পূর্ণ ধৌত না হয়—সে পর্য্যন্ত বারম্বার জল প্রয়োগ করিবে। এইরূপে হস্ত হইতে মলগন্ধ বিদুরিত হইলেই শৌচ কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

বল্মীক, মুষিকোৎখাত, জলমধ্যস্থিত শৌচাবশিষ্ট, গৃহ হইতে, লেপ৽ সম্ভব, সকর্দ্দম এই সকল মৃত্তিকা শৌচ কার্য্যে কদাচ ব্যবহার করিবে না।

বিষ্ণু পুরাণ, দক্ষ সংহিতা ও যম সংহিতা প্রভৃতিতে মৃত্তিকা প্রদানের নানাপ্রকার ব্যবস্থা আছে; ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, যে পর্য্যন্ত অঙ্গ সকল মল-গন্ধ-শূন্য না হয় সে পর্য্যন্ত বারম্বার মৃত্তিকা সংযোগ এবং জলদ্বারা ধৌত করিবে। বর্ত্তমানকালে এপ্রকার শৌচাচার বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে। একার্য্য কিছুমাত্র কঠিন নহে, কিন্তু বহুকালের অভ্যাস বশতঃ প্রথমাভ্যাসে দিনকতক আলস্য আসিতে পারে। কিন্তু তাহা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। আলস্য বা উদাসীন্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক উক্ত রূপ অভ্যাস করিলে স্বাস্থ্য সুখ অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

মূত্র শৌচ।

একার্য্যটি আধুনিক সভ্যতায় এক কালেই বিলুপ্ত হইয়াছে। একালের শিক্ষিত সম্প্রদায় এসকল উপদেশের বিন্দুমাত্রও প্রাপ্ত হন না বা আদর্শ কোন শুচি ব্যক্তিকেও দেখিতে পান না। সুতরাং এ বিষয়ের প্রচলন আর লক্ষিত হয় না। ফলে মূত্র ত্যাগের পর জল না লওয়ায় একালে নানাপ্রকার মূত্রযন্ত্রের পীড়ায় আধিক্য ঘটিয়াছে।

পাশ্চাত্য জাতির পরিচ্ছদানুরোধে দণ্ডায়মানাবস্থায় যথায় তথায় মূত্র ত্যাগের আদর্শে কতিপয় হিন্দু সন্তানকেও উক্ত অনাচার অনুকরণে বাধ্য করিয়াছে। বহুদিন এতাদৃশ কদাচার করিবার পর যখন পাশ্চাত্য সভ্য জাতির মধ্যে অধিক লোকের মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ উপস্থিত হইতে লাগিল, তখন তাঁহারা উক্ত প্রকারে মূত্র ত্যাগকেই তাহার কারণ মনে করিয়া উহা ত্যাগ করিলেন। কিন্তু অনুকরণ প্রিয় হিন্দুসন্তান মধ্যে অদ্যাপি অসদাচরণ পরিত্যক্ত হয় নাই। ফলতঃ উক্তপ্রকারে মল ত্যাগ কেবল মূত্রকৃচ্ছ্র কেন, বহু কঠিন রোগেরও কারণ হইতে পারে। সকল প্রকার শৌচাচার অতি যত্নের সহিত অভ্যাস করা নিতান্ত আবশ্যক, যাহারা শৌচাচারে উদাসীন তাহাদের শরীর চিররুগ্ন হইয়া যাবতীয় সদনুষ্ঠান নিষ্ফল হইয়া থাকে। সদাচার পালনের ফলেই হিন্দু জাতি যে একদিন অতুল স্বাস্থ্যের অধীশ্বর হইয়াছিল ইহা অবিসংবাদিত।

শিশু-পালন।

—:*:—

রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বি-এ, সরস্বতী।)

আমাদের আহার্য্য দ্রব্য পূর্ব্বকথিত প্রণালী অনুসারে জীর্ণ হইয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। এইরূপে আমরা যতবার খাদ্য গ্রহণ করি, ততবারই রক্ত পরিপুষ্ট হয়। আমরা যদি পুষ্টিকর বিশুদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমাদের রক্তও বিশুদ্ধ ও পুষ্ট হয় এবং দেহও বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইতে থাকে।

রক্ত কি? রক্ত একপ্রকার বর্ণহীন তরল পদার্থ। ইহাতে অসংখ্য অনু-কোষ (corpuscles) ভাসিয়া বেড়ায়। অনু-কোষ দুই প্রকারের—এক রকম লাল, এক রকম সাদা। রক্ত সাধারণতঃ দেখিতে লাল বর্ণের। রক্তে যে লাল অনু-কোষ ভাসিয়া বেড়ায়, তাহারই জন্য রক্তের রঙ লাল। এই অনু-কোষ হইতে পৃথক করিলে রক্ত দেখিতে ঠিক ডিমের সাদা তরলাংশের ন্যায় দেখায়। রক্তে লাল অনুকোষের সংখ্যাই অধিক; সাদা অনু-কোষ তদপেক্ষা অনেক কম আছে। রক্তের এই অনুকোষগুলি শুধু চক্ষে দেখা যায় না। আমরা তাই শুধু লাল বর্ণের একটি তরল পদার্থ দেখি। এক ফোঁটা রক্ত যদি অনুবীক্ষণের নীচে রাখা যায়, তাহা হইলে রক্তের এই লাল ও সাদা অনুকোষগুলি দেখা যায়। লাল অনুকোষগুলি এত ছোট যে, ৩৫০০ লাল অনুকোষ যদি পাশাপাশি রাখা যায় তবে এক ইঞ্চি পরিমাণ ভূমি আবৃত করে, আর যদি ১০ হাজার অনুকোষ উপরি উপরি করিয়া থাক্ করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে উচ্চতায় এক ইঞ্চি হইবে। সাদা অনুকোষগুলি ইহার অপেক্ষা কিছু বড়। ইহাদের আকার মটরের ন্যায় এবং অন্য অসমান আকারেরও আছে।

রক্তের এই তিনটি অংশের কার্য্য এই :—

(১) ডিমের ন্যায় তরলাংশ দেহের কোষগুলির পুষ্টিসাধন করে এবং খাদ্যের জীর্ণ করা শর্করা ও মেদময় অংশ মস্তিকে ও মাংসপেশীতে বহন করিয়া লইয়া যায়।

(২) লাল অনুকোষগুলি ফুস্ফুস হইতে বিশুদ্ধ বাতাস লইয়া Tissueতে এবং Tissue হইতে দূষিত বাতাস ফুসফুসে লইয়া যায়। ইহারা বাতাস বহনের কার্য্য করে।

(৩) সাদা অনুকোষগুলি সমস্ত আঘাত জুড়িয়া দেয়! যত ঘা—কাটা ঘা, ভগ্ন হাড় এই সাদা অনুকোষই জুড়িয়া দেয়। ইহারা রোগের বীজাণু নষ্ট করে।

আমাদের দেহে অসংখ্য রক্তবহা নালী আছে। এই অসংখ্য রক্তবহা নালীর মধ্যে একটি প্রধান নালী আছে। এই নালী হৃৎপিণ্ডের বামদিকে অবস্থিতি করিতেছে ইহা হইতেই সহস্র সহস্র এবং লক্ষ লক্ষ [illegible]

বহা নালী বাহির হইয়া সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া আছে। এই অসংখ্য রক্তবহা নালী দিয়াই আমাদের দেহের রক্ত চলাচল করিতেছে। এই নালীগুলির গাত্র এত পাত্‌লা যে, আমাদের মস্তিষ্ক মাংসপেশী ও গ্রন্থি glands গুলির মধ্য দিয়া রক্ত চলিবার কালে তাহারা রক্ত হইতে তাহাদের পুষ্টিকর খাদ্য টানিয়া লয়। রক্তবহা নালীর মধ্য দিয়া রক্ত নিয়তই চলিতেছে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও থামে না। হৃৎপিণ্ডই রক্তকে রক্তবহা নালী দিয়া ক্রমাগত চালিত করিতেছে। প্রত্যেক স্পন্দনে রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে রক্তবহা নালী দিয়া কিছুদূরে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে এবং প্রতি মিনিটে হৃৎপিণ্ড ৬০।৭০ বার স্পন্দিত হয় বলিয়া রক্তের প্রবাহ অবিরাম চলিতে থাকে।

রক্ত একটি গোলাকার আবর্ত্তের ন্যায় আমাদের দেহে অনবরত ঘুরিতেছে। হৃৎপিণ্ড একটি নালী দ্বারা রক্তকে বাহির করিয়া দেয় এবং অন্য একটি নালী দ্বারা রক্ত পুনরায় হৃৎপিণ্ডে আগমন করে। এইরূপে রক্ত ক্রমাগত ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

আমাদের দেহের সমুদয় অংশে পুষ্টিকর খাদ্য এবং বাতাস যোগাইবার জন্যই রক্ত এইরূপ গোলাকার ভাবে প্রবাহিত হইতেছে।

পুষ্টিকর খাদ্য এবং বিশুদ্ধ বাতাসে পূর্ণ হইয়া রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে বাহির হইয়া সমগ্র দেহের প্রত্যেক অংশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া অবিশুদ্ধ অবস্থায় পুনরায় হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে। আসিবার পথে খাদ্যের সারাংশ বহন করিয়া আনে। এই অবিশুদ্ধ রক্ত পুনরায় সমগ্র দেহে চালিত হইবার পূর্ব্বে ফুসফুস হইতে বিশুদ্ধ বাতাস এবং পরিপাক যন্ত্র হইতে পুষ্টিকর খাদ্যে পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। কিরূপে এই রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া চলিতেছে তাহা চিত্র দেখিলে সহজেই বুঝা যায়। রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া বুঝাইবার জন্য চিত্র দেওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু "আয়ুর্ব্বেদ" পত্রের পরিচালকবর্গের অসুবিধার জন্য উপস্থিত তাহা হইয়া উঠিলনা, ভবিষ্যতে এই প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় তাহা প্রদর্শিত হইবে।

হৃৎপিণ্ড ফুসফুসদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। হৃৎপিণ্ডের চারিটি ঘর আছে। উপরে দুইটি এবং নীচে দুইটি। উপরে বামদিকে একটি ইহাকে বাম auricle এবং নীচে বাম দিকে একটি ইহাকে বাম Ventricle বলে এবং উপরে ডানদিকে একটি ইহাকে right auricle এবং তাহারি নীচে ডান দিকে একটি ইহাকে right ventricle বলে। উপরে বামদিগের ঘর হইতে উপরের ডানদিকে ঘরে যাইবার দ্বার নাই, কিন্তু উপরের বামদিকের ঘর হইতে নীচের বামদিগের ঘরে যাইবার একটি দ্বার আছে। তেমনি উপরের ডানদিকের ঘর হইতে নীচের ডানদিকের ঘরে যাইবার একটি দ্বার আছে। ডানদিকের দুইটি ঘরে অবিশুদ্ধ রক্ত এবং বামদিকের ঘর দুইটিতে বিশুদ্ধ রক্ত থাকে। হৃৎপিণ্ডের বামদিক, বিশুদ্ধ রক্ত দেহের প্রধান রক্তবহা নালীতে চালিত করিয়া দেয়, এই নালী দেহের সর্ব্বত্র বিশুদ্ধ রক্ত লইয়া যায়। দেখ। এই নালী দিয়া রক্ত প্রবাহিত হইয়া অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবহা নালী দিয়া চালিত হইয়া দেহের প্রত্যেক tissueতে রক্ত যোগান দেয়। [illegible] পুনরায়

প্রধান রক্তবহা নালী দিয়া চলিয়া আসিয়া হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণে প্রবেশ করে। আসিবার কালে পথে ইহা একটি শিরার সহিত মিলিত হয়। এই শিরা পরিপাক ক্রিয়া শেষ হইবার পর খাদ্যের সারাংশ লিভারের মধ্যে দিয়া বহন করিয়া আনিয়া এই প্রধান রক্তবহা নালীর সহিত মিলিত হইয়াছে। হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ দিক হইতে রক্ত সঞ্চালিত হইয়া প্রধান রক্তবহা নালী দিয়া ফুসফুসে প্রবেশ করে। তথায় বিশুদ্ধ বায়ু দ্বারা পরিষ্কৃত হইয়া পুনরায় প্রধান রক্তবহা নালী দিয়া ফুসফুস হইতে হৃৎপিণ্ডের বামদিকে প্রবেশ করে। এইরূপে ফুসফুস এবং সমগ্র দেহে রক্ত নিরন্তর সঞ্চালিত হইতেছে। আমাদের দেহের রক্ত এইরূপে প্রতি মিনিটে দুইবার করিয়া দেহের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসিতেছে।

ধমনী (arteries)।—হৃৎপিণ্ড হইতে ফুসফুসে এবং দেহের সর্ব্বত্র রক্ত বহন করিয়া লইয়া যাওয়াই ধমনীর কার্য্য। আমাদের দেহের সর্ব্বাঙ্গে অসংখ্য ধমনী ছাইয়া রহিয়াছে। হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেক স্পন্দনের সঙ্গে ধমনী সকলও কম্পিত হয়। আমাদের হাতের কব্জিতে যাহাকে নাড়ী বলি, তাহাও একটি ছোট ধমনী। ইহা আমাদের হাতে রক্ত যোগাইতেছে।

বিশুদ্ধ লাল রক্ত—ধমনী দিয়া প্রবাহিত হয়। কিন্তু হৃৎপিণ্ড হইতে যে ধমনী ফুসফুসে গিয়াছে—তাহা অপরিষ্কৃত কালচে রঙের রক্ত ফুসফুসে পরিষ্কৃত হইবার জন্য লইয়া যায়।।

শিরা (veins)। ধমনীর পাশাপাশি শিরাগুলি রহিয়াছে। হৃৎপিণ্ড হইতে বিশুদ্ধ রক্ত বাহির হইয়া সমগ্র দেহে যাইয়া আসিতে দেহের ময়লার সহিত যুক্ত হইয়া অপরিষ্কৃত হইয়া পড়ে। শিরাগুলি এই অপরিষ্কৃত রক্ত বহন করিয়া হৃৎপিণ্ডে লইয়া আসে। হৃৎপিণ্ড হইতে এই অপরিষ্কৃত রক্ত একটি ধমনী দিয়া ফুসফুসে প্রবেশ করে। এই ধমনীর নাম Pulmonary artery। সেখানে শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা এই দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত ও নির্ম্মল হইয়া আর একটি শিরা দিয়া বাম দিগের হৃৎপিণ্ডে যায় এবং সেখান হইতে সমস্ত দেহে সঞ্চালিত হয়। আমরা শ্বাস গ্রহণের সময় যে বায়ু নাক দিয়া টানিয়া লই, তাহাতে যে অম্লজান বাষ্প (oxygen) থাকে তাহাই ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যে দূষিত ও অবিশুদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে Pulmonary artery দিয়া ফুসফুসে প্রবেশ করে তাহাকে বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল করে। এই জন্য আমাদের দেহ রক্ষার জন্য বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল বায়ুর প্রয়োজন।

উপরোক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা আমাদের খাদ্য রক্তে পরিণত হইয়া দেহের সর্ব্বাঙ্গে নিরন্তর পরিচালিত হইয়া আমাদিগকে জীবিত রাখিয়াছে। শিশুর দেহও এইরূপে পুষ্টিকর খাদ্য দ্বারা পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতেছে।

শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া।

আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য চারিটি যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। (১) নাক, (২) শ্বাসনালী, (৩) ফুসফুস, (৪) বক্ষ।

শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের জন্য নাকই আমাদের প্রধান, স্বাভাবিক উপায়। আমরা প্রধানতঃ নাক দিয়াই শ্বাস প্রশ্বাস ফেলি। মুখ দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস ফেলা অস্বাভাবিক। নিশ্বাস নাক দিয়া যাইতে যাইতে গরম হইয়া উঠে এবং এই গরম অবস্থাতেই ফুসফুসে প্রবেশ করে। সুতরাং বাহিরের বায়ুর শৈত্য ফুস

ফুসে লাগিতে পারে না। আমাদের নাকের ভিতরে লোম আছে। বাহিরের বায়ুতে যে ধুলা এবং ময়লা থাকে, তাহা এই লোমে আট্‌কাইয়া যায়, সুতরাং নিশ্বাস দ্বারা ফুসফুসের মধ্যে যে বায়ু যায়—তাহা ধূলিশূন্য নির্ম্মল করিবার ব্যবস্থা ভগবান করিয়া রাখিয়াছেন। নাক দিয়া যে বায়ু আমরা টানিয়া লই—তাহা গরম এবং নির্ম্মল হইয়া ফুসফুসে প্রবেশ করে। মুখ দিয়া নিশ্বাস লইলে ঠাণ্ডা, ধূলিপূর্ণ বায়ু আমাদের ফুস ফুসে প্রবেশ করে এবং নানারূপ রোগের উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা হয়।

নিশ্বাস দ্বারা আমরা যে বায়ু টানিয়া লই, তাহাতে যে অম্লজান বাষ্প থাকে তাহাই হৃৎপিণ্ড হইতে যে দূষিত রক্ত ফুসফুসে প্রবেশ করে তাহাকে পরিশুদ্ধ ও নির্ম্মল করে। বিশুদ্ধ বায়ুতে শতকরা ২১ ভাগ অম্লজান এবং ৭-৯ যবক্ষরজান আছে। এতদ্ব্যতীত কিছু অঙ্গার দ্রাবক (carbonic acid) জলীয় বাষ্প এবং অন্যান্য পদার্থ বায়ুতে বিদ্যমান আছে। এইরূপে অম্লজান নিশ্বাসের সহিত ফুস ফুসে প্রবেশ করিয়া দূষিত রক্ত নির্ম্মল করে। যে বায়ু আমরা প্রশ্বাস দ্বারা ফেলিয়া দিই, তাহাতে ৪ কি ৫ ভাগ অম্লজান কম থাকে এবং অঙ্গার দ্রাবকের ভাগ বাড়ে। সুতরাং ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, যে বায়ু আমরা শ্বাস গ্রহণের সঙ্গে টানিয়া লই, তাহা প্রশ্বাস দ্বারা যে বায়ু ফেলিয়া দিই তাহার অপেক্ষা বিশুদ্ধ। কারণ এই প্রশ্বাসের বায়ুতে অম্লজানের ভাগ কম থাকে। শ্বাস নলী। ফুস ফুসে বায়ু যাইবার প্রধান পথই শ্বাস নলী। ইহা গলনালীর সম্মুখ ভাগে প্রায় ইহার পাশাপাশি হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। [illegible] নলীর ভিতরেও এক রকম শুঁয়া আছে, তাহা বায়ুর ময়লা ধরিয়া শ্লেষ্মার সহিত মুখ দিয়া বাহির করিয়া দেয়।

ফুস ফুস।—হৃৎপিণ্ডের দুই পাশে দুইটি ফুস ফুস অবস্থিতি থাকিয়া বক্ষোগহ্বর জুড়িয়া আছে। হৃৎপিণ্ডের ডানদিকে একটি এবং বামদিকে একটি ফুসফুস রহিয়াছে। বাতাস শ্বাসনলী এবং বায়ু নলী (bronchial tubes) দিয়া ফুসফুসে প্রবেশ করে। ফুস ফুসের মধ্যেই বায়ু—রক্তের সম্পর্কে আসে। শ্বাসনলী বক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া একটি ডান ফুসফুসে এবং অপরটী বাম ফুসফুসে গিয়াছে। এই দুইটি শাখার নাম বায়ু নলী বা ব্রঙ্কিয়াল টিউব। প্রত্যেক বায়ুনলী ফুসফুসের ভিতর গিয়া অসংখ্য ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। আবার বায়ু নলী গুলি ফুসফুস কোষে (lung sac) গিয়া ঠেকিয়াছে। ফুসফুস কোষে অসংখ্য বায়ুকোষ (air-cells) আছে। এক একটি ফুস ফুস কোষে প্রায় ১৭০০ বায়ুকোষ আছে। বায়ুনলী বা ব্রঙ্কিয়াল টিউবেই ব্রঙ্কাইটিস অসুখ হয়। এই পীড়া খুব বেশী হয় এবং ইহাতে মৃত্যুর সংখ্যাও অধিক হয়।

আমাদের নিশ্বাসের সহিত ফুসফুসে বাতাস প্রবেশ করিলেই সেখানে নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন সাধিত হয়।

(১) বাতাসের অম্লজান বাষ্প (oxygen) রক্তের মধ্যে যায়।

(২) অঙ্গারাম্লজান বাষ্প (অবিশুদ্ধ বাষ্প) উষ্ণতা এবং জলীয় বাষ্প রক্ত হইতে বাহির হইয়া যায়।

সুতরাং ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, আমাদের নিশ্বাস গ্রহণের সহিত [illegible]

জান বাষ্প রক্তের মধ্যে যায় এবং প্রশ্বাস ফেলিবার সঙ্গে অবিশুদ্ধ বাষ্প, উষ্ণতা এবং জলীয় বাষ্প রক্ত হইতে বাহির হইয়া যায়। এইরূপে আমাদের দেহের রক্ত নিরন্তর বিশুদ্ধ হইয়া আমাদিগকে জীবিত রাখিয়াছে। এই ক্রিয়ার বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত ঘটিলেই মৃত্যু সম্ভাবনা।

বক্ষ।—বক্ষ একটি বায়ু চলাচল শূন্য বাক্স বিশেষ। ইহার আকার একটি কোণের ন্যায়। ইহার দুই পার্শ্বে পাঁজরার হাড় অবস্থিত রহিয়াছে এবং তাহার উপরে চামড়া ও মাংসপেশী সমূহ আছে। বক্ষের নিম্নদেশে বক্ষ এবং পেটের মধ্যস্থলে একটি চওড়া মাংসপেশী আছে, তাহাকে মিড্রিফ* বলে। বক্ষোগহ্বরে ফুস্‌ফুস এবং হৃৎপিণ্ড পূর্ণ করিয়া আছে।

(ক্রমশঃ)

যকৃতের যৎকিঞ্চিৎ।

——:০:——

("হিন্দুস্থান" হইতে উদ্ধৃত)

কত লোকই যে যকৃতের নানারকম রোগে ভুগিয়া কষ্ট পাইতেছে, তাহার আর সংখ্যা হয় না। নর দেহের যকৃৎ নামে এই যে একটি প্রধান গ্রন্থি-সমষ্টি, ইহার কল-কব্জা এত সহজে কেন বিকল হইয়া বিগড়াইয়া যায়? লিভার বা যকৃতের কর্ত্তব্য কার্য্য কি, আগে যদি আমরা সেটা জানিতে পারি, তাহা হইলেই এই প্রশ্নটির উত্তর পাওয়া অনেকটা সহজ হইবে।

যকৃতের প্রধান কার্য্য হইতেছে, দেহের শৃঙ্খলা রক্ষা করা। পুষ্টিকর খাদ্য এবং পানীয়ের সঙ্গে যে সকল অনিষ্টকর উপাদান বর্ত্তমান থাকে, যকৃৎ সেগুলিকে রক্তের সহিত মিশিতে বা ভিতরে যাইতে দেয় না।

আমরা যাহা-কিছু আহার বা পান করি, পাকস্থলী ও হজম-নলীর ভিতরে গিয়া আগে তাহা জীর্ণ হইয়া যায়। তাহার পর সেই জীর্ণাবশিষ্ট খাবারের শাঁসগুলি লিভারকে পার হইয়া, ভিতরে ঢুকিবার চেষ্টা করে। যকৃৎ কিন্তু সেই প্রবেশ-পথের মুখে চালাক দরোয়ানের মত বসিয়া, কড়া পাহারায় নিযুক্ত থাকে। শিষ্টদের পথ ছাড়িয়া দিয়া, সে তখন দুষ্ট উপাদানগুলিকে দূরদূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়।

কিন্তু যকৃৎ যখন খারাপ হইয়া যায়, তখন কি হয় বলুন দেখি? তখন উৎকৃষ্ট এবং অপকৃষ্ট, ইষ্টকর এবং বিষাক্ত সকল রকমেরই খাদ্য-পানীয় ঘুমন্ত বা আধ-ঘুমন্ত যকৃৎ-দ্বারবানকে এড়াইয়া, দেহের মধ্যে ডাকাতের মত প্রবেশ করে এবং রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া যায়। মানুষের দেহযন্ত্রে তখন যে-কোন ভয়ানক ব্যাপার ঘটিতে পারে।

উপরের কথাগুলি পড়িয়া আপনি বুঝিতে পারিবেন, যে, লিভারের প্রধান কর্ত্তব্য হই-

* মিড্রিফ দ্বারা আমরা প্রধানতঃ শ্বাস গ্রহণ করি।—লেখিকা।

তেছে, ভুক্ত খাদ্য দ্রব্যগুলিকে পরিদর্শন ও পরীক্ষা করিয়া দেহ ও রক্তের মধ্যে যাইতে দেওয়া। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ খাদ্যগুলি দেহের ভিতরে গিয়া, এক জটিল রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের মুখে পড়িয়া, পুরাতন রক্তের অভাব মোচন করে এবং নূতন রক্তের যোগান দেয়। এই যে রক্ত,—ইহারই অন্য নাম, মানুষের জীবনী শক্তি। কেননা, ইহার অভাবে আমরা কেহই বাঁচিতে পারি না।

কাল যে মাংস ছাগলের দেহে ছিল, আজ সেই মাংসই যকৃতের দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া, মানুষের দেহে মিশিয়া মানুষেরই দেহের নিজস্ব পদার্থে পরিণত হইল!

কিন্তু লিভার যখন পরীক্ষা করে না, তখন কোন-কিছুই নর-দেহের উপকারী উপাদানে পরিণত হইতে পারে না। পরন্তু, সেক্ষেত্রে মানুষের জীবন একান্ত ভারবহ হইয়া ওঠে। দেহের সমস্ত যন্ত্র তখন খাপছাড়া হইয়া পড়ে এবং যত-কিছু অসার পদার্থ ভিতরে ঢুকিয়া শরীর ও মনকে বিষ জর্জ্জর করিয়া তোলে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, পিত্তরসের কথা ধরা যায়। এই পিত্তরস যখন সোজা উদরগর্ভে গিয়া পড়ে, তখন তাহার সাহায্যে শরীর যথেষ্ট উপকৃত হয়। কিন্তু যকৃত যখন অকেজো, তথাকথিত পিত্তরস তখন বিপথগামী হইয়া পাকাশয়ের ভিতরে প্রবেশ করে। সেখানে থেকে তাহা আবার—খুব সম্ভব—ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়। ফলে বিষের তেজে আপনার ভয়ানক মাথা ধরিবে, মন ঝিমাইয়া ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িবে, মুখের আস্বাদ তিক্ত হইয়া উঠিবে, ক্ষুধা নষ্ট হইয়া যাইবে, জিভের উপরে একটা প্রলেপ পড়িবে এবং হয় কোষ্ঠবদ্ধ, নয় উদরাময় হইবে।

অতঃপর যকৃৎ অকেজো হইয়া পড়িবার কারণ কি, তাহা বলা আবশ্যক। ইহার প্রধান কারণ, যকৃৎকে অতিরিক্ত পরিশ্রমে বাধ্য করা। পেটে ঠাসিয়া মাংস বা মদ খাওয়ার অভ্যাস করিলে বা বেশী মিষ্ট ও মশলাদার দুষ্পাচ্য খাদ্য নিয়মিত রূপে ভক্ষণ করিলে, যকৃৎ অত্যধিক পরিশ্রম করে এবং পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে।

লিভার খারাপ হইবার দ্বিতীয় কারণ, উপযুক্ত শারীরিক ব্যায়ামের অভাব। আপনি যত বেশী পেট ভরিয়া খাইবেন, তত কম নড়া চড়া করিতে পারিবেন। আবার, কেহ কেহ যেমন পেটুক হইয়া সে অভ্যাস আর ছাড়িতে পারে না, তেমনি অনেকে আবার এমন বিষম আলস্যে অভ্যস্ত হয় যে, দেহকে ক্রমেই তাহারা একটা অসার জড়পদার্থে পরিণত করিয়া ফেলে।

সাদাসিধে, সুস্বাদু ও পোষ্টাই জিনিষ খাইবেন,—কিন্তু পেট ঠাসিয়া নয়। প্রত্যহ দুইবেলা নিয়মিত ভোজনের পর, মাঝে মাঝে যখন তখন টুকিটাকি খাবার খাওয়ার বদ অভ্যাস ছাড়িয়া দিবেন। তাহা হইলে আর যকৃৎ খারাপ হইবার ভয় থাকিবে না।

উপরন্তু, প্রত্যহ অন্ততঃ পনেরো মিনিট হইতে আধ ঘণ্টা (যাঁহার যতক্ষণ সহ্য হয়) কাল পর্য্যন্ত নিয়মিত ব্যায়াম করিবেন। প্রাত্যহিক প্রাতঃকৃত্যের মধ্যে আমরা যদি ব্যায়ামকেও ধরিয়া লই, তাহা হইলে শুধু যকৃতের পীড়া কেন, অধিকাংশ দুর্ব্বলতা এবং অসুস্থতাই মানব সমাজ হইতে অদৃশ্য হইয়া যায়। জীবন্মৃত ও স্বাস্থ্যহীন হইয়া পৃথিবীর কোন আনন্দই সম্ভোগ করা যায় না। এই আনন্দের জন্য একটু কষ্ট স্বীকার করিতে ক্ষতি কি?

সুস্থদেহে মাদক দ্রব্যের আবশ্যকতা আছে কিনা ?

বিবিধ মাদক দ্রব্য জগতের শৈশবকাল হইতে সমাজে প্রচলিত আছে। বন্য বর্ব্বর জাতি হইতে সুসভ্য উন্নতজাতি পর্য্যন্ত মাদক দ্রব্যের প্রভাব হইতে কেহই অব্যাহতি পায় নাই। ধনীর টেবিলে মাদক দ্রব্য "শাম্পেন" "হুইস্কি" রূপে এবং বন্য দরিদ্রের কুটীরে মৃৎপাত্রে "হাঁড়িয়া" "মহুয়া"রূপে বিরাজিত। মাদক দ্রব্য ধনীর গৃহে বহুমূল্য সিগারেট সিগার বা অম্বুরি তামাকরূপে, কৃষকের কুটীরে গুড়ুকরূপে, সহিস, কোচমান ও দরিদ্র ভদ্র লোকের মুখে সস্তার সিগারেট বা বিড়ি রূপে এবং মুটে কুলি ও দরোয়ানদিগের মুখে 'শুখা' বা 'খইনি' রূপে বিরাজিত! মাদক দ্রব্য দরিদ্রের অন্তঃপুরে গুল বা তামাক পোড়া রূপে এবং আঢ্য ব্যক্তির অন্তঃপুরে মৃগনাভি সুগন্ধি জর্দ্দা রূপে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ইতর জাতীয় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে গুড়ুক-বিড়িও প্রবেশ লাভ করিয়াছে। আবার অনেক সভ্য মহিলার বিম্বাধর-চুম্বনের সুখ সিগারেটের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে কিনা জানি না! মাদক দ্রব্য কি মোহিনী শক্তি বলে সভ্য অসভ্য, ধনবান, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, ভোগী, ত্যাগী, নর, নারী, সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু সকলেই যে ইহার প্রভাবে মুগ্ধ ইহা নিশ্চিত। আমাদের দেশের ত্যাগী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ মাদক দ্রব্য ব্যবহারের জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেন বটে, কিন্তু নস্য প্রয়োগে নাসা-রন্ধ্রের তৃপ্তি সাধন করিতে পশ্চাদপদ নহেন। স্যর ওয়ালটার রালের সঙ্গীগণ আমেরিকাবাসী অসভ্য জাতিদিগকে ধুমপান করিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, উহারা দানবের ন্যায় মুখ দিয়া ধুম বাহির করে। কিন্তু এই কিঞ্চিদধিক সার্দ্ধ শতাব্দী কাল মধ্যে সেই দানবোচিত কার্য্যে পৃথিবীর সকল দেশের সকল শ্রেণীর লোকেই ব্যাপৃত হইয়াছে!

যে কারণেই মাদক দ্রব্যের এইরূপ বহুল প্রচলন হউক, শরীরের সহিত উহার একটা সম্বন্ধ আছে। দ্রব্য মাত্রেই ত্রিবিধ কারণে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। প্রথম রোগশান্তির জন্য, দ্বিতীয় দীর্ঘায়ু লাভের জন্য এবং তৃতীয় সুস্থব্যক্তির শরীর রক্ষার জন্য। রোগ শান্তির জন্য বিবিধ মাদকদ্রব্য প্রয়োগের সার্থকতা দেখা যায়। সুস্থ শরীরে শরীর রক্ষার জন্য মাদক দ্রব্য উপযোগী কি না, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করা যাইবে এবং এই প্রসঙ্গেই মাদক দ্রব্য পরমায়ু বৃদ্ধি করে কি না —তাহা স্বতঃই আসিয়া পড়িবে।

মাদক দ্রব্য নানা প্রকার, যথা মদ্য, অহিফেন, গাঁজা, চরস, সিদ্ধি এবং তামাক। আমরা প্রথমতঃ মদ্য সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

মদ্য।

মদ্য ভারতবর্ষে বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত। কেবল মনুষ্য সমাজে নহে, দেব সমাজেও মদ্যের আদর যথেষ্ট—ইহার পরিচয় পুরাণাদি পাঠে জানা যায় এমন কি, সমরে অমরগণ

মদ্যের অংশ লইয়া বিষম বিবাদ বিসংবাদ ঘটিত এরূপ প্রমাণও পাওয়া যায়। চ্যবন ঋষি রাজার যজ্ঞে অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের জন্য সোম রস গ্রহণ করিতে উদ্যত হওয়ায় দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত তাঁহার কলহ হইয়াছিল। এই যে মনুষ্য এবং দেবতার (হস্তী প্রভৃতি পশুরও বটে) আদরের ধন মদ্য—ইহা কি সুস্থ শরীরে সেবন করা হিতকর না আবশ্যক? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে প্রথমে শাস্ত্র কি বলেন তাহা দেখা আবশ্যক।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রাচীন কালে ভারতে মদ্যের বিশেষ আদর ছিল, কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে মদ্যপান অত্যন্ত দূষনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রে মদ্যকে অদেয়, অপেয় এবং অগ্রাহ্য বলা হইয়াছে, কিন্তু ধর্ম্ম শাস্ত্রে মদ্যের প্রতি এই যে বিদ্বেষ, ইহা শরীরের হিতাহিতত্ব বিচার করিয়া নহে। মদ্য অল্প মাত্রায় পান করিলে আরও অধিক পান করিতে ইচ্ছা হয়, মদ্যপায়ী দ্বারা বিবিধ পাপ-কার্য্য সংঘটিত হয়, মদ্য পানের ফলে পরিবার-বর্গের এবং সমাজের অশেষ অনিষ্ট সাধিত হয় ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া ঐরূপ নিষেধ করা হইয়াছে। মদ্যপায়ীবহুল পাশ্চাত্য দেশেও মদ্য পান দ্বারা ব্যক্তিগত, পরিবার গত এবং সমাজ গত অশেষ অনিষ্ট সাধিত হয় বলিয়া তদ্দেশীয় ব্যক্তিগণ এক্ষণে অস্মদ্দেশীয় শাস্ত্রকারদিগের ন্যায় মদ্য অদেয়, অপেয় ও অগ্রাহ্য (Tuuch not, taste not, handle not) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অনেক পাশ্চাত্য কোবিদ মদ্যকে অভাবের জননী এবং পাপের ধাত্রী (Mother of want and nurse of crime) বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন সুতরাং নীতি হিসাবে যে মদ্যপান [illegible] দোষাবহ তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য মদ্যের সুস্থ শরীরে উপযোগিতা আছে কিনা তাহা স্থির করা। সুতরাং ঐ সকল মতবাদ এই প্রবন্ধের পরিপোষক নহে।

মদ্য পানের হিতাহিতত্ব নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমতঃ চিকিৎসা শাস্ত্রই আমাদের অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথমে দেখা যাউক —এ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ কি বলেন? নিম্নে মদ্যের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে যে সকল কথা আয়ুর্ব্বেদে আছে তাহার মর্ম্মানুবাদ লিখিত হইতেছে।

চরকের চিকিৎসা স্থানে মদাত্যয় চিকিৎসার প্রথমেই লিখিত আছে:—"দেবগণ ইন্দ্রের সহিত যে সুরার পূজা করিয়াছিলেন, যে সুরা যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হয়, যে সুরা বৈদিক কর্ম্মদ্বারা প্রতিষ্ঠিত, যাহা ইন্দ্রের যজ্ঞেও প্রতিষ্ঠিত, সমুদ্র মন্থনে নীর হইতে উত্থিত, যে সুরা যজ্ঞেও হিতকারিণী বলিয়া যজ্ঞ সিদ্ধির জন্য বেদ বিহিত বিধি সমূহ সহকারে যজমান্‌ মহাত্মগণ কর্ত্তৃক দৃশ্য ও স্পৃশ্য হইয়া থাকে, যে সুরা—উপাদান, সংস্কার ও নামানুসারে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া বহু প্রকার হইলেও সাধারণতঃ মত্ততা জন্মায় বলিয়া এক প্রকার, যে সুরা অমৃতরূপে দেবতাদিগের, সুধারূপে পিতৃদিগের ও সোমরূপে ঋষিদিগের উৎকৃষ্ট শ্রেয়ঃ সম্পাদন করে, যে সুরা অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের মহৎ তেজঃস্বরূপ, সরস্বতীর বীর্য্য স্বরূপ, ইন্দ্রের বল স্বরূপ, যে সুরা সাক্ষাৎ প্রীতি স্বরূপ, রতি স্বরূপ, বাক্য স্বরূপ, পুষ্টি স্বরূপ ও সুখ স্বরূপ, যে সুরা শোক দুঃখ, ভয় ও উদ্বেগ নাশক, যে সুরা দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও মনুষ্য কর্ত্তৃক সুধানামে অভিহিত হয়, সেই সুরা বিধি পূর্ব্বক পান করিবে।"

মদ্য সম্বন্ধে এইরূপ বলার পর মদ্য পানের বিধি কি তাহা বলা হইয়াছে। অনাবশ্যক বিবেচনায় তাহা লিখিত হইল না। মদ্যের অপকারিতা চরকে যাহা কথিত হইয়াছে তাহা পরে বলা যাইবে।

মদ্যের দোষের কথা বলিবার পর চরক পুনরায় বলিয়াছেন,—কিন্তু মদ্য স্বভাবতঃ অন্নের ন্যায়, অযুক্তিযুক্তরূপে প্রযুক্ত হইলে রোগ উৎপন্ন করে, কিন্তু যুক্তিযুক্তরূপে প্রযুক্ত হইলে অমৃতের ন্যায় উপকার করে। অন্ন—প্রাণিগণের প্রাণ স্বরূপ, কিন্তু অযথারূপে সেবিত হইলে প্রাণ নষ্ট করিয়া থাকে। মদ্য ও অযথারূপে প্রযুক্ত হইলে প্রাণহর বিষের ন্যায় হয় এবং যুক্তিযুক্তরূপে ব্যবহৃত হইলে রসায়নের ন্যায় কার্য্যকারী হইয়া থাকে।

মদ্য যুক্তি পূর্ব্বক পান করিলে হর্ষ, দেহ, পুষ্টি, আরোগ্য, পুরুষত্ব বৃদ্ধি এবং মত্ততা, জন্মিয়া থাকে। মদ্য রুচিকর, অগ্নিদীপক তৃপ্তিজনক, স্বর ও বর্ণের উৎকর্ষ সাধক, প্রীতিকর, পুষ্টিকর, বলকর, ভয় শোক ও শ্রমনাশক, যাহাদের নিদ্রা হয় না তাহাদের পক্ষে নিদ্রাজনক, যাহারা লোকের কাছে ভাল কথা কহিতে পারে না তাহাদিগের বাক্‌শক্তি বর্দ্ধক, যাহাদের অধিক নিদ্রা হয় তাহাদের নিদ্রার অল্পতাকারক, যাহাদের মল মূত্রের বিবন্ধ আছে অর্থাৎ মল মূত্র ভালরূপ নির্গত হয় না, তাহাদের বিবন্ধ নাশক এবং আঘাত বন্ধন, এবং অন্যান্য ক্লেশ জনিত দুঃখ নাশক।

সুশ্রুত বলিয়াছেন যে, স্নিগ্ধ অন্ন এবং মাংসের সহিত মদ্য সেবন করিলে পরমায়ু ও বল বৃদ্ধি হয়, কমনীয়তা, মনের সন্তুষ্টি, ধৈর্য্য তেজ এবং অত্যন্ত বিক্রম জন্মিয়া থাকে।

শাস্ত্রে মদ্যপানের চারিটী অবস্থা কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম অবস্থায় মনুষ্যের কিরূপ সুখজনক তাহা নিম্নে লিখিত হইয়াছে। অপর তিনটী অবস্থা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং ঐরূপ অবস্থা অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে ঘটিয়া থাকে।

প্রথম মদে বুদ্ধি, স্মৃতি, প্রীতি ও সুখ জন্মে, যথেষ্ট পানাহার করিতে পারা যায়, রতিশক্তি বৃদ্ধি হয়, পাঠ ও গান করিবার শক্তি বৃদ্ধি হয়, স্বরের উৎকর্ষ ঘটে। এই প্রথম মদ অর্থাৎ অল্প মদ্যপান জনিত যে মত্ততা তাহা অত্যন্ত রমনীয়। চরক বলিয়াছেন যে, প্রথম মদে যুবক বা বৃদ্ধদিগের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়ার্থে যে প্রীতি জন্মে পৃথিবীতে তাহার উপমা নাই। যুক্তি পূর্ব্বক পীত মদ্য বহু দুঃখ ভারাক্রান্ত এবং শোক গ্রস্থ ব্যক্তিগণের একমাত্র বিশ্রাম স্থান। চরক ও সুশ্রুতে প্রথম মদের এইরূপ সুখ্যাতি থাকিলেও বাগ্‌ভট উহার সমর্থন করেন নাই, টীকাকার অরুণ এই শ্লোকটীর ব্যাখ্যা সংগ্রহ কারের উদ্দেশ্যের বিপরীত অর্থ করিয়াছেন বলিয়া পাঠকগণের বিচারের জন্য শ্লোকটী উদ্ধৃত করা হইল।

আদ্যে মদে দ্বিতীয়েচ প্রমাদায়তনে স্থিতঃ।
দুর্ব্বিকল্প হতো মূঢ়ঃ সুখমিত্যধি মুহ্যতে॥

প্রথম এবং দ্বিতীয় মদে প্রমাদ বশতঃ দুষ্ট কল্পনা বশে মদ্যপ সুখ বলিয়া মনে হয়—উপরোক্ত শ্লোকের মর্ম্মার্থ এইরূপ। কিন্তু অরুণ দত্ত উহাকে দ্বিতীয় মদের লক্ষণ বলিয়া আদ্য মদে প্রকৃত সুখ ইহা উহ্য ধরিয়া লইয়াছেন, কারণ দেখাইয়াছেন যে তন্ত্রান্তরে এইরূপ আছে। ন্যায়ান্যায় সুধীবর্গ বিচার করিবেন।

মদ্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে সকল দোষের কথা বলা হইয়াছে তাহা বলিবার পূর্ব্বে সংক্ষেপে

সকল গুণ বলা হইয়াছে তাহা হইতে আমরা মদ্যের দোষ উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা পাইব।

মদ্যপান বশতঃ মদ্যপায়ীর যে সাময়িক ক্ষুধা, বল, রতি শক্তি প্রভৃতি উৎপন্ন হয় উহা কি মদ্য সৃষ্টি করিয়া থাকে?—না শাস্ত্র অশ্বকে কষাঘাত করিলে সে যেমন দ্রুতবেগে ধাবিত হয়, মদ্যজনিত উত্তেজনায় ক্ষুধা, রতি এবং বলেরও সেইরূপ বৃদ্ধি হয়? সম্যক রূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে শেষোক্ত কারণেই এইরূপ ঘটে বলিয়া বোধ হয়। পরে দেখান যাইবে মদ্য বলের বিপরীত গুণযুক্ত এবং বিপরীত গুণ যুক্ত মদ্য বলের অপচয়ই করিয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে যে সাময়িক বলের বিকাশ—তাহাকে অশ্বকে কষাঘাত করার ন্যায় মদ্যহেতুক উত্তেজনা ও সেইরূপ ঘটিয়া থাকে। যখন মদ্য জনিত মত্ততা ছাড়িয়া যায়। সেই সময়ে ইহার প্রতি ক্রিয়ার ফলে মদ্যের উত্তেজনা বশতঃ সাময়িক যে বলের বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল, উত্তেজনা দূর হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে বল চলিয়া যায়, শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, বিগত মদ মদ্যপায়ীর দেহ বহন করাকে ভার বলিয়া মনে করে। সুতরাং মদ্য বলজনক এ কথা বলা যাইতে পারে না, বলের সাময়িক উত্তেজক মাত্র—ইহাই বলা যায়।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, শাস্ত্রকারগণ যে মদ্যকে বলবর্দ্ধক বলিয়াছেন তাহা—কি ভ্রমাত্মক? তাহার উত্তরে আমরা বলিব যে, না ভ্রমাত্মক নহে? মদ্য শরীরকে উত্তেজিত করিয়া সাময়িক বল বৃদ্ধি করে ইহা লক্ষ্য করিয়াই তাঁহারা ওইরূপ বলিয়াছেন। কেননা তাহা না হইলে অন্যত্র মদ্যকে বলের বিরোধী বলিতেন না। আবার এই উত্তেজনা হেতু বলের বিকাশের, সুতরাং ক্ষয়ের পূরণের জন্য বলিয়াছেন যে, পুষ্টিকর স্নিগ্ধ অন্ন মাংস প্রভৃতি খাদ্য ব্যতিরেকে যে ব্যক্তি মদ্যপান করে, তাহার কষ্টতম রোগ সকল উৎপন্ন হয় অথবা মৃত্যু ঘটে।

মদ্যকে যে রতি বর্দ্ধক বলা হইয়াছে তাহাও এইরূপ। কারণ মদ্য শুক্রনাশক। শুক্রনাশক দ্রব্য কখনই রতি বর্দ্ধক হইতে পারে না। মদ্য ক্ষণেক সাময়িক উত্তেজনা জন্মাইয়া বলের ন্যায় রতি শক্তির বৃদ্ধি করে মাত্র।

মদ্যপানে ক্ষুধা বৃদ্ধির পক্ষেও এইরূপ ঘটিয়া থাকে। মদ্য পরিপাক যন্ত্র সমূহকে উত্তেজিত করিয়া ক্ষুধা জন্মায় এবং অগ্নিকে উদ্দীপিত করিয়া (ডাক্তারি মতে পাচক রস সমূহকে অধিক ক্ষরণ করিয়া) পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে।

মদ্যপান বশতঃ মনের যে সাময়িক হর্ষ হয়—তাহাও চিত্তের উত্তেজনা বশতঃ ঘটিয়া থাকে! কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, চিত্তের উত্তেজনা বশতঃ হর্ষই হয় কেন? দুঃখ শোকাদি হয় না কেন? তাহার উত্তরে বলিতে হইবে যে, সাধারতঃ লোকে হর্ষ উদ্দেশ্য করিয়া মদ্য পান করে বলিয়া চিত্তের হর্ষই হইয়া থাকে। আবার অনেক স্থলে লোকে মদ্যপান করিয়া ভয়ানক ক্রন্দন করে, শোক করে, বা ক্রোধ প্রকাশ করে। ফলতঃ মদ্যপানের ফলে যে সময়ে চিত্তের যে কোন ভাবই ঘটুক, মদ্যের উত্তেজনায় তাহা প্রবল হইয়া থাকে। চিত্তের এইরূপ অবস্থা উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া মত্ততা ছুটিয়া যাইবার সময় ঘটিয়া থাকে। সে সময়ের সাময়িক অবসাদের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক অবসাদ, গ্লানি, অস্থিরতা, বিবর্ণতা প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে। চলিত ভাষায় ইহাকে খোঁয়াড়ি ভাঙ্গা বলে।

শাস্ত্রকারদিগের সূক্ষ্ম উপদেশ বিপুল বুদ্ধি ব্যক্তিকেও আকুল করিয়া থাকে। সুতরাং আমাদের ন্যায় অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির যে তাহাতে বিভ্রম ঘটিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শাস্ত্রে মদ্য ভয়, শোক ও শ্রমনাশক বলিয়া কথিত হইতেছে, কিন্তু সেই শাস্ত্রকারই আবার বলিয়াছেন :—

"মদ্যে মোহো ভয়ং শোকং ক্রোধো মৃত্যুশ্চ সংশ্রিতাঃ" অর্থাৎ মদ্যে মোহ,, ভয়, শোক, ক্রোধ ও মৃত্যু সংশ্রিত রহিয়াছে। যাহা ভয় শোক উৎপাদক, তাহা কি প্রকারে ভয় শোক নাশক হইতে পারে। অপিচ, সুশ্রুতে ক্রুদ্ধ, ভীত শোকগ্রস্ত, ব্যায়াম, ভারবহন ও পথশ্রম বশতঃ ক্লান্ত ব্যক্তি মদ্য পান করিলে পানাত্যয়াদি বিবিধ রোগ জন্মিয়া থাকে বলিয়া কথিত হইয়াছে।

শাস্ত্রকারগণ কোন বিষয়ে পক্ষপাত না করিয়া সকল দ্রব্যেরই দোষ গুণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অবস্থা ভেদে, যুক্তি বা অযুক্তি পূর্ব্বক পান করার জন্য মদ্যে উপকার বা অপকার বিচার করিয়া উপরোক্ত বিভিন্ন মতের সমাবেশ করা হইয়াছে। চরকে মদ্যের দোষ প্রদর্শন কালে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে মদ্য দোষজ্ঞ ব্যক্তিগণ এইরূপে যত্ন পূর্ব্বক মদ্যের নিন্দা করিয়া থাকেন।"

এক্ষণে শাস্ত্রে মদ্যের যে দোষের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। বাগভট প্রথম ও দ্বিতীয় মদকে যেরূপ নিন্দা করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

সুশ্রুত বলিয়াছেন যে, মদ্য উষ্ণ গুণ বিশিষ্ট বলিয়া শরীরের শৈত্য গুণ নষ্ট করিয়া পিত্তকে কম্পিত করে, তীক্ষ্ণতা, প্রযুক্ত মনের গতি নষ্ট করে অর্থাৎ বাহ্য এবং আধ্যাত্মিক কার্য্যে বাধা জন্মায়, সূক্ষ্ম শরীরে (অর্থাৎ হৃদয়াদিতে) প্রবেশ করে, বিশদ গুণ (পিচ্ছিলের বিপরীত) বলিয়া বল ও শুক্রকে নষ্ট করে, রুক্ষ বলিয়া বায়ুকে কুপিত করে আশুকারিতা প্রযুক্ত হটকারিতা (হটাৎ কোন কাজ করা) জন্মায়, ব্যবয়ি বলিয়া রতি প্রশক্তি জন্মায় এবং বিকাশী বলিয়া শীঘ্রই সমান ধাতুতে মিশ্রিত হয়।

চরক সংহিতায় কথিত হইয়াছে :— বিষে যে সকল গুণ আছে মদ্যেও সেই সকল বর্ত্তমান। প্রভেদ এই যে, বিষে অধিকতর প্রবলভাবে বিদ্যমান আছে। বিষের গুণ সকল যেমন ত্রিদোষ প্রকুপিত করে, মদ্যের গুণ সকলও সেইরূপ ত্রিদোষ (বায়ু পিত্ত ও কফ) কুপিত করে। কোন কোন বিষ সত্বর প্রাণ নাশ করে এবং কোন কোন বিষ রোগ উৎপন্ন করিয়া থাকে। মদ্যপান জনিত মদাত্যয় রোগ ও বিষের ন্যায়।

(ক্রমশঃ)

তুত্থকাদি তৈল।

—:*:—

(কবিরাজ শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর লোহ)।

এই তৈলের ফর্দ্দটি একজন প্রাচীন চিকিৎসকের নিকট হইতে অতি কষ্টে সংগ্রহ করিয়াছিলাম। কতয়োগে এরূপ আশ্চর্য্য ফলপ্রদ ঔষধ অতি বিরল। কিন্তু এতদ্দিন

ইহা নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার অবসর পাই নাই। কেননা আমরা অধিকাংশ ক্ষতের চিকিৎসাই ডাক্তারী মতে করিয়া থাকি। কাজেই এতদিন ইহার বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। বর্ত্তমান সময়ে যুদ্ধের হাঙ্গামে ডাক্তারী ঔষধের মূল্য অসম্ভব বর্দ্ধিত হওয়ায় আমাকে বাধ্য হইয়া একটি ক্ষতরোগীকে এই তৈল প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল। ইহার উপকারিতা দর্শনে আমি বিমুগ্ধ হইয়াছি। যাঁহারা ক্ষতচিকিৎসায় আয়ুর্ব্বেদকে পাশ্চাত্য চিকিৎসা অপেক্ষা হীনপ্রভ বলিয়া মনে করেন, আমরা তাঁহাদিগকে একবার ইহা পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি। Oil carbolic যে যে অবস্থায় ব্যবহৃত হয়, এই তুত্থকাদি তৈলও সেই অবস্থায় ব্যবহার্য্য। সাধারণের অবগতির জন্য ঔষধটি প্রকাশ করিয়া দিলাম।

হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, খয়ের, দারু হরিদ্রা, বট ছাল, পাকুড় ছাল, যজ্ঞ ডুমুর ছাল, অশ্বত্থ ছাল, কদম্ব ছাল, বাবলার ছাল, অম্লবেতস ছাল, করবী মূলের ছাল, আকন্দ মূলের ছাল, কুড়্চি ছাল, নিম পাতা,

এই সমস্ত দ্রব্য উত্তমরূপে ধৌত করিয়া প্রত্যেকটি আড়াই আনী ওজনে গ্রহণ করিবে। পরে চল্লিশ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া পাদাবশেষ (দশ তোলা) থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে।

নারিকেল তৈল ২০ তোলা
পূর্ব্বোক্ত কাথ ১০ তোলা

উভয়ে একত্র পাক করিবে। জল নিঃশেষ হইলে নিম্নলিখিত দ্রব্য সমূহ উহাতে মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। তৈলের জলীয়াংশ দৃষ্ট না হইলে পাক সমাধা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

মনসা সীজের পাতার রস ১০ তোলা
অপামার্গ পাতার রস ১০ তোলা
মুদ্রাশঙ্খ চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা
শোধিত গন্ধক চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা

পাক কালে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাতে খর অথবা মৃদু পাক না হয়। খর ও মৃদু পাকের ঔষধে ক্ষত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। পাক সমাধা হইলে উহাতে তুঁতে ভস্ম মিশ্রিত করিতে হয়। ক্ষতে বেশী পচা থাকিলে তুঁতে ভস্ম অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় মিশ্রিত করিবে। পরে ক্ষত ক্রমশঃ যতই বিশুদ্ধ হইয়া উঠিবে তুঁতের মাত্রাও ততই কমাইতে হইবে। তবে কোন সময়েই এক সিকির কম ব্যবহার করিবে না। ইহার নাম তুত্থকাদি তৈল।

নিম পাতা সিদ্ধ জলে ক্ষত স্থান উত্তমরূপে ধৌত করিয়া উক্ত তুত্থকাদি তৈল দ্বারা প্রত্যহ পলিতা ভরিতে হইবে। সে সুবিধা না থাকিলে এক খণ্ড পরিষ্কার ন্যাকড়া তৈলে ভিজাইয়া লাগাইয়া দিলেও চলিতে পারে। একটি পেঁয়াজ ও দুই তোলা ময়দা একত্র বাটিয়া গরম করতঃ পুলটিশ প্রস্তুত করিতে হইবে। ক্ষতের আকার বুঝিয়া পুলটিশ ছোট বা বড় করিবে। ক্ষতের উপর একখণ্ড কচি কলার পাতা দিয়া তদুপরি উক্ত পুলটিশ প্রদান করতঃ ক্ষত স্থান উত্তমরূপে ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিবে। এইরূপ ৬।৭ দিন ধৌত করণান্তর (Dressing) ক্ষতে পচা না থাকিলে অর্থাৎ ক্ষত বিশুদ্ধ হইলে পশ্চাৎ নিম্ব ঘৃত প্রয়োগ করিবে। বিশুদ্ধ ক্ষতে নিম্ব ঘৃত প্রয়োগ করিলে অতি সত্বর ক্ষত [illegible]

কেবল মাত্র এই তুত্থকাদি তৈল প্রয়োগে ও ক্ষত শুষ্ক হইয়া যায়।

উক্ত প্রাচীন চিকিৎসক মহাশয় নানা প্রকার পলিতা ও নানাপ্রকার তুলা ব্যবহার করিতেন। কিন্তু আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উহা চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

পল্লীবাসীর প্রতি নিবেদন।

—:*:—

(রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর)।

যাঁহারা পল্লীগ্রামে বাস করেন, তাঁহারা যদি নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মনোযোগের সহিত প্রতিপালন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা দেহ সুস্থ ও সবল রাখিতে সক্ষম হইবেন এবং ম্যালেরিয়া, কলেরা, প্লেগ, বসন্ত, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি কতিপয় ভয়ানক সংক্রামক রোগের আক্রমণ হইতে সপরিবারে রক্ষা পাইতে পারিবেন।

নিয়মগুলি অতি সংক্ষেপে লেখা হইল। স্থানের অল্পতা বশতঃ নিয়মপালনের কারণগুলি বিস্তৃতভাবে এ স্থানে বর্ণিত হইল না। স্বাস্থ্যরক্ষার যে কোন ভাল পুস্তক পাঠ করিলেই তাহা জানিতে পারা যাইবে।

আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, নির্ম্মল জলপান, পুষ্টিকর নির্দ্দোষ খাদ্য গ্রহণ, যথোচিত ব্যায়াম, পরিস্কৃত পরিচ্ছদ পরিধান এবং আলোক ও বিশুদ্ধ বায়ুপূর্ণ বাসগৃহে অবস্থান, এই কয়টির একান্ত প্রয়োজন। ইহাদের যে কোনটির অভাবে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়।

বিশুদ্ধ বায়ু সেবন।

বায়ু আমাদের জীবনস্বরূপ। বায়ু না থাকিলে আমরা এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারি তাম না। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বায়ু বিশুদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বাহিরের নির্ম্মল বায়ু আমরা নিঃশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকি কিন্তু যে বায়ু প্রশ্বাসরূপে আমরা পরিত্যাগ করি, তাহা অত্যন্ত বিষাক্ত, কারণ উহার সহিত শরীরের নানাবিধ দূষিত পদার্থ মিশ্রিত থাকে। কি উপায় অবলম্বন করিলে আমরা সর্ব্বদা বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিবার সুবিধা পাই, তৎসম্বন্ধে দু একটি কথা নিম্নে লিখিত হইল।

১। বাসগৃহে যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে বায়ু ও আলো আসে, তাহার ব্যবস্থা করিবে। বাড়ীর চারি পাশে খানিকটা খোলা জায়গা থাকিলে এবং প্রত্যেক গৃহে অন্ততঃ চারিটি ঋজু ঋজু জানালা এবং দরজা রাখিলে বায়ু ও আলোক প্রবেশের বিশেষ সুবিধা হয়।

২। গৃহের পোতা উঁচু করিবে। অবস্থায় কুলাইলে ঘরের মেজে পাকা করিয়া লইবে। মেজে স্যাঁৎস্যাঁতে থাকিলে সর্দ্দি, কাশি প্রভৃতি অনেক রোগের প্রাদুর্ভাব হয়।

৩। বাসগৃহের অতি নিকটে বড় গাছপালা বা বাঁশের ঝাড় অথবা ঝোপ জঙ্গল থাকিতে দিবে না।

৪। গৃহের দরজা, জানালা বন্ধ করিয়া তন্মধ্যে কখনই বাস করিবে না। শীতকালেও শয়নগৃহের অন্ততঃ দুইটি বায়ুপথ খোলা রাখিবে।

৫। অনেক লোক একত্রে এক গৃহে বা এক মশারির ভিতরে শয়ন করিবে না কারণ বহুলোকের শ্বাসক্রিয়াদ্বারা গৃহের বায়ু অতি শীঘ্র বিষাক্ত হইয়া পড়ে।

৬। গ্রামের জল যাহাতে নিকাশ হইয়া যায়, সকলে সমবেত চেষ্টা করিয়া যতদূর সম্ভব, তাহার সুব্যবস্থা করিবে। গ্রামবাসীদিগের এই বিষয়ে ঐকান্তিক যত্ন থাকিলে সহজেই সরকার বাহাদুরের নিকট হইতে যথাপ্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য পাইতে পারিবেন।

৭। বাড়ীর নিকট ছোট খানা ডোবা ইত্যাদি থাকিলে মাটি দ্বারা ভরাট করিয়া দিবে। খানা ডোবায় পাতা ইত্যাদি পড়িয়া পচিয়া বায়ু দূষিত করে এবং ঐ সকল স্থানে মশক জন্মিয়া গ্রামের মধ্যে ম্যালেরিয়া রোগ বিস্তারের সহায়তা করে।

৭। গ্রামের পথে ঘাটে, পুষ্করিণীর পাড়ে বা নদীর ধারে কখনও মলত্যাগ করিবে না। এই কদর্য্য অভ্যাসের ফলে গ্রামের জল ও বায়ু অতি শীঘ্র অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়ে।

৯। বাড়ীর আশে পাশে ময়লা থাকিলে বায়ু শীঘ্র দুর্গন্ধ ও দূষিত হইয়া পড়ে। এই জন্য বাসগৃহ হইতে কিয়ৎ দূরে গোশালা ও মলমূত্রাদি পরিত্যাগ করিবার স্থান নির্ম্মাণ করিবে। পরিত্যক্ত মল ও আবর্জ্জনাদি যাহাতে শীঘ্র স্থানান্তরিত হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। সে ব্যবস্থা সম্ভবপর না হইলে উহার উপর তৎক্ষণাৎ শুষ্ক মাটি বা ছাই চাপা দিবে।

১০। যদি প্রত্যেক গ্রামবাসী নিজ নিজ গৃহ ও তাহার আশ পাশ এইরূপে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখেন, তাহা হইলে গ্রামের বায়ু সর্ব্বদা নির্ম্মল থাকিবে।

"নিজ গৃহ আশ পাশ রাখ পরিষ্কার।
গ্রামখানি ছবি সম দেখাবে আবার॥"

নির্ম্মল জল পান।

জলের আর একটী নাম জীবন। আমরা যে জল পান করি, তাহা নির্ম্মল হওয়া একান্ত আবশ্যক; কিন্তু আমাদিগের কতকগুলি কদভ্যাসফলে পল্লীগ্রামের জলাশয়ের জল এরূপ দূষিত হইয়া পড়ে যে, উহা পান করিলে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। জলাশয়ের নিকটে মলমূত্রত্যাগ, পুষ্করিণীর মধ্যে মনুষ্য ও পশুদিগের স্নান, ময়লা ও সংক্রামক রোগদুষ্ট কাপড় ও বিছানা কাচা সকড়ি বাসন মাজা, জলশৌচ ও মূত্রত্যাগ ইত্যাদি নানা অপবিত্র কার্য্যদ্বারা জলাশয়ের জল সর্ব্বদা দূষিত হইয়া থাকে।

১। প্রতি গ্রামে একটী বা দুইটী ভাল পুষ্করিণী কেবল পানীয় জল সংগ্রহের জন্য পৃথক্ করিয়া রাখা উচিত। ইহাতে কেহই স্নান করিতে, কাপড় কাচিতে, এমন কি মুখ ধুইতেও পারিবে না। যদি একটী পাম্প (pump) দ্বারা জল উত্তোলন করিবার ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে পুষ্করিণীর জল কোন মতেই দূষিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

২। পুষ্করিণীর পাড়ে বড় গাছ বা বেশী জঙ্গল জন্মিতে দিবে না। পাতা পচিয়া জল নষ্ট হইয়া যায় এবং উহা যথেষ্ট রৌদ্র পায় না।

৩। অল্পগভীর কূপের জল পান করা কখনও নিরাপদ নহে। যে কূপের জল ব্যবহার করিবার আবশ্যক হয়, সেই কূপটিকে

ভিতর দিক পাকা করিয়া বাঁধাইয়া দেওয়া উচিত এবং চারিপাশের জল যাহাতে কূপের মধ্যে পুনরায় প্রবেশ করিতে না পারে, কূপের উপরের জমি কিছু দূর পাকা ও ঢালু করিয়া দিয়া তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।

সাধারণ কূপের জল প্রায় নির্ম্মল হয় না, এজন্য আজকাল অনেক দেশে লোহার নলের কূপের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ কূপের জল সর্ব্বদা নির্ম্মল থাকে এবং কোন সংক্রামক রোগের বীজ ইহার সহিত মিশ্রিত হইতে পারে না।

৫। যদি কোন প্রকারে কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক রোগের বীজ জলের সহিত মিশ্রিত হইবার সুযোগ পায়, তাহা হইলে ঐ জল যিনি পান করিবেন, তাঁহারই ঐ রোগ হইবার সম্ভাবনা। অতএব কি উপায়ে পানীয় জল সহজে বিশুদ্ধ করা যাইতে পারে, তাহা জানা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমাদের মত গরীব দেশের পক্ষে ইহার একমাত্র সহজ উপায়—**জল উত্তমরূপে ফুটাইয়া শীতল করিয়া পান করা।** এই উপায় দ্বারা জলের মধ্যে যে কোন সংক্রামক রোগের বীজ থাকুক না কেন, তাহা একবারে বিনষ্ট হইয়া যায়. সুতরাং এরূপ সিদ্ধ জল পান করাই সম্পূর্ণ নিরাপদ। এই উপায়ে অতি সামান্য চেষ্টায় ও বিনা ব্যয়ে অনেক সাংঘাতিক রোগের আক্রমণ হইতে আমরা অব্যাহতি লাভ করিতে পারি। ফিল্‌টারের দ্বারা জল পরিষ্কার করা যায় বটে কিন্তু খুব দামী ফিল্‌টার্ না হইলে তাহা দ্বারা রোগের বীজ জল হইতে সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয় না। সুতরাং কোন সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের সময়ে সাধারণ ফিল্‌টারের উপর নির্ভর করিয়া আমরা একেবারে নিরাপদ হইতে পারি না। এরূপ স্থলে জল বিশুদ্ধ করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়—**জল ফুটাইয়া পান করা।** পার্‌ম্যাঙ্গানেট অব্ পটাস্ প্রভৃতি দুই একটি ঔষধের দ্বারা জল শুদ্ধ করা যায় বটে কিন্তু ঐ সকল ঔষধ সাধারণ পল্লীগ্রামবাসীর পক্ষে সংগ্রহ বা ঠিক ব্যবহার করা সহজসাধ্য নহে।

অতএব সর্ব্বদা মনে রাখিবে যে **জল ফুটাইয়া পান করিলে** আমরা অনেক রোগের হাত হইতে বাঁচিতে পারি।

আহার ও পানীয়।

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আহার সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম পালনের প্রয়োজন হয়, তন্মধ্যে পুষ্টিকর নির্দ্দোষ আহার্য্য গ্রহণ ও পরিমিত ভোজনই সর্ব্ব প্রধান।

১। সহরে নির্দ্দোষ খাদ্য পাওয়া সুকঠিন, কিন্তু পল্লীগ্রামে এখনও এ বিষয়ে অনেক সুবিধা আছে। চাল, ডাল, মাছ, তরকারি, তেল, দুধ ও নারিকেলের মিষ্টান্ন পল্লীগ্রামে বিশুদ্ধ অবস্থায় পাইতে অসুবিধা হয় না। এই সকল খাদ্য সহজ পরিপাচ্য, পুষ্টিকর, অথচ দামেও সস্তা।

২। যাঁহারা মনে করেন যে, মাংস না খাইলে শরীর সবল হয় না, তাঁহাদের ধারণা ভুল। মাংসের মধ্যে যে বিশেষ পুষ্টিকর পদার্থ আছে, ডাল, মাছ, দুধ প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্যের মধ্যেও সেই সারবান্ পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। মাছ বঙ্গদেশের অনেক স্থানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং ইহা বাঙ্গালীজাতির একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য।

৩। যাঁহারা কোনরূপ আমিষ দ্রব্য

ভক্ষণ করেন না, তাঁহারা ডাল, ভাত, রুটি, তরকারি, ঘি, দুধ, ছানা খাইয়া সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল দেহ লাভ করিতে পারেন।

৪। ভাত অপেক্ষা রুটি সারবান খাদ্য। আমাদের দেশে একবেলা রুটির প্রচলন হইলে আমাদের দেহ আরও সবল হইবার সম্ভাবনা। ভাতের ফেন ফেলিয়া খাওয়া কখনই উচিত নহে; উহাতে চালের সারাংশ কতক পরিমাণে পরিত্যক্ত হয়। খিচুড়ি অতিশয় পুষ্টিকর খাদ্য। আমাদের দেশে প্রত্যেক পরিবারে ইহার অধিক প্রচলন হইলে ভাল হয়।

৫। যাঁহারা ঘি ব্যবহার করিতে সমর্থ নহেন, তাঁহারা খাঁটি সরিষার তৈল তৎপরিবর্ত্তে ব্যবহার করিলে প্রায় একই ফল পাইবেন।

৬। আমিষ বা নিরামিষ যে কোন পদার্থই ভোজন করা যাউক না কেন, গুরু ভোজন প্রভৃত অনিষ্টের কারণ। পেট সম্পূর্ণ ভর্ত্তি করিয়া না খাওয়াই সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। মিতাহার—স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভের এক প্রধান উপায়।

৭। প্রত্যহ এক সময়ে ভোজন করা স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অনুকূল। রাত্রিতে অপেক্ষাকৃত স্বল্পাহার প্রশস্ত।

৮। খাদ্যদ্রব্য উত্তমরূপে চর্ব্বণ না করিয়া তাড়াতাড়ি ভোজন করিলে মহা অনিষ্ট সাধিত হয়। ইহার দ্বারা খাদ্য যে কেবল হজম না হইয়া অজীর্ণ রোগ উৎপাদন করে তাহা নহে, খাদ্যের অধিকাংশ সারভাগ পরিপাক প্রাপ্ত না হইয়া মলের সহিত নির্গত হইয়া যায়।

৯। হাত মুখ উত্তমরূপে ধৌত করিয়া আহার করিতে বসিবে। যে স্থানে খাদ্য প্রস্তুত হয় এবং যেখানে আহার করা যায়, তাহা অতিশয় পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত।

১০। মাছি—ময়লা দ্রব্য ও রোগের বীজ পায়ের দ্বারা বহন করিয়া আনিয়া খাদ্য দ্রব্যের উপর বসিয়া উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া দেয়। সুতরাং রান্নাঘরের মধ্যে এবং আহার করিবার স্থানে যাহাতে মাছি আসিতে না পারে এবং খাদ্যদ্রব্যে যাহাতে মাছি না বসে, তাহার ব্যবস্থা করিবে। বাড়ীর মধ্যে আবর্জ্জনা সঞ্চিত থাকিলে মাছির উপদ্রব বেশী হইয়া থাকে, সুতরাং এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিলে বাড়ীর মধ্যে মাছির উপদ্রব কমিয়া যাইবে। খাদ্যদ্রব্য সর্ব্বদা ঢাকা দিয়া রাখিবে।

১১। বাজারের খাবার যে দূষিত তাহার কারণ এই যে, উহা যে ভাবে রাখা হয়, তাহাতে উহার উপর সর্ব্বদা পথের ধূলা পড়ে এবং মাছি বসে। তদুপরি বাজারের খাবার প্রায়ই ভেজাল তেল, ঘি, ময়দা ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। জলখাবারের জন্য বাজারের খাবারের ব্যবস্থা না করিয়া আমাদের দেশের পূর্ব্ব প্রচলিত প্রথা অনুসারে চিড়া, মুড়ি, ছোলা বা মটরভাজা, ঝুনা নারিকেল কিম্বা নারিকেলের সন্দেশ ইত্যাদি ব্যবহার করিলে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ অথচ সবিশেষ পুষ্টিকর জলখাবারের ব্যবস্থা করা হয়। খরচের দিক হইতে দেখিলেও ইহা আমাদের দেশের সাধারণ লোকের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া মনে হয়।

১২। আহারের সময়ে বা অব্যবহিত পরেই অধিক জলপান বা বরফজল পান না করাই উচিত। উহাতে পরিপাকের ব্যাঘাত হয়।

১৩। সহজ শরীরে চা, কোকো বা

কফি পান করিবার কোন প্রয়োজন নাই, তবে নিয়মিত পরিমাণে পান করিলে ইহাদের মধ্যে কোনটাই অনিষ্ট উৎপাদন করে না, বরং পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে। অধিক চা ব্যবহার করিলে অজীর্ণ ও অন্যান্য রোগ উপস্থিত হয়।

১৪। সুস্থ শরীরে সুরা বা অন্যান্য মাদক দ্রব্যের ব্যবহার একান্ত বর্জ্জনীয়।

শরীর চালনা।

প্রত্যহ কোন না কোনরূপ ব্যায়াম অভ্যাস করা অবশ্য কর্ত্তব্য, কারণ ব্যায়াম না করিলে প্রকৃত স্বাস্থ্যলাভ করা যায় না। মুক্তস্থানে ব্যায়াম করাই প্রশস্ত। যে কোন প্রকার ব্যায়াম প্রতিদিন অন্ততঃ পনের মিনিট কাল অভ্যাস করিলে স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। বয়স অধিক হইলে অথবা অন্য কারণে শ্রমসাধ্য ব্যায়াম নিষিদ্ধ হইলে, পদব্রজে ভ্রমণ বিশেষ উপকারী। সুস্থ শরীরে দুই বেলায় অন্ততঃ দুই ক্রোশ পথ ভ্রমণ করা উচিত।

শরীর বা মনের অতিরিক্ত পরিশ্রম হইলে স্বাস্থ্যহানি হয় এবং মনও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। অতএব এ বিষয়ে ছাত্রদিগের বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

বিশ্রাম।

শরীরের পক্ষে পরিশ্রম ও ব্যায়াম যেমন প্রয়োজনীয়, নিয়মিত বিশ্রাম গ্রহণ করাও তদ্রূপ আবশ্যক। অধিক রাত্রি জাগিয়া পাঠাভ্যাস করিলে বা আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকিলে শীঘ্র স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। নিদ্রাই শরীর ও মনকে পূর্ণ বিশ্রাম প্রদান করে। রাত্রিকালই নিদ্রার প্রশস্ত সময়। দিবানিদ্রা সাধারণতঃ স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে। রাত্রিকালে স্বল্পাহার সুনিদ্রার পক্ষে প্রশস্ত।

পরিচ্ছদ।

আমাদের পোষাক পরিচ্ছদ খুব সাদাসিদে অথচ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া প্রয়োজন। পরিচ্ছদ আড়ম্বরহীন হইবে কিন্তু রুচিবিরুদ্ধ বা ময়লা হইবে না। ঘর্ম্মাক্ত বা ময়লা পরিচ্ছদ ব্যবহারে শরীরের অনিষ্ট হয়।

(ক্রমশঃ)।

বসন্তরোগের চিকিৎসা।*

—— :*: ——

(কবিরাজ শ্রীকিরণচন্দ্র কণ্ঠাভরণ)

সকল বসন্তেই প্রথমে বমন করাইয়া পরে বিরেচন দিবে। দুর্ব্বলের পক্ষে বমন ও বিরেচনের ব্যবস্থা নাই, কেবল দোষনাশক দ্রব্যের পাচন দিবে।

বমনের কাথ ও স্বরস প্রভৃতি।

পলতা, নিমছাল, বাসকমূলের ছাল, প্রত্যেকে ২ তোলা, পাঁচ মাষা, তিন রতি, কাথার্থ জল ৬৪ তোলা, শেষ ১৬ তোলা

---

* স্বর্গীয় হারাধন বিদ্যারত্ন কবিরাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

প্রক্ষেপ * বচ, ইন্দ্রযব, যষ্টিমধু, ময়না ফল, প্রত্যেকে চূর্ণ ৷৷৹ অর্দ্ধতোলা, ঐ ক্বাথে মিশ্রিত করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিলে পান করিবেক।

স্বরস। ব্রাহ্মী শাকের রস ৪ চারি তোলা, প্রক্ষেপ মধু ৷৷৹ অর্দ্ধতোলা; হেলঞ্চা শাকের রস ৪ চারি তোলা, প্রক্ষেপ মধু ৷৷৹ অর্দ্ধতোলা; নিমছালের রস ৪ চারি তোলা প্রক্ষেপ মধু ৷৷৹ অর্দ্ধতোলা।

বিরেচনের স্বরস। উচ্ছে পত্রের রস ৪ তোলা, প্রক্ষেপ হরিদ্রা চূর্ণ ৷৷৹ অর্দ্ধতোলা।

এইরূপ বমন বিরেচনের দ্বারা রোগীর শরীর পরিশুদ্ধ হইলে সুবসন্ত উথিত হয়।

বসন্ত আরম্ভে মুষ্টিযোগ।

জয়ন্তী বীজ ২৫টা ঘৃতে বাটিয়া ৮ তোলা বাসি জলের সহিত পান করিবেক।

দোনার মূল ১ তোলা, মরিচ ২৫টা, আট তোলা বাসি জলে বাটিয়া সেবন করিবে।

এইরূপ খাটাসী ১ তোলা উক্ত পরিমাণ মরিচ ও জলের সহিত সেবন করিবে।

দুরালভার মূল ২ তোলা—৮ তোলা বাসি জলে বাটিয়া সেবন করিবে।

ঐ প্রকার শিয়াল কাঁটার মূল, শিকটান কাঁটার মূল, অনন্তমূল ও যবাসমূলের † চারিটী মুষ্টিযোগ করিবে।

হরিদ্রা পত্র ১ তোলা, তেঁতুল পত্র ১ তোলা, ৮ তোলা বাসি জলে বাটিয়া সেবন করিবে।

২ তোলা মধু ৮ তোলা বাসি জলের সহিত সেবন করিবে।

শোধিত পারা ৷৷৹ অর্দ্ধতোলা, শোধিত গন্ধক ১ তোলা, কজ্জলী করিয়া লইয়া পর্পটী প্রস্তুত করিবে, ইহার ৪ চারি মাষকলাই পরিমাণে পানের সহিত সেবন করিবে।

বসন্ত আরম্ভের পাঁচন।

কুমাড়ু লতার মূল পশ্চাৎ বক্তব্য বিধানানুসারে প্রস্তুত করিয়া ১০ কুঁচ হিঙ্গু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে।

পাচন প্রস্তুত করিবার দ্রব্যের ও জলের পরিমাণ:--

পাচন দ্রব্য, এক খানিই হউক অথবা অধিকই হউক, ২ তোলা পরিমাণ। জলের পরিমাণ ৩২.বত্রিশ তোলা। মন্দ মন্দ জ্বালে সিদ্ধ করিবে, ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া, সেই জল পান করিতে দিবে।

বসন্ত আরম্ভে জলসেক। বহুবার বৃক্ষের ‡ ছাল ৮ তোলা—৪৮ তোলা শীতল জলে এক রাত্রি ভিজাইয়া রাখিবে, সেই জল রোগীর শরীরে সেচন করিবে।

বাতজ বসন্তের পাচন—বিল্বাদি। বেলছাল, শ্যোণাছাল, গাম্ভারী ছাল, পারুল ছাল, গণিয়ারী ছাল, শালপানী, চাকুলিয়া, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুরী, রাস্না, দারুহরিদ্রা, দুরালভা, বেণামূল, গুলঞ্চ, ধন্যা, মুতা, প্রত্যেকে ৯৷৷৹ কুঁচ লইয়া বিধানানুসারে পাচন প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে।

---

* কোন ক্বাথ অথবা পাচন পান করিবার সময় যে চূর্ণ দ্রব্য অথবা ঘৃত, মধু প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে হয় তাহার নাম প্রক্ষেপ।

ক্বাথ্য দ্রব্যের ও জলের এবং প্রক্ষেপ দ্রব্যের পরিমাণ গোবিন্দরাম সেনের পরিভাষার মতে লেখা গেল।

† খাদির ভেদ, ক্ষুদ্র কণ্টকী বৃক্ষ। ‡ চালতা।

বাতজ বসন্তের পাককালের পাচন—গুড়ূচ্যাদি। গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, রাস্না শালপানী, চাকুলিয়া, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুরী, রক্তচন্দন, গাম্ভারীফল, শ্বেত বেড়েলার মূল, বঁইচী মূল, প্রত্যেকে ১৩৷৷০ কুঁচ।

পিত্তজ বসন্তের পাচন—দ্রাক্ষাদি। কিসমিস, পিণ্ডীখাজুর, গাম্ভারী ফল, পল্‌তা, নিমছাল, বাসকমূলের ছাল, খই, আমলা, দুরালভা, প্রত্যেকে ১৭৸০ পৌনে আঠার কুঁচ।

শ্লেষ্মজ বসন্তের পাচন—দুরালভাদি। দুরালভা, ক্ষেৎপাপড়া, চিরতা, কট্‌কী, প্রত্যেকে ৪০ কুঁচ। এই পাচনটী পিত্তজ বসন্তেও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ত্রিদোষজ বসন্তের পাচন, নিম্বাদি। নিমছাল ক্ষেৎপাপড়া, আকনাদি মূল, পল্‌তা, কটকী, বাসকমূলের ছাল, দুরালভা, আমলকী, বেণার মূল, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, প্রত্যেক ১৪৷৷০ কুঁচ, প্রক্ষেপ ৷৷০ অৰ্দ্ধতোলা।

পটোলমূলাদি পাচন।

পটোলমূল, রাঙ্গা নটিয়া শাক, আমলকী, খদির সার, প্রত্যেক ৪০ রতি।

পটোলপত্রাদি পাচন।

পলতা, গুলঞ্চ, মুতা, বাসকমূলের ছাল, ধন্যা, দুরালভা, চিরতা, নিমছাল, কট্‌কী, ক্ষেৎপাপড়া, প্রত্যেক ১৬ কুঁচ।

কাঞ্চন ছালের পাচন।

কাঞ্চন বৃক্ষের ছাল ২ তোলা। প্রক্ষেপ শোধিত স্বর্ণমাক্ষিক ৷৷০ অর্দ্ধতোলা।

দ্বিতীয় পটোলমূলাদি পাচন।

পটোলমূল ও রাঙ্গানটিয়া শাক, প্রত্যেকে ৮০ কুঁচ। প্রক্ষেপ হরিদ্রা চূর্ণ ২০ কুঁচ, আমলা চূর্ণ ২০ কুঁচ। এই পাচন বিস্ফোটক হাম রোগেও ব্যবহার করা যায়।

খদিরাষ্টক।

খদির সার, হরীতকী, আমলা. বহেড়া, নিমছাল, পল্‌তা, গুলঞ্চ, বাসকমূলের ছাল, প্রত্যেকে ২০ কুঁচ। এই পাচনটীও বিসর্প, হাম, বিস্ফোটক রোগেও ব্যবহার করা যায়।

কফ-পিত্তজ বসন্তের পাচন—অমৃতাদি।

গুলঞ্চ, বাসক মূলের ছাল, পল্‌তা, মুতা, ছাতিম ছাল, খদির সার. কেলেকড়া, নিম্ব পত্র হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রত্যেকে ১৬ কুঁচ।

বিল্বাদি চূর্ণ।

বিল্বকণ্টক, মরিচ, সমভাগ চূর্ণ করিয়া, ১০ কুঁচ পরিমাণে বাসি জলের সহিত সেবন।

রুদ্রাক্ষাদি চূর্ণ।

রুদ্রাক্ষ, মরিচ, সমান ভাগ চূর্ণ. ১০ কুঁচ পরিমাণে সেবন, অনুপান জল।

পাপ রোগান্তক রস।

ষড়্‌গুণবলিজারিত মূর্চ্ছিত রস, বচ, পিপুল রুদ্রাক্ষ, মরিচ, সমানভাগ চূর্ণ করিয়া, তিন কুঁচ পরিমাণে মধুর সহিত সেবন করিবে।

পিত্তজ বসন্তের দাহাদিনাশক প্রলেপ।

শিরীষ বীজ, যজ্ঞডুমুরের ছাল, বাহবার বৃক্ষের ছাল, অশ্বত্থ ছাল, বটের ছাল, সমান

ভাগ ঘৃত দিয়া নেকড়ার উপর প্রলেপ দিয়া, তাহা শরীরে বসাইয়া দিবে।

বসন্ত পাকাইবার ও দাহ নষ্ট করিবার প্রলেপ।

টাবালেবুর দানা—যবের কাঁজি দিয়া বাটিয়া ঐরূপ প্রলেপ দিবে।

কেবল পদে দাহ হইলে চেলুনী জলে সর্ব্বদা পাদধৌত করিবেক।

বসন্ত পাকাইবার অবলেহ।

গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ইক্ষুমূল, অম্ল-দাড়িম্বের বীজ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ৩২ কুঁচ লইয়া, চারি তোলা পুরাতন গুড়ের সহিত অবলেহ করিবে।

এইরূপ কুলচূর্ণ পুরাতন গুড়ের সহিত অবলেহ

বসন্ত পাককালের পথ্যাপথ্য।

মাংসবর্দ্ধক দুগ্ধ ঘৃতাদি আহার করিবে। শরীর শুষ্ক হয় এমত দ্রব্য কদাচ ব্যবহার করিবে না।

বাতজ বসন্তের আরম্ভকালের পথ্য।

খই চূর্ণ সমান ভাগ চিনির সহিত শীতল জল দিয়া সেবন করিবে।

পল্‌তা প্রভৃতি তিক্ত দ্রব্যের যূষের সহিত ও কপোতের মাংসের যূষের সহিত ভোজন করিবে।

পিত্তজ বসন্তের পথ্য।

নিম, পল্‌তা, মুগ, তিক্ত দ্রব্যের যূষ, পুরাতন তণ্ডুল, যব এবং লঘু ভোজন করিবে।

বসন্তরোগের অপথ্য।

স্ত্রীসেবা, স্বেদ, শ্রম, গুরুদ্রব্য ভোজন, তৈল, রৌদ্র. কটুদ্রব্য, অম্ল, কোদধান্যের অন্ন, দুষ্ট জল, দুষ্ট বায়ু. ক্রোধ, বিরুদ্ধ ভোজন* বিষমাশন † এবং সীম, বসন্তরোগী পরিত্যাগ করিবেক।

উদরে বেদনা, আধ্মান ‡ ও কম্প হইলে পথ্য।

হরিণাদি মাংসের যূষ অল্প সৈন্ধব লবণের সহিত অথবা অম্ল দাড়িমের সহিত পান করিবেক।

পীতবর্ণ শাল বৃক্ষের ছাল ১ তোলা, খদির-সার ১ তোলা—৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ২ সের থাকিতে নামাইয়া, সেই জল পান করিবে, অন্য জল পান করিবে না। (ক্রমশঃ)

প্রাচীন চিকিৎসকের টোট্‌কা ও মুষ্টিযোগ। *

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র লাহিড়ী)

পোড়া ঘায়ে—হরিদ্রা পত্র অথবা তুলসী পত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে মন্ত্রের ন্যায় কাজ করে।

হাড়মোড়ায়—পুঁই শাক অথবা শোনালুর পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে বেশ উপকার হয়।

---

* দুগ্ধের সহিত মৎস্য প্রভৃতি ভোজন।

† অধিক কিম্বা অল্প অথবা অকালে ভোজন।

‡ পেটফাঁপা।

* প্রসিদ্ধ কবিরাজ ৺জয়রাম লাহিড়ী মহাশয়ের ব্যবহৃত।

সর্ব্বপ্রকার বেদনায়— জয়পালের পাতা, ফল ও ছাল একত্র মিলিত ২ তোলা, সরিষার তৈল ।• এক পোয়া একত্র ভাজিয়া লইবে, এই তৈল সর্ব্বপ্রকার বেদনায় প্রয়োগ করা যায়।

প্রস্রাব বন্ধে—চাঁপাফুলের পাতার রস ২ তোলা খাইলে বেশ ফল পাওয়া যায়।

প্রদরে—অশোক ছাল ৫ তোলা, লালী গুড় ১ তোলা—/১ সের জল দিয়া জ্বাল দিয়া /।• পোয়া থাকিতে নামাইয়া দুইবেলা সেব্য।

উপদংশে মলম—ভেড়ার লোম ভস্ম ।০ আনা, শামুকের টাটকা চূণ ॥০ আনা, তুতিয়া ভস্ম ।• আনা, শত ধৌত গব্য ঘৃত ১ তোলা—একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে উপকার হয়।

বৃশ্চিক দংশনে—আমড়া পাতার রস ও আমড়া উত্তমরূপে বাটিয়া দংশিত স্থলে প্রলেপ দিলে উত্তম ফল দৃষ্ট হয়।

বহু মূত্রে—পুরাতন কুল বীজ শাঁস ২টী ও শ্বেতচন্দন ১ তোলা—একত্র বাটিয়া খাইলে বহুমূত্রে বেশ ফল হয়।

হিক্কায়—হিং ঘৃতে ভাজিয়া এক টুকরা কাপড়ে পুঁটুলী বাঁধিয়া ঘন ঘন ঘ্রাণ লইলে প্রবল হিক্কা বন্ধ হয়। অথবা হিক্কাগ্রস্থ রোগীর জিহ্বা টানিয়া বাহির করতঃ পুনরায় ছাড়িয়া দিলেও প্রবল হিক্কা বন্ধ হয়।

প্লীহা রোগে—ঘুঘু পাখীর ডিম ১টী প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়াই খাইলে প্লীহা রোগে বেশ কাজ করে।

রক্তাতিসারে—বেলছাল /০ ছটাক, জায়ফল /০ আনা, চিনি ॥• তোলা—একত্র বাটিয়া প্রাতঃকালে ও বৈকালে কুটরাজের ছাল সিদ্ধ জল ২ তোলা—মধু ও জিরাভাজার চূর্ণ সহ সেব্য।

পাঁচড়ায়—কটু তৈল ./৵• পোয়া, রাই সর্ষপ /• ছটাক, পচা মানকচুর ডাঁটা /০ ছটাক, গাঁজা /০ আনা,—একত্র ভাজিয়া ঐ তৈল ব্যবহারে খোস পাঁচড়া প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

(ক্রমশঃ)

সমালোচনা।

বসন্ত রোগের নিদান ও চিকিৎসা—স্বর্গীয় হারাধন বিদ্যারত্ন কবিরাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। সম্পাদক—কবিরাজ শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র কণ্ঠাভরণ। কয়েক বৎসর হইতে দেশে যেরূপ বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়াছে, তাহাতে এরূপ পুস্তকের প্রকাশ যত অধিক হয় ততই মঙ্গলের কথা। এই গ্রন্থের গ্রন্থকার অনেকগুলি প্রাচীন ও আধুনিক [illegible] গ্রন্থ অবলম্বনে ইহার সঙ্কলন করিয়াছেন। বসন্ত রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা-বিধিসকল এই গ্রন্থে সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থ পাঠে দেশবাসীর উপকার হইবে। আমরা স্থানান্তরে ঐ গ্রন্থ হইতে "বসন্তরোগের চিকিৎসা" উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

শিলং পাহাড়।—শ্রীরামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক [illegible]

ষ্ট্রীট হইতে শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৸৹ টাকা। গ্রন্থকারের শিলং-ভ্রমণ উপলক্ষে গল্পচ্ছলে এই পুস্তকখানি লিখিত। এ পুস্তক পাঠে অনেক দেশের নূতন তথ্য এবং অনেক পুরাতত্ত্ব জানিতে পারা যায়। গ্রন্থখানির ভাষা বেশ প্রাঞ্জল। কাগজ উৎকৃষ্ট, ছাপা সুন্দর এবং বাঁধান বেশ পরিপাটী। আমরা এই গ্রন্থখানি পাঠে পরিতৃপ্ত হইয়াছি।

সত্য গ্রহ।—নন্দিনী সম্পাদক শ্রীআশুতোষ দাস গুপ্ত মহলানবিশ প্রণীত। মূল্য এক আনা। ভারতবাসী সত্যগ্রহীর দলকে উদ্দেশ করিয়া এই পুস্তকখানি লিখিত। গ্রন্থকার সত্যগ্রহীর দলপুষ্টির প্রশংসা করিতে পারেন নাই। তিনি বলেন ইহা ভারত সন্তানের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা,—না ইহা সময়োচিত হুজুগের জুয়ার মাত্র। বাস্তবিক সমগ্র ভারতবাসীর ইহা যে আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা নহে, ইহা তো সত্য কথা। যাহা মর্ম্মস্থল হইতে প্রকাশিত নহে তাহার জন্য বৃথা হুজুগে আত্মহারা হইয়া অশান্তিকে আলিঙ্গন করিবার কারণ কি? ভারতবাসীর প্রাণ চিরদিনই ধর্ম্ম বিজড়িত, সেইজন্য এই গ্রন্থের গ্রন্থকারের মত আমরাও বলি ধর্ম্মোন্নতি দ্বারা শক্তি সংগ্রহের চেষ্টায় আমরা যতটা ধন্যমনা হইব, এই সত্যগ্রহের গড্ডলিকা প্রবাহে প্রধাবিত হইলে সেরূপ কখনই হইতে পারিব না, ইহার ভবিষ্যৎ ফলও যে শুভদ নহে, তাহাও সুনিশ্চিত। এ গ্রন্থে ভাষার ঝঙ্কার যথেষ্ট আছে। এ গ্রন্থের ভাবরাশি গ্রহণেও অনেক বিষয় শিখিতে পারা যায়।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

শিশু মৃত্যুর হিসাব।—ইংলণ্ডে হাজার করা ৯১টি, বিহার ও উড়িষ্যায় হাজার করা ১৮০টি ও বঙ্গদেশে হাজার করা ১৮৫টি, শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সমগ্র ভারতের হিসাব করিলে উহার হার ২০৬। আমেরিকার শিশুমৃত্যুর হার ইংলণ্ড অপেক্ষাও কম। ফল কথা ভারতে ক্রমশঃ যেরূপ শিশুমৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, অন্যান্য সভ্য দেশে সেইরূপ ইহার পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে।

শিশুর মৃত্যুর কারণ—ভারতীয় মহিলাদিগের স্বাস্থ্যজ্ঞানের অভাবই ভারতে শিশু মৃত্যুর আধিক্যের কারণ বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করেন। ভারতে সূতিকাগৃহের জঘন্য অবস্থাও ইহার একটা কারণ অনেকে বলেন কিন্তু সূতিকাগৃহের জঘন্য অবস্থা আগেও ছিল, এখনও আছে, তবে সেই সূতিকা গৃহের জঘন্য অবস্থার ভিতরও আগে যে প্রসূতি ও শিশুদিগের সেঁকতাপ গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল, এখন সেটা অনেক স্থলে উঠিয়া গিয়াছে। অনেকে "পাঁচুঠাকুরে"র মানত করিয়া সেঁক তাপ গ্রহণ [illegible] করিয়াছেন, অনেকে বা ইংরাজী অনুকরণে ঐ ব্যবস্থা উঠাইয়া দিয়াছেন। [illegible]

গৃহের ব্যবস্থা যে ভারতীয়দিগের অপেক্ষা অনুরূপ—এটা আমরা ভাবিয়া দেখি না। ফলে যে সব সংসারে সেঁকতাপ গ্রহণের ব্যবস্থা এখনও উঠিয়া যায় নাই, সে সব সংসারে শিশুমৃত্যুর পরিমাণ অনেকটা কম বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

শিশু মৃত্যুর আরও কারণ।—ভারতে বিশুদ্ধ গো দুগ্ধের অভাব শিশু-মৃত্যুর আর একটি কারণ। ভারতবাসী আগের মত এখন আর দুগ্ধ প্রিয় নহেন, শিশুপালন সম্বন্ধেও অনেক স্থলে ভারতবাসী এখন অনেকটা সেই ব্যবস্থা পালন করিয়া থাকেন। বিলাতী জমাট দুগ্ধ, মেলিন্সফুড প্রভৃতি এখন অনেক শিশুরই প্রধান খাদ্য। এই খাদ্যে শিশুর প্রাণ রক্ষা দুরূহ হইয়া পড়ে। আগে গাভীপালন ভারতের প্রত্যেক ঘরে ঘরে প্রচলিত ছিল, তখন গাভী দুগ্ধের অভাব ছিল না, ভারতে শিশুমৃত্যুর আধিক্যও তখন এরূপ ছিল না। আমেরিকাবাসী এখন একথা বুঝিয়াছেন, আমেরিকায় গো পালন সম্বন্ধে বহু বিদ্যালয় আছে, সেইজন্য আমেরিকায় শিশুমৃত্যুর হার ইংলণ্ড অপেক্ষাও কম।

শিশুমৃত্যুর আরও কারণ নির্দ্দেশ।—শিশুমৃত্যুর আর একটি প্রধান কারণ, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই অপরিণত বয়সে বিবাহের ব্যবস্থা। কিন্তু সমাজের গতিস্রোতে এ ব্যবস্থা রুদ্ধ করিবার যো নাই। শিশু মৃত্যুর হিসাবে দেখা যায়, পৃথিবীর সকল স্থান অপেক্ষা বাঙ্গালাদেশে বহু শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এমন আর কোনো দেশে নহে। বাঙ্গালী সমাজ যেরূপ কন্যাদায় পীড়িত—তাহার ফলে উপযুক্ত-পাত্র-পাত্রীর মিলন হওয়া প্রায়ই সম্ভবপর হয় না। কন্যার পিতা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া বি-এ, এম এ, বি-এস-সি, এম-এস, সি পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিলেন বটে, কিন্তু পাত্র স্বাস্থ্যবান কি না, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠের পীড়নে আয়ুস্কাল স্বল্প ভোগের কারণ করিয়া তুলিয়াছেন কি না এবং তাঁহার স্বাস্থ্যহীন দেহে যে সন্তান সন্ততি জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারা সবল, সুস্থ ও দীর্ঘজীবি হইবে কি না—এ সকল বিষয় বিচার করিবার অবসর পাইলেন না। ফলে বাঙ্গালী সমাজে এখনকার দিনে অনেক ক্ষেত্রেই যে স্ত্রী পুরুষের মিলন সংঘটিত হয়—তাহা স্বাস্থ্যরক্ষার দিক দিয়া দেখিলে উপযুক্ত হয় না। কাজেই দুর্ব্বল পিতৃবীর্য্যে স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘজীবি সন্তান লাভের আশা কেমন করিয়া যায়? সকল দেশ অপেক্ষা বাঙ্গালীর শিশুমৃত্যুর আধিক্যও এইজন্য।

কলিকাতায় বসন্ত।—কলিকাতায় বসন্ত রোগ প্রবল ভাবে প্রবেশ করিয়াছে। প্রতি সপ্তাহেই এই রোগে মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। সহর বাসীর এ সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক।

স্বাস্থ্য কর্ম্মচারীর ঘোষণা।—কলিকাতার স্বাস্থ্য কর্ম্মচারী এই বসন্ত রোগ সম্বন্ধে ঘোষণা করিয়াছেন যে,—"এইবার এই রোগে মহামারী হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। সহরের উত্তরাংশেই এখন ইহার প্রকোপ দেখা যাইতেছে, কিন্তু আমার মনে হয়, এই মহামারী ১৯১৫ সালের মহামারী হইতেও ভীষণতর হইবে।"

স্বাস্থ্য কর্ম্মচারীর আরও বক্তব্য।

—বসন্ত সম্বন্ধে স্বাস্থ্য কর্ম্মচারী মহাশয় আরও বলিয়াছেন,—"১৯১৫ সালে কলিকাতা সহরের দশ হাজার ব্যক্তি বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়, উহাদের মধ্যে আড়াই হাজার লোক মারা গিয়াছিল। এবার যদি সেই বৎসরের মতই ইহা ভীষণ ভাব ধারণ করে, তাহা হইলে ৫০ হাজার হইতে ১ লক্ষ লোক এই রোগে আক্রান্ত হইবে এবং উহাদের মধ্যে সামান্য সংখক লোকই হাসপাতালে' চিকিৎসার জন্য স্থান পাইবে। এই রোগের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য সহর-বাসীর সকলেই টীকা গ্রহণ করুন। যাঁহারা একবার টীকা গ্রহণ করিয়াছেন,তাঁহারাও পুনরায় টীকা গ্রহণ করুন। টীকা লইবার পরে ক্রমশঃ উহার শক্তি কমিয়া আসে, এজন্য যাঁহারা ৫ বৎসর পূর্ব্বে টীকা লইয়াছেন, তাঁহারা আবার অবশ্য টীকা গ্রহণ করিবেন।" স্বাস্থ্য কর্ম্মচারী মহাশয়ের প্রস্তাবমত সকলেরই টীকা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

বিজ্ঞানকংগ্রেস।— সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে নাগপুরে বিজ্ঞান-কংগ্রেস আরম্ভ হইয়াছে। এই উপলক্ষে শতাধিক বৈজ্ঞানিকপ্রবন্ধপঠিত হইবার কথা।

ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রতিষেধ।—ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রতিষেধের উপায় নির্ণয়ের জন্য গত ১৯১৯ সালে পারিস সহরের চিকিৎসকগণের সম্মিলনে এক মহা সভার অধিবেশন হয়, কিন্তু সে অধিবেশনে ইহাই সাব্যস্থ হইয়াছিল যে, এই ব্যাধি সম্বন্ধে প্রয়োজন মত তথ্য সকল পাওয়া যাইতেছে না। ইহার এক বৎসর পরে এখন নাকি সেখানকার চিকিৎসকগণ গবেষণা করিবার অবসর পাইয়াছেন। সেই জন্য স্থির হইয়াছে, শীঘ্রই আর একটী মহা সভার অধিবেশন হইবে এবং সে অধিবেশনে ভারতবর্ষ হইতেও প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা থাকিবে।

সম্পাদক-কবিরাজ।—আমরা এক জন সাহিত্য সেবীকে এত দিন সংবাদ পত্রের সম্পাদক রূপেই দেখিয়া আসিতেছিলাম, সংপ্রতি কয়েক খানি সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপন স্তম্ভে দেখিতেছি, তিনি কবিরাজী ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন। শুভ!

সহরে মৃত্যুর হিসাব।—গত ১০ই জানুয়ারি যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে মোট ৮৯০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে বসন্তে মৃত্যুই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ঐ সপ্তাহে বসন্তে মরিয়াছে ১২৪ জন।

নোয়াখালিতে ইনফ্লুয়েঞ্জা।—নোয়াখালির সংবাদ পত্রে প্রকাশ, নোয়াখালি জেলার অনেক স্থানেই নাকি বহু লোক ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণে প্রাণত্যাগ করিতেছে। বাঙ্গালা দেশ ক্রমে সকল রোগের আকর ভূমি হইতে চলিল।

শোক সংবাদ।—ভট্টপল্লীর অলঙ্কার, বরণীয় অধ্যাপক, আয়ুর্ব্বেদের পরম-ভক্ত মহাত্মা ৺শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয় গত ২রা পৌষ বেলা ৮ টার সময়, সাহ্নাহ্নিক করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন! অতি সুন্দর, অতি বাঞ্ছনীয় মরণ! এতদিনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের প্রাচীন শাখা শুকাইয়া গেল। ইনি জীবনে কখনও ডাক্তারী ঔষধ সেবন করেন নাই। চির দিন আয়ুর্ব্বেদের উপাসক ছিলেন।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক

৪র্থ বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৬—মাঘ। | ৫ম সংখ্যা।

শারীর বিদ্যা।

—:*:—

[শারীর পরিচয়]

(মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এল,এম,এস)

শারীর ও মানস উভয়বিধ রোগ প্রধানতঃ শরীরকে আশ্রয় করিয়াই উৎপন্ন বা প্রকাশিত হয় এবং উভয়বিধ রোগে শরীরই চিকিৎসার প্রধান ক্ষেত্র। সুতরাং চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইলে শরীরের উপাদান, গঠন প্রণালী, শরীরস্থ বিবিধ যন্ত্রের আকৃতি-প্রকৃতি এবং ক্রিয়াদির বিষয় সম্যক্‌রূপে অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। একটি ঘড়ি মেরামত করিতে হইলে যেমন ঘড়ি কি উপায়ে চলে, উহাতে কিরূপ কতগুলি চাকা আছে, কোন্ চাকা কাহার সহিত সংলগ্ন, কোন্ চাকা কিরূপে কোন্ দিকে কার্য্য করে, কি কারণে ঘড়ি দ্রুতভাবে বা মন্দভাবে চলে—ইত্যাদি সমস্ত সূক্ষ্ম বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, সেইরূপ শরীরের চিকিৎসা করিতে হইলে শরীরের গঠন ও আভ্যন্তরিক ক্রিয়া সম্বন্ধে সমস্ত সূক্ষ্ম তত্ত্ব অবগত হওয়া আবশ্যক। ঘড়ির সমস্ত সূক্ষ্ম অংশ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে যেমন তাহার যেখানে যে বিকৃতি ঘটিয়াছে তাহা সহজেই বুঝা যায় এবং বুঝিয়া আবশ্যক মত মেরামত করিতে পারা যায়, সেইরূপ শরীরের সমস্ত আভ্যন্তরিক ক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে অসুস্থ শরীরে কোথায় কি বিকৃতি ঘটিয়াছে তাহা বুঝিয়া চিকিৎসা করিতে পারা যায়।

প্রাণিমাত্রেরই প্রাণ শরীরকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে। শরীর ও শারীরিক যন্ত্রাদির সহিত প্রাণের আধার আধেয় সম্বন্ধ। উহাদের উৎকর্ষ, স্বাভাবিক ক্রিয়া

এবং অপকর্ষ বা ক্রিয়াবৈষম্য যথাক্রমে দীর্ঘ আয়ু, মধ্যম আয়ু এবং অল্প আয়ুর কারণ হইয়া থাকে। চরক-সংহিতায় কথিত হইয়াছে:— "শরীরবিচয় অর্থাৎ শরীর সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান শরীরের হিতের জন্য চিকিৎসকের অবগত হওয়া কর্ত্তব্য—ইহা চিকিৎসাশাস্ত্রের অঙ্গ। কারণ, শরীর-তত্ত্বে জ্ঞান জন্মিলে শরীরের কিসে হিত হয়, সে বিষয়ে জ্ঞান জন্মে। এই জন্য পণ্ডিতগণ শারীর-বিজ্ঞানের প্রশংসা করিয়া থাকেন"। * সুতরাং স্বাস্থ্যরক্ষা এবং দীর্ঘায়ু লাভের উপায় জানিতে হইলে শারীর-তত্ত্ব শিক্ষা করা অতীব আবশ্যক।

শারীরতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান দুই প্রকার—যথা, বাহ্য উপায়লব্ধ জ্ঞান ও আভ্যন্তর উপায়লব্ধ জ্ঞান। তন্মধ্যে পঞ্চেন্দ্রিয় বিশেষতঃ চক্ষু দ্বারা (কোন কোন স্থলে অনুবীক্ষণাদি যন্ত্রের সাহায্যে) জীবিত এবং মৃত দেহ পরীক্ষা করিয়া যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহাকে বাহ্য উপায়লব্ধ জ্ঞান বা বাহ্য জ্ঞান বলে। আর দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন মহর্ষিগণ স্থূল ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত জ্ঞান চক্ষুর দ্বারা যে শারীর তত্ত্ব বিষয়ক সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম জ্ঞান লাভ করেন, তাহাকে আভ্যন্তর উপায়লব্ধ জ্ঞান বা আভ্যন্তর জ্ঞান বলে। কেবল যোগসিদ্ধ মহাপুরুষগণই আভ্যন্তর জ্ঞান লাভের অধিকারী। অতএব আমরা বাহ্যজ্ঞান আশ্রয় করিয়াই শারীর তত্ত্বের বর্ণনা করিব।

কিরূপে মৃত দেহ পরীক্ষা করিয়া শারীর তত্ত্বে জ্ঞান লাভ করিতে হয়, সে সম্বন্ধে সুশ্রুতসংহিতায় নিম্নলিখিত উপদেশ আছে:—

"সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন অর্থাৎ যাহা অঙ্গহীন নহে, যাহা বিষের দ্বারা মৃত নহে, যাহা দীর্ঘকাল ব্যাধি পীড়িত নহে, এবং যাহার একশত বৎসর বয়স (অর্থাৎ বিশেষ বার্দ্ধক্য) হয় নাই, এইরূপ মৃতদেহ সংগ্রহ করিয়া অন্ত্র ও পুরীষ নিষ্কাশিত করিয়া ফেলিবে। পরে উহা মুঞ্জ, তৃণ, বল্কল, কুশ বা শণের দ্বারা বেষ্টিত করিয়া পঞ্জরের (বড় খাঁচার) মধ্যে রাখিয়া অপ্রকাশ্য স্থানে স্রোতোবাহান নদীর জলে পচাইবে। সাত দিন পরে উত্তমরূপে পচিলে সেই দেহ উদ্ধৃত করিয়া বেণার মূল, চুল, বাঁশ বা গাছের ছালের কুঁচি প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করিবে এবং চর্ম্মাদি সমস্ত বাহ্য বা আভ্যন্তর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমস্ত চক্ষু দ্বারা উত্তমরূপে দেখিবে'। †

শরীরের ছয়টি অঙ্গ প্রধান বলিয়া শরীরকে ষড়ঙ্গ বলা যায়। ছয়টী অঙ্গ যথা,—দুই বাহু, দুই সক্থি (দু'খানি পা), মধ্যশরীর এবং মস্তক। দুইবাহু এবং দুই সক্থিকে আয়ুর্ব্বেদে চারিটী শাখা বলা হয়।

---

* "শরীরবিচয়ঃ শরীরোপকারার্থমিষ্যতে ভিষগবিদ্যেয়ম্। জ্ঞাতে হি শরীরতত্ত্বে শরীরোপকারকেষু ভাবেষু জ্ঞানমুৎপদ্যতে। তস্মাৎ শরীরবিচয়ং প্রশংসন্তি কুশলাঃ।" চরক শারীরস্থান ৬ অধ্যায়।

† "তস্মাৎ সমস্তগাত্রমবিষোপহতমদীর্ঘব্যাধিপীড়িতমবর্ষশতিকং নিঃসৃষ্টান্ত্রপুরীষং পুরুষমবহন্ত্যামাপগায়াং নিবদ্ধং পঞ্জরস্থং মুঞ্জবল্কলকুশশণাদীনামন্যতমেনাবেষ্টিতাঙ্গমপ্রকাশে দেশে কোথয়েৎ। সম্যকপ্রকুথিতং চোদ্ধৃত্য দেহং সপ্তরাত্রাদুশীরবালবেণুবল্কলকূর্চ্চানামন্যতমেন শনৈঃ শনৈরবঘর্ষয়ংস্ত্বগাদীন সর্ব্বানেব বাহ্যাভ্যন্তরাঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশেষান্ লক্ষয়েচ্চক্ষুষেতি। সুশ্রুত শারীর স্থান ৬ অধ্যায়। বলা বাহুল্য এই প্রণালী বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী নহে। ইদানীং পচনক্রিয়ানিবারক ঔষধাদি সংযোগে মৃত শরীর সুরক্ষিত করিয়া পরীক্ষা করা হয়। সত্য বটে শরীরের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনেক অংশ দেহ পচাইয়া দেখিলে সহজে দেখা যাইতে পারে কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে নিপুণতার সহিত [illegible] ব্যবচ্ছেদ করিয়াও সে সকল দেখা যাইতে [illegible]

দুইটী বাহুদ্বারা গ্রহণধারণাদি কার্য্য এবং দুইটি সকৃথি দ্বারা গমন ও শরীরের ধারণ কার্য্য সম্পন্ন হয়। মধ্যশরীরে রক্তসঞ্চালন, শ্বাস গ্রহণ, অন্নপরিপাক, মলমূত্র বিসর্জ্জন প্রভৃতি কার্য্যকর আশয় বা যন্ত্র সমূহ অবস্থিতি করে। বৃক্ষের কাণ্ড যেমন মূল ও শাখা সমূহের আশ্রয় স্বরূপ, মধ্যশরীরও সেইরূপ চারিটি শাখা ও মস্তকের আশ্রয় স্বরূপ। মস্তকে শ্বাস গ্রহণের দ্বার নাসা, মুখ এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহ অবস্থিতি করে। সংজ্ঞাবহ ও চেষ্টাবহ নাড়ী সকলের মূল এবং বুদ্ধীন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান ভূমি মস্তিষ্কও মস্তকের মধ্যেই অবস্থিত। জ্ঞানের অধিষ্ঠান ভূমি মস্তিষ্ক মস্তকের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া উহা উত্তমাঙ্গ নামে কথিত হইয়া থাকে। ষড়ঙ্গ শরীরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এস্থলে বীজরূপে প্রদত্ত হইল। পরে ইহাই বিস্তৃতভাবে লিখিত হইবে।

শারীরতত্ত্ব শিক্ষার আবশ্যকতা, সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ * যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছেঃ

"যে চিকিৎসক সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে সমগ্র শরীরের তত্ত্ব সমূহ অবগত আছেন, তিনিই সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ বুঝিতে সক্ষম।" (চরক)

"শাস্ত্রলিখিত শারীরতত্ত্ব পাঠ করিয়া এবং স্বচক্ষে সমগ্র শরীরতত্ত্ব দর্শন করিয়া শারীর-বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইবে। প্রত্যক্ষ দর্শন এবং শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা সন্দেহ দূর করিয়া চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। চক্ষুঃ দ্বারা প্রত্যক্ষ দেখা এবং শাস্ত্রপাঠ দ্বারা অবগত হওয়া—এই উভয়ের সমন্বয় ঘটিলেই যথার্থ জ্ঞান জন্মে।" (সুশ্রুত)

শারীর পরিভাষা।

শারীরতত্ত্ব শিক্ষা করিতে হইলে প্রথমেই শারীর পরিভাষা অর্থাৎ শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের এবং শরীরের উপাদান সমূহের শাস্ত্রীয় নাম অবগত হওয়া আবশ্যক, নচেৎ পূর্ব্ববর্ত্তী ভ্রান্তসংস্কার থাকায় নানারূপ গোলযোগ হইতে পারে। সেইজন্য প্রথমেই শারীরপরিভাষা লিখিত হইতেছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে শরীরের প্রধান অঙ্গ ছয়টী। এক্ষণে উহাদের অবয়ব সমূহের বর্ণনা করা যাইতেছে। বাহুর সহিত মধ্যশরীরের সন্ধির নিম্নভাগকে কক্ষ (বগল) এবং উর্দ্ধভাগকে অংস বা ভুজশিরঃ বলে। অংস হইতে কনুই পর্য্যন্ত স্থানকে প্রগণ্ড (উপরের হাত) বলে। বাহুর মধ্যসন্ধিকে কফোণি বলে। কফোণির পশ্চাদ্ভাগ চলিত কথায় কনুই নামে প্রসিদ্ধ। কফোণি হইতে মণিবন্ধ বা কর-সন্ধি পর্য্যন্ত স্থানকে

---

* "শরীরং সর্ব্বদা সর্ব্বং সর্ব্বথা বেদ যো ভিষক।
আয়ুর্ব্বেদং স কাৎস্নেন বেদলোক সুখপ্রদম ॥"
চরক, শারীরস্থান, ৬ অধ্যায়।

"শরীরে চৈব শাস্ত্রে চ দৃষ্টার্থঃ স্যাদ্বিশারদঃ।
দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং সন্দেহমবাপোহ্যাচরেৎ ক্রিয়াঃ ॥
প্রত্যক্ষতো হি যদ্দৃষ্টং শাস্ত্রদৃষ্টঞ্চ যত্তবেৎ।
সমাসতস্তদুভয়ং ভূয়ো জ্ঞান বিবর্দ্ধনম ॥
সুশ্রুত, শারীরস্থান ৬ অধ্যায়।

প্রকোষ্ঠ (নীচের হাত) বলে। প্রকোষ্ঠ ও করের সন্ধিস্থলকে মণিবন্ধ বলে। মণিবন্ধ হইতে করাঙ্গুলি সমূহের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত অংশ কর বা পাণি নামে খ্যাত। করের রেখাঙ্কিত ভাগকে করতল এবং বিপরীত ভাগকে করপৃষ্ঠ বলে। অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা— পাঁচটী অঙ্গুলির এই পাঁচটী নাম। সক্থির অর্থাৎ সমস্ত পা'খানির সহিত মধ্যশরীরের যে স্থলে সংযোগ হইয়াছে উহার সম্মুখের অংশকে বঙ্ক্ষণ (কুঁচকি) এবং পশ্চাদ্ভাগকে নিতম্ব বা স্ফিক্ (পাছা) বলে। বঙ্ক্ষণ হইতে জানু পর্য্যন্ত স্থানকে উরু বলে। উরু ও জঙ্ঘার (নীচের পায়ের) মধ্যস্থ সন্ধিকে জানু (হাটু) বলে। জানু হইতে পদের সন্ধি পর্য্যন্ত স্থানকে জঙ্ঘা (নীচের পা) বলে। জঙ্ঘার নিম্নভাগে দুইদিকের দুইটা অস্থিময় উন্নত প্রদেশকে গুল্ফ* (পায়ের গাঁট) বলে। গুল্ফ এবং পদের সন্ধিস্থানকে পাদসন্ধি বা গুল্ফসন্ধি বলে। ইহার নিম্নভাগকে পদ বা পাদ বলা যায়। পদের অগ্রভাগকে প্রপদ এবং পশ্চাদ্ভাগকে পার্ষ্ণি (গোড়ালি) বলে। পদের রেখাঙ্কিত ভাগকে পাদতল বা পদতল এবং তাহার বিপরীত ভাগকে পাদপৃষ্ঠ বলা যায়।

ললাট, দুইটী ভ্রূ, দুই শঙ্খ (রগ), দুই গণ্ড (গাল), ঊর্দ্ধ হনুমণ্ডল (উপরের চোয়াল), অধো হনুমণ্ডল (নীচের চোয়াল), ওষ্ঠ, অধর, চিবুক (থুৎনি), তালু (মুখের অভ্যন্তর ভাগের উদ্ধাংশ), উপজিহ্বা (আলজিব), অধিজিহ্বা (গলার ভিতরে আলজিবের দুইপাশের দুইটা গ্রন্থি বা টন্‌সিল —Tonsil) ও কণ্ঠ এইগুলি মস্তক ও গ্রীবার প্রসিদ্ধ উপাঙ্গ। চক্ষুঃ কর্ণাদির বিষয় পৃথক্ ভাবে বলা যাইবে।

স্তনদ্বয়, বক্ষঃ, পার্শ্বদ্বয়, পৃষ্ঠ, উদর, নাভি বস্তিদেশ, কটি (কোমর), ও ত্রিক—এই কয়টী মধ্যশরীরের উপাঙ্গ। দুই সক্থি এবং মধ্যশরীরের সন্ধিস্থলকে ত্রিক (মাজা) বলে। নাভির অধোভাগকে বস্তিদেশ বলে।

ত্বক্, কলা, পেশী, স্নায়ু, ধমনী, শিরা, রসায়নী, নাড়ী, রসরক্তাদি ধাতু শরীরের উপাদান স্বরূপ। শ্বাসগ্রহণ, অন্নপরিপাক প্রভৃতি কার্য্যনির্ব্বাহক অনেক গুলি যন্ত্র বা আশয় শরীরের মধ্যে অবস্থিত। জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটী, কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটী এবং শরীরের ছিদ্র বা দ্বার নয়টা। প্রত্যেকের বিষয় পৃথক ভাবে লিখিত হইতেছে।

ত্বক্—বা চর্ম্ম (Skin—স্কিন্) ইহা সর্ব্বদেহের আবরণ স্বরূপ, স্পর্শেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানভূমি এবং স্বেদবহ স্রোতঃ সকল ও সরোম রোমকূপ সমূহের আশ্রয় স্থান। স্থূল দৃষ্টিতে ইহা বহিত্বক্ ও অন্তস্ত্বক্ ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে বহিত্বক্ পাতলা ও কৃষ্ণ গৌর প্রভৃতি শারীরিক বর্ণের আধার স্বরূপ। এই ত্বক্ অগ্নির সংস্পর্শে ফোস্কা রূপে পরিণত হয়। অন্তস্ত্বক্ স্থূল, শরীরের রক্তা-

* অনেকে গুল্ফ অর্থে গোড়ালি বুঝিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা ভ্রমাত্মক।

কারক এবং শরীরলিপ্ত মেদাদির আকর্ষণ কারক। ইহাই স্পর্শজ্ঞানের এবং স্বেদবহ স্রোতঃ সমূহের আশ্রয় স্থান।

সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকারগণ--দুগ্ধের উপর যেমন স্তরে স্তরে সর পড়ে, ত্বকেরও সেইরূপ ছয়টী বা সাতটী স্তর নির্দ্দেশ করিয়াছেন *। তন্মধ্যে প্রথম ত্বকের নাম অবভাসিনী, ইহাই পূর্ব্বোক্ত বাহ্য ত্বক্। অপর পাঁচটী বা ছয়টী ত্বক অন্তস্ত্বকের অন্তর্ভুক্ত।

কলা—(মেম্বেন্ (Membrane) কলা সকল সাধারণতঃ সূক্ষ্ম রেশমী-বস্ত্রের ন্যায়, কিন্তু প্রয়োজন অনুসারে নানারূপ হইয়া থাকে। ইহারা মাংস, অস্থি ও আশয় সমূহের ভিতর দিক্ ও বাহির্দ্দিক আবৃত করিয়া অবস্থিতি করে। স্থান ও কার্য্য ভেদে কলা সকল ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কলার দৃষ্টান্ত যথা--মাংসের উপরের আবরণ ঝিল্লী (ফেঁসো) অথবা মাছের পট্কা বা পট্পটীর উপাদান। উপযুক্ত স্থানে নানাবিধ কলার বিষয় বলা যাইবে।

পেশী--(Muscle—মস্‌ল্)—পেশী সকল মাংসময়, প্রায়শঃ স্থূল রজ্জুর ন্যায়, কদাচিৎ মোটা চাদরের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট। চলিত কথায় যাহাকে মাংস বলা হয়, তাহা পেশী বা পেশীর উপাদান মাত্র। পেশী সকল দুই প্রকার, যথা---ইচ্ছাধীন ও স্বতন্ত্র। ইচ্ছাধীন পেশীগুলি আমাদের ইচ্ছা অনুসারে চালিত হইয়া থাকে। কিন্তু স্বতন্ত্র পেশীগুলির চালনা করিতে আমাদের ইচ্ছা আবশ্যক হয় না—উহারা স্বভাবতঃই ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে। পেশী সকলের বিষয় পরে যথাস্থানে আলোচনা করা যাইবে।

কণ্ডরা—(Tendon--টেণ্ডন্) পেশী সকলের রজ্জুর ন্যায় আকারবিশিষ্ট শুভ্র মসৃণ এবং দৃঢ় প্রান্তভাগকে কণ্ডরা বলা যায়। ইহারা স্নায়ু দ্বারা নির্ম্মিত এবং যথেষ্ট ভার সহনে সমর্থ।

স্নায়ু (Ligaments and Tendons †—লিগামেণ্ট এবং টেণ্ডন্)—শ্বেতবর্ণ, মসৃণ, দৃঢ় এবং শণগুচ্ছ সদৃশ। স্নায়ু শব্দ আয়ুর্ব্বেদে প্রধানতঃ দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা—(১) স্নায়ু অর্থাৎ স্নায়ুরজ্জু বা কণ্ডরা। (২) স্নায়ু অর্থাৎ সূক্ষ্ম স্নায়ু বা স্নায়ু-সূত্র। বহুসূত্র সংযোগে প্রস্তুত রজ্জু এবং সূক্ষ্ম সূত্রের যেরূপ প্রভেদ, এই দুই অর্থের প্রভেদও সেইরূপ। স্থূল স্নায়ু প্রধানতঃ অস্থি সমূহের পরস্পর ও অস্থির সহিত পেশীর বন্ধন কার্য্য করিয়া থাকে এবং সূক্ষ্ম স্নায়ু কলা সমূহে, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও বক্ষঃস্থলের চওড়া পেশী সকলের শেষভাগে এবং আমাশয়, পক্বাশয় ও বস্তির কোন কোন প্রদেশে থাকিয়া উহাদের দৃঢ়তা সম্পাদন করে।

সুশ্রুতে কথিত হইয়াছে—

"স্নায়ু চার প্রকার, যথা, প্রতানবতী (শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট), বৃত্ত বা রজ্জুর ন্যায়, পৃথু বা চওড়া এবং ছিদ্রযুক্ত। প্রতানবতী স্নায়ু চারিটী শাখায় ও সন্ধিসমূহে আছে। কণ্ডরাগুলি বৃত্তস্নায়ু। আমাশয় ও পক্বাশয়ের শেষে এবং বস্তিতে ছিদ্রযুক্ত স্নায়ু আছে। পার্শ্ব, বক্ষঃস্থল, পৃষ্ঠ ও মস্তকে পৃথু বা চওড়া

* চরকের মতে ত্বক্ ছয়টী এবং সুশ্রুতের মতে সাতটী।

† ইংরাজি (Sinew) 'সিনিউ' শব্দ স্নায়ু শব্দ হইতেই উৎপন্ন। অর্থও অনেকটা একই রূপ। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গভাষায় 'নার্ভ' বা নাড়ী অর্থের স্নায়ু শব্দের প্রয়োগ নিতান্ত ভ্রমাত্মক।

স্নায়ু আছে। নৌকার কাষ্ঠ ফলক সকল যেরূপ বহুবন্ধনযুক্ত ও গ্রথিত হইয়া জলে বহু ভার বহন করিতে সক্ষম হয়, সেইরূপ মনুষ্য-শরীরে যতগুলি সন্ধি আছে, তাহারা বহু স্নায়ু দ্বারা বদ্ধ বলিয়া মনুষ্যদেহ ভারসহ হইয়া থাকে।*

ধমনী—(Artery)—আর্টারি)—সর্ব্বদেহ ব্যাপ্ত বিশুদ্ধ রক্তবাহিনী প্রণালী বা স্রোতঃ সকলকে ধমনী বলে। হৃদযন্ত্রচালিত বিশুদ্ধ রক্ত প্রথমে মূল ধমনী, পরে তাহার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম শাখা প্রশাখা সমূহের ভিতর দিয়া সর্ব্ব শরীরে প্রবাহিত হয়। ধমনী সকল বিশুদ্ধ রক্ত বহন করে বটে, কিন্তু ফুসফসগামিনী ধমনী দুইভাগে বিভক্ত হইয়া হৃদযন্ত্র হইতে ফুসফুসে দূষিত রক্ত বহন করিয়া লইয়া যায়।

সিরা (Vein—ভেন)—সর্ব্বদেহব্যাপী দূষিত রক্ত বহনকারী স্রোতঃ সকলকে সিরা বলে। ইহারা অতি সূক্ষ্ম আকারে দেহের সর্ব্বত্র অবস্থিতি করে এবং ক্রমশঃ পরস্পরে মিলিত হইয়া স্থূল সিরাসমূহে পরিণত হয়। সর্ব্বদেহের দূষিত রক্ত বহন করিয়া হৃদয়ে লইয়া যাওয়াই ইহাদের কার্য্য। সিরা সকল দূষিত রক্ত বহন করে বটে, কিন্তু চারিটী সিরা ফুসফুসদ্বয় হইতে বিশুদ্ধ রক্ত বহন করিয়া হৃদয়ে লইয়া যায়।

রসায়নী (Lymphatic—লিম্ফাটিক)—লসীকা নামক পাতলা ও স্বচ্ছ রসবাহিনী প্রণালীকে রসায়নী বলে; রসায়নী প্রণালী সকল সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত আছে। কক্ষ, বঙ্ক্ষণ ও গলদেশ প্রভৃতি স্থানে রসায়নী প্রণালী গুলির মধ্যে মধ্যে কুঁচ বা নিমফলের ন্যায় রসগ্রন্থিসমূহে অবস্থিত।

নাড়ী—(Nerve—নার্ভ)—নাড়ী সকল কোমল সূক্ষ্ম, পীতাভ এবং রন্ধ্রহীন তারের মত। স্থান ও প্রয়োজন ভেদে উহারা কোথাও সূক্ষ্ম সূত্রের ন্যায় কোথায় বা সূত্রগুচ্ছের ন্যায় আকারে অবস্থিত। মস্তিষ্ক (Brain) এবং সুষুম্না কাণ্ড নামক স্থূল নাড়ীগুচ্ছ (Spinal cord) অন্যান্য অধিকাংশ নাড়ীর মূল। কার্য্য ভেদে নাড়ী সকল দুই ভাগে বিভক্ত। কতকগুলি নাড়ী চেষ্টা শক্তি বহন করে এবং কতকগুলি নাড়ী ইন্দ্রিয় সকলের বোধ বা সংজ্ঞা বহন করে। টেলিগ্রাফের প্রধান কেন্দ্র হইতে টেলিগ্রাফের তার সকল যেমন চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত থাকে, মস্তিষ্ক ও সুষুম্না নাড়ী হইতে নাড়ী সকলও সেইরূপ শরীরের সর্ব্বত্র বিস্তৃত

---

* স্নায়ুশ্চতুর্বিধা বিদ্যাত্তাস্তু সর্ব্বা নিবোধ মে।
প্রতানবত্যো বৃত্তাশ্চ পৃথ্বশ্চ শুষিরাস্তথা॥
প্রতানবত্যঃ শাখাসু সর্ব্বসন্ধিষু চাপ্যথ।
বৃত্তাস্তু কণ্ডরাঃ সর্ব্বা বিজ্ঞেয়াঃ কুশলৈরিহ॥
আমপক্বাশয়ান্তেষু বস্তৌ চ শুষিরাঃ খলু।
পার্শ্বোরসি তথা পৃষ্ঠে পৃথুলাশ্চ শিরস্যথ॥
নৌর্যথা ফলকাস্তীর্ণা বন্ধনৈর্ব্বহুভির্যুতা।
ভারক্ষমা ভবেদপ্সু নৃযুক্তা সুসমাহিতা।
এবমেব শরীরেঽস্মিন্ যাবন্তঃ সন্ধয়ঃ স্মৃতাঃ।
স্নায়ুভির্ব্বহুভির্ব্বদ্ধাস্তেন ভারসহা নরাঃ॥"
সুশ্রুত, শারীরস্থান, ৫ অধ্যায়।

আছে। টেলিগ্রাফের কেন্দ্রস্থল হইতে তার দ্বারা যেমন অন্যান্য স্থানে আদেশ পাঠান যায়, মস্তিষ্ক ও সুষুম্না নাড়ী হইতেও সেইরূপ শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গকে কার্য্য করিবার আদেশ পাঠান হয়। আবার অন্যান্য স্থান হইতে টেলিগ্রাফের কেন্দ্র স্থলে যেমন সংবাদ দেওয়া যায়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটিলে সে সংবাদ নাড়া পথেই মস্তিষ্কে প্রেরিত হয় এবং তাহার ফলে ইন্দ্রিয়ের বোধ উৎপন্ন হয়। সুতরাং চেষ্টাবহা (Motor) ও সংজ্ঞাবহা (Sensory) ভেদে নাড়ী সকল দুই প্রকার যথাস্থানে নাড়ী সকলের বিষয় বিস্তৃত ভাবে বলা যাইবে।

স্রোতঃ—শরীরে যে সমস্ত নল বা পথ আছে, সেই সকলের সাধারণ নাম স্রোতঃ। চরকে কথিত হইয়াছে,—স্রোতঃ সকল পরিণত ধাতু সমূহ বহনকারী পথ। ইহা দিগ্‌দর্শন মাত্র। কারণ অন্ন, মূত্র, মল, ঘর্ম্ম প্রভৃতি যে সকল প্রণালীর ভিতর দিয়া বাহিত হয়, তাহা-দিগকেও স্রোতঃ বলা যায়।

ধাতু—রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটীকে ধাতু বলে :—

(১) রস—সর্ব্বপ্রকার ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া যে সৌম্য অর্থাৎ শৈত্যগুণ-যুক্ত জলীয় সার পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাকে রস বলা যায়; "রস" ধাতুর অর্থ—গতি। শরীরের সর্ব্বত্র অহরহঃ গমন করে বলিয়া "রস" নাম হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ মতে রস—যকৃৎ ও প্লীহায় গমন করিয়া রঞ্জক পিত্ত দ্বারা রঞ্জিত হইলে রক্ত নামে অভিহিত হয়। সুশ্রুতে কথিত হইয়াছে যে, দেহীদিগের শরীরস্থ বিশুদ্ধ রস রঞ্জকপিত্ত কর্ত্তৃক রঞ্জিত হইয়া রক্ত সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।*

(২) রক্ত—(Blood— ব্লড)— সকল ধাতুর পোষক বলিয়া রক্ত জীবন রক্ষার প্রধান উপায় স্বরূপ। রক্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে শরীরের অন্যান্য ধাতুও ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে।

লসীকা— (Lymph—লিম্ফ)—রক্তের পাতলা স্বচ্ছ জলীয়াংশ লসীকা নামে খ্যাত। ইহা রসায়নী প্রণালী সমূহের মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া থাকে। লসীকা রক্ত বা রসের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পৃথক ধাতুরূপে উহার গণনা করা হয় না।

(৩) মাংস—(Muscular tissue) পেশী সমূহের উপাদান স্বরূপ কোমল রক্তবর্ণ এবং তন্তুময়।

(৪) মেদ—(Fat) ঘৃতের ন্যায় ঘন শরীরের স্নেহময় ধাতু। ইহা প্রধানতঃ উদরের মধ্যস্থ ঝিল্লী বিশেষের এবং ত্বকের নিম্নে অবস্থিতি করে। মাংসের স্নেহভাগকে বসা বলে। ইহা মেদের ন্যায় উপাদান বিশিষ্ট এবং মেদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

(৫) অস্থি—(Bone—বোন)—শরীরের অবলম্বন স্বরূপ দৃঢ় কঠিন ধাতু; চলিত কথায় হাড়।

(৬) মজ্জা—(Bone marrow—বোন ম্যারো) অস্থির মধ্যস্থিত ধাতুকে মজ্জা বলে।

* রঞ্জিতাস্তেজসা ত্বাপঃ শরীরস্থেন দেহিনাম্।
অব্যাপন্নাঃ প্রসন্নেন রক্তমিত্যভিধীয়তে॥
সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ১৪ অধ্যায়।

ইহা কতকটা মেদের ন্যায় উপাদানবিশিষ্ট হইলেও কার্য্য ভেদে পৃথক ধাতু বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। ৬

(৭) শুক্র—স্ফটিকের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, তরল, স্নিগ্ধ, মধুর এবং মধুর ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট ধাতু। ইহার মধ্যে গর্ভোৎপাদক জীবাণু সমূহ থাকে। গর্ভোৎপাদক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] স্বীকার করিয়াছেন।

রজঃ—রস হইতে স্ত্রীলোকের [illegible] আর্ত্তব উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে স্ত্রীলোকের গর্ভোৎপাদক ধাতু বীজাণু বর্ত্তমান। সাধারণতঃ দ্বাদশ বৎসর বয়সে রজঃপ্রবৃত্তি এবং পঞ্চাশ বৎসরে রজো নিবৃত্তি হইয়া থাকে। গর্ভাবস্থায় রজঃ উর্দ্ধগামী হইয়া স্তন্যরূপে পরিণত হয়। রজঃ ও স্তন্যরস রক্ত ধাতুর অন্তর্ভুক্ত।

আশয়—শরীরে তিনটী গুহা বা গহ্বর আছে এবং এই তিনটী গুহার মধ্যে শরীরের বিবিধ আশয় বা যন্ত্র অবস্থিত। তিনটী গুহা, যথা—শিরোগুহা, উরোগুহা এবং উদর গুহা। প্রত্যেক গুহা অবস্থিত আশয় সকলের বিষয় পৃথক ভাবে বলা যাইতেছে।

শিরোগুহা—এই গুহার মধ্যে মস্তিষ্ক, অনুমস্তিষ্ক এবং সুষুম্না কাণ্ডের শীর্ষদেশ অবস্থিত।

উরোগুহা—এই গুহায় ফুসফুস নামক দুইটী শ্বাস গ্রহণ যন্ত্র এবং রক্ত সঞ্চালন যন্ত্র হৃদয় অবস্থিত।

উদরগুহা—এই গুহার মধ্যে আমাশয়, পক্বাশয়, গ্রহণী, যকৃৎ, প্লীহা, অগ্ন্যাশয়, বৃক্কদ্বয় বস্তি, স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাশয় ও দুইটী বীজকোষ আছে।

আমাশয়—(Stomach—ষ্টম্যাক)—আমাশয়ের আকার ক্ষুদ্র দৃতির (ভিস্তির ব। মশকের) ন্যায়। ইহা সমস্ত ভুক্ত দ্রব্যের আধার।

পক্বাশয়—(Intestine [illegible]) [illegible] পক্বাশয় বলে। আ[illegible] [illegible] অন্নাদি থাকে, [illegible] অল্প পাক হইলেও প্রধানতঃ অন্ত্র মধ্যে আসিয়াই পাক বা পরিণতি সম্পূর্ণ হয়। এইজন্য আমাশয় ও পক্বাশয় এই দুইটী সংজ্ঞা হইয়াছে।

গ্রহণী—(Duodenum—ডিওডিনম) আমাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্যবর্ত্তী দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত স্থানকে গ্রহণী বলে। গ্রহণী শব্দ অনেকস্থলে আমাশয় ও পক্বাশয়ের ভিতরের আবরণ ঝিল্লী বা কলা অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

যকৃৎ—(Liver—লিভার)—উদরের উপরি ভাগের দক্ষিণদিকে পঞ্জরের মধ্যে যকৃৎ অবস্থিত। ইহা পাচক ও রঞ্জক পিত্তের উৎপত্তি স্থান। পিত্তকোষ (Gall-Bladder—গলব্লাডার) নামক একটি থলী যকৃতে সংলগ্ন আছে।

প্লীহা—(Spleen—স্প্লীন)—রঞ্জক পিত্তের অন্যতম উৎপত্তি স্থান। প্লীহা উদরের উপরি ভাগে বামদিকে পঞ্জরের মধ্যে অবস্থিত।

অগ্ন্যাশয়—(Pancreas—প্যাংক্রিয়াস)*—আমাশয়ের পশ্চাদ্ভাগে অগ্ন্যাশয় অবস্থিত। সর্ব্ব-

* "অগ্ন্যাশয়"—সংজ্ঞাটী প্রবন্ধ লেখক [illegible] ইহাকে 'ক্লোম' বলেন, কিন্তু সে মত যুক্তিযুক্ত নহে। তাহার কারণ যথাস্থানে বলা হইবে।

অন্ন পরিপাকে সমর্থ প্রধান আগ্নেয় রস ইহা হইতেই পরিস্রুত হয়। ইহার দক্ষিণপ্রান্ত বিস্তৃত এবং বামপ্রান্ত ক্রমে সরু।

বৃক্ক—(Kidney—কিড্‌নি) - কটিদেশে মেরুদণ্ডের দুই পার্শ্বে শিমের বীজের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট দুইটী বৃক্ক আছে। বৃক্কদ্বয় রক্ত হইতে মূত্র নিষ্কাশন করে।

বস্তি—(Bladder—ব্ল্যাডার)—ইহা নাভির অধোভাগে মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং বৃক্ক দ্বারা উৎপন্ন মূত্রের আধার স্বরূপ। পেন কলমের ন্যায় দুইটী সূক্ষ্ম নল দ্বারা মূত্র বৃক্ক হইতে বস্তিতে নীত হয়। উহাদিগকে গবীনী বা মূত্রস্রোতঃ (Utrerus—ইউটরস)—বলে।

গর্ভাশয়—(Utrerus—ইউটরস)—স্ত্রীলোকদিগের যোনির ঊর্দ্ধমুখের সহিত সংলগ্ন ক্ষুদ্র কলসের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট। গর্ভাবস্থায় গর্ভের বৃদ্ধির সহিত গর্ভাশয়ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এবং প্রসবান্তে পুনরায় ছোট হইয়া যায়।

শিশুপালন।

খাদ্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

(শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বি-এ, সরস্বতী)

খাদ্যের কার্য্য কি তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এখন কোন্ প্রকার খাদ্যে আমাদের দেহের বৃদ্ধি হয়, গঠন হয় এবং রক্ষা হয় তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে।

দুই প্রকার গুণ বিশিষ্ট খাদ্য আমাদের দেহ রক্ষার জন্য প্রয়োজন হয়। এক প্রকার খাদ্যে আমাদের দেহের ক্ষয় নিবারণ, গঠন এবং বৃদ্ধি হয়। আর এক প্রকার খাদ্যে আমাদের জীবনী শক্তি জন্মে। সুতরাং আমাদের খাদ্যকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। যথা :—

(১) মাংসের ন্যায় গুণ বিশিষ্ট খাদ্য। (flesh like substances) ইহা হইতে আমাদের দেহ যন্ত্র নির্ম্মিত হয়।

(২) তাপ উৎপাদক খাদ্য (combustible substance) ইহা আমাদের জীবন রক্ষা করে।

(১) মাংস বর্দ্ধক খাদ্য কি? বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই প্রকার খাদ্যে চারিটি জিনিস আছে। তাহাদের নাম যবক্ষার বাষ্প (nitrogen), অঙ্গারাম্লজান (carbon), হাইড্রোজেন এবং অম্লজান বাষ্প

(oxygen)। এই শ্রেণীর খাদ্য ব্যতীত অন্য কোন খাদ্যে যবক্ষারজান বাষ্প (nitrogen) নাই। এই যবক্ষার জান বাষ্পের অস্তিত্বই মাংসের ন্যায় খাদ্যের বিশেষত্ব। এই কারণে এই খাদ্যকে যবক্ষার বাষ্পাত্মক খাদ্য (nitrogenous food) বলে। এই খাদ্য খাইলে দেহে মাংস হয়। প্রধানতঃ পশু মাংসে এই যবক্ষারজান আছে। এতদ্ব্যতীত দুগ্ধ, ডিম, সকল রকল শস্য (corn), ডাল, সীম বা মটর জাতীয় শস্যে (peas and beans) এবং টাটকা সব্জিতে কিয়ৎ পরিমাণে এই nitrogen আছে। যবক্ষার বাষ্প (nitrogen) মাংসের মধ্যে যেমন, শাক সব্জিতেও তেমনি বিদ্যমান আছে। তবে মাংসের মধ্যে ইহা অবিকৃত ভাবে পাওয়া যায়।

(২) তাপ উৎপাদক খাদ্যে অঙ্গারাম্লজান (carbon) হাইড্রোজেন এবং অম্লজান বাষ্প (oxygen) আছে। এই খাদ্য দুই প্রকারের। (ক) শ্বেতসার বিশিষ্ট খাদ্য (starches) এবং (খ) মেদময় (fats) খাদ্য এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যে সকল খাদ্যে শ্বেতসার এবং চিনি আছে, সে সকল খাদ্যই প্রথম শ্রেণীর (ক) অন্তর্ভুক্ত। ইহাকে carbohydrates বলে। যে সকল খাদ্যে মাখন, চর্ব্বি ক্রিম এবং তৈল আছে সে সমুদয়ই দ্বিতীয় শ্রেণীর (খ) অন্তর্গত। ইহাকে hydrocarbons বলে। শ্বেতসার বিশিষ্ট খাদ্য অপেক্ষা মেদময় খাদ্যে carbon (অঙ্গারদ্রাবক) অধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে। এই কারণে মেদময় খাদ্য শ্বেতসার বিশিষ্ট খাদ্য অপেক্ষা অধিক পরিমাণে তাপ উৎপাদন করে এবং জীবনী শক্তি প্রদান করে।

খনিজ পদার্থ বিশিষ্ট খাদ্য। আমাদের দেহরক্ষার জন্য খনিজ পদার্থ বিশিষ্ট খাদ্যের প্রয়োজন। জল এবং কয়েক প্রকার লবণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। যেমন সাধারণ লবণ, phosphate of lime, এবং আরো কয়েক প্রকার লবণ। সমুদয় জীবন্ত দৈহিক সূত্রের (tissues) গঠন এবং কার্য্য ক্ষমতা লাভের জন্য জল এবং লবণের প্রয়োজন হয়। পরিপাক ক্রিয়ার জন্য যে চারিটি রসের আবশ্যক হয় তাহার কার্য্য চালাইবার জন্য, রক্ত সঞ্চালনের জন্য এবং দেহের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সরস এবং ভিজা রাখিবার জন্য জলের আবশ্যক। রক্তে, মাংসপেশীতে এবং দেহের সমুদয় নরম স্থানে লবণের প্রয়োজন হয়। কিন্তু লবণ হাড় এবং দাঁতের জন্যই অধিক পরিমাণে কাজে লাগে। যে দাঁতে যত বেশী (lime salt) চুণের ভাগ থাকিবে, সে দাঁত তত দৃঢ় হইবে। তাহা হইলে ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে আমাদের দেহের গঠন, বৃদ্ধি, কার্য্য ক্ষমতা, এবং জীবনী শক্তির জন্য নিম্নলিখিত চারি প্রকার খাদ্যের আবশ্যক। যথা—

(১) যবক্ষার বাষ্পাত্মক খাদ্য (nitrogenous substances)। মাংসের গুণ বিশিষ্ট খাদ্য। এই খাদ্য দেহের বৃদ্ধি এবং ক্ষয় পূরণের জন্য প্রয়োজন হয়।

(২) শ্বেতসার বিশিষ্ট খাদ্য (starchy substances) তাপ উৎপাদক খাদ্য। ইহা দেহে তাপ এবং জীবনী শক্তি (vital force) জন্মায়।

(৩) মেদময় খাদ্য। ইহাও তাপ উৎপাদক কিন্তু শ্বেতসার খাদ্য অপেক্ষা ইহা অধিক পরিমাণে তাপ এবং জীবন শক্তি উৎপন্ন করে।

(৪) খনিজ পদার্থ বিশিষ্ট খাদ্য।

(mineral substances), জল এবং লবণ—দেহ গঠন এবং কার্য্য করিবার ক্ষমতা সঞ্চার করে।

সবল, কার্য্যক্ষম, সুস্থ জীবন ধারণের জন্য আমাদের এই চারি প্রকার খাদ্যের আবশ্যক। শিশুর খাদ্যও এই চারি প্রকার গুণ বিশিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। মাতৃদুগ্ধে শিশুর দেহ গঠনোপযোগী এই চারিটি জিনিস উপযুক্ত পরিমাণে বিদ্যমান আছে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পশুর দুগ্ধে এই চারিটি জিনিস কম বেশী পরিমাণে আছে। এই কারণে সে সকল দুগ্ধ কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া শিশুকে দিতে হয়। যেমন গাভীর দুগ্ধে যবক্ষার বাষ্পাত্মক (nitrogen) পদার্থ বা ছানা মাতৃদুগ্ধ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আছে এবং শর্করার অংশ কম আছে। এই কারণে গাভীর দুগ্ধে জল কিংবা বার্লি মিশাইয়া এবং একটু চিনি দিয়া শিশুকে দিলে কতকটা মাতৃদুগ্ধের ন্যায় হয়।

আমাদের আহার্য্য দ্রব্য দুই প্রকারের।

(১) উদ্ভিজ্জ। চাল, ডাল, ময়দা, শাক, সব্জী তরি তরকারি প্রভৃতি (vegetable food) উদ্ভিজ খাদ্য। (ক) নানাপ্রকারের শস্য (cereals) গম, ওট, বার্লি, রাই, চাল, ভুট্টা (খ) নানাপ্রকারের ডাল (গ) টাট্‌কা সব্জি, আলু, কপি প্রভৃতি (ঘ) নানাপ্রকার ফল।

(২) প্রাণীজ খাদ্য। (ক) নানাপ্রকার পশু মাংস যেমন গরু, ভেড়া, পাঁটা ইত্যাদি (খ) poultry & game যেমন মুরগি, হাঁস, টার্কি, খরগোস ইত্যাদি (গ) নানাপ্রকার মাছ (ঘ) shell fish যেমন কাঁকড়া, oysters, shrimps। (ঙ) দুগ্ধ, পনির, মাখন এবং ক্রিম (চ) ডিম।

উপরে খাদ্যের যে চারিটি উপাদানের উল্লেখ করা হইয়াছে, আমাদের আহার্য্য দ্রব্যের প্রত্যেকটিতে ঐ উপাদানের দুই তিনটি করিয়া সন্নিবেশিত হইয়া আছে। কিন্তু কোনটিতে একটি উপাদান বেশী আছে, কোনটিতে কম, আবার কোনটিতে বা কোন উপাদান একেবারেই নাই, যেমন ডিম একটি সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর এবং পূর্ণখাদ্য হইলেও তাহাতে শ্বেতসার পদার্থ একেবারেই নাই. এই জন্য শুধু ডিম খাইয়া মানুষ জীবন ধারণ করিতে পারে না। ইহার সহিত অন্য খাদ্যের ও প্রয়োজন হয়। এই কারণে দুই তিন প্রকারের খাদ্য মিলাইয়া যাহাতে আমাদের খাদ্যের মধ্যে উপরোক্ত চারিটি পদার্থ উপযুক্ত ভাবে থাকে সেইরূপ খাদ্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই আমরা জীবন ধারণ করিতে পারি।

সাধারণতঃ আমরা প্রত্যহ যাহা আহার করি তাহাতে উপরোক্ত চারিটি পদার্থই সন্নিবিষ্ট হইয়া আছে। আমরা অজ্ঞাত সারেই খাদ্যের গুণাগুণ না জানিয়াই শরীর ধারণোপযোগী আহার্য্য গ্রহণ করি। তবে এসম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে আমাদের খাদ্য দ্রব্যের অনেক উন্নতি সাধন করিতে পারি এবং অনর্থক কতকগুলি মসলাযুক্ত গরম ও দুষ্পাচ্য খাদ্য না খাইয়া পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে পারি।

শিশুদিগের জন্যও তাহাদের দেহ গঠনোপযোগী উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে পারি। তাহাদের দেহ ও মস্তিষ্ক বৃদ্ধির সময় তদুপযুক্ত খাদ্য বেশ ভাবিয়া চিন্তিয়া জানিয়া শুনিয়া জ্ঞানের সহিত প্রদান করিতে পারি। শিশুর খাদ্য সম্বন্ধে মাতার পরিষ্কার জ্ঞান থাকিলে তাঁহার শিশু সুস্থ, সবল

কর্ম্মঠ জীবন ধারণ করিয়া এবং মেধাবী হইয়া তাঁহাকে এবং মানব সমাজ ও দেশকে সুখী করিবে। এ বিষয়ে মাতার দায়িত্ব কত বেশী তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সুতরাং মাতৃজাতিকে জ্ঞানালোকের মধ্যে বর্দ্ধিত করিতে প্রত্যেক দেশ হিতৈষী দায়ী। শিশুর শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভের ভার প্রত্যেক মাতার হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। মাতাকে পরিপূর্ণ জ্ঞানের সহিত এই গুরুভার সম্পাদন করিতে হইবে। অজ্ঞানতার সহিত, গতানুগতিকের ন্যায় শিশু পালন করিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। এখন আমরা বীর, ধর্ম্মপ্রাণ, বুদ্ধিমান মহৎ-হৃদয়শালী সন্তান আকাঙ্খা করিতেছি। সমগ্র সভ্য জগতের সহিত সংগ্রামে তাঁহাদিগকেই স্বদেশ রক্ষা করিতে হইবে। মূর্খ মাতার সন্তান দ্বারা এই মহৎ কার্য্য কখনো সাধিত হইবে না।

দুগ্ধ।

দুগ্ধই অধিকাংশ প্রাণীর শৈশবের একমাত্র আহার। দুগ্ধ পান করিয়াই অধিকাংশ প্রাণীর জীবন রক্ষা হয়। একটি সুস্থ শিশু কেবল দুগ্ধ-পান করিয়াই যদি বর্দ্ধিত হয় তবে তাহার এক বৎসর বয়সের সময়ের ওজন তাহার জন্মকালীন ওজনের তিন গুণ বেশী হইবে। দুগ্ধে শিশুর দেহ গঠনের সমুদয় উপাদান বিদ্যমান আছে। ইহাতে দেহের বৃদ্ধি এবং ক্ষয় নিবারণ হয়। দেহে তাপ উৎপন্ন হয় এবং জীবনী শক্তি (Vital force) জন্মে। ইহাকে একটি পূর্ণ খাদ্য (Complete Food) বলা যায়, কারণ খাদ্যের সমস্ত গুণই ইহাতে বিদ্যমান আছে। দুগ্ধে (১) যবক্ষার বাষ্পাত্মক (nitrogenous) পদার্থ ছানা বা casein আছে। (২) মেদময় পদার্থ (Fat) ক্রিম আছে (৩) শর্করা এবং (৪) লবণ ও জল আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আমাদের খাদ্যে যে চারিটি উপাদান থাকিলে তাহা দ্বারা জীবন রক্ষা হয় তাহার সকলি দুগ্ধের মধ্যে আছে।

ছানা (casein)। দুগ্ধে যে যবক্ষার বাষ্পাত্মক পদার্থ (nitrogenous matter) আছে তাহাকে দুগ্ধের casein বা প্রোটিড বা ছানা বলে। ইহা মাংসের ন্যায় গুণ বিশিষ্ট (flesh like substance) পদার্থ। দুগ্ধের ছানাই দুগ্ধের যবক্ষার বাষ্পাত্মক পদার্থ। পাকস্থলীতে পাচক রস প্রথমে দুগ্ধকে ছানায় পরিণত করে তারপর ঐ ছানাকে জীর্ণ করে।

জীর্ণ করা ছানা শিশুর দেহের বৃদ্ধি সাধন করে এবং ক্ষয় নিবারণ করে।

ক্রিম। দুগ্ধের ক্রিমই দুগ্ধের মেদময় পদার্থ বা Fat। মেদের গোলকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলি দুগ্ধে ভাসিয়া বেড়ায় বলিয়া দুগ্ধের রঙ সাদা। অনুবীক্ষণের নীচে এক ফোঁটা দুধ রাখিলে এই গোলক দেখা যায়। তাহাদের ওজন দুগ্ধ অপেক্ষা হালকা, এই কারণে তাহারা উপরে ভাসিয়া উঠে। ইহাই দুগ্ধের ক্রিম। ঘোল করিবার যন্ত্রে দুধ মন্থন করিলে সমস্ত ক্রিম একত্র হইয়া মাখন হয়।

দুগ্ধের শর্করা। দুগ্ধকে ছানা করিয়া ছানা তুলিয়া লইলে যে জলটা পড়িয়া থাকে তাহাতে এই চিনির অস্তিত্ব বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। Cane sugarর মত এই চিনি অত মিষ্ট নয়। এই চিনি শ্বেতসার পদার্থ বিশিষ্ট খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলেও ইহার প্রকৃতি তাহা অপেক্ষা ভিন্ন। এই চিনি জীর্ণ করা ...

সার পদার্থ সুতরাং ইহা আর পরিপাক করিবার প্রয়োজন হয় না। মাতৃদুগ্ধের চিনি শ্বেতসার পদার্থের অন্তর্গত হইলেও এই কারণে শিশুকে ইহা আর পরিপাক করিতে হয় না। ইহা পূর্ব্ব হইতেই পরিপাক করা থাকে। শিশুর তখন শ্বেতসার পদার্থ পরিপাক করিবার শক্তি জন্মে না বলিয়া ভগবান মাতৃদুগ্ধে শ্বেত সার পদার্থকে পূর্ব্ব হইতেই পরিপাক করিয়া চিনিরূপে রাখিয়াছেন। অথচ দুগ্ধে চিনি না থাকিলে শিশুর দেহে তাপ উৎপন্ন হইত না। দুগ্ধের ক্রিম এবং চিনি অঙ্গার বাষ্পাত্মক পদার্থ (carbonaceous)। ইহারা দেহে তাপ এবং শক্তি উৎপন্ন করে।

লবণ। দুগ্ধে যে লবণ আছে তাহা শিশুর দেহের দৈহিক সূত্রগুলি (tissues) গঠন করে। হাড় এবং দাঁতের জন্য যে phosphate of limeর প্রয়োজন দুগ্ধে তাহা লবণ রূপে আছে।

জল। দুগ্ধে যে জল আছে তাহা শিশুর দেহের পক্ষে যথেষ্ট। বয়স্কদের যতটা জলের প্রয়োজন, দুগ্ধের অন্যান্য উপাদান অপেক্ষা দুগ্ধে জল তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে আছে। বয়স্ক লোকদিগের আকারের তুলনায় তাহাদের যতটা জলের আবশ্যক শিশুর তদপেক্ষা অধিক জলের প্রয়োজন।

মাতৃ দুগ্ধই শিশুর একমাত্র স্বাভাবিক আহার। তাহা না পাওয়া গেলে অন্য প্রাণীর দুগ্ধ শিশুকে দিতে হয়। সেই দুধ যতটা মাতৃ দুগ্ধের সমগুণ করা যায় ততই শিশুর দেহরক্ষার পক্ষে উপযোগী হয়। দুগ্ধের মধ্যে যে সকল উপাদান আছে তন্মধ্যে দুগ্ধের ছানাই পরিপাক করা কষ্ট। অন্যান্য উপাদান অতি সহজে পরিপাক হয়। এই কারণে অন্য প্রাণীর দুগ্ধের ছানার পরিমাণ যাহাতে মাতৃদুগ্ধের ছানার সমান হয় সেইরূপ করিতে হইবে। যেমন গাভীর দুগ্ধে মাতৃ দুগ্ধ অপেক্ষা অধিক ছানা আছে বলিয়া গাভীর দুগ্ধে জল কিংবা বার্লি এবং একটু চিনি মিশাইলে তাহা কতকটা মাতৃদুগ্ধের তুল্য হয়। শিশুর জন্মের প্রথম কয়েকমাস যতটা দুধ তাহার তিন গুণ জল কিংবা বার্লির জল মিশাইয়া খাওয়াইতে হয়। প্রথম মাসে এইরূপ জল ও চিনি মিশান দুগ্ধ সমস্ত দিনে দশ ছটাক যেন শিশুকে পান করান হয়। ক্রমে ক্রমে জলের পরিমাণ কমাইয়া এবং দুধের পরিমাণ বাড়াইয়া ছয় মাস বয়সের সময় প্রতিদিন ৩০ ছটাক দুধ শিশুকে দিবে। এ সময় দুধ ও জল সমান ভাগে মিশাইতে হইবে ছয়মাস বয়স হইতে শিশুর শ্বেতসার পদার্থ পরিপাক করিবার ক্ষমতা জন্মে। সুতরাং এই সময় হইতে সামান্য পরিমাণে কোন শ্বেতসার পদার্থ দুধের সহিত অথবা পৃথকভাব দেওয়া যাইতে পারে। এই সময় হইতে শ্বেতসার পরিপাক করিবার শক্তি জন্মিলেও তাহা অত্যন্ত দুর্ব্বল থাকে। দুই বৎসরের পূর্ব্বে এ শক্তি ভাল করিয়া জন্মে না। শিশুকে এক বৎসর পর্য্যন্ত জল মিশান দুধ দেওয়া আবশ্যক। তাহার পর জলের পরিমাণ ক্রমে কমাইয়া আনিয়া দুই বৎসর বয়সের সময় খাঁটি দুধ দেওয়া যাইতে পারে।

শিশুকে যে খাদ্যই দেওয়া যাক না কেন, তাহার দেহ গঠন ও রক্ষার জন্য টাটকা বিশুদ্ধ দুগ্ধ ব্যতীত উপযোগী খাদ্য আর নাই। শিশুর স্বাস্থ্য কেবল উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য নিয়মিত রূপে খাওয়ানের উপর নির্ভর করে। পুষ্টিকর খাদ্য এ অনিয়মিত ভাবে খাওয়াইলে শিশুর

স্বাস্থ্যহানি হয়। শিশুর দেহ অতি দ্রুতভাবে বৰ্দ্ধিত হয় এবং ক্ষয়ও বেশী হয়। সুতরাং তাহার দেহরক্ষার জন্য অধিক পরিমাণে যব ক্ষারবাস্পাত্মক খাদ্য (nitrogenous food) প্রয়োজন।

শিশুর দুইবার আহারের সময়ের মাঝ খানে কোন খাদ্য দিবেনা। রাত্রে শুইবার পূর্ব্বের আহার যেন লঘু হয়। শিশুকে কোন উত্তেজক দ্রব্য কখনো খাইতে দিবেনা, ইহাতে তাহার ঘোরতর অনিষ্ট সাধিত হয়। শিশুকে বয়স্কদের অপেক্ষা অধিক মিষ্ট দ্রব্য খাইতে দিবে।

মাতৃ দুগ্ধের অভাব হইলে সাধারণত গাভীর দুগ্ধই শিশুকে দেওয়া হয়। সহরের বাহিরের গাভী সকল উন্মুক্ত প্রান্তরে চরিয়া বেড়ায় এবং সতেজ শ্যামল তৃণ খাইয়া থাকে। এই কারণে পল্লীগ্রামের গাভীর দুগ্ধ খাইতে সুমিষ্ট সুস্বাদ এবং অধিক পুষ্টিকর। পল্লীগ্রামের গাভীর দুগ্ধের গুণ ক্ষারজ alkaline. মাতৃদুগ্ধ ও ক্ষারজ। কিন্তু সহরের গাভী সকল গোয়ালে বহু গাভীর সহিত একত্রে বাঁধা থাকে এবং চরিয়া ফিরিয়া বেড়াইয়া ঘাস খাইতে পায় না বলিয়া তাহাদের দুগ্ধে অম্ল আছে। এই কারণে সহরের গাভীর দুগ্ধ শিশুর পক্ষে তেমন উপযোগী হয় না। দুধে অম্ল আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিতে হইলে একটুকরা নীল রঙের litmus paper দুধে ডুবাইয়া দেখিতে হয়। যদি দুধ অম্ল সংযুক্ত হয় তবে তাহা তৎক্ষণাৎ লাল রঙে পরিবর্ত্তিত হইবে। একটু চুণের জল কিংবা একটু Bi-carbonate of soda ঐ দুধে মিশাইলে তাহার অম্ল দূর হইবে। এই চুণের জল মিশান দুধে ঐ লাল রঙের litmus paper ডুবাইলে দেখা যাইবে যে ইহার রঙ তখনি পুনরায় নীল হইয়াছে। দুধ বেশ ভাল করিয়া ফুটাইয়া লইলে সকল রোগের বীজাণু নষ্ট হইয়া যায়। টাইফয়েড, কলেরা প্রভৃতি রোগের বীজাণু যদি দুধে প্রবেশ করিয়া থাকে তবে তাহা ফুটাইয়া লইলেই নষ্ট হইয়া যাইবে। দুধ ফুটাইয়া অল্প ঠাণ্ডা করিয়া বেশ পরিষ্কার একটী কাচের, পোর্সিলেন কিংবা চিনা মাটীর পাত্রে কাচের রিকাবি দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। শিশুর দুগ্ধ কখনো কোন ধাতুর পাত্রে অধিকক্ষণ রাখিবেনা তাহা হইলে দুধের গুণ নষ্ট হয়।

শিশুর আহার।

মাতৃদুগ্ধের অভাব হইলে, মাতার কোন পীড়া হইলে কিংবা শিশু মাতৃ দুগ্ধ ছাড়িলে অন্য প্রাণীর দুগ্ধ শিশুকে দিতে হয়। সাধারণত গাভীর দুগ্ধই এ সব ক্ষেত্রে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং তাহাই শিশুকে খাওয়ান হয়।

(১) মাতার দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধি কিংবা অন্য কোন সাময়িক কারণ এবং দুগ্ধের অল্পতাবশতঃ অথবা দুগ্ধ একেবারেই না থাকিলে শিশুকে জন্মের প্রথমদিন হইতেই অন্য প্রাণীর দুগ্ধে পালন করিতে হয়।

(২) মাতার শারীরিক দৌর্ব্বল্য কিংবা অন্য কোন কারণবশতঃ কোন কোন শিশুকে অকালেই মাতৃদুগ্ধ ছাড়াইতে হয়।

(৩) অধিকাংশ শিশু ঠিক সময়েই অর্থাৎ দশমাস বয়সে মাতার দুধ ছাড়ে। এই তিন শ্রেণীর শিশুর জন্যই গাভীর দুগ্ধের প্রয়োজন হয়।

বর্ত্তমান সময়ে বাজারে বিলাতি [illegible] দুগ্ধ নানাপ্রকারের পাওয়া [illegible]

দুগ্ধের মধ্যে Mellin's food, Glako এবং Allenbury's milk food শিশুর পক্ষে উপযোগী। এই সকল খাদ্যে শিশুর পক্ষে অনিষ্টকারী শ্বেতসার পদার্থ (starch) নাই। Horlick's malted milk শিশুর ৮।১০ মাস বয়স হইলে দেওয়া যাইতে পারে। এই সকল প্রকার কৃত্রিম দুধই ২।১ বারের বেশী সুস্থ শিশুকে খাওয়ান যুক্তিসঙ্গত নয়। তবে রুগ্ন মাতার রুগ্ন শিশুকে এই সব কৃত্রিম দুধেই বর্দ্ধিত করিতে হয়। allenburys milk food তিন প্রকারের আছে। প্রথম দুইপ্রকার দুধ শিশুর ছয় মাস বয়স পর্য্যন্ত দিবার নিয়ম তারপর ৩নং দুধ দিতে হয়। তিন নম্বরের দুধে শ্বেতসার পদার্থ আছে বলিয়া ইহা ছয় মাসের পূর্ব্বে শিশুকে খাওয়াইলে অনিষ্ট হয়।

প্রথম হইতেই শিশুকে চামচে বা ঝিনুকে করিয়া দুধ দেওয়া সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট নিয়ম। এইরূপে দুধ খাওয়াইলে শিশুর কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না। দুধ খাওয়া হইলে বাটি ও চামচ মাজিয়া ফেলিলেই হইল। কিন্তু অনেক সময় বোতলে করিয়া দুধ দিতে হয়। পূর্ব্বে লম্বা নল সংযুক্ত বোতলে দুধ খাওয়ান হইত। ঐ নলের ভিতর ভাল করিয়া পরিষ্কার করা যাইত না বলিয়া ঐরূপ বোতলে দুধ খাওয়ান ভয়ানক অনিষ্টকর ছিল এবং তাহাতে কত শিশুর মৃত্যু ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান কালে mellins bottle allenbury feeding bottle এবং glascobottle বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত। এই সব বোতলের দুই মুখই খোলা। বড় মুখে দুধ খাইবার জন্য একটি ছোট 'টিট' আছে এবং ছোট মুখে একটি 'ভালভ' আছে। দুধ খাইবার সময় বাতাস চলাচলের জন্য পশ্চাদ্দিকের ভালভএ একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। যে বোতলের কেবল একদিক খোলা, অন্য দিক বন্ধ সেরূপ বোতলে শিশুকে দুধ খাওয়াইলে শিশুর পেটে বায়ু জন্মিতে পারে অথবা পেট ব্যথা হইবার সম্ভাবনা।

এই বোতলও তাহার 'টিট' ও 'ভালভ' সর্ব্বদা খুব পরিষ্কার করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। নতুবা শিশুর গুরুতর পীড়া যেমন পেটের অসুখ, কলেরা, টাইফয়েড, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ প্রভৃতি হইবার সম্ভাবনা। বাজার হইতে বোতল টিট ভাল্ভ কিনিয়া একটি পরিষ্কার পাত্র শীতল জলে পূর্ণ করিয়া একটু bi-carbonate of soda দিয়া পূর্ণ করিয়া তাহাতে ঐ বোতল, টিট, ভালভ রাখিয়া দিবে; তারপর ঐ পাত্র আগুনে চড়াইয়া দিবে। ফুটীয়া উঠিলে নামাইয়া রাখিবে। পাত্রের জল ঠাণ্ডা হইয়া গেলে তবে জল হইতে বোতল, টিট এবং ভালভ উঠাইয়া রাখিবে। বাজার হইতে বোতল কিনিবার পর তাহা এইরূপে সিদ্ধ না করিয়া কখনো শিশুকে তাহাতে দুধ খাইতে দিবে না, ইহাতে নানারূপ অসুখে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। শিশুর দুধ পান হইলে অবশিষ্ট দুধ থাকিলে তাহা ফেলিয়া দিবে কিংবা গৃহের আর কেহ তাহা ব্যবহার করিতে চাহিলে তাহাকে দিবে কিন্তু তাহা কখনো শিশুর দ্বিতীয়বার আহারের জন্য রাখিয়া দিবেনা। শিশুর দুধ খাওয়ান শেষ হইলে গরম জলে সোডা দিয়া তদ্বারা টিট ভালভ এবং বোতল পরিষ্কার করিবে। বোতল ধুইবার ব্রাস দিয়া বোতলের ভিতর খুব ভাল করিয়া ধুইবে। যেন কোন কোণে দুধের কণা কি কোন ময়লা না থাকে। টিট

ও ভালভ ধুইবার ছোট ব্রাস দিয়া উহাদের ভিতর বাহির বেশ করিয়া ঘসিয়া ধুইবে। তারপর বোতলটি এক পরিস্কার পাত্রে ঠাণ্ডা জল পূর্ণ করিয়া তাহাতে রাখিয়া দিবে এবং টিট ও ভালভ একটি কাচের বাটিতে ঢাকা দিয়া রাখিয়া দিবে। প্রতিবার দুধ পানের পরই এইরূপে বোতল টিট ভালভ সোডা মিশ্রিত গরম জলে পরিষ্কার করিয়া ধুইবে তারপর ঠাণ্ডা জলে ধুইবে। মনে রাখা উচিত যে পরিচ্ছন্নতাই শিশুর জীবন। শিশুর আহার, পরিচ্ছদ শয্যা, আহারের পাত্র প্রভৃতি পরিস্কার রাখিলে শিশুকে অনেক রোগের হাতে হইতে রক্ষা করা যায়। অপরিচ্ছন্নতাই শিশুর পেটের অসুখের কারণ। পরিচ্ছন্ন হইলে শিশুকে এই অসুখ হইতে বাচান যায়। যে সব স্থানে কলের জল নাই সেসব স্থানের জল ফুটাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া শিশুকে দেওয়া উচিত।

প্রথম ছয় মাস শিশুকে দুই ঘণ্টা পর পর খাইতে দিবে। প্রাতে ৫টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত এইরূপে দুই ঘণ্টা পর পর খাইতে দিবে। কিন্তু রাত্রি ১০টা হইতে ভোর ৫টা পর্য্যন্ত শিশুর পাকস্থলীকে বিশ্রাম দেওয়া কর্ত্তব্য, এই সময়ের মধ্যে শিশুকে কিছুই খাইতে দিবেনা। প্রথমতঃ শিশুকে এইরূপে অভ্যাস করান সম্ভবতঃ কষ্টকর হইতে পারে কিন্তু ক্রমে শিশু এই স্বাস্থ্যকর অভ্যাসে অভ্যস্থ হইবে। শিশুকে যত সদভ্যাসে অভ্যস্থ করান যায় ততই শিশুর এবং শিশুর মাতার পক্ষে মঙ্গল। প্রথম প্রথম শিশু রাত্রে কাঁদিলে তাহাকে ২।১ চামচ জল দিয়া একটু চাপড়াইয়া ঘুম পাড়াইলেই শিশু ঘুমাইয়া পড়িবে। অনেকে মনে করেন যে সব শিশু মাতৃদুগ্ধ পান করে, তাহাদিগের আহারের কোন নিয়ম রাখিবার প্রয়োজন নাই। যখন তখন খাওয়াইলেই চলিবে। বস্তুতঃ এরূপ সর্ব্বদাই দেখা যায় যে শিশু কাঁদিলেই অমনি মাতা তাহাকে দুগ্ধ পান করাইতে আরম্ভ করেন। এরূপ করা শিশুর পক্ষে অনিষ্টকর। ইহাতে শিশুর অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, পেটের অসুখ হইতে পারে। ক্রমাগত খাইতে থাকিলে পাকস্থলী আহার পরিপাক করিবার জন্য মোটেই সময় পায় না। ইহাতে শিশুর পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মে।

বঙ্গে শিশু মৃত্যু।

—:০:—

বাঙ্গালা দেশে বালিকা অপেক্ষা বালকের জন্ম হয় বেশী। ১৯১৮ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালা দেশে মোট শিশু জন্মিয়াছিল ১৪,৮৯,১৩৫। ইহার মধ্যে বালকের সংখ্যা ৭৭,১৩,১৩ এবং বালিকার সংখ্যা ৭১৭,৮২২। জন্মের মত বালকও কিন্তু মরিয়া থাকে বেশী। ১৯১৮ খৃঃ অব্দে যত বালক জন্মিয়াছিল, তাহার মধ্যে ১,৮১,৫৪৭ এবং যত বালিকা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাহার মধ্যে ১,৫৮,১০২টি এক বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতেই মৃত্যুমুখে পতিত

হইয়াছে। ১৯১৮ খৃঃ অব্দে বালক ও বালিকা উভয়ে মিলাইয়া এক বৎসরের কম বয়স্ক মোট শিশুর মৃত্যু সংখ্যা ৩৩৯,৬৪৯। লোক সংখ্যা গণনায় ঐ হিসাবে ১৯১৮ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালা দেশে যত শিশু জন্মিয়াছিল তাহার চারিজনের একজন করিয়া ১ বৎসরের কম বয়সেই মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন্ জেলায় কত শিশু মারা গিয়াছে, আমরা নিম্নে তাহার তালিকা প্রদর্শন করিতেছি :—

জেলা	বালক	বালিকা
বর্দ্ধমান	৭২৮৮	৬৩৯২
বীরভূম	৫২৫১	৪৪৯৩
বাঁকুড়া	৫২২৯	৪৭৮০
মেদিনীপুর	৯৪২৪	৮৯৪০
হুগলী	৪০৭৯	৩৪৪৭
হাওড়া	৩১৮৬	২৬৮৭
২৪পরগণা	৬৬১৩	৫৬০৩
কলিকাতা	২৮১১	২২৮৪
নদীয়া	৭৩৮৪	৭৩৪৭
মুর্শিদাবাদ	৭৩৫৪	৬৮৬২
যশোহর	৪৫২৪	৪১১২
খুলনা	৬৪৯৪	৫৬৪৪
রাজসাহী	৬৪৬৫	৫৮১২
দিনাজপুর	৮৩১২	৬৮৮৭
জলপাইগুড়ি	৪২১৯	৩৭১৯
দারজিলিং	১১৪৩	৯২৭
রঙ্গপুর	১১১৯২	৯৪৫৮
বগুড়া	৩৫৯৮	২৯৯২
পাবনা	৪৬১৫	৪০৩৭
মালদহ	৩৬৬৯	৩৪৮৩
ঢাকা	১২২৭৮	১০৩০৬
ময়মনসিংহ	১৭০৩৩	১৪৭২৯
ফরিদপুর	[illegible]	[illegible]
[illegible]		
বাকরগঞ্জ	১১৭০২	৯৫৪৬
চট্টগ্রাম	৫৪৯৯	৪৭৮৮
নোয়াখালি	৫১৩০	৪৭৪৩
ত্রিপুরা	৮৫৮০	৬৯৯৯
	১৮১,৫৪৭	১,৫৮,১০২

এই মৃত্যু তালিকায় বুঝা যায়, পশ্চিম বাঙ্গালাতেই এই মৃত্যু সংখ্যা অধিক হইয়াছে। বর্দ্ধমানে শতকরা ৩০,৭ বীরভূম ৩০·১, নদীয়ায় ২৯·৬ মুর্শিদাবাদে ২৮·৩ এবং কলিকাতায় ২৮·১টি করিয়া শিশুর মৃত্যু হইয়াছে।

এখন এই শিশু মৃত্যু যে দেশে ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছে ইহার কারণ কি? যে সকল নিয়মে শিশুর জীবন রক্ষা করা উচিত এখনকার প্রসূতিগণ সে সকল বিষয়ে অনভিজ্ঞতা থাকাই ইহার প্রধান কারণ। শিশুরক্ষা করিবার জন্য প্রত্যেক প্রসূতিরই শিশুপালন করিবার প্রণালী সকল অবগত থাকা কর্ত্তব্য। অতীতযুগে আমাদের দেশের মহিলারা সকলেই বিদুষী হইতেন না,—বিদুষী হওয়া তো দূরের কথা, লেখাপড়া শিক্ষাটাও সেকালে মহিলা সমাজে বড় একটা প্রচলিত ছিলনা, কিন্তু সেকালের বয়স্থা মহিলা-গণ যে এক একজন পাকা গৃহিণী হইতেন এবং তাহারই ফলে শিশুপালনে তাঁহার বিশেষ জ্ঞানসম্পন্না ছিলেন, সে কথা তো সর্ব্ববাদী সম্মত। এখন শিশুর একটু সামান্য বাল্‌সা হইলেই চিকিৎসকের শরণ গ্রহণ করা হয়, কিন্তু তথনকার গৃহিণীগণ শিশুর সাধারণতঃ অসুখে চিকিৎসকের শরণ গ্রহণের আবশ্যকতা মনেই করিতেন না। আলুইয়ের বড়ী ছিল, তুলসীর রস ছিল, ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম ছিল, বিশুদ্ধ টাটকা মধু ছিল, সোহাগার খই ছিল

মুক্তবর্ষীর পাতা ছিল,—এই সকল দিয়াই সেকালের গৃহিণীরা আপন আপন পরিবারের শিশু চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু তথন তো দেশে শিশু মৃত্যু এত অধিক ছিল না।

এখন ব্যয়বাহুল্যে দেশের অবস্থা শোচনীয় হইলেও দেশে অর্থ সুলভ হইয়াছে, লোকের অর্থ খরচ করিবার প্রবৃত্তিও বাড়িয়াছে সেই সঙ্গে সে কালের শিক্ষা দীক্ষা দেশ হইতে লুপ্ত হইয়াছে, শিক্ষার অভাবে সেকালের ঠানদিদির মত গৃহিণী বাঙ্গালী সমাজে আর নাই, কাজেই শিশুর সামান্য বাল্সাতেও এখন চিকিৎসকের শরণ গ্রহণ না করিলে উপায় নাই। ফলে অনেক উন্নত অবস্থার পরিবারের মধ্যে চিকিৎসা-বিভ্রাটেও অনেক শিশু অকালে পঞ্চত্ব পাইয়া থাকে।

তাহার পর যে সকল নিয়মে আমাদের দেহ রক্ষার ব্যবস্থা করিলে আমরা স্বাস্থ্যবান হইতে পারি, দীর্ঘজীবি হইতে পারি—বাঙ্গালী স্ত্রী-পুরুষ কাহারও সে চেষ্টা নাই। আমরা এখন বুঝিয়াছি বিলাসিতা। অনেক দরিদ্র বাঙ্গালী প্রাণপাত পরিশ্রমে যে অর্থ উপার্জ্জন করে তাহাতে কুলাইতে পারেনা, কাজেই স্বাস্থ্যরক্ষার উপযুক্ত আহার্য্য লাভও অনেকের ভাগ্যে জুটে না। ফলে নানাকারণে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের এখন যথেষ্ট অপচয় ঘটিতেছে। কাজেই দুর্ব্বল পিতৃমাতৃ শুক্রশোণিত হইতে স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘজীবী সন্তানলাভের কামনা কেমন করিয়া করা যাইতে পারে? শিশু মৃত্যুর আধিক্য এজন্যও আমাদের দেশে ভীষণভাব ধারণ করিয়াছে।

দেশে দুগ্ধ দুর্ম্মূল্য,—দুষ্প্রাপ্য বলিলেও চলিতে পারে। পূর্ব্ববঙ্গ অপেক্ষা পশ্চিম বঙ্গে দুগ্ধ আরও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। ফলে [illegible] অভাবে যেরূপ দুগ্ধ অধিকাংশস্থলে শিশুদিগকে এখনকার দিনে পান করান হয়, যকৃতের ক্রিয়ার বিকৃতি সংঘটন তাহারই পরিণতি। এই যকৃতের ক্রিয়ার বিকৃতির জন্যই অনেক স্থলে শিশু মৃত্যু সংঘটিত হয়। আমরা 'হোমরুল' 'হোমরুল' করিয়া ব্যস্ত, কিন্তু দেশে গাভী পালনের ব্যবস্থা করিয়া খাঁটি দুগ্ধ সুলভে প্রাপ্তির কি উপায় করিতেছি? যে পর্য্যন্ত আমরা সে উপায় না করিব, সে পর্য্যন্ত দেশে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস পাইবেনা—ইহা সুনিশ্চিত।

পূর্ব্ব বাঙ্গালা অপেক্ষা পশ্চিম বাঙ্গালায় শিশু মৃত্যুর সংখ্যা যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহার আর একটি কারণ, পূর্ব্ব বাঙ্গালা অপেক্ষা পশ্চিম বাঙ্গালায় বিলাসিতার প্রসার বৃদ্ধি। পশ্চিম বাঙ্গালার মহিলা সমাজেও এই বিলাসিতাটা অধিক মাত্রায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। পশ্চিম বাঙ্গালার পুরুষগণ সভ্যতার খাতিরে 'বাবু' সাজিয়াছেন, পশ্চিম বাঙ্গালার মহিলাগণও সর্ব্বপ্রকারে 'বিবিয়ানা'র পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া মূর্ত্তিমতী বিলাসিনী হইয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গের অনেক সংসারেই এখন পাচকে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে, দাসদাসীতে গৃহস্থালীর কর্ম্ম সকল নির্ব্বাহ করে, আর মালক্ষীগণ আরামকেদারায় অবস্থিতি পূর্ব্বক নাটক নবেল পাঠেই সম্যক প্রকারে মনোযোগ দিয়া থাকেন। ফলে পরিশ্রমের প্রথাটা পশ্চিম বাঙ্গালার মহিলা সমাজ হইতে অনেক স্থলে উঠিয়া গিয়াছে। পশ্চিম বাঙ্গালার মহিলাদিগের অজীর্ণ, অম্লপিত্ত ফুসফুস ও হৃদযন্ত্রের পীড়ার উৎপত্তির ইহাই কারণ। ফলে পশ্চিম বাঙ্গালার মহিলাগণ সর্ব্ব প্রকারে [illegible] পূর্ব্ব বাঙ্গালার মহিলারা [illegible]

বাঙ্গালার পুরুষেরাও পশ্চিম বাঙ্গালার পুরুষদিগের অপেক্ষা কর্ম্মঠ, কাজেই স্বাস্থ্যবান। পশ্চিম বাঙ্গালার পিতৃমাতৃ শুক্রশোণিতের ফল সম্ভূত শিশুগণের মৃত্যু এই জন্যই অধিক হইয়া থাকে।

ইহার উপর কন্যার বিবাহে যৌতুক প্রদানে উৎপীড়ণের ব্যবস্থা পশ্চিম বাঙ্গালার সকল জাতির মধ্যেই যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, পূর্ব্ব বাঙ্গালায় এখনও সেরূপ বৃদ্ধি পায় নাই। সেই পণ পীড়ণের ফলে পশ্চিম বাঙ্গালার অধিবাসী দিগকে অনেক সময় সকল দিক চিন্তা করিবার অবসর না রাখিয়াই কন্যা সম্প্রদান করিতে হয়। পাত্র ও পাত্রীর বয়সের পার্থক্য যতটা রাখিয়া বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য, অনেক সময় পশ্চিম বাঙ্গালার কন্যার পিতা অবস্থার ব্যবস্থায় তাহা রক্ষা করিতে পারেন না, পাত্রের পিতার পক্ষেও পণ পাইলেই হইল, তিনিও অতটা বিচার করিতে চাহেন না; কাজেই পরিণয় ব্যাপারে বাঙ্গালার পাত্র ও পাত্রীর মধ্যে অধিকাংশ স্থলে উপযুক্ত মিলন অসম্ভব হইয়াপড়ে। এই বয়ঃবিচার রক্ষা না করিয়া স্ত্রী পুরুষের মিলন করিয়া দেওয়ার জন্যও দেশে শিশু মৃত্যুর পরিমাণ আমরা বৃদ্ধি করিয়া তুলিয়াছি।

হিন্দু সমাজে বাল্য বিবাহ দিবার প্রথা বরাবরই আছে, এখন কন্যাপণের জন্য তাহা অনেকটা কমিয়া গিয়াছে বলিলেও চলে। যাহা হউক হিন্দু শাস্ত্রে বাল্যবিবাহ চির প্রচলিত হইলেও পূর্ব্বে যখন তখন স্ত্রী পুরুষের মিলন কাল নির্দ্দিষ্ট ছিল না। পুরলক্ষ্মীগণ স্বামীর মুখ তো দিবাভাগে দেখিতেই পাইতেন না, সকল নিশাও তাঁহাদের আরামের কাল হইত না। এক কথায় তিথি নক্ষত্র দেখিয়া, পর্ব্বদিন বাছিয়া সেকালে স্ত্রী পুরুষের মিলনের ব্যবস্থা ছিল, এখন সে ব্যবস্থাও যে উঠিয়া গিয়াছে, বাঙ্গালার শিশু মৃত্যুর আধিক্যের ইহাও একটা কারণ।

ফলে দেশের এই ভীষণ দুর্দ্দিনে বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ আশা ভরসার স্থল শিশু জীবন রক্ষার জন্য দেশের সকল মনীষীগণেরই চিন্তা করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। দেশে আবার পাকা গৃহিণী তৈয়ার করিবার আবশ্যক। শিশু জীবন রক্ষা করিবার জন্য দেশের পুরুষদিগেরও রুচি পরিবর্ত্তন যে একান্ত প্রয়োজন তাহাতেও সন্দেহ নাই।

কোঽরুক?

—:*:—

(ডাঃ শ্রীনলিনী নাথ মজুমদার)

কঃ—অরুক্? কে রোগ ভোগ করে না? অর্থাৎ কাহার শরীর নীরোগ?

প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে [illegible] মনোমুগ্ধকর এবং হিতোপদেশ মূলক একটি গল্প আছে। সে গল্পটি এইরূপ যথা—

[illegible] এক নির্জ্জন [illegible] ঋষি একদা

স্বীয় আশ্রম তরুতলে নিবিষ্ট চিত্তে ভগবৎ ধ্যানস্তিমিত লোচনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় একটি সুন্দর বন বিহঙ্গ উড়িয়া আসিয়া আশ্রমতরুর একটি ক্ষুদ্র শাখার উপরে ঠিক সেই ঋষির সম্মুখবর্ত্তী স্থানে বসিয়া মধুরস্বরে গাহিল—

কোহরুক ?

পাখী স্বীয় স্বাভাবিক গান গাহিল, সে গানের অর্থ কি তাহা পাখী বুঝিল না। কিন্তু ঋষির কর্ণ ঐ সুশব্দে চকিত হইল। ঋষি বুঝিলেন যে, স্বভাবের অঙ্কপালিত বন বিহঙ্গের এই "কোহরুক্" শব্দটির উত্তরে জাগতিক জীব সমূহের কি গুরুতর সম্বন্ধ নিহিত আছে। ঋষি বিহঙ্গের দিকে করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক চিন্তা করিলেন—মরি! মরি! কি সারগর্ভ সুন্দর প্রশ্ন! কোন মহাত্মা আজ জীবদুঃখে দুঃখী হইয়া জগতের মঙ্গল কামনায় বিহঙ্গরূপে আসিয়া আমাকে এই মহান্ প্রশ্ন করিতেছেন? তা' ইনি যিনিই হউন তাঁহার এই মহৎ পবিত্র প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। ঋষি মহানন্দিত চিত্তে প্রত্যুত্তর করিলেন,—

জীর্ণে হিতভুক্।

অর্থাৎ—যে ব্যক্তি পূর্ব্বাহার জীর্ণ হইলে শারীরিক ও মানসিক হিতকর আহার বিহারের সেবা করে—সেই নীরোগ দেহে দীর্ঘ জীবি হয়। বন বিহঙ্গ ঋষির সেকথা বুঝিল না বা তাহাতে দৃক্পাতও করিল না; সে আপন স্বাভাবিক সুরে আবার গাহিল

"কোহরুক্ ?"

সেই স্বর শ্রবণে ঋষিপ্রবর বিস্মিত হইয়া আবার চিন্তিত হইলেন এবং বুঝিলেন যে প্রশ্নের উত্তর সমাপ্ত হয় নাই। কেননা, হিতকর আহার্য্য পরিমিত মাত্রায় না হইলেই তো রোগজনক হইবে। সুতরাং হিতকর দ্রব্য আহারে মাত্রাশী হওয়া আবশ্যক। তাই মহর্ষি আবার উত্তর দিলেন—

জীর্ণে হিতভুক্ মিতভুক্।

অর্থাৎ জীর্ণে হিতকর বস্তু পরিমিত মাত্রায় গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই দেহ নীরোগ থাকিতে পারিবে।

স্বভাবে চালিত পক্ষী আবার স্বভাব বশে স্বাধীনমনে গাহিল।

"কোহরুক্ ?"

মুনি ঠাকুর এবারও চিন্তা করিয়া বুঝিলেন যে, প্রশ্নের উত্তর সম্যক দেওয়া হয়নাই। কেন না কেবল পরিমিত হিতাহারেই জীব রোগহীন থাকিতে পারে না। ভুক্তবস্তু পরিপাকের জন্য তাহার যথোপযুক্ত পরিশ্রম করা প্রয়োজন। তাই তিনি আবার পাখীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—

জীর্ণে হিতভুক্ মিতভুক শ্রমোপভুক।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি জীর্ণে হিতবস্তু পরিমিত মাত্রায় আহার করে এবং তাহার সহিত যথা সময়ে নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রমে রত থাকে, সে নিশ্চয়ই নীরোগ অবস্থায় দীর্ঘ জীবন লাভে সমর্থ হয়।

বনচারী পক্ষী আপন মনে স্বাধীন ভাবে নিজ স্বাভাবিক সঙ্গীতে রত হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে—সে তো আর তাঁহার বুলির অর্থ জানে না যে, ঋষির সদুত্তর লাভে নিরস্ত হইবে, সে আনন্দে আবার ডাকিল—

"কোহরুক ? কোহরুক ?"

ঋষি তখন বিজ্ঞান গবেষণায় মনোনিবেশ করতঃ বিবেচনা করিয়া বুঝিলেন যে, বাস্তবিকই প্রশ্নের উত্তর এখানো হয় নাই। কেননা স্বরশাস্ত্রে আছে ;—

ভুক্ত মাত্রেণ মন্দাগ্নৌ * * *।
শয়ণ সূর্য্য বাহেন কর্ত্তব্যস্ত সদা বুধৈঃ ॥
(স্বরোদয়)।

আহারের পরবর্ত্তী মন্দাগ্নির প্রতীকারার্থ দক্ষিণ নাসাপুটে শ্বাসবহন কর্ত্তব্য। এই রূপ শ্বাস বহাইবার কৌশল বামপার্শ্বে শয়ন। আবার আহার করার পর শয়ন করা নিষিদ্ধ, কারণ তাহাতেও পরিপাক শক্তির লাঘব হয়, এজন্য শতপদ ভ্রমণান্তে বামপার্শ্বে শয়নই সুচারু পরিপাকের শ্রেষ্ঠ উপায়। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া ঋষি বলিয়া উঠিলেন—

জীর্ণে হিতভুক্ মিতভুক্ শ্রমোপভুক্।
শত পদ গামী বাম শায়ীচ ॥

অর্থাৎ জীর্ণে হিতকর বস্তু পরিমিত ভোজী ও শ্রমশীল ব্যক্তি যদি আহারান্তে শত পদ ভ্রমণের পর বামপার্শ্বে শয়ন করিতে জানে, তবে সে নীরোগ থাকিবে।

বনের পাখী এ সকল কিছুই বুঝিল না সে আবার আপন স্বরে ডাকিল,—কোঽরুক্।

তখন ঋষিবর অনেক চিন্তার পর স্থির করিলেন যে, হাঁ বাস্তবিকই একটি কথা এখনও বলিতে বাকি আছে—তাই তিনি জলদ গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন।—

জীর্ণে হিতভুক্ মিতভুক্ শ্রমোপভুক্।
শত পদগামী বাম শায়ীচ ॥
অবিজীত মূত্র পুরীষী খগেন্দ্র।
সোঽরুক্ সোঽরুক্ সোঽরুক্ ॥

অর্থাৎ হে খগেন্দ্র! যে ব্যক্তি জীর্ণান্তে হিতকর বস্তু পরিমিত মাত্রায় আহার করতঃ পরিশ্রমশীল ভাবে জীবন কাটায় এবং আহারান্তে শতপদ ভ্রমণান্তর বামপার্শ্বে শয়ন করে, আর কদাচ মলমূত্রের বেগ ধারণ না করে, সে নিশ্চয় নিরোগী হয়, নিরোগী হয়, নীরোগী হয়।

তখন বিহঙ্গমটি স্বাভাবিক চাঞ্চল্য নিবন্ধন অন্যত্র উড়িয়া প্রস্থান করিল। তাহাতে ঋষিবরও প্রশ্নের উত্তর শেষ হইয়াছে জ্ঞান করিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। *

---

* উক্ত "কোঽরুক" বিষয়ে কেহ কেহ এরূপও ঐতিহাসিক বর্ণনা করেন যে, একদা দেব বৈদ্য ধন্বন্তরি পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছিলেন, তৎকালে এক অরণ্য মধ্যে উচ্চতরুতে বসিয়া একটী পক্ষীবর রব করিতেছিল, "কোঽরুক্ কোঽরুক্?" তাহা শুনিয়া ধন্বন্তরি মনে করিলেন যে, পক্ষী আমাকেই লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিতেছে যে, "কে অরোগী? কাহার রোগ হয় না?" তদুত্তরে ধন্বন্তরি কহিলেন,—

জীর্ণে হিতমিত ভোজী শতপদগামী বামশায়ী।
অবিজিত মূত্র পুরীষী খগেন্দ্র সোঽরুক্ সোঽরুক্ সোঽরুক্ ॥

অর্থ—ভুক্তাগ্র জীর্ণ হইলে যে ব্যক্তি শরীরের হিতকর বস্তু পরিমিত মাত্রায় আহার করে আর আহারান্তে শত পদ ধীর ভাবে ভ্রমণ করিয়া বামপার্শ্বে শয়ন করে এবং মলমূত্রের বেগ ধারণ না করে, হে খগেন্দ্র! সেই অরোগী, সেই অরোগী, সেই অরোগী জানিবে।

উক্ত বচনে "শ্রমোপভুক্" শব্দটি নাই। বাস্তবিক শ্রমোপভুক শব্দ না থাকিলেও উক্ত বচনের [illegible] সৌন্দর্য্য রক্ষিত হয় না। এই [illegible] আমরা পূর্ব্বোক্তভাবে উহাকে উল্লেখ করিয়াছি।

[illegible]

এখনকার দিনে আমরা যে স্বাস্থ্য হারাইয়াছি, তাহার কারণ আমরা "কোহরুক" শব্দের অর্থ জানিনা।

চরক সংহিতাতেও স্বাস্থ্য পালন সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

মাত্রাশীস্যাৎ * * আহার দ্রব্যাণি
প্রকৃতি লঘুন্যপি মাত্রাপেক্ষীণি ভবন্তি।

মাত্রানুসারে আহার করাই নিতান্ত প্রয়োজন। আহার্য্য দ্রব্য একান্ত হিতকর অথবা স্বাভাবিক লঘু হইলেও তাহা নিশ্চয়ই মাত্রাকে অপেক্ষা করে। সহস্র হিতকর আহার্য্য বস্তুও পরিমিত মাত্রায় সেবিত না হইলে নীরোগ ভাব রক্ষা করিতে সক্ষম হয় না। সুতরাং হিতকর আহার্য্যের পরিমিত মাত্রার বিশেষ প্রয়োজন।

চরকের স্থানান্তরে শ্রমশীলতা বা ব্যায়াম সম্বন্ধেও বহু উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ব্যায়ামে যে শরীরের লঘুতা, কার্য্যে উৎসাহ, দেহের দৃঢ়তা, পাচকাগ্নির উদ্দীপনা, কোষ্ঠের অনুলোমতা প্রভৃতি অশেষ মঙ্গল সাধিত হয়, তাহা চরক সংহিতায় স্পষ্টাক্ষরেই উক্ত হইয়াছে।

অধুনা নব বিলাসিতার স্রোত দেশে আসিয়া মানবগণকে নিতান্তই শ্রম বিমুখ করিয়া তুলিয়াছে। এখন দুই এক মাইল পথও বিনাযানে পর্য্যটন সাধ্যায়ত্ত নাই। কি স্ত্রীলোক কি পুরুষ সকলেই সমভাবে শ্রমবিহীনতা-শিক্ষায় পরিপক্ক হইয়াছেন। নব্য সভ্য সমাজে পরিশ্রম কার্য্যটা নিতান্তই অসভ্যতা জ্ঞাপক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া ভারতীয় নরনারীকে নবভাবে অসম্বদ্ধ আলস্যে প্রস্তুত করিয়া তুলিয়াছে। দেশের শোচনীয় অবস্থা ইহারই ফলসম্ভূত। দেশের লোক এ সকল কথা বুঝিবেন কি?

সুস্থ দেহে মাদক দ্রব্যের আবশ্যতা আছে কি না।

—— :*: ——

পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর

(কবিরাজ শ্রী.........বন্দ্যোপাধ্যায়)

চরকে মদ্যকে বিষের সহিত উপমা করা হইয়াছে। বিষ যেমন সুস্থ দেহে হিতকর নহে, পরন্তু সমূহ অহিতকর, মদ্যও সেইরূপ সুস্থ দেহে হিতকর নহে, বরং অহিতকর বা ইহাই চরকের কথা।

বিষের ন্যায় মদ্যের দশটী গুণ ও আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই, যথা লঘুতা, উষ্ণতা, তীক্ষ্ণতা, সূক্ষ্মতা, অম্লতা, ব্যবায়িতা, আশুগামিতা রুক্ষতা, বিকাশিতা (যাহা ধাতুসম্বন্ধ শিথিল করে) ও বিশদতা (পিচ্ছিলের বিপরীত) আবার শরীরে যাহা ওজঃ থাকে তাহার গুণ ও দশটী, যথা, গুরুত্ব, শৈত্য, মৃদুত্ব, শ্লক্ষ্ণত্ব, ঘনত্ব, মাধুর্য্য, স্থিরত্ব, নির্ম্মলত্ব, পিচ্ছিলত্ব এবং স্নিগ্ধত্ব। মদ্যের দশটী গুণ দশটী গুণের বিরোধী বলিয়া বলের নাশ করিয়া থাকে। মদ্যের লঘুতা দ্বারা বলের গুরুত্ব, উষ্ণতা দ্বারা [illegible]

দ্বারা মাধুর্য্য, আশুগামিত্ব দ্বারা প্রসাদ গুণ, রুক্ষতা দ্বারা স্নিগ্ধতা, ব্যবায়ি গুণ দ্বারা স্থিরতা বিবাশিতা গুণ দ্বারা শ্লক্ষ্ণতা, বিষদ গুণ দ্বারা পিচ্ছিলতা এবং সূক্ষ্মতা বশতঃ ঘনত্ব গুণ নষ্ট করিয়া থাকে। যাহা শরীরের সার পদার্থ ও দেহের বল নষ্ট করিয়া থাকে তাহা কি প্রকারে সুস্থ শরীরে হিতকর হইতে পারে?

মদ্যের গুণ ও দোষের আলোচনা করিয়া সুস্থ শরীরে মদ্য হিতকর নহে বলিয়া শাস্ত্র কারগণ মদ্য পান নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। বাগভট সদাচার প্রসঙ্গে সুরাপান এবং মদ্যাতি শক্তি নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। সুরাপান যখন নিষেধ করা হইল, তখন মদ্যাতিশক্তি নিষেধ করিবার সার্থকতা কি? সুরাপান নিষিদ্ধ কিন্তু যদিই কদাচ কর তবে অতিরিক্ত আসক্ত হইও না। গ্রীষ্মকালে মদ্য পান করা উচিত নহে, কিন্তু যদিই খাও, তবে আসল মদ্য প্রচুর জল মিশাইয়া খাইবে। সুরাপান নিষিদ্ধ, কিন্তু যদিই সুরাপান কর, প্রচুর পুষ্টিকর দ্রব্য সহ খাইবে। সাধারণের হিতার্থ শাস্ত্রকারগণ এইরূপ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

চরক সূত্রস্থানে সদাচার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে মদ্য, দ্যূত (জুয়া) ও বেশ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিবে না।

চরক এবং বাগভট উভয় গ্রন্থেই মদ্যের সুস্থশরীরের অনুপযোগীতা সম্বন্ধে বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায় যথা :—

উভয় গ্রন্থেই এইরূপ লিখিত যে, মদ্য যে ব্যক্তি পান না করে, সে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় এবং সে ব্যক্তি এ সম্বন্ধে বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করে; তাহাকে শারীরিক ও মানসিক রোগ সকল স্পর্শ করিতে পারে না।

এতদ্দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে অল্প মাত্রায়ই হউক আর অধিক মাত্রায়ই হউক মদ্য পান করিলে শারীরিক ও মানসিক বিবিধ রোগ জন্মিয়া থাকে। যাহা রোগ জনক তাহা কখনই সুস্থ শরীরের পক্ষে উপযোগী হইতে পারে না।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে দীর্ঘ আয়ু স্মৃতি, মেধা, আরোগ্য বর্ণ স্বর, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সুস্থতা প্রভৃতি লাভের জন্য রসায়ন ঔষধ সেবনের বিধি আছে। রসায়ন প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে যে, সত্যবাদী ক্রোধহীন, মদ্য ও মৈথুন হইতে বিরত প্রভৃতি গুণযুক্ত পুরুষেরা রসায়নের ফল লাভ করিয়া থাকেন অর্থাৎ ঔষধ সেবন ব্যতীত তাঁহারা দীর্ঘ আয়ু ও আরোগ্য প্রভৃতি লাভ করিতে পারিবেন। তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে মদ্য দীর্ঘ আয়ু ও আরোগ্য প্রভৃতি লাভের অন্তরায় স্বরূপ। সুতরাং স্বাস্থ্য আরোগ্য এবং দীর্ঘ আয়ু লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তির পক্ষে মদ্য কখনই হিতকর হইতে পারে।

আমরা এ পর্য্যন্ত যে সকল শাস্ত্রীয় অর্থ প্রকাশ করিয়াছি, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, মদ্য মনের ও শরীরের সাময়িক উত্তেজনা ঘটাইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে বল, সুখ, রতি শক্তি প্রভৃতির বর্দ্ধক নহে এবং উহা পরমায়ু বা আরোগ্যের অন্তরায় স্বরূপ। কেহ কেহ বলিতে পারেন, তবে কি জন্য সুস্থাধিকারে অর্থাৎ সুস্থ ব্যক্তির আহার বিহারাদি সম্বন্ধে উপদেশ দিবার প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মদ্যপানের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে? [illegible]

সুস্থ শরীরে অহিতকরই হইল, তবে সুস্থ ব্যক্তিকে পান করিবার উপদেশ দেওয়া হইল কেন? —

ফল কথা মদ্য ব্যবহারে একটা সাময়িক সুখ হয় মাত্র কিন্তু ইহা দ্বারা ভবিষ্যতে রোগ ভোগ—হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অল্প সুখে বিমূঢ় মানব সেই সুখের প্রত্যাশায় মদ্য পান হইতে বিরত থাকে না। অপকারী জানিয়াও কত লোক যে মাদক দ্রব্যে অনুরক্ত হইয়া নিজের এবং অপরের জীবনের সুখ শান্তি নষ্ট করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা প্রথমেই বলিয়াছি সকল জাতির সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই অহিতকর মাদক দ্রব্য সেবনের প্রথা প্রচলিত আছে। ভগবান মনু বলিয়াছেন:—

প্রবৃত্তিরেব ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলাঃ।

অর্থাৎ মনুষ্যগণের প্রবৃত্তি এইরূপ—মদ্য পানাদিতে ইচ্ছুক, কিন্তু নিবৃত্তি মদ্য পানাদি পরিত্যাগ মহা ফলপ্রদ।

যদি এইরূপই হয় তবে কি সেই সকল প্রবৃত্তির দাস মনুষ্যগণের হিতার্থে শাস্ত্রকারগণ নিশ্চিন্ত থাকিবেন? এই জন্যই সর্ব্বভূতে সমদর্শী অতীন্দ্রিয় শক্তিসম্পন্ন আয়ুর্ব্বেদ বক্তা ঋষিগণ এইরূপ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের উপদেশ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে বিধি পূর্ব্বক মদ্য পান করিলে শরীর সহজে ধ্বংস হইবে না, পরন্তু সুস্থ শরীরে হিতকর হইবে বলিয়া এরূপও বলা হয় নাই। ইহার একটা সুন্দর উপমা দেওয়া যাইতেছে। চৌরকার্য্য সকল দেশে সকল সমাজে চিরদিন দূষণীয় বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। অথচ শাস্ত্রকারেরা চৌর্য্য শাস্ত্র (অর্থাৎ কি করিয়া চুরি করিতে হয়, কোথায় কিরূপ সিঁদ কাটিতে হয়) সে সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য কি চৌরকার্য্যের প্রশংসা করা? তাহা নহে। কিন্তু তস্কর পৃথিবীতে চিরদিন ছিল, আছে এবং থাকিবে। তাহারা যতই অধম হউক, তাহাদের একটা উপায় চাই তো। সেইজন্য, অধমতারণ ঋষিগণ তস্করদিগের কার্য্যসাধক উপদেশ দিতেও ক্রটি করেন নাই। মদ্য পান সম্বন্ধে উপদেশও এইরূপ, মদ্য পান হিতকর বলিয়া নহে।

সুস্থ শরীরে মদ্য পান যে হিতকর নহে, তাহা শাস্ত্রীয় বচন হইতে প্রমাণ করা হইল। এক্ষণে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ এ সম্বন্ধে কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে মদ্য কাহাকে বলে এবং আয়ুর্ব্বেদীয় ও য়ুরোপীয় মদ্যে কোন প্রভেদ আছে কি না, তাহা দেখা উচিত।

যে দ্রব্য পান করিলে মত্ততা জন্মায় তাহাকে মদ্য বলে। আর শালি ও ষষ্টিক ধান্যের চাউল প্রভৃতি হইতে যে মদ্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে সুরা বলে। সুরা শব্দের ডাক্তারী নাম স্পিরিট (spirit)। আসব, অরিষ্ট প্রভৃতি মদ্যকে ইংরাজীতে লিকার (liquor) বলে। বারুণী (তাড়ী, সীধু ভিনিগার—Vinegar) প্রভৃতি মদ্য শব্দ বাচ্য। য়ুরোপীয় মদ্য যত সুরাসার (Alchohol) বহুল, আয়ুর্ব্বেদীয় মদ্য তাহা অপেক্ষা অল্প। ফলতঃ আয়ুর্ব্বেদোক্ত সর্ব্বপ্রকার মদ্যই য়ুরোপীয় মদ্য অপেক্ষা কম তীব্র (strong)।

এক্ষণে মদ্য সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

য়ুরোপীয় চিকিৎসক [illegible]

স্থলে মদ্য শরীরে খাদ্যের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে ইহাই ধারণা করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর তাঁহাদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ বহু পরীক্ষার ফলে স্থির করিয়াছেন যে, উহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। মদ্য শরীরের খাদ্যের ন্যায় পুষ্টি সাধন করে না, বরং বিবিধ শারীরযন্ত্রের অনিষ্ট সাধনই করিয়া থাকে এবং যতটুকু মদ্য পান করা যায় তাহা অবিকৃত অবস্থায় শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়। প্রসিদ্ধ ডাক্তার রিচার্ডসন বলিয়াছেন যে, ক্লোরোফর্ম (Chlorofirm) বা ইথারকে (Ether) যেমন খাদ্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না, মদ্যকেও সেইরূপ খাদ্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

মদ্য পানের পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ মদ্যের কতকগুলি হিতকর গুণ আছে বলিয়া নির্দ্দেশও করেন। তাঁহারা বলেন যে,মদ্য শরীরকে অনেক রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করে, অত্যন্ত শীত বা উত্তাপ হইতে শরীরকে রক্ষা করে, আহার পরিপাকের সহায়তা করে, শরীরের ক্ষয় নিবারণ করে, পেশী সমূহকে সবল করে, ইত্যাদি। কিন্তু পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বহু পরীক্ষার ফলে স্থির করিয়াছেন যে, মদ্য কোন অবস্থায় কোন ব্যক্তির পক্ষেই হিতকর নয়, বরং অত্যন্ত অহিতকর। কেবল মনুষ্য বলিয়া নহে, সমস্ত প্রাণীর পক্ষেই মদ্য বিষতুল্য অনিষ্টকর। মনুষ্যের প্রাণনাশক অনেক প্রকার বিষের প্রভাব যে সকল প্রাণ অনায়াসে সহ্য করিতে পারে, মদ্যের প্রভাবে তাহাও সহ্য করিতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ ডাক্তার রিচার্ডসন বলিয়াছেন যে, এমন কোন জন্তু নাই, যে জন্তু মদ্য দ্বারা অভিভূত হয় না। একটী পারাবত—যাহাতে অনেকগুলি মানুষের প্রাণ নাশ হয়—এরূপ পরিমাণ অহিফেন অনায়াসেই সেবন করিতে পারে। একটী ছাগল—যাহাতে অনেকগুলি মনুষ্যের প্রাণনাশ হয় এরূপ পরিমাণ তামাক অনায়াসেই সেবন করিতে পারে। একটী খরগোস—যাহাতে অনেকগুলি মনুষ্যের প্রাণনাশ হয়, এরূপ বেলেডোনা (Beliadona) অনায়াসে সেবন করিতে পারে। কিন্তু ঐ সকল বিষ সেবন করিয়া অভিভূত না হইলেও, মদ্য পান করিলে উহারা মনুষ্যের ন্যায় অভিভূত হইয়া পড়ে।

নিউ ইয়র্কের অধ্যাপক উইলোর্ড পার্কার (Prof Willord Prorktur M. D.) বলিয়াছেন যে, মদ্য পান করিলে শরীরের উত্তাপ কমিয়া যায়, বলের হ্রাস হয় এবং শতকরা ত্রিশ ভাগ পরমায়ু কমিয়া যায়।

ডাক্তার পার্কস তাঁহার রচিত প্রাক্টিক্যাল হাইজিন (Practical Hygenine) নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে মদ্যের যদি অভাব থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবীর অর্দ্ধেক পাপ ও দুঃখ রোগ ভোগ প্রভৃতি কম হইত।

আমেরিকার চিকাগো মহানগরের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডাক্তার জে, কে, রসি ও চেলার এবং এফ্, এফ্, রসি ও চেলার বলিয়াছেন যে, অনেকে ইচ্ছা পূর্ব্বক এই বিষ পান করিয়া যে কেবল শারীরিক যন্ত্র সমূহের স্বাভাবিক কার্যের বিঘ্ন ঘটায় তাহা নহে, পান করিয়া শীঘ্রই মৃত্যুকে আহ্বানও করিয়া থাকে। আবার ইহা কেবল যে শরীরকে নষ্ট করে —তাহাও নহে, পরন্তু মৃত্যু হইতেও অধিক যন্ত্রণাদায়ক হইয়া মনের শান্তিকে নষ্ট করে, হিতাহিত জ্ঞান লোপ করে, পরিবার-

বর্গকে দারিদ্র্য ও দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত করে এবং তাহাদিগকে জীবনের কর্ত্তব্য পথ হইতে ভ্রষ্ট করে। যতদিন মৃত্যু আসিয়া সকল যন্ত্রণার শেষ করিয়া না দেয়, ততদিন পর্য্যন্ত রোগ-যন্ত্রণা মদ্যপায়ীর নিত্য সহনীয় হইয়া থাকে।

বিট্রিশ মেডিকেল জর্ণাল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মদ্য ব্যবহারে জীবনী শক্তি (vitality) বর্দ্ধিত হয় না, পরন্ত কমিয়া যায়।

মদ্য যে কেবল মদ্যপায়ীরই অনিষ্ট করে তাহা নহে। পিতা মাতার পাপের ফল পুত্র কন্যাও ভোগ করিয়া থাকে। ডাক্তার হাউয়ে (Mr. Howey) প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইংলণ্ড, সুইডেন এবং য়ুরোপের অনেক জড় (Idiot) ব্যক্তি মদ্যপায়ী পিতামাতার সন্তান।

লর্ড স্যাফ্‌টস্‌ বরি (Lord Shaftosbury) ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট মহাসভায় যে রিপোর্ট দেন, তাহাতে প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, ইংলণ্ডে দশ জন উন্মত্তের মধ্যে ছয়জন মদ্যপানের ফলে পাগল হইয়া থাকে। ডাক্তার উইলার্ড পার্কার, ডাক্তার বেঞ্জামিন রস, ডাক্তার হাউয়ি প্রভৃতি চিকিৎসকগণও এই মতের সমর্থন করিয়াছেন।

ডাক্তার এড মণ্ডস, পার্কার, চার্কট (Mr. Charkot of Paris) এবং ডাক্তার হল্ প্রমুখ খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ প্রমাণিত করিয়াছেন যে, মদ্যপানের প্রকৃতি পিতা অপেক্ষা পুত্রের অধিকতর প্রবল হয়। মদ্যপায়ীর পুত্র পিতা অপেক্ষাও অধিকতর মদ্যপায়ী এবং রোগগ্রস্ত হয়। ক্রমশঃ বংশের বিষম অধঃপতন ঘটে।

ডাক্তার এণ্ডারসন, এম হিউবার, ষ্ট্যানলি, ডাক্তার কার্পেণ্টার (Dr. W. B. Carpenter) প্রমুখ চিকিৎসকগণ একবাক্যে বলেন যে, মদ্য পানের ফলে শরীর সহজেই রোগ গ্রস্ত হইয়া পড়ে। মহামারীর (Epidemic) সময় মদ্যপানরত ব্যক্তিগণই অধিক সংখ্যায় মৃত্যু মুখে পতিত হয়। যাহারা মদ্যপান করে না তাহাদের রোগ মদ্যপায়ী অপেক্ষা অনেক কম পরিমাণে হয়।

ডাক্তার স্মিথ চেম্বারস, জেমস্ মিলার, কার্পেণ্টার প্রভৃতি বিখ্যাত চিকিৎসকগণ বলেন যে, অপরিমিত মদ্যপানে যেরূপ অনিষ্ট হয়, পরিমিত মদ্যপানেও সেইরূপ হইয়া থাকে।

মদ্যপানে কেবল শরীরেরই অনিষ্ট হয় না, পরন্ত মনেরও অনিষ্ট হয়, চরিত্রও অত্যন্ত দূষিত করিয়া থাকে, ডাক্তার ফাথার জিল (Dr. Futhirgill) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ বলেন যে, মদ্যপান দ্বারা চরিত্র যে কত দূর দূষিত হয় তাহার সীমা নাই। জগতে এমন কোনো পাপ নাই—যাহা মদ্যপায়ীদিগের দ্বারা কৃত না হইতে পারে। ডাক্তার নট (Dr. Nott) ডাক্তার এলিসা হ্যারিস (Dr. Elisha Harris) প্রভৃতি চিকিৎসকগণ এবং বিখ্যাত বিচারকগণ স্থির করিয়াছেন যে, অধিকাংশ অপকার্য্যই মদ্যপায়ীদিগের দ্বারা সংসাধিত হইয়া থাকে।

মদ্যের অপকারিতা সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের মত উদ্ধৃত করা হইল। এতদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, মদ্য সুস্থ শরীরে অনুপযোগী, পরন্ত বিষবৎ অহিতকর। মদ্য যে বিষ—তাহা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রেই বলা হইয়াছে।

সুস্থ শরীরে মাদক দ্রব্যের উপযোগিতা আছে

কিনা এ প্রবন্ধে তাহাই আমাদের আলোচ্য। সুতরাং রোগ সম্বন্ধে মদ্যের উপযোগিতা কিরূপ তাহা বলা অনধিকারচর্চ্চা মাত্র। তবে প্রসঙ্গ ক্রমে বলিতে হইতেছে যে, মদ্যের রোগনাশকতা শক্তিও পাশ্চাত্য চিকিৎসক গণ স্বীকার করেন না। অধ্যাপক মিলার Prof Miller M. D. of Scotland) বলিয়াছেন, সুরা দ্বারা কোন রোগ ভাল হয় না (Alchohol cure bothing)। ডাক্তার হিগিনবটম (Dr. Higgin vottom) বলেন যে, আমি সুরা প্রয়োগ করিয়া কোন রোগ ভাল হইতে দেখি নাই। ডাক্তার জনসন্ বলেন যে, ঔষধ হিসাবে সুরার প্রয়োগ সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। কিছুকাল পূর্ব্বে দুই সহস্র ইংরাজ ডাক্তার একমত হইয়া প্রচার করেন যে, ঔষধ হিসাবে সুরা প্রয়োগ করা উচিত নহে।

মদ্যপান হেতু সুস্থ শরীর বিবিধ রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। শরীরে এমন কোন যন্ত্রণাই নাই মদ্য পান বশতঃ দুর্ব্বল ও পীড়িত হয় না। অতএব সুস্থদেহে মদ্য ব্যবহার কখনই কর্ত্তব্য নহে।

(ক্রমশঃ)

কলেরা কি বিসূচিকা ?

—:*:—

(কবিরাজ শ্রীমণীন্দ্র নারায়ণ সেন)।

কলেরা বা ওলাউঠাকে সর্ব্ব সাধারণে কেন, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণও নিঃসঙ্কোচে বিসূচিকা নামে অভিহিত করেন। কিন্তু কলেরাকে বিসূচিকা না বলিয়া, অতিসারের পর্য্যায় ভুক্ত করিলে কি সঠিক আয়ুর্ব্বেদোক্ত নাম দেওয়া হয় না? অতিসারের ডাক্তারী নাম "ডাইরিয়া"। ডাইরিয়ারই অবস্থা ভেদ কলেরা, তদ্রূপ অতিসারের অবস্থান্তরের নাম কলেরা।

এই রোগ চেনা অতি সহজ। অন্য কোন রোগে এরূপ লক্ষণ সমূহ হয় না। চাল ধোয়া জলের মত স্বচ্ছ ভেদই ইহাই প্রধান বিনিশ্চয়ক লক্ষণ; এবং রোগীর এরূপ লক্ষণ থাকিলেই আমরা কলেরা বলিতে পারি। প্রথমে অতি প্রচুর পরিমাণে ভেদ; তৎপরে ভেদের উপর বমি, খালধরা, পিপাসা, দাহ, ভ্রম, বলহানি শ্বাস, নাড়ী বসিয়া যাওয়া, অঙ্গের শীতলতা অত্যন্ত অবসাদ, স্বরভঙ্গ ও স্বরক্ষীণ হওয়া, মূত্রহীনতা, বিবর্ণতা, চক্ষু কোটরগত, এবং পরবর্ত্তী কালে জ্বর,—এই রোগে এই সকল লক্ষণ ঘটিয়া থাকে। এই রোগে রোগীর প্রায়ই মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জ্ঞান লোপ পায় না। গন্ধ বর্ণহীন ভেদ ও বমন দ্বারা রোগীর সর্ব্বশরীরস্থ বহু জলীয়াংশ বাহির হইতে থাকে। ধাতুক্ষয় হেতু রোগী প্রতি ভেদের পরই অধিক অবসন্ন হইতে থাকে; সত্বর ইহার কোনো প্রতিষেধ না হইলে, অবশেষে মৃত্যুই ঘটিয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদে অতিসার শব্দের অর্থ অতি

সরণ, "গুদেন বহু দ্রব সরণং অতিসারং" রসাদি দ্রব ধাতু সকল, স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া, গুহ্য মার্গ দ্বারা অতিশয় নিঃসরণ হইলে, তাহাকে অতিসার বলে। এই রোগের সংক্রান্তি যথা :—

সংশম্যাপাং ধাতুরগ্নিং প্রবৃদ্ধো
সকৃন্মিশ্রো বায়ুনাধঃ প্রণুন্নঃ।
সরত্যতীবাতিসারং তমাহু
ব্যাধিং ঘোরং ষড়বিধন্তং বদন্তি।"

শরীরস্থ বহু জলীয় ধাতু—(অর্থাৎ রস,রক্ত, স্বেদ মেদ, মজ্জা, কফ, পিত্ত, মূত্র, জল প্রভৃতি ধাতু) প্রদুষ্ট হইয়া কোষ্ঠাগ্নিকে মন্দীভূত করিয়া মলের সহিত মিশ্রিত হয়, এবং বায়ু কর্ত্তৃক অধোদেশে প্রেরিত হইয়া গুহ্যমার্গ দ্বারা অত্যন্ত নিঃসারিত হয়, ইহাকেই অতিসার কহে। অতিসারের বহু দ্রবসরণ বিশিষ্ট লক্ষণ ঘটিয়া থাকে, তজ্জন্য ইহা গ্রহণী প্রভৃতি রোগ হইতে পৃথক রূপে আয়ুর্ব্বেদে লিখিত হইয়াছে। কলেরার বিশিষ্টতা বহুদ্রব ভেদ; বমি, খালধরা, অঙ্গের শীতলতা, তৃষ্ণা, স্বর ভঙ্গ প্রভৃতি তজ্জনিত উপসর্গ।

এই রোগে প্রথম ২।১ ভেদে শরীরস্থ-- পুরীষের ক্ষয় হয়। পুরীষের ক্রিয়া শরীরের উপগুপ্ত (ধারণ) এবং বায়ু ও অগ্নিকে ধারণ। প্রচুর ভেদ দ্বারা ক্ষয় হওয়াতে, রোগী শরীর ধারণ করিতে পারে না, এবং বায়ু আধার হীন হয় এবং শরীরে বিক্ষিপ্ত হইয়া বিবিধ বাত বেদনা, খালধরা, অরতি, শ্বাস, বমি, প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত করিয়া থাকে। অগ্নি নষ্ট হওয়ায় বিবর্ণতা, উষ্মহীনতা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়। শ্লেষ্মক্ষয়ে রুক্ষতা, অন্তর্দ্দাহ, আশয়দিগের বিশেষতঃ আমাশয়ের শূন্যতা, সন্ধিস্থান সমূহের শৈথিল্য, তৃষ্ণা, দৌর্ব্বল্য, নিদ্রানাশ হয়। বলক্ষয়ের ফলে হৃদ্স্পন্দন, কম্প, ও তৃষ্ণার প্রবলতা হয়; রক্তক্ষয়ে ত্বকের কর্কশতা, শীতানুভূতি ও শিরা শৈথিল্য হয়। মাংসক্ষয়ে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলের শুষ্কতা, রুক্ষতা, তোদ (সূচী বেধবৎ বেদনা) গাত্র সমূহের অবসাদ ও ধমনীদিগের শৈথিল্য হয়। মেদক্ষয়ে সন্ধি সমূহের শূন্যতা, রুক্ষতা প্রভৃতি, মজ্জাক্ষয়ে পর্ব্বভেদ, অস্থিতোদ ও অস্থি সমূহের শূন্যতা,-শুক্রক্ষয়ে অধিক, বলহানি ও মৃত্যু; স্বেদক্ষয়ে, ত্বকশোষ, স্পর্শ-বৈগুণ্য ও রোমকূপের স্তব্ধতা উপস্থিত হয়। মূত্রক্ষয়ে বস্তিতোদ ও মূত্রহীনতা হয়। ওজঃ বা বলক্ষয়ে, মূর্চ্ছা, মোহ, প্রলাপ অজ্ঞান, ক্রিয়া সমূহের হীনতা, ও অবসাদপ্রাপ্তি, দোষের নির্গম, গ্লানি, অঙ্গের স্তব্ধতা ও বিবর্ণতা, তন্দ্রা ও মৃত্যু হয়। রোগীর যতই ভেদ ও বমি অধিক হইতে থাকে, ততই ধাতু সমূহ অধিক ক্ষয়িত হয়,. ক্রমে উপরোক্ত ক্ষয়জনিত লক্ষণ সকল প্রবলতর হয়। ধাতু ক্ষয় হেতু বায়ুর উপদ্রব দ্বারা রোগী অধিক কাতর হয়। অবশেষে বায়ু স্বয়ং ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, রোগী বাক্যহীন ও চেষ্টাহীন হয় ও মূঢ় সংজ্ঞা হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

কলেরায় শরীরের আর আর ধাতু (জলীয়াংশ) ক্ষয় হেতু মৃত্যু হয়। ডাক্তারিতে salin injection (সেলাইন ইঞ্জেকশন) চিকিৎসা প্রণালী দ্বারা অনেক সময় তাঁহারা বিশেষ সুফল পান। তদ্বারা কতকগুলি বিশুদ্ধ সংস্কৃত শরীরোপযোগী জল, শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া শরীরের জলীয়াংশ বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়।

কলেরা রোগ আয়ুর্ব্বেদোক্ত ত্রিদোষজ অতিসার—ইহা কৃচ্ছ্র সাধ্য বা অসাধ্য ব্যাধি।

ইহা কোন স্থলেই সুখসাধ্য নহে। বিশেষতঃ "ঘোরং ষড়্‌বিধং তং বদন্তি" -- ছয় প্রকার অতিসারই 'ঘোরং' এই বিশেষণ দ্বারা রোগের ভয়ঙ্করত্ব প্রকাশ করিতেছে।... ভৈরবং। দারুণং ভীষণং তীক্ষ্ণং ঘোরং ভীমং ভয়ানকং ভয়ঙ্করং প্রতিভয়ং"—ইত্যমরঃ। কলেরা নামক ত্রিদোষজ অতিসারের বিশেষত্ব এই যে, ইহার উৎপত্তি মাত্রেই অতিসারের অরিষ্ট (মরণার্থ জ্ঞাপক উপসর্গ) লক্ষণ সমূহ দেখা দেয়, যথা বমি, স্বরভঙ্গ, উষ্মাহীনতা, শ্বাস, তৃষ্ণা, দাহ, স্বচ্ছভেদ এবং সূচীবেধবৎ বেদনা, অঙ্গে খাল ধরা প্রভৃতি ধাতুক্ষয়জ্ঞাপক উপসর্গ সকলও প্রকাশ পায়।

"ন জীবেৎ ধাতু সংক্ষয়াৎ ইতি," ধাতু ক্ষয় হইলে মানুষ বাচে না। এইজন্যই কলেরায় ধাতুক্ষয় হেতু মৃত্যু হয়।

ত্রিদোষজ জ্বর যেমন অনেক প্রকার এবং বিউবনিক প্লেগ -- জ্বর ব্যতীত অন্য কিছু নয়, ত্রিদোষজ অতিসারও সেইরূপ অনেক প্রকার, তন্মধ্যে কলেরা একটি অরিষ্ট লক্ষণ সংযুক্ত প্রাণান্তকর ত্রিদোষজ অতিসার।

দোষাবস্থা স্তস্য নৈকপ্রকারা,
কালে কালে বাধিতস্তোদ্ভবন্তি।

কলেরা যখন মহামারীরূপে উপস্থিত হয়, তখন দুষ্ট জল, বিষ বা ঋতু বিপর্য্যয় ইহার প্রধান কারণ হয়, তথা অতিসারে অন্য হেতু সকলও অনেক সময় কারণ হয়।

কলেরাকে বিসূচিকা বলার বিশেষ আপত্তি এই :—

নতাঃ পরিমিতাহারা লভন্তে বিদিতাশমাঃ।
মূঢ়া স্তানজি তাত্মনো লভন্তে শনলোলুপাঃ।

কিন্তু কলেরার পক্ষে এ কথা আদৌ খাটে না। জিতাত্মন, পরিমিতাহারী হইলেই কলেরার সংক্রামকতা হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না। কিন্তু বিসূচিকা পরিমিতাহারীর হইবে না, ইহা হইল আয়ুর্ব্বেদের বৈশেষিক সূত্র।

বিসূচিকা -- অজীর্ণান্ন হইতে উৎপন্ন হয়। অজীর্ণ হেতু বায়ু কুপিত হইয়া সূচি সহযোগে সর্ব্বগাত্র পীড়ন করিতে করিতে অবস্থান করে, এইজন্য এই রোগের নাম বিসূচিকা। কিন্তু কলেরা—অজীর্ণ হইতে উৎপন্ন হইতেও পারে, না হইতেও পারে, ইহার কোন বিশেষ নিয়ম নাই। কিন্তু বিসূচিকা—অজীর্ণ হইতে উৎপন্ন হইবে, ইহাই আয়ুর্ব্বেদের মত। কারণ বিষ্টব্ধ, বিদগ্ধ বা আমাজীর্ণ হইতে বিসূচিকা উৎপন্ন হয়। কলেরায় প্রথমে ভেদ, তৎপরে ধাতুক্ষয় জনিত অন্যান্য উপসর্গ দেখা দেয়। বিসূচিকায় পূর্ব্বে অজীর্ণ জনিত বেদনা তৎপরে অতিসার ঘটে। বিসূচিকা—অতিসারের নিমিত্ত হয় মাত্র।

"স্নেহাজীর্ণ নিমিত্তস্ত বহুশূল প্রবাহিকা।
বিসূচিকা নিমিত্তস্ত চান্যোহজীর্ণ নিমিত্তজ।
বিষার্শ ক্রিমি সম্ভূত যথাস্বং দোষ লক্ষণঃ।"
আম পক্কং ক্রমং হিত্বা নাতিসারে ক্রিয়াযতঃ
অতঃ সর্ব্বাতি সারাস্তু জ্ঞেয়া আমপক্ক লক্ষণৈঃ
(সুঃ—উ ৪০. অঃ)

উক্ত বচন হইতে প্রমাণ হয়—অজীর্ণ, ক্রিমি, অর্শ প্রভৃতির ন্যায় বিসূচিকা অতিসারের নিমিত্ত মাত্র—ইহা স্বয়ং অতিসার জাতীয় কোন ব্যাধি নয়, সুতরাং কলেরা নয়,— হয়ত কোন কোন স্থলে বিসূচিকা অতিসার বা কলেরায় নিদানার্থকারী হইতে পারে।

বিসূচিকা চিকিৎসার ক্রমশাস্ত্রে এইরূপ নির্দ্দেশ হইয়াছে,—

সাধ্যা সুসাঙ্কো গার্দ্দহনং প্রশস্ত
মধিপ্রতাপনং বমনঞ্চ তীক্ষ্ণং।

পক্কে ততোঽন্নে তু বিলঙ্ঘনং স্যাৎ
সম্পাচনঞ্চাপি বিরেচনং বা।

কলেরায় বিরেচন ঔষধ কোন চিকিৎসক প্রয়োগ করিয়াছেন কিনা জানি না। কিন্তু বিসূচিকায়

কটুত্রিকং বা লবণৈরুপেতং পিবেৎ
স্নুহীক্ষীর বিমিশ্রিত ঞ্চ।

মনসা ক্ষীরের ন্যায় অতি তীক্ষ্ণ বিরেচন ও বিসূচিকার চিকিৎসায় উক্ত আছে। কলেরায় স্নুহীক্ষীরের ন্যায় বিরেচন ঔষধ কখনও কোন অবস্থায় চলে না। তৎপরে "বমনঞ্চ তীক্ষ্ণং"—ইহাও কুত্রাপি কলেরায় প্রয়োগ হয় না।

"বিশুদ্ধ দেহস্য হি সদা এব
মূর্চ্ছাতিসারাদি রুপৈতি শান্তিং।"

বিসূচিকায় রোগীর বমন বিরেচন দ্বারা দেহ শুদ্ধ হইলে, মূর্চ্ছা অতিসার প্রভৃতি উপসর্গের শান্তি প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু কলেরায় তদ্বিপরীত রোগের স্বভাব বা প্রভাব বমন ও বিরেচনই এই রোগের সর্ব্ব প্রধান আতঙ্ক।

বিসূচিকা অজীর্ণান্ন হইতে উৎপন্ন হয়। কুপিত অন্ন শল্যরূপে দেহে অবস্থান করে, বমন-বিরেচন দ্বারা দোষের শুদ্ধি হইলে, রোগী শান্তি পায়। কিন্তু কলেরায় যত ভেদ বেশী হয়, রোগীও তত অধিক অবসন্ন হয়, উপসর্গেরাও ক্রমে অধিক ভাবে প্রকাশ পায়। কলেরায় যে বমি দেখা যায়, তাহা অতিসারের অরিষ্ট লক্ষণসমূহের অন্যতম—ইহা অজীর্ণ জনিত নহে, ব্যান ও উদান বায়ুর হেতু-বিশেষ ইহাতে প্রকাশ পায়।

কলেরায় শীতলতা ও উষ্মাহীনতা একটি প্রধান অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ রূপে দেখা দেয়, কিন্তু, বিসূচিকার লক্ষণ সমূহ মধ্যে উক্ত লক্ষণদ্বয় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে লিখিত হয় নাই। অতিসারে অরিষ্ট লক্ষণ সমূহ আয়ুর্ব্বেদে লিখিত হইয়াছে।

যে জন্যই অতিসার উৎপন্ন হউক না কেন, অতিসারে আম ও পক্ক ভেদে দুইরূপ চিকিৎসা ভিন্ন অন্যরূপ চিকিৎসা নাই। আমে পাচন, পক্কে স্তম্ভন। কিন্তু কলেরার ন্যায় আশুপ্রাণান্তকারী অতিসারের চিকিৎসা সম্বন্ধে এইরূপ বিশেষ বিধি আয়ুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে :—

ক্ষীণধাতুবলার্তস্য বহুদোষাতিনিস্রুতঃ।
আমেঽপি স্তম্ভনীয় স্যাৎ পাচনাস্মরণং ভবেৎ।

যাহার ধাতু ও বল ক্ষীণ হইয়াছে এবং ভেদ দ্বারা বহু দোষ নিঃসৃত হইয়াছে, এইরূপ অতিসারের রোগীকে আম অবস্থাতে ও স্তম্ভন ঔষধ দিবে. কেবল পাচন ঔষধ দিলে রোগীর মৃত্যু হইবে। এই অবস্থায় পাচন, স্তম্ভন ঔষধই ব্যবস্থা। কলেরার অক্ষেপ্ত "আমেঽপি স্তম্ভনীয় স্যাৎ", নচেৎ দোষ অতিনিঃসৃত হইয়া মরণ হইবে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, কলেরা নামক রোগকে আয়ুর্ব্বেদের ভাষায় বিসূচিকা না বলিয়া অতিসার বলিলে অধিক শোভন হয় এবং আয়ুর্ব্বেদসম্মত নাম হয়। যখন প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, কলেরা চিকিৎসায় আয়ুর্ব্বেদে অতিসার চিকিৎসার ক্রম অনুসরণীয়, তখন ইহাকে বিসূচিকা বলার তাৎপর্য্য কি? আয়ুর্ব্বেদজ্ঞগণের নিকট আমার ইহাই নিবেদন এবং আচার্য্যগণের নিকট আমার জিজ্ঞাস্য, আয়ুর্ব্বেদের মতে কলেরা বিসূচিকা কিনা তাঁহারা এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমার মীমাংসা খণ্ডন করিয়া দিন।

বাঙ্গালার স্বাস্থ্য।

—:*:—

বাঙ্গালা দেশের অধিবাসীদিগের স্বাস্থ্যের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইতেছে তাহা ১৯১৮ সালের সরকারি বিবরণী দৃষ্টে বিশেষ রূপ অবগত হওয়া যায়। ১৯১৮ খৃঃঅব্দে একমাত্র জ্বরে ও ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগেই বাঙ্গালা দেশের লোকক্ষয় হইয়াছে ৪,৭৫,১৩৫ জন। ইহার মধ্যে নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার লোকের মৃত্যুই অধিক হইয়াছে।

১৯১৮ খৃঃঅব্দে সমগ্র বঙ্গদেশে জন্ম সংখ্যা ১৪,৮৯,১৩৫। ১৯১৭ খৃঃঅব্দে সমগ্র বঙ্গদেশে জন্ম সংখ্যা হইয়াছিল ১৬,২৭,৮৭৩ সুতরাং ১৯১৭ খৃঃঅব্দ অপেক্ষা ১৯১৮ খৃঃ অব্দে জন্ম সংখ্যা ১,৩৮,৭৩৮ পরিমাণে কম হইয়াছে।

১৯১৮ খৃঃঅব্দে মৃত্যুসংখ্যা ১৭,২৭,৩৩১। ১৯১৭ খৃঃঅব্দে মৃত্যুসংখ্যা হইয়াছিল ১১,৮৭,৫০৯। এই হিসাবে মৃত্যু সংখ্যা ও ১৯১৭ খৃঃঅব্দ অপেক্ষা ৫,৩৯,৮২২ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

একদিকে জন্ম সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে, অন্য দিকে মৃত্যু সংখ্যা বাড়িতেছে। বাঙ্গালার অবস্থা কিরূপ শোচনীয় তাহা চিন্তাশীলগণ বিবেচনা করিবেন।

১৯১৮ খৃঃঅব্দে যে মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে জ্বর ও ইনফ্লুয়েঞ্জায় ৪,৭৫,১৩৮ ও কলেরায় ৩৭,৩৫৮ লোক মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে। কলেরা রোগে সমগ্র বাঙ্গালার মধ্যে নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম জেলার লোকই অধিক ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

১৯১৮ খৃঃ অব্দে শিশুমৃত্যুর পরিমাণ কিরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা আমরা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। শিশু ভিন্ন, বালক-বালিকা, যুবক যুবতীও বাঙ্গালা দেশে যে পরিমাণে কালকবলিত হইয়াছে, তাহাও চিন্তার বিষয়। ১৯১৮ খৃঃ অব্দে ১০ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক পুরুষের মৃত্যু সংখ্যা ৪৫,০২৭ এবং ঐ বয়সের স্ত্রীলোকের মৃত্যুসংখ্যা ৩৭,৪৫৪। ১৫ হইতে ২০ বৎসর বয়স্ক পুরুষের মৃত্যু সংখ্যা ৫১,০১৫ ও ঐ বয়সের স্ত্রীলোকের মৃত্যু সংখ্যা ৬১,৯৭৩। ২০ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্ক পুরুষের মৃত্যু সংখ্যা ১,১০,৪৮৫ এবং ঐ বয়সের স্ত্রীলোকের মৃত্যু সংখ্যা ১,২৮,০৩২। ১৫ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোকের মৃত্যুই বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফল কথা, শিশুমৃত্যুর মত যুবতী-মৃত্যুও দেশে যেরূপ বাড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ কখনই আশাপ্রদ নহে। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকগণ অল্প বয়সেই যে সন্তানের জননী হইয়া থাকেন, শিশু এবং যুবতী-মৃত্যুর অনেকটা কারণ তাহাই। অনেক মহিলা অকালে গর্ভবতী হইয়া প্রসব করিবার পূর্ব্বে কালগ্রাসে পতিতা হন, অনেকে উহারই ফলে রক্তাল্পতা নিবন্ধন প্রসবের পরই অকালে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। আমরা স্থানান্তরে বলিয়াছি, বাল্য বিবাহ বঙ্গ দেশে চির প্রচলিত, কিন্তু বিবাহ হইল বলিয়াই অকালে বা যখন তখন স্ত্রী-পুরুষের মিলনের ব্যবস্থা আমাদের দেশে ছিল না। হিন্দুর গর্ভাধান পুংসবন প্রভৃতি কার্য্যের

অনুষ্ঠান তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এখন সে গর্ভাধান-পুংসবনের ব্যবস্থা কয়জন রক্ষা করিয়া চলেন? সে তিথি-নক্ষত্র বাছিয়া স্ত্রী পুরুষের মিলনের ব্যবস্থাও দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। সে কালে ঋতুমতী স্ত্রীর ঋতু কালে স্বামীর মুখ পর্য্যন্ত দেখিবার অধিকার ছিল না, এখন সে বাছ বিচারই বা কয়জনের সংসারে দেখিতে পাওয়া যায়? বালিকা ও যুবতী মৃত্যুর আধিক্যের ইহাই প্রধান কারণ।

ইনফ্লুয়েঞ্জা, ম্যালেরিয়া, বসন্ত এবং কলেরা রোগ বাঙ্গালা দেশে ক্রমশঃই বাড়িতেছে। স্বাস্থ্যবিভাগের কমিশনর ডাঃ বেণ্টলী ইহার কারণ নির্দ্দেশে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে বাঙ্গালীর আহার ও পরিচ্ছদের অনটনের কথা বিশেষ ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, সামান্য খাদ্য এবং বস্ত্রাদি ব্যবহারের ফলে লোকের জীবনী শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়াই ইনফ্লুয়েঞ্জা ও জ্বররোগের মৃত্যুর সংখ্যা আলোচ্য বর্ষে বাড়িয়া গিয়াছে।" আমরা বলি, অন্নবস্ত্রের কষ্টে বাঙ্গালা দেশে এক ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগই বাড়ে নাই; এই দুইটি বিষয়ের অভাবে বাঙ্গালীর সকল রোগই বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখনকার দিনে যক্ষা রোগের যে এত প্রাবল্য, ইহার কারণও বাঙ্গালীর দারুণ অস্বচ্ছলতা। বাঙ্গালী আগের অপেক্ষা এখন অর্থের মুখ বেশী দেখিতে পাইতেছে সত্য, কিন্তু সে অর্থে সকল দিক বজায় রাখিতে হইলে বাঙ্গালীর যে কুলাইবার উপায় নাই। দারুণ অভাবগ্রস্ত বাঙ্গালীর মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে ইহারই জন্য।

স্বাস্থ্য বিভাগের রিপোর্টে প্রকাশ, দার্জ্জিলিংয়ে যক্ষারোগে মৃত্যু সংখ্যা বাঙ্গালার সকল স্থান অপেক্ষা ১৯১৮ সালে বৃদ্ধি পাইয়াছে। দার্জ্জিলিং তো স্বাস্থ্য-গৌরবে বাঙ্গালা দেশের মধ্যে প্রধান, সেখানে যে যক্ষারোগে এত বেশী মৃত্যু হইয়াছে, ইহা কি বাঙ্গালীর অর্থ কৃচ্ছ্রতার পরিচায়ক নহে? দার্জ্জিলিংয়ে থাকিতে হইলে বাঙ্গালার সকল স্থান অপেক্ষা যথেষ্ট পরিমাণে ব্যয় হইয়া থাকে, অথচ চাকরি সূত্রে অনেক বাঙ্গালীর সেখানে অবস্থিতি না করিলে নয়। ফলে দার্জ্জিলিং প্রবাসী অনেক বাঙ্গালীই উপার্জ্জনের তুলনায় ব্যয়ের সংকুলান করিতে পারেন না। আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশীর পরিণাম নিদারুণ দুশ্চিন্তা। দার্জ্জিলিংয়ে যক্ষারোগের প্রাবল্য সেই নিদারুণ দুশ্চিন্তারই ফলসম্ভূত।

ঢাকা ও খুলনা জেলায় আত্মহত্যার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার মধ্যেও যে ঢাকা ও খুলনা জেলার আত্মহত্যার ব্যাপারে অভাবের কারণ নাই, এমন কথাও বলা যায় না।

নদীয়া, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায় নিউমোনিয়া রোগে মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। জলপাইগুড়ি, রাজসাহি, ঢাকা, ২৪ পরগণা মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হুগলি, বাঁকুড়া বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলাতেও যক্ষারোগে মৃত্যু-সংখ্যা কম নহে।

মফঃস্বলের সহরগুলিতে মৃত্যু সংখ্যা কিছু কম বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এ বিষয়ে ডাঃ বেণ্টলী বলিয়াছেন,—"মফঃস্বলের সহর গুলিতে যে মৃত্যুর সংখ্যা কম বলিয়া বোধ হয়, বাস্তবিক তাহা নহে, ঐ সমস্ত স্থানে মৃত্যু-সংখ্যা রেজেষ্টারি করার উপযুক্ত উপায় অবলম্বিত হয় না। মফঃস্বলের সহরগুলিতে

কলিকাতা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

মফঃস্বলে কলের বৃদ্ধি উপলক্ষে ডাঃ বেণ্টলী মফঃস্বলে পানীয় জলের অভাবের উল্লেখ করিয়াছেন। মাদারিপুর এবং নোয়াখালির কথা এই প্রসঙ্গে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু মাদারিপুর ও নোয়াখালি কেন, বাঙ্গালার অনেক পল্লীতেই এখন জল কষ্ট। সেকালের দীর্ঘিকা-পুষ্করিণী সকল সংস্কারাভাবে হাজিয়া মজিয়া গিয়াছে, পশ্চিম বঙ্গ ভাগীরথির তীরে অবস্থিত হইলেও অনেক স্থানেই গ্রামের সান্নিধ্য হইতে ভাগীরথি বহুদূরে সরিয়া গিয়াছেন। নদীয়ার শান্তিপুরের কথা এই প্রসঙ্গে আমরা উত্থাপন করিতে পারি। বর্ত্তমান সময়ে শান্তিপুরের জন সাধারণ যেখানে বাস করিয়া থাকেন, সেখান হইতে বহুদূরে গঙ্গার ঘাট অবস্থিত। শান্তিপুরে সকল অধিবাসীই আর এই কারণে প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিবার অবসর পান না, অনেকেই গঙ্গাহীন স্থানের মত কূপের জলে স্নানসুখ উপভোগ করিয়া থাকেন।

ফল কথা পল্লীগ্রামে জলকষ্ট যে নানারূপ রোগের কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কলেরার কথা কেন, কলেরা, ম্যালেরিয়া, বসন্ত—অনেক রোগই পল্লীর জলকৃচ্ছ্রতা হইতে সংক্রামক হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার জন্য পল্লীবাসী জনসাধারণের চেষ্টাশীলতা কৈ? সরকার বাহাদুর আমাদের জন্য চিন্তা করিতেছেন বটে—কিন্তু তাঁহাদের চিন্তা প্রসূত চেষ্টার সহিত যদি আমাদের সমবেত চেষ্টা মিলিত হয়, তাহা হইলে ইহার ফল যে শুভপ্রদ হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু চেষ্টা করিবে কে? আমরা যে নিদ্রিত।

বসন্তের প্রতিষেধক বিধি।

——:*:——

সংপতি বাঙ্গালার অনেক স্থানেই বসন্ত রোগ দেখা দিয়াছে। কলিকাতায় ইহার প্রকোপ তো ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। এ সময় দেশের লোক যদি নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করেন, তাহা হইলে বসন্তের আক্রমণ হইতে অব্যাহত থাকিবেন।

১। বসন্তের টীকা গ্রহণ যাঁহারা পূর্ব্বে করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য করিয়া আবারও লইবেন।

২। প্রত্যহ খাঁটি সরিষার তৈল সর্ব্বাঙ্গে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবেন।

৩। সর্ব্বদা শুচিভাবে থাকিবেন। বাড়ীর সকল স্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবেন। প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় সকল ঘরে ধূনা দিবার ব্যবস্থা করিবেন। কখনো ময়লা পরিচ্ছদ ব্যবহার করিবেন না।

৪। প্রত্যহ ভোজ্য দ্রব্যের সহিত দু' একটি উচ্ছে এবং উহার বীচি ভাজিয়া খাওয়ার

ব্যবস্থা করিবেন। পলতা এবং নিমপাতা ভাজা খাওয়া এ সময় বিশেষ উপকারী। উচ্ছের স্থলে করোলা উচ্ছে হইলে আরও ভাল হয়।

৫। পচা এবং বাসি মাছ তো একেবারেই খাইবেন না, তা' ছাড়া এ সময় মাছ খাওয়াটা তুলিয়া দিতে পারিলেই ভাল হয়। কই, শিঙ্গি, মাগুর এবং জেয়োল মাছ এ সময় একেবারেই ত্যাগ করিবেন।

৬। মাংস বা ডিম খাওয়া একেবারে বন্ধ করিবেন। যাঁহা প্রত্যহ খাইয়া থাকেন, তাহা ভিন্ন পোলাও বা ঐরূপ গুরুপাক কোনো দ্রব্য এ সময় খাইবেন না।

৭। দোকান হইতে দুগ্ধ কিনিয়া পান করা এ সময় কর্ত্তব্য নহে। মৎস্য এবং দুগ্ধ হইতে ইহার উৎপত্তি আরম্ভ হয়, এজন্য দুগ্ধ খাঁটি ও বিশুদ্ধ কিনা, তাহা ভাল করিয়া জানিয়া ব্যবহার করিবেন।

৮। দোকান হইতে তৈয়ারি চা কিনিয়া খাওয়ায় যাঁহারা অভ্যস্ত, তাঁহারা অবশ্য করিয়া এ সময় উহা পরিত্যাগ করিবেন। ঐরূপ 'চা' হইতেও ইহার সংক্রমকতা আসিতে পারে।

৯। বাজারের খাবার সম্বন্ধেও যতটা পরিহার করিতে পারা যায়, ততটা মঙ্গল। থিয়েটার ও বায়স্কোপ প্রভৃতি দেখার জন্য এ সময় একদিনও রাত্রি জাগরণ করিবেন না।

১০। হরীতকীর আঁটি ফুটা করিয়া সুতার সাহায্যে পুরুষেরা দক্ষিণ হস্তে এবং মহিলাগণ বাম হস্তে ধারণ করিবেন। ইহা বসন্তের বিশেষ প্রতিষেধক ব্যবস্থা।

১১। কাঁচা কণ্টিকারীর মূল চারি আনা ও গোল মরিচ ৫টা একত্র শীতল জল সহ বাটিয়া সপ্তাহে ২দিন করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিবেন। এ মাত্রা পূর্ণ বয়স্কের। শিশুদের মাত্রা ঐ অনুযায়ী বিবেচনা করিয়া লইবেন।

১২। বৈকাল বেলা মোচার রস দ্বারা শ্বেত চন্দন পেষণ করিয়া কিম্বা বাসকের রস অথবা মধুদ্বারা যষ্টিমধু পেষণ করিয়া সপ্তাহে ঐরূপ ২দিন করিয়া পান করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

১৩। শ্বেত পুনর্ণবার মূল চূর্ণ এক আনা ও গোল মরিচের গুঁড়া এক আনা শীতল জল সহ মধ্যে মধ্যে প্রাতঃকালে সেবন করিলে বসন্ত পীড়া হইতে পারে না।

১৪। তেলাকুচা, মাধবীলতা, অশোক, পাঁকুড় ও বেতস—এই কয়টি দ্রব্যের পাতার ওজন।৵১০, জল আধসের, শেষ আধ পোয়া —এই কাথ প্রতি সপ্তাহে ১দিন করিয়া পান করিলে কখনই বসন্ত হইবে না।

১৫। হিঞ্চেশাকের রস মধ্যে মধ্যে পান করিলে বসন্তের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। ইহা শ্বেত চন্দন ঘসার সহিত মিশাইয়া—সেবনে কখনই বসন্তের আক্রমণ হইতে পারে না।

১৬। নিম্ব ও বহেড়ার বীজ এবং হরিদ্রা —শীতল জলে পেষণ করিয়া প্রতি সপ্তাহে পান করিলেও বসন্ত রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ইহা প্রত্যহ ব্যবহার করিতে পারি

মুষ্টিযোগ ও টোটকা ঔষধ।

—:০:—

কবিরাজ শ্রীগোষ্ঠ বিহারী গোস্বামী, ভিষগাচার্য্য।

অম্লজনিত শূল রোগের মহৌষধ।—(১) ফুলখড়িচূর্ণ ২০ তোলা, ফটকিরি চূর্ণ ৪ তোলা, সোরা চূর্ণ ৪ তোলা মৌরী চূর্ণ ২ তোলা, কাবাব চিনি চূর্ণ ২ তোলা, সাচিক্ষার চূর্ণ ২ তোলা ও কর্পূর চূর্ণ ১ তোলা—এই সমস্ত চূর্ণ একে একে মিশাইয়া বহুক্ষণ মাড়িয়া উপযুক্ত পাত্রে রাখিয়া দিবে। ইহার দুই আনা বা তিন আনা মাত্রায় শীতল জল সহ সেবন করিলে অম্লজনিত শূল রোগ নিবারিত হয়। (২) পরিষ্কার সোরা ৮ তোলা ও পরিষ্কার ফটকিরি ২ তোলা পৃথক পৃথক চূর্ণ করিয়া পরে মিশ্রিত করিবে। তৎপর আগুনে গলাইয়া চটি প্রস্তুত করিয়া লইবে। ঐ চটি ৫ তোলা চূর্ণ করিয়া তাহাতে সৈন্ধব লবণ চূর্ণ ২॥০ তোলা ও জোয়ান চূর্ণ ২॥০ তোলা দিয়া একত্র মিশাইয়া রাখিবে। ইহার তিন আনা বা চারি আনা মাত্রায় শীতল জল সহ সেবন করিলে অতি কঠিন অম্লশূল নিশ্চয় ভাল হয়।

অজীর্ণ নিবারণের উপায়।—(১) জোয়ান চূর্ণ।০ আনা সৈন্ধব লবণ ৵০ আনা একত্র মিশ্রিত করিয়া শীতল জল সহ সেবন করিলে অজীর্ণ রোগ বিনষ্ট হয়। (২) দুই তোলা পরিষ্কার মৌরী আধ পোয়া জলে ২ ঘণ্টা ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং উহাতে ২ তোলা পরিষ্কার চুণের জল ও আধ তোলা কাগজী লেবুর রস মিশাইয়া ৩।৪ বারে পান করিলে অতি সত্বর উপশমিত হয়। (৩) মুথা, আমরুল শাক ও পাথরকুচির পাতা একত্র ছেঁচিয়া পোড়াইয়া রস নিংড়াইয়া লইবে, এই রস এক কাচ্চা মাত্রায় একটু সৈন্ধব লবণের সহিত ২।৩ বার সেবন করিলে অজীর্ণ দোষ নিবারিত হয়। (৪) হিং, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ ও সৈন্ধব একত্র বাটীয়া পেটে প্রলেপ দিয়া নিদ্রা গেলে সকল প্রকার অজীর্ণ প্রশমিত হয়।

আমাশয় রোগে ব্যবস্থা।—আমরুলের পাতার রস সকালে আধ ছটাক ও সন্ধ্যায় আধ ছটাক কিঞ্চিৎ মধু সহ পান করিলে আমাশয় রোগ ভাল হয়। (২) পাকা তেঁতুল পাতা, বুড়ীপানের পাতা, থনকুড়ির পাতা, কয়েদবেলের পাতা ও দাড়িম পাতা একত্র ছেঁচিয়া পোড়াইয়া রস নিংড়াইয়া সেই রস আধ ছটাক পরিমাণে খাইলে নিশ্চয় আমাশয় রোগ ভাল হয়। (৩) কাঁটানটের শিকড় আধ তোলা, জলের সঙ্গে বাটিয়া শীতল জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া তাহাতে ৩ কুঁচ পরিমাণ মরিচের গুঁড়া মিশাইয়া দিবসে ৩।৪ বার সেবন করিলে শীঘ্র আমাশয় রোগ আরোগ্য হয়।

একশিরার মহৌষধ।—(১) ভেড়ার লোম ও কার্পাস তুলার বীজ—প্রত্যেক

ভাগে লইয়া একত্র হামামদিস্তায় কুটিতে কুটিতে রুটীর মত হইয়া আসিলে তদ্দ্বারা বৰ্দ্ধিত কোষ জড়াইয়া উপরের দিকে টানিয়া বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। ৪।৫ দিন বাঁধিলেই একশিরার টন্‌টনানি বা যন্ত্রণা এবং ফুলার শান্তি হইবে। (২) হরীতকী চূর্ণ ১২ রতি, সৈন্ধব লবণ চূর্ণ ৬ রতি ও পিপুল চূর্ণ ৩ রতি একত্রে মিশাইয়া গরম জল সহ প্রতিদিন রাত্রিতে শয়নকালে খাইলে সকল প্রকার কোষ বৃদ্ধি কমিয়া যায়।

দাঁত ভাল রাখিবার উপায়।—হরীতকী চূর্ণ, মরিচ চূর্ণ, কর্পূর চূর্ণ, ফটকিরি চূর্ণ, দারুচিনি চূর্ণ, দোক্তা তামাক চূর্ণ, সুপারি চূর্ণ ও তুঁতে ভস্ম প্রত্যেক ১ তোলা এবং ফুলখড়ি চূর্ণ ৮ তোলা এই সমস্ত চূর্ণ একে একে মিশাইয়া বহুক্ষণ মাড়িয়া রাখিয়া দিবে। এই চূর্ণ দিয়া প্রত্যহ দাঁত মাজিয়া মুখ ধুইলে দাঁতের সমস্ত রোগ আরোগ্য হইয়া দন্তমূল দিন দিন দৃঢ় হইতে থাকে।

শিশু চিকিৎসায় সহজ ব্যবস্থা।

কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত কবিরত্ন।

প্লীহা ও যকৃতরোগে।—(১) শুলঞ্চ ও খাঁড়িলবণ সমানভাগে লইয়া গোমূত্রে পেষণ করিয়া শিশুর প্লীহা ও যকৃৎ রোগে প্রলেপ দিলে উপকার হইয়া থাকে। (২) নীল ও আমের আঁটির শাঁস সমানভাগে লইয়া জল দ্বারা বাটিয়া গরম করিয়া অল্প অল্প গরম থাকিতে যকৃতের উপর প্রলেপ দিলে প্লীহা ও যকৃতে উপকার দর্শে। (৩) পটোলের মূল পেষণ করিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলেও প্লীহা ও যকৃত রোগে সুফল পাওয়া যায়। (৪) পিপুল ও যবক্ষার প্রত্যেকটি ১ রতি মাত্রায় গ্রহণ করিয়া কিঞ্চিৎ কালমেঘের রস ও মধুর সহিত প্রাতঃকালে সেবন করাইলে শিশুদিগের প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর ও শোথ রোগ আরোগ্য হয়। (৫) ক্ষেৎপাপড়ার রস এক ঝিনুক ও মধু ৩।৪ ফোঁটা—একত্র মিশাইয়া প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে শিশুদিগকে সেবন করাইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। (৬) নিশাদল চূর্ণ ১ রতি ও ফটকিরি চূর্ণ সিকি রতি—দুই ঝিনুক পটোল পাতার রস ও কিঞ্চিৎ মিছরি—একত্র মিশাইয়া প্রত্যহ ২ বার করিয়া সেবন করাইলে শিশুদিগের যকৃত জন্য চক্ষু ও পদাদির হরিদ্রাবর্ণ প্রাপ্তি ও হাত পা ফুলা আরোগ্য হয়।

রক্তামাশয়ে।—(১) গন্ধ ভাদুলিয়ার পাতার রস ১ ঝিনুক, লোধকাষ্ঠ * চূর্ণ ১ রতি ও মধু ২।৪ ফোঁটা—একত্র মিশাইয়া

* লোধ কাষ্ঠ বাজারে বেণের দোকানে পাওয়া যায়।

তিন দিবস পান করাইলে শিশুদিগের প্রবল রক্তাতিসার প্রশমিত হয়। (২) ছাগী দুগ্ধ এক ছটাক, জল অর্দ্ধসের, মুথা ৪টি ও বেল শুঠ এক টুকরা—একত্র সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া পান করাইলে রক্তা-শয় জনিত বেদনা দুরীভুত হয়। (৩) সাদাধুনার গুঁড়া অর্দ্ধ রতি ও গুড় এক আনা—কিঞ্চিৎ শীতল জলের সহিত মিশাইয়া সেবন করাইলে বালকদিগের আমরক্ত জনিত বেদনা নিবারিত হয়।

আমাতিসারে।—(১) বিড়ঙ্গ, যোয়ান ও পিপুল—প্রত্যেকটি ১ রতি লইয়া গরম জলের সহিত সেবন করাইলে শিশুর আমাতি-সার নষ্ট হয়। (২) বটের মূল পেষণ করিয়া চাল ধোয়া জল সহ পান করাইলে শিশু দিগের প্রবল অতিসার রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

স্তন্যপান জনিত বমন ও হিক্কায়। (১) চিনি, মধু ও টাবালেবুর রস একত্র মিশাইয়া সেবন করাইলে উপকার দর্শে। (২) বেলশুঁঠ ও জামের আঁটির শাঁস প্রত্যেকটি আধতোলা হিসাবে লইয়া এক পোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া এক ছটাক থাকিতে নামাইয়া, তাহাতে চিনি ও খই চূর্ণ মিশাইয়া—এক ঝিনুক এক ঝিনুক করিয়া ৩।৪ বার পান করাইলে সত্বর উপকার পাওয়া যায়। (৩) পিঁপুলের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, চিনি ও মধু—এই কয়টি দ্রব্য উপযুক্ত মাত্রায় টাবা লেবুর রসের সহিত সেবন করাইলেও শিশু-দিগের স্তন্যপানের পর বমন ও হিক্কা হইলে ফল পাওয়া যায়।

অজীর্ণে।—(১) ইসবগুল ৪ রতি ও মিছরি ২ রতি কিঞ্চিৎ শীতল জলের সহিত ভিজাইয়া প্রাতে অর্দ্ধেকটা ও বৈকালে অর্দ্ধেকটা সেবন করাইবার ব্যবস্থা করিলে শিশুদিগের নাভিমূলের অত্যন্ত যন্ত্রণার সহিত পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমিত মল নিঃসৃত হওয়া বন্ধ হয়। বেলশুঁঠ—জলের সহিত ঘসিয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করাইলে শিশু-দিগের পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

---

* খাদ্য ও স্বাস্থ্য।

(ডাঃ শ্রীচুণীলাল বসু)

"আমাদের খাদ্যের মধ্যে পাঁচ জাতীয় সারপদার্থ থাকা আবশ্যক। দুগ্ধ প্রকৃতিদত্ত পূর্ণ আদর্শ খাদ্য—দুধের মধ্যে পাঁচ জাতীয় সার পদার্থ আছে। (১) ছানা জাতীয়, (২) মাখন জাতীয়, (৩) শর্করা জাতীয়, (৪) লবণ জাতীয়, (৫) জলীয়। সুতরাং দুধের মধ্যে

* শান্তিনিকেতনের বাৎসরিক উৎসব সভায় স্বনামখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু মহাশয় "খাদ্য ও স্বাস্থ্য" সম্বন্ধে যে উপাদেয় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, "শান্তিনিকেতন" পত্রিকা হইতে তাহা উদ্ধৃত হইল।

যে সব সার পদার্থ আছে, শরীর পোষণের জন্য তাহাদেরই প্রয়োজন।

কিন্তু দুধ সুলভ নহে ও ক্রমাগত খাইলে একঘেয়ে হইয়া উঠে, সুতরাং আমাদের ভাত, ডাল, মাছ, মাংস, তরিতরকারী, ফলমূল প্রভৃতি নানা জাতীয় খাদ্য দ্রব্য হইতে এই পাঁচ জাতীয় সার পদার্থ সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়। সকল খাদ্যে এই পাঁচ জাতীয় পদার্থ একত্রে বা উপযুক্ত পরিমাণে থাকে না। এই ভিন্ন জাতীয় সার পদার্থগুলির ক্রিয়া একরূপ নহে, ছানা জাতীয় খাদ্য দ্বারা শরীরের গঠন-কার্য্য হয় মাখন বা শর্করা জাতীয় পদার্থ শরীর গঠন সম্বন্ধে কোনও সহায়তা করে না। এই শেষোক্ত পদার্থ দুইটী দ্বারা আমরা তাপ ও কার্য্য করিবার শক্তি আহরণ করিয়া থাকি।

বাংলা দেশে আগে মাছ ও দুধ প্রচুর পাওয়া যাইত, কিন্তু এখন আর তেমন পাওয়া যায় না। সম্প্রতি বাঙালী জাতির খাদ্যে ছানা জাতীয় পদার্থ খুব কম বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। সেই জন্য ছাত্রদের মধ্যে যথোচিত শারীরিক বিকাশ ও পূর্ণতা লক্ষিত হয় না।

দেশের অবস্থা ভাল নহে, দুধ, মাছ, মাংস প্রভৃতি দুর্ম্মূল্য, সুতরাং ছানা জাতীয় পদার্থ খাইতে হইলে ডাল আমাদের প্রধান খাদ্য করিতে হইবে। মাছ মাংস অপেক্ষা ডালে ছানা জাতীয় পদার্থ অধিক,—সারবান এবং উপরন্তু সস্তা। ডাল সহজে পরিপাক হয় না, ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। ডাল রীতিমত সুসিদ্ধ হইলে, তাহার মধ্যে একটাও বীচি থাকিবে না, ক্ষীরের মত ঘন হইবে, উহার জলীয় ভাগ আলাদা হইয়া থাকিবে না। ডাল একটু বেশী পরিমাণে খাইলে আমাদের খাদ্যে ছানা জাতীয়ের যে অভাব আছে, তাহা পূরণ হইয়া যায়। ডাল ভাত অপেক্ষা ডাল রুটি অধিক পুষ্টিকর খাদ্য। একবেলা ভাত ও একবেলা রুটি খাইলেও ছানা জাতীয় খাদ্যের অভাব অনেকটা দূর হয়, কেননা, ভাত অপেক্ষা রুটিতে দ্বিগুণ ছানা জাতীয় পদার্থ বেশী। (শতকরা ৮০ ভাগ), ছানা জাতীয় পদার্থ মোটে ৬ ভাগ, এবং মাখন জাতীয় পদার্থ ১ ভাগের অধিক থাকে না, সুতরাং চাউল যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য নয়। চাউলে একে ত সার পদার্থ এত কম, তার উপর আবার ফেন ফেলিয়া দিলে ইহা আরো অসার হইয়া পড়ে। আমাদের এই গরীব দেশে এরূপ অপচয় একান্ত দোষাবহ। দুই একদিন অভ্যাস করিলেই যে পরিমাণ জল চাউল সুসিদ্ধ করিবার জন্য প্রয়োজন, তাহা আমরা স্থির করিয়া লইতে পারি এবং সেই পরিমাণ জল দিয়া ভাত প্রস্তুত হইলে ফেন ভাতের মধ্যেই থাকিয়া যায়। আমাদের দেশের মেয়েরা এই দিকে দৃষ্টি দিলে দেশের যথেষ্ট উপকার হয়।

ভাত অপেক্ষা খিচুড়ি অধিক সারবান্। ইহা ডাল ও ঘির সহযোগে রান্না হয় বলিয়া ইহার মধ্যে পাঁচ জাতীয় সার পদার্থই যথোচিত পরিমাণে থাকে। ভাতের বদলে মাঝে মাঝে খিচুড়ি খাওয়া উচিত।

ভাত,—চালে শরীর-পোষণোপযোগী সার পদার্থ আছে, কিন্তু গম প্রভৃতি অপেক্ষা কম। ইহা হজমের পক্ষে উৎকৃষ্ট। আমরা সৌখীন-তার বশে মাজা ধবধবে পরিষ্কার চালের পক্ষপাতী, কিন্তু ধানের তুষের নীচের আচ্ছাদনের ভিতর যে একটী সার পদার্থ থাকে (vitamin) ছাঁটা চালে তাহা [illegible]

ইহা স্বাস্থ্যরক্ষার অন্তরায়। বেরিবেরি প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব কালে ইতর প্রাণীকে এই দু'প্রকারের চাল দিয়া দেখা গিয়াছে যে, ছাঁটা চাল খাওয়ায় তাহাদিগকে রোগে ধরিয়াছে। সুতরাং ধব্‌ধবে পরিষ্কার চাল খাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। চাল থেকে প্রস্তুত জলখাবার যথা—খৈ, চিড়ে, মুড়ি। এই তিনটীই বেশ সুপথ্য। মুড়ি শ্রমজীবিদের দু'বেলাকার খাদ্য—ইহা সুপাচ্য ও ভাতের চেয়ে সারবান্, অথচ অল্প মূল্যে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাতে সব রকমের সার পদার্থ নাই, তাই ইহার সঙ্গে ছোলা বা মটর এবং নারিকেল মিলাইয়া খাইবে। এই তিনের সমন্বয়ে অতি উত্তম খাদ্য হয়। ছোলা বা মটর, ডালের কাজ করে অর্থাৎ ছানা জাতীয় জিনিসের অভাব পূর্ণ করে। নারিকেল অতিশয় স্নেহযুক্ত জিনিস, ইহা মাখন জাতীয় জিনিসের কাজ করে।

ময়দা—ময়দার রুটী ভাতের দ্বিগুণ সারবান, কারণ নাইট্রোজেন ময়দায় শতকরা ১০ ভাগ আর ভাতে ৫ ভাগ। কলে পেষা সূক্ষ্ম ময়দার ছানা ও ভুষি বাদ যাওয়াতে ইহার সারভাগ কমিয়া যায়। তাই আটার রুটী খাইবে। জাঁতা-ভাঙা খাঁটি আটা কিনিবে—অনেক সময়ে ভুষি মিশানো ময়দা আটা বলিয়া চালানো হয়। আটার রুটী স্বাদু ও উপকারী এবং কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করে। হাতে গড়া রুটী ভালরূপে তৈরী না হইলে তাহার শ্বেতসার পদার্থ ভালরূপে অগ্নিপক্ক হয় না, ইহাতে হজমের ব্যাঘাত করে। ভাল সেঁক দেওয়া পাঁউরুটিতে এবং লুচিতে এই দোষ থাকিয়া যাইবার ভয় নাই, সুতরাং এ দুটীও ভাল খাদ্য এবং সুপাচ্য। কিন্তু লুচি বেশী ঘৃতযুক্ত হইলে বেহজমী হয়, ইহা স্থূলদেহ লোকদের অনুপযুক্ত।

ডাল—মসূরীর ডাল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহাতে ছানা শতকরা ২৫ ভাগ আছে। মুগ ও ও ছোলায় ইহা অপেক্ষা সার ভাগ অল্প। মুগের ডাল অতি উত্তম। অড়হর ডালের ব্যবহার পশ্চিমে খুব চলিত আছে। ইহাতে ছানা জাতীয় অংশ অপেক্ষাকৃত কম আছে বটে, কিন্তু তেমনি তাহা উদর অল্পায়াসে আত্মসাৎ করিতে পারে।

দুধ—ভাল দুধ প্রকৃতিদত্ত আদর্শ খাদ্য কিন্তু ইহা খাঁটি অবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া দুষ্কর। ভেজাল ধরাও অনেক সময় মুস্কিল হয়। সজল দুধের আপেক্ষিক গুরুত্ব খাঁটি দুধের সমান করিবার জন্য তাহাতে কিছু চিনি ফেলিয়া ব্যবসায়ী লোকে ক্রেতার চোখে ধূলা দেয়।

দই—ইহা দুধের বিকার হইলেও দুধের অন্য সকল উপাদান ইহাতে আছে, কেবল চিনি নাই। দইয়ের মধ্যে যে কীটাণুর ক্রিয়ার দুধ হইতে দই প্রস্তুত হয়, তাহারা জঠরের অনিষ্টকর বীজাণু মারিয়া ফেলে। অন্ত্রস্থ এই সকল বীজাণুই রক্ত বিষাক্ত করে ও অকাল-বার্দ্ধক্যের হেতু হয়। যাহাদের বাড়ীতে দুধের অভাব নাই তাদের দুধের কিছু অংশ দইয়ের আকারে খাওয়া ভাল। ঘোল বিশেষ উপকারী। ইহা সরবতের ন্যায় পানীয়। সকালে খাবারের পর খাইলে বিশেষ উপকার হয়। আজকাল রোগীকে ঘোল খাওয়ানো হয়।

ছানা—ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট সারবান খাদ্য। মাছ ও মাংসে যে ছানা জাতীয় পদার্থ থাকে, অনেক সময়ে তাহা দূষিত হয়। কিন্তু ছানায় এই দোষ ঘটে না।

মাংস—ইহা সুপাচ্য ও পুষ্টিকর বটে, কিন্তু বিকৃত হইলে পরম অনিষ্টকর। খাদ্য

পশুটির নীরোগ হওয়া দরকার, বড় বড় সহরে ইহা পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা আছে। বেশী মাংস খাইলে শরীরে ইয়ুরিক এসিড জন্মাইয়া বাত প্রভৃতি রোগ ঘটে। তাই য়ুরোপীয়দের এই রোগ অতি প্রবল। তা ছাড়া "টোমেন্" নামক এক প্রকার তীব্র বিষ অনেক সময়ে অল্প পচা মাংসেও জন্মে। এই প্রকার মাংস আহার করা ভয়ানক বিপজ্জনক।

ডিম—অতি সারবান খাদ্য। ইহাতে ছানা প্রায় ১৪ ভাগ, মাখন ১৮ ভাগ আছে। ইহা পূরা সিদ্ধ করিয়া খাইলে হজম হইতে প্রায় তিন ঘণ্টা লাগে। অর্দ্ধসিদ্ধ ডিম দেড় ঘণ্টায় হজম হয়।

মাছ—ইহা পুষ্টিকর খাদ্য। কিন্তু বেশী তৈলযুক্ত মাছ হজমের পক্ষে বিঘ্নকর ও উত্তেজনাজনক হয়। পচিবার উপক্রম হইলে সে মাছ পরিত্যাজ্য।

ঘৃত, তৈল—এই দুটী দেহের অত্যন্ত আবশ্যকীয় খাদ্য সামগ্রী। কিন্তু ঘৃতে অনেক বীভৎস ও অপথ্য পদার্থের ভেজাল থাকে এবং তাহা মহার্ঘ। ঘৃতের অভাব খাঁটী তেলে পূরণ করা যায়। মান্দ্রাজ তিল তৈল এবং নারিকেল তৈল ঘিয়ের বদলে ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া চিনি বাদামের তেলও ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই সব তেল অনিষ্টকর নহে এবং ঘিয়ের চেয়ে অল্প একটু নিকৃষ্ট হইলেও ইহা ব্যবহার্য্য।

তরিতরকারী—উহার মধ্যে আলু সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও মুখরোচক তরকারী। ইহাতে জল ৮০ ভাগ আর শ্বেতসার ২০ ভাগ। খোসা ছাড়াইয়া খাইলে ইহার সার ভাগ অনেকটা কমিয়া যায়। আলু সিদ্ধ হইবার পর তাহার খোসা তুলিয়া লইলে সারভাগ এত নষ্ট না। অধিকাংশ তরিতরকারীতেই জল-ভাগ খুব বেশী। কিন্তু তরকারী শরীর পোষণের জন্য প্রয়োজনীয়, কারণ ইহাতে যে লাবণিক পদার্থ আছে, তাহা রক্ত পরিষ্কার করে। ফলেও সেই উপকার হয়। তরিতরকারী কোষ্ঠবদ্ধতার নিবারক। রাঙ্গা আলুতে চিনি জাতীয় পদার্থ ও শ্বেতসার থাকাতে বেশ উপকারী খাদ্য। কড়াইসুঁটি, বরবটি, সিম প্রভৃতি সুঁটিজাতীয় তরকারী ডালের মতই উপকারী। কাঁঠালের বীজে ছানা জাতীয় পদার্থ যথেষ্ট আছে—এই হিসাবে ইহা গমের চেয়েও সারবান।

চিনাবাদাম—এখানে চিনাবাদামের চাষ হইতেছে শুনিয়া সুখী হইলাম। ইহার চাষ আরও বেশী পরিমাণে করিলে ছেলেদের জলখাবারের জন্য ইহার ব্যবহার হইতে পারে। চিনাবাদাম অধিক খাইলে ইহার তৈল জাতীয় জিনিষটা অপকার করে। ইহাতে ছানা পদার্থ শতকরা ২৬ ভাগ ও তৈল পদার্থ ৪৩ ভাগ আছে।

উপসংহারে বক্তব্য—আহার্য্য ধীরে ধীরে উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া খাইবে। পরিপাক যন্ত্রের কাজ মুখ হইতে আরম্ভ হয়। দাঁতকে তাহার কর্ত্তব্য সাধন করিতে দেওয়া চাই—খাবার অতি সূক্ষ্ম হইয়া উদরে যাওয়া প্রয়োজন এবং মুখের লালা উহার সহিত মিশ্রিত হওয়া দরকার। এই লালা খাদ্যের শ্বেতসারকে চিনিতে পরিণত করে।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৪র্থ বর্ষ।	বঙ্গাব্দ ১৩২৬—ফাল্গুন।	৬ষ্ঠ সংখ্যা।

শারীর বিদ্যা।

অস্থি পরিচয়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এল, এম, এস।

অস্থি ও অস্থির কার্য্য। শারীরতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে প্রথমে অস্থির বিষয় অবগত হওয়া আবশ্যক।—কেননা অস্থি সমূহকে অবলম্বন করিয়াই শরীর অবস্থিত আছে। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, "বৃক্ষ যেরূপ অভ্যন্তরস্থ সারকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে, দেহীদিগের দেহও সেইরূপ অস্থিসারকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। এই জন্য দেহীদিগের ত্বক্, মাংস প্রভৃতি শীঘ্র বিনষ্ট হইলেও সার স্বরূপ অস্থি সকল সহজে বিনাশ প্রাপ্ত হয় না।"*

অপিচ, অস্থি সকল মনুষ্যকে যথোচিত আকার বিশিষ্ট করে। অস্থি না থাকিলে মনুষ্যের আকার এরূপ হইত না, একটা কদাকার মাংসপিণ্ড হইয়া ভূমিতে গড়াইয়া বেড়াইত। শরীরাভ্যন্তরস্থ সুকোমল যন্ত্রগুলিও অস্থির আবরণে রক্ষিত হয়। যথা, মস্তকের অস্থি সকল শরীরের নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ মস্তিষ্ককে এবং বক্ষঃস্থলের অস্থি সকল হৃদয়, ফুস্ফুস্ প্রভৃতি যন্ত্রকে রক্ষা করে। সুতরাং শরীরের প্রধান যন্ত্রগুলিকে রক্ষা করা অস্থির অন্যতম কার্য্য। তদ্ভিন্ন অস্থি সংযুক্ত হইয়াই পেশী সমূহ শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমূহের নানা প্রকার গতি উৎপন্ন করে।

অস্থির উপাদান। অস্থি দুই প্রকার উপাদানে নির্ম্মিত—পার্থিব ও জান্তব। পার্থিব উপাদানের প্রায় সমস্ত অংশই চূণ।

---

* "অভ্যন্তরগতৈঃ সারৈর্যথা তিষ্ঠন্তি ভূরুহাঃ।
অস্থিসারৈস্তথা দেহা ধ্রিয়ন্তে দেহিনাং ধ্রুবম্।
তস্মাচ্চিরবিনষ্টেষু ত্বঙ্মাংসেষু শরীরিণাম্।
অস্থীনি ন বিনশ্যন্তি সারাণ্যেতানি দেহিনাম্॥"

সুশ্রুত, শারীরস্থান, ৫ অধ্যায়।

জান্তব উপাদানের অধিকাংশ শণের ন্যায় সূক্ষ্ম তন্তু বা স্নায়ু। স্নায়ু নির্ম্মিত কাটামোর মধ্যে পার্থিব উপাদান সংহত হইয়া অস্থি সমূহ গঠিত হয়।

উপাদানের দ্বিবিধ সংযোগ। অস্থির উপাদানের সংযোগ দুই প্রকার, যথা ঘনসংযোগ এবং সচ্ছিদ্র (ফোঁপরা) সংযোগ*। সমস্ত অস্থির বিশেষতঃ নলকাস্থির কাণ্ডের বহির্ভাগে ঘনসংযোগ দেখা যায়। ক্ষুদ্র অস্থি সমূহের ও কপালাস্থির অভ্যন্তর ভাগে এবং নলকাস্থির প্রান্তভাগে সচ্ছিদ্র সংযোগ দৃষ্ট হয়।

বয়স ভেদে উপাদানের তারতম্য। বয়স ভেদে অস্থির উপাদানের যথেষ্ট তারতম্য ঘটে। কম বয়সে অস্থিতে জান্তব উপাদান অধিক থাকে। জান্তব উপাদান কোমল এবং সহজে ভাঙ্গে না। এইজন্য বাল্যকালে অস্থিতে আঘাত লাগিলে উহা শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যায় না, নত হইয়া যায়। ভাঙ্গিলেও কাঁচা গাছের ডালের মত অংশতঃ ভাঙ্গে এবং সহজে জোড়া লাগে। বয়স যত অধিক হয়, অস্থির জান্তব উপাদান ততই কমিয়া যায় এবং পার্থিব উপাদান বাড়িতে থাকে। ক্রমে বৃদ্ধবয়সে পার্থিব উপাদান অত্যন্ত অধিক এবং জান্তব উপাদান অত্যন্ত কম হইয়া যায়। পার্থিব উপাদান কঠিন, কিন্তু ভঙ্গ প্রবণ। এইজন্য বৃদ্ধ বয়সে অস্থিতে আঘাত লাগিলে উহা সহজেই ভাঙ্গিয়া যায় এবং ভাঙ্গিলে শীঘ্র জোড়া লাগে না।

পরে যে তরুণাস্থির বিষয় কথিত হইবে, তাহাতে জান্তব উপাদানই অধিক থাকে। ভ্রূণশরীরে অস্থিসমূহ প্রথমে তরুণাস্থিরূপে উৎপন্ন হয়। পরে বয়োবৃদ্ধির সহিত পার্থিব উপাদানের সঞ্চয়ে উহা ক্রমে কঠিন অস্থিতে পরিণত হয়।

অস্থির আবরণ। বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে অস্থির আবরণ দুই প্রকার। তন্মধ্যে যে আবরণ অস্থির বহির্ভাগ আবৃত করিয়া থাকে, তাহাকে **অস্থিধরা কলা**† বলা যায়। ইহা অস্থির জীবন স্বরূপ; কারণ, এই ঝিল্লী বা পর্দা আহত হইলে সেই অস্থি বা অস্থির সেই অংশ নষ্ট হইয়া যায়। আর অস্থির যে আবরণ অস্থির ভিতরে মধ্যবর্ত্তী ছিদ্রপথকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করে, তাহাকে আভ্যন্তর আবরণ বলা যায়। অস্থির ছিদ্রমধ্যে মজ্জা থাকে বলিয়া উক্ত আবরণের নাম **মজ্জধরা কলা।**

অস্থির মধ্যে যে মজ্জা থাকে তাহা দুই প্রকার,—এক প্রকার রক্তবর্ণ, অন্য প্রকার পীতবর্ণ। দীর্ঘ অস্থিসমূহের নলকাংশের মধ্যে পীতবর্ণ মজ্জা থাকে। দীর্ঘ অস্থির উভয় প্রান্তে, ক্ষুদ্র অস্থির ভিতরে এবং অন্যান্য অস্থির স্পঞ্জের ন্যায় বহুচ্ছিদ্র বিশিষ্ট অংশে রক্তবর্ণ মজ্জা থাকে।

অস্থির প্রকার ভেদ। শরীরের যেখানে যেরূপ আবশ্যক, অস্থি সকল সেইস্থানে সেইরূপ আকারে অবস্থিত। সুশ্রুত মতে—আকার ভেদে অস্থি সকল পাঁচ ভাগে

---

* ঘন সংযোগ—Compact tissue—(কম্‌প্যাক্ট টিস্)। সচ্ছিদ্র সংযোগ—Cancellous tissue—(ক্যানসেলাস্ টিস্)।

† অস্থিধরা কলা—Periosteum—(পেরিয়সটিয়ম্)।

বিভক্ত; যথা—কপাল, রুচক, তরুণ, বলয় এবং নলক। কপালের (খাপরার) ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট বলিয়া মস্তকের অস্থিগুলিকে **কপালাস্থি** বলে। রুচক অর্থাৎ চিরুণীর দাঁতের ন্যায় বলিয়া দন্তগুলিকে **রুচকাস্থি** বলে। অস্থির তরুণ অবস্থার ন্যায় (ভ্রূণশরীরে যেরূপ থাকে সেইরূপ) আকৃতি বিশিষ্ট বলিয়া নাসিকা, কর্ণ প্রভৃতি স্থানের কোমল অস্থিকে **তরুণাস্থি** বলে। বলয় অর্থাৎ প্রায় বালার ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট বলিয়া পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও বক্ষঃস্থলের অস্থিকে **বলয়াস্থি** বলে। নলের ন্যায় দীর্ঘাকৃতি বলিয়া বাহু, সক্থি ও অঙ্গুলির অস্থিগুলিকে **নলকাস্থি** বলে।

এই সকল অস্থি ব্যতীত এরূপ কতকগুলি ক্ষুদ্র অস্থি আছে যে গুলিকে এই পাঁচ প্রকার অস্থির অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। ইহাদিগকে **বিষমাস্থি** বলিতে পারা যায় *। হস্ত, পদাদির সন্ধিস্থলে এইরূপ কয়েকটী অস্থি আছে।

অস্থির সংখ্যা—চরক, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি বেদবাদীদিগের মতে অস্থির সংখ্যা তিনশত ষাট। সুশ্রুত, ভেল প্রভৃতি শল্যতান্ত্রিকদিগের মতে অস্থির সংখ্যা তিন শত। পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগের মতে অস্থির সংখ্যা দুই শত বা দুই শত ছয়।

অস্থিসংখ্যা সম্বন্ধে পরস্পরের মত এইরূপ ভিন্ন বা বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইলেও প্রকৃত পক্ষে সকল মতই সমীচীন; কেন না এইরূপ মতভেদ দুইটী কারণে ঘটিয়া থকে। প্রথম কারণ—গণনার প্রকার ভেদ। তরুণ অস্থি, নখ ও দন্ত সমূহকে চরকাদির মতে অস্থি বলিয়া গণনা করা হয়। সুশ্রুতাদি শল্যতান্ত্রিকগণ তরুণ অস্থি এবং দন্ত সকলকে অস্থি বলিয়া গণনা করেন, কিন্তু নখের গণনা করেন না। পাশ্চাত্যগণ তরুণাস্থি, নখ ও দন্ত সমূহকে অস্থি বলিয়া গণনা করেন না।

দ্বিতীয় কারণ—পৃথক্ বয়সে অস্থি গণনা। এই জন্যও অনেকটা মতভেদ ঘটে। এতদ্দেশীয় শাস্ত্রকারগণ যৌবনের আরম্ভে অস্থির গণনা করিয়া থাকেন, কিন্তু পাশ্চাত্যগণ পঁচিশ বৎসর বয়স্ক অথবা প্রৌঢ় ব্যক্তির শরীরের অস্থি গণনা করিয়া থাকেন। বাল্যকালে বা যৌবনের আরম্ভে কতকগুলি অস্থির অবয়ব পৃথক্ থাকে, কিন্তু প্রৌঢ় বয়সে সেইগুলি পরস্পর সংযুক্ত হইয়া এক একখানি অস্থিতে পরিণত হয়। এই জন্যও সংখ্যার পার্থক্য ঘটে।

আমরা প্রৌঢ় শরীরে প্রত্যক্ষদৃষ্ট অস্থির সংখ্যা ধরিয়া অস্থির বর্ণনা করিব। তরুণাস্থি, দন্ত ও নখের সংখ্যা ইহার মধ্যে ধরা হইবে না, কারণ তরুণাস্থি সমূহের সংখ্যা কণ্ঠনালী (শ্বাসপথ) প্রভৃতি অনেক স্থানে অনিশ্চিত এবং উৎপত্তিক্রম ধরিয়া বিচার করিলে নখ ও দন্ত সকল ত্বকেরই কঠিন পরিণতি মাত্র।

অস্থি গণনা।

শাখাস্থি—প্রত্যেক পদের এক এক অঙ্গুলিতে তিন তিন খানি এবং পাদাঙ্গুষ্ঠে

* নলকাস্থি—Long bones (লং বোন্‌স)। কপালাস্থি—Flat bones (ফ্লাট বোন্‌স)। তরুণাস্থি—Cartilage (কার্টিলেজ)। বিষমাস্থি—Irregular bones—(ইরেগুলার বোন্‌স)।

দুইখানি—এইরূপে পদাঙ্গুলি সমূহে মোট চৌদ্দখানি এবং পাঁচটী পদাঙ্গুলির মূলে পাঁচখানি অস্থি আছে। পদের পশ্চাদ্ভাগে অর্থাৎ জঙ্ঘা ও পদের সন্ধির নিম্নে সাতখানি ছোট ছোট অস্থি আছে। জঙ্ঘায় দুই খানি, উরুতে একখানি এবং উরু ও জঙ্ঘার সন্ধিস্থলে জানুতে একখানি অস্থি আছে। এইরূপে প্রত্যেক সক্‌থিতে ত্রিশখানি করিয়া দুই সক্‌থিতে মোট ষাটখানি অস্থি আছে।

পদাঙ্গুলির ন্যায় হস্তের অঙ্গুলি সমূহে চৌদ্দ খানি এবং প্রত্যেক অঙ্গুলির মূলে একখানি করিয়া পাঁচখানি শলাকা-অস্থি আছে। উহাদের পশ্চাদ্ভাগে অর্থাৎ মণিবন্ধসন্ধির নিম্নে ক্ষুদ্রাকার আট খানি, এবং প্রকোষ্ঠে (নীচে হাতে) দুইখানি ও প্রগণ্ডে (উপর হাতে) একখানি দীর্ঘাকার অস্থি আছে। এইরূপে প্রত্যেক বাহুতে ত্রিশ খানি করিয়া দুই বাহুতেও মোট ষাট খানি অস্থি আছে।

মধ্যশরীরের অস্থি—কণ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া কটিদেশ পর্য্যন্ত পৃষ্ঠবংশে (মেরুদণ্ডে) চব্বিশ খানি অস্থি আছে এবং তাহার নিম্নে অর্থাৎ কটীর পশ্চাদ্ভাগে একখানি বৃহত্তর অস্থি আছে। এই বৃহত্তর অস্থির নিম্নে একখানি ক্ষুদ্র অস্থি আছে; সুতরাং পৃষ্ঠবংশের অস্থির সংখ্যা মোট ছাব্বিশ খানি।

কটীর সম্মুখ ও পার্শ্বভাগ—দুই দিক জুড়িয়া দুই খানি, বৃহৎ কপালাস্থি আছে।

বক্ষঃস্থলের মধ্যভাগে একখানি, কণ্ঠের দুই দিকে দুই খানি, স্কন্ধের পশ্চাদ্ভাগে পৃষ্ঠের উপর দুই দিকে দুই খানি এবং পার্শ্বদেশে (পাঁজরায়) প্রত্যেক দিকে বার খানি করিয়া দুই দিকে চব্বিশ খানি অস্থি আছে। এইরূপে মধ্য শরীরে আটান্ন খানি অস্থি গণনা করা যায়।

মস্তকের অস্থি—নীচের চোয়ালে একখানি, উপরের চোয়ালে দুইখানি, দুইগণ্ডে দুইখানি, তালুতে দুইখানি, দুই নাসিকায় দুইখানি, নাসিকাদ্বয়ের মধ্যস্থলে একখানি, দুই নাসিকার ভিতরে দুই পার্শ্বে দুইখানি, দুই চক্ষুর দুই পার্শ্বে দুইখানি—এইরূপে চৌদ্দখানি অস্থি মস্তকের নিম্নভাগ বা মুখমণ্ডল নির্ম্মাণ করে। মস্তকের উপরিভাগে সম্মুখে একখানি, পশ্চাতে একখানি, দুই পার্শ্বে দুইখানি, দুই শঙ্খদেশে (রগে) দুইখানি-এইরূপ ৪ খানি কপালাস্থি এবং নাসিকাদ্বয়ের ঊর্দ্ধদেশে মধ্যস্থলে একখানি এবং এই সব অস্থিগুলির মধ্যস্থলে গলার ছাদ জুড়িয়া একখানি অস্থি আছে। এইরূপে মস্তকের অস্থির সংখ্যা বাইশখানি।

এতদ্ভিন্ন কর্ণের ছিদ্রের মধ্যে প্রত্যেক কর্ণে তিনখানি করিয়া দুই কর্ণে ছয়খানি ক্ষুদ্র অস্থি আছে। এই ছয়খানি অস্থি গণনা করিলে মস্তকের অস্থির সংখ্যা আটাশখানি হয়। সুতরাং এই হিসাবে সমগ্র শরীরের অস্থির সংখ্যা দুই শত ছয়খানি। কর্ণমধ্যস্থ ছয়খানি অস্থি গণনা না করিলে সমগ্র শরীরের অস্থির সংখ্যা দুই শত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

অনেকের হস্তপদাদির কণ্ডরার শেষভাগে ছোলার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি দেখা যায়। কিন্তু এই সকল অস্থির অস্তিত্ব অনিশ্চিত বলিয়া উহাদের সংখ্যা গণনা করা হয় না।

তরুণাস্থি—(Cartilage—কার্টি

লেজ)—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে তরুণ অস্থির সংখ্যা অস্থিগণনার মধ্যে ধরা হইবে না। দিগ্‌দর্শনের জন্য সংক্ষেপে তরুণ অস্থির বিষয় কথিত হইতেছে। হস্ত দ্বারা কর্ণপালি বা নাসিকার অগ্রভাগ টিপিলে ভিতরে যে একটা নাতিকঠিন পদার্থ অনুভব করা যায়, উহাই তরুণাস্থি। পৃষ্ঠবংশের অস্থিগুলির সংযোগ স্থলে, সচল সন্ধি সমূহের ভিতরে, পশু‍র্কাগুলির সম্মুখ ভাগে, নাসিকার দুই-পার্শ্বে ও মধ্যস্থলে, কর্ণপালীতে, শ্বাসনলীতে এবং উহার শাখা প্রশাখাসমূহে তরুণাস্থি দেখা যায়। চলিত কথায় তরুণাস্থিকে কুচ্‌-কুচে হাড় বলে। তরুণাস্থিতে স্নায়ুভাগ অধিক এবং চুণের ভাগ অল্প থাকে। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে অনেক তরুণাস্থি চুণের ভাগ অধিক হওয়ায় কঠিন হইয়া যায়।

অস্থিপোষণ—প্রত্যেক অস্থির বহির্ভাগে একটী বা একাধিক ছিদ্র দেখা যায়। ধমনী সকল ঐ ছিদ্রের মধ্যে দিয়া অস্থির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং বহু সূক্ষ্ম শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট হইয়া অস্থির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম প্রদেশে বিস্তৃত হয়। এই সকল ধমনী দ্বারা বিশুদ্ধ রক্ত আসিয়া সমগ্র অস্থির পোষণ করে। সিরা সকলও সূক্ষ্ম শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত থাকিয়া অস্থির ভিতরে বিস্তৃত থাকে, ক্রমশঃ পরস্পর মিলিত হইয়া স্থূলতর সিরারূপে অস্থির ছিদ্র দিয়া বহির্গত হইয়া যায়। এই সকল সিরা দ্বারা অবিশুদ্ধ রক্ত নির্গত হয়। ধমনীর রক্ত কোথা হইতে আসে এবং সিরার রক্ত কোথায় যায়—তাহা পরে বলা যাইবে।

অস্থি বর্ণনা।

ভিন্ন ভিন্ন অস্থির আকৃতি, সন্ধি, কার্য্য এবং পেশীর সহিত সংযোগ প্রভৃতি বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিতে হইলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। অথচ এইরূপ বিস্তৃত বর্ণনা সাধারণ পাঠক এবং কায়-চিকিৎসক-দিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইবে না। এইজন্য আমরা এস্থলে সংক্ষেপে ভিন্ন ভিন্ন অস্থির বিষয় বর্ণনা করিব। প্রাচীন মতের অনুসরণ করিয়া প্রথমে পায়ের দিক হইতেই অস্থির বর্ণনা করা যাইতেছে।

বর্ণনা বুঝিবার সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত কথাগুলি স্মরণ রাখা আবশ্যক।

একটি নরকঙ্কাল দুইটি হাত চিৎ করিয়া সোজা দাঁড়াইয়া আছে—ধরিয়া লইতে হইবে। উক্ত কঙ্কালের নাসিকাগ্র হইতে নাভির অনুক্রমে নীচে উপরে বিস্তৃত একটী সরল রেখা টানিলে, সেই রেখা মধ্যরেখা নামে অভিহিত হয়। শরীরের যে অংশ এই মধ্যরেখার সমীপবর্ত্তী তাহা অন্তঃসীমা এবং যে অংশ দূরবর্ত্তী তাহা বহিঃসীমা বলিয়া কথিত হইবে। উর্দ্ধভাগ বলিলে পদ হইতে মস্তকের দিকে এবং অধোভাগ বলিলে মস্তক হইতে পদের দিকে বুঝিতে হইবে। সম্মুখ-ভাগ বলিলে বর্ণিত নরকঙ্কালের সম্মুখ ভাগ (যেমন করের সম্মুখ ভাগ বলিলে রেখাঙ্কিত ভাগ ও পশ্চাদ্ভাগ বলিলে তাহার বিপরীত ভাগ বুঝাইবে।

শাখাস্থি।

পাদাঙ্গুলির অস্থি।—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে-যে, প্রত্যেক পাদাঙ্গুলিতে তিন-খানি করিয়া এবং পাদাঙ্গুষ্ঠে দুইখানি করিয়া অস্থি আছে। এই সকল অস্থিকে অঙ্গুলি-অস্থি* বলা যায়। অঙ্গুলিঅস্থি সকল

* ইং—Phalanges—ফ্যালাঞ্জেস্।

স্থানভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—অগ্রিম, মধ্যম এবং পশ্চিম শ্রেণী। অগ্রিম শ্রেণী অর্থাৎ সম্মুখভাগে নখসংযুক্ত যে সকল অস্থি আছে উহারা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং উহাদের অগ্রভাগ নখধারণের জন্য আয়ত। ইহাদের পশ্চাদ্‌ভাগ মধ্যম শ্রেণীর অস্থির সহিত সম্বদ্ধ। কিন্তু অঙ্গুষ্ঠে মধ্যম শ্রেণীর অস্থি না থাকায় উহার অগ্রিম অস্থির পশ্চাদ্‌ভাগ পশ্চিম শ্রেণীর অস্থির অগ্রভাগের সহিত সম্বদ্ধ। মধ্যম শ্রেণীর চারিখানি অস্থির সম্মুখভাগ অগ্রিম শ্রেণীর অস্থির পশ্চাদ্‌ভাগের সহিত সম্বদ্ধ এবং পশ্চাদ্‌ভাগ পশ্চিম শ্রেণীর অস্থির অগ্রভাগের সহিত সম্বদ্ধ। এইরূপ পশ্চিম শ্রেণীর অস্থির সম্মুখভাগ মধ্যম শ্রেণীর অস্থির পশ্চাদ্‌ভাগের সহিত এবং পশ্চাদ্‌ভাগ মূলশলাকাগুলির সহিত সম্বদ্ধ।

পাদাঙ্গুলিনলকের পশ্চাতে পাঁচ খানি **মূলশলাকা*** নামক নলকাস্থি আছে। ইহারা যথাক্রমে পাদাঙ্গুষ্ঠমূলশলাকা, তর্জ্জনী-মূলশলাকা, মধ্যমামূলশলাকা, অনামিকামূল-শলাকা ও কনিষ্ঠামূলশলাকা নামে অভিহিত।

তন্মধ্যে তর্জ্জনীমূলশলাকা সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ এবং অঙ্গুষ্ঠমূলশলাকা সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল ও হ্রস্ব। ইহাদের সম্মুখভাগ পশ্চিম অঙ্গুলি নলকের সহিত সংহিত। মূলশলাকাগুলির পশ্চাতে সাতখানি বিষমাকার **কূর্চ্চাস্থি†** আছে। সেই অস্থিগুলি পদের পশ্চাদ্‌ভাগ নির্ম্মাণ করে এবং কূর্চ্চাস্থি নামে অভিহিত। সাতখানি কূর্চ্চাস্থির নাম, যথা, **কূর্চ্চশির, পার্ষ্ণি, সৌমিত্ত, ঘন, বহিঃ**

* ইং—Metatarsals—মেটাটার্স্যাল্‌স্।

† ইং—Tarsals—টার্স্যাল্‌স্।

[দ্বিতীয় চিত্র]।

পাদাস্থি।

নিম্নে অর্দ্ধ চন্দ্রাকার রেখার মধ্যে অঙ্গুলি নলক, তদুপরি মূলশলাকা, এবং তদুপরি সাতখানি কূর্চ্চাস্থি দ্রষ্টব্য। কূর্চ্চাস্থি যথা ;—

(১) ১—অন্তঃকোণক। (২) ২—মধ্য কোণক। (৩) ৩—বহিঃ কোণক। (৪) —৪ ঘন। (৫) ৫—সৌমিত্ত। (৬) ৬—পার্ষ্ণি। (৭) ৭—কূর্চ্চ শির।

"টী" (পে) চিহ্নিত স্থান পেশীর নিবেশ স্থল বুঝিতে হইবে।

কোণক, মধ্যকোণক ও অন্তঃকোণক। ইহাদের মধ্যে শেষের চারিখানি অস্থির সম্মুখভাগের সহিত মূলশলাকাগুলির পশ্চাদ্ভাগ সংহিত হইয়া থাকে।

কূর্চ্চশির—নামক অস্থি সমস্ত কূর্চ্চাস্থির শীর্ষদেশে অবস্থিত। ইহার গোলাকার মুণ্ড ও পার্শ্বদ্বয় জঙ্ঘার অস্থিদ্বয়ের অধোভাগের সহিত এবং নিম্নভাগ সম্মুখদিকে নৌনিভ নামক অস্থির সহিত ও পশ্চাদ্ভাগে পার্ষ্ণি নামক অস্থির সহিত সম্বদ্ধ।

পার্ষ্ণি—নামক অস্থি কূর্চ্চাস্থি সমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই অস্থি দ্বারা পার্ষ্ণি বা গোড়ালি নির্ম্মিত হয় এবং ইহার উপর সমস্ত শরীরের ভার পড়ে। পার্ষ্ণির ঊর্দ্ধভাগ কূর্চ্চশির নামক অস্থির সহিত এবং সম্মুখভাগ ঘন নামক অস্থির সহিত সম্বদ্ধ।

নৌনিভ—নামক অস্থি অনেকটা নৌকার ন্যায় আকার বিশিষ্ট। ইহার সম্মুখভাগ কোণক নামক তিনখানি কূর্চ্চাস্থির সহিত, পশ্চাদ্ভাগ কূর্চ্চশির নামক অস্থির সম্মুখের সহিত এবং বহিঃপার্শ্ব ঘন নামক অস্থির সহিত সম্বদ্ধ।

ঘন—নামক কূর্চ্চাস্থি পদের বহিঃসীমায় অবস্থিত। এই অস্থির সম্মুখভাগ কনিষ্ঠা ও অনামিকার মূলশলাকার পশ্চাদ্ভাগের সহিত সম্বদ্ধ।

অন্তঃকোণক—নামক কূর্চ্চাস্থি ত্রিকোণ প্রায় এবং ইহার সম্মুখভাগ অঙ্গুষ্ঠমূলশলাকার পশ্চাদ্ভাগের সহিত সম্বদ্ধ।

মধ্যকোণক—নামক কূর্চ্চাস্থি প্রায় ত্রিকোণাকার এবং ক্ষুদ্রতম। ইহার সম্মুখভাগ তর্জ্জনীমূলশলাকার পশ্চাদ্ভাগের সহিত সম্বদ্ধ।

বহিঃকোণক—নামক কূর্চ্চাস্থি প্রায় ত্রিকোণ। ইহার সম্মুখভাগ মধ্যমামূলশলাকার পশ্চাদ্ভাগের সহিত সম্বদ্ধ।

অন্তঃকোণক, মধ্যকোণক এবং বহিঃকোণক এই তিন খানি অস্থি কোণত্রয় নামে অভিহিত। কূর্চ্চাস্থিগুলি সম্মুখে, পশ্চাতে এবং পার্শ্বে পরস্পর দৃঢ়ভাবে সম্বদ্ধ। বাহুল্য ভয়ে উহাদের সন্ধির বিষয় বিস্তারিত রূপে লিখিত হইল না। দ্বিতীয় চিত্র দেখিলে উহাদের সংস্থান বোধগম্য হইবে।

জঙ্ঘাস্থি (তৃতীয় চিত্র)* —জঙ্ঘার দুইখানি অস্থির মধ্যে স্থূলতর অস্থিখানিকে জঙ্ঘাস্থি বলে। ইহা ঊরুর অস্থি ব্যতীত শরীরের অন্যান্য নলকাস্থি অপেক্ষা দীর্ঘ ও স্থূল। দুই প্রান্ত এবং মধ্যনলক ভেদে সকল নলকাস্থির ন্যায় ইহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। ইহার ঊর্দ্ধপ্রান্ত উপরিভাগে ঊর্ব্বস্থির অধঃপ্রান্তস্থ কন্দদ্বয়ের সহিত এবং সম্মুখে জান্বস্থির সহিত সংহিত হয়। ইহারই পশ্চাদ্ভাগে বহির্দ্দিকে অনুজঙ্ঘাস্থির ঊর্দ্ধপ্রান্ত সংলগ্ন হইয়া থাকে। ঊর্দ্ধপ্রান্তের দুইদিকে দুইটী উৎসেধ এবং উহাদের মধ্যস্থলে একটী দ্বিমুখ কণ্টক আছে।

জঙ্ঘাস্থির অধঃপ্রান্ত—ঊর্দ্ধপ্রান্ত অপেক্ষা ছোট। ইহার পার্শ্বভাগের ত্রিকোণাকার অংশের সহিত অনুজঙ্ঘাস্থির অধঃপ্রান্ত এবং নিম্নভাগের খাঁজের সহিত কূর্চ্চশির অস্থি সংহিত থাকে। অধঃপ্রান্তের ভিতরদিকে যে উন্নত প্রদেশ আছে তাহাকে অন্তর্গুল্ফ বা ভিতরদিকে গাঁট বলে। উহার সহিত

* ইং—Tibia—টিবিয়া।

[তৃতীয় চিত্র]

জঙ্ঘাস্থি ও অনুজঙ্ঘাস্থি।

(১-২) ২—দুইটী উৎসেধ। (সং, সং) সং, সং—উর্ব্বস্থির অধঃপ্রান্তের সহিত সন্ধির স্থান। (ক) ক—সন্ধিচিহ্ন মধ্যস্থ দ্বিমুখ কণ্টক। (৩) ৩—জানু-কপাল বন্ধনী পেশীর সংযোগস্থল। (৪) ৪—অনু-জঙ্ঘাস্থির উর্দ্ধপ্রান্তের সহিত সন্ধিস্থল। (৫) ৫—জঙ্ঘাস্থিদ্বয়ের অধঃপ্রান্তের সন্ধির স্থান। (৬) ৬—কূর্চ্চশির অস্থির সহিত সন্ধির স্থান। (৭) ৭—কূর্চ্চশিরের বহিঃসীমার সহিত সন্ধির স্থান।

অনুজঙ্ঘাস্থি—(৪) ৪—জঙ্ঘাস্থির উর্দ্ধপ্রান্তের সহিত সন্ধির স্থান। (৮) ৮—পরিবর্ত্তনী স্নায়ুর সংযোগস্থল।

(দ্র) 'পে' চিহ্নিত স্থানগুলি পেশীর সংযোগস্থল।

কূর্চ্চশির নামক অস্থির বহিঃসীমা সংযুক্ত হয়। জঙ্ঘাস্থির মধ্যনলক বা কাণ্ড ঈষৎ বক্রাকার। ইহার সহিত কোন অস্থির সন্ধি নাই, কিন্তু ইহাতে অনেক পেশী ও জঙ্ঘান্তরালা কলা সম্বন্ধ থাকে। পেশীর বিষয় পরে বিস্তারিত ভাবে বলা যাইবে।

অনুজঙ্ঘাস্থি (তৃতীয় চিত্র)।—ইহা দেখিতে দীর্ঘ যষ্টির মত এবং জঙ্ঘাস্থির ন্যায় উর্দ্ধ প্রান্ত, অধঃপ্রান্ত এবং মধ্যনলক—এই তিন ভাগে বিভক্ত। ইহার উর্দ্ধপ্রান্ত জঙ্ঘাস্থিমুণ্ডের পশ্চাদ্ভাগের সহিত এবং অধঃপ্রান্তের ভিতর দিক জঙ্ঘাস্থির অধঃপ্রান্তের পার্শ্ব ভাগের সহিত ও কূর্চ্চশির নামক অস্থির সহিত সংহিত। এই প্রান্ত উৎসেধ বিশিষ্ট এবং সেই উৎসেধ বহির্গুল্ফ (গাঁট) নামে অভিহিত। ইহার মধ্যনলকের সহিত আটটী পেশী সংযুক্ত থাকে।

[চতুর্থ চিত্র]

জান্বস্থি।

*ইং—Fibula—ফিবুলা।

(সং) সং—সন্ধিচিহ্ন । এই চিহ্নের উর্দ্ধভাগ উর্ব্বস্থির নিম্ন প্রান্তের সম্মুখভাগের সহিত সংহিত হয় ।
(পে) 'পে' চিহ্নিত স্থানগুলি পেশী সংযোগ স্থল ।

জান্বস্থি* (মালুইচাকি) —ইহা প্রায় গোলাকার কপালাস্থি । ইহার পশ্চাদ্ভাগের উর্দ্ধাংশ উরুর অস্থির সহিত এবং নিম্নাংশ জঙ্ঘার সহিত সংহিত হয় । (চতুর্থ চিত্র)

উর্ব্বস্থি† –(পঞ্চম চিত্র) ইহা সমস্ত নলকাস্থি অপেক্ষা বৃহৎ, দৃঢ়, বহুভারসহ, এবং মধ্যস্থলে বাঁশের ন্যায় গোলাকার ও ঈষৎ বক্র । ইহাও উর্দ্ধপ্রান্ত, অধঃপ্রান্ত এবং মধ্যনলক এই তিন ভাগে বিভক্ত ।

ইহার উর্দ্ধপ্রান্তে গোলাকার মুণ্ড, মুণ্ডের নিম্নে গ্রীবা এবং তন্নিম্নে একদিকে মহাশিখরক ও অন্যদিকে লঘুশিখরক নামক দুইটী উৎসেধ আছে । তন্মধ্যে মুণ্ড শ্রোণিফলক নামক অস্থির গভীর কোটর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উহার সহিত সন্ধিযুক্ত হয় । ইহার গ্রীবা সাধারণতঃ তির্য্যক্‌ভাবে অবস্থিত, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে মধ্যনলকের সহিত প্রায় সমকোণ হইয়া যায় এবং ভঙ্গপ্রবণ হয় । মহাশিখরক এবং লঘুশিখরক নামক অংশদ্বয়ের সহিত বহুপেশী সংযুক্ত থাকে ।

উর্ব্বস্থির অধঃপ্রান্তে যে দুইটি কন্দ বা মহার্ব্বুদ আছে, উহারা জঙ্ঘাস্থির সহিত এবং উভয় কন্দের মধ্যবর্ত্তী ত্রিকোণাকার সম্মুখের অংশ জান্বস্থির সহিত সংহিত হয় ।

এক সক্থির ত্রিশখানি অস্থির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হইল । অপর সক্থিতেও অস্থির এইরূপ সন্নিবেশ আছে ।

[পঞ্চম চিত্র]

উর্ব্বস্থি ।

উর্দ্ধ প্রান্ত ।

পে
২　৫
১
'পে
২
পেও
৪
পে৪
বহিঃসীমা
অন্তঃসীমা
পে৬
পে৫
৬　সং　৭

অধঃপ্রান্ত

(১) ১—মুণ্ড । (২) ২—গ্রীবা । (৩) ৩—মহাশিখরক । (৪) ৪—লঘুশিখরক । (৫) ৫—মহাশিখরাশ্রিত কোটর । (৬, ৭) ৬, ৭—দুইটী কন্দ বা মহার্ব্বুদ ।
(সং) সং—জানু কপালের সহিত সন্ধিস্থান ।
'পে' চিহ্নিত স্থানগুলি পেশীর নিবেশ স্থল ।

* ইং—Patella—প্যাটেলা ।
† ইং—Femur—ফিমর্ ।

[ষষ্ঠ চিত্র]

করাস্থি।

নিম্নে অঙ্গুলিনলক, তদুপরি মূলশলাকা এবং তদুপরি কূর্চ্চাস্থি। সাতখানি কূর্চ্চাস্থি যথা,—(১) ১—নৌনিভক। (২) ২—অর্দ্ধচন্দ্র। (৩) ৩—উপলক। (৪) ৪—বর্ত্তুলক। (৫) ৫—পর্য্যাণক। (৬) ৬—কূটক। (৭) ৭—মধ্যকূট। (৮) ৮—ফণধর। (বি) পে—চিহ্নিত স্থানগুলি পেশীসংযোগস্থল।

করাস্থি—পাদাঙ্গুলির ন্যায় করাঙ্গুলিতেও চৌদ্দখানি অস্থি এবং তাহাদের পশ্চাদ্‌ভাগে পাঁচখানি মূলশলাকা আছে। উহাদের সন্নিবেশও পাদাঙ্গুলির ন্যায়, কেবল সংস্থার কিঞ্চিৎ পার্থক্য এই যে, ইহাদিগকে করাঙ্গুলিনলক ও করাঙ্গুলিমূলশলাকা বলে। (ষষ্ঠ চিত্র)

মণিবন্ধ প্রদেশে আটখানি ক্ষুদ্র বিষমাস্থি আছে, ইহাদিগকে করকূর্চ্চাস্থি* বলে। ইহারা অগ্রিম ও পশ্চিম (বা অধঃ ও ঊর্দ্ধ) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। অগ্রিম শ্রেণীর চারিখানি অস্থি যথাক্রমে পর্য্যাণক, কূটক, মধ্যকূট ও ফণধর নামে এবং পশ্চিম শ্রেণীর চারিখানি নৌনিভক, অর্দ্ধচন্দ্র, উপলক ও বর্ত্তুলক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পশ্চিম শ্রেণীর চারিখানি অস্থির মধ্যে তিনখানি অস্থি মণিবন্ধ সন্ধির মধ্যে প্রবিষ্ট; বর্ত্তুলক নামক কূর্চ্চাস্থি মণিবন্ধসন্ধির মধ্যে প্রবেশ করে না। এই অস্থিকে কেহ কেহ কণ্ডরামধ্যস্থ চণকাস্থি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সেজন্য তাঁহাদের হিসাবে পদের ন্যায় করেও সাত খানি মাত্র কূর্চ্চাস্থি আছে।

পর্য্যাণক—ইহার সম্মুখভাগ অঙ্গুষ্ঠমূলশলাকার সহিত এবং অন্তঃপার্শ্ব ও পশ্চাদ্‌ভাগ নৌনিভক, কূটক ও তর্জ্জনী-মূলশলাকার সহিত সম্বদ্ধ।

কূটক—কূট (মেহাই) সদৃশ আকার বিশিষ্ট এই অস্থিটী অধঃসীমায় তর্জ্জনীমূল-

* ইং—Carpals—কার্প্যালস্।

শলাকার সহিত, উর্দ্ধসীমায় নৌনিভক অস্থির সহিত, বহিঃসীমায় পর্য্যাণক অস্থির সহিত এবং অন্তঃসীমায় মধ্যকূট অস্থির সহিত সংহিত।

মধ্যকূট—ইহা করের কূর্চ্চাস্থিগুলির মধ্যে বৃহত্তম। ইহার উর্দ্ধস্থ মুণ্ড অর্দ্ধচন্দ্র অস্থির সহিত, অধোভাগ তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকার মূলশলাকার সহিত, বহিঃপার্শ্ব নৌনিভক ও কূটক নামক অস্থিদ্বয়ের সহিত এবং অন্তঃপার্শ্ব ফণধর নামক অস্থির সহিত সম্বদ্ধ।

ফণধর—এই সর্পফণাকার প্রবর্দ্ধনযুক্ত অস্থিটী অধোভাগে কনিষ্ঠা ও অনামিকার মূলশলাকাদ্বয়ের সহিত এবং অন্তঃপার্শ্বে উপলক ও অন্যপার্শ্বে মধ্যকূট নামক অস্থির সহিত সংহিত।

নৌনিভক—ইহার আকার নৌকার ন্যায়, কিন্তু নৌনিভ নামক পাদকূর্চ্চাস্থি অপেক্ষা অনেক ছোট। ইহার পশ্চাদ্ভাগ বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির সহিত, একপার্শ্ব অর্দ্ধচন্দ্র ও মধ্যকূটনামক অস্থিদ্বয়ের সহিত, এবং অধঃ বা সম্মুখভাগ পর্য্যাণক ও কূটক নামক অস্থিদ্বয়ের সহিত সংহিত।

অর্দ্ধচন্দ্র—ইহার বহির্ভাগ নৌনিভকাস্থির সহিত, উর্দ্ধভাগ বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির সহিত এবং সম্মুখভাগ উপলক, ফণধর ও মধ্যকূট নামক অস্থি তিনখানির সহিত সম্বদ্ধ।

উপলক—ইহার উর্দ্ধসীমাস্থ সন্ধিচিহ্ন মণিবন্ধসন্ধির মধ্যবর্ত্তী ত্রিকোণ তরুণাস্থির সহিত সংহিত। ইহা অপর তিনদিকে ফণধর, অর্দ্ধচন্দ্র ও বর্ত্তুলক নামক অস্থির সহিত সম্বদ্ধ।

বর্ত্তুলক—ইহা বর্ত্তুলাকার ও ক্ষুদ্রতম কূর্চ্চাস্থি। ইহার পশ্চাদ্ভাগ এবং অন্তঃপার্শ্ব উপলকের সহিত সংহিত।

কর ও পদের কূর্চ্চাস্থি সকলের সম্মুখ, পার্শ্ব ও পশ্চাদ্ভাগ বলিয়া যাহা নির্দ্দেশ করা হইল তাহা দিগ্দর্শন মাত্র। ঐ সকল অস্থি বিষমাকার বলিয়া উহাদের আকার ও সন্নিবেশ যথাযথরূপে বুঝিতে হইলে স্বহস্তে অস্থি লইয়া বারংবার পরীক্ষা করা আবশ্যক।

প্রকোষ্ঠাস্থি—[সপ্তম চিত্র] পূর্ব্বেই বলিয়াছি—বাহুর নিম্নার্দ্ধ (কর বাদে) প্রকোষ্ঠ নামে অভিহিত। এই প্রকোষ্ঠে দুইখানি নলকাস্থি আছে। তন্মধ্যে যেখানি বহিঃসীমায় থাকে, সেখানিকে বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি এবং যেখানি অন্তঃসীমায় থাকে সেখানিকে অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থি বলে। বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির অধঃপ্রান্ত স্থূল—ইহা দ্বারা প্রধানতঃ মণিবন্ধসন্ধি নির্ম্মিত হয়। অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির উর্দ্ধপ্রান্ত স্থূল—ইহা দ্বারা প্রধানতঃ কূর্পরসন্ধি নির্ম্মিত হয়।

বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি—[সপ্তম চিত্র]*

ইহা নলকাস্থি, অতএব উর্দ্ধপ্রান্ত, অধঃপ্রান্ত ও মধ্যনলক ভেদে তিনভাগে বিভক্ত। উর্দ্ধপ্রান্ত চক্রাকার এবং প্রগণ্ডাস্থির অধঃপ্রান্তের বহিঃসীমায় সংযুক্ত। উক্ত চক্রাকার অংশের ভিতরের দিকের অর্দ্ধচন্দ্রাকার সন্ধিচিহ্ন প্রকোষ্ঠাস্থির উর্দ্ধ প্রান্তে বহিঃপার্শ্বের সহিত সংলগ্ন হয়।

* ইং—Radius—রেডিয়স্।

[সপ্তম চিত্র] প্রকোষ্ঠাস্থি দ্বয়।

উর্দ্ধপ্রান্ত।

অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থি

বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি

অধঃপ্রান্ত।

বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি (১) ১—চক্রমুণ্ড। (২) ২—গ্রীবা। (১ সং) ১ সং-প্রগণ্ডাস্থির কন্দলীর সহিত সন্ধিস্থল কোর। (২ সং) ২সং—অন্তঃ প্রকোষ্ঠাস্থির উর্দ্ধভাগের সহিত সন্ধির স্থান। (৩) ৩—পেশী বিশেষের অস্থ উৎসেধ। (৪) ৪—বহি মণিকা। (৪ সং) অন্তঃ প্রকোষ্ঠাস্থির অধোভাগের সহিত সন্ধির স্থান। (৫ সং) ৫ সং—মণিবন্ধসন্ধির স্থান। (৫) ৫—কণ্ডরা বিবর্ত্তন জন্য খাঁজ। অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থি (৬) ৬—চঞ্চু প্রবর্দ্ধনক। (৮) ৮—মণিমুণ্ড। (৫) ৯—অন্তমণিক (৬ সং) ৬ সং—বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির সহিত সন্ধির স্থান। (৮ সং) ৮সং—চক্রবেধিকাস্থিত সন্ধি চিহ্ন। (৭ সং) ৭ সং—প্রগণ্ডাস্থির চঞ্চু প্রবর্দ্ধনের সহিত সন্ধির স্থান।

(৬) 'পে' চিহ্নিত স্থানগুলি পেশীর নিয়োগ স্থান।

বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির নিম্নভাগ ত্রিকোণাকার এবং অর্দ্ধচন্দ্র ও নৌনিভক নামক কূর্চ্চাস্থিদ্বয়ের সহিত সন্ধিযুক্ত। এই ত্রিকোণাকার অংশের অন্তঃসীমা অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির নিম্নভাগের বহিঃপার্শ্বে সংলগ্ন থাকে। মধ্যনলকে অনেক পেশীর সংযোগ আছে, কিন্তু কোন অস্থির সংযোগ নাই। উহা ঈষদ্ বক্র এবং ত্রিধার বিশিষ্ট। ইহার ভিতরের দিকের ধারার সহিত "প্রকোষ্ঠান্তরালা" কলা সংযুক্ত থাকে।

অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থি—[সপ্তম চিত্র] * এই নলকাস্থি উর্দ্ধপ্রান্ত, অন্তঃপ্রান্ত ও মধ্য-নকল ভেদে তিন ভাগে বিভক্ত। ইহার উর্দ্ধপ্রান্ত উপরে প্রগণ্ডাস্থির অধঃপ্রান্তের সহিত এবং বহিঃপার্শ্ব বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির চক্রাকার উর্দ্ধপ্রান্তের অন্তঃপার্শ্বে সংহিত হয়। এই প্রান্তের পশ্চাদ্‌ভাগে যে উৎসেধ আছে, তাহাকে কূর্পর (কনুই) বলে। বাল্যকালে ইহা জানুকপালের ন্যায় পৃথক ভাবেই থাকে, কিন্তু যৌবনে অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির উর্দ্ধপ্রান্তের সহিত দৃঢ় সংলগ্ন হইয়া যায়। প্রাচীন শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে কেহ কেহ† ইহাকে কূর্পরকপাল নামক পৃথক্ অস্থি বলিয়া গণনা করিয়াছেন। উর্দ্ধপ্রান্তের সম্মুখস্থ প্রবর্দ্ধনক চঞ্চুপ্রবর্দ্ধন নামে খ্যাত।

অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির নিম্নপ্রান্ত প্রায় গোলাকার এবং ইহার বহিঃপার্শ্ব বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির নিম্নপ্রান্তের সহিত সন্ধিযুক্ত। ইহার নিম্নভাগে মণিবন্ধসন্ধির মধ্যস্থ ত্রিকোণাকার তরুণাস্থি সংযুক্ত থাকে। মধ্যনলকে

* ইং—Ulana—আল্‌না।

† ইং—Humerus—হিউমারাস্।

অনেক গুলি পেশীর সংযোগ আছে, কিন্তু কোন অস্থির সংযোগ নাই। ইহাও ত্রিধার বিশিষ্ট এবং ইহার বহির্ধারায় "প্রকোষ্ঠাস্থ-বালা" কলা সংলগ্ন থাকে।

প্রগণ্ডাস্থি—[অষ্টম চিত্র] + বাহুর মধ্যে ইহাই স্থূলতম নলকাস্থি। ঊর্দ্ধপ্রান্ত, অধঃপ্রান্ত এবং মধ্যনলক ভেদে ইহাও তিন ভাগে বিভক্ত। ইহার ঊর্দ্ধপ্রান্তের অর্দ্ধ গোলাকার অংশ অংসফলকাস্থির অংসপীঠ নামক অংশের সহিত সংহিত হইয়া অংসসন্ধির সৃষ্টি করে। ইহার অধঃপ্রান্তের সহিত প্রকোষ্ঠাস্থিদ্বয়ের ঊর্দ্ধপ্রান্ত দুইটির সন্ধি হইয়া কূর্পরসন্ধি নিষ্পন্ন হয়। এই অধঃ-প্রান্তের সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগে এক একটী খাত আছে। বাহু প্রসারিত করিলে পশ্চা-তের খাতে কূর্পর বা কনুই প্রবিষ্ট হইয়া যায়। বাহু সঙ্কুচিত করিলে অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির ঊর্দ্ধ-প্রান্তের অগ্রভাগ (চঞ্চুপ্রবর্দ্ধনক) সম্মুখের খাতে প্রবিষ্ট হয়। প্রগণ্ডাস্থির মধ্যনলকে বহু পেশীর সংযোগ আছে।

[অষ্টম চিত্র]

প্রগণ্ডাস্থি।

ঊর্দ্ধপ্রান্ত।

(১) ১—মুণ্ড। (২) ২—মহাপিণ্ডক। (৩) ৩—লঘুপিণ্ডক। (৪) ৪—পিণ্ডদ্বয় মধ্যগত পরিখা। (৫) ৫—বাহ্যার্ব্বুদ। (৯ ১০)—৯ ১০—দুইটী খাত।

এক বাহুর ত্রিশ খানি অস্থির বর্ণনা করা হইল। অপর বাহুতেও অস্থির সন্নিবেশ এই-রূপ। অস্থির আকৃতি সন্নিবেশ প্রভৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা প্রত্যক্ষ দর্শন সাপেক্ষ। তথাপি এইরূপ স্থূল বর্ণনা দ্বারা বাহু ও সকৃথির অস্থি সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান জন্মিলে এবং পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বর্ণনীয় পেশী সমূহের ক্রিয়া কতকটা বুঝা যাইলে চিকিৎসার অনেক সুবিধা হইতে পারে। কোন অস্থি স্থানচ্যুত বা ভগ্ন হইলে এই জ্ঞানের সাহায্যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অনেক সময়ে তাহার প্রতিকার করিতে পারিবেন। ভগ্নচিকিৎসায় এ সম্বন্ধে বিস্তৃত উপদেশ লিখিত হইবে। (ক্রমশঃ)

শিশু পালন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বি-এ, সরস্বতী।

শিশু কাঁদিলেই যে তাহাকে খাওয়াইতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। শিশুকে এরূপ অভ্যাস করান অত্যন্ত অনিষ্টকর। অনেক সময় শিশু তৃষ্ণার জন্য কিংবা পেট ব্যাথা অথবা অন্য কোন শারীরিক কষ্টের জন্য কাঁদে, মাতা তাহা বুঝিয়া চলিবেন। শিশুর সকল ক্রন্দনই যে ক্ষুধার জন্য তাহা নহে।

শিশুকে ঘড়ি ধরিয়া খাওয়াইলে আর তাহার অতিরিক্ত আহারের ভয় থাকে না। ঘড়ি ধরিয়া প্রত্যহ একই সময়ে শিশুকে আহার করান কর্ত্তব্য। শিশুর আহার—কলের মত একই সময়ে হওয়া প্রয়োজন। তাহা হইলে প্রত্যেক আহারই ভালরূপে হজম হইবার সময় পাইবে। শিশুকে ধীরে ধীরে আহার করাইবে। তাড়াতাড়ি করিবে না। একবার আহার করিতে যেন দশ হইতে কুড়ি মিনিট সময় লাগে। শিশু তাড়াতাড়ি আহার করিতে চাহিলেও একটু খাওয়াইয়াই বোতল মুখ হইতে বাহির করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে দিবে, তারপর আবার খাওয়াইবে শিশুকে খুব বেশী গরম কিংবা বেশী ঠাণ্ডা দুধ দিবে না। কখনো তাহাকে খালি বোতলের টিট চুষিতে দিবে না, তাহা হইলে পেটে বাতাস যাইবে, পেট ফাঁপিবে।

শিশুর প্রত্যেক আহারের পরই তাহাকে একটু তুলিয়া ধরিয়া তাহার পিঠ আস্তে আস্তে চাপড়াইবে, যে পর্য্যন্ত না ঢেঁকুর তুলে। আহারের পর ঢেঁকুর তুলিলে শিশুর সুনিদ্রা হইবে। শিশুকে কোলে শোয়াইয়া যেমন করিয়া মাতৃ-দুগ্ধ পান করাইতে হয়, বোতলে করিয়া দুধ খাওয়াইবার সময়ও ঐরূপে

শিশুকে কোলে শোয়াইয়া খাওয়াইবে। কখনও শিশুর পার্শ্বে দুধের বোতল রাখিয়া কার্য্যান্তরে যাইবে না। শিশুকে দুধ খাওয়াইয়া তবে অন্য কাজে যাইবে।

প্রথম দশ বৎসর শিশুর শারীরিক এবং মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা মনোযোগ দিতে হইবে। এই সময়ের মধ্যে শিশুর দেহ খুব তাড়াতাড়ি বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হয়। এই কয়েক বৎসরের খাদ্যের উপর তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের স্বাস্থ্য, কার্য্যক্ষমতা বহু পরিমাণে নির্ভর করিতেছে এবং এই কাল মধ্যে শিশুর নৈতিক শিক্ষা যেরূপ হইবে, ভবিষ্যতে সে সেইরূপ মানুষ হইয়া গড়িয়া উঠিবে। সুতরাং প্রথম দশ বৎসর শিশুর পুষ্টিকর খাদ্যের প্রতি যেমন দৃষ্টি রাখিবে, তেমনি তাহার চরিত্র গঠনের দিকেও সর্ব্বাপেক্ষা মনোযোগী হইতে হইবে। তাহা হইলে ভবিষ্যতে সুস্থ, সবল, কর্ম্মঠ, সাধু সন্তান লাভ করিয়া জননী ও জন্মভূমি কৃতার্থমনা হইবেন।

মাতৃদুগ্ধের অভাব হইলে শিশুকে গাভীদুগ্ধ কিংবা অন্য কোন কৃত্রিম দুগ্ধে বর্দ্ধিত করিতে হয়। তাহা হইলে ইহার সহিত কমলা লেবু, আঙ্গুর, বেদানার রস শিশুকে দেওয়া উচিত। Keplar's Codliver oil with malt water bury's Codliver oil এই দুইটি ঔষধটি দুর্ব্বল শিশুর পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। কৃত্রিম দুগ্ধ খাইয়া যে সব শিশু গাড়িয়া উঠে, তাহারা স্বভাবতঃই তেমন সবল হইতে পারে না। তাহাদের পক্ষে এই ঔষধটি বিশেষ উপযোগী। দুইবার আহারের পর এক চা-চামচ ঔষধ লইয়া দুধে মিশ্রিত করিয়া শিশুকে খাওয়ান উচিত।

শিশুর আহার্য্য এক যেয়ে হইবে না, মাঝে মাঝে পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে, তাহা হইলে আহারে রুচি এবং ক্ষুধাও হইবে। শিশুকে কখনও গুরুপাক খাদ্য দিবে না, সর্ব্বদা লঘু, সহজপাচ্য, পুষ্টিকর আহার্য্য দিবে। শিশু ও বালকবালিকাদিগকে কখনও hard boiled ডিম, বাজারের মিষ্টান্ন, মসলাযুক্ত তরকারি, মাংস ও মাছ, নোনা মাছ, মাংস, কেক, পুডিং, নানারকম ফল খাইতে দিবে না। বালকবালিকাকে মিষ্টান্নের মধ্যে সন্দেশ, রসগোল্লা এবং ফলের মধ্যে মিষ্ট আম, কমলা লেবু, আঙ্গুর, বেদানা দেওয়া যাইতে পারে। ৫।৬ মাসের হইলেই শিশুদিগকে এই সব ফলের রস দিলে বেশ উপকার দেখা যায়। তাহাদিগকে কখনও চা, কফি কিংবা কোন রকম উত্তেজক পানীয় দিবে না, ইহা তাহাদের পক্ষে বিষতুল্য।

শিশুর বোতলে দুধ খাওয়া অভ্যাস হইয়া থাকিলে—তের মাস কি পনের মাসের হইলে বোতল ছাড়াইয়া বাটি কিংবা গ্লাস হইতে দুধ খাওয়ান অভ্যাস করিবে। শিশুকে মাতৃদুগ্ধ দশমাস বয়স পর্য্যন্ত দিবে। তা'রপর ক্রমে ক্রমে ছাড়াইয়া লইবে। মাতৃদুগ্ধ পান করিবার সময়ও একবার বোতলে কিংবা বাটী বা গ্লাসে করিয়া গাভীর দুগ্ধ খাওয়ান অভ্যাস করান ভাল। তাহা হইলে শিশুকে মাতৃদুগ্ধ সহজেই ছাড়াইতে পারা যাইবে।

শিশুদের তিন প্রকারে দুধ খাওয়ান হয়।

(১) অধিকাংশ শিশুই মাতৃদুগ্ধ পান করে।

(২) মাতার দুগ্ধ—পরিমাণে কম কিংবা তেমন পুষ্টিকর হয় না বলিয়া অনেক সময়

শিশুকে মাতার দুগ্ধ এবং গাভী কিংবা অন্য কোন কৃত্রিম দুগ্ধ দিতে হয়।

(৩) কোন কোন শিশুকে দুর্ভাগ্যবশতঃ কেবল কৃত্রিম দুগ্ধে বাঁচাইতে হয়। কৃত্রিম দুগ্ধে যে সব শিশুকে পালন করিতে হয়, তাহাদিগকে অতি সাবধানে, যত্নের সহিত, সর্ব্বদা চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া, অতিশয় পরিচ্ছন্নতা পূর্ব্বক পালন করিতে হয়। নিয়মের একটুকু ব্যতিক্রম হইলেই এই সব শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়, নতুবা চিররুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া বাড়িয়া উঠে। এই সব শিশুকে কৃত্রিম দুগ্ধের সহিত ফলের রস, বলকারক ঔষধ, পুষ্টিকারক খাদ্য দিতে হয়। সাধ্যায়ত্ত হইলে ইহাদিগকে স্বাস্থ্যকর দেশে কয়েক বৎসর রাখা উচিত। সহর হইতে অধিক দিন দূরে থাকাই এমন সব শিশুদের পক্ষে মঙ্গলজনক, কারণ সহরের বাহিরে পরিষ্কার নির্ম্মল বাতাস এবং খাঁটি দুগ্ধ পাওয়া যায়।

এক বৎসর হইলেই শিশুদিগকে solid খাদ্য দেওয়া দরকার। দিনের মধ্যে একবার দুগ্ধের সহিত এইরূপ খাদ্য দিবে। অর্দ্ধ সিদ্ধ ডিম, রুটি, মাখন দেওয়া যাইতে পারে। দুই বৎসর হইলে ভাত, পাওয়া ঘি, মসুর ডাল এবং আলু খাইতে দিবে। ইহা বেশ পুষ্টিকর আহার্য্য। এই আহার্য্যের মধ্যে আমাদের দেহরক্ষার জন্য যে চারিটী উপকরণ প্রয়োজন—তাহার সকলই বিদ্যমান আছে। ভাত ও আলুর মধ্যে শ্বেতসার এবং ঘিতে মেদ আছে। শ্বেতসার ও মেদ দেহের তাপ উৎপন্ন এবং শক্তি সঞ্চার করে। ডালের মধ্যে nitrogen আছে, তাহা আমাদের দেহের ক্ষয়পূরণ করে এবং মাংস গঠন করে। মসুর ডালে মাংস অপেক্ষা নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশী আছে। সুতরাং শিশুদিগকে মাংস না দিয়া মসুর ডাল-ঘি দিয়া দিলেই মাংসের কার্য্য সম্পূর্ণরূপেই সাধিত হয়। সকলপ্রকার ডালই নাইট্রোজেন বিশিষ্ট খাদ্য। দুর্ব্বল শিশুকে মুগ ও মসুর ডালের ঝোল দিলে উপকার হয়।

স্নান।

শিশুকে প্রত্যহ সরিষার তৈল এক ঘণ্টা ধরিয়া সর্ব্বাঙ্গে মালিস করিয়া গরম জল ও ঠাণ্ডা জল মিশাইয়া স্নান করাইবে। সুস্থ শিশুর প্রত্যহ স্নান আবশ্যক। দুর্ব্বল ও রুগ্ন শিশুকেও ক্রমে ক্রমে স্নান অভ্যাস করান কর্ত্তব্য। এইরূপ শিশুর স্নান অভ্যাস হইলে ক্রমে সুস্থ হইবে। অগ্নিতে জল গরম করা অপেক্ষা রৌদ্রে জল গরম করিয়া শিশুকে স্নান করাইলে উপকার হয়। নবজাত দুর্ব্বল ও রুগ্ন শিশুকে স্নানের জলে একটু বিটলবণ, এক আউন্স ব্র্যাণ্ডি কিংবা এক আউন্স টয়লেট ভিনিগার দিয়া স্নান করাইলে তাহার দেহের বল হয়। স্নান অভ্যাস হইলে দুর্ব্বল শিশু ক্রমে বল পাইবে। অতএব যে রকমে হউক শিশুকে স্নান করান অভ্যাস করাইবে। দুর্ব্বল শিশুকে স্নান করাইবার পূর্ব্বে ঘরের দরজা-জানালা বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া স্নান করাইবে। স্নান করাইবার সময় হঠাৎ ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে শিশুর নিউমোনিয়া হইবার সম্ভাবনা। শিশুর স্নান অতি শীঘ্র শেষ করিয়া তখনি গামছা দিয়া খুব ভাল করিয়া গা মুছাইয়া একটী জামা গায়ে দিয়া দিবে। সাবান যত কম ব্যবহার করা যায়—ততই

ভাল। সাবান ব্যবহার করিলে শিশুর জন্য গন্ধবিহীন উৎকৃষ্ট সাবান ব্যবহার করিবে। Castile, Cuticura সাবান শিশুর পক্ষে উপযোগী। শিশুর মুখে কখনও সাবান দিবে না। তবে দেহ ও মাথা ময়লা হইলে সপ্তাহে একদিন সাবান দিয়া পরিষ্কার করিয়া দিবে। সাবান দিয়া পরিষ্কার করিবার পর Fuller's Garth, Talc Powder পাউডার শিশুর গায়ে অল্প অল্প ছড়াইয়া দিবে, তাহা হইলে শীঘ্র জল শুষিয়া লইবে, আর গরমের দিনে ঘামাচি হইলেও ইহাতে উপকার হয়। তৈল মাখিয়া স্নানের পর কখনো পাউডার দিবে না। উহাতে লোমকূপ বন্ধ হইয়া যাইবে। শিশুর মুখ দুধের সর দিয়া পরিষ্কার করিবে। বড় হইলেও মুখে সর দিবে, তাহা হইলে মুখ কোমল ও মসৃণ থাকিবে। স্নান করাইবার সময় শিশুর দাঁত, মুখের ভিতর, জিহ্বা, চোখ, নাক বেশ করিয়া পরিষ্কার করিয়া দিবে। আহারের এক ঘণ্টার মধ্যে শিশুকে কখনও স্নান করাইবে না, অনন্তর দেড় ঘণ্টার পর স্নান করাইবে। দুর্ব্বল শিশুকে প্রথম প্রথম গরম জলে গামছা ভিজাইয়া খুব তাড়াতাড়ি গা মুছাইয়া তখনি আর একখানি শুষ্ক গামছা দিয়া মুছাইয়া দিবে। এইরূপ করিতে করিতে শিশুর স্নান অভ্যাস হইবে।

নিদ্রা।

নবজাত শিশু আহার এবং স্নানের সময় ব্যতীত অন্য সব সময় নিদ্রা যাইবে। শিশু যত ঘুমাইবে তত তাহার ক্ষুদ্র দেহ শীঘ্র গড়িয়া উঠিবে। শিশুর ঘুম কম হইলেই বুঝিতে হইবে—তাহার কোন পীড়া হইয়াছে, তখনি উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ লইতে হইবে। শিশু এক মাসের হইলে রাত্রে ঘুমাইবার সময়ের পূর্ব্বে একঘণ্টা জাগাইয়া রাখা ভাল, তাহা হইলে রাত্রে তাহার সুনিদ্রা হইবে এবং মাতাকেও রাত্রিতে সে বিরক্ত করিবে না। দুই মাসের হইলে দিনে কয়েক বার এক একঘণ্টা করিয়া জাগিতে পারে। এক মাস বয়স হইলেই মাতা শিশুকে জাগ্রত অবস্থায় নিজের শয্যায় চুপ করিয়া থাকিতে শিক্ষা দিবেন। শিশু জাগিলেই যে তাহাকে বিছানা হইতে তুলিয়া কোলে করিয়া বেড়াইতে হইবে কিংবা যতক্ষণ জাগিয়া থাকিবে ততক্ষণ তাহাকে কোন রকম খেলা অথবা আমোদ দিতে হইবে—এরূপ অভ্যাস করান অত্যন্ত অন্যায়। ইহার ফলভোগ মাতাকেই করিতে হয়। এরূপ মন্দ অভ্যাসে অভ্যস্ত হইলে প্রত্যেক কর্ম্মব্যস্ত মাতাকে কত অসুবিধা ভোগ করিতে হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং জন্মের পর হইতেই মাতা শিশুকে জাগ্রত অবস্থায় আপন শয্যায় চুপ করিয়া শোয়াইয়া খেলা করিতে অভ্যাস করাইবেন।

ছয় মাসের হইলে শিশু দিনে ৩।৪ ঘণ্টা ঘুমাইবে এবং সন্ধ্যা ৬॥ টা হইতে প্রাতঃকাল ৬টা কিংবা ৭টা পর্য্যন্ত ঘুমাইবে, মধ্যে রাত্রি ১০ টায় একবার আহারের জন্য তাহাকে উঠান হইবে। ইহার কম নিদ্রা হইলেই বুঝিতে হইবে যে, তাহার কোনো পীড়া হইয়াছে। এক বৎসরের হইলে শিশু দিবাভাগে দুই ঘণ্টা ঘুমাইবে। ৫।৬ বৎসর পর্য্যন্ত শিশুকে দিনে দুই ঘণ্টা করিয়া ঘুমাইতে দিবে। এই দিবাভাগের নিদ্রা শিশুর পক্ষে অত্যন্ত হিতকারী। আর সন্ধ্যার প্রারম্ভেই শিশু

যাহাতে নিদ্রা যায়—সেদিকে বিশেষ করিয়া মনোযোগ দিবে। শিশুকে কখনো অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিতে দিবে না। সুনিদ্রা এবং সুন্দররূপে গঠিত মন এক সঙ্গে চলে। একটি আর একটির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। মাতার এইটি বিশেষ করিয়া দেখা উচিত যে, বিদ্যালয়ের বালক বালিকারা যেন কখনো দেরীতে নিদ্রা না যায়। দেহের ন্যায় মস্তিষ্কও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়। মস্তিষ্কেরও বিশ্রাম চাই। সুতরাং এটি জানা উচিত যে, ঘুমের সময় ব্যতীত অন্য কোন সময় মস্তিষ্ক যেন বিশ্রাম না করে।

শিশুকে কখনো মাতার সহিত এক শয্যায় শোয়াইবে না। প্রথম হইতেই তাহার জন্য পৃথক একটি রেলিং দেওয়া খাটে তাহাকে শয়ন করাইবে। কারণ মাতার সহিত একত্রে শুইলে,—

(১) মাতা ঘুমন্ত অবস্থায় তাহার উপর আসিয়া পড়িলে শিশুর শ্বাস রোধ হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে শীতকালে মাতার গায়ের লেপ শিশুর উপর পড়িয়া শিশুর শ্বাসরোধে মৃত্যু হইয়াছে এরূপ দুর্ঘটনার কথাও জানি—ইহাও উল্লেখ করিতে পারি।

(২) মাতার ফুসফুস হইতে যে বিষাক্ত বায়ু (কার্ব্বণিক এসিড গ্যাস) প্রধান রূপে বহির্গত হয় তাহা শিশু নিশ্বাস দ্বারা টানিয়া লয়।

(৩) মাতার গায়ের কাপড় শিশুর মুখের উপর ঢাকা পড়িতে পারে। শিশু তাহা হইলে কাপড়ের নীচের দূষিত বায়ুই কেবল শ্বাস দ্বারা গ্রহণ করিতে থাকে।

(৪) গরমের দিনে মাতার গরম দেহের সংস্পর্শে শিশুর দেহ গরম হইয়া উঠিয়া ঘর্ম্মাক্ত হইতে পারে। ঘর্ম্মাক্ত দেহে ঠাণ্ডা লাগিবার অধিকতর সম্ভাবনা।

(৫) রাত্রিতে মাতার সহিত শুইলে, দিনে কখনো নিজের শয্যায় শিশু শুইতে চাহিবে না।

শিশুকে কখনও কোলে করিয়া বেড়াইয়া বেড়াইয়া ঘুম পাড়ান অভ্যাস করিবে না। নিদ্রার সময় হইলে শিশুকে তাহার খাটে শোয়াইয়া দিবে এবং সে যাহাতে নিজের শয্যায় শুইয়া থাকিতে থাকিতেই ঘুমাইয়া পড়ে, এইরূপ অভ্যাস করাইবে। প্রথম প্রথম এইরূপে ঘুমাইবার সময় খুব কাঁদিলেও তাহা গ্রাহ্য করিবে না। দিন কয়েক কাঁদিয়া যখন সে দেখিবে যে কাঁদিলেও কেহ তাহাকে কোলে তুলিয়া লয়না, তখন আপনা হইতেই সে চুপ করিয়া যাইবে এবং নিজের শয্যাতেই ঘুমাইয়া পড়িবে।

পরিচ্ছদ।

আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শিশুর পরিচ্ছদের প্রতি তত মনোযোগ দেওয়া হয় না। সাধারণতঃ সূতিকা গৃহের একমাসকাল শিশুকে সামান্য ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়া মুড়িয়া রাখা হয়। সুস্থ, সবল, শিশুর পক্ষে এরূপ ব্যবস্থায় প্রায় কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু দুর্ব্বল, রুগ্ন শিশুকে শুধু ন্যাকড়ায় মুড়িয়া রাখিলে তাহার পক্ষে নানারূপ ফুসফুসের পীড়ায় আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। অনেক সময় সবল শিশুও অনুপযুক্ত বস্ত্রের জন্য ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া প্রভৃতি ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে

পতিত হয়। আবার অধিক যত্নে সর্ব্বদা আচ্ছাদন করিয়া রাখিলেও শিশু বাড়িতে পারে না এবং দেহ দুর্ব্বল হয় সুতরাং কখনো অল্প বস্ত্র গায়ে থাকিলে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়িত হইয়া পড়ে। দুর্ব্বল শিশুর দৈহিক যন্ত্রাদিও দুর্ব্বল থাকে, এই জন্য অতি সহজে ঠাণ্ডা লাগিয়া অসুস্থ হইয়া পড়ে। প্রথম মাস দুর্ব্বল শিশুর দেহে প্রথমে একটি সাদা বেনিয়ান, তাহার উপর একটি ফ্লানেলের বেনিয়ান পরাইয়া রাখা ভাল। তা'রপর ক্রমে ঠাণ্ডা সহ্য হইলে শুধু সূতার জামা গায়ে দেওয়া উচিত। আমাদের দেশে গ্রীষ্ম কালে খালি গায়েই শিশুদের রাখা ভাল। শিশুদিগকে যত শীতাতপ সহ্য করান যাইবে ততই ভবিষ্যতে তাহাদের দেহ দৃঢ় এবং কষ্টসহিষ্ণু হইবে। অতি যত্নে, সর্ব্বদা কেবল পোষাক পরিচ্ছদে দেহ আবৃত করিয়া রাখিলে শিশুর মঙ্গল না হইয়া ঘোরতর অনিষ্ট সাধিত হয়। এরূপ শিশু ভবিষ্যৎ জীবন-সংগ্রামে একেবারেই অপটু হয়। দুর্ব্বল শিশুকেও ক্রমে ক্রমে শীতাতপ সহ্য করাইয়া দৃঢ় ও বলশালী করা প্রত্যেক পিতামাতার কর্ত্তব্য। দেহ বলশালী ও দৃঢ় হইলে মনও তেজস্বী ও মহৎ হয়। সুতরাং শিশুকে সাজ-পোষাক পরাইয়া কেবল ফুলের মত করিয়া তুলিলে তাহার দ্বারা পৃথিবীতে কোন কাজই হইবে না। শিশুকে দেশের ও সমাজের গণ্য "মানুষ" করিয়া গড়িয়া তুলিতে প্রত্যেক পিতামাতাই দায়ী।

আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শিশুর গাত্রের উপরেই কখনো ফ্লানেল দেওয়া উচিত নহে। সর্ব্বদা সূতার কাপড় দেওয়া উচিত। শিশুর পরিচ্ছদ সম্বন্ধে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বিষয় গুলি মনে রাখিলেই যথেষ্ট।

(১) হাল্‌কা ও ঢিলা।

(২) শীতকালে গরম বস্ত্র চাই।

(৩) সচ্ছিদ্র (Porus)।

(৪) আরাম দায়ক।

(৫) যাহা অতি সহজেই পরাইয়া দেওয়া যায়।

শিশুর জন্মের প্রথম কয়েক মাস মুখ ব্যতীত তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া রাখা নিরাপদ জনক এবং প্রথম বৎসর তাহার বুক, পিঠ বেশ করিয়া আবৃত করিয়া রাখা উচিত। তা'রপর ক্রমে বাতাস ও শৈত্য সহ্য হইলে গরমের সময় খালি গায়ে রাখা যায়। তবে শীতকালে ও শীতপ্রধান দেশে উপযুক্ত বস্ত্র দ্বারা শিশুকে আবৃত করা কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ শিশুর ফুসফুসে যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে— সেদিকে প্রত্যেক মাতার বিশেষ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। ফুসফুস যে কেবল বক্ষঃস্থলেই অবস্থিত তাহা নহে, উপরে collar bone এবং পার্শ্বে armgist পর্য্যন্ত ফুসফুস বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং এই সব স্থান ও ভাল করিয়া আবৃত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। নীচু গলা এবং ছোট হাতের গাত্রাবরণ শিশুর ফুসফুসের কিয়দংশ অনাবৃত করিয়া রাখে, সুতরাং এরূপ পরিচ্ছদ শিশুর পক্ষে অনুপযোগী। শিশুর পেটও উপযুক্তরূপে ঢাকিয়া রাখা আবশ্যক। শিশুর পাকস্থলী, যকৃৎ প্রভৃতি যন্ত্রাদি এত delicate যে সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই তাহাদের কার্য্যের বিকৃতি ঘটে। পেটে সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই পেটের অসুখ কিংবা কোষ্ঠবদ্ধ হইতে পারে। আমা-

দের দেশে শীতের সময় অতি শিশুদের পেটে একটি ফ্লানেলের কিংবা পশমের বেল্ট বাঁধিয়া রাখা ভাল, অন্য সময়ে নহে। বেল্টটি আল্‌গা ভাবে বাঁধিয়া রাখা উচিত। শক্ত করিয়া বাঁধিলে খাদ্য পরিপাক করিতে পারে না। সুতার জামা সহজেই ঘামে ভিজিয়া যায়। ঘামে ভিজিয়া গেলে তৎক্ষণাৎ বদ্‌লাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, নতুবা তাহার উপর বাতাস লাগিলেই শিশুর ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া প্রভৃতি পীড়া হইবার সম্ভাবনা। গ্রীষ্মকালে বরং শিশুকে খালি গায়ে রাখিতে অভ্যাস করান উচিত। তাহা হইলে জামা ঘামে ভিজিবার সম্ভাবনা থাকে না। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শীতকাল ব্যতীত অন্য সব সময়েই শিশুদের মাথা ও গা খালি রাখা ভাল। মাথায় টুপী ও পায়ে সর্ব্বদা মোজা পরাইয়া রাখিলে শিশুর দেহ সবল হইয়া উঠিতে পারে না। শীতকালে এবং অন্য ঋতুতে খুব ঠাণ্ডা পড়িলে পায়ে মোজা দেওয়া উচিত, কিন্তু অন্য সময়ে খালি পায়েই বেড়াইতে অভ্যাস করান কর্ত্তব্য। এদেশে শিশুদের টুপীর প্রয়োজন প্রায়ই হয় না। শিশুকে যত ধূলা মাটিতে খেলা করিতে, চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে অভ্যাস করাইবে ততই তাহার দেহ দৃঢ় হইবে এবং মাতা ও শিশুর ভবিষ্যৎ মঙ্গল জনক হইবে। (ক্রমশঃ)

বাঙ্গালার স্বাস্থ্য।

(২)

গত বারে আমরা "বাঙ্গালার স্বাস্থ্য" শীর্ষক প্রবন্ধে সরকারি রিপোর্ট হইতে ১৯১৮ খৃঃ অব্দের অবস্থার যে পরিচয় প্রদান করিয়াছি, তাহাতে দেখাইয়াছি যে, বাঙ্গালা দেশে জন্ম-সংখ্যা যেমন কমিয়া গিয়াছে মৃত্যুসংখ্যা তেমনি যথেষ্ট ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই মৃত্যুর মধ্যে আবার শিশু ও যুবতী মৃত্যুই অধিক। আলোচ্য বর্ষে বাঙ্গালাদেশে যত লোক মরিয়াছে, তাহার মধ্যে জ্বর রোগে মরিয়াছে ১৩৷৷০ লক্ষের উপর, কলেরায় মরিয়াছে ৮২ হাজারের উপর এবং আমাশয় ও উদর পাড়ায় মরিয়াছে ২৯ হাজারের উপর। ১৯১৮ খৃঃ অব্দে সর্ব্বসমেত বাঙ্গালাদেশে সকল প্রকারে লোক মরিয়াছে ১৫ লক্ষ।

দেশের স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য স্বাস্থ্যবিভাগ রহিয়াছে। বলা বাহুল্য বাঙ্গালা দেশের স্বাস্থ্য বিভাগের ব্যয়ভার বাঙ্গালা দেশের প্রজাপুঞ্জই বহন করিয়া থাকে, কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে বাঙ্গালা দেশের প্রজাপুঞ্জকে রক্ষা করিবার জন্য আলোচ্য বর্ষে যে ব্যয় করা হইয়াছিল, তাহা অতি সামান্য মাত্র।

আলোচ্য বর্ষে হাওড়া, বহরমপুর, উত্তর-পাড়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ, সাতক্ষীরা, নাটোর এবং রাজবাড়ী—এই স্থান কয়টিতে পরিষ্কৃত জল সরবরাহের সুব্যবস্থা—স্বাস্থ্যবিভাগ

হইতে করা হইয়াছিল। হাওড়ায় অর্থাভাবে কার্য্যের উন্নতি করা সম্ভবপর হয় নাই। নাটোর ও বহরমপুরে বৃষ্টির জন্য কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে নাই, ঢাকার এবং রাজবাড়ীর কার্য্যও শেষ করিয়া উঠিতে পারা যায় নাই। ময়মনসিংহ এবং সাতক্ষীরার কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে। সম্পূর্ণরূপে কার্য্য সম্পন্ন হওয়ার কথা বলিতে হইলে আলোচ্য বর্ষে কেবলমাত্র উত্তর পাড়ার কার্য্যটিই সুসম্পন্ন হইয়াছে। যাহা হউক বাঙ্গালাদেশে এই জল সরবরাহ ব্যাপারে ১৯১৮ খৃঃ অব্দে ৩,০৬,৮৮৬ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন পয়ঃপ্রণালী-নির্ম্মাণ-ব্যপদেশে ৭১,০৯৮ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। সর্ব্বসমেত জল সরবরাহ ও পয়ঃ-প্রণালী নির্ম্মাণ—এই উভয় কার্য্য ১৯১৮ খৃঃ অব্দে মোট ৩,৭৭৯৮৪ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। যে দেশে এক বৎসরে মৃত্যু সংখ্যা ১৫ লক্ষ, সে দেশে চারি লক্ষেরও কম টাকা স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে ব্যয় করা কতদূর উপযুক্ত, তাহার মীমাংসা দেশের চিন্তাশীলগণ করিবেন।

হাওড়ায় অর্থাভাবে কার্য্যের উন্নতি সম্ভবপর হয় নাই, অথচ মেডিকেল কলেজের ধাত্রী-দিগের আবাসস্থান নির্ম্মাণ করিবার জন্য ৬ লক্ষ টাকা বজেটে মঞ্জুর করা হইয়াছে। রেলওয়ে বিভাগ ও সৈন্যবিভাগের খরচের তালিকাও অন্যান্য বাবের মত বাড়িয়া গিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে একমাত্র ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগেই সমগ্র বঙ্গে ৩॥০ লক্ষ হইতে ৪ লক্ষ লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে—ইহা স্বাস্থ্য কমিশনার মহোদয়ের রিপোর্টেই প্রকাশ, কিন্তু এই ভীষণ মারাত্মক রোগের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা রিপোর্টে নাই। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি এ বিষয়ে যত্ন লইয়াছিলেন সত্য, মফঃস্বলের ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডগুলিও এজন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বাঙ্গালার স্বাস্থ্য-বিভাগ হইতেও ইহার কিছু ব্যবস্থা হওয়া উচিত ছিল বলিয়া আমরা মনে করি।

দেশের মৃত্যুবৃদ্ধির কারণ উপলক্ষ করিয়া ডাঃ বেণ্টলী যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাতে তিনি স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন, খাদ্যা-ভাবেই দেশের মৃত্যু সংখ্যা এরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। শিশু মৃত্যুর কারণ নির্দ্দেশেও তিনি শিশু-জননীদিগের খাদ্যাভাবের উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা তো এ কথা বরাবরই বলিয়া আসিতেছি। লোকের পরিশ্রমের মাত্রা বাড়িয়াছে, সাধারণ গৃহস্থকে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া তবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিতে হয়। তাহার উপর অধুনা দেশে সকল জিনিসই যেরূপ দুর্ম্মূল্য এবং নানারূপে ব্যয়ের মাত্রা যেরূপ বাড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে সারাদিনের প্রাণপাত পরিশ্রমলব্ধ অর্থেও লোকের স্বচ্ছলতার সহিত সংকুলান হওয়া কঠিন ব্যাপার। কাজেই বাঙ্গালার দারিদ্র্য ক্রমশঃই ভীষণভাব ধারণ করিতেছে। বাঙ্গালী পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। উপযুক্ত পরিচ্ছদে অঙ্গ আবরণে সমর্থ হয় না, দুগ্ধ ঘৃতাদি পুষ্টিকর দ্রব্যের অভাবে বাঙ্গালীর আর বল বৃদ্ধির উপায় নাই, তাহার উপর বাঙ্গালীর যেটুকু শক্তিসামর্থ্য আছে, নানা কারণে তাহারও অপচয় ঘটিতেছে,—ইহারই ফলে বাঙ্গালী-শরীরে সকল প্রকার রোগই

অতি সহজে প্রবেশ লাভ করিতে পারিতেছে এবং তাহার পরিণতিই হইতেছে বাঙ্গালার অকাল মৃত্যু।

বাঙ্গালায় ম্যালেরিয়ায় প্রতিবৎসর বহু সংখ্যক লোকের মৃত্যু হয় সত্য, কিন্তু সেই অনুপাতে শিশু-মৃত্যু এবং যক্ষ্মায় মৃত্যু ও তো বড় কম নহে। ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে যে সমগ্র বঙ্গে ১৯১৮ খৃঃ অব্দে ৩॥০ লক্ষ হইতে ৪ লক্ষ প্রাণত্যাগ করিল—ইহারই বা কারণ কি? মানবের অস্তিত্বকাল পর্য্যন্ত পৃথ্বী রোগশূন্যা হইতে পারে না, জন্মগ্রহণ করিলেই মানবকে রোগের জ্বালা সহ্য করিতে হইবে, কিন্তু ব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেই মানুষ মরিবে কেন? অন্যান্য দেশেও তো রোগ হয়, কিন্তু অন্যান্য দেশের লোক বাঙ্গালাদেশের অধিবাসীদিগের মত এত মরে না কেন? অন্যান্য দেশের লোকের রোগ হয়, চিকিৎসা হয়, তাহারা আরোগ্য লাভ করে। যাহার নিয়তি ফুরাইয়া থাকে, সেই কেবল মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে, কিন্তু বাঙ্গালাদেশে যত লোক রোগগ্রস্ত হয়, তাহার অধিকাংশই মৃত্যুকে যে আলিঙ্গন করিয়া থাকে, ইহার প্রধান কারণই হইতেছে, পুষ্টিকর আহার্য্যের অভাবে এবং নানারূপ অত্যাচারে, তাহার উপর একটি না একটি ব্যাধিতে ক্রমাগত ভুগিয়া বাঙ্গালীর জীবনীশক্তি এরূপ কমিয়া গিয়াছে যে, সেই ক্ষয়প্রাপ্ত জীবনীশক্তি রোগের আক্রমণ মোটেই সহ্য করিতে পারে না, কাজেই অতি সহজেই ধ্বংসের পথ পরিষ্কৃত করে। বাঙ্গালীজাতির ধ্বংস হইতেছে এইরূপে।

বাঙ্গালাদেশের অধিবাসীদিগকে মৃত্যুর আধিক্যের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ডাঃ বেণ্টলী সাহেব গ্রাম্য স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য প্রত্যেক জেলায় একজন করিয়া ডিষ্ট্রিক্ট হেল্‌থ অফিসার ও কয়েকজন করিয়া তাঁহার সহকারী নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রস্তাব ভাল তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ঐরূপ নিযুক্তির ফলে কয়েকজন ডাক্তার নিযুক্ত করিয়া গ্রামে গ্রামে ম্যালেরিয়ার সময় কুইনাইন বিতরণের মাত্রা বৃদ্ধি করিলেই চলিবে না, পল্লীর পানীয় জলের সুব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে। যে সব গ্রামে বিশেষ জলকষ্ট, সে সব গ্রামে সর্ব্বাগ্রে পুষ্করিণী বা ইঁদারা কাটানর ব্যবস্থা করিতে হইবে। অনেক গ্রামে হয় তো দু'চারটি পুকুর মান্ধাতার আমলে কাটান হইয়াছিল, বহুকালাবধি সংস্কারের অভাবে সেগুলি বুজিয়া যাইবার মত হইয়াছে, সেগুলির সংস্কারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমরা জানি, এইরূপ সংস্কারের প্রয়োজন হইলে পুষ্করিণীর অধিকারীকে বা গ্রামের অধিবাসীদিগকে চাঁদা তুলিয়া কতক টাকা ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের হস্তে প্রদান করিতে হয়, তবে ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড তাহার সংস্কারে হস্তক্ষেপ করেন। কিন্তু দারিদ্র্যই যখন বাঙ্গালায় রোগ বৃদ্ধি—তথা মৃত্যু বৃদ্ধির কারণ, তখন দরিদ্র পল্লীবাসীর দ্বারা চাঁদা সংগ্রহ হওয়া এ সময় সহজ ব্যাপার হইবে না। কাজেই গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি করিতে হইলে মহামান্য সরকার বাহাদুরকে এ বিষয়ের ভার অনেকস্থলে নিজেই লইতে হইবে। পল্লীর কৃতী সন্তানদিগেরও অবশ্য এ বিষয়ে সাধ্যমত সহায়তা করা কর্ত্তব্য। জল কৃপা পল্লীগ্রামের জল সংস্থানের ব্যবস্থা না করা পর্য্যন্ত পল্লী রক্ষার যে উপায় হইবে না—ইহা সুনিশ্চয়।

সুস্থ দেহে মাদক দ্রব্যেরআবশ্যকতা আছে কি না?

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

তামাক।

তামাক মাদক দ্রব্যের মধ্যে পরিগণিত। যাহারা তামাক খাইতে অভ্যস্ত তামাকের ধূমপান করিলে তাহাদের মত্ততা জন্মে না বটে, কিন্তু যে ব্যক্তি কখন তামাক খায় নাই, তাহার মত্ততা জন্মিয়া থাকে।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে তামাক সভ্যজগতে প্রচলিত ছিল না। ১৩৯২ খৃষ্টাব্দে কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার কালে তাঁহার সঙ্গী সার্ ওয়ালটার র্যালে দুইটী দ্রব্য আমেরিকা হইতে য়ুরোপে লইয়া আসেন, একটী গোল আলু, অপরটী তামাক।

কোন কোন লেখক তামাক পূর্ব্বে এদেশে ছিল এইরূপ প্রমাণ করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদে যে ধূমপানের উল্লেখ আছে তাহা তামাকের ধূম নহে। বিবিধ ঔষধ একত্র করিয়া তাহার ধূম পান করিতে হয় এবং এইরূপ ধূমপান বিবিধ রোগনাশক ইহাই আয়ুর্ব্বেদের কথা। তামাক সম্বন্ধীয় কয়েকটি শ্লোক অল্পদিন হইল রচিত এবং গ্রন্থবদ্ধ হইয়াছে। তামাক সম্বন্ধে এক্ষণে যতগুলি শ্লোকই শুনা যায়, সবগুলিই আধুনিক রচিত।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তামাক ধনী, দরিদ্র পণ্ডিত, মূর্খ, ত্যাগী, ভোগী নরনারী সকলেরই প্রিয় হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এক সময়ে এই সর্ব্বজন সমাদৃত তামাক সেবনের বিরুদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন দেশে কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। রুসিয়া দেশে তামাক সেবনের প্রথম অপরাধে ভীষণ বেত্রাঘাত, দ্বিতীয় অপরাধে নাসিকা ছেদন এবং তৃতীয় অপরাধে প্রাণদণ্ড হইত। কিন্তু অবশেষে মনুষ্যের মাদক দ্রব্য সেবনের কুপ্রবৃত্তিই জয়লাভ করায় সে সব ব্যবস্থা সে দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে।

যাহা হউক এখনকার দিনে মদ্য খাদ্য স্থানীয় কি না—এ প্রশ্ন বরং উত্থাপিত করা যাইতে পারে, কিন্তু তামাক সম্বন্ধে এরূপ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। এখনকার দিনে সাধারণতঃ অনেক লোকেই তামাকের ধূমই পান করে। যাহারা দোক্তা, সুর্তি, নস্য প্রভৃতি ব্যবহার করে, তামাকের বীর্য্য মাত্র তাহাদের শরীরে প্রবেশ করে, সুতরাং তামাক খাদ্য নহে।

তামাক যে সুস্থ শরীরে বিষের ন্যায় অপকারী তাহা সহজেই বুঝা যায়। যে ব্যক্তি কখন তামাক খায় নাই তাহাকে তামাক খাইতে দিলে তাহার মাথার যন্ত্রণা, বমনভাব বা বমি, মত্ততা এবং শরীর যেন ঘুরিতে থাকে এই সকল উপসর্গ উপস্থিত হয়। যে দ্রব্য মুহূর্ত্ত মধ্যে এরূপ বিকার উৎপাদন করিতে সক্ষম, সেই দ্রব্য দীর্ঘকাল ব্যবহার করিলে শরীরের যে বিষম অনিষ্ট করিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

আমাদের দেশে লাউ কুমড়া প্রভৃতির চারা গাছের পোকা মারিবার জন্য হুঁকার জল ঢালিয়া দেওয়া হয়। তামাকের ধূম হুঁকার জলের ভিতর দিয়া যায় বলিয়া তামাকের কতকটা বিষ জলের মধ্যে থাকিয়া যায়। সেই বিষের প্রভাবে ছোট ছোট পোকা মরিয়া যায়।

ধূম, নস্য, দোক্তা, জরদা প্রভৃতি যেরূপেই ব্যবহৃত হউক তামাক শরীরের অনিষ্ট করিয়া থাকে। তবে ব্যবহারের পার্থক্যে অনিষ্টের তারতম্য ঘটে মাত্র। যেমন সিগারেটের পরিবর্ত্তে হুঁকার তামাক খাইলে হুঁকার জলে কতকটা বিষ থাকিয়া যায় বলিয়া অপেক্ষাকৃত কম অনিষ্ট হইয়া থাকে।

তামাকের অপকারিতা পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ পরীক্ষা দ্বারা যে সকল তথ্য অবগত হইয়াছেন, নিম্নে তাহার সারমর্ম্ম উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

দীর্ঘকাল তামাকের ধূম পান করিলে অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠে বায়ু সঞ্চয়, বিবিধ বায়ু রোগ, শিরোরোগ ও চক্ষুরোগ প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অধ্যাপক জে, রসিওয়েলার বলেন যে,—তামাকে নানাপ্রকার বিষাক্ত পদার্থ আছে। তন্মধ্যে নিকোটিন নামক মারাত্মক বিষ প্রধান। নিকোটিন শরীরের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। উহা ধমনী (Nerve) সকলকে দুর্ব্বল করে এবং ক্রমে অকর্ম্মণ্য করিয়া পক্ষাঘাত রোগ উৎপন্ন করে। নিকোটিন—হৃদযন্ত্রের ক্রিয়ার বিকৃতি, হৃদয়ের স্পন্দন (Palpitation) পাকস্থলীর ক্রিয়ার ব্যাঘাত, অজীর্ণ রোগ এবং কম্পন রোগ জন্মায়, উহার দ্বারা চক্ষুর তারা বিস্তৃত হয়, দৃষ্টিশক্তির অল্পতা ঘটে এবং কর্ণে নানাবিধ যন্ত্রণাপ্রদ শব্দ উৎপন্ন হয়।

ডাক্তার রিচার্ডসন বলিয়াছেন যে, ক্রমাগত তামাক ব্যবহার করিলে মস্তিষ্ক রক্তশূন্য ও ফেকাশে হয়, পাকস্থলীতে রক্তবর্ণ অঙ্কুর সকল উৎপন্ন হয়, রক্ত অত্যন্ত তরল হইয়া ফুস্ফুস্ ফেকাশে হয় এবং হৃদযন্ত্র অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

ডাক্তার জে, এচ, কেলগ এম, ডি, বলিয়াছেন যে, প্রসিক প্রকিও ব্যতীত এমন কোন বিষ নাই, যাহা যথেষ্ট মাত্রায় প্রয়োগ করিলে ৩।৪ মিনিটের মধ্যে মৃত্যু ঘটে। আধ সের তামাকে এত অধিক বিষ আছে, যে, যদি সেই সমস্ত বিষ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে তিন শত মনুষ্যের প্রাণ নষ্ট হইয়া থাকে। একটী চুরুটের বিষে দুইজন মনুষ্যের প্রাণ নষ্ট হইতে পাবে। পক্ষী, ভেক এবং ক্ষুদ্র জীবদিগের তামাকের ধূম পূর্ণ রুদ্ধ স্থানে রাখিলে শীঘ্রই মরিয়া যায়। সুতরাং তামাক যে ভয়ানক বিষ তাহাব সন্দেহ নাই।

ডাক্তার আলি, এফ, আর, এস বলেন যে, অস্বাস্থ্যকর এবং ম্যালেরিয়া পীড়িত স্থানের অধিবাসীদিগের মুখ পাংশুবর্ণ হয়, শরীর সম্যক পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না এবং মাংস পেশী সমূহ দুর্ব্বল হইয়া থাকে। উহারা বাঁচিয়া থাকে বটে, কিন্তু মনুষ্যোচিত জীবনী শক্তির (Vitality) অর্দ্ধাংশ মাত্র লইয়া। তামাক ব্যবহারে অভ্যস্ত ব্যক্তিদিগেরও শরীরের অবস্থা এইরূপ হইয়া থাকে।

ডাক্তার জে, এচ, কেলগ, এম, ডি, বলেন,—

তামাক ব্যবহারে রক্ত যে কেবল খারাপ হয় তাহা নহে, পরন্তু রক্ত বিষাক্ত হয় এবং রক্ত-স্থিত রক্তবর্ণ অণু সকল কমিয়া যায়।

অধ্যাপক রসিওযোনার বলেন যে, চিকিৎসকগণ স্থির করিয়াছেন যে, অত্যধিক পরিমাণে তামাক ব্যবহার করিলে কণ্ঠদেশে একপ্রকার ক্ষত হয় এবং উক্ত ক্ষত প্রায়ই মারাত্মক হইয়া থাকে।

লণ্ডনস্থ মেট্রপলিটন ফ্রি হাঁসপাতালের প্রধান চিকিৎসক ডাক্তার সি, আর ড্রাইসডেল "পবলিক হেলথ" নামক পত্রে একটী প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন যে, অল্প বয়সে তামাক খাওয়ার ফলে অনেক সময় ক্ষয়রোগ হইয়া থাকে।

তামাক ব্যবহার করিলে গ্যাষ্ট্রীক জুসের ক্ষরণ কমিয়া যায় এবং পাকস্থলীর কার্য্য কারিতা শক্তির হ্রাস হয়। নস্য ব্যবহারের ফলেও অজীর্ণ রোগ জন্মিয়া থাকে।

তামাক ব্যবহারের ফলে একপ্রকার পক্ষাঘাত রোগ জন্মে। তামাকের বিষে ধমনী বিতানের (Nervons system) অত্যন্ত বিকৃতি ঘটে। তাহার জন্য তামাক-সেবী দিগের কেহ সহজে চমকিয়া উঠে, কেহ অত্যন্ত খিটখিটে হয়, কাহারও হাত কাঁপিতে থাকে, কাহারও রাত্রিতে নিদ্রা হয় না। এইরূপ আরও আরও উপসর্গ ঘটে। বিশেষতঃ নেত্র ধমনী (Optic nerve) একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। আজ কাল লোকের যে অনেক বয়সেই দৃষ্টিক্ষীণতা ঘটিতেছে, তামাক ব্যবহার তাহার একটী প্রধান কারণ।

তামাক ব্যবহারে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে এবং হৃদয়ের স্পন্দন (Palpitation), নাড়ীর গতির বিশৃঙ্খলতা প্রভৃতি উপসর্গ হয়। তামাকসেবীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, নাড়ীর গতি এবং বল হ্রাস হইয়া পড়িয়াছে। এতদ্বারা বুঝা যায় যে, হৃদযন্ত্র দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে।

তামাকের ধূমে ফুসফুসের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। তামাক ব্যবহারকারীর শরীর সহজেই রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। ডাক্তার এচ, বি টিকানী বলেন যে, ইহা দ্বারা বুদ্ধি বৃত্তির ক্ষয় হয়, মন নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, হিতাহিত জ্ঞান কমিয়া যায় এবং চরিত্র দূষিত হইয়া থাকে। ডাক্তার এল্, জি, আলেকজাণ্ডার বলেন যে, তামাক ব্যবহার-কারীর সন্তানগণ তামাকে অত্যন্ত আশক্ত হইয়া থাকে এবং উহারা দুর্ব্বল শরীর, চরিত্র হীন এবং বিবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

উপরোক্ত প্রমাণ সমূহের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তামাক সুস্থ শরীরে বিষবৎ অনিষ্ট-কারী, সুতরাং সুস্থ শরীরীর পক্ষে তামাক ব্যবহার করা উচিত নহে। অনেক তামাক সেবী কিন্তু ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, একদিকে রসায়ন-শাস্ত্র (Chemistry) এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান যেমন তামাককে বিষ বলিয়া প্রতি-পন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে, অপরদিকে লক্ষ লক্ষ তামাকসেবী সুস্থ শরীরে জীবিত থাকিয়া তামাকের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতেছে। তামাকে যদি প্রকৃতই পূর্ব্বকথিত রূপ অনিষ্ট হইত, তাহা হইলে কখনই এত লোক সুস্থ শরীরে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারিত না।

একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই কিন্তু তামাকসেবীদিগের এই যুক্তির অসারত্ব স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। মনুষ্য শরীর এরূপ সুকৌশলে নির্ম্মিত—যে কোন বিষই শরীরে প্রবেশ করুক সহজে শরীরের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না এবং, অভ্যাস করিলে মারাত্মক বিষও সহ্য হইতে পারে। অনেক লোক এত আফিম খায়, যে তাহাতে তিন চারজন আফিম সেবনে অনভ্যস্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইতে পারে। কিন্তু তাহা বলিয়া অহিফেন যে মারাত্মক বিষ নয় এরূপ বলা যাইতে পারে না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বিষ সদ্যোমারাত্মকও আছে, আবার বহুকালে প্রাণ নষ্ট করে এমন বিষও আছে। তামাক সেবন না করিলে যে ব্যক্তি সুস্থ, সবল ও নীরোগ শরীরে সত্তর বা আশী বৎসর বাঁচিতে পারিত, সে ব্যক্তি তামাক সেবনের ফলে দুর্ব্বল দেহে রোগ ভোগ করিয়া পঞ্চাশ কি ষাট বৎসরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়—এই অকালমৃত্যু তামাক বিষের ফলেই বলিতে হইবে। কেবল তামাক বলিয়া নহে—সর্ব্বপ্রকার মাদক দ্রব্যসেবীদিগের অকালমৃত্যু, রোগভোগ এবং দৈহিক ও মানসিক অবনতি সেই মাদক দ্রব্যেরই কার্য্য।

(ক্রমশঃ)

প্রাচীন চিকিৎসকের টোট্‌কা ও মুষ্টিযোগ।*

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র লাহিড়ী।

বমন নিবারণে—এক ছটাক চিনির সরবতে দশ বারটী কচি আমের পাতা বাটিয়া সেই রস ঐ সরবতের সহিত মিশাইয়া পান করিলে বমন নিবারণ হয়।

হিক্কায়—দ্রোণপুষ্পের (গলঘসিয়া ফুল) কচি শিকড় ১টী, আদা ৩ খণ্ড—একত্র বাটিয়া ৩টী বটীকা প্রস্তুত করতঃ দিনে ৩ বার ঠাণ্ডা জলসহ সেব্য।

প্রবল হিক্কায়—পেঁপের আঠা ৩।৪ ফোঁটা /০ ছটাক শীতল জলের সহিত খাইলে প্রবল হিক্কা বন্ধ হয়। অথবা বর্ষা ঋতুতে যে সমস্ত বাঁশের খুঁটায় জল আবদ্ধ অবস্থায় থাকে, সেই জল হিক্কাগ্রস্ত রোগীকে পান করাইলে যে কোনপ্রকার হিক্কা হউক না কেন, নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে।

বাঘীতে—ভেলার আঠায় নেকড়া ভিজাইয়া তাহার উপর অল্প পরিমাণে কলিচুণ মিশাইয়া বাঘীর উপর পটি দিলে বাঘী বসিয়া যাইবে। অথবা পাকিয়া আনারের আঠা বাঘীর উপর প্রয়োগ করিলেও বাঘী বসিয়া যাইবে।

টাকে—টাকের উপর যদি আজ গাছি

---

* প্রাচীন চিকিৎসক ৺জয়রাম লাহিড়ী মহাশয়ের ব্যবহৃত।

চুল থাকে তাহা কামাইয়া সেইস্থানে পরিষ্কার চিনি ও ছোট পেঁয়াজ, অথবা লাল জবাফুল কিম্বা লাল লঙ্কা মরিচ প্রত্যিদিন ৮।৭বার ঘর্ষণ করিলে আবার চুল উঠে।

ফোড়ায়—ন'টের মূল, রক্তচন্দন, গব্যঘৃত এবং শিমুলের কাঁটা সমান অংশে লইয়া বাটিয়া লাগাইলে ফোড়া আপনা হইতেই পাকিবে ও ফাটিয়া যাইবে। অথবা, শুধু, ন'টের মূল বাটিয়া ফোড়ার উপর স্থাপনকরতঃ সেই মূল বাটার উপর একটী মটরের দাইল বসাইয়া দিলেও ফোড়া পাকিবে। অথবা গরুর দন্ত ঘষিয়া লাগালেই ফল হইবে।

আমাশয়ে—পুরাতন তেঁতুল ⁄৹ ছটাক, এক পোয়া জলে ভিজাইয়া সেই জল লবণ-সংযুক্ত করিয়া ⁄৹ আনা খদির প্রক্ষেপ করতঃ সেবন করিলে ফল হয়। অথবা কাঁচা মিঠা আমের ছাল ও কাল জামের ছাল সম পরিমাণে লইয়া তাহার রস ২ তোলা (গরম) মধু ও জিরাভাজার চূর্ণসহ সেবন করিলে প্রবল আমাশয় রোগ আরোগ্য হয়।

অর্শে—মনসা সীজের আঠা ও হরিদ্রা চূর্ণ সমানাংশে লইয়া প্রলেপ দিলে বলি খসিয়া পড়ে, ক্ষতও আরোগ্য হয়। তিল, ভেলা, হরীতকী ও ইক্ষু গুড় সমভাগে লইয়া সেবন করিলে অন্তর্বলী নিরাময় হয়।

পোড়া ঘায়ে—দগ্ধ হইবামাত্র চূণের জল, লঙ্কা গাছের পাতা ও নারিকেল তৈল সমপরিমাণে লইয়া দগ্ধ স্থানে লাগাইলে দগ্ধ স্থানের জ্বালা যন্ত্রণা দূর হয় এবং ক্ষতও আরোগ্য হয়। অথবা বেগুন গাছের পাকা পাতা অগ্নিতে ভস্ম করিয়া মধুসহ ক্ষতস্থানে দিলে ক্ষত আরোগ্য হয়। অথবা তাত পোড়াইয়া চূর্ণকরতঃ ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিলে ক্ষত নিরাময় হয়, অথবা খড়ের ঘরের পচা খড় অগ্নিতে পোড়াইয়া ভস্ম করিয়া সেই ভস্ম ক্ষতে প্রয়োগ করিলে ক্ষত আরোগ্য হয়। দগ্ধস্থানে গোল আলু বাটিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণার অবসান হইবে। দগ্ধস্থানে তৎক্ষণাৎ চূণ দিলে বেশ উপকার হয়। ডাবের শাঁস ও মাখন একত্র বাটিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইলে ক্ষত শুকাইয়া যায়।

প্রদরে—(অত্যন্ত রক্তস্রাবে) রসাঞ্জন ও লাল ন'টের শিকড় সমভাগে লইয়া একত্র বাটিয়া মসুর দাইল প্রমাণ বটিকা প্রস্তুতকরতঃ মুর্ব্বা মূলের শিকড়ের রস ও চিনি সহ সেব্য।

প্লীহায়—হিরাকস ১ তোলা, মুলার বীজ ১ তোলা—গরম জল দ্বারা মর্দ্দন করিয়া মটর প্রমাণ বটি প্রস্তুত করিতে হইবে। ঐ বটি প্রাতে ও সন্ধ্যায় গুলঞ্চের রস ও চিনি সহ সেব্য।

পাঁচড়ায়—মাখন ও গন্ধক সমপরিমাণে একত্র মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে পাঁচড়া আরোগ্য হয়।

পুরাতন জ্বরে—ক্ষেতপাপড়া ২ তোলা, গুলঞ্চ ২ তোলা—কলার পাতে বেষ্টন করিয়া রাত্রে পোড়াইয়া রাখিয়া প্রাতঃকালে ঐ রস মধুসহ সেবন করিলে পুরাতন জ্বরে উপকার হয়।

উন্মাদে—১ তোলা কর্পূর—পাথরের বাটিতে মহিষ শৃঙ্গ দ্বারা ১ ঘণ্টাকাল বাটিয়া ঐ কর্পূর রোগীর মস্তকে প্রলেপ দিতে হইবে। ঔষধ মাথায় দিলে রোগীর বেশ নিদ্রা হইবে।

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতে—শতধৌত গব্যঘৃত ৶০ পোয়া, তুতে ভস্ম ।০ আনা—একত্র মর্দ্দন করিয়া মটর প্রমাণ ঔষধ কলা অথবা মাখনের সঙ্গে খাইতে হইবে। ঔষধ সেবন-কালে ঔষধ যেন দন্তে না স্পর্শিত হয়।

বাতের বেদনায় এবং ফুলায়—আদা, লঙ্কা মরিচ, সজিনা ছাল, রসুন, ও ওকড়া শাক সমভাগে জল দিয়া বাটিয়া গরম করতঃ বেদনায় ও ফুলার স্থানে প্রয়োগ করিতে হইবে।

সর্দ্দিতে—ছোট পেঁয়াজ, আতপ চাউল, ও সোরা সমভাগে লইয়া একত্রে জল দিয়া বাটিয়া সামান্য গরম করতঃ বক্ষে প্রলেপ দিলে সর্দ্দি উঠিয়া যাইবে।

প্রমেহে—ছোট আমগাছের ছালের রস /০ ছটাক—চূণের জল /০ ছটাক একত্র মিশাইয়া সেবন করিতে হইবে। ঔষধ মিশাইয়াই সেবন করা দরকার, নতুবা জমিয়া যাইবে। ২।৩ দিন সেব্য।

প্রদরে—ওলটকম্বলের শিকড়ের ছাল ৶০ আনা হইতে ।৶০ আনা পর্য্যন্ত ৫টা গোলমরিচ দ্বারা বাটিয়া সেবন করিলে অতিস্রাব বন্ধ হয়। ৩।৪ দিন ব্যবহার করিতে হইবে।

রক্তস্রাবে—শ্বেতআকন্দের মূলের ছাল ২টী গোলমরিচ সহ বাটিয়া সেবন করিতে হইবে।

মলমূত্র বন্ধে—মলমূত্র বন্ধ হইয়া পেট ফুলিয়া গেলে একটী জায়ফল জল দ্বারা ঘসিয়া পুরাতন ঘৃত মিশ্রিত করিয়া নাভীর চারিদিকে প্রলেপ দিতে হইবে। *

স্বপ্নদোষে—হরীতকী, আমলকী, বিল্বপত্র, কালজিরা সমভাগে লইয়া কাঁচা দুগ্ধ সহ সন্ধ্যার পর সেব্য।

হিক্কারোগে—সোমরাজী বীজ চূর্ণ ও হরিদ্রা চূর্ণ সমভাগে চূণের জলের সঙ্গে সেবন করিতে হইবে।

সুপ্রসবের উপায়—হাতীশুড়ার মূল গর্ব্ভিনীর বামদিকের কোমরে বাঁধিয়া দিলে সুপ্রসব হইবে। প্রসবান্তে মূলটি খুলিয়া দিতে হইবে।

পারদ জন্য ক্ষতে—তুলসী পাতা ৪ তোলা পরিমাণ দুই সপ্তাহ চর্ব্বণ করিয়া খাইলে ক্ষত নিরাময় হয়।

ঋতুবন্ধ হইয়া গর্ভ সদৃশ হইলে—চামেলী ফুলের পাতা /।০ পোয়া, জল /৮ সের শেষ /২ সের থাকিতে নামাইয়া ঐ জল /৶০ ছটাক করিয়া প্রত্যহ ২ বার সেব্য। ৩।৪ দিন খাইলে পেটের জল বাহির হইবে।

ধ্বজভঙ্গে—একখানা ছোট নেকড়ায় পালিধা মাদারের আঠা ৭ বার মাখাইয়া

---

* এই মুষ্টিযোগটি কিন্তু আমাদের মতে কেমন কেমন ঠেকিতেছে, কারণ জায়ফলের গুণ মলের বিবদ্ধতার সংঘটন, এইজন্য প্রবল অতিসারে নাভির চারি পার্শ্বে জায়ফল ঘসিয়া প্রলেপ দিবার ব্যবস্থা আছে। মল বদ্ধ হওয়ার জন্য যাহাদের পেট ফুলিয়া উঠিয়াছে তাহাদিগের ইহাতে কি করিয়া ফল হইবে? আমাদের বোধ হয় উহাতে আরও বিপরীত হইতে পারে। তবে ইহা একজন প্রাচীন চিকিৎসকের খাতার লিখিত বলিয়া আমরা ছাপিলাম। আঃ সং।

শুখাইতে হইবে পরে জায়ফল চূর্ণ ও লবঙ্গ চূর্ণ মাখাইয়া সন্ধ্যার সময় পুরুষাঙ্গে পটী বাঁধিতে হইবে এবং সমস্ত রাত্রিই বাঁধিয়া রাখিতে হইবে।

রক্ত প্রদরে—বাসকের ছাল ২ তোলা, জল ।।৹ সের দ্বারা জ্বাল করতঃ ।৴৹ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ফটকারী, প্রিয়ঙ্গু, লোধ, রসাঞ্জন, পদ্মকেশর, ও অশোকের ছাল চূর্ণ, প্রত্যেক ৫ রতি সহ ২ বেলা সেব্য। ৭ দিন ব্যবহারে রক্ত প্রদর আরোগ্য হয়।

শোথে—সোরা ১ তোলা, শোধিত গন্ধক ১ তোলা, একত্র মিশ্রিত করিয়া এক লোহার হাতায় অগ্নিতে জ্বাল দিতে হইবে। যখন ঔষধ হাতার উপর জ্বলিয়া উঠিবে তখন তাহা একটি মাটির পাত্রে ঢালিয়া রাখিতে হইবে এবং ঠাণ্ডা হইলে চূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। সেই চূর্ণ ১ রতি পুনর্ণবার রস সহ সেব্য।

রক্তপিত্তে—চুকাশাকের মূল ৩ তোলা, মৌরী ১ পোয়া, চিনি ২ তোলা, মৌরী বাটিয়া চুকাশাকের মূলের রসে চিনি সহ সরবত করতঃ সেবন করিলে বুকের ভার ও রক্তপিত্ত আরোগ্য হয়।

দদ্রুরোগে—কর্পূর ১ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, সোহাগার খৈ ২ তোলা, গর্জ্জন তৈল ১ পোয়া, একত্র মর্দ্দন করতঃ দদ্রু স্থানে প্রযুজ্য।

রক্তপ্রদরে—কাঁচা আম্র ।৴৹ আনা, বেলছাল চূর্ণ ১ পোয়া—একত্র বাটিয়া অশোকের ছালের রস সহ খাইতে হইবে।

অধিক প্রস্রাবে—কাঁচা ডুমুর ১৫টী ছেঁচিয়া সেই রস, চিনি ২ তোলা, জল ।৴৹ পোয়া—সরবৎ করতঃ সেবন করিতে হইবে।

পেট ফাঁপায়—গোলমরিচ ৬।৭টী চূর্ণ করিয়া মিছরির সরবৎ সহ সেব্য।

ক্রিমিরোগে—পলাশবীজ, বিড়ঙ্গ, যমানী ও কুমড়ার বীজ (মিষ্ট) প্রত্যেক ।।৹ তোলা, জল ।।৹ সের দিয়া সিদ্ধ করিয়া ।৴৹ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ঐ কাথ ২ তোলা বিড়ঙ্গের চূর্ণ সহ ২ বার দিনে সেব্য।

অরুচিতে—পাকা জামের রস ।।৹ সের, মিছরি ।৹ পোয়া—একটী মাটির পাত্রে জ্বাল দিয়া মিছরি গলিয়া গেলে গোলাপ জল ২ তোলা মিশাইতে হইবে। প্রত্যহ আহারের পূর্ব্বে ১ তোলা সেব্য।

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতে—শতধৌত গব্যঘৃত ।৹ পোয়া মুদ্রা শঙ্খ ।৹ ছটাক, সফেদা ।৹ ছটাক, ১ প্রহর খলে মাড়িয়া কর্পূর ৩ তোলা মিশাইয়া ক্ষতে লাগাইতে হইবে।

পিত্তজন্য হাত পা জ্বালা করিলে—বিটলবণ, গোলমরিচ, সোহাগার খৈ প্রত্যেক ৩ রতি একত্রে মিশ্রিত করিয়া ২।৩ রতি মুখে দিয়া মিছরির সরবৎ খাইতে হইবে।

উপদংশে ও সর্ব্বপ্রকার ক্ষতে—গব্যঘৃত ।।৹ সের লইয়া নিমের পাতা ও নিসিন্দার পাতা ও অপামার্গের মূল ১টী ঐ ঘৃতে ভাজিয়া ঘৃত ছাঁকিয়া লইয়া ফিটকিরির খৈ ।।৹ তোলা, তুঁতে ভস্ম ।৹ চারি আনা মিশাইতে হইবে। ক্ষতে এই ঘৃত প্রয়োগ করিবে।

বিষ ভক্ষণে—কলমী শাকের ডাঁটা ও পাতার রস ।৴৹ পোয়া রোগীকে খাওয়াইতে হইবে, তাহা হইলে রোগীর বমি হইয়া বিষ উঠিয়া যাইবে।

হিক্কায়—আনারসের পাতার রস ।৴৹ পোয়া, মিছরি ১ তোলা সহ সেব্য।

আমাশায়ে—বাবলা গাছের পাতা, থানকুনী শাকের পাতা ও সামান্য অহিফেন একত্র বাটিয়া নাভিতে প্রলেপ দিলে আমাশয়ের জন্য পেট ব্যথায় উপকার হয়।

রাত্রিতে চক্ষুতে না দেখায়—পানের রস ২।৩ ফোঁটা চক্ষে দিতে হইবে। পরে ৫।৬ মিনিট চক্ষু বন্ধ করিয়া থাকার পর ঠাণ্ডা জল দ্বারা চক্ষু পরিষ্কার করিতে হইবে। একদিনেই উপকার হয়। ঘোটকের বিষ্ঠা (সদ্য) এক খানা পরিষ্কার নেকড়ার পুঁটুলী করিয়া চক্ষুতে সেই বিষ্ঠার রস ১ ফোঁটা করিয়া দিলেও বেশ ফল হয়। শনি মঙ্গলবারে একটী জোনাকী পোকা একটী কলার ভিতর ভরিয়া যে স্থানে ৩টী রাস্তা মিলিয়াছে সেইরূপ স্থানে রোগীকে সন্ধ্যার পর সেই জোনাকী ভরা কলা খাইতে দিতে হইবে, রোগী কলা খাইয়াই চক্ষুতে দেখিতে পাইবে। *

রক্তপ্রদরে—শ্বেত আকন্দের মূল ২ তোলা, গোলমরিচ ॥৹ তোলা—বাসি জলে বাটিয়া সেবনে ফল পাওয়া যায়।

---

* শনি মঙ্গল বারে এবং যেখানে তিনটি রাস্তা মিলিয়াছে, সেরূপ ব্যবস্থায় জোনাকী খাওয়ার কথা আমরা জানিনা, তবে জোনাকী—কলার ভিতরে পুরিয়া খাইলে যে এরূপ অবস্থায় ফল পাওয়া যায়, তাহা আমরাও কয়েক স্থানে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আঃ সঃ।

ক্ষতে—শ্বেত কাঞ্চন ফুল ১০টী, নিম পাতা বাটা ২ তোলা—একত্র বাটিয়া ক্ষতে প্রলেপ।

শিশুর উদরাময়ে—লবঙ্গ, জায়ফল, ও সোহাগার খৈ প্রত্যেকটি সমভাগ একত্র চূর্ণ করিয়া মাতৃদুগ্ধ সহ সেবন করাইলে ফল পাওয়া যায়।

বাঘী বসান—হিরাকস ভিজান জলের পটী দিলে বাঘী বসিয়া যায়। (২) কালকুকুটের ডিম ১টা কাঁসার থালে ভাঙ্গিয়া চূণ সামান্য দিয়া উত্তমরূপে ডিমের লালার সহিত মিশাইতে হইবে, এই ঔষধ দিবসে ৩।৪ বার প্রয়োগে ফল পাওয়া যায়।

অম্লরোগে—প্রতিদিন গুঁড়া চা পড়ি ১০।১২ বার—১ তোলা পরিমাণে সেবন করিলে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। রোগ উপশমিত হইলে ক্রমে ক্রমে মাত্রা কমাইতে হইবে।

প্রমেহে—স্নানকালে সাত খণ্ড আদা ও এক খণ্ড আসসাওড়ার (যাহা সকলে দন্ত ধাবনার্থ ব্যবহার করে) মূল একত্রে মুখের মধ্যে দিয়া জলে ডুব দিয়া চিবাইয়া খাইতে হইতে হইবে। পরিশেষে স্নানান্তে দধি, কদলী সহ অন্ন ভোজন। এই প্রক্রিয়া করিলে প্রমেহ আরোগ্য হয়। (২) কৃষ্ণ তুলসীর পাতার রস বিনা জলে বাহির করিতে হইবে। সেই তুলসীর রস ১ তোলা—টাট্‌কা মধু ১ তোলা, খাঁটি গব্য দুগ্ধ ১ তোলা—একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিলে যেমন কঠিন ব্যাধি হউক না কেন নিশ্চয়ই ফল হইবে। প্রমেহ অধিক দিনের হইলে এক পক্ষকাল অথবা ৩ সপ্তাহ

সেবন করিতে হইবে। (৩) একটী পুঁই শাকের মূল /১ পোয়া জলের সহিত বাটিয়া স্নানান্তে খাইতে হইবে। পরে ভিজান কাঁচা কলাই-য়ের দাইল চিনির সহিত সেবন করিতে হইবে। এই প্রকার ৩ দিন করিলে রোগ আরোগ্য হইবে।

সহজ হিক্কা নিবারণে—একটী পাতি অথবা কাগজী লেবুর একদিক কাটিয়া তাহা সূঁচ দ্বারা বার বার বিদ্ধ করিয়া তাহাতে মিছরির গুঁড়া দিতে হইবে। সূঁচ এরূপ ভাবে বিদ্ধ করিতে হইবে যে, সেই সূচী বিদ্ধ কালে ছিদ্র পথে যেন মিছরি প্রবেশ করে। এইরূপে লেবুটী প্রস্তুত করিয়া রোগীকে লেবু চুষিতে হইবে। হিক্কা কালে রোগী সেই লেবুটীর কর্ত্তিত মুখে মুখ দিয়া অল্পে অল্পে চুষিতে থাকিবে। এইরূপ করিলে হিক্কা নিবারিত হয়।'

পালা জ্বরে—হাতিশুঁড়োর পাতার রসে একখানি ছিন্ন বস্ত্র সিক্ত করিয়া ছোবড়া গুলি সেই বস্ত্রের এক প্রান্তে বাঁধিয়া বাখিতে হইবে। পরে সেই পুঁটুলীর ঘ্রাণ পুনঃ পুনঃ লইতে হইবে, পালার ২।৩ দিন এই ঔষধের ঘ্রাণ লইলে পালা নিশ্চয়ই নিবারিত হইবে।

হৃৎপিণ্ডের হাঁপছাড়া।

["হিন্দুস্থান হইতে সংগৃহীত"]

মানুষের দেহের মধ্যে হৃৎপিণ্ডই হইতেছে সব-চেয়ে বড় জিনিষ; কিন্তু তাহার সঠিক বৃত্তান্ত আমরা একরকম জানিনা বলিলেও চলে।

দেহের রক্ত সর্ব্বপ্রথমে হৃৎপিণ্ডের চারিটি কুঠরী; তারপর শরীরের ছোট-বড় ধমনীর ভিতরে ঘুরিয়া, একবার ফুসফুসের মধ্যে গমন করে। তারপর আবার হৃৎ-পিণ্ডের মধ্যে ফিরিয়া আসে। আমাদের দেহের ভিতরে ক্রমাগত এমনি রক্তের আসা যাওয়া চলিতেছে। দেখা গিয়াছে, এমনি করিয়া প্রত্যেকবার সারা দেহটা ঘুরিয়া আসিতে রক্তের পক্ষে আধ মিনিটের বেশী সময় লাগে না।

মানুষ যখন দাঁড়াইয়া থাকে তখন তাহার হৃৎপিণ্ড যতবার স্পন্দিত হয়, যখন সে শুইয়া থাকে তখন তাহার হৃৎপিণ্ড তা'র চেয়ে দশবার কম স্পন্দিত হয়। মানুষ যখন হাঁচে, হৃৎপিণ্ডের গতি তখন বন্ধ হইয়া যায়। একজন বিশেষজ্ঞের মতে, হৃৎপিণ্ডের কাজের হের-ফেরের দরুণই মানুষের মুখ ক্ষণিকের জন্য পাণ্ডুবর্ণ বা লজ্জায় সময়ে লাল হইয়া উঠে। চোকাভগা আঙ্গুল হৃৎপিণ্ডের দোষ-নির্দ্দেশক। যাঁহার উদরের পরিপাক-কারী যন্ত্রগুলি ও ফুসফুসের সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের আকারও অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হয়, সে দীর্ঘ-জীবন লাভ করিয়া থাকে। হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধে এমনি আরও অনেক জানিবার কথা আছে,

সাধারণতঃ সকলের যাহা জানা নাই। আপন আপন দেহ সম্বন্ধে সকলেরই কিছু কিছু জ্ঞান-সঞ্চয় করা উচিত। তাই এখানে আমরা হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধে আরও কতকগুলি জ্ঞাতব্য তথ্য লিপিবদ্ধ করিব।

শ্রান্তি কাহাকে বলে, আপনারা সকলেই তাহা জানেন। দেহের মাংসপেশীগুলিকে বেশীক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত রাখিলেই মানুষের শরীর শ্রান্ত হইয়া পড়ে। মাংসপেশীর মধ্যে শ্রম-বিষ সঞ্চারিত হইলে মানুষের মনে যে শ্রান্তির ভাব আসে, খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিলেই সে ভাবটা চলিয়া যায়। কার্য্যের সময়ে মাংসপেশী যে সার পদার্থ ব্যয় করে, বিশ্রামের সময়ে সে আবার সেটা পরিপূরণ করিয়া নেয়।

এই শ্রান্তির ভাবটা বেশ আরামের না হইলেও, এটা না থাকিলে আমরা কিছুতেই বাঁচিতাম না। কারণ, তাহা হইলে আমরা এমন ভীষণ পরিশ্রম করিতাম যে, আমাদের সমস্ত মাংসপেশী একেবারে নিঃশেষে ক্ষয়লাভ করিত! কিন্তু ভাগ্যে শ্রান্তি আসিয়া আমাদিগকে আগেই সাবধান করিয়া দেয়।

দেহের সমস্ত মাংস মাংসপেশীর ধর্ম্মই এক,—কেবল হৃৎপিণ্ড ছাড়া। এখানে বলিয়া রাখা ভালো, আসলে হৃৎপিণ্ড মাংসপেশী ভিন্ন আর কিছুই নহে। দিনে-রাতে হৃৎপিণ্ড যে বিপুল পরিশ্রম করিয়াও সতেজ-সবল থাকে, অন্য যে কোন মাংসপেশীর পক্ষে সে পরিশ্রমটা নিশ্চিত মরণের মতই সাংঘাতিক।

কিন্তু আপনারা অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে, হৃৎপিণ্ডও তাহার কাজের ফাঁকে ফাঁকে নিয়মিত ভাবে বিশ্রাম করিয়া নেয়। হৃৎপিণ্ডের বিশ্রামের নামান্তর মৃত্যু—এই কথাই আমরা জানি। কিন্তু হৃৎপিণ্ডের বিশ্রামের মধ্যে বেশ একটু নিপুণতা আছে এবং সেই জন্যই সে বিশ্রাম করিলে আমরাও চির-বিশ্রাম লাভ করি না।

নহিলে হৃৎপিণ্ডের ধুপধুপুনি যদি অল্পক্ষণের জন্যও বন্ধ হয়, তবে আমাদের পক্ষে সত্য-সত্যই বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব।

গড়পড়তার হিসাবে, উপবিষ্ট অবস্থায় প্রত্যেক পুরুষের হৃৎপিণ্ড মিনিটে বাহাত্তর বার এবং প্রত্যেক স্ত্রীলোকের হৃৎপিণ্ড মিনিটে আশীবার করিয়া স্পন্দিত হয়। এমন মানুষ দেখা যায়, যাহার হৃৎপিণ্ড মিনিটে পঞ্চাশ বারের বেশী স্পন্দিত হয় না। এখন ভাবিয়া দেখুন, দিন-রাতে অশ্রান্তভাবে এই বিষম পরিশ্রমটা করিতে হইলে কতখানি শক্তি-সামর্থ্যের দরকার। এত বেশী পরিশ্রম করিতে হইলে, যে শক্তি ব্যয় হয়, সেই শক্তি-বলে প্রতিদিন পৃথিবীর গভীরতম খনি হইতে একখানি চারি সের ওজনের পাথরকে অনায়াসে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতের চূড়ায় একবার করিয়া তুলিয়া ফেলা যায়।

সুতরাং হৃৎপিণ্ডেরও বিশ্রাম দরকার। কিন্তু সে কি করিয়া বিশ্রাম নেয়, জানেন? আপনি যদি কোন লোকের বুকের উপরে কাণ রাখেন, তাহা হইলে দেখিবেন, হৃৎপিণ্ড একবার ধুপ্ ধুপ্ শব্দ করিতেছে, আর একবার থামিতেছে। এই যে থামা ইহাই হৃৎপিণ্ডের কষ্টার্জ্জিত বিশ্রাম। শরীরের মধ্যে একমাত্র হৃৎপিণ্ড ছাড়া আর কোন মাংসপেশীই এমনভাবে বিশ্রাম গ্রহণ করিতে

পারে না। তাহার এই বিশ্রাম অনেকটা একচোখ মুদিয়া ঘুমানোর মতন বটে, তবু এই বিশ্রাম কালের মধ্যেই হৃৎপিণ্ড আপনার কার্য্যের উপযোগী বল সংগ্রহ করিয়া লয়। এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম এবং দুই মুহূর্ত্ত কাজ—এইরূপে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে হৃৎপিণ্ডের মোট বিশ্রামের পরিমাণও বড় অল্প হয় না। এবং এই বিশ্রাম না থাকিলে, অল্পদিনেই হৃৎপিণ্ড অচল হইয়া যাইত।

ডাক্তারের ডায়েরী।

স্বর্গীয় ডাঃ হেমচন্দ্র সেন মহোদয় কর্ত্তৃক লিখিত ও

ডাঃ শ্রীজগবন্ধু গুপ্ত এল, এম, এস, কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

আজ এক অদ্ভুত রোগী পাইয়াছিলাম। লোকটার বয়স ৩০।৩২ হইবে, সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-পূর্ণ। সে গরমীর ব্যায়রামে অনেকদিন হইতে ভুগিতেছে। প্রথমেই আসিয়া আমাকে বলিল—তাহার এক শত্রু তাহাকে পানের ভিতর করিয়া কাঁচা পারা খাওয়াইয়াছিল,—সেই জন্যই তাহার "পারার ঘা" হইয়াছে। কথাটা শুনিয়া আমার হাসি আসিল। আমি একজন ডাক্তার, লোকটা আমার সঙ্গেই প্রতারণা করিল! "পারার ঘা" কথাটাই নিরর্থক। অনেক লোক আছে—যাহারা নিজের পাপকে গোপন করিবার জন্য "পারার ঘা" কথাটার সৃষ্টি করিয়াছে। আবার এমন গুণধর পুরুষ আছেন, যিনি অম্লানবদনে বলিয়া ফেলেন—"অনেক ডাক্তারী ঔষধ খাইয়াছি—হয়ত তাহাতেই আমার দেহে পারা ফুটিয়াছে।" হায়! এই সকল প্রবঞ্চকেরা হয় ত জানে না—বিশুদ্ধ পারা শরীরে এক কণাও গৃহীত হয় না, পারায় শরীরের কোনও অপকারই হয় না। বরং পারদ ঘটিত লবণ (Salt of mercury) দেহাভ্যন্তরে গৃহীত হইয়া স্বস্ব ধর্ম্মানুযায়ী লক্ষণ উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু তাহাও কখনও 'ঘা' রূপে প্রকাশ পায় না। অধিকন্তু—পারার চেয়ে গরমীর ব্যায়রামের উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। গরমীর ব্যারাম আরাম করিবার জন্য সরল প্রকৃতির ডাক্তার-গণ প্রকাশ্যে এবং চতুর ডাক্তারেরা গোপনে ঔষধরূপে পারাই প্রয়োগ করিয়া থাকেন। মূর্খ লোকে গরমীকে "পারার ঘা" বলুক, কিন্তু শিক্ষিত ডাক্তারেরাও যে (Mercurial Eruption) বলিয়া কথাটার ব্যবহার করেন, ইহা আরোও অসহ্য।

* * * *

যক্ষ্মারোগে—ছাগল।

ছাগল যক্ষ্মারোগের প্রতিষেধক। আয়ু-

দের পূর্ব্বপুরুষগণ—এ তথ্য জানিতেন। চরক ঋষি বলেন—"ছাগ মাংস ভক্ষণ, ছাগদুগ্ধ পান, ছাগলের সেবা, ছাগলের মধ্যে শয়ন—নিশ্চয় যক্ষ্মারোগ নষ্ট করে।" আমি ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। আমার ঔষধালয়ের ১ ক্রোশ দূরে এক মুসলমান যুবক বাস করিত। এ ব্যক্তি ধনী এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিল। ইহার যক্ষ্মারোগ হয়। আমি চিকিৎসা করি। ডাক্তারী কোন ঔষধে বিশেষ ফল না পাওয়ায়, আমি তাহাকে ছাগমাংস ভক্ষণ ও ছাগদুগ্ধ পান করিতে বলিলাম। তাহার শয্যার চতুর্দ্দিকে ৪।৫টী ছাগল বাঁধিয়া রাখিবার উপদেশ দিলাম। রোগী আমার আদেশ পালন করিল। ৪ মাসের পরে তাহার বক্ষ পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল—ক্ষয় রোগের চিহ্ন অন্তর্হিত হইয়াছে। ১ বৎসর রোগী আমার আদেশ পালন করিয়াছিল। ইহার পর ১১ বৎসর কাল আমি তাহার আর রোগ হইতে দেখি নাই। সেই অবধি চরকের উপর আমার বড়ই ভক্তি। চিকিৎসা বিজ্ঞানে "চরক সংহিতা" একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, ভারতেরও গৌরবের জিনিষ। ইউরোপের একজন বড় ডাক্তার বলিয়াছেন,—"চরকের মতের চিকিৎসা প্রচলিত থাকিলে, পৃথিবী হইতে অকাল মৃত্যু দূর হইত।" আমরা কিন্তু আজও চরকের আদর বুঝিলাম না।

• • •

সোডার চেয়ে "ভাস্কর লবণ" অনেক ভাল।

পাকস্থলীর ক্ষতে এবং অম্লাধিক্যে পূর্ব্বে আমি বাইকার্ব্বনেট সোডা—যথেষ্ট পরিমাণে জল মিশাইয়া রোগীকে খাইতে দিতাম। পীড়ার প্রবল অবস্থায় তাহাতে সাময়িক কিছু উপকার দর্শিত। কিন্তু এমন দুই চারিজন রোগী পাইয়াছি—যাহাদের সোডায় কোন ফল হয় নাই। ইহাদের কোষ্ঠবদ্ধতা ছিল। প্রচুর মাত্রায় লাইট ম্যাগনেসিয়া ব্যবস্থা করিয়া ১০।১২ দিন ইহাদিগকে সুস্থ রাখিয়া ছিলাম। পাকস্থলীর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের অম্লত্ব নষ্ট করিতে হইলে—অধিক মাত্রায় ম্যাগনেসিয়া উপকারী। তবে কাহারও কাহারও সে উপকার বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। এরূপ রোগীকে—সবনাইট্রেট অফ বিসমথ ১ ড্রাম মাত্রায় দিয়াছি। বিসমথ পাকস্থলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর আবরক হইয়া থাকে, সে জন্য খাদ্য দ্রব্য কোনরূপ উত্তেজনা প্রকাশ করিবার অবকাশ পায় না, পেপটিক গ্রন্থির স্রাব এবং কার্য্যকারিতা হ্রাস হয়। যখন দেখিলাম বিসমথের ক্রিয়াও বেশীদিন স্থায়ী হইল না, তখন কবিরাজী—"ভাস্কর লবণ" ব্যবস্থা করিলাম। রোগী বেশ ভাল হইয়া গেল। "ভাস্কর লবণ" একটী মহৌষধ। ইহাতে পাকস্থলীর রক্তস্রাব বন্ধ হয়, অন্ত্রের ক্রিমি দূর হয়, গ্রন্থির স্রাব কমিয়া যায়।

• • •

যে শিশু আন্ত্রিক অজীর্ণ রোগাক্রান্ত—তাহার সর্ব্ব প্রধান চিকিৎসা—কোন প্রকার উত্তেজনার কারণ না থাকে। তাহাকে আমোদ প্রমোদ শান্তি প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার উত্তেজনা হইতে দূরে রাখিবে।

• • •

নিদ্রিতাবস্থায় ভয়ানক স্বপ্ন দেখিলে, অবসাদক [এণ্টিপাইরিন, সেনাসিটিন প্রভৃতি] বিশেষ উপকারী।

* * *

যে বালক অধিক বয়স পর্য্যন্ত শয্যায় মূত্র ত্যাগ করিয়া ফেলে, তাহাকে বেলেডোনা উপযুক্ত মাত্রায় খাওয়াইবে। প্রথমে খুব অল্পমাত্রায় দিবে, পরে সহ্যমত মাত্রা বাড়াইবে।

বেলেডোনায় যক্ষ্মা রোগীর নিশিঘর্ম্ম নিবারিত হয়।

* * *

প্রদাহ—শরীরের অনিষ্টকারী নহে। বরং উপকারী। প্রদাহ—প্রকৃতির ক্ষমতার পরিচায়ক, শারীরিক অনিষ্ট নিবারণের জন্য—তীব্র প্রতিবাদ। অতএব প্রদাহ ক্রিয়াকে শরীর রক্ষার্থ সাহায্য করিতে হইবে।

কবিরাজী ঔষধে কুষ্ঠরোগ আরোগ্য।

পাশ্চাত্য মতে কুষ্ঠ রোগের একটী মাত্র কারণ—Bacillus Lepra. আয়ুর্ব্বেদ মতে কুষ্ঠ রোগের কারণ অনেকগুলি—তন্মধ্যে খাদ্যের দোষ সর্ব্বপ্রধান। মৎস্য ও মাংসের বহুল ব্যবহারে কুষ্ঠরোগ জন্মিতে পারে—ইহা ঋষি-বাক্য। এই জন্যই বোধ হয় হিন্দুস্থানী বৈদ্যগণ কুষ্ঠরোগীকে নিরামিষ খাইতে এবং সাত্ত্বিক নিয়মে থাকিতে উপদেশ দেন।

আমি ৩টী কুষ্ঠ রোগী পাইয়াছিলাম। দুইজন মুসলমান, একজন হিন্দু মাড়োয়ারী। এই মাড়োয়ারী—কুষ্ঠরোগীর অনেক দিন ধরিয়া পরিচর্য্যা করিয়া কুষ্ঠাক্রান্ত হইয়াছিল। এই তিন জনের কুষ্ঠই—Cubercular leprosy র অন্তর্গত। তিন জনকে প্রায় একই সময়ে আমি চিকিৎসা করিয়াছিলাম। কিন্তু মুসলমান দুইজন ভাল হয় নাই, মাড়োয়ারী ভাল হইয়াছিল। মুসলমান দ্বয় মাংস ও পলাণ্ডু ব্যবহার ছাড়ে নাই। মাড়োয়ারী—সাত্ত্বিক আহার করিত। মাড়োয়ারীর—মস্তকের চুল খসিয়া পড়িয়াছিল, মুখগহ্বরের ঝিল্লী ফুলিয়া উঠিয়াছিল, কণ্ঠস্বর অনেকটা বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল। মুসলমানদ্বয়ের অবস্থা এতদূর ভীষণ হয় নাই। চিকিৎসা প্রারম্ভে আমি তিনজনকেই জোলাপ দিই। তার পর চালমুগরার বিশুদ্ধ তৈল (anti-leprol) মাংসপেশীতে পিচকারীর সাহায্যে প্রয়োগ করি। ২ C. C. তৈল ৩ দিন অন্তর injection দিই। ৭ মাস পরে মাড়োয়ারীটি ভাল হইয়া গেল। কিন্তু ১ বৎসরেরও অধিক কাল মুসলমানদ্বয়কে চালমুগরার capsule (১৪০ ফোঁটা পর্য্যন্ত) খাওয়াইয়াও কোনও উপকার দেখাইতে পারিলাম না। আমার চিকিৎসাধীন হইয়াও মাড়োয়ারী—বৈদ্যের ঔষধ পরিত্যাগ করে না। সে প্রত্যহ—নিম ছালের গুঁড়া ঘৃতের সহিত সেবন করিত। নিমের বীজ ঘৃতে ভাজিয়া গায়ে মাখিত, নিমশাখায় দাঁতন করিত। আমার বিশ্বাস—মাড়োয়ারী যে ভাল হইল—নিমের প্রভাবও তাহার একটী কারণ। নিরামিষ ভোজনও একটী কারণ।

আয়ুর্ব্বেদে কুষ্ঠরোগের অসংখ্য ঔষধ কল্পিত হইয়াছে। কত চূর্ণ, কত বটিকা, কত তৈল, ঘৃত, প্রলেপ !! এই সকল ঔষধের উপাদানের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান হওয়া উচিত।

শিশুচিকিৎসায় সহজ ব্যবস্থা।

কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কবিরত্ন

কাস ও শ্বাসে।—(১) কণ্টকারী, বাসন্তী, নতী ও নাগকেশর চূর্ণ সমভাগে ২।৩ রতি মাত্রায় মধুর সহিত লেহন করাইলে শিশুর কাস ও শ্বাস নষ্ট হয়। (২) ধনের গুঁড়া ও চিনি—চাউল ধোয়া জল সহ পান করাইলে শিশুর কাস ও শ্বাস নষ্ট হয়। (৩) দ্রাক্ষা (কিসমিস), বাসক, হরীতকী, পিপুলের গুঁড়া—মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করাইলে শিশুর শ্বাস ও কাস নষ্ট হয়। (৪) দুরালভা, হরীতকী, পিপুল, কিসমিস—ইহাদের চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করাইলে শ্বাস, কাস ও হিক্কা নষ্ট হয়। মাত্রা প্রত্যেক দ্রব্য ১ বৎসরের শিশুর জন্য সিকি রতি। (৫) কুড়, আতইচ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল ও দুরালভা—ইহাদের চূর্ণ সিকি রতি মাত্রায় লইয়া মধুর সহিত লেহন করাইলে শিশুদিগের সর্ব্ববিধ কাস রোগ আরোগ্য হয়।

বমন রোগে।—(১) বৃহতী, কণ্টকারী ও বেগুন.ফলের রস মধুর সহিত অল্প মাত্রায় লেহন করাইলে শিশুদিগের বমি বন্ধ হয়। (২) প্রিয়ঙ্গু, কুলের আঁটির শাঁস, মুথা ও রসাঞ্জন—একত্রে ১ রতি মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করাইলে শিশুদিগের বমন নিবারিত হয়। (৩) কট্‌কী চূর্ণ—মধুর সহিত সেবন করাইলে শিশুদিগের অতি প্রবল বমন ও হিক্কা নিবারিত হয়। (৪) গেরিমাটি চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করাইলে বমন ও হিক্কা পীড়িত বালক অতি সত্বর সুস্থতা লাভ করে।

রক্তাতিসারে।—(১) জামছালের রস—কিঞ্চিৎ ছাগদুগ্ধের সহিত মিশাইয়া পান করিলে শিশুদিগের রক্তাতিসারের বিশেষ উপকার হয়। (২) কুড়চির ছাল চূর্ণ ১ রতি, গেরিমাটি অর্দ্ধ রতি—কিঞ্চিৎ চাউল ধোয়া জলের সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে শিশুদিগের রক্তাতিসার প্রশমিত হয়। (৩) কাঁচা বেল পোড়াইয়া তাহার শাঁস চারি আনা, ইক্ষুগুড় দুই আনা—জলের সহিত পাতলা করিয়া সেবন করিলে রক্তাতিসারে উপকার দর্শে।

শোথে।—(১) যবক্ষার ১ রতি, মিছরি এক আনা, শ্বেত পুনর্ণবার রসের সহিত দুই তিন বার করিয়া সমস্ত দিনে সেবন করাইলে শিশুদিগের হাত পায়ের ফুলা বিনষ্ট হয়। (২) শ্বেত পুনর্ণবার রস ১ ঝিনুক—কিঞ্চিৎ মিছরির সহিত প্রত্যহ ২।৩ বার পান করাইলে বালকদিগের শোথ আরোগ্য হয়। (৩) পুনর্ণবা, নিমছাল, নতি, শুঁঠ, কট্‌কী, বিটলবণ, দেবদারু, হরীতকী—ইহাদের কাথ দুই ঝিনুক করিয়া কিঞ্চিৎ মধুসহ পান করাইলে শিশুদিগের শোথ বিনষ্ট হয়। এই সকল দ্রব্যের মাত্রা প্রত্যেকটি দুই আনা। এই কাথ কিন্তু পাঁচ বৎসরের কম বয়স্ক শিশুদিগকে দেওয়া নিষেধ।

সমালোচনা ।

অব্যর্থ সিদ্ধ মুষ্টিযোগ।—কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত কবিরত্ন কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত। মূল্য ।৵৹ আনা। মুষ্টিযোগের পুস্তক বাজারে অনেকগুলি বাহির হইয়াছে, এখানি তাহাদিগের অন্যতম। এই পুস্তকে গ্রন্থকারের কতকগুলি ব্যবহৃত দৃষ্ট-ফল মুষ্টিযোগের সহিত শাস্ত্রীয় মুষ্টিযোগগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কাজেই এ গ্রন্থে অনেক নূতন মুষ্টিযোগ শিখিতে পারা যাইবে। আগে মুষ্টিযোগ ও টোটকার ব্যবহার দেশে খুবই প্রচলিত ছিল, অনেক পাকা গৃহিণী পর্য্যন্ত সে সকল মুষ্টিযোগ ও টোটকার অনেক কঠিন কঠিন রোগ আরাম করিতেন। এখন সে গৃহিণীও নাই, সে মুষ্টিযোগও নাই—এ অবস্থায় মুষ্টিযোগ ও টোটকার গ্রন্থ লইয়া যিনিই আমাদের নিকট উপস্থিত হইবেন, তিনিই ধন্যবাদার্হ; তাহার উপর সেই সকল পুস্তকে যদি দৃষ্ট ফল ঔষধ থাকে, তাহা হইলে ঐ গ্রন্থের গ্রন্থকারের নিকট তো দেশের লোক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে বাধ্য। আমরা এ গ্রন্থখানি দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি।

সতুরমা। "দময়ন্তীর কথা" রচয়িত্রী শ্রীমতী চারুবালা সরস্বতী প্রণীত। মূল্য ১৷৹ "সতুরমা", "বিশ্বেশ্বর দর্শনে," "বন্ধু" "অলক্ষণা", "হ্যালির ধূমকেতু" "মিলন" ও "বীণা'র বিবাহ"—এই কয়টি গল্প লইয়া "সতুরমা" বিরচিত। গল্পগুলি নভেলের ধরণে লিখিত হইলেও "মলয় পবন" "হা হতোঽস্মি" বা বিকট বিরহে প্রেমিক-প্রেমিকার উৎকট চিত্তবিকৃতির ছায়া মাত্র ইহাতেনাই। সাদা কথায় সোজাভাবে কুরুচির লেশমাত্র যাহাতে স্পর্শ করিতে না পারে—এরূপভাবে সকল গল্পগুলিই লিখিত হইয়াছে। এখনকার দিনে যে সকল নভেল বাহির হইতেছে, তাহার অধিকাংশই পিতা-পুত্রে, ভ্রাতা-ভগ্নীতে, গুরুজন-অনুজনে একত্র বসিয়া পাঠ করিবার উপায় নাই, কিন্তু আমরা 'সতুরমা'র বিশেষত্ব দেখিলাম যে, ইহাতে সে আশঙ্কা একেবারেই নাই; গুরু লঘু বিচার না রাখিয়া ইহা সকলের নিকটেই পড়িয়া শুনান যায়। অথচ ইহার জন্য গল্পের সজ্জা-সম্পদের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। আমরা এই নভেলিযুগে এরূপ একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুস্তক পড়িয়া বিশেষ সুখী হইয়াছি। গ্রন্থকর্ত্রী এই ধরণের আরও কয়েকখানি গ্রন্থ লিখিয়া যশোরাশি অর্জ্জন করুন—ইহাই আমাদিগের কামনা।

বিরজা-বিয়োগ।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের একনিষ্ঠ সাধক কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ মহাশয় আর এ সংসারে নাই। গত ২৬শে মাঘ রাত্রি সার্দ্ধ একাদশ ঘটিকার সময় তিনি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের সমস্ত মায়াজাল বিচ্ছিন্ন করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিয়া বাটী গিয়া আহার সমাপনান্তে নিদ্রাসুখ উপলব্ধি করিতেছিলেন, রাত্রি ১১টার পর নিদ্রাভঙ্গে বলিলেন,—বুকের মধ্যে কি একরূপ যন্ত্রণা হইতেছে,—ক্রমে সেই যন্ত্রণায় তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন, একটু জল চাহিয়া পান করিলেন, জল পানান্তে আবার শয়ন করিলেন, সেই শয়নই তাঁহার চির শয়ন হইল, আর তিনি শয্যাত্যাগ করিলেন না, নিমেষের মধ্যে চির নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, স্থির শান্ত প্রকৃতির বক্ষে প্রলয়ঙ্কর ঝটিকার আবির্ভাব। আমরা যখন এই নিদারুণ মৃত্যুসংবাদ শুনিলাম, তখন কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলাম না, তাহার পর গিয়া দেখিলাম, সত্য সত্যই প্রগাঢ় পণ্ডিত বিরজাচরণ আমাদিগকে চির দিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এরূপ মৃত্যু ইতঃপূর্ব্বে আমরা আর কখনও দেখি নাই, প্রতি দশ হাজারের মধ্যে ১ জনের কাহারও এরূপ মৃত্যু সংঘটন হয় কিনা তাহাও সন্দেহ।

আগামীবারে আমরা আয়ুর্ব্বেদের এই চির উপাসকের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিব।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

নিখিল ভারতবর্ষীয় বৈদ্য-সম্মেলন।—আগামী ৩১শে মার্চ্চ ইন্দোরে নিখিল ভারতবর্ষীয় বৈদ্য-সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম্-এ, এল্, এম্, এস্, মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

স্বাস্থ্য বিভাগ—ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট একটি সাধারণ স্বাস্থ্য বিভাগ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিবেন কল্পনা হইতেছে।

বাঙ্গালার পল্লীস্বাস্থ্য।—বাঙ্গালার স্বাস্থ্য বিভাগের কমিশনার পল্লীস্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার সাহায্যে স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে ৫০টি ম্যাজিক লণ্ঠনে স্বাস্থ্য বিষয়ক চিত্র প্রদর্শন করান হইতেছে। ইহাতে স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রচারের সুবিধা হইবে বিবেচনায় শীঘ্রই লণ্ঠনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে। বেণ্টলি সাহেব ১৯১৮ খৃঃ অব্দের যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ, ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত ও ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপে বাঙ্গালার পল্লীগুলি শ্মশান হইতে বসিয়াছে এবং ম্যালেরিয়াই ইহাদিগের মধ্যে প্রধান। এই ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধ-পরীক্ষা বাঙ্গালার পল্লীগুলিতে কোথাও আংশিক ভাবে, কোথাও

সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু ইনফ্লুয়েঞ্জার জন্য পরীক্ষার ফলাফল নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় নাই। যাহা হউক বাঙ্গালার স্বাস্থ্য-কমিশনার মহাশয় বাঙ্গালার পল্লীগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য যেরূপ উদ্যোগ আয়োজন করিতেছেন, তাহাতে ইহার ভবিষ্যৎ ফল শুভ হইবে বলিয়া অনেকটা আশা করা যাইতে পারে। পল্লীর কৃতীপুরুষগণ যদি এ সময় একটু চেষ্টাশীল হন, তাহা হইলে ইহার ফল আরও শুভ হইতে পারে।

জন্ম মৃত্যুর হিসাব।—১৯১৮ সালে বাঙ্গালার বর্দ্ধমান জেলার মোট লোক জন্মিয়াছিল ২২৯২ জন এবং মরিয়াছিল ৫৬৯০ জন। বীরভূমে জন্ম ১৫৯২ ও মৃত্যু ৪৭১৯, বাঁকুড়ায় জন্ম ১৭১৫ ও মৃত্যু ২৫৯২; মেদিনীপুরে জন্ম ৫৪১৮, মৃত্যু ১৫৮৬৮, হুগলি ও শ্রীরামপুরে জন্ম ২১৯৬, মৃত্যু ৩৫৯০, হাওড়ায় জন্ম ১৭৯১, মৃত্যু ২১৭২, ২৪ পরগণায় জন্ম ৪৩১০, মৃত্যু ৬৭৩৭, নদীয়ায় জন্ম ৪৬৬৯, মৃত্যু ৫৭৩৭, মুর্শিদাবাদে জন্ম ৩৫১৮, মৃত্যু ৫৭৯৪, যশোহরে জন্ম ৩৬৭৬, মৃত্যু ৫৪১৮, খুলনায় জন্ম ৪২৮২, মৃত্যু ৯৪১৫, দিনাজপুরে জন্ম ৪৪৮০ মৃত্যু ৭৮০৬, জলপাইগুড়িতে জন্ম ২৭০১, মৃত্যু ২৬৬৬, দার্জ্জিলিংয়ে জন্ম ৬৯১ মৃত্যু ৬৬৭, রংপুরে জন্ম ৮৩৭১, মৃত্যু ৬৩২২, বগুড়ায় জন্ম ৩০১৬, মৃত্যু ২৪০৭, পাবনায় জন্ম ৪২৫২; মৃত্যু ২৭৭৩, মালদহে জন্ম ৩১৯০, মৃত্যু ৪০৫৯, ঢাকায় জন্ম ১১২২৬, মৃত্যু ৭৪২০, ময়মনসিংহে জন্ম ১২৬৭২, মৃত্যু ৯১২৬, বাখরগঞ্জে জন্ম ৭২৯৭, মৃত্যু ৭৪১৪, ফরিদপুরে জন্ম ৮৫৩০, মৃত্যু ৫৭৬৬, চট্টগ্রামে জন্ম ৩৭০৭, মৃত্যু ৪৪৫২, নোয়াখালিতে জন্ম ৪২৯৭, মৃত্যু ৩৩৯১ এবং ত্রিপুরায় জন্ম ৭৮৯২ মৃত্যু ৫৯০৩। ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে মোট উপরোক্ত ২৬টি জেলায় জন্ম সংখ্যা ১২৫,০১০ ও মৃত্যু সংখ্যা ২,৫০,২৮০। ১৯১৯ সালের নভেম্বর মাসে বাঙ্গালার মৃত্যু সংখ্যা ১ লক্ষ ১২ হাজার হইয়াছে। ভরসার কথা!

ইনফ্লুয়েঞ্জার ইতিবৃত্ত।—১৯১৮ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে চীন ও জাপানে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রথম আক্রমণ হয়। চীন হইতে আমেরিকায় এবং সেখানে হইতে ইওরোপে ইহা বিস্তৃত হইয়া পড়ে। যুদ্ধ জাহাজসমূহে এবং সৈন্যদিগের মধ্যে ইহা প্রথম বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। ১৯১৮ খৃঃ অব্দের মে মাসে এই রোগ গ্লাসগো সহরে ছড়াইয়া পড়ে। তাহার পর এই দুরন্ত ব্যাধি ভারত আক্রমণে যেরূপ সাজসজ্জা আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা সকলেই অবগত আছেন।

বর্দ্ধমানে চিকিৎসা বিদ্যালয়।—গত ১৬ই ফেব্রুয়ারি বাঙ্গালার গবর্ণর বাহাদুর চিকিৎসা বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। দেশে রোগ বাহুল্যের তুলনায় এখনও যে পরিমাণ চিকিৎসকের প্রয়োজন, তাহাতে এই নূতন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় সে অভাব কতকটা পূর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই, কিন্তু শুধু বর্দ্ধমানে নহে, বাঙ্গালার অন্যান্য সহরগুলিতেও যে এইরূপ বিদ্যালয়ের প্রয়োজন তাহা নিশ্চিত।

পল্লী প্র[illegible]ঙ্গ।—ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতির প্রকোপে বাঙ্গালার পল্লীগুলি যে পরিমাণে বিপন্ন, তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য অনেক পল্লীতেই যে প্রতিষ্ঠান

দাতব্য-চিকিৎসালয়ের ব্যবস্থা নাই। পল্লীর সকল প্রকার উন্নতি সাধনই ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কার্য্য, কিন্তু অন্যান্য কার্য্য অপেক্ষা এই বিষয়ের উন্নতিকল্পে তাঁহাদিগকে অধিক মনোযোগী দেখিলে হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়। মেদিনীপুরের সহযোগী "নীহার" সংবাদ দিয়াছেন,—

"মাননীয় কমিশনার বাহাদুরের মন্তব্যে দেখা গেল যে এ জেলায় জেলাবোর্ডের অধীনে ডিস্পেন্সারীর সংখ্যা খুব কম। যাহাতে এ জেলাবাসীর চিকিৎসার সুবিধা সুচারুরূপে হইতে পারে, তজ্জন্য কমিশনার বাহাদুর ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডকে উপায় নির্দ্ধারণ করিতে বলিয়াছেন। যে যে স্থলে গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসনের প্রচলন হইবে, তথায় ইউনিয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে ডিস্পেন্সারী থাকিবে। ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড কেবল একটা বিশেষ মঞ্জুরী টাকা ইউনিয়ন বোর্ডের হাতে প্রদান করিবেন। কমিশনার বাহাদুরের এ মন্তব্য পাঠ করিয়া আমাদের বিশ্বাস হইতেছে যে, অচিরে এই ম্যালেরিয়া-ইনফ্লুয়েঞ্জা-ওলাউঠা-বসন্ত পীড়িত আমাদের জেলার সর্ব্বত্র সুচিকিৎসার বিধান হইবে।"

মেদিনীপুরের মত সকল স্থানের ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডই এইরূপ দাতব্য চিকিৎসালয়ে, বৃদ্ধির জন্য মনোযোগী হইলে দেশের প্রকৃত উপকার সাধিত হইবে।

গাভী চালান। আমেরিকা হইতে কয়েকজন ব্যবসায়ী ভারতে আসিয়া বহু সংখ্যক গাভী ক্রয় করিয়া স্বদেশে চালান দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ১৯১৯ খৃঃ অব্দে ৬০ হাজার গাভী এইরূপ ভাবে বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। গুজরাট অঞ্চল হইতে এই সকল গাভী চালান দেওয়া হইয়াছে। বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভায় [illegible] ইয়দ আলি এল এড্রুস এ সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষকে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ বলিয়াছেন, তাঁহারা এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবেন। যাহা হউক, ভারতে নানাকারণে যে গাভীকুল নির্ম্মূল হইতে বসিয়াছে, সে গোচারণের মাঠ নাই, সে গাভী পালনের স্পৃহাও ভারতবাসীর নষ্ট হইয়াছে। দেশে দুগ্ধ ঘৃত ইহার ফলে দুর্ম্মূল্য—দুষ্প্রাপ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার উপর যদি এইরূপ ভাবে বিদেশে গাভী চালান বন্ধ না হয়, তাহা হইলে ভারতের ভবিষ্যৎ যে আরো শোচনীয় হইবে সে—বিষয়ে সন্দেহ নাই, গুজরাটের শিক্ষিত অধিবাসীগণ এ সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান হউন।

আহারে উপদেশ।—আহারে বসিবার পূর্ব্বে মেজাজ খুসি রাখিবার চেষ্টা করিবেন,—নহিলে আপনার উচিতমত ক্ষুধার উদ্রেক হইবে না। ফলে ক্ষুধা না থাকিলেও আহার করিয়া বদ-হজমে ভুগিতে হইবে। আহারের সময়ে তর্ক-বিতর্ক করাও নিষিদ্ধ; কারণ তাহাতেও কুফল ফলে। (হিন্দুস্থান)

নূতন রোগ।—১৯১৮ খৃঃ অব্দের স্বাস্থ্য বিভাগের রিপোর্টে বাঙ্গালাদেশে হুক-ওয়ার্ম বা সর্ব্বনেশে ক্রিমি নামক একটি নূতন রোগের প্রাদুর্ভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশের জনসাধারণের মধ্যে শতকরা ৮০জন হিসাবে মোট প্রায় ৩০কোটী ৬০ লক্ষ লোক এই রোগে আক্রান্ত। এই রোগে অল্প পরিমাণে আক্রান্ত হইলেই জীবনীশক্তির হ্রাস, রক্তাল্পতা ও অজীর্ণ ইত্যাদি উপসর্গ জুটিয়া থাকে। এই রোগের বিস্তৃতি নিবারণের জন্য চেষ্টা চলিতেছে।

কুষ্ঠাশ্রম।—৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে কলিকাতায় একটি কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা চলিতেছে। আমাদের মহামান্য বড়লাট মহিষী লেডী রোণাল্ডশে মহোদয়া ইহার জন্য সাধারণের নিকট চাঁদা প্রার্থনা করিয়াছেন।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৪র্থ বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৬—চৈত্র। | ৭ম সংখ্যা

অনুকরণে আমাদের স্বাস্থ্য।*

:*:

অনুকরণে বাঙ্গালী যেরূপ অভ্যস্ত এরূপ আর পৃথিবীর কোনো দেশের কোনো জাতি নহে। অনুকরণে বাঙ্গালীর যেরূপ সর্ব্বনাশ হইয়াছে, এমন সর্ব্বনাশও বুঝি পৃথিবীর মধ্যে কোনো দেশের কোনো জাতির কখনো হয় নাই। আজি যে দেশে সকল জিনিসই দুর্ম্মূল্য, বাঙ্গালী পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, ঋতু উপযোগী পরিচ্ছদে লজ্জা নিবারণের বস্ত্র পায় না, পল্লীবাসী-বাঙ্গালীর চালে খড় জুটে না, পূর্ব্বেকার অবস্থাপন্ন বাঙ্গালীর পতিত প্রাসাদ সংস্কারাভাবে আর মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে না, এক কথায় অশন বসন, লোক লৌকিকতা —সকল বিষয়েই বাঙ্গালী বাহিরে যতটাই বড়াই করুক, ভিতরে যে ঐ সকল বিষয় রক্ষার জন্য বাঙ্গালীকে বিষম বিপর্য্যস্ত হইতে হইয়াছে—ইহার প্রধান কারণই হইতেছে বাঙ্গালীর অনুকরণপ্রিয়তা। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর, রূপ রস-গন্ধাদির বিচার শক্তি লাভের সহিত মরণ কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালী সাংসারিক সকল বিষয়েই এই অনুকরণ লইয়া জীবন যাপন করিতেছে। ফলে অনুকরণ-প্রিয়তায় বাঙ্গালী এখনকার দিনে অর্থের মুখ আগের অপেক্ষা বেশী দেখিতে পাইতেছে সত্য, কিন্তু আধুনিক সভ্যতা বা ভদ্রতা বজায় রাখিতে গিয়া সে অর্থে কুলাইতে পারিতেছে না। অনুকরণে বাঙ্গালীর অনিষ্ট সাধন ইহারই ফল সম্ভূত।

স্বাস্থ্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও এই অনুকরণ-প্রিয়তায় আমাদের কম অনিষ্ট হয় নাই। বাঙ্গালী-শিশু যে আগের অপেক্ষা এখন মরিতেছে বেশী ইহা তো সর্ব্ববাদী সম্মত। বাঙ্গালীর পরমায়ু কমিয়া গিয়াছে,—অকাল বার্দ্ধক্য বাঙ্গালীকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে,—নানারূপ রোগ-পীড়নে বাঙ্গালীসমাজ মৃত্যুর

* কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ সভার ৯ম বার্ষিক ৪র্থ সাধারণ অধিবেশনে পঠিত।

ভীষণ মূর্ত্তিকে যখন তখন—অসময়ে—আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইতে না হইতে আলিঙ্গন করিয়া বসিতেছে,—এসকল বিষয়ের মুখ্য কারণও আমরা বাঙ্গালীর অনুকরণপ্রিয়তা বলিয়া মনে করি।

বাঙ্গালী তো এরূপ ছিল না,—বাঙ্গালীর বল ছিল, বিক্রম ছিল, শৌর্য্য ছিল, বীর্য্য ছিল, শক্তি ছিল, সামর্থ্য ছিল। বাঙ্গালী শিশুর মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই চিত্রগুপ্তের খতিয়ানে নাম লিখাইবার আবশ্যক হইত না। ভূরি ভোজনে বাঙ্গালী যশস্বী হইত, ভোজ-নিমন্ত্রণে আয়োজনকারী, ভোক্তাকে পর্য্যাপ্ত ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিত। ভাত-কাপড়ের জন্য প্রায় কোনো বাঙ্গালীকেই গোলামি করিতে হইত না, সকল বাঙ্গালীরই ক্ষেত্রে ধান্য হইত, সম্বৎসর খরচ করিয়াও সে ধান্য ফুরাইত না। কোনো কালে অজন্মার জন্য যদি দেশে দুর্ভিক্ষ হয়—এই আশঙ্কায় উদ্বৃত্ত ধান্য গোলাপূর্ণ হইয়া সঞ্চিত থাকিত। সকল বাঙ্গালীর বাগানেই পরিবার পরিপোষণের উপযোগী তরকারী উৎপন্ন হইত, সে তরকারি বাগানের মালিক নিজে ভোগ করিয়াও প্রতিবাসী পরিজন বর্গকে বিতরণ পূর্ব্বক আনন্দ উপভোগ করিত। পুকুরে মাছ যথেষ্ট হইত,—কোনো আত্মীয় কুটুম্ব অসময়ে অতিথি হইলেও ইহার ফলে পরিচর্য্যার ব্যাঘাত ঘটিত না। ঘরে ঘরে গাভী পালনের ব্যবস্থা ছিল, সে ব্যবস্থায় বাঙ্গালী পরিবারবর্গের সকলেই ভোজনের প্রারম্ভে অন্ন বিস্তর ঘৃত এবং ভোজনের পরিসমাপ্তি কালে অন্ততঃ দু'চার হাতাও দুগ্ধান্নভোজনের অপূর্ব্ব সুখ উপলব্ধি করিত। ফলে শরীর রক্ষার উপযোগী অনায়াসলভ্য ঐ সকল আহার্য্য প্রাপ্তির জন্য সেকালের সকল বাঙ্গালীই স্বাস্থ্যসুখ অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হইতেন,—কলির নির্দ্দিষ্ট পরমায়ু লাভ সকলের অদৃষ্টে না ঘটিলেও আশী নব্বই পঁচানব্বই বৎসর পর্য্যন্ত পরমায়ু লাভ যে অধিকাংশ বাঙ্গালীরই অদৃষ্টে ঘটিত ইহা সুনিশ্চিত।

এখন বাঙ্গালীর পরমায়ু হইয়াছে উক্ত সংখ্যা পঞ্চাশ। ত্রিশ বৎসরের পরই বাঙ্গালার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে আরম্ভ হয়—এবং চল্লিশ বৎসরের পরই সকল বিষয়ের কার্য্যকারী শক্তি কমিয়া আসিয়া বাঙ্গালীর আয়ুষ্কাল ফুরাইবার চিহ্ন সকল যেন প্রকাশ করিতে থাকে। বাঙ্গালী-শিশু যত জন্মগ্রহণ করে,তাহার হাজার করা ১৮৫টি জন্মের পরই কালগ্রাসে পতিত হয়। পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়ার যথেষ্ট লোক ক্ষয় হয় সত্য, কিন্তু অন্যান্য রোগেও বাঙ্গালীর মৃত্যু কম হয় না। সহরে যক্ষ্মা রোগের প্রাবল্য কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য এবং অজীর্ণের রোগী এখন শতকরা ৯৯টি বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। অধিকাংশ বাঙ্গালীরই শীর্ণ দেহ, শুষ্ক বদন, কোটরাগত চক্ষু বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য-দৈন্যের যেন জলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আগে বাঙ্গালী পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মত একটা আদর্শ জাতি বলিয়া যেমন পরিগণিত ছিল, এখন আর অহা নাই, অনেকে এখনকার বাঙ্গালী জাতিকে ইঙ্গবঙ্গ বলিয়া যে পরিহাস করিয়া থাকেন,বাঙ্গালীর পক্ষে সেই অভিধানই উপযুক্ত বলা যাইতে পারে। রাজভাষা বা ইংরাজী ভাষা না শিখিলে এখনকার দিনে চলিবার উপায় নাই, সুতরাং বাঙ্গালী তাহা শিখুক, তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই; কিন্ত সেই ইংরাজী ভাষা শিখিতে গিয়া বাঙ্গালী যে

নিজস্বের পরিপন্থী হইয়া পড়িতেছে—ইহাইতো হইতেছে বাঙ্গালীর অনিষ্টের মূল। ইংরাজ যে সময় আমাদের দেশে রাজা হইলেন, সে সময় জনকতক বাঙ্গালী যৎকিঞ্চিৎ ইংরাজী শিখিয়া মোটা মোটা মাহিয়ানার চাকরি পাইলেন বলিয়া বর্দ্ধমান বাকুড়ার কৃষিপ্রাণ বাঙ্গালী সে অনুকরণে আত্মহারা হইলেন কেন? দেশে জনকতক লোক ওকালতী পাস করিয়া অর্থ উপায়ের পথ সুলভ করিয়া তুলিলেন বলিয়া অনেক বাঙ্গালীকেই ওকালতী পাস না করিলে চলিল না কেন? কয়েকজন ডাক্তার হইলেন বলিয়া অনেক বাঙ্গালার মস্তিষ্কই ডাক্তারি শিক্ষার জন্য বিচলিত হইয়া উঠিল কেন? উঠিল উঠিল—সকল বাঙ্গালীরই উপার্জ্জন ক্ষেত্র সংবের নির্ণীত হইয়া পল্লীর সহজ সুলভ উপার্জ্জনের ক্ষেত্র বিসর্জ্জন দিবার কুমতি ঘটাইল কেন? ইহাই তো হইল বাঙ্গালীর অনিষ্টের মূল, এবং সে মূল এখন এমনভাবে গাড়িয়া বসিয়াছে যে, বাঙ্গালী সমাজকে তাহা হইতে উৎপাটন করা সুদূর পরাহত হইয়া পড়িয়াছে। যাক্,—এ সব প্রসঙ্গ অন্যদিন করা যাইবে, আজ যাহা বলিতে বসিয়াছি, তাহাই বলি।

বাঙ্গালী ইংরাজী শিখিল, কিন্তু শুধু বিদ্যা শিক্ষার জন্য ইংরাজী শিখিল না, ইংরাজের সকল আদর্শ গুলিরই অনুকরণ করিতে বাঙ্গালী তন্ময় হইয়া পড়িল। ইংরাজ প্রভাতে উঠিয়া চা পান করেন, বাঙ্গালী প্রাতঃস্নান ভুলিল, সন্ধ্যা গায়ত্রী সব ভুলিল, শয্যা পরিত্যাগ করিতে না করিতেই চায়ের পেয়ালা তুলিয়া রসনেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সাধন করিতে লাগিল,—কিন্তু এটুকু বুঝিল না ইংরাজ জাতির অস্থিমজ্জা শীতপ্রধান দেশের উপযোগী করিয়া গঠিত, এজন্য সে শরীরে প্রাতঃকালে শ্লেষ্মা বৃদ্ধির সময় 'চা এর মত উষ্ণকল্প দ্রব্যের যে প্রয়োজনীয়তা আছে, আমাদের উষ্ণ প্রধান দেশে বাঙ্গালীর পক্ষে তাহা তেমনি বিষবৎ অনিষ্টকারী। তাহার উপর ইংরাজ কখনও খালি পেটে চা পান করেন না, কিন্তু বাঙ্গালীর পক্ষে অবস্থায় ব্যবস্থায় তাহা ভিন্ন অন্য কিছু জুটিবে কি করিয়া? ফলে বাঙ্গালী ইংরাজের চা পানের অনুকরণ করিল বটে—কিন্তু তাহাতেও ইংরাজের আদর্শ টুকু বজায় করিতে পারিল না, কাজেই খালি পেটে চা পানের অবশ্যম্ভাবী ফল যে যকৃতের ক্রিয়ার বিকৃতি প্রাপ্তি বাঙ্গালীকে তাহা ভোগ করিতে হইল। বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহানি ঘটিবে না তো ঘটিবে কাহার?

তাহার পর বাঙ্গালী ইংরাজী শিখিয়া—B,A, MA, পাশ করিয়া,—বিলাত ঘুরিয়া আসিয়া, উকীল হইল, ডাক্তার হইল বটে, কিন্তু সে রোজগারের ক্ষেত্র নির্ণীত হইল কলিকাতায় বা এমন সব সহরে—যে সব স্থানে স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী পল্লীর সহজ সুলভ উৎকৃষ্ট দ্রব্য সকল লাভ করা কোনোক্রমেই সম্ভবপর নহে। কতকটা এই কারণে—কতকটা বা ইংরাজী শিখিতে গিয়া বাঙ্গালীর চিত্ত বৃত্তির বিপর্য্যায় বশতঃ আমাদের শরীরের উপযোগী পুষ্টিকর আহারীয় হইতে বাঙ্গালী বঞ্চিত হইল। সহরে গাভীপালন দুরূহ ব্যাপার, বহুব্যয় সাধ্য, কাজেই সে মতি প্রবৃত্তি বাঙ্গালীকে ছাড়িয়া দিতে হইল, যথেষ্ট পরিমাণে বিশুদ্ধ দুগ্ধ কিনিয়া খাইবারও উপায় উপার্জ্জনের তুলনায় থাকিল না। ইংরাজ দুগ্ধ ঘৃত ও মৎস্য যথেষ্টরূপে আহার করুন আর না

করুন মাংস তাহাদের প্রাত্যহিক খাদ্য। পক্ষান্তরে শীতপ্রধান দেশের অধিবাসী ইংরাজের পক্ষে মাংস ভক্ষণ যেরূপ ফলদায়ক ? বাঙ্গালা দেশের লোকের পক্ষে তাহা নহে, তা' ছাড়া প্রত্যহ যথেষ্ট পরিমাণে মাংস ভোজনের শক্তিও বাঙ্গালীর পাকস্থলীতে নাই, আর প্রত্যহ মাংস কিনিয়া ভোজন করাও বাঙ্গালীর অবস্থায় কুলাইবার কথা নহে, বাঙ্গালী প্রত্যহ অদ্ধ পোয়া হিসাবে মৎস্যই ভক্ষণ করিতে পায় না, তা' মাংস তো দূরের কথা। ফলে ইঙ্গবঙ্গ বাঙ্গালী—ইংরেজের অনুকরণ সর্ব্ব বিষয়ে করিতে চেষ্টা করিলেও আহারকালে আর সে অনুকরণ বজায় রাখিতে পারিল না। এই জন্যই আদর্শ হারাইয়া বাঙ্গালী মরিতে বসিল।

আগেকার বাঙ্গালী অতি প্রত্যূষে শয্যা পরিত্যাগ করিত। হস্ত মুখাদি প্রক্ষালনের পর প্রাতঃস্নান করিত, ভগবানের নাম লইত, তাহার পর, আদা-ছোলা-ভিজা, মুড়ি নারিকেল, গুড়-চিনি—অবস্থাপন্ন হইলে দু'একটি উপাদেয় সন্দেশ যাহার যাহা জুটিত, —বাঙ্গালী তাহা জলযোগ করিত। তাহার পর শিশুরা প্রাতঃকালেই পাঠাভ্যাসে নিরত হইত, যুবা এবং প্রৌঢ়গণ যাহার যাহা কর্ম্ম থাকিত, প্রাতঃকালেই তাহা সম্পন্ন করিত। দ্বিপ্রহরে বাঙ্গালীর আহারকাল নির্দ্দিষ্ট ছিল, আহারান্তে শিশু-বৃদ্ধ যুবা-প্রৌঢ় সকলেই কিয়ৎকাল বিশ্রামসুখ উপভোগ করিত। বৈকালে মার্ত্তণ্ডময়ূখ হীনপ্রভ হইয়া আসিলে বাঙ্গালী শিশু আবার পাঠাভ্যাস করিত, কর্ম্মিগণ আবার কর্ম্মে মনোনিবেশ করিত। সন্ধ্যার পর আর কাহারও কোনো চিন্তা থাকিত না, সকল পল্লীতেই এক একটি বৈঠক বা মজলিস বসিত, সে মজলিসে যথেষ্ট তামাক পুড়িত, তাম্রকূটের ধূমে বিভোর হইয়া কর্ম্মশ্রান্ত বাঙ্গালী গল্পগুজব, গানবাজানা, তাসপাশা —এই সব লইয়া কিছুক্ষণ কাটাইয়া দিত। রাত্রি এক প্রহরের পর বাঙ্গালী আবার আহার করিত, ভগবানের নাম লইয়া সুনিদ্রায় সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া দিত। ইংরাজী শিখিয়া অনুকরণ স্রোতে আমাদের সে সকল ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। প্রভাতে আদা ছোলা ভিজার পরিবর্ত্তে চা পান—বেলা ৯টার পূর্ব্বেই মাধ্যাহ্নিক আহারের পরিসমাপ্তি; বিশ্রামের সময় অফিসের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, সন্ধ্যার পর ক্লান্ত দেহে আফিস হইতে আসিয়া নানারূপ দুশ্চিন্তা এবং নিদ্রাকালে দুশ্চিন্তার স্বপ্নজালে নিদ্রার ব্যাঘাত—এইরূপে আমাদের এখন জীবন যাপন চলিতেছে। ইংরাজী শিখিয়া সভ্যতার খাতিরে পল্লীগ্রামে ফিরিয়া গিয়া আমরা আর কৃষিকর্ম্মে বা ব্যবসায় বিস্তারে মনঃসংযোগ করিতে পারিনা. লোকে তাহাতে, চাষা বলিবে বা ব্যবসাদার বলিয়া ঘৃণা করিবে, কাজেই লোকলজ্জার খাতিরে আমরা চাকরি করিব,—গোলামি করিব—কাজেই সেই গোলামি বজায় রাখিবার জন্য আমাদের কর্ম্মকাল দ্বিপ্রহরে না করিলে উপায় নাই, আমাদের আর বিশ্রাম করিবার সময় কোথায় ?

ইংরাজ দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম করেন না—ইংরাজের কর্ম্মকাল দ্বিপ্রহরে নির্দ্দিষ্ট, ইহার কারণও তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি—ইংরাজের জন্মস্থান শীত প্রধান দেশে—ইংরাজের জন্মভূমি যে দিন সূর্য্যের মুখ দেখিতে পান সে দিন ধন্যমনা হইয়া থাকেন, কাজেই সে দেশের কর্ম্মকাল দ্বিপ্রহরকালেই উপযুক্ত।

আমাদের গ্রীষ্ম প্রধান দেশে সে সময় আমাদের পরিশ্রম করা সহিবে কেন? আমাদের স্বাস্থ্য দৈন্যের ইহাও একটা কারণ।

তাহার পর পোষাক পরিচ্ছদের কথা। ইংরাজের অনুকরণে আমরা এখন যে সকল পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করি—এরূপ পোষাক পরিচ্ছদ আমাদের সেকালে ছিল না। সর্ব্বদা জামা জুতা আঁটিয়া—দেহ খানিকে আলোক রৌদ্র বায়ুর হাত হইতে অব্যাহত রাখিয়া—ভদ্রতা বজায় রাখিবার জন্য সে কালের বাঙ্গালীকে কখন চলিতে হইত না। শিশুর পক্ষেও ভূমিষ্টকালের পরই তাহার সর্ব্বশরীর আবৃত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা ছিল না, তাহাকে উৎকৃষ্ট খাঁটি সরিষার তৈল মাখাইয়া সূর্য্যকিরণে শয়ন করাইয়া রাখার ব্যবস্থা ছিল, শিশুর শরীর তাহাতে দৃঢ় এবং বলিষ্ঠ হইত। এখন ইংরাজী অনুকরণে সে প্রথাও উঠিয়া গিয়াছে। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতেই এখন আমাদের দেহ সর্ব্বপ্রকারে আবৃত করিয়া না রাখিলে আর ভদ্রতা রক্ষা চলে না। বয়স্কেরাও সেকালে যথেষ্ট তৈল মর্দ্দন করিতেন, সভ্যতা বজায় রাখিতে গিয়া আমরা সে প্রথাও ভুলিয়া দিয়াছি, সাবান তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। ঘৃত দুগ্ধ-পান ঘুচিয়া গিয়াছে, তৈলমর্দ্দন প্রথা দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে,—বাঙ্গালীর দেহ পুষ্টির আর তাহা হইলে রহিল কি? বাঙ্গালী মরিবেনা তো মরিবে কে?

এইবার ধূমপানের কথা। তাম্রকুট কবে আমাদের দেশে আগমন করিয়াছে তাহার সঠিক ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন—মুসলমান রাজত্বের অভ্যুদয়কালে ইহা আমাদের দেশে মুসলমানদিগের অনুকরণে প্রবেশলাভ করিয়াছে। যাউক অত বিচার করিবার এ ক্ষেত্রে আবশ্যকতা নাই? কিন্তু জলপূর্ণ গুড়গুড়ি বা হুঁকার সাহায্যে তাম্রকুটের ধূম গ্রহণে আমাদের, তত অনিষ্ট হয় না—যতটা অনিষ্ট হয় 'সহজসুলভ সিগারেটের ধূমপানে'। এ অনুকরণটা আমরা ইংরাজদিগের নিকট যে শিক্ষা করিয়াছি ইহা খাঁটি সত্যকথা। ইংরাজই আমাদেরই দেশে এ নেশা আনিয়া দিয়াছেন। এখন বালক বৃদ্ধ যুবা—সকলেই এই সিগারেটের ধূমপানে উন্মত্ত। বাঙ্গালী প্রতিবর্ষে অসংখ্য পরিমিত অর্থ সিগারেটের ধূম পানে ব্যয় করিতেছে। তামাক সেবনে গল ক্ষত, যক্ষা, হৃদপিণ্ডের নানারূপ পীড়া, অজীর্ণ, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া থাকে। সিগারেটে সে অনিষ্ট আরও বেশী সাধিত হয়। কিন্তু অনুকরণ স্রোতটা দেশে এমনই ভাবে প্রবেশলাভ করিয়াছে যে,—সহজ সুলভ সিগারেটের হাত হইতে আর বালকদিগকেও রক্ষা করিবার উপায় নাই। তাহার পর, প্রকাশ্য হোটেলে বসিয়া আহার করা—জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে প্রস্তুত কিনা বিচার না করিয়া—বাজার হইতে অখাদ্য-কুখাদ্য অমিত অহিত সকল প্রকার খাদ্য কিনিয়া খাওয়া—ছত্রিশ জাতির এবং সকল প্রকার রোগাক্রান্ত ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট পাত্রে চা সোডা সরবত পানে কৃত-কৃতার্থ হওয়া—এটাও আমাদের সভ্যযুগে অনুকরণে আনিয়া দিয়াছে। ফলে এই সকল অনুকরণে একদিকে আমাদের অর্থের অপব্যয় তো হইতেছেই—স্বাস্থ্যোন্নতির বিঘ্নও যে ইহাতে যথেষ্ট ঘটিতেছে—তাহা কেহ ভাবিতেছেন কি?

বাঙ্গালী মেয়েদের মধ্যেও অনুকরণ স্রোতটা এখন পূর্ণভাবে প্রবাহিত। মা-লক্ষ্মীগণও সে

কালের রীতি নীতি পরিত্যাগ করিয়াছেন। স্বামী ভদ্রতা বজায় রাখিবার জন্য বাবু সাজিয়াছেন, তাঁহাদেরও 'বিবি' না সাজিলে উপায় কি? কাজেই সে 'ছড়া ঝাঁট' দেওয়া, বাসন মাজা, ঘর দ্বার পরিষ্কার করা—এ সকল তো মা-লক্ষ্মীগণ এখনকার দিনে পারিয়াই উঠেন না,—সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি লইয়া রন্ধন কার্য্যেও তাঁহারা এখন অনভ্যস্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালীর হেঁসেলে ইহারই ফলে অনুকরণ বজায় রাখিতে গিয়া মেদিনীপুর-বাঁকুড়ার 'বামুন' ঢুকিয়াছে, দাস দাসীতে গৃহস্থালীর কর্ম্ম সকল নির্ব্বাহ করিতেছে, মন্ত্রত্যাগী আচার ভ্রষ্ট—পৈত্তাগলায় বামুনের দল রন্ধন করিতেছে, —আর আমাদের মহিলাগণ আরাম কেদারায় শয়ন করিয়া দিবারাত্রি আলস্য এবং অকর্ম্মণ্যতার সহচারিণী হইয়া দিবসের মধ্যে তিনবার করিয়া 'হিষ্টিরিক ফিটে' অবসন্ন হইয়া পড়িতেছেন!

এখন এ সকলের উপায় কি? এ সকলের উপায়ের কথা বলিতে হইলে—মুক্তকণ্ঠে বলিতে হয়—দেশবাসি, আবার সাবেক পদ্ধতি অবলম্বন কর। ইংরাজী পড়—ইংরাজী না পড়িলে চলিবে না—তুমি যে কোনো কর্ম্মই কর—ইংরাজী তোমাকে শিখিতেই হইবে—ইংরাজী না শিখিলে তোমার আর কোনোদিকেই উপায় থাকিবে না—কিন্তু যতটা পার অনুকরণ প্রথাটা পরিহার করিয়া আত্মরক্ষার জন্য মনোযোগী হও। পল্লী ছাড়িয়াছ, কৃষিকর্ম্ম ভুলিয়াছ, ব্যবসায় 'কল্পনায় তোমার মতি নাই, চাকুরি করিয়া—গোলামি করিয়া—এতদিন উদরান্নের সংস্থান করিয়া আসিয়াছ, সুতরাং সহসা তাহা ছাড়িয়া দিয়া পল্লী ভিটায় সন্ধ্যা জালিয়া আবার তুমি প্রাচীন পদ্ধতি অবলম্বনে আত্মকর্ম্ম পরিগ্রহ কর,—এরূপ কথাও সহসা বলিলে চলিবেনা, তবে এ কথা বলিলে অসঙ্গত হইবে না যে, নিজে যাহা হইয়াছ তাহা থাক্, নিজে যাহা করিতেছ, তাহা কর, কিন্তু বংশধরদিগকে আর সে শিক্ষায় অবসন্ন করিওনা। শিক্ষার জন্য সকলেই পুত্রকে স্কুলে দেন, কলেজে পড়ান,—পুত্র যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক একটা ডিগ্রি লইয়া বাহির হয়, তখন আহ্লাদে আটখানা হইয়া থাকেন, কিন্তু সেই পুত্র কি করিয়া নিজে খাইবে—পরিবার পোষণ করিবে—সে কথাটা একবার চিন্তা করিয়া দেখেন কি? তাহা দেখেন না, পড়াইতে হয়, পড়াইয়া যান, পুত্রও পড়িতে হয়, পড়িয়া যায়! কিন্তু রাশি রাশি পুস্তক পাঠে দৃষ্টিশক্তির অবসন্নতার ফলে উপচক্ষু ধারণ করিয়া এবং এক একজন মূর্ত্তিমান ডিসপেপটিক হইয়া যখন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় তখন চাকরি বা গোলামি করা ভিন্ন তাহার তো আর কোনো উপায় থাকে না। সুতরাং শিক্ষাকালেও তাহার হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, কর্ম্মকালেও সে খাটুনির মাত্রা আরও অধিক। সেইজন্য আমার বক্তব্য, আমরা যাহা করিতেছি, তাহা করিয়া যাই, কিন্তু ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকে আর উৎসন্ন দিয়া কাজ নাই, শিক্ষা কালেই তাহাদিগকে একটু ব্যবসায়ের পন্থা দেখাইয়া দিয়া তাহারা যাহাতে অক্ষত স্বাস্থ্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হই। পল্লী মায়া বিসর্জ্জন দিলে চলিবে না,—দেশের যেরূপ অবস্থা আসিতেছে তাহাতে পল্লীর অঙ্কে স্থান লইবার আবার প্রয়োজন হইবে,—দেশের ভবিষ্যত আশা ভরসার স্থল আমাদের বংশধরদিগের কল্যাণের জন্য এই মহামূল্য কথাটা তাহাদের

মনে ধারণা করিয়া দিবার ব্যবস্থা করা হউক পল্লীর কৃষি আবার জাগিয়া উঠুক,—পল্লীর ব্যবসায় আবার বিস্তৃত হউক—বাঙ্গালী সন্তান ইংরাজী পড়িলেও পল্লীজনোচিত শিক্ষাই তাহার আদর্শ হউক,—সেই অসভ্য জনোচিত শিক্ষাই তাহার অতুলনীয় গর্ব্বের স্থান হউক—সভ্যতার আদর্শ চা চুরুট সিগারেটের প্রচলন দেশ হইতে উঠিয়া যাউক,—বরফ সোডা লেমোনেডের পরিবর্ত্তে সেই অসভ্য যুগের ডাব মিছরির পানা চিনির সরবতে বাঙ্গালী ছেলের রুচি বৃদ্ধি হউক,—দারুণ ঘৃণাব্যঞ্জক ভাবে হোটেলের বহুদূরে বাঙ্গালী বালক আবার অবস্থিতি করুক—বাঙ্গালী জননী নাটক নবেল ছাড়িয়া স্বামীপুত্রকে স্বহস্তে পঞ্চ ব্যঞ্জন সমন্বিত অন্নবিতরণের জন্য ব্যগ্রস্বভাবা হউন,—এক কথায় অনুকরণটা আমরা পরিহার করি,—একটা আদর্শজাতি বলিয়া আমরা আগে যে গর্ব্ব করিতে পারিতাম—সেই গর্ব্ব আবার গরীয়ান হই—সেই প্রাতঃস্নান, সেই পূজাপদ্ধতি,—সেই খাদ্যাখাদ্যের বিচার বাঙ্গালী সমাজে আবার ফিরিয়া আসুক—ইহাই আমার বক্তব্য। ইহা ভিন্ন আজি আমার অন্য কিছু বলিবার নাই।

শারীর বিদ্যা।

অস্থি বর্ণনা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন, সরস্বতী, এম-এ. এল, এম, এস)

মধ্য-শরীরের অস্থি।

পৃষ্ঠবংশ—পৃষ্ঠবংশ বা মেরুদণ্ড মধ্য-শরীরের অবলম্বন স্বরূপ। চারিটী শাখা এবং মস্তক পৃষ্ঠবংশ আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে। ইহা সরল নহে, ধনুর ন্যায় বক্রতাবিশিষ্ট। সেই বক্রতাও উপরে, মধ্যে ও নিম্নে বিভিন্ন প্রকার। (নবম চিত্র দেখ)।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পৃষ্ঠবংশে ছাব্বিশ খানি অস্থি আছে। তন্মধ্যে সর্ব্বনিম্নের দুইখানি ত্রিকাস্থি এবং অনুত্রিকাস্থি নামে অভিহিত। অপর চব্বিশখানি অস্থিকে কশেরুকা বলে। স্থানভেদে কশেরুকা সকল তিনভাগে বিভক্ত। সাতখানি গ্রীবাদেশে থাকে বলিয়া উহাদিগকে গ্রীবাকশেরুকা বলে; বারখানি পৃষ্ঠদেশে থাকে বলিয়া উহাদিগকে পৃষ্ঠ কশেরুকা এবং পাঁচখানি কটিদেশে থাকে বলিয়া উহাদিগকে কটী-কশেরুকা বলা হয়।

কশেরুকাগুলি বলয়াস্থি অর্থাৎ মধ্যে বৃহৎ ছিদ্রবিশিষ্ট। গ্রীবা হইতে কশেরুকাগুলি নিম্নদিকে ক্রমশঃ স্থূলতর। উহারা উপরে ও নীচে পরস্পরের সহিত সন্ধিযুক্ত।

প্রত্যেক কশেরুকার একটী কশেরুপিণ্ড ও একটী কশেরুচক্র আছে, প্রত্যেক কশেরুচক্রের দুইদিকে দুইটি মূল আছে, উহারা কশেরুপিণ্ডে সংযুক্ত। প্রত্যেক কশেরুপিণ্ডের সাতটী প্রবর্দ্ধন (বর্দ্ধিত অংশ) আছে, যথা—উপরে দুইটী ও নীচে দুইটী সন্ধি প্রবর্দ্ধন, দুইটী বাহু ও একটী পৃষ্ঠকণ্টক। প্রত্যেক কশেরুচক্রমূলের উপরে ও নিম্নে এক একটী করিয়া ছিদ্রার্দ্ধ আছে। দুইখানি কশেরুকাস্থি মিলিত হইলে সংযোগস্থলে ছিদ্রটী পূর্ণ হয়। প্রত্যেক কশেরুকার দুইদিকের এইরূপ দুইটী ছিদ্রের ভিতর দিয়া সুষুম্না কাণ্ড হইতে স্নায়ু নাড়ীসকল নির্গত হইয়া যায়। সুষুম্নাকাণ্ড কশেরুকাগুলির অভ্যন্তরস্থ বৃহৎ ছিদ্র যা সুষুম্নাবিবর' মধ্যে থাকে।

নবম চিত্র—পৃষ্ঠ বংশ।*

গ্রীবাকশেরুকা

পৃষ্ঠকশেরুকা

কটিকশেরুকা

ত্রিকাস্থি

অনুত্রিকাস্থি

* ইং—Vertebral column—ভারটিব্রাল কলম্ বা Spine—স্পাইন্। কশেরুকা Vertebra—ভারটিব্রা।

গ্রীবাকশেরুকা—প্রথমা গ্রীবা কশেরুকার নাম 'চূড়াবলয়া'। উহার উর্দ্ধভাগ মস্তকের পশ্চাৎ-কপালের সহিত এবং নিম্নভাগ দ্বিতীয় কশেরুকার সহিত সন্ধিযুক্ত।

[দশম চিত্র—প্রথমা গ্রীবাকশেরুকা—চূড়াবলয়া]

সম্মুখ

২

৪　২　৪

৩　৮　৮　৩

৯

৬

পশ্চাৎ

১ কশেরুপিণ্ড। ২—দন্তপ্রবর্দ্ধনকের নিবেশ ও তৎসহ সন্ধির স্থান। ৩—'মধ্যারজ্জু-কাখ্য' স্নায়ুর নিবেশ স্থল। ৪—পশ্চাৎ কপালের মূলকোটিদ্বয়ের সহিত সন্ধির স্থান। ৫—সুষুম্না বিবর। ৬ পৃষ্ঠকণ্টক। ৭,৭—বাহুপ্রবর্দ্ধনকদ্বয়। ৮ নাড়ীকাছিদ্রদ্বয়।

দ্বিতীয়া কশেরুকার নাম 'দন্তচূড়া'। উহার চূড়াকার পিণ্ডভাগ প্রথম কশেরুকার সুষুম্না-বিবরের সম্মুখে যে ছিদ্র আছে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট থাকে। যদি উদ্বন্ধন বা আঘাতাদি বশতঃ

[একাদশ চিত্র—দ্বিতীয়া গ্রীবাকশেরুকা-দন্তচূড়া]

উর্দ্ধ

১　২　৩

পশ্চাৎ　ক　সম্মুখ

সং

অধঃ

১ দন্তপ্রবর্দ্ধনক। ২—চূড়াবলয়ার পিণ্ডের পশ্চাদ্ভাগের সহিত সন্ধির স্থান। ৩—'মধ্যারজ্জুকা' স্নায়ু বিবর্ত্তনের খাত। ক—পৃষ্ঠকণ্টক। সং ১—উর্দ্ধতন সন্ধি-প্রবর্দ্ধন। সং২—অধস্তন সন্ধি প্রবর্দ্ধন।

দন্তচূড়ার দন্তাকার অংশ ভগ্ন বা চূড়াবলয়ার ছিদ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তাহা হইলে

তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। সপ্তমী গ্রীবাকশেরুকার নাম 'মহাকণ্টকিনী'। ইহার মহাকণ্টক অন্যান্য গ্রীবাকশেরুকার ন্যায় দ্বিধা ভিন্ন নত এবং এত কণ্টক 'গ্রীবাধরা' স্নায়ুরজ্জু সম্বদ্ধ থাকে। গ্রীবাকশেরুকাগুলির দুই পার্শ্বে 'মাতৃকা ছিদ্র' নামক ধমনী প্রবেশের ছিদ্র আছে।

[দ্বাদশ চিত্র—পৃষ্ঠ কশেরুকা]

পৃষ্ঠ কশেরুকা—এই সকল কশেরুকার দুইদিকে, পর্শুকা সংযোগের জন্য দুইটী করিয়া স্থালক যুক্ত বৃহৎ বাহু আছে। ইহাদের পৃষ্ঠকণ্টকগুলি দীর্ঘ ও বর্ত্তুলাকার।

কটি-কশেরুকা—এই কশেরুকাগুলি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং পার্শ্বে আয়ত। ইহাদের বাহুপ্রবর্দ্ধনগুলি ছোট ও স্নিগ্ধ। পৃষ্ঠকণ্টকগুলি ছোট, স্থূল এবং কুঠারাগ্র।

ত্রিকাস্থি*—ইহা দৃঢ়সংযুক্ত পাঁচখানি কশেরুকা দ্বারা নির্ম্মিত, প্রায় ত্রিকোণাকার এবং বৃহৎ ঝিনুকের ন্যায় আকার বিশিষ্ট অস্থি। ইহার নির্ম্মাপক পাঁচখানি অস্থি বাল্যকালে পৃথক্ থাকে, কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে এক হইয়া যায়। পাঁচখানি অস্থির সংযোগস্থলে চারিটী রেখাচিহ্ন থাকে এবং প্রত্যেক রেখাচিহ্নের সম্মুখে দুইটি এবং পশ্চাতে দুই দিকে দুইটী করিয়া মোট ষোলটী ছিদ্র থাকে। এই সকল ছিদ্র দিয়া স্থূল নাড়ীগুচ্ছ সকল ত্রিকাস্থির সম্মুখভাগে এবং পশ্চাদ্ ভাগে নির্গত হইয়া যায়, ত্রিকাস্থির ঊর্দ্ধভাগ পঞ্চমী কটি-কশেরুকার সহিত, উভয় পার্শ্ব শ্রোণিফলক নামক অস্থিদ্বয়ের সহিত এবং নিম্নভাগ অনুত্রিকাস্থির সহিত সংযুক্ত। ইহাদের অবয়বগুলির নাম চিত্রে দ্রষ্টব্য।

* ইং—Sacrum—সেক্রম।

[ত্রয়োদশ চিত্র—ত্রিকাস্থি]

১, ২, ৩, ৪, ৫—ত্রিকাস্থি নির্ম্মাপক কশেরুকাগুলির সূচক। ৬, ৬—ত্রিকপক্ষদ্বয়। ৭,৭—শ্রোণিসন্ধির চিহ্ন। ৮,৮—অনুত্রিকাস্থির সহিত সন্ধির স্থান। ৯, ৯—ত্রিকশৃঙ্গাখ্য সন্ধি-প্রবন্ধনক, পঞ্চম কটি কশেরুকার সহিত সন্ধির স্থান। ১০—ত্রিকমূল। ১১—শুণ্ডিকাখ্য পেশীর নিবেশ স্থান।

অনুত্রিকাস্থি* —এই ক্ষুদ্র অস্থি-সংঘাতটী ত্রিকাস্থির নিম্নে অবস্থিত এবং

[চতুর্দ্দশ চিত্র—অনুত্রিকাস্থি]

১,১—শৃঙ্গদ্বয়। ম—অনুত্রিকপিণ্ড। ২,২—স্নায়ুরজ্জু সংযোগের জন্য দুইটি প্রবন্ধনক। ৩—অনুত্রিকাগ্র।

কতকটা শুকচঞ্চুর ন্যায় বক্রাগ্র। ত্রিকাস্থির ন্যায় ইহাও চারখানি, কখন বা পাঁচখানি কশেরুকা অস্থির সংযোগে নির্ম্মিত হয়। ইহার উর্দ্ধভাগ ত্রিকাস্থির সহিত সংযুক্ত। ত্রিকাস্থির প্রথমা কশেরুকা অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। অপর খণ্ডগুলি ক্রমশঃ ছোট হইয়া অনুত্রিকাস্থির শেষ ভাগে লাঙ্গুলের ন্যায় হইয়াছে। ইহাই বহু, ক্ষুদ্রকশেরুকাময় অস্থিমালা স্বরূপে গবাদি পশুর পুচ্ছাস্থি নির্ম্মাণ করে।

শ্রোণিফলক† —এই দুইখানি বৃহৎ

* ইং—Coccyx—কক্‌সিক্স।
† ইং—Os Innominate—অস্ ইনোমিনেট্।

কপালাস্থি মধ্যে ত্রিকাস্থির ও নিম্নে দুইটী উর্ব্বাস্থির সহিত সংযুক্ত। বাল্যকালে প্রত্যেক শ্রোণিফলক তিনভাগে বিভক্ত থাকে, কিন্তু প্রৌঢ় যৌবনে পরস্পর মিলিত হইয়া একখানি অস্থিতে পরিণত হয়। যৌবনে তিনখানি অস্থির সংযোগস্থল রেখাঙ্কিত থাকে, কিন্তু প্রৌঢ় বয়সে ঐ রেখাগুলি মিলাইয়া যায়। দুইখানি শ্রোণিফলক পশ্চাতে ত্রিকাস্থিসহ এবং সম্মুখভাগে পরস্পর মিলিত হইয়া একটী গহ্বরের সৃষ্টি করে। উক্ত গহ্বর বস্তিগহ্বর নামে আখ্যাত। পুরুষের বস্তিগহ্বর গভীর এবং অল্প আয়ত, কিন্তু স্ত্রীলোকের বস্তিগহ্বর অগভীর এবং গর্ভধারণের জন্য বৃহৎ ও আয়ত।

[পঞ্চদশ চিত্র—শ্রোণিফলক]

উর্দ্ধ

জঘন কপাল

কুকুন্দরাস্থি ভগাস্থি

অধঃ

১, ২, ৩, ৪ বংক্ষণোদূখল। তন্মধ্যে ১—ভগাস্থির অংশ, ২—জঘনকপালাংশ, ৩—কুকুন্দরাস্থির অংশ, ৪—তিনখানি অস্থির সংযোগকেন্দ্র। সং সং সং—তিনটি রেখা অস্থিত্রয়ের সন্ধানসূচক। ৫—জঘনকপালের সীমা। ৬ ভগাস্থির উত্তরশৃঙ্গ। ৭—কুকুন্দরাস্থি। ৮—শ্রোণিগবাক্ষ। ৯, ১০ জঘন কপালের অধস্তন ও উদ্ধতন অগ্রকূট। ১১, ১২—ভগাস্থি মুণ্ড বা ভগপীঠ। ১০ চিহ্ন হইতে উর্দ্ধ দিক দিয়া ১৫ পর্য্যন্ত অংশ—জঘনপক্ষ এবং উহার ধার জঘনধারা। ১৩—জঘনচূড়া। ১৪, ১৫—জঘনকপালের উদ্ধতন ও অধস্তন পশ্চিমকূট। ১৬। গৃধ্রসীদ্বার। ১৭—কুকুন্দর কণ্টক। ১৮—কুকুন্দর দ্বার। ১৯—কুকুন্দর পিণ্ড। ২০—ভগাস্থির অধর শৃঙ্গ। 'পে' চিহ্নিত স্থানগুলি পেশী সমূহের নিবেশ স্থল। পেশী বর্ণনাধ্যায়ে বর্ণনীয়।

শ্রোণিফলকের প্রধান অংশ তিনটী— (১) জঘন কপাল, (২) কুকুন্দরাস্থি, (৩) ভগাস্থি। ইহাদের অবয়ব সমূহের বিষয় সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে।

(১) জঘনকপাল—ইহা জঘনপক্ষ এবং বংক্ষণোদূখল—এই দুইভাগে বিভক্ত। পক্ষবৎ প্রশস্ত উপরিভাগকে 'জঘনপক্ষ' বলে। জঘন- পক্ষের দুইটী তল, বাহ্যতল এবং আভ্যন্তরতল। জঘনপক্ষের বাহ্যতলে বা জঘনপৃষ্ঠে 'নিতম্ব পিণ্ডিকা' নামে তিনটী পেশী সংযুক্ত থাকিয়া নিতম্ব(পাছা) নির্ম্মাণ করে। আভ্যন্তর তল বা জঘনোদর ঈষৎ খাতগর্ভ। ইহাতে 'কোষ্ঠ-ভূমিকা' পেশী সংসক্ত থাকে। জঘনকপালের উভয় তলের মধ্যবর্ত্তী উন্নত পরিধিকে 'জঘন-ধারা' বলে। উহার উচ্চতম প্রদেশ 'জঘন চূড়া' নামে আখ্যাত। জঘনচূড়ার সম্মুখে দুইটী ও পশ্চাতে দুইটী উন্নত কূট আছে, উহারা যথাক্রমে উর্দ্ধতন অগ্রকূট ও অধস্তন অগ্রকূট এবং উদ্ধতন পশ্চিমকূট ও অধস্তন পশ্চিমকূট নামে অভিহিত হয়। জঘনোদরের অধোভাগে বস্তিগহ্বরের উদ্ধসীমাভূত 'বস্তি- কণ্ঠিকা' নামে স্থূল ও উন্নত রেখা আছে। ইহার পশ্চাতে কর্ণপালির ন্যায় আকার বিশিষ্ট 'ত্রিকস্থালক' নামক ত্রিকসন্ধিস্থান। ইহার পশ্চাদ্ভাগে 'পৃষ্ঠবংশধারিণী' পেশীসকল সংবদ্ধ থাকে।

জঘনপক্ষের পশ্চাৎ দিকের তোরণাকার দ্বারকে 'গৃধ্রসীদ্বার' বলে। এই দ্বার দিয়া 'গৃধ্রসী' নাড়ী ও তদনুবর্ত্তিনী সিরা ধমনী এবং 'শুণ্ডিকা' পেশী নির্গত হয়।

জঘনকপালের বহির্দ্দিকে নিম্নভাগে 'বংক্ষণোদূখল' নামক যে উদূখলাকার গহ্বর আছে, তন্মধ্যে উর্ব্বস্থির মুণ্ড প্রবেশ করিয়া সংহিত হইয়া থাকে।

(২) কুকুন্দরাস্থি—ইহা শ্রোণি ফলকের অধস্তন অংশ এবং প্রায় অর্দ্ধচন্দ্রাকার। বর্ণনাসৌকর্য্যার্থ ইহাকে বংক্ষণোদূখলাংশ, কুকুন্দরপিণ্ড এবং কুকুন্দরকূট—এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়।

বংক্ষণোদূখলাংশ—বক্ষণোদূখলাংশের বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহার ত্রিকোণাকার নিম্নাংশ মাত্র কুকুন্দরাস্থি দ্বারা নির্ম্মিত। ইহার নিম্নে ও পশ্চাতে যে ত্রিকোণপ্রায় প্রবর্দ্ধনক

আছে তাহাকে 'কুকুন্দর কণ্টক' বলে। ইহার নিম্নভাগে যে ক্ষুদ্র তোরণাকার খাত আছে, তাহা 'কুকুন্দরদ্বার' নামে অভিহিত। এই কুকুন্দরদ্বারের ভিতর দিয়া 'অন্তঃস্থা শ্রোণি-গবাক্ষিণী' পেশী এবং তদনুবর্ত্তিনী সিরা ধমনী ও নাড়ী সকল বস্তিগহ্বরে প্রবেশ করে।

কুকুন্দর পিণ্ড—ইহা শ্রোণিফলকের নিম্নতন অংশ। মনুষ্য উপবেশন করিলে এই অংশের উপর সমস্ত শরীরের ভার পড়ে।

কুকুন্দরকূট—ইহা কুকুন্দরপিণ্ডের উৰ্দ্ধে অবস্থিত। ইহার সম্মুখবর্ত্তী শৃঙ্গ ভগাস্থির নিম্নমুখ শৃঙ্গের সহিত মিলিত হইয়া শ্রোণি-গবাক্ষের সম্মুখ সীমা নির্ম্মাণ করে।

(৩) ভগাস্থি—শ্রোণিফলকের সম্মুখবর্ত্তী অংশকে ভগাস্থি বলে। ইহা যোনি বা লিঙ্গের অধিষ্ঠানভূত। মুণ্ড, উত্তরশৃঙ্গ এবং অধরশৃঙ্গ ভেদে ইহা তিন ভাগে বিভক্ত। ভগাস্থির মধ্যস্থিত মুণ্ডবৎ অংশকে ভগমুণ্ড, ভগপীঠ বা লিঙ্গপীঠ বলে। ইহার অন্তঃসীমা অপর ভগাস্থির সহিত সংহিত হয়। ভগমুণ্ডের পশ্চাদ্ভাগের উন্নত অংশকে উত্তরশৃঙ্গ বলে। ইহা শ্রোণিগবাক্ষের ঊর্দ্ধ পরিধিভূত এবং উহার ঊর্দ্ধসীমা অভ্যন্তরস্থ 'বস্তিকণ্ঠিকা' রেখা-স্থিত ও বস্তিগুহার ঊর্দ্ধ সীমাভূত। এই শৃঙ্গের শেষ প্রান্ত দ্বারা বংক্ষণোদূখলের ত্রিকোণাকার ঊর্দ্ধাংশ নির্ম্মিত হয়। অধরশৃঙ্গ ভগাস্থিমুণ্ডের নিম্ন দিয়া বহির্গত হইয়া কুকুন্দরকূটের সহিত সঙ্গত এবং শ্রোণি-গবাক্ষের সম্মুখের পরিধিভূত। ইহার সম্মুখ ধারায় শিশ্নের মূলবন্ধন সংলগ্ন থাকে।

অংসফলক* —স্কন্ধপৃষ্ঠের দুইদিকে দুইখানি ত্রিকোণপ্রায় পক্ষবৎ বিস্তৃতভাবে কপালাস্থি আছে, উহাদের নাম অংসফলক। অংসফলক-দ্বয় অংসসন্ধির পশ্চাদ্ভাগ হইতে নিম্নে সপ্তম পর্শুকার মূল পর্য্যন্ত তির্য্যক্ ভাবে অবস্থিত। উহাদের বহিঃসীমার ঊর্দ্ধ ও সম্মুখভাগ অক্ষক ও প্রগণ্ডাস্থিদ্বয়ের সহিত সংসক্ত এবং অন্তঃসীমা ও অন্যান্য প্রদেশ কেবল পেশী দ্বারা আবদ্ধ। চারিদিকে পেশী দ্বারা আবদ্ধ থাকায় অংসফলক সহজেই চারিদিকে বিবর্ত্তিত হইতে পারে।

* ইং—Scapula—স্ক্যাপুলা।

[ষোড়শ চিত্র—বাম অংসফলক]

১ হইতে ৬—পর্য্যন্ত অংসপ্রাচীর। ১—অংসকূট ২—অংসতুণ্ড। ৩—অংসাক্ষকসংযোজনী ও তুণ্ডাংসক সংযোজনী স্নায়ুর নিবেশ স্থল। ৪—অংসশিরকোটর। ৫—অন্তঃকোটি। ৬—অংসপ্রাচীরের মূলদেশ। এই স্থানে 'পৃষ্ঠপ্রচ্ছদাখ্যা' পেশী শ্লেষ্মধরা কলার ব্যবধানে বিবর্ত্তিত হয়। ৮—বহিঃকোটিস্থ অংসপীঠ নামক স্থালক। 'পে' চিহ্নিত স্থানগুলি পেশী নিবেশ স্থল।

অক্ষকাস্থির সহিত সংহিত অংসফলক অংসচক্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দুইটী অংসচক্র পেশী ও স্নায়ু সংযুক্ত হইয়া অংসসন্ধির উপরে সন্ধিরক্ষক বর্ম্মের ন্যায় অবস্থিত।

এক একটী অংসফলক চারিভাগে বিভক্ত, যথা,—অংসপ্রাচীর, অংসতুণ্ড, অংসপীঠ এবং অংসকপালিকা।

অংসপ্রাচীর—ইহা অংসকপালের পশ্চাতে তির্য্যক্ ভাবে অবস্থিত এবং খড়্গের ন্যায় আকার বিশিষ্ট। এই অংশ ত্বকের অধোভাগে স্পর্শ দ্বারা অনুভব করা যায়। ইহা দ্বারা

অংসপৃষ্ঠ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে যথা,—'উত্তর' বা উপরের অংসপৃষ্ঠ এবং 'অধর' বা নিম্নের অংসপৃষ্ঠ।

অংসপ্রাচীরের সর্পফণার ন্যায় এবং উচ্চাবচ সম্মুখ ভাগকে 'অংসকূট' বলে। উহার অগ্রভাগে 'অংসতুণ্ড সংযোজনী' স্নায়ু এবং পশ্চাতে 'অংসচ্ছদা' ও 'পৃষ্ঠপ্রচ্ছদা' পেশী সংবদ্ধ থাকে।

অংসতুণ্ড—অংসফলকের চূড়ায় অবস্থিত কাকতুণ্ডাকার বহির্মুখ প্রবর্দ্ধনককে 'অংসতুণ্ড' বলে। ইহাতে 'তুণ্ডাক্ষক সংযোজনী' এবং 'তুণ্ডাংসক সংযোজনী' স্নায়ু সংবদ্ধ থাকে।

অংসপীঠ অংসকূটের অধোভাগে অংসফলকের বহিঃকোটস্থিত স্থালকের নাম 'অংসপীঠ'। ইহার পরিধিতে সন্নিবিষ্ট স্নায়ুকোষের মধ্যে প্রগণ্ডাস্থির মুণ্ড বিবর্ত্তিত হয়।

অংসকপালিকা—ইহা অংসফলকের প্রধান অংশ এবং ত্রিকোণ কপালাকার। ইহার দুইটী তল—সম্মুখতল এবং পশ্চিমতল। সম্মুখভাগ খর্পরাকার, ইহাতে 'অংসাস্থিকা' পেশী সংলগ্ন থাকে। পশ্চিমতল অংস প্রাচীরের দ্বারা দুইভাগে বিভক্ত। এই দুইভাগে উত্তরা ও অধরা 'অংসপৃষ্ঠিকা' পেশী সংলগ্ন হয়।

অংসকপালিকার তিনটী ধারা—উৰ্দ্ধধারা, অন্তর্ধার এবং বহির্ধারা। ইহারা যথাক্রমে উৰ্দ্ধ, অন্তঃ ও বহিঃসীমারূপে অবস্থিত। তদ্ব্যতীত বহিঃকোণ, অন্তঃকোণ এবং অধঃকোণ নামে ইহার তিনটী সুব্যক্ত কোণ আছে। তন্মধ্যে বহিঃকোণ অংসপীঠে পরিণত। অন্য দুইটী কোণ ত্বকের নিম্নে অনুভব করা যায়।

অংসকপালিকার উৰ্দ্ধধারায় অংসতুণ্ডমূলে যে কোটর আছে, তাহাকে অংসকোটর বলে। এই কোটরের ভিতর দিয়া 'অংসারোহিণী' নাড়ী, সিরা ও ধমনী পৃষ্ঠের দিকে বিনির্গত হয়। বহির্ধারা কক্ষের (বগলের) সীমাভূত বলিয়া 'কক্ষানুগা ধারা' নামে অভিহিত। অন্তর্ধারা ধনুকের ন্যায় বক্রাকার, এবং পৃষ্ঠবংশের সমীপস্থ বলিয়া 'বংশানুগা ধারা' বলিয়া কথিত। অন্যান্য পেশীনিবেশ পেশ্যধ্যায়ে বর্ণনীয়।

অক্ষকাস্থি*—অংসমূল হইতে উরঃফলকে সংসক্ত ধনুর ন্যায় ঈষদ্ বক্রাকার নলকাস্থির নাম অক্ষকাস্থি বা কণ্ঠা। কণ্ঠের দুইদিকে দুইখানি অক্ষকাস্থি স্পর্শ দ্বারা অনুভব করা যায়। সাধারণে ইহারা 'কণ্ঠার হাড়' নামে পরিচিত। ইহাদের অন্তঃসীমা উরঃফলকের সহিত এবং বহিঃসীমা অংসফলকের অংসকূটের সহিত সন্ধিযুক্ত হইয়া থাকে।

অন্যান্য নলকাস্থির ন্যায় অক্ষকাস্থিও দুইপ্রান্ত (অন্তঃপ্রান্ত ও বহিঃপ্রান্ত) এবং মধ্যনলক—এই তিন ভাগে বিভক্ত।

অন্তঃপ্রান্ত—অক্ষকাস্থির অন্তঃপ্রান্তে দুইটী সন্ধিচিহ্ন দেখা যায়। তন্মধ্যে উপরের চিহ্ন উরঃফলকের পার্শ্বদেশের সহিত এবং নিম্নের চিহ্ন প্রথমা উপপর্শুকার সহিত সন্ধির জন্য। ইহার নিম্নভাগে যে বন্ধুর স্থান আছে, উহা 'পর্শুকাক্ষকসংযোজনী' স্নায়ুর নিবেশ স্থল।

* ইং—Clavicle ক্লাভিকাল।

[সপ্তদশ চিত্র—বাম অক্ষকাদি]

(সম্মুখ হইতে দৃষ্ট)

বহিঃপ্রান্ত

অন্তঃপ্রান্ত

চিত্রদ্বয়ের বামটী উর্দ্ধতলের ও দক্ষিণটী অধস্তলের দৃশ্য। ১—অন্তঃপ্রান্ত (উরঃফলাভিমুখ)। ২—বহিঃপ্রান্ত (অংসাভিমুখ)। ৩—'ত্রিকোণিকাখ্য' স্নায়ু সংযোগের জন্য অর্ব্বুদ। ৪—'চতুরস্রিকা' স্নায়ু সংযোগের জন্য তিরশ্চীনা রেখা। ৫—অংসকূটের সহিত সন্ধির স্থান। ৬—পর্শুকাক্ষকসংযোজনী' স্নায়ু সংযোগের জন্য বন্ধুর স্থান। ৭—প্রথম পর্শুকার উপরিভাগের সহিত সন্ধির চিহ্ন। 'পে' চিহ্নিত স্থানগুলি পেশী নিবেশ স্থল।

বহিঃপ্রান্ত—অক্ষকাস্থির বহিঃপ্রান্ত অংসকূটের সহিত 'অংসাক্ষক সংযোজনী' স্নায়ুর দ্বারা প্রতিবদ্ধ।

মধ্যনলক—ইহা দুই স্থানে ধনুর ন্যায় বক্রাকার, বহিরর্দ্ধে উত্তান এবং অন্তরর্দ্ধে কুব্জ। অন্তরর্দ্ধের পরিধি দণ্ডবৎ গোল, কিন্তু বহিরর্দ্ধ চ্যাপ্টা। বহিরর্দ্ধের অধোভাগে যে অর্ব্বুদবৎ উৎসেধ আছে তাহাতে 'ত্রিকোণিক স্নায়ু এবং উক্ত অর্ব্বুদ হইতে উদগত তির্য্যক্‌রেখায় 'চতুরস্রিকা' স্নায়ু সংবদ্ধ থাকে। পেশীনিবেশগুলি যথাস্থানে বর্ণনীয়।

উরঃফলক*—এই ফলকাকার অস্থি বক্ষঃস্থলের মধ্যে অবস্থিত। ইহা তিন খণ্ডে বিভক্ত - শিখরস্থ প্রথম খণ্ড 'গৈবেয়ক' নামে, মধ্যস্থ দ্বিতীয় খণ্ড 'মধ্যফলক' নামে এবং অধঃস্থ তৃতীয় খণ্ড 'অগ্রপত্র' নামে অভিহিত। তৃতীয় খণ্ড প্রথম বয়সে তরুণাস্থিময় থাকে। এই তিনখণ্ডে সংহিত অস্থির উভয়পার্শ্বে উপপর্শুকা নামক পর্শুকাসংযোজক তরুণাস্থি সকল সম্বদ্ধ থাকে।

[অষ্টাদশ চিত্র]

উরঃফলক ও উপপর্শুকা

১ম, ২য়, ৩য়—উরঃফলক। তন্মধ্যে ১ম গ্রৈবেয়ক নামক প্রথম খণ্ড। ২য় মধ্যফলক নামে দ্বিতীয় খণ্ড। ৩য় অগ্রপত্র নামে তৃতীয় খণ্ড। ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২,—উপপর্শুকা সহিত পর্শুকাশ্রেণী। দক্ষিণ দিকে কেবল উপপর্শুকা সমূহ দেখান

* ইং—Sternum—ষ্টারনম্।

হইয়াছে। অং, সং,---অক্ষক সন্ধি চিহ্ন। ক—কণ্ঠকূপ। 'পে' চিহ্নিত স্থান গুলি পেশীনিবেশ স্থল। যথাস্থানে বর্ণনী

গ্রৈবেয়ক—ইহা কণ্ঠমূলে অবস্থিত উরঃফলকের ষট্‌কোণ প্রথম খণ্ড। ইহাতে ছয়টী স্থালক আছে; তন্মধ্যে দুইটি স্থালক অক্ষকাস্থিদ্বয়ের সহিত, দুইটী প্রথমা উপপর্শুকাদ্বয়ের সহিত এবং অপর দুইটি দ্বিতীয়া উপপর্শুকাদ্বয়ের সহিত সন্ধিযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার শীর্ষদেশে যে খাত আছে তাহা 'কণ্ঠকূপ' নামে খ্যাত। ইহার নিম্নভাগ দ্বিতীয় খণ্ডের সহিত সন্ধিযুক্ত, উভয়খণ্ড মিলিত হইয়া প্রায় একই অস্থিতে পরিণত হয়।

মধ্যফলক---উর্দ্ধভাগে প্রথম খণ্ডের সহিত এবং অধোভাগে তৃতীয় খণ্ডের সহিত সংসক্ত। ইহা চারিখণ্ড অস্থির সংঘাত দ্বারা নির্ম্মিত, ঐ চারিখণ্ড অস্থি বাল্যকালে পৃথক থাকে। ইহার এক এক পার্শ্বে উপপর্শুকা সংযোগের জন্য ছয়টি করিয়া স্থালক আছে।

অগ্রপত্র -উরঃফলকের ক্ষুদ্রতম নিম্নস্থ খণ্ড। ইহা তরুণাস্থিবহুল, কিন্তু বার্দ্ধক্যে সম্পূর্ণ কঠিন হইয়া যায়। যকৃতের বৃদ্ধি বশতঃ ইহার অগ্রভাগ উন্নত হইলে লোকে 'অগ্রমাংস' হইয়াছে বলিয়া থাকে। ইহার উর্দ্ধপ্রান্ত মধ্যফলকের সহিত সংবদ্ধ এবং ইহার সম্মুখ ভাগে 'উরঃপ্রচ্ছদা' পেশীর মধ্যকণ্ডরা ও পশ্চাতে উদরাভ্যন্তরস্থ 'মহা প্রাচীর' পেশীর অগ্রভাগ সংযুক্ত হইয়া থাকে।

পর্শুকা * —উরঃপঞ্জরের বেষ্টনভূত পর্শুকাগুলি ধনুর ন্যায় বক্রাকার এবং স্থিতিস্থাপক ভাবে আবদ্ধ। এক পার্শ্বে বারখানি করিয়া দুই পার্শ্বে চব্বিশখানি 'পর্শুকা' বা 'পার্শ্বক' (পাঁজরা) আছে। ইহাদের পশ্চাদ্‌ভাগ পৃষ্ঠকশেরুকাগুলির পিণ্ডের সহিত এবং প্রথম দশখানির সম্মুখভাগ উপপর্শুকা নামক তরুণাস্থি সমূহের সহিত সংবদ্ধ। বারখানি পর্শুকার মধ্যে প্রথম সাতখানি উপর হইতে নিম্নদিকে ক্রমশঃ দীর্ঘতর এবং এই সাতখানির দ্বারা প্রধানতঃ উরঃপঞ্জর নির্ম্মিত হয় বলিয়া ইহাদিগকে 'মুখ্যপর্শুকা' বলে। এই সাতখানি পর্শুকা স্ব স্ব অগ্রভাগস্থিত উপপর্শুকার সাহায্যে উরঃফলকাস্থির সহিত সম্বদ্ধ। অধঃস্থিত অপর পাঁচখানি পর্শুকা ক্রমশঃ হ্রস্বতর এবং উরঃফলকের সহিত সাক্ষাৎভাবে সংবদ্ধ নহে। এইজন্য ইহারা 'গৌণ পর্শুকা' নামে অভিহিত। অষ্টমী, নবমী ও দশমী পর্শুকা স্ব স্ব অগ্রভাগস্থিত উপপর্শুকা দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ববর্ত্তী পর্শুকার সহিত সংবদ্ধ। একাদশী ও দ্বাদশী পর্শুকার অগ্রভাগ বিমুক্ত অর্থাৎ কাহারও সহিত সংযুক্ত নহে।

সাধারণতঃ প্রত্যেক পর্শুকার ছয়টী অঙ্গ আছে। যথা, মুণ্ড, অর্ব্বুদ, গ্রীবা, কোণ, কাণ্ড, এবং অগ্রকোটি।

মুণ্ড—পর্শুকার পশ্চাৎপ্রান্তকে মুণ্ড বলে। মুণ্ডে দুইটী গোলাকার স্থালক আছে এবং ঐ দুইটী স্থালক সাধারণতঃ দুইটী পৃষ্ঠকশেরুকাপিণ্ডের উপরের ও নীচের অর্দ্ধ স্থালকের সহিত সংবদ্ধ হইয়া থাকে।

* ইং—Ribs রিবস্।

অর্ব্বুদ—মুণ্ডের নিকটবর্ত্তী স্থালকাঙ্কিত পিণ্ডের নাম অর্ব্বুদ। কশেরুকার বাহুস্থিত স্থালকের সহিত অর্ব্বুদের সন্ধি হইয়া থাকে।

গ্রীবা—মুণ্ড এবং অর্ব্বুদের মধ্যবর্ত্তী স্থানের নাম গ্রীবা।

কোণ—গ্রীবার সম্মুখস্থ কোণাকার অংশের নাম কোণ। এই স্থানের আকৃতি দেখিলে বোধ হয় যেন ভগ্ন স্থান জোড়া দেওয়া হইয়াছে। বস্তুতঃ বাল্যকালে অস্থিখণ্ডগুলি পৃথক্ থাকে, এই স্থানেই যৌবনে জুড়িয়া যায়।

কাণ্ড—পর্শুকার ধনুর ন্যায় বক্রাকার মধ্যভাগকে কাণ্ড বলে। ইহার দুইটা ধার আছে—অধোধারা এবং ঊর্দ্ধধারা। অধোধারায় একটী পরিখা বা খাঁজ আছে এবং সেই পরিখায় 'পর্শুকানুগা' সিরা, ধমনী ও নাড়ী অবস্থিতি করে।

অগ্রকোটি—পর্শুকার সম্মুখপ্রান্তের নাম অগ্রকোটি। এই স্থান উচ্চাবচ এবং উপপর্শুকার সহিত সন্ধিযুক্ত।

[ঊনবিংশ চিত্র—বিশিষ্ট পর্শুকা]

১ম: প্রথমা পর্শুকা। ২য়—দ্বিতীয়া। ১০ম দশমী। ১১শ—একাদশী। ১২শ—দ্বাদশী। অ—অর্ব্বুদ। ক—কোণ। সং—মুণ্ডস্থ স্থালক। প্রথমা পর্শুকায় ১,২—'অক্ষকাধরিকা' সিরা ও ধমনী ধারণের খাত। পে—চিহ্নিত স্থানগুলি পেশী নিবেশ স্থল। (পেশ্যধ্যায়ে বর্ণনীয়)

তৃতীয় হইতে নবমী পর্শুকার আকৃতি বর্ণিত হইল। প্রথমা, দ্বিতীয়া, দশমী, একাদশী ও দ্বাদশী পর্শুকার যে বিশিষ্ট লক্ষণ আছে তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে—

প্রথমা পর্শুকা—ইহা হ্রস্বতম এবং কাণ্ডের ন্যায় আকার বিশিষ্ট। ইহার মুণ্ড ও স্থালক ক্ষুদ্রতম এবং কোণ বিশিষ্ট। কাণ্ড আয়ত, কাণ্ডের ঊর্দ্ধতলে 'অক্ষকাধরিকা' সিরা ও ধমনী ধারণের জন্য দুইটি খাঁজ আছে এবং নিম্নতলে বহু পেশী সন্নিবিষ্ট।

দ্বিতীয়া পর্শুকা—ইহা প্রথমা পর্শুকা অপেক্ষা দীর্ঘতর এবং ইহার ঊর্দ্ধতলে দুইটী পেশী সন্নিবিষ্ট।

দশমী পর্শুকা—ইহা হ্রস্ব এবং কতকটা বড়িশের ন্যায় আকার বিশিষ্ট। ইহার মুণ্ডে একটী স্থালক আছে এবং কোণটী কাণ্ডের মধ্যগত।

একাদশী পর্শুকা—ইহাতে অর্ব্বুদ নাই, কোণ আছে।

দ্বাদশী পর্শুকা—একাদশী পর্শুকার ন্যায়। অধিকন্তু ইহাতে কোণও নাই।

উপপর্শুকা*—ইহাদের সংখ্যা পর্শুকার ন্যায় এবং ইহারা এক প্রান্তে পর্শুকা ও অপর প্রান্তে উরঃফলকের সহিত সন্ধিযুক্ত। প্রাচ্যমতে উপপর্শুকাগুলি তরুণাস্থি বলিয়া অস্থিসংখ্যায় গণিত হইয়াছে, কিন্তু প্রাতীচ্য মতে ইহাদের অস্থি বলিয়া গণনা করা হয় না।

উরঃপঞ্জর।°

আমরা পূর্ব্বে যে উরোগুহার কথা বলিয়াছি তাহা উরঃপঞ্জরের মধ্যে অবস্থিত। উরঃপঞ্জরের পশ্চাদ্ভাগে পৃষ্ঠবংশ, দুই পার্শ্বে পর্শুকাগুলি এবং সম্মুখে উপপর্শুকা ও উরঃফলক অবস্থিত। ইহা উপর হইতে নিম্নদিকে ক্রমশঃ আয়ত এবং নিম্নদিকে 'মহাপ্রাচীর' পেশী দ্বারা সীমাবদ্ধ। প্রধানতঃ শ্বাসনলীর সহিত দুইটী ফুস্‌ফুস্, অন্ননলী এবং স্থূল মহাসিরাদ্বয় ও মহাধমনী প্রভৃতি সংযুক্ত হৃদয় উরঃপঞ্জরের মধ্যে অবস্থিত।

(ক্রমশঃ)

---

* ইং—False Ribs—ফল্‌স্ রিব্‌স্

° ইং—Thorax—থোরাক্স

শিশু পালন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বি, এ, সরস্বতী।

শিশুর পক্ষে যাহা অত্যাবশ্যক।

বিশুদ্ধ বায়ু। শিশু যে ঘরে সর্ব্বদা থাকে সে ঘরের জানালা-দরজা দিবাভাগে সব সময়েই উন্মুক্ত করিয়া রাখিবে। রাত্রিতেও শিশুর গায়ে বাতাস না লাগে অথচ ঘরে বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু আসে এরূপ ভাবে জানালা কিংবা দরজা খুলিয়া রাখিবে। জানালা কিংবা দরজা কিছু খুলিয়া ও কিছু বন্ধ করিয়া রাখিবে না। সেই অল্প ফাক দিয়া বাতাস জোরে ঘরের ভিতর ঢুকিলে তাহা শিশুর গায়ে লাগিলে অত্যন্ত অনিষ্ট হয়। বিশুদ্ধ বায়ুই জীবন, শিশু যেন সর্ব্বদা ইহার মধ্যে থাকে।

রৌদ্র। বাড়ীর মধ্যে যে ঘরে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রৌদ্র আসে, সেই ঘরে শিশুকে রাখিবে। কোন রোগের বীজাণু রৌদ্রে বাঁচিতে পারে না, রৌদ্র সমস্ত রোগের বীজাণু নষ্ট করে।

উপযুক্ত পুষ্টিকর আহার। শিশুর স্বাভাবিক খাদ্য মাতৃদুগ্ধ। তাহার অভাবে বিবেচনা পূর্ব্বক গাধার, গাভীর কিংবা ছাগ দুগ্ধ অথবা অন্য কোন কৃত্রিম দুধ দেওয়া উচিত। বয়োবৃদ্ধির সহিত দেহ গঠনোপযোগী উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য শিশুকে দিবে।

নিয়ম মত আহার। ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া শিশুকে আহার করাইবে। দুইবার আহারের মধ্যে অন্য কিছুই শিশুকে কখনো খাইতে দিবে না। প্রতিদিন ঠিক নিয়ম মত সময়ে যাহাতে শিশুর কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় তাহা দেখিবে। প্রতিদিন যথা সময়ে শিশু যাহাতে নিদ্রা যায় এরূপ অভ্যাস করাইবে এবং নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত যাহাতে নিদ্রা হয় তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। শিশুর আহার, নিদ্রা, কোষ্ঠপরিষ্কার নিয়মবদ্ধ করিতে পারিলে শিশু এবং তাহার মাতা উভয়েই আনন্দে ও স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে।

স্নান। শিশুর স্নান অতি সত্বরতার সহিত সম্পাদন করিবে। স্নানের পূর্ব্বে গরম জল, বস্ত্রাদি সমস্তই গুছাইয়া তবে স্নান আরম্ভ করিবে।

উপযুক্ত বস্ত্র। শিশুর বস্ত্রাদি হাল্কা, ঢিলা, আরামদায়ক, সচ্ছিদ্র এবং যাহা সহজে খোলা এবং পরান যায় এরূপ হইবে।

পরিচ্ছন্নতা। শিশুর সম্পর্কিত সমুদয় দ্রব্যই যেমন, খাদ্য, বস্ত্র, শয্যা, খাট, আহার্য্য দ্রব্যের বাসন পত্র, বোতল প্রভৃতি যথাসাধ্য পরিষ্কার রাখিবে। শিশু এত দুর্ব্বল যে কোন রোগের বীজাণুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার শক্তি তাহার দেহে নাই। সুতরাং মাতা দেখিবেন যে, কোন প্রকার অপরিচ্ছন্নতা যেন শিশুর নিকটে না আসে, কারণ অপরিচ্ছন্নতার মধ্যেই রোগের বীজাণু থাকে।

ফুটন্ত জল (Boiled Water)। যে সব স্থানের জল বিশুদ্ধ নহে, তথাকার জল

ফুটাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া শিশুকে খাইতে দিবে। স্নানের জলও ফুটান উচিত।

নিদ্রা। শিশুকে মাতার সহিত এক শয্যায় কখনো শোয়াইবে না। তাহাকে প্রথম হইতেই পৃথক শয্যায় শুইতে অভ্যাস করাইবে। কেবল আহারের সময় শিশুকে জাগাইবে।

শিশুর বাসগৃহ। (Nursery).

বাড়ীর মধ্যে যে ঘরে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রৌদ্র আসে এবং বায়ু চলাচল করে সেই ঘরে শিশুকে রাখিবে। শিশুর জন্য একটি পৃথক ঘর রাখিবার সুবিধা না হইলে বাড়ীর যে ঘরে বেশী রৌদ্র ও বায়ু আসে সেই ঘরেই শিশুকে বেশীক্ষণ রাখিবে। শিশুর সুখ-সুবিধা সর্ব্বাগ্রে, তা'রপর পরিবারের অন্য সকলের সুখ সুবিধা দেখিবে। শিশু যাহাতে ভাল থাকে সেই দিকে পরিবারের সকলেই সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি রাখিবেন। একটি চারাগাছকে অন্ধকারে রাখিলে তাহা যেরূপ শুকাইয়া যায়, শিশুকেও অন্ধকার ও বায়ুচলাচলহীন স্থানে রাখিলে সে সেইরূপ অকালে শুকাইতে থাকে। আমাদের দেশে রৌদ্রের অভাব নাই। কিন্তু সহরের জনাকীর্ণ পল্লীর অন্ধকার-বাড়ীগুলির মধ্যে এমন অনেক ঘর আছে, যে, সেই ঘরে কখনো রৌদ্র প্রবেশ করে না। এই কারণে ম্যালেরিয়া শূণ্য পল্লীগ্রামের রৌদ্র ও বাতাসের মধ্যে শিশু যেমন বেশ সুন্দররূপে বর্দ্ধিত হইতে পারে, সহরে তেমন হইবার সম্ভাবনা নাই। বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা দুর্ব্বল ও রুগ্ন শিশুকে পল্লীগ্রামের রৌদ্র ও বিশুদ্ধ বায়ুর মধ্যে রাখিতেই পরামর্শ দেন।

শিশুর ঘরে যে সমস্ত দ্রব্যাদি থাকিবে তাহা যেন বেশ পরিষ্কার করিয়া ধৌত করা যায়। এমন কোন জিনিস রাখিবে না যাহা ধৌত করিলে নষ্ট হইতে পারে। ঘরে শিশুর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ব্যতীত অন্য কোন বাহুল্য জিনিস বা অধিক গৃহসজ্জার দ্রব্য রাখিবে না। তাহা হইলে অধিক ধূলা জমিয়া তাহাতে রোগের বীজাণু স্থান পাইতে পারে। ঘরে শিশুর আনন্দদায়ক এবং চক্ষের তৃপ্তিকর বর্ণে রঞ্জিত নানা প্রকার পশুপক্ষীর ছবি রাখিলে শিশু আমোদ পাইতে পারে এবং শিক্ষাও হয়। শিশুকে যে খেলানা দিবে তাহা যেন বেশ নরম হয় এবং ময়লা হইলে ধৌত করা যায়। কোন প্রকার রঙ মাখান খেলানা শিশুকে কখনো দিবে না। শিশুকে এমন খেলানা দিবে যাহা তাহার পক্ষে শিক্ষাপ্রদ হয়। যাহা পায় তাহাই মুখে দেয়। রঙ মুখে গেলে শিশুর ঘোরতর অনিষ্ট হইতে পারে।

দিবাভাগে শিশুর ঘরের জানালা-দরজা সর্ব্বদা খুলিয়া রাখিবে। রাত্রিতেও একটি দরজা বা জানালা খুলিয়া রাখিবে, যাহাতে বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু ঘরের মধ্যে আসিতে পারে। শিশুর ঘরে অধিক লোক শুইবে না। অনেক লোকের শ্বাস প্রশ্বাসে ঘরের বায়ু শীঘ্রই বিষাক্ত হইয়া উঠে এবং সেই বায়ু শিশুও টানিয়া লয়। ইহাতে তাহার স্বাস্থ্য শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া যায়। শিশুর ঘরে কেবল শিশু এবং তাহার মাতা পৃথক শয্যায় শুইলেই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হয়।

শিশুর ওজন।

সুস্থ সবল শিশুর ওজন কত হওয়া উচিত তাহা নিম্নলিখিত তালিকা হইতে প্রত্যেক মাতা বুঝিতে পারিবেন।

বয়স	ওজন
জন্মকালে	৩½ সের
এক মাস	৪½ „
দুই মাস	৫½ „
তিন মাস	৬ „
চারি মাস	৬½ „
ছয় মাস	৮ „
এক বৎসর	১১½ „

(জন্মকালীন ওজনের তিন গুণ)

জন্মিবার প্রথম এবং দ্বিতীয় দিনে শিশুর ওজন জন্মকালের ওজন অপেক্ষা কমিয়া যায় কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যেই আবার বাড়িয়া উঠে। উপরে যে তালিকা দেওয়া হইল সাধারণতঃ শিশুর ওজন গড়ে ঐরূপ হয়। অকাল-প্রসূত শিশুর ওজন এবং আকার ইহা পেক্ষা অনেক কম হয়। ৭।৮ মাসে প্রসূত শিশুর ওজন কখন কখন ১½ সের হইতে দেখা যায়। এরূপ শিশু প্রায়ই বাঁচে না! কিন্তু ২ সের ওজনের শিশুকে কোন কোন মাতা সুস্থ সবল করিয়া বাঁচাইয়া তুলিয়াছেন এরূপ দেখা গিয়াছে। এরূপ মাতা সবিশেষ প্রশংসার্হ। সুস্থ শিশুর ছয় বৎসর বয়সের সময় তাহার ওজন জন্মকালীন ওজন অপেক্ষা ছয়গুণ অধিক হইবে। কিন্তু ইহাও মনে রাখা উচিত যে, কেবল ওজনের আধিক্যই শিশুর সবলতা ও সুস্থতার পরিচায়ক নহে। অনুপযুক্ত শ্বেতসার বিশিষ্ট পদার্থ খাইলেও শিশু মোটা ও ভারি হইতে পারে, কিন্তু তাহার মাংস পেশী ও হাড় দৃঢ় না হইলে তাহা সুস্থতার পরিচয় দেয় না। অতএব মাতা দেখিবেন যে, শিশুর বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার মাংসপেশী ও হাড় দৃঢ় হইতেছে কিনা।

জন্মের প্রথম ২।৩ সপ্তাহের মধ্যে শিশুর ওজন যদি না বাড়ে তাহা হইলে তাহার খাদ্যের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। শিশু যদি মাতৃ দুগ্ধই খায়—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, মাতার দুগ্ধ ভাল নহে, সুতরাং মাতার দুগ্ধের উন্নতি সাধনে মনোযোগী হইতে হইবে কিম্বা বুঝিতে হইবে যে, মাতার দুগ্ধ শিশু তেমন উপযুক্ত রূপে পাইতেছে না। অথবা অন্য কোন কারণ থাকিলে তাহা বুঝিয়া কার্য্য করিতে হইবে। দুর্ব্বল শিশুরা মাতার দুগ্ধ তেমন টানিয়া খাইতে পারে না বলিয়া অনেক সময় দেহবৰ্দ্ধনোপযোগী খাদ্য পায় না। এইরূপ শিশুদিগকে মাতার দুগ্ধের সহিত অন্য দুগ্ধ দিতে হইবে।

শিশুর দেহ সন্তোষজনকরূপে বাড়িতেছে এবং পুষ্ট হইতেছে কিনা তাহা নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

(১) শিশুর ওজন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে।

(২) থলথলে না হইয়া দৃঢ় হইবে এবং চর্ম্মের রং পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যজ্ঞাপক হইবে।

(৩) শিশু সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্ত থাকিবে।

(৪) তাহার সুনিদ্রা হইবে।

(৫) নিয়মিতরূপে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে।

৬। উপযুক্ত সময়ে দন্তোদ্গম হইবে।

(৭) দ্বিতীয় বর্ষের শেষ ভাগে মস্তকের দুই ভাগ জুড়িয়া যাইবে।

(৮) নবম মাসের শেষে শিশু বসিতে পারিবে। শিশু নিজে বসিতে পারিবার পূর্ব্বে তাহাকে কখনো বসাইবে না, বসাইলে সর্ব্বদা ঠেস দিয়া বসাইবে।

(৯) একাদশ মাসে শিশু হামাগুড়ি দিবে।

(১০) দ্বিতীয় বর্ষের প্রারম্ভেই হাঁটিতে

পারিবে। শিশু নিজে হাঁটিবার পূর্ব্বে তাহাকে জোর্ করিয়া হাঁটাইবে না।

বল পাইলে সে নিজেই হাঁটিবে। অনেক শিশুকে জোর করিয়া হাঁটাইতে গিয়া চির-জীবনের মত বিকলাঙ্গ হইয়া গিয়াছে।

(১১) দ্বিতীয় বর্ষের মাঝামাঝি কথা বলিবে।

সুস্থ শিশুর সম্বন্ধে এই নিয়মগুলি সাধারণতঃ খাটে। দুর্ব্বল, রুগ্ন, অকালপ্রসূত শিশুদের কথা স্বতন্ত্র. তাহাদের সম্বন্ধে কোন নিয়মই নাই। ৭।৮ মাসে প্রসূত শিশু সাধারণ শিশু অপেক্ষা অনেক দেরীতে কথা বলে ও হাঁটে।

শিশুর কোষ্ঠ কাঠিন্য।

শিশুর শারীরিক অবস্থা শিশুর কোষ্ঠ পরিষ্কার আছে কিনা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। দাস্ত অনিয়মিত হইলে কিংবা দাস্তে দুগ্ধের ছানার সাদা সাদা অংশ থাকিলে শিশুর খাদ্যের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। এরূপ হইলে বুঝিতে হইবে যে, শিশুর খাদ্য পরিপাক হইতেছে না, যকৃতের ক্রিয়া ভাল-রূপে হইতেছে না।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে শিশুর অন্ততঃ একবার দাস্ত হওয়া উচিত, চারি পাঁচবার হইলেও ক্ষতি নাই। দাস্তের প্রকৃতি (character) ও রং যেমন হইবে—তদনুসারেই শিশুর সুস্থতা ও অসুস্থতা বুঝিতে হইবে। বারে অধিক হইলেও দাস্ত যদি ভাল হয় তবে ক্ষতি নাই।

শিশুর জন্মের পর কয়েকদিন পর্য্যন্ত এক প্রকার কাল, গন্ধহীন, আলকাতরার ন্যায় পদার্থ বাহির হয়। ইহাই শিশুর প্রথম দাস্ত। এইরূপ দাস্ত দিনে তিনবার হইতে ছয়বার হয়। ইহার ইংরাজি নাম maconium এই পদার্থ দ্বারা বিধাতা শিশুর জন্মিবার পূর্ব্বে তাহার পাকস্থলীর delicate lining আচ্ছা-দিত করিয়া রাখেন। ইহা বাহির করিবার জন্য কখনো কোন জোলাপ দিবে না এবং তাহার প্রয়োজনও হয় না। শিশুর জন্মের পরই মাতার দুগ্ধ আঠার মত থাকে, দুগ্ধের মত তরল হয় না। এইরূপ দুগ্ধ পান করিলেই শিশুর পেটে যত কাল পদার্থ থাকে সব বাহির হইয়া যায়। ইহা সব বাহির হইয়া গেলে সুস্থ শিশুর দাস্তের রং হরিদ্রাবর্ণের এবং নরম হয়। এইরূপ দাস্ত হইলে বুঝিতে হইবে যে, শিশুর কোন অসুখ নাই।

কঠিন, শুষ্ক, crumlely দাস্ত হইলে বুঝায় যে, শিশুর মেদময় খাদ্যের আবশ্যক। সবুজ বর্ণের দাস্ত হইলে বুঝিতে হইবে যে. শিশু যে খাদ্য গ্রহণ করিতেছে তাহা তাহার পক্ষে অনুপযোগী অথবা তাহার পেটে ঠাণ্ডা লাগিয়াছে।

Slimy দাস্ত হইলে বুঝায় যে, তলপেটে inflammation কিংবা কোন গোলমাল হইয়াছে। সাবান জলের পিচকারী দিলেও এইরূপ দাস্ত হয়। জলের মত দাস্ত হইলে পেটের অসুখ বুঝায়।

শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্যের কারণ দুইটি হইতে পারে।

(১) শিশুর bowels দুর্ব্বল হইতে পারে।

(২) শিশুর খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণে মেদময় পদার্থ (fat) নাই।

শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য (constipation) কখনো থাকিতে দিবে না। পনের দিনের হইলেই প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে শিশুর কোষ্ঠ যাহাতে পরিষ্কার হয়—এরূপ অভ্যাস করাইবে। প্রতিদিন কয়েকমিনিট ধরিয়া শিশুর পেটের

উপর হাত দিয়া ঘর্ষণ করিলে কোষ্ঠকাঠিন্যের উপকার হয়। মাতা—শিশুকে কোলের উপর শোয়াইয়া পেটের দক্ষিণদিকের নিম্নদেশ হইতে উপর দিকে নাভির উপর দিয়া বাম দিকের নিম্নদেশ পর্য্যন্ত ঘর্ষণ করিবেন। প্রত্যহ প্রাতঃকালে এইরূপ দশমিনিট ধরিয়া করিলে বেশ উপকার দেখা যায়। বয়স্ক বালক বালিকাদিগেরও এই প্রথাতে বেশ উপকার হয়।

মাতৃদুগ্ধে পালিত শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য মাতার কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য হয়। মাতার খাদ্যে মেদময় পদার্থের অভাব—তাঁহার কোষ্ঠ কাঠিন্যের কারণ। সুতরাং মাতা বিশেষ ভাবে তাঁহার খাদ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন এবং যাহাতে তাঁহার দাস্ত নিয়মিত হয় তিনি তাহা দেখিবেন। তাহা হইলেই শিশুরও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হইবে। মাতা অনাবশ্যক রূপে জোলাপ লইবেন না। যদি কখনো তাহার প্রয়োজন হয়, তবে মৃদু জোলাপ লইবেন, যাহাতে শিশুর কোন অনিষ্ট না হইতে পারে।

শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য হইলে তাহাকে—

(১) কডলিভার অয়েল ½ চামচ দিনে তিনবার দেওয়া। প্রয়োজন হইলে মাত্রা বাড়ান যাইতে পারে।

(২) গরম জল কিংবা ফুটন্ত জল ঠাণ্ডা করিয়া বড় চামচের এক চামচ আহারের মাঝখানে দিনে তিনবার দিলে উপকার হয়। প্রাতঃকালের আহারের আধ ঘন্টা পূর্ব্বে গরম জল পান করাইলে শিশুর দাস্ত পরিষ্কার হয়।

(৩) ফলের রস শিশুর পক্ষে খুব উপকারী। আঙ্গুর, কমলালেবু, ফিগ সিদ্ধ করিয়া তাহার রস এক চা চামচ শিশুকে দিবে।

(৪) কালমেঘের পাতার রস ২০ ফোঁটা হইতে ৩০ ফোটা কিংবা পাতা বাটিয়া বড়ি করিয়া একটা বড়ি খাওয়াইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

(৫) আমাদের দেশে শিশুকে প্রথম মাস হইতে তিন বৎসর পর্য্যন্ত আলুইয়ের বড়ি খাওয়ান হয়। ইহা শিশুর পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। ইহাতে তাহার যকৃতের কার্য্য ভাল হয়।

সময় সময় পিচকারি দিয়া দাস্ত করাইবার প্রয়োজন হয়। স্বাভাবিক উপায়ে এবং ঔষধ দিয়া দাস্ত না হইলে তবে পিচকারী দিবে। লবণ জলের পিচকারী দেওয়া সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। গ্লিসারিণ এবং সাবান জলের পিচকারী দিলে পেটে irritasion হয়। কখনো glycerine এবং সাবান জলের পিচকারী শিশুকে দিবে না। এক পাইন্ট অল্প গরম জলে এক চা-চামচ লবণ মিশাইয়া সেই জলের এক চা-চামচ হইতে আট চা-চামচ লইয়া পিচকারী দিবে। লবণ জল bowelকে tone করে এবং কখনো irritate করে না। শিশুকে কখনো castoroil দিবে না। ইহা পেটের মাংসপেশীকে শক্ত করে বলিয়া শিশুর আরো কোষ্ঠকাঠিন্য হয়। শিশুকে পিচকারী দিয়া দাস্ত করাইবার অভ্যাস করাইবে না। যখন অন্য কোন উপায় না থাকিবে তখনই কেবল পিচকারী দিবে।

(ক্রমশঃ)

অস্ত্রোপচার।

—:*:—

ডাঃ শ্রীসত্যজীবন ভট্টাচার্য্য—এল্, এম্, এস্।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচার।

উপসর্গ। হার্ণিয়া সেরিব্রাই, মস্তিষ্কের শোথ।

হার্ণিয়া সেরিবাই অর্থাৎ মস্তিষ্ক বাহির হওয়ার কারণ—

আভ্যন্তরিক সঞ্চাপ দূরীভূত না হওয়া। পচন দোষের জন্য প্রায়ই ইহা হইয়া থাকে। এইরূপ উপসর্গ উপস্থিত হইলে, অভ্যন্তরে কোথায় সঞ্চাপ রহিয়াছে তাহার অনুসন্ধান সর্ব্বাগ্রে করিবে। কেননা সেই কারণ দূরীভূত করিতে পারিলেই মস্তিষ্ক আপনা হইতে প্রবিষ্ট হইয়া যাইবে।

মস্তিষ্কের যে অংশ বাহির হইয়া পড়ে, প্রায়ই দেখা যায়, তাহার ভিতরে পুয সঞ্চিত থাকে, কখনও বা ছোট ফুস্কুড়ির মতও দেখিতে পাওয়া যায়। সে পুয বাহির করিয়া দিলেই কারণ দূরীভূত হয়।

মস্তিষ্কের হার্ণিয়ার অধিকাংশই গ্রানুলেশন বিধান দ্বারা গঠিত হয়, মস্তিষ্কের বিধান খুব কমই থাকে, সুতরাং তাহা স্ক্রেপ করা চলে। স্ক্রেপের পর সেইস্থানে কার্ব্বলিক অ্যাসিড্ প্রয়োগ করা যায়। এজন্য রোগীকে 'ক্লোরফর্ম্ম" করিবার প্রয়োজন হয় না। কেননা মস্তিষ্কের বহির্গত অংশ নিজেই সংজ্ঞাহীন।

মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচারের পর রোগীকে একটি আলোক বিহীন কক্ষে স্থির ভাবে শোয়াইয়া রাখিবে। রোগীকে কথা কহিতে দিবে না, আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেও দিবে না।

অন্ত্র পরিষ্কারের জন্য তেউড়ী মূল বা হরীতকী মূলের জোলাপ দিবে। ডাক্তারী মতে ক্যালোমেল দিবার ব্যবস্থা।

কিন্তু, ডিউরামেটারের, রক্তস্রাব জন্য ট্রিকাইনি, করিলে, এত সাবধান হইবার দরকার করে না, এরূপ অস্ত্রোপচারের পরই রোগী উঠিয়া বসিতে পারে। ঘা শুকাইলেই রোগী আরোগ্য হইল—ইহাও মনে করা চলে।

অস্ত্রোপচারের পর প্রদাহ উপস্থিত হইলে, দেহের উত্তাপও খুব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এরূপ ঘটনা প্রায় তৃতীয় দিবসে ঘটিয়া থাকে।

মস্তিষ্ক বিধানের যে কোন অস্ত্রোপচার হউক না কেন, অস্ত্রোপচারের পর ৫।৬ মাস মস্তিষ্ক পরিচালনার কার্য্য হইতে বিরত থাকা উচিত। অন্ততঃ ২।৩ মাস পড়া শুনা করা একেবারেই ছাড়িতে হয়।

হেয়ারলিপ অস্ত্রোপচার।

উপসর্গ। ব্রঙ্কাইটিস্, নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া, পচন, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, শ্বাসরোধ।

এইরূপ অস্ত্রোপচারের পর, যে স্থলে—

অস্থি সংশ্লিষ্ট হয় সেই স্থলে—কখনও সামান্য পচন দোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ রোগীর বলরক্ষার জন্য পথ্যের বিধিমত ব্যবস্থা করা আবশ্যক। রোগীর মুখ গহ্বর পরিষ্কার রাখাও দরকার।

শ্বাস কৃচ্ছ্রের লক্ষণ উপস্থিত হইলে, রোগীর অধর নিম্ন দিকে আকর্ষণ করিয়া রাখিবে। এইরূপ মাঝে মাঝে করিলে, সহজে মুখের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিতে পারিবে।

হেয়ার পিন প্রয়োগ করা হইয়া থাকিলে অস্ত্রোপচারের দ্বিতীয় দিনে উহা বাহির করিয়া লইবে। যদি রৌপ্যতার (ফিস্‌গাট) দিয়া সেলাই করা হইয়া থাকে, তবে তাহার একটী তৃতীয় দিবসে, অপরটি পঞ্চম দিবসে খুলিয়া দিবে। কর্ত্তিত স্থানের উভয় পার্শ্ব পরস্পর সম্মিলনের উদ্দেশ্যে যে সূক্ষ্ম সেলাই করা হইয়া থাকে,—এক সপ্তাহের পর তাহা দূর করা উচিত, তবে ইতিমধ্যে যদি সেলাই জনিত স্ফোটকের উৎপত্তি হয়, তবে তৎক্ষণাৎ সূত্র খুলিয়া ফেলিবে। ইহাতে কর্ত্তিত স্থান ফাঁক হইয়া যাইতে পারে। তজ্জন্য, একখণ্ড এবিলিভ প্লাষ্টার এরূপ ভাবে কাটিয়া লইবে, যে, তাহার সংকীর্ণ অংশ নাসারন্ধ্রের নিম্নে এবং প্রশস্ত অংশ দ্বয় গণ্ডে সংলগ্ন করিয়া রাখা চলে। ইহাতে ক্ষতমুখ বিস্তৃত হইবার ভয় থাকে না।

সেলাই করার সূত্র খুলিবার সময়—খুব সাবধান হইবে, যেন টান লাগিয়া ক্ষত স্থান বিস্তৃত না হয়।

ক্লেপ্ট প্যালেট।

উপসর্গ। হুপিং কফ, জ্বর অতিসার। কিন্তু, এ সকল উপসর্গ যাহাতে না উপস্থিত হয়—সে জন্য খুব সতর্ক থাকিতে হইবে। কাসি উপস্থিত হইলে, অস্ত্রোপচার নিষ্ফল হইয়া যায়।

গ্রীবার অস্ত্রোপচার।

ট্রেকিওটমী ও লেরিঙ্গোটমী।

উপসর্গ। এম্ফাইসিমা, ট্রেকিয়ায় ক্ষত, ক্ষত বিগলন।

অনেক সময় অস্ত্রোপচারের দোষে অথবা ট্রেকিয়ার মধ্যে নল সংস্থাপিত না হওয়ায় এম্ফাইসিমা উপস্থিত হয়। অতএব যদি এম্ফাইসিমা হয়—তবে নল বাহির করিয়া লইয়া আবার তাহা ভাল করিয়া প্রবেশ করাইবে। ধাতব নল—বেশী দিন রাখিলে ট্রেকিয়ার মধ্যে ঘা হইতে পারে। সুতরাং তাহা মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তন করিবে। এক সপ্তাহের বেশী কখনও ধাতু নির্ম্মিত নল রাখিবে না। যদি সপ্তাহের অধিক কাল নল রাখার আবশ্যক হয়, রবারের নল ব্যবহার করিবে, এক এক ব্যক্তির গ্রীবার গঠন এক এক প্রকৃতির, তজ্জন্য বিভিন্ন প্রকৃতির গঠনের নল নির্ব্বাচন করিয়া লইবে।

ডিফ্‌থিরিয়া বা সন্তাপ জন্য ট্রেকিয়ার ক্ষত হইলে, ফিতা শিথিল করিয়া দিয়া বর্ণ বিশিষ্ট মলম বা গজ দ্বারা ক্ষত চিকিৎসা করিবে। যদি বিগলন বিস্তৃত হইতেছে দেখ, তবে কার্ব্বলিক অ্যাসিড্‌ বা নাইট্রেট্‌ অফ সিল্‌ভার—প্রয়োগ করিবে।

লেরিংক্স প্রসারণ—

প্রথমে রোগিকে ক্লোরফর্ম দ্বারা অজ্ঞান করিয়া ট্রেকিয়ার ক্ষত প্রসারিত করতঃ সেই পথে খুব নরম রবারের ক্যাথিটার লেরিংক্সের

মধ্য দিয়া মুখের ভিতর চালিত করিবে। মুখের মধ্যে একটু আসিলে, ক্লিপ দিয়া তাহা ধরিয়া ধীরে ধীরে টানিয়া আনিবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে একটু একটু বড় ক্যাথিটার প্রবেশ করাইয়া উপযুক্ত পরিমাণে প্রসারিত করিয়া লইবে। কিম্বা ঐরূপ ক্যাথিটারের ভিতর দিয়া ট্রেকিচার ক্ষত পথে রেশম সূত্র প্রবেশ করাইয়া সূত্রের নীচের দিকে একখণ্ড কোমল স্পঞ্জ বাঁধিয়া সূত্রের অপর দিক মুখের ভিতর দিয়া আকর্ষণ করিয়া লইবে। ইহাতে লেরিংক্সের ময়লা সমস্তই পরিষ্কার হইয়া যায়। ম্যাকেঞ্জলের টিউব—এ কার্য্যের উপযোগী।

ইসোফেজিওটমী।

এই অস্ত্রোপচারের পর—রোগীকে কিছু খাওয়ান বড় কঠিন সমস্যা। ডাক্তারেরা প্রথম ৩ দিন মলদ্বার দিয়া পথ্য প্রয়োগ করেন। ইহারই বাঙ্গালা সংজ্ঞা—"সরলান্ত্র পথে পথ্য প্রয়োগ।" এরূপ ভাল পথ্য প্রয়োগ অসম্ভব ব্যাপার। আমি কোথায়ও সফলকাম হই নাই। বরং মুখ পথে বা নাসিকা পথে একটি কোমল রবার নল ইস্যাফোগাস্ মধ্যে চালাইয়া তাহার মধ্য দিয়া পথ্য প্রয়োগ করিয়াছি। এইরূপ নল সকালে চালাইয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রাখিয়াছি, তাহার মধ্য দিয়া ৫।৬ বার তরলীয় পথ্য রোগীকে খাওয়াইয়াছি।

১ সপ্তাহ পরে মুখপথ দিয়া তরল পথ্য প্রয়োগ করা যায়।

ক্ষতের নিম্নাংশ হইতে যাহাতে স্রাব নির্গত হইতে পারে, সেজন্য ড্রেনেজের ব্যবস্থা করিতে হয়। নতুবা ক্ষত হইতে রোগজীবাণু সংক্রমিত হইতে পারে,—কেননা এরূপ ক্ষত প্রায়ই পচন দোষযুক্ত হইয়া থাকে।

থাই রইড্ গ্রন্থির অস্ত্রোপচার।

উপসর্গ। বাক্‌রোধ, গ্রীবার সেলুলাইটিস্, থাইরইডিজম্।

১। রেকারেণ্ট লেরিঞ্জিয়াল স্নায়ু অস্ত্রোপচার জন্য আহত অথবা ২। ক্ষত শুষ্ক বিধানের সঙ্গে জড়িত হইলে, বাক্‌রোধ উপসর্গ উপস্থিত করে। প্রথম কারণে—অস্ত্রোপচারের সঙ্গে সঙ্গেই বাক্‌রোধ হইয়া থাকে। দ্বিতীয় কারণে কিছু বিলম্বে বাক্-রোধ উপস্থিত হইয়া থাকে।

গ্রীবার সেলুলাইটিস্—অতি ভয়ানক উপসর্গ। ইহাতে রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত। এ উপসর্গ উপস্থিত হইবামাত্র—ক্ষত উন্মুক্ত করিয়া দিবে—যেন স্রাব বদ্ধ হইয়া না থাকে, বাহির হইয়া যায়।

'থাইরই ডিজম্' উপস্থিত হইলে এক্স অফ থালমিক গাইটারের লক্ষণ—অস্ত্রোপচারের ২।১ দিন পরেই দেখা দেয়। জ্বর খুব প্রবল হয়—১০৩, ১০৫ পর্য্যন্ত। এত উত্তাপ—গায়ে হাত দেওয়া যায় না। হৃদ্‌পিণ্ডের কার্য্য অতি দ্রুত হইয়া থাকে, মুখমণ্ডল রক্তোজ্জ্বল, নাড়ী স্থূলা—পূর্ণ বেগবতী, রোগী অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়ে।

অনেক সময়—ক্ষত পচনদোষ সংসৃষ্ট হইলেও পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে। তবে, পচন দোষে হৃদ্‌পিণ্ডের গতি দ্রুততর হয় না। ২।১ দিন থাকিয়া ক্রমশঃ এই সকল লক্ষণ তিরোহিত হইয়া যায়, তখন আর ভয়ের কারণ থাকে না।

পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ উপস্থিত হইবামাত্র—

ক্ষত উন্মুক্ত করিয়া দিবে, জল দ্বারা ভাল করিয়া ধুইয়া দিবে, পরে গজ দ্বারা এরূপ ভাবে পরিপূর্ণ করিবে—যেন গ্রন্থির স্রাব ক্ষত মধ্যে সঞ্চিত হইয়া লিম্ফ্যাটিক কর্ত্তৃক শোষিত না হয়। অত্যন্ত কঠিন রোগীর পক্ষে ট্রান্স ফিউসন প্রয়োজন হইতে পারে। এইজন্য কখন কখন রোগীর মৃত্যুও হইয়া থাকে।

বক্ষঃ বিবরের অস্ত্রোপচার।

স্তন উচ্ছেদ।

উপসর্গ। ফুস্‌ফুসের রোগ, ত্বকের পচন, পচন সংক্রমণ।

ক্ষত মধ্যে ড্রেনেজ টিউব প্রভৃতি না দেওয়া হইলে, ক্ষতের ভিতরে শিথিল কৈশিক বিধান মধ্যে রক্ত সঞ্চিত হয়। ইহার প্রতিকারের জন্য—রোগিণীকে ২৪ ঘণ্টাকাল, তাহার সুস্থ পার্শ্বের দিকে শুইয়া থাকিতে বলিবে। কিন্তু স্রাব নির্গত হইবার ব্যবস্থা থাকিলে,—এরূপ শুইয়া থাকিবার আবশ্যক নাই। অস্ত্রোপচারের পর অত্যন্ত বেদনা হইলে, ¼ গ্রেণ মর্ফিয়া অধস্ত্বাচিক প্রণালীতে প্রয়োগ করিবে।

প্রথম ২৪ ঘণ্টা অতি অল্প রক্ত নির্গত হইয়া ক্ষতের পটী সিক্ত হইয়া থাকে। এ দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। পটীর আর্দ্র স্থানে তুলা দিয়া বাঁধিয়া দিবে।

অস্ত্রোপচারের পর—রোগিণীকে তাকিয়া হেলান দিয়া ২ দিন পর্য্যন্ত বসাইয়া রাখিলে, তাহার ফুস্‌ফুসের কোন রোগ বড় একটা হয় না।

স্তন উচ্ছেদের পর—ফুস্‌ফুসের রোগ—প্রায়ই হইয়া থাকে। বেশী বয়সে স্তনের কার্সিনোমা পীড়া বেশী হয়। এই পীড়ায় স্তন উচ্ছেদ না করিলে চলে না। ব্যাণ্ডেজ দ্বারা কষিয়া বাঁধা থাকায়, বক্ষঃস্থল যথোপযুক্ত সঞ্চালিত হইতে পারে না। অধিকন্তু বক্ষঃস্থলে বৃহৎ ক্ষত থাকায় রোগিণী নিশ্বাস গ্রহণের সময় যন্ত্রণা অনুভব করে। তাহার শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণেও ব্যাঘাত ঘটে। কাজেই ফুস্‌ফুসের রোগ হওয়া অনিবার্য্য। অনেক স্থলেই দেখিয়াছি—অস্ত্রোপচার সন্তোষজনক হইয়াছে,—রোগিণী কিন্তু ব্রঙ্কাইটিসের আক্রমণে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

অস্ত্রোপচারের পরই বাহু সেই পার্শ্বে আবদ্ধ করিয়া দিয়া হস্ত ব্যাণ্ডেজের ক্রোভঙ্গিচ দ্বারা গ্রীবা বেষ্টন স্থির রাখা আবশ্যক। যদি স্লিং দ্বারা হস্ত স্থির রাখার ব্যবস্থা করা যায় তবে তাহা স্কন্ধ না কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত টানিয়া রাখা কখনই উচিত নহে। কারণ তাহাতে টান পড়িয়া ক্ষতের সেলাই ছিঁড়িয়া যাইতে পারে।

স্রাব নির্গত হইবার জন্য ড্রেনেজ টিউবের ব্যবস্থা করিলে, দ্বিতীয় দিবসেই তাহা খুলিয়া লইবে, পটির পরিবর্ত্তন করিবে। অস্ত্রোপচারের ৩।৪ দিন পরে—বাহু এপাশে ওপাশে একটু একটু সঞ্চালিত করিতে হইবে। ১৫ দিন পর্য্যন্ত অতি সাবধানে একার্য্য করিতে হয়, ক্রমে অধিক পরিমাণে সঞ্চালিত করিতে হয়।

সেলাইয়ের কিয়দংশ অস্ত্রোপচারের সপ্তাহ পরে এবং বাকি অংশ পক্ষকাল পরে কাটিয়া দিবে। ঘা' শুকাইলে গভীর স্থরস্থিত বিধান যাহাতে পরিচালিত হইতে পারে, সে দিকে দৃষ্টি রাখিলে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত রোগিণীর দিকে দৃষ্টি রাখিবে, কেননা পীড়ার লক্ষণ পুনরায় দেখা দিতে পারে।

স্তনের সহিত অনেকটা ত্বক্ উচ্ছেদ করিয়া, অবশিষ্ট ত্বক্ খুব টানিয়া সেলাই করিয়া দিলে, কর্ত্তনের পার্শ্বদেশের ত্বক পচিয়া গলিয়া যাইতে পারে। এরূপ ঘটনা উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ সেলাই কাটিয়া দিবে। তাহাতে ক্ষত মুখ ফাঁক হইয়া যাইবে। বরং সেই ক্ষত স্কিন্ গ্রাফ্টিং দিয়া পূর্ণ করিবে।

পচন সংক্রমণ স্তন উচ্ছেদের বিপজ্জনক উপসর্গ। ক্ষত বৃহৎ এবং বিস্তর লসিকাবহা উন্মুক্ত থাকায় সহজেই রক্ত দূষিত হইয়া পড়ে। ফুস্ফুস্ আবরক ঝিল্লীর মধ্যে রস সঞ্চিত হইয়া তাহা পূযে পরিণত হইতে পারে।

এম্পাইমার অস্ত্রোপচার।

উপসর্গ। ফুস্ফুসের প্রসারণের অভাব, চিরস্থায়ী শোষ (নালীঘা) অপর পার্শ্বে পূয়োৎপত্তি। মস্তিষ্কের স্ফোটক। মেরুদণ্ডের বক্রতা।

(ক্রমশঃ)

সুস্থদেহে মাদকদ্রব্যের আবশ্যকতা আছে কি না?

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অহিফেন।

অহিফেন প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে ছিলনা বা ব্যবহৃত হইত না, কেননা প্রাচীন চিকিৎসা গ্রন্থে অহিফেনের নাম বা ব্যবহার নাই। অনেকে বলেন যে, প্রাচীনগ্রন্থে যে সকল নির্য্যাস ও ক্ষীর (আঠা) বিষের উল্লেখ, আছে, তন্মধ্যে কোনটি অহিফেন হইলেও হইতে পারে। কিন্তু ইহাও সঙ্গত নহে। কারণ অহিফেন প্রাচীন কালে যদিও অন্য নামে অভিহিত হইয়া থাকিত, তাহা হইলে উদরাময়াদি রোগে অবশ্যই তাহা ব্যবহৃত হইত কিন্তু ঐ সকল রোগের চিকিৎসায় অহিফেনের ন্যায় কোনো দ্রব্যের ব্যবহার দেখা যায় না। "ভাবপ্রকাশ।" "বসেন্দসার সংগ্রহ" প্রভৃতি নাতি প্রাচীন কালের গ্রন্থে অহিফেনের ব্যবহার দেখা যায়।

অহিফেন পূর্ব্বে ছিল না বলিয়া অহিফেন সম্বন্ধে প্রাচীন মতও লভ্য নহে। সুতরাং অহিফেন সম্বন্ধে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ কি বলিয়াছেন নিম্নে তাহার সারমর্ম্ম উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

অহিফেনের একটি প্রধান গুণ এই যে, উহা উত্তেজিত ধমনী-বিতানকে (Nervous system) প্রকৃতিস্থ করিয়া সর্ব্ব প্রকার যাতনার সত্বর প্রশমন করে, এইজন্য লোকে প্রথমে কোন কষ্টকর বেদনা নিবারণের জন্য অহিফেন ব্যবহার করিয়া ক্রমে উহাতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। ইহার পর আর অহিফেন পরিত্যাগ করিবার উপায় থাকে না।

অহিফেন সেবনে অভ্যস্ত হইলে ইন্দ্রিয় সকল, দেহ ও মন ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া পড়ে, কার্য্যে উৎসাহ থাকে না, কেবল বসিয়া বা শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়, সুনিদ্রা হয় না, কোষ্ঠ শুদ্ধি হয় না, উদরে বায়ু সঞ্চার হয়, ক্ষুধা কমিয়া যায়, পুরুষত্ব নষ্ট হয়, শরীর দুর্ব্বল ও শীর্ণ হইয়া পড়ে এবং অত্যন্ত জড়তা হয়।

ডাক্তার কেলরা এম, ডি, বলিয়াছেন যে, চা কফি, তামাক বা মদ্য দীর্ঘকাল ব্যবহার করিলে যেরূপ অপকার হয়—দীর্ঘকাল অহিফেন ব্যবহার করিলে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণেই অপকার হইয়া থাকে।

অধ্যাপক রসিওয়েলার বলেন যে, অহিফেন বিপজ্জনক নার্কটিক নামক বিষ, যে ব্যক্তি অহিফেন সেবন করে সে চিরদিন অহিফেনের দাস হইয়া থাকে। ঐ রূপ দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভ করা একরূপ অসম্ভব। এইজন্য অহিফেন সেবন করা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

অনেক বলেন যে, একটু বয়স হইলে কোন এক প্রকার মাদকদ্রব্য—বিশেষতঃ অহিফেন সেবন করা ভাল, কিন্তু যে বয়স হউক সুস্থ শরীরে অহিফেন বা কোন প্রকার মাদক দ্রব্য ব্যবহার করা উচিত নহে। কারণ উহাতে শরীরের অনিষ্ট ব্যতীত উপকারের কোন সম্ভাবনা নাই।

অহিফেন যে কিরূপ অনিষ্টকর পদার্থ তাহা চীন দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সুন্দর রূপে উপলব্ধি হইবে। অহিফেন ব্যবহার করিয়া প্রাচীন পরাক্রান্ত চীন জাতি অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। ইহা অপেক্ষা অহিফেনের অনিষ্টকারিতার প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন।

অহিফেন হইতে গুলি এবং মদক প্রস্তুত হইয়া থাকে। উহারা সাধারণ অহিফেন অপেক্ষা অধিকতর অনিষ্টকর। গুলি খাইলে শরীর জীর্ণ শীর্ণ এবং কুৎসিত হইয়া পড়ে। সেই জন্য গুলিখোরের মত চেহারা আমাদের দেশে প্রবাদবাক্যে পরিণত।

গাঁজা, চরস ও সিদ্ধি।

এই সকল মাদক দ্রব্য সেবন করিলে অজীর্ণ, উদরে বায়ু সঞ্চয়, মস্তিষ্ক দৌর্ব্বল্য, শিরো ঘূর্ণন, কোষ্ঠবদ্ধতা, সুনিদ্রার অভাব, মেজাজ খিট খিটে হওয়া, ক্রোধাধিক্য, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ ঘটে। গাঁজা খাইলে লোকের উৎসাহ ও কর্ম্ম পটুতা অত্যন্ত হ্রাস হয় বলিয়া আমাদের দেশে লোকে বলে যে, 'গাঁজা খেলে লক্ষী ছাড়ে।' আর গাঁজা খাইলে জীর্ণ শীর্ণ ও কদাকার হয় বলিয়া গাঁজা খোরের মত চেহারাও বলা হয়। তামাক সম্বন্ধে আমরা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। গাঁজা ও চরস—তামাক অপেক্ষা অনিষ্টকারী। সুতরাং তামাকের অপকারিতাকে আর একটু গুরুতর ভাবে ধরিয়া লইলে গাঁজাও চরসের অপকারিতা বুঝা যাইবে। গাঁজা খাইয়া অনেক লোকে পাগল হইয়া যায়, সিদ্ধি—গাঁজা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম অপকারী।

মাদক দ্রব্য সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা আলোচনা করা হইল—তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কোন প্রকার মাদক দ্রব্য সেবনেই শরীরের কোনরূপ উপকার হয় না, পরন্তু সমূহ অপকার হইয়া থাকে। সুতরাং সুস্থ শরীরে মাদক দ্রব্যের উপযোগীতা কিছু মাত্র নাই। কিন্তু ক্ষণিক মত্ততার লোভে লোকে অর্থব্যয় করিয়া মাদক দ্রব্য সেবন করে এবং

তাহার ফলে ভগ্নস্বাস্থ্য ও বিবিধ রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। যদ্যপি সর্ব্ব প্রকার মাদক দ্রব্যের ব্যবহার পৃথিবী হইতে উঠিয়া যায়, তাহা হইলে বোধ হয় রোগ, অকালমৃত্যু ও দারিদ্র্যের সংখ্যা অনেক পরিমাণেই কমিয়া যায় এবং পৃথিবীতে সুস্থ, সবল, নীরোগ ও দীর্ঘজীবির সংখ্যা অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়।

ব্যায়াম-প্রসঙ্গ।

("হিন্দুস্থান হইতে উদ্ধৃত)

ব্যায়ামের প্রধান গুণ তাহা মাংসপেশীকে পরিপুষ্ট করে। মাংসপেশী কি? অতি সূক্ষ্ম তন্তুর সমষ্টি। এই তন্তুগুলি আপনা আপনি সঙ্কুচিত হইয়া যাইতে পারে।

যে মাংসপেশী ব্যবহৃত হয় না, তাহার ভিতরের তন্তুগুলি বিবর্ণ ও কৃশ হইয়া পড়ে, এবং তাহাদের আকুঞ্চন ক্ষমতাও অনেকটা কমিয়া আসে।

কোন দুর্ব্বল ও কৃশ মাংসপেশী আকুঞ্চিত হইলে তাহার বিবর্ণতা শীঘ্রই দূর হইয়া যায়, তাহার মধ্যে উচ্ছ্বসিত রক্তধারা ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে রাঙা করিয়া তোলে। সেই নূতন রক্তের মধ্যে যে পোষ্টাই পদার্থ থাকে, তাহার দ্বারা মাংসপেশীর তন্তুগুলি যথেষ্ট উপকার লাভ করে। এইভাবে নিয়মিত ভাবে বারংবার মাংসপেশীকে আকুঞ্চিত করিলে ক্রমেই তাহার আকার বৃদ্ধি হইতে থাকে। ফলে সেই সঙ্গে দেহেরও বলবৃদ্ধি হয়।

আপনারা সকলেই বিখ্যাত বলবান স্যাণ্ডোর নাম শুনিয়াছেন। বাল্যকালে স্যাণ্ডো এত বেশী রোগা ছিলেন যে তাঁহার বাপ মা ছেলের জীবনের আশা রাখিতেন না। কিন্তু সেই স্যাণ্ডোই নিয়মিত ব্যায়ামের গুণে কয়েক বৎসরের মধ্যেই গায়ের জোরের জন্য সারা পৃথিবীতে নাম কিনিয়াছিলেন। শুধু গায়ের জোর নয়,—তাঁহার মতন সুগঠিত ও পরিপুষ্ট দেহও আর কাহারও দেখা যায় নাই।

বিলাতের বিখ্যাত ডাক্তার উইনসিপ মাংসপেশীর নিয়মিত পরিচর্য্যা সাধন করিয়া এমন ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, পূর্ণ সাঁইত্রিশ মণ কুড়ি সের ওজনের ভারি মাল কাঁধে করিয়া তিনি অনায়াসে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিতেন। খুব বলবান ভারবাহী অশ্বও এত ভারি মালের চাপ একেবারেই সহ্য করিতে পারিবে না। অথচ ডাক্তার উইনসিপও যৌবনে অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিলেন। যার-তার হাতে অসহায় ভাবে মার খাইয়া শেষটা তিনি উঠিয়া পড়িয়া ব্যায়াম্ চর্চ্চায় লাগিয়া যান।

বলবান ও সুগঠন মাংসপেশীর মত যৌবনের উপযোগী সৌন্দর্য্য আর কিছুই নাই। দেহের বলে মানুষের মনের বলও বাড়ে,

এবং স্বাস্থ্য অটুট হইয়া মানুষকে সকল কাজেই সাহায্য করে। যাঁহারা মস্তিষ্ক-সংক্রান্ত কাজ করেন, তাঁহাদের পক্ষেও ব্যায়াম অত্যন্ত দরকার। কারণ, মস্তিষ্ক ও মনের সঙ্গে দেহের সম্পর্ক যতদূর ঘনিষ্ঠ হইতে হয়। দেহকে অবহেলা করিলে মস্তিষ্ক মানুষকে বাঁচাইতে পারিবে না।

ব্যায়াম মানুষকে সুন্দর করে। কুঁজো, বেঁকেপড়া দেহ, সঙ্কীর্ণ বক্ষ, বিকৃত চলন-ভঙ্গী, ব্যায়ামের গুণে এ-সব অপূর্ণতা দূর হয়। মানুষের বক্ষঃস্থলের কাঠামো হইতেছে পার্শ্বাস্থিগুলি। ব্যায়ামের অভাবে সেগুলি বাহিরদিকে না আসিয়া, ভিতরদিকে চমড়াইয়া যায়। কাজেই বক্ষঃস্থল সমতল হইয়া আমাদের নিঃশ্বাস-যন্ত্র ফুসফুসকে চাপিয়া ধরে। যাঁহারা কুড়ি-বাইশ বৎসর বয়সের ভিতরে ব্যায়াম সুরু করেন, তাঁহাদের দেহের এ সমস্ত দোষ একেবারেই থাকে না। বেশী বয়সে ব্যায়াম আরম্ভ করিলে, অন্ততঃ না হোক, দেহের গড়ন অন্ততঃ কিছু কিছু বদলাইয়া ফেলা যায়।

ব্যায়ামের গুণে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের অবস্থা অতিশয় উন্নত হয়। অন্য ব্যায়ামের কথা দূরে থাক, একবার মাত্র দ্রুতবেগে দৌড়াইয়া আসিলে হৃৎপিণ্ডের কার্য্যকারিতা চতুর্গুণ ও ফুসফুসের কার্য্যকারিতা চতুর্গুণের চেয়েও বেশী হইয়া দাঁড়ায়। হৃৎপিণ্ড দেহের সমস্ত তন্তুর মধ্যে রক্তসঞ্চার করে। হৃৎপিণ্ড যদি অধিক দ্রুত-তালে চলে, তবে রক্তের যোগানও বেশী করিয়া দিতে পারিবে। সেই রক্তের ধারায় যেমন পোষ্টাই পদার্থ থাকে, তেমনি তাহার দ্বারা দেহের ভিতরের ব্যবহৃত পদার্থের অকেজো কণিকাগুলি, ঠিক সেই সেই যন্ত্রের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হয়,—যে-সব যন্ত্রের কর্ত্তব্য হইতেছে, দেহের ময়লা সাফ করা। ফুসফুসের কার্য্যকারিতা বাড়িলে দেহের সমস্ত ধমনী শোণিতের মধ্যে অধিক পরিমাণে মহা-উপকারী 'অক্সিজেন' বা অম্লজানের যোগদান পাওয়া যায়। অম্লজান দেহের রক্ত ও তন্তুগুলির মধ্যে নূতন তেজ ও শক্তির সঞ্চার করে। ফলে সমস্ত দেহ নব-জীবনের উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। মস্তিষ্কের চিন্তাশক্তি, মনের ধারণা-শক্তি, উদরের হজম শক্তি বাড়িয়া যায় এবং সমস্ত অবসাদ, নিশ্চেষ্টতা ও কর্ম্মে-বিরাগ একেবারে দূর হইয়া যায়। একালকার ব্যস্ততা ও কর্ম্ম জীবনের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, হৃৎপিণ্ড সতেজ ও নির্দ্দোষ এবং ফুসফুস বৃহৎ ও সুদৃঢ় হওয়া একান্ত আবশ্যক। আগেই বলিয়াছি, ব্যায়ামের দ্বারা মাংসপেশী পরিপুষ্ট হয় এবং সেইজন্যই ব্যায়ামের ফলে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের কোনো রকম অপূর্ণতাই থাকিতে পারে না। যাঁহারা ব্যায়াম করেন, তাঁহারা বক্ষঃস্থলকে ইচ্ছা করিলেই অসম্ভব রকম বাড়াইয়া তুলিতে পারেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ স্যাণ্ডোর নাম করা যায়। সহজ অবস্থায় তাঁহার বুকের মাপ আটচল্লিশ ইঞ্চি। কিন্তু ছাতি ফুলাইলে তাঁহার বুকের মাপ হয় বাষট্টি ইঞ্চি।

স্বর্গীয় কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত।

হুগলি জেলার অন্তর্গত তারকেশ্বর রেল-ষ্টেসনের ২ ক্রোশ ব্যবধানে দামোদর নদের পশ্চিম তীরবর্ত্তী ভাঙ্গামোড়া গ্রামে সন ১২৭৫ সালের ৬ই ফাল্গুন, বিরাজচরণ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম মাধব চন্দ্র গুপ্ত। বিরজাচরণ তাঁহার তৃতীয় পুত্র। বিরজা চরণের পিতা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ছিলেন এবং ভাঙ্গামোড়া ও তৎসন্নিকটস্থ গ্রাম সমূহে সুচিকিৎসক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। বিরজাচরণের বাল্যজীবন এই জন্য পল্লীগ্রামের আড়ম্বর বিহীন অবস্থায় অতিবাহিত হইয়াছিল। পল্লীগ্রামের সেই সরলতা, অকপটতা ও আড়ম্বরহীনতা—সহরে আসিয়াও বিরজাচরণের জীবনে অন্যরূপ ধারণ করে নাই।

পল্লীগ্রামের পাঠশালায় তাঁহার প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল। তাহার পর তিনি গ্রাম্য-মধ্যইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর বঙ্গ-সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত লেখক ৺অম্বিকা চরণ গুপ্ত মহাশয় তৎকালে পুলিশ বিভাগে চাকরী করিতেন। বিরজাচরণ ও তাঁহার অন্যান্য সহোদরেরা জ্যেষ্ঠের কর্ম্মস্থল হাওড়া শিবপুর ও উলুবেড়িয়ায় অবস্থিতি পূর্ব্বক ঐ সকল স্থানের ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হন।

বিরজাচরণ ঐরূপে ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবেশিকা শ্রেণীতে উন্নীত হওয়ার পর তাঁহার পিতৃদেব তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত করিবার অভিপ্রায়ে আবার প্রাচীন পল্লী ভাঙ্গামোড়ায় লইয়া যান্ এবং সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ পড়াইবার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু নানা কারণে ভাঙ্গামোড়ায় থাকিয়া অধ্যয়নের অসুবিধা হওয়ায় তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী কেটেড়া গ্রামে স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র চূড়ামণি মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে ইঁহার অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা হয়। কঠোর পরিশ্রমী-মেধাবী-বিরজাচরণ ৩ বৎসরের মধ্যে ব্যাকরণ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের টোল বিভাগে কাব্য শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন এবং এক বৎসরের মধ্যেই কাব্যতীর্থ উপাধি লাভ পূর্ব্বক তাঁহার কুলগুরু ভক্তি ভাজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট কিছুদিন ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ স্বর্গীয় বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন মহাশয়ের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। ইনি মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ মহাশয়ের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাহার ফলে ইঁহার আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা সমাপ্তির পর কোচবিহার নিবাসী জনৈক জমীদার পত্নীর চিকিৎসার্থ মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ মহাশয় তাঁহাকে কোচবিহারে প্রেরণ করেন। সেই সময় কোচবিহার ষ্টেটের কবিরাজের পদ শূন্য হয়, মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ মহাশয়ের চেষ্টায় বিরজাচরণ ঐ পদ লাভ করেন। কোচবিহার ষ্টেটে সে সময় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক রাখা হইত বটে, কিন্তু সমগ্র কোচ

বিহার রাজ্যে আয়ুর্ব্বেদের প্রচার একরূপ ছিল না বলিলেই চলে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বিরজা চরণের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য দেখিয়া কোচবিহার রাজ্যের তদানিন্তন দেওয়ান রায় কালিকা দাস দত্ত সি, আই, ই বাহাদুর তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং যাহাতে সমগ্র কোচবিহার রাজ্যে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রসার বৃদ্ধি হয়, তাহার ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থার ফলে ১৮৯৩ খৃঃ অব্দের এপ্রেল মাসে কোচ-বিহারে দাতব্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। বিরজাচরণ এই চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। ১৯০৯ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাস পর্য্যন্ত তিনি এই ভার রক্ষার পর কলিকাতায় আসিয়া স্বাধীন ভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন।

বিরজাচরণের প্রধান কীর্ত্তি "বনৌষধি দর্পণ।" এই গ্রন্থ লিখিবার পূর্ব্বে তিনি কোচ-বিহারে চেষ্টা করিয়া বনৌষধি উদ্যানের স্থাপনা করেন। প্রথমে ইহা ক্ষুদ্রভাবে আরম্ভ হয়, ক্রমশঃ ইহার প্রসার বৃদ্ধি হয়। বনৌষধি দর্পণের উপাদান সকল এই উদ্যান হইতে কতক কতক সংগ্রহ করা হইয়াছিল। ১৯০৮ খৃঃ অব্দে বনৌষধি দর্পণের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কোচবিহারের মহারাজা বাহাদুর ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশে সমস্ত ব্যয় বহন করিয়াছিলেন। বিরজাচরণ কলিকাতায় আসার পর ১৯১৯ খৃঃ অব্দে বনৌষধি দর্পণের ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

"বনৌষধি দর্পণ" ভিন্ন বিরজাচরণ আরও কয়েক খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন "বনৌষধি দর্পণ" নামে একখানি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থের কিয়দংশ পাণ্ডুলিপি লিখিয়া তাহা এ পর্য্যন্ত প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

কলিকাতা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের তিনি একজন একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। ইহার প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তৃগণের মধ্যে তিনি একজন অগ্রণী ছিলেন। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের সকল বিষয়ের অধ্যাপনার শক্তি তাঁহার মধ্যে এক সঙ্গে বর্ত্তমান ছিল। বর্ত্তমান সালের ১লা মাঘ হইতে বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে তাঁহাকে ভাইস্ প্রিন্সিপ্যালের পদে আরূঢ় করা হয়, কিন্তু ২৬ দিন কার্য্য করার পরই আর তাঁহাকে একার্য্য করিতে হইল না, গত ২৬শে মাঘ রাত্রি ১১॥০ টার সময় তিনি সন্ন্যাস রোগে অনন্তধামে গমন করিলেন। তাঁহার বিয়োগে তাঁহার আত্মীয় স্বজনের যেরূপ ক্ষতি হইয়াছে, সেইরূপ প্রকৃত আয়ুর্ব্বেদীয় সাধক সজ্জেরও বিষম ক্ষতি হইয়াছে। কালে হয় তো তাঁহার অভাব আবার পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দারুণ সংঘর্ষ কালে বিরজাচরণের মত আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিতের অভাব—কম ক্ষতির কথা নহে। তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি,—প্রশান্ত বদন,—মধুর স্নিগ্ধ হাস্য চিরকাল আমাদের মনে জাগরূক থাকিবে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৫১ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। পত্নী, পাঁচটি পুত্র ও একটী বিবাহিতা কন্যা রাখিয়া তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার বিয়োগ-ব্যথা আমাদের পক্ষে অসহনীয় হইয়াছে, কি বলিয়া তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আশ্বস্ত করিব, ভাবিয়া পাইতেছি না।

গত ৩রা ফাল্গুন আয়ুর্ব্বেদের সাধকপ্রবর বিরজাচরণের জন্য অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে এক শোক সভার অধিবেশন হইয়া-

ছিল। তাহাতে সভাপতি হইয়াছিলেন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ তর্কভূষণ। কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি, মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এল, এস, এস, কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনী ভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ, এম-বি প্রভৃতি বিরজাচরণের অনেক গুণ-পরিচয় সভায় প্রকাশ করেন। কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্য চরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন রচিত একখানি শোক গীতি সভায় প্রথমে ছাত্রগণ কর্ত্তৃক গীত হইয়াছিল ; সে গীত খানি নিম্নে দেওয়া হইল।

এসেছিলে তুমি পুণ্য নগরে ধন্য প্রতিভা ল'য়ে।
ঢেলেছিলে শান্তি সুধার সলিল কত না ক্লান্তি স'য়ে
ক'রেছিলে মুগ্ধ কি যেন মন্ত্রে,
বেজেছিল গান সকল যন্ত্রে,
উঠেছিল নেচে হৃদয় তন্ত্রী সে গানে মোহিত হ'য়ে।
বেসেছিলে ভাল প্রাণ ভরিয়া -
ম্লান মু'খানি সবারি চাহিয়া,
ফুটাইতে হাসি শুষ্ক অধরে আশার কথাটি ক'য়ে।
কি জানি কি এক শক্তি আনিয়া
দিয়েছিলে ওগো তুমি যে ঢালিয়া,
সে শক্তি সাধনা ক'রে ছিল সবে তোমারি ভাবেতে র'য়ে।
এত দয়ারাশি সকলি ভুলিয়া
নিমেষের মাঝে গেলে গো চলিয়া ?
(কিন্তু) কীর্ত্তি তোমারি দীপ্ত রহিবে মর্ম্ম ভিতরে ব'য়ে।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃত লাল গুপ্ত কবিভূষণ মহাশয় এই উপলক্ষে স্বরচিত একটি সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা এই -

হা হন্তাশান্তকাল ক্ষয়করজগতাং কালবোধানভিজ্ঞ।
কিং ক্রৌর্য্যাং দুঃসহংনঃ প্রকটিতমধুনা ভোস্ত্বয়া মর্ম্মপীড়ি।
সংসারারামশোভাকরমতিপবিত্রং কীর্ত্তিসৌরভ্যহৃদ্যং
লোকালোকং জনেষ্টং নরবরকুসুমং কাদ্য গোপায়সে তৎ ॥
সংসর্গঃ খলু যস্য কাঙ্ক্ষিতসুখেষ্বাগুত্বমাপ্তশ্চিরং
মূর্ত্তির্যস্য প্রতিষ্ঠিতা শিবময়ী হৃন্মন্দিরে চিন্ময়ী।
ধ্যানং যস্য চ চিত্তশর্ম্মকরণং কর্ম্মান্তরোচ্ছেদকং
তং প্রীতিপ্রদমদ্য নো বিরহয়ন্ কালোঽসি নাম্নার্থবান্ ॥
ত্যক্তস্বার্থোজগদুপকৃতা বর্পিতাত্মা মহাত্মা -
যুর্ব্বেদাব্ধিং নিখিলসুতরং সংব্যধাৎ সংস্কৃতের্যঃ।
বিস্মর্ত্তুং তং কইহ সহসা স্যাৎক্ষমঃ সর্ব্বভদ্রং
বাহ্যেনাপি ক্ষণমপিবয়ং কেপুন র্নিত্যসঙ্গাঃ
যস্যপ্যাসীৎ চিরমতিমতি র্বাহবিত্তে সদীনঃ
জ্ঞানার্থীনাং পুনরধিগমাৎ বস্তুতোঽহভ্রমহাত্যঃ।
বিত্তাভাবাদপিপরিগতঃ ক্লেশমর্থোপলাভে
নারংসীষ্ট ক্ষণমপিকৃতী প্রেক্ষ্যকর্ত্তব্যবিঘ্নঃ ॥

অকৃতমলিনকর্ম্মা নিত্যশর্ম্মাত্মধর্ম্ম—
প্রবণহৃদয়বৃত্তিঃ কর্ম্মবীরঃ সুধীরঃ।
তনুজবদনুবোধী ছাত্রবর্গে স্বভাবাৎ
স্বহৃদি সুহৃদিনাসীদ্‌যশ্চসংভিন্নবোধঃ॥

আয়ান্তি যান্তি কতিকেপরিমান্তিলোকে
লোকান্ বৃথাত্তজনুষঃ ক্ষিতিভারভূতান্।
কিন্তু প্রিয়োত্তম ভবাদৃশ মর্ত্তরত্ন—
মায়াতি যাতিনসদা চিরদুর্লভং তৎ॥

লোকান্তরং যদিভবান্ বিধিসন্নিয়োগাৎ
প্রাপ্তোঽস্তি সম্প্রতি সমর্জ্জিতমাত্মপুণ্যৈঃ।
গাঢ়ানুরঞ্জনদৃশাং ননু নোঽসমক্ষং,
ন ত্বং তথাপ্যসি সুহৃৎ সুহৃদাং কদাপি॥

সুখেবা থদুঃখে স্ববাসে প্রবাসে
বয়ং যত্র তত্রস্থিতা যদ্বিধা বা।
চিরং ত্বাং নিজস্বং স্মরন্তো ভবামঃ
কথঞ্চিদ্ ধরাবাসসংস্পর্শচঞ্চুঃস্থাঃ॥

অষ্টাঙ্গায়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়োঽয়ং
যস্তে সম্যক্ প্রাণতুল্যাসদাসীৎ।
হন্তাযাসৌত্বদ্বিযুক্তোনভাতি
ছাত্রৈঃ সার্দ্ধং শোকসংক্ষুব্ধচিত্তৈঃ॥

বসুন্ধরেয়ং প্রিয়মাত্মসম্ভবং
বসুত্তমং ত্বাং পরিহায় দুঃস্থিতা।
নিজাভিধানস্য হতার্থতার্দ্দিতা
নরাজতে প্রাগিব সম্প্রতি প্রিয়॥

তত্ত্বৎ সমৃদ্ধিপূর্ণাপি ত্বামৃতে কেবলং সুহৃৎ।
শূন্যায়তে ধরেয়ং নঃ ধন্যা প্রভাবিতাত্তব॥

পুণ্যাত্মন্ কৃতপুণ্যেন যা ত্বয়ার্জ্জিতসদ্‌গতিঃ।
দদাতু সা চিরং শান্তিং তুভ্যমিত্যর্থয়ামহে॥

বিরজাচরণধিষ্টবংশদীপ মহোদয়।
অমর্ত্তলোকমাপন্নঃ লোকাতিরিক্তশক্তিকঃ॥
দেবত্বাবেন সন্দীপ্তঃ স্বার্জ্জিতসুকৃতৈঃ কৃতী।
প্রভূয়াঃ প্রতত্তং প্রীতঃ প্রাগিবাস্মাসুপ্রীতিমান্

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এল, এম, এস—মহাশয় নিম্নের শ্লোকটি সভাস্থলে রচনা করিয়া পাঠ করেন,—

বিরজা বিরজস্তমা নু বা
সুচরিং বিভবেষু নিঃস্পৃহতঃ
ব্রতমেকং দধদায়ুরাগমং।
ক্ব নু হন্ত গতঃসখে ভবান্॥

কয়েকজন ছাত্রও এই উপলক্ষে শোক-সূচক কয়েকটি গাথা পাঠ করিয়াছিল, বাহুল্য ভয়ে তাহা আর আমরা প্রকাশ করিলাম না।

ফলকথা বিরজাচরণের জন্য ইদানীন্তন কালের রীত্যনুসারে সভাধিবেশনই হউক আর গীতি বা শ্লোকই বিরচিত হউক, ইঁহার অভাবে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক সমাজের যে বিশেষ ক্ষতি হইল—তাহা অবিসম্বাদিত।

ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কা।

(কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরত্ন।)

প্রমেহে। (১) রক্তচন্দন ১ তোলা ও মঞ্জিষ্ঠা ১ তোলা—জল অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া—এই কাথ মধুর সহিত পান করিলে প্রমেহ পীড়া আরোগ্য হয়। (২) কাঁচা হরিদ্রার রস অর্দ্ধ ছটাক—কিঞ্চিৎ মধুর সহিত প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় সেবনে প্রমেহ নষ্ট হয়। (৩) দূর্ব্বা, কেশুর, মুথা, পানার মূল ডহরকবঞ্জা ও সেওলা—প্রত্যেক দ্রব্য ।/১০ সাড়ে পাঁচ আনা, জল ৵॥০ সের, শেষ ৵০ পোয়া—এই কাথ পান করিলে শুক্রমেহ নষ্ট হয় (৪) আমলকীর রস দুই তোলা, মিচরি ।০ আনা—একত্র কয়েক দিন পান করিলে প্রমেহ আরোগ্য হয়। (৫) গাঁদা পাতার রস ২ তোলা কিঞ্চিৎ মিছরি সহ পান করিলে প্রস্রাব সরল হয় ও জ্বালা যন্ত্রণা বিদূরিত হয়।

দদ্রু রোগ।—(১) বড় এলাইচ, সোহাগার খই ও নারিকেল তৈল একত্র মিলাইয়া মলমের মত করিয়া লাগাইলে যেরূপ দদ্রুই হউক না কেন—২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হয়। (২) তুলসী পাতা ও লবণ —একত্র পিষিয়া দদ্রু স্থানে লাগাইলে দদ্রু ভাল হয়। (৩) কনক ধুতুরার মূল ও শেফালিকা পাতা —কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া বা হরিদ্রা, হরিতাল, মুর্ব্বা ও সৈন্ধব—গোমূত্র দ্বারা বাটিয়া দদ্রুস্থানে লাগাইলে দদ্রু আরোগ্য হয়। (৪) সোহাগার খই, শ্বেত চন্দন সহ মিলাইয়া ঘুঁটের ছাই অথবা করবী বৃক্ষের কস্ লাগাইলেও দদ্রু আরোগ্য হয়। (৫) শ্বেতধুনা, সোহাগা, ফট্‌কিরি ও গন্ধক সমপরিমাণে চূর্ণ করিয়া কেরোসিন তৈল সহ মিশাইয়া ব্যবহার করিলে সকল প্রকার দদ্রু আরোগ্য হয়। (৬) সোহাগার খই ও কর্পূর —ঘৃতসহ পাক করিয়া মলম প্রস্তুত করিবে। এই মলম ব্যবহারে কোঁচদাদ শীঘ্র আরোগ্য হয়।

কর্ণ রোগে।—(১) রশুন, আদা, সজিনার রস ঈষদুষ্ণ করতঃ কর্ণবিবরে প্রদানে কর্ণ বেদনা আরোগ্য হয়। (২) আকন্দের পীতবর্ণ পাকা পাতায় ঘৃত মাখাইয়া অগ্নিতে ঝলসাইবে এবং ঐ রস নিঙড়াইয়া অল্প উষ্ণ থাকিতে কর্ণপূরণ করিবে। ইহাতে কর্ণশূল ও কর্ণ বেদনা নষ্ট হইবে। (৪) মালতী পত্রের রস—মধু সংযুক্ত করিয়া পরম করিয়া কর্ণে প্রদান করিলে কান পাকা আরোগ্য হয়।

চক্ষুর ছানিতে।—(১) শ্বেতপুনর্ণবার রস ও গব্য ঘৃত—সমপরিমাণে লইয়া

বেশ করিয়া মিশাইয়া চক্ষুতে প্রদান করিলে ছানি কাটিয়া যায়। (২) আমকল পাতার রস ও কর্পূর মিশায়া চক্ষুতে দিলে চক্ষু পরিষ্কার হয় ও ছানি পড়া ভাল হয়।

চক্ষু উঠায়।—(১) করবী ফুলের পাতা ছিঁড়িলে যে দুধের ন্যায় কষ বাহির হয়, ঐ কষ চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে চোখ্ উঠা আরোগ্য হয়। (২) ডাবের জল ফটকিরির জল অথবা শামুকের পিঠ ভাঙ্গিলে যে জল বাহির হয়—ঐ জলে চক্ষু ধুইলে জ্বালা যন্ত্রণা কমিয়া গিয়া চক্ষু উঠা আরোগ্য হয়। (৩) কাঁচা হরিদ্রার রসে বস্ত্র করা ন্যাকড়া দিয়া সর্ব্বদা চক্ষু মুছিলে চোখ উঠা আরোগ্য হয়।

রাত কাণায়।—(১) পানের রস প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে ২৷৩ ফোটা করিয়া দিলে রাতকাণা, রোগের প্রতীকার ঘটে। (২) দধির সহিত গোল মরিচ ঘসিয়া অল্প মাত্রায় চক্ষুতে দিলে রাতকাণা রোগ আরোগ্য হয়। (৩) পানের সহিত জোনাকী পোকা সন্ধ্যা বেলা সেবনেও উপকার হয়।

শিরোরোগে।—বিড়ঙ্গ ও কৃষ্ণ তিল সমভাগে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, শিরোরোগে উপকার দর্শে।

আধকপালে রোগে।—গুলঞ্চ রাস্না, বেড়েলা ঘৃত ও অগুরু একত্রে পেষণ করিয়া কপালে দিলে উপকার দর্শে।

রক্ত প্রদরে। (১) দুই তোলা পরিমাণে দুর্ব্বার রসের সহিত ৩৷৪ রতি পরিমাণ রসাঞ্জন ও ৮৷১০ ফোঁটা মধু মিশাইয়া পান করিলে প্রবল রক্তস্রাব তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। (২) বেড়েলার মূল বাটিয়া দুই আনা মাত্রার কিঞ্চিৎ ছাগ দুগ্ধ ও মধুর সহিত পান করিলে রক্তপ্রদর আরোগ্য হয়। (৩) রসাঞ্জন ও ন'টে শাকের মূল এক আনা পরিমাণে প্রত্যেকটি লইয়া চাউল ধোয়া জল সহ মিশ্রিত করিবে। উহা কিঞ্চিৎ মধুর সহিত পান করিলে রক্ত প্রদরে বিশেষ উপকার দর্শে।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

বেরিবেরি।—বঙ্গের স্বাস্থ্য কমিশনার মহাশয়ের বিজ্ঞাপনে প্রকাশ,—স্থানে স্থানে বেরিবেরি, এপিডেমিক ড্রপসি ও প্রবল উদরাময় ব্যাধির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। যে সকল রেজিষ্টার ডাক্তার এই রোগের সংবাদ পাইবেন, তাঁহারা যেন স্বাস্থ্য কমিশনর মহাশয়কে সেই সংবাদ প্রদান করেন। এই রোগ কয়টির কারণ নির্ণয়ের জন্যও স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে চেষ্টা চলিতেছে। অবিশুদ্ধ সরিষার তৈল ব্যবহারই ইহার কারণ কিনা—সে সম্বন্ধেও তদন্ত চলিতেছে।

শিশু মঙ্গল প্রদর্শনী।—কলিকাতা নগরে শিশু মঙ্গল প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহার জন্য এক কমিটিও গঠিত হইয়াছে। বঙ্গের স্বাস্থ্য কমিশনর ডাক্তার বেণ্টলী ইহার সেক্রেটারী। ফলে স্বাস্থ্য কমিশনার মহাশয় এই উপলক্ষে শিশু মৃত্যু সংখ্যা যাহাতে বঙ্গদেশ হইতে হ্রাস পায়, তাহার উপায় প্রদর্শন করিবেন আশা করি।

হাসপাতালে ধর্ম্মঘট।—কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ইডেন হাসপাতাল, এজরা হাসপাতাল এবং প্রিন্সঅব ওয়েলস হাসপাতালের কুলি এবং মেথরগণ বেতন বৃদ্ধির জন্য গত ৯ই মার্চ্চ ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য বন্ধ করিয়াছিল। প্রিন্সিপ্যাল কর্ণেল ডিয়ার সাহেব ইহাদিগকে শান্ত করার পর ইহারা আবার কার্য্যে যোগদান করিয়াছে। ধর্ম্মঘটের সময় হাসপাতালের নার্সগণই উহাদিগের কার্য্য করিয়াছিল। নার্সদিগকে ধন্যবাদ।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৪র্থ বর্ষ।	বঙ্গাব্দ ১৩২৭—বৈশাখ।	৮ম সংখ্যা।

শারীর বিদ্যা।

মস্তকের অস্থি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন, সরস্বতী, এম, এ, এল, এম, এস

মস্তকে মোট বাইশখানি অস্থি আছে। তন্মধ্যে আটখানি অস্থি দ্বারা করোটি বা শিরঃ-সম্পুট * নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এই সম্পুটের মধ্যে জ্ঞানের প্রধান আধার মস্তিষ্ক অবস্থিতি করে। অবশিষ্ট চৌদ্দখানি অস্থি দ্বারা মুখমণ্ডল নির্ম্মিত হয়।

* ইং—Cranium—[illegible]।

[বিংশ চিত্র—সমগ্র করোটি]

পুরঃসীমন্ত
পুরঃকপাল
পার্শ্বকপাল
নাসাস্থি
নাসাকুণ্ড
ঊর্দ্ধহনু
শঙ্খাস্থি
পশ্চাৎসীমন্ত
পশ্চাৎ কপাল
অধোহনু
কর্ণবিবর
জতুকাস্থি

(১, ১) ১, ১—পুঃরকপাল। (২, ২) ২, ২—পার্শ্বকপাল। (৩, ৩) ৩, ৩—পশ্চাৎ কপাল (৪, ৪) ৪, ৪—শঙ্খাস্থি (যুগ্ম অস্থি সীমা নির্দ্দেশের জন্য)। (৫) ৫—শঙ্খাস্থির গোস্তনাংশ। (৬, ৬) ৬, ৬—গণ্ডাস্থি। (রে ১) রে ১—উত্তরা শঙ্খতোরণিকা রেখা। (রে ২) রে ২—অধরা শঙ্খতোরণিকা রেখা শঙ্খাজ্ঞা পেশীর উৎপত্তি স্থান।

দুই ভ্রূ জুড়িয়া উভয়দিকে পশ্চাদভিমুখে কর্ণমূলের উপর দিয়া কেশান্তভাগ পর্য্যন্ত দুইটী রেখা সংযুক্ত করিলে উহাদের ঊর্দ্ধাংশকে শিরঃ সম্পুট বলা যায়। শিরঃ-সম্পুট নির্ম্মাণ কারক আট খানি অস্থির নাম, যথা—পুরঃ কপাল একখানি, পশ্চাৎ কপাল একখানি, পার্শ্ব কপাল দুইখানি, কর্ণমূলে শঙ্খাস্থি দুইখানি এবং শিরঃসম্পুট ভূমিভূত জতুকা ও বর্ব্বরক নামক অস্থি দুইখানি। এই আটখানি অস্থির মধ্যে ছয়-খানি কঙ্কালের বাহির হইতে স্পষ্ট দেখা যায়। কেবল জতুকা ও বর্ব্বর নামক অস্থি দুইখানি স্পষ্ট দেখা যায় না। যে জতুকাস্থির অংশমাত্র দেখা যায় (চি দেখ)।

পশ্চাৎ কপাল*—চারিখা শিরঃকপালের মধ্যে পশ্চিম কপাল পৃষ্ঠবংশ চূড়ার সহিত সংহিত হইয়া মস্তকের মূলবং স্বরূপ অবস্থিত। ইহা দুইভাগে বিভক্ত, য —কপালভাগ এবং মূলভাগ। কপালভ ঊর্দ্ধে পশ্চাতে হেলিয়া অবস্থিত এবং সর্পফণ ন্যায় আয়ত। মূলভাগ নিম্নদিকে হেলিয়া অবস্থিত এবং সর্পগ্রীবা সদৃশ। উভয় ভাগের সংযোগে যে 'মহাবিবর' নি

---

*—Occipital Bone—অক্সিপিটাল বোন

হয় তাহার ভিতর দিয়া সশীর্ষ সুষুম্নাকাণ্ড নিম্নে পৃষ্ঠবংশের মধ্যে প্রবেশ করে। বাহ্য এবং আভ্যন্তর ভেদে পশ্চিম কপালের দুইটী তল আছে। তন্মধ্যে আভ্যন্তর তলের কপালভাগ মস্তিষ্কের পশ্চার্দ্ধ ও অনুমস্তিষ্ক ধারণার্থ খাতোদর। ইহাতে সিরা ধারণের জন্য চারিটী পরিখা স্বস্তিকাকারে অবস্থিত।

[২১শ চিত্র—পশ্চাৎ কপাল (সম্মুখতল)]

পার্শ্বকপালের সহিত সন্ধের অংশ

কপালভাগ

মহাবিবর

মূলভাগ

শঙ্খাস্থির সহিত সন্ধের অংশ

মূল পিণ্ড

(অতুকাস্থির সহিত সন্ধের)

(১) ১—মহাবর্ত্ত। (২-২) ২, ২—পার্শ্বকোণদ্বয়। (২-১-২) ২-১-২—পার্শ্বকাখ্যসিরাপরিখা। (৩) ৩—সম্মুখধারার মধ্যবিন্দু। (৩-১-৪) ৩-১-৪—দৈর্ঘিকাখ্যা সিরাপরিখা। (৫, ৫) ৫, ৫—স্নায়ুসংযোগের জন্য দুইটী কলায়। (৬, ৬) ৬, ৬—মজ্জাপ্রবর্দ্ধনদ্বয়। (৩, ৩)—অনুমস্তাখ্যাত দ্বয়। (ক) ক—কলাসংযোগসূচক পরিখাতটদ্বয়।

এই সিরাপরিখা চতুষ্টয়ের মধ্যবর্ত্তী কেন্দ্রকে 'মহাবর্ত্ত' বলে। প্রত্যেক সিরাপরিখার উভয় তটে 'মস্তিষ্কাবরণী' কলার অংশ বিশেষ সংলগ্ন থাকে। আভ্যন্তর তলের মূলভাগেও সামান্য খাত আছে, উহা সুষুম্নাশীর্ষক ধারণের জন্য। কপালভাগ ও মূলভাগের সংযোগ স্থলের বহিঃসীমায় দুইদিকে দুইটী অর্দ্ধচন্দ্রাকার ক্ষুদ্র গভীর খাত আছে। উক্ত খাতদ্বয়ে 'অনুমজ্জা' নামক স্থূল সিরাদ্বয় অবস্থিতি করে বলিয়া উহারা 'অনুমজ্জাখাত' নামে অভিহিত।

উক্ত খাত-দ্বয়ের পার্শ্ববর্ত্তী বর্দ্ধিত অংশদ্বয়কে "মজ্জা প্রবর্দ্ধনক" বলে।

কপাল ভাগের ধারা অত্যন্ত দন্তুর এবং উত্তর দিগের ধারার দুই পার্শ্বে দুইটী কোণ আছে, ইহারা 'পার্শ্বকোণ' নামে অভিহিত।

পার্শ্বকোণদ্বয়ের ঊর্দ্ধতন ধারার্দ্ধ পার্শ্ব-কপালের পশ্চিম ধারার সহিত এবং অধস্তন অংশের পার্শ্বদ্বয় দুইখানি শঙ্খাস্থির সহিত সন্নিযুক্ত হইয়া থাকে। পশ্চাৎ কপালের মূল ভাগের মধ্যস্থ 'মূলপিণ্ড' নামক অংশ জতুকাস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত হয়।

পশ্চাৎ কপালের বহিস্তলের ঊর্দ্ধদিকের কপালাংশ কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট এবং 'শিরশ্ছদা' পেশী দ্বারা আবৃত। ইহার মধ্যস্থলে 'পশ্চিমার্ব্বুদ' নামে একটী উৎসেধ আছে এবং তাহার নিম্নে অধোদিকে বিস্তৃত 'পশ্চিমালিকা' নামে একটী সমুন্নত রেখা আছে। এই উৎসেধ ও রেখার 'গ্রীবাধরা স্নায়ুরজ্জু' সংলগ্ন থাকে। পশ্চিমালিকার উত্তর-

[২২শ চিত্র—পশ্চাৎ কপাল (পৃষ্ঠতল)]

(ঽ, ঽ) ১, ১—পৃষ্ঠতলের ঊর্দ্ধ অংশ ভাগ, ইহা শিরশ্ছদা পেশীদ্বারা আবৃত থাকে। (২) ২—পশ্চিমার্ব্বুদ। (ঽ, ঽ) ৩, ৩—স্নায়ু সংযোগের জন্য কন্দরক-দ্বয়। (৪, ৪)—মূলকোটির পশ্চাতের ছিদ্রদ্বয়। (৫, ৫) ৫, ৫—মূলকোটিদ্বয়। (৬, ৬) ৬, ৬—মূলকোটির সম্মুখস্থ ছিদ্রদ্বয়। (৭, ৭) ৭, ৭—মজ্জাপ্রবর্দ্ধনদ্বয়। (৮) ৮—মূলপিণ্ড। (পৈ ১) পে ১—ঊর্দ্ধতোরণিকা। (পৈ ২) পে ২—অধর তোরণিকা। (পৈ) পে—চিহ্নিত স্থানগুলি পেশীদিগের মূল। পেশাধারে বর্ণিত।

দিকে দুইটী করিয়া চারিটী তোরণাকার রেখা আছে। ইহাদের উপরের দুইটীকে 'উত্তরতোরণিকা' এবং নিম্নের দুইটীকে 'অধরতোরণিকা' বলে। পশ্চাৎ কপালের মূলভাগের উপরিস্থ অংশে বস্তিস্থলে শিম-বীজের ন্যায় যে দুইটী উৎসেধ আছে, উহা-দিগকে 'মূলকোটি' বলে। 'চূড়াবলয়া' কশেরু-কার উপরিস্থিত স্থালকদ্বয়ের সহিত মূলকোটি-দ্বয়ের সন্ধি হইয়া থাকে। মূলকোটিদ্বয়ের অন্তঃপার্শ্বে 'কলায়ক' নামক উৎসেধ দুইটীর সহিত 'মধ্যরজ্জু' নামক স্নায়ু সংবদ্ধ থাকে। মূলকোটিদ্বয়ের সম্মুখে ও পশ্চাতে দুই দুইটী করিয়া চারিটী "রন্ধ্রমার্গ" আছে। এই রন্ধ্র-মার্গের ভিতর দিয়া নাড়ী প্রবেশ করিয়া থাকে।

সন্ধি—পশ্চাৎকপাল ছয়খানি অস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত। যথা, ঊর্দ্ধ দিকের অর্দ্ধভাগ দুই পার্শ্বে দুই খানি পার্শ্ব কপালের সহিত, অধোদিকের অর্দ্ধভাগ দুই পার্শ্বে দুই খানি শঙ্খাস্থির সহিত, মূলের অগ্রভাগ জতুকাস্থির সহিত এবং মূলকোটিদ্বয় চূড়াবলয়ার সহিত সংহিত হইয়া থাকে।

পেশী—পশ্চাৎ কপালে বারো জোড়া পেশী সংযুক্ত থাকে; উত্তর তোরণিকার উপকণ্ঠে তিন জোড়া, উভয় তোরণিকার অন্তরালে তিন জোড়া, অধর তোরণিকার নিম্নভাগে তিন জোড়া এবং মূলভাগে তিন জোড়া।

পার্শ্বকপাল *—(২৩শ চিত্র)

পুরঃকপাল এবং পশ্চিমকপালের মধ্যে দুই-

[২৩শ চিত্র—পার্শ্বকপাল (অভ্যন্তর তল)]

ঊর্দ্ধধারা—অপর পার্শ্বকপালের সহিত সন্ধের।
দীর্ঘিকা সিরাপরিখা
উত্তর পশ্চিম কোণ
পশ্চিমধারা পশ্চাৎ কপালের সহিত সন্ধের
উত্তর পুরঃকোণ
পুরোধারা পুরঃকপালের সহিত সন্ধের
অধর পশ্চিম কোণ শঙ্খাস্থির সহিত সন্ধের
ধমনী নিবেশ চিহ্ন
পার্শ্বিকা সিরাপরিখা
অধর পুরঃকোণ জতুকাস্থির সহিত সন্ধের
অধোধারা শঙ্খাস্থির সহিত সন্ধের

(১, ১, ১) ১, ১, ১—কলায় প্রতিঘাত। (২) ২—ধমনীনিবেশচিহ্ন।

* Parietal Bones প্যারাইটাল বোনস্।

দিকে দুই খানি পার্শ্বকপাল আছে। ইহাদের চারিটী ধারা, চারিটী কোণ এবং বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে দুইটী তল আছে।

ইহাদের বহিস্তল কূর্ম্মপৃষ্ঠের স্থায় আকার বিশিষ্ট এবং বহিস্তলে 'পার্শ্বকুম্ভ' নামে পিণ্ডাকার দুইটী উৎসেধ এবং 'উত্তরশঙ্খতোরণিকা' ও 'অধরশঙ্খতোরণিকা' নামে ধনুকের স্থায় বক্রাকার দুইটী রেখা আছে। অধর শঙ্খতোরণিকা রেখার ক্রোড় দেশ হইতে 'শঙ্খচ্ছদা' পেশী উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পার্শ্বকপালদ্বয়ের আভ্যন্তর তল খাতোদর এবং উচ্চাবচ। উক্ত খাতের মধ্যে মস্তিষ্ককলাপোষণী মধ্যমা ধমনীর শাখাপ্রশাখাজালের এবং কলাগ্রন্থি সমূহের নিবেশ চিহ্ন দেখা যায়।

পার্শ্ব কপালের চারিটী ধারা দন্তুর, এবং যথাক্রমে ঊর্দ্ধ ধারা, অধোধারা, সম্মুখধারা নামে অভিহিত। তন্মধ্যে ঊর্দ্ধধারা অপর পার্শ্বকপালের ঊর্দ্ধ ধারার সহিত, অধোধারা শঙ্খাস্থি ও জতুকাস্থির সহিত, সম্মুখধারা পুরঃকপালের সহিত এবং পশ্চিম ধারা পশ্চাৎকপালের সহিত সন্ধিযুক্ত।

পার্শ্বকপালের সম্মুখ ভাগের ঊর্দ্ধতন কোণ 'সম্মুখ উত্তর কোণ' এবং অধস্তন কোণ 'সম্মুখ অধর কোণ' নামে অভিহিত। পশ্চাদ্ ভাগের কোণ দুইটীর নামও এইরূপ অর্থাৎ 'পশ্চিম উত্তর কোণ' ও 'পশ্চিম অধর কোণ'। তন্মধ্যে, সম্মুখ ও পশ্চাতের উত্তর কোণ দুইটী জন্ম হইতে এক বৎসর পর্য্যন্ত কলাবৃত থাকে। এই জন্য দুগ্ধপায়ী শিশুদিগের মস্তকের মধ্যস্থলে সম্মুখ ও পশ্চাদ্ ভাগে কোমল স্থান (চলিত কথায় 'তালু',) দেখা যায়। সম্মুখের অধরকোণ ধমনী-ধারণের জন্য খাঁজবিশিষ্ট এবং জতুকাস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত। পশ্চাতের অধরকোণ পার্শ্বিকাখ্য সিরা ধারণের জন্য খাঁজবিশিষ্ট এবং শঙ্খাস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত।

সন্ধি—পাঁচটী অস্থির সহিত (চিত্র দেখ)।

পুরঃকপাল বা অগ্রকপাল*

—(২৪শ চিত্র) ইহা শিরঃসম্পুটের সম্মুখ ভাগ নির্ম্মাপক বৃহৎ ঝিনুকের স্থায় আকার বিশিষ্ট কপালাস্থি। ইহার দুইটী অংশ যথা, 'ললাট ভাগ' এবং 'নেত্রচ্ছদি ভাগ'। তন্মধ্যে ললাট ভাগ—তিন খানি ফলক দ্বারা নির্ম্মিত—মধ্যে ললাটফলক এবং উভয় পার্শ্বে দুইখানি পার্শ্বফলক। ললাটফলকের বহিস্তল কূর্ম্মপৃষ্ঠের স্থায় আকার বিশিষ্ট এবং উহার দুই পার্শ্বে 'অগ্রকুম্ভ' নামে দুইটী উৎসেধ আছে। এই অগ্রকুম্ভদ্বয় মেধাবীদিগের অত্যুন্নত এবং অল্প মেধাবীদিগের অল্প উন্নত হইয়া থাকে। অগ্রকুম্ভদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী নাসামূলগত স্থানকে 'কূর্চ্চক' বা ভ্রূমধ্য বলে। কূর্চ্চকের উপরে যে ঊর্দ্ধগত নাতিপরিস্ফুট রেখা আছে, তাহাকে 'গূঢ়সীমন্তিকা' বলে। উহা বাল্যকালে পৃথক্ ভাবে অবস্থিত পুরঃকপালার্দ্ধ দুইখানির সংযোগ চিহ্ন। এই রেখার নিম্নভাগের উভয় পার্শ্বে ভ্রূর অনুক্রমে 'ভ্রূতোরণিকা' নামে দুই দিকে দুইটী তোরণাকার উৎসেধ আছে। প্রত্যেক ভ্রূতোরণিকার বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে দুইটি কোটি এবং মধ্যস্থলে 'অধিভ্রুব' নামে সূক্ষ্ম ছিদ্র বা কোটর আছে। বাহ্যকোটিদ্বয় অপাঙ্গ দেশে গণ্ডাস্থির সহিত এবং অন্তঃকোটিদ্বয় নাসামূলে নাসাস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত। অধিভ্রুব নামক ছিদ্রের ভিতর

*—Frontal Bone—ফ্রণ্টাল বোন্।

[২৪শ চিত্র—পুরঃকপাল]

অন্তস্তল

(বুঝিবার সুবিধার জন্য উত্তান অধোমুখ)

দীর্ঘকাখ্য সিরাপরিখা

পার্শ্বকপালের সহিত সন্ধের অংশ

জতুকাস্থির বৃহৎ পক্ষতির সহিত সন্ধের

গণ্ডাস্থির সহিত সন্ধের

নেত্রচ্ছদি ফলক

স: ২

স: ৪

স: ৫

৮

ললাটকোটর

স: ৫ অগ্রকণ্টক

(১) ১—কলাগ্রন্থিখাত। (২) ২—ধমনী প্রতানাঙ্ক। (৩, ৪) ৩, ৪—খর্পরকোটর। (৫) ৫—মহাপরিখা। (৬) ৬—মহাপরিখাতটদ্বয়। (৭) ৭—অগ্রগ্রন্থিখাত। (৮) ৮—নাসাগুহার ছাদ নির্ম্মাপক ক্ষুদ্র ফলক। (৯) ৯—সিরা পরিখাতট। (স: ১) সং ১—জতুকাস্থির লঘুপক্ষতির সহিত সন্ধের অংশ। (স: ২) সং ২—খর্পরাস্থির পার্শ্বের সহিত সন্ধের অংশ। (স: ৩) সং ৩—অশ্রুপীঠাস্থির সহিত সন্ধের অংশ (স: ৪) সং ৪—ঊর্দ্ধহন্বস্থির সহিত সন্ধের অংশ। (স: ৫) সং ৫—নাসাস্থির সা… সন্ধের অংশ। (স: ৬) সং ৬—খর্পরাস্থির মধ্যফলকের সহিত সন্ধের অংশ।

দিয়া ঐ নামের সিরা ধমনী ও নাড়ী নির্গত হইয়া থাকে। ভ্রূতোরণিকাদ্বয়ের পশ্চাতে অস্থির অভ্যন্তরে গূঢ় ভাবে অবস্থিত 'ললাট কোটর' নামে দুই দিকে দুইটি কোটর আছে, উহারা নাসাগুহার সহিত সংযুক্ত।

ললাট ফলকের [illegible] [illegible] এবং

এই খাত কলাগ্রন্থি ও ধমনীপ্রতান সমূহের ধারণকৃত চিহ্নবিশিষ্ট। অন্তস্তলের মধ্যভাগে সিরাপরিখা আছে এবং এই পরিখার তটে মস্তিষ্কচ্ছদা কলার "দাত্রিক" নামক মধ্যভাগ সংযুক্ত থাকে।

পার্শ্বফলকদ্বয় [illegible] পেশী ধারণের জন্য

[২৫শ চিত্র—শঙ্খাস্থি (বহিস্তল)]

ঈষৎ খাতোদর। উহাদের ঊর্দ্ধ সীমার ধনুকের ন্যায় বক্রাকার ""শঙ্খতোরণিকা" নামে যে রেখা আছে, উহা পার্শ্বকপালাস্থির "শঙ্খতোরণিকা" রেখার সহিত সংযুক্ত। এই দুইটী রেখার পাশে পাশে বহু পেশী সংলগ্ন থাকে।

পুরঃকপালের নেত্রচ্ছদিভাগ দুইটী চক্ষুর উপর ছাদের ন্যায় অবস্থিত। এই অংশ—'নেত্রচ্ছদিফলক' নামক পার্শ্বস্থিত অংশদ্বয়ে বিভক্ত। দুইটি নেত্রচ্ছদি ফলকের মধ্যভাগে 'মহাপরিখা' নামে খাত আছে। নেত্রচ্ছদিফলকদ্বয় প্রায় ত্রিকোণ, মসৃণ এবং ঈষৎ খাতোদর। প্রত্যেক ফলকের বহিঃসীমায় অশ্রুগ্রন্থি ধারণের জন্য ক্ষুদ্র অগভীর কোটর আছে।

মহাপরিখার দুই তটের মধ্যবর্ত্তী শূন্যস্থানে ঝর্ঝরক অস্থির চালনীপটল নামক অংশের দ্বারা পূর্ণ হইয়া থাকে। উভয় তটস্থিত কোটরগুলি ঝর্ঝরাস্থির কোটরদ্বয়ের সহিত মিলিত। মহাপরিখার সম্মুখ ভাগে যে দুই খানি ক্ষুদ্র অস্থিফলক আছে তাহারা নাসাগুহার আচ্ছাদন স্বরূপ হইয়া থাকে। এই দুই খানি ফলকের মধ্যে 'অগ্রকণ্টক' নামে যে সূক্ষ্ম কণ্টকাকার অংশ আছে, উহা সম্মুখভাগে নাসাস্থি-দ্বয়ের সহিত এবং পশ্চাদ্ভাগে ঝর্ঝরাস্থির মধ্যফলকের সহিত সন্ধিযুক্ত। উক্ত অস্থিফলক দুইখানির দুই পার্শ্বে দুইটী ললাট কোটরের দ্বার আছে।

সন্ধি—পুরঃকপালের এক এক অর্দ্ধভাগ সাতখানি অস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত। যথা,—মহাপরিখার বহিঃসীমার চারিটির সহিত অর্থাৎ সম্মুখ কোণে নাসাস্থি, ঊর্দ্ধে হনস্থি ও অশ্রু[illegible]

ভাগে ঝর্ঝরাস্থির সহিত; নেত্রচ্ছদিফলকের বহিঃসীমায় সম্মুখার্দ্ধে গণ্ডাস্থির সহিত এবং পশ্চার্দ্ধে জতুকাস্থির সহিত; ললাটফলকের পশ্চিম ধারায় পার্শ্বকপালের সহিত। তন্মধ্যে জতুকাস্থি ও ঝর্ঝরাস্থি এই দুইখানি একত্র অস্থি এবং নাসাস্থি, অশ্রুপীঠাস্থি, শঙ্খাস্থি, ঊর্দ্ধ হন্বস্থি ও পার্শ্বকপালাস্থি এইগুলি যুগ্ম অস্থি। সুতরাং এক এক দিকে সাতখানি অস্থির সহিত সন্ধি হইলেও উভয় দিকে মোটের উপর বারখানি অস্থির সহিত সন্ধি হয়।

পেশী— পুরঃকপালে তিন জোড়া পেশী সংলগ্ন থাকে উভয় দিকের ভ্রূমধ্যে দুই জোড়া এবং শঙ্খ তোরণিকায় এক জোড়া।

শঙ্খাস্থি—* পার্শ্বকপালদ্বয়ের নিম্নে দুই রগে দুইখানি শঙ্খাস্থি অবস্থিত। প্রত্যেক শঙ্খাস্থির তিনটী ভাগ যথা,—শঙ্খচক্র, কর্ণমূলপিণ্ড এবং অশ্মকূট।

(১) শঙ্খচক্র—ইহা শঙ্খদেশনির্ম্মাণ-কারক প্রায় চক্রাকার অস্থিফলক। ইহার বহিস্তল মসৃণ এবং ধমনী ধারণের চিহ্নে অঙ্কিত। শঙ্খচক্রের দীর্ঘ ও সম্মুখদিকে বর্দ্ধিত অংশ গণ্ডাস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত বলিয়া 'গণ্ডপ্রবর্দ্ধনক' নামে খ্যাত। এই প্রবর্দ্ধনকের ঊর্দ্ধ ও অধোভেদে দুইটী ধারা। তন্মধ্যে ঊর্দ্ধ ধারায় 'শঙ্খাবরণী কলা' সংযুক্ত থাকে। অধোধারার নিম্নদিকে সম্মুখ ভাগে যে অর্ব্বুদ আছে, উহা 'সন্ধ্যর্ব্বুদ' নামে অভিহিত এবং

[২৬শ চিত্র—শঙ্খাস্থি (অন্তস্তল)]

ধমনী প্রতানাঙ্ক
গণ্ডপ্রবর্দ্ধন
শঙ্খচক্র ও অশ্মকূটের সংযোগ রেখা
শ্রোত্রচ্ছদি কূট
অশ্মতটিকা
অর্দ্ধচন্দ্রিকা
সিরাপরিখা
গোস্তনছিদ্র
কর্ণিকারন্ধ্র
কর্ণান্তদ্বার
শিরাগলান্তরীয়
পেশীর নিবেশস্থল
শিকাপ্রবর্দ্ধন
গোস্তনপ্রবর্দ্ধন

ইং—Temporal Bones—টেম্পোর‍্যাল বোন্‌স্।

১—বৈদ্যনাথ।

হনুসন্ধির সম্মুখভাগে অবস্থিত। সন্ধার্ব্বুদের পশ্চাদ্‌ভাগে অবস্থিত 'হনুসন্ধিস্থালক' নামক কোটর অধোহনুমুণ্ড ধারণ করিয়া থাকে। হনুসন্ধিস্থালকের পশ্চাতে 'কর্ণকুহর' অবস্থিত। কর্ণকুহরের পরিধিতে 'কর্ণশষ্কুলী' নির্ম্মাণকারক তরুণাস্থিগুলি সংযুক্ত থাকে। কর্ণকুহর ও হনুসন্ধিস্থালকের মধ্যবর্ত্তী অস্থিফলক 'কর্ণমূলফলক' নামে অভিহিত এবং উহা কর্ণমূলীয় লালাগ্রন্থির আশ্রয় স্থান। গণ্ডপ্রবর্দ্ধনের পশ্চাদ্ ভাগে 'শঙ্খতোরণিকা' একটী সমুন্নত রেখা আছে, উহা পূর্ব্বোক্ত শঙ্খতোরণিকা রেখার সহিত মিলিত। এই রেখার অধোভাগে আর একটী রেখা আছে, উহা শঙ্খচক্রের সহিত কর্ণমূলপিণ্ডের সংযোগের চিহ্ন স্বরূপ।

শঙ্খচক্রের অন্তস্তল মস্তিষ্কপিণ্ড ধারণের জন্য কিঞ্চিৎ খাতোদর, ধমনী ধারণের জন্য খাতবিশিষ্ট এবং মৎস্যের আঁসের ন্যায় ধারাযুক্ত।

(২) কর্ণমূলপিণ্ড—এই অস্থিপিণ্ড কর্ণমূলে অবস্থিত এবং 'পোস্তনক' নামক প্রবর্দ্ধনযুক্ত। এই প্রবর্দ্ধনটী অধোমুখ ও ভিতরে কোটর বিশিষ্ট,—কোটরগুলি কর্ণস্রোতের মধ্যপথের অনুবর্ত্তী। কাণ পাকিলে কখন কখন এই কোটরগুলি পর্য্যন্ত পূঁয হয়। কর্ণমূলপিণ্ডের অন্তস্তলে 'অর্দ্ধচন্দ্রিকা' নামে একটী সিরাপরিখা আছে, উহা পার্শ্বিকাস্থ্য সিরাপরিখার সহিত মিলিত। উক্ত পরিখার মধ্যে একটা ছিদ্র আছে, তাহা 'পোস্তনছিদ্র' নামে অভিহিত এবং সিরাপরিখা প্রবেশিনী সিরার দ্বারভূত।

(৩) অশ্মকূট—শঙ্খাস্থির এই অংশ প্রস্তরের ন্যায় ঘনসন্নিবিষ্ট, চারিটী ধারাযুক্ত এবং শিরঃসম্পুটভূমির মধ্যে তির্য্যক্‌ভাবে প্রবিষ্ট। ইহার ঊর্দ্ধদেশ শিরঃসম্পুট নির্ম্মাপক এবং মস্তিষ্কভূমির অংশভূত। উহার অধোদেশ কর্ণপীঠ নির্ম্মাপক এবং কণ্ঠকুহরের ছাদের অংশভূত। অশ্মকূটের অভ্যন্তরে তিনখানি সূক্ষ্ম কর্ণাস্থি এবং শ্রুতিযন্ত্র নিগূঢ় ভাবে অবস্থিত। নিম্নে অশ্মকূটের বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়গুলি লিখিত হইতেছে :—

(ক) ঊর্দ্ধসীমায় শঙ্খচক্রের সহিত সংযোগাঙ্ক রেখা এবং ইহার উপকণ্ঠে কূটাগ্রভাগের নিকট দুইটী রন্ধ্রমার্গ আছে। ঊর্দ্ধদিকের রন্ধ্রমার্গ 'পটহোত্তংসিনী' পেশীর প্রবেশের দ্বার এবং অধোদিকের রন্ধ্রমার্গ কর্ণস্রোতের মধ্যপথের সহিত মিলিত ও 'পটহপূরিকা' নাম্নী ক্ষুদ্র নলিকার দ্বার স্বরূপ।

(খ) শ্রোত্রপথের আচ্ছাদনভূত 'শ্রোত্রচ্ছদিকূট' নামক উৎসেধ এবং তাহার পশ্চাতে 'অশ্মতটিকা' নামে রেখা।

(গ) 'কর্ণান্তর্দ্বার'—ইহা 'শ্রোতনাড়ী' ও 'বক্ত্রনাড়ী' নামে নাড়ীদ্বয়ের প্রবেশ পথ।

(ঘ) কর্ণভূমিগামিনী সূক্ষ্ম নাড়ী ও ধমনী প্রবেশের জন্য 'কর্ণিকারন্ধ্র'।

(ঙ) পেশী ও স্নায়ু সংযোগের জন্য শিকড়ের ন্যায় আকার বিশিষ্ট অধোমুখ 'শিফা প্রবর্দ্ধনক'। ইহার মূলে বক্ত্রনাড়ী প্রবেশের জন্য 'শিফাপোস্তনান্তরীয়' নামে ছিদ্র আছে।

(চ) মাতৃকাধমনী ধারণের জন্য 'মাতৃকাসুরঙ্গা' নামক রন্ধ্রমার্গ।

সন্ধি—প্রত্যেক শঙ্খাস্থি পাঁচখানি অস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত যথা, গণ্ডপ্রবর্দ্ধন দ্বারা গণ্ডাস্থির সহিত, শঙ্খধারায় গণ্ডপ্রবর্দ্ধন

পর্য্যন্ত অংশে পার্শ্বকপালের সহিত, গণ্ড-প্রবর্দ্ধন হইতে অশ্মকুটাগ্র পর্য্যন্ত ধারার পশ্চিম কপালের সহিত, অশ্মকুটের অগ্রভাগ হইতে গণ্ডপবর্দ্ধনের উৎকণ্ঠ পর্য্যন্ত জতুকাস্থির সহিত এবং হনুসন্ধিস্থানকে অধোহন্বস্থির মুণ্ডের সহিত।

পেশী—প্রত্যেক শঙ্খাস্থিতে পনেরটী করিয়া পেশী সংযুক্ত থাকে। বিবরণ যথা স্থানে বর্ণনীয়। (ক্রমশঃ)

কচু।

[অধ্যাপক—শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম, এ]

১১৭৬ সনে যে দৈব দুর্ব্বিপাক 'দুর্ভিক্ষ' রূপে এদেশে দেখা দিয়াছিল—তাহার নাম "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর"। এই সময় অনেককে "দগ্ধকচু" খাইয়া জীবন ধারণ করিতে হইয়াছিল। বোধ হয় সেই সময় হইতেই "কচু পোড়া খাও"—বাঙ্গালীর বড় গালাগালি। যেখানে অকৃতকার্য্যতা, সেইখানেই বিজ্ঞজনের মুখে বিদ্রূপ বা উপহাস—এই অকিঞ্চিৎকর "কচুপোড়ার" স্মৃতি! কচু এতই অবহেলার সামগ্রী!

এ হেন কচুর মান রাখিয়াছিলেন কেবল বৈদ্য কবি দেবেন্দ্রনাথ। তিনি "রাঙাদিদির মধ্যস্থতায়, "ভারতীয়" পত্রপত্রে "দগ্ধকচু" পরিবেশন করিয়াছিলেন। তাহা নাকি অনেকেরই ভাল লাগিয়াছিল। ভরসা পাইয়া বন্ধু আমার সেই কচু আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রের পবিত্র নামে নিবেদন করিয়াছিলেন। সাহিত্য গুরুর যোগ্য অর্চ্চনা বটে!

আজ আমিও তুচ্ছ 'কচুর' পসরা মাথায় লইয়া পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। আমার ত 'রাঙাদিদি' সহায় নাই—তাই ভয় হইতেছে—পাছে ইহা পাঠক মহাশয়দের ভাল না লাগে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, কচুকে লোকে যত অবজ্ঞা করে, কচু কি তত তাচ্ছিল্যের জিনিষ? কচু দরিদ্রের সম্বল। এখনও অনেক স্থলে দেখিয়াছি কচুর সাহায্যে বহু ব্রাহ্মণের দিন গুজরাণ হইয়া থাকে। হিন্দুর জীবন্ত বিজ্ঞান "আয়ুর্ব্বেদ" কচুকে কখনও উপেক্ষা করেন নাই। কচুর ভেষজগুণ আছে, কচু বড় পুষ্টিকর খাদ্য। সাধারণে ইহা জানেনা। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি সেই কথাবই আলোচনা করিব। আমি স্বয়ং ২৮ রকম কচুর গুণ পরীক্ষা করিয়াছি, সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দিব।

কচুর সংস্কৃত নাম "কচ্চি," হিন্দী নাম "কচ্চু"। য়ুরোপদত্ত বৈজ্ঞানিক নাম Arum. দেশ ভেদে কচুর আরও অনেক নাম আছে—যথা ট্যারো অড্ডা, টেনিয়া, আর্ভি, এডইক্ জু, কিয়ম্, কচ আলু, টেরাস সালুপা, টেকো, টেগ্রাস্, এবং Scratch coco ইত্যাদি। সংস্কৃতভাষায় কচুর পাতাকে "পেচুকা" এবং

ডাঁটাকে "কৈচুকা" বলে। কচুর মুখীর নাম—"বিতণ্ডা"।

কচুর গুণ।

পিচ্ছিল, গুরুপাক, তীব্র (Siringent) ভেদক, কফ, পিত্ত, অগ্নি ও বলবর্দ্ধক, কণ্ডু জনক এবং শুক্রকর।

নানা জাতীয় কচু।

(ক) বন্য কচু।

(Arnom Colocasia)

এই কচু বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র জন্মে। পথের ধারে, পয়ঃপ্রণালীর পার্শ্বে, সিক্তভূমিতে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। কেহই ইহার চাষ করে না। এই কচুর পাতা হৃদ্‌পিণ্ডাকার (Hert shuped)। পাতার উপরিভাগ সবুজবর্ণ, নিম্নদেশ ফিকে সবুজবর্ণ; কাণ্ড ক্ষুদ্র ও অন্তর্ভৌম। পত্রবৃন্ত মলিন সবুজ বর্ণ, পুষ্প পীতবর্ণ। বৃক্ষের নিম্নভাগ দ্বিখণ্ডিত। ইহার মূল অতিশয় তীব্র, খাইলে গলা ধরে। ইহার কচিপাতা খাওয়া যায়। কচিপাতা সংগ্রহ করিয়া কলার পাতার উপর স্তরে স্তরে সাজাইয়া, বেশ করিয়া জড়াইয়া—অগ্নিদগ্ধ করিতে হয়। পরে তাহাতে সর্ষপ তৈল, লবণ ও লঙ্কা মাখিয়া—শাকের মত খাইতে হয়। পূর্ব্ববঙ্গের গৃহস্থগণ ইহা ব্যবহার করেন। দরিদ্র কৃষকগণ—ইহার পাতার অম্বল রাঁধিয়া খায়। অম্বল রাঁধিতে হইলে পাতাকে কুচিকুচি করিয়া কাটিয়া প্রথমে জলে সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়, পরে পাকা তেঁতুল ও লবণ সংযোগে উহা রাঁধিতে হয়। খাইতে অনেকটা চুকা পালমের অম্বলেরই মত।

(খ) গুঁড়িকচু।

ভারতের সর্ব্বত্র ইহা জন্মিয়া থাকে। কি শুষ্ক কি সিক্ত উভয়বিধ মৃত্তিকাতেই—গুঁড়ি কচু উৎপন্ন হইতে পারে। এমন কি পাশ্চাত্য প্রদেশে ৮০০০ ফিট উচ্চ স্থানেও—এই কচুর চাষ হইয়া থাকে।

উদ্ভিদ্‌ বেত্তা বক্সবর্গ কবেষ্টার, গ্রেইন প্রভৃতি মনীষীগণ এই কচু সম্বন্ধে তাহাদের গ্রন্থে অনেক কথাই লিখিয়াছেন। গুঁড়ি কচুর মধ্যে কতকগুলি শ্বেত এবং কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। ডাক্তার নিকোলস্—সবুজ ও বেগুনে বর্ণের কচুরও উল্লেখ করিয়াছেন। এই কচু অত্যন্ত মুখ প্রিয় সুখাদ্য।

(গ) ম্যানাকচু।

ইহার মূলে প্রচুর পরিমাণে শ্বেতসার পাওয়া যায়। ইহার আদর নানাবিধ। এই কচু অত্যন্ত পুষ্টিকর। বেশ করিয়া ছাড়াইয়া জলে সিদ্ধ করিয়া, ঘৃতে বা তৈলে ভাজিয়া খাইলে—বেশ লাগে। নিউগিনির লোকেরা এই কচু হইতে এক রকম ময়দা প্রস্তুত করে। সেই ময়দার রুটী ও বিস্কুট প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার কাণ্ডকে সিদ্ধ করিয়া হরিদ্রা ও সর্ষপ চূর্ণ, লঙ্কা, লবণ এবং তৈল মাখিলে একটী সুস্বাদু ব্যঞ্জন হইয়া থাকে।

(ঘ) এরকাকচু।

ইহার পাতা, ডাঁটা, মূল—সমস্ত অংশই তীব্র রস যুক্ত—খাইলে গলা ধরিয়া যায়। চূণের জলে কিম্বা অম্লদ্রব্যে ইহাকে অন্ততঃ ১ ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া রাখিয়া পরে রন্ধন করিতে হয়।

(ঙ) ওয়ারকচু।

ইহাকেও অম্ল দ্রব্যে ভিজাইয়া পরে রন্ধন করিতে হয়। (Hydrochloric

Nitric. ও Acetic অ্যাসিড দ্বারা—ইহার কণ্ডু বা বিষদোষ নষ্ট হইয়া থাকে।

(চ) শোলাকচু।

এই কচু কেবল পূর্ব্ববঙ্গেই জন্মিয়া থাকে, অন্যত্র বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার রীতিমত চাষও হইয়া থাকে। চাষও বেশ লাভজনক। ইহার তিনটী জাতি। ১। শ্বেত শোলাকচু। ২। কৃষ্ণ শোলা কচু। ৩। নারিকেলী কচু।

১। শ্বেত শোলাকচুর পত্র গাঢ় সবুজ-বর্ণ, শিরা পীতাভ, ডাঁটা ফিকে সবুজ এবং গোলাকার। নিম্নদেশ দ্বিখণ্ডিত, এই খণ্ডিত অংশে বেগুণে বর্ণের ডোরা কাটা। মূল ধূসর বর্ণ—গোলাকার এবং দীর্ঘ। নদীর চরে ইহার ফলন খুব ভাল হয়। গোবরের সার গোড়ায় দিলে—এ কচুর আস্বাদ বেশ মিষ্ট হয়। ঝোল, চড়চড়ি ছেঁচকী প্রভৃতি সকল তরকারীতেই ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনেকে ডালের সহিতও ইহা সিদ্ধ করিয়া খান।

২। কৃষ্ণ শোলা কচু। ইহা শ্বেত শোলা কচুরই মত। কেবল পত্র ও বৃন্ত কৃষ্ণবর্ণ। মূলের ত্বকও কৃষ্ণাভ। গাছ গুলি দেখিতে বড় সুন্দর।

৩। নারিকেলী কচু। পত্র পীতাভ সবুজ, হৃৎপিণ্ডাকার, অত্যন্ত দীর্ঘ। বৃন্ত স্থূল। নিম্নভাগ দ্বিখণ্ডিত; মূল প্রায় ২ ফুট দীর্ঘ হইয়া থাকে। ইহার ডাঁটা, পাতা, মূল, সমস্তই খাওয়া যায়। মূল সিদ্ধ করিলে খুব গলিয়া যায় না—কচ্ কচ্ করে, কিন্তু গলা ধরে না, খাইতেও খুব সুস্বাদু। নারিকেলের শাঁসের মত চিবাইয়া খাওয়া চলে বলিয়াই ইহার নাম নারিকেলী কচু।

(ছ) ব্যাঙাকচু।

ইহা অনেকটা নারিকেলী কচুরই ন্যায়। নোয়াখালি, কুমিল্লা, শ্রীহট্ট, ময়মন সিং ও ঢাকা জেলায়—এই কচুর চাষ হইয়া থাকে।

(জ) জলকচু।

ইহাও ঠিক পূর্ব্বোক্ত কচুর মত। জলের সময় অর্থাৎ বর্ষা কালে—এই কচুর সাহায্যে পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসিগণের তরকারীর আয়োজন হইয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন স্থানেও এই কচু জন্মিয়া থাকে।

(ঝ) শূঁয়া কচু।

অত্যন্ত পুষ্টিকর—সুখাদ্য। ইহার পত্র-বৃন্তে—আলকুশীর মত শূঁয়া দেখিতে পাওয়া যায়। উহা হাতে লাগিলে হাত কুট কুট করে। এই কচু গভীর জঙ্গলে আপনা হইতে জন্মে। ইহা অম্লের সহিত সিদ্ধ করিয়া, তৈল ও লবণ সংযোগে ভক্ষণ করিতে হয়।

(ঞ) ঢোলাকচু।

ইহা পার্ব্বত্য প্রদেশে জন্মে। ইহার পাতা অতি ক্ষুদ্র, পাতার শিরায় এক রকম শুভ্র পদার্থ লাগিয়া থাকে। গাছ গুলি মৃত্তিকা হইতে ৪ ইঞ্চির অধিক দীর্ঘ হয় না। মূল গোলাকার, অত্যন্ত ভারি। এই কচু খাইতে বড়ই সুমিষ্ট। পাহাড়ী জাতিরা বলে—এই কচু সিদ্ধ করিয়া খাইলে জোলাপের কার্য্য করে।

(ট) বিম্বীকচু।

(Arum kheshianum var.)

ইহা এক প্রকার পাহাড়িয়া কচু; ইহার কন্দ দীর্ঘকার—এক একটী কন্দ দৈর্ঘে ১ফুট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কন্দের স্থূলতা প্রায় ৪ ইঞ্চি। কন্দ ধূসরবর্ণের আঁইসে আবৃত

থাকে। ইহা অতি উপাদেয়, পাহাড়িয়াগণ আহ্লাদের সহিত ইহার চাষ করিয়া থাকে।

(ঠ) বোয়া কচু।

ইহার পত্র সমূহ গোলাকার—ঠিক পদ্ম পাতার মত। জলের ধারে জন্মে। এই কচুর কন্দ চূর্ণ করিয়া শর্করা সহ সেবন করিলে, উদরাময়ের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

(ড) আঁকুড়ীকচু।

ইহার জন্মস্থান—সাঁওতালের দেশ। গাছ ছোট, কিন্তু কন্দ খুব বড় এবং অঋজু ও দীর্ঘাকার। সাঁওতালগণ ইহা সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করে। এই কচু অত্যন্ত পুষ্টিকর।

(ঢ) মুখীকচু।

(Arum Ægypticum of Dr. Roxburgh.)

গাছ সাধারণ কচু গাছের মত। অত্যন্ত খর্ব্বাকৃতি, পত্র ক্ষুদ্র, পত্রবৃন্ত হ্রস্ব। ইহার কন্দ, পত্র ও বৃন্ত অখাদ্য। কন্দ হইতে এক রকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতান বাহির হইয়া থাকে—উহা ঠিক শকরকন্দ আলুর মত। এই গুলিই খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হয়। এই মুখী গুলি উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া খাইতে হয়। অল্প উত্তাপেই এই মুখী গুলি গলিয়া যায়, তার পর লঙ্কা, তৈল ও লবণ সংযোগে—ইহা গলাধঃকরণ করিতে হয়। এই কচুর রসে—অগ্নি দূষিত ক্ষতও শুষ্ক হইয়া থাকে।

ডাক্তার রক্সবর্গ বলেন—এই কচুর জন্ম স্থান ইজিপ্ট দেশ। আমি কিন্তু একথা বিশ্বাস করিনা। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এদেশে মুখী কচু প্রচলিত। পূর্ব্ববঙ্গে ইহার চাষও হইয়া থাকে।

(ণ) আলুকচু।

ইহা প্রায় মুখী কচুরই মত। ইহারও বৃহৎ মূল অখাদ্য। মূল হইতে বহির্গত মুখী গুলিই ব্যঞ্জনরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পার্থক্যের মধ্যে—ইহার মুখীগুলি গোল-আলুর মত পিণ্ডাকার। পশ্চিম বঙ্গে ইহা প্রচুর পাওয়া যায়।

(ত) পঞ্চমুখীকচু।

এই কচুর জন্মস্থান নাগা ও গারো পাহাড়। ইহার আসল কন্দ হইতে চতুর্দিকে পাঁচটী উপকন্দ বাহির হইয়া থাকে। আবার কোন কোন কন্দ হইতে ৩টী, ৪টী, এমন কি সাতটী পর্য্যন্ত উপকন্দ বাহির হইয়া থাকে। ইহার কন্দ অতি বৃহৎ—এক একটীর ওজন ৬।৭ সের পর্য্যন্ত হইতে পারে। ইহা উচ্চ শুষ্ক ভূমিতে জন্মে। জলা জমীতে কন্দ পচিয়া যায়। এই কচু—কচুর রাজা। খাইতে অত্যন্ত সুস্বাদু, ইহাতে গলা ধরিবার আদৌ আশঙ্কা নাই। কন্দে প্রচুর পরিমাণে শ্বেতসার আছে, সুতরাং ইহা অত্যন্ত পুষ্টিকর। ইহা হইতে একপ্রকার ময়দা প্রস্তুত হয়, সেই ময়দার চাপাটী—অতি সুখাদ্য।

(থ) পেচা কচু।

জন্মস্থান খাসিয়া পর্ব্বত। মূল অত্যন্ত বৃহৎ—চুপড়ী আলুর মত। খাইতে সুস্বাদু। এই কন্দ চূর্ণ করিয়া, ঘৃত ও চিনী সহযোগে হালুয়ার মত পাক করিয়া খাইলে অত্যন্ত শুক্র বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

(দ) আরা কচু।

জন্মস্থান খাসিয়া পাহাড়। কন্দ বৃহৎ। উপরের ত্বক নিষ্কাশিত করিলে, আলতার মত রক্তবর্ণ বাহির হইয়া থাকে। ইহাও অত্যন্ত শুক্রবৃদ্ধিকারক।

(ধ) শর কচু বা সাপলা কচু।

(Arum Nymrafolium of Dr. Rosburgh.)

এই কচুর পাতা ঠিক কুমুদ (হেলা, শালুক) পত্র সদৃশ। ইহা জলে ও স্থলে উভয় স্থানেই জন্মে। জলে গাছগুলি খুব বাড়ে। ইহার পত্র ও বৃন্ত—অরুণাভ। এই কচুর সকল অংশই খাওয়া যায়, তবে গলা ধরা দোষ বিলক্ষণই আছে। এই কচু, কচু জাতির মধ্যে বৃহত্তর। ইহা রক্তবর্দ্ধক, বলকারক—প্লীহা, যকৃৎ ও শোথনাশক, মূত্রকারক ও ভেদক।

(ন) চিম্নাড় কচু।

ইহার কন্দ ঠিক আতা ফলের মত গণ্ড গাত্র এবং পিণ্ডাকার। হিমালয়ের স্থানে স্থানে এই গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সামান্য অগ্নিতাপে দগ্ধ করিয়া খাইতে হয়। দগ্ধ করিলে—ঠিক ডেলা ক্ষীরের মত সুগন্ধি ও সুস্বাদু হইয়া থাকে। ইহা অত্যন্ত রসকারক।

এই কচু খাইলে, দুএকদিন উপবাসে শরীর নিস্তেজ হইয়া পড়ে না। দুঃখের বিষয় ইহা বড়ই দুর্লভ, অনেক অনুসন্ধানে দুই চারিটী পাওয়া যায়।

(প) গোঁদো কচু।

(Arum. fragrantossimum.)

খসিয়া, নাগা ও গারো পাহাড়ে—এই কচু জন্মিয়া থাকে। ইহার কন্দে এক রকম সুগন্ধ পাওয়া যায়। কাণ্ড ধূসরবর্ণ—দৈর্ঘ্যে ৩।৪ ফুট, স্থূলতা ২।০ ইঞ্চি। ইহার পত্র—হৃদ্ পিণ্ডাকার, পত্রের বর্ণ শ্বেতাভ সবুজ—দেখিলে মনে হয় যেন বৌপ্যের মত ঝক্‌মক্ করিতেছে। পত্রের বৃন্ত শীর্ণ—এবং খাপ্ কাটা। কন্দ ছাড়াইলে রক্তাভ, শ্বেতবর্ণের শাঁস দেখিতে পাওয়া যায়। এই কন্দই খাইতে হয়। ইহা এতদূর সুগন্ধী যে—এই কচুর দ্বারা যে ব্যঞ্জন পাক করা যায়, তাহাও সুগন্ধযুক্ত হইয়া থাকে।

এই কচু ভক্ষণ করিলে—অসম্ভবরূপে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়, ইহা পাচক, সারক, শোণিতবর্দ্ধক এবং অত্যন্ত পুষ্টিকর। উদ্ভিদ্ বিদ্যা বিশারদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুহ—এই কচুর চাষ আরম্ভ করিয়াছেন। গারোপাহাড় হইতে চারা আনাইয়া আমার পাঠক মহাশয় ও ইহার চাষ করিতে পারেন। ঈশ্বর বাবুর দেখা দেখি, আমিও ইহার চাষে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ফলাফল—পরীক্ষাধীন।

(আগামীবারে সমাপ্য)

পল্লীবাসীর প্রতি নিবেদন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

(রায় শ্রীচুণীলাল বসু আই এস্ ও এম্ বি, এফ্ সি এস্ বাহাদুর।)

সংক্রামক রোগ নিবারণ।

কি উপায় অবলম্বন করিলে কতিপয় সংক্রামক রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায় এবং উহার বিস্তৃতি নিবারণ করা যাইতে পারে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কলেরা বা ওলাউঠা।

১। একপ্রকার বীজাণু, খাদ্য বা পানীয়ের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিলে এই ভীষণ রোগ উৎপন্ন হয়। এই বীজাণু অধিক উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না। সুতরাং কলেরার সময়ে কোন খাদ্যদ্রব্য কাঁচা বা শীতল অবস্থায় ভক্ষণ করা উচিত নহে। সকল দ্রব্যই রন্ধন করিয়া গরম থাকিতে থাকিতে খাইবে।

২। পানীয় জল ও দুগ্ধ উত্তমরূপে ফুটাইয়া লইবে।

৩। খাদ্য দ্রব্যের উপর যাহাতে মাছি বসিতে না পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে।

৪। কলেরা রোগীর শয্যা ও বস্ত্রাদি নদী বা কোন পুষ্করিণীতে কিম্বা কোন কূপের নিকট কাচিবে না। বস্ত্রাদি ফেনাইলে (Phenyle) ভিজাইয়া, জলে উত্তমরূপে ফুটাইয়া লইলে, সংক্রামক দোষ নষ্ট হইয়া যায়। এক ভাগ ফেনাইল্—বিশ ভাগ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে।

৫। কলেরা রোগীর বিছানা এবং মল ও বমনাদি খড়ের উপর ঢালিয়া কেরোসিন সাহায্যে পুড়াইয়া দেওয়া উচিত, তাহা না হইলে বাটী হইতে দূরে গর্ত্ত খুঁড়িয়া পুতিয়া ফেলিবে।

৬। যাঁহারা রোগীর পরিচর্য্যা করিবেন, তাঁহারা ফেনাইলের উপরোক্ত দ্রাবণ এবং সাবান ও জল দিয়া হাত উত্তমরূপে না ধুইয়া কোনরূপ খাদ্যদ্রব্য বা পানীয় স্পর্শ করিবেন না।

৭। কলেরার সময়ে কেহ খালি পেটে থাকিবে না এবং অধিক রাত্রি জাগিবে না।

৮। বাসগৃহ ও তাহার চতুঃপার্শ্ব পরিষ্কার রাখিবে, তাহা না হইলে মাছির উপদ্রব হইয়া বাটীতে এবং গ্রামের মধ্যে কলেরা ছড়াইয়া পড়িবে।

রক্তামাশয়।

এই রোগের বীজ অনেক স্থলে দূষিত পানীয় জলের সহিত শরীরে প্রবেশ করে। বালক বালিকাদের রক্তামাশয় রোগ হইলে উহাদিগের মল যথাতথা নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে; ইহার ফলে মাছি দ্বারা বা অন্য উপায়ে খাদ্য

দ্রব্য ও পানীয় জল ঐ রোগের বীজাণু দ্বারা সংক্রামিত হয় এবং এইরূপে সুস্থ লোকের শরীরে ঐ রোগ প্রবেশ লাভ করে। সুতরাং রোগীর মল সম্বন্ধে সাবধান হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। রোগীর মল ও মলদুষ্ট বস্ত্রাদি পুড়াইয়া ফেলিবে অথবা দূরে মাটীর মধ্যে পুঁতিয়া ফেলিবে। জল ফুটাইয়া পান করিলে এ রোগের হাত হইতে অনেকাংশে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

যক্ষ্মারোগ।

১। পরিবারস্থ কাহারও এই রোগ হইলে দেহ গরম কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া রোগীকে সর্ব্বদা খোলাস্থানে রাখিবে। দালান, বারাণ্ডা, দাওয়া প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত মুক্তস্থানে রোগীর শয়নের ব্যবস্থা করিবে।

২। যক্ষ্মার বীজ রোগীর কফের সহিত নির্গত হইয়া থাকে। রোগী যথাতথা কফ ফেলিলে উহা শুকাইয়া তন্মধ্যস্থিত বীজাণুগুলি ধূলির সহিত মিশ্রিত হয় এবং বায়ুর সাহায্যে নিঃশ্বাসের সহিত সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রবেশ লাভ করে এবং তদ্দ্বারা এই রোগ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব হয়। সেইজন্য একটি ফেনাইল্ মিশ্রিত জলপূর্ণ নির্দ্দিষ্ট পাত্রে রোগীর কফ পরিত্যাগ করা উচিত। পরে উহা পুড়াইয়া ফেলিলে কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে না।

৩। যক্ষ্মাগ্রস্ত রোগীর সহিত সুস্থ ব্যক্তি কখনও এক পাত্রে পান ভোজন করিবে না, এক গামছা, তোয়ালে বা বস্ত্রাদি ব্যবহার করিবে না এবং এক বিছানায় শুইবে না।

৪। কখনও কখনও গরুর যক্ষ্মা হইতে মানুষের যক্ষ্মা উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। দুধের সহিত গরুর যক্ষ্মার বীজ মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। দুধ উত্তমরূপে ফুটাইয়া খাইলে এই রোগের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

৫। যক্ষ্মা-পীড়িত মাতা সন্তানকে স্তন্য-পান করাইবেন না।

৬। পুরুষ বা স্ত্রীলোকের যক্ষ্মার সূত্রপাত হইলে তাহার কোন মতেই বিবাহ করা উচিত নহে।

বসন্ত।

১। বাটীতে বা গ্রামে এই রোগ দেখা দিলে প্রত্যেক পরিবারের ছোট বড় সকলেরই ইংরেজী "টীকা" লওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। বাঙ্গালা "টীকা" থাকিলেও মহামারীর সময়ে ইংরেজী "টীকা" লইতে দেরী করিবে না। "টীকা" না লইয়া যেন কোন ব্যক্তি রোগীর পরিচর্য্যা না করেন এবং তিনি যথাসম্ভব অন্য লোকের সহিত কম মেলা মেশা করিবেন।

২। রোগীর বস্ত্রাদি জলে উত্তমরূপে না ফুটাইয়া ধোবাবাড়ী কখনই পাঠাইবে না।

৩। বসন্ত রোগীর গায়ে কখনও মাছি বসিতে দিবে না; তাহাকে সর্ব্বদা মশারির ভিতরে রাখিবে।

৪। বাড়ীতে বসন্ত বা যে কোনরূপ সংক্রামক রোগ হইলে বালক বালিকাদিগকে কিছুদিনের জন্য বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা বন্ধ রাখিবে।

৫। বসন্তের "ছাল" যতদিন না সম্পূর্ণ-ভাবে উঠিয়া যায়, ততদিন রোগী সুস্থ ব্যক্তির সহিত কিছুতেই মিশিবেন না। এই ছালে বসন্তের বীজাণু থাকে। ইহা যথাতথা ফেলিলে

না, ফেনাইল পূর্ণ পাত্রে সংগ্রহ করিয়া পোড়াইয়া ফেলিবে।

ম্যালেরিয়া।

১। আজকাল নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, একজাতীয় মশকের দংশনের দ্বারাই ম্যালেরিয়া রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর রক্তের মধ্যে ম্যালেরিয়ার বীজ বাস করে। মশক ঐ রোগীকে দংশন করিয়া উহার রক্তশোষণকালে রোগের বীজ গ্রহণ করে এবং পরে সুস্থ ব্যক্তিকে দংশন করিয়া তাহার শরীর মধ্যে ঐ বীজ প্রবেশ করাইয়া দেয়। এইরূপে ঐ ব্যক্তি ম্যালেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়। সুতরাং মশার উপদ্রব নিবারিত হইলে ম্যালেরিয়া রোগ কমিয়া যায়।

২। নালা ডোবা ইত্যাদিতে জল জমিলে তথায় মশা ডিম পাড়ে এবং অসংখ্য মশক উৎপন্ন হইয়া গ্রামে ছড়াইয়া পড়িয়া রোগ বিস্তার করে। এইজন্য বাড়ীর নিকটস্থ খানা ডোবাগুলি ভরাট করিলে মশার উপদ্রব কম হয়। ভরাট করা সম্ভব না হইলে কিছু পরিমাণ জ্বালানি কেরোসিন তেল তন্মধ্যে ঢালিয়া দিলে মশকশাবকগুলি বিনাশপ্রাপ্ত হয়। গ্রামের বড় পুষ্করিণীর মধ্যে কই, খলিশা, তেচোকো, পাঁচচোকো, পুঁটি প্রভৃতি মাছ জন্মাইলে তাহারা অতি শীঘ্র মশকশাবকদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলে। মশকের ডিম ও শাবক ইহাদিগের প্রধান আহার।

৩। বাড়ীর মধ্যে বা চতুঃপার্শ্বে ঝোপ বা জঙ্গল থাকিতে দিবে না। দিবাভাগে ম্যালেরিয়াবাহী মশকের উপদ্রব থাকে না, তখন তাহারা এই সকল ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়া থাকে। সন্ধ্যার সময় হইতেই তাহারা দেখা দেয় এবং বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমস্ত রাত্রি লোককে দংশন করে।

৪। যে চারি মাস ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব থাকে, সেই সময়ে ঘরজোড়া মশারি প্রস্তুত করিয়া পরিবারস্থ সকলেরই সন্ধ্যার সময় হইতে সমস্ত রাত্রি তন্মধ্যে বাস করা উচিত। ঘরজোড়া মশারি হইলে তন্মধ্যে রন্ধন ব্যতীত অন্যান্য সাংসারিক কাযকর্ম্ম করিবার বিশেষ কোন অসুবিধা হইবে না, অথচ মশার আক্রমণ হইতে একেবারে সম্পূর্ণভাবে রক্ষা পাওয়া যাইবে। পল্লীগ্রামে মশারি না খাটাইয়া কেহ কখনও নিদ্রা যাইবে না। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ে প্রতিগৃহে ধূপধূনা দেওয়া উচিত।

৫। হাতে পায়ে খাঁটি সরিষার তেল মাখাইয়া রাখিলে মশার আক্রমণ হইতে কিয়ৎ পরিমাণে অব্যাহতি লাভ করা যায়।

৬। কুইনাইন্ ম্যালেরিয়া রোগের একমাত্র মহৌষধ। কুইনাইন্ ব্যবহার করিলে রক্তস্থিত ঐ রোগের বীজ একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায় এবং রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করে। কুইনাইনে ম্যালেরিয়া রোগ যেমন আরোগ্য হয়, তেমনি ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাবের সময়ে সুস্থ ব্যক্তি যদি সপ্তাহে অন্ততঃ দুইদিন পাঁচ গ্রেণ করিয়া কুইনাইন্ সেবন করেন, তাহা হইলেই ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে পারিবেন—ইহা বহু পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং ম্যালেরিয়ার চারি মাস গ্রামবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা প্রত্যেকেরই অল্প পরিমাণে

যথারীতি কুইনাইন সেবন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

প্লেগ্।

প্লেগ্‌রোগ ভারতবর্ষের অনেক স্থানে মহামারীরূপে আবির্ভূত হইয়া লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন নাশ করিতেছে। অন্যান্য দেশ অপেক্ষা বাঙ্গলা দেশে ইহার অত্যাচার কম, বিশেষতঃ পূর্ব্ব বাঙ্গলার অনেক প্রদেশে এই রোগ এখন পর্য্যন্তও দেখা দেয় নাই। বেহার অঞ্চলে এই রোগের খুব প্রাদুর্ভাব। এই রোগ সম্বন্ধে কয়েকটী প্রয়োজনীয় বিষয় আমাদের জানিয়া রাখা উচিত।

১। এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র পোকার দংশন দ্বারা প্লেগ্ রোগ উৎপন্ন হয়।

২। মানুষের প্লেগ্ হইবার পূর্ব্বে ইঁদুরের প্লেগ্ হইতে দেখা যায়। প্লেগ্‌গ্রস্ত ইঁদুরের গায়ে প্লেগের পোকা থাকে। ইঁদুর মরিলে ঐ পোকা তাহার দেহ পরিত্যাগ করিয়া মাটীতে আশ্রয় লয় এবং তথা হইতে সুস্থ ব্যক্তির গায়ে উঠিয়া দংশন করিয়া প্লেগ্ রোগের বীজ তাহার শরীরে সংক্রামিত করিয়া দেয়। বাড়ীতে যাহাতে ইঁদুরের উপদ্রব না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবে।

৩। যখন দেখিবে অকারণে বাটীতে অনেক ইঁদুর মরিতেছে, তখনই জানিবে যে তাহারা প্লেগ্ রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। এই লক্ষণ দেখিলে বাড়ী ছাড়িয়া ফাঁকা জায়গায় ঘর বাঁধিয়া কয়েকদিন বাস করিবে এবং বাটী, ঘর, দুয়ার, ফেনাইল্ বা অন্য কোনরূপ বিশোধক ঔষধ দ্বারা ধৌত করিয়া দিবারাত্রি খুলিয়া রাখিয়া দিবে।

৪। মৃত ইঁদুর কখনই হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিবে না। চিম্‌টার দ্বারা উহাকে উঠাইয়া ফাঁকা জায়গায় খড়ের উপর কেরোসিন তেল ঢালিয়া পুড়াইয়া ফেলিবে।

৫। বাটীর সমুদয় স্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে এবং যাহাতে যথেষ্ট রৌদ্র ও বায়ু বাটীর মধ্যে প্রবেশ করে, তাহার ব্যবস্থা করিবে। যে বাটীতে বেশী রৌদ্র ও বায়ু যায়, তথায় প্লেগরোগ প্রায় হয় না। প্লেগ্‌রোগের বীজ রৌদ্র সংস্পর্শে শীঘ্র মরিয়া যায়।

৬। প্লেগ্ রোগীকে স্পর্শ করিলে বা উহার সেবা শুশ্রূষা করিলে উক্ত রোগ হয় না। তবে শরীরের মধ্যে ঘা থাকিলে প্লেগ্ রোগীকে স্পর্শ করা উচিত নহে। প্লেগ্ রোগীর থুথু বা কফ যাহাতে সুস্থ ব্যক্তির চোখে মুখে না লাগে, তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত।

৭। প্লেগ্ রোগীর বস্ত্র ও শয্যাদি পুড়াইয়া ফেলা উচিত। নতুবা বস্ত্রাদি বিশোধক ঔষধ দ্বারা উত্তমরূপে পরিষ্কৃত করিয়া, জলে ফুটাইয়া, প্রখর রৌদ্রে রাখিয়া দিলে উহার পুনর্ব্যবহারে কোন ভয় থাকে না।

৮। প্লেগের প্রাদুর্ভাব সময়ে খালি পায়ে থাকা উচিত নহে। যাঁহাদের ক্ষমতায় কুলাইবে, তাঁহারা এই সময়ে মোজা জুতা সর্ব্বদা পরিয়া থাকিবেন। গরীব লোকে পুরাণ কাপড়ের পটী দ্বারা পদদ্বয় হাঁটু পর্য্যন্ত জড়াইয়া রাখিলে প্লেগের পোকার দংশন হইতে অনেকাংশে রক্ষা পাইতে পারিবে।

৯। প্লেগের "টীকা" লইলে কিছুদিনের জন্য ঐ রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়।

নব-বর্ষ।

(সন ১৩২৭ সাল)

[কবিরাজ শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ]

(১)

পরিধানে চম্পকের চারু পীতাম্বর,
শিরে শোভে অশোকের কিরীট সুন্দর,
বকুলের বীরবৌলি শ্রবণ যুগলে,
নব মল্লিকার হার দুলিতেছে গলে.
ভালে বালার্কের ফোঁটা—ভাস্বর উজ্জ্বল
ফুল্ল কোকনদ জিনি রাঙ্গা পদতল ;
ওষ্ঠাধরে কি নির্ম্মল হাসির লহর.
তরুণ যুবক ! তুমি কেগো যাদুকর ?

(২)

এক হস্তে "নীলাপদ্ম" গঠনে নিরত,
অন্য করে—সংহারের উপাদান কত !
কিবা দিব্য সৌম মূর্ত্তি—উদার গম্ভীর—
নিরখি' সম্ভ্রমে সবে নত করে শির.
সৃজনের বীজ মন্ত্র উচ্চারণ করি',
কেগো তুমি দেখা দিলে রাজবেশ ধরি ?
এক চক্ষে অশ্রুজল, অন্য নেত্রে প্রীতি,
তুমিই কি "নব-বর্ষ, নবীন অতিথি ?

(৩)

তোমার আসার আগে, এসেছিল যা'রা,
বিশ্বাসঘাতক, শঠ প্রবঞ্চক, তা'রা।
পূজা খেয়ে— ক'রে গেছে বক্ষে পদাঘাত,
দেখে গেছে নয়নের নিত্য অশ্রুপাত ;
শ্মশানের চিতা মধ্যে ব'সে আছি মোরা,
"নূতনে"ডাকিতে,তবে কে বাজাবে ঢোরা ?
উদ্যম উৎসাহ —নাই কারো প্রাণে আর—
বর্ষরাজ ! অভ্যর্থনা হ'বে না তোমার।

(৪)

"হর প্রতি প্রিয় ভাষে সুধান্ পার্ব্বতী
বৎসরের ফলাফল—কহ পশুপতি।"
যুগযুগ ধরি'—ইহা লেখে পঞ্জিকাতে,
এবার সে ভার মোরা লব নিজ হাতে।
জিজ্ঞাসি তোমায়, রাজা ! বল দেখি তুমি—
সুখে কি অসুখে রবে এই বঙ্গভূমি ?
বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ আলো কি আঁধার !
ভাগ্যের "বজেট" খোল দেখি একবার !

(৫)

সেই নিশি, সেই দিবা, সেই ফুল ফল,
সেই শশী, সেই রবি, বায়ু, বহ্নি, জল,
সেই পাখী, সেই শাখী, সেই কান্না হাসি,
সেই জন্ম, সেই মৃত্যু—আছে পাশাপাশি,
সেই সৃষ্টি, সেই লয়, সবই পুরাতন,
তোমার শাসনে - রাজা ! কি হ'ল নূতন ?
কোন্ গুণে "নববর্ষ" নাম তবে পেলে ?
কি পরিবর্ত্তন তরে, বল তুমি এলে ?

(৬)

কাহার 'দায়াদ সূত্রে' নিলে রাজ্য-ভার ?
কোন্ ষড়যন্ত্রী —মন্ত্রী হইল তোমার ?
শুষ্ককণ্ঠ পল্লীবাসী,—পিপাসায় মরে—
জল মাপিবার ভার দিলে কার করে ?
"মেঘ ফল" রৌদ্র ফল প্রকাশিয়া কহ'—
বায়ুর অধিপ হ'ল কোন্ দুষ্ট গ্রহ ?
কার প্রতি কোন কর্ম্ম, ক'রে দিলে ভাগ !
বুঝাবে কি সে' রহস্য ওহে মহাভাগ।

(৭)

শস্যাধিপ হ'ল বুঝি "দুর্ভিক্ষ আপনি ?
সন্তানে চিবায়ে খাবে ক্ষুধার্ত্ত জননী ?
গৃহে গৃহে "ম্যালেরিয়া" ধ্বংস হ'ল দেশ,
যমরাজ নিজে বৈদ্য—"বৈদ্যফল" শেষ !!
ক্ষুদ্রতার মহাদম্ভ, পাপের প্রসার,
তুমি কি করিবে রাজা ! এর প্রতিকার ?
ভূলোকে পুলকে আসি' দ্যুলোক বিজ্ঞান
পারিবে কি করিতে এ জাতির কল্যাণ ?

(৮)

কুমারীর আত্মহত্যা, ঘৃণ্য বর পণ,
চৌর্য্য, দ্বেষ, ব্যভিচার, অকাল-মরণ,
বসন্ত, কলেরা, প্লেগ, মহামারী ভয়,
দেব ভোগ—ভেজালে হ'তেছে বিষময়,
স্বাস্থ্যহীন, ক্ষয়ক্ষীণ, দীন নারী নর,
গেছে ভুলে—"আয়ুর্বেদ" শাস্ত্রের আদর,
পার যদি—ঘুচাইতে এসব প্রমাদ—
বিদায়ের কালে দিব শত ধন্যবাদ।

শিশু পালন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বি, এ, সরস্বতী]

শিশুর দেহ উপযুক্তরূপে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইলেই তাহার মস্তিষ্কও পুষ্ট হইয়া উঠিবে। শিশুর প্রথম বৎসরে তাহার মস্তিষ্ক পুষ্ট ও গঠিত করিবার জন্য বাহির হইতে কোন আয়োজনের প্রয়োজন নাই। প্রথম বৎসরটি শিশুর দেহের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই মস্তিষ্কের গঠন হইবে। প্রত্যেক মাতাই এই কথাটি বিশেষ ভাবে মনে রাখিবেন। আমরা অনেক নবীনা মাতাকে শিশুর চক্ষুর সম্মুখে লালফুল, রঙীন খেলানা, চক্‌চকে জিনিস ঝুলাইয়া কিংবা কোনরূপ শব্দ করিয়া তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতে দেখিয়াছি। এরূপ জোর করিয়া শিশুর মনোযোগ আকর্ষণ করা অত্যন্ত অনিষ্টকর। ইহাতে শিশুর মস্তিষ্ক অনাবশ্যকরূপে উত্তেজিত হয়। জন্ম গ্রহণের পর কয়েক মাস ধরিয়া শিশুর মস্তিষ্ক বহু কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। তখন এ পৃথিবীর সকলি তাহার নিকট নূতন। এ পৃথিবীর সমুদয় চেতন, অচেতন পদার্থের দাগ তাহার মস্তিষ্কে প্রতি মুহূর্ত্তে পড়িতেছে। সুতরাং বাহির হইতে জোর করিয়া তাহার কার্য্য বাড়াইলে মস্তিষ্কের পুষ্টি না হইয়া ঘোরতর অনিষ্ট সাধিত হয়। মস্তিষ্কের developmentএর কার্য্য বিধাতাই করিতেছে। দোলায়মান খাট বা চেয়ার-দোলায় শিশুকে কখনো শোয়াইবে না। অনবরত স্পন্দন শিশুর মস্তিষ্কের পক্ষে অত্যন্ত অহিতকারী।

শিশুকে হাতে তুলিয়া লোফালুফি করিবে না।

তাহার চক্ষুর সম্মুখে কোন জিনিস অনবরত নাড়াইবে না।

শিশুকে কোলে করিয়া দুলিবে না।

আগন্তুকদিগকে দেখাইবার জন্য শিশুর ঘুম ভাঙ্গাইবে না, তাহাকে বিরক্ত করিবে না।

শিশুর সম্মুখে শিষ দিবে না, অনবরত বকবক্ করিবে না।

সর্ব্বদা তাহাকে হাসাইতে চেষ্টা করিবেনা।

এই সমুদয় কার্য্যই শিশুর মস্তিষ্ককে অস্বাভাবিক উপায়ে এবং অতিরিক্ত রূপে উত্তেজিত করে। ইহাতে তাহার স্নায়ুমণ্ডলের পীড়া হইবার সম্ভাবনা। কাহাকেও শিশুকে চুম্বন করিতে দিবে না। যে সে লোককে চুম্বন করিতে দিলে নানা রোগের বীজ শিশুকে আক্রমণ করিবার সম্ভাবনা।

অকাল প্রসূত শিশু।

অকাল প্রসূত শিশুকে অতিশয় যত্নের সহিত লালন পালন করিতে হয়। তাহার জীবনী শক্তি অত্যন্ত কম থাকে। এই জন্য দেহের স্বাভাবিক তাপ রক্ষা করাই কঠিন হয় এবং খাদ্য পরিপাক ও assimilate করিবার শক্তিও কম হয়। শিশু অকালে জন্মিলে তাহার সমস্ত দেহে তুলা জড়াইয়া, তুলার মধ্যে তাহাকে শোয়াইয়া রাখিবে। এক মাস পর্য্যন্ত তাহাকে যতদূর সম্ভব গরমে রাখিবে। তুলার বিছানার নীচে গরম জলের ব্যাগ রাখিবে, জল ঠাণ্ডা হইলে পুনরায় গরম জল ভরিয়া দিবে। এইরূপে একমাস রাখিবার পর অল্প অল্প করিয়া গরম কমাইয়া দিবে। এইরূপ শিশু এত দুর্ব্বল হয় যে, মাতৃ দুগ্ধ চুষিয়া খাইবার শক্তিও থাকে না। মাতার দুগ্ধ গালিয়া একটি বাটিতে রাখিয়া চামচে করিয়া খাওয়াইবে। কিংবা চামচের সহিত পলিতা দিবে, শিশু চুষিয়া খাইবে। মাতার দুগ্ধ যত খাইতে পারিবে ততই তাহার পক্ষে মঙ্গল। মাতার দুগ্ধ চুষিয়া খাইতে না পারিলে শিশুর উচিত মত ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না, সুতরাং যেরূপ পুষ্টি লাভের দরকার তাহা না পাইয়া শিশু ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া যায়। এরূপ স্থলে সূতিকাগারে মাতার দুগ্ধের সহিত গাধার দুগ্ধ দিলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়। গাধার দুগ্ধ—মাতৃ দুগ্ধের প্রায় সমগুণবিশিষ্ট। গাধার দুগ্ধ পাওয়া না গেলে allentury's milk Food no. 1 প্রথম তিন মাস পর্য্যন্ত, পরে ছয় মাস পর্য্যন্ত no 2 এবং mellin's Food, Glasco শিশুকে দিলে মাতৃ দুগ্ধের অভাব দূর হইবে। বিশুদ্ধ গাভীর দুগ্ধ সহ্য হইলে এই সকল বিলাতী ফুড না দেওয়াই ভাল।

অকাল প্রসূত শিশুকে এক ঘণ্টা কিংবা দেড় ঘণ্টা পর পর খাইতে দিবে। ক্রমে বল পাইলে দুই ঘণ্টা পরে দিবে। সুস্থ শিশুর রাত্রে ২।১ বারের বেশী আহারের আবশ্যক হয় না। কিন্তু অপূর্ণ সময়ে প্রসূত দুর্ব্বল শিশুর প্রথম ২।৩ মাস রাত্রে ৩।৪ বার আহারের আবশ্যক হয়। ক্রমে বল পাইলে রাত্রের আহার কমাইয়া দিয়া একবার খাওয়ান অভ্যাস করা প্রয়োজন। প্রাতে ৫টা হইতে রাত্রি ১০ টা পর্য্যন্ত দুই ঘণ্টা পর পর দুধ খাওয়াইয়া রাত্রি ১০ হইতে প্রত্যুষে ৫ টা পর্য্যন্ত পাকস্থলীকে বিশ্রাম দিবে, ইহা

শিশুর স্বাস্থ্যের, পক্ষে যেমন দরকার তাহার মাতার পক্ষেও তেমনি প্রয়োজন। সুস্থ শিশুকে প্রথম হইতেই এইরূপ অভ্যাস করাইবে, কিন্তু অপূর্ণ শিশুর ৩।৪ মাস বয়স হইলে বল পাইলে এইরূপে খাওয়াইবে। অপূর্ণ শিশুর অধিক আহারের আবশ্যক।

আহারের পরিমাণ বয়স অনুসারে ক্রমে বাড়াইবে। প্রথম হইতে অধিক আহার দিলে শিশু পরিপাক করিতে পারিবে না, পরিপাক শক্তি নষ্ট হইতে পারে। অপূর্ণ শিশুকে বেশী নাড়াচাড়া করিবে না। সুস্থ শিশুকে যেরূপে স্নান করান হয়, পরিচ্ছদ পরান হয় অকাল প্রসূত শিশুকে সেরূপে করিবে না, তাহাকে অতি সাবধানে স্নান করাইবে, কাপড় পরাইবে। তাহার হাত, পা, বুক, পিঠে প্রত্যহ সরিষার তৈল এক ঘণ্টা ধরিয়া মালিস করিলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দৃঢ় ও বলশালী হইবে এবং সহজে ঠাণ্ডা লাগিবার ভয় দূর হইবে। এইরূপ শিশুর পক্ষে সরিষার তৈল অত্যন্ত উপকারী। অকালে প্রসূত দুর্ব্বল শিশুর নিদ্রা খুব বেশী হয়। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অধিকাংশ সময়ই সে নিদ্রিত থাকে, এমন কি তাহাকে যথাসময়ে খাওয়ানই কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু আহারের সময় তাহাকে যেরূপেই হউক জাগান উচিত। নিদ্রা এবং আহার দুইই তাহার পক্ষে তুল্যরূপে আবশ্যক। অপূর্ণ শিশুর পুষ্টির জন্য আহারের পূর্ব্বে তাহাকে মাখনের ছোট ছোট গুলি চুষিতে দিলে খুব উপকার হয়। সহ্য হইলে এক একবারে ৩।৪টি করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। মটরের আকারে মাখনের ছোট ছোট গুলি করিয়া তাহাতে milk sugar মাখাইয়া লইলেই মাখনের গুলি প্রস্তুত হইল। milk sugar ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়। অল্প অল্প করিয়া সহ্য করান উচিত। অকাল প্রসূত শিশুর দৈহিক ও মানসিক শক্তি এবং মস্তিষ্ক অত্যন্ত দুর্ব্বল থাকে। জন্মমাত্র আহার, নিদ্রা প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বদা উপযুক্তরূপ যত্ন না লইলে বুদ্ধিহীন এবং বিকলাঙ্গ হইবার খুব সম্ভাবনা। পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত তাহার সকল শক্তি বর্দ্ধিত ও পুষ্ট করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন লইতে হইবে। তবে শিশু মানুষ হইবে। নতুবা বুদ্ধিহীন ও বিকলাঙ্গ হইয়া সংসারের ও সমাজের দুঃখের কারণ হইয়া থাকিবে। সাধারণতঃ পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারণেই তাহার জীবন নাশের আশঙ্কা থাকে। কারণ তাহার দৈহিক শক্তি ও যন্ত্রাদি দুর্ব্বল থাকে বলিয়া সামান্য কারণেই অসুস্থ হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। যে রোগের আক্রমণ হইতে সুস্থ শিশু ২।১ দিনেই আরোগ্য লাভ করে, অকাল প্রসূত শিশুর তাহাতে জীবন যাইতে পারে। তাহার রোগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা (Resistance Power) করিবার শক্তি থাকে না। সুতরাং এইরূপ শিশুকে অতি যত্নের সহিত লালনপালন করিতে হয়। দন্তোদ্গমের সময়, টিকা লইবার সময় বিশেষে সাবধানতার সহিত তাহাকে রাখিতে হইবে। আমরা একটি সাত মাসে প্রসূত শিশুর কথা জানি। তাহার প্রত্যেকটি দাঁত উঠিবার সময় ব্রঙ্কো নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হইয়া জীবন হানির আশঙ্কা হইত। সাধারণতঃ ছয় মাসের মধ্যে সুস্থ শিশুকে টিকা দেওয়া হয়। কিন্তু অপূর্ণ শিশুকে অত শীঘ্র টিকা দিলে

বিপদের সম্ভাবনা। শিশু বল পাইলে ২॥। ৩ বৎসরে টিকা লইবার উপযুক্ত হয়। চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিয়া এইরূপ শিশুকে টিকা দিবে। অপূর্ণ শিশুর লালনপালনে সর্ব্বদাই চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া চলিলে কোন অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না।

সাধারণতঃ সুস্থ শিশুকে দুগ্ধ খাওয়াইবার নিয়ম এই :—

	শিশুর বয়স।					
	১ সপ্তাহ	২ হইতে ৩ সপ্তাহ	৪ হইতে ৫ সপ্তাহ	৬ হইতে ১২ সপ্তাহ	৩ হইতে ৫ মাস	৫ হইতে ৯ মাস
২৪ ঘণ্টার মধ্যে কয়বার দুধ খাওয়াইতে হইবে।	১০	৯	৭	৬	৬	৫
দিনে কতক্ষণ পরে খাওয়াইতে হইবে।	২ ঘণ্টা পর পর	২½ ঘণ্টা	৩ ঘণ্টা	৩ ঘণ্টা	৩ ঘণ্টা	৪ ঘণ্টা
রাত্রে কতবার খাওয়াইতে হইবে।	১	১	১	০	০	০

অকাল প্রসূত শিশুর পক্ষে এ নিয়ম খাটে না। প্রথম ৪।৫ মাস তাহাকে ইহাপেক্ষা অধিকবার খাওয়াইতে হয়। একটি সাতমাসে প্রসূত শিশুকে প্রথম চারি, পাঁচ মাস প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই, দুই ঘণ্টা পর পর খাইতে দিতে হইত, অল্পক্ষণের জন্য মাত্র পাকস্থলীকে বিশ্রাম দিতে পারা যাইত। সে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১০।১১ বার খাইত। এই শিশু এত দুর্ব্বল হইয়া জন্মিয়াছিল যে মাতৃস্তন টানিয়া খাইতে পারিত না। মাতৃ দুগ্ধ অতি সামান্য থাইত বলিয়া তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইত না, এই কারণে তাহাকে কৃত্রিম দুগ্ধ দুই ঘণ্টা পর পর দিতে হইত। ১০।১১ বার আহারের কমে তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইত না। সপ্তম অষ্টম মাস হইতে তাহার রাত্রির আহার ক্রমে ক্রমে কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ক্রমে ১০।১১ মাসে একটু বল পাইলে তিন ঘণ্টা পর পর খাওইবার অভ্যাস করান হইয়াছিল এবং রাত্রি ১০ টার পর আর আহার দেওয়া হইত না। সুতরাং ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, উপরোল্লিখিত নিয়ম সাধারণতঃই খাটে। বিশেষ স্থলে বিশেষ নিয়মে খাওয়াইতে হয়। মাতা প্রত্যেক শিশুর অবস্থা বুঝিয়া সেইরূপে খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিবেন।

দন্তোদগম।—

"খোকার দাঁত উঠেছে।"—প্রত্যেক নবীনা মাতাই কি আনন্দোপূর্ণ গর্ব্বের সহিত এই শুভ সংবাদটি পরিবারের সকলের নিকট জ্ঞাপন করেন। খোকার পিতা প্রবাসে থাকিলে তিনি এই সুসংবাদটি শুনিয়া কত

আনন্দিত হন। নরম মাড়ি হইতে সাদা মুক্তার মত দাঁত বাহির হইতে আরম্ভ হইলে মাতার হৃদয় কি অনমুভূত আনন্দে উল্লসিত হয়। কিন্তু ইহার সহিত যে বিপদও জড়িত আছে তাহা অনেক নবীনা মাতাই জ্ঞাত নহেন। দাঁত উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর পালন সম্বন্ধে মাতার কাজ কত বাড়িয়া যায়। শিশুর আহারের পরিবর্ত্তন করিতে হয়, প্রত্যহ দাঁত মাজিয়া পরিষ্কার রাখিতে হয়। আবার দুর্ব্বল শিশু হইলে প্রত্যেকটি দাঁত উঠিবার সময়ই শিশু পীড়িত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। সুতরাং দাঁত উঠিতে আরম্ভ হইলেই মাতাকে সতর্ক হইতে হইবে।

দাঁত উঠিবার পূর্ব্বে মাড়ি ফুলিয়া শক্ত হয়। তা'রপর দাঁত বাহির হয়। শিশুর দাঁত সচরাচর ৬।৭।৮ মাসে উঠিতে আরম্ভ হয়, কখনও কখনও ৪র্থ কি ৫ম মাসে উঠিয়া থাকে। (১) অকালে প্রসূত শিশুর দাঁত ১১শ মাসে প্রথম উঠিতে দেখা গিয়াছে। দুইটি করিয়া দাঁত এক সঙ্গে উঠে। সচরাচর নীচের সম্মুখের দুইটি বাহির হয়, ক্রমে কিছু দিন পর পর অন্য দাঁত গুলি বাহির হইয়া দুই কিংবা আড়াই বৎসরের মধ্যে কুড়িটি দাঁত উঠিয়া দাঁত উঠা শেষ হইয়া যায়। দাঁত উঠা স্বাভাবিক অবস্থা। সুতরাং সুস্থ শিশুর দাঁত উঠিতে বিশেষ কোনই অসুখ হয় না। শিশু যদি পূর্ব্ব হইতেই মাতৃ দুগ্ধে কিংবা উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যে, বিশুদ্ধ বাতাসের মধ্যে যত্নের সহিত লালিত ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে তবে তাহার দাঁত উঠিতে কোন কষ্টই প্রায় হয় না। সামান্য অসুখ যাহা হয় তাহা শীঘ্রই সারিয়া যায়। কিন্তু অকাল প্রসূত, দুর্ব্বল রুগ্ন এবং অযত্নে পালিত শিশুর দাঁত উঠিবার সময় জীবন সংশয় পীড়া হয়। এ সময়ে সচরাচর সুস্থ শিশুদের পেটের অসুখ, সর্দ্দি, জ্বর, কাসি, আমাশয়, পিপাসা প্রভৃতি পীড়া হয়। প্রথম হইতেই এই সকল পীড়ার উপযুক্ত চিকিৎসা করিবে, নতুবা প্রথমে অবহেলা করিলে পরে পীড়া বৃদ্ধি হইয়া বিপদ ঘটিতে পারে। (২) দাঁত উঠিবার সময় নিকটবর্ত্তী হইলে শিশুর মুখ-গহ্বরের বিশেষ যত্ন লইবে। মাড়ি ফুলিয়া ব্যথা হইলে ধীরে ধীরে মাড়ি ঘসিলে শিশুর আরাম বোধ হইতে পারে এবং দাঁত উঠিবার পক্ষে সাহায্যও হয়। মুখের ভিতর ফুলিয়া উঠিলে ঠাণ্ডা জল একটু একটু করিয়া পান করিতে দিলে শিশু আরাম পায়। এই সময় শিশুর কোষ্ঠ যাহাতে নিয়মিত রূপে পরিষ্কার হয় তাহা দেখিবে, নিয়মিত সময়ে তাহাকে আহার করাইবে এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহার ঘুম যাহাতে হয় তাহা করিবে।

শিশুকে চিকিৎসকের অনুমতি ব্যতীত কখনও দাঁত উঠিবার কোন টোট্‌কা ঔষধ কিংবা teething powder দিবে না। এই সময়ে তাহার যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে সে দিকে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। যদি তা'র মুখ দিয়া ক্রমাগত লালা নির্গত হইতে থাকে তাহা হইলে বুকের কাপড় সর্ব্বদা ভিজা থাকে বলিয়া ব্রঙ্কাইটিস হইবার সম্ভাবনা। যাহাতে শিশুর কাপড় ভিজা না থাকে—সে দিকে দৃষ্টি রাখিবে।

শিশুর দাঁত প্রতিদিন পরিষ্কার করিবে। দুধে দাঁত ভাল হইলে তবে স্থায়ী দাঁত ভাল হইবে। দাঁতে একটু ময়লা বসিলেই তাহা পরিষ্কার করিয়া দিবে। দাঁতে পোকা লাগিবার

সম্ভাবনা কিংবা ক্ষয়ের চিহ্ন দেখিলে তৎক্ষণাৎ দন্ত চিকিৎসককে দেখাইবে। প্রত্যেক মাতাই মনে রাখিবেন যে, দাঁত খারাপ হইলে শিশুর স্বাস্থ্যও খারাপ হইয়া যায়। এক বৎসরের হইলেই শিশুর দাঁত প্রত্যহ মাজিয়া দিবে এবং সেই বয়সের উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে দিবে। শিশুর দাঁত ভাল করিয়া রক্ষা করিতে হইলে :—

(১) তাহার স্বাস্থ্য ভাল রাখিবে।

(২) দেহের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বর্দ্ধন ও পুষ্টির জন্য শিশুর জন্ম গ্রহণের পর কয়েক মাস এবং বয়োবৃদ্ধির সহিত উপযুক্ত পুষ্টিকর ও বলকারক খাদ্য দিবে।

(৩) শিশুকে কখনো dummy দিবে না।

(৪) শিশুকে এরূপ খাদ্য দিবে—যাহাতে তাহার চোয়াল এবং মুখ নাড়িয়া খাইতে হয়। ভাল করিয়া চিবাইয়া খাওয়া শিশুকে অভ্যাস করাইবে। শিশুকালের অভ্যাস কখনও ভুলিবার নয়।

(৫) শিশুকে কখনো লম্বা নল সংযুক্ত বোতলে খাওয়াইবে না। বোতলে মাতৃস্তনের বোঁটার ন্যায় বোঁটা থাকিবে। শিশু মাতৃস্তন্য যেমন টানিয়া চুষিয়া খায়, বোতলের বোঁটাও তেমনি করিয়া টানিয়া চুষিয়া খাইবে। দাঁত ও চোয়াল—ব্যবহারের জন্যই প্রদত্ত হইয়াছে। রীতিমত ব্যবহার করিলে তবে তাহারা দৃঢ় ও কার্য্যকরী হইবে।

(৬) শিশুকে তাহার খাদ্য ভাল করিয়া চিবাইয়া খাইতে শিখাইবে। দেখিবে—শিশু যেন অতি তাড়াতাড়ি কিংবা অতি আস্তে না খায়। দাঁত উঠিলে তাহাকে এমন খাদ্য দিবে—যাহা খুব ভাল করিয়া দাঁত দিয়া চিবান দরকার। দাঁতের ব্যবহারের জন্য শিশুকে কঠিন খাদ্য—যেমন রুটি টোষ্ট, শুষ্ক বিস্কুট দিবে। কঠিন খাদ্য ভাল করিয়া চিবাইয়া খাইলে দাঁতের ময়লা দূর হয়, দাঁতের ক্ষয় হয় না, দাঁত বেশ সমান হইয়া বাহির হয়।

(৭) নরম খাদ্যের টুক্‌রা দাঁতে লাগিয়া থাকিলে দাঁতের ক্ষয় হয়। দাঁতের উপর হইতেই ক্ষয় আরম্ভ হয়, ভিতর হইতে নহে। দুইটি দাঁতের মাঝখানে কিংবা দাঁতের উপরি ভাগ হইতে ক্ষয়ের সূত্রপাত হইয়াছে দেখা যায়।

(৮) প্রত্যহ একবার দাঁত পরিষ্কার করিয়া দিবে। দুইবার দিতে পারিলে আরো ভাল হয়। দুধে দাঁত ভাল হইলে পোকায় না খাইলে স্থায়ী দাঁতও ভাল হইবে। রাত্রিতে এমন কোন খাদ্য শিশুকে দিবে না— যাহার অংশ দাঁতের ফাঁকে লাগিয়া থাকিতে পারে। খাদ্যাংশ সমস্ত রাত্রি দাঁতে লাগিয়া থাকিয়া পচিয়া যায়। ইহাতে দাঁতের ঘোরতর অনিষ্ট হয়, দাঁতে পোকা লাগিয়া পড়িয়া যায়।

(১) শীঘ্র দাঁত উঠিলে সে দাঁত তত মজবুত হয় না। কারণ বিলম্বে উঠিলে শিশুর দেহ তত দিন পুষ্ট হইতে থাকিবে। শিশুর দেহ পুষ্ট হইবার পর দাঁত উঠিলে সে দাঁত অধিকতর দৃঢ় হয়।

(২) তাড়াতাড়ি দাঁত উঠিলে শিশু পীড়িত হইয়া অত্যন্ত কষ্ট পায়। দাঁত উঠিবার সময় ঐরূপ শিশুদের পুষ্টিকর অথচ লঘু খাদ্য দিবে। দুধে জল মিশাইয়া দিবে, ভারি দুধ এ সময় হজম করিতে পারিবে না। দাঁত উঠিবার সময় যে পেটের অসুখ হয় তাহা ভালই। তবে বাড়াবাড়ি হইলে কোন

ভয় নাই। তাহার অধিক হইলেই বন্ধ করিয়া দিবে। দাঁত উঠিতে আরম্ভ হইয়াছে, মাড়ি ফুলিয়া লাল এবং শক্ত হইয়াছে অথচ দাঁত বাহির হইতেছে না এরূপ হইলে চিকিৎসক দ্বারা মাড়ি চিরিয়া দিলে অনেক সময় উপকার হয়। নিজেরা কখনো চিরিয়া দিবে না, তাহাতে বিপদ ঘটিতে পারে। দাঁত উঠিবার সময় অনেক শিশুর তড়কা হয়। তড়কা হইলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসক ডাকিবে। যতক্ষণ চিকিৎসক না আসেন ততক্ষণ শিশুর মাথায় ঠাণ্ডা জল দিয়া স্পঞ্জ করিয়া হাতে সহা গরম জলে শিশুর গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া তৎক্ষণাৎ গা শুষ্ক কাপড়ে মুছিয়া গরম কাপড়ে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া রাখিবে, মাথাটি কিন্তু সর্ব্বদা ঠাণ্ডা রাখিবে। কোষ্ঠ পরিষ্কার না থাকিলে লবণ জলের পিচকারী দিয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার করিয়া দিবে। দাঁত উঠিবার সময় শক্ত জিনিস, যেমন টোষ্ট রুটির টুকরা, আকের টুকরা প্রভৃতি চিবাইতে দিলে দাঁত শীঘ্র উঠিবার সাহায্য হয়। সাধারণতঃ যে শিশুর দাঁত উঠিবার সময় যত dribble করে, তার তত কম কষ্ট হয়। এ সময়ে অনেক শিশুর মাথার মধ্যস্থলে একরকম scurt হয়, তাহা শুধু চিরুণি দিয়া কখনো আচড়াইবে না, বেশ করিয়া তেল দিয়া নরম করিয়া ফ্ল্যানেল দিয়া ঘসিয়া উঠাইয়া দিবে।

টিকা।

সাধারণতঃ সুস্থ শিশুর এক মাস বয়স হলেই তাহাকে টিকা দেওয়া হয়। সচরাচর ছয় মাসের মধ্যে টিকা দেওয়ার নিয়ম। কিন্তু দুর্ব্বল, রুগ্ন, অকাল প্রসূত শিশুদের কখনো এত অল্প বয়সে টিকা দিবে না। তাহারা বল পাইলে চিকিৎসকের দ্বারা দেহ পরীক্ষা করাইয়া তবে টিকা দিবে। এইরূপ শিশুর দেহ টিকা লইবার উপযুক্ত হইয়াছে—চিকিৎসক বলিলে তবে তাহাকে টিকা দিবে।

টিকা দিবার পর সুস্থ শিশুর বেশী কোন কষ্ট না। ৫ম হইতে অষ্টম দিনে টিকা ফুলিয়া উঠে, ২১ দিন পর্য্যন্ত টিকা ফোলা, ব্যথা, যন্ত্রণা থাকে। তাহার পর হইতে কমিতে থাকে। টিকার স্থানটি সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখিবে, যেন কোন ময়লা বসিতে না পারে কিংবা আঘাত না লাগে। টিকা ঢাকিয়া রাখিবার জন্য Vaccinating Guard কিনিয়া কিংবা তৈয়ার করিয়া টিকা ঢাকিয়া রাখিবে। কলিকাতার Smith Stanistreet, Frank Ross প্রভৃতির দোকানে ইহা Guard বিক্রয়ার্থ থাকে। ইহা শিশুর পক্ষে নিরাপদজনক এবং আরামদায়ক। ইহা দ্বারা ঢাকিয়া রাখিলে শিশুর টিকায় হাত দিবার অথবা আঁচড়াইয়া ফেলিবার সম্ভাবনা থাকে না, টিকা বেশ সুরক্ষিত অবস্থায় থাকে। টিকার স্থানটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে রাখিবে। টিকাতে ময়লা ধূলা লাগিলে লাল হইয়া ফুলিয়া অত্যন্ত কষ্ট দেয়। সুতরাং ইহা খুব পরিষ্কার রাখিবে। টিকাতে কখন কোন মলম, কি কোন প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ লাগাইবে না। প্রথম আট দিন টিকার স্থানটি বেশ করিয়া ঢাকিয়া রাখিবে, যেন শিশু তাহা নখ দিয়া আঁচড়াইয়া না দিতে পারে কিংবা কোন আঘাত না লাগে। টিকা ফুলিয়া লাল হইয়া উঠিলে কিংবা খুব কষ্টদায়ক হইলে জলে কয়েক ফোঁটা

Condy's fluid দিয়া তাহাতে একটি পরিষ্কার রুমাল কিংবা ন্যাকড়া ভিজাইয়া ভাঁজ করিয়া টিকার স্থানে বসাইয়া রাখিলে আরাম পায়। ন্যাকড়াটি সর্ব্বদা ভিজাইয়া রাখিবে। বেশী ফুলিয়া উঠিলে, লাল হইলে, খুব জ্বর হইলে, দেহের বিভিন্ন স্থানে বসন্ত বাহির হইলে চিকিৎসক ডাকিবে। এরূপ হওয়া অস্বাভাবিক না হইলেও প্রায়ই টিকা দিলে শিশু এতটা অসুস্থ হয় না। সুতরাং এ অবস্থা কখনও অবহেলা করিবেনা। শিশুর টিকার বীজ—জানিত স্থান হইতে আনিবে এবং চিকিৎসক দ্বারা টিকা দেওয়াইবে। যে সে লোক দ্বারা যে সে স্থান হইতে টিকার বীজ আনিবে না। পূর্ব্বে মানুষ এবং গরু—বাড়ীতে আনিয়া তাহাদের বীজ লইয়া টিকা দেওয়া হইত। এখন টিকার বীজ মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতাল প্রভৃতি বিখ্যাত হাঁসপাতাল হইতে কিনিতে পাওয়া যায়। সেই বীজ আনিয়া চিকিৎসককে দিয়া টিকা দেওয়াই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। টিকা দিবার পর দেখিবে যে স্নানের সময় সে স্থানটি কেহ যেন ধুইয়া না দেয়। শীতকালই টিকা দিবার প্রশস্ত সময়, বর্ষা কিংবা গ্রীষ্মকালে কখনও টিকা দিবে না, কারণ এ সময়ে ঘা শীঘ্র শুকায় না।

(ক্রমশঃ)

সূর্য্য-রশ্মির সহিত শারীরিক সম্বন্ধ।

[ডাঃ শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র দাস]

বর্ত্তমান শিক্ষার প্রভাবে আমাদের আচার ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তিরও ব্যত্যয় হইয়াছে। আর্য্য ঋষিগণের ঔষধ প্রকরণ পদ্ধতি অনেক সময় ইংরাজি শিক্ষিত কোন কোন কবিরাজ অথবা শিক্ষিত রোগী বা তাঁহার তত্ত্বাবধায়ক নিজেদের বুদ্ধি প্রাখর্য্য অবলম্বনে সহজসাধ্য করিয়া ফেলেন। তাহাতে যে ঔষধের গুণের কেবল তারতম্য হয়—তাহা নহে, একেবারে গুণহীন হইয়াই যায়—অর্থাৎ সে ঔষধের উপকারিতা শক্তি একেবারে বিলুপ্ত হয়। উদাহরণ স্বরূপ এখানে একটী প্রক্রিয়ার উল্লেখ করিব। এই প্রক্রিয়াটী আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য, আয়ু বৃদ্ধির জন্য, রোগ আরোগ্যের জন্য ও নির্ব্যাধি হইবার জন্য বিশেষ উপকারী। ইহা অতি সহজসাধ্য হইলেও অনেকে ইহা উপেক্ষা করেন। আয়ুর্ব্বেদীয় কোন কোন ঔষধ সূর্য্যপক্ক করিবার ব্যবস্থা আছে। উহা ব্যয়সাধ্য নহে, কিন্তু একটু সময় সাধ্য বলিয়া অনেকে সূর্য্যপক্ক স্থলে অগ্নিপক্ক করিয়া কাজ সারেন। তাঁহারা মনে করেন যে, তাপ হইলেই হইল। সূর্য্যাতপ ও অনলাতপের প্রভেদ তাঁহাদের তীক্ষ্ণ যুক্তিতে স্থান পায় না। তাঁহারা মনে করেন যে কতক্ষণ ধরিয়া রৌদ্রে

উত্তপ্ত করিব ?—তদপেক্ষা অত্যল্পকাল মধ্যে অগ্নিতে অতি সহজে উত্তপ্ত হইবে। কিন্তু তাহাদের একটু বিবেচনা করা উচিত যে, যদি কেবল তাপেরই প্রয়োজন হইত তাহা হইলে মহান্ ধীশক্তিসম্পন্ন সূক্ষ্মদর্শী আর্য্য-ঋষিগণের বিশাল গবেষণাপূর্ণ ও চিন্তাসাগরোত্থ শাস্ত্রসমূহে সূর্য্যপকের পরিবর্ত্তে কেবল উত্তপ্ত করিবার ব্যবস্থাই উল্লেখ থাকিত। এ স্থলে বিজ্ঞানের সাহায্যে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতটুকু সম্ভব প্রাচীন পদ্ধতির সমর্থন করিয়া একটু আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যাহা বুঝিয়াছি—তাহারই উল্লেখ করিতেছি, ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে যাহা প্রবেশ করিয়াছে—তাহাই প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি। তবে কথাটা সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হইবে কি না বলিতে পারি না।

যে সকল উপকরণে ঔষধ প্রস্তুত হয় তাহাদের কোনটী ঔষধ ও কোনটী অনুপান বা Medium। ঔষধ আরোগ্যকারী এবং অনুপান উহার শক্তিবর্দ্ধক। এস্থলে অবশ্য উল্লেখ করা উচিত যে, কেবল অনুপান শক্তিবর্দ্ধক নহে অনুপান সম্মিলনে মর্দ্দন ও আলোড়নই প্রকৃত শক্তিবর্দ্ধক। যেস্থলে সূর্য্যপকের ব্যবস্থা আছে সেস্থলে তাপালোক সমন্বিত সূর্য্যরশ্মিই (কেবল উত্তাপ নহে) ঔষধ এবং ঘৃত বা তৈল বা অন্য কোন পদার্থ যাহাকে আমরা ঔষধ মনে করি সেটী অনুপান বা Medium.—কেহ হয়ত বলিবেন, অগ্নিরও ত তাপ ও আলোক আছে। সত্য বটে, কিন্তু অগ্নির আলোক ও সূর্য্যালোক পীত ও লোহিত মিশ্রিত এবং সূর্য্যালোক শ্বেত অর্থাৎ সপ্তবর্ণ সমন্বিত। এই সপ্তবর্ণের রশ্মির দ্বারা ইথরের (Ether) যে প্রকম্পন হয় উহাও একরূপ নহে, উহাও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। ইথর সর্ব্বব্যাপী, এই প্রকম্পনও সর্ব্বব্যাপী। এই প্রকম্পনের রোগনাশিকা শক্তি আছে। লোহিত রশ্মি মস্তিষ্কের ও স্নায়ুমণ্ডলীর পক্ষে অহিতকর। সপ্তবর্ণ সমন্বিত সূর্য্যরশ্মির মধ্যে যে লোহিত রশ্মি আছে উহাও মস্তিষ্কের পক্ষে অহিতকর। তবে আর ছয়প্রকার রশ্মির সহিত মিলিত থাকায় উহার অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা কিছু লাঘব হয়। সেইজন্য বোধ হয় সৃষ্টিকর্ত্তা আমাদের মস্তক কেশগুচ্ছ দ্বারা আবৃত করিয়াছেন। সূর্য্যালোকের অন্যান্য গুণমধ্যে ব্যাধিবীজবিনাশিনী (Germicide) ও শক্তিবর্দ্ধিনী গুণদ্বয় আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ও রোগ আরোগ্যের পক্ষে বিশেষ হিতকর। ডায়োজিনিস্ (Deogines) তাঁহার বার্দ্ধক্যে শক্তিবর্দ্ধনার্থ প্রত্যহ কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া অনাবৃত গাত্রে সূর্য্যাতপে অবস্থান করিতেন। গ্রীক পণ্ডিত হিপোক্রেটিস্ শরীর সুস্থ ও নীরোগ রাখিবার জন্য মধ্যাহ্ন আহারের পর এক ঘণ্টা কাল সূর্য্যাতপে অবস্থানের ব্যবস্থা দিতেন। বৃদ্ধ প্লিনি ও তাঁহার পুত্র উভয়েই স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য সূর্য্যাতপে থাকিতেন। জনৈক ফরাসী চিকিৎসক তাঁহার এক শিশু রোগীর মাতাকে বলিয়াছিলেন যে, শিশুকে পল্লীগ্রামে লইয়া যাও এবং রৌদ্রে দগ্ধ কর। আহারের পর সূর্য্যাতপ গ্রহণ আমাদের দেশেও বহুপ্রচলিত। এখনও পল্লীগ্রামস্থ অনেক বৃদ্ধ বৃদ্ধা আহারের পর রৌদ্র পোহাইয়া থাকেন। সূর্য্যাতপ গ্রহণকালে মস্তক ও মেরুদণ্ড আবৃত থাকা আবশ্যক, এবং শরীর অনাবৃত বা পাৎলা

উড়ানি দ্বারা আবৃত রাখিতে হয়। কিন্তু আধুনিক সভ্যতায় শরীর সর্ব্বদাই আবৃত থাকে এবং মস্তক অনাবৃত থাকে। এ অবস্থায় সূর্য্যাতপ অহিতকর বই হিতকর নহে। আবার দেখুন ম্যালেরিয়া, বিসূচিকা, বসন্ত, প্লেগ, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি দেশব্যাপক রোগ সমূহ, যাহাদের কোনটী না কোনটী প্রায় প্রতি বৎসরই দেখা যায়, সেগুলি সূর্য্যের দক্ষিণায়নের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় এবং ৯ই বা ১০ই চৈত্রের পর হইতে অর্থাৎ যখন সূর্য্য বিষুবরেখা অতিক্রম করিয়া উত্তরাভিমুখে কর্কট ক্রান্তির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন উক্ত দেশব্যাপক বা epidemic পীড়া সমূহ অন্তর্হিত হয়। আবার ভাদ্রপদের ৯বম বা দশম দিবসের পর হইতে অর্থাৎ যখন সূর্য্য আবার বিষুবরেখা অতিক্রম করিয়া দক্ষিণাভিমুখে মকরক্রান্তির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে সেইকালে নানাপ্রকার ব্যাধির অভ্যুদয় দেখা যায়। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, যে সময়ে সূর্য্য আমাদের সন্নিকটে থাকে সে সময় রোগের প্রাদুর্ভাব কমিয়া যায় এবং যে ঋতুতে সূর্য্য দূরবর্ত্তী থাকে সে সময় নানাপ্রকার রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। আরও একটী কথা প্রচলিত আছে যে, রাত্রে রোগের বৃদ্ধি ও দিবসে উপশম হয়। ইহা দ্বারাও অনুমিত হয় যে, দিবালোকে রোগের উপশম ও উহার অভাবেই বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

আঠারো।

(১৮)

[কবিরাজ শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ]

—:•:—

দশের (১০) পর, আট (৮) আরও, বোধ হয় এইরূপেই সংখ্যাবাচক আঠার (১৮) শব্দের উৎপত্তি। ক্রমে একটু মহাপ্রাণ উচ্চারণে সেই "আটারো" শব্দটী, "আঠারো"য় পরিণত হইয়াছে। এই আঠারো সংখ্যাটীর উপর আর্য্য ঋষিদের ঝোঁকটা কিছু বেশী ছিল। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই কথাটা আমি অতি সংক্ষেপে সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব।

পাঠকগণ মনে করিতে পারেন—এরূপ প্রবন্ধ "আয়ুর্ব্বেদে" স্থান পাইল কেন? আমার উত্তর—আয়ুর্ব্বেদও আঠারোকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। হিন্দুর সকল শাস্ত্রই "আঠারো" লইয়া অধিক মাত্রায় নাড়াচাড়া করিয়াছেন। প্রথমেই দেখুন—হিন্দুর প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্রের, প্রাচীন ইতিহাসের নাম "পুরাণ"। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্রতাপে বৈদিকধর্ম্ম যখন লুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল

ধর্ম্মের আমূল সংস্কার কল্পনায়—তখনই "পুরাণ" শাস্ত্রের সৃষ্টি। নূতন মতকে পাছে "নূতন" বলিয়া ধিক্কৃত হইতে হয়, সেই জন্যই সেই নূতন শাস্ত্রের "পুরাণ" নাম রাখা হইয়াছিল। "পুরাণ" পুরাতন শব্দেরই অপভ্রংশ। 'পুরাণ' বৌদ্ধ-বিপ্লব হইতে হিন্দু ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়াছিল। বহু দেবদেবীর অবতারণা করিয়া, বহু বংশের ইতি কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া, "পুরাণ" ভারতে নবযুগের সূচনা করিয়াছিল। পুরাণের উপদেশে, গাথা-কৌশলে, রচনা গৌরবে, সমাজের গতি ফিরিয়াছিল। এ হেন মহাশাস্ত্র "পুরাণ"—তাহার সংখ্যা মাত্র আঠারো খানি।

তাহার পর ধরুন—শালগ্রাম। হিন্দুর বিবাহ বলুন, উপনয়ন বলুন, শ্রাদ্ধ বলুন, ব্রত, পূজা বলুন, সকল কাজেই শালগ্রাম শিলার প্রয়োজন। হিন্দু গৃহস্থের একমাত্র আরাধ্য এই শালগ্রাম শিলাও সংখ্যায় আঠারোটী।

পাপীকে পাপ পথ হইতে ফিরাইবার জন্য —সকল জাতির মহাকবিই প্রকৃতির বিশাল চিত্রপটে নরকের রুদ্রমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন, হিন্দুমতে সেই নরকের সংখ্যাও আঠারোটী।

এই জ্ঞান ও কর্ম্মের বিরাট কেন্দ্র ভারতবর্ষে যে সকল ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহাদের সংখ্যাও আঠারোটী। যথা;—১। সংস্কৃত। ২। প্রাকৃত। ৩। উদীচী। ৪। মহারাষ্ট্রী, ৫। মাগধী, ৬। অর্দ্ধ মাগধী, ৭। শকাভীরী, ৮। শ্রবন্তী, ৯। দ্রাবিড়ী, ১০। উৎকলী ১১। পাশ্চাত্য, ১২। প্রাচ্য, ১৩। বাহ্লিক, ১৪। আবন্তিক, ১৫। দাক্ষিণাত্য, ১৬। পৈশাচী ১৭। কুর্চ্চী (আবন্তী) ১৮। শৌরসেনী। যিনি এই সকল ভাষায় গূঢ় রহস্য অবগত ছিলেন, সেই "সাহিত্য দর্পণ"কার বিশ্বনাথের গৌরবময় বিশেষণ—"অষ্টাদশ ভাষা বার বিলাসিনী ভুজঙ্গ"।

হিন্দু চিরদিন মুক্তি পিপাসু। মুক্তি তাহার জীবনের লক্ষ্য। ত্রিবিধ দুঃখ হইতে মুক্তি লাভের জন্যই—তাহার জপ, তপ, সাধনা। কিন্তু সেই মুক্তি পথের বিঘ্নও পুত্র কলত্রাদি লইয়া ১৮টী। "পুরুষোত্তম"—ভারতের পুণ্য তীর্থ, এই পুরুষোত্তমে গিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকে দেখিতে হইলে, ভক্তকে ১৮টী নালা পার হইতে হয়।

প্রবল শত্রু কর্ত্তৃক উৎপীড়িত ব্যক্তিকে সান্ত্বনাময় সহানুভূতি জানাইয়া লোকে বলিয়া থাকে—"বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা।"

দীর্ঘ সূত্রির কলঙ্কে কটাক্ষ করিয়া, লোকে বলে—"তোমার আঠারো মাসে বছর!"

হিন্দুর মহাকাব্য "মহাভারত।" এই অপূর্ব্ব ইতিহাসের রচয়িতা—স্বয়ং ব্যাসদেব। ব্যাসদেবের সঙ্গে ১৮ সংখ্যার বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা;—

১। মহাভারতের পর্ব্ব ১৮টী।

২। মহাভারতে কুরু-পাণ্ডবের যে যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে, সে যুদ্ধের ব্যাপ্তি-কাল ১৮ দিন।

৩। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষে যে সকল সৈন্যের সমাবেশ হইয়াছিল—তাহাদের সংখ্যা ১৮ অক্ষৌহিনী।

৪। কৌরব কুল নির্ম্মূল হইলেও ধৃতরাষ্ট্র বাঁচিয়াছিলেন—১৮ বৎসর।

৫। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের অবসানে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজত্ব করিয়াছিলেন—১৮×২=৩৬ বৎসর।

৬। মহাভারতের অন্তর্গত "শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা"—১৮ অধ্যায়ে বিভক্ত।

৭। মহাভারতের আর একটী নাম—"জয়"। * এই 'জন্যই প্রত্যেক পর্ব্বের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ দেখা যায়—

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয় মুদীরয়েৎ॥

লঘু আর্য্য সিদ্ধান্তের মতে—"ক" হইতে "ঞ" পর্য্যন্ত অক্ষর গুলি, যথাক্রমে—১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ০,—এই কয়টী সংখ্যা বাচক। "ট" হইতে "ন" পর্য্যন্ত বর্ণগুলিও যথাক্রমে দশটী সংখ্যার বোধক। য, র, ল, ব প্রভৃতি অক্ষর গুলির দ্বারা—যথাক্রমে ১, ২, ৩, ৪, প্রভৃতি সংখ্যা স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। এই নিয়ম অনুসারে, "জ" ও "য়" এই দুইটী বর্ণ ৮ ও ১ সংখ্যার দ্যোতক। এক্ষণে "অঙ্কানাং বামতো গতিঃ" এই বিধানে "জয়" শব্দটী (১৮) আঠারো সংখ্যার বোধক হইতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে,—মহাকাব্য মহাভারতে কেবল "আঠারোর"ই লীলা!!

ভরত শাস্ত্রের মতে—৬ রাগের, প্রত্যেকের ৩টী মহাশক্তি, এই হিসাবে প্রথমে ১৮ রাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছিল। পরে কলাবিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এক একটী রাগিণীর এক একটী সখী কল্পিত হয়। মূল রাগিণী ও সখী লইয়া—ক্রমে ৩৬ রাগিণীর উৎপত্তি। এখন রাগিণী-সম্বন্ধ 'দোষে—অনেক আকৃতিতে পরিণত হইয়াছে।

তন্ত্রেও ১৮র আধিপত্য দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—তারিণী তন্ত্রে—

"প্রতিমাষ্টাদশাঙ্গুলা ন্যূনাধিক্যং ন কারয়েৎ।
অজ্ঞানেনাপি মোহেন যদি কুর্য্যান্নরাধমঃ।
প্রতিষ্ঠা বিফলা তস্য পূজনান্নিষ্ফলং ভবেৎ॥"

মৃত্তিকা নির্ম্মিত লিঙ্গ প্রতিমা—১৮ অঙ্গুলি প্রমাণ করা উচিত। ইহার কম কিম্বা বেশী করিলে প্রতিষ্ঠার ফল পাওয়া যায় না।

মাতৃকা মন্ত্রের অক্ষর ১৮টী।

"জপেন্মন্ত্রী মাতৃকায়া মন্ত্রমষ্টাদশাক্ষরীং।"

তাং ভং।

সিদ্ধি লিপ্সুর মন্ত্রস্থান ১৮টী। যথা—১। গোষ্ঠ, ২। দেবালয়, ৩। শ্মশান, ৪। কান্তার, ৫। পর্ব্বত, ৬। চতুষ্পথ, ৭। নদীতট, ৮। গোগৃহ, ৯। গুহা। ১০। মহাপীঠ, ১১। তীর্থ, ১২। মঙ্গল কুট্টক, ১৩। শৃঙ্গ, ১৪। কুশাবর্ত্ত, ১৫। ব্রহ্মাবর্ত্ত, ১৬। বিল্বমূল, ১৭। নির্জ্জন, ১৮। বক।

পূজার প্রিয়-পুষ্প ১৮টী,—১। কোকনদ ২। পুণ্ডরীক, ৩। অর্ক, ৪। অপরাজিতা, ৫। বন্ধুক, ৬। কর্ণিকার, ৭। করবীর, ৮। বক। ৯। জাতী, ১০। বকুল, ১১। ক্ষৌমপুষ্প, ১২। নাগকেশর, ১৩। কদম্ব, ১৪। যূথিকা, ১৫। জয়ন্তিকা, ১৬। কুরুবক, ১৭। মল্লিকা, ১৮। ওড়্র (জবা)।

দান পদার্থও ১৮টী। ১। অন্ন, ২। জল, ৩। শয্যা, ৪। গৃহ। ৫। ভূমি, ৬। ক্ষীর, ৭। বস্ত্র, ৮। তৈজস, ৯। মধু, ১০। ফল, ১১। স্বর্ণ, ১২। ধেনু, ১৩। কুম্ভ, ১৪। আসন, ১৫। ছত্র, ১৬। পাদুকা, ১৭। তৈজস, ১৮। বিদ্যা।

মন্ত্র স্থাপনের পত্র ১৮টী। ১। পর্ণ, ২। বিল্ব, ৩। তুলসী, ৪। মান, ৫। বট, ৬। অশ্বত্থ, ৭। প্লক্ষ, ৮। উড়ুম্বর, ৯। হরিদ্রা, ১০। কদলী, ১১। ভূর্জ্জ, ১২। তাল, ১৩। হিন্তাল, ১৪। কচ্চী, ১৫। শাল, ১৬। পলাশ, ১৭। তমাল, ১৮। পদ্ম।

সিদ্ধির উপায় ১৮টী। ১। ত্যাগ, ২। শৌচ, ৩। আচার, ৪। প্রক্ষালন, ৫। স্নান, ৬। গঙ্গ, ৭। আচমন, ৮। পূজা, ৯। নিবেদন, ১০। বলি, ১১। ভক্তি, ১২। জপ, ১৩। স্তোত্র, ১৪। তর্পণ, ১৫। সত্য, ১৬। দৈন্য, ১৭। বিশ্বাস, ১৮। শ্রবণ।

মহাপাতক ১৮টী। ১। অভক্ষ্য ভক্ষণ, ২। পরদারাভিগমন, ৩। প্রতারণা, ৪। দস্যুতা, ৫। হত্যা, ৬। বিশ্বাসঘাতকতা, ৭। সুরাপান, ৮। অসত্য, ৯। লোভ, ১০। গুরুনিন্দা, ১১। হিংসা, ১২। কুৎসা, ১৩। কাকু, ১৪। ধর্ম্মগ্লানি, ১৫। আত্মহা, ১৬। অবমাননা, ১৭। পীড়ন, ১৮। শুক্র বিক্রয়।

মহাশক্তি ১৮টী, দশমহাবিদ্যা ও অষ্ট নায়িকা। ব্যাধি—যমের অনুচর। সেই ব্যাধির সংখ্যা—১৮ কোটি। যথা—

"অষ্টাদশ কোটিব্যাধি অনুচর যা'র,
সেই যম—হের বৎস! সম্মুখে তোমার।"

আমাদের আয়ুর্ব্বেদেও ১৮র প্রভাব বড় কম নহে।

রোগের উপসর্গ ১৮টী। ১। দাহ, ২। কম্প, ৩। বমন, ৪। প্রলাপ, ৫। মূর্চ্ছা, ৬। হিক্কা, ৭। শ্বাস, ৮। কাস, ৯। অতিসার, ১০। তন্দ্রা, ১১। অরুচি, ১২। স্বেদ, ১৩। তৃষ্ণা, ১৪। জড়তা, ১৫। বিবন্ধ, ১৬। আধ্মান, ১৭। ভ্রম, ১৮। আক্ষেপ।

ক্ষয় রোগ ১৮ প্রকার।

কুষ্ঠ রোগ ১৮ প্রকার।

সূতিকা গৃহে—শিশু মাতৃকা কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে—১৮ দিনেই প্রায় তাহার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।*

ঠিক ১৮ বৎসর বয়সে স্ত্রীলোকের গর্ভ হইলে—তাহার এবং শিশুর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

ভবেত্তু যা গর্ভবতী কুমারী
কুমারিহষ্টাদশ বর্ষকালে।
সা মৃত্যু মায়াতি ততশ্চ বালঃ
উবাচ মুগ্ধে! জতুকর্ণ ইত্থং॥

হরি চন্দ্র।

ভূনিম্বাদ্যষ্টাদশাঙ্গ।

ভূনিম্ব দারু দশমূল মহৌষধাব্দ
তিক্তেন্দ্র-বীজ ধনিকেভকণা কষায়ঃ।
তন্দ্রা প্রলাপ কসনারুচি দাহ মোহ
শ্বাসাদি যুক্ত মখিলং জ্বর মাশু হন্তি॥

১। চিরাতা, ২। দেবদারু, ৩। বেল-ছাল, ৪। শোনাছাল, ৫। পারুল ছাল, ৬। গাম্ভারী ছাল, ৭। গণিয়ারী ছাল, ৮। শালপাণি, ৯। চাকুলে, ১০। কণ্টিকারী, ১১। বৃহতী, ১২। গোক্ষুর, ১৩। শুঁঠ, ১৪। মুথা, ১৫। কটুকী, ১৬। ইন্দ্রযব, ১৭। ধনে, ১৮। গজপিপুল;—এই ১৮ খানি দ্রব্যের ক্বাথ পান করিলে—তন্দ্রা, প্রলাপ, কাস, অরুচি, দাহ, মোহ ও শ্বাসাদি যুক্ত সমস্ত জ্বর শীঘ্র প্রশমিত হয়।

* বাল-তন্ত্র দেখ।

অষ্টাদশাঙ্গঃ।

দশমূল শটী শৃঙ্গী পৌষ্করং স দুরালভং।
ভার্গী কুটজ বীজঞ্চ পটোলং কটুরোহিণী।
অষ্টাদশাঙ্গ ইত্যেষ সন্নিপাত জ্বরাপহঃ।
কাস-হৃদ্ গ্রহ-পার্শ্বার্ত্তি শ্বাস-হিক্কা বমী হরঃ।

১। বেল, ২। শোনা, ৩। পারুল, ৪। গাম্ভারী, ৫। গণিয়ারী, ৬। শালপাণি, ৭। চাকুলে, ৮। গোক্ষুর, ৯। বৃহতী, ১০। কণ্টিকারী, ১১। শটী, ১২। কাঁকড়া-শৃঙ্গী, ১৩। কুড়, ১৪। দুরালভা, ১৫। বামন হাটী, ১৬। ইন্দ্রযব, ১৭। পলতা, ১৮। কট্‌কী;—এই ১৮ দ্রব্যের কাথ, পার্শ্ব-শূল, শ্বাস, হিক্কা এবং বমি নষ্ট হইয়া থাকে।

মুস্তাদ্যষ্টাদশাঙ্গঃ।

মুস্ত-পর্প্পটকোশীর দেবদারু মহৌষধং।
ত্রিফলা ধন্বযাসঞ্চ নীলি কম্পিল্লকং ত্রিবৃৎ॥
কিরাত তিক্তকং পাঠা বলা কটুক রোহিণী।
মধুকং পিপ্পলী মূলং মুস্তাদ্যোগণ উচ্যতে॥
অষ্টাদশাঙ্গ মুদিত মেতদ্বা সন্নিপাতনুৎ।
পিত্তোত্তরে সন্নিপাতে হিতমুক্তং মনীষিভিঃ॥
মন্যাস্তম্ভে উরোঘাতে উরঃ পার্শ্ব-শিরো গ্রহে॥

১। মুথা, ২। ক্ষেৎপাপড়া, ৩। বেণার-মূল, ৪। দেবদারু, ৫। শুঁঠ, ৬। হরীতকী ৭। বহেড়া, ৮। আমলা, ৯। নীল, ১০। কমলাগুড়ি, ১১। তেউড়ীমূল, ১২। চিরাতা, ১৩। আকনাদি, ১৪। বেড়েলা, ১৫। কট্‌কী, ১৬। যষ্টিমধু, ১৭। দুরালভা, ১৮। পিপুল মূল;—ইহার নাম মুস্তাদ্যগণ অথবা অষ্টা-দশাঙ্গ। এই আঠারো খানি দ্রব্যের কাথ পান করিলে, সন্নিপাত নষ্ট হয়। পিত্তোল্বন সন্নিপাতে ইহা হিতকর এবং মন্যাস্তম্ভ, উরু-ঘাত, হৃৎশূল, পার্শ্বশূল শিরঃশূল প্রভৃতি রোগেও ইহা উপকারী।

দ্রাক্ষাদ্যষ্টাদশাঙ্গঃ।

দ্রাক্ষা-তিক্তামৃতাশৃঙ্গী মুস্ত ভূনিম্ব-চন্দনং।
দুস্পর্শোশীর ধন্যাক পদ্মকারিষ্ট পুষ্করং॥
ক্ষুদ্রাশুণ্ঠী শটী পাঠা বালকৈঃ কৃথিতং জলং।
জীর্ণ জ্বরারুচি শ্বাস কাস শ্বয়থু নাশনং॥

১। দ্রাক্ষা, ২। কট্‌কী, ৩। গুলঞ্চ, ৪। কাঁকড়া শৃঙ্গী, ৫। মুথা, ৬। চিরাতা, ৭। রক্তচন্দন, ৮। দুরালভা, ৯। বেণার-মূল, ১০। ধনে, ১১। পদ্মকাষ্ঠ, ১২। নিম-ছাল, ১৩। কুড়, ১৪। কণ্টিকারী, ১৫। শুঁঠ, ১৬। শটী, ১৭। আকনাদি, ১৮। বালা;—এই ১৮ দ্রব্যের কাথ পান করিলে জীর্ণজ্বর, অরুচি, শ্বাস, কাস এবং শোথ আরোগ্য হইয়া থাকে।

অষ্টাদশাঙ্গ চূর্ণং।

বাসা লাক্ষাশ্বগন্ধাচ শটী শুণ্ঠী পুনর্নবাঃ।
ত্বগেলা কেশরং কৃষ্ণা তালীশং চব্য কটফলং॥
বচা শৃঙ্গী গুডা পার্থং নিদিগ্ধিকা তথৈ বচ।
এতানি সম ভাগানি শ্লক্ষ্ণ চূর্ণানি কারয়েৎ॥
তচ্চূর্ণং মধুনা লিহ্যাদ্যাসমেকং নিরন্তরং।
নিহন্তি রক্তপিত্তঞ্চ শ্বাস কাস ক্ষয়ং তথা।
ভাষিতং মুনি দেবেন অষ্টাদশাঙ্গ সংজ্ঞিতং॥

১। বাসকমূল, ২। লাক্ষা, ৩। অশ্ব-গন্ধা, ৪। শটী, ৫। শুঁঠ, ৬। পুনর্নবা, ৭। দারুচিনী, ৮। এলাচ, ৯। নাগেশ্বর, ১০। পিপুল, ১১। তালীশপত্র, ১২। চই, ১৩। কট্‌ফল, ১৪। বচ, ১৫। কাঁকড়াশৃঙ্গী,

১৬। বংশলোচন, ১৭। অর্জ্জুন ছাল, ১৮। কণ্টিকারী,—এই ১৮টী দ্রব্যের চূর্ণ মধুর সহিত ১ মাস লেহন করিলে, রক্তপিত্ত, শ্বাস, কাস এবং ক্ষয় রোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

আর অধিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিবার আবশ্যকতা দেখি না—প্রবন্ধ ক্রমে দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক—একটু কষ্ট করিলেই দেখিতে পাইবেন—আয়ুর্ব্বেদে এমন অনেক ঔষধ আছে, যাহা ১৮ খানি উপাদানে প্রস্তুত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতে পারি—আমবাত ও শীতপিত্তাদি রোগে—"অষ্টাদশাঙ্গ গুগ্‌গুলু"; মহাকুষ্ঠে—"অষ্টাদশাঙ্গ লেপ" প্লীহা যকৃদধিকারে—"অষ্টাদশ পিপ্পলী" বাতব্যাধির "অষ্টাদশ শতিক প্রসারণী তৈল"—প্রভৃতি সিদ্ধযোগ গুলি—(১৮) আঠারোর মহিমাই ঘোষণা করিতেছে।

পূর্ব্বে প্রসবান্তে প্রসূতিকে সূতিকাগৃহে ঝাল খাওয়াইবার ব্যবস্থা ছিল। বাহিরে "তাপ" (স্বেদ দেওয়া) ভিতরে "ঝাল,"—এই "তাপ ঝাল" প্রসূতির শরীরে নূতন জীবনী শক্তি আনিয়া দিত। সে ঝালের মসলা ছিল ১৮ খানি। যথা;—

১। মরিচ, ২। পিপুল, ৩। শুঁঠ, ৪। লবঙ্গ, ৫। জয়ত্রী, ৬। ছোট এলাচ, ৭। শটী, ৮। দারুচিনী, ৯। কৃষ্ণজীরা, ১০। যোয়ান, ১১। মেথী, ১২। বচ, ১৩। গিলা, ১৪। জায়ফল, ১৫। মৌরী, ১৬। চৈ, ১৭। রাধুনী, ১৮। তেজপত্র। এই "ঝাল মসলা" চূর্ণ করিয়া, উক্ত ঘৃতের সহিত শিশু জননীকে খাওয়ান হইত। এখন এ বালাই উঠিয়া গিয়াছে। 'চা' 'ব্রাণ্ডী'—এখন "ঝালের" আসন গ্রহণ করিয়াছে। পাছে অগ্নি তাপে ও ধূম্রের কালিমায় বিলাসিনীর কাঞ্চন তনু বিবর্ণ হইয়া যায়,—তাই আতুর গৃহে "হরির লুটের" মৌলিক মৌরসী স্থাপিত হইয়াছে!!

আগেকার গৃহিণীগণ—শিশুকে সুস্থ রাখিবার জন্য, মাঝে মাঝে "আলুই" খাওয়াইতেন। "আলুই"-প্রসাদে শিশুর সহসা রোগ হইত না। নব্যবঙ্গ কামিনী, আলুই প্রস্তুত ভুলিয়া গিয়াছেন। "আলুই" ১৮ খানি মস্‌লায় প্রস্তুত হইত। ১। কালমেঘ, ২। নিসিন্দাপাতা, ৩। বেলপাতা, ৪। যোয়ান, ৫। রাঁধুনী, ৬। বড়এলাচ, ৭। বহেড়ার শাঁস, ৮। তুলসী মঞ্জরী, ৯। সজীনা বীজ, ১০। আদা, ১১। নাগদোনা, ১২। পানের বোঁটা, ১৩। জায়ফল, ১৪। মৌরী, ১৫। মরিচ, ১৬। আকরকোরা, ১৭। আমের কেশী, ১৮। বেলশুঁঠ।

দন্তোদ্ভব কালে শিশুদের অনেক রোগ হইয়া থাকে—উদরাময়, আক্ষেপ (রস তড়কা) ইত্যাদি। এই সকল বিঘ্ন নিবারণের জন্য সেকালের গৃহিণীগণ শিশুর কটিদেশে ১৮টী নিম্ববৃক্ষের ফল—সূত্রে গাঁথিয়া পরাইয়া দিতেন। এ প্রথা এক্ষণে রূপান্তরিত হইয়াছে;—এখন ঐশ্বর্য্য প্রকাশের জন্য—শিশুর কটিদেশে সোণার নিমফল পরান হইয়া থাকে।

যখন কেশ তৈলের এত ছড়াছড়ি ছিল না, তখন নারীগণ—"মাথাঘষা"র সুরভি দিয়া কেশ সংস্কার করিতেন। ঐ মাথ ঘষার মসলাও ছিল ১৮ খানি। ১। একাঙ্গী ২। শ্বেতচন্দন, ৩। অগুরু, ৪। কালীয়ক, ৫। জটামাংসী, ৬। মুরামাংসী, ৭। কাকুল ৮। শৈলজ, ৯। দনা, ১০। তাম্বুল, ১১

মেথী, ১২। আমলা, ১৩। লতাকস্তুরী, ১৪। ঘোড়বচ, ১৫। গোলাপফুল, ১৬। রেণুক, ১৭। বেণারমূল, ১৮। নাগেশ্বর।

বিষ কন্যার বয়স যখন ১৮ বৎসর হয়, তখন তাহার দেহে—পূর্ণ বিষ বিকাশ লাভ করিয়া থাকে।

মানুষের বিপদ ১৮ প্রকার ;—১। ঋণ, ২। রোগ, ৩। দুর্ভিক্ষ, ৪। অনাবৃষ্টি, ৫। ঈতি, ৬। বিবাদ, ৭। চৌর্য্য, ৮। কুগ্রহ, ৯। প্রভুকোপ, ১০। জাতি-নাশ, ১১। শোক ১২। বৃত্তি-হানি, ১৩। অকীর্ত্তি, ১৪। কুলক্ষয়, ১৫। গৃহদাহ, ১৬। অভিচার, ১৭। প্রবাস, ১৮। রাজ-রোষ।

আসব বিধান মতে—সন্ধান ১৮ প্রকার। ১। কোহল, ২। অরিষ্ট, ৩। আসব, ৪। সুরা ৫। প্রসন্না, ৬। শীধু, ৭। কাকোলী, ৮। বারুণী, ৯। মৈরেয়, ১০। সৌবীর, ১১। কাঞ্জিক, ১২। শুক্ত, ১৩। চুক্র, ১৪। শিখরিণী, ১৫। মধুলিকা, ১৬। বব্বলী, ১৭। গৌড়ী, ১৮। শীতরস।

নির্ঘণ্ট মতে—দ্রব্যের শ্রেণী ১৮ প্রকার, ১। দীপন, ২। পাচন, ৩। শমন, ৪। অনুলোমন, ৫। স্রংসন, ৬। ভেদন, ৭। রেচন, ৮। বমন, ৯। শোধন, ১০। ছেদন, ১১। লেখন, ১২। সংগ্রাহী, ১৩। স্তম্ভন, ১৪। রসায়ন, ১৫। বাজীকর, ১৬। প্রবর্ত্তক, ১৭ ক্ষয়কর, ১৮। মদকর।

কশ্যপের মতে বিষনাশক অগদ ১৮টী। ১। পুনর্ণবা, ২। ক্যালাকড়া, ৩। কাঁটা শিরীষ, ৪। গৃহধূম, ৫। দারুহরিদ্রা, ৬। সিদ্ধার্থ, ৭। তাম্র, ৮। তগর পাদুকা, ৯। বন্ধ্যা কর্কোট; ১০। মূত্র, ১১। অর্কমূল, ১২। তুলসী, ১৩। গোরোচনা, ১৪। মদন ফল, ১৫। হিং, ১৬। আকনাদি, ১৭। আতইচ, ১৮। জলৌকা।

রাবণোক্ত শিব নির্ম্মাল্য ধূপের উপাদান ১৮ খানি। ১। সর্জ্জরস, ২। শিলারস, ৩। দেবদারু, ৪। রক্তচন্দন, ৫। শ্বেতচন্দন, ৬ গাঁঠিয়ালা, ৭। নিম্বপত্র, ৮। কর্পূর, ৯। জয়ন্ত্রী, ১০। কুঙ্কুম, ১১। শিখীপুচ্ছ, ১২। রুদ্রাক্ষ, ১৩। সরল, ১৪। জটামাংসী, ১৫। পদ্মকাষ্ঠ, ১৬। গুগ্‌গুলু, ১৭। সর্ষপ, ১৮। ঘৃত। এই ধূপে গ্রহ ও অলক্ষ্মী নিবারিত হইয়া থাকে।

অপমৃত্যুর প্রতিকার ১৮ প্রকার :—১। নস্য, ২। বমন, ৩। পার্শ্ব পীড়ন, ৪। দাহ, ৫। বন্ধন, ৬। ছেদন, ৭। আকর্ষণ, ৮। সন্তাড়ন, ৯। স্বেদ, ১০। মর্দ্দন, ১১। প্রলেপ, ১২। শোষণ, ১৩। বিরেচন, ১৪। ফুৎকার, ১৫। ঘর্ষণ, ১৬। সমবল, ১৭। শ্বাস প্রবর্ত্তন, ১৮। মন্ত্র।

বিষ-বৈদ্যদের মতে—সর্প দংশনের চিকিৎসাও ১৮ প্রকার। ১। উদ্বর্ত্তন, ২। আচুষণ, ৩। দহন, ৪। ছেদন, ৫। বন্ধন, ৬। মন্ত্র, ৭। রত্ন, ৮। শিরাবেধ, ৯। রক্তমোক্ষণ, ১০। লেখন, ১১। অগদ, ১২। বমন, ১৩। অঞ্জন, ১৪। সেচন, ১৫। বিরেচন, ১৬। প্রধমন, ১৭। দুন্দুভি বাদ্য, ১৮। নির্হরণ।

চৈত্য বৃক্ষ (দেবাধিষ্ঠিত বৃক্ষ) ১৮টী। ১। বট, ২। অশ্বত্থ, ৩। প্লক্ষ, ৪। নিম্ব, ৫। বিল্ব, ৬। উড়ুম্বর, ৭। শিংশপা, ৮। খদির, ৯। তুলসী, ১০। শমী, ১১। শাল্মলী, ১২। তাল, ১৩। নারিকেল, ১৪। দেবদারু, ১৫। কাঞ্চনার, ১৬। আখোট, ১৭। বিভীতক, ১৮। তিন্তিড়ী।

গর্ভপাতের কারণ ১৮টী। ১। ব্যায়াম, ২। উপবাস, ৩। মৈথুন, ৪। যানারোহণ, ৫। রক্ত মোক্ষণ, ৬। উচ্চভাষ, ৭। উৎকটাসন, ৮। পতন, ৯। কঠিন শয্যা, ১০। উদ্বর্ত্তন, ১১। রাত্রি জাগরণ, ১২। শোক, ১৩। বেগধারণ, ১৪। ক্রোধ, ১৫। ভয়, ১৬। নির্জ্জনবাস, ১৭। দ্রুত ধাবন, ১৮। ভারোত্তোলন।

সুস্থ ব্যক্তির নিশ্বাস—মিনিটে ১৮ বার।

১৮ দিন, ১৮ মাস, ১৮ বছর, অতীত না হইলে নাকি শৃগাল কুক্কুর দষ্ট ব্যক্তির "জলাতঙ্কের" ফ্রাঁড়া কাটে না।

স্বর্গ বেশ্যার সংখ্যা ১৮টী। রম্ভা, মিশ্রকেশী ইত্যাদি।

সম্পদের চিহ্ন ১৮টী। হয়, হস্তী, প্রভৃতি।

মালদহের কঙ্কাই জাতি—পূর্ব্বে ১৮ প্রকার তুলার চাষ করিত।

বৈষ্ণব যুগে ১৮ জন পদকর্ত্তা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

ভারতের উপাসক সম্প্রদায় ১৮ ভাগে বিভক্ত।

রতি-বন্ধ ১৮ প্রকার।

নীত্যনুশাসন ১৮টী। চিত্তবিকার ১৮ প্রকার। বাদ্য যন্ত্র ১৮ প্রকার। বাদ্য যন্ত্রের তালও ১৮ প্রকার,—১। চৌতাল, ২। রুদ্রতাল, ৩। পটতাল, ৪। ব্রহ্মতাল, ৫। ধর্ম্মতাল (ধামার) ৭। ঝম্পতাল (ঝাপতাল) ৮। ত্রিতালী (কাওয়ালী, তেতালা) ৯। যতি (যৎ) ১০। দেবতাল (ফোরদস্ত) ১১। তিওট্ট, ১২। রূপক, ১৩। সুরফাক্তা, ১৪। একতালা, ১৫। কাহারবা, ১৬। দাদরা, ১৭। দশকোশী, ১৮। তেওরা।

শিল্প শাস্ত্রের মতে—বস্ত্র ১৮ প্রকার। ১। ক্ষৌম, ২। শাণ, ৩। কার্পাস, ৪। ঊর্ণ, ৫। অংশুপট্ট, ৬। কৌশেয়, ৭। কুতপ, ৮। কম্বল, ৯। সূক্ষ্ম, ১০। কুশাগ্রীয়, ১১। চীনাংশুক, ১২। পুষ্পরক্ত, ১৩। আবিক, ১৪। বাদর, ১৫। রাঙ্কব, ১৬। দুগূল, ১৭। আতসী, ১৮। পার্ব্বতী।

প্রাচীন মতে—প্রধান রাজকর্ম্মচারীর সংখ্যাও ১৮। ১। মহাব্যূহপতি, ২। মহাসান্ধিবিগ্রহিক, ৩। মহাসর্ব্বাধিকৃত, ৪। মহাপ্রতীহার, ৫। কোট্টপাল (দুর্গরক্ষক) ৬। দোঃসাধসাধনিক (গ্রাম পরিদর্শক) ৭। চৌরোদ্ধবণিক (পুলিশ কর্ম্মচারী বিশেষ) ৮। নৌবলব্যাপৃতক, ১০। হস্তি ব্যাপৃতক, ১১। অশ্বাধ্যক্ষ, ১২। গবাধ্যক্ষ, ১৩। গৌল্মিক, ১৪। শৌল্কিক (শুল্ক সংগ্রহকারী) ১৫। দাণ্ডপাশিক, ১৬। মহাক্ষপাটলিক, ১৭। বিষয়পতি, ১৮। মহামাণ্ডলিক।

বৈদিক যুগে—স্তোচনী (নথ) সুবর্ণখাদী (খাড়ু) প্রবর্ত্ত (কুণ্ডল) প্রভৃতি অষ্টাদশ বিধ অলঙ্কার ব্যবহৃত হইত।

পল্লী-প্রসঙ্গ।

এবার কলিকাতায় বসন্তের প্রকোপ কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। মফঃস্বলের স্থানে স্থানেও, ইহার প্রকোপ কম নহে। মেদিনীপুরের সহযোগী "নীহারে" প্রকাশ,—

বসন্তের প্রকোপ—কাঁথি সহরের উপর ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী দারুয়া, খাগড়াবনী ও ভগবানপুর প্রভৃতি গ্রামে সম্প্রতি বসন্তের ভীষণ প্রকোপ চলিয়াছে। বহুলোকে এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত রহিয়াছে এবং অনেকেও মারা যাইতেছে। ইতিমধ্যে ঐ সকল স্থানে অনেকগুলি লোক বসন্তে আক্রান্ত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছে এবং এখনও উহাতে লোকে মারা যাইতেছে। বসন্ত এরূপ মারাত্মকভাবে সংক্রামিত হওয়ায় পল্লীবাসীদের একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে।

এই রোগের সংক্রামকতার সময় যে টীকা লওয়ার প্রয়োজন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি ইহার জন্য যে সুব্যবস্থা করিয়াছেন মফঃস্বলে সেরূপ নাই। মেদিনীপুরের "নীহার" বসন্তের প্রকোপের সংবাদ দানের পরই লিখিতেছেন,—

সকলে টীকা লইবার জন্ত এতদূর আগ্রহান্বিত হইয়াছে যে, কমিটীর নিযুক্ত টীকাদার অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াও সকলকে টীকা দিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। কমিটী একজন টীকাদার নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহাকেই গ্রামে গ্রামে গিয়া টীকা দিতে হইতেছে। এইরূপ ব্যবস্থায় এখন এখানে বহুলোকেরই টীকা হইয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু সর্ব্বত্রই যাহাতে এখন বিনামূল্যে সকলকে টীকা দিবার ব্যবস্থা হয়, তাহার উপায় বিধান করিবার জন্ত আমরা আমাদের জেলা-বোর্ড কর্ত্তৃপক্ষকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।

"নীহারে"র লেখায় বুঝা গেল, সেখানে যাহোক একজনও টীকাদার নিয়োগের ব্যবস্থা হইয়াছে, তবে লোক সংখ্যার তুলনায় মাত্র একজন টীকাদার যথেষ্ট নহে। কিন্তু ২৪শ পরগণার স্থানে স্থানে টীকাদার নিয়োগের কোনো ব্যবস্থাই করা হয় নাই জানিয়া আমরা দুঃখিত হইতেছি। "ডায়মণ্ড হারবার হিতৈষী"তে প্রকাশ,—

টীকাদার চাই।—ডায়মণ্ডহারবার মগরাহাট থানার নেরপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বসন্তের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। * * * কিন্তু টীকাদারের সঙ্গে কয়েক বৎসর যাবৎ দেখা সাক্ষাৎ নাই।

ঐ সংখ্যার "ডায়মণ্ডহারবার হিতৈষীতে" আরও প্রকাশ,—

ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অন্তর্গত কুল্পী থানার অন্তর্গত শ্যামবসুর চক্ গ্রামের কোন কোন বাটীতে সম্প্রতি বসন্ত রোগ দেখা দিয়াছে। দুর্ভাগ্য বশতঃ এখানে টীকা দিবার কোন বন্দোবস্ত নাই। আশা করি, সদাশয় গবর্ণমেণ্ট শীঘ্র ইহার প্রতিবিধান করিয়া দরিদ্র প্রজাদিগকে বাধিত করিবেন।

অবিলম্বে সেনেটারি বিভাগ হইতে ইহার ব্যবস্থা করা হউক,—ইহার জন্ত আমরা কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছি।

বসন্তের প্রাদুর্ভাবে তো বঙ্গের অনেক স্থানই বিপর্য্যস্ত, ইহার উপরে বাঙ্গালার কোনো কোনো পল্লী হইতে আমরা ইনফ্লুয়েঞ্জার সংবাদও পাইতেছি। সহযোগী "ঢাকা প্রকাশ" চট্টগ্রামের সংবাদে জানাইতেছেন—

কুমিল্লায় ইনফ্লুয়েঞ্জা—কুমিল্লা সহরে ইনফ্লুয়েঞ্জা

রোগের প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। গত এক সপ্তাহে এই রোগে ৮ জন লোক মারা গিয়াছে। কোন কোন বাসায় সমস্ত লোকই এই ব্যাধিতে শয্যাশায়ী হইয়াছেন।

জলকষ্টই যে পল্লীস্বাস্থ্যের উন্নতির অন্তরায় সে বিষয়ে মতভেদ নাই। আধিব্যাধির লীলানিকেতন বাঙ্গালার পল্লীগুলিকে রক্ষা করিতে হইলে পল্লীর জলকষ্ট দূর করিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে মনোযোগী হইতে হইবে। মফঃস্বলের জেলা বোর্ডগুলি অবশ্য এ জন্য প্রতিবৎসরই ব্যবস্থা করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সে ব্যবস্থা পর্য্যাপ্ত নহে। সহযোগী "হিতবাদীতে" ঢাকার পিরুজালি হইতে একজন পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন,—

ঢাকা—পিরুজালি। পিরুজালি গ্রামটীতে অনেক লোকের বাস, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, গ্রামে জলকষ্ট অত্যন্ত অধিক। লোকালবোর্ড কতকগুলি ইন্দারা খনন করাইয়া দিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাতে গ্রামবাসীর জলাভাব দূর হয় নাই। গ্রামের ৪।৫ মাইল দক্ষিণে একটী নদী আছে, সে নদী হইতে জল আনিয়া ব্যবহার করা গৃহস্থগণেরপক্ষে অসম্ভব। গ্রামে প্রায় প্রত্যেক বাটীতেই কূপ আছে, বর্ষাকালে সেই কূপ জলে পরিপূর্ণ হয় বটে, কিন্তু কার্ত্তিক মাসে অধিকাংশ কূপই জলশূন্য হয়। ইন্দারাগুলিও অনেক দূরে অবস্থিত। এই গ্রামে অন্ততঃ আর চার পাঁচটী ইন্দারা না হইলে জলকষ্ট দূর হইবার সম্ভবনা নাই।

আবার বর্দ্ধমান পূর্ব্বস্থলী—নপাড়া হইতে একজন সংবাদ দাতা ঐ হিতবাদীতেই জলকষ্টের ফলে সেখানকার দুর্দ্দশার পরিচয় দিয়াছেন দেখুন,—

কলেরা, বসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জার এই সমস্ত স্থান ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছে। বিশুদ্ধ পানীয় জল ও চিকিৎসকের অভাব এ অঞ্চলকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। দূষিত জল ব্যবহার করিয়া লোক রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িতেছে, তাহার উপর তিন ক্রোশের মধ্যে ডাক্তার নাই, বিনা চিকিৎসায় ভুগিয়া ভুগিয়া হতভাগ্যগণ মৃত্যুর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। শ্রমজীবী ও কৃষক সম্প্রদায়ই এ অঞ্চলে অধিক। ইঁহাদিগকে রক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বাগে অল্প ব্যয়ে চিকিৎসার উপায় বিধান এবং জলাভাব দুরীকরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সংবাদ দাতা ঐ সকল কথা বলিয়া এ বিষয়ের প্রতীকার কল্পে গভর্ণমেণ্টের করুণা-ভিক্ষা করিয়াছেন। আমরাও সংবাদ দাতার প্রতিধ্বনি করিতেছি।

শুধু বসন্ত ও ইনফ্লুয়েঞ্জা নহে, মফঃস্বলের স্থানে স্থানে কলেরাও আরম্ভ হইয়াছে। "বীরভূমবাসীতে" প্রকাশ,—

নানুর থানার সংবাদ—পাবুরীগ্রামে ভয়ানক কলেরা হইতেছে। ইতিমধ্যে ১০।১২ জন মরিয়াছে।

বাঙ্গালার চিরব্যাপী জ্বর রোগও ইহারই মধ্যে স্থানে স্থানে দেখা দিয়াছে। মেদিনীপুরের "নীহার" এ সংবাদ আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে প্রদান করিতেছেন,—

বসন্তের আক্রমণে অনেকেই মারা গিয়াছে। আপাততঃ উহার আক্রমণ কতকটা হ্রাস পাইয়াছে। জ্বরে ও পেটের পীড়ায় অনেকেই আক্রান্ত হইতেছে।

আধিব্যাধির লীলা নিকেতন বঙ্গদেশে দাতব্য ঔষধালয়ের সংখ্যা যত বর্দ্ধিত হয় ততই মঙ্গলের কথা। রাজসাহীর "হিন্দুরঞ্জিকা" সংবাদ দিতেছেন,—

মোহনপুর থানায় একটি সরকারী ডাক্তারখানা স্থাপন করিবার জন্য আয়োজন হইতেছে। স্থানীয় সাহায্যে যদি ৫০০৲ পাঁচশত টাকা সংগ্রহ হয় তবে রাজসাহী ডিষ্টিক্ট বোর্ড তথায় ডাক্তারখানা স্থাপন করিতে পারেন।

শুধু তাহাই নহে, রাজসাহী জেলায় পীড়ার প্রকোপ—বাহুল্য যেরূপ, সে পরিমাণ

চিকিৎসক নাই। এই অভাব দূরীকরণের জন্য রাজসাহীর ছাত্রবৃন্দ যাহাতে চিকিৎসা শিক্ষার সুবিধা পাইতে পারে, তাহার জন্য কেহ কেহ উদ্যোগী হইয়াছেন জানিয়া আমরা আরও সুখী হইয়াছি। 'হিন্দুরঞ্জিকা'ই আমাদিগকে সে শুভ সংবাদ জানাইয়াছেন,—

"রাজসাহী টাউনে দাতব্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয় স্থাপনের চেষ্টা"—

অনারেবল শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীমোহন চৌধুরী এম, এ, বিল, মহোদয় রাজসাহী টাউনে একটি "দাতব্য আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়" স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। রাজসাহী আয়ুর্ব্বেদ সভা তাহার একটি এষ্টিমেট করিয়াছেন যে উক্ত ঔষধালয়টি স্থাপন করিতে আপাততঃ এককালীন ৩০০০৲ তিন হাজার টাকা নগদ ও মাসিক ২০০৲ দুই শত টাকা খরচ দরকার। বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হওয়া যায় যে পুঠিয়ার পাঁচ আনীর রাণী হেমন্তকুমারী দেবী ও কাশীমবাজারের মহারাজা বাহাদুর এ বিষয়ে আর্থিক সাহায্য করিতে স্বীকৃত আছেন ও টাউনের মাড়োয়ারী মহাজন জানীরাম বাবু এককালীন ১০০০৲ এক হাজার টাকা দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন।

বসন্ত, ওলাউঠা ও ইনফ্লুয়েঞ্জা তিনটি ব্যাধিই বাঙ্গালা দেশকে যেরূপ বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ ফল যে কি হইবে তাহা ভাবিবার বিষয়। ২১শে চৈত্রের ঢাকা প্রকাশ সংবাদ দিতেছেন,—

সহরের স্বাস্থ্য—

সহরের স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল নহে। বিগত দুই সপ্তাহ যাবত এসহরে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগ দেখা দিয়াছে। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার সঙ্গে সঙ্গে নিউমোনিয়ার আক্রমণও বেশ আছে। সহরতলী ফরিদাবাদ অঞ্চলে ওলাউঠাও প্রকট হইয়াছে।

বিক্রমপুরের স্বাস্থ্য ও শস্য সংবাদ—

সংবাদদাতার পত্রে প্রকাশ যে, বিক্রমপুরের অনেক স্থানে ইনফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণ আছে। লৌহজঙ্গ অঞ্চলে বসন্ত দেখা দিয়াছে। শ্রীনগরের নিকটবর্ত্তী কুশারী-পাড়া ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী কয়েকখানি গ্রামে বসন্তের প্রকোপ একটু হ্রাস পাইয়াছে।

শিশু মৃত্যু নিবারণের জন্য কলিকাতায় স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে যেরূপ চেষ্টা চলিতেছে, তাহাতে ইহার ফল যে শুভ হইবে তাহা আশা করা যায়। মফঃস্বলেও এইরূপ চেষ্টা হওয়া উচিত। নদীয়ার "বঙ্গরত্নে" প্রকাশ,—

সম্প্রতি নদীয়ার সিবিল সার্জ্জন মহোদয়ের সভাপতিত্বে কৃষ্ণনগরে স্থানীয় শিশুদের অকাল মৃত্যু নিবারণ কল্পে এখানে একটী সমিতি গঠিত করিয়াছেন। আগামী এপ্রিল মাস হইতে এই সমিতির কার্য্য করিবার জন্য এক জন শিক্ষিতা ধাত্রী স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছে। এই ধাত্রী প্রত্যেক গরীব লোকের বাটীতে বিনা পারিশ্রমিকে প্রসব কালে সাহায্য করিবেন এবং শিশু রক্ষা বিষয়ে উপদেশ দিবেন কেবল মাত্র তাঁহার গাড়ী ভাড়া দিলেই হইবে। অতি গরীব হইলে ঐ গাড়ীভাড়া পর্য্যন্ত সমিতি বহন করিবেন। গরীব ভিন্ন অন্যলোকের জন্য এই সমিতিতে নূন্য কল্পে ৫৲ টাকা জমা দিলেই ঐ ধাত্রী সন্তান প্রসব হইতে ছয় দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ একবার করিয়া প্রসূত ও প্রসূতিকে দেখিয়া আসিবেন। গাড়ীভাড়া আলাহিদা দিতে হইবে।

দুঃস্থ এবং নিঃসহায় গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের যতদূর সম্ভব প্রসবের সময় এবং ছয় দিন পর্য্যন্ত পথ্যাদি দিয়া সাহায্য করিবেন।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৪র্থ বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৭—জ্যৈষ্ঠ। | ৯ম সংখ্যা।

শারীর বিদ্যা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন সরস্বতী এম, এ, এল, এম, এস।

—:*:—

জতূকাস্থি। *

জতূকাস্থি • (২৭শ চিত্র)—জতূকাস্থি শিরঃসম্পুটের মধ্যভূমি নির্ম্মাণকারক, জতূকার (চামচিকের) ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট এবং সমস্ত শিরঃকপালের কেন্দ্রবন্ধন স্বরূপ। ইঁহার চারিটী অংশ যথা,—মধ্যে জতূকাশরীর উভয় পার্শ্বে বৃহৎ পক্ষতিদ্বয় ও নিম্নে ক্ষুদ্র পক্ষতিদ্বয় এবং সর্ব্বনিম্নে চরণদ্বয়। তন্মধ্যে—

(১) 'জতূকাশরীর' নামক মধ্যস্থ পিণ্ড উচ্চাবচ এবং শূন্যগর্ভ। ইহার গর্ভস্থিত কোটরগুলি 'জতূকাকোটর' নামে অভিহিত এবং ঝর্ঝরাস্থির কোটর সকলের সহিত সম্মিলিত।

জতূকা শরীরের চারিটী তল, যথা— সম্মুখ তল, পশ্চাৎ তল, ঊর্দ্ধ তল এবং অধস্তল। তন্মধ্যে—

(ক) সম্মুখ তল ঝর্ঝরাস্থির উভয়দিকের পার্শ্বপিণ্ডের সহিত সন্ধিযুক্ত এবং উহার মধ্য দেশের সমুন্নত রেখা ঝর্ঝরাস্থির মধ্যফলকের সহিত সংহিত। সম্মুখের ঊর্দ্ধভাগে 'ত্রিকোণ-কটক' নামক একটী চূড়াকার প্রবর্দ্ধন আছে, উহা ঝর্ঝরাস্থির ছাদের ন্যায় ফলকের সহিত সংহিত হইয়া থাকে।

(খ) পশ্চাৎ তল চতুষ্কোণ এবং পশ্চাৎ-কপালের মূলভাগের সহিত সন্ধিযুক্ত।

(গ) ঊর্দ্ধতলে ত্রিকোণকণ্টকের পশ্চাতে 'দৃষ্টিনাড়ীপরিখা' নামে একটী পরিখা আছে এবং উক্ত পরিখার দুইপ্রান্তে 'দৃষ্টি-নাড়ী রন্ধ্র' নামে দুইটী ছিদ্র আছে। এই পরিখা দৃষ্টিনাড়ী ধারণের জন্য এবং [illegible]

* ইং—Sphenoid Bone—স্ফিনয়েড বোন্।

দুইটী দৃষ্টিনাড়ীদ্বয়ের অক্ষিকূটে প্রবেশের জন্য। ইহাদের পশ্চাতে 'পোষণিকা' নামক গ্রন্থি ধারণের জন্য 'পোষণিকা খাত' নামে একটী খাত আছে। উক্ত খাতের পশ্চাতে 'সুষম্নাপীঠ' নামে যে উন্নত কূট আছে, উহা সুষম্নাশীর্ষ ধারণ করিয়া থাকে। এই কূটের উভয় পার্শ্বে মাতৃকা ধমনীদ্বয় ধারণের জন্য 'মাতৃকা পরিখা' নামে দুইটী গভীর খাত আছে। ইহার সম্মুখভাগে এক এক দিকে পরে পরে তিনটী গুলিকা অবস্থিত।

[২৭শ চিত্র—জতুকাস্থি (ঊর্দ্ধতল)]

(ঘ) জতুকাশরীরের অধঃস্তল নাসাগুহা ও কণ্ঠবিবরের আচ্ছাদন ভুক্ত। উহাতে যে স্তনমূল ও উন্নতাগ্র রেখা আছে, উহা 'রসনিকা' নামে অভিহিত। এই রেখা নাসিকার মধ্যপ্রাচীরভূত সীরিকাস্থির পশ্চিম প্রান্তের খাঁজের সহিত সংহিত হইয়া থাকে।

(২) বৃহৎ পক্ষতিদ্বয় জতুকাস্থির উভয় দিকে শঙ্খদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং প্রায় ত্রিকোণাকার। এক এক পক্ষের তিনটী তল, যথা—ঊর্দ্ধতল, সম্মুখতল এবং বহিস্তল। তন্মধ্যে—

(ক) ঊর্দ্ধতলের নাম 'পক্ষতিপৃষ্ঠ'। ইহা মস্তিষ্কের মধ্যভূমিভূত এবং উহাতে 'বৃত্তবিবর' ও 'জাম্ববিবর' নামে দুইটী বিবর আছে। এই দুইটী বিবরের ভিতর দিয়া পঞ্চম নাড়ীর মধ্যম ও পশ্চিম শাখা যথাক্রমে নির্গত হইয়া থাকে। ইহার মূলে কোণ বিবর' নামে যে ছিদ্র আছে, তাহার ভিতর দিয়া 'কলাপোষণী' ধমনী প্রবেশ করিয়া থাকে।

(খ) সম্মুখতল চক্ষুকোণ এবং নেত্রকূটের বহিঃপ্রাচীর স্বরূপ।

(গ) বহিস্তল বিশেষ উচ্চাবচ এবং 'শঙ্খাধরিকা' রেখা দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত। রেখার ঊর্দ্ধভাগ শঙ্খদেশ নির্ম্মাণকারক ও শঙ্খচ্ছদা পেশীর প্রভবস্থল; অধোভাগ গণ্ডমূলের খাতে সংস্থিত।

(৩) লঘুপক্ষতিদ্বয় জতুকাশরীরের সম্মুখে উভয় দিকে অবস্থিত এবং পুরঃকপালাস্থির 'নেত্রচ্ছদিফলক'দ্বয়ের সহিত সন্ধিযুক্ত। ইহাদের মধ্যে উভয়ের সংযোজক 'ত্রিকোণকণ্টক' এবং তন্মূলস্থ দৃষ্টিনাড়ী রন্ধ্রদ্বয়ের বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

লঘু ও বৃহৎ পক্ষতিদ্বয়ের মধ্যে এক এক দিকে যে ত্রিকোণপ্রায় অন্তরাল আছে, উহারা 'পক্ষান্তরাল' নামে আখ্যাত। এই দুইটী অন্তরালের ভিতর দিয়া তৃতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠী নাড়ী, পঞ্চমী নাড়ীর নেত্রগামিনী প্রথমা শাখা এবং নেত্রগামিনী শিরা ও ধমনী নির্গত হইয়া থাকে।

(৪) চরণদ্বয় জতুকাস্থি শরীরের পশ্চাৎ প্রান্তের উভয় দিক হইতে নিম্ন দিকে বিস্তৃত। এক এক চরণে দুইটী করিয়া অস্থিফলক আছে। তন্মধ্যে সম্মুখস্থ ফলক আয়তপৃষ্ঠ এবং পশ্চাতের ফলক অঙ্কুশাগ্র। এই অঙ্কুশকে আশ্রয় করিয়া 'তালুতুংসনী পেশী বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। উভয় চরণের মধ্যে যে সুব্যক্ত অন্তরাল আছে, তথায় তালবস্থি সংহিত হইয়া থাকে।

সন্ধি—জতুকাস্থি আটখানি শিরঃসম্পুট নির্ম্মাপক অস্থির সহিত এবং গণ্ডাস্থিদ্বয়, তালবস্থিদ্বয় ও সীরিকা—এই পাঁচখানি মুখমণ্ডলের অস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত। সন্ধান প্রকার চিত্রে দ্রষ্টব্য।

পেশী—জতুকাস্থিতে এক এক দিকে এগারটী করিয়া পেশী সংযুক্ত থাকে। যথা— বৃহৎ পক্ষতির বহিস্তলে দুইটী, লঘুপক্ষতির সম্মুখভাগে অক্ষিকূটগ ছয়টি, এবং চরণু ফলকে তিনটী পেশীর সংযোগ আছে।

[২৮শ চিত্র—ঝর্ঝরাস্থি]

(পশ্চাৎ হইতে দৃষ্ট · স্বাভাবিক আয়তন)

শিখরকণ্টক

চালনীপটল

চালনী ছিদ্রসমূহ

নেত্রান্তঃপীঠ

ঊর্দ্ধশুক্তিকা

পার্শ্বপিণ্ড

মধ্যশুক্তিকা

মধ্যফলক

ঝর্ঝরাস্থি*—ঝর্ঝরাস্থি নামক নাসামূলগত পিণ্ডাকার অস্থি ছিদ্রবহুল এবং অক্ষিকোটরদ্বয়ের অন্তরালে গূঢ়ভাবে অবস্থিত। ইহার তিনটী অংশ যথা,—মধ্যফলক, চালনীপটল এবং পার্শ্বপিণ্ডদ্বয়। তন্মধ্যে—

(১) মধ্যফলক—নাসামূলের মধ্য প্রাচীর নির্ম্মাণের সহায়ভূত পাতলা ফলকের ন্যায়। ইহার অগ্রধারায় পুরঃকপালের অগ্রকণ্টক এবং নাসাস্থিদ্বয়ের পরস্পর সংযোগ ধারা সংহিত হইয়া থাকে। পশ্চাৎ ধারায় জতুকাস্থির পুরস্তসংহিত বর্ত্তিকাখ্য মধ্যরেখা এবং নামক সীরিকা অস্থি সংহিত হয়। অধোধারা নাসাগ্রভাগের মধ্য প্রাচীরভূত ত্রিকোণাখ্য তরুণাস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত।

(২) চালনীপটল—নাসামূলের ছাদস্বরূপ, চালনীর ন্যায় সূক্ষ্ম ছিদ্রবহুল এবং মধ্যফলকের মস্তকে সংলগ্ন। ইহার চূড়ায় 'শিখরকণ্টক' নামে যে প্রবর্দ্ধন আছে তাহাতে 'দাত্রিকা' কলাভাগ সংযুক্ত থাকে এবং ইহাতে যে সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রপথ আছে তাহার ভিতর দিয়া গন্ধগ্রাহিণী নাড়ীর প্রতানসমূহ নাসামধ্যে বিস্তৃত হয়।

(৩) পার্শ্বপিণ্ডদ্বয় মধুচক্রের ন্যায় ছিদ্রগর্ভ এবং খুব পাতলা পত্রবৎ অস্থি দ্বারা নির্ম্মিত। প্রত্যেক পার্শ্বপিণ্ডের ছয়টী তল। তন্মধ্যে ঊর্দ্ধ তল কোটরবহুল এবং পুরঃকপালের মহাপরিখার পরিধির সহিত সংহিত। পুরস্তল অশ্রুপীঠদ্বয় ও ঊর্দ্ধ হন্বস্থিদ্বয়ের সহিত সন্ধিযুক্ত এবং উহার অধঃস্থিত কোটরগুলি নাসাগুহার সহিত সংমিলিত। পশ্চাৎ তলও ছিদ্রবহুল এবং জতুকাস্থির কোটরযুক্ত পুরস্তলের সহিত সন্ধিযুক্ত। অন্তস্তল নাসাগুহার পার্শ্বপ্রাচীর স্বরূপ এবং দুইখানি ক্ষুদ্র শুক্তিকাকার অস্থিফলক বিশিষ্ট। উক্ত শুক্তিকাকার অস্থি দুইখানি

* ই—Ethmoid Bone—এথময়েড বোন্।

যথাক্রমে ঊর্দ্ধশুক্তিকা, এবং মধ্যশুক্তিকা নামে অভিহিত। ঊর্দ্ধ শুক্তিকা নাসাগুহার ঊর্দ্ধ সুড়ঙ্গের * এবং মধ্য শুক্তিকা মধ্যসুড়ঙ্গের চূড়ার স্বরূপ। মধ্যশুক্তিকার কিঞ্চিৎ নিম্নে অধঃশুক্তিকাস্থির সন্ধিস্থান। বহিস্তল সূচিক্কণ চতুষ্কোণ ফলকনির্ম্মিত এবং নেত্রকোটরের অন্তঃপীঠনির্ম্মাপক বলিয়া 'নেত্রান্তঃপীঠ' নামে অভিহিত।

সন্ধি—ঝর্ঝরাস্থি মস্তকের তেরখানি অস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত। যথা—পুরঃকপাল, জতূকাস্থি, সীবিকা এই তিনখানি একক অস্থির সহিত এবং নাসাস্থি, ঊর্দ্ধহন্বস্থি, তাল্বস্থি, অশ্রুপীঠাস্থি ও শুক্তিকাস্থি—এই পাঁচটী যুগ্ম অস্থির সহিত।

এই অস্থির সহিত কোন পেশীর সংযোগ নাই।

কপাল চক্রক। † মস্তকের কপালাস্থি সমূহের সীবন্তে দন্তুর ধারার মধ্যে কখন কখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রাকার অস্থি সমূহ দেখা যায়। ঐরূপ অস্থি প্রায়ই পার্শ্ব কপাল দ্বয়ের সন্ধিস্থলে—বিশেষতঃ ব্রহ্মরন্ধ্র এবং শিবরন্ধ্রের নিকটে দেখা যায়। উহাদের অস্তিত্বের কোন নিশ্চয় নাই বলিয়া পৃথক্ ভাবে গণনা করা হয় না।

মুখমণ্ডলের অস্থি।

মুখমণ্ডল চতুর্দ্দশ খানি অস্থির দ্বারা নির্ম্মিত, যথা—দুই খানি নাসাস্থি, দুই খানি ঊর্দ্ধহন্বস্থি, দুই খানি অশ্রুপীঠাস্থি, দুইখানি গণ্ডাস্থি, দুইখানি তাল্বস্থি, দুইখানি শুক্তিকাস্থি; একখানি সীরিকাস্থি, এবং এক খানি অধোহন্বস্থি। তন্মধ্যে হন্বস্থিত্রয় ভক্ষণ চর্ব্বণাদি কার্য্য সাধন করে এবং অন্যান্য অস্থি গুলি চক্ষু নাসা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠান নির্ম্মাণ ও অন্যান্য কার্য্য করিয়া থাকে।

নাসাস্থি*—নাসাস্থি দুইখানি নাসামূলে অবস্থিত বহিঃপৃষ্ঠে ন্যুব্জ এবং অন্তর্ভাগে কোরোদর। ইহারা মধ্যরেখায় পরস্পর সংহিত নাসাস্থিদ্বয়ের ঊর্দ্ধপ্রান্ত পুরঃকপালাস্থির নাসামূলখাতের সহিত এবং বহিঃপার্শ্ব ঊর্দ্ধহন্বস্থির নাসাকূটের সহিত সন্ধিযুক্ত। ইহাদের অধঃপ্রান্ত নাসাপার্শ্বিক নামক তরুণাস্থিদ্বয়ের সহিত সংহিত। পশ্চাৎভাগে পরস্পরের সন্ধান রেখায় পুরঃকপালের অগ্রকণ্টক এবং ঝর্ঝরাস্থির মধ্যফলক সংহিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক নাসাস্থির বহিস্তলের মধ্যে শিরা প্রবেশের জন্য সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে এবং অভ্যন্তর ভাগে নাসানাড়ী ধারণের জন্য পরিখা দৃষ্ট হয়।

[২৯শ চিত্র—নাসাস্থিদ্বয়]

(সম্মুখ দৃশ্য)

ঊর্দ্ধপ্রান্ত

শিরাচ্ছিদ্র

বহিঃপার্শ্ব

পরস্পর সন্ধান রেখা

অধঃপ্রান্ত

* প্রত্যেক নাসাগুহা ত্রিতল এবং তিনটী স্রোত বা সুড়ঙ্গপথযুক্ত। সুড়ঙ্গপথগুলির বিশেষ বর্ণনা পরে লিখিত হইবে।

† ইং—Wormian Bones ওর্মিয়ান্ বোন্‌স্

* ইং—Nasal Bones—ন্যাসাল বোন্‌স্

সন্ধি—প্রত্যেক নাসাস্থি পূর্ব্বোক্তরূপে চারিখানি অস্থির সহিত সংহিত হইয়া থাকে।

ঊর্দ্ধহন্বস্থি*—দুইখানি ঊর্দ্ধহন্বস্থি পরস্পর সংহিত হইয়া তালুপটল ও দন্তোদূখল সহিত ঊর্দ্ধ হনুমণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। নাসাকোটরদ্বয়, নেত্রপীঠদ্বয় এবং মুখমণ্ডলের সম্মুখ ও পার্শ্ব ভাগ প্রধানতঃ দুইটী ঊর্দ্ধহন্বস্থি দ্বারাই নির্ম্মিত। আকারে বড় হইলেও এই অস্থিদ্বয় শূন্যগর্ভ বলিয়া হাল্কা।

প্রত্যেক হন্বস্থির পাঁচটী অংশ, যথা মধ্যস্থলে হনুপিণ্ড এবং চতুঃপার্শ্বে চারিটী প্রবর্দ্ধন। উপরের প্রবর্দ্ধন নাসাকূট, বহিঃপার্শ্বের প্রবর্দ্ধন গণ্ডধরকূট, অন্তঃসীমার প্রবর্দ্ধন তালুফলক এবং অধঃসীমার প্রবর্দ্ধন দন্তোদূখল নামে অভিহিত। তন্মধ্যে—

(১) হনুপিণ্ড—হন্বস্থির শূন্যগর্ভ মধ্যপিণ্ড। ইহা চারিটী তলবিশিষ্ট। তন্মধ্যে 'মৌখিকতল' বহির্মুখমণ্ডলে পরিদৃশ্যমান, 'গণ্ডোত্তর' তল গণ্ডধরকূটের পশ্চাতে অবস্থিত, নেত্রপীঠতল নেত্রকোটরের ভূমিস্বরূপ এবং 'আন্তরতল' নাসাবিবর ও মুখবিবরের পার্শ্ব প্রাচীর স্বরূপ। ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। যথা—

[৩০শ চিত্র—ঊর্দ্ধহন্বস্থি (বহিস্তল)]

পুরঃ কপালের সহিত সন্ধের অংশ
নাসাস্থির সহিত সন্ধের অংশ
অশ্রুপীঠাস্থির সহিত সন্ধের অংশ
নেত্রপীঠতল
নাসাকূট
অণ্ডকাস্থির সহিত সন্ধের অংশ
নেত্রাধরীয় ছিদ্র
গণ্ডোত্তর তল
নাসাগুহাখাত
গণ্ডধর কূট
নাসাপ্রকণ্টক
পশ্চিমদন্তিকাখ্য বিবর
দন্তদূখবিল
হনুপশ্চিমার্দ্ধ দ

হনুপিণ্ড—মৌখিকতল

(ক) মৌখিকতলে—নেত্রকোটরের নিম্ন প্রান্তে নেত্রাধরীয় নামে ছিদ্র আছে। উক্ত ছিদ্রপথ দিয়া নেত্রাধরীয় নাড়ী ও ধমনী নির্গত হইয়া থাকে।

(খ) গণ্ডোত্তরতল—এই নামীয় খাতের প্রাচীরস্বরূপ এবং শঙ্খচ্ছদা পেশী দ্বারা আবৃত। গণ্ডোত্তরতলে 'পশ্চিম দন্তিকাখ্য নাড়ী' ও ধমনী প্রবেশের জন্য যে সকল ছিদ্র আছে, তাহারা 'পশ্চিমদন্তিক ছিদ্র' নামে অভিহিত। ইহার পশ্চাদ্ভাগে হনুপশ্চিমার্দ্ধ নামে

* ইং—Superior Maxillary Bones—রশিয়ির ম্যাক্সিলারি বোন্‌স্।

যে উচ্চাবচ উৎসেধ আছে, তাহা তাবস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত হইয়া থাকে।

(গ) নেত্রপীঠতল—নেত্রকোটরের ভূমির সম্মুখভাগ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ইহার অন্তঃসীমায় 'অশ্রুপীঠখাত' নামে যে খাত আছে, তথায় অশ্রুপীঠাস্থি সংহিত হয়। বহির্ধারা ঝর্ঝরক ও তাবস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত। বহিঃপ্রান্তে নেত্রাধিসীম পেশী ও ধমনী ধারণের জন্য সূক্ষ্ম খাত এবং 'অগ্রদন্তিক' নাড়ী প্রবেশের ছিদ্র আছে।

(ঘ) আস্তরতল—নাসাবিবর ও মুখবিবরের বহিঃপার্শ্বে অবস্থিত। ইহার পুরঃসীমায় 'নাসাখাত' নামে যে মহৎ খাত আছে, তাহা তালুফলকের দ্বারা মধ্যদেশে দুইভাগে বিভক্ত—ঊর্দ্ধভাগ নাসাগুহার অংশ ও অধোভাগ মুখবিবরের অংশ। ইহার পার্শ্বে 'হনুগর্ভকোটর' নামে যে বৃহৎ কোটর আছে, তাহা নাসাগুহার মধ্যসুড়ঙ্গের সহিত সংমিলিত। জীবিত ব্যক্তির শরীরে এই কোটর ঝর্ঝরক, শুক্তিকা ও তাবস্থি দ্বারা আচ্ছাদিত হইলেও উহাতে একটী সূক্ষ্ম শলাকা প্রবেশের উপযুক্ত দ্বার থাকে এবং উহার অভ্যন্তরভাগ কলাবিশেষের দ্বারা আবৃত থাকে। পীনস রোগে কখন কখন এই হনুগর্ভকোটরে পুয়সঞ্চার হইয়া বিদ্রধি উৎপন্ন হয়।

(২) নাসাকূট—নাসামূলের পার্শ্বগত প্রবর্দ্ধন। ইহা ঊর্দ্ধে পুরঃকপালের সহিত মধ্যরেখায় নাসিকাস্থির সহিত ও বহিঃসীমায় অশ্রুপীঠাস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার অন্তস্তল নাসিকার মধ্যসুড়ঙ্গ নির্ম্মাণের জন্য খাতোদর এবং দুইটী রেখাযুক্ত; রেখাদ্বয়ের একটীর সহিত ঝর্ঝরাস্থির প্রধান শুক্তিকাভাগ ও অপরটীর সহিত অধঃশুক্তিকাস্থি সন্ধিযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার পশ্চাদ্ভাগে যে পরিখা আছে, তাহা 'অশ্রুবাহিকা' স্রোতঃ ধারণ করিয়া থাকে। এই অশ্রুবাহিকা স্রোতঃপথে রোদনকালে অশ্রুজল নাসিকায় প্রবেশ করে।

(৩) গণ্ডধরকূট—ইহা বহিঃপার্শ্বে অবস্থিত ত্রিকোণাকার উৎসেধ—ইহা গণ্ডাস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত।

(৪) তালুফলক—তালুর সম্মুখভাগ নির্ম্মাণকারক ও হনুপিণ্ডের অন্তস্তল হইতে উদ্গত। ইহার ঊর্দ্ধতল নাসাভূমি এবং তালুর ছাদ স্বরূপ। মধ্যরেখায় ইহা অপর ঊর্দ্ধহন্বস্থির তালুফলকের সহিত সংসক্ত থাকে; এবং এইরূপে সংহিত ফলকের মধ্যরেখার অধস্তল সম্মুখভাগে অধস্তলে 'অগ্রতালুখাত' নামে একটী খাত দেখা যায়। উক্ত খাতে যে চারিটি ছিদ্র আছে, তাহাদের ভিতর দিয়া নাসা ও তালুগামিনী নাড়ী ও ধমনী সকল তালুতে প্রবেশ করিয়া থাকে। উক্ত সন্ধিরেখার ঊর্দ্ধতলে সম্মুখ দিকে যে সমুন্নত রেখা আছে, তথায় সীরিকাস্থি সংহিত হয়। তালুফলকের পশ্চিম ধারার সহিত তাবস্থির হুস্বপত্রক নামক অংশ সন্ধিযুক্ত হইয়া থাকে।

(৫) দন্তোদূখলিক—দন্তোদূখলধারক অর্দ্ধচন্দ্রাকার অধোমুখ প্রবর্দ্ধনের নাম "দন্তোদূখলিক"। ইহাতে বাল্যে পাঁচটী ও যৌবনে আটটী দন্তোদূখল থাকে এবং ঐ সকল উদূখলে বা কোটরে সমসংখ্যক দন্ত নিবিষ্ট থাকে।

সন্ধি—প্রত্যেক ঊর্দ্ধহনু অপর ঊর্দ্ধহনু, ঝর্ঝরক, পুরঃকপাল, গণ্ডাস্থি

নাসাস্থি, অশ্রুপীঠাস্থি, সৌরিকাস্থি, তালবস্থি ও শুক্তিকাস্থি—এই নয়খানি অস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত।

পেশী—প্রত্যেক ঊর্দ্ধ হনবস্থিতে এগারটি করিয়া পেশীর সংযোগ আছে। এই সকল পেশী নেত্রের উন্মীলন ও নিমীলন, নাসা ও অধরের সঙ্কোচন ও বিস্ফারণ এবং চর্ব্বণাদি কার্য্য করিয়া থাকে।

[৩১শ চিত্র—ঊর্দ্ধহনবস্থি (অন্তস্তল)]

ঝর্ঝরাস্থির সহিত সন্ধের অংশ
তালবস্থি সহ সন্ধের
হনুগর্ভ কোটর
পশ্চিম তালুকা প্রণালী
নাসাকূট
ঝর্ঝরাস্থির মধ্য শুক্তিকার সহিত সন্ধের অংশ
অশ্রুবাহিকা
অধঃশুক্তিকার সহিত সন্ধের রেখা
নাসাগ্র কণ্টক
তালুফলক
অগ্রতালুকা প্রণালী

অশ্রুপীঠাস্থি*—অশ্রুপীঠ নামক ক্ষুদ্রাস্থি নাসাস্থির ও ঊর্দ্ধহনবস্থির নাসাকূটের পশ্চাতে অক্ষিকোটরপার্শ্বে দুইদিকে দুইখানি গূঢ় ভাবে অবস্থিত। উহারা পাতলা পত্রবৎ অস্থি দ্বারা নির্ম্মিত এবং দেখিতে কতকটা অর্ঘ্যপাত্র বা কোশার ন্যায়। 'অশ্রুবাহিকা' প্রণালী ধারণ করে বলিয়া উহারা অশ্রুপীঠ নামে অভিহিত।

প্রত্যেক অশ্রুপীঠের দুইটী তল—বহিস্তল ও অন্তস্তল। বহিস্তলে অশ্রুস্রোত ধারণের জন্য অশ্রুবাহিকা প্রণালীর খাঁজ দেখা যায়। অন্তস্তল ঝর্ঝরাস্থির কোটরদ্বারের আচ্ছাদন স্বরূপ।

[৩২শ চিত্র—অশ্রুপীঠাস্থি(বহিস্তল)]

পুরঃকপালের সহিত সন্ধের অংশ
ঝর্ঝরাস্থির সহিত সন্ধের ধারা
ঊর্দ্ধহনুর সহিত সন্ধের ধারা
শুক্তিকার সহিত সন্ধের অঙ্কুশপ্রবর্দ্ধন

প্রত্যেক অশ্রুপীঠের চারিটী ধারা। তন্মধ্যে ঊর্দ্ধ ধারার সহিত পুরঃকপালাস্থি, অধোধারার অগ্রভাগস্থিত অঙ্কুশাকার প্রবর্দ্ধনকের সহিত শুক্তিকাস্থি, সম্মুখ ধারায় ঊর্দ্ধহনবস্থির নাসাকূট এবং পশ্চিম ধারায় ঝর্ঝরাস্থির নেত্রাংশপীঠ সংহিত হইয়া থাকে।

গণ্ডাস্থি*—[illegible] ন্যায়

* ইং—Lachrymal Bones—ল্যাক্রিম্যাল বোন্‌স্‌।

* ইং—Malar Bones—মেলার বোন্‌স্‌।

আকৃতি বিশিষ্ট দুই খানি গণ্ডাস্থি গণ্ডদেশে অবস্থিত। উহাদের দ্বারা গণ্ডদেশের উৎসেধদ্বয় ও নেত্রকোটরভূমির কিয়দংশ নির্ম্মিত হয়। প্রত্যেক গণ্ডাস্থির দুইটী তল—বহিস্তল ও অন্তস্তল। তন্মধ্যে—

[৩৩শ চিত্র—বামগণ্ডাস্থি (বহিস্তল)]

গণ্ডকূটের অধঃকোটি

বহিস্তল—মুক্তপৃষ্ঠ এবং নাড়ী ধমনী নির্গমের জন্য 'গণ্ডচ্ছিদ্র' নামক ছিদ্র বিশিষ্ট। ইহা দ্বারা 'গণ্ডকূট' বা গালের উন্নত প্রদেশ নির্ম্মিত হয়।

অন্তস্তল—কোরোদর। ইহার বন্ধুর ত্রিকোণাকার অংশে ঊর্দ্ধ হনুস্থির গণ্ডধরকূট সংহিত হইয়া থাকে।

প্রত্যেক গণ্ডাস্থির চারিটী প্রবর্দ্ধন আছে। তন্মধ্যে তিনটী যথাক্রমে সম্মুখ, পশ্চাৎ ও ঊর্দ্ধ কোটিরূপে অবস্থিত এবং একটী অক্ষিকোটর ভূমিতে প্রবিষ্ট। তন্মধ্যে—

(১) 'নেত্রাধরীয়' নামক সম্মুখ প্রবর্দ্ধন সূক্ষ্মাগ্র ও ঊর্দ্ধ হনুস্থির সহিত নেত্রের নিম্নভাগে সংহিত।

(২) 'শঙ্খিক' নামক পশ্চাৎ প্রবর্দ্ধন শঙ্খাস্থির গণ্ডপ্রবর্দ্ধনের সহিত সংহিত।

(৩) ঊর্দ্ধ প্রবর্দ্ধন অপাঙ্গাভিমুখ বলিয়া 'অপাঙ্গ প্রবর্দ্ধন' নামে খ্যাত। ইহা পুরঃকপালের বাহ্য কোণের সহিত সংহিত হয়।

(৪) নেত্রভূমিগত প্রবর্দ্ধন ঊর্দ্ধপ্রবর্দ্ধন ও পুরঃপ্রবর্দ্ধনের মধ্যস্থিত এবং অক্ষিকোটর ভূমির অংশ ভূত। ইহা 'অক্ষিফলক' নামে খ্যাত ও ঈষৎ খাতোদর। ইহাতে নাড়ী প্রবেশের জন্য 'শঙ্খগণ্ডিক' নামক একটী সূক্ষ্ম মার্গ আছে, উহা গণ্ডচ্ছিদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অক্ষিফলকের ধারা পশ্চাতে জতুকাস্থির সহিত সংহিত হয়।

গণ্ডাস্থির অধঃকোটি কোন অস্থির সহিত

সংহিত হয় না—ইহা গণ্ডকূটে ত্বকের নিম্নে অনুভব করা যায়।

সন্ধি—প্রত্যেক গণ্ডাস্থি শঙ্খাস্থি, পুরঃকপাল ঊর্দ্ধহন্বস্থি ও জতুকাস্থি—এই চারিখানি অস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত হইয়া থাকে।

পেশী—প্রত্যেক গণ্ডাস্থিতে পাঁচটী করিয়া পেশী সংসক্ত। যথা, বহিস্তলে ওষ্ঠ সমুৎকর্ষণী, এবং লঘু ও গুরু সৃক্কণীকর্ষণী; অন্তস্তলে শঙ্খচ্ছদা এবং হনুকূটকর্ষণী।

তাল্বস্থি*—নেত্র ও নাসাকুহরের পশ্চাতে খনিত্র বা কোদালের ন্যায় আকার বিশিষ্ট পাতলা পত্রবৎ অস্থি নির্ম্মিত দুইখানি তাল্বস্থি অবস্থিত। ইহারা নেত্রকোটরভূমি, নাসাভূমির পার্শ্বদ্বয় এবং তালুপটল নির্ম্মাণের সহায়তা করিয়া থাকে। প্রত্যেক তাল্বস্থির পাতলা পত্রময় দুই অংশ—দীর্ঘপত্রক এবং হ্রস্বপত্রক। তন্মধ্যে—

[৩৪শ চিত্র—তাল্বস্থি (বাম)]

(পশ্চাৎ হইতে দৃষ্ট)

নেত্রগুহাভিমুখ অংশ
নেত্রাভিমুখ প্রবর্দ্ধন
জতুকাভিমুখ প্রবর্দ্ধন
তালুজাতুকখাত
উত্তরালিকা
দীর্ঘপত্রক
অধরালিকা
জতুকাস্থির চরণের সহিত সন্ধের দ্বিমুখী ধারা
বিমুক্তাগ্র তালুপশ্চিমাধারা ও কাকলকধর কণ্টক
তালুকাণ
অধরাহনুকূট কর্ষণী পেশী

(১) দীর্ঘপত্রক—নেত্রকোটরের ভিতর দিক হইতে তালুমূল পর্য্যন্ত আলম্বিত। ইহার সম্মুখধারা ঊর্দ্ধহন্বস্থির পিণ্ডভাগের পশ্চাতে সংহিত। পশ্চিম ধারা দুই মুখ বিশিষ্ট এবং জতুকাস্থির চরণফলকদ্বয়ের মধ্যে সংহিত। ইহার অন্তস্তল মসৃণ এবং সমুন্নত দুইটী রেখা বা আলি দ্বারা তিন ভাগে বিভক্ত। 'উত্তরালিকা' নামক ঊর্দ্ধস্থিত আলির সহিত ঝর্ঝরাস্থি মধ্যশুক্তিকা নামক অংশ সংহিত হইয়া থাকে। 'অধরালিকা' নামক অধঃস্থিত আলির সহিত অধঃশুক্তিকাস্থি সংহিত হয়। উক্ত আলি-দ্বয়ের মধ্যদেশ নাসিকার মধ্য সুড়ঙ্গের সহিত মিলিত এবং উহার ঊর্দ্ধ ও অধোভাগ নাসিকার ঊর্দ্ধ ও অধঃ সুড়ঙ্গের সহিত সংলগ্ন।

দীর্ঘপত্রকের বহিস্তল ঊর্দ্ধহন্বস্থির আভ্যন্তর তলের সহিত সংহিত হইয়া থাকে। উহাতে 'পশ্চিমতালুকা' নামক সূক্ষ্ম প্রণালী আছে।

* ইং—Palate Bones—প্যালেট বোন্‌স।

দীর্ঘপত্রকের চূড়ায় সম্মুখ ও পশ্চাৎ দিকে বিস্তৃত দুইটী প্রবর্দ্ধনক আছে। তন্মধ্যে সম্মুখ দিকে বিস্তৃত প্রবর্দ্ধনক নেত্রকোটর-ভূমিতে প্রবেশ করে এবং জতুকা, ঝর্ঝরক ও উর্দ্ধহন্বস্থির নেত্রপীঠফলকের সহিত সন্ধিযুক্ত হইয়া থাকে। পশ্চাৎদিকে বিস্তৃত প্রবর্দ্ধনকের সহিত জতুকাস্থি সংহিত হয়। উভয় প্রবর্দ্ধনকের সন্ধিস্থলে 'জতুতালুক' নামে যে খাত আছে, তাহার ভিতর দিয়া নাড়ী ও ধমনী নাসিকার মধ্যে প্রবেশ করে।

(২) হ্রস্বপত্রক দীর্ঘপত্রকের মূল হইতে তির্য্যগ্‌ভাবে উদ্গত ও অন্তর্মুখ। ইহার উর্দ্ধতল নাসাভূমির এবং অধস্তল তালুপটলের পশ্চাদ্‌ভাগ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ইহার সম্মুখ ধারা উর্দ্ধহন্বস্থির তালুফলকের সহিত সন্ধিযুক্ত; পশ্চাৎ ধারা মুক্ত, ইহা কোমল তালুর কিয়দংশ ও কাকলক (আলজিব) ধারণ করে।

প্রত্যেক হ্রস্বপত্রকের অগ্রভাগ অপর তালবস্থির হ্রস্বপত্রকের সহিত সন্ধিযুক্ত হয় এবং উভয় সন্ধিরেখার উপর পৃষ্ঠে সৌরিকাস্থি সংহিত হইয়া থাকে। হ্রস্ব ও দীর্ঘ পত্রকদ্বয়ের সন্ধিকোণ 'তালুকোণ' নামে অভিহিত।

সন্ধি—প্রত্যেক তালবস্থি নিম্নলিখিত ছয়খানি অস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত। যথা, ঝর্ঝরক, জতুকা, শুক্তিকা, সৌরিকা উর্দ্ধহন্বস্থি এবং অপর তালবস্থি।

পেশী—প্রত্যেক তালবস্থিতে চারিটী করিয়া পেশী সংসক্ত থাকে। যথা উত্তরা কণ্ঠসঙ্কোচনী, অধরা হনুকুটকর্ষণী, কাকলকধরা এবং তালুত্তংসনী।

শুক্তিকাস্থি*—(২৯শ চিত্রে দেখ) শুক্তিকাস্থি বা অধঃশুক্তিকাস্থি পাতলা ও ছিদ্রযুক্তপত্রময় এবং দেখিতে ক্ষুদ্র দীর্ঘ শুক্তিকা বা ঝিনুকের ন্যায় আকার বিশিষ্ট। দুইখানি শুক্তিকাস্থি দুই নাসাগুহার নিম্ন ও মধ্য সুড়ঙ্গের মধ্যে অবস্থিত। ইহারা ঝর্ঝরকাস্থির শুক্তিকাফলকদ্বয় অপেক্ষা নিম্নদিকে অবস্থিত বলিয়া কখন কখন অধঃশুক্তিকা নামেও অভিহিত হইয়া থাকে।

প্রত্যেক শুক্তিকার দুইটী তল—অন্তস্তল ও বহিস্তল। তন্মধ্যে অন্তস্তল কোরোদর ও নাসাপথের নিম্ন সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণকারক। বহিস্তল মুক্তপৃষ্ঠ এবং নাসিকার মধ্যপ্রাচীরের অভিমুখ।

শুক্তিকাস্থির উর্দ্ধধারা সম্মুখভাগে উর্দ্ধহন্বস্থির সহিত এবং পশ্চাদ্‌ভাগে তালবস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত। শুক্তিকাস্থির 'অশ্রুকূটক' ও 'ঝর্ঝরকূটক' নামে দুইটী প্রবর্দ্ধন আছে। তন্মধ্যে অশ্রুকূটক অশ্রুপীঠাস্থির সহিত এবং ঝর্ঝরকূটক ঝর্ঝরাস্থির সহিত সংহিত। শুক্তিকাস্থির অধোধারা বিমুক্তাগ্র অর্থাৎ কাহারও সহিত সহিত সন্ধিযুক্ত নহে।

সন্ধি—শুক্তিকাস্থি নিম্নলিখিত চারিখানি অস্থির সহিত কেবল উপরদিকে সন্ধিযুক্ত যথা, ঝর্ঝরকাস্থি উর্দ্ধহন্বস্থি, তালবস্থি এবং অশ্রুপীঠাস্থি।

সৌরিকাস্থি*—সৌরিকা বা সৌরাগ্রিকা নামক ক্ষুদ্র দীর্ঘ অস্থিখণ্ড সীর বা

---

* ইং—Inferior Turbinated Bones—ইন্‌ফিরিয়র টরবাইনেটেড্ বোন্‌স্।

ইং—Innferior Maxillary Bones—ইন্‌ফিরিয়র্ ম্যাক্সিলারি বোন্‌স্।

লাঙ্গলের অগ্রসদৃশ ও পত্রবৎ পাতলা। ইহা নাসিকাদ্বয়ের মধ্যে পশ্চাদ্ ভাগে মধ্যপ্রাচীর রূপে অবস্থিত। ইহার অগ্রধারায় ঝর্ঝর-কাস্থির নাসাগ্রপ্রাচীরভূত মধ্যফলক এবং সংহিত অর্থাৎ—এইখানে চারিখানি অস্থির সহিত ইহার সন্ধি হয়। উর্দ্ধধারা দুইটী তটযুক্ত পরিখা বিশিষ্ট, জতুকাস্থির নিম্নতলস্থ রসনিকাখ্য উন্নত আলি এই পরিখায় সংহিত হয়।

সীরিকাস্থির পার্শ্বে 'নাসাতালুকা' নাড়ী ধারণের জন্য দুইটী সূক্ষ্ম পরিখা আছে।

সন্ধি—সীরিকাস্থি ছয় খানি অস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত যথা উর্দ্ধহন্বস্থিদ্বয়, ঝর্ঝরক এবং জতুকাস্থি।

অধোহন্বস্থি*—অধোহন্বস্থি একখানি মুখমণ্ডলের সমস্ত অস্থি অপেক্ষা বৃহৎ ও দৃঢ় এবং অধোদন্তপংক্তির আশ্রয় স্বরূপ। ইহার দুইটী অংশ—অশ্বখুরের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট 'হনুমণ্ডল' এবং উভয়দিকে হনুসন্ধির মধ্যে প্রবিষ্ট উর্দ্ধমুখ 'হনুকূটদ্বয়'; তন্মধ্যে—

(১) হনুমণ্ডল—মুখমণ্ডলের অধঃসীমা নির্ম্মাণকারক এবং অধোদিকে দন্তোদূখল ধারক। বাল্যাবস্থায় হনুমণ্ডল বামে ও

[৩৫শ চিত্র—সীরিকাস্থি]

ঝর্ঝরাস্থির সহিত সন্ধের অগ্রধারাংশ
নাসাতালুক নাড়ী পরিখা
ত্রিকোণ তরুণাস্থির সহিত সন্ধের অগ্রধারাংশ
জতুকাস্থির রসনিকার সহিত সন্ধের পরিখা
বিমুক্তাগ্র পশ্চিমধারা

ত্রিকোণ তরুণাস্থি সংসক্ত থাকে। পশ্চিম ধারা গলবিবরাভিমুখী এবং বিমুক্তাগ্র। অধোধারা উর্দ্ধহন্বস্থিদ্বয়ের তালুফলক যুগ্মের এবং তাল্বস্থিদ্বয়ের পরস্পর সন্ধান যেথায় দক্ষিণে অর্দ্ধাঙ্গভাবে পৃথক্ অবস্থিত থাকে। পরে যৌবনে চিবুকদেশে সংহত হইয়া এক হয়। ইহার দুইটী তল—বাহ্যতল ও অন্তস্তল এবং দুইটী ধারা—উর্দ্ধধারা ও অধোধারা। বাহ্যতলের চিবুকদেশে 'চিবুকপিণ্ড' নামে যে উৎসেধ আছে, তাহার উভয় দিকে 'অধরোৎক্ষেপণী' পেশীদ্বয় সংসক্ত থাকে। চিবুকপিণ্ডে সন্ধির যে রেখা আছে তাহাকে 'চিবুকসন্ধানিকা' বলে। চিবুকপিণ্ডের পশ্চাতে উভয়দিকে 'অনুচিবুক' নামে যে দুইটী বিবর আছে, উহাদের ভিতর দিয়া 'অনুচিবুকা' সংজ্ঞক নাড়ী, সিরা ও ধমনী প্রবেশ করিয়া থাকে। উক্ত বিবর দুইটির মূল হইতে পশ্চান্মুখী তির্য্যক্ রেখা দুইটাকে "বাহ্য তিরশ্চীনা" বলে। এই রেখা দুইটীর উপকণ্ঠে 'অধরানননমনী' ও 'সৃক্কণীনমনী' পেশীদ্বয় এবং নিম্নভাগে অধোধারার নিকটে 'গলপার্শ্বচ্ছদা' পেশী সংলগ্ন থাকে।

অন্তস্তল সর্ব্বত্র ঈষৎ খাতোদর এবং উহার মধ্যরেখার উভয় দিকে 'রসনাকর্ষক' নামে দুইটী কলায়াকার উৎসেধ আছে।

(ক্রমশঃ)

* —Vomer—ভোমার্।

কচু।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম, এ]

—— :*: ——

(ক) মানকচু।

(Alocasia Indica).

বাঙ্গালী পাঠকের কাছে মানকচুর পরিচয় দেওয়া বৃথা। এ কচু যিনি না চিনেন, তিনি নিশ্চয়ই "কচু পোড়া" খাইয়াছেন। মানকচুর সংস্কৃত নাম মানক, স্থূলপত্র, মহাপত্র। মহারাষ্ট্রী নাম কচ্ আলু, কর্ণাট ভাষা ইহাকে ভোগনামা বলে। ভারতবর্ষে অনেক শ্রেণীর মানকচু দেখিতে পাওয়া যায়। সকল শ্রেণীর পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। মানের অনেক গুণ;—মান মৃদুরেচক, মূত্রকারক, ঘর্ম্মকারক, শোথহারক, পিত্তনাশক, রক্তবর্দ্ধক শীতবীর্য্য এবং লঘু। মানের কন্দ, কাণ্ড প্রভৃতি সমস্ত অংশই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কবিরাজ মহাশয়দের "মানমণ্ড" একটী মহৌষধ, এবং উৎকৃষ্ট পথ্য। "মানমণ্ড" খাইয়া—আমি অনেক শোথ রোগী, প্লীহারোগী ও উদর রোগীকে আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে দেখিয়াছি। অনেক বিচক্ষণ ডাক্তার এই সকল রোগীর জীবিতাশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সেকালের প্রাচীন ডাক্তারগণ—যাঁহারা ব্যবসায়ের খাতিরে মুখে আয়ুর্ব্বেদের নিন্দা করিতেন—তাঁহারাও আয়ুর্ব্বেদের "মানমণ্ড" রোগীকে ব্যবস্থা করিতেন। বাস্তবিক রক্তাল্পতায়, যকৃৎ বিকৃতিতে মানমণ্ডের মত উৎকৃষ্ট পথ্য দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ। ২ভাগ মানকচুর গুঁড়া, ১ ভাগ আতপ চাউলের গুঁড়া উপযুক্ত দুগ্ধ এবং চিনির সহিত পায়েসের মত পাক করিলে মানমণ্ড প্রস্তুত হইয়া থাকে।

"মানকচু" খণ্ডখণ্ড করিয়া কাটিয়া শুকাইয়া চিনির রসে পাক করিলে এক রকম 'মুড়কী' প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই মুড়কী রোগীর পক্ষে একটী উৎকৃষ্ট পথ্য। খাইতেও সুস্বাদু। "মানাদি গুড়িকা" প্লীহা যকৃৎ, শোথ এবং পুরাতন গ্রহণীর ফলপ্রদ ঔষধ। মানের পত্রদণ্ডের রস কাণে দিলে—কর্ণশূল ও পুতিকর্ণ রোগী ভাল হয়। মান কচু হইতে সূতার মত একপ্রকার শিকড় বাহির হইয়া থাকে, এই শিকড় শুকাইয়া ভস্ম করিয়া মধুর সহিত মিশাইয়া লাগাইলে—অতি ভীষণ মুখক্ষতও ২।৩ দিনে ভাল হইতে পারে। মানকন্দের রস গণ্ডীর মত করিয়া চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিলে ইরিসিপ্লাস্ রোগের বিসর্পণ বন্ধ হইয়া যায়। ডাক্তার জগবন্ধু বসু মহাশয়কে ইহা আমি ব্যবস্থা করিতে দেখিয়াছি। কেবলমাত্র মানকচু চূর্ণ আধতোলা পরিমাণ লইয়া,—এক ছটাক গরম জলের সহিত প্রত্যহ খালি পেটে খাইলে—প্লীহাদি

আর বাড়িতে পায় না। মানকচু অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম তৈল ও লবণ সহ জিহ্বায় ঘর্ষণ করিলে জিহ্বার জড়তা বিনষ্ট হয়। মানের পত্রবৃন্তের রস সঙ্কোচক এবং রক্ত রোধক। ডাঁটাটি অগ্নিতে সেঁকিয়া রস বাহির করিতে হয়। মানের দণ্ড পচিয়া গেলে—তাহার রস ঘুঁটের ছাই সহ প্রলেপ দিলে পাদশোথ ভাল হয়। মানকচু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া কাটিয়া, উহা কাপড়ে পুঁটলী বাঁধিয়া অগ্নিতে তপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ দিলে বাতরোগের বেদনা ও যন্ত্রণা দূর হয়।

আমাদের দেশে প্রবাদ আছে 'বিজয়া দশমীর' পর সার্দ্ধ দুই দিবস পর্য্যন্ত শিবরাণী দুর্গা নাকি মানতলায় বাস করিয়া থাকেন। এই জন্য অনেক গৃহস্থ বাড়ীর সামনে, খিড়কীর দ্বারে মানগাছ পুঁতিয়া রাখেন। পূর্ব্ব বঙ্গের অনেক স্থানেই দেখিয়াছি প্রবীণা গৃহিণীগণ বিজয়ার পরই আঙ্গিনায় মানগাছ ও হরিদ্রা গাছ রোপন করেন। মহাদেব ভগবতীকে মর্ত্তধামে আসিতে দিতে সম্মত ছিলেন না, দুর্গা জোর করিয়া চলিয়া আসেন। দশমীর পর যখন দেবী স্বামীসহ কৈলাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন,—শিব তখন বাধা দেন। তাই দেবী মান করিয়া মানতলায় আড়াই দিন বসিয়া ছিলেন। তার পর দাম্পত্য কলহের নিবৃত্তি হয়। শিব-দুর্গা কৈলাস যাত্রা করেন। এই প্রবাদটী স্মরণ করিয়া বহু গৃহস্থের গৃহলক্ষ্মীগণ মান গাছকে অতি পবিত্র ভাবিয়া থাকেন। দুর্গোৎসবের "নব পত্রিকায়" মান ও কচুর গাছ গৃহীত হইয়া থাকে।

মানের চাষ বেশ লাভজনক ব্যবসায়। এক একটী মান ১০।১২ সের হইতে একমণ পর্য্যন্ত ওজনের হইতে দেখা যায়।

(ব) কৃষ্ণকচু।

ইহাও একপ্রকার বন্য কচু। সিক্ত ভূমিতে আপনা হইতে জন্মে। ইহার পাতা, বৃন্ত সমস্তই কৃষ্ণবর্ণ। কন্দ অত্যন্ত ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহার চতুর্দ্দিকে বহুসংখ্যক প্রতান বহির্গত হইয়া থাকে। ইহার বৃন্ত শাকের মত রন্ধন করিয়া খাইতে হয়। এই কচুর আঠার প্রলেপ দিলে শিশুদের নাভিপাক ভাল হয়, নালী বা শুকায়, বাঘী বসিয়া যায়। নখ দিয়া মূল ছেদন করিলে, দুগ্ধবৎ আঠা বাহির হয়।

(ভ) চড়কচু।

এক জাতীয় বন্য কচু। ইহার পত্র ও পত্রবৃন্ত নীলাভ কৃষ্ণ। গুণ পূর্ব্বোক্ত কচুর মত। ইহার বৃন্ত শাকের মত খাওয়া চলে।

(ম) বড়িয়াকচু।

ইহার আর একটী নাম—দস্তর কচু। পত্র গোলাকার, পত্রের ব্যাস দেড় ফুট হইতে ২ ফুট। বৃন্ত অত্যন্ত স্থূল। ইহার কন্দ নাই বলিলেই হয়,—ইহার ডাঁটা খাওয়া চলে।

(য) বিষকচু।

(Arum Fornicaturn)

এই কচু বাঙ্গালার সর্ব্বত্র বনে-জঙ্গলে জন্মিয়া থাকে। পত্র গাঢ় সবুজ বর্ণ, মূল আঁইস যুক্ত—অনেক সময় মূল—মৃত্তিকার উপরেই বিস্তৃতি লাভ করে।

এই কচু একেবারেই অখাদ্য। ইহার রস গায়ে লাগিলে গা চুলকায় ও ফুলিয়া উঠে। কিন্তু ইহার মূল বাটিয়া প্রলেপ দিলে—ইহাঁর

বাত ভাল হয়। ফোড়া বসিয়া যায়। এই কচু তৈলে ভাজিয়া সেই তৈল ক্ষতে দিলে ক্ষত শুকায়। বিষকচুর অনেক জাতি আছে। যথা—ঢোঁড়া কচু, সাপ কচু, ডাঁ কচু, আড়াই কচু, ইত্যাদি। কোন কোন দেশে—ইহাকে ঘেঁচু বলিয়া থাকে। ঘেঁচু জাতীয় বিষকচুর ফুল অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত। পল্লীগ্রামে বর্ষাকালের সন্ধ্যায়—এই ফুলের দুর্গন্ধ বেশ বুঝিতে পারা যায়। ফুল রক্তবর্ণ—দীর্ঘাকার, সূক্ষ্মাগ্র,—এই ফুলের বৃন্ত গ্রন্থিল এবং পীতবর্ণ। ইহার নাম ঘেঁটফুল।*

(র) রঞ্জনকচু।

(Caladium)

প্রায় ৩০ প্রকার রঞ্জন কচু আমি দেখিয়াছি। এই জাতীয় কচুর পত্রগুলি—শ্বেত, রক্ত, পীত, কৃষ্ণ, প্রভৃতি বর্ণদ্বারা সুরঞ্জিত। দেখিতে সুন্দর ও শোভন বলিয়া বিলাসী বাবুদের বাগানে সুরক্ষিত হয়। ইহার কোন কোন জাতীয় গাছ ১৫৲ টাকা মূল্যেও বিক্রীত হইয়া থাকে। এই সকল কচু—কতক ভারতের, কতক জাপান প্রভৃতি ভিন্ন দেশ হইতেও আসিয়াছে। এই কচু কেহই খায় না। কেবল শোভার জন্য—ইহার আদর। পারি ত পরে ইহাদের পৃথক পরিচয় দিব।

ওলকচু।

(Amerphallus Campanulatum
Syn. Colocasia camputanulata.
Telunga Potato.)

য়ুরোপের বৈজ্ঞানিকগণ ওলকেও কচু শ্রেণীর মধ্যে ধরিয়াছেন। ওল দ্বিবিধ। শ্বেত ও রক্ত। যে ওল কচু ছেদন করিলে রক্তাভ প্রবল বর্ণ শস্য দেখা যায়, তাহার নাম রক্ত ওল। শ্বেত ওল ছেদন করিলে পীতাভ শ্বেতবর্ণ শস্য দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বেত ওল সুখাদ্য—তত গলা ধরেনা। রক্ত ওল প্রায়ই কুটকুটে হইয়া থাকে। চাষের গুণে কোন কোন রক্তওল খাদ্যোপযোগী হইতে পারে। ভারতবর্ষে—বিশেষতঃ বঙ্গদেশে বিনা চাষে অযত্ন সম্ভূত ওল জন্মিয়া থাকে।

পাঠকগণের কাছে ওলবৃক্ষের পরিচয় দেওয়া ধৃষ্টতা, কেননা ওলগাছ দেখেন নাই, এমন বাঙ্গালী আছেন বলিয়া মনে হয় না। ওলকন্দ স্বভাবতঃ গোলাকার। এই কন্দ হইতে বহু সংখ্যক স্ফীত গুটিকাবৎ মুখী বাহির হয়। ইহার ইংরাজী নাম Eye or tuber এই গুটীগুলি—ওলের বীজ স্বরূপ অর্থাৎ ইহা হইতেই নূতন গাছের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ওলের ফুল খুব বড়, বর্ণ সবুজ ও বেগুণে মিশ্রিত, দেখিতে অতি সুন্দর।

ওলের সংস্কৃত নাম—শূরণ, স্থূলকন্দক কন্দ, অর্শোঘ্ন, কণ্ডুল ইত্যাদি। ইহাকে সিংহলবাসীরা—কিডারণ, হিন্দুস্থানীরা শূরণ, আসামীগণ ওলকচু, তৈলঙ্গীগণ মঞ্চাকান্দা, মহারাষ্ট্রীরা পোড়াশূণ, তামিলীগণ, শূর্ণা, গুজরাটবাসীরা শূরণ এবং পারস্যবাসীগণ ওলকন্দ বলিয়া থাকেন।

গ্রাম্য এবং বন্য ভেদে ওল আবার দুই প্রকার। যে ওলের চাষ করা হয়, তাহাই গ্রাম্য—যে ওল আপনা হইতে জন্মে তাহার নাম বন্য।

* প্রসবের পর স্ত্রীজাতিকে ঘেঁটফুলের ঝোল খাওয়াইলে জরায়ুর দোষ নিবৃত্ত হইয়া থাকে—এইরূপ শুনিয়াছি। আঃ, সং।

ওল—অগ্নিদীপক, রুক্ষ, কণ্ডু কারক, বিষ্টম্ভী, রুচিকারক—কফ, অর্শ, প্লীহা ও গুল্মরোগে—হিতকারী। বন্যওল—ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অর্শোরোগে—ওল সুপথ্য এবং একটী মহৌষধ। শূরণ খণ্ড, শূরণ পিণ্ড—প্রভৃতি ঔষধের ওল একটী প্রধান উপাদান। ওল দগ্ধ করিয়া লবণসহ ভক্ষণ করিলে—অর্শের রক্তস্রাব ও যন্ত্রণা নিবারিত হইয়া থাকে। তৈল, লঙ্কা, সর্ষপ প্রভৃতি সংযোগে—ওল পিত্তবর্দ্ধক হয়, উহার উপকারিতাও নষ্ট হয়।

ওল অত্যন্ত বলকারক, এবং পাচক, ইহা দ্বারা শ্লীপদ, অর্ব্বুদ, শূল, দদ্রু রোগ এবং গ্রহণীরোগ—ভাল হইয়া থাকে, কুচরিত্রা নারীগণ ওলের মূল ও চিতামূল বাটিয়া খাইয়া গর্ভপাত করিয়া থাকে। গর্ভপাত করিতে গিয়া অনেক সময় গর্ভিণীরও পঞ্চত্ব ঘটে।

পূর্ব্ববঙ্গে একরকম ওল পাওয়া যায়, তাহার নাম 'বাক্'। ইহার ইংরাজী নাম—Telinga potato—এই ওল টেলিঙ্গা পোটেটো নামক উদ্ভিদের মূলের অনুরূপ। ইহারই সংস্কৃত নাম '[illegible]কন্দ'। এই ওল সিদ্ধ করিয়া খাইলে অগ্নিমান্দ্য সারে।

ওলের ডাঁটা—কোমল অবস্থায় অর্থাৎ যখন পত্রগুলি ভাল ভাবে বিস্তৃত হয় নাই—অতি সুখাদ্য। ইহা সিদ্ধ করিয়া, সরিষা বাটা ও কিছু লঙ্কা মাখিয়া, সরিষার তৈলে [illegible] ফোড়ন দিয়া তাহাতে ঐ ওলের ডাঁটা ভাজিয়া লইতে হয়। ইহা বড় মুখপ্রিয়। ওলের কন্দ—ভালরূপ করিয়া ভাতে দিয়া, কখনও বা সিদ্ধ করিয়া মসলা মাখিয়া বড়ার মত ভাজিয়া খাওয়া যায়।

স্মৃতিশাস্ত্রে কার্ত্তিক মাসে ওল ভক্ষণের নিষেধ বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ কি, জানি না। এদেশ প্রচলিত একটী ছড়ায় কিন্তু কার্ত্তিক মাসেই ওল খাইবার ব্যবস্থা আছে। যথা—

ভাদ্রমাসে তালের পিঠা, আশ্বিনে শশা মিঠে।
কার্ত্তিকে খাইবে ওল, অগ্রাণে খলিসার ঝোল॥
পৌষে কাঁজি, মাঘে তেল, ফাল্গুনে গুড় আদা বেল।
চৈত্রে নিম গিমা তিতা, বৈশাখে ঘৃত নালিতা।
জ্যৈষ্ঠে খই, আষাঢ়ে দই।
শ্রাবণে ঘোল চাল্তা, তবে হয় শরীরের কান্তা॥

বনে জঙ্গলে আর এক প্রকার ওল পাওয়া যায়, তাহার কাণ্ড (ডাঁটা) বিচিত্র বর্ণ। এই ওল আদৌ খাদ্যরূপে ব্যবহার করা চলে না। ইহা ভাল করিয়া সিদ্ধ করিয়া, অম্লরস দিয়া,—অতিরিক্ত লঙ্কা মাখিয়াও দেখা গিয়াছে—আস্বাদ মাত্র ভোক্তার মুখ দিয়া 'গেটানাল' ছাড়িয়া থাকে। ইহার কিন্তু একটী গুণ আছে—এই ওল চূর্ণ করিয়া তৈলের সহিত প্রলেপ দিলে—বৃশ্চিক দংশন জনিত অসহ্য যন্ত্রণার তৎক্ষণাৎ উপশম হইয়া থাকে।

যে ওল ছায়াযুক্ত স্থানে জন্মে—তাহাতে অত্যন্ত মুখ চুলকায়। খনার বচনেও আছে "ছায়ার ওলে চুলকায় মুখ।" কিন্তু ছায়ার ওল অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া থাকে।

এদেশে আরও দুই রকম কন্দ দেখিতে পাওয়া যায়। ১। "[illegible]"। ২ কাঁটুকো। অমর্ত্ত্যমানের ডাঁটা প্রভৃতি। কাঁটুকের পত্র বৃন্ত কণ্টক যুক্ত। ইহা অখাদ্য।

শিশুপালন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বি-এ সরস্বতী]

নিদ্রা ও আহারের ন্যায় ব্যায়ামও শিশুর জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক। ক্ষুদ্র শিশু তাহার ক্ষুদ্র শয্যায় শুইয়া কেমন আনন্দে হাত পা ছুড়িয়া খেলা করে। ক্ষুদ্র শিশু ব্যায়ামের কিছুই জানেনা, কিন্তু বিধাতা তাহার দেহরক্ষার জন্য তাহাকে এই ব্যায়াম করাইতেছেন। সেই অসহায় অবস্থায় বিধাতা তাহার দ্বারা এইরূপ ব্যায়াম না করাইলে শিশুর দেহ কখনো বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইত না। শিশুর জীবনের জন্য ব্যায়াম কত আবশ্যক এতদ্বারা বিধাতা আমাদিগকে তাহা দেখাইয়া দেন। আমরা অনেক সময় এ শিক্ষা ভুলিয়া যাই। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তাও যে বাড়ীতে থাকে সে কথা আমাদের স্মরণ থাকে না। পাশ্চাত্য দেশবাসীগণ ব্যায়ামের গুণ বিলক্ষণ অবগত আছেন বলিয়াই পনের দিনের শিশু হইতে ৮০ বৎসরের বৃদ্ধকে পর্য্যন্তও ব্যায়াম করিতে দেখা যায়। আহার নিদ্রার ন্যায় ব্যায়ামও তাঁহাদের জীবনের নিত্যকর্ম্মের মধ্যে একটি প্রধান কর্ম্ম বলিয়া তাহা যত্নের সহিত পালন করেন। তাই তাঁহারা শৌর্য্যবীর্য্যের জন্য আজ ভুবন বিখ্যাত। তাই তাঁহাদের দীর্ঘ ও উন্নত দেহ, বিশাল বক্ষ, দৃঢ় ও বলশালী বাহুযুগল দেখিয়া তাঁহারা কেমন এক উন্নত লোকের জীব [illegible] আমাদের [illegible] হয়। শক্তি দেবী যেন তাঁহাদের দাসী। দেহ বলশালী হইলে মনও তেজস্বী ও মহৎ হয়, প্রাণ অগ্নিময় হয়। মানুষ তখন অসাধ্য সাধন করিতে ছুটিয়া চলে। উদ্দেশ্য সাধন করিবার পথে কোন অন্তরায়কেই তাঁহারা গ্রাহ্য করেন না। আর দুর্ব্বল, মেরুদণ্ড বাঁকা, শীর্ণকায়, রোগক্লিষ্ট হইলে মনও ভীরু, কাপুরুষ হয়, কোন কার্য্যে উৎসাহ থাকে না, কার্য্য করিবার পথে সামান্য বাধা উপস্থিত হইলেই মন দমিয়া যায়। এরূপ মানুষের দ্বারা সংসার, সমাজ, দেশের কোন কাজই হয় না, অপদার্থ জীবন ধারণ করিয়া পশুর ন্যায় দিন শেষ করে।

যে কোন স্থানেই যাই না কেন, সে যতই জনাকীর্ণ, দুর্গন্ধময় সহর হউক না কেন, আমরা প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে দেখিতে পাই যে, সহরের যতটুকু উন্মুক্ত স্থান আছে, তাহা ইউরোপীয় ইংরাজ শিশু ও বালক বালিকায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। পনের দিনের শিশু হইতে এক বৎসরের শিশুরা গাড়ীতে শুইয়া বায়ু সেবন করিতেছে। বয়স্ক বালক বালিকাগণ ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতেছে, কিংবা কোনও ব্যায়াম করিতেছে। এইরূপ ব্যায়ামের ফলে তাহাদের কি সুন্দর সুগঠিত স্বাস্থ্যের জ্যোতি সম্পন্ন দেহ। দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। কলিকাতায় ইডেন উদ্যানে

সন্ধ্যাকালে যখন বাজনা বাজিতে থাকে, তখন শত শত পাশ্চাত্য শিশু কেমন তালে তালে নৃত্য করিতে থাকে, দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয়। তাহারা প্রত্যেকে যেন এক একটি গোলাপ ফুল। শত শত ফুলে বাগান যেন আলোকিত করিয়া রাখে। জন্ম গ্রহণের পর হইতেই পাশ্চাত্য পিতামাতা তাঁহাদের শিশু সন্তানের দৈহিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য বিশেষ মনোযোগী হন। তাঁহারা জানেন যে, সুস্থ দেহের মধ্যে সবল মন বাস করে। তাই ভবিষ্যতে এই শিশুগণই এ পৃথিবীতে অসাধ্য সাধন করে। আর আমরা ব্যায়ামের গুণ অবগত থাকিলেও তাহা কার্য্যে লাগাই না। সহরের দুর্গন্ধময় পল্লীতে অন্ধকার স্যাঁতসেতে গৃহে আমাদিগের অধিকাংশ লোকেরই বাস। শিশুদিগকেও আমরা তাহার মধ্যে দিবারাত্রি ভরিয়া রাখি। কখনো একটু উন্মুক্ত স্থানে নির্ম্মল বায়ু সেবন করিতে পাঠাই না। আমাদের শিশুদের শৈশবাবস্থা ত এইরূপে কাটিয়া যায়। তারপর, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পড়ার চাপে তাহাদের অপুষ্ট দেহ শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া পড়ে, মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যায়, চক্ষের জ্যোতিঃ কমিয়া আসে। মানসিক পরিশ্রমের সহিত শারীরিক পরিশ্রম সমান ভাবে না করিলে এই অবস্থায় আসিয়া পড়িতে হয়। বর্ত্তমান সময়ের যুবকদের শীর্ণ দেহ, কোটরগত চক্ষু, বাঁকান পৃষ্ঠদেশ, পাণ্ডুর মুখ দেখিলে দেশের ভবিষ্যত ভাবিয়া শঙ্কিত হইতে হয়। 'যে দেশ চিরকালই শৌর্য্যবীর্য্যের জন্য বিখ্যাত ছিল, কি পরিতাপের বিষয়,—আজ সেই দেশের ভাবীবংশধরদিগের অবস্থা দেখিলে চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হয়। ২০ বৎসরের পূর্ব্বেও এদেশে ব্যায়ামের চর্চ্চা প্রভূত পরিমাণে হইত। বাড়ীতে বাড়ীতে কুস্তির আড্ডা, অশ্বারোহণ, সন্তরণ, বাচখেলা, লাঠি ও তরবারি খেলা, ধনুর্ব্বিদ্যা এবং অন্য নানারূপ ব্যায়াম চর্চ্চা হইত। ধনীরা বাড়ীর ছেলেদের ব্যায়াম শিখাইবার জন্য পালোয়ান দিগকে বাড়ীতে রাখিতেন।

বর্ত্তমান কালের যুবকদের শোচনীয় শারীরিক অবস্থার পরিণাম ভাবিয়া সকলেরই ব্যায়ামের প্রতি এক্ষণে দৃষ্টি পড়িয়াছে। আমাদের শৈশবে যতটা ব্যায়াম চর্চ্চা না হইতে দেখিয়াছি, এখন বালক ও যুবকদের মধ্যে তদপেক্ষা অধিক ব্যায়াম চর্চ্চা হইতে দেখিয়া এই আশার সঞ্চার হইতেছে যে, আবার দেশে দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ দেহ, বিশাল বক্ষ, দৃঢ় ভুজযুগল বিশিষ্ট বীরের আবির্ভাব হইবে।

বারবৎসর পর্য্যন্ত বালকবালিকা দিগকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় উন্মুক্ত স্থানে বিশুদ্ধ বায়ু-সেবনের জন্য পাঠাইয়া দিবে। সেখানে তাহারা ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিবে, দৌড়াইবে এবং বেড়াইবে। এই বয়সের বালক বালিকাদের পক্ষে Skipping একটি উত্তম ব্যায়াম। যাহারা হাঁটিতে পারে না—তাহাদিকে গাড়ী করিয়া কিংবা ভৃত্যের ক্রোড়ে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে পাঠাইবে। শিশুকে যত কম কোলে রাখিবে ততই তাহার দেহ ভাল থাকিবে। নিতান্ত প্রয়োজন হইলে তবে শিশুকে কোলে করিবে, নতুবা নহে। যে কোলে করে তাহার দেহের গরমে শিশু দুর্ব্বল হয়। ভৃত্যের সুবিধা না থাকিলে মাতা নিজে সংসারের কাজ সকল কাল ফেলিয়া শিশুকে লইয়া গৃহের ছাদের উপরে প্রাতে ও

সন্ধ্যায় বেড়াইবেন। শিশু হাঁটিতে পারিলে তাহাকে হাঁটাইবেন। প্রতি দিন অন্ততঃ তিন ঘণ্টা শিশুকে উন্মুক্ত স্থানে রাখিবেন। উন্মুক্ত স্থানে দূরে পাঠাইবার সুবিধা না হইলে বালক বালিকাদিগকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় ছাদে খেলা করিতে দিবে। বার বৎসর পর্য্যন্ত বালক বালিকাদিগের পক্ষে খেলা, দৌড়াদৌড়ি, ছুটাছুটি, ভ্রমণ, Skipping উত্তম ব্যায়াম। তাহার পর ডাম্বেল, ডন, বৈঠক, মুগুর ভাঁজা অল্প অল্প করিয়া বয়স অনুসারে করিলে বেশ উপকার হয়। কৈশোরে ও যৌবনে Sandow's Combined Developer দ্বারা তাঁহার প্রদর্শিত প্রণালী অনুসারে ব্যায়াম করিলে দেহের গঠন সুন্দর হয়, মাংস পেশী দৃঢ় হয়, বক্ষ প্রশস্ত হয়। বালকদিগের জন্য অন্য নানা প্রকার ব্যায়ামের ব্যবস্থা আছে। Y. M. C. A. University Institute প্রভৃতি স্থানে যুবকদিগের নানা-প্রকার ব্যায়ামের সুন্দর বন্দোবস্ত আছে।

বার বৎসর পর্য্যন্ত বালক ও বালিকা-দিগের ব্যায়াম একই প্রকারের হওয়া প্রয়োজন। তাহার পর বালিকাদিগের ব্যায়ামের প্রণালী অন্যরূপ হওয়া উচিত। কিন্তু Sandow's Developer বয়স্কা বালিকা-দিগের পক্ষেও অত্যন্ত উপযোগী ও উপকারী। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে বালিকাদিগের জন্য কোন ব্যায়াম প্রণালী নির্দ্দিষ্ট নাই। গৃহ কর্ম্মে রত থাকিলে বালিকাদিগের পক্ষে সুন্দর ব্যায়াম হয়। ঘর ঝাঁট দেওয়া, জল তোলা, মসলা বাটাতে বক্ষ প্রত্যঙ্গের সুন্দর ব্যায়াম হয়। ঝাঁট দিবার অভ্যাস করিলে হাতের গঠন সুন্দর হয়। [illegible] পূর্ব্ব

সাম্রাজ্ঞী পরমা সুন্দরী ছিলেন। তিনি প্রত্যহ এক কলসী জল মাথায় লইয়া প্রাসাদের ছাদে বেড়াইতেন। এইরূপে বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহার দেহের গঠন সুন্দর হইয়াছিল। নিয়মিত ভ্রমণও বালিকা দিগের উত্তম ব্যায়াম। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের নারীগণ উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহা-দের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যাইতেছে বলিয়া একদল নারী-হিতৈষী-নারী উচ্চ শিক্ষার বিরুদ্ধে চীৎকার করিয়া থাকেন। কাহারো কাহারো স্বাস্থ্য যদি ভাঙ্গিয়া গিয়াই থাকে, তবে তাহা উচ্চ শিক্ষার অপরাধ নহে, তাহা তাঁহাদের গৃহ শিক্ষার অপরাধ, পিতামাতার ত্রুটি। পিতামাতা যদি তাঁহাদের কন্যাদের মানসিক শ্রমের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক পরিশ্রমেরও ব্যবস্থা করিতেন তবে নারীশিক্ষার বিরুদ্ধবাদী দিগকে বলিবার এ ফাঁকটুকু রাখিবার অব-সর দিতেন না। কন্যাদিগকে যেমন মানসিক শ্রম করিতে দিবেন ঠিক তেমনি শারীরিক শ্রমেও রত রাখিবেন, এবং তদুপযোগী পুষ্টি-কর আহারের ব্যবস্থা করিবেন। তাহা হইলে উচ্চশিক্ষাও নারীদিগের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিতে সক্ষম হইবে না। বালিকাগণ যেমন লেখা পড়া করিতে থাকিবে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে গৃহ কর্ম্মে রত থাকিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে। যাঁহাদের গৃহকর্ম্ম নিয়মিত ভাবে করিবার তেমন আবশ্যক হয় না তাঁহাদের ভ্রমণ, ছাদের সিঁড়িতে উঠা নামা, স্যাণ্ডোর developer কিংবা ২ অথবা ৩ সের ওজনের ডাম্বেল লইয়া ব্যায়াম করা অত্যাবশ্যক। মোট কথা এই যে, মানসিক শক্তির পরি-চালনার সহিত যাহাতে প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্য-

ঙ্গের মাংস পেশীরও পরিচালনা হয়, প্রত্যহ এরূপ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকা সুস্থ জীবন ধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক। অবশ্য ইহার সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে,দেহের ও মস্তিষ্কের ক্ষয় নিবারণের উপযোগী পুষ্টিকর ও বলকারক খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে; নতুবা অকালে মৃত্যু হওয়া অথবা রুগ্ন হইয়া পড়া অবশ্যম্ভাবী। আমরা এমন অনেক উচ্চ শিক্ষিতা মহিলাকে জানি যাঁহাদের স্বাস্থ্য অটুট আছে, চক্ষের জ্যোতিঃ হ্রাস হয় নাই। তাঁহাদের পিতামাতা তাঁহাদের পাঠ্যাবস্থায় মানসিক শ্রমের সহিত শারীরিক পরিশ্রমেরও ব্যবস্থা রাখিয়াছিলেন, তাই তাঁহাদের স্বাস্থ্যও সুন্দর আছে।

পল্লীগ্রামে পালিত ও বর্দ্ধিত শিশুগণ সাধারণতঃ সুস্থ ও বলিষ্ঠ হয়। তাহারা দিবারাত্রি উন্মুক্ত স্থানে বাস করে বলিয়া বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিবার সুবিধা পায় এবং পল্লীগ্রামের খাঁটি দুগ্ধ, ঘি খাইয়া বেশ বলিষ্ঠ হয়। পল্লীগ্রামের বালক-বালিকাগণ পথে প্রান্তরে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করে,পুষ্করিণীতে সাঁতার দেয়, আম পাড়িবার জন্য গাছে চড়ে। ইহাতে তাহাদের বেশ ব্যায়াম হয়, দেহ সুগঠিত হয়। উন্মুক্ত স্থানের রৌদ্র ও বাতাসের মধ্যে অহর্নিশি থাকিয়া তাহারা সুস্থ ও সবল হইয়া বাড়িয়া উঠে। দুর্ব্বল, রুগ্ন এবং অকাল প্রসূত শিশুদিগকে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত সহর হইতে দূরে স্বাস্থ্যকর স্থানে রাখিলে বিশেষ উপকার দেখা যায়।

ব্যায়ামই জীবন। দেহ ও মনের সুস্থতা ব্যায়ামের উপর নির্ভর করে। উপযুক্ত ব্যায়ামের অভাবে দেহের মাংসপেশী ও tendons দুর্ব্বল ও থল্‌থলে হইয়া পড়ে এবং সমগ্র দেহ ব্যাপিয়া যে শত শত শিরা উপশিরা রহিয়াছে তাহারা Sluggish ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। আমাদের দেহের প্রতি নিমেষে ক্ষয় হইতেছে। বাহির হইতে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করিয়া এই ক্ষয় পূরণ করিতে হয়। কিন্তু ব্যায়াম না করিলে দৈহিক যন্ত্রাদির কার্য্যশক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, বলিয়া পুষ্টিকর খাদ্য যথোপযুক্তরূপে assimilate করিবার শক্তি ভালরূপ থাকে না। সুতরাং আমাদের দেহের ক্ষয় যতটা হয় পূরণ ততটা হয় না, কাজেই দেহ ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে থাকে। ব্যায়াম অভাবে আমাদের দেহযন্ত্র দুর্ব্বল হইয়া পড়ে বলিয়া আমাদের খাদ্যের অসার অংশ দেহ হইতে সবটা বাহির করিবার ক্ষমতা থাকে না। সুতরাং এই সকল অসার অংশ দেহের মধ্যে জমিয়া নানা রোগবীজাণুর আকর হইয়া দাঁড়ায়।

সকলেই জানেন যে যন্ত্রাদি ফেলিয়া রাখিলে মরিচা ধরিয়া শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু কাজে লাগিলে অনবরত ক্ষয় হইলেও তাহাপেক্ষা অধিক দিন টেঁকে। আমাদের দেহ যন্ত্রও ঠিক এইরূপ। শারীরিক ও মানসিক শ্রমে আমাদের দেহের যত না ক্ষয় হয়, অলস হইয়া বসিয়া থাকিলে মরিচা ধরিয়া তদপেক্ষা দেহের অধিক ক্ষয় হয়। কিন্তু ইহাও মনে রাখা উচিত যে আমাদের শ্রম যেন অতিরিক্ত না হয়।

উপযুক্ত পুষ্টিকর আহার, বিশুদ্ধ বাতাস, নিয়মিত ব্যায়াম, নিয়মিত কোষ্ঠ পরিষ্কার আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান উপাদান।

What a baby should do.

সুস্থ শিশু সাধারণতঃ দুইমাস বয়সে আলো এবং বিভিন্ন রঙের প্রতি মনোযোগ দিবে এবং হাসিতে চেষ্টা করিবে।

তিন মাস বয়সে তাহার ক্ষুদ্র দেহটি একটু একটু তুলিয়া ধরিতে আরম্ভ করিবে এবং যাহা তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করে তাহা ধরিতে চেষ্টা করিবে।

ছয় মাসের সময় বালিশে ঠেস দিয়া বসিতে পারিবে।

আট মাসে যে শব্দ শুনিবে এবং যে গতি দেখিবে তাহার অনুকরণ করিবে।

দশ মাসে বিনা সাহায্যেই বসিতে পারিবে এবং হামা গুড়ি দিতে চেষ্টা করিবে।

পনের মাসের সময় দৌড়াইতে এবং চেয়ার ঠেলিয়া দিতে পারিবে।

আঠার মাসে সিঁড়ি দিয়া উঠা নামা করিতে পারিবে।

দুই বৎসর বয়সে ছোট ছোট বাক্য sentence বলিতে পারিবে।

সুস্থ শিশুর পক্ষে সাধারণতঃ এই নিয়মই খাটে, কিন্তু অনেক স্থলে বহু শিশুর বিলম্বে সমস্ত কাজ হয়। তাহাঁরা বিলম্বে বসিতে পারে, হাঁটে এবং কথা বলে। এইরূপ শিশুদের জোর করিয়া কিছু করাইবেনা। তাহা হইলে বিশেষ অনিষ্ট হইবে। তাহাদের উপযুক্ত সময় আসিলে তাহারা নিজেরাই সব করিবে। বিধাতা সময় মত তাহাদের কার্য্য তাহাদের দ্বারাই করাইবেন। তবে দুর্ব্বলতা ও অসুস্থতাবশতঃ এই বিলম্ব ঘটিলে তাহার প্রতিকার তখনি করা কর্ত্তব্য। (ক্রমশঃ)

পল্লীবাসীর প্রতি নিবেদন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

[রায় শ্রীচুনীলাল বসু আই, এস, ও এম, বি, এফ, সি, এস্ বাহাদুর]

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা।

—:*:—

আজ কাল এই রোগ পৃথিবীর নানা স্থানে মহামারীরূপে দেখা দিয়াছে। ইউরোপ, এসিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশের সর্ব্বত্রই এই রোগের প্রকোপে অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। ভারতবর্ষে এই রোগ ১৮৯০ সালে একবার দেখা দিয়াছিল, কিন্তু সেবারে অনেক লোক রোগে আক্রান্ত হইলেও মৃত্যুসংখ্যা এত অধিক হয় নাই। এবারে বোম্বাই, মাদ্রাজ, পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বঙ্গ ও বিহারের অনেকানেক স্থানে এই রোগ প্রাদুর্ভূত হইয়া বহু লোকের মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। কলিকাতায় এক সময়ে এই রোগে প্রতিদিন ৫০।৬০ জন মরিতেছিল; মফঃস্বলের অনেক স্থানের

মৃত্যুসংখ্যা কলিকাতা অপেক্ষা অনেক অধিক।

ইহা একটী সংক্রামক রোগ অর্থাৎ হাম, বসন্তের ন্যায় একজনের হইলে পাঁচজনের হইবার সম্ভাবনা। যাহাদের এই রোগ হইয়াছে, তাহাদের প্রশ্বাস, হাঁচি ও কফের সহিত এই রোগের বীজ দেহ হইতে বাহির হইয়া বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে এবং নিঃশ্বাসের সহিত উহা সুস্থ ব্যক্তির দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ঐ রোগ উৎপাদন করে। নাক ও মুখের গহ্বরই রোগ-বীজের প্রবেশ পথ।

রোগের লক্ষণ কি কি, এই রোগ উপস্থিত হইলে কোন্ কোন বিষয়ে সাবধানতার আবশ্যক এবং যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে এই রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কোন স্থানে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা দেখা দিলে যদি কাহারো সর্দ্দি হয়, নাক দিয়া কাঁচা জল ঝরে বা খুব হাঁচি হয়, মাথা ধরে, গা গতরে বেদনা হয় এবং জ্বর ও কাশি হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, খুব সম্ভব, তাহার ঐ রোগ হইয়াছে। অনেক সময়ে রোগ আর অধিক বাড়ে না, রোগী ৩।৪ দিন একই ভাবে থাকিয়া আরোগ্য লাভ করে, কিন্তু কিছুদিন পর্য্যন্ত তাহার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল থাকে।

রোগ বেশী হইলে জ্বর ও কাশি বাড়ে, শুক্‌নো কাশিতে রোগী অত্যন্ত কষ্ট পায়, বুকে সর্দ্দি (Bronchitis) বসে, অনেক সময়ে নিউমোনিয়া (Pneumonia—ফুসফুসের প্রদাহ) দেখা দেয় এবং উহা হইতেই অনেক রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কোন কোন রোগী শিরোবেদনায় অস্থির হয়, কেহ জ্বরের বৃদ্ধির সময় প্রলাপ বকিতে থাকে, সর্ব্বদা ঝাঁকিয়া উঠে এবং কাহাকেও চিনিতে পারে না। তখন তাহাকে ঔষধ ও পথ্য সেবন করান দুষ্কর হইয়া পড়ে। ক্রমে হৃৎপিণ্ড (Heart) অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, নাড়ী অতি দ্রুত চলিতে থাকে, নিশ্বাস ঘন ঘন পড়ে এবং অনেক সময়ে জ্বর কমিয়া গিয়া অত্যধিক ঘাম হয় এবং রোগী এইরূপ অবসন্ন অবস্থায় (Collapsed state) মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কোন কোন রোগীর পেটের অসুখ হয়, কাহারো বা রক্ত বমি বা রক্ত দাস্ত হইতে দেখা যায়, কাহারো বা কাশির সহিত রক্ত উঠে অথবা নাক দিয়া রক্ত পড়ে।

যাহাদিগের রোগ খুব কঠিন হয়, তাহারা প্রায় ৫ হইতে ১০ দিনের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

১। থিয়েটার, বায়োস্কোপ প্রভৃতি যে সকল স্থানে লোকের ভিড় হয়, তথায় গমন করিলে এই রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় জনতাপূর্ণ স্থানে যাওয়া নিষিদ্ধ এবং এইজন্য স্কুল কলেজ প্রভৃতি কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখা উচিত।

২। কাহারো এই রোগ হইলে তাহাকে পাঁচজনের সহিত মেশামিশি করিতে দিবে না। রোগীকে পৃথক ঘরে রাখিবে এবং যাহারা তাহার সেবা শুশ্রূষা করিবে, তাহারা ব্যতীত অপর কোন লোককে সে ঘরে প্রবেশ করিতে দিবে না।

৩। যতদিন রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ না করে, ততদিন তাহাকে শয্যা পরি-

ত্যাগ করিতে দিবে না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই রোগে হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। হঠাৎ উঠিতে যাইয়া অথবা চলাফেরা করিবার সময় রোগীকে মাথা ঘুরিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িতে দেখা গিয়াছে, এমন কি সময়ে সময়ে এই কারণে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। রোগী আরোগ্য লাভ করিলেও কিছুদিন তাহার চলাফেরা করা উচিত নহে।

৪। রোগ দেখা দিলেই ইউক্যালিপ্টস্ তেল (Oil Eucalyptus) তিন চারি ফোঁটা রুমালে ঢালিয়া রোগী উহা সর্ব্বদা শুঁকিতে থাকিবে। সুস্থ ব্যক্তিও (বিশেষতঃ যে বাটীতে রোগ দেখা গিয়াছে, তথাকার লোকেরা) রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় এই তৈল সর্ব্বদা শুঁকিলে রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা।

৫। যাহাতে রোগীর গায়ে ঠাণ্ডা বাতাস না লাগে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া তাহার ঘরের দরজা জানালা সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখিবে। রোগীর দেহ সর্ব্বদা গরম কাপড়ে ঢাকিয়া রাখিবে; তাহার বুক পিট ফ্লানেল বা তুলা দিয়া বাঁধিয়া দিবে।

৬। রোগী যাহাতে পুষ্টিকর খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। দুগ্ধই এই রোগের উৎকৃষ্ট পথ্য—পেটের অসুখ না থাকিলে রোগীকে যথোচিত পরিমাণে দুগ্ধ, বার্লি বা সাগুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, সেবন করিতে দিবে এবং গরম জল বা সোডা ওয়াটার রোগীকে যথেষ্ট পরিমাণে পান করিতে দিবে।

৭। রোগের বৃদ্ধি হইতেছে বুঝিলে তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকিয়া রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি বিনামূল্যে চিকিৎসক ও ঔষধ পাইবার এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, রোগের সূত্রপাত মাত্রেই চিকিৎসককে সংবাদ দিলে রোগীর চিকিৎসার তৎক্ষণাৎ সুবন্দোবস্ত করা হয়। বিলম্ব করিলে বিশেষ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

৮। রোগ সামান্য হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ সেবন করিয়া উপকার পাইতে দেখা গিয়াছে। কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটী এইরূপ ঔষধ সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছেন। এই ঔষধ বড়ি বা চাক্তির আকারে প্রস্তুত করা যাইতে পারে। যে কোন ভাল ডাক্তারখানায় এই ঔষধ তৈয়ারি করাইয়া লওয়া যাইতে পারে :—

এমোনিয়া কার্ব্বনেট্—২ গ্রেণ।
সোডি বেঞ্জোয়েট্—২½ গ্রেণ।
কুইনিন্ সল্‌ফেট্—১½ গ্রেণ।
থাইমল্—⅛ গ্রেণ।

অল্প পরিমাণ গঁদের সহিত মিশাইয়া একটি বড়ি বা চাক্তি প্রস্তুত করা হয়। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি একখানি চাক্তি দিবসে তিনবার সেবন করিলে উপকার প্রাপ্ত হইবেন। বালকদিগের পক্ষে আধখানি এবং শিশুদিগের পক্ষে সিকি চাক্তি একমাত্রা ঔষধ।

৯। রোগীর বিছানা ও বস্ত্রাদি প্রত্যহ ২।৩ ঘণ্টার জন্য রৌদ্রে রাখিয়া দিবে। সুস্থ ব্যক্তিকে রোগীর বিছানা বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে দিবে না। রোগ আরোগ্য হইলে বস্ত্র ও শয্যাদি জলে ফুটাইয়া সাবান দিয়া

পরিষ্কার করিয়া লইলে উহা পুনর্ব্যবহারের উপযুক্ত হইবে।

১০। থাইমল (Thymol) বা পার্মাঙ্গানেট্ অব্ পটাস্ (Permanganate of Potash) নামক ঔষধ জলে অল্প পরিমাণে (½ গ্রেণ ঔষধ আধ সের গরম জলে) দ্রব করিয়া উহা দ্বারা দুইবেলা কুলকুচা করিয়া মুখ ও গলার ভিতর ধুইয়া ফেলিবে এবং উহা হাতে লইয়া উহার "নাস" লইবে। নাকের ও মুখের মধ্যে এই রোগের বীজ প্রবেশ করিয়া তথায় লাগিয়া থাকে; উপরোক্ত ঔষধের সাহায্যে নাক মুখ ও গলা ধৌত করিলে রোগের বীজ নষ্ট হইয়া যায়। কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটী থাইমলের দ্রাবণ এইরূপে ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

১১। দুইফোঁটা ইউকালিপ্টস্ তেল বা ডালচিনির তেল (Oil of Cinnamon) অল্প চিনির সহিত মিশাইয়া দিবে দুই বার সেবন করিলে এই রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা।

বাটীতে সংক্রামক রোগ হইলে উহা নির্দ্দোষ করিবার ব্যবস্থা।

বাটীতে একজনের কোন সংক্রামক রোগ হইলে অপর পাঁচজনেরও ঐ রোগ হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং রোগীর আরোগ্যলাভ বা মৃত্যুর পর বাটীর ঘর দুয়ার এরূপ ভাবে পরিষ্কার করা উচিত, যাহাতে অপর কেহ ঐ রোগে আক্রান্ত না হয়।

নিম্নলিখিত উপায়ে বাসগৃহ সহজে নির্দ্দোষ করিতে পারা যায়:—

১। এক পোয়া ফিনাইল্ (Phenyle) পাঁচসের জলের সহিত মিশাইয়া ঐ জলে "ন্যাতা" ডুবাইয়া বাটীর সমস্ত ঘরের মেজে, দেয়াল, দরজা, জানালা প্রভৃতি এবং তক্তাপোশ, সিন্দুক, বাক্স, আলনা প্রভৃতি কাঠের আসবাব দুই দিন উত্তমরূপে মুছিয়া ফেলিবে।

২। বাটীর উঠান, নর্দ্দামা, পাইখানা, আস্তাকুড় প্রভৃতি স্থানে উপরোক্ত ফিনাইলের দ্রাবণ ঢালিয়া দিয়া ধুইয়া ফেলিবে।

৩। রোগীর দরজা জানালা সমস্ত বন্ধ করিয়া তাহার ভিতর অন্ততঃ ২ ঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া গন্ধক জ্বালাইয়া রাখিবে।

৪। বাটীর সমস্ত অংশ (অন্ততঃ রোগীর গৃহ) ভাল করিয়া "চূণকাম" করিয়া দিবে।

৫। রোগীর গৃহের দরজা জানালা ৩,৪ দিবস সর্ব্বদা খুলিয়া রাখিবে।

উপরোক্ত উপায়ে পরিষ্কৃত হইবার পর ঐ গৃহে অন্য লোক বাস করিলে কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে না।

উপসংহার।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, পল্লীবাসীদিগের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন, তাঁহারা দয়া করিয়া নিজ নিজ গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া আসিবেন না। তাঁহারা গ্রামে না থাকিলে গ্রামের কোনরূপ উন্নতি হওয়া অসম্ভব। যাহাতে গ্রামের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, গ্রামের মধ্যে যাহাতে সুশিক্ষা বিস্তার লাভ করে, অজ্ঞানতামূলক সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত হইয়া, পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্দবন্ধন যাহাতে দৃঢ়ীভূত হয়, কো-অপারেটিভ প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিয়া যাহাতে গ্রামবাসী কৃষক

ও শ্রমজীবিদিগের আর্থিক ও নৈতিক উন্নতি সাধিত হয়, আপাততঃ অসুবিধা ভোগ করিয়াও তাঁহারা গ্রামে থাকিয়া সকলের সমবেত চেষ্টা দ্বারা, প্রয়োজনমত সরকার বাহাদুরের সাহায্য লইয়া, তৎসম্পাদনে বদ্ধপরিকর হউন। ভগবানের আশীর্ব্বাদে ও কৃপায় তাঁহাদের এই মহতী চেষ্টা শীঘ্রই সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিবে।

শিশুমঙ্গল।

বাঙ্গালা দেশে যত শিশু মরে, এমন আর পৃথিবীর কোনো দেশে নহে। এই মৃত্যুর সংখ্যা সংপ্রতি এরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে যে, কর্তৃপক্ষকেও তাহার জন্য চিন্তিত হইতে হইয়াছে। বাঙ্গালার স্বাস্থ্য কমিশনর ডাঃ বেণ্টলী এই জন্যই চৈত্র মাসের শেষে কলিকাতা সহরে স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়া শিশুমৃত্যুর নিবারণ কল্পে নানারূপ উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

কর্ত্তৃপক্ষের এবম্বিধ উদ্যোগ আয়োজন যে বিশেষ প্রশংসনীয় সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বেণ্টলী সাহেবের শিশুমঙ্গল প্রদর্শনী বঙ্গবাসীর সকলের দেখিবার সুযোগ না হইলে যে কয়জন কলিকাতাবাসী বা প্রবাসীর উহা দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছে, তাহাদের মধ্যে জনকয়েকের নিকট হইতেও এ সম্বন্ধে সুফলের আশা করা না যায়! কারণ প্রদর্শনীর প্রদর্শিত বিষয় গুলি ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করার ফলে স্বভাবতঃই স্বাস্থ্যরক্ষার অনেক তথ্য সহজেই অবগতি ঘটিবার কথা।

কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে যে সকল উপায়ে শিশুমৃত্যু হ্রাস পাইয়াছে, আমাদের বাঙ্গালা দেশে শুধু তাহাই প্রচলিত করিলে সম্যক ফল পাওয়া যাইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। আমাদের দেশের মহিলাগণ অশিক্ষিতা, সুতরাং পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে তাঁহাদিগকে শিক্ষিতা না করিলে যে বাঙ্গালাদেশে শিশু রক্ষার আদৌ সম্ভাবনা নাই এই যুক্তিতে আমাদের সম্পূর্ণ মতভেদ আছে। বাঙ্গালী মহিলাগণের অনেকে এখন যেরূপ স্কুলে পড়িয়া কলেজে পড়িয়া বিদুষী হইতেছেন, আগে সেরূপ ছিলনা। সরকারী রিপোর্টেই প্রকাশ, সমগ্র ভারতবর্ষে গত পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা গত বৎসর পঞ্চাশ হাজার ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। স্বীকার করি, ভারতবর্ষে স্ত্রী শিক্ষার পরিমাণ পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় যৎসামান্য মাত্র, কিন্তু এমন দিনও যখন ভারতের খুটিয়া ছিল যে খনা। লীলাবতীর যুগ পরিবর্ত্তনের পর ভারতীয় মহিলার দশ হাজারের মধ্যে এক জন মাত্রও বিদ্যা চর্চ্চা করিতেন কি না সন্দেহ, অথচ তখন আমাদের দেশে শিশু মৃত্যুর কথা সামান্যই শুনা যাইত। এই জন্য আমরা বলিতে বাধ্য—বাঙ্গালা দেশের শিশু দিগকে অকাল মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে দেশে শুধু স্ত্রী শিক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত করিলেই চলিবেনা, তাহা ভিন্ন করিবার বিষয় অনেক রহিয়াছে।

সেকালের মহিলারা স্কুল কলেজের লেখা

পড়ার ধার কমই ধারিতেন বটে কিন্তু গৃহস্থালীর সকল কর্ম্মে তাঁহারা যেরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিতেন, সেকালে শিশুমৃত্যু কম হইত তাহারই ফলে।

সে অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের জন্য তাঁহাদিগকে স্কুল কলেজে পড়িবার আবশ্যক হইত না, বাল্যে মাতার নিকট, কৈশোরে শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণীর নিকট গৃহস্থালীর কর্ম্ম শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই সে সকল শিক্ষা আপনা হইতেই অর্জ্জনের সুবিধা হইত।

ইহার ফলে সেকালে যে এখনকার তুলনায় দেশে শিশুমৃত্যু কম হইত তাহা নহে, সেকালের শিশুগণ দৃঢ়, সবল ও বিলক্ষণ বলিষ্ঠ হইত, সেকালের লোকের দীর্ঘায়ু লাভ তাহারই ফল সম্ভূত।

আঁতুর ঘরের কদর্য্য ব্যবস্থা সেকালে যে ছিলনা তাহাও নহে কিন্তু সেকালের আঁতুর ঘরে শিশু ও প্রসূতিকে 'সেক তাপ দেওয়া', 'ঝাল মসলা' খাওয়ান প্রভৃতির যে পদ্ধতি ছিল, একালে তাহা অনেক দিন উঠিয়া গিয়াছে। বেণ্টলী সাহেবের প্রদর্শিত সূতিকা গৃহের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনের সমর্থন আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে করিতেছি, কিন্তু শুধু তাহা করিলেই চলিবেনা, সেকালের মত আবার সেঁক তাপের ব্যবস্থা এবং প্রসূতিকে ঝালমসলা খাওয়ানরও বন্দোবস্ত ও করিতে হইবে।

অন্যান্য সকলে যাহাই বলুন আমরা শিশুমৃত্যুর আধিক্যের কারণ নির্দ্দেশে মুক্তকণ্ঠে বলিব, বাঙ্গালীর খাদ্যাভাবই বাঙ্গালী শিশুর মৃত্যু বাহুল্যের সর্ব্বপ্রধান কারণ। বাঙ্গালী যে পরিমাণ পরিশ্রম করে, সে পরিমাণ খাইতে পায় না। দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতি পুষ্টিকর আহার্য্য লাভ এখনকার দিনে অতি অল্প বাঙ্গালীর ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। সুতরাং পুষ্টিকর আহার্য্যের অভাবে বাঙ্গালী জাতির জীবনী শক্তি কমিয়া আসিয়াছে। কাজেই সেই ক্ষীয়মান জীবনা বাঙ্গালী জাতির যে সকল সন্তান সন্ততি জন্মিবে, তাহারা যে স্বল্পায়ু হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? প্রকৃত কথা, বাঙ্গালীর খাদ্যাভাবই বাঙ্গালী জাতিকে দুর্ব্বল করিয়া তুলিতেছে। এই দুর্ব্বল পিতামাতার শুক্র-শোণিতের মিলনে সবল, সুস্থ ও দীর্ঘায়ু সন্তান লাভের আশা আদৌ করা যায় না। এজন্য যদি বাঙ্গালা দেশ হইতে শিশুমৃত্যু নিবারণের চেষ্টা করিতে হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালী জাতির জন্য আগে পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে, বাঙ্গালীর হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর মাত্রা কমাইতে হইবে, বাঙ্গালীর দুশ্চিন্তার প্রতীকারে সচেষ্ট হইতে হইবে, মূল ধরিয়া চিকিৎসা করিলে তবে রোগের প্রতীকার হইবে, নতুবা এরূপ সংক্রামক রোগে শুধু মামুলী—বাঁধা ঔষধের ব্যবস্থা করিলে কোনও ফল হইবে না, ইহা সুনিশ্চিত।

বেণ্টলী সাহেবের প্রদর্শনীর বক্তৃতা প্রসঙ্গে আর একটি কথা উঠিয়াছিল যে, Early marrage বাঙ্গালী জাতীর মধ্যে শিশুমৃত্যুর আর একটি কারণ। আমরা এ কথারও সমর্থন করিনা। কারণ Early marrage বহুকাল হইতে বাঙ্গালী জাতীর মধ্যে প্রচলিত। তাহার কুফল পূর্ব্বে তো অতটা শুনা যায় নাই। আমাদের এক পুরুষ পূর্ব্বে যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহাতে

অনেকেই অষ্টম বর্ষে গৌরীদানের ব্যবস্থা করিতেন। সে গৌরীদানের ফলে কার্ত্তিকের মত কান্তিমান ও দীর্ঘায়ু সন্তান লাভই ঘটিত। Early marrage এবং এখন উঠিয়া গিয়াছে। এখন পণপীড়নে সেই মনুযুগের ষোড়শ বর্ষীয়া কন্যা না হইলে আর অনেকের পক্ষেই বিবাহ দেওয়া ঘটিয়া উঠে না। ফলে কন্যা পক্ষে Early marrage এখনকার দিনে আর বড় একটা ঘটিয়া উঠে না, তবে পাস করা পুত্রের বিবাহে অনেকেই অর্থের প্রলোভন ছাড়িতে না পারিয়া পাত্র পাত্রীর বয়সের পার্থক্য বজায় রাখিতে পারেন না। ইহাতে অনেক সময় কুফল ফলিয়াছে, ইহা সত্য। পূর্ব্বে হিন্দু জাতীর মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকিলেও তখন যে এখনকারমত যখন তখন স্ত্রী পুরুষের মিলনের ব্যবস্থা ছিল না এ কথা আমরা অনেকবার বলিয়াছি। তিথি নক্ষত্র দেখিয়া, পর্ব্বদিন বাছিয়া, ঋতুকাল বিচার করিয়া তবে সেকালে স্ত্রীপুরুষের মিলন কাল নির্দ্দিষ্ট হইত। এখন যে এ সকল ব্যবস্থা উঠিয়া গিয়াছে, বাঙ্গালীর শিশুমৃত্যু বাহুল্যের ইহাও একটি কারণ।

পল্লী-প্রসঙ্গ।

বসন্তের প্রকোপ এখনও বাঙ্গালার অনেক স্থলে পূর্ণভাবে বিরাজিত। তাহার উপর জ্বরের জ্বালা বাঙ্গালার অনেক পল্লীতেই প্রকাশ পাইয়াছে। গত মাসে মেদিনীপুরের "নীহার" আমাদিগকে এ সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন—ইহা আমাদের পাঠকবর্গকে জানাইয়াছিলাম। ঐ "নীহার" পুনরায় আমাদিগকে সংবাদ দিতেছেন,—

জ্বরের প্রকোপ সর্ব্বত্র আবার বাড়িতেছে। প্রায় ঘরে ঘরেই লোক জ্বরে শয্যাগত। বসন্তের প্রাদুর্ভাবও সম্পূর্ণ কমে নাই।

শুধু মেদিনীপুর নহে, ২৪ পরগণা হইতেও আমরা জ্বরের সংবাদ পাইতেছি। "ডায়মণ্ডহারবার হিতৈষীতে" প্রকাশ,—

স্থানীয় জলবায়ু ও স্বাস্থ্য।—এ সপ্তাহের মধ্যে দুই এক পসলা বৃষ্টি হইয়াছে। জ্বর-জ্বালার খুব প্রকোপ দেখা যাইতেছে।

ইনফ্লুয়েঞ্জাও কোনো কোনো স্থলে ভীষণ মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে। অনেক দুঃস্থ পরিবার ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়া উপযুক্ত ঔষধাদির অভাবেও যারপর নাই কষ্ট পাইতেছে। শিলচরের "সুরমা" জানাইতেছেন,—

মৌলবীবাজার সবডিভিসনের অন্তর্গত কমলগঞ্জ থানার এলাকাধীন মুন্সীবাজার ও তন্নিকটবর্ত্তী বহু গ্রামে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এমন অনেক পরিবার আছে যে সমস্ত পরিবারে সকলেই পীড়িত, যত্ন শুশ্রূষা করিবার কেহ নাই। আবশ্যক খাদ্য ও বস্ত্রাভাবে এই রোগ এমন প্রবল হইয়াছে বলিয়া লোকের বিশ্বাস। এ বিশ্বাস অমূলক নহে। শ্রীহট্ট জেলার সুযোগ্য সিভিল সার্জ্জন সাহেব বাহাদুরও মনে করেন, খাদ্য ও বস্ত্রের অভাবে এই রোগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। জানা যায়, রোগীর সংখ্যার তুলনায় মুন্সীবাজার ডিস্পেন্সারীতে ঔষধের পরিমাণ অপ্রচুর। অবস্থা বিবেচনায় শীঘ্র উপযুক্ত ঔষধের সংস্থান করা

একান্ত প্রয়োজন। গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে রোগীরা দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে ঔষধ পাইতেছে ও পাইবে, কিন্তু অনেক রোগীই পথ্যের জন্য সাগু, মিশ্রী ও বার্লি ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে অসমর্থ বলিয়া পথ্যাভাবে কষ্ট পাইতেছে। ।/০—।৶০ আনা দরের মিশ্রীর সের ৮৶০ আনা মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। অনেকেই জ্বরের সময় গায়ে কাপড় দিতে পারিতেছে না।

বাঙ্গালার পল্লীগুলি তো ম্যালেরিয়ার পীড়নে ধ্বংসোন্মুখ। তাহার উপর অনেক স্থলেই সুচিকিৎসকের অভাব। তাহার কারণ বাঙ্গালা দেশে যে পরিমাণ রোগ বাহুল্য, বাঙ্গালা দেশে সে পরিমাণ চিকিৎসক নাই। মেদিনীপুরের "হিতৈষী" এ সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া, বসন্ত, কলেরা প্রভৃতি ছাড়িয়া দিলেও একমাত্র ম্যালেরিয়া বিষে মেদিনীপুরের পল্লীগ্রাম সমূহ জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছে। অথচ পল্লীগ্রামে চিকিৎসার অভাবে বিনা চিকিৎসায় কত লোকের যে জীবননাশ হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

বাঙ্গালার বীরভূম জেলা রোগ-পীড়নে কিরূপ বিপর্য্যস্ত তাহা "বীরভূমবাসীর" নিম্নলিখিত সংবাদে অবগত হওয়া যায়।

"বীরভূমে রোগ।—হরেক রকম রোগ বীরভূমে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সিউড়ীতে বহুলোক নিউমোনিয়ায় মরিল। রামপুরহাট সহরে ও মফঃস্বলে ঐ রোগে মরিতেছে। বসন্তও এখানে ওখানে আছে। সাঁইথিয়া থানার কোথাও কোথাও কলেরা দেখা দিয়াছে। সাঁইথিয়াতে একটোটি বেরিবেরি হইয়া গেল। ভগবানের মতলবটা ভাল বলিয়া বোধ না।

মকরধ্বজের ব্যবহার প্রণালী।

[কবিরাজ শ্রীগোষ্ঠবিহারী গোস্বামী ভিষগাচার্য্য।]

—:০:—

নবজ্বরে—আদারস ও মধুসহ, পানের রস ও মধুসহ অথবা তুলসীপাতার রস ও মধুসহ।

সান্নিপাতিক ঘোর বিকার অবস্থায়—মৃগনাভি ১ রতি, কর্পূর ½ রতি, আদার রস ১ তোলা ও মধুসহ।

দাহজ্বরে—উচ্ছে পাতার রস ১ তোলা, হরিদ্রা চূর্ণ ২ রতি ও মধুসহ।

বসন্তরোগে—রুদ্রাক্ষ রস ½ তোলা ও মধুসহ অথবা নিমছাল, ক্ষেতপাপড়া আকনাদির মূল, পলতা, কটকী, বাসকছাল, দুরালভা, আমলকী, বেণারমূল, রক্তচন্দন ও শ্বেতচন্দন। প্রতি দ্রব্য ১৫ রতি ওজনে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া এই কাথ ও মধুসহ।

পুরাতন জ্বরে—আদার রস, শিউলী পাতার রস ও মধুসহ। মুলতানি হিং ২ রতি, পিপুল চূর্ণ ২ রতি, সৈন্ধব লবণ ২ রতি ও পানের রস ২ তোলা সহ অথবা আদা শুলফ কুলেখাড়া ও নাটার কুঁড়ি প্রভৃতি সমান ভাগে লইয়া একত্র ছেঁচিয়া কলার পাতায় বাঁধিয়া পোড়াইয়া তাহার রস ২ তোলা ও মধুসহ।

প্লীহায়—তালজটা ভস্ম ৫ রতি ও পুরাতন ইক্ষুগুড় ½ তোলা সহ, মনসাপাতা সেঁকিয়া তাহার রস ½ তোলা ও মধুসহ, অথবা পিপুল চূর্ণ ৩ রতি ও পুরাতন ইক্ষুগুড় ½ তোলাসহ।

যকৃৎরোগে—দারুহরিদ্রা নামক কাষ্ঠ জলের সঙ্গে শিলায় ঘষিয়া সেই ঘসা ২ তোলা ও মধু ½ তোলা সহ।

জ্বরাতিসারে—মুথার রস ও মধুসহ বা বেলশুঁঠ চূর্ণ ২ রতি, জীরা চূর্ণ ১ রতি, চাউল ধোয়া জলে ও মধুসহ।

অতিসারে—বাবলাপাতার রস ও মধুসহ অথবা সোনাছাল বা কুড়চিছাল ছেঁচিয়া পোড়াইয়া তাহার রস ২ তোলা ও মধুসহ।

আমাশয়ে—মরিচ চূর্ণ ৩ রতি ও কাঁটা-নটেশাকের রস ২ তোলা সহ অথবা তেঁতুল পাতা, বুড়ীপানের পাতা, থুলকুড়ির পাতা ও সরেবেলের পাতা একত্র ছেঁচিয়া পোড়াইয়া তাহার রস ২ তোলা ও মধুসহ।

রক্ত আমাশয়ে—কুকসিমার রস ও মধুসহ দাড়িম পাতার রস ও মধুসহ, আয়াপানের পাতার রস ও মধুসহ অথবা জামছালের রস, ছাগদুগ্ধ ও মধুসহ।

অর্শে—নাগেশ্বর ফুলের রেণু চূর্ণ ৬ রতি, মিছরী আধতোলা ও মাখন ২ তোলা সহ, অথবা ওলকচু চূর্ণ ৩ রতি ও মধুসহ।

অগ্নিমান্দ্যে—জোয়ান চূর্ণ ৬ রতি, সৈন্ধব লবণ ৩ রতি ও কাগজী লেবুর রস সহ অথবা আদার রস ও সৈন্ধবলবণ সহ।

ক্রিমিতে—কটুকী ।• তোলা, দাড়িম-মূলের ছাল ॥• তোলা, বিড়ঙ্গ ॥• তোলা, আপাঙ্গের শিকড় ।• তোলা ও দারুচিনি ।• তোলা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া এক ছটাক থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া এই কাথ ও মধুসহ। পালিধামাদারের ছাল চুণের জলে ছেঁচিয়া তাহার রস ও মধুসহ অথবা পালিধামাদারের পাতার রস ও মধুসহ।

পাণ্ডু, কামলারোগে—হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, গুলঞ্চ, বাসকছাল, কটুকী, চিরতা ও নিমছাল প্রতি দ্রব্য ২• রতি, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া এক ছটাক থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া এই কাথ ও মধুসহ অথবা হরীতকী চূর্ণ ⁄• আনা, পুরাতন ইক্ষুগুড় ।• আনা ও কুলেখাড়ার রস ২ তোলা সহ।

রক্তপিত্তে—আলতা ৪।৫ খানা, পাকা যজ্ঞডুমুর ৮টা ও ছাগদুগ্ধ আধপোয়া একত্র মর্দ্দন করিয়া ছাঁকিয়া এই কাথ ও মধু। দূর্ব্বা ও যজ্ঞডুমুর একত্র ছেঁচিয়া তাহার রস ও মধু, আয়াপানের পাতার রস ও মধু, অথবা বাসকপাতার রস ও মধু।

যক্ষ্মাকাসে—আয়াপানের পাতা, পাকা যজ্ঞডুমুর, কণ্টকারী ও বাসকপাতা একত্র ছেঁচিয়া ও পোড়াইয়া তাহার রস ২ তোলা, ৩ রতি বংশলোচন চূর্ণ ও মধুসহ অথবা বাসকছাল ১ তোলা, অনন্তমূল ।• তোলা, তেজপাতা ।• তোলা, যষ্টিমধু ।• তোলা ও কিস্‌মিস্‌ ।⁄ তোলা আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া এক ছটাক থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া এই কাথ ও মধুসহ।

কাসে—আদা, তুলসীপাতা ও ব্যাকুড়ের পাতা একত্র ছেঁচিয়া পোড়াইয়া তাহার রস ২ তোলা ও মধুসহ, পিঁপুল চূর্ণ ২ রতি, পানের রস ২ তোলা ও মধুসহ অথবা বাসক পাতার রস ও মধুসহ।

শ্বাসে—বহেড়া বীজের শাঁস ⁄• আনা, পিঁপুলচূর্ণ ৩ রতি ও মধুসহ, বহেড়া চূর্ণ ৩ রতি ও মধুসহ, অথবা কণ্টকারীর রস ২ তোলা ও মধুসহ।

হিক্কায়—ময়ূরপুচ্ছ ৬ রতি, পিঁপুলচূর্ণ ৩

রতি ও মধুসহ, কদলী মুলের রস ২ তোলা ও মধুসহ অথবা কচি তালের জল মধুসহ।

স্বরভেদে—যষ্টিমধু চূর্ণ ও মধুসহ, বচের চূর্ণ ও মধুসহ অথবা ব্রাহ্মী শাকের রস ও মধুসহ।

অরোচকে,—আমলকীর রস ও মধুসহ ও বা কুলভিজান জল ও মধুসহ।

বমন রোগে—স্তন দুগ্ধ ৫।৬ তোলা লইয়া তাহাতে ২।৩ খানা আলতার পাতা দিয়া মর্দ্দন করিবে, আলতার রং গুলিয়া গেলে ছাঁকিয়া তাহার ৪ তোলা, কর্পূর ½ রতি, শসা বীজের শাঁস ১২ রতি, ও মধুসহ বা শ্বেত চন্দন ঘসা ১ তোলা, আমলকীর রস ১ তোলা ও মধু সহ।

তৃষ্ণায়—ক্ষেতপাপড়ার রস ও মধুসহ, বেদানার রস ও মধু সহ, মৌরি ভিজান জল ও মিছরী চূর্ণ সহ অথবা পটোলের রস ও মধু সহ।

মূর্চ্ছায়—ত্রিফলার জল ও মধু সহ, বড় এলাচের দানা চূর্ণ ও মধু সহ অথবা বহেড়া বীজের শাঁস ও মধু সহ।

দাহ রোগে—পলতার রস ও মধু সহ, ধনে পলতার কাথ ও মধু সহ, ক্ষেতপাপড়া ও বালা পাতা একত্র ছেঁচিয়া তাহার রস ২ তোলা ও মধু সহ বা রক্তচন্দন ঘসা ২ তোলা ও মধু সহ।

উন্মাদ রোগে—শতমূলীর রস ও মধু সহ, ত্রিফলার জল ও মধু সহ অথবা ঘৃতকুমারীর রস ও মধু সহ।

অপস্মার রোগে—বচের চূর্ণ ও মধু সহ, কুষ্মাণ্ড জল ও মধু সহ, ব্রাহ্মী শাকের রস ও মধু সহ অথবা তিল তৈল ১ তোলা ও রসুন আধ তোলা সহ।

বাত রোগে—নিসিন্দার পাতা, বেল পাতা, গাঁদালের পাতা ও আদা একত্র ছেঁচিয়া পোড়াইয়া তাহার রস ২ তোলা, সৈন্ধব লবণ ৩ রতি ও মধু সহ, আলকুশীর বীজ চূর্ণ ৬ রতি, পুরাতন ঘৃত।০ আনা মধু ৵০ আনা ও রসুনের রস ১ তোলা সহ অথবা আদা ও এরণ্ডমূল ছেঁচিয়া তাহার রস ২ তোলা ও মধু সহ।

বাতরক্ত ও কুষ্ঠে অনন্তমূলের কাথ ও মধু সহ অথবা অনন্তমূল, বেতের মূল, ছাতিম ছাল, কটকী সোণামুখী, দারুহরিদ্রা মঞ্জিষ্ঠা ও তোপচিনি প্রত্যেক।০ আনা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া এই কাথ ও মধু সহ।

শূল ও অম্লপিত্তে—ফটকিরি চূর্ণ ৴০ আনা কুকসিমার রস ২ তোলা ও মধু সহ, শুঁঠ ৫।৩ রতি, এরণ্ডমূল ৫।৩ রতি ও যবের চাউল ৫।৩ রতি আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া এই কাথ ও মধু সহ অথবা ধনে ॥০ তোলা, মৌরী ।০ তোলা ও জাঙ্গী হরীতকী ১ তোলা আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া এই কাথ ও মধু সহ।

গুল্মে—জোয়ান চূর্ণ ৵০ আনা, বিট লবণ ৴০ আনা ও পরিষ্কার ঘোল [illegible] সহ।

মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরী রোগে—বরুণ ছালের রস ও মধু সহ, পাথরকুচির পাতার রস ও মধু সহ অথবা গোক্ষুরবীজ চূর্ণ ৵০ আনা, চিনি ॥০ তোলা ও কেলাকুচার পাতার রস ২ তোলা সহ।

জ্বালাযুক্ত মেহে—কাবাবচিনি চূর্ণ ৵৹ আনা কর্পূর ½ রতি, শ্বেত চন্দন ঘসা ১ তোলা ও মসিনা ভিজান জল সহ অথবা কাঁচা হলুদের রস ১ তোলা, শ্বেতচন্দন ঘসা ১ তোলা ও বাবলার আটা চূর্ণ ৩ রতি সহ।

শুক্র মেহে—কাবাবচিনি চূর্ণ ৵৹ আনা, কর্পূর ½ রতি, গুলঞ্চের রস ২ তোলা ও মধু সহ।

ধাতুদৌর্ব্বল্য ও ধ্বজভঙ্গে—শিমুল মূলের রস ২ তোলা, চিনি আধ তোলা ও বলকা দুগ্ধ ১ ছটাক সহ, আলকুশী বীজ চূর্ণ ৩ রতি তালমূলী চূর্ণ ৩ রতি, চিনি ॥৹ তোলা ও মাখন ২ তোলা সহ অথবা ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস ২ তোলা চিনি ॥৹ তোলা ও বলকা দুধ ১ ছটাক সহ।

শোথ রোগে—শ্বেত পুনর্নবার রস ও মধু সহ, বেলপাতার রস ২ তোলা ও মরিচ চূর্ণ ৩ রতি সহ অথবা শুষ্ক মূলা ১ তোলা কাঁচা বেলপাতা ॥৹ তোলা, শুঁঠ।৹ তোলা ও পাশের শিকড় ।৹ তোলা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া একছটাক থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া এই কাথ ও মধুসহ।

বৃদ্ধি, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, ও শ্লীপদে—সজিনা মূলের রস ও মধুসহ, হরীতকী চূর্ণ ৬ রতি, সৈন্ধব লবণ ৩ রতি, পিপুল চূর্ণ ৩ রতি ও গরম জল সহ অথবা বেলপাতা, আদা ও নিসিন্দার পাতা একত্র ছেঁচিয়া পোড়াইয়া তাহার রস ২ তোলা, সৈন্ধব লবণ ২ রতি ও মধু সহ।

নেত্র রোগে—ত্রিফলার জল ও মধুসহ অথবা ভীমরাজের রস ও মধুসহ।

নাসা রোগে—দাড়িম ফুলের রস ও মধু সহ বা অনন্তমূলের কাথ ও মধুসহ।

শিরোরোগে—জটামাংসী ভিজান জল ও মধুসহ, ত্রিফলার জল ও মধুসহ বা এরণ্ড-মূলের রস ও মধুসহ।

রক্তঃকৃচ্ছ্রে—রেণুকা চূর্ণ ৩ রতি ও মধু সহ, তিলের কাথ ও মধুসহ অথবা এরণ্ডমূল, বেড়েলা মূল, রক্তকম্বলের মূল ও ওলটকম্বলের মূল প্রতি দ্রব্য ॥৹ তোলা—আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া একছটাক থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া এই কাথ ও মধুসহ।

শ্বেত প্রদরে—ঘৃত ॥৹ তোলা, মধু ।৹ তোলা, চিনি ॥৹ তোলা ও লাল জবা ফুলের কুঁড়ি—চাউল ধোয়া জলে ছেঁচিয়া তাহার রস ২ তোলা সহ অথবা বাবলার পাতার রস ২ তোলা ও মধুসহ।

রক্তপ্রদরে—দুর্ব্বা, যজ্ঞডুমুর ও কাঁটা-নটের মূল একত্র ছেঁচিয়া তাহার রস ২ তোলা ও মধুসহ, বাবলার পাতা ও রক্ত কম্বলের কন্দ একত্র ছেঁচিয়া তাহার রস ২ তোলা ও মধুসহ অথবা অশোক ছালের কাথ ও মধুসহ।

সুস্থাবস্থায়—বেদানার রস ও মধুসহ অথবা মাখম ২ তোলা ও মিছিরী চূর্ণ আধ-তোলা সহ।

প্রাচীন চিকিৎসকের টোট্‌কা ও মুষ্টিযোগ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র লাহিড়ী কর্ত্তৃক সংগৃহীত]

—:*:—

শিরোঃ রোগে—একটী পাতিলেবু গোবরের (গোময়) চুঁগিতে পুরিয়া তাহা ঘুঁটের অগ্নিতে দগ্ধ করিতে হইবে। লেবুর উপরিস্থিত গোময় আবরণ পুড়িয়া গেলে লেবুনী এক রাত্রি শিশিরে রাখিতে হইবে, পরিশেষে এক তোলা সোরা ও অর্দ্ধতোলা গব্যঘৃত তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া সেই ঔষধ মস্তকে ও কপালে প্রলেপ দিলে যে কোন প্রকার শিরোরোগ হউক না কেন আরোগ্য হইবে।

প্রস্রাব বন্ধে—কুমড়ার (জলকুমড়) বৃক্ষের ক্ষার ও সোরা সমভাগে মিশাইয়া ।০ আনা অথবা ৷০ আনা পরিমাণে ঠাণ্ডা জল সহ সেবন করিতে হইবে।

নালীক্ষতে—শঙ্খভাদালীর পাতার রস ও তামাক পাতার রস একত্র মিশাইয়া কিছু তুলাতে লাগাইয়া নালীর ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে। দিনে ৩।৪ বার প্রযোজ্য।

আমাশয় জন্য উদরের বেদনায়—আমরুলের পাতার রস গরম মধুসহ খাইলে উপকার হয়।

বিবিধ ক্ষতে—শ্বেত কাঞ্চন ফুল—জল দ্বারা বাটিয়া ক্ষতে প্রলেপ দিতে হইবে।

রক্তমূত্রে—নিমছালের রস এবং আলতা ধোওয়া জল সমপরিমাণে খাইতে হইবে।

প্রস্রাব বন্ধে—পুঁই শাকের ডাঁটা, মেটে কলসের উপরের মাটি, ডিমের খোলা, গোঁসা, 'কাঁচা' বাঁশের উপরের ছাল একত্র সমভাগে লইয়া উত্তম করিয়া বাটিয়া পরে জয়ন্তী পুষ্পের পাতা ২ তোলা বাটিয়া উক্ত ঔষধের সহিত মিশাইয়া বস্তিদেশে প্রলেপ দিলে নিশ্চয়ই উপকার হইবে।

কাণ পাকায়—মান মচুব কচি পাতার রস কর্ণে দিলে বেশ ফল হয়। রস প্রয়োগের পরে তুলা দ্বারা কাণটা কিছুক্ষণ বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে।

আধকপালে মাথার বেদনায়—উননের পোড়া মাটি এবং লঙ্কা সমভাগে চূর্ণ করতঃ নস্য গ্রহণ করিলে প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যায়।

উপদংশে—একটী লৌহ পাত্রে থুথু দিয়া একটী জাঙ্গী হরীতকী ঘষিতে হইবে। পরে কিছু খদির তাহাতে পুনরায় মিশাইতে হইবে। যখন ওষধ বেশ ঘন হইবে তখন উটা কাঁটা নটের শিকড় ঘষিলে মলম হইবে, সেই মলম উপদংশ ক্ষতে প্রয়োগ করিলে অল্প দিনেই ক্ষত নিশ্চয়ই শুষ্ক হইবে। ঔষধে যেন জল না লাগে।

পোড়া ঘায়ে—হরিদ্রা পাতা অথবা তুলসী পাতা বাটিয়া প্রয়োগ করিলে বেশ ফল হয়।

ছর্দ্দি রোগে—(১) বেলের বীজের শাঁস ২ রতি শ্বেত চন্দন ঘষা আধ আনা—একত্র সেবন করিতে হইবে।

বাঘী বসান—কলিচূর্ণ, চিংড়ামাছ, শ্বেত-চিতা মূল সমপরিমাণে একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিতে হইবে।

প্লীহা রোগে—আমড়া পাতার রস দ্বারা আমড়া বাটিয়া প্লীহা স্থানে প্রলেপ দিতে হইবে।

একশিরা রোগে—তামাক পাতার উপরে শুঁঠের চূর্ণ কিছু ছড়াইয়া দিয়া এক শিরার উপর বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। বেশীক্ষণ রাখিলে বমি হইতে পারে।

ওলাউঠা চিকিৎসা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[কবিরাজ শ্রীদীননাথ কবিরত্ন শাস্ত্রী]

উদ্বেষ্টন।

যখন শরীরে রক্তের অল্পতা হইতে আন্ত্র হয় এবং মর্ম্মগ্রন্থি হইতে শ্লেষ্মরাশি ক্রমশঃ তরল হইয়া স্খলিত হইতে থাকে সেই সময় এক এক স্থানে এক এক বার ভঙ্গবৎ বেদনা উপস্থিত হইয়া রোগীকে সাতিশয় যন্ত্রণা প্রদান করে। তদ্বিধ যন্ত্রণার অতীব অধীর হইয়া রোগী সর্ব্বদাই আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। এইরূপ বেদনাকে উদ্বেষ্টন বলে। চলিত ভাষায় ইহাকে খালধরা বলা যায়। যে প্রকার বীজাণু দ্বারা শরীরস্থ রক্ত ও শ্লেষ্মা রূপান্তরিত হইয়া স্থানভ্রষ্ট হয়, কোন উপায়ে সেই বীজাণু বিনষ্ট হইলেই এই উপদ্রব নিবারিত হইতে পারে। পূর্ব্বে কথিত বিষমর্দ্দন চূর্ণের স্বরূপ যে ধুস্তুর পুষ্পের কেশর ও গোলমরিচ সেবনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা নিয়মরূপে উদরে স্থিতিশীল হইলে ওলাউঠা রোগে কোন প্রকার উপদ্রবই হইতে পারে না। উদ্বেষ্টন প্রভৃতি কোনো কোনো উপদ্রব মৃদুভাবে আক্রমণ করিলেও তাহা দূর করিবার জন্য আর বিশেষ কোনরূপ চেষ্টা করিতে হয় না। আপনা হইতেই উপশমিত হইয়া থাকে। কুড়, সৈন্ধব লবণ কাঁজির সহিত বাটিয়া প্রলেপ অথবা যখন যে স্থানে খাল ধরিতে থাকে সেই স্থানে মর্দ্দন করিলে উহা দূরীকৃত হয়। গুড়ত্বক, তেজপত্র, রাস্না, অগুরু, সজিনাছাল, কুড়, বচ ও শুল্ফা—এই সমুদয় সমভাবে লইয়া কাঁজির সহিত বাটিয়া খল্লীস্থলে (খাল) মর্দ্দন করিলে সুমহান উপকার হইয়া থাকে। আদা এক ভাগ, সোরা এক ভাগ, তিসি দুইভাগ, মাষকলাই চার ভাগ—একত্র জলে বাটিয়া কাপড়ের পুটুলিতে অল্প অল্প গরম করিয়া হাতে পায়ে স্বেদ দিলে খাল ধরা আরাম হয়। ভ্যারেণ্ডার বীজ, ভ্যারেণ্ডার মূল, ভ্যারেণ্ডার পাতা ও হিং প্রত্যেক দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া সকলের তুল্য পরিমাণ চিনির সহিত মিশাইয়া এক সঙ্গে বাটিয়া পূর্ব্ববৎ স্বেদ দিলে খালধরা ছাড়িয়া যায়। মহালতা (কেঁচো) গোটাকতক

(পরিমাণ ১ ছটাক) অর্দ্ধসের পরিমিত টাট্‌কা সর্ষের তেলে ভাজিয়া ছাঁকিয়া লইয়া বক্ষঃস্থলে মালিশ করিলে আশাতীত ফল দেখিতে পাওয়া যায়।

শিরঃশূল।

রক্ত ঊর্দ্ধগামী হইলে মস্তকে অতিশয় বেদনা হয় ও চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। ক্ষীণ বল শ্লেষ্মা ও প্রবল বায়ুর প্রকোপ বশতঃও মস্তকে বেদনা হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে মস্তকে শীতল জল সেচন, অগুরু চন্দনাদি লেপন করিলে সবিশেষ ফল দর্শে। বর্ত্তমান সময়ে মস্তকে Ice-Bag বাধা সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক ও ফলপ্রদ। সোরা, ছাগলাদ্য কচি নিমপাতা একত্রে কাঁজির সহিত বাটিয়া মাথায় প্রলেপ দিলে প্রায়ই বরফের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। পুরাতন ঘৃত, কর্পূর, বড় এলাচের দানা—একত্র মিশ্রিত করিয়া শিরোদেশে মর্দ্দন করিলে শিরঃশূল নিবারিত হয়। টাবালেবু গোবরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ঘুঁটের আগুনে পোড়াইয়া রস বাহির করতঃ মস্তকে লাগাইলে শিরঃশূল অনেক ক্ষেত্রে তিরোহিত হইয়া থাকে।

মূত্রাবরোধ।

ইহা ওলাউঠা রোগের একটী প্রধান দুর্লক্ষণ। যে পর্য্যন্ত মূত্র নিঃসরণ না হয়, সে পর্য্যন্ত কিছুতেই রোগীর জীবনের আশা করা যায় না। রক্ত হইতেই মূত্রের উৎপত্তি। ওলাউঠা রোগে সেই রক্ত প্রথমে রূপান্তরিত হইয়া আইসে। সুতরাং মূত্র বিগঠিত হইতে পারে না। আবার মূত্রাশয়ের পথ সঙ্কুচিত বা অবরুদ্ধ হইলেও মূত্র নিরোধ উপস্থিত হয়।

বরফ, সোরা ভিজান জল, কর্পূর বাসিত শীতলজল উৎকৃষ্ট মূত্রকারক। ডাবের জলেও মূত্র সঙ্কলন ও মূত্র নিঃসরণ হইয়া থাকে। নীলমাটী, সোরা, জলাশয় নিপতিত গলিত আম্রপত্র একত্র বাটিয়া নাভি ও বস্তিদেশে প্রলেপ দিলে মূত্রস্রাব হয়। ইন্দুরের গাদা অথবা গাঁদা ফুলের পাতা বাটিয়া নাভির চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিলে মূত্রাবরোধ দূরীভূত হয়। মূত্রসঙ্কলন ও মূত্র নিঃসরণ পক্ষে নিম্ন-লিখিত ঔষধটী সর্ব্বতোভাবে প্রযোজ্য।

ত্রিনেত্র দাবানল রস।*

পারদ, গন্ধক	(শোধিত ও কজ্জলীকৃত)	১ ভাগ
লৌহ	(শোধিত ও জারিত)	॥ ভাগ
তাম্রপাষাণ	(,, ,,)	,,
যবক্ষার		,,
সাচিক্ষার		,,
সোরা		,,

এই সাতখানি দ্রব্য উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। তারপর স্থলজাত পদ্মের নবপত্রের স্বরস গ্রহণ করিয়া ঐ মিশ্রিত ঔষধ মর্দ্দন করিবে (ভাবনা দিবে)। যখন বটী বাঁধিবার উপযুক্ত হইবে, তখন দুই রতি প্রমাণ এক একটী বটী করিয়া ছায়ায় শুকাইয়া রাখিবে। স্থলপদ্মের কচিপাতার রস এক তোলা ও চিনি দুই আনা সহ এক একটী বটী দুই তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করা-

---

* পারদং গন্ধকং লৌহং তাম্র পাষাণমেবচ।
ক্ষারদ্বয়ং সোরকঞ্চ মলিনী পত্রজদ্রবৈঃ।
বিভজ্য বটিকা কার্য্যেৎ স্থল পদ্মদলৈঃ।
দিত্বা মুঞ্চে মুহুর্মুহুঃ মূত্রং মুঞ্চতি তৎক্ষণাৎ।
—ভাবপ্রকাশ।

হলে মূত্র সঞ্চিত ও নিঃসৃত হয়। স্বর্ণপদ্মের অভাবে পাথরকুচি পাতার রস ॥০ তোলা ও সোরা ১ রতিসহ এই দ্রব্য সেবন করাইবার বিধান আছে। উল্লিখিত ঔষধটী প্রচলিত কোন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে দৃষ্টিগোচর হয় না; আমাদিগের পূর্ব্ব কথিত সন্ন্যাসী প্রদত্ত আদিত্য সংহিতা হইতে গৃহীত হইল। এই ঔষধমধ্যে যে কান্তপাষাণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হীরকজাতীয় এক প্রকার মূল্যবান প্রস্তর। কেহ কেহ কান্তপাষাণ শব্দে চুম্বক পাথর গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। কান্তপাষাণের কথা স্থানান্তরে আমরা বিশেষরূপে বর্ণন করিব।

উদরস্ফীতি।

রোগের প্রায় শেষ অবস্থায় এই লক্ষণ লক্ষিত হয়। উদরস্ফীত হইতে আরম্ভ হইলে কদাচিৎ কাহারও জীবন রক্ষিত হয়। এই সময় ঔষধ বা পথ্য কিছুমাত্র পরিপাক করিবার শক্তি থাকে না। সুতরাং সেবনীয় ঔষধ প্রয়োগ করিয়া কোনরূপ উপকারের প্রত্যাশাও বড় করা যায় না। মল মূত্রাদি সম্পূর্ণ নিরোধ এবং শারীরিক যন্ত্রগুলির সর্ব্বথা নিষ্ক্রিয়তা অথবা ইন্দ্রিয়বর্গের গ্রহণী শক্তির বিলুপ্তি হইতেই এই লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। স্বভাবের বশে কেহ কেহ বাঁচিয়াও যায়। বায়ুজন্য উদরস্ফীতিতে স্নেহ-স্বেদ অর্থাৎ পুরাতন ঘৃত বা তারপিন তৈল মর্দ্দন করিয়া গরম জলে নেকড়া ভিজাইয়া পেটে স্বেদ দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে উপকার হইবার সম্ভাবনা।

মলমূত্র নিরোধজন্য উদরস্ফীত হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে ফলও দর্শিয়া থাকে।

ত্রিকট্বাদি বর্ত্তি।*

পিপুল।০, মরিচ।০, শুঁঠ।০, শ্বেতসর্ষপ।০, গৃহধূম।০, কুড়।০, মদনফল।০। এই আটখানি দ্রব্য চূর্ণ করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া সম পরিমাণে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। পরে আট তোলা মধু বা গুড়ের সহিত অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি ঘৃতাক্ত করিয়া অল্পে অল্পে মলদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিবে। ইহার অচিন্তনীয় প্রভাবে মল মূত্রাদির নিঃসরণ হয়। সুতরাং অন্ত্রও পরিষ্কার হইয়া উঠে। মল মূত্রের নিঃসরণ ঘটিলে উদর স্ফীতি উপদ্রবেরও অবসান হয়। আমরা চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সূত্রে যেরূপ উপায়ে সফলকাম হইয়াছি, অকপটে সরলান্তঃকরণে অনাবিল ভাষায় তাহাই প্রকাশিত করিলাম। রুচি বা তথা কথিত বিজ্ঞানের দিকে আদৌ দৃষ্টি পাত করি নাই। সূর্য্যের আলোর যেমন স্বতঃ প্রকাশ,—কুসুমের সুষমার যেমন নৈসর্গিকী বিকাশ, বালারুণের কমনীয় মধুর,ছবি যেমন সত্যালব্ধ মনোমদ; প্রত্যক্ষ ফল প্রদ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের শক্তি-প্রভাব তেমনি প্রত্যক্ষীকৃত সমুদ্ভাসিত সত্যসম্ভ। আমাদিগের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ,—"আয়ুর্ব্বেদের" সুধীর সুধী পাঠক বৃন্দ এই অকিঞ্চনের অকি-

---

* বর্ত্তি স্ত্রিকটুক সৈন্ধব সর্ষপ-গৃহধূম-কুষ্ঠমদন ফলৈঃ।
মধুনি গুড়বা পক্কা পথ্যাঙ্গুষ্ঠ পরিমাণা।
বর্ত্তিবিরং দৃষ্টিফল শনৈঃ শনৈঃ প্রহিতা-ঘৃতাভ্যক্তা।
আনাহোদা বর্ত্ত প্রশমনী জঠর গুল্ম নিবারিণী চ।
—প্রয়োগে মালায়াং।

ক্ষিংকর প্রবন্ধ একটু প্রণিধান পূর্ব্বক আলোচনা করিবেন। মনোযোগী হইয়া চেষ্টাশীল হইলে নিশ্চয়ই ওলাউঠা রোগে সার্ব্বজনীন বিভীষিকায় আতঙ্কিত হইবেন না। আমাদিগের লিখিত ঔষধাদির প্রয়োগ-প্রণালী বিশেষ কিছু কষ্টকর নহে। ইহার উপাদান বা উপকরণ পল্লীগ্রামের সর্ব্বত্রই অনায়াসে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। ভগবানের আশীর্ব্বাদে, গ্রাহক বর্গের প্রসাদে, ভগ্ন ও রুগ্ন দেহে কিঞ্চিৎ অবসর পাইলে পরিশিষ্ট ভাগে ওলাউঠা চিকিৎসার ত্রুটী-বিচ্যুতি সংশোধন করিব।

আকন্দ।

(কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন)

আকন্দের গাছ বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। কোনো কোনো গৃহস্থের বাড়ীতেও ইহা যত্নে রক্ষিত হইয়া থাকে। যাঁহাদিগের বাটীতে এই গাছটী নাই তাঁহারা যেন প্রাঙ্গনের এক পার্শ্বে এই বনৌষধিকে একটু স্থান প্রদান করেন। সহস্র টাকা অপেক্ষা একটী আকন্দের গাছে মহৎ উপকার সাধিত করিয়া থাকে।

এই আকন্দের সংস্কৃত নাম অর্ক—আকন্দ, অলর্ক, শ্বেতপুষ্প, রক্তপুষ্প ইত্যাদি।

এইবার আমরা ইহার গুণ-পরিচয় প্রদান করিব।

আকন্দের পত্র, মূল, আঠা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শ্বেত ও রক্ত ভেদে দুই প্রকার আকন্দ। উভয়েরই গুণ প্রায় তুল্য।

শ্লেষ্মাধিক্য রোগে—অর্কপত্র।

বুকে সর্দ্দি বসিলে আকন্দের পাতার উপর দিকে পুরাতন ঘৃত মাখাইয়া উত্তপ্ত করতঃ বুকে বসাইয়া দিবে, তদুপরি পাটুলী বা নেকড়া উত্তপ্ত করিয়া স্বেদ দিবে, উহাতে বুকের শ্লেষ্মা সরল হইয়া উঠিয়া যাইবে। নিউমোনিয়া রোগে এই স্বেদ বিশেষ ফলপ্রদ। পরে অঙ্গে তুলা দ্বারা বুক বাঁধিয়া রাখিবে। যে কোন রোগে বুকে সর্দ্দি (কফ) বসিয়া যায়, তাহাতেই এই স্বেদে উপকার দর্শে।

বাতজ অর্শে—অর্কপত্র।

আকন্দের কোমল পত্র যে পরিমাণ লইবে, মিলিত পঞ্চলবণ তাহার এক চতুর্থাংশ গ্রহণ করিবে, পরে কিঞ্চিৎ তিল তৈল ও আমরুলের শাকের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবে, এই ক্ষার কিঞ্চিৎ পরিমাণে উষ্ণোদকের সহিত পান করিলে বাতজ অর্শ রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

প্লীহা রোগে—অর্কপত্র।

আকন্দের পত্র যে পরিমাণ গ্রহণ করিবে সৈন্ধব লবণ তাহার এক চতুর্থাংশ লইবে। একটী মাটির হাঁড়ীর মধ্যে একটী

একটী করিয়া আকন্দের পাতা বিছাইয়া দিবে, তাহার উপর সৈন্ধব চূর্ণ ছড়াইয়া দিবে। পুনরায় আর এক প্রস্থ পাতা সাজাইবে, তদুপরি পুনরায় সৈন্ধব চূর্ণ ছড়াইয়া দিবে, এইরূপে পত্রগুলি ও সৈন্ধব চূর্ণ উপর্য্যুপরি রাখিয়া একখানি সরা দ্বারা হাঁড়ীটার মুখ কর্দ্দমাক্ত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা লেপন করিয়া সরা ও হাঁড়ীর সংযোগস্থান বন্ধ করিয়া দিবে, এক ঘণ্টা পরিমাণ সময় লাগিয়া ঐ হাঁড়ী মৃদু অগ্নির উপরে রাখিয়া নামাইবে। এই রূপে অন্তর্ধূমে ক্ষার প্রস্তুত হইবে। শীতল হইলে হাঁড়ীর সরা খুলিয়া ক্ষার গ্রহণ করিবে। এই ক্ষার সিকি পরিমাণ প্রত্যহ দধির মাতের সহিত সেবন করিলে অতি প্রবৃদ্ধ প্লীহা নষ্ট হইয়া থাকে। ইহাকে অর্ক লবণ বলে।

উরুস্তম্ভে—অর্কপত্র।

উরুস্তম্ভ রোগীকে লবণ বর্জ্জিত তৈলাক্ত অর্কপত্র জলে সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করাইবে।

শ্বাস রোগে—অর্কপত্র ও পুষ্প।

আকন্দের পত্র ও পুষ্প সমানভাগে একত্র লইয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে, ঐ ক্বাথে যবের চাউল ৭ বার ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিবে। ঐ চূর্ণিত যবতণ্ডুল দুই আনা মাত্রায় লইয়া মধুর সহিত সেবন করাইলে শ্বাস রোগ উপশমিত হয়।

আকন্দের মূলের ছাল চূর্ণ আকন্দের আঠার ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, ঐ চূর্ণ দ্বারা তামাকের পাতা বেষ্টন করিয়া চুরুট প্রস্তুত করিয়া অগ্নি সংযোগে ধূম পান করিলে শ্বাস রোগ নিবৃত্তি হয়।

উদরাধ্মানে—অর্কপত্র।

উদরাধ্মান হইলে আকন্দের পত্রে তৈল মাখাইয়া উদর বেষ্টনপূর্ব্বক বাঁধিয়া রাখিলে পেট ফাঁপান উপশম হয়।

আকন্দ পাতার প্রলেপ বেদনা ও ফুলার পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ।

কোষবৃদ্ধি বা কুরণ্ড রোগে।

আকন্দ মূলের ছাল কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে অতি বড় কুরণ্ডও বিনষ্ট হয়। উক্ত প্রলেপ গোদে ব্যবহার করিলে গোদ নষ্ট হয়। একশিরা রোগে আকন্দের পত্র দ্বারা কোষ বেষ্টন করিয়া, বন্ধন করিয়া রাখিলে একশিরা আরোগ্য হয়।

মুখে মেচেতা (কালো কালো দাগ) পড়িলে আকন্দের আঠার সহিত হরিদ্রা চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লাগাইলে মেচেতা আরোগ্য হয়।

চোক উঠায়—আকন্দমূলের ছাল।

আকন্দমূলের ছাল ১ তোলা কুট্টিত করিয়া এক পোয়া জলে সিদ্ধ করিবে, ১৫ মিনিট সিদ্ধ হইলে উহা শীতল করিয়া দিবসে ২।৩ বার ৪।৫ ফোঁটা করিয়া চক্ষে প্রদান করিবে। চক্ষু চুলকানি, লাল হওয়া বেদনা ও ভার বোধ ও চক্ষুর পিচুটীর ন্যায় হইয়া চোক ওঠা আরোগ্য হয়।

কর্ণশূলে—আকন্দ।

আকন্দ পত্র উত্তপ্ত করিয়া নিষ্পীড়ন করতঃ রস বাহির করিবে, ঐ ঈষদুষ্ণ রস কর্ণাভ্যন্তরে ২।১ ফোঁটা নিক্ষেপ করিলে কর্ণশূল (কাণের মধ্যে বেদনা) নিবৃত্তি হয়।

কুকুর দংশন বিষে—আকন্দ।

উত্তমরূপে কুট্টিত তিল ২ তোলা, ইক্ষু গুড় ২ তোলা, এবং কিছু শুষ্ক আকন্দের আঠা (এক সিকি) একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে কুকুর দংশিত বিষ নষ্ট হয়।

কুষ্ঠ রোগে—আকন্দ।

যে কুষ্ঠ রোগীর ক্ষতে পোকা জন্মিয়াছে তাহাতে শ্বেত ও রক্ত আকন্দের মূল, পত্র ও ডাঁটার সহিত সম পরিমাণ ছাতিমছাল লইয়া কাথ করিয়া ঐ কাথ পান করাইলে কুষ্ঠের ক্রিমি নষ্ট হয়।

বাত বেদনায়—আকন্দ।

কোন স্থানে বাত জনিত বেদনা কিম্বা আঘাত জনিত ফুলিলে আকন্দের পত্র গরম করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে বেদনা ও ফুলাও উপশম হয়।

বৃশ্চিক দংশনে—আকন্দ।

বিছা, বিষকল বা বোলতা দংশিত স্থানে আকন্দের আঠা লাগাইলে জ্বালা নিবৃত্তি হয়।

বেদনা ও স্ফীতিযুক্ত সন্ধিস্থানে আকন্দের আঠার প্রলেপ বিশেষ উপকারী।

জানিয়া রাখা উচিত, আকন্দের আঠা বিষাক্ত, ইহা উদরস্থ হইলে অতি বিরেচনী ও অতি বমন হয়। চোখে লাগিলে চক্ষুর হানি করে। এজন্য আকন্দের আঠার ব্যবহার অতি সাবধানে করা উচিত।

মস্তিষ্ক-কাহিনী।

("হিন্দুস্থান" হইতে গৃহীত)

—:*:—

মস্তিষ্ক হইতেছে মন চালাইবার যন্ত্র। এই যন্ত্রটির সাহায্যে আমাদের চারিদিকে কি হইতেছে, সেটা আমরা বুঝিতে পারি এবং ইহারই সাহায্যে আমরা আমাদের ইচ্ছা-শক্তি চালনা করি।

কিন্তু এই মস্তিষ্কের কল-কব্জার কোন জায়গা সামান্য একটু বিগড়াইয়া গেলেই, মানুষের ব্যবহার একেবারে সৃষ্টিছাড়া হইয়া যায়। মানুষ যেভাবে চলিতে, ছুটিতে ও নাচিতে শেখে, ঠিক সেই ভাবেই সে লিখিতে, পড়িতে ও বানান করিতে শিক্ষা করে। কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখা গেল, একটি শিক্ষিত মানুষ বেশ লিখিতে পারিতেছে অথচ মোটেই পড়িতে পারিতেছে না। ইহার কারণ কি?

যে স্নায়ু-কেন্দ্রের (Nerve-centres) দ্বারা বাক-যন্ত্র চালিত হয়, সাধারণতঃ তাহা মানুষের মস্তিষ্কের পার্শ্বে থাকে। কিন্তু কোন কারণে এখানে যদি একচাপ রক্ত বা আর কিছু আসিয়া পড়ে, তাহা হইলেই মানুষের পক্ষে চ্যাচাইয়া বই পড়া বা কাহারও কথার পুনরাবৃত্তি করা অসম্ভব হইয়া ওঠে। অথচ শোনা কথা সে বুঝিতে পারিবে এবং বই দেখিয়া লিখিতে পারিবে। কারণ যে যে

স্নায়ু-কেন্দ্র হস্ত চালনা এবং চাক্ষুষ স্মৃতিকে নিয়মিত করে, সেগুলি মস্তিষ্কের সুস্থ অংশে অবস্থিত।

মস্তিষ্কের মধ্যে হের-ফের ঘটিলে, আরো অনেক অপূর্ব্ব ব্যাপার দেখা যায়। সময়ে সময়ে একজন মানুষ অন্যান্য সমস্ত শব্দ, গান ও গোলমাল শুনিতে পায়, কিন্তু কথিত বাক্য কিছুতেই তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না! সে লিখিতেও পারে, পড়িতেও পারে, কিন্তু তাহার মাতৃভাষায় কথিত বাক্য শুনিলেও সে মনে করিবে বনমানুষ বা বাঁদরের অর্থহীন 'কিচির মিচির' শুনিতেছে! সে একেবারে "word-deaf" বা "কথা-কালা" হয় বলিয়া তাহার দ্বারা শ্রুতি-লিখনের কাজও চলে না। মস্তিষ্কের শ্রুতি-কেন্দ্রে গোলমাল হইলে মানুষের এমনি শোচনীয় দশা হয়।

"চাক্ষুষ-স্মৃতি-কেন্দ্র" (visual memory centre) মস্তিষ্কের ঠিক পিছনদিকে থাকে। এই অংশে আঘাত লাগিলে বা ফোড়া উপস্থিত হইলে মানুষ "বাক্যান্ধ" হইয়া পড়ে। অর্থাৎ অনেকদিনের অভ্যস্ত বাক্যমূলক স্মৃতি তাহার মন হইতে মুছিয়া যায়। কিংবা সে বিশেষ এক একটি অক্ষর দেখিয়া একেবারেই চিনিতে পারে না।

কোন কোন লোক ততক্ষণ পর্য্যন্ত কথা বানান করিতে পারে না, যতক্ষণ না তাহা কালি-কলমে কাগজের উপরে লিখিয়া দেখে। যতক্ষণ না লিখিতে পারে, ততক্ষণ তাহাদের সন্দেহ থাকিয়া যায়, কথাগুলির বানান শুদ্ধ হইল কিনা! এখানে মস্তিষ্কের স্মৃতির চেয়ে হাতের মাংসপেশীর স্মৃতি প্রখর হইয়া থাকে। ইউরোপের অনেক বিখ্যাত পিয়ানো বাদকেরই এই দশা! তাঁহারা "মাংসপেশী-স্মৃতি"র (muscle memory) উপরেই বেশী নির্ভর করিয়া থাকেন; কারণ, অনেক সময়েই দেখা গিয়াছে, যে সমস্ত অনেক-দিনের পুরাণো সুর কিছুতেই তাঁহাদের মাথায় আসে না, হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলেই পিয়ানোর ভিতরে সেই সব বিস্মৃত সুর বাজিয়া ওঠে!

বিলাতী ডাক্তারদের কেতাবে কতকগুলি আশ্চর্য্য ও কৌতুককর রোগীর কাহিনী পাঠ করা যায়। সে সব রোগে মানুষের অন্য কোনরকম যন্ত্রণা দেখা যায় না বটে, কিন্তু বেচারী রোগীদের পক্ষে আর পাঁচজনের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া পৃথিবীতে বাস করা দস্তুরমত শক্ত হইয়া পড়ে। তখন মরার কষ্টের চেয়ে বাঁচার কষ্টই বেশী হইয়া দাঁড়ায়। আমরা এই রকম একটি বিচিত্র রোগের বর্ণনা করিব?

এমন অনেক লোক আছে, যাহারা সমস্ত জিনিষ উল্টা দেখে। অর্থাৎ উপরি-দিকটা নীচের দিকে এবং নীচের দিকটা দেখে উপরিদিকে! এ সব রোগী যদি ঠিক সোজাসুজি দেখিতে চান, তবে "পা'দুটো সব উপর করে মাথা দিয়ে" হাঁটিতে হয় এবং সে অবস্থাটা কাহারও পক্ষে বিশেষ আরামপ্রদ বলিয়া মনে হইতেছে না। অবশ্য বিশ্বের সমস্ত দৃশ্যই মানুষেরা দৃষ্টি-পটের উপরে আগে উল্টাভাবে ফুটিয়া ওঠে। চোখের "retina" বা ছায়াপটের সেই উল্টা প্রতিচ্ছবি আবার সোজা হয়, মস্তিষ্কের "চাক্ষুষ স্মৃতি কেন্দ্রে"র দ্বারা। যাহাদের

মস্তিষ্কের ঐ অংশটি বিকল হইয়া যায়, তাহারা তাই সমস্ত দৃশ্যই উল্টাভাবে দেখিয়া থাকে।

যাহাকে বলে "optic nerve" বা "দৃষ্টি-স্নায়ু" তাহা অন্ধ। এই জন্য উক্ত "দৃষ্টি-স্নায়ু" যেখানে 'চক্ষের মধ্যে প্রবেশ করে, বৈজ্ঞানিকেরা সেই স্থানটিকে "blind spot" বলিয়া থাকেন। দৃষ্টি স্নায়ু"র দর্শন ক্ষমতা নাই, দর্শনের শক্তি আছে চোখের ঐ "ছয়োপটে"র।

শুধু উল্টাভাবে দেখা নয়; কেহ কেহ সেই সঙ্গে গান গাহিবার সময়ে কড়া পর্দ্দা কোমলে এবং কোমলকে কড়ি করিয়া উচ্চারণও করে। আর একটি বালিকা সমস্ত ব্যাপারের পিছন বা শেষ হইতে সুরু করিত। এই সব রোগীর হৃৎপিণ্ড যথাস্থানেই আছে বটে, কিন্তু তাহাদের দেহের অন্যান্য যন্ত্র এবং মস্তিষ্ক অস্থানে অবস্থিত। তাই তারা সমস্তই উল্টাদিকে দেখিয়া থাকে।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

গবর্ণমেণ্টের সাহায্য।—হরিদ্বারে আয়ুর্ব্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা সাহায্য করিয়াছেন। অনারেবল লালা সুখবীর সিং ঐ কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগী। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের মত বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের সকরুণ দৃষ্টি কলিকাতার অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের উপর পতিত হইলে এই কলেজকে সুমুক্ত করিতে অধিক দিন লাগে না। আমরা এজন্য বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের করুণা ভিক্ষা করিতেছি।

আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয়।—যশোহর জেলা বোর্ড হইতে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি পাইয়া যে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে, সেই উপলক্ষে গবর্ণমেণ্টের সহকারী সেক্রেটারী মিঃ জ্যাকসন্ কমিশনর বাহাদুরকে জানাইয়াছেন যে, "এই অ্যালোপ্যাথিক মতে চিকিৎসালয় স্থাপন সম্বন্ধে যে বিধান প্রচলিত আছে, তাহার সমস্ত নিয়ম আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয় সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইবে না। ইহার পরিচালনার জন্য যে সমিতি থাকিবে, তাহাতে সিবিল সার্জ্জনকেও সব ডিবিসনাল মেডিকেল অফিসারকে সভ্য পদে মনোনীত রাখিতে হইবে না, কিন্তু বিভাগীয় কমিশনর বাহাদুরের সম্মতি লইয়া সভ্য নির্ব্বাচন করিতে হইবে।" আমরা এই ব্যবস্থায় যেরূপ সুখী হইয়াছি, সেইরূপ ইহাতে আমাদের মনে এমন আশারও সঞ্চার হইয়াছে যে, মহামান্য গবর্ণমেণ্টের কৃপায় লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা আবার মাথা তুলিতে সমর্থ হইবে। মেডিকেল ডিপার্টমেণ্টের রেজেষ্টারীভুক্ত ডাক্তার ভিন্ন ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের কার্য্যে নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা আগে ছিল না, কিন্তু যশোহরের এই চিকিৎসালয়ের সদস্য রূপে রেজিষ্ট্রী বহির্ভূত চিকিৎসকগণও স্থান পাইবেন। আমরা বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের এই নূতন ব্যবস্থার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৪র্থ বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৭—আষাঢ়। | ১০ম সংখ্যা।

শারীর বিদ্যা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন সরস্বতী এম, এ, এল, এম, এস।]

অন্তস্তলে চারিটী পেশী সংলগ্ন থাকে। ঐ কলায়কদ্বয়ের মূল হইতে উর্দ্ধ ও তির্য্যক্‌ভাবে দুইটী রেখা পশ্চাদ্দিকে গিয়াছে, উহাদিগকে 'আন্তরতিরশ্চীনা' বলে। উহাতে 'মুখভূমি-কণ্ঠিকা' পেশী সংবদ্ধ থাকে। এই রেখার উপরিভাগে সম্মুখদিকে 'জিহ্বাধরীয়' লালা-গ্রন্থি ধারণের জন্য তন্নামক খাত এবং অধো-দিকে পশ্চাদ্‌ ভাগে 'হন্বধরীয়' লালাগ্রন্থি ধারণের জন্য তন্নামক খাত আছে।

অধোহনুমণ্ডলের উর্দ্ধধারা দন্তোদূখল-মণ্ডল ধারণ করিয়া থাকে। হনুমণ্ডলের প্রত্যেক অর্দ্ধভাগে বাল্যে পাঁচটী করিয়া এবং যৌবনে আটটী করিয়া দন্তোদূখল থাকে। বৃদ্ধ বয়সে ঐগুলি ক্রমে ক্রমে বিলীন হইয়া যায়। উক্ত উর্দ্ধধারার পশ্চাদ্ভাগে 'কপো-লিকা' নামে পেশী সংযুক্ত হয়। দন্তগুলির বিষয় সমগ্র করোটিবর্ণনে বলা যাইবে।

অধোধারা স্থূলাগ্র এবং কেবল ত্বকের দ্বারা আবৃত। ইহার পশ্চাতের দুই প্রান্তের নিকটে বক্ত্র ধমনী ধারণের জন্য 'বক্ত্রধমনী-পরিখা' নামে দুইটী পরিখা আছে।

(২) হনুকূটদ্বয়—হনুমণ্ডলের পশ্চাৎ প্রান্তদ্বয় হইতে উদ্গত চতুষ্কোণবিশিষ্ট দুইটী প্রবর্দ্ধন। চরকসংহিতায় উহাদিগকে 'হনুমূল-বন্ধন' বলা হইয়াছে।

প্রত্যেক হনুকূটের দুইটী শিখর—সম্মুখে হনুকুম্ভ ও পশ্চাতে হনুমুণ্ড; দুইটী তল—বাহ্যতল ও আভ্যন্তরতল; এবং চারিটী ধারা

হনুমূলবন্ধনী স্নায়ুর হনুকূটকর্ষণী
হনুমুণ্ড সংযোগার্থ খাত হনুকূট পেশী

[৩৬৯শ চিত্র—অধোহন্বস্থি]
(বাহ্যদৃশ্য)

—সম্মুখ ধারা, পশ্চাৎ ধারা, উত্তর ধারা ও অধর ধারা।

হনুমুণ্ড—প্রায় গোলাকার, ইহা শঙ্খাস্থির হনুসন্ধিখাতের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। ইহার মূলের চারিদিকে স্নায়ুকোষ সংলগ্ন থাকে এবং আভ্যন্তরতলের মূলদেশে 'উত্তরাহনুমূলকর্ষণী' পেশী সংসক্ত হয়।

হনুকূট—প্রায় ত্রিকোণ এবং সূক্ষ্মাগ্র সদৃশ। ইহার বাহ্য ও আভ্যন্তর তলে 'শঙ্খচ্ছদা' পেশী সংসক্ত হইয়া থাকে।

হনুকূটের বহিস্তলে 'হনুকূটকর্ষণী' এবং অন্তস্তলে 'অধরা হনুমূলকর্ষণী' পেশী সংসক্ত হয়। অন্তস্তলের মধ্যদেশে 'অধরা দন্তমূলসুড়ঙ্গা' প্রণালীর দ্বারভূত যে বিবর আছে, তাহার ভিতর দিয়া 'অধরদন্তমূলিকাখ্য' সিরাধমনী ও নাড়ী দন্তোদূখলগুলির মূলদেশে

প্রবেশ করিয়া থাকে। হনুকূটের ঊর্দ্ধধারা অর্দ্ধচন্দ্রাকার, ইহার ভিতর দিয়া 'হনুকূট নলী' পেশীর চতুর্দ্দিকে নাড়ী, শিরা ধমনী সকল প্রবেশ করিয়া থাকে। হনুকূটের অধোধারা হনুমণ্ডলের অধোধারার সহিত সমরেখায় অবস্থিত। অধোধারার পশ্চাদ্ ভাগে 'হনুকোণ' নামে কোণ আছে এবং উহাতে 'হনুকোণিকা' স্নায়ু আবদ্ধ থাকে। হনুকূটের সম্মুখধারা ত্বক্ ও পেশীর মধ্যে গূঢ়ভাবে অবস্থিত; পশ্চাৎ ধারা স্থূল ও 'কর্ণমূলিকা' গ্রন্থি দ্বারা আচ্ছন্ন।

সন্ধি—অধোহন্বস্থির মুণ্ডদ্বয় উভয় শঙ্খাস্থির হনুসন্ধিখাতের সহিত সন্ধিযুক্ত।

পেশী—অধোহন্বস্থিতে পনেরো জোড়া পেশী সংসক্ত হইয়া থাকে। বিবরণ পরে বর্ণনীয়।

অধোহন্বস্থি সম্বন্ধে একটী বিশেষ কথা এই যে বাল্যকালে হনুকূটদ্বয় হনুমণ্ডলের উপর তির্য্যক্‌ভাবে নিবিষ্ট থাকে, যৌবনে সমকোণভাবে নিবিষ্ট হয় এবং বার্দ্ধক্যে দন্ত পড়িয়া যাওয়ায় দন্তোদুখলগুলি বিলীন হয় ও সমগ্র অধোহনুমণ্ডলের এক এক দিক নৌকার ন্যায় বক্রতা প্রাপ্ত হয়।

কণ্ঠিকাস্থি* কণ্ঠিক বা জিহ্বামূলিক নামক অশ্বখুরাকার ও নানা পেশীসংযুক্ত অস্থিখণ্ড শ্বাসপথের সম্মুখে ও জিহ্বার মূলদেশে অবস্থিত। ইহা সুদীর্ঘ স্নায়ুরজ্জু দ্বারা শঙ্খাস্থির 'মূলশিকা'দ্বয়ে প্রতিবদ্ধ হইয়া শূন্যে লম্বিত ভাবে থাকে। ইহার তিনটী অংশ—কণ্ঠিকপিণ্ড, মহাশৃঙ্গদ্বয় ও লঘুশৃঙ্গদ্বয়।

* ইং—Hyoid—হায়য়েড্।

[৩৭শ চিত্র—কণ্ঠিকাস্থি]

(১) —কণ্ঠিকপিণ্ড। (২, ২) ২, ২—লঘুশৃঙ্গদ্বয়। (৩, ৩) ৩, ৩—মহাশৃঙ্গদ্বয়। (পে) 'পে' চিহ্নিত স্থানগুলি পেশী নিবেশ-স্থল।

(১) মধ্যস্থিত পিণ্ডাকার অংশকে 'কণ্ঠিকপিণ্ড' বলে। উহার সম্মুখতলে এক এক দিকে ছয়টী করিয়া দ্বাদশটী পেশীসংসক্ত থাকে। যথা—চিবুককণ্ঠিকা, উরঃকণ্ঠিকা, চিবুকজিহ্বাকণ্ঠিকা, মুখভূমিকণ্ঠিকা, শিকাকণ্ঠিকা এবং অংসকণ্ঠিকা। কণ্ঠিকপিণ্ডের পৃষ্ঠতল মসৃণ এবং 'গোজিহ্বা' নামে কলার সহিত সম্বদ্ধ।

(২) মহাশৃঙ্গদ্বয়—মধ্যপিণ্ডের উভয় দিকে পশ্চাদ্ ভাগে প্রসারিত। উহাদের অগ্রকোটিদ্বয়ে স্নায়ুরজ্জু সংযোগের জন্য দুইটী অর্ব্বুদ আছে। প্রত্যেক শৃঙ্গে তিনটী করিয়া পেশী সম্বদ্ধ থাকে। যথা—মধ্যমা কণ্ঠসংকোচনী, জিহ্বাকণ্ঠিকা এবং অবটুকণ্ঠিকা।

(৩) লঘুশৃঙ্গদ্বয়—মহাশৃঙ্গদ্বয়ের ক্রোড়ে অবস্থিত। ইহাদের অগ্রকোটিদ্বয় স্নায়ুরজ্জুদ্বারা শঙ্খাস্থির শিকাদ্বয়ের সহিত প্রতিবদ্ধ থাকে।

সমগ্র করোটি বর্ণনা।

মস্তকের সমস্ত অস্থি সংহিত হইয়া করোটি নির্ম্মিত হয়। তন্মধ্যে অধোহন্বস্থি ব্যতীত

অন্যান্য সন্ধিগুলি অচল। করোটির অস্থি সকলের সন্ধির বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

করোটির পাঁচটী অংশ, যথা—**করোটি পটল** নামক ঊর্দ্ধপ্রদেশ, **করোটি ভূমি** নামক অধোদেশ, **করোটি পক্ষ** নামে দুই পার্শ্ব এবং **মুখমণ্ডল** নামে সম্মুখভাগ।

করোটিপটল—শিরঃসম্পুটের ছাদের ন্যায়। ইহা সম্মুখে পুরঃকপালের ললাটফলক, দুই পার্শ্বে দুই পার্শ্বকপালাস্থি এবং পশ্চাতে পশ্চিমকপালের ঊর্দ্ধভাগ দ্বারা নির্ম্মিত। ইহার দুইটী তল, যথা—বাহ্যতল ও আভ্যন্তরতল। তন্মধ্যে বাহ্যতল—কূর্ম্মপৃষ্ঠা-কার এবং তাহাতে পাঁচটী 'সীমন্ত' বা সন্ধিরেখা আছে, যথা—সম্মুখ সীমন্ত, পশ্চিম সীমন্ত ও দুইটী পার্শ্ব সীমন্ত (৩৮শ চিত্র দেখ)। তন্মধ্যে করোটিপটলের দুই পার্শ্বে অবস্থিত সন্ধিরেখা দুইটীকে পার্শ্বসীমন্ত বলে। এই স্থানে ঊর্দ্ধস্থিত তিন খানি অস্থির (যথা পুরঃ-পার্শ্ব-পশ্চিম-কপালের) সহিত অধঃস্থিত তিন খানি অস্থির (গণ্ডাস্থি-জতুকাস্থি শঙ্খাস্থির) সন্ধি হইয়া থাকে।

এই কয়টী সন্ধি ব্যতীত সম্মুখকপালের উভয়ার্দ্ধের মধ্যে যে সূক্ষ্ম 'গূঢ়সীমন্ত' আছে, উহা বাল্যকালে দেখা যায়, কচিৎ প্রৌঢ়-বয়সেও থাকে।

[৩৮শ চিত্র—করোটিপটল (স্তন্যপায়ী শিশুর)]

অগ্রকুণ্ড
গূঢ়সীমন্তিকা
পুরঃসীমন্ত
ব্রহ্মরন্ধ্র
পার্শ্বকুণ্ড
মধ্যসীমন্ত
শিররন্ধ্র বা অধিপতি মর্ম্ম
পশ্চিম সীমন্ত
পশ্চিম কপাল

পুরঃসীমন্ত ও মধ্যসীমন্তের সন্ধিস্থানকে 'ব্রহ্মরন্ধ্র' বা 'ব্রহ্মতালু' এবং পশ্চিমসীমন্ত ও মধ্যসীমন্তের সন্ধিস্থলকে 'শিবরন্ধ্র' বলে। অধিপতি নামক মর্শ্মের আধার বলিয়া উহা 'অধিপতি রন্ধ্র' নামেও কথিত। ব্রহ্মরন্ধ্র প্রায় চতুষ্কোণ ও অধিপতি রন্ধ্র ত্রিকোণ। এই উভয় স্থলই শৈশবে কোমল থাকে।

করোটিপটলের আভ্যন্তরতল খাতোদর। মস্তিষ্কচ্ছদা কলা ও তাহার গ্রন্থিসমূহ এবং উক্ত কলাপোষণী ধমনীর শাখা প্রশাখা ইহার সহিত সংলগ্ন থাকে। ইহার মধ্য-রেখায় 'দীর্ঘিকা সিরাপরিখা' নামে খাত আছে, উহা মধ্যসীমন্তের সহিত সমসূত্রে ভিতরে অবস্থিত।

করোটি ভূমি—ইহা বহু অস্থি সংঘাতে নির্ম্মিত এবং বিশেষ উচ্চাবচ। ইহার দুইটী তল। শিরোগুহার মধ্যে গূঢ় ভাবে অবস্থিত ঊর্দ্ধ তলটী 'করোটিপীঠ' বা 'মস্তিষ্ক-পীঠ' নামে খ্যাত। অধস্তল মুখবিবর ও গলার আচ্ছাদন স্বরূপ, উহা করোটিভূমিতল বা করোটিতল নামে অভিহিত।

দশ খানি অস্থিসংযোগে করোটিভূমি নির্ম্মিত হইয়া থাকে। যথা—সম্মুখে ঊর্দ্ধ-হন্বস্থিদ্বয় ও তাল্বস্থিদ্বয়, পশ্চাতে পশ্চিমকপাল, মধ্যভাগে ঝর্ঝরক, জতুকা ও সীরিকা এবং দুই পার্শ্বে শঙ্খাস্থিদ্বয়।

করোটি পীঠ ও করোটিতল সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটী কথা এস্থলে বলা হইতেছে। বিশেষ বিবরণ অস্থিগুলির বর্ণন-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে।

করোটিপীঠ বা মস্তিষ্কপীঠ—ইহা করোটি-ভূমির তিনটী মহাখাতবিশিষ্ট ঊর্দ্ধতল। তন্মধ্যে সম্মুখের খাতে মস্তিষ্কের পুরঃপিণ্ড, মধ্যখাতে উহার মধ্যপিণ্ড এবং পশ্চাৎ খাতে উহার পশ্চিমপিণ্ড, অনুমস্তিষ্ক ও সুষুম্নাশীর্ষক থাকে।

করোটিতল বা করোটিভূমিতল মুখগলাদি-বিবরের আচ্ছাদন স্বরূপ এবং অত্যন্ত উচ্চাবচ। ইহার তিনটি ভাগ, যথা—পুরোভাগ, মধ্যভাগ এবং পশ্চাদ্ভাগ। পুরোভাগে ঊর্দ্ধ দন্তো-দূখলমণ্ডল ও তালুপটল (তালুর ছাদ) বিশেষ দর্শনীয়। মধ্যভাগে কণ্ঠপটল বা গলার ছাদ অবস্থিত। পশ্চাদ্ভাগে দুইপার্শ্বে অধোহন্বুর সহিত সন্ধির স্থালকদ্বয় এবং কর্ণ-কুহরদ্বয় দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে এস্থলে দন্তোদূখলমণ্ডলের বিষয় বিশেষভাবে বলা হইতেছে।

দন্তোদূখল মণ্ডল—উপরের হন্বুমণ্ডলে ষোলটী ও অধোহন্বুমণ্ডলে ষোলটী দন্তোদূখল বা দন্তধারণের গর্ত্ত থাকে। এস্থলে করোটি-তল প্রসঙ্গে উপরের ষোলটী বর্ণনীয় (নিম্নের ষোলটীও এইরূপ, তাহাদের বিষয় অধোহন্বু প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে)। প্রতি অর্দ্ধভাগে আটটী করিয়া দন্ত থাকে, তন্মধ্যে মধ্যরেখার পার্শ্বের দুইটী 'কর্ত্তনক' *, তাহাদের পশ্চাতের একটী 'রদনক' †, তাহা-দের পশ্চাতের দুইটী 'অগ্রচর্ব্বণক' ‡ এবং শেষের দিকের তিনটী 'পশ্চিম চর্ব্বণক' § নামে অভিহিত। অষ্টম বা শেষের চর্ব্বণক

* ইং—Incissors—ইন্সাইজারস্।

† ইং—Canine—ক্যানাইন্।

‡ ইং—Pre-Molars—প্রি-মোলার্স।

§ ইং—Molars—মোলার্স।

দন্ত "জ্ঞানদন্ত" (আক্কেল দাঁত) নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। এই দন্ত যৌবনের শেষে বা প্রৌঢ় বয়সে উদ্গত হয়।

ঊর্দ্ধহনুমণ্ডলে মধ্যরেখার দুই পার্শ্বের দুইটী দন্তকে প্রাচীনেরা 'রাজদন্ত' নামেও অভিহিত করিয়াছেন।

ইহাতে বুঝা গেল যে প্রৌঢ় বয়সে ঊর্দ্ধ হনুমণ্ডলে এবং অধোহনুমণ্ডলে ষোলটী করিয়া বত্রিশটী দন্ত থাকে। কিন্তু বাল্যকালে প্রত্যেক হনুমণ্ডলের অর্দ্ধাংশে পাঁচটি করিয়া—সমগ্র হনুমণ্ডলে মোট কুড়িটী নিঃশ্বর দন্ত থাকে। বাল্যাবস্থায় পশ্চাদ্ ভাগের চর্ব্বণক দন্তগুলি থাকে না।

শৈশবে সাধারণতঃ ৬।৭ মাস হইতে প্রায়ই জোড়া জোড়া করিয়া দন্ত উদ্গত হইতে থাকে। কখন কখন ইহার পূর্ব্বে—কচিৎ ভ্রূণাবস্থাতেও দন্ত উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

প্রাপ্তবয়স্কের দন্তের ন্যায় বাল্যাবস্থার দন্তের সুদীর্ঘ মূল থাকে না। প্রায়ই পাঁচ বৎসর বয়স হইতে দশ বৎসরের মধ্যে ঐ সকল দন্ত পড়িয়া যায় এবং নূতন স্থায়ী দন্ত উদ্গত হইতে থাকে।

করোটিতলের প্রত্যেক অর্দ্ধাংশে বহুপেশী সংযুক্ত থাকে। তাহাদের বিষয় পেশীবর্ণন প্রসঙ্গে বলা হইবে।

করোটি পক্ষদ্বয়—(বিংশ চিত্র দেখ) করোটিপক্ষ বা করোটির পার্শ্বদেশ দুইটী। প্রত্যেকটী প্রায় ত্রিকোণাকার—কতকটা আকৃষ্ট ধনুর ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট। উহার ঊর্দ্ধসীমা শঙ্খতোরণিকা, রেখার অনুগামিনী ও অপাঙ্গ হইতে পশ্চিমসীমন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অধঃসীমা অধোহনুর কোণ।

পশ্চাৎ করোটিপক্ষের দুইটী অংশ—হনুসন্ধিস্থানের অগ্রে অবস্থিত সম্মুখভাগ এবং উহার পশ্চাতে অবস্থিত পশ্চিমভাগ। সম্মুখভাগে দর্শনীয় তিনটী খাত আছে, যথা—শঙ্খখাত, গণ্ডোর্দ্ধখাত এবং হনুজাতুক খাত।

প্রথমোক্ত দুইটী খাত এক হইলেও গণ্ডচক্রের ঊর্দ্ধ ও নিম্নাংশ ভেদে ভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হয়। উভয় খাতে শঙ্খচ্ছদা পেশী এবং নিম্নস্থ খাতে পঞ্চম নাড়ীর হানব্য শাখা ও শিরা ধমনী থাকে।

তৃতীয় খাত বা হনুজাতুক খাত ঊর্দ্ধহন্বস্থি ও জতুকাস্থির বৃহৎ পক্ষতির সন্ধানস্থলে অবস্থিত। ইহা ত্রিকোণাকার ও নেত্রগুহার পশ্চাতে থাকে। ইহার পূর্ব্বসীমায় ঊর্দ্ধহনুর পশ্চিমার্ব্বুদ এবং পশ্চিম সীমায় জতুকাস্থির চরণফলকদ্বয় অবস্থিত। ইহা হনুজাতুকা, কন্ধচর্ণিকা এবং পক্ষাস্তবাপা নামে তিনটী গূঢ় পরিখার কেন্দ্র স্বরূপ। নেত্রগুহা, নাসাগুহা, মুখগহ্বর, মস্তিষ্কগুহা এবং গণ্ডোত্তর খাতের সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে। সগ্রন্থিকা ঊর্দ্ধহানব্য নাড়ী এবং আন্তরহানব্যা ধমনী এই খাতে অবস্থিতি করে। এই খাতটীর প্রসঙ্গ ধমনী ও নাড়ীবর্ণনে বিশেষ আবশ্যক হইবে।

করোটির সম্মুখভাগ—করোটির সম্মুখভাগ প্রায় গোল, ইহা মুখমণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ইহার ঊর্দ্ধসীমা ভ্রূমধ্য ও ভ্রূতোরণিকাদ্বয়; অধঃসীমা অধো-

হনুমণ্ডল; এবং দুই পার্শ্বের সীমা উভয় গণ্ডাস্থি ও অধোহনুকূট।

ইহার মধ্যভাগে কনীনা ও তাহার উভয় পার্শ্বে জ্রূত্তোরণিকা রেখাদ্বয়, সংহিত নাসাস্থিদ্বয় বা 'নাসাসেতু' ত্রিকোণ নাসাগহ্বর বা 'নাসাপুরোদ্বার,' আটটী কর্ত্তনক দন্ত (উপরে চারিটী ও নীচে চারিটী) এবং চিবুকপিণ্ড বিশেষভাবে দর্শনীয়। উভয় পার্শ্বে এক এক দিকে নেত্রগুহা, দন্তকূট ও বাবটী দন্ত (উপরে নিম্নে একটী করিয়া রদনক দন্ত ও পাঁচটী করিয়া চর্ব্বণক দন্ত) এবং বক্রনাড়ী ও ধমনীর পারথা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক দিকে ষোলটি করিয়া পেশী আছে—তাহাদের বিষয় যথাস্থানে বর্ণনীয়।

নেত্রগুহা।

নেত্রগুহা বা নেত্রকোটর ধুতুরা ফুলের ন্যায় সম্মুখে আয়ত ও পশ্চাতে সঙ্কুচিত। ইহারা দুইদিকে দুইটী নেত্রগোলক ধারণ করে। প্রত্যেক নেত্রকোটরের চারিদিকের প্রাচীর সাতখানি অস্থির সংযোগে নির্ম্মিত। তন্মধ্যে চারিখানি দ্বারা গুহাদ্বয়ের পরিধি নির্ম্মিত হয় এবং তিনখানি গুহামূলের চতুর্দ্দিক ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে। সাতখানি অস্থি যথা—

(১) অশ্রুপীঠ—ইহা 'অশ্রুবাহিকা' ধারক ও অন্তঃপরিধিস্থিত। (২) পুরঃকপালের নেত্রচ্ছদিফলক—উর্দ্ধপরিধিস্থ। (৩) উর্দ্ধহন্বস্থির নেত্রপীঠফলক—ইহা নেত্রভূমিনিষ্পাদক ও অধঃপরিধিস্থ। (৪) গণ্ডাস্থির অক্ষিফলক—বহিঃপরিধিস্থ। (৫) জতুকাস্থির পক্ষভিত্তিক; (৬) তালবস্থির চূড়াস্থ প্রবর্দ্ধন; (৭) ঝর্ঝরাস্থির নেত্রান্তঃপীঠ; শেষোক্ত তিনখানি নেত্রগুহামূলের নির্ম্মাপক।

ইহাদের মধ্যে জতুকা, ঝর্ঝরক ও অগ্রকপাল—এই তিনখানি অস্থি উভয় নেত্রগুহার নিষ্পাদক—এজন্য উভয় নেত্রগুহায় মোট অস্থিসংখ্যা—১৪খানি না হইয়া ১১খানি হইয়াছে।

প্রত্যেক নেত্রগুহার ছয়টী অংশ, যথা—

(ক) নেত্রগুহাদ্বার ইহা বৃহত্তর ও বৃত্তপ্রায়।

(খ) নেত্রগুহামূল—ইহা ধুতুরাফুলের গোড়ার দিকের মত সঙ্কুচিত। এখানে 'দৃষ্টিনাড়ীরন্ধ্র' এবং 'পক্ষাস্থরাল' নামক খাত দৃশ্যমান, উহাদের মধ্য দিয়া দৃষ্টিনাড়ী, তৃতীয় নাড়ী ও নেত্রের সিরাধমনীগুলি নেত্রগোলকে প্রবেশ করে।

(গ) নেত্রগুহাচ্ছদি (ছাদ)—ইহা অগ্রকপালের নেত্রচ্ছদিফলক এবং জতুকাস্থির লঘুপক্ষকের সংযোগে নির্ম্মিত। ইহার বহিঃকোণে 'অশ্রুগ্রন্থি' ধারণের জন্য একটী ক্ষুদ্র খাত এবং অন্তঃকোণে 'বক্রোর্দ্ধদর্শিনী' নেত্রপেশীর নিবেশ স্থান।

(ঘ) নেত্রগুহাভূমি—এই অংশ সমতলপ্রায়। ইহার অধিকাংশ উর্দ্ধহন্বস্থির নেত্রপীঠফলকের দ্বারা এবং কিয়দংশ গণ্ডাস্থি ও তালবস্থি দ্বারা নির্ম্মিত।

(ঙ) অন্তঃপ্রাচীর—ইহা উর্দ্ধহনুর নাসাকূটপার্শ্ব, অশ্রুপীঠ, ঝর্ঝরাস্থির নেত্রান্তঃফলক, এবং জতুকাস্থিক শরীরের অত্যল্প অংশ দ্বারা নির্ম্মিত। এইস্থানে নাসাভিমুখী 'অশ্রুবাহিকা' প্রণালী আছে। অধিক অশ্রুপাত হইলে এই পথে নাসিকার মধ্যে অশ্রু প্রবেশ করে।

(চ) বহিঃপ্রাচীর—ইহা পূর্ব্বার্দ্ধে গণ্ডাস্থির অক্ষিফলকের দ্বারা এবং পশ্চার্দ্ধে জতুকাস্থির বৃহৎ পক্ষতি দ্বারা নির্ম্মিত। এই অংশে 'শঙ্খগণ্ডিকরন্ধ্র' নামে একটী বা দুইটী বিবর আছে।

ভিন্ন ভিন্ন অস্থির সন্ধানরেখাগুলি কর্ত্তিত নাসাগুহার মধ্যে স্পষ্টভাবে দর্শনীয়।

নেত্রগুহার ভিতরে নয়টী বিবর আছে, যথা—মূলে দৃষ্টিনাড়ী রন্ধ্র; ইহার বহির্ভাগে পক্ষান্তরাল ও ঊর্দ্ধাক্ষ খাত; অন্তঃনাসায়

[৬৩ চিত্র—নাসাগুহা (বাম)]
বহিঃ প্রাচীরের দৃশ্য।

ঝর্ঝরকাস্থির সূক্ষ্ম বিবরদ্বয়; অন্তকোণে অশ্রুবাহিকা; ঊর্দ্ধ পরিধিতে অধিদ্রুব ও অধঃপরিধিতে নেত্রাধরীয় বিবর; বহিঃকোণে শঙ্খগণ্ডিকাখ্য রন্ধ্রমার্গ।

পেশী—প্রত্যেক নেত্রগুহার প্রাচীরে চারিদিকে সাতটী পেশী সংবদ্ধ থাকে। তন্মধ্যে ছয়টী দ্বারা নেত্রগোলককে নানাদিকে ঘুরান ফিরান যায়—সপ্তমটী অশ্রুবিসর্জ্জন কার্য্যে সহায়তা করে। ইহাদের বিবরণ পরে বলা যাইবে।

নাসাগুহা।

নাসাগুহা দুইটী ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান এবং শ্বাসবায়ু গ্রহণের দ্বারস্বরূপ। ইহাদের মধ্যে পাতলা অস্থিময় প্রাচীর আছে। প্রধানতঃ গলবিবরের সহিতই ইহাদের সম্বন্ধ। চৌদ্দখানি অস্থিদ্বারা নাসাগুহা নির্ম্মিত, যথা—ঝর্ঝরক, জতুকা, অগ্রকপাল, ঊর্দ্ধহন্বস্থি—এই তিনখানি করোটির অস্থি এবং অধোহন্বস্থি ও গণ্ডাস্থিদ্বয় ব্যতীত মুখমণ্ডল নির্ম্মাপক অন্য এগার খানি অস্থি।

প্রত্যেক নাসাগুহার ছয়টী অংশ যথা—গুহাচ্ছদি, গুহাভূমি, অন্তঃপ্রাচীর, বহিঃপ্রাচীর, নাসাপুরোদ্বার, ও নাসাপশ্চিমদ্বার।

প্রত্যেক নাসাগুহার তিনটী করিয়া সুড়ঙ্গ আছে—ঊর্দ্ধসুড়ঙ্গ, মধ্যসুড়ঙ্গ এবং অধঃসুড়ঙ্গ। বহিঃপ্রাচীর বর্ণনা কালে ইহাদের বিষয় বলা যাইবে।

নাসাগুহাচ্ছদি (ছাদ)—ইহা অগ্রভাগে নাসাস্থিদ্বয় ও পুরঃকপালের অগ্রকণ্টক দ্বারা, মধ্যে ঝর্ঝরাস্থির চালনীপটল দ্বারা এবং পশ্চাতে জতুকাস্থি শরীরের পিণ্ড দ্বারা নির্ম্মিত। ইহাতে নাসাস্থি দুইটীর নিম্নে নাসানাড়ীদ্বয়ের এবং চালনীপটলস্থ ছিদ্রগুলির মধ্য দিয়া গন্ধগ্রাহি নাড়ীর শাখাপ্রশাখা সমূহ অবস্থিত।

নাসাগুহাভূমি বা নাসাভূমি—ইহা ঈষৎ ক্রোড়োদর এবং সম্মুখে ঊর্দ্ধহন্বস্থির তালুফলক ও পশ্চাতে তাল্বস্থির হ্রস্বপত্রক দ্বারা নির্ম্মিত। নাসাগুহাদ্বয়ের মধ্যভাগে সীরিকাস্থি মধ্যপ্রাচীরভূত হইয়া নাসাভূমিতে সংহিত হয়।

অন্তঃপ্রাচীর—ইহা উভয় নাসাভূমির মধ্যে একটী মাত্র। এই অংশ তির্য্যক্‌ভাবে সংহিত ঝর্ঝরাস্থির মধ্যফলক ও সীরিকাস্থির দ্বারা নির্ম্মিত, এজন্য ইহা প্রায়ই একদিকে আনত দেখা যায়। উক্ত অস্থিদ্বয় অগ্রভাগে ত্রিকোণ তরুণাস্থির সহিত সংহিত এবং পশ্চাতে জতুকাস্থির 'রসনিকা'র সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে। বাম ও দক্ষিণ ভেদে অন্তঃপ্রাচীরের দুইটী পার্শ্ব। উভয় পার্শ্বে নাসাতালুকাখ্য নাড়ীদ্বয় ধারণের জন্য দুইটী খাত এবং নাড়ী ধমনী-প্রতান ধারণের জন্য বহু সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে।

বহিঃপ্রাচীর—প্রত্যেক নাসাগুহার বহিঃসীমায় একটী করিয়া পৃথক্ প্রাচীর আছে। এই বহিঃপ্রাচীর সম্মুখে ঊর্দ্ধহনুর নাসাকূট ও অশ্রুপীঠাস্থি দ্বারা; মধ্যে ঝর্ঝরকের পার্শ্বপিণ্ড ও শুক্তিকাস্থি দ্বারা; এবং পশ্চাতে তাল্বস্থির দীর্ঘপত্রক ও জতুকাস্থির চরণফলকের দ্বারা নির্ম্মিত।

শুক্তিকাপত্রাকারে অবস্থিত তিনটী অস্থি বহিঃপ্রাচীরে সংলগ্ন থাকে, সেজন্ম প্রত্যেক দিকের নাসাপথ তিনটী সুড়ঙ্গ বিশিষ্ট হয়। তন্মধ্যে—

(১) ঊর্দ্ধসুড়ঙ্গ—ঊর্দ্ধতম ও হ্রস্বতম। এই অংশ নাসাপথের পশ্চার্দ্ধমাত্রে বর্ত্তমান এবং ঝর্ঝরাস্থির ঊর্দ্ধ ও মধ্য শুক্তিকাভাগের অন্তরালে অবস্থিত। ইহাতে তিনটী বিবর আছে, যথা—পশ্চাতে 'তালুস্রাতুক'—ইহা তদাখ্য নাড়ী ধমনী প্রবেশের জন্ম; সম্মুখে 'ঝর্ঝরকোটরদ্বার',—ইহা ঝর্ঝরাস্থির পশ্চিম-কোটরের অনুবন্ধী; চূড়ায় 'জতুকাদ্বার'—ইহা জতুকাপিণ্ডের অভ্যন্তরস্থ কোটরের অনুবন্ধী। দারুণ পীনস রোগে এই সকল বিবরপথে পূযাদি প্রবেশ করিয়া অস্থিগুলি জর্জ্জরিত হয় এবং মস্তিষ্কের পর্য্যন্ত বিকৃতি ঘটে।

(২) মধ্যসুড়ঙ্গ—ইহা ঝর্ঝরাস্থির মধ্য-শুক্তিকা ও অধঃশুক্তিকাস্থির অন্তরালস্থ মধ্য-মাকার সুড়ঙ্গ। ইহাতে ঊর্দ্ধদিকে একটী ছিদ্র দেখা যায়, উহা ঝর্ঝরকোটরের দ্বারা ললাটকোটরের সহিত অনুবন্ধী। ঊর্দ্ধহনু-পিণ্ডস্থ অপর ছিদ্রটী ঊর্দ্ধহনুর হনুগর্ভকোট-রের দ্বারস্বরূপ। নাসারোগে ললাটকোটর ও হনুগর্ভকোটর—উভয় কোটরের মধ্যে পূযাদি সঞ্চিত হইতে পারে।

(৩) অধঃসুড়ঙ্গ—অধঃশুক্তিকাস্থির নিম্নস্থ এই দীর্ঘতম মার্গ নাসিকার বহিঃ-প্রাচীরের সমগ্র অংশ ব্যাপিয়া বর্ত্তমান। ইহার পূর্ব্বার্দ্ধে অতিপ্রবৃত্ত অশ্রুর 'নাসাগুহায় প্রবেশের জন্ম 'অশ্রুবাহিকা' প্রণালীর দ্বার থাকে।

নাসাপুরোদ্বার বা নাসাগুহার সম্মুখদ্বার —কতকটা ক্ষুদ্র তাম্বুলপত্রের ন্যায় আকার-বিশিষ্ট। ইহা নাসাগুহাদ্বয়ের মধ্যস্থ ত্রিকোণ তরুণাস্থি ও মধ্যপ্রাচীর নির্ম্মাপক অস্থিগুলির দ্বারা দুইভাগে বিভক্ত।

নাসাপশ্চিমদ্বার—নাসাগুহাদ্বয়ের পশ্চা-তের দ্বার গলবিবরের দিকে উন্মুক্ত ও প্রায় গোলাকার। ইহার পশ্চাতে ও ঊর্দ্ধসীমায় গলবিবরের আচ্ছাদন স্বরূপ পশ্চিম কপা-লের মূলপিণ্ড ও জতুকাশরীর, অধঃসীমায় তালবস্থির হ্রস্বপত্রকদ্বয় এবং উভয়পার্শ্বে জতু-কাস্থির চরণদ্বয় অবস্থিত। ইহা সীবিকাস্থি দ্বারা দুইভাগে বিভক্ত।

সমগ্র করোটির খাচ ভাগ।

ত্বকের নিম্নস্থ অস্থির অংশকে খাচভাগ বলে। করোটির ও মুখমণ্ডলের সাতাশটি খাচ ভাগ বিশেষভাবে দর্শনীয়, যথা—দুইটী ভ্রূতোরণিকা (ভ্রূদ্বয়ের নিম্নে), দুইটী গণ্ডকূট ও দুইটী গণ্ডচক্র, কর্ণদ্বয়ের পশ্চাতে দুইটী গোস্তন-প্রবর্দ্ধন, মাথার পশ্চাতে দুইটী উত্তরতোর-ণিকা ও একটী পশ্চিমার্ব্বুদ, দুইপার্শ্বে দুইটী পার্শ্বকুম্ভ ও তন্নিম্নে কাণের উপর দুইটী শঙ্খ-তোরণিকা, সম্মুখে দুইটী অগ্রকুম্ভ, নাসামূলে দুইটী নাসাস্থি, দুইটী নেত্রগহ্বরের পরিধিদ্বয়, অধোহনুর দুইদিকে দুইটী হনুকোণ ও মধ্যে অধঃস্থ ধারা এবং সম্মুখে একটী চিবুকপিণ্ড। ভবিষ্যতে বুঝিবার সুবিধার জন্ম এই সকল অংশ স্মরণ রাখা আবশ্যক।

"কীকসে যদি কার্কশ্যং তথাপ্যাদীয়তামিদম্।
জ্ঞানগঙ্গাম্বুসজ্জ্যা দিষ্ট্যা তত্তুরতোবতঃ ॥"

অনুবাদ—এই অস্থিখণ্ড কর্কশ হইলেও সাদরে গ্রহণীয়। কারণ জ্ঞান গঙ্গাজল সম্পর্কে ইহা হইতে দিব্যতনু হইবে। অর্থাৎ—অস্থি গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিলে তাহা হইতে যেমন দিব্যতনু উৎপন্ন হয়, সেইরূপ এই অস্থিখণ্ডে সম্যক্ জ্ঞান হইলে শরীরের যাবতীয় অংশ সুখবোধ্য হইয়া থাকে।

নাড়ী-চক্র।

[লেখক—শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ।]

"তির্য্যক্ কূর্ম্মো দেহিনাং নাভিদেশে
বামে বক্তুং তস্য পুচ্ছঞ্চ যাম্যে।
ঊর্দ্ধে ভাগে হস্ত পাদৌ চ বামৌ
তস্যাধস্তাৎ সংস্থিতৌ দক্ষিণৌ তৌ॥"*

* * * *

বিকৃত কণ্ঠে, শিথিল উচ্চারণে,—শ্লোকটী আবৃত্তি করিতে করিতে, ডাক্তার বলিয়া ফেলিলেন—"কি ভ্রমাত্মক ধারণা!" এখন বেশ বুঝা গেল ঋষিদের শারীর বিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ জ্ঞান একেবারেই ছিল না! নাভিদেশে কচ্ছপের মত যন্ত্র থাকা—অসম্ভব!

এইখানে ডাক্তারের একটু পরিচয় দিয়া রাখি। ইনি আমার পরম বন্ধুর পুত্র। মেডিকেল কলেজের এম, বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন। সেখানে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের গৌরবোজ্জ্বল উপাধি লাভ করিয়া, দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ডাক্তারের মূর্ত্তিখানি বেশ একটু অনুকূল সৌম্য-স্নিগ্ধ গম্ভীরতায় সুপ্রকাশ। তাঁহার "কাপ্তেন" বিশেষণটী আত্মীয় স্বজনের গর্ব্ব তৃপ্তির উপাদান।

ডাক্তার শুনিয়াছিলেন—বৈদ্যগণ নাড়ী দেখিয়া রোগ ধরিতে পারেন। তাঁহার নাড়ী বিজ্ঞান পড়িবার আগ্রহ জন্মিয়াছিল। পক্ষকাল পূর্ব্বে আমার নিকট হইতে তিনি একখানি মুদ্রিত "নাড়ীজ্ঞান শিক্ষা" লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু, প্রথমেই নাভিদেশে কূর্ম্মের অবস্থিতি লক্ষ্য করিয়াই—নাড়ী-বিজ্ঞানের প্রতি তাঁহার ভক্তি চটিয়া যায়। যাহারা নিপুণ হস্তে শত শত শবদেহ ছেদন করিয়াছে—তাহারা নাভিদেশে কূর্ম্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিবে কেন? তাই ডাক্তারের বিশ্বাস হইয়াছিল—অনেক উচ্ছৃঙ্খল কল্পনা, অপ্রত্যাশিত প্রবল বাত্যার মত—ঋষি পরিষদের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, তাহাতে "আয়ুর্ব্বেদের" প্রত্যক্ষ শারীর কলুষিত হইয়াছে। বৈদ্য চিকিৎসাও শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধা হারাইয়াছে।

---

* প্রত্যক্ষশারীর হইতে উদ্ধৃত।

ডাক্তার আমাকে "নাড়ীজ্ঞান শিক্ষা" ফেরৎ দিতে আসিয়াছিলেন। যে পুস্তকে বহু শতাব্দীর পুঞ্জীকৃত অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব স্পষ্ট তর হইয়া উঠিয়াছে—এই বিংশ শতাব্দীর বুকে বসিয়া, সে পুস্তক তিনি পড়িতে পারিবেন না। আমার বৈঠকখানায় তখন অনেক গুলি ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। সুতরাং ডাক্তারের অন্ধ উগ্রতার সমালোচনায় আমি যেন কুণ্ঠিত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম।

বঙ্গ-সাহিত্যে আমার পরমারাধ্য আচার্য্য ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের মুখে একটী গল্প শুনিয়াছিলাম—একটী নব্য বঙ্গ কামিনীর সংস্কৃত শিখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল—সেজন্য তিনি "হিতোপদেশ" নামক গ্রন্থ কিনিয়াছিলেন। একদা তাঁহার এক সঙ্গিনী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সখি! তোমার সংস্কৃত শিক্ষা কতদূর হইল?" সুন্দরী উত্তর দিলেন—শিখিব বলিয়া বই পর্য্যন্ত কিনিয়াছিলাম। কিন্তু পুস্তকের প্রথম পাতাতেই দেখি—"কস্মিংশ্চিৎ বনে"র পরই "ভাসুরের" নাম—কাজেই পড়া হইল না।"

সহসা গল্পটী আমার মনে পড়িয়া গেল। প্রথমে "বড় ঠাকুরের" নাম দেখিয়া বিদুষীর সংস্কৃত শিক্ষা যেমন অগ্রসর হয় নাই, কূর্ম্মের কথায়—তেমনি ডাক্তারেরও বুঝি নাড়ী-বিজ্ঞান পাঠের প্রবৃত্তি নষ্ট হইয়াছে!

বহু নরনারায়ণের অতি-মানুষ প্রতিভা, যে বিজ্ঞানকে একদা সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল তাহার প্রতি এতদূর উপেক্ষা আমার সহ্য হইল না। আমি ডাক্তারকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম—অন্ধকার গর্ত্তের অন্ধ সরীসৃপ আপনার ললাটস্থিত "রত্নপ্রদীপের" মহিমা বুঝিতে পারে না। ডাক্তার! নাড়ী-বিজ্ঞান বুঝিতে হইলে—আবার তোমাকে হিন্দু হইতে হইবে। কৌরব লাঞ্ছিতা পাঞ্চালীর বসনের মত—হিন্দুশাস্ত্রের স্তরে স্তরে প্রহেলিকার জটিল জাল জড়াইয়া আছে,—দাম্ভিক দুঃশাসনের শক্তিতে তাহার স্বরূপ মোচন—অসাধ্য ব্যাপার।

অলস মন্থর পদক্ষেপে—লজ্জা-ললিত মুখে গোধূলির হিরণ্যদীপ্তি মাখিয়া, ডাক্তার চলিয়া গেলেন। তাঁহার পদশব্দ অস্ফুট মর্ম্মবেদনার হাহাকারের মত মুহূর্ত্তকাল ঘরের মধ্যে সুব্যক্ত হইয়া রহিল। আমি "নাড়ীজ্ঞান শিক্ষা" তুলিয়া রাখিলাম।

তন্ত্রের সিদ্ধান্ত।

যে শ্লোকটী লইয়া সেদিন ডাক্তার আমার আয়ুর্ব্বেদের উপর শ্লেষময় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন—বাস্তবিক সে শ্লোকটী আকাশের মত বিরাট, তরুচ্ছায়ার মত রহস্যময়—জল-কল্লোলের মত দুর্ব্বোধ্য। উহা তন্ত্রের শ্লোক—শঙ্কর সেনের লিপি কৌশলে "নাড়ী প্রকাশে" উদ্ধৃত হইয়াছে। যিনি "তান্ত্রিক" নহেন,—তিনি নাড়ী বিজ্ঞানের রহস্য কখনই বুঝিতে পারিবেন না।

ইতোমধ্যে—সুহৃদ্বর সত্যচরণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য "অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে" গিয়াছিলাম। তখন কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত মহাশয়—ছাত্রগণকে নাড়ী বিজ্ঞানের উপদেশ দিতে ছিলেন। সে উপদেশ শুনিবার আমার সময় ছিল না। কিন্তু আমার মনে হয়—নাড়ী-বিজ্ঞান বুঝাইবার পূর্ব্বে—ছাত্রগণকে তন্ত্র সম্বন্ধে কিছু

উপদেশ দিলে ভাল হয়। আশা করি—অধ্যাপকগণ এ অধমের কথাটা একটু ভাবিয়া দেখিবেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি তন্ত্রের "নাড়ীচক্র" লইয়াই আলোচনা করিব।

তন্ত্র—অনেকটা বিজ্ঞান, অনেকটা ইতিহাস। বিশ্বকাহিনী ও মানব কাহিনীর বিচিত্র সংমিশ্রণেই তন্ত্রের উৎপত্তি। তন্ত্রের সিদ্ধান্ত—দেহের সহিত ব্রহ্মাণ্ডের সমতা সাধন। বাহিরে যে লীলা হইতেছে—জীবের দেহের ভিতরও অহরহঃ সেই লীলা চলিতেছে। যিনি এই ভিতর-বাহির এক করিতে পারেন—তিনিই "যোগী"। তন্ত্র বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে
তিষ্ঠন্তি কলেবরে।"

চলিত কথায় ইহার অর্থ—"যাহা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তাই পাবে দেহ ভাণ্ডে"। সৃষ্টি-তত্ত্বের সহিত দেহতত্ত্বের এই সমঞ্জসীকরণ—তন্ত্রের অপূর্ব্ব শক্তি। তন্ত্রের মতে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পূর্ণজ্ঞান একমাত্র দেহ হইতেই লাভ করা যায়। যিনি বৈদ্য—তিনি তান্ত্রিক, তিনি মহাযোগী। দেহতত্ত্ব বুঝিতে হইলে—তন্ত্রের সাধনা করিতে হইবে।

তন্ত্রের কথাতেই আমি "নাড়ীচক্র" বুঝাইবার চেষ্টা করিব। কিন্তু আমার অক্ষম হস্তের রচনা হয় তো পদে পদে ভ্রান্ত হইয়া পড়িবে। পাঠকগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন।

শ্বাস-সংক্রমণ।

"উত্তরায়ণ" ও "দক্ষিণায়ন" বহির্জগতের এই দুই গতি। মানবদেহেও—শ্বাসের 'ঈড়া' ও 'পিঙ্গলা' নামে দুইটী গতি আছে। উত্তরায়ণে—ধরিত্রীর আগ্নেয় শক্তি বৃদ্ধি হয়,—সূর্য্যের উত্তাপদায়িনী শক্তি প্রবল হইয়া পড়ে; দক্ষিণায়নে—পোষক শক্তি বা চন্দ্রের শৈত্যগুণ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। চন্দ্রের এই শৈত্যগুণ সূর্য্যের অমা-কলা হইতে উৎপন্ন; শ্রুতির কথাই ইহার প্রমাণ;—

"রবিমধ্যে স্থিতঃ সোমঃ সোমমধ্যে হুতাশনঃ"।

* * * * *

অমানাম কলাহ্যেষা সূর্য্যস্যামৃতরূপিণী।
অমায়াবিকৃতিশ্চন্দ্রঃ চন্দ্রস্য বিকৃতির্জগৎ॥

অমা—সূর্য্যের অমৃতরূপিণী কলা। অমার বিকৃতি হইতে চন্দ্র এবং চন্দ্রের বিকৃতি হইতে জগতের উৎপত্তি। যে তিথিতে সূর্য্য চন্দ্রের সহিত এক রাশিতে অবস্থিতি করেন, সেই তিথি "অমাবস্যা" নামে পরিচিত।

একটী বৎসরের মধ্যে যেমন "উত্তরায়ণ" ও "দক্ষিণায়ন"—একটী দিনের মধ্যেও তেমনি "দিবা" ও "রাত্রি"। উত্তরায়ণ—দিবা, দক্ষিণায়ন—রাত্রি। উত্তরায়ণে—বসন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা—এই তিন ঋতু; দিবারও তেমনি প্রাতঃকালে বসন্ত, মধ্যাহ্নে গ্রীষ্ম এবং অপরাহ্নে বর্ষা। দক্ষিণায়নেও—শরৎ, হেমন্ত ও শীত এই তিনটী ঋতু; তদ্রূপ রাত্রিরও তিনটী ঋতু, যথা—রাত্রির প্রথম ভাগের নাম শরৎ, মধ্যম অবস্থার নাম হেমন্ত ও শেষ ভাগের নাম শীত।

মানবদেহে যে সময় দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে শ্বাস বহিতে থাকে—তাহাকে সূর্য্যনাড়ী বা পিঙ্গলা বলে। আবার যখন বাম নাসিকায় শ্বাস বহে—তখন তাহার নাম চন্দ্রনাড়ী অর্থাৎ ঈড়া। বহির্জগতে—উত্তরায়ণে অথবা দিবা-

ভাগে সূর্য্যের আদান শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; দেহ-জগতেও—দক্ষিণ নাসায় শ্বাস-সংক্রমণের সময়—দেহের আগ্নেয় শক্তি বাড়িয়া থাকে। দক্ষিণায়নে বা রাত্রিকালে—চন্দ্রের শৈত্যগুণ (পোষক শক্তি) বর্দ্ধিত হয়; বাম-নাসিকায় শ্বাস প্রবাহের সময়—শরীরের পোষণ শক্তি বাড়ে।

যে সময় দুই নাসিকাতেই শ্বাস-প্রবাহ সমান থাকে—তন্ত্র মতে তাহার নাম সুষুম্না নাড়ী। ইংরাজী ভাষায় "নাড়ী" অর্থে যাহা বুঝায়, হিন্দু মতে নাড়ী বলিলে তাহা বুঝায় না। ইংরাজী ভাষায় যাহার নাম Aorta—আয়ুর্ব্বেদ মতে তাহার নাম মহাস্রোত। তন্ত্র সুষুম্নাকেই সর্ব্বপ্রধান নাড়ী বলেন। দেহের মধ্যস্থল মেরুদণ্ড—সুষুম্নার আশ্রয় স্থান। ঈড়া নাম্নী নাড়ী—এই সুষুম্নার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, শরীরের দক্ষিণ পার্শ্বের Sympathetic nerve দিয়া বাম নাসিকায় বিকসিতা; পিঙ্গলা নাড়ী—দেহের বাম মধ্যস্থ Sympathetic nerve দিয়া সুষুম্নায় প্রবেশ করিয়া দক্ষিণ নাসিকায় প্রকাশিতা।

চিকিৎসকগণ অবশ্যই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন—শরীরের দক্ষিণ অঙ্গে পক্ষাঘাত হইলে মস্তিষ্কের বাম দিকে রোগ নিরূপিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে—বামদিকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইলে—দক্ষিণ দিকে রোগ নিরূপিত হইয়া থাকে। যে দিকের অঙ্গ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়, সে দিকের অঙ্গ, অন্য দিকের অঙ্গের চেয়ে শীতল স্পর্শ হয়,—সে অঙ্গ শীর্ণ হইয়াও পড়ে। এই যে শৈত্য ও কৃশতা—তাহা কেবল পোষণ শক্তির অভাবেই ঘটিয়া থাকে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গের বিপরীত দিকের মস্তিষ্কে বা কশেরুকা মজ্জায় যেরূপ দোষ হয়—Sympathetic nerve এও ঠিক সেই দোষ ঘটে। শোণিতবহা শিরার অধিক প্রসারণের জন্য সেই শিরাজাল হইতে রক্তের উত্তাপ অধিক পরিমাণেই নির্গত হইয়া যায়—সুতরাং পক্ষাঘাত আক্রান্ত অঙ্গ—অপেক্ষাকৃত শীতল স্পর্শ হয়।

আমাদের নাসিকার সম্মুখে যেমন দুইটী ছিদ্র আছে—নাসিকাগহ্বর অভ্যন্তরে—পশ্চাৎ দিকেও তেমনি দুইটী ছিদ্র আছে। বায়ু সম্মুখের ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিয়া পশ্চাতের ছিদ্র দিয়া বায়ুনলীতে গমন করে। কখনও এক ঘণ্টা, কখনও বা দুই ঘণ্টা অন্তর, নাসিকাভ্যন্তরের পশ্চাৎ দিকের ছিদ্র—বন্ধ হইয়া যায়। এ ব্যাপার—পর্য্যায়ক্রমে ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ একবার বাম নাসিকায়, একবার দক্ষিণ নাসিকায়, পশ্চাৎ ভাগের ছিদ্র আবদ্ধ হইয়া থাকে। যে দিকের ছিদ্র বন্ধ হয়—সেই দিকের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ফুলিয়া উঠে এবং তাহা উষ্ণস্পর্শ বলিয়া মনে হয়। যে দিকের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী স্ফীত হয়, তাহার বিপরীত দিক দিয়াই শ্বাস বহিয়া থাকে।

যদি কোন কারণে বাম নাসিকা বহুদিন আবদ্ধ থাকে—তাহা হইলে দেহে পৈত্তিক রোগের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে, আবার দক্ষিণ নাসিকা বেশী দিন বন্ধ থাকিলে—শরীরে কফজ রোগ জন্মে।

বামপার্শ্বে কিছুক্ষণ শয়ন করিয়া থাকিলে দক্ষিণ নাসিকায়, এবং দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিলে বাম নাসিকায়,—শ্বাসের সঞ্চরণ ঘটিতে দেখা যায়। এই শ্বাস-সংক্রমণের ব্যাপার যিনি বেশী জানিতে চাহেন,—

তিনি তন্ত্র পাঠ করিবেন। প্রবন্ধের অতি বিস্তার আশঙ্কায়—আমি এই স্থানেই নিরস্ত হইলাম। তন্ত্র বলেন—এইরূপ শ্বাস সংক্রমণের নির্দ্দেশ দ্বারা—শরীরের শুভাশুভ, ভাগের উন্নতি অবনতি, জীবনের বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ—প্রভৃতি বহু বিষয় অবধারিত হইতে পারে।

প্রধান নাড়ীগণের নাম।

শরীরের প্রধান নাড়ী তিনটী;—ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। এই তিনটীর মধ্যে আবার সুষুম্নাই সর্ব্বপ্রধান। কেননা—দেহের সমস্ত নাড়ীই এই সুষুম্না হইতে জাত এবং তাহাকে আশ্রয় করিয়াই কর্ম্মশীল। সুষুম্নার অবস্থান ঈড়া পিঙ্গলার মধ্যে—এই জন্যই তান্ত্রিক মতে সুষুম্নার আর একটী বিশেষণ "ত্রিগুণাত্মিকা"। সুষুম্নার যে শক্তি রজঃগুণ স্বরূপিণী—তাহার নাম "বজ্রা," যে শক্তি সত্বগুণসম্পন্না তাহার নাম "চিত্রিণী," যে শক্তি তমোময়ী—তাহার নাম "ব্রহ্মনাড়ী"। যথা;—

রজোগুণা চ বজ্রাখ্যা চিত্রিণী সত্বসংযুতা।
তমোগুণী ব্রহ্মনাড়ী কার্য্যভেদ ক্রমেণ চ॥

ঈড়া নাড়ী—বাম মুষ্ক (Prostatic Plexus) হইতে সুষুম্নাকে অবলম্বন করিয়া—ধনুর মত বাঁকিয়া—হৃদয়ে আসে, অঙ্গের বামভাগস্থিত যন্ত্র সমূহের ভিতর দিয়া দক্ষিণ নাসিকায় গমন করে। পিঙ্গলা দক্ষিণ মুষ্ক হইতে উত্থিত হইয়া—বক্রভাবে, বাম নাসিকায় উপস্থিত হয়। বাম নাসিকার শ্বাস সঞ্চরণের কাল "ঈড়া-প্রবাহ" নামে এবং দক্ষিণ নাসিকার শ্বাস বহন কাল "পিঙ্গলা প্রবাহ" নামে অভিহিত। যখন উভয় নাসিকায় সমানভাবে শ্বাস বহে—তাহার নাম—"সুষুম্না" প্রবাহ। এই সুষুম্না প্রবাহের সময় "হ" (চন্দ্র নাড়ী) এবং "ঠ" (সূর্য্য নাড়ী) এক হইয়া যায়। হঠযোগিগণ এই রহস্য অবগত আছেন। পাঠকগণ! "প্রাণাপানৌ সমৌকৃত্বা" ইত্যাদি শ্লোকে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাইবেন।

মানবের বাম নেত্রে "গান্ধারী" নাড়ী, দক্ষিণ নেত্রে "হস্তী জিহ্বা" নাড়ী, বাম কর্ণে "যশস্বিনী" নাড়ী এবং দক্ষিণ কর্ণে "পূষা" নাড়ী অবস্থিত। জিহ্বাস্থিত নাড়ীর নাম—"অলম্বুষা"—ইহার কার্য্য আস্বাদন করা। জননেন্দ্রিয়স্থিত নাড়ী "কুহু" নামে এবং মস্তকস্থিত নাড়ী "শঙ্খিনী" নামে অভিহিত। *

প্রধান নাড়ীগুলির ইহাই সংক্ষিপ্ত পরিচয়। শরীরস্থ সমস্ত নাড়ীর সংখ্যা সাড়ে তিন কোটি! তন্ত্র স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে—এই সকল নাড়ীকে ভাগ করিয়া দিয়াছেন। পারি তো সে পরিচয় পরে দিব।

নাড়ীর উৎপত্তি স্থান।

তন্ত্রের মতে সমস্ত নাড়ীর উৎপত্তি স্থান "নাভি"। "নাভি কন্দ নিবদ্ধা স্তাস্তির্য্য গূর্দ্ধমধঃস্থিতাঃ।" এই স্থলেই প্রাচ্য মতের সহিত পাশ্চাত্য মতের বিরোধ। এই নাভি কন্দই "কূর্ম্ম" নামে অভিহিত হইয়াছে। যুরোপের বিজ্ঞান কূর্ম্মের অস্তিত্ব একেবারেই

* গান্ধারী—Left Optic Nerve.
হস্তি জিহ্বা—Right Optic Nerve.
পূষা—Right Auditory.
যশস্বিনী—Left Auditory.
অলম্বুষা—Gustatory nerve.
কুহু—Pudic nerve.

স্বীকার করিবে না। কিন্তু এই 'নাভি' বা 'কূর্ম্মের' কথা একটু তলাইয়া বুঝিলেই—সমস্ত গোল মিটিয়া যায়। এখন সেই চেষ্টাই আমরা করিব। এখানেও আমাদিগকে তন্ত্রের মত অনুসরণ করিতে হইবে।

শিব সংহিতায় দেখিতে পাই গুহ্যদ্বারের দুই অঙ্গুলি উর্দ্ধে এবং মেঢ্র স্থানের দুই অঙ্গুলি নিম্নে—চারি অঙ্গুলি পরিমিত বিস্তৃত স্থানে "মূলাধার পদ্ম" বিরাজিত। এই পদ্মের কর্ণিকারের মধ্যে—"ত্রিকোণ মণ্ডল" অবস্থিত। যোগিগণ ইহাকে "যোনি মণ্ডল" বলিয়া থাকেন। "যোনি মণ্ডলে"র মধ্যস্থলে বিদ্যুৎলতার ন্যায় আকার সম্পন্ন সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারা কুটিলা কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মপথ সংরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। সেই ত্রিকোণ মণ্ডল হইতেই ঈড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্নার উৎপত্তি। মূলাধার পদ্ম হইতে আরও বহু নাড়ী উত্থিত হইয়া জিহ্বা, মেঢ্র, বৃষণ, পাদাঙ্গুষ্ঠ, নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ, পায়ু, কুক্ষি প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে গমন পূর্ব্বক স্ব স্ব কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আবার নিজ নিজ জন্মস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে।

অন্যা যাস্তপরা নাড্যা মূলাধারাৎ সমুত্থিতাঃ।
রসনা মেঢ্র বৃষণ পাদাঙ্গুষ্ঠঞ্চ নাসিকাং।
কক্ষ নেত্রাঙ্গুষ্ঠ কর্ণং সর্ব্বাঙ্গং পায়ু কুক্ষিকং।
লব্ধা তা বৈ নিবর্ত্তন্তে যথাদেশ সমুদ্ভবাঃ॥
—মূলাধার চক্রবর্ণনং।

ইহার দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে—শরীরের নাড়ী সমূহ মূলাধার পদ্মের মধ্যস্থিত কুলকুণ্ডলিনী হইতে উৎপন্ন, অতএব উদর-প্রাচীরস্থিত চর্ম্মনির্ম্মিত নাভি—কখনই নাড়ীগণের জন্মভূমি নহে।

সংস্কৃত ভাষায় যে কোন পদার্থের মধ্যস্থলকেই "নাভি" বলে। যথা,—চাকার মধ্যস্থলের নাম "চক্রনাভি"। সূর্য্য—সৌর জগতের মধ্যস্থলে আছেন, তাই তাঁহার নাম "জগন্নাভি"। চুম্বকের দুই সীমায় লৌহাকর্ষণ শক্তি আছে, কিন্তু তাহার ঠিক মধ্যস্থলে সে শক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপ শক্তিবিহীন মধ্যস্থল না থাকিলে,—চুম্বকের উভয় প্রান্ত লৌহকে আকর্ষণ করিতে পারিত না। এই দৃষ্টান্ত জগতের সকল পদার্থ সম্বন্ধেই খাটে। স্থির মধ্যস্থল না পাইলে কোন শক্তিই কার্য্য করিতে পারে না। মানব দেহেও—চুম্বকের ন্যায় মধ্যস্থলকে অবলম্বন করিয়া জীবনীশক্তি কার্য্য করিয়া থাকে। স্থিরমধ্যস্থল না থাকিলে—জীবদেহেও জীবনী শক্তির বিকাশ ঘটিত না। এই স্থির মধ্যস্থলের নাম—"অনন্ত" "বা বাসুকী"।

এইবার আমরা বুঝিবার চেষ্টা করিব মানবদেহের সেই স্থির মধ্যস্থল কোথায়?

যাঁহারা জ্যোতিষ শাস্ত্র লইয়া অল্প বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন—তাঁহারা অবশ্যই জানেন তুলা রাশি—রাশিচক্রের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। বিরাট দেহের যেমন দ্বাদশ রাশি, মানব দেহেও সেইরূপ দ্বাদশ রাশি আছে, যথা—

মেষো শিরো বৃষো বক্তুং মিথুনং বাহুযুগ্মকং।
কর্কটো হৃদয়ঞ্চৈব সিংহশ্চোদর মেব চ।
কন্যা কটী তুলা বস্তি বৃশ্চিকো গুহ্যমেবচ।
ধনু উরূ মৃগো জানু কুম্ভো জঙ্ঘে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
মীনো পাদদ্বয়ঞ্চৈব কালাঙ্গে নিয়তং ক্রমাৎ॥

অর্থাৎ মানবের মস্তক—মেষ রাশি,

মুখ—বৃষ রাশি, বাহুদ্বয়—মিথুন রাশি; হৃদয়—কর্কট রাশি, * উদর—সিংহ রাশি, (১) কটী—কন্যা রাশি; বস্তি—তুলা রাশি; (২) গুহ্যদেশ—বৃশ্চিক রাশি; উরুদ্বয়—ধনু রাশি, হাটু—মকর রাশি, জঙ্ঘা—কুম্ভ রাশি, পাদদ্বয়—মীন রাশি। মানব দেহ এই দ্বাদশ রাশিতে বিভক্ত।

তুলা রাশি যেমন রাশিচক্রের মধ্যস্থল, সেইরূপদেহের পশ্চাদ্ভাগে যেখানে ত্রিকাস্থি (Sacrum) আছে—সেই স্থান দেহের মধ্যবর্ত্তী। বস্তি ও লিঙ্গমূল সম্মুখদিকে, ত্রিকাস্থি পশ্চাৎদিকে—এই অংশের নামই 'নাভি'।

তান্ত্রিকের সূক্ষ্ম দৃষ্টি—মানব দেহে চতুর্দ্দশ ভুবন আবিষ্কার করিয়াছিল। শরীরকে চতুর্দ্দশ ভুবনে বিভক্ত করিলে—ভুঃ,ভুবঃ প্রভৃতি সপ্ত স্বর্গ এবং অতল বিতল প্রভৃতি সপ্ত পাতাল—এই চতুর্দ্দশ ভুবনের ত্রিকাস্থি যুক্ত স্থানই দেহের মধ্যস্থল বুঝায়।

তন্ত্র শাস্ত্রে আলোচনায় আরও জানিতে পারা যায়—

মহাশক্তি কুণ্ডলিনী নাড়ী স্বাহি স্বরূপিনী।
ততো দশোর্দ্ধগা নাড্যো দশশ্চাধোগতাস্তথা।
তির্য্যগ্ গর্ত্তে তথা নাড্যো চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যায়া

অহি স্বরূপিনী মহাশক্তি কুণ্ডলিনী হইতে চতুর্বিংশতি সংখ্যক প্রধান নাড়ী উৎপন্ন হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে দশটী নাড়ী ঊর্দ্ধগামিনী, দশটী অধোগামিনী, বামে দুইটী দক্ষিণে দুইটী—এই পাঁচটী তির্য্যক্ গামিনী।

এইবার সুশ্রুতসংহিতার সহিত তন্ত্রের এই সিদ্ধান্ত মিলাইয়া দেখা যাউক। শারীর স্থানের নবম অধ্যায়ে সুশ্রুত বলিতেছেন—

"চতুর্বিংশতি র্ধমন্যো নাভি প্রভবা অভিহিতাঃ। তাসাং তু নাভি প্রভবানাং ধমনী না মূর্দ্ধগা দশ দশশ্চাধোগামিন্যঃ চতস্রস্তির্য্যগ্‌গাঃ"।

সুতরাং তন্ত্রেও সুশ্রুতে কোন মতদ্বৈধ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না: "শিব স্বরোদয়" নামক আর একখানি প্রামাণিক গ্রন্থেও এই মত সমর্থিত হইয়াছে যথা;—

নাড়ীস্থা কুণ্ডলি শক্তি ভুজঙ্গাকার শায়িনী।
ততো দশোর্দ্ধগা নাড্যো দশাধ; গা প্রতিষ্ঠিতাঃ॥
দ্বে দ্বে তির্য্যাগ্‌গতে নাড্যৌ চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যয়া॥

নাভিস্থিত সর্পাকারশায়িনী কুণ্ডলিনীশক্তি হইতে ১০টী ঊর্দ্ধগামিনী, ১০টী অধোগামিনী, এবং ৪টী তির্য্যগ্‌গত—এই ২৪টী নাড়ী বহির্গত হইয়াছে। এই মূলাধারস্থ ত্রিকোণ যোনিমণ্ডলেরই নাম "কূর্ম্ম"। ভগবান্ দত্তাত্রেয় রূপকছলে এই কূর্ম্মের কথাই উত্থাপন করিয়াছেন—

তির্য্যক্ কূর্ম্মো দেহিনাং নাভিদেশে
বামে বক্তুং তস্য পুচ্ছঞ্চ যাম্যে।
ঊর্দ্ধে ভাগে হস্ত পাদৌ চ বামৌ
তস্যাধস্তাৎ সংস্থিতৌ দক্ষিণৌ তৌ॥
বক্ত্রে নাড়ীদ্বয়ং তস্য পুচ্ছে নাড়ীদ্বয়ং তথা।
পঞ্চ পঞ্চ করে পাদে বাম দক্ষিণ ভাগয়োঃ॥

দেহিগণের নাভিদেশে তির্য্যগ্‌ভাবে একটী কূর্ম্ম আছে। তাহার মুখ নাভির বামদিকে, এবং পুচ্ছ দক্ষিণ দিকে। বাম হস্ত ও বাম পদ—ঊর্দ্ধভাগে, দক্ষিণ হস্ত ও দক্ষিণ পদ—অধোভাগে। উহার মুখে ২টী নাড়ী, পুচ্ছদেশে ২টী নাড়ী—পদদ্বয়ে ও হস্তদ্বয়ে পাঁচটী

---

* হৃদয় (মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যন্ত্রের ক্রিয়াস্থান।

(১) উদর (সূর্য্যের গ্রহ)।

(২) বস্তি (এই স্থানের পশ্চাতে ত্রিকাস্থি)।

পাঁচটী করিয়া ২০টী নাড়ী, সর্ব্বশুদ্ধ এই ২৪টি নাড়ী আছে।

তন্ত্র স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন—"ত্রিকোণং যোনিমণ্ডলং কূর্ম্মবিক্যাভিধিয়তে।" ত্রিকোণ যোনিমণ্ডলের নামই কূর্ম্ম। সেই কূর্ম্ম হইতে ২৪টী ধমনীর উৎপত্তি।

মর্ম্ম নির্দ্দেশ অধ্যায়ে সুশ্রুত বলিয়াছেন—পক্কাশয় ও আমাশয়ের মধ্যে—সমস্ত শিরাজালের উৎপত্তিস্থান নাভি নামক মর্ম্ম অবস্থিত; এই মর্ম্ম আহত বা আঘাত প্রাপ্ত হইলে মানবের সত্বই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

এই সকল প্রমাণের দ্বারা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি,—নাড়ী বিজ্ঞানে যে নাভিকে নাড়ী সমূহের উৎপত্তি স্থান বলা হইয়াছে, সে নাভি উদরপ্রাচীরস্থিত চর্ম্ম নির্ম্মিত নাভি নহে। অস্ত্র চিকিৎসার প্রয়োজনে—ডাক্তারগণ অনেক সময় চর্ম্মনির্ম্মিত নাভি ছেদন করিয়া থাকেন,—তাহাতে রোগির মৃত্যু ঘটে না। সুতরাং সুশ্রুতোক্ত নাভি মর্ম্ম ও চর্ম্মনির্ম্মিত নাভি—এক হইতে পারে না। উদরাভ্যন্তরস্থিত আমাশয় ও পক্কাশয়—যেস্থান হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রসবহা শিরা উৎপন্ন হইয়াছে,—সেই স্থানের নামই "নাভি"। সেই নাভি মর্ম্ম আহত হইলে মানুষের সত্বই জীবনান্ত ঘটে।

তন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ উভয় শাস্ত্রই "নাভিকে" একবাক্যে প্রাণের আধার বলিয়াছেন। এ সিদ্ধান্তও বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নহে। ভ্রূণের দেহ নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে—জননীর, গর্ভস্থিত অণ্ডের (ovum) মধ্যস্থল হইতে জীবনীশক্তির ক্রিয়া প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে মস্তিষ্ক, হাত, পা প্রভৃতি ক্রমশঃ গঠিত হইয়া থাকে। অতএব দেহের 'নাভি' অর্থাৎ মধ্যস্থল—প্রাণ বা জীবনী শক্তির প্রধান স্থান। নাভিস্থ প্রাণই মস্তিষ্ক ও কশেরুকা মজ্জায় (Spinal cord) সৃষ্টি করে। এই জীবনীশক্তিকে—এই প্রাণকে—উপনিষৎ "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন। এই জীবনীশক্তি, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত—সমভাবে বিদ্যমান থাকে।*

মানব দেহের প্রত্যেক জীবাণু—দ্বীপের মত শরীরের রসে ভাসমান। তাহারা আকর্ষণী-শক্তির দ্বারা রস হইতে আবশ্যক পদার্থ কেন্দ্রের দিকে টানিয়া লয়, অনাবশ্যক পদার্থ কেন্দ্র হইতে পরিধির দিকে বাহির করিয়া দেয়। এই আকর্ষণী শক্তির নাম "প্রাণ" বিকর্ষণী শক্তির নাম "অপান"। এই উভয় শক্তি জীবাণুর মধ্যস্থলকে অবলম্বন করিয়াই কার্য্য করিয়া থাকে। স্থূল দৃষ্টিতে এই মধ্যস্থল চুম্বকের মধ্যস্থলের ন্যায় ক্রিয়াহীন। জীবাণুর Nucleus, চুম্বকের মধ্যস্থান, মানব দেহের মধ্যস্থল—এই তিনটী এক জাতীয় কেন্দ্র—ইহার নামই নাভি। বিজ্ঞান যাহাকে

---

* ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরস্পর যোগ রাখিবার জন্য বহির্জগতে যখন টেলিগ্রাফের তার পাতা হয়, তদ্রূপ আমাদের জীবনীশক্তি প্রাণের নাভি অর্থাৎ দেহের মধ্যস্থল হইতে Sympathetic ধমনীমণ্ডল সমস্ত শিরাজালের প্রাচীরে প্রাচীরে বর্ত্তমান থাকিয়া দেহকে ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

ভ্রূণের মধ্যস্থল হইতে Amnion Choron এবং Allunlois অঙ্কুরিত হইয়া ফুল হয় Umbilicul Vesicaleএর সহিত ভ্রূণের হৃৎপিণ্ডের সম্বন্ধ ও উহার দেহের মধ্যদেশ হইতে প্রথম পরিলক্ষিত হয়।

ডাঃ ৺হেমচন্দ্র সেন, এম্, ডি।

Centripetal force বলে—তন্ত্র মতে তাহাই "প্রাণ", বিজ্ঞানের Centrifugal force, তন্ত্রের "অপান"—এই প্রাণ ও অপানের কার্য্য পরস্পরকে আকর্ষণ করা। ইহারা দেহের মধ্যস্থল বা নাভিদেশে নিবদ্ধ। তন্ত্র ইহাদের প্রকৃতির একটী সুন্দর উপমা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"অপানঃ কর্ষতি প্রাণঃ প্রাণোঽপানঞ্চ কর্ষতি
রজ্জুবদ্ধো যথা শ্যেনঃ গতোঽপ্যাকৃষ্যতে পুনঃ॥"

যে স্থির শক্তির প্রভাবে প্রাণ ও অপান কার্য্য করিতে সক্ষম হয়—সেই শক্তিই তন্ত্রের সুষুম্না নাড়ী। প্রাণ ও অপান, ঈড়া ও পিঙ্গলা—যে স্থানে মিলিত হয়, সেই স্থানের নাম "সুষুম্না"। ইহার ইংরাজী নাম—Neutral.

শিব স্বরোদয় গ্রন্থে কথিত হইয়াছে—"নাভিকন্দ হইতে অঙ্কুরের ন্যায় ৭২০০০ সহস্র ধমনী বহির্গত হইয়াছে।"

মানুষের শরীরে যত শক্তি কার্য্য করে,—সেই সকল শক্তি যে যে স্থান হইতে বহির্গত হয়,—বৈদ্যুতিক শক্তির ন্যায় স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া তাহারা আবার নিজ স্থানে ফিরিয়া আসে। তন্ত্রও বলিয়াছেন—"লব্ধা ত্যৈ বৈ নিবর্ত্তন্তে যথাদেশ সমুদ্ভবাঃ।"

মূলাধারে তু যা শক্তি ভুজগাকার রূপিনী।
তদ্ভ্রমাবর্ত্তবা তোয়ং প্রাণ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥

মূলাধারে যে ভুজঙ্গরূপিনী মহাশক্তি আছেন, তাহারই আবর্ত্তে শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য চলিতেছে।—এই মহাশক্তি নিদ্রিতা—অর্থাৎ এই স্থানে চুম্বক-কেন্দ্রের মত কোন শক্তির চাঞ্চল্যই * পরিলক্ষিত হয় না। সমস্ত শক্তিই এখানে সুষুপ্ত (১) তাই তন্ত্র বলিয়াছেন—মুখে নিবেশ্য সা পুচ্ছং সুষুম্না বিবরে স্থিতা। সুপ্তা নাগোপমা হেষা—" কূর্ম্ম হস্ত, পদ, মুখ প্রভৃতি প্রত্যঙ্গ সঙ্কুচিত করিয়া ক্রিয়াহীন অবস্থায় থাকে, প্রয়োজন মত শক্তিবলে—আবার প্রত্যঙ্গ গুলির প্রসারিতও করে,—মূলাধারে কূর্ম্মের এই ধর্ম্ম নিরীক্ষণ করিয়াই—তান্ত্রিকগণ ইহাকে কূর্ম্ম নামেই অভিহিত করিয়াছেন।

আয়ুর্ব্বেদ যেমন "নাভিকে" সমস্ত ধমনীর উৎপত্তি স্থান বলিয়াছেন, তেমনি সমস্ত শিরারও উৎপত্তি স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ সিদ্ধান্তকেও অমূলক বলা চলে না। কথাটা একটু ধীরভাবে আলোচনা করা যাউক;—

ভুক্ত দ্রব্য সম্যক পরিপাক হইলে তাহার সারাংশের নাম—"রস"। পাশ্চাত্য মতে এই রসের নাম—chyle. এই রস যকৃৎ ও প্লীহায় গিয়া রক্তে পরিণত হইয়া থাকে। সমান বায়ু কর্ত্তৃক ইহা হৃদয়ে প্রেরিত হইয়া থাকে। যে শক্তি solarplexus এ কার্য্য করে—তাহাই সমান বায়ু। এই বায়ুর কার্য্য—অন্ন পরিপাক করা। জীবনীশক্তি প্রভাবে—মানবের আমাশয় ও পক্বাশয় হইতে—রস দুইটী মার্গ দিয়া হৃদয়ে গিয়া হৃদয়ে গিয়া উপস্থিত হয়। তাহার দ্বারাই শরীর পোষণ হইয়া থাকে। দুগ্ধের মত শ্বেত বর্ণের রস—অসংখ্য সূক্ষ্ম শিরা (Lactial) দিয়া, দেহের বামদিকস্থ 'রস বহা'র (Thorucic duct) সাহায্যে বক্ষঃপ্রদেশের ভিতরে শোণিতের সহিত মিশিয়া—হৃদয়ে উপস্থিত হয়। ভুক্ত বিপাকের সারাংশের কিয়দংশ আমাশয় ও পক্বাশয় হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম

* Vibrition. (১) Latent.

শিরা দিয়া—"মহাশিরা"য় (Portal vein) প্রবিষ্ট হয়। ইহাই তন্ত্রমতে রস প্রবাহের "দাক্ষিনী"। মহাশিরা হইতে রস যকৃতে গমন করে, তথায় বিশুদ্ধ হইয়া হৃদয়ে চলিয়া যায়। ইহার দ্বারা সিদ্ধান্ত হইতেছে—আর্য্য বিজ্ঞানের মতে রস আমাশয় ও পক্কাশয় হইতে হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া থাকে। এই উভয় আশয়ের প্রাচীরে যে সকল "স্রোতাগ্র" (Luctial ও Portal vein এর, সূক্ষ্মাগ্রে) আছে, তাহারাই রস ও রক্ত বহা শিরার জন্মভূমি। তাই সুশ্রুত বলিয়াছেন,—"তাসাং (শিরাণাং) নাভিমূলং" নাভিই শিরাগণের মূল। নাভি হইতেই শিরাজাল উর্দ্ধ, অধঃ এবং তির্য্যক্‌ভাবে প্রসারিত হইয়া—সমস্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—এ নাভি চর্ম্ম-নাভি নহে। এ নাভি প্রাণের আধার। শিরা, ধমনী ও প্রাণের সহিত চর্ম্ম-নাভির কোন সম্বন্ধই নাই। তন্ত্রের মূলাধার চক্রের কুণ্ডলিনী,—আয়ুর্ব্বেদের নাভিকন্দ—একই পদার্থ। ডাক্তারী বিজ্ঞানের Solur plexus এর ক্রিয়া, আয়ুর্ব্বেদের নাভিকন্দের কার্য্য, তন্ত্রের কুণ্ডলিনী প্রভাব—তিনই সমান এই কুণ্ডলিনীর প্রভাব বুঝাইবার জন্যই উক্ত বলিয়াছেন,—

নাভিস্থঃ প্রাণ-পবনঃ স্পৃষ্ট্বা হৃৎকমলান্তরং।
কণ্ঠাদ্বহির্বিনির্য্যাতি পা তুং বিষ্ণু পদামৃতং॥
পীত্বা চাম্বর পীযূষং পুনরায়াতি বেগতঃ।
প্রীণয়ন্ দেহ মখিলং জীবয়ন্ জঠরানলং।

"নাভিস্থিত প্রাণবায়ু হৃৎকমলান্তর (Chese) স্পর্শ করিয়া বিষ্ণু পদামৃত (বাহ্য বায়ু) পান করিবার জন্য কণ্ঠ হইতে বহির্গত হয় এবং অম্বর পীযূষ পান করিয়া সমস্ত দেহের পরিতর্পণ ও জঠরানলের বর্দ্ধন করিয়া, আবার নাসারন্ধ্র দিয়া নিজস্থানে ফিরিয়া আসে।

এতক্ষণে বোধ হয় পাঠকগণও বুঝিতে পারিয়াছেন—প্রাচীন বৈদ্যগণ কেবল কল্পনা-বলেই বিজ্ঞানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গড়িয়া তুলেন নাই। তাঁহারা শবচ্ছেদ করিয়া মানব দেহের প্রতি অণু পরমাণুর প্রকৃতি নির্ণয় করিয়াছিলেন। শক্তিশালী অণুবীক্ষণে শরীরের যে রহস্য, আধুনিক বিজ্ঞান অদ্যাপিও আবিষ্কার করিতে পারে নাই, যোগ-বিক্ষণে তাঁহাদের চক্ষে—তাহাও ধরা পড়িয়াছিল। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান—ঋষি-রচিত রূপক মায়া ভেদ করিতে জানে না, তাই পদে পদে প্রতারিত হয়।

পল্লীগ্রাম ও স্বাস্থ্যবিধান।

(শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়)।

——::——

দেশের স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখিয়া ভয় হয়। মনে হয়, বাঙ্গালাদেশ মানবশূন্য শ্মশানে পরিণত হইবে; ইহাই বুঝি তাহার নিয়তির বিধান! দেশে বার মাসই নানাপ্রকার সংক্রামক ও সংহারক ব্যাধি লাগিয়াই আছে। কোন প্রকারেই বাঙ্গালাবাসী মানবের আর স্বস্তি নাই, সুখ নাই শান্তি নাই। বাঙ্গালা কি চিরদিনই এমনি অশান্তি উপভোগ করিয়া আসিয়াছে? না, ইতিহাস সে কথা বলে না। বরং আমরা তাহার বিপরীত প্রমাণই প্রাপ্ত হইয়া থাকি। এখনকার এই প্লীহা-অগ্রমাসে স্ফীতোদর কোটরগত চক্ষু কঙ্কালমূর্ত্তিগুলির পিতৃপিতামহগণের সম্বন্ধে যে গল্প শ্রবণ করা যায় অথবা ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বের যে সকল বাঙ্গালীর দেহ প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহাতে বোধ হয় বাস্তবিকই বাঙ্গালা স্বাস্থ্য-সম্পদে এমন দীন হীন ছিল না; বরং সে বিষয়ে সে সৌভাগ্যবানই ছিল। আমরা বাঙ্গালাদেশ বলিতে বাঙ্গালার পল্লীগ্রামগুলিকেই বুঝি। এখন এই পল্লীগ্রাম ভাঙ্গিয়াই নগরের গৌরব বাড়িতেছে। দেশের যাহারা ধনী লোক, যাঁহারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও আধুনিক সভ্যতায় দীক্ষিত লোক, তাঁহারা ম্যালেরিয়ার ভয়ে পিতৃপুরুষের স্মৃতিনিকেতন পরম রমণীয় পল্লীগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া নগরে যাইয়া বাস করিতেছেন, বৃদ্ধা জননীর স্নেহ-শীতল শান্তি-আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া, নব্যা বিলাসিনীর বিলাস-কাননে আত্মবিক্রয় করিতেছেন। বোধ হয় তাঁহারা ভাবিয়াছেন, পল্লীগ্রাম পরিত্যাগ করিলেই, নীরোগ শরীরে চারিযুগ বাঁচিয়া থাকিয়া নিত্যনূতন অনাবশ্যকীয় ক্ষুদ্র বৃহৎ কত অভাবের সৃষ্টিজনিত সুখ লাভ করা যাইবে। তাই তাঁহাদের প্রাণের মধ্যে পল্লীবিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে। ক্রমে এই ধনী ও তথাকথিত জ্ঞানীদিগের বিদ্বেষ-জনিত অবহেলায় বাঙ্গালার পল্লীগ্রামগুলি ধ্বংসপথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। বাস্তবিকই পূর্ব্বে পল্লীগ্রামের এ শোচনীয় অবস্থা ছিল না। বাঙ্গালা সাহিত্যে সুপরিচিত বাবু চন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন,—"হুগলী, বর্দ্ধমান প্রভৃতি ভাগিরথীর পশ্চিমকূলস্থিত জেলা সকল তখন অতিশয় স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। কলিকাতায় পীড়া হইলে আমরা গ্রামে চলিয়া যাইতাম, বিনা চিকিৎসায় তথায় পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করিতাম এবং মহোল্লাসে খাইয়া খেলাইয়া বেড়াইতাম। স্কুল কলেজের ছুটি হইলেই দেশে যাইতাম, সেখান হইতে আর ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা হইত না। ছুটি ফুরাইলে একমাস দেড়মাস পরে কলিকাতায় আসিতাম,—তাও একরকম, কাঁদিতে কাঁদিতে। আমার পুত্র পৌত্রাদি সে গ্রাম দেখিল না, সে গ্রাম্যসুখের আস্বাদও পাইল না। তাহাদের জীবন অসম্পূর্ণ ও অঙ্গহীন

হইল। যে গ্রামাই জীবন যাহাদের হইল না, বঙ্গদেশ কি জিনিস তাহারা তাহা জানিতে পারিল না। তাহারা যথার্থই হতভাগা।" তারপর চন্দ্রবাবুই আবার লিখিয়াছেন,—"কৈকালা আজ ম্যালেরিয়ায় প্রায় জনশূন্য—গত ৪০ বৎসরে বোধ হয় শতকরা ৭৫জন চলিয়া গিয়াছে—গ্রামে গৃহ অল্পই আছে, পথের দু'ধারে কেবল কাঁতড়া পড়িয়া রহিয়াছে। * * * গ্রামে জঙ্গল বাড়িয়াছে, বন্যশূকরাদি হিংস্রজন্তু দেখা দিয়াছে। ম্যালেরিয়ার জন্য প্রায় চল্লিশ বৎসর সোণার কৈকালয়ে যাই নাই।" চন্দ্রনাথ বাবুর এই কথা, শিক্ষিত বাঙ্গালীর মর্ম্মভেদী স্বীকারোক্তি স্বরূপে গৃহীত হইবে। পল্লীবাসী চিরকাল মনে রাখিবে, চন্দ্রনাথ বাবুর মত শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও স্বীয় জন্মভূমি কৈকালাকে ম্যালেরিয়াক্রান্ত দেখিয়া কাপুরুষের মত রণে ভঙ্গ দিয়াছিলেন, ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর সহিত যুদ্ধ করিতে উপযুক্ত অস্ত্র লইয়া দণ্ডায়মান হয়েন নাই। তাঁহার এ দৌর্ব্বল্যের জন্যই, তাঁহার "সোণার কৈকালা" শতকরা ৭৫জনকে হারাইয়াছে। চন্দ্রনাথ বাবুর এই ত্রুটি স্বীকার—পরিণত বয়সে সোণার কৈকালার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ, তাঁহার মহত্ত্বেরই পরিচায়ক। পল্লীভূমির এমন কুলাঙ্গারও আছে, যিনি পল্লীমাতার সম্বন্ধ স্বীকার করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন। নগরে নিতান্ত নগণ্য ভাবে জীবন যাপন করাও যেন, পল্লীজননীর অনেক ভাগ্যবান পুত্রের অভাগা বংশধরের পক্ষে প্রার্থনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এইরূপে ম্যালেরিয়ার ভয়েও বটে এবং কতকটা অন্যান্য কারণেও বটে—ধনী ও তথাকথিত শিক্ষিতগণ পল্লীগ্রামগুলিকে পরিত্যাগ করায় পল্লীগ্রাম সকল সর্ব্বপ্রকারেই শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা এই শ্রীহীন পল্লীগ্রামে বাস করে, তাহারাই কিন্তু দেশের সর্ব্বস্ব—দেশের সম্পদ—দেশের প্রাণ। তাহাদিগকে বাঁচাইতে না পারিলে দেশ রক্ষা হইবে না। দেহের বাহ্যিক সাজসজ্জা বাড়াইবার পূর্ব্বে, যাহাতে দেহের প্রাণটুকু রক্ষা করা যাইতে পারে, তাহার চেষ্টাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। বাঙ্গালার এই প্রাণ রক্ষা করিতে হইলে—পল্লীবাসী জনগণকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে পল্লীগ্রাম হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইলে চলিবে না; বাঙ্গালার পল্লীগ্রামেই বাস করিতে হইবে, পল্লীবাসীর সুখ দুঃখের ভাগী হইয়া তাহাদিগের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, পল্লীবাসী নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিতে হইবে, আত্মরক্ষার উপযোগী জ্ঞান বিতরণ করিতে হইবে,—তবে ত পল্লীবাসী বাঁচিবে—তবে ত দেশ রক্ষা হইবে।

স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া নীরোগ দেহে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, **পুষ্টিকর খাদ্য বিশুদ্ধ পানীয়, নির্ম্মল বায়ু ও শীতাতপ হইতে দেহ রক্ষার উপযোগী পরিচ্ছদাদির** প্রয়োজন। কিন্তু আমরা এখন এই কয়টাতেই বঞ্চিত! সুতরাং আমাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ না হইবে কেন? ম্যালেরিয়ার ভয়ে জন্মভূমি পল্লীগ্রামকে পরিত্যাগ করিয়া নগরে বাস করিলেও, আমরা পূর্ব্বকথিত আবশ্যকীয় দ্রব্যগুলির কয়টির সংস্থান করিতে পারি? এক শ্রেণীর লোক

আছে, যাহাদের সকল গুলিরই অভাব। দেশে হঠাৎ একটা কোন সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইলে এই শ্রেণীর লোকেরাই অধিক মরে। যাহারা সৌভাগ্যশালী—যাঁহারা মার্কণ্ডেয়ের পরমায়ু লাভের আশায় পল্লীগ্রাম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাও আজকালের বাজারে স্বাস্থ্যের অনুকূল উপরোক্ত দ্রব্যের সকলগুলিই সংগ্রহ করিতে পারেন না। বরং তাঁহাদের অভাব কোন কোন বিষয়ে পল্লীবাসী অপেক্ষাও অধিক। আমরা একে একে আমাদের এই অভাবগুলির আলোচনা করিব।

১। **পুষ্টিকর খাদ্য।**—বাঙ্গালার প্রধান খাদ্য চা'ল, দা'ল, মাছ, মাংস, ঘৃত, দুগ্ধ প্রভৃতি। বর্ত্তমান সময়ে এই সকল দ্রব্যের কতকগুলি দুর্ম্মূল্য এবং কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য। বিশুদ্ধ ঘৃত দুগ্ধ অধিক মূল্য দিয়াও সংগ্রহ করা অসম্ভব। এখন ঘৃতের নামে নানাবিধ ঘৃত জন্তুর চর্ব্বি ও স্বাস্থ্যের প্রতিকূল অনেক প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ বাজারে প্রচলিত হইয়াছে। আমরা ঘৃতের লোভে, কতকটা মোহেও বটে, ঐ সকল অযোগ্য ও অস্পৃশ্য দ্রব্য চতুর্গুণ মূল্য দিয়া ক্রয় করিতেছি। দুগ্ধে কেবল দুগ্ধের বর্ণ রক্ষিত হয়, তাই উচ্চ মূল্যে ক্রয় করি; সময় সময় বিদেশের আমদানি "গোয়ালিনী মার্কা" গাঢ় দুগ্ধের ব্যবহার করিতে বাধ্য হই। চা'ল দা'লের দুর্ম্মূল্যতা অবর্ণনীয়। বাঙ্গালার এই প্রধান খাদ্যের যে পরিমাণে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, সেই অনুপাতে আয় বৃদ্ধি হইয়াছে কয়জনের? সুতরাং অর্দ্ধাশন বা অনশন যে অনিবার্য্য, তাহা সহজেই অনুমেয়। মৎস্য-মাংসের কথা আর না বলিলেও চলে। কুড়ি হইতে চল্লিশ টাকা দরের মৎস্য কিনিয়া কয়জন বাঙ্গালী স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী প্রয়োজনীয় মৎস্য আহার করিতে পারে? এখন বাঙ্গালার বাঙ্গালী জাতি নামে মাত্র মৎস্যাশী, সুতরাং বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য সমূহই একেতো ভেজালে ভরা, তায় আবার ভয়ানক দুর্ম্মূল্য, এ অবস্থায় শরীর রক্ষণোপযোগী পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করা অনেকের পক্ষেই বিশেষ আয়াস সাধ্য, এমন কি অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের কথা ছাড়িয়া দিলেও যাহারা ধনবান্ তাঁহারাও বিশুদ্ধ ও পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারেন না। কারণ লোকের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তন হেতু, অধিকাংশ খাদ্যই ভেজাল ভরা। তাই অনেক সময় মনে হয় বাঙ্গালী কি খাইয়া বাঁচিয়া থাকিবে?

২। **বিশুদ্ধ পানীয়।**—দুগ্ধ পানীয় হইলেও ইহাকে আমরা খাদ্যের মধ্যে গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বেই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি; সুতরাং এখন দুগ্ধের কথা রাখিয়া অন্যতম প্রধান পানীয় জলের কথাই বলি। জল ব্যতীত মানুষ বাঁচিতে পারে না, তাই জলের নাম "জীবন"। জানিনা কা'র পাপে বাঙ্গলার এই "জীবন" শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। নদনদী মজিয়া গিয়াছে, পুকুর দীঘি বুজিয়া গিয়াছে, খাল বিল হাজিয়া গিয়াছে; সরস বাঙ্গলা এখন নিরস হইয়া তৃষ্ণাশুষ্ক কণ্ঠে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছে। বিশুদ্ধ জল দূরে যাউক, অনেক স্থলে পঙ্কিল জলও দুষ্প্রাপ্য। কেন এরূপ হইল? কতকটা প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনেও বটে, আর কতকটা আমাদের প্রকৃতি পরিবর্ত্তনেও

বটে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ জলদানকে মহৎ পুণ্যজনক কার্য্য বিবেচনা করিয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা শ্রেণীর পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিতেন, তদ্দ্বারা গ্রামের জলকষ্ট নিবারণ হইত। এখন আমরা আর পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠাকে পুণ্যজনক মনে করিনা, তৃষিত জনগণকে জলদান করা কর্ত্তব্য বলিয়াও বোধ করি না, তাই এখন দেশ হইতে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা উঠিয়া গিয়াছে—তাই এখন পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা এখন শিক্ষালাভ করিতেছি, সভ্য হইয়াছি; তাই আমরা পূর্ব্বপুরুষের অর্জ্জিত অর্থ, বিলাস ব্যসনে ব্যয় করিতেছি, পূর্ব্বপুরুষের অর্জ্জিত জমিদারীর আয়ে নগরে বসিয়া কত অকার্য্যে কুকার্য্যে অর্থব্যয় করিতেছি; কিন্তু পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি লোপ করিতে সঙ্কুচিত হইতেছি না। পল্লীগ্রামে জল সংস্থানের উপায় এখন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কৃপার উপর নির্ভর করিতেছে। এস্থানেও বাবুদের খেয়ালের বাহাদুরী দেখিয়া হাস্য সংবরণ করা যায় না। অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, নদীর চড়ার জলের ধারেও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কৃপায় কূপ খনিত হইতেছে; আর যেখানে জল নাই, সেখানকার অধিবাসীগণ বার বার আবেদন করিয়াও বিফল মনোরথ হইতেছে। কিন্তু "ও কথায় কাজ নাই আর।"

যেখানে জল আছে, সেখানেও দেশের জনসাধারণ তাহাদের নিত্য ব্যবহার্য্য "জীবন" স্বরূপ জলটুকুকে বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করিবার আবশ্যকতা অনুভব করে না। বিষ্ঠামূত্রযুক্ত বস্ত্রাদি ধৌত করিয়া, ক্ষারে কাপড় কাচিয়া এবং পাকাদির পাত্র ধৌত করাইয়া পানীয় জল নষ্ট করা হইয়া থাকে। তাহারা জানেনা ইহাতে তাহারাই তাহাদের কি সর্ব্বনাশের পথ প্রস্তুত করিতেছে। পল্লীগ্রামের অধিবাসী এই সকল লোকেরা পূর্ব্বে ধর্ম্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিল, শাস্ত্রশাসনে শাসিত ছিল; তাহারা জানিত জল নারায়ণ; সুতরাং জল অপবিত্র হয়, এমন কোন কার্য্য তাহাদের দ্বারা হইত না। একেবারে হইত না এরূপ না হইলেও কাজটা খুব বিরল ছিল এবং যাহারা করিত, তাহারা বিজ্ঞদিগের দ্বারা উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইত। এখন ধর্ম্মবিশ্বাস অনেকেরই শিথিল হইয়াছে, কেহই আর শাস্ত্রশাসন মানিয়া চলে না। বিজ্ঞের উপদেশও আর বড় গ্রাহ্য হয় না, কেননা এখন কেহ কাহারও নিকট উপদেশ প্রার্থি নহে, সকলেই উপদেশদাতা। লোকের মতি প্রকৃতি এইরূপে পরিবর্ত্তিত হওয়াতেই দেশের অনেক পুরাতন প্রথাই "ওলটপালট" হইয়া গিয়াছে। ফলে দেশের জলাশয় সমূহ শুষ্ক হইয়া উঠিতেছে এবং দেশের লোকেও আর বিশুদ্ধ জল রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছে না। ফল যাহা হইবার তাহাই হইতেছে।

৩। **নির্ম্মল বায়ু।**—খুব ধূলিপূর্ণ ঘন বসতি বহুল সহরের কথা ছাড়িয়া দিলেও, বঙ্গের পল্লী অঞ্চলেও এখন সময় সময় বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব অনুভব হইয়া থাকে। ভগবানের স্নেহের দান এবং প্রচুর দান প্রাণীজগতের অত্যাবশ্যকীয় এই বিশুদ্ধ বায়ু পল্লীপ্রদেশে বর্ষাকালে দূষিত হইয়া থাকে এবং বোধ হয় সেইজন্যই পল্লীগ্রামসমূহে বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়া-বিষ বিস্তারিত হইয়া পড়ে। ঠিক যেন বর্ষাধারার সঙ্গেই সে বিষ আকাশ হইতে

নামিয়া আসে। পল্লীপ্রদেশের পূর্ব্বের প্রতিষ্ঠিত, অধুনা বিলুপ্তপ্রায় শুষ্ক পুষ্করিণী সকল বর্ষার জলে পূর্ণ হইলে এবং গৃহস্থের বাড়ীর সংলগ্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডোবাগুলিতে জল সঞ্চিত হইলে, উহাতে নানাবিধ উদ্ভিদও গোবর প্রভৃতি পচিয়া পল্লীগ্রামের বায়ুর বিশুদ্ধতা নষ্ট করিয়া থাকে। অভ্যাসবশতঃ পল্লীবাসী জন সাধারণ সে বিষয় অনুভবও করেনা, বরং জলকষ্টের পর গৃহের অনতিদূরে জলপ্রাপ্ত হইয়া কিছু সুবিধা বোধ করিয়া থাকে। এমন কি অনেক গৃহস্থের মেয়ে ছেলেরা ঐ সকল জলাশয়ের ঘাটে বাসন মাজা, কাপড় কাচা প্রভৃতি কার্য্যের জন্য অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিয় নিশ্বাসের সহিত ঐ পচাগন্ধযুক্ত বায়ু গ্রহণ করিয়া শরীরে পীড়ার বীজ সংগ্রহ করে এবং সমস্ত বর্ষাকালটা রোগভোগ করিয়া হয় মরে, নয় মৃতবৎ বাঁচিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বাপেক্ষা দেশের বায়ু দূষিত করিবার আর একটা উপায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে এবং পল্লীবাসী কৃষকগণ অর্থের লোভে ঐ উপায়টাকে সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছে। দেশে পাটের চাষবৃদ্ধি হওয়ায়, ঐ সকল পাটগাছ জলে পচানর জন্য বর্ষায় সময় দেশময় একটি বিকট দুর্গন্ধ ছড়াইয়া পড়ে। সে দুর্গন্ধটা কিরূপ উগ্র ও অশান্তিদায়ক তাহা ঐ সময়ে যাঁহারা রেলপথে গমনাগমন করিয়া থাকেন, তাঁহারা বিশেষরূপ অবগত আছেন, তাঁহাদের কাছে আর নূতন পরিচয় দিতে হইবে না। ক্রমে ঐরূপ অসহ্য গন্ধ সহ্য করিবার অভ্যাস হইলেও, তাহার অপকারিতার হস্ত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় না। ঠিক ঐ সময়েই আজকাল ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়ার রোগী রোগযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে। যখন পীড়িত ব্যক্তি জ্বরের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া শুষ্ক কণ্ঠে জল প্রার্থনা করে, তখন তাহারই আত্মীয়স্বজন, তাহার তৃষ্ণাশুষ্ক কণ্ঠে ঐ পাটপচা জলই প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত হয়। হায়! দেশের কি শোচনীয় পরিণাম!

৪। **পরিচ্ছদ।**—দেশের আভ্যন্তরে, পল্লীপ্রদেশে পূর্ব্বে পরিচ্ছদের পারিপাট্য ছিল না। মোটামুটি ধুতি-চাদরেই সম্ভ্রম রক্ষা হইত এবং তাহা এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের সম্পূর্ণ উপযোগীই ছিল। এখন কিন্তু আর সেদিন নাই। এখন সহর হইতে পরিচ্ছদ পারিপাট্যের বিকট ঘটা পল্লীপ্রদেশেও প্রবেশ করিয়াছে। যাহাদিগকে ১০।১২ বৎসর বয়স হইতেই রৌদ্রবৃষ্টি, শীতাতপ সহ্য করিয়া মাঠে মাঠে কষ্টসাধ্য কর্ম্ম করিতে হইবে, শিশুবয়স হইতে তাহাদিগের শরীর সেইরূপ ভাবেই গঠিত হওয়া উচিত। পূর্ব্বে তদ্রূপ ব্যবস্থাই ছিল। শিশুদিগকে সর্ষপ তৈল মাখাইয়া রৌদ্রে শয়ন করাইয়া দেওয়া হইত, শিশুও অকাতরে নিদ্রা যাইত। বর্ষাবাদলের দিনেও শিশুকে স্নান করাইবার নিষেধ ছিল না। ফলে সেই শিশুর শরীর দেশের শীতাতপ সহ্য করিবার উপযোগী হইয়াই গঠিত হইত। এখন কিন্তু ঠিক এরূপভাবে আর শিশুপালন হয় না। এখন সূতিকাঘর হইতেই শিশুর শরীরে নানাবিধ বস্ত্র দেওয়া হয়। রৌদ্রের মুখতো শিশুগণ দেখিতেই পায় না। অনাবশ্যকীয় জামা, জুতা, মোজা টুপিতে শরীর ঢাকিয়া চাষার ছেলে খাসা বাবু বনিয়া উঠে। তারপর সেই সযত্নগঠিত শরীর লইয়া সে যখন মাঠে বাহির হয়, তখন তাহার শরীরের

পরিণাম অবশ্যই শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। বাস্তবিকই পোষাক পরিচ্ছদের অনাবশ্যক ব্যবহারের ফলেই আমরা আমাদের শরীরটাকে নিতান্তই অকর্ম্মণ্য ও রোগপ্রবণ করিয়া তুলিতেছি।

পরিচ্ছদের কথায় আর একটা বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। এখন দেশের ইতর ভদ্র সকলেই বড়লোকের মেয়েদের ব্যবহার্য্য মিহি কাপড়ের অনুকরণে, তাহাদিগের মেয়েদের পরিধানের জন্য বিলাতী মিহি কাপড় ক্রয় করিয়া থাকেন। বোঝেন না যে, তাঁহারা যাঁহাদের অনুকরণ করিয়া বাবু হইতে যাইতেছেন—বড় হইতে যাইতেছেন, তাঁহাদের মেয়েরা বাড়ীর বাহির হ'ন না, তাঁহারা মিহি কাপড় পরিধান করিয়া বাড়ীর মধ্যে আবদ্ধ থাকেন। আর অনুকরণকারীদের মেয়েরা বাড়ীর বাহিরে আর কোথাও না হউক, স্নানের ঘাটেও যাইয়া থাকেন, তা' সে ঘাট যতদূরই হউক। স্নানান্তে সিক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া যখন মেয়েরা প্রত্যাগমন করিতে থাকেন, তখনকার সে দৃশ্য কি লজ্জাকর। তা' দেখিয়াও চৈতন্য নাই। এমনি বাবুত্বের মোহ!—এমনি সভ্যতার বিকট আকাঙ্ক্ষা! দেশের সকলেই আপন আপন মেয়েছেলেদিগকে মিহি কাপড় পরাইয়া তাহাদিগের লজ্জা-সরমের যে গৌরব ছিল, তাহা নষ্ট করিয়া দিতেছেন—নিজেরাই নিজেদের মেয়েছেলেদিগকে উলঙ্গ করিয়া জলের ঘাটে বাহির করিতেছেন! ধিক এ শিক্ষায়! ধিক এ সভ্যতায়! আমাদের দেশে ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বেও মোটাকাপড়ের প্রচলন ছিল। তখন চরকা-কাটা মোটাসূতার কাপড়ে লজ্জানিবারণ হইত বলিয়া জলের ঘাটে মেয়েদের এ দুর্দ্দশা দেখিতে হইত না। এখন সভ্যতার খাতিরে, বিলাসিতার মোহে মোটার পরিবর্ত্তে মিহিতে মজিয়া আমাদের এই নৈতিক দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইয়াছে। এ বিষয় এখনই সতর্ক হইয়া মেয়েছেলেদের জন্য লজ্জানিবারণের জন্য উপযুক্ত মোটাকাপড়ের ব্যবস্থা করা উচিত।

সর্ব্ববিষয়েই আমাদের এই যে পরিবর্ত্তন, ইহা আমাদের ধাতুর উপযোগী কিনা, তাহা আমরা চিন্তা করিনা বা চিন্তা করিবার অবসরও পাইনা। গ্রামের ধনী লোকদিগের অবকাশ মত কখন কখন নগর হইতে সখের ভ্রমণে পৈতৃক ভিটায় পদার্পণ করেন। তাঁহাদের আগমনে গ্রামে একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। দিবাভাগে মাঠে মাঠে বাগানে বাগানে বন্দুকের শব্দ, রাত্রে গ্রামোফোন—হারমোনিয়মের মধুর সুর, পল্লীবাসী যুবকবৃন্দের উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে। নাগরিক বিলাসিতার মোহে অনেকেই আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। তাই তাঁহাদিগের বেশবিন্যাসের পারিপাট্যে মুগ্ধ হইয়া, চাষার ছেলেও খাসা বাবু সাজিতে ব্যগ্র হয়। এই বাবুয়ানার বিকটত্ব এখন সংক্রামকরূপে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নিতান্ত পাড়াগাঁয়ের মুটে মজুরের ছেলেরাও পয়সা খরচ করিয়া ছোট বড় করিয়া চুল কাটে, বিড়ি-সিগারেট খায়। নগরের বিলাস-বন্যার প্রবল উচ্ছ্বাস পাড়াগাঁকেও ভাসাইতে ছুটিয়াছে। আমাদের বোধ হয় নব সভ্যতার বাহ্য চাকচিক্যই পাড়াগাঁয়ের স্বাস্থ্য-সম্পদ একেবারেই চূর্ণ করিতে প্রবলবেগে

অগ্রসর হইয়াছে। পূর্ব্বের অভাবের উপর, পল্লীবাসী আবার নূতন নূতন নানা অভাবের সৃষ্টি করিয়া ধ্বংসের পথ পরিষ্কার করিতেছে। চা, চুরুট, সিগারেট, বিড়িই এখন বাবুত্বের পরিচায়ক,—তা'র উপর নষ্টের নূতন উপসর্গ অনাবশ্যকীয় দ্রব্যের প্রসার আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। নানাবিধ মৃত জন্তুর চর্ব্বিপক্ক প্রস্তরচূর্ণ মিশ্রিত ময়দার প্রস্তুত লুচি, কচুরী, সিঙ্গেড়া প্রভৃতি এখন বাবুর জলখাবার! সহরের বর্জ্জিত বাসিপচা নানারূপ নিকৃষ্ট খাদ্যই এখন ফেরিওয়ালার কল্যাণে পল্লীবাসী নব্য সভ্যগণের রসনা তৃপ্তিকর ভোজ্য! ফল, অজীর্ণ অম্ল-অতিসার, তারপর অকালমৃত্যু!

সহরের অভাব দূর করিবার জন্য চেষ্টা আছে, যত্ন আছে, আয়োজন আছে; কিন্তু পল্লীগ্রামের অভাব দূর করিবার আশা কোথায়? পল্লীজননীর কৃতীপুত্রগণই নগরের কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম করিয়া নাগরিক নামের মোহে মুগ্ধ হইয়াছেন এবং জননী-জন্মভূমিকে জন্মের মত ভুলিয়াছেন! কিন্তু তাঁহারা এত করিয়াও রোগের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন কি? নগরেই রোগের নানামূর্ত্তি স্ফূর্ত্তি সহকারে বিরাজ করিতেছে,—বাঙ্গালীর ভাবী বংশধর খোকা-খুকীগুলি নগরেই অধিক মরিতেছে। নগরের ন্যায় পল্লীগ্রামগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য যদি যুগোপযোগী আয়োজন করা যায়, তাহা হইলে বঙ্গের পল্লীপ্রদেশ আবার তাহার পূর্ব্ব সুখ, পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইতে পারে। আমাদিগকেও আর বারমাস রোগ-যন্ত্রণায় অস্থির হইতে হয় না। এখন প্রশ্ন এই, কি উপায় অবলম্বন করিলে পল্লীগ্রামগুলিকে পূর্ব্বের ন্যায় স্বাস্থ্যপূর্ণ করা যাইতে পারে?

এ প্রশ্নের উত্তর এক কথায় এই দেওয়া যাইতে পারে যে, পল্লীগ্রামগুলির অভাব দূর করিতে পারিলেই পল্লী রক্ষার উপায় হইতে পারে। সে অভাব কি তাহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। এই অভাবসমূহ দূর করিতে হইলে, পল্লীবাসিজনগণকে তাহাদের পৈতৃক ধর্ম্মের বিধি-নিষেধের ভিতর দিয়া যুগোপযোগী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রেই করিতে হইবে। তাহারা শিক্ষিত না হইলে, নিজেদের অভাব নিজেরা না বুঝিলে, উদ্যোগ আয়োজন বৃথা, পরিশ্রম বৃথা এবং অর্থব্যয়ও বৃথা। কিন্তু এই শিক্ষার নামে বাবুত্বের ও বিলাসিতার প্রসার না বাড়ে, তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। শিক্ষাটা দেশের ধাতুর উপযোগী না হইলে, সে আবার একটী নূতন উপসর্গ আসিয়া আবির্ভূত হইবে। আচার ব্যবহারে, পোষাক পরিচ্ছদে, খাদ্য পানীয়, সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বপ্রকার সংযমী হওয়াই যাহাদিগের শিক্ষার সনাতন পন্থা, তাহাদিগকে শিক্ষার নামে স্বেচ্ছাচারী করিয়া তুলিলে সুফল ফলিবে না। পুষ্টিকর খাদ্যের নামে, তাহাদের চতুর্দ্দশ পুরুষের পাকস্থলী যে সকল খাদ্য গ্রহণ করে নাই—তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ অখাদ্য কুখাদ্য জ্ঞানে যে সকল খাদ্য বর্জ্জন করিয়াও পূর্ণ স্বাস্থ্য-সুখ উপভোগ করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল যেন প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিয়া সমাজে একটা নূতন উপসর্গ আনয়ন করা না হয়। এ শিক্ষার স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় না দিয়া, শাস্ত্র শাসনের অধীন থাকিয়া খাদ্য

পানীয় প্রভৃতি গ্রহণ বর্জ্জনের ব্যবস্থা এবং সেগুলিকে বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করিবার উপায়-শিক্ষা দেওয়াই উচিত।

পল্লীপ্রদেশে স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রচারের জন্য বক্তা নিযুক্ত করিতে পারিলে, সুফল পাওয়া যাইতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে নিম্ন শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি এবং নিম্ন শিক্ষার ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ও বাঞ্ছনীয়। এক্ষণে প্রাথমিক শিক্ষার যে বিধি ব্যবস্থা আছে, তাহাতে এক বর্ণ-যোজনা ভিন্ন আর কিছু যে শিক্ষা দেওয়া হয় না, তাহা একপ্রকার নিশ্চিত কথা। এই বর্ত্তমান ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া তাহা, অঙ্ক ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব একটু ভালরকম শিখাইতে পারিলে সুফলের আশা করা যাইতে পারে।

যাহা হউক উপসংহারে বক্তব্য এই যে, দেশের বিষয় যাঁহারা চিন্তা করেন, তাঁহাদের প্রথম কর্ত্তব্য এই যে, পল্লীগ্রামগুলি কিসে রক্ষা পাইতে পারে, তদ্বিষয়ক চিন্তাকেই প্রাধান স্থান প্রদান করা। মুমূর্ষু পল্লীজননী এখন তাঁহাদেরই মুখ চাহিয়া আছেন—যাঁহারা দেশের ও দশের প্রতিনিধি বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। এই সকল শক্তিশালী ব্যক্তি বঙ্গের পল্লী রক্ষায় মনোযোগী হউন, তবে তাঁহাদের কার্য্যের সফলতা—তবে তাঁহাদের কার্য্যের সার্থকতা। কর্ম্মক্ষেত্রে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, পল্লী রক্ষা না হইলে দেশ রক্ষা হইবে না।

শিশু-পালন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীমতী কুমুদিনী বসু—বি-এ, সরস্বতী]

শিশুর চরিত্র গঠন।

শিশুকে মানুষ করিতে হইলে শুধু তাহার শারীরিক উন্নতির প্রতি মনোযোগ রাখিলে চলিবে না, তাহার চরিত্রের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহার চরিত্র গঠনের দিকে প্রত্যেক মাতার মন দিতে হইবে। এক সময়ে একটি ইংরেজ রমণী তাঁহার তিন বৎসর বয়স্ক শিশু বালককে এক পাদ্রীর নিকট লইয়া গিয়া বলেন যে, এই শিশুকে কত বৎসর হইতে নীতি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিবেন। পাদ্রী বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলেন, "কি, এখনও আপনি ইহার চরিত্র গঠনের দিকে মন দেন নাই? শীঘ্র আরম্ভ করুন, বড় দেরী হইয়া গিয়াছে। ইহার জন্মের দশ মাস পূর্ব্ব হইতেই যে ইহার নীতি শিক্ষার সূত্রপাত হইয়াছে।" রমণী অপ্রতিভ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। শিশু

মাতার জঠরে থাকিতে থাকিতেই তাহার মানসিক শিক্ষার আরম্ভ হয়। মাতা সর্ব্বদা যেমন চিন্তা করিবেন, যেমন মনের ভাব হইবে শিশুর সেইরূপ হইবে। মাতা ধর্ম্মপরায়ণা, সৎকর্ম্মে অনুরাগিণী, তেজস্বিনী, স্বদেশ প্রেমিকা ও সুশিক্ষিতা হইলে সন্তানের প্রাণেও সেই মহৎ ভাবসমূহ মুদ্রিত হইবেই। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই সৎ ও মহৎ ভাবসমূহ অনুশীলন দ্বারা তাহার চরিত্রে ফুটাইয়া তোলা প্রত্যেক মাতার কর্ত্তব্য। মাতা সর্ব্ববিষয়ে গুণবতী হইলে সন্তানের প্রাণে সদগুণের অঙ্কুর থাকিবেই। তাহা অঙ্কুরিত করিয়া তুলিতে প্রত্যেক মাতা বিধাতার নিকট দায়ী। নতুবা তিনি মাতা হইবার অযোগ্য।

সন্তানকে সাধু দেখিতে ইচ্ছা করিলে সর্ব্বপ্রথমে মাতা তাহাকে বাধ্যতা ও সত্যনিষ্ঠা শিক্ষা দিবেন। সন্তান বাধ্য ও সত্যবাদী হইলে অন্য সব গুণ শিক্ষা দিতে কোনই কষ্ট হইবে না। দোলায় থাকিতেই শিশুকে বাধ্যতা শিক্ষা দিবে। বড় হইলে বাধ্য ও সত্যবাদী হইবে, ছেলেবেলায় যেমন দোষ থাকে থাক্, এরূপ মনে করা মারাত্মক ধারণা! কথায় বলে, "কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাক্‌লে করে টাঁস টাঁস।" শৈশবে সমস্ত সদ্‌গুণের ভাব অন্তরে বদ্ধমূল না করিয়া দিলে, বড় হইলে আর তাহা মুদ্রিত হইবে না। সুতরাং সন্তানকে বাধ্যতা শিক্ষা দিতে হইলে শৈশবেই তাহা করিবে। যে শিশু পিতামাতার ইচ্ছানুসারে না চলিয়া আপনার ইচ্ছানুসারেই চলে অথবা চলিতে দেওয়া হয়, সে ভবিষ্যতে কখনই আপনাকে শাসনে রাখিতে পারিবে না। অনেক পিতামাতা স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া সন্তান যে আবদার করে তাহা যতই অসঙ্গত হউক না কেন, পূর্ণ করেন। ইহাতে তাঁহারা সন্তানের কি ঘোর অনিষ্টসাধন করেন তাহা ভবিষ্যতে তাহার ফল ভোগ করিলে তবে বুঝিতে পারেন। পিতামাতার ন্যায় সন্তানের হিতৈষী আর কেহ নাই। কিন্তু এতদ্বারা তাঁহারা সন্তানের শত্রুর ন্যায় কার্য্য করেন। ভালবাসা দ্বারা সন্তানকে বাধ্য করিবে,—ভয় দেখাইয়া নয়। কারণ একবার ভয় ভাঙ্গিয়া গেলে আর সন্তান বাধ্য থাকিবে না। সন্তানের অসঙ্গত আবদারে কখনও কর্ণপাত করিবে না, কিন্তু তাহাকে কখনও কোন অসঙ্গত আদেশও পালন করিতে বলিবে না। একবার একটা আদেশ দিলে দেখিবে যেন সে আদেশ পালিত হয়। মাতা একটা আদেশ দিলেন অথচ তাহা শিশু পালন করিল কিনা তাহা দেখিলেন না—ইহাতে অত্যন্ত কুশিক্ষা হয়। শিশুর মনে মাতার আদেশের প্রতি কোন শ্রদ্ধাই থাকে না, সে জানিতে শেখে যে "মা অমন কত কথাই বলেন কিন্তু তা' শুনি বা না শুনি তা'তে বড় আসে যায় না। শিশু মাতার ইচ্ছা মানিয়া চলিবে বলিয়া এমন যেন না হয় যে তাহার সঙ্গত প্রার্থনাও পূর্ণ হইবে না। শিশুর সঙ্গত ও ন্যায্য প্রার্থনা সর্ব্বদা পূর্ণ করিবে। তাহার সমস্ত ইচ্ছাই দমন করিতে গেলে তাহার স্বভাব ভীরু হইয়া যাইবে, মনের স্বাধীনতার ভাব লোপ পাইবে, আপনার প্রতি বিশ্বাস হারাইবে। এরূপ হইলে তাহার মনুষ্যত্বের বিকাশ হইবে না, মনের স্ফূর্ত্তি থাকিবে না,

নিজে কিছু করিবার শক্তি হারাইবে। শিশুকে ইহাই জানিতে দিবে যে, তাহার সঙ্গত ও ন্যায্য প্রার্থনা সর্ব্বদাই পূর্ণ হইবে কিন্তু তাহার অসঙ্গত ও অন্যায় আবদার কখনই পূর্ণ হইবে না। সে জানুক যে সে যদি কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিয়াও যায় তথাপি তাহার অসঙ্গত আবদার পিতামাতা শুনিবেন না। তাহা হইলে একদিকে বাধ্যতা অপরদিকে স্বাধীনতা শিক্ষা হইবে।" শিশু দোলায় থাকিতেই এই শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিবে। শিশু আজ ঘুমাইবার সময় নিজের শয্যায় শুইবে না বলিয়া কাঁদিতে থাকিলে তুমি যদি তাহাকে কোলে লও, কল্য ও শিশু ঐ সময় কাঁদিবে এবং আশা করিবে তুমি তাহাকে কোলে লইবে। এইরূপে বড় হইলেও সে যখন যে জিনিস চাহিবে তাহা দিতে না পারিলে কাঁদিয়া অশান্তির সৃষ্টি করিবে এবং যখন আর কাঁদিবার বয়স থাকিবে না তখন নিজের ইচ্ছামত সব না হইলে সর্ব্বদাই বিরক্ত হইয়া থাকিবে, অন্যের সম্বন্ধে অভিযোগ করিবে কিংবা বকাবকি করিয়া সংসারে অশান্তি আনিবে। সুতরাং বাধ্যতা যেন শিশু গৃহের প্রথম নিয়ম হয়। শৈশবকাল হইতে যে শিশু পিতামাতার বাধ্য হইয়া বাড়িয়া উঠে, ভবিষ্যতে সে তাঁহাদের গৌরবস্বরূপ হইবেই। মনে রাখিও, যে শিশু গুরুজনের আদেশ সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে পালন করিতে শিক্ষা করিবে, বড় হইলে সেই মানুষই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে অপরকে আদেশ দিতে পারিবে। একটি বাধ্য শিশুর জননায়ক হইবার যেমন সম্ভাবনা তেমন যে শিশু সর্ব্বদা আদেশ পালনে অস্বীকার করে তাহার তাহা নাই।

শিশুকে সর্ব্বদা সত্য কথা বলিতে, সত্য আচরণ করিতে শিক্ষা দিবে। শুধু মুখে বলিলে হইবে না মাতাকে বাক্যে, আচরণে, ব্যবহারে ভাবে সত্য হইতে হইবে। শত শত বাক্য ও উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক শিক্ষাপ্রদ। মাতা সন্তানকে যেরূপভাবে গড়িয়া তুলিতে ইচ্ছা করিবেন অগ্রে নিজে সেইরূপ হইয়া তাহাকে দৃষ্টান্ত দেখাইবেন, শিশুর নিকট তাহার মাতাই তাহার আদর্শ। শিশু মাতাকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুকরণ করে। মাতা নিজে সত্য কথা বলিবেন, বাড়ীর সমুদয় পরিজনবর্গ দাসদাসী প্রত্যেককেই অন্ততঃ শিশুর সম্মুখে সত্য কথা বলিতে অনুরোধ করিবেন। মাতা শিশুর প্রাণে মিথ্যার প্রতি তীব্র ঘৃণা জন্মাইয়া দিবেন। যে কেহ মিথ্যা বলিবে শিশু তাহাকে ঘৃণা করিবে, সুতরাং শিশুর ঘৃণা পাইবার ভয়ে তাহার নিকট মিথ্যা বলিবে না। ধর্ম্মপ্রাণ রামতনু লাহিড়ীর একটি শিশুকে তাহার ক্রন্দন থামাইবার জন্য গভীর রাত্রিতে দাসী এই বলিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতেছিল যে, "চুপ কর, রসগোল্লা দিব।" শিশু তাহা শুনিয়া চুপ করিল। লাহিড়ী মহাশয় দাসীর কথা শুনিয়া তখনি উঠিয়া আসিয়া বলিলেন, "তুমি যখন বলেছ যে, একে রসগোল্লা দেবে, তখন এখনি যাও, রসগোল্লা এনে দাও।" এই বলিয়া দাসীকে সেই রাত্রিতে দোকানে পাঠাইয়া রসগোল্লা আনিয়া শিশুর হাতে দিয়া তবে শান্ত হইলেন। এই একটি কার্য্য দ্বারা তিনি দাসীকে যেমন শিক্ষা দিলেন শিশুর নিকট সত্যরক্ষাও তেমনি করিলেন। এই মহাত্মার এই সত্যপরায়ণতার এই

একটি দৃষ্টান্ত সমগ্র মাতৃ সমাজের সম্মুখে শিশুপালনের একটি আদর্শ হইয়া রহিয়াছে শুধু নিজে ভাল হইলে হইবে না, বাটীর সকল পরিজনের, পাড়াপ্রতিবাসী সকলেরই সৎ-স্বভাবের হওয়া আবশ্যক নতুবা সন্তানকে সাধু করিয়া গড়িয়া তোলা দুরূহ ব্যাপার। পিতা মাতা নিজে সত্যবাদী হইবেন, সত্যরক্ষা করিবেন, সত্য আচরণ করিবেন এবং যে সংসর্গে শিশুকে রাখিবেন, তাহাও সৎ হইবে তবে সন্তানের জন্য কোন ভয় নাই। অনেক সময় শিশু কৌতূহল বশতঃ এমন অনেক বিষয়ের কারণ জানিতে চায় যাহার প্রকৃত কারণ মাতা জানেন না। এরূপ স্থলে প্রায়ই মাতা একটা কল্পিত কারণ তৈয়ার করিয়া শিশুর কৌতূহল নিবারণ করেন কিংবা ধমক দিয়া শিশুকে তাঁহাকে বিরক্ত করিতে নিষেধ করেন। ইহাতে অত্যন্ত অনিষ্ট হয়। প্রথম কার্য্য শিশুর নিকট মিথ্যা বলা এবং দ্বিতীয় কার্য্য দ্বারা শিশুর স্বাভাবিক জানিবার আকাঙ্ক্ষা ক্রমে লুপ্ত হইয়া যায়। সুতরাং মাতা শিশুর জিজ্ঞাস্য বিষয়টির কারণ জানিয়া লইতে চেষ্টা করিবেন এবং প্রকৃত কারণটি তাহাকে বলিবেন। শিশু জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেন যে "আমি এখন জানিনা, পরে জানিয়া তোমাকে বলিব"।

শিশুর প্রতি শ্রদ্ধা রাখা পিতামাতার কর্ত্তব্য। শিশুর সদাকাঙ্ক্ষা, সাধুভাব উৎসাহ দিয়া আরো ফুটাইয়া তুলিবে। শিশু ধর্ম্মের কোন কথা বলিলে বা জানিতে চাহিলে তাহা জেঠামি বলিয়া উপহাস করিবে না। ধর্ম্মভাবের বীজ শৈশব হইতেই বপন করিবে তবে তাহা এমন দৃঢ় হইয়া বসিবে যে কখনো তাহা নষ্ট হইবে না। আমেরিকার বিখ্যাত রাজনৈতিক জন র‍্যাণ্ডলফ্ বলিয়াছেন, "শৈশবে আমার মা যে প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে আমার ছোট হাত দুটি জোড় করিয়া তাঁহার হাতের মধ্যে লইয়া, ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিতে শিখাইয়াছিলেন তাহারই স্মৃতি, যৌবন ও বার্দ্ধক্যের শত প্রলোভন, সংগ্রাম, বিপদ, কষ্টের মধ্যেও আমাকে স্থির রাখিয়াছে; নতুবা আমি নাস্তিক হইয়া যাইতাম।" জগতের কত শত বিখ্যাত লোকের মহৎ জীবনী তাঁহাদের মাতার এই ধর্ম্ম শিক্ষার প্রভাবের সাক্ষ্য দিতেছে। শৈশবে মানুষের মন সাদা থাকে, তখন যে ভাবের রেখা অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হইবে তাহাই দৃঢ় হইয়া বসিবে, তাহা কখনো মুছিয়া যাইবার নহে। শিশুর কোমল প্রাণে সর্ব্বদা এই ভাব দৃঢ় করিয়া দিবে যে, আঁধারে আলোকে—সজনে নির্জ্জনে—যখন যেখানে থাকিবে, যাহা করিবে মানুষ না দেখিলেও ভগবান তাহা তোমার সঙ্গে থাকিয়া দেখিতেছেন। ইহার দৃষ্টান্তে শিশুর শক্তির উপর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা রাখিবে। বালকবালিকার কবিতা লিখিবার, বক্তৃতা দিবার, অঙ্কন করিবার শক্তি দেখিলে তাহা উৎসাহ দিয়া বাড়াইয়া তুলিবে; কখনো অবহেলা করিবে না। ৬।৭ বৎসরের হইলে বালকবালিকাকে কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজ দিয়া তাহার কার্য্যক্ষমতা ও দায়িত্ববোধ জন্মাইয়া দিবে। যেমন একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। বালকবালিকাকে একটি বাক্স তাহাদের মনোমত দ্রব্যাদিতে পূর্ণ করিয়া তাহার চাবি তাহাদের হস্তে দিয়া মাতা বলিবেন, এই বাক্স সাজাইয়া গুছাইয়া

রাখা জিনিস পত্র সাবধানে রাখা তোমাদের হাতে। আমি মাঝে মাঝে দেখিব—তোমরা কে কেমন সুন্দর করিয়া তোমাদের এই কাজ কর"। মাতার এই বাক্যে তাহারা আনন্দের সহিত এটু কাজ করিবে। ইহাতে তাহাদের দায়ীত্ববোধ, জিনিস পত্রের যত্ন লওয়া ও একটা কর্ত্তব্য জ্ঞান জন্মিবে এবং এই জ্ঞানগুলি আনন্দ ও খেলাধুলার মধ্য দিয়াই হইবে। মধ্যে মধ্যে কোন দিন কিছু পয়সা হাতে দিয়া তাহাদের বলিতে পার যে দেখি তোমরা এই পয়সা কটি কেমন করিয়া খরচ কর এবং যে খরচ করিবে তাহার একটা হিসাব রাখিবে, যদি সদ্ব্যবহার কর তবে এই পুরস্কার পাইবে। তারপর নির্দ্দিষ্টদিনে তাহাদের হিসাব দেখিয়া বুঝিতে পারিবে যে কে কি ভাবে খরচ করিয়াছে, কে কোন কাজে খরচ করিয়া পয়সার সদ্ব্যবহার করিয়াছে বলিয়া মনে করে। যদি কেহ বৃথা কাজে পয়সা নষ্ট করিয়া থাকে, তবে তাহার কাজটি বৃথা কেন, এরূপ কাজে পয়সা ব্যয় করা উচিত হয় নাই ইত্যাদি বলিয়া উপদেশ দিবে। কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন ছোট ছিলেন তখন তাঁহার পিতা যাহা করিতেন তাহার দৃষ্টান্ত তাঁহার জীবনের মধ্যে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। শিশুর প্রাণে সর্ব্বদা এই ভাব জাগ্রত করিয়া রাখিবে যে তাহার ভিতর অনেক শক্তি আছে, চেষ্টা করিলে সে জগতের মহৎ লোকদিগের মধ্যে আসন পাইতে পারিবে। আমেরিকার প্রত্যেক শিশু মনে করে যে কালে সে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের পদ লাভ করিবে। এইরূপে শিশুর প্রাণে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিয়া দিবে। সর্ব্বদা জগতের সাধু-সাধ্বী, জ্ঞানীগুনি, স্বদেশ প্রেমিক মহাপুরুষদের আত্মত্যাগের, বীরত্বের, পাণ্ডিত্যের, অধ্যবসায়ের, পরিশ্রমশীলতার, দয়ার গল্প বলিবে এবং তাঁহাদের জীবনী পড়িতে দিবে। শৈশব হইতে তাহাদিগকে মহৎ ভাবে অনুপ্রাণিত করিবে। তাহা হইলে তাহাদের মহৎ হইবার আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে। আত্মার সুপ্ত শক্তি ক্রমে ক্রমে জাগ্রত হইয়া উঠিবে। বাঙ্গালী জাতি আবারা মানুষ হইয়া জগতের মাঝখানে দাঁড়াইবে। বাংলার প্রত্যেক ঘরের প্রত্যেক বালক বালিকা বাংলার জাতীয় সম্পদ। এই সম্পদকে প্রাণপণ যত্নে রক্ষা করা, শ্রীবৃদ্ধি সাধন করার ভার বাংলার প্রত্যেক নবীনা মাতার হস্তে ন্যস্ত। তিনি ইচ্ছা করিলে বঙ্গ জননীর মুখ উজ্জ্বল করিতে পারেন অথবা মলিন করিতেও পারেন।

(ক্রমশঃ)

কুলের কথা।

[কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন]

"কুল" সকলেই খাইয়া থাকেন, কিন্তু 'কুলে'র যে সকল রোগনাশিনী শক্তি আছে তাহা সাধারণ পাঠক অবগত নহেন, এজন্য আমরা অদ্য 'কুলে'র কথা বলিব। কুলের সংস্কৃত নাম বদর, কুল ও বরই। হিন্দী নাম—বের।

হিক্কা রোগে কুলের বীজ।—কুলবীজ ভাঙ্গিয়া তন্মধ্যস্থ যে শাঁস পাওয়া যায়, ঐ শাঁস স্তন দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করাইলে হিক্কা রোগের উপশম হইয়া থাকে। যাবৎ হিক্কা থাকিবে তাবৎ কাল মধ্যে মধ্যে সেবন করাইবে।

কাস রোগে—কুল বীজের শাঁস দধির মাতের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করাইলে কাস রোগ উপশমিত হয়।

স্বরভেদ ও কাসে—কচি কুলের পাতা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ সহ গব্যঘৃতে ভাজিয়া সেবন করিলে স্বরভঙ্গ ও কাস প্রশমিত হয়।

অতিসারে—কুল গাছের মূলের ছাল চূর্ণ দুই আনা একটু মধুর সহিত সেবন করিলে অতিসার নিবৃত্তি হয়।

প্লীহোদরে কুলের পাতা।—প্লীহা অতি বৃদ্ধিবশতঃ উদরী রোগে পরিণত হয়, ইহাতে জলোদরী রোগীর ন্যায় পেটের আকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কুলের পাতা তিল তৈলের সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিয়া প্লীহার স্থানে মর্দ্দন করিবে, তৎপর হস্তদ্বারা ধীরে ধীরে প্লীহার স্থান টিপিতে থাকিবে, এইরূপ প্রত্যহ করিবে। রোগী কেবল দুগ্ধ সেবন করিবে। অন্নাদি ভোজন নিষেধ। এই নিয়মাধীনে থাকিলে প্লীহা ক্রমশঃ ছোট হইয়া উদর স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হইবে।

রক্তাতিসারে—চারি আনা পরিমিত কুল গাছের মূলের ছাল ছাগী দুগ্ধে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া মধু সহ সেবন করিলে প্রবল রক্তাতিসার নিবৃত্তি হয়।

প্রদরে—বীজ রহিত কুল চূর্ণ চারি আনা, ইক্ষুগুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ সেবন করিলে রক্তপ্রদর উপশমিত হইয়া থাকে।

স্থূলকায়ে কুলের পাতা—অতি স্থূল ব্যক্তি প্রত্যহ অর্দ্ধ তোলা পরিমাণ কুলের পত্র কাঁজিতে পেষণ করিয়া সেবন করিলে দেহ কৃশ হইবে।

আমাশয়ে কুলের পাতা—চারি আনা পরিমাণ কুলের পাতা দধির সহিত পেষণ করিয়া, পুনরায় দধির সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে রক্ত আমাশয় ও সাদা আমাশয় নিবৃত্তি হয়।

ফোড়া পাকায়—কুলের পত্র যজ্ঞ ডুমুরের পত্রের দ্বারা পুলটীশ দিলে অপক্ক ফোড়া শীঘ্র পাকিয়া উঠে।

বসন্ত রোগে কুল—বীজহীন কুলচূর্ণ

ইক্ষুগুড় সহ সেবন করিলে বাত-পিত্ত-কফজ বসন্ত শীঘ্র পাকিয়া উঠে।

মন্দাগ্নিতে কুলের বীজ—যাহাদিগের ক্ষুধা মান্দ্য হইয়াছে, এরূপ অবস্থায় কুলের বীজের শাঁস জলের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে অগ্নি বৃদ্ধি হয়।

রক্তপিত্তে কুলের পত্র—মুখ দ্বারা রক্ত নির্গত হইলে কচি কুলের পত্র চারি আনা, মধুর সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে রক্ত বমন নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

পল্লী-প্রসঙ্গ।

মসূরিকা বা বসন্ত বোধ হয় বাঙ্গালার চিরস্থায়ী হইল। কলিকাতায় ইহার প্রকোপ কমিয়া গিয়াছে বটে কিন্তু মফঃস্বলের স্থানে স্থানে এখনও ইহার আক্রমণের কথা শুনা যাইতেছে। মেদিনীপুর-কাঁথির সহযোগী "নীহার" জানাইতেছেন,—

হাম ও বসন্ত এখনও স্থানে স্থানে লাগিয়া রহিয়াছে। জ্বরেও লোক আক্রান্ত হইতেছে।

সহযোগী "মেদিনীপুর হিতৈষী" ও ইহার সমর্থন করিয়া বলিতেছেন,—

মেদিনীপুর জেলার সর্ব্বত্রই এখনও ভীষণ জ্বর, বসন্ত, কলেরা ও আমাশয়াদির প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। এই দারুণ গ্রীষ্মে নিউমোনিয়াতেও বহু লোক মরিতেছে।

ইনফ্লুয়েঞ্জার সংবাদও অনেক স্থান হইতে পাওয়া যাইতেছে। খুলনার সহযোগী "খুলনাবাসী"তে প্রকাশ,—

ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রভাব।—ডুমুরিয়া থানা ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রভাব বিশেষভাবে বাড়িয়াছে। ডুমুরিয়া দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার বাবু যতীন্দ্রনারায়ণ গুহ রায় গত সপ্তাহে ঐ রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার বাসার আরও কয়েকজন ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল।

ম্যালেরিয়ার আক্রমণ তো বাঙ্গালীর পক্ষে চির-সহনশীল। বাঙ্গালায় ইহার আক্রমণ বার মাসই অল্প বিস্তর আছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বর্ষার অন্তে ইহার বিশেষভাবে প্রকোপ হইয়া থাকে। এবার বাঙ্গালায় বর্ষার পূর্ব্বেই ইহার আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। "ঢাকা-প্রকাশ" সংবাদ দিতেছেন,—

এবারকার জ্বরের প্রবল আক্রমণে চাঁদপ্রতাপের অধিকাংশ অধিবাসী দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। যতই দিন যাইতেছে, ততই জ্বর-রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। কোন কোন বাড়ীর প্রায় সকলেই শয্যাশায়ী; যাহার উত্থানশক্তি রহিত হয় নাই, তাহাকেই অন্য রোগীদের পথ্যাদি কোনমতে দিতে হইতেছে। ঐ সকল বাড়ী দেখিলে ক্ষুদ্র হাসপাতাল বলিয়া মনে হয়। দরিদ্র গৃহস্থদের অনেকে অর্থের অভাবে ঔষধ ও পথ্যের যোগাড় করিতে পারিতেছে না। এই জ্বরের লক্ষণও অতি অদ্ভুত; অধিকাংশ জ্বরের পূর্ব্বভাব কিছুই বুঝিতে পারে না। প্রথম দিন সামান্য জ্বর হয়, এবং অল্পকাল মধ্যেই কমিয়া যায়; তৎপর দিবস শরীর ভালই বোধ হইয়া থাকে।

কিন্তু তার পর দিনই রোগী জ্বরের প্রবল আক্রমণে অস্থির হইয়া পড়ে। এই জ্বরে পিত্ত খুব বৃদ্ধি পায়, এবং তজ্জন্য শরীরে বিশেষতঃ মাথায় অতিমাত্রায় প্রদাহ হইয়া থাকে। চিকিৎসাদির ত্রুটিতে অনেকেরই জ্বরের গতি মন্দের দিকে যাইতেছে। দুঃখের বিষয়, এ অঞ্চলে অনেক কাল হইতেই উপযুক্ত চিকিৎসকের অভাব।

বাঙ্গালাদেশ যেরূপ রোগ-প্রবণ, বাঙ্গালা-দেশে সে পরিমাণ চিকিৎসকের কিন্তু একান্তই অভাব। সরকারি হিসাবেই প্রকাশ, ভারতবর্ষের লোক সংখ্যার তুলনায় এখনও চল্লিশ হাজার চিকিৎসকের প্রয়োজন। আধিব্যাধির লীলানিকেতন বাঙ্গালাদেশকে রক্ষা করিতে হইলে বাঙ্গালী ছাত্র যাহাতে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার পথ প্রশস্ত করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ময়মনসিংহের "চারুমিহির" বলিতেছেন,—

এই নগরে একটী মেডিক্যাল স্কুল স্থাপন করার প্রস্তাব হইয়াছে। ঐ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করার জন্য গত পূর্ব্ব শুক্রবার দিবস স্থানীয় টাউনহলে জনসাধারণের যে সভা হইয়াছিল সেই সভায় ময়মনসিংহ ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের সুযোগ্য ভাইস চেয়ারম্যান বাবু শশধর ঘোষ সেটেলমেন্টের উদ্বৃত্ত টাকা এই জেলায় মেডিক্যাল স্কুল স্থাপনোদ্দেশ্যে ব্যয় করিবার কথা উত্থাপন করেন এবং তজ্জন্য গবর্ণমেন্টের নিকট আবেদন করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মেডিক্যাল স্কুল স্থাপন বিষয়ে এই স্থানে যে কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে ঐ সমিতির প্রতি শশধর বাবুর প্রস্তাব সম্বন্ধে উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিবার ভারার্পণ করা হইয়াছে। আমরা আশা করি, গবর্ণমেন্ট জনসাধারণ হইতে গৃহীত এই টাকা দ্বারা মেডিক্যাল স্কুল স্থাপনে সহায়তা করিবেন।

কলিকাতায় মেডিকেল কলেজে আসাম হইতে প্রতিবৎসর মাত্র ৬জন করিয়া ছাত্র গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। শিলচরের "সুরমা" এই উপলক্ষে বলিতেছেন,—

কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রতিবৎসর আসাম হইতে ৬ জন ছাত্র লওয়া হয়। এই ছয় জনের তিন জন ব্রহ্মপুত্র ভেলির এবং বাকী তিন জন আসাম ভেলির। আসামের লোকসংখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বলিতে হয়—আসাম বিশেষতঃ শ্রীহট্ট কাছাড় হইতে আরো অধিক সংখ্যক ছাত্র লইবার ব্যবস্থা করা উচিত। এ বিষয়ে আমরা কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিতেছি।

জল কষ্টই যে বাঙ্গালার রোগপ্রবণতার কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। বাঙ্গালার ম্যালেরিয়া বাঙ্গালীর জল কষ্টেরই ফলসম্ভূত। বাঙ্গালার কলেরা বাঙ্গালীর জলকষ্টের সর্ব্ববাদী সম্মত ভীষণ ফল। কিন্তু এ জলকষ্ট দূর করিবার জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টা কি করিতেছি? জেলাবোর্ড এবং লোকালবোর্ড প্রভৃতি হইতে প্রতিবৎসর এই জলকষ্ট নিবারণ কল্পে কিছু কিছু অর্থব্যয় করা হয় বটে কিন্তু তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। নদীয়া জেলার দৌলতপুর অঞ্চলের জলকষ্টের পরিচয় প্রসঙ্গে কৃষ্ণনগরের "বঙ্গরত্ন" বলিতেছেন,—

নদীয়া জেলার থানা দৌলতপুরের অন্তর্গত পাকুড়িয়া ও মহিষকুণ্ডী গ্রামের নিকটবর্ত্তী ৭।৮ মাইল মধ্যে কোন নদী বা পানীয় জলের উপযুক্ত ইন্দারা বা পুষ্করিণী না থাকায় পল্লীবাসীর ভীষণ জলকষ্ট হইয়াছে। একেই অন্নাভাব, তাহার উপর জলকষ্ট। গরীব কৃষকগণ গ্রীষ্মকালে উপায় বিহীন হইয়া বাধ্য হইয়া অপরিষ্কার জল পান করিয়া নানাবিধ সংক্রামক পীড়ায় আক্রান্ত হইতেছে। আশা করি নদীয়া জেলাবোর্ডের ও কুষ্টিয়া লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান ও মেম্বার মহোদয়গণ তদন্ত করিয়া গরীব পল্লীবাসীদের জলকষ্ট নিবারণ করতঃ তাহাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন।

এই জলকষ্ট উপলক্ষ করিয়া যশোহরের মুখপত্র "যশোহর" কি বলিতেছেন তাহাও শুনুন,—

বাঙ্গালার সর্ব্বত্র নিত্য নৈমিত্তিক জিনিসের মূল্য হু হু করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে,। মাগুরায় চাউলের মণ ১১৲ টাকা। কাপড় কাগজের কথা ত না বলিলেও চলে। তদুপরি ভীষণ জলকষ্ট। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমের সুজলা বঙ্গভূমি যেন পৃথিবী হইতে অদৃশ্য হইয়াছে। মাঘ মাসের প্রথম হইতেই বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে পিপাসিতের আর্ত্তনাদ শ্রুত হয়, যশোহর আবার সকলকে পরাস্ত করিয়াছে। পিতৃ-পিতামহের প্রতিষ্ঠিত পুষ্করিণী ও দীঘিগুলির কতকগুলি শুকাইয়া গিয়াছে এবং অবশিষ্টগুলি শৈবালদামে আচ্ছন্ন হইয়াছে। বৎসরের মধ্যে ছয়মাই গ্রামবাসীগণকে কর্দ্দমাক্ত জল পান করিয়া কোনমতে তৃষ্ণা নিবারণ করিতে হয়, ফলে পৌষ মাঘ মাসের প্রারম্ভেই গ্রামে গ্রামে কালাজ্বরের তাণ্ডবনৃত্য, আর সহস্র সহস্র লোকের মৃত্যু। এই জলকষ্টের বিষময় ফল জননী ভগিনীগণকেই বেশী ভোগ করিতে হয়। আমরা দেখিয়াছি, অনেক গ্রামের কুললক্ষ্মীদিগকে পিতামাতা, ভ্রাতা, ভগিনী ও আত্মীয় স্বজনের পিপাসায় একবিন্দু বারি প্রদানের জন্য এক মাইল দেড় মাইল পথ হাঁটিয়া কাদাজল সংগ্রহ করিতে হয়।—অচিরে এই জলকষ্ট দূর করিবার জন্য আমাদের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নহে কি?

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে খুলনার উড্‌বর্ণ হাসপাতালটি নাকি অর্থাভাবে অচল হইবার মত হইয়া পড়িয়াছে। খুলনার সহযোগী "খুলনাবাসী"ই এ সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন,—

স্থানীয় উডবর্ণ হাসপাতালটী অর্থাভাবে অচল হইবার মত হইয়াছে। রীতিমত চাঁদা আদায় হয় না, অথচ দৈনন্দিন ব্যয় বাড়িতেছে, কাজেই অনাটনও ক্রমশঃ বাড়িতেছে। আমরা শুনিলাম, স্থানীয় মিশনরী মিঃ মিলনে সাহেবের পত্নী হাসপাতালের চাঁদ আদায় করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। মিসেস্ মিলনে কৃতকার্য্য হইলে খুলনাবাসীর কৃতজ্ঞতার পাত্রী হইবেন।

খুলনার গণ্যমান্য অধিবাসীদিগেরও এজন্য চেষ্টাশীল হওয়া কর্ত্তব্য। আমরা খুলনার স্বদেশ-সেবকদিগকে সর্ব্বকর্ম্ম ফেলিয়া সর্ব্বাগে এ বিষয়ের চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

স্বাস্থ্য বিজ্ঞান।

মূত্র শৌচ।

[ডাঃ শ্রীনলিনীনাথ মজুমদার।]

(১৩২৬ পৌষ সংখ্যার ১৬৮ পৃষ্ঠার পর।)

রক্তের যে সকল বিষাক্ত অংশ মূত্র রূপে দেহ হইতে নির্গত হয় তাহার তীব্র বিষ ক্রিয়া এতই অধিক যে, দশ দিনকাল কোন একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে মূত্র পরিত্যাক্ত হইলে তৎ স্থানের স্বভাব জাত তৃণ গুল্মাদির জনন শক্তি বা বীজ নষ্ট হইয়া যায় এবং পূর্ব্বজাত দূর্ব্বা প্রভৃতি তৃণগুলি যে সত্ত সত্তই দগ্ধ হয় তাহা কে না প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? সুতরাং মূত্র পদার্থ যে

তীব্র বিষাক্ত তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। সেই বিষাক্ত পদার্থ দেহের কোন অংশে অথবা বস্ত্রাদিতে লাগিলে সেই সকল স্থানও যে বিষাক্ত হয় তাহা অতি সহজেই বোধ গম্য হইবার কথা। উক্ত বিষাক্ত পদার্থ যাহাতে দেহের কোনো অংশে বা বস্ত্রাদিতে সংলগ্ন হইয়া ভাবী কোন অনিষ্ট উৎপাদন করিতে না পারে সেই নিমিত্তই মূত্র শৌচের ব্যবস্থা। "শরীর-মাদ্যং খলুধর্ম্ম সাধনম্।" এই সার বচনটিতে স্পষ্টই উচ্চকণ্ঠে বলা হইয়াছে যে শরীর রক্ষা বা স্বাস্থ্যরক্ষাই ধর্ম্ম রক্ষা। একালে স্বাস্থ্য-রক্ষাই ধর্ম্মরক্ষা বিষয়ক বহু পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিয়াও যে শিক্ষকগণকে মূত্র শৌচে-পরাঙ্মুখ দেখা যায়, সেই দুঃখেই নানা কথার উল্লেখ করিতে হয়। ফলতঃ যাহা অস্বাস্থ্যকর তাহাকেই অপবিত্র এবং অধর্ম্ম জনক বা অশৌচকারক ইত্যাদি শব্দে প্রাচ্য-শাস্ত্রে অভিব্যক্ত হইয়াছে। যাঁহারা সদাচার, ধর্ম্ম বা পবিত্রতা ইত্যাদি শব্দ শ্রবণ মাত্রেই ব্যঙ্গ পূর্ব্বক কুটিল কটাক্ষপাত করেন ওদিকে স্বাস্থ্য অন্বেষণে দেশ দেশান্তরে ছুটা-ছুটি করেন, তাঁহাদের বুঝিবার জন্যই এতগুলি কথার অবতারণা করিতে হইল। নতুবা শাস্ত্র-বাক্য অবশ্য পালনীয় বলিয়া ব্যবস্থা গুলি লিখিলেই যথেষ্ট হইতে পারিত। এক্ষণে নিম্নে আমরা যথা শাস্ত্র মূত্রশৌচের ব্যবস্থাদিতে কাল ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যথাসম্ভব সঙ্কুচিত ভাবেই ব্যাখ্যা করিলাম। এজন্য সদাচার পরায়ণ শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিতগণ আমা-দের ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

মূত্র ত্যাগান্তে স্ত্রীপুরুষ সকলেরই মূত্রদ্বারে একবার মৃত্তিকা লেপন করতঃ জলদ্বারা ধৌত করিয়া ফেলিবে, অনন্তর হস্তদ্বয়ও মৃত্তিকা-দ্বারা লেপন করিয়া পরিষ্কার ভাবে ধুইয়া ফেলিবে, তৎসঙ্গে পাদ দ্বয় ধৌত করিয়া পবিত্র হইনাম জ্ঞানে ভগবানকে, স্মরণ পূর্ব্বক শুদ্ধ হইবে। মৃত্তিকা লেপন পূর্ব্বক জল দ্বারা ধৌত করিলে কোনরূপ রোগবীজ দেহ বা বস্ত্রাদিতে সংলগ্ন হইবার ভয় এককালে বিনষ্ট হয় বলিয়াই ঐরূপ ব্যবস্থা। দিবসের শৌচ বিধি যাহা ব্যবস্থা আছে রাত্রে তদপেক্ষা অর্দ্ধেক করিলেই চলে। আবার আজকাল রেল বা ষ্টীমারাদিতে উহার মৃত্তিকা প্রয়োগ চলে না বলিয়া যে সকল অপবিত্রতার কারণ উপস্থিত হয়; তাহার সংশোধন কল্পে যথাস্থানে উপনীত হইবার পর বস্ত্রাদি পরিত্যাগ এবং মৃত্তিকা শৌচ ও যথাসাধ্য প্রক্ষালন বা স্নানাদি দ্বারা শৌচ হইয়া পবিত্র চিত্তে বিষ্ণুস্মরণ করিলেই পবিত্র হওয়া যায়। কোন অনিবার্য্য কারণে বা পথ পর্য্য-টন প্রভৃতি কালে জল দুষ্প্রাপ্য হইলেও কদাচ মূত্রাদির বেগ ধারণ না করিয়া বিনা শৌচেই পরিত্যাগ করিবে কিন্তু পরবর্ত্তী কালেই যথা স্থানে উপস্থিত হইয়া উক্তরূপ শৌচ ব্যবস্থা করিতে হইবে। রোগীর পক্ষে পূর্ব্বোক্ত রাত্রিকালের শৌচের অর্দ্ধেক ব্যবস্থা করিলেই চলিবে। নিতান্ত অক্ষম রোগীর পক্ষে শুশ্রূষা-কারীগণ কর্ত্তৃক যথাসম্ভব শৌচের ব্যবস্থা কর্ত্তব্য। কারণ শৌচ কার্য্যে রোগ আরোগ্য পক্ষেও সাহায্য হয়। শৌচাচার বিহীন ব্যক্তির স্বাস্থ্যের অবস্থা খারাপ হয় বলিয়া সকল কার্য্যই নিষ্ফল হয়। এই নিমিত্ত, স্বাস্থ্যকামীগণ যত্নের সহিত শৌচাচার প্রতিপালন করিবেন।

বাহ্য ও অভ্যন্তর ভেদে শৌচ দুইপ্রকার।

মৃত্তিকা এবং জলদ্বারা বাহ্য শৌচ আর মনোভাব শুদ্ধি দ্বারা অন্তর শৌচ সম্পন্ন হয়। পর্ব্বতপ্রমাণ মৃত্তিকা বা বহু পরিমাণ গঙ্গাজল দ্বারা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত, বারম্বার স্নাত হইলেও মনোভাবদুষ্টব্যক্তি শুদ্ধ হয় না। এজন্য মনোভাব শুদ্ধির অত্যন্ত আবশ্যক। বাহ্য শৌচাদির দ্বারা নির্ম্মল ও পবিত্র হইয়াছি জ্ঞানকরতঃ শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ স্মরণ করিলেই মনোভাব শুদ্ধি হইয়া থাকে। এজন্য শৌচাদির পরে আচমনপূর্ব্বক শুদ্ধ হইলাম জ্ঞানে বিষ্ণু স্মরণ করিবে। যেস্থানে শৌচকৃত হইবে পরিমিত জলদ্বারা সে স্থানকে শোধন করিবে। নতুবা শৌচকৃত অপবিত্র স্থানে রোগবীজ জন্মিয়া ভাবী অমঙ্গলের কারণ হয়। এজন্য যে ব্যক্তি ঐস্থান শোধন না করে তাহার শৌচ সিদ্ধি হয় না।

শৌচানন্তর গোময় বা মৃত্তিকাদ্বারা শৌচ জন্য পাত্র মার্জ্জন করিয়া পূর্ব্ববৎ আচমনপূর্ব্বক সূর্য্য চন্দ্র ও অগ্নিকে যথাসম্ভব দর্শন করিবে। এবং পূর্ব্ববৎ বিষ্ণু স্মরণ করিবে। অনন্তর আবার জলপাত্রে পবিত্র জল গ্রহণপূর্ব্বক পশ্চিমাভিমুখ হইয়া প্রথমে বাম পরে দক্ষিণ পাদ প্রক্ষালন করিবে। দৈবকার্য্যে পূর্ব্ব অথবা উত্তর মুখে আর পিতৃকার্য্যে দক্ষিণ মুখ হইয়া উক্তরূপে পাদপ্রক্ষালন করা কর্ত্তব্য। ইহার প্রত্যেক ব্যাপারের সহিতই গূঢ়তম বৈজ্ঞানিক রহস্য নিহিত রহিয়াছে। এজন্য ইহা কেন করিব? উহা কেন করিব না? এরূপ 'কেন', উত্তর অন্বেষণ করিয়া এই ব্রহ্মচর্য্যবিহীন বিকৃত মস্তিষ্কে সে সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বান্বেষণের অধিকার চর্চ্চা না করাই আধুনিক হীনস্বাস্থ্য ব্যক্তিগণের একান্ত কর্ত্তব্য। ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ লোক কল্যাণকর হিন্দুশাস্ত্রে যে অবৈজ্ঞানিক নিষ্প্রয়োজনীয় কতকগুলি বাজে কথা লিখিয়া শাস্ত্রের কলেবর বৃদ্ধি করেন নাই, এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসে আপ্ত বাক্যে ভক্তি স্থাপন পূর্ব্বক যথা শাস্ত্র শৌচাচারের যতদূর বর্ত্তমান কালানুসারে সম্ভবপর তাহা অবশ্য করণীয়।

উক্তরূপে প্রথমে পাদদ্বয় ও পরে হস্তদ্বয় প্রক্ষালনপূর্ব্বক পবিত্র চিত্তে বিষ্ণুকে স্মরণ করিয়া দন্তধাবন আরম্ভ করা কর্ত্তব্য।

দন্তধাবন।

মুখবিবর পর্য্যুষিত থাকিলে মানব নিশ্চয়ই রোগগ্রস্থ হয়। অতএব সযত্নে দন্তকাষ্ঠ চর্ব্বণপূর্ব্বক এক একটি করিয়া দন্ত বিশিষ্টভাবে পরিষ্কার করিতে হইবে। যে ব্যক্তির পর্য্যুষিত দুর্গন্ধযুক্ত মুখবিবর, সে পূয় শোণিত এবং কফপিত্ত সমন্বিত কলুষিত হয়। এ নিমিত্ত দন্তধাবন অবশ্য কর্ত্তব্য। বর্ত্তমানকালে দন্তধাবনজন্য যতপ্রকার ঔষধ বা সুগন্ধি চূর্ণ আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত হইতেছে, তদপেক্ষা সুস্থ দন্তের পক্ষে দন্ত কাষ্ঠই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ঋষিগণ বহুবিধ দন্তকাষ্ঠের গুণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাবপ্রকাশে উক্ত আছে যে দ্বাদশাঙ্গুলী দীর্ঘ, কনিষ্ঠাঙ্গুলীর অগ্রভাগের ন্যায় স্থূল, সরল গ্রন্থিবিহীন ও অক্ষত বৃক্ষকাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন করা কর্ত্তব্য। দন্তকাষ্ঠের অগ্রভাগটি কোমল কূর্চ্চকাকার (ব্রাসের মত) প্রস্তুত করিয়া তদ্বারা দন্তবেষ্টিত মাংসে আঘাত না লাগে এমত ভাবে একটি একটি দন্ত ধীরে ধীরে ঘর্ষণপূর্ব্বক পরিষ্কার করিবে।

মধু, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সর্ষপ তৈল,

সৈন্ধবলবণ ও তেজবক্ চূর্ণ দ্বারা দন্তকাষ্ঠের অগ্রভাগ অবচূর্ণিত করিয়া প্রত্যহ দন্ত শোধন করিবে। তজ্জন্য নিম্নলিখিত দণ্ডকাষ্ঠ সকল প্রসিদ্ধ।

মধুর-রস কাষ্ঠের মধ্যে মৌলকাষ্ঠ প্রশস্ত, কটু রসযুক্ত কাষ্ঠের মধ্যে করঞ্জ, তিক্ত রসযুক্ত কাষ্ঠের মধ্যে নিম্ব ও কষায় রসযুক্ত কাষ্ঠের মধ্যে খদির কাষ্ঠ প্রশস্ত। এতদ্ভিন্ন কাল ও দোষ এবং প্রকৃতি অনুসারে যেস্থলে যেরূপ রসবীর্য্য হিতকর তৎস্থলে সেইরূপ গুণবিশিষ্ট কাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন করিবে। এইরূপে দন্তধাবন করিলে মুখের বিরসতা, দন্ত বা জিহ্বার রোগসমূহ অথবা যে কোন মুখ-রোগ উৎপন্ন হইতে পারিবে না, এতদ্ভিন্ন মুখের রুচি, নির্ম্মলতা এবং লঘুতা উৎপন্ন হইবে।

আকন্দ কাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন করিলে বীর্য্যবান হয়, বট কাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবনে দেহের কান্তি, করঞ্জ কাষ্ঠের দন্তধাবনে জয়লাভ, পাকুর কাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবনে অর্থ সম্পত্তি বর্দ্ধন, বদরী কাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবনে মধুর ধ্বনি, খদিরকাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবনে মুখের সুগন্ধি, বিল্বকাষ্ঠের দন্তধাবনে অতুল ধনবান, যজ্ঞ ডুম্বুরের দন্তধাবনে বাক্সিদ্ধি, আম্রকাষ্ঠের দন্তধাবনে নিরোগী, কদম্ব কাষ্ঠের দন্তধাবনে ধারণাশক্তি ও মেধা, চম্পক বৃক্ষের দন্তধাবনে দৃঢ়মতি, শিরীষ বৃক্ষের দন্তধাবনে কীর্ত্তি, সৌভাগ্য ও পরমায়ু বৃদ্ধি ও আরোগ্যদেহ, অপাঙ্গ দ্বারা দন্তধাবনে ধারণাশক্তি মেধা ও বুদ্ধি এবং সুস্বরলাভ, দাড়িম্ব, অর্জ্জুন ও কুটজ বৃক্ষের দন্তধাবনে দেহ সৌন্দর্য্য, জাতীপুষ্প তগরপুষ্প ও মান্দার পুষ্পের কাষ্ঠের দন্তধাবনে দুঃস্বপ্ন বিনষ্ট হইয়া থাকে।

নিষিদ্ধ দন্তকাষ্ঠ।

গুবাক, তাল, হেতাল, কেতকী, বৃহত্তৃণ, খর্জ্জুর ও নারিকেল এই সাত প্রকার বৃক্ষকে তৃণরাজ বলে। ইহাদের যে কোনটির দ্বারা দন্তধাবনে চণ্ডাল-যোনি প্রাপ্ত হইতে হয়।

দন্তধাবনের অযোগ্য ব্যক্তি।

গলরোগী, তালু রোগী, ওষ্ঠ বা জিহ্বা-রোগী, দন্ত ও মুখক্ষত রোগী, এবং মুখশোষ রোগী দন্তধাবন করিবে না। এতদ্ভিন্ন যে ব্যক্তি দুর্ব্বল, ও যাহার ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হয় নাই, তাহাদের পক্ষে আর শ্বাস, কাশ, বমি, হিক্কা ও মূর্চ্ছা এই সকল রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে এবং মদরোগ, শিরোরোগী এবং পিপাসিত ও শ্রান্ত, এবং মদ্যপানে ক্লান্ত ব্যক্তির পক্ষেও অর্দ্দিত রোগে, কর্ণশূলে, নেত্ররোগে, নবজ্বরে এবং হৃদ্রোগে কদাচ দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে না।

কেবল সুস্থব্যক্তি উক্তপ্রকারে যে কোন হিতকর কাষ্ঠদ্বারা দন্তগুলি পরিষ্কার করিয়া লইয়া জলদ্বারা মুখ ধৌতকরতঃ জিহ্বা নির্লেখন করিবে।

জিহ্বা নির্লেখন

সুবর্ণ, রৌপ্য বা তাম্র নির্ম্মিত অথবা দন্তধাবন যোগ্য কোমলতর কাষ্ঠ চিরিয়া তদ্দ্বারা কিম্বা কোন কোমল, স্নিগ্ধ জিব ছোলা প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা ধীরে ধীরে জিহ্বা নির্লেখন করিলে জিহ্বার মল, বিরসতা, দুর্গন্ধ ও জড়তা বিনষ্ট হয়।

দন্তধাবন ও জিহ্বা নির্লেখনান্তর শীতল ও পরিষ্কার জল দ্বারা বারংবার গণ্ডূষ ধারণ ও কুলকুচা করিয়া মুখবিবর সুন্দর রূপে

পরিষ্কার করিলে, কফ, তৃষ্ণা ও মুখগত মল নিবারিত হইয়া মুখবিবর বিশোধিত হওয়ায় দেহ স্বাস্থ্যবান হইয়া থাকে। ঈষদুষ্ণ জলের গণ্ডূষ ধারণ দ্বারা মুখ প্রক্ষালন করিলে কফ, অরুচি, মুখগত মল ও জিহ্বা এবং দন্তের জড়তা বিনষ্ট এবং মুখের লঘুতা সম্পাদন হয়। কিন্তু বিষ, মূর্চ্ছা ও মদাত্যয় রাজযক্ষ্মা এবং রক্তপিত্ত প্রভৃতি যে কোন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি গণ্ডূষ ধারণ করিবে না। উৎকুপিত চক্ষু বা কুপিত মলযুক্ত, ক্ষীণ, এবং রুক্ষ ব্যক্তির পক্ষেও উষ্ণ জলের গণ্ডূষ ধারণ প্রশস্ত নহে।

উক্তরূপে মুখ প্রক্ষালন করিয়া পরে যথাসাধ্য মুখপূর্ণ করিয়া জল গ্রহণ করতঃ মুখবন্ধ করিয়া চক্ষুতে কুড়ি বার জলের ঝাপটা দিতে হয়। ইহাদ্বারা চক্ষুর জ্যোতিঃ অক্ষুণ্ণ থাকে। ইহাই যোগীগণের অভিপ্রায়, তাঁহারা আবার এরূপও বলিয়া থাকেন যেন মল বা মূত্রত্যাগকালীন যদি উভয় পাটি দন্ত দৃঢ়ভাবে বদ্ধ করিয়া দাঁতে দাঁতে সংযুক্ত অবস্থায় ত্যাগ শেষ করা যায়, তাহাতে আমরণ কাল পর্য্যন্ত দন্ত স্থায়ী ও নীরোগ থাকে।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

নিখিল ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদ সম্মেলন।—আগামী বর্ষে নিখিল ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদ সম্মেলনের অধিবেশন বোম্বে নগরীতে হইবে স্থিরীকৃত হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদ কলেজ।—আমাদের পাঠকগণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় বা আয়ুর্ব্বেদ মেডিকেল কলেজটি উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। এবার এই কলেজের ৫ম বর্ষ আরম্ভ হইবে। লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদের পুনরুন্নতি কল্পেই এই কলেজের প্রতিষ্ঠা। ভারতবর্ষে এপর্য্যন্ত কতগুলি আয়ুর্ব্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে সকলেই ইহার শিক্ষা প্রণালীর প্রশংসা করিতেছেন। প্রকৃত চিকিৎসক হইতে হইলে শল্য চিকিৎসায় অভিজ্ঞতা অর্জ্জন যে একান্ত কর্ত্তব্য এই কলেজের পরিচালকগণ তাহারই প্রতি সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য রাখিয়া এই কলেজের শিক্ষা প্রণালীর ব্যবস্থা করিয়াছেন।

উৎসাহ প্রদান।—এই কলেজের শিক্ষাব্যবস্থায় বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া ছাত্রবৃন্দকে উৎসাহ প্রদানের জন্য মাননীয় কর্ণেল ব্রাউন পূর্ণ এক বৎসর কালের জন্য একটি ৫্ টাকার স্কলারসিপ প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রীরামপুরের মিঃ ডিক্রুজ এই কলেজের প্রথম ছাত্রকে একটি স্বর্ণ পদক দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন আরও অনেকগুলি স্কলারসিপ এবং মেডেল এই কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রদান করিবেন। যে সকল মহোদয় এই কলেজের উন্নতি কল্পে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন, তাঁহারা বাঙ্গালা দেশের সকল অধিবাসীরই নিকট বিশেষ ধন্যবাদার্হ, কারণ এই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় বা আয়ুর্ব্বেদ মেডিকেল কলেজটিই একমাত্র বাঙ্গালাদেশে আয়ুর্ব্বেদের যুগ আবার ফিরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা করিতেছে।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক

৪র্থ বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৭—শ্রাবণ। | ১১শ সংখ্যা।

শিশুপালন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

[শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বি-এ, সরস্বতী]

—:•:—

শিশুর সরলতা, পবিত্রতা সযত্নে রক্ষা করিবে। তাহাদের সম্মুখে কখনো কাহারো নিন্দা করিবে না। অনেক সময় পিতামাতা এবং বয়োজ্যেষ্ঠেরা বালকবালিকাদের সম্মুখেই সমাজের অথবা দেশের নেতাদের নিন্দাবাদ করেন। ইহাতে তাহাদের প্রাণে শ্রদ্ধাহীনতা আসে এবং সর্ব্বদাই বয়োজ্যেষ্ঠদিগের সমালোচনাতে ও পরচর্চ্চাতে সময় যাপন করে। ইহাতে তাহাদের চরিত্র বিকৃত হইয়া যায়। কেবল অপরের দোষের সমালোচনা করিতে করিতে নিজের চরিত্রের উন্নতি সাধনের দিকে মন থাকে না, চরিত্রের অবনতি ঘটে এবং যে দোষের সমালোচনা করে—সেই দোষ নিজের চরিত্রে আসে। স্বভাব "নিন্দুকে" হইয়া যায়। শ্রদ্ধাহীনতা চরিত্রের অবনতির মূল। অতএব মাতাপিতা সতর্ক হইবেন যেন সন্তানদের প্রাণে শ্রদ্ধাহীনতা না আসে। শ্রদ্ধা চরিত্রের উন্নতির মূল। শ্রদ্ধাভাজনের প্রতি সন্তানদের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা যাহাতে থাকে, পিতামাতা সেইদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। সন্তানগণ কেবল অপরের গুণ দেখিতে যাহাতে অভ্যস্ত হয় সেই যত্ন লইবে। পরের গুণ দেখিতে দেখিতে চরিত্র উন্নত কর, প্রাণ মহৎ হয়। সন্তানগণকে এই শিক্ষা দিবে যে প্রত্যেক মানুষেরই কোন না কোন গুণ আছে, তাহা হইলে তাহাদের দৃষ্টি উদার হইবে, প্রত্যেক মানুষের ভিতর গুণ দেখিতে শিখিবে। পরনিন্দা করা মহাপাপ ইহা

সন্তানকে শিক্ষা দিবে। বর্ত্তমানকালের যুবকদের উদ্ধত স্বভাব, বয়োজ্যেষ্ঠদের নিন্দা এবং গুরুজনে অশ্রদ্ধা দেখিয়া প্রাণ ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব-প্রধান যুগে সন্তানদের ভক্তিপ্রবণ করা কঠিন। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের নবীনা মাতাকে স্বাধীনতা ও শ্রদ্ধার সামঞ্জস্য সাধন করিয়া সন্তানকে শিক্ষা দিতে হইবে।

শিশুকে কখনো মিথ্যা ভয় দেখাইবে না। "ঐ জুজু আসছে, ঐ ভূতে খেলে।"—বলিয়া শিশুকে মিথ্যা ভয় দেখাইলে শিশুর অত্যন্ত অনিষ্ট সাধিত হয়। শিশুর স্বভাব ভীরু, কাঁপুক্ষ্য ভয়; হয়ত হঠাৎ ভয় পাইয়া মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে। কিংবা চিরজীবনের জন্য স্নায়বিকদৌর্ব্বল্য রোগ জন্মিতে পারে। আমাদের দেশে সর্ব্বদাই দেখিতে পাই যে, শিশু হয়ত দুধ খাইতেছে না কিংবা কোন অন্যায় আবদার ধরিয়াছে অথবা মাতার অবাধ্য হইয়া দুষ্টামি করিতেছে, তখন মা তাহাকে এই বলিয়া নিরস্ত করেন "ঐ জুজু এলো" অথবা "অন্ধকারে যাস্‌নে, ভূতে ধরবে"। এই অযথা ভয় দেখান দ্বারা শিশুর চরিত্র গঠনের মূল ভিত্তি নষ্ট হইয়া যায়। এক সময়ে একটি শিশুর বাল্যকালে সে দুষ্টামী করিলে তাহার মাতা তাহাকে নিকটস্থ একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ দেখাইয়া এই বলিয়া ভয় দেখাইতেন যে "ঐ বৃক্ষে ভূত আছে, দুষ্টামী করিলেই তোমাকে ধরিবে"। শিশু কখনো ঐ বৃক্ষের নিকটে আর যাইত না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ বৃক্ষের স্মৃতি তাহার একটা ভীষণভাব মনে বদ্ধমূল হইয়া যায়। যৌবনে এই শিশু একজন বড় যোদ্ধা হয় এবং প্রৌঢ়কালে সেনাপতির পদ লাভ করেন। বহু যুদ্ধ জয়ের পর, বীরের যোগ্য প্রভূত সম্মান লাভ করিয়া তিনি এক দিন মাতৃ সন্দর্শনের জন্য গৃহে যাত্রা করিলেন। বহুদিনের পর, বহু বিপদ কাটাইয়া পুত্র গৃহে আসিতেছে বলিয়া বৃদ্ধা মাতা আকুল প্রাণে তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। পরে পুত্র গৃহের নিকটে আসিয়া সেই বৃক্ষতলে উপস্থিত হইলেন। তখন সন্ধ্যার আঁধার চারিদিকে ঘনাইয়া আসিয়াছে। আর দুই পা অগ্রসর হইলেই পুত্র মাতার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িবেন। হঠাৎ তাঁহার ঐ বৃক্ষের উপরে নজর পড়িল; আর অমনি বাল্যের সেই ভয় মনে জাগিয়া উঠিল। তিনি যেন দেখিলেন যে, বৃক্ষের ঘন শাখা প্রশাখার ভিতর হইতে একটি প্রকাণ্ড বিরাটকায় মানুষমূর্ত্তি ব্যাদান করিয়া দুই বিশাল বাহু প্রসারিত পূর্ব্বক তাহাকে ধরিতে আসিতেছেন। আর অমনি তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গিল না। এত বড় বীর হইয়াও তিনি বাল্য শিক্ষার প্রভাব হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। বাল্য শিক্ষার প্রভাব এইরূপ। সৎশিক্ষা দাও কিংবা অসৎ শিক্ষা দাও, যে ভাবেরই শিক্ষা দাও না কেন, তাহা একেবারে পাথরে খোদাই হইয়া যাইবে। প্রত্যেক মাতা ইহা উত্তমরূপে উপলব্ধি করিয়া সন্তানের প্রাণে সৎ, মহৎ, উন্নত, উদার, ধর্ম্মপূর্ণ, সাহস ও বীরত্ব পূর্ণ ভাব মুদ্রিত করিয়া দিবেন।

সন্তান অপরাধ করিলে তাহার শাস্তি স্বরূপ তাহাকে কখনো আহার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিবে না কিংবা কোন অন্ধকার ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিবে না। ইহাতে শিশু

অসুস্থ হইয়া পড়িতে পারে, কিংবা অন্ধকারে হঠাৎ ভয় পাইয়া স্নায়ুদৌর্ব্বল্য রোগে আক্রান্ত হইতে পারে। তোমার নিজের temper-র উপর যেন সন্তানের শাস্তি নির্ভর না করে। আজ যে দোষ করিয়া শিশু কোন শাস্তি পাইল না, কারণ তোমার চিত্ত আজ প্রসন্ন, কলে তোমার চিত্ত কোন কারণে অপ্রসন্ন বলিয়া শিশু সেই দোষের জন্য যদি শাস্তি পায়, তবে তাহাতে তাহার কুশিক্ষা হইবে। শিশু বুঝিতেই পারিবে না যে, সে কখন্ অন্যায় করিতেছে আর কখন্ করিতেছে না। বিশেষ কোন গুরুতর অপরাধ ব্যতীত সন্তানকে কখনো প্রহার করিবে না। অপরাধ করিলে তাহাকে ধমক দিয়া কিংবা তাহার প্রিয় বস্তু কাড়িয়া লইয়া শাস্তি দিলেই যথেষ্ট শাসন করা হয়। কথায় কথায় প্রহার করিলে শিশু আর প্রহারকে গ্রাহ্য করিবে না, তখন আর সে কোন শাস্তিকেই ভয় করিবে না।

শৈশবে যে অভ্যাস হয়, আজীবন তাহা থাকিয়া যায়। অতএব মাতা শৈশব হইতেই শিশুকে সমুদয় সদ্ অভ্যাসে অভ্যস্ত করাইবেন Habit is second nature সদ্ অভ্যাস হইলে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনের কর্ত্তব্য গুলিও অতি সহজেই সম্পাদন করিতে পারিবে। তাহাকে ভাল করিতে কোনই ক্লেশ পাইতে হইবে না।

মাতা তাঁহার পুত্রকে শৈশব হইতেই তাহার ভগ্নীকে ভালবাসিতে ও সম্মান করিতে শিখাইবেন। বড় ভগ্নী হইলে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিবে, ছোট ভগ্নীর গায়ে কখনো হাত তুলিবে না, তাহাকে যত্ন করিবে ও ভালবাসিবে। ছোট ভগ্নী হয়ত তাহারি কোন একটি জিনিস লইবার জন্য কিংবা তাহার হাতের খাবার খাইবার জন্য কাঁদিতেছে, জননী তখনি পুত্রকে বলিবেন, "তোমার ছোট বোন কাঁদছে, ওকে দাও। বোনকে আদর করতে হয়"। পুত্র সে আদেশ পালন করিল কিনা দেখিবেন। গৃহে পুত্র যেন সর্ব্বদা দেখে যে, মাতাই সেই গৃহের একমাত্র রাণী, পিতাও তাঁহার ইচ্ছা মানিয়া চলেন। তাহার যেমন আদর ভগ্নীদিগেরও ঠিক তেমনি আদর। সে যেমন শিক্ষা পাইতেছে ভগ্নীরাও ঠিক তেমনি শিক্ষা পাইতেছে। সে যেমন গৃহে ব্যবহার পাইতেছে, ভগ্নীরাও তেমনি ব্যবহার পাইতেছে। শৈশবে গৃহের এইরূপ শিক্ষা হইতেই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে সে বাহিরের সমগ্র মাতৃজাতিকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিবে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের যুবকগণের মধ্যে নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধার অভাব দেখিয়া মর্ম্মাহত হইতে হয়। ইহা তাহাদের গৃহশিক্ষার ত্রুটি। গৃহে নারী জাতির অসম্মান দেখিয়া দেখিয়া তাহারা নারীর প্রতি শ্রদ্ধা হারায়। বর্ত্তমান যুগের নবীনা মাতার উপর তাঁহার পুত্রদিগকে নারীজাতির শ্রদ্ধাশীল করিবার গুরুভার পড়িয়াছে। তাঁহারা এই কর্ত্তব্য পালন করিয়া দেশের কলঙ্ক দূর করুন।

গৃহই চরিত্র গঠনের সর্ব্বপ্রধান এবং একমাত্র স্থল। মাতা সেই গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ও শিক্ষয়িত্রী। তিনি যেমন ভাবে গৃহ গড়িবেন, সন্তান সন্ততি তেমনি হইবে। যে গৃহ প্রেম ও কর্ত্তব্যপালনে পূর্ণ, যেখানে হৃদয় ও মস্তিষ্ক—বিচার পূর্ব্বক কার্য্য করে, যেখানে প্রাত্যহিক জীবন ধর্ম্মভাব ও সাধুতায় পূর্ণ,

যেখানকার শাসন সদয়তাপূর্ণ, প্রেমময় ও ন্যায়সঙ্গত, সেই গৃহ হইতে যে সব সুস্থ, সবল, কর্ম্মঠ, ধর্ম্মভীরু পুরুষ ও নারী উদ্ভূত হইবে, তাহারা নিজেরা জীবন ক্ষেত্রে সোজা সরল পথে চলিয়া আপনাকে সংযত রাখিয়া যেমন সুখী হইবে, তেমনি সমাজের ও দেশেরও মঙ্গল সাধন করিবে।

শৈশব হইতে সন্তান সন্ততিদিগকে সর্ব্বদা সুন্দর চিত্র, তানলয় সমন্বিত সুমিষ্ট সঙ্গীত, সুন্দর পুষ্প, মহৎ লোকের ধর্ম্মভাব পূর্ণ প্রতিকৃতি, গৃহের পবিত্র বাতাসের মধ্যে রাখিবে। তাহা হইলে একদিকে তাহাদের সৌন্দর্য্য জ্ঞান প্রস্ফুটিত হইবে এবং মনও উন্নত, পবিত্র, এবং মহৎভাবে পূর্ণ হইবে।

শিক্ষায় ব্রহ্মচর্য্য।

[কবিরাজ শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত কাব্যতীর্থ-কবিভূষণ]

আমরা পরম কারুণিক পরমেশ্বরের অপার-কৃপায় তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান দুর্লভ মানব জনম লাভ করিয়াছি। জানিনা, কত যুগযুগান্তর, কত সহস্র জন্ম ভোগ করিয়া কত কৃচ্ছ্রতম সাধনার ফলে সর্ব্বাকাঙ্ক্ষিত, সমস্ত বাঞ্ছিত ফলদায়ী এই জীবনকে অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছি, এই জীবনেই মরজগতে অমরত্ব লাভ করতঃ জীব অক্ষয় অসীম ব্রহ্মানন্দ সুধা পান করিতে অধিকারী হয়। অপরাপর জীবগণ আহার বিহার নিদ্রা প্রভৃতি জীবন যাত্রার উপযোগী স্বভাব সিদ্ধ ব্যাপার সমাধানেই জীবন পর্য্যবসিত করে এবং ঐ সকল নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি সম্পাদন করিতে পারিলেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করতঃ তৃপ্তিলাভ করে। কিন্তু মানব ইহাতে পরিতৃপ্ত নহে। প্রাণ-রক্ষার জন্য অবশ্য করণীয় বলিয়াই আমরা ঐ সমস্ত ব্যাপারে প্রবৃত্ত থাকি এবং ঐ প্রবৃত্তিও নির্দ্দিষ্ট সাময়িক মাত্র। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পরিশীলনে আত্মোৎকর্ষলাভই মানব জীবনের সার লক্ষ্য। এইলক্ষ্য সম্পাদন বিষয় যিনি যতদূর অগ্রসর হইতে পারেন তিনিই সেই পরিমাণে প্রকৃত মনুষ্যত্বের গৌরব অর্জ্জন করিতে সমর্থ হন। বড়দুঃখেই কবি বলিয়াছেন—

"জন্মেদং বন্ধ্যতাং নীতং ভবভোগোপলিপ্সয়া।
কাচমূল্যেন বিক্রীতো হন্তচিন্তামণির্ম্ময়া"॥

সাংসারিক ভোগবিলাসে মত্ত থাকিয়া জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য আত্মোৎকর্ষ লাভ করিতে না পারিলে মনুষ্যের পক্ষে এতদপেক্ষা অধিক অনুতাপের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না। অমূল্য রত্ন বিনিময়ে কাঁচের খেলনা কোন্ মূর্খ কিনিতে ইচ্ছা করে? যে জীবন রত্নের সাহায্যে মানুষ অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়া অনন্ত তৃপ্তিময় ব্রহ্মানন্দ পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারেন অথবা জড় জগতের বিচিত্র ভৌতিক ক্রিয়া কলাপের বিস্ময়কর কার্য্য-কারণ নির্ণয় ও নানাবিধ রহস্যময় নব নব তত্ত্বের উদ্ভাবন করতঃ অনির্ব্বচনীয় প্রীতি-পীযুষপানে বিভোর হইয়া ক্ষণভঙ্গুর জীবনকে

চিরস্থায়ী চিরকল্যাণকর রূপে পরিণত করিতে সমর্থ হন, তাদৃশ বহু জন্মান্তরীয় দুর্লভ সাধনার ফল স্বরূপ মানব জনম লাভ করিয়া কোন্ মূর্খ তাহাকে ব্যর্থ ভোগবিলাস চরিতার্থতার জন্য অপব্যয়িত করিতে ইচ্ছাকরে?

সাধারণতঃ জীবমাত্রই দুঃখের শান্তি ও সুখপ্রাপ্তির জন্য লালসান্বিত, বস্তুতঃ এতদুভয় ব্যতীত কাহারও কোন লক্ষ্য 'আছে' বলিয়া অনুমান করা যায় না; তবে রুচি অথবা বোধ শক্তির তারতম্য অনুসারে সুখ বা দুঃখ সম্বন্ধে মতামত থাকিতে পারে। যাহা ব্যক্তি বিশেষের সুখকর, হয় ত তাহা অপরের পক্ষে ক্লেশ বা বিরক্তিজনক। কিন্তু এ যুক্তির অনুসরণ দ্বারা সুখ বা দুঃখের স্বরূপ নির্ণয় হইতে পারে না। তুমি আমি বা অপর কোন ব্যক্তি কু আসক্তির দোষে অসদাচরণে ক্ষণিক সুখ বোধ করিলেই উহা সুখ শব্দের প্রকৃত প্রতিপাদ্য হইতে পারে না। যদি তাদৃশ সুখ সম্ভোগের ফলে উত্তরকালে কোন দুঃখ অথবা কার্য্যহানি ঘটে (অর্থাৎ জীবনের শ্রেষ্ঠতর লক্ষ্য সাধনের পক্ষে কদাপি অন্তরায় স্বরূপ হয়) তবে এতাদৃশ সুখ—সুখ নহে, প্রত্যুত দুঃখ বলিয়াই পরিগণিত। ফলতঃ দুঃখ সম্পর্ক শূন্য হৃদয়ের তৃপ্তিকেই সুখ নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। এই সুখই প্রকৃত পুরুষার্থ। ইহার জন্যই মানব সংসারযাত্রার ছলে কত ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলন করিতেছেন। নিজ কৃতকর্ম্ম সাহায্যে আত্মতৃপ্ত পুরুষই জগতে ধন্যবাদার্হ, সর্ব্বজন প্রশংসিত ও সমাদৃত হইয়া থাকেন।

এই প্রকার আত্মতৃপ্তিতে স্বার্থপরতার লেশও থাকিতে পারে না, কেননা উহা নিজের অপেক্ষা দেশের ও সমাজেরই অধিক কল্যাণকর। একজন আদর্শ স্থানীয় মহাপুরুষের আবির্ভাবে একটা সমগ্র দেশ কত উন্নতি ও গৌরব প্রাপ্ত হইতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত ভারতে বিরল নহে। পরিতাপের বিষয় আমরা বহুদিন হইতে সদাচার-পথচ্যুত হইয়া ক্রমেই অধঃপতিত হইতেছি। কর্ত্তব্যবিশ্বাসে অকর্ত্তব্য বিধানে রত হইয়া তজ্জনিত বিষময় পরিণাম ফল ভোগ করিতেছি। শিক্ষাভ্রমে কুশিক্ষা সমুতমোহে মুগ্ধ হইয়া আত্মবিস্মৃত হইতেছি। গন্তব্যপথভ্রমে কণ্টকাকীর্ণ বিপথে চলিত হইয়া বিপন্ন হইতেছি। আমাদের যাহা কিছু গৌরবের, সুখের, গর্ব্বের, ছিল, অজ্ঞতাবশে সে সমস্ত পদদলিত করিয়া পরপদলেহন বৃত্তিকেই জীবনের সার ও চরম লক্ষ্য স্থির করিয়াছি।

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় চিন্তা করিলে সমগ্র সভ্যজগতই অধঃপাতের চরমসীমা ও মনুষ্যত্বের অস্বাভাবিক বিপর্য্যয় দেখিয়া বিস্ময়বশে স্তম্ভিত হইবেন। আমরা পরের সত্তায় সত্ত্ববান্, পরের শক্তিতে শক্তিমান্, পরের কর্ত্তব্য সম্পাদনে কর্ত্তব্য পরায়ণ, এক কথায় আমাদের নিজস্ব বা নিজত্ব বলিয়া গৌরব দেখাইবার কিছুই নাই। কলের পুতুলের ন্যায় যন্ত্র চালিত হইয়া চালকের অভিপ্রায় অনুসারে কখন হাসিতেছি, কখন নাচিতেছি, কখন কাঁদিতেছি। আবার চালকের ইচ্ছাক্রমে কখনও বা নিষ্ক্রিয় নিস্পন্দভাবে অকর্ম্মণ্য দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করিয়া জীবন সার্থক করিতেছি! অধিক কি বলিব, স্নান, আহার, বেশ, ভূষা, চলন, হাস্য, ভাষ্য উপবেশনাদি ব্যাপারেও আমাদের স্বাতন্ত্র্য

দূরীভূত হইয়াছে। জানিনা, এই ভীষণ কাল-প্রবাহ আমাদিগকে আরও কতকাল কত অধঃপাতের দিকে চালিত করিবে? অথবা কোনও অলৌকিক প্রভাব সম্পন্ন মহাপুরুষের অলঙ্ঘনীয় আদেশ প্রাপ্ত হইয়া আমরা পুনর্ব্বার নিজের নিজত্ব বুঝিতে সমর্থ হইব।

এই সার্ব্বজনীন অবনতি অজ্ঞাত সূত্রে ক্রমশঃই আমাদিগকে অধঃপাতিত করিতেছে অথচ আমরা এতই মোহাচ্ছন্ন যে নিজের দুর্গতির জন্য পদে পদে লাঞ্ছিত হইয়াও নিজেকে শিক্ষিত ও উন্নত বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছি না। বিগত ইউরোপীয় মহা সমরের জন্য আজ আমরা কি দুর্দ্দশাপন্ন তাহা সর্ব্বসাধারণেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন। এই সমর যদি আর কিছুকাল থাকিত তাহা হইলে বোধ হয় অচিরাৎ সমগ্র ভারতব্যাপী হাহাকার উপস্থিত হইত। অথচ এই যুদ্ধ উপলক্ষেই আজ জাপান ব্যবসা বাণিজ্যের মাহেন্দ্রক্ষণ প্রাপ্ত হইয়া নানা উপায়ে অজস্র অর্থ সঞ্চয় করিয়া দেশকে ধনশালী এবং সর্ব্বাংশে শ্রীসম্পন্ন করিয়া তুলিতেছে। যে সুযোগ আজ জাপান পাইয়াছে আমরা তাহা হইতে বঞ্চিত কেন? কে আমাদিগকে নিজদেশের—নিজ-সমাজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের পথে বাধা দিতেছে? পাঠক! একটু চিন্তা করিলেই এই প্রশ্নের মীমাংসা অতি সহজেই করিতে পারেন। আমরা নিজজাতীয়তার গৌরব পদদলিত করিয়া পরকীয় সামাজিকতা স্রোতে গাত্র ভাসাইয়া দিয়াছি। যাহা নিজস্ব ছিল তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি, অথচ যাহা পাইব বলিয়া দুরাশা করিয়াছিলাম তাহাও পাইতেছিনা, সুতরাং এ দুর্দ্দশা আমাদের স্বকৃতব্যাধি। নীতিবিৎ পণ্ডিত বলিয়াছেন "যোধ্রুবাণি পরি-ত্যজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবংনষ্টমেবহি"। তাই এখন আমরা আমাদের নিশ্চিত অনিশ্চিত যা কিছু সম্পত্তি ছিল সমস্তই হারাইয়া এখন অতীত বিষয়ের বৃথা অনুশোচনায় অনুতপ্ত হইতেছি। কিন্তু এই অনুতাপ যদি আন্তরিক হইত, যদি আমরা অনুতপ্ত আত্মাকে স্বকীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে গ্রহণ করিতাম, তবে বোধ হয় উহা বৃথা হইত না। অবশ্যই এতদিনে কোন একটা প্রতিবিধানের পথ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইতাম। অভাবের তাড়নায় মর্ম্মাহত হইয়া দেশের, সমাজের, আত্মীয়-স্বজনের দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা সময়ে সময়ে চপলার চমকের মত প্রতিবিধানকল্পে উদ্বুদ্ধ হই বটে, কিন্তু যোগ্যতার অভাবে সে উদ্বোধন উন্মত্তের প্রলাপবৎ কার্য্যকারী হয় না। শিক্ষাবিপর্য্যয়ে আমরা দৈশিক আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছি, চিরপ্রচলিত কর্ত্তব্যপথ ভ্রষ্ট হইয়া অপথে দিগ্‌ভ্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় ঘুরিতেছি, অথচ আত্মভ্রান্তি বুঝিতে পারিতেছি না। পাশ্চাত্য উন্নত প্রণালীর শিক্ষায় আমরা নিজেকে যথেষ্ট গৌরবান্বিত মনে করিতেছি, কেহ বৈজ্ঞানিক হইয়া রহস্যময় অভিনব প্রাকৃতিক-তত্ত্বের আবিষ্কার দ্বারা বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করিতেছি, কেহ বা ব্যবহারাজীব ভাবে স্বকীয় প্রতিভার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া যশস্বী ও অগণিত ধনশালী হইতেছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত, পুরাবৃত্ত প্রভৃতি নানা শাস্ত্রেই আমাদের দিন দিন অধিকার বাড়িতেছে,

এবং তাহাতে অর্থ সমাগমেরও সুযোগ ঘটিতেছে। কিন্তু এই শিক্ষাগৌরব বা ধন-সমাগমে আমাদের দেশের অথবা সমাজের প্রকৃত উপকার অথবা অপকার সাধিত হইতেছে তাহাই এখন পর্য্যালোচনার বিষয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার ক্রমবর্দ্ধিত প্রসারে দিন দিন আমাদের পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত স্বভাষশাস্ত্রা-ভ্যাস লোপ পাইতেছে। সনাতনী সর্ব্বসম্পত্তিময়ী সংস্কৃত ভাষা আজ অনাদরা হইয়া মৃতপ্রায় নামমাত্রে অবশিষ্ট আছে। সেই সিদ্ধ মহাত্মা মহর্ষিগণের, সিদ্ধান্ত জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, ক্রিয়াকলাপের শিক্ষাপ্রদানে সমগ্র বিশ্ববাসীর আদর্শস্থল, বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, পুরাণ, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা, জ্যোতিষ, গণিত, কাব্য, ইতিবৃত্ত প্রভৃতি পবিত্র শাস্ত্রনিচয় আজ আলোচনাভাবে নিপাতোন্মুখ। আজ আমরা সেক্স্‌পিয়র, মিল্‌টন রচিত কাব্য অধ্যয়নকরতঃ কালিদাস-ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিগণের কাব্য সমালোচনা করিতেছি। ইহা অপেক্ষা আত্মাবমাননা আর কি হইতে পারে? বিজাতীয় শিক্ষা যতই উন্নত হউক তাহা কখনই অন্য জাতির পক্ষে দেশ ও সমাজের গৌরব বর্দ্ধক হয় না। তাহাকে আদর্শ করিয়া শিক্ষিত হওয়া অশ্লাঘনীয় নহে, কিন্তু তাহার মোহে মুগ্ধ হইয়া তন্ময় হওয়া নিতান্তই কাপুরুষের লক্ষণ। শিক্ষিত হইয়া নিজেকে ও নিজের সমাজকে, নিজের দেশকে উন্নত কর, অনুসন্ধান দ্বারা আমাদের অগাধ শাস্ত্রসিন্ধু হইতে জ্ঞান বিজ্ঞান রত্নে ভূষিত হইয়া নিজেকে ও দেশকে সমুজ্জ্বল কর,—দেখিবে, যে শিক্ষার জন্য পরের দুয়ারে ভিখারীর মত ঘুরিতেছ তদপেক্ষা অনেক উন্নত শিক্ষণীয় বিষয় আমাদের শাস্ত্রে গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আলোচনায় জড়জগতের অনেক চমকপ্রদ ব্যাপার আবিষ্কৃত হইতেছে সত্য, কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখ এই গবেষণায় যথার্থরূপে দেশের বা সমাজের কি উপকার সাধিত হইতেছে? যদি কিছু হইয়া থাকে তাহাতেই বা আবিষ্কর্ত্তাদিগের কোন স্বাধীনতা আছে কি না? ভারতীয় উপাদান সম্ভার সাহায্যে পরমুখাপেক্ষী না হইয়া যদি এই আবিষ্কার হইত তবে চিরদিনের জন্য ইহা আমাদের একটী সম্পত্তিরূপে উপযোগী হইয়া থাকিত।

পরিতাপের বিষয় আমরা বুদ্ধিমোহে পরকে আপন করিয়া আপনাকে পর করিতেছি। পরের সাহায্য লাভে উত্থান করিব বলিয়া স্বইচ্ছায় খঞ্জ সাজিয়া বসিয়া আছি। কিন্তু কোন দেশেই কাহারও পরের দ্বারা উদ্ধার হয় না। যদি বাস্তবিক মাতৃভূমির প্রতি অনুরাগ থাকে,—যথার্থই নিজেকে, দেশকে, সমাজকে সমৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে জাতীয়ভাবে দেশের সেবা করিতে হইবে। তজ্জন্য পরের ভাষা, রীতি, নীতি প্রভৃতি শিক্ষা করা যাইতে পারে, কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে—তাহা আত্মশিক্ষার উপকরণ মাত্র,—প্রাণ নহে। আমরা বুদ্ধি ভ্রমে পাশ্চাত্য শিক্ষাস্রোতে অবশভাবে গা ঢালিয়া দিয়াছি,—পরিণামে কোন্ দশায় উপনীত হইব তাহা চিন্তা করি নাই, সুতরাং অবিবেকীর যাহা ক্রমফল তাহাই ভোগ করিতেছি।

ইংরেজ আমাদের রাজা, সুতরাং নানা

কারণে আমরা রাজভাষা শিক্ষায় বাধ্য। বিচার বিভাগ, ডাক বিভাগ, ব্যবসায় বিভাগ, বাণিজ্য-বিভাগ স্থাপত্য বিভাগ প্রভৃতি যে সমস্ত অবলম্বনে দেশীয় সহস্র সহস্র লোকের জীবিকা সম্পন্ন হইতেছে সে সমুদয় স্থলেই ইংরাজী ভাষা প্রচলিত। ইংরাজীভাষা আজ ভারতবাসীদের পরস্পর পরিচয়ের সাধারণ ভাষা স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ ভাবে পরস্পরের পরিচয়ের সুবিধা আমরা পূর্ব্বকালে কখনও প্রাপ্ত হই নাই, সুতরাং ইংরেজী শিক্ষা যে দেশবাসীর একান্ত আবশ্যক তাহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু ইংরেজী ভাষা শিখিতে হইলেই যে ইংরেজ হইতে হইবে, দেশীয় ভাষা ও রীতিনীতি পদদলিত করিতে হইবে, এ শিক্ষা অতি দূষণীয়—এই দোষেই আজ আমরা সমগ্র পৃথিবীমধ্যে অধঃপতিত ও পৌরুষহীন বলিয়া অবজ্ঞাত।

তাই বলিতেছি স্বদেশী ভ্রাতৃগণ! একবার অনুসন্ধানতৎপর হও, দেখ আমরা কোন উপায় অবলম্বনে সেই নিত্য শান্তিময় সনাতন শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া নিজেকে ও দেশকে উন্নত করিতে সমর্থ হইব। কিসে এই নিত্য দারিদ্র্যের করাল কবল হইতে দুর্গতি-পীড়িত দেশকে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইব। এরূপ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া আর সর্ব্বনাশ সাধন করিও না। দেশের জন্য, সমাজের জন্য বদ্ধপরিকর হও, উন্নত লক্ষ্যের অনুসরণ পূর্ব্বক হৃদয়ক্ষেত্রকে মার্জ্জিত করতঃ কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হও, নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

আমাদের দেশে বিদ্যার্জ্জন সময়ে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনের বিধি চিরকালই ব্যবস্থিত ছিল, মানস ক্ষেত্র হইতে কণ্টকবৃক্ষস্বরূপ বিষয়াস্তরের উচ্ছেদ করাই ঈদৃশ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। জমীকে উর্ব্বর করিয়া অধিক শস্যোৎপাদক করিতে হইলে যেমন তন্মধ্যস্থ আবর্জ্জনাদি উৎপাটন করিতে হয়, হৃদয়কেও সুপ্রশস্ত ও বিদ্যাসম্পন্ন করিতে হইলে তেমনি সংযমপ্রভাবে তন্মধ্য হইতে বিষয়ান্তর চিন্তা দূর করিয়া দিতে হয়। সংযমই শিক্ষার নিদান। ইহা ব্যতীত কোন শিক্ষাই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। সংযমে হৃদয়ের একাগ্রতা আনয়ন করে এবং একনিষ্ঠহৃদয় সত্বর ও সম্পূর্ণভাবে শিক্ষণীয় বিষয় অধিকার করিতে সক্ষম হয়।

বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে এই সংযমের সম্পূর্ণ অভাব পরিলক্ষিত হয়। ব্রহ্মচর্য্য দূরের কথা, আজকাল শিক্ষাকালে বরং তাহার বিপরীত ভাবই অধিকাংশ স্থলে প্রকাশ পায়। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মসমন্বয়, দৈশিক রীতিনীতির দোষগুণের সমালোচনা, স্বায়ত্তশাসন-গবেষণা প্রভৃতি গুরুতর বিষয়গুলি আজকাল ছাত্রদের মানসক্ষেত্রে অটল আসন সংস্থাপন করিয়াছে। প্রাচীনকালে অধ্যয়ন পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত গুরুগৃহে অবস্থান করিতে হইত। অনন্যমনা হইয়া আচার্য্যের উপদেশ ও আদেশের অনুবর্ত্তন করাই শিক্ষার্থীর জীবনব্রত ছিল, শিষ্যগণ শিক্ষণীয় বিষয় ব্যতিরিক্ত বিষয়ান্তর চিন্তার সময় ও সুযোগ প্রাপ্ত হইত না, কারণ অবশিষ্ট সময়ে আচার্য্যদেবের নিকট বা পরস্পরে শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে আলোচনায় অতিবাহিত করিতে হইত। কিন্তু এখন

আর ছাত্রদের সে বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। মাতৃ ক্রোড় ত্যাগ করিতে পারিলেই বালক স্বাধীন হইল। সম্পূর্ণ শিক্ষা কালটী যদৃচ্ছাক্রমে যাপন করার জন্য পরিণামে একটা বিকৃত কিমাকার শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, ঐ বালক কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। সে হাকিমই হউক, আর ব্যারিষ্টারই হউক বা পদগৌরবে যত বড় উর্দ্ধাসনেই আরোহণ করুক, কিন্তু তাহারই শিক্ষার ত্রুটীর জন্য পুরুষাকারের অভাব এ জীবনে আর পূর্ণ হইবার নহে। চিত্তের স্থিরতা, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, যথার্থ কর্ত্তব্যপরায়ণতা তাহার নিকট দুর্লভ। অসংযতভাবে উচ্ছৃঙ্খল অন্তঃকরণে যে শিক্ষাবীজ বপন করা হইয়াছে তাহার ফলও তদনুরূপ হইবে। যদি কদাপি কোনস্থলে ইহার বিপরীত ভাব দৃষ্টিগোচর হয়, তবে সে জন্মান্তরার্জ্জিত বিশেষ সুকৃতির ফলেই হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কিন্তু তাদৃশ স্থল অতি বিরল। ছাত্রজীবন স্বভাবতঃই চাপল্য পূর্ণ, বাধ্যতামূলক শাসনের বহির্ভূত থাকিলে কখনই অভিনিবেশ সহকারে বিদ্যার্জ্জনে নিযুক্ত থাকিতে চায় না। সময়ে সময়ে কেহ কেহ প্রবল প্রতিভা বলে এই সমস্ত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া, শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হইলেও শিক্ষাকালীন অসংযতভাবে অবস্থানের জন্য প্রাকৃতিক উন্নতিলাভে বঞ্চিত হয়, সুতরাং তাদৃশ শিক্ষার কোনই গৌরব নাই। যে বিদ্যার্জ্জনে মানব বিনয়, লোকহিতৈষিতা, নিরভিমানতা অর্জ্জন করিতে অক্ষম তাহা সুধাফল বর্জ্জিত, অসার। এই জন্যই এখন আমরা ঘরে ঘরে প্রচুর কৃতবিদ্য দেখিতে পাই, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষিত বিদ্বান্ অতি অল্পই দেখা যায়। বিদ্যা শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য জ্ঞানের প্রসার। জ্ঞানের প্রসারে মানুষ আত্মবোধ লাভ করতঃ যথার্থ মনুষ্যত্ব পাইতে সমর্থ হয়। আমাদের দেশে অতি পুরাতন কাল হইতে জ্ঞানোন্মুখী বিদ্যাই আদৃতা হইয়া আসিতেছিল। অথচ তাহাতে কর্ম্ম শিক্ষা বা জীবিকার্জ্জন স্বতঃসিদ্ধরূপে সম্পাদিত হইত। জ্ঞানমার্গে, আরোহণ করিতে হইলেই তাহাকে কর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে হইবে, আবার আর্থিক সাহায্য ব্যতীত কেহই কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হইতে পারেনা। সুতরাং এখন যে কর্ম্ম ও অর্থ বিদ্যার্জ্জনের মুখ্য ফল বলিয়া পরিগৃহীত, প্রাচীনকালে তাহা শিক্ষার আনুষঙ্গিক ফলমাত্র ছিল। অথচ এই অসার ফলের জন্য কেহই বিদ্যার উপাসনা করিত না। আবার সেইভাবে শিক্ষার গতি পরিবর্ত্তিত করিতে না পারিলে আমরা কখনই কোন প্রকারে উন্নত হইতে পারিব না। সেই ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন ব্যতীত উন্নত বিদ্যার্জ্জনের আশা অসম্ভব।

আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির অন্তরায়।

[প্রাপ্ত]

(শ্রীরমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন)।

ভাবিয়া পাই না যে, হিন্দুসর্ব্বস্ব আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার কেন উন্নতি হয় না। অনেক দিন হইতেই ভাবি, কিন্তু কিছুতেই মীমাংসা ঠিক করিতে পারি না। অনেক বিখ্যাত কবিরাজ মহোদয়গণের প্রবন্ধ পাঠ করি, চিকিৎসক মহোদয়গণের চিকিৎসা অর্থাৎ ব্যবস্থা দেখি, রোগ পরীক্ষা দেখি, ঔষধ নির্ব্বাচন দেখি, চিকিৎসা বা রোগ নির্ব্বাচনের সাফল্য দেখিয়া কিন্তু তৃপ্তি লাভ করিতে পারি না। অনেক সময়ে নিজেই "ইদমেব তত্ত্বং"—এই জন্যই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতি হয় না ভাবিয়া লই, কিন্তু পরক্ষণেই "ন জাতু কামঃ কামানা মুপভোগেন শাম্যতি" এই ভগবদ্ বাক্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি হওয়ায় আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইয়া দাঁড়ায়। আজ অনেক দিনকার দুঃখের কাহিনী—উন্মত্তের স্থির সিদ্ধান্ত, চিন্তান্তরের অপেক্ষা না করিয়াই লিখিয়া ফেলিলাম।

আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি চিকিৎসার সাফল্যে, "তেষাং সুখৈষিণাং রোগোপশমনার্থং আয়ুর্ব্বেদং শ্রোতুমিচ্ছামঃ।" ব্যাধির তত্ত্বজ্ঞান, এবং রোগোপশমই আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি। নানাবিধ উপাধিপ্রাপ্ত হইয়া, শ্বেত কৃষ্ণ অশ্বযানে আরোহণ করুন বা প্রাসাদ শিখরবাসীই হউন বা মোটর বিহারীই হউন আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি তাহাতে নির্ভর করে না—ইহাই আমার ধারণা।

অনেক ভাবিয়া আমি ইহাই ঠিক করিয়াছি যে, আমাদের দেশে যখন দেখির অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদের শল্যতন্ত্র, শালাক্যতন্ত্র, ভূত্য, অগদতন্ত্র প্রভৃতির চিকিৎসায় পারদর্শী আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চিকিৎসকের অপ্রতুল হয়, তখনই বুঝির আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে।

এমন বহু চিকিৎসক বঙ্গদেশে আছেন—যাঁহারা শাস্ত্রের ধারেন না, শারীরতত্ত্ব, শিরা, স্নায়ু মর্ম্ম, অস্থি স্থিতির জ্ঞানলাভ করেন নাই; অথচ শল্য চিকিৎসায় কতকটা সাফল্য লাভ করিয়াছেন, আবার এমনও বহু আছেন, যাঁহারা, কাশীরাজ সদৃশ বিদ্বান, শাস্ত্রজ্ঞ, রোগ নির্ব্বাচনে অসীম ক্ষমতা সম্পন্ন, কিন্তু সামান্য একটী বিস্ফোটক হইলেই তখন পাশ্চাত্য চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন কিম্বা একটী জ্বরের রোগী চিকিৎসা করিতেছেন তাহার একটী পক্কাপক্ক শোথ চিকিৎসা করিতে হইলেই অন্য চিকিৎসার আশ্রয় লইতেছেন, তাঁহাদের দ্বারা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার যে উন্নতি হইবে না ইহা সুনিশ্চিত। এখন অনেক চিকিৎসকও দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা পাণ্ডিত্যে সুরাচার্য্যকল্প, কিন্তু স্নেহপাক—এমন কি তৈল, ঘৃতের মূর্চ্ছাপাকটি পর্য্যন্ত জানেন না, সামান্য রস, গন্ধক শোধন করিবার সময়েও কর্ম্মচারীর উপদেশ অপেক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের দ্বারা যে আয়ু-

স্বদীয় চিকিৎসার উন্নতি হইবে না ইহাও ধ্রুব সত্য কথা। যখন দেখিব এই সমস্ত অভাব দূরীভূত হইয়া আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিত চিকিৎসক যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষারাগ্নি প্রণিধানে স্নেহ স্বেদাদি কার্য্যে সব্যসাচী তুল্য কর্ম্মী হইতেছেন তখনই বুঝিব আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির অন্তরায় দূর হইতেছে।

"এতত্ত্বাবয়বশো মধ্যেষু মধীত্যচ কর্ম্ম প্যাশ্চ্য-মুপাসিতব্যং।

"যস্তু কেবল শাস্ত্রজ্ঞঃ কর্ম্মস্ব পরিনিষ্ঠিতঃ।
সমুহ্য আতুরং প্রাপ্য প্রাপ্যভীরুরিবাহবং॥
"যস্তু কর্ম্মসু নিষ্ণাতো ধার্ষ্ট্যাচ্ছাস্ত্র-
বহিষ্কৃতঃ।
স সৎসু পূজাং নাপ্নোতি বধঞ্চার্হতি
রাজতঃ॥
উভাবেতা বনিপুণা বসমর্থৌস্ব কর্ম্মণি
অর্দ্ধবেদ ধরাবেতাবেকপক্ষা বিব দ্বিজৌ॥
স্নেহাদিষ্বনভিজ্ঞোয়শ্ছেদ্যাদিষু চ কর্ম্মসু।
স নিহন্তিজনং লোভাৎ কুবৈদ্যো
নৃপদোষতঃ॥

সুহৃদয় পাঠকমাত্রেরই ঋষি বাক্যের অনুশাসন ফল প্রতীয়মান হইতেছে। তাই বলি, যখন দেখিব অমরবৈদ্য অশ্বিনীকুমার, নরবৈদ্য চরক প্রভৃতির আদর্শে, প্রাচ্য-প্রতীচ্য পণ্ডিতের নিকট অবিরুদ্ধ জ্ঞানে শিক্ষা লাভ করিয়া অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের চিকিৎসক নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে বিরাজ করিতেছেন, তখনই বুঝিব আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির অন্তরায় অন্তর্হিত হইয়াছে।

যখন দেখিব ঋষি বাক্যের ফলশ্রুতি, অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইতেছে প্রত্যেক ঔষধের বা বনৌষধের ক্রিয়া প্রত্যক্ষীভূত হইয়া শিক্ষার্থীগণকে আনন্দিত করিতেছেন, তখনই বুঝিব—ইহার উন্নতির অন্তরায় দূর হইতেছে।

কোন একটী ঔষধের ফলশ্রুতি আছে,—
"জ্বরমষ্টবিধং হন্তি কাসশ্বাস হলীমকান্
শ্বযথুং পাণ্ডুরোগঞ্চ প্লীহগুল্মাদিকানিচ"

ঋষি বলিয়াছেন,—এই ঔষধে উক্ত ব্যাধি সমূহ বিনষ্ট হইবে। শিক্ষার্থী, বিদ্যার্থী, গুরূপ-দেশে যাহাই শিখুন, সেকথা পরে বলিতেছি,—কিন্তু অনুবাদের উপর নির্ভর করিয়া, যাঁহারা ইহাতে জীবিকার্জ্জন করেন, তাঁহারাই কি বুঝেন তাহাই কিন্তু প্রথম বিবেচনার বিষয়। এই ঔষধটী জ্বরাধিকারে আছে, কিন্তু যে কেবল গুল্মরোগী তাহাকে এই ঔষধের ফলশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া চিকিৎসা করিবেন কি না? অথবা জ্বর, কাস, শ্বাস, হলীমক, শোথ, পাণ্ডুরোগ, প্লীহা, গুল্ম এ সকলের একত্র সমাবেশ থাকিলে প্রত্যেকটির জন্য পৃথক পৃথক ঔষধ নির্ব্বাচন না করিয়া যদি এই একটী ঔষধের উপর নির্ভর করেন, তাহাতেই সুব্যবস্থা হইবে কিনা? অথবা উক্ত ব্যাধি সমষ্টির ব্যষ্টিক্ষেত্রেও ঐরূপ হইবে কিনা? না হইলে ঋষিরা কি বিজ্ঞান বহির্ভূত অজ্ঞের মত কতগুলি ফলশ্রুতি দিয়া "পঞ্চমীর ব্রতের সপ্তদ্বীপেশ্বরের পত্নীত্বলাভের ("পিবনিম্বং প্রদাস্যামি বালস্তে খণ্ড লড্ডুকান্") মত প্রলোভন দেখাইয়াছেন। যখন বুঝিব, এই সমস্ত আর্ষবাক্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া হিক্মিত ঔষধের দ্বারা, পল্লীতে পল্লীতে সুচিকিৎসক বিরাজ করিতেছেন, তখনই বুঝিব আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির অন্তরায় দূর হইতেছে।

সংগৃহীত পুস্তকের অন্যাধিকারের লক্ষ্মী-বিলাসে লেখা আছে "অস্য প্রসাদাৎ ভগবান্ লক্ষ্মণাবীযুবল্লভঃ।" বাস্তবিক লক্ষ্মীবিলাসের উপাদান মধ্যে বেঁড়লা, গোরক্ষ চাকুলে, শতমূল, ভূমিকুষ্মাণ্ড, বৃদ্ধদারক প্রভৃতি বাজীকারক ও রসায়ন দ্রব্যের সমষ্টি মিশ্রিত। ঐরূপ অবস্থায় ইহাতে ক্ষয় নিবৃত্তি করিয়া ইহা যে শ্রেষ্ঠ বাজীকারক ঔষধ হইবে এবং বয়ঃ সংস্থাপন, মেধা ও বলবৃদ্ধি হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু বলুন ত? কোনও চিকিৎসক মহোদয় কি ইহাদ্বারা ঐরূপ একটী রোগ আরোগ্য করিয়া, সম্পূর্ণ বা আংশিক ফললাভ করিয়াছেন? অনুমান করি কেহই করেন নাই। করিলেই বা কোনও শিক্ষার্থীকে উপদিষ্ট বা যোগ্য করিয়াছেন কি? অধিক কি অনেকে হয় ত বংশপরম্পরা প্রচলিত কোন কোন বনৌষধি দ্বারা অনেকে রোগ বিশেষে যে ফল লাভ করিয়াছেন বা নিজেদের গবেষণা দ্বারা চিকিৎসা ক্ষেত্রে যে ফললাভ করিয়াছেন তাহার গলিতাংশও কি কাহাকে দান করিয়াছেন? বরং এমনই গোপনে, উহা রক্ষা করিয়াছেন, যাহাতে নিজের পুত্রও পরিণামে পৈতৃক সম্পত্তিতে বঞ্চিত হয়। ইহার উদাহরণ আমি বহু জানি, সময়ে প্রকাশও করিব। এই জন্যই অতি দুঃখের সহিত বলিতে হয় যে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতির যে সকল অন্তরায় আছে তাহার মধ্যে ইহাই বিশিষ্ট কারণ।

ভারতের এমনই দুর্দ্দিন উপস্থিত যে, আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ অগদতন্ত্রের বিষ চিকিৎসা দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। এই বিষ বৈদ্যের লোপ ও আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির একটি বিশেষ অন্তরায়।

পাশ্চাত্য চিকিৎসাক্ষেত্রে চিকিৎসকগণ দূর হিমালয়ের উপত্যকা অধিত্যকায় পরীক্ষালব্ধ কোন একটী বনৌষধি লিপিবদ্ধ করিয়া যাহাতে সমগ্র পৃথ্বীবাসীর উপকার হয়, তজ্জন্য ভাষা হইতে ভাষান্তরে উহার পরিচয় প্রকাশ এবং তাহার প্রযুজ্য অংশ তরল বা চূর্ণ বা বটী প্রভৃতি নানারূপে প্রস্তুত করিয়া বিতরণ এবং বিক্রয় দ্বারা "[illegible] স্বর্গং যশস্য মায়ুষ্যং বৃত্তিকরঞ্চেতি"—বাক্যের সার্থকতা প্রত্যক্ষ করাইতেছেন। এমন কি, আমাদের দেশীয় পদদলিত, দূরীকৃত জঙ্গল বাশ হইতেও সংগৃহীত বনৌষধি বিদেশের বাহ্যিক চাকচিক্যে ভূষিত হইয়া আমাদেরই পল্লী-বিপণীর শোভা বৃদ্ধি করিতেছে, আর আমি আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চিকিৎসক হইয়া, পাড়ায় আমার হাতযশ, খ্যাতি প্রতিপত্তির পসার অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও আমার গৃহিণীর পীড়ার সময় পাশ্চাত্যদেশাগত সেই চাকচিক্য সম্ভার অশোকের দ্বারা শোক নিবারণের চেষ্টা করিতেছি। উন্নতির অন্তরায় আর কাহাকে বলে?

আমাদের দেশের চিকিৎসকেরা জীবনে যে সব কঠিন কঠিন ব্যাধি আরোগ্য করিয়াছেন বা করিতেছেন তাহার ক্রমিক ঔষধ প্রয়োগ, বা কোন্ ঔষধে কি পরিমাণে কি কি ক্ষেত্রে কি উপসর্গে ফললাভ করিলেন, বা বিফল হইলেন তাহা অন্য যে কাহাকেও জানিতে দেন না বরং যাহাতে অন্যে না জানিতে পারে তজ্জন্য যথাসম্ভব "গন্ধাধন চূর্ণকে, চন্দ্রচূড় চূর্ণ"

নাম দিয়া বা চন্দ্রপ্রভাকে সুধাংশু বটী ইত্যাদি করিয়া সাধারণ চিকিৎসকগণ যাহাতে ভ্রমে পড়েন তাহার জন্য চেষ্টা করেন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার ইহাই উন্নতির অন্তরায়।

কোন মহাত্মা হয়ত আমাতীসার রোগে, জরাধিকারের একটী ঔষধে সুফল প্রাপ্ত হইলেন কিন্তু তিনি রোগীর নিকট ব্যবস্থাপত্রে যে নাম লিখিলেন সেটী আমাতীসারেরই ঔষধ। কেননা অন্য চিকিৎসক দেখিলে কি বলিবেন এই ভয় এবং দ্বিতীয়তঃ লক্ষ্মীবিলাসে যে অতিসার আরোগ্য করিলেন ইহা অপরকে কেন শিখাইবেন, বরং যাহাতে লক্ষ্মীবিলাসের যে অতিসার নাশক ক্রিয়া আছে এবং তাহা প্রত্যক্ষ সত্য, সেটি যাহাতে অন্যে শিক্ষা প্রাপ্ত না হয় বা জানিতে না পারে তজ্জন্য শাস্ত্রবাক্যকে প্রলোভন বাক্য বা মিথ্যা ফলশ্রুতি ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। ইহাতেই বলি ইহাই আমাদের উন্নতির অন্তরায়। প্রত্যেক চিকিৎসকগণ যদি ঔষধের ক্রিয়ার সাফল্যলাভ করিয়া চিকিৎসা জগতে ব্যক্ত করেন তাহা হইলেই চিকিৎসার যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারে।

অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার এই জন্যই এত উন্নতি। যদি এই সমস্ত কারণকূট দূর হইয়া, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্বাঙ্গ শিক্ষা আমাদের দেশে বিস্তার লাভ করে শল্য, শালাক্য প্রভৃতি চিকিৎসার আমরা অনুরাগী হইতে পারি তবেই আবার আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি সম্ভবপর হইবে।

তবে সুখের বিষয় সংপ্রতি এই অন্তরায় অন্তর্হিতের পথও সুগম হইতেছে। যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষার, অগ্নিপ্রয়োগ, জলৌকা নিয়োগ, পঞ্চকর্ম্ম দ্বারা জরা ব্যাধিনাশের উপায়, প্রাচ্য পাশ্চাত্য সমন্বয়ে ঔষধের বীর্য্য রক্ষা প্রভৃতির সঙ্গে শিক্ষার উপায় হইয়াছে। কলিকাতার অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় তাহার আদর্শ। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আর্য্য গৌরব পুনরুদ্দীপ্ত করিতে, আর্যবাক্যের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতে, এই শুভক্ষণে, শুভ কার্য্যে সহরবাসী, মফস্বলবাসী মহিমান্বিত চিকিৎসক মহোদয়গণের সার্ব্বাঙ্গীন সহানুভূতি আবশ্যক। সমগ্র দেশবাসী, ভারতবাসী একনিষ্ঠ হইয়া এই পৈতৃক সম্পত্তি আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি কামনায় কায়মনোবাক্য দ্বারা ত বটেই কিছু কিছু যথাসাধ্য অর্থ দ্বারাও এই আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়কে চিরস্থায়ী যদি করিবার চেষ্টা করেন, তবেই ভারতে পুনর্ব্বার শল্য, শালাক্য, কায়চিকিৎসা প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ বিভূষিত চিকিৎসকগণ আবির্ভূত হইয়া উন্নতির অন্তরায়কে দূরীভূত করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

কিন্তু শুধু এই বিদ্যালয়ের উপরও নির্ভর করিলে চলিবে না। ভবিষ্যতে এই বিদ্যালয়ের আদর্শে মফঃস্বলেও যাহাতে শিক্ষালাভ হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে এ আশাও হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ রাখিতে হইবে। এই বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য যদি ভারতবাসীর মুষ্টিভিক্ষালব্ধ অর্থসাহায্য করা আবশ্যক হয়, তাহাও করিতে হইবে। রাজদ্বারে ভিক্ষা প্রার্থনায় কাতরকণ্ঠে রোদন করিতে হয়, তাহাও করিতে হইবে, স্বার্থত্যাগ করিয়া একনিষ্ঠ ভাবে বিদ্যালয়ের সেবা করিতে হইবে, তবেই এই বিদ্যালয়টীর অঙ্গ বৈকল্য দোষ অপগত হইয়া দৃঢ়পদে দাঁড়াইতে

পারিবে। তবেই সর্ব্বাঙ্গ শিক্ষা বিস্তার করিতে পারিবে, তবেই একদিন আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির অন্তরায় দূর হইবার ব্যবস্থা।

বাঙ্গালায় একটী কবিতা আছে,

"যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই
মিলিলে মিলিতে পারে অমূল্য রতন।

এখন যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে আমাদের মধ্যে মতদ্বৈধ হইলে চলিবে না, তাহাতে আয়ুর্ব্বেদ গৌরব খর্ব্বই হইবে। যাহাদের ধারণা আর্য্য চিকিৎসা যে অনভিজ্ঞনোচিত অবজ্ঞার বিষয়, আমাদের মতদ্বৈধ ঘটিলে তাহাদের সে ধারণা দৃঢ়মূল হইবে। নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করা হইবে। অনেক মহাত্মার হয়ত ধারণা থাকিতে পারে যে কবিরাজি শিক্ষা করিতে গিয়া আয়ুর্ব্বেদের অস্ত্র চিকিৎসা শিক্ষা করিতে যদি ডাক্তারেরই সাহায্য লইতে হয়, তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের সার্থকতা কি থাকিল। কিন্তু একথা আদৌ সঙ্গত নহে, কারণ বর্ত্তমান যুগে আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চিকিৎসা ব্যবসায়ী মহোদয়গণ, শিক্ষার অভাবে যন্ত্র, শস্ত্রাদির শিক্ষা দিতে অক্ষম, কাজেই পাশ্চাত্য চিকিৎসায় শিক্ষিত মহোদয়গণের সাহায্যে শল্যতন্ত্র সম্পূর্ণ শিক্ষা দিতে হইবে। তাহাতে দোষ কি? তাহাতে ভবিষ্যতে আর্য্যগৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিয়া পূর্ব্ব সমৃদ্ধিই বজায় থাকিবে।

শল্যতন্ত্র বক্তা ধন্বন্তরিই উপদেশ দিয়াছেন,

"অন্যশাস্ত্র বিষয়োপপন্নানাঞ্চার্থানামিহোপনিপতিতানামর্থবশাত্তেষাং তদ্বিদ্ভ্য এব ব্যাখ্যা মনু শ্রোতব্যঃ। কস্মাৎ ন হ্যেকস্মিন্ শাস্ত্রে শক্যঃ সর্ব্ব শাস্ত্রানামবরোধঃ কর্ত্তুং॥

এই চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রয়োজনবশতঃ অন্য শাস্ত্রের যে কথা বলা হইয়াছে, তাহাও তদ্বজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট ব্যাখ্যা শ্রবণ করিবে। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে তত্ত্বদর্শী আয়ুজ্ঞানসম্পন্ন, ঋষিগণ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও অন্যের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে, ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে অর্থাৎ শিক্ষা করিতে আদেশ করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় আমাদের যদি কিছু দিন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত চিকিৎসক মহোদয়গণের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, তাহাতে ঋষিমতের অবমাননা হইবে না, বরং তাহাকে স্তিমিত উজ্জল আলোকে দিগ বিভাষিত করিবে সন্দেহ নাই—

একংশাস্ত্র মধীয়ানো ন বিদ্যাচ্ছাস্ত্র
নিশ্চয়ং।
তস্মাদ্ বহুশ্রুতঃ শাস্ত্রং বিজানীয়া
চ্চিকিৎসকঃ॥
শাস্ত্রং গুরুমুখোদ্ গীর্ণমাদায়ো
পাস্য চাসকৃৎ।
যঃ কর্ম্ম কুরুতে বৈদ্যঃ
সবৈদ্যো হন্যেতু তস্করাঃ॥

রোগ আরোগ্য আয়ুর্ব্বেদের শক্তি।

(শ্রীরাজেন্দ্র কুমার মজুমদার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ)

আমাদের দেশে যখন বৈদেশিক চিকিৎসার প্রভাব বিস্তার হইতেছিল, তখন হইতে আমরা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাকে অগ্রাহ্য করিতে শিক্ষা করিয়াছি। অনেক সময় কিন্তু চিকিৎসা-বিভ্রাটের দরুণ রোগীর পঞ্চত্ব পর্য্যন্ত ঘটিতে দেখা যায়। আমি আজ দু' একটী রোগীর রোগ বিবরণ প্রদান করিতেছি,—আয়ুর্ব্বেদের মহত্ব প্রচার বিষয়ে সহায়তা করিতেছি বলিয়া মনে করিব। কিছুকাল যাবত আয়ুর্ব্বেদের প্রসার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হইয়াছে, মধ্যযুগে এমনটী ছিল না, তখন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণকে বিশেষভাবে অগ্রাহ্য করা হইত। এখন লোকের মন হইতে সেই ভাব দূরীভূত হইলেও কতিপয় বিশেষ বিশেষ রোগ আরোগ্য করণের অদ্ভুত শক্তিতে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার বিলক্ষণ প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা শিশুকাল হইতে দেখিয়া আসিয়াছি আমাদের বাড়ীতে কবিরাজ ও ডাক্তার থাকিতেন, তখন হোমিওপ্যাথির এমন আদর ছিল না। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক পাড়াগাঁয় কেন, সহরেও মিলিত না। এখন. দুইখানি কেতাব, একটা বাক্স ও কয়টা ক্ষুদ্র শিশি হইলেই হোমিওপ্যাথ হওয়া চলে, যাহাদের অন্য কোন গতি নাই, তাহারাই পাড়াগাঁয়ে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার সাজেন। কিছুনা বুঝিলেও তাঁদের একটা থার্ম্মমেটার ও একটা ষ্টেথিসকোপ চাই।

আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা একবার পীড়িত হইল,—সে অনেকদিনের কথা। তাহার বয়স তখন প্রায় দশ বৎসর, রোগ জ্বর, প্লীহা ও যকৃতের দোষ বর্ত্তমান। বাড়ীর ডাক্তার দেখিতেন, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঔষধ পড়িত, বাড়ীর ডাক্তার রোগের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া পরাস্ত হইলেন, রোগী ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িল। অন্যত্র হইতে ডাক্তার আনিয়া দেখান গেল, ঔষধ ও পথ্যের পরিবর্ত্তন হইল। পথ্য ও ঔষধ তেজস্কর, কিন্তু রোগী একবারে দুর্ব্বল। রোগী কৃশ, কিন্তু উদরের পীড়া ও শোথ ধরিয়া রোগী একবারে বৃহৎকায় হইয়া পড়িল। তাহার চোখ, মুখ একবারে একাকার হইয়া গিয়াছিল, হাত, পা প্রকাণ্ড, চেনা যাইত না, দেখিলে ভয় হইত, রোগীর সেই ভীষণ চেহারা এখনও মনে হইলে বুক কাঁপিয়া উঠে। রোগীর এই অবস্থায় আমরা একবারে তাহার জীবন সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িলাম। সকলেই একবারে আশা ছাড়িয়া দিয়াছে। আমাদের বাড়ীতে ৺রূপচন্দ্র দাস নামে একজন প্রাচীন কবিরাজ থাকিতেন, তিনি বিখ্যাতনামা কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় ৺বিজয়রত্ন সেনের দাদাশ্বশুর। কবিরাজ মহাশয় আমাদের বাড়ীতে পঞ্চাশ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল ছিলেন। মা তাহাকে আর বাঁচাইতে পারিলেন না বলিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। কবিরাজ মহাশয়ও রোগী দেখিতেন, কিন্তু তিনি

ডাক্তারও ডাক্তারী ঔষধের নিন্দা করিতেন। ডাক্তার আসিলে তিনি বাহির বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন ও দুঃখ প্রকাশ করিতেন। রোগীর আশা ছাড়িয়া একদিন মা, কবিরাজ মহাশয়কে ডাকিয়া কহিলেন—"কবিরাজ রোগীর আশা ছাড়িয়াছি, এখন তুমি একবার শেষ দেখা দেখ।" কবিরাজ মহাশয় বলিলেন "এখন শেষ সময় আমাকে কেন? আগে বলিলে হয়ত রোগীর এমন দশা হইত না। আমি বলিয়াছি কেহ আমার কথা গ্রাহ্য করে নাই। যদি উহার আয়ু থাকে, তবে আমার ঔষধে ভাল হইবে, বিশ্বাস করি।" সকলেই তাঁহার চিকিৎসাধীন হইতে মত প্রকাশ করিলেন। কবিরাজ মহাশয় ঔষধ দেওয়া আরম্ভ করিলেন। পথ্য একবারে বদলাইয়া গেল। তিনি বলকর ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন না, সমস্ত শরীরে ছাই মাখাইয়া থাকার ব্যবস্থা হইল। ঔষধে ক্রমে শোথ কমিয়া আসিতে লাগিল, উদরের পীড়াও সারিয়া আসিল, অতি অল্প দিনেই এইরূপ অভিনব পরিবর্ত্তন দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন। কিছুদিন পরে জ্বর সারিয়া গেল। রোগী যখন হাঁটিতে আরম্ভ করিল, তখন সকলের মনেই আনন্দের সঞ্চার হইল, সকলে আয়ুর্ব্বেদের শক্তি দেখিয়া কবিরাজ ও তাঁহার ঔষধের শত মুখে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আমার সেই ভ্রাতা এখন রেঙ্গুন চিফ্ কোর্টের উকীল। যদি তাহাকে ডাক্তারের হাতেই রাখা যাইত তবে আর তাঁহাকে পাইতাম না। আমাদের কবিরাজ মহাশয় ডাক্তারের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কখনো চিকিৎসা করিতেন না। তিনি ডাক্তারদিগকে যমকিঙ্কর বলিতেন। বাস্তবিক ডাক্তারী চিকিৎসা যে কোন কার্য্যের নহে এ কথা আমরা বলিতে পারি না, সকল অবস্থায়, সব সময়, সব রোগীতে ডাক্তারী ঔষধে কাজ হয় না—বরং কোন কোন স্থলে বিষবৎ ক্রিয়া করে।

একবার আমার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে, সেই সময় আমি পড়া ত্যাগ করি। ময়মনসিংহের সিবিলসার্জ্জন ও তাঁহার অধীনে একজন ডাক্তার আমার চিকিৎসা করেন, ফলের বেলায় যখন অপক্ক রম্ভা—তখন ময়মনসিংহের শ্রেষ্ঠ কবিরাজের হাতে পড়িলাম, কিন্তু আমাদের বাড়ীতে একজন হাতুড়িয়া গোছ কবিরাজ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি জেদ করিয়া কহিলেন আমাকে ভাল করিবেন। তিনি বিশিষ্ট খ্যাতিসম্পন্ন কবিরাজ ৺গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের কাছে কবিরাজী পড়িয়াছেন বলিলেন, আমরা তাহা বিশ্বাস করিলাম না, তথাপি তাঁহার হাতেই আমার চিকিৎসার ভার পড়িল। ডাক্তার যেরূপ পথ্য ও উত্তেজক ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তিনি তাহা উল্টাইয়া দিলেন। ডাক্তার মানসিক দুর্ব্বলতা বলিয়া মাথায় শৈত্য ক্রিয়াও পুষ্টিকর পথ্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু কবিরাজ তাহা উল্টাইয়া মাথায় গরম অর্থাৎ মাষকলাইয়ের স্বেদ ও সাধারণ পথ্যের সঙ্গে মাখন খাওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। মাথায় দু'বেলা আয়ুর্ব্বেদীয় তৈল ও ঘৃতের ব্যবস্থা করিলেন। আমি অচিরেই ভাল হইয়া গেলাম। আমার পূর্ব্ব জ্ঞান আসিয়া পড়িল, আমি তখন লোক চিনিতে পারিতাম। বোধ হয় মাথায় ধোঁয়া জমিয়াই ঐরূপ হইয়া

থাকিবে। কবিরাজ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—কফ-বায়ুর বিকার।

আমার একজন হিন্দু প্রজার পুত্রের অন্নবিকার হয়, গ্রাম্য ডাক্তার আনা হইল। তাহার বাড়ী আমার বাড়ী হইতে একমাইল। ডাক্তার বলিলেন,—রোগী অচিরেই মারা যাইবে, ধন্বন্তরিরও অসাধ্য রোগী। ডাক্তার আসিয়াছিলেন আমারই হাতীতে, গেলেনও তাহাতেই। ডাক্তার চলিয়া গেলে রোগীর পিতা আমার বাড়ী কবিরাজের নিকট দৌড়িয়া আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—"কবিরাজ মহাশয় ইহাকে বাঁচাইয়া দিন, যেমন করিয়া পারি আপনাকে খুসী করিব। আমি গরীব, যে কিছু টাকা ছিল সহরের ডাক্তারকে দিয়া বিদায় করিয়াছি।" ফলে অনেক স্থলেই দেখা যায়, ডাক্তারকে টাকা কড়ি দিয়া ফোত হইয়া তখন সামান্য পয়সায় কবিরাজ-দেখায় ও সে গরীব সাজে। যাহাহউক আমিও প্রজাটির অনুরোধে কবিরাজ সহ তাহার বাটীতে গেলাম। রোগী দেখিয়া কবিরাজ মহাশয় কহিলেন—"যমের সাধ্য নাই এ রোগী নিতে পারে, তবে ঔষধ ও শুশ্রূষা যদি রীতিমত হয়।" এই সময় তাহারা খুব সাহস পাইয়া কবিরাজী ঔষধ দিতে প্রস্তুত হইল। কবিরাজ মহাশয় সর্ব্বপ্রথমেই সূচিকাভরণের ব্যবস্থা করিলেন। মাথার চুল কাটিয়া মাথার তালুতে রক্ত বাহির করিয়া ঔষধ বসাইয়া দিয়া শুশ্রূষার কথা বলিয়া দিলেন। পথ্যের ব্যবস্থা অদ্ভুত। দধি-ঘোল আর ডাবের জাড়। ক্রমে রোগী ভাল হইয়া উঠিল, সে কবিরাজ ও রোগী এখনও বাঁচিয়া আছেন।

বিলাতী বা বৈদেশিক ঔষধ ও পথ্য আমাদের সহ্য হইবার নহে। ইহা সে দেশীয় লোকের জন্য সে দেশের ঔষধ। শীতপ্রধান দেশের উগ্র ঔষধে আমাদের উপকার না করিয়া অপকারই করে। তবে কোন কোন অবস্থায় ডাক্তারী ঔষধ যে ফলপ্রদ সে কথা অস্বীকার করি না। সালসায় আমাদের যে কাজ না করে, তোপ্‌চিনী তদপেক্ষা বেশী কাজ করিয়া থাকে ইহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তোপচিনীর রোগীও অনেক আমি দেখিয়াছি, সালসার রোগীও বহুতর দেখিয়াছি। সালসা অপেক্ষা তোপচিনীতে খরচও কিছু কম পড়ে। কবিরাজী চ্যবনপ্রাশ—ডাক্তারী কড্‌লিভার অয়েল অপেক্ষা অনেক কার্য্যকারী। আমরা এমনই হইয়া পড়িয়াছি যে, চ্যবনপ্রাশকে দূরে রাখিয়া কড্‌লিভার অয়েলেরই আদর করিয়া থাকি। এক মকরধ্বজের মত কোন ঔষধই কোন চিকিৎসাশাস্ত্র বাহির করিতে পারিল না। আর কত কহিব, আয়ুর্ব্বেদের সকল ঔষধই যে ফলপ্রদ তাহা বলা বাহুল্য। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধগুলি আমাদের দেহের উপযোগী ও শরীরের পক্ষে হিতকর। আমাদের বিকৃত বুদ্ধি দূর হইলে আয়ুর্ব্বেদের আদর আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। দেশে যেমন হাওয়া বহিতেছে তাহাতে মনে হয় অচিরেই আয়ুর্ব্বেদ পূর্ব্বের ন্যায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইবে। উল্লিখিত প্রকারের দৃষ্টান্ত দ্বারা অনেক কথা বলা যাইতে পারে, কিন্তু বাহুল্যভয়ে ও প্রবন্ধ বিস্তৃতির আশঙ্কায় তাহা লিখিতে বিরত রহিলাম।

৩—শ্রাবণ।

শারীর বিদ্যা।

সন্ধি ও স্নায়ু।

(মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এল,এম, এস)

সন্ধি*—অস্থির সহিত অস্থির সংযোগকে সন্ধি বলে। এই সংযোগে অস্থিগুলি সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকে, জুড়িয়া এক হইয়া যায় না। শরীরে কেবল যে অস্থির সন্ধিই আছে তাহা নহে—পেশী, শিরা, স্নায়ু প্রভৃতিরও সন্ধি আছে। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে সন্ধি বলিতে কেবল অস্থিসন্ধিই বুঝায়। পেশী, শিরা প্রভৃতির সন্ধি অসংখ্য†। এই জন্য সেগুলির পৃথক বর্ণনা করা হয় না।

সন্ধি প্রধানতঃ দুইপ্রকার—চেষ্টাবান্ বা সচল এবং স্থির বা অচল। যে সন্ধির অস্থিগুলি চালনা করিতে পারা যায়, তাহাকে চেষ্টাবান্ বা সচল সন্ধি বলে—যেমন হস্তপদাদির সন্ধি। আর যেরূপ সন্ধি ঘটিলে অস্থিগুলির চালনা করিতে পারা যায় না, তাহাকে স্থির বা অচল সন্ধি বলে—যেমন মস্তকের কপালাস্থিগুলির সন্ধি।

সচল সন্ধি আবার দুই প্রকার—বহুচল, যেমন হস্তপদাদির সন্ধি এবং অল্পচল—যেমন পৃষ্ঠবংশের সন্ধি। সুতরাং সন্ধিগুলিকে বহুচল, অল্পচল এবং অচল এই তিন শ্রেণীতেও বিভক্ত করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে শাখাসমূহে ও অধোহনুকোটীতে বহুচল, পৃষ্ঠবংশাদিতে অল্পচল এবং অন্যত্র অচল সন্ধি আছে।

সচল সন্ধিস্থলে দুই বা তিন খানি অস্থি ঘন ও মসৃণ শণরজ্জুবৎ স্নায়ু দ্বারা বা কোষাকার স্নায়ু দ্বারা পরস্পর অবদ্ধ থাকে‡। অস্থি সকলের সন্ধের অংশ তরুণাস্থি দ্বারা আবৃত এবং শ্লেষ্মধরাকলাসমাচ্ছন্ন থাকে। এজন্য অস্থিগুলি সন্ধির মধ্যে ঘষিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না এবং সুচারুরূপে খেলিতে পারে। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, চক্রের অক্ষ বা চক্রমধ্যস্থ দণ্ড তৈলাভ্যক্ত থাকিলে চক্র যেমন সুচারুরূপে ঘুরিতে পারে, সন্ধিসকল সেইরূপ শ্লেষ্মলিপ্ত থাকায় সুচারুরূপে চালিত হইয়া থাকে*।

অচল সন্ধিসমূহ কোথাও স্নায়ুজাল দ্বারা আবদ্ধ, কোথাওবা দুইখানি অস্থির প্রান্তধারাদ্বয়ের সম্মিলনে নির্ম্মিত। অপ্রয়োজন হেতু এই সকল সন্ধিতে তরুণাস্থি বা শ্লেষ্মধরা কলা থাকে না।

সুশ্রুত বলিয়াছেন—"আকৃতি ভেদে সন্ধি সকল আট প্রকার, যথা—কোর, উদূখল,

---

* ইং—Joint, Articulation—জয়েণ্ট, আর্টিকুলেশন।

† অস্থ্নান্তু সন্ধয়ো হ্যেতে কেবলাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
পেশী-স্নায়ু-শিরাণান্তু সন্ধিসংখ্যা ন বিদ্যতে॥
সুশ্রুত, শারীরস্থান, ৫ অঃ।

‡ স্নায়ু অর্থে Nerve নহে, Ligaments এবং Tendons—ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

* স্নেহাক্তাক্ষে যথা চক্রং সাধু প্রবর্ত্ততে।
সন্ধয়ঃ সাধু বর্ত্তন্তে সংশ্লিষ্টাঃ শ্লেষ্মণা তথা॥
সুশ্রুত, শারীরস্থান, ৫ অঃ।

সামুদ্গ, প্রতর, তুন্নসেবনী, বায়সতুণ্ড, মণ্ডল ও শঙ্খাবর্ত্ত। তন্মধ্যে অঙ্গুলি, মণিবন্ধ, গুল্ফ, জানু ও কূর্পরে কোর; কক্ষ, বঙ্ক্ষণ ও দন্তমূলে উদূখল, স্কন্ধ, যোনি ও নিতম্বে সামুদ্গ; গ্রীবা ও পৃষ্ঠবংশে প্রতর; মস্তক, কটী ও কপালে তুন্নসেবনী; চোয়াল ও উরুতে বায়সতুণ্ড; কণ্ঠনলীতে মণ্ডল এবং কর্ণে শঙ্খাবর্ত্ত সন্ধি আছে।" প্রত্যেকের বিষয় পৃথক্‌ভাবে লিখিত হইতেছে।'

কোর—নামক সন্ধিগুলি বহুচল অর্থাৎ খুব খেলে। একখানি অস্থির কোর অর্থাৎ গর্ত্তের ন্যায় আকার বিশিষ্ট খাতের মধ্যে অপর একখানি অস্থির উন্নতভাগ প্রবিষ্ট হইয়া এই সকল সন্ধি নির্ম্মিত হয়। খল্লকোর, পরস্পরকোর, চক্রকোর এবং সন্দংশকোর ভেদে কোরসন্ধি চতুর্ব্বিধ দেখা যায়। (ক) একখানি অস্থির খলের ন্যায় গভীর খাতের মধ্যে অপর একখানি বা ততোধিক অস্থির অগ্রভাগ প্রবিষ্ট হইয়া এইরূপ সন্ধি নির্ম্মিত হয়। খলের মধ্যে নোড়ার ন্যায় এই সন্ধির অস্থিগুলি প্রধানতঃ অগ্রপশ্চাৎ দুইদিকে মাত্র খেলে; মণিবন্ধ এবং গুল্ফে 'খল্লকোর'† সন্ধি আছে। (খ) দুইখানি অস্থির ঘোড়ার জিনের ন্যায় সন্ধের অংশদ্বয় পরস্পর সংযুক্ত হইলে তাহাকে 'পরস্পরকোর'‡ বলে। অঙ্গুষ্ঠমূলে এইরূপ সন্ধি আছে। (গ) যে সন্ধিতে এক অস্থির গোলাকার গর্ত্তের মধ্যে অপর অস্থির উন্নত কীলাকার অংশ প্রবিষ্ট হইয়া ঘুরিতে পারে, তাহাকে "চক্রকোর" * বলে। প্রথমা গ্রীবাকশেরুকার সহিত দ্বিতীয়া গ্রীবাকশেরুকার এইরূপে সন্ধি আছে সেই জন্য আমরা ঘাড় ঘুরাইতে ফিরাইতে পারি। (ঘ) যে সন্ধিতে সাঁড়াশির ন্যায় মুখ বিশিষ্ট অস্থির মধ্যে অপর অস্থির অংশ প্রবিষ্ট হইয়া ঘুরিতে পারে তাহাকে 'সন্দংশকোর' † বলে। কনুইয়ের সন্ধি এইরূপ।

উদূখল সন্ধি ‡—কোন অস্থির উদূখলের ন্যায় গভীর খাতমধ্যে অন্য অস্থির মুণ্ড প্রবিষ্ট হইয়া যে সন্ধি নির্ম্মিত হয় তাহাকে 'উদূখল সন্ধি' বলে। কক্ষ এবং বঙ্ক্ষণের সন্ধি এইরূপ। দন্ত সকলের অগ্রভাগ হনুস্থির গভীর খাতে প্রবিষ্ট বলিয়া ঐ সকল সন্ধিকেও উদূখল সন্ধি বলা যায়। কিন্তু ঐ সকল উদূখল সন্ধি অচল।

সামুদ্গ—দুই বা ততোধিক অস্থির দৃঢ়সংযোগে একটি সমুদ্গ বা সম্পুট (কৌটা বা বাটির মত) নির্ম্মিত হইলে সেই সন্ধিকে 'সামুদ্গ' বলা যায়। শ্রোণিতচক্র প্রভৃতিতে এইরূপ সন্ধি আছে। এই সকল সন্ধি অল্পচেষ্ট অর্থাৎ কম খেলে।

প্রতর §—দুইখানি অস্থির সমতল অংশ পাশাপাশি ভাবে বা উপর্য্যুপরি সংহিত হইলে তাহাকে 'প্রতরসন্ধি' বলে। চলপ্রতর যুক্তপ্রতর এবং দৃঢ়প্রতর ভেদে ইহা তিন প্রকার। তন্মধ্যে চলপ্রতর সন্ধির মধ্যে শ্লেষ্মাধরা কলার ব্যবধান থাকে। করপদের কূর্চ্চাস্থিসমূহের পরস্পরসন্ধি এইরূপ। দুইখানি অস্থি মধ্যস্থলে স্নায়ুরজ্জু বা দৃঢ় কলার দ্বারা সংযুক্ত হইলে তাহাকে 'যুক্তপ্রতর' বলে। জঙ্ঘাস্থিদ্বয়ের মধ্যে ও প্রকোষ্ঠের

† ইং—Condyloid—কন্‌ডাইলয়েড।
‡ ইং—Saddle—স্যাডল।

* ইং—Pivot Joint—পিভট জয়েণ্ট।
† ইং—Gyinglymus—গিংগ্লিমস্।
‡ ইং—Enarthrosis (Ball and socket joint) এনারথ্রোসিস্।
§ ইং—Arthrodia—আর্থ্রোডিয়া।

দুইখানি অস্থির মধ্যে এইরূপ সন্ধি আছে। সমজাতীয় অস্থিগুলি মধ্যবর্ত্তী তরুণাস্থি দ্বারা পরস্পর দৃঢ়রূপে সংযুক্ত হইলে তাহাকে দৃঢ়-প্রস্তর বলে। পৃষ্ঠাংশের কশেরুকাগুলি এইরূপে সন্ধিযুক্ত।

তুন্নসেবনী*—করাতের দাঁতের ন্যায় ধার বিশিষ্ট প্রান্তদ্বারা দুইখানি অস্থি পরস্পর সংযুক্ত হইয়া সেলাই করার ন্যায় দেখাইলে উক্ত সন্ধিকে 'তুন্নসেবনী' বলে। সীমন্তসেবনী এবং গ্রন্থসেবনী ভেদে ইহা দুই প্রকার দেখা যায়। তন্মধ্যে মস্তকের কপালাস্থি সমূহে 'সীমন্তসেবনী' এবং সীরিকা ও জতুকাস্থির সংযোগ স্থলে 'গ্রন্থসেবনী' সন্ধি আছে। যৌবনের পূর্ব্বে শ্রোণিফলকের তিনটী অংশের মধ্যে তুন্নসেবনী সন্ধি থাকে। আয়ুর্ব্বেদে সীমন্তসেবনী 'সীমন্ত' নামে অভিহিত।

বায়সতুণ্ড—কোন অস্থির কাক-চঞ্চুবৎ অংশের মধ্যে অপর অস্থির অংশবিশেষ শিথিলভাবে সংহিত হইলে তাহাকে 'বায়সতুণ্ড' বলে। শঙ্খাস্থির সহিত অধোহনুর সন্ধি এইরূপ। এই সন্ধি এক প্রকার কোরসন্ধি হইলেও ইহা চেষ্টাবহুল বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে পৃথক্ বর্ণিত হইয়াছে।

মণ্ডল ও শঙ্খাবর্ত্ত—শ্বাসপথের তরুণাস্থি সমূহে 'মণ্ডল' এবং কর্ণ-শষ্কুলীনির্ম্মাণকারী তরুণাস্থি সমূহে 'শঙ্খাবর্ত্ত' সন্ধি দেখা যায়। কিন্তু উহারা তরুণাস্থির সন্ধি বলিয়া পাশ্চাত্যগণ উহাদিগকে অস্থি-সন্ধি মধ্যে গণনা করেন না।

সচল সন্ধিসমূহে চারিটী পদার্থ বিশেষ দ্রষ্টব্য, যথা—অস্থির সন্ধের অংশ, সন্ধির মধ্যস্থিত তরুণাস্থি, স্নায়ু এবং শ্লেষ্মধরা কলা। তন্মধ্যে—

(১) অস্থির সন্ধের অংশ দৃঢ় ও চিক্কণ অস্থিময় এবং সন্ধান স্থলে সুমসৃণ তরুণাস্থি-পত্র দ্বারা আবৃত।

(২) সন্ধিস্থলে অবস্থিত তরুণাস্থি-সকল দুই প্রকার—'সন্ধিবেষ্টক' এবং 'সন্ধ্যান্তরাল'। তন্মধ্যে সন্ধিবেষ্টক তরুণাস্থিগুলি অস্থির সন্ধের অংশ আচ্ছাদন করিয়া থাকে এবং সন্ধ্যান্তরাল-গুলি দুইখানি অস্থির সন্ধের অংশের মধ্যস্থলে পৃথক্ ভাবে থাকে।

(৩) স্নায়ুসমূহ তিন প্রকার—রজ্জুরূপ কোষরূপ, এবং কলারূপ। তন্মধ্যে রজ্জুরূপ স্নায়ুসকল সন্ধির মধ্যে ও চারিদিকে পৃথক্ ভাবে অবস্থিতি করে। কোষরূপ স্নায়ু সকল কোষের ন্যায় সমগ্র সন্ধিটীকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে। অনেক পেশীর কণ্ডরা সন্ধি-সংযোজনী স্নায়ুর সহিত অভিন্নভাবে মিশিয়া যায়। কলারূপ স্নায়ু সকল কলা বা ঝিল্লীর ন্যায় দুইখানি অস্থির অন্তরালে বিস্তৃত থাকে, যথা—জঙ্ঘান্তরালা কলা।

পূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদোক্ত চারিপ্রকার স্নায়ুর বিষয় বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রতানবতী স্নায়ুই অস্থির বন্ধন স্বরূপ বলিয়া এই অধ্যায়ে উহাদের বিষয়ই উল্লেখ করা যাইবে। অন্যান্য স্নায়ু পেশী ও আশয় বর্ণন প্রসঙ্গে বর্ণনীয়।

স্নায়ু শ্বেত ও পীত এই দুই প্রকার বর্ণ-বিশিষ্ট দেখা যায়। তন্মধ্যে কশেরুকাচক্রের মধ্যবর্ত্তী স্নায়ুসমূহ ও গ্রীবাধরা স্নায়ু পীতবর্ণ এবং অত্যন্ত স্থিতিস্থাপকগুণবিশিষ্ট। অন্যান্য স্থানের স্নায়ু শুভ্র।

* ইং—Schindylosis—শিন্ডিলোসিস্।

(৪) শ্লেষ্মধরা কলা*—সচল সন্ধি-সমূহের অস্থিদ্বয়ের মধ্যে এক একটী তরল পিচ্ছিল পদার্থ ('শ্লৈষ্মিক শ্লেষ্মা'†) পূর্ণ কলাময় কোষ থাকে। ঐ কোষের উভয় দিক্ অস্থিদ্বয়ের সন্ধেয় অংশগুলিকে সম্পূর্ণভাবে আবৃত করিয়া রাখে। শ্লেষ্মধরা কলা হইতে নিয়ত, 'শ্লৈষ্মিক' শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া সন্ধিস্থানকে আর্দ্র রাখে বলিয়া সন্ধিস্থান বেশ খেলিতে পারে এবং ঘর্ষিত হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না।

শ্লেষ্মধরা কলা তিনপ্রকার—সন্ধ্যন্তরীয়, কণ্ডরানুগা এবং ত্বকের নিম্নস্থ। সন্ধ্যন্তরীয় কলা অস্থিসন্ধির মধ্যে থাকে। কণ্ডরানুগা কলা চলনশীল কণ্ডরাসমূহকে বেষ্টন করিয়া থাকে। ত্বক্‌নিম্নস্থ কলা কেবল ত্বকের দ্বারা আবৃত অস্থিসমূহের উপরে—অস্থি ও ত্বকের মধ্যে অবস্থিতি করে। ইহাদের বিষয় পেশী ও অস্থিবর্ণনে দ্রষ্টব্য। সন্ধিপ্রসঙ্গে কেবল সন্ধ্যন্তরীয় কলার বিষয় বর্ণিত হইবে।

অচল সন্ধিসমূহে প্রয়োজনাভাব হেতু শ্লেষ্মধরা কলা থাকে না—তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

সন্ধিবর্ণনা।

সন্ধিসকলের স্থান, সংস্থান ও চেষ্টাদি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য এবং বিশিষ্ট সন্ধির প্রতীকারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সন্ধিসমূহের বিষয় অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। তজ্জন্য সংক্ষেপে সন্ধি সকলের বিষয় কথিত হইতেছে। উভয় দিকের অস্থির বা অস্থির অবয়বের সংযোজন করে বলিয়া সন্ধিবন্ধনী স্নায়ুগুলির নামও সেই অস্থিগুলির নামানুসারে কল্পিত হয়। কখন কখন কার্য্যানুসারেও সংজ্ঞা হইয়া থাকে। বাহুল্য ভয়ে সকল স্থলে স্নায়ুগুলির নাম লেখা হইবে না।

মস্তকের সন্ধি।

বর্ণনার সুবিধার জন্য প্রথমে মস্তকের সন্ধি হইতে আরম্ভ করা যাইতেছে। শিরঃসন্ধির অন্যান্য অচল সন্ধিগুলির বিষয় সমগ্র করোটি বর্ণনকালে বলা হইয়াছে। এইস্থলে কেবল 'অধোহনুসন্ধান' 'শিরোগ্রীব সন্ধান' নামে দুইটী সন্ধির বিষয় বলা হইবে।

অধোহনুসন্ধান—অধোহনুর দুই মুণ্ড দুইটী শঙ্খাস্থির স্থালকদ্বয়ের সহিত সন্ধিযুক্ত হইয়া থাকে। এই সন্ধিদ্বয়কে আশ্রয় করিয়া অধোহনু নীচে ও উপরের দিকে যথেষ্ট পরিমাণে খেলিতে পারে। এই সন্ধিকে প্রাচীনেরা 'স্নায়ুসন্তুণ্ড' সন্ধি বলিয়াছেন। এই সন্ধিদ্বয়ের প্রত্যেকটী স্নায়ুকোষ দ্বারা আবৃত এবং বহিঃসীমায়, অন্তঃসীমায় ও পশ্চাতে এক একটী স্নায়ুরজ্জু দ্বারা দৃঢ়ীকৃত। সন্ধির উভয় দিকে দৃঢ়পেশী নিবেশ থাকিতেও এই সন্ধির দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়; কিন্তু পেশীর ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটিলে এই সন্ধিদ্বয় সহজেই বিশ্লিষ্ট হইতে পারে। হনুসন্ধির হঠাৎ বিশ্লেষ ঘটিলে মনুষ্য মুখ খুলিয়াই থাকে, মুখ বুজিতে পারে না।

শিরোগ্রীব সন্ধি—মস্তক ও পৃষ্ঠবংশের সন্ধিকে শিরোগ্রীবসন্ধি বলে। এই স্থানে তিনটী অস্থির মধ্যে পরস্পর সংযোগ হওয়ায় ত্রিবিধ সন্ধির সৃষ্টি হয়। যথা—

(ক) পশ্চিম কপাল ও চূড়াবলয়ার সন্ধি—পশ্চিমকপালের মূলাকাটিদ্বয়ের সহিত কোরসন্ধি এবং অবশিষ্টাংশের প্রতরসন্ধি হয়। তন্মধ্যে কোরসন্ধিদ্বয় দুইটী স্নায়ুকোষে

* ই—Synovial membrane—সাইনোভিয়াল মেম্‌ব্রেণ।

† ইং—Synovia—সাইনোভিয়া।

আচ্ছাদিত ও মধ্যে শ্লেষ্মধরা কলাযুক্ত। প্রতর-সন্ধিটী চারিদিকে চারিটি স্নায়ুরজ্জু দ্বারা প্রতিবদ্ধ।

(খ) চূড়াবলয়া ও দন্তচূড়ার সন্ধি—এই সন্ধিতে দ্বিতীয়া গ্রীবাকশেরুকা দন্তচূড়াব দন্তপ্রবর্দ্ধন নামক কীলবৎ অংশ চূড়াবলয়ার

[৪০শ চিত্র—শিরোগ্রীব সন্ধি (পৃষ্ঠতল)]

(পশ্চিম কপালের উপরের ও গ্রীবাকশেরুকাগুলির চক্রাংশ অপসারিত করিয়া দেখান হইয়াছে)

[†, এইরূপ চিহ্ন স্নায়ুবোধক]

বিবর মধ্যে প্রবেশ করে এবং তাহার সম্মুখ-ভাগ বলয়ার্দ্ধের ভিতর দিকে সংসক্ত থাকে। এইরূপ সংযোগ থাকায় চূড়াবলয়াযুক্ত মস্তক পৃষ্ঠবংশের উপর সহজে ঘুরিতে ফিরিতে পারে। অতএব সম্মুখভাগে এইরূপ চক্রকোর সন্ধি এবং অবশিষ্ট অংশে প্রতরসন্ধি দেখা যায়। পাঁচটী স্নায়ু এই স্থানের সন্ধিবন্ধন কার্য্য করিয়া থাকে। তন্মধ্যে সম্মুখের স্নায়ু উভয় অস্থির কশেরুপিণ্ডের সম্মুখভাগ বন্ধন করিয়া রাখে। পশ্চাতের স্নায়ু দুই অস্থির কশেরু-চক্রের পশ্চাদ্দীপ বন্ধন করিয়া থাকে। দুইটী স্নায়ুকোষ উভয় অস্থির দুই দিকের দুইটি সন্ধি প্রবর্দ্ধনক যুগলের সংযোজনা করে। 'স্বস্তিক-রজ্জু' স্নায়ু চওড়াদিকে চূড়াবলয়ার ভিতরের পরিধির উভয়দিকের কলায় বৎ অংশদ্বয়ে সংসক্ত এবং লম্বালম্বিভাবে ঊর্দ্ধ দিকে পশ্চাৎ কপালমূলের পিছনে মধ্যরেখায় ও অধোদিকে দন্তচূড়ার অগ্রভাগের সহিত সংযুক্ত। ইহা সম্মুখ হইতে দন্তপ্রবর্দ্ধনকে চূড়াবলয়ার ছিদ্র মধ্যে যথাস্থানে ধারণ করিয়া রাখে। দন্ত-প্রবর্দ্ধন স্থানচ্যুত হইলে সুষুম্নাশীর্ষ আহত হইয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। মনুষ্যকে ফাঁসি দিলে শ্বাসরোধের পূর্ব্বেই অনেক সময়ে এই কারণে মৃত্যু হইয়া থাকে।

(গ) পশ্চিম কপাল ও দন্তচূড়ার সন্ধি—এই দুইখানি অস্থির পরস্পর সংস্পর্শ না

ঘটিলেও সুষুম্নাবিবরে গূঢ়ভাবে অবস্থিত চারিটী স্নায়ু দ্বারা ইহারা পরস্পর সংবদ্ধ থাকে।

শিরোগ্রীব সন্ধির এই সকল স্নায়ু ব্যতীত 'গ্রীবাধরা' নামে মহতী স্নায়ুরজ্জু পশ্চিম কপালের পশ্চিমার্ব্বুদ ও পশ্চিমালিকা হইতে সপ্তমী গ্রীবাকশেরুকার পৃষ্ঠকণ্টকে সংলগ্ন হইয়া থাকে। এই স্নায়ু স্থিতিস্থাপক এবং গ্রীবাকে ঋজুভাবে ধারণ করিয়া রাখে। মনুষ্যের মস্তক সোজা ভাবে থাকে বলিয়া মনুষ্যদেহে এই স্নায়ু তত পুষ্ট নহে। কিন্তু পশুর মস্তক আড়ভাবে থাকে বলিয়া তাহাদের মস্তক ধারণের জন্য এই স্নায়ু অত্যন্ত দৃঢ় ও স্থূল হইয়া থাকে।

মধ্য শরীরের সন্ধি।

পৃষ্ঠবংশসন্ধি—পৃষ্ঠবংশ উপর্য্যুপরি স্থাপিত কশেরুকা সমূহের দ্বারা নির্ম্মিত। প্রত্যেক কশেরুকা উর্দ্ধস্থিত ও অধঃস্থিত অপর দুইটী কশেরুকার সহিত পাঁচটী করিয়া সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ। যথা—

(১) কশেরুকাপিণ্ডগুলির পরস্পর-সংযোজনী স্নায়ু। ইহারা তিনভাগে বিভক্ত।

(ক) কশেরুপুরঃস্থা সাধারণী, স্নায়ু দৃঢ়, স্থূল ও দীর্ঘ পটিকার (ফালির) মত। ইহা সমস্ত কশেরুকাপিণ্ডের সম্মুখ ভাগে সংসক্ত থাকিয়া সমগ্র পৃষ্ঠবংশের সাধারণ বন্ধন স্বরূপে অবস্থিত। (খ) 'কশেরুপশ্চিমা সাধারণী'—উপরোক্ত স্নায়ুর ন্যায় কশেরুকাসমূহের পশ্চাদ্ভাগের সাধারণ বন্ধন স্বরূপ। (গ) 'কশেরুপিণ্ডান্তরালা' স্নায়ুগুলি কোমল, স্থিতিস্থাপক ও কশেরুপিণ্ডমধ্যস্থ তরুণাস্থি চক্রে সংসক্ত।

(২) কশেরুচক্রের পরস্পর সংযোজনী স্নায়ু সকল কশেরুচক্রগুলির মধ্যে মধ্যে অবস্থিত, স্থিতিস্থাপক ও পীতবর্ণ। ইহারা 'কশেরুচক্রান্তরালা' নামে অভিহিত।

(৩) প্রত্যেক কশেরুকার দুইটী নিম্নাভিমুখ সন্ধিপ্রবর্দ্ধনের সহিত নিম্নস্থিত কশেরুকার উর্দ্ধাভিমুখ সন্ধিপ্রবর্দ্ধনদ্বয়ের সন্ধি হয়। ক্রমশঃ পরে পরে এইরূপ সন্ধি হইয়া থাকে। এই সন্ধিগুলি স্নায়ুকোষের দ্বারা আবৃত ও ভিতরে শ্লেষ্মধরা কলাযুক্ত।

(৪) পৃষ্ঠকণ্টকগুলির সন্ধানকারক স্নায়ুসমূহ দুই প্রকার, তন্মধ্যে—

(ক) 'পৃষ্ঠকণ্টকধরা সাধারণী' স্নায়ু দৃঢ় রজ্জুর ন্যায় সমস্ত পৃষ্ঠকণ্টকগুলির সংযোজন করে এবং পশ্চিম কপালের পৃষ্ঠস্থিত অর্ব্বুদ হইতে ত্রিকাস্থির পৃষ্ঠকণ্টক পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার উর্দ্ধ ভাগই 'গ্রীবাধরা' স্নায়ু নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

(খ) 'কণ্টকান্তরালা' স্নায়ু সকল পৃষ্ঠকণ্টকগুলির অন্তরালে অবস্থিত এবং পাতলা কলা দ্বারা নির্ম্মিত। এই সকল স্নায়ু পৃষ্ঠকশেরুকা ও কটিকশেরুকাগুলিতে বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট দেখা যায়।

(৫) 'বাহুপ্রবর্দ্ধনান্তরালা' স্নায়ুগুলি বাহুপ্রবর্দ্ধন সকলের অন্তরালে থাকিয়া পরস্পরকে বন্ধন করে। উহারা গ্রীবাকশেরুকা ও কটিকশেরুকাগুলিতে পাতলা কলার আকারে এবং পৃষ্ঠকশেরুকা সমূহে রজ্জুর আকারে দৃষ্ট হয়।

কশেরুপিণ্ড সকলের পরস্পর সন্ধি প্রায় অচল। কশেরুচক্র সকলের পরস্পর সন্ধি অল্পচল। গ্রীবা ও কটিকশেরুকার সন্ধিগুলি

অপেক্ষাকৃত অধিক চল। পৃষ্ঠবংশের চেষ্টা বা চলত্ব তিনপ্রকার, যথা—সম্মুখে নমন বা অন্তরায়াম, পশ্চাতে নমন বা বহিরায়াম এবং উভয় পার্শ্বে নমন। পার্শ্ববিবর্ত্তন এই তিন প্রকার চেষ্টার মিশ্রণে হইয়া থাকে।

পৃষ্ঠপর্শুকাসন্ধি—পর্শুকার সহিত পৃষ্ঠবংশের কশেরুকার সন্ধিকে পৃষ্ঠপর্শুকাসন্ধি বলে। এই সন্ধি দুই প্রকার যথা—

(১) পর্শুকামুণ্ডের সহিত কশেরুকাপিণ্ডের চলপ্রস্তর জাতীয় সন্ধি। তন্মধ্যে প্রথমা, দশমী, একাদশী ও দ্বাদশী—এই পর্শুকাগুলির প্রত্যেকটী এক একটী কশেরুপিণ্ডের পূর্ণস্থালকের সহিত পৃথক্ ভাবে সংহিত হয়। অপরগুলির প্রত্যেকটী দুইটী কশেরুপিণ্ডের অর্দ্ধস্থালকদ্বয়ের সন্ধিযুক্ত হয়। ইহা প্রধানতঃ ত্রিশূলাকার স্নায়ু দ্বারা উপর নীচের কশেরুপিণ্ডদ্বয়ের ও তন্মধ্যস্থ তরুণাস্থিচক্রের সহিত সম্বদ্ধ। এখানে পর্শুকামুণ্ডের বেষ্টনভূত একটী কোষাকার স্নায়ু ও তন্মধ্যে সন্ধ্যন্তরীয় স্নায়ুও থাকে।

(২) পর্শুকার্ব্বুদের সহিত কশেরুকার বাহুপ্রবর্দ্ধনের যুক্তপ্রস্তর সন্ধি। ইহা সম্মুখে, পার্শ্বে ও পশ্চাতে রজ্জুবৎ স্নায়ু এবং মধ্যে কোষবৎ স্নায়ুদ্বারা প্রতিবদ্ধ।

পূর্ব্বপর্শুকাসন্ধি — পর্শুকা, উপপর্শুকা এবং উরঃফলকের সন্ধিসমূহ এই নামে খ্যাত। এই সন্ধি চারি প্রকার যথা—

(১) পর্শুকার সহিত উপপর্শুকার সন্ধি—বারখানি পর্শুকার অগ্রভাগস্থিত স্থালকের সহিত বারখানি উপপর্শুকার মূলের দৃঢ় ও অচল সন্ধি হইয়া থাকে।

(২) উপপর্শুকার সহিত উরঃফলকের সন্ধি—এক একদিকের প্রথম সাতখানি করিয়া উপপর্শুকার সহিত উরঃফলকের পার্শ্বস্থ স্থালকগুলির সন্ধি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রথমা পর্শুকার সন্ধি অচল, অবশিষ্টগুলি যুক্তপ্রস্তর। অগ্রিমা, পশ্চিমা, কোষাকারা এবং সন্ধ্যন্তরীয়া—এই চারি প্রকার স্নায়ু উপপর্শুকা ও উরঃফলকের সন্ধিবন্ধন কার্য্য করিয়া থাকে।

(৩) উপপর্শুকার পরস্পর সন্ধি—পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী উপপর্শুকার অগ্রভাগগুলি উরঃফলকে সংযুক্ত হইলেও উহাদের সম্মুখের কোণ উত্তরোত্তর পর্শুকার কোণের সহিত কতকগুলি স্নায়ুসূত্র দ্বারা সংবদ্ধ। অষ্টমী, নবমী ও দশমী উপপর্শুকার অগ্রভাগ কেবল পূর্ব্ব পূর্ব্ব উপপর্শুকার কোণের সহিত ঐরূপে প্রতিবদ্ধ—উহাদের উরঃফলকের সহিত সন্ধি নাই। একাদশী ও দ্বাদশী উপপর্শুকার অগ্রভাগ বিমুক্ত—অর্থাৎ কাহারও সহিত সন্ধিযুক্ত নহে।

(৪) উরঃফলকের খণ্ডগুলির পরস্পর সন্ধি—অল্প বয়সে উরঃফলকের গ্রৈবেয়ক, মধ্যফলক এবং অগ্রপত্র নামক খণ্ডত্রয় পরস্পর সন্ধিযুক্ত ও স্নায়ু দ্বারা প্রতিবদ্ধ থাকে। প্রৌঢ় বয়সে এই খণ্ডত্রয় জুড়িয়া যায়।

অক্ষকোরক সন্ধি—উরঃফলকের উর্দ্ধাংশের দুইপার্শ্বে দুইখানি অক্ষকাস্থির প্রান্তভাগ স্নায়ুকোষ দ্বারা প্রতিবদ্ধ থাকে। এই সন্ধি দৃঢ় করিবার জন্য অক্ষকাস্থি প্রথমা পর্শুকার সহিত ও স্নায়ু দ্বারা সংযুক্ত থাকে। অক্ষকাস্থিদ্বয়ের পরস্পর সাক্ষাৎ সন্ধি না থাকিলেও এক স্নায়ু উরঃ-

ফলকের শিখরদেশের উপর দিয়া উহাদের সম্মুখ প্রান্তদ্বয়কে সংবদ্ধ করিয়া রাখে। অংসসন্ধি বর্ণন প্রসঙ্গে অক্ষকাস্থির সহিত অংসের সন্ধানের বিষয় বলা যাইবে।

শ্রোণিচক্রসন্ধি — শ্রোণিচক্রসন্ধি দুই ভাগে বর্ণনীয়। শ্রোণিফলকদ্বয়ের পৃষ্ঠবংশের সহিত সন্ধি এবং পরস্পরের সন্ধি। শ্রোণিফলকদ্বয়ের সহিত পৃষ্ঠবংশের দৃঢ়প্রতম সন্ধি হয়। ইহা পঞ্চমী কটিকশেরুকার সহিত ত্রিকাস্থির সন্ধি আশ্রয় করিয়া থাকে। পৃষ্ঠবংশের সন্ধারণী যে পাঁচ প্রকার স্নায়ুর বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সেই পাঁচ প্রকার স্নায়ু দ্বারাই এই স্থলেরও সন্ধিবন্ধন কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। কেবল এক এক দিকে দুইটী করিয়া স্নায়ু বেশী থাকে। যথা—

[৪১শ চিত্র—শ্রোণিচক্র সন্ধি]

পৃষ্ঠবংশ

১

২

কটিজঘনিকা †

কটিত্রিকাস্থিকা †

ত্রিকজঘনিকা অগ্রিমা †

গুর্ব্বী ত্রিককুকুন্দরিকা †

লঘ্বী ত্রিককুকুন্দরিকা †

ত্রিকাস্থি

অনুত্রিকাস্থি

শ্রোণিফলক

[† এইরূপ চিহ্ন স্নায়ুবোধক। ১,২ কটিনাড়ী নির্গমের বিবরদ্বয়। এই চিত্রের বামার্দ্ধে যেরূপ স্নায়ু দেখান হইয়াছে দক্ষিণার্দ্ধেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে।]

'কটিজঘনিকা' নামে দুইটী স্নায়ু চতুর্থী ও পঞ্চমী কটিকশেরুকার বাহুপ্রবর্দ্ধনকগুলির সহিত উভয়দিকে জঘনধারার পশ্চিম প্রান্ত-ভাগকে সংবদ্ধ করে। 'কটিত্রিকাস্থিকা' স্নায়ু দৃঢ় ও ত্রিকোণ ফাঁলির ন্যায়, ইহা পঞ্চমী কটিকশেরুকাকে ত্রিকাস্থির ও শ্রোণিফলকের ত্রিক স্থালকের পরিধির সহিত সংবদ্ধ করে।

শ্রোণিচক্রাস্থিত্রয়ের পরস্পর সন্ধি চারি প্রকারে নিষ্পন্ন হয়, যথা—

(১) ত্রিকাস্থির সহিত জঘনাস্থির সন্ধি—ত্রিকাস্থির উভয় দিকে জঘনকপালদ্বয়ের সহিত 'দৃঢ়প্রস্তর' সন্ধি হয়। এই সন্ধি জঘন-কপালের তরুণাস্থিপত্রাবৃত ত্রিকস্থালকের সহিত ত্রিকাস্থির পার্শ্বদেশে হইয়া থাকে। এখানে প্রায় শ্লেষ্মধরা কলা দেখা যায় না, কিন্তু গর্ভিণী স্ত্রীলোকের গর্ভবৃদ্ধি হেতু শ্রোণি-ফলক যখন সচল হয়, তখন শ্লেষ্মধরা কলাও উৎপন্ন হইয়া থাকে। 'অগ্রিমা ত্রিকজঘনিকা ও পশ্চিমা ত্রিকজঘনিকা নামে এক এক দিকে দুইটী করিয়া দৃঢ়পট্টিকার মত স্নায়ু ত্রিকজঘনসন্ধির বন্ধন কার্য্য করিয়া থাকে।

(২) ত্রিকাস্থির সহিত কুকুন্দরের সন্ধি—ত্রিককুকুন্দরাস্থিসংযোজনী লঘ্বী ও গুর্ব্বী নামে নামে এক একদিকে সম্মুখে ও পশ্চাতে দুইটি করিয়া মোট চারিটী স্নায়ু দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। এই সকল স্নায়ু যথাস্থানে সংসক্ত হইয়া গৃধ্রসীবিবর" ও 'কুকুন্দরদ্বার' নামে দুইটী বিবর নির্ম্মাণ করে। তন্মধ্যে গৃধ্রসী নাড়ী এবং তদনুবর্ত্তিনী সিরা ধমনী ও শুণ্ডিকাখ্যা পেশী নির্গত হইয়া থাকে। আর কুকুন্দর-বিবরের ভিতর দিয়া 'শ্রোণিগবাক্ষণী' পেশী এবং তদনুবর্ত্তিনী সিরা ধমনী ও নাড়ী বস্তি-গুহায় প্রবেশ করিয়া থাকে।

(৩) ত্রিকানুত্রিকসন্ধি—অগ্রিমা, পশ্চিমা এবং দুইটী পার্শ্বগা—এই চারিটী স্নায়ু ত্রিকাস্থি ও অনুত্রিকাস্থির সন্ধি বন্ধন কার্য্য নিষ্পন্ন করে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অনুত্রিকাস্থি চারিখানি ক্ষুদ্র কশেরুকাখণ্ডের সংযোগে নির্ম্মিত, কিন্তু প্রসবকালে শ্রোণি-দ্বারের বিস্তারের সুবিধার জন্য নারীদিগের দেহে স্বভাবতঃ ঐ খণ্ড চতুষ্টয় পৃথক্ ভাবে থাকে।

(৪) ভগাস্থিদ্বয়ের সন্ধি—ভগাস্থিদ্বয় মধ্য-রেখায় স্ব স্ব মুণ্ডদ্বারা পরস্পর সংহিত হইয়া থাকে। প্রাচীনেরা সংহিত ভগাস্থিদ্বয়কে একখানি পৃথক্ অস্থি বলিয়া গণনা করেন। এই সন্ধি দৃঢ়প্রস্তর হইলেও গর্ভিণীদিগের দেহে কিঞ্চিৎ বিস্ফারিত হইতে পারে। ঊর্দ্ধ্বা, অধরা, অগ্রিমা ও পশ্চিমা এই চারিটী 'ভগ-সংযোজনী' স্নায়ু এই সন্ধিবন্ধন কার্য্য নিষ্পন্ন করে। উক্ত সন্ধিমধ্যে তরুণাস্থি-চক্র থাকে, কিন্তু শ্লেষ্মাধরা কলা থাকে না।

শাখাসন্ধি।

প্রত্যেক বাহুতে ও সক্থিতে সাতটী স্থানে সন্ধি আছে। বাহুতে যথা—অংসে, কূর্পরে, প্রকোষ্ঠান্তরালে, মণিবন্ধে, করকূর্চ্চাস্থি গুলির করতলে এবং করাঙ্গুলিসমূহে। সক্থিতে যথা—বংক্ষণে, জানুতে, জঙ্ঘান্তরালে, পদসন্ধিতে, পাদকূর্চ্চাস্থিগুলির মধ্যে, পদতলে এবং পদাঙ্গুলি সমূহে। প্রত্যেকের বিবরণ পৃথক্ লিখিত হইতেছে।

ঊর্দ্ধশাখাসন্ধি।

অংসসন্ধি—অক্ষক, অংসফলক ও প্রগণ্ডাস্থি—এই তিনটী অস্থির যোগে এই সন্ধি নির্ম্মিত। অক্ষক ও অংসফলকের সন্ধিকে অংসচক্র সন্ধান এবং প্রগণ্ড ও অংস ফলকের সন্ধানকে অংসোদূখল সন্ধি বা কক্ষা-সন্ধি বলে।

অংসচক্র সন্ধান—অক্ষকাস্থির বহিঃপ্রান্ত এবং অংস কূটাগ্রের সংযোগে এই 'চলপ্রস্তর' সন্ধিটী নির্ম্মিত হয়। এই সন্ধিবন্ধনী চারিটী স্নায়ুর মধ্যে 'অংসাক্ষকবন্ধনী' উত্তরা ও অধরা নামে দুইটী ঊর্দ্ধ ও অধোদিকে অংস এবং অক্ষকাস্থির বন্ধন কার্য্য নিষ্পন্ন করে। 'তুণ্ডা-ক্ষকবন্ধনী' ত্রিকোণিকা ও চতুরস্রিকা নামে দুইটী স্নায়ু অংসতুণ্ডের পশ্চার্দ্ধের সহিত অক্ষকাস্থির বহিঃপ্রান্তের ঊর্দ্ধাধস্তলকে সংবদ্ধ করিয়া থাকে। অংসফলকের তুণ্ড ও কূট নামক অবয়বদ্বয়ের মধ্যে 'তুণ্ডমূলিকা' নামে দুইটি স্নায়ু আছে।

অংসোদূখলক সন্ধি বা কক্ষাসন্ধি—অংস পীঠের নাতিগভীর উদূখলাকার স্থালকটি পরিধিতে তরুণাস্থিচক্রের সংযোগে গভীর কোটারাকার হয়। উহার মধ্যে প্রগণ্ডাস্থির মুণ্ড সংসক্ত হইয়া এই সন্ধি নির্ম্মিত হয়। দুইটী স্নায়ু এই সন্ধিবন্ধন কার্য্য করিয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রথমটী 'অংসোদূখলিক' নামক দীর্ঘ শিথিল স্নায়ুকোষ। ইহা ঊর্দ্ধে অংসোদূখলের চারিদিকে এবং নিম্নে প্রগণ্ডাস্থির গ্রীবা বেষ্টন করিয়া অবস্থিত। ইহার মধ্যে বৃহৎ শ্লেষ্মধরা কলা বর্ত্তমান। স্নায়ুকোষের তিনটী ছিদ্র দিয়া এই কলার তিনটি কণ্ডরানুগা শাখা বাহির হইয়া কণ্ডরাগুলির ক্রিয়ার সহায়তা করে। কণ্ডরাগুলি 'অংসান্তরিকা' অধরা, 'অংসপৃষ্ঠিকা' এবং 'দ্বিশিরস্কা' পেশীর দীর্ঘশিখা নামে প্রসিদ্ধ। শেষোক্ত কণ্ডরাটী সন্ধির ভিতর পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট। দ্বিতীয় স্নায়ুটী 'তুণ্ডপ্রগণ্ডিকা' নামে প্রসিদ্ধ। ইহা অংস-তুণ্ড এবং প্রগণ্ডাস্থির মহাপিণ্ডের সংযোজন করে এবং স্নায়ুকোষের গাত্রে প্রতিবদ্ধ।

পেশী—নিম্নলিখিত পেশীগুলি অংস-সন্ধিকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত যথা—ঊর্দ্ধে উত্তরা অংসপৃষ্ঠিকা, নিম্নে ত্রিশিরস্কাপেশীর দীর্ঘশিখা, অন্তঃপার্শ্বে অংসান্তরিকা, বহিঃ-পার্শ্বে অধরা অংসপৃষ্ঠিকা ও লঘ্বী অংসাধারিকা, স্নায়ুকোষের অভ্যন্তরে দ্বিশিরস্কা পেশীর দীর্ঘ-শিখা এবং সমগ্র অংসসন্ধি ও অংসচক্র আচ্ছা-দন করিল অংসচ্ছদা।

চেষ্টা—এই সন্ধিকে আশ্রয় করিয়া সম্মুখ, পশ্চাৎ, ভিতর ও বাহির দিকে নানা প্রকার আকর্ষণাদি চেষ্টা হইয়া থাকে। এই সন্ধিতে প্রগণ্ডাস্থির মুণ্ড যথেষ্ট বিবর্ত্তিত হয় বলিয়া ইহাকে সমস্ত সচল সন্ধির প্রধান বলা যায়।

কূর্পর সন্ধি—প্রগণ্ডাস্থির অধঃ-প্রান্ত এবং প্রকোষ্ঠাস্থিদ্বয়ের ঊর্দ্ধপ্রান্ত সংযোগে এই সন্ধি নির্ম্মিত হয়। অন্তঃ-প্রকোষ্ঠাস্থির সন্দংশাকার কূটদ্বয়ের মধ্যস্থলে প্রগণ্ডাস্থির ডমরুবৎ অংশ সংহিত বলিয়া ইহাকে 'সন্দংশকোর' সন্ধি বলে। বহিঃ প্রকোষ্ঠাস্থির কোরমধ্য মুণ্ড এই স্থানে প্রগণ্ডাস্থির কন্দলীর সহিত সংহিত হইয়া থাকে এবং উক্ত মুণ্ডের পার্শ্বদেশ এই সন্ধির মধ্যেই 'মুণ্ডবেষ্টনিকা' স্নায়ু দ্বারা অন্তঃপ্রকো-ষ্ঠির পার্শ্বে সংহিত হয়।

[৪৩শ চিত্র—কূর্পর সন্ধি (আন্তর তল)

প্রগণ্ডাস্থি

অগ্রিমা কূর্পর-সন্ধিবন্ধনী +

কূর্পরসন্ধিবন্ধনী অন্তঃপার্শ্বিকা +

মুণ্ডবেষ্টনিকা +

দ্বিশিরস্কা পেশীর অধঃকণ্ডরা

বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি

প্রকোষ্ঠতিরশ্চীনা +

প্রকোষ্ঠান্তরালা কলা +

অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থি

কূর্পর কূট

[+ এইরূপ চিহ্ন স্নায়ুবোধক]

কূর্পরসন্ধিবন্ধনী স্নায়ু চারিটী—অগ্রিমা, পশ্চিমা, বহিঃপার্শ্বিকা ও অন্তঃপার্শ্বিকা। তন্মধ্যে—

অগ্রিমা বা সম্মুখস্থ স্নায়ুর এক প্রান্ত প্রগণ্ডাস্থির অন্তরর্ব্বুদের সম্মুখতলে সম্বদ্ধ এবং অপর প্রান্ত অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির চঞ্চুপ্রবর্দ্ধনের পরিধিতে ও মুণ্ডবেষ্টনিকা স্নায়ুর সহিত সম্বদ্ধ। পশ্চিমা স্নায়ুর এক প্রান্ত কূর্পরখাতের উপকণ্ঠে এবং অন্য প্রান্ত অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির কূর্পরকূটের পরিধির সহিত সংসক্ত। বহিঃপার্শ্বিকার এক প্রান্ত প্রগণ্ডাস্থির বাহ্যার্ব্বুদে এবং অন্য প্রান্ত মুণ্ডবেষ্টনিকা স্নায়ুর সহিত সংসক্ত। অন্তঃপার্শ্বিকা স্নায়ুর এক প্রান্ত প্রগণ্ডাস্থির অন্তরর্ব্বুদে এবং অন্য প্রান্ত অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির কূটদ্বয়ের পরিধির অন্তঃসীমায় সংসক্ত।

চেষ্টা—কূর্পরসন্ধির চেষ্টা চারি প্রকার—সঙ্কোচ, প্রসার, অন্তর্ব্বিবর্ত্তন ও বহির্ব্বিবর্ত্তন। তন্মধ্যে—প্রসার দ্বারা বাহু দণ্ডবৎ হইতে পারে, বিপরীত দিকে নত হয় না।

শ্লেষ্মধরা কলা—এই সন্ধির মধ্যস্থিত শ্লেষ্মধরা কলার শাখা প্রকোষ্ঠাস্থিদ্বয়ের ঊর্দ্ধসন্ধি পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে।

প্রকোষ্ঠান্তরীয় সন্ধি—প্রকোষ্ঠাস্থিদ্বয়ের ঊর্দ্ধ ও অধঃপ্রান্তে কোরসন্ধি এবং মধ্যস্থলে প্রতর সন্ধি হইয়া থাকে। এই সকল সন্ধি অল্পচল। ঊর্দ্ধপ্রান্তে বহিঃ-

প্রকোষ্ঠাস্থির মুণ্ড অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির চক্র-নেমিখতে সংহিত হয় এবং বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির মুণ্ডের বিবর্ত্তনপ্রদ 'মুণ্ডবেষ্টনিকা' স্নায়ু এই সন্ধিবন্ধন কার্য্য করিয়া থাকে। 'প্রকোষ্ঠা-তিরশ্চনী' নামে অপর একটী স্নায়ুও এই স্থানের অধোদেশের বন্ধনস্বরূপে তির্য্যগ্‌ভাবে অবস্থিত। প্রকোষ্ঠাস্থিদ্বয়ের নিম্নপ্রান্তে অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির মণিমুণ্ড বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির অধঃপ্রান্তের পার্শ্বে সংহিত হইয়া থাকে। সম্মুখে ও পশ্চাতে দুইটী স্নায়ু এবং মণিবন্ধ-সন্ধির মধ্যে প্রবিষ্ট ত্রিকোণ তরুণাস্থি দ্বারা এই সন্ধির বন্ধন কার্য্য সম্পন্ন হয়। মধ্য-নলকদ্বয়ের সন্ধানে অস্থিদ্বয়ের পরস্পর সংস্পর্শ হয় না, পরন্তু 'প্রকোষ্ঠান্তরালা' নামে দৃঢ় কলা দ্বারা ইহারা পরস্পর আবদ্ধ থাকে।

(ক্রমশঃ)

বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য।

বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য যেরূপ দিন দিন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে, এবং তাহার ফলে বাঙ্গালা-দেশে মৃত্যু সংখ্যা যেরূপ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে তাহা ভাবিবার কথা। এক সময়ে বাঙ্গলার অবস্থা এরূপ ছিল না। তখন-কার বাঙ্গালী এখনকার অপেক্ষা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন কি না—সে বিচার আমরা করিব না, তবে তখন অপেক্ষা এখনকার বাঙ্গালী হয় তো অনেক বিষয়ে পরিমার্জ্জিত বুদ্ধি লইয়া সভ্যতার চরমসীমায় উপনীত হইয়াছেন এবং সেই সঙ্গে অর্থোপার্জ্জনের পন্থাও পূর্ব্বাপেক্ষা সুলভ করিয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু শারীরিক সামর্থ্যে—তথা পরমায়ু লাভ বিষয়ে এখনকার বাঙ্গালী যে সেকালের বাঙ্গালীর অনেক নিম্নস্তরে পতিত হইয়াছেন, সে বিষয়ে আদৌ সন্দেহ নাই।

তখনকার বাঙ্গালীর সকলেই লেখাপড়া শিখিত না, তাহার কারণ সেকালে চাকরি অর্থে জীবিকা নির্ব্বাহের কল্পনা এখনকার মত বাঙ্গালী মাত্রেই প্রথম হইতে করিয়া রাখিতেন না। সেকালের গোয়ালা-বাঙ্গালী জানিত—দুগ্ধ বিক্রয়ের অর্থেই তাহার সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইবে, মালাকর জাতীয় বাঙ্গালী জানিত—পূজা-পার্ব্বণে দেবীপ্রতিমার সজ্জা বিন্যাসে—তথা বরবধূর মিলন জনিত কতক-গুলি কার্য্যে তাহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইবে। বাঙ্গালী-তিলি জানিত কিছু না করিতে পারিলে সে মুদিখানার দোকান করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিবে। বাঙ্গালী-তন্তুবায় সকল বাঙ্গালীর বস্ত্র যোগাইত, কাজেই তাহাকে অন্য উপায়ে জীবিকানির্ব্বাহের চিন্তা করিতে হইত না। বাঙ্গালী-মোদক মিষ্টান্ন প্রস্তুতকরিত। বারুইজাতীয় বাঙ্গালী সকলকে তাম্বুল যোগাইত, কুম্ভকার ঘট নির্ম্মাণ করিত, কর্ম্মকার—বাঙ্গালীর প্রয়োজনীয় কুঠারাদি অস্ত্র প্রস্তুত করিত, নাপিত ক্ষৌরকার্য্য করিত;—কাজেই বাঙ্গালীর নবশাক জাতীয়ের মনে সেকালে চাকরি করিবার

কল্পনা আদৌ উপস্থিত হইত না। সেকালের নবশাক জাতীয় বাঙ্গালীর এইজন্য লেখাপড়া শিখিবার আবশ্যকও হইত না।

সেকালে বাঙ্গালীর মধ্যে প্রকৃত লেখাপড়া শিখিত ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্যগণ। বাঙ্গালী কায়স্থও লেখাপড়া শিখিত বটে, কিন্তু সে বিদ্যার পরিসমাপ্তি প্রায়ই শিশুবোধক এবং শুভঙ্করী পাঠেই হইয়া যাইত, কেহ কেহ একটু আরবী, একটু পারসী একটু উর্দ্দু শিক্ষা করিতেন, তাহার ফলে নবাব সরকারে চাকরির একটু সুবিধা হইত। ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্যজাতির বাঙ্গালী সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত হইতেন, কিন্তু তাহা চাকরি করিবার উদ্দেশ্যে নহে। ব্রাহ্মণেরা 'টোল' খুলিয়া অধীত বিদ্যার অধ্যাপনায় আরও বিদ্যালাভের পন্থা পরিষ্কার করিতেন, বৈদ্য চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রশিক্ষার ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণেরই মত জ্ঞানার্জ্জনের উপায় করিতেন।

এখন সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন বাঙ্গালীর সকল জাতিই পণ্ডিত হউক না হউক—বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিলাভের জন্য ব্যগ্র হইতেছে। উদ্দেশ্য—সহজে চাকরিপ্রাপ্তির উপায় বিধান। ফলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি লাভের জন্য বাঙ্গালীর কোমলমতি শিশুদিগের স্বাস্থ্য প্রথম হইতেই ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, তাহার পর চাকরি জীবনে যে স্বাস্থ্যের অপচয় এরূপ হইয়া পড়িতেছে যে, বাঙ্গালীর অকর্ম্মণ্যতা একান্তই অবশ্যম্ভাবী।

এখনকার দিনে অজীর্ণ বা ডিসপেপসিয়া বাঙ্গালীর মধ্যে শতকরা ৭৫ জনের বলিলে অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু এই অজীর্ণপ্রবণতার কারণ কি? বাঙ্গালী ছেলের অনেকেই অভিভাবক শূন্য অবস্থায় মেসে-বোর্ডিংয়ে অবস্থিতি করে, স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় বিধি সকল তাহাদিগকে কেহ শিখাইয়া দেয় না। অধিক জলপান বিষম-ভোজন (অল্প ভোজন, বহু ভোজন বা বা অসময়ে ভোজন) মল মূত্রাদির বেগ ধারণ, দিবানিদ্রা, রাত্রি জাগরণ—এই সকল কারণে যে অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হয়—এ সব কথা তাহাদিগকে কেহ বলিয়া দেয় না। বলিয়া দিলেও ঘটনাচক্রে সে সকল পালন করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হইয়া উঠে না। মাতাভগ্নী পরিত্যক্ত অল্পমতি শিশুগণ ফিজিক্স-কেমিষ্ট্রির তত্ত্ব সকল অবগত হইতে গিয়া যখন অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন কলিকাতার মত স্থানে সহজসুলভ-চায়ের লোভ সম্বরণ অথবা সোডা-লেমোনেড-সরবতের পিপাসা পূর্ণ না করিয়া তাহারা থাকিতে পারে না। ফলে অজীর্ণের প্রধান কারণ অধিক জলপান এইরূপ ভাবে ছাত্র জীবনেই অনেকের নিকট অভ্যস্ত হয় এবং কালে কর্ম্মময় জীবনেও অভ্যাস দোষে অনেকে সে দোষ পরিত্যাগ করিতে পারে না। তাহার পর অল্প ভোজন,—বহু ভোজন—ইহাও ছাত্রজীবনে অপরিহার্য্য। এখানে অল্প ভোজন অর্থে ধরিয়া লইতে হইবে—বাঙ্গালী বালককে যে পরিমাণ শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক বিদ্যার্জ্জন করিতে হয়, মেসে-বোর্ডিংয়ে থাকিয়া সে পরিমাণ আহার্য্যলাভ প্রায়শঃই তাহাদিগের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। আর, রাত্রি জাগরণ—সে তো ডিগ্রি লাভের কামনায় না করিলে উপায় নাই। ফলে নানা কারণে অজীর্ণের বীজ বাঙ্গালী

শিশুর প্রাথমিক জীবনেই যাহা অঙ্কুরিত হইয়া পড়ে—কালে কর্ম্মময় জীবনে তাহাই বাঙ্গালীর আয়ুক্ষয়ের সর্ব্বপ্রধান কারণ হইয়া উঠিতেছে। অনেক বাঙ্গালীই অজীর্ণপ্রবণ হইতেছে এই কারণে।

বহুকাল চিকিৎসা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া আমরা যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে এই অজীর্ণই হইতেছে বাঙ্গালী জাতীর আয়ুক্ষয়ের সর্ব্বপ্রধান কারণ। আমরা ছেলেদের লেখাপড়া শিখাইয়া কাজ নাই—এমন কথা বলিতেছি না, কিন্তু যেরূপ ভাবে তাহাদিগকে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, তাহার পরিবর্ত্তন করা যে উচিত—একথা মুক্তকণ্ঠে বলিব। আমরা এখনকার দিনে ছেলেরা কেবল নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থগুলি আয়ত্ত করিয়া ফেলিতেছে কিনা তাহাই দেখি—কিন্তু তাহার ফলে তাহাদের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিতেছে কিনা তাহার চিন্তা তো মোটেই করিনা। স্বাস্থ্যরক্ষায় জন্য যে ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা আছে—এ কথাটা এখনকার অনেক পিতামাতারই জ্ঞান নাই। বিদ্যালয়সমূহে অবশ্য সে ব্যায়ামের ব্যবস্থা অল্পবিস্তর প্রবর্ত্তিত আছে, কিন্তু সে ব্যায়ামের কাল যে সময়ে নির্দ্দিষ্ট—তাহা কখনই বাঙ্গালী শিশুর পক্ষে উপযুক্ত নহে। বাঙ্গালী বালকদিগকে যে সকল ব্যায়াম করান হয়, উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে তাহাও বাঙ্গালীশিশুর পক্ষে প্রকৃষ্ট নহে। সেকালে ছেলেদের ব্যায়ামের ব্যবস্থা ছিল—হৈঁড়েডুডু, কপাটিখেলা প্রভৃতি। একালের ব্যায়াম হইয়াছে, ব্যাটবল, ফুটবল প্রভৃতি। এ সকল ব্যায়ামের ব্যবস্থা ইংরাজ জাতির নিকট আমরা শিক্ষা করিয়াছি। ইংরাজ স্বভাবতঃ মাংসাশী জাতি। মাংসাশী জাতির পক্ষে ঐরূপ ব্যায়াম যেরূপ ফলোপদায়ক হয়, শাকান্নভোজী বাঙ্গালী শিশুর পক্ষে তাহা কখনই উপযুক্ত নহে, কাজেই ঐ ধরণের ব্যায়াম চর্চ্চায় অনেক স্থলে বাঙ্গালীবালক যশস্বী হইলেও তাহা যে তাহার স্বাস্থ্যরক্ষার পরিপন্থী হইয়া পড়িতেছে তাহা সুনিশ্চয়।

সেকালে বাঙ্গালী শিশুর লেখাপড়ার সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল—প্রাতঃকালে এবং অপরাহ্নে। বাঙ্গালীর কর্ম্মকালও নির্দ্দিষ্ট ছিল ঐ দুইটী সময়। দ্বিপ্রহরে সকলেই বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতেন, এখন দেশ হইতে সে প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। ফলে আহারান্তে ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইতে না হইতেই বাঙ্গালী শিশুকে জ্যামিতি-বীজগণিতের তত্ত্ব অন্বেষণে মস্তিষ্ক আলোড়িত করিতে হয়—বাঙ্গালী কর্ম্মীর পক্ষেও ঐ ব্যবস্থা। বাঙ্গালীর আয়ুক্ষয়ের ইহাও কারণ। তাহার পর ব্রহ্মচর্য্যের কথা। ব্রহ্মচর্য্যপালন বাঙ্গালী বালক তো এখনকার দিনে করিতেই জানেনা,—সে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষাদানের স্পৃহাও কাহারও নাই। সেকালে বাঙ্গালী বালকের অধ্যয়নকাল যতদিন পূর্ণ না হইত—ততদিন তাহাদিগের ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার জন্য বিশেষ ভাবে ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইত। সেকালের গুরুগৃহের অধ্যয়নের ব্যবস্থা ইহারই জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। এখন সে গুরুও নাই, সে ছাত্রও নাই। ফলে ব্রহ্মচর্য্যহীনতাই যে এখনকার দিনে আমাদের আয়ুক্ষয়ের সর্ব্বপ্রধান কারণ এবং কলিকাতায় যক্ষ্মা বৃদ্ধি যে তাহারই ফলসম্ভূত, তাহা প্রত্যেক অভিভাবকই চিন্তা করুন—ইহাই আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। আমরা সময়ান্তরে এ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিব।

পদ্ম।

(কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন)

পদ্ম—পদ্ম ত্রিবিধ, শ্বেতপদ্ম, নীলপদ্ম রক্তপদ্ম। নীলপদ্ম এখন এতদ্দেশে দৃষ্ট হয় না। পুরাণে বর্ণিত আছে—শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধেচ্ছু হইয়া মহামায়া ভগবতীকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য এক লক্ষ নীলপদ্ম দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটী অপহৃত হওয়ায় পূজায় বিঘ্নোৎপন্ন হয়, পরম ভক্ত রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ সংকল্পিত পদ্মের সংখ্যা পূর্ণ করিবার জন্য নিজের দক্ষিণ চক্ষু উৎপাটিত করিয়া পূজা সমাপনের বাসনা করিলে, মহামায়া মহাশক্তি ভক্তের বাসনা পূর্ণার্থে শ্রীরামচন্দ্রকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া রাবণবধের বরদান করিয়াছিলেন। এই পুরাণোক্ত বর্ণিত বিষয়ে নীলপদ্মের সংজ্ঞা অবগত হওয়া যায়। উহা না কি রামভক্ত হনুমান কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল।

রক্তপদ্ম ও শ্বেতপদ্ম এতদ্দেশে প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। রাঢ়দেশেই শ্বেতপদ্মের উৎপত্তি অধিক দৃষ্ট হয়।

পদ্মের মূল, মৃণাল, পত্র ও পুষ্প সমস্তই বিভিন্ন প্রকারের ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমরা নিম্নে পদ্মের গুণ প্রকাশ করিতেছি—

রক্তপিত্তরোগে পদ্ম—পদ্ম বা মৃণালের শরবৎ, কিঞ্চিৎ ইক্ষুচিনির সহিত সেবন করিলে রক্তপিত্ত রোগীর রক্তবমন নিবৃত্ত হইয়া থাকে মৃণালের কল্ক কাথও রক্তপিত্তে হিতকর।

মূত্রকৃচ্ছ্রে পদ্ম—মূত্রকৃচ্ছ্র রোগীকে পদ্মের মৃণাল ও উৎপলের কাথ সেবন করাইলে মূত্রকৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়।

রক্তার্শে পদ্মকেশর—পদ্মের কেশর চূর্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ মাখন ও ইক্ষুর চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অর্শের রক্তরোধ হইয়া থাকে।

জ্বরাতিসারে পদ্ম কেশর—জ্বরাতিসার রোগে, পদ্মকেশর, উৎপল ও দাড়িমের খোসা—সমভাগে লইয়া চাউল ধৌত জলের সহিত সেবন করিলে জ্বরাতিসার উপশমিত হয়।

রক্তবমনে পদ্মকেশর—রক্তবমন হইলে পদ্মকেশর কিঞ্চিৎ ইক্ষুচিনির সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে রক্তবমন নিবৃত্ত হয়।

মূত্ররোধে পদ্মকন্দ—মূত্র রোধ হইলে পদ্মকন্দ গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে মূত্ররোধপীড়ার উপশম হয়। পদ্মকন্দ প্রথমতঃ তিল তৈলে ভাজিয়া লইবে, তৎপর গোমূত্রে পেষণ করিয়া গোমূত্রের সহিত পান করিবে।

পদ্মবীজ—শ্বেত ও রক্ত প্রদরে চাউল ধৌত জলসহ পান করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

দাহসংযুক্ত জ্বরে **পদ্মপত্রে** শয়ন করিলে দাহ উপশম হয়।

পদ্মের শিরাল—অর্শের রক্তস্রাব ও রক্তপ্রদরের স্রাবে বিশেষ উপকারী।

পদ্মের কোমল পত্রপুষ্প শ্বেতচন্দন ও আমলকী পেষণ করিয়া জ্বরকালীন শিরঃপীড়ায় কপালে প্রলেপ দিলে বিশেষ শান্তি বোধ হইয়া থাকে।

ম্যালেরিয়ায় মুষ্টিযোগ।

(কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরত্ন)

১। কিসমিস, গুলঞ্চ, বাসকছাল, চিরাতা, দারুহরিদ্রা, আমলকী—প্রত্যেক দ্রব্য ।৶১০ জল ⁄।॥০ সের শেষ ৵০ এই কাথ সেবনে ম্যালেরিয়া জ্বর বিনষ্ট হয়।

২। অনন্তমূল, যষ্টীমধু, আপীহরীতকী ও পিঁপুল—প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ সমানভাগে ১ তোলা লইয়া আমলকীর কাথে ভিজাইয়া শুষ্ক করিবে। তৎপরে এক আনা মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিয়া প্রাতে, বৈকালে ও রাত্রে একটি করিয়া বটীকা সিউলী পাতার রস ও মধুসহ সেবন করিলে ম্যালেরিয়ার হাত হইলে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

৩। সিউলী পাতা, বেলপাতা, গুলঞ্চ ক্ষেৎপাপড়া—ইহাদের স্বরস ⁄০ ছটাক পরিমাণ কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণসহ পান করিলে ম্যালেরিয়ার উপশম হয়।

৪। মনসাপাতা অগ্নিতে ঝলসাইয়া তাহার রস অর্দ্ধছটাক ৩।৪ রতি পিঁপুল চূর্ণ ও মধুসহ সেবন করিলে ম্যালেরিয়া জ্বর বিনষ্ট হয়।

গুলঞ্চ ও অনন্তমূল প্রত্যেক দ্রব্য ১ তোলা, জল ⁄।॥০ সের শেষ ৵০ পোয়া—ইহাতে চারি আনা পরিমাণ সোঁদালের আটা গুলিয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে পান করিলে ৩ সপ্তাহের মধ্যে ম্যালেরিয়া জ্বর বিনষ্ট হয়।

৬। বামনহাটী চূর্ণ করতঃ এক আনা প্রাতে ও এক আনা সন্ধ্যায়—২ তোলা পরিমাণ ক্ষেতপাপড়ার রস ও মধুর সহিত সেবনে ম্যালেরিয়া নষ্ট হয়।

৭। নিমপাতা, চিরাতা, গুলঞ্চ, সোঁদালের আটা—প্রত্যেক দ্রব্য ॥০ তোলা জল ⁄।॥০ সের, শেষ ৵০,—ইহা কয়েক দিন পান করিলে ম্যালেরিয়া জ্বর বিনষ্ট হয়।

৮। তুলসীর পাতার রস ১ তোলা ও বেলপাতার রস ১ তোলা—কিঞ্চিৎ মধুসহ প্রত্যহ পান করিলে ম্যালেরিয়া জ্বর উপশমিত হয়।

৯। হিঙ্গু অর্দ্ধ রতি, পিঁপুলচূর্ণ ৩ রতি—২ তোলা গুলঞ্চের রসের সহিত প্রাতে ও বৈকালে সেবন করিলে প্রবল কম্পযুক্ত ম্যালেরিয়া জ্বর অতি শীঘ্র বিদূরীত হয়।

১০। রসসিন্দূর ⁄০ আনা, সোডা ১।০ সওয়া রতি—একত্র গ্রহণকরতঃ মিসিন্দা পাতার রসে মর্দ্দন করিয়া ৩টি বটি প্রস্তুত করিবে। এই বটীকা প্রাতে ১টি মধ্যাহ্নে ১টি ও বিকালে ১টি জলসহ সেবন করিলে জ্বর ৩ দিনের মধ্যে ছাড়িয়া যায়।

১১। কণকধুতুরার মূল অর্দ্ধ রতি সন্ধ্যাকালে ছেঁচিয়া একছটাক জলে ভিজাইয়া রাখিবে। প্রাতে উক্ত ঔষধ না ঝাকাইয়া মূলটি তুলিয়া কেলিয়া দিয়া নির্ম্মল জলটুকু পান করিয়াই সর্ষপতৈল মর্দ্দন করতঃ অবগাহন করিবে। স্নানের পর মিছরির সরবৎ খাইবে। জল ⁄।॥০ সের ও মিছরি ⁄।০ ভিজাইয়া প্রস্তুত করিবে। তৎপরে ঝালের ঝোল ও ভাত খাইবে। এই ঔষধ ১ দিন মাত্র সেব্য। কিন্তু সরবত ১০ সপ্তাহ খাইবে। ইহা জীর্ণজ্বর, বিষমজ্বর প্রভৃতি ফলদায়ক।

পল্লী-প্রসঙ্গ।

জীর্ণ জটিল রোগে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা যেরূপ ফলপ্রদ এমন আর কোনো চিকিৎসা নহে। ম্যালেরিয়া জ্বরে এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা কুইনাইন-সাহায্যে যে চিকিৎসা করেন, তাহাতে কিন্তু পুনঃ পুনঃ পালটাইয়া পড়িতে হয়। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ মতে যদি পাচন ও বটিকা প্রভৃতির প্রয়োগে ম্যালেরিয়াক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা করা যায়, তাহা হইলে তাহার যে আর পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না ইহা ধ্রুব সত্য। সুখের বিষয় এখন দেশের লোকে এ কথা বুঝিতেছেন এবং তাহার ফলে আয়ুর্ব্বেদের প্রসার বৃদ্ধির জন্য স্থানে স্থানে আয়ুর্ব্বেদীয় বিদ্যালয় এবং হাসপাতাল স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে। ময়মনসিংহের চারুমিহির আমাদিগকে সংবাদ দিতেছেন —

অনেক সময় দেখা গিয়াছে, ডাক্তারি চিকিৎসায় ম্যালেরিয়া জ্বর হইতে মুক্তিলাভ করা কঠিন, কিন্তু ভাল কবিরাজী চিকিৎসায় উত্তম ফল পাওয়া যাইয়া থাকে। টাঙ্গাইল উপবিভাগ ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগবাহুল্যের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। টাঙ্গাইলের বহু অধিবাসী টাঙ্গাইলের একটী আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় স্থাপন জন্য ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। আমারা দেখিয়া সুখী হইলাম, ডিঃ বোর্ডের স্বাস্থ্যকমিটি গত ১৩ মে তারিখে এই বিষয়ে টাঙ্গাইলের সবডিবিসনাল অফিসারকে সবিস্তার রিপোর্ট করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক কি পরিমাণ ব্যয় পড়িবার সম্ভাবনা, কি প্রকার শিক্ষক নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক, ছাত্রসংখ্যা কি পরিমাণ হওয়ার সম্ভাবনা এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিবেন।

ম্যালেরিয়ার আক্রমণে ময়মনসিংহের অবস্থা যেরূপ ভয়াবহ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাও চারুমিহিরের নিম্নলিখিত সংবাদটীতে উপলব্ধি হইয়া থাকে,—

নেত্রকোণা উপবিভাগের অন্তর্গত বহুগ্রামে ভীষণ জ্বরের আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। অনেক লোক ইতিমধ্যেই জ্বরে মারা গিয়াছে। বহু পরিবারে শুশ্রূষা করিবার বা পথ্যাদি দিবার লোক পর্য্যন্ত নাই ডিঃ বোর্ড কোনও কোনও স্থানে ডাক্তার পাঠাইয়াছেন বটে, কিন্তু তদ্বারা সামান্য লোকেরই উপকার হইতেছে।

যতগুলি কারণে বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইয়া পড়িয়াছে, বাঙ্গালা দেশে রেল বিস্তৃতি তাহার একটী কারণ। রেলওয়ের সুবিধার জন্য বাঙ্গালার অনেক নদী হাজিয়া মজিয়া গিয়াছে। অনেক স্থানে গর্ত্ত গগার প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়া পড়িয়াছে। যে সকল নদী সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের সংস্কার সাধন সময় সাপেক্ষ। কিন্তু গর্ত্ত গগার গুলি বুজাইয়া দেওয়া বিশেষ ব্যয়ের ব্যাপার নহে। এই কার্য্যের ব্যবস্থা সরকার হইতে রেল কর্তৃপক্ষকে দিয়াই সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করা উচিত। সহযোগীর চারুমিহির এ সম্বন্ধে এইরূপ প্রস্তাব করিতেছেন,—

রেল রাস্তার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বত্র ম্যালেরিয়া জ্বর বিস্তৃতি লাভ করিয়া থাকে এই কথায় আর এখন সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জ উপবিভাগের অধিবাসীগণ এই কথার যাথার্থ্য বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের নিকট

ঢাক্তার ও ঔষধ প্রার্থনা করিয়া এই রিপুর হস্ত হইতে স্থায়ীরূপে উদ্ধার পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। যাহাতে স্থানীয় স্বাস্থ্যের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহার চেষ্টা করাই বিশেষ আবশ্যক। রেল রাস্তা ও অন্যান্য উচ্চ রাস্তার মধ্যে ঘন ঘন পোল দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া, গর্ত্ত পগার ইত্যাদি ভরিয়া ফেলিয়া জল নামিয়া যাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিলে ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে। আমরা আশা করি, জনসাধারণে তৎপ্রতি মনোযোগ প্রদান করিবেন এবং যাহাতে ডিঃ বোর্ড ও গবর্ণমেণ্টের উচ্চ কর্ম্মচারীগণ এই প্রকারে স্থানীয় স্বাস্থ্যের উন্নতির নিমিত্ত সচেষ্ট হন তৎপ্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইবে।

জ্বরের সংবাদ বাঙ্গালার সকল জেলা হইতেই পাওয়া যাইতেছে। ত্রিপুরা হিতৈষীতে প্রকাশ,—

"রোগের প্রাদুর্ভাব—মফঃস্বলের অনেক স্থান হইতেই নানাবিধ রোগের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। জ্বর রোগ কোন কোন স্থলে মহামারীরূপে দেখা দিয়াছে। প্রকাশ মুরাদনগর থানার অধীন একবাইরা গ্রামে ১২৫।১৩০ জন লোক জ্বর রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। একে অন্নাভাবে অনশনে বা অর্দ্ধাশনে লোক দিন কাটাইতেছে, তার উপর যদি রোগের আক্রমণ হয় তবে অভাবে অপরিপুষ্ট জীর্ণ দেহ সেই ব্যাধির সহিত কয়দিন সংগ্রাম করিতে পারে? অনশন এ সকলের মুখ্য কারণ হইতে পারে, কিন্তু উহাও যে গৌণ কারণ সে বিষয় সন্দেহ নাই।

"ত্রিপুরা হিতৈষী" শুধু স্থানীয় রোগ বিবরণ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই সেখানকার হাসপাতালটিরও যে দুরবস্থার পরিচয় দিয়াছেন তাহাও বড় মর্ম্মভেদী। পাঠক তাঁহারই ভাষায়, সে সংবাদ অবগত হউন,

"স্থানীয় হাসপাতালের কথা—শ্রীযুক্ত ডিভিসন্যাল কমিশনার সাহেব এবার যখন কুমিল্লা পরিদর্শনে আগমন করিলেন, তখন তিনি স্থানীয় হাসপাতাল পরিদর্শন কালে কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্র ও ঔষধ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। প্রকাশ, এই অনুসন্ধানের ফলে তিনি কোনরূপ সন্তোষ লাভ করিতে পারে নাই। তিনি যখন যে যন্ত্র বা ঔষধ দেখিতে চাহিয়াছেন তাহার উত্তরে না ব্যতীত হাঁ না কি শুনিতে পান নাই। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বটে। এ নিমিত্ত কাহার দোষ দিব তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। সহরের দাতব্য হাসপাতালে অত্যাবশ্যকীয় ও মূল্যবান যন্ত্র ও ঔষধাদি রক্ষিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। সহরে যে সকল ডাক্তার চিকিৎসা ব্যবসায় করিয়া থাকেন, তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রাদি রাখিতে পারেন না, রাখা সম্ভবও নয়। কাজেই যন্ত্র ও ঔষধের অভাবে কঠিন ব্যাধিগুলি অচিকিৎসায় থাকিয়া গেলে উহা সহরের ও জেলাবাসীর নিতান্ত দুর্ভাগ্যের কথা বলিতে হইবে। যাঁহারা ধনী তাহারা না হয় চিকিৎসায় নিমিত্ত দূরবর্ত্তী স্থানে যাইতে পারেন, কিন্তু দরিদ্রের উপায় কি? এ নিমিত্ত আমাদের মনে হয়, কেবল দাদ ও পাঁচড়ার ঔষধ বিতরণের স্থান না হইয়া যাহাতে লোক দুঃসময়ে ও কঠিন রোগে সাহায্য পাইতে পারে হাসপাতালে তেমন ব্যবস্থা থাকা নিতান্ত প্রয়োজন এবং ঐ সকল ক্ষেত্রেই হাসপাতালের সার্থকতা।

"এসম্বন্ধে আমাদের অপর একটি অভিযোগ আছে। হাসপাতালে সকল সময় রোগীদিগকে গ্রহণ করা হয় না। সংঘাতিকরূপে আহত ব্যক্তি দিগকেও নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত না হইলে প্রত্যাখ্যান করা হয়, ইহা আমাদের নিজের প্রেসের একটী লোকের সম্পর্কে বিশেষ ভাবে জানিতে পারিয়াছি। দুর্ঘটনা—হাসপাতালের আইন মানিয়া চলে না। ইহার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। এমতাবস্থায় কোন দুর্ঘটনায় আহত কেহ যদি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত হয় নাই বলিয়া নিষ্ঠুর ভাবে প্রত্যাখাত হয়, তবে তাহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? যদি তাহাই হয়, তবে ডাক্তারের বাসস্থান সরকার হইতে দিবার ব্যবস্থাই বা কি নিমিত্ত? এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেও একবার কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। জানিনা তাঁহারা ইহার কোন প্রতীকার করিয়াছেন কি না?"

আমাদের দেশ হইতে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা উঠিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহানির কারণও ইহাই। এখনকার স্কুল কলেজে

যেরূপ ধরণে শিক্ষা প্রদত্ত হয়, তাহার মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। এ অবস্থায় দেশে যদি ব্রহ্মচর্য্য বিধানের প্রতিষ্ঠার কথা শুনা যায়, তাহা হইলে মনোমধ্যে স্বভাবতঃই আশার সঞ্চার হইয়া থাকে। মুর্শিদাবাদের "প্রতিকার" সংবাদ দিতেছেন,—

ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় স্থাপন। কয়েক দিন হইল, ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় সংস্থাপন জন্য বৈদ্যনাথধামের রায় বাহাদুরের সুরম্য অট্টালিকায় একটী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভায় অগ্রদ্বীপের জমিদার মাননীয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ মলিক মহাশয়ের সভাপতিত্বে সভার কার্য্য সুন্দররূপে সমাধা হইয়াছিল। তিনি এই সভায় উক্ত ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় স্থাপন জন্য নগদ দশ হাজার টাকা ও এক হাজার বিঘা জমি দান করিবেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় স্থাপন একটী মহৎ পুণ্যের কার্য্য। আমরা সভাপতি মহাশয়ের এইরূপ দানের প্রশংসা করি। ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে তাঁহার দান চিরস্মরণীয় থাকিবে।

কলেরার প্রাদুর্ভাব এখনও বাঙ্গালার অনেক স্থানে চলিতেছে। "ঢাকাপ্রকাশে" প্রকাশ,—

সদরঘাটী করিদাবাজার অঞ্চলে 'কলেরা' রোগ দেখা দিয়াছে। তত্রত্য 'কনষ্টেবল ট্রেণীং স্কুলের' শিক্ষার্থীগণের মধ্যেও নাকি কয়েক জন এই রোগে শয্যাশায়ী হইয়াছে। যাহাতে সাংঘাতিক ব্যাধি আর বেশীদূর ছড়াইতে না পারে, মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ অচিরে তাহার সুব্যবস্থা করুন।

মেদিনীপুরের "নীহার" হইতেও সেখানে কলেরার আক্রমণের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে,—

ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব—পুরীর রথযাত্রী ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গেই মেদিনীপুর সহরে ওলাউঠা ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং উহাতে অনেক লোকে মারা যাইতেছে।

"মেদিনীপুর হিতৈষিণী"তেও এই কলেরার সংবাদ পাওয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, "মেদিনীপুর হিতৈষিণী" সেখানে কলেরা বিস্তৃতির কারণেও সেখানকার পানীয় জলের দুরবস্থার কথাও উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন,—

স্বাস্থ্য—এখনও কলেরা সহর ছাড়িলনা! মধ্যে মধ্যে দুই চারিজন উক্তরোগে দেহত্যাগ করিতেছে। জ্বরাদির আবির্ভাব অল্প নয়। চারি দিকে মাছি ভন ভন্ করিতেছে! নর্দ্দামায় জিনিষ পচিতেছে। পুষ্করিণী-আদি অপরিস্কৃত ও তাহাতে জলাভাব। গরীব লোক জলের অভাবে তাহাই পান করে।

আসাম প্রদেশ তো ম্যালেরিয়া ও কালা-জ্বরের আবাসভূমি। সেখানকার সাতগাঁও অঞ্চলের বর্ণনা করিয়া শিলচরের সহযোগী "সুরমা"তে একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন,

ম্যালেরিয়ার আক্রমণে এই অঞ্চলের শত শত লোক প্রতিবৎসর প্রাণত্যাগ করিতেছে—গ্রামের পর গ্রাম ম্যালেরিয়ায় উজাড় হইতেছে। সাতগাঁয়ের ম্যালেরিয়া জ্বরের কথা এখন প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে। উহা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এখন ঐ অঞ্চলের লোক গ্রাম ছাড়িয়া সহরে পলাইতেছে—পারত পক্ষে সাতগাঁও এর ছায়া মাড়াইতে চাহে না, —যাহারা নিতান্ত নিরুপায়, তাহারাই গ্রামে থাকিয়া জঠরানলে আহুতি যোগাইতেছে।

বাঙ্গালাদেশে যেরূপ আধিব্যাধির পরিমাণ বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালার প্রত্যেক জেলায় সরকার হইতে মেডিকেল স্কুলস্থাপনার চেষ্টা করিয়া চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যে একান্ত উচিত—সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। আমরা এ কথা অনেকবারই বলিয়াছি। প্রত্যেক জেলার অধিবাসী-বৃন্দের ইহার জন্য চেষ্টাশীল হওয়া কর্ত্তব্য। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, ময়মনসিংহের অধিবাসীগণ ইহার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। সহযোগী "চারুমিহির" আমাদিগকে জানাই-তেছেন—

এই নগরে মেডিক্যাল স্কুল স্থাপন সম্বন্ধে স্থানীয় জন সাধারণের পক্ষে গবর্ণমেণ্টের নিকট এক আবেদন পত্র প্রেরিত হইয়াছে। আমরা এ আবেদন পত্রের প্রতিলিপি প্রাপ্ত হইয়াছি, স্থানাভাবে উহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। এই আবেদনপত্রে ময়মনসিংহে মেডিকেল স্কুল স্থাপন সম্বন্ধে যে সকল উক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা অকাট্য। উহাতে যে সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা হইতে মনে হয়, এই স্থানে মেডিকেল স্কুল স্থাপন করা আশাপ্রদ। আমরা ভরসা করি, কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে আর কালগৌণ না করিয়া সত্বর স্কুল স্থাপনে যত্নবান হইবেন।

সহযোগী "হিন্দুস্থান"ও ময়মনসিংহে মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া বলিতেছেন,—

ময়মনসিংহ বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বাপেক্ষা বড় জেলা, সুতরাং সে হিসাবে দাবী যে খুব জোরাল তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জেলাটিতে ৪৪,২০ জন লোক পিছু বা ১৭২ খানা গ্রাম পিছু মাত্র একটি করিয়া চিকিৎসক আছেন। আর কোনো সভ্য দেশে এরূপ ব্যবস্থা আছে কিনা জানি না।

কাজের কথা।

বাঙ্গালার স্বাস্থ্য—বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের কথা ভাবিলে শুধু দুঃখ হয় না, চক্ষু ফাটিয়া জল আসে। নীরোগ দেহে স্বাস্থ্যসুখ উপভোগ এখন অতি অল্পসংখ্যক বাঙ্গালীর ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। যাঁহারা পল্লীগ্রামে বাস করেন, ম্যালেরিয়ার পীড়নে তাঁহারা তো চিরবিপর্যস্ত। সহরে বাস করিয়াও বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় নাই, কারণ সহরবাসের ফলে প'নের আনা বাঙ্গালীকে অজীর্ণ রোগ ভোগ করিতে হয়। ইহার উপরে সহরে বদ্ধবায়ুর ফলে যক্ষাগ্রস্থের সংখ্যাও শনৈঃশনৈঃ যেরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে—তাহাই হইতেছে বাঙ্গালীর পক্ষে আশঙ্কার কথা।

সেকালের বাঙ্গালী।—সেকালের বাঙ্গালীর যে কখনও কোন রোগ হইত না—জ্বর-জ্বালা, অজীর্ণ এবং ক্ষয়গ্রস্থ হইয়া সেকালের বাঙ্গালী যে কখনও মরিত না—এমন কথা আমরা বলিতেছিনা, কিন্তু একালের মত সেকালের বাঙ্গালী এত যে রোগে ভুগিত না এবং তাহার ফলে তাহাদের স্বাস্থ্যসুখ অটুট থাকিত—ইহা সুনিশ্চয়। সেকালের বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যসুখ অটুট থাকিত বলিয়াই সেকালের বাঙ্গালী যেরূপ পরিশ্রম করিতে পারিত একালের বাঙ্গালীর নিকট সে ক্ষমতা লোপ পাইয়াছে। বাঙ্গালী এখন একপোয়া পথ হাঁটিতেও কষ্ট বোধ করে। কিন্তু এমন একদিন ছিল, যেদিন বাঙ্গালী শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবের দর্শনে কৃতকৃতার্থ হইবার জন্য বাঙ্গালার সুদূর পল্লী হইতে পুরী পর্য্যন্ত পদব্রজে যাইতে কষ্ট বোধ করিতেন না। এখন দেশে যেরূপ নানা প্রকার যান বৃদ্ধি হইয়াছে, সেইরূপ পথপর্য্যটনের অভ্যাস হইতেও বাঙ্গালীকে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে।

* * *

উন্নতি না অবনতি।—কিন্তু এই শ্রমবিমুখতা বাঙ্গালী জাতির উন্নতি কি অবনতির পরিচায়ক, তাহা ভাবিবার কথা। শ্রমবিমুখতার ফলে একদিকে বাঙ্গালীর শারীরিক অবনতি ঘটিতেছে, অন্য দিকে বাঙ্গালী-বড়লোকদিগের দেখাদেখি বাঙ্গালী-দরিদ্রও নিজের অবস্থা না বুঝিয়া শ্যামবাজার হইতে হেদুয়ার মোড় পর্য্যন্ত যাইতে হইলেও ট্রামে চড়িয়া অর্থের অপব্যয় করিতেছে। দেশে দশ টাকা মণ চাউল, বাঙ্গালার অনেক স্থানের লোক দু'বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাইতেছে না, এ অবস্থায় বাঙ্গালীর পক্ষে এরূপ অভ্যাসের প্রশ্রয় পাওয়া উচিত কিনা—তাহা কি বিবেচনার বিষয় নহে। বাঙ্গালী মরিতেছে তো ইহারই জন্য।

* * *

মানসিক শ্রম।—বাঙ্গালী শারীরিক শ্রম করিতে আর অভ্যস্ত নহে। কিন্তু মানসিক শ্রমটা বাঙ্গালীর যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে। বাল্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিলাভের জন্য এবং তাহার পর বিশ্বপণ্ডিত রূপে বাহির হইয়া গোলামি বজায় রাখিবার জন্য এই মানসিক শ্রমটা বাঙ্গালীকে অতিরিক্তই করিতে হয়। কর্ম্মময় জীবনে যাঁহারা সেরূপ মাথা ঘামাইতে অনভ্যস্ত, তাঁহাদের আর্থিক উন্নতিও অসম্ভব। কাজেই বাঙ্গালীজাতি একদিকে যেরূপ শ্রমবিমুখতার ফলে স্বাস্থ্যোন্নতির বিঘ্ন ঘটাইতেছে, অপর দিকে সেইরূপ অতিরিক্ত মানসিক চিন্তার ক্ষয়রোগগ্রস্ত হইবার কারণ উৎপন্ন করিয়া তুলিতেছে। শুধু বিশ্বপণ্ডিত হইলে চলিবে না, দাসত্বের বড় বড় অভিধানে সন্তুষ্ট থাকিলেও চলিবেনা, ইহার ফলে আমাদের অবস্থাটা কি দাঁড়াইতেছে, তাহা প্রত্যেক বুদ্ধিমানেরই কি চিন্তা করা উচিত নহে?

সমালোচনা।

শিশুপালন। ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম, বি সম্পাদিত। মূল্য ||০ আনা। এখনকার দিনে শিশুমৃত্যুবাহুল্যের যুগে কার্ত্তিক বাবুর মত বিজ্ঞ ও বহুদর্শী চিকিৎসক যে বহুল কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও এরূপ গ্রন্থ সম্পাদনে সময়ক্ষেপ করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি প্রত্যেক বাঙ্গালীরই ধন্যবাদের পাত্র। ভারতে প্রত্যেক মিনিটে চারিটি করিয়া শিশু মরে। আমরা হোমরুল লইয়া ব্যস্ত, বক্তৃতার চোটে দেশ কাঁপাইয়া তুলিতেছি, কিন্তু ভারতবাসী কি করিয়া স্বাস্থ্যোন্নতি হইবে, কি করিয়া শিশুমৃত্যুর সংখ্যা দেশ হইতে লোপ পাইবে—সে কথাটা একবার চিন্তা করিতেছি কি? দেশরক্ষা করিতে হইলে সকল চিন্তা অপেক্ষা আগে শিশুরক্ষার জন্য মনোযোগী হইতে হইবে। আমাদের দেশে শিশু মৃত্যু-বাহুল্যের সর্ব্বপ্রধান দায়ী আমরাই;—আমরা ব্রহ্মচর্য্য ভুলিয়া গিয়াছি, কিরূপ সময়ে উপযুক্ত স্ত্রীপুরুষের মিলনে শুভ কার্য্যের ব্যবস্থা আবশ্যক ও [illegible]

পারে—সে চিন্তা কয়জন দেশবাসী করিয়া থাকেন? তাহার পর সন্তান লাভ হইল তো—সে সন্তান প্রকৃত কর্ম্মীপুরুষ হইবে কি না, তাহা আমাদের বিচার করিবার প্রয়োজনও নাই। স্থির, ধীর শান্তভাবে —বিশ্ববিদ্যালয়ের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া সে ছেলে একজন বড় চাকুরে হউক ইহাই এখনকার প্রত্যেক পিতামাতার কামনা। একে আমাদের ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষা নাই—স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি সকল আমরা অনবগত, তাহার ফলে দুর্ব্বল, রুগ্ন, অকর্ম্মণ্য শিশু লাভ তো আমাদের নিত্য ঘটিতেছে, তাহার উপরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাশিক্ষায় ছেলেদের অর্দ্ধেক পরমায়ু কমিয়া যাইতেছে, —সে যে অধিকতর ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িতেছে এবং সেই ভগ্নস্বাস্থ্য হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগকে যে নানা কারণে আমরা উপযুক্ত আহার দিতে অসমর্থ—এ সকল কথা আমরা কয়জন ভাবিয়া থাকি? কার্ত্তিক বাবু এ সকল কথা চিন্তা করিয়াছেন। এ পুস্তক তাহারই ফলসম্ভূত। কাজেই পুস্তকখানি উপাদেয় হইয়াছে। এ পুস্তক পড়িলে বাঙ্গালী-পিতামাতার অনেক শিক্ষা লাভ হইবে, আমরা সকলকেই এরূপ একখানি অবশ্য প্রয়োজনীয় পুস্তক পড়িবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

শরীর-তত্ত্ব। Phisiology ৪র্থ সংস্করণ। শ্রীবাজেন্দ্রলাল সুর এল, এম, এস, সি প্রণীত ও ৮৯ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট হইতে শ্রীরামলাল সুর কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা। মানবদেহের গঠন কিরূপ, কিরূপেই বা নির্ম্মিত এবং ইহার কার্য্যই বা কিরূপে সম্পাদিত হয়, এ সকল বিষয় অতি প্রাঞ্জল ভাবে এ পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। এ পুস্তকখানি চিকিৎসার প্রথম শিক্ষার্থিগণের বিশেষ উপকারে আসিবে। আমরা এ পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

অস্থিতত্ত্ব। Osteology, ৩য় সংস্করণ। ডাঃ শ্রীবাজেন্দ্রলাল সুর এল, এম, এস, সি প্রণীত। মূল্য ৸৹ আনা। এ পুস্তকে অস্থিতত্ত্বের বর্ণনা উত্তমরূপে বর্ণিত। যাঁহারা অস্থিরহস্য অবগত হইতে চাহেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এ পুস্তক প্রয়োজনীয়। এরূপ ধরণের পুস্তকের ভাষা স্বভাবতঃই দুরূহ হইবার কথা, কিন্তু আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, এই গ্রন্থের রচয়িতা সে পক্ষেও বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া যথাসম্ভব সহজকথায় গ্রন্থখানি প্রণয়নের প্রয়াস পাইয়াছেন। তবে মূল্য কিছু বেশী হইয়াছে মনে হইল। মূল্য আর একটু কমাইয়া দিলে সাধারণের সুবিধা হইতে পারে।

তিব্বেমসিহা বা সহজ হাকিমী শিক্ষা।—১ম খণ্ড। হাকিম মসিহর রহমান কোরায়শী প্রণীত। ১১৪ ও ১১৫ মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২৲ টাকা। এখানি হাকিমী চিকিৎসার উৎকৃষ্ট পুস্তক। ইহাতে সকল রোগের পরিচয় লিখিয়া তাহার চিকিৎসা-প্রণালী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যাঁহারা হাকিমী চিকিৎসা শিক্ষা করিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা উপকারে আসিবে।

চিকিৎসক।—ডাঃ এ, সি, মজুমদার এল, এম, এস প্রণীত। ৬৪ নং শিকদার বাগান ষ্ট্রীট হইতে মজুমদার এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—১৩০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা। এখানি হোমিওপ্যাথিক গ্রন্থ। হোমিওপ্যাথি কি? প্রথমেই তাহার বিবরণ দিয়া তাহার পর স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি, রোগীর পথ্যাপথ্য ও মেটিরিয়া মেডিকার পরিচয় দিয়া, তাহার পর রোগী পরীক্ষা, রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা-প্রণালীর কথা ইহাতে বলা হইয়াছে। গ্রন্থকার

"হোমিওপ্যাথি কি?"—বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছেন যে, "আয়ুর্ব্বেদ ও হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রের মূলসূত্র এক।" বাস্তবিক তাহাই ঠিক। হোমিওপ্যাথির মতে যেরূপ স্বল্প মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগে শুভফলের আশা করা যায়, আয়ুর্ব্বেদবেত্তারাও বহুযুগ পূর্ব্বে তাহাই করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। এ গ্রন্থ পাঠে বুঝা যায়,—এ গ্রন্থের গ্রন্থকার বায়ু-পিত্ত-কফ-নির্ণয় করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করার পক্ষপাতী। সেইজন্য তাঁহার প্রাকটিস বা চিকিৎসার বর্ণিত অংশ বিচক্ষণতার সহিত লিখিত হইয়াছে মনে হয়। গ্রন্থখানি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকগণের উপকারে আসিবে।

স্বস্তিকা। শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। মূল্য।৶০ আনা। ৫৫নং চিৎপুর রোড আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত। এ গ্রন্থের ভূমিকা পাঠে জানা যায়, সুখ দুঃখের মধ্যে কর্ম্মক্ষেত্রের অবিশ্রাম কর্ম্মস্রোতের মধ্যে সোয়াস্তি পাইবার উপায় স্বরূপ অবসর মত ইহার কবিতাগুলি লিখিত হইয়াছে। এইজন্য ইহার নামকরণ হইয়াছে স্বস্তিকা। ইহার কবিতাগুলি মনোরম। কবিতাগুলিতে গ্রন্থকারের ভগবদ্ভক্তির পরিচয় প্রত্যেক ছত্রে প্রকটিত। গ্রন্থকার কর্ম্মক্ষেত্রের অবিশ্রাম কর্ম্মস্রোতের মধ্যে সোয়াস্তি পাইবার জন্য স্বস্তিকা লিখিয়াছেন বটে—কিন্তু ঐরূপ কর্ম্মক্লান্ত পাঠকও এগ্রন্থ পাঠে যে সোয়াস্তি পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ছাপা, কাগজ ও বাঁধান অতি সুন্দর।

প্রচারক। হোমিওপ্যাথিক মাসিকপত্র। ডাঃ এ, সি, মজুমদার সম্পাদিত। ৪র্থ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা। বার্ষিক মূল্য ২৲। ১১০নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রচারোদ্দেশে এই মাসিকপত্রের প্রকাশ। আলোচ্য সংখ্যায় যে কয়টি সন্দর্ভ বাহির হইয়াছে, তাহার মধ্যে বালকগণের সর্ব্বনাশকারী পীড়া ও প্রতিকারের ব্যবস্থা" ও "শিশুপালন" পাঠে সাধারণের উপকার হইবে। জ্বররোগে "অর্জ্জুন বৃক্ষের ছাল—গবেষণামূলক সন্দর্ভ। "রোগীবিবরণ" হোমিওপ্যাথি চিকিৎকদিগের উপকারে আসিবে। সম্পাদকীয় মন্তব্য যদি স্বাস্থ্যতত্ব লইয়া লিখিত হয়, তাহা হইলে তদ্বারা পাঠকের উপকারের আশা বেশী করা যায়। "একনাইটের গুণ"—কবিতাকারে আমাদের ভাল লাগিল না। "চিকিৎসার চেয়ে রোগবিবরণ শ্রেয়ঃ।"—এরূপ প্রবন্ধ হোমিওপ্যাথিক ডোজে প্রকাশ করা পাঠকের ধৈর্য্যহানি ঘটিবে বলিয়া আমাদের মনে হয়।

কাশী আয়ুর্ব্বেদ সম্মিলনী পরীক্ষার ফল।

(১ম শ্রেণী)

বিজয় কান্ত সেন বি, এ,

(২য় শ্রেণী)

প্রমীলা বালা দাসী। সরোজিনী দেবী। সরযূ বালা দেবী। বিপিন বিহারী বিদ্যাবিনোদ। যতীন্দ্র প্রসাদ রায়।

(মধ্য পরীক্ষা)

(১ম বিভাগ)

জ্যোতীশ্চন্দ্র কাব্য ব্যাকরণতীর্থ। অম্বিকা চরণ কাব্যতীর্থ। বনবিহারী মুখোপাধ্যায়। মধুসূদন প্রসাদ মিশ্র। পীতাম্বর পাণ্ডে।

(২য় বিভাগ)

যোগেন্দ্র সিংহ দে। বীরেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য। শ্রীচন্দ্র শর্ম্মা। জানকী বল্লভ পাণ্ডে। কেশব লাল চক্রবর্ত্তী। কিশোরী শরণ দীক্ষিত। আত্মারাম পাঠক। বৈদেহীরমন মুখোপাধ্যায়।

আদ্য পরীক্ষা

১ম বিভাগ

কিশোরী শরণ দীক্ষিত। দেবদত্ত পাণ্ডে। মুরারি সিংহ বর্ম্মা। জগদীশ প্রসাদ পাণ্ডে। ঠাকুরদাস শর্ম্মা। বুদ্ধিবল্লভ পাণ্ডে।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক

৪র্থ বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৭—ভাদ্র। | ১২শ সংখ্যা।

কাজের কথা।

কলিকাতায় শিশু মৃত্যু।— সকল দেশ অপেক্ষা কলিকাতায় শিশু মৃত্যুর সংখ্যা অধিক। উহার সর্ব্বপ্রধান কারণ কলিকাতায় বিশুদ্ধ গব্যদুগ্ধ পাওয়া সুকঠিন। কলিকাতাবাসীগণ যে দুগ্ধ পাইয়া থাকেন, তাহা মফঃস্বল হইতে রেলযোগে এখানে আমদানি হইয়া থাকে। সে অবস্থায় গবা—সুস্থ কি অসুস্থ, দুর্ব্বল কি রুগ্ন, উহার দুগ্ধ ফুকা দিয়া দোহন করা কিনা—এ সকল বিষয় কাহারও দেখিবার প্রয়োজন হয় না, দুগ্ধ পাইলেই হইল! শুধু জল মিশাইলেই যে দুগ্ধের কৃত্রিমতা দোষ ঘটে তাহা নহে, উপরোক্ত কারণগুলি হইতেও দুগ্ধ বিকৃত হইয়া থাকে। ফলে কলিকাতা সহরে বিশুদ্ধ দুগ্ধের যথেষ্ট অভাব এবং তাহারই জন্য শিশুদিগের যকৃতের রোগ এবং তাহার পরিণতি অকাল মৃত্যু। কলিকাতা সহরে এমনই করিয়া infant leaver বা যকৃত রোগে অসংখ্য শিশু কালকবলিত হইতেছে। যাঁহারা শিশুমৃত্যু নিবারণের জন্য চিন্তা করিতেছেন, তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে কলিকাতাবাসীগণ যাহাতে বিশুদ্ধ দুগ্ধ পাইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করুন—তবে কলিকাতায় অকালমৃত্যুর কবল হইতে শিশুগণ রক্ষা পাইবে।

* * *

দুগ্ধ সম্বন্ধে সতর্কতা।—দুগ্ধ সম্বন্ধে মার্কিনের অধিবাসীগণ যেরূপ সতর্ক, এমন আর কোনো দেশের অধিবাসীগণ নহেন। ভারতের অধিবাসীদিগের পক্ষে যে বিচার শক্তির ব্যবস্থা অতীত যুগে ছিল, মহাকবি কালিদাস তাহারই ফলে আসমুদ্র ভূমণ্ডলের সম্রাট দালিপকে দিয়া গোচারণের চিত্র প্রদর্শনেও কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু ভারতবাসীর নিকট এখন সে বিচারশক্তি লোপ পাইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে দুগ্ধের স্পৃহাও এখন অনেক ভারতবাসীর নাই বলিলেও চলে। যাঁহাদের সে স্পৃহা এখনো লোপ পায় নাই তাঁহারা বাহ্য বিচারের

ব্যবস্থা রাখেন না, দুগ্ধ পাইলেই হইল,—তা' যেমনই কেন হউক না! বিলাতেরও নাকি এই অবস্থা! বিলাতের "ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জ্জেন" পত্রে প্রকাশ, বিলাতে অনেক স্থানেই দুগ্ধে আবর্জ্জনা থাকে এবং তাহারই জন্য সেখানে টাইফয়েড, যক্ষ্মা, গলনালীর ক্ষত প্রভৃতি রোগ জন্মিয়া থাকে। আমাদের দেশেও যে এই একই কারণে ঐ সকল রোগের বাহুল্য ঘটিতেছে না, তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব? এখন কলিকাতায় যক্ষ্মায় যত লোক মরে, আগে কি এত মরিত? টাইফয়েডও তো এখন যথেষ্ট বাড়িয়াছে। গলনালীর ক্ষত বা ডিপথিরিয়াও এখন শিশুদিগের একটা সংক্রামক ব্যাধি। আমাদের দেশের দুগ্ধ বিকৃতির ফলে তো আমরা এ সকল রোগ ভোগ করিতেছিই, তা' ছাড়া যে বিলাতী কাগজে বিলাতী দুগ্ধের নিন্দাস্রোতঃ অতি ভীষণভাবে প্রবাহিত হইতেছে, অনেক সময় সহজলভ্য মনে করিয়া সেই "গোয়ালিনীমার্কা খাঁটি দুগ্ধ"-কেও আমরা সাদরে আহ্বান পূর্ব্বক পান-সুখ উপভোগ করিতেছি! বিলাতে যে দুগ্ধ সাধারণ পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়, তাহার অভিধান মার্কিনে তৃতীয় শ্রেণীর দুগ্ধ। তাহা "রন্ধন ও পনীর প্রস্তুত করিবার জন্যই ব্যবহারের যোগ্য" বিক্রয়ের সময় লিখিয়া দিতে হয়। আমরা কিন্তু বিলাতী জমাট দুগ্ধ ব্যবহার সময়ে এ সকল কথা কিছুই ভাবিয়া দেখি না। ধিক আমাদের! আমাদের দেশে প্রতিদিনিতে 'ফ্যাবিজন' করিয়া শিশু মরিবে না তো মরিবে কোন্ দেশে?

* * *

পাঁউরুটী।—পাঁউরুটীর প্রচলনটাও এখন আমাদের দেশে যথেষ্ট। সখ করিয়া এবং জলখাবারের সময়ে তো এই পাঁউরুটি অনেক পরিবারেই ব্যবহৃত হয়, তা' ছাড়া অনেক সংসারে নৈশভোজনের হাতেগড়া রুটীর পরিবর্ত্তে পাঁউরুটীর প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাঁউরুটী কিন্তু যেরূপ ভাবে প্রস্তুত হয় তাহার কথা অবগত হইলে স্বভাবতঃই ঘৃণা উপস্থিত হইবার কথা। পাঁউরুটী প্রস্তুতের সময় দুই পা দিয়া উহার উপাদান দ্রব্যকে বিশেষ ভাবে মর্দ্দন করিয়া লওয়া হয়, ইহার অন্যথায় পাঁউরুটী প্রস্তুত হইতে পারে না। তাহার পর, এক দিনে যতগুলি পাঁউরুটী প্রস্তুত হয়—তাহা সেদিনই সমস্ত বিক্রয় হয় না, কাজেই তাহার পরদিনও সেই বাসিরুটী বিক্রয় না করিলে উহার ব্যবসায়ীকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। পাঁউরুটী-প্রিয় খরিদদারগণ কিন্তু সে সকল বিষয় ভাবিবার অবসর পান না। কলিকাতায় এই পাঁউরুটীপ্রিয় ব্যক্তিগণই কিন্তু অধিক অজীর্ণগ্রস্ত। মফঃস্বলেও যে সকল স্থানে ইহার প্রচলন কলিকাতারই মত, সে সকল স্থানের অধিবাসিগণও অজীর্ণের হাত হইতে অব্যাহতি পান না। আমরা উদাহরণস্বরূপ নদীয়া জেলার রাণাঘাটের নাম উল্লেখ করিতে পারি। নদীয়ার রাণাঘাট ষ্টেশন ই, বি, রেলের একটি বড় জংসন। এখানে এই উপলক্ষে অনেকগুলি লোক পাঁউরুটীর ব্যবসায় পূর্ণোদ্যমে চালাইয়া থাকে। রাণাঘাট এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের বাসিন্দাগণও এইজন্য দারুণ অজীর্ণ প্রবণ।

* * *

শিশুশরীরে পাঁউরুটী।—অনেকে আবার পা দিয়া চটকান পাঁউরুটীর আস্বাদন নিজেরা উপভোগ করিয়াই পরিতৃপ্ত নহেন, তাঁহাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম সন্তান-সন্ততিগণকেও উহার প্রসাদ দিয়া আনন্দ অনুভব করেন। সে আনন্দ কিন্তু শেষে যকৃত বিকৃতির ফলে নিরানন্দে পরিণত হয়। তখন অনেক সময় কায়-মনোবাক্যে চিকিৎসকের শরণ গ্রহণ করিয়াও ফললাভ হয় না। দেশে দুগ্ধের দুর্গতি, তাহার জন্য আমরা কদর্য্য দুগ্ধ ব্যবহার করাইয়া শিশু মৃত্যুর কারণ করিয়া তুলিতেছি,—ইহার উপর পাঁউরুটীর মত তাড়িমিশ্রিত দ্রব্য শিশুদিগের মুখে তুলিয়া দিতে অভ্যস্ত হইয়া যে কি বিষময় ফল উৎপন্ন করিতেছি, তাহা এখনও বুঝিতে পারিতেছি না—ইহাই দুঃখ।

* * *

আমাদের খাদ্য।—আমাদের দেশে খাদ্যদ্রব্যের তো অভাব নাই,—যে স্থলে আমরা পাঁউরুটীর ব্যবহার করিয়া থাকি, সে স্থলে বাঙ্গালা দেশের সহজ সুলভ খাদ্য 'মুড়ি' যে কত উপকারী তাহা বলিবার নয়। মুড়ির মত সহজপাচ্য খাদ্য অতি অল্পই আছে। আগে পল্লীগ্রামে এই মুড়ির প্রচলন যথেষ্ট ছিল. তখনকার দিনে সকল সংসারেই মুড়িভাজার প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল, অনেক সংসারে সকালে বিকালের জলখাবার ছিল সেই মুড়ি। এখনও সেই মুড়ির প্রচলন বাঙ্গালার বর্দ্ধমান-বাঁকুড়া-মালদহ-মেদিনীপুর প্রভৃতি সকল হইতে লোপ পায় নাই। যে সব দেশে পাঁউরুটীর প্রচলন কম, সে সব দেশের লোকে এই জন্যই দক্ষিণ বাঙ্গালার মত এত অজীর্ণগ্রস্থ নহে।

* * *

মুড়ি ও বিস্কুট। এখনকার দিনে অনেকে পাঁউরুটীর মত বিস্কুটও যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহার ফলে আমাদের দেশের বিস্কুটনির্ম্মাতাগণ অর্থাগমের পন্থা বড় বেশী সুলভ করুন আর না করুন, বিলাতী বিস্কুট ব্যবসায়ীরা কিন্তু যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। অনেক সংসারেই এখন দেখিবেন—আলমারির তাকে টিন ভরা বিস্কুট গৃহস্বামীর সমৃদ্ধি গৌরব প্রকাশ করিতেছে। এই বিস্কুটগুলি যে কতদিন পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়া, কত সাগর মহা-সাগর অতিক্রম করিয়া আমাদের দেশে আসিয়া পঁহুছিয়াছে এবং কতকাল পূর্ব্বের প্রস্তুত সেই দ্রব্য সম্ভারকে আমরা উৎকৃষ্ট আহারীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি কি না—তাহা কিন্তু আমাদের বিচার করিবার প্রয়োজনীয়তা নাই,—ক্ষমতাও নাই। দেখিতে চমৎকার,—খাইতে সুস্বাদু—মুখে দিলেই মিলাইয়া যায়—ইহাই তো সে দ্রব্যের পক্ষে উৎকৃষ্ট প্রশংসাপত্র! সে দ্রব্য—কে—কি প্রণালীতে প্রস্তুত করিয়াছে—কোন্ দেশ হইতে কিরূপভাবে কবে আসিয়াছে এবং সেই দ্রব্য বহুকালাবধি পর্য্যুষিত হওয়ার ফলে আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে শুভদ হইতে পারে কি না—এ সকল বিষয় আমাদের চিন্তা করা উচিত নহে কি? আমাদের দেশে 'মুড়ি' এই বিস্কুট অপেক্ষা বহুল পরিমাণে উপকারী। যেস্থলে কোনো প্রকার খাদ্য জীর্ণ করান সুকঠিন, সেস্থলে এই মুড়ি ব্যবস্থায় যথেষ্ট

সুফল পাওয়া গিয়াছে। হিক্কা নিবারণে মুড়ির জল অমোঘ ঔষধ। তবে আমরা বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে 'মুড়ি' খাইতে লজ্জা বোধ করি—কারণ দরিদ্র বিবেচনায় আমরা ঘৃণাস্পদ হইয়া পড়িব—এই যা' কথা।

* * *

খাদ্যে বিষ।—সেকালে দোকান হইতে খাবার কিনিয়া খাওয়ার প্রথা কমই ছিল। সেকালে এখনকার মত নানারূপ খাদ্যের ব্যবস্থাও ছিল না। মুড়ি-নারিকেল, আদা-ছোলা-ভিজা, গুড়-বাতাসা—ইহাই ছিল সেকালের সাধারণ গৃহস্থের জলখাবার। বড় লোকেরা ইহার উপর সন্দেশ-রসগোল্লা ব্যবহার করিতেন। ক্ষীর-ছানা-মাখন নবনী—দুগ্ধজাত এ দ্রব্যগুলি সেকালে গরীবেও খাইত, বড়লোকেও খাইত। এ কালে সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা লবণাক্ত খাদ্যসম্ভারের অধিক পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছি, কলিকাতার কচুরি-শিঙ্গাড়ার দোকানগুলি তাহারই ফলে সমৃদ্ধি সম্পন্ন। যদি উৎকৃষ্ট ঘৃতে সে সকল প্রস্তুত হয় এবং দেশের লোক তাহা খাইবার জন্য বেশী আগ্রহান্বিত হন তাহা হইলে আমাদের বলিবার কিছুই নাই,—কিন্তু অনেকস্থলেই ঐ সকল দ্রব্য গলাধঃকরণের কিছুক্ষণ পরেই বুক জ্বলিতে থাকে, অম্লোদ্গার উঠিয়া থাকে, সেরূপ অবস্থায় সে সকল খাদ্য পাকস্থলীতে পঁহুছিয়া যে বিষবৎ ক্রিয়া উৎপন্ন করে তাহাতে তো আর সন্দেহ নাই। আমরা ই, বি, এস, রেলওয়ের দু'একটি ষ্টেসনের কথা জানি,—সে সকল স্থানের লবণাক্ত খাদ্য খাওয়ার পরই ঐরূপ অম্লোদ্গার হইয়া থাকে। রাণাঘাট ষ্টেসনের 'গরম-শিঙ্গাড়া' ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আমরা এই প্রসঙ্গে রাণাঘাটের সবডিবিসন্যাল অফিসার মহাশয়কে এ সকল রহস্য ভেদ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

* * *

কলিকাতার চপ-কাটলেট।

এখনকার দিনে কলিকাতার চপ-কাটলেটের দোকানগুলি হইতেও আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতির কম অন্তরায় ঘটিতেছে না। অনেক স্থলে যেরূপ মাংস প্রভৃতির মিশ্রণে উহা প্রস্তুত করা হয়—তাহা আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতির তো সমূহ বিঘ্নোৎপাদক বটেই, কখনও কখনও বিষ-ক্রিয়াও সদ্যঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে। কিছুকাল পূর্ব্বে—গত বৎসর চৈত্র মাসে হ্যারিসনরোডের এক রেষ্টারেন্ট বা চপ-কাটলেটের দোকানে ছয়টি বাঙ্গালী ছাত্র আহার করিতে গিয়াছিল; আহার করিয়া মেসের বাসায় প্রত্যাবর্ত্তনের পরই ছয়জন পীড়িত হয়। তৎক্ষণাৎ চিকিৎসার ব্যবস্থা আরম্ভ হয়, ফলে পাঁচটি ছাত্র চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিল, একটি কিন্তু উন্মাদগ্রস্ত হইল। খাদ্যপরীক্ষক মহাশয় সংবাদ পাইয়া সেই রেষ্টারেন্টে গিয়া খাদ্য পরীক্ষা করিলেন এবং পচা খাবারের জন্যই যে অনিষ্টোৎপাদন হইয়াছে তাহাও প্রকাশ করিলেন। এরূপ দৃষ্টান্ত দেখিয়াও কি লোকের চৈতন্য হইবে না? এখনকার দিনে ঐরূপ চপ-কাটলেটের দোকানে আহার করায় জাতি ধর্ম্ম তো নষ্ট হইতেছেই, তা' ছাড়া স্বাস্থ্যের অপচয়ে আমাদের পরমায়ু হ্রাসেরও যে কারণ ঘটিতেছে—ইহাই কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা।

বাঙ্গালীর বাঁচিবার ব্যবস্থা।

বাঙ্গালীকে যদি বাঁচিতে হয় তাহা হইলে বাঙ্গালীকে আবার সেকালের আহারের ব্যবস্থা ফিরাইয়া আনিতে হইবে। আর্য্য ঋষিমণ্ডলী ফলমূলাশী ছিলেন, তাহার ফলে তাঁহাদের পরমায়ু লাভ যেরূপ ঘটিত তাহা এখন আরব্যোপন্যাসের কিম্বদন্তী বলিয়া পরিগণিত। ফলভক্ষণে রক্তের ক্রিয়া উত্তমরূপে সাধিত হয়, মেধা ও স্মৃতি শক্তি প্রখর হয়। জীবনে নূতন রক্তকণিকা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালাদেশে সাময়িক ফলমূলেরও অভাব নাই, কিন্তু "বাঙ্গালীর তাহা ভক্ষণের আগ্রহ নাই—এই যা' কথা। দুগ্ধের কথা তো বলিয়াছিই, কিন্তু বাঙ্গাদেশের ঘরে ঘরে আবার গাভী পালনের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হউক, বাঙ্গালী আবার ভারতচন্দ্রের পাটনীর কথার মত 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে' এরূপ কামনা করিতে থাকুক"—এরূপ উপদেশ দিলে শীঘ্র ফলোপদায়ক হইবে না। চাকরিজীবি-প্রবাসী-বাঙ্গালীর পক্ষে জীবনের গতিস্রোতঃ ফিরাইয়া দিয়া আবার পল্লীবাসী হইতে না পারিলে সে ব্যবস্থা হইবে না, কিন্তু তাহা সুদূরপরাহত। তবে চপ-কাটলেটের অভ্যাস ত্যাগ করিয়া, বাজারের চর্ব্বিমিশ্রিত ঘৃতে প্রস্তুত কচুরি-শিঙ্গাড়ার লালসা বিসর্জ্জন দিয়া জলখাবারের স্থলে ফলমূলকে স্থান দান করা বাঙ্গালীর পক্ষে খুব কঠিন ব্যাপার নহে। বাঙ্গালী যদি সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে পারে—তাহা হইলে বাঙ্গালীজাতি আবার রক্ষা পাইবে, নতুবা Imperial Gazetter of India গ্রন্থে সরকারী মৃত্যু তালিকায় বাঙ্গালাদেশের মৃত্যুর হিসাব প্রতিবৎসরই যেরূপ বর্দ্ধিত দেখা যাইতেছে—তাহা আরও বর্দ্ধিত দেখিতে হইবে এবং কালে সেই মৃত্যু সংখ্যা এরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে যে, সত্য সত্য বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্বও বুঝি দেশ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া পড়িবে।

শারীর বিদ্যা।

[মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এল, এম, এস]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

মণিবন্ধসন্ধি।—ইহাতে বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির অধঃপ্রান্তস্থ খলের ন্যায় গর্ত্তযুক্ত অংশের সহিত অর্দ্ধচন্দ্র ও নৌনিভ নামক কূর্চ্চাস্থিদ্বয়ের অগ্রকোণের সন্ধি হইয়া থাকে। অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির অধঃপ্রান্ত সাক্ষাৎভাবে এই সন্ধিতে কূর্চ্চাস্থির সহিত সংহিত হয় না, পরন্তু তৎসংসক্ত ত্রিকোণ তরুণাস্থি 'উপলক' নামক কূর্চ্চাস্থির সহিত সংহিত হইয়া থাকে। বহিঃপার্শ্বে, অন্তঃপার্শ্বে, সম্মুখে ও পশ্চাতে অবস্থিত চারিটী স্নায়ু এই সন্ধির বন্ধনকার্য্য সম্পন্ন করে।

[৪৪শ চিত্র—মণিবন্ধসন্ধি (সম্মুখতল)]

প্র কো ষ্ঠা স্থি দ্ব য়

প্রকোষ্ঠাস্থিযোজনী পুরোগা +

অগ্রিমা মণিবন্ধবন্ধনী +

মণিবন্ধবন্ধনী অন্তঃপার্শ্বিকা +

বর্তুলক

পাণিসঙ্কোচনী পেশীর কণ্ডরা

কর্ণিকা +

মূ ল শ লা কা

[+ ঈদৃশ চিহ্ন স্নায়ুবোধক]

চেষ্টা— এই সন্ধি সম্মুখে, পশ্চাতে, অন্তঃপার্শ্বে ও বহিঃপার্শ্বে খেলিয়া থাকে। এই সকল চেষ্টার মিশ্রণে নানাবিধ বিবর্ত্তনরূপ চেষ্টা সম্পন্ন হয়। তন্তে ভার-ধারণের সুবিধার্থ এই সন্ধির স্নায়ুগুলি শিথিল ও স্থিতিস্থাপক।

শ্লেষ্মধরা কলা—এই সন্ধির মধ্যস্থ শ্লেষ্মধরা কলা শিথিল এবং প্রচুর শ্লেষক-শ্লেষ্মযুক্ত।

করকূর্চ্চান্তরীয় সন্ধি—কূর্চ্চাস্থিসমূহের পরস্পর সন্ধি 'প্রতর-সন্ধি' নামে অভিহিত। এই সন্ধিগুলি তিন ভাগে বিভক্ত, যথা—ঊর্দ্ধশ্রেণীর অস্থিগুলির পরস্পর সন্ধি, অধঃশ্রেণীর অস্থিগুলির পরস্পর সন্ধি এবং ঊর্দ্ধ ও অধঃশ্রেণীর মধ্যে পরস্পর সন্ধি। সকলগুলিই স্নায়ুপট্টিকা দ্বারা উপরে, নিম্নে ও উভয় পার্শ্বে এরূপ ভাবে সম্বদ্ধ যে.

সংহিত কূর্চ্চাস্থিগুলি একখানি অস্থি বলিয়া ভ্রম হয়। তবে 'বর্ত্তুলক' নামক কূর্চ্চাস্থিটী এই সন্ধির বহির্ভাগে দুইটী পৃথক্ স্নায়ু দ্বারা আবদ্ধ থাকে। কূর্চ্চাস্থিগুলির মধ্যে নানা শাখা প্রশাখাবিশিষ্ট শ্লেষ্মধরা কলা বর্ত্তমান থাকে। কূর্চ্চাস্থিগুলির চলচ্ছক্তি অল্প পরিমাণে দেখা যায়।

করতলসন্ধি—এই সকল কোর-সন্ধি প্রধানতঃ করতল নির্ম্মাণিকা মূলশলাকাগুলির সহিত কূর্চ্চাস্থিসমূহের ও অঙ্গুলিনলকগুলির সন্ধি। মূলশলাকাগুলি ঊর্দ্ধদিকে পর্য্যাণক, কূটক, মধ্যকূট ও ফণধর নামক চারিখানি কূর্চ্চাস্থির সহিত, অধোদিকে অঙ্গুলি সমূহের পশ্চিমনলকগুলির সহিত এবং সম্মুখে পরস্পর সন্ধিযুক্ত হইয়া থাকে। ইহাদের সন্ধির বিষয় অস্থিবর্ণন প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ছয়টী পশ্চাতে, আটটী সম্মুখে ও দুইটী মধ্যস্থলে—এইরূপে বিস্তৃত ষোলটী স্নায়ু দ্বারা ইহাদের সন্ধিবন্ধন হইয়া থাকে।

করাঙ্গুলি সন্ধি—চৌদ্দখানি অঙ্গুলিনলকে চৌদ্দটী কোরসন্ধি হইয়া থাকে, যথা অঙ্গুষ্ঠে দুইটী এবং অপর অঙ্গুলি চতুষ্টয়ের প্রত্যেকটীতে তিনটী করিয়া বারটী।

প্রত্যেক অঙ্গুলিসন্ধির বন্ধন কার্য্য সম্মুখে, অন্তঃপার্শ্বে ও বহিঃপার্শ্বে অবস্থিত তিনটী স্নায়ুদ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। 'প্রসারণী' সংজ্ঞক পেশীসমূহের কণ্ডরাগুলির দ্বারা উহাদের পৃষ্ঠবন্ধন কার্য্য সম্পন্ন হয় বলিয়া প্রয়োজনাভাবে স্বতন্ত্র পৃষ্ঠগা স্নায়ু থাকে না।

[৪৫শ চিত্র—বঙ্ক্ষণসন্ধি]

বঙ্ক্ষণোদূখল বেষ্টন স্নায়ুকোষ (কর্ত্তিত
বলয়াকার তরুণাস্থি
স্নায়ুকোষের কর্ত্তিতাংশ
বঙ্ক্ষণান্তরীয়া
স্নায়ুরজ্জু
স্নায়ুকোষ
শ্রোণফলক
ঊর্বস্থি

চেষ্টা—করাঙ্গুলিসমূহ সঙ্কোচ, প্রসার অন্তঃকর্ষণ ও বহিঃকর্ষণরূপ চেষ্টাবান্। অঙ্গুষ্ঠের অপসামর্থ্য আছে অর্থাৎ অন্য অঙ্গুলী-সমূহের উপর উহার অগ্রভাগ যথেচ্ছ ঘুরিতে পারে।

অধঃশাখা সন্ধি।

অধঃশাখার সন্ধি প্রায় উর্দ্ধশাখার স্থায় কেবল অবস্থান ভেদ বশতঃ কিঞ্চিৎ পার্থক্য দেখা যায়।

বঙ্ক্ষণসন্ধি——শ্রোণিফলকের তরুণাস্থি বেষ্টিত বংক্ষণোদূখল নামক কোটরে উর্ব্বস্থির মুণ্ড সংস্থিত হইয়া এই উদূখলসন্ধি নির্ম্মাণ করে। এই স্থানের বৃহৎ স্নায়ুকোষের অভ্যন্তর ভাগ ব্যাপিয়া বৃহৎ শ্লেষ্মধরা কলা থাকে। এই মহান্ স্নায়ুকোষ বংক্ষণোদূখলের পরিধি হইতে উত্থিত হইয়া উর্ব্বস্থির গ্রীবার চারিদিকে সম্বদ্ধ থাকে। অধিকন্তু ইহা শ্রোণিফলকের অবয়বভূত তিনখণ্ড অস্থি হইতে উদ্গত তিনটি স্নায়ুরজ্জু দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হয়। তদ্ভিন্ন 'বংক্ষণমধ্যস্থরজ্জু' নামে একটী দৃঢ় স্নায়ুরজ্জু স্নায়ুকোষের ভিতরে, বংক্ষণো-দূখলের মধ্যস্থ গভীর কোটর হইতে উদ্ভূত হইয়া উর্ব্বস্থির মুণ্ডস্থিত গর্ত্তে সম্বদ্ধ থাকিয়া এই সন্ধিকে আরও দৃঢ় করিয়া থাকে।

জানুসন্ধি—উর্ব্বস্থি, জান্বস্থি ও জঙ্ঘাস্থির দ্বারা নির্ম্মিত এই সন্ধিটী নানা-প্রকারে বন্ধনযুক্ত হইলেও বিশেষ চেষ্টাবান্। তন্মধ্যে জানুকপালের সহিত উর্ব্বস্থির ও জঙ্ঘাস্থির প্রতরসন্ধি এবং উর্ব্বস্থির সহিত জঙ্ঘাস্থির কোরসন্ধি হইয়া থাকে। অনু-জঙ্ঘাস্থি জান্বস্থির মধ্যে প্রবেশ করে না, জঙ্ঘাস্থির পশ্চাতে পৃথক্ভাবে সংহিত হয়।

একটী পাতলা অথচ দৃঢ় স্নায়ুকোষ উর্ব্বস্থি, জান্বস্থি ও জঙ্ঘাস্থিকে বেষ্টন করিয়া এই সন্ধিবন্ধন কার্য্য প্রধানতঃ নিষ্পন্ন করিয়া থাকে। অধিকন্তু এই স্নায়ুকোষ সম্মুখে, পশ্চাতে, অন্তঃপার্শ্বে ও বহিঃপার্শ্বে অবস্থিত চারিটী স্নায়ুরজ্জু দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হয়। তন্মধ্যে সম্মুখের স্নায়ুরজ্জুটী উরুপ্রসারণী পেশীচতুষ্টয়ের সম্মিলিত কণ্ডরার সহিত মিশিয়া এক হইয়া যায়, ইহারই মধ্যস্থলে ভিতরদিকে জানু-কপালাস্থি দৃঢ়ভাবে সম্বদ্ধ থাকে। এইজন্য কেহ কেহ জানুকপালকে কণ্ডরামধ্যস্থ বৃহৎ চণকাস্থি (Sesamoid bone) বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। জানুসন্ধির অভ্যন্তরে অপর পাঁচটী স্নায়ু এবং যোজকরজ্জুসম্বদ্ধ দুইখানি অর্দ্ধচন্দ্রাকার তরুণাস্থি আছে। এই তরুণাস্থি দুইখানির প্রান্তভাগ জঙ্ঘাস্থির শিরঃস্থিত দ্বিমুখ কণ্টকের দুইদিকে সম্বদ্ধ।

চেষ্টা।—এই সন্ধি সঙ্কোচ ও প্রসার—এই দ্বিবিধ চেষ্টাযুক্ত, তন্মধ্যে সঙ্কোচ দ্বারা সক্‌থি পশ্চাদ্দিকে সম্পূর্ণভাবে মুড়িয়া যায় এবং প্রসার দ্বারা সম্মুখদিকে দণ্ডবৎ হয় মাত্র, তদধিক মুড়িয়া যায় না।

শ্লেষ্মধরা কলা—জানুসন্ধির শ্লেষ্মধরা কলা তিনটী; একটী 'সন্ধ্যন্তরীয়া মহতী'—ইহার একটী শাখা ঊর্দ্ধে বিস্তৃত এবং ইহা জানুসন্ধির মধ্যস্থ ও বিনালায়তন, অপর দুইটী শাখা সন্ধির বাহ্যদেশে সংসক্ত। অন্যগুলি সন্ধির বহিঃস্থিত একটী কলাপুট জানুকপাল ও ত্বকের মধ্যে অবস্থিত। অপরটী জানুকপালবন্ধনী স্নায়ুবজ্জুর পশ্চাতে অবস্থিত ও কণ্ডরানুগা। মহতী কলা হইতে অতিরিক্ত শ্লেষ্ম ক্ষরণ হইয়া 'শিবামুণ্ড' বা 'ক্রোষ্টুশীর্ষ' নামক বাতব্যাধি উৎপন্ন হয়। এই সন্ধির সম্মুখে ও পশ্চাতে শ্লেষ্মধরাকলাচ্ছন্ন দুইটী মেদঃপিণ্ড আছে।

জঙ্ঘান্তরীয় সন্ধি—জঙ্ঘাস্থি ও অনুজঙ্ঘাস্থির সন্ধি ঊর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্য—এই তিন স্থানে হইয়া থাকে। ঊর্দ্ধে অনুজঙ্ঘাস্থির উ[illegible] জঙ্ঘাস্থির ঊর্দ্ধ প্রান্তের বহিঃ[illegible] কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্ভাগে সংহিত হয়। [illegible] প্রবসন্ধি ও জানুসন্ধির সম্পূর্ণ বহির্ভূত। [illegible]সন্ধির তুলনায় এই বৈসাদৃশ্য দেখা [illegible] ঊর্দ্ধাস্থি সংযুক্ত দুইটী স্নায়ু এই সন্ধিকে [illegible] দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া থাকে। [illegible] অগ্রিমা, পশ্চিমা ও কোষাকারা—[illegible]টী স্নায়ুও উক্ত সন্ধির বন্ধন করে। [illegible] জঙ্ঘাস্থির অধঃপ্রান্তের বহিঃ[illegible] ত্রিকোণাকার কোরে অনুজঙ্ঘাস্থির [illegible] নিষ্পাদক অধঃপ্রান্ত সংহিত হইয়া কোরসন্ধি নির্ম্মাণ করে। অগ্রিমা, পশ্চিমা, বলয়িকা, ও সন্ধ্যন্তরীয়া নামে চারিটী স্নায়ু এই সন্ধিবন্ধন করিয়া থাকে। এইরূপে সংহিত জঙ্ঘাস্থি ও অনুজঙ্ঘাস্থির অধঃপ্রান্তদ্বয়ের সহিত 'কূর্চ্চশির' নামক অস্থির সন্ধি হয়। এই সন্ধির বিষয় পরে বলা যাইবে। জঙ্ঘাস্থি ও অনুজঙ্ঘাস্থির মধ্যনলকদ্বয় 'জঙ্ঘান্তরালা' নামে দৃঢ় কলা দ্বারা সুবদ্ধ। প্রকোষ্ঠাস্থিদ্বয়ের ন্যায় ইহাদেরও মধ্যনলকদ্বয়ের পরস্পর সংস্পর্শ হয় না।

গুল্‌ফসন্ধি বা পাদসন্ধি—জঙ্ঘাস্থিদ্বয়ের অধঃপ্রান্তের সহিত কূর্চ্চশির অস্থির পল্লকোর সন্ধি হয়—ইহা দুই গুল্‌ফের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া ইহাকে গুল্‌ফসন্ধি বলে। এই সন্ধি আশ্রয় করিয়া সমগ্র পদ সম্মুখে পশ্চাতে, ভিতরদিকে ও কিঞ্চিৎ বাহিরদিকে বিবর্ত্তিত হইতে পারে। এইজন্য ইহাকে পাদসন্ধিও বলা যায়। অগ্রিমা, পশ্চিমা, অন্তঃপার্শ্বিকা ও বহিঃপার্শ্বিকা নামে চারিটী স্নায়ু জঙ্ঘাস্থি, অনুজঙ্ঘাস্থি, কূর্চ্চশির, নৌনিভ, পার্ষ্ণি—এই কয়টি অস্থিতে সংসক্ত থাকিয়া এই সন্ধির বন্ধনকার্য্য নিষ্পন্ন করে।

পাদকূর্চ্চাস্থির সন্ধি—পাদকূর্চ্চাস্থি সমূহের মধ্যে কোন্‌টী কাহার সহিত সন্ধিযুক্ত তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অনেকগুলি স্নায়ু ঐ সকল অস্থির বন্ধন করিয়া থাকে এবং ঐ সকল স্নায়ু পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট বলিয়া এইরূপ স্নায়ুজালবেষ্টিত ও দৃঢ়বদ্ধ পাদকূর্চ্চাস্থিসমূহ ধরকূর্চ্চাস্থির মত একখানি অস্থি বলিয়া বোধ হয়। সেইজন্য প্রাচীনেরা কেহ কেহ প্রত্যেক পদে একখানি করিয়া 'শলাকাধিষ্ঠান' অস্থি আছে বলিয়াছেন।

পাদতল সন্ধি—পাদতলের পশ্চার্দ্ধে অবস্থিত কূর্চ্চাস্থিসন্ধির বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পাদতলের সম্মুখার্দ্ধে পাদ-মূলশলাকাগুলির সম্মুখে ও পশ্চাতে কোরসন্ধি হইয়া থাকে। ইহাদের সন্ধান তিন প্রকার—সম্মুখে পাদাঙ্গুলিসমূহের পশ্চিমনলকগুলির সহিত; পশ্চাতে কোণকত্রয় ও বলনামক কূর্চ্চাস্থির সহিত এবং মূলদেশে পরস্পরের সহিত। তন্মধ্যে পাদাঙ্গুলির পশ্চিম নলকের সহিত সন্ধি অঙ্গুলির সন্ধির ন্যায়। কূর্চ্চাস্থি-গুলির সহিত সন্ধি পাদতলগত, পাদপৃষ্ঠগত এবং সন্ধ্যন্তরীয়—এই তিন প্রকার স্নায়ু দ্বারা সম্বদ্ধ হয়।

অঙ্গুষ্ঠ ব্যতীত অন্যান্য মূলশলাকাগুলি মূলদেশে পরস্পর সংসক্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্ববৎ ত্রিবিধ স্নায়ু দ্বারা সন্ধি বন্ধনকার্য্য সম্পন্ন হয়।

পাদাঙ্গুলি সন্ধি—করাঙ্গুলির ন্যায় পাদাঙ্গুলি সমূহের চৌদ্দটী কোরসন্ধি আছে—অঙ্গুষ্ঠে দুইটি এবং প্রত্যেক অঙ্গুলীতে তিনটি করিয়া বারটি। ইহাদের বন্ধনী স্নায়ু-গুলিও করাঙ্গুলিসন্ধির ন্যায়।

[৪৭শ চিত্র—পাদ সন্ধি বা গুল্ফ সন্ধি]

[+ এইরূপ চিহ্ন স্নায়ুবোধক]

চেষ্টা—পাদস্থুলি সকলের চেষ্টা বা চলন অল্পমাত্র—সঙ্কোচন, প্রসারণ, অন্তঃকর্ষণ ও বহিঃকর্ষণ—এই চারিপ্রকার চেষ্টাই অল্পভাবে বর্ত্তমান।

পেশী পরিচয়।

পূর্ব্বে নরকঙ্কাল বর্ণন প্রসঙ্গে যে অস্থিময় শরীরের বিষয় বলা হইয়াছে, উহা সর্ব্বত্র পেশী দ্বারা আবৃত থাকে এবং পেশী সকল বিবিধ কলা ও ত্বক দ্বারা আবৃত থাকে। অর্থাৎ শরীরের বহির্ভাগ হইতে অভ্যন্তর দিকে প্রথমতঃ ত্বক্, তৎপরে মেদোধরা কলা, পরে মাংসধরা কলা, তৎপরে স্তরে স্তরে পেশী সমূহ এবং তৎপরে অস্থি অবস্থিত। পেশী সমূহের দ্বারা শরীরের সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা সাধিত হইয়া থাকে।

পেশী সকল মাংসময়। মাংস ও পেশীর কোন প্রভেদ নাই। চলিত কথায় পেশীগুলি খণ্ড খণ্ড করিলেই মাংস বলা হয়। পেশীর আকার প্রায় স্থূলমধ্য রজ্জুর ন্যায়, কচিৎ মোটা চাদরের ন্যায় এবং হৃদয়াদি স্থানে কোষের ন্যায়। সুশ্রুতে কথিত হইয়াছে যে পেশী সকল সন্ধি, অস্থি, সিরা ও স্নায়ু সমূহকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে এবং স্থানভেদে আবশ্যক মত কঠিন, কোমল, স্থূল, সূক্ষ্ম, আয়ত, গোল, হ্রস্ব, দীর্ঘ, স্থির, মৃদু, মসৃণ ও কর্কশ হয়। *

রজ্জুর ন্যায় আকারবিশিষ্ট পেশীসমূহের শুভ্র মসৃণ, দৃঢ় ও স্নায়ুময় প্রান্তভাগকে কণ্ডরা † বলে। বিস্তৃত ও স্থূল, পেশী সকলের প্রচ্ছদাকার অর্থাৎ চাদরের ন্যায় আয়ত প্রান্তভাগগুলির কলা ও কণ্ডরা উভয়ের সহিত সাদৃশ্য আছে, এজন্য উহাদিগকে 'কলাকণ্ডরা' ‡ সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায়।

শাখাসমূহের পেশীগুলি পরস্পরসহ ঘনভাবে সন্নিহিত। উভয়ের মধ্যে কেবল খুব পাতলা কলার ব্যবধান আছে মাত্র। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক পেশী পৃথকভাবেও কলাদ্বারা বেষ্টিত, আবার সবগুলি একত্র একটী কলা দ্বারা বেষ্টিত।

প্রধানতঃ পেশীসকলকে আশ্রয় করিয়া সিরা, ধমনী ও স্রোতঃসমূহের শাখা প্রশাখা সমূহ মাংসাদির মধ্যে প্রসারিত হয়। সুশ্রুতে কথিত হইয়াছে যে "পঙ্কোদকস্থিত মৃণাল যেমন ভূমিতে চতুর্দ্দিকে তন্তু বিস্তার করিয়া থাকে, সিরা ধমনী প্রভৃতিও মাংসের মধ্যে সেইরূপ শাখা প্রশাখাদ্বারা বিস্তৃতি লাভ করিয়া থাকে। §

পেশী সকলের সঙ্কোচ ও প্রসার বশতঃ অবয়ব সমূহের আকর্ষণ, প্রসারণ, উৎক্ষেপণ অবক্ষেপণ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার শারীরিক চেষ্টা সাধিত হইয়া থাকে। চেষ্টার বেগপ্রবৃত্তি পেশীর মধ্যে প্রবিষ্ট চেষ্টাবহা নাড়ী সকলের

* তাসাং বহল-পেলব-স্থূলাণু-পৃথু-বৃত্ত-হ্রস্ব-দীর্ঘ-স্থির-মৃদু-শ্লক্ষ্ণ-কর্কশ ভাবাঃ সন্ধ্যস্থি-সিরা-স্নায়ু-প্রচ্ছাদকা যথা-প্রদেশং স্বভাবত এব ভবন্তি

সুশ্রুত, শারীর স্থান, ৫ অঃ।

† ইং—নাম Tendon (টেণ্ডন্)।

‡ ইং—নাম—Apponeurosis—(এপোনিউরোসিস)।

§ যথা বিসমৃণালানি বিবর্দ্ধন্তে সমন্ততঃ।
ভূমৌ পঙ্কোদকস্থানি তথা মাংসে সিরাদয়ঃ।

সুশ্রুত, শারীর স্থানে ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

দ্বারা ঘটে। শারীরিক বলও পেশীমূলক। পেশী সকল সুপুষ্ট ও সুসংহত হইলেই লোককে বলবান বলা হয়।

চেষ্টাবহা ব্যতীত সংজ্ঞাবহা নাড়ীও পেশীর মধ্যে অবস্থিতি করে। এই সকল নাড়ী দ্বারা পেশী সমূহের সঙ্কোচপ্রসার জনিত স্পর্শ সজাতীয় জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

ক্রিয়ার বিশেষত্ব হেতু পেশীসকল 'স্বতন্ত্র' ও 'পরতন্ত্র'— এই দুই ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে স্বতন্ত্র পেশী সকলের ক্রিয়া আপনা হইতে হইয়া থাকে, পুরুষের ইচ্ছার অপেক্ষা করে না—যেমন হৃদয়, আমাশয় প্রভৃতি স্থানের পেশীগুলি স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়াশীল। পরতন্ত্র পেশীসকল পুরুষের ইচ্ছাবশে চালিত হইয়া থাকে, যেমন কর চরণাদি স্থানের পেশী। এই জন্য ইহাদিগের অপর নাম—"ইচ্ছাধীন" পেশী।

ইচ্ছাধীন পেশী সমূহের উভয়প্রান্ত প্রধানতঃ স্নায়ুময়। উহারা উভয়দিকেই অস্থিতে সংবদ্ধ, কচিৎ একদিকে অস্থিতে ও অপরদিকে ত্বকে অথবা একদিকে অস্থিতে ও অপর দিকে স্নায়ুতে সংবদ্ধ থাকে। তন্মধ্যে ঊর্দ্ধদিকের নিবন্ধন প্রায়ই স্থিরতর ও 'প্রভব' নামে অভিহিত এবং নিম্নের নিবন্ধন অধিক ক্রিয়াশীল ও 'নিবেশ' নামে কথিত।

পেশী-সকলের উপাদান—জলৌকা শরীরের ন্যায় সঙ্কোচ-প্রসারশীল মাংসতন্তুগুচ্ছ এবং অল্প সংখ্যক স্নায়ুসূত্র। গুচ্ছীভূত মাংসতন্তু সমূহই পেশী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে পরতন্ত্র পেশীসমূহের মাংসতন্তুগুলি চওড়াদিকে রেখাঙ্কিত, দীর্ঘ এবং নাতিঘন সংঘাত বিশিষ্ট; আর স্বতন্ত্র পেশী সমূহের মাংসতন্তুগুলি ঐরূপ রেখাবিহীন, হ্রস্ব এবং ঘনসংঘাত বিশিষ্ট। স্বতন্ত্র পেশী সকলের উৎপত্তি বা নিবেশ অস্থিসাপেক্ষ নহে—উহারা প্রায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবেই অবস্থিতি করে।

সিরাধমনীজালকনিঃসৃত রক্তের 'লসীকা' নামক স্বচ্ছ জলীয় ভাগের দ্বারা পেশী সকলের পোষণ হয়।

প্রাণীর প্রাণবিয়োগ হইলে পেশী সকল প্রথমে শীঘ্রই সঙ্কুচিত ও কঠিন হইয়া যায়, এই কারণে মৃতদেহে হস্তপদাদির কঠিনতা ঘটে। ইহাকে 'মৃতিকাঠিন্য' (Rigor Mortis) বলে। ইহা অপগত হইলে পেশী সকল পচিতে আরম্ভ হয়।

পেশী সকলের নামকরণ নানাবিধ সূত্র ধরিয়া করা হয়। কখন স্থান ভেদে যেমন 'গ্রীবাপৃষ্ঠিকা' পেশী, কখন উৎপত্তি-নিবেশ ভেদে—যেমন 'উরঃকর্ণমূলিকা' পেশী কখন কার্য্য ভেদে—যেমন 'অঙ্গুষ্ঠপ্রসারিণী' পেশী, কখন আকৃতি ভেদে—যেমন 'দ্বিশিরস্কা' পেশী, কখন যদৃচ্ছাক্রমে—যেমন 'মঞ্জা'—ইত্যাদি।

আয়ুর্ব্বেদকারগণের মতে পেশীর সংখ্যা পাঁচশত*। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের মধ্যে ও কেহ কেহ পেশীর সংখ্যা ৫০১ পাঁচশত

---

* Sappey recogninses 501 muscles distributed as follows :—trunk, 190 ; head 63 ; arms, 98 ; legs 104 ; and alimenlary canal 46. G. D, Thane finds 311 muscles on cach side of the body :—head and front of neck, 82 ; Vertebral colunm and back of neck, 60 ; thorax, 42 ; abdomen, 14 ; arm 59 ; leg, 54, (Morris's Anatomy p. 317.)

এক বলিয়াছেন †। পেশীর সংখ্যা সম্বন্ধে এইরূপ কথঞ্চিৎ মতের ঐক্য পেশী সমষ্টি সম্বন্ধে মাত্র—ভিন্ন ভিন্ন অবয়বের পেশী সংখ্যা সম্বন্ধে নহে। উদাহরণ যথা—সুশ্রুত বলিয়াছেন যে, শাখাসমূহের পেশীর সংখ্যা চারি শত, কিন্তু নব্য মতে শাখাসমূহের পেশীর সংখ্যা দুই শত মাত্র।

এইরূপ মতভেদ গণনার পার্থক্য বশতঃ ঘটিয়া থাকে। যেমন প্রতীচ্যমতে অঙ্গুলি প্রসারণী ও সঙ্কোচনী পেশীগুলি বহুশাখা বিশিষ্ট হইলেও সংখ্যায় অনেকগুলি বলিয়া ধরা হয় না, এক একটী মূল ধরিয়া এক একটী পেশী ধরা হয়। সম্ভবতঃ প্রাচ্যমতে ইহাদের নির্দ্দেশ ও পৃথক্‌ভাবে ক্রিয়াশীলতা ধরিয়া শাখাগুলির পৃথক্ গণনা করা হইয়াছে। ঐরূপ পৃষ্ঠপ্রচ্ছদা পেশীকে প্রাচ্যমতে দুই দিকে স্বতন্ত্র পেশী বলিয়া গণনা করা হয়, কিন্তু প্রতীচ্য মতে উভয় দিকের অংশ একত্র করিয়া একটী পেশী বলিয়া গণনা করা হয়। প্রাচ্যমতের সংখ্যামাত্র সুশ্রুতাদিতে পাওয়া যায়, পৃথক্‌ভাবে বিশেষ বর্ণনার গ্রন্থসমূহ এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে। এইজন্য প্রাচ্যমতের সম্পূর্ণ অনুসরণ এক্ষণে অসম্ভব।

অতএব এই প্রবন্ধে আমরা প্রাচ্য মতের অনুসরণ না করিয়া প্রতীচ্যমতানুসারে পেশী সমূহের বর্ণনা করিতে বাধ্য হইলাম।

পেশী বর্ণনা।

প্রথমে মস্তক ও গ্রীবার পেশী সমূহের বর্ণনা করা যাইতেছে। তন্মধ্যে মস্তক ও মুখমণ্ডলের পেশীগুলিকে বর্ণনা-সৌকর্য্যার্থ দশটী স্থানে বিভক্ত করা যায়। যথা, করোটি পটলে একটী, অক্ষিকোটরের চতুর্দ্দিকে তিনটী, অক্ষি পুটে তিনটী, প্রতি নেত্রগোলকে সাতটী, নাসাপার্শ্বে সাতটী, ঊর্দ্ধহনুর এক এক দিকে চারিটী, অধোহনুর এক এক দিকে তিনটী, হনুদ্বয়ের মধ্যে এক এক দিকে তিনটী, কর্ণ ও মস্তক মধ্যদেশে এক একদিকে তিনটী, হনুদেশে এক এক দিকে দুইটী।

ফ্রোণ্টোপেরাইটালিস্ পেশীর নাম শিরঃশঙ্খা। উহা ললাট হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চাৎ কপাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং মধ্যে সূত্রকলা নির্ম্মিত। শিরঃশঙ্খা পেশী ললাটসঙ্কোচন ও মস্তক আচ্ছাদন—প্রধানতঃ এই দুইটী কার্য্য করিয়া থাকে।

---

† পঞ্চ পেশীশতানি ভবন্তি। তাসাং চত্বারি শতানি শাখাসু, কোষ্ঠে ষট্‌ষষ্টিঃ, গ্রীবাং প্রত্যূর্দ্ধং চতুস্ত্রিংশৎ।
(সুশ্রুত, শারীরস্থান ৫ অঃ।)

[৪৮শ চিত্র—মস্তকের পেশীসমূহ]

(উপরিস্থ স্তর)

শিরশ্ছদা (অগ্রিমাংশ)
নেত্রনিমীলনী
ভ্রূ সংনমনী
নাসৌষ্ঠকর্ষণী
নাসাসেতুকা
নাসাবিস্ফারণী পূর্ব্ব
নাসাবিস্ফারণী পশ্চিম
ওষ্ঠ সমুৎকর্ষণী লঘ্বী
কর্ণী কর্ষণী পশ্চিমা
মুখমুদ্রণী
অধরোৎক্ষেপণী
অধরাবনমনী
কোষ্ঠকর্ষণী গুর্ব্বী
গলপার্শ্বচ্ছদা

শিরশ্ছদাপেশীরমধ্যস্থ
কণ্ডরাময় অংশ
কর্ণোন্নমনী
কর্ণপূর্ব্বিকা
—শিরশ্ছদা (পশ্চিমাংশ)
কর্ণপৃষ্ঠিকা
হনুকূটকর্ষণী
হসনিকা
উরঃ কর্ণমূলিকা
পৃষ্ঠপ্রচ্ছদা

আয়ুর্ব্বেদ—অনুশীলন।

(কবিরাজ শ্রীদীননাথ কবিরত্ন শাস্ত্রী)

যে শাস্ত্র আজ সমুদ্রের ন্যায় বিস্তৃত হইয়াও রোগ ও ঔষধ রাজ্যে মানবের প্রকৃত বা সম্পূর্ণ আধিপত্য জন্মাইতে পারিতেছে না, তাহার সামান্য আভাসে কি হইবে? উক্ত সামান্য আভাসই বা কোথা হইতে আসিল, কেইবা তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা, ঐ আভাস পরম্পরা হইতে কোন কৌশলেই বা এই বিশ্বব্যাপক শাস্ত্রের উদ্ভব হইল, আয়ুর্ব্বেদ তত্ত্ব জিজ্ঞাসু মাত্রেরই এই রহস্য জানিবার কৌতুহল জন্মিতে পারে।

কেবল চিকিৎসা শাস্ত্র কেন, যে কোন বিষয়ই কেন হউক না, মানবের সেই অন্ধকারময় আদিম অবস্থা হইতে বর্ত্তমান অবস্থা চিন্তা করিলে সকলের হৃদয় বিস্ময় রসে প্লাবিত হয়। চিকিৎসা শাস্ত্রের বিষয় আজ একটী পঞ্চবর্ষীয় শিশুও সরল বলিয়া বুঝিতে পারে, প্রথমাবস্থায় তাহা সর্ব্বতোভাবে অজ্ঞাত ছিল। আজ যাহা নগণ্য আবিষ্কার বলিয়া প্রতীত; তাহাতেও এক সময় মানব বুদ্ধি চমকিত হইয়াছিল, জয়নাদে গগন বিদীর্ণ হইয়াছিল। ভাবিয়া দেখিলে ঐ সকল এক দিনের এক মাসের বা এক বৎসরের সংগৃহ নয়। কত যুগ যুগান্তর অতীত হইয়াছে, বহুদর্শন বহু চিন্তা বহু পরীক্ষায় বহু মানব-জীবন ব্যয়িত হইয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? এক ব্যক্তি কোনো বিষয়ের আভাস মাত্র পাইলেন, সেই ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে সেই বিষয়ের উপদেশ দিলেন, এইরূপ উপদেশ-পরম্পরাক্রমে শাস্ত্র মাত্রেরই শিক্ষা চলিয়া আসিতেছে। বেদের সময়ে, পুরাণের সময়ে এবং তন্ত্রের সময়ে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষারও কোন প্রভেদ ছিল না। বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন, অথবা শিক্ষা প্রদান করেন, তাঁহাদিগের শিক্ষা প্রণালী কিরূপ, এবং প্রকৃত চিকিৎসা শাস্ত্রের দিক তাঁহাদিগের কতদূর লক্ষ্য—তদ্বিষয় আমরা সংক্ষেপে—কিছু কিছু আলোচনা করিব।

এ বিষয়ের আলোচনায় ফল কি? তাহা পাঠকগণ স্বয়ং বুঝিয়া লইবেন। শিক্ষা বলিলে কি বুঝায় এবং শিক্ষার গুণ কি ইহা বলা অনাবশ্যক। কেননা শিক্ষার স্রোতের পূর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বাধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে, সুতরাং শিক্ষার প্রভাবও সাধারণে অবগত হইয়াছেন। পরন্তু শিক্ষার সহিত চিকিৎসার অনেক অংশে সাদৃশ্য বা সাম্য আছে ইহা হয়ত সাধারণে না জানিতে পারেন।

চিকিৎসার যেমন চিকিৎসক, ঔষধ দ্রব্য পরিচারক ও রোগী এই চারিটী পাদ বা অঙ্গ বলিয়া গণ্য, এই কারণেই চিকিৎসককে—

"চতুষ্পাদ বা চতুরঙ্গ বলে।" (১)

* ভিষগ্দ্রব্যাণ্যুপস্থাতা রোগীপাদ চতুষ্টয়ম্।
গুণবৎকারণং জ্ঞেয়ং বিকারব্যুপশান্তয়ে।
(চরক) (১)

শিক্ষারও তেমনি শিক্ষক, গ্রন্থ, অভিভাবক ও শিষ্য এই চারিটিকে পাদ বা অঙ্গ বলা যাইতে পারে। কেন না উহাদের কোনটির অভাবে চিকিৎসা চলিতে পারে না। এবং উহাদের গুণ-দোষের উপর চিকিৎসা বা শিক্ষার উৎকর্ষ অপকর্ষ নির্ভর করে। চিকিৎসা পাদের সহিত শিক্ষাপাদের নিম্নলিখিত সাদৃশ্য প্রতিপাদন করা যাইতে পারে।

"চিকিৎসা পাদ—" (২)

"চিকিৎসক"—যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ দৃষ্টকর্ম্মা, স্বয়ংকৃতী, ক্ষিপ্রহস্ত, শুচি, শূর, চিকিৎসোপযুক্ত সজ্জা ও উপকরণ যুক্ত প্রত্যুৎপন্নমতি, বুদ্ধিমান, উদ্যমশীল, বিশারদ, সত্যধর্ম্মপরায়ণ।

ঔষধ—প্রশস্ত দেশসম্ভূত প্রশস্ত দিনোদ্ধৃত মাত্রোচিত, মনোহার গন্ধবর্ণ রসান্বিত, দোষঘ্ন, অগ্লানিকর।

পরিচারক—স্নেহবান অনিন্দুক বলবান, রোগীরক্ষণতৎপর, বৈদ্যবাক্য প্রতিপালক, শ্রমশীল।

রোগী—আয়ুষ্মান্, ক্লেশসহিষ্ণু, সর্ব্ব দ্রব্য নির্লোভ, আস্তিক, বৈদ্যবাক্য প্রতিপালনকারী।

শিক্ষাপাদ—

শিক্ষক—শাস্ত্রের যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ, দৃষ্টকর্ম্মা, অভিজ্ঞ, ক্ষিপ্রকর্ম্মা শুচি, শূর শিষ্যোপযুক্ত উপকরণ সম্পন্ন, প্রত্যুৎপন্নমতি, বুদ্ধিমান্ উদ্যমশীল, বিশারদ, সত্য ধর্ম্মপরায়ণ।

গ্রন্থ—সুলেখনী প্রসূত-সুসময় লিখিত শিষ্যের ধারণ যোগ্য মনোহারী রস কাব্যাদি-গুণ সমন্বিত চরিত্র সংশোধক, সন্তোষদায়ক, অনপকারী।

অভিভাবক—স্নেহবান্, অনিন্দুক, বলবান্ ছাত্রশাসনপটু শিক্ষক।

শিষ্য—আয়ুষ্মান, ক্লেশসহিষ্ণু, উপদেশ গ্রহণক্ষম, গ্রন্থায়ত্বকরণ সম্পন্ন, নির্লোভ আস্তিক, শিক্ষকোপদেশানুরাগী।

রোগীর রোগ মোচন করিয়া সুনির্ম্মল স্বাস্থ্য সুখ বিতরণ করা যেমন চিকিৎসকের কার্য্য, শিষ্যের মনোমালিন্য দূর করিয়া প্রকৃত জ্ঞানালোক বিতরণ করিয়া দেওয়াও শিক্ষকের তেমনি কর্ত্তব্য। রোগ পরীক্ষার জন্য রোগীর বাহ্য বা অভ্যন্তর দেশ উন্নত করিয়া পরীক্ষা করা যেমন চিকিৎসকের কর্ত্তব্য শিষ্যের অন্তঃকরণ কিরূপ কুসংস্কারাদিতে আচ্ছন্ন তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার পঠনের সহিত তাহার মানসিক বৃত্তিনিচয় নূতন ভাবে পরীক্ষা করাও শিক্ষকের তেমনই কর্ত্তব্য। রোগীর প্রকৃত বয়স ইত্যাদির সহিত দেশকাল প্রভৃতির সামঞ্জস্য করিয়া মাত্রাতে ঔষধ প্রয়োগ করা যেমন চিকিৎসকের কর্ত্তব্য, শিষ্যেরও মানসিক

---

(২) তত্ত্বাধিগতশাস্ত্রার্থো দৃষ্টকর্ম্মা স্বয়ংকৃতী।
লঘুহস্তঃ শুচিঃশূরঃ সজ্জোপস্কর ভেষজঃ॥
প্রত্যুৎপন্নমতির্ধীমান্ ব্যবসায়ী প্রিয়ম্বদঃ।
সত্যধর্ম্মপরো যশ্চ বৈদ্য ঈদৃক্ প্রশস্যতে।
প্রশস্ত দেশেসম্ভূতং প্রশস্তেহহনি চোদ্ধৃতম্।
অল্পমাত্রং মহাবীর্য্যং গন্ধবর্ণ রসান্বিতং॥
দোষঘ্নমগ্লানিকরং মধিকং ন বিকারি যৎ।
সমীক্ষ্য কালেদত্তঞ্চ ভেষজং স্যাদ্ গুণাবহম্॥
সিদ্ধো হস্তহস্তম্পূর্ব্বলবান যুক্তো ব্যাধিত রক্ষণে
বৈদ্যবাক্য কৃদশ্রান্তং প্যাদ পরিচর স্মৃতঃ।
আয়ুষ্মান সত্ত্ববান সাধ্যো দ্রব্যবানাত্ম বসানি,
আস্তিক বৈদ্যবাক্যস্থো ব্যাধিতঃ পাদ উচ্যতে॥

প্রবৃত্তি, মনের গঠন কিরূপ, কোন্ বৃত্তি প্রবল, কোন্ বৃত্তি অপ্রবল, মেধা কেমন, বুদ্ধি কেমন, মনের ভাবাশক্তির কোন দিকে কোন বিষয় শিক্ষার সমধিক ফলোপধায়ক হইতে পারে, ইত্যাদি মনের স্বতঃসিদ্ধ অবস্থা বা গতি, বয়স প্রভৃতি বিচার করিয়া দেশ কাল ইত্যাদি বিবেচনা পূর্ব্বক সুশোভিত শিক্ষা প্রদান করাও শিক্ষকের কর্ত্তব্য, নতুবা শিক্ষা সুসিদ্ধ বা সুফলপ্রদ হইতে পারে না। রুগ্ন ভগ্ন জীর্ণ দেহ সংস্কার এবং মুমূর্ষু জীবনের পুনরানয়নরূপে উৎকৃষ্ট কার্য্য সাধন করেন বলিয়া চিকিৎসক যেমন জীবনদাতা পিতা, অজ্ঞান তিমিরান্ধ বিমূঢ় ব্যক্তির আত্মসংস্কার এবং জ্ঞানালোক বিতরণ করেন বলিয়া শিক্ষকও তেমনি জ্ঞানদাতা পিতা। একটু আধটু তিক্ত প্রভৃতি ঔষধ রোগীর রুচিকর হয় না বলিয়া চিকিৎসককে সময় সময় কল্পনার আশ্রয় লইতে হয়, আপাত অপ্রীতিকর দুর্গম জটিল বিষয় সকল অরুচিকর হয় বলিয়া শিক্ষককেও সময় সময় উপন্যাস ও গল্প প্রভৃতি নানাবিধ কল্পনার আশ্রয় লইতে হয়। অতএব চিকিৎসা যেমন দুরূহ, শিক্ষাও তেমনি দুরূহ। এই কারণে প্রকৃত চিকিৎসক যেমন দুর্লভ, প্রকৃত শিক্ষক তেমনি দুর্লভ। এইরূপ শিক্ষক দুর্লভ বলিয়া শিক্ষাকুশল নীতিনিপুণ কবি বলিয়াছেন,—

"যেমন জলাশয় দুরবগাহ হইলেও কেহ যদি সোপান করিয়া দেন, তবে তাহাতে অবগাহন করা যাইতে পারে, তেমনি ছাত্র দুর্ব্বোধ হইলেও কেহ যদি সোপান অর্থাৎ শিক্ষাপদ্ধতি করিয়া দেন—তাহা হইলে তাহাতে প্রবেশ করা যাইতে পারে।" কিন্তু সুন্দর সোপান প্রভৃতি করিয়া দিবার উপযুক্ত ব্যক্তি পাওয়াই ভার।

চিকিৎসার সহিত শিক্ষার এইরূপ সাদৃশ্য প্রদর্শন প্রকৃত প্রস্তাবে সমীচীন। এইরূপ সাদৃশ্য প্রসঙ্গের তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা চিকিৎসার্থী বা চিকিৎসার উৎকর্ষাভিলাষী, তাঁহাদের যেমন চিকিৎসক, ঔষধ, পরিচারক ও রোগী এই চারিটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, এই চারিটীর উৎকর্ষ বিধানে অনুশীল হওয়া উচিত, তেমনি যাঁহারা শিক্ষার্থী বা শিক্ষার উন্নতিকামী, তাঁহাদিগেরও শিক্ষক, শিষ্য প্রভৃতি চারিটীর অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাদিগের একটী দ্বারায় কখনও শিক্ষার উন্নতি হইতে পারে না। যে কার্য্য পরস্পর যোগসাপেক্ষ, সে কার্য্যের প্রত্যেক অঙ্গের দোষ-বিচার করা বিধেয়। যে আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষা প্রসারে আমরা এই সকল কথা উত্থাপন করিলাম, বলিতে বড়ই দুঃখ হয়, সেই আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার সমস্ত অঙ্গেরই অভাব। সেই সকল অভাব মোচন না করিয়া যাহারা কেবল উন্নতি লইয়াই ব্যস্ত তাঁহাদিগের কথা লইয়া আলোচনা করা আমরা বাস্তবিকই প্রয়োজন মনে করি না।

স্বাস্থ্যবিজ্ঞান।

(পূর্বানুবৃত্তি)

[ডাঃ শ্রীনলিনীনাথ মজুমদার]

প্রাতঃস্নান এবং সন্ধ্যা।

তৃণ, অঙ্গার, (ছাই বা তামাকের গুল) প্রস্তর, বালুকা, লৌহ, চর্ম্ম-লোম (tooth brush) প্রভৃতি নিতান্ত অব্যবস্থিত দ্রব্যে দন্তধাবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত সুব্যবস্থিত উপকরণে দন্তধাবন করিয়া মুখগহ্বর পবিত্র করিবে। তৎপর হস্ত পদ প্রক্ষালন করিয়া শুচি হইবে। ঈদৃশ শুচি ব্যক্তিকে দেবতাগণ রক্ষা করিয়া থাকেন। পিতৃগণ শুচি ব্যক্তির অনুগত হন। রোগ-বীজরূপ রাক্ষসগণ শুচি ব্যক্তিকে স্পর্শ করিতে সক্ষম হয় না। শৌচভ্রষ্ট ব্যক্তি স্নান, দান, তপস্যা, ত্যাগ, মন্ত্র, জপ, ধর্ম্ম এবং বিধিবোধিতক্রিয়া ও মঙ্গলাচার প্রভৃতির ফল কিছুমাত্র লাভ করে না। এ নিমিত্ত নিরন্তর নানাবিধ রোগ-শোকাদির অধীন হইয়া থাকে।

উক্তরূপে শৌচক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক রাত্রিবাস পরিত্যাগ কর্ত্তব্য। যে সকল ব্যক্তির প্রাতঃস্নান সহ্য হয় না, তাঁহারাই সংক্ষেপে-প্রাতঃস্নান করিবেন বলিয়া রাত্রিবাস তৎকালে পরিত্যাগ করিবেন। রাত্রিবাস পরিত্যাগ, হস্তপদাদি প্রক্ষালন, মস্তকে গঙ্গোদক—অভাবে তুলসীযুক্ত জল প্রক্ষেপ করতঃ অগ্রে গাত্র মার্জ্জনী দ্বারা আপাদ মস্তক মার্জ্জন করাকে সংক্ষেপ প্রাতঃস্নান কহে। এতদ্দ্বারা শারীরিক বাহ্যক্লেদাদি বিদূরিত হইয়া দেহ পবিত্র, হর্ষযুক্ত এবং বিমল হইয়া দেহের জড়তা বিদূরিত হয়। প্রত্যেকবার মূত্রত্যাগান্তে হস্তপদ প্রক্ষালনেও উক্ত প্রকার সুফল হইয়া থাকে। অরোগ এবং সহিষ্ণু ব্যক্তি উক্তরূপে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শৌচকার্য্য সমাধা করিয়াই নদ্যাদিতে সমন্ত্র এবং গৃহে হইলে অমন্ত্র প্রাতঃস্নান করিবে। প্রাতঃস্নান স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অমৃত তুল্য। প্রাতঃস্নানে দেহ রোগশূন্য পবিত্র ও সাত্বিকভাবাপন্ন হইয়া দীর্ঘায়ু লাভ হয়। প্রাতঃস্নান সদ্যঃ পাপহর, সদ্যঃ দুঃখবিনাশক, সুখপ্রদ। প্রাতঃস্নানাভ্যাসীগণ প্রায়শঃই মহামারী-জীবাণু বা ম্যালেরিয়ার জীবাণু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন না। অতএব প্রাতঃস্নান যত্নপূর্ব্বক অভ্যাস করা সকলের পক্ষেই নিতান্ত মঙ্গলজনক। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই প্রাতঃস্নান এবং সন্ধ্যাবন্দনা শেষ হওয়া আবশ্যক। প্রাতঃস্নান এবং সন্ধ্যা-বন্দনার উপকারিতা আধুনিক নব্যশিক্ষিতগণ বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া দেশব্যাপী নিত্য নূতন রোগ-শোকের প্রাদুর্ভাব দিন দিনই বাড়িয়া যাইতেছে। পূর্ব্বোক্তরূপে প্রত্যূষে গাত্রোত্থান এবং শৌচ-সদাচার ও প্রাতঃস্নান এবং সন্ধ্যাবন্দনা পরায়ণ ছিলেন বলিয়াই পূর্ব্বকালের ব্যক্তিগণ সুস্থ, সবল, দীর্ঘায়ু ও নীরোগ এবং নিরন্তর

উৎসাহ সম্পন্ন থাকিতেন। উক্তরূপ সদাচার বিহীনতাই বর্ত্তমান কালের স্বাস্থ্যবিহীনতার অন্যতম কারণ। এ নিমিত্ত স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং ভাবী সদ্বংশোৎপাদনকামী ব্যক্তি মাত্রেরই আর পাশ্চাত্য অনাচার-তরঙ্গে অঙ্গ ভাসাইয়া না থাকিয়া প্রাচ্য স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের অনুশীলনে ভক্তিমান হওয়া এবং তদ্রূপ সদাচার অভ্যাস করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। প্রাচ্য বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক কোন সদুপদেশ শ্রবণমাত্রেই পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্তগণ "ইহা কেন করিব; উহা কেন করিব?" ইত্যাদি "কেন" লইয়া উন্মত্ত থাকেন; এবং কথায় কথায় "হাইড্রোজেন, অক্সিজেন" ঘটিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বুঝিয়া লইবার দাবী করেন, সেই দাবীগুলি ভুলিয়া শাস্ত্র বাক্যে বিশ্বাস ভক্তি স্থাপন পূর্ব্বক যথাসাধ্য শাস্ত্রাদেশ প্রতিপালনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কারণ স্থূলজ্ঞানসম্পন্ন পাশ্চাত্য বিদ্যালাভ করিয়া কথায় কথায় "কেন"র সন্নিগুঞ্জন এতকাল পর্য্যন্ত করিয়া দেখা হইয়াছে, তাহাতে সে "কেন"র সদুত্তর প্রাপ্ত না হওয়ায় তদনুসারে অনুষ্ঠিত হয় নাই। সেই অনাচারে পরিচালিত হইয়া তাহার কুফল যখন যথেষ্ট উপভোগ করা হইল, যাহার ফলে আজ পল্লী, নগর শ্মশানভূমিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে, এমন অবস্থায় এখন একবার "কেন"র প্রলাপ ছাড়িয়া দিয়া অন্ধবৎ আপ্ত বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন এবং উপদিষ্ট অনুষ্ঠানে ব্রতী থাকিয়া কিছুদিন পরীক্ষা করিয়া দেখার ক্ষতি কি?

প্রাতঃস্নানার্থী ব্যক্তি সূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত পূর্ব্বদিককে অবলোকন পূর্ব্বক কর্ণদ্বয় মধ্যে তর্জ্জনী অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া বক্ষনিমজ্জিত জলে অবগাহনপূর্ব্বক স্নান করিবে। প্রত্যহ নদী বা পুষ্করিণী, বাপী বা প্রস্রবণে স্নান করাই প্রশস্ত। অধিকক্ষণ স্নান করিবে না। অনভ্যাসীগণ আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন হইতে নিত্য প্রাতঃস্নান অভ্যাস আরম্ভ করিবেন। স্নানান্তে গঙ্গা স্তোত্রপাঠ ও প্রণাম করিবে। গাত্রমার্জ্জনী দ্বারা বল পূর্ব্বক দৃঢ় ভাবে গাত্র মার্জ্জনা করিলে রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া সুচারু হইবার সাহায্য লাভ করিবে। অনন্তর আর্দ্রবস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধৌত পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধান করতঃ গঙ্গামৃত্তিকা অথবা তিলক দ্বারা যথাবিহিত নিয়মে তিলক ধারণ করিবে। তিলক ধারণ পরম পবিত্র কর্ম্ম। তিলক ধারী ব্যক্তি পরম বৈষ্ণব স্বরূপ। অনন্তর পিতৃতর্পণ করা পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহাতে পিতৃলোকের তৃপ্তি সম্পাদন হয়। পিতৃলোক পরিতৃপ্ত হইলে তদ্বংশজাত ব্যক্তিগণ সুস্থ ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত দেহে দীর্ঘায়ু থাকিতে পারেন। তিলক ধারণ ব্যতীত গোদান, তপস্যা, হোম, স্বাধ্যায় ও পিতৃতর্পণাদি কর্ম্ম নিষ্ফল হয়। উক্ত কর্ম্ম সমূহের পূর্ব্বে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিতে হইবে। মৃত্তিকাদির অভাব হইলে জল দ্বারাও ঊর্দ্ধপুণ্ড্র করিয়া সন্ধ্যাবন্দনা বা দেবাদির অর্চ্চনা কর্ত্তব্য। তিলক ধারণে অঙ্গুষ্ঠ ব্যবহার পুষ্টিবৃদ্ধিকরী, মধ্যমা আয়ুবৃদ্ধিকরী, অনামিকা অর্থপ্রদা, প্রদেশিনী মুক্তিদাত্রী হয়েন। যে ব্যক্তি গঙ্গাতীর সম্ভূত মৃত্তিকা দ্বারা তিলক ধারণ করে, সে সূর্য্যরূপধারী হইয়া মোহ অন্ধকার নাশের নিমিত্ত হয়। অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। দ্বিজগণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র মৃত্তিকা দ্বারা বা হোমভস্ম দ্বারা

ত্রিপুণ্ড, আর যদৃচ্ছা প্রাপ্ত চন্দন দ্বারা তিলক ধারণ করিবেন। ব্রাহ্মণ উর্দ্ধপুণ্ড্র করিবেন, ক্ষত্রিয় ত্রিপুণ্ড করিবেন, বৈশ্য অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি তিলক ধারণ করিবেন, শূদ্র বর্ত্তুলাকার তিলক করিবেন। তিলক ধারণে ভগবদ্ভক্তির বৃদ্ধি হয়।

তিলক ধারণান্তর স্ব স্ব ধর্ম্মানুরূপ প্রাতঃ সন্ধ্যা করিবেন। সন্ধ্যা বন্দনা এবং ভগবানে ভক্তি ও বিশ্বাস—সর্ব্বরোগ আরোগ্যের মূল। সন্ধ্যাবন্দনা অন্তে মধ্যাহ্ন কালের পূজা অর্চ্চনার নিমিত্ত দূর্ব্বা চয়ন কর্ত্তব্য। তাহাতে পুষ্পোদ্যানে ভ্রমণ ও সুগন্ধ গ্রহণে স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়া থাকে। অনন্তর কেশ-প্রসাধন, আদর্শ ও মাঙ্গল্য দ্রব্যাদি দর্শন, তরল ঘৃতের মধ্যে স্বীয় প্রতিবিম্ব দর্শন, দীর্ঘায়ু ও স্বাস্থ্যকামী ব্যক্তিগণের নিত্যকর্ম্ম জানিবেন। ইহলোকে মঙ্গল আটপ্রকার, যথা, ব্রাহ্মণ, গো, হুতাশন হিরণ্য, ঘৃত, সূর্য্য, জল এবং রাজা। ইহাদিগকে এবং যতিধর্ম্মীদিগকে দর্শন, স্পর্শন, এবং ভাবনা দ্বারা পরিতুষ্ট করিলে মানবের দেহ মন পবিত্র হয়। বর্ত্তমান সময়ে যতিধর্ম্মীদিগের সংখ্যা নিতান্ত বিরল, এজন্য শুদ্ধাচার পরায়ণা বালবিধবাকে আমরা যতিধর্ম্মাবলম্বিনী মনে করিয়া লইতে পারি। বালবিধবাগণ সৎসঙ্গে সদাচার পরায়ণা থাকিলে তাঁহাদিগকে দেবী বা যতি বলিতে আপত্তি নাই। বৈধব্যধর্ম্ম যে পরম পবিত্র ধর্ম্ম,—তাহা আমরা বিগত ১৩১৬ সালের বৈশাখ সংখ্যা আয়ুর্ব্বেদের ৩০৫ পৃষ্ঠায় আলোচনা করিয়াছি।

ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ শুক্র ধারণ, দয়া, ক্ষমা, ধ্যান, সত্যবাক্য কথন, হিংসা পরিত্যাগ, নিষ্পাপ অন্তঃকরণ, পরদ্রব্যে লোভ না করা প্রভৃতি মধুর ভাবে জীবন যাপনে কৃতসংকল্প হইয়া শুদ্ধাচার পরায়ণ হইতে পারিলেই স্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল নিশ্চয় লাভ করা যায়। অতএব প্রভাতে উঠিয়াই সৎসংকল্প সকল লইয়া সমস্ত দিনের জন্য প্রস্তুত হওয়া স্বাস্থ্যকামীর পক্ষে কর্ত্তব্য। এইরূপ স্বাস্থ্যরক্ষা করিলেই মানব ধর্ম্ম রক্ষিত হয়। ধর্ম্ম রক্ষা হইলেই শরীর রক্ষা অনিবার্য্য। তাই শাস্ত্রে বলেন, "শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্ম সাধনম্"। অর্থাৎ ধর্ম্ম রক্ষিত হওয়াই শরীর রক্ষার মূল।

আমাদের দুই প্রকার ক্ষুধা হয়। দ্রব্যের কথা স্মরণ হইলে যে মানসিক, লোভ বশতঃ খাইবার ইচ্ছা হয়, তাহাতে পাকাশয়ের খাদ্যের অভাব উপস্থিত হয় না। ইহাকে চক্ষুর ক্ষুধা বলে। আর প্রকৃত খাদ্যের প্রয়োজন বশতঃ যে ক্ষুধা হয় তাহাকেই প্রকৃত ক্ষুধা বলে। চক্ষুর ক্ষুধায় আহার করিলে অজীর্ণ হয়, সুতরাং তাহা কদাচ করিবে না। প্রাতঃস্নান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি সর্ব্বকর্ম্ম সমাধা হইলে যদি কাহারো প্রকৃত ক্ষুধার উদ্রেক হয় তবে তিনি অল্প পরিমাণ ছোলা ভিজা ও ইক্ষু গুড় ভোজন করিবেন। বিদেশীয় "চা" বিস্কুট, পাঁউরুটী প্রভৃতি দ্রব্য কদাচ আহার করিবেন না। তাহাতে অপকার ভিন্ন বিন্দুমাত্রও উপকারের সম্ভাবনা নাই। তবে ক্ষুধার আধিক্য স্থলে অল্প মাত্রায় হালুয়া ব্যবহারও এই অন্নগতপ্রাণ কলির জীবের পক্ষে চলিতে পারে। কিন্তু প্রাতঃক্রিয়া ও সন্ধ্যাদির পর উদর শূন্য থাকা কালে যাহার যতটুকু সহ্য হয়—সেই পরিমাণে দৈহিক ব্যায়াম

করা আবশ্যক। সে উদ্দেশ্যে কেহ বা "ডন্" কেহ বা কুস্তি, কেহ বা কোদালি দ্বারা মাটি কোদান, কুঠার দ্বারা লকড়ী প্রস্তুত প্রভৃতি গৃহস্থলীর সাহায্যকর পরিশ্রমও করিয়া লইতে পারেন। যে পরিমাণ পরিশ্রমে যাহার শরীর কথঞ্চিৎ পরিশ্রান্ত ও ঘর্ম্মাক্ত হয় তাহাই তাহার পক্ষে পরিমিতশ্রম। পরিমিত পরিশ্রম সকলেরই নিতান্ত প্রয়োজন। তদ্বারা দেহ লঘু বোধ হয়, রক্ত সঞ্চালন সুচারু হয় এবং ক্ষুধা পরিবর্দ্ধিত এবং মন উৎসাহিত হয়। পক্ষান্তরে অপরিমিত পরিশ্রমে আবার ঐ সকল গুণের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। পরিমিত পরিশ্রমের পরক্ষণোপযুক্ত বিশ্রামান্তে প্রয়োজনানুসারে অল্প মাত্রায় লঘুপাক ও হিতকর বস্তু আহার করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। যাঁহারা মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়ার পর ভিন্ন আহারাদি করিতে অনিচ্ছুক বা অনভ্যস্ত তাঁহারা প্রাতঃকালীন ভোজন করিলে অস্বাস্থ্যের কারণ হইবে। প্রাতঃকালীন ভোজনে "চা"র অপকারিতা বুঝিয়া উহা পরিত্যাগের চেষ্টায় যত্নপরবশ হইবেন। তৎপরিবর্ত্তে সদ্যঃদোহিত ধারোষ্ণ গব্যদুগ্ধ সেবন পরমোপকারী। তাহাতে অতি অল্পদিনের মধ্যেই স্বর্ণকান্তিলাভ হইয়া থাকে। অভাবে ঈষদুষ্ণ এক বলকের গব্যদুগ্ধও উপাদেয় পথ্য। মুড়িভজা বা ইক্ষুগুড় প্রায় সকলের পক্ষেই সুবিধাজনক হইতে পারে। একমুষ্টি চাউল সহ এক গ্লাস জলও অনেকে পান করিয়া থাকেন। ইহাও কুশার্থীদিগের পক্ষে মন্দ নহে। ফলতঃ নিতান্ত আবশ্যক হইলে প্রাতঃকালের ভোজ্য অতি অল্প মাত্রায় গ্রাহ্য হইতে পারে, নতুবা নহে।

উপযুক্ত সময়ে পরিমিত স্নান, মৌনাবলম্বন অর্থাৎ অতি অল্প বাক্য ব্যবহার, উপবাস, দৈবকার্য্য ও বেদাধ্যয়ন অর্থাৎ ধর্ম্ম শাস্ত্রাদি পাঠ এই গুলিকে নিয়ম বলে। পূর্ব্বোক্ত ভাবে সাধ্যমত সংযম শিক্ষা করিয়া উক্ত নিয়ম সকল প্রতিপালন করিলে স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে। সংযম প্রতিষেধ স্বরূপ, আর নিয়ম—অনুষ্ঠেয় রূপ। দিবসের প্রথম যাম অর্থাৎ চারি দণ্ড কালের মধ্যে উক্ত কর্ম্মসকল সম্পাদন করিয়া দ্বিতীয় যামের জন্য প্রস্তুত হইবে।

দ্বিতীয় যামার্দ্ধকৃত্য।

দ্বিতীয় যামার্দ্ধে বেদাভ্যাস বিহিত আছে। বেদাভ্যাস—ব্রাহ্মণগণের পক্ষে এক কালে তপস্যা ছিল। এখন আর সেকাল নাই। পূর্ব্বকালে বেদ, বেদাঙ্গ ও স্মৃতি ভিন্ন শাস্ত্র ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন করা নিষিদ্ধ ছিল। প্রাচীনগণ বলিয়াছেন যে, বিদ্যা উপার্জ্জন দ্বারা যে পরম গতিলাভ হয়, সে গতি দান, তপস্যা যজ্ঞ, উপবাস, এবং ব্রতাদি আচরণেও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাই সাক্ষাৎ শঙ্কর অবতার শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

> বিদ্যাহি কা ব্রহ্মগতি প্রদায়া।
> বোধো হি কো যস্তুবিমুক্তি হেতু।

যে শিক্ষাতে ব্রহ্মের দিকে গতি করে তাহাকেই বিদ্যা বলে—অর্থাৎ ব্রহ্ম আরাধনা করিবার তাহাই প্রকৃত। বিদ্যাপদবাচ্য অপর সবই অবিদ্যা। যে জ্ঞান লাভে ভববন্ধন হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়, সেই জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞানপদবাচ্য। অধুনা সে সকল মহাবাক্য স্বপ্নে পরিণত হইয়া তত্তৎস্থলে ঠিক তদ্বিপরীত ভাব অবলম্বিত হইতেছে।

এইখানেই আমাদের কলিকলুষ অর্জ্জনের প্রাথমিক ভিত্তি সংস্থাপিত হইতেছে। যত-দিন না এই ভিত্তির সংশোধন হয়, ততদিন লক্ষ লক্ষ চেষ্টাতেও জনসাধারণের কোন প্রকার উপকার সাধিত হইবার প্রত্যাশা করা যাইতেই পারে না। অধুনা, এই গভীর ও প্রকৃত তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি করতঃ দৈনন্দিন সামাজিক অধঃপতনে মর্ম্মাহত হইয়া অনেক স্বদেশহিতৈষী মহাত্মা বালক-শিক্ষা এবং বালকরক্ষা বিষয়ক নানাপ্রকার প্রবন্ধ লিখন এবং উপদেশ প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। আমরা কিন্তু তৎপূর্ব্বে অভিভাবক এবং শিক্ষক-শিক্ষার ব্যবস্থা বিষয়ে মনোযোগ দিতে অনুরোধ করি। কারণ যতদিন ভাবিসন্তানের অভিভাবক এবং শিক্ষকগণ প্রকৃত সংশিক্ষা প্রাপ্ত না হইতেছেন, ততদিন বালকশিক্ষা ও বালক-রক্ষার চেষ্টা কার্য্যকরী হইবে না। কোমল প্রকৃতি বালক বালিকাগণ ঠিক কাঁচা মাটীর মত, যে ছাঁচ তাহাদের স্বভাব স্পর্শ করিবে—তৎক্ষণাৎ তাহারি ছাপ পড়িয়া যাইবে। এজন্য অভিভাবক এবং শিক্ষক যাঁহারা তাহাদের সম্মুখে আদর্শরূপে দণ্ডায়মান, তাঁহাদের চরিত্র নির্ম্মল হওয়াই প্রথম ও প্রধান আবশ্যক। আদর্শ—অনাচারী, মিথ্যাবাদী, রিপুপরতন্ত্র, মদ্যপায়ী প্রভৃতি অসদ্গুণ সম্পন্ন হইয়া কখনই সন্তানকে সদ্গুণ সম্পন্ন করিবার প্রত্যাশা করিতে পারেন না। যদিও কদাচিৎ এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়, কিন্তু তাহা নিতান্ত বিরল। ফলতঃ আদর্শকে নীতিপরায়ণ, ধর্ম্মজ্ঞ, স্বাস্থ্যরক্ষক, জ্ঞানবান প্রভৃতি সদ্গুণ-শালী হইতেই হইবে। বালকবৃন্দ এক্ষণে কোমল প্রকৃতি বিধায় কাঁচা মাটীর তুল্য, সুতরাং তাহারা আদর্শ-পরিত্যাগে চরিত্রগঠন করিতে কদাচই পারিবে না। তার অভি-ভাবক ও শিক্ষকগণ এক্ষণে অনেক জ্ঞান লাভ করিয়া পাকিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা চেষ্টা এবং অভ্যাস দ্বারা স্ব স্ব স্বভাব অনায়াসেই জ্ঞানপূর্ব্বক পরিবর্ত্তন করিয়া আদর্শ সাজিতে পারিবেন। এইরূপে তাঁহারা আদর্শ না সাজিলে অন্য কোনো উপায়ে, কোন প্রকার তীব্র শাসনে বালক-চরিত্র সংশোধন হইতে পারিবে না।

বালক যখন বর্ণপরিচয় দ্বিতীয়ভাগ পড়ে, তখন তাহাকে পড়ান হয় যে, "মিথ্যা কথা কহা বড় দোষ," কিন্তু তাহারা জানে যে, উহা পড়িয়া কণ্ঠস্থ করার দরকার কেবল পরীক্ষায় পাশ হইবার জন্য। আর কাজের বেলায় মিথ্যা কথা বলাই আবশ্যক। কারণ অভিভাবক এবং শিক্ষকগণের নিকট কার্য্যতঃ সে ঐরূপ আচরণ প্রত্যক্ষ করিয়াই অনুকরণ করিয়া থাকে।

আধুনিক বিদ্যালয়সমূহে পারিতোষিক বিতরণের দিনে সর্ব্বকার্য্যের শেষ ভাগে "বালকগণের প্রতি উপদেশ" শীর্ষক একটী ধারা নির্দ্ধারিত থাকে। এই ধারাকে আমরা ততটা বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি না। কেননা বালকগণ বৎসর ব্যাপী বহু উপদেশ গ্রহণ করিয়া পরীক্ষা দিয়াছে, আজ তাহারি পারিতোষিক বিতরণে উৎসাহ প্রদানের দিন, আজিকার ক্ষণিক উপদেশ তাহাদের কর্ণে আদৌ প্রবেশের অবসর পাওয়া স্বাভাবিক হয় না।

যেহেতু তাহারা পারিতোষিক-আনন্দে অনুমংস্থ আছে। তৎপরিবর্ত্তে এই ধারায় শিক্ষক এবং অভিভাবকগণের প্রতি উপদেশ দিবার ব্যবস্থা থাকাই নিতান্ত দরকার। কারণ তাঁহাদের এ সুযোগ আর বৎসরের মধ্যে কোন দিনই ঘটে না।

বালক বালিকাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্বভাব সম্পন্ন করিয়া তুলিতে প্রত্যেক অভিভাবক ও শিক্ষকই ইচ্ছা করেন, কিন্তু কিরূপ আদর্শ তাহাদের সম্মুখীন থাকিলে যে তাহা কার্য্যে পরিণত হয় একথা অনেকেই চিন্তা করেন না। অভিভাবকগণ বালককে স্কুলে পাঠাইয়া এবং গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত, আর স্কুল-কলেজের শিক্ষকগণ পুস্তকে ছাপার লেখাগুলি কোনমতে কণ্ঠস্থ বা গলাধঃকরণ করাইয়া পরীক্ষায় পাশ করাইতে পারিলেই দায়িত্ব হইতে খালাস, বস্তুতঃ বালক যে কিরূপ বিশুদ্ধ [illegible] চরিত্রগঠন করিয়া সমাজে সম্মানবান হইল তাহার দিকে তাহাদের ভ্রূক্ষেপও নাই। বালকগণও কেবল মুখস্থের জোরে অথবা প্রশ্ন চুরি করিয়া কিম্বা [illegible] বন্দোবস্ত করিয়া কোনমতে পাশ করিবার চেষ্টাতেই ব্যতিব্যস্ত। কারণ যেকোনরূপে পাশের ডিপ্লোমা জুটাইতে পারিলেই তিনি লোকসমাজে "সরকারী"রূপে সম্মানিত হইতে পারিবেন। এ বিশ্বাস তাঁহার পিতামাতা ও অভিভাবক এবং শিক্ষকগণকে সহ তাঁহার নিজকেও জড়াইয়া ধরিয়াছে। সুতরাং বালকগণের অনুমান তাহাই কার্য্যে পরিণত করিতেছেন। তজ্জন্যই জনসমাজও সর্ব্বপ্রকারে অধঃপতিত হইতেছে।

সেই নিমিত্ত আমাদের মনে হয়, এক্ষণে যদি সাবেককালের মত সুস্থ দেহ, তেজঃবীর্য্য ও দীর্ঘায়ু, মেধাবী, ধর্ম্মপরায়ণ, ও প্রকৃত বিদ্বান লোক প্রস্তুত করিয়া দেশের উন্নতি করিতে হয়, তবে পরবর্ত্তী বংশের নিকট আকাঙ্ক্ষিত গুণরাজি নিজদিগের মধ্যে প্রথমে শিক্ষার্থী সাজিয়া প্রাচ্য-[illegible] সদুপদেশ গ্রহণে সর্ব্বপ্রকার সদাচরণ অভ্যস্ত করিতে হইবে। "নিজে কিছুই করিব না—কেবল সন্তানকেই শিক্ষা দিব" এই অসার প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া যাইতে বা অসম্ভব জ্ঞান করিয়া লইতে হইবে। সুতরাং আমাদিগের পুরাণোক্তি প্রাতঃকৃত্যাদি প্রথম যামার্দ্ধকৃত্য হইতে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের যাবতীয় উপদেশ শিক্ষক ও অভিভাবক এবং স্কুল কলেজের "ইনস্পেক্টার" প্রভৃতি উচ্চ-কর্ম্মচারীগণকে সমাদরে প্রতিপালন করিতে হইবে। নতুবা শুষ্ক চাকুরী বক্তৃতা দিয়া বা দুইখানি পত্রিকা বা পুস্তক লিখিয়া অথবা তৎস্থলে অঙ্ক চালাইয়া কেবল মাসিক বেতন গ্রহণে পূর্ণ স্বার্থপর থাকিয়া সমাজ নেতৃত্ব লাভ করা চলিতেই পারিবে না।

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট যখন কার্য্যকারিতা বুঝিবার জন্য শিক্ষার ভার ভারতবাসীর কর্তৃত্বেই ছাড়িয়া দিতে স্বীকার করিয়াছেন, তখন এইত সুবর্ণ সুযোগ, এই সময়ে বহু পরীক্ষিত আর্য্যপন্থার শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা যাহাতে হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা নেতৃবৃন্দের অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু তৎপূর্ব্বে অভিভাবক এবং শিক্ষক সম্প্রদায়কে সেই সকল বিষয়ের আদর্শ হইতে হইবে—নতুবা সবই বিফল।

পল্লীগ্রাম ও ম্যালেরিয়া।

আমরা ইতিপূর্ব্বে পল্লীস্বাস্থ্য লইয়া অল্প বিস্তর আলোচনা করিয়াছিলাম, আবার করিব। যাঁহারা সহরে বাস করেন,—সহরের কূপমণ্ডুক হইয়া যাঁহারা সহর ভিন্ন আর কোনো স্থানের কোনও খবর রাখেন না, পল্লীস্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না, কিন্তু পল্লীই হইতেছে দেশরক্ষার প্রধান উপায়। সহরে কলের জল, বা বৈদ্যুতিক আলোকে আমাদের সুখ-সুবিধার পন্থা পরিষ্কৃত হইতে পাবে, কিন্তু আমাদের জীবন ধারণের অবশ্য প্রয়োজনীয় ধান্য-কলায়-মুগ মসুরি—পল্লীর অখিল প্রান্তর ভিন্ন আর কোথাওতো উৎপন্ন হইবার উপায় নাই। সহরের মত পল্লীপ্রদেশে মণিকাঞ্চনের সুলভতা নাই, কিন্তু স্বর্ণ রজত অলঙ্কার বিহীনা-পল্লীরাণীর অঙ্গলতা হরিৎ-শ্যামল শস্প সম্ভারে যে সৌন্দর্য্য লইয়া বিরাজ করিতেছে, সে রূপলাবণ্যের সাধনা করিবার সৌভাগ্য লইয়া সকলে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। সেই জন্যই বাঙ্গালার পল্লীগুলিকে রক্ষা করা যে কত দূর প্রয়োজনীয় তাহা আমরা চিন্তা করিবার অবসর পাই না।

কিন্তু সে চিন্তা আর না করিলে নয়, নানাকারণে বাঙ্গালার পল্লী গুলি ধ্বংস হইতে বসিয়াছে। কৃত্তিবাস পণ্ডিতের ভিটায় ঘুঘু চরিতেছে, কাশীরাম দাসের ভিটা শ্বাপদকুলের আবাস ভূমি হইয়াছে, 'ভারতের' জন্মভূমি প্রায় জনশূন্য শ্মশানে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে। যে নবদ্বীপ এক দিন সাহিত্য-দর্শন-স্মৃতি-পুরাণ, চিকিৎসা-জ্যোতিষের গর্ব্বে সকল দেশের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, রোগের জ্বালায় পিতৃপিতামহের ভিটার মায়া বিসর্জ্জন দিয়া সেখানকার অর্দ্ধেক অধিবাসী আজি দেশত্যাগ করিয়াছে। বিদ্যাসাগরের প্রতিবাসীগণ, বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রামনিবাসীগণ, নবীনচন্দ্রের দেশবাসীগণ এখন আর কেহ দেশের খবর রাখেন না, কারণ রোগের পীড়নে দেশে থাকিবার উপায় নাই। জয়দেবের কেন্দবিল্ব গ্রাম—যে গ্রামে ভক্তের গৃহে একদিন স্বয়ং ভগবান আসিয়া "দেহিপদপল্লবমুদারম্" স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, সে গ্রাম আজি জন শূন্য। বোপদেবের ভিটা কেহ আর চাহিয়া দেখেনা। বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাস-জ্ঞান দাসের জন্মভূমি যে কোথায় ছিল—সে চিন্তা করিবার আবশ্যকতাও এখনকার দিনে কেহ মনে করে না।

কিন্তু কেমন হইল? কেমন করিয়া কাহার অভিসম্পাতে আজি সোণার বাঙ্গালার অধিবাসীগণ দেশত্যাগী হইয়া পড়িল। সহরে আমাদের সুখ-সুবিধা যত প্রকারেই বর্দ্ধিত হউক না কেন, সহর হইতে কেহই কবি-প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নাই। স্মৃতির ব্যবস্থা, দর্শনের মীমাংসা, সাহিত্যের অনুশীলন—ইহাও আমরা সহর হইতে কোনওকালে প্রাপ্ত হই নাই। সহরে অর্থ যথেষ্ট আছে, সহর বাণিজ্যের বন্দর, বণিক সাজিয়া সহর হইতে অর্থ কুড়াইবার চেষ্টা কর, যথেষ্ট

পাইবে, কিন্তু সাহিত্যের সাধনা, ন্যায়ের সিদ্ধান্ত, জ্যোতিষের আলোচনা করিবার স্থান সহর নহে, বাঙ্গালার নিভৃত পল্লী ভিন্ন সে সকলের উর্ব্বর ক্ষেত্র সহরে কোনও কালে প্রশস্ত হয় নাই। আজি কেমন করিয়া কাহার অভিসম্পাতে আমাদের সে পল্লী জননী তাঁহার কৃতী সন্তানদিগকে প্রবাসী সাজাইয়া দারুণ দৈন্য বেশ পরিগ্রহ করিলেন এবং আমরা চেষ্টা করিয়া আবার তাঁহার সেই হৃতশ্রী ফিরাইতে পারি কি না—এই সমস্যার সমাধান করাই কিন্তু এখন আমাদের সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

সহরে বাস করার ফলে পেট ভরাইবার জন্য যাঁহারা পরের চিন্তায় দিবসের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন, ঘরের খবর রাখিবার চিন্তা তাঁহাদের অনেকেরই নাই। অর্থের সাধনায় তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কোন কোন্ দেশ হইতে ধান্য উৎপন্ন হয়—কেমন করিয়া কিরূপ ভাবে সে ধান্যরাশি হইতে আমরা আমাদের প্রধান আহারীয় দ্রব্য চাউল প্রাপ্ত হইয়া থাকি এবং অধুনা দেশে দিন দিনই যে সেই চাউলের মূল্য অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং চেষ্টা করিয়া তাহার প্রতীকার করিতে পারি কিনা—এ সব চিন্তা করিবার অবসর তাঁহাদের আদৌ নাই। অবসরও নাই, প্রবৃত্তিও নাই, প্রবৃত্তি থাকিলে তো অবসর আসিবে।

এখন আমরা জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষের বিচার না রাখিয়া সকলেই গতানুগতিক ভাবে দাসত্বের শৃঙ্খল পরিধান করিয়াছি বটে, কিন্তু এমন একদিন ছিল, যে দিন আমরা দাসত্বকে ঘৃণা করিতাম, জাতি ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া সামাজিক বিধি উল্লঙ্ঘনের ভয়ে আতঙ্কিত হইতাম, জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য সকল জাতির লোকে একাকার পন্থা অনুসরণ করিতে শিহরিয়া উঠিতাম, শাস্ত্র মান্য করিয়া ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া স্ব স্ব জাতির কর্ম্ম পালনে গর্ব্ব অনুভব করিতাম। তখন দেশে অর্থ সুলভ ছিলনা, কিন্তু উদরান্নের সংস্থানের জন্য আমরা তখন তো দেশত্যাগী হই নাই। পল্লীপ্রান্তরের মুক্ত বায়ু তখন আমাদের যেরূপ ভাবে সর্ব্বাঙ্গ শীতল করিত, সহরের সহস্র বৈদ্যুতিক ব্যজনও তাহার সমযোগ্য নহে। স্বচ্ছ স্ফটিক তুল্য নদী-তড়াগের জলপ্রবাহ আমাদের যে স্নিগ্ধতা উৎপাদন করিত, সহরে কলের জলে সে স্নিগ্ধতার সম্ভাবনা কোথায়? পূর্ণিমার চন্দ্র সহরেও প্রকাশ হয় বটে, কিন্তু পল্লী ভিটার আঙ্গিনায় বসিয়া সেই প্রাকৃতিক শোভা যে প্রত্যক্ষ না করিয়াছে, সে কখনই পূর্ণিমার চন্দ্র কিরণে যে কত মাধুরী,—তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবে না। সে কোকিলের কুহুরব, পাপিয়ার কলতান, ভ্রমরের মধু গুঞ্জন—পল্লীবাসী ভিন্ন কাহার শ্রবণযুগল পরিতৃপ্ত লাভ করিতে পারিয়াছে? আমরা একদা পল্লীরাণীর সেই সকল প্রাকৃতিক সুখ উপভোগ করিতাম। হায়, কাহার অভিসম্পাতে আমাদের সে সকল নষ্ট হইল?

অনেকে বলিবেন, ম্যালেরিয়ার জন্য আমাদের সে সুখ-সৌভাগ্য নষ্ট হইয়াছে। অনেকটা একথা সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নহে। আমাদের দেশত্যাগী হইবার মুখ্য কারণ

আমাদের দাসত্বের স্পৃহা,—গৌণকারণ ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়া বঙ্গদেশে আসিয়াছে ১৮০৪ খৃঃঅব্দে। মুর্শিদাবাদ ও কাশিম বাজারে এই রোগের প্রথম আবির্ভাব হয়, কিন্তু তখন ইহার সামান্য সূচনা মাত্র। ঐ সূচনার ২০ বৎসর পরে যশোহর জেলার মহম্মদপুর আক্রমণের ফলে ম্যালেরিয়া যে কি পদার্থ তাহা আমরা চিনিতে পারি। কিন্তু মুর্শিদাবাদ ও কাশিমবাজারে ইহার প্রথম সূচনা যে সময় হইয়াছিল ইংরাজী শিক্ষার সূচনার সঙ্গে সঙ্গে সেই সময় হইতেই আমাদের মনে চাকরি করিবার স্পৃহা জাগিয়া উঠে। সেই জাগরণই হইল আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ। সেই জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে দেশে রেল-ষ্টীমারের আবির্ভাব হইল, ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার হইতে চলিল, দেশের লোকে অল্প স্বল্প ইংরাজী শিখিয়া মোটা মোটা মাহিয়ানার চাকরি পাইতে লাগিল। স্ত্রী-পুত্র লইয়া সেই সময় সর্ব্ব প্রথম বিদেশবাসী হইবার কামনা বাঙ্গালীর প্রাণে জাগিয়া উঠিল। পল্লীজননীর কৃতীসন্তানগণ পল্লীমাতার অঙ্ক শূন্য হইবার ইহাই সর্ব্বপ্রথম কারণ। তাহার পর নানাকারণে দেশে ম্যালেরিয়ার বীজ শিকড় গাড়িয়া বসিল, কাজেই প্রবাসী বাঙ্গালী আর পল্লীভিটা চাহিয়া দেখিলনা, এমনই করিয়া বাঙ্গালার পল্লীগুলি হতশ্রী হইল। কাজেই বলিতেছিলাম, ইংরাজী শিখিয়া গোলামীর স্পৃহাই আমাদের পিতৃ পিতামহের ভিটাগুলি জনশূন্য হইবার মুখ্য কারণ এবং ম্যালেরিয়ার ভয়ে পল্লী পরিত্যাগের স্পৃহা আমাদের গৌণ কারণ।

স্বীকার করি—অনেকে দেশ ত্যাগ করিয়াছেন ম্যালেরিয়ার ভয়ে। কিন্তু দেশে থাকিয়া সে ম্যালেরিয়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তাঁহারা কোনো চেষ্টা করিয়াছেন কি? যাঁহারা পেটের দায়ে দেশ ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের দেশ ত্যাগের কারণ ম্যালেরিয়া নহে, কিন্তু যাঁহারা ম্যালেরিয়ার জন্যই দেশ ত্যাগ করিয়াছেন, পল্লীর প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা ছাড়িয়া সহরের অসূর্য্যম্পশ্য সৌধ গহ্বরে যাঁহারা সখ করিয়া আবাস স্থান নির্ণয় করিয়া লইয়াছেন, তাঁহারা কি পল্লীভিটার সন্ধ্যা জ্বালিয়া প্রতিবাসীদিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া এবং মহামান্য সরকার বাহাদুরের হস্তে সেই সংগৃহীত অর্থ প্রদানান্তর পল্লীর বন জঙ্গলগুলি কাটাইবার জন্য—পুষ্করিণী দীঘিকাগুলির পঙ্কোদ্ধারের জন্য—কর্দ্দমপঙ্কিল-সরসীগুলির সংস্কার সাধনের জন্য মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিতেন না? ম্যালেরিয়া বলিয়া আতঙ্কিত হইলে চলিবে কেন?—শত্রু শিবিরে, তাহাকে বিতাড়িত করিতে [illegible] মূর্চ্ছিত হইলে চলিবে না।

ম্যালেরিয়ার উৎপত্তির কারণ-অনুসন্ধানে অবগত হওয়া যায়, যে দেশ নিম্ন, যে দেশের ভূমি অধিকাংশ সময় সিক্ত, যে দেশে পয়ঃ প্রণালীর সুব্যবস্থা নাই এবং যে স্থান জঙ্গল-বহুল,—ম্যালেরিয়ার আক্রমণ সেই স্থানেই পূর্ণভাবে প্রকটিত হইয়া থাকে। ইহাই যদি ম্যালেরিয়ার কারণ হয়, তাহা হইলে আমাদের বঙ্গভূমিকে ম্যালেরিয়ার হাত হইতে রক্ষা করা কি বিশেষ কঠিন ব্যাপার? ম্যালেরিয়ার তাড়নে আমরা বঙ্গদেশের লোকই যে আজি নূতন বিপর্য্যস্ত এবং

ইহা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশকে ইতিপূর্ব্বে আক্রমণ করে নাই—তাহা নহে, বাঙ্গালা ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশেও এই দুরন্ত রাক্ষসী যে সকল স্থানকে গ্রাস করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সে সকল দেশের অধিবাসীদিগের চেষ্টা ও যত্নে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজিত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া, ম্যালেরিয়া রাক্ষসী সে সকল স্থান হইতে পলায়ন করিয়াছে। ১৮৮৭ সালে হাভানার এই দুরন্ত দানবী মৃত্যু সদনে প্রেরণ করিয়াছিল ৩২৫ জনকে, ১৮৮৮ সালে ১০১, ১৮৯০ সালে ১১০, ১৮৯২ সালে ২০৬ ও ১৯০০ সালে ৩৪৪ জনকে শমন-সদনে প্রেরণ করে, কিন্তু ১৯০১ সালের পর হাভানিয়ার কর্ত্তৃপক্ষ ম্যালেরিয়া দমনের জন্য এরূপ জোর জোর করিয়া তুলিল যে, ১৯০৩ সালে ঐ রোগে মৃত্যু সংখ্যা হইল মাত্র ১৬ জনের। সুইডেনহামবন্দরেও ১৯০১ সালে মৃত্যু সংখ্যা ছিল ৬১০, কিন্তু ঐ সময় হইতে চেষ্টা করিয়া ১৯০৫ সালে মৃত্যু সংখ্যা হইল মাত্র ২৩। [illegible] ১৯০০ সালে মৃত্যু সংখ্যা ছিল ১৬৩, কিন্তু তাহার পর বৎসর হইতে ম্যালেরিয়া দমনের চেষ্টার ফলে ১৯০৫ সালে মৃত্যু সংখ্যা দাঁড়াইল মাত্র ৫৪। আমি ম্যালেরিয়ার ইতিবৃত্ত এখানে সম্পূর্ণ রূপে প্রদান করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহিনা, আমার বক্তব্য ম্যালেরিয়া বাঙ্গালার মত অন্যান্য প্রদেশকেও ইতঃপূর্ব্বে আক্রমণ করিয়াছিল এবং সে সকল দেশের অধিবাসীগণ তাহা দেখিয়া বাঙ্গালার পল্লীবাসীদিগের মত রণে ভঙ্গ দিয়া দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করেন নাই, পরন্তু প্রকৃত চেষ্টায় ঐ দুরন্ত ব্যাধিকে দেশ হইতে বিদূরিত করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে কিরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তাহারই পরিচয় দিবার জন্য উপরে সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ করিয়াছি।

অন্যান্য দেশের লোক আমাদের মত বচনবাগীশ নহেন, তাঁহারা প্রকৃত কর্ম্মের উপাসক, প্রকৃত উপাসকের সাধনা নিষ্ফল হইবার নহে; কাজেই তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন। আর আমরা,—আমাদের পল্লী জননী ঐ ম্যালেরিয়ার আক্রমণে প্রতি বৎসর অসংখ্য অসংখ্য সন্তান-সন্ততির বিয়োগ ব্যথা অম্লান বদনে অনুভব করিতেছেন, যে মুষ্টিমেয় অপত্য—না মরিয়া বাঁচিয়া থাকিতেছে, তাহাদের পেট জোড়া প্লীহা, পার্শ্ব জোড়া যকৃত ও কুক্ষি জোড়া অগ্রমাস তাহাদের স্বাস্থ্যহীনতার জলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে,—যাঁহাদের আর্থিক অবস্থা সমুন্নত, তাঁহারা দেশ ছাড়িয়া পলায়ণ করিতেছেন, যাঁহাদের গত্যন্তর নাই তাঁহারা উপায় রহিত অবস্থায় ভিটায় সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালিয়া নিজেদের আয়ু প্রদীপ নির্ব্বান প্রায় করিয়া তুলিতেছেন। আমাদের দেশে Ronald Ross জন্মগ্রহণ করেন নাই, ডাক্তার সিলিও আমাদের দেশের নহেন, ডাঃ ষ্টিফেন এবং ক্রিষ্টোফারও আমাদের দেশে নাই, জার্ম্মানীর সুধী অধ্যাপক কক (Kocu) ও আমাদের দেশের নহেন, সুতরাং তাঁহারা আমাদের এই ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট দেশের কথা চিন্তা করিয়া তাঁহাদের দেশের মত ম্যালেরিয়া দূর করিবার উপদেশ প্রদান না করিলেও আমাদের দেশেও তো কর্ম্মীদিগের অভাব নাই [illegible] পি. সি. রায়, স্যার জগদীশ চন্দ্র

বসু, রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর প্রমুখ বাঙ্গালার কৃতী সন্তানগণ 'বাঙ্গালার ম্যালেরিয়া দূর করিবার জন্য যদি চিন্তা করেন, তাহা হইলে আমাদের দেশ হইতে কি ম্যালেরিয়ায়-মৃত্যুসংখ্যা হ্রাস পাইতে পারে না? বাঙ্গালার দেশের কথা চিন্তা করেন এমন মনস্বী আরও অনেক আছেন, তাঁহারাই বা এ সম্বন্ধে কি চিন্তা করিতেছেন? আসল কথা, এরূপ একটা অবশ্য প্রয়োজনীয় চিন্তা শুধু কাগজে কলমে লিপিবদ্ধ [illegible] নিশ্চিন্ত থাকিলেই চ[illegible] হইতেছে [illegible]ভেদী বক্তৃতার জোরে শ্রো[illegible] কর্ণপটাহ বিদীর্ণ করিলেও চলিবেনা,—এই চিন্তার ফলে পল্লীর কৃতী সন্তানগণ যাঁহারা ম্যালেরিয়ার হাত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য চিরকালের মত পল্লীমায়া বিসর্জ্জন দিয়া সহরপ্রবাসী হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে অনুনয় করিয়া—বিনয় করিয়া—তাঁহারাই পল্লীর আশা-ভরসা—সহায় সম্বল—এ সকল কথা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়া যাহাতে তাঁহারা আপন-আপন পল্লীর উন্নতি সাধনে বদ্ধপরিকর হন—তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে, যাঁহাদের অর্থ আছে তাঁহারা অর্থ প্রদান করুন, যাঁহাদের সামর্থ্য আছে তাঁহারা শক্তি প্রদান করুন, যাঁহাদের কর্ত্তব্য বোধ আছে তাঁহারা দায়ীত্ব গ্রহণ করুন,—এইরূপে যাঁহার যতটুকু শক্তি—যাঁহার যতটুকু ক্ষমতা—তিনি ততটুকু আপন পল্লী রক্ষার জন্য যদি ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত না হন, তাহা হইলে এই দুরন্ত দানবীর সহিত যুদ্ধে অন্যান্য দেশের মত আমরাও জয়ী হইব—তাহা অবিসম্বাদিত।

আমরা সহরে বাস করিতেছি, কিন্তু সহরেও তো রোগের জ্বালা কম নহে। পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়া সব চেয়ে বড় ব্যাধি, কিন্তু সহরে সব চেয়ে বড় ব্যাধি হইতেছে যক্ষ্মা বা ক্ষয়রোগ। সহরের বদ্ধ বায়ু, কলকারখানার ধোঁয়া এবং খাদ্যাখাদ্যের বিচারশূন্যতা—মোটামুটি এই কয়টি কারণে আমরা সহরে থাকিয়া যক্ষ্মাগ্রস্থ হইয়া পড়িতেছি। যক্ষ্মাগ্রস্ত হইবার আরও অনেকগুলি কারণ আছে—কিন্তু প্রয়োজন নাই বলিয়া সে সকল পরিচয় এখানে নাই প্রদান করিলাম। যাহা হউক মফঃস্বলের ম্যালেরিয়ার মত সহরেও যক্ষ্মারোগ শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ইহা ভিন্ন সহরে সকল প্রকার ব্যাধিই বারমাস লাগিয়া আছে, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাম, বসন্ত, কলেরা নিউমোনিয়া—কাহাকে ফেলিয়া কাহার কথা বলিব? এক কথায় বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান সহর কলিকাতা তো এখন সকল রোগের আকরভূমি। ইহার উপর কলিকাতার বাসাবাড়ীর কথা আর নাই তুলিলাম। ফলে কলিকাতার অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে—তাহাতে ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক—অনেককে আবার পল্লীভিটায় ফিরিয়া যাইতেই হইবে। তাহাই যদি আর কিছুদিন পরে করিবার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে আর বাঙ্গালার পল্লীগুলি ধ্বংস করিয়া লাভ কি? এখন হইতে কায়মনোবাক্যে পল্লী-সংস্কারে মনোযোগী হইয়া যাহাতে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ আবার সেকালের মত সুখসমৃদ্ধিতে কাটাইতে পারে,—তাহার জন্য চেষ্টা করা উচিত নহে কি? আমাদের অবশ্য ব্যবহার্য্য চাউলের মূল্য দশটাকা

একরূপ নির্দ্দিষ্ট ভাবেই দাঁড়াইয়াছে, ইহার প্রধান কারণ ইতিপূর্ব্বে তো বলিয়াছি—আমরা অনেকেই চাউলের উৎপত্তির বিষয় অবগত নহি, বাজার বসিয়াছে যখন যে দরই হউক কিনিয়া আনিতেছি, রন্ধন হইতেছে, আহার করিতেছি—ইহাই আমাদের চাউলের সহিত সম্বন্ধ। যাঁহাদের অবস্থা স্বচ্ছল, তাঁহারা এরূপ সম্বন্ধ স্থাপনে কাতর নহেন, কিন্তু যাঁহাদিগকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াও সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাঁহাদের পক্ষে এ সম্বন্ধ যে বিশেষ দুর্ব্বিষহ তাহাতে তো কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু যে পর্য্যন্ত বাঙ্গালী জাতি সেই অতীত যুগের অসভ্য প্রথার পল্লী প্রান্তরে আবার কৃষি কর্ম্মে মনঃসংযোগ না করিবে সে পর্য্যন্ত যে তাহার পক্ষে এই দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বাঙ্গালী চাকরিই করুক আর যাহাই করুক, বাঙ্গালী যে এখন 'হাভাতের' দল হইয়াছে। বাঙ্গালীর অধিকাংশ চিরদিনই আগে চাকরি করিত না বটে, কিন্তু তখন তাহাদের চাষে ধান্য হইত, মাঠে ফসল হইত, ক্ষেত্রে তরকারী জন্মিত, পুষ্করিণীতে মৎস্যের অভাব ছিল না। তাহার ফলে তখন বাঙ্গালী এখনকার মত 'হাভাতের' দল হয় নাই। চাকরির স্পৃহাতেই বল, আর ম্যালেরিয়ার তাড়নেই বল, আর সখ মিটাইবার জন্যই বল, বাঙ্গালী পল্লী ছাড়িয়া—সেকালের [illegible] পরিত্যাগ করিয়া আপন কর্ম্মদোষে অগাধ-সলিলে ডুবিয়া মরিতেছে। কে আছ দেশের—আশা ভরসা,—বাঙ্গালীর এই দারুণ দুর্গতির দিনে বাঙ্গালী জাতিকে তাহার ভ্রম দেখাইয়া দিয়া,—তাহাকে তাহার অনেক কালের অভ্যাস পরিত্যাগ করাইয়া পল্লী পরিত্যাগই যে তাহার আজি চরম দুর্গতির কারণ তাহাকে ইহা বুঝাইয়া দিয়া—আবার তাহাকে স্বপথে আনিয়া তাহার উদ্ধার সাধনে চেষ্টা করিবে আজ! যিনি এই কর্ম্মে অগ্রসর হইবেন—আমরা তাঁহাকে কোটী ধন্যবাদ দিব, বিশ্ববাসী তাঁহার গুণগাথা গাহিবে, ভবিষ্যৎ ইতিহাসে তাঁহার নাম অবিনশ্বর ভাবে কীর্ত্তিত হইবে। যদি কাহারও সাহস থাকে, এস—বা[illegible] অসংখ্য [illegible] নিজের পথ দেখাইয়া রক্ষা কর[illegible]।

এইবার দেশ হইতে ম্যালেরিয়ার উচ্ছেদ সাধন কি করিয়া হইতে পারে, সেই কথাটা বলিব। পল্লীগ্রামে ফিরিয়া যাইতে হইলে আমাদিগকে ম্যালেরিয়া দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হইবে, পল্লীগ্রামে ফিরিয়া না যাইলেও আমাদিগকে তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। বৎসরের শতকরা ৩০ জনেরও অধিক লোক ম্যালেরিয়ার আক্রমণে মরিয়া থাকে। একি মৃত্যু! জগতের কোন দেশের লোক তো এরূপভাবে মরণের পথ পরিষ্কার করে না।

আমরা পল্লী ছাড়িয়াছি, কিন্তু যাহারা আমাদের ভিটায় সন্ধ্যা জ্বালিয়া এখনো পল্লীর অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে, চৈত্রের কাটফাটা রৌদ্র, শ্রাবণের অবিরাম বারিধারা, পৌষের হাড়ভাঙ্গা শীত অম্লানবদনে সহ্য করিয়া যাহারা দেশের জন্য—জাতির জন্য পল্লী প্রান্তরে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া সর্ব্বপ্রকারে শস্য উৎপাদনের প্রয়াস করিতেছে, নিরক্ষর অসভ্যজাতি বলিয়া উপেক্ষার হাস্য আজ বিকাশপূর্ব্বক

তাহাদের মরণ তো চাহিয়া দেখিলে চলিবে না! তোমার আমার দেশ রক্ষার চেষ্টা অপেক্ষা তাহারা যে সত্য সত্য কায়মনোবাক্যে দেশের সেবা করিতেছে—এ কথাটা এখন আর মর্ম্মে মর্ম্মে না বুঝিলে চলিবে না, বৎসরে শতকরা যদি ৩০ জন কৃষক ম্যালেরিয়ার আক্রমণে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালীকে বাঁচাইবার আর উপায় থাকিবে না—ইহা ধ্রুব সত্য। পল্লীগ্রামের কৃষককুল নিরক্ষর হউক, অসভ্য হউক, কিন্তু [illegible] হইতেছে সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে [illegible] একমাত্র ভরসা। তাহারা কুশলে থাকিলে তবে বাঙ্গালার সকল জাতি কুশলে থাকিবে, তাহারা রক্ষা পাইলে তবে বাঙ্গালা দেশ রক্ষা পাইবে। বঙ্গের কৃতী পুরুষগণ, তোমরা জন্মভূমিতে ফিরিয়া যাও আর না যাও, তোমরা অগ্রণী হইয়া দুরন্ত ম্যালেরিয়ার হাত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টা কর। তাহাদের আবাসস্থানের পার্শ্বস্থ বন জঙ্গলগুলি কাটাইবার ব্যবস্থা করিয়া দাও, তাহাদের আবাস স্থানের পার্শ্বস্থ নালা ডোবাগুলি বুজাইয়া দিবার বন্দোবস্ত কর; তাহাদের পানীয় জলের দুর্গতি দূর করিবার জন্য তাহাদের রুদ্ধপ্রায় জলাশয়গুলির সংস্কারসাধনের ব্যবস্থা কর, তাহাদের পানার্থ যে জলাশয়গুলি নির্দিষ্ট,—সেগুলিতে পাট পচাইয়া যাহাতে কেহ সে জল কলুষিত না করে, তাহার ব্যবস্থা কর—দেখিবে, তাহাদের আবাসভূমি আবার স্বাস্থ্যনিকেতন হইয়া উঠিবে—পল্লীর সুখসৌভাগ্য অতীতযুগের শান্তিবহন করিয়া আবার ফিরিয়া আসিবে, রূপার পৈঁছাভূষিতে বাহুলতার শোভা বৃদ্ধি করিয়া পল্লীগ্রামের কৃষাণীকুল আকুল হইয়া আবার কৃষকের আনীত শস্য আঙ্গিনাপ্রদেশে বিস্তারণপূর্ব্বক রৌদ্রে দিবার জন্য ব্যগ্রস্বভাবা হইয়া উঠিবে।

উপরে যে চিত্রের কথা উল্লেখ করিলাম—ইহা আমাদের কল্পনার চিত্র নহে—সত্য সত্য বাঙ্গালার পল্লীগুলিতে একদিন ঘরে ঐরূপ চিত্র দেখিতে পাওয়া যাইত। কৃষকের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে ক্ষেত্রে শস্য উৎপন্ন হইত, সেগুলি পরিপক্ক হইলে কাটিয়া আছড়ান হইত, তাহার পর শস্যসম্ভার পৃথক পৃথক করিয়া লওয়ার পরে যখন সেগুলিকে গৃহে আনা হইত—তখন কৃষাণীই সে শস্যরক্ষার অধিকারিণী হইতেন। কৃষাণী সেগুলিকে রৌদ্রে দিয়া শুকাইয়া লইয়া কতকাংশ বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিয়া তদ্দ্বারা তৈল লবণ প্রভৃতি সাংসারিক দ্রব্য সকল ক্রয় করিতেন। হৈমন্তিক ধান্য যখন এইরূপে গৃহজাত হইত—তখন সকল গৃহেই কি এক অদ্ভুত আনন্দস্রোতঃ প্রবাহিত হইত। এখনকার নবান্ন, এখনকার পৌষপার্ব্বণ—সে তো বাঙ্গালীর পূর্ব্বস্মৃতি রক্ষা করিতেছে মাত্র,—একটা শুভদিন দেখিয়া বাজার হইতে নূতন চাউল কিনিয়া আনিয়া এখন আমরা যেমন নবান্নের আয়োজন করি, পৌষপার্ব্বণের ঘটাও এখন আমাদের সেইরূপ। কিন্তু সেকালে কৃষক যখন সারা বর্ষের শ্রম সফল মনে করিয়া নূতন ধান্যরাশির স্তূপে আঙ্গিনাপ্রদেশ আলোকিত করিত—তখনই কৃষাণী সেই ধান্যে নবান্নের

উৎসবের আয়োজন করিত। সে এক কি আয়োজন! পুরোহিত ডাকা হইত, মন্ত্রপাঠ হইত, প্রতিবাসী আত্মীয়স্বজনবর্গকে নিমন্ত্রণ করা হইত, তবে সে নবান্নের ব্যবস্থা সিদ্ধ হইত। বাঙ্গালীর পৌষপার্ব্বণও ছিল—ঐ নূতন ধান্য উৎপন্নের পরে। এখন সে নবান্নের ঘটাও নাই, পৌষ পার্ব্বণের উৎসবও নাম মাত্র আছে।

যাক্ সে কথা। এখন হইতেছে বাঙ্গালায় আবার সেই অতীত যুগ ফিরাইয়া আনিবার কথা, বাঙ্গালার যুবক সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার কথা, বাঙ্গালার পল্লীগ্রাম হইতে ম্যালেরিয়া-রাক্ষসীকে দূর করিবার কথা। পরীক্ষাদ্বারা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, মশকদংশনই ম্যালেরিয়া আক্রমণের সর্ব্বপ্রধান কারণ। ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে ডাঃ ম্যানসনই একথা সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করেন। ইহার পর ডাঃ রস ১৮৯৭—৯৯ খৃঃ অব্দে স্পষ্ট দেখাইয়া দেন যে, কতকগুলি মশক নরশোণিত হইতে অর্দ্ধচন্দ্রাকার প্রাপ্ত জীবাণু শোষণ করিয়া স্বীয় জীবাণু উৎপন্ন করিতেছে। ইহার পর ডাঃ লো ও সামবন প্রকৃতি ইটালী প্রদেশে অবস্থিতি করিয়া ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ লোকসমাজে প্রকাশ করেন। মূলকথা মশকই হইতেছে ম্যালেরিয়ার আক্রান্ত হইবার সর্ব্বপ্রধান কারণ। যে সব দেশে মশক নাই সে সব দেশে ম্যালেরিয়াও নাই। দেশ হইতে ম্যালেরিয়া দূর করিতে হইলে দেশ হইতে আগে মশকবংশ নির্ম্মূলের ব্যবস্থা করিতে হইবে,—অল্পতোয়া নদী-সরিৎগুলি, পুরীষ কর্দ্দম পরিপ্লুত খাল বিল ডোবাগুলি, গৃহপার্শ্বস্থ গর্ত্ত ও নালাগুলিই হইতেছে মশক বিস্তৃতির সর্ব্বপ্রধান স্থান—সেগুলির সংস্কার সাধনের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তা' ছাড়া যাহাতে পল্লীবাসীমাত্রেই গ্রীষ্মের দিনে দাওয়ার পড়িয়া মুক্ত বায়ুতে আরাম সুখ উপলব্ধি না করে—তাহার জন্য উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক তাহারা যাহাতে মশারি ব্যবহারে অভ্যস্ত হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। বর্ষার সময় স্বভাবতঃই জল দূষিত হয়, এজন্য গরম জল পানীয়রূপে ব্যবহার করিবার জন্য তাহাদিগকে পরামর্শ দিতে হইবে—সর্ষপ তৈল উদ্বর্ত্তন সহিত তৈল মর্দ্দন—নানা রোগের উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক—এ কথা তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে।—কৃষকদিগের পক্ষে আর স্বতন্ত্র ব্যায়ামের প্রয়োজন হয় না—কর্ম্মসূত্রে তাহারা যে ব্যায়াম করে তাহাই যথেষ্ট, কিন্তু কৃষিজীবি বা অন্যান্য শ্রমজীবী ভিন্ন যাহারা পল্লীগ্রামে বাস করেন তাঁহাদের পক্ষে যে প্রত্যহ কিছুক্ষণ ধরিয়া ব্যায়াম করা একান্ত প্রয়োজন—একথা পল্লীবাসীর সকলকেই বুঝাইয়া দিতে হইবে।—ফলে এই সকল ব্যবস্থা যদি পল্লীগ্রামে কেহ প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিতে পারেন, তাহা হইলে ম্যালেরিয়া-রাক্ষসী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া যে বাঙ্গালা দেশ হইতে চলিয়া যাইবে তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার প্রবর্ত্তক হইবেন কে?—তাহাই তো চিন্তা! কে এমন কর্ম্মবীর আছেন—যিনি সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ করিয়া বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক এই ম্যালেরিয়া নিবারণের কথা পল্লীবাসীদিগকে বুঝাইয়া দিবেন? বাঙ্গালার পল্লীবাসী

অবশ্য নিশ্চিন্ত নাই, কিন্তু তাঁহাদের অপেক্ষা আমরা নিজেরা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে কর্ম্মফল যে আরও শুভদ হইবে, তাহা নিশ্চিত। সেইজন্ত বলিতেছি,—[illegible] প্রাণ বাঙ্গালীর গৌরব! এস ভাই,—বাঙ্গালী জাতির এই দারুণ দুর্দ্দিনে বাঙ্গালী জাতিকে ম্যালেরিয়ার আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্ত বদ্ধ পরিকর হও,—মৃতপ্রায় বাঙ্গালী জাতিকে রক্ষা করিবার [illegible]। যে জাতির একদিন [illegible] ছিল, সাহস ছিল, শক্তি [illegible] বাঙ্গালায় একদিন আশানন্দের মত বীর, বৈদ্যনাথ-বিশ্বনাথের মত পরাক্রমশালী লোকের অভাব ছিলনা, জাতির লোক একদিন অঙ্গসৌষ্ঠবে বিজ্ঞানালোচনায় সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট সুপরিচিত হইয়াছিল,—যে জাতি দেশের জন্ত—দশের জন্ত—রাজার জাতির সাহায্যের জন্ত—পক্ষান্তরে বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্ত ব্রিটিশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধে যাইতেও পশ্চাৎপদ হয় নাই,—এস ভাই বাঙ্গালার কৃতীসন্তান! সেই দেশকে রক্ষা করিতে চেষ্টা কর, সেই বাঙ্গালীকে বাঁচাইতে চেষ্টা কর—সেই বাঙ্গালার পল্লীগ্রামের ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্ত বদ্ধপরিকর হইয়া পল্লীর পূর্ব্বশ্রী ফিরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা কর;—সমগ্র বাঙ্গালী জাতির অমোঘ আশীর্ব্বাদ দেবনির্ম্মাল্যের মত তোমার মস্তকে পতিত হইবে,—তুমিই বাঙ্গালীজাতির রক্ষার কারণ হইবে।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

আয়ুর্ব্বেদ কলেজ।—নিখিল ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদ সম্মিলন হইতে একটি আয়ুর্ব্বেদ কলেজের প্রতিষ্ঠা হইবে। কথা উঠিয়াছে কলিকাতার অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের সহিত উহা মিশাইয়া সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী একটি কলেজের ব্যবস্থা হউক। ভাল কথা।

ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডে আয়ুর্ব্বেদের সাহায্য।—যশোহর ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড সেখানে "আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয়" প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা [illegible]ছেন, তাহা আমাদের পাঠকগণ [illegible] কুমিল্লা ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড হইতে ২০[illegible] [illegible] দিয়া আমাদের আয়ুর্ব্বেদ কলেজে [illegible]জন ছাত্রকে পাঠা[illegible]ছে। লক্ষ্ণৌ [illegible] ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড সেখানে [illegible] আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক নিযুক্ত করিবেন বলিয়া অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে একজন পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র চাহিয়াছেন। ভারতে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা-বিস্তৃতির পন্থা সুগম হইতেছে বলিতে হইবে।

আয়ুর্ব্বেদ সভা।—আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতি বিধানের জন্ত মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন মহাশয় কলিকাতা মহানগরীতে একটি আয়ুর্ব্বেদ সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। প্রতিষ্ঠাতার পরলোক গমনের পর সভাটি ধ্বংসোন্মুখ হইয়া পড়িয়াছিল। কুমারটুলীর বর্ত্তমান কবিরাজ মহাশয়দিগের প্রভৃত চেষ্টায় উহাকে ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করা হয়। এখন সভার অবস্থা

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ ও টোটকা।

(কবিরাজ শ্রীসুধাংশুভূষণ সেনগুপ্ত)

বাধক রোগে। (১) মুসব্বর ও হিং— সমান ভাগে মিশাইয়া প্রত্যহ প্রাতে [illegible] মাত্রায় কিছুদিন সেবন করিলে রজঃকৃচ্ছ্রতা আরোগ্য হয়। (২) শ্বেতকম্বলের মূলের ছাল দুই আনা ও গোলমরিচ ৩টি, একত্র জল দ্বারা বাটিয়া অন্ততঃ তিন দিবস প্রাতে ও বৈকালে ২বার সেবন করিলে বাধক বেদনার শান্তি হয়। (৩) সোহাগার খই, হিং মুসব্বর ও হীরাকস—সমান ভাগে লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া ২ রতি মাত্রায় জলের সহিত সেবনে বাধকবেদনা নিবারিত হয়।

মূর্চ্ছা বা হিষ্টিরিয়ায়।—আদার রস দ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে মূর্চ্ছা নিবারিত হয়। (২) মধু, হিং, মনঃশিলা ও লবণ একত্র পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে মূর্চ্ছা প্রশমিত হয়। (৩) কাগজ চুরুটের মত প্রস্তুত করিয়া তাহার ধূম নাসিকায় ধরিলে মূর্চ্ছা শীঘ্র নষ্ট হয়। (৪) রসুনের রসের নস্য প্রদান করিলে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয়। (৫) মরিচ পোড়াইয়া তাহার ধূম নাকে লাগাইলে মূর্চ্ছার অপনয়ন হয়।

শ্বাস বা হাঁপানিতে।—(১) বহেড়া ফলের শাঁস ৪।৫টা—[illegible] আনা—পরিমিত মিছরি [illegible] পান করিতে দিবে। (২) শ্বাসের কষ্ট [illegible] আকন্দ চূর্ণ ৵০ মাত্রা প্রত্যহ তিনবার করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে শ্বাসের কষ্ট নিবৃত্তি হয়। (৩) পুরাতন গুড় ও সর্ষপ তৈল সমভাগে মিশাইয়া সেবন করাইলে শ্বাসের কষ্ট নিবারিত হয়।

প্রমেহ। (১) কচি বাবলা পাতা চারি আনা ওজনে লইয়া মধুর সহিত পিষিয়া সেবনে প্রমেহ রোগ আরোগ্য হয়। (২) কাঁচা হরিদ্রার রস ১ তোলা, যজ্ঞডুমুরের রস ১ তোলা ও চিনি চারি আনা একত্র কয়েক দিন সেবনে প্রমেহের জ্বালা-যন্ত্রণা উপশম হয়। (৩) গুলঞ্চ, আমলকী গোক্ষুর ও কাঁচা হরিদ্রা ইহাদের এক একটি ॥০ তোলা, জল ॥০ সের, শেষ ৵০—এই কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে প্রমেহ পীড়ার শান্তি হয়।